ম—মগ্নং ভবাব্ধাবভিতারয়ন্তং
স্বাঙ্কং নয়ন্তং দুরিতং চরন্তং
ভক্তার্তিভারং কৃপয়া হরন্তং
শ্রীরামকৃষ্ণং শরণং ব্রজামি ॥
কৃ—কৃচ্ছ্রং তপোযজ্ঞমহং ন জানে
মন্ত্রং ন মন্ত্রং স্তবনঞ্চ কিঞ্চিৎ ।
জানে সদাহং শরণং বরেণ্যং
হে দীনবন্ধো তব পাদযুগ্মং ॥
ষ—ষড় বৈরিণো মে প্রসভং প্রমত্ত
মাতঙ্গবন্মাং নিয়তং তুদন্তি ।
হা দেবদেবেশ জগন্নিবাস
দাসোঽস্মি তে মাং পরিপাহ্য রক্ষ ॥
না—নাহং প্রযাচে মণিরত্নপূর্ণং
হর্ম্যং মনোজ্ঞং সুরবৃন্দসেব্যং ।
মেরোঃ সমানং রজতং সুবর্ণং
কান্তাং সুরম্যাং ভুবি সম্বিরাজং ॥
য—যদ যোগিবৃন্দা জনহীনদেশে
মগ্নাঃ সমাধৌ পরিচিন্তয়ন্তি ।
যাচে স্বহং তে ভুবনৈকনাথ
ব্রহ্মাদিবন্দ্যং চরণারবিন্দং ॥
ন—নাথৈব জানাসি মতেশ্বরোঽসি
দীনাতিদীনশ্চ পদাশ্রিতোঽহং ।
সংযচ্ছ তস্মৈ স্বকৃপাগুণেন
ভক্তিং তদায়ামচলাং বিশুদ্ধাং ॥
ম—মন্দঃপ্রমত্তো গুণবিত্তিহীনঃ
কথং নু বেদ্মি স্তবনং তবাহং ।
তথা যথা ত্বাং করুণৈকসিন্ধো
প্রাপ্স্যামি তস্মাং প্রবিধেহি শিক্ষাং ।
নমামি নিত্যং তব পাদযুগ্মং
ধ্যায়ামি নিত্যং তব পূর্ণরূপং
করোমি নিত্যং কমলাজ্ঞি পূজাং
নাথ স্বনক্ষত্রবণং ন জানে ॥ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ ।

**আদর্শ-ভক্ত রামচন্দ্রের স্তোত্র।**

সৌম্যং প্রশান্তং কনকোজ্জ্বলাঙ্গং
প্রোৎফুল্লপঙ্কেরুহচারুনেত্রং ।
ভক্তে সুমূর্তিং প্রণমামি ভক্ত্যা
তং দেশিকেন্দ্রং প্রভু রামচন্দ্রং ॥১
সম্বন্ধসংসারসমুদ্রসেতুং
কামাদিরক্ষঃকুলনাশহেতুং ।
বিত্তাবিদেহাত্মজয়াচ যুক্তং
তং দেশিকেন্দ্রং প্রভুরামমীড়ে ॥২
জগতিবিষয়পূর্ণে জন্মমৃত্যুপ্রকীর্ণে
অমৃতফলসমানো রামরত্নস্য সঙ্গঃ ।
সদয়হৃদয়বৃত্ত্যা দর্শিতো যেন লক্ষ্য
তমহং অখিলবন্ধুং রামচন্দ্রং নমামি
বন্দে শ্রীরামং ভববীজনাশনং
বন্দে শ্রীরামং রবিসম্বিভাবং ।
বন্দে শ্রীরামং করুণাপ্রকাশং
বন্দে শ্রীরামং শিবদং সুহাসং ॥৪
শিরসিকমলমধ্যে শুভ্ররূপং স্বদীয়ং
স্মিতমুখশুচিশোভং চিন্তয়ে ধ্যানযোগাৎ
নয়নকমলদৃষ্ট্যা পাহি মাং মৃত্যুমার্গাৎ
শ্রিতপদযুগছায়ং তাবকং দেশিকেশ ॥৫
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ।
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ।
শিবশাসনতঃ শিবসাসনতঃ
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ ॥৬ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ ।

**বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।**

(প্রভু) এস কাঙ্গালশরণ—আমার হৃদয়রঞ্জন ।
তুমি আঁধারে আলোকময়—মোহ-বিনাশন (আমার) ।
দুঃখ জ্বালা তাপে ভরা,— (আমার) ভাঙ্গা বুক আলো করা,
কাঙ্গালের প্রাণসখা—জগতজীবন ॥
যাচিয়ে চরণ দিলে, সব জ্বালা কেড়ে নিলে,
ধরিলে গো কলেবর, (শুধু) আমার কারণ ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র সম, মুখজ্যোতিঃ অনুপম,
(তুমি) কুমার সন্ন্যাসীবর—ভুবনমোহন ॥
কেহ নাহি যার কোথা, তুমি তার আছ তথা,
পতিত জনের গতি—কপাল মোচন (আমার) ॥
কি[illegible]ত দীনের গতি, তুমি না থাকিতে যদি,
তৃণসম ভেসে শেষে দিয়েছ শরণ—
মাগো পেয়েছি চরণ (আজ) ॥
তুমি পিতা তুমি মাতা, কল্পতরু গুরুত্রাতা,
তোমারি কৃপায় নাথ চিনেছি চরণ—
সর্বস্ব আমার তুমি পরম রতন ॥
শুকতরু মুঞ্জরিল, শূন্য প্রাণ ভরে গেল,
উছলিছে শতধারে প্রেম প্রস্রবণ ॥
কে আর তোমার মত, আছে ত্রিভুবনে নাথ,
সহিতে সাগর-সম গরল এমন (আমার) ॥
তুমি শুকদেব সম, গুণ তব অনুপম,
(তুমি) ধ্যানসিদ্ধ মহাযোগী পরশরতন ।
কত লোহা সোনা হল, পরশি চরণ কমল
জুড়াল সকল জ্বালা আমার মতন ।
গুরু-ইষ্ট—মন-প্রাণ, তনু তব যোগোদ্যান,
তোমারি তুলনা তুমি প্রেমিক রতন ।
(প্রাণের রতন, হৃদয় রতন, সাধক রতন)
(যদি) দেছ স্থান শ্রীচরণে, শুধু তব নিজগুণে (প্রভু)
(মাগো) ছেড়নাক হাত যেন ভুলিয়ে কখন—
(মোরে [illegible] ভুলিয়ে নাথ) ॥
তুমি ত[illegible], তুমি প্রাণ আমি কায়া,
তুমি আছ তাই আছি অধমতারণ ।
তোমারি কৃপার বলে, গাই আজ প্রাণ খুলে (মোরা),
জয় রাম—রামকৃষ্ণ দেহি শ্রীচরণ ।
মোরে অধীন বলিয়ে—মা-ও দেহি শ্রীচরণ ।

# সমারসেট মম্

সুনীলকুমার নাগ

লণ্ডন, প্যারিস এবং নিউইয়র্ক—এই তিনটি প্রাণ-চঞ্চল এবং নানাদিক থেকে ঐতিহ্যময় সহরে একখানা করে নিজস্ব বাড়ী থাকাটা নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা। রাজা-মহারাজা, বড় ব্যবসায়ী বা মোটা মাইনের চাকুরে কেউ যদি ঐ সমস্ত সহরে বাড়ী তৈরী করতে পারেন, তাহলে আমরা অবাক হবো না। স্বাভাবিকভাবে এটা বোধহয় শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যদি শোনা যায় যে, না, রাজা-মহারাজা নয়, ব্যবসায়ী নয় বা লাট-কোটও নয়, একজন লেখক লিখে যা রোজগার করেছেন, সেই টাকাতেই ঐ সমস্ত সহরে বাড়ী করেছেন একখানা করে, তাহলে অবাক হতে হয় বৈকি। আর যদি জানা যায় যে, ঐ লেখককেই কোনো এক সময়ে দিনের পর দিন, চাই কি, বছরের পর বছর—একটানা প্রায় দশটা বছর এক-বেলা কি আধ-বেলা খেয়ে কাটাতে হয়েছে, তাহলে তো রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটাই বাস্তবে সম্ভব করেছেন স্বনামধন্য ইংরেজ সাহিত্যিক সমারসেট মম্।

সমারসেট মম্ (William Somerset Maugham, b. 1874) জন্মেছিলেন প্যারিসে। বর্তমানে ওঁর অষ্টাশী বছর চলছে।

বেশির ভাগ মানুষের বেলাতেই দেখা যায়—জীবনটা যে কি, কেমনভাবে অতিবাহিত করতে হবে এ জীবনটা, তা নিয়ে চিন্তার কোনো বালাই নেই। কোনো নিশ্চিত উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা নেই। মানুষমাত্রেই কমবেশি সুখসন্ধানী। সকলেরই [illegible] থাকে একটা সুখকর অবস্থার জন্যে। এবং ব্যক্তিবিশেষের রুচি মাফিক ঐ সুখ পদার্থটা যতক্ষণ সহজেই পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'বাঁচার' কাজটা এতো অনায়াসে চলতে থাকে যে, সে যে বেঁচে আছে, [illegible] থাকে না। কিন্তু এক-একসময় টনক নড়ে। এ যেন অনেকটা পথচারীর হোঁচট খাওয়ার মতো। অকস্মাৎ মনে হয়,—তাই তো, পথ চলছি, অর্থাৎ বেঁচে রয়েছি। এই উপলব্ধিটা হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন সম্বন্ধে যে প্রত্যয় জাগে, সচরাচর তা' দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমন কি অনেকের বেলায় এই বোধটা একবার দেখা দিলে আর কখনো তা মন থেকে মুছে যায় না। ফলে, এঁদের জীবনে একটা লক্ষণীয় ব্যতিক্রম দেখা যায় অন্য সাধারণ মানুষের চাইতে। অন্যেরা যেখানে স্রোতে ভেসে চলে, এঁরা সেখানেই দেখা যায় সর্বদা একটা উদ্দেশ্যের পেছনে ধাবিত হ'চ্ছেন। এঁরা জীবনটা অতিবাহিত করেন একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে। সাফল্য কারো জীবনে আসে, কারো জীবনে আসে না। সাফল্যটা আসলে খুব বড়ো কথা নয়, কারণ তার ওপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ খাটে না। আসল কথা হচ্ছে চেষ্টা, উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একাগ্রভাবে কে কতদূর চেষ্টা করতে পারেন, সেইটেই হ'চ্ছে আসল কথা।

সমারসেট মমের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একেবারে বালক বয়সেই মনে ওঁর অনেক জিজ্ঞাসা দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে এবং নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে ভেতরে ভেতরে একটা তাড়না অনুভব করছেন। এ জিনিষটার সূচনা হয় মাত্র আট বৎসর বয়সে মায়ের মৃত্যুর দিন থেকে এবং উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে দেখা যায় জীবনের লক্ষ্য ওঁর স্থির হয়ে গেছে এবং নিরলসভাবে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কেমন করে ধীরে ধীরে ঘটলো সম্ভব চরিত্রেরই কথায় আসা যাক।

[illegible] থেকে [illegible] ধরে মম-পরিবারের ছেলেরা আইন-ব্যবসায় করে এসেছেন। সমারসেট মমের ঠাকুরদাদার বাবা আইনজীবী ছিলেন, ঠাকুরদা নিজেও ছিলেন আইনজীবী। শুধু তাই নয়, ওঁর ঠাকুরদা

ইংলণ্ডের আইনজীবী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। এবং এ জন্যে উনি রীতিমতো গর্ব অনুভব করেন। সমারসেট মমের বাবা রবার্ট ওরমণ্ডও একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের পঁচিশে জানুয়ারী যখন মমের জন্ম হ'লো, তখন ওঁর বাবা ছিলেন প্যারিসে ব্রিটিশ দূতাবাসের সলিসিটর। জন্ম থেকে জীবনের প্রথম এগারো-বারোটা বছর মমের ফ্রান্সেই কেটেছে। তখন ওঁদের আস্তানা ছিলো প্যারিসে, তবে অন্যান্য সহরেও প্রচুর বেড়িয়েছেন বাবার সঙ্গে।

মম্ ছিলেন মা-বাবার কনিষ্ঠ সন্তান। ওঁর আগে আরো পাঁচটি ভাই ছিলো। দীর্ঘকাল টি, বি-তে ভুগবার পরে মমের মা মারা গেলেন। এ সময়ে ওঁর বয়স ছিল ঠিক আট বৎসর।

মায়ের মৃত্যুর সময়েই মমের অন্তরে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো। জীবন সম্পর্কে কিছুটা যেন ভয়-মিশ্রিত বিস্ময়। কারণ, বাড়ীতে যতো ছবি ছিলো মায়ের, তার কোনোটার সঙ্গেই রুগ্না মায়ের কোনো মিল খুঁজে পান নি। মম-পরিবারের বন্ধুস্থানীয়রা সমারসেটের বাবা-মাকে পরিহাসছলে বলতেন Beauty and the Beast. রবার্ট ওরমণ্ড ছিলেন রীতিমত কুৎসিত, আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন প্রকৃত সুন্দরী। সুন্দরী হিসেবে বেশ নাম-ডাকই ছিল তাঁর। কিন্তু বিয়ের দু'তিন বছর পরে টি, বি, হলো ওঁর। এবং কয়েক মাসের মধ্যেই শরীরটা ভেঙ্গে পড়লো। টি, বি, হবার পরেও আরো চারটি সন্তান হয়েছিলো ওঁর। সমারসেট মম্ কখনো তাঁর মায়ের সুন্দর চেহারা দেখেন নি। কিন্তু শুনেছেন এবং ছবিতেও দেখেছেন মা কতো সুন্দর ছিলেন। তাই রুগ্না মায়ের শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালে মনটা ওঁর ব্যথায় ভরে যেতো। কিন্তু এই রুগ্না মা যে একদিন সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন, সে কথা নিশ্চয়ই বালকের মনে হয়নি কখনো। তাই, মায়ের মৃত্যু একেবারেই স্তব্ধ করে দিল মমকে।

সুন্দর-কুৎসিত, ভালো-মন্দ, জীবন-মৃত্যু—নানা প্রশ্নই জাগতে লাগলো বালক মমের মনে। এবং এই আচ্ছন্ন-করা চিন্তার জট খুলবার আগেই এলো দ্বিতীয় আঘাত। মায়ের মৃত্যুর ঠিক দু'বছর পরে মারা গেলেন মমের বাবা। মা মারা গেছেন টি, বি-তে, বাবা মারা গেলেন ক্যান্সারে। দশ বছর বয়সেই রূঢ়-বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'লো মমকে। কেঁদে হালকা হবার অবসর টুকুও পেলেন না।

বাবার মৃত্যুর পর প্যারিস এবং ফ্রান্স ত্যাগ করবার প্রয়োজন দেখা দিলো। ম্রিয়মান হ'য়ে পড়লেন বালক মম্। উত্তরজীবনে লেখক হিসেবে খ্যাতির চরম শিখরে উঠে মম্ তাঁর আত্মকথা The Summing up-এ লিখেছেন: ফ্রান্সই আমাকে সব কিছু শিখিয়েছে। শিল্প-সাহিত্য, রসবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ, বিচার-বুদ্ধি, এমনকি লিখতেও ফ্রান্সই শিখিয়েছে আমাকে। কাজেই এই [illegible]স ছেড়ে যাবার প্রশ্নে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলো মমের অন্তরাত্মা।

প্যারিসে এ্যাভেনিউ দ আন্তিন-এ যে বাড়ীতে বাস করতেন মম, নানাভাবে ওঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করেছে সে [illegible] বিশেষ করে বাড়ীর ভেতরের সাজ-সজ্জার কথা বলতে [illegible] একটা ঘরে আলমারীর মাথায় হয়তো হাজার বছর আ[illegible] তৈরী প্রাচীন আফ্রিকার কোনো দেশের একটা অদ্ভুত মূর্ত্তি, আর [illegible]কটা ঘরে হয়তো কাঁচের আলমারীর মধ্যে রয়েছে পূর্ব-দেশের গহনার কিছু নিদর্শন, বারান্দার হয়তো দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলছে ভীষণ দর্শন একখানা তুর্কী ভোজালী। এগুলো কি করে এলো এ বাড়ীতে? প্যারিস প্রবাসকারী একেবারে হাল ফ্যাশনে কেতাদুরস্ত ইংরেজ পরিবারে ঐ সমস্ত দ্রব্য থাকা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়।

স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তবু ঐ বিচিত্র-দর্শন জিনিষগুলি ছিলো বাড়ীতে এবং মাঝে মাঝে সংখ্যাবৃদ্ধি হতো। ব্যাপারটা হচ্ছে-মমের বাবার ছিলো দেশভ্রমণের সখ। সুযোগ সুবিধে হলেই চট করে ঘুরে আসতেন বিদেশ থেকে এবং ফেরবার সময় প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু নিদর্শন নিয়ে ফিরতেন। বালক মম ছেলেবেলা থেকেই এই অদ্ভুত জিনিষগুলি দেখতেন আর কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করতেন ঐ সমস্ত দ্রব্য যারা ব্যবহার করে, তারা কে, কেমন দেখতে, কার কেমন স্বভাব ইত্যাদি। দেশভ্রমণের বাসনা এই সময় থেকেই দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো মমের মনে। এবং ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়, চীন, আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ সাগরের বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন মম্। তা'ছাড়া খাস ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ এবং ইয়োরোপের নিকটবর্ত্তী আফ্রিকা ও এশিয়া-মাইনরের বিভিন্ন অঞ্চলও স্বচক্ষে দেখেছেন। আজকের অষ্টাশী-বছরের প্রবৃদ্ধ মমের কাছে যতো শ্রেষ্ঠশিল্পীর নানাধরণের ছবি আছে, তার মূল্য শোনা যায় কয়েক কোটি টাকা। পিকাসো থেকে আরম্ভ করে শক্তিমান শিল্পী মাত্রেরই কিছু না কিছু সৃষ্টি মম্ সযত্নে তাঁর সংগ্রহশালায় রেখেছেন। শোনা যায়, মোট ছবির সংখ্যা তিন শ পঁচানব্বই। মমের সংগ্রহশালাটি ওঁর স্থায়ী আস্তানার সঙ্গেই। লণ্ডন, প্যারিস এবং নিউইয়র্কে মম্ বাড়ী করেছেন নেহাৎ সখের জন্যে। ওঁর স্থায়ী আস্তানা হলো ফ্রান্সের রিভিয়েরা-তে। কাজেই সংগ্রহের জন্যে মমের এই যে ঝোঁকটা—এরও সূত্রপাত খুব ছেলেবেলা থেকেই হয়েছিল বলা চলে।

যাই হ'ক, প্যারিস ছাড়তে হলো মমকে। ছাড়তে হ'লো ফ্রান্স। চলে এলেন স্বদেশে এক কাকার কাছে। ওঁর কাকা ছিলেন হুইটষ্টেবল-এর পুরোহিত। স্বদেশে এসে মোটেই খুসী হ'তে পারলেন না মম্। নানা অসুবিধে দেখা দিতে লাগলো। প্রথমত ভাষার অসুবিধে। একটি এগারো বছরের ছেলে যদি তার মাতৃভাষায় স্পষ্ট করে কথা বলতে না পারে, তা'হলে তার পক্ষে সমবয়সী আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। মাতৃভাষা ইংরেজীর চাইতে ফরাসীটাই ভালো জানতেন মম্। যেটুকুও বা জানতেন ইংরেজী, তা'ও গুছিয়ে বলে উঠতে পারতেন না, কারণ উনি বেশ একটু তোতলাও ছিলেন। তৃতীয়ত গড়নট' ছিলো একটু বেঁটেখাটো। পাড়ায় একটি নতুন ছেলে যদি এতগুলি খুঁত নিয়ে এসে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়, তা হলে আর পাঁচটি চ্যাংড়া ছেলে মিলে তাকে নিয়ে স্বভাবতই কারণে-অকারণে উপহাস করে থাকে। এ রকম নির্মম [illegible] সেই [illegible] বয়সেই হজম করে যেতে হয়েছে। স্বদেশে [illegible] দিন পরেই মমের কাকা ওঁকে স্কুলে ভর্ত্তি করে [illegible] সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে যাওয়া মানেই তাদের হৃদয়হীন উপহাস সহ্য করা। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা দুঃসহ হয়ে উঠলো মমের কাছে। মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন মম্। পারিপার্শ্বিকের চাপে মনটা ওঁর অন্তর্মুখীন হয়ে উঠলো। একদিক দিয়ে চলতে লাগলো

...লের পড়া, আর একদিকে আরম্ভ হ'লো লেখার অভ্যাস। যে ...লের খেলার সাথী কেউ নেই, স্কুলের পড়া শেষ হবার পর সে কি ...রবে? —হয় গল্পের বই পড়বে, আর না হয় এক-আধটা লেখার ...ষ্টা করবে। এইটেই স্বাভাবিক। মম্ দুটোই যুগপৎ আরম্ভ ...রলেন—অর্থাৎ গল্প পড়া আর লেখা, এইভাবেই চলতে লাগলো।

তিন বছর পরের কথা। হঠাৎ একদিন ভীষণ জ্বর হ'লো মমের, ...ঙ্গে ভয়ানক কাশি। ডাক্তার এসে বললেন: টি, বি। টি, বি? ...া টি, বি। নতুন হয়েছে তা' নয়, টি, বি, ওঁর ছেলেবেলা থেকেই ...াছে। পড়াশুনোর পরিশ্রম আর সেই সঙ্গে অনিয়ম—এই দুটো ...ঙ্গে হঠাৎ বেড়ে গেছে। সুতরাং, ডাক্তার পরামর্শ দিলেন: ...াপাতত পড়াশুনো বন্ধ রাখতে হবে, ওষুধপত্র তো খেতেই হবে, সেই ...ঙ্গে চাই পুষ্টিকর খাদ্য এবং বায়ু পরিবর্তন। মমের বাবা যে টাকা, ...য়সা রেখে গিয়েছিলেন, তাই দিয়েই ওঁর বায়ু পরিবর্তনের বন্দোবস্ত ...লো দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ছোট সহরে। দশ মাস এখানে কাটাবার ...র সুস্থ হয়ে উঠলেন মম্। তাই আবার দেশে কাকার কাছে ফিরে ...গলেন।

আগেই বলেছি, মমের কাকা ছিলেন হুইটস্টেবল-এর পুরোহিত। অভিভাবক হিসেবে মমের ভবিষ্যৎ-জীবনের কথা উনি মনে মনে ঠিক ...রে রেখেছিলেন। ওঁর বাসনা ছিলো—মমও ওঁর মতো পুরোহিত ...বে। কিন্তু নানা কারণে পুরোহিত-জীবনের ওপর মমের ইতোমধ্যেই ...শ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল এবং তার প্রধান কারণ ওঁর কাকার চরিত্র। ...ঁর কাকা যেমন ছিলেন অলস তেমনি স্বার্থপর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ...াধারণ বুদ্ধিবৃত্তিরও যথেষ্ট অভাব ছিলো ওঁর। প্রসঙ্গত মমের ...তোতলামীর কথা বলা যেতে পারে। সমবয়সীদের ঠাট্টাবিদ্রূপ যখন ...নেমে উঠতো, তখন অনেক সময় কেঁদে ফেলতেন মম। এই সময় ...ময় ওঁর কাকা উপদেশ দিতেন ভগবানকে ডাকতে। বলতেন: ...একাগ্রভাবে ভগবানকে ডাকতে পারলে মানুষের সব কামনা-বাসনা ...র্ণ হয়। কাকার কথামতো একমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ...রতে লাগলেন মম্ তোতলামী সারিয়ে দেবার জন্যে। এইভাবে ...িছুদিন চলবার পরও যখন তোতলামী সারলো না, তখন ধর্মের প্রতি ...শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললেন মম্।

একজন নাস্তিকের পক্ষে আর যে কাজই হক না কেন, পুরোহিতের কাজ সম্পর্কে আগ্রহ থাকবার কথা নয়। কাকার যদিও এই ক'বছর ধরে মনে মনে ইচ্ছে ছিলো যে, মমকে পুরোহিত বানাবেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার কথা পাড়লেন, কিন্তু মম তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন পুরোহিত না হবার জন্যে। কায়মনোবাক্যে তোতলামী সারাবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তোতলামী সারেনি, সেইজন্যে মমের ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো। আর একদিকে পেশা হিসেবে পুরোহিতের কাজের প্রতিও শ্রদ্ধা চলে গিয়েছিল মমের এবং তার কারণ তাঁর কাকা নিজে। কাজেই ভবিষ্যৎ জীবনের পেশা নির্বাচনের প্রশ্নে রীতিমতো সমস্যা দেখা দিল। মম্ বললেন: ভাষাতত্ত্ব শিখবো, দর্শনশাস্ত্র শিখবো এবং সেজন্যে জার্মানী যাওয়া দরকার। তখন পর্যন্ত বাবার কিছু টাকাকড়ি ছিলো কাকার কাছে, তাই মমের ইচ্ছেতে বাধা দিলেন না উনি।

মম চলে এলেন জার্মানীর হাইডেলবার্গ-এ। জার্মানীতে পৌঁছেই নিজের মানসিক অবস্থা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেলো মমের কাছে। উনি ভেবে দেখলেন—ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস বা দর্শনশাস্ত্র, কোনোটার দিকেই এগোবার জন্যে মনে মনে তেমন কোনো আগ্রহবোধ করছেন না। যদিও প্রখ্যাত দার্শনিক কুনো ফিশারের কয়েকটি লেকচার মম্ শুনলেন ছাত্র হিসেবে নাম না লিখিয়েই। মাস দশেক উদ্দেশ্যহীনভাবে জার্মানীর বিভিন্ন সহরে ঘুরে বেড়ালেন মম্। এই রকম ঘুরতে ঘুরতেই একবার মম্ মিউনিক-এ এসে পড়েছিলেন।

মিউনিকে যদিও মাত্র কয়েক সপ্তাহ ছিলেন মম, কিন্তু তার মধ্যেই ওঁর জীবনের একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিলো। সে সময়ে নব্য ইয়োরোপের মন্ত্রগুরু যুগপ্রবর্তক হেনরিক ইবসেন মিউনিকে ছিলেন। ইবসেন তখন নাট্যকার হিসেবে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছেন। গোটা ইয়োরোপের সমস্ত বড়ো বড়ো সহরে ইবসেনের নাটক অভিনীত হচ্ছিলো সাফল্য এবং উত্তেজনার সঙ্গে। সেই ইবসেনকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হলো মমের। মিউনিকের একটা বিখ্যাত রেস্তোঁরায় বসে বিয়ার পান করতেন ইবসেন। তরুণ মম্ শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে দূর থেকে নিবিষ্ট মনে দেখতেন ইবসেনকে। দেখতেন আর বিস্মিত হতেন।

এই সময়ে, অর্থাৎ জার্মানীতে থাকতেই পড়াশুনোর অভ্যাসটা দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো মমের। ভাগনার, কুনো ফিশার, ডারউইন প্রভৃতির অনেক লেখাই পড়ে ফেললেন। ইবসেনকে দেখবার পর ওঁর নাটকগুলিও পড়তে আরম্ভ করলেন। চাই কি খাস জার্মানীর পটভূমিকায় একটি জার্মান চরিত্র নিয়ে জার্মান ভাষায় একখানা বইও লিখে ফেললেন। কয়েকজন প্রকাশকের কাছে পর পর ধর্ণা দিলেন মম্। কিন্তু সবাই এক কথাই বললেন: এ বই ছাপাবার উপযুক্ত হয়নি। দারুণ বিরক্তিতে সে পাণ্ডুলিপি মম্ নষ্ট করে ফেললেন।

মিউনিক থেকে সোজা স্বদেশে ফিরলেন মম। এবার ওঁর কাকাকে বেশ একটু রুষ্ট দেখা গেলো। যা হ'ক একটা পেশা ঠিক করবার প্রশ্নটা উনি আর ফেলে রাখতে কোনো মতেই রাজী হলেন না। জার্মানীতে গিয়ে ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব বা দর্শনশাস্ত্র কিছুই যে পড়েননি মম বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হননি, সে সব যথাসময়ে খবর পেয়েছেন উনি।

এবার কি করা যায়? নিজেকে প্রশ্ন করলেন মম্। এ সময়ে মমের বয়স ঠিক সতেরো বছর। যদিও অন্তত: পাঁচ বছর ধরে লেখার অভ্যাস করছিলেন মম্ কিন্তু লেখাটা যে পেশা হতে পারে, সে কথা বোধহয় কল্পনায়ও আনতে পারেননি সে সময়ে। অথচ এদিকে কাকা নাছোড়বান্দা, বললেন: তোমার পেশার প্রশ্নটার এবার নিষ্পত্তি করতেই হবে। অবিলম্বে ঠিক করো কি করবে। কিছুদিন ছবি আঁকবার চেষ্টা করলেন মম। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন ওদিকে বিশেষ সুবিধে হবে না। এরপর ঠিক করলেন এ্যাকাউন্ট্যান্ট হবেন। একজন বিখ্যাত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টের সঙ্গে মাস দেড়েক কাটাবার পর মম বুঝলেন এ-কাজেও ... চরিত্র ... কাকা বললেন: পাদ্রী হ'তে না চাও, আমাদের পূর্বপুরুষদের ... যা করে গেছেন, সেই কথাটা ভেবে দেখতে পারো ... অর্থাৎ কিনা আইন পড়ো; ওকালতি করবার জন্যে তৈরী ...। কিন্তু এতেও রাজী হতে পারলেন না মম্।

মমের কাণ্ডকারখানা দেখে কাকা এবং কাকীমা দু'জনেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কাকা তো রীতিমতো বিরক্তই হয়ে উঠলেন বলা যায়। যাই হ'ক, শেষ পর্যন্ত মমু জানালেন যে উনি ডাক্তারী পড়বেন। পেশা হিসেবে ডাক্তারীটা অনেক কাজের চাইতেই ভালো। কাজেই কাকা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হ'লেন। লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হসপিটালের মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হ'লেন মম।

কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, ডাক্তার হিসেবে জীবনে প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যে মমের ক্ষীণতম বাসনাও ছিলো, তা হ'লে খুব ভুল হবে। আসলে ব্যাপারটা হ'চ্ছে লণ্ডনে বসবাস করবার একটা বন্দোবস্ত করা—এবং লণ্ডনে বসবাস করবার একমাত্র উদ্দেশ্যই হ'লো সাহিত্য-সাধনার পথ সুগম করা। লণ্ডন শুধু বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীই নয়, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির একটা বিরাট কেন্দ্রও বটে। চলতি সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হ'লে লণ্ডনের বাইরে থাকবার অনেক অসুবিধে।

চরিত্রের অন্তর্নিহিত সততার জন্যে, একটা 'পলিসি' হিসেবে ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করলেও কখনো ফাঁকি দেন নি মম। ডাক্তারী বইপত্র বেশ মনোযোগের সঙ্গেই পড়তেন। কিন্তু সাহিত্যপাঠ করতেন আরো চারগুণ বেশি মনোযোগ দিয়ে। ইংরেজী, ফরাসী এবং ইতালীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলি বেছে পড়তে আরম্ভ করলেন মম্। আর একদিকে চলতে লাগলো লেখা। পর পর কয়েকটি একাঙ্ক নাটক লিখে ফেললেন। কয়েকজন থিয়েটার-কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটোছুটি করলেন মাস কয়েক ধরে, যদি কোনো একটা নাটক মঞ্চস্থ করা যায়—এই আশায়। কিন্তু কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই কিছুমাত্র আশাভরসা পেলেন না মম্। এমন কি, অনেক থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখতেও অস্বীকার করলেন। ভগবানে বিশ্বাস আগেই হারিয়েছিলেন, এবার বুঝি নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওপরও আস্থা টলে উঠলো। একে বেঁটে, তায় তোতলা, তার ওপর বুকের তলায় টি, বি-র বীজাণু—কিন্তু এ সমস্ত অসুবিধের সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন মম্, বিশ্বাস ছিলো সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু থিয়েটার-কর্তৃপক্ষদের পেছনে ঘোরাঘুরি করে বেশ একটু হতাশ হয়েই পড়লেন। শরীরটাও যেন খারাপ লাগতে লাগলো।

জার্মাণীতে বসে লেখা প্রথম পাণ্ডুলিপিটি যেমন নষ্ট করে ফেলেছিলেন মম, এবারকার রচনাগুলিও ঠিক তেমনি নষ্ট করে ফেলবেন কিনা ভাবছিলেন, কিন্তু এই সময়েই আর একটা কথা মনে হ'লো। মম্ ভাবলেন প্রথমে নাটকের জন্যে চেষ্টা না করে বরং উপন্যাসের জন্যে চেষ্টা করলে কেমন হয়? কথাটা মনে হতেই একাঙ্ক নাটকগুলি প্যাকেট করে স্যুটকেসে রেখে দিয়ে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন মম্। কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা গেলো উপন্যাস নয়, দুটি বড় গল্প তৈরী হয়েছে। লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মম্ বড়-গল্প দুটি বিখ্যাত প্রকাশক ফিশার আনউইনকে ডাক যোগে পাঠালেন। মনের ইচ্ছে, যদি দুটি গল্প একত্রে একখানা বই হিসেবে প্রকাশ করা যায়।

কিন্তু না, সে আশাও পূর্ণ হ'লো না মমের। আনু[illegible] অনেক পরেই ফেরৎ পাঠালেন গল্প দুটি। জানালেন—[illegible] না তাঁর কাজে লাগবে না। আরো জানালেন: নতুন লেখকদের রচনা প্রকাশ করবার আমাদের একটি পরিকল্পনা আছে[illegible] কিন্তু গল্প নয়, উপন্যাস যদি কিছু থাকে আপনার, জানাবেন। পত্রোত্তরে জানালেন: কয়েকদিনের মধ্যেই আমি একখানা উপন্যাস পাঠা[ব] আপনাকে, আশা করি, এ রচনাটি আপনাদের ভালো লাগবে।

মমের চিঠির ভাবটা দেখলে মনে হয় যেন উপন্যাস লেখা হয়ে প[ড়ে] আছে; একটু চোখ বুলিয়ে দিতে হবে আর কি। কিন্তু আসল ব্যাপ[ার] মোটেই তা নয়, কোনো উপন্যাসই মমের লেখা ছিল না। আনউইনকে চিঠি পোষ্ট করবার দশ মিনিটের মধ্যে একখানা উপন্যা[স] লিখতে আরম্ভ করলেন মম। দিন দশেকের মধ্যেই শেষ হ'লো লে[খা] এবং তার দিন-তিনেকের মধ্যেই আনউইনের ঠিকানায় পৌঁছে গেলো পাণ্ডুলিপি। এই উপন্যাসটির নাম করলেন মম্—Liza o[f] Lambeth.

বছর পাঁচেক ধরে, ডাক্তারী পড়তে এসে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা[র] ওপর নির্ভর করেই Liza of Lambeth রচনা করলেন মম্। Lambeth হ'লো লণ্ডনের বস্তী-অঞ্চল। এই বস্তী অঞ্চল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয়েছিল মমের সেণ্ট টমাস হসপিটালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ছাত্র হিসেবে। এই বইখানা রচনা করবার সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র ডেলিভারী কেসই মম্ তেবোটি দেখাশুনো করেছেন। বস্তীবাসিনী বিপথগামিনী তরুণী লিজাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত কতকগুলি সাধারণ মানুষ এর পার্শ্বচরিত্র।

Liza of Lambeth-এর পাণ্ডুলিপি আনউইনকে পাঠাবার পর দিনকয়েক খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটলো মমের। কিন্তু মাস দুইয়ের মধ্যেও যখন কোনো খবর পাওয়া গেলো না, তখন আশাভঙ্গে অভ্যস্ত মম্ আবার মনে মনে তৈরী হচ্ছিলেন আর একটা আঘাতের জন্য। এমন সময় চিঠি এলো। প্রকাশক অবিলম্বে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। পত্রপাঠমাত্র মম্ এলেন প্রকাশকের অফিসে। দু'চার কথার পরই চুক্তিপত্রখানা মমের দিকে এগিয়ে দিলেন প্রকাশক। মম্ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন! অসতর্ক মুহূর্তে হয়ত বা একটা ধন্যবাদও দিয়ে ফেললেন ভগবানকে। এতদিনে সত্যি প্রথম বইখানা প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দিলো। এটা ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের কথা। এর পরের বছর মম্ ডাক্তারী পাশ করলেন। বছর খানেক ডাক্তারী করবার পর কায়মনোবাক্যে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করলেন। Liza of Lambeth প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নাম হলো মমের, বইখানার কয়েকটা সংস্করণও হয়ে গেলো পর পর। কিন্তু সাহিত্যসাধনার প্রথম দশটা বছর অবর্ণনীয় কষ্টে কাটাতে হয়েছে মমকে। ডাক্তারী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনও ছাড়লেন মম। চলে এলেন প্যারিস। ছেলেবেলার স্বপ্ন-মেশানো ফ্রান্স একটির পর একটি গল্প, উপন্যাস এবং নাটক লিখবার প্রেরণা জোগাতে লাগলো বেঁটে, তোতলা, টি, বি, রোগগ্রস্ত তরুণ কথা-সাহিত্যিককে। সাহিত্যসাধনার প্রথম দশ বছরে অর্থাৎ ১৮৯৭ থেকে ১৯০৭[illegible] অনেকগুলি বই বেরুলো মমের। তার অন্ততঃ [illegible] দ্বারা কিছু অর্থাগমও হ'লো। এ চারখানা হ'লো Merry Go Round; A Man of Honour, Mrs. Craddock এবং The Making of a Saint. কিন্তু মোটের ওপর কষ্টেই কাটাতে হয়েছে মমকে।

মমের অনেকদিনের [illegible] পূর্ণ হ'লো ১৯০৭ সালে। ওঁর নতুন নাটক Lady Frederick সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন মম্। যে বইগুলি এ ক' বছর ধরে বিক্রয় হচ্ছিল না মোটেই—সেই বইগুলিরই সংস্করণ হ'তে আরম্ভ করলো বছরে দু'তিনটে করে। Lady Frederick প্রকাশিত হবার সাত বছরের মধ্যে আরো তিনখানা বই প্রকাশিত হ'লো : The Magician ; Home and Beauty এবং Loaves and Fishes. তারপর, অর্থাৎ ১৯১৫ খৃঃঅব্দে প্রকাশিত হ'লো মমের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—Of Human Bondage.

Of Human Bondage ষোলো বছর ধরে ধীরে ধীরে লিখেছেন মম্। এ বইখানা সম্বন্ধে উনি বলেছেন : কেমন যেন ভূতে পাওয়ার মতো হয়ে গিয়েছিলাম আমি, এ বইখানা লেখবার জন্যে একটা দুঃসহ নেশা চেপে গিয়েছিলো আমার···লিখে তবে রেহাই পেলাম। অর্থাৎ ভেতর থেকে রীতিমতো একটা প্রেরণা পেয়েছেন মম্ এ বই লেখবার জন্যে। পাবার কথাও। কারণ, যদিও বইখানা একখানা পুরাদস্তুর উপন্যাস, কিন্তু এর মধ্যে মম্ প্রধানতঃ নিজের ছবিই তুলে ধরেছেন। কিছুটা আত্মকথা, কিছুটা কাল্পনিক কাহিনী—এই দু'য়ের প্রায় সমান মিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে Of Human Bondage. বালক বয়স থেকে মমের জীবনের নানা প্রতিবন্ধকের কথা আমরা জেনেছি—বেঁটে, তোতলা, টি বি-রোগী—Of Human Bondage-এর নায়ক ফিলিপ কেরীরও তেমনি প্রতিবন্ধক, ওর একখানা পা বিকৃত। মম্ যেমন তাঁর প্রতিবন্ধকের জন্যে সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না, ফিলিপও তেমনি। মম্ তোতলামী সারিয়ে দেবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে নাস্তিক হয়ে ওঠেন আর ফিলিপ ঈশ্বরে বিশ্বাস হারালো পা সারিয়ে দেবার জন্যে প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে। মমের কাকা ছিলেন Whitstable-এর Vicar—ফিলিপ-এর কাকা Blackstable-এর Vicar. মমের মত ফিলিপও হাইডেলবার্গ ঘুরে এসেছে, ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি; একাউন্ট্যান্ট হবার চেষ্টা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী পড়েছে। একেবারে ছেলেবেলা থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত ফিলিপের জীবনের যে চিত্র মম্ এঁকেছেন, তার মধ্যে ওঁর নিজের বাস্তব জীবনের অনেকখানিই এসে পড়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আবার কতকগুলি জায়গায় কল্পনার আশ্রয়ও নিয়েছেন মম্। যেমন : মম্ ছিলেন ছ'ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ, কিন্তু ফিলিপ একমাত্র সন্তান; দশ বছর বয়স পর্যন্ত মমের কেটেছে ফ্রান্সে, কিন্তু ফিলিপ জন্ম থেকেই ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছে। মমের মা মারা যান আগে, তারপর বাবা; কিন্তু ফিলিপের আগে বাবা, তারপর মা। সবচাইতে বড় অমিল হচ্ছে প্রেম এবং বিবাহ সম্পর্কে। মম্ বিয়ে করেন একচল্লিশ বছর বয়সে এবং ওঁর যখন তিপান্ন বছর বয়স, তখন সে [illegible] সমাপ্তি ঘটলো বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যে; কিন্তু এদিকে [illegible] সাক্ষাৎ যায় মিলড্রেড রজার্স নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। কিন্তু মিলড্রেড বিয়ে করলো অন্য একটি যুবককে। ওদের একটি মেয়ে হলো, তার পরেই স্বামীপরিত্যক্তা ও ফিরে এলো ফিলিপের কাছে। ফিলিপ কিছুদিন পর্যন্ত মিলড্রেড এবং ওর মেয়ের খরচপত্র জোগাড় করতে লাগলো। কিন্তু তারপর বিয়ে করবার সময় ফিলিপ বিয়ে করলো অন্য একটি মেয়েকে—তার নাম স্যালী।

সাহিত্যকর্ম হিসেবে Of Human Bondage-এর যথাযোগ্য সমাদর একটু দেরিতেই হয়েছে। কারণ বইখানা যখন বেরুলো, প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে মানুষ তখন সুস্থভাবে কোনো কিছু বিচার করবার অবস্থায় ছিলো না। মম্ নিজেও যুদ্ধের কাজ করেছিলেন ডাক্তার হিসেবে। কিন্তু টি. বি-র যন্ত্রণা বেড়ে যাওয়াতে কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর ধীরে ধীরে Of Human Bondage-এর জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো।

কিছুদিন ব্রিটেনের সিক্রেট সার্ভিস-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন মম্। এবং এ ব্যাপারে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হ'লো তার ভিত্তিতে কতকগুলি ছোটো গল্প লিখে Ashenden নামে প্রকাশ করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও পঁয়ষট্টি বছরের স্বনামধন্য সাহিত্যিক মম্ ঘটনাচক্রে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩০ সালে ফ্রান্সের রিভিয়েরাতে বাড়ী কিনলেন মম্, এবং সেই সময় থেকে এই বাড়িতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন, কিন্তু অল্প কয়েকদিন প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পর ফ্রান্স যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন বেশ কিছুদিন মমের কোনো খবরাখবর পাওয়া যায় নি। জার্মানরা ওঁকে বন্দী করেছে বা হয়তো উনি মারা গেছেন—এ-রকম গুজবও শোনা গিয়েছিল। খবর নিয়ে দেখা গেলো ফ্রান্সে তাঁর ঘরবাড়ীও সব তচনচ হয়ে গেছে, সারা পৃথিবীতে মমের অসংখ্য মুগ্ধ পাঠকের আশংকার শেষ নেই। এমন সময় একদিন মম স্বদেশে আত্মপ্রকাশ করলেন। ফ্রান্স থেকে পলায়নের এই চমকপ্রদ ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই মম্ লিখলেন—Strictly Personal.

Of Human Bondage-এ স্থায়ী প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছোটো গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ মিলিয়ে চল্লিশখানারও বেশি বই প্রকাশ করেছেন মম্—এবং আজকে তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। তার মধ্যে অন্ততঃ দশখানা বইয়ের পাঠক এক কথায় বিশ্বজোড়া, থিয়েটার এবং সিনেমা হিসেবেও এর অনেকগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

The Moon and Six Pence, The Painted Veil, Cakes and Ale, The Razor's Edge, The Hour before the Dawn, East of Suez, Rain, The Bread-winner, Our Betters—প্রভৃতি গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে বিশ্ব-সাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন। বাস্তব চরিত্র মমের অনেক উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করেছে বলে একটা অভিযোগ শোনা যায়। যেমন Cakes and Ale, অনেকেই মনে করেন এডোয়ার্ড ড্রিফিল্ড-এর চরিত্রটি মম্ সৃষ্টি করেছেন প্রখ্যাত কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির অনুকরণে এবং মিঃ কিয়ার হচ্ছেন স্যার ওয়ালপোল। ঠিক এই রকমই The Moon and Six Pence-এর নায়ক চার্লস স্ট্রিকল্যাণ্ড-চরিত্রটি নাকি প্যারিসের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গগিনকে দেখে সৃষ্টি করেছিলেন। এ অভিযোগ যেমন একেবারে সত্যি নয়, তেমনি একেবারে মিথ্যেও নয়। এ সম্বন্ধে মম্ নিজে বলেছেন : লেখকেরা বাস্তব চরিত্রগুলির হুবহু অনুকরণ করেন না, যদিও প্রয়োজন মতো বাস্তবচরিত্র থেকে তাঁরা মালমশলা সংগ্রহ করে থাকেন···যা তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, যা দেখে তাঁরা অনুপ্রাণিত বোধ করেন, তা অবশ্যই তাঁরা নেন, বাস্তবচরিত্রগুলির সঙ্গে হুবহু মিল ঘটাবার জন্যে

তাঁদের কোনো দায় থাকে না। মমের এ কথার পর আমরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারি যে, কোনো বাস্তব ও জীবন্ত লোককে দেখে মম্ হয়তো অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন কিন্তু লেখাটা উদ্দেশ্যমূলক নয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে হুবহু মিলও ঘটে যায়।

The Moon and Six Pence-এ শিল্পী গগিন-এর জীবনের সঙ্গে চার্লস স্ট্রীকল্যাণ্ডের মিলটাও একটু বেশি হয়ে গেছে, অর্থাৎ হুবহু হয়ে গেছে। এর কাহিনীভাগে প্রধান চরিত্র তিনটি: শিল্পী স্ট্রীকল্যাণ্ড এবং একটি তরুণী ব্লাঙ্ক ও তার স্বামী। শিল্পীর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণের জন্যে ব্লাঙ্ক তার স্বামীর ঘর ত্যাগ করলো (যদিও কোনো এক সময়ে এই স্বামীই তাকে ভয়ানক দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করে এনে সামাজিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল), কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেলো শিল্পী ব্লাঙ্ক সম্পর্কে মোটেই আগ্রহশীল নয়, তার কোনো দায়িত্বই নিতে প্রস্তুত নয়। ফলে, একটি সাজানো সংসার ধ্বংস হ'লো, অথচ মেয়েটির জন্যে শিল্পীর আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র। কাহিনীটির বৈশিষ্ট্য হলো ব্লাঙ্ক-এর প্রতি স্ট্রীকল্যাণ্ডের যে আকর্ষণ, তার পেছনে কোনো যৌন কামনা-বাসনা নেই। শিল্পী তার সৃষ্টির প্রয়োজনে, তার সাধনায় অনুপ্রেরণার জন্যে মেয়েটিকে আকৃষ্ট করে।

মমের বইতে যাঁরা বাস্তব চরিত্রের অনুরণন খোঁজেন, তাঁরা সব চাইতে অবাক হবেন The Painted Veil পড়লে। এ উপন্যাসের নায়ক ডাঃ ওয়াল্টার ফেন বহুলাংশে মম্ নিজে। এই যে সাদৃশ্য, তা জীবনের ঘটনা বিস্তারের জন্যে নয়। কিন্তু ডাঃ ফেন-এর কথাবার্তার ধরণ, জীবন সম্পর্কে তার বিশ্বাস, অর্থাৎ সব মিলিয়ে তার যে ব্যক্তিত্ব তা' যেন মমেরই প্রতিরূপ। হংকং-এর পটভূমিকায় রচিত এর কাহিনীভাগে দেখা যায় ডাঃ ফেন ও তার স্ত্রী কিটি, বাহ্যতঃ একটি সুখী পরিবার বলেই মনে হয়। কর্মব্যস্ত ডাঃ ফেন একদিন বাড়ী ফিরে দেখতে পেলো কিটি তার এক প্রণয়ীর সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তিনজনেই এ ওর মুখের দিকে দেখলো। কিটি এবং তার প্রণয়ী একটা ভয়ানক অবস্থার জন্যে তৈরী হচ্ছিলো, কিন্তু দেখা গেলো ডাঃ ফেন কাউকেই কিছু বললো না। কিটির প্রণয়ী অকস্মাৎ মেলামেশা বন্ধ করলো। এদিকে চীনের মেই-তান-ফু অঞ্চলে তখন প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। ডাঃ ফেন-কে যেতে হবে সেখানে। এ সমস্ত সময়ে সাধারণতঃ ডাঃ ফেন একাই গিয়েছে এর আগে, কিন্তু এবার ও জেদ ধরলো কিটিকেও সঙ্গে যেতে হবে বলে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হলো কিটিকে। কিটি হয়তো প্লেগের শিকার হলেও হতে পারে—এই রকম একটা চিন্তা ছিল ফেন-এর। কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় ফিরলো। চীনের গ্রামাঞ্চলে কর্মরতা ফরাসী সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কিটির হৃদয়ের পরিবর্তন হ'লো। ডাঃ ফেন মার্জনা করলো স্ত্রীকে।

প্রাচ্যের পটভূমিকায় আরো অনেক বই লিখেছেন মম্। তার মধ্যে The Razor's Edge, East of Suez এবং Rain বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। একটি বড়ো গল্পের নাট্যরূপ হ'লো Rain এবং এইটিই খুব সম্ভব মমের শ্রেষ্ঠ নাটক। The Razor's Edge-এর পটভূমি প্রধানতঃ ভারতবর্ষ, যদিও এর নায়ক আমেরিকান। একটি আমেরিকান যুবক মানবজীবনের রহস্যভেদ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ভারতবর্ষে এসে একজন সাধকের কাছ থেকে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে শিখতে লাগলো। মম্ লিখেছেন [illegible] ভারতীয় তত্ত্বশাস্ত্রের সর্বেশ্বরবাদ দেখে আকৃ[illegible]ন্‌। এ উপন্যাসখানা [illegible]

করেন। মম্ নিজে পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, A Writ[er's] Notebook-এ তিনি বিশেষভাবে লিখেছেন দেশ ভ্র[মণের] প্রয়োজনীয়তার কথা। এ প্রয়োজন সকলেরই কমবেশি আ[ছে] অর্থাৎ দেশভ্রমণের ফলে সকলেই অল্পবিস্তর লাভবান হবে[ন,] লেখকদের পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মম্ শুধু কথার ক[থা] হিসেবে উপদেশই দেননি, এর গুরুত্ব তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক[রেছেন] এবং এ জন্যে উনি নিজে সাধ্যমতো সাহায্য করবার জন্যেও এগি[য়ে] এসেছেন। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে দেখা গেলো—মম, এক[টি] 'ফাণ্ড' তৈরী করেছেন নিজে টাকা দিয়ে, যার থেকে প্রতি ব[ছর] ৭০০০৲ টাকা দেওয়া হবে দেশ-ভ্রমণেচ্ছু দরিদ্র তরুণ লেখকদের।

আজকের পৃথিবীর সবচাইতে ধনী লেখকদের অন্যতম হ'লেন মম হয়তো সবচাইতে ধনীও হতে পারেন। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতে তাঁর কিছু কিছু বই অনূদিত হয়েছে এবং তাঁর যে ধনসম্পদ—ত[া] এই লেখার দ্বারাই তিনি অর্জন করেছেন। কয়েক বছর আগে ম[ম] একটি উইল তৈরী করেছেন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে—তাঁর মৃত্যুর পর তাঁ[র] সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে একটি ট্রাষ্ট তৈরী হবে এবং এ[ই] ট্রাষ্ট পৃথিবীর সমস্ত দেশের দরিদ্র লেখকদের সাহায্য করবে।

গত অর্ধ-শতাব্দীরও বেশিরভাগ সময় ধরে মম্ লিখছেন। আ[জ] পর্যন্ত কবিতা ছাড়া অনেক কিছুই লিখেছেন। কিন্তু ওঁর প্রতিভা[র] একটি এমন লক্ষ্যনীয় দিক আছে যা এ যুগের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরে[র] সঙ্গে পাশাপাশি বিচার করে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এটা হ'[চ্ছে] শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মমের দক্ষতা। মমকে বলা হ[য়] ইংরেজ মোপাসাঁ, কিন্তু আবার তাঁর Of Human Bondag[e] এ শতাব্দীর একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাঁর বেশিরভাগ নাটকই ম[ঞ্চে] অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আবার সিনেমাতেও তাঁ[র] কাহিনী জনপ্রিয়তায় অতুলনীয়। রেডিও এবং টেলিভিশনে[ও] আগ্রহভরে মানুষ তাঁর কাহিনী শোনে। বিভিন্ন মাধ্যমে কাহি[নী] পরিবেশনের এই যে দক্ষতা, এটা নিঃসন্দেহে তুলনাহীন।

মমের কথা শুনে মনে হয় লেখার অভ্যাস যাঁদের একবার হয়েছে[,] তাঁরা বোধ হয় না লিখে থাকতে পারেন না। লেখার কাজটা এঁদের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বেঁচে রইবো অথচ লিখবে[া] না, এ রকম একটা অবস্থার কথা এঁরা ভাবতেই পারেন না। লেখা[র] নেশা মমের প্রায় পঁচাত্তর বছরের, কিন্তু লেখাকে পেশা করে নে[ন] প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে এবং সেই থেকে দুটো মহাযুদ্ধের সম[য়] কিছুদিনের জন্য তাঁর লেখার রুটিনের কিছু হের ফের হয়েছে, তা' ছাড়[া] এই দীর্ঘকাল ধরে লেখার ব্যাপারে নির্দিষ্ট একটা রুটিন অনুসরণ ক[রে] আসছেন মম। ঘুম থেকে ওঠবার অভ্যাস মমের খুব ভোরবেলায়[।] প্রাতঃকৃত্য শেষ করে সামান্য কিছু খাবার খেয়ে নেন, তারপর পড়তে বসেন। ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েক সাধারণতঃ কঠিন কো[নো] বিষয়ে পড়াশুনোয় ডুবে থাকেন—গ্রীক নাটক বা দর্শনশাস্ত্রে[র] এমন[illegible]নই যা পড়বার পরে রীতিমতো মস্তিষ্ক চালনা [illegible] যায়। পড়া শেষ করবার পর কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে [illegible] Go Round; [illegible]ন মম, তারপর সকাল ঠিক সাড়ে আটটার সম[য়] The Mal[illegible] প্রবেশ করেন। দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা—এমন বি[illegible] নাগাড়ে লেখেন কোনো কোনো দিন।

এমন ধারা কঠোর লেখবার কঠিন অনুসরণ করা সত্ত্বেও, একসময় মম্ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, অবিচ্ছিন্নভাবে লেখায় ধারা বজায় রাখতে না পারলে পৃথিবীর মানুষ হয়তো তাঁকে ভুলে যাবে। ১৯৪৯ সালে A Writers' Notebook প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের এক জায়গায় মম্ লিখলেন : দিনকাল যা পড়েছে, তাতে অবিশ্রান্তভাবে লিখে যেতে না পারলে লোকে নিশ্চয়ই ভুলে যাবে আমাকে। এবং এইভাবে কিছুদিন চলবার পর যখন হঠাৎ একদিন 'দি টাইমস' খবর ছাপবে যে, সমারসেট মম্ মারা গেছেন, তখন পাঠক আশ্চর্য হয়ে যাবেন —ওঃ ভদ্রলোক তাহলে বেঁচে ছিলেন এতদিন। কিন্তু মমের এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। বছরের পর বছর তাঁর বিভিন্ন বইয়ের নতুন সংস্করণ বের হচ্ছে এখনো এবং তাঁর জনপ্রিয়তাও অব্যাহত থেকেই চলেছে। সবশেষে একটা কথা মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্নটা হলো : বিশ্বসাহিত্যে মমের স্থান কোথায়? প্রতিভার স্তর-বিন্যাসে মম্ কাদের আগে বা পরে? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের বিস্তর লেখা আছে। কিন্তু অন্য সকলের চাইতে নিজের সম্বন্ধে মমের অভিমতই খুব সম্ভব সবচাইতে চমৎকার। The Summing up-এ এক জায়গায় মম্ বলেছেন : খুব শক্তিশালী লেখকেরা ইটের দেওয়াল ভেদ করেও তাঁদের দৃষ্টির প্রসার করতে পারেন।···কিন্তু আমি ততটা চক্ষুষ্মান নই। ( The greatest writers can see through a brickwall. . .My vision is not so penetrating. )

# মৃত কি জীবিত হয়?

## অধ্যাপক শ্রীরথীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

হিন্দু-শাস্ত্রে ৮ প্রকার মৃত্যুর বর্ণনা দেখা যায়। এই ৮ প্রকারের মধ্যে অবক্ত সম্মানহানি, স্মৃতিহীনতা প্রভৃতিকেও বর্ণনা করা হইয়াছে। দেহ অসাড় হইয়া যে মৃত্যু ঘটে, তাহাকেও আমরা দুইটি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। দেহ হইতে পঞ্চ প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যখন দেহাভ্যন্তরস্থ চৈতন্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং রক্তের সম্পূর্ণ বিকৃতি ঘটে, তখন সেই মৃত্যুই যথার্থ মৃত্যুরূপে বিবেচনীয়। অপর পক্ষে যখন কোন বিশেষ কারণে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মচৈতন্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে না এবং রক্তও অবিকৃত থাকে; তখন সাধারণ চিকিৎসকদের দৃষ্টিতে ইহাও মৃত্যু রূপে বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু ইহাকে যথার্থ মৃত্যু না বলিয়া অযথার্থ মৃত্যু বলাই যুক্তিসঙ্গত। শেষোক্ত প্রকারের মৃত্যুতে ডাক্তারেরা death certificate দিয়া মৃতদেহ সংকারের অনুমতি দেন, তাহারও দীর্ঘকাল পরে কোন কোন রোগীকে পুনরায় বাঁচিয়া উঠিতে দেখা যায়। দেহে বিষপ্রয়োগের ফলে যখন সর্ব্ববিধ মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেও কোন কোন ব্যক্তিকে বাঁচিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে।

ভাওয়ালের জমিদার-পুত্র রমেন্দ্র নারায়ণকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরে বৃষ্টির জলের সংস্পর্শে তাঁহার দেহে পুনরায় চৈতন্য সঞ্চার হয় এবং বিখ্যাত সন্ন্যাসী ধর্ম্মদাসের দৃষ্টিতে পড়ায় তিনি পুনরায় বাঁচিয়া উঠেন—এই ঘটনা সকলেই অবগত আছেন। উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামীর জীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি—এই মহাপুরুষও তাঁহার জীবনে অন্ততঃ দুইবার ২ জন মৃত ( অযথার্থমৃত ) ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন। একজনকে তিনি বাঁচান তিব্বতের শ্মশান-ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় জনকে বাঁচান ৺কাশীধামে মণিকার্ণিকার ঘাটে। আরও কত সাধু মহাত্মা হয় তো কত ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন এবং আজও তুলিতেছেন; কিন্তু আমরা তাহা জানিবার সুযোগ পাই না। কোন সাধু সন্ন্যাসী বা চিকিৎসকের সাহায্য-ব্যতিরেকেও যে কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহাদের মৃত ( অযথার্থ মৃত ) আত্মীয়কে শ্মশানক্ষেত্র হইতে জীবিত অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন—এমন সংবাদও মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখা যায়।

বর্ত্তমানে পশ্চিমের দেশগুলিতে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করিয়া আপাতদৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তিদিগকে বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এইরূপ চেষ্টার ফলে কে কয়জন লোককে বাঁচানও সম্ভব হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে British Medical Journal নামক পত্রিকায় উল্লিখিত বিষয়ে বহু তথ্য পরিবেশন করা হয়।

বিগত জুলাই মাসের ( ১৯৬১ ইং ) Reader's Digest নামক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকায় Paul Kearney নামে পরিচিত জনৈক মনীষী হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মৃত ( অযথার্থমৃত ব্যক্তিদিগকে বাঁচাইবার উপায় এবং এই উপায় অবলম্বনে পুনর্জ্জীবি কয়েকজন ব্যক্তির উল্লেখ করতঃ জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ হইতে জানা যায়—চিকিৎসক কর্ত্তৃক মৃ ঘোষণার পৌনে দুই ঘণ্টা পরেও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাই কোন কোন ব্যক্তিকে বাঁচান সম্ভব হইয়াছে। প্রবন্ধের মনীষী লেখ সংবাদ পরিবেশনের পর যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতি জন্য তাহার সারাংশ বিবৃত করিতেছি।

"কখন কোন্ ব্যক্তির সম্পূর্ণরূপে মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহা নির্ণয় ক চিকিৎসকগণের পক্ষে দিন দিন কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে নয়নমণির বিস্তার, উগ্র আলোকে তাহাদের রূপান্তরাভাব প্রভৃ প্রাচীন সম্মত মৃত্যুলক্ষণগুলি সম্প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযো নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে একজন চিকিৎস কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ৭৫ মিনিট পরে কৃত্রি উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন জনস হপকিন্স হাসপাতালের ডাক্তারেরা সম্প্রতি এক ব্যক্তি তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ১০৫ মিনিট পরে অক্সিজে ও কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস প্রয়োগের দ্বারা বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন।"

উল্লিখিত বিবরণ সমূহ দেখিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পা যে, ৺মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী যে সকল মৃত ( অযথার্থমৃত ) ব্যক্তি বাঁচাইয়াছিলেন, তাহাদের হৃৎপিণ্ড ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হইলেও আত্মচৈতন্যের বিলুপ্তি অথবা রক্তের বিকৃতি ঘটে নাই বুঝিতে পারিয়াই তিনি এইরূপ আপাতদৃষ্টিতে অসাধ্য কার্য্যের সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাপুরুষদের দূরদৃষ্টি যে সাধারণ মানুষের তুলনায় অত্যন্ত অধিক হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

শ্রীজয়শ্রী বসু

প্রথম দর্শনেই যে প্রেম, তাকে যদি বলি রোমান্টিক, তাহলে দর্শনের আগেই যে প্রেম, তাকে কি বলব? অতি-রোমান্টিক? এমনি অতি-রোমান্টিক প্রেমের জন্যেই বিখ্যাত হয়ে আছেন শেবা-র রাণী। তাঁর নাম ছিল বাল্‌কিস। রাজা সলোমনকে চোখে দেখবার আগেই তাঁর মহত্ব, চরিত্র-মাধুর্য, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির কাহিনী শুনে শুনে মুগ্ধ হয়েই তিনি তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।

শেবা-র রাণী ও রাজা সলোমনের প্রেম-কাহিনী বর্ণিত আছে বাইবেল গ্রন্থের 'ওল্ড-টেষ্টামেণ্ট' অংশে। ইথিওপিয়া-র (আফ্রিকা) পৌরাণিক কাহিনীতেও শেবা-র রাণী বিখ্যাত। যেমন সুন্দর ছিল তাঁর মুখশ্রী, তেমনি সুন্দর ছিল তাঁর দেহের গঠন। এ ছাড়া জ্ঞানে আর বুদ্ধিতেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। কিম্বদন্তী অনুসারে তিনিই ইথিওপিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং ইথিওপিয়ার রাজা-রাজড়ারা তাঁরই সন্তানের বংশধর বলে দাবি করেন।

শেবা-র রাণীকে বাইবেল গ্রন্থে 'দক্ষিণের রাণী' বলা হয়েছে। রাণী একদিন তাঁর প্রাসাদে বসে বসে সওদাগর তামরিণের মুখে গল্প শুনছিলেন। দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ভ্রমণ করে করে তাঁর যে নানা রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাই থেকে বেছে বেছে রাণী বাল্‌কিস্‌কে বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে তাঁর মনোরঞ্জন করছিলেন সওদাগর তামরিণ।

রাণী বাল্‌কিস্‌ ছয় বছর সুন্দর ভাবে রাজ্য শাসন করলেন, তবু তখনো তিনি কুমারী, কারণ তাঁর যোগ্য পাত্র তিনি তখনো খুঁজে পান নি।

তামরিণ ছিলেন তখনকার সেরা সওদাগর। তাঁর ছিলো—পাঁচশো'র বেশী উট, জাহাজ ছিল সত্তরখানারও বেশী। সেই সময় রাজা সলোমন জেরুজালেমে বিরাট মন্দির তৈরী করাচ্ছিলেন। তিনি তামরিণের খবর পেয়ে তাঁকে ফরমায়েশ পাঠান মন্দির তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় নানারকমের জিনিষ আরব থেকে এনে তাঁকে জেরুজালেমে যোগান দিতে। তামরিণ উটের পিঠে চাপিয়ে নানা জিনিষপত্র নিয়ে জেরুজালেমে গিয়েছিলেন। সেখানে রাজা সলোমনের কার্যকলাপ অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করেছিলেন। রাজা সলোমনের জ্ঞান, বিচার-বিবেচনা, চরিত্র-মাধুর্য্য তামরিণকে মুগ্ধ করেছিল। মন্দির তৈরীর কাজও রাজা সলোমন নিজেই যেভাবে দেখাশুনা করছিলেন, তা দেখেও তামরিণ কম বিস্মিত হন নি।

সলোমনের বিপুল ঐশ্বর্য, সোনা ও দামী পাথরের কাজকরা বিরাট প্রাসাদও সওদাগর তামরিণের মনে ছাপ রেখেছিল।

তামরিণ ছিলেন শেবা-র রাণীর বিশেষ প্রিয়পাত্র। জেরুজালেম থেকে ফিরে এসে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতার কথাই তামরিণ রাণীকে বলেছিলেন।

তামরিণ রোজ সকালে রাণীকে শোনাতেন রাজা সলোমনের নানা কাহিনী—তিনি কি ভাবে আনন্দোৎসব করতেন, কি করে জ্ঞা[ন] বিতরণ করতেন, কি সুন্দর ভাবে তাঁর কর্মচারী এবং ভৃত্যা[দের] প্রত্যেককে কাজের নির্দেশ দিয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করিয়ে নিতে[ন]। তামরিণের মুখেই রাণী বালকিস শুনলেন সলোমনের রাজত্বে [কে]উ কাউকে ঠকায় না, কেউ চুরি বা ডাকাতি করে না, তাঁর আ[দর্শ] সুশাসনে প্রজারা সবাই সুখী, সবাই নিরাপদ, সবারই মুখে তাঁ[র] জয়জয়কার।

এইভাবে রাজা সলোমনের নানা সুখ্যাতি শুনে শুনে মুগ্ধ হ[য়ে] গেলেন শেবা-র রাণী বালকিস। সলোমনের কাহিনী তিনি যত [ই] শুনতে লাগলেন তামরিণের মুখে। যত শুনতে লাগলেন ততই [তাঁকে] আরও বেশী ভাল লাগতে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন "আশ্চ[র্য!] এমন মানুষও আছেন পৃথিবীতে?" অসীম আগ্রহে তিনি অ[স্থির] হয়ে উঠলেন। তাঁর ঐকান্তিক কামনা ছিল আদর্শ রাণী হবা[র।] তাই ভাবলেন নিজের চোখে দেখে আসবেন এই আদর্শ রাজ[ার] আদর্শ রাজ্যশাসন পদ্ধতি, আর সেই পদ্ধতিতেই নিজের রা[জ্য] পরিচালনা করে প্রজাদের সুখী করবেন। কিন্তু শুধু কি তাই[?] তা নয়। এই আদর্শ পুরুষের বর্ণনা শুনে শুনে আপন মনে তাঁ[র] মূর্তি গড়ে তিনি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। আকুল হয়ে উঠ[ল] রাজার কাছে যাবার জন্ম তাঁর প্রাণ। কিন্তু সে যে অনেক দূ[রের] পাড়ি, আর পথও খুব সহজ নয়। পথে নানা অসুবিধা, নানা বিপদ[।] কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রবল ইচ্ছাই জয়ী হলো। তিনি রওনা হলেন। হোক পথ দীর্ঘ, হোক পথ বিপদসঙ্কুল, তবু এমন পর[ম] পুরুষকে না দেখে তিনি থাকতে পারবেন না।

সাতশ' সাতানব্বইটি মালবাহী উট আর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রাণ[ী] যাত্রা করলেন।·····

রাজা সলোমন খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রাণীকে অভ্যর্থনা করলেন তিনি রাণীকে প্রাসাদের একদিকে বাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন তাঁর এবং তাঁর দলের সকলের জন্য পাঠালেন প্রচুর উপাদেয় খাদ্য ও পানীয়; তাঁদের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাতেও এতটুকু ত্রুটি রাখলেন না।

রাজা রাণীকে দেখে এবং রাণী রাজাকে দেখে খুশী হলেন। দুজনেই মুগ্ধ হলেন দুজনকে দেখে। রাণী দেখলেন রাজা সলোমনের জ্ঞান বিচারবুদ্ধি, মাধুর্য এবং ঐশ্বর্যের তুলনা নেই। আর কি অপরূপ সুন্দর তাঁর কণ্ঠস্বর আর কথাবার্তা! সব কিছু মিলিয়ে অসাধার[ণ] ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এই মানুষটি ঈশ্বরের সার্থক সৃষ্টি।

দিনের পর দিন রাজা সলোমনের সান্নিধ্যে থেকে রাণী বালকি[স] নিজের চোখে দেখতে লাগলেন তাঁর আশ্চর্য সুন্দর কার্যকলাপ, তাঁ[র] মন্দির নির্মাণ পর্যবেক্ষণ, তার বিচার, দাস-দাসীদের সঙ্গে ব্যবহার জ্ঞান বিতরণ প্রভৃতি। তামরিণের মুখে শুনে যত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবার নিজের চোখে দেখে তার চাইতে অনেক বেশী মুগ্ধ হলেন

শেবা-র রাণী। রাজা সলোমনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো তাঁর মন।

* * * *

এ ভাবে ছ'মাস রাণী বালকিস জেরুজালেমে রইলেন রাজা সলোমনের কাছাকাছি। তাঁর মনে যত রকম প্রশ্ন উঠত, সবই তিনি রাজাকে জিজ্ঞেস করতেন; রাজাও প্রত্যেকটি প্রশ্নের অতি সুন্দর জবাব দিতেন। ফলে দুজনেই দুজনের পরিচিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক অন্তরঙ্গতার পর্য্যায়ে ওঠে নি।

অবশেষে রাণীর মনে হলো যে, এবার তাঁর দেশে ফিরে যাবার সময় এসেছে। তিনি যা শিখতে চেয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশী শেখা হয়েছে। ছ'মাস তিনি প্রজাদের ছেড়ে রয়েছেন, প্রজারা নিশ্চয় তাঁর অভাব অনুভব করছে।

সুতরাং তিনি রাজা সলোমনকে বার্তা পাঠালেন যে, এবার তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে যাবেন।

এই বার্তা পেয়ে রাজা সলোমন চমকে উঠলেন। হঠাৎ যেন তাঁর মোহভঙ্গ হলো। তাইতো! শেবা-র রাণীকে যে শেবায় ফিরে যেতে হবে, এ কথাটা তাঁর মনেই হয়নি! নারী-সৌন্দর্যের প্রতি রাজা সলোমনের আকর্ষণ ছিল অসামান্য। তাঁর এক হাজার স্ত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে চারশ'জন পেতেন রাণীর মর্য্যাদা।

বালকিস ছিলেন তখনো কুমারী, যুবতী এবং অপরূপ সুন্দরী। তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিল আকর্ষণীয়। রাজা সলোমনকে দেখবার জন্যই রাণী এতদীর্ঘ বিপজ্জনক পথে যাত্রা করেছিলেন। ছ'মাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই রাণী কথাবার্ত্তা বলেছেন সলোমনের সঙ্গে, তাঁর কথা ধৈর্য্য ও বিনয় সহকারে শুনেছেন, এমনকি তাঁর শিক্ষাও রাণী খুব ভালবেসে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রাজা তাঁকে প্রেম নিবেদন করবার কথা চিন্তাই করেন নি। সেই রাণী এবার ঘরে ফিরে যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন। কুমারী রাণী বালকিসের রূপ এবং যৌবন রাজা সলোমনকে আকৃষ্ট করেছিল সেকথা সত্য, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। সলোমন তাঁর ভেতরে দেখতে পেলেন সেই আদর্শ নারী, যে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সন্তানের জননী হতে পারবে।

রাজা সলোমন ঠিক করলেন শেবার রাণীকে বিবাহ করবেন।

এই ভেবে তিনি বার্তা পাঠালেন রাণী বালকিসকে: "এত কষ্ট করে এতদূর এসেছো, ফিরে যাবার আগে দেখে যাবে না কি ভাবে আমার রাজ্য পরিচালিত হয়, কি ভাবে আমি শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন করে থাকি? এসেছো যখন, তখন আমার আরো কাছাকাছি থেকে সব কিছু আরো ভালো করে দেখে শুনে জ্ঞান অর্জন করে নিয়ে যাও। তোমার শিক্ষা তো এখনো সম্পূর্ণ হয় নি রাণী। সেই শিক্ষা আমি সম্পূর্ণ করে দেবো। তুমি জ্ঞানের পূজারিণী, চলে যেয়ো না অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে। তুমি চলে এসো আমার কাছে, আরো কাছে।"

এই চিঠির ইঙ্গিত ছিল এই যে, রাজপ্রাসাদের যে অংশে রাজা থাকতেন, সেখান থেকে অনেক দূরে না থেকে রাণী থাকবেন রাজা স্বয়ং যে অংশে থাকেন সেই অংশেই।

বালকিস এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

রাজা সলোমন চাইলেন রাণীকে অভিভূত করতে এবং তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিতে। রাণীর তাঁর কাছে আগমন উপলক্ষে রাজা যে বিরাট ভোজ উৎসবের ব্যবস্থা করলেন, তা তাঁর আগেকার প্রত্যেকটি বিরাট উৎসবকে তুলনায় ম্লান করে দিল। সোনা-রূপোর বাসনে টেবিল সাজানো হ'ল। মেঝে ঢাকা হলো অপরূপ সুন্দর মণিময় কারুকার্যকরা দামী গালিচায়। সভাসদেরা চমৎকার চাকচিক্যময় নানারঙের রেশমী পোষাক পরেছিলেন, তাছাড়া চুনী, পান্না ও নীলা বসানো নানারকমের দামী অলংকার। অতিথিদের হাওয়া করবার জন্য ভৃত্যেরা ময়ূরের পালকের পাখা নিয়ে উপস্থিত ছিল। বহুদূর থেকে নানাদেশের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন রাজা সলোমনের কাছে তাঁর জ্ঞান-গরিমা এবং অতুল বৈভবের কথা শুনে। তাঁরাও নিমন্ত্রিত হলেন এই উৎসবে।

শেবা-র রাণী তাঁর সহচরদের সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনিও খুব সাজসজ্জায় সজ্জিতা হয়ে এসেছিলেন, কারণ তিনিও প্রায় রাজা সলোমনের মতই ঐশ্বর্য্যময়ী ছিলেন। রাজা বড় টেবিলের পিছনে রাণীর জন্য আরেকটি টেবিলের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাণীর টেবিলের সামনে একটি সুন্দর পর্দা টাঙান ছিল—যাতে রাণী সবাইকেই দেখতে পাবেন, কিন্তু সভাসদ্‌রা কেউ রাণীকে দেখতে পাবেন না।

রাণী প্রত্যেকের কথাই শুনতে পেলেন। তাদের জ্ঞানের কথা শুনে রাণী আশ্চর্য্য হলেন। খাবার সময়ে ধূপ জ্বালান হল, আর সমস্ত ঘর ধূপের গন্ধে সুরভিত হ'ল।

বালকিসকে জয় করার জন্য রাজা সলোমান সযত্নে যে সব ফন্দি করে রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি ছিল রাণীকে খুব বেশী মশলা দিয়ে রাঁধা খাবার খাওয়ানো, যাতে তাঁর জলের পিপাসা অদম্য হয়ে ওঠে এবং এমন সৌরভযুক্ত পানীয় দেওয়া, যাতে তাঁর তৃষ্ণা না মেটে।

নৈশ ভোজ শেষ হ'ল। রাজার সভাসদরা সবাই চলে গেলেন। রইলেন কেবল সলোমন আর শেবা-র রাণী। এবার রাজা পর্দার আড়াল পেরিয়ে চলে এলেন যেখানে পর্দার আড়ালে ছিলেন শেবা-র রাণী। এসে রাণীকে বললেন:—"সুন্দরি, প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত এইখানে সুখ-শয্যায় বিশ্রাম উপভোগ করো।"

রাজা সলোমনের কথায় গভীর অন্তরঙ্গতার সুর।

গত ছয়মাসের মধ্যে এই প্রথম রাজা এমন সুরে কথা বললেন।

শেবা-র রাণীর চোখ তখন ঘুমে বুজে আসছিল। দেহও অবসন্ন বোধ হচ্ছিল। আহার এবং পান দুটোই তাঁর অত্যন্ত বেশী হয়ে গেছে। তিনি দেখলেন তাঁর সামনে সেই মানুষটাই দাঁড়িয়ে,—যাঁকে তিনি ভক্তি করেন এবং যাঁর জন্য কোনো দ্বিধা না করে তিনি দুস্তর মরুপথ পার হয়ে আসতে সাহসী হয়েছিলেন।

রাজার পরনে ছিল ভোজ-সভার জাঁকালো পোষাক, কিন্তু তখন আর তাঁর ভেতরে রাজকীয় ভাব একটুও ছিল না। তিনি হেসে এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন একজন সাধারণ পুরুষ একটী সাধারণ নারীর সঙ্গে কথা বলছে। তাকিয়ে দেখলেন রাণী—কি অপরূপ সুন্দর পুরুষ এই সলোমন! সলোমনের চোখে তিনি যে দৃষ্টি দেখলেন, অমন দৃষ্টি আগে কখনো দেখেননি। সেই মুহূর্তেই রাণী বুঝতে পারলেন রাজা তাঁকে কত গভীরভাবে ভালবাসেন।

কিন্তু রাণী ভয় পেলেন। যদি তিনি সলোমনকে বিবাহ করেন, তবে তাঁর প্রজারা কি বলবে? ছ-বছর তিনি কুমারী রাণী রূপেই রাজত্ব করেছেন। প্রজারা তাঁকে কুমারী রাণী রূপেই মেনে নিয়েছে।

স্বামীরূপে সলোমন কখনোই নিজের রাজ্য ছেড়ে তাঁর রাজ্যে আসবেন না, অথচ তিনিও নিজের রাজ্য ছেড়ে রাজা সলোমনের সঙ্গে এখানে থাকতে পারবেন না।

শেবা-র রাণী পড়ে গেলেন ভীষণ মানসিক দ্বন্দ্বে। তিনি আকণ্ঠ ডুবে গেছেন সলোমনের প্রেমে, আর পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন—রাজা সলোমনও ভালোবেসেছেন তাঁকে। দুজনেই দুজনের প্রেমে পড়েছেন, কিন্তু হায়, তাঁদের প্রেম ভুখের হতে পারে না। যদিও বা বিবাহ-মিলন তাঁদের হয়, তবু তাঁকে নিজের রাজ্যেই ফিরে যেতে হবে, বাকি জীবনটা কাটাতে হবে শুধু কয়েকটি আনন্দময় মুহূর্তের স্মৃতি বুকে নিয়ে।

শেবা-র রাণী ভীতা হয়ে রাজাকে বললেন:

"ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলুন যে, আপনি আমাকে বলপূর্বক গ্রহণ করবেন না। আমি এখনও কুমারী। যদি এখানে আমার কৌমার্যের হানি ঘটে, তাহলে অসীম লজ্জা আর বেদনা নিয়ে আমাকে ফিরে যেতে হবে।"

ঠিক এমনি কথাই সলোমন শুনতে চেয়েছিলেন, এবং একথার জবাবের জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বললেন, "আমি শপথ করে তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, জোর করে আমি তোমাকে গ্রহণ করব না। কিন্তু তার বিনিময়ে তোমাকে শপথ করতে হবে যে, তুমিও আমার এখান থেকে বলপূর্বক যা আমাকে না বলে কিছু গ্রহণ করবে না।"

সলোমনের এই অদ্ভুত কথা শুনে হাসলেন শেবা-র রাণী। সমস্ত সংকোচের বাধা ভুলে গিয়ে সকৌতুকে রাজা সলোমনকে বললেন—"আপনি এত জ্ঞানী হয়েও এরূপ নির্বোধের ন্যায় কথা বলছেন? আমি কি কিছু চুরি করব অথবা আপনি আমাকে যা উপহার দেননি, সে সব নিয়ে যাব? ভাববেন না যে, ঐশ্বর্যের লোভে আমি এসেছি। আমার রাজ্যও আপনার রাজ্যের চাইতে কিছু কম ঐশ্বর্যশালী নয়। কোন জিনিষেরই আমার অভাব নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, জ্ঞান অন্বেষণেই আমি এসেছিলাম।"

সলোমনও কৌতুক করে জবাব দিলেন, "তুমি আমাকে যেমন শপথ করিয়েছ, তেমনি তুমিও এবার শপথ করো। এক যাত্রা পৃথক ফল হবে কেন?"

রাণী বালকিস বললেন: "শপথ করছি, আমিও আপনার কোন জিনিষ আপনাকে না বলে নেব না।" এভাবে দুজনেই দুজনের কাছে শপথ করলেন।

ঘরের এক পাশে রাজার, অপর পাশে রাণীর শয্যা তৈরী হ'ল। ঘরের ছাত থেকে ঝোলান ঝাড়ে জ্বলছিল অনেক উজ্জ্বল বাতি। সলোমন তাঁর এক ভৃত্যকে তাঁর নিজের শয্যার পাশে এক কুঁজো পানীয় জল এমনভাবে রাখতে বললেন যেন রাণী তা দেখতে পান। কাজ শেষ হলে ভৃত্যেরা চলে গেল।

শেবা-র রাণী বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু এই বিশ্রাম বেশীক্ষণ টিকল না। রাণী খুব বেশী মশলার রান্না খেয়েছিলেন, তাই অনতিবিলম্বেই তৃষ্ণার জ্বালায় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর [illegible] কিয়ে কাঠ হয়ে গেছে জল না খেলে চলবেই না।

রাণী জেগে উঠেই ওপাশে তাকিয়ে রাজার শয্যার নিকট জলভর্তি কুঁজোটি দেখলেন। তারপর শয্যা থেকে আস্তে আস্তে রাজার কাছে গিয়ে দেখলেন রাজাও গভীর ঘুমে অচৈতন্য।

নিঃশব্দে কুঁজোটি তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে একটু জল পান করলেন বালকিস; আর সেই মুহূর্তে রাজা চোখ খুলে তাঁর হাতটি ধরে ফেলে বললেন "কেন তুমি তোমার শপথ ভেঙে আমার জিনিষ না বলে নিলে?"

বালকিস দেখলেন তিনি ধরা পড়ে গেছেন। কে বলতে পারে হয়তো তাঁর প্রেমাস্পদের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে তিনি খুশী হয়েছিলেন? তবুও তিনি বললেন—"সামান্য একটু জল খাওয়াতে কি আমার শপথ ভাঙল?" জবাবে সলোমন বললেন: "জল কি সামান্য বস্তু? পৃথিবীতে জল অপেক্ষা শ্রেয় আর কোন জিনিষ তুমি দেখেছ?"

শেবা-র রাণী বুঝতে পারলেন তিনি বুদ্ধিতে হেরে গেছেন তাই বললেন, "আমি স্বীকার করছি আমার শপথ ভেঙেছি হেরে গেছি আপনার কাছে। আমার তৃষ্ণা সম্পূর্ণ দূর করতে দিন।"

রাজা সলোমন বললেন "তুমি যখন তোমার শপথ ভঙ্গ করেছো তখন আমার শপথ থেকে আমি নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়েছি?"

পরাজিতা বালকিস হয়তো বা পরাজয়ের আনন্দে পূর্ণ হৃদয়ে বললেন—"মহারাজ, আপনার শপথ থেকে আপনি মুক্ত। কিন্তু আগে আমাকে আমার জলের তৃষ্ণা মেটাতে দিন।" কুঁজো থেকে আরো জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন শেবা-র রাণী বালকিস।

রাণীর বহুকালের বাসনা পূর্ণ হ'ল। রাজা সলোমন শেবা-র রাণীকে বিবাহ করলেন।

তারপরই এলো রাণীর দেশে ফিরে যাবার পালা। বিদায় দেবার সময়ে রাজা সলোমন রাণী বালকিসকে প্রচুর মূল্যবান জিনিষ উপহার দিয়ে দিলেন। সেগুলো বয়ে নিয়ে গেল ছ'-হাজার উট। যাত্রার আগে রাজা রাণীকে একটি আংটি দিয়ে বললেন: "আমার স্মৃতিচিহ্নরূপে এই আংটি তুমি গ্রহণ করো। যদি তুমি আমার সন্তানের জননী হও, তবে এই আংটি তাকে দিও অভিজ্ঞানরূপে। সন্তানটি যদি পুত্র হয়, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।"

সলোমনের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছিল। আপন রাজ্যে ফিরে গিয়ে বালকিস একটি পুত্রের জননী হলেন। তার নাম মেনেলিক। আজও ইথিওপিয়ার রাজারা এই নামটি ব্যবহার করেন, এবং নিজেদের মেনেলিকের বংশধর বলে দাবী করেন। বলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ মেনেলিক জ্ঞানী রাজা সলোমন এবং শেবা-র সুন্দরী রাণী বালকিসের সন্তান।

---

# আন্তর্জাতিক বিবাহ

বাদল ঘোষ রায়

অসবর্ণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উদার মনোভাবের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। বর্তমান যুগে তার প্রয়োজনও ক্রমশই প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সবর্ণের সঙ্গে অসবর্ণের, স্বজাতির সঙ্গে বিজাতির, দেশীর সঙ্গে বিদেশীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। এই বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা পরকে আত্মীয়, দূরকে নিকট করার একটা সহজ পন্থাও সৃষ্টি হয়। এবং এই পন্থা যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট সেতু বিশেষ—তা আর না বললেও চলে।

এজন্যেই প্রগতিশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদার ব্যক্তিরা এই বৈবাহিক সম্পর্ককে ভীতির চোখে দেখেন না। দেশের পক্ষে ও জাতির পক্ষে এই সম্পর্কটা আপাত দৃষ্টিতে কল্যাণকর দেখে বর্তমান নেতৃস্থানীয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তিরা এই ব্যাপারে দেশের জনসাধারণকে আরো উৎসাহিত করার চেষ্টা করছেন।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই উত্তম ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু একটা ব্যাপার আরো তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

আমরা যতই বিশুদ্ধ উদার মনোভাবের পরিচয় দেই না কেন, তবু মনের এক স্থানে উঁচু জাত নীচু জাত, স্বজাতি-বিজাতি, স্বধর্ম-বিধর্ম, দেশী-বিদেশী প্রভৃতি পরস্পর বিপরীতার্থক কথাগুলো আছে। এবং থাকবেও। যতদিন না এই কথাগুলো দেশ থেকে —সমাজ থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত থাকবে।

উদার মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মনের ভিতর এই কথাগুলো নিরীহ গোবেচারার মত থাকলে কি হবে। ক্ষতি করার পক্ষে এরা এক একজন মহা ওস্তাদ।

দেশী বিদেশীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে তাদের যে next generation হবে, সেই generation-এর ছেলে মেয়েদের উৎকর্ষ লাভের ক্ষেত্রে গোবেচারা গোছের ঐ ক্ষতিকর কথাগুলো অন্তরায় স্বরূপ। কারণ, এই পরস্পর বিপরীতার্থক কথাগুলোর জন্যেই ঐ ছেলে-মেয়েদের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের শিকড় বেশী গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এইজন্যই দেশীয় ও জাতীয় কর্তব্য কর্মে অবগত থাকলেও—না থাকলেও নিষ্ক্রিয় ও নিরাসক্ত একটা উদাসীনতার ভাব বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এবং নির্লিপ্তাকার নিরপেক্ষবশতঃ এই অগভীর শিকড় নিয়েও তাদের স্বভাবতই দু' নৌকায় পা দিয়ে চলার একটা চেষ্টা বা মজ্জাগত স্বভাব আছে। জোয়ান শক্তিশালী লোকের পক্ষেও দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলা বেশ কষ্টকর। দুর্বল লোকের পক্ষে যে তা আরো মারাত্মক, সেকথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে না বললেও হয়।

যাদের দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ প্রভৃতির শিকড় অগভীর, তারা বড় হয়ে বিশেষ উন্নতি করতে পারে না। দেশের হিতার্থে—জাতির হিতার্থে প্রাণ দিয়ে লড়াই করতে পারে না। দেশের কল্যাণার্থে—জাতির কল্যাণার্থে বিশেষ বিশেষ চিন্তাও তাদের আসে না।

উদাহরণস্বরূপ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কথা ধরা যেতে পারে। তাদের ভিতর থেকে আজ পর্যন্ত খুব নামকরা বিশেষ কেউ জন্মাতে পারেনি। স্বচ্ছন্দে একটু খেতে পরতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। তার উপর যদি আবার একটু পার্টি করতে পারে, তাহলে তো আর কথাই নেই। পার্টিতে যাওয়ার সময় কিরকম ড্রেস করে গেলে ভালো হয়, কিরকম পোজ নিয়ে ঢুকলে ভালো দেখায়, সস্তা দেখে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড একখানা গ্যাবার্ডিনের দামী স্যুট কিনলে ভালো হয়, না, কয়েক ঘণ্টার জন্যে ভাড়া করলেই ভালো হয়—এইসব চিন্তাতেই তারা মহা ব্যস্ত থাকে। জটিল চিন্তা-ভাবনা নিয়ে তারা মাথা ঘামায়ও না, ঘামাতে চায়ও না।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আবার এর ব্যতিক্রমও অবশ্য দু' একটা দেখা যায়। যেমন, কোনো এ্যামেরিকান হয়তো ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করছে। আবার কোনো ইংরেজও হয়তো এ্যামেরিকান মহিলাকে বিয়ে করছে। সেইরকম স্কচ্ আছে, জার্মাণ আছে, ফরাসী আছে, স্প্যানিস আছে। পাশ্চাত্য দেশে এইরকম বৈবাহিক সম্পর্ক হামেশাই হচ্ছে। তবুও তাদের ভিতর দু-একজন নামকরা লোক মাঝে মাঝে প্রায়ই জন্মায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সর্বজন-বিদিত সায়েন্টিষ্ট আইনষ্টাইন, শ্রীমতী এলেন রায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, তাদের একমাত্র প্রধান feelings সাদা-চামড়া আর কাল-চামড়ার ভিতর। এ্যামেরিকান, বৃটিশ, জার্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ সাদা-চামড়া দল ভুক্ত।

মুসলমানদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে দু' একটা। একদেশের মুসলমান ছেলে আরেক দেশের মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করছে। তবুও তাদের ভিতর নামকরা লোক এক-আধজন জন্মেছেন। জনাব আবুল কালাম আজাদ এর প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। তার কারণ মুসলমানরা স্থান কালের চাইতে ধর্মকেই প্রাধান্য দেয়

দেখি। তাই দেশী কি বিদেশী তার বিচার তারা বিশেষ করে না। স্বধর্মের—স্বসম্প্রদায়ের লোক হলেই তাদের হয়।

আমাদের দেশের অনেক হিন্দু মেয়েকেও বিয়ে করেছে মুসলমানরা। তবু তাদের next generation-এর ছেলে-মেয়েরা কিন্তু নিরপেক্ষবাদী বা উদারবাদী হয়নি। পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক বা প্রীতির সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। বরং ধর্মে তারা আরো গোঁড়া প্রকৃতির হয়েছে। এবং হিন্দু-বিদ্বেষী মনোভাবও তাদের প্রবল। কারণ বিশেষ করে আগেকার দিনে কোনো হিন্দু মেয়েকে কোনো মুসলমান বিয়ে করলে, সে মেয়ে তো একেবারেই সমাজচ্যুত হয়ে যেত। কোনো প্রকারেও তার আর হিন্দু সমাজে স্থান হত না। তারা তখন একেবারে অস্পৃশ্য অশুচি। শুধু যে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে হলেই এরকম হয়, তাই নয়। মুসলমানের ছোঁয়া লাগলে, মুসলমানের হাতের রান্না খেলে এবং মুসলমানের ঘরে গেলেও তার জাত যায়। এবং তার কোনো প্রায়শ্চিত্তের উপায়ও তখনকার হিন্দু সমাজের রীতি নীতিতে ছিল না। হিন্দু সমাজের এই অতিরিক্ত নির্মম কঠোরতার জন্যে সেই সমাজচ্যুত ছেলে বা মেয়েদের মনে হিন্দুদের উপর, হিন্দুধর্মের উপর এবং হিন্দু-সমাজের রীতিনীতির উপর একটা প্রবল ক্ষোভ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এবং ক্ষোভ ও বিদ্বেষের থেকেই প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসারও স্পৃহা জেগে ওঠে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ "কেদার রায়" শীর্ষক নাটকে সোনার চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য)। এই বিদ্বেষমূলক মনোভাব তাদের next generation-এর ছেলে মেয়েদের মনেও সহজে সংক্রামিত হতে বেশী দেরী লাগে না।.....

অতিরিক্ত আরো উদাহরণের সাহায্যে আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায় (বা দেখানো যায়) যে, এখনো পর্যন্ত এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান পুরুষ জন্মাননি—যাঁর মাতা কৃষ্ণাঙ্গী এবং পিতা একজন শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ কি ফরাসী। আবার আমাদের দেশে যেখানে উঁচু জাত নীচু জাতের feelings খুব বেশী, সেখানেও এমন কোনো কীর্তিমান পুরুষ জন্মায়নি—যাঁর মাতা [illegible] কুলীনশ্রেষ্ঠা—পিতা ঠিক তার উল্টো। আমাদের দেশের বড় বড় নামকরা লো ভিতর বেশীর ভাগ পিতামাতারাই ছিলেন প্রায় সমপর্যায়ে যেমন, মেঘনাদ সাহার পিতামাতা, রাজা রামমোহন র পিতামাতা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতামাতা, জগদীশচন্দ্র বো পিতামাতা এবং রবিঠাকুরের পিতামাতা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক অবস্থায় সবার পক্ষে সম্ভবপর নয়, জাতিধর্ম প্রভৃতি সবকিছু দেখে শুনে বিয়ে দেয় বিয়ে করা। এবং জাতিগত, দেশগত বা সম্প্রদায়গত বৈষ আর জীইয়ে রাখা মোটেই শুভ বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। কিন্তু বৈষম্যের ভাব আমরা ইচ্ছে করলেই পরিহার করে চলতে পারি ন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এটা আমাদের একটা মজ্জা স্বভাব বা দোষ।

সুতরাং এমতাবস্থায় সমস্যা সমাধানকল্পে দেশকে, জাতিকে সমাজকে সবদিক দিয়ে সমুন্নত করে গড়ে তুলতে হলে সর্বজনবি সেই একটামাত্র উপায় আমাদের গ্রহণ করতে হবে। উপা হচ্ছে—সর্বাগ্রে যথাসম্ভব সব রকম সংকীর্ণতাকে জলাঞ্জলি দি সকল প্রকার সম্প্রদায়ের সঙ্গে আন্তরিক ও সহজ স্বাভাবিকভ মেলামেশা করা। তাহলে এই বৈষম্যমূলক মনোভাব ধীরে ধ আমাদের সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। উঁচু জাত নীচু জ দেশী-বিদেশী, স্বজাতি-বিজাতি বলে কোনো কথা থাকবে ন সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। তখন যার সঙ্গেই বিয়ে হে না কেন, ক্ষতি নেই।

আর তা নাহলে কয়েক পুরুষ অতিক্রম হয়ে গেলেও মজ্জা এই স্বভাব-দোষ আমাদের মজ্জা থেকে বা অন্তর থেকে কখ দূরীভূত হবে না। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও দেশকে, জাতি ও সমাজকে সবদিক দিয়ে সমুন্নত করে গড়ে তোলা সহজস হবে না।

# পতিতা

দীপক সেনগুপ্ত

নীল চোখ দিয়ে দেখেছি  
তোমার বীভৎস-বেদনাময় রূপ,  
জীবনের পসরার ধূপ  
জ্বালিয়ে রেখেছ। ব্যথার উৎসমুখ  
এভাবে কি বন্ধ হবে!

দেহকে অযথা অভুক্ত রাখোনি  
হৃদয়টা যদিও রয়েছে নিরন্ন  
মুখে এঁটে দাওনি অপ্রসন্ন  
কোন হাসি—আয়নার ভগ্নাংশ  
তোমাকে প্রতিটি প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছে।

শত শত মুখ জেগে উঠবে  
একবার কি পেছনে তাকিয়ে দেখবে?  
প্রতি অংশে বিভিন্ন মুখ সবি,  
সহস্র কৃষ্ণের সাথে সহস্র রাধার ছবি;  
আর তুমি তাকাবে না।

অমর, অজেয়, নীলকণ্ঠ আমি  
পান করে নেবো সে গরল তেজ  
ধ্বংসের সময় শুধু গুনি  
কখন ছাড়ি সে শক্তিশেল  
তুমি কিছুকাল শুধু ধৈর্য্য ধরো।

# কুলটা

রচনা—রাজেন্দ্র যাদব

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

...এ আমিকতা [illegible] হয় না। তাই কোনদিন ওঁকে আমি [illegible] নিতে পারি নি। [illegible] সম্পর্ক। মিসেস তেজপালের ওপরও ছায়া ফেলেছিল এ আত্মবোধ আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়েছিল—ওঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এ প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে সর্বক্ষণ। স্বামীর উপস্থিতিতে নিজের সব ভাবধারা প্রাণপণে সংহত করে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কোন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস তেজপাল এমন এক অদ্ভুত উপেক্ষার ভঙ্গিতে চেয়ে থাকতেন—যেন কোন অপরিচিত জন সৃষ্টি করে চলেছে অর্থহীন কতগুলি শব্দসমষ্টি। এই কথা আমার প্রথম মনে হয়েছিল প্রথম যেদিনই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তক্ষুনি সিনেমা দেখে ফিরেছিলাম আমরা। হাত-পা ছড়িয়ে শ্রান্তভাবে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিলাম কখন গোমেস খাবার জন্যে ডাকবে। সোফার ওপর পা ছড়িয়ে দুহাতের ভেতর থুতনি রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল রণধীর। নিচে বসে আর্দালি ওর জুতোর ফিতে খুলছিল তাড়াতাড়ি। কাপড় বদলাতে গিয়েছিল বিনু। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে তেজপাল আর মিসেস তেজপাল একেবারে ঘরের মধ্যে এসে পড়েন। দরজা বোধহয় খোলাই ছিল। তেজপাল সাদা পাজামা, খোলা গলার জামা আর সাদা নাগরা পরেছিলেন। বলতে বলতে হঠাৎ আমার জবাব-দিহীর ভঙ্গিতে বলেন,—"আজ তো মশাই একেবারে জমলই না। এক তো আপনিই ছিলেন, তারপর আবার আইয়ার বড় 'বোর' করেছে মশাই। 'আই সো', যখন মানুষের স্পোর্টসম্যান স্পিরিটই নেই, তখন আব খেলতে আসা কেন? ডাক্তার তো বলেনি যে শুধু খেল। কি বই দেখতে গিয়েছিলেন?" র‍্যাকেট দুটো বিরক্তভাবে ফরাশের ওপর ফেলে দেন।

পা গুটিয়ে সোজা হয়ে বসে রণধীর। আজ হয় তেজপাল ভীষণ খুশীমনে ছিলেন, নাহলে খুবই বিরক্ত। কারণ, উনিই বললেন এমনভাবে বিনা খবরে উনি কখনোই এসে পড়েন না কোনদিন। রণধীর আমার সঙ্গে আলাপ করায়: ইনি মেজর তেজপাল। আমাদের ঠিক ওপরের ফ্লাটে থাকেন। আর বিনুর খুব কাছের সম্বন্ধের ভাই। অর্থাৎ আমার শালা মহাশয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন তেজপাল। 'ভেরি গ্ল্যাড টু সি ইউ'এর বিনিময় হয়।

মিসেস তেজপালের দিকে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে এই জন্যেই পড়ে যে, ওঁর চুল কাঁধ পর্য্যন্ত ছাঁটা ছিল আর প্রতি মুহূর্তে কানের পাশে এমনভাবে হাত তুলছিলেন যেন খুলে যাওয়া এক গোছা চুল সামলাতে ব্যস্ত সারাক্ষণ। ওর দিকে চেয়ে নমস্কার করতে গিয়ে দুচোখ ভরে দেখে নেবার একটা দুর্বার ইচ্ছেকে যেন অঙ্কুশের আঘাতে জোর করে বন্ধ করে রাখি। হাল্কা ক্রীম রঙের ক্রেপের সাড়ী, ওই রঙেরই ছোট ব্লাউজ আর কাঁধের ওপর হাল্কা কাজ করা পশমের ঢিলে কেপ আর কানের ওপর আটকিয়ে রাখা নার্গিসের একটা ছোট্ট সাদা ফুল। পালিশ করা নখ। মোটা মোটা রেশমি দড়ির ঝালর নিয়ে খেলায় ব্যস্ত দুই হাত। হলুদ রঙের চকমকে মখমলের ব্যাগ হাঁটু ছাড়িয়ে হলুদ স্যাণ্ডেল পর্যন্ত ঝোলান। প্রথম দর্শনেই মনে হয় উনি সেই দলের মানুষ—যারা নিজের মধ্যেই তলিয়ে থাকেন সঙ্গীতের এক অপার্থিব জগতে।

তলোয়ারের মতন গোঁফের ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প হেসে বিনুর দিকে চেয়ে রণধীর বলছিল, 'স্ত্রীর ভাই, বন্ধু, তাই সিনেমা ইত্যাদি দেখিয়ে খুশি করে রাখতে হয়। নাহলে কালই শুনতে হবে 'আমার ভাই এসেছিল, তাকে তো বড় আদরই করলে না।'

লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে থেমে পড়েন তেজপাল। ঠোঁটে লাগান সিগারেট নিয়েই বলেন: 'স্ত্রী হোন কিংবা স্ত্রীর ভাই, আমাদের কপালে তো খিচুনিই বরাদ্দ।' আর সিগারেট হাতে সরিয়ে নিয়ে সজোরে হেসে ওঠেন এবার।

শুধুই রহস্যের কথা। লাল হয়ে ওঠে বিনু। চোখোচোখি হয় ওদের দুজনের—আমি আজও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই—মিসেস তেজপালের দুটি চোখ জ্বলে উঠেছিল কি এক অদ্ভুত [illegible] ভাবে। সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারেননি তেজপাল। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে ব্যস্ত ভাবে সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে লাইটারটা এমনভাবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে নেভাতে থাকেন যেন ওটা দেশলাই। মিসেস তেজপালের সে দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে আমার ওপর পড়ে তো চঞ্চল হয়ে উঠি আমিও। সেই দিনই রণধীর এমন কথা বলেছিল যে, ওর মতন মানুষের কাছে যেন ঠিক আশা করা যায়নি। আর সে কথা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার মতন আজও মনে পড়লে না হেসে থাকতে পারি না আমরা।

রণধীর বলেছিল "এদের কাছে সাকার ভগবান বলে যদি কিছু থাকেন তো সে তাদের ভ্রাতৃরূপে। তুমি হচ্ছ ডি, জি।" বলেছিল আবার আমার দিকে ফিরে।

সকলের দৃষ্টি এবার এদিকে পড়েছিল। 'ডি, জি,' কি?

বেশ রসিয়ে রণধীর আস্তে আস্তে বলেছিল "মানে ডেপুটি গড। এইচ, জি, অর্থাৎ হেড গড। বড়ই গম্ভীর মানুষ ইনি। কোথাও আসেন যান না। সব সময় নিজের ঘরেই স্থিতি করেন।" এরপর ওঠে যে হাসির হুল্লোর বিরামহীন ভাবে চলতে থাকে পনেরো কুড়ি মিনিট ধরে। "বিনু মহাশয়ার কাছে এই গডদের এক একটি কথা তো বেদবাক্যের থেকে কিছু কম নয়।" রণধীর আবার যোগ করে।

'ডি-জি', ডাকের সঙ্গে সকলে আমার দিক চায় আর হাসির ফোয়ারা ছোটাতে থাকে। উন্মুক্ত পাহাড়ী ঝর্ণার মতন খিলখিল করে হাসিতে ভেঙ্গে পড়ছিলেন মিসেস তেজপাল। পেটে বোধহয় ব্যথা ধরে গিয়েছিল ওঁর। এক হাত পেটের ওপর রেখে বিচ্ছিরি রকম হাঁপাতে আরম্ভ করেছিলেন উনি। আর সেদিন থেকে যখন তখন হাসির ছলে সকলে আমাকে ডি-জি বলতে আরম্ভ করেছিলেন।

টানা টানা দীর্ঘ দুই চোখ, তিলফুলের মতন সুগঠিত নাক, আর ছুরি দিয়ে পাতলা করে কাটা ঠোঁট আর ভরন্ত দুই গাল—বিধি সে চেহারার এমন অভিব্যক্তি দিয়েছেন তিনি মুখ টিপে হাসছিলেন

কপালে ছোট্ট একটা কুমকুমের টিপ আর কাঁধ পর্য্যন্ত কাটা চুল।

ঠাট্টা তামাসা হলেও, পাছে আমি কিছু মনে করি এই ভয়ে, হাসতে হাসতে রণধীরের দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করে বিনু। হাসি থেমে গেলে যেমন একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যায় চারদিক, তেমনি হয়েছিল। মিসেস তেজপাল একটা পা অন্য হাঁটুর ওপর বদলিয়ে বসলেন। অন্য পায়ের হাঁটুর ওপর দু'হাত জড় করে রেখে পায়ের আঙুলগুলো নাচাতে লাগলেন আস্তে আস্তে। হাতদুটিকে এমনি ভঙ্গিতে রাখার জন্যে ওপরে এসে পড়েছিল বাঁ হাতের মণিবন্ধ। আর অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে চাইবার চেষ্টা করলেও দৃষ্টি এড়াচ্ছিল না। আমি ওঁর সরু সরু সুন্দর আঙুল, রঙ করা নোখ আর আংটিটির দিকে স্থির চোখে চেয়েছিলাম বুঝি শুধু।

"আমাদের ডি, জি, মশাই মাঝে মাঝে কিন্তু সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন।" রণধীর বলে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, "তোমার সে সব কাব্য আর কবিতার কি খবর হে?"

"কোথায় কাব্য আর কবিতা? ষ্টুডেণ্ট লাইফে ছিল, সে সব শেষ হয়ে গেছে কবে। এখন তো দিন কাটছে কোম্পানির রিপোর্ট টাইপ করে।" কথা পালটাবার চেষ্টায় বলি আমি।

নাও, শোন কথা। বিনুকে চটাতে বলে রণধীর। আমি তো বলছিলামই যে লেখাপড়া ও কবেই বন্ধ করে দিয়েছে। কি না:, তা তো নয়। দুনিয়াতে এমন কি গুণ আছে যা আমাদের ডি, জি'র মধ্যে নেই। রাতদিন শুধু এই। এই গজল আমার ভাই লিখেছে, ঐ সিনেমাতে আছে। অমুকে গেয়েছে।

আমি রেগে গেছি ভয়ে বিনু মিনমিন করে কিছু বলবার চেষ্টা করবার আগেই উৎসুকভাবে মিসেস তেজপাল বলে ওঠেন, "আপনার কাছে ভালো কিছু কবিতা সঞ্চয়ন থাকলে আমাকে দেবেন?"

"কেন, সিনেমার গানের ষ্টক শেষ?" অল্প মুখ খুলে মুখ ভরা ধোঁয়ার একটু পথ করে বলে ওঠেন তেজপাল। বিদ্রূপে হাসছিল ওর দু'চোখের দৃষ্টি। চেয়ারের হাতলে রাখা হাতে ধরা সিগারেটটা তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে নিবিষ্ট মনে ঘোরাতে থাকেন। নিজেই আবার হেসে একটু পরে বলেন, "উফ, এঁর কাছে সিনেমার গানের জমান ধন আছে বটে। এমন সময় কেউ কি খুঁজে বার করতে পারবে যে উনি গান করছেন না? 'আই স্যো, আই স সিফ অফ দেম।'

"কি ব্যাপার মেজর তেজপাল, আপনি সব সময় ও বেচারার গান নিয়ে কটাক্ষ করেন।" আমার প্রতি যে সমবেদনা ও প্রকাশ করবার পথ পায়নি, তাই যেন মিসেস তেজপালের জন্যে উছলে ওঠে। "আপনিই দেখুন না, এখানকার মানুষের মধ্যে একমাত্র ইনিই তো দিয়ে নিয়ে সকলকে প্রাণ দিচ্ছেন, না হলে আর সকলে নিজের নিজের মহলে বন্দী। প্রথম প্রথম একটু অবাক লেগেছিল, কিন্তু ওপর থেকে কোন শব্দ শুনতে না পেলে মন অস্থির অস্থির করে।

কে জানে কেন তেজপাল একেবারে উঠে দাঁড়ান, আর একটা ছবির একেবারে নিচে দাঁড়িয়ে সেদিকে দেখতে দেখতে বলেন, "আপনিই তো বোধহয় বলছিলেন যে নিচের লোকেরা এঁর নাম রেডিওগ্রাম রেখেছেন। আটোচেঞ্জার।"

এবার মিসেস তেজপালকে নিয়ে হাসির পালা। কিন্তু ওঁর সমস্ত মুখ থমথম করে ওঠে আর ভেতরে ... প্রচণ্ড ঝড় খুঁজি ... মুহূর্ত্তে নেমে আসতে চায় বাঁধভাঙা চোখের জলে। নিচের ... সজোরে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তাড়াতাড়ি চোখের পলক ... ঘরে ছাতের দিকে জালে মোড়া এরিয়ালের তারের দিকে চেয়ে নি... সামলাতে চেষ্টা করেন মিসেস তেজপাল।

"ডার্লিং, এঁদেরকে ভালো কিছু একটা শুনিয়ে দিয়ে চল যা... যেন সমস্তটাই শুধু একটা হাল্কা হাসির কথা, এমনি ভাবে পরিস্থি... সামলে ফেলতে পায়ের ওপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আদরের সুরে ব... তেজপাল।

"হ্যাঁ তাই হোক, মিসেস তেজপাল।" আগ্রহে বলি আমরা সবা...

কফি এসে গিয়েছিল। বিনু একবার ওঁর চেহারার দিকে ... নিঃশব্দে উঠে কফি তৈরী করতে আরম্ভ করে।

"না, শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছে না।" অস্পষ্ট ভাঙা ভা... গলায় বলেন মিসেস তেজপাল।

কেমন নিঃশ্বাস বন্ধ করা হয়ে উঠে সমস্ত পরিস্থিতিটা। ওঁর ক... যেন শোনা হচ্ছে না—এইভাবে তেজপালের সমস্ত মুখ কঠিন হ... ওঠে আর মিসেস তেজপালের মুখের দিকে চেয়ে মনে হতে থাকে— আর একবার কেউ অনুরোধ করলে এখুনি বুঝি কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে উনি।

"নিন, আপনিই খান আগে।" ওর দিকে সব প্রথম কফি কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলে বিনু।

পেছন দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িতে ওর মাথার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টি... চেয়েছিলেন তেজপাল। বিনু ওঁর দিকে কফি পেয়ালা এগি... ধরতেই চমকে ওঠেন হঠাৎ যেন। 'ধন্যবাদ' বলে কাপটা হাতে নি... আরামের এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে আরম্ভ করেন।

সহসা অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে কাপটা পাশের টেবিলে নামি... রাখতে রাখতে রণধীর বলে,—অন্তত আমাদের ডেপুটি গডের অনুরো... রাখা তো উচিত।

সমস্বরে সকলে আবার হেসে ওঠে। আচ্ছা যাকৃগে, আবা... কোনদিন শোনা যাবে খন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সকলে আর অসমিয়া বেয়ারা গোমেসের কথা শুরু হয় আবার ... ও হিন্দী জানত না। একবার ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেটাকে বিনু... কাছে এনে বলেছিল, "মেমসাহেব, ইয়ে তো মর গিয়া।" চা... দেওয়া ফেলে হাসতে হাসতে অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল বিনুর ঘরের গুমোট আবহাওয়া কাটাতে বিনু নানান কথা বলতে বলতে ক্রমাগত হাসতে থাকে। তেজপালও সে হাসিতে যোগ দেন এতক্ষণে আবার চেয়ারে এসে বসেছিলেন উনি।

এক চুমুকে সমস্ত কাপটা খালি করে উঠে দাঁড়ান মেজর তেজপাল। "আচ্ছা মিসেস ধীর, আমরা তাহলে চলি এবার আপনারাও খাওয়া দাওয়া করুন। অনেকক্ষণ বাইরে থেকে এলেন নিজের সুবিশাল হাত এবার আমার দিকে বাড়িয়ে বলেন,—"আপনি তো এখন এখানেই আছেন? আবার দেখা হবে তাহলে। একই তো সিঁড়ি। ওপরে চলে আসবেন না এক সময়।" আঙুলের গাঁটে গাঁটে লোমের গুচ্ছ ওঁর।

ওঁর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে উঠে দাঁড়ানতে অবাক হয়ে যা... সকলে। মিসেস তেজপাল এক চুমুকের বেশী খান নি তখনও

উনি একবার উঠে... তেজপাল আর একবার কাপের দিকে তাকান। আমি সে সময় তেজপালের কথার উত্তর দিচ্ছিলাম: "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু আপনার সমান উঁচুতে উঠতে যে ভয় করে।"

"মানছি ভাই আপনি ডি, জি নামের সার্থকতা। সাহিত্য করছেন নিশ্চয়ই।" খুশি হয়ে ওঠেন তেজপাল। কেন জানি না ওঁর মুখ দেখে আমার হঠাৎ আলেকজাণ্ডার ডুমার কথা মনে পড়ে যায়। তুলনা করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই চোখ গিয়ে পড়ে মিসেস তেজপালের ওপর, আর কি জানি যেন মনে হয়, ওঁর বোধহয় মনে হচ্ছে তেজপাল দাঁড়িয়েই থাক আর খুব আরাম করে আস্তে আস্তে কাপ খালি করে তবে ওঠেন উনি। ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল ওঁর। সজোরে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সামনে এসে পড়া চুলগুলোকে এক ঝটকায় পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে কাপের পাশে হাত দিয়ে বিক্ষুব্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ওঁর খোলা কোমর আর সুগঠিত শরীর সকলের দৃষ্টি টেনে ধরে। আন্দাজ করতে পারেন মিসেস তেজপাল আর এই মিলিত প্রশংসাই যেন ওঁর আহত অহঙ্কারকে সান্ত্বনা দেয় খানিকটা।

দরজার বাইরে আসা পর্য্যন্ত এক অদ্ভুত উদ্ধত ভঙ্গি যেন ঘিরে ধরছিল ওঁর সমস্ত শরীর। হয়ত······কোমরের ওপর দুটো হাত এমন ভাবে জড় করে ধরেন যে, পেছন দিকে এগিয়ে এসে ফোটা ছাতার মতন ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় যেন ইচ্ছে করেই সমস্ত শরীরটা এক অদ্ভুত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে টেনে তুলে এমন একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে চারদিক ভরিয়ে তোলেন যে, হঠাৎ যেন ওর শরীরটা হাত দিয়ে একবার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। বোধহয় তেজপালেরভেতরের সমস্ত হিংস্র প্রবৃত্তিটুকু জাগিয়ে তুলতেই আমার দিকে সোজাসুজি চেয়ে বললেন, "মিসেস ধীর, আপনিই ওঁকে নিয়ে আসবেন না।" মনে হয় সে দৃষ্টির মোহজাল যেন শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় এক অদ্ভুত শিহরণ জাগিয়ে তোলে।

"আপনার ক্যাম্পে যাবার কতদূর মেজর তেজপাল?" বাইরের দিকে চলতে চলতে বলে রণধীর।

"সেই ভয়েই তো আছি ভাই। আসছে মাসেই বোধহয় মাস তিনেকের জন্যে চলতে হয়।"

"কোথায় কিছু খবর পেয়েছেন?"

এখনো তো কিছু জানতে পারিনি। দুকাঁধ 'কি জানির' একটা সিনেমা-ভঙ্গিতে নাচিয়ে তেজপাল বলেন: পাঁচ ছ'দিনের মধ্যে তো এন, সি, সি'র ছেলেদের নিয়ে যেতে হবে এই কাছেই কোন গ্রামে 'সোস্যাল সার্ভিসের' জন্যে। এ বাবা আর এক ঝামেলা জুটেছে। কোদাল নিয়ে রাস্তা তৈরী কর। সপ্তাহ খানিকের ক্যাম্প হবে বোধহয়।

"আমার ব্যাপার তো এখন কিছুই বুঝতে পারছি না।" ট্রাউজারের পকেটে হাত রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে রণধীর। "আপনার সঙ্গেই পড়বে মনে হয়।"

"আসবেন কিন্তু নিশ্চয়ই।" সুন্দর ভঙ্গিতে নমস্কার করে বিদায় জানান মিসেস তেজপাল। তেজপালের হাতে র‍্যাকেট ছিল। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠতে থাকেন ওঁরা। ছিপছিপে হালকা শরীর··সিঁড়ি ওঠায় ব্যস্ত দুটো পা··কেশের ফুল আর দুলে দুলে ওঠা চুলের গুচ্ছ··সিঁড়ির বাঁকে আর একবার বিদায় নেবার পালা শেষ হয়।

"চল মশাই এবার।" মনে করিয়ে দেয় বিনু। চমকে উঠে একটু হেসে বিনুর কাঁধে হাত দিয়ে ফেরে রণধীর। মেজর তেজপালদের বংশ অনেক বড়। দেরাদুনে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ কলেজে দেখেছিলাম ওঁর ঠাট। বাবা বোধহয় এইচ এইচের সম্বন্ধে ভাই। নিজেও ছোট খাটো একজন রাজাই হবেন। হাজার বিঘের জমিদারী আছে। দেখনি কথাবার্তায় এক অদ্ভুত ধরণের চমক আছে। চেহারায় চলনে বলনেও কি রকম আভিজাত্য ফুটে ওঠে। তারপর যেন আমার চিনে স্বভাবকে কটাক্ষ করে বলে, "যেমন তেমন পোষাকে দেখবে না কোনদিন। বড় স্মার্ট লোক।"

"ভাই, আমার তো তোমাদের মিসেস তেজপালকে অনেক বেশী ভালো লেগেছে।" দুষ্টুমির ভঙ্গিতে আমি বলি।

রণধীরের হাত আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে বিনু রেডিও 'অন' করে দিয়েছিল আর ঝুঁকে পড়ে ষ্টেশন মেলাচ্ছিল। একেবারে ঘুরে আমার দিকে চেয়ে বলে: "খুব ভালো না? সত্যি এমন মিষ্টি। মনটাও খুব পরিষ্কার বেচারার। কোন কথাটথা কিছু বলার থাকলে নিজেই দশবার করে চলে আসবে। অন্য অন্য অফিসার-গিন্নীদের মতন দেমাক নিয়ে নেই যে, ও তো আমার কাছে একবারই এসেছে, আমি কেন তবে আবার যাব। আলস্য বলে যেন কোন কথাই নেই। মন হবে তো সারাদিনই কিটিকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে আর নামছে।" হঠাৎ খট্ করে সুইচ বন্ধ করে দিয়ে কিছু শুনতে শুনতে বলে: নাও, ওপরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই গান সুরু হল। সারাদিন শুধু গান আর গান। বারান্দায় সোয়েটার বুনতে বুনতে চলল গান। রান্নাঘরে গান··

"শি ইজ ফুল অফ মিউজিক।" রণধীর বলে, সুগভীর বিস্ময়ে 'আমি সত্যিই স্তব্ধ হয়ে যাই। এমন কথা, এত স্নায়বিক উত্তেজনার পরও যে সত্যি সত্যি কেউ আবার গান করতে পারে, এ আমার কল্পনাতেও ছিল না কোনদিন। প্রথমে মনে হয়েছিল—ওপরে বাজা রেডিওই হবে বুঝি বা। কিন্তু সে সুরের সঙ্গে না কোন যন্ত্রের ধ্বনি ছিল, না রেডিওর স্বাভাবিক শব্দের রেশ। ভেসে আসছিল শুধু মিষ্টি গুন্ গুন্ একটা স্বর।

"কিন্তু ওদের মধ্যে··"

"হবে কোন 'পার্সোনাল' ব্যাপার।" একটু যেন ইতস্তত করে রণধীর: "অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে দরকারটাই বা কি··বাট ইউ সি হার··দি 'বিউটি'··কি শরীর। ঠিক যেন কেউ একতাল মাখন দিয়ে তৈরী করে খাড়া করে দিয়েছে। একেবারে নিরানব্বই নম্বরের দানা।" উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে রণধীর।

"দানা আবার কি?" জিজ্ঞেস করি আমি। রেগে ওঠে বিনু। "লজ্জা করেনা অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে কথা বলতে?" ভ্রূ কুঁচকে বলে ও। "নিজের বৌয়ের সম্বন্ধে যদি কেউ এমন জঘন্য কথা বলত?"

"করে করবে।" টাই খুলে রণধীর বিনুর কাঁধের ওপর রেখে দিয়ে আদর মাখা স্বরে বলে, "আমার বৌ কি কারুর থেকে কম দানা?"

"যাঃ।" লাল হয়ে ওঠে বিনু।

"ও, আছে—খেয়াল আছে?" রণধীরের পিঠে টাইএর ঝটকা মেরে বলে।

"ও আমার কথা কি খেয়াল করেছিল? দেখনি দুচোখ দিয়ে কেমন গিলে খাচ্ছিল?" ছেলেমানুষ হয়ে ওঠে যেন রণধীর।

কানের ডগা গরম হয়ে ওঠে আমার। "কিন্তু দানাটা কি?" জিজ্ঞেস করি আবার।

থেমে থেমে যেন বড় বিপদে পড়ে বিনু বলে: আরে ভাই, যে কোন সুন্দর মেয়েকেই দানা বলে এরা। অর্থটা—চক্ষুর খাদ্য। ভয়ানক অসভ্য সব। একবার 'উইন্টার ভেকেশনে' কিশোর আমায় ওকেও শিখিয়ে ছেড়েছিল। অঙ্ক কষতে নয় নামতা মুখস্থ করতে করতে হঠাৎ বলে উঠত 'মামি, মামি' পাপার দানা গান করছে। ওকে উঠতে বসতে বা কোন মেয়েকেই আসতে যেতে দেখলেই বলত—পাপার দানা যাচ্ছে। বলত' স্কুলে ফিরে গেলে কি রকম নাম হবে? সিষ্টাররাই বলবেন কি যে ভালো 'ম্যানার্স' শিখিয়েছেন তোমার পেরেন্ট্‌রা।

দানা কথায় না হেসে পারিনা আমি। ছেলেকে নিয়ে কথা বলতে বলতে কি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল ভুলেই গিয়েছিল বিনু। ছেলের অভ্যেস আর ম্যানার্স নিয়েই কথা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছিল ও।

"দানাই তো সত্যি হয়ে উঠেছে ও। নিশ্চয়ই নিরানব্বুই নম্বরের। ওকে দেখলে তো তোর পঁচিশ পাওয়াও মুস্কিল হয়ে উঠবে।" ঐ জন্যেই মাঝখানে বলি আমি।

"এ, মাইণ্ড ইট।" কপট ক্রোধে বলে রণধীর। "আমার শব্দের অপব্যবহার করবে না। ভালো সেকেণ্ড ক্লাশের নিচের জিনিস দানা হয়না। তুষো হয়ে যায়।"

"সরি।" সকৌতুকে একসঙ্গে বিনুর দিকে তাকাই আমরা। ওপর থেকে গানের স্বর ভেসে আসছিল তখনও!

ঐরকম সাড়ীর সঙ্গে বব্‌ড চুল অনেক দেখেছি, কিন্তু কারুকে যে সে অমন ভাবে মানাতে পারে আমি ভাবতে পারিনি কোনদিন—আমি বলি। আর সত্যিই আমার মনে হয় যে, কাটা চুল, লিপষ্টিক, পাউডার আর পেট দেখান ব্লাউজ—এ সবই আমার অত্যন্ত উচ্চ মনোবৃত্তির পরিচয় বলে মনে হত। কিন্তু তবুও আজ ওকে ঘেন্না করতে মন সরে না।

"ইস্ আহা-হা, গো।" ঠাট্টায় উচ্ছল হয়ে ওঠে বলে বিনু। বড় শোচনীয় অবস্থা যে। বলত খবর দিই পৌছে। কিন্তু মেজর তেজপাল যে গুলি চালিয়ে দেবে, সে কথাটি মনে রেখো। আমার তো বাপু ওকে দেখলেই বুক গুড়গুড় করে। রাক্ষসের মতন তো চোখই। চোখ বন্ধ করে' ভয়ের এক ভঙ্গি করে বিনু। "চুল তো এখন ওর নেই। ছুমাস আগে যদি দেখতিস।" করুণ গলায় বলে ও। রেশমের মতন ঘন আর কালো একরাশ চুল হাটু পর্য্যন্ত যেন ঢেউ দিয়ে থাকত। সমস্ত জুবিলী লাইনসে একেবারে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেই ভয়ে বেচারা খোঁপাই বাঁধত সব সময়। লোক পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়াত মাথা জোড়া সে খোঁপার বহর দেখে। কখন নিঃশব্দে গেল আর কেটে এল সে চুলের রাশ। কিন্তু চিরকালের অভ্যেস কি আর চলে যায় সত্যি! দেখিসনি—চুল ঠিক করতে হাত বারবার উঠে আসছিল কেমন করে?

"কেন, কেটে ফেল্‌ল কেন?" উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

"আরে এমন কিছুই ব্যাপার ছিল না। আমাদের সামনেই তো সব কথাবার্ত্তা। এমনিই সবাই বসেছিলাম। ও গান করছিল। দানা তো মিষ্টিই। সবাই প্রশংসাও করছিল উচ্ছ্বসিত। তেজপাল বলেছিল "ওর গান শুনতে শুনতে আমি [illegible] হয়ে গেলাম কিন্তু ওর ঐ চুল যে কি ভালো লাগে আমার। মরি তো ওতেই" সে সময় তো কিছুই বলল না। পরের দিনই গিয়ে সমস্ত চুল কাটিয়ে এল আর নিজেই সে কথা ভেবে কেঁদে ভাসাল সারাদিন অদ্ভুত মেয়ে!"

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি আমি। গানের স্বর শোনা যাচ্ছিল তখনও। আজ যখনই সেদিনের কথা ভাবি, তখনই মনে হয়—সে গুলির স্কুল আর সেই অদ্ভুত রহস্যময় কণ্ঠস্বর। সেই মুহূর্ত্তে প্রথম বার আমার ইচ্ছে হয়েছিল সেই কোঁকড়ান চুলের জ্যোতির্মণ্ডলে ঘেরা মুখখানি কাছ থেকে দেখি। তুই কানে হাত রেখে দেখি••দেখি ঐ তুই চোখে কোন্ সে গহন অরণ্যের তরল কালিমা মেশামিশি হয়ে আছে•••••

বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারগুলোর পাশ দিয়ে এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করতে করতে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। হাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘে ঢাকা ছিল সমস্ত আকাশ। এখানে ওখানে লাগান ইলেকট্রিকের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সামনে বিছিয়ে ছিল সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ আর বাচ্চাদের খেলার এটা সেটা। আর লোহার দোলনা যন্তর-মন্তর থেকে দেখা যাচ্ছিল। আইসক্রিম আর বিস্কুটের কাগজ ছড়ান ছিল এদিক সেদিকে। লনের আশে পাশে কেয়ারি করা পাতা-বাহার আর হলদে রঙের ডালিয়া আবছা আবছা ফুটে উঠেছিল। দূরে কেল্লার মাঠের ঢালু পথে ছুটে আসা কোন গাড়ির হেডলাইটের এক ঝলক আলো এসে হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল, আর সমস্ত বারান্দাটা ভরে উঠছিল আলোর বন্যায়। সামনের ব্লকে আমাদের ফ্ল্যাটের লাগোয়া যে ফ্ল্যাট পড়ত, তার পেছনের দিকের বারান্দা এদিকে পড়েছিল। ভেতরের ঘরের অল্প আলোয় গেঞ্জি ও [illegible] খাকি ইজের পরা আর্দালি দৌড়ে দৌড়ে মশারি লাগাচ্ছিল। সামনেই সেই কোণটা চোখে পড়ছিল—যেখানে বসে বেশীর ভাগ সময় টাইপ করতাম আমি আর ওপরের বারান্দায় মাঝে মাঝে কিটি এত জোরে ডেকে উঠত যে, সমস্ত ব্লকটাই যেন গুমগুম করে উঠত। গানের স্বর আর কিটির ডাক কি বিপরীত দুটো জিনিস—কিন্তু মনে হত এ দুই-এর মধ্যে যেন কি গভীর এক মিল লুকিয়ে আছে। হ্যাঁ, টাইপ করতে করতে বারান্দাতেই তো বোধহয় মিসেস তেজপালের এক অন্য রূপ প্রথম দেখেছিলাম।

মেজেতে চারিদিকে কাগজ ছড়িয়েছিল, আর আমি টাইপ করছিলাম। ফলওয়ালা এসেছিল, তাই দরজা খোলা ছিল••হঠাৎ ঝড়ের বেগে বায়ুপোতের মতন গুনগুন করে গান করতে করতে ওপর থেকে নেমে এসেছিল আর দড়াম করে খুলে গিয়েছিল দরজাটা।

"ওঃ, সরি, আমি ভাবলাম মিসেস ধীর বুঝি বুনছেন বসে বসে, দরজা খোলা আছে—হঠাৎ গিয়ে চমকে দেব ওঁকে।" তু'হাতে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ও। চোখে কালো চশমা, হাল্কা গোলাপী শাড়ি, ব্লাউজ, নখে হাল্কা গোলাপী নখরঞ্জনী, হাতে বেতের চ্যাপ্টা ঝাঁপি, যার তু'দিকে প্লাষ্টিকের ফুলতোলা ঢাকনা ফেলা। কাঁধে সোনালি কাজ-করা একেবারে সাদা ব্যাগ। আমি সত্যিই চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি বলে উঠি,—"আসুন, আসুন।"

দরজায় আস্তে একটা ধাক্কা দিয়ে চারিদিকে হাল্কা একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে ভেতরে চলে আসে ও।

"বিমু বাথরুমে গেছে। এক্ষুনি এসে পড়বে। বসুন না আপনি ততক্ষণ।" টাইপকরা কাগজগুলোর দিকে চোখ রেখে বলি আমি। হঠাৎ মনে পড়ে যায় রণধীরের সেই কথাটা "নিরানব্বই নম্বরের নানা।" কিছুতেই আর হাসি চাপতে না পেরে মাথা ঘুরিয়ে কাগজপত্র সামলাতে সুরু করে দিই।

"আরে আমাকে তো বলেছিল যে, হ'টোর সময় তৈরী থাকব। এটা কি স্নানের সময়! মরবে নাকি?" বেতের চেয়ারে এক হাঁটুর ওপর আর এক পা তুলে বসে পড়ে এক দৃষ্টিতে স্যাণ্ডেলের দিকে চেয়ে অল্প অল্প পা নাচাতে থাকে ও।

"বেরোবেন নাকি কোথাও?" আজ মেজাজটা বেশ খুশী-খুশী মনে হয়। মিসেস ধীরের বদলে বিমু বলছিল তাই বুঝি।

"নিউ মার্কেটে যাবার কথা ছিল। বলছিল, চারটের আগে ফিরতে হবে, না হলে মেজর ধীর অপেক্ষা করবেন। পর্দা-টর্দা কিছু কিনতে আছে বোধহয়।" হঠাৎ ফিরে বারান্দায় ঝোলান ছোট ছোট, সবুজ গামলাগুলোর দিকে চেয়ে বলে ওঠে,—"আমার এই গামলা আর ফুলগুলো যে কি ভালো লাগে! বিমু বলেছিল আনিয়ে দেবে। আমি আমাদের ঘরের ধারের দিকের বারান্দাতে ঝোলাব। রাতে যদি হঠাৎ চোখ খুলে যায়, বারান্দায় এসে পড়া এক টুকরো চাঁদের আলো গামলায় ফুটে থাকা ফুলগুলোর সঙ্গে মেশামিশি হয়ে ওঠে। শিশির ভেজা বাইরেটায় তখন আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াতে কি ভালো লাগবে। না?"

আরে এ যে রীতিমত কাব্যকথা! চমকে উঠে ওর দিকে তাকাই এবার। কালো চশমা খুলে নিয়েছিল ও! আর ফ্রেমের শেষ দুটো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কথা বলছিল একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে। নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে দেখে নেবার এই অবসর ছিল বুঝি। দেখছিলাম ওর কাঁধ আর কানের পাশে ছোঁয়া রেশমের মতন চুলের গোছা। এক্ষুনি চুল ভিজিয়ে স্নান করেছিল বুঝি। হালকা শ্যাম্পুর গন্ধ ভেসে আসছিল বাতাসে। কানের রিঙ, দুলছিল এক টুকরো ভাঙা চাঁদের মতন। গোলাপী রঙের কনুই পর্য্যন্ত মেশা ব্লাউজে বাঁধা হাত চেয়ারের হাতলে রাখা ছিল—আর অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছিল কব্জিতে বাঁধা কালো ফিতের ঘড়ি। আর গন্ধ ভেসে আসছিল ওর তাল দেওয়া আঙুলগুলোয় সদ্য রাঙান নখরঞ্জনীর।

"ওমা, একি কথা! আমি তো বসে বসে বেশ আপনাকে ডিস্টার্ব করছি।" ঈষৎ এদিকে ফিরে বলে ও। বসে বসে গল্প জুড়ে দিয়েছি। এ এক বদ অভ্যেস সত্যি আমার। কোথাও বসলেই সুরু হল গল্প। যাকগে, আমি এখন তবে ওপরে যাই। বসে বসে কিটির সঙ্গে দুএকটা কথাটথা বলি। না হলে নিচে গুড্ডির কাছে গান শুনিগে বসে। মিসেস ধী··বিমুর স্নান হয়ে গেলে বরং আমাকে বলে পাঠাবেন·····"

"আরে না-না। আমি তো এতক্ষণ বসে বসে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম।" দুহাত মুখের কাছে এনে হাই তোলবার ভান করি। এমনি তে আগে ওর ভাবে ভঙ্গিতে কোনখানেই উঠবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। বলতে হয় তাই বলছিল কথাগুলো। "এখানে এসে থেকে তো খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম আমি।" অল্প হেসে বললাম আবার। "একে তো এই বদ্ধ বদ্ধ বাতাস, তার ওপর প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ব্রেক ফাষ্ট, লাঞ্চ, টি, নাহলে ডিনারের কোন না কোন সময় এসেই চলেছে। তারও মাঝে মাঝে ফল—বিস্কুট তো আছেই। প্রথম খাবার গলা দিয়ে নামতে না নামতে দ্বিতীয় দফা হাজির। সবার ওপর এই জাহাজের শব্দ·····"আপনি কি করছিলেন এতক্ষণ?"

## প্রতিবাদ

### মৃত্যুঞ্জয় সেন

বাসনার শক্তি আজ খোঁজে নিরিবিলি
সূর্য্যের প্রখর তাপে সে যে গেছে চলি
ধোপ দুরন্ত ধ্বনি তাও মিশে যায়
যদিও প্রেম আসে সুন্দর আঙিনায়।
ঘরানা বাঁধে জাল উত্থান-শ্রেষ্ঠ
দেবদূত বাঁশী ভাঙে যে মন-ক্লিষ্ট;
তারিফ করা বেদেনীর সাপের ঝাঁপি
জাদু মন্ত্রে তাও উঠে কাঁপি
গোলাপী ফুলের পাপড়ি একটু করে বাড়ে
শত্রু এগিয়ে আসে, শুধু চুপিসাড়ে—
অজানা পাহাড় জেতা উল্লাস নিয়ে ফেরে
উন্মাদ সে নেচে উঠে দ্বার-রুদ্ধ ঘরে।
এ বছর ঘরটার কার্নিশ ভেঙে পড়ুক
যদি শেষ হবার ঘণ্টা বাজে তাও বাজুক
সংরক্ষক ভক্ষক হয়—অস্থায়ী কীর্ত্তি নিয়ে
প্রতিবাদ সমিতি নির্বাক থাক সমাপ্তির কাছে গিয়ে।

## রজনীগন্ধা

### বিদ্যুৎকুমার দে রায়

রজনীগন্ধার মত তোমাকে দেখেছি কোনো প্রাতে
কোনো মিষ্টি সুবাসের ডানাখানি লেগেছে বাতাসে,
কিসের আবেশে মন দিশাহারা হয়ে আজ কাঁদে
ব্যাকুল মূর্চ্ছনা তার অঙ্গে অঙ্গে আকণ্ঠ তিয়াসে।
যদি তুমি করে থাকো কিছু কথা সঞ্চয় হৃদয়ে
হয়তো গভীর লজ্জা বিস্মৃতির অণু-পরমাণু—
ঘাসের বুকের মত অনিচ্ছায় যাব সব সয়ে
বন্দীর কান্নার সুরে জমা হয় মৃত্যুর জীবাণু।
এখনও সন্ধ্যার মেঘ কালো ঢেউ দেয়নি ছড়িয়ে
রঙের জটিল জালে অনাহত পুষ্পের আঘ্রাণ
নিয়েছি কোমল গন্ধা কোনো তবু হাত দুটি দিয়ে
একান্ত পাখীর ডানা বন্ধ করে তার পরে স্নান।
বিযুক্ত হয়েছি যেন বহুদিন বহুদিন পরে
তাই মনে হয় কোনো রাত্রিকে ভীষণ
ভয়াল ভ্রূকুটি দেখে ভীরু হয়ে ফিরে যায় ঘরে
ফিরে যায় বাতিঘরে উচ্ছ্বসিত আলো মোর।

রত্নগিরি ( উড়িষ্যা )

# উড়িষ্যায় লালা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

পাইকপাড়া জমীদার বংশের কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বা লালাবাবুর নাম দানশীলতার জন্যে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দীর জমীদার ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা নবাব আলীবর্দী ও সিরাজউদ্দৌল্লার অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার উড়িষ্যা জয় করিলেন। উড়িষ্যাকে সাময়িক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া চার্লস্ গ্রোমকে দক্ষিণ অংশের কালেক্টার নিযুক্ত করা হইল। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পিতামহের ন্যায় ইংরাজ সরকারের অধীনে দেওয়ানী কার্য করিতেন। তিনি গ্রোম সাহেবের দেওয়ান হইয়া পুরী আসিলেন। ১৮০৫র গোড়ায় তিনি দরখাস্ত করিলেন যে জগন্নাথ মন্দিরের ভিতর অংশ মেরামতের জন্য তাঁকে অনুমতি দেওয়া হউক। তাঁকে জানান হইল যে, তিনি মেরামত করিবার জন্য পাণ্ডাদের সম্মতি পাইলে গবর্ণমেন্টের কোন আপত্তি নাই (১)। কৃষ্ণচন্দ্র বোধহয় পাণ্ডাদের সম্মতি পান নাই। পরবর্তী এক ঘটনা হইতে অনুমান করা যায় যে, পাণ্ডাদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না।

১৮০৬ র শেষের দিকে উড়িষ্যার দুই ভাগকে জুড়িয়া একটা জেলা করা হইল। কৃষ্ণচন্দ্র চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তিনি নিজের জমীদারীতে ফিরিয়া না গিয়া পুরীতে স্থায়ী ভাবে বাস করিলেন। তাঁর বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল, শেষ জীবন জগন্নাথ দর্শন করিয়া কাটাইবেন।

১৮০৬তে গবর্ণমেণ্ট পুরী জেলার তিনটী খাস মহল জমীদারী চব্বিশকুদ, রাহাঙ্গ ও সেরাই ইজারা দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র পদত্যাগ করিলেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কালেক্টারের সেরেস্তাদার তাঁর আত্মীয় চন্দ্রপ্রসাদের সাহায্যে তিনি অন্যলোকের নামে জমীদারী তিনটীর ইজারা লইলেন। সেই সময় জমীদারী তিনটী বিক্রী করিয়া দিবার কথা চলিতেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র সেগুলি কিনিয়া লইবেন স্থির করিলেন।

রাহাঙ্গের পাশে খুর্দা রাজার সেনাপতি বক্সী জগবন্ধুর রোড়ং নামে একটি ছোট জমীদারী ছিল। "দুই বিঘা জমী" কবিতার জমীদারের মত কৃষ্ণচন্দ্র রাহাঙ্গ জমীদারীকে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান করিবার জন্য রোড়ং দখলের চক্রান্ত করিলেন।

চন্দ্র প্রসাদের আত্মীয় গৌরহরি খাসমহলের তহশীলদার ছিলেন। তিনি জগবন্ধুকে পরামর্শ দিলেন যে, রোড়ং জমীদারীর খাজনা পুরী গিয়া কালেক্টারের ট্রেজারীতে জমা না দিয়া তাঁর কাছে জমা দিলেই চলিবে। জগবন্ধু তাঁর প্রস্তাব মত কাজ করিলেন। কিন্তু জগবন্ধু রোড়ংর খাজনা পৃথকভাবে জমা না দিয়া রাহাঙ্গ 'ওগের' ( প্রভৃতি ) বলিয়া চালাইয়া দিলেন।

এই সময় বক্সী জগবন্ধুর পিতৃব্য-পুত্র রোড়ং জমীদারীর এক অংশ দাবী করিলেন। জগবন্ধু সম্পত্তি ভাগে রাজী হইলেন। নানা গোলযোগের দরুণ রোড়ং খাজনা দাখিলে ভুল হইল কিম্বা সময়মত দেওয়া হইল না। ইহাতে গৌরহরির সুবিধা হইল।

১৭ই জুন, ১৮০৯ তারিখে সেরাই, চব্বিশকুদ ও রাহাঙ্গ নীলাম করা হইল। রোড়ং জমীদারী রাহাঙ্গ 'ওগেরের' অন্তর্ভুক্ত হইয়া নীলামে উঠিল। রাহাঙ্গ 'ওগের' জমীদারী ১০,০০০ টাকা দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র কিনিয়া লইলেন (২)। সেরাই ও চব্বিশকুদ জমীদারীও তিনি কিনিলেন।

এইভাবে জগবন্ধুকে না জানাইয়া ও বকেয়া খাজনা মিটাইয়া দিবার সুযোগ না দিয়া রোড়ং হস্তান্তর হইল। কিন্তু ব্যাপার এইখানেই মিটিল না। জগবন্ধু কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মচারীদের রোড়ং দখল করিতে দিলেন না। তিনি কালেক্টার মিলফোর্ড সাহেবের নিকট দরখাস্ত পাঠাইলেন। কিন্তু সেরেস্তাদার চন্দ্রপ্রসাদের প্রভাবের দরুণ জগবন্ধুর অভিযোগ ধামাচাপা পড়িল।

জগবন্ধু কিন্তু কাগজপত্রে নিজেকে রোড়ংর জমীদার বলিয়া পরিচয় দিলেন ও জমীদারী একজনকে ইজারা দিলেন। ১৮১৩তে ত্রিবার্ষিক বন্দোবস্তের সময় কৃষ্ণচন্দ্র সেরাই, চব্বিশকুদ ও রাহাঙ্গের ( রোড়ং সহিত ) নূতন করিয়া ইজারা লইলেন। (৩)

নিজের নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য সেরাই ও চব্বিশকুদের নাম বদলাইয়া তালুক কৃষ্ণনগর ও কৃষ্ণচন্দ্র রাখিলেন। জগবন্ধু সেটেলমেণ্ট কমিশনার রিচার্ডসন সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিয়া জানাইলেন যে, গৌরহরি তাঁহার অজ্ঞাতসারে রোড়ং রাহাঙ্গের সহিত জড়াইয়া বিক্রী করিয়াছেন। রিচার্ডসন জগবন্ধুর দরখাস্ত কালেক্টার ট্রাওয়ার সাহেবের কাছে পাঠাইলেন। ট্রাওয়ার পরিষ্কার লিখিলেন যে, রোড়ং সম্পূর্ণ পৃথক জমিদারী ও রাহাঙ্গের অংশ

---

(১) টি ফর্টেশ,ক, কমিশনারের সেক্রেটারী—চার্লস্ গ্রোমকে ১২ই মার্চ, ১৮০৫ (রেভিন্যু বোর্ড রেকর্ডস, কটক— সংক্ষেপে রে,র,ক)

(২) ট্রাওয়ার, কালেক্টার—সদর রেভিন্যু বোর্ডকে—১১শে এপ্রিল ১৮১৭ [ ওড়িষ্যা আর্কাইভস্ ভুবনেশ্বর—সংক্ষেপে ও, আ, ভু ]

(৩) ককবার্ণ রেভিন্যু বোর্ডকে—২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬০ [ রে, ব, ক ]

নয়। (৪) কিন্তু ট্রাওয়ার চিঠি লেখার আগেই কৃষ্ণচন্দ্র এক অপ্রীতিকর ঘটনার দরুণ উড়িষ্যা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। জগন্নাথ-মন্দির সংলগ্ন কিছু জমী তিনি রাহাঙ্গ জমিদারীর অংশ বলিয়া দাবী করিলেন। মন্দিরের পাণ্ডারা আপত্তি করায় মামলা আরম্ভ হইল। জেলা আদালতে কৃষ্ণচন্দ্র জিতিলেন! কিন্তু তিনি জমী দখলের চেষ্টা করাতে পাণ্ডারা বাধা দিল। দাঙ্গার ফলে একজন পাণ্ডা প্রাণ হারাইল। সদর রেভিন্যু বোর্ড সেটেলমেণ্ট কমিশনার রিচার্ডসনের মত জানিতে চাহিলে রিচার্ডসন লিখিলেন যে, সেই জমীতে পাণ্ডাদের ন্যায্য অধিকার আছে (৫)। সদর রেভিন্যু বোর্ড কমিশনারকে জানাইল যে, কৃষ্ণচন্দ্রকে সেই জমী দেওয়া যেন না হয়; তিনি আদালতে আপীল করিয়া তাঁর অধিকার যেন প্রমাণ করেন (৬)। মনের ক্ষোভে কৃষ্ণচন্দ্র কাশী চলিয়া গেলেন। (৭)

১৮১৪তে রোড়ংকে রাহাঙ্গ হইতে আলাদা করা হইল। কৃষ্ণচন্দ্রের 'মোক্তার' রোড়ং ফিরিয়া পাইবার জন্য কলিকাতার আপীল কোর্টে দরখাস্ত করিল। ওদিকে বকেয়া খাজনা না দেওয়ার দরুণ চব্বিশকুদ, রাহাঙ্গ ও সেরাই গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিল। মালিকানা হিসাবে জমীদারকে জমীদারীর আয়ের শতকরা দশ অংশ দেওয়া হইল। (৮)

কৃষ্ণচন্দ্রের অর্থের অভাব ছিলনা। বাঙ্গলার ৯টি জেলায় তাঁর জমীদারী ছিল (৯)। তাঁর মনে হঠাৎ ধর্মভাব দেখা দেওয়াতে তিনি উড়িষ্যার জমীদারীর খাজনা দেওয়ার বন্দোবস্ত না করিয়াই কাশী চলিয়া গেলেন। জগবন্ধু কিন্তু রোড়ং ফিরিয়া পাইলেন না। গদাধর বোধ হয় রেভিন্যু বোর্ডকে দরখাস্ত করিয়াছিলেন রোড়ং জমীদারীতে তাঁর স্বত্ব উপেক্ষা করা হইয়াছে। কালেক্টার ট্রাওয়ার ২৭শে মে ১৮১৭ তারিখে সদর রেভিন্যু বোর্ডকে লিখিত তাঁর চিঠিতে রোড়ং জমীদারীতে জগবন্ধুর অধিকার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সদর রেভিন্যুবোর্ড নির্দেশ দিল যে, জগবন্ধু যেন আদালতে রোড়ংএ তাঁর অধিকার সংক্রান্ত কাগজ পত্র দাখিল করেন। (১০)

ইংরাজ সরকার কিম্বা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়িবার সামর্থ্য জগবন্ধুর ছিলনা। খুর্দা এলাকায় তাঁর কিছু জায়গীর ছিল। গবর্ণমেণ্ট জায়গীর জমীগুলি খাসমহল করিলেন। অবশিষ্ট জমী তাঁর এক কর্মচারী জগবন্ধু পটনায়েক বেদখল করিল (১১)। খুর্দারাজার সেনাপতি অভিজাত বংশীয় জগবন্ধু নিঃসম্বল হইলেন।

১৮১৭তে জগবন্ধুর নেতৃত্বে খুর্দার পাইকরা বিদ্রোহ করিল। কিছু সময়ের জন্য পুরী জেলায় ব্রিটিশ শাসন লোপ পাইল। বিদ্রোহ দমনের পর গবর্ণমেণ্ট ওয়ালটার ইউয়েরকে বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে পাঠাইলেন।

ইউয়ের তাঁর রিপোর্টে লিখিলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র জগবন্ধুকে প্রতারিত করিয়া রোড়ং দখল করায় ও গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিকার না করায় জগবন্ধু সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। ইহার চল্লিশ বৎসর পরে কমিশনার ককবার্ণ লিখিলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র প্রতারণায় সাহায্যে রোড়ং দখল করার পাইক-বিদ্রোহ হইল। (১২)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উড়িষ্যার ইতিহাস-লেখক হাণ্টার ও টয়েনবী পাইক-বিদ্রোহের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকে দায়ী করিলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজার অর্থ সাহায্যে লিখিত 'উড়িষ্যার ইতিহাস' বইতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যায় আচরণের উদাহরণ দিয়া উড়িষ্যায় ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকে বাঙ্গালী কর্মচারীদের অত্যাচারের বিবরণ অতিরঞ্জিত করিলেন।

জগবন্ধুর মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ ক্রমে রোড়ং তাঁর পুত্র গোপীনাথ ও আত্মীয় গদাধরের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

১৮৩৫এ কমিশনার জোসেফ মাষ্টর কলিকাতায় কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র নারায়ণ সিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া সেরাই, চব্বিশকুদ ও রাহাঙ্গ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কিনিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কথাবার্তা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ১৮৪৫-এ সম্পত্তির অধিকারিণী রাণী কাত্যায়নীর সঙ্গে জমীদারী কিনিবার জন্য আরেকবার কথাবার্তা হইয়াছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে পাইকপাড়া জমীদার বংশ মামলা করিয়া উড়িষ্যার জমীদারী ফিরিয়া পাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। বৃন্দাবনে গিয়া তাঁর বিষয়-বুদ্ধি আবার জাগিয়া উঠিল। মথুরা জেলার পবিত্র স্থানগুলি সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি স্বল্প মূল্যে অনেকগুলি জমীদারী কিনিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁর মৌখিক প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। (১৩)

মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে ঘোর পরিবর্তন দেখা দিল। বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি বৃন্দাবনে মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণ করিলেন। ক্রমে তাঁর ধর্মভাব প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মাধুকরী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সংসার ত্যাগ করায় কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ তাঁর নাবালক পুত্র নারায়ণ সিংহের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করিল (১৪)। বোধহয় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আনুমানিক ৪৮ বৎসর বয়সে এক দুর্ঘটনার ফলে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হইল।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্ধী জগবন্ধুর ছোট জমীদারী রোড়ং দখলের জন্য প্রতারণার আশ্রয় লইয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ধর্মকার্যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি স্মরণীয়; কিন্তু উড়িষ্যার লোকে তাঁকে প্রতারক বলিয়া জানে। উড়িষ্যার ইংরাজ শাসকেরা তাঁকে খুর্দা বিদ্রোহের জন্য দায়ী করিলেন। অতুল ঐশ্বর্যের মোহ একদিন তাঁকে অন্ধ করিয়াছিল। সে মোহ কাটাইয়া স্বেচ্ছায় পথের ভিখারী হইয়াও চন্দ্রের মত কৃষ্ণচন্দ্রের কলংক থাকিয়া গেল।

---

(৪) ওয়ালটার ট্রাওয়ার, কালেক্টার—কমিশনারের সেক্রেটারীকে ২৫ আগষ্ট ১৮১৩ [ ও, আ, ভু ]

(৫) জন রিচার্ডসন কমিশনার—সদর রেভিন্যুবোর্ডকে ১৫ এপ্রিল ১৮১৩ [ পশ্চিমবঙ্গ আর্কাইভস্ সংক্ষেপে প, ব, আ ]

(৬) সদর রেভিন্যু বোর্ড—রিচার্ডসনকে ৪ জুন ১৮১৩—[প,ব,আ]

(৭) জর্জ ককবার্ণ, কমিশনার—সদর রেভিন্যুবোর্ডকে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৬০ [ রে, ব, ক ]

(৮) মোফাট মিলস্, কমিশনার—সদর রেভিন্যুবোর্ডকে—২০ জুন ১৮৪৪ [ রে, ব, ক ]

(৯) সদর রেভিন্যুবোর্ড কার্য নির্ঘণ্ট—১৮ জুলাই ১৮২০ [প,ব,আ]

(১০) সদর রেভিন্যুবোর্ড—জন রিচার্ডসনকে ২৬ মে ১৮১৪ [ প, ব, আ ]

(১১) ইউয়ের রিপোর্ট ২৭ মে ১৮১৭ [ ও, আ, ভু ]

(১২) ককবার্ণ সদর রেভিন্যু বোর্ডকে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৬০ [ রে, ব, ক ]

(১৩) গ্রাউস মথুরা জিলা ম্যানুয়াল ( ১৮৮২ ) পৃ ২৫১

(১৪) রেভিন্যু বোর্ড কার্য নির্ঘণ্ট ১৮ জুলাই ১৮২০ [ প,ব,আ ]

বিষ্ণুপ্রিয়া শুনলেন, স্বামী গয়াধামে চলেছেন।

মিলনের পরে এই প্রথম বিরহ।

আসন্ন বিরহে কাতর বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখ সজল হলো। নিমাই তাঁকে আশ্বাস দিলেন, পিতৃ-পিণ্ড দিয়ে আসব তোমার কাছে। স্বামীর প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।···

দিন যায়।

দুঃসহ হয়ে ওঠে প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি। ফিরে আসে না বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণপ্রিয়। বিরহানলে দগ্ধ হয় তাঁর অন্তর।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে সংবাদ এলো গয়াধামে গিয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে পতিদেবতার। গৃহত্যাগের সংকল্প করেছেন তিনি।

এই নিদারুণ সংবাদ শুনে বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে ঘুম নেই। এ কী অপ্রত্যাশিত অশুভ তাঁর জীবনের অনাবিল সুখের পথে কণ্টক হয়ে এলো? ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করলেন সাধ্বী। তিনি তো কোন অপরাধ করেন নি। কেন তবে এমনি করে ব্যর্থ হবে তাঁর জীবন, কেন ভেঙে যাবে দাম্পত্য-জীবনের মধুর স্বপ্ন?···

আরো কিছুকাল কাটে আশঙ্কায়, বিরহ-বেদনায়।···

শিষ্যদের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না নবদ্বীপচন্দ্র।

নবদ্বীপে ফিরে এলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

তখন পৌষমাসের শেষ।

উল্লাসমত্ত নবদ্বীপবাসী। আনন্দবিহ্বলা শচীদেবী। পতিমুখ-দর্শনাভিলাষিণী কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরালে দণ্ডায়মানা।

ফিরে এসেছেন তাঁর নয়নানন্দ, বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রাণবল্লভ। কিন্তু এ কী? তাঁকে যে চেনাই যায়না। দেহে দিব্যজ্যোতিঃ, চোখে অবিরাম অশ্রুধারা। এ কী ভাব?

শঙ্কায় কেঁপে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

এলো মসীময়ী রজনী।

অনুচরেরা বিদায় নিলেন একে একে। বিশ্রাম সময় উপস্থিত।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ এলেন প্রেমময়ী প্রিয়ার কাছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেখলেন তাঁর স্বামীর দু'চোখে তখনো ঝরছে অবাধ অশ্রুধারা।

বিস্ময়ব্যাকুলা বিষ্ণুপ্রিয়া ত্রস্তপদে চললেন জননী শচীদেবীর কাছে।

শচীদেবী ছুটে এলেন পুত্রবধূর সঙ্গে।

নিমাই জননীকে বললেন, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—এক অপরূপ রূপবান বনমালাধারী নবীন পুরুষকে। সেই সম্মোহন জ্যোতির্ময় পুরুষের পায়ে সমর্পণ করেছেন জীবনের সর্বস্ব।···

চিন্তার অবধি [illegible]র।

নিমাই জননীকে বললেন, আমায় ছেড়ে দাও মা, কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাই।

যে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমে এতদিন তিনি মেতে ছিলেন, সেই বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি আর আকর্ষণ নেই, সম্পর্ক নেই তাঁর সঙ্গে।

নিমাইকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেন জননী শচীদেবী।

আশঙ্কায় ও গভীর উদ্বেগে দিন কাটে জননীর। তেমনি চিন্তিতা বিস্ময়বিমূঢ়া বিষ্ণুপ্রিয়া।

শচীদেবীর অভিলাষ—তাঁর পুত্র নিমাই ও পুত্রবধূর সঙ্গে আনন্দ-সম্ভোগে দিনাতিপাত করেন। মাতৃবৎসল নিমাই গার্হস্থ্য-জীবন আরম্ভ করলেন আবার। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবলেন—আবার বুঝি ফিরে পেলেন তাঁর প্রাণপ্রিয়কে, বুঝি ফিরে এলো হারাণো সুখের দিন। প্রিয়তমকে নিবিড়তর প্রেম-প্রীতি-ডোরে বাঁধবার চেষ্টা করলেন তিনি।

জননী শচীদেবী সাংসারিক আলোচনার মধ্যে পুত্রকে ডুবিয়ে রাখতে চাইলেন।···

নিমাই ভোজন-রত। ভক্ত অনুচরেরাও খেতে বসেছে। শচীদেবী বীজনহস্তে অদূরে উপবিষ্টা, অন্তরালে বিষ্ণুপ্রিয়া।

স্বামী শাক ভালবাসেন, তাই নানাবিধ শাক রন্ধন করেছেন।

শচীদেবী সংসারের নানা কথা, বিশেষ করে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা আলোচনা করছেন।

জননীর অভিপ্রায় পুত্রবধূর প্রতি পুত্রের আকর্ষণ সৃষ্টি করা। আপনভোলা নিমাই-এর যে কিছুতেই আসক্তি নেই!

অতর্কিতে জননীকে সম্বোধন করে নিমাই বললেন, তোমায় একটি গোপন কথা বলবো মা'।

উদ্গ্রীব হলেন শচীদেবী।

নিমাই বললেন, আমাদের ঠাকুরের নৈবেদ্য যা দেওয়া হয় তার অর্ধেক মাত্র থাকে, অর্ধেক থাকে না। আমার সন্দেহ হতো, তোমার বধূমাতাই অর্ধেক নৈবেদ্য সরিয়ে নেন। এতদিন লজ্জায় তোমায় বলিনি একথা। কিন্তু এখন দেখছি আমাদের জাগ্রত গৃহদেবতাই নৈবেদ্য গ্রহণ করেন।

হাসলেন নিমাই।

অন্তরালবর্তিনী সীমন্তিনী তাঁর লজ্জারুণ মুখখানি অবগুণ্ঠনাবৃত করলেন।

জননী বুঝলেন নিমাই-এর পরিহাস।

বললেন, বৌমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তার কিসের অভাব যে চুরি করে খেতে যাবে? বৌমাকে ও-কথা বলতে পারবিনে তুই।···

আহারান্তে বিশ্রাম করতে গেলেন নিমাই।

তাম্বুল-পাত্র হাতে নিয়ে তাঁর পদসেবা করতে এলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

স্বামি-প্রেম-গরবিনী নববালা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুদিনের জন্ম পিত্রালয়ে গেলেন।

বহুদিন পরে প্রিয়সখী-সান্নিধ্যে সুখসাগরে মগ্ন হলো সঙ্গিনীরা। বিষ্ণুপ্রিয়ারও হর্ষগৌরবের শেষ নেই। নবদ্বীপচন্দ্র তাঁর স্বামী, আর তিনি তাঁরই প্রিয়তমা পত্নী।

পরমানন্দে অতিবাহিত হলো কিছুদিন।

কিন্তু হঠাৎ অশুভ আশঙ্কায় তাঁর অন্তর কেঁপে উঠলো। তাঁর জীবনে যেন নেমে আসছে বিষাদের কালো ছায়া, বিপদ আসছে ঘিরে। পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে দেখা দিল অশ্রু। তিনি কল্পনা করতে পারলেন না অমঙ্গল কোন্ রূপ পরিগ্রহ করবে, কোন্ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে? শঙ্কিতচিত্তে কাটালেন একটি দিন।

সখী-মুখে শুনলেন—তাঁর স্বামী গৃহত্যাগের সংকল্প করেছেন। সকলে একবাক্যে বলছে, নিমাই নিজের মুখে বলেছেন একথা। তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের বিলম্ব নেই আর।

প্রিয়সখীর আসন্ন দুর্ভাগ্যের জন্ম অনুতাপ করলো বিষ্ণুপ্রিয়ার সহচরী।

তবু বিশ্বাস হলো না বিষ্ণুপ্রিয়ার। প্রেমময় নবদ্বীপচন্দ্রের অন্তর যে 'প্রেম দিয়ে গড়া'। পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার অকৈতব প্রেম, জননীর অনাবিল স্নেহ উপেক্ষা করে নিমাই কি কখনও সংসার ত্যাগ করতে পারেন? অসম্ভব। এ বাঁধন তিনি কাটাবেন কেমন করে? তিনি তো নিষ্ঠুর নন।

সখীর কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন পতিব্রতা। কিন্তু মন প্রবোধ মানলোনা কিছুতেই। চির-উদাসীর প্রেমে বিশ্বাস কি? নিমাই-এর উপর কি নির্ভর করা যায়? কিছুদিন আগেও তো তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

তাই পিতৃগৃহ ত্যাগ করে ব্যস্তভাবে স্বামীগৃহে ফিরে এলেন।...

নিসুতি রাত্রি।

ভোজনান্তে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছেন স্বামী।

কেশ-বিন্যাস করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

তারপর হাতে তাম্বুলপাত্র, রেকাবিতে চন্দনের বাটি ও ফুলের মালা নিয়ে শয়নগৃহে এলেন।

স্বামী সুখনিদ্রামগ্ন। সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত। প্রশস্ত প্রশান্ত আনন উদার নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের মতো অপরূপ, দীপ্তিময়।

ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলেন না বিষ্ণুপ্রিয়া।

স্বামীর মুখেই শুনবেন সব। চঞ্চল ব্যাকুল হয়ে উঠেছে পতিসোহাগিনী বিরহ ভয়ভীতা কুলবধূ। প্রতিটি মুহূর্ত যেন বিলম্বিত। কিন্তু স্বামীর নিদ্রাভঙ্গের মহা পাতক তিনি করতে পারবেন না।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়া বিষ্ণুপ্রিয়া।

কি ভাবলেন। তারপর স্বামীর রাতুল চরণ স্পর্শ করলেন। মাটিতে বসে হৃদয়ে ধারণ করলেন স্বামীর পদযুগল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই অনিন্দ্য-কান্তি মুখের পানে।

অনাবিল পুলকে ও তৃপ্তিতে শিহরণ জাগলো সর্বাঙ্গে।

একি বিচিত্র অনুভূতি।

মনে হলো তাঁর জন্ম সার্থক, ত্রিজগতে তাঁর মতো ভাগ্যবতী আর নেই।

আনন্দাশ্রু নীরে সিক্ত হলো পতির চরণ-যুগল।

নিদ্রাভঙ্গে নিমাই দেখলেন অশ্রুময়ী বিষ্ণুপ্রিয়া,—যেন শিশিরসিক্ত ফুল্ল শতদল।

ঘুমের ঘোর কেটে গেল। পত্নীকে কাছে আকর্ষণ করলেন তিনি। প্রাণপ্রিয়ার চিবুক স্পর্শ করে বললেন, ওগো আমার নয়নানন্দদায়িনী প্রিয়া, তোমার চোখে জল কেন? বল, তোমার অভাব কি?

স্বামীর সোহাগ-সম্ভাষণে বিগলিত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রবলতর হলো অশ্রুর বেগ। বস্ত্রাঞ্চলে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগলেন নিমাই। প্রিয়ার মুখের বিচিত্র ভাব লক্ষ্য করে বললেন, বল বল প্রিয়ে, কি চাও তুমি? এমন করে চোখের জল ফেলে আর কষ্ট দিয়ো না আমায়! আমি রয়েছি তোমার কাছে, তুমি আমার বাহুবন্ধনে। দুঃখ কোথায় তোমার?

বিষ্ণুপ্রিয়া নীরব, বেপথুমতী। তিনি একবার চোখ খুললেন। অনুযোগ মাখা তাঁর দৃষ্টি। এ অবস্থায় কেটে গেল কিছুক্ষণ।

স্বামীর বুকে এলিয়ে পড়লেন পতিপ্রাণা। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সজোরে। তারপর প্রশ্ন করলেন: তুমি নাকি মাকে অকূলে ভাসিয়ে যাবে?

নিমাই বুঝলেন পত্নীর মনের কথা। পতিসোহাগিনী নারী প্রকারান্তরে তাঁর নিজের অসহায়তার কথাই বলছেন।

শান্তকণ্ঠে বললেন, মাকে অকূলে ভাসাবো কেন?

: তোমার দাদা যা' করেছেন, তুমি নাকি তাই করবে?

নিমাই-এর সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধেই আকুল প্রশ্ন করছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু "সন্ন্যাস" শব্দটি কেমন করে উচ্চারণ করবেন ও-মুখে?

নিমাই-এর তো অজানা নেই কিছুই। স্মিতহাস্যে তিনি প্রশ্ন করলেন, একথা তোমায় কে বলল?

স্বামীর হাত ধরলেন প্রেমময়ী। নিজের মাথার উপর হাতখানি রেখে বললেন, আমার মাথার দিব্যি করে বল—

ছলনাময় নিমাই এড়িয়ে গেলেন সে প্রসঙ্গ।

বললেন, কতদিন পরে আমার কাছে এলে তুমি আজ। দীর্ঘ বিরহের পরে তোমার দেখা পেলাম প্রাণপ্রিয়া। আজ কোথায় তোমার চন্দ্রানন নয়নভরে দেখবো, না শুধু কেঁদেই কাটাবে?...তবে হাঁ, যেখানেই যাই—তোমার অনুমতি নিয়েই যাবো প্রিয়ে। এখন ভুলে যাও ও-সব কথা। মিলনের এ মধু-লগ্ন বিফল করে দিয়ো না। এসো প্রাণলক্ষ্মী—

শঙ্কাতুরাকে বুকে টেনে নিলেন নিমাই।

স্বামিজনোচিত পরিহাসে ও সোহাগে ভুলালেন মুগ্ধাকে।

সকল বেদনা বিস্মৃত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আত্মহারা হলেন সীমাহীন আনন্দে। যদি চিরন্তন হয় এই সুখনিশি!

কিন্তু একি!

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

মনে হলো তাঁর স্বামীর অন্তরে বয়ে চলেছে কান্নার অনন্ত সিন্ধু।

বিস্ময়-বিহ্বলা বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন, তুমি কাঁদছ?

হাসলেন নিমাই।

বললেন, না না, এইতো আমি হাসছি।

স্বামীর পা দু'খানি বুকে চেপে ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, তোমার ভাব দেখে শঙ্কা হয়—আমায় ফাঁকি দিচ্ছ তুমি। বল, একি ছলনা তোমার, আশ্বস্ত কর আমায়।

স্থির কণ্ঠে বললেন নিমাই, চল দু'জনে কৃষ্ণ-ভজন করি। তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া। সার্থক কর তোমার নাম।

বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝলেন স্বামীর ইংগিত। গৃহত্যাগী হতে চান তিনি। শুষ্ক পাণ্ডুর হলো চন্দ্রানন।

বললেন, কৃষ্ণ-ভজন কর আর যাই কর, গৃহত্যাগ করো না। আমি পিতৃগৃহে চলে যাবো, তোমার কাছে আসবো না আর! তুমি চলে গেলে যে মা আর বাঁচবেন না, লোকে অপযশ গাইবে। আর—

অবরুদ্ধ বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠস্বর।

—আর তোমার কাছে আসবো না। তবু মাতৃঘাতী হয়ো না তুমি।

কুসুমপেলবা প্রেয়সী বিষ্ণুপ্রিয়া।

তাঁর দিকে চেয়ে করুণা-ঘন হলো নিমাই-এর অন্তর।

বালিকা-বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর সর্বগুণাশ্রিত স্বামীকে কি বুঝাবেন, কোন্ যুক্তি দেখাবেন?

নিমাই বললেন, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করবো আমি। তা'তে মঙ্গল হবে উভয়েরই। তোমায় ভালবাসি আমি। তোমার কল্যাণই আমার চির-কাম্য। তোমায় ছেড়ে গৃহত্যাগী হয়ে আমি নিজে কি কম ব্যথা পাবো? দুঃখ শুধু তুমি একা পাবে না। দেহ বিচ্ছেদ ও বিরহে অম্লান থাকবে আমাদের প্রেম। তুমি কি জাননা বিরহেই গাঢ়তর হয় প্রেম? দুঃখ করোনা, আমার কল্যাণ কামনা কর, কল্যাণময়ি!

তবু সান্ত্বনা পেলেন না বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়া। শেষ হয়ে এসেছে তার দাম্পত্য-জীবন। তাঁর প্রাণপতি তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন। স্বামী হবে গৃহত্যাগী, কুল-লক্ষ্মী থাকবে ঘরে একাকিনী—বিগত দিনের সুখস্মৃতিটুকু সম্বল করে। এ যে স্বামী-বর্তমানেও বৈধব্যের মতো মর্মান্তিক পীড়াদায়ক!

স্বামীকে শুধালেন সাধ্বী, আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না তুমি আমায় পরিহাস করছ?

নিমাই উত্তর দিলেন, না প্রিয়ে, এ স্বপ্ন নয়, পরিহাসও নয়। তাই আমি সন্ন্যাসী হতে চাই। তুমি আমায় অনুমতি দাও। তোমার অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছি আমি।

অচেতন হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। স্তব্ধ হয়ে রইলেন বজ্রাহত ভূলুণ্ঠিত লতার মতো। নিমাই-এর স্পর্শে বাহ্য-জ্ঞান ফিরে এলো।

নিমাই আকুল স্বরে বললেন, দাও, অনুমতি দাও প্রিয়ে।

কিন্তু অনুগতা পত্নী কি কখনও চির-বিদায় দিতে পারে তার প্রাণাধিক স্বামীকে? নিজের শ্রেষ্ঠতম ধন কেউ কি বিলাতে পারে অকুণ্ঠিত-চিত্তে?

মর্ম-বেদনায় উন্মাদিনী হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

কোথায় যাবে? কেন—কেন যাবে? না না, আমি মাকে ডেকে আনি। আমি অভাগিনী, আমাকে না হয় অবজ্ঞা করলে, কিন্তু মাকে তো আর একা ফেলে রেখে যেতে পারবেনা।

গমনোদ্যতা বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরলেন নিমাই।

বললেন, অধীর [illegible] পরতমে। তুমি কি বুঝতে পারছনা—কী গভীর বেদনা আমার বুকে? জায়া-জননী [illegible] স্নেহ-প্রেমাস্পদ ছেড়ে সন্ন্যাস-জীবনে দীক্ষা নিতে চলেছি। তাতে কি আমার অন্তরে আলোড়ন জাগেনি? প্রাণপ্রিয়তমা তুমি। তোমায় ছেড়ে যেতে কি হৃদয় ব্যথায় জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেনা? তুমি আমার এ দুঃখের বি[illegible] ভার নাও সোহাগিনি! মার অনুমতি পেয়েছি, এখন শুধু চাই তোমার সম্মতি।

সবিস্ময়ে স্বামীর দিকে চাইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

বল কি! মা অনুমতি দিয়েছেন?

হ্যাঁ প্রিয়ে, তাঁর অনুমতি পেয়েছি।

কিন্তু তাতেও নিরস্ত হলেন না বিষ্ণুপ্রিয়া। বললেন, মা অনুমতি দিয়েছেন—দিন। আর ক'দিনই বা বাঁচবেন তিনি আমাকে চিরজীবন রক্ষা করবে কে? আমি যে তোমারই আশ্রিতা তুমি চলে গেলে আমার ঠাঁই হবে কোথায়?

কিছুতেই প্রবোধ মানছিল না বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর। পতিই যে নারীর সর্বস্ব। পতি-বিচ্ছেদ-বেদনা কিছুতেই সইতে পারবেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তা'ছাড়া, স্বামীর সুখই পতিব্রতার সুখ। নিজের সুখের জন্য সে লালায়িত নয় কখনও। সন্ন্যাস-জীবনের কঠোরতা ও দুঃখ বরণ করবেন স্বামী। একথা যে ভাবতেই পারেন না শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। পতিকে বললেন,—তুমি সন্ন্যাসী হবে, মানে—আমাকে ত্যাগ করবে। বেশতো, সেজন্য ঘর ছাড়বে কেন? আমি না হয় বাবার কাছেই থাকবো। তাতেও হবে না? বেশ—তবে বিষ খাবো, নয়তো গঙ্গায় ডুবে মরবো। তবু মাকে রেখে ঘর ছেড়ে যেয়ো না। অধর্ম হবে, লোক-নিন্দার পাত্র হবে তুমি। সন্ন্যাস-জীবনের দুঃখ বরণ করোনা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার দুটি গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

প্রিয়ার অশ্রুসিক্ত চোখ মুছিয়ে দিয়ে নিমাই বললেন, এ-জন্মে আমাকে শুধু কাঁদতে হবে। এজন্যই তো আমি এসেছি ধরায়। কত কেঁদেছি, তবু জীবে হরিনাম হলো না। এবার সবাই মিলে কাঁদবো। চোখের জলে জীবের কঠিন হৃদয় গলাবো।··আমি তোমাদের ছেড়ে যাবো। তুমি কাঁদবে, মা কাঁদবেন। আমার কান্নায় কাঁদবে সর্বজীব। নইলে যে জীবের মুক্তি হবে না।

স্বামী যে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'অমূল্য নিধি', জীবন-সর্বস্ব। আর সব কিছুর বিনিময়ে তিনি স্বামীকেই চান।

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন,—না না, তোমায় কিছুতেই যেতে দিতে পারবোনা আমি। তুমি আমার অনুমতি পাবে না—পাবেনা। বহুজন্মের পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়। তোমার রূপ-গুণে বনের পশুপক্ষী মুগ্ধ, পথে-ঘাটে তোমার জয়গান, তোমায় পেয়েছি স্বামিরূপে। এ দুর্লভ রত্ন যে ছাড়তে পারিনা কখনই। আমি জানি, আমার ছেড়ে যেতে এতটুকুও কষ্ট হবেনা তোমার। তোমার কাছে আমার মূল্যই বা কতটুকু? তবু, তোমায় অনুরোধ—ঘর ছেড়ে যেয়োনা। কে তোমায় আদর-যত্ন করবে? কে খেতে দেবে? কোথায় থাকবে? পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো সাজবে না তোমার। আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে অনাত্মীয় পৃথিবীতে তোমায় ছেড়ে দিতে পারিনা আমি। তবে হ্যাঁ, আমায় না বলে তুমি যেতে পার। তাতে কেমন করে বাধা দেবো? তুমি আমার স্বামী, তোমার সুখেই আমার সুখ।

বাক্চতুর নিমাই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ... উত্তরে বললেন, তুমি তো এইমাত্র বললে, আমার সুখই তোমার কাম্য। গৃহে সুখ হবেনা আমার, বৃন্দাবনে গেলেই আমি সুখী হবো।

বেশ তো, আমাকেও সঙ্গে নাও। পত্নী চিরদিন স্বামীর সঙ্গিনী ও অনুগামিনী। রামচন্দ্র কি বনে যাবার সময় জানকীকে সঙ্গে নিয়ে যাননি? তুমি কেন আমায় ফেলে যাবে?

কিন্তু রামচন্দ্র তো সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্ত বনবাসী হননি। তিনি বনে গিয়েছিলেন সত্য-রক্ষার্থে। আমাকে যেতে হবে সন্ন্যাসী হয়ে, সর্বস্ব ত্যাগ করে। কাঙাল হতে হবে আমাকে। দুঃখ করোনা তুমি। যেখানেই থাকি, আমি চিরদিন তোমার। বাইরে বিদায় দাও আমায়। প্রতিষ্ঠিত কর তোমার হৃদয়-মন্দিরে। তাতেই ভুলতে পারবে বিরহ-ব্যথা। আমিও ঠিক তেমনি করেই তোমার বিরহ-বেদনা ভুলবো। চোখের আড়াল হলেই কি বিচ্ছেদ হয়? ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকলেই মিলন-সম্পর্ক অটুট থাকে। প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হলেই প্রকৃত বিচ্ছেদ। আমাদের প্রেম তো আর নষ্ট হচ্ছেনা। আমি বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু তোমারই জন্ত রেখে যাচ্ছি অন্তরের অনাবিল অফুরন্ত অক্ষয় প্রেম। সে-প্রেমের স্পর্শ তুমি অনুভব করবে অনুক্ষণ। জীবের দুঃখে চির-ব্যথাতুর আমার হৃদয়। আমি তোমার স্বামী, স্বামিসোহাগিনী তুমি। তুমি আমার সহায় হও।

পরম আদরে বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখখানি তুলে ধরলেন নিমাই।

চোখে-চোখে মিলন হলো। অমত করতে পারলেন না বিষ্ণুপ্রিয়া, মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন বজ্রাহতার মতো।

নিমাই তুলে নিলেন তাঁকে। বললেন, চিরায়ুষ্মতী হও, চোখ খোল, আমায় প্রাণ দান কর প্রিয়ে।

চোখ খুললেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় বিহ্বল—অশ্রুহীন শুষ্ক তাঁর দুটি চক্ষু, শুষ্ক তাঁর সর্বেন্দ্রিয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি যাবে প্রিয়তম। কী দিয়ে বেঁধে রাখবো তোমায়? কিন্তু তুমি গেলে কী হবো আমি? আমি কি সীমন্তিনী থাকবো? তুমি আমায় স্বামী—একথা বলতে পারবো তো? লোকে বলবে তো—আমি তোমার স্ত্রী, না ত্রিজগতে আমি হবো একাকিনী? এতদিন সবাই ভাগ্যবতী বলতো আমাকে। এখন তারা যেন আমায় অভাগী না বলে—তুমি তাই করে যেয়ো নাথ।...

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। পত্নীই গৃহ। স্বামীর গৃহত্যাগে পত্নীরই অপযশ। গৃহিণীর কর্তব্য পালনে ত্রুটিই স্বামীর গৃহত্যাগের কারণ—এই তো সকলের—বিশেষ করে স্ত্রীলোকের বিশ্বাস। নিমাই যদি গৃহত্যাগ করেন, পুরনারীরা বিষ্ণুপ্রিয়াকেই দোষী করবে। এ অপবাদ তিনি সহ্য করবেন কেমন করে?

একদিকে পতি-বিরহ, অপর দিকে অন্যায় অহেতুক অপবাদ।

বিষ্ণুপ্রিয়াই কি তবে তাঁর স্বামীর সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণের জন্ত দায়ী?

স্বামীর হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগী হলে কুললনারা বলবে আমারই দোষে বিবাগী হয়েছ তুমি। সত্যি করে বল প্রিয়তম, আমিই কি তোমায় ত্যক্ত করে ঘর ছাড়ালাম?

উত্তরে নিমাই বললেন, এ কী উন্মাদের মতো কথা বলছ প্রাণাধিকে? শ্রীকৃষ্ণ জগতের পতি। জীবনের একমাত্র কর্তব্য—শ্রীকৃষ্ণভজন। তুমিও তাই কর, তবেই নির্মল নিত্য আনন্দ লাভ করবে। আত্মচিন্তা পরিহার করে তাঁরই চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট কর। সতীসাধ্বী তুমি। নিন্দা-অপবাদ স্পর্শ করতে পারবেনা তোমায়, ওগো অপাপবিদ্ধা, চিরশুদ্ধাচারিণি।

শান্ত হলো বিষ্ণুপ্রিয়ার অশান্ত অন্তর। তিনি দেখলেন, তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু।

মনে হলো এ স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম। এ শুধু ছলনা, মিথ্যা। কিন্তু কেটে গেল সংশয়।

গললগ্নীকৃতবাস হয়ে ভক্তিগদগদচিত্তে তিনি প্রণাম করলেন শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মে। কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন,—দয়াময়, অবলা আমি। বুঝিনা তোমার লীলা, জানি না একী ছলনা তোমার।...

একী! কোথায় গেলেন স্বামী? তাঁকে ছাড়া যে এক মুহূর্তও জীবন ধারণ সম্ভব নয়। তবে—তবে কি তুমিই আমার স্বামী? যদি তাই হও, তোমায় শতকোটি প্রণাম, তুমি আমার স্বামীর রূপ ধারণ কর আবার।

চোখের পলকেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেখলেন—নিমাই দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সামনে, আগে যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি নর-রূপ, রক্তমাংসের শরীরে। পতিপরায়ণার আকুল পতিপ্রেমের কাছে পরাভব স্বীকার করলো শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য।

নিমাই বললেন, একী করলে বিষ্ণুপ্রিয়া! আমার জন্ত শ্রীনারায়ণকে উপেক্ষা করলে?

অশ্রুমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া নীরব, নতাননা।

বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ বললেন, আমি কি তোমায় ছেড়ে যেতে পারি গৌর-প্রিয়া? যখনই আমার বিরহ দুঃসহ হবে, তখনই তোমায় দেখা দেবো।

বিরহ ছাড়া মিলনের সুখ আস্বাদন করা যায় না। বিরহে মিলন-সুখ-স্বাদ পাবে তুমি।

স্বামী-ক্রোড়ে উপবিষ্টা বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করতে লাগলেন। পরম সোহাগভরে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন নিমাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, স্বেচ্ছাময় তুমি। স্বেচ্ছায় শ্রীচরণে স্থান দিয়েছিলে, আমি যেন সেই পদে বঞ্চিত না হই। জীবের মঙ্গলার্থে দীক্ষিত হচ্ছ তুমি। তাই তোমরই চরণাশ্রিতা অম্লানবদনে দুঃখকে বরণ করবে। শুধু এটুকু দয়া কর—যেন চিরদিন তোমার শ্রীচরণে মতি থাকে।

নিমাই বললেন, তথাস্তু।...

...স্বামিসোহাগে সেই রাত্রির কথা প্রায় বিস্মৃত হলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

অতিবাহিত হলো মাসাধিক কাল।

নিমাই সংসারী সেজেছেন আবার।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবলেন, স্বামী বুঝি মায়ার কঠিন বাঁধন ছিঁড়ে যেতে পারলেন না আর। আনন্দে ও গর্বে ভরে উঠেছে তাঁর বুক। নবদ্বীপবাসীরা ভুলে গেল নিমাই-এর গৃহত্যাগের সংকল্পের কথা। শচীমাতা পুত্রস্নেহে আত্মবিস্মৃতা। পুত্র নিমাই সংসারধর্ম পালন করছে, তার মত পরিবর্তন করেছে। এর চেয়ে অধিক সুখতো কল্পনা করতে পারেন না জননী।

[ক্রমশঃ।

৪৬

রামানন্দ বললে, 'প্রভু, তোমার স্বরূপ উন্মোচন করো।'

প্রভু হাসলেন। দেখালেন তাঁর স্বরূপ। 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' শৃঙ্গাররসরাজ কৃষ্ণ আর মহাভাবস্বরূপিনী রাধিকা—দুয়ে মেলামেশা এক অপূর্ব মূর্তি।

মহানন্দে রামানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

হস্তস্পর্শে প্রভু তাকে সচেতন করলেন। বললেন, তুমি ছাড়া এ-রূপ কেউ পায়নি দেখতে। আমার [illegible]লীলারস তোমার কাছে প্রকট, তাই তোমার কাছেই এ রূপ প্রকাশিত হল। শোনো—এ কথা কাউকে বোলো না। বললে লোকে শুধু আমাকে পাগল বলবে না, তোমাকেও পাগল বলবে। দুইজনে সমান উপহাসাস্পদ হব।'

দশ দিন থাকলেন বিদ্যানগরে। প্রতি রাত্রে মিলিত হয়ে দুজনে বিচিত্র কৃষ্ণকথায় মত্ত হয়ে রইলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব গোপীতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব—ব্রজের নিগূঢ় রসলীলার বিচারে বিস্তারে আনন্দের অবধি রইলনা।

'এবার আমি যাই।' প্রভু বিদায় চাইলেন। তুমি বিষয়কার্য ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিয়ে নীলাচলে গিয়ে থাকো।'

'নীলাচলে?'

'হ্যাঁ, আমি তীর্থ সাঙ্গ করে নীলাচলে যাব। সেখানে দুজনে থাকব একসঙ্গে।' প্রভু হাসলেন, আর দুজনে কৃষ্ণকথারঙ্গে দিন কাটাব।'

রামানন্দকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। শোকাকুল রায় রামানন্দ [illegible]। 'দুঃখমধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুভার? কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।' এমন সঙ্গ হারিয়ে আমি কোন্ জনারণ্যে ঘুরে বেড়াব? বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগল রামরায়।

বিদ্যানগরের লোকদের বৈষ্ণব করে প্রভু চললেন দাক্ষিণাত্যে।

যাবার আগে হনুমানের বিগ্রহকে প্রণাম করলেন।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম।

গৌতমী গঙ্গায় স্নান করলেন। এলেন মল্লিকার্জুনে। মহেশ দর্শন করলেন। সেখান থেকে অহোবল। সেখানে নৃসিংহ দর্শন করে অনেক নতি-স্তুতি করলেন। সিদ্ধবটে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, সীতাপতি রঘুনাথকে দেখলেন।

মুখে নিরন্তর রামনাম, এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল যুক্ত করে। কৃপা করে আমার ঘরে যদি ভিক্ষা পান, নিমন্ত্রণ করল সবিনয়ে।

রামনাম ছাড়া অন্য কথা বলে না, ব্রাহ্মণে আকৃষ্ট হলেন প্রভু। তার ঘরে অতিথি হয়ে রাত কাটালেন। রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম।

পরদিন চললেন আরো দক্ষিণে। স্কন্দক্ষেত্রে এসে স্কন্দ দর্শন করলেন। ত্রিমঠে এসে দেখলেন ত্রিবিক্রমকে।

ফিরে এলেন সিদ্ধবটে, সেই রামভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এ কি, ব্রাহ্মণ দেখি এখন নিরন্তর কৃষ্ণনাম বলছে!

'এ তোমার কোন্ দশা!' বললেন প্রভু, 'আগে তুমি সর্বদা রামনাম করতে, এখন হঠাৎ কৃষ্ণনাম বলতে সুরু করেছ কেন?'

ব্রাহ্মণ বলে, প্রভু, তোমার দর্শনপ্রভাবে আমার আজন্মের স্বভাব দূর হয়ে গেল। আমি বাল্যকাল থেকে রামনাম করছি, তোমাকে দেখে একবার কৃষ্ণ-নাম মনে এল। মনে আসতেই জিভে এল, আর বিনা চেষ্টায়ই বারে বারে স্ফুরিত হতে লাগল। শাস্ত্রমতে রামও পরব্রহ্ম, কৃষ্ণও পরব্রহ্ম, কিন্তু শাস্ত্রই বলছে রাম নামের চেয়ে কৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য বেশি। তবু আমি যে রামনাম করতাম তার কারণ রাম আমার ইষ্টদেব, কিন্তু তোমাকে দেখে যখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কৃষ্ণনাম মুখে এসে গেল, তখনই বুঝলাম সে নামের কী মহিমা।'

'ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাইয়া সেই নাম নিরন্তর গাই ॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাঁহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥'

প্রভু হাসতে লাগলেন।

'তুমিই সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।' ব্রাহ্মণ প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

সেখানে একদিন থেকে প্রভু গেলেন বৃদ্ধকাশী। সেখানে শিবদর্শন করলেন।

চললেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তর।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করো।

অরসিক কাক আমের মুকুল খায় না, নিমফল খায়। তেমনি জ্ঞানমার্গের সাধকেরা প্রেমরসের মর্ম না জেনে শুষ্ক জ্ঞানের নিমফল কামনা করে। আর যে ভক্ত, ভক্তিরসে অভিজ্ঞ, সে কৃষ্ণপ্রেমের আম্রমুকুল ভালোবাসে।

'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥
অভাগীয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান ॥'

সমস্ত দেশ বৈষ্ণব হয়ে গেল। তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদীর দল যুদ্ধং দেহি বলে আসতে লাগল এগিয়ে। নিয়ে এল শাস্ত্রস্তূপ, সাংখ্য পাতঞ্জল শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগম—অনেক পাণ্ডিত্যের কোলাহল। কিন্তু তর্ক করবে কার সঙ্গে? এ যে সকল শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, সকল শাস্ত্রে পারঙ্গম। সৌন্দর্যে-মাধুর্যে ব্যক্তিত্বে-বৈদগ্ধ্যে প্রদীপ্ত।

সকলের মত অভ্রান্ত বুদ্ধিতে খণ্ডন করলেন প্রভু। নিরস্ত করলেন সমস্ত তর্ক। বিরুদ্ধবাদীরা পরাস্ত হতে-হতে প্রভুর সিদ্ধান্তে এসে প্রবেশ করল। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হল সর্বত্র।

এবার নিরীশ্বরবাদীরা এগিয়ে এল দম্ভ ভরে। সুরু হল মহা তর্কযুদ্ধ। হ্যাঁ, তর্কের অযুক্তিকে পরাভূত করব। দেখিয়ে দেব ভ্রম-প্রমাদ।

বৌদ্ধশাস্ত্র নব প্রস্থানের ভিত্তিতে সুরু হল বাদানুবাদ। প্রভু যুক্তিতর্কেই সমস্ত খণ্ডন করলেন। বিরুদ্ধবাদীদের আচার্য পরাস্ত হয়ে অধোমুখ হল। তাদের দলের লোক আচার্যকে উপহাস করতে লাগল। তখন সকলে কুমন্ত্রণায় বসল, কী করে এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

একথালা অপবিত্র অন্ন প্রভুর সামনে রেখে বললে, 'আপনার জন্যে এই বিষ্ণুপ্রসাদ এনেছি, গ্রহণ করুন।'

সবাই ভেবেছিল, প্রসাদ বলে যাই দেওয়া যাবে, তাই বৈষ্ণব অপ্রতিবাদে গ্রহণ করবেন।

কিন্তু অঘটন ঘটল। কোত্থেকে এক মহাকায় পাখি এসে ঠোঁটে করে থালা নিয়ে উড়ে পালাল। না, পালায়নি। থালার সেই অমেধ্য অন্ন বৌদ্ধদের উপর বর্ষণ করল আর থালা ছুঁড়ে মারল আচার্যের মাথা লক্ষ্য করে। মাথা কেটে গেল আচার্যের। আচার্য মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। শিষ্যগণ শিরে করাঘাত করে হাহাকার করতে লাগল। সন্দেহ কি, মহতের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র করারই এই প্রতিফল।

তখন প্রভুপদে শরণ নিল বৌদ্ধরা। বললে, 'তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আমাদের অপরাধ মার্জনা করো। বাঁচাও আমাদের গুরুকে। করুণায় উদারধী হও।'

প্রভু বললেন, 'গুরুকর্ণে কৃষ্ণনাম বলো, তোমরাও সকলে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরি বলো উচ্চকণ্ঠে, তোমাদের গুরুর চেতনা ফিরে আসবে।'

তথাস্তু। শিষ্যরা সমস্বরে কৃষ্ণকীর্তন করতে লাগল আর গুরুর কানে বলতে লাগল, কৃষ্ণ বলো, রাম বলো, হরি বলো।

চেতনা পেয়ে আচার্য বলে উঠল—হরি-হরি। আর প্রভুকে স্তব করতে লাগল,—তুমিই কৃষ্ণ। তুমিই কৃষ্ণ।

অকস্মাৎ প্রভু সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। উপস্থিত হলেন ত্রিমল্লে। চতুর্ভুজ বিষ্ণু দর্শন করে গেলেন বেঙ্কটাচলে। সেখান থেকে ত্রিপদীতে এসে রাম দর্শন করলেন। সেখান থেকে পানা-নরসিংহে এসে দেখলেন নৃসিংহকে। তারপর পৌঁছুলেন শিবকাঞ্চীতে। শিবকাঞ্চীতে শিব দেখে বিষ্ণুকাঞ্চীতে

লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করলেন। দিন দুই থাকলেন সেখানে, প্রেমাবেশে করলেন অনেক নৃত্যগীত।

পৌছুলেন ত্রিকালহস্তি-স্থানে, সেখানে মহাদেবকে প্রণাম করলেন। আবার শিব দর্শন করলেন পক্ষীতীর্থে। বৃদ্ধকোলে দেখলেন শ্বেতবরাহ, পীতাম্বর শিব আর শিয়ালী ভৈরবী। তারপর উপনীত হলেন কাবেরীতীরে। সেখানে এসে দর্শন করলেন গো-সমাজ-শিব, বেদাবনে মহাদেব, অমৃতলিঙ্গ শিব, দেবস্থানে বিষ্ণু, কুম্ভকর্ণকপালের সরোবর, শিবক্ষেত্রের শিব আর পাপনাশনের বিষ্ণু। সমস্ত দেখে পৌছুলেন শ্রীরঙ্গমে।

শ্রীরঙ্গমে বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে মিলন। বেঙ্কটভট্ট শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, নারায়ণ-পরায়ণ। প্রভুকে বহুমানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল স্বগৃহে। সবংশে তাঁর পাদোদক খেল। ভিক্ষা গ্রহণ করে প্রভু কিছুটা সুস্থ হলে ভট্ট বললে, 'চাতুর্মাস্য কাছে এসে পড়েছে, কৃপা করে এই চার মাস অধীনের ঘরে অবস্থান করুন। কৃষ্ণকথা শুনিয়ে নিস্তার করুন আমাকে।'

রাজী হলেন প্রভু। ভট্ট গৃহে নিত্য আরম্ভ হল কৃষ্ণনাম গান, কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ। হাজারে হাজারে লোক আসতে লাগল প্রভুর দর্শনে, নামকথায় লুব্ধ হয়ে। কৃষ্ণ নাম ছাড়া কারু মুখে আর কথা নেই, কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়া মনে নেই আর কোনো বাসনা। যে প্রভুকে দেখে, সেই যেন কৃষ্ণকে দেখে, পলকে সমস্ত দুঃখশোক খণ্ডে যায়।

এক ব্রাহ্মণ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে বসে তন্ময় হয়ে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় আবৃত্তি করে। আর ভক্তিতে বিগলিত হয়ে কাঁদে। দেহে কখনো কম্প, কখনো রোমাঞ্চ, সে এক অদ্ভুত প্রেমাবেশ। কিন্তু তার সংস্কৃত-জ্ঞান নেই। শুদ্ধাশুদ্ধ যেমন শিখেছিল তেমনি বলছে অকুণ্ঠে। অশুদ্ধ পাঠ শুনে সকলে উপহাস করছে, তাতে চাঞ্চল্য নেই এতটুকু। আবেশে অব্যাহত হয়ে আছে।

প্রভুর মহা আনন্দ হল দেখে। জিগগেস করলেন, 'পাঠের সময় আপনার এত আনন্দের হেতু কী? কোন অর্থ বুঝে আপনার এত সুখ, এত সাত্ত্বিক বিকার?'

ব্রাহ্মণ বললে, 'প্রভু, আমি মূর্খ, আমি শব্দার্থের কিছুই জানিনা। আমি শুধু দেখি অর্জ্জুনের রথে শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ রজ্জুধর হয়ে বসে অর্জুনকে হিতোপদেশ শোনাচ্ছেন। তাই দেখে আমার আনন্দ। আমি সংস্কৃতের কী-ই বা জানি, কী-ই বা বুঝি ত ব্যাকরণ! যাবৎ পড়ি তাবৎ কৃষ্ণদর্শন হয়, তাই ে ছাড়তে পারি না গীতাপাঠ।'

প্রভু ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করলেন। বললে 'গীতাপাঠে তোমারই অধিকার। তুমিই বুঝেছ গীত সার অর্থ।'

প্রভুর পা ধরে ব্রাহ্মণ বললে, 'অর্জুনের র কৃষ্ণকে দেখে আমার যে আনন্দ, তোমাকে দেখে ত চেয়ে আমার দ্বিগুণ আনন্দ। আমার মন বল তুমিই সেই রথারূঢ়।'

প্রভু বললেন, 'এমন কথা মুখেও এনো না।'

চার মাসে এক একদিন এক এক ব্রাহ্মণের ঘ প্রভুর নিমন্ত্রণ, সেই গীতাধ্যায়ী বিপ্র প্রভুর স ছাড়ল না। ছায়ার মতন ফিরতে লাগল পি পিছে।

বেঙ্কট ভট্টের ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা। একদি প্রভু ভট্টকে জিগগেস করলেন, 'তোমার লক্ষ্মী তে নারায়ণের বক্ষোবিহারিণী। পতিব্রতার শিরোমণি, তিনি আবার গোয়ালা কৃষ্ণ—রাখাল কৃষ্ণের সঙ্গমের জন্যে কেন তপস্যা করতে বসলেন?'

ভট্ট বললে, 'কৃষ্ণে আর নারায়ণে ভেদ নেই স্বরূপত এক। কৃষ্ণে লীলামাধুর্য বেশি। তাই আমার লক্ষ্মী যদি কৌতুকে কৃষ্ণরূপের প্রতি অভিলা করে, তাতে তার পাতিব্রত্য ক্ষুণ্ণ হয় না।'

'তা হয় না। কিন্তু তপস্যা করেও লক্ষ্মী রাস লীলায় স্থান পেল না কেন? কেন পেল না কৃষ্ণ সঙ্গ?'

'তা আমি কী জানি। কেন তুমি লক্ষ্মীকে স দাও নি, তা তুমিই বলতে পারো।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, "কৃষ্ণের এক অদ্ভু স্বভাব এই যে, সে স্বমাধুর্যে সর্বদা সকলকে আকর্ষ করে থাকে, মানুষ থেকে স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত। এম কি, নিজেকেও। 'স্বমাধুর্যে করে সদা সর্ব আকর্ষণ' এ বৈশিষ্ট্য নারায়ণে নেই। কৃষ্ণকে ব্রজজনেরা ঈশ মনে করে না, আপনজন মনে করে। গোপীভাব ভজ করে গোপীদেহ প্রাপ্ত না হলে কৃষ্ণের প্রেয়সী হওয় সম্ভব নয়। 'গোপজাতি কৃষ্ণ—গোপী প্রেয় তাঁহার। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। লক্ষ্মী দেবী-দেহেই কৃষ্ণ সঙ্গম চেয়েছিল, তাই ব্য হল। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, নারায়ণ তার বিলাসমূর্তি

ই কৃষ্ণ লক্ষ্মীরও মনোহরণ করতে সমর্থ। তোমার রায়ণ গোপীর মনোহরণ করতে সমর্থ নয়।'

বেঙ্কট ভট্টের মনে গর্ব ছিল তার নারায়ণ পূজনই বজবের সর্বোচ্চ ভজন। পরিহাসচ্ছলে প্রভু তার র্ব নষ্ট করে দিলেন।

দেখলেন ভট্টের মুখখানি ম্লান হয়ে গিয়েছে। খন তাঁর সিদ্ধান্তের গূঢ়ার্থ উন্মোচন করলেন: ঈশ্বরত্বে ভদ নেই। একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ একই গ্রহে নানারূপ ধরে। লক্ষ্মী দেবী-দেহে কৃষ্ণ সঙ্গ য়নি বটে, কিন্তু গোপীদেহে পেয়েছে। গোপীদেহে ক্ষ্মীই তো রাধিকা। রাধায় ও লক্ষ্মীতে স্বরূপত কানো ভেদ নেই। তাই রাধা যখন কৃষ্ণসঙ্গ পেল, খন লক্ষ্মীও কৃষ্ণসঙ্গই পেল। নীল-পীত বহুরূপ রণ করলেও বৈদূর্যমণি যেমন অক্ষুণ্ণ মণিই থাকে, তমনি ভক্তের ধ্যান ভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হলেও চ্যুত অচ্যুতই থাকেন, নিজেকে ন্যূন করেন না।'

ভট্ট প্রসন্ন হল। বললে, 'ঈশ্বরের অগাধ লীলার মি কী জানি! তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমি যা ছ তাই সত্য বলে মানছি। বুঝতে পারছি লক্ষ্মী রায়ণ আমাকে পূর্ণ কৃপা করেছেন, তাই তোমার চরণ দর্শন পেলাম। বুঝলাম কৃষ্ণ-ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন।'

চাতুর্মাস্য পূর্ণ হল। শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে রঙ্গনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে প্রভু চললেন দক্ষিণে। এ কে? সঙ্গে আবার এ কে জুটেছে? এ কী, কাঁদছে নিরর্গল।

প্রভু চিনতে পারলেন। বেঙ্কটের কিশোর পুত্র গোপাল।

'এ কী, কাঁদছ কেন?'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাব। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হব।'

এতদিন প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেছে গোপাল। তাঁর সংসর্গে থেকে তাঁরই কৃপায় হৃদয়ঙ্গম করেছে কাকে বলে প্রেমভক্তি, কাকে বলে উচ্চাঙ্গের সাধন ভজন। তাই সে সঙ্গ ছাড়তে নারাজ।

প্রভু তাকে বোঝালেন। 'যতদিন বাবা মা বেঁচে আছেন, ঘরে থেকে তাঁদের সেবা করো। পরে কোরো সংসার ত্যাগ।'

ফিরে গেল গোপাল।

প্রভু পৌছুলেন মাদুরা জেলায় ঋষভ পর্বতে। নারায়ণবিগ্রহ দেখে ফিরছেন, লোকমুখে শুনলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী আছেন এখানে। প্রভু তখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন। দেখা পেতেই তাঁর চরণবন্দনা করলেন। বললেন, 'বড় ইচ্ছে হয় নীলাচলে দুজনে কিছুকাল একত্র থাকি।'

'আমি গৌড়ে যাচ্ছি গঙ্গাস্নানে, সেখান থেকে আসব নীলাচলে।' বললেন পরমানন্দ।

'আর আমি সেতুবন্ধ হয়ে ফিরব পুরুষোত্তমে।' প্রভু সানন্দে বললেন, 'দুজনের দেখা হবে।'

ঋষভ থেকে প্রভু এলেন শ্রীশৈলে। সেখানে শিবদুর্গা এক ব্রাহ্মণের বেশে বিরাজ করছে। সেই ব্রাহ্মণের ঘরে তিন দিন থাকলেন প্রভু, নিভৃতে বসে দুজনে অনেক গুপ্ত কথা হল।

সেখান থেকে এলেন কামকোষ্ঠী। কামকোষ্ঠী থেকে দক্ষিণ মাদুরায়, মীনাক্ষী মন্দিরে। সেখানে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা, প্রভুকে সে ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু, আশ্চর্য, রান্নার কোনই আয়োজন নেই। প্রভু স্নান করে এলেন, মধ্যাহ্ন উপস্থিত, তবু উনুনে আগুন দেখা যাচ্ছেনা।

প্রভু জিগগেস করলেন, 'দুপুর হয়ে গেল, রান্না কোথায়?'

রামদাস ব্রাহ্মণ বললে, 'আমি বনবাসে আছি। বনে পাকের সামগ্রী দুর্লভ। লক্ষ্মণ বন্য অন্নফল শাক আনতে গেছে। সে ফিরে এলে সীতা রান্নার যোগাড় দেখবে।'

ব্রাহ্মণের ভাব বুঝে নিলেন প্রভু। অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে লীলাস্মরণ। এ উপাসনা-প্রণালী দেখে প্রভু আনন্দে ভরপুর হয়ে গেলেন। এমন ভক্তও দেখা যায় সংসারে।

লীলাস্মরণের আবেশ তৃতীয় প্রহরে তিরোহিত হল। তখন অতিযত্নে প্রভুকে ভিক্ষা দিল ব্রাহ্মণ। কিন্তু নিজে কিছুই খেলনা, বিষণ্নমনে বসে রইল।

'এ কী, তুমি খেলে না?'

'আমার জীবনে প্রয়োজন নেই। অনাহারে আমি দেহত্যাগ করব।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'রাক্ষস মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণীকে ধরেছে।' ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগল, 'এই দুঃখে দেহ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, একে আর বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছেনা।'

প্রভু বললেন, 'সীতা ঈশ্বরপ্রেয়সী, চিদানন্দমূর্তি

প্রাকৃত হাত তাঁকে ছুঁতে পারে না, দেখতে পারেনা প্রাকৃত চোখ। রাবণের কী সাধ্য তাঁকে দেখে, তাঁকে ছোঁয়। রাবণকে কুটীরদ্বারে আসতে দেখেই মায়া-সীতা রেখে সীতা স্বয়ং অন্তর্হিত হলেন। তুমি দুর্ভাবনা কোরো না, আমাকে বিশ্বাস করো। 'অপ্রাকৃতবস্তু নহে প্রাকৃতগোচর।'

প্রভুর বাক্যে বিশ্বাস হল ব্রাহ্মণের। তখন সে আহার গ্রহণ করল।

কৃতমালায় স্নান করে প্রভু তারপর গেলেন দুর্বেশনে। সেখানে রঘুনাথ দর্শন করে মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দেখলেন। সেখান থেকে সেতুবন্ধে গিয়ে ধনুতীর্থে স্নান করে দেখলেন রামেশ্বর। রামেশ্বরে ব্রাহ্মণসভায় কূর্মপুরাণ পাঠ হচ্ছে, শুনতে গেলেন প্রভু। পতিব্রতা উপাখ্যান পড়ছে। কী আশ্চর্য, তিনি যেমনটি বলেছিলেন রামদাস ব্রাহ্মণকে—তেমনি অবিকল।

জগতের মাতা সীতা, শ্রীরামগৃহিণী পতিব্রতা-শিরোমণি, রাবণকে আসতে দেখেই অগ্নির শরণাপন্ন হলেন। অগ্নি তাঁকে আবৃত করে রাখল, পরিবর্তে এক মায়া-সীতা স্থাপন করে বঞ্চিত করল রাবণকে। সেই মায়া-সীতাই রাবণ হরণ ... ল। রাব[illegible] করে সীতাকে ঘরে এনে রাম যখন তাঁর অগ্নি পরী[illegible] করলেন, তখন অগ্নি সেই মায়া-সীতাকে গ্রাস ক[illegible] সত্য-সীতাকে রামসকাশে এনে দিল।'

গ্রন্থের যে পত্রে এ কাহিনী বিবৃত আছে, [illegible] প্রতিলিপি রেখে সে মূল পত্র ছিঁড়ে নিলেন। ফি[illegible] এলেন দক্ষিণ মাদুরায়। 'দেখ দেখ কূর্মপুরাণ কী বলে[illegible] উৎসাহিত হয়ে প্রাচীন পত্র দেখালেন রামদাসকে।

আর সন্দেহ কী, দুঃখ কিসের! দশানন রাক্ষ[illegible] সত্যসীতাকে স্পর্শ করতে পারেনি, স্পর্শ করেছিল মায়া[illegible] সীতাকে। সত্যসীতাকে অগ্নি রেখে দিয়েছিল বহ্নিপুরে[illegible]

প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগল বিপ্র। বললে, 'তুমিই সাক্ষাৎ রঘুনন্দন। সন্ন্যাসীর বেশে আমাকে দর্শন দিলে; তোমার কী করুণা! মহাদুঃখ থেকে আমাকে ত্রাণ করলে। পাছে তোমার মুখের কথায় আমার প্রতীতি না হয়, একেবারে প্রাচীন পুঁথির পত্র ছিঁড়ে নিয়ে এলে নিজের হাতে। প্রভু, সেদিন মনো-দুঃখে তোমাকে ভালোকরে খাওয়াতে পারিনি। আজ একবার পরিপূর্ণ করে ভিক্ষা গ্রহণ করো।' [ ক্রমশঃ।

# বৈশাখ

শ্রীঅতীন মজুমদার

চৈত্রের শেষ দিন দিয়ে গেল ডাক :
এলো বৈশাখ!
সাহারার রোদ নিয়ে রুখ খো পথ কাঁকরের বুকে
কালো লোনা ঘাম ফেলে জলন্ত প্রহর
মরে ধুঁকে-ধুঁকে!
চৈত্রের কবিতা পোড়ে পথে-প্রান্তরে,
দিনের ঝাঁঝালো আলো ঝরে' ঝরে' পড়ে,
স্বপ্ন পালায় ভয়ে গুহার ভিতরে!
আকাশে কোথায় মেঘ? কোথায় আশ্বাস?
কোথায় বা একমুঠো শ্যাম দূর্বাঘাস?
মাঠ হ'লো জ্বলে জ্বলে খাক্।
পৃথিবী অবাক,—
বন হ'লো মরু ছায়াহীন,
শ্বাস টেনে টেনে ফিরে বাতাসও হয়েছে ক্ষত ক্ষীণ!
খর বৈশাখ তার চোখা-চোখা দাঁতগুলি দিয়ে
করাত চালায় প্রাণ-পাখি বুঝি নিতে ছিনিয়ে।
আশা লয়ে শুধু জেগে থাকে
মানুষের আশাবাদী মন,
আবার আসবে ফিরে সজল মেঘের দিন
আষাঢ়—শ্রাবণ!

# স্বেচ্ছা-বন্দী

শতভিষা

ভালোবাসার মূল্য দিতে হে পাষাণী আজকে এলাম,
মূল্যহীন এ হৃদয়টারে তোমার পায়ে লুটিয়ে দিলাম;
ওষ্ঠে তোমার বাঁকা হাসি ঝিকিয়ে ওঠে,
আমায় দহন করবে বলে—
কালো চোখে আগুন ফোটে;

যতই তুমি আঘাত হানো,
সবই আমার সইবে জেনো,
সখি, চরণ পরশ না' পেলে কি অশোকশাখে মুকুল ফোটে!

লুব্ধ ভ্রমর গুঞ্জরিছে কমলিনী নয়ন মেলো,
পরম লগন এলো কাছে
অবুঝ কুঁড়ি ঘোমটা খোলো.
একটু আঘাত না পেলে কি!
রসের ধারা ঝরবে সখী?
বৃথাই তোমার পরাগদানি ভৃঙ্গ যদি না রাঙিলো।

কোমল দুটি বাহুপাশে বাঁধো এ দুর্বিনীতেরে,
বাঁকিয়ে গ্রীবা শাসন করো, বিচার করো আজি এরে,
তোমার হৃদয় দ্বীপান্তরে,
নির্বাসিত করো ওরে,
সরমহারা অপরাধী মধুর মরণ খুঁজে ফেরে।

# মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

( ১ )

আলাপিনী-মহিলা-সমিতি। বিবাহিতা মহিলা ও বয়স্কা গৃহিণীদের নিয়ে এই ক্ষুদ্র সম্মেলনীটি শ্রদ্ধাস্পদা স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবীর অতি আদরের সামগ্রী রূপে শান্তিনিকেতনে তাঁরই গৃহ-অঙ্গনে সম্মিলিত হত: অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যুর পর এই সমিতি যেন মাতৃ-হারা শিশুর মতই ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, এমন দিনে শুনলাম সদ্য-সংস্কৃত 'দেহলি' বাড়ীটিতে তাকে স্থায়ী আসন দেওয়া হবে।

আনন্দিত মনে যাই ওখানকার প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে, দেহলির প্রাঙ্গণে, উন্মুক্ত আকাশ তলে, দুটি লণ্ঠনের আলোয়, মুষ্টিমেয় মহিলার এই সম্মেলনী যেন স্বপ্ন-ভারাতুর হয়ে উঠল।

শুনি, দেহলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কবি-গুরু প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বাড়ীতে অনেকদিন ছিলেন; তাঁর ভগবৎ-প্রেম-ভাগীরথী কবিত্ব ও সুরের উচ্ছ্বসিত বন্যায় দুই কূল প্লাবিত করে, গীতাঞ্জলি-রূপে, এখানেই প্রথম প্রবাহিত হয়েছে।

বাড়ীটি ছোট কিন্তু দোতলা; উপরে মাত্র একখানি ঘর, সেখানেই থাকতেন গুরুদেব একাকী, আর নীচের তলায় থাকতেন তাঁর সুরের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী।

এই সম্মেলনীতে স্থির হল প্রাচীনা—যাঁরা গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যে ধন্যা হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতি থেকে পুরোনো দিনের ব্যক্তিগত অজানা কাহিনী ঘরোয়া ভাবে বলবেন। প্রথমেই অনুরুদ্ধ হলেন বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রদ্ধেয়া সুধীরা বসু।

সুধীরাদি বর্ষীয়সী হলেও জরা তাঁকে এখনও স্পর্শ করেনি। সর্ব্ব-কর্ম্মে-উৎসাহী, কোমল-মনা, মধুর-ভাষিণী, প্রিয়-দর্শনা, সুধীরাদি বললেন, তিনি বহুকাল শান্তিনিকেতন-বাসিনী—১৯১১ সাল,—অর্থাৎ প্রায় ৪২ বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসেন।

আজকের শান্তিনিকেতন ও সেদিনের শান্তিনিকেতনের ব্যবধান আকাশ-পাতাল। বৃক্ষাদি-বিহীন খোওয়াইয়ের দারুণ গ্রীষ্মের অনুপযুক্ত পাকা বাড়ীর অস্তিত্ব তখন মোটেই ছিল না; দু-একটি পাকা বাড়ী ছাড়া তখন সবই মাটির কাঁচা বাড়ী। সে সব বাড়ীতে মনের আনন্দে বাস করতেন দেশের সেরা বিদ্বান, গুণী, সব শিক্ষক-বৃন্দ। তাঁরা যেন ছিলেন, 'সাদা-মাটা থাকা ও অতি-উচ্চ-চিন্তার' প্রতীক। গুরুদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ও সাহচর্য্যে তাঁদের জীবনের পাত্র থাকত সদাই পরিপূর্ণ।

দেহলির বিপরীত দিকে, দক্ষিণে কতকগুলি ভাঙ্গা দেয়াল (যার অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত) দেখিয়ে সুধীরাদি বললেন, 'এখানে ছিল একটি দোতলা পাকা বাড়ী। তারই উপর তলায় কলা-ভবন আরম্ভ হয়; নীচে ছিল সঙ্গীত-ভবন। বাড়ীটির নাম 'দ্বারিক'। সকালে বিকালে ক্লাশ, মধ্যাহ্নে কয়েক ঘণ্টার ছুটি। সকলে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন, গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষায়। এ সময় তিনি 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসখানি লিখছেন; বিশ্রাম কাকে বলে জানতেন না, দুপুর বেলা ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে, খাতাপত্র নিয়ে আসতেন দ্বারিকের দোতলায়, যতটুকু লিখেছেন পড়ে সকলকে শোনাবার জন্য।

সময়ের ব্যবধানে কলা-ভবন ও সঙ্গীত-ভবন স্থানান্তরিত হয়ে গেল, দ্বারিক ছাত্রী-আবাসে পরিণত হল। 'অল্প কয়েকটি ছাত্রী নিয়ে ছাত্রী-বিভাগ কিছুকাল পূর্ব্বে সবে সুরু হয়েছে; মেয়েরা তখন হেমবালাদির অধীনে ছাত্রী-আবাসে থাকত, এমন দিনে প্রতিমাদি, মীরাদি, সুধীরাদি, কমলাদি প্রভৃতির মাথায় জাগলো এক মজার

বুদ্ধি। উদ্দেশ্য ছাত্রীদের সাহস পরীক্ষা ও তৎসঙ্গে অনাবিল কৌতুক উপভোগ।

গম্ভীর রাত্রি, দারুণ গ্রীষ্মে মেয়েরা অধিনায়িকার সঙ্গে খারিকের অঙ্গনে সুপ্তিমগ্ন,—এমন সময় সেখানে ডাকাত পড়ল! কালীঝুলি মাখা, পাগড়ী পরা, লম্বা লাঠি হাতে ডাকাতের দল নিঃশব্দে মেয়েদের অলঙ্কার নিয়ে টানাটানি সুরু করল। দু'চারটি মেয়ে ছিল অতি সাহসী,—তেমনি একটির গলার হারে হাত দেওয়া মাত্র সে ডাকাতের হাতখানা এমন জোরে চেপে ধরল যে, বেচারা ডাকাতের অবস্থা কাহিল। সে না পারে চেঁচাতে, না পারে হাত ছাড়াতে;—অনেক ধস্তাধস্তির পর হাত ছাড়িয়ে তিনি ও তাঁর দলটি চক্ষের নিমেষে উধাও। এই ডাকাত-সর্দারটিই আমাদের কুসুম-কোমল-বৌঠান প্রতিমা দেবী।

এদিকে মেয়েদের পরিত্রাহি চীৎকারে আশে পাশের অনেকেই বেরিয়ে এলেন। সন্তোষ মজুমদার মশাই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাড়াতাড়ি বন্দুক হাতে এসে সকলকে 'কিছু না, কিছু না' বলে অভয় দিতে লাগলেন।

সাহসী মেয়েরা ডাকাতের মুখোমুখী খুব সাহস দেখালেও, তারা চলে যাবার পর, ভয়ে কম্পমান হয়ে মূর্চ্ছা যাবার জোগাড়!

[লেখিকার পরিচিতিঃ—ত্রিপুরার দেওয়ান রমণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গদের মধ্যে এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। লেখিকা তাঁর কন্যা। বর্ত্তমানে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন সম্বন্ধীয় অসংখ্য রচনা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বহু লেখকের লেখনী থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন সম্বন্ধীয় অজস্র মূল্যবান তথ্য আলোকিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের মহিলা বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় তাঁদের আপন আপন বিভিন্ন স্মৃতিকথা লেখিকা সংগ্রহ করেছেন। বর্ত্তমান রচনাটি সেই সংগৃহীত স্মৃতিকথাকে ভিত্তি ক'রেই রূপ নিয়েছে।—স।]

সন্তোষ দা যত বলেন, কিছু ভয় নেই, ওসব নকল ডাকাত,—মেয়েরা ততই বলে, 'তা বই কি! আমরা স্বচক্ষে স্পষ্ট দেখেছি, ইয়া লম্বা লাঠি হাতে কালো কালো যমের মত সব ডাকাত! কাল ভোরেই আমরা যে যার বাড়ী চলে যাব,—এ ডাকাতের দেশে আর নয়।'

ভালোমানুষ হেমবালাদি বলতে লাগলেন, 'এতগুলি মেয়ে নিয়ে, খোলা মাঠের মধ্যে, এমন অরক্ষিতভাবে থাকতে আর আমার সাহস হয় না, যতশীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত রক্ষকের ব্যবস্থা চাই।'

ব্যাপারটা তাদের কিছুতেই বোঝাতে না পেরে নিরুপায় সন্তোষ দা পার্শ্ববর্ত্তী দেহলি থেকে কালী-মাখা কমলাদিকে এনে দেখিয়ে, অনেক করে বুঝিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করেন।

এর কয়েক দিন পরেই ভুবনডাঙ্গায়, শিক্ষক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের বাড়ী পড়ল সত্যিকার ডাকাত। পরদিন ঘটনা শুনে, প্রতিমাদেবীকে ডেকে গুরুদেব হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—'বৌমা, তোমাদের দল নয় ত'?'

শুনে সেখানে হাসির হিল্লোল বয়ে গেল। তিনি বোধহয় চাইতেন, মেয়েরা অসীম সাহসী হউক,—ভীরু বলে বঙ্গবালার অপবাদ একেবারে ঘুচে যাক।

( ২ )

হেমবালা দি শান্তিনিকেতনের প্রাচীনাদের একজন। ঘটনাক্রমে আমি তাঁর আবাসনের দরজায়। সময়টা বেড়াবার পক্ষে অসময়,—বেলা দশটা,—গ্রীষ্মের সূর্য্যদেব মাথায় আগুন ঢালছেন; এ-হেন সময়ে স্বল্প-পরিচিতার তাঁকে বির[ক্ত করা] উচিত হবে কিনা, বুঝতে না পেরে অনেক ইতস্ততঃ করে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করি।

আশাতিরিক্ত আদর-সম্ভাষণে মন ভরে গেল। পূর্ব্বপল্লীর নিরিবিলি বাড়ীখানা,—বাসিন্দা দুটি সমবয়সিনী বর্ষীয়সী ম[হিলা।] হেমবালা দির পূর্ণ নাম শ্রীযুক্তা হেমবালা সেন,—বয়স প্রায় প[...] তিনি তাঁর দীর্ঘ কুমারী-জীবন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী-অ[...] তত্ত্বাবধায়িকার কাজে নিয়োগ করে, এখন শান্তিতে ব[...] অবসর-জীবন যাপন করছেন। বয়সের তুলনায় অনেক বেশী ক[র্ম্ম]-স্বাবলম্বিনী। সাথী,—তাঁরই বয়সী তাঁর বিধবা ভ্রাতৃ-মাতৃসমা দুই প্রবীণার সহৃদয় ব্যবহার সত্যই মনোমুগ্ধকর।

গুরুদেব সম্বন্ধে পুরোনো দিনের কথা তাঁর নিকট কিছু চাওয়ায় তিনি বললেন,—১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গুরুদেবের আহ্বানে ব্রাহ্ম-গার্লস-স্কুলের কাজ ছেড়ে এখানে আসেন। তা[র] দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্য[াশ্রমে] ছাত্রী-বিভাগ প্রথম আরম্ভ হয়। হেমবালা দি যখন ছাত্রী-অ[...] তত্ত্বাবধায়িকার কর্ম্ম গ্রহণ করলেন, তখন সেখানে ছাত্রী-সংখ্যা মোট ১৩টি। দ্বারিকের নীচের তলা ও দেহলির পেছনে ক[...] খড়ের ঘরে বিচ্ছিন্ন ভাবে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। [...] তাঁকে বলেছিলেন, 'মেয়েদের সব ভার তোমার; কি করলে উপকার হয়,—কিসে তাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে নিয়ে যায়,—তাদের মানসিক বিকাশের সাহায্য হয়,—তুমি নিজে ঠিক কর। এখানে যাঁরা যেদিকের ভার নিয়ে আছেন, নিজেরাই তাঁদের কর্ম্মপন্থা স্থির করেন,—তুমিও তাই কোরো, অসুবিধা কিছু হলে আমাকে জানিও।'

প্রতি বৎসর শীতকালে ছাত্রাবাসের ছেলেরা এখনকার বিভিন্ন শিক্ষকের অধীনে দলে দলে বাহিরে যায় প্রমোদ-[ভ্রমণে।] এখনকার মত গাড়ী-ঘোড়ায় কিংবা রেল-ষ্টীমারে নয়, এ[...] ভারতীয় প্রাচীন পদ্ধতিতে,—পদব্রজে,—তবে সঙ্গে জিনিষপত্র, রাত্রের আশ্রয় তাঁবু প্রভৃতি নিয়ে যাবার জন্য দু'চা[রটি] গরুর গাড়ীও সঙ্গে থাকত। গুরুদেব নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, [...] জেলার মধ্যেই ভ্রমণ সীমাবদ্ধ রেখে দর্শনীয় সব দেখার।

বীরভূম জেলাটি সত্যই সুন্দর, এর দিগন্ত-বিস্তৃত খোলা স্থানে স্থানে অনুর্ব্বর রুক্ষ মাটি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকার অপূর্ব্ব মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জাগায়! এখানে সাধু, সন্ত, লেখকের প্রচুর সমাবেশ, সেই প্রাচীন কাল থেকেই। আবার স[তীর দেহ] বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়, ভারতের ৫১ পীঠের একটি পীঠস্থান এই জেল[ায়।] কাছেই জয়দেবের কেঁদুলী গ্রাম, অজয় নদীর ধারে যেখান [থেকে] একদিন গীত-গোবিন্দের মত ভাব-সমৃদ্ধ ভক্তি-গীতি মহাপুরুষ জয়দে[ব]

লেখনী-নিঃসৃত হয়ে শত-সহস্র জনের প্রাণে মহানন্দের উদ্রেক করেছিল।

আর একদিকে চণ্ডীদাসের লীলাভূমি নান্নুর। বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের অমৃতময় পদাবলী কীর্ত্তনাবলীর কি আর তুলনা আছে? আজও তা রসিকজনের মনে অমৃত-ধারা প্রবাহিত করে। আজও সেখানে সেই দীঘি, রামী ধোপানীর ঘাট, চণ্ডীদাসের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রভৃতি প্রচুর স্মৃতিচিহ্ন বিরাজমান।

অন্যদিকে মহা-শ্মশান তারাপীঠ। যেখানে সেকালের অলৌকিক সাধক বামা-ক্ষ্যাপা প্রমুখ কত সাধু-সন্ন্যাসী আজও ভগবৎ-প্রেমে আকুল হয়ে তাঁর দর্শনাভিলাষে সংসার ত্যাগ করে মহাসাধনায় রত! আরও কত কাপালিক সাধু, মাতৃ-সাধক, আউল, বাউল, এর পথে-প্রান্তরে নির্জ্জনতার কোলে ছড়িয়ে আছে, তা কে জানে?

মেয়ের ধরে বসল,—ছেলেরা বাইরে বেড়াতে যায় ত আমরাই বা যাব না কেন? এবারের প্রমোদ-ভ্রমণে আমরাও যেতে চাই।

সেকালের শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার মহাশয় একদল ছাত্র নিয়ে সেবার যাবেন,—শান্তিনিকেতন থেকে ৪০ মাইল দূরে উষ্ণ-প্রস্রবণ দেখতে,—বক্রেশ্বরে; হেমবালা দি গুরুদেবের সম্মতিক্রমে মেয়েদের নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যাওয়া স্থির করলেন। এই এখানকার ছাত্রী-আবাসের মেয়েদের প্রথম প্রমোদ-ভ্রমণ। পদব্রজে বক্রেশ্বরে পৌঁছাতে তাঁদের তিন দিন সময় লেগেছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আহারাদি সম্পন্ন করে বক্রেশ্বরে যাত্রার পূর্ব্বে গুরুদেবকে প্রণাম করতে সকলে গেলেন উত্তরায়ণে। প্রণাম-পর্ব্ব চুকে যাওয়ার পর একবার সকলের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করেই গুরুদেব বলে উঠলেন, 'এ কী? তোমরা পায়ে হেঁটে কতদূরের রাস্তায় যাচ্ছ, যেখানে সেখানে তাঁবুতে রাত্রি-বাস করতে হবে, গায়ে সোনার অলঙ্কার কেন? শীগ্‌গীর সব খোলো, সকলের চুড়ি, বালা, হার, বৌমার কাছে জমা রেখে, তবে যাও।'

হেমবালা দির নারী-চক্ষে যা ধরা পড়েনি, তাঁর সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে নিমেষে তা ধরা পড়ে গেল!

আর একবার মেয়েরা ধরলো,—কঙ্কালী তলার মেলা দেখতে যাবে। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শান্তিনিকেতনের মাইল চারেক দূরে কঙ্কালী তলায় মস্ত মেলা বসে; আশে পাশের বহু গ্রামবাসী সেদিন সেখানে যায়, ভক্তিভরে পূজো দিতে,—সম্বৎসরের আধি-ব্যাধির হাত থেকে ৺মায়ের দয়ায় উদ্ধার পাওয়ায় নিজ নিজ মানসিক ঋণ-শোধের সঙ্কল্প পূরণ করতে।

কঙ্কালীতলা পুণ্য পীঠস্থান। কিংবদন্তী এবং এদিককার লোকের অখণ্ড বিশ্বাস, নারায়ণের চক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে সতীর মস্তকের একখানা হাড় পতিত হয়েছিল। মন্দির নেই, মূর্ত্তি নেই,—আছে শুধু একটি গাছপালায় ঢাকা নির্জন শান্তিপূর্ণ স্থানে ছোট্ট একটি জলাশয়, চলতি ভাষায় ডোবা, এই ডোবাতেই লোক ফুল-বেলপাতা দিয়ে ৺মায়ের উদ্দেশে পূজা দেয়। এই ছোট ডোবাটির জল নাকি বীরভূমের দারুণ গ্রীষ্মেও কখনই শুকায় না।

হেমবালাদি মেয়েদের এ আব্দারও পূর্ণ করলেন। গন্তব্যস্থান অতি নিকট, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লে, বেলা বারোটার মধ্যে ফিরে এসে অক্লেশে স্নানাহার সমাধা করা যায়। গুরুদেব সেদিন কি এক দরকারী কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায়, তাঁকে জানাবার সুবিধে হল না, সংক্ষিপ্ত পথ, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন মনে করে হেমবালাদি মেয়েদের নিয়ে প্রত্যুষে বেরিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই গুরুদেবের কর্ণগোচর হল এ সংবাদ। চৈত্র মাসের দারুণ গ্রীষ্ম,—তদুপরি বীরভূমের অত্যন্ত চড়া রোদ। মেয়েদের জন্য তিনি বিষম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোক পাঠাতে লাগলেন, ওরা ফিরে এসেছে কিনা জানবার জন্য।

এদিকে হেমবালাদির সঙ্গে মেয়েরা খুব আনন্দ করে দেখে শুনে, বেলা বারোটার মধ্যেই ফিরে এল। নিজেদের আস্তানায়। স্নানাহার সমাধা করে যে যার শয্যায় ক্লান্তি-বিনোদিনী নিদ্রার কোলে এলিয়ে পড়ল। গুরুদেবের লোক পাঠানোর খবর জানতে না পারায় হেমবালাদিও নিজের কামরায় বিশ্রাম নিলেন।

বেলা দুটো,—রৌদ্রে চতুর্দ্দিক পুড়ে যাচ্ছে, কোনো দিকে যেন চোখ মেলে তাকানো যায় না, এমন সময় হেমবালাদির বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত! তিনি উঠে দরজা খুলে সামনেই গুরুদেবকে দেখে অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সময়ে, এত রোদ্দুরে আপনি এত কষ্ট করে কেন এলেন? আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন?' স্নিগ্ধ হেসে তিনি বললেন, 'আমি শুধু খবর নিতে এলাম, সবাই সুস্থশরীরে ফিরে এসেছ ত? যাতায়াতে তোমাদের কোন কষ্ট হয়নি ত?' মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখে হেমবালাদি বিস্ময়ে হতবাক্‌!

গুরুদেবের গানের বিষয়ে একটু জানতে চাওয়ায়, হেমবালাদি বললেন, দেহলির নীচের তলায় থাকতেন দিনেন্দ্রনাথ, আর গুরুদেব তখন ছিলেন নির্ম্মীয়মান উত্তরায়ণের এক অংশে, উত্তরায়ণের অতি সামান্য অংশই তখন তৈরী হয়েছে। দেহলি থেকে উত্তরায়ণের দূরত্ব বেশ খানিকটা, যখনই গুরুদেব নূতন একটি গানের কথা ও সুর সৃষ্টি করতেন, তৎক্ষণাৎ দেহলিতে এসে দিনেন্দ্রনাথকে তা শুনিয়ে ও শিখিয়ে দিয়ে—দিনু বাবুর ভাণ্ডারে তাকে গচ্ছিত রেখে, নিশ্চিন্ত হতেন, না হলে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তা তাঁর মন থেকে মুছে যেত ও নূতন সুরের গুঞ্জন উঠত। পরে, শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীর নিকট শুনি, এ বিস্মৃতি ছিল তাঁর স্বেচ্ছাকৃত,—কারণ, পুরাতন সুর মন থেকে একেবারে নির্ব্বাসিত করে, আবার সেখানে তিনি একটি মনোমুগ্ধকর নূতন সুরের আমদানী করতেন।

উত্তরায়ণ ও দেহলিতে এই যাওয়া আসার কোন সময় অসময় ছিল না, দিনরাত্রির যে কোন সময়ে তিনি এতটা পথ আসা যাওয়া করতেন।

তিনি কি প্রথমে কবিতা রচনা করে পরে তাতে সুর-সংযোগ করতেন? যা সাধারণ বুদ্ধিতে হওয়া উচিত মনে হয়,—এ প্রশ্নের জবাবে শুনলাম, না, ঠিক এর বিপরীত। তাঁর অনেক সময়েই সুর আগে মনে হত, মনের মধ্যে সুরের গুঞ্জন উঠলে, উপযুক্ত কথা তাতে আপনিই এসে পড়ত, অন্ততঃ হেমবালাদির অভিজ্ঞতায় তাই মনে হয়। ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

( ৩ )

ঘুরে ঘুরে একদিন আমি যাই পূর্ব্ব-পল্লী-বাসিনী, শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রী-বিভাগের প্রাচীনতমা আদি ছাত্রীদের মধ্যে

একজন,—টুলুদির কাছে। এখানকার প্রাচীন শিক্ষক স্বনামধন্য ৺ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর ভগ্নীপতি। স্বামী—সরকারী কর্ম্মে অবসর-প্রাপ্ত, বাগান-ঘেরা নিজ বাটীতে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন-রত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গুপ্ত মহাশয়। এখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে টুলুদি নামে পরিচিতা হলেও, নাম তাঁর হেমলতা গুপ্ত।

সদালাপী, হাস্যমুখী, নিরহঙ্কারা, সুদর্শনা টুলুদির নিকট পুরাতন কথা কিছু শুনতে চাওয়ায় বললেন, তিনি তাঁর শৈশবে, অর্থাৎ ১২।১৩ বৎসর বয়সেই শান্তিনিকেতনে আসেন, এবং এখানেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত অল্প বয়সে আসার যে কারণটি তিনি বললেন, তা খুবই হৃদয়-স্পর্শী!

গুরুদেব শিলাইদহে বাস কালে, বোধ হয় গ্রাম গ্রামান্তরে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে বাঙ্গালী মেয়েদের দুর্দ্দশা দেখে বড়ই ব্যথিত হন। তিনি দেখেন, মেয়েরা শুধুই খাঁচার পাখীর মত গৃহ-কোণে আবদ্ধ থাকে—খাওয়ার পরে রাঁধে, আর রাঁধার পরে খায়,—বহুবিধ কুসংস্কারে জর্জ্জরিতা, মেয়েদেরও যে প্রাণ আছে, পুরুষের মতই আত্মা আছে,—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-ক্ষমতা আছে,—তা তারা নিজেরাই সম্পূর্ণ বিস্মৃত! এই আত্ম-বিস্মৃত নারী জাতির কল্যাণে কিছু করার জন্য, তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অভিলাষে, অন্তরঙ্গ ক্ষিতিমোহন বাবুকে বললেন,—যদিও শুধু ছেলেদের জন্যই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে, এর সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে এ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে; ছেলে মেয়ে দুই নিয়ে সমাজ-দেহ, তার এক অঙ্গের পুষ্টি ও অন্য অঙ্গের জীর্ণতায় কখনোই দেহটি সম্যক বিকশিত হতে পারে না, এইজন্য আমার আজকাল খুবই মনে হচ্ছে গুটিকতক মেয়ে পেলে একটি মেয়ে-বিভাগও আরম্ভ করি।'

তখনকার দিনে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্ম পরিবার ভিন্ন হিন্দুদের ভিতরে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার খুবই সামান্য ছিল। বাল্য-বিবাহ, পর্দ্দা-প্রথা, প্রভৃতির লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ মেয়েরা কেবল নিজের সংসারেই ঘুর-পাক খেয়ে মরত, নিজের আত্মীয়-স্বজনের বাহিরেও যে একটি বিরাট পৃথিবী আছে, মেয়েরাও যে লেখাপড়া শিখে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, পুরুষের মতই পরীক্ষায় পাশ করে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে,—সর্ব্বোপরি অব্যাহত মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারে,—গার্গী মৈত্রেয়ীর দেশের মেয়েরা তা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। গুরুদেবের করুণ উদার মন এর প্রতিকারের জন্য এত ব্যগ্র হয়েছিল যে, তাঁর আবেগ-কম্পিত আলোচনা ক্ষিতিবাবুর মনেও বোধহয় তীব্র রেখাপাত করেছিল।

পরের ছুটিতে তিনি যখন তাঁর দেশ ঢাকায় যান, তখন ১২।১৩ বৎসর বয়স্কা কিশোরী শ্যালিকা টুলুদি, ও তাঁর বন্ধুবর ডাক্তার প্রসন্ন সেন মহাশয়ের দুই কন্যা হিরণ এবং ইন্দুকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে শুভাগমন করেন। এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে যুক্ত হল, পরবর্ত্তী জীবনের ৺অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্য দি ও আরও দু'তিনটি মেয়ে।

এই ৫।৭টি মেয়ে নিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্রী-বিভাগ খোলা হল। বালিকাদের দেখাশোনার ভার নিলেন ৺অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মা—এখানকার সার্ব্বজনীন মাসীমা।

টুলুদি বাল্য-স্মৃতি থেকে ২।৪টি ঘটনা বললেন। তিনি বললে গুরুদেবকে শিশুকাল থেকেই নিজের পিতার মত করে দেখেছি' পেয়েছি। তিনি যে কত বড় ছিলেন,—জগৎ-জোড়া তাঁর কী খ্যাতি,—এ সব কথা একবারও মনে হত না। অতি সহজেই তাঁ কাছটিতে যেতে পারতাম, তিনিও সেভাবেই আমাদের গ্রহণ করতেন প্রত্যেকেই মনে করতাম, আমাকেই বুঝি তিনি সবচেয়ে বে ভালবাসেন; অবশ্য পরের জীবনে বুঝেছিলাম, এটি মহামানবে লক্ষণ,—মহাপুরুষেই ইহা সম্ভবে।

আশ্রমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গাছের পাতা ছিঁড়লে কি কোন প্রকারে তাদের কোনো অনিষ্ট করলে গুরুদেব অত্য দুঃখিত হতেন; তখন সুন্দর করে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন যে গাছগুলোও আমাদেরই একজন, আমরা যেমন এখানকার আলো হাওয়া, খাদ্যে পুষ্ট হচ্ছি, বড় হচ্ছি, ওরাও তাই। ওদের প্রাণ আছে ওদের পাতা ছিঁড়ে কষ্ট দেওয়ার মানে, নিজের ভাইকে কষ্ট দেওয়া শিশুমনে কথাগুলো এত গভীর দাগ কেটে বসেছিল যে, আজও পরিষ্কা মনে আছে।

কিছুকাল বাদে,—রথীদার খুব ধুমধাম করে বিয়ে হল প্রতিমা-বৌঠান নববধূ বেশে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করে আশ্রমে প্রবে করলেন। আমরা ছাত্র-ছাত্রীর দল ভীড় করে কনে-বৌ দেখতে গেলাম। লক্ষ্মী-প্রতিমা বৌঠান সকলকে একটি করে উপহা দিয়ে, আশ্রম-শিশুদের সঙ্গে ভাব করলেন। আমার ভাগ্যে উঠেছি একটি 'লিপি-স্থালী' (রাইটিং-প্যাড)। কিশোর মনের সে আনন্দে দিনগুলি স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল।

প্রতিমা বৌঠান আসার পর গুরুদেব মন্দির-সংলগ্ন শান্তিনিকেতন ভবনের দোতলায় বাস করতেন। বুধবার ছুটি, সেদিন সেই বাড়ীটাতে আশ্রম-ছাত্রীদের আনন্দের মেলা বসত। সারাদিন বৌঠানের সঙ্গ চড়ুইভাতি, আনন্দ করে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, বিকেলে গান আবৃত্তি, প্রভৃতিতে দিনটি যে কোথা দিয়ে কেটে যেত, কেউ বুঝতে পারত না।

গুরুদেব তখন এই মেয়ে কটিকে নিয়ে আরম্ভ করলেন,—'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটকটির মহড়া। তাঁর শিক্ষায় অল্প দিনের মধ্যে মেয়েরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' মঞ্চস্থ করতে পেরেছিল,—অবশ্য সম্পূ ঘরোয়া ভাবে। তখনও মেয়েদের নৃত্যগীত, নটকুশলতা, আজকে মত প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করার রীতি মোটেই প্রচলিত হয়নি শান্তিনিকেতনের ছাত্রীদের অভিনীত এই প্রথম নাটক। এতে বোধ হয় শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা বৌঠান, মীরাদি ও তাঁদের দু একজন আত্মীয়াও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

শুনি, গান, আবৃত্তি, ও অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা দেবার কালে কাঁ গুরুদেব নাকি প্রায়ই মেয়েদের বলতেন, তোমরা সর্ব্বপ্রকা শিক্ষিতা হও, কল্যাণী হও, কিন্তু কখনো কোনো প্রকারেই উচ্ছৃঙ্খ হয়ো না।

গুরুদেবের মুখের আরও একটি বাণী,—'নারী জাতি—মায়ে জাতির মলিন মুখ আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। টুলুদি নিকট শুনে নিজেকে ধন্য মনে করে, কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁর কাছে বিদা নিলাম।

[ ক্রমশঃ

## রাজর্ষি রামমোহনের পত্র—সিল্ক বাকিংহামকে লেখা

১১ই আগষ্ট ১৮২১
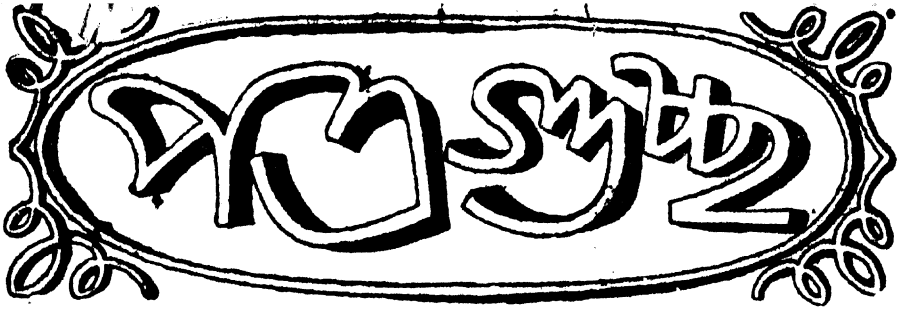
আমার মনে হয় আজ সন্ধ্যায় আপনাদের সম্মেলনের আনন্দলাভ হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখার প্রয়োজন আমার মধ্যে অনুভূত হইতে পারে, বিশেষতঃ যেহেতু ইয়োরোপ হইতে প্রাপ্ত শেষ সংবাদে আমার সমগ্র অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত। নেপোলিটিনেদের স্বার্থ আমি নিজের স্বার্থ বলিয়া মনে করি। তাহাদের শত্রুও তাই আমাদেরও শত্রু বলিয়া আমার নিকট গণনীয়। স্বাধীনতার শত্রু এবং যথেচ্ছাচারিতার সমর্থকরা কখনই শেষ অবধি সফলতা লাভ করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না।

[স্বেচ্ছাচারী রাজার কাছ থেকে নিয়মানুগ শাসনতন্ত্র আদায় করেও নেপলসের অধিবাসীরা অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদল কর্তৃক পুনরায় দাসত্ব-বন্ধনে বন্দী হওয়ার সংবাদ শ্রবণে রামমোহনের প্রতিক্রিয়া এই পত্রটির মধ্যে পরিস্ফুট।]

## রাজর্ষি রামমোহনের চিঠি—মিসেস উডফোর্ডকে লেখা

২৭এ এপ্রিল ১৮৩২

এই সংঘাত কেবলমাত্র সংস্কারক ও সংস্কার-বিরোধীদের মধ্যেই আজ আবদ্ধ নহে। এই সংঘাত আজ মুক্তির সহিত অত্যাচারের, ইহা বিচারের সহিত অবিচারের, যথার্থের সহিত ভ্রান্তের। এই সংঘাত আজ সারা জগতে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু অতীতকালের ইতিহাসের পৃষ্ঠাসমূহ অন্বেষণ করিয়া আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি যে রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে উদারপন্থী ভাবধারা চিরদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে এবং দৃঢ়তার সহিত আপন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় এবং তাহা সর্বপ্রকার যথেচ্ছাচারিতা ও গোঁড়ামির সকল বাধা অতিক্রম করিয়াই।

## রাজা রাধাকান্ত দেবের চিঠি—ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনকে লেখা

২০এ মার্চ ১৮৫১

"স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক"এর নূতন সংস্করণটি যেটি আপনি আমায় সেদিন পড়িতে দিয়াছেন—পাঠ করিলাম। প্রথম অধ্যায়ে দেখিলাম দু'জন দেশীয় মহিলার কথোপকথন কথা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আমার মনে হয় ইহা পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের নবতম সংযোজন। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিলাম শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু রমণীদের আলোকিত করিয়া তুলিতে ইয়োরোপীয় রমণীদের প্রচেষ্টা, সংযুক্তি দ্বারা সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করার দৃষ্টান্ত, ইহাও আমার ধারণা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়েরই রচনা। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং অতীতের ও আধুনিকযুগের বিদুষীগণের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য পাঠ্য রচনার্থে এ ক্ষেত্রে আমি যদিও বহু উপকরণাদি সরবরাহ করিয়াছি কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই আমার সংযোগ। প্রচেষ্টাটি যাহাতে সফলতা অর্জন করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমি উপকরণাদি সরবরাহ করিয়াছি কিন্তু লেখকের গৌরব এই গ্রন্থের প্রসঙ্গে কোনমতেই আমার প্রাপ্য নহে।

["স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক" স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় তদানীন্তনকালের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এর রচয়িতা গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। কিন্তু গ্রন্থটির কোন সংস্করণে গ্রন্থকারের নাম না থাকায় অনেকেই অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেকেই রাধাকান্ত দেবকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলে ভুল করেছেন। বীটনকে লেখা রাধাকান্তের এই চিঠিটিও প্রমাণ করছে যে, গ্রন্থটি তাঁর রচনা নয় এবং গ্রন্থকার কে।]

## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিঠি : ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসানকে লেখা

৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৫

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের আইন সংক্রান্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার শূন্য পদের প্রার্থী হিসাবে আমি কলেজের অধ্যক্ষের সহকারী পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকেই সমর্থন করি। ইনি যথেষ্ট দক্ষ এবং সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য। আমার মতে, এই পদের তিনি উপযুক্ততম প্রার্থী। ইহার পূর্বে তিনি যখন ব্যাকরণের দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন তখনই তিনি যোগ্যতা, কৃতিত্বের ও নৈপুণ্যের প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন।

## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিঠি : শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষকে লেখা

২রা জুলাই ১৮৫৫

আমি প্রস্তাব করি যে, আমাদের নূতন দেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে শিক্ষণ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য দুইজন শিক্ষাদাতা নিযুক্ত করা হউক। তাঁহাদিগকে মাসিক দেড়শত টাকা এবং পঞ্চাশ টাকা হারে বেতন দেওয়া হউক।

নর্মাল ক্লাসগুলির প্রধানশিক্ষকের পদের জন্য আমি "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের নাম প্রস্তাব করি। ইনি বর্তমানকালের স্বল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠতম বাঙালা লেখকদের অন্যতম। ইংরাজীভাষায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি, তাহা ছাড়া ইনি বিবিধ জ্ঞান-গর্ভ তথ্যের আকর ও শিক্ষাদানে যথেষ্ট পারদর্শী। ইঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এই পদের জন্য আমরা আর পাইব বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের জন্য আমি পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নাম প্রস্তাব করি। ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতবিদ্য ভূতপূর্ব ছাত্র এবং বঙ্গদেশের খ্যাতনামা লেখক-গোষ্ঠীর একজন। শিক্ষাদানে ইনিও যথোচিত পারদর্শী।

আমার মতে এই পদে তিনি সর্বতোভাবে উপযুক্ত প্রার্থী।

[সুবিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নর্মাল স্কুলের প্রতিষ্ঠার যখন পরিকল্পনা চলছিল, এ চিঠি সেই সময়ে লেখা। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়।]

## অক্ষয়কুমার দত্তের চিঠি : রাজনারায়ণ বসুকে লেখা

চৈত্র ১২৫৭

'প্রভাকর' সম্পাদক আপনাকে একটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মেদিনীপুরের সংবাদগুলি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ হইবেন এবং আপনার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিবেন; ঝকড়া (ঝগড়া), মারামারি, ডাকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যতপ্রকার সর্বনাশের ব্যাপার আছে সকলই লিখিয়া দিবেন। বাস্তবিক দেখিবেন লিখিতে হইলে মনুষ্যের অমঙ্গল-সমাচারই অধিক লিখিতে হইবে। এই সকলই লোকের কার্য্য। ইহাই মর্ত্তলোকের স্বরূপ। এ লোকে আবার নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা?

## পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের চিঠি : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদককে লেখা

সাহিত্য পরিষদ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

পরিষদ আমাকে বিশিষ্ট সভাপদে বরণ করিয়াছেন অবগত হইয়া যারপরনাই সম্মানিত বোধ করিতেছি এবং কৃতার্থম্মন্য হইতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, রোগে ও বার্ধক্যে আমার শরীর এরূপ জীর্ণ শীর্ণ ও অপটু হইয়াছে যে পরিষদে উপস্থিত হইয়া তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্যে লিপ্ত হওয়া কিংবা সহায়তা করা আমার দ্বারা ঘটিবে না। আমি কেবল নামমাত্র সভ্য হইলাম। যাহা হউক, শেষাবস্থায় দেশের মান্যগণ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নিকট এ প্রকার সমুন্নত সম্মান লাভ করিয়া আমার অন্তঃকরণে একটা অপরিসীম তৃপ্তি আসিয়াছে। ইতি—সন ১৩১৮ সাল ৫ই আশ্বিন।

## উইলিয়ম কেরীর চিঠি : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষকে লেখা

৫ই জানুয়ারী ১৮১১

কলেজের প্রাক্তন প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় কয়েক বছর আগে আমারই অভিপ্রায়ানুযায়ী উক্ত রচনা কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং রচনাটির 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' নামকরণ করেন। সমগ্র হিন্দু সাহিত্যের উৎস উহার উপজীব্য। প্রচলিত উপমাদি দ্বারা উহা অলঙ্কৃত। তাঁহার এই প্রভূত শ্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি কিছু আশা করেন। রচনাটি বর্তমানে শ্রীরামপুর প্রেসে রহিয়াছে এবং গ্রাহক হইবার কোনপ্রকার আবেদন না করিয়াই উহাকে প্রকাশ করা হইবে। আমি মনে করি রচনাটি কলেজপাঠ্য হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্য্যময় বলিয়া বিবেচিত হইবে। রচনাটি সুখপাঠ্য এবং সুলিখিত। মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত সাহিত্য হইতেও কিছু তর্জমা করিয়াছেন এবং বিবিধ উপকরণকে অবলম্বন করিয়া কিছু মৌলিক রচনাও করিয়াছেন। সেগুলি কলেজে পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত। এই সকল রচনাগুলির জন্য তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট বেতন ব্যতীত একটি কপর্দকও লাভ করেন নাই। সেইজন্যই তাঁহার এই শেষ অনুরোধকে আমি কোনপ্রকারে অযৌক্তিক বলিতে পারি না। তাঁহার শ্রমের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি টাকার অঙ্ক তিন শত নির্ধারণ করিবার প্রস্তাব করি।

স্বাঃ উইলিয়াম কেরী।

[দুর্ভাগ্যের বিষয়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রবোধ চন্দ্রিকার গ্রন্থরূপ দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর দেহান্তের পর গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে।]

## উইলিয়াম কেরীর চিঠি : কলেজ কর্তৃপক্ষকে লেখা

১৮ই জুলাই ১৮০৩

চার্লস রথম্যান,

কলেজ কাউন্সিলের সচিব সমীপে—

মহাশয়,

দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা গ্রন্থাদি রচনা করাইবার যে সিদ্ধান্ত কলেজ কাউন্সিল গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃতভাষা হইতে বাঙলা গদ্যে 'বত্রিশ সিংহাসন' এর অনুবাদ করিয়াছেন, গ্রন্থটি ক্লাসের পাঠ্য হিসেবে খুবই উপযোগী এবং সন্তোষজনক। আরও উল্লেখ করি যে রামরাম বসু বঙ্গভাষায় একটি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, উহার নামকরণ করিয়াছেন "প্রতাপাদিত্য", ঐ গ্রন্থটিও ছাত্রগণ কর্তৃক পাঠ্য হিসাবে পঠিত হইতেছে। গ্রন্থগুলি গ্রন্থকারদের প্রতিভা ও নৈপুণ্যের পরিচয় নানাভাবে বহন করে এবং যথাযথ পারিশ্রমিকের দাবী রাখে। এই কার্য্যে মৃত্যুঞ্জয়কে একাদশ মাস এবং রামরামকে দেড় বৎসর সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে।

মহাশয়, আপনার বিশেষ অনুগত

স্বাঃ ডব্লিউ, কেরী

বঙ্গভাষার শিক্ষক

পুনশ্চ— রামরামের 'প্রতাপাদিত্য' বাঙলাভাষায় রচিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ এবং আকবরের রাজত্বের সূচনা হইতে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সমাপ্তি পর্যন্ত বঙ্গদেশীয় সরকারের একখানি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক আলেখ্য। 'লিপিমালা' নামক অপর একখানি পাঠ্য-গ্রন্থও যথেষ্ট সারগর্ভ এবং উপযোগী। তাঁহারা পারিতোষিকের জন্য

আবেদন করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা, মৃত্যুঞ্জয়কে চারি শত টাকা এবং রামরামকে ছয় শত টাকা প্রদান করা হউক।

[কেরী সাহেবের এই পত্র পেয়ে কর্তৃপক্ষ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসুর রচনার সম্মানদক্ষিণা হিসেবে যথাক্রমে ছুশো সিক্কা টাকা এবং তিন শো সিক্কা টাকা ধার্য্য করেন।]

## উইলিয়াম কেরীর চিঠি : কলেজ কর্তৃপক্ষকে লেখা

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষ সমীপে

মহোদয়গণ,

বঙ্গভাষা বিভাগের অন্যতম পণ্ডিত রামরাম বসু গত সপ্তাহে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তাঁহার শূন্য আসন অধিকার করার ক্ষেত্রে আমি তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসুকে যোগ্যতম প্রার্থী বলিয়া বিবেচনা করি। সার্টিফিকেট পণ্ডিত হিসাবে গত আট বৎসর ধরিয়া সে কলেজে কর্ম করিতেছে। তাহার কর্ম প্রত্যেকের মধ্যে প্রভূত সন্তুষ্টিবিধান করিতেছে। তাহার কর্মদায়িত্ব সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন এবং এইপদে সে যোগ্যতম প্রার্থী।

মহোদয়গণ, আপনাদের অনুগত
স্বা: উইলিয়াম কেরী

১১ই আগষ্ট ১৮১৩

## উইলিয়াম কেরীর চিঠি : কলেজ কর্তৃপক্ষকে লেখা

১৬ই জানুয়ারী ১৮০৪

মহাশয়,

'তোতানামা'র একখণ্ড অনুবাদ এতৎসহ প্রেরিত হইতেছে। এখানকার অন্যতম পণ্ডিত চণ্ডীচরণ ইহাকে পারস্যভাষা হইতে বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। আপনি কর্তৃপক্ষের সম্মুখে গ্রন্থটি পেশ করিলে সুখী হইব। গ্রন্থটি অতি উৎকৃষ্ট এবং অতিশয় সরল বাঙলায় লিখিত এবং পাঠ্যপুস্তক হিসাবে খুবই উচ্চাঙ্গের হইবে সন্দেহ নাই। ইহার জন্য কর্তৃপক্ষ কিছু সম্মানমূল্য ধার্য্য করিলে ইনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন।

স্বা: ডব্লিউ কেরী।

[কেরী সাহেবের এই সুপারিশপত্রে চণ্ডীচরণ মুন্সীকে তাঁর অনুবাদকর্মের সম্মানমূল্য হিসাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ একশত টাকা দেন।]

## উইলিয়ম কেরীর চিঠি : ডক্টর বাইল্যাণ্ডকে লেখা

২৭এ জানুয়ারী ১৭৯৫

এখন ইংল্যাণ্ড হইতে একটি মুদ্রণযন্ত্র এদেশে প্রেরণ করা সমিতির বিশেষভাবে উচিৎ। আমাদের জীবন নিঃশেষিত হইয়া যাইলেও আমরা উহা পরিশোধ করিয়া দিব। আমরা এ দেশীয় মুদ্রাকরদের মুদ্রণকার্য্য চালাইবার জন্য মুদ্রাকর হিসাবে নিযুক্ত করিব।

## ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের চিঠি : লর্ড ডালহাউসীকে লেখা

২১ এ মার্চ ১৮৫০

এই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে আমাকে অকৃত্রিম এবং অশেষ সহযোগিতাদানের জন্য তিনজনের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। ইহারা রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার। রামগোপাল ঘোষ স্বনামধন্য বাণিজ্যবিদ্; তিনি আমার কার্য্যাদির উপদেষ্টা এবং প্রথম ছাত্রীলাভের প্রধান সহায়ক। দক্ষিণারঞ্জন জমিদার, পূর্বে তিনি আমার অপরিচিতই ছিলেন কিন্তু আমার পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবামাত্র আমার সহিত স্বত: প্রবৃত্ত হইয়া আলাপ করিয়া কলিকাতার দেশীয় অঞ্চলে তাঁহার অধিকারভুক্ত দশ হাজার টাকা মূল্যের পাঁচ বিঘা জমি আমার পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিতে বিনামূল্যে দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অন্যতম পণ্ডিত, ইনি শুধু তাঁহার দুই কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই সহযোগিতার হস্ত সঙ্কুচিত করেন নাই, অধিকন্তু নিজেও উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষা কর্মে নানাবিধ সহায়তা করিয়া থাকেন। তাহাদের উপযোগী কিছু গ্রন্থ রচনায় তিনি তাঁহার অবকাশের সময় ব্যয় করিতেছেন।

## কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র : মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা

২৭এ অক্টোবর ১৮৮১

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা, আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেঙ্গল ম্যাগাজিনের আলোচিত খণ্ডটি আপনার উদ্দেশে পাঠাইতেছি। ইহার মধ্যেই সেই তিনটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, কাগজের টুকরা দিয়া আমি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি। প্রথমটিতে, ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে তাঁহার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনটিই পড়িয়া যে আপনি আনন্দলাভ করিবেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, বিশেষ করিয়া ইহাদের মধ্যে এমন কোন কোন অংশ আছে—যাহা পাঠে ব্যক্তিগতভাবেও আপনি আনন্দিত হইবেন।

আমি এখন অনেকটা ভাল। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

স্বা: কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী

## ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টারের পত্র : মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা

অফিস অফ দ্য ডিরেক্টার জেনারেল
অফ ষ্ট্যাটিসটিকস্
টু দ্য গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া
সিমলা, ২২এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩

প্রিয়বরেষু,

রাজা, আপনার ১৮ই সেপ্টেম্বরের পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ঐ পত্রের সহিত আপনি যে মহামূল্য তথ্যাদি সরবরাহ করিয়াছেন, তাহার জন্য প্রভূত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। রাজা এবং জমিদারদের দ্বারা দেশীয় ও জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধীয় কিছু বিবরণ আপনার নিকট হইতে পাইতে আশা করি। এই বিষয়ক তথ্য আপনার নিকট হইতে পাইলে প্রভূত উপকার হয়।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বা: ডব্লিউ, ডব্লিউ হাণ্টার

# অবিস্মরণীয় মল্ল ভীম ভবানী

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক কুস্তি-প্রতিযোগিতায় অধুনা বাঙালীর ভূমিকা নগণ্য ও উপেক্ষণীয় হলেও, সর্ব-ভারতীয় কুস্তি-চর্চার আদিপর্বে বাংলাদেশ যে এক বিশিষ্ট আসন দখল করেছিল, এ-কথাটা ঐতিহাসিক সত্য।

বাংলাদেশের মল্লক্রীড়ার ইতিহাসে কলকাতার গুহদের নাম আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। এঁদের আখড়ার শতায়ু কয়েক বছর আগেই হয়ে গেছে। এই একশো বছর ধরে এঁদের পাঁচ-পুরুষ ধনে জনে প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেও নিজেরা আখড়ার মাটিতো মাখছেনই আর এঁদেরই আগ্রহে, চেষ্টায় ও অর্থে বহু বাঙালী তরুণদের কুস্তির-আখড়ায় এনে বাংলার কুস্তিকে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

এই আখড়ার মাটিই একদিন গায়ে মেখেছিলেন বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ। মেখেছিলেন ভারত-বিখ্যাত মল্ল ক্ষেত্রচরণ গুহ, 'কলির ভীম' ভীম ভবানী, বিশ্ব-বিশ্রুত গোবর পালোয়ান। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে খুব বড় বড় বহু মল্ল ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণত: বিদেশে যাওয়া ও বিদেশী মল্লদের সাথে শক্তি-পরীক্ষা দেওয়া পছন্দ করতেন না। তাই বিশ্বের জন-সাধারণও এঁদের নাম তেমনভাবে জানতে পেতো না। আসলে, ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক কুস্তির লড়াই খুব অল্পদিন পূর্বে শুরু হয়েছে এবং অমৃতসরের গোলাম পালোয়ানের (১৯০২ সাল) আগে আর কোন ভারতীয় মল্লই বিশ্বজয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে ধারাবাহিক কুস্তির লড়াইয়ে নামেননি। বাংলাদেশের মধ্যে ভীম ভবানীর আগেও আর কেউ এ্যাড ভেঞ্চারের উদ্দেশ্য নিয়ে ধারাবাহিক কুস্তির লড়াইয়ে নামেননি। বাঙালী মল্লবীরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম একলা বাংলার বাইরে গিয়ে ভারতবর্ষের বি ভিন্ন প্রদেশে সম্ভব পক্ষে বাঙালী-অবাঙালী খ্যাত-অখ্যাত বহু মল্লের সাথে লড়াই শুরু করেছিলেন এবং এইভাবে সমসাময়িক বহু মল্লকে পরাস্ত করেছিলেন। ভীম ভবানীর আগে বাংলার আর কোন মল্লই বাংলার বাইরে ব্যাপকভাবে দংগলে (পেশাদার পালোয়ানদের কুস্তি-প্রতিযোগিতা) লড়েননি এবং এই সমস্ত দংগল লড়াইতে মল্ল-হিসেবে তিনি জীবনে কোনদিন কারু কাছেই পরাজয় স্বীকার করেননি।

ভীম ভবানীর জীবনের দুটো দিকই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতন চির-ভাস্বর। একদিকে তিনি ভারতবিখ্যাত মল্লবীর আর অপরদিকে সার্কাসের এক বিশ্বখ্যাত ক্রীড়াবিদ রূপে স্বীকৃত। এ-কথা সর্বজন-স্বীকৃত যে, ব্যায়াম-জগতে জার্মান-বলী ইউজেন স্যাণ্ডোর মতন ভীম ভবানীর অভ্যুত্থানও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা এবং ব্যায়ামী ও বলী হিসেবে পৃথিবীর বুকে আর কোন মানুষই এই দুজনের মতন এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। ব্যায়ামী হিসেবে বা মল্লবীর হিসেবে—যেদিক থেকে বিচার করা যাক্—ভীম ভবানী নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ছিলেন।

ভীম ভবানী কুস্তি-জগতের ও ব্যায়াম-জগতের যত বড় বিস্ময়ই হোন না কেন, তাঁর অভ্যুত্থান আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেন না বিংশ-শতাব্দীর প্রথমভাগে কুস্তিতে ও ব্যায়ামে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য ছিল। তখনকার প্রখ্যাতনামা ব্যায়ামীদের মধ্যে দেবী চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ, ফণীন্দ্রকৃষ্ণ, রাজেন গুহঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আর পালোয়ানদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ক্ষেতুবাবু, শ্যামাকান্ত, পরেশনাথ, ভীম ভবানী ও গোবর পালোয়ান। এঁদের মধ্যে একমাত্র ভীম ভবানীই এই দুই বিভাগে খ্যাতি লাভ করেন। ভীম ভবানী সার্কাসের একজন বিশ্ববিশ্রুত ক্রীড়াবিদ্‌রূপে খ্যাতিলাভ করলেও তাঁর সময়ে তিনি যে একজন বড় জোরের পালোয়ান হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একথা রামমূর্তি নাইডুও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, ভীম ভবানী ভারতে না জন্মে যদি ইউরোপে কিংবা আমেরিকায় জন্মাতেন, তবে বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করতেন। ভারতের বাইরে দূর প্রাচ্যে একাধিক দংগলে তিনি লড়েছেন। নাগপঞ্চমী, বিজয়া-দশমী ও বসন্ত-পঞ্চমীতে সে-সময় প্রতি বছরই ঝরিয়াতে ও মহিষাদলে বড় রকমের কুস্তির দংগল হোতো। সে-সব দংগলে অংশ নিতে তিনি বহুবার একাই ছুটে গিয়েছেন। এই ঝরিয়াতেই ১৯০৭ সালে ঝরিয়ার মহারাজার রাজবাড়ীতে এক কুস্তির দংগলে ভীম ভবানী লড়েছিলেন অমর সিং-এর সাথে। মাত্র ১৮ মিনিট লড়াই হবার পর অমর সিং হার স্বীকার করেন। সে সময় ভীম ভবানীর বয়স মাত্র ষোল বছর। এত অল্প বয়সে আজো কোন ভারতীয় মল্ল দংগলে লড়েননি। বেনারসে একবার বেড়াতে গিয়ে সেখানকার বটুয়া পাঁড়ের আখড়াতে বেনারসের বিখ্যাত পালোয়ান স্বামীনাথনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বাংলার তরুণ ও অখ্যাত মল্ল ভীম ভবানী। প্রায় ৪০ মিনিট লড়বার পরও লড়াইটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে যায়। স্বামীনাথনের মতন অভিজ্ঞ ও দক্ষ মল্লের সাথে লড়াই করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

ভারতবিখ্যাত মল্ল করিম্ বখশ, পালোয়ানের প্রিয় সাকরেদ রাজ

পালোয়ানের সাথে ভীম ভবানীর এক লড়াই হয়েছিল ক্ষেতুবাবুর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের আখড়ায়। সেই আখড়ার ওপরই এখন দর্পণা সিনেমা-হল শোভা পাচ্ছে। এই লড়াইতেও ভীম ভবানী অতি সহজে রাজা পালোয়ানকে আসমান দেখিয়ে দেন। তারও আগে ক্ষুদিবাবুর আখড়ায় মুখা পালোয়ানকেও কয়েকবার জব্দ হতে হয়েছিল তরুণ ছাত্র এই ভীম ভবানীর কাছে। একবার ক্ষুদিবাবুর (অতীন্দ্রনাথ বোস) শ্যালক নন্দবাবু ভারতবিখ্যাত মল্ল কিক্করের সাকরেদ তাজ পালোয়ানকে এনেছিলেন আখড়ার ছাত্রদের মল্লশিক্ষা দেবার জন্যে কিন্তু তরুণ মল্ল ভীম ভবানীর কাছে প্রথম দিনই তাজ পালোয়ান এমন মার খেলেন যে, আর তিনি আখড়ার-মুখো হননি।

বস্তুতঃ ভারতীয় কুস্তির ক্ষেত্রে ভীম ভবানীর আবির্ভাবকে এক আকস্মিক ঘটনা বলা চলে। কেননা, ভীম ভবানী গোবরবাবুর মতন 'খানদানি' পালোয়ান ছিলেন না। তাঁর বাবা বা ঠাকুরদার মধ্যে বংশের কেউ কোনদিন মল্ল ছিলেন না। এমন কি, ভীম ভবানীর আগে সারা পরিবারে খেলাধুলা বা কুস্তির কদরও বুঝতেন না কেউ, কিন্তু উত্তরকালে তাঁরই প্রভাবে এই পরিবারের অনেকেই আখড়ার মাটির ওপর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ভীম ভবানীর ভাইদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ (রামভাই) ও দুর্গাচরণই ভাল লড়তেন। জন্মসূত্রেও ভীম ভবানীর দৈহিক কাঠামো ও শক্তি এত উন্নত ছিল না যে, ১৩।১৪ বছর বয়সেই তিনি দুই বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশী বয়সের জোয়ানদের ছাড়িয়ে যেতে পারেন। ছেলেবেলায় ৯।১০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর শরীর নাকি খুবই রুগ্ন ছিল। ম্যালেরিয়া ছিল তাঁর চিরসঙ্গী। লেখা-পড়ায়ও মন ছিল না। তাঁর ২০ বছর বয়সের হস্তাক্ষর যা দেখছি, তা অতি কদর্য। এমনি অবস্থার মধ্যে একদিন তাঁর হাতে-খড়ি হোলো এক গুরুর কাছে। লেখা-পড়ার নয়, কুস্তিরও নয়। হাতে-খড়ি হোলো জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স্-এর, ক্ষুদিবাবুর কাছে, তাঁর বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই আশাতিরিক্ত ফল ফললো। রুগ্ন-শরীর নওজোয়ানে পরিণত হল।

এই সময় নন্দবাবুর পরামর্শে ক্ষুদিবাবু তাঁকে ক্ষেতুবাবুর ডন্-কুস্তির আখড়ায় নিয়ে যান। সেখানেই তিনি একদিন ক্ষেতুবাবুর নজরে পড়ে যান, বস্তুতঃ এই সময় থেকেই ভীম ভবানীর জীবনের পট পরিবর্তিত হয়।

ক্ষেতুবাবু ছিলেন ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। অন্যান্য গুরুভার পালোয়ানদের মতন বিশালকায় না হলেও তিনি ছিলেন সত্যিকারের বলশালী ও কুশলী মল্ল। সেকালে মল্লবীর হিসেবে ক্ষেতুবাবুর নাম বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি সুদূর পাঞ্জাবের পালোয়ানী মহলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এ-হেন গুরুর শিক্ষা-গুণে ভীম ভবানীর অভাবিত উন্নতি ঘটে এবং খুব অল্প বয়সেই বড় বড় নামকরা পালোয়ানদের হারিয়ে মহিষাদলে পেশোয়ারী খোদা বখশ্-এর মতো ভারতবিখ্যাত মহামল্লের সম্মুখীন হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। খোদা বখশ্ ও ভীম ভবানীর এই লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হয়েও শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে যায়। বহু রণজয়ী ভারতবিখ্যাত মল্ল পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেও তরুণ বাঙালী মল্লকে পরাস্ত করতে পারেননি। ১৯০৮ সালে বেনারসের আর একজন নামজাদা লড়িয়ে বরবস্ গুরজান্ পালোয়ানকেও তিনি অতিসহজেই পরাস্ত করেন।

দেহ-গঠনের জন্যে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উপযুক্ত মেহনত করে গেছেন। মল্ল চর্চাকালে এক হাজার বুকডন আর দু'হাজার গোলা সপেটা (হাত পা ছেড়ে আগু-পিছু হওয়া) বৈঠক দেওয়া ছিল তাঁর দৈনিক ব্যায়াম। অনেকে এ-সব হিসেব দেখে অবিশ্বাস করবেন। কিন্তু যিনি বৈঠকের সময় হিসাব-রক্ষক ছিলেন, সেই রামভাইয়ের কাছ থেকেই এ-তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আহার্য তালিকাও আজকালকার মতন সামান্য ছিল না। অতীনবাবুর কাছে শুনেছি তিনি নাকি মাংস খেতে খুব ভালবাসতেন। যে-কোন সময় সের খানেক মাংস অনায়াসেই খেতে পারতেন। তবে দুধ তিনি আদৌ খেতেন না।

[আগামী বারে সমাপ্য।

# ঋতু-রঙ্গ

### শ্রীমতী সবিতা মুখোপাধ্যায়

বিচিত্ররূপিণী সৌন্দর্যময়ী ধরণী খেয়ালের বশীভূত নয়, সে আপন নিয়ম নির্দ্ধারিত পথ অনুসরণ করিয়া দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে আপন বিচিত্র রূপ পরিগ্রহণ করে। এক একটি ঋতু এক এক প্রকার সৌন্দর্য্যের ডালি বহন করিয়া ধরণীপরে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করে। তাহার পর মানবসমূহ সেই সৌন্দর্য্যে অবগাহন করিলে নির্দ্ধারিত সময়ে তাহারা বিদায় গ্রহণ করে।

গ্রীষ্মের আগমনে ধরণী রুক্ষ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে। তপন-তাপে জর্জরিতা পৃথিবী সকল সৌন্দর্য্য বিবর্জ্জিতা হইয়া পড়ে। সে রূপ মানবের চক্ষুকে তৃপ্তিদান করিতে পারে না। বরং মনে ত্রাসের সঞ্চার করে, কোথাও এতটুকু শ্যামলতা, সরসতার চিহ্ন মেলে না। রুদ্র সন্ন্যাসীর রুক্ষ জটার ন্যায় বৃক্ষের ডালগুলি পত্রশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আর সবুজ পত্রগুলি নিদাঘ তাপ হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য ঝরিয়া পড়িয়া মাটির বুকে আশ্রয় লয়। চারিদিক ধুলায় ধূসরিত হইয়া উঠে। সূর্য্যের এই মত্ততার বুকেস তাই কাঁপন জাগে। তখন মনে হয় :—

"হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক।"

সূর্য্য যেন ক্রোধে উন্মত্ত ভৈরবের ন্যায় রক্তনেত্র কপোলে ধারণ করিয়া সারা ধরণীকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হয়। তাই জলাশয়ে জল থাকে না, থাকে না মাঠে শস্য। চারিদিককে শীর্ণ উপবাসী মৃতের মত মনে হয়। তাই বুঝি কবিগুরু গাহিয়া গিয়াছেন এই রুদ্র সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়া :—

"জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নি শিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার"।

কিন্তু বেশীদিন এই বৈরাগী তাহার প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। নব বর্ষার আগমনবার্তায় তাহার অমোঘ প্রতাপ তিল তিল করিয়া শিথিল হইয়া যায়। তাই নির্মেঘ আকাশে দেখা যায় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের অস্তিত্ব। সেই পুঞ্জীভূত মেঘ ক্রমশ: এক ঘন নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ আকারে সারা আকাশ আবৃত করিয়া দৈত্যের ন্যায় অগ্রসর হইতে থাকে। মনে হয় বুঝি এইমাত্র ধরণীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। পরক্ষণেই তার প্রবল প্রতাপধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয় সে যেন ডম্বরু মৃদঙ্গ বাজাইয়া শত শত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ধরণীপরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঠিক যেন—

"ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা"।

পরক্ষণেই 'অঘোর ঝরণ শ্রাবণ জলে' সারা পৃথিবীকে সিক্ত করিয়া দেয়। নিদাঘতাপে তাপিত ধরণী অমৃত বারি বর্ষণে আবার পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। দীর্ঘদিন পরে তরুলতা প্রভৃতি সলিলে অবগাহন করিয়া নূতন প্রাণ স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে। চারিদিক শ্যামলতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। শুষ্ক জলাশয়গুলি নব জীবনানন্দে কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। মনে হয় উহাদের জীবনেও সাড়া জাগিয়াছে। এই বর্ষা সত্যই এক নব যুবতীর বেশ ধারণ করে ফলে ফুলে পূর্ণ হইয়া উঠে। সেই সঙ্গে মানব মনেও জাগায় নূতন জীবনের ছন্দ। অপূর্ব্ব এক সুরের লহরী তোলে মানব-হৃদয়কুঞ্জে। তাই তো কবি কালিদাস লিখেছিলেন 'মেঘদূত'। আর রবীন্দ্রনাথ দিলেন বর্ষাকেই তাঁহার কাব্যে প্রধান স্থান। বৈষ্ণব সাহিত্যও বর্ষার জয়গান করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। কৃষ্ণহারা রাধা যখন বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই বর্ষার আগমন হওয়ায় বিরহিণী রাই দুঃখভারে নীত হইয়া মনের অসহ্য খেদ প্রকাশ করিয়াছেন চণ্ডীদাসের কবিতায় :—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

আকাশ ছাওয়া মেঘ; মাঝে মাঝে চোখ ধাধানো বিজলী, আর চুল ওড়ানো, অঞ্চল দুলানো চঞ্চল বাতাস সব মিলাইয়া এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে, যা মানব মনকেও উদ্বেল করিয়া তোলে। তাই তো কবিগুরু বলিয়াছেন যে কথা অন্য সব সময় বলা যায় না, সেই না-বলা বাণী এই সময় রূপ নেয় ভাষার মাধ্যমে।

"ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়, বিজুলি থেকে থেকে চমকায়,
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়।"

কিন্তু কোন ঋতুই বোধহয় তাহার অবস্থানকে স্থায়ী করিতে পারে না এই ধরণীতে। যে বর্ষা মানব-মনকে ও বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে উদ্বেল করিয়া তোলে, তাহাকেও একদিন তাহার শাসনদণ্ড সহ বিদায় লইতে হয়। বর্ষার কালো নিবিড় মেঘমালা পরাজয় স্বীকার করে শরতের খণ্ড খণ্ড মেঘপুঞ্জের কাছে। শরতের শুভ্র আলো পৃথিবীর সকল কালিমা ধুইয়া দেয়। সারা আকাশ নীল রঙে শোভিত হয়। মানব-হৃদয়ও যেন আলোকিত হইয়া উঠে। কবির ভাষায় বলা যায়,—

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলী, ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি"

পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে যখন খণ্ড খণ্ড সাদা পেঁজা-তুলার মত মেঘগুলি ইচ্ছামত ভাসিয়া বেড়ায়, তখন মনে হয়,—

"নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা!"

কিন্তু শরৎও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় হেমন্তের আবির্ভাবে। সেই স্বচ্ছ নীল আকাশের লক্ষ লক্ষ তারাদলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে হেমন্তিকা। চারিদিক ঘন কুয়াসার আস্তরণে আবৃত হইয়া যায়। শরতের সেই শুভ্র জ্যোৎস্না যেন কোথায় তাহার অস্তিত্বকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। চারিদিকে কি এক অজানা আতঙ্কে শিহরিত। কারণ এই হেমন্তই সেই কঠিন বর্মধারী শীতের আগমন-বার্তা দৃপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত করিয়া তোলে। তাই তো কবিগুরু গাহিয়াছেন,—

"হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা,
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যা-প্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াসাতে
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা।"

তারপরেই দেখা দেয় সেই মহাস্থবির শীত।
শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।

সত্যি সে এক অদ্ভুত রূপ প্রকৃতির। শীতের কঠিন স্পর্শে এক এক করিয়া ঝরিয়া পড়ে গাছের পাতাগুলি। চারিদিকে ঘন কুয়াসার জাল বিস্তারিত। প্রকৃতি যেন কঠোর তপস্যায় মগ্ন। সেই কঠিন সাধনা ভঙ্গ করিবার সাধ্য যেন কাহারও নাই। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"নির্দ্দয় অতি করুণা তোমার, বন্ধু তুমি হে নির্মম।
যা কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ দণ্ড তোমার দুর্দম"।

সকল কুয়াসার জাল বিদীর্ণ করিয়া কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া, মানবকুঞ্জে প্রাণের সঞ্চার করিয়া আবির্ভূত হয় ঋতুরাজ বসন্ত।

বসন্তের আগমনে প্রকৃতির বুকে জাগে সৌন্দর্য্যের লীলা। সারা প্রকৃতি যেন রঙিন হইয়া উঠে। পাতায় পাতায় ভরিয়া উঠে বৃক্ষগুলি। ফুলে ফুলে করে কানাকানি। বৃক্ষকুলের বুকে জাগে দোলা। তার সঙ্গে মানবও এক অজানা আনন্দে ভরিয়া উঠে। প্রকৃতির মত অকারণ চঞ্চল হইয়া উঠে মন। মনে হয় :—

"আজ দক্ষিণ দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত এসো,
দিব হৃদয় দোলায় দোলা।"

এই সময় মন যেন পাল তোলা নৌকার মত ভেসে চলে। বাঁধ মানে না। তাই তো কবি গাহিয়াছেন—

"মোর বীণা উঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয় স্পন্দে।"

বসন্তের প্রভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সত্যই রমণীয়। তাই বসন্তকে বলা হয় ঋতুরাজ। মানবের দেহ যেমন যৌবনে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে, ঠিক প্রকৃতিও বসন্ত ঋতুতে হইয়া উঠে নব-যৌবনমদে বিভূষিতা। এইরূপে একের পর এক ঋতু তার সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার লইয়া ধরণীর বুকে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। এবং অপরের আবির্ভাবে বিমর্ষ হইয়া ধীরে ধীরে বিদায় লয়। অনাদি-অনন্ত কাল ধরিয়া প্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যলীলা মানব দেখিয়া আসিতেছে। আর সেই সৌন্দর্য্য-সরোবরে অবগাহন করিয়া মানবের মনও এক অনাস্বাদিত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

শীতের দেশের মেয়ে —ডক্টর অনুপম সান্যাল
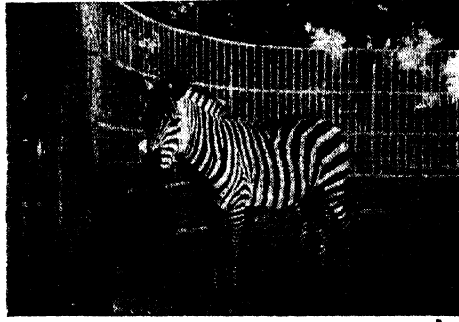
## ॥ আ লো ক চি ত্র ॥

প্রাকৃতিক —দেবু দাস

জেব্রা —অজিত কর্মকার

পাণ্ডুকেশ্বর মন্দির ( শ্রীবদরী ) —সমীর মুখোপাধ্যায়

মজদুর ভাই —মণিময় ঘোষাল

খাদ্য ও খাদক —শান্তিময় সান্যাল

নায়িকা মীনাকুমারী —পল ষ্টুডিও (বোম্বাই)

# নিষিদ্ধ এলাকা

কালপুরুষ

১০
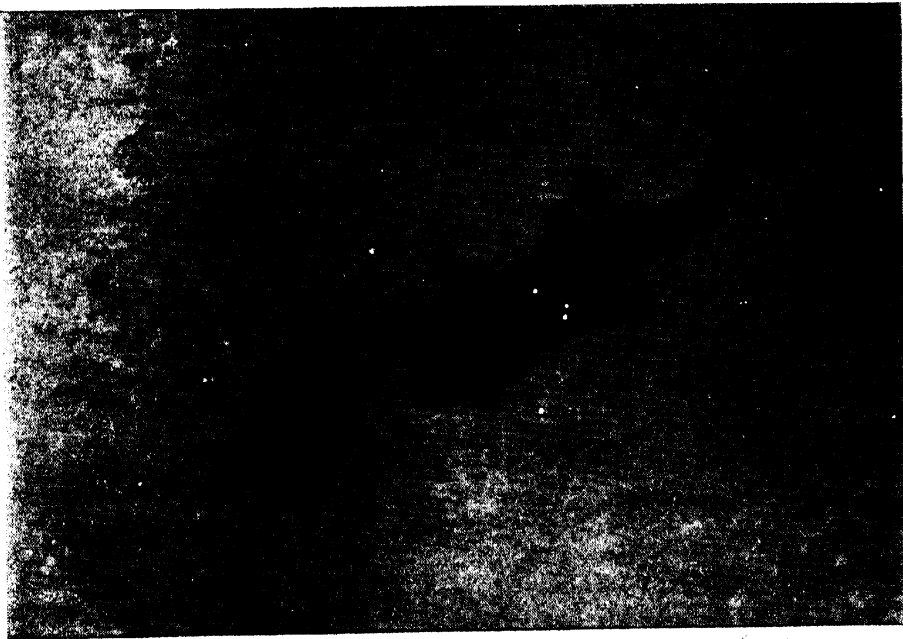
লতার মত কোমল-জীবনের আশ্রয় একটা চাই-ই। কিন্তু যাতে সে নির্ভর করবে, সে যদি বিমুখ হয়, সে যদি বৈরী হয় তবে কি লতা ভেঙে পড়ে? একথা অবশ্য ঠিকই, একবার প্রাণ-মন দিয়ে যাকে সে জড়ায়, তাকে কোন বিপদে-আপদে ঠেলে ফেলে না। ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে প্রাণপণে তাকে পতন থেকে রোধ করতে চেষ্টা করে; না পারলে নিজেও সেই অধঃপতনের সাথী হয়।

বাণীর জীবনও তাই।

বাণী শেষে ধরা দিল একটা হারকে কেন্দ্র ক'রে। শোনা যায়, এর আগে অনেক বড় বড় চুরির সঙ্গে সে জড়িত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তাতে নাকি সে দোষী প্রমাণিত হয়নি, তাই তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি কেউ। আবার সে-সব কেসের জিনিসপত্রও ফিরে পায়নি পুরো। কতক তার সন্দেহবশতঃ বাজেয়াপ্ত হয়েছে সরকারে।

এখানকার ঠিকানার ঠিক নেই। কখনও বলে আসাম, কখনও বলে কলকাতা। আর তার ছেলের চিঠিতে যে ঠিকানা লেখা থাকে তা একটা কলোনীর।

বাণী বলে, বাড়ী ছিল পূর্ব্ব-পাকিস্তানে। সেখানে ওঁর অর্থাৎ তার স্বামীর মুদির দোকান ছিল, আর ছিল তেজারতী ও বন্ধকী কারবার।

বাবা ছিল অত্যন্ত গরীব; তাই আধবুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে এমনই সব সন্দিগ্ধ মনের লোক আছে যে, আমাকে অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলতে দেখলে অনর্থ হয়ে যেত। শাসন ছিল এদিক থেকে কড়া। সংসারের কাজে আর পূজা-অর্চনায় তাই সেদিন নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আজ সেটা অভ্যাসের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার শ্বশুর আমাকে পছন্দ করেছিলেন শুধু রূপ দেখেই নয়, তাঁর সংসারের কাজে একজন নারীর প্রয়োজন ছিল, তখন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তখন সদ্য মারা গিয়েছেন দু-তিন বছরের একটা ছেলে রেখে। নিজে বিয়ে করা আর ভাল দেখায় না বলেই ছেলের বিয়ে দিয়ে আমাকে সেদিন ঘরে তুলেছিলেন। ছেলের বাপের দোষ ছিল না; ছেলে কোনদিন বিয়ে করবে না বলেছিল। অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাই তার বাবাও আর চেষ্টা করেননি। কিন্তু সেজন্যে বয়সটা তো আর বসে থাকেনি।

আমার সং-শাশুড়ী দেখতে নাকি খুবই সুন্দরী ছিলেন। সেজন্যে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ত না তাঁর। আর বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা হলে যা হয়—শ্বশুর মশায় তো তাঁর হাতের পুতুল ছিলেন। তিনি নিজেও এত সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন যে, ছেলে সংমায়ের সঙ্গে ভাল করে দুটো কথা বলতে পর্য্যন্ত পারত না। অবশ্য এতে সং-শাশুড়ীরও দোষ ছিল। তিনি কোথায় এ-সব শাসন করবেন, না, তিনিই আরও আগুন জ্বালাতেন। এই সব কথা নিয়ে একদিন রাতদুপুরে সে কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড! শাশুড়ী বেরিয়ে যান বাড়ী থেকে—যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবেন; ওদিকে ছেলে এ-হেন অপমান সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিতে চায়। পাড়ার লোক জুটে যায়। ঘণ্টা দুয়েক পর বিস্তর বাক্যব্যয়ের শেষে একটা মিটমাট হয়, রাত্রির মত শান্তি হয়। যে যার বাড়ী ফিরে যায়। এ ঘটনার পরিণাম হয় আরও বিষময়।

সং-শাশুড়ী সেবার অসুখে পড়েন, আর সেই অসুখেই তাঁর কাল কিন্তু তাঁকে দেখাশুনা করার জন্য লোকের প্রয়োজন। ছেলে বৌ কাছে যায় না। নিজের পেটের ছেলের বয়স তো দু'-তিন বছর যা একা মানুষের পক্ষে করা সম্ভব, তা শ্বশুরমশায় সবই করেছেন ওষুধ দেওয়া, পথ্য তৈরি করা, খাওয়ানো ইত্যাদি সব।

রোগ যখন কঠিনতর হয়ে দাঁড়াল এবং শাশুড়ী যখন নিশ্চিত বুঝতে পারলেন—এ যাত্রা তাঁকে বিদায় নিতেই হবে, তখন ব ছেলেকে ডেকে বললেন তার হাত দু'টি ধরে—বাবা, একটা বিয়ে-ব করো, না হলে—আর বলতে পারলেন না। গলার স্বর ভারী হা এল, চোখের দু' কোণ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

মুখ নীচে নামিয়ে ছেলে শুধাল—না হলে কি?

না হলে ওকেও বাঁচানো যাবে না। ওকে অর্থাৎ নিজের পেটে ছেলেকে।

এক ফাঁকে স্বামীকেও বললেন কথাটা।

সেদিনই রাত্রিতে তিনি মারা যান।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেলে শ্বশুরমশায় একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে বাবার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলেন, বাবা তখনই রাজী হয়ে যান এবং মাসখানেকের মধ্যে আমি ও-বাড়ীর বৌ হয়ে চলে যাই। ওদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল অনেক দিন আগে থেকেই; কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘর বলে নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া আমি ওদের বাড়ী যাইনি। শুনেছি, ওদের সঙ্গে আমাদের নাকি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তাও একটু আছে। ইদানীং সে-সূত্রে এত ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে, কেউই আর তা মনে রাখেনি। বাবার মুখে শুনেছি—ওদের যেখানে বৈঠকখানা উঠেছে, সে জায়গাটুকু আমাদেরই ছিল। দু'এক পুরুষ আগে কোন এক কৌশলে ওঁরা সেটা বের করে নেন। আমাদের না ছিল অর্থবল, না লোকবল; কাজেই বেদখল হয়ে যাওয়া জমি নিয়ে লড়াই করবার সাধ্য আমাদের ছিল না। সঙ্কীর্ণ এক ফালি জমি নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট হতে হল। তাই-ই চলে আসছে আজও।

বিয়ে হয়ে নূতন গিয়েছি। ও-বাড়ীর হাল-চাল জানা ছিল না স্বামীও কিছু আভাস দেয়নি। বাড়ীর এক মুসলমান কৃষাণ এসে সন্ধ্যেবেলায় কি যেন বলছিল;—আমি সব কথা বুঝতেও পারিনি তাই একটু বেশিক্ষণই তার সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল। সে ছি

উঠোনে দাঁড়িয়ে, আমি রোয়াকে। কিন্তু কখন যে শ্বশুরমশায় পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা জানতে পাইনি। কথা বলা শেষ করেই যেই ভিতরের দিকে পা বাড়িয়েছি, অমনি দেখতে পেলাম তিনি হলঘরের ভিতর দিয়ে ডানদিকে চলে গেলেন। আমি ভিতরে পা দিতেই তিনি ডাকলেন—বৌমা, শোন।

গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন—এই যে-সব কৃষাণ রাখাল এরা সব আসে-যায়, এদের সঙ্গে তুমি অতক্ষণ ধরে কথা বলবে না। আসলে তোমার না বললেও চলে।

আচ্ছা বেশ—মৃদুস্বরে উত্তর দিয়ে আমি ভিতরে চলে গেলাম। মনটা অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গেল। বাড়ীর কৃষাণ, বাড়ীর রাখাল,—এদের সঙ্গে কথা বলা দোষের। এরা কেউ ছেলের বয়সী, কেউ বাবার বয়সী। যাই হোক, শ্বশুর যখন চান না, তাই হবে।

এ বাড়ীতে একটা পাকা ইঁদারা ছিল। সে ইঁদারার জল অনেকেই ব্যবহার করত, জাত-বেজাতের লোকও বাদ যেত না। আমরাও ছোটবেলায় ওদের এই ইঁদারার জল নিয়ে যেতাম। সে এক পর্ব্ব ছিল। সন্ধ্যেবেলায় কলসী-বালতি নিয়ে সে যেন এক মেলা বসে যেত ইঁদারার পাশে। নানা গল্পগুজব, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের ইতিহাস, পাড়ার কেচ্ছাকাহিনী,—সব কিছুরই আলোচনা হত এখানে। ভীড়টা হত ঠিক সন্ধ্যের মুখেই বেশি। সন্ধ্যে উৎরে গেলে সে-ভীড়টা আবার পাতলা হয়ে যেত।

সকালের দিকেও কিছু ভীড় হত, কিন্তু সে ব্যস্ত লোকের ভীড়। তখন আবার বিপরীত—তাতে অনেক সময় আগে-নেওয়া নিয়ে ঝগড়া-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। একদিন আমার সঙ্গেও হয়েছে।

সকালবেলা। সবারই তখন তাড়াতাড়ি। আমি যখন গেলাম, তখন দেখি মনো-পিসীমা নিজের কলসী মাজছেন, কিন্তু জল-তোলার বালতিটা আটকে রেখেছেন নিজের ডানদিকে। এ বালতিটা আটকানো ছিল একটা ঢেঁকি-কলের সঙ্গে। মনো-পিসীমার মুখ ভাল ছিল না, সবাই জানত। তা সত্ত্বেও আমিই মুখরার মত বলে উঠলাম—পিসীমা, একটু তাড়াতাড়ি নিন, নয়ত বালতিটা একটু ছেড়ে দিন আমাকে।

আর যায় কোথায়! জ্বলে উঠলেন পিসীমা, খুলে গেল তাঁর মুখ। কেন গো? কিসের তাড়াতাড়ি! পারব না আমি। আমার তো তোদের মত হাতীর গতর নেই! অত যদি তাড়া, তবে এখানে না এলেই হয়, বাড়ীতে ইঁদারা কাটিয়ে নিলেই হয়।

পিসীমা জানতেন, বাড়ীতে ইঁদারা কাটাবার মত অবস্থা আমাদের নয়। সেইজন্যেই, ইচ্ছে করেই, অন্তরে আঘাত দিয়ে কথাটা তিনি বলেছিলেন, সকলে যাতে শুনতে পায়।

আমার সর্ব্বশরীর রাগে জ্বলে উঠল। তবু কণ্ঠস্বর সংযত করে বললাম—যাদের অবস্থা আছে, তারাও তো একটা কুয়ো পর্য্যন্ত কাটায় না—ইঁদারা তো দূরের কথা।

পিসীমার গায়ে লাগল কথাটা। তিনি মনে করলেন, তাঁর মুখে মুখে তর্ক করেছি আমি এবং সেটা আমার ইচ্ছাকৃত। তিনি যাই মনে করে থাকুন না কেন, আমার কাজ উদ্ধার হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি জল নিয়ে চলে গেলেন আর যাওয়ার সময় শাসিয়ে গেলেন—এর বিহিত ব্যবস্থা যদি আমার বাবাকে বলে না করতে পারেন তিনি, তবে তাঁর নাম-ই যেন পাল্টে রাখা তাঁর নামে কুকুর ছেড়ে দেওয়া হয়—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বাবাকে তিনি বলেছিলেন সত্যি, তবে আমার সাক্ষাতে ন জানতেন—সাক্ষাতে বললে তেমন মুখরোচক করে বলা যেত না।

বাবা আমাকে শুধালে আমি যা সত্যি ঘটেছে, তাই সব বললা ঐ সঙ্গে এ-কথাও জানিয়ে দিলাম—আমি আর ও-বাড়ী জল আন যাব না।

সস্নেহে বাবা বললেন—দূর পাগলী, তাই কি হয়! খাওয় জলটা তো আনতেই হবে।

সে আমি আনব বোর্ডের অফিসের সামনের কল থেকে। বে অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ড।

বাবা বললেন—সে কি-রে! সেখানে যে দিন-রাত লো গিজগিজ করছে। না, না—তা হয় না।

তবে, একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়, একটা উপা আছে; যদি তুমি এখানে একটা কুয়ো খুঁড়িয়ে নাও।

বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন—কোন কথা বললেন না।

দিন পনেরো পরে সত্যিই কুয়ো খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল এই কুয়োই আজও গরীবের ঘরে তৃষ্ণার জল দান করে। এই কুয়ে খুঁড়তে গিয়ে কিছু টাকা তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর তা শো করতে হয় আমার বিয়েতে টাকা নিয়ে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, যে-বাড়ীর ইঁদারার জল নেব না প্রতিজ্ঞা করে একদিন বেরিয়ে এসেছিলাম, সেই বাড়ীর সেই ইঁদারার জলই আমার সর্ব্বক্ষণের প্রয়োজন মিটাচ্ছে, আমি তার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব করছি।

এর পরও মনো-পিসীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এ বাড়ীতেই। কিন্তু তখন তাঁর সুর সম্পূর্ণ অন্য রকম। বাবা, বাছা ছাড়া কথা বলতেন না তখন। আমি অবশ্য বিয়ে হওয়ার পরে ইঁদারার কাছে খুব কম যেতাম। প্রয়োজনও তেমন ছিল না।

একটা জিনিস খুব আশ্চর্য্য মনে হত—মনো-পিসীমা এ-বাড়ীতে যখন-তখন আসতেন, কেন? আমি রান্না করছি; বেলা প্রায় দশটা। দরজায় ছায়া পড়ল। মনো-পিসীমা। শুধাল—কি গো, রান্না-বান্না হ'ল?

প্রায়। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিই আমি।

যাই।—আমারও তো আবার দুটো কিছুর যোগাড় করতে হবে, বলে চৌকাঠের উপরই বসে পড়লেন। অগত্যা পীড়িখানা এগিয়ে দিতে হল।

কত কি যে বলে গেলেন তিনি, তার ঠিকানা নেই। তবে কথা প্রসঙ্গে এটুকু জানিয়ে গেলেন যে, এ-বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর আজ নূতন নয়। তাই তিনি যখন-তখন এসে বিরক্ত করবেন আমাকে।

বেলা বারোটা নাগাদ উঠলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—একটু তেঁতুল দিতে পারো বৌমা?

তেঁতুল এনে তাঁর হাতে দিয়ে আমি-ই হেসে বললাম—আমি কি আপনার সে-বাণী নেই?

না-না তা কেন? তবে কিনা কানাইও তো আমার ছেলের মত। সেই হিসেবেই তোমাকে বলি 'বৌমা'। তা যখন যা খুশী তাই বলব, কেমন? অন্তরঙ্গতায় মধুর হয়ে আমার চিবুকে একটা নাড়া দিয়ে তিনি চলে গেলেন সে দিনের মত। যেতে যেতে বলে গেলেন—মদন বেঁচে থাকলে তো এত বড়টাই হত।

মদন পিসীমার একমাত্র ছেলের নাম। ছোটবেলায় কি করে যে হারিয়ে যায়, খোঁজ পাননি আজও। তাই তাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছেন।

কানাই আমার স্বামীর নাম।

আবার একদিন পিসীমা এলেন সন্ধ্যেবেলা। আমি সব ঘরে প্রদীপ দেখানো শেষ করে তুলসীতলায় প্রদীপ রেখে রান্নাঘরে পা দিয়েছি কি হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন বসে রয়েছে চুপচাপ অন্ধকারে।

কে? আমি বেশ উচ্চস্বরেই শুধালাম।

আমি, বৌমা।

ওঃ, আমি তখন হেসে উঠলাম। আপনি পিসীমা। তা এমন অন্ধকারে চুপচাপ একা-একা বসে আছেন কেন?

ত্রস্তে উঠে পিসীমা আমার মুখে হাত চাপা দিলেন। বললেন, চুপ। কাউকে ব'লো না, মা লক্ষ্মী। আমাকে দুটো টাকা ধার দিতে হবে। আমি তোমাকে সুদশুদ্ধ দিয়ে যাব ও মাসে।

মেয়েদের এই গোপনে টাকা খাটানোর ব্যাপার সব মেয়েরাই জানে। আরও জানে এতে আগ্রহের পরিমাণটা। তাই পিসীমা ঠিক জায়গা মতই কথাটা পেড়েছিলেন। আমি ঢোঁক গিলি কিনা, কয়েক মিনিট তা লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমিও চুপচাপ আছি দেখে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কৈ, হ্যাঁ-না কোন কথাই বললে না তো!

দাঁড়ান্—দিচ্ছি এনে।

একটু তাড়াতাড়ি কর মা।

বিভিন্ন জায়গা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে, সিকিতে দুয়ানিতে মিলিয়ে দুটো টাকা পুরো করতে বেশ খানিকটা দেরি-ই হয়ে গেল।

হাতে নিয়েই,—বেঁচে থাক বৌমা—বলেই অন্ধকারে যেমন এসেছিলেন, তেমনি বেরিয়ে গেলেন।

আরও দু'তিন বার এসে তিনি এইভাবে মোট গোটা ছয়েক টাকা নিয়ে গেলেন প্রায় মাসখানেকের মধ্যে। টুকটাক কত্রে আরও অনেক জিনিসই এইভাবে নিয়ে গেলেন। তবে সেগুলো খাওয়ার জিনিস।

তিন-চার মাস কেটে যাওয়ার পরও যখন তিনি সুদ দূরের কথা—টাকার কোন কথাই তুললেন না, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হল সে-কথাটা একদিন। উত্তরে তিনি এমন বিনয় প্রকাশ করলেন যে আমি-ই লজ্জা পেলাম।

আমি যখন টাকা পাওয়ার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, তখন হঠাৎ একদিন তিনি এসে আমার হাতের মধ্যে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, বৌমা, এটা আসল বাবদে উশুল ক'র মা। সুদটা ছেড়ে দিতে হবে।

আমাকে জোর করেই হেসে বলতে হল—তাতে আর কি আছে?

আরও দু-তিন মাসের মধ্যে বাকী টাকাটা তিনি দিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য, সুদ একটা পয়সাও দিলেন না বা দিতে পারলেন না।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর শ্বশুরের ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই পিসীমার গলা কানে এল। দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিসীমা এই অসময়ে এখানে কি করছেন?

টুকরো টুকরো কথাবার্ত্তা যা কানে এল, তা থেকে অনুমান করে নিলাম, আমাকে ঘিরেই কথাবার্ত্তা হচ্ছে। আমি নাকি আমার ছোট দেওরকে দেখতে পারিনে। টাকা-পয়সা বেশ গুছোচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বুঝতে বাকী রইল না যে, এ সংসারে ভাঙনের ঢেউ উঠেছে এবং তার মূলে আছে ঐ একটি নারী। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারলাম না, এতে তাঁর স্বার্থ কোথায়, বা কি উদ্দেশ্য তাঁর সিদ্ধ হবে এ সংসারটা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলে।

রাত্রে স্বামীকে বললাম কথাগুলো। তিনি শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন—বুঝেছি। ঐ মাগীই আমাদের সর্বনাশ করবে। আমার মা মারা যাওয়ার পর থেকেই ওর যে কি কুক্ষণে এখানে প্রবেশ ঘটেছিল, সেই থেকেই ওর বিষ-দৃষ্টি লেগে আছে আমাদের সংসারে। শান্তি এল না কোনদিন। আচ্ছা, তুমি ওসব কথায় কান দিও না। ওই বুড়ীকে আমি খুন করব। তাতে যদি জেলও হয় তাও ভাল, ফাঁসীও পরোয়া করিনে সেজন্য—এই তোমাকে বলে রাখলাম।

আমি তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিলাম—কি জানি একথা যদি ঘূণাক্ষরেও কারো কানে যায়, তবে আমার তো দূরের কথা, ওঁরও এ বাড়ীতে স্থান হবে কিনা সন্দেহ।

এরপর আরও অনেকদিন দেখেছি মনো-পিসীমাকে এ বাড়ীতে আসতে। শুধু তাই নয়, ইদানীং তিনি আবার ছোট দেওরটিকে খুব ভালবাসতে আরম্ভ করেছিলেন। আমি অবশ্য তাতে কিছু বলিনি বা বলতামও না। কিন্তু সেদিন তিনি যা করলেন, তাতে আমি তাঁকে কিছু না বলে একেবারে মুখ বুজে থাকতে পারলাম না।

বিকেলবেলা। ছোট দেওর বলাই সে সময় প্রায়ই কিছু খেতে চাইত না। শ্বশুরের আদেশ ছিল—ঐ সময় ওকে দুধ খাওয়াতে হবে। আমিই তাকে ঐ সময়টা প্রতিদিন এক বাটি করে দুধ দিতাম। কোনদিন বা নিজে বসে খাওয়াতাম কোলের কাছে নিয়ে, কখনও বা বাটি ধরে নিজেই চুমুক দিয়ে খেয়ে নিত।

ওকে বসতে বলে আমি দুধের বাটিটা একটু জোরে ঠেলে ওর দিকে এগিয়ে দিয়েছি। আর ও বোধ হয় উঠে ঠিক এই দিকেই আসছিল, দুধের জন্যই কিনা জানি না, বাটির মধ্যে পড়ল পায়ের এক পাতা। গরম দুধ। পা গেল পুড়ে। ছেলে করতে লাগল চীৎকার। আমি তো এমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, না পারলাম কাঁদতে, না কিছু বলতে।

মনো-পিসীমা কোথায় ছিলেন জানি না, হঠাৎ ছেলের চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েই হাউ-মাউ করে উঠলেন। আর শুরু হয়ে গেল আমাকে বকুনি—এমন অশ্রদ্ধা করে খেতে না দিলেই বা কি? তুমি কোন্ দিন ওকে পুড়িয়ে মারবে, দেখছি। কপাল মন্দ ওর, না হলে এ-বয়সে মা হারায়? মায়ের বদলে এসেছে ডাইনী—। আরও হয়ত কিছু বলতেন, কিন্তু বক্তৃতা বাধা পেয়ে গেল শ্বশুরমশায়ের আবির্ভাবে। দিবানিদ্রার অন্তে তিনি হুঁকোটা হাতে করে যাচ্ছিলেন বৈঠকখানার দিকে। দাঁড়িয়ে পড়লেন; অথচ ঘটনা আগাগোড়া না শুনেই চেঁচিয়ে উঠলেন—ও ছেলেকে সত্যিই তুমি মেরে ফেলবে দেখছি। মনো-দি, নিয়ে এসো তো ওকে, দেখি কি করা যায়।

মনো-পিসীমা জোর করেই আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে

গেলেন ওকে। আর একটা বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলেন আমার উপর।

স্বামীর কাছে আত্মোপান্ত না বলে পারিনি। তাতে তিনি আবারও সেই উচ্চগ্রামে স্বর তুলে বলেছেন—ওকে সত্যিই আমি খুন করব। ও শুধু বাবার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়েই ক্ষান্ত হবে না। ভবিষ্যতে ভ্রাতৃবিরোধের বীজও বুনে যাচ্ছে। ওকে না সরাতে পারলে শান্তি নেই আমার।

কিন্তু চরম ঘটনা ঘটতে তখনও কিছু দেরি ছিল। কিছুদিন পরে—বলাই সেদিন নিজেই এসে দুধ চাইল। জানি না কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল কিনা। দিলাম আমি। কিন্তু যেই ও দুধের বাটি নিয়ে মুখে তুলতে যাবে, অমনি মেজো-পিসীমা কোথা থেকে ছুটে এসে বাটিটা ওর এক টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন উঠোনে, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার—খাসনে, খাসনে বিষ। ও খেলে মৃত্যু অনিবার্য।

আমি সহ্য করতে পারলাম না, বলে ফেললাম—আমি ওর বৌদি, মায়েরই মত—আর আপনি? মায়ের চেয়ে বেশি দরদ! আমি নয়, বিষ আপনিই দিচ্ছেন ওর শরীরে, মনে।

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি—তাকিয়ে দেখ।

দেখলাম, দুধের বাটি থেকে খানিকটা দুধ মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, একটা বিড়াল তারই খানিকটা খেয়ে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। টলছে আর মাথা ঘুরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট বিষক্রিয়ার লক্ষণ। আমি একেবারে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলাম। অন্তর্যামী জানেন—আমি নির্দোষ। কিন্তু অন্যে?

পিসীমা বললেন—হ্যাঁ, আমি কে, শুধাচ্ছিলে না? এর উত্তর জানতে হলে ঐখানে জিজ্ঞেস করে দেখো। বাপ যাকে ত্যাজ্যপুত্র করে, তার বৌয়ের আবার দেমাক দেখ! বলে এক অদ্ভুত বিকৃত মুখভঙ্গী করে, পরমুহূর্তেই 'চল্' বলে বলাইকে কোলে তুলে নিয়ে সবেগে প্রস্থান করলেন!

কথাটা কি করে পাড়াময় রাষ্ট্র হল, জানি না। স্বামী অবশ্য আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। আমি শুধু পিসীমার কাছে শুনেছি, এই কথাই বললাম। এবার তিনি কিছুই বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ আমাকে বললেন—তৈরি হও। এ বাড়ী ছেড়ে চিরকালের মত যেতে হবে। পারবে?

কেন পারব না?

আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বললেন—এই তো চাই।

কিন্তু তাঁর কথা যে এত শীগ্‌গিরই কাজে পরিণত হবে তা ভাবিনি। পরের দিন বিকেলে তিনি স্পষ্টই জিজ্ঞেস করলেন বাবাকে—আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন?

হ্যাঁ, ভেবে দেখলাম বলাইয়ের জীবন বৌমার হাতে নিরাপদ নয়, তাই তোমাদের—

বঞ্চিত করে ঐ মাগীকে সম্পত্তি দেখাশুনার ভার দিয়ে গেলেন—এই তো? মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন আমার স্বামী।—বেশ, তাই হবে। আপনার সম্পত্তির দাবী আমি করব না কোনদিন। দেখি, সম্পত্তি আমি করতে পারি কিনা। বলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন। কোথায় তা কেউ জানল না।

গভীর রাত্রি, জনমানিষ্যি জেগে নেই। মাঝে মাঝে শুধু কুকুরে চীৎকার শোনা যাচ্ছে। হীরের টুকরোর মত জ্বলছে জোনাকীরা পথে দুধারে ঘন জঙ্গলের সারা অঙ্গে। আমি দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছি ঘরে খিল দিয়ে—

এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। চমকে উঠলাম—কে?

ফিসফিস করে উত্তর এল—আমি, দরজা খোল।

আতঙ্কে গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। তবু সকল সাহস সঞ্চয় করে বললাম—জানালায় এস, দেখি কে।

জানালায় এল সেই মূর্তি। কিন্তু একি! এমন বীভৎস মূর্তি তার হল কেমন করে? চোখে-মুখে একটা অপরিসীম ভয়ের ছাপ ছড়িয়ে আছে যেন।

দ্রুতে দরজা খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই স্বামী আমার মুখ চাপা দিয়ে ধরে কানে কানে বললেন—কোন কথা নয়। চল, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে। এই বাড়ী ছেড়ে চিরকালের মত। চট্ করে তৈরি হও।

আমার তৈরি হতে বেশি সময় লাগে নি। তবে আমার সম্পত্তি যা কিছু ছিল, অর্থাৎ গয়না-গাটি, কাপড়-চোপড়—সবই নিলাম।

স্বামী নিয়ে এসে উঠলেন দু'মাইল দূরে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে। তিনি অবশ্য আমাকে একটা পৃথক ঘর দেখিয়ে দিলেন। ওরা দুজনে কি কথা বলতে লাগলেন, সব আমি শুনতে পাইনি।

শেষরাত্রের দিকে স্বামীর ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। আবার রওনা দিতে হবে—এখুনি।

সেই বন্ধুটি ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসে ট্রেণে তুলে দিয়ে গেলেন। গাড়ী ছাড়বার একটু আগে, তিনি কি একটা কাগজ—যেন ভুলে গিয়েছেন এই ভেবে—ওর হাতে গুঁজে দিলেন। গাড়ী ছাড়লে কাগজখানা খুলে দেখা গেল, শুধু একটা ঠিকানা। হাসি ফুটল স্বামীর মুখে।

বাংলা দেশের সীমান্তবর্ত্তী এক জেলা। দূরে দূরে দেখা যায় ধূম্রাভ পর্ব্বতমালা। এই রকম এক পাহাড়তলীর কোলে এসে উঠলাম আমরা, স্বামীর বন্ধুর নির্দ্দেশিত ঠিকানায়। আমাদের অভ্যর্থনা করে নেওয়ার জন্য একজন লোক এগিয়ে এল। তার হাতে আমার স্বামী একটা চিঠি দেখতে দিলেন। লোকটা একটু হাসল, কিন্তু কোন কথা বলল না।

দূরে, পাহাড়ের অন্তরালে, সূর্য্যের রঙীন আভাস। এপারের আকাশে রঙের ছোপ লেগেছে। আমরা এসে উঠলাম একটা ছোট খালি বাড়ীতে। বাড়ীটায় যে কোন লোক থাকে তা মনে হল না।

লোকটা আমাদের পৌঁছে দিয়েই চলে গেল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ফিরে এল রান্নার সব সরঞ্জাম নিয়ে। আশ্চর্য্য, দেখলাম লোকটা এবারও কোন কথা বলল না। এই দূর দুর্গম দেশে একজন লোকও অনেক কাম্য, তার সঙ্গ অনেক বাঞ্ছনীয়। তাই আমি নিজেই তাকে শুধালাম—তোমার নাম কি?

আমার না—না—নাম হ-হ-হরিচরণ।

ও হরি, তাই তো ও বেশি কথা বলে না, বলতে রীতিমত কষ্ট হয়। এতক্ষণে বুঝলাম সে কথা।

সন্ধ্যেবেলায় দেখি, স্বামীর সেই বন্ধুটি এসে হাজির। অনেক রাত পর্য্যন্ত আবারও তাদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হল। আমি রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই এদিকে কান দেবার অবকাশ পাইনি।

প্রথম দিন রান্নাবান্নার যোগাড় বেশি কিছু করিনি। তাই সকাল-সকালই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল; কিন্তু শোওয়া হল না।

স্বামী বললেন—আমাকে একবার মিট্টুবাবুর ওখানে যেতে হবে। মিট্টুবাবু সেই বন্ধুটির নাম।

কখন ফিরবে?

কিছুই ঠিক নেই।

আমার ভয় হল। তাই তাঁর হাত চেপে ধরে বললাম—সে কি?

এ কথায় তাঁর যেন একটু রাগের ভাব দেখা গেল। আমি আর সেদিক দিয়ে গেলাম না। শুধু বললাম—আমিও যাব।

না,—তা হয় না।

তবে কি আমি এখানে একা থাকব? সে আমি মেরে ফেললেও পারব না।

এখানে হরিচরণ থাকবে পাহারায়। ব্যস, এইটুকু বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আর হরিচরণও সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়াল। মনে হল, সে বুঝি কাছেই কোথাও ছিল। আমরা দুজনে কথাবার্ত্তা বলছি দেখে হয়ত সে আত্মপ্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করছিল।

একগাল হেসে হরিচরণ বললে—মা, আ-আ—আপনার কোন ক-ক-ক-কষ্ট হবে না আ-আ-আমি থাকতে।

একে নূতন জায়গা, তারপর এমনি নির্জ্জন। স্বভাবতঃই ঘুম আমার কথা নয়। তাই হরিচরণের সঙ্গে বসে বসে নানান আজে-বাজে কথা বলতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, মিট্টুবাবুর বাড়ী থেকে স্বামীর ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত কোনক্রমে জেগে থাকা।

কিন্তু তা আর হল না। এক সময় হরিচরণ আমাকে বলল—অ-অ-অনেক রাত হল, মা। এ-এ-এবার আ-আ আপনি শু-শু-শুতে যান। ছু-ছুটোর গাড়ী চলে গেল।

ছুটো! কিন্তু উনি এলেন না কেন হরিচরণ? আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে।

ভয় নে-নে-নেই মা। ঠিক ফি-ফি-রে আ-আসবেন।

ঘরের মধ্যে গেলাম বটে, কিন্তু আরও যে কতক্ষণ জেগে ছিলাম, জানি না। তার পর এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

# ব্যর্থ প্রেমের চিঠি

[ কবি M-C-এর লিখিত শ্যামলীর কাছে একটি বিরহের পত্রের অনুবাদ ]

শ্রীঝরাফুল

প্রিয় শ্যামলী—ব্যর্থ আশা নিয়ে রই * *
আমার উত্তর কই?
গুমরিয়া কাঁদে এ প্রাণ
নাই যে তার অবসান।
অশ্রু ঝরিছে বিরহ-বেদনায়
তুমি হওনি শুধু আপনামায়।
এত লেখে একটাও পত্র নাই!
দিবা রজনী বসে ভাবছি তাই।

কতবার·····প্রশ্ন করেছি আকাশেরে
কেন সে উত্তর দেয়নি আমারে।
কত আশা নিয়ে
রোজ রোজ ভাবি·····
সময় হলে(ই) দ্বারে থাকি
সবারে দিয়েছে রাণার
আনেনি সে চিঠি আমার!
তবু আশা নেই আজ বুঝি এল
এম্নি করে আমার জীবন গেল···* *

# দেনা

প্রবীরকুমার সিংহরায়

পৃথিবীর নির্জন প্রান্তর,
বালুচরে বসে আছি হইয়া নিথর।
তমসা ঘেরি আছে চারি ধার,
যেন সদ্য বৈধব্য ব্যথাতুর।
বাতাস মেলায়েছে সুর
বেদনা বিধুর॥

নেই শিখা, নেই দিশা,
নেই তৃষা, আছে অমানিশা।
স্মৃতি শুধু করিতেছে বিলাপ
হৃদয় মাঝারে করি আনাগোনা।
ব্যক্ত করিতেছে তার পুরাতন
সুখের জাল বোনা॥

পূর্ণিমা বিরাজিত রজনী হাসির
উছল ধারায় হয়েছিল মাতাল,
জোছনার স্নিগ্ধ পরশে গতিহীন
জীবন নদী বুঝি হয়েছিল পাথাল।
আকাশের প্রতিটি তারকা ছিল সাক্ষ্য,
মোদের মিলন দৃশ্য করেছিল নিরীক্ষ্য॥

জসীম উদ্‌দীন

বৈষ্ণবী ঠাকরুণের কথা আজ না লিখিয়া পারিতেছি না। কবেই ত সে মরিয়া গিয়াছে কিন্তু স্মৃতির পটে বার বার তাহার সুন্দর মুখখানি ভাসিয়া ওঠে। তাহার সঙ্গে আমার যে দিনগুলি কাটিয়াছিল—সেই সব কথা মনে হয়। আরও মনে হয়, তাহার কথা না লিখিলে বুঝি জীবনের একটা বড় ঋণ থাকিয়া যাইবে।

আমাদের বাড়ির ধারেই অম্বিকাপুর রেল ষ্টেশন। বিকাল হইলে সেখানে যাইয়া ষ্টেশনের কর্মচারীদের সঙ্গে আড্ডা জমাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটি গাড়ী আসিয়া থামিল। সেই গাড়ীর একটি কামরা হইতে একজন গেরুয়া-পরা বৈরাগী নামিল। বাবাজীর গায়ের রঙ পাকা সবরী-কলার মত। খাইয়া-দাইয়া তাহার বপুটি হইয়াছে নাদুস-নুদুস। সঙ্গে চার পাঁচজন বোষ্টম-বোষ্টমী। ঝোলা-কাঁথার লটবহর কেউ কাঁধে, কেউ মাথায় লইয়া তাহারা একে একে অবতরণ করিল। তারপরে নামিল মূল বৈষ্ণবী। হাতে একটি একতারা। মুখখানা যেন চুন-হলুদে ডুগুডুগু। গায়ের চম্পক বর্ণ তাহার গায়ের গেরুয়া রঙের শাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিতেছে। একহারা লম্বা পাতলা গঠন। গলায় হাতে কোন গহনা নাই। তার মুখখানি সুন্দর, আরও সুন্দর তার বড় বড় কালো চোখ দুইটি। তাহারই পাশে সুন্দর দুইটি কান কালো চুলের মধ্যে যেন দুইটি কাঞ্চনবর্ণ পদ্ম ফুটিয়া আছে। বাহু দুইটি যেন দু'গাছি সোনার লতা। নড়নে চড়নে তার আভরণহীন দেহে যেন শত শত গহনা ঝলমল করিতেছে। বৈরাগিণীর রূপে সমস্ত ষ্টেশনটি আলো হইয়া উঠিল।

বৈরাগী-বোষ্টমীদের প্রতি কোন দিনই ভাল ধারণা ছিল না। সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, "বেটা বৈরাগী শিষ্যদের বাড়িতে আম-দুধ খাইয়া কেমন চেহারাটা করিয়াছে।"

আমাদের সমালোচনা বৈরাগী শুনিল, কিন্তু কিছু বলিল না। ইহাতে আমরা তাহার উপরে আরও কঠোর হইলাম। তাড়াতাড়িতে গাড়ীতে ওঠায় তাহারা টিকিট করিয়া আসে নাই। আমরা ষ্টেশন-মাষ্টারকে উৎসাহ দিয়া তাহাদের ডবল ভাড়া আদায় করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। বৈরাগী ঠাকুর তাহার ঠাকরুণটিকে কি ইঙ্গিত করিল। ঠাকরুণ তাহার একহাতে একতারাটি ধরিয়া আঁচলের গিঁটটি দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া অতি নিপুণ হাতে কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে দিল। এই কাজটি অতি তুচ্ছ। কিন্তু মনে হইল ইহা করিতে বৈষ্ণবী যেন একটি ছোটখাট কবিতা লিখিয়া ফেলিল। বুঝিলাম, গানের প্রতীক একতারাটি যাহার হাতে, রসিক বৈরাগী তাহারই হাতে লক্ষ্মীর ঝুলিটিও তুলিয়া দিয়াছে। খবর লইয়া জানিলাম, তাহারা আমাদের গ্রাম সংলগ্ন শোভারামপুরে নাপিত বাড়িতে সেদিন রাত্রি যাপন করিবে।

রাত্রে বেশ গরম পড়িয়াছে। কিছুতেই ঘুম আসে না। ভাবিলাম, নাপিত বাড়িতে যাইয়া বৈরাগীদের গান শুনিয়া আসি। এক পা এক পা করিয়া নাপিত বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নাপিতদের উঠানে প্রায় জন বিশেক লোক জমা হইয়াছে। কেহ চট কেহ বা চাটাই পাতিয়া বসিয়া আছে।

মাঝখানে সেই মোহন্ত বাবাজী আর তাহার বৈষ্ণবী, একটি পুরু কাঁথার উপর বসা। শিষ্যেরা এপাশে-ওপাশে। নিকটে একটি কুপি ঘুরিয়া ঘুরিয়া জলিতেছে। বৈষ্ণবীর সামনে একটি পানের বাটা। সেখান হইতে পান লইয়া অতি নিপুণ হাতে চুন-খয়ের-সুপারী ভরিয়া সুন্দর করিয়া খিলি বানাইয়া নিজের মুখে দিতেছে। দু'একটি আবার ভক্তদেরও দিতেছে। পান খাইয়া বৈষ্ণবীর রাঙা ঠোঁট দুটি আরও রাঙা দেখাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম হাসি-তামাসার আলাপ-আলোচনাও হইতেছে। তাহার মধ্যে কৃষ্ণকথার নামগন্ধও নাই। দেখিলাম পাড়ার যত বখাটে যুবকের দল, তাহারাই সবচেয়ে বেশী উৎসাহে এখানে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। পরিবেশটি আমার খুবই খারাপ লাগিল।

পান খাওয়া শেষ হইলে বৈরাগী একতারাটি হাতে লইয়া টুং-টাং করিয়া সুর যোজনা করিয়া বৈষ্ণবীর হাতে দিল। বৈষ্ণবীর বাজানোর তালে তালে বৈরাগী দুই-তিনটি গান গাহিল। উপস্থিত শিষ্যেরাও সেই গানের সঙ্গে সুর মিলাইল। গানের বিষয়বস্তু—

"সময় কালে গুরুর পদে প্রেম ভক্তি হইল না।
গুরু নাম স্মরণ করো মন,
শমন জ্বালা দূরে যাবে একবার গুরু বলে—
ডাকরে মন রসনা।"
ইত্যাদি।

বুঝিলাম শিষ্য যাহাতে গুরুর উপর অটল থাকে, বাছিয়া বাছিয়া গুরু ঠাকুর শিষ্যদের সামনে সেই গানই করিতেছে। আমি গুরু-বাদে বিশ্বাস করি না। আর এ-সব গানের সুরেও কোন মাদকতা নাই। আমার বড়ই বিরক্ত লাগিল। তিন চারটি গান গাওয়ার পর আবার পান খাইবার পালা, আবার সেই হাসি-মস্করা। ভাবিলাম এবার বাড়ি চলিয়া যাই। এখানে বসিয়া রাত জাগার কোন মানে হয় না।

এমন সময় পান সাজিতে সাজিতে ঠোঁট দুইটি রাঙা টুকটুকে করিয়া বৈষ্ণবী ধীরে ধীরে অতি সরু কণ্ঠে একটি গানের কলি আওড়াইতে লাগিল। সে সুর যেন বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া আছে, কিন্তু এত মধুর যে সভাস্থ সমস্ত লোক তাহার মোহে নীরব হইয়া গেল। হঠাৎ বৈরাগী সেই সুরটি কাড়িয়া লইয়া তাহার হেঁড়ে গলায় ভরিয়া লইল। অতি কৌশলে বৈরাগীর কণ্ঠ হইতে কাড়িয়া লইয়া বৈষ্ণবী তাহাতে আরও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য মিশাইয়া আপনার প্রাণরস ঢালিয়া উদারায় মুদারায় ছাড়িয়া দিল। এ যেন গানের অপ্সরীর সঙ্গে ব্রহ্মদৈত্যের সংগ্রাম। কোথায় পড়িয়া রহিল পানের বাটা, কোথায় পড়িয়া রহিল সুপারী-লং-এলাচির খিচা। একবার গান বৈরাগী ধরে, আবার বৈষ্ণবী ধরে। বৈষ্ণবীর সরু গলা হইতে কাড়িয়া তাহার গাওয়া পদটিতে আরও রঙ লাগাইয়া আবার বৈরাগী গায়। বৈষ্ণবী আবার সেই পদের উপর আরও রঙ লাগায়। শিষ্যেরা পিছনে থাকিয়া দোয়ারকি করে। ধীরে ধীরে গানের পদ বিস্তৃত হইতে থাকে।

কৃষ্ণ সেই কবে মথুরায় চলিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনে আজ আর কেহ হরিনাম করে না। অভাগিনী রাধা কৃষ্ণের পথের পানে চাহিয়া থাকে। আজ বহুদিন পরে কে আসিয়া ব্রজের পথে হরিনাম করিল?

তোরা কে যে হরির নাম শুনালি,
কাছে আয় রে কে তুই আলি।
কে তুই আলি, সময় কালে
আমার মৃত দেহে জীবন দিলি।
সোনার গোকুল করে আঁধার
যেদিন হ'তে যমুনার পার,
চলে গেছে গোবিন্দ আমার,
সেদিন হ'তে শুনিনি আর
কৃষ্ণ নামের গুণাবলি।

এই গানের শেষ পদটি মনে নাই। সেখানে রাধা বলিতেছে যদি আমার কৃষ্ণকে তোরা আনিয়া থাকিস শীঘ্র আনিয়া তাহাকে দেখা তিলেক বিলম্ব হইলে অভাগিনী রাধা আর প্রাণে বাঁচিবে না বৈরাগী যখন এই কথাগুলি গাহিতেছিল তখন তাহার দেহে পুলকক প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতেছিল। উপস্থিত জন গানের সুরে কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল।

প্রায় ঘণ্টা দুই এই গান গাহিয়া বৈরাগী আর একটি গা ধরিল—

মনের মতন মানুষ নাই যে দেশে
সে দেশে কেমনে থাকি;
মনের কথা মনে রেখে আমি কতকাল আর
নিজেরে বুঝায়ে রাখি।
কৃষ্ণ প্রেমের আশীষে,
যারে ছোঁয় সে হারায় দিশে;
জ্বলন্ত অনল কি সে
আমি অঞ্চলে ছাপায়ে রাখি।
দেশের বুকে আগুন দিয়ে,
মনে কয় সই যাই পালিয়ে;
যেথায় যায় দুই আঁখি;
পোড়া বিধি হয়ে বাদী
আমায় করেছে পিঞ্জিরার পাখী।

এই গান গাহিতে গাহিতে কখনও বৈষ্ণবী কাঁদিয়া বৈরাগীর পায়ে পড়িতেছে, আবার বৈরাগী কাঁদিয়া বৈষ্ণবীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িতেছে। সে কি ভাব! সে কি উন্মাদনা! মাঝে মাঝে তাহারা গান গাহিতে পারিতেছিল না, শুধু কাঁদিতেছিল। শিষ্যেরা তখন গানের প্রথম কলিটি আওড়াইতেছিল।

জ্বলন্ত অনল কি সে
আমি অঞ্চলে ছাপায়ে রাখি।

গানের এইখানটিতে আসিয়া বৈরাগী আর গাহিতে পারিতেছিল না। অশ্রুধারায় তাহার সমস্ত বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। "পোড়া বিধি হয়ে বাদী আমায় করেছে পিঞ্জিরার পাখী", এই পদটি গাহিতে বৈষ্ণবী কাঁদিয়া বৈরাগীর পায়ে লুটাইতেছিল। মনে হইতেছিল, এই বৈষ্ণবী যেন বাঙলা দেশের সমস্ত নারী জাতির প্রতীক হইয়া তাহাদের অবরোধবাসের সমস্ত দুঃখ-বেদনা নিজের অঙ্গে ধারণ করিয়াছে। একই পদ বার বার গাওয়া হইতেছিল। গাহিতে গাহিতে ভাববন্যা আরও উদ্বেল হইতেছিল। আমার কেবলই মনে হইতেছিল, এ গান যেন কখনও শেষ হয় না। কিন্তু গান শেষ

হইল। এই বিরহিণী বৈষ্ণবীর অনুরাগে ভোরের আকাশ গেরুয়া রঙে রঞ্জিত হইল। মনে হইল, গানের এই ভাবলহরী কণ্ঠে লইয়া পাখীরা এ-ডালে ও-ডালে ঘুরিয়া সুর বর্ষণ করিতে লাগিল। ঢুলিতে ঢুলিতে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সে প্রায় তিরিশ বছরের কথা। আজও আমার মনে সেই গানের রেশ লাগিয়া আছে।

এই গানটি সুগায়ক ভবানীদাসের কণ্ঠে মেগাফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করাইয়াছিলাম। শুনিয়াছি, ঢাকার টঙ্গী থানার নিকটে কোন গ্রামের দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী নামক একজন কবি এই গানটি রচনা করেন। তাঁহার লেখা এরূপ আরও অনেক গান আছে। একখানা গানের বইও তিনি ছাপাইতেছিলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমরা এই গানের বই সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

নাপিত বাড়ির এই গানের জলসার পর বৈরাগী ঠাকুর যখনই আমাদের অঞ্চলে আসিয়াছে, আমাকে খবর পাঠাইয়াছে। তাহার গান শুনিয়া বড় তৃপ্ত হইয়াছি।

সেবার পূজার ছুটি। শুনিলাম, গোঁসাই আমাদের বাড়ি হইতে দুই মাইল দূরে জেলে বাড়িতে আসিয়াছে। রাত আটটার সময় সেখানে যাইয়া গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখা করিলাম। সেদিন গোঁসাই বিশ্রাম লইতেছে। বৈষ্ণবীর অসুখ। মূল শিষ্য সদানন্দের প্রায় কলেরার মত হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া গোঁসাই বলিল, "কেষ্ট ঠাকুর আসিয়াছে? আজ যে বৃন্দাবন অন্ধকার। সকলেরই শরীর ভাল না। আজ গান হইবে না।" আমি বলিলাম, "যদি সত্য সত্যই আপনার কেষ্ট ঠাকুর আসিয়া থাকি তবে বৃন্দাবন অন্ধকার হইবে কেন? এতদূরে আসিয়া আপনার গান না শুনিয়া কেষ্ট ঠাকুর ফিরিয়া যাইবে না।" আমার কথা শুনিয়া বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল। গোঁসাই তখন বলিল, "সদানন্দ, আইস ত। একবার একতারাটা আমাকে দাও।" একতারা আনিয়া দিলে ঠাকুর তাহাতে সুর সংযোজনা করিয়া বৈষ্ণবীর হাতে দিল।

গানের পর গান চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টা গান চলিল। ইহার মধ্যে সদানন্দকে একবারও উঠিতে দেখিলাম না। বৈষ্ণবীকেও অসুস্থ বলিয়া কোন অনুযোগ করিতে শুনিলাম না। গানের সুরের মাদকতা তাহাদের সকল রোগ দূরে করিল। সেদিনকার গানের একমাত্র শ্রোতা আমি। গোঁসাই বলিল, "তোমাকে গান শুনাইয়া আমি আমার কৃষ্ণকে গান শুনাই।"

আমি সে কথা বুঝিতে পারি না। আমার কাছে মনে হয় এই গানের ভিতর দিয়া যুগ-যুগান্তরের বাঙলার গ্রাম্য জীবনের ভাবলহরীর ধারা আমি অনুভব করিতেছি। সেই ভাবধারার উপর দাঁড়াইয়া দুইটি মূর্ত্তি আমার মনে খেলা করেন। তাঁহারা যুগ-যুগান্তরের বাঙালীর স্বপ্নলোকের রাধা আর কৃষ্ণ। তাঁহারা আমার কাছে ভগবান নন। তাঁহারা অনন্তকালের বাঙালীর ভাবধারার প্রতীক। শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙালী কবিরা এই দুই চরিত্রকে যার যার মনের মত করিয়া রূপ দিয়াছে। তাই বাঙালীর এই ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীকে আমি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেই না। যেখানে কেহ কাহাকেও সত্যকারভাবে ভালবাসিয়াছে সেখানেই তাহারা আসিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই বসনে বসনে লাগিবে বলিয়া একছি রজকে দেয়, আমি যদি নাহি এই ঘাটে সে যে অপর ঘাটেতে নায়,

আমার অঙ্গের বাতাস লাগিয়া মোর পিছে পিছে ধায়,—এই দৃশ্য আজও অভিনীত হইতেছে।

তাই বৈরাগীর গান শুনিতে শুনিতে আমার দুই নয়ন অশ্রু-ধারায় ভাসিয়া যায়। বৈরাগী ঠাকুর ভাবে আমি একজন কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব। বার বার আপত্তি করিলেও ইহা আমার বিনয় বলিয়া আমার প্রতি সে আরও আকৃষ্ট হয়।

আগের গানগুলি গাওয়ার পর এবার গোঁসাই কয়েকটি নূতন গান শুনাইল। কৃষ্ণ চলিয়াছে মথুরায় অক্রূরের রথে। রথের চাকা ধরিয়া সখীরা কাঁদিতেছে। রাধা মূর্চ্ছিতা। ব্রজের যত তরুলতা সবাই আজ কৃষ্ণ-বিরহে কাতর। নিঠুর বন্ধু ভালবাসার এই লতা-বন্ধন ছিঁড়িয়া মথুরায় চলিয়া গেল। ব্রজের আকাশে-বাতাসে হাহাকার উঠিল। এই গান গাহিতে গাহিতে গোঁসাই আর বৈষ্ণবী কাঁদিয়া আকুল হইল। তখন শুকতারা আকাশে উঠিয়াছে। গোঁসাই বলিল, "তুমি এখন যাইয়া বিশ্রাম কর।" আবার অন্য সময় গান শুনাইব। আমার গান শোনার নেশা তখনও মেটে নাই। হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "গোঁসাই! আর একটি গান শোনাও।"

গোঁসাই বলিল, "না ঠাকুর, আজ আর গান হইবে না।"

বৈষ্ণবী তখন বলিল, "কেষ্ট ঠাকুর যখন বলিতেছে তখন তাহার আদেশ অমান্য করা যায় না। এই বলিয়া সে একতারায় ঝঙ্কার দিল। এবারের গান আরও মধুর—

তুমি যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না হে বঁধুয়া
বলো না যাই যাই যাই।
তোমার যাই কথা শুনিয়া মরমে মরিয়া
হৃদয়ে দহিয়া যাইছে প্রাণনাথ
বলোনা যাই যাই যাই।
আমার শাশুড়ী ননদিয়া ফেরে সদা গাহিয়া,
বলে কলঙ্কিনী রাই—হে বঁধুয়া।
তুয়া প্রেম কালিয়া শ্রীঅঙ্গে মাখিয়া
জনম গোঙাইতে চাই-হে বঁধুয়া।
বলো না যাই যাই-যাই॥

সুরের পর সুর বিস্তৃত হইতে লাগিল। আমার সমস্ত দেহ-মন কদলীপত্রের মত সেই গানের সুরে সুরে কাঁপিতে লাগিল। গান থামিলে সেই গানের আবেশে ঢুলিতে ঢুলিতে বাড়ি রওনা হইলাম। শরৎকালের চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। রেলসড়কের পথ দিয়া আমি চলিতেছি। দু'একটি রাত-জাগা পাখী পার্শ্ববর্ত্তী গাঁয়ের গাছগুলি হইতে ডাকিয়া সেই নিস্তব্ধ রাতের বুকে যেন করুণ সুরের রামধনু আঁকিয়া দিতেছে। রেলসড়কের দুই ধারের খাদগুলিতে রাশি রাশি শাপলা ফুল ফুটিয়া শীতল বাতাসে-দোলা জললহরীর সঙ্গে খেলা করিতেছে। এত রাতে একা পথ চলিতেছি। ভয়ের একটু রেশও আমার মনে নাই। আমার কানে বাজিতেছে সেই সুর, "তুমি যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না হে বঁধুয়া, বলো না যাই যাই যাই।"

বহুকালের তপস্যারতা রাধার কুঞ্জে আজ কৃষ্ণ আসিয়াছিল। রজনী প্রভাতের কালে সে বিদায় হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ভালবাসার ধনকে বিদায় দিতে কি মন চায়? আজ জোছনা রঞ্জিত আকাশ, পথের দু' পাশের শাপলা ফুল আর পাখীর ডাক সকলে মিলিয়া আমার মনে এক বৃন্দাবন গড়িয়া উঠিল। বৈরাগী ঠাকুরের গানের আসর যেন কে এই অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে বিস্তার করিয়া দিয়াছে। জীবনে বিশ্ব প্রকৃতিকে এমন সুন্দর করিয়া কোনদিন দেখিতে পারি নাই। মনে হইল, বৈরাগী ঠাকুরের গান যেন আমার সমস্ত অন্তরকে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। স্বচ্ছ কাচের মত আজ যেদিকে যাহা দেখি, যাহা শুনি, সবই আমার কাছে নূতন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় এমন যেন দেখি নাই কোন কালে, এমন যেন শুনি নাই কোন দেশে।

ইহার পরে আরও বহু বৈঠকে বৈরাগী ঠাকুরের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। ঢাকা জেলার কোন গাঁয়ে তাহার বাড়ি। বৈষ্ণবী ঠাকরুণকে তাহার পূর্ব্বজীবনের কাহিনী বলিতে কতবার অনুরোধ করিয়াছি। সে হাসিয়া বলিয়াছে, "ঠাকুর, সে সব কাহিনী আমার বলিতে নাই।" কোথা হইতে কি করিয়া সে এই ঠাকুরের সঙ্গী হইল, আজ বাঁচিয়া থাকিলে যেমন করিয়া হউক তাহা জানিয়া লইতাম। শুনিয়াছি সে কোন ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা। সাত-আট বৎসর আগে এই গোঁসাইয়ের সঙ্গে কন্ঠী বদল করিয়াছিল।

সেবার শুনিতে পাইলাম বৈরাগী ঠাকুর খানখানাপুরে জনৈক শিষ্য বাড়িতে আসিয়াছে। আমার বাড়ি হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে খানখানাপুরে গেলাম। সেখানে যাইয়া শুনিলাম, বৈরাগী ঠাকুর বসন্তপুরে গিয়াছে। সাইকেলে করিয়া আবার পাঁচ মাইল দূরে বসন্তপুরে গেলাম। গোঁসাই স্নান করিতেছিল। আমাকে বলিল, "দুপুরের আহার শেষ করিয়া আমি মহমদিয়া কাড়াল বাড়িতে যাইব। তুমি যদি রাতে সেখানে যাও গান শুনিতে পাইবে।" এবার গোঁসাইয়ের সঙ্গে অপর একজন বৈষ্ণবী আসিয়াছে। আগের বৈষ্ণবীর মত অত সুন্দর না হইলেও চেহারা বেশ ভাল।

সেখান হইতে বিদায় লইয়া সাইকেলে করিয়া চাঁদপুরে আসিয়া আমার একজন গরীব আত্মীয়ের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম। তখন বেলা আড়াইটা বাজিয়াছে।

বেলা পাঁচটার সময় আমার সেই আত্মীয়কে সঙ্গে করিয়া কাড়াল বাড়িতে আসিলাম। এখানকার কাড়ালেরা শুধু মাছের ব্যবসাই করিত না। আশপাশের কৃষকদিগকে সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিত।

বৈরাগী ঠাকুর কাড়ালদের ঘরের বারান্দায় একখানা চৌকির উপর আধশোয়া অবস্থায় বসিয়াছিল। দু'একজন পাড়া-প্রতিবেশী কেহ চেয়ারে, কেহ জলচৌকিতে বসিয়া বৈরাগী ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। আমার গরীব আত্মীয়ের সঙ্গে আমাকে দেখিয়া বাড়ির কর্ত্তা উঠানের মাঝখানে একখানা ময়লা ছেঁড়া চট বিছাইয়া দিয়া আমাদিগকে বসিতে দিল। তখন শরীরের রক্ত গরম। সবে এম-এ পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের গবেষণার সহকারী হইয়াছি। আমার মনে হইল, এই তাচ্ছিল্য ত আমার প্রতি নয়, আমার সম্প্রদায়ের সকলের প্রতি। সেকালে কোন বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু বাড়িতে গেলে গরীব মুসলমানদিগকে এইভাবেই অভ্যর্থনা করা হইত। আমি কোন রকম ভূমিকা না করিয়াই বলিলাম, "তোমরা সকলে উচ্চ আসনে বসিয়া আছ। আর আমাকে যে এই ময়লা চট বিছাইয়া দিলে, ইহা কোন্

কারণে? আমার চাইতে কি তোমাদের অবস্থা বেশী ভাল, না আমার চাইতে তোমরা বেশী লেখাপড়া করিয়াছ, না তোমরা আমার চাইতে উচ্চবংশের লোক? এই কথার উত্তর না পাইলে আমি এখান হইতে যাইব না।"

আমার কথা শুনিয়া বৈরাগী ঠাকুর লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। বাড়ির কর্ত্তাকে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিল। তখন আরম্ভ হইল অভ্যর্থনার পালা। বারান্দার উপরে সবচাইতে ভাল কাঁথাখানা জলচৌকীর উপর বিছাইয়া দিয়া আমাদিগকে বসিবার জন্য কি অনুরোধ! বৈরাগী নিজেও সেই অনুরোধে যোগ দিল। তারপর আমাকে আর আমার সেই গরীব আত্মীয়কে দুই তিনজনে প্রায় শূন্য করিয়া ধরিয়া সেই আসনের উপর লইয়া বসাইল। আর বার বার মাফ চাহিতে লাগিল।

এ-কথা সে-কথার পরে বৈরাগী বলিল, "কেষ্ট ঠাকুর! আজ একতারার তার কাটিয়া গিয়াছে। এখানে আনন্দ হইবে না। আর একদিন তোমাকে গান শুনাইব। আমি আগামী কাল টেপাখোলা জেলেবাড়ি যাইব। তোমাকে সেখানে ডাক দিব। সেখানে যাইয়া তোমাকে লইয়া ভাল মত আনন্দ করিব।"

টেপাখোলা আসিয়া বৈরাগী ঠাকুর আমাকে কোন খবর পাঠাইল না। চার-পাঁচ দিন পরে খবর পাইলাম, সামান্য জ্বরে বৈরাগী ঠাকুর মারা গিয়াছে। গরীব জেলেরা তাহার মৃতদেহ পদ্মানদীতে ভাসাইয়া দিয়া বৈষ্ণবীকে টেলিগ্রাম করিয়াছে।

তখন মনের মধ্যে একটা অনুতাপ আসিল। জীবনে ত কত জায়গায়ই কতভাবে অনাদর পাইলাম, অবহেলা পাইলাম। সেই সব জায়গায় ত প্রতিবাদও করিতে সাহস পাই নাই। কি এমন হইত সেই ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া বৈরাগীর মুখে তাহার শেষ গান শুনিলে? কত বার কত গানের জলসায় এই বৈরাগীকে দেখিয়াছি। তাঁহার কণ্ঠের সুমধুর গান বার বার মনে আসিয়া আমার চোখ দুইটিকে অশ্রুসজল করিতেছিল।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে এই বৈরাগীর বাড়ি। যৌবনকালে বৈরাগী আর বৈষ্ণবী দৈনিক আট নয় তোলা গাঁজা টানিত। শিষ্য সদানন্দও গুরুর প্রসাদ পাইত।

একদিন বৈরাগী বৈষ্ণবী আর সদানন্দকে বলিল, "দেখ, আজ বার বছর ধরিয়া গাঁজা খাইতেছি। বার বার গাঁজা টানিয়া ইহা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। আমরা এত যে গাঁজা টানি, আমাদের কোন নেশা হয় না! আমরা গাঁজা খাইয়া যখন আনন্দে গান করি, লোকে বলে গাঁজার নেশায়ই আমাদের এরূপ ভাবে বিভোর করে।"

বৈষ্ণবী বলিল, "গোঁসাই, এ কথা সত্য।"

গোঁসাই তখন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এটা ছাড়িয়া দেওয়া যায় না?"

বৈষ্ণবী আর সদানন্দ দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, "গোঁসাই, আপনার যেমন ইচ্ছা।"

"তবে আজ হইতে ইহা ছাড়িয়া দিলাম।" ইহা বলিয়া তখনই গোঁসাই পিতলের তৈরী গাঁজার কলকেটি ভাঙিয়া ফেলিল। ইহার পর সোনারুকে দিয়া সেই পিতলের একটি সাপ বানাইয়া বৈরাগী তাহার একতারার আগায় আটকাইয়া লইয়াছিল। এই সাপ তাহার পূর্ব্ব জীবনের গাঁজার নেশার প্রতীক হইয়া এখনও তাহার একতারার উপরে বিরাজ করিতেছে।

ইহার পর কি গোঁসাই, কি বৈষ্ণবী, কি সদানন্দ একদিনও তাহারা গাঁজা স্পর্শ করে নাই। বৈষ্ণবীর কাছে শুনিয়াছি—"গোঁসাই যখন আদেশ দিল তারপর কোন সময়ই গাঁজার নেশা আর আমাদের পাইল না।"

সেই হইতে বৈরাগী, বৈষ্ণবী আর সদানন্দ তামাকটি পর্য্যন্ত খায় নাই। ইহা কম মনোবলের কথা নয়। আমরা কত চেষ্টা করিয়া সিগারেটটি, পানটি পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি না আর বারো বছরের গাঁজার নেশা কোন্ শক্তিতে ইহারা একদিনে অতিক্রম করিয়াছিল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

প্রথমে হয়তো বার বার তাহাদের মন সেই নেশার জন্য ব্যাকুল হইত। কিন্তু মনের দৃঢ়তা লইয়া তাহারা সেই লোভকে অতিক্রম করিয়াছিল।

এই বৈরাগী ঠাকুরের লোভ জয়ের আরো অনেক কাহিনী আছে। তাহার শিষ্য সদানন্দ আমাদের দেশের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। গুরুর প্রতি তাহার এত ভক্তি যে একবার সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি গুরুর নামে লিখিয়া দিতে চাহিল। বৈরাগী বলিল, "সদানন্দ! বিষয়-সম্পত্তি দিয়া আমি কি করিব? আমার সামান্য প্রয়োজন। যখন তোমার বাড়িতে আসিব, আমার ভিক্ষার ঝুলিতে যাহা পার দিও। তাহাতেই আমি সুখী হইব।"

এই বৈরাগী ঠাকুর শুধুই গায়ক ছিল না। যে গান সে গাহিত তাহাই সে নিজের জীবনে আচরণ করিত। তাই বৈরাগীর হঠাৎ এরূপ মৃত্যুর খবর শুনিয়া মনে বড়ই আঘাত পাইলাম।

ইহার দশ বারো দিন পরে জেলেপাড়ার একটি লোকের মুখে শুনিলাম, বৈরাগীর মৃত্যুসংবাদের তার পাইয়া উন্মাদিনীর মত বৈষ্ণবী ষ্টীমার-নৌকাযোগে জেলেপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর অনাহারে অনিদ্রায় নৌকা করিয়া পদ্মার চরে চরে বৈরাগীর মৃতদেহ খুঁজিতে লাগিল। বৈষ্ণবীর কান্নায় সেদিন পদ্মানদীতে জেলেরা মাছ ধরা ভুলিয়া গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে নলখাগড়ার বনে তাহারা বৈরাগীর মৃতদেহ পাইল। সেই মৃতদেহে ফুল-চন্দন মাখাইয়া তাহারা পাঁচুড়িয়া ষ্টেশনের নিকট কালিবাড়ীতে আনিয়া তাহাকে সমাধিস্থ করিল। তাহার উপর একখানা ঘর উঠাইয়া সেইখানে বৈষ্ণবীর কান্নার সাধনা আরম্ভ হইল। সেই সমাধির সামনে বসিয়া বৈষ্ণবী সারা রাত তাহার ঠাকুরকে গান শুনায়। একজন শিষ্য দিবাভাগে কিছু রান্না করিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বৈষ্ণবীকে খাওয়ায়। কোনদিন সে খায়, কোনদিন সে খায় না।

খবর পাইয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা পাঁচুড়িয়ার সেই কালিবাড়িতে গেলাম। দেখিলাম বৈষ্ণবীর অঙ্গের সেই ভুবনমোহিনী রূপ শোকে-দুঃখে কালি হইয়া গিয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুইটি কোটরাগত। আমাকে দেখিয়া ম্লান হাসিয়া বৈষ্ণবী বলিল, "ঠাকুর, বড় দেরীতে আসিলে। বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ আজ মথুরায় চলিয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া বৈষ্ণবী আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

ইহার পরে বৈষ্ণবী আমাকে বলিল, "চার পাঁচ দিন যে গোঁসাই জলের মধ্যে ছিলেন, তাহার দেহ এতটুকুও বিকৃত হয় নাই। মাছে-কাছিমে শ্রীঅঙ্গের এতটুকুও ক্ষত করে নাই। গোঁসাই যেন

ঘুমাইয়া আছে। আমি গোঁসাইকে কোলে করিয়া নৌকায় উঠাইলাম। যেন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসিতেছে।" ইহা ভক্তের কথা? এত দিন কি সেই মৃতদেহ অক্ষত ছিল?

আমি বলিলাম, "গোঁসাই আমাকে কথা দিয়াছিল একদিন ভাল করিয়া গান শোনাইবে।"

মাটিতে আঁক কাটিয়া বৈষ্ণবী বলিলেন, "গোঁসাইয়ের কথা কখনো অনড় হইবার নয়। আজ পূর্ণিমা নয়? তুমি ভাল দিনে আসিয়াছ। আজ গোঁসাই এখানে আসিবেন।"

শিষ্য সদানন্দের বাড়ি নিকটে। তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বৈষ্ণবী আজ নিজেই রান্নার তদ্বির-তালাসী করিতে লাগিল। আমাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া নিজে সামান্য কিছু মুখে দিয়া একতারাটি হাতে লইয়া বৈষ্ণবী সমাধির সামনে যাইয়া বসিল। দুই তিনজন শিষ্য আর সদানন্দ বৈষ্ণবীর পিছনে।

আকাশে আজ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছে। তাহার জ্যোছনাধারায় দূরের শস্যক্ষেতগুলিতে কে যেন হলুদ মাখাইয়া দিয়াছে। উপরের আম্রশাখার ডালগুলির ফাঁক দিয়া থোপা থোপা জোছনা বাহিরের লেপা-পোছা আঙিনার উপর পড়িয়াছে। কাহার আগমনে যেন প্রকৃতি মাটির গায়ে এই সুন্দর আলপনার নক্সা আঁকিয়া দিয়াছে। দুই-একটা রাত-জাগা পাখী এডালে-ওডালে ঘুরিয়া কাহার বিরহের প্রতীক হইয়া যেন রহিয়া রহিয়া ডাকিতেছে। বহুদূরের কৃষাণ পল্লী হইতে কোন্ গ্রাম্যচাষী যেন তাহার বাঁশীতে বিলম্বিত লয়ের রাখালী সুর বাজাইয়া তাহার কোন্ ব্যথাকে আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া দিতেছিল।

একতারাটি হাতে লইয়া বৈষ্ণবী গান গাহিতে আরম্ভ করিল। আজ তাহার ঠাকুর আসিবে। এ গান আর কাহারও জন্য নয়। তাহার ঠাকুরের জন্য। এতদিন তাহার মুখে যে সব গান শুনিয়াছি তাহার একটি গানও বৈষ্ণবী আজ গাহিল না। কত পুরানো কালের গান! হয়ত তিন শ' বছর আগের। এই গান যে বৈষ্ণবী এত দিন মনের কোন্ গহনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাই ভাবি। যুগে যুগে এই গান গাহিয়া ইহার সুরে সুরে বিরহীরা যে কান্না রাখিয়া গিয়াছে সেই কান্নার সঙ্গে নিজের কান্না মিশাইয়া বৈষ্ণবী আজ গান ধরিল। এ গান, না কান্না? মাঝে মাঝে গান আর গাহিতে পারে না। বৈষ্ণবী মাটিতে মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদে। শিষ্যেরা বার বার করিয়া তাহার ছাড়িয়া দেওয়া গানের কলি আওড়ায়। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বৈষ্ণবী আবার গান আরম্ভ করে।

ও বদল বাঁশী
আরে বন্ধু দিয়ো রে যাও মোরে
হয় আমার বাঁশী দাও
নইলে এই দাসীরে সঙ্গে লয়ে যাও হে প্রাণনাথ।

তোমার কথা মনে হ'লে
বাঁশী তুলে লব কোলে
আমি বাঁশীর সুরে কব মনের কথা রে প্রাণনাথ।

বন্ধু যাবা যমুনার পার
গেলে না আসিবা আর রে
আমি তোমার জন্যে কাঁদব ঝুরে ঝুরে রে প্রাণনাথ।

এই গানের পর বৈষ্ণবী গান ধরিল—

ও তোমার মোহনবাঁশী
ধুলায় পড়ে রয়।
যে পথে মোর বন্ধু গেছে
ও কত পথে পদ চিহ্ন আছে
সখি রে!—
যে ঘাটে মোর বন্ধু নাইছে
কত পুষ্প লতা গাঙ্গে ভাসে,
সখি রে।

এমনি গানের পরে গান চলিতে লাগিল। সখি, আগে ত আমি জানি নাই বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করিয়া আমার এমন হইবে। আমার ঘরের পিরীতির আটন পিরীতির ছাটন পিরীতির দু'খানা চাল। সেই পিরীতির ঘরে কপাট লাগাইয়া আমি আর কতকাল অপেক্ষা করিব? আগে যদি জানিতাম ভালবাসার এমনি জ্বালা তবে আমি কদমতলা ঘর বাঁধিয়া একেলা জনম কাটাইতাম। সখি, তোরা ত বলিয়াছিলি পিরীত বড়ই ভাল, এখন তোরা ত সকলেই ভাল রহিলি, আমারই কাঁদিয়া কাঁদিয়া জনম গেল।

বন্ধু যখন আমার কাছে ছিল তখন বন্ধুকে হারাইব বলিয়া আমি চক্ষের পলক ফেলিতাম না। আজ আমাকে ফেলিয়া সেই বন্ধু কোথায় গিয়াছে? সখি রে, আঙুল কাটিয়া আমি কলম বানাইলাম চক্ষের জল আমার কালি। আমার পাঁজর কাটিয়া লেখন লিখিয়া কত আশা করিয়া বন্ধুকে আমি লেখন পাঠাইলাম। কিন্তু বন্ধু সেই লেখনের উত্তর দিল না। বন্ধুহীন এ জীবনে তবে আমার কি প্রয়োজন? সখি রে, তোরা আমাকে জহরের কৌটা আনিয়া দে। তাই খাইয়া আমি জীবন বিসর্জ্জন দিই।

ধীরে ধীরে রাত শেষ হইয়া আসিতেছিল। পূব আকাশের কোণ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবী তখন গান ধরিল,—

আমি বন্ধুর জন্য এত আশা করিয়া বাসর শয্যা সাজাইলাম, আমার সমস্ত আশাই নিরাশা হইল। বন্ধুর গলায় দিব বলিয়া যে মালা গাঁথিয়াছিলাম, নিশি শেষে সেই মালা বাসি হইয়া গেল। সখি, তোরা আয়, সেই মালা এখন জলে দিয়ে আসি। বন্ধু দেখিয়া খুশী হইবে বলিয়া আমি দুই চোখে কাজল পরিয়াছিলাম। আমার নয়নের জলে সেই কাজল ধুইয়া গেল। কত আশা করিয়া সারা অঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার পরিয়াছিলাম, এখন সেই মণির অলঙ্কার ফণীর মত আমাকে দংশন করিতেছে।

প্রভাত হইলে গান বন্ধ করিয়া বৈষ্ণবী সেই সমাধির সামনে পড়িয়া রহিল। আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। জীবনে এমন গান আর শুনিব না।

ইহার পর আরও কয়েকবার এই আশ্রমে আসিয়া বৈষ্ণবীর গান শুনিয়াছি। কয়েকবার তাহাকে আমাদের বাড়িতেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি। সেবার ঢাকা হইতে পাঁচুড়িয়া যাইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে দেখা করিলাম। বৈষ্ণবী বলিল, "আজ আমাকে পাশের গ্রামের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে গান শুনাইতে হইবে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবে?"

আমি রাজি হইলাম। মাঠের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথ। শস্যক্ষেতের আলি ঘুরিয়া যাইতে হয়। ঝুপুঝে মুষলধারে বৃষ্টি

হইয়াছে। সদানন্দ বৈরাগীর হাতে হারিকেন লণ্ঠন। তাহারই ক্ষীণ আলোকে দু'পাশের অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া দেখায়। মাঠ পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। এ-বাড়ির বামদিক দিয়া ও-বাড়ির ডান ধারের আত্রবন দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। দুই পাশে ঘন জঙ্গল। ব্যাঙ আর ঝিঁ ঝিঁ পোকারা সমস্ত পথ মুখর করিয়া তুলিয়াছে। রাশি রাশি জোনাকী বনের মধ্যে কুণ্ডলী করিয়া ঘুরিতেছে। এরূপ গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিতে আমার খুব ভাল লাগে। গাছের একটি পাতা হইতে আর একটি পাতায় টুপ্ টুপ্ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে নির্দিষ্ট বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ির কর্ত্তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি আসিয়া বৈঠকখানায় আমাদিগকে বসিতে দিলেন। বৃদ্ধের ছেলেরা বা বাড়ির বৌ-ঝিরা কেহই এই আগত অতিথিদের প্রতি কোনই ঔৎসুক্য দেখাইল না।

বৈষ্ণবী গান ধরিল। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে গান জমিল না। প্রায় ঘণ্টা কয়েক গান গাহিয়া বৈষ্ণবী নীরব হইল। বাড়ির কর্ত্তাও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ফিরিবার পথে আমি বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যারা তোমার গানকে তেমন শ্রদ্ধা করে না তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার সার্থকতা কি?"

সদানন্দই উত্তর দিল, "বাড়ির কর্ত্তা বৃদ্ধ হইয়াছেন, কবে মরিয়া যান বলা যায় না। আমার কাছে গান শুনিতে চাহিলেন, তাই আসিলাম। যেখানে কৃষ্ণনাম হয় না সেখানেই ত আমাদের আগে যাইতে হইবে।"

আশ্রমে আসিয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে আরও অনেক আলাপ হইল। তাহার গোঁসাইর সংসার পক্ষের স্ত্রী এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহার দু' একটি সন্তান-সন্ততিও আছে। গোঁসাই চলিয়া যাওয়ার পর তাহাদের বড়ই অর্থকষ্ট। তাই বৈষ্ণবী শিষ্য বাড়ি ঘুরিয়া যাহা পায় তাহার প্রায় সবটাই গোঁসাইর সংসার পক্ষের স্ত্রীকে পাঠাইয়া দেয়। এমন অভাবনীয় আত্মত্যাগ খুব কমই দেখা যায়।

আমি বিদেশে থাকি। দেশে আসিলে ইহাদের সন্ধান লই। সেবার দেশে আসিয়া শুনিলাম, বৈষ্ণবী দেহত্যাগ করিয়াছে। কিছুদিন হইতেই তাহার ম্যালেরিয়া হইয়াছিল। অসুখ-বিসুখ হইলে ইহারা ডাক্তারের চিকিৎসা করে না। আর করিবেই বা কি দিয়া? সে অর্থ তাহারা কোথায় পাইবে? শিষ্য সদানন্দ বৈষ্ণবীকে গোঁসাই ঠাকুরের সমাধির পার্শ্বেই কবর দিয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে সদানন্দও দেহত্যাগ করিল। গোঁসাই ঠাকুর, বৈষ্ণবী আর সদানন্দকে লইয়া যে ভাবুক গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল, এইভাবেই তাহাদের জীবননাট্যের যবনিকাপাত হইল। আজ বস্তুতান্ত্রিক দেশে ইহাদের আর কোন উত্তরাধিকারী রহিল না। ইহাদের স্বল্পপরিসর জীবনে যে ক্ষুদ্র ভালবাসার জগৎ তৈরী হইয়াছিল, যে কেহ ইহার সংস্পর্শে আসিত, সেই ভালবাসার ছাপ তাহার অন্তরে লাগিয়া যাইত।

# আশীর্ব্বাদ

## সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভালবাস সংকে
স্বগত মহৎকে,
সাহিত্য সঙ্গীতি
সাধু সম্ভবকে,
অকপট হাসি খেলা
উৎসব মহামেলা,
সুন্দর কর্ম্মঠ
কায়-সম্পৎকে।
ভালবাস সংকে।

ভালবাস কর্ম্মে
জীবন্ত ধর্ম্মে
সংযত উন্নত
অকুণ্ঠ মর্ম্মে।
অবসর নন্দিতে
ভালবাস সঙ্গীতে
কিম্বা সে নির্জ্জন
নদী-সৈকতকে।
ভালবাস সংকে।

সদা রাখ লক্ষ্যে
স্মরণ সমক্ষে
যার লাগি' মহাপ্রাণ
স্পন্দিত বক্ষে:
জীবনের সেই আশা
আনন্দ ভালবাসা!
সুখী হও সুখী কর
সকল জগৎকে।
ভালবাস সংকে।

# গীতা কাপুরের আত্মহত্যা

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

মিনিট দশেকের কাছাকাছি তারস্বরে ঝগড়া করল সে, তারপর বোধ হয় আর কথা চালাতে না পেরে নামিয়ে রেখে দিল রিসিভার এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল গুপ্তভায়ার দিকে।

"এবার আমার ছুটি?"

"একটা স্টেটমেণ্ট দিলেই! কিন্তু তার আগে আর একটু অপেক্ষা করো—"

"আমার জাহাজ—"

"আমার কাজটাও কম জরুরী নয়—" বলে গুপ্তভায়া সরে এল নীল-চোখের কাছ থেকে এবং টেলিফোনের উপর নজর রেখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল আবার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝনঝন ক'রে বেজে উঠল টেলিফোন এবং আবার ভঁল্ট খেয়ে এসে গুপ্তভায়া ঝাঁপিয়ে পড়ল রিসিভারের উপর।

"হ্যালো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কী হোলো?"

"—"

"অয়্যারলেস ব্যবস্থা, সে-সম্বন্ধে তাহলে আর কোনো সন্দেহ নেই?"

"—"

"মাইল তিনেকের মধ্যে কী ক'রে বুঝছো?"

"—"

"ওয়েভটা ধরতে পারলে না?"

"—"

"কাল তৈরি হয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ধরতে পারবে বুঝলাম, কিন্তু তার মধ্যে চালাক হয়ে যাবে না ওরা?"

"—"

"ভাঙা তালা দেখেই বুঝবে! আশ-পাশে ওদের চরও থাকতে পারে এবং এতক্ষণে হয়তো তেমন কেউ খবর দিয়ে দিয়েছে যথাস্থানে।"

"—"

"তাহলে তালাটা কোনোরকমে আটকে দিয়ে যতক্ষণ না সাদা-পোষাকের লোক পাঠাতে পারি ততক্ষণ নজর রাখো একটু দূরে থেকে!"

রিসিভার নামিয়ে রেখে বিরসবদনে গুপ্তভায়া তারপর ফিরল নীল-চোখের দিকে, "এসো, এবার স্টেট্‌মেণ্টটা নিয়েই ছুটি দিয়ে দেবো তোমাকে—"

নীল-চোখের স্টেট্‌মেণ্ট নিতে বিশেষ সময় লাগল না গুপ্তভায়ার। নীল-চোখকে আরো দু'একটা মামুলী প্রশ্ন ক'রে নিজেই লিখে ফেলল এবং তারপর নীল-চোখকে পড়ে শোনাতে সে সই ক'রে দিল। নতুন কথা বিশেষ নেই, নীল-চোখের বিস্তৃত নাম-ধাম এবং এতক্ষণ সে যা বলেছে ও করেছে তার বিবরণ।

সই ক'রে উঠে দাঁড়াল নীল-চোখ, "এবার যেতে পারি আমি?"

"নিশ্চয়, তবে আমার লোক যাবে তোমার সঙ্গে এবং তোমার নাম ধাম পরিচয় মিলিয়ে নিয়ে তবে উঠতে দেবে জাহাজে!" বলে উইলসনে অপেক্ষমান দুই সাকরেদের দিকে তাকাল গুপ্তভায়া, "যা বললা শুনলে। জাহাজে উঠে আগে খবর নিয়ে সব ঠিক দেখলে তবে ও থেকে ছাড়বে একে। একবার জাহাজে উঠলে তখন একে ফের ধ কঠিন হবে। সঙ্গে আরো দু'জনকে ডেকে নিয়ে যাও, নই সামলাতেও পারবে না একে।"

নীল-চোখ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুনল গুপ্তভায়ার ইংরেজীতে বলা কথাগুলি এবং শুনেও হেসে করমর্দন ক'রে গেল গুপ্তভায়ার সঙ্গে উইলসনের সাকরেদদের পাহারায় বেরিয়ে যাবার আগে।

নীল-চোখ চলে যেতে আমার দিকে ফিরল গুপ্তভায়া, পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে হাতে দিল আমার, "স্টেটমেন্টটা পড়ো—"

"কার স্টেটমেন্ট?" কাগজটা হাতে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলাম।

"সুনীতি সহানী! যে জাম্বুবান চলে গেল—তার সঙ্গিনী!"

স্টেটমেন্ট বা বিবৃতিটা পড়তে দশ সেকেণ্ডও লাগল না। সত্যিকার স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি তাকে বলা চলে না—বলতে হ'লে উল্টোটাই বলতে হয়।

"আমি সুনীতি সহানী, কী অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অবগত আছি। আমি কুমারী কি বিবাহিতা, বাঙ্গালী কি অবাঙ্গালী, আমার পরিচয় বা ঠিকানা সম্বন্ধে কোনো বিবৃতি বা প্রশ্নের জবাব আমার উকিলের পরামর্শ ব্যতীত দিতে আমি প্রস্তুত নই।"

পড়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম গুপ্তভায়ার দিকে, "এ আবার কেমন বিবৃতি?"

"কিছু বুঝলে বিবৃতি পড়ে?"

"না। বোঝবার কিছু আছে এ ক'লাইনের মধ্যে?"

"গভীর জলের এবং বড় ঝাঁকের মাছ মেয়েটি, আইনজ্ঞান খুব টনটনে এবং বেকায়দা কিছু বলে ফেলবার ভয়ও আছে—যেটা ঐ জাম্বুবানের ছিল না। ইচ্ছে করলে সে মার্কিণ কনসালেট থেকে সাহায্য চাইতে পারতো এবং আরো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারতো এখান থেকে।"

"হয়তো আসলে মার্কিণ নাগরিকই নয়—"

"মার্কিণ নাগরিক, সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই; কেন না এস, এস, সিট্‌ল্ যে মার্কিণ জাহাজ এবং আজ শেষরাতে ছেড়ে যাবে সে-খবর আমি নিয়েছি এবং মার্কিণ জাহাজে অমার্কিণদের আজকাল আর চাকরি হয় না।"

"ও যে ঐ জাহাজেরই লোক কী ক'রে জানলেন?"

"ঐ জাহাজ যে-ঘাটে রয়েছে সেই ঘাটে এসে এই রাতে ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে বলে!"

"কোকেনের চোরাচালানীদের দলের যে নয়, সেটাই বা বুঝলেন কী ক'রে? শুধু শরীর তল্লাসী ক'রে? সেটাও তো ভালো ক'রে করলেন না! ওর সঙ্গিনীর কাছে যদি কোকেন পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে ওকেও নিরপরাধ মনে করা চলে না।"

"হুঁ—" বলে গম্ভীর মুখে কী যেন চিন্তা করতে লাগল গুপ্তভায়া।

"আজ রাতে বোধ হয় আপনি আর বাড়ি ফিরতে পারছেন না?"

"এ্যাঁ?" হঠাৎ যেন খেয়াল হ'ল গুপ্তভায়ার, "রাত হয়ে যাচ্ছে, না?"

"রাত আর হবার নেই, এখন ভোর হবার পালা!"

"কিন্তু সরকার না এলে তো উঠতে পারছি না!"

"আপনি না উঠলে আমিও নড়তে পারছি না। এতো রাতে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।"

"বাড়িতে তোমার খবর দিয়ে দিয়েছি আমি, সে-জন্যে ভেবো না।"

"বাড়িতে খবর দিয়েছেন? কখন?"

"উইলসনকে অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানে নিয়ে ওয়েলস্‌লি ষ্ট্রীটে রেডিও দোকানে পাঠাবার সময়।"

"ওয়েলস্‌লি ষ্ট্রীটের রেডিওর দোকান?"

"জাম্বুবানের দেওয়া ঐ টেলিফোন নম্বরটা ওয়েলস্‌লি ষ্ট্রীটের এক রেডিও দোকানের। দোকানের তালা বন্ধ, অথচ ফোন ক'রে কি সাড়া পাওয়া যাচ্ছে দেখে তালা ভেঙে সেখানে দেখা গেল টেলিফোনের সঙ্গে একটা দু'মুখো অ্যারলেস ট্রান্সমিটার লাগানো রয়েছে। ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে বে-ঠিকানা হ'য়ে কেউ সেই ফোনে সাড়া দিচ্ছে।"

"দোকানের মালিক তো একজন আছে এবং টেলিফোনটা নিশ্চয়ই রয়েছে কারুর নামে!"

"তাদের কারুকে ধরা যাবে বলে মনে হয়?"

"কেন?"

"টেলিফোনের সাথে ট্রান্সমিটারের বন্দোবস্ত যারা ক'রেছে, তারা কি অতো কাঁচা লোক?"

"তাহলে তাদের ঠিকানা বার করবার কোনো উপায় নেই?"

"অ্যারলেসের ওয়েভ ধরে ঠিকানা বার করা যেতে পারে, কিন্তু করতে করতে সেই লোকগুলি সাবধান হ'য়ে যাবে এবং তখন সাড়া দেওয়া বন্ধ ক'রে দেবে এবং তাদের সাড়া দেবার ওয়েভ না পেলে তাদের সন্ধানও আর করা যাবে না।"

"তাহলে কোকেন চালানীদের ধরবার উপায়?"

"আপাততঃ কিছু দেখছি না।"

"যে-মেয়েটিকে ধরেছেন?"

"তাকে ছেড়ে দেবো ভাবছি—"

"ছেড়ে দেবেন?"

"ধরে রেখে আর লাভ নেই।"

"এক হিসেবে বোধ হয় ভালোই হ'ল। গীতা কাপুরের হত্যা তদন্তের মাঝখানে এই আর এক ঝামেলা উপস্থিত হয়েছিল। আজ গঙ্গার ধারে মিনতি সরকারের মৃত্যুর মধ্যে কী দেখে বা পেয়ে আপনি কোকেনের চোরাচালানীদের সন্ধানে লেগে গেলেন, সেটা বুঝতে পারলাম না। অনেকক্ষণ ধরেই আপনাকে জিগ্যেস করব ভাবছি—"

"এখন বুঝিয়ে বলার ফুরসৎ হবে না। তবে যে-কোনো একটা তদন্তের সুরাহা হ'লেই সব জানতে পারবে।"

"কিন্তু শর্মাকে দু'-দু'বার গ্রেপ্তার করবার পরেও কি বলতে চান গীতা কাপুরের মামলার সত্যিই কিছু সুরাহা আপনি করতে পারেন নি?"

"নিশ্চিত সুরাহা সত্যিই কিছু এখনো করতে পারিনি। তবে এইটুকু নিশ্চয় তুমিও বুঝতে পেরেছো যে, একটার সঙ্গে আর একটা জড়িত?"

"হ্যাঁ—"

"কী ভাবে জড়িত হ'তে পারে, সেইটে এখন ভাববার, ভেবে বার করবার চেষ্টা করবো—"

"উরুর ঐ লাল বৃত্তের দাগটা? কোনো চোরাচালানীদের সঙ্কেত চিহ্ন?"

"অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছেছো—" বলে জুতোর আওয়াজে গুপ্তভায়া ফিরল দরজার দিকে এবং হাতে দপ্তরের একটা খাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে সরকারকে ঢুকতে দেখেই সোজা হয়ে বসল চেয়ারে।

"কী ব্যাপার সরকার ? এতো দেরি কেন ?"

"আজ্ঞে, উইলসন গঙ্গার ধারে মাঝিমাল্লা একগাদা লোক গ্রেপ্তার র রেখে এসেছিল। তাদের আনবার জন্যে গাড়ি ছিল না, হাঁটিয়ে আনতে হোলো—"

"তুমিও সঙ্গে হেঁটে এলে নাকি ?"

"হ্যাঁ, স্যর। অতোগুলি লোক নিয়ে দু'জন সেপাই ঠিক ভরসা ছল না।"

"লোকগুলি কোথায় ?"

"নীচে, এখনি ডেকে আনছি—"

"আনতে হবে না। শরীর তল্লাসী ক'রে ওদের মধ্যে বোকা-সোকা কজনকে হাজতে রেখে বাকিগুলিকে ছেড়ে দাও। আর, '—' ওয়েলস্‌লি স্ট্রীটে জন দুই লোক নিয়ে সাদা পোষাকে যেতে হবে মায়। উইলসন ওখানে রয়েছে, নজর রাখছে একটা দোকানের র। দোকানের তালা ভাঙ্গা হয়েছে, রাতারাতি তালা মেরামত র আবার লাগিয়ে দিতে হবে দোকানে। উইলসনকে ছুটি। সারারাত তোমাকে নজর রাখতে হবে দোকানের উপর কাল সকালে দোকান না খুললে আশে-পাশে এবং ড়ওয়ালার কাছে খবর নিতে হবে দোকানের মালিক সম্বন্ধে, যদি দোকান খোলে তো সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে আমায় র। সকালের পর দাশ যাবে তোমায় ছুটি দিতে—"

"সারারাত—কাল সকাল পর্যন্ত ?" গলাটা কেমন ভাঙা শোনাল ারের।

"হ্যাঁ, আর বেশি দেরি কোরো না, শুধু যাবার আগে নীচের ঐ লোকগুলির ব্যবস্থা ক'রে যাও এবং নীচের ব্যবস্থা করতে যাবার আগে জাল-নার্স টির সম্বন্ধে খবরাখবর বিস্তারিত বলে যাও আমায়।"

"কাল রাতে একটুকু ঘুমোতে পারিনি। বিয়াল্লিশ ঘণ্টার উপর একটানা ডিউটি দিচ্ছি স্যর!" কাঁদো-কাঁদো গলায় হঠাৎ বলে উঠল সরকার।

"চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে গেলে ঘুমোবার অনেক সময় পাবে তুমি। চাকরি মানে চাকরি! আমিই বা কোন্ পিতৃশ্রাদ্ধ করছি এতো রাত পর্যন্ত এখানে বসে বলতে পারো ?" শুনে থমকে উঠল গুপ্তভায়া।

"মাপ করবেন স্যর!" সঙ্গে সঙ্গে নরম হ'য়ে এল সরকারের গলা এবং সেই ছোঁয়ায় গুপ্তভায়ার স্বরও।

"যে 'উন্নতিটুকু হয়েছে সেটা রাখতে চাও, না খুইয়ে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরিই করতে চাও বাকি জীবন ?"

"আমার অন্যায় হয়েছে স্যর!"

"স্টেটমেন্টে কী বলছে ট্যাক্‌সির ড্রাইভার ?"

"আজ্ঞে, পড়ে শোনাচ্ছি!" বলে হাতের বাঁধানো খাতাটা তুলে পাতা খোলবার চেষ্টা করল সরকার।

"না, দাও, আমিই ওটা পড়ে নিচ্ছি। ঐ ব্যাগটা কার ?"

"গ্লোরিয়া বেনেট—সেই জাল-নার্সের।"

"কিছু পেয়েছো ঐ ব্যাগে ?"

"আজ্ঞে, হাসপাতালে এই ব্যাগটাই ছিল মেয়েটির হাতে। তখনো যা ছিল, এখনো তাই, উপরন্তু দুটো ট্রামের টিকিট এবং সেই

জায়গায় দশ টাকার নোটে একশোটা টাকা রয়েছে একটা খাপে আলাদা করা।"

"খাতার সঙ্গে ব্যাগটিও রেখে যাও—"

"ইয়েস স্যর!"

সরকার ঘর থেকে চলে যেতে আমাকে পাশে ডেকে বসিয়ে প্রথমে খাতাটা খুলে পড়তে আরম্ভ করল গুপ্তভায়া। পড়া শেষ হ'তে তারপর ব্যাগটা দেখতে শুরু করল, ট্রামের টিকিট দুটো লক্ষ্য করতে লাগল ভালো ক'রে।

"স্টেটমেণ্ট পড়ে কী বুঝলে?" হঠাৎ প্রশ্ন করল গুপ্তভায়া।

"তেমন কিছুই বুঝলাম না, শুধু জানলাম, ট্যাক্সি-ড্রাইভারটির নাম, ঠিকানা, লাইসেন্স নম্বর, ট্যাক্সির নম্বর, মালিকের নাম-ঠিকানা এবং ট্যাক্সি-ড্রাইভারটি আজ সন্ধ্যের পর সিঁথির মোড়ে সওয়ারীর জন্যে যখন অপেক্ষা করছিল তখন অর্থাৎ এই সাতটা নাগাদ তার ট্যাক্সির পিছনে একটা কালো ফোর্ড জাতীয় পুরণো গাড়ি এসে দাঁড়ায় এবং এই মেয়েটি, মানে গ্লোরিয়া বেনেট, সেই গাড়ি থেকে নেমে এসে তার ট্যাক্সিতে ওঠে এবং এণ্টালী যেতে বলে। পিছনের গাড়িতে কে বা কারা ছিল, ট্যাক্সিচালক মাণিক দাস দেখেনি, গাড়ির নম্বরও নয়, শুধু গাড়িটা যে কালো রঙের ফোর্ড জাতীয় এবং পুরণো, সেটুকু পিছন-দেখবার কাঁচে প্রতিফলিত হ'য়ে তার চোখে পড়েছে। তারপর ট্যাক্সি চালিয়ে মৌলালির মোড় পেরোবার পরই হঠাৎ পিছন থেকে গোঙানির আওয়াজ পেয়ে সে ফিরে দেখে সওয়ারী-মেয়েটি সীটে শুয়ে পড়ে দু'হাতে বুক ধরে হাঁপাচ্ছে। তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে মেয়েটিকে সে জিগ্যেস করতে থাকে—কী হয়েছে তার, কোথায় নিয়ে যাবে তাকে এবং কোনো ডাক্তারখানায় কিনা? 'লোকটা বিষ দিয়েছে আমাকে—' এইটুকুই শুধু হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে বলতে পারে বা বলে মেয়েটি এবং তারপরই ঢলে পড়ে। ভয় পেয়ে এবং ব্যাপার গোলমেলে দেখে মাণিক দাস তখন সবচেয়ে কাছাকাছি তালতলা থানায় ট্যাক্সি নিয়ে এসে উপস্থিত হয় এবং থানায় ঘটনা বলে। থানার লোকেরা গিয়ে ট্যাক্সিতে গ্লোরিয়াকে মৃত দেখে এবং চিনতে পারে এবং মাণিক দাসকে আটক করে। তার পর সরকার যেতে এবং থানা থেকে খবর পেয়ে ট্যাক্সির মালিক ...লাল মল্লিক উপস্থিত হ'তে সে ঘটনাবলীর একটা লিখিত বিবৃতি দেয় এবং সেই সঙ্গে বলে, গ্লোরিয়াকে সে চেনে না, দেখেও নি ...না আগে।"

"ভালো, ভালো—" শুনে খুশি হয়েছে মনে হ'ল গুপ্তভায়া, টিকিট দুটো দেখিয়ে বলল, "এ-দুটো থেকে কী জানতে পারছো?"

"একটা টিকিট সম্ভবতঃ কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় থেকে পার্ক সার্কাসের অন্যটি সম্ভবতঃ পার্ক সার্কাস থেকে শিয়ালদা'র।"

"সম্ভবতঃ কেন?"

"হাসপাতাল ও কুষ্ঠোকার লেনের ধার কাছ দিয়ে ট্রামের ঐ গুলি পড়েছে বলে।"

"আর কিছু জানতে পারছো টিকিট থেকে?"

"ঠিক কোন্ রাস্তার ট্রাম, কোম্পানীতে খোঁজ করলেই জানা যাবে।"

"আর কিছু নয়?"

"না—"

"চলো, এবার তা'হলে ওঠা যাক—" টিকিট দুটো আবার ব্যাগের মধ্যে রেখে এবং ব্যাগ ও খাতাটা নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল গুপ্তভায়া। একটা আলমারি খুলে ব্যাগ ও খাতাটা রেখে হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে তাড়া দিয়ে উঠল আমায়, "কী ব্যাপার? চেয়ারে বসে রইলে যে? চলো, চলো—"

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম, "আর একটু দেরি করলে পারলে চাকর ডেকে আর বাড়ির দরজা খোলাতে হোতো না সত্যিকার সকাল-সকাল বাড়ি ফেরা হোতো এবং রাত ক'রে বাড়ি ফেরার বদনামও হোতো না আমার।"

বাড়ি ফেরার পথে আর বিশেষ কোনো কথা হ'ল না গুপ্তভায়ার সঙ্গে। কথা বলার উপায়ও ছিল না, মাঝরাতের রাস্তা খালি পেয়ে গাড়ি একেবারে উড়িয়ে নিয়ে চলেছিল গুপ্তভায়া আর বরফ-ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা জীপের মধ্যে অসাড় ক'রে দিচ্ছিল সমস্ত শরীর এবং দাঁতে দাঁত চেপে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা ছাড়া আমার উপায়ও ছিল না অন্য।

গুপ্তভায়া কিন্তু নির্বিকার, অনেক তীক্ষ্ণ রসিকতার মত শীতের সূঁচ-বিঁধনো হাওয়াও বুঝি জব্দ ওর মোটা চামড়ার কাছে। বাড়ির সামনে আমায় নামিয়ে দিয়ে একবার তাকাল দোতলার দিকে "তোমার কাকা মনে হচ্ছে তোমার জন্যে জেগে রয়েছেন।"

গুপ্তভায়ার দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে তাকিয়ে দেখলাম, জানলা-দরজা বন্ধ, সমস্ত দোতলার মধ্যে শুধু আমার ঘরের ঘুলঘুলি দিয়েই আলো বেরিয়ে আসছে। বললাম, "না, ওটা আমার ঘর।"

"তাহলে তোমার ঘরেই বসে রয়েছেন, ভাখো গে।"

গুপ্তভায়ার অনুমান মিথ্যে নয়। দোতলায় উঠে বারান্দা দিয়ে এগোতেই দেখলাম, কাকা বেরিয়ে আসছেন আমার ঘর থেকে এবং হাতে তাঁর—অবিশ্বাস্য ব্যাপার—আমার লিখে রাখা সেই গল্পটা।

"কী হোলো? গুপ্তভায়া এখনো অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে, না ধরতে পারলো কারুকে?" আমাকে দেখেই কাকা প্রশ্ন করে উঠলেন।

"শর্মাকে গ্রেপ্তার করেছে আবার, তবে সঠিক সুরাহা কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না।"

"আবার গ্রেপ্তার করেছে শর্মাকে?" কাকা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না কথাটা, "গুপ্তভায়ার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?"

"না। গীতা কাপুরের বন্ধু এবং ওদের বিয়ের একজন সাক্ষী মিনতি সরকারকে খুন ক'রে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে শর্মা।"

"এ্যাঁ, বলিস কি?" রীতিমত ভাবিত হয়ে উঠলেন কাকা, তারপর আমার লেখাটা দেখিয়ে বললেন, "পড়ছিলাম। যদ্দুর পড়েছি ভালোই লাগছে। বাকিটা পড়ে দেখি—আজ রাতে ঘুম বোধ হয় আর হবে না।"

বলে লেখাটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন কাকা। তাঁর এতক্ষণ জেগে থাকার কারণ শুধু যে আমার দেরি করে ফেরাটা নয়, বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। শর্মার ব্যাপারে গুপ্তভায়ার সঙ্গে কাকার যে একটা প্যাঁচ কষাকষি চলছে, সেটাও অনুমান করলাম, কিন্তু সেই প্যাঁচ কষাকষির রহস্যটা কী, বুঝে উঠতে পারলাম না। চাদরটা তুলে ঘরে রেখে খাওয়া দাওয়ার খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল হয়ত শর্মার সঙ্গে কোনো ব্যাপারে জড়িত রয়েছেন কাকা।

কিন্তু কী ভাবে? বিছানায় শুয়ে শুয়েও চিন্তাটা কেবলই ঘুরতে লাগল আমার মাথায়। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি না জানলেও কখন জেগে উঠেছি সেটা বলতে পারব, কেন না ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল, "উঠুন দাদাবাবু, সাড়ে দশটা বাজে। গুপ্তবাবু আপনার জন্যে গাড়িতে রয়েছেন।"

"কে গুপ্তবাবু?" বিরক্তভাবে বলে উঠেই খেয়াল হ'ল আমার, চাকরের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই চাদর জড়িয়ে সোজা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম আর রাস্তায় জীপে বসে আমাকে দেখতে পেয়েই চীৎকার ক'রে উঠল গুপ্তভায়া।

"রাত জেগে কী করো যে সাড়ে দশটায় ঘুম ভাঙল?"

"শয়তানের সঙ্গ এবং ঘুমটা এখনো ভাঙেনি—এ শুধু মাঝের ইন্টারভ্যাল!" চেঁচিয়ে উত্তর করলাম আমিও।

"ইয়ার্কি রাখো, গায়ে জামা দিয়ে নেমে এসো তাড়াতাড়ি। দেড় ঘণ্টার উপর বেরিয়ে এসেছি দপ্তর থেকে—এখনি ফিরতে হবে—"

"আমি তৈরিই হয়নি—এবং হতে অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা লাগবে।" আপত্তি করতে গেলাম।

"স্নান-আহ্নিকের চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে দপ্তরে—তোমাকে দেখানোই হয়নি। এসো, এসো, নেমে এসো—আর দেরি করিয়ে দিও না—"

শেষ পর্যন্ত নেমেই আসতে হ'ল গুপ্তভায়ার হাঁক-ডাকে কোনোমতে আধা তৈরি হয়ে এবং বিরসবদনে এসে উঠতে হ'ল জীপে এবং ওঠামাত্র জীপ ছেড়ে দিয়ে গুপ্তভায়া জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কাকা কী জিগ্যেস করলেন তোমায় কাল রাতে?"

রাত্রের কথাটা মনে পড়ে গেল, এবং বদনের বিরসতাও বোধ হয় কেটে গেল মনের কৌতূহলে, বললাম, "কী ব্যাপার বলুন তো কাকার সঙ্গে আপনার?"

"কিছু না! কাল তোমার কাকার সঙ্গে বাজি হয়েছে একটা আমার।"

"কী বাজি?"

"কাল তোমার ফিরতে দেরি হবে খবরটা যখন তোমার কাকাকে দেই তখন ফোন ধরে তোমার কাকা ভেবেছিলেন শর্মা সম্বন্ধে ওঁর কাছ থেকে কিছু জানবার জন্যেই ফোন করছি আমি। যখন দেখলেন তা নয়, তখন শর্মা সম্বন্ধে কতটা কী জানতে পেরেছি আমি সেটা জানতে চাইলেন। এখনো শর্মা সম্বন্ধে কিছু বলতে বা ওঁর কাছ থেকে শুনতে আমি রাজী নই বলায় বোধ হয় ক্ষুণ্ন হলেন খুব এবং বললেন যে, উনি যা বুঝছেন তাতে গীতা কাপুরের মামলার সমাধান করতে আমার ছ'মাস লেগে যাবে। আমি উত্তরে বললাম, ছ'মাস নয়, আর ছ'দিনই যথেষ্ট।"

"মাত্র ছ'দিন?"

"হ্যাঁ, তাই শুনেই তো পাঁচশো টাকা বাজি রাখলেন উনি।"

"পাঁ-চ শো?"

"হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে ছ'দিন বলা ভুল হয়েছে।"

"তাহলে সময়টা বাড়িয়ে নিচ্ছেন না কেন?"

"আমি কমাবার কথা বলছি। কমিয়ে যদি বাজির টাকাটা বাড়ানো যায়।"

"তার মানে গীতা কাপুরের মামলার একটা সুরাহা আপনি ক'রে এনেছেন?"

"মনে তো হচ্ছে।"

"কিন্তু কাল রাত পর্যন্ত তো সুরাহার উপায় কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না?"

"সত্যিই পাইনি।"

"কিন্তু তারপর আজ সকালের মধ্যে এমন কী ঘটল যা সঠিক একটা সুরাহার পথ ক'রে দিল?"

"এখনো দেয়নি, তবে আশা করছি দেবে। আর কাল রাতের পর যা যা ঘটেছে বলে যাচ্ছি তোমাকে। শুনে সুরাহার কোনো সূত্র পাও কি না দেখো।"

"বলুন—" বলে দম নিয়ে কান খাড়া ক'রে জীপে সোজা হয়ে বসলাম আমি।

"কাল রাতে তোমার এখান থেকে সোজা বাড়িই ফিরে গিয়েছিলাম আমি, তবে ফিরে ঘুমোতে পারিনি। ভোরেই আবার বেরুতে হবে বলেও বটে এবং মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাওয়া অনেকগুলি চিন্তার সূত্র ছাড়াবার জন্যেও বটে—বাকি রাতটা জেগেই কাটিয়েছি। তারপর আজ ভোরে পাঁচটায় উঠে প্রথমে বেহালায় যাই আমি এবং মিনতির মায়ের সঙ্গে কথা বলে মর্গে নিয়ে এসে তাঁকে দিয়ে মিনতিকে সনাক্ত করি। অন্য মেয়েটিকে দেখলাম তিনি চেনেন না—চেনবার কথাও নয়। তারপর মিনতির মাকে বেহালায় ফিরিয়ে দিয়ে আসি এবং গোপন করব না, মিনতির মায়ের কান্নাকাটির মধ্যে জানতে পারি মিনতি আসলে বিধবা।

"বেহালা থেকে ফিরে দপ্তরে গিয়ে পৌঁছোই ঠিক সাড়ে সাতটার মধ্যে। মিসেস ওয়ার্ডের হস্টেল, শর্মার হোটেল এবং ডঃ তৌফিকের—এই তিন জায়গায় টেলিফোনে গত আটচল্লিশ ঘণ্টারও উপর সর্বক্ষণ কান পেতে রয়েছে আমাদের লোক—তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে জানলাম, সন্দেহজনক কোনো কথাবার্তা ঐ তিন জায়গা থেকে এখনো তারা শোনেনি। হস্টেলের দু'টি মেয়ে, যারা ট্যুরিষ্ট আপিসে কাজ করে তাদের হস্টেল ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া হস্টেল স্বাভাবিকভাবেই চলছে, ডঃ তৌফিক তেমনি রয়েছেন এবং শর্মার হোটেলেও নতুন কোনো খবর নেই।

"তারপর আটটার সময় অয়্যারলেস এ-সি মিঃ করঞ্জারী ও দু'জন বেতার-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সলা-পরামর্শ হ'ল এবং তাঁরা ওয়েভ ধরবার এবং ওয়েভ ধরে ঠিকানা বের করবার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন এবং ফোনে বিদেশী জাহাজীদের গলা অনুকরণ ক'রে অভিনয় করবার জন্যে উইলসন ও আরো চারটি লোককে মহলা দিয়ে তৈরি করে মিঃ করঞ্জারীর সঙ্গে দিয়ে দিলাম।

"ঠিক ন'টার সময় একটি ট্যাক্সি, তার মালিক ও চালক এসে উপস্থিত হ'ল দপ্তরে। সরকারের সার্কুলার পেয়ে মালিক ও চালক এসেছে। এই চালকই আঠারোই রাতে হস্টেল থেকে গীতা, মিসেস ওয়ার্ড ও ডঃ তৌফিককে নিয়ে এসেছিল হাসপাতালে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, ট্যাক্সিটা রুক্মিণী নিয়ে এসেছিল হস্টেলে এবং দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। কোথা থেকে রুক্মিণী এসেছিল জিগ্যেস করতে চালকটি বলল যে, সেই রাতের মহিলা সওয়ারিণী কসবার এক বাড়ি থেকে প্রথমে তার ট্যাক্সিতে ওঠে এবং বেহালায় এক বাড়িতে

যায় এবং সেখান থেকে একটি অসুস্থ বাচ্চা ছেলেকে তুলে নিয়ে ভবানীপুরের এক শিশু-হাসপাতালে আসে এবং তারপর ছেলেটিকে সেখানে রেখে তবে আসে হস্টেলে।"

"তার মানে মিনতির ওখানে গিয়েছিল রুক্মিণী?"

"হ্যাঁ—"

"মিনতির সঙ্গেই?"

"হ্যাঁ এবং একটু বেশি অঙ্গাঙ্গীভাবে! অর্থাৎ মিনতিই রুক্মিণী! ট্যাক্সিচালকটিকে নিয়ে আবার গেলাম মোমিনপুর মর্গে তাকে দিয়ে রুক্মিণীকে সনাক্ত করাতে এবং সেদিনের সেই মহিলা বলেই মিনতিকে সনাক্ত করল ট্যাক্সিচালক। আর সেই সঙ্গে আরো জানাল যে, উনিশ তারিখ রাতে মালিকের কাছ থেকে খবর নিয়ে পুলিশের একটি লোক এসেছিল তার বাড়িতে এবং এই মহিলাটি সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য খবরগুলিই করে গিয়েছে একবার।"

"কে গিয়েছিল? সরকার?"

"না। চেহারার বর্ণনা শুনে মনে হ'ল এই লোকটিই পরে গিয়েছিল বেহালায় মিনতির মায়ের কাছে! লোকটি কে হ'তে পারে ভাবতে ভাবতে আবার ফিরে এলাম দপ্তরে এবং দেখলাম, বেতার-বিশেষজ্ঞেরা বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।"

"ওয়েভের ঠিকানা করতে পেরেছে কিছু?"

"না। যেমন আশঙ্কা করেছিলাম, সাড়া দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওয়েভ থেকে, অর্থাৎ জানতে পেরে গিয়েছে তারা সব!"

"তাহলে ওয়েভ দিয়ে ওদের ধরা এখন মুস্কিল!"

"তাহলে কী ক'রে ধরবেন?"

"যদি হিসেবে ভুল করে না থাকি, তাহলে আজ দিনের মধ্যেই তা দেখতে পাবে।"

"কিন্তু কী ক'রে তো বুঝতে পারছি না—"

"বোঝবার কথা নয়। ওয়েভে সাড়া দেওয়ার মত তাহলে সেদিকেও সাবধান হয়ে যেতো ওরা—"

কথা বলতে বলতে চৌরঙ্গীতে এসে গিয়েছিলাম আমরা। লাইট হাউসের রাস্তায় ঢুকে এক পানের দোকানের সামনে জীপ দাঁড় করিয়ে পান খেল গুপ্তভায়া এবং তারপর এক ঠোঙা পান সাজিয়ে নিয়ে হাতের ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল হঠাৎ, "চলো, চলো—আর দেরি নয়! দপ্তরে যাবার আগে একবার শর্মার হোটেল হ'য়ে যেতে হবে।"

দেরি যেন আমিই করছিলাম! তবু সে কথা না বলে জিজ্ঞাসা করলাম, "শর্মার হোটেলে কেন?"

"আসল এবং সবচেয়ে বড় খবরটাই তোমায় বলা হয়নি।"

"কী?"

"শর্মা হাজত থেকে পালিয়েছে।"

"পালিয়েছে? সে কী!"

"হ্যাঁ—"

"কখন?"

"ট্যাক্সিচালককে নিয়ে মোমিনপুর থেকে ফিরে শুনি শর্মা নেই হাজতে—"

"কিন্তু কী করে পালালো? পুলিশ-হাজত থেকে পালানো তো সহজ কথা নয়!"

"ঠিকই ধরেছো। আমাদের ভিতরের কারুর সাহায্যেই পালাতে পেরেছে।"

"ভিতরের মানে পুলিশের?"

"হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে শর্মার হোটেলটা ঘেরাও করতে বলে দিয়েছি—শর্মার জিনিষপত্তর সব ওখানে রয়েছে। ওর ঘর একবার তল্লাস করে দেখা দরকার, কোথায় পালিয়েছে কিছু সূত্র যদি পাওয়া যায়।"

"পালাতে যখন পেরেছে তখন হয় কলকাতায় সে এখন নেই কিম্বা এখনো ছাড়বার চেষ্টা করছে—"

"এর মধ্যে কলকাতা ছেড়ে যেতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। আর আমার কেমন ধারণা, ওর হোটেলেই ও লুকিয়ে আছে।"

"ধরা পড়বার জন্যে?"

"পালাবার জন্যে রেস্ত-র ব্যবস্থা করতে। ওর জিনিষপত্তর ওখানে এবং কলকাতা ছাড়বার আগে একবার হোটেলে ঢুঁ ও মারা উচিত!"

"তাই বলে এখনো হোটেলে বসে আছে আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে?"

"আছে কি নেই, হোটেলে গেলেই সেটা দেখতে পাবো। না থাকলেও কোথায় গিয়েছে তার সূত্র হোটেল থেকে বের করাই সবচেয়ে সোজা হবে।"

হোটেল '—'এ পৌঁছে দেখি সেখানে পুলিশ ভ্যানের ছড়াছড়ি, সব রকমের পুলিশের গাড়ি দু' চারখানা ক'রে দাঁড় করানো রয়েছে হোটেলের সামনে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে কথাটা গেরস্থদের সম্বন্ধেই এতদিন বলেছি বা বলতে শুনেছি,—পুলিশের লোকদের সম্বন্ধেও যে সেটা প্রযোজ্য হ'তে পারে, এই প্রথম মনে হ'ল। জীপ থেকে নেমে দেখি হোটেলের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছে লাল পাগড়িতে। হোটেলের মধ্যেও লাল পাগড়ি ও খাকি পোষাকে ছড়াছড়ি। আমরা দু'জন এগিয়ে আসতেই দাশ ও উইলসন এগিয়ে এল।

"কী বলছে হোটেল থেকে?"

"বলছে শর্মা এখানে আসেনি।" উত্তর করল দাশ।

"ম্যানেজার ও কর্মচারীরা কোথায়?"

"সবাইকে ডাইনিং-রুমে এনে জড়ো করেছি—বোর্ডারদেরও।"

"বেশ! চলো, এবার হোটেলের প্রত্যেকটা ঘর, প্রত্যেকটা কোণ ভালো ক'রে খুঁজে দেখতে হবে। যাও, ম্যানেজারকে ডেকে নিয়ে এসো, এবং সব ক'টা ঘরের চাবি নিয়ে সঙ্গে আসতে বলো আমাদের। ভাঁড়ার, রান্নাঘর—যেখানে যত তালা আছে, কোনো কিছুর চাবি আনতে যেন ভোলে না।"

দাশ চলে যেতে গুপ্তভায়া ফিরল উইলসনের দিকে, "কী বুঝছো উইলসন?"

"এতো বড় হোটেল-বাড়ির মধ্যে গুপ্ত-ঘর থাকাও বিচিত্র নয়।"

"সেই জন্যেই তো আমার ধারণা, শর্মার লুকনোর পক্ষে এই হোটেলই সবচেয়ে সুবিধের জায়গা।"

"তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে সময়ও লেগে যাবে অনেক।"

"খুব বেশি সময় লাগলে বুঝতে হবে এতোদিন পুলিশে কাজ করিনি, ঘোড়ার ঘাস কেটেছি আমরা।"
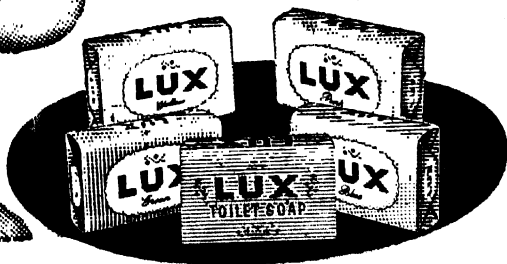
গম্ভীর মুখে জবাব দিয়ে হাতের ঠোঙা থেকে আরো দুটো পান মুখে পুরল গুপ্তভায়া।

একটু পরেই দাশের সঙ্গে ম্যানেজার এবং এই হোটেলের একদা-মালিক এসে উপস্থিত হ'ল—বিপন্ন, ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত ভঙ্গীতে।

"এ কী করছো তোমরা?" এসে গুপ্তভায়াকে বেশ চড়া গলাতেই বলে উঠল ম্যানেজার, "এর পর কি একজন বোর্ডারও আমার হোটেলে থাকবে, না একজন খদ্দেরও আমাদের রেস্তোরাঁ আর বার-এ ঢুকবে?"

"খুব বেশি বোর্ডার তো দেখছি না! আর বার-রেস্তোরাঁয় তেমন খদ্দের হ'লে কি আর তুমি এই লাভের হোটেল বেচতে?"

"এটা হোটেল জমবার মরশুম নয়। বড়দিন আর পূজোয় আমরা সারা বছরের খরচ তুলি। লোকসানের ব্যবসা বলে এই হোটেল আমি বিক্রি করিনি—করেছি ব্যবসা থেকে অবসর নেবো বলে। কিন্তু যা হাঙ্গাম তোমরা বাধিয়েছো তাতে এ-হোটেলের চৌকাঠও কেউ আর মাড়াবে না এবং মিষ্টার শর্মা এই হোটেলের সুনাম বা 'গুডউইলের' জন্যে যে-টাকাটা দিয়েছেন সেটা তাঁর পুরোপুরি জলে যাবে।"

"নিজের সে-ক্ষতির জন্যে তোমায় মিষ্টার শর্মাই দায়ী। পুলিশ হাজত থেকে পালাবার জন্যে সে-খেসারত তাকে দিতেই হবে। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, সারা হোটেল খুঁজে দেখতে অনেক সময় লাগবে। চলো, একেবারে ছাদ থেকে দেখতে শুরু করি।"

"চলো—" বলে গোমড়া-মুখে লিফ্‌টের পাশের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল ম্যানেজার—গুপ্তভায়া, আমি ও দাশ চললাম তার পিছু-পিছু। উইলসনকে কী যেন ইশারা ক'রে দিল গুপ্তভায়া ম্যানেজারের পিছু নেবার আগে।

[ ক্রমশঃ।

# রূপের গরবে যার

### শক্তি মুখোপাধ্যায়

রূপের গরবে যার মাটিতে পড়ে না পা
সে আমাকে আজও ভালোবাসে···
ভালোবাসে আত্মগরবিনী।
এ কথা আগেও কোনদিন
বুঝিতে পারিনি আমি যার
পাত্র-মিত্র ছিল অনেক অশেষ
সে আমাকে কেন ভালোবাসে।

কি পেলে আমি যে খুসী হই
যেন সে আগেই জেনেছিল।
ফুলের সুরভি নিয়ে তাই
সে আমার দ্বারে এসেছিল।
আয়ত আঁখির কোণে দেখিনি সেদিন—
উদ্ধত চেতনা জড়ানো
ছিল কি? ছিল না এতটুকু।

কি পেলে আমি যে খুসী হই
যেন সে আগেই জেনেছিল।
তাই সে জ্যোৎস্না রজনীতে
এনেছিল একমুঠো যূঁই।

রূপের গরবে যার মাটিতে পড়ে না পা
সে আমাকে আজও ভালোবাসে।

# বৈশাখের প্রার্থনা

### রুদ্রাণীশংকর ঘোষ

উড়ে যাক কাল-বৈশাখীর ঝড়ে
পুরাতন-জীর্ণ-জরা-পাতা,
আবর্জনা, জঞ্জাল যতো; উড়ে যাক
নিরস অনুর্বর তপ্ত বালুকণ।
সতেজ মাটির খোঁজ মিলুক, মিলুক।

রুদ্ধ-দ্বার-জানালায় করুক আঘাত
দামাল বাতাস—
বিত্তেদের পর্দায় ছিঁড়ে নিয়ে যাক;
গোঁড়ামির, চালাকির অর্গল ভাঙুক।
নবীন বর্ষার মেঘ আসুক আসুক।

নিপীড়িত, জর্জরিত, রিক্ত জনগণ
পায় যেন প্রাণ,
ধরণী সুফলা হোক। মাঠে মাঠে
সবুজ ধানের মেলা আবার বসুক।
মানবের শান্তির দিন আসুক আসুক।

# বন্দর

বাসব ঠাকুর

হ্যালো প্রতুল! পেছন ফিরে দেখি সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে বিকাশ। ও আর আমি এক সঙ্গে স্কুলে পড়তাম, সে আজ কতকাল আগের কথা। আই-এ পাস করে আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হই আর ও ফেল করে শুনেছিলুম পড়াশুনো ছেড়েই দেয়। জমিদারের ছেলে, পড়াশুনো না করলে ওর কোন ক্ষতি ছিল না। পয়সার তো অভাব নেই। আই-এ দেবার পর আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি মেডিক্যাল কলেজের পড়াশুনো নিয়ে। কারণ, গরীবের ছেলে, পাস করে রোজগারের রাস্তা দেখতে হবে তো। আর বিকাশ? খবর পেতুম ফিরিঙ্গি মেম সাহেবদের নিয়ে ঘোরাঘুরিতেই ব্যস্ত। তবু মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হ'ত এবং ওর সঙ্গে দেখা হলে চৌরঙ্গীর হোটেলে খেয়ে-দেয়ে, সিনেমা দেখে দিনটা ভালই কাটতো। বলা বাহুল্য, বিকাশই করতো ওসবের খরচ বহন।

ডাক্তারী পাস করার পর আমি একটা জাহাজে কাজ নিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাই, তারপর ওর সঙ্গে বছর দশেক আর দেখাই হয়নি। তাই এতকাল পর 'লাইট-হাউসের' সামনে আজ ওকে দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগছিল, মনে পড়ে যাচ্ছিল পুরানো দিনের অনেক কথা। তাই বললাম, "চলো, কোন এক হোটেলে বসে দুটো বিয়ার নিয়ে তোমার কথা শোনা যাক।" আমাদের দু'জনেরই বয়স এখন চল্লিশের কোঠায়। আমার মাথায় পাকা চুলের অভাব নেই, কিন্তু মনে হ'ল ওর এখনও একটা চুলও পাকেনি। বয়সের ছাপ পড়লেও ওর চেহারা আজও তেমনি সুন্দর। একে বড়লোকের ছেলে তার উপর এই চেহারা, তাই ফার্স্ট ইয়ার থেকে কলেজের অনেক মেয়ের নজরই ওর উপর ছিল। বাঁশরী দত্ত বলে একটি মেয়ে ওর জন্য কি না করেছে? ও বললে, "না, না, তার চেয়ে চলো আমার বাড়ীতে। আজ রাতের খাবারটা আমার ওখানেই হবে, আর গল্পও করা যাবে।" বলে ও একটা ট্যাক্সি ডেকে জোর করেই আমায় তাতে ঠেলে উঠিয়ে দিলে।

আমরা ট্যাক্সি থেকে নামলুম একেবারে ভবানীপুরে বিকাশদের বাড়ীর সামনে। স্কুলে পড়বার সময় ওখানে অনেকবার গিয়েছি। বাড়ীটার বেশী পরিবর্ত্তন হয়নি, তবে তিনতলা বাড়ীটার ওপরতলাগুলো সমস্তই এবার ভাড়াটে বসে গেছে। বিকাশের ড্রইংরুম এখন একতলায়, নীচের তলাতেই ওরা থাকে। ওদের বেশীর ভাগ সম্পত্তি ও জমিদারী পাকিস্তানে ছিল বলে দেশভাগ হওয়ার পর সবই হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। এখন কলকাতার এই বাড়ীটার ভাড়াতেই ওর খরচ চলে। বাপ মারা যাবার পর ও নিজেই এখন সম্পত্তির মালিক, আর আমার মত সংসারে ওর কেউ যে নেই, এ খবর আমার আগেই জানা ছিল।

আমাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে "আমি এখনি আসছি" বলে ও পাশের ঘরে অন্তর্ধান হ'ল। একটু পরেই ও আবার ফিরে এলো। ওর পেছনে পেছনে জড়সড়ভাবে একটি সতের আঠারো বছরের মেয়ে, তার হাতে এক থালা খাবার। ঘরে এসে মেয়েটির উদ্দেশে ও বললে, "এ হচ্ছে আমার ছোটবেলার বন্ধু প্রতুল। ওর কাছে লজ্জা কোরো না। প্রতুল, ইনি হচ্ছেন আমার পরিবার, অর্থাৎ wife। তোমাকে উঠে দাঁড়িয়ে আর অত শ্রদ্ধা দেখাতে হবে না, বসো হে, বসো।"

আমরা বসলে খাবারের থালাটা নামিয়ে রেখে লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে একটু হেসে মেয়েটি বললে, "আপনারা খেতে আরম্ভ করুন, আমি চা নিয়ে আসছি।" বলে সে পাশের ঘরে চলে যায়। ভারী মিষ্টি লাগলো ওর হাসিটি। গায়ের রংটা ফর্সা না হলেও ছিপছিপে শরীরে এক স্বাস্থ্যময় সৌন্দর্য্য যেন উছলে পড়ছে। মেয়েটির বয়সের পক্ষে অবশ্য সেইটাই স্বাভাবিক। বিকাশের পেড়াপীড়িতে থালা থেকে একটু খাবার মুখে দিতেই হ'ল। কিন্তু সেই একটু তরকারীর সঙ্গে কচুরি খেয়ে যে এত ভালো লাগবে, তা গোড়ায় বুঝতেই পারিনি। জাহাজে আর বিদেশী হোটেলেই খাওয়া অভ্যেস, তাই এতকাল পরে বলেই কি এত ভালো লাগলো একটি বাঙালী মেয়ের হাতের রান্না? খেতে খেতে বললাম, "সত্যি, খুব ভালো করেছ বিকাশ শেষ পর্য্যন্ত সংসার কেঁদে। 'বেটার লেট দ্যান নেভার'। ছেলে-মেয়ে কটি?"

ও হেসে বললে, "একটাও না ভাই, বিয়ের পর এখনো এক বছর পার হয়নি।" বললাম, "ওঃ, এখনও হানিমুন শেষ হয়নি, তা হলে···।" মেয়েটি চা নিয়ে এসে পড়লো। বিকাশ আমার চেয়ে কয়েক মাসের ছোটই হবে, তবু সম্বন্ধটা হালকা করে নিয়ে হেসে বললাম, "বৌদি, আপনি খুব ভালো রাঁধেন তো। বিকাশ সত্যি ভাগ্যবান। আমরা জাহাজী লোক। এমন ঘরের তৈরী খাবার তো কখনো জোটে না। তা ছাড়া ঘরও নেই, আর রেঁধে খাওয়ানোর লোকও নেই।"

এবার সে একটু অপ্রতিভ হয়েই বলে, "তা বন্ধুর মত আপনিও একটা বিয়ে করতে পারেন তো!"

হেসে বলি, "আমাকে আর এই বয়সে কে বিয়ে করবে বলুন সবার তো আর বিকাশের মত ভাগ্য হয় না।"

"তা এদেশে গরীবের মেয়ের তো অভাব নেই। অনেক বাপ-মা আপনাকে মেয়ে দিতে লাফিয়ে আসবে, আর আপনার কি বা বয়স হয়েছে? বলে, খাট থেকে নামতে পারে না এমন কত বুড়োরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। দেখুন, রাজী থাকেন তো মেয়ে দেখি।"

কথাগুলোর কেমন একটা খট্‌কা লাগলো। এর মধ্যে বিকাশ

আমার বয়সের দিকে কটাক্ষ করা হচ্ছে কি না ঠিক বোঝা গেল না। উত্তরে বললাম, "কিন্তু বৌদি, আমরা হচ্ছি জাহাজী লোক। একথা নিশ্চয় জানেন যে, নাবিকদের প্রত্যেক বন্দরেই একটা করে বিয়ে হয়। আমিও তো তাদেরই একজন।" সকলেই হেসে উঠলুম, ঘরের আবহাওয়াটাও হাল্কা হয়ে গেল। রাতের খাওয়া শেষ করে পরের দিন আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাহাজে ফিরতে রাত হয়ে গেল অনেক।

পরের দিন ওদের কাছে যাওয়া আর হয়নি। কারণ, আমাদের কোম্পানীর আর একটা জাহাজ ছাড়বার কথা ছিল সেইদিন, কিন্তু তার ডাক্তার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই জাহাজে আমাকেই যেতে হয়। তিন মাস পরেই ফিরে আসার কথা ছিল। তবু দক্ষিণ প্যাসিফিক ওসানের বন্দরগুলোয় জাহাজের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে তিন বছরের আগে কলকাতায় আসবার সুযোগ আর হয়নি। 'হংকং'-এ যখন জুয়ার আড্ডায় অর্দ্ধ চৈনিক, অর্দ্ধ ইউরোপীয় মেয়েদের পাল্লায় পড়ে টাকা-পয়সা সব খুইয়েছি কিংবা রেঙ্গুণ, সুরাবায়া অথবা প্যারাডাইস দ্বীপের কোন কাফেতে বসে অর্থলোভী মেয়েদের সঙ্গে মদ খেতে খেতে প্রতারিত হয়েছি, তখন অনেক সময় বিকাশের কথা ভেবে হিংসা হয়েছে। কত সুখেই না আছে ওরা! এবার দেশে ফিরলে নিশ্চয় দেখবো ওর ছেলেমেয়ে কিছু একটা হয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলে ভেসে ভেসে তিন বছর পরে আবার একদিন কলকাতায় পৌছলুম। সেদিন একটু আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। চারিদিক সবুজ। বড় সুন্দর মনে হোল এই বাংলা দেশ। বিকাশের কথা আগে থাকতেই ভাবছিলুম, তাই জাহাজ থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ভবানীপুরে ওদের বাড়ীতে গিয়ে নামলুম। বাড়ীটা দেখি আগের মত চুণ-বালি খসা আর নেই। দেয়ালে নতুন এলা রং আর দরজা-জানালায় হাল্কা নীল রং পড়ে একটা নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। ওদের ড্রইংরুমের দরজায় রিং করতে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলেন, কাকে চাই? বিকাশের কথা জিগ্যেস করে জানতে পারলুম বছর দুই হোল এ বাড়ীটা সে বেচে দিয়েছে। কথায় কথায় গতবারে সে বলেছিল, এ বাড়ীটা বেচে কলকাতার আরো দক্ষিণে একটা ছোট পরিবারের উপযোগী বাংলো তৈরী করে বসবাস করাই তার ইচ্ছে। কিন্তু ভদ্রলোককে তার উপস্থিত ঠিকানা জিগ্যেস করায় তিনি পার্ক সার্কাসের একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, এই ঠিকানায় গিয়ে দেখতে পারেন, তবে বলতে পারছি না, এখনও তিনি ঐখানেই আছেন কিনা। ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে উঠেই আবার বিকাশের খোঁজে পার্ক সার্কাসে চললুম। বেশ কিছু খোঁজাখুঁজির পর পার্ক সার্কাসের একটা নোংরা বাড়ীতে ওর ফ্ল্যাটের দরজার কড়া নাড়তে ও দরজা খুলে আমাকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ঘরে নিয়ে বসালে, তার পর একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললে, কিছু মনে কোর না ভাই, ঘরটা একটু অগোছালো হয়ে আছে। একটু হুইস্কি হবে? দেখলুম ঘরটা সত্যি ভয়ানক নোংরা। চারদিকে সিগারেটের টুকরো আর দেশী হুইস্কি ও ধেনো মদের বোতল ছড়িয়ে পড়ে আছে। বিকাশের চেহারাও এই তিন বছরে যেন দশ বছর বুড়িয়ে গেছে। ওর কোঁকড়া কালো চুল অর্দ্ধেকের উপর হয়ে গেছে শাদা। কিছুই ঠিক বুঝতে না পেরে সব জিনিষটাকে হাল্কা করার চেষ্টায় বোকার মত বলে ফেললুম, "ও ঠিক আছে, তবে এখন আর হুইস্কি নয়, বাদলার দিন, বৌদিকে বলো একটু সাঁতলা ভাজা আর চা দিতে।" বিকাশ যেন রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো, তারপর সামলে নিয়ে সে পাশের ঘরে কার উদ্দেশে ইংরেজীতে চেঁচিয়ে বললে, "দেখো, আমার এক বন্ধু এসেছে, শীগ্‌গির একটু চা কর।" পরদার ও-পাশ থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মেয়ের ঝাঁজালো গলায় ইংরেজীতেই উত্তর এলো, "ঘরে এক কৌটা দুধ নেই, আর চিনিও নেই একদম। ইচ্ছে হয় বাইরে গিয়ে চা খেয়ে এসো।" বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে যে বেরিয়ে এলো সে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা। তারও মুখ থেকে আসছে মদের গন্ধ। আমাকে দেখে তার কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হোল, সে যেন ভয়ানক লজ্জায় পড়লো। বললে, আই এ্যাম সরি, দুধ না থাকলেও কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে এখুনি চা আনছি। আপনি বসুন।" বিকাশ অপ্রতিভ ভাবটা একটু কাটিয়ে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল—"এই হচ্ছে ডঃ বোস, বেশির ভাগ সময় জাহাজেই থাকেন, আমার বাল্যবন্ধু আর এ হচ্ছে আইলিন।" মেয়েটির বিষয় সে আর কিছু বললে না। আমার জিগ্যেস করার সাহসও হোলো না। মেয়েটি চা করতে পাশের ঘরে চলে গেলে সে কোন রকম ভূমিকা না দিয়েই বলতে লাগলো, "ওঃ, সেই ছোটলোক মাগীর কথা আর বোল না। ভেবেছিলুম গরীবের মেয়ে, ভালোভাবে রাখলে সুখে থাকবে, তা না। বললে বিশ্বাস করবে না, আমার ভবানীপুরের বাড়ীর পেছনে একটা মেস ছিল, সেই মেস বাড়ীর আঠারো উনিশ বছরের একটা বেকার ছোঁড়ার সঙ্গে বারো চৌদ্দ হাজার টাকার সমস্ত গয়নাপত্তর নিয়ে একদিন উধাও। ছোটলোকের মেয়ে, এরা আর কত ভাল হবে?" মনে মনে ভাবলাম বেশি বয়সে ঐ ছেলেমানুষ মেয়েকে বিয়ে করার এই পরিণতি। তবু মেয়েটাই বা কি রকম! ছিঃ, ছিঃ! তবু কথাটা শুনে মনটা ভয়ানক মুষড়ে গেল। এই সময় আইলিন চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সে বিকাশকে বললে, ঘরে একটাও সিগারেট নেই। যাও বিকু, শীগ্‌গির এক প্যাকেট কিনে আনো। আমার কাছে সিগারেট ছিল, প্যাকেটটা দেখিয়ে সে কথা বললুম, তবু আইলিন যেন জোর করেই বিকাশকে সিগারেট আনতে পাঠালো। বিকাশ বেরিয়ে যেতেই আমি যে সিটেতে বসেছিলুম ও তাতেই এসে আমার গা ঘেঁষে বসলো। দেখি এর মধ্যেই সে ভুরুতে পেনসিল, ঠোঁটে লিপষ্টিক আর মুখে পাউডার লাগিয়ে বিগত যৌবনকে ফিরিয়ে আনবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। প্রায় আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললে, "তুমি এসেছো বলে আমার যে কি ভালো লাগছে তা কি বলবো। জাহাজী লোকদের আমার খুব ভাল লাগে। কিছুদিন আগে একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার ভীষণ বন্ধুত্ব ছিল, জানো। লোকটি বড় ভাল ছিল, সেও তোমার মতই ভালো ভালো সিগারেট খেত। তোমাকে ভারি সুন্দর দেখতে। দেখো তোমার বন্ধুকে বোলো না, কাল আমি চুপি চুপি খিদিরপুরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো, কিংবা আর যেখানে বলবে। বলো আমায় নিরাশ করবে না? এই নোংরা লোকটার পাল্লায় পড়ে আমার সমস্ত যৌবনটাই মাটি হতে চলেছে।"

ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল, কি যে করি ঠিক করতে পারছিলুম না। ভাবছিলুম বিকাশ এসে পড়লে বাঁচি। ভাগ্যিস এই সময় বিকাশ এসে পড়লো। ও বললে, "বেশ লোক তো, এখনও চায়ে

র দাওনি। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না? আইলিন, তোমরা কি ভদ্রতা রে আমার জন্য অপেক্ষা করছো?" কোন রকমে সেই প্রায়-ঠাণ্ডা টা শেষ করে একটা বাজে অজুহাত দিয়ে আবার আসবো বলে দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। দের সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি।

আমার জাহাজটি ছাড়তে কিছুদিন দেরি ছিল, তবু কর্তৃপক্ষকে অনেক বলে-কয়ে পরের দিন যখন অন্য এক পারস্যগামী জাহাজের সওয়ার হয়ে বসলাম তখন মনে হচ্ছিল ঐ উন্মুক্ত আকাশ আর সীমাহীন জলে কি বিরাট বিপুলের সমাবেশ। নাবিকের জীবনই যেন সবচেয়ে সুখের।

# পুতুলের ব্যথা

শ্রীগৌরগোবিন্দ সেন

খেলার নেশা ফুরলো তাই নেইকো আদর মা তোর কাছে,
মাছের মায়ের মায়াও বুঝি তোর চেয়ে মা বেশি আছে।
যেদিন মা তুই আমায় ফেলে গেছিস চ'লে শ্বশুর-ঘরে,
সেদিন হ'তেই আঁস্তাকুড়ে লুটোচ্ছি মা অনাদরে!
পুতুল ব'লেই যদি আমায় ফেলবি শেষে ঘৃণায় হেন,
দু'দিন তরে সজীব ক'রে স্নেহের পরশ দিলি কেন?
সেই অতীত শৈশবে তোর পুতুল নিয়ে খেলার ছলে
ছেলের খিদে জাগলো যখন অজ্ঞাতে, ঐ বুকের তলে;
পুতুল হ'লেও আমিই তখন কুসুম-কোমল পরশ দিয়ে
তোর ঐ বুকের তলায় থেকে ফল্গুধারা-স্তন্য পিয়ে,
মিটিয়েছি মা তোর যত সবুজ বুকের স্বপ্ন-ক্ষুধা।
এ-সব কথা সত্যি কি না—বারেক ভোলা-মনকে শুধা!
এখন যে-সব ছেলেমেয়ের মা হ'য়ে তুই মাতৃদেবী,
তারা যতই দিক না তোকে শান্তিধারা চরণ সেবি,'
আমি তাদের সবার বড়, আমিই মা তোর প্রথম ছেলে,
আশ্চর্য্যি এই—কেমন ক'রে আছিস্ ভুলে আমায় ফেলে!

* * * *

শৈশবে তোর নতুনতরো গেরস্তালীর কোন্ প্রয়োজন?
তবু যে তা পেতেছিলি—কর মা স্মরণ কে তার কারণ।
ছোট উনুন-খুন্তি-হাতা-হাঁড়ি-কড়ায় হেঁসেল পাতি,
সজনে পাতার তরকারি-মাছ, খোলামকুচির চড়ুইভাতি;
ভাব দেখি মা, এ-সব খাবার কোন্ ছেলেকে দিতিস বেঁধে;—
কার বিছানা-জামার বরাত মা-বাবাকে দিতিস সেধে?
স্তাকড়া-পাড়ের টুকরো পেলেই—কুড়িয়ে মোর অঙ্গে আঁটি,
মন ভুলাতে দিতিস হাতে ঝুমঝুমি আর চোষণকাঠি।
আমার নীরব কান্না যে তুই বুকের কানে শুনতে পেয়ে—
ছুটে এসেই দিতিস্ চুমো, 'খোকন ঘুমোও' গানটি গেয়ে।

* * * *

কভু আমায় ঠাকুর ক'রে ভক্তিভরে পুজো দিতে,
নিত্য নতুন খেলার খেয়াল কতই না তোর জাগতো চিতে।
সিঁড়ির পিঠে কয়লা-ইটে বসিয়ে ঐ বেদীমূলে,
গুড়-বাতাসা-কদ-কলায়, কালকাসিন্দে-কলমি-ফুলে।
কচুর পাতে শুচির সাথে ভোগের তরে ভ'রে ডালা,
পূজা আমার দিতিস যেন তপোবনের তাপস-বালা।
জলভরা শাঁখ—শুকনো শামুক; পঞ্চপ্রদীপ—মোমের বাতি,
কাশের ফুলে চামর ব্যজন করতো মা তোর সঙ্গী-সাথী।
তোর বয়সী ছেলেদের সব ঝুলতো গলায় কানাস্তারা,
ঢাকের বাদ্যি শুনে তাদের উঠতো মেতে সারা পাড়া।
কেউ বাজাতো ঢোল ও কাঁসি, কেউ বা টিনের বাঁশির সানাই—
আলাপচারী করতো যা মা, নেই নবাবের ন'বৎখানায়।
কেউ নীচুতে ত্রিশূল পুঁতে, মেখে ইটের সিঁদুর-ফোঁটা,
'জয় মা' ব'লে কাটতো পাঁঠা—কচুর ডাঁটা, আমালকোটা।
পুজোর শেষে বাধতো ফ্যাসাদ ভোগের প্রসাদ বিতরণে,
ভীড় জমাতো সঙ্গীরা সব একটু গুড়ের প্রলোভনে।

* * * *

ছাদনা-বাসর সাজিয়ে আর পাকা একটা গিন্নি সেজে
চুমকি-পুঁতির হার পরিয়ে—বরের মায়ের মতন তেজে,
মাথায় আমার কল্কে-ফুলের হলুদ-ছোপা টোপর দিয়ে,
সঙ্গিনীদের মেয়ের সাথে নিত্য আমার দিতিস বিয়ে।
মা, তোর শুভ স্নেহের আশিস্ চরণ-ধূলি মাথায় ধ'রে,
রাঙতা-ছিটের রঙিন জামায়, শাল-দোশালার সজ্জা ক'রে,
শোলার দোলায় চ'ড়ে তখন মশালধারী মিছিল ল'য়ে,
ক'নের বাড়ী যেতাম মাগো শঙ্খধ্বনির সমারোহে।
আমার বিয়ের বৌভাতে তুই অফুরন্ত ভাঁড়ার পেতে,
নেমন্তন্নে পর না গুণে,—পরগণাটাই দিতিস খেতে।
সুরকি-মাটির মুড়কি-বোঁদে, তেলাকুচো পাতার লুচি,
সবাই সমান ঢালাও খেতো—বামুন-কায়েত মেথর-মুচি।

* * * *

যার তরে তোর ছিল অমন ঘরকন্নার ঘনঘটা,
কেমন ক'রে ভুললি মা সে ছেলের স্নেহ-স্মৃতির ছটা?
কুমারী-মা'র বক্ষ জুড়ে আমিই ছিলাম একক ছেলে,
সত্যিকারের মা হ'য়ে আজ সেই ছেলেকেই দিলি ফেলে?
ধূলায় প'ড়ে কাঁদছি সদাই,—ভুলেও তবু নিস্ না সাড়া,
আমার পরে এলো যারা তাদের স্নেহেই আত্মহারা!
ডুবে আছিস দিবস-রাতি নতুন-পাতা সুখের হাটে,
ভাব দেখি এই মাতৃহারা কি ভাবে আজ জীবন কাটে!
আর কত কাল আঁস্তাকুড়ে কাঁদবো প'ড়ে,—আর ছুটে মা,
কোল দিয়ে তোর প্রথম ছেলের বুকের ব্যথা নিভিয়ে দে মা!

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অবিনাশ সাহা

## ১৫

ক'দিন থেকে গেন্থুর মেজাজ যেন সপ্তমে উঠে আছে। রহিমা কিছুতেই ওর নাগাল পায় না। কিছু বলতে গেলে খেঁকিয়ে ওঠে। ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না। আপন মনেই সময় সময় কি যেন বিড় বিড় করে বলে। খেপে গেলো কি ও? নিশ্চয় অতিরিক্ত নেশার কুফল। কিন্তু গাঁজা খাওয়া তো সত্যি ইদানিং ও কমিয়ে দিয়েছে। এক রকম খায় না বললেই হয়। লোকে তো বলে, অতিরিক্ত নেশা যারা করে তারা হঠাৎ তা ছেড়ে দিলে বিপরীত ফল হয়। মেনির বাবার কি তবে তাই হলো? ও অসুস্থ হয়ে পড়লে সংসার চলবে কেমন করে? বাড়ি-ঘর-দোরের যে কিছুই হলো না। জমিদারের কাছ থেকে এখনো দানপত্রের দলিল পাওয়া যায়নি। এরপর বরাতে কি আছে কে বলতে পারে?··· ইতস্ততঃ ভাবনায় ভেঙে পড়ে রহিমা। কি করবে ভেবে পায় না। মনে মনেই আবার ভাবে, গাঁজা ছাড়ার জন্যেই যদি মেনির বাবার এ দুর্গতি হয়ে থাকে তা হলে ও আবার তা আগের মতোই খাক। খোদার ইচ্ছায় এখন তো আগের চেয়ে ঢের ভাল আছে ওরা। জানের চেয়ে পয়সা বড় নয়। মেনির বাবা যেমন খুশী চলুক, ও বাধা দেবে না।

কার্তিকের বেলা—রহিমার হাতে অনেক কাজ। দুপুরের রান্না এখনো শেষ করতে পারেনি। বাচ্চাগুলো সমানে ভাতে ভাত খেয়ে দৌড়-ঝাঁপ করছে। আর একটু রোদ চড়লেই ছুটে আসবে পেটের খিদেয়। কি বলবে তখন ও ওদের? মুখের কথায় তো আর পেট ভরবে না!···রহিমা আর দাঁড়ায় না। বাঁশের নলে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়ানো উনুনটা জ্বালিয়ে দেয়। ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে ডালের কড়াটা চাপাতে যায়। কিন্তু হাত কিছুতেই ওঠে না। গেন্থু কোন্ সে সকালে বিছানা থেকে উঠে দাওয়ার ওপরে বসে আছে। খাওয়া তো দূরের কথা, হাতে-মুখে পর্যন্ত জল দেয়নি। দু'বার সাধতে গিয়ে শুধু তাড়া খেয়েছে ও। কি ভাবছে মেনির বাবা? গালাগালিই বা করছে কাকে? এ তো রীতিমতো পাগলের লক্ষণ। হায় হায়, শেষটায় কি পাগল হয়েই যাবে মেনির বাবা? ওর বরাতে কি এতটুকু সুখ নেই?···রহিমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে।

না না, নিরর্থক কাঁদবে না ও। যেভাবেই হোক, মেনির বাবাকে সুস্থ করে তুলবেই। ডালের কড়াটা কোন রকমে উনুনের ওপরে বসিয়ে দিয়ে আবার এসে গেন্থুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। কোন রকম সাড়া না পেয়ে চলে যায় ঘরের ভেতরে। এদিক-ওদিক চেয়ে বড় হাঁড়িটার ভেতর থেকে টেনে বার করে লুকানো কৌটোটা—সেখান থেকে আস্ত একটা রূপোর টাকা। হ্যাঁ, এটা ও গোটাই দেবে আজ মেনির বাবাকে। গাঁজা, দুধ, মিঠাই যা খুশী গঞ্জে গিয়ে কিনে আনুক ও। যতো ছিলুম খুশী বাড়িতে বসে খাক। আর ও বারণ করবে না। কেন করবে? ওর সুখেই তো ওর সুখ। ···টাকা হাতে রহিমা ফিরে আসে গেন্থুর কাছে। দরদভরা কণ্ঠেই সোহাগ জানায়। বলে, এই নেও, ওঠো। জ্ঞান চদ্রির দোকান এলা খুলচে। যাও, মোনের মতন জিনিস কিনা আনগা। কতদিন খাও না। শরীলডার মদ্দে সেই জন্যই বুঝি জুইত নাই—ওঠো!—বলতে বলতে সহাস্যে টাকাটা গেন্থুর হাতে গুঁজে দিতে যায় রহিমা।

গেন্থু এতক্ষণ নিজের খেয়ালে ছিল। রহিমার বেয়াদবিতে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। টাকাটা হাতে আসতেই ঝা করে ছুঁড়ে মারে ওর নাকের ডগায়। গলা ফাটিয়ে শুরু করে অশ্রাব্য গালাগাল।

রহিমা থ বনে যায়। এমন গালমন্দ বহুদিন ও শোনেনি। কিন্তু রাগে না। এবার ও ঠিক বোঝে, মেনির বাবা অনিবার্যভাবেই পাগল হয়ে গেছে। নাক ধরে বসে পড়ে। ক্ষতের জ্বালা থেকেও বুকের জ্বালা মোচড় দিয়ে ওঠে।

কিন্তু গেন্থুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বকে চলেছে তো বকেই চলেছে। ওর চীৎকারে বড় ছেলে হানিফ ছুটে আসে। বয়েস বারো তেরো। মার নির্দেশ মতো পাশের লঙ্কা ক্ষেত থেকে লঙ্কা তুলছিল। আর একটু বেলা হলে গঞ্জের বাজারে যাবে। দু' দশ পয়সা যা পায়, তা দিয়েই সংসারের তেল-নুন আনবে। নতুন গাছের ফসল মন্দ ফলেনি। দাওয়ায় পা দিয়েই হানিফ ভড়কে যায়। মার নাক দিয়ে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে। দু' হাত দিয়ে চেপে ধরেও রক্ত থামাতে পারছে না রহিমা। গোটা আঁচলটাই ভিজে গেছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে যায় হানিফের। কি করবে ভেবে পায় না। গেন্থু বড় বড় চোখ করে চেয়ে আছে যমের মতো। নিথর নিস্তব্ধ। তবু মার দুঃখে দু'পা এগিয়ে গিয়ে বাবাকেই শুধোয়, অ বাজান, আম্মার কি হইল? খুনে যে আঁচল ভাইসা গেল! ইদিকে আস না!···

কিন্তু গেন্থুর কানে সেকথা পৌঁছয় না। শুধু 'খুন' কথাটা কানে যেতেই আঁৎকে ওঠে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অনর্গল চেঁচাতে থাকে, না

যেখানে শুধু সেরা জিনিষই প্রিয়...
পরিবারের জন্য মায়েদের পছন্দ ডালডা

না, আমি খুন করি নাই। তরা পুলিশ ডাকিচ না। আমি খুন করি নাই—না না, ই আল্লা···বলতে বলতে ছুটে পালাতে যায়।

রহিমার মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। ইচ্ছা ছিল না উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু গেন্থুকে ছুটতে দেখে স্থির থাকতে পারে না। মুখের ওপর থেকে আঁচলটা সরিয়ে নিয়ে হানিফকে লক্ষ্য করে পাল্টা চেঁচাতে থাকে, অরে, তর বাজানরে গিয়া চাইপা ধর। হার মাথার ঠিক নাই। তড়াতড়ি যা, গাঙে ঝাঁপ দিলে আর রক্ষা নাই।···বলতে বলতে নিজেও ছুটে যায়।

হানিফ ভয়ে জড়সড়। পাগলকে ও বরাবরই ভয় করে। পাগল একবার ওকে ঢিল মেরে খতম করে দিয়েছিল আর কি। পায়ে না লেগে মাথায় লাগলে কিছুতেই সেদিন ও বাঁচতো না। তবু মার তাড়ায় না এগিয়ে পারে না। আকুল হয়েই বাবাকে ডাকতে থাকে, অ বাজান, খাড়ও—যাইয় না। অ বাজান—

কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়ানোর বদলে গেন্থু আরো জোরে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতেই ঘুরে এসে চালের বাতা থেকে কুড়োলটা টেনে নেয়। রুখে দাঁড়ায় সরোষে। ভয়াল ভীষণ মূর্তি। হানিফের সাধ্য নেই আর এগোয়। কিন্তু রহিমা ভয় করে না। রক্তমাখা আঁচলটা গায়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে যায়। বোধ হয় এক নিমেষে বাহুই করে ও গেন্থুকে। হাতের কুড়োল ছুঁড়ে ফেলে ওকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে গেন্থু। নিজের কোমর থেকে গামছাটা খুলে ওর মাকে চাপা দেয়। আরো কি করবে ভেবে পায় না। ব্যস্তভাবেই হানিফকে তাড়া দেয়, খাড়ইয়া খাড়ইয়া কি তামসা দেখবার নৈচ চ? তড়াতড়ি এক বদ্‌নি পানি লইয়া আয়। আম্মিরে কি মাইরা ফেলবি?

তাড়া খেয়ে হানিফ জল আনতেই ছোটে।

গেন্থু ততক্ষণে রহিমাকে কোলের ওপরে শুইয়ে দিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে থাকে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে। রুদ্ধ আবেগেই প্রশ্ন করে, তর খুব লাগচে মেনির মা?

গেন্থুর সোহাগে রহিমার সব ব্যথা নিমেষে জল হয়ে যায়। ইচ্ছা করে আরো খানিকক্ষণ ওর কোলের ওপরে শুয়ে থাকে। কিন্তু হানিফের পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি উঠে বসে। আস্তে করেই প্রশ্নের জবাব দেয়, বেশী কিছু হয় নাই। নরম জায়গা ত, তাই খুন বাইরইবার নৈচে।

নড়িচ না, একটু চুপ কইরা বস।—তারপর ঢোক গিলে আবার বলে, তুই আমারে সকালবেলাই গেঁজা খাওয়নের কতা কলি ক্যান্? জানচ না কত কষ্টে আমি ওডারে ছাড়বার লাগচি?—বলতে বলতে কণ্ঠ ভারি হয়ে আসে গেন্থুর।

গেঁজা কমাইয়াই ত তোমার ই-রকম হইল। দিন-রাইত গুম হইয়া বইসা থাক।

গেঁজা কমাইয়া না রে পাগলী, গেঁজা কমাইয়া না। দিন-রাইত আমার কৈলজার ভিতরডা তোলপার করে।

ক্যান, কি হইচে তোমার?

হা কতা আমারে জিগাইচ না। মোনে পড়লে আমার দোম বন্ধ হইয়া আসে। শয়তানের বাচ্চা—মুখের কথা শেষ করতে পারে না গেন্থু, হানিফ জলের বদনিসহ ফিরে আসে। তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে বদনিটা নিয়ে রহিমার ক্ষতস্থানটা ধুইয়ে দিতে থাকে।

আবেগে রহিমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। গেন্থুকে ও যেন নতুন করে পায় নিজের মধ্যে।

গেন্থু ধরা গলায় সান্ত্বনা দেয়, মেনির মা, কান্দিচ না। আমি আর তগ লগে পাগলামী করুম না। খোদার কাচে দোয়া মাগ।

কোন উত্তর দিতে পারে না রহিমা। নীরব কান্না এবার ফোঁপানীতে রূপান্তরিত হয়। কেন কাঁদছে তা হয়তো নিজেই জানে না ও।

গেন্থুও আর কথা বাড়ায় না। হানিফের আনা জল আর নেকড়ার সাহায্যে নীরবেই শুশ্রূষা করে যায়। ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নেকড়া দিয়ে বেঁধে দেয়। হয়তো নিজেও নতুন করে বাঁধা পড়ে রহিমার কাছে।

সেই থেকে সাধ্য মতো হালকা হয়েই চলতে চেষ্টা করছে। ছেলেমেয়ে কিংবা রহিমা কারো সঙ্গেই হেসে ছাড়া কথা বলে না। গঞ্জে গিয়ে দু' হাট কেনা-বেচাও করে এসেছে। তবু তারই ফাঁক ফাঁকে কখন যে ওর মুখখানা পাথর হয়ে গেছে তা ও টেরও পায়নি। রহিমা টের পেয়েও কোন কথা বাড়ায়নি। ও বুঝে নিয়েছে, নির্ঘাত মনোরোগেই ভুগছে মেনির বাবা। সুতরাং কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে সাধ্য মতো চিকিৎসা করে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। রহিমা সেদিকেই মন দেয়। কিন্তু কোন কূল পায় না। হিসেব মতো মাথার ব্যামোতে শরৎ কবরেজের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত। কিন্তু ওর অতো হাতে টাকা কোথায় যে কবরেজের কাছে যাবে? না না, তাই বলে ও হাল ছেড়ে বসে থাকবে না। যার কেউ নেই তার আছেন খোদাতালা। খোদাতালার দরবারেই ও মেনির বাবার জন্যে আর্জি পেশ করবে। আর সে দরবার বেশী দূরেও নয়। বাড়ির পাশেই চরফুটনগর—করিম ফকিরের আসন। খোদার নফর ছিলেন ফকির সাহেব। খোদার মর্জিতেই বেহস্তে গেছেন। কিন্তু আসন তাঁর এখনো বিদ্যমান। সে আসনের সামনে যে যা চাইবে খোদাতালা তাকে তাই দেবেন। ফকির সা সাহেবই এখন আসনের কর্তা। মাটির মানুষ—হেসে ছাড়া কথা কন না। লোকের উপকার করতে পারলে আর কিছু চান না। না না, কবরেজের কাছে যাবে না ও। সা সাহেবের দুয়ারেই আর্জি পেশ করবে। ধন-দৌলত কিছু ওর চাইনে। শুধু চাই মেনির বাবার সাবেক স্বাস্থ্য। দয়ালচান একটু দয়া ওকে করবেনই।···

রহিমা চুপে চুপেই একদিন খেয়া পার হয়ে চরফুটনগরে গিয়ে হাজির হয়। চোখের জল ছাড়া ওর আর কি সম্বল আছে যে দয়ালচানের চরণে নিবেদন করে? তবু আজ ও খালি হাতে আসেনি। ওর লাউ মাচায় মাত্র দুটো লাউই ডাগর হয়েছিল। ও সে দুটো লাউই দয়ালচানের ভোগের জন্যে সঙ্গে করে আনে। আর আনে পাঁচটা তামার পয়সা ও মোমবাতি। প্রথমে লাউ দুটো সা সাহেবের চরণের কাছে নামিয়ে রেখে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় আসনের কাছে। তারপর একটি একটি করে সবগুলো বাতিই নিজের হাতে জ্বেলে দেয়। বুকের পাঁচটা পাঁজরাই আহুতি দেয় গেন্থুর জন্যে। ও তো শুনেছে, মহাপাতকেই মানুষের ব্যাধি হয়। গেন্থু যদি তেমন কোন পাপ করে থাকে তাহলে দয়ালচান যেন ওকে মার্জনা করেন। আর যদি মার্জনা করা একান্তই সম্ভব না হয় তবে যেন উচিত শাস্তি ওকে দেন—গেন্থুকে

।।...বাতি জ্বালতে জ্বালতে চোখের জলে বুক ভেসে যায় রহিমার। টু গেড়ে বসে পড়ে আসনের সামনে। চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়।

সা সাহেব ওর মনোভাব বোঝেন। বুঝেই সান্ত্বনা দেন, কাঁদিসনে লক্ষ্মী। খোদা রসুলের দোয়া মাগ। সব জ্বালা দূর হবে। শান্তি পাবি।...

সা সাহেবের আশ্বাসে শান্ত হয়েই বাড়ি ফেরে রহিমা। আর ওর কোন ভয় নেই। ফকির সাহেব তেল আর জল পড়ে দিয়েছেন। এতেই ভাল হয়ে যাবে মেনির বাবা। নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে। খোদার দূত ফকির সাহেব। তাঁর কথা কখনো মিথ্যে হতে পারে না।...রহিমার মনোভার কেটে যায়।

ক'দিন বেশ ভালই আছে গেন্থ। নিয়মিত খাচ্ছে, নিয়মিত ঘুমোচ্ছে। কিন্তু রহিমা তবু নিয়মের অন্যথা করে না। রোজ সকাল-সন্ধ্যা পড়া-জল ও পড়া-তেল গেন্থর শিরে মালিশ করে যায়। এ ছাড়া দয়ালচানের নাম তো অষ্টপ্রহর স্মরণ করছেই। আর ক'টা দিন এভাবে কাটলে মানত করা সিন্নী চরকুটনগরে গিয়ে দিয়ে আসবে। এবং তখন আর একা নয়—গেন্থকে সঙ্গে করেই যাবে।

একের পর এক দিন গুণে চলে রহিমা। না, আর ওর কোন ভয়-ভাবনা নেই। এবার মেনির বাবাকে গঞ্জে পাঠাতে পারলেই হয়। নিজে গরজ করে না আনলে জমিদার কখনো গায়ে পড়ে এসে দানপত্র দেবে না। অবশ্য তার আগে চরকুটনগর থেকে ঘুরে আসতে হবে। দয়ালচান মুখ তুলে চাইলেই সব মিলবে, নয়তো নয়।...

ছোট বাচ্চারা সব দুপুরের ভাত খেয়ে ঘুমিয়েছে। হানিফ গেছে গঞ্জের হাটে। গেন্থও অনেকক্ষণ হয় খেয়ে নিয়েছে। রহিমা ওর বিশ্রামের জন্তে দাওয়ার ওপরে মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে। হুঁকো সেজে দিতেও ভুল করেনি। এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে মেনির বাবা। ক'দিন ধকল যাবার পর ফকির সাহেবের দয়ায় ইদানীং বেশ ঘুমোচ্ছে।...রহিমা নিশ্চিন্ত হয়েই ভাতের সান্‌কী নিয়ে বসে। খাওয়া হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে বড় ঘরের দাওয়ায় আসে। উদ্দেশ্য একটা পানের খিলি মুখে দিয়ে নিজেও এইবেলা একটু জিরিয়ে নেয়। এর পর তো আবার হামলা শুরু হবে।

কিন্তু মনের সাধ মনেই থাকে রহিমার। দাওয়াতে পা দিয়েই ধাক্কা খায়। মেনির বাবা তো ঘুমোয়নি। এ যে ঠিক সেই আগের ভাব! হাঁ করে বসে আছে গাছের দিকে চেয়ে। আবার ওর কি হলো? কিন্তু মুখে কোন প্রশ্ন করে না। তাড়াতাড়ি এক খিলি পান সেজে এগিয়ে দেয়।

গেন্থ নিরাসক্ত—কোন রকম সাড়া দেয় না।

শুষ্ককণ্ঠে রহিমা অনুরোধ জানায়, কি ভাবচ আবার? পান নেও।

গেন্থ মুখে কোন উত্তর দেয় না। যন্ত্রচালিতের মতোই হাত বাড়িয়ে পানের খিলিটা নেয়। এবং যন্ত্রচালিতের মতোই মুখে দিয়ে চিবোতে থাকে।

রহিমা নিজেও একটা খিলি মুখে দিয়ে প্রস্তাব করে, হাটবার, যাও না গঞ্জে গিয়া পোলাপানগ লেইগা কয়খান জিলাপী কিনা আনগা।

গেন্থ তবু কোন সাড়া দেয় না। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে।

কিন্তু রহিমা হাল ছাড়ে না। কিঞ্চিৎ আব্দারের ভঙ্গীতেই আবার চেঁচিয়ে ওঠে, বলি কথাডা কানে ঢুকল, না বইসা বইসা খালি ধলেশ্বরীর ঢেউ গণবা?

এবার গেন্থ চমকে ওঠে—পাশ ফিরে তাকায়।

ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে রহিমা বলে, যাও না, জ্ঞান চন্দ্রির দোকান থেইকাই না হয় একবার ঘুইরা আস। বাড়িতে বইসা শরীলডারে কিয়ের লেইগা খালি খালি মাটি করবার লাগচ?—কথা শেষ করে কিছুটা আয়ত্তের বাইরে চলে যায় রহিমা।

কিন্তু গেন্থ আজ আর সে কথায় চটে না। সত্যিই তো, কেন ও এমন করে ভেবে মরছে? বরাতে যা আছে হবে। মেনির মার কথা মতো আজ ও জ্ঞান চন্দ্রির দোকানেই যাবে। আগের মতোই কিনে আনবে পুরো এক ভরি গাঁজা। কলকের পর কলকে মৌজ করে খাবে। না না, আর ও একবর্ণও ভাববে না।...রহিমার ভাব দেখে ফিক করে হেসে ফেলে। হাসতে হাসতেই বলে, জ্ঞান চন্দ্রির দোকানে যামু, টেকা দিবার পারবি?

হেসে রহিমা বলে, কয় টেকা চাই তোমার?

বেশী না—একটা।

মুটে একটা?

ইস্, তর যে বড় টেকার গরম হৈচে! কোথায় পালি এত টেকা?

হ্যা খোঁজে তোমার কাম নাই, চাও তো বেশীও দিবার পারি।

তবে দে তুই টেকা।

চখ বুজ, ইদিকে তাকাইয় না।

আইচ্ছা, নে, আর কেরামতি দেখাইচ না।

রহিমা হাতে যেন স্বর্গ পায়। ছুটে ঘরের ভেতরে যায়। এবং নিজের গুপ্ত-কৌটো খুলে পুরো দুটো রূপোর টাকা তৎক্ষণাৎ এনে হাজির করে।

গেন্থ থ বনে যায়। নিষ্পলক নেত্রে খানিক তাকিয়ে থাকে রহিমার দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে টাকা দুটো নেয়। নিয়ে ভাবে, সত্যি কেন ও পলে পলে এভাবে মরবে? শমন তো শিয়রে দাঁড়িয়েই আছে। যে ক'দিন ভবে আছে ফূর্তি করে যাবে।...

ওকে নিরুত্তর দেখে রহিমা বলে, কিগ মিঞা, মাথা ঘুইরা গেল নাকি?

গেন্থ এবার হেসে ফেলে। বলে, টেকা দেইখা মাথা ঘুরে নাই। ঘুরচে তর ঠমক দেইখা।

আ আমার মরণ! বুইড়া বয়সে ঢং দেখ না! যাইবা নাকি যাও।

যা কইচচ, বাড়ি বইসা থাকতে আমার আর ভাল লাগে না।— বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় গেন্থ।

রহিমা বলে, দেইখ, পুরা দুইখান টেকারই যেন গেঁজা কিনা বইস না। পোলাপানগ লেইগা কিছু আইন।

তর লেইগা কিছু আনুম না?

আইন তোমার মোন যা চায়।

তর মোন কি চায়?

আমার মোন তো অনেক কিছুই চায়—তুমি কি তা দিবার পারবা?

কইয়াই ছাখ না পারি কি না।

মরদ কত বুঝা গেচে। এখন উঠবা নাকি ওঠ। জ্ঞান চদ্দরির দোকান বন্ধ হইয়া যাইবনে।

কচ কি? তবে আর তর লগে খালি খালি পেচাল পারুম না। পান-দোক্তা দুই পয়সার আনুমনে তর লেইগা।

না না, আমার লেইগা কিছু আনন লাগব না। পান-দোক্তা আমার আচে। পয়সা বাঁচে ত নিজের লেইগা একখান গামছা কিন। ই গামচা আর ভদ্দরলোকের ম্যালে বাইর করণ যায় না।

ভদ্দরলোক আবার কেরা আইল তর কাছে? দেখিচ, আমারে ম্যান ডুবাইচ না।—হাসতে হাসতে ছুট দেয় গেন্থ। পায়ে পায়ে খেয়াঘাটে এসে পড়ে। এবং স্বাভাবিকভাবেই সকলের সঙ্গে নৌকোয় ওঠে। দিব্যি হাসিখুশী। নিজে গায়ে পড়ে পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। অনেকে অবাক হয় ওর কথাবার্তায়। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কিন্তু না, গেন্থ আজ সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই কথা বলছে। পাগলামীর কোন লক্ষণ নেই। নৌকোর কেউ কেউ তবু কানে কানে ফিস ফিস করে। বলে, আরে, পাগল ঠিকই হয়েছিল। সা-সাহেবের জল-পড়ায় ভাল হয়ে গেছে। ফকির সাহেব যাকে দয়া করে তার কি আর কোন অসুখ থাকতে পারে? সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।···

গঞ্জে পৌঁছে সোজা জ্ঞান চৌধুরীর দোকানে যাবার কথাই ভেবেছিল গেন্থ। কিন্তু খেয়া থেকে নেমে মত পরিবর্তন করে। সূর্যের দিকে চেয়ে দেখে, রহিমা ওকে যে রকম তাড়া দিয়েছিল আসলে ততো তাড়া নেই। সূর্যাস্তের এখনো ঢের বাকি। তাই সর্বপ্রথম রাখাল গোঁসাইর ওখানে যেতেই মনস্থির করে। গোঁসাই তো দিব্যি ঘাপটি মেরে বসে আছে। কোন রকম সাড়াশব্দ নেই। কি মতলব এঁটেছে শয়তান কে জানে?··গাঁজার নেশা ফিকে হয়ে আসে। খেয়া থেকে নেমে সোজা গিয়ে ওঠে কালিমপুরের কাছারিতে। রাখাল তখন সবে দিবানিদ্রা ত্যাগ করে হুঁকো নিয়ে বসেছে। আমেজের সঙ্গে গোটা কয়েক টানও দিয়েছে। সহসা গেন্থকে দেখে ভূত দেখার মতোই চমকে ওঠে। ভেবে পায় না সত্যি গেন্থকে দেখছে, না মনের ভ্রান্তি। কিন্তু বেশীক্ষণ হাবুডুবু খেতে হয় না রাখালকে। গেন্থ ততক্ষণে সামনের টুলে এসে বসেছে। দু'চোখের দৃষ্টি ভাঁটার মতো।

নিজেকে সামলে নেয় রাখাল। যথাসাধ্য মোলায়েম করে কুশল প্রশ্ন করে। হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটা নামিয়ে গেন্থর দিকে এগিয়ে দেয়।

কিন্তু গেন্থ ভোলে না। মোলায়েমের বদলে কর্কশ স্বরেই বাধা দেয়, তামুক খাইবার সময় নাই মশয়। আমার পাওনাগণ্ডার কি হইল কন।

গেন্থর জবাব দেবার ঢং দেখে রাখালের ভাবনা বেড়ে যায়। নিজের মনেই ভাবে, নিজের সৃষ্ট দৈত্য কি শেষটায় ওর নিজেরই ঘাড় মটকাবে? না না, এতো সহজে ভেঙে পড়লে ওর চলবে না। ছলে-বলে-কৌশলে ডাকাতটাকে আয়ত্তে রাখতেই হবে। রাখাল রসনায় রস রেখেই জবাব দেয়, তোকে খুব রুক্ষ মনে হচ্ছে গেন্থ! বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে এলি নাকি?

ও সব চলাইনা কথা থোও মশয়। যা কইবার সোজা কইয়া কও।

সোজা কথাই তো বলছি ভাই। তোর যা পাওনাগণ্ডা আমার বাক্সেই আছে। চাস তো এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে বোস। গোটাকতক কাজের কথা আছে।

ইয়ার পরেও কাজের কথা আচে!—প্রশ্নের সঙ্গেই জবাব দেয় গেন্থ।

বিলক্ষণ, তুই বলিস কি! কাজ তো সবে শুরু হয়েছে। ভেবে দেখ, তোর এতগুলো ছেলেপুলে। বাড়ি-ঘর-দোরের স্থির-স্থিরতা না হলে কি দিয়ে কি করবি?

বাড়ি-ঘর-দোরের লোভ আর আপনে আমারে দেখাইয়েন না গোঁসাই। ঐ লোভেই আমার সব শান্তি উইরা গেচে। আমি না পারি খাইবার, না পারি ঘুমাইবার। চখ চাইলেই চাইর দিক জুইড়া দেখি রক্ত আর রক্ত! গোঁসাই—

চুপ চুপ, ও-কথা মুখে আনিসনে। তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

না, এখনও তা হই নাই। তবে শীগ্‌গিরই হমু। কিন্তু তার আগে আমার পাওনাগণ্ডা সব বুইঝা চাই।

সব পাবি। দরকার হয় এক্ষুনি নিয়ে যা। কিন্তু গোলমাল করে কি লাভ হবে বল? ফাঁসীর দড়ি কি স্বেচ্ছায় গলায় পরতে চাস?

ফাঁসীর দড়ি রোজ আমারে ডাকে গোঁসাই—রোজ রাত্রে। নবীন চদ্দরির দুইডা বড় বড় হাত আমার দিকে ধাইয়া আসে। আমারে গলা টিপা মাইরা ফেলবার চায়। গোঁসাই, ই আমার কি হইল কন্?

তুই এতটা দুর্বল, আমি তা ভাবতে পারিনি।

ভাববার আমিও পারি নাই। খুনখারাবি জীবনে কম করি নাই। কিন্তু ই রকম কোন দিন হয় নাই।

এটা তোর মনের রোগ। কিন্তু ভেবে দেখ, কি অন্যায় আমরা করেছি! জীবনে তো কম খাটাখাটুনি করলি না। কিন্তু কি পেলি?

কিচুই পাই নাই গোঁসাই—কিচুই না। ওবার আপনাগ লেইগা ফাটকে গেলাম। কত্তা আচিল, আপনারা আমার পোলাপানগুলারে দেখবেন। কিন্তু ফাটকে বইসাই শুনলাম, দেখা ত দূরের কথা, আপনারা অগ দূর দূর কইরা খেদাইয়া দিচেন। ইচ্ছা হইল, ফাটক পলাইয়া আপনাগ খুন করি। কিন্তু কিচুতেই নিস্তার পাইলাম না। লোকে কয়, তবু আমি খুনী, ডাকাত, চোর।···
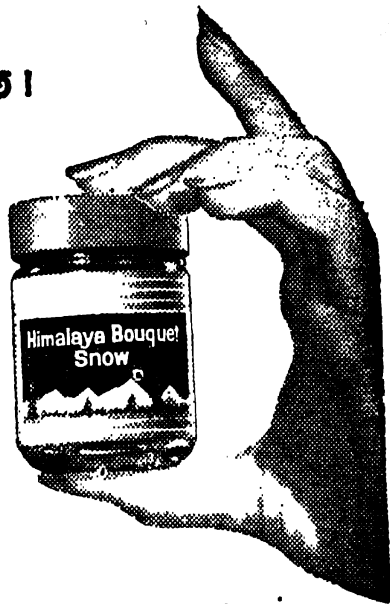
তোর কথা সবই ঠিক। কিন্তু আমার তো কোন উপায় ছিল না। আমার হাত-পাও তোর মতোই বাঁধা ছিল। শুধু তোর আর আমার কেন, যারা গরীব তাদের প্রত্যেকের হাত-পাই ওদের কাছে বাঁধা। আর এ বন্ধন জোর করে ছিঁড়তে না পারলে কোনদিনই আমাদের মুক্তি নেই। ভেবে দেখ, আমরা তো একটাকে কোতল করেছি এবং নিরুপায় হয়েই তা করেছি। কিন্তু ওরা তোর-আমার মতো কত লোককে খতম করে ওদের ঐ ঐশ্বর্য লাভ করেছে বল তো?

গোঁসাই—

আমি মিছিমিছি তোকে উত্তেজিত করছিনে গেহু। ঐ চরফুট-নগরের কথাই ধর। শুকনো বালির টিপি ছিল। নিজে গায়ের রক্ত জল করে গড়ে তুললাম। কিন্তু কি পেলাম? শুধু লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। বালির টিপি যখন লক্ষ্মীর ঝাঁপি হলো, তখন বাবু এসে কায়েম হয়ে টাটে বসলেন। কার ঝি, কার বউ, কার বুকে বাঁশ ডলাই—কিছুই বাদ গেলো না। অথচ ছুটো টাকা মাইনে বাড়াতে বললে দাঁত খিঁচুনী ছাড়া কিছু পাইনি। ওরা যদি মানুষ খুন করে তার গায়ের রক্ত দিয়ে নিজেদের ইমারত গড়তে পারে, তবে আমরা ওদের ক্ষমা করবো কেন?

গোঁসাই, আপনারে সেলাম—বহুৎ বহুৎ সেলাম। টেকার আমার দরকার নাই। আপনে যা কইবেন, আমি তাই করুম।

সাবাস, এই তো চাই। শোন, চর তোর—গঞ্জ আমার। কিন্তু চাইলেই তো আর তা পাওয়া যায় না। একটা কাঁটা দূর হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো ছুটো বাকী। মানবেন্দ্রনাথ আর যশোদা মজুমদারকে নিকেশ করতে না পারলে কিছুতেই আমরা এগুতে পারবো না।

হইয়া যাইব। সব বেটারে আমি একাই খতম করুম। আপনে খালি আমারে পথটা বাতলাইয়া দিবেন।

পথ ঈশ্বর বাতলিয়ে দেবেন। এতদিন ওরা সুখ করেছে, এবার আমাদের পালা। চুপ কর, হরে বেটা আসছে। এসব কাজে দেয়ালকেও বিশ্বাস নেই। আপাততঃ এই একশ টাকা রাখ—বলতে বলতে হাতবাক্স খুলে একশ টাকার একখানি নোট গেহুর হাতে গুঁজে দেয় রাখাল। হরিকে দূর থেকেই তাড়া দেয় তামাক দেবার জন্যে।

জীবনে একশ টাকার নোট চোখে দেখলেও হাত দিয়ে কোন দিন স্পর্শ করার সুযোগ পায়নি। গেহু উল্লাসে নিজেকে সামলাতে পারে না। অজ্ঞাতসারেই চেঁচিয়ে ওঠে, একশ টেকা!

আরো পাবি—এ তো সামান্য। কিন্তু চেঁচাচ্ছিস কেন? আস্তে কথা বল। হরে শুনতে পাবে।

কন ত শালারে এখনই খতম কইরা দেই।

না না, এসব মশা মেরে হাত কালি করতে হবে না। প্রয়োজন হলে—মুখের কথা শেষ করতে পারে না রাখাল। হরি কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে হাজির হয়।

গেহু থতমত খেয়ে যায়।

কিন্তু হরিকে এবার আর তাড়াতে হয় না। কলকেটা রাখালের হাতে দিয়েই ও সরে পড়ে।

রাখাল একটু দম নিয়ে কলকেটা গেহুর দিকে এগিয়ে দেয়।

বাধা দিয়ে গেহু বলে, সেকি দেবতা, আগে আপনে সেবা করেন।

আমার আর দরকার নেই, তুই খা।

গেহু এরপর আর কথা বাড়ায় না। সত্যি ওর তামাকের তেষ্টা পেয়েছে। কলকেটা ছু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে জোরে জোরে টানতে থাকে।

ঝোপ বুঝে রাখাল কোপ মারে, আমি ভাবছিলাম আজকেই তোর ওখানে যাবো। চর তো অনেকটা জেগেছে। এবার ধীরে ধীরে দখল নিতে হয়।

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে গেহু উত্তর করে, ও দখলের লেইগা ভাইবেন না। মনে করেন ও জমি আমাগ হইয়াই গেছে।

কাজটা অতো সহজ নয়। মানবেন্দ্র নাথের শ্যেন দৃষ্টি রয়েছে। কোন্ ফাঁকে ঢুকে পড়ে বলা যায় না।

তাইলে অর বৌও বিদ্‌বা হইব জানবেন। গেহু ত্যাক্ তার হাতের কুড়াল এখনো গাঙে ফেইলা দেয় নাই।

অষুধে কাজ হয়েছে দেখে রাখাল কথার মোড় ঘোরায়, চুপ—চুপ, আস্তে কথা বল। পাঁচটা বাজে, জ্ঞানবাবুর দোকান কিন্তু—

মুখের কথা শেষ করতে পারে না রাখাল, গেহু লাফিয়ে ওঠে, কন কি! তাইলে চট কইরা একবার ঘুইরা আসি। কি খাইবেন কন? কাঞ্চনী ঘোষের দোকান থেইকা লালমোহন—

আরে না না, আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না। তুই তোর ছেলেপুলের জন্যে যা মন চায় নিয়ে যা। আমি তোকে ভিটির ওপরে পাকা-পোক্তভাবে বসিয়ে দিতে পারলেই খুশী হবো।

গেহু সে কথায় কান দেয় না। মিষ্টির জন্যে আবারও পেড়াপীড়ি করতে থাকে।

রাখাল নিরুপায় হয়ে পট পরিবর্তন করে, বেশী বাড়াবাড়ি করিসনে, মনে রাখিস, পুলিশ এখনো ফিঙে হয়ে লেগে আছে। বাগে পেলেই—

সহসা পুলিশের নাম শুনে আঁৎকে ওঠে গেহু।

রাখাল সেদিকে লক্ষ্য করে সাহস সঞ্চার করে, ভয় নেই—তবে সতর্ক থাকা উচিত। যা কেনাকাটার আছে, তাড়াতাড়ি কিনে নিয়ে বাড়ি চলে যা। আমি খবর না দিলে আর এ-মুখো হোসনে।

গেহু আর কথা বাড়াতে সাহস করে না। মুখ চুণ করে উঠে পড়ে। সহসা কে যেন ওর মগজে আস্ত একটা কাল কেউটে ছেড়ে দেয়। অবিরত ছোবল দিতে থাকে সে কাল-সাপ। যে চিন্তা ও ভুলে গিয়েছিল সে চিন্তা আবার ওকে কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে। চারদিক জুড়ে ফাঁসীর দড়ি লকলক করছে। না না, একি ভাবছে ও! এতো ভয় কিসের? হয় মরবে আর নয় তো করবে। মাঝখানে অন্য কোন কথা নেই। নবীন চৌধুরীর ভাগ্য নবীন চৌধুরীকে টেনে নিয়েছে। এতে ওর কোন অপরাধ নেই। ও নিমিত্ত মাত্র। আর এ তো প্রকৃতির নিয়ম—সবলের মুখের গ্রাস ছুর্বল। বাহুবলে শত্রুকে জয় করেছি, বাহুবলেই আরো এগিয়ে যাবো। চর পাবো—জমিদারী পাবো—খোদার দোয়া হলে একদিন গোটা গঞ্জই হাতের মুঠোয় এসে যাবে। আসলে শক্তি আর সাহসই সব। কেন ভয় পাবো? মরতে যদি হয়ই পুরুষের মতোই মরবো।···পথ চলতে চলতে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে গেহু। ফূর্তিতে পায়ের পর পা ফেলে হাজির হয় এসে জ্ঞান চৌধুরীর দোকানে। কোন রকম দ্বিধা না করে ট্যাক থেকে একশ টাকার নোটটা বার করে জানালা দিয়ে গলিয়ে দেয়। পুরো এক ভরি গাঁজা চাই ওর।

জ্ঞান চৌধুরী তখন নিজে দোকানে ছিলেন। সারা দিনের হিসেব মিলিয়ে দোকান বন্ধ করারই তোড়জোড় করছিলেন। গেহুর তাগিদে চোখ বিস্ফারিত করে তাকান। ভেবে পান না সত্যি গেহুই নোট হাতে দাঁড়িয়ে, না গোধূলির আবির রাগে খোয়াব দেখছেন ?

কিন্তু গেহু ওকে বেশীক্ষণ দম রাখতে দেয় না। নিজের স্বভাব-সুলভ ভঙ্গীতে আবদার জানায়, বেশী দেরী হয় নাই কত্তা, মেহেরবাণী কইরা দিয়া দেন এক ভরি।

দেরী আদৌ হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ের এখনো পাঁচ মিনিট বাকী। ভাবনা শুধু নোটটা নিয়ে। পুরো একটা একশ টাকার নোট! ডাকাতটা পেলো কোথায় ? হালে তো আশে-পাশে কোন ডাকাতির নজির নেই! তবে ?

ওকে ইতস্তত: করতে দেখে গেহু আবার তাড়া দেয়, কি হইল কত্তা—এতদিন পর আইলাম ?

জ্ঞান চৌধুরীর এবার ঘোর কাটে। গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখেই সাড়া দেন, একশ টাকার ভাঙানী তো হবে না ভাই।

আরে, তার লেইগা আবার ভাবনার কি আছে ? যা থাকে জান, বাকীটা কাইল নিমু।

উঁহু, সরকারী ক্যাশ—আগাম জমা রাখার আইন নেই।

ইয়ারে আবার আগাম জমা কন নাকি আপনে ? নগদ পয়সা তো আর কোনদিন ফেরত চামু না—পর পর মালই খাইয়া যামু। জান তড়াতড়ি।

কিন্তু—

আরে ধুৎতর মশয় কিন্তু। দিবার হয়ত জান, নয়ত না করেন।

রাগ করিসনে, দেবো তো তোকে নিশ্চয়—শুধু ভাবছি খাতাপত্রে কি করা যায়। আচ্ছা একটু দাঁড়া, দেখি ভেতরে কত টাকা আছে।—বলতে বলতে তাল সামলাবার জন্যে বাড়ির ভেতরে চলে যান। যেতে যেতে ভাবেন, টাকার ভাঙানী তো বাক্সেই রয়েছে, এখন প্রশ্ন, এ নোট রাখা উচিত হবে কি না।—জ্ঞান চৌধুরী কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। তবু ঠিক করেন, নোটটা রেখে চাহিদা মতো গাঁজা দিয়ে দেবেন এবং আজকেই পুলিশকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখবেন।···

তাই করেন জ্ঞান চৌধুরী। পুরো এক ভরির একটা পুরিয়া ও অবশিষ্ট সমস্ত টাকা গেহুকে দিয়ে দেন।

পুরিয়াটা হাতে পেয়ে গেহুর আনন্দ ধরে না। জ্ঞান চৌধুরীকে আদাব জানিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে দেয় মিষ্টির দোকানের দিকে। তারপর পছন্দমতো কেনাকাটা করে রওনা হয় বাড়ির উদ্দেশে। কোন রকম ভয়-ভাবনা নেই।

মনের আনন্দেই ছুটে চলছিল, সহসা কেমন করে যেন পা দুটো থেমে যায়। চেয়ে দেখে দেওয়ান বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। বাড়ির ভেতরে কে যেন বিলাপ করে করে কাঁদছে। করুণ মর্মভেদী। কান খাড়া করে খানিক অপেক্ষা করে। একটু থেকেই বুঝতে পারে দেওয়ানের মা-ই কাঁদছে, কিন্তু কি হলো বুড়িটার ? ওর ছেলের তো এখনো ফাঁসীর হুকুম হয়নি। মাত্র তো পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। এতেই এতো কান্না ?···রাস্তার উল্টো দিকে তাঁতিদের শান-বাঁধানো রোয়াক। সেখানে বসেই বুঝতে চেষ্টা করে ব্যাপারটা কি। চেনা কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করে নিতেও পারতো।···

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয় উৎরে গেছে। চারদিক জুড়ে ঘন অন্ধকার। গ্রামের পথ নিস্তব্ধ। কতক্ষণে কে আসবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার চেয়ে নিজে বাড়ির ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই সব ঝামেলা চুকে যায়। দেওয়ানের মা ওর পরিচিতই। বাড়ির সকলেই এক রকম ওকে জানে।···ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ায় গেহু। কয়েক পা এগিয়েও যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার নতুন করে ভাবনা আসে। —গোঁসাই তো বলেছে, অষ্টপ্রহর কেউ পেছনে লেগে আছে। শেষটায় কি নিজে গায়ে পড়ে ধরা দেবে ? না না, তা হতে পারে না। রহিমার মনে অনেক সখ-আহ্লাদ। এ পর্যন্ত তার কিছুই পূর্ণ হয়নি। দেওয়ান নিজের কপালদোষে ধরা পড়েছে। এতে ওর কিছু করার নেই। ওর নিজের জীবনেও এ-রকম বহুবার ঘটেছে। সব ভাগ্য। ভাগ্যদোষে দেওয়ান যদি ঝুলে যায় তা হলে ও কি করতে পারে।··· ভাবতে ভাবতেই আবার ঘুরে দাঁড়াতে যায়।

এমন সময় পেছন থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে, কে ওখানে দাঁড়িয়ে ?

আচমকা কণ্ঠস্বরে প্রথমটা আঁৎকে ওঠে গেহু। তারপর সঙ্গে সঙ্গে তাল সামলিয়ে চোখ তুলে তাকায়। তাকিয়েই বোঝে, মহেন্দ্র দফাদার। নিজের হাতের লণ্ঠনের আলোই মহেন্দ্রকে চিনিয়ে দেয়। গেহুর মাথায় খুন চাপে—নিশ্চয় শালা ফেউ। হয়তো গোড়াগোড়িই পেছনে লেগেছে। তাই প্রশ্নের জবাবে ফুঁসে ওঠে, তর বাবা শালা।

মহেন্দ্র প্রথম বুঝতে পারেনি গেন্থু দাঁড়িয়েছিল। তাই এ রকম জবাবের জন্যও প্রস্তুত ছিল না। পুলিশের চাকরি না করলে হয়তো প্রতি-জবাবে হাতের বল্লমটাই ডাকাতটার পেটে বসিয়ে দিতে ও। কিন্তু এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। বরং কৌশলে ওর চটবার কারণটা জানতে পারলে একটা সুযোগ আসতে পারে। সত্যিই তো, এ সময়ে ও দেওয়ান বাড়ির ফটকে কেন? দেওয়ান কি ওকে দিয়েই কাজ হাসিল করিয়েছে? হ্যাঁ, তাই হবে। হয়তো কাজের উপযুক্ত মজুরী পায়নি বলেই প্রতিশোধ নিতে এসেছে। দেখা যাক ব্যাপারটা কি।···

ক্রোধের বদলে মুখে হাসি ফুটিয়েই এগিয়ে যায় মহেন্দ্র। হাসতে হাসতেই বলতে থাকে, রাগ করলে নাকি গেন্থু ভাই? তুমি দাঁড়িয়েছিলে আমি বুঝতে পারিনি। ভাবলাম, কে-না-কে—

মুখের কথা শেষ করতে পারে না মহেন্দ্র, গেন্থু বাধা দেয়, খাড়ইয়া থাকবার আবার তুমি কখন দেখলা? বাড়ি যাইবার নৈচিলাম কান্দন শুইনা একটু খাড়ইলাম।

মহেন্দ্র এবারও সংযত হয়েই উত্তর দেয়, তা তো দাঁড়াবেই ভাই, দেওয়ানের ছোট ছেলেটা মরণাপন্ন—রক্ত আমাশা।

কও কি দফাদার?

হ্যাঁ ভাই, বেচারারা বড্ডো ফেরে পড়েছে। দেখাশুনো করার লোকের অভাবে। ভাল চিকিৎসা হচ্ছে না বাচ্চাটার।

ক্যান, চদরি বাড়ির তারা কেউ আসে না?

চৌধুরী বাড়ীতে আর এখন কে আছে বলো? গিন্নীমা তো পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে শয্যা নিয়েছেন। বড় ছেলে কলকাতা থেকে পড়ে। শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে যাবার পর সেও চলে গেছে। দেখলে একমাত্র দেখতে পারে রাজেন দত্ত মশায়। তা তিনি তো—

না, ও বেটা কাউরে দেখব না। অরে আমি চিনচি। ও একটা আস্তা কুত্তার জাত। ও খালি কামড়াইবারই পারে—কাউকে কোন রকম আসান দিবার পারে না।

বড়লোকের কথা আমরা কি বলবো ভাই? আচ্ছা চলি—সামনে অন্ধকার, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও।—বলতে বলতে পথ ধরে এগিয়ে যায় মহেন্দ্র। হয়তো আড়ালে থেকে ওঁত পাতবারই মতলব করে।

গেন্থু আপত্তি করে না। ওর সরল মনে তখন ঝড় উঠেছে। বলছে কি মহেন্দ্র! দুধের মতো কচি ছেলেটা দেওয়ানের বিনা চিকিৎসায় মরবে! টাকার অভাবেই যদি ওদের এ হাল হয়ে থাকে তাহলে তো এখনো ওর হাতে নব্বুই টাকা রয়েছে। ওর কাশেমেরও তো এই হাল হয়েছিল। তিন দিনের ওলাওঠা—টাকার অভাবে রহিমা কোন ডাক্তার-কবরেজ ডাকতে পারেনি। শালা রমেন্দ্রনারায়ণ চক্রান্ত করে জেলে পাঠালো। ওর হয়ে দাঙ্গা করলাম—পাঁচ সাতটা লাস পড়লো অথচ বিপদের সময় রহিমাকে একটা ফুটো পয়সা দিয়েও সাহায্য করলো না। শালা বেইমানের জাত। নিজেদের সুখ ছাড়া অন্যের সুখ-দুঃখ বোঝে না। কিন্তু দেওয়ানের মাকে টাকা দিতে গেলে কি সে তা নেবে?···মনের ঝড় গেন্থুকে বিহ্বল করে ফেলে। কি করবে ভেবে পায় না। আবার এসে তাঁতি বাড়ির রোয়াকে বসে। ওর বুকের মধ্যে কাশেমই যেন রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। দেওয়ানের মার কান্না অসহ্য। সেই থেকে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে বুড়িটা। কাঁদছে ওর ছেলের জন্যে, নাতির জন্যে। এক কোঁটা ছেলে বাবার বায়না ধরেছে। কিন্তু কোথায় ওর বাবা? সে তো ওর জন্যেই হাজতে পচছে। না না, এ হতে পারে না···বসেছিল গেন্থু, পাগলের মতোই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। হাতের মিষ্টির হাঁড়িটা কখন পাশে রেখেছিল আর কখন তা দুটো নেড়ী কুকুর চেটেপুটে খেয়ে গেছে ও টেরও পায় না। খালি হাতেই ছুটতে থাকে খেয়াঘাটের দিকে। পথে কাশেমের প্রেতাত্মা অবিরত হুল ফোটাতে থাকে, আব্বাজান, মলাম। একটু জল দাও, পেট জ্বলে যাচ্ছে—একটু অষুধ।

খেয়া তখন সবে ওপার থেকে এপারে এসে ভিড়েছে। ঘাটে আর কোন যাত্রী নেই। কিন্তু গেন্থুর তর সয় না। একা ওকে পার করে দেবার জন্যেই জেদ ধরে। মাঝি কাঁপরে পড়ে। কি করবে ভেবে পায় না, গেন্থুকে ভাল করেই চেনে। কুড়ালটা আজ কাঁধের ওপরে নেই ঠিক। কিন্তু বলা যায় না, পাটাতনের একটা কাঠ তুলেই না মাথার ওপরে বসিয়ে দেয়। মাঝি নৌকো ছাড়তেই যায়। কিন্তু গেন্থু আর দম রাখতে পারে না। নৌকোয় উঠেই বিকট ভাবে ফেটে পড়ে, কাশেম, খাড় বাজান। আমি ডাক্তার লইয়া আসচি—খাড় বলতে বলতে নৌকোর ওপরেই ভিরমি খেয়ে পড়ে। ততক্ষণে অন্যান্য যাত্রীরা এসে জড় হয়েছে। একজন মুখের দিকে চেয়ে মন্তব্য করে, ই মিঞা তো বহুৎ দিন থেইকাই মাথার বেমতে ভুগচে—নতুন কিছু না। মাথায় পানি দেও।···

গেন্থুর পথ চেয়েই দাওয়ার উপরে বসেছিল রহিমা, লণ্ঠন হাতে পাঁচ সাতজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখে আঁৎকে ওঠে। ওরা তো কাকে যেন পাঁজা কোলে করেই এদিকে আসছে। তবে কি—ভাববার অবকাশ পায় না রহিমা সকলে মিলে গেন্থুকে এনে দাওয়ার উপরে নামিয়ে দেয়। মূর্চ্ছা অবশ্য ভেঙেছে ওর কিন্তু কেমন যেন ধন্দ ধরে আছে। মুখে কোন কথা নেই। চোখের দৃষ্টি উদাস।

রহিমার আবার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। এতদিন বেশ ভালই ছিল মেনির বাবা, কেন ও মরতে ওকে গঞ্জে পাঠালো? কি হলো আবার ওর সেখানে গিয়ে?···নিরুপায় রহিমা অগতির গতি দয়ালচাঁদকেই স্মরণ করে। সা-সাহেবের দেওয়া জল-পড়া চাঁদিতে ঠাসতে থাকে। বুকে পিঠে মালিশ করে যায় তেল-পড়া।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। চর নিস্তব্ধ। কার্তিকের হিমেল হাওয়ায় গা শিরশির করছে। বাচ্চাগুলো মেঝের ওপরে সার সার শুয়ে আছে। অসাড়েই ঘুমোচ্ছে ওরা। ঘুম নেই শুধু রহিমার চোখে। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে গেন্থু চোখ বুজে থাকলেও জেগেই আছে। সময় সময় বিড় বিড় করে বকেও যাচ্ছে। রহিমার বুক কাঁপতে থাকে। ভেবে পায় না কেন এমন হলো মেনির বাবার। আজীবন তো ওরা দুঃখ কষ্ট সয়ে আসছে—মেনির বাবা নিজেও কম ধকল সয়নি। কিন্তু তার জন্যে কোন দিন তো ভেঙে পড়েনি! বলতে গেলে এখন ওরা সুখের নাগালই পেয়েছে। এবং সামনে আরো সুদিনের সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে। তবু কেন এমন হাল হলো ওর?··· ইতস্তত ভাবনায় খেই হারিয়ে ফেলে রহিমা। গেন্থুর বুকে পিঠে তেল মালিশ করছিল, হাত আপনা থেকেই থেমে যায়। ইচ্ছে হয়, নিরিবিলিতে ওকে প্রশ্ন করে জানে কেন এমন হলো। কিন্তু ফুরসৎ পায় না। কোলের বাচ্চাটা কোল থেকে চেঁচিয়ে ওঠে। হয়তো দুধের তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছে খুদেটার। কিন্তু ও এ ভাবে

চেঁচালে সে মেনির বাবার তন্দ্রাটুকুও টুটে যাবে।···রহিমা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ছেলের পাশে শোয়। হাত দিয়ে ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ছেলে শান্ত হতে না হতেই গেছু লাফিয়ে ওঠে। উন্মাদের মতোই গজরাতে থাকে, মরল—মরল, ছাওয়ালডা বিনা চিকিৎসায় মরল। কাশেম—বাজানরে—

ছেলেকে রেখে রহিমা আবার ছুটে আসে গেছুর কাছে। উদ্বেগ আকুল কণ্ঠেই শুধোয়, তুমি আবার উঠলা ক্যান্? পোলাপানে কি কান্দে না—না কান্দলেই মইরা যায়! শোয়—আর জ্বালাইয় না।···

কিন্তু গেছুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের খেয়ালেই চেঁচাতে থাকে, ভয় নাই দেওয়ানজী, আমি থাকতে তোমার ছাওয়াল বিনা চিকিৎসায় মরব না। তুমি আমারে মাপ কর। আমি এহমি যাইতেছি—ভয় নাই।···

কি হইল তোমার? পাগল হইলা নাকি? কেরা বিনা চিকিৎসায় মরব?—রহিমা গলার স্বর চড়িয়েই বাধা দেয়।

এবার বোধ হয় হুঁশ হয় গেছুর। ফ্যালফ্যাল চোখে খানিক তাকিয়ে থাকে রহিমার দিকে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে, পাগল হইলে ত বাঁইচা যাইতাম রে মেনির মা। খোদায় আমারে পাগল ত করে না। আমাগ লণ্ঠনডা কোথায় রাখচ? তড়াতড়ি আগাইয়া দে—আমি গঞ্জে যামু।

গঞ্জে যাইবা! এত রাইত্রে কেরা তোমারে পার কইরা দিব? কি হইল তোমার?

কেউ না দেয় আমি গাং সাঁতরাইয়াই যামু—তুই তড়াতড়ি কর, ছাওয়ালডা যে মইরা যায় খাড়াইয়া রইলি ক্যান—লণ্ঠনডা আন?

রহিমা থ বনে যায়। কি করবে ভেবে পায় না।

গেছু আবার তাড়া দেয়, কি দিবি না! আইচ্ছা আমি আন্ধারেই যাইবার পারুম,—বলতে বলতে রহিমার নিকট থেকে হাত ছাড়িয়ে ছুটতে যায়।

এমন সময় ধলেশ্বরীর একটা বিরাট চাপ ধ্বসে পড়ে। পাড় ভাঙার সে শব্দে শিউরে ওঠে গেছু। মনে হলো রাক্ষুসী ধলেশ্বরী যেন ওর পাঁজরার একটা হাড়ই খুবলে খেলো। এবার ওকেও গোটাটা গিলবে।

রহিমা পেছন থেকে ছুটে গিয়ে জাপটে ধরে ওকে। রুদ্ধ আবেগে সান্ত্বনা দেয়, গাংএ ঝাঁপ দিলে কি আর বাঁচবা? কাল নাগিনী গিলা খাইব। শোও থির হও। কি হইচে তোমার আমার ঠাঁই কও?

কইবার কিছু নাই—কইবার কিছু নাই। তুই আমারে দড়ি কলসী দে আমি ডুইবা মরি। তরা থির হ আমিও থির হই।

কি জ্বালায় পড়লাম দেখনি! কি হইচে কইবা ত?

রক্ষা নাই মেনির মা আর রক্ষা নাই। তুই দড়ি না দিলেও দড়ি আমার গলায় পড়বই। কপাল—আমার কপাল, বলতে বলতে দুহাত দিয়ে আর বুক চাপড়াতে থাকে গেছু।

রহিমা কোমর ছেড়ে শক্ত করে ওর দুহাত জড়িয়ে ধরে। হানিফ অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। নিরুপায় হয়ে ওকেই জাগাতে চেষ্টা করে। জোরে জোরে ওর নাম ধরে ডাকতে থাকে।

কিন্তু গেছু তার চেয়েও উচ্চগ্রামে গলা চড়ায়, না না, অরে তুই ডাকিস না। দিনভর খাটে একটু শান্তিতে ঘুমাইবার দে। হানিফ বাজান, তর মায়রে দেখিস—আমি চললাম।—অসুরের শক্তি নিয়ে এগুতে চায়। কিন্তু পারে না। চাষীর মেয়ের গায়েও কিছু শক্তি কম নেই। রহিমা যেন অসুরমর্দিনী মহাশক্তিই।

কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে হাঁপিয়ে পড়ে গেছু। হাঁপাতে হাঁপাতেই কাকুতি জানায়, আমারে তুই ছাইরা দে মেনির মা। আর দেরি হইলে দেওয়ানজীর শাপ লাগব—মইরাও শান্তি পামু না।···

ক্যা দেওয়ানজীর আমরা কি করচি যে তার শাপ লাগব! তুমি শোও—আমি বাতাস করি। দয়ালচানরে ডাক, হেই সব দোষ খণ্ডাইব।

পুলিশ—পুলিশ, মেনির মা আমারে ছাইড়া দে। আমি পালাই—আমারে ছাইড়া দে। পুলিশ আসচে—আমারে ধরবার লেইগা পুলিশ আসচে।

সহসা পুলিশের নাম শুনে চমকে ওঠে রহিমা। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে একিক ওদিক তাকায়। কিন্তু কোথাও কিছু না দেখে চাপা শুধোয়, ক্যা, পুলিশ আইব ক্যান্! কি করচ তুমি?

না না আমি কিচু করি নাই, শয়তান আমারে দিয়া করাইচে। ও—হো-হো, কথা শেষ করতে পারে না গেছু, ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে।

কি মুস্কিল! কি হইচে খোলসা কইরা কও না?

খুন—আমি নবীনবাবুরে খুন করচি। পুলিশ মিথ্যা দেওয়ানজীরে ধরচে। খোদা—

রহিমার কানে আর কোন কথা পৌঁছয় না। সহসা মাথার ওপরে যেন বাজ পড়ে। মূর্চ্ছায় ঢলে পড়ে রহিমা।

সে দৃশ্য দেখে গেছু পাগলের মতোই দাপাতে থাকে, তুই আমারে বিশ্বাস কর মেনির মা, ই কাম আমি করবার চাই নাই। শয়তান গোসাঁইডা দিন-রাইত ফিডা হইয়া আমার পিছনে লাগল। তুইও ঘর-বাড়ির জন্যে অস্থির হ'লি। আমারে ভাল হইয়া চলবার জন্যে কিরা দিলি—গেঁজা ছাড়াইলি। কিন্তু ভাল হইয়া চইলা আমার কি হইল? কোথায় টেকা পাই আমি? তাই শয়তানের কাচেই যাই—হারই হাতে পায়ে ধইরা কই, বাড়িডা আমারে লেইখা দেন গোসাঁই। কিন্তু আমি কি তখন বুঝচিলাম, অর প্যাটে প্যাটে এত বজ্জাতি লুকাইয়া আচে। ও কয়, মিঞা, সবই ঠিক খালি একজনের বজ্জাতিতে তোমারে দিবার পারচি না।

রাগে আমার শরীলডা জ্বইলা ওঠে। কুড়ালডা কান্ধের উপর থেইকা নামাইয়া কই, কন গোসাঁই, ক্যারা সে শালা?—মেনির মা ঘুমাইয়া পড়লি নাকি—শোন। আমার সব কয়ডা কথা শোন আর ত সময় পামু না। মেনির মা—রহিমার বুকের ওপরে দাপাতে থাকে গেছু।

কিন্তু রহিমার তরফ থেকে কোন উত্তর আসে না। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।

রাত্রির শেষ প্রহর। দূর প্রান্তে শেয়াল ডেকে ওঠে। একটা নৈশ পাখি সাঁ সাঁ শব্দে পাশের হিজল গাছ থেকে পাখসাট মেরে উড়ে যায়। ভয়ে আঁৎকে ওঠে গেছু। চোখ মেলে বাইরের দিকে তাকাতে পারে না। অন্ধকারের বুক চিরে কে যেন ধেয়ে আসছে ওর দিকে। হাতে তার ফাঁসীর রজ্জু। ভীষণ ভৈরবাকৃতি। রহিমার মতো গেছুরও দাঁতে দাঁত লেগে যায়। [ক্রমশঃ

# রিক্স ওয়ালা

আশু চট্টোপাধ্যায়

সুখনলালের শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। মধ্যরাত্রির রাস্তা জনহীন। আর সোয়ারি পাবার আশা নেই বলেই ধরা যেতে পারে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় তার পাকস্থলিতে মোচড় দিচ্ছে। এখনো ঘরে ফিরে তাকে রুটি বানাতে হবে, তবে ক্ষুন্নিবৃত্তি। ঘ ণ্টির আওয়াজ করতে করতে সে দ্রুত চলতে লাগল রিক্সটাকে টেনে নিয়ে। বাসার পথেই যদি আর কয়েক আনা রোজগার হয়ে যায় ত মন্দ কি!

"ও বাবা, রিক্সাওয়ালা, শুনছ?—ও রিকসা!" হঠাৎ নারীকণ্ঠের ডাক তার কানে এল।

সে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটিকে তার ভদ্রঘরের বলেই মনে হ'ল, তবে শরীরে যৌবন অস্তমিত না হলেও, কোথাও অর্থাস্বাচ্ছল্যের ইঙ্গিত নেই। মুখে মাতৃসুলভ কোমলতা, কিন্তু তা যেন কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে।

"চলিয়ে মাইজী, কিধার যায়েগা, পৌঁছায় দেগা।" সে বলল। এত রাত্রে একা মেয়েলোক নিশ্চয়ই খুব বেশী দূর যাবে না।

সে বিস্মিত হয়ে শুনল মেয়েটি বলছে, "কিন্তু আমার কাছে যে পয়সা নেই বাবা।"

"পরোয়া নেহি, আপকা কোঠিমে মিল যায়গা। কেৎনা দূর?"

"হাসপাতাল যেতে হবে।" মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলল। অনতিবিলম্বেই আবার যোগ করল, "পয়সা আমার বাড়িতেও নেই, বাবা। স্বামী বিদেশে কাজ করেন, খুব কম মাইনে। এদিকে আমার ছেলে হবে, ব্যথা উঠেছে। আমাকে কোন হাসপাতালে যেতেই হবে এখনি।"

"ইয়ে ত তাজ্জব বাত!" সুখনলাল অত্যন্ত বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "লেড়কা হোগা, আপকো সাথ একঠো আদমি ভি নেহি হয়? ক্যায়সে হসপতাল মে যাওগে? কোই হসপতাল মে নাম লিখায়া?" নেহি লিখায়া ত, আপকো নেহি লেনে শেকেগা। তব্, ক্যা হোগা?"

তার পর সে মেয়েটিকে পরামর্শ দিল, বাসায় ফিরে গিয়ে কোনও দাই ডেকে আনাতে। সে তখন এই বিনি পয়সার হাঙ্গামার হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারলে বাঁচে। কিছু খেয়ে নিয়ে, আরামে ঘুমুতে পারবে। সকাল থেকেই ত আবার হয়রানি!

"একজনকে বলেছিলাম ত নাম লেখাতে, কিন্তু সে লিখিয়েছে কি না, তার আর খবর দেয়নি। কিন্তু রাস্তায় পড়ে ত' আর মরতে পারি না, বাবা। তোমার পয়সা আমি একদিন দিয়ে দেব ঠিক, আমার ঠিকানাটা মনে রেখ। তবে এখন ত আমাকে নিয়ে যেতে হবেই তোমাকে, আমার যে বেশ ব্যথা উঠছে!"

বোধ হয় যন্ত্রণাতেই শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে এল। সুখনলাল একটু সময় নিঃশব্দে কি ভাবল, তারপর বিনা দ্বিধায় স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে বলল, "বইঠিয়ে মাইজী, সে যায়েগা, আপকো, রুপেয়া নেহি মাঙতা। লেকিন, কিধার যায় গা, উও বাৎলাইয়ে।"

কাছাকাছি হাসপাতালের নাম আর ঠিকানা ব'লে মেয়েটি রিক্সয় উঠে বসল।

রিক্স নিয়ে সুখনলাল ঝড়ের বেগে চলতে লাগল। মেয়েটিকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলে সে বাঁচে; তা ছাড়া এ হ'ল বিনি-পয়সার উটকো আপদ। অবিলম্বে পথেই যদি প্রসব হয়ে যায় ত' সে সামলাবে কেমন করে! তাদের নিজেদের ঘরের আওরৎ হ'লে আলাদা কথা। তাদের ছেলে হয় যেখানে-সেখানে। বিশেষ কোন হাঙ্গামাই নেই। তাদের মেহনৎ করা শরীরে সামর্থ্য আছে। গরীবের ঘরে দুধ-ঘি না থাকলেও ডাল-রুটি আর ছাতুর প্রসাদে, নিরুদ্বিগ্ন মনের দৌলতে তাদের শরীরে স্বাস্থ্য-শ্রী ধরে না।

মনে হল পিছন থেকে কাতরানির শব্দ সে শুনতে পেল। হয়ত অমসৃণ রাস্তায় দ্রুত যাওয়ার জন্যই ব্যথা বেশী উঠছে। এসব বিষয়ে সুখনলালের অভিজ্ঞতা নেই; কারণ তার স্ত্রীর এখনো ছেলে হয়নি। কিন্তু সে শুনেছে। যাই হোক সে গতি কমিয়ে দিল।

কিন্তু মেয়েটি উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলে উঠল, "ওকি, একটু জোরে চল বাবা, তাড়াতাড়ি পৌঁছান দরকার।"

"আপকো তকলিফ হোগা, মাইজী।"

"তা হোক", মেয়েটি অসহিষ্ণু ভাবে বলল, "এখনি হাসপাতালে যাওয়া দরকার। তুমি আগের মত ছুটে চলু।"

অগত্যা সুখনলাল আবার গতি বাড়িয়ে দিল।

হাসপাতালে দারোয়ানের বাধা কাটিয়ে সুখনলাল যখন কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানাল, তাঁরা মাথা নাড়লেন। বললেন,

বারেই জায়গা নেই, এমন কি বারান্দাগুলোও ভরে গেছে। তাঁরা প্রসূতিকে ছাদে বা উঠানে শুইয়ে রাখতে পারেন না। এখনি অন্য হাসপাতালে চেষ্টা করে দেখা উচিত। হয়ত সেখানে জায়গা পেতে পারে।" তারা একথাও জানিয়ে দিলেন যে এইজন্যই কার্ড রাখা দরকার।

নির্বোধ সুখনলাল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না, একখণ্ড করলেই কি ক'রে বাড়তি জায়গা তৈরি হয়ে থাকত! সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁদের জানাল যে তাঁরা মেহেরবানি করে টা ব্যবস্থা না করলে, "মাইজী মর যায়েগা।"

ডাক্তার হেসে বললেন, "তিনি দুঃখিত হলেও, তাঁর করবার ছু নেই।"

সুখনলাল মাথা নিচু করে রিক্সার কাছে ফিরে এসে দেখল, মেয়েটি শক্ত মুঠোয় দু'পাশের হাতল ধরে গেটের ভিতরের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে। সে বোধ হয় প্রতিমুহূর্তে আশা করছিল ভিতর থেকে কেউ তাকে অবিলম্বে নিতে আসবে। সুখনলালের ফিরে আসার ধরণ আর মুখ দেখেই সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অপরিসীম ক্লান্তিতে পিছনে হেলান দিল। সুখনলাল নিঃশব্দে রিক্সটা তুলে নিয়ে চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, "আভি কিধার যায় গা, মাইজী?"

"কি জানি, বাবা," মেয়েটি উত্তর দিল, "আমি ত আর কোন হাসপাতাল চিনি না।"

সুখনলালই কি জানে! কোথাও যায়গা আছে কিনা তা ঈশ্বরই জানেন। এদিকে মেয়েটি প্রায় মুমূর্ষু। তখন রাত একটা বেজে গেছে; পথ জনমানবহীন। দেশে তার স্ত্রীর কথা সুখনলালের মনে পড়ে গেল। তার ক্ষুধাতৃষ্ণা আর ক্লান্তি তখন তার মাথায় উঠেছে। শহরের এধারে সে আর একটা হাসপাতাল দেখেছে, কিন্তু সে ত এক মাইলের ধাক্কা। তবু সেই দিকেই সে সাগ্রহে পা বাড়িয়ে দিল। পিছন থেকে কাতরানির শব্দ তখন আরও ঘন ঘন শোনা যাচ্ছিল।

পনেরো বিশ মিনিট পরে সেই হাসপাতালের লোকেরাও যখন জায়গা নেই বলে তাকে হাঁকিয়ে দিল, তখন সে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। মেয়েটি তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে; তার কাছ থেকে একটা একটানা গোঙানিই কেবল শোনা যাচ্ছিল। রাত তখন দুটো বেজে গেছে।

সুখনলালের অন্তরের গভীর থেকে একটা সতর্ক বাণী এল—হয়ত এখন তার মেয়েটিকে নিয়ে থানায় যাওয়া উচিত। গেলে হয়ত পুলিশ একটা ব্যবস্থা করতে পারত। থানার গাড়িতে ক'রে সিপাই সমেত কোন হাসপাতালে হাজির হ'লে তার দরজা এভাবে হয়ত বন্ধ হয়ে যেত না। কিন্তু অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মনে সব সময় থানা সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক থাকে। তাদের মনে একটা অহেতুক সংশয় থাকে যে, একবার পুলিশের হাতে পড়লে উপকারের বদলে অপকারই বেশী হয়।
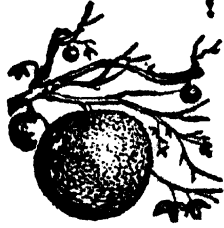
মেয়েটির জ্ঞান থাকলে সে হয়ত মরিয়া হয়ে তাকে থানায় যাবার পরামর্শই দিত। কিন্তু বার বার ডেকেও তার কাছ থেকে বিশেষ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তার মানে মেয়েটির বাসার ঠিকানাটা পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। নিজের অবস্থা বুঝে নিদারুণ দুশ্চিন্তায় সুখনলাল তার সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। তার মাথায় কেবল একটি চিন্তাই ঘুরপাক খেতে লাগল, যে-কোনো উপায়ে মেয়েটিকে বাঁচাতেই হবে, নইলে তার পরিত্রাণ নেই।

শহরের অপর প্রান্তে আরও দু'-তিনটে হাসপাতাল আছে ব'লে সে শুনেছে। কিন্তু তার দূরত্ব প্রায় ছ'সাত মাইল। সেখানে পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে। তা থাক; এক দিক থেকে তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। দিনের আলোতে হয়ত রাতের এই দুঃসাধ্য কাজ সহজ হয়ে যেতে পারে। তাই দিখিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে পাগলের মত ছুটতে লাগল। পিছনে মেয়েটির কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দই আর আসছে না। সে প'ড়ে যাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য সুখনলাল মাঝে মাঝে গতি কমিয়ে পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল। শ্রান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে; ক্ষুধা এখন আর নেই, শুধু মাঝে মাঝে একটা বমির ভাব তার গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠতে লাগল।

রাস্তার দু'পাশে শুধু আলোগুলো অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে দিয়ে সুখনলাল পাগলের মতো তার রিক্স নিয়ে ছুটে চলেছে।

• •

শেষ পর্যন্ত ভোর বেলায় তাকে পুলিসের হাতেই পড়তে হ'ল। সিটের উপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সেপাই-এর কি রকম সন্দেহ হয়, সে ধমক দিয়ে রিক্স থামাতে বলে। তারপর কাছে এসে মেয়েটির নাপালে হাত দিয়ে দেখে সুখনলালের গালে একটি প্রচণ্ড চড় মারে। অভুক্ত ক্লান্ত শরীরে সুখনলাল রাস্তায় পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে সামলে নেয়।

"শালা ডাকু, চল্ থানামে।" সেপাই চিৎকার ক'রে ওঠে।

সুখনলাল কিছুই বুঝতে না পেরে বোবা বিস্ময়ে পুলিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সেপাই তার ঘাড় ধ'রে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, "চল্।" তখন সুখনলাল যন্ত্র চালিতের মত রিক্স টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে সেপাই-এর পিছু পিছু চলতে থাকে।

থানায় পৌঁছে অন্য এক সেপাইকে দাঁড় করিয়ে আগের সেপাইটি ভিতরে চ'লে যায়। কিছু পরেই একজন ইন্‌স্‌পেকটার বের হয়ে এসে রিক্সর মেয়েটিকে পরীক্ষা করেন।

সুখনলাল তখনও রিক্সটাকে তুলে ধ'রে দাঁড়িয়েছিল।

ইন্‌স্‌পেকটর কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "এই ব্যাটা, লাশটা কোথায় ফেলতে যাচ্ছিলি। গঙ্গায়?"

লাশ! সুখন চমকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মেয়েটি রিক্সর এক কোণে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে। তার অবশ হাত থেকে রিক্সটা সশব্দে পড়ে গেল, আর মেয়েটির শরীরটা মাটিতে গড়িয়ে প'ড়ে মুখটা উপরের দিকে অনাবৃত হয়ে রইল। সুখনলাল সেই মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। গত রাত্রের মাতৃত্বের মহিমায় উজ্জ্বল সেই মুখ আর নেই, বিবর্ণ পাণ্ডুর চামড়ার রেখায় রেখায় কত অসহ্য যন্ত্রণার ইতিহাস লেখা রয়েছে। এত বড় সহরে এমন একটা জায়গাও মেলেনি, যেখানে সে তার নারী জীবনের চরম সার্থকতায় তার স্নেহের বস্তুকে কোলে পায়, নিজের প্রাণটা ধ'রে রাখতে পারে।

ক্ষুধা, ক্লান্তি আর নিজের বিপদের কথা ভুলে সুখনলাল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। শুনতে পেল কাকে যেন ইন্‌স্‌পেকটর বলছেন, "ব্যাটা, মেয়েটার সর্বনাশ করে তারপর তাকে শেষ ক'রে দিয়ে কোথায় ফেলতে যাচ্ছিল। নয়ত, কারুর কাছ থেকে মোটা টাকা খেয়েছে। লোকটাকে আটকে আটকে দিন। আর মেয়েটাকে একবার ডাক্তারকে দেখাতে হবে, পেটের ছেলেটা এখনো বেঁচে আছে কি না দেখা দরকার।"

## মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

### ভারতের বাহিরে ( ভারতীয় মুদ্রায় )

| | | |
|---|---|---|
| বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে | — | ২৪৲ |
| ষাণ্মাসিক " | — | ১২৲ |
| প্রতি সংখ্যা " | — | ২৲ |

### ভারতবর্ষে

| | | |
|---|---|---|
| ( ভারতীয় মুদ্রামানে ) বার্ষিক সডাক | — | ১৫৲ |
| " ষাণ্মাসিক সডাক | — | ৭·৫০ |

### ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১·২৫

| | | |
|---|---|---|
| বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে | — | ১·৭৫ |

### পাকিস্তানে ( পাক মুদ্রায় )

| | | |
|---|---|---|
| বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ | — | ২১৲ |
| ষাণ্মাসিক " " " | — | ১০·৫০ |
| বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " | — | ১·৭৫ |

# উপজাতীয় শিল্পচেতনা

আশীষ বসু

উপজাতি বলতে আমাদের চোখের সামনে যে ছবিটি ভেসে ওঠে সেটির রূপ প্রায় সারা ভারতবর্ষেই এক। অর্থাৎ উড়িষ্যার মাহার কি পাণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার বেদিয়া, উরী, কি কোঙার বা বিহারের বেলদার, বিন্দ কি খটিকের ফাৎ সচরাচর আমাদের চোখেই পড়ে না। আসলে কিন্তু এরা নেকেই সাধারণ অর্থে যাদের আদিবাসী (সাঁওতালদের বা ছাটনাগপুর অঞ্চলের মাহলি, মুণ্ডা ওরাও, নাগেশিয়া) বলা হয় চাদের মতো নয়। এদের জীবনধারণ পদ্ধতি একেবারে আলাদা এবং অনেকাংশে আমাদের সহর বা গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকের মতোই। বড় জোর তাদের অনুন্নত কারিগর সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যেতে পারে।

পশ্চিম বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যা, পূর্বাঞ্চলের এই তিনটি প্রদেশের শিল্পচেতনার মিল খুব বেশী। শিল্পচেতনার ধারাগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এগুলির বিকাশ ঘটেছে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে। নিজের সংসারের প্রয়োজনের তাগিদে, শ্রেণী চেতনায়, রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়,—জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে এবং শিল্পবৃত্তির প্রকাশ আকাঙ্ক্ষায়। পাশাপাশি গ্রামগুলির মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা, রাজানুগ্রহ ইত্যাদি সেগুলির বিকাশে সাহায্য করেছে। ধর্মের প্রভাবও পড়েছে অনেক স্থলে।
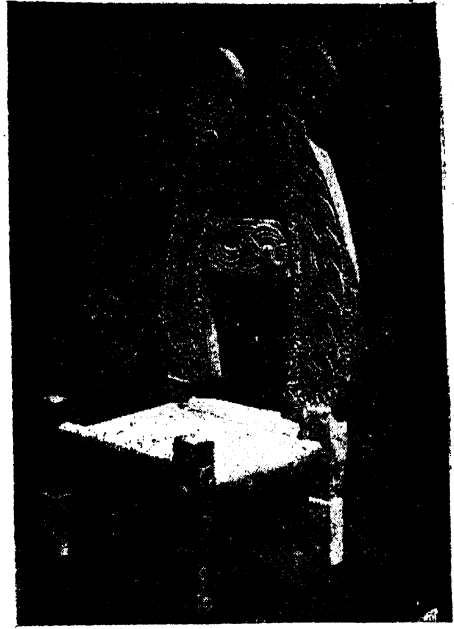
আদিবাসীগৃহে ব্যবহৃত চেয়ার, কাঠের খোদাই

সামগ্রিক ভাবে দেখলে পশ্চিম বাঙলার কারিগর সম্প্রদায়কে কয়েকটি মোটামুটি ভাগে ভাগ করা যাবে যথা সূত্রধর, মালাকর, কর্মকার, কংসকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার ইত্যাদি এই এক ভাগ, আর এক ভাগ বা উপজাতি শিল্পচেতনা অর্থাৎ বাঁকুড়ার কি আউস গ্রামের ডোকরা প্রভৃতির কাজ বা বিষ্ণুপুরের নক্সী-তাসের কাজ।

বিহারের কাঠ-খোদাই মূর্তি

আদিবাসী এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিল্প কাজের মধ্যে আলাদা ভাবে ভাগ না করে এখন সে দুটিকে এক সঙ্গেই আলোচনা করা যাবে। এই সম্প্রদায়ের তালিকা অতি দীর্ঘ এবং তাদের উপজীবিকাও বিচিত্র। বিহারে মোটামুটি এর দুই ভাগ ছোটনাগপুর বা ঝাড়খণ্ড অঞ্চল এবং বিহারের অন্য অংশ অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণা, পালামৌ ইত্যাদি। ছোটনাগপুরে রয়েছে ভুইয়া, ভূমিজ, খাসি, কাউর, কাদার, খৈরা, মাহলি, মুণ্ডা, নাগেশিয়া, ওরাও, সাঁওতাল (সাধারণ), টুরি প্রভৃতি। অন্যদিকে আছে বাহেলিয়া, বেলদার, বিন্দ, চামার, দোসাদ, গুণহরি, লোহার, মাল্লা, মালপাহারিয়া, পাশি, রাজওয়ার, খটিক ইত্যাদি। বাঙলা দেশে এমনি সম্প্রদায় অগুণতি যেমন পূর্ব বাঙলায় ছিল ভূঁইমালী, পাটনী, জালিয়া, মুক, দোয়াই ইত্যাদি। উত্তর বাঙলায় কোচ পালিয়া, রাজবংশী, লেপচা, মেচ, রাভা এবং পশ্চিম বাঙলায়
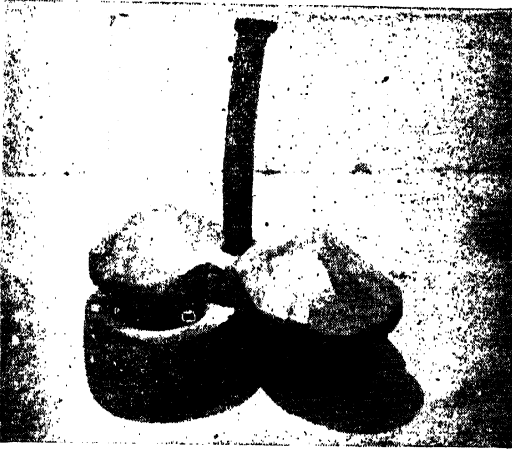
উপজাতি এলাকায় প্রাপ্ত কাঠের পাত্র জিনিস রাখবার জন্য সংসারের কাজে লাগে।

আগেই বলেছি, পশ্চিম বাঙলা, বিহার আর উড়িষ্যার শিল্পচেতনা ও পদ্ধতির মিলের কথা। উদাহরণ স্বরূপ বাঁকুড়ার কি বর্দ্ধমানের ডোকরা কামারদের কথাই ধরা যাক। মোম গলিয়ে তাতে ছাঁচ তুলে পেতলের ঢালাই কাজ এই একই পদ্ধতিতে করা হয় বিহারের রাঁচীর কাছের লোহারডিতে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে। পশ্চিম বাঙলার শালতোড়া (বাঁকুড়া), নতুনচটি (বাঁকুড়া) কি আউসগ্রাম (বর্দ্ধমানে) যে ডোকরা কামারদের দেখা পাওয়া যায় তারা আসলে এক যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত অনুন্নত শ্রেণীজাত এবং তারা ছড়িয়ে আছে বিহারে, উড়িষ্যায় এমন কি মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যেও। আবার ধরি ছবি আঁকার কথা, মেদিনীপুরের পট পারলৌকিক চিত্রকলার (অর্থাৎ যাতে মৃত ব্যক্তির ছবি বা জীবন কাহিনী আঁকা হোত) সঙ্গে অদ্ভুত মিল পাওয়া যাবে উড়িষ্যার এমন কি আরও এগিয়ে দক্ষিণ ভারতের ফ্রেসকো পেণ্টিং বা জৈন পেণ্টিংগুলির মধ্যে।

শ্রেণী চেতনা মানুষকে তার জীবিকা নির্দ্দেশ করেছে। যেমন ধরা যাক বিহারের খটিক সম্প্রদায়, এরা সাধারণতঃ কৃষিজীবী এবং কাঁচা তরকারীর আড়তদার বা ব্যবসায়ী। এদের মূল নিবাস বিহার। কলকাতা, হাওড়া কি ২৪শ পরগণায় এদের দেখা মিলবে। পশ্চিম বাঙলার করঙ্গা এরা সাধারণতঃ কাঠের কারিগর, বেত কি বাঁশের কাজও করে থাকে। বিহারের দোসাদদের দেখুন। এরা চৌকিদার জাত। পাহারা দেওয়া এবং চাষবাস এই জীবিকা। বাঁকুড়ার চুনারদের দেখুন, আসলে এরা পাহাড় থেকে চুন কাটে। মাদুর তৈরী কি তাঁতের কাজেও এদের দেখা যায়। নদীয়ার কালীগঞ্জে শোলার টুপী বানাতেও এদের দেখেছি।

বাগদী, বেদিয়া, বাইতি, বাউরী, করঙ্গা, কোনাই, কোভাঃ, কোরা, কোটাল, লোধা, মাল, পোদ, সুনরি, তিয়র প্রভৃতি। এদের সকলেই যে শিল্পী এ কথা বলছি না। তবে এদের মধ্যেই পশ্চিমবাঙলা, বিহার প্রভৃতি জায়গার অনেক শিল্পকাজগুলির কারিগরেরা লুকিয়ে আছে।

ডিজাইন জ্ঞান রঙের কারিগরী, জ্যামিতিক পদ্ধতি সমূহের বিকাশ উপজাতি শিল্পগুলিতে বিশেষ ভাবে দর্শনীয়। নাগাপ্রদেশের তৈরী লোরামন্ত (এক শ্রেণীর গায়ের চাদর, মেয়েদের) তার বয়নপদ্ধতি এবং রঙের খেলা দেখলে এখনকার অনেক বিশেষজ্ঞ চমৎকৃত হবেন নিঃসন্দেহে। পশ্চিমবাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার উপজাতি শিল্প চেতনাগুলির মধ্যে নানা প্রেরণা কাজ করছে। এতে প্রভাব পড়েছে আসাম অঞ্চলের নাগা কাজের, অন্ধের 'মাল' সম্প্রদায়ের, নীলগিরির 'টোডা' শ্রেণীর। পারস্য, চীন প্রভৃতি থেকে এসেছে কিছু আর আমাদের শিল্প চেতনা যার রূপ ফুটেছে মন্দিরের গায়ে, বাড়ীর দেওয়ালে। উদাহরণ স্বরূপ নাম করা যায় বিষ্ণুপুরের 'মুখ-ডিবা'র যাতে নাগা প্রভাব আছে একথা কেউই অস্বীকার করবেন না।

শিল্প পদ্ধতিই এমনি জটিল এবং পরস্পরের প্রতি আশ্রিত। তাই অন্তত শিল্পের ক্ষেত্রে একথা অনস্বীকার্য যে বাঙলা বিহারকে দিয়েছে অনেক, বিহার বাঙলাকে দিয়েছে অনেক। আসাম বাঙলাকে দিয়েছে, নিয়েছে। উড়িষ্যাও পিছিয়ে নেই।*

আদিবাসীদের শিল্পকাজের নমুনা

---

* সঙ্গে প্রকাশিত ছবিগুলি বিহার শিল্প নক্সা কেন্দ্র, বোরিং রোড, পাটনার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

# স্বপ্ন, বিজ্ঞান, বাস্তবতা

ভি. অফনস্ এফ, এম্-এস্সি ( অর্থনীতি ), সমাজ-বিজ্ঞান
আকাদেমীর সহকারী অধ্যাপক ।।

। এস্. দজারসোফ, এম্-এস্সি ( অর্থনীতি ), মস্কো রাষ্ট্রীয়
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ।।

## স্বর্ণনগরীর দিকে

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যসূচীতে,—পৃথিবীতে ন্যায়ের সমাজ লাভের মেহনতী মানুষের যুগ-প্রাচীন স্বপ্নকে, কমিউনিজমের মহান্ জীবনপ্রবাহ দিয়ে জীবন্ত করার প্রয়াস অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উৎপীড়ন আর লাঞ্ছনার অবসানের আকাঙ্খা,—মানুষের,—দারিদ্র্যহীন, শোষণহীন, বৈষম্যহীন, যুদ্ধের বিভীষিকাহীন,—প্রাচুর্য, শান্তি আর সুখী স্বাধীন-ধর্মের সমাজের উদ্বেল কামনাকে হত্যা করতে পারেনি।

অবস্থার মধ্যে,—যখন, এখন পর্যন্তও ওই ধরণের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্মাণকার্যের প্রয়োজনীয় মাল-মশলা বিকাশ লাভ করেনি, যখন, এখন পর্যন্তও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের নীতি প্রকাশিত হয়নি,—তখন ভবিষ্যৎ সামাজিক সংগঠনের শিক্ষার মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই বেশ কিছু বোকামীপ্রসূত ও কাল্পনিক বিষয়বস্তু থাকবে। এবং এখন পর্যন্ত, কাল্পনিক সমাজবাদীরা, ভবিষ্যতের সঠিক ছবি উল্লেখ্যভাবে উপস্থিত করে, কিছু বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করেছেন। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে নিকিতা খ্রুশ্চেফ্ তাঁর ভাষণে বলেছেন : আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে—সেইন্ট সাইমন, ফোরিয়ার, ওয়েন, ক্যাম্পনেল্লা এবং মুর প্রমুখ মহান্ কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিকদের নাম ;—চার্ণাশেভ্স্কি, হারজেন, বেলিন্স্কি এবং দব্রোলিউবফ্ প্রমুখ আমাদের রাশিয়ার বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের নাম স্মরণ করি, যেহেতু তাঁরা অন্যের চেয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের নিকটতর হয়েছেন।

সমাজবাদীদের সূচনা প্রভাত 'কল্পনা' দ্বীপকে আলোকিত করে সমুদ্রের কোথাও হারিয়ে গেলো। ১১১৬ সালে এই দ্বীপ সম্বন্ধে ইংরেজ জুরি 'টমাস্ মুর' তাঁর 'গোল্ডেন বুক'-এ লিখলেন। চারদিকে শ্রমজীবী মানুষের উপর ধনবানের ভয়ংকর হিংস্রতা তিনি দেখেছেন। তিনি দেখেছেন কৃষক আর কারুশিল্পীরা জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে ;—রক্তলোলুপ আইন, কয়েদ আর ফাঁসীর দড়ি দিয়ে বুর্জোয়ারা পেটে খাওয়া মানুষকে কারখানার যন্ত্রে পরিণত করেছে। 'টমাস্ মুর' অনুধাবন করেছেন যে, "স্তরে স্তরে মানুষের ব্যাপারে মঙ্গলজনক কিছু করা, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির খোল আনা বিলোপসাধনের মধ্য দিয়েই সম্ভব।"

তাঁর স্বপ্নে,—তিনি তাঁর কল্পনা' দিয়ে গড়া—এক আদর্শ আর ন্যায়ের সমাজ-সমৃদ্ধ দ্বীপের দিকে তাকিয়েছেন। এখানে এই দ্বীপে,—গণমালিকানার ভিত্তিতে সার্বজনীন কর্মসংস্থান আর উন্নত আন্দোলনের বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রাচুর্যের সফলতা আসে, আর প্রয়োজন অনুযায়ী বিলি-ব্যবস্থা মঞ্জুর হয়।

এক ইতালীয় বিপ্লবী এবং ভাবুক—'টমাসো ক্যাম্পানেল্লা' নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্যে কারাগারের গরাদের আড়াল থেকে সুখী 'সূর্য শহরের' রৌদ্রকরোজ্জ্বল তোরণ দেখেছিলেন। এক বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য তিনি কয়েদে নিক্ষিপ্ত হলেন। জনগণের এক সুখী সমাজ যা প্রাচুর্য লাভ করেছে,—তারই এক ছবি তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সূর্যশহরে' এঁকে গেছেন ( ১৬০২ )। "গৃহস্থালীর সামগ্রী আর খাদ্যে তাদের বিশেষ আগ্রহ নেই, কেনো না, সকলেই সমাজের কাছ থেকে যা প্রয়োজন তা পায়,—কাজেই তারা প্রয়োজন মেটাবার কথা না ভেবে মানুষের সেবার কথা ভাবে।"

ফরাসীর কাল্পনিক-সমাজবাদী 'সেইন্ট সাইমন' এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁদের রচনায় ন্যায়-ধর্মের নীতিতে বিশ্ব-রূপান্তরের চিত্র অংকনের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎকে মেহনতী

মিঃ জি. পকরোভস্কির তৈরী আন্তর্মহাদেশীয় পরিবহন রকেট পৃথিবীর কক্ষপথে নেমে আসছে। চিত্রটি মিঃ কুলশভ কর্তৃক গৃহীত।

মানুষের এক বিশ্ব-সমিতিরূপে দেখেছেন। জ্ঞান এবং নৈতিক বিকাশের ফলে এই সমিতি শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং সামাজিক ব্যাপক হারে উৎপাদন সংগঠনকে সুনিশ্চিত করবে। বিশ্ব-সমিতির অবস্থাসমূহের মধ্যে মানুষের স্থান "তার কাজ অনুযায়ী সমাজ দ্বারা নির্ধারিত হবে, এবং সে তার কাজ অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে।"

সেইণ্ট সাইমনের সহ-দেশপ্রেমিক 'চার্লস ফোরিয়ার' উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর রচনায় আবেগের সঙ্গে পুঁজিবাদের মুখোস টেনে ছিঁড়েছেন এবং "সমতাবাদ" নামে এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, এক সমতাবাদী সমাজে মানুষের বৈষয়িক সম্পর্ক "বিকশিত সত্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির" ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। সমাজে, আর্থিক কাজকর্মকে ভোগ্য-পণ্য উৎপাদনের সমিতিসমূহের মধ্যে চালিত করা হবে এবং এই সমিতিগুলো বা 'ফলনস্তেন্'-এর মধ্যে ভাড়াটে শ্রমিক থাকবে না। স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ মানুষ পূর্ণোদ্যমে কাজ করবে আর শ্রম তাদের আনন্দের উৎস হয়ে উঠবে।

মহান্ কল্পনাপ্রবণ ইংরেজ সমাজবাদী—'রবার্ট ওয়েন' ফোরিয়ারের মতো বিসদৃশভাবে নয়, উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ষোল আনা উচ্ছেদের জন্য যুক্তির অবতারণা করেছেন। "শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র ছাড়া অন্য সব কিছুকেই সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে।" তিনি লিখেছেন,—"শ্রমজীবী মানুষের শোষণ এবং সমাজকে শ্রেণীতে বিভক্তকরণের ব্যাপারে 'টাকা' বা 'অর্থের' আইন-কানুনকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।"

রাশিয়ার বিপ্লবী গণতান্ত্রিক—এন. জি. চার্ণ্যাশেভ্স্কি, এ. আই. হারজেন, ভি. জি. বেলিন্স্কি এবং এন. এ. দব্রোলিউবফ—সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিকাশে সমৃদ্ধ অবদানের মধ্য দিয়ে অন্য সকলের চেয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের নিকটতর হয়েছেন। পশ্চিম ইউরোপের কল্পনাবিলাসীদের থেকে পৃথকভাবে তাঁরা অনুধাবন করেছেন, জনগণ ইতিহাসে এক চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। কাজে কাজেই, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শুধু সমাজতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে। আর এই সমাজতন্ত্র স্বেচ্ছায় কখনো শান্তিপূর্ণ প্রচার অভিযানের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের মঞ্চ পরিত্যাগ করে না।

রাশিয়ার কাল্পনিক-সমাজবাদীরা বুঝেছেন যে, সমাজতন্ত্রে উত্তোরণের একমাত্র পরিবেশ হচ্ছে জনগণের বিপ্লব। আর, এই বিপ্লবই শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা দিতে পার।

মহান্ রুশ বিপ্লবী এবং বিজ্ঞানী এন্. জি. চার্ণ্যাশেভ্স্কির রচনা থেকে প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ অত্যন্ত উচ্চস্তরের সফলতা লাভ করেছে। তবুও চার্ণ্যাশেভ্স্কি এমন চিন্তা পোষণ করতেন,—সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়া ধনতন্ত্রবাদকে পাশ কাটিয়েই সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারবে। নতুন এক পদ্ধতি—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্রষ্টা হিসেবে বিশ্ব-ইতিহাস নিয়ন্ত্রণে সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা তিনি জানতেন না।

কাল্পনিক সমাজবাদের অন্যতম প্রধান গুণ হচ্ছে,—ন্যায়ের এক সমাজ বিশ্বে গড়ে তোলার ব্যাপারে শ্রমজীবী মানুষের উজ্জ্বল স্বপ্নের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারকে যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে আসা।

## সুখের দিগ দর্শন

এক নতুন প্রকৃত সমতার পথে সমাজের মৌলিক পুনর্গঠনের পূর্বে মানুষ উন্নয়নের এক দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করেছে। ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে শিল্প-শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপের শহরগুলোর পথ-প্রান্তর শ্রমিকদের রক্তপাতে লাল হয়ে উঠেছিলো,—আর এর কারণ ছিলো—বুর্জোয়াদের শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে শিল্পোন্নয়নের মধ্য দিয়ে নতুন সামাজিক শক্তি যে জীবন্ত হয়ে উঠলো, সামাজিক বিকাশের নীতিসমূহ প্রকাশে তার প্রয়োজন অনেকখানি।

কল্পনা এবং স্বপ্নের সমাজবাদকে সংগ্রামী সর্বহারাদের বিপ্লবী বিজ্ঞানসম্মত পথে রূপান্তর ঘটালেন,—এদেরই মহান নেতা কার্ল মার্কস্ এবং এফ. এঙ্গেলস্। প্রগতিশীল মানবতা—সমাজ-জীবন এবং এর বিপ্লবী পরিবর্তন অনুধাবনের বলিষ্ঠ অস্ত্র লাভ করলো।

মার্কস্ ও এঙ্গেলস্-এর সৃষ্ট এবং ভি. আই. লেনিনের প্রতিভার নতুন এক উঁচুস্তরে সমুজ্জ্বল এবং উন্নত,—মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব, মানুষের সমাজ বিকাশের সবচেয়ে জটিল এবং জড়িত বিষয়ের উপর আলোকপাত করলো।

সমস্ত মানবতার ইতিহাস এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হলো, আকস্মিকতায় জড়িত হয়ে নয়,—স্বাভাবিক

এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি রুশ রেডিওফোনের শেষতম সংস্করণ। চিত্রটি মিঃ শেরবাকভ কর্তৃক গৃহীত।

সৈক প্রক্রিয়া হিসেবেই ; যার মধ্যে সমাজ বিকাশের নির্দিষ্ট
লো সক্রিয়।

র্কস্‌, এঙ্গেলস্‌ এবং লেনিন এক বলিষ্ঠ দুঃসাহসিক কর্তব্য পালন
।

তিহাসের সমস্ত ঘটনালিপির মহৎ প্রতিভাদৃপ্ত পর্যালোচনার
নির্ভর করে সমাজ বিকাশের পথ তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন। তাঁরা
ান, সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ স্বপ্নদ্রষ্টাদের কল্পনাপ্রসূত
র্বহারাদের শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিধিবদ্ধ আকারে শিল্প
পর দাবী, যা মানবতার প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা পর্ব।
কমিউনিষ্ট সমাজের দুটি স্তরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং
বিপত্সমূহের সত্য প্রকাশ করলেন। "কমিউনিষ্ট সমাজের
চ স্তরে," কার্ল মার্কস্‌ বিস্ময়কর কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে
ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "যখন মানুষকে শ্রম বণ্টনে বশীভূত করে
পরিণত করার ব্যবস্থা অন্তর্হিত হবে, এরই সঙ্গে যখন
হবে ধাতু আর কায়িক শ্রমের মধ্যের ব্যবধান ; যখন শ্রম
ত্র জীবিকানির্বাহের মাধ্যম আর থাকবে না, জীবনের প্রধান
াজন হয়ে উঠবে ; যখন ব্যক্তির সর্বাত্মক বিকাশের সঙ্গে
াদনী শক্তিও বিকশিত হবে ; এবং গণ-সম্পদের সমস্ত উৎস এক
র্যের স্রোতে বইতে শুরু করবে,...শুধু তখনি...সমাজ খোদাই
ত সমর্থ হবে তার পতাকায় : 'প্রত্যেককে সামর্থ্য অনুযায়ী,
প্রত্যেককে প্রয়োজন অনুযায়ী'।"

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি,—সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের প্রতি তাঁদের
ইতিহাসিক কর্তব্য পালনের জন্য তাঁরা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর
নোর মৌলিক সমস্যাসমূহের কাজের
াধানে বিরাটাকার বৈজ্ঞানিক
স্পাদনের দিকে মনোযোগ দিয়ে-
লন।

নিগ্রহ ও নির্বাসনের বাস্তব
ঠোরতার অবর্ণনীয় কষ্টকর অবস্থার
ধ্য মার্কস্‌ এবং এঙ্গেলস্‌ বৈজ্ঞানিক
ম্যবাদের তত্ত্ব সৃষ্টির কাজ করে
ছেন। ভি· আই· লেনিনের ভাগ্যও
ছুমাত্র ভালো ছিলো না। জারের
রাগার এবং নির্বাসন, আত্মগোপন
বস্থায় কাজ এবং বছরের পর বছর
ঠোর দেশত্যাগী জীবন ছিল তাঁর
দৃষ্টে। যাই হোক্‌ না কেনো,
দের অপরাজেয় প্রতিভাকে কোন
ছুই স্তব্ধ করতে বা ভাঙতে পারেনি।

নৈতিক দিক থেকে বিভিন্ন
াকর্ষণীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে যা ভবিষ্যতের
ক ছবি এঁকে ধরেছে,—সমস্ত প্রাক্তন
শিক্ষা-দীক্ষার তুলনা করলে দেখা যাবে,
ামাজিক বিকাশের গতি এবং সমৃদ্ধির
ক নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসবাদ
ষ্টি করেছে। জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের

সামগ্রিক ইতিহাসের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা এবং বুর্জোয়া সমাজ-
ব্যবস্থায় গভীর শ্রেণী বিরোধ প্রকাশ করে মার্কসবাদ এর
ধ্বংসভোগের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা দেখিয়েছে, এবং উচ্চতর সমাজ-
ব্যবস্থা—কমিউনিজমে উত্তোরণকে সুনিশ্চিত করতে বিপ্লবী শক্তিসমূহ
যে সমর্থ তা নির্দেশ করেছে। "মার্কসবাদ," লেনিন লিখেছেন,
"অন্য সমস্ত সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহ থেকে স্বতন্ত্র, যেহেতু সম্পূর্ণ
বৈজ্ঞানিক মিতাচারের উল্লেখযোগ্য মিশ্রণের মধ্য দিয়ে বস্তুসমূহের
অবস্থার বাস্তব ব্যাখ্যা এবং ক্রম-বিবর্তনের বাস্তব পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ
জনগণের বিপ্লবী শক্তির, বিপ্লবী সৃষ্টিশীলতার, বিপ্লবী উদ্যোগের অত্যন্ত
একাগ্র স্বীকৃতি দান করে।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের বোধ-শক্তির বাইরে মৌলিক
শক্তিসমূহের প্রক্রিয়ার ফলে সমাজ-জীবনের বিকাশ ঘটেছে। মার্কসীয়
বিজ্ঞান গভীরভাবে সমাজ-জীবনের গুপ্ত রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশলাভ
করেছে এবং মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে এক শক্তিশালী আধ্যাত্মিক
অস্ত্র, যার সহায়তায় তারা সচেতনভাবে তাদের নিজস্ব ইতিহাস
সৃষ্টি করা শুরু করেছে।

পুঁজিবাদের ঝড়ের মধ্যে, ভি· আই· লেনিন প্রতিষ্ঠিত—শ্রমিক-
শ্রেণীর মার্কসবাদী পার্টি, বিপ্লবী কার্যকলাপের পার্টি,—কমিউনিষ্ট
পার্টি আমাদের দেশের শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়েছে।

বিপ্লবী যুদ্ধপোত 'অরোরা' থেকে গোলাবৃষ্টি, বিশ্ব-ইতিহাসে এক
নতুন যুগ সূচনার কথা ঘোষণা করলো, যে যুগ ধনতন্ত্রবাদের নিপাতের
এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠার যুগ। প্রাচীন রাশিয়ার ধ্বংসের
উপরে শ্রমিকরা আর কৃষকরা নতুন জীবন গড়া শুরু করলো
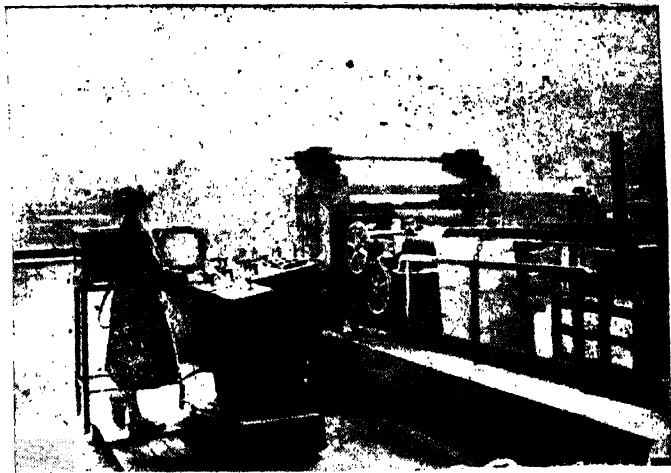
টেলিভিসন ও ইস্পাত—বর্তমানে সীট মিল এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যেখানে প্রতি সেকেণ্ডে ৬০ মিটার, এমন কি ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার উত্তপ্ত ইস্পাতের পাত যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ৩০ বছর আগেও এই পাত উৎপাদনের হার ছিল অত্যন্ত কম। ছবিতে একজন অপারেটর মঞ্চের ওপর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বাঁ পাশে ২টি টিভি-সেট রয়েছে। উত্তপ্ত ইস্পাতের পাত কিভাবে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে তা টিভির সাহায্যে অপারেটর লক্ষ্য করতে পারে।

এক মহান্ স্থপতির ভার লেনিন আমাদের দেশের সামনে কমিউনিজমের শৃঙ্গে আরোহণের আলোকিত সম্ভাবনা তুলে ধরলেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই, ঐতিহাসিক পটভূমির দিক থেকে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন একটা সময়ে আমাদের দেশ বিশ্বের সেরা শক্তিশালী দেশে উন্নীত হল।

সমাজতন্ত্রবাদ সোভিয়েত জনগণকে কর্মতৎপরতার সমস্ত ক্ষেত্রে এমন এক দর্শনীয় অগ্রসরতা দান করেছে, যা অতীতের সবচেয়ে বলিষ্ঠ কল্পনাসমূহকেও আমাদের বাস্তবতা অনেক পেছনে ফেলে এসেছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিহীন এক সমাজ-ব্যবস্থা, যে-সমাজে জনগণের মালিকানার উৎপাদনের মাধ্যম সমস্ত জাতির স্বার্থে নিয়োজিত, যেখানে মুক্ত শোষণহীন শ্রম এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি,—লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের লভ্য বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির সফলতা ঘটায়—এমন এক সমাজের জন্য যুগ-প্রাচীন স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত।

কার্ল মার্কসের বিস্ময়কর সমাজতন্ত্রবাদের কল্পনা,—প্রতিবাদী শ্রেণীবিহীন এক সমাজ, যা সামাজিক উৎক্ষেপণ ছাড়াই বেড়ে উঠতে সমর্থ,—"যে-সমাজে সামাজিক বিবর্তন রাজনৈতিক বিপ্লব বন্ধ করবে,"—সত্য হয়ে উঠেছে।
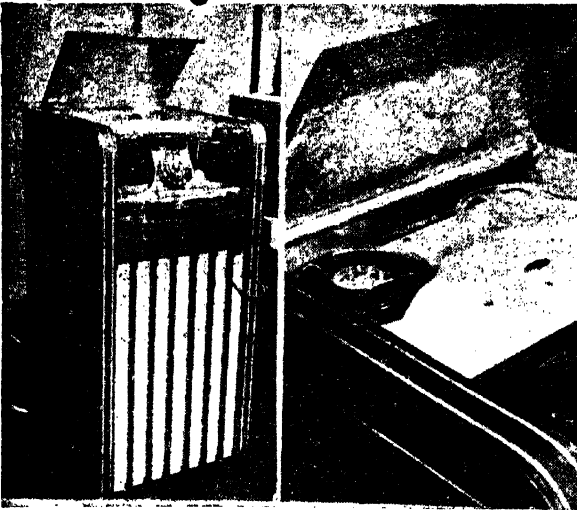
রোবোট সেক্রেটারী—ফটো-সিনে রিসার্চ ইনষ্টিটিউটএর এল ডেমিথোভস্কি এক যন্ত্র তৈরী করেছেন তার নাম টেল্‌সা অটোমেটিক সেক্রেটারী। এতদিন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে যে সব রোবোট সেক্রেটারীর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এই যন্ত্রে তা' বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। যন্ত্রে আছে একটি রেডিওগ্রাম (বাঁ দিকের ফটো)। ডানদিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি রেকর্ডার, তাতে খবর রেকর্ড করার ও টেলিফোনে উক্ত খবর পাঠাবার জন্যে চৌম্বক ফিতা লাগান আছে। কোন জরুরী খবর দেবার জন্য টেলিফোনের কাছে অনাবশ্যকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন হয় না, এমন কি দীর্ঘ অবকাশের সময়ও এর সাহায্য নিয়ে টেলিফোনবার্তা প্রেরণের সমস্যা সমাধান করা যায়।

## কমিউনিজমের আলো

অনেক পুরুষের শ্রেষ্ঠ মানুষের স্বপ্নের আর সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সুখী সমাজ আজ আর হতবুদ্ধিকর অজ্ঞাত নয়। শান্তির জন্য, কাজের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, সম অধিকারের জন্য, সমস্ত জাতির ভ্রাতৃত্ব ও সুখের জন্য মানুষের অসংখ্য শুভেচ্ছা,—আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কমিউনিষ্ট নির্মাণ কাজের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বাস্তব কর্তব্য এবং সময়ের আকার ধারণ করেছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে এন. এস. খ্রুশ্চফ্ বলেছেন, "কমিউনিষ্ট সমাজের আরো সঠিক ধারণাই শুধু নয়, উপরন্তু, এর প্রধান জিনিস,—কমিউনিষ্ট নির্মাণকার্যের বাস্তব পদ্ধতিসমূহ নির্ণয়ে এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিসমূহকে বাস্তব উপাদানে ভরিয়ে তুলতে এখন আমরা সমর্থ।"

যেখানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পার্টির কর্মসূচীতে কমিউনিষ্ট নির্মাণকার্যের ব্যাপারে ঠিক যে ভাবে সমাজ পরিবর্তনের সময় এবং স্তর দেওয়া আছে,—সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাস এই ধরণের আর একটিও উদাহরণ জানে না। পার্টি নেতৃত্বের এই বৈশিষ্ট্য মনে রেখেই সোভিয়েত সরকারের প্রথম দিকের বছরগুলোর মধ্যে ভি. আই. লেনিন বলেছিলেন, "ইতিহাসে এখন আমরা মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকরী করার প্রয়োজনে সময় নির্ধারণের এক দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি এবং এখন আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি,—পাঁচ বছরে কি করা যেতে পারে, আর কি করতে আরো দীর্ঘতর সময়ের দরকার।"

মহান্ লেনিন আমাদের পার্টি গড়েছেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় কার্যক্রম প্রণয়ন করেছেন। এই কার্যক্রমকে কার্যকরী করেই আমাদের জনগণ পুঁজিবাদের উচ্ছেদ-সাধন করেছে এবং পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। এখন আমাদের দেশ কমিউনিষ্ট নির্মাণকার্যের বিরাট কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে,—লেনিনিষ্ট পার্টি আর তার কেন্দ্রীয় কমিটি এই নতুন তৃতীয় কার্যসূচী প্রণয়ন করেছেন।

নিকিতা খ্রুশ্চেফ, তৎপরতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন, "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যসূচীর সঙ্গে এক তৃতীয় পর্যায়ের রকেটের তুলনা করা চলতে পারে। প্রথম পর্যায়ে আমাদের দেশ পুঁজিবাদী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হল, দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের দেশ সমাজতন্ত্রে উন্নীত হল, এবং তৃতীয় পর্যায়ে—ধরে নিলাম,—কমিউনিজমের কক্ষপথে স্থাপিত হল। এ চলেছে, ঠিক ভাবে,— লেনিনের প্রতিভাদৃপ্ত পথ ধরে,—আমাদের বিপ্লবী নীতির পথ ধরে, আর যে-পথ আঁকা হয়েছে মহান্ শক্তি দিয়ে—কমিউনিজম্ নির্মাতাদের শক্তি দিয়ে।" শতে-শতে সহস্রে-সহস্রে নয়, জনসমষ্টির অনেক লক্ষ মানুষ বিপ্লবী সাহসে জেগে উঠেছে।

অনগ্রসরতা থেকে বিকাশের শীর্ষে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আরোহণে ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত সময়, বিংশ

…র স্বাভাবিক অগ্রগতির চরিত্রই বিশ্লেষণ করে,—যখন বিশ্ব…ভাবে পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে জনমণ্ডলীর আরো আরো…ণ ঘটছে। শক্তিশালী বিশ্ব-পদ্ধতি হিসাবে সমাজতন্ত্রের বৃদ্ধির …াসিক অপ্রতিরোধনীয় গতির জন্যই এ ঘটছে। বিশ্বের সমস্ত …র শ্রমজীবী মানুষের উষ্ণ সহানুভূতি এর সাথী এবং বিশ্ব বিকাশে …ন্তকারী শক্তি হিসেবে এর রূপ পরিগ্রহ।

…সমস্ত মানবজাতির অগ্রগতির জন্য, শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছোনোর …বিশ্ব ইতিহাসের মঞ্চে সমাজতন্ত্রের প্রবেশের মূল্য প্রচণ্ড। …র দ্বারা মানুষ শোষণের অবলুপ্তির কমিউনিজমের ঐতিহাসিক …পা বিশ্বে স্থায়ী শান্তি আনবে। "পুরোনো সমাজ—তার আর্থিক …দ্র্য আর রাজনৈতিক উন্মাদনার সঙ্গে তুলনা করলে," ভবিষ্যদ্বাণীর …া কার্ল মার্কস্ লিখলেন, "নতুন এক সমাজ জন্মলাভ করছে, যার …র্জাতিক নীতি হবে শান্তি,—আর প্রত্যেক জাতির থাকবে … এবং একই সার্বভৌম—শ্রম।"

কমিউনিষ্ট-বিরোধী ব্রিটিশ্যার সংগঠকরা বারে বারে চীৎকার …র,—"কমিউনিজম ব্যক্তির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ স্বার্থরক্ষাকে ধর্তব্যের …া ধরে না। কিন্তু, বুর্জোয়াদের এমন কোন কি দল আছে, …া ঘোষণা করতে পেরেছে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অত্যন্ত মানবিক …ওয়াজকে জীবনে রূপায়িত করতে পেরেছে: সব কিছু মানুষের …মে,…মানুষের স্বার্থে।" ইতিহাস এই ধরণের কোন বুর্জোয়া …ার্টিকে জানে না। এই মহান্ আওয়াজ অনুধাবনের অর্থের …র্বকারিতা কমিউনিষ্ট পার্টি একলাই দেখছে।

আজ আমাদের পার্টি,—বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সুযোগ-সুবিধার …মিউনিষ্ট প্রাচুর্যের সফলতার জন্য, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনযাত্রার …নকে জনগণের মধ্যে সুনিশ্চিত করার জন্য, ভোগ্য-পণ্যে জনগণের পূর্ণ …াহিদা মিটাবার জন্য, বাসগৃহ এবং সমাজসেবামূলক কাজের সমস্যাকে …বনা পয়সায় সমাধান করার জন্য,—এক কর্তব্য উপস্থিত করেছে। কিন্তু, যাদুকরের দণ্ডের স্পর্শেই কমিউনিজমকে জীবন্ত করা যায় না। উৎপাদনী শক্তির বিরাটাকার উন্নয়ন এবং উৎপাদনী শ্রমের বল্গাহীন বৃদ্ধি—সমাজের জন্য প্রচুর সম্পদ লাভে প্রয়োজনীয়।

আগামী বিশ বছরের মধ্যে সোভিয়েতের মানুষ কমিউনিজমের বৈষয়িক এবং যন্ত্র কৌশলের ভিত্তি স্থাপন করবে। আমাদের সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক এই ভিত্তিতে পরিবর্তিত হবে। দুই ধরণের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক একক উৎপাদনের মাধ্যমের সার্বজনীন মালিকানায় পরিণত হবে।

যাই হোক না কেন, প্রচুর বৈষয়িক পণ্যের উৎপাদন এবং বৈষয়িক প্রয়োজনের পরিপূর্ণ তৃপ্তিই মানুষের সুখের গণ্ডি নয়। পরিপূর্ণভাবে শব্দগত অর্থে সুখের প্রয়োজনীয় পরিবেশ হচ্ছে,—মানবিক ব্যক্তিত্বের সর্বতোমুখী এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। কমিউনিজমের বৈষয়িক এবং যন্ত্র-কৌশলের ভিত্তি প্রস্তুত করে, একই সময়ে আমাদের পার্টিকে সমাধান করতে হচ্ছে,—নতুন মানুষ গড়ে তোলা, এবং কমিউনিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক গঠন করা। সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের মধ্য থেকেই এই সম্পর্কের উৎপত্তি এবং এই সম্পর্ক অকপট মুক্তির উঁচু ধরণের সচেতন ব্যক্তিত্বের, বন্ধুত্বের এবং সাথীত্বের অত্যন্ত খাঁটি ধরণের প্রতিনিধি।

যেমনভাবে কমিউনিজমের নির্মাণ কাজ অগ্রসর হচ্ছে, তেমন তেমন জনগণের শিক্ষার মান নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্ত মানুষই উপভোগ করবে—বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান আর যন্ত্রবিজ্ঞানের সফলতা। শ্রমজীবী মানুষরা আরো খোলা সময় পাবে—সর্বোচ্চ সীমায় তাদের সৃষ্টিশীল যোগ্যতাকে অগ্রসর করতে। নতুন বিশ্বের মানুষ অতীতের খোঁড়া পাপের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবে। কমিউনিষ্ট নীতিপরায়ণতা,—সবচেয়ে নির্মল এবং মহৎ নীতিশাস্ত্র,—যা সমস্ত শ্রমজীবী মনুষ্যজাতির স্বার্থ এবং আদর্শের প্রকাশ।

আমাদের পরিকল্পনাসমূহের ব্যাপকতা,—আমাদের সমাজের সর্বগুণী বিকাশ, আমাদের দেশের প্রতিটি কোণে দেখা যাচ্ছে। নতুন নির্মাণকার্যের অগ্রসরতায় তারায় আস্তরণে, বর্ণিষ্ঠ বিদ্যুৎকেন্দ্র-সমূহের আগুনে উদ্ভাসিত হয়ে সোভিয়েতসমূহের দেশ কখনো তার সম্মুখগতি স্তব্ধ করে না। সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পূরণ করার প্রতিযোগিতামূলক প্রচেষ্টা সমস্ত দেশব্যাপী সত্য হয়ে উঠেছে, এবং ২২তম কংগ্রেসের পর থেকে আরো বিরাট শক্তিতে অগ্রসর হচ্ছে। সোভিয়েতের মানুষ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যসূচীর মহান্ লক্ষ্যসমূহকে তাদের বীরত্বপূর্ণ শ্রমের দ্বারা যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট।

এই বসন্তের দিনে সংগ্রামের সীমান্তে শ্রমের আক্রমণ,—কৃষির আরো অগ্রসরতার জন্য নতুন শক্তির সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্চ মাসের বর্ধিত অধিবেশনের সিদ্ধান্তসমূহকে পূরণ করার জন্য সোভিয়েতের মানুষ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র, যা জনসাধারণ তার সৃষ্টিশীল শ্রমের দ্বারা নিকটতর করছে, আমাদের কাজের দিনের জীবনে বাস্তব আকৃতি ধারণ করছে। কমিউনিজম্ অতীতের চেয়ে স্পষ্ট আকারে বাস্তবে বিকাশ লাভ করছে। এবং আমরা, বিংশ শতাব্দীর ছয় দশকের মানুষরা নিজেদের চোখ দিয়েই দেখতে পাই—কি করে কমিউনিষ্ট যন্ত্র-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হচ্ছে, কি করে কমিউনিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক গঠিত হচ্ছে, কি করে নতুন মানুষ গড়ে উঠছে।

* * * *

স্বপ্ন সময়কে ছাড়িয়ে যায়, যখন জীবন স্বপ্নকে সমৃদ্ধ করে।

প্রথমতঃ শ্রমিকরা বিজয়ী হয়েছে,—সত্য, কয়েক সপ্তাহের জন্য একক এক শহর প্যারীতে,—তারপর একক এক দেশ রাশিয়ায়,—আর এখন, সমাজতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ছে—ইউরোপ এবং এশিয়ার ব্যাপক বিস্তৃতি জুড়ে এবং অতীতের চেয়ে আরো শক্তিশালী শক্তি হয়ে বেড়ে উঠতে বাধ্য।

কমিউনিজমের বিজয়ের অনিবার্যতার শপথ এই ঘটনার মধ্যেই বিদ্যমান যে, কমিউনিজম খুলে দেয় উৎপাদন বৃদ্ধির মহত্তর সুযোগ এবং সৃষ্টি করে সর্বোচ্চ উৎপাদনী শ্রম। একমাত্র কমিউনিজমের ছত্রছায়ায়ই বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক পণ্যসম্ভারের প্রাচুর্যের সফলতা সম্ভব। কমিউনিজম এককভাবে ব্যক্তির সর্বাত্মক উন্নতিকে সুনিশ্চিত করবার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং জাতিসমূহের জন্য শান্তি এবং সুখ আনে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

## চার

!! গ !!

সুতোয় বাঁধা চাবীটা হাতে নিয়ে সুন্দরম গদি-ঘর থেকে বের হয়ে আসে। একটি মুহূর্তও আর সে বিলম্ব করবে না। যত শীঘ্র মৃন্ময়ীকে নিয়ে গিয়ে তোলা যায়, ততই বুঝি মঙ্গল। নৌকায় মধ্যে ভালভাবে মৃন্ময়ীর চিকিৎসাও হচ্ছে না। নৌকায় কামরার মধ্যে সামান্ত জায়গা, নানাবিধ অসুবিধা। অরিন্দমের বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলে কালই একবার সে কানা কবিরাজকে ডেকে নিয়ে যাবে। বলবে, কবরেজ মশাই, যত তাড়াতাড়ি পারো মৃন্ময়ীকে ভাল করে দাও, সুস্থ করে দাও। চিকিৎসা ও ঔষধের জন্য যা দিচ্ছি তা তো দিচ্ছিই, ও ভাল হয়ে উঠলে তোমাকে খুশি করে দেবো।

বহির্মহল অতিক্রম করে যাবার পথে আত্মচিন্তায় বিভোর সুন্দরম্ হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায়। বহির্মহলের একেবারে শেষ প্রান্তে অলিন্দটা প্রায় অন্ধকার বললেও চলে। সামান্য যে একটি দেওয়ালগিরির ব্যবস্থা আছে তার আলো প্রশস্ত টানা ঐ অলিন্দ-পথটিকে কেমন যেন একটা রহস্যপূর্ণ আলোছায়ায় থমথমে করে রাখে। অধিক রাত্রে তো ঐ অলিন্দ-পথে একা একা হেঁটে যেতে গায়ের মধ্যে কেমন ছমছমই করে।

হঠাৎ যেন একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে আসে সুন্দরমের। কান্নার শব্দটা কানে যেতেই সে থমকে দাঁড়ায়। অলিন্দের একধারে আবছা আলো-আঁধারীতে প্রথমটায় নজর না পড়লেও একটু ভাল করে দৃষ্টিপাত করতেই সুন্দরমের নজরে পড়ে আবছায়া একটা মূর্তি।

কেউ দাঁড়িয়ে আছে ওখানটায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কাঁদছে যেন অতি সংকোচের সঙ্গে সকলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে। মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেন কি ভাবে সুন্দরম, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সামনে। কাছাকাছি আসতে নজরে পড়ে আবছা আলো-আঁধারীতে, পনের যোল বছরের একটি কিশোর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে চোখে হাত দিয়ে।

কে তুমি ?

সুন্দরমের গলায় সাড়া পেয়ে কিশোর হঠাৎ তার কান্না থামায়, কিন্তু কোন সাড়া দেয় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

কে তুমি ? এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছো কেন ?

তবু সাড়া নেই।

কে তুমি ?

আমি শিবনাথ।

শিবনাথ।

হ্যাঁ, শিবনাথ লাহিড়ী।

ব্রাহ্মণ ?

আজ্ঞে।

এ বাড়িতেই থাক বুঝি তুমি ?

আজ্ঞে।

সরকার মশাইয়ের কোন আত্মীয় ?

আজ্ঞে না।

তবে।

আশ্রিত। এখানে থেকে পড়াশুনা করি।

পড়াশুনা কর।

আজ্ঞে, মহাত্মা হেয়ারের স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি।

তা বেশ। কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে কেন?

সারাদিন কিছু আহার হয়নি—ক্ষুধায় কাঁদছিলাম।

কথাটা শুনে বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না সুন্দরমের। পনের যোল বৎসর বয়স্ক একটি কিশোর ক্ষুধার তাড়নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

তবু সে শুধায়, এখানে থাক যখন, এখানেই নিশ্চয়ই আহার কর।

তা করি।

তবে।

আমার তো সব পাঠ্যপুস্তক নেই—এক সহাধ্যায়ীর গৃহে তাই প্রত্যহ পড়তে যাই, একত্রে সেখানে দু'জনা অধ্যয়ন করি। কয়েক দিন থেকেই ফিরতে রাত হচ্ছিল—

তার পর ?

এবং প্রত্যহই এসে দেখি পাচকঠাকুর রন্ধনশালার দ্বার রুদ্ধ করে চলে গিয়েছে। আজও তাই হয়েছে।

তা সরকার মশাইকে কথাটা বলনি কেন ?

তিনি যদি রুষ্ট হন।

রুষ্ট হবেন কেন, চল আমার সঙ্গে তুমি, তিনি এখনো হয়ত গদি-ঘরেই আছেন—তোমার হয়ে না হয় আমিই তাঁকে জানাব ব্যাপারটা।

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY Glucose
KOLAY GLUCOSE BISCUITS
KOLAY Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

না, না—তার কোন প্রয়োজন নেই। কত দয়া তাঁর, দয়া করে দুঃস্থ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর আশ্রয় না পেলে তো আমার ইংরাজী শিক্ষাই হতো না। শুধু তাই কেন, তিনি দয়া করে মহাত্মা হেয়ারের বন্ধু গৌরমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে না বলে দিলে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ফ্রি ছাত্ররূপে ভর্তি হতেও তো পারতাম না।

বেশ, বেশ—তা তোমার ক্ষুধা পেয়েছিলে বলছিলে না?

তা তো পেয়েছিল, তবে সে যা হোক করে রাতটা কেটে যাবে। একটা রাত তো—

কিন্তু কাল রাতেও যদি অধ্যয়ন সেরে গৃহে ফিরতে তোমার দেরি হয়।

তা হলে আর কি করা যাবে।

তা অবিশ্যি ঠিক কিন্তু এই ভাবে প্রতি রাত্রে উপবাস দিলে যে ক্রমশঃই দেহ তোমার দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল শরীরে অধ্যয়ন করবে কি করে?

তা অবিশ্যি ঠিকই, কিন্তু উপায় কি?

তুমি আমার গৃহে যাবে।

আপনার গৃহে!

হ্যাঁ, আমার গৃহে। সেখান থেকে তুমি স্কুল করবে পড়াশুনা করবে।

কিন্তু—

কি! বল!

আপনাকে তো আমি চিনি না!

তা ঠিক। তবে সরকার মশাইকেই কি তুমি এখানে আসবার চিনতে?

না।

তবে?

তবে আমাকে না চিনলেই বা তোমার ক্ষতি কি! দেখ যদি থাক তো কাল তুমি যে কোন সময় আমার গৃহে যেতে পারো। র গৃহে বেশী লোকজনের ভিড় নেই, আমি আর আমার স্ত্রী—আমার অসুস্থ। বেশ বড় বাড়ি। তোমার সেখানে কোনরূপ বে না।

রকার মশাইকে তাহলে জিজ্ঞাসা করবো।

া করতে চাও করো। তবে একটা কথা তোমার জানা র শিবনাথ।

কি বলুন!

আমি কিন্তু ব্রাহ্মণ নই।

আপনি ব্রাহ্মণ নন।

া। জাতে আমি পর্তুগীজ। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে —পৃথক ঘরে তুমি থাকবে এবং রন্ধনের জন্ম আমি পাচকের করবো। সেই তোমার দুবেলা রন্ধনাদি করে দেবে—

তবে আর কি!

া হলে তুমি সরকার মশাইকে বলে তাঁর কুলীর বাজারে যে বাড়ী আছে সেখানে চলে যেও,—হ্যাঁ একটা কথা।

কি!

মি আমার নাম তাঁকে করতে পারো। আমার নাম সুন্দরম। আমাকে সুন্দর সাহেব বলে।

আমি সরকার মশাইকে শুধিয়ে যা তিনি পরামর্শ দেবেন তা করবো।

তাই করো। কিন্তু আজ রাত্রে তো তোমার কিছু খাওয়া দরকার। আমার সঙ্গে যদি তুমি আসো, আমি তোমার আহারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। যাবে আমার সঙ্গে।

কত দূরে যেতে হবে?

বেশী দূর নয়। কাছেই—

বেচারী শিবনাথের সত্যিই বড় ক্ষুধা পেয়েছিল। সে আর আপত্তি করে না।

তবে এসো আমার সঙ্গে।

শিবনাথ সুন্দরমের পিছনে পিছনে এগিয়ে চলে।

পথ তখন প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। লোক চলাচল একপ্রকার নেই বললেই চলে। রাতটাও অন্ধকার পক্ষ।

তবে আকাশে তারা থাকায় স্তিমিত একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল আকাশ থেকে। সেই আলোতেই দু'জনে হেঁটে চলে। কিছুদূর এগিয়ে একটা অপ্রশস্ত গলিপথের মধ্যে প্রবেশ করে সুন্দরম একটা চালাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

বাইরে ঝাঁপ ফেলা। বাঁশের চাঁচারীর ঝাঁপ, ফাঁকে ফাঁকে একটা মৃদু আলোর আভাস আসছে।

বোঝা গেল ভিতরে আলো জ্বলছে তখনও।

ঝাঁপের সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দরম ডাকে, মোতির মা। অ মোতির মা।

কে?

ভিতর থেকে সাড়া এলো।

ঝাঁপটা খোল মোতির মা। আমি সুন্দর সাহেব।

বিশেষ ঐ নামটার সঙ্গে বৃদ্ধা মোতির মা'র কি পরিচয় ছিল কে জানে, বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঝাঁপটা খুলে গেল।

ছোটখাটো একটা দোকান—মুড়ি, চিঁড়ে, মেঠাই ইত্যাদির।

একপাশে একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে। তারই আলোয় জায়গাটা মৃদু আলোকিত। মোতির মা'র বয়স যদিও হয়েছে তথাপি এখনো বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মাথার চুলগুলি পেকে প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি একটা জলচৌকী এগিয়ে দেয় মোতির মা, বোস সাহেব, বোস—

না মোতির মা, বোসবো না।

এতক্ষণে মোতির মা'র সুন্দরমের পাশেই দণ্ডায়মান শিবনাথের উপরে নজর পড়ে। কেবল মোতির মা'র কেন, সুন্দরমেরও এই প্রথম যেন নজর পড়লো শিবনাথের 'পরে।

রোগাটে গড়ন, খুব বেশী লম্বা নয়। টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ। মাথাভর্তি কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে কাঁধের 'পরে নেমে এসেছে।

পরিধানে একটি মলিন ধুতি ও গায়ে একটি বেনিয়ান।

মুখখানা যেন শিবনাথের একেবারে পটের ছবি।

প্রশস্ত ললাট, টানা টানা দুটি চক্ষু—বংকিম ভ্রূ যুগলের নীচে। তীক্ষ্ণ নাসা। কোমল চিবুক।

মোতির মা এবং সুন্দর সাহেব দুজনাই একদৃষ্টে তাকিয়েছিল কিশোর শিবনাথের দিকে। মোতির মা-ই প্রথমে প্রশ্ন করে, সঙ্গে এ কে সাহেব?

ছেলেটি ব্রাহ্মণ সন্তান, ক্ষুধার্ত—এর জন্য কিছু ফলারের জোগাড় দিতে পারো মোতির মা ?

স কি! কেন পারবো না। চিঁড়া আছে, দুধ আছে, কলা এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

র্তার পকেট থেকে একটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে মোতির মা'র দিতে যায় সুন্দরম, তাহলে ওকে পেট ভরে ফলার করিয়ে —

কিন্তু ওটা কি দিচ্ছ সাহেব !—মোতির মা হাত সরিয়ে নেয়, ব্রাহ্মণ সন্তানকে একটু ফলার করাবো তার জন্য মূল্য নেব—কপাল আমার—

না, না—আমি যখন দিচ্ছি কেন নেবে না।

না সাহেব। ও-কথা বলো না, বামুনের ছেলের ক্ষিধে পেয়েছে খেতে দেবো তার জন্য মূল্য নিয়ে কি নরক যাবো! তা'ছাড়া ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেচো সাহেব। না, না—ও কথা না।

সুন্দরম্ হাসে। বলে, বেশ, নিও না—ওকে খেতে দাও।

চল গো ঠাকুর, ও-দিকে ভিতরে জল আছে, হাত-মুখ ধুয়ে —সব দেখিয়ে দিচ্ছি, জোগাড় করে বসে পড়।

মোতির মা তাগিদ দেয়।

তাহলে আমি চলি শিবনাথ। তবে তোমাকে যা বলছিলাম, আমার ওখানে গিয়ে থাকতে চাও তো চলে যেও।

সুন্দরম চলে গেল।

সব গোছগাছ করে নিয়ে শিবনাথ ফলারে বসে।

কিছু দূরে বসে বসে দেখে মোতির মা।

বেচারীর বোধ হয় সত্যিই খুব ক্ষুধা পেয়েছিল, গোগ্রাসে খেয়ে চলে। শালিধানের মিহি সুগন্ধি চিঁড়া, পুরুষ্ট পাকা মর্তমান কদলী—টি দুধ—ফুল বাতাসা—পরিতৃপ্তির সঙ্গেই ফলার করে শিবনাথ।

এক সময় মোতির মা শুধায়, তা ঠাকুর, ঐ সুন্দর সাহেবের সঙ্গে মার পরিচয় হলো কি করে ?

ওকে তো আমি চিনি না।

চেনো না।

না।

তবে ওর সঙ্গে এলে।

উনি নিয়ে এলেন ডেকে সঙ্গে করে পরবশ হয়ে।

তা ঠাকুরের কোথায় থাকা হয়।

অরিন্দম সরকার মশাইয়ের গৃহে থাকি।

তিনি কি তোমার আত্মীয়।

না। আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

পড়াশুনা করছো বুঝি ?

হ্যাঁ—হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি।

সংসারে কে আছেন ?

কেউ নেই।

মা-বাপ।

না—তাঁরা অনেক দিন স্বর্গে গিয়েছেন।

আহা রে—তা আর কেউ নেই।

আছেন মামা-মামী।

তা দেখো ঠাকুর, দোকানটা তো এবার চেনা হয়ে গেল তোমার, যখন খুশি এখানে চলে এসো ক্ষুধা পেলেই। কেমন ?

আসবো ?

হ্যাঁ, আসবে বৈ-কি! এসো কেমন!

আচ্ছা!

## পাঁচ

॥ ক ॥

সেই রাত্রেই সুন্দরম মৃন্ময়ীকে নিয়ে এসে অরিন্দম সরকারের কুলীর বাজারের গৃহে এনে তুলল।

বলতে গেলে একেবারে গঙ্গার তীরেই গৃহ।

জায়গাটি নির্জন, তেমনই খুব জনবসতি নেই। কয়েক ঘর যা বাসিন্দা আছে আশ-পাশে ছড়ানো, তারা কেউ-ই উচ্চবর্ণের নয়।

জেলে, কুমোর, কামার ইত্যাদি।

তবে কিছুটা এগিয়ে গেলে মানুষ-জনের বসতি আছে।

প্রায় বিঘা দুই জায়গা নিয়ে আম কাঁটালের বাগান ও তার মধ্যে একটি পাকা গাঁথুনীর গৃহ। গোটা চারেক কামরা।

তবে কামরাগুলো বেশ প্রশস্ত।

নৌকার কামরার মধ্যে এতটুকু স্থান, মৃন্ময়ীকে এনে তোলবার পর-সেখানে যেন আর পা ফেলবারই জায়গা ছিল না। বিশেষ করে সুন্দরমের লম্বা চওড়া চেহারা, তার নড়ে চড়ে বসতেও ঐ স্বল্প পরিসর কামরার মধ্যে অসুবিধা হচ্ছিল। আরো বেশী অসুবিধা হচ্ছিল শয্যার। একটিমাত্র শয্যা কামরার মধ্যে, তাও অধিকার করেছিল মৃন্ময়ী। সুন্দরমকে কামরার একপাশে কোন মতে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে রাতটা কাটাতে হচ্ছিল, অরিন্দম সরকারের বাড়িতে এসে উঠে, প্রশস্ত ঘরের মধ্যে মনটা যেন মুক্তির আনন্দে পাখা মেলে দেয়।

তা ছাড়া এতকাল সুন্দরমের নৌকার মধ্যে জলে জলেই কেটেছে। জল আর চারিদিকে উন্মুক্ত আকাশ বন্ধনহীন মুক্তির একটা স্বাদ ছিল বটে, কিন্তু তবু তার মধ্যে যেন কোথায় ছিল অদৃশ্য দাগকাটা একটা সীমানা।

নৌকার সীমানা। যে সীমানাটা পার হলেই শুধু জল আর

জল। নিশ্চয়তা নেই যেখানে, নেই যেখানে বিশ্বাস, নেই কোন অবলম্বনের নিশ্চিন্ত আশ্বাস বা তৃপ্তি। একঘেয়ে স্বাদহীন বৈচিত্র্যহীন শুধু অনিশ্চিত জলের ব্যাপ্তি। এবং যার মধ্যে সে ক্রমশঃই নিজের অজ্ঞাতে যেন হাঁপিয়ে উঠছিল।

হাঁপিয়ে উঠছিল সুন্দরম আরো একটা কারণে। স্বাদহীন, ছন্দহীন একঘেয়ে একক জীবনের ক্লান্তি, কেমন যেন তাকে ক্রমশঃই আচ্ছন্ন করে ফেলছিল ইদানীং। কেমন যেন একটা দুর্বোধ্য ভাবনা মধ্যে মধ্যে তার মনের চারপাশে এসে তাকে যেন উদাস বিষণ্ণ করে দিচ্ছিল। বাধাহীন বেপরোয়া যে জল-জীবনটা একদিন তাকে উগ্র একটা নেশায় বুঁদ করে রেখেছিল, সে নেশাটা যেন কেমন তরল হয়ে এসেছে। বিশেষ করে গভীর রাত্রে একাকী ভাসমান নৌকার কামরার মধ্যে মনে হতো যেন সুন্দরমের, সে বড় একা। কেউ যেন নেই তার কোথায়ও।

একটু স্নেহ, একটু মিষ্টিকথার জন্য মনটা যেন তার কেমন কাঙ্গাল হয়ে উঠতো। মনে হতো এই ভাবে জলে জলে ভেসে বেড়ানর চাইতে শক্ত মাটির 'পরে ছোট্ট একটি ঘরেও যদি সে রাত কাটাতে পারত। এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তটিতে যদি কেউ তার পাশে থাকত। তবে বুঝি এমনি করে সে হাঁপিয়ে উঠতো না। মনের মধ্যে যখন ঠিক এমনি একটা দ্বন্দ্ব চলেছে, তার জীবনে এলো মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ীকে সুন্দরম লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিল নিতান্তই একটা ঝোঁকের মাথায়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যই সেদিন তার মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু লুণ্ঠন করে আনবার পর নৌকার কামরার আলোয় মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকাবার পরই হঠাৎ যেন তার মনে হয়েছিল, অনেক লুণ্ঠন ইতিপূর্বে সে করেছে কিন্তু এমন একটি বস্তু যেন জীবনে এই প্রথম সে লুণ্ঠন করে নিয়ে এলো! নানা বয়েসের স্ত্রীলোক সে ইতিপূর্বে বহু দেখেছে, কিন্তু মৃন্ময়ী যেন সেই দেখার মধ্যে পড়ে না। মৃন্ময়ী যেন একান্তই স্বতন্ত্র, যেন একটা বিস্ময়।

তারপর জ্বরের ঘোরে মৃন্ময়ী হলো আচ্ছন্ন। আর তার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে থাকতে সেই বিস্ময়টা যেন ক্রমশঃ অপূর্ব এক মমতায়, অপূর্ব এক স্নেহে রূপান্তরিত হয়ে সুন্দরমের সমস্ত মনটাকে ভরিয়ে তুলল।

এদিকে মৃন্ময়ীকে পেয়ে তার মনের দুঃসহ একাকীত্বটা কখন যে ভরাট হয়ে উঠেছিল সুন্দরম নিজেও জানতে পারেনি।

মৃন্ময়ীকে যেন সুন্দরম দুহাতে আঁকড়ে ধরল।

পরের দিন বৈকালের দিকে সুন্দরম গিয়ে কানা-কবিরাজের গৃহে হাজির হলো। সেদিন আবার সকাল থেকেই কি একটা তুচ্ছ কারণে ভিষগরত্ন ও জগদম্বার মধ্যে কলহের শুরু হয়েছিল।

সুন্দরম যখন গিয়ে ভিষগরত্নের গৃহে পৌছাল তার কিছুক্ষণ আগেই সে একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে জগদম্বাকে তাড়া করায়, জগদম্বা তার হাত থেকে সেই কাঠটা ছিনিয়ে নিয়ে ভিষগরত্নকেই বেশ করে উত্তম মধ্যম দিয়েছিল।

জগদম্বার হাতে প্রহৃত হয়ে আক্রোশে ও মনের দুঃখে অসময়েই ঘরের সামনে বারান্দায় কারণের পাত্রটি নিয়ে বসেছিল।

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে সুন্দরমের গলা শোনা গেল, ঠাকুর মশাই আছেন নাকি।

এবং সুন্দরম বরাবরই সাড়া দিয়েই সোজা এসে একেবারে দুয়োর ঠেলে ভিতরে এসে প্রবেশ করত, আজও তাই করে।

ঠাকুর মশাই!

খিঁচিয়ে ওঠে এবারে ভিষগরত্ন, কেন! দেখতেই তো পাচ্ছো এখানে আছি। প্রয়োজনটা কি বলে ফেল।

ঠাকুর মশাই আমি সুন্দরম।

সুন্দরম এগিয়ে এলো।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার আবছা আঁধার একটু একটু করে চারিদিকে জমাট বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল। সুন্দরমের প্রথমটায় নজর পড়েনি, কিন্তু এতক্ষণে নজর পড়লো দাওয়ায় কারণপাত্র সামনে রেখে ভিষগরত্ন বসে।

ঠাকুর মশাই আমার স্ত্রীকে একটিবার দেখতে যেতে হবে।

পারবো না।

চলুন ঠাকুর মশাই, একটিবার তাকে আবার ভাল করে দেখে ব্যবস্থা করে দিন—

না। পারবো না।

যা টাকা চান পাবেন, চলুন।

না, না, না—নিকালো হিঁয়াসে—

হঠাৎ একটা কথা ঐ সময় সুন্দরমের মনে পড়ে যায়। মুহূর্তকাল কানা কবিরাজের দিকে তাকিয়ে থেকে সুন্দরম বলে, তা ঐ তাড়িগুলো গিলছেন কেন! চলুন ভাল বিলিতি সুরা আছে আমার কাছে, দেবো—

সাপের মাথায় যেন ধুলোপড়া পড়লো।

বললেন, সত্যি বলচিস তো বেটা। ধোঁকা দিচ্ছিস না তো।

আজ্ঞে না, চলুন না—

টাকাও দিতে হবে কিন্তু—

পাবেন তাও, চলুন।

কয় বোতল দিবি!

দু' বোতল।

ঠিক তো।

ঠিক।

তবে—চল—

ভিষগরত্ন উঠে দাঁড়ালেন।

এদিকে সেই দিন সন্ধ্যা রাত্রে গদি-ঘরে, চৌকি 'পরে বসে আলবোলার নলটি হাতে অরিন্দম সরকার সম্মুখে দণ্ডায়মান জগার দিকে চেয়েছিলেন।

একটু পরে বললেন, সত্যি।

আজ্ঞে কর্তা।

মেয়েটা সত্যি বলচিস সুন্দরী!

যাকে বলে ডানাকাটা পরী।

বয়স কত হবে বলে মনে হয়।

তা চোদ্দ-পনের হবে।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে কেন?

তা বলবো কি করে। বোধ হয় অসুখ—

হুঁ।

অরিন্দম সরকার কি যেন ভাবতে লাগলেন। [ক্রমশঃ

# ইনিয়াৎবানু বেগম

## শিবানী ঘোষ

মতিবাগের বিরাট রাজপ্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সম্রাট রফি-উদ-দরজাৎ। আজ ঐ পুষ্প শোভিত ফুল-বাগিচায় অধিকার পর্যন্ত তাঁর নেই। আজ তিনি বন্দী সৈয়দ হিম্মৎ সৈয়দ কুতুব-উল্-মুলকের নিকট।

াগল সাম্রাজ্যের গৌরব আজ অস্তমিত। আলমগীর বাদশার : পর সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর শাহ। জন্মের পর কিছু দিনের জন্য সম্রাট হলেন বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ হান্দার শাহ। বিরাট ভোগ-লালসায় মত্ত থেকে তাঁর পতন কয়েক মাসের মধ্যেই। তারপর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী াহাদুর শাহ-তনয় আজিম ওসমানের পুত্র ফারুক শায়ার। জন্মের অবসানের পরই সিংহাসন পেলেন রফি-উদ-দরজাৎ।

ফি-উদ-দরজাতের পিতা রফি-উল-কাদের ছিলেন বাহাদুর পঞ্চম সন্তান। আর তিনি হলেন পিতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। সিংহাসন লাভ করা তাঁর ভাগ্যে ছিল আশাতীত। কিন্তু াপন শৌর্য-বীর্য, বুদ্ধিমত্তায় তিনি যখন সেই দুর্লভ বস্তুরই ন্নী হলেন তখন মনে-প্রাণে স্থির করেছিলেন, আবার তিনি সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন, আবার তিনি হন্দুস্থানকে এক শক্তির অন্তর্ভুক্ত করবেন, আবার ঘরে ঘরে হবে মোগল শাসনের জয়গান। কিন্তু না, কিছু হল না। দলাদলি, প্রতিহিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা সব কিছু ভাসিয়ে দিল পরিপূর্ণতাকে। যার অন্তরে রয়েছে ভাঙনের বিরাট ফাটল, দ-দরজাৎ শত চেষ্টাতেও তা জোড়া লাগাতে পারলেন না। অন্যান্য সম্রাটের মতোই তাঁকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হল প্রতিহিংসার কাছে।

-তুমি কি এত ভাবছো?

াপন সহধর্মিণী ইনিয়াৎবানুর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর পানে ফিরে : রফি-উদ-দরজাৎ। বেগম সাহেবা পুনরায় বললেন—তুমি ত এত কি ভাবছো বল তো?

ফি-উদ-দরজাৎ ইনিয়াৎবানুর হাত দুটো ধরে বলেন—ভাবছি াই কথা।

নিয়াৎবানু বেগম বলেন—আমার কথা ভাবছো?

—হ্যাঁ প্রিয়তমে। ভাবছি, যে প্রতিহিংসার কবলে আজ আমরা ্, জানি না এর পরিসমাপ্তি কোথায়। আমার কেবলই মনে হয়, আমার অবর্তমানে তোমার ওপর চালাবে পাশবিক অত্যাচার।

'নিয়াৎবানু বলেন—আমার জন্যে তুমি মিথ্যা দুশ্চিন্তা করো এটুকু ভরসা রেখো, আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ ছাড়া এ দেহ অন্য আর কেউই স্পর্শ করতে পারবে না।

ফি-উদ-দরজাৎ প্রিয়তমার ওষ্ঠে চুম্বন দিয়ে বলেন—ইনিয়াৎ, া—

—বলো।

—আমার কি ইচ্ছে করছে জানো, ঐ বাগিচা থেকে ফুল তুলে সাজিয়ে দিই তোমার মাথায়। ঠিক যেমনটি দিয়েছিলাম দের বিয়ের দিন। সেদিনও ছিল এমনি চাঁদনি রাত। কিন্তু ই ভাগ্যের বিড়ম্বনা যে, ঐ বাগানে যাওয়ার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত আমার নেই।
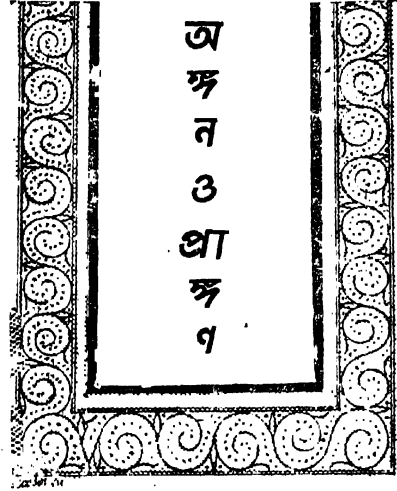
ইনিয়াৎবানু বলেন—তুমি কিছু ভেবো না। আমি তোমাকে ফুল এনে দিচ্ছি।

রফি-উদ-দরজাৎ বলেন—না ইনিয়াৎ, তুমি যেও না। ওরা তোমাকে বাগিচায় যেতে দেবে না।

ইনিয়াৎবানু বলেন—আমি ওদের বন্দী নই। আমি স্বেচ্ছায় এখানে এসে রয়েছি। কাজেই ঐ বাগিচায় যাবার মতো পূর্ণ স্বাধীনতা আমার আছে।—বলেই মাথায় ওড়না টেনে বাগিচার দিকে চলে যান বেগম সাহেবা।

সৈয়দ কুতুব-উল-মুলকের মনে প্রাণে তখন অনুরণিত হচ্ছে হারেমের নেশা। প্রতি রাত্রে বিলাসের ইন্ধনস্বরূপ তাঁর চাই কয়েকটি সুন্দরী তরুণী। মতি-বাগের দক্ষিণ দিকের বিরাট অট্টালিকাটিই তাঁর বিলাস-ভবন। দেশ-বিদেশের অগণিত সুন্দরী রমণী রক্ষিতা হিসেবে আনা হয়েছে ঐ প্রাসাদে। সৈয়দ কুতুব-উল-মুলক প্রতিদিন রাত্রে তাঁর পছন্দ মতো কয়েকটি তরুণীকে নিয়ে নিমগ্ন হয়ে ওঠেন বিলাসিতায়।

সেদিন জোৎস্না-স্নাতা রজনীতে তাঁর রস-বিহারের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে মতি-বাগের ফোয়ারার পাশে। সেখানে একপাশে পাতা হয়েছে জাজিম। সেই জাজিমের ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন সৈয়দ কুতুব-উল-মুলক। তাঁর পাশে বসে রয়েছেন হারেমের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সদরুন্নিসা। মাঝে মাঝে তিনি সফেন শরাব ভর্তি করে দিচ্ছেন সৈয়দের পেয়ালায়।

ফোয়ারা থেকে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে জল। তার চারপাশে ঘুরে-ফিরে নৃত্য করে চলেছে সুন্দরী তরুণীরা। ফোয়ারার জলে সিক্ত হয়ে উঠছে তাদের বসন। যা ভেদ করে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাদের তন্বী দেহকান্তি।

হঠাৎ নাচতে নাচতে থমকে দাঁড়ায় নর্তকীরা। তাদের মনে হল কে যেন আসছে এই ফোয়ারার দিকে। যদি ঐ আগন্তুক ব্যক্তি পুরুষ হয় তবে কেমন করে তারা দেখাবে স্নানের নৃত্য?

নেশায় বুঁদ হয়ে ঢুলুঢুলু নয়নে তরুণীদের নাচ দেখে চলেছেন

সৈয়দ কুতুব-উল-মুলক্। ফোয়ারার জলে সিক্ত হয়ে গেছে ওদের বসন। এবার ওরা এলিয়ে দেবে মাথার চুল। তারপর দেহ হতে খুলে ফেলবে সিক্ত বসন। চাঁদের আলো এসে ঠিকরে পড়বে ওদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। তখন জমবে আসল নেশা। কিন্তু এ কি, ওরা নাচতে নাচতে থমকে দাঁড়াল কেন?

—কি, কি হল তোমাদের?—হাঁক পাড়লেন কুতুব-উল-মুলক্।

—কে যেন আসছে এদিকে!—শঙ্কিত হয়ে লুকিয়ে দাঁড়ায় তরুণীরা।

কে আবার আসছে! কার এমন স্পর্ধা মতি-বাগের এ প্রান্তে আসবে? ওদিকের অট্টালিকায় বন্দী রয়েছে রফি-উদ-দরজাৎ। তার জন্যে তো ব্যবস্থা হয়েছে সতর্ক প্রহরীর! তবে?

—প্রতিহারী!—হাঁক পাড়লেন কুতুব-উল্-মুলক্।

সদরুন্নিসা স্মরণ করিয়ে দেয়—এদিকে প্রতিহারীদের আসতে নিষেধ আছে।

—ও, আচ্ছা তবে আমিই দেখছি।—টলতে টলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন কুতুব-উল্-মুলক্।

তাঁকে বসিয়ে দিয়ে সদরুন্নিসা বলে—আপনাকে উঠতে হবে না। আমি গিয়ে দেখে আসছি কে আসছে।

সদরুন্নিসা তখুনি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসে খবর। সে জানায় —ও কোন পুরুষ নয়। ও আমাদের মতোই একটি নারী।—নর্তকীদের সে হুকুম করে—ওগো, তোমরা আবার সব নাচ সুরু করো।

আবার সুরু হয়ে যায় নাচনেওয়ালীদের নাচ। ঝুমঝুম্ ক'রে বাজতে থাকে তাদের পায়ের নূপুর।

কুতুব-উল্-মুলক্ জড়িত কণ্ঠে বলেন—কি বললে সদর? পুরুষ নয়, নারী? তা কে সেই নারী?

সদরুন্নিসা বলে—উনি হলেন ইনিয়াৎবান্নু বেগম। সম্রাট রফি-উদ-দরজাতের স্ত্রী। বাগিচায় এসেছেন স্বামীর জন্যে ফুল নিয়ে যেতে।

কুতুব-উল্-মুলুক বলেন—শুনেছি, ইনিয়াৎবান্নু বেগমের রূপের তুলনা হয় না। বসরার গোলাপও নাকি তার রূপের কাছে মাথা হেঁট করে. এ কথা কি সত্যি সদর?

সদরুন্নিসা বলে—আপনি মিথ্যে কিছু শোনেননি। ঐ বেগমের রূপের তুলনা হয় না।

কুতুব-উল্-মুলক্ বলেন—তবে তুমি ঐ বেগম সাহেবাকে ডেকে আনো এই আসরে।

সদরুন্নিসা চমকে উঠে বলে—বলেন কি আপনি! ঐ স্বামী-সোহাগিনী বেগম আসবেন এখানে? এ কথা ভুলেও মনে স্থান দেবেন না।

কুতুব-উল্-মুলক বলেন—কিন্তু সেই রূপসীকে আমার চাই-ই। যাও, তুমি এখুনি গিয়ে তাকে নিয়ে আসো আমার কাছে।

সৈয়দের নির্দেশ শুনে উঠে পড়ে সদরুন্নিসা।

ইনিয়াৎবান্নু বেগম ফুলের স্তূপ নিয়ে হাজির হন তাঁর স্বামীর কাছে। রফি-উদ-দরজাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলেন—সত্যি ইনিয়াৎ, তুমি যে এই রাত্রে বাগিচায় গিয়ে ফুল নিয়ে আসতে পারবে তা আমি ভাবতেও পারি নি।

ইনিয়াৎবান্নু বেগম বলেন—এবার তুমি এই ফুলগুলো আমার মাথায় সাজিয়ে দেবে না?

রফি-উদ-দরজাৎ বলেন—দেবো, ঠিক আমাদের বিয়ের দিনে তোমার মাথায় যেভাবে ফুল সাজানো ছিল, এখনও আমি ঠিক সেই-ভাবে তোমাকে সাজিয়ে দেবো।

ইনিয়াৎবান্নু বলেন—তার আগে বিয়ের সময় আমার চুলটা যে-ভাবে বাঁধা ছিল সেইভাবে বেঁধে নিই।—বলেই তিনি তাঁর আজানুলম্বিত কেশ পিঠের ওপর আলুলায়িত করে তা বিন্যাসে মনোযোগ দেন। সহসা তাঁর চোখে পড়লো তাঁর কেশের প্রান্তভাগ বড় অসমান। বিয়ের সময় তো এমন ছিল না। তাই তিনি কাঁচি এনে চুলের প্রান্তদেশ খানিকটা ছেঁটে সমান করে নেন।

এমন সময় টোকা পড়লো দরজায়। রফি-উদ-দরজাৎ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখলেন, কুতুব-উল-মুলকের সুন্দরী সদরুন্নিসা। সে জিজ্ঞেস করে—বেগম সাহেবা রয়েছেন?

—হ্যাঁ। দরজা ছেড়ে চলে আসেন রফি-উদ-দরজাৎ।

সদরুন্নিসা তখন এগিয়ে আসে বেগম সাহেবার কাছে। ইনিয়াৎবান্নু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তার মুখের পানে। সদরুন্নিসা বলে—একটা কথা আছে বেগমসাহেবা।

ইনিয়াৎবান্নু বলেন—কি কথা?

সদরুন্নিসা সম্রাটের পানে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে কথা বলতে। সে কথা অনুমান করে রফি-উদ-দরজাৎ সেই কক্ষ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়ান অলিন্দে। সদরুন্নিসা তখন বেগম সাহেবার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলে দু'চারটে কথা। যা শুনে ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে চীৎকার করে ওঠেন ইনিয়াৎবান্নু—কি! কি বললে? সৈয়দ কুতুব-উল-মুলক্ দেখা করতে চান আমার সাথে? তাঁকে বলে দিও, আমি তাঁর দাসী-বাঁদী কিংবা রক্ষিতা নই। এ আমার প্রাণ থাকতে কখনও হবে না।

সদরুন্নিসা বলে—কিন্তু আপনি ভুল করছেন বেগম সাহেবা। এটুকু মনে রাখবেন, আপনার স্বামী সম্রাট হলেও তিনি এখন কুতুব-উল-মুলকের নিকট বন্দী। কাজেই তাঁকে অসন্তুষ্ট করার অর্থ নিজের গলার ফাঁস আরও জোর করে টেনে দেওয়া।

ইনিয়াৎবান্নু বলেন—তা বলে তোমাদের মতো নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে একটা কুলাঙ্গারের কামের বলি হতে হবে! আর তোমাদের কুতুব-উল-মুলক যদি আমার স্পর্শ পাবার জন্যে একান্তই পাগল হয়ে ওঠেন তবে আমার এই চুলগুলো নিয়ে যাও। এগুলো পেলে তিনি আনন্দ পাবেন।—বলেই তিনি তাঁর কর্তিত চুলগুলো ছুঁড়ে দেন সদরুন্নিসার দিকে।

সদরুন্নিসা বলে—বেশ, আমি তাই গিয়ে দেবো সৈয়দকে। তবে এটুকুও জেনে রাখুন, এর ফল ভাল হবে না।—বলে সে চলে যায় ঘর থেকে।

তখন রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছে ইনিয়াৎবান্নুর। রফি-উদ্-দরজাৎ তখন এগিয়ে আসেন বেগম সাহেবার কাছে। তিনি তাঁর মাথায় হাত রেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন—ও এতক্ষণ কি বলছিল ইনিয়াৎ?

ইনিয়াৎবান্নু স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলেন—ও অত্যন্ত নীচ প্রস্তাব বহন করে এনেছে, সে-কথা আমি তোমাকে বলতে লজ্জা পাচ্ছি।

; সদরুন্নিসার মুখে বেগম সাহেবার নিদারুণ অপমানসূচক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কুতুব-উল-মুল্‌ক্। তিনি তখুনি ডাক তিহারী!

ণ জানিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় প্রহরী। কুতুব-উল-মুলক্ যাও এখুনি গিয়ে রফি-উদ-দরজাৎকে চালান করে দাও নীচের কুঠরিতে। আর উপস্থিত তিনি যে ঘরে রয়েছেন সেই ঘরে করে রাখো তাঁর বেগম সাহেবাকে। এই নিয়ে যাও তার া।

শ জানিয়ে তখুনি পরওয়ানা নিয়ে চলে যায় প্রতিহারী।

নিয়াৎবান্নু বেগম তখনও স্বামীর বুকে মাথা রেখে বসে রয়েছেন হয়ে। রফি-উদ-দরজাৎ তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর মাথায় বুলিয়ে হাত।

মন সময় টোকা পড়লো দরজায়।

ফি-উদ-দরজাৎ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখলেন সৈয়দ উল-মুলকের প্রতিহারী। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—কি?

প্রহরী কুর্নিশ জানিয়ে বলে—একটা পরওয়ানা আছে জাঁহাপনা। সই কুতুব-উল-মুলকের সই ও শীলমোহর অঙ্কিত পরওয়ানাটি সে দেয় তাঁর দিকে।

পরওয়ানাটি পড়ে অবাক হয়ে যান রফি-উদ-দরজাৎ। তিনি য়ে বলেন—সে কি, এখন আমাকে থাকতে হবে নীচের তে? এর কারণ কি?

প্রতিহারী বলে—কারণ কি তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে আপনাকে এখুনি যেতে হবে—এই হুকুম দেওয়া আছে আমার ওপর।

তাদের কথা শুনে ইনিয়াৎবান্নু বেগম আর স্থির থাকতে না পেরে চীৎকার করে ওঠেন—কখখনো না, সম্রাটের পক্ষে নীচে অন্ধকার কুঠরিতে থাকা কখনই সম্ভব না।

প্রতিহারী বলে—কিন্তু তবু যেতে হবে, কারণ আমার প্রতি সেইরূপ আদেশ আছে।

ইনিয়াৎবান্নু বলেন—বেশ, তবে চলো, আমরা দু'জনে নীচের কুঠরিতেই থাকবো।

প্রতিহারী বলে—আপনার সেখানে যাবার হুকুম নেই বেগম সাহেবা।

ইনিয়াৎবান্নু বেগম বলেন—হুকুম নেই মানে? আমি সৈয়দের বন্দিনী নই। কাজেই এ হুকুম আমার প্রতি কখনই জারী হতে পারে না।

প্রতিহারী বলে—কিন্তু পরওয়ানাতে এ হুকুম স্পষ্ট লেখা আছে। আজ থেকে আপনিও তাঁর বন্দিনী। আপনি একাকিনী বন্দিনী হয়ে থাকবেন এই ঘরেই।—বলেই সে রফি-উদ-দরজাতের হাত ধরে টেনে বাইরে এনে দরজায় এঁটে দেয় কুলুপ।

প্রহরীর আচরণে চমকে ওঠেন ইনিয়াৎবান্নু বেগম। এ কি, তবে সত্যিই তাঁর স্বামীকে এরা নিয়ে গিয়ে রাখবে নীচের অন্ধকার কুঠরিতে? আর তাঁরও বাইরে যাবার অধিকার নেই। এদিকে

রাশিকৃত ফুল পড়ে রইলো মাটিতে। ওদিকে আতরের শিশিগুলো সারি সারি পড়ে রইলো। আজ তাঁদের বিয়ের দিন। ইনিয়াৎবানুর ইচ্ছে ছিল আজ স্বামীর সারা অঙ্গে ছড়িয়ে দেবেন আতর। কিন্তু না, কিছুই হল না। তাঁর বুক ভেঙ্গে নেমে আসে কান্না!

আপন শোকে অভিভূত হয়ে যখন ঘরে একাকিনী বসে রয়েছেন ইনিয়াৎবানু বেগম তখন তাঁর কানে এল দরজায় কুলুপ ঘোরানোর শব্দ। বেগম সাহেবা অত্যন্ত সচকিত হয়ে ওঠেন সেই শব্দ শুনে। এবার নিশ্চয়ই কেউ প্রবেশ করবে তাঁর ঘরে.।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকে এলেন সৈয়দ কুতুব-উল-মুলক্। তাঁকে দেখে ইনিয়াৎবানু লাফিয়ে উঠে মুখে নেকাব টেনে দিয়ে বলেন—কে। কে আপনি?

দরজা ভেতর দিক থেকে বন্ধ করে হা-হা করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসেন কুতুব-উল-মুলক্। তিনি জড়িত কণ্ঠে বলেন—আমি কে তা কি নতুন করে পরিচয় দিতে হবে? শোন সুন্দরী, তোমার চুলের গুচ্ছ উপহার পেয়ে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সোজা ছুটে এলাম সেই চুলের মালিককে অধিকার করতে।

ইনিয়াৎবানু তাঁর কথা শুনে চমকে উঠে বলেন—এ কি বলছেন আপনি। এখুনি আপনি বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে।

কুতুব-উল-মুলক্ হাসতে হাসতে বেগম সাহেবার দিকে এগিয়ে এসে বলেন—বেরিয়ে যাবো বলে তো এখানে আসিনি। যখন এসেছি তখন যতটুকু আনন্দ উপভোগ করা যায় তা করেই যাবো।

কুতুব-উল-মুলকের কথা শুনে ভয়ে শিউরে ওঠেন ইনিয়াৎবানু। তিনি চারিদিকে খোঁজেন পালাবার পথ। কিন্তু না, সব পথ রুদ্ধ। ওদিকে কামার্ত পশুটা এগিয়ে আসছে তাঁকে গিলে খেতে। বেগম সাহেবা তখুনি ছুটে যান আতরের শিশিগুলোর কাছে। তার মধ্য থেকে দ্রুত একটি শিশি বেছে নিয়ে তার তরল পদার্থ তিনি ঢেলে দেন নিজের মুখের মধ্যে। সেই তরল পদার্থ তাঁর গলনালীর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে পাকস্থলীর মধ্যে। মুহূর্তেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে তাঁর শরীর। তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। দেখে অবাক হয়ে যান কুতুব-উল-মুলক্। হঠাৎ কি হল তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। তবু তিনি একবার এগিয়ে এসে হাত দিলেন ইনিয়াৎবানুর গায়ে। দেখলেন তাঁর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এভাবে ঠাণ্ডা মানুষ নিয়ে রসভোগ করা যায় না। তাঁকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ান কুতুব-উল-মুলক্। আজকের রাতের সব আনন্দটুকুই পণ্ড হল।

## চলন্তিকার পথে

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

### আভা পাকড়াশী

আরও যে কত দুঃখ দেবেন ভগবান কে জানে। এই পথে একে দারুণ চড়াই তাতে নুড়ি ভর্ত্তি। অসংখ্য বার পা পিছলে যাচ্ছে। অমন যে মন ভোলান প্রাকৃতিক শোভা তা-ও প্রাণ ভরে দেখার উপায় নেই, তাহলেই আছাড় খেয়ে প্রাণটি যাবে। বদ্রীর সঙ্গে কেদারের পথের তফাত এই যে, বদ্রীর পথ যেন সমানে লুকিয়ে পড়ছে পাহাড়ের আড়ালে। এখানে অলকানন্দারও ঠিক এই ভাব। কোথাও ভীষণ বেগে প্রবাহিনী দৃশ্যমানা, কোথাও সম্পূর্ণ অদৃশ্যচারিণী, শুধু তাঁর গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। কেদার শিবভূমি। ভোলানাথ সরল সোজা দেবতা, অত লুকোচুরির ধার ধারেন না। তাই তাঁর কাছে পৌঁছবার পথও সোজা উঠেছে নেমেছে। এমন ঘোরপ্যাঁচ নেই। তাঁর দেখাদেখি পত্নী গঙ্গাদেবীও বাধ্য হয়ে সরলমতি হয়েছেন। আর এখানে আছেন ছলনাময় কৃষ্ণ। তাই অলকানন্দাও ধরেছেন শ্রীমতীর রূপ। কেষ্ট ঠাকুরটি তো আর কম নন। আড়াল-আবডাল না পেলে রসিক চূড়ামণির খেলা জমবে কেন? তাই পথিকের সব সময়েই মনে হয় সে যেন পাহাড়ের ঘেরাব মধ্যে পড়েছে। ওপরে গোল চত্বরের মত একটুখানি নীলের আভাস আর চারদিকে সবুজ দেওদার আর চীড়ের পাঁচিল। চীড়ের শোভা বড় সুন্দর। ঐ গাছের পাতাগুলি যেন ময়ূরের পেখম উলটান ঝাড়-লণ্ঠনের মত। তবে বড় বড় জঙ্গল ছিল কেদারের পথে, তাই তার পথও অমন ভাল। এ-পথে গাছপালা বেশী না থাকায় মাটি বড় নরম তাই কেবলই পথে ধ্বস নামে। তা ছাড়া গাই-গরুর খাবার নেই তার জন্য দুধেরও অভাব এ-পথে। চটিরও দূরত্ব বেশ। কেদারের মত দু'পা হাঁটলেই ক্লান্তি বিনোদনের জন্য কোন দোকানদার গরম দুধ বা চা তার সঙ্গে পকৌড়ি বা জিলিপি নিয়ে বসে নেই। পয়সা দিলেই চকচকে করে মাজা পেতলের ওপর রূপার মত কলাই চড়ান গেলাসে গরম পানীয় এনে সশ্রদ্ধভাবে হাতে তুলে দেবার কেউ নেই এ পথে। এখানে ঝগড়া করে আদায় করতে হচ্ছে তা যাই কিছু হোক না। এমন কি কেরোসিন তেল পর্য্যন্ত। এর ওপর আবার কুণ্ডুবাবুর দল এসে পড়লেই তো সর্ব্বনাশ। সেদিন সে চটিতে আশ্রয় তো মিলবেই না তা ছাড়া খাদ্য জুটবে হরিমটর। আমরা সেইজন্য এই কুণ্ডুবাবুর দলটিকে এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কেদারের পথেও হয়ত এঁরা ছিলেন। তবে তখন কিন্তু এঁদের উপস্থিতি এমন ত্রাসের সঞ্চার করেনি। এই কুণ্ডুবাবু কুণ্ডু স্পেসাল ট্রেণে করে একরাশ যাত্রী এনেছেন তাঁদের বিনা ঝঞ্ঝাটে তীর্থ ভ্রমণ করাবার লোভ দেখিয়ে। কথা আছে পথ চলতে এঁদের ডাক্তারী চিকিৎসাও মিলবে। তা ছাড়া মিলবে বিনা পরিশ্রমে ভাল খাবার আর বিনা ঝামেলায় নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু এঁদের সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে তখনই এঁরা বলেছেন, বেশ আছো তোমরা মা, কেমন স্বাধীনভাবে চলেছো। কারুর জন্য কোন দায় নেই। আর আমাদের যেন গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তাঁদের সুখ সুবিধের কথা উল্লেখ করে শুনেছি—হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভাল খাচ্ছি, সেই হৃষীকেশ থেকে কুমড়ো সুরু হয়েছে সে আর ফুরোবে না। ঐ অমৃত ফলের ঘ্যাঁটে যমের অরুচি ধরিয়ে ছাড়লে মা। আর ওষুধের কথা বলছ, ও মার্কুরীক্রম আর ঘায়ের মলম তো তোমাদের সঙ্গেও আছে বাছা। কি জানি কি ব্যাপার? সত্যিই ভাল ব্যবস্থা নেই? না নদীর এপার বলে ওপারে বড় সুখ তাই?

সকালে উঠে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় দুপুর নাগাদ পৌঁছলাম জ্যোতিপীঠে। মাঝে আর একটি পাহাড় ডিঙ্গিয়েছি। পথে যেমন কাদা আর তেমনি কাঁটাগাছের ঝোপ। তাছাড়া নুড়ি তো আছেই। পা কেটে শাড়ী ছিঁড়ে একাকার। ঝড়কুলা চটির পর পড়ল এই পাহাড়। ঐ ঝড়কুলাতে দেখা হল আটটি বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে। এরা আট বন্ধু এসেছে ছুটিতে এই পথে এক্সকারসনে। তা ছাড়া হিন্দুর ছেলে যখন তীর্থদর্শনে পুণ্য লাভ তো হবেই। ওরাও

কদার ফেরত। তা ছাড়া ঐ পথে চলার সময়ে সমানে র দেখেই নাকি ইনস্পিরেসন পেয়েছে ওরা। তবে এখন এরা দুটো দল হয়েছে। দু দলে সমান ভাগ। মানে চার জন চারজন ও দলে। একজন বলছে, খুভ্ত হেঁটে হেঁটে মারা যাবার। তা ছাড়া খাবার দাবার কিছু পাবার জো নেই এ ভাবে য় নাকি? আমরা ফিরে যাই।

দলটা বলছে পাগল হয়েছিস নাকি? অ্যাদ্দুর এসে কি না ফিরে যাবি? কিরে তোরা। দেখ দিকিনি এই মেয়েছেলে হয়ে কি রকম হাঁটছে? তা ছাড়া এই বাচ্চাগুলোকে তোদের লজ্জা করছে না? নে চল চল, এক যাত্রায় পৃথক ফল া কি ভাল? উঠল সবাই গা ঝাড়া দিয়ে।

খানে আবার সেই বইমীর_দলের সঙ্গে দেখা। তারা তো দাদা আর মেমদিদিকে দেখে আনন্দে ডগমগ। আমার ছেলেদের তোমরাই ভাই নারায়ণ। ধন্যি পা বাছা, তোমাদের।

ারা বলে বাঃ আমরা চার জনেই যে আবার ঘোড়ায় চড়েছিলাম। লে সে দেখেছি ভাই আমরা, কি সুন্দর যে লাগছিল যেন র্বতী চলেছেন কার্ত্তিক-গণেশ নিয়ে। তবু ভাই খুব পুণ্য হল দের।

ঝড়কুলা থেকে জ্যোতিপীঠে আসতে ওরা আট বন্ধু সঙ্গেই ছিল। ধ্যে একজন ছিল বেশ একটু মোটাসোটা। সবাই তার সঙ্গে ছ। একটা জায়গায় রাস্তা ছিল ভীষণ ঢালু। আমরা সবাই রকমে নেমে এলাম, কিন্তু সেই ছেলেটি আর কোন মতেই নামতে না একবার করে পা নামায় আর তোলে। একে ত ঢালু আর সরু রাস্তা তার ওপর উল্টো দিক থেকে কতকগুলো দৌড়ে আসছে—নীচে থেকে ওর অবস্থা দেখে সকলে বলছে, তুই গড়িয়ে নেমে আয়।

হেসে খুন হচ্ছে সকলে—এর পরের অবস্থা আরও করুণ। খচ্চরের দল দেখে ও না পারে এগুতে না পারে পিছোতে, । আবোল তাবোলের হটমুলার গাছে চড়ার মত একটা হর ডাল ধরে কোনরকমে ঝুলে রইল আর ওর তলা দিয়ে য়ে গেল খচ্চরগুলো। সেই অবস্থাতেই বিচিত্র বঙ্গীয় হিন্দীতে দিল ও খচ্চরবালাদের—এই তম লোগ খচ্চড় কিঁউ দৌড়িয়ে া হ্যায়, দেখতে নেহি পারতা হ্যায় হামলোগ যাত্রীলোগ কৈসে গা? তখন আমরা সকলের কষ্ট ভুলে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছি। ীর ছাতাটি আবার হাত ফসকে পড়ে গেল খাদে—অনেক কষ্টে াগাছের শুকনো ডাল দিয়ে উদ্ধার করা গেল সেটাকে। ভাগ্যিস ভাবে সেই গাছের ডালটা ভেঙ্গে পড়েনি এই রক্ষে।

কেদারের উখিমঠের মত এখানেও এই জ্যোতিপীঠে ছয় মাস নারায়ণের পুজো হয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় ঠিক অমনি করে মণ ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে নেমে আসে পাণ্ডারা এইখানে। ানে সুন্দর স্নানের জায়গা রয়েছে। সমানে চারটে নলের মুখ য় পড়ছে নরসিংহ ধারার জল। মন্দিরে সুন্দর একটি ছোট সিংহ মূর্ত্তি রয়েছে কষ্টি পাথরে তৈরী। মূর্ত্তিটি নাকি প্রহ্লাদের রকার। এই শহরের মধ্যে চটিগুলির চেহারা দেখে থাকবার চি হল না আমাদের। তাই আমরা আর একটু এগিয়ে গিয়ে লাম যোশী মঠে। এখানে কীর্ত্তনানন্দ স্বামী নামে একজন বাঙালী সাধুর সৌজন্যে একটি ঘরও পেলাম, পুরী তরকারীও জুটল। সুন্দর মঠটি। চারদিকে চমৎকার গোলাপের বাগান। দোতলা বাড়ী। ওপরে গিয়ে শঙ্করাচার্য্যের সিংহাসন দেখে এলাম। আ কৃষ্ণবোধাশ্রম শঙ্করাচার্য্যকেও দর্শন করলাম। ওঁকে দেখে সত্যি শ্রদ্ধা হল মনে। ওরা আট বন্ধুও অন্য ঘরে ছিল এখানেই ঐ বাঙালী সাধুটি আমাদের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনার ফাঁকে উপস্থিত শেয়ার-মার্কেটের দর জানতে চেয়ে জানিয়ে দিলেন শঙ্করাচার্য্যের গদি না পেলেও ক্ষতি নেই, তাঁরও অনেক সম্পত্তি আছে। আবার রাত্রে আমাদের পাশের ঘরের এক গুজরাটী ভদ্রমহিলাকেই সাধুজী কি ভাবে মীরাবাঈয়ের মত ভক্তিমতী হতে হয় তারই উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল স্বা সেবা করেও কি ভাবে সাধু সঙ্গ করা যায়, আর এই সা সন্ন্যাসীরাই হচ্ছেন ভগবানের কাছে পৌঁছবার প্রথম সোপান তবে এঁদের মধ্যে থেকে আসল-নকল বেছে নেবার বুদ্ধি থা চাই। এই যেমন ধরুন আমি—এই যে আমি আপনার সঙ্গে এ সব কথা আলোচনা করছি, কোন অর্থের প্রত্যাশায় নয়। ও-ব ভগবান আমাকে প্রচুর দিয়েছেন। [ ক্রমশঃ

## মা ও শিশু

### মীরা সরকার

সন্তানকে শুধু জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না। সন্তানে জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আনন্দ বেদনা, সমস্ত কিছু অংশ মাকে নিতে হয়। সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার, তাকে মানুষ ক তোলার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব মায়ের।

আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বুইটি পরিবারের পিতা শুধু অর্থোপার্জন করেই সংসারের প্রতি, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তাঁদের দায়ি শেষ করেন। বাকী সমস্ত দায়িত্বই বহন করতে হয় মাকে। ছো হিসাব, বাজারের ফর্দ, ঠাকুর-চাকরের মাইনে থেকে আরম্ভ ক ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা, তাদের আচার-ব্যবহার সব দিকেই লক্ষ রাখতে হয়।

ছেলেমেয়েরা বাইরে কোনো খারাপ কাজ করলে অনেকে বলতে শোনা যায়—"বাপ-মা কি কিছুই শেখায়নি?" কোথাও কি ভাল করলেও অনেকে বলেন—"বাঃ, বাবা-মা'র ট্রেণিং তো চমৎকার"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা খারাপ কাজ করলে দা তাদের বাবা-মা, ভাল কাজ করলে তার গর্ব বাপ-মায়েরই। আম বিভিন্ন মনীষীর জীবনী পড়লে দেখতে পাই, তাঁরা প্রথমে তাঁদের মায়ে কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাঁদের বড় হওয়ার মূলে আছে মা।

জন্মের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিশু জননীর সত্তার সঙ্গে একীভূ হয়ে থাকে।

জন্মের পর নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হলে শিশু সহসা অসহায় বো করে। সেই অসহায় ভাব দূর হয় যখন সে জননীর স্তন্যপান করে অতি শৈশবে মাতৃস্তন্যপান থেকে বঞ্চিত শিশুদের মানসিক জীব গঠনে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। এই সব শিশুরাই কোনো কাজে সহজে মন দিতে পারে না। পরবর্তী জীবনে এদের অনেকে 'স্বভাব অপরাধী'র দলে এসে ভীড় করে। অনেক শিশুসন্তানে

মাকে অর্থোপার্জন করতে বাইরে যেতে হয়। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই শিশুকে ঝি-চাকরের কাছে রেখে তাঁরা বাইরে থাকেন। এর ফলে মাসান্তে কিছু অর্থ হয়তো গৃহে আসে কিন্তু শিশু সন্তানের কী ভীষণ অনিষ্ট হয় তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না। মায়ের কোল, মায়ের স্নেহ-সোহাগের মূল্য শিশুর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুর জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য দুধ, পুষ্টিকর খাবার যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মায়ের কোলের উষ্ণ স্পর্শ, তাঁর স্নেহ, আদর।

শিশুমাত্রই অনুকরণপ্রিয় কিন্তু তারা ভালমন্দ বিচার করে অনুকরণ করতে জানে না। বাড়ীতে এবং আশে-পাশের মানুষকে যা করতে দেখে, যা বলতে শোনে তাই করে ও বলে। সুতরাং শিশুর সামনে মা-বাবা এবং বাড়ীর অন্যান্যকে খুব সাবধানে সংযত ভাবে কথা বলা উচিত। একদিন আমি আমার এক প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নানা কথার মধ্যে তিনি আমার হাতের বালাটি দেখে খুব প্রশংসা করলেন। তাঁর পাঁচ বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি কাছেই ছিল, সে গম্ভীর মুখে বলল "ওর বাবা কত বড়লোক, কত ঘুষ পায়। ঘুষের টাকায় গয়না কেনে। তোমার বাবাকে তো কেউ ঘুষ দেয় না তুমি কি করে গয়না পরবে?" ঐ পাঁচ বছরের শিশুর মুখে ঐ রকম হীন কুৎসিত কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সরল ছোট্ট শিশুর মুখে এত কুৎসিত কথা বেরোন সম্ভব নয়, যদি তার বাড়ীতে এসব কথা তার সামনেই আলোচনা হয়ে না থাকে।

অনেক বাবা আছেন যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা অন্য ছেলেমেয়েদের সংগে মিশলে খারাপ হয়ে যাবে। এই ভয়ে তাঁরা তাঁদের শিশুদের আড়াল করে রাখেন। এর ফলে শিশুর মনে সমাজ চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে না। লোকজনের সংগে মেলামেশা করবার, নোতুন পরিস্থিতিকে সহজভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা কোনো দিন হতে পারে না। এই সব শিশুরাই নিজের সুখ দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, অতি সহজে ভেঙ্গে পড়ে এবং এরাই অভিমানী ও ভাবপ্রবণ হয়। শিশুকে আরো অন্য শিশুদের সংগে মিশতে দিতে হবে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, শিশুর সংগী নির্বাচন করা খুব সহজ কাজ নয়। শিশুর সংগীরা যদি তার চেয়ে বয়সে বেশী বড় হয় তাহলে তাঁরা শিশুর উপর কর্তৃত্ব করবে, ফলে শিশু স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে না। তেমনিই সংগীরা যদি বয়সে অনেক ছোট হয় তাহলে শিশু তাদের উপর প্রভুত্ব করবে এবং বাধ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি গুণগুলি থেকে বঞ্চিত হবে।

অনেক বাবা মা আছেন যাঁরা শিশুর সংগে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। তাঁরা মনে করেন শিশুর সংগে মিষ্টি কথা বললে, আদর দিলে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁরা ভুলে যান অত্যধিক স্নেহের মত অত্যধিক কঠোরতাও শিশুকে মানুষ করার প্রতিবন্ধক।

অনেক শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস একেবারেই থাকে না। প্রফেসর এ্যাডলার বলেছেন, শিশুদের এই Inferiority Complex হয় সম্পূর্ণ বাবা-মার দোষে। কোনো কোনো বাবা-মা চাইলেন, আমার ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে, শিশুও ফার্স্ট হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু দেখা গেল আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে ফার্স্ট হতে পারলো না। তখন বাবা-মা তাকে তীব্র অপমান করেন তিরস্কার করেন। চূড়ান্ত চেষ্টা করেও শিশু যখন ফার্স্ট হতে পারলো না, তখন বাবা-মার অপমান অসন্তোষে সে তার আত্মবিশ্বাস একেবারেই হারিয়ে ফেলে। কত শত বাবা-মা এইরকম করে ছোট শিশুর জীবন নষ্ট করে ফেলেন।

আগেকার দিনে মা ঠাকুমারা শিশুদের রূপকথা শোনাতেন। আজকাল শিশুর কাছে গল্প বলার ইচ্ছা ও অভ্যাস প্রায় কারোরই নেই। আধুনিকা মায়েরা গল্পবলার অবসর বড় একটা পান না। সাধারণতঃ রূপকথায় দেখা যায়, অজস্র রাক্ষস দৈত্যদানব বাঘ ভাল্লুকের কাছ থেকে অসীম সাহসে নানা বিপদ তুচ্ছ করে বন্দিনী রাজকন্যাকে রাজপুত্র উদ্ধার করে এনেছে। এই রকম গল্প শুনলে শিশুর মনে সাহসের সঞ্চার হয় এবং কল্পনাশক্তি প্রখর হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ শিশুই এই সব গল্প শোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিশুদের মধ্যেও যে যৌন ঔৎসুক্য আছে সেকথা অনেক মা বাবা স্বীকার করতে চান না। শিশুরা সরল তারা এসবের কি বোঝে ইত্যাদি বলে থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, শিশুদের মধ্যেও যৌন ঔৎসুক্য আছে। বাবা মাকে শিশু এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করলে তাঁরা তাদের ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন কিংবা মিথ্যা কথা বলে প্রসংগ চাপা দেন। বলা বাহুল্য এতে শিশুর অনিষ্ট হয়। যথাসাধ্য সত্যি কথা বলে ধৈর্য্যসহকারে শিশুকে তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত।

আমাদের সন্তানদের সাধারণত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে জ্ঞান কম থাকে। ঘর নোংরা অগোছাল হয়ে থাকে, স্কুলে যাবার সময় হয়তো বই খুঁজে পাওয়া যায় না, ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরোবার সময় কোনো দিন হয়তো একপাটি জুতোই হারিয়ে যায়, বাবার অফিসের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফাইলটি তিনদিন খুঁজে পাওয়া গেল না ইত্যাদি নানারকম বিশৃঙ্খলা অনেক গৃহেই দেখা যায়। এই সব পরিবারের শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞান থাকবে, তা সহজেই অনুমেয়। নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকে এবং রেখে শিশুকে তাই শেখাতে হবে।

শিশুকে জন্ম দিয়ে তাকে যদি সুশিক্ষা দিতে না পারি তবে এর চেয়ে দুঃখের এবং লজ্জার আর কি হতে পারে? আজ বিজ্ঞানের যুগে পরিমিত সন্তান নিয়ে পরিচ্ছন্ন সুস্থ সুন্দর সংসারের মধ্যে তাদের সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলতে হবে। আর এ গুরুদায়িত্ব প্রধানতঃ মায়েদেরই।

## কে তুমি আমায় ডাকো

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

### সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলায় ওদের বাড়ী গিয়ে সুজাতার সঙ্গে দেখা হোতে সুজাতা গম্ভীর মুখে বললে—সাহস কোরে আসতে পারলেন? জয়ন্ত হাত জোড় অবস্থায় বললে—সাহস আছে বলেই তো আসতে পারি। কবি বলেছেন, শাসন করা তারেই সাজে, সোহাগ—বলেই জয়ন্ত লজ্জা পেয়ে থেমে গিয়ে বেশ একটু ব্যস্ত ভাবেই বললে—গুরুদেবকে কেউ এভাবে অভ্যর্থনা করে না। কই, আমার পা ধোবার জল কোথায়? বসবার জায়গাই বা কই? এলুম অথচ শাঁখ বাজালেন না।

সুজাতা জয়ন্তর কথায় আরক্ত হলেও বেশ সহজ ভাবে বললে—শাঁখ বাজাবার সময় হলে ঠিকই বাজবে। এখন শিখিয়ে দিন কি কি কোরতে হবে। এই প্রথম গুরু-করণ তো!

জয়ন্ত বেশ ভারিক্কী চালে বললে—প্রথমে উচ্চাসনে বসিয়ে পা ধুইয়ে, নিজের চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিন, তার পর হয় দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করুন, তা না করলে পায়ের কাছে বসে পদসেবা করাই নিয়ম।

সুজাতার ছদ্ম গাম্ভীর্য উড়ে গেল। তর্জন কোরে বললে—বয়ে গেছে আমার চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিতে।

জয়ন্ত নিরীহভাবে বললে—চুলগুলি নিশ্চয় ছোট কোরে ছাঁটা? পা মোছানোর অসুবিধে আছে। বেশ, তবে তোয়ালে দিয়ে মোছাবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোয়ালে যেন নতুন হয়। আর গুরুর জন্যে চাই বেনারসী জোড়, মোটা টাকা প্রণামী···

সুজাতা বাধা দিয়ে সবেগে বলে উঠলো—সব আপনার বানানো কথা। এভাবে কেউ গুরু-সেবা করে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে—এটাও পছন্দ হচ্ছে না? তবে আর আমার ভাগ্যে গুরুগিরি করা নেই দেখছি। আপনাকে আমি রেহাই দিলুম।

জয়ন্ত আরও কি বলতে যাবে এমন সময় নীচে গাড়ী থামার শব্দ হোল। সুজাতা বললে—মা এলেন।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রা দেবী ঘরে প্রবেশ করে হাসিমুখে জয়ন্তকে বললেন—কতক্ষণ এসেছো?

জয়ন্ত বললে—এই খানিকক্ষণ হবে।

সুজাতা বললে—আজ বাবার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করবেন। তারপর আপনার রসালাপ হয় কি বিলাপ হয় দেখা যাবে।

সুমিত্রা দেবী বললেন—উনি আমাকে নামিয়ে দিয়ে আবার কোথায় গেলেন।

সুজাতা জয়ন্তকে বললে—তবে আর কি হবে? পরের দিনের জন্যে তোলা রইলো।

জয়ন্ত সে কথায় উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে বললে—আমি আজ উঠি।

সুজাতা বললে—খুব ফাঁকি দিতে শিখেছেন দেখি।

জয়ন্ত বললে—আজকাল আড়ম্বরের যুগ। লোকে খাঁটি চায় না—সব কিছুর ভেতর ভেজাল দিতে হয়, নইলে মন ওঠে না তাদের।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে জয়ন্ত সেদিনের মত বিদায় নিয়ে উঠে পড়ে।

—আমাকে দু'চারটে বই দিতে পারো মিতা?

সুমিতা বললে—দু'চারটে কি বোলছো? আমি তোমাকে দু'চার হাজার বই দিতে পারি।

সুজাতা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো বইয়ের কথায়। বললে—তবে তো ভালই হবে। এখানে এসে ভারি একলা বোধ হচ্ছে। বই নেই সঙ্গে। অবশ্য এখানে কি বইয়ের অভাব? তা নয়, তবে কি জানো? আমার এই প্রথম কলকাতায় আসা, কোথায় কি পাওয়া যায় কিছুই জানি না।

সুমিতা বললে—এই প্রথম এলে? তা হলে এ দেশের কোথায় কি দেখবার আছে কিছুই দেখনি নিশ্চয়?

—কই আর দেখা হোল। বাবার সময় নেই। আর ড্রাইভারও রাস্তা ঘাট চেনে না, কাজেই কি করি বল?

সুমিতা হেসে বললে—আচ্ছা, এবার আমি তোমার গাইড হবো। কেমন, রাজী তো? আপত্তি থাকলে বলতে সঙ্কোচ কোর না।

—তোমার মতো গাইড পেলে যেখানে কৃতার্থ হবো, সেখানে আপত্তির কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

সুমিতা হেসে উঠলো—এতখানি? সাবধান সুজাতা, সকলের সামনে ও কথাটা যেন বোল না, আমি বিপদে পোড়বো। যাক এসো, লাইব্রেরীতে যাই। এটা লাইব্রেরীতে যাবার দরজা। দাদা অফিস যাবার সময় বন্ধ কোরে দিয়ে যায়। চল আমরা দাদার ঘর দিয়েই ও ঘরে যাই। তোমার কোন সঙ্কোচ করবার দরকার নেই, দাদা এখনও অফিস থেকে ফেরেনি।

সুজাতাকে নিয়ে জয়ন্তের কক্ষে প্রবেশ কোরেই মিতা বুঝলো—জয়ন্ত অফিস থেকে ফিরেছে—এবং নিজের ফটো সহ পাশের ছোট ঘরে অবস্থান কোরছে।

একবার ভাবলে দাদার লুকোচুরি ভেঙে দিয়ে সব ব্যাপার সহজ কোরে দেয়। কিন্তু জয়ন্ত যদি রাগ করে? থাক, কাজ কি? কে জানে শান্ত প্রকৃতির জয়ন্ত যদি অশান্ত হয়ে ওঠে, তখন তাকে সামলাবে এমন সাহস মিতার নেই। যদিও সুমিতার সব আবদার জয়ন্তর কাছেই, তবু···

সুজাতা ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে গৃহস্বামীর সুরুচির প্রশংসা কোরলে—মিতা, তোমার দাদা দেখছি বেশ সৌখিন··নাকি তুমি কিংবা মাসীমা ঘর গুছিয়ে রেখেছো?

সুমিতা স্মিত মুখে বললে—দাদা সামনে থাকলে বলতুম, আমি গুছিয়ে রেখেছি, কিন্তু আড়ালে তো আর মিথ্যে কথা বলতে পারি না। দাদা যেমন সৌখিন তেমনি পরিষ্কার। মনটাও তেমনি শুভ্র সহজ সরল। জানো সুজাতা, এই লাইব্রেরীতে অত বই আছে, সব দাদা নিজের হাতে গুছোবে মুছবে। কারুকে হাত দিতে দেবে না পাছে বই নোংরা হয়ে যায়। অবশ্য আমিও দাদার সঙ্গে থাকি, তা নাহলে বড় অসুবিধে হয়। বই যেন দাদার প্রাণ।

সুজাতা বললে—যিনি বইকে এত ভালবাসেন, কত যত্নে সাজিয়ে রেখেছেন বইগুলিকে, তাঁর বই—তুমি আমাকে দিচ্ছো কেন সুমিতা? জানতে পারলে কত রাগ কোরবেন বল তো?

মিতা হেসে বললে—আমি বই দিলে দাদা রাগ কোরবে না। দাদা খুব ভাল রকম জানে, আমি যাকে তাকে বই দোব না। কাজেই কোন দ্বিধা না কোরে যা খুসী বই নাও।

সুজাতা হেসে ফলে বললে—তুমি যখন অভয় দিচ্ছো তখন আমি নির্ভয়ে বই নিয়ে যাবো। আশা করি বইগুলি ভাল অবস্থাতেই আবার ফিরিয়ে আনতে পারবো।

সুমিতা লজ্জা পেয়ে বললে—ছিঃ ছিঃ তুমি ওভাবে বোল না সুজাতা। ভারি খারাপ লাগছে শুনতে। শোন, তুমি যদি বই ছিঁড়ে নোংরা কোরে ফেরৎ দাও, তবু দাদা কিছু বোলবে না—বরং খুসী হবে যে তুমি··উঃ!·····

সুজাতা অন্য দিকে তাকিয়ে থাকায় ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সুমিতার দিকে তাকিয়ে বললে—কি হোল মিতা?

[ ক্রমশঃ।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অজিতকৃষ্ণ বসু

কিছুদিন বাদে কারাগার থেকে তিনি ছাড়া পেলেন বটে। কিন্তু পারী শহর ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলেন। তখন ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষের দিক। এখানে বলে রাখা ভালো এই 'বাস্তিল' কারাগার সম্পর্কে ক্যাগ্লিওস্ট্রো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এর পতন ঘটবেই। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হয়েছিল সে কথা তো ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রই জানেন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে—যে বছর শুরু হলো ফরাসী বিদ্রোহ, আর পতন হলো 'বাস্তিল' কারাগারের—কাউণ্ট ক্যাগ্লিওস্ট্রোকে দেখা গেল 'চিরন্তনী নগরী' ( Eternal city ) রোমে, সঙ্গিনী সেরাফিনা সহ। সেরাফিনার সৌন্দর্য তখন অনেকখানি ঝরে গেছে, থাকবার মধ্যে আছে শুধু তাঁর দুটি আশ্চর্য চোখ। ক্যাগ্লিওস্ট্রোও হয়ে পড়েছেন আরো স্থূল, আরো অপ্রিয়দর্শন।

এই রোম শহরেই ক্যাগ্লিওস্ট্রোর উত্থান শুরু হয়েছিল। ভাগ্যের চাকা ঘুরে ঘুরে তাঁর চরম পতনও ঘটলো এই রোম শহরেই। এখানে আবার নতুন করে মিশরী কায়দায় একটি তান্ত্রিক গুপ্তচক্র স্থাপনের চেষ্টার অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হয়ে তখনকার অসীম শক্তিশালী 'ধর্মীয় আদালত'-এর ( ইতিহাসখ্যাত ( Holy Inquisition) পাল্লায় পড়লেন। খোদ পোপের খাস তালুকে এত বড় অপরাধ অমার্জনীয়। বিচারে তাঁর শাস্তি নির্দ্ধারিত হলো—মৃত্যুদণ্ড। এ দণ্ড কার্যকরী করা হয় নি, কারণ এর পর স্বয়ং পোপ মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দিয়ে তার বদলে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিলেন। লোরেনৎজা ফেলিশিয়ানি, ওরফে 'সেরাফিনা' বাকি জীবনটা নাকি অনুতপ্ত চিত্তে একটি মঠে কাটিয়েছিলেন।

বন্দিদশা ক্যাগ্লিওস্ট্রোকে আর বেশি দিন সইতে হলো না, তিনি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দেই একদিন ভোরে মারা গেলেন।

## মিশরীয় যাদুকর মাহমুদ বে

পল ব্রাণ্টন ( Paul Brunton ) তাঁর "A search in secret India" ("গুপ্ত ভারতে অনুসন্ধান") গ্রন্থে একজন মিশরী যাদুকরের কথা লিখেছেন, তাঁর নাম মাহমুদ বে। এঁর সঙ্গে ব্রাণ্টনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল বোম্বাই শহরের হোটেল ম্যাজেষ্টিকে। বোম্বাই শহরের অন্যতম সেরা এই হোটেল ম্যাজেষ্টিক; ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতের আত্মার সন্ধানে এসে সর্বপ্রথম এই হোটেলেই উঠেছিলেন ব্রাণ্টন। এসেই শুনেছিলেন এই হোটেলেরই একটি ঘরে রয়েছেন এক অলৌকিক শক্তিধর যাদুকর, যাঁকে হোটেলের সবাই ভীতি-মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এই যাদুকর ভদ্রলোক, অর্থাৎ মাহমুদ বে, হোটেলের কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন না, আহারও করেন একা একা। অনেকটা অষ্টদশ শতাব্দীর বিখ্যাত প্রতারক যাদুকর কাউণ্ট ক্যাগ্লিওস্ট্রোর মতো! এরই ফলে তাঁর চারধারে রহস্যের আবহাওয়াটা আরো বেশি জমাট হয়ে উঠেছে।

ব্রাণ্টন অধীর হয়ে উঠলেন এই আশ্চর্য লোকটির সঙ্গে মোলাকাত করতে। হোটেলের এক ভৃত্যকে ভোরবেলা একটি নগদ রৌপ্য মুদ্রা আগাম বখশিশ দিয়ে তিনি তার হাত দিয়ে যাদুকরের ঘরে একটি ভিজিটিং-কার্ড পাঠিয়ে দিলেন, যার অর্থ; "সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি।"

ভৃত্য অনতিবিলম্বে ফিরে এসে জানাল "মাহমুদ বে এখন ভোরের খাওয়া খাবেন, তাতে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

ব্রাণ্টন খুশী মনে ঢুকে গেলেন যাদুকরের ঘরে। ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন মাহমুদ বে। ব্রাণ্টন বসলেন তাঁর উলটো দিকের চেয়ারে, প্রাতরাশের অংশ গ্রহণও করতে লাগলেন।

"আপনি কি কোনো পত্রিকার প্রতিনিধি?" প্রশ্ন করলেন মাহমুদ বে।

"না।" বললেন ব্রাণ্টন। "আমি এসেছি আমার আপন গরজে, অসাধারণের সন্ধানে। একটি গ্রন্থ-রচনার খোরাক সংগ্রহও আমার উদ্দেশ্য।"

আরো দুচার কথার পর ব্রাণ্টন প্রশ্ন করলেন "আপনি কি সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী?"

মাহমুদ বে বললেন "হ্যাঁ, আল্লা আমাকে কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন। আপনি বোধ হয় তার কিছু নমুনা দেখতে চান?"

মাথা নেড়ে সায় জানালেন পল ব্রাণ্টন।

মাহমুদ বে উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালেন পল ব্রাণ্টনের দিকে পেছন ফিরে। তারপর বললেন, "আপনার নোট বইয়ের এক টুকরো কাগজে আপনার পেন্সিল দিয়ে আপনার খুশিমতো যে কোনো

লিখে কাগজের টুকরোটাকে ভাঁজ করতে করতে যত ছোট করতে
করুন।"

চার বছর আগে আমি কোথায় ছিলাম?" ঐ প্রশ্নটি লিখে
ভাঁজ করে করে ছোট করে ফেললেন ব্রান্টন।

মাহমুদ বে বললেন, "কাগজের টুকরোটা আর পেন্সিলটা এবার
হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখুন।"

তাই করলেন ব্রান্টন। মিশরী যাদুকর মাহমুদ বে কিছুক্ষণ
বুজে যেন ধ্যান করে তারপর বললেন, "আপনার প্রশ্ন হচ্ছে
ছর আগে আমি কোথায় ছিলাম। তাই না?"

ব্রান্টন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তাই।"

"এইবার কাগজের ভাঁজটা খুলে ফেলে দেখুন।" বললেন যাদুকর
মুদ বে।

ব্রান্টন খুলে দেখলেন সেই কাগজেই প্রশ্নের ঠিক তলায় যেন
অদৃশ্য শক্তি ঐ পেন্সিল দিয়েই সঠিক উত্তরটি নির্ভুলভাবে লিখে
ছে। আশ্চর্য, ভূতুড়ে ব্যাপার, এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করা
না!

"আচ্ছা, এ জিনিষই আরেকবার করে দেখাতে পারেন?"

"পারি।"

দ্বিতীয় বারেও ঠিক একই রকম সাফল্যলাভ করলেন যাদুকর
মুদ বে, ব্রান্টনকে অবাক করে দিয়ে।

এ কি করে সম্ভব? সাধারণ ভেল্কি, ভোজবাজি, ভানুমতীর
? কিন্তু তা কি করে হয়? ফাঁকির বা হাতসাফাইর কোনো
বা সুযোগই তো নেই।

হিপ্নোটিজম্, অর্থাৎ সম্মোহন? তার সম্ভাবনা স্বীকার করেন
পল ব্রান্টন।

কথায় বলে বার বার তিনবার। দুবারই এই আশ্চর্য ব্যাপারের
তৃতীয় বার মাহমুদ বেকে পরীক্ষা করলেন ব্রান্টন। তৃতীয় বারেও
সাফল্যলাভ করলেন এই অত্যাশ্চর্য মিশরী যাদুকর।

বিস্মিত হয়ে ব্রান্টন প্রশ্ন করলেন, "এমন আশ্চর্য ব্যাপার আপনি
করে করেন?"

ব্যাখ্যাটা মাহমুদ বে পল ব্রান্টনকে শুনিয়েছিলেন পরের দিন।
লছিলেন "হ্যাঁ, কতকগুলো অদৃশ্য শক্তিকে কাজে লাগিয়েই আমি
সব আশ্চর্য কাণ্ড করি, অর্থাৎ করাই। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
গতের বাইরে একটা আলাদা জগৎ আছে, তাতে আছে বহু অশরীরী
ক্তি বা আত্মা (spirits)—কতকগুলো ভালো, কতকগুলো মন্দ।
দের ভেতর কতকগুলো মৃত মানুষের আত্মা বটে, কিন্তু বেশির ভাগ
আত্মা'গুলোই (Spirits) সম্পূর্ণভাবে দেহ-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ওরা
বরই ঐ রহস্যময় অদৃশ্য জগতের বাসিন্দা, মানবদেহে ওরা কখনোই
ল না। এদের আমরা বলি 'জিন'। কতকগুলো 'জিন' বুদ্ধিতে
নোয়ারের মতো, কিন্তু কতকগুলো ঠিক চালাক-মানুষের মতোই
লোক। এই জিনদের ভেতর ভালো যেমন আছে তেমনি আবার
জিনও আছে। ভৃত্য হিসেবে এরা অনেক সময় মারাত্মক হয়ে
ঠে, অর্থাৎ এদের দিয়ে যাঁরা কাজ করান সেই গুণীদের প্রাণহানি
টে এদেরই হাতে।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমাদের বাংলা দেশের কিম্বদন্তী-খ্যাত
যাদুকর আত্মারাম সরকারের কথা। শোনা যায় তিনি ভূতসিদ্ধ
ছিলেন; ভূতদের দিয়ে নিজের পালকি বহন করাতেন এবং অন্যান্য
কাজও করিয়ে নিতেন। শেষকালে নাকি এই ভূতের হাতেই আত্মারাম
সরকারের মৃত্যু হয়েছিল। জার্মাণীর কিম্বদন্তীখ্যাত যাদুকর ডাক্তার
ফাউষ্ট (Faust) কে বিখ্যাত জার্মাণ কবি গ্যেটে (Goethe)
তাঁর নাটকে অমর করে গেছেন। এই ফাউষ্টও অলৌকিক বিদ্যার
চর্চা করতেন এবং শেষকালে ভূতেদের হাতেই তাঁর শোচনীয় ভাবে
মৃত্যু ঘটেছিল বলে কিম্বদন্তী আছে।

পল ব্রান্টন যখন প্রশ্ন করলেন, "আপনি লোকান্তরিত মানুষের
আত্মাকে কাজে লাগান না?" তখন মাহমুদ বে জবাব দিলেন
"হ্যাঁ, লাগাই। তাদের ভেতর একটি হচ্ছে আমার ভাইয়ের
আত্মা; এ ভাইটির মৃত্যু হয়েছে বছর কয়েক আগে। আমার এই
ভাইয়ের আত্মা তার মনের কথা ছবির মতো করে আমার মনের
চোখের সামনে তুলে ধরে। আপনি কাল যে প্রশ্নগুলো লিখেছিলেন
আমাকে না দেখিয়ে, সেগুলো আমি আমার এই ভাইয়ের আত্মার
সাহায্যেই জানতে পেরেছিলাম।"

মাহ্‌মুদ বে তারপর বললেন, তাঁর অধীনস্থ 'জিন'-দের কথা।
তাঁর তাঁবেদার ছিল ত্রিশটি 'জিন'। তাদের প্রত্যেকের আলাদা
আলাদা নাম। বাচ্চাদের নাচ শেখাবার মতো করে এদেরও ভিন্ন
ভিন্ন ধরণের কাজ শিখিয়ে তৈরি করে নিতে হয়েছিল।

"এই জিনদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেন কি করে?" প্রশ্ন
করলেন পল ব্রান্টন।

মাহমুদ বে বললেন, "ওদের স্মরণ করে ওদের ওপর গভীর ভাবে
মনঃসংযোগ করলেই ওরা এসে পড়ে। আমার অবশ্য অতটা করতে
হয় না। যে জিন-কে আমার দরকার, আমি আরবী হরফে তার
নামটা শুধু লিখে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে সে এসে যায়।"

মাহমুদ বে পল ব্রান্টনের কাছে বর্ণনা করে বলেছিলেন, কি করে
জিন-সিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। এ বিদ্যা তিনি শিখেছিলেন মিশরের
রাজধানী কায়রো শহরে এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ইহুদীর কাছে। যে
বাড়িতে মাহমুদ বে থাকতেন সেই বাড়িতেই একটি অংশের ভাড়াটে
এই বৃদ্ধ ইহুদী নানা রকম অলৌকিক গুপ্ত বিদ্যার চর্চা করতেন।
কায়রোতে একটি সমিতিতে যাদু, প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি নানারকম
অলৌকিক বিদ্যার চর্চা এবং গবেষণা হতো। এই সমিতির বৈঠকে
বৃদ্ধ প্রায়ই মাহমুদ বে-কে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন; সমিতির সভ্যদের
উদ্দেশে গুপ্তবিদ্যার নানা বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতাও দিতেন, সেই সব
বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ, বিস্মিত হতেন মাহমুদ বে।

"নানা রকম গুপ্ত বিদ্যা সম্পর্কে সেই বৃদ্ধ ইহুদীর কাছে যে সব
বহু প্রাচীন গ্রন্থ ছিল সেগুলো আমি পড়তে লাগলাম।" ব্রান্টনকে
বললেন মাহমুদ বে। "সেই সব গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নানা রকম
প্রক্রিয়া-অনুষ্ঠানাদিও করতে লাগলাম। ক্রমে ক্রমে এই সব বিদ্যায়
আমি বেশ পাকা হয়ে উঠে সেই সমিতিরই বৈঠকে বক্তৃতা দিতে এবং
নানা রকম প্রক্রিয়া হাতে কলমে করে দেখাতে লাগলাম।"

ক্রমে সেই সমিতিতে মাহমুদ বে-র পসার বেড়ে গেল, তিনি
সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। বারো বছর সেই সমিতির
নেতৃত্ব করার পর মাহমুদ বে সেই সমিতি পরিত্যাগ করলেন, স্থির
করলেন মিশর ছেড়ে এবার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে হবে, এবং
বেশ মোটা রকম অর্থ উপার্জন করতে হবে।"

"সেটাই একটু শক্ত ব্যাপার।" বললেন ব্রান্টন।

মাহমুদ বে হেসে বললেন—"আমার পক্ষে খুবই সহজ। আমার শুধু কয়েকজন ধনকুবের মক্কেল দরকার, যাঁরা আমার অলৌকিক শক্তির সাহায্য চান। সে রকম বেশ কয়েকজন মক্কেল আমার ইতিমধ্যেই জুটে গেছেন। তাঁরা তাঁদের নানারকম সমস্যা সমাধানের জন্য আমার শরণ নিচ্ছেন; এমন অনেক জিনিষ তাঁরা জানতে চাইছেন যা কোনো রকম লৌকিক উপায়েই জানা সম্ভব নয়। আমি আমার অলৌকিক শক্তির সহায়তা দিয়ে তাদের সাহায্য করি, আর তার বিনিময়ে মোটা দক্ষিণা আদায় করি। অবশ্য ওঁরা যে অমূল্য সাহায্য পান তার তুলনায় আমার দক্ষিণা কিছু অন্যায্য নয়। সত্যি বলছি আপনাকে, আমার হাতে বেশ কিছু টাকা জমে গেলে আমি এসব অলৌকিক যাদুর' কারবার ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবো আমার জন্মভূমি মিশর দেশের অভ্যন্তরে। সেখানে কিনবো কমলালেবুর বিস্তীর্ণ ক্ষেত (plantation), শস্য ফলাবো বিস্তীর্ণ জমিতে চাষ-আবাদ করে।"

"আপনি কি মিশর থেকে সোজা ভারতে এসেছেন?" প্রশ্ন করলেন পল ব্রান্টন।

মাহমুদ বে বললেন, "না, তার আগে সিরিয়া আর প্যালেস্টাইনে কিছুদিন ছিলাম। সিরিয়ার পুলিশ কর্মচারীরা আমার অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে অপরাধ-রহস্য সমাধানের জন্য মাঝে মাঝে আমার সাহায্য চাইতেন, যখন তাঁদের অন্য সব রকম চেষ্টা বিফল হতো। প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমি ঠিক ঠিক অপরাধী ধরে দিতাম।"

"কি করে?"

"অপরাধের রহস্যগুলো আমার অধীনস্থ জিনেরা আমার মনে এমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতো যে আমি যেন অতীতের সেই অপরাধগুলো আমার চোখের সামনে ঘটতে দেখতাম।"

বোম্বাইর হোটেল ম্যাজেষ্টিকে মাহমুদ বে-র সঙ্গে পল ব্রান্টনের অবিশ্বাস্য রকম বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল। একবার মাত্র নয়, পর পর তিনবার যে একই অলৌকিক কাণ্ড বা 'মিরাক্‌ল্' (miracle) করে দেখিয়েছিলেন রহস্যময় মিশরী গুণী মাহ্‌মুদ বে, সন্ধ্যা বা রাতের ঝাপসা আলোয় বা ঝাপসা অন্ধকারে নয়, ভোরের উজ্জ্বল আলোতে, মাহ্‌মুদ বে-র নিজের দেওয়া ব্যাখ্যা ছাড়া তার অন্য কি ব্যাখ্যা হতে পারে? পল ব্রান্টন—যিনি ঐ অদ্ভুত ব্যাপার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন—অন্য কোনো রকম ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি। হাতসাফাই? অসম্ভব। কাগজ আর পেন্সিল দুই ছিল পল ব্রান্টনের নিজের। প্রশ্নও তিনি নিজের হাতেই লিখেছিলেন মাহ্‌মুদ বে-কে না দেখিয়ে। মাহ্‌মুদ বে কাগজ বা পেন্সিল একবারও স্পর্শ করেন নি, আর সব সময়ে তিনি ছিলেন পল ব্রান্টনের কয়েক ফুট দূরে।

হিপনোটিজম্, অর্থাৎ সম্মোহন? ব্রান্টনের ধারণা তাও হতে পারে না। কারণ সম্মোহন বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি প্রচুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কাজেই মাহ্‌মুদ বে তাঁর ওপর সম্মোহনী প্রভাব বিস্তার করবার উপক্রম করলেই তিনি নিশ্চয় তা টের পেতেন—তাতে বাধা দিতে না পারলেও টেরটা অন্তত পেতেনই।

অতএব হাতসাফাই বা অন্য কোনো রকম' চাতুরির খেলাও নয়, সম্মোহনও নয়। তবে? তবে মাহমুদ বে-র দেওয়া ব্যাখ্যাকেই সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?" পল ব্রান্টনের মনের ভাবটা এই রকম।

মধ্যযুগের বিখ্যাত পর্যটক ভেনিস-নিবাসী মার্কো পোলোও তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখে গেছেন তিনি চীন'দেশে, তাতার দেশে আর তিব্বতে এমন আশ্চর্য যাদুকরদের দেখা পেয়েছিলেন যাঁরা পেন্সিল স্পর্শ না করেই দূর থেকে শুধু আত্মিক শক্তিতে পেন্সিলকে লেখাতে পারতেন।

পল ব্রান্টন প্রশ্ন করেছেন "মাহমুদ বে আমাকে ভাঁজকরা কাগজটা আর পেন্সিল একহাতে একসঙ্গে ধরতে বলেছিলেন কেন? তবে কি তাঁর তাঁবেদার জিনগুলো ঐ পেন্সিলের শীষ থেকে অণু সংগ্রহ করে তাই দিয়ে ঐ কাগজে প্রশ্নের জবাব লিখেছিল?"

ব্রান্টন বিশ্বাস করেছিলেন মাহমুদ বে সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতাধর যাদুকর। কিন্তু ব্রান্টনের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাই বিশ্বাস করে নেবো কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

সেক্‌সপীয়ারের বিশ্ববিখ্যাত নাটকে হ্যামলেট তাঁর নিহত পিতার ভৌতিক আবির্ভাবের পর বন্ধু হোরেশিও-কে বিস্মিত হতে দেখে বলছেন "হোরেশিও, দুনিয়ায় এমন অনেক কিছু আছে, তোমার দর্শন স্বপ্নেও যার আভাস পায় না"।

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy,"

অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন অনেক কিছু আছে বা ঘটে, আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে—এমন কি অনেক সময়ে অসাধারণ বুদ্ধি দিয়েও—যার ব্যাখ্যা মেলে না, যা আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান বা দর্শনের নাগালের বাইরে। সেই কারণেই কোনো-কিছুকেই চট করে মিথ্যে, অসম্ভব বা গাঁজাখুরী বলে উড়িয়ে দেওয়া সমীচীন নয়।

তবু কিন্তু মাহমুদ বে-র অলৌকিক শক্তির উক্তরূপ ব্যাখ্যা, অর্থাৎ জিন-তত্ত্ব মেনে নিতে আমার মন সায় দেয় না, হ্যামলেট হোরেশিওকে এবং পল ব্রান্টন মাহমুদ বে সম্বন্ধে আমাদের যাই বলুন না কেন, মাহমুদ বে বর্ণিত জিন-তত্ত্ব আমার গাঁজাখুরি বলেই মনে হয়—ইংরাজিতে যাকে বলে ফ্যান্টাষ্টিক (fantastic)। পল ব্রান্টন যদি তাঁর বইটিকে রসালো করবার জন্য আমাদের ধাপ্পা দিয়ে না থাকেন, তাহ'লে আমার মনে হয় এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে মাহমুদ বে ধাপ্পা দিয়ে বোকা বানিয়েছিলেন পল ব্রান্টনকে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে "The will to believe ultimately becomes belief itself" অর্থাৎ আমরা যা বিশ্বাস করতে প্রবল ভাবে ইচ্ছা করি, শেষ পর্যন্ত তাই বিশ্বাস করে ফেলি, বিশ্বাসের প্রবল কামনা পরিণত হয় বিশ্বাসে। পল ব্রান্টন ভারতে এসেছিলেন অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় প্রভৃতি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে; ভারতে পা দিয়েই হোটেল ম্যাজেষ্টিকে তাঁর সুযোগ মিলে গেল। মাহমুদ বে-র বিস্ময়কর কৃতিত্বটির অলৌকিক ব্যাখ্যা বিশ্বাস করবার কামনা প্রবল ছিল তাঁর অবচেতন মনে, তাই তিনি সেই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করেছিলেন। (অথবা বিশ্বাসের ভান করেছিলেন?)

অলৌকিক ব্যাপার ঘটে না বা ঘটতে পারে না, এ কথা আমি বলি না বা বিশ্বাস করি না। কিন্তু অদ্ভুত বিস্ময়কর কিছু দেখে তার লৌকিক কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে না পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটিকে অলৌকিক বলে মেনে নিতে আমি রাজি নই। আধুনিক 'লৌকিক'

চার এমন একাধিক খেলা আছে যা পাকা যাদুশিল্পী দ্বারা ত হলে অলৌকিক 'মিরাক্‌ল্‌' বলে মনে হবে, যে পর্যন্ত না শু কৌশলটুকু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

াধুনিক ( অর্থাৎ 'লৌকিক' ) যাদুবিদ্যার প্রধান বিষয় যেটি, ইংরাজিতে বলা হয় মিস্‌ডিরেক্শন (misdirection); ন হচ্ছে দর্শকের মনোযোগকে ভুল পথে চালিত করা, যাতে বুঝতে না পারেন খেলার কৌশল অর্থাৎ ফাঁকিটা কোথায়। নজর দিলে এই ফাঁকি ধরা পড়বার সম্ভাবনা, যাদুকর এমন করে দর্শকের নজর সেদিক থেকে সরিয়ে রাখবেন যেন সেই ্টুকু দর্শক ধরতে না পারেন। এই দক্ষতাই যাদুকরের কৃতিত্ব র্ষের মাপকাঠি।

ল ব্রান্টন আধুনিক যাদুবিদ্যার কলাকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লই ধরে নিতে পারি, কারণ সম্মোহন বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান তিনি বলেছেন, যাদু কৌশল সম্বন্ধে তাঁর কিছু মাত্র জ্ঞান আছে থা বলেন নি। তাই আমার সন্দেহ হয় মাহমুদ বে পল ক যা দেখিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন সেটি একটি আধুনিক 'লৌকিক' খেলা, তার সূক্ষ্ম ফাঁকিটা কোথায় সেটা আধুনিক-যাদু বিষয়ে জ্ঞ ব্রান্টন ধরতে পারেন নি। সম্ভবত খেলাটির যে বর্ণনা তিনি ন সেটিও নিখুঁত নয়। আধুনিক যাদু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল । দর্শক ঠিক ঐ খেলাটি দেখলে তাঁর বর্ণনা খুব সম্ভব একটু কম হতো, খুব সম্ভব তাতে খুঁটি নাটি এমন দুএকটি বিষয় বেশি যা যাদু-অনভিজ্ঞ ব্রান্টনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, এবং গেছে বলেই বর্ণনায় একটি লৌকিক যাদুর খেলা অলৌকিক 'মিরাক্‌ল্‌'-এর রূপ ধারণ করেছে।

আমার একটি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী বললে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হবে। ভারতীয় 'মাদারি' বা ভ্রাম্যমান যাদুকরদের আমার ভালো লাগে, এই যাযাবর যাদুওয়ালাদের রিয়ানাতেও যেন রোমান্সের আমেজ আছে। এরা বেশির অশিক্ষিত, নিরক্ষর, কিন্তু যাদুকৌশলে এদের সহজ দক্ষতা ক্রমে চলে আসছে। বাংলার বিশিষ্ট যাদুবিদ শ্রীঅশোক রায় দার যাদুকর জীবনে যিনি ছিলেন "ওসাক রে" (OSAK )—নিজে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে যাদুপ্রদর্শনে অভ্যস্ত হলেও তাঁর এই যে 'মিস্‌ডিরেক্শন'-এর ব্যাপারে ভারতের 'মাদারি'-রা পাশ্চাত্য যাদুকরদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর। বহু মাদারির খেলা দেখে এবং তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আমার মনেও সেই ধারণাই পাকা হয়েছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে পথের ধারের যে কোনো যাযাবর যাদুকরই একজন অসাধারণ যাদুশিল্পী।

ভূমিকা থাক, ঘটনায় আসি। মাসখানেক আগে (৩১শে মার্চ, ১৯৬২) বেলা তিনটের সময়ে বাড়ি ফিরছি, হাজরা পার্কের উলটো দিক থেকে ট্রামে উঠবো বলে ট্রাম ষ্টপের দিকে এগিয়ে আসছি, এমন সময় দেখলাম একটা ফাঁকা জমির ওপর গোলাকার ভিড় জমেছে, আর সেই ভিড়ের ভেতর থেকে ডুগডুগির আওয়াজ আসছে ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ। প্রথমে মনে হল বাঁদর-নাচানেওলার ডুগডুগি বাজছে বোধ হয়। বিশেষ উৎসাহ বোধ করলাম না। কিন্তু তারপর মনে হল হয়তো বা মাদারিদের যাদুর খেলা হচ্ছে, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখাই যাক না কেন। ওদের খেলা অনেকদিন দেখা হয়নি বলে মনটা মাদারি-দর্শনোৎসুক হয়েছিল।

ভগবান আমাকে লম্বা বানিয়ে আমার এই সুবিধাটি করে দিয়েছেন যে এ ধরণের ভিড়ের ব্যূহভেদ না করেও বাইরে দাঁড়িয়েই ভিড়ের ভেতর দৃশ্য দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয় না। গিয়ে দেখলাম যা আশা করেছিলাম তাই, যাদুর খেলা দেখাচ্ছে দু'জন মাদারি। চেহারা দেখে মনে হল দু ভাই ওরা। আসল খেলা-দেখানে-ওয়ালা বড় ভাই, ছোট ভাই মাঝে মাঝে একটু একটু সহযোগিতা করছে মাত্র।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের অবান্তর বকবকানি শুনে চলে আসবার উপক্রম করছি, এমন সময় জ্যেষ্ঠ 'মাদারি' ভাইটি ঝুলি থেকে একটা রূপোর টাকা তুলে নিয়ে বসে বসে টাকার খেলা যখন দেখাতে শুরু করল, খুশী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। টাকার খেলার অধিকাংশ মূল কৌশলগুলোই আমার জানা, ওর হাতে সেই কৌশলগুলোরই অপরূপ দক্ষ প্রয়োগ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কৌশল জানা থাকলেও বার বার চোখে ধাঁধা লাগতে লাগল, হাতসাফাই ওর এমন চমৎকার আর দর্শকের মনকে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে চালিত করার (misdirection) ক্ষমতা ওর এমনি অসাধারণ।

[ ক্রমশঃ

প্রশান্ত চৌধুরী

১৭

এ-অঞ্চলের অন্য কোনো মন্দিরের রবিবার বলে নেই কিছু। ও-সুখটা একমাত্র শনিমহারাজের মন্দিরেরই প্রাপ্য।

শনিবারে শনিপূজা সুপ্রশস্ত হয়।
শুদ্ধ শুচিবাস পরি পবিত্র হৃদয় ।।
শাস্ত্রমত উপচার সাজাইয়া নিবে।
কৃষ্ণতিল তৈল আর কুকুষট দিবে ।।
নীলবস্ত্র একখণ্ড করিবে সংগ্রহ।
মহিষ উৎসর্গে তৃপ্ত হন শনিগ্রহ ।।
মাষকলাই পঞ্চফল পঞ্চফুল আর।
শনৈশ্চরের তরে এই উপচার ।।

শনিবারে শনিমহারাজের মন্দিরে আর তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। মন্দিরে আর জায়গা কতটুকুই বা। জনা আষ্টেক লোক খেব্‌ড়ি খেয়ে বসলেই ঠাসাঠাসি চাপাচাপি। তারপর আছে রাস্তা। সারা রাস্তাটা জুড়ে বসে যায় ভক্তের দল। ছেলে-বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ ধনী-দরিদ্র বাছবিচার নেই কিছু। কুলবধূ আর বারবধূ, ঝাঁকামুটে আর টাকার কুমীর, চিটার আর চিটার,—সবাই পাশাপাশি হয়ে হাত পাতে শনিমহারাজের প্রসাদ নিতে।

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্ ।।

শনিবারের মাতামাতির পর রবিবারটায় বলতে গেলে কাঁকাই যায় শনিমহারাজের মন্দিরটা। মন্দিরের দুই পার্টনারে রবিবারের সকালটায় মন্দির নামক ঘরটার পিছনের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভক্তজনের দেওয়া প্রণামী ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়।

এ-অঞ্চলের এই শনি-মন্দিরটা আশপাশের আর-পাঁচটা দেব-দেবীর মন্দিরকে দাবিয়ে দিয়ে বেড়ে উঠছে দিন দিন। অথচ এ-মন্দিরটা নেহাৎই নাবালক। কত বছরই বা বয়স ওর? মেরেকেটে বছর দশেক হবে;—আর কত?

বছর বারো-তের আগেও এটা তো একটা কবিরাজী ওষুধের দোকান ছিল গো। তারও আগে ছিল এটা ডাক্তারখানা। আজকের শনিমন্দিরের দুই পার্টনার মুরারি আর গোবিন্দর বাপ স্বর্গীয় চারু বাগচী ময়মনসিংহের গদাই ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারি থেকে কম্পাউণ্ডারির চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রথম যখন এই ঘরটা নিয়ে একটা অ্যালো-হোমিও ডাক্তারখানা খুলে নিজেই হোমিওপ্যাথী ডাক্তার সেজে বসলেন, তখন ওই মুরারি আর গোবিন্দ গঙ্গারঘাটের খড়ের নৌকো থেকে খড়ের আঁটি চুরি করে মোষের খাটালে বেচে সেই পয়সায় বিড়ি টানত লুকিয়ে লুকিয়ে।

অ্যালো-হোমিও ডাক্তারখানাটা যখন কিছুতেই আর জমতে চাইল না, রাতারাতি—নাক্সভোমিকা টিংচারাইডিন-ভিভামিক্সচারের শিশি-বোতলের জায়গায় বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ আর ছাগলাদ্য ঘৃতের বয়েম সাজিয়ে ফেলে রাতারাতি কবিরাজী ওষুধের দোকান কেঁদে বসলেন চারু বাগচি। আর, সবার আগে দোকানের দরজায় লটকে দিলেন আকর্ষণীয় সাইনবোর্ড,—এখানে পাওয়া যায়, মদনানন্দ মোদক।

মোষের খাটালের পিছনের রাতজাগা-বস্তিতে রাত জাগতে আসে যারা, তারা এসে চারু বাগচির কবিরাজী ওষুধের দোকান থেকে কিনে নিয়ে যেত সেই অত্যাশ্চর্য মোড়কের পুরিয়া। আর একটু উঁচুদরের রাতজাগিয়ে যারা, তারা নিয়ে যেত সেই বলকারক স্মৃতিবর্ধক টনিক দ্রাক্ষারিষ্ট,—যা পেটে গেলে পিচের রাস্তাটাকে রাবড়ির সর বলে মনে হয়, থ্যাদা টগরকে ডানাকাটা পরী ভেবে আদর করতে ইচ্ছে করে।

সেই কবিরাজী ওষুধের দোকানের একপাশে একটুখানি জায়গা নিয়ে দোকান কাঁদবার জন্যে একসঙ্গে দু-দুটো খদ্দের জুটেছিল চারু বাগচির। দু-জনেই মাসে নগদ পাঁচ টাকা করে ঘর ভাড়া দিতে আর এক মাসের নোটিশে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে উঠে যেতেও রাজি ছিল! তাদের মধ্যে একজন ছিল পানের দোকানদার, আরেকজন শনিঠাকুরের। কি জানি কি ভেবে চারু বাগচি শনিঠাকুরের দোকানদারকেই দোকান খুলে বসতে অনুমতি দিলেন। অর্থাৎ
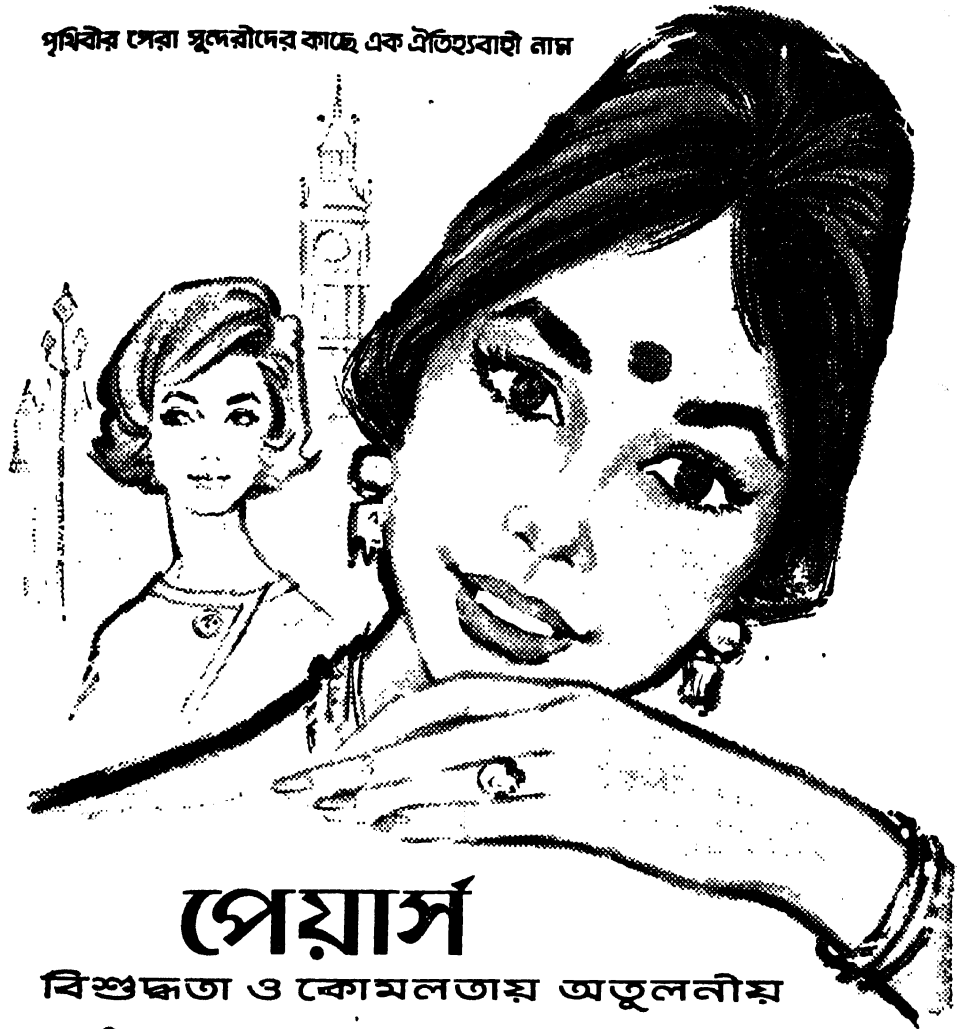
পাঁচ টাকায় নিজের কবিরাজী দোকানের এক-দশমাংশ তাকে সাবলেট করলেন।

কিছুদিন পরে চারু বাগচি যখন দেখলেন যে, তাঁর মদনানন্দ মোদক আর দ্রাক্ষারিষ্টের খদ্দেররা ধারে মাল নিয়ে শোধবার আর নামটি পর্যন্ত করে না এবং ওদিকে এতটুকু একটি শনিঠাকুর বসিয়ে কেশব মোহান্তি নগদ পয়সার দিব্যি লাভের কারবার কেঁদে বসেছে,—তখন এক মাসের নোটিশে কেশব মোহান্তিকে তার জাগ্রত শনিঠাকুর সমেত ঘর থেকে উঠিয়ে দিয়ে রাতারাতি কবিরাজী দোকান তুলে দিয়ে নিজেই বড়সড় একটি শনিঠাকুর এনে বসিয়ে অ্যালো-হোমিও-কবিরাজী ওষুধের দোকানের বদলে মোক্ষম দাওয়াইয়ের মন্দির কেঁদে বসলেন চারু বাগচি।

জয় জয় শনৈশ্চর গ্রহরাজ শনি।
এ দীন জনেরে কৃপা কর গুণমণি।

তা' কৃপা তিনি করেছিলেন বৈকি। মাসখানেক যেতে না যেতেই ডাল-চচ্চড়ির জায়গায় মাছের ঝোল আর দই দুধ পড়তে লাগল চারু বাগচির ভাতের পাতে।

কিন্তু এ-সুখ বেশিদিন ভোগ করে যেতে পারেন নি চারু বাগচি। আর, তাঁর সেই শনি-মন্দিরের আজকের এই রমরমা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল। এসব হয়েছে তাঁর দুই গুণধর পুত্র মুরারিমোহন আর গোবিন্দশরণের আমলে।

বাড়ির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে মামলা চলছে জ্ঞাতিদের সঙ্গে? যদি জিততে চান তো,—

শনৈশ্চরস্য কবচং ত্রৈলোক্যমঙ্গলপ্রদং।···এই নিন কবচ। মামলার খরচ সুদ্ধু ডিক্রি পেয়ে যাবেন।

শনিবারে রেসের মাঠে ঘোড়ার বাজি ধরে বার বার হেরে আসছেন। চট্‌পট্ চলে আসুন এখানে, মুরারিমোহন অ্যাণ্ড গোবিন্দশরণ ব্রাদার্সের জাগ্রত শনিঠাকুরের দোকানে।—

পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ শনিপীড়াবিনাশনম্।···এই নিন কবচ। বেঁধে ফেলুন হাতে অবিশ্যি কবচের দাম ৭।৵৹ আনা দিতে ভুলবেন না আগে। দেখবেন বাজীর বাজীতে বাজীমাৎ হয়ে যাবে আপনার।

ছেলে চাই?

অস্য শ্রীশনৈশ্চরকবচস্য কালাগ্নিঋষির্বিরাড-গায়ত্রীচ্ছন্দঃ···নিয়ে যান কবচ। স্পেশ্যাল ১৷৶ আনা। ঘরে গিয়ে কাঁথা সেলাই করতে শুরু করে দিন গে।

মুস্কো ষণ্ডা কাবলীওলাটা কামিনীর ঘরে গিয়ে রোজ রোজ ঘর আগলে রাখছে, সেঁধুতে দিচ্ছেনা তোমাকে?

হুং হুং হুং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হ্রীং পাতু মুখং মম।···বেঁধে ফ্যালো দিকিনি ভায়া এই কবচখানা হাতে। বেশ তো, ২২৷৶ না পার ১৷৶ আনাই না হয় পুজোর খরচ দিয়ে যেয়ো। ঐ ব্যাটা কাবলীওলা যদি তেরাত্তিরেই না রক্তবাহ্যে করে মরে তো বুঝবে নিতান্তই ওর গুরুবল ছিল।

হারুগুণ্ডা রোজ এসে হামলা করে যাচ্ছে বাছা তোমার ঘরে? দালালীর কমিশন্ নিয়েও আরো পয়সা চাইছে?

আং হ্রীং ক্রোং হুং ফট্···

কালো সুতোয় বেঁধে নাও এই কবচ তোমার হাতে। ঐ যেখানে বাঙলা-টিকের বড় গোল গোল দাগ রয়েছে হাতে, ঐখানে। হারুগুণ্ডার পায়ে বাত হবেই হবে।

কোঁকড়া চুল আর সিল্কের জামা পরা ফরসা বাবুটিকে বেঁধে রাখতে চাও নাকি গো গোলাপ দাসী? টগর-বেদানা-আঙুরদের জাল থেকে ছাড়িয়ে নিজের জালে জড়িয়ে রাখতে চাও যদি মানুষটাকে চিরদিনের জন্যে তো,—

আং হ্রীং কটিং সদা পাতু ঐং হ্রীং সৌরিঃ ককুৎস্থলম্···

এই রইল কবচ। এগারোটাকা তিন আনা। মানুষটা যায় দেখি তোমার ঘর টোপকে ঐ টগর-বেদানা-আঙুরের ঘরে।

শুধু কবচ কেন? ঘর-বন্ধন, দোকান-বন্ধন, রোগ-বন্ধন, বাবু-বন্ধন,—কে কী বাঁধতে চাও, সটান্ চলে এস শনি মহারাজের দাস এই মুরারিমোহন অ্যাণ্ড গোবিন্দশরণ ব্রাদার্সের দোকানে। হাতে-নাতে ফল পাবে।

আজকাল আর ডাকতে হয় না, হ্যাণ্ডবিল্ বিলোতে হয় না, সহরের রাস্তার পেচ্ছাপখানার নোঙরা দেয়ালে বিজ্ঞাপনের কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়ে আসতে হয় না,—লোকের মুখে মুখে জাগ্রত ঠাকুরের মহিমার কথা শুনে ছুটে আসে ভক্তের দল, কৃপাভিখারীর দল।

শুধু এই গঙ্গার ধারের অঞ্চলের লোকেরাই নয়,—কাঁটাপুকুর, দর্জিপাড়া, চোরবাগান, সিমলে থেকেও আসে কত রকমের মানুষ কত রকমের আর্জি নিয়ে।

গরীব মানুষ কেউ এলে ভাগিয়ে দিতে চাইত গোবিন্দশরণ। বলত, ভাগো, ভাগো; এখানে দাতব্য হাসপাতাল খুলিনি আমরা।

মুরারিমোহন আশ্রয় দিত তাদের। বলত,—ওকি কথা। এটা তো ব্যবসা নয় গো আমাদের। পুজোর জন্যে যে-খরচ নিই আমরা, সে তো পুজো করতেই চলে যায়। বাঁচে যা, তা' জমা হচ্ছে শনিঠাকুরের সিন্দুকে। বিশ-পঞ্চাশ হাজার হবে যেদিন, সেদিন তাই দিয়ে মন্দির উঠবে মহারাজের। বেশ তো, অর্থ দিতে না পারো, গতর দিয়ে শোধ কোরো মহারাজের মানৎ। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হলে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে দণ্ডী খাটতে খাটতে এই মন্দির পর্যন্ত এসে প্রণাম কোরে যেয়ো মহারাজকে। তাহলেই হবে।

রাজী হয়ে যেত গরীব মানুষেরা। বলত,—তাই হবে বাবা।

গোবিন্দ বলত,—পয়সা দেবে না, কড়ি দেবে না, কী হবে ওকে নিয়ে?

মুরারি বলত,—আছে, আছে, হড়বড় করিস কেন গোবিন্?

পঞ্চাশজনের মধ্যে একজন না একজনের অভীষ্ট সিদ্ধি না হয়ে যায় কোথায়?—পঞ্চাশটা বাঁদরকে একটা টাইপরাইটিং যন্ত্রের সামনে বসিয়ে দিলে বছর তিনেকের মধ্যে একজনের হাত থেকে আন্দাজে একটা 'টুইংকিল্ টুইংকিল্ লিটিল্ ষ্টার' বেরিয়ে যায় শুনেছি। কাজেই গোটা পঞ্চাশ লোককে শনির চরণামৃত খাওয়ালে কমপক্ষে একজনের কামনা পূরণ তো হতেই হবে। মজা এই যে, যে—উনপঞ্চাশ-জনের অভীষ্ট পূরণ হল না, তারা কখনো ঝগড়া করতে আসে না। কিন্তু অভীষ্ট পূরণ হল যার, সে জাগ্রত ঠাকুরের মহিমায় গদ্‌গদ্ হয়ে ছুটে আসে মানৎ শোধ করতে। বলে,—শনির কোপে ছেলেটার আমার পেটের ব্যামো সারছিল না কিছুতেই ঠাকুরমশাই,

ার দেওয়া 'জল-পড়া'র ভাল হয়ে গেছে সে। আমি তাই গঙ্গা মন্দির পর্যন্ত দণ্ডী খাটতে এসেছি।

াঙ্গে সঙ্গে মুরারিমোহন খবর দিয়ে দেয় গরাণহাটার বংশীচুলিকে। —লোকটা গঙ্গা থেকে মন্দির পর্যন্ত সারা রাস্তা বুক-পেছলা দণ্ডী খাটবে যখন, তখন ঢোল-কাঁসি নিয়ে বাজনা বাজাবি নেচে নেচে। পয়সা পাবি নগদ ষোলো আনা।

তাই হয়। গঙ্গায় ডুব দিয়ে মানুষটা ভিজে কাপড়ে রাস্তার ় উপুড় হয়ে শুয়ে হাতটাকে বাড়িয়ে দিয়ে দাগ কাটে , তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সেই দাগে পা দিয়ে উপুড় হয়ে হাত বাড়িয়ে আবার একটা দাগ কাটে। এমনি ভাবে মতো সোজা হয়ে শুয়ে শুয়ে মন্দির পর্যন্ত আসতে থাকে টা। রাস্তার ধুলোয়-কাদায়-গোবরে-থুতুতে মাখামাখি হয়ে তার সর্বাঙ্গ। পরিশ্রমে দরদর করে ঘাম ঝরে তার দেহে। াারজনেরা পাখার বাতাস করতে থাকে। আর গরাণহাটার চুলী তার বাচ্চা কাঁসিগুলোকে নিয়ে নেচে নেচে ঢোল-কাঁসিতে ঘা

—কাঁইনানা, কাঁইনানা, গিজদাগিজাং গিং!

দেখে ভিড় জমে যায়।

রাস্তার চলতি পথের লোকেরা চোখে-চোখে মুখে-মুখে কানাকানি লি করে,—কে যায়, কে যায়?

না, ছিরিকণ্ঠর মা।

—কেন যায়, কেন যায়?

না, ছেলের ব্যামোর জন্তে মানত ছিল। যমের মুখ থেকে এসেছে ছেলে।

—আহা, কোন্ ঠাকুরের মানত গা?

না, শনিমহারাজের।

—আ-হা, কোথায় তাঁর মন্দির গো?

না, হোথায় ডান দিকের রাস্তা দিয়ে ঢুকে বাঁ-দিকের গলি, ই মধ্যে। পুরোনো অশথ গাছের নিচে পাঁপড় বেলা হচ্ছে দেখবে ঠিক গায়েই মন্দির। জাগ্রত দেবতা।

ব্যাস, আর ত্যাখে কে!—একটা বিনি-পয়সার খদ্দেরের বদলে । পয়সা-দেনেওলা খদ্দের হাতের মুঠোয়!

মুরারিমোহন অল্পবুদ্ধি অনুজের দিকে বাঁকা-চোখে তাকিয়ে ক হেসে বলে,—রেজাল্টটা দেখলি এবার গোবিন্?

গোবিন্দ ভক্তি গদ-গদ চিত্তে দাদার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ,—ধন্তি দাদা, মাইরি দাদা।

স্টিমার-ঘাটের টিকিটঘরের রাজীব সরকার ফাঁক-ফুরসৎ পেলেই দিন থেকে মাঝে মাঝে বসছে এসে মুরারি গোবিন্দ অ্যাণ্ড ব্রাদার্সের ঠাকুরের দোকানে। বলে,—বেড়ে ব্যবসা ফেঁদেছেন ভাই ারিবাবু।

মুরারি বলে,—আমি না দাদা। আমার স্বর্গত পিতাঠাকুর।

রাজীব বলে,—আপনাদের কবচের তিন রকম দাম কেন ভাই ারিবাবু?

মুরারি বলে,—শোনো কথা! অর্ডিনারী, স্ট্রং আর এক্সট্রা স্ট্রং!

রাজীব বলে,—বুঝেছি। ঠিক ডাইংক্লিনিং-এর হিসেব আর কি। র্ডিনারি, সেমি-আর্জেন্ট আর আর্জেন্ট। কাপড়ের ময়লা সাত দিনে ধুয়ে সাফ করাতে চাও, অর্ডিনারির দাম দাও পনেরো নয়া পয়সা;—শনির কোপদৃষ্টি থেকে সাত মাসে উদ্ধার পেতে চাও, অর্ডিনারি কবচের দাম দাও ৭।।৵০ আনা। কাপড়ের ময়লা তিন দিনে সাফ করাতে চাও, সেমি-আর্জেন্টের দাম দাও উনিশ নয়া পয়সা;—দুর্ভাগ্য তিন মাসে ঘোচাতে চাও, স্ট্রং কবচের মূল্য দিয়ে যাও ১৮৵০ আনা। এক দিনে কাপড় ফর্সা করতে চাও তো পঁচিশ নয়া পয়সা ফ্যালো;—শনির দশা থেকে এক মাসে মুক্তি পেতে চাও তো নিয়ে যাও এক্সট্রা স্ট্রং কবচ ২২৶০ আনা দিয়ে।

মুরারিমোহন একগাল হেসে বলে,—আপনি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক, ধরেছেন ঠিক সোজা হিসেবটা।

রাজীব বলে,—তাড়াতাড়ি কোরে কাপড় কেচে দিতে গেলে ধোবা বাড়তি চার্জ করে, ডাইংক্লিনিংওলারা তাই নেয় বাড়তি পয়সা;—এটা বুঝতে পারি। কিন্তু আপনাদের বেলায়?

মুরারি বলে,—বাঃ রে, আমাদেরও শনি মহারাজের গায়ে বাড়তি পুজো চড়াতে হয় না বুঝি? কেষ্টতিলের ওজনটা বাড়াতে হয়, মাষকলাইয়ের ওজনটা বাড়াতে হয়;—খরচ বেড়ে যায় বৈকি।

—তাতে মহারাজ বুঝি বেশি সন্তুষ্ট হন?

—হবেন না? এতো সোজা কথা। যেমন দক্ষিণা; তেমনি কাজ।

রাজীব বলে,—এবার বুঝেছি। যেমন ঘুষ, তেমনি লাইসেন্স। পাঁচ টাকার ঘুষে তো আর হাজার টাকার লাইসেন্স বেরোবে না। কি বলেন মুরারিবাবু?

মুরারি বলে,—এই তো ঠিক ধরে ফেলেছেন হিসেবটা। সোজা হিসেব। না কি বলুন?

রাজীব বলে,—হুঁ, সোজা বলে সোজা! একেবারে জলবৎ!

মুরারি বলে,—আপনি বুঝি মানেন না এসব?

রাজীব জিভ কেটে বলে,—অ্যাল্! ওসব অলক্ষুণে কথা। দস্তুর মতন হিঁদুর ছেলে, মাদুলি-কবচ মানব না কী বলেন! হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে যে!

—কই, আজ দিন সাতেক হল আসছেন, আলাপ-সালাপ হল, কোনো দিন কিছু চাইতে তো দেখলুম না।

—আরে, চাইবটা আর কী বলুন না। মা-বাপ ভাইবোন সব তিন রাত্তিরের মধ্যে কলেরায় ফর্সা হয়ে গেছেন বছর ষোলো আগে। একা মানুষ। মাইনে যা পাই, দিব্যি চলে যায়। রোগ-ভোগও নেই কিছু।

—রেস্-টেস্ আসে?

—উঁহু।

—মামলা-মোকদ্দমা?

—সে-গুড়ে বালি।

—প্রেম-ভালবাসা-প্রণয়-পীরিত?

—ও বাবা, শনির কবচে তারও ব্যবস্থা আছে নাকি মশাই?

—কিসের ব্যবস্থা নেই রে দাদা? পুত্রার্থী লভতে পুত্রং, ধনার্থী ধনবান ভবেৎ। শত্রুনাশকরঞ্চৈব সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদং।

—গোরু হারালে গোরু পাওয়া যায় দেখছি!

—কথার কথা নয়, হারানো গোরু ফিরে পাওয়ার জন্তে সত্যিই আসে গোয়ালারা এখানে।

—ফিরে পায় ?

—না পেলে আসে কেন ?

—তা' তো বটেই। তা' প্রেম-প্রণয়ের কবচের ব্যবস্থাটা কী রকম ?

শুনে মুরারিমোহন মুচকি হেসে বলে,—কেন ? আছে নাকি কিছু ইয়ে-টিয়ে ?

রাজীব সরকার তেঁতো-খাওয়া মুখ করে বলে,—আরে ছুর্ মশাই, আপনার সঙ্গে আর বছরখানেক আগেও যদি আলাপ হত, তাহলে কি আর এমন ব্যাচিলার হয়ে ঘুরে মরি ?

—প্রেমে বিফল হয়েছেন বুঝি !

—হুঁ। টোট্যাল্ ফেলিওর।

—ওঃ, কবচ যা ছিল একখানা ?

—ছিল ?

—ছিল বলে ছিল। যত বড় কঠিন-হৃদয়াই হোক্ না কেন সে, আপনার কাছে ছুটে তাকে আসতেই হতো। প্রিয়তম বলে ডাকতেই হতো।

—ইস্ ! এখন একেবারে টু-লেট্ !

—কেন ?

—তার বিয়ে হয়ে গেছে।

—ছুর্ মশাই। এমন। বুদ্ধিমান লোক আপনি, আর একটা মেয়েকে কায়দা করতে পারলেন না ?

বলতে বলতে জামার পকেট থেকে পনেরো নয়া পয়সা প্যাকেটের ছুটো কড়া সিগারেট বের কোরে মুরারিমোহন বলল—আসুন দাদা, ধরান।

দিনটা রবিবার। শনিবারের মাতামাতির পর মহারাজের মন্দিরটা ফাঁকা ছিল একেবারে। কাজেই গল্পগুজবে বাধা পড়ছিল না কিছুই। গোবিন্দশরণ বাড়ির মেয়েদের নিয়ে দিল্লী কা ঠগ সিনেমা দেখতে গেছে। মুরারি একাই দোকানে ছিল। রাজীবকে পেয়ে লাগছিল বেশ তার। দেশলাই-এর কাঠি জেলে রাজীবের এবং নিজের ঠোঁটের সিগারেট ছুটো ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুরারি বলল—ব্যাপারটা কি হয়েছিল ? মেয়ের মা-বাপ মত দিলেন না বুঝি ?

—নাঃ।

—তবে ?

এতক্ষণ চাতাল থেকে পা ঝুলিয়ে বসেছিল রাজীব, এবার পা ছুটো গুটিয়ে নিয়ে বাবুসাবু হয়ে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—শুনবেন ?

—আপত্তি যদি না থাকে।

—আরে, আপত্তি আর কিসের।

—তাহলে চা আসুক।

—বেশ তো।

মুরারিমোহন দোকান থেকেই হাঁক পাড়ল,—ও বেহারী, বেহারী মন্দিরে চা দিয়ে যেও ছুটো। কড়া হাপ। তারপর ? লাগুক।

আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ উঠেছিল। সেই দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজীব সরকার বলল—ইলাকে আমি ভালবেসেছিলুম।

—ইলা ?

—হ্যাঁ, ইলা, ইলা, ইলা। জপের মন্ত্র করেছিলুম তার নাম। ইলা, ইলা, ইলা··ইলা, ইলু, ইল্লি !

—আর, ইলা বুঝি একদম ভালবাসত না আপনাকে ?

—উঁহু। মোটেই না। ভালবাসায় ওয়েট্ ছু পক্ষেরই নিক্তির ওজনে সমান ছিল। ইলার গুরুজনেরাও ছিলেন খুব মডার্ণ। আমি ইলাকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম, সিনেমায় যেতুম, পড়বার ঘরে নিরিবিলিতে প্রেমালাপ করতুম ;—গুরুজনদের তরফ থেকে কোনো আপত্তিই উঠত না।

—তবে ? এত সুবিধে পেয়েও··

—ধৈর্য ধরুন দাদা। আমি ভালবাসতুম ইলাকে, ইলাও ভালবাসত আমাকে। মানে এক কথায়, ভালবাসার রেসে আমরা সমান সমান ছিলুম, যাকে বলে ডেড হিট্। তবু হল না।

—কেন ?

—আমার কোমরে তখন দাদ হয়েছিল।

—আঃ, দাদের সঙ্গে প্রেমের কী ? প্রেমের সঙ্গে বিরহ, আর বিরহের সঙ্গে দাড়ুরীর সম্পর্ক থাকতে পারে ;—দাদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ?

—সেকথা বলবার আগে, দাদ বা দদ্রুরোগ সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলে নেওয়া দরকার।

—বলুন।

—দাদের মজাই হচ্ছে এই যে, মনটাকে দাদ থেকে সরিয়ে অন্যমনস্ক করে রাখতে পারলেই দাদের আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে মনে করেছেন যে, আপনার দাদ হয়েছে, সেই মুহূর্তেই দেখবেন নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই কখন আপনার হাতের নখসংযুক্ত পাঁচটা আঙুল দাদের কাছে চলে গেছে !—একথা আপনি মানেন কি না মুরারিবাবু ?

—মানি। আমারও হয়েছিল একবার।

—বেশ। এবার বলুন তো, প্রেমিকার সামনে কোমরের দাদ চুলকানো কারুর পক্ষে সম্ভব ?

—না।

—তবে ?

—আহা, অন্যমনস্ক হলেই তো দাদের সাড়াশব্দ থাকে না বললেন।

—মানছি।

—তা' আপনার সেই ইলার সঙ্গে প্রেম করবার সময়ও আপনি দাদের কথা ভুলে অন্যমনস্ক হতেন না, এ আবার কেমন ধারা কথা মশাই ? প্রেমালাপ করবার সময়, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেমালাপ করবার সময়, তুচ্ছ দাদের কথা কখনও কারুর মনে পড়তে পারে ?

—পারে। যদি প্রেমিকার নাম ইলা হয়।

—মানে ?

—ইলাকে ডাকতে গেলেই ইলা শব্দটা থেকে আমার মনে পড়ে যেত ইলিস মাছের কথা।' ইলা—ইলিস্।

—অসম্ভব নয়।

—ইলিস্ শব্দটা আবার আমার কানের ভেতর গিয়ে উল্টেপাল্টে কখন্ একসময় মনে পড়িয়ে দিত পদ্মা নদীর কথা ;—পদ্মার ইলিস। —পদ্মা।

—বেশ।

—পদ্মা ভাবলেই মনে পড়ত ঢাকা শহরের নাম। ঢাকার নদীর ।—ঢাকা।

—তা যেন হল।

—ঢাকা থেকে ঢাক।

—হোক।

—ঢাক থেকে ঢোল।

—হল।

রাজীব বলল,—এই ঢোল শব্দটা মগজের মধ্যে একবার ঢুকলেই ণ আমার মনে পড়ে যেত ঢোল কোম্পানির দাদের মলমের । সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যেত আমার রোগের কথা এবং সঙ্গে ই ইলাকে চোখের সামনে থেকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে আমার হাতের যুক্ত পাঁচটি আঙুল···

হো-হো করে হেসে ওঠে মুরারি।

,—ছেড়েছেন বটে একখানা।

রাজীব মুখখানাকে নিতান্তই কাঁচুমাচু । বলে,—শুধু ঐ জন্যেই ইলার আশা গ করতে হল আমায়। ভাবতে পারেন জেডিটা।

আরো একবার হো-হো করে হেসে মুরারি বলল,—আমি কিন্তু দাদা গ করছি না আপনাকে। সময় সেই আসাটি চাই। আলাপ যখন । ছাড়ছি না আর আপনাকে।

আসে রাজীব। মাঝে মাঝেই সে। বাইরের লোক থেকে এখন তরের লোক হয়ে গেছে রাজীব। তরকমের মানুষকে দেখতে পায় এখানে স।

আসে মোটা থপথপে শেঠজী। গাজীতে চান-টান সেরে এক লোটা জল য়ে রাম নাম জপ করতে করতে বাড়ি রবার পথে শনিবার দেখে এসে দাঁড়ায় নিঠাকুরের মন্দিরের দরজায়। মোটা কা ঘুষ দিতে চাওয়া সত্ত্বেও দু-দুবার তাঁর দোমে হানা দিয়ে এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের াকেরা জাল-ঘিয়ের টিন বের করে য়ে গেছে। এমন কবচ চাই, যাতে ন্‌ফোর্সমেণ্টের লোকেরা ঘুষ নিয়ে মুখ দ্ধ করতে রাজি হয়।

একসূত্রী ষ্ট্রং কবচেও শানায় না এসব কস্-এ। বিদ্যুৎসম ক্ষিপ্র কার্যকরী স্পেশাল পাওয়ার" কবচের দরকার পড়ে। ম ৪৭৷৷৵০ আনা।

লেগে গেল যদি, তো শনিঠাকুরের সোনার মুকুট; এবং তারপর সেই ভেঙে মুরারিমোহনের বৌয়ের গলার হার। আর না যদি লাগল তো,—"নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করতে পারনি শেঠজী। তাই কাজ হল না।"

সেদিনটা ছিল শুক্রবার। শনিঠাকুরের মন্দিরে ভক্তজনের ঘন ঘন আনাগোনা চলছিল। ওরই মধ্যে জায়গা করে নিয়ে একধারে ব'সে চা আর সিগারেট টানছিল মুরারি আর রাজীব, আর গল্প করছিল নানারকম। এমন সময় ক্ষেতচষা ট্রাক্টরের মতন বিদিকিচ্ছিরি শব্দ করতে করতে মান্ধাতা আমলের একটা হুড্‌ওলা পুরনো ফোর্ডগাড়ি এসে দাঁড়াল শনিমন্দিরের সামনে।

গাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন একজন। মাথার চুল আর গোঁফের চুলের পাক দেওয়ার কায়দায় সাবেকি কলকাতাকে ধরে রেখেছেন নিজের মুখটুকুর মধ্যে। জামা কাপড়েও তাই। কড়া মাড় দেয়া ডবলকফ সার্টের নিচে কালাপাড় কোঁচানো ধুতিটি। পায়ে
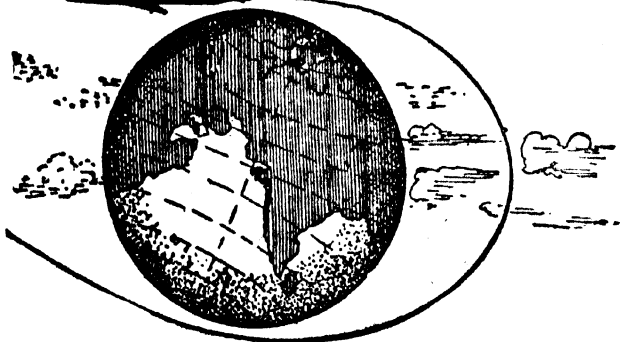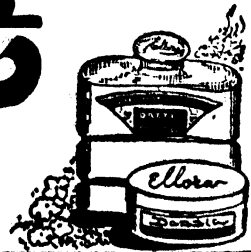
ফিতে বাঁধা বুটজুতো। ভদ্রলোক এসেই পাঁচসিকে পয়সা প্রণামীর তামার থালার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে রেস-এর ছোট্ট বইটা এগিয়ে দিলেন মুরারিমোহনের হাতে।

বইটাকে শনিঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে মুরারি বলল,—চোখ বুজে ফুল তুলে নিন, বেটা হাতে ওঠে।

ভদ্রলোক চোখ বুজে হাত ঘষতে ঘষতে তুলে নিলেন জবাফুল একটা।

মুরারি বলল,—ঘোড়ার আত্যাক্ষর জ ; অর্থাৎ ইংরিজি জি কিংবা জে দিয়ে-যে ঘোড়ার নাম, সেই ঘোড়া ধরুন কাল।

একটু চরণামেত্তর হাতে নিয়ে ভক্তিভরে মুখে আর মাথায় দিয়ে আবার সেই বিদিকিচ্ছিরি শব্দ তুলে মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

রাজীব চোখ নাচিয়ে বলল,—রেজাল্ট ?

মুরারি বলল,—ইংরিজি 'জি' আর 'জে' দিয়ে অন্তত গোটা দু-তিন ঘোড়ার নাম বেরিয়ে যাবে ভায়া। লাগে তাক, না লাগে তুক। লাগে তো বলব, কেমন হল তো ? আর না লাগলে বলব,— এই ঘোড়াটা না ধোরে ঐ ঘোড়াটা ধরলেই মেরে দিতে পারতেন।

রাজীব বলল,—চমৎকার। যাক, উঠি আমি এবার। বাসায় গিয়ে আবার ভাত ফোটাতে হবে।

ঠিক এমনি সময় শনিঠাকুরের মন্দিরের সামনে একটি রিক্সা এসে দাঁড়াল, এবং পর্দা সরিয়ে বুড়ি দাসীকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এলেন সালঙ্কারা এক মহিলা। বেশ চটকদার মুখ। বাঁদিকের চোখের ঠিক শেষপ্রান্তে মাঝারি গোছের একটি আঁচিল। শাড়িতে গহনায় ঘোমটায় মহিলাটিকে বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের বলেই মনে হল রাজীবের।

মুরারি বলল,—আসুন মিসেস রায়। খবর সব ভাল তো ?

রাজীব বলল,—চললুম তাহলে আমি।

চলে গেল রাজীব।

মিসেস রায় এবার উঠে এলেন মন্দিরের ঘরের মধ্যে। চুপিচুপি বললেন,—ঐ জেরিনা মুখপুড়ী বড় বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে মুরারিবাবু। আগরওয়ালাকে তো ভাগিয়েছেই, বোস সাহেবকেও ভাগাবার তালে আছে। শত্রু বিনাশের কিছু উপায় নেই আপনাদের হাতে ?

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে গাঢ় ধোঁয়া ছেড়ে মুরারিমোহন হেসে বলে,—নেই আবার কী ?···শত্রুনাশকরঞ্চৈব সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদম্।···কিন্তু মজা হচ্ছে এই, এক জেরিনা মলে আরেক মর্জিনা এসে হাজির হবে। কটাকে মারবেন বলুন মিসেস রায় ? তার চেয়ে সেদিনেই বলেছিলুম,—ঘর-বন্ধন করে ফেলুন। বেশি নয় গোটা পঁচাত্তর টাকা খরচ করতে পারলেই আপনার ঘরে যে মানুষ একবার পা দেবে, সে আর ভুলেও কখনো অন্য কারুর ঘরে পা দেবে না। পনেরো টাকা অ্যাডভান্স ;—বাট টাকা ঘর-বন্ধনের দিন দিলেই চলবে।

—পঁচাত্তর ?

—পঁচাত্তর। সাতান্নতেও ঘর-বন্ধনের একটা বিধান আছে বটে ; তবে তাতে চান্সটা হল ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি। ইচ্ছে করলে সেটাও ট্রাই করতে পারেন।

—থাক্, থাক্, এ বয়েসে ঝুঁকি নিতে আর রাজি নই আমি। ঐ পঁচাত্তরেই রাজি। কিন্তু ফল পাওয়া যাবে তো ?

—সে ঐ মহারাজজীর ইচ্ছা। তবে, শোভাবাজারের ময়ূরী দেবীর ঘর দিয়েছিলুম বেঁধে। তারপর বসন্তরোগে একটা চোখ পর্যন্ত গলে নষ্ট হয়ে গেছে ময়ূরী দেবীর। তবু কৈ, মেরুণ রঙের বড় পন্টিয়াক গাড়িখানাকে কেউ ময়ূরী দেবীর দরজা থেকে কোনো হরিণী দেবীর দরজায় সরাতে পারলে আজ পর্যন্ত ? তবে ঐ যে বললুম, সবই ঐ মহারাজজীর মর্জি।

অগত্যা রাজী হয়ে গেলেন মিসেস রায়।

—তাই হবে। পঁচাত্তরেই রাজি। পনেরো টাকা অ্যাডভান্সও করে যাচ্ছি। কবে যাচ্ছেন তাহলে আমার ওখানে।

—মঙ্গলবার। প্রশস্ত দিন। সূর্য ডোবা আর চাঁদ ওঠার মাঝখানে সেদিন অনেকখানি সময় পাওয়া যাচ্ছে। তারই মধ্যে যখন হোক্ এক সময় হাজির হব গিয়ে। ঘরটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করিয়ে রাখবেন, আর পারেন তো ধুনোর ধোঁয়ায় একটু আঁধার করে রাখবেন ঘরটাকে। মনে থাকবে তো ?

—নিশ্চয়ই মনে থাকবে।

ব্লাউজের গলার মধ্যে হাত চালিয়ে ঝিনুকের বোতামের ছোট্ট বটুয়া বের কোরে পনেরোটি টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে উঠে পড়লেন মিসেস রায়। যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—কই, সেদিনের সেই সাগরবাবু তো কই গেলেন না আমার ওখানে।

—সাগর ?

—ওমা, সেই যে। সেই চওড়া বুক, শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ, টিকোলো নাক,—সেই শক্তসমর্থ জোওয়ান মানুষটা। সেদিন যে না থাকলে পড়েই যেতুম আমি রাস্তার গর্তর মধ্যে। যাব বলে গেলেন না তো।

সেদিনের কোনো কথাই আজ আর মনে নেই মুরারিমোহনের। সাগরের কথাও ভুলে গেছে বেমালুম। তবু বলল,—যাবে, যাবে। ঘরটা একবার আমায় বেঁধে ফেলতে দিন না। তারপর দেখি কোন্ শালা না যায়। উড়িয়া-তেলেভাজার দোকানের ভেলিগুড়ে মাছি-বসা দেখেছেন ? ঠিক তেমনি বসা বসবে গিয়ে মানুষেরা আপনার ঘরে। আপনি শুধু কালো ঘটে একঘট গঙ্গাজল, একটু কালো তিল, কিছু মাষকলাই, আর নতুন একটা লোহার হুক্ জোগাড় করে রাখবেন। মঙ্গলবার আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হচ্ছি।

রিক্সায় উঠে পড়লেন মিসেস রায়। তারপর কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে কী বলে দিয়ে পাঠালেন আবার সেই বুড়ি দাসীকে।

দাসী এসে বলল,—ঠাকুরমশাই গো, মা বললেন কি যে, সেদিনের সাগর নামের শক্ত সমর্থ জোওয়ান মানুষটার সঙ্গে দেখা হলেই বলে দেবেন যেন যে, তিনি যেন অতি অবিশ্যি মায়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুলে না যান।

পঁচাত্তর টাকার খদ্দেরটা এমন সহজে হাতের মুঠোয় এসে যাওয়ায় মনটা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিল মুরারিমোহনের। নতুন একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে আগুন ধরাতে ধরাতে বলে উঠল,—বহুৎ আচ্ছা।

রিক্সা চলে গেল।

আর, শনিমহারাজের কী কৃপা! রিক্সা চলে যাবার আধঘণ্টার

মুরারিমোহন দেখতে পেল সেদিনের সেই সাগর নামের জোওয়ান কমবয়সী ছেলেটা একলা পায়চারি করছে ওদিকের দোতলা ঠার সামনের রাস্তাটায়।

—ও মশাই, ও সাগরবাবু!

নতে পায় না সাগর। ক্যাচাং-এ পড়েছে ভারি। শ্যামাপদ র জ্বর হয়েছে ক'দিন থেকে। জ্বরটা বেশি নয় তেমন। গাঁটে গাঁটে ব্যথা। তাই যেতে পারছে না সোহাগীদের । শীতলা মন্দিরেই পড়ে আছে চাদরমুড়ি দিয়ে। এদিকে বুড়ির শরীরটাও ভাল নয় তেমন। কাজেই সাগরের ভার পড়েছে, মাসকাবারে ঠানদি যে-টাকা সাহায্য করে ওদের, রাদ্দ টাকাটা সাগরই যেন সোহাগী বা চাঁপার কাছে পৌঁছে ব্যবস্থা করে।

সাগর বলেছিল একবার,—এই যে তুমি মাসে মাসে টাকাগুলো ঠানদি, তোমার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে যখন, তখন তোমার নিজের কি করে সেটা ভেবেছ?

ঠানদি বলেছিল,—আমার এদিকের পুঁজি ফুরোবার আগেই র আয়ুর পুঁজি ফুরিয়ে যাবে গো দাদা, ভাবছিস কেন তুই? র ভেতরে একটা কাঁপন ধরেছে। চুপচাপ বসে থাকলেও সেই নটাকে টের পাচ্ছি। বেশি দিন আর থাকব না রে দাদা। ডাক গেছে। আর, নেহাৎ পুঁজি ফুরোবার পরেও যদি বেঁচে থাকি, তো রইলি;—বুড়ি ঠানদিটাকে দেখবি নে?

সাগর বলেছিল,—আচ্ছা, খুব ঢং হয়েছে। তোমার টাকা। দিয়ে আসি সেখানে। র হয়েছে যত জ্বালা! কোত্থেকে যে আমার ত তুমি জুটলে এসে ঠানদি হাড় আমার ভাজা হয়ে গেল।

ফোকলা দাঁতে মুচকি হেসেছিল ঠানদি। ন্দে জল ভরে এসেছিল ঘোলাটে দুটো চোখে। ছিল,—এখন হয়েছে কী রে? এই তো সবে র সন্ধ্যে। নিদেনকালে খাবি খাব যখন, তোকে গঙ্গাজল ঢালতে হবে আমার —মরে গেলে কাঁধ দিতে হবে,—চিতেয় মুখে আগুন দিতে হবে,—বারোটি বামুন য়াতে হবে। তারপর আমার এই দোকানে বসবি যখন, তখন আমার কথা মনে পড়ে য় কাঁদতে হবে।

সাগর বলেছিল,—দায় পড়েছে আমার, মার দোকানে বসতে।

ঠানদি বলেছিল,—ওমা! শোনো ছেলের । দোকান কি তখন আমার নাকি? খন তো তোর দোকান। তোকে তো আমি ল কোরে লিখে দিয়েছি। কিচ্ছু মনে থাকে দেখছি তোর সাগর।

সাগর বলেছিল,—বেশ, বেশ, আমি ভুলো, মি বোকা, আমি গাধা, আমি বাঁদর। তোমার ফোকলা-দাঁতের বক্তিমে শোনবার সময় নেই আমার। কী দেবে দাও, দিয়ে আসি তোমার সেই আদুরী মা সোহাগীকে।

টাকা ক'টা নিয়ে চলে এসেছে সাগর। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করে ঠিক কোন্ দিক দিয়ে যে ওপরে উঠবে, ভেবে না পেয়ে পায়চারি করছিল সোহাগীদের মাটকোঠার সামনের রাস্তায়, এমন সময় শনিঠাকুরের মন্দির থেকে মুরারিমোহন হাঁক দিল,—ও মশাই,—ও সাগরবাবু, এই যে, এদিকে, সামনে তাকালেই দেখতে পাবেন আমাকে।

এবার শুনতে পেল সাগর। তাকিয়ে দেখল, সেদিনকার সেই শনিঠাকুরের চেম্বার থেকে ডাকছে সেদিনকার সেই বাবু-পুরুৎ। এখানকার এই অচেনা মুখের রাজত্বে তবু একটা চেনামুখ দেখতে পেয়ে নেহাৎ মন্দ লাগল না আজ সাগরের। এগিয়ে গিয়ে বলল,—কি বলছেন?

—আরে, কী যোগাযোগ দেখুন, এই কিছুক্ষণ হল মনে মনে আপনাকেই খুঁজছিলুম, আর সঙ্গে সঙ্গেই কি না আপনি এসে হাজির।

—আপনি আজ্ঞে থাক্, তুমি বলেই কথা বলুন আমার সঙ্গে। আপনি শোনবার বয়েস হয়নি আমার।

—বেশ, বেশ, ভাল কথা। তা' বোসো ভাই উঠে।

—মন্দিরে ঢুকি না আমি। যা বলবার বলুন, এখানে দাঁড়িয়েই শুনছি।

—কেন বল তো?

—এমনি। ভাল লাগে না।

—এক্সাইজ-টেক্সাইজ কর বুঝি?

এই একটি দুর্বল জায়গা আছে সাগরের। ডন-বৈঠক; ডাম্বেল-মুগুরের কথা উঠলেই আর স্থানাস্থান কালাকালের বিচার থাকে না। বলল,—ওরেব্‌, বাবা! একদিন এক্সাইজ না করলে সেদিন আমার রাত্রে ঘুমই হয় না। দেখবেন হাতের গুলটা?

চাঁপা তার সেই নিজের হাতে তৈরি ছোট খোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল চুপচাপ।—

তেলেভাজার দোকানটায় ফুলুরি ভাজছে উড়িয়া দোকানদার। কালকের বাসি আলুরচপগুলোকেও ভেজে মিশিয়ে দিচ্ছে টাটকা বেগনভাজার সঙ্গে। ওর মা সোহাগী ওকে খেতে দেয় না দোকানের তেলেভাজা। নিজে ও' ছেলেবেলায় যা-যা করেছে, যা-যা খেয়েছে, যা-যা পরেছে,—তার কোনো কিছুই করতে দেবে না, খেতে দেবে না, পরতে দেবে না সে তার মেয়েকে। তার ভয়, তাহলে চাঁপার জীবনটা সোহাগীর মতে হয়ে যাবে। নিজে যা হতে পারেনি, তাই সে করে তুলতে চায় চাঁপাকে। এই তার একমাত্র সাধনা। এই আশাতেই সে এত ভুগেও বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েও বেঁচে আছে।

চাঁপা দেখছিল দাঁড়িয়ে।—

কামারের দোকানের বুড়ো সুবল নেহাইয়ে গরম লাল লোহা রেখে হাতুড়ি পিটে চলেছে দুমদাম। রোগা একটা হাড় জিরজিরে ছেলে ক্রমাগত হাপর টেনে চলেছে। হাত তার হাপরে থাকলেও মনটা তার কখন ছুটে বেরিয়ে গেছে সামনের রাস্তায়, যেখানে হাওয়াই লাড্ডুর আশ্চর্য লাল গাড়িটা এসে অদ্ভুত একটা গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে অত্যাশ্চর্য লাল লাল তুলোর মতো সেই হাওয়াই লাড্ডু তৈরি করে দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে।

চাঁপা দেখছে।—

ওর চোখদুটো ভেসে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। ভেসে বেড়াচ্ছে চায়ের দোকানের রোয়াকে, বিড়ির দোকানের ঘরের মধ্যে, জলের কলের ধারে, মোষের খাটালের আশেপাশে, অশ্বত্থগাছের নিচে যেখানে পাঁপড় তৈরি হচ্ছে, আর তার পাশেই শনিঠাকুরের মন্দিরে।

থেমে গেল চাঁপার চোখ।

জোওয়ান একটা কমবয়সী মানুষ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ও-কি করছে কী পাগলের মতো?

মানুষটা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে গেঞ্জি জামা সব খুলে বুকের পিঠের হাতের কাঁধের পেটের পায়ের মাসল্‌ দেখিয়ে চলেছে মন্দিরের মুরারি ভট্‌চাজকে।

হাসি পেল চাঁপার দেখতে দেখতে। এমন পাগল মনিষ্যিও থাকে পৃথিবীতে! মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পুরুৎ ঠাকুরকে কিনা মাসল্‌ দেখাচ্ছে লোকটা।—মাসলগুলো অবিশ্যি দেখবার মতোই বটে। সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। চেহারাটা যেন পাথর কুঁদে তৈরি। কিন্তু তাই বলে এই ভরসন্ধ্যে বেলাতে রাস্তার মাঝমধ্যিখানে দাঁড়িয়ে কেউ দম আটকে বুক ফুলিয়ে মাসল দেখায় নাকি? হাতের গুল্‌ নাচায় নাকি? পেটের মাস্‌লের নড়াচড়া দেখাতে যায় নাকি?

আবার হাসি পেল চাঁপার।

সর্বাঙ্গের মাস্‌লের সব রকম কেরামতী দেখাবার পর এতক্ষণের পরিশ্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সাগর যখন তার জামাটা গায়ে চড়াচ্ছে আবার, মুরারি বলল,—হ্যাঁ, চেহারা একখানা গড়ে তুলেছ বটে ভাই। সাধে কি আর মিসেস রায়ের নজর পড়েছে তোমার ওপর!

—মিসেস রায়? নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে?

—আহা সেই যে, সেদিন যাঁকে তুমি গর্তয় পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালে গো। মনে পড়ছে না? বাঃ, ঠিকানা লিখে কাগজ দিলুম তোমায়।

মনে পড়ে গেছে সাগরের। নিজের বলিষ্ঠ দুটো হাতে মিসেস রায়ের ফর্সা নরম নিটোল দেহের স্পর্শের শিহরণটা পর্যন্ত এই মুহূর্তে যেন আবার ঠিক সেদিনকার মতই অনুভব করতে পারছে সাগর।

সাগর বলল,—মনে পড়েছে। সেই সুন্দরপানা···

মুরারি বলল,—পানা মানে? ক'টা দেখেছ ভাই অমন মুখ। তা' সে যাই হোক। তুমি আসবার আধঘণ্টা আগেই এসেছিলেন তিনি।

—কেন?

—আসেন মাঝে-মাঝে আমার কাছে। সকলে তো আর নাস্তিক নন তোমার মতো। তা' এ-কথা-সে-কথায় হঠাৎ তোমার কথা বললেন। বললেন দেখা হলে তোমায় যেন আমি মিসেস রায়ের সঙ্গে দেখা করার কথাটা মনে করিয়ে দিই। অনেক করে বলে গেছেন তিনি।

সাগর বলল'—আচ্ছা, যাব'খন একদিন। কিন্তু ঠিকানা লেখা সেই কাগজখানাই এতদিনে হারিয়ে ফেলেছি বোধ হয়।

মুরারি বলল,—বেশ তো, আমি আবার লিখে দিচ্ছি ঠিকানাটা। আর, এক কাজ কোরো ভাই। আগামী মঙ্গলবার যেয়ো। এই ধরো সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ।

—ঠিক আছে।

—মনে থাকবে তো?

—ঠিক থাকবে।

সাগর ভেবেছিল, আলাপ যখন হল, তখন ঐ মুরারিবাবুকে বলেই এ-পাড়ার কোনো একটা চেনা বাচ্চা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সোহাগীদের ওপরে উঠবে। কিন্তু সে-কথাটা মুরারিবাবুকে বলবার আগেই মস্ত একটা পন্টিয়াক গাড়ি এসে থামল মন্দিরের দরজায়। মুরারি শশব্যস্তে এগিয়ে গিয়ে নিজে হাতে গাড়ির দরজা খুলে বলল,—আসুন, আসুন, ময়ূরী দেবী।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত একা-একাই সাগরকে যেতে হল সোহাগীর সেই দোতলার ঘরে। [ক্রমশঃ।

## বৈদ্যুতিক পাখাশিল্প ও ভারত

জকাল এমন কোন সহর ( ছোট-বড় ) পাওয়া যাবে না, কিংবা এমন কোন আধুনিক কর্মকেন্দ্র নেই, যেখানে পাখা চলে নি। বিদ্যুৎ সরবরাহ যেখানেই রয়েছে, হোক ী-অঞ্চল, বৈদ্যুতিক পাখা সেখানে কম-বেশি দেখতে পাওয়া সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ যেমন ত হচ্ছে, বৈদ্যুতিক পাখারও ব্যাপকতা তেমনি লক্ষ্য করা বলতে কি, আজ বৈদ্যুতিক পাখাশিল্প একটি বৃহৎ শিল্পে য়েছে, এমন কি নানাদিক থেকে অনগ্রসর এই ভারতেও।

নে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী হিসাব থেকে আলোচ্য অগ্রগতির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক পাখার দন দিন কতটা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এই বৃদ্ধির সত্যি রণগুলি কি, সরকারী বিবরণে তারও ইঙ্গিত রয়েছে। ছে—ভারতের সুদূর পল্লী অঞ্চলে বৈদ্যুতিক সংযোগ সাধন, ব্যবাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং নাগরিকদের ক্রমবর্দ্ধমান হারে ার মানের উন্নয়নই বৈদ্যুতিক পাখার চাহিদা বৃদ্ধির রণ।

থম দুইটি পাঁচসালা গঠন পরিকল্পনার কাজ শেষ করে তৃতীয় বৃহৎ পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্রতী হয়েছে। সরকারী অনুসারেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদ্যুতিক পাখা-শিল্পের হার সমধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫—৫৬ সালে বৈদ্যুতিক যখানে উৎপন্ন হয় ২,৮৭,২৩৬টি, সেক্ষেত্রে ১৯৬০—৬১ সালে ত হয়েছে মোট ১০,৫৮,১৬১টি পাখা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক নাকালে বৈদ্যুতিক পাখা উৎপাদন হার বাড়াবার জন্তে র উদ্যম চলবে, সরকার এমনি ব্যবস্থা করেছেন। আরও য়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদ্যুতিক পাখাশিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা। বর্তমান তৃতীয় নাকালে এই খাতে অর্থ বিনিয়োগ হবে অনেক বেশি াটি ৫০ লক্ষ টাকা ), এমনি সম্ভাবনা রয়েছে।

াধীনোত্তর ভারতে ছোট-বড় বহু শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে, নিয়মিত ধারায় বৈদ্যুতিক পাখা নির্মিত হয়। একটি সরকারী —১৯৫৬ সালে অর্থাৎ এখান থেকে ছয় বৎসর আগে দেশের এলাকায় বৈদ্যুতিক পাখার কারখানা ছিল ১৬টি। দ্বিতীয় ল্পনার পাঁচ বছর সময় শেষ হতেই দেখা যায় যে, কারখানার ংখ্যা বেড়ে ২৪টি দাঁড়িয়েছে। এক্ষণে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই তক পাখার কারখানা রয়েছে বারোটির মতো। এ সকল একটু বৃহদাকার কারখানা, যার বাইরে আরও অনেক ছোটখাট তক পাখা নির্মাণ সংস্থা রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পাখা তৈরী হয়, আর এদের দামও পরস্পরের া। দেশের ক্ষুদ্রাকৃতি কারখানাগুলোতে ১৯৫৫ সালে পাখা তিক ) উৎপাদিত হয়েছিল ১২,৮০০-টি। সেক্ষেত্রে ১৯৫৯ হিসাবেই দেখা যায় যে, পাখার উৎপাদনের হার বেড়ে যেয়ে ০০টি দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় কারখানাসমূহে সিলিং পাখা, পাখা—সব রকম বৈদ্যুতিক পাখাই উৎপাদিত হচ্ছে, লক্ষ্য করবার।

দ্যুতিক পাখা শিল্পে এই দেশের অগ্রগতি আজ স্পষ্ট বলতে য়। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক পাখার চাহিদা মিটানো

চলছে কিনা, সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। ১৯৫৭ সালের পূর্বেও বিদেশ থেকে ভারতে বহু বৈদ্যুতিক পাখা আমদানী করা হতো। কিন্তু এর পর থেকে আমদানী বছরের পর বছর হ্রাস পেয়ে পেয়ে এসেছে, সরকারী হিসাবেই তা দেখা যায়। বর্তমানে মাত্র শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য এক্জষ্ট পাখা ও ব্লোয়ার বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। ভারত থেকে কতক জাতীয় বৈদ্যুতিক পাখা অবশ্যি বিদেশে রপ্তানী হয়েও যাচ্ছে—যেমন, ১৯৬০ সালে রপ্তানীকৃত পাখার পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার। আশা করা হচ্ছে—আলোচ্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের চাহিদা মিটিয়েও বহির্ভারতে ৫০,০০০টি বৈদ্যুতিক পাখা রপ্তানী করা যাবে। শুধু তাই কেন, ভারতের বৈদ্যুতিক পাখা শিল্পে এখন যে ক্ষেত্রে ৮ হাজার লোক কর্মনিযুক্ত রয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনাকাল শেষে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালের পর এই শিল্পে আরও ছয় হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে বিশ্বাস। মোটের ওপর ভারতে বৈদ্যুতিক পাখা শিল্পের প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়বে বই কমবে না

## চাক্ষুষ শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা দেওয়া-পাওয়ার মাধ্যম একটি নয়—একাধিক। চাক্ষুষ শিক্ষা ব্যবস্থাও এমনি একটি মাধ্যম বললে ভুল হবে না। শুধু লিখে নয়, পড়েও নয়, এটা-ওটা দেখেশুনেও বহু কিছু শেখা যায়। চাক্ষুষ শিক্ষা বা 'ভিস্যুয়াল এইড' পদ্ধতির গুরুত্ব কিন্তু এইখানেই।

মানুষকে বড় হবার জন্তে, এগিয়ে যাবার দাবীতে কোন না কোন ভাবে শিক্ষালাভ চাই-ই। এক্ষণে লিখিত ভাষার ব্যাপক ব্যবহার চলেছে, কিন্তু একদিন ছিল যখন কোন লেখবার হরফই সৃষ্টি হয়নি। শিখবার-জানবার সূত্র বা পথ ছিল সে-যুগে অন্য ধরণের। সাঙ্কেতিক ভাষা অর্থাৎ আকার-ইঙ্গিতে আর এটা-ওটা দেখিয়ে ভাবের আদান-প্রদান হতো মানুষ-মানুষে। এখনও অবশ্যি এই সাঙ্কেতিক ভাষার প্রয়োগ সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে। নতুন কথা যে-টা, মানুষ এক্ষণে তা নিয়ে চিন্তা করতে শিখেছে, সঙ্কেত শিক্ষার ক্ষেত্র আরও কি ভাবে ফলপ্রসূ করা যেতে পারে, সেই নিয়ে ভাবতে লেগেছে।

চাক্ষুষ শিক্ষা ব্যবস্থা বা ভিস্যুয়াল এইড পদ্ধতির আসল লক্ষ্যটি কি? শিশুমনে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে সরাসরি সুস্পষ্ট ছাপ রাখা নিঃসন্দেহে একটি মুখ্য লক্ষ্য। এক সঙ্গে অনেক কিছু মাথার ভেতর

ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া দূরে থাক, বহু ক্ষেত্রে এতে বরং খারাপ ফলই হয়। শিক্ষার নাম করে যে-ছবি বা পোষ্টারই সামনে রাখা থাক, তরুণ শিক্ষার্থীর মনে এর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, না দেখলে চলবে কেন? ছবি বা পোষ্টার শুধু আকর্ষণীয় হলেই হ'ল না, দেখতে হবে তা কতটা সহজবোধ্য ও অনায়াসগ্রাহ্য হয়েছে।

এই জিনিসগুলো সম্পর্কে এখনও বিভিন্ন দেশে দৃষ্টিভঙ্গির অভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক জায়গায় শিক্ষা সংক্রান্ত পোষ্টারগুলোকে বহুরকমের ছবি দিয়ে আর ছবিগুলোর জটিল ব্যাখ্যা জুড়ে বেশি রকম ভারাক্রান্ত করে তোলার চেষ্টা হয়। ফলে কি দাঁড়ায়—শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়—শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের মনে বলতে গেলে কোন ছাপই পড়ে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পোষ্টার দেখানোর পর তাদের যদি প্রশ্ন করা হলো—কি দেখেছে আর যা দেখলো, মনে রাখতে পেরেছে কতটুকু, একরূপ নিরুত্তর থাকে তারা। সেজন্যেই আলোচ্য শিক্ষা পদ্ধতি বা ব্যবস্থার কিছুটা রদবদল চাই, সমগ্র কাজটি হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক।

অগ্রসর দেশগুলোতে এই নিয়ে চিন্তা-আলোচনা দীর্ঘ দিন থেকেই চলেছে। এই ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে বৃটেনের উৎসাহ ও তৎপরতা অনেকটা বেশি। লণ্ডনের ওভারসীজ ভিস্যুয়াল এইড সেণ্টার ('ও, ভি, এ, সি') একটি বড় কাজ করে চলেছেন—বিদেশ থেকে যারা বিলেতে আসছে, ভিস্যুয়াল এইডের পদ্ধতি মূলতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া। 'ওরাল এইড' বা মুখে মুখে শিখানোর পদ্ধতিটিও এখন একই সঙ্গে মেলানো হয়েছে।

লণ্ডনের 'ওভারসীজ ভিস্যুয়াল এইড সেণ্টারটি' মূলতঃ দুইটি কোর্স অনুসরণ করছেন—একটি স্বল্পমেয়াদী ও একটি দীর্ঘমেয়াদী। মাত্র দুই বছর সময়ের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী এই কোর্সগুলোতে শিক্ষালাভ করেছে। এতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক, নার্স, সরকারী কর্মচারী কিংবা ফ্যাক্টরী ম্যানেজার নিজ দেশে বসে প্রয়োজন-মত নিজের 'ভিস্যুয়াল এইড' নিজেই নির্মাণ করে নিতে পারছেন।

চাক্ষুষ শিক্ষাদান শুধু এক ভাবে নয়, নানা ভাবেই হতে পারে—তবে পদ্ধতিসমূহ নিয়ে নিবিড় গবেষণা দরকার। যে কোন জাতীয় সরকারের পক্ষেই এই বিষয়ে উৎসাহ যোগান সমীচীন বলে গণ্য হবে। ভারতে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার যেখানে প্রয়োজন, সেখানে এই পদ্ধতি কিংবা অপর সুচিন্তিত ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে অনুসরণ না করলে নয়। শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের মতে সাউণ্ড ফিল্ম প্রোজেক্টরের সাহায্যেও এই চাক্ষুষ শিক্ষাদানের কাজ চলতে পারে। কিন্তু উপকরণটি বেশ ব্যয়বহুল (২৫০ পাউণ্ড বা ৩,৩৩৩্ টাকা) আর তারই জন্যে অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এর ব্যবহার সম্ভবপর না-ও হতে পারে। ওয়াল চার্টের ব্যবহার ব্যাপক চালু করেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে সুফল কিছুটা মিলবেই।

যতদূর জানতে পারা যায়—'ভিস্যুয়াল এইড' বা চাক্ষুষ শিক্ষাদান পদ্ধতিটি নতুন উন্নতিশীল দেশগুলোতে ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছেই। কমছে ঠিক নয়। শ্রমশিল্প বা কৃষি কর্তৃপক্ষ ছাড়াও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষকরা ভিস্যুয়াল এইড সাহায্যে শিক্ষাদানের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন। মোটের ওপর, আলোচ্য শিক্ষাপদ্ধতি এক্ষণে সমর্থন পাচ্ছে নানা মহল থেকে, যা সত্যি একটি শুভ লক্ষণ।

## টেলিপ্রিণ্টার উৎপাদন

বিজ্ঞানের মস্ত জয়যাত্রার যুগ চলেছে এখন। আজকের দিনে কোন দেশই গতানুগতিকতাকে আঁকড়ে ধরে পিছনে পড়ে থাকতে চাইছে না। স্বাধীনোত্তর ভারতও নানা দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে উদ্যম দেখাচ্ছে। এই উদ্যম-তালিকার মধ্যে টেলিপ্রিণ্টার উৎপাদন অন্যতম বলা যায়।

এ যুগে তারবার্তা যোগাযোগের ক্ষেত্রে টেলিপ্রিণ্টারের গুরুত্ব অপরিসীম, এ বলবার অপেক্ষা রাখে না। এর সাহায্য না পেলে বিশ্বের সংবাদ সংবাদপত্র মারফৎ এতটা দ্রুত পরিবেশিত হতে পারত কি? ভারত সরকার টেলিপ্রিণ্টারের প্রয়োজনীয়তা যে আজ কত বেশি, তা ভালোরকম উপলব্ধি করেই দেশের অভ্যন্তরে এই যন্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন। টেলিপ্রিণ্টার উৎপাদনের প্রথম সরকারী সংস্থা স্থাপিত হয়েছে মাদ্রাজে—নাম হিন্দুস্থান টেলিপ্রিণ্টার লিঃ। মোট তিন কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে এর সূচনা ঘটে, কিন্তু এখনও সংস্থাটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক বাকী।

অবশ্যি, ভারতে টেলিপ্রিণ্টার উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে, দিন দিন উৎপাদন সম্প্রসারিত করবারও ব্যবস্থা হচ্ছে। একটি সরকারী হিসাব আভ্যন্তরীণ উদ্যমের ফলস্বরূপ গত বছর জুন মাস অবধি টেলিপ্রিণ্টার নির্মিত হয়েছে ৭০টি। আলোচ্য বর্ষের সূচনাকাল মধ্যে আরও প্রায় ১০০টি টেলিপ্রিণ্টার উৎপাদিত হয়েছে বলে জানা যায়। এ কথা ঠিক, এখনও বিদেশ থেকে আমদানীকৃত যন্ত্রাংশ সংযোজন করে এখানে পূর্ণাঙ্গ টেলিপ্রিণ্টার তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী যাতে না হয়, জাতীয় সরকার সে ভাবেই পরিকল্পনা করেছেন।

সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে মাদ্রাজের গুইণ্ডি নামক স্থানে ৩৫ একর জমিতে হিন্দুস্থান টেলিপ্রিণ্টার-এর প্রধান কারখানাটি স্থাপিত হবে। প্রস্তাবিত এই কারখানার কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে, কাজটি নিশ্চয়ই উৎসাহসূচক। এক একটি টেলিপ্রিণ্টার যন্ত্রে যন্ত্রাংশ থাকে মোট ২,৫০০টি। আশা করা হচ্ছে যে, ১৯৬৫ সাল মধ্যে ঐ গুলোর সবই ভারতে নির্মিত হতে পারবে। সরকার যতটা দাবী রাখছেন—১৯৬২-৬৩ সালে মাদ্রাজের আলোচ্য কারখানায় টেলিপ্রিণ্টার তৈরী হবে ৮৫০টি। অপরদিকে ১৯৬৩ সালের শেষাশেষি কারখানাটিতে বছরে টেলিপ্রিণ্টার উৎপন্ন হবে ১২০০টি করে। শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে—ঐ সময় (১৯৬৩) মধ্যে ঐ সকল যন্ত্রের শতকরা ৭৮ ভাগ যন্ত্রাংশই এখানে নির্মিত হবে।

ভারতে টেলিপ্রিণ্টার উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে সরকার ১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে ইটালীর প্রতিষ্ঠান মেসার্স ওলিভেত্তীর সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ঐ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেয়েই এই বিরাট পরিকল্পনার রূপায়নের প্রয়াস চলেছে। প্রস্তাবিত বৃহৎ কারখানাটি গড়ে উঠলে এখনকার চলতি মডেলের পরিবর্তে চলমান বাস্কেট'ধরণের টেলিপ্রিণ্টার নির্মিত হবে বলে জানা যায়। বর্তমান টেলিপ্রিণ্টারগুলোর দিকে তাকালেই দেখা যাবে, কাগজসহ ক্যারেজ হরদম যাতায়াত করছে, উন্নততর নতুন ধরণের টেলিপ্রিণ্টারে তা হবে না। তারবার্তা চলাচল ক্ষেত্রে ভারত অদূর ভবিষ্যতেই টেলিপ্রিণ্টারের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে পারবে, এ কিছু অতিরিক্ত আশা নয়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২০

শুধু সুলতানকুঠিতে নয়, ধীরাপদ সর্বত্রই একটা অনাগত বিপর্যয়ের ছায়া দেখছে।

বড়সাহেবের বাড়িতে অসন্তোষ, চারুদির বাড়িতে অসন্তোষ, কারখানায় অসন্তোষ, এমন কি ধীরাপদর মগজের মধ্যেও কি এক অসন্তোষের বাষ্প জমাট বাঁধছে। কেবলই মনে হয় এই সবগুলি অসন্তোষের ধারা কোথাও এসে মিলবে, তার খরবেগে তখন অনেক কিছুই তলিয়ে যাবে।

অর্গানিজেশন-চীফ সিতাংশু মিত্র অর্গ্যানিজেশনে মেতেছে। প্রেম-দেউলে পুরুষ অনেক সময় নেশাসক্ত হয় নাকি। ছোট-সাহেবকে সংগঠনের নেশায় পেয়েছে। দুর্বলের দাপটে ভয়ের থেকেও অস্বস্তি বেশি। ঘরের সবুজ আলোয় একজনের কোলে তার মুখ-থুবড়নো দুর্বল চেহারাটা ধীরাপদর দেখা আছে। কিন্তু লাবণ্য সরকার প্রকাশ্যে আগের থেকেও আরো অনেক কম জাহির করে নিজেকে। একেবারে নিজস্ব আওতার কিছু না হলে কোনো কাগজপত্রে তার মন্তব্য বা সই সাবুদও দেখা যায় না বড়। তবু ধীরাপদর ধারণা, যে-কারণে মহিলা একজনকে মন দেওয়া সত্ত্বেও আর একজনকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে এতকাল, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই কারণটা আরো জটিল বই সরল হয়নি।

বহুদিন আগে অফিসের কাজে লাবণ্যকে নিয়ে সিতাংশু একবার বোম্বাই গিয়েছিল। ফলে, বড়সাহেব বিরূপ হয়েছিলেন, অমিতাভ ক্ষেপে উঠেছিল। সম্প্রতি একজন সমুদ্র-পারে আর একজন কাছে থেকেও অনেক দূরে। কিন্তু খুব কাছে তৃতীয় একজন আছে। একই উপলক্ষে এবারে আর এক বৈচিত্র্যের সম্মুখী হল ধীরাপদ।

রাতে মানুকে এসে কথায় কথায় জানালো, বউরাণীর মাথা-টাথা ধরে থাকবে, ওষুধের দোকানে ফোন করে মেম-ডাক্তারের খোঁজ করছিলেন। মেম-ডাক্তার আসছেন হয়ত···

মন বলে বস্তুটাকে ধীরাপদ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, কিন্তু এরা এক-একটা নাড়াচাড়া দিয়ে সজাগ করবেই। ধীরাপদ জানে মেম-ডাক্তার আসবে না। সকালের প্লেনেই তারা বোম্বাই পৌঁছে গেছে। আসতে আসতে কাল বিকেল। ভালো ভালো, এতদিনের মধ্যে দিন বুঝে সময় বুঝে বউরাণীর তা'হলে আজই মাথা ধরেছিল! ধরতেই পারে, দেহ-যন্ত্রের সারথি এই মাথাটা কম ব্যাপার নয়।

পরদিন সকালে চায়ের অপেক্ষায় বসেছিল, নির্লিপ্ত-বদন মানুকে খালি হাতে এসে খবর দিল, বউরাণী আপনাকে ওপরে গিয়ে চা খেতে বললেন।

বউরাণীর মাথার আওতায় নিজেও পড়তে পারে ভাবেনি। শুনে ধীরাপদ খুব স্বস্তিবোধ করল না। বউরাণীর তলব এই প্রথম। এ-যাবত আড়াল থেকে তার একটু-আধটু যত্ন-আত্তির আভাস পেয়েছে।

বড় সাহেবের ঘরে টিপয়ে চায়ের সরঞ্জাম রেখে অপেক্ষা করছিল। মাথার কাপড়টা খোঁপার ওপর নেমে এসেছিল, একটু তুলে দিয়ে তাকালো। সলাজ মিষ্টি অভিব্যক্তি, আপনাকে ওপরে ডেকে বিরক্ত করলাম···বসুন।

সঙ্কোচ নেই বটে, কিন্তু ঘরের বউয়ের সহজাত নম্রতাটুকু সুশোভন। টিপয়ের সামনের চেয়ারটায় বসে ধীরাপদ সহজ ভাবেই বলল, না, বিরক্তি কিসের।

খাবারের ডিশটা এগিয়ে দিয়ে বউরাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা করতে লাগল। এই অভ্যর্থনার পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য ধীরাপদ অনুভব করছে। কি ভেবে সে নিজেই জিজ্ঞাসা করে বসল, কাল রাতে আপনি অসুস্থবোধ করছিলেন নাকি?

হাত থামল, মুখ তুলল—পলকের বিড়ম্বনা। তারপরেই প্রশ্নের হেতু বুঝল। দুই ভুরুর মাঝে ওই চকিত কুঞ্চনের আভাস মানুকের প্রতি বিরক্তিসূচক হয়ত।

না···। চা করা শেষ হতে জিজ্ঞাসা করল, দেব?

ধীরাপদ ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি ঢেলে নেব'খন, আপনি বসুন।

একটু সরে গিয়ে খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল সে, বসল না। বলল, আমাকে তুমি বলবেন, আমার নাম আরতি।

নাম জানে, কিন্তু প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত। এ-বাড়িতে বড় সাহেব ধীরাপদকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বটে, কিন্তু এতটা করেছেন নিজেও জানত না। এর পর আরো সহজ হওয়ার কথা, কিন্তু কেন জানি বিপরীত হল। হাসতে চেষ্টা করে শূন্য পেয়ালাটা কাছে টেনে নিল।

আরতি এগিয়ে এসে পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে আবার খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল। ধীরাপদর এও ভালো লাগল, মিষ্টি লাগল, অথচ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। শিখার মত সেজেগুজে মানুকেকে বাহন

যে-মেয়ে স্বামীর ফ্যাক্টরী দেখতে যায়, এই আটপৌরে বেশবাস মিষ্টি সৌজন্যের মধ্যেও সেই মেয়েই উকিঝুঁকি দিচ্ছে।
'মাস হল আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখছি, কারখানার কাজ বেড়ে বুঝি?
।···অন্য একটা ঝামেলা নিয়ে আছি। ফ্যাক্টরীর কিছু না—
কাল সকালে উনি বম্বে চলে গেলেন, পরে শুনলাম লাবণ্য দেবীও ।···খুব জরুরী কিছু ব্যাপার বোধ হয়?
য-মেয়ে উকিঝুঁকি দিচ্ছিল নির্দ্বিধায় তার সামনেও সে এতটাই হয়ে উঠতে পারে ধীরাপদ ভাবেনি। অথচ বলার ধরনে তির্যক স মাত্র নেই, যেন খবর করার মত সহজ সরল প্রশ্নই শুধু একটা। ঠিক জানিনে···।
ই এক মুহূর্তের বিনয়-নম্র প্রতীক্ষা, কিন্তু ধীরাপদ চায়ের লা মুখে তুলেছে।
শুর মশাই যে-ভাবে বলেন, মনে হয় কারবারের মাথা বলতে আপনি। এঁরা কেন গেলেন আপনি জানেনও না?
ধীরাপদ নিরুত্তর, চায়ের পেয়ালা নামায়নি। আরতির সৌজন্যে খেকে দেখল না, পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মত লেগে। শ্রদ্ধেয় জনের সঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারেই কথা কইছে, কিন্তু সে-ও র বাড়ির বউ, জিজ্ঞাসা যা করছে তার যথাযথ উত্তর সে প্রত্যাশা মনে হল।
একটু থেমে ঘুরিয়ে সেই গোড়ার প্রশ্নেরই পুনরুক্তি করল, নও দিন-রাতের খাটুনি দেখছি, বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ারও হয় না···কারখানার কাজের চাপ এখন খুব বেশি নাকি?
পেয়ালা নামালো। সহজভাবেই বলল, নিজে সব-দিক দেখাশুনা নে তাই চাপ একটু বেশিই পড়েছে।
আরতি আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, কিন্তু এর পরেও একটা জিজ্ঞাসা তার চোখে লেগে ছিল। সিতাংশু একা সবদিক শুনা করছে না, সঙ্গে একজন আছেন···তিনি কতটা আছেন? একসঙ্গে বম্বে যাওয়ার মত সত্যিই কিছু জরুরী কাজ ছিল কিনা সেটুকু জানাই বোধ হয় আসল উদ্দেশ্য ছিল তার। র অজ্ঞাতে ধীরাপদ তার জবাবও দিয়ে ফেলেছে! সে জানে না ই তেমন গুরুতর প্রয়োজন কিছু ছিল না। অন্তত আরতি ধরে নিয়েছে। কিন্তু ধীরাপদ সত্যিই সঠিক জানত না। হয়ত লস অর্গানিজেশানেই গেছে সিতাংশু। বোম্বাই মস্ত মার্কেট। ডাক্তার থাকলে সুবিধেও হয়ই। লাবণ্যর মত ডাক্তার থাকলে ক গুণ বেশিই সুবিধে হয়।
ভিতরে ভিতরে মেয়েটার ভাল-মতই মানসিক দুর্ভোগ শুরু ছ।···বড় বেশি স্পষ্ট মেয়েটা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কম। কিন্তু বেশ মেয়ে, পদ খুশী হয়েছে। অফিসের পরিবেশে সিতাংশু এমনিতেই , পরের কয়েকটা দিন আরো একটু বেশি গম্ভীর মনে হয়েছে । তার বোম্বাই সফরের স্টেটমেন্টে দেখা গেছে, বছরে বিশ পঁচিশ হাজার টাকার ব্যবসা বাড়ার সম্ভাবনা।
কিন্তু বাড়ীর অন্দরমহলের জের কোথায় এসে ঠেকল সে-সম্বন্ধে কর মুখ থেকেও কিছু আভাস পাওয়া গেল না। সে জানলে কানে আসতই। সে-দিন শরীর অসুস্থ হয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা ধীরাপদই হয়ত বোকার মত সতর্ক করে দিয়েছে মেয়েটাকে।

গণুদার কেসটা প্রথম কোর্টেই ঝুলছে তখনো, তাই আগের মত অতটা নিষ্ক্রিয় ভাবনা-চিন্তার অবকাশ ছিল না। তবু এরই ফাঁকে ব্যক্তিগত ভাবনাটা বক্র গতি নিয়েছে। নিভৃতে এই ভাবনাটা লালন করতে ভালো লাগছে ধীরাপদর। সেই ভাবনা লাবণ্য সরকারকে ঘিরে।···সব ক'টা জটিল আবর্তের মূলে সে, তাকে কেন্দ্র করেই যা-কিছু। মাটির তলা থেকে গাছের শিকড়সুদ্ধু উপড়ে নেওয়ার মত এই একজনকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সরিয়ে আনতে পারলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বোধ হয়।··চারুদি ছেলে পায়, পার্বতী আরো বেশি কিছু। গ্লানি-মুক্ত বাতাসে একটি শিশুর আবির্ভাব ঘটতে পারে। আরতির মাথা ধরা ছেড়ে যেতে পারে, সুস্থ সম্পদে ভরে উঠতে পারে মেয়েটা। আরো অনেক দিকে অনেক কিছু হতে পারে···। ধীরাপদ কি এই সঙ্কল্প নেবে? পুরুষের সঙ্কল্প? আরতির মুখ, চারুদির মুখ, পার্বতীর মুখ, এমন কি যে জাতক এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি সেই মুখের হাসিটুকুরও যেন তার এই সঙ্কল্পের সঙ্গে যোগ।

কিন্তু নিজের ভিতরটাই এক প্রস্থ কুয়াশায় ছাওয়া। অন্তস্তলের নিভৃতচারীকে দেখার ভয়ে সেই কুয়াশাও নিজেই পুষছে। লাবণ্যকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সরিয়ে আনা মানে কর্মস্থল থেকে তাকে বিচ্যুত করা নয়। তার ভগ্নিপতির বাসনার ইন্ধন যুগিয়ে বড় ডাক্তার হয়ে আসার জন্যে তাকে বিলেত পাঠানও নয়। দুটোর একটার সঙ্গেও আপস করতে পারে না। তাহলে আর কি ভাবে সরিয়ে আনবে? সঙ্কল্প নেবে কেমন করে?

রমেন হালদারের চাকরি গেল।

খুব সঙ্গত কারণেই গেল। আগে হলে কেসটা ধীরাপদর কাছেই আসত। তা আসে নি। বরখাস্তের নোটিস সিতাংশু সই করেছে। কিন্তু ধীরাপদর কাছে এলে সেও একই নিষ্পত্তি করত। রমেন হালদারের চাকরি যেত।

চুরি ধরা পড়েছে। দোকানের ওষুধ সরিয়ে অন্য দোকানে সস্তায় চালান দিচ্ছিল। কতদিন ধরে এ-কাজ শুরু হয়েছে সঠিক জানা যায়নি। অন্য দোকান থেকে সস্তায় সেই ওষুধ কিনে একজন মুখচেনা খদ্দের ম্যানেজারকে চোখ রাঙাতে এসেছিল—এই দোকানে দাম এত বেশি নেওয়া হয় কেন?

ওষুধের প্যাকেট হাতে করে ম্যানেজার হতভম্ব, প্যাকেটে এই দোকানের সাঙ্কেতিক দাগ। ভুলবশতঃই হোক বা ওষুধ নিয়ে কেউ যাচাই করতে আসতে পারে না ভাবার দরুনই হোক, পেন্সিলের দাগটা তোলা হয়নি। ম্যানেজার প্যাকেট হাতছাড়া করেননি। চুরির ব্যাপারে কেউ গণ্ডগোল পছন্দ করে না। ম্যানেজার প্যাকেটসহ সেই দোকানে গিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলার উপক্রম করতেই তারা সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে। তারা জানে ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া ওষুধ, কত ডাক্তার কত-রকমে কত ওষুধ সংগ্রহ করে। তারা সস্তায় পেয়েছে, কিনেছে।

ম্যানেজার লাবণ্য সরকারকে জানিয়েছেন। সে তাঁর লিখিত রিপোর্ট আদায় করে সিতাংশুকে দিয়েছে। তারপর সেই রিপোর্টসহ বরখাস্তের কপি ধীরাপদর কাছে এসেছে। শুধু তাই নয়, ম্যানেজারের মৌখিক অভিযোগের দরুন কাঞ্চনকেও আপাতত সাসপেণ্ড করা হয়েছে। তার চাকরি থাকবে কি থাকবে না সেটা বিবেচনা সাপেক্ষ।

ধীরাপদ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিল। তিনি সেই পুরানো কথাই বলেছেন। সেই সঙ্গে একটা নতুন কথাও।

রমেনের চুরি হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। তবু একেবারে চাকরি যাক সেটা তিনি চাননি। কয়েক বছর আগেও এ-রকম একটা কেস হয়েছিল। হাতে পায়ে ধরতে বড়সাহেব সেই লোকটিকে ক্ষমা করেছিলেন। এ-কথা তিনি মিস সরকারকে জানিয়েছিলেন, চাকরিটা যাতে থাকে সেই অনুরোধও করেছিলেন। ছেলেটাকে সকলেই ভালবাসে, লোভে পড়ে করেছে। ম্যানেজারের আসল রাগ কাঞ্চনের ওপর, তাঁর বিশ্বাস ওই মেয়েটার জন্যেই এই কাণ্ড করেছে সে—তাকে টাকা পয়সাও দেয় হয়ত যার দরুন নিজের খরচ চালাতে পারে না। ওই মেয়েটার ফাঁদে পা দিয়েই লোভের ফাঁদে পা দিয়েছে সে। ম্যানেজার জানালেন, মিস সরকার কোনো কথা কানে তোলেননি। কিছুদিন ধরেই তিনি ছোকরার ওপর বিষম তেতে ছিলেন। তাঁর ধারণা, রমেন মিস সরকারের এক আত্মীয়ের কাছে তাঁর নামে কিছু বলেছে। মিস সরকার নিজেই একদিন ম্যানেজারকে ঘরে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর আত্মীয়টি দোকানে এলে কার সঙ্গে কথা-বার্তা হয়—শুধু রমেনের সঙ্গেই কিনা।

বাড়ি ফিরে ঘরের আবছা অন্ধকারে অস্ফুট শব্দ করে ধীরাপদ আঁতকে উঠেছিল একেবারে। তারপরেই স্থির, নিশ্চল। দু'পা আঁকড়ে ধরে পায়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে কাঞ্চন। বিকেলেই এসেছিল হয়ত, মানুকেই এ-ঘরে এনে বসিয়ে থাকবে, তারপর খেয়াল করে আর আলো জেলে দিয়ে যায়নি।

আজ ধীরাপদর একটুও মায়া হল না, একটুও মমতা বোধ করল না। ম্যানেজারের মতই একটা হাসি-খুশি ভালো ছেলের অধঃপতনের মূলে এই মেয়েটাকেই দেখছে সে-ও।...রমেনের বিধবা মা আছে শুনেছিল, বড় ভাইটা পাগল, আরো একটা নাবালক ভাই আছে।

ওঠো!

উঠল না।

ওঠো—! কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ, আরো কঠিন।

এইবার উঠল।

ধীরাপদ ঘরের আলো জ্বালল, চেয়ারটা টেনে বসতে দিল, তারপর মুখের দিকে না চেয়ে বলল, তোমাদের কোনো ব্যাপারে আমি নেই, এখানে এসেছ কেন? কে বলেছে এখানে আসতে?

কাঞ্চন মাথা নাড়ল। কেউ বলেনি।

আমার কাছে কেন এসেছ?

এসেছে কিছু বলতে। ধীরাপদ শুনতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু বাধা দেবার আগে যে ক'টা কথা বলল তারপর আর বাধা দেওয়া গেল না। ঠিক এই কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

কাঞ্চন নিজের জন্যে দয়া ভিক্ষা করতে আসেনি, ও দয়ার যোগ্য নয় জানে। তার বাঁচার দাবি অনেক আগেই ফুরিয়েছিল, এই বাঁচাটুকুই অনেক বাড়তি। কিন্তু রমেনের কোনো দোষ নেই, সব দোষ ওর, দাদা দয়া করে তাকে বাঁচান। সে লোভে পড়ে এই কাজ করেছে, ওকে নিয়ে আলাদা দোকান করার আশায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছিল। কাঞ্চন না থাকলে সে এসব কিছুই করত না, এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠার জন্যে পাগল হত না। একটি একটি করে পয়সা জমাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু অভাবের তাড়নায় তাও না পেরে শেষে এই কাজ করেছে। চাকরি গেলে রমেনের আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না, দাদা তাকে রক্ষা করুন, ওর চাকরিটা নিয়ে তার চাকরিটা রাখুন।

বলতে বলতে আবারও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তাকে কোনরকম আশ্বাস না দিয়ে বিদায় করার পরেও একটা দৃশ্য ধীরাপদ কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছিল না। একদিন না একদিন নিজস্ব একটা দোকান হওয়ার সম্ভাবনায় ছেলেটার সেই আশা-জ্বলজ্বলে মুখখানা। তার দোকানে ধীরাপদকে নেবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে আশার আলোটা চতুর্গুণ হয়েছিল, কিন্তু লজ্জায় ভেঙে পড়ে বলেছিল, যাঃ, ঠাট্টা করছেন।

পরদিন কোম্পানীর ষ্টেশান ওয়াগনে বাড়ি ফিরছিল, ধীরাপদর চোখ দুটো একটা শুকনো বিবর্ণ পাংশু মুখের ওপর ধাক্কা খেয়ে অন্যদিকে ফিরল। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিল না। থামালেই বরং ড্রাইভার ধমক খেত। ফটক থেকে খানিকটা দূরে রমেন দাঁড়িয়েছিল। কার প্রতীক্ষায় তাও জানে। কাতর দৃষ্টিটা মুহূর্তের মধ্যেই বিঁধিয়ে দিতে পেরেছিল, কিন্তু ফল হয়নি।

পরদিন অফিসেই এলো। তার ঘরে। ধীরাপদ মুখ তুলতেই তার চেয়ারটার দিকে এগোলো সে।

দাঁড়াও!

রমেন দাঁড়িয়ে পড়ল। শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট দুটো ঘষে নিল একবার।

ল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল ধীরাপদ, যাও—।

সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আগুন অল মাথায়, কণ্ঠে বলল, চোরের জন্যে আমি কোনো সুপারিশ করিনে, ন থেকে, নইলে দরোয়ান ডাকব।

ন তবু দাঁড়িয়ে। তবু কিছু বলতে চায়। ধীরাপদ চেয়ারসুদ্ধ ঘুরল তার দিকে। এরা বুঝি পাগলই করে দেবে কিন্তু আর কিছু বলার অবকাশ হল না। দরকারও হল না। লে লাবণ্য ঘরে ঢুকল।

ন চলে গেল।

ণ্যর আসার কারণ বোঝা গেল। কোনো রকম ভনিতা না সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, আপনি এই ছেলেটাকে প্রশ্রয় দেন

রাপদ চেয়ারটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নিল। শান্ত, সংযত।— য় দিতে দেখলেন ?

এখানে আসে কোন্ সাহসে? ওকে কারবারের ত্রিসীমানায় বারণ করে দেওয়া হয়েছে।

র দিকে সরাসরি চেয়ে এখন আর কথা বলতে সঙ্কোচ বে না ধীরাপদ।—ওকে বরখাস্ত করেও ওর ওপর আপনাদের য়নি দেখছি। কেন?

ঠিন কিছু একটা বলার প্রস্তুতিই শুধু দেখা গেল, কি বলবে না। তেমনি ধীরে সুস্থে ধীরাপদ আবার বলল, চুরি ছেড়ে খুন করলেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না আপনাকে কে বলল?···রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে, ওর আসাই স্বাভাবিক।

কে বললে বন্ধ হয়েছে? রোজগারের অনেক পথ জানা আছে ওর, এখানে না এসে সেই চেষ্টা করতে বলুন গে।

তপ্ত জবাব ছুঁড়ে প্রস্থান করল। ধীরাপদর মনে হল লাবণ্যর অসহিষ্ণুতা একটু বেড়েছে।··ছোটসাহেবের জোরে জোর বেড়েছে হয়ত। কাজে মন দিতে চেষ্টা করত, কিন্তু লাবণ্যর শেষের উক্তি বাধা সৃষ্টি করছে। ম্যানেজারের কথাগুলো মনে পড়ছে।··ভগ্নিপতি সর্বেশ্বর বাবুটিকে মনে পড়ছে। রমেনের রোজগারের আর কি পথ জানা আছে?··ছিল হয়ত, এখন সে-পথও বন্ধ।

কি ভেবে সেই বিকেলেই ধীরাপদ ভগ্নিপতির বাড়ি এসে হাজির। লাবণ্যর সঙ্গেই একদিন এসেছিল, আবার আসার জন্ত ভদ্রলোক অনেক করে বলে দিয়েছিলেন। যাওয়ার কৈফিয়ত আছে।

সেই বাড়ি, ঘর। দেয়ালের খোপে লাল গণেশ মূর্তি, রেকাবীতে শুকনো বাতাসা। দেয়ালে কড়ি-গাঁথা গোবর-ছাপ। পুরনো বই-ঠাসা তাক, সেগুলোর মাঝে মাঝে একটা দুটো চক-চকে নতুন বই। সর্বেশ্বরবাবুর বড় মেয়ে তাকে বসিয়ে বাবাকে খবর দিতে গেল। ধীরাপদ আজও বেছে বেছে রমণী পণ্ডিতের বই ক'খানাই টেনে নিল। সেদিন ছিল একখানা, এখন আরো দু'খানা চটি বই হয়েছে। এই বই দু'খানারও সর্বস্বত্ব দে-বাবুর। বই অজস্র বিক্রি হলেও দে-বাবুর লেখকরা টাকার মুখ দেখেন না।

রমেন হালদারের চাকরি গেল।

খুব সঙ্গত কারণেই গেল। আগে হলে কেসটা ধীরাপদর কাছেই আসত। তা আসে নি। বরখাস্তের নোটিস সিতাংশু সই করেছে। কিন্তু ধীরাপদর কাছে এলে সেও একই নিষ্পত্তি করত। রমেন হালদারের চাকরি যেত।

চুরি ধরা পড়েছে। দোকানের ওষুধ সরিয়ে অন্য দোকানে সস্তায় চালান দিচ্ছিল। কতদিন ধরে এ-কাজ শুরু হয়েছে সঠিক জানা যায়নি। অন্য দোকান থেকে সস্তায় সেই ওষুধ কিনে একজন মুখচেনা খদ্দের ম্যানেজারকে চোখ রাঙাতে এসেছিল—এই দোকানে দাম এত বেশি নেওয়া হয় কেন ?

ওষুধের প্যাকেট হাতে করে ম্যানেজার হতভম্ব, প্যাকেটে এই দোকানের সাংকেতিক দাগ। ভুলবশতঃই হোক বা ওষুধ নিয়ে কেউ যাচাই করতে আসতে পারে না ভাবার দরুনই হোক, পেন্সিলের দাগটা তোলা হয়নি। ম্যানেজার প্যাকেট হাতছাড়া করেননি। চুরির ব্যাপারে কেউ গণ্ডগোল পছন্দ করে না। ম্যানেজার প্যাকেটসহ সেই দোকানে গিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলার উপক্রম করতেই তারা সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে। তারা জানে ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া ওষুধ, কত ডাক্তার কত-রকমে কত ওষুধ সংগ্রহ করে। তারা সস্তায় পেয়েছে, কিনেছে।

ম্যানেজার লাবণ্য সরকারকে জানিয়েছেন। সে তাঁর লিখিত রিপোর্ট আদায় করে সিতাংশুকে দিয়েছে। তারপর সেই রিপোর্টসহ বরখাস্তের কপি ধীরাপদর কাছে এসেছে। শুধু তাই নয়, ম্যানেজারের মৌখিক অভিযোগের দরুন কাঞ্চনকেও আপাতত সাসপেণ্ড করা হয়েছে। তার চাকরি থাকবে কি থাকবে না সেটা বিবেচনা সাপেক্ষ।

ধীরাপদ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিল। তিনি সেই পুরানো কথাই বলেছেন। সেই সঙ্গে একটা নতুন কথাও।

রমেনের চুরি হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। তবু একেবারে চাকরি যাক সেটা তিনি চাননি। কয়েক বছর আগেও এ-রকম একটা কেস হয়েছিল। হাতে পায়ে ধরতে বড়সাহেব সেই লোকটিকে ক্ষমা করেছিলেন। এ-কথা তিনি মিস সরকারকে জানিয়েছিলেন, চাকরিটা যাতে থাকে সেই অনুরোধও করেছিলেন। ছেলেটাকে সকলেই ভালবাসে, লোভে পড়ে করেছে। ম্যানেজারের আসল রাগ কাঞ্চনের ওপর, তাঁর বিশ্বাস ওই মেয়েটার জন্যেই এই কাণ্ড করেছে সে—তাকে টাকা পয়সাও দেয় হয়ত যার দরুন নিজের খরচ চালাতে পারে না। ওই মেয়েটার ফাঁদে পা দিয়েই লোভের ফাঁদে পা দিয়েছে সে। ম্যানেজার জানালেন, মিস সরকার কোনো কথা কানে তোলেননি। কিছুদিন ধরেই তিনি ছোকরার ওপর বিষম তেতে ছিলেন। তাঁর ধারণা, রমেন মিস সরকারের এক আত্মীয়ের কাছে তাঁর নামে কিছু বলেছে। মিস সরকার নিজেই একদিন ম্যানেজারকে ঘরে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর আত্মীয়টি দোকানে এলে কার সঙ্গে কথা-বার্তা হয়—শুধু রমেনের সঙ্গেই কিনা।

বাড়ি ফিরে ঘরের আবছা অন্ধকারে অস্ফুট শব্দ করে ধীরাপদ আঁতকে উঠেছিল একেবারে। তারপরেই স্থির, নিশ্চল। দু'পা আঁকড়ে ধরে পায়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে কাঞ্চন। বিকেলেই এসেছিল হয়ত, মানুকেই এ-ঘরে এনে বসিয়ে থাকবে, তারপর খেয়াল করে আর আলো জ্বেলে দিয়ে যায়নি।

আজ ধীরাপদর একটুও মায়া হল না, একটুও মমতা বোধ করল না। ম্যানেজারের মতই একটা হাসি-খুশি ভালো ছেলের অধঃপতনের মূলে এই মেয়েটাকেই দেখছে সে-ও।···রমেনের বিধবা মা আছে শুনেছিল, বড় ভাইটা পাগল, আরো একটা নাবালক ভাই আছে।

ওঠো!

উঠল না।

ওঠো—! কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ, আরো কঠিন।

এইবার উঠল।

ধীরাপদ ঘরের আলো জ্বালল, চেয়ারটা টেনে বসতে দিল, তারপর মুখের দিকে না চেয়ে বলল, তোমাদের কোনো ব্যাপারে আমি নেই, এখানে এসেছ কেন ? কে বলেছে এখানে আসতে ?

কাঞ্চন মাথা নাড়ল। কেউ বলেনি।

আমার কাছে কেন এসেছ ?

এসেছে কিছু বলতে। ধীরাপদ শুনতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু বাধা দেবার আগে যে ক'টা কথা বলল তারপর আর বাধা দেওয়া গেল না। ঠিক এই কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

কাঞ্চন নিজের জন্যে দয়া ভিক্ষা করতে আসেনি, ও দয়ার যোগ্য নয় জানে। তার বাঁচার দাবি অনেক আগেই ফুরিয়েছিল, এই বাঁচাটুকুই অনেক বাড়তি। কিন্তু রমেনের কোনো দোষ নেই, সব দোষ ওর, দাদা দয়া করে তাকে বাঁচান। সে লোভে পড়ে এই কাজ করেছে, ওকে নিয়ে আলাদা দোকান করার আশায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছিল। কাঞ্চন না থাকলে সে এসব কিছুই করত না, এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠার জন্যে পাগল হত না। একটি একটি করে পয়সা জমাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু অভাবের তাড়নায় তাও না পেরে শেষে এই কাজ করেছে। চাকরি গেলে রমেনের আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না, দাদা তাকে রক্ষা করুন, ওর চাকরিটা নিয়ে তার চাকরিটা রাখুন।

বলতে বলতে আবারও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তাকে কোনরকম আশ্বাস না দিয়ে বিদায় করার পরেও একটা দৃশ্য ধীরাপদ কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছিল না। একদিন না একদিন নিজস্ব একটা দোকান হওয়ার সম্ভাবনায় ছেলেটার সেই আশা-ঝলমলে মুখখানা। তার দোকানে ধীরাপদকে নেবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে আশার আলোটা চতুর্গুণ হয়েছিল, কিন্তু লজ্জায় ভেঙে পড়ে বলেছিল, যাঃ, ঠাট্টা করছেন।

পরদিন কোম্পানীর ষ্টেশান ওয়াগনে বাড়ি ফিরছিল, ধীরাপদর চোখ দুটো একটা শুকনো বিবর্ণ পাংশু মুখের ওপর ধাক্কা খেয়ে অন্যদিকে ফিরল। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিল না। থামালেই বরং ড্রাইভার ধমক খেত। ফটক থেকে খানিকটা দূরে রমেন দাঁড়িয়েছিল। কার প্রতীক্ষায় তাও জানে। কাতর দৃষ্টিটা মুহূর্তের মধ্যেই বিঁধিয়ে দিতে পেরেছিল, কিন্তু ফল হয়নি।

পরদিন অফিসেই এলো। তার ঘরে। ধীরাপদ মুখ তুলতেই তার চেয়ারটার দিকে এগোলো সে।

দাঁড়াও!

রমেন দাঁড়িয়ে পড়ল। শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট দুটো ঘষে নিল একবার।

আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল ধীরাপদ, যাও—।

তবু সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আগুন জ্বলল মাথায়, কঠোর কণ্ঠে বলল, চোরের জন্যে আমি কোনো সুপারিশ করিনে, যাও এখান থেকে, নইলে দরোয়ান ডাকব।

রমেন তবু দাঁড়িয়ে। তবু কিছু বলতে চায়। ধীরাপদ এবারে চেয়ারসুদ্ধ ঘুরল তার দিকে। এবা বুঝি পাগলই করে দেবে তাকে। কিন্তু আর কিছু বলার অবকাশ হল না। দরকারও হল না। দরজা ঠেলে লাবণ্য ঘরে ঢুকল।

রমেন চলে গেল।

লাবণ্যর আসার কারণ বোঝা গেল। কোনো রকম ভনিতা না করে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, আপনি এই ছেলেটাকে প্রশ্রয় দেন কেন?

ধীরাপদ চেয়ারটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নিল। শান্ত, সংযত।—কি প্রশ্রয় দিতে দেখলেন?

ও এখানে আসে কোন্ সাহসে? ওকে কারবারের ত্রিসীমানায় আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে।

মুখের দিকে সরাসরি চেয়ে এখন আর কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করে না ধীরাপদ।—ওকে বরখাস্ত করেও ওর ওপর আপনাদের রাগ যায়নি দেখছি। কেন?

কঠিন কিছু একটা বলার প্রস্তুতিই শুধু দেখা গেল, কি বলবে জানে না। তেমনি ধীরে সুস্থে ধীরাপদ আবার বলল, চুরি ছেড়ে খুন করলেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না আপনাকে কে বলল?···রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে, ওর আসাই স্বাভাবিক।

কে বললে বন্ধ হয়েছে? রোজগারের অনেক পথ জানা আছে ওর, এখানে না এসে সেই চেষ্টা করতে বলুন গে।

তপ্ত জবাব ছুঁড়ে প্রস্থান করল। ধীরাপদর মনে হল লাবণ্যর অসহিষ্ণুতা একটু বেড়েছে।···ছোটসাহেবের জোরে জোর বেড়েছে হয়ত। কাজে মন দিতে চেষ্টা করত, কিন্তু লাবণ্যর শেষের উক্তি বাধা সৃষ্টি করছে। ম্যানেজারের কথাগুলো মনে পড়ছে।···ভগ্নিপতি সর্বেশ্বর বাবুটিকে মনে পড়ছে। রমেনের রোজগারের আর কি পথ জানা আছে?···ছিল হয়ত, এখন সে-পথও বন্ধ।

কি ভেবে সেই বিকেলেই ধীরাপদ ভগ্নিপতির বাড়ি এসে হাজির। লাবণ্যর সঙ্গেই একদিন এসেছিল, আবার আসার জন্য ভদ্রলোক অনেক করে বলে দিয়েছিলেন। যাওয়ার কৈফিয়ত আছে।

সেই বাড়ি, ঘর। দেয়ালের খোপে লাল গণেশ মূর্তি, রেকাবীতে শুকনো বাতাসা। দেয়ালে কড়ি-গাঁথা গোবর-ছাপ। পুরনো বই-ঠাসা তাক, সেগুলোর মাঝে মাঝে একটা দুটো চক-চকে নতুন বই। সর্বেশ্বরবাবুর বড় মেয়ে তাকে বসিয়ে বাবাকে খবর দিতে গেল। ধীরাপদ আজও বেছে বেছে রমণী পণ্ডিতের বই ক'খানাই টেনে নিল। সেদিন ছিল একখানা, এখন আরো দু'খানা চটি বই হয়েছে। এই বই দু'খানারও সর্বস্বত্ব দে-বাবুর। বই অজস্র বিক্রি হলেও দে-বাবুর লেখকরা টাকার মুখ দেখেন না।

অপ্রত্যাশিত পায়ের ধুলো পড়তে সর্বেশ্বরবাবু আজও বিনয়ে গলে গলে পড়তে লাগলেন।—কম ভাগ্য তাঁর! মহৎ জন কথা দিয়ে গিয়েছিলেন আসবেন, সত্যিই এলেন—একি সোজা সৌভাগ্য! এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বাড়ি দেখে মনে পড়ে গেল? এ-ও ভাগ্য ছাড়া আর কি! সেই সৌভাগ্যই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দশ-মুখে ঘোষণা করতে লাগলেন তিনি।—বসুন বসুন, না এখানেই বা বসবেন কেন, একেবারে ভিতরেই চলুন, আপনি বাইরের ঘরে বসবেন কেন।

তার আগেই ধীরাপদ বসে পড়েছে এবং এখানেই ভালো লাগছে তার। কুশল-প্রশ্ন বিনিময়ের পর সর্বেশ্বরবাবু ঘর ছেড়ে বেরুবার উদ্যোগ করতে ধীরাপদ বাধা দিল। ভয়ানক অসুস্থ সে, জলটুকুও মুখে দেবার উপায় নেই, সে-জন্যে পীড়াপীড়ি করলে, তাকে এক্ষুনি উঠতে হবে। ভদ্রলোকের ফরসা মুখ বিষন্ন হয়ে উঠল, সে-দিনও ব্রাহ্মণ শুধু-মুখে গিয়েছিলেন আজও তাই। সবই ভাগ্য, এত অসুস্থ যখন তিনি আর পীড়াপীড়ি করেন কি করে।

বই ক'টার দিকে চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সলজ্জ উৎসাহ, আজও এই-সব বই-ই বার করেছেন, আপনার নিশ্চয় চর্চা আছে কিছু। নেই?···তাহলে পড়তে ভালো লাগে বুঝি? লাগবেই তো। ভদ্রলোকের লেখার ক্ষমতা আছে—জলের মত সরল মনে হয় সব, পড়লেই বোঝা যায় মস্ত গুণী মানুষ। হঠাৎ দ্বিগুণ আগ্রহ, আচ্ছা, এই ভদ্রলোককে একবার পাওয়া যায় না? আমার কিছু ক্রিয়া-কর্ম করানোর 'ছিল নিজের আর ছেলে-পুলের কুষ্ঠিগুলোও দেখাতাম।···এ-সব লোক কারো বাড়ি টাড়ি আসেন না, না?

বইয়ের দোকানে লিখুন।

লিখব কি, আমি নিজেই গিয়েছিলাম। তারা আরো এক-গাদা আজে-বাজে বই গছালে কিন্তু ঠিকানা দিলে না। মহাপুরুষ ব্যক্তি···নিষেধ-টিষেধ আছে বোধ হয়। ঠিকানা পেলেই তো লোক গিয়ে হামলা করবে।

ঠিকানা না পেয়েই ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা আরো অনেক গুণ বেড়েছে, রমণী পণ্ডিতকে মহাপুরুষ ঠাওরেছেন। প্রয়োজনে দে-বাবুও মহাপুরুষ বানিয়ে থাকতে পারেন তাঁকে।

অন্যান্য দু'পাঁচ কথার পর প্রশংসাটা ধীরাপদর দিকেই বাঁক নিল আবার। সত্যিই বড় খুশির দিন আজ সর্বেশ্বর বাবুর, তাঁর মহত্ত্ব আর বিচার-বিবেচনার কথা এত শুনেছেন যে দু'কান ভরে আছে—

সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল ধীরাপদ, এ-টুকুই সুযোগের মত। হাসিমুখে তক্ষুনি বলল, কিন্তু এত-সব যার মুখে শুনেছেন তার তো চাকরি গেল—

সর্বেশ্বরবাবু সচকিত। ঢোক গিললেন, তাই নাকি! ইয়ে, কেন? কেন?

আপনি কি ওর সম্বন্ধে লাবণ্য দেবীকে কিছু বলেছেন?

রমেনের সম্বন্ধে! না তো···ইয়ে, রাগের মাথায় লাবুকে অবশ্য একদিন পাঁচ কথা বলে ফেলেছিলাম। তবে আমার বিশ্বাস ছোঁড়াটা অনেক বানানো কথাও বলে—

আপনার কাছ থেকে এ-পর্যন্ত টাকাও অনেক নিয়েছে বোধ হয়?

না···মানে অনেক না। অভাবী ছেলে, মাঝে-মধ্যে দু'দশ টাকা এমনিই দিতুম। কিন্তু টাকার কথা তো লাবুকে আমি বলিনি!

ও নিজেই স্বীকার করেছে। ধীরাপদ গম্ভীর।

লাবুর কাছে? ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন।

না আমার কাছে।

আপনি তা'হলে দয়া করে এটা আর কাউকে বলবেন না অভাবের সময় এসে হাত পাতলে কিছু না দিয়ে পারিনে, অথ শুনলে কে কি ভাববে ঠিক নেই। চাকরি গেল কেন? কাজ-ক কিছু করত না বুঝি?···ওই জন্যেই লাবু ক্ষেপেছে তা'হলে. কাজে হেলা-ফেলা করলে তার কাছে মাপ নেই। আপনি দয়া করে তাকে টাকার কথাটা বলবেন না···বলবেন না তো? পাজী ছোকরা আপনার কাছে স্রেফ মিছে কথা বলেছে মশাই, অভাবে কেঁদে হাত পাততো তাই দিতুম, আর কিছুর জন্য না—যাকগে লাবুকে এ-স কিছুই বলার দরকার নেই। বলবেন না, কেমন?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, বলবে না। হাসতে না পারলেও হাসিই পাচ্ছে এখন। নিরীহমুখে জিজ্ঞাসা করল, লাবণ্যদেবীকে বিলেত পাঠানোর কথা বলছিলেন সে-দিন, তার কি হল?

কই আর হল। কিছুই হল না। সখেদে বড় নিঃশ্বাস ফেললেন একটা, তারপর কি মনে হতে ধীরাপদর হাত দুটো সাগ্রহে চেপে ধরলেন।—আপনি একটু চেষ্টা করে দেখবেন? কৌশলে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে দেখুন না—আপনার অনেক ক্ষমতা, অনেক গুণ, আপনার সম্বন্ধে তো কিছু আর বাড়িয়ে বলেনি ছোঁড়াটা, দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করে আপনাকে দেখেছি—কবারই কথা, আপনি চেষ্টা করলে যেতে রাজি হতেও পারে। কি হবে গোলামী করে? দুটো বছর ঘুরে এলে কত বড় ভবিষ্যত! আমি এতখানি করেছি, এখন গোলামী করতে দেখলে ভালো লাগে! যায় যদি আমি বিশ-তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারি, আরো বেশিও পারি—

এই লোকের কাছ থেকে রমেন হালদার টাকা নেবে না তো আর কার কাছ থেকে নেবে। বাইরে এসে ধীরাপদর মনে হচ্ছিল, রমণীর পায়ে এমন দাসত্বের নজির আর দেখেনি। নিজে নাগাল না পাক, আর কারো নাগালের বাইরে গেলেও ভদ্রলোকের শান্তি।

পরদিন। অফিসে সেই থেকে চুপচাপ বসে আছে ধীরাপদ। তার সামনে দুটো জিনিস।

একটা রমেন হালদারের চিঠি।

চিঠি ডাকে এসেছে। রমেন লিখেছে, দাদা তাকে তাড়িয়ে দেবেন জেনেও এসেছিল। তার যোগ্য শাস্তি হয়েছে। নিজের অদৃষ্টে কি আছে সে জানে, কিন্তু তার অপরাধে নিরপরাধ কাঞ্চনকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে? তার কোনো দোষ নেই। দাদা দেবতার মত, একবার তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন, বিনা দোষে আবার যেন তাকে সেই ঘৃণ্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দেন। এই কথা বলতেই সে দাদার কাছে এসেছিল, আর দাদার এই দয়াটুকু ভিক্ষে চেয়েই সে চিঠি লিখছে।

···সেদিন ওই মেয়েটা তার দু'পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিল, রমেনের কোনো দোষ নেই, তাকে নিয়ে দোকান করার লোভে ফাঁদে পা দিয়েছে, সব দোষ তার—তার যা হয় হবে, দাদা যেন ওকে বাঁচান। কেন কেন কেন? কেন এমন হয়? চোরের বুকে আর 'দেহজীবিনীর' বুকের মধ্যেও এ কোন বস্তুর কারিগরী? কোন দুর্নিরীক্ষ্য অবুঝের খেলা?

দ্বিতীয় জিনিসটা ম্যানেজারের মতামত সহ কাঞ্চনের ফাইল।

ধীরাপদর বিবেচনার জন্ত এটা পাশের ঘর থেকে এসেছে। কেন এসেছে অনুমান করা কঠিন নয়। কাঞ্চনের নিয়োগের ব্যাপারে অমিতাভ ঘোষের ইচ্ছের জোর ছিল। বরখাস্তটা সিতাংশুর হাত দিয়ে হলেও তাতে লাবণ্যর হাত আছে ভাবতে পারে সে। অতএব ধীরাপদ রাখতে ইচ্ছে হলে রাখুক, বিদায় দিতে হলে বিদায় দিক।

বিকেলের দিকে ফাইলটা টেনে নিয়ে ধীরাপদ খসখসিয়ে বরখাস্তের নির্দেশই দিল। তারপর রমেনের ফাইল তলব করে তার বাড়ির ঠিকানা নোট করে পকেটে রাখল।

দেরি করতে ভরসা হয় না। আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস নেই কিছু। ঠিকানা মিলিয়ে যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা একটা বস্তি ঘর। রমেন বাড়িতেই ছিল। আর তাকে দেখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধীরাপদ যা বলার পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে বলে এসেছে। রমেন হাঁ করে শুনেছে, তারপর তার দুই গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। কিন্তু তখনো নড়তে পারেনি সে, তখনো স্বপ্ন দেখছে যেন। স্বপ্নের কথা শুনছে যেন।

সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে ধীরাপদ আবার কাজে মন দিয়েছে। কর্মচারীদের অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বাড়ছিল। বড়সাহেবের বিগত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের প্রাপ্তির একটা বড় অংশ বাকি বলে তারা ক্ষুব্ধ। তাছাড়া যে-সব সুবিধে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তারও কোনরকম লক্ষণ দেখছে না, তোড়জোড় দেখছে না। ধীরাপদ এই সব ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করতে এলো সিতাংশুর সঙ্গে। সিতাংশু দু'কথায় ফিরিয়ে দিল তাকে, কোম্পানীর এখন অনেক খরচ অনেক ঝামেলা—এখন এ-সব ভাবার সময় নয়।

অতএব ধীরাপদ সব কাজ ফেলে কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের নথি-পত্রের মধ্যে ডুবে রইল দিন কতক। তারপর আবার এলো।

বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোম্পানী স্বচ্ছন্দে কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে পারে। আর ঘোষণা অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থায়ও কিছুটা এগনো যেতে পারে। হিসেবের ফাইলটা তার সামনে রাখল।

ওটা আবার ঠেলে দিয়ে সিতাংশু রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, এ-সব নিয়ে আপনাকে এখন কে মাথা ঘামাতে বলেছে?

আপনার বাবা। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে যতটা করা সম্ভব করতে বলে গেছেন।

কিন্তু আমি আপনাকে বলেছি কিছু করতে হবে না, এখন কিছু হবে না!

ধীরাপদ ফাইলটা হাতে তুলে নিল, লাবণ্যর দিকে ফিরল তারপর।—আপনারও তাই মত বোধ হয়? তিনি আপনার সঙ্গেও পরামর্শ করতে বলেছিলেন।

লাবণ্য জবাব দিল না। সিতাংশুর দিকে চেয়ে মনে হল, চূড়ান্ত কিছু একটা জবাব এবারে সে-ই দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখে কিছু বলল না, জবাবটা নীরব অভিব্যক্তির মধ্যেই শেষ হল।

ধীরাপদ বলল, তাহলে আপাতত আমি চলি। আপনার বাবা ফিরে আসুন···তাঁরও আর আমাকে দরকার আছে কিনা একবার এসে জেনে যাব।

সিতাংশু হকচকিয়ে গেল, কিছুটা লাবণ্যও। ধীরাপদ দুই-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে দরজার দিকে পা বাড়ালো। সিতাংশু বাধা দিল, তার মানে, আপনি এতদিন আর আসবেন না?

ধীরাপদ ঘুরে দাঁড়াল, বলল, তার মানে তাই।

নিজের ঘরে এসে বসল। চেয়ার-টেবিলময় ঘরটাসুদ্ধ ঘুরছে চোখের সামনে। এই জবাব দিয়ে আসার জন্ত প্রস্তুত হয়ে ও-ঘরে ঢোকেনি। কর্মচারীদের এরপর ছোটসাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেবে, সে এ-সব ব্যাপারে থাকবে না—এই কথাটাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে আসবে স্থির করেছিল। লাবণ্য ঘরে না থাকলে হয়ত সেই কথাই বলে আসত। কিন্তু সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। যে-কথা আগে মনেও আসেনি সেই কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হিসেবের ফাইলটা অ্যাকাউনটেন্ট-এর জিম্মায় রেখে এলো। শুধু তাঁকেই জানিয়েছে কিছুদিন সে হয়ত আর আসবে না—দরকারী কাগজপত্র সব যেন ছোট-সাহেবের কাছে পাঠানো হয়।

রাস্তা। বছর কতক আগেও এই রাস্তাই সম্বল ছিল। কিন্তু বুকের ভিতর আজ একটা শূন্যতা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, আগে তা উঠত না। এবারে কি করবে? সুলতান কুঠিতে ফিরবে? হিমাংশু বাবুর বাড়িতে এর পর থাকা চলে না। কিন্তু সুলতান কুঠিতে ফেরার চিন্তাটাও বাতিল করে দিল। সেখানেও নয়, আর কোন খানে। যেখানে তাকে নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই, কারো কোনো আগ্রহ নেই। হাতে টাকা থাকলে এ-রকম জায়গা অনেক মিলবে!···কত টাকা আছে ব্যাঙ্কে? ঠিক মনে করতে

পারছে না কত আছে। দিন কয়েক হল এক ধাক্কায় হাজার তিনেক কমেছে, হঠাৎ হাসি পেল, রমেন আর কাঞ্চনের সঙ্গে গিয়েই যোগ দেবে নাকি?

...যাক, মন্দ টাকা থাকার কথা নয় এখনো, কিছুকাল নিশ্চিন্তে চলে যাবার কথা। তারপর দেখা যাবে। ধীরাপদ নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করছে। একটা ট্যাক্সি নিয়েই বাড়ি ঢুকল। আদেশ অনুযায়ী হতভম্ব মানুকে ট্যাক্সিতে তার জিনিসপত্র তুলে দিল। একটু ফাঁক পেলেই ছুটে গিয়ে সে বউরাণীকে খবরটা দিয়ে আসত। কিন্তু সেই ফাঁক ধীরাপদ তাকে দিল না। ট্যাক্সিতে উঠে তাকে জানালো, বউরাণীকে যেন বলে দেয়, আপাতত তার এখানে থাকার সুবিধে হল না।

না, চারুদির বাড়িতেও নয়, খুব একটা সাধারণ মেসে এসে উঠল। সেখানেই কাটল দিনকতক। মনে মনে মাঝের এই ক'টা বছর স্বপ্ন বলে ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু তবু থেকে থেকে মনে হল, স্বপ্নটা বড় তুচ্ছ কারণে ভেঙে গেছে। অফুরন্ত সময়, দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টাই নিজের দখলে। আগে যেমন ছিল। অথচ এই অবকাশ দুঃসহ বোঝার মত বুকের ওপর চেপে বসছে।

কার্জন পার্কের একদিনের সেই পরিচিত বেঞ্চটায় এসে বসল সেদিন। কিন্তু সেই ধীরাপদ বদলে গেছে। বসে বসে কালের কাণ্ড দেখার সেই চোখ গেছে, মন গেছে। দূরের প্রাসাদ-লগ্ন বড় ঘড়িটা তেমনি চলছে, কিন্তু ধীরাপদর মনে হচ্ছে থেমে আছে। বেশীক্ষণ বসা গেল না, উঠে পড়ল। চৌরঙ্গীর দিকেও চোখ পড়ছে না, অথচ এই চৌরঙ্গীর দিকে চেয়ে চেয়ে কতদিন কত কি আবিষ্কার করেছে সে।

অম্বিকা কবিরাজের দোকান। তেমনি আছে বোধ হয়, কিন্তু ধীরাপদর চোখে আরো নিষ্প্রভ লাগছে। কবিরাজ মশাইও আরো বুড়িয়ে গেছেন। তাকে দেখে খুশি, সত্যিকারের বড় যে, বড় হয়েও পুরনো সম্পর্কের মায়া শুধু সে-ই ছাড়তে পারে না বলে মন্তব্য করলেন। বিকৃত আনন্দে এক সময় রমণী পণ্ডিতের কথা তুললেন, বললেন, তার কি মাথার ঠিক আছে, সেই সব ওষুধের জন্যে হাতে পায়ে ধরছে মশাই—তার মেয়েটাকে কারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল কাগজে পড়েছেন তো?

ধীরাপদকে দেখে আরো বেশি খুশি নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবু। চা না খাইয়ে ছাড়লেন না, বড় হয়েও পুরনো সম্পর্ক ধীরাপদ ভোলেনি—তিনিই কি ভুলেছেন! তাঁর অবস্থা আগের থেকে আরো ফিরেছে মনে হল।—আপনি এখন হাজার দুই পাচ্ছেন মাসে, না? পণ্ডিত সেই রকমই বলছিল একদিন। দে-বাবু ধীরাপদকে আপ্যায়ন করেন নি, দু'হাজার-ওলাকে আপ্যায়ন করছেন। তিনিও শেষে রমণী পণ্ডিতের কথাই তুলেছেন, বইক'টা তো মন্দ কাটছিল না তার, কিন্তু আর লিখবে কি, অন্যকে আশা-ভরসাই বা কি দেবে—নিজেই খাঁচা-কলে পড়ে গেছে। কাজকর্মের নাম নেই, কেবল হাত পেতেই আছে, টাকা দাও আর টাকা দাও—আচ্ছা লোক ঠেকিয়ে দিয়ে গেছেন মশাই!

না, সংস্থানের জন্যে আবার যদি পথে পথে ঘুরতেও হয়, এই দুই দোকানের কাছ দিয়ে অন্তত ধীরাপদর আর ঘেঁষা চলবে না। সুলতান কুঠির দিকে চলল। ওদিকের খবর কিছু আছে কিনা জানে না। গণুদার সেখানের কেস চলছে পুরো দমে। তাছ কেন জানি রমণী পণ্ডিতের সঙ্গেও একবার দেখা হওয়া বাঞ্ছনীয় ম হচ্ছে।

দেখা হল। মজা-পুকুরের ধারে কুঠি-বাসীদের চোখের আড়া একদিন গণুদা যেখানে বসেছিল, রমণী পণ্ডিত সেখানে একা বসে ধীরাপদকে দেখে বিড় বিড় করে কুশল প্রশ্ন করলেন। নিষ্প্র কোটরাগত দুই চোখে মৃত্যু-ছোঁয়া হতাশার ছায়া দেখল ধীরাপদ আগেও দেখেছে, কিন্তু এই মন দিয়ে দেখেনি বোধ হয়। রমণী পণ্ডি কেসের খবর দিলেন—নতুন খবর কিছু নেই, এক-ভাবেই চলছে তারপর সখেদে বললেন, মেয়েটা যদি আঁতুড়ে মরত ধীরুবাবু—

ধীরাপদ চেয়ে চেয়ে দেখছে তাঁকে। যা হতে পারত তা দেখছে ন যা হয়েছে তাই দেখছে। তাঁর ছেলের থেকে মেয়ে বড়, তাই ও মেয়েকে দিয়েই একদিন অনেক আশা করেছিলেন ভদ্রলোক।

—আজও ওই গণুবাবুর বউ চাল পাঠাতে তবে হাঁড়ি চড়েছে অথচ দুদিন বাদে তার নিজের কি হবে ঠিক নেই। হঠাৎই ধীরাপদ হাতদুটো আঁকড়ে ধরলেন রমণী পণ্ডিত, এই বয়সে আর কো রাস্তায় যাব ধীরুবাবু? এই করে আর কতকাল টানব?

ধীরাপদ দেখছে। সোনাবউদির চাল পাঠানোর কথা শুনে ভিতরে মুহূর্তের জন্যে একটু নাড়া পড়েছিল, তারপর আবার তেমনি ঠাণ্ডা প্রায় নির্লিপ্ত। কালের কাণ্ড দেখতে বসে অনুভূতির বন্যায় নিজে ভাসলে দেখায় ফাঁক থেকে যায়।

হাত ছেড়ে দিয়ে রমণী পণ্ডিত দৃষ্টি ফেরালেন, মজা-পুকুরের দিকে চেয়ে রইলেন। ধীরাপদ দেখছে, ওই মজা-পুকুরটার সঙ্গে ভদ্রলোকের বেশ মিল। কিন্তু তেমন করে ছেঁচতে পারলে ওটা তো আবার নতুন জলে টলটলিয়ে উঠতে পারে। এঁর কি সেই আশাও নেই?

তেমনি নির্লিপ্ত নিরাসক্ত মুখে ধীরাপদ আশাই দিল। আ ঘণ্টাখানেক লেগেছে এই আশার বারতা সম্পূর্ণ করতে। তারপর যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই রমণী পণ্ডিতের নিষ্প্রভ দুই চোখের জরা সরে গেছে, হতাশা সরে গেছে—জীবনের আলো চিকচিকিয়ে উঠেছে। পিঁজরাবদ্ধ পশু হঠাৎ মুক্তির হদিস পেলে যে-ভাবে থমকে তাকায়, তার সঙ্গে মেলে এই চাউনিটা।

ধীরাপদ সুলতান কুঠির দিকে চলেছে। কোনো ন্যায়-অন্যায় বোধ তাকে উতলা করছে না। যতটুকু মিয়াদ এই জীবনের ততটুকু বাঁচতে হবে, এর মধ্যে ন্যায়-অন্যায় কি? প্রতি মুহূর্তের বাঁচার নিশ্বাসে কত শত জীবাণু মরছে—ন্যায়-অন্যায় দেখছে কে? লোভ কামনা বাসনার ওপর তো দুনিয়া চলছে, ওই আলেয়া কাকে না টানছে? এরই থেকে রমণী পণ্ডিত যদি জীবনের রসদ সংগ্রহ করতে পারে করুক, ক্ষতি কী? এক ভাবে না এক ভাবে সবাই তাই করছে।...লাবণ্য সরকারের ভগ্নিপতির অনেক টাকা, লোভের ইন্ধন যোগাতে পারলে অনায়াসে তিরিশ পঁয়তিরিশ হাজার পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। দৈবানুকূল্যের আশায় এই রমণী পণ্ডিতের মতই একজন মহাপুরুষকে খুঁজছেন তিনি। একটু আগে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই বয়সে আর কোন রাস্তায় যাবেন তিনি। ধীরাপদ যে-রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা লাবণ্য সরকারের ভগ্নিপতি সর্বেশ্বর বাবুর বাড়ির ঠিকানায় এসে থেমেছে। এখন মহাপুরুষের হাত যশ। ধীরাপদর ন্যায়-অন্যায় ভাবার দরকার নেই।
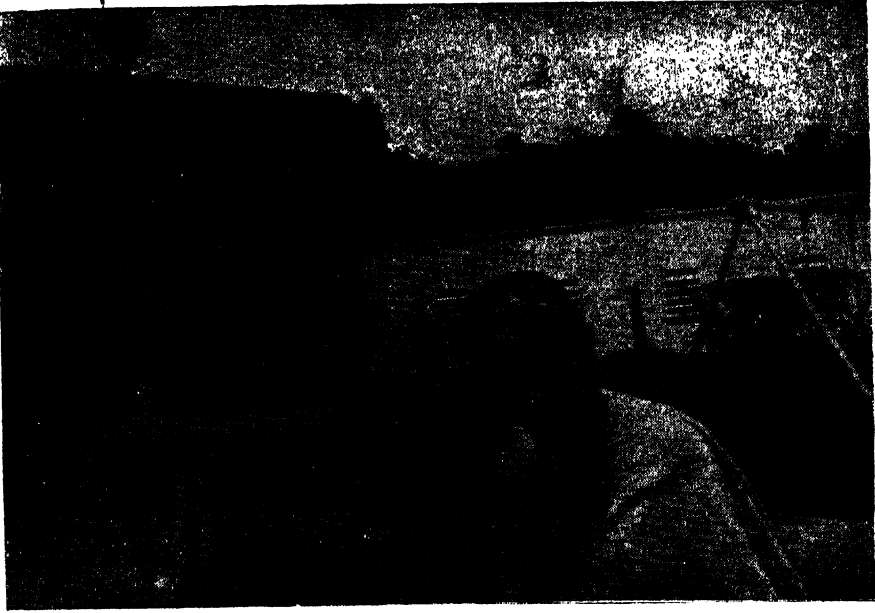
অবসাদ —শান্তিময় সান্যাল

## ॥ আ লো ক চি ত্র ॥

ফতেসাগর লেক ( উদয়পুর ) —নারায়ণ সাহা
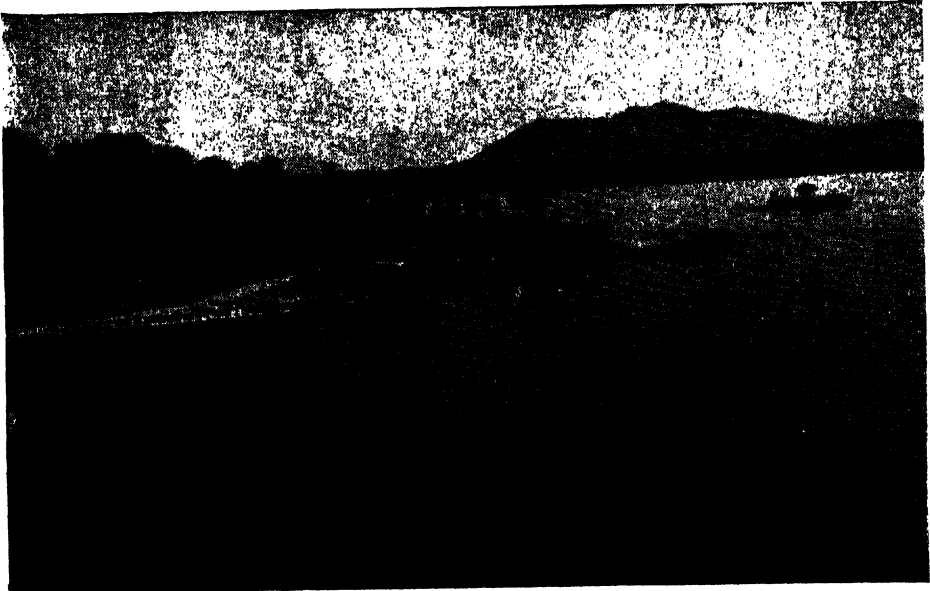
ত্রয়ী —রথীন রায়

ভাই-বোন —শম্ভুনাথ

নীড় —বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দিনের শেষে —সুশান্ত মণ্ডল
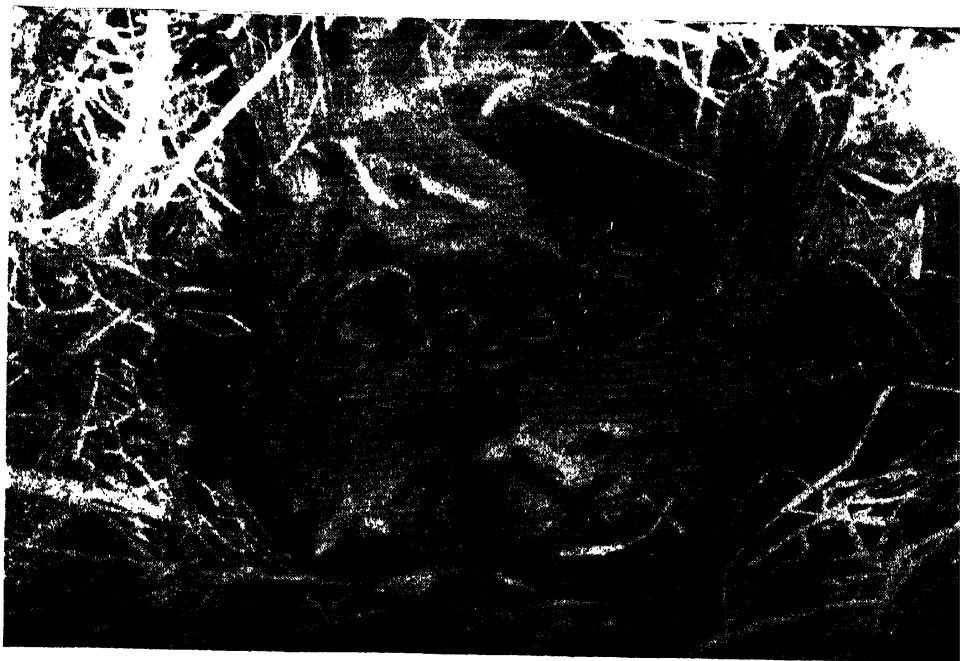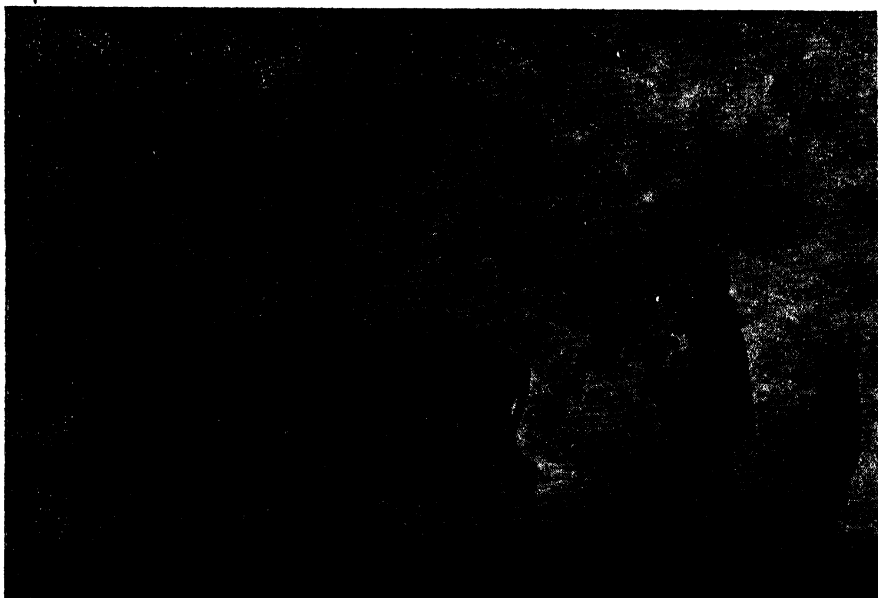
ভবিষ্যৎ —অমলেন্দু ঘোষ

রান্না —বামাচরণ
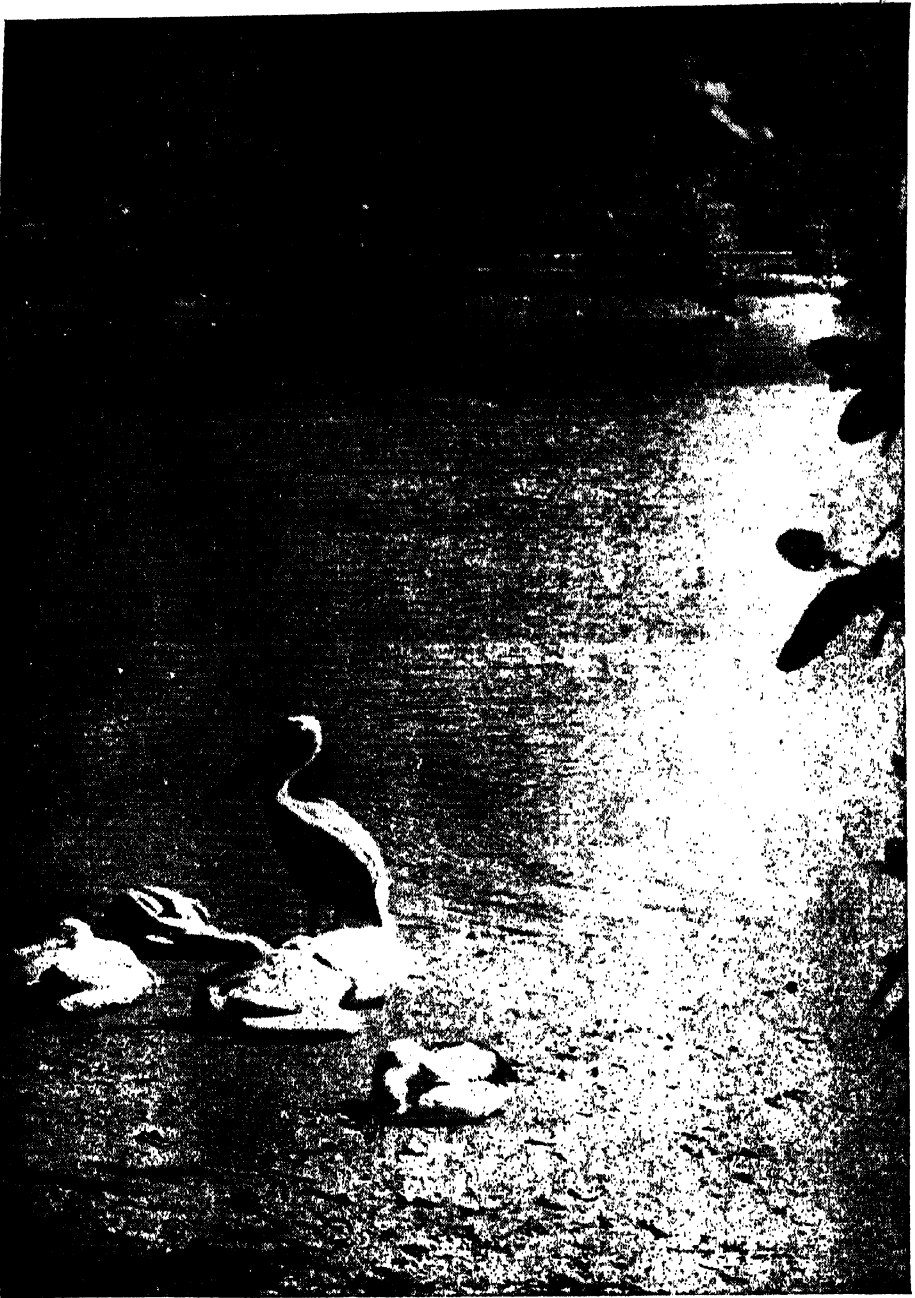
চিড়িয়াখানা ( কলিকাতা )　　—মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

# ৩টি কারণে বনস্পতিতে রঙ মেশানো উচিত নয়

ঘি ব্যবহারকারীদের নাম ক'রে বনস্পতি রঙ করার যে দাবী উঠেছে তার পেছনে একটি ধারণা রয়েছে যে এতে করেই ঘিয়ে ভেজাল মেশানো নির্ঘাৎ বন্ধ হবে। কিন্তু এ ধারণা ভুল···এতে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

১। **কেননা রঙটি এমন হওয়া চাই যেন কিছুতেই নষ্ট না হয়;** তা না হ'লে রঙ মিশিয়ে কোন কাজই হবে না। সত্যিকার পাকা রঙ হয় বিষাক্ত, নয়তো ক্যান্সার রোগ জন্মায়। বনস্পতিতে এধরণের রঙ মেশালে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক তাদের দৈনন্দিন খাবারের সঙ্গে তা উদরস্থ করবে!

২। **ভারতের নানান জায়গায় ঘিয়ের রঙ নানান রকম;** কোন কোনটার রঙ এমন কড়া যে রঙীন বনস্পতির রঙেও তা ঢাকা পড়বে না। ফলে বনস্পতি রঙ করার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

৩। **শুধু যে বনস্পতিই ঘি-এ ভেজাল দেওয়া হয় তা নয়;** তবে একথা ঠিক যে বনস্পতি সবচেয়ে নিরাপদ এবং একটি বিশুদ্ধ খাদ্য। ঘিয়েতে চর্বি ইত্যাদি যে সব ভেজাল মেশানো হয়, সেগুলো নোংরা, সুতরাং অত্যন্ত আপত্তিজনক। ভেজালকারীরা যদি বনস্পতি মেশাতে না পারে তা হ'লে ঐসব নোংরা জিনিসই বেশী করে মেশানো শুরু হবে। বনস্পতি নির্দোষ, উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। অন্য জিনিসকে ভেজালের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বনস্পতিতে রঙ মেশানো একটি খাঁটি খাদ্যে ভেজাল মেশানোরই সামিল।

## বনস্পতিতে স্বভাবতই একটি নির্দোষ রঙ লুকানো থাকে

বনস্পতিতে তিলতেলের যে নির্দোষ রঙ লুকানো থাকে তা সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষায়ই ধরা পড়ে। এর ওপর আলাদা রঙ করার কোন প্রয়োজন নেই!

## বনস্পতি-জাতীয় স্নেহপদার্থ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহার করা হয়

আলবানিয়া, আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলেশিয়া, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, বুলগেরিয়া, ব্রহ্মদেশ, কানাডা, মধ্য আফ্রিকান ফেডারেশন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, হাঙ্গেরী, ভারত, ইরান, ইরাক, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইস্রায়েল, ইটালী, জাপান, লিবিয়া, মালয়, মেক্সিকো, মরক্কো, নাইজিরিয়া, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ডস্‌, পাকিস্তান, পোল্যাণ্ড, পর্তুগাল, রুমানিয়া, সৌদী আরব, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব সাধারণ তন্ত্র, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইয়েমেন, যুগোস্লাভিয়া।

আরও বিস্তারিত জানতে হলে
এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন :

**দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব্‌ ইণ্ডিয়া**
ইণ্ডিয়া হাউস, ফোর্ট ষ্ট্রিট, বোম্বাই

আজও ছেলে-মেয়েরা নয়, সোনাবউদিই ঘরে এলো। দুই-এক পলক নিরীক্ষণ করে দেখল তাকে। ফিরে ধীরাপদও। সোনাবউদির মুখ কালচে দেখাচ্ছে, চোখের কোলে কালি ভেসে উঠেছে।

আপনি আজকাল কোথায় আছেন ?

ধীরাপদ অবাক, তার ওদিকের কোনো আভাস সুলতান কুঠিতে পৌঁছেছে ভাবেনি। সত্যি জবাবই দিল।—একটা মেসে।

কেন ?

নিরুত্তর। একটু থেমে সোনাবউদি ঠাণ্ডা সুরে সংবাদ দিল, গত কয়েকদিনের মধ্যে অনেকে তার খোঁজ করে গেছে, কারা এসেছে একে একে তাও জানালো।

—প্রথমে এসেছেন আপনি যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ির ছেলের বউ, নাম বললেন আরতি। একজন লোকের সঙ্গে গাড়িতে এসেছিলেন। আপনি এখানে এলেই আপনাকে অবশ্য একবার পাঠিয়ে দিতে বলে গেছেন। তিনি আট দিন আগে এসেছিলেন।

ধীরাপদ অবাক।···আরতি এসেছিল, কেয়ার-টেক বাবুকে সঙ্গে করে নিশ্চয়। কিন্তু আশ্চর্য···

—দিন কয়েক আগে এসেছিলেন লাবণ্য সরকার। আপনি এখানে থাকেন না তিনি ভাবেন নি। বলার পরেও বিশ্বাস করেছেন কিনা জানি না। তাঁর ধারণা, আমি আপনাকে বললে আপনি কারখানায় ফিরে যাবেন। বলার জন্তে অনুরোধ করে গেছেন।

ধীরাপদ নির্বাক। সোনাবউদি আবারও থামল একটু, তেমনি ভাবলেশশূন্ত।

—চার দিন আগে আপনার দিদি আপনার খোঁজে ড্রাইভার আর গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। পরশু দিন অমিতাভ ঘোষ এসেছিলেন। তিনি কিছু বলে যান নি।

ধীরাপদ হতভম্বের মত বসে! এতগুলো সম্ভাবনা স্বপ্নের অগোচর ছিল।···চারুদি খবর পেলেন কি করে জানে না। অমিতাভর আসাটা আরো অবাক হবার মত। তার একবারের অসুখে সবাই যখন ছোটাছুটি করে এসেছিল, তখনো একমাত্র সে-ই আসেনি।

সংবাদ দেওয়া শেষ করে সোনাবউদি চুপচাপ চেয়েছিল তার দিকে। মুখ তুলে ধীরাপদ হাসতেই চেষ্টা করল একটু।

আপনি কি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন নাকি ?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল। কিন্তু তাও খুব স্পষ্ট করে নয়। অর্থাৎ, ঠিক ছাড়ে নি।

সোনাবউদি আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না, এখানে না এসে মেসে আছে কেন, তাও না।

সুলতান কুঠি থেকে সোজা হিমাংশুবাবুর বাড়ি চলে আসতে ধীরাপদ আর একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেনি। আজকের দিনটা ছাড়লে ঠিক এগারো দিন আগে এই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল স। প্রথমেই মানুকের মুখোমুখি। বিস্ময় আর কৌতূহলের ধাক্কা সামলে চট করে সমুখ থেকে সরে গেল সে। বাধা পড়ার আগেই তাড়াতাড়ি বউরাণীকে খবর দিতে ছুটল হয়ত। ধীরাপদ নিচের ঘরে এসে বসতে না বসতে ফিরে এলো। তার হাতে খাম একটা। বিলেতের খাম।

বউরাণী দিলেন—

খাম হাতে নেবার আগেই ধীরাপদ অনুমান করেছে বড় সাহেবের চিঠি। খুলে পড়ল। না, সে কারখানায় যাচ্ছে না বা এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে-খবর পাননি। এই চিঠিতে অন্তত তার কোন আভাস নেই। কিন্তু চিঠিখানা প্রচ্ছন্ন অনুযোগে ভরা। ছেলের চিঠিতে জেনেছেন, কারখানার প্রায় সকল ব্যাপারে তার আন্তরিক সহযোগিতার অভাব। ছেলের প্রতি তার বিরূপ মনোভাবের দরুন তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, ছেলেকে তিনি এক-রকম পাকাপাকি-ভাবেই তাঁর জায়গায় বসিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গে মতের মিল বা মনের মিল না হলে চলবে কেন ? লিখেছেন, ধীরাপদর ওপর তাঁর অনেক আস্থা অনেক নির্ভর, ছেলেরও সে ডান হাত হয়ে উঠবে এই আশা তাঁর। মতের অমিল যদি কিছু হয়ও, সেটা যেন কোন-রকম মনোমালিন্তের হেতু হয়ে না দাঁড়ায়—অন্তত তিনি ফেরা পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করা হয়।

ভিতরটা জ্বালা জ্বালা করছিল ধীরাপদর। ছেলের প্রতি বাৎসল্য স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা উজিয়ে উঠে অতি বিশ্বস্ত মনের জনকেও যখন সংশয়ের চোখে দেখতে শেখায়, তখন এমনিই জ্বলে বোধ হয়। সিতাংশু কি লিখেছে তার বাবাকে জানে না, যাই লিখুক, ধীরাপদর কর্তব্যের দিকটাই বড়সাহেবের বড় করে ভাবার দরকার হয়েছে। ভেবে এই চিঠি লিখেছেন। মোলায়েম মিষ্টি অক্ষরগুলোর মধ্য দিয়ে ধীরাপদ নিজের কর্মক্ষেত্রের ভবিষ্যত চিত্রটা দেখতে পাচ্ছে।

চকিতে উঠে দাঁড়াল, মানুকের বউরাণী আরতি আসছে। বাইরে যাতায়াতের প্রয়োজন ছাড়া এ-পর্যন্ত কখনো নিচে নামতে দেখা যায়নি তাকে। মাথায় ছোট ঘোমটা, নম্র পদক্ষেপ, অথচ আসার মধ্যে একটুও জড়তা নেই।

আমাকে ডাকলেই তো হত—

আমার আসতে অসুবিধে কি···মৃদু জবাব, আপনি আমাকে কিছু না জানিয়ে চলে গেলেন !

ধীরাপদ বিব্রত বোধ করল, এ-বাড়ি থেকে যেতে হলে তাকে জানিয়ে যাওয়া দরকার সে-আভাস দেয়নি। বিস্ময়টুকু মিষ্টি দাবির মত শোনালো।

আরতি একবার এদিক-ওদিক তাকালো, তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনার জিনিস-পত্র কোথায় ?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ এবারও বিব্রতমুখে হাসল শুধু একটু। এই মেয়েটিকে অন্তত ছোট ভাইয়ের বউয়ের মত ভাবতে ইচ্ছে করে।

দুই-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আরতি নির্দ্বিধায় বলল, শ্বশুর মশাই যাবার আগে আপনার কথাই বার বার বলে গেছেন। কোন-রকম অসুবিধে হলে, কোন-কিছু দরকার হলে তক্ষুনি যেন আপনাকে জানাই—আপনি থাকলে কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই।··· কিছু না বলে আপনি এ-ভাবে চলে যেতে পারেন আমি ভাবিনি।

চুপ করে থাকা ছাড়া ধীরাপদ এবারেও কিই-বা বলতে পারে ? এ-ভাবে কেউ অনুযোগ করতে পারে জানলে যেত না হয়ত। অন্তত না বলে যেত না নিশ্চয়। কিন্তু এ-ও মুখ-ফুটে বলার কথা নয়।

—যেতে যদি হয় তিনি ফিরে এলে যাবেন। মিষ্টি মুখ-খানা

গম্ভীরই দেখাচ্ছে এখন, বলল, তখন আমারও কিছু চিন্তা করার আছে···তিনি ফিরে আসার পরেও কি হয় আমি সেই দেখার অপেক্ষায় আছি। আপনার জিনিস-পত্র নিয়ে আসুন।

সে-দিনের মত আজও এই নিঃসঙ্কোচ ঋজু স্পষ্টতাটুকুই ধীরাপদকে অভিভূত করেছে। মেসে জবাব দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরল। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত তখন। কিন্তু ফিরে নিজের ঘরে ঢোকা হল না, জিনিষপত্র মানুকের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে পায়ে পায়ে ভাইনের বড় হলএর দিকে এগলো। অমিতাভ ঘরে আছে, তার ঘরে আলো জ্বলছে।

হ্যালো হ্যালো হ্যালো গ্রেট ম্যান! ভিতরে আসুন, আমি তো আপনার অপেক্ষাতেই দিন গুনছি।

ধীরাপদ ভিতরে এসে দাঁড়াল। এত উচ্ছ্বাস কেন জানি স্বাভাবিক লাগছে না খুব। একটানা অনিয়মে চোখ-মুখ শুকনো অথচ কি এক অশান্ত উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করছে। চেয়ারটা খাটের সামনে টেনে নিয়ে বসতে গিয়ে ছোট-খাট ধাক্কা খেল একটা। অবিন্যস্ত শয্যায় ছড়ানো কাগজপত্রের মধ্যে সেই ফোটো অ্যালবাম।··· এই উচ্ছ্বাস আর উদ্দীপনার উৎস কি তাহলে ওটাই। ফোটো থেকে আগের পার্বতীকে আবিষ্কার করছিল বসে বসে?

—তারপর? আপনার আদর্শের ভরা-ডুবি হয়েছে? নাও হ্যাভ ইউ রিয়্যালাইজড—কি করতে পারবেন আর কি করতে পারবেন না?

ধীরাপদ চুপচাপ দেখছে তাকে। এত কাছ থেকে এত ভালো করে শিগ্‌গীর দেখার সুযোগ হয়নি। খুশির ছটায় ধীরাপদ কিছুটা বিভ্রান্ত। উতলাও। এই খুশির তলায় তলায় গনগনিয়ে জ্বলছে কিছু।

—কিন্তু আমাকে না বলে সব ছেড়েছুড়ে আপনি পালিয়েছিলেন কেন? হোয়াই ডিড ইউ লীভ? ওদের মুখে রাজভোগ তুলে দিয়ে এইভাবে যাব আমরা ভেবেছেন? যখন যাব সব ঝাঁঝরা করে দিয়ে যাব—বাট ওয়েট্, সময় আসুক। এক গোছা টাইপ-করা কাগজ তার মুখের সামনে নেড়ে দিল, অ্যাটর্নির নোটিস—সব তচনচ করে পাই পয়সা অবধি বুঝে নেব—তারপর আরো আছে, দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ—

জোরেই হেসে উঠল। ধীরাপদ ভাবছে, ক'দিন ঠিক-মত খাওয়া-দাওয়া হয়নি লোকটার? ক'রাত ঘুমোয়নি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে গেলে বিপরীত হবে। কাগজের গোছার দিকে হাত বাড়াতে হাসি থামিয়ে অমিতাভ ছদ্ম-গাম্ভীর্যে ভুরু কোঁচকালো।—আপনাকে বিশ্বাস কি?

আপাতত আর কিছু না হোক এই একজনের বিশ্বাসটুকু যে ষোল-আনা লাভ হয়েছে, ধীরাপদর তাতে একটুও সন্দেহ নেই। বিশ্বাস অমিতাভ তাকে আগেও করত, কিন্তু এত করত কিনা সন্দেহ। এই নব-লব্ধ বিশ্বাসের জোয়ারে ভেসেই সে তার খোঁজে সুলতান কুঠি পর্যন্ত হানা দিয়ে এসেছে। কারখানার সংস্রব ছেড়ে-ছুড়ে ডুব দিয়েছিল বলে চোখ রাঙালেও মনে মনে তার মত অত খুশি আর বোধ হয় কেউ হয়নি, সেটা তার প্রথম অভ্যর্থনার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা গেছে। তার চোখে সে এখন স্বার্থের কষ্টি পাথরে যাচাই করা জোরালো-রকমের খাঁটি মানুষ একটা।

হাত গুটিয়ে নিয়ে নিস্পৃহ গাম্ভীর্যে ধীরাপদ জবাব দিল, বিশ্বাস করার জন্ম কে আপনাকে সাধছে···।

অমিতাভ খলখলিয়ে হেসে উঠল আবারও। অ্যাটর্নির কাগজের গোছা এক-ধারে ঠেলে দিয়ে অ্যালবামটা টেনে নিল।—ও-সব উকীলের কচ-কচি কি বুঝবেন, তার থেকে এটা দেখুন, দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ—

কিছু না বুঝে অ্যালবামের মলাট উল্টে ধীরাপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ঘরে দুটো অ্যালবাম দেখেছিল, এটা অন্যটা। পার্বত্য-রমণীর যৌবন ধরা সেই অ্যালবামটা নয়। কিন্তু এ-ও অবাক ব্যাপার, এত-সব কি এতে কিছুই বোধগম্য হল না চট করে। নানা, রকম অ্যাকাউন্টের কপি বা ফোটো কপি, আর ফ্যক্টরীর কর্মরত পরিবেশের ছবি। কোম্পানীর অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্টরদের অর্থাৎ হিমাংশু মিত্রর আর সিতাংশু মিত্রর পারসোন্যাল ড্র-ইংস্, ব্যক্তিগত প্রচারের খাতে স্ফীতকায় ব্যয়ের অঙ্ক, লাবণ্য সরকারের ফ্রী-কোয়াটারের খাতে বছরে কত টাকা ব্যয় হয়, কত টাকার ওষুধ যায়, সেখানকার বেড়ে কত রোগী আসে ইত্যাদির হিসেব, গত বার্ষিকী উৎসবে প্রতিশ্রুতি এবং প্রাপ্তির খসড়া, এমন কি পাকা চাকুরে রমেন হালদারের বরখাস্তের কপি পর্যন্ত আছে ওতে। ছবিগুলো আরো দুর্বোধ্য। কর্মচারীদের ওষুধ-ভরতি শিশির লেবেল তোলা আর লেবেল আঁটার ছবি অনেকগুলো। আরো খানিক খুঁটিয়ে দেখে ধীরাপদ হতভম্ব। ওষুধ-ভরতি লেবেল-তোলা শিশিতে নতুন লেবেল আঁটা হচ্ছে বোঝা যায়। একটা বড়-রকমের ধাক্কা খেয়ে ধীরাপদ সচকিত হয়ে উঠল হঠাৎ। হৈ চৈ করে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুখে দুর্নামের কালি মাখাতে হলে আগের নজিরগুলো ফেলনা নয়, কিন্তু এই ব্যাপারটা বিপজ্জনক।

তার দিকে চেয়ে অমিতাভ হাসছে। চশমার পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে সেই হাসির আভা তার মুখের ওপর ঠিকরে পড়ছে।

এ কি কাণ্ড ?

কেন, কিছু নয় মনে হচ্ছে ? অমিতাভ ঘোষ চাপা আনন্দে ভরপুর।

কিন্তু এ-সব কি পাগলামী করতে যাচ্ছেন আপনি ?

কী ? হাসি মিলিয়ে গিয়ে ফরসা মুখ ঝলসে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। একটা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের যোগ্য কি না এখন তাই আবার খুঁটিয়ে দেখছে। ধীরাপদর মুখটা চোখের ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে দেখছে। কণ্ঠস্বরেও চাপা আগুন ঝরল, বলল, এ যেন আর কেউ জানতে না পারে।

চালে ভুল হয়ে গেল ধীরাপদরও মনে হয়েছে। কিন্তু এক্ষুনি এই ভুল শুধরে দ্বিগুণ বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠার অস্ত্র আছে তার হাতে। সেই অস্ত্র লোকটার হাতে তুলে দেবে কি না চকিতে ভেবে নিল। হিমাংশু মিত্রের চিঠিখানা অন্তস্তলে নতুন করে জ্বালা ছড়ালো এক প্রস্থ।···কর্মক্ষেত্রের ভবিষ্যত চিত্রটাও তো দেখা হয়ে গেছে। অঘটন ঘটেই যদি জোরালো রকমই ঘটুক্ না, কি এমন ক্ষতি ? যাক না সব তচ-নচ হয়ে, কি এমন ক্ষতি ? ভাঙন যদি ধরেই, হুড়মুড়িয়েই ভাঙবে না হয় সব। কিন্তু এই লোকের বিশ্বাসের ওপর পুরোপুরি দখল নেওয়াই দরকার। হয়ত বা তাতে করে ভাঙন রোধ করাও যেতে পারে। লোকটাকে বশে আনতে পারলে হয়ত বা আরো অনেক কিছু হতে পারে।···চারুদি ছেলে পেতে পারে, পার্বতী আরো বেশি কিছু পেতে পারে, আর, গ্লানি-মুক্ত বাতাসে একটি শিশুর আবির্ভাব ঘটতে পারে। অমিতাভকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ধীরাপদর কারখানার গোলযোগের কথা একবারও মনে হয়নি, জীবনের এই পথে তাকে ফেরানো যায় কি না সেই কথাই শুধু মনে হয়েছে।

বলল, আমাকে বিশ্বাস কি, দেখবেন কালই হয়ত জানাজানি হয়ে গেছে।

পরিহাস বুঝেও অমিতাভও চোখের ধারে নরম হল না, এ-সব ব্যাপারে ঠাট্টাও বরদাস্ত হবার নয়।

ধীরাপদ নির্লিপ্ত মুখে আবার বলল, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কোনরকম গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসবেন না যদি কথা দেন, তাহলে হয়ত ছবি তোলার আরো দুই-একটা সাবজেক্ট আমি বলতে পারি—

এই এক কথা শুনেই ভিন্ন মানুষ আবার। চোখে-মুখে উৎসুক আগ্রহ।—কী ?

কথা দিচ্ছেন ?

আঃ, বলুন না ! আমি এক্ষুনি কিছু করতে যাচ্ছি না, আর কিছু করলে আর কেউ না জানুক আপনি জানবেন।

ধীরাপদ নিশ্চিন্ত যেন। বলল, অনেক বড় বড় ব্যবসাতে ট্যাক্সর গণ্ডগোল এড়ানোর জন্যে অনেক রকম খাতা থাকে শুনেছি, আমাদেরও আছে কিনা খোঁজ করে দেখতে পারেন।

শোনা মাত্র চাপা উল্লাসে নড়ে-চড়ে বসল অমিতাভ ঘোষ, এমন একটা জানা ব্যাপার মনেও পড়েনি, আশ্চর্য ! নীরব প্রশংসার বন্যায় ধীরাপদকে চান করিয়ে দিল যেন, তারপর জিজ্ঞাসা করল, আর কি ?

—আর, বড় বড় কারখানায় অনেক ফিকটিশাস লেবার থাকে শুনেছি, যাদের কোনো অস্তিত্ব নেই—আমাদের এখানে সপ্তাহে কত লোক টিপসই দিয়ে মজুরী নিয়ে যাচ্ছে আর সত্যি সত্যি কত লোক আছে একবার খোঁজ করে দেখলে পারেন। মনে হয়, লোকের থেকে টিপ-সইয়ের সংখ্যা দিন-কে দিন বাড়ছে।

অমিতাভ ঘোষ লাফিয়ে উঠল একেবারে। এ-ও বলতে গেলে জানা ব্যাপারই অথচ সময়ে মনে পড়েনি। হিংস্র আনন্দে গোটা মুখ উদ্ভাসিত। তার কাঁধ ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিল গোটা কয়েক, আপনি সাঙ্ঘাতিক লোক, আমারই মনে পড়া উচিত ছিল—ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল, সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল !

ধীরাপদ গম্ভীর, বসুন, আরো কথা আছে—

অমিতাভ তক্ষুনি বসে পড়ল আবার, ধীরাপদর মত এমন মনের জন, এত আপনজন আর কেউ না। উন্মুখ প্রতীক্ষা। আঘাত যদি দিতেই হয় এটাই সুসময় ধীরাপদর কাছে—এই উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনার মুখেই। সহজ মুখেই বলল, আপনি পার্বতীর সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছেন ?

আচমকা এই বিপরীত ধাক্কার প্রতিক্রিয়া যেমন হবে ভেবেছিল তেমনই হল। বিস্মিত, বিভ্রান্ত। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ?

তার কোলে ছেলে আসছে। আপনার ছেলে।

এক-নজর তাকিয়েই বোঝা গেল খবরটা এই প্রথম শুনল। এমন বিমূঢ় হত-চেতন মূর্তি আর বোধ হয় দেখেনি। কিন্তু অস্ত্রোপচারে বসে চিকিৎসকের মায়া করতে গেলে চলে না। ধীরাপদও সেই গোছের নির্মম। বলল, চারুদি আপনাকে চান, কিন্তু এইভাবে এই

ব্যাপারটা চান না। ফলে ওই মেয়েটাকেই মুখ বুজে সব গঞ্জনা ভোগ করতে হচ্ছে—

অমিতাভর চাউনিটা ধারালো হয়ে উঠছে একটু একটু করে। উক্তির মধ্যে আতিশয্য বা ছল-চাতুরীর আভাস আছে কিনা দেখছে। ছাড়া পশুকে খাঁচার দিকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে বুঝতে পারলে সে যে-ভাবে তাকায়, তেমনি চেয়ে আছে।

আর একজনের বিশেষ করে এই একজনের অনুভূতি-বিপর্যয় ঘটাতে হলে যতটা দরকার ততটাই ধীর শান্ত ধীরাপদ। বলল, আপনার মাথায় মস্ত মস্ত গবেষণা ঘুরছে, কিন্তু আমি ও-সব বুঝি না। আমি কাছের মানুষদের ভাল-মন্দ বুঝি শুধু। এদের মাথায় এই নিগ্রহের বোঝা চাপিয়ে আপনি যত বড় গবেষণাতেই মেতে থাকুন, আমি সেটা বড় করে দেখব না। এ-রকম হলে আপনি আমাকে শত্রু বলে জেনে রাখুন।

খাঁচাটার কাছাকাছি এনে ফেলা হয়েছে যেন। চোখের তারায় অব্যক্ত খেদ। বিড় বিড় করে বলল, থামুন—

ধীরাপদ নিষ্পলক চেয়ে আছে তেমনি, তার থামার সময় হয়নি এখনো। প্রতিক্রিয়া দেখছে।—পার্বতী ভিক্ষে চাইতে জানে না। জানলে এ-সব কথা আপনাকে আমার মুখ থেকে শুনতে হত না। আমি চারুদির কাছে শুনেছি। ছেলের জন্যেও সে আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসবে না, একটি কথাও বলবে না, মনে মনে আপনাকে শুধু ঘৃণা করে যাবে।

স্টপ···

ধীরাপদর কানেও গেল না যেন,' নির্মম বিশ্লেষণে মগ্ন সে।—হয়ত আপনার থেকেও বড় সম্ভাবনা নিয়ে আসছে কেউ, কিন্তু আপনার হাত দিয়েই তার মূলে ঘা পড়বে। এরপর তাকে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু কেউ ভাববে না—পথে-ঘাটে এমন অনেক জঞ্জাল দেখে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই। আমার মতে এও হত্যাই। আপনারা বিজ্ঞান-ভক্ত, এর থেকে অনেক সহজ হত্যার রাস্তা আপনাদের জানা আছে। ···যে আসছে, সে আসবে কি আসবে না আপনি ভাবুন এখন—

স্টপ! স্টপ! স্টপ! উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষিপ্ত আক্রোশে অমিতাভ তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। যে-ভাবে চিৎকার করে উঠে এলো, আঘাত করে বসাও বিচিত্র ছিল না। চোখের আগুনে তাকে দগ্ধ করে দু হাতে অমিতাভ ঘোষ নিজের চুলের গোছাই টেনে ছেঁড়ার উপক্রম করল, তারপর মাতালের মত টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘর খোলা। দরজার আউটায় তালা-চাবি ঝুলছে। শয্যায় অত যত্নের গোপনীয় কাগজ-পত্র ছড়ানো।···ভালো নাটক হয়ে গেল। লোকটা অমিতাভ ঘোষ বলেই হল। এই রকমই হবে আশা ছিল ধীরাপদর। এই নাটকের জন্যেই অনেক দিন ধরে একটা নীরব প্রস্তুতি চলছিল। উঠে অ্যাটর্নির লেখা কাগজের গোছা আর অ্যালবামটা দেয়ালের কাছের খোলা স্যুটকেসের মধ্যে রাখল, তারপর দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো। রাতে একসময় কেয়ার-টেক বাবুকে ডেকে চাবিটা তার জিম্মায় রাখল—অমিতবাবু এলেই ওটা যেন তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়। · · [ ক্রমশঃ।

## জয়দেবের মেলায়

### শ্রীসাধনা কর

—শিউড়ি, অজয়, এই যে বোলপুর···।

আরেকজন চেঁচিয়ে উঠল—কেন্দুবিল্ব···।

ট্রাক ছুটে চলেছে, আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছি, দেখছি বীরভূমের ম্যাপ। সু-দা'রা দেখাচ্ছেন—বোলপুর থেকে ইলামবাজার হয়ে কেন্দুবিল্ব মাইল আটাশ দূর, শিউড়ি থেকে হবে মাইল কুড়ি দক্ষিণে···।

ম্যাপের সরু মোটা রেখা, ওতে কেন্দুলির অবস্থান আর রাস্তার বিবরণ কতটুকুই বা জানতে পারছি—রাস্তার বাস্তব পরিচয় যে মিলছে হাতে-হাতে। ট্রাক ছুটতে থাকলে ধুলোটা ওড়ে পিছনে, ছোটার একটু কমতি হল আর রক্ষে নেই। দৈত্যের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে ধুলোর রাশি, শ্বাস চেপে ধরছে। আশ্চর্য মানুষ ভূ-দা, নানাভাবে দাঁড়িয়েছেন ট্রাকের পাদানিতে, অবস্থা শোচনীয়, তবু উৎসাহের কমতি নেই; বলেই চলেছেন—"বোলপুর নয়, বলিপুর, সুরথ রাজার দেশ। ওই যে ভাঙা মতো মন্দির, ওই সুরথ রাজার মন্দির। দুর্গার অকালবোধন ক'রে হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। মন্দিরে কারুকাজ আছে দেখবার মতো······।"

ঐতিহাসিক, পৌরাণিক যত কাহিনী আছে, এক নাগাড়ে তিনি বলে চলেছেন; তিনি কত কিছু দেখে চলেছেন, আমরা কি কিছুটি দেখতে পাচ্ছি না, সে-কথাটি বলতে পাচ্ছি না। ধুলোয় ধুলোয় কণ্ঠ রোধ হয়ে যাচ্ছে। দিগ্বলয়হীন মহাপ্রান্তর, কাটা ধানের শুকনো গুঁড়িভরা, মাঝে মাঝে সবুজের ছোপ—আখ ক্ষেত, কলাই ক্ষেত। উপরে দুপুরের কড়া রোদ, নীচে রসহীন বর্ণহীন গেরুয়া-প্রান্তর। যেটুকু দেখছি এই রূপ। মাঝখানে সরু রাস্তাটি ধরে আমাদের ট্রাক ছুটে চলেছে; গরুর গাড়ি যাচ্ছে, মোটর গাড়ি ছুটছে, বোঝাই হয়ে চলেছে যত মানুষ—

একদিকেই গতি, একই গন্তব্য। ইলামবাজারের ঘন শালবনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে—কত চেনা দল হৈ-হৈ করে উঠলো, কত দল তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল, কতদল রইল পিছিয়ে। গায়ে মুখে লাল ধুলোর প্রলেপ। জয়দেব যাওয়ার পথ পথের ধুলো দিয়েই চেনা; বর্ধমানে নেবে অজয় পেরিয়ে আসছে কত লোক; বোলপুরের পথে আসছেই বা কত; এদিকে আসছে শিউড়ির পথ বেয়ে। বাঙ্গালীর অন্তরে আজ ডাক পৌঁছেছে জয়দেবের।

আটশ' বছর আগে যে সুর বাঙলাতে প্রথম উঠেছিল বেজে জয়দেবের পদাবলী-গানে, সেই সুর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মধ্য দিয়ে একদিন জীবন্ত রূপ ধরেছিল শ্রীচৈতন্যে। সে সুরে প্লাবিত হয়েছে দেশ, বর্ষে-বর্ষে পৌষ-সংক্রান্তির দিনটিতে দেশের ছেলে বুড়ো সবার অন্তরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

"সজলনলিনী দল শীলিত শয়নে,
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে।"

আমাদের ট্রাকেও জয়দেবের সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছে। একজন বললেন—মকর সংক্রান্তিতে অজয়ে জোয়ার আসত, গঙ্গার সঙ্গে ছিল যোগ, স্রোত বইত। সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হল তো, দেবযান পক্ষ পড়ল। এ ক'মাস পুণ্য মাস বলে মনে করা হয়, ভীষ্ম অপেক্ষা করেছিলেন দেবযান পক্ষে মরবার জন্যে। পৌষ-সংক্রান্তির থেকে এই পক্ষের আরম্ভ মনে করা হয় বাঙলায়। তাই সারা বাঙলা জুড়েই এ দিনটিতে উৎসব হয়ে থাকে। রাঢ়দেশে সংক্রান্তির ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান পরম পুণ্যের। অজয় এবং কাটোয়ার গঙ্গার তীরে তীরে গ্রামের লোকেরা এসে জমে, মেয়ে পুরুষ ছেলেবুড়ো সবাই স্নান করে, বনভোজন হয়! কিংবদন্তী—জয়দেবের জরাতুর মা স্নানে যেতে পারলেন না, বড় দুঃখ মনে। জয়দেব অজয়ে পতিত-পাবনী জাহ্নবীর ধারা বইয়ে আনলেন, মা আনন্দে স্নান করলেন।

এ পাশে তর্ক উঠেছে কেন্দুবিল্ব গ্রামের নামটি নিয়ে। কেউ বলছেন—কেন্দু হচ্ছে কেঁদ ফল, আর, বিল্ব তো বেল। হয়তো এখানে এসব গাছে একসময় প্রচুর ছিল, তাই গ্রামের নাম হয়েছিল কেন্দুবিল্ব।

কেউ বা বলছেন—কেন্দুলি ব'লে আলাদা একরকমের গাছও আছে, বার্মা অঞ্চলে দেখেছি। হয়তো-বা সে গাছ এ অঞ্চলেও ছিল, তাকেই সংস্কৃত করে নেওয়া হয়েছে—কেন্দুবিল্ব।

নানা রকম তর্ক, নানা রকম আলোচনা চলছে, এক সময় সামনে-বসা ক'জন চেঁচিয়ে উঠল—'এসে গেছি, ওই যে কেন্দুলি।'

সাদা দিক্-রেখা। মহাসাগর যেন। মানুষে মানুষে এ কি অপূর্ব মেলা। মনটা দুলে দুলে উঠল।

* * * *

গাড়ি এসে থামল। গ্রামে ঢুকবার মুখ। এক পাশে তেলে-ভাজা, মিষ্টি, বিড়ির দোকান আর বেলুনের দোকান, এ পাশে একটা পানাপুকুর, বাঁশে কাঠে লম্বা ঘাট তৈরী হয়েছে। শেওলায় বিবর্ণ জল। সেই জলেই মেয়ে-পুরুষেরা হাত মুখ ধুয়ে নিচ্ছে। আমরা নেবে ভিতরে চললাম। জমিদার বাড়ি যেতে হবে।

গ্রামে ঢুকেও দেখি মেলা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মেলা আগে দেখিনি, ধারণা ছিল না। পূর্ববঙ্গের মেলা হয় কালীতলায়, হাটতলায়—খোলা মাঠে। এ মেলা দেখলাম তা নয়। গ্রামের অলি-গলিতে মেলা, ঘরের দোরে ছাঁচতলায় মেলা, সারা গ্রাম জুড়ে পথ জুড়েই মেলা। খুব মজা লাগল।

মেলা দেখতে দেখতে, পথের লোকদের ঠেলতে ঠেলতে এক সময় দেখি সামনে এক পাশে প্রকাণ্ড মন্দির, উলটো দিকে প্রকাণ্ড এক পিতলের রথ। কোন্‌টাকে দেখব! ভাবতে না-ভাবতে দেখি আগে পাছের তাড়া খেয়ে জমিদারবাড়ির বিরাট জীর্ণ দ্বার দিয়ে কখন

সদর-বাড়িতে ঢুকে গেছি। একটু সরু গলি মতো, পেরিয়েই বিশাল ফাঁকা প্রাঙ্গণ। ওপাশে তিনদিকেই দালান, এপাশে কুয়ো, শিবের মন্দির, চৌকোনো চত্তর, ছাউনি ঘেরা—সভাখানা। সেখানে চেয়ার টেবিল বেঞ্চ পাতা। জমিদার নন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে বসেছিলেন; এগিয়ে এলেন মহান্ত—জমিদার বাড়ির বিগ্রহের পূজারী। ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন—"সারা গাঁ জুড়ে মেলা, বাইরে তো আপনাদের থাকা সুবিধের হবে না। জমিদার বাড়ির ভিতরেই তাঁবু ফেলুন, মেয়েরা অতিথিশালার দোতলায় থাকবেন। ঘর খালি নেই।"

মহান্ত হেসে বললেন—খালি কি আর থাকবে? একটা ঘর খালি করিয়ে দিচ্ছি, মেয়েরা জিনিসপত্র রেখে আসুন গে। এখানেই চা খাবেন সবাই।

একজন লোক দিলেন, সঙ্গে গেলাম। এ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আরেক প্রাঙ্গণ—

উঁচু নীচু এবড়ো-খেবড়ো ঘাসে-ভরা, খানিকটা জমি, পশ্চিম দিকের উঁচু প্রাচীর অর্ধেক ধ্বসে পড়েছে। মাঝে এক সারি ঘর ছিল, ভেঙে চুরে এখন তা স্তূপ হয়ে উঠেছে। পুবে মন্দিরের দিকে দোতলা অতিথিশালা। এককালে বিরাট ব্যবস্থা ছিল। নীচে সারি সারি থাকবার ঘর। বাইরের বারান্দা মাটি-সিমেণ্টে এক হয়ে গেছে। দু'তিন জায়গায় উনুন জ্বলছে, বড়-বড় হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে, পরাত-ভরতি বেগুন আলু কফি রয়েছে—কিছু কোটা কিছু আ-কোটা। এক পাশের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। সামনের ঘরটা পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম—এক পলকে গ্রামের পুবদিকের পরিপূর্ণ দৃশ্যটি চোখে পড়ে গেল। সামনেই জয়দেবের রাধাবিনোদ বিগ্রহের মন্দির—হাত দশেক মাত্র তফাৎ। কাছে দূরে অলিগলিতে মেলা—ঝকমক সাজসজ্জা, কলকল মানুষের কলরব। দূরে গ্রামের প্রান্তসীমা, যত ঘর—সব খোলার চাল মাটির দেওয়াল। দু-একটি ডোবাও আছে। দাঁড়িয়ে এক পলক দেখে নিলাম। হাজির হলাম গিয়ে থাকবার ঘরে। "থুপ্‌থুড়ে বুড়ি তার ঝুরঝুরে বাড়ি"—'আবোল তাবোলের' ছড়া; এ দোতালা বাড়ি তারও বাড়া। টালির ছাদ জায়গায় জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, দরজা ভেঙে ঝুলে রয়েছে, আর সামনের দিকের এ বারান্দাটা চলতে গেলে দোলে। এরই মধ্যে ওদিকে খান তিন চারেক ঘর একটু অক্ষত রয়ে গেছে কী করে; লোকটি একটা ঘর সাফ করে দিলে। তালা দিলে, চাবি দিলে, বললে—যখনই বেরুবেন, তালা-চাবি দিয়ে বেরুবেন। এ তিনদিন কি আর লোকের শেষ আছে, বর্ধমান-বীরভূমের দূর দূর গাঁ থেকে লোক আসে, এ জায়গায় রাতের পর রাত কাটিয়ে যায়।

জিনিসপত্রগুলি নাবিয়ে রেখে স্বস্তি পেলাম। চা খেতে-খেতেই রাত নেমে এল। শুনেছিলাম রাতে এ মেলাতে বাউল-বোষ্টমের গান হয়। প্রধান আগ্রহ ছিল সে সব শুনবার। কিন্তু চা খেয়ে সবাই তাঁবু খাটাতে লেগে গেলেন, রান্নার যোগাড় শুরু হল। এদিকটা না সেরে রেখে ওদিকে গেলে রাতের থাকবার খাবার ব্যবস্থা আর হবে না। দু' একজন সান্ত্বনা দিলে—একটু রাত হলে বাউল গান হয়।

কে আবার ধুয়ো তুললে—পরশু দিন ছুটি আছে, কালকের দিনটা থেকে পরশু যাওয়া যাবে।

শুনলাম পরদিন ধলোট—অর্থাৎ বাউল বোষ্টমদের গানের শেষ দিন। সেদিন গান নাকি খুব জমে। আশ্বস্ত হলাম। বেলা দশটা এগারোটায় খেয়ে রওনা দিয়েছি, পুরো তিনঘণ্টা এসেছি, ট্রাকে, দেদার ঝাঁকুনি খেয়েছি, পেটের নাড়িভুঁড়িও হজম হয়ে যাবার কথা। ভাতের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। হী-হী হু-হু পৌষের হাওয়া বইছে, খোলা মাঠে থাকা চলবে না, তাঁবুও খাটানো চাই। বাস্তব প্রয়োজন না মিটতে আধুনিক মানুষ অবাস্তবের পিছনে ছুটতে চায় না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতে লাগল। এক ফাঁকে এলাম বেরিয়ে। জমিদার-বাড়ির অতিথিশালায় গ্রামের লোকেরা রান্না করছিল, দেখতে এগিয়ে গেলাম। এ পাশে একদল রান্না করছে, ওপাশে আরেকদল। মাঝে একদল; একজন মাঝারি গোছের লোক সেখানে রান্না করছে দু তিনটি বউ-ঝি তরকারী কুটছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করলে—কোত্থেকে আপনাদের আসা হচ্ছে বটে?

চোখে-মুখে আগ্রহ, বীরভূম, বর্ধমানের মিশোল ভাষা, কথায় গ্রামের টান। পরিচয় দিলাম, জিজ্ঞেস করলাম—এখানে কি সবারই জন্তে রান্না হচ্ছে?

—না মা, যার-যার দলে দলে রান্না হচ্ছে।

—জমিদারের দান?

—জমিদার কোথায় মা, এ সব গাঁ এক কালে দেবত্র সম্পত্তি ছিল, এ মেলাতে কত লোকজন আসে, অতিথিশালায় থাকে, রান্না করে, খায় দায়। জমিদারের সঙ্গে যোগ কোথায়?

বললাম—আচ্ছা, কী উপলক্ষে এ মেলা?

আমাদের অজ্ঞতায় ওদের সঙ্কোচটুকু গেল কেটে। হেসে বললে—বলেন কি, জয়দেব ঠাকুর, যিনি কবিতা লিখেছেন 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্'—তিনি যে এ তিথিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কবিতা আর মেলে না, ভাবতে ভাবতে গেলেন স্নানে। মস্ত ভক্ত ছিলেন, ভগবানের নামে কবিতা লিখছেন, ভগবান কি থাকতে পারেন! ঠাকুরের বেশ ধরে এসে কবিতা লিখলেন, পদ্মাবতীর কাছ থেকে চেয়ে ভাত খেলেন। এদিকে জয়দেব ঠাকুর ফিরে এসে শোনেন এই ব্যাপার, দেখলেন কবিতার মিল হয়ে রয়েছে, তখন দু জনের কী আনন্দ! স্বামী-স্ত্রী সেই পাতে একত্রে আহার করলেন।

একজন প্রৌঢ়া বলে উঠলেন—বেটাছেলের সঙ্গে কি মেয়ে-মানুষের কখনো এক সাথে খেতে আছে? স্বামী গুরুজন। কিন্তু এখানে এ তিন দিন আমরা মেয়ে পুরুষ এক পাতে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করে থাকি।

স্মিত লজ্জিত হাসিতে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রান্নার লোকটি বললে—এখানে এ তিন দিন ভাগবত পাঠ হয়, জয়দেবের কথা হয়, কত লোক ব'সে শোনে, ঐ উঠোনে।

কৌতুকে সভাখানার কাছে গিয়ে বসলাম। একটা করবী ফুলের গাছ, সামনে ছোট টেবিল, আর একটা চেয়ার পাতা। শতরঞ্চিতে বসে গেছে কত মেয়ে পুরুষ। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পুরাণ-কথা শোনাচ্ছেন। ভদ্রলোক সাধারণ শিক্ষিত মনে হল। খানিকক্ষণ বসে শুনলাম, বেশিক্ষণ শুনবার ধৈর্য রইল না। অলৌকিক কাহিনী, অলৌকিক ব্যাখ্যাই বেশি হচ্ছে। ফিরে আসতে আসতে সেই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ উন্মুখ শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। এই উত্তুরে হাওয়া সয়ে, শিশিরে-সিক্ত হয়ে এতগুলি লোক এ কী শুনছে! এত জানবার শুনবার আগ্রহ এদের, সে পিপাসা কী দিয়ে মেটানো হচ্ছে! কী পাচ্ছে এরা! [ক্রমশঃ।

# ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

## দুই

### বাঙালীর সৃষ্টি

কয়েকটা নৌকো এগিয়ে আসছে। বঙ্গোপসাগরের নীল জলের উপর দিয়ে তারা চলেছে। যেন নীল আকাশের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে এক ঝাঁক পাখী। নৌকোগুলোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তারা আসছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে। তারা এদিকে হামেশাই আসে। হঠাৎ তাদের একজনের চোখে পড়ল, সাগরের উপর নতুন ভূখণ্ডটা। সে সবাইকে দেখাল। সবাই হাসিমুখে তাড়াতাড়ি নৌকো চালিয়ে এগিয়ে এল ভূখণ্ডটার দিকে। উপকূলে নৌকোগুলো রেখে তারা তীরে এসে দাঁড়াল। নরম উর্বর মাটি। একজন হাতে করে খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। দেখে বলল, 'খু—ব সুন্দর মাটি। চাষ বাস হবে! বীজ পুঁতলেই আপনা-আপনিই গাছ আর ফসল।' মুখ তার আশার আলোয় ঝলমল করে উঠে। অন্যরা সবাই মাটিটা উৎসুক ভাবে দেখতে লাগল।

আর একজন বলল, আর দেশে ফিরব না। এখানেই থাকব। সত্যিই তারা আর দেশে ফিরল না। থেকে গেল নতুন ভূখণ্ডটিতে। বাঁধল ঘর। ঘরের পাশে তৈরী করল জমি। লাগাল গাছ। এমনি ভাবে সেই ভূখণ্ডে শুরু হোল চাষবাস। আর এই যারা নৌকোয় করে এল, তাদের বলে অষ্ট্রিক জাতি।

আর একদিন। দেখা গেল কালের পাতায়।

শিকারে বেরিয়েছে একদল লোক। দেখতে তাদের কালো ও খর্বকায়। বন্যজন্তুর পিছনে ছুটতে ছুটতে তারা বনের শেষ প্রান্তে পৌঁছুল। এসে দেখল, গঙ্গার উপর গড়ে উঠেছে নতুন এক দেশ। তীরে দেখল একটা গাছ। তারা সেই গাছের গোড়াটা কেটে এমন ভাবে সেদিকে ফেলল যে, সে দেশের সঙ্গে এদেশের একটা যোগসেতু হয়ে গেল। তারা নতুন দেশে এসে দাঁড়াল। তারপর সে দেশের মোহিনী মায়ায় ভুলে গিয়ে তারা সেখানে অষ্ট্রিক জাতির সঙ্গে থেকে গেল। এই জাতি দ্রাবিড়।

এমনি ভাবে একদিন এল আর একদল লোক। রঙ তাদের ফর্সা। গোল তাদের মাথা। তারাও দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক জাতির সঙ্গে বসবাস শুরু করল। আলপাইন এই জাতি।

কত না মানুষের ইচ্ছে। ক'টাই বা তার পূরণ হয়। তাই মানুষ এই পৃথিবীর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। নিয়মকানুনের দড়ি দড়ায় আবদ্ধ সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে মনে মনে কল্পনা করে নতুন সমাজের। সে সমাজে থাকবে না ঝগড়াঝাটি, খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি। আমাদের মন মুক্ত জীব, বন্ধন তার সয় না। মানুষ তাই বন্ধনহীন জীবন খোঁজে। এই বন্ধনহীন জীবন পেল অষ্ট্রিক দ্রাবিড়-আলপাইনরা বাংলার বুকে এসে। রক্তে তাদের স্বৈরাচারের মন্ত্রণা চিন্ চিন্ করে উঠল। তাদের কানে জীবনের স্পন্দন স্পষ্ট ভাবে ধ্বনিত হতে লাগল।

সাগর ভরাট হয়ে বাংলার সৃষ্টি হোল, কিন্তু তখন তার নাম বাংলা ছিল না। সেই জলো ভূমিতে এসে জুটল নানান জাতি, সে জাতির পরিচয় তখন বাঙালী ছিল না। এ হোল বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির জন্মের আগেকার কথা। উদার জলো মাঠের এখানে সেখানে নানা জাতীয় নানান আস্তানা গড়ে উঠেছে। একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খলার ভাব। সেই সব জাতি যেন তাদের জাতগোষ্ঠী ছেড়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তাদের গোষ্ঠীর নিয়মকানুনের দড়ি ভিজিয়ে এক অনিয়মের রাজত্বে এসে পৌঁছেছে। এখানে প্রাণের সহজ লীলা, মনের অসঙ্কোচ অভিব্যক্তি, জীবনের স্বচ্ছন্দ বিহার।

সত্যিই বাংলা মুক্তির রাজত্ব। কেন হবে না? এর জন্মলগ্নে ভগীরথের শঙ্খধ্বনি বেজেছিল। সেই শঙ্খধ্বনি দুস্তর বাধা উত্তীর্ণ করে সহজ শুদ্ধ প্রাণধারাকে নিয়ে চলে মহত্তম সার্থকতার অভিমুখে। সেই শঙ্খধ্বনিতে ঘোষিত হয় মানবতার জয়গান? বঙ্গভূমি সেই মানবতার পীঠস্থান। বাঙালী তার পূজারী। এসব পরের কথা। বাঙালীর এখনও জন্ম হয় নি। এ পর্যন্ত দেখলাম, কয়েকটা জাতি দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠে দল বেঁধে এখানে সেখানে বসবাস শুরু করল। ইতিহাসে এই দলের পারিভাষিক নাম কোম। এক কোম অন্য কোমকে সাহায্য করত। এমনি এক কোমের নাম আমরা জানতে পেরেছি। পুণ্ড্রকোম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লেখা আছে এই কোমটিরকথা।

যাক্,, এগিয়ে আসি কালের ধারায়। আর্য্যদের-ভারতে আগমন—পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে তাদের জয়যাত্রা। বর্ধিষ্ণু জাতি সপ্তসিন্ধু ছাড়িয়ে তার বিজয়রথ ছুটাল ভারতের দিকে দিকে। একদিন তাদের বিজয়রথ এসে পৌঁছুল বাংলার দুয়ারে। বাংলার দুয়ার চিরদিন সবার জন্যে খোলা। আর্য্যরা কিন্তু বাংলার দুয়ারে এসে ইতস্তত করতে লাগল। মনে তাদের ভয়—একাকার হয়ে যাবার ভয়, নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিয়ে এই গাছ, মাটি ও নদীর দেশে হারিয়ে যাবার ভয়। এখানে নেই ধর্মের কড়াকড়ি, আছে মানুষের বাড়াবাড়ি। তাই আর্য্যঋষিরা পথ ভুলে এখানে চলে এলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করলেন। এখানকার লোকদের বললেন পাপ, দস্যু। আর্য্যরা তাদের ভাষা নিয়ে হাসি ঠাট্টাও করতেন, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, ওদের ভাষা নয় তো পাখীর বুলি।

বর্ধিষ্ণু জাতি স্থিতিশীল নয়, গতিশীলতায় তার পরিচয়। আর্য্যরা উত্তর ভারত থেকে পূর্ব দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালেও একে একে বাংলার বুকে আসতে শুরু করল। প্রথম দিকে আর্য্যসমাজ থেকে যাদিগে তাড়িয়ে দেওয়া হোত, তারা বাংলার বুকে এসে আশ্রয় নিত। তারপর হয়তো কোনো বুড়ো ঋষি তপস্যার সুবিধের জন্যেই হোক, আর ধর্ম প্রচারের জন্যই হোক বাংলার বুকে আসতে লাগলেন। শেষের দিকে ক্ষত্রিয় রাজারা গোটা পৃথিবী দখল করবার ইচ্ছে নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরোতে শুরু করলেন ও বাংলার বুকে এসে হাজির হতে লাগলেন। বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি তাঁদিগে লুব্ধ করত। তাই তাঁরা কি ভাবে এখানে মান বাঁচিয়ে বসবাস করতে পারেন—ভাবতে লাগলেন।

সংসারে দেখা যায়, কয়েকজন লোক আসে প্রভুত্ব করতে। আর্য্যরাও প্রভুর জাত। তারা যেখানে গেছে সেখানেই হয়েছে প্রধান। বাংলাদেশে আসতেই তাদের আগে যে মিশ্র জাতি ছিল তাদের মধ্যে হোল আর্য্যাকরণের সূত্রপাত। আর্য্যজাতির আগে যে মিশ্র জাতি ছিল, সে জাতি আজকের বাঙালীজাতির মাতৃস্থানীয়। ঐ

মিশ্র জাতির সম্মিলিত প্রকৃতি বাঙালী জাতির মূল বৈশিষ্ট্যটি গড়ে তুলছিল। দেশের প্রভাবে তাদের মধ্যে একটি একরূপ প্রকৃতি দেখা গেলেও তাদের মধ্যে ভাষা, আচার, ব্যবহার ও সামাজিক জীবনের কোনো আদর্শগত ঐক্য দেখা দেয়নি। তাই বাঙালী জাতি তখনও জন্ম গ্রহণ করেনি। আর্য্যরা তাদের সঙ্গে মিশবার পর—

সে বিরাট ইতিহাস। আর্য্যরা তো প্রথমে তাদের সঙ্গে মিশতেই চাইত না। তবু ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে মেলামেশা চলতে থাকে। আর্য্যরা তাদের উন্নত সভ্যতা বাংলার জাতগোষ্ঠির মাঝে ছড়াতে থাকে; দেশকে তারা তাদের মতো করে গড়ে তুলতে চাইল। মানুষে দেশ গড়ে, না, দেশ মানুষকে গড়ে—ভাববার কথা। দু'টো ব্যাপারই ঘটে থাকে, তবে বাংলার অতীত ইতিহাসে পরের কথাটাই সত্যি হয়েছিল। আর্য্যরা আসবার আগে যে সমস্ত জাতি এসেছিল, বাংলা তাদিগে নিজের মতো করেই গড়ে তুলছিল। আর্য্যরা অন্যপথে চলতে চেষ্টা করল। কিন্তু মহাকালের বিচিত্র ও অমোঘ বিধানে তারা অন্যান্য জাতির সঙ্গে এক হয়ে বাংলার নিজের পথে চলতে বাধ্য হয়েছিল—যে পথে বাঙালী জাতি জগতের দরবারে এগিয়ে এসেছে এ কথার সাক্ষ্য দেবে পরবর্তী ইতিহাস।

[ ক্রমশঃ।

বেশ কিছুদিন পরে আবার তোমাদের আসরে এলাম আমার যাদুর ঝুলি নিয়ে। এবারে তোমাদের দেখাবো একটি খুব মজার টাকা অদৃশ্য করার খেলার কৌশল।

খেলাটার কৌশল খুব সহজ বটে, কিন্তু এ দেখলে ছেলে-বুড়ো সবাই হয়ে পড়ে বিস্ময়ে হতবাক। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে, এতে কোন কৌশল থাকা একেবারেই অসম্ভব।

যাদুকর একটি সাধারণ চাঁদি বা নিকেলের টাকা নিয়ে দেখালেন দর্শকদের। এর পরে একটি রুমাল নিয়ে তার ভেতরে ঐ টাকাটা মুড়ে একজন দর্শককে বললেন, তা চেপে ধরে রাখতে। যাদুকর মন্ত্র পড়া আরম্ভ করলেন অল্পক্ষণের মধ্যেই :—

"লাগ লাগ লাগ ভেল্কী লাগ
ভূত নাচানী বাদ্য চাই
এই টাকাটাই যাইনে পাক
মামদো ভূতের যমজ ভাই
উধাও হলেও আপত্তি নাই
ভূত নাচানী বাদ্য চাই···"

মন্ত্র পড়ে যেই না রুমালের কোণা ধরে হেঁচকা টান মারা সঙ্গে সঙ্গে সবাই অবাক!—কোথায় টাকা!—টাকার টিকিও পাত্তা নাই!

খেলাটার কৌশলটা মন দিয়ে শুনে নাও। যে রুমালটা দিয়ে টাকা জড়ানো হয় তার কোণে যাদুকর আগে থেকেই একটা টিনের চাকতি ( টাকার মাপের ) সেলাই করে আটকে রাখে বর্ডারের ভাঁজে ছবির মতন ক'রে। পরে রুমালের ভেতরে টাকা রাখার সময়ে কৌশলে হাতের চেটোতে টাকাটাকে লুকিয়ে ফেলে যাদুকর চাকতিশুদ্ধ রুমালের কোণটাকে রুমালের মাঝখানে এনে দর্শককে দিয়ে ধরিয়ে দেন আর সময় মতন হাতের চেটোয় লুকনো আসল টাকাটা চালান করে দেন পকেটে। এখন রুমালের কোণা ধরে ঝাঁকুনি দিলে কি হবে? রুমালের কোণায় লুকানো টিনের চাকতি তো আর কারও নজরে পড়বে না! তবে হাঁ, খেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে রুমালটা সরিয়ে ফেলা খুবই দরকার। তোমাদের মধ্যে যারা যাদুবিদ্যানুরাগী তারা আমার সঙ্গে এ, সি, সরকার, ম্যাজিক ভিলা, ১২।৬, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৩১ ঠিকানায় জবাবী কার্ডে চিঠি দিতে পার। আমার ফোন নম্বরটাও জেনে রাখো—চার ছয়-ছয় এক সাত ছয়।

## ব্যাঙের লাথি

জয়া সরকার

লেখাপড়া না জানলে—ব্যাঙে লাথি মারে,
ম্যাও মাসী রাতে এসে রোজ চাপে ঘাড়ে।
কাছে গেলে প্যাঁচা খুড়ো শুধু করে তাড়া,
দশা দেখে হুলো বুড়ো হেসে হয় সারা।
ল্যাজ তুলে চিক্-চিক্ লুটে খায় ছোলা,
ক্যাবলার ভাগে থাকে শাঁস ছাড়া খোলা।
আরশোলা যেচে এসে থু থু দেয় গায়,
কানামাছি দূর থেকে দাঁত সিটকায়।
জু-জু বুড়ী ফাঁক পেয়ে চুপ ক'রে এসে,
ছেঁড়া কাঁথা চাপা দিয়ে জোরে ধরে ঠেসে।
আর কিছু জানি না'কো এই ব'লে যাই,
সাবধানে থেক' সব খোকা-খুকু ভাই।

# কবি কর্ণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৩৪। এইভাবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-উৎসব শেষ হয়ে গেল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এতে ঘটলো মহেন্দ্রের যজ্ঞ-ভঙ্গ-পীড়া। তাঁর যেন মাথা ঘুরে গেল। তাঁর সেই রোগ শান্তির উদ্দেশ্যে তিনি যে একটি অতিবৃষ্টি-লক্ষণ কুরীতির প্রণয়ন করেছিলেন, অধুনা সেটি সবিশেষ বর্ণিত হচ্ছে।

৩৫। সুরসভায় তখন সমাসীন ছিলেন পুরন্দর। হঠাৎ রসভঙ্গ হওয়াতে বিমনা হয়ে গেলেন তিনি। এত স্পর্দ্ধা! আমার যজ্ঞে কিনা ব্যাঘাত ঘটায়? কুটিল আক্ষেপে আগুনের মত যেন জ্বলে উঠলেন তিনি আকাশে। অনল্প পরুষ ভাষায় গুঞ্জন করে উঠল তাঁর তপ্ত মনের ক্রোধ।

৩৬। "কি আশ্চর্য্য ছিঃ, পশুর মত কতকগুলো পশুপালক গোপ···, একটি শিশুর কথায় কিনা নেচে উঠল? রসাতলে পাঠাল আমার যজ্ঞকে। বাণীশ্বরী যাঁর স্তব করে থই পান না সেই হেন আমার কিনা উপাসনা ছেড়ে দিল গোপেরা? আমাকে গণনার মধ্যেই আনলো না। এ অপরাধ। এ তাদের মদান্ধতার চরম, আমারো অন্ধতার চরম। ভালো, ভেবেছ নির্ভয়ে আছো, আভীরের ঐ কূটবুদ্ধি নিয়েই থাকো; দেখি কেমন করে একটি বালক শতমন্যুর ক্রোধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে, প্রচণ্ড অপরাধের হাত থেকে তোমাদের বাঁচায়, আয়ুষ্মান হয়, তোমাদের মঙ্গল করে।"

৩৭। ক্রোধের প্রতিঘাতে মন যার ভাঙ্গে, সে অনেক কিছুই চিন্তা করে। অতএব ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের সহস্রলোচনে ভেসে উঠল মহাপ্রলয় সংঘটনকারী বৃহৎ দেহধারী মহামেঘ-দের মূর্তি। নিমেষে তিনি তাঁদের বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। সংবর্ত্তকাদি মেঘদল যখন তাঁর অতি প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে আজ্ঞাবাহী কিঙ্করের মত তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, ইন্দ্রদেব তখন বললেন,—

৩৮। "গতিরাগ-রসিক মেঘদল, বিশ্বজয়ী ধারাবর্ষণ আপনাদের কীর্ত্তি। আপনাদেরি বলার্জ্জিত মদগর্ব্ব পুষ্ট করে আমার ওজঃ-শক্তি। মৎপ্রীত্যর্থং আপনারা বর্ত্তমান। অতএব আজ আমার আদেশ অনুযায়ী কার্য্যসাধন করে কৃতার্থ করুন আমাকে। বিলম্ব না হয় যেন। একটি প্রদেশ কেন, ইচ্ছা করলে বিশ্ব সংহার করতেও পারেন আপনারা। অতএব ধারাবর্ষণ করে ধ্বংস করুন ব্রজনগর। যেন কেঁপে ওঠে ভুবনকোষ।"

৩৯। ইন্দ্রাদেশ শিরোধার্য্য করে বন্ধনমুক্ত সংবর্ত্তক নামক "গণ" তখন যেন নিজের দর্প ফলিয়েই আরম্ভ করে দিলেন প্রক্রিয়া।

প্রথমেই, গগন-সরোবরে-ভেসে-চলা এক বলীয়সী শৈবাল শ্রেণীর মত দেখা দিলেন এক কাদম্বিনী; অমনি মলিন হয়ে গেলেন কিরণমালী। পরমুহূর্ত্তেই দিগ্‌বলয় অন্ধকার করে ধেয়ে চলে গেল আর একটি মেঘশ্রেণী,···রসাতলের তলদেশ থেকে লাফিয়ে উঠে ঘুরতে ঘুরতে যেন ছুটে চলে গেল গরবিনী যত নাগ-নাগরীর নিঃশ্বাস ধূমের ঘূর্ণি।

৪০। তারপরেই বিলম্ব না করেই দেববর্ষ্ম রোধ করে একসঙ্গে খেলতে লেগে গেল দাম্ভিক কতকগুলো "অচ্ছোদ"। মাটি খোঁড়ার খেলায় যেন মত্ত হয়ে উঠল একদল হাতী। সঘনে ঘন হয়ে জমে যেতে লাগল মেঘ, মেঘের পরে মেঘ। সে যেন এক মৈনাকের কায়ব্যূহ রচনার ছবি,···শতকোটি বজ্রাঘাতেও অক্ষুণ্ণ যাঁর পক্ষ।

৪১। এবং ঠিক সেই সময়েই আবির্ভূত হল···'ধারাধর'—মেঘদলের এক বিরাট অতিকায় সঙ্ঘ। কী অসংখ্য তাদের শিখর-শিখার খর মূর্ত্তি। যেন ঘুরতে ঘুরতে, বাড়তে বাড়তে, খরবেগে চতুর্দ্দিকের অন্য পাহাড়গুলোকে টানতে টানতে, ছুটে এল লোকপ্রসিদ্ধ "লোকালোক-পর্ব্বতের বিপুল মালা। সেই অতিকায় মেঘসঙ্ঘ জ্যোতিশ্চক্রকে নিভিয়ে দিয়ে যেন বহির্লোককে এমন কি অন্তরলোককেও তমোময় করে তুলল। কী নিবিড় সেই তিমির-সংঘাত,···যেন শত্রুর খরতর পরশুরও তা অচ্ছেদ্য। মনে হল তমোভূমির মতই যেন বিপুলভাবে তিনভুবনের তামসিকতা বাড়ছে।

৪২। মনে হল এই জগদণ্ড-ভাণ্ডটিও যেন সীমাহীনভাবে মসীময়। কিন্তু তবুও আশ্চর্য্য সেই তিমির-সংঘাত এতটুকুও অনিষ্ট ঘটাতে পারল না ব্রজপুরের। সে ব্রজপুর কিরণোদ্ভাসিত হয়েই রইল শ্রীমান নন্দনন্দনের চরণনখরের চন্দ্রিকায়।

৪৩। ঠিক্ সেই সময়ে দশদিক সঙ্কুচিত করে দিয়ে, জগৎটাকে যেন পূর্ণান্ধ জনতায় পরিপূর্ণ করতে করতে ব্রজপুর আক্রমণ করলেন প্রসিদ্ধ সম্বর্ত্তক-মেঘ। যেন দশম দ্রব্য অন্ধতামস। বেগের সেই বারান্তরহীন আবেগে অকস্মাৎ যেন ঘুণবিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের আবরণ ভেদ করে গলে ঝরে পড়তে লাগল··জল,···বিন্দু বিন্দু জল। বিন্দু-জলেই মহাপঙ্কিল হয়ে উঠলেন মহী। কী অনন্তবেগশীল সেই বিন্দু! গর্জ্জা-মহাবটের শাখা-প্রশাখায় রুদ্ধ গতি হয়ে, সেই বিন্দুগুলি তাদের বিন্দুত্ব পরিহার করে, গ্রহণ করল ধারাভাব। মহাবটের বিরাট ঝুরির মত ধারাভাব।

৪৪। সম্বর্ত্তকমেঘের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণের দুর্দ্দান্ত আঘাতে ক্ষুভিত হয়ে উঠল বৃন্দাবনের ধেনুর পাল। থর থর থর প্রচণ্ড কম্পনে শিউরে উঠল তাদের পিঠ। বাছুরদের তারা টেনে নিল গলকম্বলের বলয়-ছায়ায়। তারপরে গলা লম্বা করে চাইতে চেষ্টা করল আকাশের মেঘের দিকে। কিন্তু পারল না। মাথা তাদের নোয়াতেই হল, নয়ন তাদের নীচু করে বাঁকাতেই হল, পুচ্ছলোম সটান করে স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা তাদের করতেই হল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা-ও চলল না। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে, কাতরচোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তারা শরণ নিতে ছুটল কৃষ্ণের চরণে।
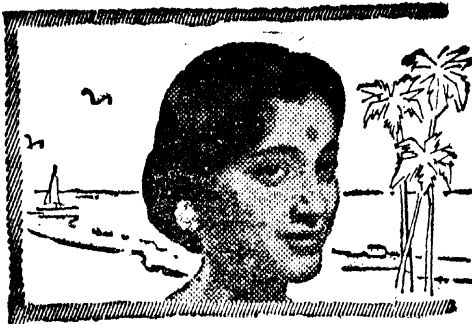
দিনে দিনে
ত্বকে নবীন লাবণ্য আসে
নতুন রেক্সোনার পরশে
যতবারই মাখুন রেক্সোনার অবাক পরশ যেন প্রতিবারই আপনার ত্বকে নবীনতা এনে দেয়। ফেনিল রেক্সোনায় ক্যাডল আছে, বিশেষ ধরনের এই সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক তেলটি ত্বকের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যায় আর ত্বককে কোমল ও মসৃণ করে তোলে, চেহারায় আপনার লাবণ্য আনে। মিষ্টি গন্ধ ভরা রেক্সোনা প্রতিদিন স্নানের পক্ষে আদর্শ সাবান। একবার মাখলে আপনি এর গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে প্যাবেন।
Rexona
GOOD FOR YOUR
নতুন রেক্সোনার নতুন মোড়ক,
নতুন আকার আর নবীন সবুজ
রং আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।
নতুন রেক্সোনা-
ত্বকের সেরা যত্নের সহায়ক
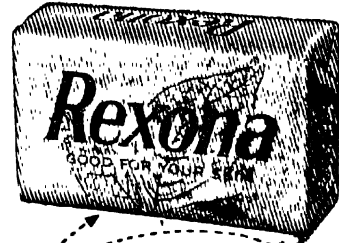
ব্রজের বৃষদের শৃঙ্গকোটিতে ; ও গণ্ডশৈলের মত অতিবিশাল ককুদে বিঁধতে লাগল সেই ধারাস্রাবের শর। কিন্তু হেরে ভেঙে পড়েও সেগুলো ধারণ করল জলকণার মূর্ত্তি। তারপরেই কী তাদের রোষ! স্ফটিক শিলার মত ব্রজবৃষভদের গরিষ্ঠ পৃষ্ঠে কী তাদের লাফালাফি, কী দাপাদাপি! কী মার! শেষে আঘাতে আর্ত্ত হয়ে বৃষেরাও ছুটল শরণ নিতে কৃষ্ণের চরণে।

৪৫। তারপরেই আরম্ভ হল মুষলধারে বর্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে যেন বিস্ফোরণ। স্থূল স্তম্ভের মত স্থূলধারায় ঝরে পড়তে লাগল প্রচুর বর্ষণজল। আতঙ্কে চকিত হয়ে উঠলেন ব্রজের পুরজনেরা। একি তবে অকাল-প্রলয়ের অতর্কিত আক্রমণ? কেমন যেন সবল ভাবে বলহীন হয়ে গেলেন সকলে। চঞ্চল বেগ তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল জনাসন্ধকর কৃষ্ণের নিকটে। তাঁরা বললেন,—

"কৃষ্ণ, উৎসব-রক্ষক তুমি থাকতে আমাদের কিনা পড়তে হল এই বিপদ্বিপদ্সঙ্কটে? গোকুলের তুমি হৃদয়নাথ, দেরী কোর না, রক্ষা কর গোকুলকে।

ঐ দেখ, ক্রুদ্ধ সর্পের জিহ্বার মত লক্ লক্ করে বিদ্যুৎ-বীথি কাঁপছে, নগরের গাছগুলোর গোড়া খসিয়ে দিচ্ছে শিলার গোলা, সমুদ্র-বহ্নির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে আকাশ-ভাঙা বর্ষার বজ্রবহ্নি।

মেঘের দুরন্ত গর্জ্জন বাড়ছে। থামের মত স্থূলধারায় ঝরছে জল। উধাও হয়ে গেছে পৃথিবীর নতোন্নত পরিচয়। জলের এই অপার ব্যাপার রূপ নিচ্ছে প্রলয়-সমুদ্রের।

আর আমাদের সুরভিদের কী দশা হয়েছে একবার চেয়ে দেখ। শিলার আঘাতে ওরা বিকল হয়ে পড়েছে। কোলের কাছে বাছুরদের টেনে নিয়ে, গা দিয়ে গা ঢেকে তোমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ভিজে চোখের পাতা···কাঁপছে, যেন বলছে,—

'একদিন দাবাগ্নি থেকে বাঁচিয়েছিলে, এখন সলিল থেকে আমাদের বাঁচাও,···এখনি।'

আর ঐ দেখ, বৃন্দাবনের বৃষরাজদের অবস্থা। বিরাট কুঁজগুলো দিয়ে পাথরের মত বড় বড় শিলগুলোকে মুক্তোর দানার মত গুঁড়োচ্ছে, আর কী নিদারুণ ক্রোধে আর কষ্টেই না মাথা উঁচিয়ে মেঘের দিকে চাইছে।

কী অদ্ভুত বৃষ্টিপাত! মহাপ্রলয়ের জন্যেই যেন জন্মেছে। অনর্থের পসরা নিয়েই যেন ছুটেছে। কৃষ্ণ, তোলো তোমার মহাবাহু, আমাদের রক্ষা কর! তুমি ছাড়া আর পরিত্রাতা নেই। আমরা শরণার্থী, আমাদের আশ্রয়হীন কোরো না।'

৪৬। কথা শুনে কানের পাশে যেন চলে এল শ্রীকৃষ্ণের চোখ। ধেনুদের দেহে সম্পূর্ণ অবসাদের লক্ষণ দেখে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন, এবং নিমেষে বুঝতে পারলেন, এই অতি বর্ষণের মূলে রয়েছে ইন্দ্রের ক্রোধ। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসবাণীর এবার অনুচরী হলেন অকম্পা অনুকম্পা। তিনি বললেন,—"তোমরা ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, এ উপদ্রব ক্ষুদ্র,···অনেকটা···ক্ষিদের অসুখের মত।"

সঙ্কল্পের কল্পনামাত্রেই অনর্থের অনর্থকত্ব প্রতিপাদন করা যাঁর পক্ষে অতি সহজ, ভগবান সেই শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু বাসনা হল, এমন একটি লীলাবিশেষ তিনি প্রকট করবেন তাঁর কুসুম-সুমধুর দেহে, যা আকল্প ভূষণ হয়ে থাকবে ভক্তজনের, যা চিরদিন সঙ্গীত হয়ে থাকবে সুরনরকিন্নরের, এবং যা নিঃশেষে ছিন্নমূল করে দেবে ইন্দ্রদেবের প্রমত্ততা। এই বাসনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর যেন মনে হতে লাগল এত তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁর যেন আর কোমর বাঁধবার দরকার নেই এবং সত্যই তিনি যেন এক অবহেলা-লোল-লাবণ্য-সরোবরে স্নান করছেন আনন্দে।

তারপরে হঠাৎ যেন কৃষ্ণদেহের অভ্যন্তরে লাফিয়ে উঠল চিত্ত। চিত্তের বাসনা হল,···ছোট্ট ছেলে যেমন করে খেলতে খেলতে ব্যাঙের ছাতা ছেঁড়ে, হাতী যেমন করে ঘাসের চাপড়া ছেঁড়ে, তেমনি করে ঊর্দ্ধে ধারণ করতে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতটিকে। এবং আশ্চর্য, অমনি ব্রজলোক প্রত্যক্ষ দেখতে পেল, শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত বাঁ হাতের মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন, আর তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনি এক বিপুল চড়চড়ে গুম্‌গুমে প্রণাদে হঠাৎ ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠছে একপাল কিশোর কেশরী।

সহজ নয় এই কেশরী প্রণাদ। এ প্রণাদে ধ্যানীদের ধ্যান ছোটে, রসাতলের প্রৌঢ়া বাসুকি-নাগবধূর মধুপানোৎসবের নবলীলায় হঠাৎ বাধা পড়ে, থেমে যায় দিগ্বারণেন্দ্রদের দান-ক্ষতি। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর অধিকার করে যখন ঘুরতে থাকে সেই প্রণাদ তখন তা অমেয়।

ওদিঃ—কণ্ডুল একখানি করপদ্মের লীলাসৌজন্যের আনন্দিত সমুল্লাসে অদ্ভুত এক হাস্য-মূর্ত্তি ধারণ করল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের হর্ষ-প্রকর্ষ। তাঁর শিখর-শোভন, আবেগ-চঞ্চল মহীরুহের সমারোহ থেকে বৃন্তচ্যুত হয়ে ঝরণার মত মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল পুষ্পের বরিষণ,···ঝরিয়ে নিপাত করে দিয়ে বজ্রপাণির যশ।

আর ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে বেড়ে উঠতে লাগল তাঁর মহীরুহ-সঙ্ঘ। খরতর শিখর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করতে লাগল অভ্রপংক্তি, যেন তারা পরাস্ত করতে চায় নন্দনের মন্দারদের। এবং ক্রুদ্ধ কেশরীরা গজরাজ-ভ্রমে তাদের বক্র তীক্ষ্ণ নখাগ্র দিয়ে পুঞ্জীভূত মেঘরাশিকে নিদারুণ ভাবে বিদীর্ণ করতে খেদিয়ে দিতে লাগল সর্ব্বত্র।

বামকরতলে কৃষ্ণ যখন উৎক্ষিপ্ত করলেন পর্ব্বতরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে তখন—"আশ্চর্য্য, একি হোলো, কে আবার আড়াল করল ব্যোম?"—ভাবতে ভাবতে ভয়ে কেঁপে উঠলেন কৈলাস, আতঙ্কে শিউরে উঠলেন সুমেরু, লাফিয়ে আকাশ থেকে গঙ্গায় ডুব দিলেন ত্রস্ত দিগ্‌বারণের দল।

তারপরেই গোকুলের ভক্তজনেরা প্রীতির প্রবাহ বইয়ে দেখতে পেলেন,—মুরারাতি কৃষ্ণের শ্রীবাহুতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত রূপান্তরিত হয়ে গেছেন একটি বিরাট রত্নছত্রে,···যার দণ্ডটি মরকত, যার চতুষ্প্রান্তে বৃষ্টিজল সৃষ্টি করছে মুক্তার ঝরণা, যা ঝঞ্ঝার অকম্প্য, যা বজ্রেরও অভেদ্য।

৪৭। ব্রহ্মা-বৃহস্পতি-বিশ্বকর্মারও অনির্ব্বচনীয় যাঁর চারুচরিত, তিনি তখন তাঁর বাম করতলে ব্রজধামের গিরিশ্রেষ্ঠকে উল্লসিত করে, প্রণয়ন করলেন তাঁর বিশ্বাস-সিঞ্চিত অভয়বাণী,—

"মাতৃদেবীর শঙ্কার কোনো কারণ নেই, পিতৃদেবের চিন্তারও কোনো প্রয়োজন নেই। হে সুহৃদ্‌গণ, সন্দেহহীন হও। আমার হাত থেকেও খসে পড়ে যাবেন না এই গিরি। যাঁকে তোমরা সাক্ষাৎ দর্শন করছ, দেহধারণ করে যিনি স্বীকার করছেন অর্চ্চনা, তাঁর পক্ষে কি আকাশে ভর দিয়ে দাঁড়ানো এতই দুষ্কর?

ইনি আকারে মহান্‌। ইনি গিরি, তাই স্থাবর। কিন্তু ইনি অলৌকিক। সহজাত এঁর দেবত্ব। অতএব ইনি আমাদের তর্কের অগোচর। এঁর অণিমা-সিদ্ধি দর্শনীয়; আর তাই এত লীলাভরে এঁকে আমি উল্লসিত করতে পেরেছি। এই গিরি স্বেচ্ছাময়।

অতএব ব্রজবাসিগণ, আপনারা এর অধোদেশে নিজের নিজের গোধন ও পরিজন নিয়ে প্রবেশ করুন, নিবাস করুন স্বচ্ছন্দে, সুখী হোন। আশা করি, গোপনগরও এই সত্তজন্মা বিকটিকে আপনারা অভিন্ন করে দেখবেন। জেনে রাখুন, জগতের নিখিল জন্মধারীরা স্বস্থানে সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করেই বাস করেন নারায়ণের উদরে। সেখানেও ঘটে না এমন কৌতুক।

উৎপাটনের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে পাড় দিয়ে দৃঢ় হয়ে জমে উঠেছে মৃত্তিকার প্রাকার। সেখানে প্রবেশপথ পাবে না বর্ষার জল। স্বেচ্ছায় কানন-বিহার ছেড়ে সকলকে নিয়ে চলে আসুন এই গিরি-গর্ত্তে। আশা করি আপনারা বিস্মৃত হবেন নিজেদের বিলাস-ভবনেরও সুখ।"

৪৮। গলায় যেন মণিমাল্য পরিয়ে দিল গোবর্দ্ধনধারীর অমৃত-বাণী। নিমেষে শান্ত হয়ে গেল ব্রজবাসীদের হৃদয়। আশ্বস্ত হলেন সুহৃদেরা। পুত্র, কলত্র, পুরোহিত, ধন, গোধন, এমন কি গোলাঘর তুলে নিয়ে, আনন্দে ডগমগ করতে করতে তাঁরা প্রবেশ করলেন গিরি-গর্ত্তে। কোলাহলের কি মুখরতা! প্রবেশ করেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন সকলে। কী অতুল সৌন্দর্য্য দীপ্ত গিরিগর্ত্ত!

৪৯। এ যেন এক স্বর্গে প্রবেশ। যেন স্তুতলাদি নিরাবিল এক বিল-স্বর্গে বাস। স্থানটি যেন বিশ্বভুবনের একটি কর্ণকুণ্ডল। প্রান্ত-পর্য্যন্ত দূরে মিলিয়ে গেছে কাঁচা যবের মত অনুপম তৃণ-ক্ষেত্র, দুলছে মাননীয় মরকতের দ্যুতি। বিমল সরোবর। সরস করে রেখেছে স্থানটিকে। কী নেই সেখানে? গো এবং গোপদের শান্তি-রক্ষণ ও কান্তি বর্দ্ধনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজনীয় সবই রয়েছে সেখানে। পর্য্যাপ্ত ভোগের উদ্দেশ্যে ভোগসামগ্রীর বিরাট সংগ্রহ। দেখে সকলের চোখ উঠে গেল কপালে, ঠোঁটে একটু হাসিও নাচলো।

শাবলাঢ্য বহির্মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল ধেনুর পাল, আর তাদের সামনে রাখালেরা; তাদের পুরোভাগে ব্রাহ্মণ-পরিবৃতা হয়ে দল বেঁধে বসলেন পুরস্ত্রীরা। তাঁদের মধ্যে কোথাও স্থান হল রাধা প্রভৃতি কুলবধূ-মণ্ডলীর, কোথাও কন্যাদের। এবং কৃষ্ণের দুই পাশে বসলেন সখাগণ, বটুও। নন্দ-বলরাম নন্দ যশোদা বসলেন কৃষ্ণের সম্মুখে।

৫০। ব্রজনগরীর চেয়েও গরীয়ান্‌ এক কৌতুকের অনুভূতি এল ব্রজবাসীদের হৃদয়ে। কোথাও নেই আতঙ্কের লেশ, এ যেন এক আনন্দের দেশ। এখানে এসে কোথায় যেন 'ভাঁদের ভেসে গেল ঐ প্রলয়-ঘন ঘটার অবসাদ। যেমন ইচ্ছে ঘুরতে ফিরতে লাগলেন সকলে, কিন্তু প্রতিক্ষণ প্রত্যেকেই অনুভব করতে লাগলেন···তাঁরই দিকে চেয়ে আছে গিরিধারীর আবেশ ভরা সুনয়ন।

[ ক্রমশঃ।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

**অধামার্গব**—অপামর্গ, আপাং গাছ ॥ রাজনি॰ ॥

**অধোঘণ্টা**—অপামার্গ, achyrathes aspera ॥ রত্না॰ ॥ শীষের নীচে ঘণ্টার মত ফল।

**অধোমুখ**—অনন্তমূল লতা, hemidesmus indicus.

**অধোমুখী**—গোজিহ্বা লতাবি॰, premna escubenta. । রাজনি॰ ।

**অধোবির্ণী**—ব্রাহ্মীশাকবি॰ herpestis monneiria, জল নিম।

**অধ্যণ্ডা**—কপিকচ্ছু, শূকশিম্বী বা আলকুশী, ভুঁই আমলা, ffacouritia cataphracta. । রত্না॰ । কুলেখাড়া । মদনপাল । অজশৃঙ্গী, carpopogon puriens. ॥ অম॰ ॥

**অধ্বগভোগ্য**—বৃক্ষ—আম্রাতক। আম্রাত, আমড়া, spondias mangifera । ত্রিকাণ্ড॰ ।

**অধ্বজা**—স্বর্ণলীবৃক্ষ, স্বর্ণপুষ্পীবৃক্ষ, সোনাগাছ।

**অধ্বশল্য**—অপামার্গ, আপাঙ গাছ । রাজনি॰ ।

**অধ্বান্তশাত্রব**—শ্যোনাকবৃক্ষ, শ্যোনাগাছ bignonia indica, উইলসন মতে cassia fistula ( cathartocarpus fistula pers ) ইহা ছায়ায় প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

**অনঃশুমংফলা**—কদলী, কলাগাছ musa paradisiaca.

**অনডুজ্জিহ্বা**—গোজিহ্বা ( অনন্তমূল ), elephantopus scaber । রাজনি॰ ।

**অনন্ত**—গৌরসর্ষপ, শ্বেতসরিষা, রাইসরিষা।

**অনন্ত**—সিন্ধুবার, নিসিন্দাগাছ, vitex trifolia

**অনন্তমূল** } **অনন্তা** } লতাজাতীয় বনৌষধিবি॰। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম hemidesmus indicus, Roxburge তাঁহার Flora Indiaতে ইহাকে aselepias pseudosarsa নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অর্ক-গোত্রীয় ( asclepiadacae ) বৃক্ষ। পর্যায়—ধবালা, শারিবা, গোপী, গোপীকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, শ্যামা, গোপবল্লী, লতা, আস্ফোতা ও চন্দনা।

**অনন্তমূলী**—রক্তত্বরালতা।

**অনন্তা**—অনন্তমূল। পর্য্যায়—দূর্বা, স্বর্ণক্ষীরী, শ্বেত ও নীল দূর্বা, হরীতকী, আমলকী, গুরুচী।

**অনল**—১ অগ্নিচিত্রক, রক্তচিত্রক, রাঙচিতা plumbago zeylanica and rosea ॥ রাজনি॰ ॥ ২ ভল্লাতক, ভেলা Semicarpus anacar—dium ॥ রাজনি॰ ॥

**অনলপ্রভা**—জ্যোতীষ্মতীলতা বা লতাকটকী cardiospermum halicacabum ॥ রাজনি॰ ॥

**অনল-বিবর্ধিন**—কর্কটিকা, কাঁকুড় গাছ।

**অনলি**—বকবৃক্ষ, বকফুলের গাছ agati grandiflora ॥ ত্রিকাণ্ডব ॥

**অনাক্রান্তা**—কণ্টককারিকা solanum jacquini ॥ রত্নমালা ॥

**অনার্যক, অনার্যজ**—অগুরু কাষ্ঠ ॥ রাজনি॰ ॥

**অনার্যতিক্ত (-ক)**—কিরাততিক্ত বা চিরতা gentiana chirata ॥ অম॰ ॥

**অনিক্ষু**—ইক্ষুসদৃশ কাশবি॰, নাটা আক, নটা ঘাস saccharum spontaneum ॥ রত্নমালা ॥

**অনিমক**—মধুক বৃক্ষ, মহুয়া গাছ।

**অনির্মাল্যা**—পৃক্কা বা পিড়িং শাক ॥ রত্না॰ ॥

**অনিলঘ্নক**—বিভীতক বৃক্ষ, বহেড়া গাছ terminalia belerica Roxb. ॥ রাজনি॰ ॥

**অনিলান্তক**—১ ইঙ্গুদী বৃক্ষ, অঙ্গারপুষ্প ॥ রাজনি॰ ॥ ২ জীয়াপুতি বৃক্ষ, পানমরিচ গাছ।

**অনিষ্টা**—নাগবলা বৃক্ষ sida-alba Lin. ॥ রাজনি॰ ॥

**অনুকূলা**—দন্তীবৃক্ষ, croton polyandrum.

**অনুপুষ্প**—শরবৃক্ষ, খাগড়া গাছ saccharum sara Roxb. ॥ শব্দ॰ ॥

**অনুলোমন**—হরীতকী ॥ ভাবপ্র॰ ॥

**অনুষ্ণ**—উৎপল 'nymphaeca caerulea ॥ রাজনি॰ ॥

**অনুষ্ণবল্লিকা**—নীলদূর্বা, panieum dactylon ॥ রাজনি॰ ॥

**অনূপজ**—আদা দ্র॰।

**অন্তকোটরপুষ্পী**—নামান্তর—অণ্ডকোটরপুষ্পী। নীলবুহ্না, ছাগল-বেঁটে। ইহার ফুল পাতার ভিতর ঢাকা থাকে।

**অন্তঃসলিলা**—নারিকেল, তরমুজ প্রভৃতি।

**অন্তর্গর্ভ**—কলাগাছ, কুশ। ভিতরে মাইজ বা শীষযুক্ত।

**অন্তমূল**—[ হি॰ অন্তমূল, জংলী—পিকৃরাল, ও॰ মেদী ] অর্কাদিবর্গের লতাবি॰ tylophora asthmatica.

**অন্ত্রপাচক**—ভেষজবি॰ ; aeschynomene grandiflora.

**অন্ত্রমোড়া**—আবর্তনী, আঁতমোড়া, helicteres isora. ফলের গায়ে অন্ত্রের মত পাক দেওয়া আছে।

।রিকা, অম্রবল্লী—মহিষবল্লীলতা ॥ রাজনি' ॥ সোমবল্লীলতা ॥ বৈত্ত-প' ॥

মূষিকা—দেবাতাড় বৃক্ষ ॥ শব্দচ' ॥

ল—শিরীষ বৃক্ষ acacia sirissa ॥ শব্দচ' ॥ ইহার পুষ্প দেখিলে বিয়োগী অন্ধপ্রায় হয়।

।রং—বেতগাছের মত calamus species. বেত ও ফলের ন্যায় রঞ্জন রং—red resin—East Indian dragonis blood. আসল অপ্‌রং অন্য গাছ (dracoena) হইতে পাওয়া যায়। ভারতে এ গাছ জন্মায় না।

পাঙ্গ—অপামার্গ দ্র'।

রাজিতা—[ স' অশ্বভরা, অস্ফোত, মরা' গোকর্ণী, কষ্টী, পনটরী, গুজ' গরণী, তে' নীলগণ্টনা : তা' কক্কোনম্ কদিঃ, হি' বিষ্ণুক্রান্তি, সফেদ কোয়ল, নীলীকোয়ল লতাবৃক্ষবিশেষ : নীল বা শ্বেত ফুলের গাছ, clitoria ternatea. পর্যায়—আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা, গবাক্ষী, অশ্বখুরী, শ্বেতা, তভণ্ডা, গবাদনী, অদ্রিকর্ণী, কটভী, ই' ॥ অম' রত্নমালা' শব্দ' ॥

পশোক—অশোক বৃক্ষ ॥ আপ' ॥

পাকশাখ—আদা দ্র'।

পালক—সোঁদাল গাছ cassia fistula.

পামার্গ—[ স' অপামার্গ, হি' লাটজিরা, বোম্ব' ও মরা' অঘাড়, পঞ্জা' কুত্রি, তে' অপ থারেরাজম, তা' ন-যুবিভট ] আপাঙ achyranthus aspera বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পর্যায়—ময়ূরক, খরমঞ্জরী।

প্রপুষ্প—[ মরা' ফনস ] পনস বৃক্ষ, উডুম্বর বৃক্ষ, jack tree, artocarpus integrifolia

প্রেতরাক্ষসী—তুলসী। আপ'।

রকসা—১ ভূম্যামলকী, ভুঁই-আমলা, ২ ঘৃতকুমারী।

দক্ত—নিচল বৃক্ষ।

দক্তবীজভূৎ—শ্বেতকরবী বৃক্ষ।

দব্দ—মুস্তা, মুতা, নাগরমুতা ॥ শব্দ' ॥

দব্দনাদ—কাঁটা নটে, মেঘনাদ ক্ষুপ।

দব্দনাদা—শঙ্খিনী লতা।

অব্ধিবৃক্ষ—শাখিমূল বৃক্ষ।

অভয়া—[ মরা' হিবড়া ] হরীতকী, chebula retz.

অভয়দা—ভুঁই আমলা, আমলক।

অভীষ্ট গন্ধা—মাধবীলতা।

অমর—কয়েকটি বৃক্ষ—১ ইন্দ্রবারুণী, ২ বটা, ৩ মহানীলী, ৪ ঘৃতকুমারী, ৫ স্নুহী, ৬ গুড়ুচী, ৭ দূর্বা ॥ শব্দ' ॥

অমরজ—খদির বৃক্ষবিশেষ।

অমরতরু, অমরদারু—ইন্দ্রের পারিজাত কাননের বৃক্ষ ॥ আপ' ॥

অমরদ্রু—বিট খদির বৃক্ষ, গুয়ে বাবলা।

অমরপুষ্প, অমরপুষ্পক—কেতব, চূড়, তৃণবিশেষ। পুগফল, সুপারী, কাসতৃণ, আম্র।

অমরপুষ্পিকা—অধঃপুষ্পী বৃক্ষ ॥ আপ' ॥

অমরবল্লরী, অমরবেল—[ মরা' আংধলা ] আকাশবল্লী লতা

অমরাগন্ধক—কাপূর gratisloides r, গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।

অমরাবেল—[ স' আকাশবল্লী ] অলোক লতা, স্বর্ণলতা reflexon rox.

অমলকুঁচি—[ হি' বাকেরি মল ] কাঁটাযুক্ত গুল্ম digyne rox.

অমলা—১ সাতলা বৃক্ষ, ২ ভুঁই আমলা।

অমলাজ্‌কটা—ভুঁই-আমলা।

অমলাতকা—মহারাজতরুণীপুষ্প বৃক্ষ, চামেলী, বেলফুল, ॥ হলা' ॥

অমৃলা—অগ্নিশিখা methonica superba lam.

অমৃত-উদ্ভব—বিল্ব বৃক্ষ।

অমৃতজটা—জটামাংসী।

অমৃতফলা—পটোল, পারাবত, দ্রাক্ষা, আমলকী।

অমৃতলতা, অমৃতলতিকা—লতাবিশেষ, গুড়চী।

অমৃতসম্ভবা—গুড়চী, গুলঞ্চ।

অমৃতস্রব—রুদ্রন্তী বৃক্ষবিশেষ ॥ আপ' ॥

অমোঘ—পাটলীবৃক্ষ, বিড়ঙ্গ, কৃমিঘ্ন।

অম্বরদ—কার্পাস বৃক্ষ।

অম্বরাত—আম্রাতক বৃক্ষ।

অম্বরীষ—আম্রাতক বৃক্ষ।

অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠা—চারাবিশেষ। পর্যায়—গণিকা, যূথিকা, পাটা, চুত্রিকা, অম্বারা।

অম্বষ্ঠিকা, অম্বষ্ঠিকা—ব্রাহ্মী ॥ আকনাদি দ্র' ॥

অম্বুকন্দ—পানিফল, শৃঙ্গাটক।

অম্বুকৃষ্ণা—জলপিপ্পলী।

অম্বুকেশর—ছোমক বৃক্ষ।

অম্বুজ—হিজ্জল বৃক্ষ, জলবেতস।

অম্বুষ্ঠ—অশ্মন্তক বৃক্ষ, পাহাড়ী শিরীষ।

অম্বুধিস্রবা—ঘৃতকুমারী।

অম্বুপ—চাকুন্দা গাছ।

অম্বুবল্লিকা—কারবেল্লী, করেলা।

অম্বুবাসী—পাটলাবৃক্ষ bignonia suaveolens.

অম্বুসারা—কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ।

অম্ভোজা—যষ্ঠিমধুলতা।

অম্রাত—আমড়াগাছ।

অম্লনিম্বুক—গোঁড়ালেবু, citrus acida.

অম্লপত্র—১ অশ্মন্তকবৃক্ষ, ২ তুলসীগাছ ॥ রাজনি' ॥

অম্লপত্রক—১ অম্লকুচাই, ২ আমরুল ॥ রাজনি' ॥

অম্লপনস—মান্দার, লিকুচবৃক্ষ, artocarpus lacucha.

অম্লপর্ণিকা, অম্লপর্ণি—বৃক্ষবিশেষ।

অম্লপাদপ—তেঁতুলগাছ।

অম্লরুহা—মালব দেশজাত নাগবল্লী ॥ রাজনি' ॥

অম্লবতী—আমরুললতা দ্র'।

অম্লবাটক, বাতক—আম্রাতকবৃক্ষ, আমড়াগাছ দ্র'।

অম্লবাস্তুক—চাঙ্গেরী, আমরুল দ্র'।

অম্লবাস্তক—শাকবি'। টকপালং। অম্লবেতস।

অম্লবিন্দুল—অম্লবেতস।

অম্লবেতস—ক্ষুপবি'। [ হি' অমলবেৎ, কোচ' থৈকড়, মহা' চুকা, গুজ' অচবেত, ফা' তুর্শক, সংস্তম্ভহা ] অম্লবেতস, চুকপালং, টকপালং, rumex vesicarius.

অম্লশাক—টকপালং।

[ ক্রমশঃ।

# সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

## পল্লী-প্রকৃতি

স্বদেশের পল্লীপ্রকৃতি ও তার সম্ভাব্য সংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছেন ও বক্তৃতাদি দিয়েছেন, আলোচ্য গ্রন্থটি তারই এক সুষ্ঠু সংকলন। রচনাগুলির মাধ্যমে স্বদেশের কল্যাণকল্পে কবির যে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তা তাঁর প্রতিভার মতই বহুমুখী ও সমৃদ্ধ, দেশের বাস্তবিক কল্যাণ কোন পথে, একথাটা তিনি শুধু চিন্তাই করেননি কার্যে ও বাক্যে সে চিন্তাকে যথাযথ রূপ দিতেও উত্তম প্রকাশ করেছেন বারংবার। শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর জন্মও এই রকম এক উদ্যমেরই ফল। আলোচ্য প্রবন্ধগুলিরই একটিতে তিনি বলেছেন যে, "যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতেই পাইনে, তাদের জন্য যে কিছু করা যেতে পারে একথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথা একমাত্র তাঁর সম্বন্ধেই খাটে না, কারণ অন্ধকারে যারা অবলুপ্তপ্রায় সেই দীন অভাজনদের দেখার প্রচেষ্টা যে তাঁর কতটাই আন্তরিক, তাঁর রচনায়, তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মধারায় তারই স্বাক্ষর নিহিত। আলোচ্য রচনাগুলিই এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। এরূপ একটি মূল্যবান স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিশ্বভারতী সমগ্র সুধী সমাজেরই ধন্যবাদার্হ। লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭, মূল্য সাড়ে চার টাকা।

## বেদ-মীমাংসা ( ১ম খণ্ড )

হিন্দুর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ, বৈদিক সাহিত্যের যে বিপুল ঐশ্বর্য্য তা সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করার গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন লেখক, বেদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা, নানা রকম টীকা ভাষ্যাদির মাধ্যমে তিনি এই সুপ্রাচীন সাহিত্যের মর্মকথাটি পাঠকের মননে উপস্থাপিত করেছেন। এই কার্য্যে যে নিষ্ঠা, শ্রম ও বৈদগ্ধ্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য ভাবেই তিনি তার অধিকারী, আর সে জন্যই তাঁর প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে। এই উদ্যমের প্রথম ফল বর্ত্তমান খণ্ডটি, বলা বাহুল্য, এই বিরাট কার্য্য একটিমাত্র খণ্ডে সমাধা হতে পারে না, গ্রন্থকার বেদ মীমাংসারই আলোচনা করেছেন, বর্ত্তমান খণ্ডে তারই দুটি অধ্যায় আলোচিত হয়েছে, প্রথম অধ্যায়ে আছে বেদ-ব্যাখ্যার পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। গ্রন্থকারের ভাষারীতি সাবলীল, জিজ্ঞাসু পাঠক সহজেই বিষয়বস্তুর সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। আমরা এই মহৎ উদ্যমের সাফল্য কামনা করি। গ্রন্থটির আঙ্গিক মূল্যবান ও শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—অনির্বাণ
Published by the Principal Sanskrit College
1. Bankim chatterjee St. Cal-12 Price Rs. 10-00.

## রবীন্দ্র অভিধান ( ২য় খণ্ড )

সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলীর একটি সুষ্ঠু ও প্রামাণ্য অভিধান রচনায় ব্রতী হয়েছেন লেখক, আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর এই প্রয়াসেরই ফল, এর পূর্ব্বেই প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে, এটি দ্বিতীয় খণ্ড। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে যে নিষ্ঠা ও যোগ্যতার প্রয়োজন সৌভাগ্যবশতঃ লেখক তার অধিকারী, আর সে জন্যই তাঁর উদ্যম সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বিদগ্ধ ও সুধী পাঠক-সমাজে লেখকের এই প্রয়াস যথেষ্ট সমাদৃত হবে বলেই আমরা আশা করি। চিন্তামূলক সাহিত্য আসরে এই ধরণের রচনার মূল্য অসীম। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—সোমেন্দ্রনাথ বসু, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, মূল্য ছয় টাকা।

## সুতানুটি সমাচার

১৭৭৫ থেকে শুরু করে ১৮৩০ পর্যন্ত শহর কলকাতার এই পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাসে অসংখ্য কৌতুহলোদ্দীপক বিচিত্র ও রসঘন কাহিনী জড়িয়ে আছে। এই রসোদ্দীপক অথচ ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কাহিনীগুলি জীবন্ত হয়ে আছে সমকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও মহিলাদের বর্ণনায়, তাঁদের চিঠিপত্রে। এই প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে অধিকাংশজনই ইতিহাসে আজ অমরত্বের আসনে সমাসীন। এই নির্দিষ্ট সময়টিকে শহর কলকাতার নব রূপায়ণের যুগ বলে অভিহিত করা সমীচীন। এই সময়ের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ঘটনা, কাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য্যময়। ম্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি, এলিজা ফে, ফ্যানি পার্কস ভিক্টর জাকমোর প্রভৃতির বর্ণনায় কলকাতার সেদিনকার রূপটি অপরূপ মহিমায় অঙ্কিত আছে। তাঁদের রচনায় কলকাতার সমাজচিত্র ও জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে। এই রচনাগুলি অবলম্বন করে প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষ "সুতানুটি সমাচার"কে রূপ দিয়েছেন। বিনয় ঘোষের রচনা সাহিত্যজগতে যথেষ্ট সমাদরের অধিকারী। তাঁর তথ্যনিষ্ঠা ও ইতিহাস সচেতনতা তাঁর রচনাগুলিকে অভিনবত্ব দিয়েছে। সুতানুটি সমাচারও তাঁর গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বৃহদায়তন গ্রন্থটি তাঁর প্রভূত শ্রমস্বীকার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং বিপুল পাণ্ডিত্য ইতিহাস চেতনা এবং বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় বহন করে। পণ্ডিতসমাজে এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। কয়েকটি আলোকচিত্র গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আত্মস্মৃতিতে এবং চিঠিপত্রের মধ্যে কলকাতার সেদিনকার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। তখনকার কলকাতার বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন মানুষ, শাসনসংস্কার, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা, সর্বোপরি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবধারা বিনিময়ের আলেখ্যটি স্পষ্ট ছায়াপাত করছে এই গ্রন্থটিতে। ইতিহাস

বিখ্যাত বহুজনের বহু বিচিত্র ঘটনাও আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। পাঠকসমাজে গ্রন্থটি বিপুল সাড়া জাগাবে, এ আশা আমরা রাখি। প্রকাশক—বাক সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো। মূল্য—বারো টাকা মাত্র।

## অগ্নিযুগের পথচারী

বাঙলায় বিপ্লব যুগের পটভূমিতে লিখিত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত এক রম্যরচনা বললেই বোধ হয় আলোচ্য গ্রন্থটির যথাযথ পরিচয় দেওয়া যায়। অগ্নিযুগের অন্যতম আগ্নিক পথচারী, পথ চলতে চলতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে নিজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সে সেটাই পাঠককে পরিবেশন করেছে, এতে সেই বিপ্লবযুগের আগুন জ্বালানো দিনগুলি থেকে আজকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা সম্বলিত দিনগুলিরও এক সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে হয়ত সকলে এক মত হতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর রচনা যে আন্তরিক এ কথাটা সকলেই স্বীকার করে নেবেন। বর্ণনাগুণে বিষয়বস্তু নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট হয়েও মনে দাগ কেটে যায়। লেখকের ভাষা সহজ ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ, বক্তব্যকে বেশ সহজেই প্রকাশ করে। জায়গায় জায়গায় আর একটু সংযম দেখালে বোধ হয় রচনাটির মান আরও একটু উন্নত হতে পারত। ছাপা, বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক ভাল। লেখক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। প্রকাশক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। নব ব্যারাকপুর, বিদ্যাসাগর রোড সাউথ, পো: আড়ারামপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র।

## শতাব্দীর শত কবিতা

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংকলন। বিগত শত বৎসরের মধ্যে উল্লেখ্য কবিগণের কাব্যমালিকার পাপড়ি একটি একটি করে চয়ন করে গ্রথিত করা হয়েছে এই শত কবিতার মালাগাছি। কবিতা উপভোগ করতে হলে যে রসপিপাসু মনের দরকার তা সার্ব্বজনীন নয় আর সে জন্যই এর আবেদনও একটা বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমিত, সুতরাং নিছক কাব্য প্রকাশনী কার্য্যে যে বা যাঁরা ব্রতী হন খানিকটা ঝুঁকি তাঁদের নিতেই হয়, এ সত্ত্বেও এ ধরণের উত্তম যাঁদের মধ্যে দেখা যায় তাঁরা নিঃসন্দেহে রসজ্ঞ পাঠকের অকুণ্ঠ অভিনন্দনের যোগ্য। বর্ত্তমান সংকলনটির সম্পাদক ও প্রকাশকও ঠিক এই কারণেই ধন্যবাদার্হ। সংকলনটি সুষ্ঠু ও সুন্দর, সম্পাদক আন্তরিকতার সঙ্গে স্বকার্য্য সাধন করেছেন, যার ফলে তাঁর প্রয়াস সঙ্গত ভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কাব্যামোদী রসজ্ঞ পাঠক বর্ত্তমান সংকলনটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করি। ছাপা বাঁধাই ও আঙ্গিক যথাযথ। সম্পাদক—সমরেন্দ্র ঘোষাল, প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, মূল্য-পাঁচ টাকা।

## হাওড়া জেলার লোক-উৎসব

বর্ত্তমানে লোক-সংস্কৃতির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি বিপুল ভাবেই আকৃষ্ট হয়েছে, গ্রামীণ সংস্কৃতি, লোক-উৎসব প্রভৃতির উপকরণ সংগ্রহের প্রবণতাও বিশেষ ভাবেই লক্ষ্যণীয়; এটা সত্যই অতি শুভ লক্ষণ, কারণ দেশের প্রাণসত্তা এরই মধ্যে নিহিত। কাজেই মৃতপ্রায় লোকসংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার যে কোন প্রয়াসই যথেষ্ট সাধুবাদের দাবী করতে পারে। বর্ত্তমান গ্রন্থটি এক বিশেষ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির উপরই রচিত, এর তথ্যাদি যথেষ্ট অনুশীলনের দ্বারা সংগৃহীত এবং সেজন্যই রচনাটি সহজেই প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। হাওড়া জেলার লৌকিক গ্রাম্য দেবদেবী ও তাদের কেন্দ্র করে যে-সব উৎসব পার্ব্বণাদি অনুষ্ঠিত হয় আলোচ্য রচনার বিষয়বস্তু মূলত: সেটাই। এছাড়া সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করা হয়েছে যার দ্বারা বিষয়বস্তুর বক্তব্য প্রণিধান করা সহজ হয়। লোক-সংস্কৃতির ইতিহাসে বর্ত্তমান রচনাটি সাদরে গৃহীত হবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—তারাপদ সাঁতরা প্রকাশক—নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়—শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পক্ষে, পাণিত্রাস—হাওড়া। মূল্য—দু'টাকা।

## রাজ-কন্যার স্বয়ম্বর

রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে প্রথম সারির যে কয়জন, বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁদেরই অন্যতম। বর্ত্তমান উপন্যাসেও তাঁর সে বৈশিষ্ট্য পুরোপুরিই বজায় রয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট এক পরিবারের কয়েকটি মানুষ এই উপন্যাসের কুশীলব। দেশভাগের প্রচণ্ড ঝড় উড়িয়ে নিয়ে এলো সোনাটিকুরি গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার কন্যাকে কলকাতার আশ্রয় শিবিরে, রাজা উপাধি ছিল যার পূর্ব্বপুরুষদের সেই রাজকন্যা অবশেষে পরিজনবর্গের সঙ্গে এক ধনীর পড়ে থাকা বাগান বাড়ীতে, জবরদখলকারী উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় নিল। তারপর ঘটে চলল একের পর এক অভাবনীয় ঘটনা। রাজ্য না থাকলেও রূপবতী রাজকন্যার লোভে বহু পাত্র জুটে যেতে লাগলো, যার ধনী আশ্রয়দাতা পর্য্যন্ত কাত হয়ে গেলেন। কিন্তু শেষে সকলকে সরিয়ে দিয়ে রাখালের গলায়ই পড়লো কন্যার বরমাল্যখানি। বাপের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীর পুত্র বিনয়ই স্বয়ম্বর সভায় জিতে গেলো। আভিজাত্যের যে অহঙ্কারে স্বদেশে তাকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছিলো, বিদেশের রূঢ় বাস্তবের সামনে সে অহঙ্কার মুছে গেলো নিঃশেষে, রাজকন্যা বাঁশি খুঁজে পেলো সহজেই তার মনের মানুষটিকে, সার্থক হয়ে উঠল এক নিভে যাওয়া প্রেমের দীপ। সহজাত ললিত ভঙ্গীতে এক মিষ্ট মধুর প্রেমের কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক, পড়তে পড়তে মন রসাপ্লুত হয়ে ওঠে। গভীর কথা হালকা সুরে বলতে বিশেষ পারদর্শী লেখক, তাই ছিন্নমূল একটা জাতির মর্ম্মান্তিক বেদনাদায়ক মূর্ত্তিটিকেও সহজ ভাবেই তুলে ধরেছেন তিনি। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—মনোজ বসু। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—তিনটাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

## কন্যা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী এবং…

রসরচনায় বর্ত্তমান সাহিত্যের পুরোধা বলতে যাঁদের বোঝায় বিভূতিভূষণ তাঁদেরই অন্যতম। সাধারণ বাঙালীর জীবনের ছোট ছোট ঘটনাই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য, একমাত্র কথকতার গুণেই তুচ্ছ বিষয়বস্তুকেও অসামান্য সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে তোলেন

তিনি, হাল্‌কা হাসির মেলায় মনের গুমোট সহজেই কেটে যায়, পাঠক সহজেই খুসী হয়ে ওঠেন। আলোচ্য গ্রন্থেও এই জাতীয় পনেরোটি গল্প স্থান পেয়েছে। সবগুলিই সুরে মেজাজে প্রায় এক ধরণের হলেও ওরই মধ্যে উল্লেখ্য 'মেঘকুন্তলের ঘরের কেচ্ছা', 'গোবর্দ্ধন দারোগা বনাম রাধোমণি দাসী' ও 'কাশ্যপ গোত্র সিংহরাশি' প্রভৃতি রচনাগুলি। লেখকের ভাষারীতিও অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল, গল্পের মেজাজের সঙ্গে যা অতিশয় সঙ্গতিপূর্ণ। গল্পগুলিকে রসজ্ঞ পাঠক সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

## রক্তের স্বাদ লোনা

বাঙলা সাহিত্যের আসরে ডিটেক্‌টিভ গল্প লেখাটা আজও উন্নাসিক সাহিত্যিকরা একটু এড়িয়ে চলেন এবং তার ফলেই সাহিত্যের এই বিভাগটি এখনও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রয়ে গেছে। তবে আশার কথা এই যে, ক্রমেই এ ভাবটা কেটে আসছে এবং কেউ কেউ বিশেষ ভাবেই এর প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এই বিরল সংখ্যকদেরই একজন। গাঁজাখুরী কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক কার্য্যধারার অনুসরণে তিনি কলম চালিয়েছেন, তাঁর গল্পের ডিটেক্‌টিভ বাস্তবের রক্তমাংসে গড়া আর তার কার্য্যক্রমও আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আমাদের বর্ত্তমান পুলিশ বিভাগের তদন্তের ধারা সম্বন্ধে তিনি সম্যক্‌ ভাবেই ওয়াকিবহাল আর সেজন্যই তাঁর রচনা সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে। পাঠক-সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ রহস্য উপন্যাসের অনুরাগী, কাজেই একে তাচ্ছিল্য করার পক্ষে কোন যুক্তিই নেই, আর সেজন্যই এ ধরণের রচনা তথ্যনিষ্ঠ হওয়ারও প্রয়োজন আছে। লেখকের উত্তম সেদিক থেকেও প্রশংসনীয়। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি এবং এ ধরণের রচনার প্রকৃত সমাদর হোক, এটাই কামনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। প্রকাশক—বাক্‌ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯; দাম—তিন টাকা।

## বিলিতি বিচিত্রা

বর্ত্তমানে বিলেতের পটভূমিকায় বহু রচনাদি প্রকাশ হয়ে চলেছে, আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুও সেই জাতের, লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বিলেতের সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, বর্ত্তমান পুস্তকে তারই কয়েকটি সংকলিত হয়েছে। রচনাগুলির ভার কম, কিন্তু ধার বেশী, এগুলিতে লেখকের বৈদগ্ধ্য যত না প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সহজ মানবিকতা ও সরস লিপিকুশলতা. এক কথায় রচনাগুলিকে রম্যরচনার শ্রেণীভুক্ত করাই বোধ হয় সমুচিত। ভারি সুন্দর ও সাবলীল লেখকের বাচনভঙ্গী। সামান্য সামান্য ঘটনা ও পরিবেশনের গুণে মনোরম হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে বর্ত্তমান লণ্ডনের একটা পরিচ্ছন্ন রূপও ছবির মত ফুটে ওঠে চোখের সামনে। বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অনুযোগের কিছু নেই। লেখক—হিমানীশ গোস্বামী, প্রকাশক—বাক্‌ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯ দাম—চার টাকা।

# ॥ ১৩৬৮ সালের উল্লেখযোগ্য বই ॥

## কবিতা

| | | | |
|---|---|---|---|
| অনিত্র গোলাপ | ২'৫০ | মানস রায়চৌধুরী | মানস প্রকাশনা |
| আরশিনগর | ২'০০ | রমেন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী | কৃত্তিবাস প্রকাশনী |
| ঐক্যতান | ২'৫০ | সংকলন | মিত্র ও ঘোষ |
| কখনো মেঘ | ৪'০০ | প্রেমেন্দ্র মিত্র | আই এ পি |
| কবিপ্রণাম | ৫'০০ | বিশু মুখো: সম্পাদক | আই এ পি |
| কয়েকটি কণ্ঠস্বর | ২'৫০ | মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য | কবিপত্র প্রঃ ভঃ |
| গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ | ২'০০ | মোহিত চট্টোঃ | কৃত্তিবাস প্রকাশনী |
| চৈত্রে রচিতা কবিতা | ২'০০ | উৎপল বসু | |
| দ্বিতীয় পৃথিবী | ২'০০ | সুরজিৎ দাশগুপ্ত | ডি এম লাইব্রেরী |
| ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি | ২'০০ | তুষার চট্টোপাধ্যায় | কবিপত্র প্রঃ ভঃ |
| নতুন বাঁকে | ২'৫০ | বনফুল | আই এ পি |
| বেলা অবেলা কালবেলা | ৩'০০ | জীবনানন্দ দাশ | নিউস্ক্রীপ্‌ট |
| ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল | ২'৫০ | সুনীল নন্দী | কোয়ার্টেট |
| মহাদিগন্ত | ৩'০০ | জগন্নাথ চক্রঃ | মহাদিগন্ত প্রকাশন |
| মোহিতলাল কাব্যসম্ভার | ১০'০০ | | মিত্র ও ঘোষ |
| যত দূরেই যাই | ৩'০০ | সুভাষ মুখোপাধ্যায় | ত্রিবেণী প্রকাশন |
| শতাব্দীর শত কবিতা | ৫'০০ | সমরেন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত | মণ্ডল বুক হাউস |
| শতপুষ্প | ৪'০০ | রামেন্দ্র দেশমুখ্য | নলেজ হোম |
| শবযাত্রা | ২'০০ | পবিত্র মুখোপাধ্যায় | কবিপত্র প্রঃ ভঃ |
| শান্তির পাখিরা এবং তুমি | ২'০০ | সুধাংশু তুঙ্গ | দিশারী |
| শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৬'০০ | প্রমথনাথ বিশী | ওরিয়েণ্ট বুক কোঃ |
| শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৬'০০ | কুমুদরঞ্জন মল্লিক | মিত্র ও ঘোষ |
| শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৩'৫০ | দিনেশ দাস | লেখক সমবায় |
| প্রথম নায়ক [কাব্যনাট্য] | ১'৫০ | নীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী | সুরভি প্রকাশনী |
| সোনাটা | ২'০০ | কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত | বসুধারা প্রকাশনী |
| চারচোখ [ কাব্যনাট্য ] | ৩'০০ | সংকলন | স্টাডিজ |

## রবীন্দ্রসাহিত্য

| | | | |
|---|---|---|---|
| উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস | ৭'৫০ | ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত | এ মুখার্জি |
| ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ | ৬'০০ | প্রভাত বন্দ্যোঃ | সান্যাল এণ্ড কোং |
| জীবনমৃত্যুর ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ | ১'৫০ | চণ্ডীচরণ বন্দ্যোঃ | মুখার্জি বুক হাউস |
| রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙের দিনগুলি | ৩'০০ | শক্তিব্রত ঘোষ | ক্লারিয়ান পাব্লিকেশন |
| প্রভাত রবি | ৪'৫০ | অধ্যাপক বিজন ভট্টাঃ | গুপ্ত প্রকাশিকা |

ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ৪˙০০ রণজিৎকুমার সেন এ মুখার্জি
রবি কথা ৩˙৫০ প্রভাত মুখোপাধ্যায় আই এ পি
রবিচ্ছবি ৬˙০০ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত জিজ্ঞাসা
রবিপ্রদক্ষিণ ৭˙৫০ চারু ভট্টা: সম্পাদিত বসুধা প্রকাশনী
রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ ১˙০০ সন্তোষকুমার দে বিচিত্রা প্রকাশনী
রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্র পরিচয় ৩˙৫০ সুধীরচন্দ্র কর ভারতী লাইব্রেরী
রবীন্দ্র অভিধান ৬˙০০ সোমেন্দ্রনাথ বসু বুকল্যাণ্ড
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৭˙০০ ডঃ শুভ্রাংশু মুখো: মিত্র ও ঘোষ
রবীন্দ্রচর্চা ৫˙০০ হরপ্রসাদ মিত্র সম্পা: সুরভি প্রকাশনী
রবীন্দ্রপ্রতিভা ১০˙০০ কানাই সামন্ত আই এ পি
রবীন্দ্রপ্রবাহ ২˙৫০ তারিণীশংকর চক্র: সম্পাদিত
সম্পা: : হুইলার্স বিল্ডিং এলাহাবাদ
রবীন্দ্রবিতান ৫˙০০ ডঃ অরুণকুমার মুখো: এ মুখার্জি
রবীন্দ্রবীক্ষা ১২˙০০ নীলরতন সেন সম্পা: এসিয়া পাব্লি:
রবীন্দ্রমনীষা ৫˙০০ ডঃ অরুণকুমার মুখো: ক্লাসিক প্রেস
রবীন্দ্রসমীক্ষা ৪˙০০ ডঃ অরুণকুমার মুখো: এ মুখার্জি
রবীন্দ্রসরণী ১০˙০০ প্রমথনাথ বিশী মিত্র ও ঘোষ
রবীন্দ্রস্মৃতি ৩˙৫০ ডঃ আশুতোষ ভট্টা: ক্যাল: বুক হাউস
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬˙০০ বিমানবিহারী মজুমদার বুকল্যাণ্ড
রবীন্দ্রনাথ ২˙০০ প্রমথ চৌধুরী বর্তিক
রবীন্দ্রনাথ ১০˙০০ দেবীপদ ভট্টা: সম্পাদিত ইস্টলাইট
রবীন্দ্রনাথ ৫˙০০ গোপাল হালদার সম্পাদিত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
রবীন্দ্রনাথ ( ১ম ও ২য় ) ৮˙০০,
১০˙০০ জীবেন্দ্র সিং রায় ক্যাল: পাবলিশার্স
রবীন্দ্রনাথ—উত্তরপক্ষ ৪˙০০ বীরেন্দ্র চট্টো: সম্পাদিত ইণ্ডিয়ানা
রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ ৪˙০০ অজয়কুমার রায় এ মুখার্জি
রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ পরে ২˙৫০ ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার ইণ্ডিয়ানা
রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য ৮˙০০ ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ মিত্রালয়
রবীন্দ্রনাথের গল্প ও
বাংলার সমাজ ৬˙০০ সৌরিন্দ্রমোহন মুখো: শিশির পাব্লিশিং
রবীন্দ্রায়ণ ( ১ম ও ২য় )
প্রতি খণ্ড ১০˙০০ পুলিন সেন সম্পা: বাক্ সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা ১৫˙০০
ও ৮˙০০ সম্পাদনা : গোবিন্দ চট্টো: ও
হিমাংশু গঙ্গো: শতবার্ষিকী সমিতি
আগরতলা
রবীন্দ্রনাট্যপ্রসঙ্গে কাব্য নাটক ৪˙০০ ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিসার্স
রাবীন্দ্রিকী ৪˙৫০ ধীরানন্দ ঠাকুর বুকল্যাণ্ড
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৬˙০০ প্রতিভা গুপ্ত ওরিয়েণ্ট বুক কোং
স্বজনী ৬˙০০ ভবেশ দাশগুপ্ত সম্পাদক বিচিত্রা

## নাটক

| | | | |
|---|---|---|---|
| অংশীদার | ২'৫০ | গঙ্গাপদ বসু | গ্রন্থপীঠ |
| অঘটন আজো ঘটে ( দিলীপকুমার রায় ) | ২'২৫ | ধনঞ্জয় বৈরাগী ( নাট্যরূপ ) | আই এ পি |
| উদ্ধার | ১'৫০ | দেবব্রত সুর চৌধুরী | জাতীয় সাঃ পঃ |
| এ বাড়ি ও বাড়ি | ২'০০ | জরাসন্ধ | কথাকলি |
| এই দশকের একাঙ্ক | ৫'০০ | সূত্রধার সম্পাদিত | নবগ্রন্থ কুটির |
| এমনও দিন আসতে পারে | ১'০০ | নারায়ণ বন্দ্যোঃ | জাতীয় সাহিত্য পঃ |
| কি বিচিত্র এই দেশ | ২'০০ | সুকমল দাশগুপ্ত | জাতীয় সাহিত্য পঃ |
| ডবক্ক ডাক্তার | ১'৭৫ | মনোজ বসু | গ্রন্থপ্রকাশ |
| তিনচম্পা | ২'০০ | শিবেশ মুখোঃ | জাতীয় সাহিত্য পঃ |
| দর্পণ | ১'৫০ | সলিল সেন | ইণ্ডিয়ানা |
| দুই আঙিনা এক আকাশ | ১'৫০ | মন্মথ রায় | বাক সাহিত্য |
| দ্বাপর থেকে কলি | ১'০০ | শম্ভুনাথ ভদ্র | চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স |
| নটী | ২'০০ | কান্তি বন্দ্যোঃ | জাতীয় সাহিত্য পঃ |
| ফিঙ্গার প্রিন্ট | ২'৫০ | পার্থপ্রতিম চৌধুরী | জাতীয় সাঃ পঃ |
| বর্ণ পরিচয় | ২'০০ | সুনীল দত্ত | জাতীয় সাহিত্য পঃ |
| বিশ পঞ্চাশ | ১'৫০ | কিরণ মৈত্র | সিটি বুক এজেন্সি |
| ভাঙা গড়া খেলা | ২'৫০ | বীরু মুখোপাধ্যায় | সিটি বুক এজেন্সি |
| মরাস্রোত | ২'৫০ | দীপাংশু দেব | জাতীয় সাহিত্য পঃ |
| রিহার্সাল | ১'০০ | শৈলেশ গুহ নিয়োগী | সিটি বুক এঃ |
| শততম রজনীর অভিনয় | ২'৫০ | রমেন লাহিড়ী | জাতীয় সাহিত্য পঃ |
| শেষাগ্নি ( শক্তিপদ রাজগুরু ) | ২'৫০ | দেবনারায়ণ গুপ্ত | কথাকলি |
| সম্পাদকের বিপদ | ১'০০ | শিবরাম চক্রবর্তী | এম সি সরকার |

## ছোটগল্প

| | | | |
|---|---|---|---|
| অনেক আগে অনেক দূরে | ৪'০০ | প্রমথনাথ বিশী | মিত্র ও ঘোষ |
| অমিল পয়ার | ৩'০০ | বীরেন্দ্র দত্ত | অক্ষর |
| এক রাত্রি | ২'৫০ | অচিন্ত্য সেনগুপ্ত | অনন্দধারা প্রকাশন |
| কুমারী কন্যা কাহিনী | ৩'০০ | জাহ্নবী চক্রবর্তী | বিহার সাহিত্য ভঃ |
| ক্রীতদাস ক্রীতদাসী | ২'৫০ | সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় | এ পি |
| ছোট ছোট ঢেউ | ২'০০ | সমরেশ বসু | বিশ্বাস পাব্লিঃ |
| জনতা | ৩'০০ | প্রবোধকুমার সান্যাল | শ্রীগুরু |
| জলভ্রমি | ৩'০০ | সতীনাথ ভাদুড়ী | বাক সাহিত্য |
| দময়ন্তী | ৩'০০ | সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ত্রিবেণী |
| দূরবীন | ৪'০০ | বনফুল | বাক সাহিত্য |
| পরিচয় | ৪'০০ | বিভূতিভূষণ মুখোঃ | মিত্রালয় |
| পলাতকা | ৩'০০ | বিমল কর | একাল সেকাল |
| পাপুই দ্বীপের কাহিনী | ৩'৩০ | নবেন্দু ঘোষ | আই এ পি |
| পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা | ৩'৫০ | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | একাল সেকাল |
| ময়ূরী | ৩'০০ | নরেন্দ্রনাথ মিত্র | আনন্দ পাব্লিঃ প্রাঃ লিঃ |
| মরুভূমি | ২'৫০ | হরিনারায়ণ চট্টোঃ | সুরভি প্রকাশনী |
| মনোনীতা | ৩'০০ | ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য | মিত্রালয় |
| মায়া কন্যা | ৩'৫০ | মনোজ বসু | গ্রন্থ প্রকাশ |
| রঙীন লণ্ঠন | ৩'০০ | মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় | ত্রিবেণী |
| শনি রাজা রাহু মন্ত্রী | ৩'৫০ | বিমল মিত্র | করুণা প্রকাশনী |
| শিমুল ফুলের ছায়া | ২'৫০ | নৃপেন্দ্র সান্যাল | আনন্দধারা প্রকাশন |
| শ্রেষ্ঠ গল্প | ৪'০০ | সৈয়দ মুজতবা আলী | বাক সাহিত্য |
| সাতটি রাত্রি | ২'৭৫ | বাণী রায় | ত্রিবেণী |
| হসন্তী | ৪'৫০ | শরদিন্দু বন্দ্যোঃ | বাক সাহিত্য |
| হৃদয়ের জাগরণ | ৩'৫০ | বুদ্ধদেব বসু | ত্রিবেণী |

## উপন্যাস

| | | | |
|---|---|---|---|
| অতসী | ৪'৫০ | প্রবোধবন্ধু অধিকারী | বসুচৌধুরী |
| আজ রাজা কাল ফকির | ৩'০০ | স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় | বাক সাহিত্য |
| আড়াল | ২'৫০ | শুদ্ধসত্ত্ব বসু | সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ |
| আবরণ | ৩'৫০ | জরাসন্ধ | কথাকলি |
| আরো আলো | ৫'০০ | সুবোধ চক্রবর্তী | বাক সাহিত্য |
| আলোর স্বাক্ষর | ৪'৫০ | আশাপূর্ণা দেবী | গুপ্ত প্রকাশিকা |
| ইমন বেহাগ বাহার | ৫'৫০ | বারীন্দ্রনাথ দাশ | নিও লিট |
| উপনগর | ৭'০০ | নরেন্দ্রনাথ মিত্র | বেঙ্গল পাব্লিঃ |
| ঋণশোধ | ৩'৫০ | সঞ্জয় ভট্টাচার্য | শ্রীগুরু |
| ঋতু পত্র | ২'০০ | চিত্ত সিংহ | নতুন প্রকাশক |
| এই দাহ | ৩'৫০ | গৌরকিশোর ঘোষ | মিত্রালয় |
| এই দিন এই রাত | ৩'৫০ | প্রভাতদেব সরকার | মিত্র ও ঘোষ |
| এক নদী বহু তরঙ্গ | ৪'৫০ | মিহির আচার্য | বুক সোসাইটি |
| এক যে ছিল রাজা | ৫'০০ | দীপক চৌধুরী | রূপা এণ্ড কোং |
| একটি মুখ তিনটি মন | ৩'৫০ | বাসুদেব সাহা | আলফা বীটা |
| এলেম নতুন দেশে | ২'০০ | জ্যোতির্ময় রায় | ত্রিবেণী প্রকাশন |
| এসো নীপ বনে | ৪'০০ | শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোঃ | বুক সোসাইটি |
| কংস কবুতরী কথা | ২'৫০ | বরেন গঙ্গোপাধ্যায় | ইম্প্রেশন |
| কন্যাকলঙ্ক কথা | ৩'০০ | গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু | বাকসাহিত্য |
| কনে চন্দন | ২'৫০ | শৈলজানন্দ মুখোঃ | রবীন্দ্র লাইব্রেরী |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম ( ১ম খণ্ড ) | ১৬'০০ | বিমল মিত্র | মিত্র ও ঘোষ |
| কহেন কবি কালিদাস | ৩'০০ | শরদিন্দু বন্দ্যোঃ | আনন্দ পাব্লিঃ প্রাঃ লিঃ |
| কাছের জানালা | ৪'০০ | বীরেন্দ্র মিত্র | ক্লাসিক প্রেস |
| কেয়াফুল | ২'০০ | সনৎকুমার বন্দ্যোঃ | ক্লাসিক প্রেস |
| ক্রৌঞ্চনিষাদ | ৬'০০ | অজিত দাস | তিনসঙ্গী প্রকাশনী |
| গৌড়জন বধূ | ৫'৫০ | শক্তিপদ রাজগুরু | গুরুদাস |
| গোধূলির রঙ | ৩'৫০ | দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য | বেঙ্গল পাবলিশার্স |
| গোরাকালার হাট | ৮'৫০ | অশোক গুহ | গ্রন্থালয় |
| চন্দনবাঈ | ৫'০০ | হরিনারায়ণ চট্টোঃ | মিত্র ও ঘোষ |
| ছায়াবৃতা | ২'৫০ | সুবোধ ঘোষ | প্রাইমা পাব্লিঃ |
| ডাঃ জনসনের ডায়েরি | ৩'০০ | চিত্তরঞ্জন মাইতি | গ্রন্থশ্রী |
| ডাকো নতুন নামে | ৪'০০ | প্রশান্ত চৌধুরী | মিত্র ও ঘোষ |
| তিন কাহিনী | ৪'৫০ | বনফুল | গ্রন্থপ্রকাশ |
| তিন প্রহর | ৩'২৫ | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | গ্রন্থপ্রকাশ |
| ত্রিনয়না | ৫'০০ | সুশীল রায় | এম সি সরকার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ত্রিনায়িকা | ২'০০ | অজয় দাশগুপ্ত | কথাকলি |
| দিন রাত্রি | ৩'৫০ | সুরজিৎ দাশগুপ্ত | ডি এম |
| দওগাঁর প্রাসাদ | ৭'৫০ | সুশীলকুমার মুখো: | সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয় |
| নাটঘর | ২'৫০ | লীলা মজুমদার | ত্রিবেণী |
| নাগরী | ৪'০০ | সরোজ রায়চৌধুরী | রবীন্দ্র লাইব্রেরী |
| নির্বাসন | ২'৭৫ | বিমল কর | ত্রিবেণী |
| নীলাঞ্জনা | ৭'০০ | সুমথনাথ ঘোষ | মিত্র ও ঘোষ |
| পট ও পুতুল | ২'৫০ | রঞ্জত সেন | টি এস বি প্রকাশন |
| পুনর্মিলন | ২'০০ | শিবরাম চক্রবর্তী | সিটি বুক এজেন্সি |
| পূর্বরাগ | ২'৫০ | রমেশচন্দ্র সেন | ক্লাসিক প্রেস |
| প্রতিধ্বনি ফেরে | ৪'০০ | প্রেমেন্দ্র মিত্র | আনন্দ পাব্লি: প্রা: লি: |
| প্রথম বসন্ত | ২'৫০ | নবেন্দু ঘোষ | আই এ পি |
| বন কেটে বসত | ৯'০০ | মনোজ বসু | মিত্র ও ঘোষ |
| বিদেশিনী | ৪'৫০ | নীরোদ দাশগুপ্ত | মিত্রালয় |
| বিবাগী ভ্রমর | ৭'০০ | প্রবোধকুমার সান্যাল | মিত্র ও ঘোষ |
| বৃহন্নলা | ৪'৫০ | শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় | বসুচৌধুরী |
| ভেঙেছে দুয়ার | ২'৫০ | জ্যোতির্ময় রায় | গ্রন্থপীঠ |
| মঞ্চ কন্যা | ৭'০০ | ধনঞ্জয় বৈরাগী | গ্রন্থম |
| মধ্য পঞ্চাশ | ২'৫০ | চাণক্য সেন | নবভারতী |
| মন দেয়া নেয়া | ৩'০০ | অমরেন্দ্র ঘোষ | সাহিত্য |
| মনসিজ | ৫'০০ | জ্যোতির্ময় গঙ্গো: | অগ্রণী প্রকাশন |
| মনে পড়ে | ৩'০০ | রূপদর্শী | নবগ্রন্থ কুটির |
| মহামায়া | ৬'০০ | সীতা দেবী | বেঙ্গল পাব্লি: |
| মাটি আর নেই | ৪'৫০ | প্রফুল্ল রায় | ত্রিবেণী |
| মাটি আর মানুষ | ৪'০০ | দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যো: | মণ্ডল বুক হাউস |
| যতিভঙ্গ | ৩'৫০ | তারাশঙ্কর বন্দ্যো: | ত্রিবেণী |
| যদি জানতেম | ৪'০০ | উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো: | গ্রন্থশ্রী |
| যদি জানতেম | ৩'০০ | ভক্তি দেবী | নবযুগ প্রকাশনী |
| যে তাপে রঙ বদলায় | ২'০০ | যজ্ঞেশ্বর রায় | এভারেষ্ট বুক হাউস |
| রক্তের স্বাদ লোনা | ৩'০০ | গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু | বাকসাহিত্য |
| রম্যাণি-বীক্ষ (মহারাষ্ট্র পর্ব) | ৭'৫০ | সুবোধকুমার চক্রবর্তী | এ মুখার্জি |
| রূপং দেহি ধনং দেহি | ৩'২৫ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | গ্রন্থপ্রকাশ |
| রোজালিণ্ডের প্রেম | ৩'০০ | প্রাণতোষ ঘটক | বাক সাহিত্য |
| সুখ | ৫'০০ | অন্নদাশঙ্কর রায় | ডি এম |
| সাতটি রাত্রি | ২'৭৫ | বাণী রায় | ত্রিবেণী প্রকাশন |
| সুপ্রিয়ার বন্ধন | ২'৫০ | সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় | লিও লিট |
| সুপ্তি সাগর | ৪'৫০ | গজেন্দ্রকুমার মিত্র | কথাকলি |
| সুরের আগুন | ৪'৭৫ | গোলাম কুদ্দুস | মিত্রালয় |
| সেদিন চৈত্রমাস | ৩'৫০ | দিব্যেন্দু পালিত | বসুচৌধুরী |
| সোনাঝরা সন্ধ্যা | ২'০০ | সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: | নবগ্রন্থকুটির |
| স্বপ্নসঞ্চার | ৩'৫০ | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | বর্তিক |

## সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অমর অনু: সত্যেন্দ্রনাথ ৬.০০ ডাঃ সুধাকর চট্টোঃ এ মুখার্জি
উপন্যাস পাঠের ভূমিকা ৫.০০ শিশির চট্টোঃ বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম ১৬.০০ প্রফুল্ল দাশগুপ্ত সান্যাল এণ্ড কোং
নাটকের রূপরীতিও প্রয়োগ ৪.৫০ সাধনা ভট্টঃ জাতীয় সাঃ-পরিঃ
বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ১.০০ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন সাঃ ভঃ
বাংলা ছন্দ ৩.০০ সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য
ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়
বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস ১০.০০ অধ্যাপক কনক বন্দ্যোঃ এ মুখার্জি
বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ৮.০০ আশা দেবী ডি এম লাইব্রেরী
মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব ৫.০০ ঘোষ ও মুখোঃ হাউস অব বুকস
মনসা পুঁথি ( বাইশ কবি বিরচিত ) ৬.০০ স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিসার্স
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩.৫০ নিতাই বসু ফসল প্রকাশনী
সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার ৪.০০ অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত গ্রন্থনিলয়
সাংস্কৃতিকী ৫.৫০ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বাক্ সাহিত্য
সাহিত্যচিন্তা ৩.০০ অমিয়রতন মুখোঃ শান্তি লাইঃ
সাহিত্যে রামমোহন থেকে স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী ৭.৫০ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোঃ এ মুখার্জি

## সংকলন

অন্ত ভুবন ১০.০০ বিমলাপ্রসাদ মুখোঃ সম্পাঃ বর্তিকা
বিদেশিনী ১০.০০ মীনাক্ষী দত্ত নতুন সাহিত্য ভবন

## জীবনী

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ ৮.৫০ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত গ্রন্থম
অগ্নিযুগের পথচারী ৫.০০ ক্ষিতীশ মৌলিক এ মুখার্জি
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৪.৫০ মণি বাগ্‌চি জিজ্ঞাসা
এই যা দেখা ৩.০০ লীলা মজুমদার ত্রিবেণী
দক্ষিণের বারান্দা ৪.০০ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় আই এ পি
নীলকণ্ঠ ( ১ম ও ২য় খণ্ড ) ৬.০০, ৬.০০ ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী
সদ্‌গুরু সাধন-সঙ্ঘ
পরিব্রাজক ৫.০০ অমিতা দেবী ও কানাইলাল ঘোষ
অ্যাকাডেমিকা
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ৪.০০ তারকচন্দ্র রায় এম সি সরকার
বাংলা-সাহিত্যে মোহিতলাল ৫.০০ আজহারউদ্দীন খান জিজ্ঞাসা
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ৫.০০ বলাই দেবশর্মা জিজ্ঞাসা
ভারতচন্দ্র ৩.০০ মদনমোহন গোস্বামী জিজ্ঞাসা
সুভাষচন্দ্র ২.০০ দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল সুপ্রকাশ

## রম্যরচনা

অযাত্রায় জয়যাত্রা ৪.০০ বিভূতি মুখোপাধ্যায় বাক্-সাহিত্য
কাঞ্চন তৃষা ৪.০০ বিদগ্ধ শর্মা চিনকো
খ্যাপা খুঁজে ফেরে ৬.০০ নীলকণ্ঠ বাকসাহিত্য
চণক সংহিতা ৩.৫০ কালিদাস রায় আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় ৩.৭৫ জসীমউদ্দীন গ্রন্থপ্রকাশ
পথ-চলতি ৪.৭৫ সুনীতি চট্টোঃ গ্রন্থপ্রকাশ
বার্দ্ধক্যে বারাণসী (১ম) ৫.৫০ নীলকণ্ঠ রাইটার্স সিণ্ডিকেট
সাত রাণী আট বেগম ৫.০০ শ্রীপান্থ ত্রিবেণী
রাজযোটক ২.০০ আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্য

## পদাবলী ও বৈষ্ণব সাহিত্য

পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৭.৫০ বিমানবিহারী মজুমদার জিজ্ঞাসা
পদাবলী সাহিত্য ৭.০০ কালিদাস রায় এ মুখার্জি
বৈষ্ণব পদরত্নাবলী ৫.০০ সরোজ বন্দ্যোঃ সম্পাঃ নতুন সাহিত্য ভবন
বৈষ্ণব পদাবলী ২৫.০০ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-সংসদ
ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫.০০ বিমানবিহারী মজুমদার জিজ্ঞাসা

## ভ্রমণ ও অভিযান

কী হেরিলাম নয়ন মেলে ২.৫০ মায়া দাস গ্রন্থপীঠ
বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ৬.০০ শঙ্কু মহারাজ মিত্র ও ঘোষ
রহস্যময় রূপকুণ্ড ৩.৫০ বীরেন্দ্রনাথ সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

## বিবিধ নিবন্ধ

আদিম সমাজের ইতিহাস ৫.০০ মনোরঞ্জন রায় ন্যাশনাল বুক এঃ
আমাদের পরিচয় ৪.০০ ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত এ মুখার্জি
আমার দেখা ক্রিকেট ৪.০০ বেরী সর্বাধিকারী আনন্দধারা প্রকাশন
আলিম্পন ১০.০০ দুর্গা মুখোপাধ্যায় নিউ এজ
টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৫.০০ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মিত্র ও ঘোষ
তরুণ বাংলা ২.৫০ সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীগুরু
দেখা ৩.০০ অন্নদাশংকর রায় এম সি সরকার
পঞ্চোপাসনা ১২.০০ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়
পল্লীপ্রকৃতি ৪.৫০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী
বই পড়া ৪.০০ সরোজ আচার্য ত্রিবেণী প্রকাশন
বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস ৬.০০ অ, ভট্টাচার্য্য
ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়
মানবতাবাদ ৬.০০ বসুধা চক্রবর্তী দীপায়ন
মুখের ভাষা বুকের রুধির ৩.৫০ অমিতাভ চৌধুরী গ্রন্থপ্রকাশ
রামায়ণতত্ত্ব ৪.৫০ তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা জিজ্ঞাসা
রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি ৩.০০ প্রবোধচন্দ্র সেন জিজ্ঞাসা
যুগপরিক্রমা ( ২য় খণ্ড ) ১৬.০০ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়
লিপিবিবেক ৬.০০ ডঃ বিজন ভট্টাঃ বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
লেখন ৪.০০ ( শোভন সংস্করণ ) ১০.০০ ( রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে মুদ্রিত ) বিশ্বভারতী
শরৎচন্দ্রের প্রণয়কাহিনী ২.৫০ গোপালচন্দ্র রায় সাহিত্য-সদন
শিশুমঙ্গল ৪.০০ আবুল হাসানাৎ স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স

সমাজসমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার ৭.০০ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত গ্রঃ প্রঃ
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১২.৫০ বিনয় ঘোষ বেঙ্গল পাবলিশার্স
সাহিত্যচর্চা ৩.৭৫ বুদ্ধদেব বসু ত্রিবেণী প্রকাশন
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ ৬.০০ অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় সরস্বতী লাইব্রেরী

## ইতিহাস ও দর্শন

প্রাচীন ইরাক ৬.০০ শচীন্দ্রনাথ চট্টো: এম সি সরকার
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় ভাগ) ৮.০০ রাধাকৃষ্ণন মিত্র ও ঘোষ

## গ্রন্থাবলী

গান্ধী রচনাবলী (১ম খণ্ড) ৬.০০ রতনমণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র
বিহারীলাল রচনাসম্ভার ১০.০০ প্রমথনাথ বিশী সম্পা: মিত্র ও ঘোষ

## ধর্মগ্রন্থ

এতশর প্রলাপ ৪.০০ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শ্রীগুরু
জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে ৩.০০ বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহেশ লাইব্রেরী
শ্রীমদভাগবদ্গীতা ৩.৫০ রাজশেখর বসু এম সি সরকার

## অনুবাদ সাহিত্য

অজানার অভিযানে (রিচার্ড এল নিউবার্জার) ২.৫০ এ চক্রবর্তী অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
অপমানিত ও লাঞ্ছিত (ফিওডর ডষ্টয়েভস্কি) ৮.০০ সমরেশ খাসনবিশ রূপা
অহিংস সমাজবাদের পথে (ম. ক. গান্ধী) ৫.০০ মিত্রালয়
আর্চবিশপের মৃত্যু (উইলা ক্যাথার) ৪.০০ ভবানী মুখোপাধ্যায় এম সি সরকার
আলো থেকে অন্ধকারে (জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন) ২.৫০ নিখিল সরকার বাক সাহিত্য
চীনা মাটি ৬.০০ মোহন গঙ্গো: ও অমিতেন্দ্র ঠাকুর রূপা
জর্জ ওয়াশিংটন (মার্কাস কর্নিলিফ) ৩.৫০ রেখা বন্দ্যো: শ্রীভূমি পাবলিশার্স
দক্ষিণ মেরুতে (পল্ সিপ ল) ১.৭৫ সনাতন গোস্বামী পরিচয় পাব্লি:
পল্লী পুনর্গঠন (মহাত্মা গান্ধী) ৫.০০ শৈলেশ বন্দ্যো: গান্ধীস্মারক নিধি
প্যারীর পতন (ইলিয়া এরেনবুর্গ) ৮.০০ অমল দাশগুপ্ত ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
বিশ শতকের আমেরিকার ধর্ম (হার্বার্ট ওয়াক্লাস) ৪.০০ সনাতন গোস্বামী পরিচয় পাব্লি:
ব্যক্তিত্ব (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ২.৫০ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী
ভবিতব্য (উইলা ক্যাথার) ২.৫০ রাখাল ভট্টাচার্য এম সি সরকার
মোনালিসা (আলেকজাণ্ডার লারনেট হলেনিয়া) ২.৫০ বাণী রায় রূপা এণ্ড কোং
যুক্তরাষ্ট্রে জীবনধারা (ব্রেডফোর্ড স্মিথ) ৪.০০ অজয় চক্রবর্তী পরিচয় পাবলিশার্স
রাইট ব্রাদার্স (হেনরি টমাস) ২.০০ সবুজ সাথী এশিয়া পাবলিশিং
রাতের গাড়ি (আগাথা ক্রিষ্টি) ৪.০০ ত্রিবেণী
মঙ্গলা (আন্নাভাউ সাঠে) ২.০০ বোম্মানা বিশ্বনাথম্ নয়া প্রকাশ
সেকালের বুখারায় (সদরুদ্দীন আইনী) ৪.০০ বিনয় মজুমদার ন্যাশনাল বুক এঃ
স্তেফান ৎস্বোয়াইগের গল্প সংগ্রহ (২য় খণ্ড) ৫.০০ দীপক চৌধুরী রূপা

## শিশু সাহিত্য

অনেক মানুষ একটি মন ২.০০ সবুজসাথী এশিয়া পাবলিশিং
ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে ২.০০ হেমেন্দ্রকুমার রায় আই এ পি
এলোমেলো ২.০০ বুদ্ধদেব বসু শ্রীপ্রকাশ ভবন
কিশোর কাহিনী ১.৫০ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস আই এ পি
কিশোর সঞ্চয়ন ৪.০০ প্রেমেন্দ্র মিত্র অভ্যুদয়
ঐ ৪.০০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ
ঐ ৪.০০ শিবরাম চক্রবর্তী ঐ
গ্রীসের রূপকথা ১.০০ রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যো: ন্যাশনাল পাব্লি:
ছোটদের ভাল ভাল গল্প ২.০০ বনফুল শ্রীপ্রকাশ ভবন
ঐ ২.০০ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
ঐ ২.০০ হেমেন্দ্রকুমার রায় ঐ
টাকা গাছ ১.৭০ লীলা মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরী আই এ পি
দুই ভাই ২.৫০ সুখলতা রাও মিত্র ও ঘোষ
দেশে দেশে রাণী (ভ্রমণ কাহিনী) ২.০০ ভবপুরে চিনুকো
নবীন রবির আলো ১.৭৫ বিজনবিহারী ভট্টা: সাহিত্য সংসদ
পাখী আর পাখী ৩.০০ ইন্দিরা দেবী আই এ পি
নাট্যে প্রণাম ৩.০০ স্বপনবুড়ো ঐ
পিনকুর ডাইরী ২.০০ সরলাবালা সরকার আনন্দ পাব্লি:
বারো মাসের বারো রাজা (অনুবাদ) ৩.০০ মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায় অভ্যুদয়
মেঠাইপুরের রাজা ১.৬০ বিশ্বনাথ দে শ্রীপ্রকাশ ভবন
যত রাজ্যের রূপকথা (সংকলন) ২.০০ ন্যাশনাল পাবলিশার্স
যত রাজ্যের সেরা গল্প (সংকলন) ৩.০০ ঐ
রাজস্থানী রূপকথা ২.০০ নীলরতন মুখোপাধ্যায় চিনুকো
রূপকথার সাজি ১.৫০ সুনন্দা ঘোষ শ্রীপ্রকাশ ভবন
সব সেরা গল্প ২.০০ কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত এশিয়া পাবলিশিং
স্বামী বিবেকানন্দ ২.০০ আশাপূর্ণা দেবী নবগ্রন্থ কুটির

ধারাবাহিক আত্ম-জীবনী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

পরিমল গোস্বামী

১১

**শশিশেখর বসু**

বলেছি, আমাদের দেশে ভূত দেখা খুবই সোজা, এবং আমার মনে হয় ঠিক এই কারণেই আমাদের পক্ষে মানুষ দেখা বেশ একটু কঠিন। বৈশিষ্ট্যহীন জনারণ্যে আমরা মানুষকে ঠিকমতো দেখতে পাই না। অথচ আমরা যাদের বৈশিষ্ট্যহীন মনে করি, তারা আসলে তা নয়। তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা ক'রে জগৎ আছে, একটা ক'রে পটভূমি আছে। সেই পটভূমিতে দেখলে প্রত্যেক মানুষই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অণুবীক্ষণে বেশি বাড়িয়ে দেখা জীবাণু যেমন একটি বিশেষ ফোকাসে একটি বিশেষ স্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং তার উপরের বা নিচের স্তরের জীবাণু তখন দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, মানুষকেও তেমনি বিশেষ বিশেষ ফোকাসে দেখতে হয়।

পাটনার মণীন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত বিহার হেরাল্ডে প্রথম Esobss নামক এক অপরিচিত ব্যক্তির লেখা পড়তাম, ভাল লাগত। একদিন মণির কাছে শুনলাম, ঐ নামটি হচ্ছে S. S. Bose উল্টো ক'রে লেখা। বুঝলাম ব্যঙ্গ কৌতুকের দৃষ্টিতে সাধারণ জিনিস উল্টো ক'রে দেখতে হয় অনেক সময়। এই লেখক নিজের নাম থেকেই ঐ কার্যটি শুরু করেছেন।

তারপর শুনলাম তিনি শশিশেখর বসু এবং রাজশেখর বসুর বড়দা। তখন তাঁর লেখার প্রতি মনোযোগ আরও বেশি ঘনীভূত হ'ল। দেখলাম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এমন উদার এবং হিংসা-দ্বেষ বর্জিত যে ইনি সত্য কৌতুকরস সৃষ্টিতে সে কারণে এত সফল। তারপর তাঁর সঙ্গে পরে যোগাযোগ ঘটিয়ে ফেলতে কোনো অসুবিধা হল না। ঠিকানাটা আমার বাড়ির কাছাকাছি ছিল, কিন্তু তবু প্রথম পরিচয় হ'ল চিঠির সাহায্যে। চিঠির মধ্যেই সবখানি মানুষটার পরিচয় মিলল। পরম উদার এবং সরল। বয়স ৭৮ বছর, কিন্তু পত্র লিখনভঙ্গিতে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। যেন সমবয়সী বন্ধু।

তারপর দেখা হ'ল। সে এক স্মরণীয় দিন। আমি মানুষটিকে দেখে বিস্মিত হলাম। আমি নাম বলতেই অভ্যর্থনার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন একবার এ ঘরে যান, একবার ও ঘরে। আমার সঙ্গে ছিলেন নিখিলচন্দ্র দাস। তাঁর পরিচয় স্মৃতিচিত্রণে একটু বেশি করেই দেওয়া আছে। নিখিলবাবুও শশিশেখরের কথা শুনে তাঁকে দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ শশিশেখরকে দেখে হঠাৎ মনে হ'ল যদি কিছু হাসির কথা বলেন এবং নিখিলবাবুর উপর তার প্রতিক্রিয়া হয়, তা হ'লে খুনোখুনি কিছু না ঘ'টে বসে। কেননা হাসতে আরম্ভ করলে নিখিলবাবু তাঁর মোটর নার্ভের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, সবটাই হয় তখন রিফ্লেক্স ক্রিয়া। যখন মোটর চালাতেন তখনও হাসিয়ে দিলে মোটরের উপরেও তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকত না। একবার একা চলছিলেন হ্যারিসন রোড দিয়ে। কি এক হাসির কথা মনে পড়ায় এক মারাত্মক কাণ্ড ঘটেছিল। যখন সব ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলেন তখন দেখেন ওয়াই-এম-সি-এর পাশে তাঁর মোটর আকাশে চার পা তুলে প'ড়ে আছে, এবং তিনি ষ্টিয়ারিং ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন।

সুতরাং আমি শশিশেখরের সামনে খুব সতর্ক রইলাম, দৃষ্টি রাখলাম নিখিলবাবুর দিকে। কিন্তু খুবই সৌভাগ্য বলতে হবে, শশিশেখর সে রকম কৌতুক কথা কিছুই বললেন না, যদিও তাঁর পক্ষে যেসব কথা বলা সম্ভব ছিল ব'লে পরে জেনেছি, তার যে-কোনো একটা বললেই গুরুতর কাণ্ড ঘটে যেত। যেসব কথা বলায় সামাজিক ভাবে অনেক ক্ষেত্রে নানা বিধি-নিষেধ আছে, শশিশেখরের হাতে সেসব কথা অর্গলহীন অবস্থায় বেরিয়ে আসে। লেখাতে কিছুই আটকায় না। ইংরেজীতে তিনি ছিলেন বেপরোয়া ভাবে স্বাধীন। বিহার হেরাল্ডে মাঝে মাঝে এমন লেখা দেখেছি যার বাংলা অনুবাদ ছাপা চলে না।

শশিশেখরকে আমিই বাংলা লিখতে প্রবৃত্ত করি এবং সেজন্য তিনি এই তাঁর নতুন ভাষা মাধ্যমে মনের কথা বহু লোককে শোনাতে পেরে একটা মস্ত বড় মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন মনে মনে। সেজন্য আমাকে যেন একটা মস্ত বড় আশ্রয়ের মতো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। কি গভীর প্রীতি ও স্নেহের পরিচয় যে পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে! তিনি আমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করতেন, আমাদের বাড়ির সবাইকে সমান স্নেহ করতেন। পাটনা থেকে তাঁর পুত্র মৃগাঙ্ক অথবা পুত্রবধূ শান্তা কিছু পাঠালে আমাকে তার অংশ দিতেন। বাড়ি

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

থেকে উৎকৃষ্ট মাংস রান্না ক'রে মস্ত বড় হাঁড়িতে ক'রে পাঠিয়ে দিতেন তাঁর ভৃত্য কানাইয়ের হাত দিয়ে।

আমি তাঁর যে প্রবন্ধগুলি সাময়িকীতে ছেপেছি, তার একটা সংকলন ছাপা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১লা ভাদ্র ১২৮১, মৃত্যু ১৪ই ফাল্গুন ১৩৬১। বাংলা লেখা আরম্ভের পর মাত্র দু বছর বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়েই প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে গেলাম শেষ প্রণাম জানাতে। সে গম্ভীর পরিবেশে মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাজশেখর বসুর মতো স্থির মস্তিষ্ক লোকই সেখানে অবিচলিত থাকতে পারেন।

তাঁর যত লেখা ছেপেছিলাম এবং অন্যত্র ছাপার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলাম তার মধ্যে "বুড়ো সাবধান" নামক রচনাটি সব চেয়ে মূল্যবান মনে হয়েছিল সবার কাছে। অবশ্য তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই তাঁর এক অদ্ভুত ঘরোয়া ভঙ্গিতে লেখা, এবং প্রত্যেকটি উপভোগ্য। তবু "বুড়ো সাবধান" প্রবন্ধে অনেক কাজের কথা ছিল ব'লে বিশেষ ক'রে বয়স্করা প্রবন্ধটিকে খুব পছন্দ করেছিলেন।

কিছু নমুনা দিচ্ছি—"একদিন সার্কুলার রোডে বেড়াচ্ছি, সামনে একটা আমের খোসা পড়ে আছে। নজর হয়নি। পেছু দিকের ভদ্রলোকটি তা দেখে হেঁকে সতর্ক করলেন "বুরা সাবধান!" ফিরে দেখি পূর্ববঙ্গের বন্ধু চানু—বিলেত ফেরত। আমাদের জেলাতেও 'বুরো' বলে, এটাকে বানান ভুল বা প্রিন্টিং মিসটেক ভাববেন না।

···এক নব্বই বছরের বৃদ্ধ বলেন, 'অবাক হই ভেবে কেমন করে আমার মোটা বৌকে ত্রিশ বছর বয়সে বিছানায় ক্যাঁক ক'রে ধ'রে বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে সরিয়ে দিতাম। এখন তো আমার ছোট্টটো পাঁচ বছরের নাতনীটাকে তুলতেই পারি না।'

"ঘাটে পা দিলেই ট্রাম বস্ চড়া বন্ধ করবেন। ফুটপাথেও সাবধান। অনেক বৃদ্ধের ফুটপাথে ফ্রাকচর হয়। প্যারালিসিস ভগবানের হাত, কিন্তু ফ্রাকচর বাঁচান আপনার হাত। তবে কি বিছানায় শুয়ে থাকবেন?···কেতাবে পড়েছি বিছানায় পাশ ফিরতে গিয়েও বৃদ্ধের ফ্রাকচর হয়। তবে তাই—বিছানায় শুয়ে কাজ নেই।

"অতি বৃদ্ধের কি বাঁচবার দরকার আছে? বুড়োরা মনে করেন, আমরা বেঁচে না থাকলে বুঝি পৃথিবী চলবে না। অসুখে পড়ে এক বৃদ্ধ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ডাক্তার মশায়, আমি বাঁচব তো?' ডাক্তার হেসে জবাব দিলেন, 'আপনার আর বাঁচবার দরকার কি বলুন না?' বৃদ্ধ হতাশ হল, মৃত্যুর করাল ছায়া তার মুখ ঢাকলো। তারপর তুমুল রবে—বল হরি হরি বোল!

অপ্রিয় সত্য বৃদ্ধের প্রাণনাশ করে, মিথ্যা কথায় বৃদ্ধ জোর পান, —'কর্তা গো, আপনি দুশো বছর বাঁচবেন!'

এ রকম গল্পের পর গল্প, কি চমৎকার বলবার ভঙ্গি! আর এক জায়গায় বলছেন—

"এলাহাবাদে রবাই ঘোষ নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন, সর্বদা মৃত্যু ভয়ে অভিভূত। মাইনটি নাইন টেম্পারেচারেই 'মধুসূদন, বাঁচাও এ যাত্রা!' বলে কাঁদতেন। তাঁকে সকলে উৎসাহ দিত, 'ভয় কি রবাই দাদা, আপনার চেয়ে বয়সে বড় মতি ময়রা, তার চেয়ে বেশী বুড়ো রমেশ ডাক্তার। ওরা মলে তবে আপনার পালা।' সামলে নিতেন। একদিন রমেশ ডাক্তার মরলেন। রবাইদাদার কম্প দিয়ে জ্বর এল 'ভয় কি? এখনও মতে-ময়রা বেঁচে।' সামলে উঠলেন। তারপর রোজ খোঁজ নিতেন মতে-ময়রা কেমন আছে, ও তার একটু অসুখ হলেই চিকিৎসার খরচ দিতেন।"···

এ রকম সরল সরস ভঙ্গি বাংলা ভাষায় খুব বেশি লেখা হয়েছে কি? অথচ শশিশেখরের নাম নেই অধ্যাপকদের লেখা বাংলা হাস্যরসের বইতে।

শশিশেখর প্রথম প্রথম আমাকে 'আপনি' বলতেন, চিঠিতেও তাই লিখতেন। আমি বললাম, এ বড়ই অন্যায়। আপনি তো বড়দা। তিনি চিঠিতে লিখলেন 'ব্রাহ্মণ, তাতে আর কি হয়েছে। আচ্ছা, আরও কিছুদিন ইয়ার্কি দিই, তারপর তুমি বলব।' এর অল্পদিনের মধ্যেই 'তুমি' সম্বোধন ধরেছিলেন। এ সব ১৯৫৩-এর কথা।

পূজা সংখ্যায় শশিশেখরের লেখা ছাপতাম। আমি একদিন বলেছিলাম বড়দা, রাজশেখরের ছেলেবেলার কথা লিখুন সে বেশ ইন্‌টারেসটিং হবে। বড়দা তৎক্ষণাৎ রাজি। এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে লেখা শেষ ক'রে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারপর হল মুশকিল। যত দিন যায় তত দেখি বড়দা ভয়ে অস্থির। কারণ রাজশেখর নিজে তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগত আলোচনা খুব পছন্দ করতেন না, তার উপর তা আবার নিজেরই দাদার লেখা।

লেখার সময় এতটা খেয়াল হয় নি। লেখা দেওয়ার পর দেখা দিল সমস্যা। রাজশেখর রাশভারী লোক, হঠাৎ যদি ব'লে বসেন, দাদা ও-সব লিখো না, তাহ'লে কি হবে?

পরামর্শ সভা বসল আমাদের মধ্যে। ঠিক হল খুব গোপন রাখা হবে ব্যাপারটা। ঘুণাক্ষরে টের পেলে সব উল্টে যেতে পারে। আপাতত সমস্যাটা এইখানেই মিটে গেল। কিন্তু শশিশেখরের মন থেকে ভয় দূর হল না। তাঁর এত যত্ন ক'রে লেখা রচনাটি যদি বাতিল হয় তাহলে তাঁর বড় দুঃখ হবে। নিজে এদিকে অতিরিক্ত রক্তের চাপে ভুগছেন, মাথা ঘোরে যখন-তখন, সে সময় বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়, এমনি অবস্থায় আমাদের কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাড়িতে তিনি আসতে লাগলেন। ছেলেমি বুদ্ধিটি পুরোপুরি আছে, অথচ দৈহিক শক্তিতে কুলোচ্ছে না। এ সম্পর্কে তিনি বলছেন "আমি প্রত্যহ দু'ঘণ্টা অন্ধ হয়ে শুয়ে থাকি, চোখ বুজলেও ঘরের আকাশে উড়ন্ত চাক্তি দেখি এবং রং চং করা ভাসন্ত পদ্মফুল।"

নিজের ঐ লেখা সম্পর্কে কি পরিমাণ ভয়ে ভয়ে ছিলেন, তা তাঁর কয়েকখানা চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। আমি বড়দাকে (শশিশেখরকে) লিখেছিলাম রাজশেখর যতীন্দ্রকুমার সেনের ছবিতে এমন অভ্যস্ত যে অন্য কোনো শিল্পী তাঁর গল্পের ছবি আঁকলে তা তাঁর খুব পছন্দ হয় না। যতীন্দ্রকুমার কি এখনও ছবি আঁকেন? তাঁকে কি পাওয়া যায় না? তার উত্তরে বড়দা জানালেন—

"কল্যাণীয় গোস্বামী মহাশয়, রাজশেখরের এখনকার টেলিফোন নম্বর ৩৫১১ সাউথ।

যতীনের ঠিকানা পার্শিবাগানে কৃষ্ণশেখরও জানে না। ৭২ বকুলবাগান রোডে সকলে চিঠি দেয়। এটা রাজশেখরের ঠিকানা।

যতীনের বয়স ৭২। চোখ খারাপ, যতদূর জানি রাজশেখরের ছবি যতীন এখন আঁকেন না।···

রাজশেখরের ঠিকানায় জিজ্ঞাসা করবেন না কি? কিন্তু তাতে গ্রাইভেসি থাকবে না, surprise হবে না।" শশী, ২১।১।৫৩।

এত কাণ্ডের পরেও ধরা পড়বার ভয়। যদি এই উপলক্ষে তাঁর লেখার কথাটা জানাজানি হয়ে যায়।

আর একখানা চিঠি আগে লেখা—গোস্বামী মহাশয়, যদি কোন রকমে টের পায় তাহলে আমাকে বলবে "ছি ছি ক্যানসেল কর।"

তার অনুরোধ শুনতে আমি বাধ্য। সে আমার অনুরোধ রেখেছে। অতএব দয়া করে দেখবেন যেন leak না করে!

একটা ফোটো পাঠাই। এর সঙ্গে তার [ রাজশেখরের ] মহত্ত্ব কবিত্ব জড়িত। এটা না হলে ইনটারেষ্টই হবে না।

আপনিই বিচারকর্ত্তা।

আমি ভাল, আশা করি আপনি ভাল। এখন ত আপনার বেজায় কাজ বাড়বে। প্রণাম শশী, ২১।৮।'৫৩

আমি জানিয়েছিলাম এখন তো গোপন করা গেল, কিন্তু যখন পুজো সংখ্যা প্রকাশের আগে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে, তা-তো রাজশেখর দেখতে পাবেন।

আবার সমস্যা, কি করা যায়। ইতিমধ্যে শশিশেখর জানালেন রাজশেখর এসেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন পুজোয় কি লিখছ? শশিশেখর লিখছেন "এ প্রশ্নে আমি গাঁইগুঁই করে কাটিয়ে দিলাম। দিয়েছি তো কয়েকটা দেখি গোস্বামী মহাশয় কোনটা ছাপেন। জিজ্ঞাসা করা এটিকেট নয়, তাই কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।"

আমি শশিশেখরের নির্দেশেই তাঁকে লিখে জানালাম বিজ্ঞাপনে প্রথমে লিখে দেব শশিশেখর বসুর লেখা—"বাল্যকাল"। তারপর বই যেদিন বেরোবে সেইদিন "রাজশেখরের বাল্যকাল" কথাটি বসিয়ে দিলেই হবে।"

তার উত্তরে শশিশেখর লিখলেন "ধন্যবাদ! ঠিক স্কীম হয়েছে। প্রথম দিকে চাতুরি, যেদিন বই বেরুবে সেদিন ফাঁস। তা নইলে ভয়ানক সীন হতে পারে।

কবিশেখরকে যে চিঠি দিয়েছি তার কপি আমাকে ফেরৎ দিতে হবে না। আমার মুখস্থ আছে।

যতীন্দ্রকুমার সেন রোজ রাজশেখরের বাড়ি ২টা থেকে সন্ধ্যা আড্ডা দেন। তিনি শুনতে পাই কেবল বেঙ্গল কেমিক্যালের ছবি আঁকেন। টেলিফোন রাজশেখরের বাড়িতে করলেই হবে South 932.

কিন্তু জানাজানি হওয়াই সম্ভব। যতীনের ঠিকানা আমি আপনাকে কাল ৭টায় সকালে পাঠাব। প্রাইভেট চিঠি। লিখলেও ফাঁস হয়ে যাবে বোধ হয়।" (২১।৯।৫৩)

ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে কত রকম আতঙ্ক এবং কত রকম ছলনা। অথচ যে লেখাটি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন তাতে ভয়ের তো কিছু ছিলই না, সংকোচেরও কিছু ছিল না। শুধু রাজশেখরের চরিত্র স্মরণ করেই তাঁর যত সংকোচ। রাজশেখরের চরিত্রের সেই দিকটি, যার জন্য শশিশেখরের এই ছলনা, সে দিকটির সঙ্গে পরে আমারও পরিচয় ঘটেছিল। সে কথা পরে বলা যাবে।

১৩৫৩ সালের বিজয়ার পরে শশিশেখর আমাকে এই চিঠি লেখেন—

১৪৩।বি বিবেকানন্দ রোড

স্নেহাস্পদেষু,

বৃদ্ধের অকৃত্রিম প্রীতি আলিঙ্গন ও গোটাকতক কবিতা বিজয়ার ভেট নেবেন। এ পূজায় সকল ম্যাগাজিনে প্রায় লিখেছেন দেখছি।

আপনি গদ্য লেখেন, তবে আপনাকে পদ্য উপহার দিই কেন? আপনার সমালোচক একজন লিখেছেন আপনি 'রোদনভরা হাসি' লেখেন। তাই এই রোদনভরা কবিতা দিলাম। ধার করে কবিতা দিলাম, আমার নিজের নয়। আপনি যে রকম বিলাতি চোরদের উপর সহানুভূতি দেখাচ্ছেন তাতে বিলাতি চোরাই মাল দিতে দোষ নেই। যাঁর জিনিস চুরি করেছি তাঁকেও পাঠালাম আলিঙ্গন সমেত। তার কপি ওপাতে দিলাম। দেখবেন।

তাঁর কবিত্বের সীলমোহরে আপনিই আমার মনে আগে ছাপ মেরেছিলেন, হয় তো না জেনে। তার পর আমার ভাই, তাঁর আর দুই বন্ধু, আমাকে তাঁর কবিতায় দীক্ষিত করল। তারাও বোধ হয় ঠিক জানে না কি রকমে আমাকে দীক্ষিত করল।—শুভানুধ্যায়ী আশীর্বাদক শশিশেখর বসু।"

এই চিঠিতে বিলাতি চোরদের কথা লিখেছেন বিলাতি চোরদের সম্পর্কে আমার লেখা ইতস্ততঃ প'ড়ে। যে কবির কথা বলেছেন তিনি কবিশেখর কালিদাস রায়। কালিদাস রায়ের কয়েকটি কবিতা তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন, এবং তা সম্ভবত: বিহার হেরাল্ডে প্রকাশও হয়েছিল।

শশিশেখর যে চিঠির নকল আমাকে পাঠাচ্ছেন লিখেছেন, সেখানা কালিদাস রায়কে লেখা। সে চিঠিতে তিনি লিখছেন—"···আপনার কবিতার উপর আমার একগুণ অনুরাগ পাঁচ জনে মিলে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিদ্রা না হলে এখন আমি বায়রন আওড়াই না—

My days are in the yellow leaf
The flowers and fruits of love are gone.

এখন একলাই কোরস্ মুখস্থ আওড়াই—

চণ্ডীদাস বিমণ্ডিল শির হীরক কিরীট তারে
জ্ঞান গোবিন্দ বৃন্দাবনের কুন্দকুসুম হারে।"

এর পূর্বের চিঠিতে রাজশেখরের ছেলেবেলা প্রবন্ধের সঙ্গে যে ফোটোগ্রাফ পাঠানোর কথা আছে, সেখানা শশিশেখরের স্ত্রীর ফোটোগ্রাফ।

শশিশেখরের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাঁর সঙ্গেই একদিন গিয়ে আমি রাজশেখরের সঙ্গে প্রথম আলাপ করি। ঠিক হয়েছিল তিনি বিবেকানন্দ রোড থেকে কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে এসে আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নেবেন। অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার জন্য এতটা ঝুঁকি নিতে রাজি হয়েছিলেন এতে তাঁর মহৎ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর এই চিঠিখানায় রাজশেখর দর্শনের খবর পাওয়া যাবে—শশিশেখর লিখছেন, "গোস্বামী মহাশয় প্রণাম,—কাল (২৮।৮।৫৩) শুক্রবারে সকালে আপনাকে আমি তুলে নেব। আমি চাকর পাঠিয়ে আপনাকে খবর দেব, আমি নিজেই গাড়িতে বসে থাকবো।

৮টার সময় আমি আপনার কাছে পৌঁছব। আপনার কাল সুবিধা হবে তো? না হয় তো অন্যদিন ঠিক করে জানাবেন।

Appointment করা শক্ত, হয় তো সেদিন মাথা ঘুরবে!

আমি যদি ৮টার মধ্যে না পৌঁছতে পারি, বুঝে নেবেন শরীর ঠিক নেই, যাব না।

I am anxious to finish the introduction soon, which is a great duty for me.

আপনার শশিশেখর বসু
২৭-৮-৫৩

আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, শশিশেখর পরদিন দূত মারফৎ এই চিঠিটি পাঠালেন—গোস্বামী মহাশয়, আমি এসেছি। আপনার বাড়িতে অপেক্ষা করছি।—শশী ২৮।৮

এই লিখনটুকু তিনি বাড়ি থেকেই লিখে এনেছিলেন। তাঁর কাজে খুব শৃঙ্খলা ছিল, উপরের প্রথম চিঠিখানার যে অংশটুকু ইংরেজীতে লেখা, সেটুকু তাঁর নিজ হাতে টাইপ করা। সব সময় প্রায় টাইপরাইটার নিয়ে বসে থাকতেন, যিহার হেয়ালাতে নিয়মিত লিখতেন। সেখানে আমার কয়েকটি গল্পের অনুবাদ ছেপেছিলেন। "মারকে লেজে" ও 'ব্ল্যাক মার্কেট' এই দু'খানা বইয়ের কয়েকটি গল্প—সংখ্যা মনে নেই, অন্তত তিনটি মনে আছে। তার বেশি না বোধ হয়।

প্রথম বইখানা পাঠানোর পর লিখছেন—"গোস্বামী মহাশয় প্রণাম, মারকে লেজে পেয়ে মহা গৌরব বোধ করছি। আজ পড়তে আরম্ভ করবো অন্ডারলাইন করে। পরে পাটনা পাঠাব। [ পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে ]।

"ইতস্তেতঃ পড়লাম, আমাদের পাড়ার হিন্দুস্থানী এত বড় লোক যে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইলেই বলে বাঙালী।

কবিশেখর মহাশয়ের ( যুগান্তর সাময়িকীতে ছাপা ) প্রবন্ধ দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ছি। অতি চমৎকার। বোধ হয় যেন আমার গুরু মহাশয়কে ( ১৲ মাইনে ) দেখে লিখেছেন। আমি বাবার তামাক চুরি করে নিয়ে তাঁকে দিতাম। ধন্যবাদ। —শশী, ৩০।৮।৫৩ [ ক্রমশঃ।

## চন্দ্রালোক-গীতিকা

### শ্রীমতী ছায়া দেবী

ওগো চন্দ্রা রাতের তন্দ্রা-মোহন আবেক ছলনা!
সেই স্বপ্ন ভরা সুরের পরশ আমায় বল না?
এই ছন্দহারা স্বপ্ন তারার মালা গাঁথিতে,
মনটি আমার ভেসে বেড়ায় আকাশ নদীতে।
স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ বিধুর বকুল বীথিকা,
ফাগুন সমীর পাঠিয়ে দিলো তোমার লিপিকা।
বন্ধু তোমার আবেশ বিভোল প্রেমের গীতালি,
আমার প্রাণে জাগিয়ে দিলো অমর মিতালী!

কনক-আলো উঠলো জ্বলে ফুলের আসরে,
রূপের ছায়া লুটায় নিঝুম প্রেমের বাসরে।
মাধবী-রাত ডাকিল আজ, আমায় বাঁধ না?
তোমার প্রাণে আমার আলো সেই তো সাধনা!
নিঝর সুরে বেড়ায় ঘুরে উছল তটিনী,
চলার তালে বাজায় নূপুর নৃত্য নটিনী!
হেথায় শুনি তোমার হাসি মধুর কলস্বর,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী উদাস বালুচর।

জ্যোছনা মেখে লুটিয়ে আছে আশার মণিকা,
সুপ্ত ধরায় মুগ্ধ মায়া মিছেই কণিকা!
তোমার সাথে আমার দেখার ব্যাকুল কামনা!
মরাল পাখায় আলোর রথে আজকে নাম না?
তোমার গানে আমার কথা অমর কাহিনী,
মধুর সুরে উঠুক ফুটে আলোক রাগিণী।
বন্ধু আমার আঁখির আলো! হিয়ার গভীরে,
অসীম নভে মেঘের লিখন স্বপ্ন ছবি রে!

## নববর্ষ

### কার্ত্তিক ঘোষ

আগত নূতন বর্ষ গত আটষট্টি
গত পুরাতন—
বিষাদ-বিরহ বাধা বিপত্তি বিভ্রাট,
হিংসার গর্জ্জন, বিষাক্ত দংশন
হৌক পুরাতন।
নূতন বরষ এস তের শত উনসত্তর—স্বাগতঃ নূতন
নবীন আশার আলো ভারতে বিরাট
নব জাগরণ
বিজয় কেতন
আগত নূতন।
লইয়া জ্ঞানের জ্যোতি, স্নেহ প্রেম দয়া প্রীতি,
সরল তরল মতি শিশুর মতন—
তরুণ তপন
আগত নূতন।
কপোতী কপোত সাথে
হংস হংসী যুথে যুথে
প্রেমের আলোক-পাতে
মধুর মিলন ভ্রমর গুঞ্জন
স্বাগতঃ নূতন।

## ডক্টর শ্রীনীলরতন ধর

### ( জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিক )

শুনেছিলাম, ব্যক্তিটি নাকি খুব গম্ভীর প্রকৃতির ও পরম শৃঙ্খলা-পরায়ণ। তদুপরি স্বদেশে ও বিদেশে বন্দিত প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক। আমার মনে উঠল এক বিরাট প্রশ্ন—কি ভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবে? দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে এলাহাবাদ শহরের উপান্তে অবস্থিত এক সুন্দর ও শান্ত পরিবেশময় গবেষণাগার জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমীর অন্তর্ভুক্ত—শীলা ধর ইনঃ অব সয়েল সায়েন্স (Soil Science)-এ সাক্ষাৎ হল আত্মভোলা, সন্ন্যাসী-প্রতিম ও জনকল্যাণনিরত বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্, ডক্টর শ্রীনীলরতন ধরের সহিত। স্বদেশহিতৈষী ও লোকদরদী এই জনসেবক জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও সুসমখাদ্য উৎপাদন গবেষণায় মগ্ন।

সব ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে তৃতীয় সন্তান নীলরতন ১৮৯২ সালের ২রা জানুয়ারী যশোহর সহরে ভূমিষ্ঠ হন। আইনজীবী পিতা ৺প্রসন্ন কুমার ধর ৯৭ বৎসর বয়সে মারা যান। মাতা ৺নীরদমোহিনী দেবী। ১৯০৭ সালে তিনি যশোহর সরকারী বিদ্যালয় হইতে এন্ট্রান্স, রিপণ কলেজ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট, প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অনার্স সহ বি, এস, সি এবং ১৯১৩ সালে তথা হইতে রসায়নশাস্ত্রে এম, এস সি পাশ করেন। শেষ দুই পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্রজীবনে কুড়িটি (২০) স্বর্ণপদক পাওয়া ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আচার্য্য রায়, জে, বি ও সি, বি ভাদুড়ী, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি স্বনামধন্য অধ্যাপকদের নিকট পাঠ গ্রহণ বিশিষ্ট ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ডঃ জীবনরতন ধর ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডঃ দুর্গারতন ধর তাঁহার অন্যতম ভ্রাতৃদ্বয়।

শ্রী ধর ষ্টেট স্কলারসীপ পাইয়া চারি বৎসর য়ুরোপে পড়াশুনা করেন। ১৯১৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, এস, সি ও ১৯১৯ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় (Sorbonne) হইতে ষ্টেট ডি, এস, সি হন। শেষোক্ত ডিগ্রীর জন্য তিনি ফ্রান্সে অধ্যাপনা করিতে পারিতেন। কিন্তু ডঃ ধর উক্ত বৎসরে তদানীন্তন ভারত-সচিব কর্ত্তৃক ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হওয়ায় বরাবর তিনশত টাকা ওভারসীজ ভাতাসহ এলাহাবাদ মুইর সেণ্ট াল কলেজে যোগদান করেন। পুনর্গঠিত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সায়েন্স ফ্যাকাল্টীর প্রথম ডীন (Dean) হইয়া (১৯২৩-২৬) পরলোকগত ডঃ মেঘনাদ সাহাকে ১৯২৩ সালে অধ্যাপক হিসাবে আনয়ন করেন।

ডঃ ধর বিগত পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী নানারূপ গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহার উল্লেখ্য অবদান হল (১) রসায়ন ও মৃত্তিকা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণাগার স্থাপন, (২) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্রিকায় তৎ লিখিত ৪৬০ মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশনা, (৩) ভূমিতে নাইট্রোজেন অবক্ষয় ও স্থিরীকরণে আলোর প্রভাবের অবিষ্কার ইত্যাদি, (৪) তৎ-লিখিত ইংরাজীতে তিনটি মৌলিক গ্রন্থ, (৫) "আমাদের খাদ্য" ও "জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়" পুস্তকদ্বয়ের লেখক এবং (৬) পরলোকগত সহধর্ম্মিণী (ডঃ পরেশ রঞ্জন রায়ের কন্যা) শীলাদেবীর স্মৃতি জড়িত "শীলাধর ইনষ্টিটিউট"-এ বিভিন্ন দেশের মৃত্তিকা লইয়া গবেষণা। একশত ষাটের উপর গবেষণাকারী ছাত্র তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ডক্টরেট ডিগ্রী গ্রহণ করিয়া ভারতের

বিভিন্ন কেন্দ্রে নিযুক্ত রহিয়াছেন। "শীলা ধর ইনঃ" প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ডঃ ধর এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি সাড়ে তিন লক্ষ টাকা গবেষণাকারী ছাত্রদের বৃত্তি বাবদ উহাতে প্রদান করেন।

১৯৩০ সালে তিনি শ্রীমতী শীলাদেবীকে বিবাহ করেন এবং ১৯৪৯ সালে ক্যান্সার রোগে শ্রীমতী ধর পরলোক গমন করিলে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী শ্রীমতী মীরা দেবী (এম, এ, লণ্ডন)-র সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

আমাদের গর্ব্বের কথা যে, ডঃ ধর ১৯৩৮, ১৯৪৭ ও ১৯৫২ সালে Nobel প্রাইজ কমিটীর সদস্য হিসাবে (রসায়ন বিভাগে) কার্য্য করিয়াছেন। ১৯৬৩ সালে নোবল প্রাইজের (কেমিষ্ট্রী) অন্যতম প্রতিযোগী হিসাবে তাঁহার নাম কয়েকটী দেশ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত তিনি প্রায় আটলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩৷০ লক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে (আচার্য্য রায় চেয়ারের জন্য) ২৷০ লক্ষ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনকে এক লক্ষ, বিশ্বভারতীকে দশহাজার ও ভারতীয় কেমিক্যাল সোসাইটীকে বারশত টাকা দান উল্লেখযোগ্য।

তিনি ১৯৫৫ সালে ফরাসী কৃষি এ্যাকাডেমীতে প্রাচ্যদেশ হইতে একমাত্র নির্ব্বাচিত সদস্য, ফরাসী বিজ্ঞান এ্যাকাডেমীতে ১৯৬১ সালে সর্ব্বোচ্চ ভোটে নির্ব্বাচিত সদস্য (উহাতে ৩০০ বৎসরে মাত্র আজীবন সদস্য হইয়াছেন), ১৯৬১ সালে রুরকীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি, ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স-এর ভূতপূর্ব্ব

ডক্টর শ্রীনীলরতন ধর

সভাপতি এবং বহু বিজ্ঞান সভার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনি আজীবন সদস্য।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "কমলা বক্তৃতা" দেন। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় কংগ্রেস বিজ্ঞানবিদ হিসাবে তাঁহাকে প্রথম স্বাগত অভ্যর্থনা জানান।

ডঃ ধরের কিছু প্রবন্ধ "মাসিক বসুমতী"-তে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা পাঠক-পাঠিকাদের অজানা নহে।

## শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় ( "রয় দি মিষ্টিক" )

( বাংলা, তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর )

আধুনিক যাদুবিদ্যার চর্চায় সারা ভারতে বাংলা দেশই অগ্রণী। বাংলাদেশে যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর যাদুকর জন্মগ্রহণ করেছেন, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় ( "রয় দি মিষ্টিক" ) তাঁদের অন্যতম। জীবিত বাঙালী যাদুকরদের মধ্যে তিনিই প্রবীণতম, বয়স তাঁর সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা শহরে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারে এঁর জন্ম হয়। পিতা শ্রীকালী ভৈরব রায় একটি জমিদারি এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। বাল্যকালে একটি নাটকের অভিনয়ে যতীন্দ্রনাথ দূতের ভূমিকা নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন। সেদিনই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন ভবিষ্যতে এমন ভূমিকা তিনি নেবেন যাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে একাই আসর মাত করে এই অপমানের শোধ তুলতে পারেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারের মঞ্চে তখনকার বিশিষ্ট যাদুকর এমিন সুরাবর্দি-র ("প্রফেসর এমিন") যাদুক্রীড়া—বিশেষ করে তাঁর "শূন্যে ভাসমানা সুন্দরী"-র খেলাটি—দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে তিনি স্থির করেন এমনি যাদুকরের ভূমিকা নিয়েই আসর মাত করবেন। তাঁর জীবনের গতি নির্ধারিত করে দিল এমিনের যাদু। সৌভাগ্যবশতঃ এক মুসলিম বন্ধুর কাছে বিখ্যাত ইংরেজ যাদু-লেখক প্রোফেসর হফম্যানের লেখা একটি বৃহৎ যাদুগ্রন্থ এই সময়ে তিনি পান; সেই গ্রন্থের সাহায্যে এবং বিদেশ থেকে যাদুর সরঞ্জামাদি আনিয়ে যতীন্দ্রনাথ যাদুবিদ্যা অভ্যাস করতে শুরু করেন।
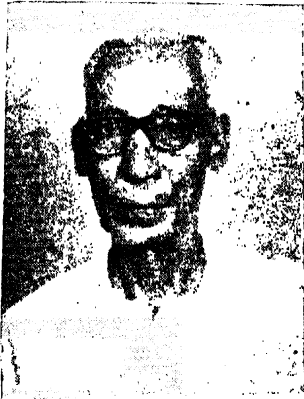
শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়

পারিবারিক অবস্থা বিপর্যয়ের ফলে ১৯১১ সালে তিনি সেটেলমেণ্ট বিভাগে কাজ নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে যান। তার কিছুদিন আগেই স্বনামধন্য যাদুকর গণপতি চক্রবর্তী তাঁর অদ্ভুত যাদুর খেলা দেখিয়ে জলপাইগুড়ি মাতিয়ে গেছেন; সবারই মুখে গণপতির যাদুর প্রশংসা। যতীন্দ্রনাথ এবং কয়েকজন যাদু-নেশাগ্রস্ত বন্ধু মিলে গণপতির অনুকরণে এক যাদুদল গড়লেন এবং যতীন্দ্রনাথ যাদু দেখিয়ে প্রচুর রোজগারের আশায় সরকারী চাকরি ছেড়ে দিলেন। দল নিয়ে গেলেন ঢাকা শহরে। সেখানে ক্রাউন রঙ্গালয়ে ১৯১২ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য মঞ্চে জনসাধারণের সামনে যাদুপ্রদর্শন করলেন, কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। ১৯১৪ সালে মুঙ্গের জেলার মুক্তিপুর গ্রামে গৃহশিক্ষকতার কাজ নিয়ে চলে গেলেন, নিরালায় একাগ্রভাবে যাদুবিদ্যা অভ্যাসের সুবিধা হবে বলে। এখানে বছর তিনেক দৈনিক এগারো বারো ঘণ্টা একাগ্র অভ্যাসের ফলে তিনি হস্তকৌশলে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন, এবং ভেন্ট্রিলোকুইজম্ ( স্বরক্ষেপণ ) বিদ্যায় ও দক্ষতা লাভ করেন। ১৯১৬ সালে ভাগলপুরে ( বিহার ) টি, এন, জুবিলী কলেজে "প্রোফেসর রায়" রূপে তাঁর একক যাদুপ্রদর্শন সাফল্যমণ্ডিত হয়। তারপর বাংলা, বিহার, আসাম ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে এই নামেই তিনি যাদুপ্রদর্শন করে বেশ আর্থিক সাফল্য লাভ করলেন। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলো ইউরোপিয়ানদের ক্লাবগুলো, চা-বাগানের সাহেববৃন্দ, জুটমিল, ইউরোপিয়ান স্কুল প্রভৃতি। তাঁর মঞ্চের বেশভূষা, যাদু প্রদর্শন, মঞ্চে বক্তৃতা ( patter ) সব ছিল ইংরেজি কায়দায়, তাই ইউরোপীয়ান মহলেই যাদুকর রায়ের সমাদর ছিল বেশি, এবং তাঁরা প্রচুর পয়সাও দিতেন। তাঁর খেলার ফর্দে অধিকাংশ খেলাই ছিল হাতসাফাই এবং চাতুর্যের খেলা, যাতে সত্যিকারের দক্ষতার প্রয়োজন হয়, যে দক্ষতা প্রচুর সাধনায় অর্জিত!

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে বাঙালী মাত্রেই ইউরোপীয়ানদের শংকা ও সন্দেহের কারণ হয়ে ওঠে। যতীন্দ্রনাথের শুভানুধ্যায়ী কয়েকজন ইংরেজ তাঁকে ইউরোপীয়ান মহলে চলাফেরা করতে নিষেধ করে দিলেন, কারণ তাতে পুলিশের সন্দেহের পাল্লায় পড়ে তাঁর অত্যন্ত বিপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে। এই কারণে বাধ্য হয়ে যাদুর পেশা ছেড়ে ১৯৩২ সাল থেকে দার্জিলিং-এ স্থায়ীভাবে আবাস নিয়ে তিনি চায়ের ব্যবসা শুরু করেন ইউনাইটেড টী সার্ভিস নামে। ব্যবসাটি বেশ ভালোই চলেছিল, কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার ফলে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। তারপর থেকে চলছে তাঁর অবসরপ্রাপ্ত জীবন। তাঁর দুই পুত্র এবং এক কন্যা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

দীর্ঘকাল পেশাদারী যাদু-মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেও ১৯৫৩ সালে দার্জিলিং-এ রাষ্ট্রপাল সম্বর্ধনা উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি যাদু-প্রদর্শন করে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিলেন—এ প্রদর্শন সম্পূর্ণ স্বদেশী কায়দায়, খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরে! বর্তমান বছরে ( ১৯৬২ ) মার্চ মাসে 'রবি-বাসর'-এ একটি বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি তাঁর যাদুকর জীবনের কিছু বিচিত্র কাহিনী শোনাবার পর এই পরিণত বয়সে অনভ্যাস সত্ত্বেও কয়েকটি বিস্ময়কর তাসের খেলা

দেখিয়ে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। পেশাদারী যাদুকর জীবনে তাঁর দুটি বিশিষ্ট খেলা ছিল "শূন্যে ভাসমান গোলক" (Floating Ball) এবং "শূন্যে ভাসমান সুন্দরী" (Lady floating in the air)। এ দুটি তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে দেখাতেন।

অবসর জীবনেও তিনি অলস হয়ে বসে নেই। তাঁর যাদু-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী নিয়ে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা রচনায় হাত দিয়েছেন; তার কিছু কিছু অংশ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

## ডাঃ শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত

[ পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের চীফ ইঞ্জিনীয়র ]

নানাপ্রকার প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকিয়াও ঐকান্তিক অধ্যবসায় ও স্বীয় প্রতিভাবলে যাঁহারা জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, ডাঃ শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার আদি নিবাস চট্টগ্রাম; সেখানেই তাঁহার জন্ম হয় ১৯০৩ সালে। চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত ব্যবহারজীবী স্বর্গত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার পিতৃদেব। আত্মীয় অনাত্মীয় অনেক ছেলেকেই তিনি উচ্চ শিক্ষালাভে সাহায্য করিতেন ও বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। ডাঃ দত্ত তাঁহার মাতাপিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার আদর্শ যে পুত্রকে অনুপ্রাণিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? চট্টগ্রামে পিতার কাছে থাকিয়াই ডাঃ দত্ত স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৫ সালে চট্টগ্রাম কলেজ হইতে গণিতে অনার্স সহ বি-এস-সি পাশ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন ও বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। সেখান হইতে তিনি ১৯২৭ সালে ফলিত পদার্থবিদ্যায় (Applied Physics) এম-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরই তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। পরের বৎসর তিনি খুলনা বাগেরহাট কলেজে চলিয়া আসেন ও তথায় এক বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৯২৯ সালে তিনি সরকারী বিদ্যুৎ দপ্তরে চাকুরী নিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং তখন হইতেই তাঁহার প্রকৃত কর্মজীবন আরম্ভ হয়। ঐ কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থাতেই ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "গুরুপ্রসন্ন ঘোষ" বৃত্তিলাভ করিয়া বিলাতে যান এবং সেখানে ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনিভারসিটি হইতে ১৯৩৫ সালে এম-এস-সি (টেক্) ডিগ্রীলাভ করেন। এই ডিগ্রীলাভ করার পর তিনি কিছুদিন Manchester Municipal College of Technologyতে অধ্যাপনাও করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বের কাজে (Electrical Inspector) যোগদান করেন।

১৯৩২ সালে ভবানীপুর নিবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী চামেলী দেবীকে বিবাহ করেন।

১৯৪৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ghosh Travelling Fellowship বৃত্তি পান। কিন্তু সেই সময়েই ভারত সরকার সারা ভারতবর্ষ হইতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা ছয়জন ইঞ্জিনীয়রকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য বিলাত পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করেন। সেই ছয়জন ইঞ্জিনীয়রের মধ্যে ডাঃ দত্ত নির্ব্বাচিত হন। সেইজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Ghose Travelling Fellowship গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ভারত সরকার কর্ত্তৃক তাঁহাকে যে উদ্দেশ্যে বিলাত পাঠান হয়, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডের বহু বিখ্যাত বিদ্যুৎ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন ও বহু কারখানা পরিদর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

১৯৪৯ সালে পুনরায় তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের State Scholarship লইয়া বিলাত যান এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ph. D ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময়ে তিনি লণ্ডনের Institute of Electrical Engineersএর পুরো সদস্য (M. I. E.) হন।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ সংগঠিত হইবার সময় হইতে ১৯৫৬ সালের মে মাস পর্য্যন্ত ডাঃ দত্ত পর্ষদের সেক্রেটারী ও Superintending Engineer ছিলেন। সেই সময় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি পুনরায় পর্ষদ কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হন।

১৯৫৯ সালে দিল্লীতে যে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহার ইঞ্জিনীয়ারিং সেকসনে তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৬১ সালে লণ্ডনের Institute of Electrical Engineers তাঁহাদের সরবরাহ বিভাগের বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ দিবার জন্য ডাঃ দত্তকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি ১০ই মে লণ্ডনে ঐ Instituteএর বিখ্যাত হলে ইউরোপের বিশিষ্ট Electrical Engineersদের উপস্থিতিতে "ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও তাহার ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে অভিভাষণ দেন ও তাঁহাদের নিকট হইতে অশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। একজন ভারতীয় ইঞ্জিনীয়রের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ, ইতিপূর্ব্বে কোনও ভারতীয় ইঞ্জিনীয়র এ সম্মানের অধিকারী হন নাই।

ডাঃ শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত

ডাঃ দত্ত বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের চীফ ইঞ্জিনীয়র। বিভিন্ন সময়ে তিনি Calcutta University, Science College, Sibpore Engineering College, Jadabpur Universityতে ভিজিটিং লেকচারার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও I. T. T. খড়গপুরের পরীক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। ডাঃ দত্তের Electrical Engineering সম্বন্ধে প্রায় ২০।২৫ খানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ বিলাতের ও এদেশের বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবানের দয়ার উপর তাঁহার অশেষ বিশ্বাস। যৌবনে তিনি স্বামী প্রণবানন্দের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সেই সূত্রে তিনি এখনও ভারত সেবাশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

## শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এ বৎসর যাঁহারা উচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি "পদ্মভূষণ" সম্মান লাভ করিয়াছেন। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ বিধিপ্রণেতা রূপে বাংলার এই কৃতী সন্তান দেশে ও বিদেশে বিখ্যাত। বাংলার এই কৃতী সন্তানকে সম্মানিত করিয়া ভারত সরকার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা (ভবানীপুর) ২৪ নং পদ্মপুকুর রোডস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ৺রাসেশ্বরী দেবী। ৺সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আইনজীবী হিসাবে প্রথিতযশা ছিলেন। স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ, স্যর বি, এল, মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। সুধীন্দ্রবাবু সাউথ সুবার্বন স্কুল হইতে বৃত্তিসহ এনট্রান্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। বি-এ, এম-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়া তিনি প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে উচ্চস্থান অধিকার করেন।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি ইঁহার সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। বি-এল পাশ করিয়া ইনি কিছুকাল ওকালতি করেন এবং তাহার পরে অবিভক্ত বাংলার আইন বিভাগের চাকুরী গ্রহণ করিয়া আপন যোগ্যতায় উক্ত বিভাগের সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন। আইন প্রণয়নে ইঁহার খ্যাতি এতই ছড়াইয়া পড়ে যে, ভারতের সংবিধান রচনার জন্য Constituent Assembly স্থাপিত হইলে স্যর বি, এন রাওয়ের আগ্রহে ভারত সরকার ইঁহাকে জয়েণ্ট সেক্রেটারী ও ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতের সংবিধান রচনার জন্য লইয়া আসেন। অতি অল্প সময়ে নিখুঁতভাবে এই কার্য্য সমাধা করিয়া ইনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং সকলের, বিশেষ করিয়া Constituent Assembly-র সভাপতি পরে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। ইনি কিছুকাল ভারত সরকারের আইন-মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পদেও আসীন ছিলেন। পরে ১৯৫২ সালে সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় সংসদ স্থাপিত হইলে ইনি রাজ্যসভার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং আজিও সেই পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ সংগঠনের সময় অন্ধ্রপ্রদেশ আইন রচনার ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হয় এবং অতি অল্প সময়ে এই আইন রচনা করিয়া ইনি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। ইহা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পুনর্গঠন বিষয়ে ইহাই প্রথম আইন। Commonwealth Parliamentary Conference এবং বিভিন্ন সংসদীয় কার্য্যে ইনি রাশিয়া-সহ বিলাত ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

১৯৫১ সাল হইতে ইনি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের (U. N. O.) মানবিক অধিকার (human rights) বিষয়ক correspondent; এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হইয়া ইনি বাংলা ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

মানুষ হিসাবে মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেবতুল্য ব্যক্তি। ইঁহার সৌজন্য, আতিথেয়তা ও বিনম্র ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। ইঁহাকে অজাতশত্রু বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। নিষ্কলুষ চরিত্র, সহৃদয়তা পরদুঃখকাতরতা ও ধর্মপ্রাণতা ইঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব। ইঁহার কর্মক্ষমতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

স্থানীয় প্রবাসী বাঙালীদের ইনি নিতান্ত আপন জন এবং সুখ-দুঃখের সহায়। প্রায় প্রত্যেকটি স্থানীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। নিউদিল্লী কালীবাড়ী, হরিসভা, দুর্গাপূজা-সমিতি প্রভৃতির তিনি সহঃ সভাপতি এবং ইউনিয়ন একাডেমী বিদ্যালয়, জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি। অনেক দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিয়া ও বহুলোকের কর্মসংস্থান করিয়া দিয়া ইনি সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত। ইঁহার যোগ্য সহধর্মিণী শ্রীমতী অশোকা দেবী নিষ্ঠাবতী, ধর্মপ্রাণা ও স্নেহপরায়ণা মহিলা, একাধারে আদর্শ-গৃহিণী ও মাতা। ইঁহার একমাত্র পুত্র ডাঃ শ্রীসন্দীপ মুখোপাধ্যায় M. B. B. S. (Cal) F. R. C. S. (Lond), F. R. C. S (Edin) দিল্লীর প্রসিদ্ধ শল্যচিকিৎসক।

# বার্ধক্যে বারানসী

নীলকণ্ঠ

## বাইশ

মহাকালের কোলে যখন অবিনাশী সৃষ্টি অনন্ত সুখনিদ্রায় অত্যল্প কালের জন্যে অভিভূত তখন সৃষ্টির বেদনায় জাগ্রত হলেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা। চতুর্দিকে অবলোকন করে তিনি আপনাকে ছাড়া আর দেখতে পেলেন না কিছু। শুধু দেখলেন যোগনিদ্রায় শায়িত শ্রীবিষ্ণু; আর তাঁরই নাভিপদ্মে আসীন স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রহ্মার অতন্দ্র অনলস দিব্যারাধনায় পদ্মপলাশলোচন অবারিত করে নিদ্রোত্থিত নারায়ণ প্রশ্ন করলেন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে: তুমি কে? অট্টহাস্যে অনাদি অনন্ত অসীম আকাশের অকলংকিত বক্ষ বিদ্ধ করলেন ব্রহ্মা; তারপর বললেন: তুমি কে? শংখচক্রগদাপদ্মপাণি সৃষ্টির পালক ও পরিচালক সর্ববিপদ-বিঘ্ন-বিনাশী অবিনাশী সত্ত্বা পরমাশ্চর্য সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষে ব্রহ্মার অজ্ঞান অন্ধকার দূর করবার অভিলাষে ব্যক্ত করলেন: আমি বিষ্ণু; তোমার সৃজনকর্তা। সৃষ্টিকর্তা, প্রজার জনক, চতুরানন সুচতুর হাসলেন আবার: আমি তোমাকে জাগালাম যোগনিদ্রা থেকে, সাধ্যাতীত সাধনায়। আমি তোমার কর্তা। 'অবিদ্যার কি অমোঘ অহংকার'। অবলোকন করে শিহরিত হলেন গোলোকবিহারী বিষ্ণু, পদ্মনাভ, শ্রীহরি স্বয়ং; বললেন: তাকিয়ে দেখো ব্রহ্মা, কোথা থেকে তোমার উদ্ভব? সমস্ত সৃষ্টির উদ্ভব যাঁর থেকে তিনি স্বীকার করলেন না যে তাঁর আবির্ভাব যাঁর নাভিপদ্মে, সেই পদ্মনাভ, ব্রহ্মারও স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তার এবং সৃষ্টের হর্তাকর্তায় বেধে গেল বিপুল বিতর্ক। বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন একে অন্যকে। অনন্যকে, তবু সিদ্ধান্ত হলো না তার কিছুতেই।

সময়ের প্রান্তর প্রান্তে রুদ্র কাণ পেতে শুনছিলেন সেই কলহ।

পরস্পর বিবদমান আদিজ দ্বয়ের সামনে আবির্ভূত হন জ্যোতির্ময় অনাদি ও অনন্ত মহালিংগ। সেই অনাদি লিংগ আদেশ করলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে: কূর্মবাহনে তুমি বিষ্ণু আমার আদি এবং হংসবাহনে ব্রহ্মা তুমি আমার অন্ত অন্বেষণ করে এসো। অনন্তর বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা, যাঁর আদি এবং অন্ত নেই সেই অনাদি অনন্ত রুদ্রের, আদি ও অন্ত অন্বেষণে বহির্গত হলেন। কূর্মবাহিত বিষ্ণু নামলেন জলে; অসীম অতলে। হংসপৃষ্ঠে ব্রহ্মা উঠলেন আকাশে; অসীম অনন্তে। অবাধ অবারিত, নিঃসীম নীল নিরুপম আকাশে উড়ে উড়ে চললেন হংসাশ্রয়ে লোক পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভু, বিরিঞ্চি, ব্রহ্মা। দূরে কাছে অন্তহীন অসীমে ঘুরে ঘুরে অন্ত খুঁজে না পেয়ে ফিরে এলেন যাত্রারম্ভের জায়গায়। বিষ্ণু তখনও অন্বেষণ করে চলেছেন আদি,—সেই অনাদি পুরুষের। সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করলেন প্রজাপতি, প্রজাপালকের জন্যে। আদি অন্বেষণে ব্যর্থ শ্রীবিষ্ণু ফিরে এলে, অন্তের সন্ধানে সমান অসার্থক, অনন্তের ব্যর্থব্যাহত ব্রহ্মা ব্যর্থতা গোপন করতে, কল্পনার আশ্রয় নিলেন অন্ত বর্ণনায় অনন্তের। জ্যোতির্লিংগ মহা তেজে মুখর হলেন ব্রহ্মার অসৎ অসত্যোচ্চারণে: ব্রহ্মা তুমি যাঁর অন্ত পাওনি তাঁর অনন্ত-ব্যাখ্যা করছ কেন কল্পনায়?

লিংগ-জ্যোতি তখন দিব্যপুরুষে দীপ্ত হলো। অসীম শূন্য আকাশ যে উদ্দীপ্ত পুরুষের অম্বর, উন্নত ফণা ভুজংগাচ্ছাদিত পিংগল যাঁর জটাজাল! নরকপাল যাঁর নীলকণ্ঠের ভুবনমনোমোহিনী মাল্য, কুন্দফুলশুভ্র যাঁর চিরতরুণ তনু, সেই মহারুদ্র চিরশিব বিষাদে উদাসীন হলেন সব্রহ্মাবিষ্ণু।

তিন জনে উপস্থিত হলেন 'অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে'। 'অসীমে কালের সেই মহা কন্দরে' যেখানে 'সতত শত শত বিশ্ব নির্ঝরের মতো স্বতোৎসারিত' 'স্বর-তরংগ যত গ্রহতারা যেখানে শূন্যে ছুটোছুটি করছে উদ্দেশহারা, সেখানে এক 'কল্পবৃক্ষের তলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিবরূপী পঞ্চশিবের ওপর শায়িত রয়েছেন পরশিব।' পরশিবের নাভিকমলের ওপর ত্রিপুরসুন্দরী সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী উপবিষ্ট আছেন ষোড়শী মূর্তিতে। চতুর্দিকে কুমারীরা ধরে আছে ছত্র; চামর ও ব্যজন ধারণ করে সেবায় নিযুক্ত আছে তারা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং জ্যোতির্লিংগাভিভূত শিব,—তিন জন সেখানে পদক্ষেপ করা মাত্র পরিণত হলেন কুমারী রূপে; ছত্র, চামর ও ব্যজনহস্তা হলেন মুহূর্তে। এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি তাদের দেখল অনন্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু রুদ্র তাঁদের তিনজনের মতোই এক প্রান্ত মহাশক্তির পদতলে পৌঁছেই পরিণত হচ্ছে তিন কুমারীতে; আর,—আরেক প্রান্ত প্রস্থান করছে নূতন ব্রহ্মাণ্ডের উদ্যোগ পর্বের সূচনা করতে। এক সময়ে এই তিন জনেরও সময় আসন্ন হয়ে এলো নূতন ব্রহ্মাণ্ড রচনার কাজে এগবার। কুমারীকন্যার মূর্তি ত্যাগ করে আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র রূপে মূর্ত হলে দেবী তাঁদের আকর্ষণ করলেন। ব্রহ্মা অচৈতন্য হলেন; বিষ্ণু বালক রূপে বটপত্রে বিলীন হলেন; জেগে রইলেন মহারুদ্র,—অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হলো শুধু তাঁর তৃতীয় নয়নে। দেবী মুহূর্ত পরে মুক্তি দিয়ে ব্রহ্মাকে বললেন: অনন্তের সন্ধান না পেয়েও তাঁর অন্তের কল্পনা করতে চেয়েছিলে তুমি; তাই ব্রহ্ম-সৃষ্টি পরিকল্পনায় কাজ তোমার। যাক তোমার সৃষ্টিযোগ্যতা স্বীকৃত হবে! বিষ্ণুর প্রতি বর্ষিত হলো এই দেবী, দৈব-বাণী; তুমি অনাদির আদি না পেয়ে কুণ্ঠিত হওনি তা স্বীকারে; তাই সত্ত্বগুণপ্রধান তোমার প্রধান কাজ হবে সৃষ্টি-

পালন! তারপরে রুদ্রকে আহ্বান করলেন ব্রহ্মময়ী, বললেন: হে রুদ্র! সংগাপুষ্ঠতা তোমায় স্পর্শ করতে পারেনি,—তাই লয়শক্তিতে শক্তিমান তুমি;—মুক্তিকামীদের তুমিই লক্ষ্য হবে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ফিরে এলেন সেইখানে, যাত্রা শুরু করেছিলেন যেখান থেকে। এবং সেইখানেই জন্ম নিলো যে ক্ষেত্র,—মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেতে হলে যেতেই হবে সেখানে। সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের নাম বেনারস নয়; কাশী। * [ সচিত্র কাশীধাম—মন্মথনাথ চক্রবর্তী ]।

হে কালের অধীশ্বর, তোমার স্মৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপি এই কাশী,—বিস্মৃতির যবনিকা উত্তোলন করে উন্মুক্ত কর ভারত-আত্মাকে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীতে।

তাজমহল, হচ্ছে রূপের প্রতি ভারতের সানন্দ নতি; আর কাশী হচ্ছে অপরূপের প্রতি ভারতের অশেষ প্রণতি। এই কাশীতে হিন্দু ধর্মের অবনতি লক্ষ্য করে অধুনা অনেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাঁদের অবগতির জন্যে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মোদ্দীপ্ত জীবন থেকে দিব্যদীপ্তির একটি ঘটনা এখানে উদ্ধার করে দিই। ভারতবর্ষের হিন্দু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় বিমর্ষ হন বিবেকানন্দ, যেমন একদিন হয়েছিলেন বংকিম। বিবেকানন্দ কেবল দুঃখ পাবার পাত্র ছিলেন না। দুঃখ দূর করবার মন্ত্রে দীপ্ত ছিলেন আজীবন। মুসলমানরা যেসব হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলো, সেই সব মন্দির দর্শন করে বিবেকানন্দ মনে মনে বলেছিলেন: আমি যদি তখন উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে প্রাণপণ করিয়াও জননীর মন্দির রক্ষা করিতাম, কিছুতেই পবিত্র মন্দির ধ্বংস হইতে দিতাম না।

মনে বলা মানেই কাজে রূপ দেওয়া। 'বিবেকানন্দ'-র মানে তাই।

সংকল্প করলেন স্বামীজি সে জীর্ণ দেবতালয়দের সংস্কার করবেন তিনি ভিক্ষালব্ধ ধনে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে তিনি যাবেন; হিন্দুর কাছে যাবেন হিন্দুর মন্দির যাতে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়,—তারই প্রার্থনা নিয়ে। এ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারবে এমন হিন্দু কেউ নেই। সংকল্প গ্রহণ করার সংগে সংগে অলক্ষ্য লোক থেকে উঠে আসে দিব্যবাণী: যদিই বা মুসলমানগণ আমার মন্দির ধ্বংস করিয়া প্রতিমা অপবিত্র করিয়া থাকে, তাহাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?

দৈব সহায় নয়, একি দুর্দৈব!

তবু বিচলিত হলেন না বিবেকানন্দ; চ্যুত হলেন না সংকল্পের চূড়া থেকে। দৈবকে, দুর্দৈব বলে স্বীকার করতে পারলেন না তিনি। আবার স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন স্থিরপ্রাজ্ঞ পুরুষ। ভারতের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের মাথা আবার উঁচু করে তুলতে, চাঁদা তুলতে, ভিক্ষে করতে কিছুতেই লজ্জা নেই ভারতপথিকের। কিন্তু আবার সংকল্প করা মাত্র আবার অলক্ষ্য থেকে বিবেকানন্দকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত হয়: "যদি আমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি আমি সপ্ততলে সুবর্ণ মন্দির এই মুহূর্তেই গঠন করিতে পারি না? আমার ইচ্ছাতেই এই মন্দির ভগ্ন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে।"

'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা',—একথা এই কারণেই ভারতই বলতে পেরেছে কেবল।

এই ঘটনার পর জীবনকর্মযোগী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: আমার কার্যের স্পৃহা স্বদেশপ্রেম সমস্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। হরি ওঁ। আমি ভুল করিয়াছিলাম, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। মা-মা তিনিই সব, তিনিই কর্তা—আমি কে?—তাঁহার অজ্ঞান সন্তান মাত্র।' [ স্বামী বিবেকানন্দ-চরিত: সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ]

বিশ্বনাথের মন্দির ওঠে যাঁর ইচ্ছায়, তাঁর ইচ্ছায় মাটিতে লোটে মন্দিরের উন্নত মস্তক!—ঔরংজেব তার নিমিত্ত মাত্র; কালাপাহাড় কেবল উপলক্ষ্য। একথা যে উপলব্ধি করেনি,—কাশী তার কাছে, 'ভিজিট ইণ্ডিয়া' সিরিজের রেলওয়ে-বিজ্ঞাপন মাত্র। এ বার্তা যার কানে গেছে কাশী তার কাছে তীর্থক্ষেত্র; বিশ্বনাথের এই বাসস্থান বিশ্বের সকল মুমুক্ষুর সতীর্থ-ক্ষেত্র।

এই কাশীতে মুমুক্ষুদের মুক্তিমন্ত্র দিতে এসেছেন যাঁরা, তাঁরাই ভারতের আত্মার বাণীবাহক। তাঁদের পরিচয়েই কাশীর পরিচয়। কাশীই ভারত-আত্মা। এই কাশীর অন্য কোনও ইতিহাস নেই। এঁদের ইতিহাসই কাশীর ইতিবৃত্ত। ইতিহাসই কেবল পুনরাবৃত্ত হয় না; ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষরা, মহামানুষরাও বার বার আসেন, মানুষের মনের মধ্যে যাঁর মন্দির তাঁর বাণী বহির্লোকে পৌঁছে দিতে। পতিতোদ্ধারিণী এঁদের জীবনগংগা বয়ে যাচ্ছে আদিকাল থেকে অনাদিকালের উদ্দেশে। বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা; ধ্যেয়ানে তাদের মিলিয়েছেন যাঁরা কাশীর গংগা তাঁদেরই মুক্তধারা, বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা কেবল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে অভিষিক্ত করেনি। মানুষের মুক্তির সংগ্রামে, শক্তির চেয়ে বড় নিরাসক্তির বীর সাধকের ভক্তিস্রোত আর মহাপুরুষ প্রসবিনী শক্তি-স্বরূপিণী মায়ের অবিচ্ছিন্ন ধারায় ধৌত ভুবনমনোমোহিনী ভারতের হিমাচল; অনিল বিকম্পিত তার শ্যামল অঞ্চলে মুক্তির আলিম্পন। এ মুক্তি কেবল বিদেশী রাজার নাগপাশ থেকে মুক্তির সংগ্রাম নয়; এ মুক্তি,—সমস্ত মানবজাতির।—জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভেদের, ধনী-দরিদ্র-পণ্ডিত-মূঢ়ের; তন্ত্র-মন্ত্র-যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভেদের বিনাশকারী মুক্তির কামনা।

কাশী সেই অবিমুক্ত স্থান। অবিনাশী ভারত-আত্মার বাস ও বিশ্বনাথের আবাসভূমি।

বৃন্দাবনের মাটির মতোই কাশীর বুকে কান পাতলে বিশ্বনাথের দূতেরা যাঁরা বার বার আসেন, যাঁরা আরবার আসেন 'ক্ষমা কর, ভালোবাসো'; অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষও নাশো' বলতে, তাঁদেরই কথা শোনা যাবে। সে কথার একটিও জীবনে সত্য হলে মানব-জীবনের যা কিছু বাসনা, সব যাবে সোনা হয়ে। সেই পাথর যার স্পর্শে তমো হয় মহত্তম ভগবানের দূতেরা সেই পরশপাথর; কাশী ভারতের সেই পরশপাথরের আকরভূমি। ভারতবর্ষের ইতিহাস রাজনৈতিক যেমন তেমনই নৈতিক; যুদ্ধের যেমন তেমনই বুদ্ধের; শংকার যেমন তেমনই শংকরের। ভারতেতিবৃত্ত রক্তের রং-এ যতখানি তার চেয়ে গৈরিক রং-এ ছোপানো অনেক বেশি। এই ভারত যে রণে নয় কেবল; জীবনে ও মরণে জন্ম-মৃত্যুর যিনি অতীত তাঁরই সাধনার পীঠস্থান,—সেই ভারতকে দেখতে হলে যেতে হবে কাশীতে। কাশীর অন্য কোনও ইতিহাস নেই; কাশীই ভারতবর্ষের সেই ইতিহাস।

যুগে যুগে সেই ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন কাশীতে, তাঁদেরই একজনের কথা আজ এখন বলছি। ভাস্করানন্দ সরস্বতী তাঁর পুণ্য নাম; তাকে প্রণাম করে আরম্ভ করি আমার বার্দ্ধক্যে বারাণসীর দ্বিতীয় পর্ব। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। [ ক্রমশঃ।

## মানুষ ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন

.শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'অতুল অতুলনীয়'। এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে বিশিষ্ট আইনজীবী, প্রখ্যাত গীতিকার ও সুকবি অতুলপ্রসাদ সেনের লেখনী নিঃসৃত গানের ডালির উপহারে। তাঁহার লেখা গানের সংখ্যা খুব বেশী নহে, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরেই বর্ত্তমানে অতুলপ্রসাদের গানের স্থান।

১৮৭১ সালের ২০শে অক্টোবর অতুলপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। সিভিলিয়ান কে. জি. গুপ্ত তাঁহার মাতুল ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। কলিকাতা ও ইংল্যাণ্ডে পাঠ শেষ করিয়া তিনি লখনৌতে নিজ কর্ম্মক্ষেত্র স্থাপন করেন। একক প্রচেষ্টায় আইনবিদ্ হিসাবে তিনি যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেন। অতুলপ্রসাদ প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেছেন সত্য—কিন্তু নিঃস্ব ও নিপীড়িতদের নীরবে যথাসাধ্য দান করেছেন। বরাবর প্রচার বিমুখ থাকায় তাঁহার ব্যাপক কর্ম্মকুশলতার কথা আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন—তিনিই অতুলপ্রসাদের মননশীলতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, উদার মনোভাব ও সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। লখনৌর সমস্ত বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলির তিনিই 'হোতা' ছিলেন তজ্জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর স্থানীয় সংস্থাগুলি ও বাঙ্গালী সমাজ প্রায় 'অভিভাবকহীন' হইয়া পড়ে। কারণ, তিনি উঁহাদের সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। যখনই স্থানীয় কোন ব্যক্তি অভাব অসুবিধা বা বিপদে পড়েছেন তখনই তিনি অতুলপ্রসাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। আর সেন মহাশয় তাঁহাকে বিনা দ্বিধায় যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। সরল জীবন যাপন তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি তিনি ছিলেন অসীম দরদী—আর অ-বাঙ্গালীদের নিকট ছিলেন খুব প্রিয়। কারণ, বাঙ্গালার শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত তিনি উত্তর ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতির অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করেন। অবসর ও বিশ্রামের সময় তাঁহার ছিল না। নিজ পেশার জন্য তিনি সদা-ব্যস্ত থাকিতেন আর নানা সাংস্কৃতিক সংস্থার সহিত কার্য্যকরীভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। লখনৌ 'বার' এ তিনি অন্যতম 'ব্যারণ' (Baron) ছিলেন। প্রাদেশিক সরকারের নিকট তাঁহার প্রচুর সম্মান ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা বহু বিষয়ে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন। একবার এক লাটসাহেব অতুলপ্রসাদের সহিত সাক্ষাতের পর মন্তব্য করেন, "Mr. Sen spoke with me about welfare measures of the Province but not for himself." ইহা হইতে বুঝা যায় যে নিজ স্বার্থের প্রতি তিনি বরাবর কত উদাসীন ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি 'লিবারেল' দলভুক্ত ছিলেন। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের উপাচার্য্য ও চীফ কোর্টে বিচারপতির পদের জন্য তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইলে তিনি উক্ত পদদ্বয় গ্রহণ করেন নাই। কারণ, 'নাম'-এর মোহ কোনদিন তাঁহার ছিল না।

একদিন লখনৌস্থ অতুলপ্রসাদের চেম্বারে একটি মামলার জটিলতা ও আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় লইয়া গভীরভাবে আলোচনা চলিতেছিল। ইতিমধ্যে দুইটি ভদ্রলোক প্রবেশ করিয়া মামলার ব্যাপারে কর্ণপাতহীন হইয়া গৃহের বৈঠকখানায় রক্ষিত 'অর্গ্যান'এর সম্মুখে বসিয়া 'পুরিয়া' রাগে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। আইনজীবী অতুলপ্রসাদের কর্ণে উহা প্রবেশমাত্র সারাদিনের আইনের 'কচকচি' ছাড়িয়া সোজা বাদক ও গায়কের নিকট উপস্থিত হন ও দুজনকে ধন্যবাদ দিয়া নিজেও উহাতে অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। তাঁহার মক্কেল এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হইয়া পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধির কথা জানান

গত ১২ই মে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বার্ষিক উৎসবে 'শ্রীমতী' (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার জীবন আলেখ্য) নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য। পরিচালনা—নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

কিন্তু অতুলপ্রসাদ আর্থিক লাভের পরিবর্ত্তে এইরূপ স্বর্গীয় আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিলেন না। দুজন গায়ক ও বাদক হলেন শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপকুমার রায়। অল্প বয়স থেকে শ্রীসেন কবিতা লিখিতেন—কিন্তু সেগুলি ছিল গানের পর্য্যায়ে। লেখার পর তিনি নিজেই সুরসংযোগ করিতেন। ব্যারিষ্টার হিসাবে প্রচুর পশার থাকা সত্বেও অবসর সময় কবিতা ও সঙ্গীতের রাজ্যে তাঁহার মন বিচরণ করিত। সুরের মারাজালে সমৃদ্ধ 'রাগপ্রধান' বাংলা গানের তিনি অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বাংলা গানের কাঠামোর মধ্যে উত্তর ভারতের সঙ্গীত সৌকর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়। ফলে এক নূতন বাংলা সঙ্গীতগোষ্ঠী সৃষ্টি হইয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সহিত সমান মর্য্যাদা লাভ করে। অতুলপ্রসাদ নিজেকে 'কবি-বাউল' বলিয়া আখ্যাত করেন—কারণ তিনি বাউল সঙ্গীতের অতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'ধ্রুপদ' ষ্টাইলে ও দ্বিজেন্দ্রলাল 'খেয়াল' ষ্টাইলে প্রধানতঃ স্বলিখিত সঙ্গীতগুলি রচনা করেন, অতুলপ্রসাদ তেমন 'ঠুংরী' ষ্টাইলে নিজ সৃষ্ট গানগুলি বাঁধিয়া উহাদের উচ্চপর্য্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

উক্ত ত্রয়ী কবি-গীতিকার গানের মধ্য দিয়া স্বদেশী ভাবধারা প্রচার করিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। আর সারা ভারতে তাঁহাদের রচিত জাতীয় সঙ্গীতগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

অতুলপ্রসাদের পারিবারিক জীবন খুব সুখকর হয়নি এবং তাঁহার মনোবেদনা তৎরচিত অনেকগুলি গানের মাধ্যমে প্রকট হয়েছে। বহুদিন ইংল্যাণ্ডে থাকা সত্বেও তাঁহার গানে কোনরূপ বিদেশী প্রভাব পড়ে নাই। বরং তিনি ভারতীয় রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতের প্রচারে আগ্রহী ছিলেন।

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য্য ডঃ জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য কতিপয় বন্ধুর পীড়াপীড়িতে তাঁহার প্রথম বই "কয়েকটি গান" ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। মাতৃভূমির পরাধীনতা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হয়—সেজন্য তিনি পরপর কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান লিখিয়া বিপ্লবী বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করেন। সেগুলিও বাউল ইত্যাদি কতিপয় গান গ্রথিত করিয়া "গীতিগুঞ্জ" ১৯২৭ সালে মুদ্রিত হয়। ইহার গানগুলি তিন ভাগে সংকলিত হয়—'মানব,' 'সমাজ' ও 'দেবতা'। উহার স্বরলিপি পুস্তকটির নাম দেওয়া হয় 'কাকলী' এবং উহা দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়। বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অতুলপ্রসাদ 'কাকলী' জনসমক্ষে উপস্থিত করেন। প্রখ্যাতা গায়িকা শ্রীমতী সাহানা দেবী ইহার স্বরলিপি তৈয়ার করেন ও শ্রীদিলীপকুমার রায় উহা মুদ্রিত করাইবার ব্যবস্থা করেন। একবার রবীন্দ্রনাথ লখনৌতে আসিলে অতুলপ্রসাদ স্বরচিত গানের মাধ্যমে কবিবরকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করেন। বিশ্বকবি তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান—কিন্তু লখনৌ ছাড়িয়া যাওয়ার অসুবিধা থাকায় উক্ত অনুরোধ রক্ষা করা অতুলপ্রসাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

অতুলপ্রসাদ "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন"এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উহার গোরক্ষপুর অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। উক্ত সম্মেলনের মুখপত্র 'উত্তরা' তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লখনৌ হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। বহির্বঙ্গের এই মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালী সমাজে প্রচুর সমাদৃত হয়।

১৯৩৪ সালের ২৬শে আগষ্ট কবি ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ লখনৌর স্বগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার গানের অর্ঘ্য তাঁহার দেশবাসীর স্মৃতিপটে শুধু অতুলপ্রসাদকে স্মরণ করিয়ে দেয় না—বাংলা গানের ক্রমপর্য্যায়ে তাঁহার অবদানের কথাও মনে করাইয়া দেয়। সঙ্গীতের মাধ্যমে যিনি আমাদের দেশমাতৃকাকে ভালবাসিতে—দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে—মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে অমর করিতে সাহায্য করেছেন—আত্মবিস্মৃত আমরা বাঙ্গালী কি অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতকে লোকপ্রিয় করিতে এবং বৎসরান্তে একবার সেই গীতিকারকে স্মরণ করিব না?

## রবিতীর্থে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে, এটা গৌরবের। তবে এ ধরণের অনেক অনুষ্ঠানেই যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনুপস্থিত থাকেন, এ-কথা দুঃখের হলেও অনস্বীকার্য্য। বক্তৃতা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র-নাটক পাণ্ডিত্য ও বিশুদ্ধতার মাধ্যমেই যদিও বা পরিবেশিত হল, তা শুধুমাত্র আন্তরিকতার অভাবে বিশ্বকবিকে সে অনুষ্ঠানে পাওয়া একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই অনেক সময়, অনেক আলো অনেক মালা অনেক শিল্পী আর অনেক শ্রোতার মধ্যেও মনটা ভরে

উঠতে পায় না কানায় কানায়—ফিরে ফিরে কেবল বলে "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি।"

তবু আমাদের সহস্র দুর্ভাগ্যের মধ্যে এখনও এটুকু সুকৃতি বজায় আছে যে কয়েক জন প্রকৃত শিল্পীর পূজার অর্ঘ্য আজও কবির পায়ে নিবেদিত হয়। এমনি এক অনাড়ম্বর প্রাণস্পর্শী রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান। শুনলাম গত ১৩ই মে সন্ধ্যায় শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও শ্রীদ্বিজেন চৌধুরীর পরিচালনায় রবিতীর্থের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের সঙ্গীতানুষ্ঠান ছিল। প্রারম্ভে 'হে নূতন' দিয়ে রবীন্দ্র-আবির্ভাবের সূচনা করে সমবেতকণ্ঠে অনেকগুলি স্বদেশী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন তাঁরা নির্ভুল ও ঐক্যবদ্ধ ভঙ্গী। অনুষ্ঠানটি বিশেষ মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল মধ্যে মধ্যে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের একাধিক একক গানে। ও আমার সোনার বাংলা···অয়ি ভুবনমনোমোহিনী···ও আমার দেশের মাটি··সার্থক জনম আমার···অবহেলিত অনাদৃত এই বাংলা দেশকে কি অপরিসীম ভালোবেসেছিলেন কবি, তার চির স্বাক্ষর রূপে বেঁচে আছে তাঁর স্বদেশী গান···আজকের বাংলায় স্বর্ণময় আর কিছুই নেই তবু কবিগুরুর গান আর জাতশিল্পীর কণ্ঠ মেলে যখন তখন ভাগ্যবান শ্রোতারাও নিজের অজান্তেই কখন মাথা নোয়ান মাতৃভূমির পায়।

প্রতি বছরে এ অনুষ্ঠানের প্রধান প্রলোভন থাকে স্কুলের অনুষ্ঠান শেষে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের গান। এ বছর অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল অতিথিশিল্পী শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের গান—যেমন বছর দু'য়েক আগে এই অনুষ্ঠানে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের অপূর্ব্ব সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রোতাদের। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস একক ও দ্বৈত সঙ্গীত শোনালেন। দুই জনই সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী—এই দিন তাঁদের গান শ্রোতাদের এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লোকের সন্ধান দিয়েছিল। সুসজ্জিত মণ্ডপ আলোকোদ্ভাসিত মঞ্চ ও সর্ব্বোপরি চপলমতি শ্রোতার অনুপস্থিতিতে এই দুই শিল্পীর পক্ষে গানের মাধ্যমে পূজার নৈবেদ্য সাজানো সহজতর হয়েছিল।

আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সস্তা করার এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। নতুন কোন চলচ্চিত্রে কোন পরিচালক হঠাৎ কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত যোজনা করলে চিত্রামোদী যে দর্শককুল চলচ্চিত্রের গান মাত্রকেই ভালো-লাগা আধুনিকতার অঙ্গ মনে করেন, তাঁদের নির্দ্দয়তায় সঙ্গীতগুলো জাত-মান খুইয়ে বসে। পাড়ার বারোয়ারী মাইকে তাকে বাজাতে হয়, গাওয়ার মুন্সিয়ানায় কণ্ঠ হতে কণ্ঠান্তরে যে সুর তার ছড়িয়ে পড়ে তাতে রাবীন্দ্রিকতার ভগ্নাবশেষও থাকে না। সম্মেলন থেকে সম্মেলনে মূল শিল্পীকে এক শ্রেণীর শ্রোতা ( রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরোধ করতে বাধ্য হলে ) স্থান-কাল-পাত্র নির্ব্বিচারে অনুরোধ করেন ঐ চলচ্চিত্রের গানখানি গাইতে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাব-ভাষা সুরের গভীরতা নষ্ট হওয়ার নয়, শিল্পীর কণ্ঠও অপরাজেয়—তবু এই বারংবার অনুরোধের কোথায় যেন একটা আন্তরিকতাহীন লঘুত্বের ছোঁয়া থাকে। আর সব কিছু ছেড়ে দিলেও মহাজনের এ-কথাটা অবহেলার নয় যে, ফরমাসী গানের চেয়ে শিল্পীর অন্তর উৎসারিত যে সঙ্গীত—স্বর্গীয় সুরের পরশ তাতে। রবিবার সন্ধ্যায় এমনি এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পীদ্বয়ের সঙ্গীতে।

যে পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে নদীর জলে বনের ঘাসে বারে বারে আপনাকে বিলীন করে দেবার স্বপ্ন দেখেছেন কবি, তারি এক ক্ষুদ্র কোণে খোলা আকাশের নীচে অনাড়ম্বর শ্যামলতায় কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের ক্ষণে কবি নিজে সজীব হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতায়।

বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশানের সিম্ফোনী অর্কেষ্ট্রার বংশীবিভাগের বাদ্যীদের একটি সম্মিলিত আলোকচিত্র। পুরোভাগে ডগলাস মুরকে দেখা যাচ্ছে। ১৯৩০ সালে এই সিম্ফোনী অর্কেষ্ট্রার প্রথম নির্দেশক হন স্যার অ্যাড্রিয়ান বোল্ট।

## আমার কথা ( ৮৬ )

### শ্রীবটুক নন্দী

পারিবারিক ধারা, সুশ্রী শারীরিক গঠন, সুমার্জ্জিত আলাপ-আলোচনা, নিভৃত সাধনা, ভগবদ্-বিশ্বাস ও মাতৃভক্তি—এইগুলি কেন্দ্রীভূত করে যেন দরদী শিল্পী শ্রীবটুক নন্দী শ্রোতাদের মনের মণিকোঠায় স্থান নিয়েছেন।

শ্রীনন্দীর নিজের কথা হল :—

"১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় আমার জন্ম। পিতা ৺প্রসাদদাস নন্দী আপন ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। আমার এক মাত্র মামা আসানসোলের বেশ বড় ব্যবসায়ী। নিজ গ্রাম হল বর্দ্ধমান জেলার দিগনগর। সেখানে বাড়ী ও জমিজমা কিছু আছে।

১১৪৬ সালে কলিকাতা ( বহুবাজার ) মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে প্রবেশিকা, রিপণ কলেজ হইতে আই, এস, সি, ও বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র হিসাবে বি, এ, পাশ করেছি। খেলা-ধূলা করেছি বরাবর।

আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চ্চা আছে বরাবর। যেমন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে হয়ে থাকে। পিতা বেশ ভাল গাইতেন—তাঁহার সঙ্গীত রেকর্ড এচ, এম, ভি, তে তোলা হয়েছিল। আমার ভাই-বোনেরা ম্যাট্রিক পাশ করার পরই বাবা প্রত্যেককে সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ করাতেন। আর আমার মা শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী আমাদের লেখা পড়া ও গানবাজনায় ততোধিক আগ্রহী ছিলেন। আমিও এইরকমে গানের চর্চ্চা আরম্ভ করি। বহুদিন আমি প্রধানত রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিতাম।

১১৫০ সালে এক আসরে বিশিষ্ট যন্ত্রী শ্রীসুজিত নাথের গীটার বাজান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁহার কাছে উহা শিখিবার জন্ত অনুরোধ জানাই। অথচ ইতিপূর্ব্বে কোনদিন আমি কোনরূপ বাদ্যযন্ত্র প্রায় স্পর্শ করি নাই। কেন জানি না, সুজিতবাবু সম্মত হলেন। ১১৫২ সালে তিনি গড়ে তোলেন SABS অর্কেষ্ট্রা পার্টি। শ্রীনাথের গৃহে হাউইয়ান গীটার সহযোগে প্রায় তিন বৎসর উহার নিয়মিত অধিবেশন হইত। ১১৫৫-৫৬ সালে আমি সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করি গীটারের মাধ্যমে। ১১৫৪ সালে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে আমার গীটার বাজনার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। সেখানে আমি পাশ্চাত্ত্যদেশীয় অনুষ্ঠানেও নিয়মিত শিল্পী ছিলাম। কতকগুলি ছায়াছবিতে আমায় আবহসঙ্গীতে অংশ নিতে হয়েছে। রেকর্ড-এ আমার অনেকগুলি বাজনা আছে।

শ্যামাসঙ্গীত, কীর্ত্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান, নজরুলগীতি—এগুলি গীটার-এ বাজিয়ে আমি খুব আনন্দ পাই। বৃহৎ সঙ্গীতাসর অপেক্ষা স্বল্প সমাগত সুধীজন ও বোদ্ধাসমাবেশে শিল্পী হিসাবে যোগদান করে আমি আনন্দ পাই। আমার "Pandal Function" ভাল লাগে না।

ভারতের নানা স্থানে আমি গীটার বাজাইয়াছি! শ্রীমতী নীলা দেবী হলেন আমার সহধর্ম্মিণী।"

বটুক নন্দী

শ্রীনন্দীর সঙ্গে কথায় কথায় জেনেছি যে, তিনি শিল্পী হিসাবে নিজের মায়ের সঙ্গে প্রতি ব্যাপারে পরামর্শ করেন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাথেয় হিসাবে নিয়ে কার্যে অগ্রসর হন। তিনি প্রায়শঃ দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে উপস্থিত থাকেন নির্জ্জনে, আর পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে একান্ত অনুরাগী তিনি—তাহা তাঁহার নিজস্ব ঘরের মধ্যে প্রবেশের সাথে সাথে বুঝা যায়।

বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলাম শ্রীনন্দীর সরল ব্যবহারে ও উদাসী মনোভাবে।

# পঁচিশে বৈশাখ

পরেশ মণ্ডল

জীবনের নিত্যপথে ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই, ছোট সেই তরী ;
রবীন্দ্র ঠাকুর আজ উৎসবের উপলক্ষ্য শুধু,
বসন্তের মধুমেলা তাঁকে নিয়ে ভরি,
গ্রীষ্ম বর্ষা শরতে ও শীতে

প্রচ্ছন্ন আঁধার সত্তা নীরবেই ঘেরে।
শিশিরের দর্পণেতে প্রতিবিম্ব এঁকে
বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘে মুক্তি দাও পর্বতেরে,
কেবল দুচোখ ভরে আলো দাও রবি !

তোমার আলোর পথে নব উত্তরণ
হয় যেন আমাদের কবি !
আমাদের মাঝখানে তোমার স্রোতের গতি দিগন্ত-উধাও
বিস্তারের ছন্দে যেন হোয়ে ওঠ ছবি।

ঋষিদত্ত মন্ত্রে দীক্ষা পেতে চাই আজ,
পঁচিশে বৈশাখ হোক অবিনাশী তাজ।।

## ইষ্টবেঙ্গল দলের দ্বিতীয়বার বাইটন কাপ লাভ

ভারতের প্রাচীন ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা—বাইটন কাপের ফাইন্যাল খেলার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার হকি মরশুমের পরিসমাপ্তি ঘটে। এবার কলকাতার খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় দল—ইষ্টবেঙ্গল বাইটন কাপ লাভ করে—তাদের গৌরবময় ইতিহাসে আর একটা অধ্যায় রচনা করেছে। তারা ফাইন্যালে এবারকার গোল্ড কাপ ও গতবারের বিজেতা সেন্ট্রাল রেলওয়ে দলকে এক গোলে পরাজিত করার গৌরব অর্জন করে। নির্দ্ধারিত সময়ে কোন গোল হয় নি। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইষ্টবেঙ্গল দলের হাফব্যাক কুশলকুমার "সর্ট কর্ণার" থেকে জয়সূচক গোল করে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছেন।

ইষ্টবেঙ্গল দলের বাইটন কাপ লাভ এই প্রথম নয়। ১৯৫৭ সালে ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই কাপ জয়ের সৌভাগ্য তাদের হয়েছে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের বর্ত্তমান কালের হকি ইতিহাস খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৬১ সালে তারা যুগ্মবিজয়ী। এবার তারা অপরাজিত ভাবে "রাণার্স-আপ" হয়েছে। শুধু তাই নয়। ১৯৫৭ সাল থেকে তারা প্রথম ডিভিসন হকি লীগে অপরাজিত আছে, একটা দলের পক্ষে সত্যই এটা গৌরবের কথা।

ইষ্টবেঙ্গল দলের এবারকার বাইটন কাপ লাভ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তারা ভারতের খ্যাতনামা দল দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস, ইণ্ডিয়ান নেভী (বোম্বাই) ও বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ (বাঙ্গালোর) দলকে পরাজিত করে ফাইন্যালে ওঠে এবং ফাইন্যালে তারা সেন্ট্রাল রেলওয়ের ন্যায় ভারতের অপর একটি শক্তিশালী দলকে পরাজিত করে।

এবারকার বাইটন কাপ ফাইন্যালে যেরূপ অভূতপূর্ব দর্শক সমাগম হয়—তা বহুদিন দেখা যায়নি। হকি খেলার জনপ্রিয়তা যে বাড়ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই একটা প্রশ্নই মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে—ক'জন বাঙ্গালী খেলোয়াড় হকি খেলায় অংশ গ্রহণ করছেন? কেনই বা বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের হকি খেলায় আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না—সেই অনুধাবন করার সময় এসেছে। আশা করা যায় যে খেলোয়াড়রা এই বিষয়ে অগ্রণী হবেন।

## যোগীন্দার সিং সেরা খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত

অলিম্পিক খ্যাত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সুযোগ্য রাইট ইন যোগীন্দার সিং বাইটন কাপের ফাইন্যাল উপলক্ষে মাঠের সেরা খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়ে প্রতীপ স্মৃতি ট্রফি লাভ করেছেন। এবার প্রথম এইভাবে ফাইন্যালের সেরা খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করা হয়। এবারকার নির্ব্বাচনের ভার ছিল—দিকপাল খেলোয়াড় প্যাট জ্যানসেন, কেশব দত্ত, লেসলী ক্লডিয়াস ও বলবীর কাপুরের ওপর।

খেলোয়াড়দের এইভাবে সম্মানিত করার প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই সকলে সাধুবাদ জানাবেন।

## ডেভিস কাপের পূর্ব্বাঞ্চল ফাইন্যালে ভারত জয়ী

দিল্লীর রোসেনারা ক্লাব লনে ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বাঞ্চল ফাইন্যালের আসর বসে। ভারত সহজেই ৫-০ খেলায় ফিলিপাইনকে পরাজিত করে আন্তঃ-আঞ্চলিক পর্য্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। ভারত এবার ইউরোপীয় এবং মার্কিণ অঞ্চলের বিজয়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

উপর্য্যুপরি দু'টি সিঙ্গলস ও ডাবলসে জয়ী হওয়ায় তৃতীয় সিঙ্গলসে কৃষ্ণাণের পরিবর্ত্তে প্রেমজিৎ লাল খেলেন।

ভারতের তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জ্জী ও প্রেমজিৎ লাল উচ্চস্তরের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বিশেষ করে প্রেমজিৎ লালের জোরালো সার্ভিস, প্রতিপক্ষের সার্ভিসে ফিরতি মার ও "স্ম্যাশ" সত্য প্রশংসার যোগ্য হয়।

ফিলিপাইনের বয়োবৃদ্ধ রেমণ্ড ডেইরোর ক্রশ-কোর্ট মার, জোরালো ভলি ও নিখুঁত লব মার সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। নিম্নে সকল খেলার ফলাফল প্রদত্ত হ'লো :

সিঙ্গলস

জয়দীপ মুখার্জ্জী (ভারত) ৯-১১, ৭-৫, ৬-০ ও ৬-৪ সেটে জুয়ান জোসেকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

রমানাথ কৃষ্ণণ (ভারত) ৬-১ সেটে ফেলিসিমো এম্পনকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

প্রেমজিৎ লাল (ভারত) ৬-৩, ৬-১ ও ৬-০ সেটে জুয়ান মাজোসকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

জয়দীপ মুখার্জ্জী (ভারত) ৬-১, ৬-৩, ৩-৬ ও ৬-১ সেটে ফেলসিমো এম্পনকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

ডাবলস

প্রেমজিৎ লাল ও জয়দীপ মুখার্জ্জী (ভারত) ৬-৩, ৩-৬, ৯-৭ ও ৬-১ সেটে রেমণ্ড ডেইরো ও জুয়ান জোসেকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

## কলিকাতায় জার্ম্মাণ ফুটবল দল

পশ্চিম জার্ম্মাণীর খ্যাতনামা দল ভি: এফ: বি: ষ্টুটগার্ট ভারত সফরে এসে কলকাতায় প্রথম আত্মপ্রকাশে এক বিশেষ প্রদর্শনী

ফুটবল খেলায় আই. এফ. এ. একাদশের সঙ্গে মিলিত হয়। এক গোলে পশ্চাদ্বর্ত্তী হলেও তারা এই খেলায় ৩-১ গোলে জয়ী হয়েছে। বিদেশাগত এই দলটির খেলা দেখে কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের মন বিশেষ ভরেনি, তবে দলটির ক্রীড়াধারা যে উন্নত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। দলের খেলোয়াড়রা অনেক পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখেছেন। খেলোয়াড়দের দৈহিক গঠন ও শারীরিক পটুতা সত্যই দেখবার বিষয়। খেলোয়াড়রা বল ধরা ও আয়ত্তে রাখা এবং নিখুঁত পাশ করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। খেলোয়াড়রা পরস্পরে স্থান পরিবর্ত্তন করে খেলেন। কোন খেলোয়াড় কোন স্থানে খেলছেন তা বোঝা কঠিন। তাঁদের খেলায় সব সময়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে তাঁদের রক্ষণ ব্যবস্থায় অনেক ক্রটিবিচ্যুতি ধরা পড়েছে। আই. এফ. এ. দলের খেলোয়াড়গণ প্রতিপক্ষ দলের রক্ষণ ব্যবস্থার এই ফাঁকগুলিকে কাজে লাগাতে পারেননি।

আগন্তুক দলের সঙ্গে তিনজন আন্তর্জ্জাতিক খেলোয়াড় কলকাতায় আসা সত্ত্বেও একমাত্র সেণ্টার ফরওয়ার্ড গাইজ্জার ব্যতীত অপর দুই জন খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি।

আই. এফ. এ. দল প্রথমার্দ্ধে প্রশংসনীয় ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায় এবং এক গোলে অগ্রগামী থাকার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। এমন কি এই অর্দ্ধে তারা একাধিক গোল করলেও কিছু বলার ছিল না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশেষ করে বিতর্কমূলক পেনাল্টীর পর দলের খেলোয়াড়দের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

কলকাতার কোন জনপ্রিয় দলের খেলা না হলেও এই খেলা দেখার জন্য ক্যালকাটা মাঠের সকল আসনই পরিপূর্ণ হয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষকে কেল্লার উন্মুক্ত স্থানে মেলা বসাতে দেখা গেছে। এই সব দেখে স্বভাবতঃই মনে পড়ে যায় কলকাতার ষ্টেডিয়াম আর কত দূর?

## এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতীয় হকি দল গঠিত

জাকার্ত্তায় আগষ্ট মাসে চতুর্থ এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান হবে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারতীয় হকি দলের মনোনীত ১১ জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পাঞ্জাব পুলিশ দলের অলিম্পিক খেলোয়াড় গুরুদেব সিং দলের অধিনায়ক, সার্ভিসেসের লক্ষ্মণ সহকারী নির্দ্ধারিত হয়েছেন। বোম্বাই-এর জে. জেমিসন্ দলের সঙ্গে ম্যানেজার ও কোচ হিসাবে যাবেন।

নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়, ষ্ট্যাণ্ডবাই ও অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের বরোদায় শিক্ষা শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই শিক্ষাশিবির পরিচালনার ভার পড়েছে—গুজরাট হকি এসোসিয়েশনের ওপর। শিক্ষা শিবিরে কোন খেলোয়াড় আশানুরূপ নৈপুণ্য দেখাতে না পারলে তার পরিবর্ত্তে অন্য খেলোয়াড়কে লওয়া হবে।

ভারতীয় হকি দল সাফল্য অর্জ্জন করুক—এটাই সকলে আশা করেন। নিম্নে ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল :—

গোল—লক্ষ্মণ ( সার্ভিসেস ) ও কুট্টি ( মহীশূর )।

ব্যাক—পৃথীপাল সিং ( পাঞ্জাব )। যমনলাল শর্ম্মা ( উত্তরপ্রদেশ ) ও পিয়ারা সিং ( সার্ভিসেস )।

হাফ ব্যাক—দেশমুখ ( সার্ভিসেস ), এণ্টিক ( রেলওয়ে ), চিরঞ্জিৎ সিং ( পাঞ্জাব ), নিমল ( রেলওয়ে ) ও গুরমিৎ সিং ( পাঞ্জাব )।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় আই. এফ. এ. একাদশের বিরুদ্ধে যোগদানকারী পশ্চিম জার্ম্মাণীর ভি এফ. বি ষ্টুটগার্ড দলের খেলোয়াড়গণ।

ফরওয়ার্ড—মদনমোহন সিং ( পাঞ্জাব ), গুরদেব সিং ( পাঞ্জাব ) দর্শন সিং ( পাঞ্জাব ) বান্দু পাথিল ( সার্ভিসেস ), হামিদ ( রেলওয়ে ), উপো ( সার্ভিসেস ) ও আরম্যান ( রেলওয়ে ) ।

ষ্ট্যাণ্ড-বাই—ধরম সিং ( পাঞ্জাব ), কাদিরেসন ( মাদ্রাজ ), যোগীন্দার সিং ( বাঙ্গালা ) ও পিটার্স ( সার্ভিসেস ) ।

অতিরিক্ত খেলোয়াড়—গজেন্দ্র সিং ( সার্ভিসেস ), গুরবক্স সিং ( বাঙ্গালা ), সাভান্ত ( গুজরাট ), রত্তি ( রেলওয়ে ), ইনাম-উর-রেমান ( ভূপাল ), বলবীর সিং ( বাঙ্গালা ), গাইকোয়াড় ( গুজরাট ) ও নাগরাজ ( মহীশূর ) ।

## অলিম্পিক অনুসন্ধান কমিটির কার্য্যকলাপে গাফিলতি

সম্প্রতি লোকসভায় রোম অলিম্পিকে ভারতীয় দলের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান কল্পে নিয়োজিত কমিটি যথোপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুসন্ধান কাজ আরম্ভ করেন নাই বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে, এল, শ্রীমালী অভিযোগ করেছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, সাক্ষিগণ উপস্থিত না হওয়ার জন্যই কমিটির কাজে বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু উহাই একমাত্র কারণ বলে তিনি মনে করেন না। আসল কারণ যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপে অনুসন্ধান কমিটির গাফিলতি প্রকাশ পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই অভিযোগের উত্তরে লোকসভার অন্যতম সভ্য ও অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি শ্রীজয়পাল সিং জানিয়েছেন যে, ক' বছর পূর্ব্বে রোম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে ; কিন্তু এখনও তার আয়-ব্যয়ের হিসাবের তালিকা কমিটির হস্তগত হয় নি। এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও সময় মতন এই হিসাব পাননি। এই কারণেই কমিটির কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব ঘটেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই অভিযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মর্য্যাদার প্রশ্ন যেখানে জড়িত—সেখানে অনুসন্ধান কমিটি দু বছরের মধ্যে তাঁদের কার্য্য ধারা শেষ করতে পারলেন না—এটা সত্যই দুঃখের বিষয়। শ্রীজয়পাল সিং যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তাতে কমিটির গাফিলতির কথাই প্রকাশ পায়। শ্রীসিং-এর বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, রোম অলিম্পিকের আয়-ব্যয়ের হিসাবও নাকি সরকারের নিকট পৌঁছায়নি। সরকার কেন এ বিষয়ে গুরুত্ব দেন নি—এই প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে। আশা করা যায় সরকার এ বিষয়ে একটু সজাগ হবেন। অনুসন্ধান কমিটিও সত্বর তাঁদের রিপোর্ট পেশ করবেন।

## বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি

ইংলণ্ডের এফ, এ, কাপের কথা কাহারও অজানা নেই। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে এটা স্বীকৃতি পেয়েছে। এই প্রতিযোগিতা ৯০ বছরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বিশ্বের সকল ফুটবল অনুরাগীরাই এফ, এ, কাপের ফাইন্যালের ফলাফলের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। সম্প্রতি ওয়েম্বলে ষ্টেডিয়ামে এবারকার এফ, এ, কাপের ফাইন্যালের আসর বসে। এই ষ্টেডিয়ামে এক লক্ষ আসনের ব্যবস্থা থাকে। বহুদিন আগেই সকল টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। এই খেলার টিকিট বিক্রি থেকে সাত লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। টেলিভিশন ও রেডিও থেকে পাওয়া যায় দু লক্ষ টাকা। ফাইন্যালের দু দল এই টাকার শতকরা ২৫ ভাগ করে পাবে বিজয়ী দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় পাবেন দেড় হাজার টাকা এবং নিজে ক্লাব থেকেও পাবে তিনশো টাকা।

এবার খেলার কথায় আসা যাক। এবারকার ফাইন্যালে গা বারের লীগ ও কাপ বিজয়ী টটেনহাম হটস্পার ৩—১ গোলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বার্ণলে দলকে হারিয়ে দিয়ে এবারও কাপ লাভে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। হটস্পার দলের গোল করেন জিমি গ্রীভ বলি স্মিথ ও ড্যানি ব্লাঞ্চফাওয়ার এবং বার্ণলে দলের জিমি রবস গোল করেন।

ফুটবল বিদেশী খেলা হলেও ভারতেও বিশেষ করে কলকাতা এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানেও কোন ভাল খেলায় দু জনপ্রিয় দলের মিলনকে কেন্দ্র করে—ক্রীড়ামোদীদের উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব থাকে না। টিকিটের জন্য হাহাকার পড়ে যায় উপযুক্ত ষ্টেডিয়ামের ব্যবস্থা হলে—এখানেও কয়েক লক্ষ টাকা সংগৃহী হওয়া অসম্ভব নয়। তবে একটা জিনিষ ভাববার বিষয়। ইংল খেলায় সংগৃহীত অর্থ থেকে যোগদানকারী ক্লাব ও খেলোয়াড়দে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু কলকাতার ব্যাপার সবই অদ্ভুত। এখা সব টাকা চ্যারিটির উদ্দেশ্যে আই. এফ. এ'র তহবিলে যায়। এ টাকা থেকে কিছু চ্যারিটির উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় সত্য, তবে বেশীর ভা টাকাই মোটা মাইনার সম্পাদক ও অফিস কর্ম্মচারীদের পুষতে লো যায়। এখানে খেলোয়াড়দের কোন ব্যবস্থা নেই। আই. এফ. এ পরিচালকমণ্ডলী এই দিকে একটু দৃষ্টি দিলে সকলে খুসী হবেন।

## উদীয়মান খেলোয়াড়দের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন

সম্প্রতি ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত বাঙ্গালা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষে সভাপতির ভাষণ প্রস শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ উদীয়মান ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সুষ্ঠু শি ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। এই শিক্ষা দ কল্পে তিনি "ইণ্ডোর ক্রিকেট মাঠের" প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে কারণ বৃষ্টির জন্য বছরের অধিকাংশ সময় খোলা মাঠে ক্রিকেট খেলা শিক্ষা পরিকল্পনা চালু রাখা সম্ভবপর নয়। ক্রিকেট খেলায় প্রতি লাভ অর্থাৎ বিশ্বের অন্যান্য শক্তিশালী দলগুলির সঙ্গে সমতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে—বৎসরের সব সময়ই উদীয়মান খেলোয়াড় শিক্ষা দানের প্রয়োজন। "ইণ্ডোর ক্রিকেট মাঠই" এই প্রচেষ্টা সফল করে তুলবে।

শ্রীঘোষের বক্তৃতাটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বাঙ্গালার ক্রি পরিচালকরা এই বিষয়ে অগ্রণী হওয়া দরকার।

## বাছাই করা খেলোয়াড়ের মধ্যে কৃষ্ণণের স্থান দশ

বিশ্বের নাম করা টেনিস প্রতিযোগিতার মধ্যে কর আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা অন্যতম। বিশ্বের স শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

এ বছর বাছাই করা খেলোয়াড়ের যে তালিকা প্রস্তুত ব হয়েছে তাতে গতবারের উইম্বলডন বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার রড লে গ্রাস এবং অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন দ্বিতীয় বাছাইরূপে স্বীকৃ পেয়েছেন।

স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা তালিকায় তৃতীয় স্থান প

রেছেন। গত বছর এই প্রতিযোগিতায় তিনি লেভার ও এমার্সনকে রাজিত করেছিলেন। ইতালীর নিকোলে পিয়েত্রাঞ্জলী চতুর্থ ান পেয়েছেন। ভারতের পয়েলা নম্বর খেলোয়াড় রমানাথ ক্ষণ তালিকায় দশম স্থান লাভ করেছেন।

মহিলা বিভাগের সিঙ্গলসে গত বছরের বিজয়িনী ব্রিটেনের ্যান হেডন ও অষ্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ বাছাই তালিকায় প্রথম । দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। নিম্নে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের ঙ্গলসের বাছাই তালিকা দেওয়া হ'লো :—

পুরুষ বিভাগ

(১) রড লেভার ( অষ্ট্রেলিয়া ) (২) রয় এমার্সন ( অষ্ট্রেলিয়া ) ) ম্যানুয়েল স্যানটানা ( স্পেন ) (৪) নিকোলা পিত্রাঞ্জলি ইতালী ) (৫) নীল ফ্রেজার ( অষ্ট্রেলিয়া ) (৬) হুইটনে রীড আমেরিকা ) (৭) বরো জোভানওভিক ( যুগোশ্লাভিয়া ) ) জুয়ান ম্যানুয়েল কুভার ( স্পেন ) (৯) জ্যান এরিক ল্যাণ্ড কুইষ্ট ( সুইডেন ) (১০) রমানাথ কৃষ্ণাণ ( ভারত ) (১১) পিয়ারী ডারমন ( ফরাসী ) (১২) মাইল স্যাঙ্গষ্টার ( ব্রিটেন ) (১৩) ইনগো বাডিং ( পশ্চিম জার্ম্মাণী ) (১৪) বিলি নাইট ( ব্রিটেন )।

মহিলা বিভাগ

(১) অ্যান হেডন ( ব্রিটেন ) (২) মার্গারেট স্মিথ ( অষ্ট্রেলিয়া ) (৩) খৃষ্টাইন ট্রুম্যান ( ব্রিটেন ) (৪) স্নুজি করোমোকজি ( হাঙ্গেরী ) (৫) মিসেস স্যাণ্ডা প্রাইস ( দক্ষিণ আফ্রিকা ) (৬) রেনি সুরম্যান ( দক্ষিণ আফ্রিকা ) (৭) এডা বাডিং ( পশ্চিম জার্ম্মাণী ) (৮) জান লেহান ( অষ্ট্রেলিয়া ) (৯) এলিজাবেথ ষ্টার্ডি ( ব্রিটেন ) (১০) দেরক্রে ক্যাট ( ব্রিটেন ) (১১) জাষ্টিন ব্রিকা ( আমেরিকা ) (১২) ম্যারিয়া টেরেসা রিভল ( ইতালী ) (১৩) লেসলী টার্ণার ( অষ্ট্রেলিয়া ) (১৪) লি পেরিকোলি ( ইতালী ) (১৫) পিলার বারিল ( স্পেন ) (১৬) সিলভানা লাজারিনো ( ইতালী )।

## এখন এখান থেকে

### সমরেন্দ্র ঘোষাল

অলস মধ্যাহ্ন হয়ে জীবনের যতগুলি সাধ
একে একে নিক্রান্ত হোলো।
এখন বিষণ্ণ অবসাদ, আমার সায়াহ্ন শুধু।
অশরীর বিড়ম্বিত জর্জরিত হতাশার
ধূলা বিলীন অন্ধকার গোধূলি।
সান্ত্বনার হাত ধরে পা বাড়ালাম তাই
ভালবাসার রাস্তায়।
সেখান থেকে অতঃপর অনেক সংঘাত যেখানে
স্তূপীকৃত অতৃপ্ত আকাঙ্খার সাথে মিশে
সংযমের হাত মুচড়ে দিয়ে
কান্নাকেই স্বাগত জানাচ্ছে,
সেখানেই এসে ঠাঁই নিলাম।
এখন এখান থেকে,
তোমার ইচ্ছার প্রাসাদ-স্তম্ভশীর্ষে
প্রসন্ন রৌদ্রের অবাধ গমনাগমন
আমি বসে বসে দেখি।
আর অপারক আমি শীতার্ত্তের রাত্রি হয়ে
তোমার আলোর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করি শুধু।
কেন আমি অশরীর অন্ধকারের কাছে
আমার স্বাক্ষর রেখেছি এ কথার উত্তরে
আমার বক্তব্য কিছু নেই, কভু নেই এবং থাকবে না।
যেহেতু আলোর পাখী হয়ে এসে
তোমার আমন্ত্রণ আমাকে প্রলোভিত করলেও
আমার আকাশ হতে একটি উচ্ছাস-আলোক কণাও
অদ্যাবধি বিচ্ছুরিত হয়নি।

## বৃথা বসে থাকা

### কুমারী চিন্তা চিন্যা

হয়তো হারিয়ে যাবে,
মিলিয়ে যাবে,
অসীম মেলার ভীড়ে;
সামান্য স্বাতন্ত্র্য তবু
বজায় রাখায়,
বাঁচিয়ে চলায়,
স্বতঃই সচেষ্ট থাকবে।

অতীতে তুমি বলে
বিশেষ একটি একদা
এখানে এসেছিলে,
কিছু করেছিলে,
কিসের জোরে সে দাবী দেবে?
কাজেকাজেই তখন তোমায়
সবসত্তা নির্বিশেষে
একাকারে মিলেমিশে
জলাশয়ের শিশির হ'য়ে,
বিলুপ্ত ব্যক্তিত্বে
বধ্য হ'তে বাধ্য হ'বে।

তার চেয়ে কিছুটা চেষ্টায়,
আর স্বল্প সচেতনতায়,
থাকে যদি চিরস্থায়ী স্থান
তোমার, কোনোও এক অংকে,
তবে কেন এখনো
বৃথা বসে থাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

## পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমস্যা—

পশ্চিমী শক্তিবর্গের মৈত্রীবন্ধন সূত্রে প্রবল টান পড়িয়াছে, এই মৈত্রী যে গুরুতর দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া চলিতেছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন পশ্চিমী শক্তিবর্গের একটা বিভেদ সৃষ্টি করিতে চায়, একথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে এই বিরোধটা রাশিয়ার চাপে বা প্রচারকার্য্যের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। পশ্চিমী-শক্তিবর্গের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে বার্লিন সমস্যা সমাধানের জন্য, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে আলোচনা এবং বৃটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশ সংক্রান্ত আলোচনাকে কেন্দ্র করিয়া—বিষয় দুইটি আপাতদৃষ্টিতে যতই স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হউক না কেন, উহাদের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, এই সমস্যা দুইটি একদিকে ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্ম্মাণী এবং আর একদিকে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে পারে। রাশিয়া ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে বার্লিন সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। ইহার পর হইতে ১৯৫৯ সালে একবার এবং বর্ত্তমানে বার্লিনে মিত্রশক্তিবর্গের অধিকার সম্বন্ধে রাশিয়ার সহিত নূতন চুক্তি করিবার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইবার বৃটেন এবং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মাণী তাহাতে রাজী নয়। পশ্চিম জার্ম্মাণীর আশঙ্কা এইরূপ আলোচনা পূর্ব্ব জার্ম্মাণ সরকার এবং জার্ম্মাণীর যুদ্ধোত্তর সীমান্তকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের পূর্ণ সদস্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার পর হইতে এ পর্য্যন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গের কেহই প্রকাশ্যে উহার বিরোধিতা করেন নাই একথা সত্য। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, বৃটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের পূর্ণ সদস্য হওয়ার ব্যাপারে জেনারেল দ গলের উৎসাহের একান্ত অভাব। বৃটেনের আশঙ্কা কমনওয়েলথ রপ্তানী সম্পর্কে এবং ইউরোপীয় নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নরওয়ে এবং ডেনমার্কের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের পুরা সদস্য হওয়া সম্পর্কে ফ্রান্স গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিবে। এই সমস্যা দুইটির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য এখানে একটুকু বিশদভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

ইতিপূর্ব্বে বার্লিন সঙ্কট যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তখন পশ্চিম জার্ম্মাণীর সমর্থনে ফ্রান্স বৃহৎ চতুঃশক্তির আলোচনায় বিরোধিতা করিয়াছিল। এই অবস্থায় বার্লিন সমস্যা সমাধানের কোন পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা তাহা দেখিবার জন্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র নিজে উদ্যোগী হইয়া রাশিয়ার সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এই আলোচনায় বার্লিনে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনী থাকার সমস্যা সম্পর্কে কোন সমাধানই সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই আলোচনা পশ্চিম জার্ম্মাণীর মনে একটা আশঙ্কা যে সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গত এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র বার্লিনে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য তের জন সদস্যবিশিষ্ট একটি আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব শক্তি গঠনের একটি পরিকল্পনা তাহার মিত্রবর্গের নিকট উপস্থিত করে। এই আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব শক্তিতে তিনটি পশ্চিমী শক্তি, তিনটি কম্যুনিষ্ট শক্তি, তিনটি নিরপেক্ষ শক্তি অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড তো থাকিবেন-ই তাছাড়া থাকিবেন পশ্চিম জার্ম্মাণী, পশ্চিম বার্লিন, পূর্ব্ব জার্ম্মাণী এবং পূর্ব্ব বার্লিন কিন্তু উহাতে পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর প্রতিনিধি থাকা সম্পর্কে পশ্চিম জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্স উভয়েই আপত্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মে মাসের (১৯৬২) প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে এথেন্সে 'নাটো'র (NATO) যে সম্মেলন হয় তাহাতে মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ রাস্ক এবং পশ্চিম জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী Gerhard Schroeder উভয়ে মিলিয়া মতভেদের সমাধানের জন্য একটা চেষ্টা করেন। মিঃ রাস্ক রাশিয়ার সহিত আলোচনা চালাইয়া যাইতে থাকিবেন, এ বিষয়ে পশ্চিম জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মত হন। পশ্চিম জার্ম্মাণীর সম্মতি ছাড়া আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে না, মিঃ রাস্কও এ সম্পর্কে রাজী হন। ইহার পরেই পশ্চিম জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেন্বর পশ্চিম বার্লিনে যাইয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে যাহা বলিলেন তাহাতে পশ্চিমী মিত্রবর্গের মধ্যে তুফান উঠিয়াছে, একথা বলিলে ভুল হইবে না।

পশ্চিম জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা চালাইয়া যাইতে সম্মতি দিয়েছেন, ডাঃ এডেন্বর তাহাকে কোন আমলই দেন নাই। তিনি মনে করেন, রাশিয়ার সহিত আলোচনা সাফল্য মণ্ডিত হইবে না, সাফল্য মণ্ডিত না হওয়াই উচিত। তিনি মনে করেন, বার্লিনে প্রবেশের জন্য যে আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব শক্তি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা আদৌ কার্য্যকরী হইতে পারে না। এই কর্ত্তৃত্ব শক্তি পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতাই শুধু করেন নাই, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রত্রয়ের ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। মার্কিণ-সোভিয়েট আলোচনাকে তিনি boring বলিয়া মনে করেন এবং আলোচনা চালাইয়া যাওয়ার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। ডাঃ এডেনুরের মন্তব্য যদি প্রেসিডেন্ট কেনেডীর

মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া থাকে তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির বিপদের সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত দায়িত্ব বহন করিবে অথচ পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নীতি নির্দ্ধারণে কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ একটা ব্যবস্থায় মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র রাজীই বা হইবে কেন? সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী তাঁহার অসন্তোষ গোপন রাখেন নাই। আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব শক্তিতে পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর প্রতিনিধি থাকিলেই রাষ্ট্র হিসাবে পূর্ব্ব জার্ম্মাণীকে স্বীকৃতি দান করা হইল, একথা তিনি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্ম্মাণী অনায়াসেই মার্কিণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া নূতন ভাষায় অধিকতর ভাল প্রস্তাব রচনা করিতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী বলিয়াছেন, "When the difficult times come, it the United States that carries the major burden and is looked to take the major actions...So that I think we have some rights to at least explore possibilities of finding a better solution than we now have. অর্থাৎ 'যখন কঠিন সময় আসে তখন প্রধান ভার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই বহন করে, প্রধান ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দিকেও দৃষ্টিপাত করা হয়।···সুতরাং বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর ভাল সমাধানের সম্ভাবনা আছে কিনা সে-সম্বন্ধে পথের সন্ধান করিবার অধিকার আমাদের আছে বলিয়া আমি মনে করি।" প্রেসিডেণ্ট কেনেডী চার্চ্চিলের কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন, It is better to jaw-jaw than war-war.

বার্লিন এবং ইউরোপীয় সাধারণ বাজার লইয়া পশ্চিমী শক্তি-বর্গের মধ্যে এই যে মত বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহা অপেক্ষা ঐক্যই বেশী শক্তিশালী, একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই ঐক্যের মূলেও রহিয়াছে কম্যুনিজম এবং কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার বিরোধিতা। এই বিরোধিতার জন্য পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের পর অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক হইতে এই সকল দেশ ছিল দুর্ব্বল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল প্ল্যান অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থা তাহাদিগকে রুশ আক্রমণের দুঃস্বপ্ন হইতে অনেকখানি মুক্ত করিয়াছে। কাজেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কোন পথও তাহাদের ছিল না। কিন্তু তাহারা ক্রমশঃ অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটাইয়া উঠিয়াছে, সামরিক শক্তিতেও ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে; কাজেই তাহারা এখন নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহারা অধিকতর

শক্তিশালী হওয়ায় প্রত্যেক দেশের জাতীয় স্বার্থের সহিত অন্যদেশের জাতীয় স্বার্থের বিরোধ সৃষ্টি তো হইয়াছেই, তা ছাড়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইউরোপে যে একটা আন্তর্জ্জাতিক শক্তি-শিবির গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সহিতও বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে। ফ্রান্স সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, নাটোর শক্তি ও প্রভাবকেও অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। জেনারেল দ্য-গলের নেতৃত্বে ফ্রান্স নিজেকে পশ্চিম ইউরোপের নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। বৃটেনেরও নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ রহিয়াছে। বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সদস্য হইতে চায়, সেই সঙ্গে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখাও তাহার কাম্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করিতেও বৃটেন ইচ্ছুক, কিন্তু পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হিসাবে বজায় রাখিতে চায় নিজের স্বাতন্ত্র্য। বৃটেনের এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, ফ্রান্স আর ইউরোপের একমাত্র নেতা হইতে পারিবে না। বিরোধটা এইখানে।

ফ্রান্স চায় ভাবী ইউরোপ একটা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে, একটা তৃতীয় শক্তিরূপে গড়িয়া উঠিবে এবং তাহার নেতা হইবে সে। অবশ্য নাটোর সহিত এই তৃতীয় শক্তির একটা সম্পর্ক অবশ্যই থাকিবে। পশ্চিম জার্ম্মাণী সংযুক্ত ইউরোপের নেতৃত্ব লইয়া মাথা ঘামায় না। তাহার লক্ষ্য এই সংযুক্ত ইউরোপের সহিত জার্ম্মাণীর জাতীয় স্বার্থের সহিত বিরোধ না ঘটে। বার্লিন সমস্যা, পূর্ব্ব জার্ম্মাণী এবং কম্যুনিষ্ট শিবিরের পশ্চিমী শিবিরের কূটনৈতিক সম্পর্কের স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই পশ্চিম জার্ম্মাণীর জাতীয় স্বার্থ। পশ্চিম জার্ম্মাণী ভাল করিয়াই জানে রাশিয়ার সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার প্রেরণা আসিয়া থাকে লণ্ডন হইতে। বৃটেন যদি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সদস্য হয় তাহা হইলে উহার কম্যুনিজম বিরোধিতার নীতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। নরওয়ে এবং ডেনমার্ক ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের পুরা সদস্য হয়, ইহা বৃটেনের কাম্য। নিরপেক্ষ অষ্ট্রিয়া, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ড উহার এসোসিয়েট সদস্য হয় ইহাও বৃটেন চায়। কিন্তু ডাঃ এডেনুর এইরূপ অতি বৃহৎ ইউরোপীয় ইকনমিককে কমিউনিটি পছন্দ করেন না। তিনি মনে করেন, বৃটেনের স্বার্থ ইউরোপের স্বার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাও তাঁহার আশঙ্কা যে, নরওয়ে প্রভৃতি দেশগুলি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে উহা এত বৃহৎ হইবে যে, শেষ পর্য্যন্ত উহা ফাটিয়া পড়িবে। ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ইউরোপের ধ্বংসোম্মুখ ধনতন্ত্রকে রক্ষা করিবার প্রয়াস বলিয়া রাশিয়া মনে করে। কিন্তু ইহা গঠনের ব্যাপারেও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়াছে। বার্লিনের ব্যাপারে ডাঃ এডেনুরের মনে একটা অসন্তোষ ধুমায়িত হইতেছে। তিনি হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপে তৃতীয় শক্তি গঠন সম্পর্কে জেনারেল দ্য গলের পরিকল্পনা সমর্থন করিতেও পারেন। এই তৃতীয় শিবির একদিকে ইঙ্গ-মার্কিণ শিবির এবং আর একদিকে কম্যুনিষ্ট শিবিরের মধ্যবর্ত্তী হইবে। বার্লিন সঙ্কট সত্ত্বেও ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মাণী, বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় স্বার্থের একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে। বার্লিন সম্পর্কে হুমকী দেওয়া ছাড়া রাশিয়া আর কিছুই করে নাই। পশ্চিম জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স হয়ত মনে করে রাশিয়া হুমকী দেওয়া ছাড়া আর কিছু করিবেও না। কারণ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু অস্ত্রের ভয় আছে। কিন্তু পরমাণু অস্ত্র যে রাশিয়ারও সে-কথা তাহারা ভাবেন কিনা বুঝা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে পশ্চিমী শক্তিবর্গ যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন, যুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইউরোপে তাহা অভূতপূর্ব্ব। পরস্পর বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্ব যেন বার্লিন সমস্যাকেও গৌণ করিয়া তুলিয়াছে।

## লাওস-সঙ্কট—

এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৬১ সালের ৩রা মে লাওসে যুদ্ধ বিরতি কার্য্যকরী হইয়াছে। কিন্তু এই এক বৎসরে লাওসে নিরপেক্ষ সরকার গঠন করা তো সম্ভব হয়-ই নাই, অধিকন্তু সম্প্রতি সঙ্কট আবার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। গত ৭ই মে ( ১৯৬২ ) পাথেট-লাও বাহিনী উত্তর লাওসের নাম থা সহরটি আক্রমণ করে। আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সাত ঘণ্টা পরেই নাম থা হইতে তিন হাজার দক্ষিণপন্থী সৈন্য বাহিনী পলায়ন করিতে আরম্ভ করে এবং মেকং নদী পার হইয়া থাইল্যাণ্ডে না পৌঁছা পর্য্যন্ত তাহারা থামে নাই। অভিযোগ উঠিয়াছে পাথেট লাও বাহিনী নাম থা আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ বিরতি ভঙ্গ করিয়াছে। শুধু যুদ্ধ বিরতি ভঙ্গই নয়, লাওসের দক্ষিণপন্থী সরকারের রাজধানী ভিয়েনটিয়েন বিপন্ন হওয়ারও আশঙ্কা দেখা দেয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে অবস্থা যে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সমগ্র লাওস যদি পাথেট লাওয়ের দখলে চলিয়া যায়, তাহা হইলে দক্ষিণ ভিয়েটনামে এবং থাইল্যাণ্ডে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তাহাও বিপন্ন হইয়া উঠিতে পারে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবাহিনীর নৌসৈন্য থাইল্যাণ্ডে অবতরণের নির্দ্দেশ দেন। অবশ্য বলা হইয়াছে যে, থাই গবর্ণমেণ্টের অনুরোধেই এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গত ১৭মে মার্কিণ সৈন্য থাইল্যাণ্ডে অবতরণ করে। অবশ্য পাথেট লাও বাহিনী থাইল্যাণ্ড আক্রমণ করিবে, এই রূপ আশঙ্কা করার কোন কারণ নাই। পাথেট লাও বাহিনীর পক্ষ হইতে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ভারতীয় চেয়ারম্যান শ্রীঅবতার সিংকে জানানো হইয়াছে যে, থাইল্যাণ্ডের সীমান্তবর্ত্তী মেকং নদীর তীরে অবস্থিত হোই সাই সহর হইতে দক্ষিণপন্থী বাহিনী তাহাদিগকে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে তাহারা ঐ সহরে আক্রমণ করিবেন না। অতঃপর প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি করিবে? প্রেসিডেণ্ট কেনেডী লাওসের গৃহ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিতে চান না। গত ১৭ই মে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলিয়াছেন যে, কূটনৈতিক সমাধানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এইরূপ সমাধানই যুদ্ধের আশঙ্কা হ্রাস করিবে। থাইল্যাণ্ডে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণের সংবাদে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমেরিকানরা এই জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। একবার আপনারা যদি জড়াইয়া পড়েন, তবে বাহির হইয়া আসা কঠিন। কোরিয়ায় আপনারা সহজেই যাইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু উহা তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল এবং অন্যান্য দেশও এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।"

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য সত্ত্বেও লাওসের দক্ষিণপন্থী সরকার সামরিক শক্তি দ্বারা পাথেট লাও বাহিনীতে ঠেকাইয়া রাখিতে

পারেন নাই। এই অবস্থায় ১৯৬১ সালের প্রথম দিকেই লাওস সম্পর্কে মার্কিণ নীতিতে একটা পরিবর্তন ঘটে। লাওসকে নিরপেক্ষ দেশে পরিণত করাই প্রেসিডেণ্ট কেনেডী লাওস সঙ্কট সমাধানের উপায় বলিয়া গ্রহণ করেন। গত বৎসর জুন মাসে ভিয়েনায় কেনেডী ক্রুশ্চভ সাক্ষাৎকারের সময় লাওসে তিনটি দলের কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে তাঁহারা উভয়েই এক মত হইয়া ছিলেন কি ভাবে এই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইবে সে সম্পর্কে জেনেভায় চতুর্দ্দশ শক্তির সম্মেলনে বিস্তৃত ভাবে পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট বৌন ঔম এবং ফৌমি নোসাভান কোয়ালিশন সরকার গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠেন। দেশরক্ষা দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাঁহাদিগকে দিতে হইবে তাঁহাদের এই অনমনীয় দৃঢ়তার জন্তই এ পর্য্যন্ত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে নাই। অথচ জেনেভা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রিত্ব সহ এই দুইটি দপ্তর নিরপেক্ষপন্থী সৌভান্না ফৌমারই পাওয়ার কথা। বৌন ঔম এবং ফৌমি নোসাভান যাহাতে তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন করেন তাহার জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাদের উপর চাপ দিতে ক্রটি করে নাই। বৌন ঔম সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে মাসিক যে ৩০ লক্ষ ডলার সাহায্য পাইয়া থাকেন তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। ইহার কারণ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু মার্কিণ সরকারের ঘোষিত নীতিকে ব্যর্থ করিবার জন্ত অনেক মার্কিণ সামরিক ও অসামরিক কর্ত্তা বৌন ঔম সরকারকে যে প্ররোচিত করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বৌন ঔম এবং ফৌমি নোসাভান লাওসে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন যাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সৈন্ত পাঠাইয়া লাওসের গৃহযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করে।

এক বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধ বিরতি হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত না হওয়ায় যুদ্ধ বিরতিটা যেন দক্ষিণপন্থী সরকারের শক্তিবৃদ্ধির উপায়ে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল। নাম থা সহরটি চীন সীমান্ত হইতে মাত্র ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। দক্ষিণপন্থী সরকার উহাকে সুদৃঢ় সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিতেছিলেন। উহাতে যে যুদ্ধবিরতির উপর গুরুতর চাপ পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ নাম থা সহরটি সুদৃঢ় সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার প্রয়াস যে পুনরায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করার সুযোগ সৃষ্টি, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বৌন ঔম এবং ফৌমি নোসাভান কোয়ালিশন সরকার গঠনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন, নূতন করিয়া গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উস্কানী দেওয়ার জন্ত নাম থা সহরটিকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের হয়ত আশা ছিল আবার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাথেট লাওকে পরাজিত করা কঠিন হইবে না। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধ-বিরতি হইলেও মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণপন্থী সরকার সামরিক শক্তিতে পাথেট লাওয়ের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পাথেট লাও বাহিনী মেকং নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। দক্ষিণপন্থী বাহিনী পাথেট লাও বাহিনীকে আক্রমণ করিলে কি হইবে বলা কঠিন। থাইল্যাণ্ডে মার্কিণ সৈন্তের উপস্থিতিতে তাহাদের সাহস বাড়িয়া যাইতে পারে। নাম থা হইতে যে-সকল সৈন্ত পলাইয়া থাইল্যাণ্ডে গিয়াছিল তাহাদের প্রায় সকলকেই বিমানযোগে লাওসে পাঠান হইয়াছে।

বৌন ঔম সরকার হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত মার্কিণ সৈন্ত লাওসের গৃহযুদ্ধে নামিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। কোরিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার আর কোন মূল ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িত হইতে চাহিবে না বলিয়াই মনে হয়। লাওসে যে সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কতকটা পাৎলা হইয়াছে। কিন্তু লাওসের সমস্যা যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে আপোষ মীমাংসা এখনও সম্ভব কি? রাশিয়া এখনও কোয়ালিশন সরকার গঠনের পক্ষপাতী। পাথেট লাও-ও কোয়ালিশন সরকার গঠন করিতে ইচ্ছুক। তাহারা আবার আলোচনা আরম্ভ করিতে চায়। বৌন ঔম এবং ফৌমী নোসাভান আলাপ-আলোচনা চালাইবার ব্যাপারে খুব উৎসাহী নয়। কিন্তু এখন তাঁহাদের অবস্থা আরও দুর্ব্বল। তবে তাঁহারা নাকি আলোচনা করিতে রাজী হইয়াছেন। দেশরক্ষা দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজেদের হাতে রাখিবার জেদ যদি তাঁহারা এখনও না ছাড়েন, তাহা হইলে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। মার্কিণ সৈন্ত থাইল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছে, এই ভয়ে পাথেট লাও তাঁহাদের জেদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে, এইরূপ কোন দুরাশা পোষণ করিয়া থাকিলে তাহা ব্যর্থ-ই হইবে। নিরপেক্ষ লাওস গঠন অদূরবর্ত্তী, এরূপ আশা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।
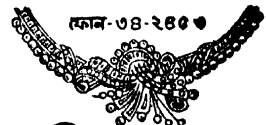
## আমেরিকার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ—

গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৬২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নূতন পর্য্যায়ে পারমাণবিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। বৃটিশ শাসিত ক্রিষ্টমাস দ্বীপের নিকট ইষ্টার্ণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় বেলা ১০-৪৫ মিনিটের (গ্রীণ উইচ সময় ১৫-৪৫; ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ২১-১৫) সময় এই বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে বলিয়া পরমাণু শক্তি কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন। এই বোমা মাঝারি পাল্লার ছিল বলিয়া ঘোষণায় জানানো হইয়াছে। মাঝারি পাল্লার অর্থ ২০ হাজার হইতে ১০ লক্ষ টন টি-এন-টির মধ্যবর্ত্তী কোন শক্তির সমান। একখানি বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া এই বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে বলিয়া উক্ত কমিশন জানাইয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করায় রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ বুলগেরিয়ার অন্তর্গত ভার্ণায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, আমেরিকার বর্ত্তমান পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়নও আবার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রুশ প্রতিনিধি মঃ জোরিন ২৬শে এপ্রিল বলিয়াছেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নূতন করিয়া পরমাণু অস্ত্রসজ্জার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল এবং বিশ্ব পরমাণু যুদ্ধের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইল। ঐদিনই সুপ্রীম সোভিয়েটে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ গ্রোমিকো রাশিয়ার অস্ত্রাগারে নূতন অস্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিম জার্ম্মাণী নূতন পর্য্যায়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করা সমর্থন করিয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার অবশ্য কিছুই নাই। পরীক্ষামূলক পরীক্ষা বন্ধ রাখিবার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ এবং রাশিয়া স্বেচ্ছায় রাজী হইয়াছিল। তা সত্ত্বেও গত অক্টোবর মাসে (১৯৬১) রাশিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও পরীক্ষা আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই পশ্চিম জার্ম্মাণীর অভিমত। প্রত্যেক পশ্চিমী শক্তেরই যে এই মত সে-কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নকে বাদ দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করিল কেন, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা, গত যে-তিন বৎসর পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় নাই সেই তিন বৎসরের মধ্যে গুণগত ও সংখ্যাগত দিক দিয়া পরমাণু অস্ত্রসজ্জার ব্যাপারে রাশিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। গত অক্টোবর মাসে রাশিয়া যে-সকল বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে তাহা হইতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহাও মনে করে যে, পরমাণু অস্ত্রের দিক দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া অপেক্ষা যতখানি অগ্রগামী ছিল তাহা হ্রাস পাইয়াছে। তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইহাও বিশ্বাস যে, মোটের উপর পরমাণু অস্ত্রশক্তির দিক দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখনও রাশিয়ার অগ্রগামীই রহিয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা এই যে, যদি আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছাড়া পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা হয় তবে রাশিয়ার গোপনে প্রস্তুতি চলিতে থাকিবে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হয়ত পিছনে পড়িয়া যাইবে। তা ছাড়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনে আরও আশঙ্কা এই যে, রাশিয়া যদি আর পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নাও ঘটায়, তাহা হইলেও সে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহাও মনে করে যে, ভূগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া যে সকল তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি পরমাণু অস্ত্রের উন্নয়নের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। বস্তুতঃ পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথম উদ্দেশ্য পরমাণু বোমার ধ্বংস শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ। একটি বোমা কিরূপ ধ্বংস করিতে পারে পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্দ্ধারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ উহার ধ্বংস শক্তিকে কিরূপে আরও বৃদ্ধি করা যায় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও পথের সন্ধান পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ হইতে পাওয়া যায়। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যে অস্ত্রসজ্জা প্রতিযোগিতার অপরিহার্য্য অঙ্গ একথা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। এই জন্যই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হইয়াই রহিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করায় রাশিয়াও আবার বিস্ফোরণ আরম্ভ করিবে। পরমাণু অস্ত্রসজ্জার এই প্রতিযোগিতা বিশ্ববাসীকে পরমাণু যুদ্ধের কিনারায় লইয়া যাইবে, যদি না নিরস্ত্রীকরণ সত্যই সম্ভব হয়।
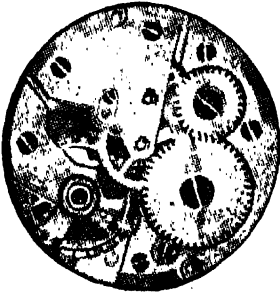
# চলচ্চিত্রে আইসেনষ্টাইনের অবদান

শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেগেই আইসেনষ্টাইন এক নতুন পথের সন্ধান পেলেন। এই পথেই তিনি এগিয়ে চললেন অবিচলিত চিত্তে। এই পথ, তাঁরই ভাষায়, "বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আর্ট ও আর্টের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের পথ।"

আইসেনষ্টাইন প্রথমে ছিলেন রঙ্গমঞ্চের পরিচালক। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্প তাঁর কাছে মনে হল আরও আধুনিক, আরও আকর্ষণীয়, তাঁর সযত্নলালিত ধ্যানধারণাগুলির আরও কাছাকাছি।

১৯২৪ সালে আইসেনষ্টাইন "দি ষ্ট্রাইক" ছবিখানি তুললেন। সোভিয়েত সমালোচকরা একবাক্যে এই ছবিটিকে এক নতুন ফিল্ম্ আর্টের শুভ জন্ম বলে অভিনন্দিত করলেন।

"দি ষ্ট্রাইক" ছবির নায়ক কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, নায়ক এক শক্তিবিশেষ—সমগ্র মেহনতি জনগণই নায়ক বা ছবির ঘটনাঘটনের মুখ্য নিয়ামক। চলচ্চিত্র-শিল্পে গণ-শক্তির রূপায়ণে "দি ষ্ট্রাইক" আইসেনষ্টাইনের এক মস্ত বড় অবদান। এ শুধু অপূর্ব নয়, অভূতপূর্ব।

এর এক বছর পরেই আইসেনষ্টাইনের হাত থেকে বার হল আর একখানি নতুন ছবি—বিশ্ববিখ্যাত "দি ব্যাটলশিপ পটেমকিন"।

আইসেনষ্টাইন

এই ছবিখানি তৈরীর পিছনের কাহিনী অনেকেরই জানা আছে। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের বিংশ বার্ষিকীর জন্য একখানি "জয়ন্তী" (জুবিলি) চিত্র তোলার ভার পড়ল আইসেনষ্টাইনের উপর। এন. আগাদঝানোভার লেখা চিত্রনাট্যে প্রথম রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলীর অসম্ভব ভিড়। তাই ছবি তোলার উদ্যোগ আয়োজনের পর্বে অনেক বেশি সময় লাগল। অবশেষে দলবল গিয়ে পৌঁছল ওদেসা বন্দরে। সময়ের স্বল্পতার জন্য মূল চিত্রনাট্যকে ছেঁটেকেটে ছোট করে নিতে হল। তা করতে গিয়ে আইসেনষ্টাইন ১৯০৫ সালের বিপ্লবের বহু ঘটনার মধ্য থেকে একটি মাত্র ঘটনা বেছে নিলেন—যুদ্ধজাহাজ "পোটেমকিনের" নাবিকদের বিদ্রোহ। তিন মাসের মধ্যেই ছবি তোলার কাজ শেষ হয়ে গেল। "১৯০৫ সাল"—এর গোটা ইতিহাস ছবিতে রূপ পেল না বটে, কিন্তু আইসেনষ্টাইন ঐ খণ্ড-ইতিহাসটুকুর মধ্যেই এক অসাধ্য সাধন করলেন—একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুললেন সমগ্র বিপ্লবের মর্মকথা, তার মহিমা, তার অপরাজেয়তা!

এই ছবিতে দর্শকরা ইতিহাসের মুখোমুখী গিয়ে দাঁড়ায়। কাহিনীর মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আদৌ গুরুত্ব পায়নি। "দি ষ্ট্রাইক" ছবির মতো "দি ব্যাটল্‌শিপ, পটেমকিন"—এও আইসেনষ্টাইন জনগণের ভূমিকাই বড় করে তুলছেন। আইসেন-ষ্টাইনের নিজেরই ভাষায়: এই ছবির প্রধান প্রধান চরিত্র হচ্ছে জলের উপরের যুদ্ধ জাহাজ ও ডাঙার উপরের শহর, অর্থাৎ বিপ্লবী নাবিকরা ও উপকূলের নাগরিকরা। এই দুই পক্ষের মিলন প্রচেষ্টায় বাধা দিচ্ছে নৃশংস জারতন্ত্র। ছবিখানির মূল সুর বৈপ্লবিক ঐক্যের গর্ভযন্ত্রণা।
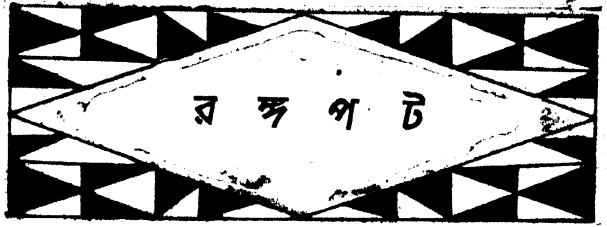
"ওদেসা সোপানশ্রেণীর" মর্মান্তিক ঘটনা বহুকাল যাবৎ বিশ্বের সিনেমা আর্টের একটি চরম উৎকর্ষ বলে অভিহিত হয়ে এসেছে। তীরে জনগণ সমবেত হয়েছে যুদ্ধ জাহাজের বিপ্লবী নায়কদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে। এই অপরাধে নিরপরাধ জনগণের উপর চলল নৃশংস নিপীড়ন ও নির্বিচার গুলিবর্ষণ। পৃথিবীর বহু দেশে ছবির ঐ দৃশ্য—ওদেসা সোপানশ্রেণীর ঐ ঘটনাটি "মাউণ্টিং" ও "কাটিং" আর্টের একটি উজ্জ্বল আদর্শ বলে পরিগণিত। এই ছবিখানির মধ্যে দিয়ে সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ নরনারী বিপ্লবের সত্য কী, মর্ম কী সেই কথা ভালো করে বুঝতে পেরেছে। কেবল জনগণের প্রতি সহানুভূতি ও জনগণের ভাগ্য দেখিয়েই ছবিখানি ক্ষান্ত হয়নি। এই ছবিতে জনগণেরই একজন শরিকের দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। দর্শকও বিদ্রোহী নাবিকদেরই একজন হয়ে পড়ে, একজন বিপ্লবীর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন জনতার সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যায়। দর্শক ও জনতার দ্বিধাদ্বন্দ্ব, আশঙ্কা, ঐক্যশক্তি ও পরাজয়ের অংশভাগী হয়। এক কথায় দর্শকও বিপ্লবে—অংশগ্রহণকারীর চোখ দিয়েই ঐ বিপ্লবকে দেখে। গণশক্তির শিল্পসম্মত রূপায়ণ হিসাবে "ব্যাটল্‌শিপ পটেমকিন" চলচ্চিত্র-শিল্পে অপূর্ব ও অতুলনীয়।

সুচিত্রা সেন এবং উত্তমকুমার ও অন্যান্য অভ্যাগতবৃন্দ

এই ছবির পরেই ভি. পুদভকিনের "মাদার" ছবি। এই দুইখানি ছবি মিলে সোভিয়েত ক্লাসিক্যাল চলচ্চিত্র-শিল্পের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করল।

আইসেনষ্টাইনের পরবর্তী জনপ্রিয় ছবি "আলেকজান্দার নেভস্কি"। আর্টের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অখণ্ড উদ্দেশ্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ছবিখানি বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই ছবি তুলবার সময় ইউরোপের মাথার উপর মহাযুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। ফ্যাসিষ্টদের বোমাবর্ষণে স্পেনের মাটি বিধ্বস্ত, রক্তচক্ষু জার্মাণীর রণহুঙ্কারে সারা পৃথিবী ভীত, তটস্থ। আইসেনষ্টাইনের ছবিতে দেশাত্মবোধকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হল ইতিহাসের শিক্ষা—অত্যাচারের কাছে নতি স্বীকার না করার উদাত্ত আহ্বান। এই এক আসন্ন বিপর্যয়ের প্রাক্কালে এই ছবিখানির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিষ্ট জার্মাণী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পরে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে এই ছবি লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত নাগরিককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে, ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রাণিত করেছে। এই ছবিতে আলেকজান্দার নেভস্কির ভূমিকায় নিকোলাই চের্কাসভের অভিনয় অবিস্মরণীয়, অতুলনীয়।

এর দু'বছর পরে মহাযুদ্ধের কঠোর পরিবেশ ও বিস্তর অসুবিধার মধ্যেও, আইসেনষ্টাইন "ইভান দি টেরিবল" ছবি তোলার কাজে হাত দিলেন। তাঁর তোলা ছায়াছবিগুলির মধ্যে এই ছবিখানিই সবচেয়ে জটিল, কিন্তু আর্টের দিক থেকে সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি। এই ছবি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ও বিষয়বস্তুর উপযোগী সুষ্ঠু আঙ্গিক আবিষ্কারের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। ইভানের তথা তাঁর যুগের নিষ্ঠুরতা ও শোচনীয় স্বতোবিরোধ সুন্দরভাবে দেখিয়েও আইসেনষ্টাইন ইতিহাসের দৃষ্টিবিচারে রুশ নৃপতির প্রগতিশীল দিকটিও তুলে ধরেছেন এই অপূর্ব, অদ্ভুত ছায়াছবিটিতে। এই ছবির স্থানে স্থানে—নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে—আলোর ব্যবহার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আইসেনষ্টাইনের মতে, ছায়াছবিতে আলোর ব্যবহার হবে কেবল প্রকৃতির রঙ ফুটিয়ে তুলতেই নয়, ব্যবহৃত হবে চিন্তাধারা ও ভাবানুভাবেরও যথাযথ রূপদানের প্রয়োজনে।

শ্রীমতী সুচিত্রা সেন ও পিছনের সারিতে গায়ক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে।

অনিল চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিত রায়, শ্রীমতী রায় এবং আমন্ত্রিতমণ্ডলী

আইসেনষ্টাইন ছিলেন ভাবুক, চিন্তাশীল। বাইরে থেকে তাঁকে মনে হত রাশভারী লোক, কিন্তু ভিতরে তিনি ছিলেন বেগের আবেগে চিরচঞ্চল।

আইসেনষ্টাইন আজ নেই। কিন্তু তিনি চিরকালের জন্যে বেঁচে আছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। বিশ্ব চলচ্চিত্র-শিল্পে তিনি এক অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে আছেন। তাঁর "ব্যাটলশিপ পটেমকিন" একবাক্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে পরিগণিত।

—এল, কোজলফ।

## রঙের একটি সরণি

( Sergei Eisenstein লিখিত আত্মচরিতের কণিকা )

রঙের কাজে আমার প্রথম আত্মনিয়োগ—এটা সৌভাগ্য না বয়সের জোর—কোন্‌টা? যাই হোক না কেন, এটা যে অদৃষ্টের খেলা এতে সন্দেহ নেই। এ থেকে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হতে পেরেছিলো আর তা-ই আমাকে প্রকৃত কাজে নিয়ে গেল এগিয়ে। অভাবিত সে সুবিধা-পরম্পরা এবং কার্যক্রম, এ-গুলির কল্যাণে রঙের ক্ষেত্রে যে মূলগত সমস্যা আছে তার সমাধানের পথ-নির্দেশ চোখে পড়লো।

সপরিবারে উপভোগ করার মতো

## সর্বযুগের, সর্বকালের গার্হস্থ্য জীবনালেখ্য !
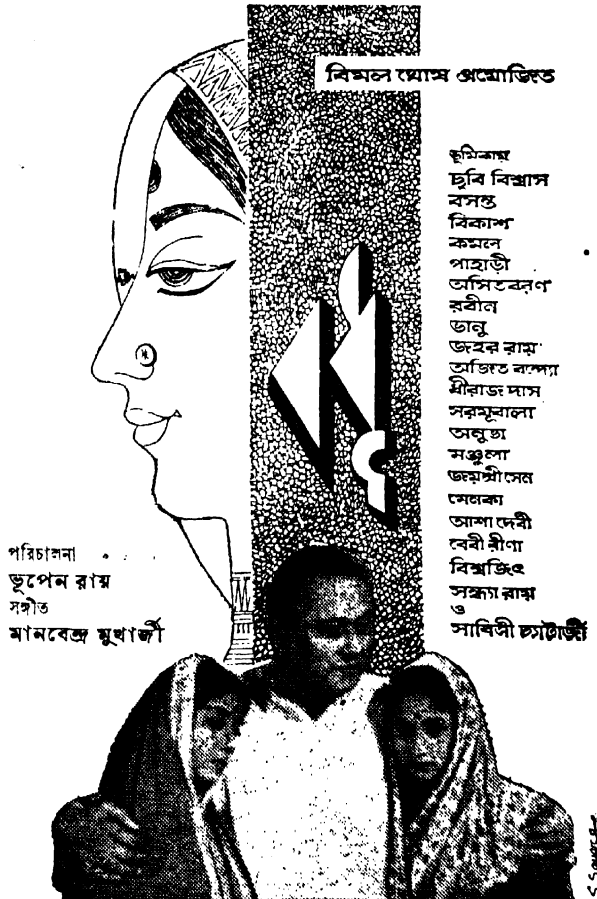
কাহিনী শৈলেশ দে সম্পাদনা অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী ন্যাশনাল মুভীজ প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত

।। চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত ।। গীত রচনা : শ্যামল গুপ্ত ।।

চিত্র গ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখার্জী ।। শিল্প নির্দেশনা : শচীন মুখার্জী ।।

।। শব্দগ্রহণ : সুনীল ঘোষ ।। প্রচার : নিত্যাই দত্ত ।।

।। প্রচার পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন ।।

।। নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখার্জী ও মানবেন্দ্র মুখার্জী ।।

**শুভমুক্তি ১৫ই জুন !**

# রাধা • পূর্ণ • প্রাচী

অজন্তা • লীলা • পারিজাত • মায়াপুরী

(বেহালা) (দমদম) (সালকিয়া) (শিবপুর)

নারায়ণী • নবরূপম • উদয়ন • গৌরী

(আলমবাজার) (কদমতলা) (লেকটাউন) (উত্তরপাড়া)

রঙিন ছায়াছবির বিষয়টি বহুকাল আগেই আমার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। গোড়ার দিকের প্রচেষ্টা হাতে-করে রঙ-করা 'fe'eries of me'lies' নিশ্চয়ই আমি দেখেছিলাম। সে ছিলো এক সাগরতলের রাজত্ব, সেখানে উজ্জ্বল সোনালি বর্মপরা যোদ্ধারা সবুজ তিমি মাছের চোয়ালের মাঝে লুকোনো আর সাগরের ঢেউ-এর ফেণায় রূপ নিচ্ছে নীল এবং গোলাপী পরীর দল।

স্বাভাবিক রঙ ফলাবার চেষ্টা আরও কিছু হয়েছিলো এর কিছু পরে—তবে খুব বেশি পরে নয়। কোন্ প্রক্রিয়ায় সেটা হয়েছিলো সে সম্বন্ধে ধারণা আমার তত নিশ্চিত নয়, যদ্দুর মনে পড়ে ১৯১০ কি ১৯১২ সালে এ ধরণের ছবি রিগা-য় দেখানো শুরু হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে ওয়্যারম্যান পার্ক-এ 'Kino kultura' নামটি বিরাট করে লেখা আছে যে ছবি ঘরটির গায়ে সেখানেই একমাত্র হোতো এই ছবিগুলি। অবশ্য এই বিজ্ঞান-বিষয়ক ছোটো-ছোটো ছবিগুলির সংগে ভৌতিক গল্প প্রভৃতির আকর্ষণীয় ছবিও জুড়ে দেওয়া হোতো। এ প্রদর্শনী চলত সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এই রঙিন ছবিগুলো সব সময় গোলাপী রঙেরই হোতো—সব কিছুর ব্যাপারে ওই একই রঙ। ধরুন নীল সমুদ্রে পানসী চলেছে সাদা পাল তুলে কিংবা নানান রঙের ফলের আর ফুলের সম্ভার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সুন্দরীরা, মাথা ভরতি তাদের টকটকে লাল কিংবা হলুদরঙা চুল—সবই ওই গোলাপী রঙের।

শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র—ছায়াছবির বাইরে

শ্রীমতী কাজল গুপ্ত—ছায়াছবির বাইরে

পরিচিত হাতে-রঙানো পোটেমকিনের রক্ত পতাকা- হোলো আমাদের নিজস্ব প্রথম পরীক্ষা রঙিন ছবির ব্যাপারে এর পর অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত ছোটো ছোটো montag সটের সমষ্টি যাতে আলোছায়ার খেলাই ছিলো প্রধান।

রঙের ব্যাপার আমার কাছে আসল সমস্যা রূপে দে দিলে ১৯৩৯ সালে। Farghana canal নিয়ে ছ তুলতে আমি পরিকল্পনা করলাম। ত্রিকোণ পদ্ধতিতে সে গৃহীত হবে ঠিক হোলো। অতীতের বিকাশোন্মুখ মধ্য-এশি অপূর্ব জল সেচ প্রণালীই হোলো এই ছবির উপাদান। বি জনবল ভ্রাতৃ-কলহে এবং তৈমুরলঙের অভিযানে বিধ্বংস হো সমগ্র ভূখণ্ড বালুরাশিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিশ্বের পয়ঃপ্রণালী। একদা যেখানে বিরাজিত ছিলো, জা দুঃশাসনে সেখানে নর্দমার বিক্ষিপ্ত জলকণাই মরুভূমির দ্ থেকে রক্ষা পাবার সম্বল হয়ে উঠলো। অবশেষে সমাজতন্ত্র ও সৌভ্রাত্রের জলন্ত নিদর্শন উজবেকিস্তানের কৃষককুলের প্র সমবেত প্রচেষ্টার বিজয় স্বরূপ দেখা দিলো Farghı Canal.

ত্রিকোণ পদ্ধতির প্রথম পর্বেই আরব্ধ কাজ বাধা প্র হোলো। এবং শেষ পর্যন্ত ছবিটি তোলাই বন্ধ হোয়ে গে বলসোই নাচঘরে 'Die Walkure' নাটকের প্রযোজ যোগ দিলাম। শেষ দৃশ্যের (the Magic Fire) পরিকল্প আমি wagner-এর যন্ত্রানুষঙ্গের সাথে আলোক সম্পাতে রঙের খেলা দেখাবার উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হল পুরোপুরি ভাবে রঙিন ছবির কাজে আমার নিয়োগের ডাক ঠিক ওই একই সময়ে। এবং তা সাড়ম্বরে—এটা সকলে

করতে পারেন। চিত্রকর্তৃপক্ষেরা Giordano Bruno-র বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক এবং জীবন্ত করে অঙ্কিত করেছিলেন যা সকলেরই গ্রহণযোগ্য। জানেন তো, ইতালী ···নব জীবন···সাজপোশাক ···ইত্যাদি।

অন্য কোনো বিষয় এই ভাবেই পরিবেশন করা যেত। মধ্যযুগ ও নব জাগরণের সীমারেখায় বর্ণোজ্জ্বল অতীতের কাহিনী অবশ্যম্ভাবী ভাবেই আদৃত হয়েছিলো। ফিল্ম কমিটির জনৈক পাঠক এই জাঁকজমকপূর্ণ গল্পটি আমাকে এনে দিলেন। প্লেগই ছিলো ওর বিষয়বস্তু। প্লেগ। কলেরা নয় কেন? কিংবা বসন্ত বা টাইফাস নয়ই বা কেন?

এই পরিকল্পনাটি আমায় আকৃষ্ট করলো অন্য আর একটি কারণেও বটে। প্লেগ সবকিছুই অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে—এইটাই বোধ হয় আমার ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো।

• • • •

জীবনের বিস্ময়কর প্রাচুর্য সর্বগ্রাসী মৃত্যু দ্বারা আচ্ছন্ন হচ্ছে এমনই এক কাহিনী আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো বহু দিন আগে একবার। Blaise Cenderএর 'গোল্ড' উপন্যাসটি চিত্রনাট্য রচনায় আমি তাঁর নাটকের প্রধান অংশটির এমনই সমাধান করেছিলাম। ক্যাপ্টেন সাটারের রোম্যান্টিক জীবন-কাহিনীটি আমেরিকার প্যারামাউন্ট ষ্টুডিয়োয় তোলা হয়েছিলো। ক্যালিফর্নিয়ার মাটিতে সোনার ধ্বংসাত্মক অনুসন্ধান কি ভাবে তাঁর বিরাট সম্পত্তি ও নিজের চরম ক্ষতি বয়ে এনেছিলো—আমি তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাঝে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলাম। ক্যালিফর্নিয়ার স্বর্ণ খননকারীরা এখনও অধীর উদ্দামতায় খুঁড়ে চলেছে মাটি সাটারের সময়ে যেমন হোতো। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খোঁড়া পাথরের পাহাড় হয়ে উঠেছে চারদিকে, ঢাকা পড়ে গেছে বাগান বাগিচা ক্ষেত খামার ওই প্রাণহীন রুক্ষ পাথরে মাটির চাবড়ার দৌরাত্ম্যে। এর শেষ নেই, বন্ধ করার উপায় নেই, উৎক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে পাথর শুধু সোনার জন্যে! সোনা, জীবনের জয়ের ব্যঞ্জনা ওই সোনার জন্যে!

১৮৪৮ সালের সোনার খোঁজের অভিযাত্রীরা হাজারে হাজারে ক্যালিফর্নিয়ায় সমবেত হয়েছিলো কিন্তু সংখ্যাতিরিক্ত হওয়ায় তাদের পরিশ্রমই সার হোলো। তাদের সেই স্বর্ণ-ক্ষুধার পরিমাপ ও তার জন্যে দুর্গতি আজ কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়!

এখন আমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় সহজেই অনুমান করতে পারি, সেদিনের মানুষগুলোর স্বর্ণ আহরণের উন্মাদ প্রবৃত্তির উত্তাপ। এর বেশ কিছুদিন পরে Kabardind-Bulkaria প্রজাতন্ত্র ভ্রমণের সময় সেই পাহাড়গুলিতে হাজির হয়েছিলাম। এইখানেই হালফিল সোনা আবিষ্কৃত হয়েছিলো। আমার পথপ্রদর্শক সহচর ঝুঁকে পড়ে খানিকটা কাদা তুলে নিয়ে একটা টিনের কৌটোয় রেখে ধুতে শুরু করলো···হঠাৎ দেখা গেল কয়েকটি চকচকে দানা—হ্যাঁ সোনা! বিন্দু বিন্দু সোনা।

পায়ের নীচের মাটি যেন সরে যেতে থাকে···মানুষ অনুভব করে স্বতঃই পৃথিবীর জঠর থেকে ভারে ভারে উঠে আসছে অদেখা সোনার সম্ভার, মাটির ওপরের ময়লা আবর্জনা আগাছা ভেদ করে। সহজেই অনুমান করা যায় স্বর্ণলোভী লক্ষ লক্ষ মানুষের উন্মাদনা—তারা এই সোনার জন্যে পরস্পর কামড়া-কামড়ি ছেঁড়াছিঁড়িতে পিছপাও নয়

একটুও ; ক্যাপ্টেন সাটারের সোনার দেশে পৃথিবীর এ প্রান্ত সে প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছে, মাটির বুক চিরে আহরণ করবে ফিকে হলুদ ধাতু খণ্ড।

সাটারের অধিকৃত সম্পদ ছিলো অপরিমেয় কিন্তু সে সবই আজ নিশ্চিহ্ন পদদলিত লোভী অভিযাত্রীদের আক্রমণে! ক্যালিফর্ণিয়ার স্বর্গরাজ্য ধূলি-লুণ্ঠিত, সাটার সর্বস্বান্ত!

কয়েক বছরের মধ্যেই St. Fransis-এর ক্ষুদ্র সংগঠক দল গড়ে তুললো এখনকার কোলাহলমুখর বিরাট স্যানফ্র্যান্সিসকো শহর। তৎকালীন খোদাই চিত্রগুলিতে এর বিশদ বর্ণনা আছে। সাগরের বুক বোঝাই হয়ে গেল জাহাজে আর বজরাতে—যেখানে পারা গেল সেখানেই নোঙর পড়লো এবং স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করে ফেললো সমাগত অভিযাত্রীরা। জলের বুকেই গড়ে উঠলো রাস্তাঘাট, তক্তা প্রভৃতির সাহায্যে শহর, অতীতে মধ্য এশিয়ায় যেখানে লবণাক্ত মরুভূমির সবুজ উদ্যান বিরাজ করতো। সহসা এই নৌসহরের বুকে একজন উন্নতকায় স্থিরসংকল্প মানুষ ওই রক্তশোধক অক্টোপাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে বসলো। ক্যালিফর্ণিয়ার আকাশে মেঘ দেখা দিলো।

এবার এলো কালো পোষাকপরা এক দল! ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আইনজীবীরা লম্বা ফ্রককোট পরতো মাথায় দিত টপহ্যাট—এই ধরণের সজ্জা লিঙ্কন ও তাঁর সহকর্মীদের ছবিতে আমরা দেখতে পাই। হাজার হাজার ওই পোষাকের লোক স্যানফ্রান্সিসকো শহর ছেয়ে ফেললে।—সে এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম। গোটা শহর দাঁড়িয়েছে একটিমাত্র লোকের বিরুদ্ধে। ক্যাপ্টেন সাটারের একদা স্বর্ণপ্রসবিনী ভূমি এখন ভয়ে ভাবনায় কালিবর্ণ—তাদের ছায়ামূর্তি আপনি ক্যালিফর্ণিয়ার রাত্রির আলোয় দেখতে পেতেন।

শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দেবী—ছায়াছবির বাইরে

শ্রীমতী নমিতা সিংহ—ছায়াছবির বাইরে

এই কালো পোষাকের ঝাঁক আমার চোখে বোধ হয় প্রকৃত রূপ নিয়েই জেগে উঠলো। এখন কিংবা যুদ্ধের আগে এক সংগে শত শত কালো হ্যাট মাথায় দেয়া মানুষকে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখতে পাওয়া যেত কোথায়, কেমন করে? সত্যিই তেমন জায়গা আছে ছবি নয় বাস্তব জায়গা যেখানে এই ধরণের অপ্রাকৃত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়?

আছে, অনুমান করুন। টপ হ্যাটের নীচে গোঁফ, দাড়ি কিছুই যদিও দেখা যাচ্ছে না, এমনকি ওপরের ঠোঁটও নয়—আমি তো ওদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠর কুড়ি বছর বয়েস হয়েছে বলেই মনে করতে পারছি না। প্রদোষের রহস্যময় আলোয় ওদের আরও রহস্যময় করে তুলছে, সমগ্র পরিবেশই পো'র লেখা কোনো ভীতিপ্রদ কাহিনীর অধিবাসী অধ্যুষিত বলে প্রতীতি হচ্ছে।

আমার প্রোফেসার বন্ধু আইজাকের সংগে ইটনের নিকটস্থ উইণ্ডসর কাসল্-এ লিয়োনার্দো-র নোটবুক এবং হলবেনের আঁকা ছবির সংগ্রহ দেখতে গিয়েছিলাম। প্রোফেসারের ইয়া লাল গোঁফ হাতে জড়ানো ছাতি, মাথায় গোল টুপি। এখানেই রয়েছে ইংরিজি শিক্ষাপদ্ধতির প্রথম সূত্র—যে শিক্ষায় মানুষ তৈরি হচ্ছে না, হচ্ছে শুধু মেরুদণ্ডহীন দুর্বিনীত দুর্বল এবং হৃদয়হীন কতকগুলি অপোগণ্ড। অপেক্ষাকৃত স্বল্পবুদ্ধি জার্মাণদের মতন ওদের দৃঢ় ধারণা এরা চেঁচিয়ে বলতে পারে না, এরা পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; অথচ সমুদ্রের অধীশ্বরী ব্রিটেনের গৌরব রক্ষার ভার ওদেরই ওপরে ন্যস্ত।

[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ]

অনুবাদ : রমেন চৌধুরী

বনানী চৌধুরী···"চোখের বালি" নাটকের এক দৃশ্যে

## কাঞ্চনজঙ্ঘা

গতানুগতিকতার গণ্ডী পেরিয়ে বাঙলাদেশের ছায়াছবির বৃহত্তর পটভূমিতে পদক্ষেপণ প্রচেষ্টা যে আজ উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার সম্মুখীন "কাঞ্চনজঙ্ঘা" তার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। শিল্পোৎকর্ষ আর মার্জিত পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিটিতে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিটিকে বিস্ময়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণত, বাঙলার ছবির মধ্যে যে জাতীয় বিন্যাসরীতি গঠন কৌশল ও প্রয়োগপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত এ দেশের দর্শক সাধারণ, কাঞ্চনজঙ্ঘার মধ্যে তাঁরা এক ভিন্নতর আঙ্গিকের সন্ধান পাবেন। এর কাহিনীকার ও সুরকারের দায়িত্বও সত্যজিৎ রায়ের দ্বারা পালিত হয়েছে। কাহিনীর পটভূমি শৈলশিখর হিমালয়ের পদপ্রান্ত। গল্পটি রচিতও হয়েছে খুব অল্পসময়কে কেন্দ্র করে। চরিত্র সংখ্যাও অনধিক, কিন্তু এর মধ্যে যে গভীরতার পরিচয় মেলে তা বিস্ময়কর। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পীমনের সঙ্গে তাঁর সমাজচেতনা এক হয়ে এক অভিনব রূপে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে।

একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে গল্পের রূপায়ণ। পরিবারের প্রতিটি সদস্য ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের এই বিভিন্নতার মধ্যে এক পরম ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেখানে একটি বিন্দুতে প্রতিটি রেখা এসে মিলে যাচ্ছে। সমাজের এই সমস্যাসকুল আলেখ্য তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ রায় এবং তার সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। এই সমস্যার ব্যাপক রূপের চিত্রায়ণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে ভাবে তিনি সমস্যাটির পরিচর্যা করেছেন তা তাঁর নৈপুণ্যেরই পরিচায়ক। তাঁর চরিত্রসৃষ্টি ঘটনাসংস্থাপন বিন্যাসভঙ্গিমা প্রকাশরীতি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী সকল দিক দিয়েই প্রশংসার দাবী রাখে। এই কাহিনীর সফলতা অর্জনে সবচেয়ে সহায়তা করেছে তার পরিবেশ। পরিবেশের কল্যাণেই কাহিনীর আবেদন দর্শক মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়। রায়বাহাদুর একটি বিশেষ চরিত্র, তাঁর স্ত্রী, শ্যালক পুত্র, দুই কন্যা, জামাতা এবং ছোট মেয়ের পাণিপ্রার্থী তথাকথিত অভিজাতপুরুষ, এই ক'টি নরনারীর কাহিনীই এখানে বর্ণিত হয়েছে। ছবির মধ্যে যে বলিষ্ঠ জীবনবাণীর প্রচার হয়েছে তা দর্শকচিত্তে আবেদন জাগাতে সক্ষম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সংযোজনটিও যথার্থ সময়োপযোগী। সর্বোপরি ছবিটির মধ্যে যে বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে তার আবেদনও তুলনা বিহীন। আজকের এই ভঙ্গুর সমাজের সঙ্কটঘন মুহূর্তে এই জাতীয় বক্তব্য অনেকখানি আশার বাণী শোনাবে, অনেকটা আলোর সন্ধান দেবে, দেবে নবজীবনের প্রেরণা।

অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সম্মিলিত অভিনয় ছবিটির নানা ভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই ছবিতে শিল্পী-নির্বাচনও সাধুবাদের দাবী রাখে। খ্যাতমামা ও নবাগতদের এক মিলন ঘটেছে এই ছবিটিতে। সুব্রত সেন, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অলকানন্দা রায়, বিদ্যা সিংহ প্রমুখ শক্তির অধিকারী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটল। রায়বাহাদুররূপী ছবি বিশ্বাস, তাঁর সহধর্মিণীর ভূমিকায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যালক জগদীশের চরিত্রে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় অনবদ্য। অরুণ মুখোপাধ্যায় (নায়ক), অলকানন্দা রায় (নায়িকা, রায়বাহাদুরের ছোট মেয়ে), এন, এম, বিশ্বনাথনের (নায়িকার পাণিপ্রার্থী) অভিনয় সর্বাংশে উপভোগ্য। অনিল চট্টোপাধ্যায় (রায়বাহাদুরের পুত্র), বিদ্যা সিংহ (তার বান্ধবী) এবং হরিধন মুখোপাধ্যায়ের (নায়কের পিতৃব্য) রূপায়ণও দর্শকচিত্তে আনন্দের সঞ্চার করে। রায়বাহাদুরের বড় মেয়ে এবং জামাইয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে অনুভা গুপ্ত এবং সুব্রত সেনের

উত্তমকুমার—ছায়াছবির বাইরে

অভিনয় নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ। দাম্পত্য-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-জ্বালা আনন্দ হাসির একটি নিখুঁত আলেখ্য শিল্পীযুগল অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা সেই শ্রেণীর মধ্যে স্থান পায় যে শ্রেণীর ছবিগুলির সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে ভরপুর।

# সংবাদবিচিত্রা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী এবং রাজ্যসভার সদস্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে (৬৪) ভারত সরকার এ বছর কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের অন্যতম সদস্য মনোনীত করেছেন।

বাঙলার চিত্রামোদীর দল জেনে আনন্দলাভ করবেন যে, জনপ্রিয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (২৪) অভিনয়ের জন্যে হলিউড থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এ উপলক্ষে শিল্পীকে আমরা অভিনন্দন জানাই। তাঁর যাত্রা সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক এবং হলিউডে বাঙলা ও বাঙালীর মুখ তিনি উজ্জ্বল করে ফিরে আসুন, এই কামনা করি। এই ঘটনা এ দেশের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

সম্প্রতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্রবিষয়ক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ সি, ডি, দেশমুখ (৬৭)। আলোচনাচক্রে তিরিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। যোগদানকারীদের উদ্দেশে শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকে, সুব্রহ্মণ্যম, শ্রীএজরা মীর, শ্রীকে, এ, আব্বাস প্রভৃতি ভাষণ দান করেন।

নয়াদিল্লীতে চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটিতে ভাষণ দান কালে ভারতের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুধীবর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (৭৪) চলচ্চিত্রই শিশুমনকে গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যে যুগে আমরা সবাই এক বৃহত্তর জগতের অধিবাসী। দেশ বা সমাজের কোন নির্দিষ্ট গণ্ডী আজ আমাদের আটকে রাখেনি এবং ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের আজ আমরা মুখোমুখী। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিশুদের পরবর্তীকালের সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠ সহায়ক। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর সাধারণ্যে এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা।
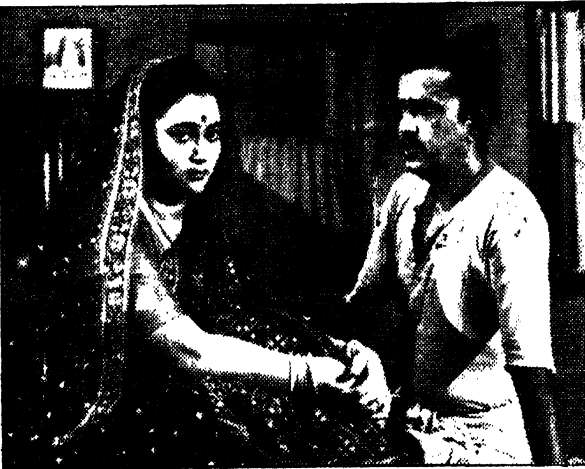
হলিউডের চিত্রতারকা এঞ্জি ডিকিনসন (৩১) অল্পকাল আগে আঠারো দিনের জন্যে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। কলকাতা প্রমুখ ভারতের দ্রষ্টব্য প্রধান প্রধান স্থানসমূহ ইনি পরিদর্শন করেন এবং নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর (৭৩) সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সাংবাদিকদের কাছে তিনি ভারতে চিত্রাভিনয়ের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।

"সাম পিপল—" নামে একটি নির্মীয়মান ফিচার ফিল্মের সংবাদ লণ্ডন থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে সংবাদটি প্রচারিত হয়েছে সেটি হচ্ছে যে নির্মাতাবৃন্দ অতিথিশিল্পী হিসেবে এই ছবিতে অভিনয়ের জন্যে অনুরোধ করেছেন ইংলণ্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী এডিনবারার ডিউক যুবরাজ ফিলিপকে। তবে এ সম্বন্ধে ফিলিপের মতামত এখনো কিছু জানা যায়নি।

হলিউড থেকে বব হোপের সম্মান প্রাপ্তিতে তাঁকে যাঁরা যাঁরা অভিনন্দিত করেছেন মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কেনেডি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্রপতি কেনেডি শুধু অভিনন্দনই জানাননি শিল্পীকে তাঁর আগামী চিত্র নির্মাণের জন্যে কাহিনী সঙ্কেতও দিয়েছেন। নাম দিয়েছেন রোড টু ওয়াশিংটন, এইখানেই শেষ নয়। গল্পের পটভূমি দিয়ে সাহায্য করে শিল্পীকে উৎসাহিত করে একটি সতর্ক বাণীও সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন, ছবিটি যাতে হাস্যপ্রধান না হয়ে মাত্যপ্রধানই হয়ে ওঠে সেদিকে যেন বব হোপের দৃষ্টি থাকে—শিল্পীর প্রতি রাষ্ট্রনায়কের এই অনুরোধ।

হলিউডের বিগতযুগের ইতিহাসে রেমান নোভারো একটি অবিস্মরণীয় নাম। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান এঁর প্রভাবকে অমলিন করতে পারে নি। অশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী এই শিল্পী আবার অভিনয় জগতে ফিরে আসছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেল। সেদিনকার চিত্ররসিক সমাজের একচ্ছত্র সম্রাট—সেই তরুণ শিল্পীটির বয়েস আজ ৬৪।

হলিউডের নির্মীয়মান ছবিগুলির মধ্যে রসিকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে বোধ করি "ক্লিওপেট্রা"ই সবচেয়ে বেশী সমর্থ হয়েছে। একে কেন্দ্র করে সংবাদের অন্ত নেই এমন কি এর নায়িকা একত্রিশ বছর বয়স্কা এলিজাবেথ টেলারের পারিবারিক জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল তার মূলেও এই ছবিটিই। এই বহুল প্রচারিত ছবিটির সম্পর্কে সম্প্রতি যে চমকপ্রদ সংবাদটি প্রচারিত হয়েছে সেটি হচ্ছে যে এই ছবিতে "এক্সট্রা" হিসেবে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করছেন তাঁদের সংখ্যা হাজারকেও অতিক্রম করে গেছে।

সখের জন্যে মানুষকে যে কত রকম বিব্রত হয়ে পড়তে হয়, তার ঠিকঠিকানা নেই। মানুষের বিবিধ সখ একেক সময়ে বিবিধ বিপদকেও ডেকে আনে। এই সখকে কেন্দ্র করেই এখন টেলিভিসান

মুক্তি প্রতীক্ষিত "বধূ" চিত্রের একটি দৃশ্য ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেন।

পরিচালক টেড পোষ্ট এবং চিত্রাভিনেত্রী টিউসৃডে ওয়েলড-এর (১১) মধ্যে এক বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পরিচালক-অভিনেত্রীর সম্পর্ক নয়, নয় কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সম্পর্কটি বাদী ও প্রতিবাদী। টেড এখানে বাদী আর টিউসৃডে এখানে প্রতিবাদী। টিউসৃডের পোষা সারমেয়টি আপন দন্তের সাহায্যে টেডকে সম্বর্দনা জানিয়েছিল—সেই কারণেই এই মামলার উদ্ভব এবং এই মামলায় খেসারত হিসেবে টিউসৃডের কাছে আদালতের মাধ্যমে টেড দাবী করেছেন দশ হাজার ডলার।

# রঙ্গপট প্রসঙ্গে

## ধূপছায়া

ডা: নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত "ধূপছায়া"র চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক চিত্ত বসু। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, বিপিন গুপ্ত, বিশ্বনাথন, অনুভা গুপ্তা, দীপ্তি রায়, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গ। ছবিটির পরিবেশক শ্রীজগন্নাথ পিকচার্স।

## পলাশের রঙ

একটি গ্রাম্য কবিরাজের জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে "পলাশের রঙ" ছবিটি রূপ নিচ্ছে। ছবিটির পরিচালক এবং সুরকার যথাক্রমে সুশীল ঘোষ এবং বাল্সারা। রূপায়ণে আছেন বিকাশ রায়, অসীমকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, মঞ্জুলা সরকার, অঞ্জনা নাগ, চিত্রিতা মণ্ডল প্রভৃতি।

## মায়ার সংসার

কনক মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "মায়ার সংসার" এর চিত্রগ্রহণ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে ছবিটিতে সুর যোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রণব রায়। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী দেবী, দীপ্তি রায়, সুলতা চৌধুরী ইত্যাদি।

## ভ্রষ্টলগ্ন

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যুবশক্তির অপচয় সম্পর্কিত বিরাট সমস্যাকে কেন্দ্র করে "ভ্রষ্টলগ্ন"র কাহিনী রূপ নিয়েছে। সেই কাহিনীর চিত্রায়ণের ভার নিয়েছেন সিনে এজ। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সুখেন, দীপ্তি রায় প্রভৃতি শিল্পীরা। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সলিল চৌধুরী।

## সাক্ষী

এম-কে-জি প্রোডাকসান্সের আগামী নিবেদন "সাক্ষী"। এক অভিনব রোমাঞ্চপূর্ণ রহস্যকাহিনীকে অবলম্বন করে এর গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করছেন কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, অনিল চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বীরেশ্বর সেন, বিপিন গুপ্ত, নিরঞ্জন রায়, ছায়া দেবী, সন্ধ্যা রায়, রেণুকা রায় এবং স্বনামধন্য শ্রীধীরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় (ডি, জি,), প্রমুখ কুশলী শিল্পিবৃন্দ। পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিটির চিত্রনাট্যকার এবং সুরকার যথাক্রমে প্রণব রায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# সৌখীন সমাচার

## নষ্টনীড়

রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে রঙ্গম শিল্পী সঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" অভিনয় করে কবিগুরুর উদ্দেশে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। নাটকটি পরিচালনা করেন অমরেশ দাশগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন সুশীল আচার্য, সলিল মুখোপাধ্যায়, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কর সিকদার, স্বদেশ দাশগুপ্ত, অজিত দে, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, বর্ণশ্রী চক্রবর্তী ও কাজল রায় প্রভৃতি।

## বৈকুণ্ঠের উইল

শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল" মঞ্চস্থ করলেন দীপালি সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ। চরিত্রগুলির রূপদান করলেন সুকুমার ঘোষ, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত নন্দন, বুদ্ধদেব বসু, অনিল মিত্র, সঞ্জীব বসু, গোপাল সরকার, মুরারি বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্র বসু, নকুল সরদার, বীরেন সারখেল, প্রতিমা দে, বীণা চক্রবর্তী, তারা ভাদুড়ী, সন্ধ্যা দে, তাপসী গুহ, মণিকা দত্ত প্রভৃতি।

## সাজাহান

দ্বিজেন্দ্রলালের অমর নাটক "সাজাহান" সম্প্রতি মঞ্চস্থ করেছেন কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস প্র্যাকটিশানার্স য্যাসোসিয়েশামস। অভিনয়াংশে ছিলেন গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কর সেন, গোপাল মুখোপাধ্যায়, সুনীল চৌধুরী, মণি সাহা, দিলীপ রায়, শাশ্বতী রায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

## লৌহ কপাট

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী জরাসন্ধের লৌহকপাট উপন্যাসের নাট্যরূপ সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন হাওড়া ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের সদস্যবৃন্দ। চরিত্রগুলির রূপ দিলেন রঞ্জিত সরকার, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, অখিল মজুমদার, জয়ন্ত চৌধুরী, কমল মজুমদার, অনিল মুখোপাধ্যায়, মদন রাণা, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীল মুখোপাধ্যায়, সারদা চট্টোপাধ্যায়, বেলা রায়, মনীষা রায় প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন সুবোধ রায়চৌধুরী।

## মণি বেগম

সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর জনপ্রিয় উপন্যাস "মণিবেগম" এর নাট্যাভিনয় করলেন ইসকো রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। উপন্যাসটির নাট্যরূপ দান করেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নাটকটি পরিচালনা করেন প্রণবেশ দত্ত। রূপায়ণে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, কামাখ্যা বসু, অসীম মিত্র, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার ভট্টাচার্য, আশুতোষ গোস্বামী, দীপেন সরকার সচ্চিদানন্দ ঘোষাল, শাশ্বতী রায়, দীপালি চৌধুরী ও মিতা চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখনীয়।

## উদ্ধার

বর্তমানের ললিতা কলাশ্রী কেন্দ্রের মেয়েরা সম্প্রতি দেবব্রত সুরচৌধুরীর "উদ্ধার" নাটকটি অভিনয় করলেন। অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে রেখা ভট্টাচার্য, মমতা রায়, রূপা সেন, মন্দিরা বাগচী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নাটকটি পরিচালনা করেন উমা বাগচী।

সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলির প্রথম চারিটি ব্যতীত জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোনা চৌধুরী ও চিত্ত নন্দী কর্তৃক এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যক চিত্রত্রয় বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গৃহীত।

## বৈশাখ, ১৩৬৯ ( এপ্রিল-মে, '৬২ )

**অন্তর্দেশীয়—**

১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ ( ১৪ই এপ্রিল ) : 'ভারতরত্ন ডাঃ এম্ বিশ্বেশ্বরায়ার ( ১০১ ) বাঙ্গালোরে জীবন-দীপ নির্বাণ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আরও ৪জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১১জন উপমন্ত্রী নিযুক্ত। ( মোট মন্ত্রী সংখ্যা ৩৮ )।

২রা বৈশাখ ( ১৫ই এপ্রিল ) : এলাহাবাদে অশান্ত জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ জারী।

৩রা বৈশাখ ( ১৬ই এপ্রিল ) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক লবণ হ্রদ(কলিকাতা) সংস্কার পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিকউদ্বোধন।

৪ঠা বৈশাখ ( ১৭ই এপ্রিল ) : দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিণতিতে মালদহ সহরে কারফিউ ও ১৪৪ ধারা জারী।

সর্দ্দার হুকুম সিং সর্ব্বসম্মতিক্রমে লোকসভার ( তৃতীয় ) স্পীকার নির্ব্বাচিত।

৫ই বৈশাখ ( ১৮ই এপ্রিল ) : শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ( কংগ্রেস মনোনীত ) পুনরায় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত।

৬ই বৈশাখ ( ১৯শে এপ্রিল ) : রেলওয়ে মন্ত্রী সর্দ্দার শরণ সিং কর্তৃক লোকসভায় রেল বাজেট পেশ—১লা জুলাই ( ১৯৬২ ) হইতে রেলের মাশুল ও যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব।

দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত নেপালের রাজা মহেন্দ্রের গোপন বৈঠক—ভারত-নেপাল সম্পর্ক বিষয়ে নিবিড় আলোচনা।

৭ই বৈশাখ ( ২০শে এপ্রিল ) : ব্যাণ্ডেলে দেশের বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্ম্মাণ কাজের উদ্বোধন—উদ্বোধক ; ভারতস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ গলব্রেথ।

৮ই বৈশাখ ( ২১শে এপ্রিল ) : একতরফা-ভাবে কর্ণফুলী বাঁধ নির্ম্মাণ সম্পর্কে পাকিস্তানের নিকট ভারতের আর এক দফা প্রতিবাদ।

৯ই বৈশাখ ( ২২শে এপ্রিল ) : শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনান্তে নেপালের রাজা মহেন্দ্রের আনন্দ প্রকাশ—দিল্লী আলোচনা ফলপ্রসূ হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য।

১০ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল) : পার্লামেণ্টে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কর্তৃক কেন্দ্রের ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট পেশ—বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব—বাজেটে ১৫০ কোটি টাকা ঘাটতি প্রদর্শন।

নেহরু-মহেন্দ্র যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ—ভারত নেপাল সম্পর্কের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা।

১১ই বৈশাখ ( ২৪শে এপ্রিল ) : পারমাণবিক শক্তিগুলির নিকট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর আবেদন—ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রসমূহের পরীক্ষা বন্ধ রাখুন।

১২ই বৈশাখ ( ২৫শে এপ্রিল ) : 'শৌলমারী আশ্রমের সাধু' নেতাজী সুভাষচন্দ্র নহেন—সরকারের ( পশ্চিমবঙ্গ ) নিকট আশ্রম সম্পাদক শ্রীরমণীরঞ্জন দাসের পত্র।

১৩ই বৈশাখ ( ২৬শে এপ্রিল ) : বিক্ষুব্ধ রিয়ার এডমিরাল শ্রীচক্রবর্ত্তী ( অজিতেন্দু চক্রবর্ত্তী ) কর্তৃক পদত্যাগপত্র পেশ—সিনিয়রিটির দাবী উপেক্ষা করিয়া চীফ অব ন্যাভাল ষ্টাফ পদে রিয়ার এডমিরাল সোমানকে নিয়োগের জের।

১৪ই বৈশাখ ( ২৭শে এপ্রিল ) : দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্ত দণ্ডকারণ্যের দ্বার অনির্দ্দিষ্ট কাল খোলা থাকিবে।

১৫ই বৈশাখ ( ২৮শে এপ্রিল ) : ভারতীয় সেনাবাহিনী অভিযাত্রী দল কর্তৃক কোম্লাং শৃঙ্গ ( ২৩ হাজার ফুট ) বিজয়।

১৬ই বৈশাখ ( ২৯শে এপ্রিল ) : ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভাপতি ও সম্পাদক শ্রীএস্ এ ডাঙ্গে ও শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ নিযুক্ত।

১৭ই বৈশাখ ( ৩০শে এপ্রিল ) : বাঁকুড়ার শালতোড়া উপনির্ব্বাচনে ( বিধান সভা ) কংগ্রেসপ্রার্থী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় ( প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ) নির্ব্বাচিত।

১৮ই বৈশাখ ( ১লা মে ) : পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্ত কেন্দ্র কর্তৃক সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্যম।

১৯শে বৈশাখ ( ২রা মে ) : দাবী পূরণ না হওয়ায় পোর্ট কমিশনার্সের অধিকাংশ পাইলটের পদত্যাগ।

২০শে বৈশাখ ( ৩রা মে ) : রাজ্যসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা : চীনা হুমকীর সম্মুখীন হইতে ভারত প্রস্তুত রহিয়াছে।

২১শে বৈশাখ ( ৪ঠা মে ) : পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানী মুসলমানদের দলবদ্ধ ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ—এ যাবৎ বহু পাকিস্তানী গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ।

২২শে বৈশাখ ( ৫ই মে ) : পাইলট ধর্ম্মঘটের ফলে কলিকাতা বন্দরে ১৯খানি জাহাজ আটক—কাজে যোগ না দেওয়ায় ২৫জন পাইলটের বিরুদ্ধে চার্জ্জশীট প্রদান।

২৩শে বৈশাখ ( ৬ই মে ) : কেন্দ্রে আরও দুইজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১০জন উপমন্ত্রী নিয়োগ—নূতন মন্ত্রিসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ৫০।

২৪শে বৈশাখ ( ৭ই মে ) : ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে ডাঃ জাকির হোসেন নির্ব্বাচিত।

২৫শে বৈশাখ ( ৮ই মে ) : কবিগুরুর জন্মতিথিতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন—প্রথম উপাচার্য্য : শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৬শে বৈশাখ ( ৯ই মে ) : কলিকাতা বন্দরে ১১জন শিক্ষানবীশ পাইলটেরও পদত্যাগ—বন্দরে ও মোহানায় ৮২খানা জাহাজ আটক।

২৭শে বৈশাখ ( ১০ই মে ) : অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের (৮০) জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

২৮শে বৈশাখ ( ১১ই মে ) : ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বিপুল ভোটাধিক্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ( দ্বিতীয় ) নির্ব্বাচিত।

২৯শে বৈশাখ ( ১২ই মে ) : 'হুগলী নদীর পাইলটদের বেতন সংক্রান্ত দাবী সরকার মানিয়া লইতে পারেন না'—লোকসভায় জাহাজী সচিব শ্রীরাজবাহাদুরের উক্তি।

৩০শে বৈশাখ ( ১৩ই মে ) : ভারতের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে যথাক্রমে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও ডাঃ জাকির হোসেনের শপথ গ্রহণ।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব মুক্ত হইয়া ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ট্রেনযোগে পাটনা যাত্রা।

৩১শে বৈশাখ ( ১৪ই মে ): পাটনা পৌঁছিবার পর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিপুল সম্বর্দ্ধনা—জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি জাতির সেবায় উৎসর্গ করার সম্বন্ধে ঘোষণা।

**বহির্দেশীয়—**

১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ ( ১৪ই এপ্রিল ): আন্তর্জ্জাতিক তদারকীতে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করণের প্রস্তাব রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ কর্ত্তৃক নাকচ হওয়ায় পশ্চিমী মহলে হতাশা।

৩রা বৈশাখ ( ১৬ই এপ্রিল ): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ ছাত্রমণ্ডলীর পুনরায় ধর্ম্মঘট—গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্ত কার্য্য ব্যবস্থা।

সপ্তদশ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ( জেনেভা ) অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির নূতন উত্তম—নিরপেক্ষ দেশগুলির বৈজ্ঞানিকদের লইয়া আন্তর্জ্জাতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাব।

৪ঠা বৈশাখ ( ১৭ই এপ্রিল ): সাধারণ ও পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির খসড়া মুখবন্ধ অনুমোদিত—জেনেভা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ দলিল সম্পর্কে প্রাচ্য-প্রতীচ্য মতৈক্য।

ভারতের বিরুদ্ধে নেপালের পুনরায় বিষোদগার, রাজা মহেন্দ্রের দিল্লী সফরের প্রাক্কালে দীর্ঘ দলিল প্রকাশ।

ছাত্র আন্দোলনের দরুণ ৩১শে মে ( ১৯৬২ ) পর্য্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাশ বন্ধ।

৫ই বৈশাখ ( ১৮ই এপ্রিল ): নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ( জেনেভা ) আমেরিকার পক্ষ হইতে তিনটি পর্য্যায় সমন্বিত প্রস্তাব পেশ।

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর সতর্কবাণী—রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদনে রাজী না হইলে আমেরিকা বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক পরীক্ষা চালাইবে।

৭ই বৈশাখ ( ২০শে এপ্রিল ): আমেরিকা আণবিক পরিক্ষা চালাইলে সোভিয়েট পক্ষ ত্রিশক্তি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ কমিটি বর্জ্জন করিবে'—জেনেভায় রুশ প্রতিনিধি জোরিনের সাফ কথা।

৮ই বৈশাখ ( ২১শে এপ্রিল ): ভারত সমেত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের নিকট মনীষী রাসেলের আবেদন—প্রশান্ত মহাসাগরের খৃষ্টমাস দ্বীপ এলাকায় আমেরিকার প্রস্তাবিত পারমাণবিক পরীক্ষায় বাধা প্রদান করুন।

১০ই বৈশাখ ( ২৩শে এপ্রিল ): মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কর্ত্তৃক পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা প্রস্তাব অনুমোদন।

১১ই বৈশাখ ( ২৪ এপ্রিল ): রুশিয়ার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদে পুনরায় যথাক্রমে ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভ নির্ব্বাচিত।

নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট গুইডো কর্ত্তৃক সকল প্রদেশের কার্য্যভার গ্রহণ।

১২ই বৈশাখ ( ২৫শে এপ্রিল ): প্রশান্ত মহাসাগরে পারমাণবিক পরীক্ষা আরম্ভ করার জন্ত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নির্দ্দেশ।

১৪ই বৈশাখ ( ২৭শে এপ্রিল ): অবিভক্ত বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতা এ, কে, ফজলুল হকের ( ৮১ ) ঢাকায় জীবনাবসান।

পাক্ দাবীর ফলে কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের পুনরায় বৈঠক।

১৫ই বৈশাখ ( ২৮শে এপ্রিল ): পাক্ জাতীয় পরিষদের নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন।

১৬ই বৈশাখ ( ২৯শে এপ্রিল ); ঢাকার পর ত্রিপুরা ও রাজসাহীতেও সাম্প্রদায়িক গোলযোগ—সংখ্যালঘুদের জীবননাশ, গৃহলুণ্ঠন ও অগ্নি-সংযোগের সংবাদ।

১৮ই বৈশাখ ( ১লা মে ): রাজসাহী জেলায় ( পূর্ব্ব পাকিস্তান) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তৃতি—পাক্ সরকার কর্ত্তৃক সৈন্তবাহিনী প্রেরণ সংবাদ।

১৯শে বৈশাখ ( ২রা মে ); পাবনা সহরেও ( পূর্ব্ব পাকিস্তান ) ব্যাপক হাঙ্গামা—শতাধিক ব্যক্তি ছুরিকাহত হওয়ার সংবাদ।

২০শে বৈশাখ ( ৩রা মে ): চট্টগ্রাম ও যশোহরে চলন্ত ট্রেণ আক্রান্ত—সংখ্যালঘু যাত্রীদের উপর হামলা।

২১শে বৈশাখ ( ৪ঠা মে ): নিরাপত্তা পরিষদে ( রাষ্ট্রসঙ্ঘ ) ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণমেননের দৃঢ় উক্তি: কাশ্মীর ভারতেরই অঙ্গ—কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না।

২২শে বৈশাখ (৫ই মে): পূর্ব্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলাতেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা প্রসার ও সর্ব্বত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি।

২৪শে বৈশাখ ( ৭ই মে ): পাক্ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব্ব পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণকারী বিদ্রোহী নাগাগণ কর্ত্তৃক 'স্বাধীন নাগা সরকার' গঠনের তোড়জোড়।

২৭শে বৈশাখ ( ১০ই মে ): বাস্তত্যাগকারীর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভীত-সন্ত্রস্ত অসংখ্য নর-নারীর ত্রিপুরা রাজ্য ও উত্তরবঙ্গে প্রবেশের উত্তোগ—ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারের নিকট মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের জন্ত হাজার হাজার দরখাস্ত পেশ।

পাকিস্তানে আবার রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী—পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের অর্ডিন্যান্স।

২৯শে বৈশাখ ( ১২ই মে ): সমগ্র লাওস রাজ্যে অবরোধ অবস্থা ঘোষিত—প্যাথেট লাও ফৌজের অগ্রগতিতে দক্ষিণপন্থী সরকারের কার্য্য-ব্যবস্থা—লাওস প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনে জরুরী বৈঠক।

৩০শে বৈশাখ ( ১৩ই মে ): লাওসে মার্কিণ সৈন্ত নিয়োগকল্পে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির উত্তম—সপ্তম নৌ-বহরের প্রতি তৎপর থাকার নির্দ্দেশ।

৩১শে বৈশাখ ( ১৪ই মে ): ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণের প্রাণনাশের চেষ্টা—ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহে নয় ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

## এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বাঙলা দেশের প্রখ্যাতনামা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রটি শ্রীচিত্তনন্দ কর্ত্তৃক এক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে গৃহীত।

## ভারত-পাক সম্পর্ক

"ভারতের দেশরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননের সাম্প্রতিক উক্তিকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে আর এক দফা বিষোদ্গার করিয়াছে। ইহা লইয়া গত কয়েক দিনের মধ্যে দুই বার ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করা হইল। সম্প্রতি কৃষ্ণমেনন বলিয়াছেন, পাকিস্তানের বিমানবাহিনী ভারত অপেক্ষা শক্তিশালী হইলেও ভারতীয় সৈন্যগণের মনোবল পাকিস্তান সৈন্যদের অপেক্ষা বেশী। এই উক্তিকে উপলক্ষ করিয়া গত বুধবার পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হিংসা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এই ধরণের অভিযোগ উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, ভারতের সামরিক শক্তি কম করিয়া দেখাইবার জন্য শ্রীমেননের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যেন সতর্ক থাকেন। যাঁহারা এ সম্পর্কে অবগত আছেন তাঁহাদিগকে গান্ধীজীর কোন শিষ্যের ছলনা দ্বারা আর ঠকান যাইবে না। তিনি আরও বলেন, উভয় শিবিরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিপুল অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পাইয়া ভারতীয় বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমেননকে আক্রমণ করিয়া উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, গান্ধীর এই শিষ্যটি বহুদিন পূর্ব্বে সকল প্রকার লজ্জা বিসর্জন দিয়া প্রকাশ্যেই যুদ্ধ, হিংসা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পন্থা বাছিয়া লইয়াছেন। ভারতের বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গারে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। পাকিস্তান যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহা ঢাকিবার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে ঐ পন্থা গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। ভারত অহিংস বলিয়া আত্মরক্ষার জন্য শক্তিশালী হইবে না, সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবে এবং অস্ত্রশস্ত্র ভারত মহাসাগরে বিসর্জ্জন দিবে, পাকিস্তান ইহা চাহিতে পারে। কিন্তু তাহার সে-ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।"—দৈনিক বসুমতী।

## কাবুলী হত্যাকাণ্ড

"কোচবিহার হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা যে খবর পাঠাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, পূর্ব-পাকিস্তানে এখন ব্যাপক ভাবে কাবুলী-নিগ্রহ চলিতেছে। 'বহুসংখ্যক কাবুলী সেখান হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাদের বক্তব্য এই যে, পাকিস্তানীরা তাহাদের শত্রু মনে করে, এবং সুযোগ মিলিলেই তাহাদের উপরে মারপিট চালায়। বলা বাহুল্য, আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। তা ছাড়া, এই নিগ্রহের পিছনে একটা অর্থনৈতিক প্ররোচনাও থাকিতে পারে। আসল কারণ যাই হউক, দেখা যাইতেছে, ধর্মের মিল থাকিলেই যে মনের মিল থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। মনের মিল অবশ্য পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানেরও নাই। বস্তুত, পশ্চিম-পাকিস্তানের মানুষরা পূর্ব-পাকিস্তানকে তাহাদের জমিদারি বলিয়া গণ্য করে, এবং সেই জমিদারিকে তাহারা বেশ ভালভাবেই লুটিয়া-পুটিয়া খাইতেছে। অর্থনৈতিক প্ররোচনাই যদি কাবুলী-নিগ্রহের কারণ হয়, তবে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের প্রতিই কি সর্বাগ্রে নজর দেওয়া উচিত ছিল না? নাকি তাহাদের খুঁটি আরও শক্ত? তাই, সংখ্যায় প্রবাসী কাবুলীদের ঠেঙাইয়াই এখন পূর্ব-পাকিস্তানের বীরপুরুষরা তাঁহাদের বীরত্ব দেখাইতেছেন?" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

## কুখ্যাত এলাকা

"হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য নৃশংস কাণ্ডের জন্য যতগুলি এলাকা কুখ্যাত হইয়া আছে, গয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান তাহাদের অন্যতম। ডাউন দেরাদুন এক্সপ্রেসের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার যাত্রী ভদ্রেশ্বর, হুগলী নিবাসী ৭১ বৎসর বয়স্ক উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর হত্যার সংবাদ যেমন শোচনীয় তেমনি ভয়াবহ। গয়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে তাঁহাকে ট্রেণের কামরায় হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা সাধারণতঃ খালি থাকে না, বিশেষতঃ দেরাদুন এক্সপ্রেসের ন্যায় ট্রেণে। রাত্রিকালে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। ভদ্রলোক বানারস হইতে নাকি আসতেছিলেন। গয়ায় তাঁহার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং জিনিষপত্র হাওড়ায় আসে। রেলপথে সর্বপ্রকারের, অনাচার,—খুন, জখম, অতর্কিত আক্রমণ, জিনিষপত্র লইয়া পলায়ন ইত্যাদি এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, রেলপথে ভ্রমণই বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলের দস্যু দুর্বৃত্ত দমনে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে ইহার প্রতিকার কখনই সম্ভব হইবে না। গয়া ও আসানসোল এই দুইটি অঞ্চল দস্যুদুর্বৃত্তের প্রধান কেন্দ্র। সুতরাং এই দুইটি এলেকায় পুলিশের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত।"

—যুগান্তর।

## জাতীয় সংহতির প্রশ্ন

"সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাস্ত করা প্রতিটি ভারতবাসীর পবিত্র জাতীয় কর্ত্তব্য। তেমনি ভাষার ব্যাপারে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সুমীমাংসারও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। এই সব ক্ষেত্রে সরকারের নীতির উপরই সব কিছু নির্ভর করিতেছে। বিভেদমূলক সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিকে যেমন সরকার ইচ্ছা করিলে কঠোর হস্তে দমন করিতে পারেন এবং তাহা করিলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষ জাতীয় সংহতি, ঐক্য ও সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করিতে পারে। তাহা ছাড়া, তৎপরতার সহিত এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল ক্রিয়াকলাপকে স্তব্ধ করিতে হইলে রাজ্যস্তরে এমন কি জেলাস্তরেও জাতীয় সংহতির জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে আমরা ইহার গুরুত্ব

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। জাতীয় সংহতি পরিষদের সভায় এই বিষয়ে কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। আমরা আশা করি, পরিষদের সদস্যগণ এ সম্পর্কে ভাল করিয়া চিন্তা করিবেন এবং জাতীয় সংহতি রক্ষায় ও দৃঢ় করার জন্য প্রকৃত ও বাস্তব কাজগুলি যাহাতে সম্পন্ন করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।" —স্বাধীনতা।

## পার্লামেণ্টের প্রিভিলেজ

"পার্লামেণ্টের প্রিভিলেজ বস্তুটি কি, কিসে তার মান যায় এবং কিসেই বা বাড়ে তাহা আজও ঠিক হইল না। "ব্লিংস" কৃপালনীকে কৃপালুনী বলিয়াছিল; তাহাতে লোকসভার অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে এবং করঞ্জিয়াকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে! তৈল মন্ত্রী মালব্য একটি সাধারণ বাণিজ্য চুক্তি পার্লামেণ্টের নিকট হইতে গোপন রাখিতে চাহিয়াছিলেন, "ষ্টেটসম্যান" তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। মন্ত্রী মালব্য লোকসভাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিলে উহার প্রিভিলেজ ভঙ্গ হয় নাই, "ষ্টেটসম্যান" সর্ত্ত প্রকাশ করিলে উহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। "ষ্টেটসম্যান"কে ধমক খাইতে হইয়াছে। দ্রাবিড় কাজাঘাম ভূপেশ গুপ্তকে গুণ্ডা বলিয়াছে এবং নালিশটা রাজ্যসভায়ও উঠিয়াছে কিন্তু এবার কোন ফল হয় নাই। পাঞ্জাব বিধান সভায় জনৈক সদস্য অভিযোগ করিয়াছেন এক মন্ত্রীর চাপরাসী তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়াছে। তিনি বিধান সভায় প্রিভিলেজ রক্ষার দাবী তুলিয়াছিলেন, স্পীকার শোনেন নাই। মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর একটা লাইব্রেরী হস্তান্তরের চুক্তি লোকসভার সদস্যদের জানাইতে অস্বীকার করিলেন—এটা কি প্রিভিলেজ ভঙ্গ নয়? আমরা তো মনে করি লোকসভার এর চেয়ে বড় অপমান কিছু হইতে পারে না।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

## পাক সাম্প্রদায়িকতা

"গত এপ্রিল ও মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হইল, তাহা বিশ্বের ইতিহাসে অভিনব। হিটলারের ইহুদী নিধন যজ্ঞের সঙ্গে তাহার তুলনা চলিতে পারে। পাক সাম্প্রদায়িকতা সমগ্র পাকিস্তানে শুধু হিন্দু নিধন যজ্ঞের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু ভারতবর্ষে কতকগুলি কাল্পনিক কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করিয়া সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাইতে সচেষ্ট হইয়াছিল, দলে দলে পাকিস্তানী গোয়েন্দারা ভারতের মাটিতে অনুপ্রবেশ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়াছিল। পাকিস্তানের সেই দুরভিসন্ধিমূলক কূটনীতির পরাজয় ঘটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখানে বাধে নাই এবং উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিও বিনষ্ট হয় নাই। ভারত সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানে প্রশংসনীয় ভাবে সচেষ্ট। পাকিস্তানে এখনও প্রায় সোয়া কোটি হিন্দু জিম্মির মত বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেখানে তাহাদের নিরাপত্তা নাই, মানসিক শান্তি নাই। তাহা হইলে পাকিস্তানে হিন্দুরা কি ভাবে বাস করিতে পারে? হিন্দুদের নিরাপত্তা বিধানে পাক সরকার বার বার ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহা পাক সরকারের সদিচ্ছার অভাবের কথাই প্রমাণ করে না কি?"—ভাগীরথী (কালনা)

## মৎস্য মূল্য বৃদ্ধি

"কিছুকাল পূর্ব্বে, অন্যান্য স্থানের মত আসানসোলেও মাছের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রেতাসাধারণ শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। আন্দোলন সুরু হইবার পর দুই একটি বামপন্থীদল নিজেদের মুখ রক্ষা করিবার জন্য সেই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল সত্য, কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন ছিল বলিয়া তাহারা এদিকে ততটা মনোযোগ দেয় নাই। পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ হইলে আন্দোলনের গতি কোন পথ লইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। রাজনৈতিক দল কর্ত্তৃক কোন আন্দোলন আরম্ভ হইলে, প্রয়োজন মত দলের নেতারা সে আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে কোন আন্দোলন শুরু হইলে তাহা সংযত করা তত সহজসাধ্য হয় না। যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়। তজ্জন্য সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত। শুধু, মাছ নয়; প্রতিটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। অতি-মুনাফাবাজী বন্ধ করিবার জন্য যথোপযুক্ত আইন সরকারের হাতে আছে। অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ন্যায্যমূল্যে পাইবার দাবীকে অসঙ্গত দাবী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। এরূপ ক্ষেত্রে, প্রথমেই আইনের সাহায্য না লইয়াও সহরের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে সফলতা লাভ করা যাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। স্থানীয় মহকুমা হাকিম প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?" —আসানসোল হিতৈষী।

## রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সার্থকতা

"রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন গ্রামে গ্রামে জ্ঞানের সাধনার বৃদ্ধিলাভ ঘটুক। তবেই মানুষ দেশকে বুঝিবে দেশের শুভাশুভের সহিত নিজেকে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত করিতে পারিবে। তাই তিনি ঐ সাধনার বেদী প্রতিষ্ঠার জন্য দিকে দিকে তাহার ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। নব নব প্রেরণায় তিনি দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রসারের জন্য নূতন আয়োজন করিয়াছিলেন। আজ এই মহকুমাবাসী তাহার এই আয়োজন ও উপচারের কতটুকু মূল্য দিয়াছে তাহাই আজ তাহার জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রণিধান করিবার সময় আসিয়াছে। এই মহকুমায় একটিও প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার নাই যেখানে গিয়া মানুষ সাহিত্য-সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করিবে। মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে যে সাধনার বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহাতে বারি সিঞ্চন করিয়া অঙ্কুরোদ্গমের জন্য কোনও ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত এখানকার মানুষ করিতে পারিল না। তাই আজ রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান আমাদের চোখে নিছক অনুষ্ঠানরূপেই ধরা দিয়াছে। একটিও রবীন্দ্র-অনুরাগী ব্যক্তি এইদিনে শপথ গ্রহণ করিল না যে, রবীন্দ্রনাথের সাধনার দেবালয়ের দ্বার আমাদের মহকুমার বুকে আমরা উন্মুক্ত করিব, কবিগুরুর ঐকান্তিক বাসনাকে আমরা আমাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিব। প্রত্যেকটি রবীন্দ্র-অনুরাগী ব্যক্তির সহযোগিতায় মহকুমার বুকে একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা আদৌ কষ্টসাধ্য নহে। ইহার জন্য চাই কেবল ঐকান্তিকতা। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়

এই মহকুমার বুকে সাহিত্য সাধনার একটি বিরাট কর্মকেন্দ্র গড়িয়া উঠুক ইহাই আমরা কামনা করি। যেই দিন এখানকার মানুষ তাহার রূপদান করিতে পারিবে সেই দিনেই হইবে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান প্রতিপালনের সার্থকতা।" —জনমত (ঘাটাল)।

## চালে ভুল

"তমলুকে আংশিক বরাদ্দ প্রথায় চাল দেওয়া সুরু হইয়াছে। চালটা প্রচুর পাউডার মিশানো এবং দেখিতে খারাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় লোকে ইহা লইতে তেমন আগ্রহী নহে। তাছাড়া এই বরাদ্দ কেবল 'ক' শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেন? 'খ' শ্রেণী অর্থাৎ মধ্যবিত্তরা এই খাদ্যাভাবে কি কম বিপর্য্যস্ত? বরং হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে এই খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য মধ্যবিত্তরাই সর্ব্বাধিক বিপদে পড়িয়াছেন। তাহাদের সীমাবদ্ধ আয়ে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আংশিক বরাদ্দ এখন সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই দরকার। তবে ঐ চাউল চলিবে না। সরকার কলিকাতায় মধ্যবিত্তদের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাল দিতেছেন। তমলুকে অবিলম্বে ঐ মার্কিণ বা সমপর্য্যায়ভুক্ত চাল খ বা বি শ্রেণীর জন্য বরাদ্দে না ছাড়িলে মধ্যবিত্তদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যাইবে। শেষে একটা বিক্ষোভ জাগাও অস্বাভাবিক নয়।"—প্রদীপ (তমলুক)।

## শোক-সংবাদ

### আবুল কাশেম ফজলুল হক

অবিভক্ত বাঙলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী, তৎকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অন্যতম নায়ক, কলকাতার ভূতপূর্ব পৌরপাল মৌলভী আবুল কাশেম আবুল আলী ফজলুল হক সাহেবের গত ১৪ই বৈশাখ ৮৯ বছর বয়েসে বৈচিত্র্যপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের অবসান হয়েছে। বৃটিশ-শাসনকালে বাঙলার রাজনীতি-জগতে এঁর প্রভাব একদিন ছিল অনতিক্রম্য। প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র হক সাহেব ১৮৯৮ সালে গণিতে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করার পর সসম্মানে আইন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক রূপে এঁর কর্মজীবনের সূচনা। তারপর কিছুকাল দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরী করার পর হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৩ সালে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ও বাগ্মী হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯২৪ সালে ইনি বাঙলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে ইনি কলকাতার মেয়র নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৭ সালে বাঙলায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৩ পর্য্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে সমাসীন ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর ১৯৫৩ সালে পূর্ব-বাঙলার আইনসভার নির্ব্বাচনেও তিনি বিপুল সাফল্যে ভূষিত হন। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব বাঙলার রাজনীতি জগতের সঙ্গেও ইনি বিশেষ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। পূর্ব-বাঙলায় অ্যাডভোকেট জেনারেল, মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল প্রভৃতি সম্মানজনক আসনেও ইনি অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে "শের ই বঙ্গাল" হক সাহেবের রাজনৈতিক জীবনে যবনিকা পড়ে।

### অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রবীণ বিপ্লবী নেতা অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য গত ২৭শে বৈশাখ ৮১ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাঙলার অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক রূপে যাঁদের নাম চিরদিন স্মরণীয় অবিনাশচন্দ্র তাঁদেরই একজন। দেশের মুক্তি-সাধনায় যোগ দেওয়ার জন্যে বিদেশী শাসকের হাতে অন্যান্য নেতা ও কর্মীবৃন্দের সঙ্গে অবিনাশচন্দ্রও সেদিন যথেষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করেছিলেন। আলীপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী হিসেবে ইনিও নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তি লাভের পর ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে কর্মগ্রহণ করেন। প্রাবন্ধিক হিসেবেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এঁর সারগর্ভ রচনাদির মধ্যে সে যুগের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বরেণ্য মুক্তি সাধকদের সম্বন্ধে বহু তথ্য আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন-সংক্রান্ত বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পথ ইনিও অনেকখানি সুগম করে দিয়েছেন।

### সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

প্রখ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র গত ২১শে বৈশাখ ৬৭ বছর বয়েসে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। জার্মাণীর সুবিখ্যাত লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি "পি-এইচ-ডি" উপাধি লাভ করেন। স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে ইনি কলকাতা 'বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দান সুরু করেন। আমাদের দেশে ফলিত মনোবিদ্যা ও 'ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ' শাস্ত্রের প্রসার ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে সুহৃৎচন্দ্রের অবদান অনবদ্য। এ ক্ষেত্রে তাঁর একাধারে গুরু ও সহকর্মী ছিলেন স্বনামধন্য মনোবিজ্ঞানী স্বর্গীয় ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু। ডক্টর মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউটের সদস্য ছিলেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিদ্যাশাখার সভাপতির আসনও অলঙ্কৃত করেছেন। বাঙলা ভাষায় ইনি বহু মনোবৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ও মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলেন।

### নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী এবং কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের (অধুনা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত) প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত গত ২রা বৈশাখ ৮৪ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। যথেষ্ট দুঃখদারিদ্র্য বরণ করে ইনি জীবনের যাত্রাপথে পদক্ষেপণ সুরু করেন। ১৯০৫ সালে ইনি আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায়ীর জীবন গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে সুবিখ্যাত কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশান প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই ব্যাঙ্ক তাঁর অসামান্য কর্মদক্ষতা ও বিরাট ব্যবসায়িক প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে পরিগণিত হয়। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ছাড়া ইনি বীমা ব্যবসায়েও আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৭ সালে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
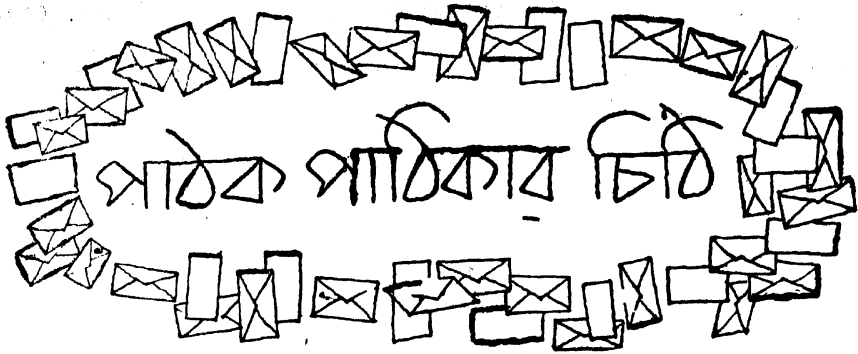
## পত্রিকা সমালোচনা

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

গত ফাল্গুন, ১৩৬৮ মাসিক বসুমতীতে রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "শিশুদের যৌনশিক্ষা" প্রবন্ধটি পড়ে এবং নানা দেশ ঘুরে এ সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা ও প্রশ্ন মনে জেগেছে তা পাঠকসমাজের সামনে তুলে ধরতে ও তার প্রকৃত উত্তর জানবার জন্য লিখছি। ছেলেমেয়েদের বয়স বাড়বার সাথে সাথে যৌন প্রবৃত্তি তাদের চরিত্রে স্থান পেতে থাকে—যা' মানবজীবনে কেন সমস্ত প্রাণীরই বেলায় একটি অনিবার্য্য ধর্ম্ম। কেবল মানবজীবনে এর প্রয়োগ সংযত, সভ্য ও গোপন। বয়স বাড়বার সাথে সাথে যৌন চেতনার প্রাবল্য ও উৎসুকতার বৃদ্ধি স্বাভাবিক এবং সে সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানবার চেষ্টাও অস্বীকার করবার নয়। ফল স্বরূপ অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকে যৌন ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করবার জন্য সুযোগ পেলেই ব্যবহারিকজীবনে তার প্রয়োগ করে থাকে। এই যৌন উত্তেজনার জন্য তাদের নিত্য পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই—বাড়ীর মধ্যে এবং বাড়ীর বাইরে দৈনন্দিন কর্ম্মস্থলে যেমন স্কুল, কলেজ, সিনেমা, থিয়েটার, জলসা-স্থান ও চাকুরীস্থল—বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটও অনেকাংশে দায়ী। অভিভাবকদের যৌন আচরণ এবং তাঁদের অত্যধিক কর্ম্মব্যস্ততা ছেলেমেয়েদের প্রতি লক্ষ্য রাখবার অভাব ঘটায় এবং তার ফলেই ক্রমবর্দ্ধমান ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায় এবং যৌন উত্তেজনার ও উৎসুকতার চরিতার্থ অবৈধ সঙ্গমের দ্বারা করে থাকে। আমাদের দেশে অভিভাবকদের সংযত আচরণ ও অপরিণত বয়সেরও অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের আচরণ ও ভাবধারার প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবার ফলে এখনও যৌন সম্পর্কিত অবাধ প্রয়োগের ব্যভিচার পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় অনেক সীমিত আছে। যৌন প্রবৃত্তি যখন বয়সের সাথে সাথে ঊর্দ্ধমুখী হওয়া মানব জীবনে একটি অনিবার্য্য ধর্ম্ম, তখন বিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং যে কোন বয়সে বহু নারী সম্ভোগ কিম্বা বহু পুরুষ সম্ভোগ সম্বন্ধে যৌন প্রবৃত্তির উপর সংযত মনোভাব আনাই এবং তার সুফল সম্বন্ধে অবহিত করাই আমার মতে বাঞ্ছনীয়। কারণ শৈশবকাল থেকেই যৌন জিজ্ঞাসায় উৎসুকতার সমাধান স্বরূপ শিক্ষা এবং তার মারফৎ সংযত যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির উদ্দেশ্য আজও কোন দেশে সাধিত হয়েছে কি। পাশ্চাত্য দেশগুলি যাদের উন্নত দেশ বলা হয়, সে সব দেশে শৈশবকাল থেকে এই জাতীয় শিক্ষার প্রাচুর্য্য থাকা সত্বেও কি সংযত যৌন লিপ্সার কোন সমাধান হয়েছে। সে সব দেশে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী **Little Mothers Craft** নামে এক শিক্ষার প্রচলন আছে যার দ্বারা দশ এগার বছর বয়সের মেয়ে থেকে যতদিন না তারা বিবাহিত হয়, তাদের আগে থেকেই মাতৃত্ব ব্যাপারটি কি এবং মাতৃত্বের জন্য নিজেকে কি ভাবে তৈরী হতে হবে তার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এরূপ শিক্ষা মায়ের ও শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী কিন্তু সংযত যৌনশিক্ষায় কি এ শাস্ত্র আজও সাহায্য করেছে। ওই সব দেশে যেখানে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং তাদের প্রয়োগ বাল্যকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য অবাধ মেলামেশা প্রচলন মেনে নিয়েছে কিন্তু তাতেও কি সংযত যৌনক্ষুধার স্বপক্ষে কোন সুফল পাওয়া গিয়েছে বরং যৌন ক্ষুধা তৃপ্তির যথেচ্ছ ব্যবহার খুবই দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রক নানাপ্রকার উপকরণের নিত্য ব্যবহার যথেচ্ছ যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির প্রধান সহায়ক হয়েছে। ফলস্বরূপ পাশ্চাত্য দেশে অবিবাহিত মাতা, অবৈধ শিশু, বিবাহ বিচ্ছেদ, মানসিক উত্তেজনা ও ব্যাধি, পারিবারিক জীবনের প্রতিনিয়ত ভাঙনের হার ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। Demographic year Book of W. H. O. Statistical Bureau of England ইত্যাদি থেকে এ'র প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি ইংলণ্ড বর্ত্তমানে এটাকে একটি জাতীয় সমস্যা বলে ধরে নিয়েছে। অতএব আমার বক্তব্য এই যে, এ শাস্ত্র যুক্তিতর্কের দ্বারা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা যতই সারগর্ভ বলে মনে হোক না কেন, তবুও তাদের প্রয়োগ যখন কোন সুফলই পাশ্চাত্য দেশে আনতে পারেনি, তখন তার প্রয়োগ এদেশে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়, বরং পাশ্চাত্য দেশের ফলাফল দেখে এ শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যাপক শিক্ষার চিন্তাও এ দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। এ দেশের দেশাচার ও সংস্কৃতি যা' পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় একেবারেই ভিন্নপন্থী, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অপরিণত ছেলেমেয়েদের ক্রমবর্দ্ধমান যৌন প্রবৃত্তি ও যৌন চেতনার প্রবল ঔৎসুক্য বিধি সম্মত উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংযত রাখবার নানাবিধ ব্যবস্থার প্রতি অভিভাবকদের ও দেশের নেতৃস্থানীয় মনীষীদের প্রযত্ন বাঞ্ছনীয় ও একান্ত কাম্য। এদেশে এইরূপ প্রয়াসই জাতির ও সমাজের কল্যাণকর। ইতি—শ্রীমতী বেলা দে, গ্রাহকসংখ্যা—১২৭৫০ গুলজারবাগ, পাটনা—৭।

শ্রদ্ধাস্পদেষু মহাশয়—

প্রথমেই আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের আমার শুভ নববর্ষের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালাম। মোহময়ী বসুমতীকেও আমার অভিনন্দন জানালাম। নববর্ষের সূচনায় রূপে রসে মনোরম

রচনাশৈলীতে সে আমাদের কাছে জনপ্রিয়া হয়ে উঠুক। মাসিক বসুমতী সম্বন্ধে নতুন করে বলবার আর কিছু নেই। সমস্ত পত্রিকা কুলের মধ্যে যে নামী, এবং দামী পত্রিকা। "কথামৃত" এর উপদেশ খুবই সুন্দর। "চারজন" বিভাগে যে প্রথিতযশা মহিলাদের জীবনী দিয়েছেন এই পরিবেশনের জন্য নতুন করে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। বাণি দেবীর "আলো-আঁধারে" অপূর্ব্ব সুষমায় এবং নতুনত্বের আবরণে মণ্ডিত। এঁর লেখা ভবিষ্যতে দেখতে চাই। "সিক্ত যুথীর মালা" বেশ সুন্দর। শুভজিৎ ও শর্মিষ্ঠার সম্বন্ধে আরও একটু বেশী বাড়িয়ে শেষ করলে পারতেন প্রণতি দেবী। "বার্ধক্যে বারাণসী" নীলকণ্ঠের অবিস্মরণীয় অতুলনীয় প্রতিভার প্রকাশ। কত মহাপুরুষের কত পবিত্র সাধনালব্ধ জীবন তাঁর লেখনীতে আমরা জানতে পারি। তুলসীদাসের অধ্যায় পড়তে গিয়ে এক অনির্বচনীয় আকুতিতে মন প্রাণ আকুল হয়ে যায়। তাঁর লেখার দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা তাঁকে আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাবেন। ছোট ছোট গল্পে পূরবী দেবীর হাত সত্যিই অপূর্ব। "কনক-ধুতুরা" তারই স্বাক্ষর। নীহাররঞ্জন গুপ্তের "তালপাতার পুঁথি" আর একটু বেশী করে প্রকাশ করলে ভাল হয়। "পায়ে পায়ে কাদা", "কে তুমি আমারে ডাকো", "কাল তুমি আলেয়া", "অছিলা" ভাল লাগছে। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, বাণী রায়, বাণি দেবী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা মাসিক বসুমতীর মত অভিজাত পত্রিকায় দেখতে চাই। আশা করি নিরাশ করবেন না। "আমার কথা" বিভাগ মন্দ নয়। "প্রশ্নোত্তর" বিভাগ খুললে কেমন হয়? সর্বোপরি আপনার লেখা মাসিক বসুমতীতে আমরা দেখতে চাই। সর্বশেষে আপনাকে ও অন্যান্য সহকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে এই লেখনীর ইতি টানলাম বিনীতা—ভারতী ব্যানার্জী, বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী ধীরা সেনগুপ্তা, সন্ধ্যা, বর্দ্ধমান, কম্পাউণ্ড, লালপুর, (রাঁচি বিহার) * * * শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বার্ন স্ট্যাণ্ড কোং, পোঃ কুসমা, ধানবাদ। * * * প্রধান শিক্ষক। বেলিয়াবেড়া কে, সি, এম এইচ, এস, স্কুল পোঃ বেলিয়াবেড়া। জেলা: মেদিনীপুর * * * শ্রীমতী এন, বি দে। মিডওয়াইফ সিপন টি, ই- পোঃ সিপন, শিবসাগর, আসাম * * * শ্রীসমরেশ সাহা, কোলাঘাট, মেদিনীপুর, পঃ বঙ্গ * * * গ্রন্থাগারিক। জেলা গ্রন্থাগার, শিলচর, পোঃ শিলচর। কাছাড়। আসাম * * * শ্রীঅশোককুমার মাইতি। খাটিরাল বড়বেড়িয়া জেলা: মেদিনীপুর দ্বারা—(কাজলাগড় হয়ে) * * * শ্রীমতী সুষমা দত্ত। অবধারক —ডক্টর জে, কে, দত্ত। পোঃ বারলোগঞ্জ। মুসৌরি ইউ, পি * * * শ্রীমতী ডলি মুখোপাধ্যায়। অবধারক—শ্রীএন, এম, মুখোপাধ্যায়। থানারোড পোঃ দুমকা। এস, পি * * * শ্রীমতী সাধনা নন্দী। অবধারক—ডক্টর এস সি, নন্দী, ১৫ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ। কলিকাতা—৬ * * * শ্রীজ্ঞানেশ চক্রবর্তী, মাতৃসত্ত্ব ইরিগেশন ডি, এন, ডি, এন, কে প্রোজেক্ট, পোঃ জগদলপুর, জেলা—বস্তার, এম, পি * * * ডক্টর এস, কে, রায়। এম, বি, বি, এস (ক্যাল) ডি, টি, এম, এইচ (লণ্ডন)। মেডিক্যাল অফিসার, এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোং লিঃ, পোঃ খেলাড়ী, পালামৌ * * * সচিব, রাজনগর সাধারণ পাঠাগার, পোঃ রাজনগর, জেলা বীরভূম।

১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে আপনাদের সভ্য তালিকাভুক্ত করিবেন, সেক্রেটারী পি, ভি, এন্ এন্ লাইব্রেরী পোঃ হলদিবাড়ি, কুচবিহার।

Herewith Rs. 15/- being Subscription for the year 1369 B. S. for the Monthly Basumati. Mrs. Anjali Ghose, C/o. S. N. Dutt Esqr. Patna.

১৩৬৯ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম, নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন, শ্রীমতী রেখা মিত্র, খামারিয়া জব্বলপুর, এম, পি।

Subscription of Rs. 15/- is remitted for the year 1962—63 Please acknowledge receipt and oblige: Headmaster Radhagobinda Jiu High School, Khujutipara, Birbhum.

I am sending herewith Rs. 15/- for one year's Subscription for the Monthly Basumati. Sm. Pratima Raha, Calcutta.

Please accept Rs. 15/- being the annual Subscription for the current year. Send the Magazine regularly—Sm. Nilima Das, P. O. Pingla, Dist. Midnapur.

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম, প্রাপ্তি-স্বীকার করিবেন।—শ্রীমতী অমিয় দেবী চট্টোপাধ্যায়, দি মস, পামটী, মহারাষ্ট্র।

১৩৬৯ সালের দরুণ পুরা বৎসরের ২১৲ টাকা চাঁদা পাঠাইলাম। যথারীতি মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—শ্রীমতী শৈলজা দেবী, রায়পুর, এম, পি।

বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাইবেন—অপর্ণা ভট্টাচার্য্য, খার, বোম্বাই।

Annual subscription for Monthly Basumati for the year 1962-63.—S. B. Bose, Library Ason, Jabalpur.

Herewith sending Rs. 15/- for the continuance of my membership with best wishes.—Himani Banerjee, Jhansi.

Rs. 15/- is being sent to renew subscription for Monthly Basumati.—Sudha Chatterjee, Cachar (Assam).

১৩৬৯ সনের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ মাস হইতে বই পাঠাইবেন।—অণিমা চক্রবর্ত্তী, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী যথারীতি পাঠাইবেন।—শ্রীমতী নীলিমা বসু, কলিকাতা।

I am sending Rs. 15/- being my subscription for the year 1369 B. S.—Sm. Rekha Banerjee, Cal.

১৩৬৯ সালের জন্য মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Mrs. P. B. Ghose—Patna-4

# সূচীপত্র





শ্রীরামপুরের
এস,চক্রবর্ত্তীর
স্পেশাল গোল্ডেন
XX
নস্য
লক্ষ্মী এজেন্সী
৪৩/১. ষ্ট্র্যাণ্ড রোড • কলিকাতা-১

## সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

রাষ্ট্রীয় সাহায্যে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হলো ॥ সুধীরকুমার মিত্রের অনন্ত সাহিত্যকীর্তি

# ॥ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ ॥

৬০টি আর্ট প্লেট, অজস্র ছবি ও মানচিত্র, শোভন অঙ্গসজ্জা এবং লাইনোয় ছাপা ডিমাই ৬০০ পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থের

॥ দাম মাত্র সাত টাকা ॥

এ জাতীয় দিগ্‌দর্শনী গ্রন্থ এর আগে এতো কম দামে প্রকাশিত হয় নি ॥

মিত্রাণী প্রকাশন ॥ ২, কালী লেন ॥ কলিকাতা-২৬

---

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

# মহাভারত

প্রথম খণ্ড—মূল্য ৮৲ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড—( সচিত্র )

[ বিরাট, উদ্যোগ ও ভীষ্ম পর্ব্ব ] মূল্য—৮৲ টাকা

বসুমতী সাহিত্য মন্দির : কলিকাতা - ১২

---

পি-৩, চাঁদনীচক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৩-৩৯৫০

---

সেই বিখ্যাত ভাষাশিক্ষার একমাত্র বইখানি

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাইতেছে

যাহারা পূর্ব্বে অর্ডার পাঠাইয়া হতাশ হইয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহাদের চাহিদা জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের আর এক অনন্য অবদান আত্মপ্রকাশ করিল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা ইংরেজী শিখিবার—বলিবার—লিখিবার সর্ব্বজন পরিচিত ও স্বনামপ্রসিদ্ধ চূড়ান্ত গ্রন্থ

# রাজভাষা

( স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত )

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিশু, কিশোর, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধজন ইংরেজী ভাষা শিখিতে, বলিতে ও লিখিতে পারিবেন।

বাঙলা দেশের মনীষী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

শিক্ষাপ্রণালীভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

নামমাত্র মূল্য তিন টাকা

---

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট—সেই সর্ব্ব জনপ্রমোদন—অমরকীর্ত্তি ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস শিল্পী—'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

# সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৩য় ভাগে :—দরদী, প্রেয়সী, মুক্ত পাখী, বন্দী, কঙ্কনা, সুপর্ণা, পঞ্চশর, রূপসী, আধুনিক, সমাজ সমস্যা, লেখার নমুনা, গবেষণা, বায়োস্কোপের সিনারি, কবিতা ও গান, গার্হস্থ্য উপন্যাসের আদরা, উদ্ধার, মোটরে কাশ্মীর।

সর্ব্বজন চিত্তবিনোদন—সর্ব্বরসসম্মিলন উপন্যাসরাজি সমন্বয় ১৸০

৪র্থ ভাগে :—মাতৃঋণ, সোণার কাঠি, মনের মিল, নেপথ্যে, পুনশ্চ, মৃণাল, হাতের পাঁচ, মুক্তার মালা, দেশের জন্য, বৃষ্টি, সহযাত্রী প্রায়শ্চিত্ত, দু'দিক, জাতীয় নাটকের প্লট, নয়াযুগের নাট্য ঠাট, মোটরে কাশ্মীর, রৌদ্র মেঘে মাত্র ১৸০ টাকায়।

৫ম ভাগে :—নূতন উপন্যাস সমন্বয়—বাবলা, মমতা, নির্ব্বর, অতঃপর, পরদেশী, স্মরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, একযাত্রায়, ফুলকাটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি। এই সর্ব্বচিত্ত-বিভ্রম আনন্দসম্মিলন মাত্র ১৸০ টাকায়।

---

বসুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

॥ মাসিক বসুমতী ॥
॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ ॥

( জলরঙ )

শ্বেতময়ূর

—পঞ্চানন রায় অঙ্কিত

# মাসিক বসুমতী

৪১শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৯ ]   । স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ।   [ ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

# কথামৃত

### শিলংয়ে জানকীর ভাবে

১৩২৩ সালে শিলং গিয়া গৌরীমা প্রথম কিছুদিন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের য়্যাসিষ্টাণ্ট একাউণ্টস্ অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন। পরে কন্‌ট্রোলার অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার মজুমদারের গৃহেও কিছুদিন ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"নিত্যই মাকে দর্শন করিবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ ভক্ত অনেকে আসিতেন। পুরুষভক্তেরা অফিসের পর প্রায় সন্ধ্যার সময়ই আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় রাত্রি ১১টা বাজিয়া যাইত। তৎপর আমরা বিশ্রাম করিতাম। সকালে উঠিয়া দেখিতাম, মা জাগিয়াই আছেন। রাত্রিতে তিনি নিদ্রা যাইতেন কি না বলিতে পারি না।

"সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা ২/৪টি ভক্ত সঙ্গে লইয়া প্রায়ই রাস্তায় বেড়াইতে যাইতেন। সেই সময় রাস্তায় স্ত্রী-পুরুষ যাহাকেই দেখিতেন (খাসিয়া পর্য্যন্ত) সকলকেই উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ', কি 'জয় মা সারদেশ্বরী' বলিয়া ঠাকুর কি মার নাম শুনাইতেন। খাসিয়া মেয়েরা হাসিতে হাসিতে তাঁহার মুখপানে চাহিত, মাও আরও উল্লসিতা হইয়া তাহাদিগকে নাম শুনাইতেন। * *

"একদিন রবিবারে তাঁহারই ইচ্ছামতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন হইল। * * মা বাহিরের ঘরে সকলের মধ্যে আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্থ রাসপঞ্চাধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা সকলকে শুনাইলেন। এই প্রসঙ্গ কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল। মা নিজের ব্যাখ্যার সঙ্গে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ টীকাকারদের ব্যাখ্যাও কিছু কিছু বলিলেন। সকলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। * *

ঐ দিনই প্রত্যূষে "মা জনকদুহিতা কুমারী সীতাদেবীর কথা

আমাকে বলিতে লাগিলেন। তখন পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেব একখানি সোনার থালার মত উদিত হইতেছিলেন। মা বলিলেন, 'দেখ, সীতাদেবীর বয়স যখন ৮ বৎসর তখন তিনি জনক রাজার ঠাকুরঘরে রক্ষিত হরধনুখানি বাঁ হাতে এইরূপে তুলিয়া (হাতে দেখাইয়া) ডান হাতে ঘর লেপিতেন। * * ইতিমধ্যে মা পাকঘর হইতে উঠানে আসিয়াই পূর্ব্বমুখী হইয়া হঠাৎ কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। * * আমি এরূপ চিত্র আর কখনও দেখি নাই। এদিকে ঠাকুরের সমাধির কথা স্মরণ করিয়া 'সীতারাম, সীতারাম' নাম করিতে লাগিলাম। * * মা নিজেই 'রামরাঘব, রামরাঘব' বলিতে লাগিলেন। পরে আরও স্পষ্টতরভাবে ঐ নাম বলিতে বলিতে সুস্থ হইলেন—চক্ষু নামিল; হস্তপদ স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল। মার মুখমণ্ডল তখন এক দিব্য রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইয়াছে—তাহাতে আবার মৃদু মৃদু দিব্য হাসি খেলিতেছে। * * বোধ হইল, তিনি এক অমৃতসরোবরে অবগাহন করিয়া উঠিয়াছেন * *।"

## তেজস্বিতার একটি দৃষ্টান্ত

আশ্রমের জনৈক অনুগত সেবক—ক—লিখিয়াছেন,—

"বাংলা ১৩২৩।২৪ সালে কলেজের ছুটির অবকাশে মাকে দর্শন করিতে একবার ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। মা একদিন বলিলেন, 'রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) অনেক দিন দেখিনি, তোরা কেউ মঠে যাবি ত চল আমার সঙ্গে।'

"বেলুড় মঠে যাইবার সৌভাগ্য ইহার পূর্ব্বে আমার আর হয় নাই। সানন্দে স্বীকৃত হইলাম, আরও কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে চলিলেন। মঠে যাইয়া রাখাল মহারাজের প্রতি মায়ের যে স্নেহ দেখিলাম এবং মহারাজেরও মায়ের প্রতি যে ভক্তিবিমিশ্র ভালবাসার পরিচয় পাইলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়—স্বর্গীয় ভাবের বস্তু।

"ফিরিবার সময় বেলুড় মঠ হইতে একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা বাগবাজার ঘাটে আসিয়া নামিলাম। মা এবং আমরা সকলে বাঁধের উপরে উঠিয়া আসিলাম। একটি ভক্ত মাঝিদের ভাড়া মিটাইয়া দিবার জন্য নীচে রহিলেন। মাঝিরা তাঁহাকে মফঃস্বলের লোক বুঝিয়া বেশী ভাড়া হাঁকিয়া বসিল। তিনি তাহা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহা লইয়া মাঝিদের সহিত তাঁহার বচসা হয়; কথায় কথায় এক মাঝি তাঁহার প্রতি অসম্মানসূচক ভাষা ব্যবহার করে। ভক্তটি অসাধারণ বলিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু ইহাদিগের সহিত মারধর করিলে পাছে মা অসন্তুষ্ট হন, এই আশঙ্কায় তিনি কথাটা হজম করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া তাহাদিগের দাবী মিটাইয়া দিলেন।

"মা কিন্তু কথাটা শুনিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গম্ভীরমুখে উপর হইতে নৌকার কাছে গিয়া সেই মাঝিকে একবার তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, 'তু মেরে লেড়কেকো কাহে গালি দিয়া?' বলিয়াই তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন।

"তারপর সেই ভক্তকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, 'মরদ্ হয়ে এমন গালিটা বেমালুম হজম করে ফেললে! তোমাদের আত্মসম্মান-বোধ নেই!'

"মায়ের তেজস্বিতা দেখিয়া ততক্ষণে আরও লোক আসিয়া সেখানে জড় হইল। মা অবিচলিতভাবে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

"কলিকাতায় এবং বাহিরে নানাস্থানে মায়ের সহিত যাতায়াত-কালে এমন আরও কয়েকটি ঘটনা দেখিয়াছি। মনে মনে মায়ের এইরূপ ব্যবহারের বিচার করিয়াও দেখিয়াছি। আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, মা নিমেষের মধ্যে তাহাই করিয়া ফেলিতেন।

"অন্যায় দেখিলেই মা তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া উঠিতেন, কখনও তাহা নীরবে সহিয়া যান নাই। অথচ মাকে কোনদিন তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতে দেখি নাই। পরাজয় তাঁহার কখনও হয় নাই; জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিজয়িনীর গর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন।

"আমার একটি বন্ধু—তিনি কবি। তিনি বলিতেন, 'বাঙ্গালীর মেয়ের এমন তেজস্বিতা, ওঁর পায়ে মাথা নোয়াতেই হবে।'

"মায়ের চরিত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছি, তন্মধ্যে দুইটি বিপরীত ধারার সম্মেলনে মুগ্ধ হইয়াছি। মায়ের বাহিরে রুদ্রাণী মূর্ত্তি, কঠোর শাসন, আর অন্তরে মাতৃমূর্ত্তি, স্নেহের নির্ঝর;—শুষ্ক কঠিন নারিকেলের অন্তস্তলে যেন সুরক্ষিত সুমধুর পানীয়।"

## বিপন্ন জীবের উদ্ধার

অসহায় এবং বিপন্ন জীবের প্রতি গৌরীমা কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি কুকুরশাবকের জন্য তিনি নিজের জীবনকে কিরূপ বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আশ্রম তখন শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে। একদিন দুই-তিনটি হনুমান একটি ছোট কুকুরশাবককে কিরূপে যেন ছাদের উপর তুলিয়া পীড়ন করিতে থাকে। এই করুণ দৃশ্যে গৌরীমার চিত্ত ব্যথিত হইল। এই বিপন্ন জীবটিকে কি উপায়ে হনুমানের কবল হইতে উদ্ধার করা যায়, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

একতলা হইতে একটা বাঁশের সাহায্যে সেই হনুমানগুলিকে তাড়াইতে না পারিয়া তিনি ছাদে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই বাড়ীর ছাদে উঠিবার কোনও সিঁড়ি ছিল না। তিনি শক্ত করিয়া কাপড় পরিলেন এবং পিঠে একটি লাঠি গুঁজিয়া লইয়া একটা জীর্ণ পিচ্ছিল প্রাচীর বাহিয়া ধীরে ধীরে ছাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় হনুমানগুলি ছাদের আলিসায় আসিয়া মুখ বিকৃত করিয়া তাঁহার মাথার উপর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তখন মাতাজী একস্থানে বসিয়া লাঠিটা বাহির করিয়া হনুমানগুলির সম্মুখে ঘুরাইতে লাগিলেন। ইহাতে সুফল দেখা গেল। হনুমানগুলি ভয়ে সরিয়া পড়িল। তিনি তখন ছাদের উপর উঠিয়া কুকুরশাবককে কাপড়ের মধ্যে বাঁধিয়া লইলেন এবং পুনরায় সাবধানে নীচে নামিয়া আসিলেন।

তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আশ্রমবাসিনীগণ তাঁহাকে বলিলেন, "একটা কুকুরছানার জন্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন মা! ভাগ্যিস্ পড়ে যাননি, নইলে কি হতো!"

তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের সৃষ্ট একটি অসহায় জীব এভাবে চোখের সামনে মরবে, সেটাই কি ভাল হতো?"

—গৌরীমা গ্রন্থ হইতে।

# দীপ ও দর্পণ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

## এক

আমি একটি ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপ। আমার কাজ হচ্ছে অন্ধকার গৃহকোণকে আলোকিত করা। শক্তি আমার ক্ষুদ্র, কিন্তু জীবন আমার সার্থক। কেননা, আমি যথাশক্তি আলো বিতরণে কার্পণ্য করি না। তোমরাও যদি তোমাদের সাধ্যমত আলো বিতরণ করো, তা হোলে সাফল্যমণ্ডিত হবে তোমাদের জীবন। যে সার্থকতা তোমার সাধ্যায়ত্ত নয়, তার পিছনে মরীচিকার মতো ছুটে যেও না। যথাশক্তি পরের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দাও, তোমার কর্মের ক্ষেত্র বা পরিধি যদি সঙ্কীর্ণ হয়, তাতে তোমার কিছু অগৌরব নেই। বুদ্ধদেব আনন্দকে বলেছিলেন, আত্মদীপ হোয়ে বিহার কর, আপন অন্তরের আলোতে পথ চল। আমি তোমাদের চোখে ক্ষুদ্র, কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমায় গৌরব দান কোরেছেন একটি ছোট্ট কবিতায়। তিনি লিখেছেন—

'কে লইবে মোর কার্য্য?' কহে সন্ধ্যা-রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল—'স্বামি,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

সেকালেও আমায় মর্য্যাদা দিয়েছেন মহাকবি কালিদাস। মহাদেব যখন পদ্মাসনে বসে ধ্যানমগ্ন, স্থির, অচঞ্চল, তখন তিনি তাঁকে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার সঙ্গে তুলনা কোরেছেন। আমার আলো কিন্তু আলেয়ার আলোর মতো মানুষকে বিভ্রান্ত করে না, বিদ্যুতের আলোর মতোও চোখ ঝলসায় না। আমি বাইরের ও ভেতরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে এক মুহূর্তে ধ্বংস কোরে দিই। একটি বিখ্যাত কবিতা হয়তো তোমরা সবাই জানো—

'অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ,
একটি আলোকশিখা সুমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।'

তোমরা জ্ঞানকে আলোর সঙ্গে তুলনা করে থাকো। যথার্থ জ্ঞানের আলোও বিদ্যুতের আলোর মতো চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী নয়। কবি বলেন—

'ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।'

আবার জ্ঞানের আলো আলেয়ার আলোর মতো বুদ্ধির বিভ্রমও ঘটায় না। সত্যিকারের জ্ঞানের আলো স্নিগ্ধতায় আমার আলোর সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু যে তথাকথিত জ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতির সঙ্গে সম্পর্কবর্জ্জিত, সে জ্ঞান বিদ্যুতের আলোর মতো চঞ্চল কিংবা আলেয়ার আলোর মতো বিভ্রান্তিকর।

তোমরা পরম দেবতার কাছে প্রার্থনা করো, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', আমাদিগকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে যাও। বাইবেলে বলা হোয়েছে, God said, Let there be light and there was light. ঈশ্বর বল্লেন: আলোর আবির্ভাব হোক আর অমনি দিগ্‌দিগন্ত আলোয় উদ্ভাসিত হোলো। এই জন্য কবি মিল্টন বলেছেন—আলো হচ্ছে offspring of heaven first born অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে সর্ব্বাগ্রে যার উদ্ভব হোয়েছে। মিল্টনের চোখের আলো নিভে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর অন্তরে জ্বলেছিল জ্ঞানের আলো। আমিও আলো-দানেরই ব্রত গ্রহণ কোরেছি। অন্তগামী সূর্য্যের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে আমি জগৎকে আলোকিত করি। আবার আমি তো একা নই, আমার সংস্পর্শে এসে সহস্র সহস্র দীপশিখা জ্বলে ওঠে। তোমরাও আমার মতো হও, তোমাদের সান্নিধ্যে এসে অগণিত মানুষের অন্তরে আলো জ্বলে উঠুক। মনে নেই, ইংরেজ কবি কি বলেছেন—

'As one lamp lights another, nor grows less,
So nobleness enkindleth nobleness'

তোমরা তো জানো, আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার পতঙ্গ আমার দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু তারা তো জানে না দাহনের কী তীব্র জ্বালা।

'অজানন্ দাহার্ত্তিং পতঙ্গো বিশতি দীপদহনম্।'

দাহের জ্বালা জানে না বলেই তো পতঙ্গ আমার অভিসারী হয়। কিন্তু তাদেরই বা দোষ কি? তোমরা তো মানুষ বলে গর্ব্ব কর, কিন্তু তোমরাও কি রূপের আকর্ষণে পতঙ্গের মতো বহ্নিমুখে বিবিক্ষ হও না? তোমাদের বিবেক আছে, বিচার-বুদ্ধি আছে, কিন্তু বল দেখি, তোমরা পতঙ্গের চাইতে শ্রেয় কিসে? মানুষ মাত্রেই যে পতঙ্গ, সে কথা বুঝেছিলেন আফিংখোর কমলাকান্ত। আমি শুধু আলো দিই না, আমি প্রলয়কাণ্ডও ঘটাতে পারি। তোমরাও কি প্রয়োজন হলে একটা প্রলয় ঘটাতে পারো না, যে প্রলয়ে পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা দগ্ধ হয়ে যায়? যখন দেশে অনাচার, অত্যাচার, অবিচার পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তখন প্রলয়ের ভেতর দিয়েই তো নতুন সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হোয়ে ওঠে।

তোমরা হয়তো জানো না, আমার একটি বন্ধু আছে, আমার

মতো তারও কাজ—প্রকাশ করা। তবে আমি প্রকাশ করি রাত্রে আর আমার বন্ধুটি প্রকাশ করে দিনের বেলায়। অবশ্য আমার আলো পেলে সে রাত্রেও প্রকাশ করে। বলো তো, আমার এই বন্ধুটি কে? আমার এই বন্ধুর নাম হচ্ছে 'দর্পণ।' তোমাদের কাছে এর কথা বেশি না বল্লেও চলে। ইনি না থাকলে জগতের কি গতি হোতো বলতে পারিনে। রূপসী ও রূপবানদের রূপের গর্ব্বই বা কোথায় থাকতো! তোমরা একটু স্থির হয়ে আমার এই বন্ধুটির কথা শুনবে কি?

## দুই

আমি আরশি। শোন, হে বিশ্বের নরনারীগণ, তোমরা বিশ্বসংসার দেখতে পাও, কিন্তু নিজেদের মুখ নিজেরা দেখতে পাও না। এটাই তোমাদের জীবনের সব চাইতে বড়ো ট্র্যাজিডি। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জানো। সেকালের গ্রীক পণ্ডিতও বলেছেন—Know thyself. কিন্তু কয়জন মানুষ নিজেকে জানে বা জানতে চেষ্টা করে? আমার ভেতরে যখন কোনো বিকৃতি ঘটে, তখন আমার প্রতিবিম্বও বিকৃত হয়, আমি যখন ভেঙে যাই, তখন আমার যথার্থ প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। যারা বিত্তশালী বা উচ্চপদস্থ, তারা প্রায়ই মোসাহেব বা চাটুকারের বচনে বিভ্রান্ত হয়, নিজেদের বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখে বলে তারা নিজেরা প্রতারিত হয় বা অপরকে প্রতারিত করে। তোমরা বিশ্বাস কোরো, এমন কাউকে তারা পায় না যার ভেতর দিয়ে তাদের অন্তরের ছবি ফুটে উঠতে পারে। অবশ্য মহাকালই এদের বিচারের ভার গ্রহণ করেন। এ বিচার নির্মম ও নিরপেক্ষ। এ বিচারে, যারা একদিন বড়ো ছিল তারা ছোট হয়ে যায়, আর যারা ছোট ছিল তারাও সহসা এক অভাবনীয় মহিমা লাভ করে।

দার্শনিক বেকন মানুষের চিত্তকে আমার সঙ্গে তুলিত কোরেছেন বেকন সত্যি কথাই বলেছেন। আমি যখন ধূলিজালে আচ্ছন্ন থা[illegible] বা বাইরের জঞ্জাল যখন আমার স্বচ্ছতাকে অবরুদ্ধ করে, তখন কো[illegible] বস্তুই আমার ভেতর প্রতিফলিত হয় না। তখন যদি কেউ তঁ[illegible] মুখচ্ছবি দেখতে চান, তবে তাঁকে প্রথমেই এই মালিন্য দূর কোর[illegible] হবে। মানুষের চিত্তও নানা সংস্কারে, নানারূপ 'আইডোলা[illegible] আচ্ছন্ন থাকে বলে তাতে সত্যের প্রতিফলন ঘটে না। কিন্তু য[illegible] সত্যকে জানতে চাও, তবে মনকে সংস্কারমুক্ত কর, চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জি[illegible] কর। যারা অজ্ঞানান্ধ ও বিচার-মূঢ়, তারা আজও পৃথিবীর [illegible] ভয়াবহ অকল্যাণ সাধন কোরচে! আঘাত হানো, প্রচণ্ডভাবে এদে[illegible] আঘাত হানো, নইলে কিছুতেই এদের চৈতন্য সম্পাদন হবে না।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবও মানুষের চিত্তকে আমার সঙ্গে তুলনা কোরেছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বলেছেন, মানুষে[illegible] চিত্তরূপ দর্পণে কতো মলিন বাসনা সঞ্চিত হোয়ে রয়েছে। তা[illegible] মার্জ্জনা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে নাম-সংকীর্তন। শিক্ষাষ্টকে বলা হোয়েছে, এই নাম-সংকীর্তন হচ্ছে 'চেতোদর্পণমার্জ্জনম্'। এ[illegible] কারণ হচ্ছে, নাম আর নামী যে অভিন্ন।

এ সব কথা যাক। তোমরা যদি মানুষ হতে চাও, ত[illegible] তোমাদের অন্তরকে স্বচ্ছ দর্পণের মতো কর। আত্মবঞ্চনা কো[illegible] না, ভাবের ঘরে চুরি কোরো না। মনে রেখো তোমাদের দেশে[illegible] সাধকের গান—

> 'ভিতর বাহির দুই সমান রেখ, ভাই,
> মানুষ যদি হতে চাও।
> কাক তুমি, ময়ূর সেজে
> জগৎকে ভুলাতে চাও,
> কিন্তু যে একজন ওপরে বসিয়ে
> দেখেও কি দেখ না তাও?'

# প্রসূর্য্য এষণা

### রাধামোহন মহান্ত

সপ্তসিন্ধুদেশে আমি নিরালা মনের পুরাতনী একটি কামনা:
আচ্ছন্ন করেছে মোরে ভল্ডাই ঈগল, নখে-দন্তে বিচ্ছিন্ন স্বপন;
রক্ত ঝরে—রক্ত ঝরে, আরণ্য আপসী, স্বাদে-গন্ধে বিব্রত বিমনা,
হে মৈত্রেয়ি, উদাসীনা থেক না থেক না, এসো করি ব্রত উদ্‌যাপন!

আমি তো চাইনি এই রোদের চাদরে আলিঙ্গন মরণ নিবিড়;
প্রস্তুত যৌবন, ফুল, বর্ণালি চটুল, চপলার শিহর চমক!
এই রোদে পোড়া, এই নিঃসঙ্গ দুপুরে প্রতীক্ষার দাহন গভীর,
কর্ণিকা-শিরীষে স্তব্ধ সৈকত উচ্ছ্বাস, কোণারকে ধ্রুপদী ঠমক!

আমারে প্রকাশ করো সুচিরা রুচির তেজে বীর্য্যে মহান্ সুন্দর:
প্রতি শ্যাম দূর্বাঘাসে শিশিরে শিশিরে জীবনের পোশাক তিমির,
অনন্ত জীবন যাক, ছিঁড়ুক নোঙর, পাল তুলে ছাড়ুক বন্দর,
আমি তো চাইনি এই নিরেট ভোগের, শেষ হোক প্রাত্যহ রুচির!
অরণ্য-নগর থাক, আশ্লেষ আবদ্ধে, সামগীতে সুনৃত সান্ত্বনা
সপ্তসিন্ধুদেশে চাই, সজীব মনের ত্যাগে-ভোগে প্রসূর্য্য এষণা।

# কুঁড়ি

### রবীন্দ্রনারায়ণ সরকার

ঘুম ভেঙ্গে দেখি মন-বাগিচায় কুঁড়িগুলি ফোটে নাই
নিশীথ শিশিরে মধু ত' ঝরেনি দখিণা বাতাস বিনে;
ভ্রমরা ওদের কোরকে মাখেনি পরাগ-সুরভি তাই
স্বপনসায়রে তরী ত' ভাসেনি দিশারী আলোক চিনে।

মধু মাস কত কেটে গেছে তার না পাবার ব্যথা নিয়ে,
শুকায়ে গিয়াছে যতন পশরা শত কুসুমের মালা;
পায়নিকো তারা একটি আশিষ অমিত শক্তি দিয়ে
প্রাণের অর্ঘ্য শত বেদনার গোপনে রয়েছে জালা।

আগামী দিনের কুসুম কলির চির বাঞ্ছিত সুখ
অসীম তাহার পরশে আনিবে সার্থক চেতনায়;
তাই ত' সকলে ফুটিবার তরে উচ্ছ্বাসে উন্মুখ
মনোহর দিশা' গন্ধ সুরভি দূর করি হতাশায়।

শত জীবনের গ্রাব-রেখা ধরে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে
ঘুম ভাঙ্গা কলি সারা দিনমান দূর অসীমেরে বন্দে।

# বিদ্রোহী বিশ্বনাথ

**হারাধন দত্ত**

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সংগে-সংগেই এদেশে শাসনবিধির পরিবর্তন ঘটে। এতদিন যে প্রণালীতে দেশরক্ষা চলে আসছিল—তা আর রইল না। তৎকালে দেশরক্ষার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ব্যবস্থা করেছিল তা দেশের পক্ষে যথেষ্ট ত ছিলই না—অদক্ষ ও অপটুও ছিল। বিশেষ এই কাল যুগ-পরিবর্তনের কাল। প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলমানগণের হাত হতে শাসন-ব্যবস্থা ইংরেজদের হস্তগত হতে চলেছিল। সুতরাং দেশী ও বিদেশীদের মধ্যে বৈরী ভাব তখনও একেবারে দূরীভূত হয়নি। এরূপ সময়ে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ফলে দেশ অরাজকতার কালগ্রাসে পতিত হয়। চুরি-ডাকাতি দৈনন্দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি সিরাজদ্দৌলার পর নামে মাত্র নবাবদের শাসনকালে—বাংলা দেশ শাসনে-শোষণে ও অত্যাচারে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। এর পরেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। রেজা খাঁর শাসন। বাংলা দেশে সে এক অরাজকতার যুগ। এইকালে বিত্তবান ও ঐশ্বর্য্যশালীরা নিজেদের ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য লাঠিয়াল বা পাইক রাখতেন। ইতিহাসের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে উত্তর ভারত ও বাংলা দেশে একশ্রেণীর বিদ্রোহী মানুষের আবির্ভাব ঘটে। ইতিহাসে এঁরা কুখ্যাত ডাকাতরূপে অভিহিত। ইংরেজ শাসনের এই উষালগ্নে আবির্ভূত বাংলা দেশের এক বীর ও বিদ্রোহী সন্তানের কথাই বক্ষ্যমান আলোচনার বিষয়বস্তু। ইনি বিশ্বনাথ সর্দার; ইতিহাসে 'বিশে ডাকাত' নামে কথিত।

বিশ্বনাথ সর্দারের কাহিনীতে প্রবেশ করার পূর্বেই পিছনের ঘটনা আরও একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সেকালে এরূপ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর মানুষের আবির্ভাবের কারণ কি? শক্তিহীন শাসন-ব্যবস্থাই এর অন্যতম কারণ বলে মনে করি। বাংলা দেশের এই কালের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখেছেন—"When Clive struck at the Nawab, Mughal civilization had become spent bullet. Its potency for, its very life was gone. The country's administration had become hopelessly dishonest and inefficient, and the man of the people had been reduced to the deepest poverty, ignorance and moral degradation by a small, selfish, proud, and unworthy ruling class.. The army was and honeycombed with treason." ১ এর পূর্বেও শক্তিহীন দুর্বল মুঘলশাসনকালে ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কোন কোন প্রদেশ শাসন-ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পলাশীযুদ্ধের ১২।১৩ বৎসর পূর্বে মারাঠারা বারে বারে বাংলা দেশ আক্রমণ করে। ১৭৪২-৪৪-এর মধ্যে মারাঠারা পর পর তিনবার বাংলা দেশ আক্রমণ করে। ১৭৪৫ সালে Afgan Mutiny। অপর দিকে পূর্বাঞ্চল হতে মগ ও বিদেশী জল-দস্যুদের আক্রমণ। আর দেশ দারিদ্র্যে জর্জরিত। দারিদ্র্য-দুষ্ট বাংলা দেশের মানুষ মারাঠা ও বর্গী দস্যুদের বীভৎস ধন… ও ঐশ্বর্য্যলুণ্ঠনের মধ্যে কেউ কেউ নিজ দুরভিসন্ধি সার্থক করার পথ খুঁজে পেল। দৈহিক শক্তিতে বলিষ্ঠ কোন কোন ব্যক্তি ধন… সংগ্রহে প্রলুব্ধ হয়। এদের অনেকেই নিজ নিজ অর্থ কামনা ও বিলাস-ব্যসনকে চরিতার্থ করার জন্য মারাঠা দস্যু ও বর্গীদের মত দস্যুবৃত্তির পন্থাকে গ্রহণ করে। এর ফলেই পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের সূচনা। ডক্টর যদুনাথ সরকার মহাশয় ১৭৫… সালের বাংলা দেশের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—"The loss of Orissa to the Mughal Empire was the one permanent result of the Muratha Invasions. Another was the Bargis showed the way for the organised looting of Bengal and Bihar to the upper Indian robber bands callling themselves Sannyasis and Faqirs, whom it required the genious and persistence of Warren Hastings to suppress about thirty years later." ২ এই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দস্যুবৃত্তি ও বাংলা দেশের মানুষদের উপর তা… প্রভাবের কথা আরও দু'একজন লেখক সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ৩ এই সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ, মানুষের দারিদ্র্য, ধনলুণ্ঠনের ঐ পূর্ববর্তী আদর্শ এবং শক্তিমান মানুষের অন্যায়ের প্রতিরোধস্পৃহা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা—সেকালের এই অরাজ… দেশে এই সমস্ত বিদ্রোহী ও অত্যাচারী মানুষের অভ্যুত্থানে… প্রেরণাস্থল হ'য়ে দাঁড়ায়। এর পরবর্তীকালেও আমরা বরাহভূমি… দুর্জন সিং এবং লাল সিং-এর বীরত্বমণ্ডিত কাহিনীর সংগে পরিচি… হয়েছি। ১৮০০ সাল থেকে সিপাহী বিদ্রোহের কাল পর্যন্ত অ… ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত—এই বরাহভূমির অরণ্যদুর্গের মানুষগুলি বার বা… বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বাঘের মত দুরন্ত বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে… ১৮৩২-এর দিকে এই বংশের গঙ্গানারায়ণ সিংহের বীরত্ব-কাহি… ইতিহাসের প্রদীপ্ত অধ্যায়ে পরিণত হয়। ৪ তবু বিশে…

১ History of Bengal (1948), vol. II Ed. by Jadunath Sarker. P-497,

২ Hist. of Bengal ( D. U. ) II P- 467.

৩ (1) Dawn of New India (1927) —By Brajendra Nath Banerje…

(2) Sannyasi and Fakir Raiders in Beng… (1930)—By J. M. Ghos…

৪ গঙ্গানারায়ণী সেনা।—সুধীর করণ। আনন্দবাজার পত্রি… ১২ই কার্তিক—১৩৬…

ঐতিহাসিকেরা এদের বলেছেন, চুয়াড়—আর এদের বিদ্রোহকে বলেছেন, চুয়াড়-বিদ্রোহ। পলাশী-যুদ্ধের পূর্বে ও পরে বাংলা দেশ এমনিভাবে বারে বারে আঘাতপ্রাপ্ত হয়—ঐক্যহীন খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ দেশের শান্তিকে দীর্ঘকালের জন্য বিঘ্নিত করে রাখে। বিশ্বনাথের অভ্যুত্থানের মূলেও দেশ ও সমাজের এই অশান্ত অবস্থা অনেকাংশে দায়ী। আমরা পুনরায় বিশ্বনাথ প্রসঙ্গেই ফিরে আসছি।

১৮৭০ সালের দিকে কোলকাতার অধিবাসীদের ধন-সম্পত্তি ও জীবন-প্রাণ মোটেই নিরাপদ ছিল না। বাংলা ১১৭৫ ( ইং ১৭৭০ ) সালের বাংলা দেশের কথা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠে' চিত্রবৎ উপস্থিত করেছেন। অধ্যাপক রাম, জে, মৃণ্ময় এই সময়কে "Power without responsibility'র যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। ৫ ডাকাতি ও নরহত্যা অবিসম্বাদে অনুষ্ঠিত হত। দূর পল্লীগ্রামের অবস্থা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। বাংলা দেশের নদীয়ার মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে—মাথাভাঙ্গা, ইছামতী ও চূর্ণীর সলিলপ্রবাহ আমাদের চোখে পড়বে। পীযূষবাহী এই স্রোতস্রোত এই অঞ্চলের মানুষের আশা, আনন্দ ও বেদনার মূর্ত প্রতীক হয়ে আজও লীলাচঞ্চল হয়ে আছে। এই ভূখণ্ডই বিদ্রোহী বিশ্বনাথ সর্দারের লীলাভূমি। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদের শেষাংশে এই অঞ্চলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শিবনিবাস নগরী পত্তন করেন এবং সাময়িকভাবে রাজধানী করে এখান হতেই রাজ্যশাসন করতে থাকেন। গগনচুম্বী দেবমন্দির—জমজমাট রাজপুরীর জৌলুষে মণ্ডিত হয়ে বহতা চূর্ণীর উপর শিবনিবাস নগরী শোভা পেত। কাকচক্ষু চূর্ণীর জলে মন্দিরময় শিবনিবাসের ছায়া পড়ত। এই সবুজ স্নিগ্ধ অরণ্য-দুর্গের দেবায়তন হতে সেদিন বেদমন্ত্র সমুত্থিত হয়ে ঊর্দ্ধলোকে প্রসারিত হত। নহবত বাজতো। আমীর ওমরাহরা বন্দনাগানে মুখর করে তুলত এখানকার আকাশ-বাতাস। মহারাজ প্রতিষ্ঠিত আর একখানি গ্রামের নাম কৃষ্ণপুর। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামের স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। কৃষ্ণপুর গণ্ডগ্রাম। বহু লোকের বাস এখানে। গোয়ালাদের সংখ্যাই অধিক। এই গ্রামের শৌর্য-বীর্য্যের কথা একদা বহু দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ৬ চূর্ণীতীরের এই গ্রামে সুখ্যাত গন্ধবণিক পরিবার কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই বসতি স্থাপন করেন। এই পরিবার প্রথমে ঢাকা থেকে যশোর এবং পরে যশোর থেকে কৃষ্ণপুরে গ্রাম পত্তনের সংগে সংগেই এসে উপস্থিত হয়। এরা জোতদার ও কুসীদজীবি ছিল। দেওয়ান রঘুনন্দন প্রবর্ত্তিত পুণ্যতোয়া চূর্ণীর প্রবাহ অবলম্বনে বাণিজ্য করে বহু ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়। এই বংশের কালাচাঁদ দত্ত ও প্রেমচাঁদ দত্তের বীর্যবত্তা ও রাজসিকতার কাহিনী আজিও প্রবীণ গ্রাম-বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়। এখানে অসংখ্য জলাভূমি। চূর্ণীর পরপারে অর্থাৎ শিবনিবাসের পাড়ে বয়রার বিল, পাকসের বিল, গাজনার বিল এবং অপর তীরে চন্দননগর, বাবলাবন, মিহিরপোতা, ভৈরবচন্দ্রপুর, শোনঘাটা, চৌগাছা, নাইকুড়ো, আসান-নগর, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপ্ত করে এক সুবৃহৎ জলাভূমি বিরাজ করছে। কোন অংশের নাম ষাড়ভাঙ্গা, কোনটি ডাকাতেগাড়ি, কোনটির নাম আবার পলদা। মনে হয় কোন প্রাচীন নদী এই অঞ্চলে এসে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। চূর্ণীর আবির্ভাব আধুনিক-কালের। এর উদ্ভবের মূলে মানুষের ক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে মল্লিখিত একটি নিবন্ধে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। ৭ এই জল-জঙ্গল ও মানুষের অরণ্যময় সুবৃহৎ ভৌগোলিক পরিবেশের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা গেল এই কারণে যে, বিদ্রোহী বিশ্বনাথের পরাক্রমে এই অঞ্চল একদা প্রকম্পিত ছিল। এই ডাকাতেগাড়ির উপরেই নীল আন্দোলনে সূতিকাগৃহ চৌগাছা গ্রাম—বিদ্রোহী বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের বসতভূমি। নিকটেই দিগম্বর বিশ্বাসের জন্মস্থান পোড়াগাছা। আর ডাকাতেগাড়ির অপর দিকে চৌগাছার ঠিক বিপরীত দিকে গাটরা ভাতছালা। চৌগাছা কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন। গাটরা ভাতছালা চাপড়া থানার অন্তর্গত। এই গাটরা ভাতছালাতেই বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

জল-জঙ্গলের দেশ। নদীয়ার এক নিভৃত পল্লী গাটরা ভাতছালা। বিশ্বনাথকে বুকে ধারণ করে এই সামান্য গ্রাম ইতিহাসে অসামান্য হয়েছে। একদিন এই গ্রামের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। ব্যগ্রক্ষত্রীয়, তুলে, রাজবংশী, মাহিষ্য ও মৎস্যজীবি সম্প্রদায় বহুকাল হতে এই অঞ্চলের অধিনায়ক। বিশ্বনাথের কালে ত ছিলই। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিশ্বনাথের জন্মস্থান নির্ণয় করেছেন নদীয়া জেলার আসাননগরকে। Hunterও আসাননগরকে বিশ্বনাথের জন্মস্থান বলেছেন। ৮ বস্তুত: এ অনুমান সত্য নয়। গাটরা ভাতছালাতেই এই বাঙালী বীরের অভ্যুত্থান ঘটে। সেদিনের বৈদেশিক শাসক সম্প্রদায় কূট চক্রান্তে, কলঙ্ক-কালিমায় এই বীরের জীবন সমাপ্তি ঘটিয়েছিল। কিন্তু শেরউড বনভূমির দস্যু রবিনহুড ইংরেজের জাতীয় জীবনে মহা মহিমান্বিত হয়ে আছে। অথচ সেই ইংরেজই বিশ্বনাথের মত স্বদেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, উদার-চরিত্রের মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। আজ ইতিহাস হতে সেই অখ্যাতি মোচনের দিন এসেছে। বিশ্বনাথের মত বীর বংগসন্তানদের কথা আজ নূতন করে ভাববার প্রয়োজন হয়েছে।

কোন্ সময়ে বিশ্বনাথের জন্ম হয়, ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। কোথাও লিপিবদ্ধও হয়নি। ১৮৮৫ সালের দিকে সুসাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রাজকার্য্যে নদীয়া জেলায় উপস্থিত হন। সে সময়ে পলাশী ভ্রমণকালে তিনি বিষম কুলবেড়ে বা ডাকাতে কুলবেড়ে নামক একটি গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সাধারণ লোকের মুখে বিশ্বনাথ ডাকাতের কথা শোনেন। পরে তিনি অতি নিম্নস্তরের মানুষের কাছে বিশ্বনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা সংগ্রহ করেন। ১২৯২ সালের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিশ্বনাথ জীবিত ছিলেন—শ্রীশচন্দ্র বিশ্বনাথ সম্বন্ধীয় একটি নিবন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বনাথ ১৮৩৬ সালের দিকেও জীবিত ছিলেন। বিশ্বনাথকে তিনি জনবুলের সংগে তুলনা করেছেন। এই চরিত্র তাঁকে এত অনুপ্রাণিত করে যে, তিনি তৎকালীন একখানি বিখ্যাত সাহিত্যপত্রে বিশ্বনাথের সংক্ষিপ্ত

৫ আনন্দমঠ (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)—যদুনাথ সরকারের ভূমিকা।
৬ নবজীবন। শ্রাবণ—১২৯৩।

৭ পুণ্যতোয়া চূর্ণী। হারাধন দত্ত। বসুধারা—ভাদ্র, ১৩৬৬।
৮ (১) বাংলার ডাকাত ( বিশ্বনাথ সর্দার )। শিশুসাথী—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫।
(২) Statistical Account of Nadia. Hunter. P. 159.

জীবন-কাহিনী পরিবেশন করেন।[৯] কেবল তাই নয়, বিশ্বনাথের জীবন-কাহিনী অবলম্বন করে তিনি একখানি উপন্যাসও প্রণয়ন করেন।[১০] এই উপন্যাস পুরাপুরি বিশ্বনাথের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এই কাহিনী "সাহিত্য" পত্রিকায় 'প্রতিশোধ' নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। যাঁরা বিশ্বনাথের দুঃসাহসিক ও মনোমুগ্ধকর কাহিনী পাঠ করতে চান, তাঁদের শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কৃত ঐ 'বিশ্বনাথ' উপন্যাস এবং এই উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু কয়াল মহাশয়ের একটি সংক্ষিপ্ত রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিই।[১১] মোহিত রায় "কুখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ" নামক সংক্ষিপ্ত রচনাতে বিশ্বনাথের জন্মস্থান নির্ণয় করেছেন 'বাঙালঝি' গ্রামখানিকে।[১২] এই অনুমানও ভ্রমাত্মক। বিমলেন্দু কয়াল মহাশয়ের উক্ত রচনাটি মুখ্যত: 'বিশ্বনাথ' উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার। এই বিশ্বনাথের জীবন-কাহিনী একটানা নয়—সেখানে উত্থান-পতন আছে—আছে বৈচিত্র্য। বীরত্বব্যঞ্জক-লোমহর্ষক বিশ্বনাথের কাহিনী শ্রবণকালে মুগ্ধ হতে হয়। তাঁর জীবনের শৃঙ্খলাহীনতার সংগে উচ্চ চরিত্রাদর্শের সদ্ভাব দেখে আরও মুগ্ধ ও বিস্মিত হতে হয়।

আজকাল আমাদের সমাজ দ্রুত অগ্রগতির পথে চলেছে। কিন্তু উচ্চ-নীচের ভেদ আজও দূরীভূত হয়নি। বিশ্বনাথের কালে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও বিদ্যাভ্যাস করতো না, এমন নয়। বাল্যকালে বিশ্বনাথ গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। আজকের বাংলা দেশের মত সেকালে বাঙালী দেহ-জীবনে এত দুর্বল ও অসুস্থ ছিল না। বিশ্বনাথ সুগঠিত দেহযৌবন ও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। বাল্যে ও যৌবনে বিশ্বনাথ ছিলেন শান্ত প্রকৃতির। নদীয়া জেলা বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান। বিশ্বনাথের আমলে গ্রামে গ্রামে 'কানু বিনা গীত নাই' কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। সে সময় হরি সংকীর্তন ও কৃষ্ণনামে দেশ ছিল মাতোয়ারা। বৈষ্ণব গুহ্য সাধনাও বিরল ছিল না। বিশ্বনাথ এইরূপ এক গুহ্য সাধন আশ্রমের সংগে যুক্ত ছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে বিশ্বনাথ বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বিশ্বনাথ জাতিতে বাগদী ছিলেন। বিশ্বনাথের পরিচিত ঐ গুহ্য আশ্রমে পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের বাসিন্দাই যোগদান করতো। তন্মধ্যে আসাননগরের বিখ্যাত পাঁচকড়ি সর্দার উল্লেখযোগ্য। পাঁচকড়ির সংগে তাঁর এক সুন্দরী যুবতী কন্যা ঐ গুহ্য বৈষ্ণব আশ্রমে যাতায়াত করতো। এই কন্যার সংগে কালক্রমে বিশ্বনাথের প্রণয় ঘটে। একদিন পাঁচকড়ি সর্দার নিশীথে কন্যাকক্ষে বিশ্বনাথকে দেখেন এবং কৌশলে বিশ্বনাথকে ধৃত ও বন্দী করেন। কুলকলঙ্ক ভয়ে পাঁচকড়ি রাজ সমীপে এই ঘটনার কথা উপস্থিত করেননি। আসাননগরের অদূরবর্তী একটি নীলকুঠীতে সে এবং তার ভাগিনেয় কাজ করতো। ভাগিনেয় মেঘাই সেকালে অজেয় ছিল। বিশ্বনাথকে কি করে শাস্তি দেওয়া যায়, পাঁচকড়ি এ বিষয়ে ভাগিনেয় মেঘাইয়ের সংগে পরামর্শ করার জন্য নীলকুঠীর পথে রওনা হলে বিশ্বনাথের প্রণয়ী তাঁর বন্ধন মোচন করেন। বিশ্বনাথ মুক্তি-লাভ করে সতর্ক হ'ল বটে—কিন্তু তাঁর যে প্রণয়ী নিজ প্রাণকে তুচ্ছ করে বিশ্বনাথের জীবন রক্ষা করেছিল—সেই প্রণয়ীর কোন খবর পাওয়া গেল না। কিছুদিন পরে গ্রামে খবর এল, সর্দারের কন্যা মেঘাইয়ের গৃহে সর্পদংশনে মারা গেছে। বিশ্বনাথ প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে পারল। হতভাগিনীর অকালমৃত্যুর কারণ জেনে অতীব মর্মাহত হল। পাঁচকড়ি সর্দার ও মেঘাইয়ের উপর তার জাতক্রোধ হোল। প্রণয়ের ধ্যান রূপান্তরিত হ'ল প্রতি-হিংসায়। প্রেমিক হল শৃঙ্খলাহীন ভয়াবহ দুর্দ্ধর্ষ জীবনের প্রতীক। শান্ত, সৌম্য, বৈষ্ণব প্রলয়ঙ্কর প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে উঠল।

অচিরে বিশ্বনাথ দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতে রূপান্তরিত হল। কিন্তু নিজ অকুতোভয়তা ও সহৃদয়তায় বলে বিশ্বনাথ দস্যু-ব্যবসাকে মনোহর করে তুলেছিল। তাঁর কৃত লোকহিত কথা আজও নদীয়ার ঘরে ঘরে কথিত হয়। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এদেশে কিরূপ উৎচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করত—তখনকার 'মানাসুরে' ও ডাকাতদল তার প্রমাণ। নিম্ন শ্রেণীর দারিদ্র্য ও উচ্চশ্রেণীর অত্যাচার এরূপ অরাজকতার কারণ। এ বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করেছি। এই অবস্থায় যে-কোন সমাজে কাপুরুষতা এবং দারুণ প্রতিহিংসার ভাব অত্যাচারিতের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। সেজন্যই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে বাংলার ধন-প্রাণ নিরাপদ ছিল না। এমনও শোনা যায়, একটিমাত্র রৌপ্য মুদ্রার লোভে 'মানাসুরে' তরুণ ব্রাহ্মণতনয়কে হত্যা করে দেখেছে, তার গাঁটের সে ধন ডবল পয়সা মাত্র। নরঘাতী দস্যুপুত্র একদা পিতৃসমক্ষে অনুশোচনা করে বলেছিল, 'না জেনে ৪টি পয়সার জন্য সে একটা মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।' পিতা প্রবোধ দিয়েছিলেন, 'অনেকগুলো মানুষ না মারলে ৪টি পয়সা আসে না।' এমনই ছিল সে যুগ। বিশ্বনাথ এইপ্রকার কাপুরুষতা ও নিরর্থক অত্যাচারকে প্রশমিত করেন। এই সময়কার সমাজের নেতা ধনবান এবং তাদেরই আশ্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল বিশ্বনাথকে যমের মত ভয় করতে শিখল। বিশ্বনাথের অভ্যুদয়ে 'মানাসুরে'র দল অন্তর্হিত হয়েছিল। বিশ্বনাথের আবির্ভাবের ফলেই ডাকাতেরা স্ত্রীলোক, বালক এবং গরীব লোকদের প্রতি বীরোচিত ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করতে শিখল। অপর দিকে দেশের ধনকুবেরগণ বুঝতে পারলেন—তাঁদের অগাধ ধনের একাংশ বিশ্বনাথবাবুর অবশ্য প্রাপ্য।

দলবদ্ধ ডাকাতি সেদিন নানা কারণে মানুষের পেশা হয়েছিল। বিত্তবান ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা কেবলমাত্র নিজেদের ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্যই এইরূপ ডাকাতদল নিযুক্ত করতো না—শত্রুদমন করার জন্যও পালন করতো। বিশ্বনাথ অচিরে দস্যুর সর্দার হয়ে ওঠেন এবং স্বীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রায় শতাধিক বিদ্রোহী লোক নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করেন। ব্যর্থপ্রেমিক বিশ্বনাথ পরে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁর এই স্ত্রী প্রথম প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করেন। দিগনগরের উত্তরে ইটলেবেড়ে নামক এক গ্রাম আছে। তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়ী ছিল এই গ্রামে। ইনি প্রথমে বিশ্বনাথের রক্ষিতা ছিলেন। পরে তাঁর মায়ের অনুরোধে মেয়েটিকে বিবাহ করেন।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

---

৯ বালক। ফাল্গুন, ১২৯২

১০ বিশ্বনাথ (উপন্যাস) ১৩০৩—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

১১ বিশে ডাকাত, যুগান্তর সাময়িকী। ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০।

১২ কুখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ।—মোহিত রায়, আনন্দবাজার, ১৪ই আশ্বিন। ১৩৬৮

# প্রেমের কাহিনী

শ্রীজয়শ্রী বসু

## অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা

ভূমধ্যসাগর পার হয়ে মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা এসেছেন মার্ক অ্যান্টনির সঙ্গে দেখা করতে। এশিয়ামাইনরে কিডনাস নদীর তীরে তাঁর সৈন্যবাহিনী সহ তাঁবু ফেলেছেন মহাবীর মার্ক অ্যান্টনি। যে তিনজন নেতা সে সময় রোম সাম্রাজ্য শাসন করতেন, অ্যান্টনি তাঁদেরই একজন।

মিশরের রাণী ছিলেন ক্লিওপেট্রা, কিন্তু মিশর-রাজ্যের অস্তিত্বই ছিল রোমের দয়ার ওপর নির্ভরশীল।

মার্ক অ্যান্টনির কাছে ক্লিওপেট্রা চলেছেন তাঁর রাজ্যের ভবিষ্যৎ জানতে। তাঁর মনে পড়ছিল, দশ বছর আগে এমনি করেই তিনি দেখা করতে চলেছিলেন রোম-সাম্রাজ্যের আরেকজন মহাবীর নেতার সঙ্গে—তিনি জুলিয়াস সীজার।

টলেমির কন্যা ক্লিওপেট্রা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে যুগ্মভাবেই মিশরের সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক চক্রান্তে কিছুদিন পরেই তিনি ক্ষমতা হারান এবং নির্বাসিতা হন।

দিগ্বিজয়ী সীজার যখন প্রাচ্যে এলেন, তখন তরুণী ক্লিওপেট্রা ভাবলেন সীজারের সঙ্গে দেখা করে হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে তাঁর সাহায্য চাইবেন। কিন্তু সীজার তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না। মহাব্যস্ত তিনি। বালিকার সঙ্গে দেখা করে নষ্ট করবার মতো তাঁর সময় কোথায়? ক্লিওপেট্রা তখন বলে পাঠালেন—তিনি সীজারকে সীজারের উপযুক্তই একটি উপহার পাঠাতে চান। ক্লিওপেট্রার ক্রীতদাসেরা যখন উপহারের আধারটি সীজারের কাছে এনে তার আবরণ খুলল, তখন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং ক্লিওপেট্রা, যেন রেশমীগুটি থেকে বেরিয়ে এল প্রজাপতি! অথবা শুক্তি থেকে মুক্তা। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন বিজয়ী জুলিয়াস সীজার। তারপর যুদ্ধ করে আবার মিশরের সিংহাসনে বসালেন ক্লিওপেট্রাকে। সীজারের সঙ্গে রোমেও গিয়েছিলেন ক্লিওপেট্রা। ফিরে এসেছিলেন সীজারের মৃত্যুর পর।

অ্যান্টনি-সন্দর্শনে যেতে যেতে এই পুরোনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ছিলো ক্লিওপেট্রার।

* * *

মার্ক অ্যান্টনি রোমের এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তিনি ছিলেন সীজারের অন্যতম প্রধান সেনাপতি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সীজার নিহত হবার পরে অ্যান্টনিও রোমের অধীশ্বর হবার চেষ্টা করেছিলেন। নেতায় নেতায় রেষারেষির পর শেষ পর্যন্ত রফা হল, অ্যান্টনি, অক্টেভিয়াস ও লেপিডাস—এই তিনজন যুক্তভাবে রোম সাম্রাজ্য শাসন করবেন।

অ্যান্টনির জীবনের বেশীর ভাগই যুদ্ধক্ষেত্রে কেটেছে। অ্যান্টনি অমিতব্যয়ী, মাতাল এবং জুয়ায় আসক্ত হলেও অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর দিলদরিয়া স্বভাবের জন্য তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। অ্যান্টনি বিবাহিত ছিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না।

অ্যান্টনি জানতেন সীজার এবং ক্লিওপেট্রার প্রেমজীবনের কথা। জানতেন ক্লিওপেট্রার বিলাসিতা এবং মোহিনী শক্তির কথা। এশিয়া-মাইনরে ক্লিওপেট্রা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনে বিস্ময়ে আর রোমাঞ্চে ভরে উঠলো অ্যান্টনির মন।

উজান বেয়ে এগিয়ে চলল ক্লিওপেট্রার নৌবহর, মাঝখানে ক্লিওপেট্রার বজরা। ধীরে ধীরে তাঁর নৌবহর রোমানদের দৃষ্টিগোচর হল।

অ্যান্টনির অতিথি হলেন ক্লিওপেট্রা; এক সঙ্গে আহার করলেন দুজনে। ক্লিওপেট্রা তাঁর মোহিনী রূপের জালে অ্যান্টনিকে জড়াতে বিলম্ব করলেন না।

তাঁদের সাক্ষাতের মুহূর্ত্ত থেকেই অ্যান্টনি ভুলে গেলেন রোম, ভুলে গেলেন তাঁর কর্ত্তব্য, তাঁর ঐতিহ্য। তাঁর মনে হ'ল যেন প্রাচ্যের এই মোহময়ী, রহস্যময়ী নারীর জন্যই তিনি সারা জীবন অপেক্ষা করছিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল তখন প্রমোদ-বিলাসের তীর্থভূমি। অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার সঙ্গে গেলেন মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায়। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার এই নগরীর পত্তন করেছিলেন খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩১ সালে। রোমের উত্থানের আগে গ্রীসই পৃথিবী-বিজয়ী হয়েছিল। পুরাতন পৃথিবীর সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়ায় একাধিক পাঠাগার, যাদুঘর এবং বিরাট প্রাসাদ ছিল।

আলেকজাণ্ডারের পত্তন করা ভূমধ্যসাগরের তীরে এই সুন্দর বন্দরটি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।

এই নগরীর এক-পঞ্চমাংশ ছিল ক্লিওপেট্রার রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের সঙ্গেই ছিল প্রাচ্যের সাহিত্য ও দর্শনের ভাণ্ডাররূপী বিরাট গ্রন্থাগার। আশ্চর্য্য এই নগরী! একদিকে যেমন ছিল সংস্কৃতির তীর্থ, অন্যদিকে এ নগরীতে ছিল প্রমোদ-বিলাস আর ব্যভিচারের বন্যা।

এ সবেরই অধিষ্ঠাত্রী সম্রাজ্ঞী ছিলেন ক্লিওপেট্রা, আর এ সবের সম্রাট এবং দাস হলেন মার্ক অ্যান্টনি।

সারা শীতকালটা তাঁরা দুজনে একসঙ্গে রইলেন, শপথ করলেন—কেউ কাউকে কখনো ত্যাগ করবেন না এবং একসঙ্গে তাঁরা প্রাচ্যে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করে দুজনে মিলে শাসন করবেন, রোমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। কে বলতে পারে, ভবিষ্যতে হয়ত রোম জয় করে তাঁরা সমগ্র পৃথিবীই শাসন করতে পারবেন।

শীতকাল যেন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। তারপর যথানিয়মে এলো ঋতুরাজ বসন্ত। আর সেই বসন্তে সহসা সচকিত হয়ে উঠলেন মার্ক অ্যান্টনি। তিনি যখন ক্লিওপেট্রার মোহে আত্মহারা, সেই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ পার্থিয়ান জাতি রোম-অধিকৃত সিরিয়া আক্রমণ করল। ওদিকে রোমে অক্টেভিয়াসের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত গড়ে উঠেছে, যার ফলে পরে মার্ক অ্যান্টনিরও ক্ষতি হতে পারে। এবার অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রাকে রেখে রোমে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন অক্টেভিয়াস তাঁর প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন এবং এখন তিনিই অ্যান্টনির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কিছুদিন আগে অ্যান্টনির প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। অ্যান্টনি অক্টেভিয়াসের বোন অক্টেভিয়াকে বিবাহ করলেন। এই বিবাহের ফলে মার্ক অ্যান্টনি হলেন অক্টেভিয়াসের ভগ্নীপতি। তাঁদের রাজনৈতিক রেষারেষির এইভাবে অবসান হল। কিন্তু এ বিবাহ নিতান্তই রাজনৈতিক; এতে প্রেম-ভালবাসা ছিল না, অ্যান্টনির মন পড়ে ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায় ক্লিওপেট্রার কাছে।

এই বিয়ের পর অ্যান্টনি রোম ছেড়ে চলে গেলেন পার্থিয়ানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে। সাময়িকভাবে তাদের কিছুটা শায়েস্তা করেই আবার চলে গেলেন আলেকজান্দ্রিয়ায় ক্লিওপেট্রার কাছে। তারপর দুজনে একসঙ্গে কাটাতে লাগলেন।

কথিত আছে, আরব্যোপন্যাসের খলিফা হারুণ-অল-রসিদের মতো এঁরা দুজনেও ছদ্মবেশে আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। "নীলনদের নাগিনী" ক্লিওপেট্রা ক্রমে অ্যান্টনিকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন তাঁর মোহিনী মায়ার জালে। ক্লিওপেট্রার মতো অনন্যার হৃদয়ের অধীশ্বর হয়েছেন তিনি, এই গর্বে অ্যান্টনি নিজেকে একটি দেবতাবিশেষ বলে মনে করতে লাগলেন। তাঁর অত্যধিক এবং অশোভন বিলাসিতার খবর রোমেও পৌঁছলো।

খৃষ্টপূর্ব ৩২ সালে অ্যান্টনি স্থির করলেন, তিনি এবং ক্লিওপেট্রা দুজনে মিলে একটি নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রোম সাম্রাজ্যকে টেক্কা দেবেন। এই ভেবে ঠিক করলেন, ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা বিবাহ দ্বারা বৈধ করে নিতে হবে। অক্টেভিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ তিনি বাতিল বলে ঘোষণা করলেন। অক্টেভিয়াস স্বভাবতঃই তাঁর বোনের পক্ষ নিয়ে অ্যান্টনির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে ফেলে নিজেকে রোমের একমাত্র শাসক বলে ঘোষণা করলেন।

অক্টেভিয়াস তাঁর সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়ে পথের কাঁটা অ্যান্টনিকে চিরতরে বাতিল করে দেবার জন্য তৈরী হলেন। উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখী হল। যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে—অ্যান্টনির বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু ক্লিওপেট্রার পক্ষে অ্যান্টনি যুদ্ধযাত্রা করলেন। রোমের কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে তিনি একটি প্রাচ্য সাম্রাজ্য স্থাপন করার ষড়যন্ত্র করছেন, এই অপরাধে রোমের 'সেনেট' (শাসক বা ব্যবস্থাপক সভা) অ্যান্টনিকে রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তার পদ থেকে বিচ্যুত করেছিলেন।

প্রথম আক্রমণটা অ্যান্টনিই করলেন। ক্লিওপেট্রাও অ্যান্টনির সঙ্গে এসেছিলেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর (ক্লিওপেট্রার) নিজের পাঁচ ডজন রণতরী। লড়াই সমান-সমান চলছিল। কেউ কেউ বলেন, অ্যান্টনির সৈন্যরাই জয়ী হতে যাচ্ছিল। কিন্তু ক্লিওপেট্রা হঠাৎ এমন এক কাণ্ড করে বসলেন, যাতে যুদ্ধের গতিই বদলে গেল। তিনি তাঁর ষাটটি রণতরী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে চললেন আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে।

অ্যান্টনি দেখতে পেলেন ক্লিওপেট্রার এই অপ্রত্যাশিত পলায়ন। ক্লিওপেট্রার ষাটটি রণতরী ছাড়াও হয়তো যুদ্ধ জয় হ'ত আর তিনিও পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারতেন। কিন্তু অ্যান্টনি যখন দেখলেন তাঁর প্রিয়তমা ক্লিওপেট্রা চলে যাচ্ছেন, তখন তিনি আর থাকতে পারলেন না, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ক্লিওপেট্রার পিছু নিলেন।

নেতার অভাবে ছত্রভঙ্গ, বিশৃঙ্খল হয়ে অ্যান্টনির নৌবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল অক্টেভিয়াসের নৌবাহিনীর সুশৃঙ্খল আক্রমণে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় থেকে ক্লিওপেট্রা ও অ্যান্টনি আবার নতুন করে সৈন্যবাহিনী সুনিয়ন্ত্রিত করে দু'বছরেরও বেশী যুদ্ধ চালালেন। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে দুটি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে অক্টেভিয়াস তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করলেন।

অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন চূরমার হয়ে গেল।

ক্লিওপেট্রার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। তাঁর বয়স তখন ৩৭ বছর। তিনি তখন আর মোহময়ী সুন্দরী তরুণী নন। তিনি ঠিক করলেন—অক্টেভিয়াসকে হাত করতে হবে অন্য কৌশলে।

অক্টেভিয়াসের একটিমাত্র উদ্দেশ্য সাধন বাকি ছিল—তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্টনির নিধন। অক্টেভিয়াস ভাবলেন এই উদ্দেশ্য সাধনে ক্লিওপেট্রাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। তিনি ইঙ্গিতে ক্লিওপেট্রাকে বুঝতে দিলেন যে, অ্যান্টনিকে চিরতরে সরিয়ে দিতে পারলেই ক্লিওপেট্রা অক্টেভিয়াসকে পাবেন। অক্টেভিয়াসের এই ইঙ্গিতের ফাঁদে পা দিলেন ক্লিওপেট্রা।

ক্লিওপেট্রা একটি বিরাট সমাধি-মন্দির তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন দু'জনের জন্য; অ্যান্টনি আর তিনি মৃত্যুর পর ঐ মন্দিরে পাশাপাশি থাকবেন বলে। তিনি অ্যান্টনিকে জানালেন—সমস্ত আশা নির্মূল হয়েছে, এসেছে মৃত্যুবরণ করে ঐ সমাধি-মন্দিরে পাশাপাশি চির আশ্রয় নেবার পালা।

সমাধি-মন্দিরে পৌঁছে অ্যান্টনি ভাবলেন, ক্লিওপেট্রা তাঁর আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। ক্লিওপেট্রাহীন জীবনে বীতস্পৃহ অ্যান্টনি নিজের তরবারি দ্বারা আত্মঘাতী হলেন। চিরতরে সরে গেল অক্টেভিয়াসের একমাত্র পথের কাঁটা। তখন অক্টেভিয়াসের কাছে গিয়ে ক্লিওপেট্রা দাবী করলেন তাঁর সিংহাসন আর পুরস্কার। অক্টেভিয়াস তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না।

অক্টেভিয়াসের দ্বারা এভাবে অপমানিত হয়ে ধিক্কারে ভরে গেল ক্লিওপেট্রার মন; আর ভরে গেল অনুশোচনায়, প্রেমিক বীর অ্যান্টনির প্রতি নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে। ভেবে দেখলেন তিনিও ভালোবেসেছিলেন অ্যান্টনিকে—কি কুক্ষণে অক্টেভিয়াসের ফাঁদে পড়ার দুর্গতি হয়েছিল তাঁর! একটি বিষাক্ত সাপের দংশন বক্ষে গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করলেন ক্লিওপেট্রা। এর পর সম্রাট অগাষ্টাস নামে অক্টেভিয়াস রোম-সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বে সাহিত্য ও শিল্প অসামান্য উন্নতি লাভ করেছিল।

অক্টেভিয়াসের কাছে ক্ষমতার লড়াইতে হেরে গিয়েছিলেন অ্যান্টনি। কিন্তু ইতিহাসে বেঁচে আছেন ক্লিওপেট্রার প্রেমিকরূপে। তাঁর প্রেমকাহিনী সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন সেক্সপীয়ার, তাঁর বিখ্যাত "অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা" নাটকে।
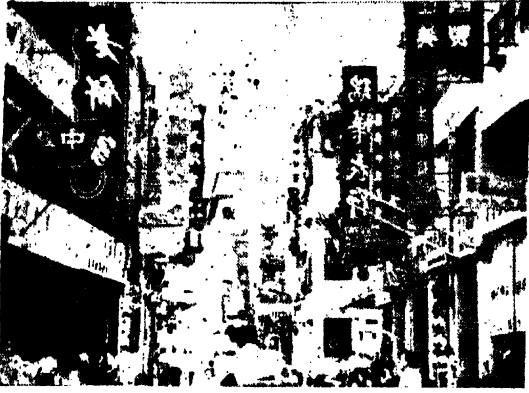
হংকং-এর একটি রাস্তার দৃশ্য

# জাপানে যা দেখে এলাম

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র

গত বছর ( ১৯৬১ ) জুন মাসে জাপানের রাজধানী টোকিওতে রোটারী ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় এবং সেই উপলক্ষে আমার জাপানে যাওয়ার সুযোগও ঘটেছিল। ভেবেছিলাম, আমার নিজের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়াও পৃথিবীর সেরা শিল্পপতিদের সঙ্গে আলাপ হবার সুবর্ণ সুযোগ হয়ত ঘটবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্লেনে জায়গা না পাওয়ায় সে ইচ্ছা আমাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া টোকিওতে তখন এত ভীড় হয়েছিল যে, হোটেলে জায়গা না পাওয়ায় কিছু লোককে জাহাজেই থাকতে হয়েছিল।

যাই হোক, পূজার পরে যাওয়াই আমি স্থির করলুম। বিজয়া দশমীর পরের দিন। সে দিনটা ছিল শুক্রবার, ২০শে অক্টোবর। আমি এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল 'জেট' বিমানযোগে জাপান যাত্রা করলাম। ব্যাংকক ও হংকং-এ থেমে প্লেন শনিবার, ২১শে অক্টোবর যখন টোকিওতে পৌঁছল তখন টোকিওর ঘড়িতে রাত ১টা ১৫ মিনিট, অর্থাৎ পৌঁছানোর নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্বে। বিমান থেকে রাত্রে হংকং-এর দৃশ্য বাস্তবিকই অনুপম। সহরটা হচ্ছে পাহাড়ের ওপরে। আর সমুদ্রের গা ঘেঁষে পাহাড়ের উচ্চাবচ স্থানগুলোতে ছড়ানো আছে নানা রং-এর ও নানা আকারের নিয়ন আলোকবিধৃত অসংখ্য সৌধাবলী ও বিপণিমালা।

হংকং থেকেই আবহাওয়া ঝোড়ো হয়ে ওঠে। যদিও আমাদের বিরাট জেট প্লেন সমুদ্র সমতল থেকে ৩০।৩৫ হাজার ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তবু আমাদের কিছু 'বাম্পিং' সহ্য করতে হয়। যখন আমরা টোকিও বিমান-ঘাঁটিতে এসে নামলাম, তখন প্রবল বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় এত রাত্রে ভয় হয়েছিল, হয়ত আমাকে অসহায় হয়ে পড়তে হবে। এই বৃষ্টিতে এত রাত্রে আমাকে কেউ নিতে আসবে, এ আমি আশা করিনি। কিন্তু কাষ্টমসের Clearance Counter Officer আমার হাতে যখন এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেল তখন একটু বিস্মিত হয়ে পড়ে দেখি যে, তাতে লেখা রয়েছে, সিঁড়ির ধারে একজন বিশেষ ভদ্রলোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আরও একজনের সঙ্গে সেখানে দেখা হল। জাপানীদের বহুবিদিত আতিথেয়তার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সত্যি কথা বলতে কি, ভদ্রলোক আমাকে নিতে না এলে আমি বেশ একটু অসুবিধের মধ্যে পড়তাম; কারণ, যে হোটেলে আমার আগে যাবার কথা ছিল, সেখানে জায়গা পাওয়া যায়নি। এখবর আমাকে আগেই দেওয়া হয়েছিল। দেশভ্রমণকারীদের পক্ষে সেটা তখন শ্রেষ্ঠ ঋতু; কাজেই, এই সময় আগে থেকে রিজার্ভ না করে রাখলে কোনো হোটেলেই জায়গা পাওয়া কঠিন।

সেই জাপানী ভদ্রলোকটি শুধু যে সেই রাত্রেই বিমান-ঘাঁটি থেকে তাঁর নিজের মোটরগাড়ী করে আমাকে তাঁদেরই নির্দিষ্ট হোটেলে পৌঁছে দেন তাই নয়, আবার আমার দেশে ফেরবার দিনও তাঁরা নিজেদের গাড়ীতে বিমান-ঘাঁটিতে এসে বিদায় দিয়ে যান। তিনি
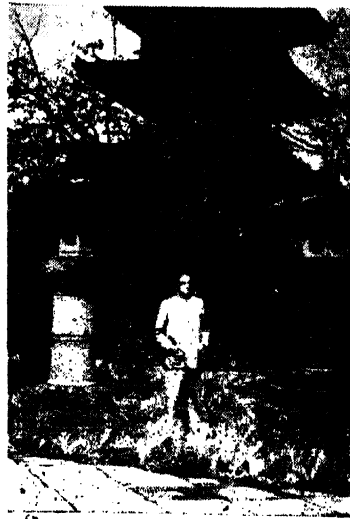
টোকিওর ইউনো পার্কে লেখক।

এবং আরও অনেকেই আমাকে তাঁদের গাড়ী ব্যবহার করতে দিয়ে এবং মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেছেন।

আমাকে যে হোটেলে তাঁরা থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সেটি বেশ ভাল একটি ইয়োরোপীয় ধরণের হোটেল এবং সেটি টোকিও রেল-ষ্টেশনের কাছেই। টোকিওর মারুনৌচি 'গিন্‌জা' অঞ্চলে 'ফিফ্‌থ এভেনিউ' বা 'Rue de La Paix' রাস্তার ওপরে হোটেলটি। এ-জায়গাটিতে অনেক প্রসিদ্ধ বড় বড় দোকান, ব্যাঙ্ক, অফিস, হোটেল ও রেস্তোঁরাঁর ভীড়। ঐ জায়গার অন্যান্য নতুন বাড়ীগুলির মত এ হোটেলটিও ন' তলা উঁচু। ওখানে আবার মাটির নীচেয় অনেকগুলি ঘর থাকার দরুণ সবচেয়ে নীচের তলাকেই একতলা হিসাবে ধরা হয়। এদেশে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলে ১০০ ফিটের চেয়ে উঁচু বাড়ী করা বে-আইনী।

টোকিওতে বিলিতী ধরণের যে-সব হোটেল আছে, সেখানে সংলগ্ন স্নানের ঘর সহ একখানি কামরায় শুধু থাকবার জন্য দৈনিক ৩০০০-৩৫০০ ইয়েন ভাড়া দিতে হয়; অধিকন্তু পরিচর্যার ব্যয় বাবদ আরও শতকরা দশ ইয়েন লাগে। আমাদের দেশের এক টাকা ওখানে ৭৫ ইয়েনের সমান। হোটেলে রেস্তোরাঁও আছে। সেখানে খাওয়া, না-খাওয়া অতিথিদের ইচ্ছাধীন। এখানে ভারতীয় মুদ্রায় প্রতিদিন থাকা-খাওয়ার খরচ পড়ে প্রায় ৭৫-৮৫ টাকার মতন। অবশ্য এর চেয়েও বেশি খরচের এবং কম খরচেরও ইয়োরোপীয় ধরণের হোটেল এখানে আছে।

হোটেলে থাকার সুখ-সুবিধা জাপানে দিন-দিনই ভাল হচ্ছে। 'জাপান হোটেল এসোসিয়েশনে'র (সরাই সমিতির) অন্তর্ভুক্ত ১০০টির ওপর হোটেলে বিদেশী ভ্রমণকারীরা বেশ ভালভাবে খাওয়া-থাকার সবরকম আরাম আশা করতে পারেন। বিলিতী ধরণের হোটেলগুলি ছাড়াও আরও ২৪০টি জাপানী সরাইখানা আছে—বিদেশী যাত্রীদের থাকার যোগ্য বলে যা জাপান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। ওখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভাল। বিলিতী ধরণের হোটেল-গুলির চেয়ে এ হোটেলগুলি সস্তা। এই ধরণের সরাইখানা এদেশে আরো অনেক আছে বটে; কিন্তু বিদেশী পর্যটকদের পক্ষে জাপানী সরকারের অনুমোদিত হোটেলগুলিতে থাকা ভাল।

এখানে জাপানী রেস্তোরাঁ আছে অসংখ্য। এই সব রেস্তোরাঁ আর হোটেলগুলির অধিকাংশ কর্মীই মহিলা। তা ছাড়া দেশীয় বিশুদ্ধ জাপানী রেস্তোরাঁগুলিতে টেবিল-চেয়ারের কোনও ব্যবস্থা নেই। মেঝেয় পাতা মাদুরের ওপর বসতে হয়। সামনে থাকে একটি নীচু ছোট চৌকি। এই সব বিশুদ্ধ জাপানী রেস্তোরাঁগুলিতে অতিথিদের আহারান্তে চটুল নৃত্য-গীত পরিবেশনের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

এছাড়া জাপানে আর একরকম বিশেষ ধরণের রেস্তোরাঁও আছে—এগুলিকে বলে 'টেম্পুরা'। এখানে টাটকা গরম মাছ ভাজা (বেশীর ভাগই বাগ্‌দা বা গলদা চিংড়ী) পরিবেশন করা হয়। এ ধরণের রেস্তোরাঁগুলির বিশেষত্ব হল যে, খাবার ঘরের ঠিক মাঝখানে থাকে বিদ্যুৎচালিত রন্ধন-সরঞ্জাম এবং এরই চারপাশে ঘিরে বসেন ভোজনাভি-লাষীরা। খাবার টেবিলখানি বৃত্তাকারে গোল হয়ে ঘুরে গেছে। সূপকার এই বৃত্তের কেন্দ্র থেকেই গরম-গরম খাদ্য পরিবেশন করে। এ ধরণের টেম্পুরা রেস্তোরাঁর সংখ্যা খুব বেশী নয়। এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মাছ-মাংস সংরক্ষণাগার আছে। সেখান থেকে প্রতিদিন এই সব টেম্পুরার মাছ নিয়ে আসা হয়।

আগেই বলা হয়েছে, এখানকার হোটেল আর রেস্তোরাঁগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা নিয়োগ করা হয় অতিথি-পরিচর্যার জন্য। এমন কি, ব্যাঙ্ক ও অফিসেও দেখা যায় শতকরা দশ থেকে তিরিশ ভাগ মহিলা কর্মী। ব্যাঙ্ক অব্‌ টোকিওর ম্যানেজারের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছিল। তিনি বলেন যে, মেয়েদের কাছ থেকে অল্প বেতনে ভাল কাজ পাওয়া যায়।

জাপানের প্রচলিত রীতি হচ্ছে যে, এখানে কোনো রেষ্টুরেন্টে অথবা কোনো ভদ্রলোকের বাড়ীতে কেউ জুতা পরে ভেতরে যান না। সাধারণতঃ অতিথিদের সাময়িক ব্যবহারের জন্য রেষ্টুরেন্টগুলিতে বিশেষ ধরণের নির্দোষ পাদুকা সরবরাহ করা হয়।

বারো মাসের মধ্যে মাত্র তিন মাস—মার্চ থেকে মে পর্যন্ত এখানে বসন্ত ঋতু। এই সময় তাপমাত্রা ৪৫°F থেকে ৬২°F-এর (ফারেনহাইট) মধ্যে থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুতে, অর্থাৎ জুন থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে ৬৯°F থেকে ৭৮°F ওঠে। শরৎকাল এখানে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। এ সময় তাপমাত্রা ৭১°F থেকে ৫৭°F পর্যন্ত নেমে যায়। আবার শীতকালে, অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকে ৪০°F থেকে ৩৮°F-এর মধ্যে।

বসন্ত ও শরতে জাপানীরা হাল্কা পশমের কাপড়-জামা পরে। গ্রীষ্মকালে সূতী, পাতলা সিল্ক কিংবা স্পোর্ট পোষাকের ব্যবহার হয়। তা ছাড়া এই সময় হাল্কা বর্ষাতি কাজ দেয়। শীতকালে সোয়েটার, গরম পোষাক ও ওভারকোটের প্রয়োজন হয়।

জাপানকে বলা হয় 'প্রশান্ত মহাসাগরের ভাসমান স্বর্গ'। এটা একটুও অত্যুক্তি নয়। জাপানের লোক-সংখ্যা আমরা জানি প্রায় নয় কোটি চল্লিশ লক্ষ; আর উত্তর থেকে দক্ষিণে একেবারে চীনের উপকূল ঘেঁষে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর অবধি প্রায় ১,৪৩,০০০

একটি জাপানী রেষ্টুরেন্টে লেখক।
লেখকের বামপাশে রেষ্টুরেন্টের অতিথি-আপ্যায়নকারিণী।

বর্গ মাইল পর্যন্ত জাপানের ভৌগোলিক সীমা। অধিকাংশ দ্বীপই পর্বত-সঙ্কুল। পাহাড় এবং তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলি, উর্বর প্রান্তর বিস্তৃত তার উভয়কূলে, মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী ইত্যাদি সব মিলে জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এনেছে এক নিসর্গ বৈচিত্র্য। টোকিওর পথগুলি ঢেউ-খেলানো, যেমন পর্বতচূড়ায় অবস্থিত সহরগুলিতে সাধারণতঃ হয়ে থাকে। একমাত্র হোক্কাইদো, অর্থাৎ জাপানের একেবারে উত্তর সীমান্তবর্তী দ্বীপগুলি ছাড়া এদেশের আবহাওয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী এবং ইয়োরোপের মাঝামাঝি ও দক্ষিণ অংশের অনুরূপ।

জাপানের মর্মস্থল এই টোকিওতে অতিথিরা একেবারে নিজেদের বাড়ীর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেন; কারণ এখানে আধুনিক কালের সবরকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। টোকিওর একেবারে সুদূর জনপদগুলির সঙ্গে পরিবহনের পর্যন্ত যোগাযোগ আছে। ট্যাক্সির ভাড়া প্রায় ভারতেরই অনুরূপ। যানবাহনের এই সুযোগ পাওয়া যায় বলে পর্যটকেরা জাপানের সুপ্রসিদ্ধ প্রত্যেক দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখে আসবার এবং এখানকার নিসর্গ সৌন্দর্যের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে তা উপভোগ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পান। এখানকার প্রাচীন 'কাবুকী' নাট্যাভিনয়—যাতে পুরুষেরা মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং 'নোহ' নাট্য, যাদুঘরে রক্ষিত বহু শতাব্দীর পুরাতন শিল্পসামগ্রী, সুচারু পরিকল্পনায় প্রস্তুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ উদ্যান, টোকিওর উৎসব-দিবসের অনুকৃতি ও ললিত-নৃত্যকলার পরিচয়। আমি যে-সময় জাপানে যাই, ঠিক সেই সময় ওখানে শারদোৎসব সুরু হয়েছিল। প্রত্যেক চলচ্চিত্র ও নাট্যশালায় তখন শারদোৎসবের মনোহর নৃত্যনাট্য ও চিত্রপ্রদর্শন চলছে।

টোকিওর জন-সংখ্যা প্রায় এক কোটি। শুনেছি যে, জাপানে বেকার-সমস্যা নেই। জাপানের পথে-ঘাটে কোন ভিখারী আমার চোখে পড়েনি। এদের আর্থিক অবস্থা কত ভাল তার প্রমাণ হল যে, শতকরা ২টি বাড়ীতে এখানে টেলিভিশন সেট আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই রেডিও, ইলেক্ট্রিক কুকিং রেঞ্জ এবং কাপড় কাচা কল আছে। এর কারণ হচ্ছে যে, এখানে প্রায় প্রত্যেকটি জিনিষই, এমন কি মোটরগাড়ী পর্যন্ত মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ্য চুক্তিতে ধারে কিনতে পাওয়া যায়। এখানকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের ধর্মঘট হয় না। পারিশ্রমিক বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত সুখ-সুবিধা আদায়ের জন্য কর্মীরা মাঝে মাঝে আন্দোলন করে বটে, কিন্তু তার জন্য কাজ বন্ধ বা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে না। কারণ এরা জানে যে, তাতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা বলে যে, তাদের অভিযোগ কোম্পানীর মালিকদের বিরুদ্ধে—দেশ বা জাতির বিরুদ্ধে নয়। ভারতবর্ষের শ্রমিকরা যদি এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তাতে মঙ্গল হবে।

জাপানের প্রধান নগরী টোকিওর পথ দিয়ে প্রায় দশ লক্ষ মোটরগাড়ী প্রতিদিন চলাচল করে। এদের সংখ্যা প্রতি মাসেই অনুমান ১২০০০ করে বেড়ে যাচ্ছে। 'ষ্ট্রীট কার', অর্থাৎ ট্রামগাড়ীর অসংখ্য লাইন টোকিও সহরের চারদিকে পাতা আছে এবং সেই লাইনে প্রতিদিন অসংখ্য 'ষ্ট্রীট কার' চলে। তা ছাড়া 'জাপানীজ্ ন্যাশনাল রেলওয়েজ'-এর অসংখ্য বৈদ্যুতিক ট্রেণ টোকিও সহরের চারদিকে লাইন ধরে এবং মাথার ওপর টানা তার ছুঁয়েও চলে। ন্যাশনাল রেলওয়েজ ছাড়াও কতকগুলি বেসরকারী যৌথ বৈদ্যুতিক রেলও টোকিও ও তার চারপাশের দর্শনীয় স্থানগুলিতে যাতায়াত করে। টোকিওতে মাথার ওপর দিয়ে যে রেল চলে, সেই লাইনের তলায় অনেক দোকানপাট ও অফিস আছে। এখানে ইলেক্ট্রিক ট্রাম-বাস, বড় রাজপথ এবং সুড়ঙ্গ-পথও আছে। এত সব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও টোকিওর প্রধান সমস্যা পথচারীদের যাতায়াতের ভীষণ ভীড়। যাত্রীদের যাতায়াতের ভীড় এত বেশী যে, পুলিসকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে যানবাহন পরিচালনা করতে হয়। অনেক সময়েই মোটরগাড়ী পার্ক করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। তবে মাটির তলায় অনেক মোটরগাড়ী রাখার গ্যারেজ আছে, সেখানে ঘণ্টা হিসাবে কিছু ন্যায়সঙ্গত ভাড়া দিলে গাড়ী রাখা চলে। টোকিওর রাজপথে আমি কোন বাইসাইকেল বা রিক্সা চলতে দেখিনি। পথে জনতার অত্যধিক ভীড়ের জন্য টোকিওর রাজপথে চলতেই দেওয়া হয় না। উপস্থিত মাথার উপর দিয়ে কেবলমাত্র বিমান-বন্দরে যাবার মোটর-গাড়ী চলবার জন্য একটি বড় রাস্তা তৈরী হচ্ছে, যাকে এরা 'Speed way' বলে।

টোকিওর দোকানপাট ও সরাইখানাগুলোতে রাত্রে নানা রং-এর ও হরেক ধরণের নিয়ন বাতি জ্বলতে থাকে; এর মধ্যে অনেকগুলি আবার নড়ে-চড়ে, জ্বলে-নেভে এবং ঘোরে। টোকিও প্রতি রাত্রে যেন উৎসব বেশে সজ্জিত হয়। সামান্য একটি ফুলের দোকানও এমন সুন্দরভাবে সাজান থাকে যে, পথচারীরা তা দেখে দোকানে ঢুকে কিছু-না-কিছু কিনতে প্রলুব্ধ হয়।

টোকিও সহরে অন্ততঃ দু'ডজন 'সব পাওয়া যায়' দোকান আছে এক-একটি ন'তলা উঁচু বাড়ীতে। এখানে ঢুকে যে-কোন লোক একটি আল্‌পিন থেকে হাতী পর্য্যন্ত কিনতে পারেন। জিনিষপত্র-গুলি সাজানও ভারী চমৎকার। ভারতবর্ষে এরকম একটিও নেই। সব দিক দিয়ে টোকিওর সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে নিউ ইয়র্কের। খেলাধূলার মধ্যে 'বেসবল' জাপানে সব চেয়ে জনপ্রিয়। ৬৫,০০০ লোক একসঙ্গে বসে দেখবার মতো একটি ষ্টেডিয়াম শুধুমাত্র 'বেসবল' খেলার জন্যই রয়েছে। অধিকন্তু, সেখানে ন্যাশনাল ষ্টেডিয়ামও আছে, যেখানে ৫৫,০০০ লোক একত্রে বসে খেলা দেখতে পারে।

এবছর টোকিওতে অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে এখন থেকেই তার বিপুল তোড়জোড় চলছে।

জাপানীদের চিরাচরিত ভদ্রতার আকর্ষণে বহু ভ্রমণকারী এদেশে বেড়াতে আসেন। তাদের এ সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে। এখানে 'কাষ্টমস' বা শুল্ক বিভাগের লোকেরা যাত্রীদের কোনওরকম কষ্ট দেন না। যে-কোনও লোক সেখানে নেমে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে কাষ্টমসের অনুসন্ধান সেরে বেরিয়ে পড়তে পারেন।

জাপানে জমির দাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে একটা মোটামুটি ধারণা হতে পারে। মারুনাউচি ও গিনজার মত জায়গায় (আমাদের চৌরঙ্গী কিম্বা পার্ক ষ্ট্রীটের মত পল্লীতে) প্রত্যেক বর্গ মিটারের দাম দশ লক্ষ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ ইয়েন পর্যন্ত।

দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে, গত মহাযুদ্ধের বিপুল ধ্বংসের পর এত অল্প সময়ের মধ্যে জাপান প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও সুবৃহৎ কলকারখানা গড়ে তুলেছে। আমি সেখানে গন্ধকাম্ল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ভেষজ সামগ্রী, সাবান, সুগন্ধিসার প্রভৃতি

প্রস্তুতের কারখানা দেখে এসেছি, যেখানে একেবারে হাল আমলের বিরাট বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হচ্ছে, অথচ শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছে যথাসম্ভব কম। একটি সাবানের কারখানায় গিয়ে দেখলাম সেখানে মাত্র দুটি স্বয়ংক্রিয় সাবান তৈরীর যন্ত্র এবং অবিরাম উৎপাদন পদ্ধতি ছাড়াও পুরাতন কর্মায় গড়া প্রণালীও চালু রয়েছে। এই কারখানায় প্রতিদিন ৫০ টন করে সাবান উৎপাদন হয়। এছাড়া এখানে বিশাল বিশ্লেষণাগার ও অনুশীলনোপযোগী গবেষণাগারও আছে।

এছাড়া আমি এখানে একটি সুগন্ধিসার এবং সুরভিতৈলের একটি কারখানা দেখে এসেছি—যা ৬০,০০০ বর্গ মিটার স্থান জুড়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক বিক্রয় প্রায় দশ লক্ষ ডলার; কিন্তু এখানে কর্মীর সংখ্যা—রসায়নবিদ ও কার্যপরিচালকদের নিয়ে আড়াইশ'র বেশী লোক নিযুক্ত করতে হয়নি। একটি ভেষজ কারখানাতেও আমি গিয়েছিলাম। এটি বৃহৎ একটি চারতলা বাড়ীতে স্থাপিত। বাড়ীটির সবটাই অনুশীলনাগার, গবেষণাগার, নানা বিভাগ ও আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। এছাড়া এখানে সিমেন্ট, রেয়ন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি বড় বড় কারখানা দেখে এলাম। ছাত্রবয়সে শুনতাম যে, সিমেন্ট জাপানে কুটীরশিল্প হিসাবে তৈরী হত এবং যে সব প্রতিষ্ঠান বিদেশে সিমেন্ট রপ্তানী করত তারা সেগুলি সংগ্রহ করে সিমেন্টের থলিতে ভরে তার ওপর নিজেদের নাম ও ট্রেড মার্কা মুদ্রিত করে বিদেশে চালান দিত। আজকাল জাপানে অনেকগুলি বড় বড় সিমেন্টের কারখানা হয়েছে। কুটীরশিল্প বলে সেখানে আজকাল আর কিছু নেই। ১৯৬১ সালে ৫ই নভেম্বর তারিখে আমি জাপান ছাড়ি; ফেরার পথে দু'দিন হংকং সহরে ছিলাম। তারপর সুইস্‌এয়ারে ৭ই নভেম্বর দেওয়ালীর দিন কোলকাতা পৌঁছই। টোকিও আর হংকং সহরের প্রতিদিনের দীপমালার তুলনায় আমাদের দেশের দীপান্বিতার রাতও ম্লান মনে হয়। হংকং সম্পর্কে দু'চারটি কথা না বলে আমি এ প্রবন্ধ শেষ করতে পারছি না।

ক্যান্টন নদীর উত্তর-পূর্ব তীরে এই 'ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনী' হংকং সহর। পর্বতসঙ্কুল এই রুক্ষ সহরটির মধ্যে অতি অল্প স্থানই সমতল। হংকং-এর বিমান ঘাঁটি যেখানে, সে স্থানটির নাম 'কোউলুন'। এ একেবারে প্রজাতান্ত্রিক চীনের সীমান্ত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং হংকং সহরের প্রধান ভূখণ্ডের উপর স্থাপিত। হংকং নদীর অপর তীরে পাহাড়ের ওপর একটি দ্বীপ। চীন সামান্ত থেকে মাত্র কয়েক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। হংকং সহরটিও পাহাড়ের ওপর স্থাপিত। কোউলুন বিমান বন্দর থেকে হংকং-এ যাওয়ার জন্য একটি পারঘাট আছে। এখানে নদী পারাপারের জন্য ষ্টীমারও পাওয়া যায়। তা ছাড়া Cable Car বা তারে ঝোলা বৈদ্যুতিক বাহনেও পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত যাওয়া যায়। হংকং-এ সর্বদেশীয় লোকের বসবাস থাকলেও এখানে চীনেদের সংখ্যাই বেশী।

হংকং একটি শুল্কমুক্ত (Free Port) বন্দর। এই জন্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের, এমন কি ভারতবাসী বণিকদের পর্যন্ত এখানে কারবার সংক্রান্ত কুঠী আছে। যে-কোনও যাত্রী যে-কোনও দেশের জিনিষ সেখানে যে দামে বিক্রী হয়, তার চেয়েও সস্তায় এখানে কিনতে পারেন।

টোকিও সহরের একেবারে বিপরীত ব্যাপার এই হংকং সহরে চোখে পড়ে। এখানে অনেক চীনে ভিক্ষুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া সাইকেল রিক্সা ও মোটবহা কুলীও মেলাই পাওয়া যায়। হংকং-এর পথে-ঘাটে অসংখ্য ছোট-বড় বিপণিতে সবরকম জিনিষ, এমন কি খাদ্যসামগ্রীও সাজান। দোকানদার ক্রেতাদের ডাকাডাকি করে। অনবরত তাদের হাঁকডাকের চোটে কাণে তালা ধরে যায়। রাস্তার ধারে চীনেরা লটারীর টিকিট বিক্রী করছে, এ দৃশ্য সর্বত্র দেখা যায়। আবার অপরদিকে সেখানে বড় বড় সব আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী, প্রকাণ্ড হোটেল, নাট্যশালা, রেস্তোরাঁও রয়েছে। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সহরটি নানা বিচিত্রবর্ণের নিয়নদীপে দীপান্বিতা হয়ে ওঠে।

## আশাবরী

### অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

নীরব সন্ধ্যার দেশে শৃঙ্খলিত আমি নাগরিক
কালের যাত্রার পথে পাথরের শুনি হাহাকার।
অনেক তারার ব্যর্থ অনন্ত হাতছানি
আকাশে নির্বাক অস্তিত্ব রেখে যায়। আর
অন্ধকারের সাথে মিতালী পাতিয়ে এই মৌন সন্ধ্যায়
অনেক অশান্ত ঢেউ (কাবেরীতে) গান গেয়ে বয়ে চলে যায়।

এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যার মহাদেশে কা'রা যেন চারদিক থেকে
জোনাকির আলো এনে বাসর সাজায় এক
আকাশের রাজমহিষীর। নিদ্রাহত পৃথিবীর বুকে
শ্যামলী রাত্রির এই নিতি অভিষেক
বসে দেখি। একটি অবুঝ মন ভরে যায় গুপ্ত কামনায়—
সূর্য্যকে আবার পাবো—আলোভরা কানায় কানায়।

## বৃষ্টির জলের দাগ

### অনিল চক্রবর্তী

বৃষ্টির জলের দাগ
পুষে রাখে সুকঠিন মৃত্তিকার মন,
সযতনে পঞ্জরের রেখায় রেখায়;
সুখের সঞ্চয় যত গোপনে শুকায়,
এখানে আকাশে শোন—
চাতকের বিষণ্ণ ক্রন্দন।

বৃষ্টির জলের দাগ
সূর্য্য জিহ্বা চেটে নেয় কিছু,
তবুও অতৃপ্ত তার অনন্ত পিয়াস;
বাঁকী জলে স্নান করে সময়ের হাঁস।
চাতকের মত যত তৃষ্ণার্ত মন
অবিরাম ধাবমান তারই পিছু পিছু।

# অবিস্মরণীয় মল্ল ভীম ভবানী

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

১৯০৯ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে, দক্ষিণ ভারতের বিশ্ববিশ্রুত ব্যায়ামবীর (শো-ম্যান্) রামমূর্তি নাইডু এসেছিলেন বাংলাদেশ পরিক্রমায়, সাথে তাঁর সার্কাস দলের লোকজন। নিজেকে তিনি ইণ্ডিয়ান্ হারকিউলিস (Indian-Hercules) বলে পরিচয় দিতেন। সে সময় ভীম ভবানী মৈমনসিং-এর জমিদার আচার্য জগৎ কিশোর চৌধুরীর কাছে চাকুরী করতেন। হঠাৎ সে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায়, উপস্থিত হলেন ময়দানে সার্কাস দেখতে। সেখানেই তিনি একদিন রামমূর্তির নজরে পড়ে যান। সেদিন ছিল ২২শে নভেম্বর, ১৯০৯ সাল। সেদিনই ভীম ভবানীর জীবনের পট আর একবার পরিবর্তিত হল। মল্লবীর ভীম ভবানীর মনে 'ষ্ট্রং মেন্‌স্ ফিট্‌স' দেখাবার প্রেরণা জাগে এবং প্রথম সুযোগেই ব্যবসার খাতিরে রামমূর্তিও তাঁকে লুফে নেন। রামমূর্তির দলের সদস্য হিসেবে ভীম ভবানী দূর প্রাচ্যে রেঙ্গুন, পেনাং, সিঙ্গাপুর, মালক্কা ও জাপান সফর করে সার্কাসের আকর্ষণীয় ক্রীড়াবিদ্‌রূপে প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, সার্কাসের কয়েকটি সত্যিকারের জোরের খেলায় ভীম ভবানীর সমকক্ষ বলী শুধু এদেশে কেন, পৃথিবীতে আজো আর কেউ জন্মান নি।

জাভা সফরের সময় একজন ডাচ্চ মল্ল রামমূর্তিকে কুস্তিতে আহ্বান করেন। রামমূর্তি বলী ছিলেন বটে, তবে মল্লবীর ছিলেন না এবং নিজেকে তিনি মল্ল বলে পরিচয়ও দিতেন না। তাই রামমূর্তির সম্মান রক্ষার্থে ভীম ভবানী নিজেই এগিয়ে এলেন এবং অতি সহজেই মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাচ্চ মল্লকে ধরাশায়ী করে তাঁর চ্যালেঞ্জের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেন।

এর পরই কোন কারণে রামমূর্তির সার্কাস দলে ভীম ভবানীর আর থাকা সম্ভব হলো না। ১৯১১ সালে ২৫শে এপ্রিল হঠাৎ তিনি একদিন কলকাতায় ফিরে এলেন। আখড়ার মাটির টানে আবার তিনি একা একা কলকাতা ও কলকাতার আশে পাশে বিভিন্ন আখড়ায় ঘুরে বেড়িয়ে পরিচিত অপরিচিত মল্লবীরদের সাথে লড়তে সুরু করলেন। এইভাবে একদিন করিম্ বখ্‌শ্, পেরলে ওয়ালার যোগ্য সাকরেদ্ মতির সাথেও তাঁর 'জানমারি-কুস্তি' বেধে যায়। এর আগে গাজীপুরের আমির পালোয়ানের সাথে সমান তালে লড়ে তিনি করিম বখ্‌শ-এর সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। রাজা পালোয়ানের মতন মতিও ভীম ভবানীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। বিশ্ব-প্রাধান্য লাভ করার আগে ঘরোয়া কুস্তিতে গোবরবাবুও কয়েকবার ভীম ভবানীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। তবে সে-সব কুস্তি প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। কেননা ভীম ভবানী গোবরবাবুকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন না। তিনি গোবরবাবুকে ছোটভায়ের মতনই স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। গোবরবাবুও একথা স্বীকার করেছেন। আর তা'ছাড়া ভীম ভবানী ও গোবরবাবু একই আখড়ার ছাত্র। উভয়েরই ওস্তাদ ছিলেন ক্ষেতুবাবু।

১৯১২ সাল। বাংলার আর একজন প্রখ্যাত ব্যায়ামবীর কেষ্টলাল বসাক বেরিয়েছেন ভারত পরিক্রমায়। উত্তর-ভারত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এখানে ওখানে বিভিন্ন ধরণের চমকপ্রদ খেলা দেখিয়ে একদিন এসে হাজির হলেন বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়, তাঁর হিপোড্রোম্ বা হিপোড্রোম্ সার্কাস পার্টি নিয়ে। এইদলে 'রাশিয়াম্ স্যাণ্ডো' নামে একজন বলী 'লোহার ডাণ্ডা বাঁকানো', 'শেকল ছেঁড়া' প্রভৃতি জোরের খেলা দেখাতেন আর রামমূর্তির মতন প্রেক্ষাগৃহে নাটকীয় উত্তেজনা বাড়াবার জন্যে প্রতিদিনই দর্শকদের আহ্বান জানাতেন। ভীম ভবানীও দর্শক হিসেবে একদিন সেখানে উপস্থিত। এর আগেই তিনি 'পান্তির মাঠে' (এখন যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ) "শিবাজী-উৎসব" উপলক্ষে অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়ে রসরাজ ৺অমৃতলাল বসুর কাছ থেকে "কলির ভীম, ভীম-ভবানী' এই আখ্যা লাভ করেন। ভীম ভবানী রাশিয়ান্ স্যাণ্ডোর আহ্বানে সাড়া দিলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। প্রথমে ভীম ভবানীর 'ষ্ট্রং মেন্‌স্ ফিট্‌স্' দেখেই 'রাশিয়ান্ স্যাণ্ডো' বিস্ময়ে হতবাক। তারপরই তিনি ভীম ভবানীকে আহ্বান জানালেন মল্লযুদ্ধে। ভীম ভবানী কোন আহ্বানেই পেছপা হবার পাত্র ছিলেন না। সাথে সাথে তিনিও রাজী হয়ে গেলেন। এই লড়াইতেই ভীম ভবানী আধঘণ্টার ওপর লড়ে 'রাশিয়ান স্যাণ্ডোকে' পরাস্ত করেন।

অনেকের মতে বিখ্যাত রুষবলী ভানা ক্রেমারই (ওয়ানা ক্রামার) 'রাশিয়ান স্যাণ্ডো' নাম নিয়েছিলেন। নামকরা ক্রীড়াবিদ ছাড়াও ভানা ক্রেমার একজন বিখ্যাত মল্ল ছিলেন। সেই বছরই এলাহাবাদে রেওয়া রাজার কুঠিতে প্রসিদ্ধ মল্ল পীর বখ্‌শ (পীরা

বখশ্ )-এর সাথে ক্রেমারের এক কুস্তি হয়েছিল। অবশ্য সে কুস্তিতেও ক্রেমার ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই পরাস্ত হয়েছিলেন। এরপরই কেষ্ট বসাক ভীম ভবানীকে তাঁর সার্কাস দলে যোগ দিতে অনুরোধ জানান। ভীম ভবানীও এক কথায় রাজি। জানা ক্রেমারের কাছেই ভীম ভবানী আধুনিক প্রথায় 'বিম্ বাঁকানো', 'বারবেল্ তোলা' প্রভৃতি জোরের খেলা শেখেন। ক্রেমারের সাথে ভীম ভবানীকেও পেয়ে হিপোড্রোন্ সার্কাসের কদরও বেড়ে গেলো। এরপরই হিপোড্রোন সার্কাস পার্টির দূর প্রাচ্য সফর সুরু হয়।

এই সফরের সময় সাংহাই শহরে একজন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী আমেরিকান্ মল্ল ভীম ভবানীকে কুস্তিতে আহ্বান করেন। এই কুস্তিতে ১০০০ ডলার বাজী রাখা হয়েছিল। ভীম ভবানী অতি সহজেই আমেরিকান্ মল্লকে পরাস্ত করে বাজীর এক হাজার ডলার আদায় করে নেন। এখানেই তিনি কন্‌সাল সাহেবের মোটর গাড়ী ধরে রেখে তাঁর নতুন মিনার্ভা মোটর গাড়ী পুরস্কার পান। এই বছরেই ১৯১৩ সালে বাংলার আর একজন মল্ল ভীম ভবানীরই অন্তরঙ্গ বন্ধু গোবরবাবু 'স্কটিশ চ্যাম্পিয়ান্' জিমি ক্যাম্পবেলকে হারিয়ে 'স্কটিশ চ্যাম্পিয়ানশিপ' ও 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মল্ল', জিমি এসেন্‌কে হারিয়ে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের কুস্তি প্রাধান্য' লাভ করেন, যা আজো আর কোন ভারতীয় মল্ল লাভ করতে পারেননি। এরপরই গোবরবাবু দেশে ফিরে আসেন, আর ভীম ভবানীও তাঁর সফর শেষ করে ফিরে আসেন। কিন্তু ঘরের বাইরে আখড়ার মাটির টান তিনি জীবনেও ভুলতে পারেননি। সময় ও সুযোগ পেলেই নিজের অজ্ঞাতসারে চলে যেতেন কোন এক আখড়াতে, সে কাছেই হোক, আর দূরেরই হোক।

এখনকার মতন তখন এত কুস্তি-প্রতিযোগিতা হোতো না, আর হলেও এত জাঁক-জমক বা টিকিট বিক্রীর ধূম লাগতো না। মাঝে মাঝে যে সব দংগল হোতো, তাতে বিদেশী নামকরা মল্লও কেউ যোগ দিতেন না। তাই তাতে প্রতিযোগী ও দর্শক কারুই তেমন আগ্রহ থাকতো না। এখনকার মতন প্রতিযোগিতা থাকলে ভীম ভবানী হয়তো সার্কাস ছেড়ে কুস্তির মধ্যেই ডুবে থাকতেন। ১৯১৬ সালে ভীম ভবানী আবার ছুটে যান কোলাপুরের দংগলে। সেখানে বিখ্যাত মল্ল গনুপুপালোয়ানের উপযুক্ত সাকরেদ ঢনুডির সাথে ভীমভবানীর যে লড়াই হয়, তা অনেকক্ষণ চলার পরেও অমীমাংসিত থেকে যায়। কেউ কাউকেই হারাতে পারেননি। এই লড়াইতে দর্শক হিসেবে গোবরবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

১৯১৭ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। চলছে লোকের মুখে মুখে জার্মাণ সাবমেরিন্ 'এমডেনে'র কাহিনী। গড়ের মাঠে পাতা হয়েছে এক বিরাট দংগলের আসর। এসেছেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতবিখ্যাত মল্লবীরেরা, এমন কি ভারতশ্রেষ্ঠ (পুরুজবন্দ) পালোয়ানেরাও। এসেছেন বিশ্বজয়ী বড় গামা, এসেছেন কাল্লু, হোসেন বখশ্ মুলতানিয়া। গুর্তা, রজ্জাব, ছোট গামা, হার্তু মুলতানিয়া প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত পালোয়ানেরাও বাদ যাননি। এবারও ভীম ভবানী বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হলেন দংগল লড়াইতে। দংগলের শেষদিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল ছোট গামার সাথে ভীমভবানীর মল্লযুদ্ধ। আম্পায়ার ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ও মৈমনসিং-এর মহারাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী। বড়গামা ও গোবরবাবুও সেদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন। ভীম ভবানী ছোটগামার চেয়ে বয়সে ৫ বছরের বড় ছিলেন। ছোটগামার বয়স তখন ২০ বছর, প্রথম শ্রেণীর মল্ল হিসেবে তখনই তিনি প্রতিষ্ঠিত। শুধু বয়সেই বড় নয়, দৈহিক বিপুলতা, শক্তির তুলনায় ও কুস্তির কলা-কৌশলেও ভীমভবানী ছোটগামার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। তা সত্বেও নওজোয়ান পাঞ্জাবী মল্ল ছোটগামা কুস্তির প্রথম পর্বে ভীম ভবানীর সাথে ২৫।৩০ মিনিট সমান তালেই লড়েছিলেন। ভীম ভবানীও বহুদিন সার্কাসদলে থাকার দরুণ কুস্তি-চর্চা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে মেদ-বহুল শরীর নিয়ে ছোটগামার মতন শক্তিমান মল্লের সাথে লড়তে কিছুটা অসুবিধা ও কষ্ট যে হচ্ছিল না, তা নয়। সেই সুযোগে ছোটগামা কয়েকবার নিপুণভাবে ভীম ভবানীকে ভূপাতিত করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভীম ভবানী বিস্ময়কর কৌশলে ছোটগামার আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। প্রায় একঘণ্টা লড়াই করেও আক্রমণকারী ছোটগামা আত্মরক্ষী ভীম ভবানীকে পরাস্ত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত লড়াইটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

১৯১৮ সালের শেষের দিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গিয়েছে, ভীম ভবানী আবার কেষ্ট বসাকের হিপোড্রোন্ সার্কাস দলের হয়ে দূর প্রাচ্য সফরে যান। 'রাশিয়ান্ স্যাণ্ডো' জানা ক্রেমার তখন সে দলে ছিলেন না। দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সফরের সময় জনকয়েক চৈনিক মল্লের সাথে ভীম ভবানীর কয়েকটি কুস্তি হয় এবং তিনি সব কয়টিতেই জয়লাভ করেন। চীন ভূ-খণ্ডে এর আগে আর কোন ভারতীয় মল্ল লড়াই করেননি। চীনদেশে তখনকার কুস্তি-ধারা ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। একটি বৃত্ত-রেখার মধ্যে দুই মল্লের শক্তি-পরীক্ষা হোতো। তা'তে দুই মল্লের মধ্যে একে অপরকে গায়ের জোরে বৃত্তরেখার বাইরে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইতো। নিয়ম ছিল বৃত্ত-রেখার বাইরে কোন প্রতিযোগী চলে গেলে বা যেতে বাধ্য হলে, তাকে পরাজিত বলে গণ্য করা হ'ত। ভীম ভবানীর শক্তির অভাব তো ছিলই না, উপরন্তু প্যাঁচপ্যাঁজার জ্ঞানেরও অভাব ছিল না। কাজেই চৈনিক মল্লদের পরাস্ত করতে তাঁকে কোন বেগ পেতে হয়নি।

১৯২০ সালের শেষের দিকে 'রাশিয়ান সার্কাস' কলকাতার ময়দানে এলো তাদের খেলা দেখাতে। ঐ দলে 'অ্যাপোলো স্যাণ্ডো' (Appolo Sandow) নামে একজন বিখ্যাত জার্মাণ-মল্ল ও বলী 'শক্তির কাজ' (Feats of Strength) দেখাতেন। তিনি এসেই বাংলার সকল শ্রেষ্ঠ মল্লের উদ্দেশ্যে এক 'মুক্ত-আহ্বান' ঘোষণা করেন। তখন ভীম ভবানী কলকাতায়, গোবরবাবু সবে অ্যাড্ সান্টেলকে হারিয়ে আমেরিকান্ মল্ল-সমিতি কর্তৃক সরকারীভাবে 'বিশ্বের নাতি-গুরু-ওজন মল্ল-প্রাধান্য' লাভ করেছেন। এ-হেন সময় বাংলার মান বাঁচাতে জার্মান মল্লের এই 'মুক্ত-আহ্বানে' ভীম ভবানী তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। অ্যাপোলো স্যাণ্ডোর কতকগুলো সর্ত্তও ছিল। এই সর্তগুলোর একটি হোল, লড়াই হবে 'ক্যাচ্-অ্যাজ ক্যাচ-ক্যান্' প্রণালীতে। দ্বিতীয় সর্ত, প্রস্তাবিত কুস্তির মধ্যস্থ থাকবেন তাঁরই দলের ম্যানেজার সাহেব। তৃতীয় সর্ত, মল্ল-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে 'রাশিয়ান সার্কাসেরই' তাঁবুর মধ্যে। চতুর্থ সর্ত, লড়াইতে বাজী থাকবে নগদ পাঁচ শত টাকা, লড়াইতে যিনি জিতবেন,

সে টাকা তাঁরই প্রাপ্য। ভীম ভবানী বিদেশী মল্লের দম্ভের প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে সেই সব সর্তেই রাজী হয়ে গেলেন। 'ক্যাচ্-অ্যাজ্-ক্যাচ্-ক্যান্' কুস্তিতে দক্ষ না হয়েও ভীম ভবানী সেবার অতি সহজেই মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জার্মাণ বলী অ্যাপোলো স্যাণ্ডোকে সম্পূর্ণরূপে চিৎ করে প্রথম চক্রের লড়াইতে জয়লাভ করেন। দ্বিতীয় চক্রের লড়াই সমান সমান থেকে যায়। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ চক্রে ভীম ভবানী জয়লাভ করে বাজীমাৎ করেন। এই 'অ্যাপোলো স্যাণ্ডো' আর 'অ্যাপোলো হারকিউলিস্' একই ব্যক্তি কিনা, আর স্কটিশ মল্ল 'উইলিয়ম্ ব্যাংকিয়র'-ই সেই ব্যক্তি কিনা, আজো তা' সঠিকভাবে জানা যায়নি। কারণ, আমাদের দেশে আগে আজকালকার মতন ইতিহাস রাখবার রেওয়াজ আদৌ ছিল না। তাই এই সব লড়াই-এর স্থান কাল দিন-ক্ষণ সঠিকভাবে পাওয়া অসম্ভব। তবে একথা ঠিক যে, বাংলার গৌরব ক্ষেতুবাবুর দুই কীর্তিমান ছাত্র ভীম ভবানী ও গোবরবাবুই মল্ল-জগতে বাংলার নাম অক্ষয় করে রেখেছেন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এত বড় বলী ও মল্ল হয়েও গোবরবাবু ও ভীম ভবানীর চমকপ্রদ জীবন-ইতিহাস আজো সার্কাসের বিখ্যাত ক্রীড়াবিদরূপেই স্মরণীয়, তাঁর মল্ল-জীবনের সংঘর্ষময় ইতিহাস আজও অবজ্ঞাত।

শক্তিরখেলাকে ভীম ভবানী যেমন ভালবেসেছেন তেমনি আবার এই খেলাই তাঁকে এনে দিয়েছে জগৎজোড়া সম্মান। আজ ভারতে বোধ হয় এমন সার্কাস-রসিক কমই আছেন, যাঁর মনে 'ভীম ভবানী' নামটি শোনবার সাথে সাথে শিহরণ জাগে না। যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন তাঁরা তো বটেই, এমন কি সেই শক্তির খেলার বিবরণ পড়বার বা শোনবার যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাও অন্তর থেকে অভিনন্দিত করেছেন সার্কাসের সেই অবিস্মরণীয় বলীকে। কিন্তু সেই সাথে আমরা কুস্তিগীর ভীম ভবানীকেও ভুলতে পারি না।

ভীম ভবানীর আসল নাম ছিল ভবেন্দ্রমোহন সাহা। কিন্তু দেশে-বিদেশে তিনি 'ভীম ভবানী' নামেই সমধিক পরিচিত। মহাভারতের মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেনের মতন উপেন্দ্রনাথ সাহার ১৪ পুত্র ও ১ কন্যার মধ্যে ভীম ভবানীও ছিলেন মধ্যম পুত্র। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের (ইংরেজী ১৮৯১ সাল) আষাঢ় মাসে হাওড়া জেলার আন্দুলমৌরী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়; ১৩২৯ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৯২২ সাল) কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ভীম ভবানীর মরদেহ আজ পৃথিবীতে নেই সত্য, কিন্তু ব্যায়াম-চর্চার ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

# কেরাণী

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়

মোরা যে শুধু কেরাণী
দশটা ছ'টায় যাতায়াত করি
চেয়ার টেবিলে জানি,—
মোরা শুধু যে কেরাণী।

অফিস ও বাড়ী, বাড়ী ও অফিস
দু'য়ে মিশে একাকার,—
যতদিন বাঁচি পৃথিবীতে শুধু
শুনে যাই হাহাকার।

অভাব মোদের চিরসাথী তায়
অভাবের গান গাই,—
মরণের সাথে হাতে হাত দিয়ে
জীবনেতে চলি ভাই।

সেলাম জানাতে এসেছি ধরায়
সেলামের দাম জানি,—
হাতের কলম থামিবে সেদিন
সেদিন মরিবে কেরাণী।

# সঞ্চয়

রমেন চৌধুরী

বেদনার সাত সাগরে তুমি যে
সান্ত্বনা-দ্বীপখানি
কাছে নেই, তবু আছে তো তোমার
অমিয়া নিঝর বাণী!
কাজল চোখের সুগভীর চাওয়া
এ-জীবনে মোর সে পরম পাওয়া
দুখের উপলে ছাওয়া বেলাভূমি
আজও করে কানাকানি;
কাছে নেই, তবু আছে তো তোমার
অমিয়া নিঝর বাণী!!

চোখের আড়ালে লুকাতে চেয়েছো···
ঠাঁই দিনু তাই মনে,
বঞ্চিত মোরে করিবে কী করে
গোপন-সঞ্চয়নে?
মনে নাই রাখো আমি তো ভুলিনি
সুরের রাখীটি আজিও খুলিনি,
ওগো পলাতকা তুমি যে আমার
শত জনমের রাণী;
কাছে নেই, তবু আছে তো তোমার
অমিয়া নিঝর বাণী!!

# পৃথিবী-বিখ্যাত জারজ

অভিধানের একটি অতি ধিকৃত শব্দ বোধ করি 'জারজ' (জার, অর্থাৎ উপপতি দ্বারা জাত সন্তান)। কী অভিশাপময় জীবন তার, সমাজে জারজ বলে যে চিহ্নিত হলো। নিজের কিছুমাত্র অপরাধ নেই, তবুও সে অপরাধী, যত সুন্দর ও গুণবান হয়েই জন্মানো যাক, জন্ম-কলঙ্ক তার ঘোচে কৈ? জন্মের বৈধ সূত্রটি হাজির করতে না পারার জন্যেই তো এই বিপদ বা লাঞ্ছনা!

কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যাবে, সামাজিক বিধান মতে জারজ পর্যায়ে যাদের ফেলা হয়, সেই ধরণের মানুষ যুগে যুগেই রয়েছে। আর সেটা যে শুধু কোন একটা বিশেষ দেশের চিত্র তা নয়, পৃথিবীর সব জায়গায় এ জিনিস আজও আছে, আগেও ছিল। বিবাহিত জীবনের বাইরে কোথাও নর-নারীর অবৈধ ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে যদি কোন সন্তান এসে গেলো, সমাজে তার পরিচিতি কি হবে? 'জারজ' আখ্যাত হয়ে একটা নিরপরাধ মানুষ অগ্রগতির পথে পা-ও বাড়াতে পারবে না, সহানুভূতির বদলে চিরকাল জুটবে তার কেবলি নিন্দা ও উপেক্ষা, এ বড়ো সাংঘাতিক কথা! অথচ দেশ-বিদেশে পুরাণ ও ইতিহাসে বহু বীর চরিত্র ও গুণী মানুষ পাওয়া যাবে, চুলচেরা হিসাব করলে যাঁদের 'জারজ' বলা ভিন্ন উপায় নেই।

খুব বেশি দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই—বিগত কয়েক শতকের মধ্যে আমরা বেশ কতক প্রতিভাবান ও প্রতিষ্ঠাবান মানুষ পেয়েছি, তথাকথিতভাবে জারজ হলেও যাঁরা পরম শ্রদ্ধেয়। শিল্পীপ্রবর লিওনার্দো দ্যভিঞ্চির নাম বিশ্বে কে না জানে, জারজদের দলে ফেলে তাঁকে অস্বীকার করতে যাওয়ার মতো ধৃষ্টতা আর কিছু হতে পারে না। জন্মগত দোষ ধরে আলেকজাণ্ডার হ্যামিণ্টনকেও আমরা নিন্দাবাদ দিতে পারি কি? জন এ্যাডামস্ একবার হ্যামিণ্টনকে
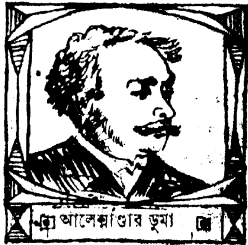
পিজারো

লক্ষ্য করেই বলেছিলেন, 'দ্যাট লিট্‌ল ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান বাষ্টার্ড' (জারজ)। কথাটি যতই সঠিক গণ্য হোক, হ্যামিণ্টনের দেশবাসী সেদিনও শ্রদ্ধাভরে তাঁর জন্ম-দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলো। অবশ্য, তাঁর অপরাধ কোন্ জায়গাটুকুতে—তাঁর সুন্দরী জননী র‍্যাচেল ফসেট তাঁর বাবাকে বিয়ে করতে চান নি। আর তা তিনি করবেনই বা কি করে? শ্রীমতী ফসেট সে-সময়ে অপর একজনের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন।

এমনি আরও কতো গণ্যমান্য ও বরেণ্য লোকের জন্মের বৈধতার প্রশ্ন তোলা যায়—রাজা আর্থার, গাওয়েন, রোলাণ্ড, শার্লেমাগনে, ফ্রান্সিস্কো পিজারো (পেরুর আবিষ্কর্তা), জন জেমস আওডুবন, বোক্কাসিও (বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক), চার্লস মারটেল প্রভৃতি। কিন্তু

ইথেল ওয়াটার্স

আলেকজাণ্ডার ডুমা

বোরোদিন

নিজেদের কর্মদোষ যদি না থাকলো, জন্মদোষের জন্যে এই স্তরের লোকেরাও অবজ্ঞাত হবেন, সে হয় না। আবার এমনও দেখা যায়, নিজে যথেষ্ট খ্যাতিমান, অথচ বাইরে 'জারজ' বলে পরিচয় দিতেও দ্বিধা নেই। জানা

যায়, বিজয়ী উইলিয়াম নিজেকে নাকি 'জারজ উইলিয়াম' বলতে এতটুকু সঙ্কোচ অনুভব করতেন না। কাষ্টাইলের দ্বিতীয় হেনরী প্রজাদের নিকট 'এল বাষ্টার্ডো' (জারজ) বলেই পরিচিত ছিলেন। জোয়ান অফ্ আর্কের প্রধান সেনাপতি জীন বারবার এই দাবী জানিয়েছেন—তাঁর সমসাময়িক সৈনিক-মহলে তাঁর এই পরিচিতিটুকুই যেন থাকে—তিনি ওরলিয়ান্‌স-এর একজন বাষ্টার্ড (জারজ)। মহামতি ফিলিপের ঔরসজাত ইউট্রেচটের বিশপ ডেভিডের কী দাবী ছিল—তাঁকে বুরগুনভির বাষ্টার্ড (জারজ) বলে ডাকতে হবে, অপর কোন নামে নয়।

রবার্ট বার্টনের একটি কথা এক্ষেত্রে বোধ করি যথার্থ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখে গেছেন : প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই সুপ্রাচীন পরিবারগুলোতে প্রথম দফায়• প্রিন্সদের অনেককেই বাষ্টার্ড রূপে (জারজ) দেখা দেয়। তারপর তাঁদের যোগ্যতম সৈন্যাধ্যক্ষগণ এবং বিদ্বান্ ও পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই এমনি শ্রেণীর—যাঁদের জন্মসূত্রটি সামাজিক বিধান মতে দোষদুষ্ট। সিজার বোরজিয়া ও লুক্রেজিয়া বোরজিয়া—উভয়েই প্রতাপশালী পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের অবৈধ সন্তান। সিজার ১৭ বছর বয়সেই কার্ডিন্যাল হন এবং পরে প্রতিষ্ঠালাভ করেন একজন সেনাধিনায়করূপে। লুক্রেজিয়াও একটি অবৈধ সন্তানের জন্ম দেন—নাম গ্যানারো। তাকে তখনকার সমাজে বলাই হতো 'অবৈধ জননীর অবৈধ পুত্র'। সমাজের চলিত বিধান অনুযায়ী জন্ম হয় নি, সপ্তম পোপ ক্লিমেণ্ট কেন, এমন আরও কত সংখ্যক পোপই সেদিনে ছিলেন। একাদশ জন বলে যিনি খ্যাত, তিনি নাকি ছিলেন পোপ তৃতীয় সার্গিয়াসের ঔরসজাত।

অপরদিকে কবি ও নাট্যকার রিচার্ড স্যাভেজ 'জারজ' বলে যাঁদের ধরা হয়ে থাকে, তাঁদেরই একজন কিনা, বিষয়টি এখনও বিতর্কমূলক। কিন্তু এই চিন্তাশীল মানুষটি বহু দিন বহু ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, তিনি চতুর্থ আর্ল রিভার্স ও দ্বিতীয় আর্ল অব্ ম্যাকলস ফিল্ড-এর পত্নী আনের অবৈধ সন্তান। জন্মগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করা যায়, তেমনি জারজদের জন্যেও তাঁর দরদ ও সহানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে কী বলিষ্ঠ ভাষায়!

১৮৯২ সালের একটি সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভিক্টোরিয়া আমলের ইংল্যাণ্ডে 'প্রতি ছয়টি শিশুর মধ্যে একটি' নাকি জারজ অর্থাৎ সামাজিক বিধি-বিধান অনুযায়ী অবৈধভাবে জাত সন্তান। জেনেই হোক কি না' জেনেই হোক, সে যুগে ঐ স্বনামধন্যা ইংল্যাণ্ডেশ্বরী অন্ততঃ একজন জারজকে 'নাইটহুড' প্রদান করে রাজকীয় স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। সম্মানিত মানুষটি হলেন আফ্রিকার তথ্যসন্ধানী অসমসাহসী স্যার হেনরী ষ্টানলি। ইংল্যাণ্ডের প্রথম শ্রমিক প্রধান মন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ডের নামটিও প্রসঙ্গতঃ এসে যায়। তিনি তো নাকি এই কথা বুক ফুলিয়েই বলতেন—একজন কিষাণ ও কিষাণ-বালিকার তিনি অবৈধ সন্তান।

জারজদের সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ঔরসজাত পুত্র (যাঁকে ফ্রাঙ্কলিন অবৈধ তনয় বলে স্বীকার করতেন) নিউ জার্সির গভর্ণর হয়েছিলেন। লিঙ্কনের জননী ন্যান্সি হ্যাংসের জন্মগত বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন ছিল, অন্ততঃ লিঙ্কন এমনটি বিশ্বাস করতেন মনে হতো। লিঙ্কনের জন্মের ব্যাপার নিয়েও জল্পনা-কল্পনার অভাব ছিল না। একবার তো ছড়িয়েই পড়ে, তিনিও বৈধ সন্তান নন, কিন্তু জিনিষটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরবর্তী আরও দুইজন মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের নামেও এমনি কথা রটনা হয়ে পড়ে। তাঁরা ডেমোক্র্যাট দলের ছিলেন বলে রিপাবলিকান সদস্যদের মধ্যে কুৎসা ছড়াবার জন্যে স্বতঃই উল্লাস জেগে উঠেছিল। ছড়া পর্যন্ত বানিয়ে রাস্তায় রাস্তায় চালু করে দেন তাঁরা—'মা! মা! কোথায় মোর বাবা, গেছেন তিনি হোয়াইট হাউজ, মরি হা! হা! হা!' গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড এই ধরণের অপবাদের একটি বড় লক্ষ্য ছিলেন। কিন্তু আমেরিকার সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা যায়নি। ওয়ারেন গামালিয়েল হার্ডিঙ্গও রাষ্ট্রীয় নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি যে একজন জারজ কন্যার পিতা, সেই পরিচয়টি প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ১৯২৭ সালে মাত্র নান ব্রিটন নামে এক ব্যক্তি 'প্রেসিডেণ্টের কন্যা' (The President's Daughter) নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং সেই বইটি উৎসর্গ করেন সকল অবিবাহিতা মায়েদের উদ্দেশ্যে এবং বাপের নাম বিশ্বের কেউ জানে না, এমন নিরপরাধ সন্তানদের উদ্দেশ্যে।' এই গ্রন্থখানি প্রকাশ ও প্রচার পেলে যথেষ্ট সরগোল পড়ে যায় বটে, কিন্তু হার্ডিঙ্গকে জাতি অস্বীকার করেছে বলা যায় না। কেন না, আজও তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ ওহিও'র ম্যারিয়নে অম্লান দাঁড়িয়ে আছে।

এক-একটি বিশ্বযুদ্ধে হাজার হাজার, লাখ লাখ অবৈধ সন্তানের আবির্ভাব ঘটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতিতে হিসাব করে দেখা গেছে—জারজ আখ্যাত হতে পারে, এমন শিশুর সংখ্যা হবে ৪ লক্ষ। বিধ্বংসী যুদ্ধের দরুণ যে বিপুল লোকক্ষয় হয়, এতে তার কিছুটা পরিপূরণ হয়ে থাকে, কোন কোন মহল প্রশ্নটি এইভাবে তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, এদের যাতে পূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হয়, সে দাবীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে। পিতাদের অপরাধের বোঝা সন্তানরা (জন্মের ওপর যাদের কোন হাতই নেই) চিরকাল বইবে, যুক্তিতে এ মেলে না। রটার্ডামের ইরাসমাসের মতো সুপণ্ডিত, জীন আলেমবার্টের মতো বিজ্ঞানী, ডুমার মতো স্বনামধন্য লেখক, বরোদিনের মতো কুশলী সঙ্গীতজ্ঞ, লরেন্স অব আরেবিয়ার মতো ঐতিহাসিক—এঁদের যদি সামাজিক মর্যাদা পুরোপুরি না দেওয়া হলো, তা হলে গোটা মানুষ-সমাজেরই অমর্যাদা হবে না কি? পৃথিবী-বিখ্যাত ব্যক্তি হয়েও 'জারজ' অপবাদে যদি কাউকে দষ্ট হতে হয়, গভীর পরিতাপের বিষয়।

প্রসঙ্গতঃ একটি চমৎকার কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। বার্ণার্ড শ'র কাছে ইসাডোরা ডানকান নাকি একবার একটি আর্জি নিয়ে হাজির হন। অনুরোধ-লিপিতে তিনি বলেন, 'বিশ্বে আপনি হলেন সবচেয়ে মনীষাসম্পন্ন পুরুষ আর আমি হলুম অনিন্দিত সুন্দরী। আমাদের মিলন যদি ঘটে, বিশ্বের সেরা ছেলে আমরা নিশ্চয়ই সৃষ্টি করতে পারব।' শ' এই মাত্র বলেই নাকি বিদায় দিয়েছিলেন ইসাডোরাকে—'তুমি তো এমনি আশা করছ, কিন্তু এর ঠিক উল্টোটি যদি হয়ে গেলো, শিশুটির গড়ন হলো আমার মতো, আর বুদ্ধিটা যদি পেয়ে গেলো তোমার, তা হ'লে····?'

মোটের ওপর, তথাকথিত জারজদের জন্যে সব দেশেরই দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব না পাল্টালে চলবে না। জননী কুন্তীর স্নেহপাশে যাবার ডাক পেয়েও কর্ণকে বলতে শোনা গেলো, আমি 'অধিরথ সূতপুত্র,

রাধা গর্ভজাত'। সেই উক্তির ভিতর একটি তীব্র বেদনার চিত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এই অসহায় অবস্থায় হাত থেকে 'জারজ' বলে যাঁদের অভিহিত করতে যাওয়া হবে, তাঁদের বাঁচানোই মহৎ কাজ। সমাজে যাতে জারজ সন্তান সৃষ্টি না হতে পারে, সেদিকে যতদূর সম্ভব বিধি-ব্যবস্থার কড়াকড়ি করা হোক, প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হোক, যাতে করে সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাত্রা চলে। কিন্তু তবুও ঘটনাচক্রে পৃথিবীতে অবৈধসূত্রে কোথাও কোন মানবকের আবির্ভাব হলে মানুষের রাজ্যে তাকে কোন দিক থেকেই উপেক্ষা যেন না করা হয়। প্রাচীন হিব্রু-বিধান কী নির্মম ছিল জারজদের প্রতি—জন্মের যার ঠিক-ঠিকানা নেই, ধর্মীয় সম্মেলনে তার যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ। শুধু সে কেন, তার নিম্নতন দশ পুরুষ পর্যন্ত কেউ তাতে যোগ দিতে পারবে না। আর এখানকার হিন্দু-প্রবাদ—যেটি দীর্ঘদিন থেকে চলে এসেছে: জারজদের থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাক।

কিন্তু কথা হলো—এই যে দূরে থাকার দাবী—এই যে দারুণ নির্মমতা, জন্মের জন্য আদৌ যে দায়ী নয়, 'জারজ' কুখ্যাতি দিয়ে তার প্রতি এই প্রহসন কি সমীচীন? বিষয়টি বোধ করি খুব নিবিড়ভাবে ভেবে-চিন্তে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে। পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন সমাজে যাঁদের আমরা জারজ বলতে চাই, তাঁদের মধ্যে অনেকের অপূর্ব মনীষার বিকাশ ঘটেছে—এমন কি নীল রক্তধারীদের (blue blood) চেয়েও কেউ কেউ জ্ঞানে-গুণে এবং ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার দিক থেকে সমধিক উন্নত। আজও অবধি এ নিঃসন্দেহে একটি প্রকাণ্ড রহস্য—আর সেজন্যেই বিশ্ববিখ্যাত জারজদের কয়েকজনের নাম এই নিবন্ধে উল্লেখ করতে চাওয়া হয়েছে।

গুণাগুণ বিচার না করেই নিছক 'জারজ' অপবাদ দিয়ে কাউকে দূরে ঠেলতে যাওয়া নিশ্চয়ই ধর্মীয় আচরণ হতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কে বলতে পারে, যেমন দেখা গেছে অতীতেও, 'জারজ' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত এমন কোন শিশুই একদিন মনীষী পদবাচ্য হবে, প্রাতঃস্মরণীয় ও প্রকৃত বরেণ্য পুরুষ হবে? শেক্সপীয়ার থেকে সুরু করে বহু বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তানায়ক তাই তো তথাকথিত 'জারজ'দের মানুষ হিসাবে মর্যাদা দিতে ইতস্ততঃ করেননি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দরদী লেখনীতেও একথাই দৃঢ়তার সহিত ধ্বনিত হয়েছে: ভর্তৃহীনা জবালার সন্তানও (সত্যকাম) অপাংক্তেয় নয়, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।' কারো জন্ম নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবার আগে এই সব কথা—মনীষীদের অমর বাণীগুলো যেন আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, অন্ততঃ এই ক্ষেত্রটিতে আমরা যেন কখনও বিবেক ও বিচারবুদ্ধিবিবর্জিত পাষাণের মানুষ না হয়ে যাই!

—অনিলধন ভট্টাচার্য

# গ্রামের একটি দিন

(Johu Keats'এর 'To one who has been long in city Pent' কবিতার ছায়ানুবাদ)

মনি দাশ

শহরের আবদ্ধতায় যার
দীর্ঘ সময় কাটে
পাবে সে যে সুখ-সুমধুর
গ্রামের পথে-ঘাটে।
মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ
গ্রামেই শুধু পাবে
নানান রকম পাখীর ডাকে
মুগ্ধ হো'য়ে যাবে।
শ্রান্ত দেহে শু'তে মজা
সবুজ ঘাসের 'পরে
ক্লান্তি নামে দেহ মনে
মন থাকে না ঘরে।
ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে
দূর-দিগন্তে মন চলে যায়
স্বপ্ন-মধুর বেশে।

দিনের শেষে আনন্দেতে
(ফিরবে) যবে আকাশ-পানে চেয়ে
মনটি খারাপ হো'য়ে যাবে
পাখীর গানটি শুনতে পেয়ে
অবাক হোয়ে দেখবে যখন
ক্ষুদ্র মেঘের মেলা
মনটা তখন লাগবে ভালো
দেখে বলাকাদের খেলা।
মনটি তখন বিষাদেতে
যাবেই যাবে ভ'রে
যেমন ক'রে সকাল-বেলা
শিশির পড়ে ঝরে।
যেমন ক'রে দেবদূতেরা
অশ্রুপানি ফেলে
ছুটীর দিনটি এই ভাবেতেই
পিছনে যায় চলে।

সহরবাসীর গ্রাম্য ভ্রমণ
এইখানেই হয় শেষ
এইবারেতে গৃহে ফিরতে
(তার) লাগে বিষাদ ক্লেশ।
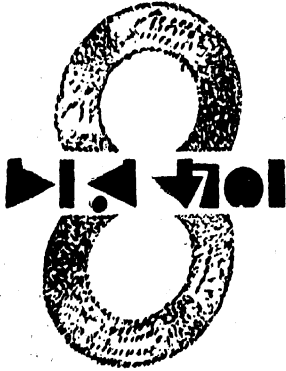
## ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার

( প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধক )

মহীশূর রাজ্য পেরিয়ে এসে ঢুকলাম মাদ্রাজ রাজ্যে। দু-রাজ্যের মধ্যে এক লোহার গেট। মাদ্রাজ রাজ্যে ঢুকতে টোল দিতে হল। সেখানে বসেছে এক ফলের বাজার। অবশেষে এসে পৌঁছলাম পার্ব্বত্য সহর উতাকামাণ্ডে।

গেলাম স্নোডন রোডের ধারে একখানি সুন্দর বাড়ীতে। গেটের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে পথ। বাড়ীর সামনে দেয়াল ঘেঁসে ফুলের কেয়ারী। বাঁ-দিকে সেই ফুলের সমারোহ। দেখা হল সুসজ্জিত ঘরে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের সঙ্গে। ভারত গবর্ণমেণ্টের লেখবিদ্যা-বিশারদ জ্ঞানের সাধনায় ডুবে আছেন। কোথায় কোন্ বাঙ্গালী সাধক সাত্বিক ব্রাহ্মণের মত নীরব সাধনায় নিমজ্জিত আছেন, কে তার খবর রাখে ?

জন্ম হয়েছিল ফরিদপুর জেলায়। সহর থেকে ছ'মাইল পশ্চিমে। গ্রামের নাম শালকাঠি কৃষ্ণনগর। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন শনিবারে তাঁর জন্ম। মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মেছিলেন দীনেশচন্দ্র। পিতা ছিলেন গ্রাম্য কবিরাজ। প্রথম ও একমাত্র জীবিত সন্তান সাড়ে তিন বৎসরের শিশু দীনেশচন্দ্রকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পিতা মহাপ্রয়াণ করলেন।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার

পিতৃহীন বালক দীনেশচন্দ্র গ্রামের পাঠশালায় পাঠ আরম্ভ করলেন। সেটা শেষ করে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে। তারপর ফরিদপুর জেলা-স্কুল থেকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর ভর্ত্তি হলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে দীনেশচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এরপর দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ভর্ত্তি হলেন। নিলেন এপিগ্রাফী আর নিউমিসমেটিকস গ্রুপ। তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও পরিশ্রম তাঁকে দু বছর পরে সফলতার কূলে পৌঁছে দিয়ে গেল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র এম, এ পাশ করলেন। স্বর্ণপদক পেলেন। ইউনিভার্সিটি প্রাইজম্যান হলেন! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি।

এম, এ পাশ করে দীনেশচন্দ্র ডাঃ ভাণ্ডারকরের অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ করতে লাগলেন। এখনও সম্বল তাঁর সেই যত্ন ও চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। তাতেই তিনি ভাণ্ডারকরের প্রিয়ছাত্র হয়ে উঠলেন। পিতৃহীন দীনেশচন্দ্র ডাঃ ভাণ্ডারকরের কাছে পেলেন পুত্রাধিক স্নেহ। ডাঃ ভাণ্ডারকর বলতেন, "আমার দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে আমি তিনটিমাত্র প্রতিভাশালী ছাত্র দেখেছি। দীনেশ তাদের অন্যতম। ইণ্ডিয়ান কালচার পত্রিকা ভলিয়ুম নয়—জানুয়ারী-এপ্রিল, ( Vol. IX January-April ) ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ১৭৭-৭৮ প্রসঙ্গক্রমে চারজন শ্রেষ্ঠ লিপিবিদ্যাবিদের তালিকায় দীনেশচন্দ্রের নাম উল্লেখ করলেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীও তাঁকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্র বলে স্নেহ করতেন।

ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক প্রভৃতি কেউ কেউ দীনেশচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাঁরা প্রাচীন শিলালিপি এবং তাম্রশাসন পাঠ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে দীনেশচন্দ্রের চেয়ে কৃতী আর কাউকে দেখতে পান নি। দীনেশচন্দ্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় লোকলোচনের অন্তরালে নীরবে তাঁর কর্ম্মসাধনা করে চলেছেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁর কাছে একাধিকবার আহ্বান এসেছে। তাঁর সে সব কৃতিত্বপূর্ণ বক্তৃতায় ভারতের যশ ও কীর্ত্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পারিতোষিক পেলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, "Successors of the Satavahans in the Eastern Deccan"। তাঁর লিখিত এই বিষয়ের পরীক্ষক ছিলেন মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ এস, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার আর সরকারী পুরাতত্ত্ববিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ রাও বাহাদুর কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত। এই বিষয়ে আরও গবেষণার ফলে তিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মৌয়ট সুবর্ণ পদক পেলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৬ স'নে দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেটের জন্য থিসিস দিয়েছিলেন। তাঁর বিষয় ছিল, "Dynasties of the Lower Deccan c 200-600 A. D ।" এই ডক্টরেট ডিগ্রীর থিসিস পরীক্ষা করলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এল, ডি, বারনেট। অধ্যাপক র‍্যাপসন থিসিস পরীক্ষা করে লিখলেন, "Mr. Sircar has diligently collected such evidence as

exists for the reconstruction of the history of the Lower Deccan during c 200—600 A. D. and his treatment of this evidence is sober and judicious. He does not attempt to make history out of ingenious hypotheses." অধ্যাপক টমাস লিখলেন, "The author's judgment upon the numerous details of history and interpretation where he has to criticise the opinions of other, seems unusually to be sensible and sound." অধ্যাপক বারনেট আর দুজন অধ্যাপকের সঙ্গে একমত হলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দীনেশচন্দ্রকে 'ডক্টরেট' উপাধি দিলেন। এর পূর্ব্বেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। একটি পুত্রও জন্মেছিল। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত তিনি কোন চাকরি করেননি। দারিদ্র্যকে বরণ করে তিনি নীরবে জ্ঞানের তপস্যায় রত ছিলেন। এতদিনে তিনি তাঁর নীরব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

তখন স্বর্গীয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতি। অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী শ্যামাপ্রসাদকে অনুরোধ করলেন দীনেশচন্দ্রকে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত করবার জন্য। সুতরাং ২৯ বৎসর বয়সে দীর্ঘ দিবসের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও একাগ্র সাধনার পর তাঁর সিদ্ধিলাভ হল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বলতেন, "আমরা এত লোককে রিসার্চ স্কলারসিপ দিয়েছি, কিন্তু দীনেশ ছাড়া আর কাউকে রিসার্চ করতে দেখলাম না।" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছায় দীনেশচন্দ্রকে অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। দীনেশচন্দ্রকে তারজন্য দরখাস্তও করতে হয়নি। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলতেন, "You are a pillar of strength to my Department." অধ্যাপনা করবার সময় দীনেশচন্দ্র বেনারস ও পাটনা থেকে প্রকাশিত ইতিহাস সমিতির "New History of the Indian People." পুস্তকের একটা অধ্যায় রচনা করেন। তারপর ভারতীয় বিদ্যাভবন বোম্বাই থেকে "The History and Culture of the Indian People" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। দীনেশচন্দ্র তার অনেকগুলি অধ্যায় রচনা করেন। ভারতীয় ঐতিহাসিক • কংগ্রেস একখানি Comprehensive Histoty of India প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেরও তিনি অনেকগুলি অধ্যায় রচনা করেছেন। তারপর এই ধরণের আর এক-খানি গ্রন্থের জন্য তিনি মালবের ইতিহাসের এক অধ্যায় রচনা করেন।

দীনেশচন্দ্র ভারতীয় ইতিহাস, ভূগোল, লেখবিদ্যা, প্রত্নলিপি, সমাজ, মুদ্রা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে দেশের ও বিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

১৯৪৯ সালে ডঃ দীনেশচন্দ্র ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে এপিগ্রাফির সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করে উতাকামাণ্ডে চলে যান। পুরাতত্ত্ব বিভাগের তখন ডাইরেক্টর-জেনারেল ছিলেন ডঃ নিরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্ত্তী। তাঁরই আগ্রহে ও ডঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের পরামর্শে দীনেশচন্দ্র এই পদ গ্রহণ করেন।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডঃ দীনেশচন্দ্রকে ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ দেন। তা'ছাড়া ফরাসী সরকার তাঁকে একটা বৃত্তি দিয়ে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়বার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ডঃ চক্রবর্ত্তীর পরামর্শে দীনেশচন্দ্রকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ চক্রবর্ত্তী দীনেশচন্দ্রকে লেখেন,—"তোমার বিষয়ে তোমাকে পড়াবার মত কেউ নেই। পড়বার জন্য ইউরোপ যাওয়া তোমার পক্ষে অর্থহীন।" ডঃ চক্রবর্ত্তী তাঁকে বেশী বেতনে এই পদে নিযুক্ত করেন। অধ্যাপক লুই রেণু ডঃ দীনেশচন্দ্রকে প্যারী নিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। আর তাঁরই পরামর্শে ফরাসী সরকার তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র পুরাতত্ত্ববিভাগের লেখ-বিদ্যা শাখার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তারপর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি "গবর্ণমেণ্ট এপিগ্রাফিষ্ট ফর ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর কর্ত্তব্য হল ভারতের যে কোন স্থানে শিলালিপি ও তাম্রশাসনের অনুসন্ধান করা ও প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করে প্রকাশ করা। তাঁকে "এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিয়া" নামে সুবিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদনা করতে হয়। আর ভারতীয় শিলালিপির বাৎসরিক বিবরণ (Annual Report on Indian Epigraphy)ও) তিনি সম্পাদনা করেন।

জ্ঞানতপস্বী ডঃ দীনেশচন্দ্র নীরবে তাঁর সাধনা করে চলেছেন। অনলস ও অধ্যবসায়শীল দীনেশচন্দ্র কখনও সম্মানের প্রার্থী হন নি। কিন্তু সুখের বিষয়, তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে তাঁকে বঞ্চিত হতে হয় নি। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিবেশনে তিনি ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও এলাহাবাদে ভারতীয় নিউমিসম্যাটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনেও দীনেশচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কটকের উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্কলিত উড়িষ্যার সমগ্র ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ও আফ্রিকার ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে আহূত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ঐতিহাসিক লেখাবলী সম্পর্কিত এক সম্মেলনে ভারতীয় শিলালিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁর আহ্বান আসে এবং তিনি তাতে বক্তৃতা দেবার জন্য লণ্ডন গমন করেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে দিল্লী অধিবেশনে তিনি ইতিহাস বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই বছর তিনি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করবেন।

একজন বাঙ্গালী জ্ঞানবৃদ্ধ একনিষ্ঠ সাধক বাংলা দেশ থেকে বহুদূরে পাহাড়-বেষ্টিত প্রকৃতির রম্য নিকেতনে উতাকামাণ্ডে তাঁর নীরব সাধনা করে চলেছেন। তাঁর পরিচয় বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট আদৃত হবে। বাঙ্গালীমাত্রেই তাঁর জন্য গর্ব্ববোধ করবেন।

## শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

[ বাঙলার তথা ভারতের অভিনয়জগতের দিকপাল ]

বোধকরি সেদিন এমন কেউ ছিলেন না, যাঁর কাণে সেই বিস্ময়কর খবরটি গিয়ে পৌঁছয়নি। বোধহয় এই খবরটি শোনার পর সকলেরই সেদিন আর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। স্বনামধন্য এক অধ্যাপক—হাঁ—শৌখীন অভিনয়ে তিনি সুনাম ও সফলতা দুটোই অর্জন করছেন, তিনি পেশাদারীভাবে রঙ্গালয়ে

আত্মপ্রকাশ করছেন। অধ্যাপক থেকে নট—কিমাশ্চর্যামত: পরম! শুধু রাজনীতিরই নয়, সবকিছুরই ইতিহাসে সকল কালে, সকল যুগেই লক্ষ্য করা যায় আলো-আঁধারির এক অপূর্ব খেলা। নব্বই বছর আগে অরুণ আলোর দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে বাঙলার পেশাদারী রঙ্গালয়ের প্রথম যবনিকা উত্তোলিত হওয়ার পর চল্লিশ বছর পরে সেখানে আবার অন্ধকারের ঘন পর্দা নেমে আসে। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর দেহ রেখেছেন। দানীবাবু শক্তিমান নট সন্দেহ নেই, কিন্তু নতুন কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই। উদ্ভাবনীশক্তি থেকে তিনি বঞ্চিত, অল্পকালের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথও হলেন লোকান্তরিত, বাঙলার রঙ্গালয়ের তখন শোচনীয় অবস্থা, সেখানে তখন রীতিমত অন্ধকার যুগ। মানুষের মনকে ভরিয়ে তোলার মত কোন শক্তি তখন তার নেই। আলো তার প্রায় নিভে আসে—চরম দৈন্যের সম্মুখীন তখন বাঙলার গৌরবোজ্জ্বল ও ঐতিহ্যপুষ্ট নাট্যশালা। সেই সময়ে শিশিরকুমারের বহু-প্রতীক্ষিত আবির্ভাবে রঙ্গালয়ের প্রাণহীন বক্ষে ধ্বনিত হল নতুন প্রাণের পদসঞ্চার। তাঁর আবির্ভাবে অন্ধকারকে অতিক্রম করার মন্ত্র পেল বঙ্গনাট্যালয়। সেখানে তখন অজস্র আলোর সমারোহ, নতুন যুগের শুভ অভ্যুদয়, ত্রিযামরাত্রির অবসানে পূত প্রত্যুষের স্নিগ্ধ রশ্মি।

শিশিরকুমার একা আসেননি। অনেকানেক দিকপাল গুণীর সমন্বয়ে সেদিন শিশিরকুমার করেছিলেন বাঙলার নাট্যশালার সেই সুবর্ণযুগের শুভদ্বারোদ্ঘাটন। শিশিরকুমারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার রঙ্গালয়ে অন্যান্য যে-সব উজ্জ্বল রত্নের অভ্যুদয় ঘটল, শিশিরোত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নট, গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর ঐতিহ্যের শেষ জীবিত প্রতিনিধি, শিশিরকুমারের আবাল্য-সুহৃদ্ নটশেখর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রনায়ক।

আদি নিবাস যশোহরে। পিতৃদেব স্বর্গীয় বঙ্কুবিহারী মিত্র মহাশয় ত্রিপুরার রাজচিকিৎসক ছিলেন। আগরতলাতেই ১৮৮৮ সালের ১৮ই মে নরেশচন্দ্রের জন্ম। ১৮৮৮ সালটি বাঙলার আরও অনেক কৃতবিদ্য সন্তানকে জন্ম দিয়েছে,—যাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শিল্পী যামিনী রায়, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মনস্বী আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ সালে নরেশচন্দ্র কলকাতায় আসেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে এই সময় থেকে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে! বালক নরেশচন্দ্র খেলাতচন্দ্র ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হলেন ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্ররূপে। মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন (মেন) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় পাশ করলেন ১৯১১ সালে। ১৯১৪ সালে হলেন আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়ছিলেন, পিতৃবিয়োগ ঘটায় সে পরিকল্পনা রূপ পেল না। শিশিরকুমারও আইনের ছাত্র ছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে লক্ষ্যণীয়, একজন এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, আইন-পড়া ছাড়লেন, আর একজন আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, এম-এ পড়া ছাড়লেন। ১৯১৫ সাল থেকে শুরু হল কর্মজীবন। আইনব্যবসায় শুরু [illegible] নরেশচন্দ্র। আইনব্যবসায়ীর জীবন তিনি বেশীদিন [illegible]। জীবনদেবতার অভিপ্রায় অন্যরূপ। যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ, বিধি, [illegible] জগৎ থেকে জীবনবিধাতা তাঁকে নিয়ে এলেন রূপ, রস, [illegible], অভিব্যক্তি ও সৃষ্টির জগতে। ঠিক অনুরূপভাবেই জীবনদেবতার অভিলাষেই একদিন সওদাগরী অফিসের বুক-কীপার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জীবনের গতিপথ অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল।

বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইচ্ছাই একরকম ভাবে নরেশচন্দ্রকে পেশাদারী রঙ্গালয়ে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাব। ১৯২২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী নরেশচন্দ্রের সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশের স্মরণীয় দিন। ১৯২৩ সালে ৩০এ জুন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রথম আবির্ভূত হলেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

মিনার্ভায় চাণক্যের নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন নরেশচন্দ্র। একই সময়ে মনোমোহন থিয়েটারে চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করছেন দানীবাবু। সেই সময় আণ্টিগোনাসের ভূমিকায় সম্ভাবনাময় এক নতুন নট অভিবাদন জানালেন দর্শকসাধারণকে। তাঁর নাম রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অসংখ্য চরিত্রে তারপর সুদীর্ঘকাল ধরে নরেশচন্দ্রের অনবদ্য অভিনয় বাঙলাদেশের দর্শক সাধারণ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। নরেশচন্দ্র অভিনীত প্রতিটি নাটকের পূর্ণ তালিকা পেশ করা সম্ভব নয়। শুধু রঙ্গমঞ্চ নয়—চলচ্চিত্র-জগতেও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নির্বাক এবং সবাক অভিনেতা রূপে নয়, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালকরূপেও তিনি অগ্রগণ্য। চলচ্চিত্রজগতে তাঁর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অবদান রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাহিনীর চিত্রায়ন। রবীন্দ্র-শরৎ-কাহিনীর প্রথম চিত্ররূপ দেওয়ার গৌরব নরেশচন্দ্রেরই প্রাপ্য। কবিগুরুর 'গোরা' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেওয়ার কৃতিত্বও নরেশচন্দ্রের। নাট্যজগতেও শুধু নট হিসাবেই তিনি বন্দিত নন; প্রয়োগকর্তা, শিক্ষক ও পরিচালক হিসেবেও তিনি অভিনন্দনীয়। নরেশচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণে অসংখ্য শিল্পী পরবর্তীকালে প্রভূত যশ ও সুনাম অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। নরেশচন্দ্রের এই

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

স্বনামধন্য শিষ্যশিষ্যাদের মধ্যে একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। বাঙলার অপরাজেয় অভিনেতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অবিস্মরণীয় নাম। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট বাঙলার অনেক বিদগ্ধ সন্তানের সম্মিলন-কেন্দ্র। শিশিরকুমারের মত নরেশচন্দ্রও ছাত্র-জীবন থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত। সেখানেও শিশিরকুমার এঁর সতীর্থ। পেশাদারী অভিনয় শুরু করার পূর্বে ইনষ্টিটিউটের অভিনয়ে এঁরা অংশ গ্রহণ করতেন একথা সর্বজনবিদিত। ইনষ্টিটিউটে সেদিন এঁদের নির্দেশক ছিলেন পরলোকগত শিক্ষাব্রতী শ্রদ্ধেয় মন্মথমোহন বসু। ব্যক্তিগত জীবনে স্বর্গীয় যদুগোপাল মজুমদার মহাশয়ের কন্যা স্বর্গীয়া মুকুল মিত্রের সঙ্গে নরেশচন্দ্র পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। অল্পকাল আগে প্রদেশ কংগ্রেস নরেশচন্দ্রকে সম্বর্ধিত করেন। আজকের পঁচাত্তর বছরের স্রষ্টাশিল্পীর অবসর কাটে পারলৌকিক তত্ত্বানুশীলনে।

বাঙলার নাট্যজগতের নবযুগের বোধনলগ্নে তাঁর আবির্ভাব। তার সমৃদ্ধিকল্পে তাঁর আত্মোৎসর্গ আজ ইতিহাসের রূপ নিয়েছে। তাঁর বিরাট ও বলিষ্ঠ অবদান নাট্যশালাকে নানাভাবে উন্নত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যযুক্ত করে তুলেছে। রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এঁদের স্বাক্ষর থেকে মালিন্য চিরদিনই অনেক দূরে।

## কিরণকুমার রায়

একদিন যে প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া অনেকে অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলেন —অল্প সময়ের ব্যবধানে উহাই যখন বাস্তব সত্য হয়ে উঠল—তখন জানা গেল যে, মধ্যবিত্ত ঘরের এক বাঙ্গালী সন্তান বুদ্ধিদীপ্ত কর্ম্মক্ষমতায় এইরূপ বিরাট সংস্থার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু সেখানেই তাঁহার উদ্দীপনা স্তব্ধ হয়ে গেল না—নিত্য নূতন প্রবৃত্তিতে নিজেকে আবদ্ধ করে—নব নব সংস্থা গড়িয়া তোলেন—সর্ব্বভারতে স্বীকৃতি পেলেন—বাঙ্গালী তরুণদের আকৃষ্ট করলেন। ইনি হলেন বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার শ্রী কে, কে, রায় অর্থাৎ শ্রী কিরণকুমার রায়।

কিরণকুমার ১৯১৩ সালের ২রা জুলাই হবিগঞ্জে (শ্রীহট্ট) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় ও মাতা শ্রীমতী সুশীলা দেবী। হবিগঞ্জ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, সিটি কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে আই, এস, সি, বি, এস, সি ও পদার্থবিদ্যায় এম, এস, সি পাশ করিয়া ১৯৩৭ সালে তিনি চেমসফোর্ড (ইংলাণ্ড) Mercury Instt. of Broadcasting-এ ভর্ত্তি হন। তথা হইতে শিক্ষাসমাপনান্তে তিনি আকস্মিকভাবে বিমানশিল্প ইনজিনিয়ারিং-এ আকৃষ্ট হন। গ্রেটবৃটেনের বিভিন্ন বিমান নির্ম্মাণ কারখানায় তিনি যুক্ত থাকিয়া M. I. Ae. S. ও A. F. R. Ae. S সনদ লাভ করেন। ১৯৪১ সালে দেশে ফিরিয়া তিনি বাঙ্গালোর হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট কারখানায় Design-Engineer হিসাবে যোগদান করেন। পরে তিনি C. N. A. Corporation-এ প্রধান ডিজাইন ইনজিনিয়ার হিসাবে কাজ করিবার সময় ভারতীয় বিমান সংস্থা গঠনের স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। বাস্তব রূপায়নে তিনি Airways (I) Ltd গড়িয়া তোলেন। কিন্তু এখন প্রয়োজন অর্থ ও একজন কর্ম্মী—কারণ উহার 'মস্তিষ্ক' ছিলেন শ্রীরায়। এই সময় তাঁহার যোগাযোগ হল ভারত তথা বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক, জননেতা ও বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের সহিত। বাঙ্গালী যুবকের উৎসাহকে তিনি বাহবা দিলেন ও ৺নির্ম্মলচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজনের সঙ্গে ডাঃ রায় যোগদান করলেন Airways (I) Ltd-এ প্রথম বিমান চালনা হল কলিকাতা-বাঙ্গালোর। কিছুকালের মধ্যে উহা বৃহত্তম অন্তর্দেশীয় বিমান-পরিবহন সংস্থারূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আর জাতীয়করণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিয়মিত লভ্যাংশ বিতরিত হতে লাগল শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে।

বিমানপথ জাতীয়করণের পর শ্রী রায় আটমাস কলিকাতায় সমস্ত বিমানপথের আঞ্চলিক প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন।

ইতিপূর্ব্বে তৎকর্তৃক ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত Aeronautical Services Ltd. অসামরিক বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজের ও ১৯৪৯—৫০ সালে স্থাপিত উহার "কলেজ বিভাগ"-এ বাঙ্গালী তরুণদের বিমান সংক্রান্ত ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্ত্তিত শরণার্থী শিক্ষা পরিকল্পনা (ট্রেড্‌কোর্স) তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হয়।

অসামরিক বিমান চলাচলে বাঙ্গালী তরুণদের Commandership অর্থাৎ বিমানের ক্যাপ্টেন হওয়ার ব্যাপারে শ্রী রায়ের প্রচুর অবদান রয়েছে। নিজ তত্ত্বাবধানে তিনি বাঙ্গালী সন্তানকে উক্ত পদলাভের যোগ্যতায় তুলতে সক্ষম হইয়াছেন।

আই, এ, সি-তে শ্রীরায়ের কাজ শেষ হওয়ায় ১৯৫৪ সালে তিনি পুনরায় বিমান পরিবহন কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরবৎসর তিনটি পুরাতন বিমানকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তিনি কলিকাতা-আন্দামান লাইনে কাজ আরম্ভ করেন। প্রচুর লোকসান হওয়ায়

কিরণকুমার রায়

উহা বন্ধ করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে শ্রীনগর—লে-তে তিনি ডাকোটা বিমানের কাঠামোয় পরিবর্ত্তন না করিয়া সরবরাহের কাজ আরম্ভ করেন। ইহাছাড়া, A. S. Ltd-র কারখানায় তিনি লিলিংকাটার, পেট্রল—কেরোসিন ইঞ্জিন নির্ম্মাণ, প্লাইভার তৈয়ারী ( একমাত্র ভারতীয় সংস্থা ) ও বাইসাইকেল চালনার শক্তি-সম্পন্ন ইঞ্জিন উৎপন্ন করিতে থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত কারকাখানায় ত্রিচক্রযান ( রিক্সার পরিবর্ত্ত ) নির্ম্মাণের লাইসেন্স তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫৪ সালে কিরণবাবু বিদেশী সংস্থা Air Survey Co. of India ( P ) Ltd, ক্রয় করেন। বর্ত্তমানে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে আকাশপথে ম্যাপিং, সার্ভে ও গভীর অনুসন্ধান কার্য্যে রত আছে। তিনি কয়েকটী ( New Scheduled ) বিমান পথে Airways (P) Ltd, কে নিয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে Steel line কলিকাতা—জামসেদপুর—রাঁচী—রূরকেল্লা উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি উহা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর: গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীরায় কোম্পানী-আইন, হিসাব নিকাশ ইত্যাদি বিষয় পারঙ্গম। তিনি বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু প্রতিটী সংস্থার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

এরো-মডেলিং বাগান, সিনেমা ও প্রচুর পুস্তকপাঠ তাঁহার প্রিয়।

১৯৩১ সালে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জমিদার বংশের তনয়া শ্রীমতী বীণা দেবীকে বিবাহ করেন।

শ্রীরায় I. A. C. পরামর্শদাতা-বোর্ডের সদস্য, এরোনটিক্যাল সোসাইটী অব ইণ্ডিয়ার ও ভারতীয় বিমান পরিবহন এসো:-এর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অব ইনডাষ্ট্রীজের ভাইস-চেয়ারম্যান, বেঙ্গলন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন: এর সহ-সভাপতি, এবং কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ও কলিকাতা ষ্টেট ট্রানস্‌পোর্টের সদস্য।

## শ্রীঅবনী সেন

( বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী )

দিল্লীর শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার জ্ঞান-গরিমার ছাপ যে সর্বত্র বর্ত্তমান, শিল্পী শ্রীঅবনী সেন তার অন্যতম প্রমাণ। শিল্পকলা-ক্ষেত্রে পিতাপুত্রের এমন মনোরম সমাবেশ খুবই বিরল। দিল্লীতে এমন কেহ নাই যিনি পিতা অবনী মোহনকে চেনেন অথচ পুত্র রঞ্জনকে জানেন না। একজন প্রৌঢ়, অপরজন যুবক; সম্বন্ধ পিতা ও পুত্র। একজন পূর্ণ বিকশিত, আরেকজন বিকাশোন্মুখ। পিতা পুত্রের এই শিল্পকলার সৌন্দর্য্য শুধু ভারতের মাটীতেই আবদ্ধ নাই, বাহির বিশ্বেও তার ছাপ বর্ত্তমান। কিশোর শিল্পী রঞ্জনের 'শঙ্কর উইকলি'-আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিশু চিত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার তার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

গভর্ণর জেনারেল পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীঅবনী সেন ১৯০৫ সালে ঢাকা জেলার বেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত দক্ষিণারঞ্জন সেনের জন্মগত শিল্পানুরাগ নিজের জীবনে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ না পেলেও, পুত্র শ্রীঅবনী সেনের জীবনে প্রকাশ পেয়েছে পুরোপুরি। অতি বাল্যে পিতৃহারা বালক অবনী সেন আপন গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষা সমাপনান্তে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখবার আশায় চলিয়া আসেন কলিকাতায়। কিন্তু নিয়তির বিধানে যেমনি কামারের কাজ কুমোরের সাজে না, তেমনি রং তুলি যার নেশা, ডাক্তারী হয়ে উঠে না তার পেশা। তাই মেডিকেল স্কুলের পরিবর্তে সরকারী আর্ট স্কুল। চিকিৎসা বিদ্যা নয় চিত্রবিদ্যা। আঁকতে শুরু করলেন চিত্রকলা, চলতে লাগলো শিল্প-সাধনা। শ্রীসেনের চিত্রাঙ্কনের প্রথম পাঠে মুগ্ধ হলেন তদানীন্তন স্কুলের অধ্যক্ষ মি: প্যারী ব্রাউন। ফলে বেতন করলেন মকুব, দিতে লাগলেন উৎসাহ। বাড়তে লাগলো শিল্পীর প্রতিভা, প্রকাশ পেলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। বাংলার মাটীতে অধীত বিদ্যা ছড়ালেন দিল্লীর দরবারে। আজ প্রায় দেড় যুগ ধরে দিল্লীতে বসে শ্রী সেন তাঁর শিল্প-প্রতিভায় ভারতেরই মুখ উজ্জ্বল করেননি, গৌরবান্বিত করেছেন বাংলা মাকে। যে সকল শিল্প-প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত সেনের শিল্পী-প্রতিভার সাক্ষ্য বর্ত্তমান, নিম্নোক্ত প্রদর্শনী তাহাদের অন্যতম।

শ্রীঅবনী সেন

১। ১৯২৮-২৯-নৈনিতাল আর্ট ক্লাব আয়োজিত শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রথমস্থান। ২। ১৯৩৩ সালে একাডেমি অব ফাইন আর্টস আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রথমস্থান। ৩। ১৯৩৪ সালে একাডেমি অব ফাইন আর্টস আয়োজিত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান; ১৯৪৪ সালে বিহার শিল্পকলা পরিষদ-আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান। ১৯৪৮ সালে অল ইণ্ডিয়া আর্টস ফেষ্টুন সোসাইটী (বোম্বে) আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান। ১৯৪৬, ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে ইণ্ডিয়ান বোর্ড ফর ওয়াইড লাইফ আয়োজিত চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান। ১৯৪৯ সালে গভর্ণর জেনারেল পুরস্কার। পারিবারিক জীবনের উল্লেখ করে একথাই বলতে হয় যে, শ্রী সেনের পরিবার একটা শিল্পী পরিবার।

বাঘের পেটে বাঘই জন্মায়—এ প্রবাদ-বাক্য আর কোথাও ঠিক না হলেও শ্রী সেনের পরিবারে যে তাহা বাস্তব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রী সেনের পুত্র রঞ্জন ও কিষাণ, মেয়ে চন্দ্রাও চিত্র-প্রতিযোগিতায় একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করে সারা ভারত তথা বাংলা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীসেনের শিল্পী-জীবনের উৎস ও প্রেরণা তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী উষা সেন। শ্রীমতী সেনের উৎসাহ এবং প্রেরণা আজিও শ্রী সেনের শিল্পী-জীবনের উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলছে।

তাম্রপর্ণীতে স্নান করে নয়ত্রিপদী দেখলেন, চিড়য়তালাতে রাম-লক্ষ্মণ। শিব দেখলেন তিলকাঞ্চীতে, গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে বিষ্ণুমূর্তি। পানাগড়িতে সীতাপতি দেখে চামতাপুরে রামানুজ। মলয় পর্বতে কন্যাকুমারী। আমলীতলাতে আবার রাম। তারপর এলেন মল্লারে। সেখানে বামাচারী ভট্টমারিদের আস্তানা।

প্রভুর সহচর কৃষ্ণদাস ভট্টমারিদের খপ্পরে পড়ল। কামিনী-কাঞ্চনে প্রলুব্ধ করল কৃষ্ণদাসকে। ঘরে আটকে রাখল।

'আমার পার্ষদকে তোমরা ধরে রেখেছ কেন?' গৌরহরি ভট্টমারিদের প্রশ্ন করলেন সরোষে।

'রেখেছি, বেশ করেছি। তাতে তোমার কী।' ভট্টমারিরা তেড়ে এল।

'তোমরা নিজেরা সন্নেসী হয়ে কেন আরেক সন্নেসীর বিঘ্ন করো?'

'বেশ করি।' ভট্টমারিরা অস্ত্র নিয়ে মারতে এল প্রভুকে।

'সে কি? মারবে?'

প্রভু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যার যার অস্ত্র তার তার হাত থেকে খসে পড়তে লাগল। পড়তে লাগল নিজের-নিজের শরীর। আপন অস্ত্রেই আপনি ঘায়েল।

এদিক-ওদিক পালাতে লাগল ভট্টমারিরা।

বদ্ধ ঘরে ঢুকলেন গৌরহরি। কী না জানি হয়, বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। ঘরে ঢুকে কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করলেন প্রভু। চুলে ধরে টেনে বার করে নিলেন ঘর থেকে।

তারপরে এলেন পয়স্বিনীতে। স্নান করে আদিকেশবের মন্দিরে গেলেন। সেখানে কেশবকে দেখে প্রেমাবিষ্ট হলেন। 'নতি-স্তুতি নৃত্য-গীত বহুত করিলা।' সেই আদিকেশব-মন্দিরে দেখতে পেলেন 'ব্রহ্মসংহিতা'। সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্রের শিরোমণি। 'অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।' সেই সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের প্রতিলিপি লিখিয়ে নিলেন প্রভু। এই গ্রন্থেই কৃষ্ণের ও কৃষ্ণধামের কথা লেখা আছে বিশদ করে।

সেখান থেকে গেলেন অনন্ত পদ্মনাভে। সেখানে দিন দুই পদ্মনাভকে দেখে নর্তন-কীর্তন করে গেলেন সিংহারী বা শৃঙ্গেরী মঠে, শঙ্করাচার্যের স্থানে। অদ্বৈতবাদের প্রচারকেন্দ্রে। তারপর মৎস্যতীর্থ দেখে তুঙ্গভদ্রায় স্নান করে পৌঁছুলেন উড়ুপীতে, দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্যের শ্রীপাটে।

এক বণিক দ্বারকা থেকে বেরিয়েছে নৌকো করে। নৌকোর মধ্যে গোপীচন্দন আর গোপীচন্দনের মধ্যে বালগোপালের মূর্তি। মধ্বাচার্যের শ্রীপাটের কাছে এসে নৌকো ডুবল। নৌকোর সঙ্গে গোপালও ডুবল। তখন গোপাল স্বপ্নে মধ্বাচার্যকে আদেশ করল, জল থেকে আমাকে উদ্ধার করো। উদ্ধার করল মধ্বাচার্য। দক্ষিণ কানাড়ায় সমুদ্রের কাছে উড়ুপীতে মূর্তি তুলে এনে মধ্বাচার্য গোপালের সেবা প্রতিষ্ঠিত করলে।

শঙ্করাচার্যের ঘোর বিরোধী মধ্বাচার্য। আগন্তুক সন্ন্যাসী দেখলেই তাকে শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী বলে মনে করত তত্ত্ববাদীরা। যারা দ্বৈতবাদী, তাদেরই আরেক নাম তত্ত্ববাদী। তাই প্রথমে তারা গৌরহরিকে সম্ভাষণই করল না। কে না কে এক মায়াবাদী এসেছে।

কিন্তু এ কী! গোপালকে দেখে এ তার কী প্রগাঢ় প্রেমাবেশ! এ যে নাচছে, কাঁদছে, টলে-টলে ঢলে-ঢলে পড়ছে।

সন্দেহ কী, এ সন্ন্যাসী বৈষ্ণবত্তম সন্ন্যাসী।

চলো, এর সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করি; দেখি, এ কী বলে।

প্রভু বললেন, 'সাধ্যসাধন আমি ভালো জানিনা। তোমরা একটু বলবে আমাকে বুঝিয়ে?'

তাদের আচার্য্য বললে, 'বর্ণাশ্রমধর্মের ফল কৃষ্ণে অর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধনেই পঞ্চবিধ মুক্তি। মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠগমন।'

পঞ্চবিধ মুক্তি কি? সার্ষ্টি—ভগবানের সমান

ঐশ্বর্য, সালোক্য—ভগবানের সমান স্থান, সারূপ্য—ভগবানের সমান রূপ, সামীপ্য—ভগবানের নৈকট্য, আর সাযুজ্য—ভগবানে সংমিশ্রণ।

'কিন্তু শাস্ত্র বলেন, নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন।' বললেন গৌরহরি। পঞ্চবিধা মুক্তির কথা কে বলে, কোন্ শাস্ত্র? কৃষ্ণের প্রেমসেবাই সাধ্য আর শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিই সাধন। শ্রবণ-কীর্তন থেকে কৃষ্ণে প্রেম জন্মে, আর সেই প্রেমই পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থসীমা—যার পরে আর কাম্য-প্রাপ্য কিছু নেই।'

'আরো বলুন।'

'কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে।' কর্ম ভক্তির অঙ্গ নয়, কেন না, কর্মে শুধু স্বসুখানুসন্ধান। উদ্ধবকে কী বলছেন কৃষ্ণ? বলছেন, যে পর্যন্ত নির্বেদ না জন্মে কিংবা যে পর্যন্ত আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্যন্তই নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করবে। মুক্তিতে ভগবৎসেবা কই? তাই ভক্তেরা পঞ্চবিধা মুক্তির কোনো মুক্তিই কামনা করে না। 'সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য।'

অনন্তদেবের কৃপায় মহারাজ চিত্রকেতু অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। আকাশ-পথে যাচ্ছে, দেখল, মুনিদের সভায় মহাদেবও বসে আছে। কিন্তু এ কী, বসে আছে পার্বতীকে কোলে করে। শুধু কোলে করে নয়, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। চিত্রকেতু ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে মহাদেবকে বিদ্রূপ করে উঠল। এ কী আচরণ! প্রাকৃত মানুষও যে আচরণে লজ্জাবোধ করে, স্বয়ং মহাদেব, যিনি লোকগুরু, যিনি ধর্মবক্তা, তিনি কী করে তা করছেন, আর করছেন মুনিসভায় বসে! মহাদেব স্তব্ধ হয়ে রইল। স্তব্ধ মুনিরাও। কিন্তু জগজ্জননী পার্বতী এ কঠিন বাক্য সহ্য করতে পারল না, শাপ দিল চিত্রকেতুকে। বললে, তুমি অসুরযোনি প্রাপ্ত হবে। পার্বতীর শাপ যে অব্যর্থ, এ চিত্রকেতুর অজানা নয়, তবু সে বিচলিত হল না, বিমান থেকে নেমে নত মস্তকে বললে,—মা, তোমার শাপ আমি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করছি, আমাকে আমার কর্মফল ভোগ করতেই হবে। কিন্তু যে নারায়ণনিষ্ঠ, তার সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, তার স্বর্গ নরক অপবর্গ সমস্ত সমান।

তখন পার্বতীকে সম্বোধন করে মহাদেব বললে, 'দেবি দেখ, ভগবদ্ভক্তেরা কেমন নিস্পৃহ, কেমন নির্বিচল। তাদের শাপই দাও, তাপই দাও, অগ্নিকুণ্ডে ফেল, ফেল বা সর্পমুখে—তারা নির্ভয়, নির্বিকার। তাদের কাছে স্বর্গ-নরক মুক্তি-মোক্ষ এককথা। যেহে ওর কোনোটাতেই ভক্তিসুখ নেই। তারা শু ভক্তিসুখপ্রয়াসী।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

'বৈষ্ণবের সাধ্য মুক্তি নয়, সাধনও কর্ম নয়' বললেন গৌরহরি, 'তোমরা তত্ত্ববাদী, তোমরা তো জানো, কিন্তু কেন আমাকে বঞ্চনা করছ? কর্মী জ্ঞানী দুই-ই ভক্তিহীন, আর তোমাদের সম্প্রদায়ে কর্ম আর জ্ঞানেরই প্রশংসা। তবে তোমাদের একমাত্র গুণ তোমরা ঈশ্বরের বিগ্রহকে মায়িক মনে করো না, সচ্চিদানন্দময় মনে করো।'

প্রেমভক্তির প্রকৃতস্বরূপ বর্ণনা করলেন গৌরহরি। শাস্ত্র যুক্তিতে তত্ত্ববাদীদের গর্ব ধূলিসাৎ হল।

প্রভু ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুপুরে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন বিঠ্ঠল ঠাকুরকে।

ইটের উপর বসে থাকা ঠাকুরই বিঠ্ঠল ঠাকুর।

এক ভক্ত কায়ে-মনে অখণ্ড পিতৃসেবা করছে, ভগবান তুষ্ট হয়ে তাকে দেখা দিলেন। সেবায় নিযুক্ত পুত্র অতিথিকে তখুনি অভ্যর্থনা করতে ছুটল না। হাতের কাছে একখানা ইট ছিল, তাই এগিয়ে দিয়ে বললে,—বৈঠো। হাতের কাজ সেরে আসছি তোমার খবর নিতে, ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করো।

হাতের কাজ সেরে ভক্ত এগিয়ে এসে দেখে সেই ইটের উপর কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। ভক্ত তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, বলল, সেবায় তন্ময় থেকে তোমাকে চিনতে পারিনি, আমার অপরাধ মার্জনা করো।

ভগবান বললেন,—তোমার পিতৃসেবায় আমি আনন্দিত, তুমি বর নাও।

'আর কোনো বর নয়, তুমি এইখানে এমনিভাবে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকো।'

ভুবনমোহন হাসলেন। বললেন—তথাস্তু।

বৈঠ্‌তে বলেছিল বলে ঠাকুরের নাম বিঠ্ঠল ঠাকুর।

এক ব্রাহ্মণ প্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করল, বললে মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী আছে তার অতিথি হয়ে।

বলো কী ? প্রভু তখুনি চললেন বিপ্রগৃহে, দেখলেন তাঁর গুরুর গুরুভ্রাতা শ্রীরঙ্গ বসে আছে উদগ্রীব হয়ে। প্রেমাবেশে দণ্ড-প্রণাম করলেন, পুলকাশ্রু স্বেদ-কম্পের বিকার জাগল শরীরে।

'তোমার সঙ্গে আমার গুরুদেবের কি কোনো সম্পর্ক আছে ?' জিগগেস করল শ্রীরঙ্গ, 'নইলে এমন প্রেমবিকার তো সম্ভব নয়।'

তার আর সন্দেহ কী। দুজনে কাঁদতে লাগল গলাগলি হয়ে।

তারপর সুরু হল কৃষ্ণকথা। কৃষ্ণানন্দ।

'তোমার পূর্বাশ্রম কোথায় ?' কথাচ্ছলে জিগগেস করল শ্রীরঙ্গ।

'নবদ্বীপ।'

'জানো, মাধবপুরীর সঙ্গে আমি একবার গিয়েছিলাম নবদ্বীপ। এক সদ্‌ব্রাহ্মণ, নাম জগন্নাথ মিশ্র, আমাদের ভিক্ষে করিয়েছিলেন—একটি অপূর্ব জিনিস সেদিন খেয়েছিলাম।'

'কী ?'

'মোচার ঘণ্ট। বাৎসল্যে জগন্মাতা, জগন্নাথের স্ত্রী কত যত্ন করে আমাদের খাইয়েছিলেন। তুমি চেন তাঁদের ? তাঁদের এক ছেলে অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিল—নাম শঙ্করারণ্য। এই তীর্থেই সে দেহরক্ষা করেছে।'

প্রভু বললেন, 'তিনি পূর্বাশ্রমে আমার ভ্রাতা ছিলেন। আর জগন্নাথ মিশ্রই আমার পূর্বাশ্রমের পিতা।'

বিভোর হয়ে প্রভুকে দেখতে লাগল শ্রীরঙ্গ। দ্বারকায় কী যাচ্ছি তবে কৃষ্ণ দেখতে !

শ্রীরঙ্গ দ্বারকায় চলে গেলেও প্রভু আরো চারদিন থাকলেন পাণ্ডুপুরে। তারপর এলেন কৃষ্ণবেণ্বাতীরে। শুনলেন সেখানকার বৈষ্ণবচরিত্র ব্রাহ্মণেরা বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' পড়ছে। শুনে শুনতে গেলেন একদিন।

কৃষ্ণলীলার সৌন্দর্য আর মাধুর্যের অবধিই 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।' পাঠ শুনে আনন্দময় হলেন প্রভু। পুঁথির প্রতিলিপি করিয়ে নিলেন। নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

তাপ্তীতে স্নান করে এলেন মাহিষ্মতীপুরে, নর্মদার তীরে দেখলেন নানা তীর্থ। ধনুতীর্থ দেখে নির্বিন্ধ্যাতে স্নান করলেন। তারপর এলেন দণ্ডকারণ্যে, ঋষ্যমূক পর্বতে।

কাননে সপ্ত তালবৃক্ষ। অতি-বৃদ্ধ, অতি-স্থুল, অতি-উচ্চ। প্রভু তাদের আলিঙ্গন করলেন। সপ্ততাল সশরীরে চলে গেল বৈকুণ্ঠে।

শূন্যস্থান দেখে সকলে অভিভূত হয়ে গেল। ইনি তবে সেই রাম-অবতার, করতে লাগল বলাবলি। রাম ছাড়া আর কার এমন শক্তি হবে !

প্রভু পম্পা-সরোবরে স্নান করলেন, বিশ্রাম করলেন পঞ্চবটীতে। নাসিক-ত্র্যম্বক দেখে ব্রহ্মগিরি গেলেন, গেলেন গোদাবরীর জন্মস্থানে, কুশাবর্তে। আরো বহুতীর্থ দেখে বিদ্যানগরে ফিরলেন।

সচল জগন্নাথ ফিরে এসেছেন খবর পেয়ে ছুটে এল রামানন্দ। নয়নে নিরবধি আনন্দের ধারা, বদনে 'হরেকৃষ্ণ' নাম—চলো দেখিগে সেই ভক্তিরস-বিহারীকে। পদতলে লুটোই ধুলোতে।

রামানন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করল প্রভুকে, প্রভু তাকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সুস্থির হয়ে সুরু করলেন 'ইষ্টগোষ্ঠী', কৃষ্ণকথার আলাপন। প্রভু বর্ণন করলেন তাঁর তীর্থভ্রমণের কাহিনী, ব্রহ্মসংহিতা আর কর্ণামৃত পুঁথি দেখালেন।

'জানো, রাজা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।' বললে রামানন্দ, 'আমি পুরীতে গিয়ে থাকব।'

'খুব ভালো কথা।' বললেন প্রভু, 'আমি তো সেজন্যেই এখানে এসেছি। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

রামানন্দ বললে, 'না, তুমি আগে যাও। আমার সঙ্গে অনেক হাতি ঘোড়া সৈন্য সামন্ত যাবে। সে সব কোলাহল তোমার ভালো লাগবে না।'

ইষ্টগোষ্ঠী হল আরো কয়েক দিন। তুমি তবে পিছু-পিছু এস, প্রভু চললেন নীলাচলে। যে পথ ধরে গিয়েছিলেন, ফিরলেনও সেই পথে। হরিনামের ঢেউ পড়ে গেল চারদিকে। আমাদের গোঁসাই ফিরে এসেছেন।

'যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেইদিগে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-যুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করেন সকল॥
ধূলি গুটী পায় মাত্র যে সুকৃতি জন।
তাহার আনন্দ হয় অকথ্য কথন॥
কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম।
দেখিতে সভার চিত্ত হরে অবিরাম॥'

প্রভু আলালনাথে এসে পৌছুলেন। কৃষ্ণদাসকে

পাঠিয়ে দিলেন, নিত্যানন্দকে খবর দাও,—আমি এসেছি।

ছুটে চলে এল নিত্যানন্দ। 'প্রেমে থেহ নাহি পায়।' প্রেমে আর স্থৈর্য মানতে চাইছে না। সঙ্গে এল দামোদর, মুকুন্দ, জগদানন্দ। পশ্চাতে গোপীনাথ। পথের মাঝখানেই নাগাল পেল প্রভুর। এ কি, এ যে সার্বভৌমও এসে পড়েছে। সকলকেই গাঢ় আলিঙ্গন করলেন প্রভু। সার্বভৌম কাঁদতে লাগল।

প্রথমেই চলো জগন্নাথ-দর্শন করে আসি।

জগন্নাথ দেখে প্রভুর প্রেমাবেশ জাগল। শরীর ভেসে গেল পুলকাশ্রুতে। নৃত্য সুরু হল, কিছুতেই স্থির হন না প্রভু। পাণ্ডারা প্রসাদ নিয়ে এল, সঙ্গে প্রসাদী মাল্য। প্রসাদে শান্ত হলেন।

কাশী মিশ্র এসে প্রণাম করল। উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ, রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু, জগন্নাথ-সেবার অধ্যক্ষ। আলিঙ্গনে তাকে সম্মানিত করলেন প্রভু।

সার্বভৌম প্রভুকে নিজগৃহে নিয়ে গেল। ভিক্ষে করাল। শয়ন করলে লাগল পদসেবা করতে।

প্রভু বললেন, 'এত তীর্থ ঘুরলাম, তোমার মত বৈষ্ণব দেখলাম না। আর রায় রামানন্দ যে আনন্দ দিল, তার তুলনা হয় না।'

'তাই তো তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম।'

তারপর এবার আবার আরেকজন আসছে।

প্রভু তখন দাক্ষিণাত্যে, রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে রাজধানী কটকে ডেকে পাঠাল। বললে, 'হ্যাঁ হে, তোমার ঘরে নাকি এক অদ্ভুত মহাপুরুষ এসেছেন। অনেক নাকি কৃপা করেছেন তোমাকে। আমাকে একবার দর্শন করিয়ে দাও না।'

'অসম্ভব।'

'অসম্ভব কেন?'

'তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, স্বপ্নেও রাজদর্শন করেন না। বিষয়ীর সংস্পর্শের ভয়ে নির্জনে থাকেন। তা ছাড়া—'

হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল প্রতাপরুদ্র।

'তাছাড়া সম্প্রতি তিনি তীর্থ করতে দক্ষিণে গিয়েছেন।'

'সে কী? তাঁর আবার তীর্থের প্রয়োজন কী?'

'প্রভুর এই এক লীলা। তীর্থ পবিত্র করবার জন্যেই মহাপুরুষদের তীর্থভ্রমণ। আর তীর্থভ্রমণের ছলে লোকনিস্তার।'

'তাঁকে তুমি যেতে দিলে কেন?' প্রতাপরুদ্র করুণ স্বরে বললে, 'পায়ে পড়ে কেন রেখে দিলেনা সযত্নে?'

'আপনি কি বলছেন? তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সাক্ষাৎ বাসুদেব, কে তাঁকে আটকাবে? কে তাঁর ইচ্ছার বাদী হবে?'

'কৃষ্ণ—তাকে তুমি কৃষ্ণ বলছ?' প্রতাপরুদ্র বললে গম্ভীর হয়ে, 'আমিও তাই সত্য বলে মানছি। কিন্তু বলো কী করে নয়ন সফল করি?'

'তিনি অল্পকালের মধ্যেই ফিরবেন।' বললে সার্বভৌম, 'কিন্তু তাঁকে রাখতে হলে তাঁর জন্যে একটি নির্জন স্থান দরকার।'

'কাশীমিশ্রের বাড়ী সমুদ্রের ধারে, মন্দিরের কাছে, বেশ নির্জন জায়গা। সেখানেই ব্যবস্থা করো।'

কাশীমিশ্র বললে, 'এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে! প্রভু আমার গৃহে থাকবেন, আমার ভাগ্যের ইতি-অন্ত নেই।'

আর প্রভু তার ঘরে থাকতে সম্মত আছেন জেনে কাশীমিশ্র তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'শুধু ঘর নিলে চলবে না, সেই সঙ্গে আমাকেও নিতে হবে।' 'গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদন।'

বিরলে তাকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন প্রভু।

তারপর আসন নিলেন।

পুরুষোত্তমবাসীরা দেখা করতে আসছে প্রভুর সঙ্গে। তৃষিত চাতকের যেমন মেঘের জন্য উৎকণ্ঠা, তেমনি প্রভুর জন্যে তাদের ব্যাকুলতা।

ডাইনে বসে সার্বভৌম পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এ জগন্নাথসেবক জনার্দন। এ হাতে সোনার বেত মন্দিরের প্রহরী কৃষ্ণদাস, এ হিসেবরক্ষক শিখি মাহিতী—আর ইনি বৈষ্ণবপ্রধান প্রদ্যুম্ন মিশ্র। কীর্তনবিহারী, প্রেমের শরীরধারী প্রদ্যুম্ন। 'ইনি কে?'

'ইনি শিখির ভাই মুরারি মাহিতী— যিনি মন্দিরের প্রধান পাচক। ইনি বিষ্ণুদাস, ইনি পরমানন্দ মহাপাত্র। সবাই তোমার চরণ ভজন করে।'

'আর ইনি?'

'ইনিই রায় ভবানন্দ পট্টনায়ক। রামানন্দের বাবা।'

ভবানন্দের পাঁচ ছেলে। রামানন্দ পরে আসছে, অপর চার-চার ছেলেসহ এসেছে ভবানন্দ। বললে, 'আমার সমস্ত তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম।' 'নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে। আত্মা সমর্পিল আসি তোমার চরণে॥'

ছোট ছেলে বাণীনাথকে প্রভুর কিঙ্কর করে রেখে গেল।

যে কৃষ্ণদাস সঙ্গে গিয়েছিল তার কীর্তির কথা প্রভু বললেন সকলকে। 'আমাকে ছেড়ে বামাচারী ভট্টমারি হতে গেল, লুব্ধ হল কাম-কাঞ্চনে। বামাচারীদের হাত থেকে নিয়ে এসেছি উদ্ধার করে। ও এখন যেখানে খুশি সেখানে থাক, আমার সঙ্গে আর নয়।'

তবে ওকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিই। নিত্যানন্দ পরামর্শ দিল। শচীমাতাকে গিয়ে খবর দিক। খবর দিক অদ্বৈত-শ্রীবাসকে। প্রভু ফিরে এসেছেন নীলাচলে।

'কী বলো, দেশে এবার খবর পাঠাই।' প্রভুর মতামত জানতে এল সকলে।

'তোমাদের যা খুশি করো।' সম্মতি দিলেন প্রভু।

কৃষ্ণদাসই নিয়ে যাক সমাচার। লোকশিক্ষার জন্যে প্রভু তাকে বর্জন করেছেন কিন্তু তবু নিত্যানন্দের কৃপা থেকে সে বঞ্চিত হয়নি। যদি কামকাঞ্চনে মন বিক্ষুব্ধ হয়, নিত্যানন্দের চরণ স্মরণ করো, বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হও, মোহমুক্ত হয়ে যাবে।

কৃষ্ণদাসের সঙ্গে মহাপ্রসাদ দিয়ে দিল। দিও শচীমাতাকে। বৈষ্ণববৃন্দকে।

অদ্বৈত আচার্যের ঘরে উল্লাসের বান ডাকল। প্রেমাবেশে হুঙ্কার করতে লাগল অদ্বৈত। এল হরিদাস, বাসুদেব, মুরারি, শিবানন্দ। এল বক্রেশ্বর, গদাধর, শ্রীবাস, দামোদর। এল আরো অনেকে।

চলো সকলে নীলাচলে যাই। আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হই। তার আগে শচীমাতার আশীর্বাদ নিই।

গেল সকলে শচীমাতার কাছে।

'খবর পেয়েছ ?'

'পেয়েছি বইকি।' বললেন শচীমাতা, 'নিমাই আমার জন্যে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ পাঠিয়েছে। ভিক্ষে করেছে আশীর্বাদ।' একচোখে হাসছেন, কাঁদছেন আরেক চোখে।

'অনুমতি করো—আমরা সব নীলাচলে যাব।'

'যাও, দেখে এস আমার নিমাইকে। নিত্য যে বালগোপালকে ভোগ দিই, আমার সেই চিত্তের পুত্তলকে।'

আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। এগিয়ে এল পরমানন্দ পুরী।

ঋষ্যভ পর্বতে দেখা হয়েছিল প্রভুর সঙ্গে। প্রভু বলেছিলেন নীলাচলে স্থায়ী ভাবে বাস করতে। নীলাচল হয়ে পরমানন্দ এসেছিল নবদ্বীপ। বিশ্রাম করল শচীগৃহে, ভিক্ষাগ্রহণ করল। বলল প্রভুর সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাতের কথা। তোমার নিমাই ভালো আছে, ভুবন প্লাবিত করছে কৃষ্ণনামে।

ওদের বেরুতে বোধহয় এখনো দেরি আছে। তর সইল না পরমানন্দের। কমলাকান্তকে সঙ্গে করে চলল নীলাচলে।

সকলের আগে এসে পৌঁছুল।

'মাধবেন্দ্রের প্রসাদ আবার প্রকাশিত হল আমার কাছে।' প্রভু পরমানন্দকে আলিঙ্গন করলেন : 'ইচ্ছে হয় তুমি নীলাদ্রি আশ্রয় করে থাকো। আমাকে তোমার সঙ্গ দাও।'

কাশী মিশ্রের আবাসেই পরমানন্দের জন্যে নিভৃত ঘর ধার্য হল। ধার্য হল সেবক কিঙ্কর।

এ আবার কে এল মিলতে ?

এ যে দেখি স্বরূপদামোদর। পরমানন্দের আবির্ভাব ত্রিহুতে, স্বরূপদামোদরের নবদ্বীপে। পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য। প্রভুর সন্ন্যাস দেখে পাগলের মত ছুটল কাশীতে, চৈতন্যানন্দের কাছে সন্ন্যাস নিল। শিখাসূত্র ত্যাগ করল না, যোগপট্ট গ্রহণ করল না, স্বরূপে অবস্থান করল বলে নাম হল স্বরূপ। শুধু গৈরিক ধারণ করে ব্রহ্মচারী রইল।

গুরু বললে, 'বেদান্ত পড়ো, বেদান্ত পড়াও।'

স্বরূপ বললে, নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজনা করব বলেই আমার সন্ন্যাস। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানি না, নেই বা জানবার।

গুরুর সম্মতি নিয়ে ছুটলেন নীলাচল।

প্রভুরই দ্বিতীয় স্বরূপ, প্রেমময় দেহ, কৃষ্ণরসতত্ত্ব-বিগ্রহ। পাণ্ডিত্যের পাহাড়, কিন্তু কারু সঙ্গে কথা কন না, নির্জনে বসে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিহ্বল থাকেন। কেহ কোনো গ্রন্থ বা গীত বা শ্লোক রচনা করে প্রভুকে দেখাতে আনলে স্বরূপ প্রথমে পরীক্ষা করে দেখে এতে ভক্তির কোনো বিরুদ্ধ কথা আছে কিনা, আছে কিনা রসাভাস, রচনা শুনে প্রভু আনন্দিত হবেন কিনা। যদি স্বরূপ বোঝে রচনা শুদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল, তবেই প্রভুকে শোনায়। আর সঙ্গীতে গন্ধর্ব, প্রভুর কাছে গান গায় দামোদর। প্রভুর রুচি শুধু চণ্ডীদাসে, বিদ্যাপতিতে, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে।

পরমানন্দ আর স্বরূপদামোদর প্রভুর দুই বাহু। দুই নেত্র। এক নদীর দুই তীর। [ ক্রমশঃ।
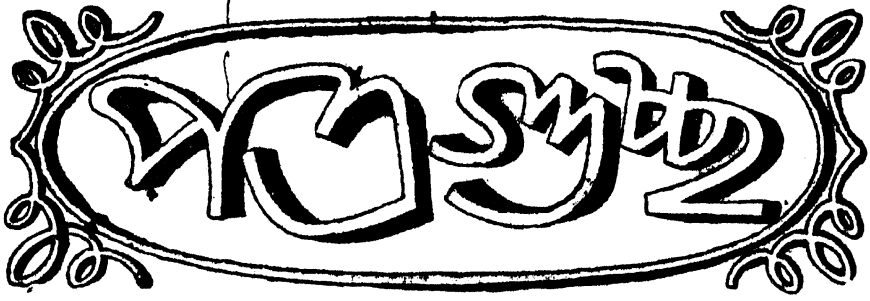
# মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চিঠি ঃ স্বামী যুবরাজ য়্যালবার্টকে লেখা

বাকিংহাম প্যালেস
২১এ নভেম্বর ১৮৩৯

......যথাশীঘ্র বিষয়টি কোবার্গে ঘোষিত হোক এবং ঘোষণার পরমুহূর্তেই তোমাকে আমি অর্ডারটি ১ পাঠিয়ে দিই—এখানে সেই ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়েছে।

তুমি এখানে আসার ঠিক পূর্বমুহূর্তেই এখানে তোমার স্তর নির্দিষ্ট হবে। সৈন্যবাহিনীতেও তোমার আসন সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই করা হবে। সবকিছুই খুব সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থা করা হবে। গতকাল লর্ড মেলবোর্ণ ২ আমাকে ঘোষণাপত্রটি দেন। ঘোষণাপত্রটি খুব সরল এবং চমৎকার। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলি তোমাকে পাঠাচ্ছি। গতকাল লর্ড মেলবোর্ণ আমাকে জানিয়েছেন যে, সমগ্র মন্ত্রিসভা দৃঢ়ভাবে মত দিয়েছেন যাতে তোমাকে কোন মতে "পীয়ার" না করা হয়। এ বিষয়ে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ এবং দৃঢ়সঙ্কল্প। আমি মামাকে ৩ বিষয়টি জানাচ্ছি।

২২এ নভেম্বর ১৮৩৯

এইমাত্র লর্ড মেলবোর্ণ আমার কাছেই ছিলেন এক ঘোষণাটি কোবার্গে যাতে যথাশীঘ্র ঘোষিত হয়, সেই তাঁর প্রবল ইচ্ছা। পরিবারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোমায় আমাকে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করি, এই তাঁর ইচ্ছা, যে ইতিহাসে জানা যাবে যে, কারা আমাদের যথার্থ পূর্বপুরুষ ছিলেন, প্রোটেষ্টাণ্ট বা লুথেরান ধর্মের প্রসারে বা অনুশীলনে তাঁরা কে কতখানি অংশগ্রহণ করেছিলেন। যতটা জান যথাশীঘ্র জানিও এবং যতদূর সংগ্রহ করতে পার যথাশীঘ্র পাঠিও। এখানে কয়েকটি দুষ্ট লোক জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, তুমি আসলে ক্যাথলিক, তোমার কাছে এই তথ্যগুলি পেলে সেইগুলির সাহায্যে এই ভ্রান্ত এবং অনিষ্টকর প্রচার বন্ধ করতে পারবেন বলে লর্ড মেলবোর্ণের ধারণা। তথ্যগুলি মিঃ শেঙ্ককে দিয়ে ইংরাজী ভাষায় লিখিয়ে পাঠিও।

আমাদের দিক থেকে এ বিষয় স্থির করার আর কিছুই নেই। বিয়ের জন্যে চুক্তির কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না তবে তুমি যদি কোন কিছু ঠিক করে নিতে চাও, তা হলে সবচেয়ে ভালো হয় সেটি এখানে পাঠিয়ে দেওয়া।

উইণ্ডসর কাসল
২৩এ নভেম্বর ১৮৩৯

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় এখানে পৌছেচি। সবকিছুই খুব সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। অধিবেশনটি ৪ বসেছিল দুটোর সময়। প্রায় এক শ' জনেরও বেশী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সামনে আমাকে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করতে হয়েছিল। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই বিব্রতকর বলে মনে হচ্ছিল; অত লোকের সামনে ঐ ঘোষণাটি পাঠ করা—তার উপর অনেকেই আমার অপরিচিত, তবে তাঁরা পরে বললেন যে, আমার পড়া খুব ভালো হয়েছে।

লর্ড মেলবোর্ণ তো একেবারে অভিভূত। প্রত্যেকেই আমায় জানিয়েছেন যে, তাঁরা খুব তৃপ্ত। আমি যখন উইণ্ডসর প্যালেস থেকে বেরোচ্ছি তখন যে বিরাট সংখ্যক জনতা উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি দিয়ে আমায় অভিবাদন জানালে—তুমি যদি তা দেখতে পেতে!

আজ আমি আনন্দে পরিপূর্ণা। আমার আনন্দের আজ সীমা-পরিসীমা নেই। আচ্ছা, যদি তুমি আজ একবার আমার পাশে এসে দাঁড়াতে। বার বার এই জয়নাদের মধ্যে—এই প্রশংসাবাদের মধ্যে—এই সাধুবাদের মধ্যে আমার যে খালি তোমাকেই মনে পড়েছে। আমার এই সবকিছুর সমান অংশ তুমিই শুধু নিতে পারতে, এই জয়োল্লাসে আমার অন্তরের অনুভূতির স্পর্শ তুমিই পারতে উপলব্ধি করতে।

তোমাকে শুধু ঘোষণাপত্রটি আজ পাঠাতে পারি। সবকিছুর বিশদ বর্ণনা এরপর তোমায় পাঠাব।

উইণ্ডসর কাসল
২৭এ নভেম্বর ১৮৩৯

কোন বিদেশী এদেশের সরকারী কাজে হাত দিলে তার প্রতি ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ভয়ানক হিংসুটে মনোভাব-সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

---

১ অর্ডার অব দ্য গার্টার।

২ ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত জীবনেও ইনি বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ভিক্টোরিয়ার সকল কর্মের মধ্যে এঁর প্রভাবের স্বাক্ষরটি প্রস্ফুটিত হয়ে থাকত। ভিক্টোরিয়ার জীবনে এঁর প্রভাব এককথায় ছিল অনতিক্রম্য। ইনি শুধু প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না, ভিক্টোরিয়ার অন্তরঙ্গতম বন্ধুদের মধ্যেও অন্যতম।

৩ বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড। ইনি ভিক্টোরিয়ার মামা ও য়্যালবার্টের কাকা ছিলেন।

৪ মহারাণীর বিবাহের সংবাদটি শোনার জন্যে পার্লামেণ্ট এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। এই অধিবেশনে মহারাণীর ভূমিকা সংশ্লিষ্ট পত্রের মাধ্যমেই জানা যাচ্ছে।

দেখ, এর মধ্যেই এখানকার কয়েকটি কাগজ আশা করছেন যাতে তুমি না এখানকার সরকারী কার্য্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ কর ( অথচ এঁরা আমাদের উভয়ের প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন )। আমি জানি, যদিও তুমি কোনদিনই পীয়ার হচ্ছ না, তবুও যদি তুমি পীয়ার হ'তে তাহ'লে এরা সবাই বলত যে, যুবরাজ এবার রাজনৈতিক খেলায় মাতছেন। আমি নিশ্চিত যে সবই তুমি বুঝছ তবে এসব বিষয়ে বর্তমানে কোন কিছু না বলাই ভালো। সবকিছু আস্তে আস্তে থেমে যাক। ঘোষণাপত্রে তোমার নামে 'প্রোটেষ্ট্যাণ্ট প্রিন্স' কথাটি লেখা না থাকায় টোরিরা আবার তোমাকে 'পেপিস্ট' বলে প্রচার করে আবহাওয়া অত্যন্ত তিক্ত করে তুলছে। আমি কোন পেপিস্টকে বিয়ে করতে পারি বলেই এই প্রচারের প্রয়োজন হয়েছে।

২১এ নভেম্বর ১৮৩১

গতরাত্রে মেলবোর্ণের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হল। পীয়ারেজের ব্যাপার নিয়ে তোমার অভিমত তিনি সমর্থন করেন। আজ সকালে আবার আমাদের বিয়েতে তোমার ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও অনেক আলোচনা হ'ল তোমার সরকারী অনুচর প্রসঙ্গেও। তিনি বললেন যে তাঁর একান্ত সচিব মিঃ য়্যানসন তোমার কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমিও এ প্রস্তাব খুব আনন্দের সঙ্গে সমর্থন করি; কারণ আমি জানি যে, মিঃ য়্যানসন একজন চমৎকার যুবক, তার উপর খুব সাধু প্রকৃতির, পরিশ্রমী এবং বহু তত্ত্ববিদ ও তথ্যের আকর। তিনি হাউস অফ কমন্সের সভ্য নন, সেটাও সুবিধের। মোটের উপর ভদ্রলোক নানাভাবে তোমার কাজে আসবেন।

উইণ্ডসর কাসল
৮ই ডিসেম্বর ১৮৩১

যে সব লোককে তোমার কাজে নিয়োগ করা হবে, তোমার অনুচর যাঁরা হবেন, তাঁদের অধ্যবসায়, আন্তরিকতা ও সততা সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করতে পার। তাঁরা প্রত্যেকেই কর্মক্ষম, সৎ ও সজ্জন। তা'ছাড়া এঁরা সদাসর্বদাই তোমার আশেপাশে থেকে তোমাকে ঘিরে রাখবেন না। এঁরা তোমার কাছে থাকবেন কেবল বিরাট উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানাদিতে, তোমার বহির্ভ্রমণের সময়ে, ভোজসভা ইত্যাদিতে। আমি তোমার জন্যে অলস ও অসৎ লোককে নিয়োগ করব না, তুমি এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। লর্ড মেলবোর্ণও এবিষয়ে অনেকগুলি উপযুক্ত ব্যক্তির নামের তালিকা পেশ করেছেন।

৯ই ডিসেম্বর ১৮৩১

পূর্বপত্রের জের·····

আজকে আমি নিউ পোর্টের মেয়রকে নাইটহুড দিলাম। ইনিও খুব দক্ষ লোক এবং তাঁর কার্য্যাদিতে আমি সন্তুষ্ট। মৌখিকভাবে এই কথাটি যখন তাঁকে জানালুম, তিনি আশাতীত আনন্দলাভ করলেন। অন্যান্য কর্মচারীদেরও পুরস্কৃত করা হয়েছে।

তোমার সকল আনন্দে, সকল বেদনায় তোমার সঙ্গে আমি সমান অংশগ্রহণ করি, আমার আনন্দ, আমার বেদনাতেও তোমার সমান অংশ।

আজ লর্ড উইলিয়ম রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তুমি কেন তাঁকে, চেন না? আমি তোমাকে বলতে একেবারে ভুলে গেছি যে, ইনিই তোমার খাস দপ্তরের গ্রুম অফ দি ষ্টোল হবেন। এই পদটি কেবলমাত্র নিছক সম্মানেরই, কোন কাজকর্ম এর নেই, তিনি একজন পীয়ার হবেন।

১০ই ডিসেম্বর ১৮৩১

পূর্বপত্রের জের·····

এখানে এখনও তোমার মূর্তি এসে পৌছল না। আমি ভয়ানক অধৈর্য্য হয়ে পড়ছি। সাদারল্যাণ্ডের ডাচেস আমায় লিখেছেন যে, তিনি রোমে সেটি দেখেছেন আর জানিয়েছেন মূর্তিটি অপূর্ব হয়েছে।

আজ রাণী য়্যাডলেডকে ৫ আমি এখানে খুব আশা করছি। পরশু পর্য্যন্ত তিনি এখানে থাকবেন। লর্ড মেলবোর্ণ তোমায় জিজ্ঞেস করতে বলেছেন যে, তুমি লর্ড গ্রসভেনোরকে চেন কি না? তিনি ওয়েসমিনস্টারের মার্কুইসের ছেলে এবং কোন দলভুক্ত নন; পার্লামেন্টেও তাঁর কোন যোগ নেই, লোক তিনি চমৎকার এবং জার্মাণ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। মহাদেশ সম্বন্ধেও তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর, তিনি যদি সম্মত হন, তাঁকেও তোমার কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে, তোমার পছন্দমত তোমার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে লর্ড মেলবোর্ণ কাজ করতে সর্বদাই উৎসুক এটা তুমি জেন! এবার আমার একটা অনুরোধ তোমার কাছে—তোমার চিকিৎসকের পদটা হতভাগ্য ক্লার্ককে দাও না। এতে সে যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করবে আর তা ছাড়া পদটাও অবৈতনিক।

উইণ্ডসর কাসল
১৫ই ডিসেম্বর ১৮৩১

তোমার কাছ থেকে আবার কোন চিঠিপত্র পাচ্ছি না। লর্ড মেলবোর্ণ তাঁর বোনের বিয়ের জন্যে আজ সকালে গেছেন, কাল অপরাহ্নেই ফিরে আসবেন। আমি আশা করি, তিনি এখানেই থাকবেন কারণ আমি তাঁর অত্যন্ত অনুরাগিণী, আমার জীবনের সকল আনন্দে তাঁর বিরাট অংশ, তা'ছাড়া তিনিই একমাত্র ব্যক্তি—যাঁর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমি প্রাণ খুলে অসঙ্কোচে সব রকম কথাবার্তা বলতে পারি, যা আমার মন্ত্রিসভার আর কারো সঙ্গে পারি না।

কোবার্গের নরনারী আমাদের বিবাহের ব্যাপারে আনন্দিত জেনে সত্যই খুব তৃপ্তি পেয়েছি।

১৭ই ডিসেম্বর ১৮৩১

তোমার ইচ্ছা সম্পর্কে আমি লর্ড মেলবোর্ণের সঙ্গে কথা করেছি এবং তিনি সে বিষয়ে যা বলেছেন আমারও মত তাই। তোমার লোকজন যতদূর সম্ভব পার্লামেণ্ট থেকে দূরে থাকবে, তোমার খাস দপ্তর এবং আমার খাস দপ্তরের মধ্যে যেন কোনপ্রকার বৈপরীত্য গড়ে না ওঠে, তাই তোমার লোকজনদের মধ্যে টোরি দলভুক্ত যেন কেউ না হয়, তবে তুমিও এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে, লর্ড মেলবোর্ণ এবং আমি তোমার জন্যে সৎ এবং সজ্জন ব্যক্তিই নির্বাচনে সদাসর্বদা সচেষ্ট

---

৫ ইংল্যাণ্ডেশ্বর রাজা চতুর্থ উইলিয়ম (১৭৬৫-১৮৩৭) এর সহধর্মিণী। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সেজ জ্যাঠাইমা। জন্ম ১৭৯২, মৃত্যু ১৮৪৯। চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পরই অষ্টাদশী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

থাকব এবং সেদিকে আমরা দুজনেই আমাদের সমস্ত সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব।

২২শে—আমার লেখার সময় এখন খুব অল্প। সাদারল্যাণ্ডের ডাচেস এখন এখানে। তোমার প্রতি তিনি খুব সহানুভূতিশীল এবং প্রীতিপূর্ণা।

২৩এ—তোমার ১৫ তারিখের চিঠিটি এইমাত্র পেলুম। তুমি ঠিকই ধরেছ যে, সকল সময় তোমার ভাললাগার মত কাজ করে যাওয়ার বাসনা আমার প্রবল এবং সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা, কিন্তু একটি ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত নই—মিঃ য়্যানসনকে আমি তোমার উপদেশদাতারূপে নিয়োগ করতে চাই না, আমার বক্তব্য তুমি এ ব্যাপারে ঠিক ধরতে পার নি। আমি তোমায় বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, মিঃ য়্যানসন বেশ কর্মঠ এবং সজ্জন, তা' ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ইনি ওয়াকিবহাল, অতএব ইনি নানাভাবে তোমার কাজে লাগতে পারেন। এঁকে তুমি অনেক কাজে লাগাতে পার, এই ছিল আমার মূল বক্তব্য।

তোমার কাজে যোগ দেবার আগেই ইনি লর্ড মেলবোর্ণের কাজে পদত্যাগ করবেন।

তুমি য়্যানসন সম্পর্কে আরও আপত্তি জানিয়ে বলেছ যে, প্রধান মন্ত্রীর একান্ত সচিবকে কোষাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করলে লোকে তোমায় দলভুক্ত বলবে—তোমার এ ধারণার সঙ্গে আমি একেবারেই একমত নই। তারপর য়্যানসন নিজেও পার্লামেন্টের সঙ্গে যুক্ত নন। সেইজন্যে তিনি খুব একটা ঝানু রাজনীতিকও নন। তোমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আমি অবলম্বন করছি, তা তোমার ভালোর জন্যেই, আবার বলছি এ সব ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার প্রতি নির্ভরশীল হতে পার।

উইণ্ডসর কাসল
২৬এ ডিসেম্বর ১৮৩১

ঐতিহাসিক ধারা বিবরণীটি আমাদের গভীর আনন্দদান করেছে। লর্ড মেলবোর্ণ পাওয়ামাত্র সবটা একেবারে পড়ে ফেললেন এবং পড়লেনও অসীম আগ্রহের সঙ্গে। যে বংশগতাটি তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, সেজন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

আমি জেনে খুশী হলুম যে, লর্ড গ্রসভেনারকে তোমার বাবা চেনেন। তোমার কৃতজ্ঞতার কথা লর্ড মেলবোর্ণকে আমি নিশ্চয়ই জানাব। তুমি যে তাঁকে চিঠি লিখবে, এ সত্যিই অসীম আনন্দের কথা। ওঁর মত মহৎ, দরদী এবং উদার লোকের সঙ্গে তুমি যদি মিত্রতা গড়ে তোল, তা হলেই আমি সবচেয়ে সুখী হই। ওঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার পর আমি যতটা ওঁর বিরাটত্বের পরিচয় পেয়েছি, তুমিও ততটাই পাবে। ঠিক আমারই মত, তুমিও তাঁর প্রতি ভয়ানকভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। দুষ্টলোকদের দ্বারা তাঁর চেয়েও আর কেউ নিন্দিত হয়েছেন বলে আমার জানা নেই, আবার তাঁর মত ক্ষমাশীল ব্যক্তি আমার চোখে আজ পর্য্যন্ত কেউ ধরা পড়েননি।

উইণ্ডসর কাসল
৩০এ ডিসেম্বর ১৮৩১

এই সঙ্গে লর্ড মেলবোর্ণের চিঠিটিও জুড়ে দিলুম। আমি চিঠিটি পড়েছি। আমার মনে হয় এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। তাঁর মত মহাপ্রাণের নিরপেক্ষ উপদেশ আমি বলছি তু মেনে চল; তার ফল পাবেই। আমাদের জীবনের সর্বাঙ্গীন আনন্দ যে তাঁর একমাত্র কাম্য।

লর্ড মেলবোর্ণ বললেন যে—চিঠিটি তাঁর এক সচিবকে দিয়ে তি লিখিয়েছেন—পাছে তাঁর হাতের লেখা তুমি পড়তে না পার; নি শুধু সইটি করেছেন। জান, তাঁর হাতের লেখাও এক অদ্ভু ধরণের।

আমি আজ কেম্ব্রিজের ডিউকের ৬ সঙ্গে দেখা করেছি তোমার চিঠি তিনি আমায় দেখালেন। চমৎকার চিঠি। তি খুব খুশী হয়েছেন।

আমার প্রিয় হতে প্রিয় য়্যালবার্ট, নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি য নিও। আর এই কথা বিশেষ ভাবে মনে রেখে নিজেকে নিশ্চি কোরো যে, পৃথিবীতে তোমার বিশ্বস্তা ভিক্টোরিয়ার মত তোমাে এত ভাল আর কেউ বাসে না।

বাকিংহাম প্যালে
১১ই জানুয়ারী ১৮৪

ষ্টকমার ৭ এখন এখানে। আমি তাঁর সঙ্গে গতকাল এবং আজ দেখা করেছি। এখানকার দরবারী আদবকায়দা ও প্রথাদি তিনি তোমায় সমস্ত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন। এবং এ সব বিষ আমার চেয়ে তিনি অনেক অভিজ্ঞ। তাঁকে আবার দেখতে পে এবং সর্বোপরি তাঁকে এখানে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। ষ্টি (আমি তাঁকে ঐ নামেই ডেকে থাকি) ইংরাজীটা খুবই ভাল বোঝেন তা ছাড়া তোমার প্রতিও তিনি খুব আসক্ত।

বিরাট ভোজ-সভার আয়োজন এখানে এখন করছি না। কার উপরের বড় ঘরগুলো বর্ত্তমানে ঠিক ব্যবহারোপযোগী নেই কেবলমাত্র হপ্তায় তিন-চারদিন আমার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে ভোজনে যোগ দেন। প্রতি রবিবার ভোজন-সঙ্গী হিসেবে আমি তাঁকে পাই-ই। রবিবারে অন্য কাউকে আমি ভোজনে আহ্বান জানাইনা।

তোমার গান অপূর্ব। ওর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার মনকে অভিভূত করে তোলে।

---

৬ রাজা তৃতীয় জর্জের সপ্তম পুত্র। ভিক্টোরিয়ার কাকা। চতুর্থ উইলিয়ামের রাজত্বকালে হ্যানোভারের ভাইসরয়। জন্ম—১৭৭৪, মৃত্যু—১৮৫০। বর্ত্তমান ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর পিতামহী রাণী মেরী এঁরই দৌহিত্রী।

৭ ভিক্টোরিয়ার প্রধান উপদেশক। মহারাণীর জীবনকে ইনিও নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ভিক্টোরিয়ার জীবনে এঁর প্রভাবও অনেকখানি ছায়াপাত করেছিল। জাতিতে জার্মাণ। পেশায় চিকিৎসক। ভিক্টোরিয়ার চেয়ে বয়েসে ইনি বত্রিশ বছরের বড়। ভিক্টোরিয়ার পিতামহী, রাজা তৃতীয় জর্জের সহধর্মিণী মহারাণী সার্লোট (১৭৪৪-১৮১৭) এঁরই হাতে হাত রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। য়্যালবার্টের সঙ্গেও এঁর সম্পর্ক ছিল মধুর, সখ্য ছিল প্রগাঢ়।
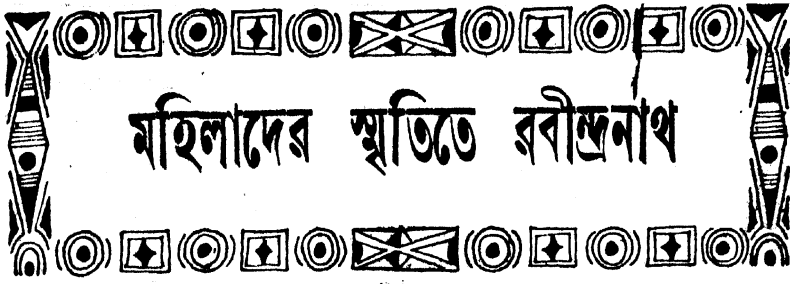
অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

## ( ৪ )

শান্তিনিকেতনের এক বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট শুনি এক বিচিত্র কাহিনী। কোনো উপলক্ষে গুরুদেব এসেছেন হিন্দু সংস্কৃতির পীঠস্থান কাশীতে। দিনগুলো কর্ম্ম-ব্যস্ততায় মুখর, এমন সময় এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এলেন একটি আবেদন নিয়ে,—অশীতিপরা বৃদ্ধা কাশীর বিখ্যাত বাইজী, অল্প একটু সময়ের জন্য গুরুদেবের দর্শন চান নিরিবিলি। তিনি অনেক আশা করে আছেন, বাসনা পূর্ণ করতেই হবে।

গুরুদেব চিন্তান্বিত হলেন। সকাল বিকাল সভা-সমিতির কাজে পূর্ণ, একটুখানি শুধু সময় পাওয়া গেল মধ্যাহ্ন আহারাদির পর বেলা একটায়। তিনি সেদিনের মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের সময়টুকু বাইজীকে দিলেন।

এলেন বাইজী। লোল-চর্ম্মা, গৌর-বর্ণা বাইজীর চেহারা একটু নেপালী ধাঁচের; পোষাক শুচি-শুভ্র বেনারসী রেশমে তৈরী, নাকে নাকছাবি, কথা বলেন হিন্দিতে। তিনি এসেই গভীর শ্রদ্ধায় গুরুদেবের পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিলেন। বললেন,—সমস্ত জীবন কিছুই করিনি শুধু গান ছাড়া; কণ্ঠস্বরই আমার জীবন-মরণের পাথেয়। স্রষ্টার পুজার উপকরণ ফুল, নৈবেদ্য, সবই আমার সুর। ভুল চুক ত যথেষ্ট হয়েছে এ জীবনে, তবুও মনে হয়, বিধাতা হয়ত আমার পুজা গ্রহণ করেছেন। আমার মন্ত্রদাতা গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে, আমার গানের ডালা উজাড় করে কারো পায়ে দিয়ে যেতে; আপনিই তার উপযুক্ত আধার,—আজ আপনার পায়েই আমার সমস্ত গানের শেষ নিবেদন,—দয়া করে গ্রহণ করুন!

গুরুদেবের নিকট অনেকে অনেক আবেদন নিয়ে আসেন, কিন্তু এ একেবারে অনবদ্য! কবি-সম্রাট, সুর-স্রষ্টা, পৃথিবীর বিস্ময়, নিজেই বিস্মিত হলেন; চেয়ারে বসে একটু একটু পা দোলাচ্ছিলেন, তা বন্ধ হয়ে গেল, নড়ে চড়ে স্থির সোজা হয়ে বসলেন।

আরম্ভ হল গান। একটির পর একটি বাইজী গেয়ে চললেন,—সে বয়সেও গলার কি জোর, সুরের কত কারীকুরী! কণ্ঠস্বর উঠে যায় কত উঁচে, যেন অসীমে মিশে এক হয়ে যেতে চায়, পর মুহূর্ত্তে নেমে এসে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে গুরুদেবের পায়ের কাছটিতে,—সে এক অপূর্ব্ব হৃদয়ের নিবেদন। চক্ষে দর-বিগলিত ধারা, গুরুদেবের আঁখ-দুটিও ছলোছলো,—আশে পাশে দু একজন যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও তাই। সকলে মন্ত্র-মুগ্ধের মত সেই সঙ্গীত-সুধা প্রাণ ভরে পান করতে লাগলেন। ঘণ্টা দুই এভাবে কাটিয়ে বাইজী নিজেকে উজাড় করে নিঃশেষ করে, ঢেলে দিয়ে গেলেন হাল্কা হয়ে! মুখে অসীম তৃপ্তি যেন জীবন-স্বপ্ন আজ সার্থক!

গুরুদেবের অশ্রু-সজল, করুণা-ঘন আঁখি, শরীর নিশ্চল, যেন ধ্যানস্থ! দাতা ও গ্রহীতা দুজনেই ধন্য, আর যাঁরা চর্ম্ম-চক্ষে এ দৃশ্য দেখেছেন,—এ সঙ্গীত-মাধুরীর রস গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও ধন্য!

## ( ৫ )

শান্তিনিকেতনের কমলা বৌমা। কমলার মতই রূপ, লক্ষ্মীশ্রী যেন সর্ব্বাঙ্গে উপচে পড়ছে! এখানকার প্রাচীন শিক্ষক ৺নেপাল রায় মহাশয়ের পুত্র, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র, অধুনা বিশ্বভারতীর পদস্থ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় মহাশয়ের স্ত্রী এই কমলা বৌমা। অল্প বয়সে বিবাহিতা হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন, সে আজ প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

৺নেপাল রায় মহাশয়ের বৌমা, সেই সূত্রে তিনি এখানে 'বৌমা' নামেই পরিচিতা, এবং বর্ত্তমানে যদিও, তাঁরও বৌমা এসে গেছেন, তবুও শাশুড়ীর পদে উন্নীত না হয়ে, বৌমাই রয়ে গেছেন!

তিনি তাঁর পূর্ব্ব-স্মৃতি আলোড়ন করে কিছু বলে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করলেন। তাঁর ১৫।১৬ বৎসর বয়সে গুরুদেবকে প্রথম দর্শনের দৃশ্যটি মনে গভীর দাগ কেটে বসে, এখনও উজ্জ্বল, সেইটি বললেন। পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর সমষ্টি উত্তরায়ণের প্রথম বাড়ী কোণার্ক। সর্ব্বপ্রধান ও বৃহৎবাড়ী উদয়ন,—যাতে গুরুদেব পরে বাস করেছেন, সেটি তখনও নির্ম্মিত হয়নি। কোণার্কের পাশে প্রকাণ্ড বাঁধানো চত্বর, গুরুদেব সূর্য্যাস্তের সময় সেখানে বসে দিনান্তের সৌন্দর্য্য-শোভায় মগ্ন হয়ে যেতেন। নব-বিবাহিতা পল্লীবালা সরম-কুণ্ঠিত পদে তাঁকে প্রথম দর্শন আশায় এক অপরাহ্ণে সেখানে এসে তাঁর পদ-প্রান্তে দাঁড়ালো। সঙ্গিনী, প্রতিবেশিনী কিরণদি, তিনিই পরিচয় প্রদান করায়, গুরুদেব,—'এসো বৌমা, এসো, তোমার সঙ্গে এখনও মোটে পরিচয়ই হয়নি' বলে স্মিত হাস্যে প্রণাম গ্রহণ করলেন।

অস্তরবির বর্ণচ্ছটায় অপূর্ব্ব সুন্দর হয়ে ওঠা আকাশের পটভূমিকার সম্মুখে, গুরুদেবের গেরুয়া জোব্বা পরা, শ্বেত-শ্মশ্রু ও শুভ্র স্কন্ধ-কেশমণ্ডিত অতুলনীয় রূপ দেখে কমলাদেবী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে

গেলেন। তাঁর কেবলি প্রাচীন ঋষিদের কথা মনে পড়তে লাগল। পুঁথিতে পড়া পৌরাণিক যুগের বেদ, উপনিষদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিদেরই একজন বলে এঁকে মনে হতে লাগল ও গভীর শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে গেল।

তারপর আরম্ভ হল আলাপ পরিচয়। গুরুদেব প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের দেশ কোথায়?' কমলা দেবী যশোর জেলায় বলায়, তিনি শিশুর মত বলে উঠলেন, 'আরে, সে যে আমারও দেশ! জান বৌমা, আমার মামার বাড়ী, বাবার বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী সব তোমাদের দেশে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তুমি, নিশ্চয় রাঁধতে জান!' কিশোরী বধূ লজ্জায় ঘেমে মাথা কাত করল।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'চৈ, কচু, আর বড়ি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রাঁধতে পার? আর কুলির অম্বল, মুগির ডাল?' যশোরের প্রাদেশিক উচ্চারণগুলো এত রসালো করে বললেন যে সকলে হেসে অস্থির। কিশোরী বধূটির লজ্জার বাঁধ সে হাসির তোড়ে বালির বাঁধের মতই ভেসে গেল।

চৈ দিয়ে কৈ মাছের ঝোল? সে আবার কি? একি শুধুই তামাসা? না চৈ নামে কোন বস্তুর অস্তিত্ব সত্যই আছে? দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করায় কমলাদি বললেন, যশোর জেলার একরকম লতা গাছের শিকড় চৈ, এটি রান্নায় দিলে স্বাদও বাড়ে, আর শরীরের পক্ষেও উপকারী। গুরুদেব এই জিনিষটি বড়ই ভালবাসতেন।

তিনি পিঠে, পুলি, মিষ্টান্নেরও খুব সমঝদার ভক্ত ছিলেন। সংযত, মিতাহারী হলেও এসব জিনিষ অল্প অল্প আস্বাদন করে দেখতে ভালবাসতেন। শিক্ষক নেপালবাবুকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন 'কি হে, তোমাদের পৌষ-পার্ব্বণের আর কত দেরি?' তখন নেপাল বাবুর বাড়ী থেকে কমলা বৌমা ও তাঁর শাশুড়ীর হাতে গড়া নানাপ্রকার পিঠে তাঁকে পাঠানো হত।

এই পিঠেরই এক মজাদার গল্প শুনি।

এখানকার এক ভদ্রমহিলা পিঠে করে গুরুদেবকে পাঠিয়েছেন। কয়েকদিন পর সুবিধামত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরুদেব, সেদিন যে পিঠে পাঠিয়েছিলাম, তা কেমন খেলেন?' মৃদু হেসে গুরুদেব বললেন, নেহাৎ যখন শুনতে চাইছো, তখন বলি,—

লোহা কঠিন, পাথর কঠিন, আর কঠিন ইষ্টক,
তার অধিক কঠিন কন্যে, তোমার হাতের পিষ্টক!

বাচন-ভঙ্গীর সরসতায় উপস্থিত সকলে এত হাসতে লাগলেন যে, ছোঁয়াচ লেগে পিষ্টক রন্ধনকারিণীও হেসে গড়িয়ে পড়লেন!

একটু প্রসঙ্গান্তরে আসা হল, পূর্ব্বস্থানে ফিরে যাই। কমলা বৌমাকে গুরুদেব আবার প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের দেশে নদী আছে?' সম্মতিসূচক জবাব পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নদী?' বৌমা বললেন—'মধুমতী।' গুরুদেব খুব আনন্দিত হয়ে বললেন, 'বাঃ কি সুন্দর নাম! আচ্ছা, ঐ নদীতে নিশ্চয় অনেক ইলিশমাছ পাওয়া যায়? তুমিও বোধহয় পাতুরী প্রভৃতি ইলিশের নানাবিধ শিল্প-চাতুরী জান?'

পল্লী-বালা ততক্ষণে সরমের বাঁধ ভেঙ্গে সপ্রতিভ হয়েছেন ও চটপট জবাব দিচ্ছেন। গুরুদেব আবার বললেন, 'নদীর দেশের মানুষ, নিশ্চয়ই সাঁতার জান!' বৌমা 'হ্যাঁ' বলায় বললেন,··সাঁতার জানা খুব ভাল, কিন্তু এখানে সাঁতার কাটার কোন ব্যবস্থা নে[ই], হয়ত তুমি ভুলেই যাবে।' প্রথম দর্শনের সরম-কুণ্ঠা-ভীতি বিস[র্জন] দিয়ে, দূরত্ব ঘুচিয়ে, অনেক পাওয়ার আনন্দে মন পরিপূর্ণ ক[রে] কমলাদি সেদিন বাড়ী ফিরলেন।

বর্ত্তমান মেয়েদের ছাত্রী-আবাস 'শ্রী-সদনে'র দ্বারোদ্ঘাটনের ... গুরুদেব মেয়েদের উদ্দেশে অনেক কথা বলেন। তার থেকে স্ম[রণ] করে কমলাদি বললেন, 'কয়েকটা কথা আজও মনে আছে; মেয়ে[রা] অধুনা যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে, তাতে দেশের দশের মঙ্গল! অমঙ্গল জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা পা[বে] যেটা সকলেরই কাম্য,—কিন্তু সে শিক্ষা যেন তাদের বহির্মুখী [না] করে। মেয়েদের প্রকৃত স্থান গৃহের বাহিরে নয়,—ভিতরে। তা[রা] সুগৃহিণী হউক, সুমাতা হউক, তবেই সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে, দে[শের] প্রকৃত কল্যাণ হবে।'

একটি সাহসী মেয়ে বলল, 'কেন মেয়েরা ঘরের ভিতরে থাকবে[?] তারাও সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলবে না কেন?'

তিনি হেসে বললেন, 'ওরে তোদের যে সৃষ্টিকর্ত্তাই মে[য়ে] রেখেছেন,—পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী করে গড়েছেন!'

কমলাদি বললেন, সেই অল্প বয়সে তাঁদের সংসারের কা[জ] তাড়াতাড়ি শেষ করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, সন্ধ্যার প্রাক্কা[লে] গুরুদেবের নিকট যাওয়া একটা নেশা ছিল। ঐ সময় তিনি সকলে[র] সঙ্গে নানাপ্রকার সরস আলাপ-আলোচনা করতেন। কখনও নিজে[র] লেখা পড়ে শোনাতেন, কখনও রাজনীতি ও স্বাদেশিকতা নি[য়ে] সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতেন, কখনও গ্রাম-উন্নয়ন নিয়ে সার[গর্ভ] কথা বলতেন। সে সভায় একদিকে যেমন এখানকার জ্ঞানী-গু[ণী] অধ্যাপকবৃন্দ যোগ দিতেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের ঘরণীরাও ব[াদ] যেতেন না; শান্তিনিকেতনে চাঁদের হাট বসে যেত।

এখানে শিক্ষক নেপাল রায় সম্বন্ধে একটি সুবিদিত কাহি[নী] শুনি। কাহিনীটি গুরুদেবের রহস্য-প্রবণতার পরাকাষ্ঠা। রায় মহাশয় অত্যন্ত ভালো মানুষ ও শিশুর মত আপন-ভোলা ছিলেন। কোনো কেয়াবনে কেয়াফুল ফুটেছে, সময় অসময় নেই, খবর পে[য়ে] তিনি ছুটলেন কেয়াফুল সংগ্রহ করতে, এদিকে ক্লাশে[র] সময় বয়ে যায়;—ছুটোছুটি করে যখন ফিরে এলেন, ছাত্ররা তাঁ[র] আশায় বসে বসে সমস্ত ঘণ্টাটি কাটিয়ে তখন অন্য ক্লাশে চলে যাচ্ছে[।] দেখে টাক মাথা চুলকাতে চুলকাতে করুণ সুরে বলতেন, 'হ্যাঁ[রে] তোরা চলে যাচ্ছিস?' এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত ও তিনি তা[তে] অত্যন্ত দুঃখিত হতেন।

কখনও খুব উৎসাহের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পথ-প্রদর্শ[ক] হয়ে, আশে পাশের গ্রামে খেজুর রস খাওয়াতে নিয়ে যেতেন, ও প[থ] ভুল করে ঘুরে ঘুরে নাকালের একশেষ হলে, বাচ্চারাই সোজা রা[স্তা] দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে আসত। দূরের পথ যেতে হলে ষ্টেশনে গি[য়ে] ট্রেণ না পাওয়া তাঁর ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার!

একদিন হঠাৎ তিনি গুরুদেবের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলে[ন]: 'কাল বিকালে আমার এখানে এসো, ও চা পান করে দণ্ড নিও।'

চিঠি পেয়ে চক্ষু স্থির! গুরুদেব কোন্ অপরাধের শাস্তি দি[তে] চান? না জানি সে কি দণ্ড! হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, ন[ন্দ]লালবাবুর নিকট। মিনতি করে বললেন,—'চলো ভাই ক[...]

তুমিও আমার সঙ্গে, জানিনা কি দণ্ড দেবেন, তুমি পাশে থাকলে তবু একটু ভরসা পাব।' নন্দলালবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'সে কি হয়! তোমাকেই চা-পানে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি কি সেখানে যেতে পারি? সাহস করে যাও, দেখো, কিছু হবে না।'

রায় মহাশয়ের মুখ চোখ শুকিয়ে এতটুকু, সেদিনের মত আহার নিদ্রা মাথায়।

পরদিন যথা সময়ে চা-পানের সময় উত্তরায়ণে গিয়ে, গুরুদেবের স্বাভাবিক সৌম্য মূর্ত্তিই দেখেন নেপালবাবু। চায়ের সঙ্গে নানা লোভনীয় আহার্য্যের সমাবেশ,—গুরুদেব তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গীতে নানা প্রসঙ্গে আলোচনা চালালেন; কিন্তু নেপালবাবুর মুখে যেন সবই বিস্বাদ! ভোজন-বিলাসী সেকালের খাইয়ে মানুষ, কিন্তু গলা দিয়ে কিছুই গলছে না, হৃৎপিণ্ডে ধুকধুকানী,—কি জানি কখন ভাগ্যে কি দণ্ড-পাত হয়!

তিনিও অপেক্ষা করে আছেন,—গুরুদেবও সে ধার দিয়েই যাচ্ছেন না, অনেকটা সময় এই যম-যন্ত্রণা ভোগ করে, রাত্রি অধিক দেখে রায় মহাশয় গাত্রোত্থান করলেন। দরজার নিকট যাবার পর গুরুদেব হঠাৎ একটি মোটা লাঠি হাতে নিয়ে কাছে এসে বললেন, ওহে, এই নাও তোমার দণ্ড! সেদিন যে এখানে ফেলে গিয়েছিলে, সেকথা বুঝি একদম ভুলে গেছ?

প্রিয় সাথী লাঠিটির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বুকের বোঝা হাল্কা করে, হাসি মুখে নেপালবাবু বাড়ী ফিরে এলেন।

( ৬ )

আজীবন-প্রবাসী এক বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় পুণা বাসকালে। তাঁর নিকট বহুকাল পূর্ব্বে শুনেছিলাম, তাঁকে দেওয়া গুরুদেবের মুখ-নিঃসৃত সাধন-পূত বাণী!

বান্ধবীর দুটি পুত্র-সন্তানই বিকলাঙ্গ। দুটিই একপ্রকার,—মুখ ও গলা পর্য্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু তার পর থেকে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অসাড়। বাক্‌শক্তি, উত্থানশক্তি, বোধশক্তি, কিছুই তাদের নেই। সেকালের প্রাচীন-পন্থী হিন্দুঘরের মেয়ে হয়েও, এবং ইয়োরোপীয় ভাষা-জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ঐ অসমসাহসী মহিলা, দুটি শিশুপুত্র, একজন মহারাষ্ট্রীয় ডাক্তার এবং একটি পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে, তাদের চিকিৎসার জন্য ইয়োরোপ যাত্রা করেন।

তাঁর স্বামী পুণায় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী; জানতেন যে, এ ভাল হবার নয়। তাই তিনি সময় ও অর্থের অপব্যয় করতে রাজী হলেন না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহিলাটি এদেশের চিকিৎসার চূড়ান্ত করে, এদেশের ডাক্তারদের একপ্রকার অমতেই বিদেশযাত্রায় বদ্ধপরিকর হন। মায়ের প্রাণ,—সর্ব্বস্বপণ করেও সন্তানের মঙ্গল চায়! মনের কোণে ক্ষীণ আশা, বিদেশের চিকিৎসায় যদি বিন্দুমাত্রও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে! একটুও যদি ফল পান, তবে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করবেন! কিন্তু হায়! সমস্ত ইয়োরোপ ঘুরে, বহু বিশেষজ্ঞের চিকিৎসারও কোনই ফল হয়নি। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, যাবার সময় জাহাজেই একটি ছেলের প্রাণবিয়োগ ঘটে।

তাকে সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দিয়ে, অতি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি লণ্ডনে পৌঁছান। গুরুদেব তখন লণ্ডনে। বান্ধবী নির্বান্ধব-পুরীতে স্বদেশের এক মহাপুরুষের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে, তাঁকে দর্শনাকাঙ্খায় অধীর হয়ে, তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন।

প্রণামাদির পর, নিজের দুঃখের কথা জ্ঞাপন করে বললেন, 'এ দুঃখ আর আমি সইতে পারছি না। কি করে দুঃখকে জয় করা যায়, ভুলে থাকা যায়,—আপনি আমাকে তার সন্ধান দিন! আপনি ঋষি-কল্প মহা-মানব, আপনি আমার দুঃখ দূর করে দিন!'

গুরুদেব একটু নিঃশব্দে থেকে, ধীরে ধীরে তাঁকে বললেন, 'দেখ,—একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমার পায়ে এক কাঁকড়া-বিছে কামড়ে দিয়েছিল। কথায় বলে, বৃশ্চিক-দংশন; তার তুল্য যন্ত্রণা আর নেই। রাত্রি গভীর,—সকলে ঘুমে অচেতন। কাকে ডাকব? ডেকেই বা কি হবে? ওরা ত আমার কষ্টের লাঘব করতে পারবে না; বিষের জ্বলুনী যতক্ষণ থাকে, আমাকে সহ্য করতেই হবে। এইসব ভেবে আর কাউকে ডাকলাম না। ঘুম দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। ব্যথায় ছটফট করতে করতে মনে হল, আমি কে? ঐ যে যন্ত্রণায় পাটা অবশ হয়ে আসছে, ঐ পাটাই আমি? না তো! তবে? তবে কি হাতগুলো আমি? তাও তো নয়! তখন মনে হল—আমি একটি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু; যেই একথা মনে হওয়া, অমনি দেখি ব্যথা বেদনা কিছুই আর বুঝতে পারছি না।'

ভদ্র মহিলা নিজের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে, গভীর চিন্তা করতে করতে বাড়ী ফিরে এলেন!

( ৭ )

একদিন যাই বীণাদির নিকট। শান্তিনিকেতনে অনেক বীণা,—বোধ হয় বীণাপাণির প্রিয় স্থান বলে। সকলের মাতৃস্থানীয়া ৺বিবিদি বলতেন, 'আমার আশে পাশে চতুর্দিকে কেবল বীণা বাজে!'

এই বীণাদি, উচ্চ রাজকার্য্যের অবসানে এক্ষণে অবসর জীবন যাপন-রত শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু মহাশয়ের পত্নী,—উচ্চ শিক্ষিতা অমায়িক, মধুর-স্বভাব বিশিষ্টা, বীণা বসু।

তাঁদের বাড়ীখানার নাম 'বসু-ধারা'। বসু-ধারায় এসে আমা পূর্ব্ব-পরিচিতা এই বান্ধবী, বীণাদিকে সংকল্প জানাই। বীণাদি সাদে ও সাগ্রহে বাসনা পূর্ণ করেন। একেবারে শিশুকাল৺ তাঁর পাঁচ ছ বৎসর বয়সের একটি সুন্দর ঘটনা বললেন। বীণাদি গুরুদেবের ব ভক্ত ও স্নেহধন্য শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ের ভগ্নী। তাঁর নিজে কথায়ই কাহিনীটি বলি,—

'খুব ছোট বেলার একটা কথা মনে আছে,—আমার তখন বোধ হ ৫।৬ বছর বয়স, কারণ বেশ মনে আছে,—তখনও দ্বিতীয় ভাগে সব যুক্তাক্ষর শেখা হয়নি। অজিত দা (৺অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যি তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষক ছিলেন) গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকে থেকে কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে থাকতে এলেন; তিনি আম পিতার বন্ধুপুত্র,—আমাদের নিজের দাদার মতনই ছিলেন। তি সব সময়ই গুরুদেবের গান করেন, কবিতা আওড়ান ও গুরুদেবের ক বলেন। আমার দাদাটি তখন ১৩।১৪ বছরের ছেলে, সমস্ত অজিতদার সঙ্গে থাকেন ও অজিতদা তাঁকে কবির কাব্য-রসে অভিষি করেন! থেকে থেকে অজিতদা গেয়ে ওঠেন,—'আমরা লক্ষ্মীছাড় দল'!

তখনকার দিনের ব্রাহ্ম-কন্যা আমি,—'লক্ষীছাড়া' কথাটা খুব খারাপ, মুখে আনতে নেই, জানি। অথচ অজিতদার গুরুদেব ঐ রকম খারাপ কথায় গান লিখেছেন,—খুব মন খারাপ হয়ে যায়! থাকতে না পেরে একদিন অজিতদাকে বললুম, আচ্ছা অজিত দা, তোমার গুরুদেব তো খুব ভাল লোক,—তিনি কেন ভাল কথা না লিখে খারাপ কথা লেখেন?' তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী? একথা কেন বলছিস?'

আমি,—'কেন, ঐ যে তোমার গান, লক্ষ্মী··তারপর খারাপ কথা'! তিনি খুব হেসে বললেন, 'এক কাজ করো, তুমি গুরুদেবকে একটা চিঠি লেখো,—ভাল কথা লিখতে।'

মহা চিন্তায় পড়লুম,—শ্লেট পেন্সিল আছে, খাতা-কাগজে তখনও প্রমোশন পাই নি। কি করি,—দাদামণির লাইন-টানা একটা খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে লিখলুম,—'আপনি আমাকে একটা ভাল কথা লিখে দেবেন।'

অজিতদাকে চুপি চুপি কাগজটা দিলুম।

জানি না, তিনি কি সব মন্তব্য লিখে পাঠিয়েদিলেন,—খুব শিগগিরই একদিন আমার নামেই একটা খাম এলো,—ভেতরে সাদা চিঠির কাগজে লেখা—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আযে ধামানি দিব্যানিত স্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

অজিতদা কবিতাটা মুখস্থ করিয়ে দিলেন ও মানে বুলিয়ে দিলেন। তখন এত ছোট, কি বুঝলুম জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সহি করা চিঠি পেয়েছি, আনন্দে আটখানা হয়ে নেচে বেড়াই।'

তারপর বীণাদির মুখে শুনলাম, চিঠির উপরে ঠিকানা লেখা ছিল, শ্রীমতী···। আবার বীণাদি মহা ভাবনায় পড়লেন। ব্রাহ্ম সমাজে তখন দস্তুর ছিল, অবিবাহিতা মেয়েরা নামের পূর্ব্বে কুমারী ও বিবাহিতারা শ্রীমতী লিখবেন,—যেমন ইংরেজীতে মিস ও মিসেসের ব্যবহার হয়। তাঁর খুব ইচ্ছা করতে লাগল যে স্কুলের সহপাঠিনীদের গুরুদেবের সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি খানা গর্ব্ব করে দেখাবেন, কিন্তু বাদ সাধল ঐ-'শ্রীমতী'! লজ্জায় এ চিঠি তিনি গোপনে লুকিয়ে ফেললেন। চিঠিখানা লুক্কায়িত করলেও তার লেখনটুকু সেই কিশোরী বালিকা মনে গেঁথে রাখলেন জীবন-ভোর!

সমস্যায় পড়ে বড়দাদা অমল হোমকে বলেছিলেন, গুরুদেব কেন তাঁকে 'শ্রীমতী লিখলেন? বড়দাদা সুবিধা মত জিজ্ঞাসা করে জবাব দিয়েছিলেন, গুরুদেব বলেছেন,—সমগ্র নারী জাতিই শ্রী, কাজেই প্রতিটি মেয়েই শ্রীমতী।

পরের জীবনে বীণাদি গুরুদেবের বহু সাহচর্য্য লাভ করেছিলেন। গুরুদেব যত বড়ই হউন না কেন, তাঁর কাছটিতে যারা এসে পড়ত, তাদের সঙ্গে তিনি এত সহৃদয়, মধুর ব্যবহার করতেন, দরদী মনের এত পরিচয় দিতেন যে, তাদের মনে হত এক পরমাত্মীয়ের কাছে এসেছি, দূরত্বের ব্যবধান আপনা থেকে দূর হয়ে যেত।

তিনি পিয়ার্সন সাহেবকে লিখেছিলেন,—

ছোটরে কখনও ছোট নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে!'

যা লিখেছিলেন পিয়ার্সন-সাহেবকে, নিজের জীবনের আচরণ দিয়েও সেই একই কথা ব্যক্ত করে গেছেন!

কোনো ২৫শে বৈশাখে গুরুদেবকে স্মরণ করে বীণাদির লেখা একটি রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি—

"বৈশাখ মাস প্রচণ্ড গরম কাল, রবি উদয়ের যোগ্য-কাল, আবার বৈশাখ মাস অজস্র ফুলের মাস,—কবি উদয়ের যোগ্য কালও বটে! বাইরের মাঠ পথ রোদে তেতে পুড়ে অগ্নি-বর্ষণ করছে, আবার কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুল প্রভৃতি গাছ অগ্নিরই শিখার মত লাল হয়ে আছে,—ফুলগুলো বৈশাখের বুক জুড়িয়ে ফুটে আছে।

আমরা রবীন্দ্র-যুগে জন্মেছি, তাঁর ভাষায় ভাষা শিখেছি, তাঁর গানেই গান শিখেছি, তাঁর চেনা দিয়েই প্রকৃতিকে চিনতে চেষ্টা করেছি, তাঁর আনন্দভোগের ছোঁয়া দিয়েই আনন্দ করতে শিখেছি, তাঁর ভাবেতেই এমন কি, পরমেশ্বরকেও উপলব্ধি করতে শিখেছি।

২৫শে বৈশাখ তাঁর জন্মতিথির বিশেষ দিনটিতে জীবনে ৪।৫ বার মাত্র তাঁর গলায় মালা দেবার ও পদধূলি মাথায় নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, কি অপূর্ব্ব আনন্দে, শ্রদ্ধায় মন ভরে গেছে, এখন মনে হয়, আরও কেন বেশী করে তাঁর কাছে যাবার সুযোগ খুঁজিনি!

স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি ৭ বছর বয়সে,—'ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে'। সেখানে তখন গান শেখান ৺চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী অমলা দাশ,—কি মধুর কণ্ঠ! তাঁর কাছে যে গান শিখি, সে সমস্তই রবীন্দ্রনাথের। আমাদের দিয়ে তিনি সেবার প্রাইজের সময় 'শারদোৎসব' নাটক করালেন,—সেই সব গান শিখি, কিছুই বুঝিনা কিন্তু ছন্দে, সুরে, মন আনন্দে ভরে যায়। তারপর একটু বড় হলে তাঁকে দেখবার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তখন কলকাতায় রামমোহন মৃত্যুবার্ষিকী সভা যে কি বিরাট ব্যাপার হত, যাঁরা তাতে যোগ দিয়েছেন তাঁরাই জানেন। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ,—তাঁকে দেখতে সে সভায় গেছি, গুরুজনদের বহু খোসামোদ করে। সভা, লোকে লোকারণ্য, সভাপতির কি চেহারা,—কি কণ্ঠস্বর,—বক্তৃতা সব বোঝার বয়সও নয়, কিন্তু কি এক আবেশে তাঁকে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি। তারপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হলে, টাউন হলে, তাঁর কত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনেছি, গল্প পড়া শুনেছি, এখন যেন মনে লেগে আছে।

তাঁকে দেখেছি 'বিচিত্রা' (ক্লাব) সভায়, কত অনুষ্ঠানে, তাঁর লিখিত ও অভিনীত ডাকঘর, বৈকুণ্ঠের খাতা, ফাল্গুনী প্রভৃতি নাটকে সে সব ভোলবার নয়। অভিনেতা হিসাবেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী,—রঘুপতি বেশে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য না হলেও ১৯২৬ সালে জয় সিংএর বেশে তাঁর যে অভিনয় ও রূপ দেখেছি, তা আজও ভুলতে পারি না।

কলকাতায় এক একটা নাটক করতে আসেন, ষ্টেজের এক পাশে বসেন, কখনো কবিতা পড়েন, কখনও বা নাটকটি ব্যাখ্যা করেন। 'নটীর পূজা' হল জোড়াসাঁকোর উঠানে, কবি এসে বসলেন ষ্টেজের এক পাশে, কি চমৎকার অভিনয়,—কি নাচ গান,—দিনূদা বসেছেন পেছনে গানের দল নিয়ে, নন্দলালবাবুর কন্যা 'গৌরী' 'কম হে কম' নাচলেন,—কলকাতা-বাসী স্তম্ভিত, মুগ্ধ!

[ক্রমশঃ।

# শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কিন্তু নিমাই কি কখনও ভুলতে পারেন তাঁর প্রতিজ্ঞা? তিনি লীলাবতার। সে-লীলা কি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়!......

অবশেষে উপস্থিত হলো ব্রতাদি যাপনের সেই মহালগ্ন।

নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন নবদ্বীপচন্দ্র নিমাই।

দেখলেন তাঁর আশৈশব-পরিচিত প্রিয় স্থানগুলি, গঙ্গাতীরের নয়নাভিরাম শোভা দেখলেন নয়নভরে।

মাঠে মাঠে নিশ্চিন্তে বিচরণ করছে ধেনুদল, রাখালের বাঁশি পরিচিত মন-ভুলানো সুরে বাজছে পল্লব-ঘন বৃক্ষতলে। সরোবরে অজস্র প্রস্ফুট ফুল্ল শতদল। প্রফুল্ল দিঙ্মণ্ডল।

নিমাই দেখলেন অপার বিস্ময়ে।

দেখে দেখে তৃপ্তি হলো না। পরিচিতদের সঙ্গে প্রাণখোলা আলাপ করলেন। সবাই ভাবলো সেই উদাস আপনভোলা নিমাই-এর সঙ্গে এ নিমাই-এর কত তফাৎ। স্থির শান্ত সংযত করুণাময়, যুক্তিপরায়ণ, বুদ্ধিমান, বিনম্রচিত্ত নিমাই। আর চিন্তা নেই শচীমাতার। পুত্র নিমাই সংসারী, সন্ন্যাসের অভিলাষমুক্ত তার মন।

দিনের সূর্য নেমে এলো পশ্চিমদিগন্তে।

শেষ হলো পরিক্রমা।

সন্ধ্যা নামলো। ঘরে ফিরলেন নিমাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া কাছে বসে তাঁকে খাওয়ালেন।

সেকি গভীর তৃপ্তি বিষ্ণুপ্রিয়ার।

আজ প্রিয়তর মনে হলো স্বামীকে। তীব্রতর হলো তাঁকে আরো কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

তাড়াতাড়ি নিজের কাজ শেষ করে স্বামীর ঘরে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। ইচ্ছা হলো—প্রাণপ্রিয়কে আজ নিজের হাতে সাজাবেন মনের মতো সাজে। বিচিত্র এ সাধ। তবু, বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যক্ত করলেন তাঁর অভিলাষ। পত্নীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন নিমাই।

স্বামীকে মনের মত করে সাজালেন সাধ্বী।

এ কি অপরূপ রূপ! এমন রূপ চোখে পড়ে না ত্রিভুবনে। এক সুদুর্লভ তৃপ্তির অবিরল প্রবাহ ছুটলো বিষ্ণুপ্রিয়ার সর্বাঙ্গে।

এবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাতে বসলেন নিমাই।

রূপবতীকে কোন্ সাজে না মানায়? "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং'। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষ্ণুপ্রিয়া সেজে উঠলেন ত্রৈলোক্যবিমোহিনী-রূপে। বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। নারীসুলভ লজ্জায় অধোবদনে রইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

তাড়াতাড়ি পালালেন সেখান থেকে, লুকোচুরি খেললেন, তারপর ধরা দিলেন আবার। কী গভীর আকুলতা উভয়ের। দুঃসহ বোধ হচ্ছিল ক্ষণিকের অদর্শন। এ-যেন নিমিষে মানয়ে যুগ—। স্তিমিতালোক কক্ষে সুখনিদ্রায় বিভোর গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।

দুজনের চোখে অবিরল প্রবাহিত অশ্রু। এ মিলনে যেন কখনও বিচ্ছেদ না আসে। দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।···

রাত্রিশেষের ক্লান্ত তারাগুলি নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মুমূর্ষু রজনীর অন্তিম দীর্ঘশ্বাস কানে বাজছে।

আর দেরী নেই। অনতিবিলম্বেই প্রভাতের অরুণালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে পূর্বাচল। পতির বুকে সুখনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুপ্রিয়া।

নীরবে গাত্রোত্থান করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

মহা-বিদায়ের লগ্ন সমাগত—।

দূরের বাঁশির সুরে সাড়া দিয়েছে তাঁর অন্তর। জীবের মঙ্গল কামনায় অধীর হয়ে উঠেছেন তিনি।

সংসারের বাঁধন ছিঁড়ে তাঁকে নামতে হবে পথে, নাম বিলাতে হবে জগতে, উদ্ধার করতে হবে পাপী-তাপীকে। প্রিয়ার বাহু-বন্ধনে বন্দী হয়ে থাকা সাজেনা তাঁর।

সন্তর্পণে বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথাটি তুলে বালিশের উপর রাখলেন নিমাই। সম্ভোগতৃপ্তা নিদ্রিতা প্রেয়সীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির দিকে একবার চাইলেন। মুহূর্তের জন্য দুর্বল হলো তাঁর চিত্ত। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করলেন তিনি। তারপর বিষ্ণুপ্রিয়ার কপোল চুম্বন করে ঘরের বাইরে এলেন। অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন আঙিনায়। আঙিনা থেকে নেমে এলেন পথে। পথ বেয়ে চললেন গঙ্গার ঘাটের দিকে।

জনহীন পথ, নিস্তরঙ্গ গঙ্গাবক্ষ।

গঙ্গাবক্ষে ঝাপিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে অপর তীরে উঠলেন।

কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন তিনি।···

দিবালোকে ভীত পেচকের বিকট আর্তনাদ শুনে ঘুম ভাঙলো সুখনিদ্রাবিভোর বিষ্ণুপ্রিয়ার।

শয়ন-মন্দিরে তখনও আলোক প্রবেশ করেনি।

পাশে হাত বাড়িয়ে দেখলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আবার হাতড়ালেন।

শয্যা শূন্য, পাশে নেই স্বামী। চোখ মেলে ভালো করে দেখলেন। ঘরের কপাট উন্মুক্ত।

বাইরে আঁধার-আলোর হাসি-কান্না।

শয্যায় উঠে বসলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

ঘরের বাইরে এলেন সাহসে ভর করে। নেই, সেখানেও তিনি নেই। উদ্বিগ্ন হলো মন। কোথায় গেলেন তিনি? বাইরে গেছেন কি? কিন্তু তাঁকে না জাগিয়ে, কপাট খোলা রেখে গেলেন কেন? অপেক্ষা করলেন কিছুক্ষণ, হয়তো এখুনি এসে পড়বেন। শুকনো পাতা-ঝরার শব্দে চমকে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আরো ব্যাকুল হলেন। ঐ-ঐ বুঝি আসছেন তাঁর প্রাণপ্রিয়।

কিন্তু এলেন না তিনি। বাড়তে লাগলো তাঁর অধীরতা। স্থির থাকতে পারলেন না আর। অশুভ আশঙ্কায় কাঁপতে লাগলো সতীর সংশয়-কাতর অন্তর।

শচীমাতা কক্ষান্তরে সুপ্তিমগ্না। সেদিকে ছুটলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। দরজায় করাঘাত করতে লাগলেন বারংবার। রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলেন, মা ওঠ—ওঠ! ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল শচীমাতার।

আনন্দের মধ্যেও জননী বিস্মৃত হননি নিমাই-এর সংকল্পের কথা। সে যে সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিল।

ক্ষিপ্র পদক্ষেপে শয্যা থেকে নামলেন তিনি। শুনলেন কান পেতে।

বললেন, কে?—যেন মা বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার নিমাই ভালো আছে তো?

: না মা, উনি ঘরে নেই, কোথায় চলে গেছেন, খুঁজে পাচ্ছিনা—

: সে কী!

প্রদীপ জ্বাললেন শচীদেবী।

দরজা খুলে বাইরে এলেন। বধূকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে লাগলেন—নিমাই—কোথায় আমার নিমাই?

প্রদীপ হাতে নিয়ে খুঁজলেন। ডাকলেন,—নিমাই, নিমাই! প্রতিধ্বনি শুনলেন,—নাই—নাই!

নিমাই নেই।

উন্মাদিনীর মতো ছুটলেন ব্যাকুলা জননী। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর সঙ্গে চললেন ছায়ার মতো।

শ্বশ্রূমাতার বস্ত্রাঞ্চল ধরে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি। দু'চোখে অশ্রুর প্লাবন। শচীর আকুল আর্তনাদে মুখর হলো নীরব প্রকৃতির বুক। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে ভাষা নেই।

পথে পথে ঘুরলেন দু'জনে।

নিমাই-এর সন্ধান মিললো না।

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে।

পুণ্যার্থীরা গঙ্গাস্নানে চলেছে, জেগে উঠেছে গৃহবধূরা, সাড়া পড়ে গেছে ঘরে ঘরে। পথে লোক চলাচল প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

ঘরে ফিরলেন শাশুড়ী-বধূ।

*শোকক্লিষ্টা জননী মাটিতে বসে পড়লেন।*

*বিষ্ণুপ্রিয়া অশ্রুমুখী, নতাননা। তিনিও বসলেন শচীমাতার পাশে।*

অন্ধকার অন্তর্হিত হয়েছে।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ও জননী শচীদেবী দেখলেন কারা যেন ছুটে আসছে। আসছে নিমাই-এর ভক্তবৃন্দ। এলেন নিতাই, শ্রীবাস, [illegible] ঘোষ।

গৃহত্যাগ করেছেন নিমাই।

বাইরে শোকাচ্ছন্ন জননী ও জায়া।

পুত্রশোকে বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা শচীদেবী। ভক্তদের [illegible] আকুল মিনতি জানালেন, ওগো,—তোমরা আমার নিমাইকে দাও। এনে দাও আমার সোনার চাঁদ নিমাইকে।

বেদনায় নির্বাক হয়ে রইলেন ভক্তেরা।

নিতাই বললেন,—অধীর হয়ো না মা, আমি তোমায় দিচ্ছি—নিমাইকে এনে দেবো।·····

প্রভু-অন্বেষণে যাত্রা করলেন ভক্তেরা।

শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রইলেন শ্রীবাস।···

বেলা বাড়তে লাগলো।

নিদারুণ শোকে বিহ্বলা দু'টি অসহায়া নারী। নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়া আর জরা-ভারাবনতা শচীমাতা। স্বামিবিচ্ছেদকাতরা আর অপত্যবিয়োগবিধুরা জননী।

ধূল্যবলুণ্ঠিতা বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘিরে বসেছে প্রতিবেশী কুলবধূরা। ত্রিলোকে তিনি একাকিনী, কাঙালিনী। তাঁর [illegible] গৌরব-গর্ব চূর্ণ হয়েছে আজ। এ নিদারুণ আঘাত দুর্বি[illegible] অনাবিল সুখের অবসানে এমন অপ্রত্যাশিত বেদনায় তিনি কি অ[illegible] থাকতে পারেন?

দিন গেল, সন্ধ্যা হলো।

ফিরে এলো না ভক্তেরা। কোন সংবাদ এলো না। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া জলস্পর্শ করলেন না।

ক্ষুৎপিপাসা বিস্মৃত হয়েছেন তাঁরা। অবগুণ্ঠনাবৃতা বিষ্ণু[illegible] শয্যাশায়িনী। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসছে দুটি ক্লান্ত আঁখি, পরক্ষ[illegible] চকিত চমকিত হচ্ছেন বিধুরা। পদশব্দে মনে হচ্ছে—সংবাদ [illegible] বুঝি, বুঝি ফিরে এলো তাঁর প্রাণপতি।···

দুঃসহ বিরহ-ব্যথায় জর্জর বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর। কিন্তু তাঁর [illegible] মদনমোহন। এ গৌরব কি কম?

তিনি যুক্তপাণি হয়ে আহ্বান করলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে: এক[illegible] দেখা দাও, শুধু একবার নয়নভরে তোমায় দেখে জন্মের ম[illegible] বিদায় নিই।

পতিপরায়ণার এই আকুল ডাক গৃহত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গের অ[illegible] না পৌঁছে কি পারে?

প্রেম-রজ্জু বন্ধনে স্তব্ধ হয়ে রইলো তাঁর দু'টি চরণ। সাম[illegible] দিকে অগ্রসর হতে পারলেন না তিনি। সাড়া দিতে হ[illegible] প্রেমময় তিনি। প্রিয়তমার এ আকুল মিনতিতে তিনি কি [illegible] থাকতে পারেন?···

বিরহ-শোকে কেটে গেল তিন দিন, তিন রাত্রি।

সংবাদ নিয়ে ফিরলেন নিত্যানন্দ।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধান মিলেছে। শচীমাতাকে শান্তিপুরে নি[illegible] আদেশ দিয়েছেন তিনি।

শচীমাতা শান্তিপুরে যাবেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও যাবেন সঙ্গে। কুলবধূ একা ফেলে যেতে পারেন না শ্বশ্রূমাতা।

আশায়-আনন্দে উদ্বেলিত হলো বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়সিন্ধু। তবে তবে তাঁর ডাক শুনেছেন স্বামী।

প্রস্তুত হলেন শচীদেবী, প্রস্তুত বিষ্ণুপ্রিয়া। শচীমাতার আঁচ[illegible] ধরে এসে দাঁড়ালেন অবগুণ্ঠনবতী।

মৃদু গুঞ্জন উঠলো, কে ইনি?

কৌতূহল নিবৃত্ত হলো অবশেষে।

ভক্তেরা চিনলেন—ইনি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। পতিদর্শনাভিলাষিণী কুলবধূ। কিন্তু তাঁকে সঙ্গে নেবার যে অনুমতি নেই! নিত্যানন্দ প্রকাশ করলেন প্রভুর আদেশ।

মর্মাহত হলেন শচীদেবী।

স্বামি-শোক-বিহ্বলা পুত্রবধূকে ফেলে তিনি কেমন করে যাবেন? তাঁর নিজের শোকের চেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যথা কি কম?

বললেন, তবে আমিও যাবো না।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। কী ভাবলেন। তারপর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন নীরবে, নতমুখে।

শচীদেবী অসহায়ভাবে বসে পড়লেন সেখানে।

কিছুক্ষণ কাটলো এমনি করে।

শচীমাতাকে আনা হলো বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। শচীমাতা বললেন, ভুল করেছি আমি যাত্রার আয়োজন করে। সত্যিই ভুল হয়েছে আমার। বিষ্ণুপ্রিয়াকে একা ফেলে আমি কোথাও যেতে পারিনা।

শ্বশ্রূমাতার কথা শুনে লজ্জিত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

অন্তরে অনুভব করলেন, জননীর মনে অকারণ দুঃখ দিয়েছেন তিনি। স্বামীর অপ্রত্যাশিত আদেশ শুনে অস্থির হয়েছিল পতিব্রতার চিত্ত। কিন্তু পরক্ষণে তিনি বুঝলেন সব। মনে পড়লো সব কথা। তিনি যে নিমাই-এর অর্ধাঙ্গিনী, তাঁকে ছাড়া নিমাই যে অপূর্ণ! নিমাই-এর দর্শনে তিনি তো বঞ্চিত থাকতে পারেন না কখনও। না-ই বা হলো চোখের দেখা। তবু, তিনি মনে-প্রাণে জানেন নিমাই তাঁরই। আগে যেমন ছিলেন, আজও ঠিক তেমনিই রয়েছেন। তাঁর জিনিস নিয়ে অপরে তৃপ্তি পায়, পাক। তাতে তাঁর ঈর্ষা হবে কেন? নিমাই যে তাঁরই অন্তরের মণিময় হার। ত্রিভুবন তাঁর দর্শন-ব্যাকুল। এ যে তাঁর পরম সৌভাগ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। গৌরবানন্দে পরিপ্লুত হলো বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর।...

মনে হলো একদিকে ত্রিজগৎ—আর একদিকে তিনি। এতেই তো স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গের পরম শক্র কিংবা একমাত্র প্রিয়তমা।

গৃহত্যাগ করেছেন নিমাই, ত্যাগ করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে, কিন্তু আর কাউকে তো গ্রহণ করেননি।

সন্ন্যাসী হয়েছেন তাঁর স্বামী। সন্ন্যাসজীবন কঠোর, সন্ন্যাসে বড় দুঃখ, সন্ন্যাসের অর্থ পত্নীত্যাগ। পত্নীত্যাগ করেছেন তাই। তাঁর দুঃখের সীমা নেই। তাঁর দুঃখে সমবেদনা জানাবে সকলে, কাঁদবে তাঁরই সঙ্গে, চোখের জলে প্লাবিত হবে মেদিনী।...

সব অভিমান দূরে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবলেন, শীত-গ্রীষ্মে খরৌদ্রে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন পত্নীবিচ্ছেদ-ব্যাকুল স্বামী। কি নিদারুণ সেই জীবন! পত্নী-বিরহই তো পতির একমাত্র দুঃখ, আর পত্নীর সঙ্গে মিলনই তাঁর সুখ। পত্নীই তাঁর একান্ত আপন।

পতি যদি এমন কঠোর জীবন যাপন করতে পারেন, তিনি কেন পারবেন না?

শচীদেবীর কথা শুনে তাই বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, তুমি যাও মা। উনি তো আমার কাছেই রয়েছেন। আমার একটুও কষ্ট নেই মা।

বিস্মিতা শচীদেবী চেয়ে দেখলেন অশ্রুসিক্তা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে। সে মুখে বেদনার লেশমাত্র নেই।

বুঝলেন, সত্যিই দুঃখ নেই বিষ্ণুপ্রিয়ার।

শান্তিপুর যেতে সম্মতি দিলেন শচীদেবী।

গৃহলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহে রইলেন কয়েকজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে।

শচীদেবী যাত্রা করলেন।

ঘরে ফিরে গেল সমাগতেরা।

নীরব হলো অঙ্গন। নীরব গৃহ। মৌন প্রকৃতি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর মথিত হয়ে কান্না বেরিয়ে এলো। যৌবনে যোগিনী হয়েছেন তিনি। কিন্তু স্বামী তাঁকে জ্ঞানামৃত পান করিয়েছেন। তবু, প্রবোধ মানেনা অবোধ মন। তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো বিলাপ-বাণী:

"চাঁদ মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে-সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব—"

মর্তের মানবী বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি যে অধ্যাত্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিতা হতে পারেননি, বিস্মৃত হ'তে পারেননি স্বামী-বিচ্ছেদ-বেদনা। জীবনের চরম সার্থকতার স্বাদ পাননি আজো। তাই শূন্য মনে হলো বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন, হাহাকারে বেদনায় ম্রিয়মাণ হলেন তিনি।...

আবর্তিত হয় সময়ের রথচক্র।

এগিয়ে চলে দিন। মাস, বর্ষ শেষ হয়।

সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর কেটে গেছে।

পাঁচ বছর হলো নবদ্বীপ ছেড়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। জননীকে আশ্বাস দিয়ে গেছেন, আবার আসবো মা।

শচী প্রতীক্ষমানা, স্বপ্নাতুরা। আসবে—ফিরে আসবে তাঁর প্রাণের নিমাই। কখন? কখন আসবে সেই বহু-প্রতীক্ষিত শুভক্ষণ? দিন-ক্ষণ জানা নেই। তবু আসবে—সে আসবে।

প্রতিদিনই, প্রতিমুহূর্তেই তাঁর মনে হয় ঐ বুঝি ফিরে এলো নিমাই। আবার ভাবেন, কেন—নিমাই তো ঘরেই রয়েছে। কোথাও যায়নি মাতৃবৎসল সন্তান। শচী নিজ হাতে রাঁধেন, অপেক্ষা করেন, ভুলে যান নিমাই-এর অনুপস্থিতির কথা, হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আবার উদ্গ্রীব উৎফুল্ল হন আশায়। আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া?

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের দিন থেকেই আহার নিদ্রা পরিহার করেছেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। 'গৌরাঙ্গ'—নাম-সুধা-রসই তাঁর একমাত্র খাদ্য। কারো মুখের দিকে চোখ তুলে তাকান না তিনি। দু'একজন প্রিয় সখী ছাড়া আর কেউ থাকেনা তাঁর কাছে।

সর্বত্যাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া, যোগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া, পরম তপশ্চারিণী বিষ্ণুপ্রিয়া।...

শচীমাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে চলেছেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

ওপারে ফুলিয়ায় সহস্র সহস্র লোকের ভিড়, এপারে ভেসে আসছে কোলাহল। গঙ্গাস্নানে আসছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। মুহুর্মুহু 'হরি'-ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। সেদিকে লক্ষ্য নেই শচীদেবীর।

তিনি চলেছেন গঙ্গাস্নানে। আপন মনে, নীরবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ডাকলেন জননীকে। বললেন, ঐ দেখ মা, ওপারে লক্ষ লক্ষ লোক হরিনামে মাতোয়ারা। তোমার গৌর হয়তো সেখানেই বিরাজ করছেন। কিন্তু আমি তো তাঁকে দেখতে পাইনা! পাপী-তাপী সকলেই তো তাঁর চরণে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছে। জগতে শুধু বিষ্ণুপ্রিয়াই তাঁর চরণ-সেবায় বঞ্চিতা।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা দেখলেন—লক্ষাধিক লোকের শোভাযাত্রা এগিয়ে এলো অপরপারে গঙ্গার ঘাটের দিকে।

সুরধুনীর এপারে দণ্ডায়মানা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেখলেন—কৌপীনধারী, দীর্ঘকায়, স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ নাম-কীর্তনে মশগুল; অগণিত ভক্ত রয়েছে তাঁকে ঘিরে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, ঐ ঐ দেখ মা, ঐ তোমার গৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ দেখা যায়।

শচীমাতা দেখলেন দু'নয়ন ভরে, দেখলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

তবু তো তৃপ্তি হলো না।

এপারের জনতা ওপারে হরিনামরসপ্লাবিত ভক্তদের দেখলো, দেখলো নবদ্বীপচন্দ্রকে। ধন্য মনে হলো তাদের জীবন।

অতৃপ্ত অশান্ত অন্তরে ফিরলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

আশ্চর্য!

শ্রীগৌরাঙ্গ যেন অন্তর্যামী।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আকুল নীরব আহ্বান তিনি শুনেছেন।

কিছুদিন পরে তাই নবদ্বীপে পদার্পণ করলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।

দূর থেকে পতিমুখসন্দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বললেন, এতদিনে আমার দুঃখ ঘুচলো, ক্ষুধিত নয়ন সার্থক হলো। তৃষিত চকোর যেন কৃষ্ণপক্ষের অবসানে চাঁদের দেখা পেলো।

সন্ন্যাসী হয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

কিন্তু সন্ন্যাসী হলেও তাঁর প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভালবাসা কি কমতে পারে? একদিন তিনি ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী, সুলভ ছিলেন তাঁর কাছে, আজ তিনি দেবতার মতো দুর্লভ হয়েছেন।

দূর থেকে দেখে দেখে মধুর প্রেম-সাগরে নিমগ্ন হলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

দীর্ঘ বিরহের অবসানে মধুময় মহা মিলন। অনির্বচনীয়, অনাবিল, অপূর্ব।...

তারপর আবার বিরহ। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ।

পতিহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কখনও শোকে, কখনও ভক্তিতে, কখনও ক্রোধে, কখনও আনন্দে অভিভূত হয়ে থাকেন।

মনে হয় তিনি আর নবীনা বালিকা-বধূ নন। তাঁর উপর সংসারের সকল কর্তব্যভার সমর্পণ করে স্বামী নিশ্চিন্ত মনে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছেন। বৃদ্ধা জননী শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার দায়িত্ব তাঁরই।

আবার কখনও প্রলাপ বকেন, কখনও বা গভীর নৈরাশ্যে আকুলভাবে কাঁদেন:

"সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল
এ জনমের সুখ ফুরাইল।"

পতির এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তাঁর উপর রাগ ও অভিমান করেন। পর মুহূর্তে কে যেন তাঁর হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে করুণ কোমল প্রীতির ভাব। স্বামিবিরহিণী তিনি। স্বামী তাঁর কাছে নেই। তাই তাঁর দুঃখ। কিন্তু তিনি তো গৃহবাসিনী। স্বামী বৃক্ষতলবাসী। তাঁর চেয়ে স্বামীর কষ্ট যে অনেক বেশি।

পতি সন্ন্যাসী, সুতরাং তিনি নিজেও সন্ন্যাসিনীর জীবন পালন করবেন। স্বামী তৃণশয্যায় শয়ন করেন, তিনিও তাই করবেন, শুধু প্রাণধারণের জন্য দু'মুঠো খাবেন।

গৃহত্যাগের পূর্বে স্বামীর কাছ থেকে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে কোন নির্দেশ পাননি।

তাই, পতিসোহাগিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া একখানি পত্রে নির্দেশ চাইলেন স্বামীর কাছে। তিনি লিখলেন:

"আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে
তাহার কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে।"

স্বামী যে ব্রত উদযাপন করছেন, যে কৃচ্ছ্র সাধন করছেন, পত্নীকে তার চেয়েও কঠিন ব্রত পালন করতে হবে, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করতে হবে।

স্বামিসঙ্গবিচ্যুতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বধূ। পতিসেবাই তাঁর জীবনের কর্তব্য ও ধর্ম।

তাঁর মনে হয় স্বামীর উপযুক্ত সেবা তিনি করেননি। স্বামীকে বুঝতে পারেন নি। না বুঝে অনাদর করেছিলেন। তাই তিনি গৃহত্যাগী হয়েছেন।

ত্রিজগতকে তিনি কেমন করে বুঝাবেন—স্বামী ছাড়া পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই, স্বামীই তাঁর একমাত্র আশ্রয়?

তাঁর উপর সকলের অত্যাচার-অবিচারের জন্য স্বামীর কাছেই অভিযোগ জানাবেন তিনি!

তাই স্বামীরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন তাঁর অন্তরের অবরুদ্ধ দুর্বিষহ বেদনা। দু'নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে পতিব্রতার।

কখনও বা স্বামিগর্বে আনন্দের বিপুল তরঙ্গে ভেসে যান। মুখের উপর ফুটে ওঠে অপূর্ব দীপ্তি।...

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমপ্রীতি-মুগ্ধা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

সন্ন্যাসী সেজেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

কিন্তু দুজনের কী প্রীতি নেই?

আছে—আছে। অক্ষয় রয়েছে প্রীতি, নেই শুধু দেহের সম্পর্ক।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ভালবাসেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণয়িনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

শুধু দুজনে কাছে নেই দুজনের।

দুঃখ নেই তাতে, নেই কোন ক্ষোভ।

বিরহে, বিচ্ছেদে ও প্রতিকূলতায় দৃঢ়তর হয়েছে প্রীতি-প্রণয়-বন্ধন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রেমাবতার মহাপ্রভু, নবদ্বীপচন্দ্র নিমাই। অনন্ত করুণাময় তিনি, অপার তাঁর করুণা।

জীবের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর প্রিয়তমা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকেও ত্যাগ করেছেন।

এ কী সহজ কথা? এমন উদারতা ও ত্যাগ আর কোথায় আছে?

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের রূপ ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে।

মনে হয় স্বামীর উপর রাগ অভিমান সাজেনা তাঁর। সন্ন্যাসী হয়ে আপন প্রাণপ্রিয়াকে ছেড়ে এসে তিনি কি সত্যই সুখী হয়েছেন?

মনকে প্রবোধ দেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া:

"কার উপরে কর অভিমান, রে পাগল প্রাণ?" জীবহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি। তাঁর উপর অভিমান সাজে না। তাঁর এই শুভকার্যের অন্যতম উপকরণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।...

সমগ্র পৃথিবীকে আত্মীয় মনে হয় বিষ্ণুপ্রিয়ার, ধন্য মনে হয় নিজেকে, অন্তরের সকল গ্লানি মুছে যায় নয়নজলে, পবিত্র স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হয় হৃদয়। [ক্রমশঃ।

[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না। ]

গল্প হলেও সত্যি ?
—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যাত্রারম্ভ
—শান্তিময় সান্যাল

মানুষ পুতুল —বৈজনাথ ভড়

বিলাত যাত্রী —কে, সরকার

তৃষাতুর —এন, রামকৃষ্ণ

শীর্ষ সম্মেলন

—এস, পি, মণ্ডল

শ্রীবিষ্ণু

—চিন্ময় দাস

রাম-সীতা

—এন, রামকৃষ্ণ

সফদরজং টুম্ব ("দিল্লী")

—শ্রীমতী অদিতি রায়

হবুকর্তা

—জয়দেব দে

শ্রোতা

—নীলিমা দত্ত

বারি দেবী
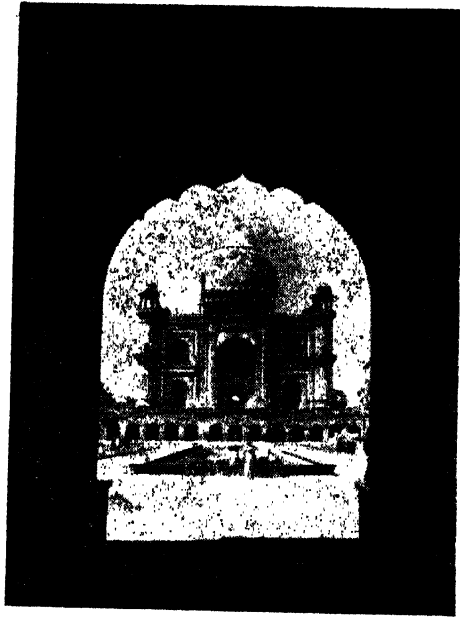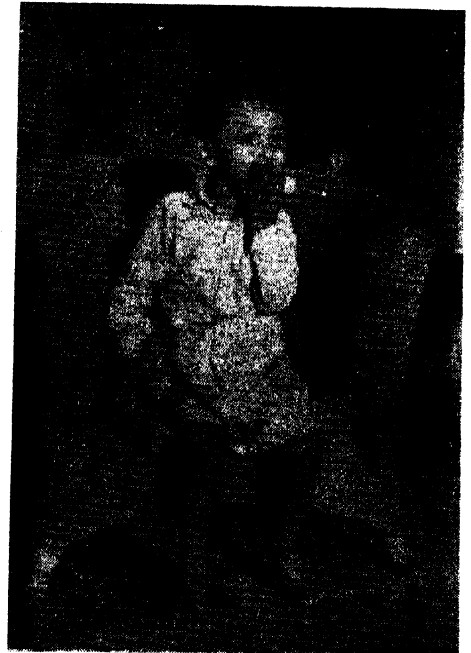
আবার সেই মালাবার হোটেল।

আমি বসে আছি একা, হোটেলের লনের একেবারে শেষ প্রান্তে। একটি পল্লবীরো গোলাপ ঝোপ আমাকে আড়াল করে রেখেছে, উৎসবমুখর হোটেলের মত্ত জনতার কৌতূহলী দৃষ্টিবাণ থেকে।

কোচিনের উইলিংডন আইল্যাণ্ডে,—এই হোটেলে জলের ধার ঘেঁষা এই চেয়ারে, তিন বছর আগেকার এক সন্ধ্যায় বসে ছিলাম আমি। সেদিন তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, জীবনে আর কোন দিন আসবো না, এই মালাবার উপকূলে। আসবো না এই অভিশপ্ত মালাবার হোটেলে।

হ্যাঁ আজ আমি নিঃসঙ্কোচেই এই হোটেলটাকে অভিশপ্ত নাম দিতে পারি, তার কারণগুলো কি নগ্নরূপে ধরা পড়ছে আমার চোখে। হায়। আবার কেন এলাম এখানে!

কোন অশুভ শক্তি যেন চক্রান্ত করে আজ আমাদের নিয়ে এসেছে এখানে। তারপর একখানি কালো যবনিকা সরিয়ে দিয়ে এই মাত্র দেখিয়ে দিলো, একটি বিয়োগান্ত নাটকের মর্মঘাতী দৃশ্য।

উঃ। কি দেখলাম? কাকে দেখলাম? স্বপ্ন দেখছি না তো?

দুহাতে ভালো করে চোখ মুছে আবার,—চেয়ে দেখেছিলাম, ওদের দিকে। না, স্বপ্ন নয়,—নগ্ন সত্য।

ঐ তো,—টলটলে ফেনিল পাত্রটি হাতে নিয়ে শঙ্করম্ আয়েঙ্গারের হাতে তুলে দিয়ে,—নির্লজ্জ হাসির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে যে, সে তো আর কেউ নয়,—সে হচ্ছে কমলেশ কাপুর।

ক্রিসমাস ডে।

আজ উনিশশো ষাট সালের এক স্মরণীয় দিন। ক্যাপ্টেন হালদারের আমন্ত্রণে এসেছিলাম আমরা এখানে ডিনার খেতে।

সারা কোচিন জুড়ে চলেছে উৎসব,—তবুও মালাবার হোটেলের জাঁক জমকের বনেদিরূপ সকলকে আকর্ষণ করে। নানা রংএর আলোর রোশনাই চারি দিকে। দেওয়ালে দেওয়ালে ফুলের রিং, দোদুল্যমান অর্কিড এখানে সেখানে, ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে জ্বলছে রঙিন বাল্‌ব; লাল-নীল, প্ল্যাষ্টিকের ঝালর, উড়ন্ত বেলুনের মালা ইত্যাদি মিলিয়ে জায়গাটাকে, স্বপ্নলোক বানাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে! সন্ধ্যে থেকে ভিড় বেড়েছে!

নানা দেশীয় লোকের ভিড়। মালয়ালাম, মাদ্রাজী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, ইহুদী, ইংরেজ, আমেরিকান,…মিশ্রিত এই বিরাট প্রসেশনে, বাঙালীর সংখ্যাই নগণ্য।

ডিনার শেষ হয়েছে। এবারে চলেছে এলোপাতাড়ি পানোৎসব। তাই সংযমের শিষ্টতার বাঁধনও হয়ে গেছে ঢিলেঢালা। কার মেয়ে, কার বৌ, এ সবের বাচবিচার এ সময় বড় একটা থাকে না। রঙিন চোখ, রঙিন মনে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম!" সব রূপের মাঝে শুধু একটি রূপ দর্শন। কোনো বিভেদ নেই। যা প্রাণ চায় করো। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পাসপোর্ট।

ইংরাজি অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে চলছে ভাঙা ভাঙা গলার গান আর উদ্দাম হয়ে উঠেছে যুগোল নৃত্য।

আমরা, মানে আমি, মারুতি,…মারুতির বাবা মিষ্টার মেনন, আর মেডিকাল কলেজের পুরানো ডাক্তার ক্যাপ্টেন হালদার, এই ক'জনে আমরা বসেছিলাম,—হোটেলের বিরাট হলের একটি কোণের দিকে। আমাদের ডিনার শেষ হয়েছে। আমরা তখন, কফির পাত্রে চুমুক দিতে দিতে, দেখছিলাম, দূরে বসে, ঐ সব ভাঁড়ামি।

ডিনারের পরই কমে গেছে উজ্জ্বল আলোর রোশনাই, মৃদু নীলাভ আলো ছড়ানো রইলো চারিধারে।

ভিড়ের ভিতর কখন যে, এসেছে আয়েঙ্গার আর কমলেশ কাপুর, তা আমাদের নজরে পড়েনি। ওরা বসেছে আমাদের থেকে খানিকটা দূরে। ওদের টেবিলে রয়েছে আরো দুজন, পুরুষ।

কার তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ যেন, চমকে দিলো আমাকে।

কে? কে? বড্ড যেন চেনা লাগছে হাসিটা। সন্ধানী দৃষ্টি আমার চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো সবার মুখের উপর। তারপর সে আবিষ্কার করলো, কমলেশ কাপুরকে।

ভীষণ চমকে উঠেছিলাম ওকে দেখে। ঠিক ভূত দেখার মতো। বুকের ভেতর যেন লাগলো হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের শক্।

ও'-কোথা থেকে এলো? কেন এলো? ও কি ধূমকেতু? প্রেমের আলোভরা আকাশে অমঙ্গলের বিভীষিকা জাগানোই কি ওর কাজ?

মারুতির দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, সেও দেখছে ওদের দিকে। সে তো চেনে না কমলেশ কাপুরকে। সে অবাক চোখে দেখছিলো, আয়েঙ্গারের মদ্যপান। আর বোধ হয় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

হায় কেন? কেন এসেছিলাম মালাবার হোটেলে?

সন্ধ্যাকালে জায়গাটাকে তো ভারি মনোরম লেগেছিলো।

সকলকার সঙ্গে পরিচয় লেন-দেন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিচিত্র সাজ সজ্জা, পরিবেশটিকে বিশেষ একটি রূপদান করেছিলো। কিন্তু তারপর!

একেবারে বেদুইনের বেলেল্লাপনা। শিক্ষিত, মার্জিত সব অভিজাত শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলারা সংস্কৃতি ও সংস্কারের মার্জিত খোলসগুলো যেন ফেলে দিয়ে, আদিম, প্রবৃত্তি, ও রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলো, এ সব তো তবুও সহ্য হচ্ছিলো, ছন্দপতনের শেষ ধাপে,—আমার জীবনের ছন্দপতনই এলো,—আরেকটি জীবনের ছন্দ ভাঙার বিষম তাল নিয়ে।

বাজপাখীর মতো কমলেশ ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছে শঙ্করম আয়েঙ্গারকে, যেমন করে তিন বছর আগে তুলে নিয়েছিলো আরেকজনকে।

নীলাম্বিত বাহু বিস্তার করে ও জড়িয়ে ধরলো আয়েজারের কোমরটা, তারপর দুজনে বাহুবদ্ধ হয়ে এলো নাচতে।

অনেক যুগল-নৃত্যের সঙ্গে ওরাও ঘুরপাক খেয়ে নাচছে।

মাকৃতি দেখছে। দেখুক। উঃ! আমি যে আর পারছি না। বড্ড মাথা ধরেছে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।—ব'লে আমি পালিয়ে এসেছি বাইরে।

তিন বছর আগের সন্ধ্যায় যখন বসেছিলাম এখানে, তখন মনের সদ্যক্ষত স্থানটি থেকে ঝরেছিলো অনর্গল রক্তধারা। তারপর এই তিন বছরে, সে জায়গাটা আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে আসছে; এমন সময় আবার সেই—কমলেশ কাপুর।

পুরোনো সেই ক্ষতমুখটা আবার বুঝি গেছে খুলে, এই অবাঞ্ছিত দর্শনের আঘাত লেগে। আবার বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ সুরু হয়েছে। মনের গহন অরণ্যে স্মৃতির ঝড় তাণ্ডবনৃত্য করে চলেছে।

যোগরাজ যোগলেকার। কোথায়? কোথায় সে? এ প্রশ্ন এতদিন মনে জাগেনি তো!

একটা অবাঞ্ছিত ঘটনার ওপর সম্ভাবনাময় পরিণতির রেখা টেনে দিয়ে, এতদিন তো বেদনা ভারাক্রান্ত মনটাকে নানা বিষয়ে নিযুক্ত করে ভুলিয়ে রেখেছিলাম; কিন্তু ঐ কমলেশ কাপুর যে আজ সব গোলমাল করে দিলো। হিসেবের মিল কই?

সামনে আরব সাগরের ব্যাক্ ওয়াটার্স ক্যানেল। ওর সীমাহীন নিবিড় কালো জলরাশি, অশান্ত আবেগে, মাথা খুঁড়ছে পাষাণ বাঁধের ওপর।

হু হু করে ভেসে আসছে আরব সাগর থেকে জলো সমুদ্র বাতাস। আশে-পাশে ছড়ানো দ্বীপগুলো থেকে আসছে সর-সর সাঁ-সাঁ শব্দ। নারকোল বীথির দীর্ঘশ্বাস। ব্যাক-ওয়াটার্সের বুকে ছড়ানো ছিটোনো, এ-ধারে ও-ধারে, ছোট বড় অনেকগুলো দ্বীপ সব গুলোর নামও জানি না। কালো জলের বুকে ঝিক ঝিক করে জ্বলছে, দ্বীপগুলোর আলো।

দক্ষিণ দিকে এর্ণাকুলামের আলোর ছটা, থর থর করে কাঁপছে জলের বুকে!

ঠাণ্ডা জলো বাতাসের ঝাপটা লেগে, শরীরের জ্বালা, মনের জ্বালা, কিছুটা জুড়ালো। এতক্ষণ কিছু ধারণা করবার মত শক্তি বোধ হয় ছিলো না মস্তিষ্কে। যেন কোন অশুভ শক্তি এসে, চেতনা শক্তিকে হঠাৎ স্থবির করে দিয়েছিলো, প্রাণ-জুড়োনো সাগর-বাতাস এসে, পাথর হয়ে যাওয়া মনটাকে আবার চেতনাময় করে তুলছে।

বিকট হুইসিলের শব্দে চমকে উঠলাম। শেষ ফেরী স্টিমার চলেছে ম্যাটেনচারীর দিকে। তার চোখ-ঝলসানো তীব্র সার্চ লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়ে ব্যাক ওয়াটারের বহু দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করে তুলেছে।

চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; বোলগ্যাডিন দ্বীপটি। অপূর্ব শ্যামল দ্বীপের বোলগ্যাডিন প্যালেসে মাঝে-মাঝে এসে বাস করেন, দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা। শ্রীনেহেরু নাকি ভারি পছন্দ করেন ঐ দ্বীপটিকে।

ঐ দ্বীপটিকে দেখে মনে পড়লো, আরেকটি দ্বীপের কথা।

গভীর শান্তিপারাবারের ওপর ভেসে উঠেছিলো ঐ রকম আশ্চর্য সুন্দর একটি প্রাণময় দ্বীপ।

বোলগ্যাডিন দ্বীপের মতোই সে দ্বীপে ছিলো, আ[illegible] নারকোলবীথির মর্মর ধ্বনি। বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতির ঝি[illegible] ফুলের সমারোহ, সাগর বিহঙ্গদের কলকাকলী। হঠাৎ এ[illegible] এক সর্বনাশা ঝড়ের তাণ্ডব লীলা ঐ রূপময়ী দ্বীপের বুকে। আ[illegible] সাগরের বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ এসে, ভেঙে চুরে, ভাসিয়ে নিয়ে গে[illegible] ওর সব আনন্দসম্পদরাশিকে।

পড়ে রইলো, এক ভাঙা চোরা, পরিত্যক্ত জনহীন দ্বীপ।

আমার দুচোখে নেমেছে জলের ধারা।

না, না, কাঁদবো না।

দ্বীপের ঐ সর্বহারা, ভগ্ন দশাটাই তো শুধু সত্য নয়, তার আ[illegible] যে ছিলো ওর শ্যামল অরণ্যের পল্লবে পল্লবে মলয় হিল্লোল, পুষ্পাঢ্য শাখায় শাখায় ছিলো, বিহঙ্গমের কলগান, প্রেমঝর্ণার নৃত্য ছন্দ।

সেই সোনালী আলোঝরা দিনগুলোও যে ওর জীবনে পরম সত্য।

সে তো মিথ্যা নয় স্বপ্ন নয়! ঐ দুর্লভ আনন্দ সম্পদে অধিকারিণী' একদিন সত্যই ছিলো সে। ওর ভাঙাবুকের পাঁজ[illegible] পাঁজরে, খোদাই করা রয়েছে সেই সোনালী দিনের ইতিহাস।

উনিশশো সাতান্ন সাল। আমার জীবনের এক অভিশপ্ত বছর।

বাবার মৃত্যু। আমার পাঠ্যজীবনের ব্যর্থতা। মধ্যপ্রদেশ,—যোগলেকার। দক্ষিণ ভারত—মালাবার হোটেল। কমলে[illegible] কাপুর।···সব শেষ।

কিন্তু এ সবই কি অশুভরূপে এসেছিলো আমার জীবনে?

অনেক ভেবেছি, কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারিনি আজও পাইনি মনের কাছ থেকে এর নির্ভুল জবাব।

আমার জীবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ পুরুষ ছিলেন যিনি,—তিনি আমার বাবা। জ্ঞানশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। লম্বা চওড়া বিরা[illegible] পুরুষ। টকটকে দুধ আলতায় ছিলো তাঁর গায়ের রং। চওড়া বুকের ছাতি; নাক চোখ মুখের গড়ন ছিলো, কতকটা ইটালিয়ানদের মতো। পুরুষ-সিংহের মতো ছিলো তাঁর একজোড়া গোঁফ।

সূর্যের তেজ, হিমাদ্রির গাম্ভীর্য্য শিশুর সরলতা আর ফুলের পবিত্রতার একাধারে সংমিশ্রণ দেখেছি আমার বাবার মধ্যে। দেখেছি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে প্রতিদিন কত জ্ঞানী-গুণিজনকে আসতে তাঁর লাইব্রেরীতে।

যিনি যখন সমস্যা নিয়ে এসেছেন তাঁর কাছে, সকলকে সন্তুষ্ট করেছেন তিনি। কি অপূর্ব ধৈর্য!

আমি একদিন বলেছিলাম বাবাকে—রোজ এত লোক রাত বারোটা অবধি ঘিরে থাকে তোমাকে, তোমার বিরক্ত লাগে না বাবা? ওরা তো সবাই তোমার মকেল নয়, পয়সাও দেয় না,—শুধু শুধু বকায় তোমাকে।

বাবা ছিলেন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। আমার পিঠে গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে জবাব দিয়েছিলেন তিনি—পয়সাই তো জীবনের পরমার্থ নয় মা। "কায়েন মনসা বাচা"।

সব কিছু দিয়ে জীবের মঙ্গলের চেষ্টা করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। দুটো পরামর্শ দিলে যদি কারুর কিছু উপকার হয় তো হোক না। সামান্য মুখের দুটো কথা বৈ তো নয়।

আনন্দমুখর
দিনে
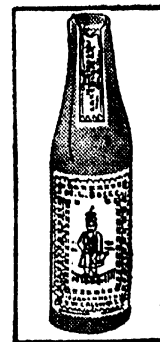
গভীর শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে পড়েছিলো বাবার পায়ের ওপর।

মায়ের ছিলো জাগরণী সমিতি। আমাদের বাড়ীতেই বসতো সমিতিটা। সমাজের উচ্চশ্রেণী থেকে, সাধারণ শ্রেণী পর্যন্ত সকল স্তরের মহিলাদের জন্য ছিলো তার অবারিত দ্বার।

সেলাই, চিত্রাঙ্কন ও নানারকম শিল্প কর্ম,—গান, সাহিত্যচর্চা, স্বাস্থ্যচর্চা, শিশুপালন, খেলাধূলা, প্রভৃতি বিভিন্ন-ধারায়-পরিপুষ্ট সমিতিটির ব্যবস্থার বন্দন করতেন, অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা।

অনেকজন মহিলা ডাক্তারও ছিলেন সমিতির সভ্যা। দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য দান, ও তাঁদের শিশুদের দুধ, ও বিনা ফিতে ডাক্তার দেখানো, বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হতো।

আমাদের বাড়ীটা ছিলো যেন একটা আনন্দের হাট। পৃথিবীতে যে কোথাও দুঃখ, বেদনা, দ্বন্দ্ব মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনা আছে, তার পরিচয় তখনও পাইনি আমরা। সুব্রত চ্যাটার্জি।—আমার মামাতো বোন শাস্তাদির দেওর। শিবপুর—ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ে, থাকে হোষ্টেলে। মাঝে মাঝে সে আসতো আমাদের বাড়ীতে। বাবা মার খুব পছন্দ ওকে। মনে বাসনা ছিলো জামাই করবার!

তবে বাবা এ কথাও বলতেন মাকে—খুকিকে বোলো ওকে যাচাই করে নিতে! ওর জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ওর নিজেরই থাকা উচিত, আমাদের থাকবে শুধু সমর্থন।

সুব্রতকে রূপে, গুণে, বিদ্যায়, আচারে ব্যবহারে সব দিক থেকেই নিখুঁত বলা চলে!—তবুও…

ওর আবির্ভাবে আমার মনের শতদল, কেন যে গভীর আনন্দে দল মেলে ফুটে ওঠে না! মনের গহনে কোথায় যেন ছিলো এক মৌন অসম্মতি!

অবশ্য এ বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচার বোধ তখন আমার ছিল না অথবা তখনও তার—প্রয়োজন ঘটেনি।

একদিন হয়তো সব ঠিক হয়ে যেতো। বাবা মা'র নির্বাচিত পাত্রকেই বরমাল্য দিতাম মনের সূক্ষ্ম বাধাকে উপেক্ষা করে!—কিন্তু…

মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে, বাবা আমাদের জীবনের ধারাগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে চলে গেলেন।

উঃ! আজও সেদিনের কথা ভাবতে মন প্রাণ হাহাকার করে ওঠে।

উনিশ-শো সাতান্ন সাল, বারোই মার্চ। বেলা তিনটের সময়, সকলে গাড়ী করে বাবার অচেতন দেহটা হাইকোর্ট থেকে নিয়ে এলো। তারপর ধরাধরি করে তাঁকে ওপরে এনে খাটে শুইয়ে দিলো। বড় বড় ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে রাত বারোটায় বাবা চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে।

আমার চির আনন্দময়ী মায়ের বিধবা বেশ দেখে, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরতে দু'হাতে মুখ ঢেকেছি[illegible] মা তোমায় আমি দেখবো না। তোমার থান কাপড়, শূ[illegible] আমি দেখতে পারবো না মা-গো।

আকুল কান্নায় মার বুকে ভেঙে পড়েছিলাম। দেখতে সবই সয়ে গেলো। এম-এ পড়ছিলাম,—পড়া ছেড়ে দিলাম।

আমার অসাধারণ ধৈর্য্যময়ী মা, কিন্তু কয়েক মাস পরেই [illegible] জাগরণী সমিতিতে যোগ দিলেন। তবে তাঁর সেই হাস্যময়ী [illegible] আর কেউ দেখতে পেলো না। আর বড় বেশী ক্লান্তি ভারে [illegible] মনে হতো মা-কে।

জাগরণীর মাসীমারা, যখন আমাকে বিশেষ ভাবে বোঝাচ্ছি[illegible] পড়াশোনা করবার জন্য তখন, একমাত্র মা-ই বললেন—

না থাক। যখন আবার ওর মন চাইবে, তখন পড়বে।

সুব্রত মাঝে মাঝে আসে। মাকে বলে, এ সময় বাড়ী'র আবদ্ধ না থেকে গাড়ীতে করে বেশ খানিকটা বেড়াতে পা[illegible] মনটা হাল্কা হয়।

মার একান্ত অনুরোধে আমি গেলাম ওর সঙ্গে বেড়াবার জ[illegible] সুব্রত গাড়ী চালাচ্ছে আমি বসেছি ওর পাশে।

বাবার গায়ের মৃদু গন্ধ। বাবার স্মৃতি সব যে ছড়িয়ে র[illegible] এ গাড়ীখানাতে। বুকটা আমার কি এক যন্ত্রণায় মোচড় [illegible] উঠলো। অবসন্ন ভাবে এলিয়ে পড়লাম সিটের ওপর। সু[illegible] দেখলো আড় চোখে। শাণিত কণ্ঠে বললো সে—এই সেন্টি[illegible] জিনিষগুলো অত্যন্ত বাজে। মানুষকে একেবারে অকর্মণ্য করে তোলে।

হায় রে বেদরদী মানুষের হৃদয়হীন মন্তব্য! পরদিন থে[illegible] আমি বেড়াতে যাইনি ওর সঙ্গে। এর চেয়ে বাবার লাইব্রেরী ঘ[illegible] অনেক বেশী শান্তি পাই। আর বাইরে,—লনের এক পাশে অশোকফুলের গাছের তলায় যে পাথরের বেদীটায় বসে বা[illegible] ভোরবেলায় গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ করতেন, কোনদিন [illegible] বাবার সঙ্গে আমি গাইতাম, ব্রহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য গান।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যাকালে ঐখানে বসে, আমি বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রনা[illegible] শেলি, বায়রণ, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতির কবিতা আবৃ[illegible] করতাম। সেই আমার অতি প্রিয় জায়গাটি এখন হয়েছে আমা[illegible] শান্তিতীর্থ।

সেই নিদারুণ শোকের সময় আমার কোন বন্ধুদেরও আমি স[illegible] করতে পারতাম না। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী তখ[illegible] ছিলো ঐ রক্তরাঙা ফুলে ভরা গাছগুলো, আর বাবার জলন্ত স্মৃতি।

[ ক্রমশঃ।

"The Hindu has to acknowledge an immense debt to European scholars have converted what was once unintelligible nonsense to a subject of accurate scientific study. What was hitherto unnecessary and meaningless, has now been shown to be a necessary condition of primitive culture and full of deep signification. A myth can now be traced back from its ulterior development to its origin."—*Bankimchandra Chattopadhay*

ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

# গীতা কাপুরের আত্মহত্যা

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

ছাদ থেকে শুরু মানে চিলে-কোঠার সিঁড়ি ছাড়া ফাড়া ছাদও—এবং জিমন্যাস্টিকের কসরৎ করে দাশকে উঠতে হ'ল সেই ছাদে, তারপর জলের ট্যাঙ্কগুলির মধ্যেও নামতে হ'ল। ছাদের কার্ণিশগুলি ঘুরে দেখে নামা গেল পাঁচতলায়। পাঁচতলার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘর, ঘরের আলমারি, খাটের তলা, সোফার পিছন, বাথরুম দেখে যেতে লাগল গুপ্তভায়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে—ঘরের মধ্যে ম্যানেজারের সঙ্গে যখন আমি ও গুপ্তভায়া ঢুকি তখন বাইরে করিডোরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় দাশ। প্রত্যেক তলার দুদিকের সিঁড়ির মুখে দুটি করে সিপাই মোতায়েন, যাতে সমস্ত তলাটা মোটামুটি নজরে থাকে তাদের।

পাঁচতলা থেকে চারতলায়। একই ভাবে তল্লাস করা হ'ল ঘরের পর ঘর। সূর্যের যত না তাপ, সূর্যের তাপে উত্তপ্ত বালির প্রতাপ নাকি তার চেয়ে বেশি। গুপ্তভায়া যদি সোফার পুরু গদী টিপে দেখে তো দাশ টোকা মেরে দেখে করিডোরের দেয়ালে।

চারতলা থেকে তিনতলা। প্রথমে ডানদিকের করিডোরের ঘরগুলি দেখে বাঁ দিকের করিডোরে এসে ঢোকা গেল। কয়েক পা এগিয়েই ডান হাতে শর্মার এগারো নম্বর ঘর। খুব সতর্ক দৃষ্টিতে বাঁ হাতি দুটো ও ডান হাতি দুটো ঘর পর পর দেখে গুপ্তভায়া শর্মার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

"ওটা কীসের শব্দ?"

"কোনটা?" প্রশ্ন করল ম্যানেজার।

"কান পেতে শুনুন—"

ম্যানেজারের সঙ্গে কান পেতে আমিও শোনবার চেষ্টা করলাম এবং কিছুক্ষণ কান পেতে থাকার পর শুনতেও পেলাম—ঘড়ির এলার্মের ক্ষীণ শব্দ যেন একটা।

"হ্যাঁ, আওয়াজ পাচ্ছি বটে। বোধ হয় কোনো বাথরুমের কল খোলা রয়েছে!" বলে উঠল ম্যানেজার। আমিও ভেবে দেখলাম আধা ঝির ঝিরে আধা ঝিনঝিনে আওয়াজটা আধখোলা কলের হওয়াও বিচিত্র নয়।

"কোন বাথরুম থেকে?" প্রশ্ন করল গুপ্তভায়া।

"মনে হচ্ছে শর্মার ঘর থেকেই।" উত্তর করল ম্যানেজার।

"এ ঘর তো 'সীল' করা রয়েছে দেখছি। ঠিক আছে, পরের ঘরটা খুলুন।"

"ওটা আমার ঘর—" বলল ম্যানেজার, "আর খোলাই আছে। বন্ধ করে যাওয়ার সুযোগ আপনার লোকেরা আমায় দেয়নি।"

"তাই নাকি?" বলে গুপ্তভায়া দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ঘরে, ম্যানেজারের সঙ্গে আমিও ঢুকলাম ঘরে ওর পিছু-পিছু এবং ঘরে ঢুকতেই সেই ঝির ঝিরে ঝিনঝিনে আওয়াজটা যেন একটু ঝরঝরে ঝনঝনে শোনাতে লাগল।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্যান্য ঘরের মতই প্রথমে চারিদিক ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করল গুপ্তভায়া। আসবাবপত্র সাজ সরঞ্জাম অন্যান্য ঘরের মতই শুধু—ম্যানেজারের ঘরের মহিমা বাড়াবার জন্যে কি না বোঝা যাচ্ছে না—জানলার ধারে একটা লোহার সিন্দুক দাঁড় করানো রয়েছে।

আলমারি, খাট, বাথরুম ছেড়ে সিন্দুকটার দিকেই এগিয়ে গেল গুপ্তভায়া, কিছুক্ষণ সেটাকে লক্ষ্য করে ম্যানেজারের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, "কী আছে এই সিন্দুকে?"

"গতকাল টাকাকড়ি যা আমদানী হয়েছে আর বোর্ডারদের গচ্ছিত প্যাকেট পত্তর।"

"সিন্দুকের চাবিটা ?"

"ক্যাশিয়ারের কাছে। হোটেল বিক্রি হওয়ার পর থেকে চাবি আর আমার কাছে থাকে না। সিন্দুকটাও সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এ ঘর থেকে—"

"ক্যাশিয়ার কোথায় ?"

"এখনো আসেনি।"

"কখন আসে ?"

"আসবার সময় হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।"

"কখন ?"

"দশটায় এসে টাকাকড়ি নিয়ে ব্যাঙ্কে যায় সে।"

"কাল থেকে যায় কখন ?"

ঠিক নেই—ছটা থেকে আটটার মধ্যে।"

"এই সিন্দুকে নগদ টাকা তুলে দিয়ে ?"

"হ্যাঁ"—

"সিন্দুকটা খোলবার এখন একটা ব্যবস্থা করতে পারেন ?"

"চাবি ছাড়া কী ক'রে করবো ?"

"হুঁ"—বলে দরজার কাছে গেল গুপ্তভায়া, দাশকে ডেকে বলল, ও, নীচে গিয়ে দ্যাখো তো ক্যাশিয়ার এসেছে কি না ? এসে থাকলে সিন্দুকের চাবি সঙ্গে নিতে বলে সঙ্গে ক'রে উপরে নিয়ে আসবে।"

দাশ চলে যেতে গুপ্তভায়া আবার ফিরল ম্যানেজারের দিকে, ওকে আপনার কেমন লোক মনে হয় ?"

"ভালো লোক বলেই তো মনে হয়েছিল, এবং হোটেলটা বিক্রি করেছিলাম ওকে ?"

"কেন, খারাপ লোক হ'লে করতেন না ?"

"করতাম তবে দামটা বোধ হয় কম করতাম না।"

"কেন, বেশি দাম কেউ দিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ, বোম্বের এক পার্টি"—

"ম্যানেজার বোধ হয় তারা আর আপনাকে রাখতো না ?"

"সে-সম্বন্ধে কোনো কথা হয়নি"—

"আপনার ক্যাশিয়ার মনে হচ্ছে আজ আর আসবে না। সে কি প্রায়ই কামাই করে।"

"ইদানীং করছে।"

শুনে চুপ করল গুপ্তভায়া, কী যেন ভাবল মনে মনে, তারপর হাতের পানের বড় ঠোঙ্গা থেকে বিনা নোটিশে হঠাৎ একটা পিস্তল বার ক'রে আনল। বলা নেই—অকস্মাৎ একটা পিস্তল চোখের সামনে ঝলসে উঠতে ম্যানেজার ও আমি দু'জনেই বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। পানের ঠোঙ্গার মধ্যে কখন পিস্তলটা ঢুকল সেটা বুঝতেও ধাঁধা লাগল আমার।

পিস্তলটা নিয়ে সিন্দুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল গুপ্তভায়া, সিন্দুকের চাবির যায়গাটা পিস্তল তাগ ক'রে বলে উঠল, "দেখি সিন্দুকটা খোলবার আমি কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কি না ?"

"পিস্তল দিয়ে চাবি ভাঙ্গবার চেষ্টা করলে ভিতরে আগুন লেগে যেতে পারে।" গুপ্তভায়াকে তাড়াতাড়ি সাবধান ক'রে উঠল ম্যানেজার, "তার চেয়ে বরং ক্যাশিয়ারকে গিয়ে তার বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি আমি।"

"না, আর দেরি করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এমনিতো অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে"—বলে হঠাৎ পিস্তলটা সিন্দুকের উপর রে[খে] সিন্দুকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গুপ্তভায়া এবং ডালায় কা[ন] পেতে কী শুনতে লাগল। শুনতে লাগল এবং কিছু হৃদয়ঙ্গম করা[র] ভঙ্গীতে দোলাতে লাগল মাথা।

"কী শুনছেন ?" বিমূঢ় দৃষ্টিতে সিন্দুকের পাশে গিয়ে গুপ্তভায়াকে জিজ্ঞাসা করল ম্যানেজার।

"অনুমান করুন"—

"শর্মার নিঃশ্বাসের আওয়াজ ?"

"কেন, শর্মা কি এর মধ্যে রয়েছে ?"

"আপনার তো সেই রকমই সন্দেহ মনে হচ্ছে।"

"না"—

"তা হলে আর তোমার শুনে কাজ নেই, উঠে দাঁড়াও"—বলেই সিন্দুকের উপর থেকে গুপ্তভায়ার পিস্তলটা চকিতে তুলে নিল ম্যানেজার এবং সেটা গুপ্তভায়ার দিকে লক্ষ্য করে ধরে ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠল, "অনেক বাঁদরামি সহ্য করেছি তোমার—আর নয় ?"

চোখের সামনে অভাবনীয় এই নাটকীয় পরিস্থিতির জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি, তাই কেমন হকচকিয়ে গেলাম। সন্ত্রস্ত হয়ে গুপ্তভায়ার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল তার অবস্থাও আমারই মত। হাঁটু গাড়া অবস্থাতেই বোকার মত ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

"কথা কানে যাচ্ছে না ? বলছি না, উঠে দাঁড়াও"—পিস্তল হাতে এমন ভাবে ধমকে উঠল ম্যানেজার যে মনে হ'ল মানুষটাই যেন বদলে গিয়েছে।

ধীরে ধীরে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল গুপ্তভায়া, অত্যন্ত বোকার মত ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী ব্যাপার ?"

"হাত তোলো মাথার উপরে"—

"তা-ও না হয় তুললাম !"

"তুমি"—হঠাৎ আমার দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠল ম্যানেজার,

"সরে এসে ওর পাশে হাত তুলে দাঁড়াও"—

ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি গুপ্তভায়ার পাশে গিয়ে সংকীর্তনের ভঙ্গীতে আমিও দাঁড়ালাম এবং দাঁড়ানো-মাত্র গুপ্তভায়াকে আবার মধুর সম্বোধন ক'রে উঠল ম্যানেজার, "পুলিশের ডালকুত্তা, তোমার গোয়েন্দাগিরি এর এক গুলিতে আমি শেষ ক'রে দিতে পারি তা জানো ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু পালাতে পারবে না !"

"ঠিক ধরেছো ! ঐ পালাবার জন্যেই তোমাকে বা তোমার সঙ্গের এই পুঁচকে ইঁদুরটাকে কিছু বলছি না !"

"কিন্তু আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেও কী তোমার পালাবার উপায় হচ্ছে কোনো ?"

"হ্যাঁ। আমার অনুগ্রহের পরিবর্তে তোমাকে অনুগ্রহ ক'রে সে-ব্যবস্থাটা করতে হচ্ছে।"

"কী উপায় ?"

"এই ঘর থেকে প্রথম বেরুবে এই ছোকরা, তার পিছনে তুমি আর তোমার পিছনে আমি এই পিস্তল পকেটে লুকিয়ে কিন্তু তোমার উপর সর্বক্ষণ নিশানা রেখে। নীচে নেমে তুমি সবাইকে বলবে আমাকে নিয়ে ক্যাশিয়ারকে তার বাড়ি থেকে আনতে যাচ্ছো তুমি

এবং তারপর এই ছোকরাকে নিয়ে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে জীপের পাশে। আমি উঠে জীপের পিছনে বসবার পর তুমি আর এই ছোকরা উঠবে জীপে এবং যেমন আমি বলবো তেমন চালিয়ে নিয়ে যাবে জীপ—ঢুকেছে এবার মাথায়, না আরেকবার বলবো ?"

"আরে বলতে হবে না, কিন্তু তোমার এ-প্রস্তাবে আমরা রাজী নই।"

ম্যানেজারের প্রস্তাবে প্রাণে বাঁচবার একটু যদি বা আশা হয়েছিল, গুপ্তভায়ার জবাবে আবার পিলে চমকে গেল আমার। বলে কী গুপ্তভায়া ?

"রাজী নও ?" শুনে যেন মজা পেল ম্যানেজার।

"না"—গোঁয়ারের মত জবাব দিল গুপ্তভায়া।

"এখনো নও তবে হতে বেশি সময় লাগবে না !" বলতে গিয়ে যেন গর্জে উঠল ম্যানেজার, "আমি দাঁড়িয়ে দশ গুণবো আর তার মধ্যে রাজী হতে না পারলে উড়িয়ে দেবো তোমার মাথার খুলি !"

"তা হলে গুলিই চালাও, গুণে আর সময় নষ্ট কোরো না। তোমার ক্যাশিয়ারকে নিয়ে হয়তো আমার লোক এখনি এসে পড়বে এখানে !"

"ক্যাশিয়ারকে পেলে তো আসবে ? শর্মা যদিও জানে সে ছুটিতে রয়েছে, আসলে হোটেল-বিক্রির পর তাকে শর্মার নাম ক'রে বরখাস্ত করেছি আমি এবং চাকরির চেষ্টায় বোম্বাই যেতে উপদেশ দিয়েছি"—বলে দাঁত বার করল ম্যানেজার আর তারপরই ধমকে উঠল যেন, "এক···!"

"দুই···তিন" গোণাটা··· এগিয়ে দিল গুপ্তভায়া।

"ধন্যবাদ। চার···!"

"পাঁচ···ছয়···সাত···"

"আট···!"

"নয়···এবং তারপর দশ ! কৈ, গুলি চালাও—"

শুনে ধক ধক করে জ্বলে উঠল ম্যানেজারের চোখ, "তবে মরো"—বলে গুপ্তভায়াকে লক্ষ্য ক'রে পিস্তল তুলল সে।

"সেফ্‌টি-ক্যাচটা ভাখো তো খোলা কি না ? খুলে নাও, নইলে গুলি চলবে না !" ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল গুপ্তভায়া।

"আমি দেখেছি, এবার তুমি ভাখো—"

ভয়ে চোখ বুজলাম। বুজলাম বলা ভুল কেন না সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় চোখ আমি বুজিনি, পরিস্থিতির ঘনঘটায় চোখ আপনিই বুজে গিয়েছিল। বারুদ-ফাটার আওয়াজের জায়গায় পর্বতের মূষিক প্রসবের মত কানে এল, 'ক্লিক' !

চোখ খুললাম অর্থাৎ ভয়ে বিস্ময়ে চোখ খুলে গেল আমার, তাকিয়ে দেখলাম, গুপ্তভায়া হাত নামিয়ে মৃদুমন্দ হাসছে এবং ম্যানেজার ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে !

"খালি পিস্তল ?" ম্যানেজারের মুখের কথাটা আর্তনাদের মত শোনাল।

"টোটা ভরবার সময় আর তুমি দিলে কৈ ? আগেই তুলে নিলে আর আমার শেষ সন্দেহটুকু দূর ক'রে দিলে !"

"তোমার ফাঁদে আমি পা দিয়েছি"—ধরা গলায় বলে উঠল ম্যানেজার, "এবং তার ফলে তুমি যা জানতে পেরেছো সেটা ভুলে যেতে কতো চাই তোমায় বলো ?"

"তুমিই বলো!"

"পাঁচ হাজার!"

"মাত্র পাঁচ!" শুনে ঠোঁট ওল্টাল গুপ্তভায়া, "গীতার মত অমন সুন্দরী তরুণী মেয়ের প্রাণের দাম মাত্র পাঁচ হাজার? জানলে শর্মা তোমায় ডবল দিতে পারতো!"

"দশ!"

"গীতার প্রাণের দাম হোলো কিন্তু তোমার নির্দেশ অনুযায়ী শর্মাকে ফল কিনতে নামিয়ে সন্দেশে বিষ মেশানোর জন্যে মিসেস ওয়ার্ডের যে লম্বা মেয়াদটা হোতো তার দাম?"

"বারো!"

"রুক্মিণী কাউল বা মিনতি সরকার—যে-নামেই ধরো, তারও তো প্রাণের দাম আছে একটা!"

"পনেরো!"

গীতার মত সুন্দরী না হোলেও রুক্মিণীর যৌবনের দাম তুমি কম পাওনি। দেহের জন্যে যা পেয়েছো, প্রাণের জন্যে তার কিছুটা অন্তত দেবে তো?"

"বিশ!"

"গ্লোরিয়া বেনেট—নিতান্ত নিরপরাধ বেচারী! নার্সিং-সেণ্টারকে মোট শতকরা সাড়ে বারোর জায়গায় শতকরা সাড়ে বারো প্যাট্রিসিয়াকে এবং আটচল্লিশ নার্সিং-সেণ্টারকে কবুল ক'রে পাশ-করা নার্স সেজে এসেছিল দিনের শেষে ছ'টা টাকা রোজগারের আশায়। তাকেও তুমি শেষ করে দিলে। চব্বিশ ঘণ্টা তোমার কাছে আটক থেকে শেষ পর্যন্ত একশো টাকা পেয়ে গিয়ে মনের স্ফূর্তিতে যখন সে বাড়ি ফিরছে তখন স্বপ্নেও সে ভাবেনি যে আসবার আগে তোমার দেওয়া কফি যা সে খেলো, সেইটেই জীবনের শেষ খাওয়া তার!"

"পঁচিশ?"

"ভাবী স্ত্রীর নামে কিনলে তার সম্মানে হোটেলটা শর্মার দামেই তুমি বেচবে বলে শর্মার কাছে তুমি খুব সিভালরি ও দরাজ-দিলের পরিচয় দিয়েছিলে। গীতা তোমায় চেনে না, দলের মাথাকে তার চাক্ষুষ জানবার কথাও নয়—কিন্তু মাথা সবাইকে চেনে এবং শর্মার সঙ্গে গীতাকে দেখে প্রথম দিনই তাই তুমি চিনতে পেরেছিলে এবং গীতা দল থেকে পালাবার চেষ্টা করছে বলে হেসেওছিলে মনে মনে, এবং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলে ব্যাপারটা বিয়ে অবধি গড়ায় কিনা দেখবার জন্যে। বিয়ে ঠিক হতে হোটেল-বিক্রিও ঠিক করে ফেললে তুমি এবং বিয়ের শুভদিনে হোটেলটা কেনবার জন্যে ভজিয়ে ফেললে শর্মাকে, যার ফলে সেদিন দুপুরে গীতার কুমারী নামেই কেনা হয়ে গেল হোটেল। তোমার দিক থেকে শুধু বাকি রইল কাপুর নামে গীতার স্বামী সাজিয়ে একজনকে উপস্থিত করা এবং শর্মার কাছ থেকে গীতার সঙ্গে হোটেলের দখল নেওয়া। তোমার হোটেল তাহলে তোমারই থেকে যায়—মাঝখান থেকে ঘরে এসে যায় সাত লাখ বিশ হাজার টাকা।

"বিয়ের ক'মাস পরেই যদি হঠাৎ একদিন মারা যায় শর্মা, তাহলে গীতার হোটেল তো বটেই গীতা মারফৎ সেই সঙ্গে শর্মার স্থাবর-অস্থাবর সবই এসে যাবে তোমার হাতে! তখনো গীতাকে তুমি দলের একটি মেয়ে ভাবছো এবং ঊরুতে ঐ রক্ত-চক্র আছে বলে হাতের পুতুল মনে করছো। তখনো তুমি জানো না, এই ঘৃণিত, বিকৃত জীবনের গ্লানিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে গীতা, তোমাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ঊরু থেকে ঐ উল্কি-চক্র মাংসশুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে এবং জীবনে প্রথম সহানুভূতি ও ভালোবাসা পেয়ে কেনা বাঁদী হয়ে গিয়েছে শর্মার।

তোমার বাড়া-ভাতে কিন্তু ছাই দিয়ে দিল এই সময় হঠাৎ একজন বাইরের লোক। পাঁচ তারিখ রাতে শর্মাকে ফোন ক'রে গীতা সম্বন্ধে অনেক গোপন কথা—এমন কি, ঊরুর চিহ্নের কথা পর্যন্ত বলে দিল সে। ফলে, রাতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ক'রে এবং আলাদা ঘরে কাটিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত শর্মা পরের দিন সকালে রওনা হয়ে গেল ফৈজাবাদ। হোটেলের মালিকানার দলিলটা সেদিন বিকেলে এটর্নী এসে হোটেলে দিয়ে গেল গীতাকে এবং গীতাও দলিল নিয়ে ফিরে গেল হস্টেলে এবং গিয়ে বন্ধু ও এ-ব্যাপারে পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী রুক্মিণীকে জানাল সব কথা এবং দু'জনে স্বভাবতঃই অনুমান করল ঐ টেলিফোন দল থেকেই কেউ করেছে শর্মাকে—অর্থাৎ তাদের গোপন চেষ্টা সব জেনে ফেলেছে দলের লোক। ভয়ে রুক্মিণী পালাল হস্টেল থেকে কিন্তু মরিয়া গীতা রয়ে গেল হস্টেলে। ভয় পাবার জায়গায় ভয় দেখাতে শুরু করল সে পুলিশকে সব জানিয়ে আত্মহত্যা করবার। গীতার ভাবগতিক এবং ঘন ঘন এক এটর্নীর কাছে যাতায়াত দেখে তাড়াতাড়ি কিছু একটা করাও প্রয়োজন হয়ে পড়ল তোমার। অধিকতর লাভের আশা আর নেই দেখে কিম্বা গীতার ভাবগতিক দেখে তা আর সম্ভব হবে না মনে করে তখন হোটেলটা বাগানোই তোমার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ালো এবং গীতা বিগড়ে যাওয়াতে তার একমাত্র উপায় দেখলে আত্মহত্যার মত সাজিয়ে গীতাকে খুন করা। সাজিয়েওছিলে তুমি চমৎকার—দেখে মনে হবে লুকিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রে ধরা পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে গীতা এবং তার ফলে তোমার সাজানো জনৈক কাপুর স্বামী হিসেবে এসে দাঁড়ালেই গীতার ওয়ারিশন হিসেবে হোটেলটা প্রাপ্য হয়ে দাঁড়াবে তার। কাপুরের সঙ্গে গীতার বিয়ের পুরুত ও সাক্ষীর বোধহয় ব্যবস্থা করে রেখেছিলে, কিন্তু তোমার কপাল মন্দ, ছেলের অসুখের জন্যে টাকা প্রয়োজন হওয়ায় রুক্মিণী ছুটে আসে গীতার কাছে নিতান্ত অসময়ে এবং গীতার ঐ অবস্থা দেখে ডক্টর তৌফিককে ডেকে আনে এবং তোমার প্ল্যান ভেস্তে দেয়।

"রুক্মিণী তোমার প্ল্যান ভেস্তে দিয়ে পালিয়ে গেলেও সাত-আট লাখ টাকার এই হোটেল তুমি ছাড়তে পারো না! হাসপাতালে আবার তাই বিষ দিলে তুমি গীতাকে এবং এমন ভাবে দিলে যাতে স্বভাবতই সন্দেহ গিয়ে পড়ে শর্মার উপর—যেন মনে হয় বেয়াকুবি ক'রে গীতার কুমারী নামে হোটেল কিনে এবং তারপর গীতার সঠিক পরিচয় জানতে পেরে শর্মাই বিষ দিয়েছে গীতাকে—যাতে ঐ হোটেলের মালিকানা ওয়ারিশন হিসেবে গিয়ে শেষ পর্যন্ত শর্মাতেই বর্তায়! শর্মাও গাধার মত সে-ষড়যন্ত্রে সাহায্য করেছে তোমাকে। গীতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বভাবতই ভুল ধারণা হয়েছিল শর্মার আর তাই হোটেল-কেনা ব্যাপারটাই পুরোপুরি গোপন রাখবার চেষ্টা করছিল সে সকলের কাছ থেকে শুধু এই আশায়—হোটেল-কেনা ব্যাপারটা জানতে না পারলে আর গীতার পাপসঙ্গী সাথীরা কেউ দাবি করতে আসবে না হোটেল।

"শর্মা যত চেষ্টা করেছে ঘটনা চাপবার আর ঢাকবার, তোমার তত সুবিধে হয়েছে শর্মাকে ফাঁসির ফাঁসে জড়াবার। সেদিন রাতে

হাসপাতালে যাওয়ার সময় পরে রুক্মিণীর খবর করবার জন্যে ট্যাকসি-র নম্বর দেখে রেখেছিল মিসেস ওয়ার্ড। পরে ট্যাকসি-চালকের কাছ থেকে রুক্মিণীর ঠিকানা সংগ্রহ করেও রুক্মিণীকে তুমি এমনিতে কিছু বলোনি কেন না ছেলে মারা গিয়ে রুক্মিণীও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে গীতার মত। ফন্দি এঁটে শর্মার নাম ক'রে খবর দিলে তুমি তাকে গঙ্গার ধারে আসবার জন্যে, আর তোমার দলের মেয়ে কারুকে দিয়ে রুক্মিণী পরিচয় দিয়ে ফোন করিয়ে শর্মাকে ডাকলে গঙ্গার ধারে এবং শর্মাকে হাতে নাতে ধরবার জন্যে আমাকেও তাকে দিয়ে ফোনে নেমন্তন্ন করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। শর্মার ঘর থেকে পিস্তলও চুরি করলে, রুক্মিণীকে মেরে কাছাকাছি কোথাও ফেলে রাখবার জন্যে—শুক্লার গাড়ি পেয়ে গিয়ে হাতে যেন চাঁদ পেলে তুমি। অন্ধকারে পিস্তলটা খুঁজে না পাবার আর কোনো ভয় রইল না তোমার! রুক্মিণীর পাশেও ফেলে আসতে পারতে, কিন্তু সেটা বড় বেশি সাজানো মনে হবে বলে ভয় হয়েছিল তোমার!

"এখন তুমিই বলো ভালো ক'রে চিন্তা ক'রে—এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পোর্ট সৈয়দ, এডেন, কলম্বো, হংকং ও সায়গানের অনুকরণে বা সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে বিদেশীদের 'বড়িয়াচিক্স' সরবরাহ করবার এবং দেশীদের আক্কেল-সেলামী নেবার যে কারবার তুমি চালিয়েছো—এ দু'টো প্রকাশ করতে পারলে—চাকরির উন্নতি তো আছেই—সরকারের কাছ থেকে নগদ কত টাকা পুরস্কার পাবো আমি? তোমার ব্যাপার ইতিমধ্যে দু'চার জন সহকর্মীও জেনে ফেলেছে—তাদের মুখ বন্ধ করতে ভাগ-বখরা ক'রে পঁচিশের আর কী থাকবে আমার?"

"পঞ্চাশ!"

"ধরা প'ড়ে চাকরি যাবারও ভয় আছে!"

"যাট!"

"ভাঙ্গা আর রেখো না, ভরিয়ে পুরো লাখ করো—"

"কিন্তু যাট হাজারের বেশি এই মুহূর্তে তোমায় দেবার উপায় নেই আমার!"

"কেন?"

"ঐ সিন্দুকে ঠিক যাট হাজার টাকাই রয়েছে!"

"বেশ, আপাতত তবে ঐ দাও আর চল্লিশের জন্যে জমা রাখো তোমার দলের মেয়েদের নামের লিষ্ট!"

"লিষ্ট?"

"কারবারের সুবিধের জন্যে মজুদ মালের 'লিষ্ট' সব ব্যবসায়ীর থাকে, তোমারও আছে!"

"ভদ্রলোকের চুক্তি তো?"

"হ্যাঁ—"

"বেইমানি করবে না, তার প্রমাণ?"

"ঐ লাখ টাকা! একসঙ্গে লাখটাকা কখনো এর আগে বানাতে পারিনি আমি!"

"বেশ; শুধু একটা কথা আমায় বলো—কে বেইমানি করেছে আমার দলের?"

"কেউ না!"

"তবে তুমি ধরলে কী ক'রে আমায়?"

"তোমারই ভুলে!"

"আমার ভুল?"

"হ্যাঁ। শর্মার বিরুদ্ধে ব্যাপারটা এমন গুছিয়ে করতে শুরু করলে তুমি, যে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হ'ল শর্মা আদৌ অপরাধী কি না? যে সাক্ষ্য প্রমাণ ও সূত্রের জন্যে হন্যে হ'য়ে ঘুরতে হয় আমাদের—সেগুলি মনে হতে লাগল কে যেন মোয়ার মত তুলে দিচ্ছে আমাদের হাতে!"

"তার দ্বারা শর্মার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের না হয় হদিশ পেলে, কিন্তু আমার সন্ধান পেলে কী ক'রে?"

"শর্মার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাষ পাওয়া মাত্র তাকে গ্রেপ্তার করলাম যাতে ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে ভাবতে পারে ষড়যন্ত্রকারী বা কারীরা। গঙ্গার ধার থেকেও ধরে আনলাম কিছু লোক—সাক্ষী সাজাবার জন্যে! ষড়যন্ত্রকারী বা কারীরা খুশি হ'ল; আত্মবিশ্বাসে অসতর্ক হল!"

"কী রকম?"

"রেডিও-টেলিফোন তারা নষ্ট করল না, সরিয়ে ফেলল না এই সিন্দুক থেকে!"

"কিন্তু সাড়া দেওয়া বন্ধ করার পর কী করে সন্ধান করে এলে এই হোটেলে?"

"সন্ধান ক'রে আসিনি, এসেছি সন্দেহ ক'রে। গীতার মৃত্যুর পর গীতার হষ্টেল ও শর্মার হোটেলের টেলিফোন লাইনে আড়ি পাত্তা হবে তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে এবং তাই বে-কায়দা একটা কথাও শোনা যায়নি দু'জায়গার কোনোটার থেকে। অথচ শুনতে পাওয়া উচিৎ ছিল—অন্তত রুক্মিণীর নামে শর্মাকে করা টেলিফোনটা! মিনতির সঙ্গে শর্মার পরিচয় কতটা, মিনতির গলা কতটা চেনে সে তুমি ঠিক জানতে না—তাই রুক্মিণীর নাম ক'রে শর্মাকে টেলিফোন করিয়ে ছিলে তুমি—এবং করিয়েছিলে এই হোটেল থেকে যাতে শর্মার টেলিফোনের কথা বললে সেটা অবিশ্বাস করি আমরা। এবং মনে করি শর্মার সঙ্গে দেখা করলে প্রাণের আশঙ্কা আছে বলেই রুক্মিণী টেলিফোন করে ডেকেছে আমাকে। একটা কথা শুধু তোমার খেয়াল হয়নি—শর্মাকে সর্ব সময় অনুসরণ করছিল আমার লোক আর তার চোখ এড়িয়ে রুক্মিণীর সঙ্গে খোলা কাজ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না শর্মার পক্ষে!

"শর্মার মুখের টেলিফোনের কথাটা বিশ্বাস করবার আরো কারণ হোটেলের সুটকেশ থেকে তার পিস্তলটা চুরি যাওয়া। টেলিফোনটা হোটেল থেকেই কেউ শর্মাকে করেছে হোটেল এক্সচেঞ্জের মধ্যে দিয়ে এবং সে বা তার দলের লোক সরিয়েছে পিস্তলটা—অনুমান করতে তাই অসুবিধে হল না আমার এবং ষড়যন্ত্রের বড় একটা খুঁটি যে এই হোটেলেই রয়েছে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যেতেই হোটেল-কেনার ব্যাপারে একদিকে শর্মার গোপনতা এবং অন্যদিকে তোমার বলবার আগ্রহ তোমার উপরেই সব সন্দেহ টেনে আনে! তোমার ঘরের সিন্দুকের মধ্যে টেলিফোনের বাজনা শুনেই তোমার অপরাধ সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবার কথা আমার, কিন্তু ক্যাশিয়ারের কাছে চাবির কথা বলে ক্ষণকালের জন্যে আমায় ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিলে তুমি। পিস্তলের ফাঁদটা তাই পাততে হয়েছিল আমায় এবং তার জন্যে নগদ পুরস্কারও জুটে যাচ্ছে যাট হাজার টাকা! কৈ, টাকাটা বার করো—"

"দিচ্ছি—শুধু আর একটা কথা, শর্মা এখন কোথায় ?"

"কাল সারারাত হাজতে থেকে আজ সকালে গোড়া থেকে সব কিছু আমায় বলে মন হাল্কা ক'রে শুক্লার কোয়ার্টারে গিয়েছে বিশ্রাম করতে! নাও, আর দেরি কোরো না। সিন্দুকটা খোলো—"

গুপ্তভায়ার হাতে পিস্তলটা দিয়ে পকেট থেকে সিন্দুকের চাবিটা বের করল ম্যানেজার এবং সেটা সিন্দুকে লাগাতে যেতেই তার হাত থেকে চাবিটা ছোঁ-মেরে কেড়ে নিল গুপ্তভায়া।

"সরো, টাকাটা আমায় বার করতে দাও। মনে হচ্ছে বেশি আছে বাটের!"

ম্যানেজারের কাছ থেকে কম্বিনেশন জেনে ডায়াল ও চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে ফেলল গুপ্তভায়া এবং ডালা খোলামাত্র এতক্ষণের থেকে থেকে কানে-আসা ঝরঝর-ঝনঝন আওয়াজটা হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠল এবং সিন্দুকের অভ্যন্তরে ছোট গ্রামোফোনের মত একটা যন্ত্রের সঙ্গে তার-জোড়া টেলিফোনও একটা নজরে পড়ল। টেলিফোনের পাশেই পরপর সাজানো নিচু নোটের বাণ্ডিল দেখলাম একটা রিভলবার দিয়ে চাপা দেওয়া রয়েছে। রিভলবার তুলে নিয়ে বাণ্ডিলগুলি ভালো ক'রে লক্ষ্য করল গুপ্তভায়া, বলল, "পুরো বাট এখানেই রয়েছে ?"

"হ্যাঁ। ইচ্ছে করলে গুণে নিতে পারো—"

"আর চল্লিশ হাজারের জামীন সেই লিষ্টটা ?"

"নীচের তাকে ঐ নোট-বইতে রয়েছে—"

নীচের তাক হাতড়ে একটা নোট-বই তুলে খুলে দেখে পকেটে পুরল গুপ্তভায়া, তারপর লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাল নোটগুলির দিকে, বলল, "গোণবার সময় নেই আর টাকা-গোণা অবস্থায় সহকর্মীদের কাছে ধরাও পড়তে চাই না আমি। দেখো, ঠিক বাট আছে তো ?"

"হ্যাঁ—আর না থাকলেও তো নোট-বই রইল তোমার কাছে—"

"তা যা বলেছো!" বলে হাত-বাড়াল গুপ্তভায়া, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভারটা, "হ্যাঁ, এবার তোমরা উপরে উঠে আসতে পারো, উইলসন।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্জন কানে এল, তাকিয়ে দেখলাম আহত, হিংস্রপশুর মতন দাঁড়িয়ে ফুঁসছে ম্যানেজার, সিন্দুকের রিভলবারটা গুপ্তভায়া সময়মত তার দিকে বাগিয়ে না ধরলে গুলি খাওয়া বাঘের মতই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ফেলত গুপ্তভায়াকে আর তা না পেরে নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল, "বেইমান শুয়ার, এই তোমার ভদ্রলোকের চুক্তি ?"

ডান হাতে রিভলবারটা নাচিয়ে বাঁ-হাতের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সিন্দুকের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল গুপ্তভায়া, হেসে বলল, "পুলিশের গোয়েন্দাদের সত্যিকার পরিচয়টা বড় দেরি করে জানলে তুমি। আর সরকারী-নুন-খাওয়া গোয়েন্দা কখনো ভদ্রলোক হয় ?"

শর্মার হোটেল থেকে দপ্তরে ফিরতে বেশ সময় লাগল আমাদের। প্রথমে সেই নোটবই দেখে দেখে মিসেস ওয়ার্ডের মত মেয়েদের আরো কয়েকটি হটেল ও বাড়ি ও লোকজনের ঠিকানায় রওনা করে দেওয়া হ'ল হোটেলের সামনের অপেক্ষমান ভ্যানগুলি। তারপর ভালো ক'রে সিন্দুকটা তল্লাশ করল গুপ্তভায়া এবং তার
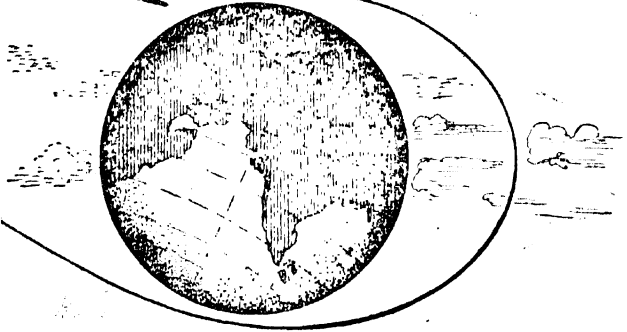
থেকে যা বেরুতে লাগল তার কোনোটাই সরকারী সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে তুচ্ছ নয়।

হোটেল থেকে দপ্তরে ফিরে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—শুধু আমার কেন বাগদাদের অতি-খলিফা কোনো খলিফেরও দেখে পুলকিত হওয়ার মত দৃশ্য বুঝি সেটা। গুপ্তভায়ার ঘর থৈ থৈ করছে নানাজাতের যুবতী মেয়ের বন্যায়—ঘরে ঠাঁই না হওয়ায় যৌবনের সে স্রোত উপচে এসে পড়েছে বারান্দায়। স্রোতে-ভেসে আসা আবর্জনার মত ভদ্রলোক ও সাহেব-সুবো চেহারারও কয়েকজন রয়েছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে। আর ফেনার মত রয়েছে মিসেস ওয়ার্ড এবং তার মত বিগত যৌবনা কয়েকজন। আমার চোখের উৎসাহ দেখে কিনা জানি না, অত্যন্ত বে-রসিকের মত গুপ্তভায়া বাড়ি পাঠিয়ে দিল আমায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত চলে আসতে হল আমায়।

পরের দিন ভোরে গুপ্তভায়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম আমি, গুপ্তভায়া তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে। আমাকে দেখেই গুপ্তভায়া চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, "অনেক প্রশ্ন আছে করবার, না?"

"হ্যাঁ, বেশি নয়, কয়েকটা!"

"যথা?"

"গীতা কাপুর যে প্রথমবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেনি—লুমিন্যাল খাইয়ে তাকে মারবার চেষ্টা হয়েছিল—সেটা আপনি জানলেন কী ক'রে?"

"প্রথম লুমিন্যালের শিশির সঙ্গে কোনো জলের গেলাস দেখতে না পেয়ে। অতগুলি লুমিন্যালের বড়ি শুকনো গলায় জলাতঙ্কের রুগীরও খাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, ল্যাবোরেটরি রিপোর্টে গীতার পেটে অর্ধপাচ্য খাদ্য পাওয়া গিয়েছে। তার মানে মিসেস ওয়ার্ডের কথা সত্যি নয়—রাতে যথারীতি খেয়েছে গীতা এবং সেই খাবারের সঙ্গেই লুমিন্যাল গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল!"

"নার্স যে বিষ দেয়নি, আপনি বুঝলেন কী করে?"

"বিষ দিয়ে থাকলে বিষ দেওয়ার খবরটা নার্স জানতো। বিষ দেওয়ার পর এবং পুলিশ আসবার আগে পালাবার যথেষ্ট সুযোগ ও সময় পেয়েছিল সে। সে যে পালায়নি তার কারণ বিষ দেওয়ার খবর সে জানতো না। তা ছাড়া তার ব্যাগে পাওয়া ট্রামের টিকিট দু'টো কী বলে? হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে প্রথম গিয়েছিল নিউ পার্ক স্ট্রীটে নার্সিং সেণ্টার-এ এবং সেখান থেকে ফিরেছে বাড়ি এবং টিকিট থাকা সত্ত্বেও যায়নি সিনেমায়!"

"ওকে খুন করার কারণ কী?"

"সন্দেহটা শর্মার উপর থেকে কেটে গেলেও যেন মিসেস ওয়ার্ডের দিকে না যায়!"

"প্যাট্রিসিয়া জর্জের হাসপাতালে আসাটা এবং ফিরে যাওয়াটা তাহলে মিথ্যে কথা?"

"পুরোপুরি। যে লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ফিরে গিয়েছে বলছে তার চেহারা বর্ণনায় সঙ্গে ছেড়েই দিলাম—তোমার ও শর্মার চেহারার মধ্যে মিল নেই কোথাও, অথচ তোমাদের দু'জনকেই প্যাট্রিসিয়া অনেকক্ষণ ধরে নজর ক'রে দেখল—যা করা তার উচিৎ ছিল না। মিসেস গুরসেল-এর পরামর্শে যে গল্পটা বানিয়েছে সেটাও পরীক্ষা ক'রে দেখো—ছদ্মবেশের একেবারে একটি পরাকাষ্ঠা!"

"গীতার উপর নজর রেখেও তার শর্মাকে রেজেস্ট্রি করা চিঠিটা আটকাতে পারলো না মিসেস ওয়ার্ড!"

"ওরা সাবধান হবার আগেই সে-কাজ সেরে ফেলেছিল গীতা!"

"সন্দেশের সঙ্গে যদি বিষটা গীতা খেয়ে থাকে তাহলে হিসেব মত আরেকটু আগে মৃত্যু হওয়া উচিৎ ছিল না তার?"

"হিসেবটা খালি পেটের শুনেছো—খাওয়ার পর ভরা পেটে বিষ পড়লে সময় তো একটু বেশি লাগবেই।"

আমি চুপ করতে গুপ্তভায়া জিজ্ঞাসা করল, "আর কোনো প্রশ্ন?"

"না, এবার পুরস্কার!" বলে কাল রাতে কাকার দেওয়া হাজার টাকার একটা চেক পকেট থেকে বার ক'রে দিলাম গুপ্তভায়াকে, "ছ দিনের কাজ একদিনে হওয়ায় পাঁচশো টাকা বোনাস দিয়েছেন কাকা!"

চেকটা হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল গুপ্তভায়া, উল্টেপাল্টে দেখে সেটা ফেরৎ দিল আমার হাতে, বলল, "নেবার হ'লে কাল ঐ লাখ টাকাই নিতাম। এই চেকটা ফেরৎ দিয়ে দিও তোমার কাকাকে! আর বলো, ভয় নেই।"

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল গুপ্তভায়া; বলল, "তুমি বসে কাগজ পড়ো, ততক্ষণ একটু বাথরুম সেরে আসি আমি—"

গুপ্তভায়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে কাগজটা তুলে নিলাম কিন্তু পড়তে পারলাম না এক লাইনও।

লাখ টাকাটা ছিল ঘুষ—কাকার পাঠানো হাজার টাকাটাও কী তাহলে তাই? মন্মথ মুখার্জি নামে এক জন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু রয়েছে কাকার এবং জাহাজ সংক্রান্ত ব্যাপারেই তিনি আছেন বলেই যেন শুনেছিলাম!

সমাপ্ত

# কলকাতায় রবীন্দ্র গ্যালারী

অশোক ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত এক বছরে কলকাতায় নানা ভাবে জাতির কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের মানসলোকের কতখানি অধিকার করে আছেন তা আমরা আমাদের প্রাত্যহিক কর্মব্যস্ততার মধ্যে ভুলে থাকলেও যখনই ইচ্ছা করি তার পরিমাপ করতে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত না হয়ে পারি না। এবং সে দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে সভা-সমিতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির যে বন্যা বাংলাদেশ জুড়ে বয়ে গেল তা অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; কেননা এতে এটুকু অন্তত প্রমাণিত হলো যে, বাঙালী কৃতঘ্ন নয়। তবে এই শ্রদ্ধা জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠতে পারে না, তা নয়। সভা-সমিতি এবং মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে যতখানি উন্মাদনা দেখা গিয়েছে, ততখানি চিন্তাশীল মননের পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এই একটি কেন্দ্রবিন্দুকে সামনে রেখে সমগ্রজাতি একই আবেগের অংশীদার হতে পেরেছিল। আজ এক বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর, জাতি যখন কিছুটা অবসাদগ্রস্ত তখন একাডেমি অব ফাইন আর্টসের ক্যাথেড্রাল রোডের ভবনে একটি স্থায়ী রবীন্দ্র সংগ্রহশালা স্থাপন করে একাডেমির কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সমগ্র কলকাতাবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই সংগ্রহশালা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করলো যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সাময়িক উন্মাদনার ব্যাপার নয়, বরং তা চিরস্থায়ী।

একাডেমি অব ফাইন আর্টসের ভবনের সম্মুখস্থ দোতলার কক্ষে এই সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠা করে সংগঠকেরা কবিগুরুর প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। একথা ভাবতেও ভালো লাগে যে বাংলা দেশের একাডেমি অব ফাইন আর্টসের ভবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশেই স্থাপন করা হলো বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সংগ্রহশালা। এর পর কলকাতাবাসীদের অথবা কলকাতার দর্শকদের দর্শনীয় বস্তুর তালিকায় একটি নতুন নাম সংযোজিত দেখা যাবে আশা করা যায়—ক্যাথেড্রাল রোডের রবীন্দ্র গ্যালারী।

বর্তমান রবীন্দ্র গ্যালারীর সমূহ বস্তুই শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। এগুলি বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বার বার চাওয়া হয়েছিল সেখানকার রবীন্দ্র সংগ্রহশালায় রাখবার জন্যে। কিন্তু শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বস্তুগুলি তিনি একটি স্থায়ী সংগ্রহশালা তৈরী করে তা কলকাতার রবীন্দ্র-ভক্তদের জন্য তুলে ধরেন। আজ তাঁর অশেষ চেষ্টার ফলে তা সম্ভব হলো এবং তিনিও কলকাতাবাসীদের প্রতি তাঁর এই ঐকান্তিকতার জন্য চিরদিন ধন্যবাদ ভাজন হয়ে থাকবেন। শান্তিনিকেতন কিংবা বেনারসের অনুরোধে এই মূল্যবান বস্তুগুলি না দিয়ে হয়তো তিনি রসজ্ঞানের পরিচয়ই দিয়েছেন, কেন না ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসাবে আজও যে কলকাতাই সব চেয়ে অগ্রণী এবং এখানে যে সংখ্যার দিক থেকে রসিকের অভাব নেই, তা সবাই স্বীকার করবেন। এই সংগ্রহশালায় আছে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত বত্রিশটি চিত্র, তাঁর ব্যবহৃত একটি কাঁথা, একটি টেবিলক্লথ, ফুলদানী হিসাবে ব্যবহৃত একটি ধাতু নির্মিত ঘড়া, তাঁর ব্যবহৃত একটি পোর্ট-ফোলিও, তাঁর ভানু সিংহের পত্রাবলীর (যা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন) পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি গানের পাণ্ডুলিপির খাতা, তাঁর বাংলা ও ইংরেজি কবিতা লেখা একটি সাত ফুট দীর্ঘ স্ক্রল, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পরিজনকে লেখা অন্যান্য পত্রাবলী ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও আছে স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়কে উপহার দেওয়া কবির স্বাক্ষরযুক্ত প্রকাশিত গ্রন্থাদি এবং স্বর্ণখচিত কৌটোয় রবীন্দ্রনাথের অলকগুচ্ছ, যা কিনা শ্রীমতী রাণুর বিবাহে ছিল কবির আশীর্বাদ। তালিকাটি দেওয়ার কারণ এই যে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের কতখানি মূল্যবান একটি সংগ্রহশালা গঠিত হলো তার পরিমাণ পাঠকদের কাছে তুলে ধরা গেল। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহশালাটি যদিও ক্ষুদ্র তবু তা দেখতে দেখতে কখন যেন মনে হয় কবির অনেক কাছাকাছি এসে গেছি; তাঁর রচিত মূলচিত্রের রাজ্যে, তাঁর হাতের লেখার মেলার মধ্যে, তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহের কাছাকাছি এসে যেন কবির সান্নিধ্য অনুভব করা যায়।

রবীন্দ্র গ্যালারীটিকে একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যে বেমানান হয়নি তার কারণ হলো এই সংগ্রহশালাটির প্রধান আকর্ষণই রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত বত্রিশটি চিত্র। এই চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মনের অনবদ্য স্বাক্ষর বহন করছে এবং এদের বিস্তারিত আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের যদি বাংলা দেশের প্রথম আধুনিক চিত্রশিল্পী বলা হয়, তা হলে হয় তো তা অন্যায় হবে না।

বত্রিশটি চিত্রের প্রতিটিই নানা দিক থেকে শিল্পীর উচ্চ শিল্পমানের পরিচয় বহন করছে এবং আজ পর্যন্ত যাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চা নিতান্তই "সখ" বিশেষ, তারাও যদি এই ছবিগুলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন কী বস্তু সংস্থাপনায়, কী বর্ণ-বিন্যাসে, কী নক্সা রচনায় কী পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টিতে, সর্বত্রই শিল্পী তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যখ জল রং, জল রং এবং প্যাস্টেল বা চকখড়ি এই তিনটি মাধ্যমেই

নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন ; এবং সব চেয়ে বড় কথা সর্বত্রই তাঁর নিজের একটি শিল্পভঙ্গীর ছাপ রাখতে পেরেছেন। বেশী বয়সে নিয়মিত চিত্ররচনা সুরু করে শিল্পী হিসাবে চিত্রের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্রাত্য মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং বলেছেন যে এ ক্ষেত্রেও ছন্দই হলো তাঁর প্রধান অবলম্বন এবং মূলত তাঁর চিত্র তাঁর কবিতারই রেখারূপ। কথাটিতে সত্য আছে সন্দেহ এবং বিশেষ করে ছান্দসিকতা যখন সকল শিল্পেরই প্রাণ, কিন্তু তাই বলে রঙের ব্যবহারে তিনি যে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন, তাও অস্বীকার করা যায় না।

প্যাস্টেল (১৪নং) ও ঘন জলরঙের (৮নং) নিসর্গ চিত্র দুটিতে হলদে রঙের অপরূপ ব্যবহার দেখলে তা বোঝা যাবে। সোনালী নিসর্গ চিত্রটি (২২ নং)-তেও সোনালী রঙের জোরদার ব্যবহারে তাঁর রঙের প্রতি যে সাবেগ দখল তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে আকাশের নীচে (৩১ নং) ছবিটিকে উল্লেখ করতে হয়। নিসর্গ চিত্রগুলি ছাড়া যে সব ছবি রয়েছে তার মধ্যে অনেক কটিই হলো মানুষের বিভিন্ন চারিত্রিক রূপায়ণ। এগুলিতে সামান্য প্রয়াসে মানব মনের যে সব রেখাচিত্র তিনি এঁকেছেন তার চারিত্রিক গুণাগুণও কম অনুধাবনীয় নয়। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছবির যা বিশিষ্টতা সেই কিম্ভুত এবং কল্পলোকের চিত্রও এই গ্যালারীতে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের যে প্যাটার্ণের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান ছিল ; এবং সামান্য কিছুকেও অবলম্বন না করেও তিনি যে কালির আঁচড় টেনে টেনে নানারকম নক্সার সৃষ্টি করতে পারতেন এবং সেই নক্সাগুলি যে কতখানি উচ্চস্তরের শিল্প হয়ে উঠতো তা বোঝা যাবে ২নং কিংবা ২৬ নং ছবি থেকে। ছন্দের দিক থেকে অপূর্ব মনে হয় নৃত্যরত মূর্তি (২৪ নং) ছবিটি। সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্র চিত্রকলার একটি প্রতিনিধিমূলক সংগ্রহ যে রবীন্দ্রগ্যালারীতে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

একটি বিষয়ে শুধু কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারা যায় না, তা হলো সংগ্রহশালার বস্তু তালিকা এবং প্রবেশমূল্য কিছুটা বেশী

# বাতাবি ফুলের মিষ্টি সুবাস

শ্রীমতী ভবানী দাশগুপ্ত

বাতাবি ফুলের মিষ্টি সুবাস
ভেসে আসে,
ঐ বাতাসে।
ছোট্ট সাদা ফুলের কুঁড়ি
পাপড়ি ছড়ায়,
সুরবা বাসে॥

বসন্ত যে সবে এল
দখিন বাতাস
সঙ্গে নিয়ে।
কোকিল ডাকে কুহু কুহু
ঐ আঙ্গিনার
ও পাশ দিয়ে॥

পলাশের রঙ লাগেনি
সবুজ পাতার
ফাঁকে ফাঁকে।
বাতাবি ফুলের গন্ধ ছড়ায়
দমকা হাওয়ায়
পথের বাঁকে॥

বাতাবি লেবুর ফুল ফুটেছে
ভ্রমরা আসে
গুন্ গুনিয়ে।
কৃষ্ণচূড়ার হয়নি সময়
রেঙ্গে ওঠার
আবির হয়ে॥

হাল্কা সবুজ দুষ্টু শিশু
উঁকি মারে
ফুলের কোলে।
নিটোল কচি বাতাবি লেবু
কদিন্ পরে
দোদুল দোলে॥

বাতাবি ফুলের মিষ্টি সুবাস
ভাসে নাকো
আর বাতাসে।
কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমূল
বনের মাঝে
লুটায় হেসে॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অবিনাশ সাহা

১৬

গেন্থর একশ টাকার নোট জ্ঞান চৌধুরীকে ভাবিয়ে তোলে। কোন রকমেই হিসাব মেলাতে পারেন না জ্ঞান চৌধুরী! গেন্থ যে গায়ের জোরে অন্যের বাগানের ফলফুল চুরি করে—অন্যের ঝাড়ের বাঁশ কেটে কায়ক্লেশে সংসার চালায় তার হাতে একশ টাকার নোট কোত্থেকে আসতে পারে! গাঁজা অবশ্য বরাবরই ও খাচ্ছে। এবং মাত্রায় এক ভরিও অনেক বার কিনেছে, কিন্তু সে তো একটা একটা করে ট্যাঁকের পয়সা গুণে দিয়ে। এক সঙ্গে পাঁচটা টাকাও তো কোন দিন ফেলতে পারেনি—তবে?···জ্ঞান চৌধুরীর ললাটে চিন্তায় কুঞ্চন রেখা ওঠে। কোন রকমে সরকারী ক্যাশ মিলিয়ে উঠে পড়েন। ভাবেন, এই মুহূর্তে ওঁর পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। রমণীবাবু গঞ্জে বদলি হয়ে আসা অবধি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য খবর দিতে পারেনি। অবশ্য পুলিশের অকপট বন্ধু হিসেবে চেষ্টায় ত্রুটি করেনি ও।···জ্ঞান চৌধুরী থানার পথেই পা বাড়ান। যেতে যেতে আবার ভাবেন, এবার নিশ্চয় একটা খবরের মতো খবর দিতে পারবো। একশ' টাকার নোটের সূত্র ধরেই উদ্‌ঘাটিত হবে অনেক গুপ্ত ইতিহাস। শুধু ডাকাতটাকে কোন উপায়ে বাঁধতে পারলে হয়। পুলিশের গুঁতোতেই পেটের কথা বেরিয়ে পড়বে। কেউ ওর হয়ে লড়তে আসবে না। গঞ্জের মানুষ ওর ওপরে হাড়ে হাড়ে চটা। বড্ডো বাড় বেড়েছে পাজিটার। কথায় কথায় যাকে তাকে কুড়োল উঁচিয়ে ধরে।···

কিন্তু সরাসরি থানায় না গিয়ে মানবেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় এসেই ওঠেন জ্ঞান চৌধুরী। ওঠেন অনেক ভেবে চিন্তে। ওঁর বিবেচনায়, পুলিশকে খবর দেবার আগে মানবেন্দ্রনাথকে খবর দেওয়া উচিত। কেন না, এসব ব্যাপারে ওর মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লোক গঞ্জে একটিও নেই। দারোগা হয়েও রমণীবাবু যে কথা সাতবার ভাববেন সে কথা একবার কানে শুনেই ও বুঝে নেবে। তাছাড়া ওকে না জানিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় বিপদও আছে। হয়তো নিজেদের মধ্যেই ভুল বুঝাবুঝিই হয়ে যাবে। আবার এমনও হতে পারে, আজকের ঘটনা সম্পূর্ণ চেপে যাওয়াই উচিত বিবেচিত হবে।···জ্ঞান চৌধুরী সাত পাঁচ ভাবনা নিয়েই হাজির হন।

মানবেন্দ্রনাথ রোজকার সান্ধ্য মজলিসের জন্য তৈরীই ছিলেন। তাই জ্ঞান চৌধুরীকে দেখে লাফিয়ে ওঠেন। চায়ের কাপ হাতেই থাকে, চৌধুরীকে সাদর সম্ভাষণ জানান। চাকরকে ডেকে আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দেন।

জ্ঞান চৌধুরী আপত্তি করেন না। মুখে হাসি ফুটিয়েই সায় দেন, তা চা এক কাপ চাই বটে। সঙ্গে কিছু টা হলেও আপত্তি নেই। তাড়াতাড়িতে কিছুই আজ মুখে দিতে পারিনি।

তাড়াতাড়ি কেন মাষ্টার? ভাগাড়ে শকুন পড়েছিল বুঝি?—হাসির জবাব মিষ্টি হেসেই দেন মানবেন্দ্রনাথ।

জ্ঞান চৌধুরীও হেসে হেসেই বলতে থাকেন, তা যা বলেছ। ভাগারের কাজ করি তা শকুন জুটবে না তো জামা জুটবে কোত্থেকে? তবে আজ একটা মজার খবর আছে।

মজার মধ্যে তো তুমি ডুবেই আছ চৌধুরী। ঐ যে লোকে বলে:

এক ছিলুমে যেমন তেমন
দুই ছিলুমে মজা—
তিন ছিলুমে চড়ক গাছ
চার ছিলুমে রাজা।

আরে রাখ রাখ, আর কবিতার নিকুচি করো না। সত্যি মজার খবর আছে।

সত্যি নাকি? তাহলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও। ভৃত্য চা এনে হাজির করে, মানবেন্দ্রনাথ কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে মন্তব্য করেন।

জ্ঞান-চৌধুরী চা-য়ে চুমুক দিয়ে হাঁপ ছাড়েন, আঃ বাঁচা গেলো।

মরা-বাঁচার আবার কি হলো হে? চলো ওঠা যাক?

খবরটা শুনবে না তাহলে?

সত্যি কোন খবর আছে নাকি?

কিছু নয় অনেক, তাজ্জব ব্যাপার!

ভণিতা রেখে যা বলবার চট করে বলে ফেলো।

জ্ঞান চৌধুরী তাই বলেন—আগাগোড়া।

মানবেন্দ্রনাথ সব শুনে লাফিয়ে ওঠেন, বলো কি-হে চৌধুরী, পুরো একশ' টাকার নোট!

হ্যাঁ তাই।

হুঁ, আমিও এ রকমই ভাবছিলাম।

কি ভাবছিলে?

ভাবনা নয়, নবীন চৌধুরীর হত্যাকারী অনিবার্য ভাবেই ঐ বেটা জল্লাদ।

প্রমাণ?

প্রমাণ পাবে। দেরি করো না—চলো। এক্ষুনি আমাদের কাজে লাগতে হবে।

জ্ঞান চৌধুরী কিছুই ঠাওর করতে পারেন না। তবু নির্দ্বিধায় মানবেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন।

থানায় তখন সান্ধ্য মজলিস চলেছে। বংশীর কোলে সূর্য অস্ত যায়-যায়। পশ্চিম গগন আবির রাগে রাঙা। সেই রাগরঞ্জিত অনুরাগের মিষ্টি মন নিয়ে দারোগার অন্তরঙ্গরা এসে জড় হয়েছেন। জড় হয়েছেন স্কুলের হেডমাষ্টার, সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার, পোষ্ট মাষ্টার, সাব রেজিষ্ট্রার, ষ্টেশন মাষ্টার ও আরো অনেকে।

শান-বাঁধানো মুক্ত প্রাঙ্গণ সবুজ দুর্বায় মসৃণ। বর্ষায় বংশীর জল কানায় কানায় ভরে ওঠে, শীতে শুকিয়ে গিয়ে পায়ের নীচে হামাগুড়ি খায়। কিন্তু শীত বর্ষা উভয় ঋতুতেই প্রাঙ্গণের ওপর মজলিস বসে। দারোগার আজ্ঞাবহরা রোদ পড়লেই চেয়ার বিছিয়ে আসর ঠিক রাখে। হুকুমমতো চা-সিগারেট বিলোয়। মজলিস কোন দিনই বাদ যায় না। কাজের চাপে দারোগা নিজে উপস্থিত থাকতে না পারলেও সভাসদরা যথারীতি জড় হন। কিন্তু আসর কোন দিনই জমে না যতক্ষণ না জ্ঞান চৌধুরী আর মানবেন্দ্রনাথ উপস্থিত হন। বৈঠকী গল্প আর চুটকি কথায় ওঁদের জুড়ি নেই।

মজলিসের সকলেই আজ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ আর জ্ঞান চৌধুরীর বিলম্ব দেখে মোহন ডাক্তার প্রধান ভূমিকা নেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও কাউকে মাতাতে পারেন না। হাসি-তামাসার কথাও অকারণ কেমন যেন গায়ে বিঁধে। স্যানিটারী ইনস্পেক্টর মাখন মুন্সী পাড়াগাঁয়ের লোক। গঞ্জের পাশের গ্রামেই ওঁর বাড়ি। গাঁয়ে জন্মেছেন গাঁয়েই মানুষ হয়েছেন। শুধু মাঝে দু'বছর কলকাতায় থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন। ট্রেনিং শেষে বহাল হয়েছেন আবার পাড়াগাঁয়েই। তবু সারা জীবন অপেক্ষা দু'-বছরের প্রবাস জীবনই ওঁর মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। শহুরে কায়দায় চলেন, কলকাতায় বুলি কপচান। অবশ্য খাঁটি কলকাতায় লোক ওঁর কথা শুনলে হয়তো হেসে খুন হবেন। কলকাতার কথা তো নয়ই ভূ-ভারতের কোথাও এ-রকম উচ্চারণ আর ভাষা আছে কিনা গবেষণা করে জানতে হবে।

মোহন ডাক্তার সাদাসিধে মানুষ—কারো চালবাজী সহ্য করতে পারেন না। মাখন মুন্সীর ওপর হাড়ে চটা। শুধু অপেক্ষায় ছিলেন। আজ সেই সুযোগ এসে যায়। বংশীর বুকের ওপর দিয়ে দূর দেশের এক মাঝি নৌকো বেয়ে যাচ্ছিল। কণ্ঠে প্রাণ মাতানো ভাটিয়ালী সুর। মজলিসের সকলেই বেশ উপভোগ করছিলেন। সহসা ছন্দপতন ঘটান মাখন মুন্সী। গান ওঁর কাছে বড় নয়, বড় নৌকোর পেছনের ঐ হাল। মোহন ডাক্তারকে লক্ষ্য করেই প্রশ্ন করেন মাখন মুন্সী, মোহনবাবু, বলুন তো নৌকোর পেছনে ওটা কি?

আর যাবে কোথায়। প্রশ্ন তো নয় যেন মৌচাকে ঢিল পড়ে। কর্কশ স্বরেই হুল ফোটান মোহন ডাক্তার, ওটা আপনার লেজ—বেটি লঙ্কায় রেখে এসেছেন।

বেচারা মাখন মুন্সী। প্রশ্নের এ রকম জবাব পাবেন ভাবতেই পারেননি। লজ্জায় ক্ষোভে চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। কোন কথাই আর মুখ দিয়ে সরে না।

ষ্টেশন মাষ্টার জগদীশবাবু কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেন, নৌকোটা ধানগাছের তক্তা দিয়ে তৈরী তাই না মোহনবাবু?

সেটা ওকে জিজ্ঞেস করুন, মাখন মুন্সীকে কটাক্ষ করেই জবাব দেন মোহন ডাক্তার।

রমণী দারোগা লজ্জায় পড়েন। হাজার হোক, মাখন ওঁর অতিথি। সকলে মিলে খোঁচালে বেচারা যায় কোথায়? একটু বিরক্ত হয়েই রাশ টানেন রমণী দারোগা, কি সব যা তা বলছেন। গানটাই শুনুন না!

কিন্তু গান শোনা আর কারোরই হয় না। মানবেন্দ্রনাথ আর জ্ঞান চৌধুরী একযোগে মঞ্চে প্রবেশ করেন।

আসরে নতুন করে প্রাণ আসে। সকলেই নড়ে চড়ে বসেন। শুধু উঠে দাঁড়ান মাখন মুন্সী। কিছুতেই আর এ আসরে নিজকে খাপ খাওয়াতে পারেন না। জরুরী কাজের কথা জানিয়ে আসর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

ও অদৃশ্য হয়ে গেলে রমণী দারোগা হাসতে হাসতে মন্তব্য করেন, ডোজটা বড্ডো বেশী দিয়ে ফেললেন মোহনবাবু।

না মশায়, বরং কম দিয়েছি। আপনারা জানেন না হতভাগা কি রকম পাজী। বরাবর কি রকম ন্যাকামো করে আসছে তা তো জানেনই। তাতেও ওকে এতদিন কিছু বলিনি। আজো বলতাম না—

তবে বললেন কেন দাদা? জ্ঞান চৌধুরী উসকিয়ে দেন।

বললাম ওর আচরণে। জানেন, নচ্ছারটা নিজের বাপকে বাড়ির চাকর বলে পরিচয় দেয়?

কি রকম? জগদীশবাবুর সবিস্ময়ে প্রশ্ন।

রকম আবার কি মশায়। গেলো শনিবার রুগী দেখে ওর অফিসের সুমুখ দিয়ে ফিরছিলাম। পাশ কাটাতে গিয়েও চোখে চোখ পড়লো। আদর করে ডাকলেন, তাই না গিয়ে পারলাম না। কিন্তু মশায় গিয়ে দেখি, বাবু গ্যাঁট হয়ে চেয়ারে বসে আছেন আর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। দেখেই বুঝলাম, ভদ্রলোক সাদাসিধে মানুষ। পরনে হাঁটুর ওপরে কাপড়, খালি পা, ফতুয়া গায়। চলনে বলনে কোন রকম কৃত্রিমতা নেই। মুন্সী সাহেব বোধ হয় আমার সামনে ওকে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। আমাকে এক ছিলুম তামাক দিতে বলে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা আমার তেমন যুৎসই মনে হলো না। তাই ওঁর অনুপস্থিতে প্রশ্ন করলাম, ভদ্রলোক কে মাখনবাবু?

আরে মশায় আপনাদের বলবো কি আমি তো তাজ্জব। জিভে একটুও আটকালো না, দিব্যি উত্তর করলেন, ও আমাদের বাড়ির পুরোনো চাকর—হাটে সওদা নিতে এসেছে।...

কি আর করি বলুন? আমি তাই বিশ্বাস করলাম। কিন্তু পরের দিন কথায় কথায় ওর আরদালীর কাছ থেকে জানলাম, ভদ্রলোক ওর পিতা। শুনে ইচ্ছে হলো, আমার ডাক্তারী ছুরিটা নিয়ে গিয়ে হতভাগার ধমনী কেটে দিই। এমন ইতরের দেহে পবিত্র পিতৃধারা প্রবাহিত হতে দেওয়া অন্যায়।...

যেখানে শুধু সেরা জিনিষই প্রিয়...
পরিবারের জন্য মায়েদের পছন্দ ডালডা
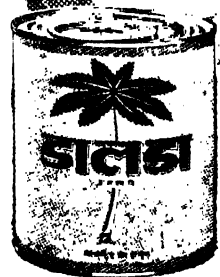
ঘোর কলিতে এতো হতেই হবে মশায়। এতে আর ওর অপরাধ কি?—জগদীশবাবু হেসে হেসেই ইন্ধন যোগান।

কিন্তু হাসির বদলে মোহন ডাক্তার গর্জে ওঠেন, কি বললেন?

বলাবলির কি আছে বলুন? আমার বিবেচনায়, এ সব ফ্যামেলি এফেয়ার্সে আমাদের নাক না গলানোই উচিত, নিজের কথায় জের টানেন জগদীশবাবু।

মোহন ডাক্তার আবারও ফুঁসে উঠতেই যাচ্ছিলেন জ্ঞান চৌধুরী বাধা দেন তা যাই কেন বলুন না, মুন্সী সাহেব কিন্তু আমাদের কল্যাণে সদাব্রত। গঞ্জের কোন গোয়ালাই এখন আর দুধে জল মেশাতে সাহস করে না।

রাখুন রাখুন মশায়, আমাকে বেশী ঘাঁটাবেন না। মেশায় কি না মেশায় তা নিজের মক্কেলদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। মাখন মুন্সীর আর বেশী বাখনাই করবেন না। মোহন ডাক্তার পিঠ পিঠ জবাব দেন।

সমতা রেখে জ্ঞান চৌধুরী বলেন, না, বাখনানোর আর কি আছে। তবে শোনা যায় ইদানীং কুইনিনেও নাকি ময়দা মেশানো থাকছে।

হ্যাঁ, যেমন গাঁজায় থাকে শুকনো দুর্বোঘাস, মোহন ডাক্তার উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

জগদীশবাবুও ওঁকে অনুসরণ করেন। বংশীর বাঁকে সহসা ষ্টীমারের হুইসল শোনা যায়। জগদীশবাবু বলেন, চাকরি গেলো মশায়। কুইনিন আর গাঁজার এ্যানালাইসিস আপনারা করুন, আমি চললাম।

ওদের দুজনের দেখাদেখি হেড মাষ্টার, পোষ্ট মাষ্টার এবং সাব-রেজিষ্ট্রারও উঠে পড়েন। শুধু ওঠেন না জ্ঞান চৌধুরী আর মানবেন্দ্রনাথ।

রমণী দারোগাকে লক্ষ্য করে মানবেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, তাহলে মার্ডার কেসের চার্জ মতি দেওয়ানের বিরুদ্ধেই দিচ্ছেন কি?

তাছাড়া আর উপায় কি? আপনারা তো কোন হদিসই করতে পারলেন না।

যদি বলি পেরেছি, মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন মানবেন্দ্রনাথ।

বাজে গুল মারবেন না।

বাজে নয়, কাজের কথাই বলছি।

সত্যি!

সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলার অবকাশ এখন নেই। অন গড বলছি।

আসল খুনী তাহলে কে?

বলছি, পুরস্কার পাবো তো?

পুলিস বন্ধুদের কখনো নিরাশ করে না।

ভেরি ওয়েল। কিন্তু পুরস্কারের জন্যে নয়—কর্তব্য হিসেবেই বলছি। আসল খুনী গেছু সেখ।

বলেন কি! আমি তো ভাবতেই পারছিনে!

ভাবতে আমিও পারি নি। জ্ঞানবাবু আজ হাতে হাতে ধরে ফেলেছেন।

কি রকম?

উত্তরে মানবেন্দ্রনাথ আর নিজেকে চাপতে পারেন না। সব কথা আগাগোড়া বলে যান।

রমণী দারোগা উল্লাসে লাফিয়ে ওটেন, ভাটস্ রাইট। এ কাজ নিশ্চয় জল্লাদটার। কিন্তু—

কিন্তুর কথা পরে ভাববেন। আগে ডাকাতটাকে বেঁধে আনুন। চাপ দিলে ওর মুখ থেকেই সব বেরিয়ে পড়বে।

যা বলেছেন। আমি না হয়ে আপনারই দারোগা হওয়া উচিত ছিল, মানবেন্দ্রনাথের কথায় সায় দিয়ে ঈষৎ হাসতে থাকেন রমণী দারোগা। হাসতে হাসতেই আবার মন্তব্য করেন, ডাকাতই হোক আর সিংহই হোক—খাঁচায় ওকে ঢুকতেই হবে।

তাহলে আমরা আজ আসি। ভগবান আপনার সহায় হোন, উঠে দাঁড়ান মানবেন্দ্রনাথ।

ভগবান সহায় হবেন কিনা জানিনে, তবে আপনাদের সহায়তা থেকে যেন বঞ্চিত না হই, রমণী দারোগা আবারও হাসতে থাকেন।

জ্ঞান চৌধুরী মানবেন্দ্রনাথও হাসিমুখেই বিদায় নেন।

পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। গেছু আচমকা বিছানার ওপর উঠে বসে। কে যেন ওকে তাড়া করে আসছিল। হয়তো নিছক স্বপ্ন আর নয়তো অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া। কেমন যেন ভয় ভয় করে ওর। রহিমা তখনো অসাড়ে পড়ে আছে। সারা রাত্রের মধ্যে ওর ঘুম ভেঙেছে কিনা গেছু তা জানে না। বড় করুণ দেখাচ্ছে ওর মুখখানা। যেন এইমাত্র কেউ ওকে গলা টিপে হত্যা করেছে।···স্থির থাকতে পারে না গেছু। কান্নায় বুক ভেঙে আসে। বিশাল এই পৃথিবীতে আজ ও নিঃস্ব। রহিমা তো বটেই ছেলেপুলেরা অবধি ঘৃণায় ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু কেন? অন্যায় যদি কিছু করে থাকে তাহলে তো ওদের জন্যেই করেছে। ও তো একার সুখের জন্যে কখনো কোন কাজ করেনি। না না, কারো অনুকম্পা ও চায় না। কোন অন্যায় করেনি। দশজনের মতোই সবল সুস্থ স্বাভাবিক জীবন চেয়েছিল। কিন্তু শয়তান ওকে সে সুযোগ দেয়নি। সারা জীবন কুরে কুরে খেয়েছে। কিন্তু আর নয়। মরার আগে শুধু একবার শয়তানের সঙ্গে বুঝাপড়া করে দেখবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই শয়তান যে ওকে পাপের পথে টেনে নিয়েছে। তারপর—উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় গেছু। চালের বাতা থেকে কুড়োলটা হাত বাড়িয়ে টেনে নেয়। কিন্তু এগুতে আর পারে না। রমণী-দারোগা সশস্ত্রবাহিনী সহ হাজির হন।

সেদিকে চোখ পড়তে আতঙ্কে শিউরে ওঠে গেছু। কোন দিক দিয়ে পালাবে পথ খুঁজে পায় না। পুলিস বাড়ির চারদিক ঘিরে আছে। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। কুড়োলটা খসে পড়ে হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন সিপাই ছুটে এসে হাত কড়া লাগিয়ে দেয়।

শেষ বারের মতো গর্জে ওঠে গেছু। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোয়। তারপর থিতিয়ে পড়ে। বনের বাঘকে কেউ যেন কৌশলে খাঁচায় আটকে ফেলেছে। নিরুপায়। আবার দেহের বাঁধনের চেয়ে মনের বাঁধনের সে এখন জর্জর। দেওয়ানের কচি ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরছে। ও ধরা দিলেই ওর বাবা খালাস পাবে। আর তার ওপরেই নির্ভর করছে ওর মরা বাঁচা।··· নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে গেছু। দুচোখে শ্রাবণের ধারা নামে।

রমণী দারোগা এতটা আশা করেননি। গেছুর মতো খুনীকে

ধরতে এসেছেন যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু গেন্দুর আচরণে স্তম্ভিত হন। মনে মনে স্বস্তির হাঁপ ছাড়েন। গেন্দুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি থানায় ফিরতেই মনস্থ করেন। সিপাইদের তাড়া দেন। কিন্তু বাধা পান রহিমার কাছ থেকে। চারদিকের কতাবার্তায় তন্দ্রা টুটে গেছে ওর। চোখ চেয়েই বিছানা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে রমণী দারোগার দু'পা জড়িয়ে ধরে। বুক ফাটা কান্নায় অনুনয় জানায়, মেনির বাবার আপনে দয়া কইরা ছাইড়া ভান। হার কোন দোষ নাই। হারে আপনে।

কথা শেষ করতে পারে না রহিমা রমণী দারোগা খেঁখিয়ে ওঠেন, চুপ কর মাগী! দোষ আছে কি না আছে দুদিন পরেই টের পাবি। এই রাম সিং, হাঁ করে শুনছ কি? নিয়ে চলো, বলতে বলতে এক ঝামটায় পা ছাড়িয়ে নেন।

কিন্তু রহিমা দমে না। ছুটে গিয়ে আবার পা জড়িয়ে ধরে। আবার পায়ের ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে বিলাপ করতে থাকে, দোহাই আপনার, হাক শরীল ভাল না। মাথার বেমত্তে ভুগচে। হার আপনে মেহেরবাণী কইরা ছাইড়া ভান। আল্লায় আপনার ভাল করব।...

আঃ—রমণী দারোগা আবার খেঁখিয়ে ওঠেন।

গেন্দু এতক্ষণ নিরুত্তর ছিল এবার মুখ খোলে, পা ছাড় মেনির মা, ধরে না। যমদূতে যারে ধরে তার আর ভাস্তি নাই। আল্লার দোয়া মাগ। ইয়াগ—

তাই নাকিরে শালা? তবে চল তোকে জন্মের ভাত খাইয়ে দিচ্ছি বলতে বলতে ঠাস করে একটা চড় গেন্দুর বাঁ গালে বসিয়ে দেন রমণী দারোগা। ক্রোধে আগুন হয়ে ওঠেন।

সঙ্গে সঙ্গে গেন্দুও ঝংকার দিয়ে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইও দারগার পো, বলতে বলতে সজোরে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিফল চেষ্টা।

রমণী দারেগা ততক্ষণে হাতের বেটন দিয়ে পিঠের ওপর আবার এক ঘা বসিয়ে দেন।

যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে গেন্দু। কিন্তু দমে না। সমানেই যুঝে যায়, বাপের বেটা হচ ত কয়ড়া খুইলা দিয়া লড়—কত ক্ষ্যামতা দেখি। মেনির মা, ছুড়ালডা আমারে আইনা দে। বান্দা হাত লইয়াই অ্যা লগে লড়ুম—খাড়াইয়া রইলি ক্যান—

চুপ কর তুমি। পাগলের কথা আপনে ধইরেন না দারগাবাবু। পোলাপানগুলার দিকে চাইয়া হারে আপন ছাইড়া ভান। দোহাই আপনার, কান্নায় ভেঙে পড়ে রহিমা।

গেন্দু ক্ষেপে যায়। রমণী দারোগাকে ছেড়ে রহিমাকে ধরে, ভাল চাচ ত কসাইডার পা ছাড়, নইলে তরেই খুন করুম হারামজাদী, বলতে বলতে দুজন সিপাইকে ঠেলে ফেলে তেড়ে আসে।

রমণী দারোগাও তেমনি তেড়ে এসে ওর কাঁধের ওপরে আবার আর এক ঘা বসিয়ে দেন।

গেন্দু এবার আর টাল সামলাতে পারে না। মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

রহিমা সে দৃশ্যে ডুকরে ওঠে, মেনির বাবারে মাইরা ফেলাইল গ আমি কি উপায় করুম?

চুপ—চুপ কর মাগী, নইলে তোকেও চালান দিয়ে দেবো।

মেহেরবাণী কইরা তাই জান দারগাবাবু। পোলাপান লইয়া কি করুম আমি? হায়, হায়! মেনির বাবা, ওঠ—কথা কও—অ মেনির বাবা!—দারোগার পা ছেড়ে গেন্থুকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে রহিমা।

গেন্থু আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায়। তাকিয়ে কাতরাতে থাকে, আমারে তুই ছাড়াইবার পারবি না মেনির মা—পোলাপানগুলারে দেখিচ। ভাইবা ছাখ, চেষ্টায় ত কসুর করলি না—পারলি কিছু করবার? নসীব সব নসীব, খোদা আমার জান কোরবাণী চায়—কাইন্দা কি করবি?

গেন্থুর সান্ত্বনায় সহসা চিন্তার মোড় ঘোরে রহিমার। সোজা হয়ে উঠে বসে। তারপর রমণী দারোগাকে লক্ষ্য করেই নালিশ জানায়, খোদা তুমি ইয়ার বিচার কইর। যত দোষ গরীবের। মেনির বাবারে মন্দ করল কেরা? কই তাগত কিছু করবার দেখি না? গরীবের কেউ নাই তাই ধইরা টানাটানি। আমার মতন হগলে ব্যান অইলা পুইড়া মরে।···

কার—কার কথা বলছো তুমি? বলো কে মন্দ করেছে তোমার স্বামীকে? সহসা রমণী দারোগার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। সোৎসাহে প্রশ্ন করেন রহিমাকে।

কিন্তু রহিমা জবাব দেবার আগে গেন্থু বাধা দেয় মেনির মা, বেইমানী করিচ না—ধম্মে সইব না।

ধম্ম—ধম্ম আমার নাই। আমি সব কথা ভাইঙা কমু। আপনে শোনেন দারগাবাবু।

মেনির মা, আবার ফেটে পড়ে গেন্থু।

না না, তোমার কোন ভয় নেই। যা জানো সত্যি বলো। সত্যি বললে তোমার স্বামী খালাস পাবে, রমণী দারোগা ব্যাকুল ভাবে এগিয়ে যান। সস্নেহেই অভয় দেন।

রহিমা তাই বলবে। নিশ্চয় বলবে। কেন বলবে না? কি পেয়েছে ও জীবনে? বিচার যদি হয় তাহলে একলা মেনির বাবার হবে কেন?···রহিমা মুখ খুলতেই যায়।

গেন্থু আবার গর্জে ওঠে, বেইমানী করবি ত গলা টিপা মাইরা ফেলামু তরে।

তাই ফেল, তবু আমি সব কথা কমু আইজ।

হাত বদ্ধ—গেন্থু নিরুপায়। নিরুপায় হয়েই শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে, তর পোলার মাথা খাচ যদি কিছু কচ।

রহিমা এ অস্ত্রে ঘায়েল হয়। পাগলিনীর মতোই মুখ থুবড়ে দাপাতে থাকে।

রমণী দারোগা আর শত অনুরোধ করেও জবাব পান না। ভয় প্রলোভন সবই নিষ্ফল হয়। এমন সময় হানিফ এসে কাছ ঘেষে দাঁড়ায়। সকলের চেঁচামেচীতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে ওর। মার হয়ে হানিফই জবাব দেয়, আমি জানি হুজুর কেরা বাজানরে দিয়া ইকাম করাইচে।

কে—কে করিয়েছে বলো?—রমণী দারোগা আবার উৎসাহ বোধ করেন। পারেন তো হানিফ কে বুকের মধ্যে লুফে নেন।

হানিফ নির্বিকার ভাবে উত্তর করে, রাখাল গোঁসাই।

না না, ঐ চামচিকা কিছু জানে না হুজুর। ও অর মার লেইগা মিথ্যা কথা কইবার লৈচে। আমি—আমি একা খুন করেছি নবীন চদরিয়ে। কেউ আমারে কিছু কয় নাই। আমি একা—

হাসতে হাসতে রমণী দারোগা বাধা দেন, একা কি দোকা আদালতেই দেখা যাবে। রাম সিং, জলদি নিয়ে চলো। আর আমার কিছু জানবার নেই।

কিন্তু গেন্থু তবু থামে না। যেতে যেতে উচ্ছ্বাস জানায়, আপনে বিশ্বাস করেন হুজুর, গোসাঁই ইয়ার সঙ্গে নাই। হ্যার এখন তক জমি লেইখা দেয় নাই বইলা ঐ কুত্তার বাচ্চা হ্যার নামে মিথ্যা কথা কইবার লৈচে।···

মিথ্যা কথা আমি কই নাই হুজুর। বাজান নিজেই কাইল রাইএে সব কথা আম্মারে থুইলা কইচে। আমার ঘুম আসে নাই—আমি নিজের কানে সব শুনচি।···

গেন্থু নিরুপায় হয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, মর মর শালা বেইমানরা। মাইয়েরে কথা দিয়া কথা রাখলি না—আল্লার কাচে, ঠকবি—মর।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)।

## মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

### ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

| | | |
|---|---|---|
| বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে | — | ২৪৲ |
| ষাণ্মাসিক " | — | ১২৲ |
| প্রতি সংখ্যা " | — | ২৲ |

### ভারতবর্ষে

| | | |
|---|---|---|
| (ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক | — | ১৫৲ |
| " ষাণ্মাসিক সডাক | — | ৭৷৫০ |

### ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১·২৫

| | | |
|---|---|---|
| বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে | — | ১·৭৫ |

### পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

| | | |
|---|---|---|
| বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ | — | ২১৲ |
| ষাণ্মাসিক " " " | — | ১০·৫০ |
| বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " | — | ১·৭৫ |

# উদ্ভিদ বিজ্ঞানী উইলিয়াম কেরী

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

যখন আমাদের সমাজ গতিহীনতার পঙ্কিল আবর্তে, শিক্ষাহীনতার গভীর অন্ধকারে যখন আমাদের সমগ্র দেশ নিমগ্ন, তখন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে দেশকে নবজাগরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য শিক্ষা ও সংস্কারের আলোকবর্তিকা হাতে যে সমস্ত মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিদেশী ধর্ম প্রচারক মহাত্মা উইলিয়াম কেরী ছিলেন অন্যতম প্রধান। বহু ভাষাবিদ সুপণ্ডিত অধ্যাপক, বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রবর্তক, দরদী সমাজ সংস্কারক প্রভৃতি বহুবিধ অতুলনীয় গুণাবলীর অধিকারী মহাত্মা কেরী বাঙ্গালীর অন্তরে যে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে আছেন তা থাকবে চির অটুট। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভার প্রভায় তাঁর একটি মহৎ গুণের পরিচয় আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে। এই মহৎ গুণটি হোল তাঁর গভীর বিজ্ঞান প্রীতি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিশেষ করে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। এ সম্বন্ধে Lawson to Jno. Dyer ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বলেছেন, "No person can be more passionately fond of natural history than Dr. Carey."

ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র পল্লী পলার্সবেরীতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের বিস্ময়কর রহস্যের প্রতি বাল্যকাল হইতে তিনি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। বিচিত্র বৃক্ষলতাদি পূর্ণ উদ্যান রচনা বা কীট পতঙ্গের কৌতূহলোদ্দীপক জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ তাঁকে প্রভূত আনন্দ দিত। তাঁর সম্বন্ধে W. H. Carey লিখেছেন, "The room which was wholly appropriate to his use, was full of insects stuck in every corner that he might observe their progress. His natural fondness for a garden was cherished by his uncle who was then settled in the same village and often had his nephew with him."

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে কিছুদিন থাকার পর, স্থায়ীভাবে শ্রীরামপুরে বসবাস আরম্ভ করেন এবং এইখানেই তাঁর কর্মবহুল জীবনের সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর অতিবাহিত করেন। ভারতে আসার পর হতেই উদ্ভিদ বিজ্ঞান গবেষণার প্রচুর সুযোগ সদ্ব্যবহার করেন। শ্রীরামপুরে তিনি একটি মনোরম উদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় শিবপুরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিদ উদ্যানের চেয়ে ইহা কম প্রসিদ্ধ ছিল না। ভারতে ও ভারতের বাহিরে তাঁর অগণিত বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর বহু বৃক্ষলতাদি আনাতেন এবং বিনিময়ে তাঁদেরও দিতেন এখানকার গাছপাছড়া ও বীজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রস বলেছেন, "Many plants to be found in Bengal to day came of seeds first bird borne or wind sown from Carey's garden." তাঁর বাগানে পাওয়া যেত বহু দুষ্প্রাপ্য গাছপালা। উদ্যান রচনায় তিনি লিনিয়ান পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। এই উদ্যান বহুবিধ বীজ ভারত সরকারকে যোগান দিত, আর তাঁর বন্ধু বান্ধবকে দিত সুন্দর সুন্দর কলমের চারা। উদ্যানের বৃক্ষগুলি এমনভাবে সাজানো ছিল যে একটি মনোরম ছায়াচ্ছন্ন বীথি রচিত হয়েছিল, তার নাম ছিল Carey's walk. ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে বহু পরিদর্শক আসতেন এই উদ্যানে। ব্র্যাণ্ডিস, ক্লেগহর্ণ প্রভৃতি বিখ্যাত বনরক্ষকগণ আসতেন এখানে গাছপালার বৃদ্ধির পরিমাপ দেখবার জন্য। কেরীর অন্তরের অনেকখানি স্থান জুড়েছিল এই উদ্যানটি। এইখানেই ছিল তাঁর বক্তৃতামঞ্চ, প্রার্থনা বেদী এবং এইখানেই তিনি দিনের কার্য্য সুরু ও শেষ করতেন। তাঁর পুত্র জোনাথন লিখে গেছেন, "In objects of nature my father was exceedingly curious. The Science of Botany was his constant delight and study and his fondness for his garden remained to the last. The garden formed the best and rarest botanical collection of plants in the East"..

ভারতে ও ভারতের বাহিরে তাঁর বহু উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বন্ধু ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্টতম ছিলেন শিবপুর উদ্ভিদ উদ্যানের অধ্যক্ষ ডাঃ রক্সবার্গ। তাঁরা একত্রে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বহু চর্চা করেছিলেন, দুষ্প্রাপ্য বীজ ও চারার বিনিময়ও তাঁদের মধ্যে প্রচুর হয়েছিল। শ্রদ্ধা ও প্রীতির চিহ্নস্বরূপ ডাঃ রক্সবার্গ একটি অজ্ঞাত শালবৃক্ষের নাম দিয়েছিলেন Careya Sanlea. কিন্তু বিনয়ী মহাত্মা কেরী খুব অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন এর জন্য। তাঁরই অনুরোধে বোধ হয় পরে বৃক্ষটির নাম পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানের Shorea Robustaরই বোধ হয় পূর্বে নাম ছিল Careya Sanlea ইহা সত্বেও তাঁর প্রিয় বন্ধু ডাঃ রক্সবার্গ তাঁর স্মৃতিকে ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল রাখবার জন্য এক জাতীয় গুল্মের নামকরণ করেছিলেন Careya, এই জাতীয় গুল্ম কেবল ভারতবর্ষেই পাওয়া যায় এবং এর পাতা ঔষধ প্রস্তুতে কাজে লাগে। Careya জাতীয় গুল্মের তিনটি শ্রেণীর একটি, Careya Harbacea কেরী নিজেই হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে আবিষ্কার করেন। এর অপর দুই শ্রেণী Careya Arborea ও Careya Sphoerica ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ডেলেসার্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Musse Botaniqueএ এবং ফরাসী বিজ্ঞানী জন গ্রাহাম তাঁর দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতাদির গ্রন্থালেখ্যতে শ্রদ্ধার সংগে ডাঃ কেরীর নাম উল্লেখ করেছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য স্থানে উদ্ভিদ ও কৃষি বিজ্ঞানের উপর তিনি অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন এবং ঐগুলির দ্বারা বহু ব্যক্তিকে কৃষিবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করেন। এ দেশের কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে তার আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রথম ফল দেখতে পাওয়া যায় এশিয়াটিক রিসার্চে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর রচনা, "State of Agriculture in the

District of Dinajpur" এর মধ্য দিয়ে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কেরী রক্সবার্গের 'Hortas Bengaleusis'এর সম্পাদনা করেন। তিনি রক্সবার্গের মূল্যবান গ্রন্থ Flora Indica ও চার খণ্ডে প্রকাশিত করেন। ভারতে Agriculture and Horticulture Societyর প্রতিষ্ঠা ডাঃ কেরীর একটি অতুলনীয় কীর্তি। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সোসাইটি স্থাপিত হয়। ভারত সরকারকে বন সংরক্ষণের উপদেশ তিনিই প্রথম দেন।

কিন্তু তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি হোল ভারতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের মহৎ প্রচেষ্টা। তাঁরই আন্তরিক প্ররোচনা, উৎসাহ এবং সাহায্যে শ্রীরামপুরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তাঁরই সহযোগিতায় মার্শম্যান, পিয়ার্স, ইয়েট্‌স্, ম্যাক, ফেলিক্সকেরী প্রমুখ সহযোগিবৃন্দ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, জ্যোতিষ ও ভূগোল প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের উদ্দেশে বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। এই সকল পুস্তকের বঙ্গানুবাদে ও পরিভাষা সংকলনে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মার্শম্যানের সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের সাময়িক পত্রিকা "দিগ্‌দর্শন" তাঁরই উদ্যোগে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়।

তাঁর এই অতুলনীয় বিজ্ঞান সাধনা সর্ব্বত্রই যথোচিত স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল, এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাহা ছাড়া ইংলণ্ডের লিনিয়ান সোসাইটি, জিওলজিক্যাল সোসাইটি এবং হর্টিকালচারাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন এই মহাপুরুষের জীবনাবসানে ভারতবর্ষ সত্যই একজন দরদী বন্ধু ও বিজ্ঞানসেবীকে হারিয়েছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুতে নিম্নলিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলিটি প্রকাশিত হয়েছিল, "Asiatic Society cannot note upon their proceedings the death of the Rev. William Carey, D. D. so long an active member and ornament of this Institution, distinguished alike for his attainments in the oriental languages, for his eminent services in opening the store of Indian literature to the knowledge of Europe and for his extensive acquaintance with the sciences, the natural history and botany of this country, and his useful contributions in every branch towards the promotion of the objects of the Society, without placing on record this expression of their high sense of his value and merits as a scholar and a man of science; their esteem for the sterling and surpassing religion and moral excellencies of his character, and their sincere grief for his irrepairable loss."

# মেঘ ও রৌদ্র

## সবিতা দেবী

মেঘ আর রৌদ্রের
আলোছায়া খেলা।
ধরণীর 'পরে তার কি
বিচিত্র মেলা ॥
এক চোখে হাসি তার
এক চোখে জল।
দুই মিলে মুখখানি
করে টলমল্ ॥
কভু বা মেঘের জটা
ছাইল আকাশ।
শন্ শন্ রবে ছুটে
দুরন্ত বাতাস ॥
মেঘে মেঘে আলিঙ্গনে
করে বজ্রপাত।
ধরিত্রীর বুকে হয়
অভিসম্পাত ॥

কভু বা মেঘের দল
হইল বিদায়।
দেখা দিল তপনের
নব অভ্যুদয় ॥
সোনার রোদের আলো
করে ঝলমল্।
ধরণীতে জেগে উঠে
খুসীর হিল্লোল ॥
সাঁঝের আকাশে হাট
বসেছে চাঁদের।
চারিদিকে চিক্‌মিক্
গ্রহ-তারাদের ॥
কভু বা হাসিছে আকাশ
রোদের আভায়।
কভু বা বিষণ্ণ সে যে
মেঘের ছায়ায় ॥

এইরূপে হাসি-অশ্রু
যুগ-যুগান্ত ধরি।
মেঘ ও রৌদ্রের মত চলে
হাত ধরাধরি করি ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এত কালের মধ্যে চারুদি এই বাড়িতে কোনদিন ধীরাপদকে টেলিফোনে ডাকেন নি! গলা শুনেই বোঝা গেল তিনি বেশ ঘাবড়েছেন। সাড়া পেয়ে প্রথমেই অসহিষ্ণু বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাজ-কর্ম ছেড়ে চলে গেছলে নাকি কোথাও?

কাজ-কর্ম ছাড়ার খবর বা আবার ফেরার খবর কার মুখে শুনেছেন ধীরাপদ ফিরে আর সে-প্রশ্ন করল না। শুধু জানালো, কোথাও যায় নি, তবে দিনকতক অফিসে অনুপস্থিত ছিল বটে।

চারুদিও আর এ-প্রসঙ্গ তুললেন না। তার গলার স্বরে উৎকণ্ঠা ঝরল।—কি ব্যাপার বলো তো, তুমি অমিতকে কিছু বলেছ নাকি? তার কি হয়েছে?

কি হয়েছে?

কানে রিসিভার ঠেকিয়ে শান্ত মুখে শুনল কি হয়েছে। গতকাল একটু বেশি রাতে অমিতাভ চারুদির বাড়ি গিয়েছিল। তার সে-চেহারা দেখে চারুদি ভয়ই পেয়ে ছিলেন। একটা কথারও জবাব না দিয়ে সে অনেকক্ষণ পাগলের মত চেয়ে ছিল শুধু। তারপর বিড়বিড় করে জিজ্ঞাসা করেছে, পার্বতী কেমন আছে। চারুদি ভয় পেয়ে পার্বতীকে ডাকতে গিয়েছিলেন, অমিতাভ মাথা নেড়ে নিষেধ করেছে। তারপর হঠাৎ চারুদির কোলে মুখ গুঁজেছে। একটানা দু ঘণ্টা মুখ গুঁজে পড়েছিল, একটু নড়েচড়েনি পর্যন্ত। তারপর অত রাতে উঠে চলে গেছে, চারুদির ডাকাডাকিতে কান দেয়নি।

কি বলেছ তুমি ওকে? এই তো ক'দিন আগে তুমি অফিসে আসা ছেড়ে দিয়েছ বলে কত খুশিতে ছিল, তোমার সুখ্যাতি মুখে ধরে না—কি হল হঠাৎ? ওকে যে ডাক্তার দেখানো দরকার—

ধীরাপদ টেলিফোনে কিছু বলেনি, শুধু আশ্বাস দিয়েছে কোনো ভয় নেই। বলেছে, যা হয়েছে ভালই হয়েছে—খুব ভালো হয়েছে। দুই একদিনের মধ্যেই দেখা করচে কথা দিয়ে তাড়াতাড়ি টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছে। চারুদিকে মিথ্যে আশ্বাস দেয়নি, সে নিজেই বিশ্বাস করতে চাইছে ভালো হয়েছে—খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু ভালো হওয়ার তুষ্টিটুকু কেন যে উপলব্ধি করছে না সেটাই আশ্চর্য।

কারখানার কর্মচারীদের খুশির অভ্যর্থনায় ধীরাপদ রীতিমত বিব্রত বোধ করল। তারা শুধু খুশি নয়, উত্তেজিতও। গত ক'টা দিনের বিচ্ছেদের ব্যাপারটা দশগুণ পল্লবিত হয়ে তাদের উত্তেজনা পুষ্ট করেছে। এ নিয়ে প্রকাশ্যে জটলা হয়েছে, প্রকাশ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে। দল বেঁধে তারা ছোটসাহেবের কাছে প্রাপ্য দাবি করেছে, আর জেনারেল সুপারভাইজারের কি হয়েছে জানতে চেয়েছে। ব্যাপারটা প্রতিদিন ঘোরালো হয়ে উঠছিল। ছোটসাহেব সেই চিরাচরিত কড়া রাস্তাটাই নিয়েছে, যা দিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেছে। অন্যায় আচরণের জন্য অনেককে লিখিত ওয়ার্নিং দিয়েছে, তানিস সর্দার আর তার তিন-চারজন পাণ্ডাকে 'শো-কজ' নোটিশ দিয়েছে—শৃঙ্খলাভঙ্গ আর অন্যায় বিক্ষোভ সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত তারা, কেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ দর্শাতে হবে।

ঘণ্টাখানেকের আগে ধীরাপদ নিচে থেকে দোতলায় উঠতে পারেনি। সব শুনে বিরক্ত হয়েছে, বিড়ম্বিত বোধ করেছে। ওপরে নিজের ঘরেও সুস্থির হয়ে বসতে পারে নি। প্রায় চুপিসাড়ে একের পর এক ভদ্রলোকেরাও এসে তার খবর করেছে, অনুপস্থিতির দরুণ আনন্দ জ্ঞাপন করেছে। এমন একটা সরগরম ব্যাপার হয়ে উঠবে জানলে ধীরাপদ যাবার আগে ভাবত।

উঠে পাশের ঘরে এলো।

লাবণ্য আর সিতাংশু দুজনেই ঘরে ছিল। দুজনেই মুখ তুলল। কিন্তু সে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিতাংশু গম্ভীর ব্যস্ততায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কোনদিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ধীরাপদ ঘরে দাঁড়িয়ে দেখল তাকে। সিতাংশুর মুখখানা কঠিন বটে কিন্তু শুকনোও। ধীরাপদর হঠাৎ কেন জানি মনে হল, সেটা এখানকার এই ঝামেলার দরুণ নয়। এখানকার ব্যাপারে ছোটসাহেব অনেকটাই বে-পরোয়া আজকাল। এমন কি তার সঙ্গে একটা রূঢ় বোঝাপড়ায় এগিয়ে এলেও হয়ত খুব বিস্মিত হত না। তার বদলে এই আচরণ অপ্রত্যাশিত।

মনে হল তাকেও হয়ত কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে কারো কাছে। তাকেও লাগামের মুখে রেখে একজন কৈফিয়ৎ তলব করতে পারে। তার ঘরের একজন। আসল ঝামেলার উৎসটা হয়ত সেইখানেই।

দিব্বি সহজ ভাবে লাবণ্যর সামনের চেয়ারটা টেনে বসল। সোজাসুজি দৃষ্টি-বিনিময়। বলল, কাল বড়সাহেবের চিঠি পেলাম। আপনারা ঠিক মত আমার সহযোগিতা পাচ্ছেন না জেনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, বেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে লিখেছেন।

একটু অবাক হয়েই লাবণ্য বলে বসল, এখানকার ব্যাপার তো তাঁকে কিছু জানানো হয়নি।

এখানকার কোন্ ব্যাপার?

লাবণ্য থমকালো। তারপর অনেকটা নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে জিজ্ঞাসা করল, আপনার এভাবে চলে যাবার মত কোনো কারণ ঘটেছিল? বড়সাহেব ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলত না?

চলত যে সে-দিন সেটা আপনারা বুঝতে দেননি। তবে আমি তাঁর ফেরার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

আর ইতিমধ্যে একটু আধটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হোক সে-রকম ইচ্ছেও ছিল বোধ হয়?

ধীরাপদ সোজা জবাব দিল, এটুকু আপনাদের হাতযশ। আপনি আমার খোঁজে সুলতান কুঠিতে গেছলেন শুনলাম, সোনাবউদি জানালেন এখানে আসার জন্যেও বিশেষ করে বলে এসেছেন। সেই জন্যেই এলাম·· কিন্তু আমি এসে আপনাদের অসুবিধে ছাড়া সুবিধে তো কিছু দেখি না।

লাবণ্য চেয়ে আছে, মুখের রুক্ষ ছায়া স্পষ্টতর। চোখে চোখ রেখে কথা কইতে এখন আর একটুও সঙ্কোচ নেই ধীরাপদর। কিন্তু সঙ্কোচ না থাকলেও অন্য বিড়ম্বনা আছে। উষ্ণ, রমণীয় বিড়ম্বনা। তাই ওঠা দরকার এবার।

*—এদিকে যে-সব ওয়ার্নিং আর নোটিশ-টোটিস দিয়েছেন সেগুলো তুলে নিন, তারপর দেখা যাক।*

*ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে লাবণ্য বলে উঠল, নোটিশ আমি দিই নি—*

*ধীরাপদ উঠে দাঁড়িয়েছে। লঘু কৌতুকে দুই একমুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, তাহলে যিনি দিয়েছেন তাঁকেই তুলে নিতে বলুন। আমাকে দেখেই তো তিনি উঠে গেলেন, বাক্যালাপেও আপত্তি মনে হল—আমার হয়ে আপনিই তাঁকে এই অনুরোধটা করুন।* কর্মচারীরা কর্মচারীই বটে, কিন্তু সব সময়ে ছড়ি উঁচিয়ে সেটা মনে রাখতে বললে তাদের ভালো লাগার কথা নয়।

বচনের ফলাফল দেখার জন্যে আর অপেক্ষা না করে নিজের ঘরে চলে এলো। কটা দিনের দুর্বহ নিষ্ক্রিয়তা থেকে নিজেকে টেনে তোলার জন্যেই একাগ্র ভাবে কাজের মধ্যে ডুব দিল। কিন্তু মনে মনে একজনের প্রতীক্ষা করছে সে। অমিতাভ ঘোষের। ইতিমধ্যে দিন দুই সে অফিসে এসেছে টের পেয়েছে। অ্যাকাউনটেণ্ট বলেছেন। নইলে জানতেও পারত না। ধীরাপদর সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। কেন দেখা হওয়া দরকার জানে না। দেখা হলে কি বলবে তাও না। ভিতরে সারাক্ষণ একটা অস্বস্তি, দেখা না হওয়া পর্যন্ত সেটা যাবে না।

অমিতাভ বেশি রাতে বাড়ি ফিরলেও ধীরাপদ টের পায়। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তখন সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না। চারুদির টেলিফোনের কথা ভেবে উতলা বোধ করে। তবু না। সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত দরজা বন্ধ থাকে, তখন ইচ্ছে করলে দরজা ঠেলে ঢুকতে পারে। তাও পারে না। অনুকূল অবকাশ মনে হয় না সেটা।

কিন্তু অবকাশ আর হলই না। আচমকা ঝড় এলো একটা। এত বড় ব্যবসায়ের অস্তিত্ব বিড়ম্বিত হবার মত ঝড়। সে-ঝড়ের ইন্ধন এলো বাইরে থেকে, যার জন্যে একটি প্রাণীও প্রস্তুত ছিল না। এমন কি অমিতাভ ঘোষও না।

খবরের কাগজে সেদিন একটা ছোট খবর চোখে পড়ল ধীরাপদর না পড়তেও পারত। সাধারণের লক্ষ্য করার মত খবর কিছু নয়। এই ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে সেও লক্ষ্য করত না। জাপান থেকে নতুন ওষুধ বেরিয়েছে একটা—ছোটখাট আবিষ্কারই বলা যেতে পারে। চিলেটেড আয়রন ইনট্রাম্যাসকুলার ইন্‌জেকশান—নানা জাতীয় রক্তাল্পতার ব্যাধিতে এই আবিষ্কার বিশেষ ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা।

ধীরাপদ চমকে উঠেছিল। অমিতাভ ঘোষ আজ ক'বছর ধরে কি নিয়ে গবেষণা-মগ্ন? কি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল সে? কি জন্যে গবেষণাবিভাগ খোলার এত তাগিদ ছিল তার? এই রকমই তো কি একটা শুনেছিল। এই ব্যাপারই তো! তাড়াতাড়ি অফিসে এসে তিন দিন আগের সাপ্তাহিক মেডিক্যাল জার্ণাল খুলেছে। তারপরেই চক্ষু স্থির তার। ওই কাগজের কাছে খবরটা ছোট নয়। তারা ওই আবিষ্কার সম্বন্ধে ফলাও করে লিখেছে। ওই ব্যাপারই যে, ধীরাপদর আর একটুও সন্দেহ নেই।

হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ভয়ে আড়ষ্ট সে। মনে পড়ল গত তিন দিন ধরে বেশি রাতেও তার বাড়ি ফেরার সাড়া-শব্দ পায়নি। এখন মনে হচ্ছে সে বাড়ি ফেরেইনি মোটে। আরো দু'দিন বুক বুজে অপেক্ষা করল, মাঝ রাত পর্যন্ত কান খাড়া করে কাটালো। যত রাতেই ফিরুক সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

ফেরেনি।

ধীরাপদ চারুদিকে টেলিফোন করল। তিনি উতলা না হন এইভাবেই কথা বইল। তার না যেতে পারার ব্যাপারে অনেকগুলো কৈফিয়ৎ খাড়া করল প্রথম, এমন কি নিজের সুস্থ শরীরকে অসুস্থ বানালো। চারুদি গম্ভীর, চুপচাপ শুনলেন শুধু, একবারও অনুযোগ করলেন না বা আসার তাগিদ দিলেন না। শেষে ধীরাপদ অমিতাভর কথা জিজ্ঞাসা করল—ক'দিন বাড়িতে দেখা নেই, তার কি খবর?

চারুদি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, জানেন না। ইতিমধ্যে সেখানেও সে যায়নি।

আরো কয়েকটা দিন গেল। ধীরাপদ ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠেছে। শেষে আর থাকতে না পেরে সিতাংশুর অনুপস্থিতিতে জার্ণাল খুলে জাপানের নয়া ওষুধের ব্যাপারটা লাবণ্যকে দেখালো সে। ডাক্তার হিসেবে তারই আগে দেখার কথা, কিন্তু দেখেনি।

দেখা মাত্র মুখ শুকালো তারও। বিগত ক'টা দিনের ব্যক্তিগত সমাচারও শুনল। লাবণ্য নির্বাক, পাংশু।

তারপর ঝড়।

সেই ঝড়ের ধাক্কায় ছোটসাহেব সিতাংশু মিত্রর স্থির গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে গেছে। ক্ষিপ্ত দিশেহারা হয়ে উঠেছে সে। মুহুর্মুহু ডাক পড়ছে ধীরাপদর, কখনো বা নিজেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। দিশেহারা ধীরাপদ, আর লাবণ্য সরকারও।

পর পর দুটো শমন এসেছে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নামে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে সিতাংশু সেই শমন গ্রহণ করেছে। একটা হাইকোর্ট থেকে, অন্যটি ফৌজদারী আদালত থেকে। আরজির নকল-সহ শমন। অভিযোগের দীর্ঘ জোরালো
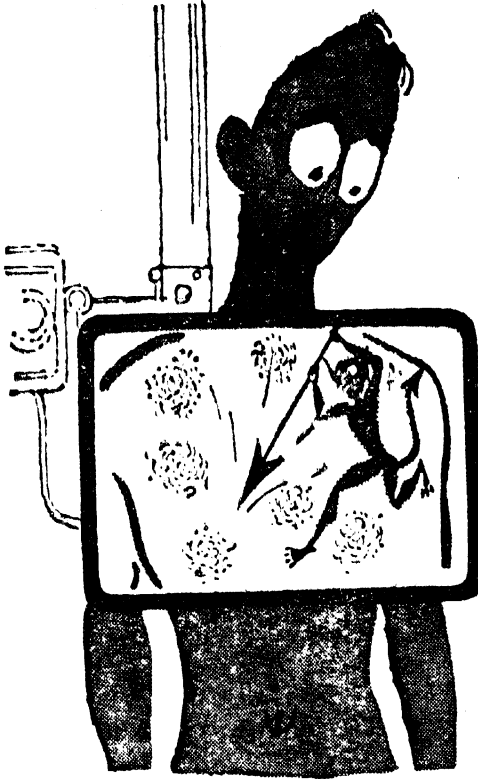
তালিকা। তহবিল তছরূপ, তহবিল অপচয়, প্রবঞ্চনা, জাল কর্মচারী নিয়োগ, ব্যক্তিগত প্রচারের খাতে অপব্যয়, লাবণ্য সরকারের ফ্রী কোয়ার্টারের খাতে অর্থব্যয় এবং সেখানকার বেঙএ বিনামূল্যে কোম্পানীর ওষুধ-চালান, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইচ্ছাকৃত ও স্বার্থপ্রণোদিত পরিচালনার গলদ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাইকোর্টে অমিতাভ ঘোষ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের অপসারণ দাবি করেছে, এবং যতদিন তা না হয় ততদিনের জন্য অচিরে রিসিভার নিয়োগের আবেদন জানিয়েছে। আর ফৌজদারী আদালতে ফৌজদারী মামলা রুজু করেছে।

এ দিন না যেতে ইনকাম ট্যাক্সের লোকসহ এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ হানা দিয়েছে আর রাজ্যের খাতাপত্রে টান পড়েছে। কিছু পাক না পাক এদিক থেকেও সঙ্কট হাঁ করে আছে।

আর, পরদিন সকালেই লাবণ্যর দাদা বিভূতি সরকারের সপ্তাহের খবরে জোর খবর, গরম খবর, বিষম খবর!

বিজ্ঞাপন বাদ দিলে কাগজের সবটাই প্রায় এই খবর। সপ্তাহের খবর কোম্পানীর গোড়া ধরে টান দিয়েছে। কার টাকায় ব্যবসায়ের পত্তন হয়েছিল প্রথম আর সেই লোকেরই কি অবস্থা এখন, কেসের বিস্তৃত সমাচার, কতভাবে টাকা অপচয় হয়, প্রতিশ্রুতিসত্ত্বেও কর্মচারীদের বঞ্চিত ভাগ্য, বড়সাহেবের উচ্চাকাঙ্খা ও তাঁর বর্তমান সফরের উদ্দেশ্য, ট্যাক্স ফাঁকি, অস্তিত্বশূন্য কর্মচারীর ফিরিস্তি, ইত্যাদির পরে নতুন লটএর সঙ্গে মিয়াদ-ফুরানো পুরনো ওষুধ বিক্রির রহস্য। ছোট-বড় হরফে শুধু সংবাদ পরিবেশন করেনি, রঙ্গ ব্যঙ্গ করে টিকা-টিপ্পনী সহ ঝাঁঝালো সম্পাদকীয় মন্তব্যও লেখা হয়েছে এই নিয়ে।

ঝড়ের ঝাপটায় সমস্ত কারখানায় মৃত্যুর স্তব্ধতা। বড়সাহেবের কাছে জরুরী তার পাঠানো হয়েছে, সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি যেন রওনা হন। সিতাংশু বার কতক ট্রাঙ্ককলেও ধরতে চেষ্টা করেছে তাঁকে, কিন্তু তিনি একজায়গায় বসে নেই বলেই ধরা যায়নি। টেলিগ্রামও চট করে পাবেন কিনা সন্দেহ।

এদিকে লাবণ্য স্তব্ধ সব থেকে বেশি। ধীরাপদ তার কারণও অনুমান করতে পারে। বিভূতি সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের যোগটা ভুলবে কেমন করে? ধীরাপদ সেই দিনই বিভূতি সরকারের বাড়ি অর্থাৎ তাঁর সাপ্তাহিক খবরের অফিসে এসেছিল। দুই একজন কম্পোজিটারের সঙ্গে শুধু দেখা হয়েছে, তাঁর ঘর বন্ধ। খবর পেয়েছে দিন কয়েকের জন্য বাইরে গেছেন তিনি। ধীরাপদ ফিরে এসেছে।… যেতেও পারে বাইরে, অনেক টাকা পকেটে এলে তবে এর মধ্যে নাক গলানো সম্ভব। এই কাগজ সম্বন্ধে বা কাগজের খবর সম্বন্ধে লাবণ্য একেবারে নির্বাক। কিন্তু ধীরাপদর ধারণা সে-ও দাদার খোঁজে এসেছিল আর এই একই অনুপস্থিতির সংবাদ নিয়ে ফিরে গেছে।

কিন্তু ধীরাপদ আর একটা ভয়ে বিভ্রান্ত। শুধু টাকার লোভে বিভূতি সরকারের এতটা দুঃসাহসিক ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়া সম্ভব কিনা বুঝছে না। হাতেনাতে প্রমাণ না দেখে তিনি কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু অমিতাভ ঘোষ কতটা প্রমাণ হাত-ছাড়া করেছে? কি হাত-ছাড়া করেছে?

রাত একটা-দেড়টার কম নয় তখন। বহুবার এ-পাশ ও-পাশ করার পর সবে একটু তন্দ্রার ঘোর এসেছে। পার্টিশনের ও-ধারে মানুকের নাকের খেলা তেমন করে আর কানের পর্দায় ঘা দিচ্ছে না। হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠে ধীরাপদ এ-পাশ ফিরল, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

ধীরুবাবু! ধীরুবাবু—

আবছা অন্ধকারে ধীরাপদ দু চোখ টান করে তাকালো। সামনে অমিতাভ ঘোষ। অস্ফুট স্বরে হেসে উঠল সে, চাপা গলায় বলল, এরই মধ্যে ঘুমুলেন নাকি!

হাত বাড়িয়ে ধীরাপদ টেবিল-ল্যাম্পের সুইচ টিপতে যাচ্ছিল, বাধা দিল।—থাক্ আলো জ্বালতে হবে না, আপনাকে ডাকতে এলাম, আমার ঘরে আসুন।

ধীরাপদ তক্ষুনি বিছানা থেকে নেমে এলো। আশ্চর্য, কখন ফিরেছে! সারাক্ষণ তো জেগেই ছিল, কিন্তু টের পায়নি। অথচ ফিরলে সাধারণত টের পায়। অবশ্য আজ আসবে একবারও ভাবেনি। এই বাড়িতেই আর তার দেখা মিলবে কিনা সেই-রকম সন্দেহও হয়েছিল।

—বসুন। নিজে অগোছালো শয্যায় বসল। হাসছে। উদ্‌ভ্রান্ত, স্নায়ু-সর্বস্ব হাসি। হাসির সঙ্গে চাপা উত্তেজনা।—মজাটা কেমন দেখছেন বলুন?

ভালো।

ভালো, না? প্রতিভা ছিল কিনা টের পাচ্ছে এখন, কেমন? এখন ওরা কি করবে? বিদেশের বার-করা ওষুধ বেচে কমিশন লাভ করবে, এই তো? করাচ্ছি লাভ, সব তছনচ করে না দিতে পারি তো…। হেসে উঠল, হাঁ করে দেখছেন কী?

ধীরাপদ সত্যিই দেখছে আর বিপন্ন বোধ করছে। চারুদি অত্যুক্তি করেননি, সত্যিই চিকিৎসা দরকার। এই মুখ এই নাক-চোখ দিয়ে আলগা রক্ত ছোটাও বিচিত্র নয় বুঝি। কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন একে প্রকৃতিস্থ করতে হলে সহজ কথায় হবে না, নাটকীয় কিছুই বলা দরকার। কি বলবে?

বলল, প্রতিভার শেষ ফল দেখছি।

অপলকে চোখ দুটো মুখের ওপর থমকালো, কি রকম?

এ-যুগের সব প্রতিভারই শেষ ফল তো ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, বিনাশ—

ডোন্ট টক্ রট! চেঁচিয়েই উঠল প্রায়, আমি আপনার বক্তৃতা শুনতে চাই না! বিশ্বাসের গোড়াতেই ঘা পড়েছে যেন, সমস্ত মুখে সংশয় উপচে উঠল।—আমি যা করেছি আপনার তাহলে সেটা পছন্দ নয়?

এই রাস্তায় হবে না বুঝে ধীরাপদ সুর বদলে ফেলল।—আমার পছন্দ অপছন্দর কথা হচ্ছে না, আপনি কথা দিয়েছিলেন কিছু করার আগে আমাকে জানাবেন, এখন দেখছি আপনি আমাকেও বিশ্বাস করেন না।

জ্বালা গেল, যাতনাও কমল। ওই মুখেই আবার হাসির আভাস জাগতে সময় লাগল না। আগের উত্তেজনার মধ্যেই ফিরে আসছে আবার। বলল, আপনি আচ্ছা ছেলেমানুষ…বিদেশ থেকে ওই ওষুধের খবর পড়ে আমার মাথার ঠিক ছিল ভেবেছেন? তাছাড়া কত কাণ্ড করতে হল এর মধ্যে যদি জানতেন, অ্যাটর্নি বলেছে, আপনি যে-দুটো পয়েন্ট মনে করিয়ে দিয়েছেন বড় মোক্ষম পয়েন্ট সে দুটো।

আগের মতই হেসে উঠল। ধীরাপদ বাইরে শান্ত, কিন্তু মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ করে চলেছে। জিজ্ঞাসা করল, বিভূতি সরকারের কাগজে তো ঢালা খবর বেরিয়েছে দেখলাম, আপনার সেই সব কাগজ-পত্র প্রায় অ্যালবামটাও এখন তাঁর হাতেই বোধ হয়?

অমিতাভ প্রায় অবাক, নির্বোধের কথা শুনছে যেন। আমার আনন্দও হচ্ছে।—এই বুদ্ধি আপনার···এই জন্তেই বুঝি ঘাবড়েছেন? মশাই টাকায় সব হয় আজকাল, বুঝলেন? সব হয়—তাকে শুধু কাগজপত্রগুলো দেখিয়েছি সব, আর কড়কড়ে তিন হাজার টাকার নোট নাকের ডগায় দুলিয়েছি, তাতেই কাজ হয়েছে। চালিয়ে গেলে পরে আরো দু হাজার দেব বলেছি। তিনি সব নোট করে নিয়েছেন, ছবির কপি চেয়েছিলেন তাও দিইনি—অবিশ্বাস করবে কেন, তার পিছনে তো দাঁড়াবই জানে—হাইকোর্ট আর ক্রিমিন্তাল কোর্টের নকল দেখেছে না?

ধীরাপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চেষ্টা করে আবারও অন্তরঙ্গ দৃঢ়তায় ছেলেমানুষি উপদেশ দিল, কোনো ডকুমেন্ট হাত-ছাড়া করবেন না, অ্যাটর্নির কাছেও নয়।

অমিতাভ হাসছে। উত্তেজনায় ভরপুর অন্তরতুষ্টির হাসি। বলল, মশাই অ্যাটর্নিও মানুষ, নাকের ডগায় টাকা দোলালে তারও মাথা বিগড়তে পারে সেই জ্ঞান আমার আছে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

নিশ্চিন্ত থাকা সহজ নয় যেন, একটু ইতস্তত করে ধীরাপদ বলল, কিন্তু যে ব্যাপারে নামছেন সেটা তো দু'পাঁচ হাজারের ব্যাপার নয়, টাকা তো অনেক ছড়াতে হবে।

কত? এক লক্ষ? দেড় লক্ষ? আমার টাকা নেই ভাবেন নাকি? আমি শেষ দেখব, বুঝলেন?

ধীরাপদ বুঝেছে। এই মুহূর্তে অন্তত বেসুরো একটা কথা বলাও ঠিক হবে না, এতটুকু বিপরীত আঁচ সহ্য হবে না। বরং অন্য কিছু বলা দরকার, খুব অন্তরঙ্গ কিছু। এইভাবে একটানা স্নায়ুর নিষ্পেষণ চললে শেষ দেখার অনেক আগে নিজেকেই নিঃশেষ করবে লোকটা।

খানিক চুপ করে থেকে খুব শান্ত মুখে বলল, আমার একটা কথা শুনবেন?

জলজলে দৃষ্টিটা থমকালো একটু, জবাব দিল না। জিজ্ঞাসু প্রতীক্ষা।

তার আগে একটা কথা, আমাকে আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন?

কি বলবেন বলুন।

সত্যিই বিশ্বাস করেন, নাকি নাকের ডগায় টাকা দোলালে আমিও উল্টো রাস্তায় চলতে পারি মনে করেন?

চকিত অবিশ্বাসের ছায়াই উঁকিঝুঁকি দিল মুখে, তপ্ত বিরক্তিতে বলে উঠল, এ সব কথা উঠছে কেন, কি বলবেন বলুন না?

সাধারণ কথা ক'টা যাতে খুব সাধারণ না শোনায় ধীরাপদ সেই জন্তেই সময় নিল আরো একটু। তারপর অন্তরঙ্গ সুরে বলল, এই সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে আপনি দিনকতক সময় মত খাওয়া দাওয়া করুন, সময় মত ঘুমোন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেছেন শিগগীর?

এই সামান্য ক'টা কথা এমন একজায়গায় গিয়ে পৌঁছুবে ধীরাপদও আশা করেনি। এক মুহূর্তে সব অবিশ্বাস সব সংশয় কেটে গেল যেন, শিশুর অসহায় যাতনা ফুটে উঠল মুখে। একটা উদগত অনুভূতি সামলে উঠতে চেষ্টা করেও পারল না, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ধীরাপদর দুটো হাত আঁকড়ে ধরল। অস্ফুট ত্রাস, ধীরুবাবু আপনি ঠিক বলেছেন। আমি খেতে পারি না, ঘুমুতে পারি না, সব সময় কি জানি কি ভয়—এ আমার কি হল ধীরুবাবু?

মর্মছেঁড়া অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত ব্যাকুলতা। আর কারো মুখে শুনলে বুকের ভিতরটা এমন মোচড় দিয়ে উঠত কিনা বলা যায় না। কয়েক মুহূর্ত ধীরাপদও অসহায় বোধ করল। তারপর কি ভেবে পরামর্শ দিল, দিন কতক না-হয় আপনার মাসির কাছে গিয়ে থাকুন না?

মাথা নাড়ল, তাও পারবে না। বলল, এই ব্যবসায়ে মাসির স্বার্থও তো কম নয়, তার স্বার্থেও তো ঘা পড়েছে, এখন আর মাসিই বা আমাকে আগের মত দেখবে কেন? উত্তেজনা বাড়ল, তাছাড়া আমি সেখানে যাই কি করে এখন, তারা তো আমাকে শত্রু ভাবছে!

তারা বলতে আর কে ধীরাপদ বুঝেছে। পার্বতী। শান্ত গলায় বলল, ভাবছে না।

আবারো সেই আগ্রহ, সামনে ঝুঁকে এলো।—আপনি কি করে জানলেন?

আমি জানি। সেখানে কেন, এখানেও আপনার কোনো ভয় নেই।

নেই—না? আমিও জানি, কেউ আমার কোনো ক্ষতি করবে

না জানি, ক্ষতি করতে পারবে না। তবু এ-রকম হচ্ছে কেন? সর্বক্ষণ এ কিসের ভয় আমার?

ধীরাপদ তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, তখনকার মত ঠাণ্ডা করে নিজের ঘরে চলে এসেছে। কিন্তু মনে যা হয়েছে সে কথাটা বলতে পারেনি। জবাব দিতে পারেনি কিসের ভয়, কেন ভয়।···ভয় তার নিজেকেই। অন্তস্তলে ধ্বংসের বীজ বুনেছে। সেখানে ধ্বংসের ছায়া পড়েছে। যে মানুষ শুধু তৃপ্তির স্বপ্নে তৃপ্তির তন্ময়তায় নিজেকে বিভোর—ওই বীজ পুষ্ট হলে আর ওই ছায়া ঘোরালো হলে অন্তরতর সত্তা কেঁপে উঠবে না তো কী? বজ্র ভেদ করে যে ছাউনির আশ্রম ছুটিয়েছে, এ-পর্যন্ত সেটা তো শুধু তার নিজের বুকেই ফিরে এসেছে।

আশার কথা, লোকটা আজ এই প্রথম অসহায় শিশুর মতই একান্তভাবে বিশ্বাস করেছে তাকে, তার ওপর নির্ভর করেছে। কিন্তু ধীরাপদ কি করবে, কি তার করার আছে ভেবে পাচ্ছে না। আর ভাবতেও পারছে না সে।···আজ থাক, পরে চিন্তা করবে। পরে ভাববে।

পরে ভাবার অবকাশ হল না। বিচারে গণুদার জেল হয়েছে।

দল-বল সহ একাদশী শিকদারের ছেলের জেল হয়েছে—কারো দশ বছর কারো আট বছর। গণুদা নতুন আসামী, নতুন হাতে খড়ি, তার জেল হয়েছে তিন বছর। সশ্রম কারাদণ্ড।

রায় যেদিন বেরুবে সেদিন ধীরাপদ কোর্টে উপস্থিত। আর, সেই একদিন সোনাবউদিও। বিচারক রায় দিলেন। গণুদা শুনল, সোনাবউদি শুনল, ধীরাপদ শুনল। ধীরাপদ শুধু শুনল না, দেখলও। বিচারক রায় ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস আসামীদের ভার নেবে। তাই নিল। পুলিসের সঙ্গে গণুদা চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে গণুদা কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র থমকে দাঁড়িয়েছিল।

সেই ক'টা মুহূর্ত ধীরাপদ ভুলবে না।

গণুদা দাঁড়িয়েছিল। মুখ তুলে সোনাবউদিকে দেখেছিল। সেই মুখে শুধু নির্বাক বিস্ময়। জীবনে সেই একটা মুহূর্তই যেন সে স্ত্রীকে দেখে গেছে—দেখে গেছে, কিন্তু বোঝেনি। আর সোনাবউদিও তেমনি করেই তাকিয়েছে তার দিকে। রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, স্থির নীরব দুই চোখে শুধু যেন বলতে চেয়েছে, যে-টুকু হওয়া প্রয়োজন ছিল সেইটুকুই হয়েছে, যাও, ঘুরে এসো।

বিস্ময় শুধু গণুদার নয়, ধীরাপদরও। হয়ত বিচারের ফল এই হত, হয়ত সোনাবউদির বিবৃতিতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু অনুভূতির রাজ্যে তার প্রতিক্রিয়া অন্যরকম। সোনাবউদি পুলিসের কাছে যে এজাহার দিয়েছিল তা অস্বীকার করেনি। বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সোনাবউদি চুপ করে ছিল। সেই নীরবতা স্বীকৃতির সামিল। তাই শুধু গণুদার নয়, ধীরাপদরও কেমন মনে হয়েছে সোনাবউদি গণুদাকে শাস্তির মুখে ঠেলে না দিক, তাকে রক্ষাও করতে চায়নি।

···এই কারণেই গণুদার এই বিস্ময় আর এই চাউনি।

সোনাবউদিকে নিয়ে ধীরাপদ সুলতান কুঠিতে ফিরল। ট্যাক্সিতে একটি কথাও হয়নি। সমস্তক্ষণ সোনাবউদি রাস্তার দিকেই চেয়েছিল। সুলতান কুঠিতে ফিরে পাশের খুপরি ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সেখানেই চুপচাপ বসে আছে। বড়-ঘরে উমা নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, ছেলে দুটো সঠিক বোঝেওনি কি হয়েছে।

সন্ধ্যার আগে একবার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল ধীরাপদ। কিন্তু সেখানেও ধাক্কা খেয়েছে একটা। দূরে, ঘরের ভিতর থেকে গলা বার করে দাঁড়িয়ে আছেন একাদশী শিকদার। এতদিনের মধ্যে ধীরাপদ এই আবার দেখল তাঁকে। কিন্তু না দেখলেই ভালো ছিল। শেষ খবরটা পাবার আশাতেই ও-ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন হয়ত। অভিশাপ বয়সের দুটো অসম্পূর্ণ, ধীরাপদ চোখ ফিরিয়ে নিল। মনে হল দুর্বৃত্ত নিষ্ঠুর ঘোলাটে দুই চোখের মিনতি তাকে টানছে। অথচ সত্যিই তিনি ডাকছেন না। ধীরাপদ কি করবে? কাছে গিয়ে খবরটা দেবে?···থাক, খবর জানতে পারবেন এক সময়ে।

ভিতরে চলে এলো। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে। সুলতান কুঠির রাত গাঢ় হতে সময় লাগে না। সোনাবউদি সেই খুপরি ঘরেই বসে। আর খানিক বাদে ছেলেমেয়ে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে হয়ত। এর পরের ব্যবস্থা-প্রসঙ্গে সোনাবউদির সঙ্গে খোলাখুলি কিছু কথা হওয়া দরকার। অবশ্য তাড়া নেই, কথা দু'দিন বাদে হলেও চলবে। কিন্তু আজকের এই স্তব্ধতা খুব স্বাভাবিক লাগছে না. সোনাবউদি কি আশা করেছিল গণুদা ছাড়া পাবে? একবারও তা মনে হল না, আশা করলে নিজের বিবৃতি অস্বীকার করত। করেনি যে সেই অনুতাপ?

পায়ে-পায়ে ধীরাপদ খুপরি ঘরে ঢুকল। চৌকিতে সোনাবউদি মূর্তির মত বসে। কোনরকম অনুতাপ বা অনুভূতির চিহ্নমাত্র নেই। ধীরাপদ কাছে এসে দাঁড়াল, একেবারে চৌকির সামনে। সোনাবউদি তাকালো তার দিকে, দেখল। কিন্তু যে দেখল সে যেন ওই মূর্তির মধ্যে উপস্থিত নেই, চেতনার অন্য কোনো প্রান্তের অনেক দূরের কিছুতে তন্ময়। অথচ তখনো ধীরাপদর দিকেই চেয়ে আছে, তাকেই দেখছে।

আর ভেবে কি করবেন, উঠুন—

অসূচ্চ, সামান্য ক'টা কথার শব্দ তরঙ্গের মধ্যে এমন কিছু সান্ত্বনাও ছিল না, আশ্বাসও না। কিন্তু সোনাবউদির যেন দিশা ফিরল আস্তে আস্তে, নিজের মধ্যে ফিরে এলো। দৃষ্টি বদলালো, জীবনের বিষম কোনো মুহূর্তে হঠাৎই সব থেকে প্রয়োজনের মানুষকে একেবারে নাগালের মধ্যে পেলে যেমন হয়, সোনাবউদির চোখে সেই আলো সেই আগ্রহ। দু'হাত বাড়িয়ে ধীরাপদর হাত দুটো ধরল, সর্বাঙ্গে চকিত শিহরণ একটু। আয়ত পক্ষ্মরেখায় জলের আভাস কিন্তু জল নেই। ধীরাপদ চেয়ে আছে, স্বচ্ছ দুটি কালো তারার গভীরে তার দৃষ্টিটা যেন নিঃশেষে হারিয়ে যাচ্ছে।

অস্ফুট স্বরে, প্রায় ফিস ফিস করে সোনাবউদি বলল, কি হবে ধীরুবাবু, এরপর কি হবে?

অনাগত দিনের বার্তা কি ধীরাপদর মুখেই লেখা আছে? দু'হাতের মুঠোয় সোনাবউদি তার হাত দুটো আরো একটু জোরে আঁকড়ে ধরেছে। এই মুখ এই চোখ এই আকুলতা ধীরাপদ আর কি কখনো দেখেছে? সোনাবউদিকে নিশ্চিন্ত করার জন্য হঠাৎ কত কথার ঢেউ তোলপাড় করে ঠেলে উঠতে চাইছে বুকের তল

থেকে। কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুলো শুধু দুটি কথা, যে-কথা অনেকদিন বলতে চেয়েছে, অনেকদিন মনে মনে বলেছে।

বলল, আমি তো আছি। ভয় কি···

সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে গেল। হাতের স্পর্শ থেকে মনে হল সোনাবউদির সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে উঠল একবার। মনে হল, সেই কাঁপুনি দুই ঠোঁটের ফাঁকে এসে আটকাতে চাইল। মনে হল, আয়ত-পক্ষরেখায় ওধারে কালো তারার অতল থেকে চকিত ঢেউ উঠল একটা। তারপরেই এক নিবিড় আকর্ষণে ধীরাপদ বসে পড়ল, তারপর কোথায় হারিয়ে যেতে লাগল জানে না। সোনাবউদি বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে তাকে, দুই ব্যগ্র বাহু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে তাকে। বিহ্বল আবেগে তার গালের ওপর নিজের গাল দুটো ঘষছে। একটা হাত তার ঘাড়ে মাথায় চুলের ঝাঁকড়ায় সমস্ত মুখের ওপর বিচরণ করে বেড়াল কয়েক মুহূর্ত, বিড় বিড় করে বলে গেল, আমি জানি, আমি জানি, না জানলে এত পারি কোন ভরসায়···। ছোট ছেলের মতই তার মাথাটা সবলে টেনে এনে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল, কপালের ওপর গাল রেখে শেষ বারের মতই বুকের মধ্যে আর দুই হাতের নিবিড়তার মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকল তাকে।

ঘরের দরজাটা খোলা।

বাঁধন ঢিলে হল একসময়। ছেড়ে দিল। উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দেখল দুই এক পলক। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

ধীরাপদর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। নিস্পন্দ, কাঠ। একটা স্পর্শের শিহরণ লাগছে এক-একবার, সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। অনেকক্ষণ বাদে সম্বিত ফিরল, সাড় ফিরল। কি জানি কেন উঠে এই খুপরি ঘর থেকে—এই সুলতানকুঠি থেকেই ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। আর কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার হাতে পায়ে কেমন করে যেন শেকল পড়ে গেছে, তার নড়াচড়ার উপায় নেই, একজনের ইচ্ছে ভিন্ন এই ঘর ছেড়ে তার কোথাও যাবার শক্তি নেই।

রাত বাড়ছে। ও-ধার থেকে রান্নার টুক-টাক আওয়াজ আসছিল কানে, সেটা আর শোনা যাচ্ছে না। খুব সংক্ষেপেই রান্না সেরেছে মনে হয়।··উমা আর ছেলে দুটোর খাওয়া হয়ে গেল বোধ হয়। এবারে তার ডাক পড়বে। সে খেয়ে নেবে। তারপর···তারপর কি হবে?

ডাক পড়ল না। তার খাবার নিয়ে সোনাবউদি এ-ঘরেই এলো। এক-হাতে মেঝেতে জল ছিটিয়ে জায়গা মুছে থালাটা রাখল। একটা আসন পেতে দিল। ধীরাপদ অবাক হয়ে দেখছে। এমন শান্ত সুন্দর আর বোধ হয় সোনাবউদিকে কোনদিন দেখেনি। চোখ ফেরানো যায় না এখন, অথচ এই মুহূর্তেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছেটা আরো বেশি অনুভব করছে।

জলের গেলাস রেখে সোনাবউদি তাকালো তার দিকে। যন্ত্রচালিতের মত উঠে এসে ধীরাপদ খেতে বসল। মাথা গোঁজ করে খেতে লাগল। পলকের দেখা সোনাবউদির ওই চাউনিটুকু বুকের তলায় নড়াচড়া করছে। ঠিক এমনি স্নিগ্ধ নীরব দৃষ্টি আজই যেন কোথায় দেখেছে। কোর্টে দেখেছে। সোনাবউদি যখন গণুদার দিকে চেয়েছিল, তখন।

কিন্তু খাওয়া তো হয়ে গেল। আর একটু বাদেই সুলতান কুঠির রাত নিঝুম হবে।…তারপর কি হবে?

মুখ তুলল একবার। সোনাবউদি অদূরে বসে। নিষ্পলক চেয়ে আছে। দেখছে তাকে। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। সোনাবউদির চোখে মুখে একটুও অস্বস্তির ছায়া নেই, কোনো উত্তেজনার রেখা-মাত্র নেই। বরং ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাসের মত দেখল যেন। কালো তারায় শুধু মমতার ধারা দেখল যেন।

উঠুন। আপনার অনেক রাত হয়ে গেল আজ।

গোড়ার ওই রাতটুকু কি স্বপ্ন? ধীরাপদ স্বপ্ন দেখছিল? আবারও মুখ তুলল, তারপর চেয়েই রইল।

এত রাতে আর ট্রাম-বাসের জন্য অপেক্ষা করবেন না, একটা গাড়ি ধরে নিয়ে চলে যান।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেও ভুল হয়ে গেল ধীরাপদর। চেয়ে আছে, আর মনে হচ্ছে এতক্ষণের শিকলটা বুঝি বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শান্ত মৃদু স্বরে সোনাবউদি বলল, আপনি আছেন আমার আর ভয় ভাবনা নেই। তবু মন অবুঝ হলে এক কথাই ঘুরে ফিরে বলি।…ডাকলে আপনাকে পাবো তো?

এই মুহূর্তে আবার ধীরাপদর বলতে ইচ্ছে করছিল, না ডাকলেও পাবেন। বলা গেল না। মাথা নাড়ল শুধু।

মুখের দিকে চেয়েই সোনাবউদি ভাবল কি, হাসলও একটু। এই হাসিটুকুরও যেন তুলনা নেই। বলল, শিগগীরই ডাকব কিন্তু…। আচ্ছা, রাত হল, উঠুন এখন—

পর পর তিন চারটে দিন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে কেটে গেল ধীরাপদর। প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি একটা বিস্ফোরণের মুখে এসে ঠেকেছে খেয়াল নেই, অমিতাভর ক্ষিপ্ততার দিকে চোখ নেই। সবই দেখছে সবই শুনছে, নিয়মিত কাজে যাচ্ছে, কাজ করছে— কিন্তু ভিতরের মানুষটার সঙ্গে কোনো কিছুর যোগ নেই। সে সারাক্ষণ প্রতীক্ষারত আর সারাক্ষণ উতলা। টেলিফোন বেজে উঠলে চমকে ওঠে, খামে নিজের নামে চিঠি দেখলে খাম খুলতে গিয়ে আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে যায়। একটা ডাক শোনার আকাঙ্খায় দু-কান উৎকর্ণ সর্বদা। সুস্থ চিন্তার অবকাশে সোনাবউদির কথা হেঁয়ালীর মত লেগেছে। ডেকে পাঠাবার আগে প্রকারান্তরে যেতে নিষেধ করেছে হয়ত। সেই ডাকের দুর্বহ প্রতীক্ষা, অথচ প্রতীক্ষার অবসান হোক একবারও চায় না সোনাবউদির ডাক এলেই যেন এক চরম সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়াতে হবে তাকে, নিঃশব্দে পা বাড়াতে হবে। সেই রাতের নিবিড় স্পর্শ আজও আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, কিন্তু আশ্চর্য, সেই স্পর্শের জ্বালা নেই যাতনা নেই তাপ নেই, এমন কি কোনো বিনিময়ের উষ্ণ বিস্মৃতিও নেই এতটুকু। সেই স্পর্শের অনুভূতিতে সর্বাঙ্গ সিড়সিড়িয়ে বুকের ভিতর থেকে একটা নিটোল ভরাট কান্নাই শুধু গলা দিয়ে ঠেলে উঠতে চায়। আর কিছু নয়।

ডাক এলে ধীরাপদ কি করবে? শিগগীরই ডাকবে বলল কেন সোনাবউদি? উঠতে বসতে চলতে ফিরতে কথা ক'টা ভয়ের একটা সংকেতের মত কানে লেগে আছে কেন?

ডাক এলো।

সকালে সবে চায়ের পেয়ালা মুখে তুলেছে, হন্তদন্ত হয়ে রমণী পণ্ডিত এসে হাজির। কেউ তাঁকে নিয়ে আসে নি, নিজেই ঢুকে পড়েছেন। বড় হল-ঘরের এধারে আসার আগেই তাঁর কথা কানে এলো।—ধীরুবাবু শিগগীর চলুন, গণুবাবুর বউটির বোধ হয় কিছু হয়ে গেল—

পেয়ালাটাও হাত থেকে নামায়নি ধীরাপদ। কথাগুলো কানের ভিতর দিয়ে উপলব্ধির দোরে এসে পৌঁছুনোর আগেই সমস্ত চেতনা সমস্ত বোধশক্তি নিষ্ক্রিয়, অসাড়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিকল, পঙ্গু।

কাছে এসে রমণী পণ্ডিত আবার বললেন, শিগগীর চলুন। সকাল হলেই বার বার করে আপনাকে খবর দিতে বলে রেখেছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে কি হয়ে গেল আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। উঠুন! বসে রইলেন কেন—!

আবারও একটা ঘা খেয়েই যেন চেতনা ফিরে আসছে। হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল। সামনে রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে। উনি বলছেন কিছু, তাকে উঠতে বলছেন, সোনাবউদির কিছু হয়েছে বলছেন।

উঠে দাঁড়াল। অকস্মাৎ সর্বাঙ্গের সব ক'টা স্নায়ু একসঙ্গে কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। সমস্বরে চিৎকার করে উঠতে চাইছে তারা, কি হয়েছে? কি হয়েছে সোনাবউদির? স্যাণ্ডেল জোড়া পায়ের কাছেই ছিল, ত্রস্তে জামাটা টেনে গায়ে পরে নিল। তারপর একটা উদভ্রান্ত অনুভূতি দমন করে অনুচ্চ ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। আসতে আসতে রমণী পণ্ডিত সংক্ষেপে সমাচার জানালেন, কাল রাতে গণুবাবুর বউ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তিনি খুব অসুস্থ বোধ করছেন, সকাল হলেই নিজে গিয়ে যেন ধীরুবাবুকে একবার খবর দেন আর তাকে ডেকে আনেন। আর, যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন তাদের অফিসের সেই মহিলা ডাক্তারটিকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। রমণী পণ্ডিত তক্ষুণি একজন ডাক্তারের খোঁজে যেতে চেয়েছিলেন, বউটির মুখ দেখে অসুখ কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু উনি তাঁকে ঘরে ডেকে এনে অসুস্থ বোধ করার কথা বলতে তাঁর কেমন ভয় ধরেছিল। বউটি নিষেধ করলেন, বললেন, সকালের আগে কিছু করার দরকার নেই, সকাল হলেই তিনি যেন সোজা ধীরুবাবুর কাছে চলে আসেন। কিন্তু সকালের মধ্যেই এমন কাণ্ড হবে কে জানত? সকালে এখানে আসার আগে একবার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন গণুবাবুর মেয়েটা কাঁদছে আর চিৎকার করে মাকে ডাকাডাকি করছে—সঙ্গে ছেলে দুটোও। কিন্তু বউটির কোনো সাড়া-শব্দ নেই, তিনি নিজেও ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া পাননি। একেবারে বেহুঁস। মনে হয়েছে নিঃশ্বাসও পড়ছে না। সেখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়েছেন রমণী পণ্ডিত, সোজা এখানে চলে এসেছেন। গিয়ে কি দেখবেন জানেন না—

রমণী পণ্ডিতকে আর একটা ট্যাক্সি ধরে নিয়ে চলে যেতে বলে ধীরাপদ এই ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ট্যাক্সি লাবণ্য সরকারের নার্সিং হোমের পথে ছুটল। ধীরাপদ মূর্তির মত বসে। বুকের ভিতরটা গুমরে গুমরে উঠতে চাইছে, সে উঠতে দিচ্ছে না।…সোনাবউদি

এই তাকাই তো তাকবে, এই তাকাই তো তাকতে পারে সোনাবউদি। ধীরাপদর মত নির্বোধ জগতে আর কে আছে? এত বড় নির্বোধ আর কে আছে জগতে? কিন্তু সোনাবউদির কি সত্যিই কিছু হয়ে গেছে? কি হতে পারে ধীরাপদ ভেবে পাচ্ছে না। কেমন করে হতে পারে ধীরাপদ ভেবে পাচ্ছে না। ভাবতে গিয়ে দুর্বোধ্য জট পাকিয়ে যাচ্ছে একটা, মাথাটা যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে আবারও। হয়ত কিছুই হয়নি, হয়ত সোনাবউদি শুধু অসুস্থই হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার কথামত ধীরাপদ লাবণ্যকেই ডেকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? ধীরাপদর ভয় করছে কেন? অজ্ঞাত ত্রাসে বুকের ভিতরটা নিস্পন্দ কেন?

লাবণ্য অবাক। মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়েও গেছে একটু।—কি হয়েছে?

এক্ষুনি আসুন একবার।

কিন্তু কি হয়েছে? কারো অসুখ নাকি?

হ্যাঁ, সোনাবউদির। সঙ্গে ট্যাক্সি আছে, তাড়াতাড়ি এলে ভালো হয়।

লাবণ্য তবু দাঁড়িয়ে আরো একটু নিরীক্ষণ করে দেখল তাকে, তারপর ভিতরে চলে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ব্যাগ হাতে ফিরে এলো আবার। নিচে নামল। ধীরাপদ আগে আগে, লাবণ্য পিছনে। ট্যাক্সিতে উঠল। ট্যাক্সি ছুটল।

লাবণ্য ফিরে তাকালো।—কি অসুখ?

জানি না। সকালে লোকের মুখে খবর পেয়েছি। ধীরাপদ রাস্তার দিকে ফিরে বসল, সারাক্ষণের মধ্যে একটিবারও ঘাড় ফেরাল না।

সুলতান কুঠি। দাওয়ার সামনে ট্যাক্সি থামল।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই দু'পা কাঠ ধীরাপদর। সোনাবউদির ঘরের দিকে এক নজর তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে কে-যেন বলে দিল, বড় দেরিতে এসেছে সে, যা হবার হয়ে গেছে। ব্যাগ হাতে লাবণ্য তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল। কলের মূর্তির মত পায়ে পায়ে ধীরাপদও। দু'চোখ টান করে দেখছে সে। সব দেখছে।

···মেঝেতে বিছানা পাতা। সোনাবউদি শয়ান। অঘোরে ঘুমুচ্ছে মনে হয়। পাশে উমা বসে ফ্রকের আঁচলটা মুখে গুঁজে দিয়ে কাঁদছে। ছেলে দুটোও মায়ের দুধারে পুতুলের মত বসে আছে আর ফ্যাল ফ্যাল করে এক-একজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সোনাবউদির মাথার কাছে ঘোমটা টেনে বসে বোধ হয় রমণী পণ্ডিতের স্ত্রী, ও-ধারে হাঁটুতে মুখ গুঁজে কুমু। পণ্ডিতের অন্য ছেলে মেয়ে গুলোও এধার-ওধার থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুকলাল দারোয়ান, ভিতরে রমণী পণ্ডিত।

শিয়রের পাশে বসে পড়ে লাবণ্য তাড়াতাড়ি সোনাবউদির হাত টেনে নিল। হাতটা মুষ্টিবদ্ধ। নাড়ি দেখল। তারপরেই ঘাড় ফিরিয়ে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা। ক্ষিপ্র হাতে স্টেথোস্কোপের জট ছাড়িয়ে যন্ত্রটা বুকে লাগাল, বুকের ওপর নিজেও ঝুঁকে পড়ল প্রায়। স্তব্ধ মুহূর্ত গোটা কয়েক, কান থেকে স্টেথোস্কোপ ফেলে দিয়ে ব্যাগটা কাছে টেনে নিল।

সেটা খোলার আগে হাত থেমে গেল। ব্যাগ ছেড়ে আস্তে আস্তে সোনাবউদির একটা চোখের পাতা টেনে দেখল। তারপর ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে তাকালো আবার। সকলকেই দেখে নিল একবার, ধীরাপদকেও।

আপনারা একবার বাইরে যান। রমণী পণ্ডিতের ঘোমটা-টানা স্ত্রীও উঠে দাঁড়াতে তাঁকে শুধু বলল, আপনি থাকুন।

নিশ্চেতন মূর্তির মত ধীরাপদ নিজের ঘরে এসেছে। তার কোলে মুখ গুঁজে উমা এতক্ষণে শব্দ করে কাঁদার অবকাশ পেয়েছে। ছেলে দুটো তেমনি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে মাথা গোঁজ করে রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে। দোর গোড়ায় পাংশু মুখে শুকলাল দারোয়ান।

খানিক বাদে লাবণ্য এলো। উমা চমকে মুখ তুলল, তারপর ছুটে চলে গেল। বোধ হয় মায়ের কাছেই গেল। ছেলে দুটোও অনুসরণ করছে। তারা না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত লাবণ্য কিছু বলল না। শুকলাল এরই মধ্যে একটা মোড়া ঘরে রেখে আবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লাবণ্য বসল। প্রথমে রমণী পণ্ডিতের দিকে তাকালো একবার, তারপর ধীরাপদর দিকে। জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রমহিলার স্বামী তো জেলে, না?

ধীরাপদ নির্বাক। বিচারের খবর কাগজে উঠলেও লাবণ্যর সেটা লক্ষ্য করা বা গণুদাকে চেনার কথা নয়। পরক্ষণে মনে হল, খবরটা ওই পাশের ঘর থেকেই সংগ্রহ করেছে, রমণী পণ্ডিতের স্ত্রীর কাছ থেকে। কিন্তু লাবণ্য বলছে না কেন কিছু। কি বলবে সে? প্রতিটি নীরব মুহূর্ত বুকের ওপর মুগুরের ঘা দিচ্ছে। ও-ঘরে উমার কান্না।

ব্যাগ খুলে প্যাড বার করল। তারপর রমণী পণ্ডিতের দিকেই তাকালো আবার। বলল, বড় রকমের শক পেয়েছেন, কার্ডিও ভাসকুলার ফেলিওর···হার্ট আর ব্লাডপ্রেসার এক সঙ্গে কোলাপস্ করেছে।

ডেথ সার্টিফিকেট লিখল। প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে ধীরাপদর হাতে দিল। তারপর ব্যাগ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। যাবে।

সব মিলিয়ে মিনিট কুড়িও নয়। ট্যাক্সিটা বাইরে অপেক্ষা

করছে। লাবণ্য ট্যাক্সিতে উঠল। ধীরাপদ যন্ত্রচালিতের মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আপনি এখন এঁদের সঙ্গেই আছেন তো?

ধীরাপদ মাথা নেড়েছে হয়ত।

বিকেলে নয়তো সন্ধ্যার পরে একবার আমার ওখানে আসবেন। কথা আছে।

ট্যাক্সি চোখের আড়াল হয়ে গেল। ধীরাপদ দাঁড়িয়ে আছে। উমার আর্ত কান্না কানে আসছে। মাথার ওপর আগুনের গোলার মত সূর্য জ্বলছে, সামনে রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে।···হাতে এটা কী! ও। ডেথ সার্টিফিকেট···সোনাবউদি আর নেই। কার্ডিও ভাসকুলার ফেলিওর। হার্ট আর ব্লাডপ্রেশার এক সঙ্গে কোলাপস্‌ করেছে। হার্ট আর ব্লাডপ্রেশার···

এক কালে ধীরাপদর দেখার গর্ব ছিল। সকলে যা দেখে না সে তাই দেখত। কিন্তু চোখের ওপর দিয়ে কত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে সে কি দেখতে পাচ্ছে? দেখলে তো বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না।

উমা আর ছেলে দুটোকে তারস্বরে কেঁদে উঠতে দেখেছে। উমা যদিও বুঝেছে, ছেলে দুটো মোটেই বোঝেনি তাদের মাকে কাঁধে তুলে কোথায় নিয়ে গেল সকলে। তারা ভয় পেয়ে আর দিদির কান্না দেখে কেঁদে উঠেছে। ধীরাপদ চেয়ে চেয়ে দেখেছে, অনুভব করতে চেষ্টা করেছে। পারেনি।

চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে। সোনাবউদির দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে। ধীরাপদ নির্নিমেষে দেখছে। কিন্তু এই দেখাটাও অন্তস্তলে পৌঁছুচ্ছে না।

স্টেশান ওয়াগনে করে লাবণ্য এলো। লাবণ্য শ্মশানে আসতে পারে ভাবেনি। ধীরাপদ বিমূঢ় চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। মিনিট দুই দাঁড়িয়ে লাবণ্য চিতা জ্বলতে দেখল। তারপর ধীরাপদর সামনে এসে দাঁড়াল। তার পাশে রমণী পণ্ডিত বসে।

সাদাসিধে ভাবে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখন যাচ্ছেন না তো? আমি এলাম একবার দেখতে···

চলে গেল। লাবণ্য কি দেখে গেল? কার্ডিও ভাসকুলার ফেলিওরে চিতার আগুন ঠিক ঠিক জ্বলছে কি না? কিন্তু ধীরাপদ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কেন? কার্ডিও ভাসকুলার ফেলিওর না, বাড়িতে উমা আর ছেলে দুটোর কান্না না, সামনের ওই চিতার আগুনও না।

কেন কেন কেন?

কেন তাও জানে। ধীরাপদ কিছুই দেখছে না, কারণ সারাক্ষণ নিজের মধ্যে ডুবে সে শুধু একটা জবাব হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সেই খোঁজার তাড়নায় বাকি সব ক'টা অনুভূতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। চোখের সমুখ থেকে তার দুর্বোধ্যতার পরদাটা এখনো সরেনি।

বিকেল গেল। সন্ধ্যা গড়াল। রাত হল, সুলতান কুঠির রাত। রমণী পণ্ডিতকে দিয়ে খাবার আনিয়ে মেয়েটাকে আর ছেলে দুটোকে খাইয়েছে। তারপর তাদের জড়িয়ে ধরে শুয়েছে, ঘুম পাড়িয়েছে। আর আশ্চর্য, নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছে কখন।

একেবারে সকালে চোখ মেলেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসেছে। প্রথমেই মনে হয়েছে সোনাবউদি আর নেই এটা সত্যি কিনা। সত্যি। তার মেয়ে আর ছেলেরা জড়াজড়ি করে ঘুমুচ্ছে। তাহলে সোনাবউদি নেই। কেন নেই?···কার্ডিও ভাসকুলার ফেলিওর···হার্ট আর ব্লাডপ্রেশার একসঙ্গে কোলাপস করেছে। সোনাবউদির মৃত্যুর ওপর ওগুলো কতগুলো হিজিবিজি শব্দের বোঝা। কেন নেই সোনাবউদি? তাকে ডাকতে বলেছিল, ডেকেছে। কিন্তু সোনাবউদি নেই কেন?

ঘুমন্ত মেয়ে আর কচি ছেলে দুটোর দিকে চোখ গেল। আজ বুকের ভিতরে মোচড় পড়ছে, চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। না, সোনাবউদিকে সে কোনদিন ক্ষমা করবে না, সোনাবউদি আছে কি নেই ছিল কি ছিল না—সে চিন্তাও ভিতর থেকে নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করবে। ওরাও যাতে না তোলে সেই চেষ্টা করবে। এই মাকে ওদের মনে রেখে কাজ নেই।

গতকাল সন্ধ্যায় লাবণ্য দেখা করতে বলেছিল। বলেছিল কথা আছে। ধীরাপদর মনেও ছিল না।···লাবণ্য শ্মশানে গিয়েছিল কেন? অনুমান করতে পারে, কিন্তু থাক, ভেবে কাজ নেই। লাবণ্যর প্রতি কৃতজ্ঞ।

আজও সন্ধ্যার আগে সুলতান কুঠি থেকে বেরুবার অবকাশ পেল না ধীরাপদ। মা তোলানোর চেষ্টাটা কম দুরূহ নয়। ওই নির্মম মাকেও ওরা সহজে ভুলতে চায় না। এদিকের অন্যান্য ব্যবস্থায় শুকলাল দারোয়ানকে বড় কাছে পেয়েছে। সে না থাকলে ধীরাপদ হিমসিম খেত। আর কুম্ভও ঘুরে ফিরে কতবার এসেছে ঠিক নেই। রমণী পণ্ডিত এসেছেন, এমন কি ঘোমটা টেনে তাঁর স্ত্রীও। মানুষ অবিমিশ্র ভালো না হোক, অবিমিশ্র মন্দও যে নয় ধীরাপদ সেটুকুই অনুভব করতে চেষ্টা করেছে।···এক সোনাবউদি ছাড়া ধীরাপদ সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

শুকলালকে ঘরে বসিয়ে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফেরার আশ্বাস দিয়ে ধীরাপদ লাবণ্যর নার্সিং হোমে এলো।

কিন্তু নার্সিং হোম আর নেই? বাইরের ঘরটা তেমনি আছে। ভিতরের ঘরে একটাও বেড নেই। ঘরটা যে রোগীর আবাস ছিল তাও বোঝা যায় না। একেবারে ফাঁকা। অমিতাভর শমনের কথা মনে পড়ল। একটা নয়, দু' দুটো শমন। নিরাপত্তার প্রয়োজনে নার্সিং হোম রাতারাতি উঠে গেছে।

কড়া নাড়ল। সব ঘর খোলা যখন লাবণ্য ভিতরেই আছে। ছিল। তক্ষুনি বেরিয়ে এলো, বাইরের ঘরে বসল দুজনে।

কাল এলেন না, ক্লান্ত ছিলেন?

ক্লান্তি এখনো। রাজ্যের ক্লান্তি। ধীরাপদ চুপ করে রইল।

লাবণ্য কুশনে গা এলিয়ে একটু একটু পা দোলাচ্ছে, আর তার দিকেই চেয়ে আছে।—এদিকের সব ভালো মত হয়ে গেল?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল।

চিকিৎসকসুলভ নিস্পৃহতা সত্ত্বেও লাবণ্যর কৌতূহল চাপা থাকল না। বলল, ভদ্রমহিলা আমি যাবার অনেকক্ষণ আগে মারা গেছেন মনে হল, আপনি আমাকে ডাকতে আসারও আগে।···এত দেরিতে খবর দিলেন কেন?

চকিতে খেয়াল হল কি বলতে চায়। ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায় রোগিণী মারা গেছে জেনেই তাকে ডাকতে আসা হয়েছিল। সন্দেহ

সব জামাকাপড়ই রোজ বাড়ীতে সার্ফে কাচুন—শাড়ী, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবী, সার্ট, প্যাণ্ট, ফ্রক, তোয়ালে। দেখবেন কি পরিষ্কার, কি ধব্‌ধবে ফরসা হবে! সার্ফে কাপড় কাচার অতুলনীয় শক্তি আছে, তাই বাড়ীতে কাপড় ধব্‌ধবে ফরসা করে কাচায় সার্ফের জুড়ী নেই। আজই সার্ফ কিনুন!

# সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

SU. 27-X52 BG

অস্বাভাবিক নয়, ধীরাপদ বলল, আমিও জানতুম না, খবর পেয়ে আগে সোজা আপনার কাছে এসেছি।

লাবণ্যর দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু প্রশ্নটা নরম গলাতেই করল।—আগে আমার কাছে কেন?

উনি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

কে?

সোনাবউদি।

বিস্মিত দৃষ্টিটা মুখের ওপর থেমে রইল একটু, কবে কার কাছে বলেছিলেন?

আগের দিন রাতে, পণ্ডিতমশায়ের কাছে।

আবারও সংশয়ের ছায়া পড়ল মুখে, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন?

তিনি পণ্ডিত মশাইকে বলেছিলেন অসুস্থ বোধ করছেন, সকাল হলেই যেন আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

ও···। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল চুপচাপ খানিক। তারপর স্বাভাবিক সুরেই জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রমহিলার মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয় আপনি বুঝেছেন বোধ হয়?

বুকের তলায় হৃৎপিণ্ডটাকে সংযত করতে বেগ পেতে হল। ধীরাপদ মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

কেমন করে বুঝেছে সেটা আর লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল না, মুখের দিকে চেয়ে শুধু অপেক্ষা করল একটু। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বলে গেল, গুচ্ছের সিডেটিভ খেয়েছেন, অত সিডেটিভ পেলেন কোথায় আশ্চর্য! শেষে আর জল দিয়ে গেলেননি, মুড়ির মত চিবিয়েছেন। হাঁ করিয়ে দেখলাম মুখের মধ্যে তখনো ছিল, আর দুই একটা বিছানায় কাঁধের নিচেও পড়ে ছিল।

ধীরাপদর চোখের সমুখ থেকে দুর্বোধ্যতার পরদাটা এবারে সরছে আস্তে আস্তে।···সোনাবউদির রাতে ঘুম হত না শুনেছিল, শুকলাল দরোয়ানকে দিয়ে প্রায়ই ঘুমের ওষুধ আনাত শুনেছিল। শুধু শুকলাল কেন, গণুদাকে দিয়েও আনাত হয়ত, তখনও গণুদা জেলের বাইরে। আর, হয়ত নিজেও সংগ্রহ করত। নইলে এত পেল কি করে? কতদিন ধরে সোনাবউদি এই ঘুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে? কবেকার সংকল্প এটা? এমন স্বার্থপরের মত ঘুমোবার মতলব সোনাবউদি কতদিন ধরে করে আসছে?

শোনার পর ধীরাপদ হঠাৎ কেন জানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে একটু। সংকল্পটা অনেকদিনের জানার পর তার যেন হালকা বোধ করার কারণ আছে কিছু।···পরে ভাববে। লাবণ্য এ-প্রসঙ্গে আর কিছু বলেনি। অন্য আলোচনার ইচ্ছে ছিল বোধ হয় তার। বড় সাহেব টেলিগ্রাম পেলেন কিনা সেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছিল।

ধীরাপদ উঠে পড়ল। শরীরটা ভালো ঠেকছে না জানিয়ে আর অপেক্ষা করল না। এরপর কারবারের আসন্ন দুর্যোগের কথা উঠত, অমিতাভ ঘোষের মারাত্মক পাগলামীর কথা উঠত, বিভূতি সরকারের সম্ভাব্য খবরের কথাও উঠত কিনা বলা যায় না। সামনে গুরুতর সমস্যা, গুরুতর সংকট। কিন্তু আজ আর কোন কিছুতে মন দিতে পারছে না ধীরাপদ। কবে পারবে তারও ঠিক নেই।

সুলতানকুঠিতে ফেরার আগে মিত্তির বাড়িতে এলো একবার। গতকাল থেকে সে নেই, সেখানে তারা হয়ত ভাবছে। খবরটা জানিয়ে যাওয়া দরকার। তাছাড়া ও-বাড়ির বাস এবারে তো উঠলই মনে হয়।

কেয়ার-টেক বাবু জানালো মানকেকে নিয়ে বউরাণী গেছে বাপের বাড়িতে। রাত হয়ে গেল, এখনো ফিরছে না দেখে সে চিন্তিত। তাকেই খবরটা দিল ধীরাপদ, বউরাণী এলে তাকে জানাতে বলল, আপাতত তার এখানে থাকা সম্ভব নয়, পরে একদিন এসে বউরাণীর সঙ্গে দেখা করবে।

শয্যার ও-পাশের টেবিলের ওপর তার নামের খাম একটা। বাংলায় নাম ঠিকানা লেখা। কেয়ার-টেক বাবু জানালো আজ দুপুরেই এসেছে ওটা। খামটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে কি যে হল ধীরাপদ জানে না। মুহূর্তের জন্য ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল বুঝি, বুকের স্পন্দন থেমে গেল। তারপরেই প্রবল নাড়াচাড়া পড়ল, আস্তে আস্তে ধীরাপদ বিছানায় বসল।

বাবু কিছুক্ষণ খানিক থাকবে ভেবে কেয়ার-টেক বাবু চলে গেল। ধীরাপদর চোখের সামনে খামের ওপরের অক্ষরগুলো নড়েচড়ে আবার স্থির হল। চেনা অক্ষর নয়, পরিচিত লেখাও নয়। কিন্তু ধীরাপদ নিঃসংশয়ে জানে এ চিঠি কোথা থেকে এসেছে, এই শেষ লেখা কে লিখেছে।

ধীরুবাবু,

আপনাকে ডাকব বলেছিলাম, ডাকলাম তো? এখন রাগ করুন আর যাই করুন, আপনার কথা ফেলার সাধ্য নেই। বলেছি না, আপনি আছেন না জানলে এত ভরসা আমি পেলাম কোথায়? সত্যি বলছি, কাল কি হবে ভেবে আমার এতটুকু দুঃখ নেই, আতঙ্ক নেই। শুধু আপনাদের বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করেই যা দুঃখ। নইলে এ পরিণতির জন্যে আমি কতদিন ধরে তিলে তিলে প্রস্তুত করেছি নিজেকে ঠিক নেই। সেই যেদিন চাকরি খুইয়ে তখনকার মত মনস্তাপী হয়ে আমাকে শুনিয়েছিল, আর তার বাঁচার ইচ্ছে নেই, এক-মাত্র আত্মহত্যা করলেই সব-দিক রক্ষা হয়, জয়েন্ট লাইফ ইনসিওরেন্সের দশ হাজার টাকা আমাকে দিয়ে যেতে পারে—সেই দিন থেকেই।

বিশ্বাস করুন, তার মুখের দিকে চেয়ে সেইদিন সেই মুহূর্তে কেমন করে যেন আমি নিজের এই পরিণতিটা দেখেছিলাম। দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে দেখাটা সয়ে গেছে। তারপরে সহজ হয়েছে। শেষে এত সহজ হয়েছে যে এক-একসময় এই মরণ-দশার মধ্যেও নিজের মনে হেসেছি আর আপনাদের রমণী পণ্ডিতের গণনার বাহাদুরী দিয়েছি। আজ তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আপনি আমাকে বরাবর ছেলেমেয়ের প্রতি নিষ্ঠুর বলে এসেছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি নিষ্ঠুর হতে পারলে তো বাঁচতুম। শুধু ওদের দিকে চেয়েই আমি আর কোনো পথ দেখলাম না। টাকাটা পেলে ওরা যদি বাঁচে ভেবে মৃত্যুটা খুব ত্রাসের মনে হয়নি আমার। এ-ভাবে টাকা পেতে বিবেকে লেগেছে, প্রবঞ্চনা মনে হয়েছে। কিন্তু হলেও তার দাম তো কম দিচ্ছিনে, আমি এই দেহটা বয়ে বেড়িয়ে কি করতে পারতুম?

আমার বিচার ভগবান করবেন। আপনি শুধু গরীবের ছেলে মেয়ের মত মেয়েটা আর ছেলেদুটোকে একটু মানুষ করে

দেবেন। দেবেনই জানি! জেলে তার সঙ্গে দেখা করে যা ব্যবস্থা করা দরকার করবেন! ব্যবস্থার ভার আমি আপনাকে দিয়ে গেলাম তাঁকে জানাবেন। আমার স্থির বিশ্বাস এতে কোনো বাধা হবে না। লোকটাকে আপনারা যতবড় অমানুষ দেখেছেন ঠিক ততটাই অমানুষ সে নয়। অন্তত ছিল না। লোভ তাকে বিষিয়েছে, এই দিনের অভিশাপ তাকে বিষিয়েছে। আমি তাকে রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু ভগবান রক্ষা করেছেন। সে বাইরে থাকলে আমার এই যাওয়াও যে ব্যর্থ হত সেটা এখন সে বুঝবে একটুও সন্দেহ নেই। আর তার ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই, আপনিও রাগ করবেন না। যতখানি আয়ু সে আমার ক্ষয় করেছে ভগবান আরো ততখানি সুস্থ পরমায়ু তাকে দিন।

এইবারে আপনাদের রমণী পণ্ডিতকে ডাকব, কাল ভোরে আপনাকে খবর দিতে বলব। সম্ভব হলে আপনাদের লাবণ্য সরকারকেও ডাকতে বলব। তার কথা কেন মনে হচ্ছে জানি না। ডাক্তার এনে আপনারা তো হৈ-চৈ করবেনই জানা কথা, এই দেহটা নিয়ে টানা হেঁচড়াও হবে হয়তো।···যদিই এড়ানো যায়।

কোনো-রকম পাগলামো করবেন না, আমার নিষেধ থাকল। ছেলেমেয়ের জন্তে আর আমি একটুও ভাবি না। আপনাকে নিয়েই আমার ভয়। নিজের ওপর কোনো অনিয়ম অত্যাচার করতে গেলেই আপনার যেন মনে হয় সোনাবউদি দেখছে। আপনার কোনো ক্ষতি আমার সহ্য হবে না। ভগবানের কাছে শত-কোটি প্রার্থনা জানাই যেন আপনাকে চিনতে পারে।

সোনাবউদি।

মাথাটা ঘুরছে একটু একটু। ও কিছু নয়, আলোটা চোখে বেশি লাগছে। উঠে আলো নিবিয়ে আবার এসে বসল। শুতে পারলে আর একটু ভালো লাগবে। বিছানায় গা ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর থেকে নাড়িছেঁড়া যাতনায় হাহাকার করে যে আবেগটা ফুকরে উঠতে চাইল, বালিশে প্রাণপণে নিজের মুখ চাপা দিয়ে তার মুখ চাপা দিতে চেষ্টা করল ধীরাপদ।

সোনাবউদি তুমি এ কি করলে!

তুমি এ কি করলে সোনাবউদি!

এ তুমি কি করলে সোনাবউদি—? [ আগামী বারে সমাপ্য ]

# বেদনার বেদ

মেঘলা ঘোষ

পান্থপাদপের ছায় শান্ত নদীতীর
শেষ বসন্তের ক্লান্ত, মন্থর, গম্ভীর
পদধ্বনি বুকে লয়ে বেদনার বেদ
রচেছিল, তবু তারি মাঝে ছিল ছেদ।
তুমি ছিলে স্বপ্নলীলা, লাবণ্য বিলাসে,
একান্ত আমারই হ'য়ে বসি' মোর পাশে।
শেষ-রশ্মি-রক্ত তব কপোলের 'পরে
চূর্ণকুন্তলের দোলা ছিল প্রাণ ভরে।
উন্মুখ-অধীর তব কৃষ্ণচূড়া মন
চুম্বিছে সস্নেহে আসি' আকাশের রং
কঠিন আশ্লেষে। আলো ঝিলিমিলি
নদীর অতল জলে লাবণ্য উজলি'
উৎসারি সৌন্দর্য সীমা, আমার বঁধুর
রক্তিম কপাল হতে আহরি' সিঁদুর
রঞ্জিত করেছে তারে ফাগুনের ফাগে।
তাই বায়ু চিত্তলোল, তাই পিক জাগে
সুরের হিল্লোলে। অশোক-পলাশ
উদ্ভাসিয়া রাগরক্ত রঙের বিলাস

বর্ষালীর আলিম্পনে রেখেছিল ধরি
তব অলক্তকরাগে অঙ্গরাগ করি।
দূর বনান্তের ছায়ে সায়াহ্নের আলো
ছল ছল নয়নের অমানিশা কালো
দিয়েছিল ব্যক্ত করি। অব্যক্ত ব্যথায়,
নিস্তব্ধ নিথর সেই গোধূলি বেলায়;
নতনেত্রে ধীরপদে চলি গেলা ফিরে
না রাখিয়া বিদায়ের ক্ষুদ্র বাণীটিরে;
নভোনীল বনান্তের শান্ত শ্যামলিমা
তোমার সে তন্বীদেহে খুঁজি পেল সীমা।
তোমার সে লীনপ্রায় অঞ্চলের রেখা
সম্পূর্ণ আবরি মোর কামনার লেখা
নিঃশেষে মুছিয়া নিল আলো আলিম্পন,
বিদায়ের ক্ষণে তব কৃষ্ণচূড়া মন।

তুমি চলে গেছ—তাই বর্ষালী সন্ধ্যার
রাত্রির আঁধার নামে বিষণ্ণ ব্যথায়।

## রেমি-শিল্প ও ভারত
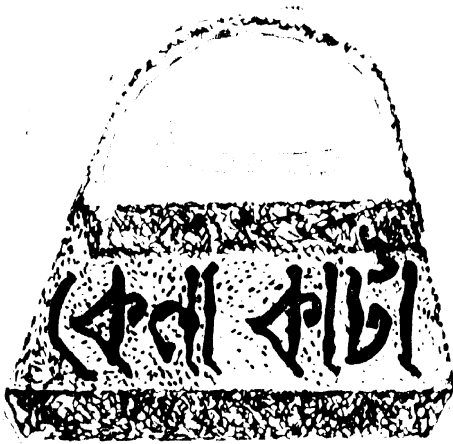
এদেশে রেমির চাষ চলে এসেছে দীর্ঘকাল আগে থেকেই, অবশ্য সেটা সীমাবদ্ধ এলাকায়। একটি সময় গেছে যখন ভারতের অন্যান্য স্থানে যেমনই হোক, বাংলা ও আসামে এর ব্যাপক চাষই ছিল। সুপরিচিত পাট চাষের পাশাপাশি বহু স্থলে রেমির চাষ হতে দেখা গেছে—একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবেই এর মর্যাদা দাঁড়িয়ে যায়।

পাটের মতোই রেমির তন্তু অনেক কাজে লাগে—মানুষের নানা প্রয়োজন এতে মেটানো সম্ভব হয়। এর বিশেষ উপকারিতা থাকার জন্যেই দিন দিন এর ব্যবহার মাত্রাও বাড়ছে। এই তন্তু বয়নশিল্পের উপাদান হিসাবেই পূর্ব্বে ব্যবহৃত হতো। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহার চলছে অন্যভাবেও। আজকের দিনে রেমি থেকে শুধু জামা-কাপড় নয়, দড়ি, কাছি জাল, নৌকার পাল, সেলাই-এর সুতো, মাছ-ধরা সুতো, কাগজ প্রভৃতি কত কি মূল্যবান জিনিস তৈরী করা সম্ভবপর। রেমির তন্তু খুব মজবুত, এমন কি রেশমের চেয়েও, এ বহুকালের পরীক্ষিত। বলতে কি, রেমিজাত জিনিস অন্য অনেক জিনিসের তুলনায় অধিক টেঁকসই বা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

সব রকম জমিতেই এবং সমস্ত ঋতুতে রেমির চাষ ভালো হবে, সেরকম দাবী করা চলে না। দেখা গেছে—বর্ষায় একেবারে সূচনা অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসই রেমি রোপণের উপযুক্ত সময়। এর জন্যে চাই নরম মাটি, জল ও পর্য্যাপ্ত সার—জমিতে জল জমে গেলে অবশ্য চলবে না। রেমির চারা করে নেওয়া চলে দুই ভাবে—বীজ থেকে সরাসরি কিংবা গাছের ডাল কেটে সেটা মাটিতে লাগিয়ে দিয়ে। আসাম অঞ্চলে রেমি 'রিয়া বা 'রিহা' নামে পরিচিত—চীনা ঘাস বলেও এর আর একটি পরিচিতি রয়েছে।

শত শত বছর আগেও রেমির চাষ ও ব্যবহার ছিল, এরূপ জানতে পারা যায়। শুধু ভারতে কেন, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক জায়গায় বস্ত্র প্রস্তুত করা হতো এই রেমি থেকে। রেমির তন্তুর একটি বিশেষ গুণ—অন্যান্য বস্ত্রের চেয়ে এতে ভালো রঙ ধরে এবং যে-কোন রঙেই একে রাঙানো সম্ভবপর। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এবং চীনদেশে প্রাচীন যুগে এর নাকি ব্যবহার ছিল ব্যাপকতর ভিত্তিতে। অন্যান্য কতক দেশেও কোন না কোন সময় রেমি তন্তুজাত বস্ত্রাদি যে ব্যবহৃত হতে না দেখা গেছে, এমন নয়। একটি কাহিনী চলতি আছে—কয়েকটি মিশরীয় মমি নাকি জড়ানো ছিল রেমি সুতোর তৈরী শুভ্র বস্ত্র দিয়ে। ইতিহাস পর্য্যালোচনায় এই ধরণের ঘটনা বা কাহিনী আরও জানতে পারলে বিস্ময়ের কিছু হবে না।

আজ রেমি বা রেমিজাত সামগ্রী বিশ্বের বিস্তীর্ণ অংশে সমাদর লাভ করছে। একে কেন্দ্র করে একটি মস্ত শিল্পও গড়ে উঠেছে ক্রমিক ধারায়। দড়ি, কাছি, জাল, সেলাই-এর সুতো—এ সব তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ হাতে কাটা রেমি। রেশম, পশম নাইলন এবং রেয়নের সঙ্গে রেমি তন্তুকে মিশ্রিত করে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তার ব্যবহার আরও ব্যাপক। এই বিশেষ তন্তুর দ্বারা ব্যাঙ্ক নোটের জন্য ফিল্টারিং কাপড় ও মূল্যবান কাগজ তৈরী করা যায়, যেমন তৈরী করা চলে টেবিল ও গৃহোপযোগী লিনেন, প্যারাসুট, বৈদ্যুতিক কয়েল মোটরের টায়ারের জন্য আঁশ, ক্যানভাস, গ্যাসম্যাণ্টল, সজ্জা জাতীয় বস্ত্র প্রভৃতি। গোড়াতেই বলা হোল—রেমি তন্তু অতি মাত্র মজবুত। পরন্তু এর ওপর সহসা জল বায়ুর প্রতিক্রিয়া হয় না বলে একে ব্যবহার করা যায় এমন কি কতকগুলো জরুরী প্রয়োজনে। হোসপাইপ ও পচনহীন বস্ত্র তৈরী করবার জন্যেও রেমি তন্তুর মূল্য বেশি রকম দেওয়া হয়। জানা যায় বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রেমির দড়ি বিশেষ কাজে লেগেছিল। প্যারাসুট থেকে মাল-পত্র ও সরঞ্জামাদি ফেলবার জন্য দড়ি দরকার হয়, রেমি তন্তুর পাকানো দড়িই এ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছে।

একটি কথা প্রসঙ্গতঃ বলতে হবে—বাংলা ও আসামে এক কালে রেমির ব্যাপক ভিত্তিতে চাষাবাদ ছিল বটে, কিন্তু বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর আমলে এর অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এক্ষণে জাতীয় সরকার রেমি চাষ বাড়াবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে একটি আশার কথা। ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চলেই রেমির চাষ চালানোর উপযুক্ত ক্ষেত্র রয়েছে, তবে এর ভেতর উত্তরবঙ্গের মাটি ও জল-বায়ু নাকি এর পক্ষে সমধিক উপযোগী। তাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলপাইগুড়ি জেলায় এই চাষ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা মতো কাজ হলে সুফলও মিলবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জলপাইগুড়ি জেলায় মোহিতনগর খামারের অধীনে রেমির চাষাবাদ জোর চলেছে বলে জানা যায়। মোহিতনগরের বীজ পরিবর্দ্ধন খামারটির সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকছে একটি রেমি গবেষণা কেন্দ্র। উত্তর বঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি রেমি কারখানা স্থাপনেরও পরিকল্পনা রয়েছে, যে ধরণের কারখানা ভারতের অন্যান্য স্থানেও হওয়া চাই। সন্নিহিত টালিগঞ্জে একটি কারখানা রয়েছে, যেখানে মূল্যবান রেমি সুতো বোনা হয়ে থাকে। রেমি তন্তুর ছাল অপসরণ, সুতো কেটে তা শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও স্থাপন করা হয়েছে টালিগঞ্জের কারখানায়।

ভারতীয় রেমির গুরুত্ব ও উপযোগিতা অন্য দিক থেকেও লক্ষ্য করবার। বাইরে এর যথেষ্ট চাহিদা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এ একটা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে পড়েছে। নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই দুই তিন বছর মধ্যে প্রায় ৫,৫০০ একর জমি এনে ফেলা হবে রেমি চাষের আওতায়। এই মূল্যবান ফসল বাড়ানো এবং নতুন নতুন বাজার পাওয়া, সরকারকে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আরও সচেষ্ট হতে হবে। আজ যদি একে

চুক্তি করে একটি প্রকাণ্ড শিল্প গড়ে তোলা হয়, তা হলে অনেকেরই কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়, আর এটা নিতান্ত জরুরী। চীন, জাপান, মালয়, ফিলিপাইন, আমেরিকা, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে রেমি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে গণ্য হচ্ছে। বাইরের চাহিদা যত বেশি পরিমাণে মেটানো যাবে এবং যত দ্রুত, বৈদেশিক মুদ্রা ভারত সেই অনুপাতে অর্জ্জন করতে পারবে, এ বলাই বাহুল্য।

## কারিগরী শিক্ষা—কয়েকটি কথা

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিশ্বের বলতে গেলে সকল দেশেই এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তৎপরতা চলেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতেও অবশ্যি সে অবস্থাটি স্পষ্ট। নবভারত গঠনের বিরাট দায়িত্ব জাতীয় সরকার এবং সেই সঙ্গে দেশবাসী গ্রহণ করেছেন। এখানে দুই দুইটি পরিকল্পনার কাজ হয়ে গেছে এবং এক্ষণে চলেছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ। লক্ষ্য অনুযায়ী এই বৃহৎ কর্ম্মকাণ্ডকে সফল করে তোলার জন্যেই চাই ট্রেনিং-প্রাপ্ত অগণিত কারিগর, যন্ত্রবিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার।

এই থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যায়—ভারতে কারিগরী বা পেশাদারী শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। যতদিন বিদেশী শাসন এদেশে কায়েম ছিল, ততকাল গঠন উদ্যম ছিল প্রত্যাশার জিনিস মাত্র। কারিগর, যন্ত্রকুশলী ও ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন এখনকার মতো সেদিনে এতটা তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি। যে-টুকু দরকার হতো, কোন প্রকারে সমাধা করতে পারলেই আর ভাবনা ছিল না। আজকের দিনে জাতীয় সরকারকে নিজস্ব শিল্প ও গবেষণার দিকে সমধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হচ্ছে। কিন্তু পনেরো বছর আগে অবধি কী ছিল? রুটিন মাফিক কাজ করা ছাড়া সৃজনীশক্তি বিকাশের সুযোগ তখন প্রায় ছিলই না। বড় বড় নক্সা রচনা, উন্নতধরণের ইঞ্জিনীয়ারিং, উন্নত গবেষণা-আলোচনার ফল—সবই আমদানী করা হতো বিদেশ বিভুঁই থেকে। ইঞ্জিনীয়ারিং বা কারিগরী শিক্ষার মান বলতে ভারতে তখন অবধি কিছু গড়েই ওঠেনি, বললে অত্যুক্তি হবে না।

স্বাধীনতার পর থেকে অবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে বলা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাজার হাজার ট্রেনিং প্রাপ্ত কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ার ভারতের প্রতিটি রাজ্যের জন্যেই প্রয়োজন। টেকনিক্যাল ট্রেনিং বা কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণ দ্রুতগতিতে হয়ে চলেছে এবং সরকারও এই খাতে প্রচুর অর্থ জুগিয়ে যাচ্ছেন বটে; কিন্তু তবুও চাহিদার তুলনায় ব্যবস্থা এখনও অপর্য্যাপ্ত বলতেই হবে। দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে যেমন পলিটেকনিক বা অন্যান্য ধরণের ট্রেনিং স্কুল আরও অধিক সংখ্যায় চাই, তেমনি চাই সুষ্ঠু ও উপযুক্ত মানসম্পন্ন ট্রেনিং কোর্স (পাঠক্রম) নির্দ্ধারণ এবং ট্রেনিং দানের যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ। হাতে-কলমে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সৃজনীশক্তি বিকাশের দিকে নজর না রাখলে চলতে পারে না। চিন্তাশক্তির বিকাশ করতে হলে শিক্ষার্থীদের জন্যে গোড়া থেকেই কতকগুলো বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন অত্যাবশ্যক। নিয়মিত আলোচনা-চক্র, বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতামালা, গবেষণার অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দান—এগুলোর গুরুত্ব দিতেই হবে।

প্রথম দুইটি পাঁচশালা পরিকল্পনার ন্যায় তৃতীয় পরিকল্পনাতে দেশে বহু নতুন কল-কারখানা স্থাপন, বাঁধ, সেতু ও সড়ক নির্মাণ, রেলওয়ে সম্প্রসারণ ও বৈদ্যুতিকরণ প্রভৃতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই কয়টি প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য যেমন চাই ইঞ্জিনীয়ার, তেমনি চাই অসংখ্য সাধারণ কারিগর ও ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মী। স্বাধীন আমলে পূর্ব্বের তুলনায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বেড়েছে, কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এই শ্রেণীর শিল্পের জন্য সরকারকে আরও উন্নততর ও সহজলভ্য ব্যবস্থা না করলে নয়। শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীরা যাতে বৃত্তি পেতে পারে এবং সরঞ্জাম ও পুস্তকাদির সুবিধা পায়, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষই সেদিকে সচেতন হবেন। শুধু সহরাঞ্চলেই নয়, সহর থেকে দূরে পল্লী অঞ্চলেও বেশ কিছু সংখ্যক কারিগরী (ট্যাকনিক্যাল) শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হলে সুফলই মিলবে।

অতি প্রয়োজনীয় এই কারিগরী শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি কি ভাবে হতে পারে, সেই নিয়ে বিশেষজ্ঞদের এখনও গবেষণা-আলোচনার অবকাশ আছে। শিল্প-বিজ্ঞানে ভারত যদি বিশ্বের উন্নততর দেশগুলির সঙ্গে ভবিষ্যতে পাল্লা দিবে বলে দাবী রাখে, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন শিক্ষাকেই তার উপেক্ষা করা চলবে না। কারিগরী ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার স্থান ঐ দিক থেকেও প্রথম পর্য্যায়েই নির্ণীত করতে হবে। এ যাবৎ পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে এসেছে, বলতে গেলে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই। এই পদ্ধতিতে কারিগরী ট্রেনিং যারা পেয়ে আছেন, তাদেরও সহযোগিতা চাই। কিন্তু, সেই সঙ্গে বিশেষভাবে চাই—গবেষণাক্ষম ও সৃজনী শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনীয়ার ও অতি আধুনিক যন্ত্রকুশলী তৈরীর জন্যে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন। আর সর্ব্বোপরি যে-টি দরকার, সে হচ্ছে—সর্ব্বক্ষেত্রে টেকনিশিয়ান ও ইঞ্জিনীয়ারদের জন্যে একটি নতুন বৈজ্ঞানিক পটভূমি ও অনুকূল পরিবেশ রচনা।

একটি ভ্রান্ত ধারণাই বলতে হবে—কারিগরী শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে নতুন ধরণের বেকার সৃষ্টির বহুল আশঙ্কা। কিন্তু এই আশঙ্কা এখন অবধি নিতান্ত অমূলকই বলতে হবে, কেন না, শিল্পায়ন ও ইঞ্জিনীয়ারিং উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলো রূপায়িত হলে (যা অবশ্য হতেই হবে) কারিগরী কর্ম্মী বা যন্ত্রকুশলীদের সংখ্যা বৃদ্ধি বরং প্রয়োজন। তা-ছাড়া, যে-দেশে বেকার সমস্যা এত জটিল ও ব্যাপক সেখানে সাধারণ শিক্ষার চেয়েও কারিগরী শিক্ষার দিকেই যুব-সমাজকে সমধিক ঝুঁকতে হবে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন বেকার হয়ে থাকবার ভয় থাকবে না, এ অনেকটা জোর দিয়েই বলা যায়।

নিপুণ কারিগরের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি, সরকারের তরফ থেকেই তা বহুবার ব্যক্ত হয়েছে। স্পষ্টই বলা হয়েছে: যদিও প্রতি বছর ৩০ লক্ষ তরুণ-তরুণী কর্ম্মপ্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তা হলেও নিপুণ কর্ম্মীর বিশেষ চাহিদা আছে এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্ম্মী পাওয়াও অসুবিধাজনক। যন্ত্রকুশলী বা দক্ষ কারিগরের অভাবে পরিকল্পনার রূপায়ণ শুধু যে ব্যাহত হয়, তাই নয়, দেশে নতুন কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ-সৃষ্টিরও অসুবিধা ঘটে। সেজন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষণ পরিকল্পনা সম্প্রসারিত না করলে হতে পারে না।

# দয়া

সঙ্কর্ষণ রায়

কুয়াশা কেটে যায় ধীরে ধীরে। সবুজ ও অন্যান্য রঙের সুসমঞ্জস মিতালি ফুটে ওঠে বিস্তীর্ণ বাগানটি জুড়ে। ড্রইংরুমের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোটির সামনে সোফাটি টেনে নিয়ে ব'সে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল রুমা। হাতে তার বোনবার সরঞ্জাম। কিছু একটা বুনতে শুরু করেছে সে—কী বুনবে তা' অবশ্য সে নিজেই জানে না। তার চাঁপার কলির মত আঙুলগুলো বুঝি তার মনের অস্পষ্ট সুদূর মধুর কোন কল্পনাকে হলদে রঙের উলের মধ্যে রূপ দিতে চায়।

প্রচণ্ড শীত। কলিংবেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বলল রুমা। এই নিয়ে তিনবার হ'ল। এত কফি খাওয়া বোধ হয় ভাল নয়। কিন্তু যা শীত পড়েছে—না খেয়ে পারা যায় না! উলের পুরু ড্রেসিং গাউনেও শীতটাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। রমেনকে বলেছে সে, সমস্ত বাড়িটাতে আর্টিফিশিয়েল হিটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা খরচ। এমন কিছু নয়। রমেন আসছে শীতের আগেই, ক'রে দেবে বলেছে। এ বছরটা একটু কষ্ট ক'রে থাকতে হবে। উলের জামা, পেটিকোট ও শালের শাড়ির ওপর দামী কাশ্মীরী ক্লোক্ প'রে ও ফায়ার-প্লেসে আগুন রেখে।

বাগানে মস্ত বড় বড় ডালিয়া ফুটেছে। তাজা টকটকে লাল ও হলুদ রঙ। শীতের সঙ্গে ফুল ফোটার কোন বিরোধ নেই। বাগানের বাইরে বিস্তীর্ণ মাঠে গরুর পাল চরছে। দু'চারটা রাস্তার নেড়ী কুকুরও চোখে পড়ে। শীতে যে ওরা বিশেষ কাবু হ'য়েছে তা' মনে হয় না। ওদের প্রতি প্রকৃতির কী পক্ষপাত রয়েছে?

হঠাৎ রুমার দৃষ্টি পড়ল বাগানের মালীদের দিকে। সাত আট জন কাজ করছে। ওদের অনেকেরই খালি গা। শীত যেন ওদেরও স্পর্শমাত্রও করে নি এমনি নির্বিকার ভাবে ওরা চলাফেরা করছে। ঐ গরুগুলোর মত ওরাও উদাসীন এই বরফ ঠাণ্ডা সকালটি সম্পর্কে। রুমার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে সে ড্রেসিং গাউনটাকে আরও ভালভাবে জড়িয়ে নেয় গায়ে।

বেয়ারা কফির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সে তাকে হুকুম দিল ফায়ার-প্লেসে আরও কয়লা দিয়ে আগুনটাকে উসকে দিতে।

বাংলোর ড্রইং-রুমের সংলগ্ন অফিস ঘরে ব'সে কাজ করছিল রুমার স্বামী রমেন। দিল্লীর অদূরে কেন্দ্রীয় কুটীর শিল্প সংস্থার একটি বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছে সে। ছোট একটি গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে সরকারী উদ্যোগ ও সমারোহ বেশ জাঁকালো ভাবে প্রকট হ'য়ে উঠেছে তার অধিনায়কত্বে। অল্প সময়ের মধ্যেই খুব নাম করে ফেলেছে সে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে। সুদৃশ্য কলোনির মধ্যে তার প্রাসাদোপম বাংলোটি এ অত্যাশ্চর্য বিস্ময়ের মত দাঁড়িয়ে আছে—বাংলোটির মধ্যেও যেন ত কর্মনৈপুণ্যের আত্মঘোষণা উদ্ধত হ'য়ে আছে। সেদিন কেন্দ্রী শিল্পসচিব বলছিলেন, রমেন রায়ের বাংলো দেখলেই বোঝা যায় সে কত efficient!

সচিব মহোদয়ের কথায় মনে মনে রীতিমত পুলকিত বোধ করেছিল রমেন।

এত বড় একটা চাকরির গুরুত্ব মাপতে গিয়ে মাঝে মাঝে রমেনের মনের তন্ত্রীগুলিতে শিহরণের তরঙ্গ খেলে যায়। বিরাট চাকরি—বিরাটতর কোয়ার্টার—সবার ওপরে রুমার মত পরমা সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী—তার মত সুখী আর কে আছে!

কাঁথার ওপর নক্সার কাজের স্কীম তৈরী করছিল রমেন তার অফিসে বসে। স্কীমটির জন্য দশ হাজার টাকা দরকার। বিশ হাজার চাইলে হয়তো দশ হাজার পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে শিল্প-সচিবকে একটি ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি লিখলে ফল হবে কিনা রমেন ভাবছিল।

এমন সময় রুমা ঢুকল ঘরে অফিসরুমের গুমোট আবহাওয়াতে তার রূপের তরঙ্গ তুলে। স্টেনোগ্রাফার ডিক্টেশন নিচ্ছিল—তাঁর হাত কেঁপে যায়। ত্রস্ত ব্যস্ততার সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের কিউবিক্‌লে চলে যায়। রমেনের ঘূর্ণি-চেয়ারের পাশে দোলন-চেয়ারে বসে রুমা বলে, এক মনে অফিসে বসে শুধু কাজই করে যাচ্ছ তুমি—দেখতে পাও না শীতে এখানকার লোকগুলো কী কষ্ট পাচ্ছে।

রুমার গলার স্বর ভেজা-ভেজা—চোখ দুটো তার ছল ছল করছে। রমেন মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—শিশির ধোয়া রজনীগন্ধার শুভ্র স্তবকে বিশ্বের করুণা যেন পুষ্পিত হয়ে উঠেছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত কমনীয়তা দিয়ে গড়া মুখখানি।

রুমা রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বললে, এদের কষ্ট আর আমার সয় না। ওগো তুমি এক্ষুণি আমাকে উল এনে দাও—এখানে কুলি মজুর যারা কাজ করে তাদের জন্য আমি সোয়েটার বুনে দেব।

রমেন বললে, নিশ্চয়ই—এক্ষুণি আমি লছমন সিংকে বলে দিচ্ছি। বলে সে কলিং বেল টিপতে যায়।

এমন সময় রুমার নজর গিয়ে পড়ে টেবিলের ওপর রাখা একটি চিঠির দিকে। রুমা বললে, কে চিঠি লিখেছে গো?

আমতা আমতা ক'রে রমেন বললে, তেমন কেউ নয়—বাবা লিখেছেন।

মুহূর্তে রুমার মুখ থেকে সমস্ত কমনীয়তা অন্তর্হিত হ'ল—কঠিন স্বরে সে বললে, কী লিখেছেন তোমার বাবা!

একটু ইতস্তত ক'রে রমেন বললে, শীতের পোষাক করার জন্য কিছু টাকা চেয়েছেন।

টাকা চেয়েছেন! তোমার টাকা ছাড়া অন্য কোন দিকে নজরই নেই যেন তাঁর। অবশ্য থাকবেই বা কী করে! চিরকাল মার্চেণ্ট অফিসে কেরাণীর কাজ ক'রে এসেছেন, উঁচু নজর তাঁর আসবে কোত্থেকে!

ক্ষীণ অস্ফুটকণ্ঠে রমেন বললে, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ রুমি এই বাবাই কষ্ট ক'রে আমাকে মানুষ ক'রে তুলেছেন।

ঝাঁজালো স্বরে রুমা ব'লে ওঠে, ভারি তো মানুষ ক'রে তুলেছেন। আমার বাবা যদি তোমাকে এই চাকরিটা জোগাড় ক'রে না দিতেন কে তোমাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করত শুনি!

রুমার বাবা লক্ষ্ণৌয়ের একজন বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বড়লোক।

রমেন মুখ নীচু ক'রে চুপ ক'রে থাকে।

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে রমেনের বাবার চিঠিখানা তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে রুমা। তারপর বলে, খবর্দার তোমার বাবাকে এক পয়সাও পাঠাতে পারবে না। হ্যাঁ ভাল কথা, আমার বাবার জন্ত কাশ্মীরী শাল কেনার কথা বলেছিলুম, তার কী হ'ল।

রমেন ক্ষীণ স্বরে বলে, আজই এনে দেব।

হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। আর সোয়েটারের জন্ত উল—দশ পনেরো জনের জন্ত আমি বুনব। এক্ষুণি গাড়ি পাঠাও দিল্লীতে।

ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রুমা।

পশমে স্তূপীকৃত হ'ল রুমার নিজস্ব লাইব্রেরী ঘরের টেবিল। রুমা এখানে ব'সে বোনার কাজ করে।

রমেনের কাছে কেন্দ্রীয় শিল্পবিভাগের মন্ত্রীমশাইয়ের আসন্ন সফরের কথা শোনে রুমা—মাসখানেক বাদে তাঁর এখানে আসার কথা।

মন্ত্রীমশাই আসার আগেই বোনার কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যে একটির বেশি সোয়েটার শেষ করতে পারে না রুমা। সে রমেনকে বললে, এতগুলো সোয়েটার বুনে উঠতে পারব না আমি। তুমি বরং পনেরোটা রেডিমেড সোয়েটার কিনে নিয়ে এস আজই।

রমেন মাথা চুলকে বললে, উলগুলো তুমি বরং আমাকে দিয়ে দাও রুমি—আমাদের কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী সেণ্টারের মহিলা ওয়ার্কারদের দিয়ে বুনিয়ে নেব—খুব তাড়াতাড়িই বুনে দেবে ওরা।

তিক্তস্বরে রুমা বলে, ওরা তাড়াতাড়ি বুনে দেবে, আর আমি যেন পারিনে! আমার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা, তাই না? এই উল দিয়ে হয় আমি নিজে বুনব নয়তো কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে দেব। তোমার কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজ সেণ্টারের মেয়েদের বা কাউকেই এ উল আমি ছুঁতে দেব না। বাজে কথা রেখে এখন যাও দিকিনি তুমি দিল্লীতে—রেডিমেড পনেরোটা সোয়েটার নিয়ে এস কিনে।

উলের স্তূপের পাশে সাজিয়ে রাখা হল পনেরোটি সোয়েটার।

রমেন বললে, রুমি, সোয়েটার তো এল—কিন্তু বিলোচ্ছ না কেন বল তো? শীত যে শেষ হয়ে যাবে।

গম্ভীর মুখে রুমা বললে, মন্ত্রী মশাই আসুন আগে।

চমৎকৃত হল রমেন। রুমার গাল টিপে আদর করে সে বললে, চমৎকার বুদ্ধি তোমার রুমি। সত্যি এ আমার মাথায় আসেনি কখনো—খেয়ালও হয়নি। চতুর্বেদীজী খুব দয়া ধর্ম মেনে চলা মানুষ—উনি খুব খুশি হবেন। উনি খুশি হলে আমাদের সবই হবে।

খুশিতে ঝলমল করে রুমা।

হঠাৎ খবর এল মন্ত্রী মশাইয়ের সফরের কর্মসূচী মুলতবী রাখা হয়েছে। মাস তিনেক বাদে তিনি আসবেন।

নিষ্প্রভ মুখে রুমা বললে, তা'হলে কী হবে গো! তিন মাস

াদে তো গরম পড়ে যাবে, তখন তো আর এই সোয়েটারগুলো দেওয়া যাবে না।

রমেন ব্যাজার মুখে বললে, তা দেওয়া যাবে না।

—একটা কাজ করলে হয় না গো। মন্ত্রীমশাই তিন মাস বাদে আসছেন তো—তখন না হয় সূতীর পোষাক বিলি করা যাবে। তিনি আসার আগে কুড়ি পঁচিশ জোড়া ধুতি ও শার্ট কিনে রেখে দেব।

—আইডিয়াটা ভালই। কিন্তু এই সোয়েটারগুলোর কী হবে?

—ওগুলো আসছে বছর শীতের সময় মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী বা তোমাদের ডিরেক্টর জেনারেল সফরে এলে বিলি করা যাবে।

—দি আইডিয়া। সত্যি রুমি তোমার মত স্ত্রী পেয়েছিলাম ব'লেই না—

আরক্ত মুখে রুমা বললে, থাক থাক, আদিখ্যেতায় কাজ নেই।

কেন্দ্রীয় শিল্পবিভাগের মাননীয় মন্ত্রী চতুর্বেদীজী অবশেষে সফরে এলেন।

গরীব দুঃখীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করেছেন বাহাদুর গঞ্জের কেন্দ্রীয় কুটির-শিল্প সংস্থার অধিকর্তার পত্নী শ্রীমতী রুমা রায়—সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্ত আমন্ত্রণ জানানো হ'ল মন্ত্রীমহোদয়কে।

সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন চতুর্বেদীজী।

অনুষ্ঠানের দিন শাদা লালপেড়ে শাড়ি পরেছিল রুমা—খোপায় জড়িয়েছিল বেলফুলের মালা। মন্ত্রীমশাইকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল সে হাসি মুখে—সাদর অভ্যর্থনা জানাল তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে।

রুমার অসামান্ত রূপে চমৎকৃত হ'লেন চতুর্বেদীজী। এক সঙ্গে এত রূপ বুঝি তিনি কখনো কল্পনাও করেন নি। একটি মেয়ের সীমিত অবয়বের মধ্যে কী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে!

বস্ত্র বিতরণের সময় চতুর্বেদীজীর মনে হ'ল এমনি একটি সুন্দর মুখেরই বুঝি দয়া করা সাজে—আর কারুর নয়। বিশ্বসংসারের গরীব দুঃখীদের ওপর করুণা করবে ব'লেই যেন বিধাতা এই পরমা-সুন্দরী মেয়েটিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের শেষে সংক্ষিপ্ত আড়াই ঘণ্টার ভাষণে মন্ত্রীমশাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অনেক সাধুবাদ জানালেন রুমা রায়ের উদ্দেশ্যে।

সভা ভঙ্গ হওয়ার পর চতুর্বেদীজী রমেনকে বললেন, এমনি অসাধারণ একটি স্ত্রী পেয়েছ—তুমি খুব ভাগ্যবান রমেন।

রমেন বিগলিত।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিতদের তালিকায় রুমা রায়ের নাম ছিল। অসাধারণ দানশীলতার জন্ত বিশেষ একটি পদক পাবে রুমা।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় কুটির-শিল্প সংস্থার উদ্যোগে রুমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'য়েছিল। রমেনের বাড়ির ড্রইং-রুমেই সভা বসেছে।

গান-বাজনা ও ফাঁকে ফাঁকে ছোটখাটো বক্তৃতা—অনুষ্ঠান খুব জমে উঠেছে। এমন সময় ঘরে ঢুকল জীর্ণ মলিন পোশাক পরা একটি যুবক ম্লান মুখে। রমেন ও রুমা দু'জনেই তাকে দেখে চমকে উঠল। সে রমেনের ছোট ভাই নীরেন।

রমেনের কানে কানে রুমা বললে, নীরেন এখানে কেন? তুমি তোমার বাবাকে লেখো নি যে নীরেনের জন্ত এখানে কোন চাকরি জোগাড় করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়!

আমতা আমতা ক'রে রমেন বললে, আমি তো লিখেছিলাম—কিন্তু বাবা দেখছি ওকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে রুমা চাপা গলায় বললে, দাঁড়াও, আমি ওর ব্যবস্থা করছি।

যে বেয়ারাটি ট্রে হাতে ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সবাইকে কফি বিতরণ করছিল তাকে ডেকে রুমা নীরেনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, দরোয়ানকে ডেকে ঐ লোকটাকে বাংলোর কম্পাউণ্ড থেকে বের করে দিতে বল এক্ষুণি।

নীরেন ঘরে ঢুকতে অনুষ্ঠানের ছন্দোভঙ্গ হ'য়েছিল—সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আবার জমে উঠল।

হিমি হালদার গান গাইতে থাকে, 'দয়া দিয়ে হ'বে যে গো জীবন ধুতে।

## প্রথম প্রেম

### রঞ্জু চন্দ

একটি ফুলের কলি,
চেয়েছিল সুন্দর পৃথিবীর বসন্ত-বাতাস—
হিমেল হাওয়াই দ্বীপের এক কোণে দুলি,
ফেলেছিল প্রতীক্ষার দীর্ঘশ্বাস।

সন্ধ্যা হয়ে আসে—
উঠিয়াছে পূর্ণিমার চাঁদ;
হাওয়াই দ্বীপে দখিন হাওয়ায় প্রস্ফুটিতা হাসে
লভিয়াছে তৃপ্তির কৃত্রিম স্বাদ।

## বৃষ্টি-ঝরা রাতে

### শেফালি মোদক

বৃষ্টি-ঝরা আধো-আঁধার রাতে,
অন্ধ ঘরের রুদ্ধ জানালাতে,
বৃষ্টি গেল আছাড় খেয়ে ফিরে
বুকের ব্যথা বুকের মাঝে ঘিরে।

বৃষ্টি-ঝরা আধো-আঁধার রাতে,
ঘুম নামে না আমার আঁখি পাতে,
নিঝুম রাতে ঝিঁ ঝিঁ ডাকার সুরে,
হৃদয় শুধু হারায় দূরে দূরে।

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

## সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

### সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক, দার্শনিক এই কথাই বার বার মনে পড়ে। তিনি সৃষ্টি করেন, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু সমালোচক হিসাবে তাঁহাকে আমরা খুব কমই দেখি। আজ সেই সমালোচক রবীন্দ্রনাথের রূপ উদ্‌ঘাটনে আমি প্রয়াস পাইয়াছি।

কবি ও সাহিত্যিকের কাজ হইতেছে বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্গ'ঢ় রস সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করা এবং উহা উপাদান হিসেবে ব্যবহার করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। আর সমালোচকের কাজ হইতেছে কবি ও সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া বাহিরে প্রকাশ করা। সমালোচক সাহিত্যিকের আন্তর সত্যটিকে নিজের মনের রসে রসাম্বিত করিয়া নুতন রূপে সৃষ্টি করিয়া পাঠকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করা। কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে পাঠকের এই যোগ সাধনে পৌরোহিত্য করেন সমালোচক। তিনি "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" নূতনত্ব সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এই নূতনের অগ্রদূত।

তিনি প্রাচীন ও নবীন সকল সাহিত্যই সমালোচনা করিয়াছেন নূতন দৃষ্টিতে। প্রাচীন সাহিত্য শকুন্তলা তাঁহার একটি অপূর্ব্ব ও বিশেষত্বময় সমালোচনা। অনেক ইংরাজ সমালোচক এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত ইহার চমৎকার রসবিশ্লেষণ করিয়া আর একটি 'নব শকুন্তলা' রচনা করিতে কেহ সক্ষম হন নাই। তবে জার্মাণ কবি গ্যেটে তিনিও কালিদাস ও তাঁহার শকুন্তলা রবীন্দ্রনাথের মত একই দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে তিনি যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছেন, "কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে," তাহাই রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলায়' পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাইয়া পাঠক সাধারণের নিকট অপূর্ব্ব প্রবন্ধাকারে পরিবেশন করিয়াছেন। শকুন্তলার নবযৌবনের প্রেম এবং দুষ্মন্তের ভোগসর্ব্বস্ব প্রেম কিরূপে দুঃখ বিরহ ও তপস্যার মধ্য দিয়ে পূর্ণতায় পরিণতি লাভ করিল তাহারই রূপক যেন এই দুষ্মন্ত শকুন্তলা কাহিনীটি।

রবীন্দ্রনাথের মানসপটে শকুন্তলার পাশে শেক্সপীয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকটির উদয় হইয়াছে। তিনি ইহাদের তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন উভয়ের মধ্যে বাহ্য সাদৃশ্যও থাকিলে অন্তরের বৈসাদৃশ্যই বেশী। শকুন্তলা মিরান্দা উভয়েই প্রকৃতির পরিবেশে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এবং উভয়েরই প্রণয় হইয়াছে যথাক্রমে দুষ্মন্ত ফার্দিনান্দের সঙ্গে। ঘটনাস্থলটিরও যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। একজনের সমুদ্রবেষ্টিত দেশ দ্বীপ, অপরজনের তপোবন। কিন্তু তথাপি কাব্যরসের দিক দিয়া পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে প্রচুর। কারণ মিরান্দার প্রকৃতির পরিবেশ শকুন্তলার অনুরূপ নহে। নির্জন-লালিতা মিরান্দা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী প্রস্পেরোর কন্যা। সে তাহার পিতা ছাড়া অপর কোন মানুষের সাহচর্য পায় নাই। তাই তাহার মন স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সমাজ সংসার সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞা ছিল। যদিও শকুন্তলার মত সেও সরলা ছিল। তাহার সরলতা আভ্যন্তরীণ নয়, তাহা অজ্ঞতারই নামান্তর। মিরান্দা-ফার্দিনান্দের প্রণয় হইয়াছিল প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে। কিন্তু তাহাতে শান্তির প্রলেপ ছিল না। ছিল শক্তির প্রয়াস। কারণ প্রস্পেরো তাহার ভ্রাতা এ্যান্টোনিয়োর ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত হইয়া এই নির্জন দ্বীপে বাস করিতেছিলেন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সেই সুযোগ আসিলে তিনি যাদুবলে প্রবল ঝড়ের দ্বারা তাহার প্রতিশোধ লইলেন। এবং নেপলসের রাজপুত্র ফার্দিনান্দের প্রাণরক্ষা করিয়া নিজের আয়ত্তে লইয়া আসিলেন। এইভাবে বলের দ্বারা এই প্রণয় সংঘটিত হইল।

টেম্পেষ্টের বড় বৈসাদৃশ্য হইল শকুন্তলায় যেখানে প্রীতি শান্তি সম্ভার, টেম্পেষ্ট সেখানে শাসন-দমন-পীড়ন। কারণ এরিয়েল নামক বহিঃপ্রকৃতি মানবরূপ ধারণ করিয়াও কাহারও সহিত আত্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। মানুষের সহিত তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীনতা চায়, মানব শক্তি তাহাকে আবদ্ধ করিয়া নিজের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে চায়। তাই সেখানে মানুষের সহিত মানুষের বিরোধের ও পীড়নের চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় আত্মীয়তার মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। তাই মিরান্দাকে সেখান হইতে সরাইয়া আনিলে দ্বীপ প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তনই চোখে পড়ে না। কারণ সে প্রকৃতির অঙ্গীভূত নয়। এই প্রকৃতি কেবলমাত্র আখ্যানের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হইয়াছে, চরিত্রের জন্য নয়।

কিন্তু শকুন্তলার এই প্রকৃতি মানুষ না হইয়া প্রকৃতি থাকিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয় সম্পর্কে মিলিত। সেখানে শকুন্তলা তপোবনেরই অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আশ্রমপালিতা শকুন্তলা পিতার সাহচর্য্য

ব্যতীত সখীদের সংস্পর্শেও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সখীদের সহিত কথাবার্ত্তায়, হাস্যপরিহাসে সে যৌবনচেতনায় স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। আর নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে তপোবনের সহিত। শকুন্তলার সহিত তপোবনের যে প্রাণের একটা নিবিড় মধুর সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা তাহার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটিতে অপূর্ব্ব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চেতন অচেতন সকলের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এক প্রীতি কল্যাণের বন্ধন। তাই শকুন্তলা বলিয়াছে "তপোবন ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।" তপোবন বিরহে কেবল শকুন্তলাই কাতর নহে, তপোবনও শকুন্তলার আসন্ন বিরহ-বেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। তাই ময়ূর আর নাচিতেছে না, হরিণশিশু তাহার অঞ্চল টানিয়া পথরোধ করিতেছে। এইভাবে বিদায় পর্বটি গভীর বেদনার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। কারণ তপোবনের প্রতিটি প্রাণীর পশুপক্ষী সকলের সহিত সে এতদিন এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। সবকিছু মিলিয়া সে শৈশব হইতে একটি শান্তির আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছিল। এই তপোবন তাহার কাছে ছিল শান্তি ও মঙ্গলের আশ্রয়স্থল। তাই টেম্পেষ্টের মত ইহাতে শাসন-দমন-পীড়ন নাই।

শকুন্তলা ও টেম্পেষ্টে আর একটি গভীর বৈসাদৃশ্য হইল, টেম্পেষ্টে অৰ্দ্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। কারণ মিরান্দা ও ফার্দিনান্দ পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিবাহও হয়। কিন্তু তাহাদের পরবর্ত্তী জীবন কিরূপে সুখে-দুঃখে, মঙ্গলে-অমঙ্গলে অতিবাহিত হয় তাহার আর চিত্র নাই। এবং শকুন্তলার মত মিরান্দার জীবনে প্রণয় ব্যাপারে অগ্নিপরীক্ষাও আসে নাই। প্রেমকে যাচাই করিয়া লইবার জন্য ফার্দিনান্দের যদিও কৃচ্ছ্রসাধন আছে তবুও তাহা একান্তই বাহিরের।

কিন্তু শকুন্তলায় কালিদাস নরনারীর সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যভোগের চিত্র আঁকিয়াই তাহার কাব্য শেষ করেন নাই। তিনি তাহাদের প্রেমকে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। তাই তাহার মধ্যে রহিয়াছে একটি কল্যাণকর পরিণতি। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রণয় হইয়াছিল এবং শকুন্তলা বিবাহ করিয়া পতিগৃহে যাত্রাও করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বের প্রেম লালসাযুক্ত প্রেম থাকায় কালিদাস দুর্ব্বাসার অভিশাপ দ্বারা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান ঘটাইলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাবাদর্শের একটি সুন্দর বৈসাদৃশ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতীয় আদর্শে সার্থক প্রেম তপস্যার বস্তু। তাই তরুণ দুষ্মন্তের প্রথম প্রেমের চপলতাকে অনুতাপ অনুশোচনার দ্বারা সংযত ও সার্থক করিয়া তুলিলেন। তাই শকুন্তলার জীবনে আসিল গভীর বেদনা। তাহার চারিদিক ছাইয়া এক নিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। যে শকুন্তলার তপোবনের সহিত একাত্ম হইয়া উচ্ছলতায় ও সরলতায় দিন কাটাইয়াছিল দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যান ও হংসপদিকার করুণ গান তাহার জীবনের সঙ্গে তপোবনের চিরবিচ্ছেদ ঘটাইল। এইরূপে দুঃখের আগুনে প্রেমের অপরাধের কালিমাকে দগ্ধ করিয়া মারীচের তপোবনে কবি উভয়ের মঙ্গলমিলন ঘটাইলেন। পূর্ব্বে পরস্পরের প্রেম যে সৌন্দর্য্য স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে ভোগবাসনা প্রবেশ করায় শকুন্তলা স্বর্গচ্যুত হইল। পরে দুঃখের মধ্য দিয়া উন্নততর সাধনার স্বর্গ তাহারা রচনা করিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, শকুন্তলাকে একটি Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে। এবং আর একটি অভিমত দিয়াছেন যে, মেঘদূতে যেমন পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে, পূর্ব্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য্য পর্য্যটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্য সৌন্দর্য্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। তেমন শকুন্তলায় একটি পূর্ব্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। এই দুইটি অভিমত রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রাখিয়া যায়। এইরূপে টেম্পেষ্ট ও শকুন্তলায় বৈসাদৃশ্যকে তিনি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি ইহার অন্তরের সৌন্দর্য্যকে বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ করিয়া পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এক মহাকবির সৃষ্টিকে আর এক বিশ্বকবি অন্তরের শ্রদ্ধায় প্রীতিতে ও রচনার গুণে নূতনতর করিয়া সৃষ্টি করিলেন।

## কে তুমি আমায় ডাকো

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে সুমিতা হাসতে হাসতে বললে—দরজার ফাঁকে চুলটা কি ভাবে আটকে গিয়েছিল। চল ভাই ও-ঘরে যাই। এখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। আবার হয়তো দরজায় চুল আটকে যাবে।

সুজাতা হাসতে হাসতে বললে—কি ব্যাপার সুমিতা, ঘরে কি অশরীরী কেউ আছে নাকি? তা নাহলে শুধু শুধু দরজায় চুল আটকাচ্ছে কেন?

বইয়ের আলমারীর দরজাগুলো খুলতে খুলতে সুমিতাও হেসে বললে দেখতে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন অশরীরী হয়তো আছে ঘরে—আচ্ছা তুমি ততক্ষণ বই দেখে নাও, আমি এখনি আসছি।

সারি সারি সাজানো ঝকঝকে বইগুলির পানে তাকিয়ে সুজাতা কত কি ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে কতকগুলি বই বার কোরে পাতা উল্টে উল্টে দেখতে লাগলো।

ঘরের দেওয়াল ভর্ত্তি আলমারী প্রায় কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে। ওপর তাক থেকে বই নামাবার জন্যে এক ধারে একটি ছোট সিঁড়িও আছে।

মাঝখানে সোফা কোচ রকিং চেয়ার দিয়ে সাজানো। ইচ্ছেমত জ্বালাবার জন্যে বিশেষ ভাবে আলোরও ব্যবস্থা আছে। নিশ্চিন্তচিত্তে বই পড়বার জন্যে সুন্দর পরিবেশ। দেখলেই মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। সুজাতার মন ভরে উঠলো।

সুজাতাকে বইয়ের আলমারী খুলে দিয়ে এ ঘরে এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুমিতা মৃদু টোকা দিয়ে আস্তে ডাকলে—দাদা।

দরজা অল্প ফাঁক কোরে জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললে—কি হোল?

হাসিমুখে তেমনি গলা নামিয়ে সুমিতা বললে—ওভাবে কেউ চুল টানে? যদি সুজাতা দেখে ফেলতো তখন কি হোত শুনি?

কি হোত সেটা ধারণা কোরতে পারছি, কিন্তু তুই ওর কাছে যা তা কথা বলছিস কেন? চেনা জানা নেই, সেখানে বই দিলে কেউ খুশী হয়?

চোখ টান কোরে সুমিতা বললে—বেশ তো, চেনা জানা

কারতেই তুমি বেরিয়ে এসো না। তাহলে আর কোন ঝঞ্ঝাট াকে না, তোমাকেও লুকোচুরি খেলতে হয় না। তোমার বন্ধ দরজার সামনে বন্ধু এসেছে, দরজা খুলে তাকে বরণ কোরে নাও, এবার।

ওর কথা শুনতে শুনতে জয়ন্তর মুখে হাসি দেখা দিলো। মৃদু ব্যঙ্গের সঙ্গে বললে—হুঁস! কি আমার বুদ্ধিমতী এলেন! যা, পালা এখান থেকে, এখনি ও এসে পোড়বে।

দুষ্ট হেসে সুমিতা বললে—কে এসে পোড়বে দাদা?

রাগ করে জয়ন্ত কি বলতে যাবে, সুজাতার সাড়া পেয়ে দ্রুত দরজা বন্ধ কোরে দিলে।

সুমিতা বললে—তুমি কি এইভাবে থেকে অনশন শুরু কোরবে নাকি?

না—অনশন নয়, তপস্যা বলা যায়।

শোন দাদা, আমি সুজাতাকে নিয়ে ও-ঘরেই থাকবো, তুমি নীচে চলে যাও খাবার ঘরে। শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে জয়ন্তর গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—খুব শুনতে পাচ্ছি, যা তোমার গলার জোর, এখন দয়া কোরে ওদিকে যাও। এখনি যদি এসে পড়ে এখানে তোকে পাগল ভাববে নয়তো···

সুজাতা পেছন থেকে সুমিতাকে বললে কি হোল মিতা ডাকছো কেন? কি হয়েছে? বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছো?

সুমিতা ফিরে দেখে বললে—কই, তোমাকে ডাকিনি তো?

—ডাকো নি? আমার কানে গেল তুমি যেন বোলছো—শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?

সুমিতা সামলে নিয়ে বললে—বই নিয়ে বসেছিলে তো, তাই বইয়ের কথাগুলো তোমার কানে বাইরের কথা বলে মনে হয়েছিল।

সুজাতা বললে—সত্যি বড় ভাল লাগছিল একসঙ্গে অত বই দেখে। কোনটা নোব ভেবেই পাচ্ছি না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো যে, কোন দরকার আছে বুঝি?

সুমিতা হাসতে হাসতে বললে—তখন সেই চুলটা আটকে গেল না? তাই ভাবছিলুম ভেতরে যাবো কিনা।

সুজাতা অবাক হয়ে বললে—তুমি কি কথা বলে বলে ভাবছিলে নাকি মিতা?

ওর কথা শুনে সুমিতা খিল খিল কোরে হেসে উঠলো, বললে—সত্যি—এক এক সময় মনে হয়···যাক গে। চল, বই নেবে না? কই, একটিও তো বার করোনি দেখছি! সব বইগুলো পড়া হয়নি···

সুজাতা হেসে বললে—অত বইয়ের মাঝে ছেড়ে দিয়ে এলে আমাকে, কোনটা রেখে কোন বই নেবো বুঝতেই পারছি না। ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত বই শেষ কোরে ফেলি।

—তোমার ঐ ইচ্ছেতে বাধা দিচ্ছে কে? তোমার যত ইচ্ছে বই নাও। ইংরেজী বাংলা যেটা খুসী। কোন সঙ্কোচ কোরো না তার জন্যে।

সুজাতা বললে—যতক্ষণ বই দেখিনি ততক্ষণ সঙ্কোচ হচ্ছিল। এখন বইয়ের রাশি দেখে, সঙ্কোচ কোরতে পারছি না। তাতে ঠকতে হবে নিজেকেই। আজ আমি বাংলা বই খানকতক নিয়ে যাবো, পরে ইংরেজী বই নোব। আচ্ছা মিতা,—

কথার মাঝখানে সর্ব্বাণী দেবী ঘরে এসে বললেন—মিতা জয় আসেনি এখনও?

সুমিতা বিস্মিত ভাবে বললে—দাদা? চা খায়নি? আমি তো কখন বলেছি, ইয়ে মানে দেখেছি গ্যারেজে ছোট গাড়ীখানা রয়েছে।

সর্ব্বাণী দেবী বললেন—কই নীচের ঘরে দেখলুম না তো। আমি ভাবছি তোদের সঙ্গে গল্প করছে। বাড়ী ফিরতে দেরী হবে বলে ফোন করেছিল কি?

সুমিতা বললে—না, মা' ফোন তো করেনি। নিশ্চয় বিশেষ কাজে আটকে পড়েছে—তাই ফোন করবারও সময় পায়নি।

সর্ব্বাণী দেবী বললেন—এমন তো সে কখনও করে না। দেরী হলে ফোনে জানিয়ে দেয়।

এমন সময় একজন চাকর এসে খবর দিলে দাদাবাবু এসেই আবার বাইরে চলে গেছেন।

সর্ব্বাণী দেবী অবাক হয়ে বললেন—দাদাবাবু এর মধ্যে কখন এলো কখন বেরিয়ে গেল? বাড়ীতে যখন এলই তখন চা খেয়ে যাবে তো? এদিকে উনি তখন থেকে খোঁজ করছেন ছেলের।

ছেলের উদ্দেশে রাগ করতে করতে সর্ব্বাণী দেবী চলে যেতে সুমিতা এতক্ষণের চেপে রাখা হাসি ছেড়ে দিলে। সুজাতা কিছুই বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সুমিতা হাসি সামলে বললে—দাদা নিশ্চয় তোমার ভয়ে পালিয়েছে।

—কেন মিতা? আমাকে উনি ভয় পাবেন কেন? আমার চেহারাখানা কি ভয় পাবার মত?

—তা নয়। দাদা একটু লাজুক স্বভাবের কি না। মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হতে লজ্জা পায়। আমি ভেবেছিলুম দাদার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দোব, তা আর হলো না। কখন ঘরে এসেছে—কখন বেরিয়ে গেছে কিছুই জানতে পারিনি।

সুজাতা বললে—জানতে না পেরে ভালই হয়েছে। তাঁর প্রিয় বইগুলি আমার হাতে দেখলে তিনি খুসী হতেন না নিশ্চয়। পরে যেদিন আসবো সেদিন আলাপ করিয়ে দিও। আর আমাকে বোলো আমাকে বই দেবার জন্যে দাদার কাছে ক ঝুড়ি বকুনি খেয়েছো তুমি। সত্যি কথা বলবে কিন্তু।

মিতা রহস্য ভরে বললে—বকুনি খাবো কি প্রাইজ পাবো কে জানে।

সুজাতা হেসে উঠে বললে—প্রাইজ পাবে? তা হলে তো খুব ভাল কথা বল। আচ্ছা মিতা তোমার দাদার নাম জয় মানে বিজয় অজয় এই ধরণের নাম থেকে, না শুধুই জয়?

সুমিতা বললে—দাদার নাম জয়ন্ত, ছোট কোরে নিয়েছেন সকলে।

সুজাতাকে একটু অন্যমনস্ক দেখালো। সুমিতা উত্তর না পেয়ে প্রশ্ন কোরলে—কি ভাবছো সুজাতা? জয় শুনে কারুর কথা মনে পোড়ছে নাকি?

শুনে সুজাতা ঈষৎ আরক্ত হোল—সেটা লক্ষ্য কোরে সুমিতা পুলকিত হয়ে আবার বললে—কে ভাই বল না।

সুজাতা হেসে বললে—তুমি যা ভাবছো সে সব কিছু নয় আমার একটি পেন ফ্রেণ্ডের নাম জয়-বিজয় থেকে জয়ে রূপান্তর।

—পেন ফ্রেণ্ড? তাহলে লক্ষ্ণৌয়ের বন্ধু নয়?

—না তিনি কলকাতাতেই থাকেন।

—ও: কাগজে প্রায়ই দেখি পেনফ্রেণ্ড হবার বিজ্ঞাপন সেই ভাবে আলাপ কোরলে বুঝি?

সুজাতা হেসে বললে—ঠিক ওভাবে নয়। আমার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—সেটার প্রশংসা কোরে উনি চিঠি লেখেন সেই থেকে আলাপ—তারপর আমি কলকাতায় আসতে ভদ্রলোক আমাদের বাড়ী গিয়ে মুখোমুখি পরিচয় কোরে এসেছেন।

মিতা মৃদু হাসির সঙ্গে বললে—কেমন দেখলে বন্ধুকে?

সুজাতা বললে—মন্দ কি? আমার মায়ের খুব পছন্দ হয়েছে।

সুমিতা হেসে বললে—আর মেয়ের? সুজাতা—উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়তে সুমিতা বললে—ওভাবে উত্তর দেওয়া গ্রাহ্য নয়। মুখে বল।

স্মিতমুখে সুজাতা আবার বললে—মন্দ কি?

খুসী হয়ে সুমিতা বললে—নেমন্তন্ন কোরতে ভুলে যেও না।

ব্যস্ত হয়ে—সুজাতা বলে উঠলো—আরে না না, ওকথা আমার মনেই হয়নি। যেটা তুমি ভেবে নিয়েছো তা হবার নয়। একেবারেই অসম্ভব।

সুমিতা আশ্চর্য্য ভাবে বললে—কেন? জাতি গোত্র ইত্যাদি যা কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে সেদিকের অমিল বুঝি?

সুজাতা বললে—সে সব কিছু নয়। ভদ্রলোক খুব পুরানোপন্থী ঘরের ছেলে। ও-ধরণের বাড়ীতে মানিয়ে চলা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তারপর আমি চিরকাল পশ্চিমেই মানুষ হয়েছি—ধরণ ধারণ সম্বন্ধে নানা কথা উঠতে পারে কাজেই জেনে শুনে ওসব বাড়ীতে কোন কাজ না করাই উচিত।

—আচ্ছা সুজাতা কি ধরণের পুরানো বাড়ী? আমি ঠিক ধারণা করতে পারছি না।

—ভদ্রলোক বলেছিলেন—ওঁদের বাড়ীর বৌয়েরা চাকরের সামনে বার হয় না। কর্ত্তারা সব সময় বাইরের ঘরেই থাকেন, আরও কত কি বলেছিলেন, আমার মনে পোড়ছে না। আমার তো ভাবতেই ভয় হয়।

সুজাতার কথা শুনে মিতা হেসেই অস্থির। ওর হাসি দেখে সুজাতা অভিমান ভরে বললে—আমার ভয় হয় শুনে তোমার অত হাসি পাচ্ছে কেন? খুব মজা লাগছে বুঝি!

সুমিতা আরও জোরে হেসে উঠলো। দাদা ওদের কাছে খুব চাল দিয়েছে তো? কিন্তু পুরানো বাড়ীর চাল চলন ও জানলে কি কোরে। আজকাল ওসব জমিদার বাড়ীর চাল একেবারেই অচল। তবে বোধ হয় কারুর কাছে গল্প শুনে সেটা এইভাবে কাজে লাগিয়েছে। মুখে বললে—তোমার ভয় দেখে হাসবো, এমনি হৃদয়হীন ভাবছো আমাকে? আমি হাসছি—দাদার একটা কথা কেন জানি না মনে পোড়লো তাই। সত্যি—মানুষকে এইভাবে ভয় পাইয়ে দিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছে সে-দিকে বাবুর খেয়াল নেই।

—মিতার কথাগুলি রহস্যময় ঠেকলো সুজাতার কাছে। সে

য়ে কোন কৌতূহল প্রকাশ না কোরে উঠে দাঁড়ালো সে—এবার ই মিতা।

—আবার কবে আসবে বল।

—যা বইয়ের রাশি সামনে ধরে দিয়েছো এগুলি শেষ হলেই বার আসবো। সুমিতা অভিমান ভরে বললে—বেশ চিনলুম মাকে। আমার টানে এখানে আসবে না, বইয়ের টানে আসবে।

সুজাতা মিষ্টি হেসে বললে—তোমার টা নই আসবো মিতা। টা হোল গৌণ, বুঝলে।

—আর বাজে কথা বলে মন রাখতে হবে না। আমার ওপর মার কত টান তা বুঝতে পেরেছি।

সুমিতার হাত ধরে একটু নাড়া দিয়ে সুজাতা হাসিমুখে বললে—খি দেখি আমার ওপর কতটা রাগ হয়েছে।

সুমিতার গাম্ভীর্য্য খসে পোড়লো। হেসে বললে—কেন রাগ রলে কি অন্যায় হয়।

—একটুও অন্যায় নয়। কিন্তু বিশ্বাস করো তোমার টানেই সবো, বই নিতে নয়, সে কথা প্রমাণ কোরবো। কেমন বিশ্বাস চ্ছে তো?

—কাজে কোরে প্রমাণ দিলে তবে বিশ্বাস কোরবো।

সুমিতার দুহাত নিজের হাতের ভেতর ধরে সুজাতা বললে—বেশ তাই-ই দোব। খুসী এবার?

দুজনেই হেসে উঠলো। [ক্রমশ:।

## কুড়িয়ে পাওয়া ডায়েরীতে

### শ্রীকণা বসু

এখন আমার অফ্‌। এইমাত্র ক্লাস সেরে এলুম। উদ্ভিদের জীবন নিয়ে গবেষণা করাই আমার কাজ। ওদের কান্না, হাসি, ওদের অনুভূতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। আমার ভাল লাগে। ওঃ, বলতে ভুলে গেছি, কে আমি? আমি বোটানির প্রফেসর। আর একটি পরিচয়ও আমার আছে বৈকি—আমি একজনের স্ত্রী, আর একজনের মা। বয়েস কত আমার? তা গোটা চল্লিশেক হ'ল। চুলেও তো সাদা ছোপ ধরল। ডায়েরী লেখার অভ্যেস কিন্তু নেই আমার। নেহাৎ নতুন রয়ে গেছে বলেই লেখা। নইলে তো আমার কন্যাটি ধ্বংস করবেন এখানা। হিজিবিজি সব দাগ কেটে রাখবে এর পাতায়। কিছু বলারও উপায় নেই; বকারও উপায় নেই। ওই একটিই আমার কি না? একটু বকুনি দিলেই মুখ আঁধার হ'য়ে যায়—যেন শ্রাবণের কালো আকাশ। সকালবেলাটা ছাত্রীদের নিয়েই আমি ব্যস্ত। তারপর সারাদিন কাটে কলেজে। বিকেলে যখন বাড়ী ফিরি, ও যায় তখন পার্কে। ঝিয়ের সঙ্গে বেড়াতে। সন্ধ্যে হ'লেই ঘুমে নেতিয়ে পড়ে। কতটুকু সময়ই বা বাবিল পায় ওর মাকে? ওই তো একরত্তি মেয়ে। এই আশ্বিনে সবে পাঁচে পা দিয়েছে। যাক্—বাবিলের প্রসঙ্গ।

ভেবেছিলুম, যাদের নিয়ে কাটে আমার সারাদিন, তাদের নিয়েই ভরাব এ ডায়েরীর পাতা। কিনেছিলেম সেইজন্যই। মানে আমি উদ্ভিদের কথা বলছিলুম। কিন্তু তা আর হ'ল কৈ। বরং গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে এসে দু' চারটে সুখ-দুঃখের কথা বলি কেমন?

স্বামীটি কিন্তু আমার বড় বেশী প্র্যাকটিক্যাল। ওঁকে নিয়ে আর পারিনে বাপু। পতি পরম গুরু। পতি নিন্দে শুনে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আমি তাই করতে বসেছি। তা আর কি হবে? আমি তো আর অন্য কাউকে মুখ ফুটে বলতে যাইনি। বলেছি, আমারই এই কালো ডায়েরীটাকে। বাড়ীর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে উনি নাক গলাবেন। এ আমার ভারী অসহ্য! ব্যাটাছেলে থাকবে ব্যাটাছেলের মত। মেয়েছেলের ব্যাপারে এত কৌতূহল কেন? একটি নয়া পয়সারও তার কাছে হিসেব চাই। পয়সাটাই কেবল চিনেছেন। স্ত্রীকে চিনতে শেখেননি। নিজে রোজগার করে এনে দিচ্ছি গুচ্ছেরখানিক টাকা। তাতেই এই! ভাগ্যিস্ নোলক-পরা গ্রাম্য-বালিকা নই। তাহ'লে যে কি দুর্ভোগই হ'ত!

সত্যি কথা বলতে কি ওঁকে আমি ভালবাসতে পারিনি একফোঁটাও। তবে কেন বিয়ে করেছিলুম? করিনি—হ'য়েছিল। বাবা-মা দিয়েছিলেন তাই। আমি তো ঠিক করেই রেখেছি বাবিলকে আর নিজে বিয়ে দোব না। ও যাকে পছন্দ করবে, তারই সাথে বিয়ে দোব আমি। ওর বাবা যা খুশি বলুন। মেয়েকে আমার ইচ্ছেমত মানুষ করব। মেয়ের সুখই আমাদের সুখ।

ফোন এসেছে আমার। এইমাত্র বেয়ারাটা এসে বলে গেল। যাই দেখি, কে আবার ফোন করলে। উনি খুব অসুস্থ হ'য়ে নাকি বাড়ী ফিরেছেন। তাই আমায় যেতে বললেন এক্ষুনি। ব'য়ে গেছে আমার যেতে। এখনও দুটো ক্লাস করা বাকী। একটা ১৪ নম্বর বি, আর একটা ২৩ নম্বর এ। উনি তো মদ খেয়ে বাড়ী ফিরেছেন। সে আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। এ অভ্যেসটাও ওঁর বহুদিন থেকে। আমি কোনদিনই বাধা দিইনি অবশ্য। আমার কিসের মাথাব্যথা? যার মনে যা চায় করুক। আমি কে এ সংসারের? এসেছিলুম শুধু এঁদের টাকা এনে দিতে। আর? আর আমায় বাবা মায়ের কথার মর্যাদা রাখতে। বাইরেটা আমার বড্ড নির্মম, বড্ড নিষ্ঠুর তাই নয়? জানি। আমি নিজেই উপলব্ধি করছি। কিন্তু কত দাগা পেয়ে এ ভীষণ আমির সৃষ্টি? লিখবো আজ সব কথা। আর চাপতে পারছি না। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। যৌবন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তার জ্বালা গেছে রেখে।

ওর নাম আমি বলতে পারব না। ওর নাম লুটিয়ে ফেলেছি আমি। হারিয়ে ফেলেছি আমি। আর খুঁজতেও চাইনে। এই ভাখো, তার কথা বলতে গেলে আমি যেন কেমন হ'য়ে পড়ি। ভুলে যাই আমি একজনের স্ত্রী একজনের মা। ও ছিল আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। পরে হ'য়েছিল কলেজ-জীবনের বন্ধু। তারও পরে হ'তে চেয়েছিলুম আমরা জীবনসঙ্গিনী। ওর চেহারা ছিল অপূর্ব্ব। আমার স্বামীর যেমন দৈত্যের মত চেহারা; ওর তেমন নয়। ওর কাজল চোখে ছিল নতুন দিনের স্বপ্নের ইসারা। ওর চোখের দিকে চেয়ে আমি ভুলে যেতুম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আরও কত কি মনে হ'ত।

থাক্ ওসব ছেলেমানুষী। সে সব কাব্য করার বয়েস কি আর আছে? না আছে আমার কলমের জোর? লিখতে গেলে সব ফুরিয়ে যায়। ছাত্রী, কলেজ আর একগাদা বই—সেই কথাই মনে হয় শুধু। তবু ওর একটা কথা আমি ভুলতে পারিনি। প্রায়ই মনে পড়ে। ও বলেছিল, তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। আর কিছু বলেনি ও। বাক্য বাকির

নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেই আর্শির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি আমার প্রতিবিম্বটাকে। কপালের চামড়া কুঁচকে এসেছে। তবু রূপ যায়নি হয়ত ওর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে মন আমার। কি জানি! ভাবতেও তো হাসি পায়। বুড়ো বয়েসে আবার এসব ছেলেমানুষী কেন? আমার সমস্ত মন জুড়ে যেন ওরই আসন পাতা। আমি কিন্তু অস্বীকার করতে পারিনে এ সত্বাকে। ও আর এসেছে! আমার সব যে ফুরিয়ে গেল! শেষ মুহূর্তে এসে পাবে আমার অস্থি। নাঃ। আমি এত সেন্টিমেন্টাল কেন? আমি যেন ভুলে যাচ্ছি—আমি একজন বোটানীর প্রফেসর। এবারে উঠি। বেল বেজে উঠল। এক্ষুনি দৌড়তে হবে ১৪ নম্বর-এ।

অনেকদিন পর লিখছি। মাঝে ডায়েরীটা হারিয়ে গেছিল। হারিয়ে ঠিক যায়নি। কলেজে আমারই ড্রয়ারে ভুল করে ফেলে রেখেছিলুম। বাড়ীতে তো আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। ভয়ই হচ্ছিল, ওঁর হাতে না পৌঁছোয়। আমি বাবিলের বাবার কথা বলছিলুম। যে সন্দেহ মন! মানুষটাকে নিয়ে যে আমি কি অশান্তিতেই থাকি। এই ডায়েরী ওঁর হাতে পড়লে আর রক্ষে থাকত না! চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় তুলতেন। বলতেন, কে তোমার সেই মনের মানুষ? ঠিকানা কি তার বল? ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার কথা তো অনেক। ডায়েরীর এই কটা পাতাতে কি আর কুলোবে? বলছিলুম কি, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতাকে বাদ দিয়েই লিখব। কিন্তু আবার রোজকার একঘেয়ে সাধারণ ঘটনার ভিতরেই অনেক অসাধারণ ঘটনা ঘটে যায়। তাদের ছাঁটখাট করে লেখাও তো সম্ভব নয়। তার চাইতে বরং একজনের কাহিনীর মত করেই লিখবো আমার ডায়েরী। সন, তারিখ এসবের প্রয়োজন কি? আজ আর লিখব না। থাক্। এ ক'লাইন লিখেই হাঁপিয়ে পড়েছি। শরীরটা বড্ড খারাপ।

দুমাস পর আমি কলেজে এসেছি। আমার জীবনের উপর দিয়ে একটা বিরাট ঝড় ব'য়ে গেল। ছাত্রীরা বলছে, আমার চেহারাটা কেন এত রুক্ষ লাগছে? আমি কেমন ক'রে বলব' ওদের এ কথা? আমার সব ওলোট পালোট হ'য়ে গেল! বলতে গেল সুরু হ'ল এক নতুন অধ্যায়। এবারে আমি একা। বাবিল আমায় ছেড়ে চলে গেছে। বাবিল আর কোনদিন ফিরে আসবে না। ওকে আমি নিজে হাতে ছাই করে দিয়ে এলেম কেওড়াতলায়। মৃত্যুর পরেও ওর চোখের কোণে শুকিয়ে ছিল জল। বাবিল বড় অভিমানী। মায়ের উপরে কি তীব্র অভিমান তার। মাকে একলা ফেলে রেখে তাই সে চলে গেছে। আমার বাড়ী এখন শূন্য। ছুটীর পর বাড়ী ফেরার নেশা আমার কেটেছে। ইচ্ছে করে রাতটাও কাটিয়ে যাই কলেজের ল্যাব্রেটরীতে।

কিন্তু, না। আমি গৃহস্থঘরের বধূ। সংসার চেয়ে রয়েছে আমারই প্রতীক্ষায়। সে অহরহ ডাকছে আমায়। প্রতি মুহূর্তে আমায় স্মরণ করিয়ে দেয়—স্বামী আছে ঘরে। তাই তো ক্লান্ত দেহে, মনে, টলতে টলতে ফিরে যাই আমারই বাড়ীর দরজায়। কিন্তু আমার মন ভরিয়ে দেয় কে? যাঁর জন্য আমি সে তো বেহুঁশ, মাতাল। সারা ঘরে মদের উগ্র গন্ধ। মিটসেফটা [illegible] গেল ব্রাণ্ডির শিশিতে। নিকুচি করেছে। কবে যে চোখ বুজে শান্তি পাব। এত শিগগিরই মৃত্যুর কপাল করে আসিনি আমি। কি অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন উনি। কিছু বলতে গেলেই অশান্তি। তার চেয়ে চুপ করে পড়ে থাকা ভাল। টাকার গদিতেই বসে রইলুম—সুখ নেই আমার।

আগে বাবিলটা বেঁচে থাকতে বাড়ী ফেরার জন্য মনটা ছটফট করে উঠত। স্নেহের একটা আকর্ষণ থাকে। অনেকটা চুম্বকের শক্তির মত। কিন্তু যেখানে স্নেহ নেই, প্রেম নেই সেখানে বন্ধনটাও নিরর্থক। স্বামী আমায় ভালবাসে না। আমিও না। মনে হয়, আর কেন? বাবিল নেই। গ্রন্থি গেছে আলগা হ'য়ে। এবারে আমি পালাই। কিন্তু তা আর হয় কৈ। অনেকে বলছেন, যান কাশীতে ঘুরে আসুন। আমি বলেছি, এই বোটানীর ল্যাব্রেটরীই আমার কাশী, আমার তীর্থ। একটা রক্তজবা ছিঁড়ে এনেছিলুম গাছ থেকে। ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়ে এসেছিল বুঝতে। কোনটি গর্ভকোষ, কোনটি কি একটি একটি করে বুঝিয়ে দিলেম ওকে। বেশ লাগল' মেয়েটিকে। মুখের আদলটি অনেকটা আমার বাবিলেরই মত। মনটা যেন কেমন ক'রে উঠেছিল' ওর মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু আমি তো প্রফেসর আর ওরা ছাত্রী। মধ্যখানে দূরত্বের ব্যবধান রাখাই ভাল। আমার দুর্ব্বলতায় ওরা পেয়ে বসবে আমাকে। প্রশ্রয় দোব' কেন ওদের?

পুজোর সানাই বেজে উঠল। কলেজে মাসখানেকের ছুটী। ঘরে বসে সময় আর কাটে না। বাবিল থাকলে আমায় জ্বালাতন করে মারত'। মা, আমায় এটা দাও, সেটা দাও। আমার ডলের হাত ভেঙে গেছে। হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর একটা ডল কিনে দাও। আরও কত কি বলত। বাবিল। কিন্তু আজ আর বিরক্ত করে না কেউ। এখন আমার সত্যিই ছুটি। ডায়েরীর অর্দ্ধেকটা জায়গা বাবিলের কথাতেই ভরে যায়। তা যাক্। নিজের কথা আর কি লিখব'। এই তো গতবারের পূজোর ছুটীতে—কি কাণ্ডই না বাধিয়েছিল বাবিলটা। কার বাড়ীর একটা হ্যাংলা কুকুরকে কান ধরে টেনে এনে বলেছিল, এর একটা নাইলনের জামা করে দাও না। ঠিক আমার মত। সে কি কান্না আমার মেয়ের। কিন্তু তা কি আর দিই। কত টফি, কত বিস্কুট দিয়ে তবে থামিয়েছিলেম ওর কান্না। মরুগ গে! বাবিলের কথা আর আমি ভাবব না। আমায় কাঁদিয়ে ও দিব্যি চলে গেল। আচ্ছা বাবিল আজ কোথায়? ও কি আবার জন্ম নিয়েছে? আমি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নই। যারা বলে, Death is nothing, but a transformation of our body from this world to heaven. তাদের কথাকে আমি মেনে নিতে রাজী নই। বাবিল আমার কাছেই আছে। বাবিলের আত্মাটা ঘুরছে আমার আশেপাশে। এ মাকে ছাড়া বাবিল যে কিছুই জানত না। অন্য কারুর ঘরে জন্ম নিয়ে অন্য কাউকে মা বলতে পারবে না ও। ও যে আমার বুকচেরা ধন। আমার চেয়ে এত বেশী করে আর কে জানে ওকে। ঘুমুলে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

বাবিলের চলে যাওয়ার আগের ছোট্ট শেষের নিঃশ্বাসটুকু বুকে বাজে। এটা ওর ঘর। ওর ঘরে বসেই আমি লিখছি। এই আলনা, এই পুতুল, এই খেলাঘর সবই রয়েছে। নেই শুধু সেই—যার জন্য এত আয়োজন। ভাবছি, ওর একটা মডেল গড়াব'। সেটিকে রেখে দোব আমার ল্যাব্রেটরীতে। ভাবব, আমার পিঠের

…ছ ও দাঁড়িয়ে। বলছে, মা! কখন শেষ হবে তোমার পড়া? …মার যে ঘুম পেয়েছে। আমি বলব সোনা মেয়ে আমার! এক্ষুণি শেষ হবে মা। ধ্যেৎ! এসব কি বলছি আমি? …চ কাজ আমার। এক গাদা লতা, পাতা পড়ে আছে টেবিলে। …, চলি। প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আসন্ন। ছাত্রীরা আসবে …তে। তার আগে আমারও তো একটু পড়াশুনো করতে হবে।

আমি ডায়েরীতে শেষ আঁচড় দিয়েছিলুম এক বছর আগে। …রিখের বালাই নেই আমার। আমি আন্দাজেই বলছি। আমি …ন্ত কলকাতা থেকে বহু দূরে। বদ্রিনাথের মন্দিরে বসে লিখছি। …রের নীল আকাশ, নীচে বয়ে যায় অলকানন্দার জল, সবই সত্যি। সত্যি নই এই আমি; এই বোটানীর প্রফেসার। সিঁদুর নেই …থিতে। ধুয়ে ফেলেছি। জল নেই চোখে। আমি মুছে ফেলেছি। …মী আমার জীবিত। তবু আমি অস্বীকার করি তার অস্তিত্ব। …জানি আমি যেন দিন দিন কেমন হ'য়ে যাচ্ছি। এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করে চলে এলুম সব ছেড়ে দিয়ে। কলেজ, ছাত্রী, স্বামী, ঘর কেউই …মায় পারলে না বাঁধতে। আগেই বলেছি, স্বামীকে ভালবাসতে …রিনি একফোঁটা। কেবল সাতপাকেই জড়িয়েছিল আমায়।

আমি সতী নই। যে নারী বিবাহিত জীবনেও চিন্তা করে অন্য …ষকে, সে কি করে সতী হয়? বাবিলকে পেয়ে কতকটা …সেছিলুম ওকে। কিন্তু, বাবিল। না থাক। কলেজ করতে …রতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তুম। কেন জানি মনে …ত ওর আসার সময় হ'য়ে এল। ও যে বলেছিল, একদিন ও …সবে। আমাদের আবার দেখা হবে। আয়নার দিকে চেয়ে …থতুম, চুলগুলো সব সাদা। আর কবে আসবে ও? আশ্চর্য …ন্দর, তবু সুন্দর আমি। এ রূপ দিয়ে কি হবে আমার? একদিন …রিয়ে পড়লেম পথে। কিসের আকর্ষণে? জানিনে। ওসব …বান্তর জিজ্ঞাসা। না, কোন আকর্ষণে নয়। কাউকে খুঁজতে নয়। …কেবলমাত্র আমার পুরোন আমিটাকে আমার করে রাখবার চেষ্টায়। …মার কোন কাজ নেই আজ। ছুটী—দীর্ঘ ছুটী। কয়েকটা টাকা …নেছিলাম। যতদিন না ফুরোয় চলুক। তারপর? ভেবে দেখিনি।

অলকানন্দায় স্নান সেরে এলুম। একটিমাত্র জবাবে এতদিনের …তীক্ষার সমাপ্তি ঘটালুম। বুঝতে পাচ্ছি না কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল। …ক—ভূমিকা ছেড়ে আসল কথায় আসি। ডায়েরীটা যেন আমার …থী। আমার নিঃসঙ্গ জীবনকে ভরিয়ে তুলেছে ও। হঠাৎ দেখা …লুম তাকে। কোথায়? মন্দিরে ফেরার পথে। এতদিন ধরে যাকে …মনা করেছিলেম মনে মনে—তাকে দেখলেম। ঋষির মত ধ্যান …ভীর রূপ তার। পরনে গৈরিকবসন। আমি স্তব্ধ। বলেছিল …র সাথে যেতে কৈলাসে। কিন্তু এখানেও যে লতা, পাতা। কাঁটানটে …থ আগলে দাঁড়াল। আমি বললেম, না। আমি বোটানীর প্রফেসর।

## চলন্তিকার পথে

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

### আভা পাকড়াশী

এদিকে রাত বেশ গভীর হয়েছে ভদ্রমহিলার স্বামীর নাসিকা গর্জ্জনও শুনতে পাচ্ছি। বিকেলে দেখেছি মহিলাটি সুন্দরী। …বলে ব্যাপার সুবিধের বুঝছি না। সজাগ থাক। এ বাঙাল আর হিন্দীয় সংমিশ্রণে উপদেশ বর্ষণের বহর শুনে হাসতে হাসতে আমার ঘুম তখন চটেই গিয়েছিল। বুঝলাম সাধুজী আগে বসন রাঙিয়েছেন এবার মন রাঙানোতে মন দিয়েছেন। আমরা দু'জন সশঙ্কিত মনে জেগেই রইলাম কখন বা যোগী মত্ত বা, মত বা, করে চেঁচিয়ে উঠতে হয় এই জন্য।

সকালে উঠেই আবার ঐ ক'জন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। কিন্তু ওদের সংখ্যা কম দেখে জিজ্ঞেস করলাম বাকি ক'জন কোথায়? এখনো ঘুমচ্ছে নাকি?

নাঃ তারা ফিরে গেছে। কিছুতেই আর তাদের ধরে রাখা গেল না। বলে গেছে হরিদ্বারের গীতা ভবনে অপেক্ষা করবে ওরা। ভারী কষ্ট হল ওদের জন্য আ-হা এতটা এসে শেষে কিনা ফিরে গেল?

ওরা বলে, হ্যাঁ সকালে একজন বাঙ্গালী সাধু বললেন, বুঝলাম কে—আগে নাকি ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন ক'দিন এখানেই থাকতে হবে নাহলে ফিরে যেতে হবে। অনেক যাত্রী নাকি ফিরে গেছে। তাই তাই আরও ভয় পেয়ে চলে গেল ওরা।

আমি বলি হ্যাঁ একথা আমিও শুনেছি, তবে আমরা ঠিক করেছি শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে যাব।

ওরা বলে তবে আমরাও তাই করব। ওরা যে চারজন রইল তাদের নাম যথাক্রমে বিমল, কালোবরণ, দীপ্তিকা আর নব।

ওদের চার বন্ধুর জায়গায় আমরা চারজন সামিল হয়েছি। তাতে ওদের লাভ হল কিনা জানিনা, তবে আমার ত হল। তখনও এগিয়ে গেলেও আমাকে আর একা পথ হাঁটতে হচ্ছে না। তা ছাড়া গল্প করতে করতে করতে হাঁটার দরুণ পথের ক্লান্তিও অনেক কম লাগছে। মজাদার গল্প শুনে ছেলেরাও মজা পাচ্ছে। তবে ঐ নুড়ি ভর্তি পথের জন্য সবসময় চক্ষু দুটি সজাগ রাখতে হচ্ছে, না হলেই আছাড় খেতে হবে। অথচ পাহাড়ী মেয়েরা মাথায় পর পর তিনটে গাগরী বসিয়ে, ছেলে কোলে নিয়ে, ইয়াক তাড়াতে তাড়াতে অনায়াসে তরতর করে নেমে চলেছে ঐ গড়ানে পথ দিয়ে। সত্যিই ওরা পর্ব্বত দুহিতা। দুপুরে পৌছলাম পাণ্ডুকেশ্বর চটিতে। বেশ বড় চটি। ওরা এতদিন ওদের সঙ্গের কুলি যা বেঁধে দিচ্ছিল তাই খাচ্ছিল। ওদের কুলিটা ভাল জাতের। তাই চটিবালারা আপত্তি তোলেনি। তাই শুনে আমি আরও বললাম তাহলে না হয় এক কাজ করা যাক, তোমাদের যতটা জিনিষ-লাগে তোমরা কিনে আন আমাদেরটা আমরা কিনি, তারপর রান্নাটা একসঙ্গেই না হয় হোক। ওদের চারজনের তো মহা ফুর্ত্তি! বাঃ অনেকদিন পর ভাল রান্না খেয়ে বাঁচা যাবে। মহা উৎসাহ সকলের। আমি বলি আমি রাঁধব আর আর সবাই যে বসে থাকবে, সে হবেনা। সবাই কাজ কর।

যো হুকুম। কালোবরণ খুব ভাল উনুন ধরাতে পারে, ধোঁয়া টোঁয়া না বের করেই পাঁচ মিনিটে উনুন ধরিয়ে ফেলল, নব বসল আলু ছাড়াতে। ওদের কুলি চোনসিং গেল মশলা পিষে আনতে আর দীপ্তিকা আর বিমল বসল আমার ষ্টোভটা নিয়ে ঠিক করতে। ও এনে দিল জল। আর সেই জ্বলন্ত উনুনে আমি চাপালাম মস্ত এক হাঁড়ি ভাত। ঠিক যেন পিকনিক করা হচ্ছে

স্নান হচ্ছে আশ্চর্য্য স্টোভটা পাঁচ মিনিটেই চালু করে দিল ওরা। তাতে চড়ল ভাজা মুগের ডাল আর হল আলু পিঁয়াজ চচ্চড়ি। মহা মুস্কিল ডাল আর গলে না। সব তৈরী, এখন ডালটা নামলেই হয়। সকলের পেটেই তখন ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে। শেষপর্য্যন্ত টাইকো সোডার গোটাকতক ট্যাবলেট ছেড়ে দিয়ে ডাল সেদ্ধ হল। তার সঙ্গে ছিল আমার তৈরী আমের চাটনি। সবাই গোল হয়ে বসে এক সঙ্গে খাওয়া হল। এত খাওয়া হল যে শেষ পর্য্যন্ত ওদের চোনসিং-এর ভাতই কম পড়ে গেল। সে বেচারী আবার আটা এনে রুটি বানাল। আমাকে অবশ্য আর কাঠের কালি তুলে বাসন মাজতে হল না, ওদের ঐ চোনসিং-এর কল্যাণে।

ঘণ্টা দুই পরই আবার হণ্টনের জন্য তৈরী হতে হল। দেখলাম আমারই মত ওদেরও পায়ের অবস্থা সঙ্গীন। বিমলেরও পায়ের পাঁচটা আঙুলেই ফোস্কা পড়ে একেবারে জুড়ে গেছে। সে বেচারীর জুতো-জোড়া আবার কেদারে হারিয়ে গেছে। ওদেরই কারুর একজোড়া ফালতু জুতো পেয়েছে, সেটা আবার মাপে ছোট। তার জন্যে কোন আক্ষেপ নেই। আমার মতই মলম দিয়ে তারপর ন্যাকড়া জড়িয়ে জুতো পরে পথ হাঁটছে অম্লান বদনে। এখানে আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে চাও জুটে গেল বরাতে। ওরা সবাই ঐ ভরপেট খেয়েও আবার বার বার চা খেয়ে কদিনের চায়ের তৃষ্ণা মেটাল। আমরাও খেলাম নাহলে ছাড়বে কেন ওরা। ভারী অমায়িক স্বভাব ওদের। হঠাৎ যেন পথের মাঝে চারটি ভাই পেয়ে গেলাম। এই পাণ্ডুকেশ্বরে পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তী দেবী আর পাণ্ডুরাজার বেশ বড় বড় মন্দির আছে। এখান থেকে অনেক যাত্রী আমাদের সামনে দিয়েই ফিরে গেল, বলল আপনারাও ফিরুন মিছি মিছি আর এগোবেন না। বদ্রী যাবার পথ বন্ধ।

ওর চিরকালই একটা অদ্ভুত মনের জোর আছে, তাতেই ও নিজে নিঃশঙ্ক চিত্তে এগিয়ে চলে আর আমারও ওর ওপর নির্ভর করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কেমন যেন মনে হয়, ও যখন বলছে তখন সেটা হবেই। এ পথেও তাই হল এত লোকের এত বারণ না মেনে ও গোঁ ভরে ছেলে দুটি নিয়ে এগিয়ে চলল। বলল এসেছি যখন শেষ-পর্য্যন্ত দেখব। এতটা এসে ফিরে যাব না কোন মতেই। আমাদের বলল তোমরা এসো আমি এগোলাম, দেখি রাত্রের একটা আশ্রয় যদি কোনরকমে জোটাতে পারি। ওর সঙ্গে কালোবরণ চলে গেল। সেও খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে।

বেশ বড় একটি ঝরনা পড়ল এই পথে। পথের শোভা বেশ সুন্দর। মাঝে মাঝে অলকানন্দার হাতছানিও আছে। যেন লুকোচুরি খেলছেন আমাদের সঙ্গে। কোথাও গর্জ্জন শুনছি, অথচ নদীর দেখা নেই। যেন ছোট্ট শিশুর মত শব্দ সৃষ্টি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা। আমরা বাঙালী জাত সব চেয়ে ভালবাসি বোধ হয় নদী। জগতে সব জায়গাতেই সব প্রাচীন সভ্যতার পত্তন হয়েছে এই নদীর তীরেই। নদীই হল আমাদের মা, জীবনদায়িনী। সমুদ্রেই হয়তো নদীর শেষ পরিণতি আর ঐ নীলাম্বুকে আমরা দর্শন করে বিপুল আনন্দও পাই, কিন্তু একথা সত্য যে সমুদ্র যেন আমাদের শিক্ষাগুরু আর নদীই হল আমাদের আত্মার আত্মীয়া মাতৃরূপে সংস্থিতা, তার কোলে আমরা নিশ্চিন্তে বসবাস করি, অবশ্য প্রলয় প্লাবন না হলে।

এবার দীপ্তিশ বলে, কি এত ভাবছেন বৌদি?

আমার মনের কথা শুনে বেশ একটি গান ধরে ওরা তিনজনে। ধীরে ধীরেই এগিয়ে চলেছি বদ্রীর শেষ চটি হনুমান চটির দিকে। সকালের দিকে আমার পা চলে জোর কদমে, কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পর তার গতি হয়ে যায় ঢিমে তেতালা। এইখান দিয়েই পথ রয়েছে লোকপাল হয়ে নন্দনকাননে যাবার। ঐ দুর্গম পাহাড়ের ওপর এই স্বর্গোদ্যান কেউ সৃষ্টি করেনি। ওটি সত্যিকারের ভগবানেরই অপরূপ সৃষ্টি। হরেক রকম নাম না জানা ফুলে ফলে ভরা নাকি ঐ বাগান। পারিজাতও আছে ওর মধ্যে তবে ফুল তোলা বারণ। যে তুলবে তার নাকি বিপদ অনিবার্য্য। তবে এই স্বর্গোদ্যানের যা শোভা শুনেছি, মানুষের পক্ষে বোধ হয় লোভ সংবরণ করা সম্ভব হয় না। একজন মেমসাহেব একবার লুকিয়ে একটি সর্পগন্ধার চারা নিয়ে যাচ্ছিলেন বিলেতের মাটিতে উপস্থিত করার জন্য, কিন্তু ঐ পথের শেষেই খাদে পড়ে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। বড় লোভ হচ্ছিল ঐ দেব দুর্লভ উদ্যানটি দেখার, ভাবলাম ফেরার পথে বলব না হয় ওকে।

বিমল বলে জানেন বৌদি, আমার মনে হয় সত্যভামা আর রুক্মিণীর সেই পারিজাত ফুলের জন্য ঝগড়াটা মোটেই অসমীচীন হয়নি—

হেসে বলি, কেন বলত?

বলে, মনে হচ্ছে নারদের কুটিলতার চেয়ে ঐ ফুলের আকর্ষণটাই ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধের কারণ ঘটিয়েছিল বেশী। চারদিক তাকিয়ে দেখুন কত সুন্দর সুন্দর ফুল, পারিজাত তো নিঃসন্দেহে এই সবগুলোর থেকে অনেক সুন্দর। তবে কে বলতে পারে, হয়তো এরই মধ্যে কয়েকটা নাগকেশর, সর্পগন্ধা বা পারিজাত লুকিয়ে নেই। সবাই হেসে উঠি আমরা, এই পরিবেশে ওর কথা নেহাৎ মিথ্যে বলে মনে হয় না। ভাবি হতেও পারে—ভারী সুন্দর ফুলের শোভা এই পথে।

সন্ধ্যের আগে আগেই পৌঁছে গেলাম হনুমান চটিতে। পাণ্ডুকেশ্বর থেকে হনুমান চটি পুরো ছয় মাইল। আবার যোশীমঠ থেকে পাণ্ডুকেশ্বর ছিল সাত মাইল দূর। আমরা রোজই এমনি বার-চোদ্দ মাইল পথ হাঁটছি। সেই কেদার থেকেই এমনি চলেছে ওপথে কখন কখন ষোল-সতের মাইলও হেঁটেছি আমরা। এখানে পৌঁছে একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম ওদের। ভীষণ ঠাণ্ডা। চাপ চাপ বরফ জমে আছে এখানে-সেখানে। এখান থেকে বদ্রী মাত্র পাঁচ মাইল দূর। বহু যাত্রী জমে গেছে সেই বদ্রীনাথের বংশীবাদক মূর্ত্তিখানি দেখার আগ্রহে। সামনে আর পথ নেই। সকলেই বলছে তারা নাকি বার-চৌদ্দ দিন হল অপেক্ষা করে বসে আছে এখানে পিসু আর মাছির কামড় খেয়েও। এইটুকু ছোট চটিতে এত লোক জমে যাবার দরুণ দারুণ খাদ্যাভাব আর স্থানাভাব হয়েছে। ও ঘর না পেয়ে অনেক বলে-কয়ে P. W. Dর লোকেদের কাছ থেকে একটা তাঁবু পাবার আশা পেয়েছে। সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে আছে দেখে রাজী হয়েছে ওরা একটা তাঁবু দিতে। গরম গরম লুচি ভাজিয়ে ও ছেলেদের তক্ষুনি খাইয়ে দিয়ে আমরাও খেয়ে নিলাম এ সঙ্গে। এ পথে কোথাও ভাল ঘি পাই নি। সব জায়গাতেই আছে আসলি বনস্পতি মানে দালদা। সুতরাং সেই বস্তুতে ভর্জিত লুচি ঠাণ্ডা হলেই হয়ে যায় এক-একখানি টিনের

তি। আর আছে একমাস কি তারও আগে ভাজা বিনা নের শর্করপারা মানে ময়দার গজা। কাউকে ছুঁড়ে মারলে নিশ্চিত মাথা ফেটে যাবে। সুতরাং যা পারা যায় গরম ই উদরস্থ করা গেল।

কিন্তু কালোবরণ আমাদের সঙ্গী মানুষ সে বলল, এই সবে সন্ধ্যে এখন থেকে খেয়ে নিলে রাত্রে নির্ঘাত ক্ষিধে বে। খানকতক থাক না হয় রাত্রের জন্য।

দোকানদারও বলল, যা নেবেন এখনই নিয়ে নিন বাবু এই মাথা-টার তালটি ফুরোলেই শেষ, আর আটা নেই।

সবাই দেখলাম মুড়ি খেয়ে পড়ে লুচি কিনতে ব্যস্ত। এত ঠাণ্ডা ত পা জমে যাবার জোগাড়, কিন্তু চা নেই। কি যে কষ্ট হচ্ছিল।

দীপ্তিশ বলে, ঘাবড়াবেন না বৌদি ঠিক চা খাওয়াব দেখবেন।

এখন ওর সঙ্গে সকলেই সেই তাঁবুটির জন্য ছুটোছুটি করতে য়। ওরা চারজনেই বলছে, দোহাই বৌদি, আমাদেরও পনাদের ঐ তাঁবুর একপাশে একটু স্থান দেবেন দয়া করে।

আমি বলি, দাঁড়াও বাপু আগে জোগাড়ই হোক তাঁবু।

ছেলেদের নিয়ে সেই দোকানের উনুনের সামনে বসে আছি। ত্যই কাঠের অভাব, কিছুক্ষণের মধ্যেই উনুনও নিবে গেল। দিকে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে আসছে। যা-কিছু ম জামা কাপড় ছিল সব ওদের দু'জনের গায় জড়িয়েছি। এমন ওদের চারজনের ওয়াটার প্রুফ পর্যন্ত।

ছুটে এলো বিমল। আসুন বৌদি তাঁবু খাটান হচ্ছে। সত্যিই দা আমাদের জোগাড়ে আছেন। বাবা বদ্রীনারায়ণ খুব সময়ে পনাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, না হলে তো এই বরফের মধ্যে ইরে পড়ে থেকে আজকেই আমাদের তুষার সমাধি হয়ে যেত।

আমি বলি, বাঃ তা কেন? হয়ত তোমরাও তোমাদের বন্ধুদের পন্থা অনুসরণ করতে। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

হাসছে ওরা। চললাম রাত্রের ডেরায়। ওমা এ যে ভীষণ টি তাঁবু, তায় মাটির থেকে আধ হাত প্রমাণ উঁচু। আর তার মধ্যে য়ে বয়ে যাচ্ছে হিমপ্রবাহ। এদিকে জমিটা ভিজে সপ সপ করছে। খানে নাকি চাষীরা আলুর বিচন দিয়েছে। কি হবে এখন? এই মেঝেতেই তো শুতে হবে? ছেলেদুটোর যে সদ্য নিমোনিয়া ধরবে।

আমার কথা শুনে ধমকে ওঠে ও, বলে, তবু তো মাথার ওপর আচ্ছাদন জুটিয়ে দিয়েছি। অন্যদের তাইবা জুটেছে কই। সত্যি বচারী অনেক হয়রাণ হয়ে তবে এই তাঁবুটি জোগাড় করতে ক্ষম হয়েছে, এখন কোথায় একটু বাহবা পাবে তা নয়। আমার এমনি কথা শুনে রাগ ত হবেই।

এবার ওদের চারবন্ধুকে বলি, দেখ বাপু তোমরা এই তাবুর চার ধারের এই ফাঁক বন্ধ করা, আর মেঝেটার একটা ব্যবস্থা করে ফেল, তবেই এই দাদুর দস্তানায় স্থান হবে তোমাদের।

মহা উৎসাহে লেগে পড়ল ওরা। বেরুল আমার শাড়ী ওদের লুঙ্গি, তোয়ালে এই সব, সেগুলো সেফটিপিন আর ছুঁচ সুতো দিয়ে জুড়ে তাঁবুর চারদিকে ঘিরে দেওয়া হল। আর ভিজে মাটি সকলের ওয়াটারপ্রুফ আর কোম্বলে চাপা পড়ল, কিন্তু আলো? কুপি মোমবাতি সব নিবে যাচ্ছে হাওয়ার চোটে। আবার এক ঝটকা হাওয়া হুস করে যে অত কষ্ট করে চাপা দেওয়া শাড়ী লুঙ্গির ঘেরাটোপ ফ্ল্যাগের মত ফর ফর করে উড়তে লাগল। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরে ভেতরে কোথাও কিছু দেখাও যাচ্ছে না। নব আর দীপ্তিশ মাফলার গায় কম্বল জড়িয়ে বেরুল আবার বাইরে। এবার কতকগুলো পাথরের টুকরো আর বরফের চাই দিয়ে বাইরে থেকে চেপে দেওয়া হল সেই শাড়ী লুঙ্গির ঘেরকে।

বন্ধ হল বাতাস তারপর ভেতরে ঢুকে টর্চের কাঁচ খুলে সেটাকে জ্বালিয়ে ওরা টাঙিয়ে দিল তাঁবুর ঠিক মাঝখানে। এবার চারজনে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, দেখুন দাদা, দেখুন বৌদি, ইলেকট্রিক লাইটশুদ্ধ ফিট করে দিয়েছি আর আমরা নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু। ওরই মধ্যে দু ভাগে বিছানা পাতা হল। একদিকে ওরা, একদিকে আমরা। তারপরে শুধু ওরাই নয়, আমাদের দুই কুলিও এসে ঢুকল ঐ দেড়গজি তাঁবুর মধ্যে। ওদের কুলি ব্যারাকেও নাকি ন স্থানং তিলধারণের অবস্থা, অল্প সময় ওরা সেখানেই থাকে। মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠের কেমন যেন একটা গমগম ধ্বনি উঠছে, সব কিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে আসছে জয় বাবা বদরী বিশাল কি জয়। কেদারের পথের সেই জয় কেদারনাথজী কি জয়, এখন এই জয় বাবা বদরী বিশালে পর্য্যবসিত হয়েছে যাত্রীদের মুখে। কারণ এ পথের ত্রাণকর্ত্তা যে তিনিই। খানিক বাদে লক্ষ্য করলাম চোন সিং আর দীপ্তিশ নেই তাঁবুতে। ওরা আবার গেল কোথায়? আমরা তো ছেলে দুটি নিয়ে 'এ সঙ্কীর্ণ' বিছানাতেই গুটিসুটি হয়ে ঢুকে পড়েছি এরই মধ্যে। [ক্রমশঃ।

# ছায়া দোলে

## অপরাজিতা গোহ

আজ সকাল থেকে যতবার শুভময়ের কথা মনে হয়েছে, ততবারই তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অনিমেষ রায়। এই শুভ মুহূর্তেও সে তাকে ছেড়ে দেবে না, শুভময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকেছে। পিছন ফিরে বসেই অনুভব করতে পারছে বিশাখা, শুভময় বোধ হয় জামা ছাড়ছে। সিল্কের পাঞ্জাবী ছেড়ে এবার সহজ হবার চেষ্টা করবে। কিন্তু অনিমেষ তার চিরপরিচিত পোষাকে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিশাখার। তার গায়ের মিষ্টি গন্ধটা যেন এখনও স্পষ্ট। তার শিউলি ফুলের মত রঙ আর গম্ভীর কণ্ঠস্বর কালকে দেখা বা শোনা জিনিষের মত উজ্জ্বল। বেল ফুল আর যুঁইফুল আজ ঘরটাকে যেন স্বপ্নময় মাৎ করে তুলেছে। মুসৌরীতেও অনেক ফুল ছিল হোটেল 'বিউটি'র বাগানে। তবে সিজন্ ফ্লাওয়ার আর গাঁদার ভীড়, তার মাঝে ছিল দু'একটা গোলাপ। ফুল তোলা ছিল সেখানে নিষিদ্ধ। কিন্তু অনিমেষ অবজ্ঞা এ আইন মানতো না। প্রথম যেদিন অনিমেষকে বিশাখা দেখে ছিল, বিস্ময়ের আর আনন্দের একটা অদ্ভুত ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এই বাগানের মধ্যেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। প্রথমে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয়নি যে, কলকাতার বিখ্যাত অভিনেতা অনিমেষ রায়কে মুখোমুখি দেখবে বিশাখা। তের বছর বয়স থেকে যাকে ধ্যান করেছে সে, তিনি আজ এসে দাঁড়ালেন বিশাখার সামনে। তার কুড়ি বছরের জীবনে আর কোন পুরুষই এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কি এক অসীম উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল বিশাখার সমস্ত অন্তর।

"আপনারা কোলকাতা থেকে আসছেন?" অনিমেষ রায় প্রথম কথা বলেছিল। বুকের উঠাপড়া চাপা দিতে কথার উত্তর দিতে পারেনি সে, ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"আপনি কার সঙ্গে এসেছেন?"

"বাবা আর মায়ের সঙ্গে।"

"তবে ত' একেবারে বন্ধ হয়েই এসেছেন।" হাসলো অনিমেষ। অবাক হয়ে গেছলো বিশাখা।

"এ কথার অর্থ?"

"এই বেড়ানো, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি সব মত নিয়ে তাঁদের সঙ্গে করতে হবে, আর কি!" আবার হাসলো সে।

তখন আর কোন কথার উত্তর দেয়নি বিশাখা। অনিমেষও সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

পিঠের উপর একটা স্পর্শ অনুভব করলো বিশাখা। অনিমেষ!

শুভময় কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি বিশাখা। এমনি করে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে তাকে স্পর্শ করেছিল অনিমেষ রায় এক সুন্দর সন্ধ্যায়। সেদিন বাবা আর মা বেরিয়েছিল, সে যায়নি ইচ্ছে করেই। কারণ বাবা মা তাকে অনিমেষের দৃষ্টি থেকে আগলে রেখেছিল। সে অনিমেষের সঙ্গে একটু কথা বলতে চেয়েছিল। মাকে বলেছিল তার ভীষণ শরীর খারাপ, সে ঘরে শুয়ে থাকবে, কোথাও যাবে না। কিন্তু বাবা মা হোটেল পার হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। হোটেল 'বিউটি'র অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে বাগানে এসেছিল। অনিমেষ ঠিক তাকে দেখতে পেয়েছিল। অদৃশ্য থাকতে বিশাখাও চায়নি, 'দৃশ্য' হতেই সে চেয়েছিল। চুপি চুপি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ যেন দেখতে পেয়েছে তেমনি ভাবে বললো বিশাখা, "বেড়াতে যাননি?"

"আপনি যাবেন না জানতুম কিনা!" আরও ঘন হয়ে এগিয়ে এল। এর আগে আরও দু' তিনবার কথাবার্ত্তা হয়েছে বটে, তবে এবারের মত এমন ভয়াবহ কোনদিনই অনিমেষ রায় হয়নি। ভয় পেয়েছিল বিশাখা। সরে গেছলো তার কাছ থেকে।

"ভয় পেলেন বুঝি?" আরও হাসলো সে।

চুপ করেছিল বিশাখা।

ভয় পেলে জীবন আরও ছোট হয়ে যায়; তাকে বেড়া দিয়ে বেঁধে রাখলে জীবন কোনদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠে না। ভয় ভয় করে দিন কেটে যাবে।

হয়ত তখন তার কথার মধ্যে নীতিজ্ঞান ছিল না, তবু তার কথা একটা আবেগ সৃষ্টি করেছিল। সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় ছিল না, মুখ দেখা যাচ্ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে হাত রেখেছিল অনিমেষ। শুভময় এখনও দাঁড়িয়ে আছে, শুধু কথা বলতে চায়, কিন্তু তারও হাত কাঁপছে বুঝতে পাচ্ছে বিশাখা। অনিমেষ ছিল ভয়ঙ্কর স্মার্ট। তার সবেতেই ছিল বাড়াবাড়ি। পরের দিন বিকেলে বেড়াতে যাবার কথা নিয়ে তবে রেহাই দিয়েছিল বিশাখাকে।

"বিশাখা! মৃদু স্বর। কে অনিমেষ! না শুভময়। আশ্চর্য্য মিল দুই ডাকের মধ্যে। মাকে আর বাবাকে ঠকিয়ে পালিয়েছিল বিশাখা সেদিন। দু'জনের দুটো ঘোড়া ঠিক করে পাহাড়ের পথ বেয়ে ছুটেছিল তারা। সেই সময়ের হাওয়া আর ধুলো এখনও যেন তার মুখে এসে লাগছে। তারপর যখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল, ম্যালের রাস্তার বাঁধানো জায়গায় একটায় গিয়ে বসলো দু'জনে। দূরে ডেরাডুনের আলোগুলো দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট বাড়ীও বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। আকাশে চাঁদও ছিল বোধ হয়। একটা হাত তুলে নিয়ে মৃদু স্বরে এমনি করে অনিমেষ ডেকেছিল। কোন কথা ছিল না। একটা ভয়ঙ্কর আনন্দের অনুভূতি তার হৃদয়ে এনে দিয়েছিল সুতীব্র বেদনাবোধ। চোখের পাতা জলের ভারে বন্ধ হয়ে আসছিল। গলা কান্নায় বুজে এসেছিল। আরও সরে এসেছিল অনিমেষ, একটা হাত তার কাঁধের উপর দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। কান্নার আবেগে দেহ ফুলে ফুলে উঠছিল। চোখের জলে মুখ ভেসে যাচ্ছিল।

"বিশাখা!" উত্তেজিত কণ্ঠ বেশ জোর ছিল।

চমকে উঠলো বিশাখা। শুভময় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। অনিমেষও অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল তার কান্না শুনে।

"কাঁদছো কেন?"

"তুমি ভাবতেও পারো না আমাদের প্রেমের পরিণতি। তুমি বিবাহিত! বাড়ী গিয়ে ইুডিওর ভীড়ে একটিবার মনেও করবে না আমার কথা। মনে পড়লেও হয়ত একবার হাসবে। আর আমার কথা একবার ভেবেছে? এই পাঁচদিনের আনন্দ সারা জীবনের চোখের জল হয়ে থাকবে।" কান্নাতে অর্দ্ধেক কথা শোনা গিয়েছিল, অর্দ্ধেক চাপা পড়ে গিয়েছিল। তবু এই কথাই বলতে চেয়ে ছিল বিশাখা।

"তোমার এত দুঃখ পাবার কি আছে। একে জীবনের আনন্দের স্মৃতি করে রাখবে, দুঃখ কেন পাবে? এখানের পরিচয় আমরা এখানেই রেখে যাব। কোনদিন আর এর রেশ টানতে যাব না। একে জাগাতে গেলেই ত দুঃখ।"

"তুমি পুরুষ, তুমি যা পার আমরা মেয়ে হয়ে তা পারি না। তোমাকে দোষ আমি দিতে চাই না, দোষ কারুরই না। বোধ হয় আমার ভাগ্যের। তোমার দেখা না পেলে আমার জীবনে হয়ত এতটা ওলোটপালোট হ'ত না। তোমার প্রতি আকর্ষণ আমার মনেই থাকতো।" এবারে কান্না মুছে নিয়ে এল নিদারুণ স্তব্ধতা।

"জীবনে যা পেলে তাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করো! দুঃখকে ডেকে আন কেন?" বিষাদ হয়ে গেল অনিমেষের কণ্ঠ।

আবার কান্না এলো বিশাখার। অনিমেষের বুকে মুখ লুকিয়ে দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল সে।

রাস্তার লোক কি দেখেছিল? কে জানে! শীতের রাত, লোকজন কম ছিল, দেখলেও খেয়াল ছিল না বিশাখার।

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে শুভময়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বিশাখার। এতক্ষণ যাকে সে অনিমেষের আলিঙ্গন বলে মনে করেছিল তা শুভময় ছাড়া কেউ নয়। সইতে পা'চ্ছে না বিশাখা, শুভময়কে বিশ্রী লাগছে তার। কিন্তু আরও জোরে ধরেছে শুভময়, ছাড়িয়ে নেবার পথ নেই। মুখটা দু'হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিল শুভময়। নববধূর লজ্জা আছে সে জানে। তার মুখের দিকে তাকালো বিশাখা। বিস্মিত হয়ে গেল সে। এ যে অনিমেষের মুখের ছায়া! অনিমেষ আজ নূতন বেশে তার কাছে! অনিমেষ··এবারে ধরা দিল বিশাখা। মধুর অনুভূতিতে তার শরীর ভরে গেল।

# জন ষ্টাইনবেক

**সুনীলকুমার নাগ**

গত পঁচিশ বছরে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রে বৈষয়িক দিকে যেমন বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে, ঠিক তেমনি শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে উন্নতি ও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক সাহিত্যসেবী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন এবং সরাসরি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই হ'ক বা অনুবাদের মাধ্যমেই হ'ক, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্য, বিশেষ করে গল্প এবং উপন্যাসের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর সাহিত্যরসিক সমাজ কমবেশী পরিচিত হয়েছেন। শুধু পরিচিত হয়েছেন বললে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হয় না, বরং বলতে হয়, প্রভাবিত হয়েছেন। কারণ, এই সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটেছে অন্তত দশজন প্রথম শ্রেণীর লেখকের এবং তার মধ্যে তিনজন—পার্ল বাক, উইলিয়াম ফক্‌নার এবং আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে তো নোবেল পুরস্কারই পেয়েছেন। সিনক্লেয়ার লুই নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন এঁদেরও আগে। সাহিত্য এবং সভ্যতার ইতিহাসে পঁচিশটা বছর কিছুই নয়, কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের যে অগ্রগতি ঘটেছে, যুক্তরাষ্ট্রের যারা বন্ধু নন, তাঁরাও তার তারিফ না করে পারেন না।

জন ষ্টাইনবেক নোবেল পুরস্কার পাননি এখনো, কখনো পাবেন কি না তা' নিয়ে গবেষণা করেও লাভ নেই বা তার স্থানও এ নয়, তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আধুনিক মার্কিণ সাহিত্যের দশজন, এমন কি পাঁচজন প্রথম সারির জীবিত লেখকের নাম করতে হ'লেও ষ্টাইনবেককে বাদ দেওয়া যায় না। পনেরো কি কুড়ি বছর আগে খাস আমেরিকায় যাঁরা ঘোরতর ষ্টাইনবেক বিরোধী ছিলেন, আজকের দিনে দেখা যায় তাঁদের বেশির ভাগেরই সুর শুধু নরম হয়নি, তাঁরা রীতিমতো ষ্টাইনবেক-ভক্ত হয়ে উঠেছেন। এটা একটা তাজ্জব ব্যাপার নিশ্চয়ই। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা হয়েছে এবং ষ্টাইনবেক-এর তরফ থেকে কোনো রকম প্রোপাগাণ্ডা না হওয়া সত্ত্বেও হয়েছে। এটা যে সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাঠক এবং সমালোচকের মনে জীবন সম্পর্কে নব-লব্ধ অভিজ্ঞতার চাপ। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই যে পরিবর্তন এটা অনিবার্য ভাবেই ঘটেছে, এ ছাড়া আর কিছু হতে পারতো না। লেখক হিসেবে এইখানেই ষ্টাইনবেকের শ্রেষ্ঠত্ব যে কালের ঝড়-ঝাপটা সামলেও তিনি শুধু টিকে আছেন তাই নয়, পাঠক সাধারণের রুচিতে তিনি বেশ একটা লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

লেখক হিসেবে ষ্টাইনবেককে বিভিন্ন সময়ে যে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা' ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এতো মিথ্যে, এতো সুপরিকল্পিত বিরোধিতা এবং অপ্রীতিকর পরিবেশে বোধ হয় অনেকে লেখাই ছেড়ে দিতেন! কিম্বা, অন্তত: পক্ষে নিজের বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে এবং আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে স্রোতের দিকে গা এলিয়ে দিতেন। কিন্তু ষ্টাইনবেক এ সমস্ত কিছুই করলেন না। মানুষের চিন্তার দৈন্ত দেখে দুঃখিত হলেন, ব্যথিত হলেন, কিন্তু দমলেন না। এক সময় শোনা গেলো অনেকে বলছেন, ষ্টাইনবেক একজন পাক্কা কম্যুনিষ্ট, আর কম্যুনিষ্টরা বলতে লাগলেন যে ভদ্রলোক শোধনবাদী। আবার আর এক সময় (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি) শোনা গেলো একদল বলছেন যে ষ্টাইনবেক নাৎসী-দরদী! কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! যে সময় দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ বিদেশের মাটিতে নাৎসীদের উৎখাত করবার জন্যে সর্বস্ব পণ

করে লড়ছে ঠিক সেই সময় নাৎসী দরদী আখ্যা লাভ করাটা নিতান্তই বেদনা দায়ক। কিন্তু এ অবস্থা থেকে নাৎসীরাই যা হ'ক রক্ষে করলেন ষ্টাইনবেককে। কারণ, ওঁরা বলতে আরম্ভ করলেন যে: ষ্টাইনবেক লোকটা একজন খাঁটি ইহুদী। ষ্টাইনবেক যা হ'ক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যে এর পর আর যাই হ'ক নাৎসী-দরদী এ কথা কেউ বলবে না। কারণ, একজন ইহুদীর পক্ষে কোনো প্রকারেই নাৎসী-দরদী হওয়া সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য, ষ্টাইনবেক মোটেই ইহুদী নয়।

ষ্টাইনবেক তা' হ'লে কি? নিছক একজন কাহিনীকার? মোটেই তা' নয়। ওঁর যে কোনো দু'খানা উপন্যাস পাঠ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে ষ্টাইনবেক জীবনে একটা দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে চলেন এবং কাহিনী ছাড়াও আরো অনেক কিছুই থাকে ওঁর রচনায়, তা সে উপন্যাসই হ'ক আর গল্পই হ'ক। সাধারণ লেখকদের মতো প্রেম বা প্রেম-কেন্দ্রিক মানসিক জটিলতার বিশদ বিশ্লেষণের মধ্যে ষ্টাইনবেক তাঁর কোনো কাহিনীই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব—অনেক সমস্যাই অধিকার করে আছে তাঁর গল্প এবং উপন্যাসের বেশির ভাগ পৃষ্ঠা। এবং এদিক থেকে ভেবে দেখলে মনে হয়, এ যুগের অনেক লেখকের চাইতেই ষ্টাইনবেক মানুষ এবং সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালনে সর্বদা তৎপর।

জন ষ্টাইনবেকের (জন্ম ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২) বর্তমানে একষট্টি বছর চলছে। ওঁর বাবা জন আর্নেষ্ট সামান্য সরকারী চাকুরী করতেন, মা ছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা। ষ্টাইনবেকের পিতৃকুল এসেছিলেন জর্মনী থেকে এবং মাতৃকুল আয়র্লণ্ড থেকে। আমেরিকার নানা জায়গা ঘুরবার পর ষ্টাইনবেক পরিবার ক্যালিফর্ণিয়ারই স্যালিন্যাস-এ এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে লাগলেন। ষ্টাইনবেকের জন্ম এই স্যালিনাসেই। ষ্টাইনবেক তাঁর স্কুলের পড়াশুনোও শেষ করলেন এইখানেই। স্কুলের বাঁধাধরা পড়াশুনো বা অন্য কোনো দিকেই বালক ষ্টাইনবেকের মধ্যে তেমন কোনো বিশিষ্টতা কারো চোখে পড়েনি। তবে জলজীব সম্পর্কে ওঁর কিছুটা আগ্রহের কথা অনেক মাষ্টার মশায় বলতেন।

স্কুলের পড়া শেষ হবার পর দেখা গেলো ষ্টাইনবেক ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করছেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে উনি কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হননি বা পরীক্ষাও দেননি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি আদায় করে ষ্টাইনবেক মোট চার বছর প্রাণি-বিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনলেন। বিশেষ করে সামুদ্রিক প্রাণি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে। সামুদ্রিক জীবদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করবার জন্যে কিশোর এবং যুবক ষ্টাইনবেককে অনেক দিন সমুদ্রতীরে কাটাতে হয়েছে।

স্কুল ছাড়বার পর একদিকে যেমন প্রাণি-বিজ্ঞান পড়তে লাগলেন ষ্টাইনবেক আর একদিকে সুরু হলো কাজকর্মের চেষ্টা। পর পর সাত রকমের কাজের চেষ্টা করলেন উনি, কিন্তু কোনোটাতেই মন বসলো না। অযোগ্যতার দায়ে চাকুরীও গেলো একাধিকবার। এক এক করে বলা যাক। প্রথমেই নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্রের রিপোর্টারের চাকুরী নিলেন ষ্টাইনবেক। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ চাকুরীটা গেলো। কাগজের কর্তৃপক্ষের অভিযোগ: তোমার কাজ তথ্য সংগ্রহ করা এবং সরবরাহ করা, কিন্তু তা' না করে তুমি ক্রমাগতই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ঘটনার উপর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছো। ষ্টাইনবেক চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না কাগজের মালিককে খুশী করতে। এর পরেই এক বিখ্যাত স্থপতির শিক্ষানবীশ হয়ে গেলেন ষ্টাইনবেক। এ কাজটাও মাস কয়েক করবার পর ছেড়ে দিলেন উনি। এর পর একটা বছর কাটলো আরো দু' রকম কাজে—একজন শিল্পীর শিক্ষানবিশী এবং ছোট একটি প্রতিষ্ঠানে কেমিষ্টের কাজ।

পর পর এতোগুলি কাজে ব্যর্থতার জন্যে যুবক ষ্টাইনবেক এবার রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়লেন নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। আমেরিকা একটা এমন দেশ যেখানে উদ্যোগী মানুষের জন্যে জীবিকার নানা পথ খোলা রয়েছে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, অধিকাংশ ছেলেরাই স্কুলের পড়া কিছুদূর এগোবার পরেই ভবিষ্যৎ জীবিকার ব্যাপারে নিজেকে তৈরী করতে আরম্ভ করেছে। বলাই বাহুল্য, ওদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাটাও এ কাজের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্কুলের পড়া শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো ছেলের পেশা কি হবে বা হতে পারে, সে বিষয়ে অভিভাবকদের ভাবতে হয় না। সমস্যাটা দেখা দেয় কাজ জোগাড় করার ব্যাপারে। একটা কাজ জোগাড় করাই যেখানে সমস্যা, সেখানে পর পর চারটে কাজ জোগাড় হ'লো অথচ কোথায়ও টিঁকে থাকতে পারছেন না ষ্টাইনবেক, এটা দেখে ওঁর আত্মীয়-স্বজনেরাও বেশ একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। বেশি দিন অবশ্য বেকার থাকতে হলো না ষ্টাইনবেককে কিছু দিনের মধ্যেই আর একটা চাকুরী জোগাড় হয়ে গেলো। লেক তাহো এষ্টেট নামে বিরাট একটা সম্পত্তির কেয়ারটেকারের চাকুরী জুটে গেলো। এটা হ'লো ষ্টাইনবেকের পঞ্চম চাকুরী। এর পরেও আরো দুটো চাকুরী করলেন উনি। একটা হ'লো সার্ভেয়ারের কাজ আর অপরটা ফলবাগানের তদারকী। সাহিত্যচর্চা পেশা করে নেবার আগে এতো বিভিন্ন রকমের কাজ করতে হয়েছে ষ্টাইনবেককে।

কোন এক মহাপুরুষ যেন বলে গেছেন যে প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই মূল্যবান, প্রশ্নটা হ'চ্ছে কে কার অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে কাজে লাগাবে। কথাটা যে কতো সত্যি ষ্টাইনবেকের মতো তা বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না। স্কুল ম্যাগাজিনেও অবশ্য একাধিক রচনা বেরিয়েছিল ষ্টাইনবেকের, কিন্তু সে কিছুই নয়। সাহিত্যিক হবার কোনো বাসনা বা দুঃসাহস সে সময়ে নিশ্চয়ই ছিল না ওঁর। কিন্তু পর পর চারটে চাকুরী চলে যাবার পর এষ্টেটের কেয়ারটেকারের চাকুরীটা জোগাড় হতে ষ্টাইনবেক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ, এ চাকুরীতে প্রচুর অবসর আর দ্বিতীয়ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঠোকাঠুকির সম্ভাবনা অনেকটা কমে গেলো। তাঁরা চাইছিলেন একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী, এ ব্যাপারে কয়েকদিনের মধ্যেই ষ্টাইনবেক তাঁর মালিকদের আস্থাভাজন হয়ে উঠলেন। কেমিষ্টের চাকুরীটা করবার সময়ই মাঝে মাঝে লেখার কথা মনে হয়েছে ষ্টাইনবেকের। কিন্তু সে সময়ে সাহিত্যচর্চা করবার মতো ফুরসৎ ছিল না ওঁর। এষ্টেটের কেয়ারটেকারের চাকুরীতে ঢুকবার পর উনি এবার লেখা আরম্ভ করলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে। এ সময়ে ষ্টাইনবেকের বয়স ছিলো চব্বিশ পঁচিশ বছর। লেখা আরম্ভ করে উনি দেখলেন যে পূর্বের ব্যর্থতাগুলির

মধ্যে অকল্পনীয় সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ সমস্ত কাজকর্মের সময় আমেরিকার সাধারণ মানুষের প্রায় প্রতিটি স্তরের সঙ্গেই কম বেশি পরিচয় ঘটেছে। এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন ষ্টাইনবেক। পর পর অনেকগুলি ছোটো গল্প এবং দু'খানা উপন্যাস রচনা করলেন উনি। ওঁর প্রথম উপন্যাস "কাপ অব গোল্ড" (১৯২৯) যখন প্রকাশিত হলো তখন ষ্টাইনবেকের বয়স সাতাশ। তিন বছর পর ছোটো গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো: "দি প্যাসাচিওরস অব হেভেন"। এর পরের বছর বেরুলো ষ্টাইনবেকের দ্বিতীয় উপন্যাস: "টু এ গড আননোন"। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনখানা বইই সাহিত্যের বিচারে ব্যর্থ হলো, এবং বৈষয়িক দিক দিয়েও প্রকাশকের মোটারকমের লোকসান হয়ে গেলো।

পাঠক, সমালোচক বা প্রকাশক, কারো দিক থেকেই কিছুমাত্র উৎসাহজনক সাড়াশব্দ না শোনা গেলেও ষ্টাইনবেক পূর্ণোদ্যমে লিখে যেতে লাগলেন। ভেতরে ভেতরে একটা আশ্চর্য রকমের শক্তি অনুভব করতে লাগলেন উনি। ওর মনে হ'লো, যে সমস্ত চিন্তা মনে আসছে একদিন না একদিন মানুষের তা নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। কাজেই অবিশ্রান্ত ভাবে কলম চালাতে লাগলেন ষ্টাইনবেক।

নিজের শক্তি সামর্থ্যের ওপর এই যে একটা আপাতঃ দৃষ্টিতে অহেতুক আস্থা এর পেছনে অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো। প্রথম বইখানা প্রকাশিত হবার কিছুদিন আগে থেকেই ষ্টাইনবেক একটি মেয়ের সংস্পর্শে আসেন। মেয়েটির নাম ক্যারল। 'কাপ অব গোল্ড' প্রকাশিত হবার পরের বছর ক্যারলকেই বিয়ে করলেন ষ্টাইনবেক। ষ্টাইনবেকের জীবনে ক্যারলের প্রভাব এক কথায় অসামান্য। সমস্ত দিকে ব্যর্থতা যখন ওঁকে ঘিরে ধরেছিল অনশন, অর্দ্ধাশন যে সময় ওঁর প্রত্যহের সঙ্গী, সেই সময়ে এই তরুণী বান্ধবী রূপে, স্ত্রী রূপে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তরুণ ষ্টাইনবেককে, শুধু বাঁচিয়ে রাখেননি, নিজের শক্তির ওপর আস্থা রাখতে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে এবং সংগ্রাম করতে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাই দেখা যায়, অনেক আশা ভরসা নিয়ে পর পর তিনখানা বই লিখে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ষ্টাইনবেক সুখী। ব্যক্তিগত জীবনে সুখী। ক্যারলকে নিয়ে সুখী।

ষ্টাইনবেকের প্রথম উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বোম্বেটে হেনরী মরগ্যান-এর জীবন নিয়ে এ উপন্যাস রচিত। প্রচুর হানাহানি-মারামারি-কাটাকাটি লুঠতরাজ এ উপন্যাসের পাতায় পাতায় দেখা যায়। পরবর্তীকালে ষ্টাইনবেকের একাধিক লেখায় নরহত্যার ব্যাপার দেখা গেছে তা ঠিক, কিন্তু ঠিক এ ধরনের নয়। লেখক হিসাবে যে বিশিষ্টতার জন্য ষ্টাইনবেক স্বনামধন্য হয়েছেন তার কোন লক্ষণই ওঁর এই প্রথম উপন্যাসে দেখা যাবে না। হেনরী মরগ্যানের কমবেশী জানা জীবন কাহিনীর মধ্যে অবশ্য একটি নারীর জীবন জড়িত হয়ে আছে। ষ্টাইনবেকের লেখায় এই নারীর চরিত্রটি স্পষ্টতর হয়েছে মাত্র, তা' ছাড়া আর কিছু নয়। হেনরী তার দস্যুপনা দিয়ে ইসোবেলকে অভিভূত করে রাখতে চায়। ও বলে—দেখো, এই পৃথিবীটা আমাকে শেষ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর। অন্ধের মতো কিছু দেখবার শক্তি নেই, মস্তিষ্কহীনের মতো কিছু ভাববে না, হৃদয়হীনের মতো কিছু অনুভব করবার বালাই নেই, আছে শুধু ঈর্ষা আর ঘৃণা, আর একটা বিশ্রী কৌতূহল, কোথেকে আমার টাকা আসছে, কোথেকে আসছে আমার সম্পদ তাই নিয়ে একটা বিরক্তি ঘটানো। তাই বলছিলাম, বুঝলে, একটা পোকা মারলে যেমন দোষ হয় না, কারণ মহৎ কিছু বুঝবার ক্ষমতা নেই ওর তেমনি যারা ঐ পোকার মতো সেই মানুষদের ক্ষতি করলেও তাতে দোষের কিছু হয় না, সেটা কোনো ক্ষতিই নয়। কিছুটা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নারী ইসোবেলকে এ সব কথা বলে অবশ্য হেনরী মোটেই প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু এই হ'চ্ছে ওর জীবনদর্শন। এ জীবন দর্শনে যেমন আকর্ষণের কিছু নেই, তেমনি রচনাও অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর, তাই এ বই কোনদিনই পাঠক সমাজ গ্রহণ করেন নি।

ষ্টাইনবেকের দ্বিতীয় বই এবং প্রথম গল্পগ্রন্থ "দি প্যাসচিওরস অব হেভেন অবশ্য পরবর্তীকালে অনেকেরই ভালো লেগেছে। ক্যালিফর্ণিয়া অঞ্চলের যে কৃষিশ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কথা লিখে ষ্টাইনবেক নিজেকে সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তার সূত্রপাত হয়েছিলো এই বইয়ের গল্পগুলিতে।

বিখ্যাত হবার পর ষ্টাইনবেকের তৃতীয় বইখানাও অবশ্য কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। "টু এ গড আননোন" যদিও একখানা উপন্যাস, কিন্তু তবু দেখা যায় এর মধ্যে ষ্টাইনবেক রীতিমত একটা নৃতাত্বিক গবেষণা করেছেন। জোসেফ অর্থাৎ এ কাহিনীর নায়ক তার পিতৃকুলের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করে এসে মেক্সিকোর সীমান্তবর্তী একটা অঞ্চলে নিজের বসবাসের জায়গা করে নিলো। সঙ্গে আছে কৃষিকর্মের জন্যে কিছুটা জমি। জোসেফ বাড়ীটা তৈরী করলো বিরাট একটা 'ওক' গাছের তলায়। মেক্সিকানদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ক্রমশঃ ওর মনটা নানা কুসংস্কারে ভরে উঠতে লাগলো। প্রাচীন মেক্সিকানদের মতো ভূত-প্রেত-অপদেবতা প্রভৃতির চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেললো ওকে। যে বিরাট 'ওক' গাছটার তলায় নিজে বাড়ী তৈরী করেছিলো জোসেফ ক্রমশঃ ভাবতে লাগলো যে কৃষিকর্মে ওর যে উন্নতি তার পেছনে ঐ গাছটা, অর্থাৎ গাছটার অধিষ্ঠাতা দেবতার নির্ঘাৎ কোনো হাত আছে। এক সময় দেখা গেলো খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে ও রীতিমতো প্রাচীনপন্থী হয়ে উঠেছে। কুসংস্কারের তাড়নায় চলতে লাগলো ঐ 'ওক' গাছ-রূপী দেবতার পুজা ইত্যাদি। যেমন বিচিত্র ধারণা, তেমনি বিচিত্র তার পুজা পদ্ধতি। এদিকে জমির ফসলও ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। কাজেই 'ওক' গাছের দেবত্ব এখন তর্কের উর্ধ্বে। এদিকে জোসেফ নিজেও অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে এবং স্থানীয় সমাজে ওর রীতিমতো মর্যাদার সৃষ্টি হয়েছে। এমনি সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। জমির ফসল ক্রমশঃ কমে থাকতে লাগলো। জমির উর্বরা শক্তি অব্যাহত রাখতে হলে যে তাতে 'সার' দেওয়া দরকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জোসেফের একবারও মনে হলো না সে কথা। ও নিজের বিচিত্র পদ্ধতিতে মানৎ করে চলতে লাগলো 'ওক' গাছরূপী দেবতার কাছে। কিন্তু তাতে আর কি হবে! শেষে একটা বছর কাটলো একেবারে অনাবৃষ্টির মধ্যে। জমি সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। কোনো মানতেই দেবতার করুণা হলো না দেখে জোসেফের উম্মাদনা দেখা দিলো। কিন্তু তবু বিশ্বাস হারালো না। শেষ পর্যন্ত একদিন দেখা গেলো ঐ 'ওক' গাছের তলাতেই জোসেফ আত্মঘাতী হয়েছে। এই ভাবে নিজের কুসংস্কারের মূল্য দিলো ও।

প্রথম দিকের এই তিনখানা বই নিয়ে সে সময়ে তো কোনো

লাই হয়নি, যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়খানা পরবর্তীকালে রই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু চতুর্থ বই তরতিলা ফ্ল্যাট ৫) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যরসিক ষ্টাইনবেক সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। অবশ্য যে বিশিষ্টতার নি বিশ্ববিখ্যাত তার লেশমাত্র নেই এ বইতে, কিন্তু তবু কিছুটা য়তা অর্জন করলেন ষ্টাইনবেক। এর প্রধান কারণ এ বইয়ের গুণ। অতি সাধারণ শ্রেণীর কতকগুলি লোকের হৈ হুল্লোড়-। ইত্যাদি কেন্দ্র করে রচিত এ উপন্যাস এক সময় মঞ্চস্থ হয়েছিল, তেমন চলেনি। 'তরতিলা ফ্ল্যাট' একটা জায়গার নাম। এ র প্রধান অধিবাসীরা হলো স্পেনীশ, রেড ইণ্ডিয়ান এবং চানদের সংমিশ্রণ সৃষ্ট একটা সংকর শ্রেণীর জন-গোষ্ঠী। এদের জীবন যাত্রাই হলো এ বইয়ের বিষয়বস্তু।

রচনাশৈলী ছাড়াও 'তরতিলা ফ্ল্যাটের' আর একটি দিক ছিলো যে এ বইখানার বিশেষ একটা মূল্য আছে। তা' হলো ঐ মিশ্র গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার কথা। একটা হালকা কাহিনীর মে ষ্টাইনবেক ওদের সমাজ জীবন সম্পর্কে যে আলোকপাত লন, এ উপন্যাসে তা' নিয়ে বেশ একটা আলোচনা সুরু হয়ে ছিল চিন্তাশীল মহলে।

তরতিলা ফ্ল্যাট আধাআধি লেখা হয়ে যাবার পর ষ্টাইনবেক একখানা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এ বইয়ের "ইন ডুবিয়াস ব্যাটল"। "ইন ডুবিয়াস ব্যাটল" প্রকাশিত হলো তলা ফ্ল্যাটের পরের বৎসর। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ রাষ্ট্রের সাহিত্যরসিক সমাজ ষ্টাইনবেক সম্বন্ধে রীতিমত সিরিয়াস উঠলেন। লেখক যদি নিজে সিরিয়াস হন তা' হলে পাঠক, রয়াস না হয়ে পারবেন কি করে? এ একখানা প্রকৃতই সিরিয়াস াস। এ উপন্যাসের একটি চরিত্র (জিম কোয়াট) প্রকাশ্যেই ছ তার মনের কথা। বলছে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক াজিক অবস্থা ওর সর্বনাশ করলো। খাস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জন মার্কিণ নাগরিকের মুখ দিয়ে ঐ ধরণের কথা শোনানোটা চয়ই অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ! কিন্তু এ হেন দুঃসাহসিক কাজ নবেক করলেন। শুধু তাই নয়। 'জিম' কম্যুনিষ্ট পার্টির জন সভ্যও হয়ে গেলো। কম্যুনিষ্ট পার্টিতে ঢুকবার পর তিনজন কের সঙ্গে পরিচয় হ'লো জিমের। একজন ম্যাক, নেতৃস্থানীয় ক্ত, দ্বিতীয় ডিক, কর্মী হিসেবে ততটা দক্ষ নয়, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর; র তৃতীয় জয়। টরগাস ভ্যালীতে ফলবাগানের কর্মচারীরা ধর্মঘট বে মনস্থ করেছে। ম্যাক চলে এলো এখানে, সঙ্গে এলো জিম। ঘটের কাজকর্ম কি ভাবে চালানো হয় তা সব শিখতে হবে ওকে। গাস ভ্যালীতে এসে পৌঁছবার পর আরো দু'জনের সঙ্গে পরিচিত লো ওরা। একজন অল এণ্ডারসন, এ কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য নয়, কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন সমর্থক। তা'ছাড়া আরো একটি চরিত্র আকর্ষণ করে, এর নাম লণ্ডন; লণ্ডন বয়সে এদের চাইতে কিছু এবং স্থানীয় শ্রমিক নেতা।

ধর্মঘট যথা সময়ে আরম্ভ হয়ে গেলো। হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। ল-এর বাবার একটা বিরাট বাগান ছিলো। লণ্ডনের অনুরোধে ক হাজার ধর্মঘটী কর্মচারী ঐ বাগানে আশ্রয় পেলো। ডিক দায়িত্ব লো খাদ্য সরবরাহের, ডাঃ বারটন দায়িত্ব নিলেন স্বাস্থ্যরক্ষার, লণ্ডন-এর একজন সহকর্মী হ'লো ডাকিন। ওরা দু'জনে যুগ্ম ভাবে ধর্মঘটী শ্রমিক সঙ্ঘের কর্ণধার। ফলবাগানের মালিকেরা গোপনে গোপনে চেষ্টা করলো ওদের দু'জনকে হাত করে নিয়ে ধর্মঘট বানচাল করে দিতে। কিন্তু পারলো না। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর লণ্ডন এবং ডাকিন ক্রমাগতই প্রেরণা জোগাতে লাগলো ধর্মঘটী শ্রমিকদের। শ্রমিকদেরও মনোবল অটুট। এমন সময় মালিক পক্ষ ধর্মঘট ভাঙবার জন্যে শহর থেকে ভাড়াটে লোক আমদানী করতে লাগলো। তার পরের ঘটনাগুলি সহজেই অনুমেয়। একদিকে ধর্মঘটী শ্রমিকদল এবং তাদের সমর্থকেরা আর একদিকে ফলবাগানের মালিকপক্ষ এবং তাদের ভাড়াটে লোকজনেরা। কয়েক দিনের মধ্যেই পরিষ্কার দুটো ভাগ হয়ে গেলো। এবং কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে চলতে লাগলো খুনজখমের পর্ব। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী সমর্থনটা সাধারণত মালিকপক্ষের দিকেই থাকে। খোলাখুলিভাবে না হলেও সরকার তার নিষ্ক্রিয়তার দ্বারাই মালিকপক্ষকে প্রচুর সাহায্য করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তাই করলো। কয়েক হাজার মানুষের জীবন-মরণ সংগ্রামে সরকার প্রথমটা একেবারেই দর্শকের ভূমিকা নিয়ে নীরব রইলো। ফলে, মালিকপক্ষ তাদের ভাড়াটে লোকজনের সাহায্যে একটির পর একটি খুন-জখম চালিয়ে যেতে লাগলো। সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে চলতে লাগলো অরাজকতা। অবস্থা যখন চরমে উঠলো তখন সরকার এগিয়ে এলো। সংবাদপত্রে এই ধর্মঘট নিয়ে যে রকম লেখালেখি আরম্ভ হ'লো তাতে এ সময়ে সরকারী হস্তক্ষেপ না হলে ভালোও দেখায় না, তাই আসতে হলো সরকারকে। ইতোমধ্যে জয় খুন হয়েছে, ডাঃ বারটন এবং ডিক নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে; আল এবং জিম গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এবং ডাকিন গ্রেপ্তার হয়েছে; আলের বাবার বাগানের আশ্রয় থেকে ধর্মঘটী শ্রমিকেরা বিতাড়িত হয়েছে।

কাহিনীর প্রায় শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে যে জিম সেরে উঠেছে এবং শ্রমিকেরা তাকে নেতৃপদে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু এতো অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করে, এতো রক্ত এবং অশ্রু ঝরিয়েও শ্রমিকেরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারলো না। জিমও বেশি দিন নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পেলো না। কারণ, কয়েকদিন পরেই দেখা গেলো যে মালিকপক্ষের লোকজনের হাতে ও নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে।

সমগ্রভাবে কাহিনীটি সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে তেমন অসাধারণ কিছু নয়। একদল সমালোচক তো বললেনই যে এরকম উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটা ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে লেখাটা অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের চিত্র এরকম নগ্ন ভাবে আঁকবার কোনো সাহিত্যিক সার্থকতা নেই। একটা ধর্মঘটের কথা কোনো মহৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না, ইত্যাদি। কিন্তু ঠিক এই সমস্ত কারণের জন্যেই অন্য একদল সমালোচকের ভালো লাগলো "ইন ডুবিয়াস ব্যাটল।" তাঁরা বললেন যে এক শ্রেণীর লোককে কখনো কখনো যে প্রতিবাদের চরমপন্থা হিসেবে ধর্মঘট করতে হয়, এইটেই সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে একটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। এ নিয়ে দেশের সরকার এবং সাধারণ নাগরিক সকলেরই চিন্তা করা দরকার। এই উপন্যাসখানার মাধ্যমে সকলকে সেই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে ষ্টাইনবেক একটা সামাজিক কর্তব্য পালন করেছেন, এ জন্যে তিনি ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন। ওঁর লেখার ধারা যে ক্রমশ উন্নত হচ্ছে, চিন্তার

স্বচ্ছতা আসছে, প্রকাশভঙ্গীতে সাবলীলতা বাড়ছে, এ কথা অবশ্য উভয় শ্রেণীর সমালোচকেরাই স্বীকার করলেন। পাঠক সমাজ অবশ্য সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করলো উপন্যাসখানা, কারণ দু' বছরের মধ্যে পর পর কয়েকটি সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দিলো। এবং প্রায় সমস্ত শ্রেণীর পাঠক এবং সমালোচকদের মধ্যেই একটা চাপা গুঞ্জন দেখা দিলো—ভদ্রলোক যেন একটু বেশি শ্রমিক-দরদী; কম্যুনিষ্ট নাকি?

উনিশ শ' সাঁইত্রিশ এবং আটত্রিশ সাল—অর্থাৎ 'ইন ডুবিয়াস ব্যাটল'-এর পরের দু' বছরও একখানা করে নতুন বই বেরুলো 'অব মাইস এণ্ড মেন' একখানা উপন্যাস এবং আটত্রিশ সালে 'দি লঙ ভ্যালী'—কয়েকটি পূর্ব-প্রকাশিত গল্পের সংগ্রহ।

'অব মাইস এণ্ড মেন'-এ কৃষিকর্মজীবী সাধারণ মানুষের জীবনের নানা সমস্যার কথা আছে, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আছে, অল্পবিস্তর প্রেমের চিত্র আছে কিন্তু 'ইন ডুবিয়াস ব্যাটল'-এর মতো প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক সমস্যার অবতারণা করেন নি ষ্টাইনবেক। তাই ব্যক্তিগত ভাবে ষ্টাইনবেক কম্যুনিষ্ট কিনা, সাহিত্যের মাধ্যমে রাজনীতি প্রচার তাঁর উদ্দেশ্য কিনা, এ নিয়ে আলোচনাটা খুব বেশি ছড়ালো না।

'দি লঙ ভ্যালী'র একটি গল্প 'দি রেড পনি' একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কাহিনী। ষ্টাইনবেককে বুঝবার জন্যে এ গল্পটির মূল্য অসাধারণ। আমরা পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

'ইন ডুবিয়াস ব্যাটল'-এর পর দু'টো বছর ষ্টাইনবেকের কাটলো ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে। ওঁর রাজনৈতিক মতামত নিয়ে যদিও অল্পবিস্তর আলোচনা (অর্থাৎ চাপা গুঞ্জন) সমানেই চলতে লাগলো, কিন্তু তার পরেরই দু'খানার জন্যে ষ্টাইনবেক সম্বন্ধে সমালোচক এবং পাঠক মহলে আলোচনা একটু অন্যদিকেও মোড় ঘুরলো।

কিন্তু উনিশ শ' উনচল্লিশ সালে আমেরিকার সাহিত্যের আসরে তোলপাড় সুরু হয়ে গেলো ষ্টাইনবেককে নিয়ে, কারণ এই বছরই ওঁর 'দি গ্রেপস অব র‍্যাথ' প্রকাশিত হ'লো। সমালোচক গাইসমার বলেছেন যে এ উপন্যাসখানা বেরুবার কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে অদ্ভুত সব ব্যাপার হ'তে লাগলো। কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের সরকার নিষিদ্ধ করে দিলেন এ বইখানা। তাঁরা বললেন, এ উপন্যাস পড়লে আমেরিকার জাতীয় চরিত্রে পঙ্কিলতা দেখা দেবে। কিন্তু, আবার আর এক দিকে, অন্য কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের সরকার জনসাধারণকে উৎসাহিত করলেন বইখানা পড়বার জন্যে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বললেন—এ বই পড়লে ক্ষতির কোনই আশঙ্কা নেই, বরং অঞ্চলবিশেষে মার্কিণ দেশে যে কি অত্যাচার-অনাচার-শোষণ এবং অবিচার চলছে মার্কিণ নাগরিকদেরই ওপর সে সম্বন্ধে গোটা দেশের মানুষের ধারণা হওয়া দরকার, এই একখানা বই পড়লেই সে ধারণা যে কোনো লোকের হবে, কাজেই সকলে এ বই পড়ুক এইটেই বাঞ্ছনীয়। যে অঙ্গরাজ্যগুলিতে নিষিদ্ধ করা হ'লো এ বই সেখানে হাজার হাজার কপি চোরাই চালান হয়ে পৌঁছতে লাগলো, আর যে রাজ্যগুলিতে নিষিদ্ধ হ'লো না সেখানে তো লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হ'তে লাগলো স্বাভাবিকভাবেই। মার্কিণ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষি-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এ্যাসোসিয়েটেড ফারমার্স প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে ষ্টাইনবেক একজন পাকা কম্যুনিষ্ট, এঁর 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ' অবিলম্বে গোটা দেশে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যা ছিলো এতোদিন চাপা গুঞ্জন, তা এবার প্রকাশ্যে আলোচিত হ'তে লাগলো। লেখক মহলে, পাঠক মহলে, সমালোচক মহলে এমন কি সরকারের বিভিন্ন মহলেও এ বই নিয়ে জোর আলোচনা চলতে লাগলো। কফিখানা, পানশালা, সাধারণ ব্যবসায়ী মহল, জনসাধারণের তো কথাই নেই। বেশ কয়েকটা বছর যাবৎ ষ্টাইনবেকের নাম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষিত নাগরিকদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। একদল উঁচু গলাতেই বলতে লাগলেন ষ্টাইনবেক কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্টরা ভুরু কোঁচকালেন, কম্যুনিষ্ট? ফু! কম্যুনিষ্ট হওয়া চাট্টিখানি কথা কিনা। ভদ্রলোক বড় জোর একজন শোধনবাদী, অর্থাৎ কিনা রিফর্মিষ্ট। ষ্টাইনবেক দু' পক্ষের কথাই শুনলেন। কোনো জবাব দিলেন না। 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ' প্রকাশিত হবার এক বৎসরের মধ্যে ষ্টাইনবেক রীতিমতো একজন মান্য-গণ্য বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এই সমালোচনা বা সৌভাগ্য এর কোনোটাতেই ওঁর নিজস্ব চরিত্রে কোনো লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনই ঘটাতে পারলো না। একাধিক বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি যখন ওঁর সঙ্গে 'ইণ্টারভিউ' চাইলেন, সবিনয়ে তা' প্রত্যাখ্যান করলেন উনি।

কিন্তু দ্রুত, খুব দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। যা সত্যি, তা আপনার শক্তিতেই মানুষের মনে ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করে নিতে লাগলো। দু' বছরের মধ্যে অনেকে (যাঁদের কোনো মতেই কেউ কম্যুনিষ্ট বলতে পারে না) শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন যে ষ্টাইনবেকের 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ' এক মহান সাহিত্য-সৃষ্টি, 'টম কাকার কুটীর' মার্কিণ সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করে আছে, যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত, এ উপন্যাসও কালে কালে তার পাশেই স্থান পাবে এবং তারই সমান মর্যাদালাভ করবে।

একজন বিখ্যাত চিত্র-প্রযোজক যখন 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ'-এর চিত্রসত্ব কিনলেন তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকায় তখন অনেকেই ভদ্রলোকের বুদ্ধি-বিবেচনা (!) দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বহুল প্রচারিত 'লাইফ' পত্রিকা লিখলেন—এমন কি আছে ও বইতে, যে অতো টাকায় কিনতে হ'ল?

শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো এই চিত্র-প্রযোজক অনেকের চাইতেই অনেক বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। কারণ, প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি ছায়াছবি তুললেন এবং ওঁর কয়েক কোটি টাকা লাভ হ'লো।

লাইফ পত্রিকার ভাষায় কিন্তু অন্য ভাবে আমাদেরও মনে এর পর স্বভাবতই যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা' হ'লো—কি আছে এ বইতে? এবার সেই কথাতেই আসা যাক।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একটা বিরাট অঞ্চল ধুলোর বাটী (dust bowl) নামে পরিচিত। জায়গাটা নেহাৎ কম নয়। রকি পর্বতমালা যেখান থেকে ঢালু হ'তে আরম্ভ করেছে সেইখান থেকে সুরু হয়ে সমগ্র নেব্রাস্কা, কানসাস, ওকলাওমা, টেক্সাস এবং মণ্টানা, ওয়াইওমিং, কলরাডো ও নিউ মেক্সিকোর পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর ও দক্ষিণ ড্যাকোটার পশ্চিমাঞ্চল এই বিরাট অঞ্চলটি জনসাধারণের কাছে 'ধুলোর বাটী' বলে পরিচিত। কেন সে কথাটাও বলা দরকার। পূর্বে অর্থাৎ সভ্য-জগতের অন্তর্ভুক্ত হবার আগেও' বটেই, তার পরেও শতাধিক বৎসর পর্যন্ত এ বিরাট অঞ্চলে মানুষ বলতে একমাত্র রেড
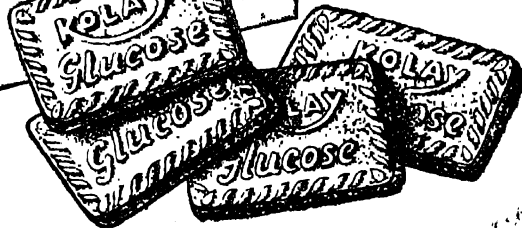
কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY
GLUCOSE
BISCUITS
KOLAY
Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

ইণ্ডিয়ানরাই বসবাস করতো। ওদের প্রধান কাজ ছিলো বাইসন শিকার করা। হাজারে হাজারে বাইসন চরে বেড়াতো এ অঞ্চলে। পরে সভ্য মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এ অঞ্চলটা নির্দিষ্ট করা হ'ল গো-চারণ ভূমি হিসেবে। দীর্ঘদিন এই বিরাট অঞ্চলটির উন্নতির জন্য অন্য কোনো চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই কৃষিকর্মের প্রয়োজনে এ অঞ্চলটা উদ্ধার করবার সুপরিকল্পিত চেষ্টা আরম্ভ হলো। ফাঁকা ফাঁকা ভাবে ছোটো বড়ো কতকগুলি শহর ও জনপদ তা ছাড়া বাদবাকী আর সমস্ত জায়গার জঙ্গল কেটে সাফ করা হলো—এমন কি চাষবাসের প্রয়োজনে ছোটো ছোটো আগাছা এবং ঘাসও তুলে ফেলা হ'ল। তার ফলে শুকনো মাটি ক্রমশ: ধুলোয় পরিণত হতে লাগলো, আর এক দিকে চলতে লাগলো অনাবৃষ্টি। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো যে একটু জোরে হাওয়া বইতে আরম্ভ করলেই ধুলোয় চতুর্দিক একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়, চাই কি ধুলোর ঝড় বইতে থাকে। ওকলাওমা এবং টেক্সাসের অবস্থাই হয়ে উঠলো সব চয়ে শোচনীয়। শত শত বর্গ মাইল জমিতে চাষ বন্ধ হয়ে গেলো। হাজার হাজার ক্ষেতমজুর এবং কৃষি-কর্মী বেকার হয়ে পড়লো। 'দি গ্রেপস অব র‍্যাথ'-এ ষ্টাইনবেক এই রকম দুর্দশাগ্রস্ত একটি পরিবারের কথাই লিখেছেন।

ওকলাওমার জোড পরিবার এক সময় বেশ স্বচ্ছলই ছিলো। নিজেদের জমি ছিলো কিছু। কিন্তু কালক্রমে জমি-জমা হারাতে হ'লো ওদের। কাজেই জীবিকা নির্বাহের জন্যে জোড পরিবারের ছেলেদের এখন দিনমজুরী করতে হয়। ধুলোর বাটী অঞ্চলে যে জায়গাতে ওরা বসবাস করতো সেখানে (এবং আরো অনেক জায়গাতেই) অনাবৃষ্টি এবং ধুলোর উপদ্রবের জন্যে চাষের কাজ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। প্রায়ই বেকার বসে থাকতে হয় ওদের। ফলে অনশন এবং অর্ধাশনে কাতর হয়ে জোড পরিবার মনস্থ করলো ও অঞ্চল ছেড়ে দেবে। চলে আসবে ক্যালিফোর্ণিয়ায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার উর্বর জমিতে চাষ-আবাদ বিশেষ করে ফলের বাগানের কাজ সহজেই জুটে যাবার সম্ভাবনা। মজুরীও নাকি ওখানকার ফলবাগানের মালিকেরা ভালোই দেয় শোনা যায়। কাজেই অনেকদিনের পুরনো, জরাজীর্ণ একটা ট্রাকে করে জোড পরিবার ধুলোর রাজ্য ছেড়ে শস্যশ্যামল ক্যালিফোর্ণিয়ার দিকে, আশায় বুক বেঁধে রওনা হ'লো।

উনিশ শ' চল্লিশ সালে পুলিৎসার পুরস্কারপ্রাপ্ত ষ্টাইনবেকের এই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কাহিনী এতো শাখাপ্রশাখা সংবলিত, প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব এতো চিন্তা এবং সমস্যা রয়েছে যে সংক্ষেপে বলতে যাওয়ার অনেক অসুবিধে। কারণ, এ বইতে রয়েছে অনেকগুলি চরিত্র, অসংখ্য ঘটনা—যার প্রায় প্রত্যেকটি মূল কাহিনীকে প্রভাবিত করছে। কাজেই মহান লেখকের প্রতি কিছুটা অবিচার হবে এটা ধরে নিয়েই মোটামুটি ভাবে মূল কাহিনীটি বলতে গেলে এই রকম দাঁড়াবে।—ধুলোর রাজ্য ছেড়ে ভাঙা ট্রাকে করে জোড পরিবার রওনা হলো ক্যালিফোর্ণিয়ার উদ্দেশ্যে। গ্র্যানপা এবং গ্র্যানমা, পরিবারের বুড়ো-বুড়ী দু'জন পথেই মারা গেলো: আর একজন, নোয়া গেলো নিরুদ্দিষ্ট হয়ে। পথের নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত যা হ'ক ক্যালিফোর্ণিয়ায় পৌঁছলো ওরা। পরিবারটির এখন কর্তাব্যক্তি দু'জন —খুড়ো জন এবং পা জোড্। খুড়ো জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত, একটু নিরিবিলি থাকতে চায়, পা নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে; কাজেই পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়েছে মা জোডের ওপর। নতুন জায়গায় এসে কি করে পরিবারটি দাঁড়াতে পারে কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মা সারাক্ষণ সেই চিন্তায় বিভোর; টম, অল, রোজ, কোনি এবং দু'টি ছোটো ছেলেমেয়ে রুথী এবং উইনফিল্ড, তা'ছাড়া মা, পা এবং জন, এই নিয়ে এখন জোড পরিবার। ধুলোর রাজ্য থেকে ওদের সঙ্গে অন্য একটি লোকও এসেছে, সে হলো জিম কেসী। কেসী আগে পাদ্রী ছিল কিন্তু নানা কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ও এখন সোশ্যালিষ্ট হয়ে গেছে। চার্চের কাজ ছেড়ে ও শ্রমিক আন্দোলন করছে। ক্যালিফোর্ণিয়াতে এসেও ও লেগে গেল এই কাজে।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় পৌঁছবার কয়েকদিনের মধ্যেই জোড পরিবার নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। নতুন জায়গায় অনেক নতুন অসুবিধে দেখা দিতে লাগলো। লেবার কনট্রাক্টর তা ছাড়া স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিরা নতুন লোকদের সহসা সাহায্য করতে প্রস্তুত নয়। কেন এসেছো এখানে, এই এতো দূরে, রাজনীতি করো নাকি, ইত্যাদি সাত-সতেরো রকমের জটিল প্রশ্ন। কেসী গ্রেপ্তার হ'লো; গর্ভবতী কোনি পালিয়ে গেল। অনশন-কাতর জোড পরিবার আশ্রয় নিলো সরকারী ক্যাম্পে। এক ফলবাগানের মালিকপক্ষের লোকজনের গুলিতে কেসী নিহত হলো, টম হত্যা করল কেসীর হত্যাকারীকে। ইতোমধ্যে ওরা কয়েকজন একটা ফলবাগানে কাজ পেয়েছিলো। কিন্তু পর পর দুটো খুনের পর জোড পরিবারের গা ঢাকা দেওয়া ছাড়া আর উপায় রইলো না। আত্মগোপন করা অবস্থাতেই টম কাজ নিলো একটা তুলো বাগানে। ক্যালিফোর্ণিয়ার জীবন সম্পর্কেও হতাশ হয়ে মা শেষ পর্যন্ত টমকে বাইরে পাঠিয়ে দিলো এবং কেসীর অসমাপ্ত শ্রমিক-সংগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিজে। এই হ'লো মোটামুটি ভাবে ষ্টাইনবেকের "দি গ্রেপস অব র‍্যাথ"-এর কাহিনী সূত্র। এ বইয়ের প্রতিটি ছত্রে ষ্টাইনবেক যে বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং যে ভাবে উদ্বৃত্ত হয়ে জমিহারা বাস্তুহারা শ্রমজীবীদের জীবনকে আধুনিক পৃথিবীর সভ্য সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

ধুলোর রাজ্য এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অনেক মার্কিণ লেখকই গল্প, উপন্যাস বা নাটক লিখেছেন। পার্কম্যান, এডনা ফারবার, লিন রিগস, উইলা ক্যাথার প্রভৃতি অনেকেই এই অঞ্চলের পটভূমিকায় সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সাহিত্য হিসেবে তাঁদের বইগুলি জনপ্রিয়ও কম হয়নি। কিন্তু তবু, ষ্টাইনবেকের বইয়ের সঙ্গে ওঁদের কারোই তুলনা হয় না। কারণ, ষ্টাইনবেকের "দি গ্রেপস অব র‍্যাথ" অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি তো বটেই, কিন্তু তা' ছাড়াও আরো কিছু। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিশ্রমজীবী সমাজ যে সামন্ত-যুগ-সুলভ পঙ্কিলতায় নিমগ্ন ছিল, তার কবল থেকে জাতীয় জীবনকে মুক্ত করবার পথে একখানা শক্তিশালী দলিলও বটে। এবং এই কারণেই এ উপন্যাস "টম কাকার কুটীর"-এর সমতুল্য বলে সমাদৃত।

দি গ্রেপস অব র‍্যাথ" লিখে জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করবার টাইনবেক আরো বারোখানা বই প্রকাশ করেছেন। তার ভিন্ন ভিন্ন কারণে তিনখানা বই নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও ।।চনার সম্মুখীন হতে হয়েছে ষ্টাইনবেককে।

প্রথমেই বলতে হয় "দি মুন ইজ ডাউন"-এর কথা। দ্বিতীয় :দ্ধের সময়ে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত নরওয়ের পটভূমিকায় এ বই । এই বইখানা প্রকাশিত হবার পরই কানাঘুষো চলতে লা যে ষ্টাইনবেক নাৎসী-দরদী। যারা স্পষ্ট করে এ কথাটা ১ চাইলেন না, তাঁরাও বললেন যে আক্রমণকারীর প্রতি আরো বিদ্বেষ প্রচার করা খুবই উচিত ছিলো ষ্টাইনবেকের। খাস ী-জগতে তখন ষ্টাইনবেককে ইহুদী বলে প্রচার করা হচ্ছিল। শুনে ষ্টাইনবেক সংক্ষেপে বললেন—আমার উদ্দেশ্য রাজনীতি সাহিত্য। এবং আমি ইহুদী নই।

'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ'-এর পর দ্বিতীয় যে উপন্যাসখানা সর্বাধিক প্রিয়তা অর্জন করেছে, তা হ'লো "দি পার্ল" (১৯৪৭)। এ াসখানা বাংলাতেও অনূদিত হয়েছে। একটি মেক্সিকান উপকথা ম্বনে রচিত এই ছোট্ট উপন্যাসখানা ষ্টাইনবেকের এক বিস্ময়কর । একটি জেলে তরুণ, নাম তার কিনো। সমুদ্র থেকে মুক্তো হের সময় একবার এমন বড় একটি মুক্তো পেলো, যা দেখে ।সজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করলো যে এতো বড়ো একটি মুক্তো ।। কেউ এর আগে কখনো দেখেনি। যে মুক্তো-ব্যবসায়ীরা জ্ঞায় কথা বলতো না কিনোর সঙ্গে, তারাই সাদরে আমন্ত্রণ ।ালো কিনোকে। সাধারণত একটি মুক্তোর যা দাম হয় তার গুণ, তিনগুণ কেউ বা চারগুণ দাম বলতে লাগলো কিনোর াটির। তার বেশি কেউই বললো না। মুক্তো-ব্যবসায়ীদের চোখ- দেখে সন্দেহ হ'লো কিনোর যে ওরা নিশ্চয়ই জোট পাকিয়েছে। ঃ জোট পাকিয়েই প্রকৃত দাম কেউ দিতে নারাজ। এদিকে দালরা ব্যতিব্যস্ত করতে লাগলো কিনোকে স্থানীয় বাজারে মুক্তোটি ক্রয় করবার জন্যে। স্থানীয় গির্জার পাদ্রী মশায়ও এসে জুটলেন। ।লেন: কিনো, তোমাদের বিয়েটা তো আইনত সিদ্ধ নয়, অথচ ামার ছেলে অবধি হয়ে গেছে। মুক্তোটি তুমি গির্জাকে দান করো, ।মরা তোমার বিয়ে আইনত এবং ধর্মত সিদ্ধ করে দেবো। এই াস্ত ব্যাপারের পর কিনোর ধারণাটা বদ্ধমূল হ'লো যে মুক্তোটি অতি ল্যবান। কারণ, যে ব্যবসায়ীরা ফিরেও তাকাতো না একদিন ওর কে, তারাই আজ খাতির করে কথা বলছে। খরচ জোগাড় করতে । পারার জন্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে পর্যন্ত করতে পারেনি যে ায়েটিকে ও ভালবাসতো। জুয়ানাও সত্যি ভালোবাসে ওকে। ারণ, আনুষ্ঠানিক বিয়ে না হওয়া সত্বেও ও একত্র বসবাস করতে াজী হয়েছে। ওদের ছেলেও হয়েছে একটি। শিশুটির দিকে াকালে আশায় কিনোর বুকখানা ফুলে ওঠে। কিছুদিন আগে নে পড়ে একটা বিছে কামড়েছিলো ছেলেটাকে। পয়সার অভাবে াক্তারবাবু একটু ওষুধ পর্যন্ত দিতে রাজী হননি। অর্থ। অর্থ। র্থই তো সব কিছু পৃথিবীতে। কিনো ঠিক করে ফেললো মনে নে, অর্থ সংগ্রহের একটা সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তখন তার ব্যবহার করতেই হবে। ও মনস্থ করলো, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের াছে বেচবে না মুক্তোটি, চলে যাবে বড় কোনো শহরে। ন্যায্য দাম আদায় করে নেবে। তারপর নতুন করে ভদ্র ভাবে শুরু করবে সংসারযাত্রা। ছেলেকে ভালো ভালো পোষাক কিনে দিতে হবে, লেখাপড়া শেখাতে হবে। হ্যাঁ, এই একটি মুক্তো দিয়েই করা যাবে এই সমস্ত কিছু। শুধু ন্যায্য মূল্য পাওয়া দরকার। কিনোর অনুমান মুক্তোটির মূল্য কয়েক হাজার ডলার। কিনো ঠিক করলো রাতের অন্ধকারে স্ত্রী, পুত্র এবং মুক্তোটি নিয়ে পালিয়ে যাবে। যথা সময়ে বেরিয়েও পড়লো। ও ঘর ছেড়ে বেরুবার একটু পরেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ঘরখানা। লোভী দুষ্টলোকেরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কিনোদের পুড়িয়ে মারবার জন্যে। কিনো স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে হট্টগোলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লো। পরদিন রাতের ঘটনা। আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় ওদের অনুসরণকারী একটি দুষ্টলোকের গুলিতে মারা গেলো শিশুটি।" শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলো কিনো আর জুয়ানা। ওরা ভাবলো সম্পদই জীবনের সব চাইতে বড়ো শত্রু। মৃত শিশু-সন্তানটিকে নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে এলো ওরা। অসীম ঘৃণায় কিনো মহামূল্য মুক্তোটি সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

এতক্ষণে ষ্টাইনবেকের মূল চিন্তার সূত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রাচীন আমেরিকার, বিশেষ করে পেরু এবং মেক্সিকোর অসংখ্য উপকথা আছে। কিন্তু তার ভেতর থেকে কিনোর উপাখ্যানটি বেছে নেবার একটি বিশেষ কারণ আছে। সম্পদের সঙ্গে সাদামাটা জীবনের বৈপরীত্য এ কাহিনীতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এবং এইটেই ষ্টাইনবেকের মূল চিন্তা। জীবনের প্রতি একটা অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই ষ্টাইনবেক সাহিত্য রচনা করেন। ইন ডুবিয়াস ব্যাটল বা 'দি গ্রেপস অব র‍্যাথ'-এর উদ্দেশ্য মোটেই কম্যুনিজম বা অন্য কোনো রকম রাজনীতি চর্চা করা নয়। সমাজের বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর জন্যে মানব জীবন যখন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন ষ্টাইনবেকের বিশ্বাস তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হওয়া উচিত এবং এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করে হওয়া দরকার। কম্যুনিষ্টরা যতক্ষণ এই কাজকে প্রাধান্য দেন, সে পর্যন্ত ষ্টাইনবেক কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে চলতে রাজী। এই জন্যেই ইন ডুবিয়াস ব্যাটল-এ ম্যাক-এর মুখ দিয়ে রীতিমতো প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছেন। কিন্তু মানুষের দুর্দশা অবিলম্বে দূর করবার চেষ্টা না করে, তাকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করে, দুর্দশাগ্রস্তদের দেখিয়ে কম্যুনিষ্ট প্রোপাগাণ্ডার সুযোগ করে নেবার বিরোধী ষ্টাইনবেক। মানুষের জীবন যে কোনো প্রকার, চাই কি সমস্ত প্রকার "ইজম"-এর চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান—এ কথা ষ্টাইনবেক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

শুধু যে সম্পদের সঙ্গে জীবনের বৈলক্ষণ্য দেখিয়েছেন ষ্টাইনবেক তা নয়। মুক্তোয় দেখিয়েছেন সম্পদের সঙ্গে বৈলক্ষণ্য, ইন ডুবিয়াস ব্যাটল এবং দি গ্রেপস অব র‍্যাথ-এ দেখিয়েছেন প্রধানত: সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে বৈলক্ষণ্য। খৃষ্টধর্মের কিছু কিছু সমালোচনাও ষ্টাইনবেক করেছেন 'দি গ্রেপস অব র‍্যাথ-এ। পাদ্রী কেসী নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গেই করতো তার কাজ। বহু লোককে ও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর মনে হ'লো ব্যাপারটা আত্মপ্রতারণার সামিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার ফলে কারো জীবনেই যে কোনো পরিবর্তন ঘটছে তা ওর মনে

হয় না। একদিন জো জিজ্ঞাসাই করে ফেললো টমকে : টম, তোমাকে ত আমি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলাম? টম স্বীকার করলো। কেসী জিজ্ঞাসা করলো : তার পর থেকে তুমি কি নিজের ভেতর ভালো কিছু অনুভব করছো? টম বললো : না। কেসী আবার জিজ্ঞাসা করলো : খারাপ কিছু? টম এবারও সত্যি কথাই বললো : না, খারাপ কিছুও অনুভব করছি না।

বাঃ, কেসী ভাবলো, ভালোও হচ্ছে না, খারাপও হচ্ছে না, তা' হলে এই বাজে ভড়ং-এর জন্যে জীবনপাত করবো কেন? পাদ্রীর কাজ ছেড়ে তারপর কেসী শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলো।

'টু এ গড আননোন'-এ আমরা দেখেছি পরিণত বয়স্ক একটী লোক কী ভাবে ধর্মীয় সংস্কারের ফলে মৃত্যুকে বরণ করে নিলো। এ ঘটনায় জীবনের সঙ্গে কুসংস্কারের বৈলক্ষণ্য দেখিয়েছেন ষ্টাইনবেক। "দি প্যাসচিওরস অব হেভেন"-এ একটি গল্প আছে, 'জুনিয়াস মাল্টবি,' খুব সম্ভব এইটিই ষ্টাইনবেকের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। সভ্যতার কৃত্রিমতার সঙ্গে জীবনের বৈলক্ষণ্য দেখিয়েছেন ষ্টাইনবেক এ গল্পটিতে।

নীতিধর্মের নামে কতকগুলি প্রচলিত নিয়মকানুন যেখানে জীবনকে ব্যাহত করে, ষ্টাইনবেক তারও কঠোর সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে। কেসী এক জায়গায় বলছে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে—অবিশেষিত যৌন মিলনে কোনো পাপও হয় না, পুণ্যও হয় না।...পাপ-পুণ্য মনের বিকার মাত্র। এ সম্পর্কে পা বলছে : যে যা করে তা' না করে পারে না বলেই করে,...কাজেই তার পক্ষে এইটেই ঠিক। এ সম্পর্কে খুব সম্ভব "বারনিং ব্রাইট" (১৯৫০) নাট্যোপন্যাসেই ষ্টাইনবেক তাঁর বক্তব্য সব চাইতে স্পষ্ট এবং জোরালো-ভাবে বলেছেন। এই কাহিনীটিতে দেখা যায় একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক জো সল, পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছে। এর ফলে নিজেকে খুবই ছোট ভাবতে আরম্ভ করছে ও। স্বামীর এই অবস্থা দেখে জো'র দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী ভাবলো, কোনোরকমে একটি সন্তান হলে স্বামী নিশ্চয়ই হীনমন্যতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। সল পরিবারের এক সুহৃদ এড-এর পরামর্শ মতো জো-র স্ত্রী ভিক্টর নামে একটি যুবকের দ্বারা সন্তানসম্ভবা হলো। স্বামীকে ও বোঝালো যে, এ সন্তান তারই, সেই এই সন্তানের পিতা। জো খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠলো। কিন্তু এমন সময় ভিক্টর সত্য কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখালো। এড অবিলম্বে হত্যা করলো ভিক্টরকে। এর পর নিজের সম্বন্ধে জো-র সন্দেহটা আরো বেড়ে গেলো। তাই এক ডাক্তারের কাছে গেলো ও। ডাক্তার পরিষ্কার জানালো : তুমি একেবারেই পুরুষত্বহীন। জো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো স্ত্রীর ওপর। কিন্তু ওর স্ত্রী যথাসময়ে সন্তান প্রসব করবার পর আবার দেখা যাচ্ছে জো উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে এবং সরবে বলছে যে, প্রত্যেকটি পুরুষই প্রত্যেকটি শিশুর পিতা। অর্থাৎ কিনা নবজাতকের পিতৃত্বের প্রশ্নে জো'র মনে আর কোনো ক্ষোভ নেই। একটি নতুন জীবন পৃথিবীতে এসেছে এইটাই বড় কথা, এইটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা। যৌন-জীবনে বা দাম্পত্য-জীবনে নীতিধর্মের অনুশাসন জো'র মনে আর কোনো অশান্তির কারণ ঘটায় না।

আমরা আগেই দেখেছি, স্কুলের পড়াশুনো শেষ করবার পর ষ্টাইনবেক চার বছর প্রাণী-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন, বিশেষ করে সামুদ্রিক প্রাণী-বিজ্ঞান। জীবনের প্রতি একটা প্রগাঢ় মমত্ববোধের সৃষ্টি ওঁর মনে সেই সময় থেকেই দেখা দেয়। মানবজীবনের ভালোমন্দের প্রতি ষ্টাইনবেক অবশ্যই অত্যন্ত সজাগ। মানুষের তৈরী কোনোপ্রকার ধর্ম, নীতি, সমাজব্যবস্থা বা সভ্যতার নামে কোনো-প্রকার উৎপীড়ন ব্যবস্থা এই জীবনের স্বচ্ছন্দগতিতে বাধা সৃষ্টি করবে—এটা ষ্টাইনবেক কোনোমতেই সহ্য করতে পারেন না।

প্রসঙ্গত আর একটা কথা বলা দরকার। মানুষের জীবন এবং মনুষ্যেতর জীবন সম্পর্কে অনেক সময় তুলনা করেছেন ষ্টাইনবেক, এটাও দেখা যায়। দি গ্রেপস অব র‍্যাথ-এ উনি মানুষের সঙ্গে কুকুরের তুলনা করেছেন। 'অব মাইস এণ্ড মেন'-এ একটা বুড়ো কুকুর হত্যার ব্যাপার একটি বৃদ্ধ লোককে হত্যার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইন ডুবিয়াস ব্যাটল-এ কতকগুলি কুকুরের খেয়োখেয়ির একটি ঘটনাকে কতকগুলি মানুষের মারপিট-এর একটি ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ওঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে এমনধারা অনেক ব্যাপারই ছড়ানো রয়েছে। ষ্টাইনবেককে বুঝতে হ'লে এর প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ।

'দি রেড পনি'র কথা আগেই বলেছি। এই ছোট উপন্যাসখানার মধ্যে ষ্টাইনবেক তাঁর নিজস্ব চিন্তা অনেকখানি ঢেলে দিয়েছেন। একটি ঘোটকীর মৃত্যু এবং একটি অশ্বশাবকের জন্ম—প্রধানত: এই সামান্য ব্যাপার দু'টির মধ্য দিয়ে একটি কিশোরকে তিনি জীবন-মৃত্যুর চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমান আলোচনার ষ্টাইনবেকের যে বইগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি বলা হ'লো তা' ছাড়া অন্য বইগুলি হচ্ছে : দি ফরগটেন ভিলেজ (১৯৪১), সি অব করটেজ (১৯৪১), বম্বস্ এ্যাওয়ে (১৯৪২), ক্যানারী রো (১৯৪৫), দি ওয়েওয়ার্ড বাস (১৯৪৭), রাশিয়ান জার্ণাল (১৯৪৮), ইষ্ট অব এডেন (১৯৫২), সুইট থারস্‌ ডে (১৯৫৪)।

ষ্টাইনবেক বর্তমানে নিউ ইয়র্ক সহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং নিরলসভাবে সাহিত্যের নূতনতর দিগন্তের সাধনায় মগ্ন রয়েছেন।

"As I grow older I am more amaged to discover how great are the differences between one man and another. I am not far from believing that everyone is unique." —*Somerset Maugham*

# ঘরের ঠিকানা

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

ট্রেণ চলেছে হু হু শব্দে। দু' পাশের গাছপালা, মাঠ-বনকে পিছনে ফেলে ছুটেছে অতিকায় যন্ত্রদানব নিজের গতিতে। সুকান্তর মনটাও ছুটে চলেছে ঐ একই গতিতে। ট্রেণের হয়ত সময় লাগবে ষ্টেশনে পৌছাতে তিন ঘণ্টা। সুকান্তর কিন্তু ষ্টেশন ছাড়িয়ে বাড়ী পৌছাতে এক সেকেণ্ড সময়ও লাগেনি। মনটা মেঘের চেয়েও দ্রুততালে ছুটে গিয়েছে, রকেটের চেয়েও দ্রুত। মনের সঙ্গে ট্রেণ চলতে পারে না। মনের সঙ্গে পারে না দেহ।

তাই ভারী খারাপ লাগে। সে তো ট্রেণে বসে মনীষাকে দেখতে পাচ্ছে। মনীষা ফিরছে গা ধুয়ে পুকুর থেকে। কাঁধে ছোট্ট পেতলের ঘড়া, ভিজে গামছাটা বুকের ওপর চাপানো, সুডৌল চিবুক আর কপোল বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে, চাঁপার মত বর্ণ সাবানের ফেনায় ঈষৎ ফ্যাকাসে, মুক্তার মত ঝকঝকে দাঁত দিয়ে নীচের রক্তাভ ঠোঁটটাকে চেপে ধরে পিছল ঘাটের পথটাকে অতিক্রম করছে মনীষা।

বাড়ীটা এতক্ষণে নির্জন। ছেলেমেয়েরা গিয়েছে খেলতে। মা পাড়ায় বেরিয়েছেন ওদের খুঁজতে। নিশ্চিন্তমনে গায়ে লেপটে থাকা কাপড়টাকে নিংড়াচ্ছে ও। গা মুছছে, বুঝি কিছুটা শিথিল দেহবাস, মন। কেউ নেই কোথাও। কাপড় বদলাচ্ছে—ফর্সা ব্লাউজটা পরছে। তারপর ঘরে গিয়ে বসেছে আয়না নিয়ে, পাশে প্রসাধনের সাজ। কুমকুমের টিপটা দিচ্ছে সন্তর্পণে। ভারী টিপ পরতে ভালবাসে ও। স্নো একটু আঙুলে তুলে নিয়ে গালে কপালে ঘষে দিয়েছে, পাউডারের পাফটাও বুলিয়ে নিল একবার মুখে, গলায় ঘাড়ে—পরিপাটি সজ্জা—অপেক্ষমানা এখন সে দয়িতের জন্ত।

পাশ দিয়ে উল্টো দিকের ট্রেণটা তীব্র হুইসিলের শব্দ করে নিমেষের মধ্যে ছুটে গেল ওকে চমকে দিয়ে। ধ্যান ভাঙিয়ে এত জোরে গেল ট্রেণটা, কিন্তু তার গাড়ীটা ছোটে না কেন? জোরে আরো জোরে—

ট্রেণটা মোটেই জোরে যায় না। সিঙ্গেল লাইন। আপ-ডাউন ট্রেণের সাক্ষাৎ হবে। তিনটে ষ্টেশন দূরে তবুও সুকান্তর ট্রেণটাকে আধ ঘণ্টার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখে। বিরক্তিতে সুকান্তর মন ওঠে ভরে। আধ ঘণ্টার ওপর লেট। আর কত লেট করবে?

—ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি? সুকান্তর প্রথম প্রশ্ন।

ঘুম জড়ানো চোখে অনেকক্ষণ ডাকা ডাকির পর মনীষা দরজা খোলে—

—এত ঘুম তোমার?

— কি করব? সন্ধ্যে থেকে বসে। রাত্রি দশটা বাজার পর ভাবলাম তুমি আর আসবে না।

—সত্যিই ট্রেণটা বেজায় লেট করেছে!

—সন্ধ্যের ট্রেণ এত লেট।

—না, সন্ধ্যের ট্রেণ ধরতে পারিনি যে—

আজও হয়ত সেদিনের মত মনীষা ঘুমিয়ে পড়বে! ঘুমিয়ে গেলে বিরক্তি লাগে সকলেরই! মনীষাও বুঝি প্রথমটায় বিরক্ত হয়। কাঁচা ঘুম ভাঙলে কে না হয় বিরক্ত।

সুকান্তও বিরক্ত হয়। শিশু হকারটা গায়ের ওপর এসে পড়ে শুধায়—বাবু! দেব নাকি চানাচুর! নিজে খান বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্ত নিয়ে যান! টাটকা মুখরোচক চানাচুর!

ঠিক একেবারে বিমলের মত শিশু। চানাচুর বিক্রী করে সংসার চালাচ্ছে। আর বিমল?

ট্রেণের গতি মন্দীভূত। সন্ধ্যার দেরী আছে। রেল লাইনের পাশের বাড়ীগুলো ছায়াছবির মত চোখের সুমুখে নিমেষের মধ্যেই ধরা দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। সুকান্ত দেখে দোতলা ঘরের একটি বৌ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ট্রেণটা তীব্র হুইসেলের শব্দ করে যাওয়াতেও তার ধ্যান ভাঙে না। কার ধ্যান করছে মহিলাটি। স্বামীর। এর স্বামীও কি তারই মত চাকরী করে শহরে। তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। মনীষাও কি অমনি করে চেয়ে আছে তার আশা-পথের দিকে চেয়ে? তার তো যেতে রাত্রি হবে? এখন থেকেই কি মনীষা তার প্রতীক্ষায় আছে! বৌটি এমন করে প্রতীক্ষা করছে কেন। ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে তো তার স্বামী! তবুও মন ভরে না সাত ঘণ্টা কি আট ঘণ্টার অদর্শন সইতে পারছে না? অথচ মনীষা এক মাস অপেক্ষা করে থাকে। থাকে কি করে?

একদম ভাল লাগে না। এখনও দু ঘণ্টা থাকতে হবে ট্রেণের মধ্যে ভ্যাপসা গরমে। ফ্যান দিয়েছে বটে, চলে না সবগুলো। মেয়ে-পুরুষের গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি মালপত্রে। এর ওপর হকারদের

হঠাৎ চীৎকার—গরম মুড়ি খাবেন নাকি? হাতকাটা তেল, চন্দন ধূপ, নারকেলের চকোলেট, পকেট চিরুণি এক আনায় পাচ্ছেন। লিখে দেখে নিন কলমগুলো কেমন সুন্দর।

মনীষার জন্য কলম একটা কিনলে কেমন হয়?

—তোমার কলমটা আমাকে দিয়ে যাও। হ্যাণ্ডেলের কলমে লেখা যায় না। একদিন মনীষা অভিযোগ করেছিল।

—কেন গো? তোমার তো লেখার মধ্যে ন' মাসে ছ' মাসে পত্র একখানা।

—তাই! বললেই হোল আর কি? সপ্তাহে একখানা করে পত্র দিই, নিজেই বরং ভুলে থাকে আমাকে, শহরে গিয়ে।

কলমের কথাটা তখনকার মত চাপা পড়েছিল। ছ' আনা দাম একটা ফাউণ্টেন পেনের। হ্যাণ্ডেলের সমান আর কি।

ট্রেণটা আবার দাঁড়িয়েছে।

—দাদা, ক'টা বাজল?

—ছ'টা! আধ ঘণ্টার ওপর লেট।

ভদ্রলোকও বিরক্ত। বোধ হয় তারই মত দয়িতার চিন্তায় বিভোর।

এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করেনি সুকান্ত। ও পাশের কোণে একজোড়া দম্পতি, বোধ হয় নববিবাহিত। ট্রেণে চড়ার সুরু থেকে দুজনে ফিসফিস করে গল্প করে চলেছে। মধ্যে মধ্যে চাপা হাসি—বৌটি কখনও কখনও খিল খিল করে গড়িয়ে পড়ছে হাসতে হাসতে স্বামীর গায়ের ওপর। দুজনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, একান্ত কাছাকাছি, যেন এই ট্রেণে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। মনের দরজা দিয়েছে খুলে, নতুন জীবনের নতুন রং লাগিয়েছে মনে আর হাসিতে। কত সহজ!

মনীষা কিন্তু আজও এতটা সহজ হ'তে পারেনি, এখনও তার লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়। এখনও সে ঘুরে বেড়ায় সংসারকে ঘিরে।

ঈর্ষা হয় সুকান্তর নবদম্পতিকে দেখে। ও-জীবন তারা কত আগে ফেলে এসেছে। ও-দিন আর ফিরে আসবে না।

হঠাৎ মনে হয় সুকান্তর এমন করে কথা বলবে তারা আজ। অমন করে উচ্চকিত হাসি হাসবে। মনীষা কি সত্যিই ভুলে গিয়েছে অমনি হাসতে। এমন করে মনীষা তো হাসে নি কোনদিন।

আবার ক্রসিং হচ্ছে আপ ডাউনের। অসহ্য। এমন করে মিছামিছি দেরী করানো। কতদিন পরে যাচ্ছে সুকান্ত বাড়ী। যেন এক যুগ সে যায়নি। ভুলে গিয়েছে মনীষার মুখটাকে। ট্রেণের ঐ নববধূর হাসিমুখটাই কেবল তার চোখের ওপর ভাসছে। মনীষার হাসিমুখটা মনে করতে পারছে না কেন? মনীষা সত্যিই তো হাসেনি কোন দিন এমন করে। নববধূ হ'য়ে এল যখন তখনও না। বেশ মনে আছে সুকান্তর। বার বার কি একটা অনুরোধ করায় একটু ম্লান হেসে, বলেছিল মনীষা—দূর! কে কোথায় দেখে ফেলবে? তা ছাড়া ও ঘরে মা আছেন না?

—তাতে কি? কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না!

—না না, তা হয় না? আমার ভারী লজ্জা করে!

হতাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুকান্ত, মনীষা কোন দিন হাসেনি

বলেই কি তার হাসিমাখা মুখটা কিছুতেই মনে করতে পারছে না সুকান্ত।

ট্রেণ ছেড়েছে এবারে। গতি এত কম যে সুকান্তর মনে হচ্ছে সে ছুটে চলে যায় বাড়ী। পত্রে সে লিখেছিল সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছাবে নিশ্চয়ই! কোনরকমে ভুল হবে না তার। মনীষা তাই বুঝি তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার আগে গা ধুয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। রান্নাটাও নিশ্চয়ই সেরেছে সন্ধ্যার মধ্যেই। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করছে। হয়ত বই পড়ছে। পড়তে পড়তে ঘুম আসছে। ঘন ঘন হাই তুলছে। তারপর পড়েছে ঘুমিয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। স্বামী তার পাশে। আদর করছে, বলছে গল্প—হাসির কথায় হেসে উঠেছে খিল খিল করে। নিজের হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছে নিজেরই! ধড়মড় করে উঠে বসেছে। পাশের বিছানা হাতড়াচ্ছে। ফাঁকা···কেউ নেই।

মনটা মুষড়ে পড়েছে আবার। এলো না। আশা দিয়ে সারারাত ছটফট করেছে মনীষা। বার বার ঘুমে চোখ এসেছে জড়িয়ে জেগে থাকার চেষ্টা করেও ঘুমিয়ে গিয়েছে এক সময়। একটু শব্দে ঘুম ভেঙেছে বার বার। উঠেছে, বসেছে, ভাল করে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারেনি। এমন করে কাটিয়েছে অনেক রাত। তার পর যখন এসেছে সুকান্ত। কি অভিমান! মান ভাঙাতে এমন কিছু একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে যা সে রাখতে পারেনি, তবু মান ভাঙাতে হয়েছে।

ট্রেণ চলেছে ধীরে ধীরে। মনটা হু হু করে ছুটে চলেছে। স্পষ্ট দেখছে সুকান্ত মনীষাকে। জোর করে ঘুম তাড়িয়ে জেগে থাকছে। সুকান্তর লেখা পুরানো পত্রগুলো পড়ছে বার বার। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে আর হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হচ্ছে, আবার সে হাসি যাচ্ছে মিলিয়ে আর একটা কথায়।

আর পারা যায় না। রাত্রি আটটা। এখনও ট্রেণের এক ঘণ্টার ওপর সময় লাগবে। ভাল লাগে না। বেশ ছিল এতদিন। যেই বাড়ী চলেছে আর ভাল লাগে না দেরী। মনে হয় ট্রেণটা যদি একঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পৌঁছাত তা হলে কি আনন্দই হোতো। মনীষা ভাবতেও পারত না বিকাল বেলায় এসে পৌঁছাবে সে। সংসারের টুকিটাকি কাজ করছে আপন মনে, হয়ত মৃদুস্বরে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে কাজ করে চলেছে এমন সময় মুখ তুলতেই দেখবে তাকে। কি খুসী যে হবে মনীষা।

হোলো না, কোনদিনই তা হোলো না। বিকালে না হলেও সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছালেও তো মজা মন্দ হয় না।

মাটির প্রদীপটা জ্বালিয়ে আঁচলের আড়ালে ঢেকে তুলসীমঞ্চের কাছে গিয়ে সেটাকে নামিয়ে রাখল মনীষা। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম জানাল দেবতার উদ্দেশ্যে। যার মঙ্গল কামনায় দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা সেই মানুষ সুমুখে হাজির।

মুখ তুলতেই চোখাচোখি। এক গাল হেসে লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ দুটো নামিয়ে নিল মনীষা।

—কাকে প্রণাম করলে মনীষা।

—কাকে আবার ঠাকুরকে? তখনও হাসি লেগে আছে মনীষার চোখে মুখে। কৌতুকের হাসি।

—কই ঠাকুরকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

—এই তো আমার ঠাকুর। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল সুকান্তকে।

ক্ষণেকের জন্য ভুলে গিয়েছিল বুঝি মনীষা পরিবেশটা।—কে গো বৌমা! কে এসেছে! কার সঙ্গে কথা বলছ!

জিভ কেটে তাড়াতাড়ি আধ হাত ঘোমটা টেনে ছুটে পালিয়ে গেল ও।

—ও মশাই শুনছেন! ভাল করে শুয়ে পড়ুন না। ওদিকে তো ঢের জায়গা আছে!

ভাবতে ভাবতে বুঝি মাথাটা পাশের ভদ্রলোকের কাঁধের ওপর গিয়ে পড়েছিল।

চমকে উঠেই সরে গেল সুকান্ত। এখনও দেরী আছে অনেক। ঘুমে চোখ দুটো বুঁজে আসছে। একটু গা গড়িয়ে নিলে মন্দ হয় না। ঘুম তো হবেই না। যা গোলমাল ষ্টেশনে। ট্রেণ থামতেই নামার হুড়োহুড়ি। চীৎকার আর ডাকাডাকি। হকারদের আপ্যায়ন! এই যে আর সামান্যই আছে। সামনের ষ্টেশনেই নেমে যাব। খাবার! খাবার চাই!

সবাই সামনের ষ্টেশনে নামবে। কেবল সুকান্তর সামনে অনেক পথ। ষ্টেশন থেকে হাঁটতে হবে দু' মাইল। বেশ রাত্রি হয়েছে। মনীষা হয়ত ঘুমুচ্ছে। ডেকে তুলতে হবে। ঘুম তো আর তার হবে না ভাল করে। দু'-বার ডাকতেই উঠে আসবে। কিন্তু যদি এমন হোতো!

হঠাৎ মাথায় একটা প্লান এলো। মনীষাকে খবর না দিয়ে যদি কোনদিন যায় সে। কেমন হবে! বেশ মজা হবে না। নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। কোন কথা বলবে না সুকান্ত প্রথমে। দু'-তিন বার ধাক্কা দেবার পর মনীষার ঘুম ভাঙবে। দরজা ধাক্কানোর শব্দে এবারে ভয় পাবে নিশ্চয়ই। কে এত রাত্রে দরজা ঠেলে! চোর নিশ্চয়ই! নয়ত ডাকাত! আবার ধাক্কা। ভয় পেয়েছে বেজায় এবার মনীষা। কে? কে? চীৎকার করে উঠেছে যত জোর আছে গলায়।

ও ঘরে মাও বুঝি জেগে গিয়েছেন ওর চীৎকারে। ছেলেমেয়েও একসঙ্গে তারস্বরে চীৎকার। পাশের বাড়ীর লোক জেগে উঠেছে। তারপর—

চীৎকারেই ঘুম ভেঙে গেল সুকান্তর হঠাৎ। কোথায় এল। এত চীৎকার কেন? তাড়াতাড়ি উঠে চোখ কচলে দেখে তার ষ্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেণ চলে এসেছে আরও দু' ষ্টেশন পরে। রাত্রি এগারটা রাত্রে আর কোনমতেই বাড়ী ফিরে যাবার ট্রেণ নেই।

"My literary reputation will I hope be sufficiently established by my labours as an orientalist." — *Henry Thomas Colebrook*

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অম্লষ্ঠা—আমরুল।

অম্লসার—চুক্র, চুকপালং, ২ নিম্বুক, ৩ হিন্তাল।

অম্লস্তম্ভনিকা—তিন্তিড়ী, তেঁতুল।

অম্লহরিদ্রা—আমহরিদ্রা, শঠিবৃক্ষ, আমহলুদের গাছ।

অম্লা—১ তেঁতুল, ২ আমরুল, ৩ বনমাতুলুঙ্গ, ৪ অম্লবেতস, ৫ বর্ষামল্লিকা।

অম্লাতকী—পলাশীলতা।

অম্লাদান—কুরণ্টক বৃক্ষ।

অম্লান—১ আমলা বা আঁবলাফুলের গাছ, ২ বাঙ্গুলীবৃক্ষ, ৩ পদ্ম।

অম্লানা—মহাসেবতী পুষ্পবৃক্ষ, বড় সেউতী গাছ।

অযুগ পলাশ—বৃক্ষবিশেষ।

অযুগ্মচ্ছদ—সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতিমগাছ।

অযুগ্মপর্ণ—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ।

অরগ্বধ, আরগ্বধ—সোঁদাল গাছ, cassia fisfula.

অরণি, অরণী—গণিকারিকা, ত্বরালতা, শ্যোনা গাছ, চিত্রক বৃক্ষ।

অরনিসেতু—মহাগ্নিমন্থ বৃক্ষ, বড় গণিয়ারী গাছ।

অরণ্যকণা—১ কটু জীরক, ২ বন পিপ্পলী।

অরণ্যঘোলিকা, অরণঘোলী—বনঘোলী গুল্ম।

অরণ্যশালি—অরণ্যধান্য, নীবার।

অরলু—শ্যোনা গাছ।

অরাবক—[ সং বাসক, সিংহমুখী, সিংহপর্ণী, হিং অরূপ, তাং এধাডোণ্ড, তেং আদাসরা ] বাসক vasica nees.

অরিমেদ—বিট্‌খদির, গুয়েবাবলা accacia farmesiana; mimosa.

অরিষ্ট—১ রিঠা বা রীঠা গাছ, ২ নিম্ব বা ফেনিলা soapberry plant। শ্রীকণ্ঠং।

অরিষ্টা—নাগবল্লী।

অরুণা—[ হিং পুঁড়েরী ] পৌণ্ডরীক নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ, root stock of nymphœa plant, ২ জবা, ৩ ইন্দ্রাবারুণী, ৪ গুঞ্জা, ৫ পুনর্ণবা, ৬ মুণ্ডিটিকা বা মুণ্ডিরী বা বড় থলকুড়ী sphaeranthus indicus.

অরুহা—ভুঁই-আমলা।

অর্ক—আকন্দগাছ calotropis gigantea.

অর্কপত্র, অর্কদল—আদিত্যপত্র দ্রং।

অর্কপাদপ—নিমগাছ।

অর্কপুষ্পী—১ সূর্যবল্লী, অর্কদূনা, শ্বেত হুড়হুড়ে, ২ রক্তাপরাজিতা, ৩ ক্ষীরুই গাছ।

অর্কমূলা—[ সং রুদ্রজটা, সুগন্ধা, বাং হিং ইশের মূল, তেং দুরাগবেলা, তাং পেরু মারিন্দু ইশের মূল।

অর্ঘমাস—গন্ধতৃণ বিশেষ।

অর্জুন—[ সং ককুভ, হিং অর্জুন, তাং ভেল্লাইমরুদমারুম, তেং জারমাদি, মরাং শার্দুল, গুজং সজদন ]। অর্জুন গাছ termilalia arjuna.

অলকুশী—আত্মগুপ্তা।

অলম্বুষা—লজ্জাবতী লতা, ২ ভুঁই কদম, ৩ কুসসিম।

অলর্ক—শ্বেত আকন্দ। আকন্দ দ্রং।

অলকলতা—[ সং অমরাবেল, আকাশবল্লী, হিং আকাশাবল ] স্বর্ণলতা।

অলাবু—লাউ, তুম্বী lagenaria vulgaris ser.

অশোক—[ সং অশোক, কাঙ্কেলি, গুজং অশোপালভ, কন্নং আম্নকার ] অশোক গাছ jonesia asoka. ২ বকুল গাছ। পর্যায়—অঙ্গনাপ্রিয়।

অশ্মন্তক—পাষাণভেদক বৃক্ষ, পাথরকুচি গাছ calcus aromaticus.

অশ্বকর্ণ—শালগাছ, সজ্জ-শাল ( যার নির্যাস থেকে ধুনা হয় ) shorca robusta.

অশ্বগন্ধা—ক্ষুপবিশেষ withania somnifera.

অশ্বকাতরা—[ হিং ঘোড়েকাথর ] ঘোড়া কাতরা গাছ।

অশ্বঘ্ন—করবী।

অশ্বত্থ—[ সং গজভক্ষ, ক্ষীরদ্রুম পিপ্পল, হিং পিপ্পল, গুজং জেরি, মলয়ং অরেয়ল, মেং রাগী, তাং অর্শেমরম, সাওতাল—হেসাক ] অশ্বত্থগাছ ficus religiosa.

অশ্ববলা—পালংশাক।

অসন—[ সং বীজক, হিং পিয়াশাল, তাং কুরুপ্প, মারুতা ] পিয়াশাল tomentosa bedd. ইহা ৮০।৯০ ফুট লম্বা হয়।

অসিতা—অম্লকা, তেঁতুল, ২ নীলীবৃক্ষ।

অস্থিভঙ্গ—হাড়ভাঙ্গা গাছ।

অস্থিসংহার—হাড়জোড়া গাছ quadriangularis wall.

অস্ফোত—অপরাজিত।

অহিংস্রা—কণ্টকপানি, কুলেখাড়া capparis sopiasia.

অহিফেন—লতানে গাছ, আফিং গাছ, somniferum l.

অহিভয়—ভুঁই আমলা।

**অহিভুক**—গন্ধনাকুলী।

**অহিলতা**—গন্ধনাকুলী, ২ তাম্বুলিলতা।

**অহীত্র**—অনন্তমূল।

**অহেরু**—অনন্তমূল, শতমূল।

**আঁইষ**—লিচুজাতীয় গাছ, আঁষ ফল, nephelium longana. ফল গোলাকার মসৃণ। লিচুর ফুলদল নাই, আঁষফলের আছে। শাঁসে আমিষ গন্ধ।

**আঁকোড়**—অঙ্কোট দ্র°।

**আঁটিকা কলাই**—[ হিং আঁকড়ী ] লতানিয়া গাছ, শিম্বাদিবর্গের বন্য কলাই বিশেষ, vicia sativa.

**আঁত মোড়া**—[ সং আবর্ত্তকী, অজশৃঙ্গী, রক্তপুষ্পী, বামাবর্ত্তা, আবর্ত্তনী, হিং কুপাইসি, জোয়াকা ফল, মাড়োর ফলী, তে° শয়ামলী, তা° বলাম্বিরিকৈ, ফা° পিচক্ ] বন্ধুকাদিবর্গের বৃহৎ ক্ষুপবিশেষ। ফল পিপুলের মত কিন্তু স্ক্রুর মত প্যাচ আছে, isora corylifolia, helictares isora.

**আইচ**—আউচ্ছ দ্র°।

**আউচ্ছ**—[ সং আচ্ছুক, ও° আচ্ ] আচ্ছুকাদিবর্গের ছোট ক্ষুপবিশেষ; আচ, morinda citrifolia.

**আউস**—ধান্যবিশেষ। ধান্য দ্র°।

**আক, আখ**—[ সং ইক্ষু, পুণ্ড, কান্তার, কজ্জল, হিং ইখ, উঁখ, উক; গন্না, গাঁড়া, ম° উঁস, গু° শেরডী, ক° কবু, কব্বিন্ মেক্স, তে° চিরকু, ফা° নেশকর, অ° কমবুল শক্কর, ও° আখু, ঢাকায় আউখ, ফরিদপুরে কুষইর ] মিষ্ট রসাল দণ্ডের ন্যায় বৃক্ষ, saccharum officinarum. প্রকার ভেদ—দেশী, পুঁড়ী, কাওারী, খড়ী, শ্যামসাড়া, কাজলা, কাজলী, বোম্বাই।

**আকন**—আকন্দ দ্র°।

**আকনাদি**—[ সং বিদ্ধকর্ণী, অবিদ্ধকর্ণী, কর্ণ, নিমুকা, হিং আকনাদি, ও° অকানবিঁধি ] লতাবিশেষ, গুড়চীর মত, stephania hernandifolia. আকনাদি ও নিমুকা এক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পর্যায়—অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা যূথিকা, স্থাপনী, শ্রেয়সী, বিদ্ধকর্ণিকা, একাষ্ঠিলা, কুচেলী, দীপনী, বনতিক্তিকা, তিক্তপুষ্পা, বৃহত্তিক্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, বরা, দেবী, বৃত্তপর্ণী॥ শব্দ°॥

**আকন্দ**—[ সং অর্ক, মন্দার, তুলফল, হিং আক, মদার, ও° অরখ ] অর্কাদিবর্গের ক্ষীরীক্ষুপবিশেষ। আকন, আকন্দ calotropis gigantea, ছোট আকন্দ calotropis herbacea. আকন্দের প্রকার—শ্বেত আকন্দ, রক্ত আকন্দ। পর্যায়—সাধারণ—ক্ষীরদল, পুচ্ছী, প্রতাপ, ক্ষীরকাণ্ডক, বিক্ষীর, ক্ষীরী, অর্কপর্ণ, খর্জুঘ্ন, শীতপুষ্পক, জম্ভন, ক্ষীরপর্ণী, বিকীরণ, সদাপুষ্প, সূর্য্যাহ্ব, আস্ফোতক, শুকফল, বসুক, আস্ফোত; শ্বেত আকন্দ—অলর্ক, রাজার্ক, প্রতাপস, গণরূপী; রক্ত আকন্দ—বিশ্বোর, সদাপুষ্পী, রূপিকা, আদিত্যপুষ্পিকা, দিব্যপুষ্পিকা, অর্ক॥ শব্দ°॥

**আকরকড়া**—গুলদণ্ডী বা গুলচিনি বলিয়া পরিচিত, pyrethum-indicum.

**আকরকরা**—[ সং আকারকরভ, অকর, অকরকরভ; হিং আকরকরা, তে° অকলকরা, গু° অকীরকরম, ইং spanish pelitory ] সোমরাজিবর্গের শাকবিশেষ, anacyclus pyrethum.

**আকারকরভ**—আকরকরা দ্র°।

**আকরোট**—আখরোট দ্র°।

**আকাশমাংসী**—জটামাংসী দ্র°।

**আকাশমূলী**—কুম্ভিকা, পানা।

**আকাশবল্লী**—[ হিং অমরবেল ] আকাশবালি, আকাশবেল, cassytha filifornis, সরু পত্রহীন হরিদ্বর্ণ লতাবিশেষ।

**আকাশবেল**—আকাশবল্লী দ্র°।

**আক্রণ**—rotthera laccifero।

**আক্ষিক**—রক্তকবৃক্ষ।

**আক্ষীব**—অক্ষীব দ্র°।

**আক্ষোট, আক্ষোড়**—পর্বতীয় পীলুবৃক্ষ, ২ আখরোট গাছ।

**আখরোট**—অখরোট দ্র°।

**আখু**—দেবতাড় বৃক্ষ।

**আখুকর্ণপর্ণিকা, আখুকর্ণী, আখুপর্ণিকা**—ইন্দুরকানী লতা।

**আখুবিশহা**—দেবতাড় বৃক্ষ, দেবতালী লতা।

**আখোট**—শৈলপীলু বৃক্ষ, আখরোট গাছ।

**আগমকি, আগমী**—[ ইং bristly bryony ]।

**আগমুখী**—mukia scabrela।

**আঘটক**—রক্ত অপামার্গ, রাঙা আপাং গাছ।

**আঘাট**—আপাঙ গাছ।

**আওলা**—আমলকী দ্র°।

**আঙ্কোল**—অঙ্কোট দ্র°।

**আঙ্গুর**—[ সং দ্রাক্ষা, ফা° অঙ্গুর, ইং vine, grapes ] দ্রাক্ষা লতার ফল। দ্রাক্ষা দ্র°। দুই রকম ফল—কিসমিস, মনক্কা। পর্যায়—দ্রাক্ষা, মৃদ্বীকা, গোস্তনী, স্বাদী, মধুরসা, চারুফলা, কৃষ্ণা, প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা, রসালা, অমৃতফলা, রসা। শব্দ°।

**আচ**—আউচ্ছ দ্র°।

**আচারী**—হেলঞ্চ লতা।

**আচু**—[ ইং rasp berry ] একপ্রকার কাঁটাগাছ, rubus panciflorus.

**আচ্ছুক**—আইচ বৃক্ষ।

**আজন্ম সুরভিপত্র**—মরুবকী বৃক্ষ।

**আঞ্জীর**—[ ফা° অঞ্জীর (পেয়ারা ফল), সং অঞ্জীর (ডুমুর) ] ficus cunia. আটকপালি—অঞ্জীর দ্র°।

**আটকে কলায়**—[ সং বৃকানক, হিং মুঙ্গফলি, তা° বার্কদলাই, তে° বার্পসানা গা-কায়া ] চীনাবাদাম, মাটকলাই arachis hypogaea. চীনাবাদাম দ্র°।

**আড়স**—অশ্বগন্ধা ও আড়শ এক অথবা এক নয়।

**আঢকী**—অড়হর, শমীধান্যবি°।

**আতবী জাম্বীর**—[ ও° নারগুলি, ইং wild lime ] ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, atlantia morophylla c.

**আতা**—[ সং আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র, হিং আতা, সীতাফল, শরীফা, ফা° আতা, শরীফঃ, তা° সীতাপল্লম, তে° সীতাপুলু, ও° আত, ইং sweet shop, castard apple ] ফলতরুবি° anona squamosa. ফলের গা উঁচু-নীচু। নোনা আতা [ ইং bullock's heart ] anoma reticulata. [ ক্রমশ ]

## জয়দেবের মেলায়

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

### শ্রীমতী সাধনা কর

চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের রান্না, খাওয়া, সে কি দু-এক ঘণ্টাতেই হয়। কাজে ব্যস্ত আছি, শ-দা এসে বললেন—করছ কী? কী কাজে ব্যস্ত রইলে? গান যে শেষ হয়ে গেল।

—আজ না হয় শুনব কাল, ধুলোট'নাকি খুব জমে।

—জমে তো; কাল থাকা হবে কী করে? পরশু ছুটি নেই, ভুল খবর। গান শুনব ব'লে এসেছি, সে শোনা হবে না। থাক্ পড়ে খাওয়া, থাক্‌গে ঘুম। তাড়াহুড়ো লাগিয়ে কোনো রকমে খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম পাঁচ মিনিটে। সরু গলি, দোকানে দোকানে ভরা, আলোয় সব ঝলমল করছে। ঘুরতে ঘুরতে অল্প পরেই এসে পড়লাম রাস্তায়—মেলাহীন আলোহীন জায়গা। রাত প্রায় এগারোটা। বাউলদের গান ঝিমিয়ে পড়েছে। দু'কাতারে মেলার লোক আর বাউল-বোষ্টম ঘুমিয়ে পড়েছে, নিশীথ রাতে চাঁদ উঠেছে, শান্ত-স্নিগ্ধ। দূরে বটতলায় তখনো গান হচ্ছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললাম। যেখানে এসে থামলাম সে অলৌকিক স্বপ্নরাজ্য। বিরাট-বিরাট অশথ গাছ, একটার সঙ্গে আরেকটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। এমনি মোটা-মোটা গুঁড়ি। এ পাশে কীর্তন হচ্ছে আর ওপাশে বাউল-গান, এদিকের গান ওদিক থেকে শোনা যাচ্ছে না। উপরে ডালে পাতায় নিশ্ছিদ্র চন্দ্রাতপ। ফাঁকে-ফুকোরে চাঁদের আলো, দুটি-একটি সোনালী তারা দেখা যাচ্ছে। গাছগুলি থেকে অজস্র ঝুরি নেবেছে। প্রাকৃতিক সভাখানা। হাজার-হাজার বাউল-বোষ্টম। বেশীর ভাগ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুতিন দল তখনো গান করছে। আমরা গিয়ে বসতে ওদের গানে এল ফুর্তি। গুপীযন্ত্রে মারতে লাগল ঘন ঘন ঘা, ঘুঙুর-পায়ে, ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল, গলা খুলে আপন ভুলে গাইতে লাগল গান,—

—মনে করি পায়ে ধরব না, তবু মন প্রাণ কাঁদে।

তুমি গো রাজনন্দিনী, তোমায় না দেখে পরান কাঁদে।

কত শত গান, গানে-গানে রাত্রি সজীব হয়ে উঠল, গাছ পালায় গান প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। কোন্ অজানার প্রেমের রসে মজে উঠল বাউল, কাকে পেয়েছে আজ বহুদিনের পরে অতি কাছে, অভিসারে বেরিয়ে পড়েছে অন্তরে অন্তরে। তাকে পাওয়া না-পাওয়া যেন এক হয়ে গেছে; বিরহ দুঃখে উপচিয়ে বেজে উঠছে যে মাধুরী তাতে শোনা যাচ্ছে যেন বহুদিনের সুর—

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।

কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি।

আমার পাশেই বসেছিলেন আমাদের দলের একটি পারসিক ভদ্রলোক, আর, দু'টি আমেরিকান ছাত্র। একটি ছাত্র বলে উঠলেন ভারতবর্ষে এমন জিনিস আছে, জানা ছিল না তো।

পারসিক ভদ্রলোক বললেন—না দেখলে বই পড়ে কি আর এর স্বরূপ বোঝা যেত।

প-দা বললেন—ভারতবর্ষের এ একটি খাঁটি দেশী জিনিস দেখতে পেলে। শহরের জিনিষ যেন ভারতবর্ষের বাইরের কারু কাজ; দেশের ভিতরে-ভিতরে সবার চোখের আড়ালে এ সব ধারা বয়ে চলেছে।

ওরা বললেন—গানের মানে বুঝিয়ে দাও।

প-দা ইংরাজি করে মানে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, ওরা খুব খুশি। বাউলদের দল ঝিমিয়ে পড়ছে, ক্লান্তিতে নিজেদেরও চোখ বুজে আসছে, এ জায়গা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

শ-দা বললেন, আমি চা খেয়েই চলে এসেছিলাম। তোমরা কতটুকু আর দেখতে পেলে? হাজার হাজার বাউল বোষ্টম এক সঙ্গে নাচ গান করে, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটি বাউল যা দেখলাম, তাঁকে না দেখলে বুঝতে পারবে না সে কি মানুষ! যেমন তাঁর গান, তেমনি নাচ; অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি; ওদিকে নির্জনে গাছের আড়ালে গিয়ে দেখালে।

দোতালায় উঠতে গিয়ে হতবুদ্ধি। পা ফেলতে জায়গা পাইনে। ঢুকবার ঘরে ভিতরের বারান্দায় তিল ধরে না। গায়ে-গায়ে মানুষ শুয়ে আছে, যেন স্ক্রু দিয়ে আঁটা। শেষটা রেলিঙের পাশে পাশে পা ফেলে ফেলে চললাম। ঝরঝরে নড়বড়ে রেলিং, ভয়ে ভয়ে পা ফেলি, না পড়ে যাই! একজন বলে উঠল—যে ভিড় হয়েছে, গোটা দোতালা-টাই না ধ্বসে পড়ে। অবিশ্বাস্য নয়, কিছু উপরে নীচে শ-পাঁচেক লোকের ভিড় তো হয়েই-ছে। চাপা পড়বে, একদিন খবরের কাগজে হয়তো খবরটা বেরুবে, তার পরে····সান্ত্বনা এই—তীর্থস্থানে মরলে স্বর্গলাভ হয়; অপমৃত্যুতেও নরক অবধি—নিশ্চয় যেতে হবে না। মেলাতে আধুনিক উপদ্রব বায়োস্কোপের কান-ফাটানো গান থেমে এলো; মেলা ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুমে আমাদেরও চোখ জড়িয়ে এল।

"বহুদিনের সাধ জয়দেবে আসা, হয়ে কি আর ওঠে। সেই যে গল্পে আছে······।"

আধ-ঘুমে বুঝে উঠতে পারিনে—কোথায় আছি, কারা সব গল্প করছে; কোত্থেকে বা ভেসে আসছে অতি সুললিত সুর। ভাঙা টালির ভিতর দিয়ে, ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে ডুবে-আসা চাঁদের ম্লান আলো ঘরটাকে ভরিয়ে তুলেছে। ঘুম ভেঙে গেল। হুঁশ হল জয়দেবের জন্ম স্থান কেন্দুলিতে আছি। বারান্দায় যাত্রীরা শুয়ে গল্প করছে, কত দেব-মাহাত্ম্যের গল্প কত তীর্থের কাহিনী নিজের নিজের সংসারের গল্পই বা কত। সেই বটতলাতে তখন চলছে প্রভাতী কীর্তন গান, গাইছে বোধ হয় বাউলরা কয়েক জন মিলে; অস্পষ্ট সুর পাখির কাকলির মতো ভেসে আসছে। ইচ্ছে হল ছুটে যাই। কিন্তু দলের সবাই আছে ঘুমিয়ে। কনকনে শীত, ডাকাডাকি ঠেলাঠেলি করে তুলব, সাজ পোষাক পরা হবে নির্ঘাত বেলা হয়ে যাবে, গান কি ততক্ষণ থাকবে। চুপ করে শুয়ে

শুনতে লাগলাম :—"ওঠো জাগো শ্রীনন্দের নন্দন "—অতি কাছেই গান শোনা গেল। আর কি শুয়ে থাকা চলে? দোর খুলে চৌকাঠে দাঁড়ালাম। আলো আবছায়ার শান্ত ক্ষণ। মন্দিরের চূড়ায় জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। একজন প্রভাতী গেয়ে গ্রাম ঘুরছে! প্রদক্ষিণ করছে মন্দির। দোকানীরা সবে দোকানের ঝাঁপ তুলছে, জলের ছিটে দিচ্ছে ঘরের দোরে, নাম গান করছে। গৃহস্থ-বধূরা জলের ছিটে দিতে দিতে জয়দেবের মন্দিরে ঢুকলো।

চা খাওয়া চলছে, সু-দা বললেন—বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত, যিনি বীরভূম সম্বন্ধেও বই লিখেছেন, বসে আছেন নাকি সভাখানায়। তাঁকে এখানকার বিষয় কিছু জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাক।

প্রৌঢ় পণ্ডিত ব্যক্তি পরম উৎসাহে আলাপ-আলোচনা করলেন। বললেন—এবার তো তেমন বাউল-বোষ্টম আসেনি, সারা ভারতের বাউল-বোষ্টমরা এখানে এসে মিলত। জয়দেবের জন্মস্থান তাঁদের প্রধান তীর্থস্থান। আগে কত মুসলমান ফকির-দরবেশকেও আসতে দেখেছি, আজ ক'বছর থেকে দেখছি তাঁরা একেবারেই আসছে না। এবার একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ভদ্রলোক বললেন —জয়দেবের মেলা কবে থেকে হচ্ছে ঠিক জানা যায় না, হয়তো তাঁর তিরোধানের পর থেকেই হচ্ছে। না হলেও, এ মেলা বহুকালের পুরোনো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দেখতে বললেন,—লাউসেন তলাও, ইছাই ঘোষের গড়। অজয় পেরিয়ে যেতে পথ অল্প, কিন্তু গহন অরণ্য, বাঘের ভয় আছে। ঘোরা-পথে যাওয়া নিরাপদ, কিন্তু মাইল তিনেক দূর হবে।

একদিনের মধ্যে কি আর সে-সব হেঁটে দেখা সম্ভব! স্থানীয় দ্রষ্টব্য জয়দেবের মন্দির, কুশেশ্বর শিবমন্দির, কদমখণ্ডীর ঘাট—যেটা জয়দেবের সিদ্ধিস্থান বলে খ্যাত, এসব দেখতেই বেরিয়ে পড়লাম। আগে চোখে পড়ল রথটি। শুনলাম—কোনো এক মোহান্ত এই পিতলের রথ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা। খুব সমারোহ হয়। পৌষ-সংক্রান্তি এবং রথযাত্রা—এ দুটিই কেন্দুবিল্বের প্রধান উৎসব। জয়দেবের মন্দির ব'লে কথিত মন্দিরে গিয়ে উঠলাম। মন্দির খুব প্রাচীন বলে মনে হল না। ষোড়শ শকাব্দে বর্দ্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী নাকি এই নূতন মন্দিরটি তৈরী করে দিয়েছেন। রাধাবিনোদ মূর্তিটি শ্যামরূপার গড় থেকে আনীত। প্রবাদ জয়দেবের রাধাবল্লভ বিগ্রহ তাঁর সঙ্গে এ স্থান ত্যাগ করেছিল। মনে মনে ভাবতে লাগলাম—কিংবদন্তীর মূলে কি সত্যের আভাস লুকিয়ে আছে। জয়দেবের সময় দ্বাদশ শতাব্দী, তারপরে দেড়শ' বছর ধরে এ মুসলমান আক্রমণ চলেছিল, মন্দির লুণ্ঠিত, বিগ্রহ চূর্ণিত হয়েছিল, কেন্দুলি কি রেহাই পেয়েছিল তার থেকে? জয়দেবের কৃষ্ণভক্তি বিখ্যাত ছিল সেই সময়ই, সেখ শুভদয়ায় এমন ইঙ্গিত রয়েছে। মুসলমান আক্রমণ হওয়া অসম্ভব নয়। মন্দিরের বাইরে ইটের কাজ ঝাপসা হয়ে এসেছে। ভিতটি বড় নয়, একটি মাত্র কোঠা। অন্তরে ঢোকা নিষিদ্ধ। বিগ্রহ মূর্তির সামনে পাথরে খোদাই— "স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্"।

কদমখণ্ডীর ঘাটে এসে দেখলাম অজয়। ঘাট বলে কিছু নেই উঁচু নীচু ভাঙা পাড়। একটা অশথ গাছ মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। বালির স্তূপ আর বালির চর। রাশি রাশি বালির মধ্যে একটিমাত্র ক্ষীণ স্রোত, বয়ে চলেছে, কি না—চলেছে। জলে বোধ হয় পা ডোবে না। এ জলেই মকর-সংক্রান্তির ব্রাহ্মমুহূর্তে হাজার হাজ বাউল-বোষ্টম এবং পুণ্যার্থীরা স্নান করেছে। পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখা ভারী সুন্দর। ভোরবেলাকার স্নিগ্ধ রোদ, সাদা বালির চর, এখানে ওখানে জলের ধারা, স্নান করছে, আহ্নিক করছে কত লোক কদমখণ্ডীর ঘাটের উপরে মন্দির—ছোটোখাটো ঘর। কুশেশ্ব শিবের মন্দির, মাঝারি গোছের শিবলিঙ্গ। কাঠের শিকের দরজা বন্ধ। সিঁদুরে-চন্দনে লেপা শিক। মন্দিরের গায়ে লেখা— "এইখানে একটাকা দিলে সন্ধ্যা ছ'টায় জয়দেবের পুঁথি হস্তলিপি দেখিতে পাওয়া যাইবে," ইত্যাদি। পাশের মন্দিরে একটা পাথরে পায়ের ছাপ রয়েছে।—জয়দেব ঠাকুরের? এদিকে আরো দুখানা ঘর, দেবদেবীর মূর্তি আছে, সঙ্গের একজন বললে—চলো, এ সব দেখার চাইতে বরং বিল্বমঙ্গল দেখে আসা যাক। মাইলখানেকের মধ্যেই আছে।

আর-একজন বললে—বিল্বমঙ্গল তো দক্ষিণ দেশে।

বললাম—ঘুরে আসাই যাক, সারা গাঁটা তো দেখা হবে।

তিন চারজনে মিলে বেরিয়ে পড়লাম। মেলার একজন সেবাব্রতী, জানা গেল সে আমাদেরই একজনের চেনা, চললেন তিনিও। ক'দিন থেকে এখানে আছেন। গ্রাম কিছুটা তাঁর জানা শোনা। বললেন— গ্রামটা খুব বড়ো নয়। পোষ্টাফিস আছে, মহান্তদের বড়ো-বড়ো আখড়া আছে,—কাঙাল খেপা, খোটরি বাবা ও মনোহর দাস বাবাজির; জমিদার আছেন, এ ছাড়া আর সাধারণ গৃহস্থ।

মেলা পাশে রেখে নদীর তীর ধ'রে চললাম। গাছপালার নীচে এক এক জায়গা এত স্তব্ধ, এমন মনোহর—পা আর চলতে চায় না।

খানিকটা এসে নদী ছেড়ে মাঠের পথ ধরলাম। আখ-খেত, কলাই-খেত, শর-ঝোপ। সামনেই টিকরবেতা গ্রাম। পেরিয়েই প্রান্তর, তারই বনের মধ্যে বিল্বমঙ্গল সাধুর আশ্রম। কেন্দু বা বিল্ব গাছের প্রাচুর্য্য দেখলাম না, এখানে এসে তমাল গাছের ঘনকুঞ্জ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কালো গাছে পুঞ্জপুঞ্জ কালো পাতা। গাব ফলের মত ফল। মনে পড়ে গেল—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ—নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।"

একজন প্রৌঢ় বাবাজি আছেন, আলাপ হল। একখানা মাটির কুটীর; তার ভিতরে দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি; বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধে নানারকম কথা হল, তাঁর কাছে সব শোনা গেল। সরল মানুষটি বললেন—পঁচিশ বছর আছি এখানে। চেষ্টা করছি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সম্বন্ধে তথ্য জানতে। এই যে অজয় দেখছেন এ অজয় বর্ষায় জলে ভেসে যায়, এক-একবার ভাসিয়ে নিয়ে যায় এ সব জায়গা, বড় বড় সাপ ভেসে আসে, গাছে উঠে থাকতে হয়।

বিল্বমঙ্গল দেখে ফিরে আসতে-আসতে বেলা দুপুর। আসবার পথে মেলাটা একটু ভাল করে দেখে এলাম। তাঁতের কাপড়, মটকা কাপড় প্রচুর উঠেছে, আর উঠেছে পাকা কলা, বিরাট বিরাট কাঁদি অজস্র। শ্বেত পাথরের জিনিস সব সস্তা। নানান রকমের পাখি এসেছে বিক্রি করতে। এ ছাড়া বিদেশী দ্রব্য। এদিকে এসে দেখি আমাদের খেতে বসবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তার পরই নাকি রওনা দিতে হবে।

পথে আছে ইলামবাজারের মন্দির; সবারই দেখে যাবার ইচ্ছে।

জমিদার-বাড়ির সভাখানা। কাছেই কুয়ো। গেলাম হাত-মুখ ধুতে। অমনি ঘুরে আসা গেল ভিতরটা—জমিদারের ঠাকুরবাড়ি। কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মূর্তি। সুন্দর বিগ্রহ। বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ, কত রকম অলঙ্কার। কাছে গিয়ে দেখি কাপড়ের বিড়ার উপর কালো কালো পাথর,—সারি সারি সব শালগ্রাম শিলা। শুনলাম, মানত ক'রে ফল পেয়েছে যারা, শালগ্রাম শিলাগুলি তাদের দান।

সঙ্গী আমাকে চুপি চুপি বললেন—ভগবানের বিবেচনা আছে, সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে এতদিনে ঘরটা শালগ্রাম-পাথরে ঢাকা পড়ত যে।

খেতে বসে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ধুলোট না দেখে যাচ্ছি! গুম হয়ে আছি, শ-দা বুঝলেন, কোন্‌খান থেকে ঘুরে এসে চুপি চুপি বললেন—বাউল-বোষ্টমদের মচ্ছোব হচ্ছে, কাউকে জানিয়ো না, চলে এসো। বেঁধে-ছেঁদে রওনা হতে ঘণ্টাখানেক আরো দেরী। এর মধ্যে একবার ঘুরে আসি গে।

চুপ ক'রে শ-দার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। প্রেমদাস বাবাজি, মনোহরদাস বাবাজি, সবার আখড়া, বড় বড় পাকা বাড়ি। উল্টো দিকে নদীর তীরে বাঁশের বাখারি দিয়ে ঘেরা খাবার জায়গা। স্তূপীকৃত সব রান্না। দেখতে দেখতে খাবার জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। বাঁশের বাখারির বাইরে দর্শকদের ঠাস বুনোট। ভিতরে ঢুকব সাধ্য কী। যাঁরা পরিবেশন করছিলেন একজন শ-দার পরিচিত। ভাগ্যক্রমে তাঁরই সঙ্গে শ-দার চোখোচোখি হয়ে গেল। হাতের ইসারায় ডাকলেন। শ-দা বললেন—অভেদ্য ব্যূহ।

তিনি হেসে একটু এগিয়ে এলেন। বললেন—"ওদিকে যান, ও কোণটা একটু ফাঁকা আছে, বাউল-বোষ্টম ভিন্ন অন্যের ঢোকা নিষেধ।"

এ কাঠরায় শ' তিন-চারেক লোকের বৈঠক সবে বসেছে। ওপাশে শ' তিন-চার লোকের বৈঠকে পায়েস-মিষ্টি দেওয়া চলছে। কলকাতা থেকে সেবাব্রতীরা এসেছেন, স্থানীয়ও কত আছেন, শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিবেশন চলেছে—ভাত-ডাল, ভাজা, তরকারী, চাটনী, পায়েস মিষ্টি। পরিচিত ভদ্রলোক এক ফাঁকে শ-দার কাছে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—তিন দিন এমনি চলে। বারোটা থেকে সূর্যাস্ত অবধি বাউল-বোষ্টমদের আহার হয়, তার পরে আছে সাধারণের ভিড়। রাত ন'টা অবধি এমনি চলে।

যে-দলের খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল সে-দল সুন্দর সুরে কী একটা কলি গাইতে লাগল। একজন প্রথম একটি কলি গেয়ে দিচ্ছে, ধুয়ো টেনে উঠছে সবাই। জোরে নয়, মৃদুমন্দ সুরের ধুয়ো, একটি উঁচু, একটু নীচু, কখনো-বা স্থির মধ্যম। চমৎকার মিলিত সুরের ধুয়ো, কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। শ-দা সঙ্গীতজ্ঞ, বলে উঠলেন—ঠিক যেন বেদের সূক্ত গাইছে, সেই সুর সেই লয়···।

কান পেতে শুনলাম। গান থামল, পাতা হাতে উঠে দাঁড়াল সবাই, সার বেঁধে বেরিয়ে গেল একে-একে। আর এক দল এসে ঢুকল। শ-দা বললেন—এবার চলো, ট্রাকের হর্ণ বাজছে।

পরিচিত ভদ্রলোকটিকে বিদায় নমস্কার জানাতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন—

"চলে যাচ্ছেন। সন্ধ্যে লাগতেই যে ধুলোট আরম্ভ হবে, না দেখেই যাবেন? সম্পূর্ণ কেন্দুলি মেলা দেখতে হয় পৌষ-সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে তিন দিন। মেলা ভাঙতে অবশ্য চার পাঁচ দিন লেগে যায়। তবে আজ ধুলোট হলেই কাল বাউল-বোষ্টম সব চলে যাবে।"

শ-দা বললেন—"কাল আমাদের ছুটি নেই, যেতেই হবে।"

যেটুকু দেখলাম আর যা রইল অদেখা, তারই দুঃখে আনন্দে হৃদয় রইল ভ'রে ছেড়ে চললাম জয়দেবের দেশ।

## বর্ষ-শেষ

### রমেশ মুখোপাধ্যায়

এসে গেছে বৈশাখ, শেষ হলো বর্ষ,
পুরাতন পুড়ে ছাই—নতুনের হর্ষ।
বন্ধ ও চোখ যায় রোদ্দুর জ্বলছে,
এক পায়ে গাছ পালা জ্বর গায়ে টলছে!
আগুনের হলকায় রোদ্দুর ঝলকায়,
আই-ঢাই জল খাই—প্রাণ যেন চলকায়।
জাকুরার ভাপরার আঁচ করে গন্‌গন্‌,
শন্‌শন্‌ হাওয়া ছোটে, মাথা করে বন্‌বন্‌।
সূর্যের তেজ গলে, লাগে তাই শংকা,
চকচকে টাকে যেন ঘসে কাঁচা লংকা।
সন্ন্যাসী নেই হাসি, রুক্ষ এ পৃথ্বী,
ধূলা পায় গেরুয়ায় ভিক্ষাই বৃত্তি।
তবু ভাই, ভয় নাই, আম-লিচু-কাঁঠাল
টস্‌টসে রসভরা হাসি কেবা পাঠালে!

## ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

### দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

#### তিন

ইতিহাসের আগেও

বাংলার সৃষ্টি হোল। পরিপুষ্টি লাভ করল গঙ্গাস্রোতিবঙ্গভূমি। কত হাজার বছর বাদে সেখানে বসবাস শুরু হোল কে জানে—

'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে এ সমুদ্রে হোল হারা।'

সৃষ্টি হোল বাঙালী জাতির। গঙ্গাস্রোতিবঙ্গভূমিতে জ্বলে উঠল সভ্যতার মশাল।

সেই হোল প্রাচীন বাংলার প্রাচীনতম অধ্যায়। সেই হোল ইতিহাসের ভোর বেলা। তখন অন্ধকারের বুক চিরে আলো সবে জাগছে। তখনকার কথা লেখাজোখা নেই পুঁথিতে, উৎকীর্ণ নেই শিলালিপিতে, পরিচয় নেই তার ভূমি কিংবা ভূমাতে। 'অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে'—লিখেছেন কবি। সত্যিই অতীত কেটে গেছে, এসেছে বর্তমান, বর্তমান প্রস্তুত হয়েছে ভবিষ্যতের জন্যে; অতীত রেখে যায় নি কোনো আঁচড় বা কোনো স্বাক্ষর, মানুষ রেখেছে কিছু কিছু—তাতেই গড়ে উঠেছে ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস; সেই হোল ইতিহাসের নজীর।

*সেই কোন সুপ্রাচীন যুগে মানুষ লিখে রেখে গেছে রামায়ণ আর মহাভারত। এ দু'টি ইতিহাস নয়, মহাকাব্য। কিন্তু মহাকাব্য 'ইতিহাসোদ্ভব'। যে যুগে লেখা হয় সে যুগের আদর্শ ও ঐতিহ্যের পরিচয় এতে অম্লান ভাবে ফুটে ওঠে। সেজন্যে এই দুটি মহাকাব্য থেকে বাংলার প্রাচীনতম ইতিহাস জানতে পারি।*

রামায়ণ, মহাভারত—একাধারে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি—কি নয়? এক কথায়, একটা দেশের একটা কালের সামগ্রিক পরিচয় এদের মধ্যে পাই। আর্য্যরা এই বিশাল ভারতকে জানতে চেয়েছে, জানতে জানতে এগিয়ে গেছে একপ্রান্ত থেকে অন্তপ্রান্ত অবধি। সেই একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতকে জানা ও চেনার ইতিহাস এই মহাকাব্য দু'টি। তাই আর্য্যরা কি ভাবে বাংলার বুকে এগিয়ে এল, এ দেশটাকে জানল, চিনল, বসবাস শুরু করল—জানতে হলে এদের পাতায় দৃষ্টিপাত করতে হবে।

কিন্তু তার আগে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আলপাইন জাতি মিলে মিশে আর্য্য-পূর্ব যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তার দিকে দৃষ্টিপাত করি, এস।

আর্য্যরা আসবার আগে বাংলাদেশে যে মিশ্রজাতি থাকত, তারা দল বেঁধে নদীমাতৃক পল্লীগ্রামের নিভৃত নীড়ে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের মধ্যে ছিল সভ্যতার আলো, ছিল জীবন ধারণের বিশিষ্ট পদ্ধতি। তাদিকে অবৈদিক বলতে পারি। বৈদিক সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র ছিল তাদের সভ্যতা। কৃষি ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। গোড়ার দিকে চাষের কাজটা অবশ্য মেয়েদের এক্তিয়ারে ছিল। পুরুষেরা চলে যেত বনেজঙ্গলে, করত শিকার, মারত পশু, ধরত পাখী। আর মেয়েরা ছোট ছেলেমেয়েদিকে নিয়ে ঘরের পাশে ছুঁচলো কাঠের টুকরো বা পাথরের কুড়ুল দিয়ে মাটি খুঁড়ে বীজ পুঁতত, চাষ করত। ক্রমে পুরুষরা এসে তাদের সঙ্গে চাষের কাজে লেগে গেল। দূরদূরান্তর আর অনিশ্চিতের দিকে তাদের আকর্ষণ কমে গেল। নিশ্চয়তার পরম নির্ভরতায় তারা ঘরের কোণে আবদ্ধ হোল। ঘর আর গাঁ-কে কেন্দ্র করে তাদের আনন্দের শত আয়োজন; মাঠ-গাছ মেঘকে ছিল তাদের একান্ত প্রয়োজন। চাষবাসের স্বপ্নে তাদের দিনগুলি রঙিন হয়ে উঠত। মাঠে বীজ বুনে তারা মেঘের অপেক্ষা করত, বীজ বুনেই তারা ক্ষান্ত হোত—ফসল ফলানোর অন্য কোন উপায় তাদের জানা ছিল না। তাই ফসলের জন্যে তারা উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের সঙ্গে অনিশ্চয় অপেক্ষা করত। বীজ বোনা আর ফসল—এর মাঝে যে অনিশ্চয়তার ব্যবধান তাকে সফল কামনার কল্পনার ভরে তুলতে চেষ্টা করত। এই ভাবে তাদের মধ্যে নানান ব্রতকথার উৎপত্তি হয়েছিল, দেখা দিয়েছিল কত রকমের যাদু বিশ্বাস। প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ তাদের অজ্ঞাত ছিল। তারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির মূলে দেবতা-অপদেবতা কল্পনা করে তাদিকে তুষ্ট করবার জন্যে আর নিজেদের যাতে ভালো ফসল ফলে বা সৌভাগ্য লাভ হয় সেজন্যে তারা কথা ও সুর, ছবি ও নাচ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রত করেছে। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ "তোষলা" ব্রতের মাধ্যমে সেই প্রাচীন সমাজের একটি ছবি তুলে ধরেছেন।—

"পৌষমাসে এদেশে বেশ একটু শীত এবং সকালবেলার ব্রত এটি, কাজেই আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি, বহু যুগ আগেকার বাংলাদেশের একখানি গ্রামের উপর রাত্রির যবনিকা আস্তে আ সরে গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি, শীতের হাওয়া বইছে—গ্রা উপর বড় গাছের আগায় এখনো কুয়াশা পাতলা চাদরের মতো রয়েছে; শিশিরে সকালটি একটু ভিজে ভিজে; বেড়ার ধারে ধারে চালে চালে শিমপাতার সবুজ; ক্ষেতে ক্ষেতে মূলোর ফুল সরষের —দুধ আর হলুদের ফেনার মতো দেখা যাচ্ছে; নতুন সরায় বে পাতা চাপা দিয়ে, সার-মাটি নিয়ে মেয়েরা দলে দলে তোষলা করতে ক্ষেতের দিকে চলল এবং সেখানে মূলোর ফুল, শিমের ফু সরষের ফুল দিয়ে ব্রত আরম্ভ হোল।···

তারপর পৌষের-সংক্রান্তির দিনে মেয়েরা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ব্র সাঙ্গ করে একটি সরায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে সেগুলি মাথায় নি সারি বেঁধে নদীতে স্নান করে তোষলা ভাসাতে চলেছে।···

নদীতে তোষলার সরা ভাসিয়ে, তোষলার সারমাটি আর সূর্য চাষের দুই প্রধান সহায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেয়েদের জ ঝাঁপাঝাঁপি খেলা।···

এর পর, সূর্য্যের উদয় দর্শন করে, স্নান করে, ব্রত শেষে নদীতী দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় বর্ণন করে ছড়া—

"রায় উঠেছেন রায় উঠেছেন বড় গঙ্গার ঘাটে।

কার হাতের তেল গামছা? দাও গো রেয়ের হাতে।"

সত্যিই, এই ব্রত "আমাদের সেইকালের মধ্যে নিয়ে যায় যেখা দেখি মানুষে আর বিশ্বচরাচরের মধ্যে সরস একটি নিগূঢ় সম্ব রয়েছে।"

এরও আগে নব্যপ্রস্তর যুগ। পাথর দিয়ে অস্ত্র তৈরী কর সে-যুগের লোক। সে অস্ত্র দিয়ে বন্য পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষ করত। তখনও ধাতুর আবিষ্কার হয়নি। কেউ মারা গেলে তা মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হোত। সমাধির উপর একটা পাথর পুঁতে দেওয়া হোত। তখনই মানুষ শিখেছিল চাষ করতে, শিখেছিল মা দিয়ে পাত্র বানাতে। ঘর তৈরী করতে শিখল কালক্রমে। শিখ আগুন জ্বালাতে। এর পর তারা তামার সন্ধান পেয়েছিল। তাম দিয়ে তৈরী করেছিল অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র। মেদিনীপুর জেলা উত্তর দিকে, বাঁকুড়া জেলারও কোথাও কোথাও মাটি খুঁড়ে সেদিনকা মানুষের তৈরী তামার জিনিস পাওয়া গেছে। এই ব্যাপার ঘটেছি দ্রাবিড় জাতির মধ্যে। ক্রমে পূর্ব দিকে তারা এগোতে থাকে। আ ক্রমে ক্রমে অষ্ট্রিক, আলপাইন জাতিরাও এসে হাজির হয়। তার এখানে সেখানে ছড়িয়ে দল বেঁধে বসবাস করতে লাগল। তাদে মধ্যে মেলামেশাও শুরু হোল ধীরে ধীরে। এমনি ভাবে বাঙা জাতির প্রথম পত্তন হয়েছিল। বাংলার আদিম সভ্যতা গ উঠেছিল। তাদের মধ্যে নানান ব্রতকথার উৎপত্তি হয়েছিল কেমন ভাবে হয়েছিল তা আগেই বলেছি। নানা রকম যাদু বিশ্বাসও দেখা দিয়েছিল। গাছ-পুজো, পাথরপুজো তখন থেকে চলে আসছে। চাষ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে অনেক শস্যদেবী আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন ষষ্ঠী ঠাকুর, লক্ষ্মীঠাকুর। দুর্গাও মূলত এক শস্যদেবী। সাপের পুজোও তখন প্রচলিত হয়েছিল। ভূত প্রেত, উপদেবতা-অপদেবতা এসব এসময়েই সৃষ্টি হয়েছিল। নৌকে তৈরী করতে পারত তখনকার লোকেরা। তখন থেকেই বিয়েতে হলুদ, সিঁদুর প্রভৃতির ব্যবহার চলে আসছে।

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সেখানে অনেক ছোটছোট রাজ্য গড়ে উঠল। আর্য্যেরা এল। আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হতে থাকল। আমরা রামায়ণ মহাভারতের যুগে এসে পৌছলাম। আগেই বলেছি, আর্য্য রাজন্যবর্গ ক্রমে ক্রমে দিগ্বিজয়ে বেরুতে শুরু করলেন। বাংলার বুকে হানা দিতে লাগলেন। রামায়ণের পাতায় একটিমাত্র অভিধানের কথা জানতে পারি। কবির কথায়,—

"আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।"

রামচন্দ্রের প্রপিতামহ হলেন রঘু। রঘু ভীষণ যুদ্ধের পর বঙ্গ ও সুহ্ম জয় করেন। পরে আমরা দেখি, বঙ্গ, অঙ্গ মগধ, মৎস্য, কাশী ও কোশল কোমবর্গ অযোধ্যা রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।

মহাভারতে আদিপর্বে, সভাপর্বে আর ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মজনের কথা আছে।

অঙ্গদেশ ছিল দুর্য্যোধনের অধিকারে। তিনি কর্ণকে অঙ্গের রাজা করেছিলেন। পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষার পর তাদের প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল। অর্জ্জুনকে কেউ হারাতে পারেন না। কোথায় ছিলেন কর্ণ। এসে হাজির! কিন্তু তাকে কে জানে? রাজার ছেলে না হলে এই প্রতিযোগিতায় কেউ যোগ দিতে পারবে না। কর্ণ হলেন সারথি অধিরথের ছেলে। কর্ণ যোগ দিতে পারেন না প্রতিযোগিতায়। দুর্য্যোধন তখন কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করে দিলেন। কর্ণের রাজধানী ছিল চম্পা নগরীতে। প্রবাদ আছে, এই চম্পা থেকে আনা কলা ও ফুলের নাম চাঁপা কলা ও চাঁপা ফুল।

পুণ্ড্ররাজ্য। তার রাজা বাসুদেব। কৃষ্ণের এই নাম। তাই তাঁকে বলা হয়ে থাকে পৌণ্ড্র বাসুদেব। তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ বলে ঘোষণা করতেন। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হয়।

উত্তরবঙ্গে আর একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্য বাণরাজার, বাণরাজা শিবের ভক্ত ছিলেন, কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। বাণরাজার মেয়ে উষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধর বিয়ে হয়। দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে মাটির তলা হতে একটি দুর্গ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাকে "বাণরাজার গড়" বলে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভা হয়েছিল। রাজা দ্রুপদ ঘোষণা করেছিলেন যে লক্ষ্য বিঁধতে পারবে তাকেই বরণ করবেন দ্রৌপদী। নিচে গভীর কূপের মধ্যে আছে একটি মাছের চোখ, উপরে তার প্রতিচ্ছায়া দেখে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। এই সভায় কত যে রাজা এসেছিলেন, তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে মহাভারতে। তাতে বঙ্গরাজের কথাও বলা হয়েছে।

অর্জুন বারো বছর বনবাস করেছিলেন। ঘুরেছিলেন তীর্থে তীর্থে। কাশীরাম দাস লিখেছেন,

"অঙ্গবঙ্গ মধ্যেতে যতেক তীর্থ বৈসে।
দেখি পার্থ যান পরে মণিপুর দেশে।।"

আর ভীমের দিগ্বিজয় বর্ণনায় তিনি লিখেছেন,

"হেলায় জিনিয়া ক্রমে অনেক নৃপতি।
গিরিব্রজে শীঘ্র গেলা ভীম মহামতি।।
পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব কৌশিকীর কূলে।
তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ দলে।।
তাহারে জিনিয়া রাজ্য পাইল বহুত।
বঙ্গেতে সমুদ্র সেনে জিনে কুন্তীপুত।।
চন্দ্র সেন রাজারে জিনিয়া মহাবীর।
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর।।"

সমুদ্রতীরে ছিল তাম্রলিপ্তি রাজ্য। তাম্রলিপ্তির রাজা ময়ূরধ্বজ ও তাঁর ভাই নীলধ্বজ ভীমের সঙ্গে তাঁদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তার বর্ণনা মহাভারতের পাতা উল্টোলেই দেখতে পাবে।

শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ নয়, মহাভারতে বাংলার সমৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। বাংলার হাতী আর্য্যরাজাদের কাছে ছিল লোভনীয়। বঙ্গ ও পুণ্ড্রের রাজারা যুধিষ্ঠিরকে হাতী, দামী কাপড়, মুক্তা ইত্যাদি উপহার দেন। বাংলার লোকরা তখন বড় বড় নৌকোয় করে সমুদ্র ভ্রমণ করত, সমুদ্র হতে মুক্তা তুলে আনত।

আর্য্যরাজাদের পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজাদের পরিবারের এ ভাবে যোগাযোগ ঘটতে থাকে। বাংলাদেশের রাজপরিবারগুলি আর্য্য প্রভাবের বশীভূত হয়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু উপরওলা লোকও আর্য্য প্রভাবে পড়ে। আর্য্য সভ্যতার কাছে বাংলার মাথা বিকোলো কিন্তু প্রাণ বিকোলো না। বাংলার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটল, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরাভব ঘটল না। বাংলার আদিম সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার মুখোমুখী হোল

## অভাগা

### অসীমকুমার দাশ

তাদের কথা ভুলিস না রে
যাদের চোখে অশ্রু ঝরে।
বাঁধন যাদের ছন্নছাড়া
বাঁধ না তাদের মায়ার ডোরে।।
বেদন যাদের চিরসাথী
ধরায় যাদের আঁধার রাতি
দেনা তাদের জ্বালিয়ে বাতি,
জমাট বাধা আঁধার ঘরে।
কণ্ঠে তাদের সুর মিলিয়ে
গা না গান দুঃখ চুকিয়ে
দরদ তোর দে বিলিয়ে,
এমনি শুধু তাদের তরে।।

## ভৌতিক বাক্স

### যাদুকর বি, দাস

ভারতীয় যাদুবিদ্যা বা যাদুকরদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে ৺গণপতি চক্রবর্ত্তীর কথা। আর ৺গণপতি চক্রবর্ত্তীর কথা উঠলেই মনে হয় তাঁর সুবিখ্যাত ভৌতিক বাক্সের (Illusion Box) খেলা। যে সময়ে ভারতে ৺গণপতি চক্রবর্ত্তী তাঁর বাক্সের খেলা দেখিয়ে দর্শকচিত্ত জয় করে চলেছেন প্রায়—সেই সময়েই ইংলণ্ডে এই খেলাটি সমান জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন সেখানকার এক কৃতী যাদুকর জন নেভিল মাস্কেলীন (John Nevil Maskelyne)

এই খেলাটাকে কেন্দ্র করে মাস্কেলীন সাহেবকে কতবার যে আদালতে দাঁড়াতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই কথাই বোলবো। ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্যে যতটুকু দরকার তার বেশী কথা বাক্সের কৌশল সম্বন্ধে বোলবো না, কারণ পৃথিবীর বহু যাদুকর আজও দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। আশা করি, পাঠক আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা ক'রবেন। ঘটনাটা বলার আগে যাদুকর মাস্কেলীন সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিলে ব্যাপারটা আরও ভালো লাগবে—বলে মনে হয়। এতবড় এবং প্রতিভাবান যাদুকর শুধু ইংলণ্ডেই নয় সারা পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছে। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে সুরু তাঁর যাদুজীবনের। বয়স তখন কম। তিনি ক্যাথেলটনহামের এক ঘড়ির দোকানে কাজ করেন। সেই সময়ে আমেরিকার বিখ্যাত ভৌতিক বিদ্যা প্রদর্শনকারী (spirit seance) ডেভেনপোর্ট ব্রাদার্স ঐ সহরে খেলা দেখাতে আসেন। সাধারণ দর্শকের মত কৌতূহল নিয়েই মাস্কেলীন খেলা দেখতে যান। কিন্তু ভাগ্যের চাকা তাঁর ঘুরতে আরম্ভ করেছে অন্যদিকে, নইলে এত দর্শক থাকতে কেনই বা জানালার পর্দাটা স'রে গিয়ে ভেতরের থেকে দুজন সহকারী কি ভাবে দড়ি টেনে দর্শকদের বোকা বানাচ্ছেন সেটা তাঁর চোখে পড়বে।

ঘড়ির কাজ চুলোয় গেল। যাদুকর হবার ভূত তাঁর ঘাড়ে চেপে বসলো। বড় যাদুকর হবেন,...ম্যাজিক দেখিয়ে বহু টাকা উপার্জন কোরবেন এই হোলো তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা। মাথা খাটিয়ে নিজেই তিনি কতকগুলো ম্যাজিকের যন্ত্রপাতি তৈরী ক'রে ফেললেন। প্রতিভার বিকাশ হ'তেও দেরী লাগলো না। লণ্ডনের "ইজিপসিয়ান হলে" (যাকে ইংলণ্ডের যাদুবিদ্যার পীঠস্থান বলা হয়), "সেণ্ট জেমস্ হলে," "পিকাডিলিতে" খেলা দেখিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সারা পৃথিবীতে যাদুকর হিসেবে খ্যাতিলাভ ক'রে ফেললেন। তাঁর তৈরী কয়েকটা খেলা অসাধারণ যান্ত্রিক প্রতিভার পরিচয়। সাইকো (Phycho) নামের কলের মানুষটার কথাই ধরা যাক। তার সাথে তাসের যে কোন খেলায় সুদক্ষ খেলোয়াড়েরাও বার বার হেরে গেছেন। কিন্তু তার খ্যাতির বেশীর ভাগই বাক্সের খেলার (Box escape) জন্যে। এই খেলাটা কিন্তু তাঁর নিজের আবিষ্কার নয়। প্রথম এই খেলা তিনি দেখেন ক্ল্যাকটনের (Clackton-on-sea) সমুদ্রতীরে দুজন নাবিকের কাছে। ভালোভাবে সেটা পরীক্ষা ক'রে তিনি খেলাটার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দশ পাউণ্ড দিয়ে সেটা কিনে নিলেন এবং খেলাও দেখাতে লাগলেন। এই বাক্সের খেলা দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করেছেন কিন্তু তার বেশীর ভাগ অংশই তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে ঐ খেলার জন্যে আদালতের খরচ হিসেবে।

বাক্সের খেলা যে সময় খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সেই স তিনি আরও প্রচারের জন্যে ঘোষণা ক'রে দিলেন যদি কেউ ব কোন কৌশল বার করে দিতে পারে তাকে ৫০০ পাউণ্ড পুর দেবেন। দুজন যাদু যন্ত্রপ্রস্তুতকারী তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে মাস্কেলীন তাঁদের ব্যাখ্যা মেনে নিলেন না, ফলে যা হবার তাই আদালতে মামলা আরম্ভ হোলো। মামলায় যাদুকর মাস্কেলীন হে গেলেন। তিনি আপীল করলেন কিন্তু এবারও তাঁর পরা হোলো। শেষে তিনি ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত হাউস অফ লর্ড (House of Lords) আপীল করলেন। সেখানেও তাঁ পরাজয় অক্ষুণ্ণ রইলো কারণ বাদীপক্ষ বাক্সের কৌশলের যে বর্ণ দিলেন তা তিনি মানলেনও অথচ নিজে কৌশলটা প্রকাশও কর চাইলেন না। ৫০০ পাউণ্ড তাঁকে দিতেই হোলো।

এই মামলা মিটে যাওয়ার পর তিনি তাঁর এক বিশিষ্ট যাদুক বন্ধুকে বলেছিলেন যে, বাক্সটা তিনি হাউস অফ লর্ডসের সামনে উপস্থিত করেছিলেন সেটাতে সত্যিই কোন কৌশল ছিল না। কারণ কৌশলকরা বাক্সটা তিনি আগেই ভেঙ্গে ফেলে ঠিক ঐ রকমে আর একটা বাক্স তৈরী করে নিয়েছিলেন। সেই বাক্সে কোন কৌশলই ছিল না। অথচ এই বাক্স দিয়ে ঠিক আগের মতই খেলা দেখান চলতো। যাদুকর বন্ধু তাঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করায় তিনি কৌশলটা তাঁকে জানাতে রাজী হলেন কয়েকটা সর্তে। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত ঐ খেলার কৌশল অন্য কাউকে যেন জানান না হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর বাক্সটা যেন ভেঙ্গে ফেলা হয়। বন্ধু রাজী হলেন সর্ত মানতে। পাঠকদের অনেকেই এই খেলা দেখে থাকবেন। সুতরাং অনেকেরই জানা আছে যে যাদুকরকে বা তাঁর একজন সহকারীকে হাতকড়া দিয়ে বাক্সে পুরে তালা দিয়ে এবং দড়ি দিয়ে চতুর্দ্দিকে বেঁধে একটা কাপড়ের মশারীর তলায় ঢাকা দিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতরের লোকটি বাইরে চলে আসে অথচ বাক্স যেমন ছিল তেমনিই বন্ধ থাকে। মাস্কেলীন তাঁর আর একজন সহকারীকে খেলার আগে হতেই মশারীর পেছনে লুকিয়ে রাখতেন। বাক্সটা মশারী ঢাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভেতরে ঢুকে দড়ির বাঁধন ও তালা খুলে ভেতরের লোকটিকে বার করে দিয়ে আবার আগের মত বেঁধে নিজের গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে পড়তো।

বাক্সের খেলাটাকে নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হওয়ায় আপনা আপনি এর প্রচার হয়ে যায়। ফলে মাস্কেলীনের লাভের অঙ্ক দিন দিন বেড়েই যেতে লাগলো। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বাক্সটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। প্রদর্শকই যখন রইলো না তখন যন্ত্রটার থাকা না থাকা সমান! অবশ্য যাদুসামগ্রীর যাদুঘরে ওটার স্থান হোতো নিশ্চয়ই। কিন্তু তা আর হোলো কৈ?

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সমুদায়ই জড় পদার্থ। জড় পদার্থ দুই প্রকার; সজীব ও নির্জীব। যাহার জীবন আছে, অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, ও মৃত্যু হয় তাহাকে সজীব কহে; যেমন পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। আর যাহার জীবন নাই, সুতরাং যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাসাদি হয় না, তাহাকে নির্জীব বলা যায়, যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ ইত্যাদি। —অক্ষয়কুমার দত্ত

## কবি কর্ণপুর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৫১। বেদবিৎ তেজস্বী ব্রাহ্মণেরা মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ করলেন তাঁদের কৃষ্ণকে,···যিনি মনুষ্যলোকবিহারী, যিনি অভিমানহারী ত্রিলোকের সুরাসুর-বৃন্দের।

৫২। তারপরে কৃষ্ণের কাছে ছুটে এল মিষ্টিহাসির জয় দিয়ে অবাক বিস্ময়ে ভরা মাতা ও পিতার কল্যাণ কামনা, শিরঃঘ্রাণ, এবং ছুটে এল শ্রীরোহিণীর সবাক আপ্যায়ন। উৎসমুখ খুলে গেল যেন বাৎসল্য রসের।

তারপরে তাঁর কাছে ধেয়ে এল দাদা বলরামের প্রবল বল; সন্তোষের উল্লাস দিয়ে যেন বেঁধে ফেলল তাঁকে আলিঙ্গনে।

তারপরে তাঁর কাছে ঢেউ দিয়ে ভেসে এল···মুচকি মুচকি হাসিভরা কত পদ্মমুখের অমলতা, কত আধ খুলি-খুলি নয়নের উন্নত রসিকতা, কত সংখ্যা—শেষ প্রণয়ের নির্ব্বাক বদান্যতা। এদের অধিকারিণীদের দিকে চেয়ে দেখলেন গোবর্দ্ধনধারী। চাইতেই তিনি যেন আলিঙ্গন পেলেন···রাধার, সখীদের, নবানুরাগিণী সৌন্দর্য্য সুকুমারীদের, এমন কি আভীরিণীদের চকোর আঁখির চকিত-চপল কটাক্ষের।

সখাদের দিকে এবার চেয়ে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁদের প্রমোদপুষ্ট অসহ্য প্রণয়ের উৎসব দেখে এবং বন্ধুজনের প্রীতি বরণের ঘটা দেখে যখন নিজেও লাভ করেছেন নিবৃত্তি, তখন তিনি শুনতে পেলেন··· অস্ফুটস্বরে, একটু বদন তুলে, তাঁর নর্মপটু বটুটি তাঁকে বলছেন,—

"ও আমার বিশ্বৈকপ্রিয় বয়স্য, বজ্রার মত যার অমোঘ ব্রহ্মতেজ উপভোগ করতে করতে আপনারা পুলকিত হয়ে ওঠেন,···সেই আমি, ···সেই আমি···কথা বলছি। বলি সখা, আমি আর আমার এই ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমান থাকতে···এই গিরিরাজকে তুলে ধরতে আহা ধরে থাকতে,···আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? কি মুস্কিল,···আমাকে আজ্ঞা করছেন না কেন···পদ্মচোখে একটি আদেশ ছাড়ছেন না কেন,···তাহলে এই সোনা বাঁধানো লাঠিগাছটার ডগায়···ক্ষণকাল ···ধরে থাকতুম এই গিরিরাজকে!···আর আপনিও ভাই, জিরিয়ে নিতেন ক্ষণকাল। উঃ, কী প্রখরপরিশ্রমটাই না হচ্ছে!"

৫৪। বটুর কথা শুনে গোষ্ঠেশ্বরী বলে উঠলেন,—"আমার বাছা তো উদ্ধত নয়, এদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন উদ্ধতপণাতেই গোপাল আমার উদ্ধত হতে শিখছে। শোনো গোপাল, সম্বৎসর-ব্যাপী ইন্দ্রযজ্ঞ তুমি খণ্ডালে, ঠাকুর-দেবতার হেনস্তা করাটা কি ভালো? দেবাসুরের দ্বেষ সুখের হয় না মনুষ্যের পক্ষে। দুদিক থেকেই যদি ধেয়ে আসে বিভীষিকা তখন বাস করি কোথায়?"

এই বলতে বলতে, আহা, ছেলের তাঁর কতই না পরিশ্রম হচ্ছে ভাবতে ভাবতে, পদ্মপলাশের মত সুখ-বুলানি হাত দিয়ে তিনি দূর করে দিতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-ঘন অঙ্গের অ-পরিশ্রম। মা যশোদার ভাবতেও কেমন ভয় হল···পর্ব্বতের ভার সইছে একরত্তি একখানি হাত! তাই কৃষ্ণভুজ পরিস্পর্শ করে আবার তিনি বললেন,—

৫৫। "নতুন ননীর চেয়েও নরম ঠাণ্ডা হাতে পর্ব্বতটিকে বইছে। হে পর্ব্বতরাজ, ভিখারিণীকে বর দান করুন। যদি সত্যই আপনি দেবতাত্মা হন, তাহলে আজকের হোক্ আপনার হৃদয় কোমলতায় আর লঘিমায়। হে মারুতম, মন্তিমান্ তুলবেন যেন খেদ না হয়।"

৫৬। বটু বললেন,—"অমন কথা বলবেন না মা। খেদ কোথায়? কল্পান্ত-প্রতিম মহা ঘনঘটায় এক সংঘট্ট উদ্ঘাটন করে, রাগের মাথায় কি উপকারটাই না করে ফেলেছেন বজ্রধারী ইন্দ্রদেব! দেখুন দেখি, শ্রীগোবর্দ্ধনকে ধারণ করে কি মাধুর্য্যই না তাই খুলেছে আমার সখার দেহে। ওটি যদি ইন্দ্রদেব দয়া করে না করতেন তাহলে মা, আমরা কি এই গুলগুলে চোখ দিয়ে দেখতে পেতেম এই মাধুর্য্যের ঐ খেলা?"

৫৭। মা যশোদা বললেন,—"বড্ড যে সাহস বেড়েছে! মাধুর্য্য! পর্ব্বতের ভার বইতে বইতে পরিশ্রমে গোপালের আমার অঙ্গ বিকল হয়ে যাচ্ছে, আর উনি দেখছেন মাধুর্য্য! দেখ একবার চোখ খুলে দেখ···ঘামে ভিজে কপালের পাতায় ভাঙা ভাঙা চুলগুলো কি সেঁটে যায়নি ওর? শুখনো হয়ে যায়নি কি মুখ···হিমে-ভেজা পদ্মের মত? হাত পা থেকে ফেটে পড়ছে না কি লালি? শিব শিব, মায়ের প্রাণে কত কষ্টই না সইতে হয়।"

৫৮। শ্রীকৃষ্ণ।—"মা, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কৌতুক আর হয় না। বৃথাই আশঙ্কা করছ আমার খেদ। এই দেখ, গগনে নিজেই অবস্থান করছেন গিরিবর। আমি তো আগেই বলেছিলেম, আমার এই রূপময় দেহ হেথায় নিমিত্ত মাত্র।"

৫৯। শ্রীযশোদা।—"তাতো বুঝলুম গোপাল, কিন্তু একটি কথা কেবল বুঝতে পারছি না; এতক্ষণ ধরে হাতখানা উঁচু করে উঠিয়ে রয়েছিস, একটু একটু থরথরিয়ে কাঁপছেও,···অদ্রির সঙ্গ পেয়ে খেদবৎ দেখতে হয়েছে পাণিপদ্ম,···অথচ খিন্ন হয়ে পড়ছে না,···এ কেমন করে হয়?

৬০। নিজেকে বড় চালাক ভাবিস, না? বেশ, তোর কথা মানতে রাজী আছি যদি গিরিরাজ স্বয়ং তোর করস্পর্শ ছেড়ে দিয়ে আকাশ অবলম্বন করে খেলা দেখান।"

৬১। শ্রীবটু।—"গোষ্ঠেশ্বরী, মন্ত্রের প্রভাব এবং বিপ্র-ভাব··· এই দুটির বৈশিষ্ট্যেই আমি গুণময়। অতএব এই গিরিবর আমাকে সম্মান দেখাবার উদ্দেশ্যেই, আমার একমাত্র মমতা-ভাজন বয়স্যকে পরিত্যাগ না করেই, এমন ভাবে তাঁর করকমলে বিরাজ করছেন, যাতে তাঁর একটি নখেরও পরিশ্রম না ঘটে। যিনি সকলের হৃদয়নাথ তাঁকে সকলেই বাঁচায়।"

৬২। শ্রীযশোদা।—"বৃষ্টি। আর প্রলাপ বকতে হবে না। আমার প্রাণ দাউ দাউ করে জলছে, এক ফোঁটা আশ্বাসও কেউ ছিটোয় না,...আর হাসি-মস্করার বেলায় সাতখানা।"

৬৩। ব্রজেশ্বর বললেন,—

"দেবি, বটুকে অপরাধী করছ কেন? যশস্বীদের এই ধরণের অসাধ্য-সাধনের সময় প্রায়ই দেখা যায়, নর্ম-নীতিজ্ঞেরা এমন কতকগুলো ক্রিয়াকলাপ করেন যাতে তাঁদের উৎসাহ ও সাহস বাড়ে। বটুও দেখছি যথাসময়ে তার কাজটুকু ভোলে নি। আর তাও বলি, গোপালও তোমার অমন বটুর কথা শুনতে ভালবাসে।"

৬৪। ইত্যবসরে গোবর্দ্ধনধারীর রসমূর্ত্তিটিকে ঘিরে যাঁরা নয়নভরে দেখছিলেন তাঁর মাধুরীধুরীণতা, লৌকিক জ্ঞানবুদ্ধির অতীত হয়ে যাঁরা কেবল দুহাতে বহন করে দাঁড়িয়েছিলেন ভালবাসার নৈবেদ্য, যাঁদের ঘুচে গিয়েছিল অভিমান এবং নির্মূল হয়ে গিয়েছিল মোহ, তাঁদের মধ্যে যে রসালাপ জমে উঠেছিল সেটিও উল্লেখযোগ্য।

৬৫। একদিকের লোকেরা যখন বললেন,—"আগেও দেখছি, কিন্তু কৃষ্ণের এমন লাবণ্য কখনও অনুভব করিনি। আহা, এ লাবণ্য যেন পৃথিবীর অলঙ্কার।

...এ সৌন্দর্য্য অনুপম।

...ঐ দেখ...উঁচু হয়ে রয়েছে গোড়ালি পায়ের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে রয়েছেন মাটি, একটু কুঁচকে গেছে জানু, বাঁকা কটির সন্ধি পর্য্যন্ত দক্ষিণে হেলে পড়েছে মালা। কী অবহেলায় না ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছেন বাম হাতখানি! জ্যোতিতে আলো হয়ে গেছে কক্ষপুট। বাম অঙ্গখানি...সটান, সোজা, লতিয়ে নেই একটিও ভাঁজ।

...সত্যিই কী লীলা ভরে বেঁকে রয়েছে ডান হাতের কনুই! সুকুমার শ্রোণীসীমায় উল্লসিত হয়ে রয়েছে তর্জ্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের পুষ্টি! ভাঁজ পড়েছে ডান কোমরের মালার নীচে। পায়ের তলা দিয়ে মাটি কামড়ে শ্রীঅঙ্গের দক্ষিণ পাশটিকে তুলে ধরার সত্যিই কী অকপট শৈলী।...আহা আমার মন ভুলিয়েছে ঐ শ্রীমুখের দ্যুতি। এ ভ্রম যেন ভ্রমই নয়...এই কথাটি জানিয়েই যেন রাঙা কমল অধরটিতে হাসছে। ঘামে-ভেজা গালের উপর কুণ্ডলের মত নীল পদ্মটি নাচছে। কী রেণুই না ছড়াচ্ছে। মদ-ভরা নয়নে কী ঘূর্ণ্যমান চাহনি!

আজ কি আমরা তবে আর একজনকে দেখছি?"

৬৬। অন্যদিকের লোকেরা তখন বললেন,—"...এ-ও এক রহস্য, যে চরণ দু'খানি মাড়িয়ে দূর করে দেয় সমস্ত আপদ, সঞ্চালনের অভাবে ঐ দেখ সে দুটির নীরব হয়ে রয়েছে নূপুর—যুগ; যেন পদ্মটিকে সামনে রেখে জেগে ঘুমচ্ছে এক জোড়া হংস। একটু নড়লেই যেন ডাকবে, ঝঙ্কার দিয়ে জানিয়ে দেবে...সাবধান!"

৬৭। আবার ওদিকে আর একদল বলে উঠলেন,—"আ-মরি মরি, যে হাতে বিলাসবংশী ধরে রয়েছেন সেই হাতখানি দিয়েই আশ্চর্য্য, বাঁশীখানি বিম্বাধরে ঠেকিয়েছেন, আবার মৃদু মৃদু বাজাচ্ছেন, ...যেন প্রিয়-প্রেয়সীদের হৃদয় রসিয়ে জানাচ্ছেন—ক্লান্তি নেই, এ পাহাড় ধরেও ক্লান্তি নেই।"

৬৮। আর ঠিক সেই সময়ে বটুও চিৎকার দিয়ে উঠলেন,—কি কর কি কর সখা, দুঃসাহস দেখিও না বয়স্য, দয়া কর, তোমার ঐ মুরলীখানি বাজিও না। মুরলীর ধ্বনি শুনে যদি পাহাড় টলে, যদি পাহাড় খসে, তখন কেমন করে তোমার বন্ধুদের রক্ষা করবে বয়স্য? আমি তো কোন পথ দেখি না।

৬৯। আর ঐ বংশ-ছাড়া বংশীটিরও এমনি প্রভাব এ বিভূতি, যে উনি বাজালেই পাহাড়ও টলবে নদীও গলবে। অমঙ্গলে এই বাঁশরী।"

৭০। সহচরেরা বললেন,—কুসুমাসব, মহাবলশালী গিরিরাজ প্রচণ্ড ধারা বর্ষণের উপদ্রব থেকে আমাদের রক্ষা আপনি কি বলতে চান, নিজের রূপময় শরীরটাকে দৌড় ক আঘাত মূলে ধ্বংস করবেন নিজেকে? না কখনোই তা হতে না। যাঁরা মহাপ্রাণ তাঁরা গভীর আনন্দে যেমন দ্রুত গল জানেন, তেমনি দ্রুত থামতেও জানেন। তিল মাত্রও ভয় এখানে। ঐ শুনুন বাঁশরী বাজছে। সরল প্রাণটাকে কাঁপিয়ে তুলবেন না।"

৭১। একটি দল...যাঁরা শ্লেষে ভণিতা করতে ভালবা তাঁরা বললেন,—"অপরিসীম মূঢ়তা কুচ্ছ ইন্দ্রের। যিনি বিশ্ব তিনিই হলেন কি না তাঁর হৃদয়-বৈরী। ইনি গোত্রের উদ্ধর্তা, উনি গোত্রের নাশ-কর্ত্তা। একজন গ্রহণ করেন শতকোটি (ব আর একজন জগতে বিতরণ করেন শতকোটি (অর্থ)।

একজন পালন করেন একাশা (পূর্ব্বদিক) অন্যজন সকল ব সকলাশা (সর্ব্বদিক)।

হায়রে, এতটুকুও লজ্জা নেই ইন্দ্রের, হরির নামটিও নিয়েছেন। আশ্চর্য্য।"

৭২। আর একদিক থেকে আর একদল বলে উঠলেন,—অদ্ভুত কি সাংঘাতিক এই প্রলয় ঝঞ্ঝা, এই প্রলয় ঘনঘটা, প্রলয় দুর্দ্দিন, এই প্রলয় ধারাপাত। একি আমাদের ভ্রম, ইন্দ্রজালের কোন ক্রিয়া, এরা কি হার মানতেও জানে না, কোথায় কে...কার...কি...হোলো।"

৭৩। সখাদের এই ভেন বাক্য-নদের মোহনায় এমন স মিলন এসে, বসুধার অভিনব সুধা ধারার মত, অন্য একটি মং গোষ্ঠি নিঃসৃত বাক্য-নদী। পরিহাসের কোমলতায়, হাং পেশলতায় সুরভিত হয়ে গিয়েছিল সে নদীর জল; আর তা ভাসছিল কত না কৌতুক, কত না রহস্যের ইঙ্গিত।

হৃদয়কে চেনে, তাই যেন হৃদয়ালু হয়েই জনৈকা সখী বলে উঠলেন,—

"যতক্ষণ উনি শ্রীগোবর্দ্ধন ধরে আছেন, ততক্ষণ রাধে, ওর দিকে লোল করে রেখো না। তোমার লোচন প্রান্ত। কখন না জানি ওর বেপথু হবে, কখন না জানি আবার ভেঙে পড়বেন। হাত থেকে ফসকে পাহাড়টি পড়লেই হয়েছে আর কি।"

৭৪। শ্যামলার নিভৃত পরিহাসে লজ্জায় কুঞ্চতরা হয়ে উঠলো রাধার নয়নতারা, তিনি বললেন,—

"অমন হরিণের মত চোখ নাচিয়ে চেয়ে থেকো না। দয়া করে তোমার প্রাণের আগুন আমার প্রাণে জালিও না। উপদেশটা নিজেকেই দিও সই।"

৭৫। আর এক সখী প্রশ্ন করলেন,—

"মহা ধৃতিমান এই শৈলাধীশকে যিনি ফুলের তোড়ার মত হাতে ধরে রয়েছেন, কে এমন পণ্ডিত-রসিকা রয়েছেন বলতে পার, যিনি লোপ পাইয়ে দিতে পারেন তাঁর ধৈর্য্য?"

৭৬। উত্তর পেলেন,—"অয়ি···মুগ্ধে···ধন-ভাগ্নি···তোমার ভক্ত কৃষ্ণের শোভা দেখাতে গিয়ে যে ধৈর্য্য দেখাচ্ছ, তা থেকে মনে হয়··· শৈলোদ্ধরণে আজ উনি যে ধৈর্য্যটি দেখাচ্ছেন···সেটি ঐ ধৈর্য্যেরি গরিমা। মন্দ নয়, কি বল ?"

৭৭। দ্বিতীয় সখী বলে উঠলেন,—"সত্যিই চোখ মাথানো যায় না এ ওঁর মাধুর্য্য থেকে। যেমন সাগরের গৌরবে গম্ভীর, তেমনি রমণীদের বস্ত্রদানেও ঊর্দ্ধ স্থির। এখন পরিহাস রেখে, ঐ হাসিটুকু ঐ চাওনিটুকু, না হয় একটু কষ্ট করেই দেখলি।

কী অদ্ভুত মোহন রূপ! বাম করপদ্মে ধরে রয়েছেন শৈল, দক্ষিণ করে মৃদু-লীলায় বাজাচ্ছেন বাঁশরী; অথচ প্রত্যেকটি মানুষকে নয়নপ্রান্ত দিয়ে দেখাটি চাই, বান্ধবদের প্রত্যেকটি বচন শোনাটি চাই, আর মাথা নেড়ে নেড়ে আশ্চর্য্য, অনুমোদনটিও করা চাই।"

৭৮। এবার তৃতীয়া সখীর পালা, তিনি রাধিকাকে বললেন,—"আমি এমন কথা যে বলছি তা নয়, তবে লোকে কি বলছে জানেন? ···সব্বাই বলছে,···প্রত্যেকটি মানুষকে দেখতে দেখতে যেই আপনার মুখের উপর গিরিধারীর দৃষ্টিটি এসে পড়ছে, অমনি ঝপ করে নাকি ঐ তাঁর ঐ দেহের বিকারটি নাকি ঘটছে!"

৭৯। চতুর্থী ফোড়ন কাটলেন,—"সত্যিই ভাই, তোমার বক্তৃতাটা মুক্তোর মালার মত গলায় ঝুলিয়ে রাখতে ইচ্ছে করছে। ও বক্তৃতার প্রতিবাদ চলে না। রাধাকে রেখে আহ্লাদে শ্রীগোবর্দ্ধনধারীর অঙ্গ যে ঘামছে কাঁপছে, অর্থাৎ তাঁর যে একক্কাড়ি-বিকার দেখা দিয়েছে, সে তো আমরাও দেখতে পাচ্ছি,···আর ঐ দেখ ওরাও দেখতে পেয়েছে,···ব্রজের ঐ গোয়ালারা,··· ঐ যারা মণ্ডলের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোবর্দ্ধন ধারণে কৃষ্ণক্লান্ত হয়েছেন ভেবে, স্নেহের ব্যাকুলতায়, হাতে লগুড় নিয়ে ওরা চেষ্টা করছে পাহাড়টিকে তুলে ধরতে।"

৮০। কথা শুনে, চন্দ্রাননা শ্রীরাধিকা করকমল দিয়ে ঢেকে ফেলতে গেলেন নিজের লজ্জা-শিথিল দু'নয়ান; কিন্তু ঢাকতে গিয়েও যখন নতনয়নের প্রান্ত দিয়ে লক্ষ্য করলেন··· সত্যিই ব্রজের গোয়ালারা তাদের সমস্ত ব্যাকুলতা নিয়ে উদ্যত হয়েছে শৈলরাজকে লগুড়ের মাথায় তুলে ধরতে,···তখন অঞ্চল দিয়ে কিঞ্চিৎ মুখখানি ঢেকে, সখীদেরও অলক্ষিতে একটি মুচকি হাসি না হেসে থাকতে পারলেন না।

ইত্যবসরে গোয়ালাদের লক্ষ্য করে বটুও হাঁকলেন,—"হে ব্রজবাসীগণ, ভয় পাবেন না; ভয়ের কিছু নেই; কিন্তু দয়া করে লগুড়গুলো দিয়ে সুড়সুড়ি দেবেন না শৈলরাজের পায়ে। শ্রান্ত হয়ে পড়েন নি অমল-বল বলানুজ, আর ঐ দেখুন হোথায় গুণ্ঠন দিয়ে মুখশ্রীর অপঘাত ঘটিয়ে সরেও পড়ছেন রাধিকা।"

৮১। বটুর কথা শুনে একটি মিষ্টি হাসি হাসলেন নীলপদ্মের মত নন্দকুমার। তারপরেই তাঁর মনে হল তিনি যেন প্রবেশ করছেন এক গম্ভীর বিস্ময়ের মন্দিরে। ঝিলিক্ হেনে বক্ষে চিকিয়ে উঠল হার, মানস থেকে ঝরে পড়ল বিন্দু বিন্দু রস, দশনের জ্যোৎস্না মেখে সলজ্জ-নম্রতায় ফুর ফুর করে কেঁপে উঠল লাল টুকটুকে নীচের ঠোঁট। তিনি বললেন,—

"বটু, অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ঐ সব ব্রজরাখালদের স্বভাব··· সম্পর্কে। কেন উপহাসের বান ডাকাচ্ছ? সারাধিকা হওয়া সত্ত্বেও আমার এই অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি-সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান ওদের নেই। আমার আধার উদ্বেল হয়ে রয়েছে বিঘ্নহীন বিরামহীন এক প্রবহমান বাল্যভাবে। সেই আনন্দেই অতি শোভন হয়ে ওঠে সমস্ত। বটু এর চেয়েও কি বড় কৌতুক সম্ভব?"

৮২। তারপরে তিনি কৃষ্ণৈকবৎসল আভীরদের উদ্দেশ করে বললেন,—

"আপনারা প্রত্যেকেই মহেশ্বরের মত মাননীয়। সাধারণ জনতার মত এ আচরণ শোভা পায় না আপনাদের। বিরত হোন। এই অতি কঠোর পরিশ্রমের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনাদের আর এই দেখুন, আমিও অশ্রান্ত ভাবেই অশ্রান্ত।"

[ ক্রমশঃ।

প্রতিমা দাশগুপ্ত

প্রায় আধ মাইল জায়গা জুড়ে চারধারের বায়ুমণ্ডল টকটকে লাল রং-এ রাঙা হোয়ে উঠেছে···। তীব্র রৌদ্রতেজে আরও রক্তিম হোয়ে উঠেছে সে চূর্ণ রাগ···। চারিধারের ধূসর মলিন নিসর্গের রুক্ষ মেজাজও যেন আজ পরিবর্ত্তিত হোয়ে গেছে···আনন্দে মেতে উঠে নানা রং-এর বন্যায় প্লাবিত হোয়ে যাচ্ছে ফাল্গুনের নীলাকাশ।

"আজু হোরি খেল তো নন্দলাল··" হাতে মুঠো করে ধরা ফাগ্‌টি জয়পাল সিং-এর গালের উপর ছুঁড়ে দিয়ে মোটা বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলো কমলাপৎ।···প্রৌঢ়নির্বিশেষে একদল রাজপুত বৃদ্ধ মিলে মনের আনন্দে হোলি খেলে চলছিল। তাদের শুভ্র, প্রায় শুভ্র, পিঙ্গল, বাদামী···নানা রং-এর আকর্ণ বিস্তৃত ঘন খাটো দাড়ি প্রজাপতির বিচিত্রিত পক্ষের মতো রঙ্গিন হোয়ে উঠেছে। তাদের চোখের আড়ালে অল্প দূরে উন্মত্ত হোলি খেলায় মত্ত হোয়ে উঠেছিল তাদের পুত্রেরা।···রং-এ রং-এ আপাদমস্তক সিক্ত হোয়ে এমন চেহারা ধারণ করেছিল তারা যে নাম না বলে দিলে কাউকে চিনবার উপায় ছিল না। সকলের হাতেই একটা করে বাঁশের পিচকারি আর গুলাল···। মীরজাই-এর ঘুন্টির সঙ্গে বাঁধা উটের চামড়ার তৈরি ছোট থলি ভর্ত্তি গুলাব-গন্ধী তরল ফাগ···। এটি হোলাকা উৎসবের যতি পাতে ব্যবহৃত হবে। দেহ শিথিল ও মন যখন শ্রান্ত হোয়ে আসবে তখন এই থলি পরস্পর পরস্পরের গায়ে ছুড়ে দিয়ে এক-একটি সরব হুংকারে শেষ করবে তাদের খেলা। সমবেত চীৎকারে বিস্তৃত বক্ষ তাদের বিস্তৃততর হোয়ে উঠবে··· "ফিন মিলোগে··ভাইয়েঁ।···ফিন মিলোগে"···। তার পর এক মুহূর্ত্তের জন্য যতিপাত···তারপর তাদের যবিষ্ঠ কিশোরটি শুধাবে "কব্‌-কব্‌?" আবার সমবেত হুংকার ধ্বনি "সামনা বরখ···সামনা বরখ···।" তারপর ধপ করে মাটির উপর বোসে পড়বে তারা গোল হোয়ে। উৎসবের অবশ্য এখানেই শেষ নয়···আরও বাকি আছে।

"আরে কেশরীমোহন···আঁখ বাঁচাইকে···" দু' চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে রংয়ের ধারা প্রতিহত করতে করতে বলে উঠলো একটি যুবক।

"আরে হাম ক্যায়সে বাঁচাওগে তুমহারা আঁখ ভেইয়া? এক পঙ্কিকা চান্ত কো বামেঁসে আঁখ তো তুমহারা অন্ধা হো গেই এক বরষ আগারিই।" একটা হাসির হুল্লোড় উঠলো সমবেত যুবকবৃন্দের মধ্যে···শুধু পর্ব্বতলাল···আগের যুবকটি ঈষৎ জিহ্বা প্রদর্শন করে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল অদূরে সে জায়গাটি যেখানে বয়োজ্যেষ্ঠেরা খেলায় মেতেছেন।

তাদেরও খেলা বোধ হয় শেষ হোলো। ঝুম-ঝুম-ঝুম ক
হাতের সঙ্গে বেজে উঠলো করতাল আর বাঁশরীর ঝঙ্কার···। এ
সঙ্গীত চর্চ্চা আরম্ভ হবে বৃদ্ধদের···তারপর গান শেষ হোলে খা
পালা।···যারা ইচ্ছে করে তারা এর মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে পো
পরিচ্ছদ বদলেও নিতে পারে।

হোলির ভোজের আয়োজনটা হোচ্ছিলো পর্ব্বতলালের
কমলাপৎ-এর বাড়ীতেই। নিমন্ত্রিতরা যারা এসেছে, অকু
তাদের মধ্যে কেউই নয়। কিছু না কিছু খাদ্য সম্ভার সকে
তারা হাতে করে নিয়ে এসেছে হোলেকার উপহার স্বরূপ।
বাড়ীর মেয়েদের খেলা সমাপ্ত হোয়েছে প্রাক্‌ দুপুরেই। অ
সকলের বাড়ীতেই বহু কাজ, সারাদিন ধরে খেলায় মেতে থাক
কি চলে বাড়ীর মেয়েদের?···খঞ্জনি আর করতালের সঙ্গে ধ্বনি
হোয়ে উঠলো বেসুরো একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর—

"লালিরা ধীরে ধীরে লো ছিটাও··
আহা গিরধারী আসে বেণু বাজাইঁয়া···মন ভুলাইঁয়া
রঙ্গোমে তারে তো রাঙ্গহাও··"

সহসা সমবেত যুবকশ্রেণীদের মধ্যে একটির কান খাড়া হে
উঠলো। গানের সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেয়েছে সে নারীকণ্ঠের অ
সকৌতুক চাপা এক হাসির শব্দ···আর সেটা ধ্বনিত হোয়েছে
বাড়ীর ভিতর থেকেই। আরো দু'একজন শুনতে পেয়েছে বইকি
তাদের চোখের চাউনি থেকেই আন্দাজ করে নিতে পেরেছে পর্ব্বতলা
মুখ লাল হোয়ে উঠলো তার···আস্তে আস্তে উঠে রওনা হোলো
ভেতরের দিকে। পেছন থেকে একজন বলে উঠলো "এ পর্ব্ব
সোর মত্‌ করো আজ হোরিকা দিন মে···।"

বাড়ীর ভেতর এক প্রান্ত ঘেঁষে ছোট খাপরার রান্না ঘরের ভে
কাঠের আগুনের উনুন জ্বেলে পিতলের বড় একটা কড়া চাপি
সবেগে তার মধ্যে কাঠের তাড় চালাচ্ছিল দ্রৌপদী, পর্ব্বতলা
বর্ষীয়সী স্থূলাঙ্গিনী মা। হালুয়া পাক হোচ্ছিলো মস্ত কড়াটার মধ্
মাঝে মাঝে সবেগে ফোঁস ফোঁস করে উঠছিল কড়ার ভেতরের কো
চালের গুঁড়ো, সুজি, চিনি আর ময়দার মিশ্রিত পিণ্ডটা···অ
সবেগে দ্রৌপদীর হাতের তাড়ুর ঘায়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্ত হে
যাচ্ছিলো সে ক্রুদ্ধ গর্জ্জন। অদূরে কাঠের তৈরি পিঁড়ার ও
বোসে কানা উঁচু একটা থালায় স্তূপাকৃতি বাদাম, পেস্তা, কিশ
বেছে ঝেড়ে রাখছিল পর্ব্বতলালের তরুণী বধূ রাজোয়ারি।

এক হাতে তাড় চালাতে চালাতে অন্য হাতটা হাঁটুর ও

দেখে দ্রৌপদী গঞ্জনা দিচ্ছিল পুত্রবধূকে "এ বহু! বাপ মাই তুঝকো ক্যায়সি মহব্বৎ সিখাইদি হো? বেসরম কি মাফিক অ্যায়সি হাসলি বুড়া আদমি কো গানা শুনকে? যব পর্ব্বত শুনা হোগা তো তুঝকো হাড্ডি চুর কর ডালেগা।"

আর বেশী বলতে হোলো না স্বয়ং পর্ব্বতলাল দেখা দিল রান্নাঘরের দরজার বাইরে। নানা রং মাখা মস্ত মুখটা পড়ন্ত বেলায় আলো লেগে বিশাল একটা দৈত্যের মুখের মতো লাগছিল। গামোছাটাকে কোমরে কষে বাঁধতে বাঁধতে ঘূর্ণিত নয়নে সে একবার স্ত্রীর দিকে তাকালো পরে দ্রৌপদীর দিকে চেয়ে বললো "এ মাঈয়া! যো হুয়কা বহুকা দাম ময় বাত্তি উসকি তো অ্যায়সি সহবৎ হোগি।"

ছেলেকে খুব ভালো করেই জানে দ্রৌপদী—তাই তার কথা শুনে চটে উঠলেও মুখে তা প্রকাশ না করে শুধু তাকে ইঙ্গিতে বাইরে যেতে বললো।

পর্ব্বত কিন্তু গেল না দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীর দিকে হাত দেখিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললো "ই জেনানা আজ বাহার কো আদমি লোগোঁকে সামনে মেরা শির একদম মাটি মে সমান কর দিয়া···আজ উসকি ম্যয়"—রাগের চোটে কথাটা সে শেষ করতে পারলো না। দ্রৌপদী কাঁধের থেকে গামোছাটা নিয়ে ভারী কড়াটার দুই প্রান্ত ধরে অবলীলাক্রমে উনুনের ওপর থেকে নামিয়ে মাটির ওপর রেখে বললো, "দেখো বেটা বহুত দাওয়াজি আদমি জমায়ৎ হুয়া চবুতরা মে··কুছ হুজ্জৎ তো মৎ করনা চাহিয়ে।"

পর্ব্বতলাল জানে সে কথা। তাই রাগটা আপাতত গিলে ফেলা ছাড়া আর উপায় নেই। আর একবার সে চাইলো বউ-এর দিকে। দেখতে পেলো না পর্ব্বতলাল দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বৈশাখের রক্তচক্ষুর সম্মুখে নিঃসঙ্কোচ কামিনীর কৌতুক হাসি খেলে যাচ্ছে রাজোয়ারির চোখে মুখে।

পর্ব্বত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদী বললো রাজোয়ারিকে, "দেখলি! ম্যয় কুছ ঝুঁট বোলি! আভি সে আদব কুছ শিখ লে। দে, মেওয়া তো সব তৈয়ার হো গ্যাই আভি উনকা তাল কুছ পিষকে··উনকা বাদ চিলা তি বনানে পড়ে গা।"

অনেক দেখে শুনে পর্ব্বতলালের বাপ কমলাপৎ ঘরে এনেছিল রাজোয়ারিকে অচলগড়ের এক গ্রাম থেকে। সুন্দর কিশোরী মেয়েটির মিষ্টি মুখখানি ভারি ভালো লেগেছিল দ্রৌপদী আর কমলাপৎ-এর। রাজোয়ারির বাপ ছুনীচাদজী আবুপাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দিরের এক গরীব সেবায়েৎ। বিত্তহীন, নিঃস্ব ঘরে মেয়েটি ও রুগ্না স্ত্রী ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। সবই ভালো

হিল মেয়েটার কাজকর্মে পটু মনটা বড় খোলসা। শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামীর আত্মীয় স্বজনকে মেনেই চলে, তবে একটা দোষ একটু বেশী মাত্রায় চপল আর কারণ অকারণে খিল খিল করে হেসে উঠবার জন্ত প্রস্তুত হোয়ে থাকে। বিয়ের অল্প পরে পাড়ার এক সমবয়সী মেয়ের কাছে হাসতে হাসতে বলেছিল পর্ব্বতলাল যখন মাথায় মুরেঠা আর ঝলমলে ঝলদার আঙরাখা গায়ে চড়িয়ে বিয়ে করতে যায়···আর বিয়ের সভায় "বর উসকো আঁখকা সাথ আঁখ মিলানে পড়া তো উসকা মুখ এইসা লাল্ কিসা মাফিক লাগা মুঝকো ক্যা বোলি". মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সত্যি সত্যি কৌতুক হাসিতে উচ্ছল হোয়ে উঠেছিল রাজোয়ারি। পর্ব্বতলাল অবশ্য এ কথা শোনেনি···পাঁচকান হোয়ে শুধু দ্রৌপদীর কানে উঠেছিল তখনই বুঝতে পেরেছিল দ্রৌপদী বউ তার অতি চপলমতি···কিছু শাসনে আটকে না রাখলে চলবে না।

তবে সত্যি সত্যি ভালো মেয়েটা। গালমন্দ খেলে মুখ হাঁড়ি করে না খেয়ে বসে থাকে না। ঝগড়াঝাঁটি কথা কাটাকাটি করে না কারুর সঙ্গে। শুধু পর্ব্বতের মুখের যে কোন ভাব বৈলক্ষণ্যেই তার ভিতরের হাসির দুয়ারটা একেবারে হাট হোয়ে খুলে যায়। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি আটকাতে আটকাতে অন্তখানে চলে যায়। বকুনি দেবার সময় সে হাসি দেখলে আর রক্ষা থাকবে না, মাথায় খুন চেপে যাবে পর্ব্বতলালের।

মাখা আটার তাল থেকে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুই হাতের ফাঁকে বড় বড় গুলি তৈরি করে ঘি মাখানো গোল পিঁড়ার ওপর স্তূপাকারে রাখছিল দ্রৌপদী, তারই ফাঁকে পুত্রবধূর দিকে একবার তাকালো। ডাল পেষা তার প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে কচি মুখখানা লাল হোয়ে উঠেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ছোট ফরসা কপালটুকুর ওপর। অজানিতে স্নেহসিক্ত হোয়ে উঠলো দ্রৌপদীর মন। এই তো এত বকুনি খেলো রাগ বা অভিমানের কোন চিহ্ন আছে মুখে? এত ভালো মেয়েটা তবু মাঝে মাঝে কি যে হয়! আহা, ওকে এখন ছুটি দিয়ে দেবে দ্রৌপদী। ছেলে মানুষ, সংসারের জোয়াল কাঁধে করবার এখনই কি সময় হোয়েছে ওর? তার দিকে তাকিয়ে বললো দ্রৌপদী "যারে বহু যা। ডাল্ পিষা তো খতম্ হো গিয়া অভি নিয়া সে দো লোটা পানি বদন মে ঢালকে সাফা কাপড়া পিহন্ লে ার কোই বেচাল মৎ কর।"

*এইটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল রাজোয়ারি। রান্নাঘরের বাইরে শাশুড়ীর দৃষ্টির বাইরে এসেই প্রথমে এক ঝটকায় খুলে দিল মাথার ঘোমটাটা, পায়ের রুপোর পাঁইজোড় দুটো টেনে প্রায় হাঁটুর পর উঠিয়ে হরিণীর মতো দ্রুতগতিতে দৌড়ে গেল ইঁদারার তে, যেখানে চারপাইয়ের ওপর বোসে মস্ত শ্বেত পাথরের মলার মধ্যে মোটা কাঠের মুগুর দিয়ে একমনে পেস্তা, বাদাম আর লাপজল মিশিয়ে ভাঙ্গের সরবৎ ঘুঁটে চলছিল মনোহারি বতলালের ছোট বোন। হুমড়ি খেয়ে তার পিঠের ওপর পড়লো জায়ারি "এ ননদিনী।"*

মনোহারিরও মায়ের মতো বেশ ভারি ভুরি গঠন রাজোয়ারির । অল্প কিছু বড় হবে বয়সে। বিয়ে হোয়ে গেছে, হোলির বে বাপ-মার কাছে এসেছে কদিনের জন্য। বেশ শান্ত শিষ্ট াজ, ভাইয়ের মতো রগচটা নয়। মোটা রুপোর পঁইছা পরা ভারী হাতখানা পিছনে ঘুরিয়ে ভ্রাতৃবধূর মুখখানা সরিয়ে প করলো মনোহারি "কিয়ে ভৌজি! পাক ঘরকা কাম হো গ্যই কোন আদমি উধার শোর করতা থা রে?"

"আউর কোন। মেরি পতি দেবতা তুমহারি ভাই। ক্যায়া খেলি তুঝকো বহিন। বড়া বদ মিজাজ উঁনকা।"

মনোহারির সামনা সামনি এসে বললো রাজোয়ারি। ভাইয়ে মেজাজের কথা অজানা নেই মনোহারির। তাই বলে মায়ে পেটের ভাইয়ের নিন্দা করবে পরের মেয়ের কাছে? তাই উত্তরে বললো, "যদি জানিসই তবে সমঝে চলিস না কেন? খাপ পা ভুলিস কেন ওকে?"

ঐ এক কথা। শাশুড়ী, ননদ সবাই মিলে তাকে ঐ এ উপদেশই দেয়। বিরক্ত হোয়ে রাজোয়ারি বললো, "ছে দে উসব বাত আজ হোলিকা দিন যে। চল নাহাবি বল চল।"

সরবৎ বানাবার সরঞ্জাম গুটোতে গুটোতে মনোহারি বল "চল মেরি ভি হো গ্যই।" বাঁধানো ইঁদারার অরঘট্টে ঝোলা বালতিটা হড় হড় করে ভিতরে নামিয়ে দিলে রাজোয়ারি। স হাতে বালতি ভর্ত্তি জল উঠিয়ে চুমকি ঝাড়িতে ঢাললো। আঁজলা জল চোখে মুখে ছিটিয়ে আপন মনে বলে উঠলো "অ এক দম বরফ কা মাফিক ঠিম্ এ কুঁইয়া কা পানি।" ঢক্ করে খানিকটা জল গিলে নিল ঝারি থেকে, পরে ননদের দিকে চে বললো, "হারে মনোহারি! চলনা সীতা তালাও মে, ভা করে নাহিয়ে আসি। কিছু তারণাও দেওয়া যাবে।"

মনোহারির মনঃপূত হোলো কথাটা কিন্তু ইতস্তত: করে বলে "গেলে হোতো কিন্তু তুই যা দেরি করবি, আবার বকুনি খেয়ে ম শেষে, থাকগে দরকার নেই।"

একটা ঠোনা লাগিয়ে দিল রাজোয়ারি মনোহারির গালে, "আম ডর পোকনা তো তুই। চল, চল বকুনি তো তুই খাবি না।"

রাজস্থানের ঊষর মরুভূমির কাঠিন্ত উপেক্ষা করে নয়ন বিমো এক তড়াগ আপন কল-সঙ্গীতের সঙ্গে নিজের মনে ছুটে চলেছে কে মরীচিকার সন্ধানে। তার চারধারে বিস্তৃত হোয়ে রয়েছে অ ক্ষেত্রের স্নেহময় অঞ্চল। এরই স্থানীয় নাম সীতা তালাও। নন ভ্রাতৃবধূতে মিলে নামলো সেই তালাওয়ের বুকে। স্বচ্ছ নীলাভ মতো শান্ত সলিল রাশি পরমানন্দে তাদের গ্রীবা বেষ্টন করে ধরলো অঞ্জলি পুরে জল নিয়ে চোখে-মুখে ছিটাতে ছিটাতে মনোহারি বললে *"নাহাতে তো এলি সীতাতালাও তে, এখানে নাহাতে এলে সীতা মতোই দুঃখিনী হোতে হয় জানিস?"*

দু'হাতে কান চেপে ঝপ করে একটা ডুব দিল রাজোয়ারি, তারপর উঠে সিক্ত চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বললো, *"সুখ আউর দুখ এ দো মন্থন মে পরমানন্দ কর লিয়া—দুখ তো মেরি অমৃত, বন গ্যই রে।"*

মনোহারি তাকিয়ে রইলো রাজোয়ারির দিকে। তার চেয়ে বয়সে ছোট মেয়েটা, মাঝে মাঝে এমন সব তত্ত্বকথা বলে যে সত্যি সত্যি অবাক মানতে হয়।

তার দিকে চেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো রাজোয়ারি, এক ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল তাকে গভীর জলে আর বলে উঠলো "হাবায়

সাধনার সৌন্দর্যের গোপন কথা...

'লাক্স আমায়

সুন্দর রাখে'

সুন্দরী সাধনা বলেন, 'লাক্স সাবানটি আমি ভালবাসি আর এর রঙ গুলোও আমার ভারী ভাল লাগে!'

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 111-X52 BG

মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সাঁতার দে না মোটেরি, অমন করে তাকিয়ে থাকবি না আমার দিকে তোর ভাইয়ের মতো।"

শান্ত সীতা তালাওয়ের জল তরঙ্গময়ী হোয়ে উঠলো, দুটি তরুণীর কলহাস্যে। সাঁতার দেবার সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলো রাজোয়ারি—

"আ শ্যাম! চুমুরিয়া মেরি
আর ক্যায়সি নয়া রঙ, মে রঙাই,
উজলা তো উ তুমহারা
প্রেমকোঁ রাগোঁসে কবই হো গ্যাই।"

আর একবার তাকালো মনোহারি রাজোয়ারির দিকে···কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "এত সুরেলা গলা তোর ভৌজি, আর ভাই তোকে গান গাইতে শুনলেই রাগ করে।"

*চুক চুক করে একটা আক্ষেপের শব্দ করে উঠলো মনোহারি।*

*সীতা তালাও থেকে দেখা যায় অল্প দূরে সুধা ধবলিত এক বিরাট সৌধের কিয়দংশ। দিবালোকের শেষ রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে আকাশের গায়···। আসন্ন সায়াহ্নের পিঙ্গল আভায় দিক চক্রবাল রঞ্জিত হোয়ে উঠলো।···সে বিশাল প্রাসাদের হর্ম্যচূড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন যশেন্দ্র দেব।···তাঁকে ঘিরে চিত্র-বিচিত্র রংয়ের পোষা পারাবতের দল নানাবিধ ক্রীড়া করে যাচ্ছিল···। সস্নেহ হাস্যে যশেন্দ্র দেব তাদের দিকে চেয়ে দেখছিলেন আর মাঝে মাঝে পরম যত্নে যবের কণিকা তুলে দিচ্ছিলেন তাদের চঞ্চুপুটে।*

তরুণ যশেন্দ্র দেব মৈত্রির রাজসিংহাসনে সবে মাত্র আরূঢ় হোয়েছেন। মৈত্রি রাজস্থানের বহু সংখ্যক সামন্তরাজ্যের অনুরূপ ছোট একটি রাজ্য।···তাঁর প্রিয় সিরাজু পায়রাটি উড়ে এসে তাঁর হাতের উপর বসলো···হেসে তার চিত্রিত গ্রীবায় বারবার হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন যশেন্দ্র দেব···। হঠাৎ তাঁর মৃদু হস্তসঞ্চালন স্তব্ধ হোয়ে গেল।···কোথা থেকে সুমিষ্ট কাফির মীড় ভেসে এলো দখিনা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে। উৎকর্ণ হোয়ে নিস্তব্ধ রইলেন তিনি। কণ্ঠস্বর হয় তো খুব মার্জ্জিত নয় তবু এমন সুরেলা নারীকণ্ঠ কোথা থেকে ভেসে আসছে?···সুউচ্চ প্রাচীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে উৎসুক নয়নে চারদিকে তাকালেন তিনি···

বনগন্ধবহী উষ্ণ সমীর ছুঁয়ে গেল তাঁর কপোল দেশ। ধূসর দিগন্তে বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চালনা করে কাউকে দেখতে পেলেন না তিনি। সে অর্দ্ধশ্রুত সঙ্গীত বলাকা ডানা মেলে উড়ে চলে গেল কোন অনন্ত অসীমের সন্ধানে···আর তা শুনতে পেলেন না যশেন্দ্র দেব।

এক হাঁড়ি ভাঙ গিলে নেশায় বুঁদ হোয়ে বিছানায় চিৎপাত হোয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল পর্ব্বতলাল। সামনের উঁচু দাঁত দুটো বিস্ফারিত ওষ্ঠাধরের মধ্য হোতে প্রকট ভাবে বেরিয়ে আছে। রাত বারোটা বাধহয় হবে। নিমন্ত্রিতদের খাওয়া শেষ হোলে নিজেরা খেয়ে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে এই মাত্র অবসর পেয়েছে রাজোয়ারি। ঘরে ঢুকে একবার নিদ্রিত পর্ব্বতলালের মুখের দিকে তাকালো সে···তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের প্রান্তে ছিটে কঞ্চির ঘের দেওয়া আবরু জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালো···গা থেকে টেনে টেনে খুলতে লাগলো ভারী পশোয়াজটা। নিমন্ত্রিতের দলের মধ্যে আজ ভালো ঘরের স্ত্রীলোকও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন···তাই শাশুড়ীর আদেশে এই গরমের মধ্যেও পরতে হোয়েছে রাজোয়ারিকে এই ভারী পোষাকটা। রাজোয়ারির দুই হাতের নির্দ্দয় পীড়নে অভিমানে মাটিতে থুবড়ে পড়লো ঘাগরাটা। কাল সকালে শাশুড়ীর চোখে পড়া প্রচুর বকুনি খাবে, তবে দ্রৌপদীর চোখে পড়বার আগেই ক সকালে ভাঁজ করে রেখে দেবে রাজোয়ারি এটাকে।···হালকা বে অভ্যন্তরে ঢুকে ঘরের ঘুলঘুলির মতো বন্ধ জানালা দুটো হাট ক খুলে দিল রাজোয়ারি। তাপদগ্ধ বিরহী দিগন্তের বুক থেকে নে ব্রীড়াময়ী অভিসারিণীর মতো একটা ক্ষীণ বায়ুধারা দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষে ঢুকলো ঘরের ভেতর।···জুড়িয়ে গেল রাজোয়ারির সারা দেহ সে স্নি স্পর্শে।···

রাজোয়ারির বাপ ছুনীচাদজী সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ না হোলে দারিদ্র্যের দুঃখ পিষ্ট করতে পারেনি তার পাগলকরা সুকুমার এ বৃত্তিকে। সে তার সঙ্গীত। গান করতে করতে চোখ দিয়ে জ ঝরে পড়ে। রাজোয়ারি প্রথমে দেখে তার বাপকে। অন্তরের কো সুগভীর তলদেশ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত তার এ সঙ্গীত নিজের ভাবাবেগে ধরা দিত ছুনীচাদের কণ্ঠে।···বিশ্বসঙ্গীতের আনন্দ গুণীজনে কাছে ধরা দেয় দেয় নানা ভাবে। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর মধ্যে, সঙ্গীত ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে, কথার জাল বুনে কত ভাবে সঙ্গীত অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বন্দিনী করতে চেয়েছেন তাঁর উপাসক-বৃন্দ···কিন্তু ছুনীচাদ একই ভাবে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছিল সে বিরাট সঙ্গীতকে···দেখতে পেয়েছিল তাঁকে প্রকৃতির অকৃপণ দানের মধ্যে···তার জীবনের স্বল্প পরিসরের ভিতরে।···অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও অন্তরের সুগভীর আনন্দানুভূতির মধ্যেই লাভ করেছিল ছুনীচাদ তার সে সঙ্গীত।

অচলগড়ের অখ্যাত গ্রাম্য এক সেবায়েত ছুনীচাদের সমাহিত ভাবাবেশে আবিষ্ট অন্তর থেকে যখন ভজনের নির্ঝর ধারা নেমে আসতো তখন তা আকর্ষিত করতো বই কি গুটি কয়েক পথচারীকে।···পিতার সে সঙ্গীত-আবিষ্ট মুখের ছবি অঙ্কিত হোয়ে রয়েছে রাজোয়ারির মানস পটে। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সুকণ্ঠের অধিকারিণীও হোয়েছিল সে কিয়দংশে।···বাল্যাবধি সঙ্গীত তার অতি প্রিয়। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরালের ঘরে এসে তার স্বল্প কয়েক বৎসরের জীবনের ওপর প্রথম ও প্রচণ্ড অভিঘাত চিহ্ন পড়লো।···

পর্ব্বতলালদের বাড়ীতে আর যাই থাক বাড়ীর মেয়ে বউদের গান গাওয়ার হুকুম একেবারেই ছিলো না···। শুধু তাই নয় মেয়েদের গান গাওয়া সেখানে চূড়ান্ত লজ্জাহীনতা বলেই পরিগণিত হোতো।···অন্তরে যথার্থ শিল্পী যারা তারা অন্তরের গভীর ভাবাবেগ বাইরে প্রকাশ করবার জন্য যুগ যুগ ধরে সাধনা করে আসছে নানা ভাবে। প্রকাশ করতে চেয়েছে তাকে তারা কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, সাহিত্যে। যেখানে প্রতিহত হোয়েছে এ ভাবাবেগ সেখানেই গেছে তাদের জীবনের তন্ত্রী ছিঁড়ে।···রাজোয়ারির বয়স অল্প। সবই এখন তার কাছে নতুন মনের আনন্দও বিনষ্ট হোয়ে যায়নি। তাই অব্যবহারে সে তারটাতে মরচে ধরবার উপক্রম করলেও সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যায়নি তখনও। তাই মুহূর্তের জন্য হোলেও শ্বশুরবাড়ীর দৃষ্টির অন্তরালে যেতেই আপনা হোতেই কণ্ঠে তার সুর গুনগুনিয়ে ওঠে···কিছুতেই থামাতে পারে না তাকে। পিতার মতো একই ভাবে রাজোয়ারি অন্তরের মধ্যে লাভ করেছে সে বিরাট সঙ্গীতের

বাঁচলে হয়! —শান্তিময় সান্যাল

## ॥ আ লো ক চি ত্র ॥

প্রতিবিম্ব —সনৎকুমার রায়চৌধুরী

কলিকাতা হাইকোর্ট—
শতাব্দীর আলোয়

—আলোকচিত্র বসুমতী
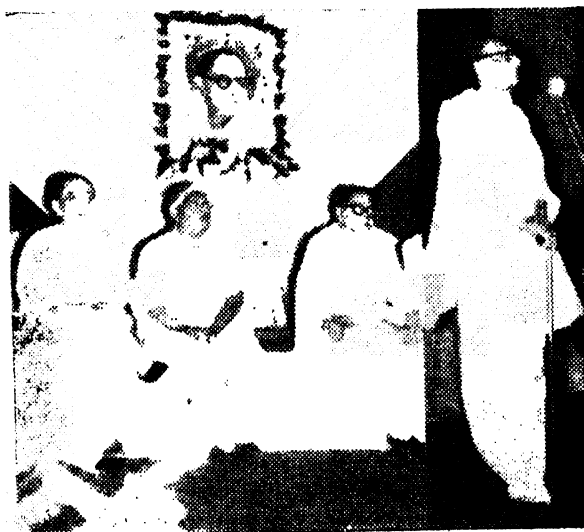
ছবি বিশ্বাস স্মরণে
বক্তা অহীন্দ্র চৌধুরী

—আলোকচিত্র বসুমতী

করদংশ—সে আনন্দের মধ্যে নিজের ছোট জীবনটিকে পরিপূর্ণ করে ঢেলে দিতে পেরেছে বলেই বোধ হয় পর্ব্বতলালের ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গী, দ্রৌপদীর তিরস্কার পড়শিনীদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র হোয়ে গেছে তার কাছে।···রাত্রির এই স্বল্প অবকাশটুকু অতি মনোহর হোয়ে দেখা দিল রাজোয়ারির কাছে। নির্মেঘ আকাশের মধ্যস্থলে তিথির পর তিথি পার হোয়ে পূর্ণ বিকাশে সুধাস্রাবী হোয়ে উঠেছে পূর্ণচন্দ্র···অদূরে নিমগাছের পাতাগুলো কেঁপে উঠলো শির শির করে। আলুলায়িত কেশজাল বেণীর ভুজঙ্গ পাশে বদ্ধ করতে করতে র ভুলে অনুচ্চস্বরে তরঙ্গায়িত হোয়ে উঠলো রাজোয়ারির কণ্ঠ :

"পান খটপে মেরি শ্যাম···বাজাও মুরলীয়া"

কিন্তু থেমে গেল তার গান···খড়মড় একটা আওয়াজ শুনে চমকে সে পিছন ফিরে তাকালো। এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল পর্ব্বতলাল···কিন্তু রাজোয়ারির গানের সুর কানে যেতেই কি করে এমন গভীর ঘুম চটকে গেছে তার···একেবারে সোজা হোয়ে বসেছে দড়ির খাটিয়ার উপর···রাজোয়ারি আশ্চর্য্য হোয়ে যায় মনে মনে···। য মানুষটার ঘুম পাঁচ সাতটা বুনো মোষে গুঁতিয়েও ভাঙতে পারে না কি করে তা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভেঙ্গে যায় রাজোয়ারির দু' একটা গানের কলির সঙ্গে সঙ্গেই।···লাল টকটকে বড় বড় চোখ মেলে এদিক ওদিকে একবার তাকালো পর্ব্বতলাল···তার পর বিড় বিড় করে নিজের মনে কি বলে আবার শুয়ে পড়লো। মুহূর্ত্তের মধ্যে পঞ্চম রাগে নাক ডেকে উঠলো।···মৃদু হাসলো রাজোয়ারি সেদিকে তাকিয়ে।

অনুত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে সঙ্গীহীনা, ক্ষীণকায়া এক স্রোতস্বতী তন্ময় চিত্তে বয়ে চলেছে কোন সুদূরে প্রিয় সঙ্গম আকাঙ্খায়। ধীরে ধীরে অস্তাচলে নেমে আসছে সূর্যদেব···নীলাকাশ তার শেষ উপহার রক্তিম আভরণ গাত্রে ধারণ করে করুণ হাসিতে পূর্ণ হোয়ে উঠেছে। সে স্রোতস্বতীর উপর চারধারে প্রশস্ত মর্মরময় চত্বাল বিশিষ্ট ও অপরূপ কারুকার্য্য খচিত যশেন্দ্র দেবের জলটুঙ্গি অবস্থিত। অভ্যন্তরে বিস্তৃত কক্ষের তলদেশ অতি মসৃণ রক্তবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত। পদ্মলেপ শোভিত প্রাচীরে সারি সারি বিলম্বিত ময়ূর ও চন্দন পঙ্ক। হস্তিদন্ত নির্ম্মিত উন্মুক্ত দ্বারপথে বার বার ভেসে আসছিল সজল বাতাসের স্পর্শ।···হর্ম্যতলে মুক্তার ঝালর সমন্বিত শীতলপাটির উপর উপবেশন করেছিলেন রাজা যশেন্দ্র দেব।

বস্ত্রের আবরণে আবৃত বিভিন্ন আকারের গুটিকয় বাদ্যযন্ত্র অবহেলিত ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সম্মুখে। ধূমায়িত গুগগুল ও লোবান পূর্ণ ভারী তাম্রপাত্র বহন করে ভৃত্য প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে। এক কোণে পাত্রটি স্থাপন করে অন্য একটি পাত্র থেকে সারা কক্ষময় গুগগুলের সুগন্ধি ধূমজালের মধ্যে বার বার ছিটিয়ে দিতে লাগলো শুষ্ক চন্দন রেণু।···তারপরেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল আর একটি ভৃত্য।···প্রমোদ মদিরা পূর্ণ কারুকার্য্য করা সোনার ছোট পানপাত্রটি সসম্ভ্রমে সে স্থাপন করলো যশেন্দ্র দেবের সম্মুখে। অন্য হাতে ধরা ছোয়ারা, সাম্ভারা, সেও আর সীতাফল পূর্ণ রৌপ্য পরাতটি রাখলো তার পাশে।···তার দিকে না তাকিয়েই যশেন্দ্র দেব উচ্চারণ করলেন "ওস্তাদজী।" সবিনয়ে মস্তক অবনত করে ভৃত্য দ্বারপথ দিয়ে বহিষ্ক্রান্ত হোলো।···

সায়াহ্নের শেষ রেখা অন্তর্হিত হোলো আকাশের বুক থেকে। সপ্তর্ষি মণ্ডল অধিকার করে নিল সে শূন্য জায়গা। অনুসরণরত কালো ছেঁড়া মেঘগুলিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিতে দিতে পূর্ণচন্দ্র উদয় হোলো পূর্ব্বাকাশে। বাইরের তরুশ্রেণীর উপর দিয়ে অসংলগ্ন ভাবে বসন্তের উন্মত্ত হাওয়া বয়ে গেল।···অন্যমনস্ক ভাবে যন্ত্রের আবরণ উন্মোচন করে প্রিয় বিচিত্রবীণাটি নিজের কোলের ওপর তুলে নিলেন যশেন্দ্র দেব। ঠিক সেই সময়ে জলমহলের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন প্রৌঢ় ওস্তাদ মিনহাজউদ্দীন। সদ্য অবগাহন স্নান সমাপন করে এসেছেন ওস্তাদজী।

বিধর্ম্মী হোলেও রাজপুত হিন্দুরা হোলির প্রেমরাগে রাঙাতে কসুর করেননি ওস্তাদজীকে। প্রভাতেই যশেন্দ্র দেব স্বয়ং উদার মুক্ত হাতে ওস্তাদজীকে প্রায় আবৃত করে দিয়েছেন ফাগে গুলালে। এক ঘণ্টা ধরে খইল মেখে ওঠাতে হোয়েছে ওস্তাদজীকে গায়ের রং। তবু ঘন আধপাকা দাড়ি আর চুলের মধ্যে এখানে ওখানে লুকিয়ে আছে সে রক্তিম রাগের অস্পষ্ট প্রকাশ।···প্রৌঢ় বয়সেও ওস্তাদজীর দেহের বাঁধন এখনও চমৎকার। এক চুল পাকা আর গোমেদমণির মতো চোখের দুই তারার মধ্যে কিছু অবসন্নতার ছাপ পড়া ছাড়া শালপ্রাংশু মহাভুজ সম দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন শিথিলতার ছাপ পড়েনি।

বাড়ী তাঁর বারাণসী। বছর কয়েক আগে তাঁর হাতের বীণ শুনে যশেন্দ্র দেব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোয়েছিলেন এ গুণীটিকে যেমন করে হোক···রাজকোষ শূন্য করে হোলেও আনবেন তিনি তাঁর দরবারে। টকটকে গৌরবর্ণ দেহের উপর তুষার শুভ্র চুড়িদার পাজামা পাঞ্জাবী আর কাবা পরিহিত হাস্যমুখ ওস্তাদজী ছোট কুর্ণিশ জানালেন যশেন্দ্র দেবকে।···তাঁর দিকে চেয়ে প্রীতিপূর্ণকণ্ঠে যশেন্দ্র দেব বললেন···"আইয়ে ওস্তাদজী বৈঠিয়ে।" অদূরে স্থাপিত অন্য একটি আসনে বসলেন। সম্মুখস্থিত গোলাপ পাশ থেকে খানিকটা গোলাপ জল ছিটিয়ে দিলেন যশেন্দ্র দেব ওস্তাদজীর মখমলের টুপির নীচে ঝুলে পড়া চুলগুলির ওপর।

"বহুৎ বহুৎ শুক্রিয়া রাজাজী" হেসে বললেন ওস্তাদজী।

ফলপূর্ণ পরাতের ওপর হোতে অন্যমনস্ক ভাবে একটি সাম্ভারা তুলে নিয়ে পাত্রটি ওস্তাদজীর সম্মুখে এগিয়ে দিলেন যশেন্দ্র দেব। সীতাফল, সাম্ভারা জাতীয় ফল কখনও খান না ওস্তাদজী তাতে কণ্ঠস্বরের হানি ঘটবার আশঙ্কা থাকে। প্রায়ই তাঁর পাঞ্জাবীর পকেট ভর্ত্তি থাকে ছাড়ানো গুজরাট এলাচের দানাতে। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার থাকে গুজরাট এলাচের দানাতে, জড়তা জমেনা কখনো।

দু'হাতের ভেতর সাম্ভারাটিকে নাড়াচাড়া করতে করতে যশেন্দ্র দেব বললেন "আজ এক কাফিকা মহফা দিজিয়ে ওস্তাদজী। থোড় সঙ্গত করুঙ্গা আপ কো সাথ।"

"হাঁ" হেসে ওস্তাদজী উত্তর দিলেন "হোরিকা সাথ আজ কাফি তো জরুর দেনা চাইয়ে রাজাজী।"

মহানন্দা পূর্ণ আর একটি রৌপ্য পাত্র ভৃত্য এনে স্থাপন করলো ওস্তাদজীর সম্মুখে। আস্তে আস্তে পাত্রটি মুখের কাছে ধরলেন তিনি, তারপর অর্দ্ধপীত পাত্রটি সম্মুখের থালার ওপর রাখলেন। পাঞ্জাবীর জেব হোতে এক মুঠো এলাচদানা বের করে মুখে পুরলেন। নয়ন নিমীলিত হোলো। কোলের উপর

প্রিয় বীণখানি আবার টেনে নিলেন যশেন্দ্র দেব। আসন্ন বৈশাখীর আগমন বার্তা জল টুঙ্গীর বাইরে···আকাশের গায়ে বিদ্যুৎচ্ছন্দে ছন্দিত হোয়ে উঠলো। মিনহাজউদ্দীনের কণ্ঠস্বর গুণ গুণ রবে গুঞ্জরিত হোয়ে উঠলো তারপর বিরহানন্দের সঙ্গীতে তরঙ্গায়িত হোয়ে উঠলো সে কণ্ঠ। যুগ যুগ ধরে যে গান বিরহীর নয়নকোণে অশ্রু টেনে আনে, সেই কাফি রাগিণীর ধ্রুপদ ধরলেন তিনি :

"ঝমঝম বরখে আজু বাদরওয়া পিয়া বিদেশ মোরি,
থর থর ছতিয়া ন মিশ দিন মন ভাবে,
নৈন ন নিদ আবে দামিনী দমক লাগে.
উন বিন কলন পাড়ত নাথ নাথ ধারে।"

বীণার রূপার তন্ত্রর উপর যশেন্দ্র দেবের চম্পক কোরকের মতো আঙুলগুলি লীলা চঞ্চল হয়ে উঠলো। সহসা ওস্তাদজীর নিমীলিত নয়ন উন্মুক্ত হোয়ে গেল··ধ্রুপদের অন্তরা আবার সঞ্চারীতে অবতরণ করলো।···মৃদু হেসে যশেন্দ্র দেবের দিকে তাকালেন তিনি "আজ আপনার মন সুস্থির নেই রাজাজী।"

মিনহাজউদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসলেন যশেন্দ্র দেব তারপর বীণটি কোলের উপর থেকে নামিয়ে পাটির উপর রাখলেন।

"ওস্তাদজী! আজ বীণে একটা আলাপ করুন··গান থাক।"

"আজ আপনার মনে আনন্দ নেই কিছুই আজ ভালো লাগবে না আপনার কাছে।"

আবার হাসলেন যশেন্দ্র দেব, ওস্তাদজীর কথা শুনে বললেন—"উ আনন্দকা বীণ তো আপকো হাতঁা সেই বাজ রহে ওস্তাদজী"

"নেহি রাজাজী! আপনা দিল্ মে যব আনন্দ, রূপে প্রকাশ দেতা তব, আপনা সে উস্‌কা বীণ বাজ যাতা।"

"ঠিক ওস্তাদজী" ঘাড় নেড়ে যশেন্দ্র দেব বললেন, "আজ আর কিছু ভালো লাগছে না···আসুন, কিছু গল্প গুজব করা যাক।"

ভৃত্যকে ডেকে আর দু'টি ঠাণ্ডা পানীয় আনবার আদেশ দিলেন যশেন্দ্র দেব। সেজদানের প্রদীপ্ত বর্ত্তিকাগুলি নিভিয়ে দিতে বললেন। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। ক্ষীণা সরসীর অনুত্তাল উর্দ্মিরাশি জলমহলের চারধারে আছড়ে পড়তে লাগলো বারে বারে। হিম শীতল 'আমিলে'র পাত্রটি মুখের সম্মুখে তুলে ধরলেন যশেন্দ্র দেব।

"ওস্তাদজী!" মিনহাজউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে হঠাৎ প্রশ্ন করেন যশেন্দ্র দেব, "আপনাকে মাঝে মাঝে আমার অদ্ভুত লাগে কিছুতেই যেন আপনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আচ্ছা, আপনি সাদি করলেন না কেন ওস্তাদজী?"

এ ধরণের প্রশ্ন যশেন্দ্র দেব বিশেষ করেন না তাই একটু বিস্মিত হোলেন ওস্তাদজী, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে উত্তর দিলেন, "শিল্পীর জীবন বীণে তার পড়াতে পড়াতে বড় দেরী হোয়ে গেল রাজাজী···অবসর যখন হোলো, চমকে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম—দিগন্তে বাসন্তী রং ম্লান হোয়ে গৈরিক বর্ণ ধারণ করেছে··· তখন থেকে এই বীণকেই সঙ্গিনী করেছি।

বাহিরে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতে লাগলো বিদ্যুতের চকিত হাসি। সেইদিকে আনমনে চেয়ে রইলেন মিনহাজউদ্দীন। যশেন্দ্র দেব আবার ডাকলেন, "ওস্তাদজী"।

মুখ ফিরিয়ে মিনহাজউদ্দীন উত্তর দিলেন, "ফরমাইয়ে"।

"যে আনন্দের মধ্যে আমরা আমাদের সঙ্গীত জগৎ সৃষ্টি ক[রি] তার ভিতরে তো কোন ক্ষোভ প্রবেশ করতে পারে না।"

অল্প হাসলেন মিনহাজউদ্দীন "নেহি রাজাজী।"

প্রাসাদ অন্তঃপুরের অলিন্দে মধ্যরাত্রে রাজবধূ কাঞ্চন [মালা] কোন সুদূরে তার দৃষ্টি প্রসারিত করেছে। বিশাল প্রাসাদ[...] নিস্তব্ধ রজনীর মধ্যযামে মহা অনন্তাকাশে একাকী চন্দ্রমার ম[...] সঙ্গীহীনা কাঞ্চনমালা···। স্বামী সে রাত্রে আসেননি অন্তঃপুরে এ[...] ···অনেক রাত্রেই আসেন না তিনি। কিছু দূরে জলমহল থেকে ে[...] আসছে অস্পষ্ট সঙ্গীতের রেশ···। কার নিদ্রাহীন রজনীর অশা[...] মুহূর্ত্তগুলি পূর্ণ হোয়ে উঠছে পরজ রাগে। দূর পশ্চিমাকাশে কৃত্তি[কা] নক্ষত্র অস্ত গেল···দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনে নিশাচর একটা পাখী উ[ড়ে] গেল আকাশপ্রান্তে···। অমানিশার শূন্যতা অন্ধকার আসনে বো[সে] প্রহর গণনা করছে কতদূরে আর·পূর্ণিমার·পূর্ণতা···। সুদূরে চো[খ] থাকা কাঞ্চনমালার দুই চোখের দৃষ্টি জ্বালা করে উঠলো। স্বামী[র] আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করতে পারেননি। পৃথিবীতে স্বামীর সব চো[খের] প্রিয় বস্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের জীবনে ফোটাতে পারেননি[...] ভগবান তাঁকে সুকণ্ঠ হোতে বঞ্চিতা করেছেন—সে কি তাঁর দোষ[?] অপ্রতিভ ওস্তাদজী তাঁকে আহত না করে অতি মিষ্ট কথায় বলেছে[ন] "গভীর ভাবাবেগ ছাড়া গানের সুর সহজে কণ্ঠে আসতে চায় [না] রাণীজি। আজন্ম সৌভাগ্যের সিংহাসনে বোসে সে আবেগ অন্ত[রে] লাভ করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন, আপনি সাধনা করুন।"

কাঞ্চনমালা জানেন ওস্তাদজী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তাঁ[র] মতো তারহীন যন্ত্র পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম গুণীর হাতের স্পর্শেও জীব[ন্ত] হোয়ে উঠবে না কোন দিন। দৈহিক সৌন্দর্য্য তাঁর যে অনুপা[ত] কর্কশ। গানের সুর কোন দিন ফুটবে না সে কণ্ঠে।

দুপুর বেলাটা রাজোয়ারির কিছুতেই কাটতে চায় না। মনোহা[...] শ্বশুর বাড়ী চলে গেছে। সকাল বেলাতেই কমলাপৎ আর পর্ব[...] দুই বাপ-ব্যাটাতে মিলে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেছে জই আর জনারে[র] ক্ষেতের কাজে···। নিজেরা খবরদারি না করলে মজুররা ফাঁকি দে[য়] দুপুরের আগেই শাশুড়ী, বউ খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়েছে। ত[ার] পর বড় পিতলের ডেগ ভর্ত্তি মোষের দুধ চুলার ওপর চাপিয়ে দি[য়ে] রাজোয়ারিকে দেখতে বলে ঘুমুতে গেছে দ্রৌপদী। ডেগচির দু[ধ] উথলে উঠতেই চুলা থেকে জ্বলন্ত কাঠখানা উঠিয়ে ফেলে[...] রাজোয়ারি। ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগলো অবশিষ্ট অঙ্গারগুলো···[...] দুধের ওপর পড়তে লাগলো পুরু চটের মতো একখানা সর। [...] সর দিয়ে মালাই বানাবে দ্রৌপদী বাকি দুধে দহি আর পেঁড়া হবে[...]

আস্তে আস্তে হাসি ফুটে উঠলো রাজোয়ারির মুখে। আচ্ছা খা[...] রসিকা কিন্তু তার শাশুড়ী আর বুড়ো বয়সে খেতেও পারে। [...] দুপুরেই তো অড়হরের ডাল, কোঁহড়া আর বৈগনের তরকারি [দি]য়ে বারোখানা প্রকাণ্ড বাজরার রুটি সাবাড় করে দিল··আর বার [...] গঞ্জনা খেতে হোলো শাশুড়ীর কাছে তার নাকি পক্ষীর মতো খোর[াক] তাতেই তো গায়ে তাকত লাগে না। বাপ রে! কাজ নেই [...] শাশুড়ী, ননদের মতো অত মুটিয়ে। দুধ জ্বাল দেওয়া তো হে[য়ে] গেল এখন করে কি সে? দিনে ঘুমোবার অভ্যাস নেই কাজক[র্ম] এখনকার মতো সব চুকে-বুকে গেছে গান গাইবার মতো [...]

অবসর ছিল কিন্তু দ্রৌপদী যদি জেগে ওঠে? যদি কেন নিশ্চয়ই জেগে উঠবে। ঘর্-ঘর্-র ভোঁস ভোঁস একটানা নাক ডাকার শব্দ আসতে থাকে দ্রৌপদীর শোয়ার ঘর থেকে। সেদিকে সকৌতুকে একবার তাকিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলো রাজোয়ারি। ঝাঁ ঝাঁ রোদে আকাশ-পাতাল ফেটে যাচ্ছে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা কথা উঁকি দিয়ে গেল রাজোয়ারির মনে। সীতা তালাওয়ের পাড়টা ভারি ঠাণ্ডা আর নির্জ্জন। এই দুপুরে লোকজন মরতেও যাবে না সেখানে। দ্রৌপদীর ঘুম ভাঙ্গতেও সেই একেবারে বিকেল…কমলাপৎ আর পর্ব্বত ফিরবে সন্ধ্যা মিলিয়ে যাবার পর। তালাওয়ের দক্ষিণ পাড়ে বড় একটা গুঞ্জার গাছ…কি চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া তার। তার নীচে বোসে আপন মনে একখানা গান যদি গাইতে পারে রাজোয়ারি। আর একবার দ্রৌপদীর শয়নকক্ষের দিকে তাকালো সে। তার পর বাইরে থেকে রান্নাঘরের শিকলিটা এঁটে দিল।

তরঙ্গিনী সীতা তালাওয়ের দক্ষিণ পাড়ে অর্দ্ধশায়িতা রাজোয়ারিকে পিছন দিক থেকে দেখলেন যশেন্দ্র দেব…। তপন তাপে আতপ্ত হোয়ে উঠেছিল মধ্যাহ্ন। মাটির নীচে ঠাণ্ডা ঘরখানায় বোসে বিশ্রাম করছিলেন যশেন্দ্র দেব। কাঞ্চনমালা দিবানিদ্রায় মগ্না। ভালো লাগছিলো না, উঠে পড়লেন। তরখানা থেকে বেরিয়ে জলমহলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। রাজস্থানের গ্রীষ্মকাল অতি ভয়ঙ্কর। চোখের সম্মুখে মধ্যাহ্নের দগ্ধ তাম্রদিগন্ত থরথর করে কাঁপতে থাকে। সর্বাঙ্গ ঝলসে যায় উষ্ণ হাওয়ায়। সন্তর্পণে এদিক ওদিক চাইলেন যশেন্দ্র দেব, ভৃত্যের দলের মধ্যে কাউকে এখন দেখা যাচ্ছে না। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন, না হোলে এখনই তারা দৌড়ে আসতো তাঁর পরিচর্য্যায়। একটি দিবা প্রহরী শুধু তরখানার সম্মুখে ছোট ঘরে নিদ্রালস নয়নে বসে আছে। তার চোখ এড়িয়ে সন্তর্পণে পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এলেন যশেন্দ্র দেব।

আলুলায়িত কুন্তলা বসুন্ধরা অরাতুর তপ্তদেহে ঘন ঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলো। রুদ্র তাপদগ্ধ প্রলয়দাহের ভিতর দিয়ে চোখের উপর হাতের আড়াল দিয়ে দ্রুতপদে জলটুঙ্গীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন যশেন্দ্র দেব। কিন্তু সেখানে পৌছতে পারলেন না। থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মরুভূমির মধ্যে কোথা হোতে ভেসে আসছে পাদপপাদপের ক্ষীণ জলধারা? শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ কে ফুটিয়ে তুলছে এত সুন্দর ভূপালীর টানে?

"গোঠ বিহারে নন্দলাল হমারি…
উছুর ঝুমুর বাজে পাঁওজনিয়া
মত্ত যমুনা নাচত অধীরা
শুন্‌হি মধুর মুরলীয়া।"

এক মাস আগে কাফির সুর বেজেছিল যে কণ্ঠে, এই সে কণ্ঠ কোন ভুল নেই। বৃক্ষবাটিকার পিছন দিয়ে সন্তর্পণে আত্মগোপন করে যশেন্দ্র দেব পা টিপে টিপে চললেন সে কণ্ঠ লক্ষ্য করে…। ঘন অতসীক্ষেত্রের পিছনে দাঁড়িয়ে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন তিনি নিজেকে। গান তো বন্ধ হয়ে গেলই, সঙ্গীত অধিকারিণীটিও উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্তরাল হ'তে যশেন্দ্র দেব দেখলেন একটি বালিকা ভীত নয়নে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে ত্বরিতপদে পথ চলতে লাগলো…। তবে কি মেয়েটি দেখতে পেয়েছে তাকে? কিন্তু এই শান্ত মুখশ্রীবিশিষ্টা নিতান্ত গ্রাম্য বালিকাটিই কি এত সুকণ্ঠের অধিকারিণী? বিস্মিত হলেন যশেন্দ্র দেব। কে এ মেয়েটি?

কাঞ্চনমালার অন্তঃপুর উদ্যানে ভবনশিখী বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছ মেলে নর্ত্তন করে উঠলো…পোটলা হরিণী উচ্ছ্বল হয়ে উঠলো অকারণ পুলকে। শুষ্ক বীথিকার কঙ্করাশি আবৃত হলো শেষ বসন্তের অকৃপণ পুষ্প বর্ষণে। দূর হ'তে ওস্তাদজীর কণ্ঠ নিঃসৃত পূরবীর মীড় ভেসে আসছে দখিনা বাতাসের সঙ্গে…। চৈত্রের আকাশ ভরে উঠেছে নীল রংএর বন্যায়। সেদিকে আনমনে তাকিয়ে রইলেন কাঞ্চন। যে সঙ্গীত গাওয়া হোয়ে উঠলো না কোনদিন, তার রেশ কি সারাজীবন ভরে খুঁজে বেড়াবো? প্রস্তরবেদিকা থেকে উঠে দাঁড়ালেন কাঞ্চনমালা…। আজ যশেন্দ্র দেবকে আসতেই হবে অন্তঃপুরে। সন্ধ্যার নীরবতা কি এরই মধ্যে দেখা দেবে জীবন প্রত্যূষের কাকলী ধ্বনির মধ্যে?

"কিষণলাল"? দ্রুত পদে জলমহলের খাস ভৃত্য এসে দাঁড়ালো যশেন্দ্র দেবের সম্মুখে। প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় নীরবে মাথা পেতে দাঁড়ালো…শীতল শ্বেত মর্ম্মরের উপর আলস শয়নে অর্দ্ধশায়িত হোয়েছিলেন যশেন্দ্র দেব—দীঘির কৃষ্ণজল আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে কৃষ্ণতর হোয়ে উঠছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রতীক্ষমান ভৃত্যকে প্রশ্ন করলেন যশেন্দ্র দেব—আশপাশের গ্রামের কোন ঝি বা বহুড়ী কে সে জানে নাকি যে খুব ভালো গান করতে পারে?

ভৃত্য কিছু বিস্মিত হোলো—ইতিপূর্ব্বে মহারাজা তাকে এমন ধরণের প্রশ্ন করেননি। সঙ্কুচিত ভাবে সে নেতিবাচক একটু ঘাড় নাড়লো, "তব প্রভুকো বব আগিয়া হোগা তব সন্ধান লেগা।"

ঠিক সেই সময়ই অন্দর মহলের ভৃত্য এসে দাঁড়ালো হাতে একটি স্বুবর্ণপাত্র বহন করে। বঙ্কিম-পাকে আচ্ছাদিত হালকা সুগন্ধি পত্রখানি তুলে নিলেন যশেন্দ্র দেব পাত্রের উপর থেকে, ভৃত্য চলে গেল। চোখের সম্মুখে পত্রখানি তুলে ধরে ঈষৎ হাসলেন যশেন্দ্র দেব।

নিপুণ হস্তে কুঙ্কুম চন্দনের পত্রলেখাটি সযত্নে কাঞ্চনমালা এঁকে তুলছিলেন তাঁর শঙ্খ শুভ্র ললাটের উপর। আজ সন্ধ্যায় অন্তঃপুরে আসবেন যশেন্দ্র দেব, অন্তর বার বার ভরে উঠছে সে আনন্দে। প্রসাধন শেষে দর্পণের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বিত মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন কাঞ্চনমালা। কুরঙ্গ নয়নের স্থির দৃষ্টি নিষ্ঠুর ভৎর্সনাতে তাঁকে গঞ্জিতা করে দিল। যে সৌন্দর্য প্রিয়জনকে আকর্ষণ করতে পারে না কি প্রয়োজন সে সৌন্দর্য্যে···? যশেন্দ্র দেব কাঞ্চনমালার প্রতি অবিচার করেননি কখনও। সপত্নীহীনা মেত্রির রাজ অন্তঃপুরের একচ্ছত্র রত্ন সিংহাসনে পরম গৌরবে তিনি অধিষ্ঠিতা। কিন্তু অন্তর পূর্ণতা লাভ করে না তাতে। স্বামীর প্রিয় জিনিষ ফুটিয়ে তুলতে পারলেন না নিজের জীবনে, মহারাত্রির নিয়ে গভীর শ্রাবণ ধারার মতো অন্তরে সে ক্ষোভ ক্রমেই স্ফীততর হোতে থাকে। স্বর্ণপাত্রে বহিত সৌভাগ্যের দীপ শুষ্ক করতে পারে না সে জলধারা।

প্রতিপদের চন্দ্র পার হোয়ে এসেছে তার দুঃসময়ের কৃষ্ণপক্ষ। অস্পষ্ট স্বর্ণমুকুট রেখা শিরে বহন করে হেসে উঠেছে দিক প্রান্তে। হর্ম্যতলে বিছানো কোমল হংস শুভ্র গালিচার উপর উপবেশিতা কাঞ্চনমালা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ঈষৎ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে যশেন্দ্র দেব পাঠ করে নিতে পারলেন নীরব অভিযোগ। বললেন, "কয়েকদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় অন্তঃপুরে আসতে পারিনি, তুমি দুঃখিত হোয়ো না কাঞ্চনমালা।"

নিরুত্তরে কাঞ্চন কক্ষাভ্যন্তরের প্রদীপ্ত প্রদীপের শিখা অকারণে উজ্জ্বল করে দিলেন। সীমন্তের মাণিক্য সিঁথি উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো ··শুভ্র অনামিকায় স্থাপিত অঙ্গুরীয়কের পুষ্পরাগ মণিটি নিজ দেহে সহস্র শিখা ধারণ করে সগর্ব্বে হেসে উঠলো। সেদিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন যশেন্দ্র দেব এগিয়ে গেলেন কাঞ্চনমালার দিকে, "কাঞ্চন! বিরহ মিলনানন্দের মধ্যেই তো আবর্ত্তিত হোচ্ছে বিশ্বের হৃদয় স্পন্দন। এ বিচ্ছেদের অভাব যদি ঘটতো, মিলনকে আজকের মতো এমন মধুর লাগতো না।"

নতমুখী কাঞ্চনমালার চক্ষুদুটি বাষ্প ভারাক্রান্ত হোয়ে উঠলো। সূর্য্যের করস্পর্শে তুষারাবৃত দ্বার উন্মুক্ত হোচ্ছে ধীরে ধীরে। কাঞ্চনমালার ম্লান মুখে হাসির লেখা ফুটে উঠলো। "আপনার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করবার যাদুমন্ত্র থেকে বিধাতা বঞ্চিতা করেছেন আমাকে, তাই আমি উপেক্ষিতা আপনার কাছে।"

উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন যশেন্দ্র দেব, "ছিঃ কাঞ্চন! মহাকালের পারাবারে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতোই আমাদের ক্ষণস্থায়ী এ জীবন, তার মধ্যে এত অনুযোগ অভিযোগ! না, না মনকে এমন ভাবে পীড়িত করো না। আজ সারারাত্র তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হোয়ে থাকবো।" তারপর কি একটা কথা মনে পড়াতে উৎফুল্ল হোয়ে বললেন "শেষ বসন্তের কয়েক ফোঁটা মধু কাল সন্ধ্যায় আমাকে উপহার দিয়েছেন ওস্তাদজী। আজ গভীর রাত অবধি তাই দিয়ে তোমার উপকার করবো। তুমি একটু অপেক্ষা কর কাঞ্চন! আমি নিজে নিয়ে আসছি আমার বীণ।"

দেখতে দেখতে হতাশার মেঘ ঘনিয়ে এলো কাঞ্চনমালার মুখের উপর। আবারও সেই গান। স্বামীর কাছে চিরদিন তাই মুখ্য রয়ে গেল, গৌণ হোয়ে রইলো শুধু কাঞ্চনমালা আর তার ভুবনমোহিনী রূপ, যা কোনদিন আকৃষ্ট করতে পারলো না যশেন্দ্র দেবকে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে যশেন্দ্র দেবের মুগ্ধ প্রাণের আবেশ কোন গম্ভীর গুহামুখে স্থাপিত বিশাল এক কৃষ্ণ প্রস্তরের কঠিন সংঘাতে বাধা প্রাপ্ত হোয়ে ফিরে এলো। কাঞ্চনমালার কণ্ঠ সঙ্গীতময় নয় কিন্তু তার সুর কি ভুলেও একবার তার মর্ম্মমূলে আঘাত করে না?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যশেন্দ্র দেব বললেন, "আমি তো আগেই বলেছি আজ সারা রাত তোমার আজ্ঞাবহ হোয়ে থাকবো···। চলো, তোমার প্রমোদ উদ্যানে, সুলতান চম্পার গাছে নতুন ফুল এলো কিনা দেখবো।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে সচকিতা হোয়ে উঠলেন কাঞ্চন, বললেন, "সে কি? না, না। আমি আশা করে আছি আজ সারারাত তোমার বীণ শুনবো।"

স্থির দৃষ্টিতে যশেন্দ্র দেব একবার তাকালেন কাঞ্চনমালার মুখের দিকে, কণ্ঠ থেকে একটি শব্দ শুধু নির্গত হোলো "না"।

[ আগামীবারে সমাপ্য।

# প্রিয়া মিলন

শ্রীমতী সীমা গঙ্গোপাধ্যায়

বৈশাখী এক গোধূলি বেলায়
দেখা হয়েছিল তোমার আমার,
সানাই-এর সেই মঙ্গল সুর
মোদের জীবনে মিলন মধুর।

এসেছিলে তুমি বরবেশে সাজি
দিয়েছিলে মালা গলে,
বলেছিলে তুমি ওগো বধূরাণী
মানসী প্রিয়তমা আমার।

সেইদিন হতে কতনিশি পোহায়েছে
কত বিহ্বল আবেশে,
রাত্রের নক্ষত্র সম মোরা
তন্দ্রাহারা হয়ে, ছিনু গো দোঁহে॥
আজি তোমার বিরহে কাঁদিতেছে
তব প্রিয়া, দেখনাগো তুমি চেয়ে।
তোমার আকাশে ওঠে কত তারা
সে প্রিয়া তোমার তন্দ্রা হারা
মণিহারা ফণী সম
স্থির অচঞ্চলা।

# সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

## The Swami Vivekananda—a Study

আলোচ্য গ্রন্থখানি ১৯০৭ সালে প্রথম প্রকাশের গৌরব লাভ করে, পরলোকগত লেখক স্বামী বিবেকানন্দর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেছিলেন, সেই হিসাবে তাঁর রচনাটির এক বিশেষ মূল্য আছে। বিবেকানন্দকে তিনি যে ভাবে দেখেছেন, তাঁর সান্নিধ্য যেটুকু লাভ করেছেন তারই একটা আন্তরিক পরিচয়ে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ, মহান্‌ সন্ন্যাসীর চরিত্রের অনেক দিক তিনি উদ্‌ঘাটিত করে দেখাতে চেয়েছেন যা স্বামীজির ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দের কাছে মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে। লেখকের মতবাদ সকলের কাছে অভ্রান্ত বলে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাঁর রচনার প্রতি ছত্রে আত্ম প্রকাশ করেছে তা পাঠকচিত্তেও গভীর দাগ কাটে। লেখকের ভাষা সহজ ও সাবলীল, বিদেশী ভাষাকে তিনি সহজেই আত্মসাৎ করেছেন যা তাঁর রচনার উৎকর্ষ বাড়িয়ে তুলেছে। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর পুণ্য মুহূর্তে স্মারক গ্রন্থ হিসাবে বর্তমান রচনাটিকে পাঠক সমাজ সাদরে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা পোষণ করি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। Written by—Late Monomohan Ganguly, Publisher—Contemporary Publishers. private Ltd. 65 Raja Rajballav St, Cal—3. Price Rs. 3/- (India, Pakistan and Ceylon).

## পল্লী প্রকৃতি

রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রীতি সম্বন্ধে সকলের খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা নেই, তাঁর প্রতিভার দীপ্তিই বোধ করি সাধারণ মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে তাঁর প্রকৃতির অন্যান্য দিকে সেটা একটু ছায়াপাত করেই সেজন্যই তাঁর অনন্যসাধারণ জীবনে তিনি কত সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন তার একটা ব্যাপক পরিচয় পেতে হলে এ ধরণের সংকলন গ্রন্থের ব্যাপক প্রকাশ ও প্রচার একান্ত প্রয়োজনীয়, সেজন্যই বিশ্বভারতীর এই উদ্যম আমাদের ধন্যবাদার্হ। আলোচ্য সংকলনে পল্লীসমস্যা ও পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী সংগৃহীত হয়েছে, এগুলির মাধ্যমে পল্লীদরদী রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আর পল্লীসমস্যা নিয়ে তিনি যে কত গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন তাও উপলব্ধি গোচর হয়। পল্লী-সমস্যা ও পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমতও এগুলির মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হয়। আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য তাই শুধু সাহিত্য সৃষ্টিতেই সীমিত নয়, এর মূল্য অনেক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। প্রবন্ধ সাহিত্যের অঙ্গনে বর্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য অবদান। সংকলনটির আঙ্গিক সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭। মূল্য সাড়ে চারটাকা।

## লেখন

অটোগ্রাফ বা স্বাক্ষর সংগ্রহের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ যে টুকরো লেখনগুলি রচনা করেছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থটি তারই সংকলন। অবশ্য পূর্বে এর অন্যান্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমান পুস্তকটি তাদেরই সংস্কৃত নবরূপায়ণ মাত্র। সাধারণ কবিতার সঙ্গে এই লেখনগুলির একটু পার্থক্য আছে, কবির নিজেরই ভাষায় বলতে গেলে এগুলি হোল হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়, যে পরিচয় শুধু আক্ষরিকই নয় ভাববাহীও। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত ভাবটি খানিকটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলেই হাতের আখরে এদের বাঁধা হয়েছে আর সে জন্যই এগুলির আবেদন এত মর্মস্পর্শী। এই মূল্যবান সংগ্রহের শোভন ও সুন্দর নবরূপায়ণ করে বিশ্বভারতী সমগ্র পাঠক সমাজেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই অতি উচ্চমানের। লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭, মূল্য—চার টাকা।

## রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা

আলোচ্য গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা সম্পর্কে এক সুষ্ঠ ও প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার রীতি প্রকৃতি ও তার প্রাণসত্তাকে পূর্ণ ভাবেই উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন লেখক। গদ্য কবিতা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে স্বতঃই একটা বিমুখতার ভাব দেখা যায়, রসাস্বাদনে অক্ষমতাই অবশ্য এই বিমুখতা বা মানসিক দ্বিধার প্রকৃত কারণ। সেই ধরণের পাঠক ও বহুল পরিমাণেই উপকৃত হবেন আলোচ্য রচনার দ্বারা। মানব মনে সুর ও তালের যে সহজাত সংস্কার আছে। তাকে সংস্কৃত করে উপলব্ধিক্ষম করে তোলার জন্যই প্রয়োজন সাহিত্য-ও শিল্পবোধের, পাঠক আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে সে বিষয়েও প্রভূত উন্নতি করতে পারবেন। যে সৌন্দর্য্যকে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের বন্ধনে বেঁধেছেন, ছন্দের বাইরেও তার প্রকাশকে যে ঠিক সমভাবেই সুসংহত করে প্রকাশ করেছেন, তাঁর গদ্য কবিতা তারই পরিচয়বাহী। তাঁর এই বিশেষ দিকটিকে পাঠকের মননে সহজ করে দেখানোর জন্যই আলোচ্য গ্রন্থের অবতারণা করা হয়েছে। জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে এর মূল্য বড় অল্প নয়। বইটি আঙ্গিকেও সমৃদ্ধ। লেখক—বীরাবন্দ ঠাকুর। প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, মূল্য—বারো টাকা।

## রবীন্দ্র নির্দেশিকা

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হ'ল। বর্ষব্যাপী এই উৎসবে দেশে দেশে আয়োজিত হ'ল কত সংগীতানুষ্ঠান, কত নাট্যানুষ্ঠান, কত সারগর্ভ আলোচনা তর্ক-বিতর্ক। বিশ্ববাসী আর একবার বিশ্বকবির প্রতিভার পরিচয় পেলো নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে। কিন্তু এ-সবই যে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাবার। যা শোনা হ'ল মনে তার রইলো কতটুকু? মনে রাখার জন্তে চাই প্রয়োজন কোনও চিরস্থায়ী মাধ্যমের। আর সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হ'ল বই। এই কবি-বর্ষে তাই সরকারী বেসরকারী ভাবে প্রকাশিত হয়েছে—সুলভ সংস্করণে রবীন্দ্র রচনাবলী, সংক্ষিপ্ত সংস্করণে রবীন্দ্র রচনাসম্ভার, বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা বহু 'রবীন্দ্রজীবনী' আর ভিন্ন ভিন্ন ধারায় লেখা রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা। যার যা কিছু ছিল সঞ্চিত—রবীন্দ্র-পত্রাবলী অথবা পূজ্য রবীন্দ্রস্মৃতি, সব উজাড় করে দিয়েছেন শতবর্ষের এই মহাক্ষণে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্যগ্রন্থ 'রবীন্দ্র' নির্দেশিকা উপরোক্ত কোন নির্দ্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হয়নি। লেখক শ্রীনির্মলেন্দু রায়চৌধুরী নিজে দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে রচনা করেছেন অন্তের জন্য মসৃণ রাজপথ। রবীন্দ্র সাহিত্যের অরণ্যে ঘুরতে হবে না আগন্তুককে অন্ধজনের মত। রবীন্দ্রসাহিত্যের 'দিগ্‌নির্ণয়' করেছেন লেখক—বহুশ্রমে আর অধ্যবসায়ে গ্রথিত করেছেন এক নির্ভরযোগ্য রবীন্দ্র-সাহিত্য-সূচী। যদিও এই সূচী মূলত বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর নির্দেশিকা তবুও কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ থাকায় দিগ্‌ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত রচনাবলীর নির্দেশনাও এতে সন্নিবিষ্ট আছে। আয়তনে রবীন্দ্রসাহিত্য বিপুল, সেই কারণে রবীন্দ্রপাঠচর্চার এই ধরণের নির্দেশিকা একান্ত প্রয়োজনীয়। বইখানিতে রবীন্দ্ররচনার সাল অনুযায়ী, রচনাবলীর খণ্ড অনুযায়ী, গ্রন্থের নাম, কবিতার নাম ও কবিতার প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকায়, বইটি রবীন্দ্ররচনাবলীর পার্শ্বে স্থান পাবার যোগ্য হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই এতদিন রবীন্দ্ররচনাবলীর একটি সুসম্পূর্ণ সূচীর অভাব অনুভব করে এসেছেন—সেই অভাব পূরণ করে লেখক ও প্রকাশক 'লাইব্রেরিয়ান-পাবলিকেশনস্' ধন্যবাদার্হ। এই বইটি প্রকাশ করে এঁরা শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে শ্রদ্ধাশীলতারই পরিচয় দেননি—সাধারণ পাঠককুলকেও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। একদা মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে রূপায়িত রবীন্দ্র নাটক, গল্প ও উপন্যাসের তালিকা সংযোজিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তা ছাড়া রেকর্ডে কবিকণ্ঠ ও রবীন্দ্র সংগীতের তালিকা বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। বইখানির ছাপা বাঁধাই সুরুচিসম্পন্ন। প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীবাণীকুমার মজুমদারের প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ প্রশংসার দাবী রাখে।

## সাংস্কৃতিকী

বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনামধন্য বৈদগ্ধ্যের জন্য, প্রাবন্ধিক ও চিন্তাশীল লেখক হিসাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ একত্রে গ্রথিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে প্রবন্ধগুলি রচিত; লেখকের পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার আভাসে এর প্রত্যেকটিই সমুজ্জ্বল। সংস্কৃতি বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়, প্রাথমিক প্রবন্ধে লেখক তারই বিশদ আলোচনা করেছেন, তাঁর মতে সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ খুবই ব্যাপক। কাল ভেদে এর রূপ ও রীতির পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে, কিন্তু মূল অর্থ থাকে অবিকৃত। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ঠিক সহজবোধ্য না হলেও জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু পাঠক-সমাজে আলোচ্য গ্রন্থখানি সাদরেই গৃহীত হবে বলে আমরা আশা করি। গবেষণা ও চিন্তাশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সংকলনটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ শিল্প শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলি-১। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## উপন্যাস পাঠের ভূমিকা

সাহিত্যের আসরে উপন্যাসের এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, বস্তুত পাঠক সমাজের প্রধানতম অংশই উপন্যাসের অনুরাগী, কাজেই এই উপন্যাস পাঠেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে যার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাতেই উপন্যাস পাঠের সত্যকার সার্থকতা নিহিত আছে আলোচ্য গ্রন্থে সেইদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। উপন্যাসে রূপ ও রীতিতে ঘটেছে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন, আজকের উপন্যাস দাঁড়িয়েছে কঠিন বাস্তবের পায়ে ভর করে, সত্যকার জীবনবোধ না থাকলে কোন লেখকই আজকের সাহিত্যে মালা চন্দনের অধিকারী হতে পারেন না, জীবনকে যথাযথ রূপে সাহিত্যের আয়নায় প্রতিফলিত করাই বর্ত্তমান সাহিত্যকারের প্রধান কাজ। এই জীবনবোধ সাহিত্যে কে কেমন ভাবে ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন তার বিচার করার ভার পাঠকসমাজেরই উপর, আলোচ্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাও সেখানেই উপন্যাসের বক্তব্যকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যই উপন্যাস পাঠের কিছু ভূমিকার প্রয়োজন, বর্ত্তমান রচনাতে পাঠকের সেই প্রয়োজনটুকু মিটবে। প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। বইটির আঙ্গিক ত্রুটিহীন। লেখক—শিশির চট্টোপাধ্যায় প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রা: লি:, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

## নৈমিষারণ্য

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলা তথা ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, এই সমস্যা আজ আমাদের সমাজ-জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী হলেও এ সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতনার আভাস দেখা দেয়নি এখন ও, অন্তত বর্ত্তমান সাহিত্যে এর যথোপোযুক্ত স্থান হয়নি আজ পর্য্যন্ত। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই অভাব বহুলাংশেই দূর করবে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, ও উদ্বাস্তু জীবন এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু, গভীর আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই মহৎ রচনাকে উদ্বাস্তু জীবন সম্বন্ধে এপিক বলে উল্লেখ করলেও বোধ হয় যথেষ্ট হয় না, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে লেখক শুধু আলোচনাই করেননি এর সমাধানের নিপুণ ইঙ্গিত দিয়েছেন যা বাস্তববোধ ও হৃদয়বত্তা এই উভয় পরিচয়েই সমুজ্জ্বল। ছিন্নমূল মানুষগুলিকে বুঝতে হলে তাদের বর্ত্তমান রূপটাই যে একমাত্র

বিবেচ্য নয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখক তাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, পুনর্বাসনে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে গেলেও কেন যে আজও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সরকারের এত বড় সমস্যা হয়েই রয়ে গেছে সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ মাত্র রাখেন নি তিনি। সর্বহারা রিক্ত একদল মানুষের জীবনবেদ স্বরূপ এই গ্রন্থে শুধু যে নৈরাশ্যবাদই প্রাধান্য লাভ করেছে তা নয়, ভবিষ্যতে তাদের যে বলিষ্ঠ সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মৃতপ্রায় মানুষ আজ যে নূতন জীবনের স্পর্শে বেঁচে উঠতে চলেছে তারও সুস্পষ্ট পরিচয় বিধৃত হয়েছে এতে। সাহিত্য ও সমাজ এই দুই ক্ষেত্রেই আলোচ্য গ্রন্থের অবদান অসীম। বাস্তববোধ সমুজ্জ্বল কাহিনী কোথাও এতটুকু নীরস বা বোরিং ঠেকে না, কারণ গল্পের ধারা বয়ে গেছে অব্যাহত গতিতেই। লেখক যেই হোন তিনি যে গভীর সাহিত্যবোধের অধিকারী সে পরিচয় ছড়ানো রয়েছে তাঁর রচনার ছন্দে ছন্দে। সাহিত্যের আসরে তাঁকে আমরা সমগ্র পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে সাদর স্বাগত জানাই। গ্রন্থটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—বিকর্ণ। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯ মূল্য—নয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## মহাবিশ্বের রহস্য

মহাকাশ সম্বন্ধে আজকের মানুষের কৌতূহল অসীম আর বিজ্ঞানের অগ্রগতি সে কৌতূহলকে সার্থক করে তুলেছেও দিনে দিনে, আকাশ আজ শুধু কল্পনার রাজ্যই নয় সেখানে অভিযান সুরু হয়ে গিয়েছে, কাজেই ভবিষ্যতে মানুষ যে মহাবিশ্বের রহস্যকে সম্পূর্ণরূপেই উদ্‌ঘাটিত করতে পারবে এ আশা দুরাশা নয়। আলোচ্য বইখানিতে লেখক মহাবিশ্বের নানাবিধ বৈচিত্র্য ও রহস্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখিয়েছেন, আজকের যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা মহাশূন্যে রকেট অভিযানের বিশদ বিবরণ বিধৃত করেছেন। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত হলেও লেখনীর যাদুতে তাঁর রচনা নিছক বৈজ্ঞানিক আলোচনা মাত্রতে পর্যবসিত হয়নি বরং বৈজ্ঞানিক রূপকথা বললেই এর সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব। জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রই বইখানি পড়ে আনন্দ লাভ করবেন। লেখকের ভাষা চিত্তাকর্ষক ভঙ্গী মনোরম। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। বইটি মূল রুশ থেকে অনূদিত হয়েছে। লেখক—বি, ভি, লিয়াপুনভ, অনুবাদক—প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—তিন টাকা।

## অযাত্রায় জয়যাত্রা

আলোচ্য গ্রন্থখানিকে রম্যরচনার অন্তর্গত করাই বোধ হয় সঙ্গত। লেখক বাংলা কথাসাহিত্যের সুপরিচিত শিল্পী, বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনই তাঁর সাহিত্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, আলোচ্য গ্রন্থেও তিনি তাঁর জীবনদর্শনের সেই বিশেষ রীতিটিকেই অনুসরণ করেছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে একটু বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যায়, লেখক সংস্কার অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়েছিলেন একদিন এক অযাত্রার যাত্রায়, স্বল্প কয়েকটি দিনে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হল তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে আলোচ্য রচনার কাহিনী। সরল মাধুর্য্যে ভরা ভাবারীতি রচনাটির অন্যতম সম্পদ, বস্তুতঃ এজন্যই অতি সাধারণ ঘটনা ও চরিত্রগুলিও বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েই পাঠক মানসে প্রতিভাত হয়, লেখনীর সরলতা সর্বত্রই সহজ গতিতে বয়ে গিয়েছে কোথাও তা ব্যঙ্গের পর্য্যায়ে চলে যায়নি কাজেই যে রসে পাঠকচিত্ত অবগাহন করে তার সবটাই মধুর, অম্লের আস্বাদ তাতে একেবারেই নেই। রসজ্ঞ পাঠক সমাজে বইটি আদর পাবে বলেই আমরা আশা করি। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—চার টাকা।

## মন দেউলে দীপালোক

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি ছোট গল্প সংগ্রহ। সাহিত্যিক সাংবাদিকের রচিত এই গল্পগুলি নানা কারণেই উল্লেখ্য। নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে গড়ে উঠেছে কাহিনীগুলি, যার ভার খুব না থাকলেও ধার আছে যথেষ্ট। গল্পগুলির পাত্রপাত্রী আমাদেরই চেনা মানুষ সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট রাগ অনুরাগ, ব্যথা বেদনাই নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন লেখক তাদের উপলক্ষ্য করে, সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অসংখ্য গল্পের উপাদান, এগুলি তারই পরিচয়বাহী। লেখকের মুন্সীয়ানায় এই সাধারণ কাহিনীগুলিই শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। বেশ একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় গল্পগুলি পড়লে। ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রকাশক—কন্টেম্পোরারী পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ ৬৫, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৩, মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## শর্বরী

আলোচ্য গ্রন্থখানি জনপ্রিয় সাহিত্যিক নীহাররঞ্জন গুপ্তের নব প্রকাশিত এক রচনা। দুটি ভিন্নধর্মী নারী-প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কাহিনী দানা বেঁধে উঠেছে। বাহ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনায় আন্তর সম্পদ যে কত বেশী গরীয়ান মর্মস্পর্শী কাহিনীটির মাধ্যমে লেখক তাই বলতে চেয়েছেন। নীহাররঞ্জন গল্প বলতে জানেন, তাঁর শৈলীও আকর্ষণীয় কাজেই এই উভয় সম্পদে সমৃদ্ধ কাহিনীটি সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। সহজ সুন্দর ভঙ্গীতে বলা মনোরম গল্পটি তাঁর অনুরাগীদের খুসী করবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## আলিম্পন

আলপনা শিল্প বাংলার লোক সংস্কৃতির এক প্রাচীন শাখা, এই শিল্পের উদ্ভব নানা রকম হিন্দু লোকাচার ও ধর্মাচার থেকে, নানান মঙ্গল কর্মে ও পূজাপার্বণে আলিম্পন বা আলপনা এখনও এক বিশেষ ভূমিকার অধিকারী, সেজন্যই এই শিল্পের আদর এখনও পূর্ববৎই রয়েছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর আলপনার নক্সা দেওয়া হয়েছে। আবহমান কাল থেকে বাঙালী হিন্দুর পুরস্ত্রীরা যার সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিত। লোক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের পক্ষে এই ধরণের বইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। বাংলার মেয়েরা বইটির সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। বলেই আমরা আশা করি। বইটির প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—প্রতিভাবালা বর্দ্ধন। প্রকাশিকা—শ্রীমতী প্রতিভাবালা বর্দ্ধন, ৬৬। বি· আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫ দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃটিশ রাজা স্বাধীন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করেন, এমন কেলেঙ্কারী বন্ধ করার প্রয়োজন,—এবং শাসনতন্ত্র রাজতন্ত্রী হলে ঐ বৃটিশ রাজাকেই ভারতের রাজা বলে মানতে হয়, এবং তাতে স্বাধীনতার চেহারাটা যেমন কদর্য তেমনিই থেকে যায় বলে' কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি প্রথম যে objective resolution পাশ করলে, অর্থাৎ সংবিধানের কাঠামো খাড়া করলে, তাতে বলা হল, ভারত একটা সভারেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিপাবলিক হবে।

শুনে লোকে বুঝলে,—এই তো কথা,—এবার ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ডোমিনিয়ন পরিচয় বর্জন করে সম্পূর্ণ স্বাধীনই হবে—সংবিধানটা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারতের সংবিধানই হবে। কিন্তু আমার মতে, '৩৫ সালের শাসনবিধি ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট মিলে যে ইণ্টারিম ডোমিনিয়নের শাসনবিধি তখন চলছিল,—সেটার স্থলে নতুন সংবিধানটা হবে পাকা (full fledged) ডোমিনিয়নের শাসনবিধি,—এবং কাজেই ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তই থেকে যাবে। সভারেন, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি কথাগুলো দেখে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই,—কারণ ঐ দুটো কথা বড়লাট-শাসিত স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন সম্বন্ধেও বলা হয়ে থাকে।

এখন মনে হলে হাসি পায়,—এই মত প্রকাশ করে দু'-এক জন পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে কেমন তাড়াতুড়ি খেয়েছিলুম, এবং শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত মশায়রা কেমন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিলেন। আমার এক বন্ধু (যশোরের পাঁজিয়ার শিব মিত্র) একদিন আমাকে এবং তাঁর আর এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে মুখোমুখি ভিড়িয়ে দিয়ে ঐ কমনওয়েলথের প্রশ্নটা তুলে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। সে বন্ধুটি একজন এম-এ, বি-সি-এস সরকারী কর্মচারী।

তিনি বললেন,—আপনার এমন defeatist mentality (পরাজিতের মনোবৃত্তি) কেন?—আমি বললুম,—কারণ "স্বাধীন রিপাবলিক" হয়েও বৃটিশ প্রজা হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত আইরিশ ফ্রি ষ্টেট। তিনি মানলেন না তর্ক অসমাপ্ত থেকে গেল। পরে আমি বিশ্ববিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রোফেসর ব্যারিডেল কীথ-এর বই এবং আইরিশ কনষ্টিটিউশন থেকে দুটো উদ্ধৃতি লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম,—যাতে বলা হয়েছে,—আইরিশ ফ্রি ষ্টেট দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা থেকে বৃটিশ রাজ্যের উচ্ছেদ করেছে, কিন্তু বিদেশে তার নাগরিকেরা বৃটিশ প্রজার অধিকার চায়ও এবং পায়ও। ব্যারিডেল কীথ বলেছেন, ব্যবস্থাটা anomalous বটে, কিন্তু এ anomaly একটা fact.

এদিকে সংবিধান রচনার আলোচনা উঠলে সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠলো,—ভারত কমনওয়েলথে থাকবে, কিনা? নিরীহ নরলোক একটু হকচকিয়ে গেল,—সভারেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিপাবলিক সম্বন্ধে এ কেমন প্রশ্ন? কিন্তু কর্তারা তার জবাব না দিয়ে ভারতের এক সংবিধান বিশেষজ্ঞ বি, এন, রাওকে বিদেশে পাঠালেন বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসার জন্যে।

তিনি আমেরিকায় গেলেন রিপাবলিক্যান শাসনযন্ত্র দেখতে, তারপরে বিলেতে গেলেন পার্লামেণ্টারী বিধিব্যবস্থা বুঝতে, আর গেলেন আয়র্লণ্ডে—অন্য কোন দেশে নয়। দেখে আমার আনন্দ হল। আভ্যন্তরীণ শাসনে রিপাবলিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ ডোমিনিয়ন—আমার এই থিওরীর সঙ্গে সংবিধান রচয়িতাদের আদর্শের মিল প্রমাণিত হল, এবং তদনুযায়ীভাবেই সংবিধান রচিত হল। তাতে ভারতের পরিচয় লেখা হল, সভারেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক।

জনগণ তখনও এসব বোঝেনি, এবং এই ভেবেই সন্তুষ্ট আছে যে, সার্বজনীন ভোটাধিকার চালু হলে তার ভিত্তিতে যখন প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবে, তখন শেষ সিদ্ধান্ত আমাদের হাতেই আছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী এক ইণ্টারিম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করলে, এবং রাতারাতি বড়লাটই হয়ে গেলেন ইণ্টারিম প্রেসিডেণ্ট (রাজেন্দ্রপ্রসাদ)।

এদিকে '৪৮ সালের জানুয়ারীতে হিন্দু সভাপন্থী নাথুরাম গড্সে কর্তৃক অকস্মাৎ মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন। দেখতে অকস্মাৎ হলেও ব্যাপারটার পিছনে একটা চমৎকার ইতিহাস আছে। দেশ বিভাগের কল্যাণে সরকারী সম্পত্তি বিভাগও হয়েছিল, এবং নানা বাবদে নানা ব্যবস্থার মধ্যে ভারতের পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। পাকিস্তান তাগাদা করে,—ভারত টাকা দেয় না,—এই নিয়ে মনোমালিন্য চলছিল। এই অবস্থায় কাশ্মীরের লড়াই সুরু হয়।

সর্দার প্যাটেল কলকাতায় আসেন এবং প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন। তাতে নানা কথার মধ্যে তিনি পাকিস্তানের ঐ টাকার দাবীর কথা তুলে বলেন,—"আমরা ৫৫ কোটি টাকা দোব, আর তোমরা সেই টাকার গোলাগুলী কিনে কাশ্মীরে ভারতের সঙ্গে লড়বে,—সেটি হচ্ছে না।" শুনে লক্ষ লক্ষ লোক হাততালি দিয়ে সমর্থন জানালো।

ওদিকে মহাত্মাজী বলেন, টাকাটা আটকে রাখা অন্যায়, দিয়ে দাও। সর্দারজী বাগ মানেন না। শেষে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী (বোধ হয় গোলাম মহম্মদ) রাষ্ট্রসংঘে প্রচারের জন্য দশ দফা এক ফিরিস্তি পেশ করে দেখালেন, ভারত পাকিস্তানের ওপর কি রকম অন্যায় জুলুম করছে।

যেদিন কাগজে এই খবর বেরুলো, তার দু'এক দিন পরেই খবর বেরুলো, ভারত সরকার ঐ টাকা দিয়ে দেবে স্থির করেছে। সর্দার প্যাটেলের বক্তব্য কারণ হল,—"মহাত্মাজীর পীড়াপীড়ির জন্যে" ভারত সরকার মত পরিবর্তন করেছে। আরো শোনা গেল, মহাত্মাজী বলেছিলেন, টাকাটা না দিয়ে দিলে তিনি অনশন সুরু করবেন,—এবং সর্দার প্যাটেল নাকি বলেছিলেন,—"মরণে দেও।"

এই সব খবর এবং গুজব শুনে গডসের দল ক্ষেপে গেল, তাদের মতে মহাত্মাজী মুসলমানদের বন্ধু, সুতরাং দেশদ্রোহী (ইংরেজের বন্ধু বলে নয়)। অতএব গডসের দল তাদের প্যাট্রিয়টিক ডিউটী পালন করলে।

ওদিকে স্বাধীন ভারতের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চীফ জেনারেল অকিনলেককে সরানোর পর তিনজন বৃটিশ সেনানায়কের (আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স) ওপর প্রধান সেনাপতি করে বসানোর জন্যে জেনারেল কারিয়াপ্পাকে বিলেত পাঠানো হল, সেনাপতিগিরী শিখে আসার জন্যে। বলা বাহুল্য, শিক্ষাটা রাজনৈতিক।

'৪৮ সালের জুন যখন পার হল, তখনও যে সব কাণ্ড চলছে, তা দেখে "যুগান্তর" এক প্রকাণ্ড সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হতাশা ও বিক্ষোভ প্রকাশ করে লিখলো,—শ্রীনেহেরু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, '৪৮ সালের জুন নাগাদ ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হল কেন? কোথায় সেই পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র?

তার জবাবে আমি ঐ কাগজেই একটা প্রবন্ধ লিখে বলেছিলুম, এরকম প্রতিশ্রুতি কেউ কখনো দিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। '৪৮এর জুনের কথা সরকারী কাগজপত্রে একবার মাত্র বেরিয়েছিল, যখন '৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছিল, '৪৮এর জুন মাসে তারা ভারতের হাতে "পাওয়ার" ছেড়ে দেবেই। সেই ঘোষণার কল্যাণে আমাদের হিন্দু-মুসলমান মিলন চেষ্টার অবসান হল, এবং আমরা হিন্দু-মুসলমান প্রেমানন্দে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরলুম। তার পর '৪৭ এর আগষ্টে পাওয়ার ট্রান্সফার করে '৪৮ এর জুনের কথা নিঃশেষে মুছে দিলেন, এবং মহাত্মাজীও বললেন, '৪৮ এর জুন যা হওয়ার কথা ছিল, সেটা দশ মাস আগেই হয়ে গেল।

শ্রীনেহেরু বলেছিলেন অক্টোবর নাগাদ নতুন সংবিধান তৈরী হয়ে যাবে,—তাতে লোকে মনে করেছিল, তাহলে বুঝি '৪৮ এর জুনে নতুন সংবিধান চালু হবে। এ টাইম টেবল ঠিক হয়নি, কিন্তু এতে লোকের '৪৮ এর জুন আঁকড়ে থাকার সাহায্য হয়েছিল, এ নেহেরুর ঐ কথাটাকেই হয়ত "প্রতিশ্রুতি" বলে ধরে নেওয়া হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা গণতন্ত্রের লোভের গরজে।

তারপর যত দিন যায়, লোকে দেখে, "ইংরাজ ভারত ছাড়ি চলিয়া গিয়াছে" কৈ? দেখে আর ভাবে, বোধ হয় '৪৮ এর জু যাবে। এমনি করে আমাদের মগজের দুর্বুদ্ধির খোপের মধ্যে '৪ এর জুন বাসা বেঁধে আছে।

তারপর নতুন সংবিধান রচিত হল,—তখন দেখা গেল, ইংরে তার মধ্যে আগের মতই জেঁকে বসে আছে—বৃটেনের সাম্রাজ স্বার্থ নিরঙ্কুশ করার জন্যে '৩৫ সালের শাসনবিধিতে লাট সাহেবে যে স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল, নতুন সংবিধানে তাদের দি পার্টনারদের লাটসাহেবদেরও সেই স্পেশাল পাওয়ার দে হয়েছে,—আর বৃটেনের অর্থ-নৈতিক শোষণ নিরঙ্কুশ করার জ '৩৫ সালের শাসন বিধিতে ভারতে বিলাতী ব্যবসাগুলোকে ভারতের জাতীয় ব্যবসায়ের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল, ন সংবিধানে সেটাও ঠিক রাখা হয়েছে।

'৩৫ সালের শাসন বিধি সম্পর্কে নেহেরু বলেছিলেন—T future of India is mortgaged,—আর এখন দেখা স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুই সেই ব্যবস্থা পাকা করলে জনগণের মৌলিক অধিকার বলে অনেক ভাল ভাল কথা লেখা কিন্তু তার প্রত্যেকটার সঙ্গে এক গাদা করে সর্তও লিখে দে হল, যাতে হল "সাত নকলে আসল খাস্তা"—আর তারই ঠে সংবিধানটা হল দুনিয়ার সব বড় বড় দেশের সংবিধানের চেয়েও ওজন প্রায় আধ মণ। দেখে আমরাও ফুলে উঠলুম। ওপর একটা হিপনোটিক প্যাঁচ মারা হল, ল' মিনিষ্টার আম্বেদ সংবিধান রচনার কেন্দ্রমূর্ত্তি বলে, তাকে এ যুগের মনু বলে পেটানো হল। আমরাও বললুম, আলবৎ! সম্মিলিত জাতিপু সভায় ভারতের প্রতিনিধি পিল্লাই বললেন, "যেহেতু পৃথিবী আমেরিকাই সব চেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশ,—অতএব অন্যান্য দে শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা তার একটা বিশেষ দায়িত্ব ভারতকে সাহায্য করা তো তার নিজের স্বার্থেই দরকার।"

আমেরিকান এশিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট কমো এক সি রিনিক বললেন,—"ভারতে আমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বৃদ্ধির আরো গুরুতর ও মৌলিক কারণ এই যে, এশিয়ার মধ্যে ভা ব্যক্তিগত স্বাধীন কাজ কারবারের (free world) শেষ বৃ ঘাঁটী। এই ঘাঁটীকে মূলধন ও যন্ত্রশক্তি দিয়ে শক্তিশালী করে ভার পুঁজি ও মজুরের সঙ্গে একযোগে সোসিয়ালিষ্টদের শিল্প জাতীয় প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে হবে।"—(ষ্টেটসম্যান—১৫।৬।৪৮)।

অর্থাৎ '৪৮ এর জুনে ভারতের বুকের ওপর ইংরেজই শুধু আমেরিকাও চেপে বসার ব্যবস্থা সুরু করেছে।

পণ্ডিত নেহেরুও উতকামণ্ডে এক বক্তৃতায় বললেন,—" want to co-operate in the fullest measure with a policy or programme laid down for the worl good even though it might involve the surrend in common with other countries of a particular attribute of sovereignty."

( অর্থাৎ দুনিয়ার কল্যাণের জন্তে যদি কোন বিশেষ নীতি ও কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং তার জন্তে যদি অন্তান্ত দেশ সার্বভৌমত্বের কোন বিশেষ অধিকার ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়,—তাহলে আমরাও তার সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত )।

—অমৃতবাজার পত্রিকা—২।৬।৪৮

ইংরেজ কেন ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্তে এত হুড়োহুড়ি করলে এবং আমেরিকা কেন তার এত তারিফ করলে,—তা ক্রমে প্রকাশ হতে লাগলো। ভারত যে রিপাবলিক হলেও বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে না, এটা যখন জানা গেল তখন বিড়লার কাগজ ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট লিখলে ( ৩১।১২।৪৮ )—"এই রাজনৈতিক তথ্যটার আইনগত ফলাফল বোঝা দরকার। রাষ্ট্রসংঘে বা আর কোথাও আমরা মামুলী ও তুচ্ছ বিষয়ে ছাড়া কমনওয়েলথ বা আমেরিকার নীতির বিরোধী নীতি অবলম্বন করতে পারবো না।"

১৯৪৯ সালের শেষে যখন চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে আমেরিকাও চীন থেকে বিতাড়িত হয়েছিল,—তার অনেক আগে থেকেই আমেরিকা চিয়াংকে খরচের খাতায় লিখে কমিউনিজমের বন্তাপ্রবাহ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বাঁচানোর জন্তে ভারতকে ঘাঁটী করার মতলব এঁটেছিল। '৪৯ সালের অক্টোবরে জন ফষ্টার ডালেস নিউ-ইয়র্কে বললেন ( নিউ ইয়র্ক টাইমস—২১।১০।৪৯ )—"চীনে কমিউ-নিজমের বিরুদ্ধে আমেরিকার শেষ চেষ্টাকে পাছে লোকে সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা বলে মনে করে,—তার জন্তে দূর প্রাচ্যে কমিউনিজমের প্রসার রোধের ব্যাপারে স্থানীয় নেতৃত্ব খাড়া করতে হবে,—যাদের স্বার্থ কমিউনিজম-বিরোধিতার সঙ্গে জড়িত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুই এই নেতৃত্ব দিতে পারেন।"

তার আগেই, ২৫শে সেপ্টেম্বর ( ১৯৪৯ ) ওয়াশিংটন থেকে ওভারসীজ নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধি ম্যালকম হবস লিখেছিলেন, "আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির বিকাশের পক্ষে ভারতই হবে পরবর্তী বড় ঘাঁটী। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রসচিব অ্যাচেসন কিছুদিন আগে এক সঙ্গে পরামর্শ করার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এশিয়ায় আমেরিকার হাতছাড়া ঘাঁটীর পুনরুদ্ধারের পক্ষে ভারত একটা মহা সুযোগের স্থল।"

ইতিমধ্যে আমেরিকা শ্রীনেহেরুকে আমেরিকায় আসার জন্তে নিমন্ত্রণ করেছিল। তিনি ঐ সময়েই আমেরিকায় গেলেন। ১৯টা কামানের তোপ এবং শত শত কাগজে তোপ দেগে তাঁর বিরাট অভ্যর্থনা হল। ঘটা এমন বিসদৃশ,—যাকে বাঙ্গালীরা বলে "কুলায়"। তারপরে প্রায় এক মাস ধরে চললো সরকারী চার্ট অনুযায়ী সফর, বক্তৃতা, ভোজ।

আমেরিকার ডেমোক্রেসীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ দেখে একদল ঠোঁট কাটা সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করে বসলো, নিগ্রোদের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন? শ্রীনেহেরু বললেন, সরকারী চার্ট যারা তৈরী করেছে, তারা জানে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, চার্টের মালিকরা ঐ সাংবাদিকদের খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছেন। যে নেহেরু আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ বা নিগ্রো লিঞ্চিং সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও একটা কথা বলেননি, হঠাৎ দেখা গেল, একদল পোষা নিগ্রোর সভায় নিগ্রোরা তাঁকে নিগ্রো-কল্যাণ স্পিনগার্ণ গোল্ড মেডাল পুরস্কার দিচ্ছে।

আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে বক্তৃতায় শ্রীনেহেরু বললেন—"তোমাদের যে সব নেতা আমেরিকার স্বাধীনতা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্তে সংগ্রাম করেছেন, তাঁরা নমস্য। তোমরাও স্বাধীনতা অর্জন করেছ একটা বিপ্লব করে, আমরাও স্বাধীন হয়েছি বিপ্লব করেই। তবে কিনা, আমাদের বিপ্লবটা একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তবে, আমাদের বিপ্লবটা এখনো শেষ হয়নি, লোককে খেতে-পরতে দিতে না পারা পর্যন্ত সেটা চলবে। তার জন্তে আমরা তোমাদের কাছে সাহায্য চাই।

"আমাদের বৈদেশিক নীতি শান্তিকামী। আমরা গান্ধীপন্থায় চ'লে স্বাধীনতা তো পেয়েছিই, উপরন্তু শত্রুদের বন্ধুত্বও পেয়েছি। গান্ধীর পন্থাই শান্তির পন্থা। অবশ্য বর্তমান যুযুৎসু দুনিয়ায় গান্ধী-পন্থার বাস্তব প্রয়োগ কি ভাবে হতে পারে, তা বলা শক্ত। তবে, লোকের মনের ভয়টা গান্ধীপন্থায় উড়িয়ে দিতে পারা যায়।"

শ্রীনেহেরু নিরপেক্ষ নীতিও ঘোষণা করে সঙ্গে সঙ্গে ( যেন খুড়ি দিয়ে ) বললেন,—But where freedom is menaced or justice threatened or where aggression takes place, we cannot be and shall not be neutral.—( কোথাও যদি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়, বা পররাজ্য আক্রান্ত হয়, তাহলে আমরা আর নিরপেক্ষ থাকতে পারি না এবং থাকবো না )।

ষ্টেটসম্যানের ওয়াশিংটনস্থ বিশেষ প্রতিনিধির চিঠিতে বলা হল ( ১৬ই অক্টোবর )—"আমেরিকার কর্তারা নেহেরুর কথায় খুব খুসী হয়েছেন। যারা জাতীয়তাবাদকে দমন করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অর্থ অতি স্পষ্ট। তা ছাড়া অ্যাচেসন এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে নেহেরুর যে এক ঘণ্টা গোপন আলোচনা হয়, তার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ হতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু সে আলোচনায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন—আমেরিকার চীন নীতি বিশেষজ্ঞ মিঃ জেশাপ এবং রুশনীতি ও কমিউনিষ্ট মতবাদ বিশেষজ্ঞ মিঃ কেন্নান তার মধ্যে ছিলেন। সুতরাং আলোচ্য বিষয়টা আন্দাজ করা যেতে পারে।

নিউইয়র্কের নাগরিকদের অভ্যর্থনাসভায় শ্রীনেহেরু বলেন, "আমেরিকা যে পৃথিবীর সব ভাল কাজেরই মুরুব্বী, সেটা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে, এবং সেই জন্তে সে অবশ্যই ভারতের বন্ধুত্ব এবং শুভেচ্ছা পাবে! আমি এ দেশের ধন-দৌলত দেখে আকৃষ্ট হইনি, কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছি এই জন্তে যে, আমেরিকা মানুষের স্বাধীনতার সমর্থক ও সহায়ক। আমাদের দুই দেশের মধ্যে কোনো-কোনো বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও দুনিয়ার সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারার একটা ঐক্য আছে। সুতরাং সে বিষয়ে আমরা দুই দেশ অবশ্যই সহযোগিতা করতে পারি।"

ইউনাইটেড ষ্টেট নিউজ অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট লিখলে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী আমেরিকা সফরে এসেছেন, যেটাকে তিনি শুভেচ্ছা সফর বলছেন। তিনি চিন্তান্বিত এবং আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান। আমেরিকায় ঘুরে যে শুভেচ্ছা তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন,—তাই ভাঙিয়ে দেশের জন্তে ডলার সংগ্রহ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আমাদের উদ্বৃত্ত গমের গাদা দেখে তিনি বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন—লাখ দশেক টন ধার পাওয়া তাঁর ইচ্ছে।—তিনি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা

দিয়ে ন'বার জেলে গেছেন। তিনি খুব লম্বা বক্তৃতা দিতে পারেন, এবং শ্রোতাদের ধমক দেন।"

এটা হল বে-সরকারী আমেরিকার অভ্যর্থনার একটা নমুনা। এ ধরণের আরো নানা কথা আমেরিকার আরো অনেক কাগজে লেখা হয়েছিল। আর শ্রীনেহেরু এবং তাঁর সরকারের যে স্বরূপ এই আমেরিকার কল্যাণে প্রকাশ হয়েছে, সেটাও অপূর্ব।

'৪৯ সালের ডিসেম্বরে নিউ দিল্লীতে ইণ্ডিয়া আমেরিকা কনফারেন্সে করেন পলিসী অ্যাসোসিয়েশনের ডীন ভেরা মিচেলস বললেন,—"আমেরিকানদের অনেকের মনে একটা উৎকণ্ঠা ছিল যে, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে ভারত বুঝি-বা নিরপেক্ষই থাকবে। কিন্তু ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে থেকে যাবে শুনে এখন তাদের সে ভয় কেটে গেছে। কারণ আমেরিকা ১৯৪৫ সাল থেকেই বৃটেনের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে একযোগে কাজ করে আসছে।"

বামপন্থী জনগণকে ভোগা দেওয়ার জন্তে শ্রীনেহেরু দেশে অনেক বামপন্থী ঢংয়ের কথা বলতেন এবং বীরত্ব হুঙ্কারও দিতেন। তাতে পাছে আমেরিকানরা ঘাবড়ায়, সেজন্তে আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের প্রেসিডেন্ট জে জে সিং বললেন,—"দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোটি কোটি বুভুক্ষু জনগণের মধ্যে কমিউনিষ্টদের রণধ্বনি (স্লোগান) এবং বামপন্থী প্রোগ্রামই আওড়ানো দরকার।"

দিন কতক আগে কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির এক মাতব্বর শ্রীনেহেরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—ইউরোপের জন্তে যেমন মার্শাল প্ল্যান হয়েছে (আমেরিকার ঋণ-এণ্ড-লগ্নীর ব্যবস্থা), ভারতের জন্তে তেমন একটা ব্যবস্থা কেন করা 'হচ্ছে না? তার জবাবে শ্রীনেহেরু হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন,—India is an independent country and she cannot .be expected to go to foreign countries with a beggar's bowl in hand—অর্থাৎ ভারত স্বাধীন দেশ, সে কি টুপি হাতে করে বিদেশে যেতে পারে!

লংজাম্পের আগে খেলোয়াড় যেমন পিছিয়ে এসে জোর নেয়, এ-কথাগুলোও তেমনি শ্রীনেহেরুর আমেরিকা সফরের প্রস্তুতি। সেখানে বিজয়লক্ষ্মী আগেই গিয়ে জমি তৈরী করেছিলেন, এবং দশ লাখ টন গম কর্জ পাওয়ার ব্যবস্থাও হল। এ ঋণের সর্ত সম্বন্ধে শ্রীনেহেরুকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেছিলেন,—সে সব বিজয়লক্ষ্মী জানে।—অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও ব্যাপারে সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

বামপন্থী ও সোসিয়্যালিষ্টদের আন্দোলনের ফলে নেহেরু কিছু কিছু শিল্প জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে ছিলেন। ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত গ্রেডি বলেছিলেন,—এই সব কথার জন্তেই আমেরিকা ভারতে অর্থ লগ্নী করতে উৎসাহ পায় না। তারপর শ্রীনেহেরু ঘোষণা করলেন,—আপাতত ২৫ বছরের জন্তে জাতীয়করণ বন্ধ রাখা হবে,—এবং তারপর থেকে আমেরিকার এড-লগ্নীর প্রবাহ সুরু হল।

এদিকে ভারত যখন রিপাবলিক হতে যাচ্ছে,—তখন সাড়ে পাঁচশো'র ওপর দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনে স্বৈররাজতন্ত্র চলবে, অথচ ঐ সব রাজ্যের সঙ্গে ভারত রিপাবলিকের অ্যাকসেশন বিধির গাঁটছড়া বাঁধা থাকবে, এ এক অতি বিসদৃশ ব্যাপার। সুতরাং অ্যাকসেশন বা আধা-ভারত ভুক্তির স্থলে "মার্জার" বা সম্পূর্ণ ভারত ভুক্তির ব্যবস্থার জন্তে সর্দার প্যাটেল কাজে নামলেন। রাজাদের রাজ্য ও স্বার্থ বজায় রেখে ছাড়া কিছু করার উপায় নেই—সমান দুই পক্ষের চুক্তি ছাড়া যেমন অ্যাকসেশনও হয়নি,—তেমনি সমান দুই পক্ষের চুক্তির দ্বারাই ঐ "মার্জার" বা পূর্ণ ভারত ভুক্তির ব্যবস্থা করা চাই। কিন্তু সেটা কেমন করে হবে?

সর্দার প্যাটেল তার উপায় বের করলেন। বৃটিশ ভারতে যে সব জমিদার খাজনা আদায় করা বা সরকারে খাজনা জমা দেওয়া নানা কারণে পেরে উঠতো না, সেই বিপন্ন জমিদারদের জমিদারী রক্ষার জন্ত বৃটিশ সরকারের কর্তারা কোর্ট অফ ওয়ার্ডস ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। তার মোদ্দা কথা,—সরকার জমিদারীটা হাতে নিতো, আর খাজনা আদায়ের পর তার একাংশ ম্যানেজমেন্টের খরচ হিসেবে রেখে বাকি এক অংশ জমিদারকে দিতো। জমিদার নির্বিবাদে একটা আয় ভোগ করতো

সর্দার প্যাটেল সেই পদ্ধতির সুবিধা দেখিয়ে দেশীয় রাজাদের "মার্জার" বা সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির প্ল্যানে তাঁদের রাজী করালেন এবং ব্যবস্থা হল, রাজাদের রাজ সম্মান, ব্যক্তিগত ধন দৌলত সবই বজায় থাকবে এবং রাজ্যের আয়ের অনুপাতে "প্রিভি পার্স" নামক একটা মোটা বৃত্তি তাঁদের দেওয়া হবে,—এবং তার পরিবর্তে তাঁদের রাজ্য ভারতের শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই ভাবে, ছোট ছোট রাজ্যের রাজাদের ২৫৲। ৫০০৲ টাকা সুরু করে বড় বড় রাজাদের দশ-বিশ-পঞ্চাশ লাখ পর্যন্ত টাকা প্রিভিপার্স নির্ধারিত হল,—নিজামের প্রিভিপার্স হল বোধ হয় এক কোটি টাকা, এবং সকল দেশীয় রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি হয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে এ-ব্যবস্থাও হল যে, পাশাপাশি কয়েকটা দেশীয় রাজ্য শাসনকার্যের সুবিধার জন্তে একসঙ্গে মিলিয়ে এক-একটা ছোট প্রদেশের মতন ইউনিট করা হলে, ঐ সব দেশীয় রাজাদের মধ্যে এক জনই রাজপ্রমুখ হতে পারবেন (গভর্ণরের মতন) এবং কোন বড় রাজ্য যে প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে প্রদেশের গভর্ণরের পদে নিয়োগের ব্যবস্থাও দরকার মত করা হবে।

এই ব্যবস্থার এত কথার জনগণ ধার ধারে না, তারা আনন্দে গদ গদ হয়ে বলতে লাগলো, দেশী রাজাদের রাজ্যগুলো সর্দার প্যাটেল "লে লিয়া"। যেন সেগুলোকে ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। অথচ রাজাদের রাজ-সম্মানের অধিকার বজায় রইলো এমন ভাবে যে, নিজামের প্রাসাদে তিনশত ক্রীতদাসী আছে বলে, তাদের মুক্তি দাবী করে হায়দ্রাবাদের এক উকীল হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করলে হাইকোর্টে জবাব দিলে যে, নিজামের প্রাসাদের ওপর হাইকোর্টের কোন এক্তিয়ার (Jurisdiction) নেই।

যাই হোক, এই মার্জারের ব্যবস্থা থেকে কাশ্মীর রাজ্য বাদ থেকে গেল, ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের কল্যাণে। অথচ অ্যাকসেশন বা আধা ভারতভুক্তির ফলে আভ্যন্তরীণ শাসনে যে স্বৈর রাজতন্ত্রই চলছিল, তাকে একটা গণতান্ত্রিক রূপ না দিলেও চলে না। তারও উপায় বের করা হল।

মহারাজা হরি সিংয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, তিনি বছরে দশ লাখ টাকা প্রিভিপার্স নিয়ে গদী ত্যাগ করলেন,—তাঁর পুত্র যুবরাজ করণ সিং গদী পেলেন, কিন্তু তাঁকে রাজা হিসাবে রাজ্যপতির পদে

# সুর ও সঙ্গীতের ঝঙ্কারে আপনার ঘর আনন্দমুখর করে তুলবে এই চমৎকার সব

## ন্যাশনাল একো রেডিও

আজই ন্যাশনাল-একো'র একটি রেডিও কিনুন— দেখবেন আপনার একঘেঁয়ে ঘরোয়া পরিবেশ এক মুহূর্তে সুর ও সঙ্গীতে অপূর্ব আনন্দময় হয়ে উঠবে। ন্যাশনাল-একোর মডেলগুলি শক্তিশালী ও নির্ভর-যোগ্য…সব স্টেশনই সহজে ধরা যায়। আজই আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো বিক্রেতাকে বিনা খরচায় বাজিয়ে শোনাতে বলুন।

**মডেল ইউ ৭৩০—** এসি/ডিসি। সহজে স্টেশন ধরার নতুন 'ম্যাগনিব্যাণ্ড' টিউনিং; ৪১ মিটার ব্যাণ্ড, বিশেষ ভাবে ব্যাণ্ডস্প্রেড করা। ৯ রকম কার্যকরী ৬ ভ্যালভ্, ৮ ব্যাণ্ড। কাঠের ক্যাবিনেট। তাছাড়া: এ-৭৩০ শুধু এসি। 'মনসুনাইজড্'।

**দাম: ৫৭৪·২৫ নঃপঃ**
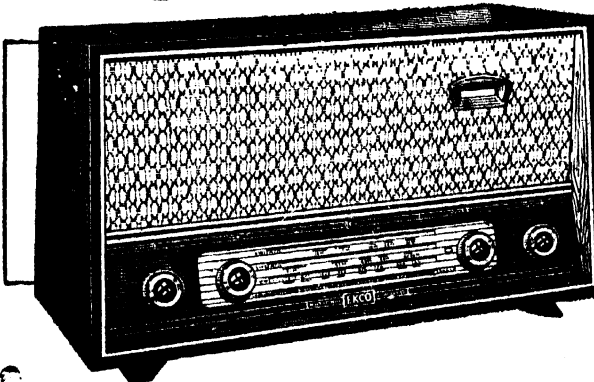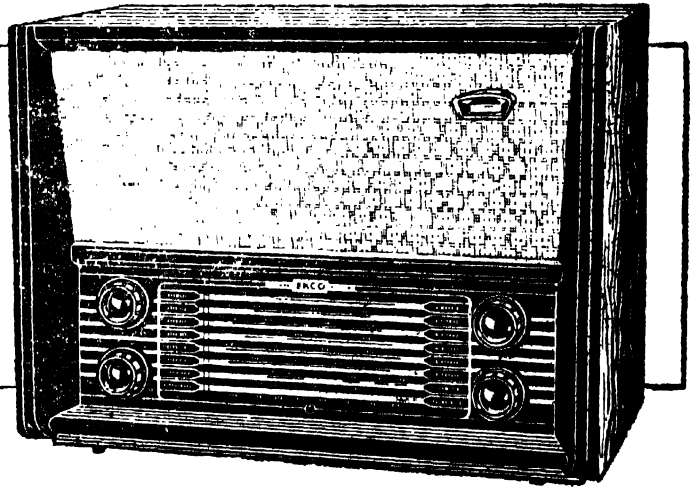
**মডেল ইউ-৭৫৫—** এসি/ডিসি। ৯ রকম কার্যকরী ৬ ভ্যাল্ভ, ৩ ব্যাণ্ড, টোন্‌কন্ট্রোল সংযুক্ত, কাঠের ক্যাবিনেট। 'মনসুনাইজড্'। এছাড়া: বি-৭৫৫ ব্যাটারীতে চলে, ৫ ভ্যাল্ভ, ৩ ব্যাণ্ড। ব্যাটারীর খরচ খুবই সামান্য।

**দাম: ৩৫১৲ টাকা**

উল্লিখিত দামগুলি উৎপাদন শুল্কসমেত। বিক্রয়কর আলাদা।

বিক্রয় ও মেরামতের জন্য সারা ভারতে ৬০০র ওপর অনুমোদিত বিক্রেতা রয়েছেন।

**জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ লিমিটেড**
কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • দিল্লী • পাটনা
বাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ

না রেখে একটা হাত-তোলা ধরণের নির্বাচন করে প্রেসিডেন্টের অনুরূপ পদে বসানো হল, সদর-ই-রিয়াসৎ।

সঙ্গে সঙ্গে বিধান পরিষদের মতন একটা গণপরিষদও তৈরী হল, এবং প্রায় রাতারাতি একটা পৃথক সংবিধানও রচিত হয়ে গেল। আধা ভারতভুক্তির সঙ্গে এই ব্যবস্থা মিলে কাশ্মীরের (আধখানা) প্রশাসনিক রূপ দাঁড়ালো ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটা স্বশাসিত রাজ্যের মতন, এবং ভারতের পার্লামেন্টে কাশ্মীরের জন ছয়েক প্রতিনিধি নেওয়ারও ব্যবস্থা হল। জনগণের কাছে বলা হল, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে,—তবে কিনা, ভারত কাশ্মীরকে কয়েকটা বিশেষ অধিকার দিয়েছে। কেন দিয়েছে, তা বলার গরজও কারো নেই,—আর জিজ্ঞাসার বা বোঝারও গরজ কারো নেই।

সভারেন রিপাবলিকের সংবিধান রচনা হ'চ্ছে,—জনগণের তাতেই আনন্দ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে আর একটা রফাও চলছে। '৪৮ সালে বৃটেন ন্যাশান্যালিটী অ্যাকট নামক এক আইন পাশ করলে,—আমাদের সংবিধানের ৩৭২ ধারায় তদনুযায়ী ব্যবস্থা লেখা হয়ে গেল,—এবং স্বাধীন ভারতের আইনব্যবস্থার মধ্যেও ঐ বৃটিশ ন্যাশান্যালিটি অ্যাক্টের ব্যবস্থা ঢুকিয়ে নেওয়া হল। সে আইনের মর্ম,—কমনওয়েলথের দেশগুলোর নাগরিক সবই বৃটিশ প্রজা,—ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ভারতের নাগরিকরা যেমন বৃটিশ প্রজা ছিল, তাদের সে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে,—ভারতে ইংরেজ এবং অন্যান্য কমনওয়েলথ-দেশের নাগরিকরা বিদেশী বলে গণ্য হবে না—বিদেশী সংক্রান্ত আইনের আওতায় তারা আসবে না,—তাদের পরিচয় অতঃপর হবে অ-ভারতীয় (Non-Indian)।

এর আগে শ্বেতজাতিগুলোই ডোমিনিয়নে ছিল, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি,—ঐ সব দেশের কালা আদমীদের রাজনৈতিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না,—এখন একটা প্রকাণ্ড কালা আদমীর দেশ ডোমিনিয়ন হল,—সুতরাং এম্পায়ার সাইন-বোর্ডের স্থলে কমনওয়েলথ সাইনবোর্ড চালু হল,—এবং বরাবর বছর বছর ডোমিনিয়নগুলোর প্রধান মন্ত্রীদের নিয়ে বৃটেন যে ইম্পিরিয়্যাল কনফারেন্স করতো,—যার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুবিধামূলক অর্থনৈতিক আদান প্রদানের আলোচনা ও ব্যবস্থা,—এবং সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে ডোমিনিয়নগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্যের পর্যালোচনা,—১৯৪৯ সালে সেই ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সেও নতুন সাইনবোর্ড লাগানো হল—কমনওয়েলথ কনফারেন্স—এবং সেটাকে প্রথম কমনওয়েলথ কনফারেন্স বলে জনগণকে বোঝানো হল, বৃটিশ সাম্রাজ্যটা অতীতের কথা,—কমনওয়েলথটা কতকগুলো স্বাধীন দেশের স্বেচ্ছামূলক সমবায়।

১৯২৯ সালে কানাডার অটোয়ায় ডোমিনিয়নগুলোর পারস্পরিক আর্থিক আদান-প্রদান পারস্পরিক সুবিধাজনক শুল্কব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল,—যার নাম ছিল ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স সিষ্টেম,—সে ব্যবস্থাটা ঠিকই এবং ঐ নামেই রয়ে গেল। '২৯ সালে ভা[রত] ছিল কলোনী,—খাঁটি গোলাম,—বৃটেনের কাঁচামাল সংগ্র[হ] এবং শিল্পজাত পণ্য বিক্রির বাজার। ইম্পিরিয়াল প্রেফা[রেন্স] ব্যবস্থার গুণে ভারতের কাঁচা মালের ওপর বৃটেন অন্যান্য দেশ থে[কে] আমদানী কাঁচা মালের চেয়ে কম শুল্ক ধার্য করতো, আর ভা[রত] বৃটিশ শিল্পজাতপণ্যের ওপর অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী শিল্পপ[ণ্যের] চেয়ে কম শুল্ক ধার্য করতো। দেখতে সুবিধাটা পারস্পরিক হ[লেও] দু'-দিক দিয়েই বৃটেনেরই লাভ হত। '৪৯ সালেও যখন ভার[তের] শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা প্রায় '২৯ সালের মতই অনুন্নত, তখন ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের কল্যাণে দু'দিক থেকে বৃটেনের লা[ভ] চলতে লাগলো।

কানাডা-অষ্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য প্রেফারেন্স ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ইম্পিরিয়াল প্রেফারে[ন্সের] তথাকথিত সুবিধার সঙ্গে ভারত কমনওয়েলথ থেকে আর একটা সুবিধা পাবে—বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে বৃটেন ও কানাডা প্রভৃ[তি] দেশের সাহায্য পাবে কমনওয়েলথের সদস্য থাকায় এই সব আশী[র্বাদ] জনগণের কানে কানে প্রচার চললো।

কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া স্বায়ত্তশাসিত দেশ, কেনিয়া, উগাণ্ডার ম[ত] গোলাম নয়, তাদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা তাদের আ[ছে] আমরাও কেনিয়ার পর্যায় থেকে কানাডার পর্যায়ে উঠেছি, আমাদে[র] সেই রকম স্বাধীনতা হয়েছে, এটাই প্রচার চলতে লাগলো। কি[ন্তু] আমাদের স্বাধীনতার বহর যে কানাডা প্রভৃতির চেয়ে সংকীর্ণ কথাটা ঢাকা পড়ে গেল। কানাডা অষ্ট্রেলিয়া সাদা আদমির দে[শ] বলে তারা সোজা পথে স্বায়ত্ত শাসন পেয়েছে, কিন্তু আমরা ক[ালা] আদমির দেশ বলে একটা এমন সর্তে স্বায়ত্তশাসন পেয়েছি, যা আমাদের হাত-পা অনেকখানি বেশী বাঁধা রয়ে গেছে।

বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মৌলিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কানাডা অষ্ট্রেলিয়া বি[রুদ্ধাচরণ] করতে পারে না, তাদের স্বাধীনতার ঘাটতি এইটুকু মাত্র, কি[ন্তু] আমাদের ঘাটতি অনেক বেশী, কারণ we have inherited a[ll] the agreements and commitments, internal a[nd] external of the former British Indian Gov[ernment]. Inherited কথাটার অর্থ "মেনে চলার সর্ত"।

এর চমৎকার উদাহরণ আছে। ঝান্সার রাণী লক্ষ্মীবাই বৃটিশে[র] বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, বৃটেন তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল, এ[বং] তাই তারা তাঁর বংশধরদের ভিক্ষার মত যৎসামান্য বৃত্তির ব্যব[স্থা] করেছিল। স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নও তাঁদের সেই বৃত্তিই দেয় আর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে রাজ্য স্থাপনে সাহায্য করেছিল বলে আগা খাঁকে কোম্পানি বছরে ৪০ হাজার টাকা পুরষানুক্রমি[ক] পেনসন দিয়েছিল, নেহেরু সরকার আগা খাঁর প্রপৌত্রকে সে পেনশন দেয়। [ আগামীবারে সমাপ্য।

## Bengali Language

"I see that it is a very copious language, and abounding with beauties. The hope of soon getting the language puts fresh life into my soul."

—*Sir William Jones*

প্রশান্ত চৌধুরী

১৮

সাগর দাঁড়াল গিয়ে সোহাগীর বাসার দরজার সামনে।

রাস্তার কলে মেয়েরা আর চান করছে না তখন। কলতলাটা ফাঁকা। কোন্ মেয়েছেলে একটুকরো কাপড়কাচা সাবান এনেছিল মুখে ঘষে ফর্সা হবে বলে। যাবার তাড়ায় সাবানটাকে ফেলে গেছে ভুলে। সাবানটার তলা থেকে পাতলা দুধের রঙের একটা ক্ষীণ জলের রেখা গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তার নর্দমার দিকে। হিন্দুস্থানী কয়লাওলার বাচ্চা উলঙ্গ ছেলেটা হাতের মুঠোয় একটা পরোটা বাঁশি-পাকিয়ে ধ'রে রাস্তার ধুলোতেই মহানন্দে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কামড় দিচ্ছে সেই ধূলিলিপ্ত পরোটায়। গলায় তার লেটেষ্ট হিন্দী ছবির হটেস্ট গানের কলি!

সাগর তাড়াতাড়ি টেনে তুলল ছেলেটাকে। হাত থেকে পরোটাটা কেড়ে নিল। ছেলেটা বিশ্বগ্রাসী এক হাঁ ক'রে বিকট চিৎকার শুরু করে দিল।

কিছুটা দূরেই যে বিপুলা হিন্দুস্থানী মেয়েছেলেটি রাস্তায় বসে বার্তন মলছিল, তিনিই যে ছেলেটির স্বর্গাদপী গরীয়সী জননী, সেটা ভাবতেও পারেনি সাগর। অতর্কিতে এঁটো খুন্তি তুলে ছুটে এলেন তিনি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে।

—কৌন্ হো তুম্ লাট সাহেবকা বাচ্চা।

অর্থাৎ, আমার ছেলের হাত থেকে পরোটা কেড়ে নেবার কে হে তুমি?

—রাস্তায় কত ধুলো, কত রোগের পোকা, ও রুটি খাওয়া ঠিক নয়, তাই—

—রোটি নেহি জী, পরেঠা। না খায়া কভি তো চিন্হে গা কৈসে?

সাগরের হাত থেকে খাঁ করে পরোটাটা ছিনিয়ে নিয়ে আবার ছেলেটার হাতে গুঁজে দিল সেই বিপুলা রমণী।

সাগর আবার বলল,—ও-পরোটা খাইও না। ওতে লক্ষ রোগের পোকা লেগে আছে।

—তেরা বাপ্‌কো ক্যা?

মুখের সামনে হাত নেড়ে কাঁচের আর রূপোর চুড়ি ঝনঝনিয়ে বলে উঠল সেই মুখরা জননী।

ছেলেটা পরোটায় কামড় বসিয়ে সাগরকে ভেঙচি কেটে পরোটা-গোঁজা চাপা গলায় বলে উঠল,—হারামী শালা!

ছেলেটার মুখের ভাব আর বলার ভঙ্গি দেখে গোড়াটায় হাসিই পেয়েছিল সাগরের;—তার পরে দুঃখ রাগ ইত্যাদি অনেক রকম ভাবই একটার পর একটা উদয় হয়েছিল তার মনে।

মরুক গে! ভাল করতে গেলে মন্দ হয় ব্যাটাদের। যা ইচ্ছে করুক, আমার কী?—বলতে বলতে তাকাল আবার একবার সোহাগীর বাসার দরজাটার দিকে। একা একা দোতলায় উঠে যেতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকছিল সাগরের।

ডেকে আনলেই হতো বাইধর শতপথিকে। তাকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠলে গোল চুকে যেত সব। এখন আবার যাবে নাকি সাগর? ফিরে গিয়ে বাইধর ঠাকুরকে খুঁজে ডেকে নিয়ে আসবে? কিন্তু এই সন্ধ্যের সময় পাওয়া যাবে কি বাইধরকে গঙ্গারঘাটে? না বলেই মনে হয়। জগন্নাথের মন্দিরের চাতালেও পাওয়া যাবে না এখন বাইধরকে। সন্ধ্যের মধ্যেই তাস খেলা শেষ হয়ে যায় সেখানে। এখন ওকে পাওয়া যেতে পারে কুমোরদের দোকানের পাশে সাবিত্রী-সত্যবানের রোয়াকে। সন্ধ্যের পর সেখানে জোর পাশার আড্ডা চলে।

সেই সাবিত্রী-সত্যবানের রোয়াকের দিকেই যাবার উপক্রম করছিল সাগর, এমন সময় দেখল, ওদিকের গলিটার মোড় বেঁকে একটা মানুষ তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতন পাঁই-পাঁই করে ছুটে আসছে। লোকটার গায়ে সাগরেরই মতন কমলালেবু রঙের তাঁতের কাপড়ের কতুয়া। চক্ষের নিমেষে লোকটা সাগরের সামনে দিয়ে চলে গিয়ে আরেকটা গলির মোড় বেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু দৌড়ে যাবার সময় তার হাত থেকে একটা সরু পুরোনো সোনার হার ছিটকে এসে পড়ল ঠিক সাগরের পায়ের কাছে।

কী করা উচিত, সেটা ভেবে নেবার আগেই সাগর একটা গোল-মালের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখল, একদল মানুষ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছে এদিকে! সাগর তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে সোনার হারটা তুলে নিল। হাতে ঝুলিয়ে দেখতে লাগল হারটাকে।

হঠাৎ দঙ্গলবাঁধা মানুষদের মধ্যে থেঁকুরেপানা একজন চিৎকার করে উঠল,—ঐ যে শালা, ঐ যে!

—কৈ যে?

—ঐ যে, শালা এখন দাঁড়িয়ে আছে ভালমানুষটি সেজে।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকগুলো ছুটে এসে ঘিরে ধরল সাগরকে। থেঁকুরে লোকটা আগেই এক হ্যাঁচকায় ছিনিয়ে নিল হারটা সাগরের কাছ থেকে।

সাগর বলল,—হারটা ছিনিয়ে নিচ্ছেন মানে? আপনার হার?

লোকটা বলল,—তবে কি তোর বাবার নাকি রে শালা?

সঙ্গে সঙ্গে সাগরের হাতের প্রচণ্ড একটা চড় পড়ল লোকটার গালে। লোকটা পড়ে গেল উল্টে।

সে পড়ে গেল বটে, কিন্তু বাকি সকলে ঘিরে ধরল সাগরকে।

একটু একটু করে বাড়তে লাগল ভিড়। এদিক-ওদিক যাচ্ছিল যারা দাঁড়াল সবাই ভিড় করে। থেঁকুরে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে,—চোর, চোর ব্যাটা। আমার মেয়েটাকে পাশে নিয়ে বসেছিলুম মশাই গঙ্গার ধারে,—ঐ ব্যাটা আচম্কা আমার মেয়ের গলা থেকে হারটা ছিঁড়ে নিয়ে পালাচ্ছিল,—এই দেখুন হার।

ভিড়ের ভেতর থেকে অর্ধেক লোক চেঁচিয়ে উঠল,—মারো ব্যাটাকে।

সাগর বলল,—ভুল করছেন আপনি। আমি গঙ্গার ঘাটেই যাইনি আজ।

থেঁকুরে লোকটা চড় খেয়ে নিতান্তই অপমানিত বোধ করছিল। চিৎকার করে বলল,—আমি শালা কানা নই; ঐ কমলালেবু রঙের ফতুয়া লক্ষ্য করে দৌড়চ্ছি তখন থেকে!

ভিড়ের মধ্যে থেকেও দু-চারজন সমর্থন করল থেঁকুরে লোকটাকে। বলল,—কমলালেবু রঙের ফতুয়া-পরা একটা লোককে আমরাও কিন্তু ছুটে পালাতে দেখেছিলুম বটে চায়ের দোকানে বোসে।

সাগর বলল,—তাকে আমিও দেখেছি পালাতে।

—রঙবাজি হচ্ছে?

কালো চশমা-পরা একটা ফচকে ছেলে আচম্কা মারল সাগরের বুকে এক ধাক্কা।

টাল সামলাতে না পেরে সাগর একটা লোকের গায়ে গিয়ে পড়তেই সে মারল আরেক ধাক্কা উল্টোদিকে। তারপর সুরু হল কিল চড় ঘুষির বৃষ্টি। হাতের সুখ করে নেবার এমন একটা অভাবনীয় সুযোগ ছাড়তে রাজি নয় কেউ।

আর থাকতে পারল না চাঁপা। নিরপরাধ মানুষটার ওপর কিল চড় ঘুষি বৃষ্টি সুরু হতেই দোতলার বারান্দায় তার সেই হাতে-তৈরি খুপরি ঘরের ঘুলঘুলি ছেড়ে তরতরিয়ে নেমে এল নিচের রাস্তায়। ভিড় ঠেলে সাগরের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল,—থামুন, থামুন, থামুন সবাই।

চাঁপার গলার আওয়াজ পেয়ে মার থামিয়ে তাকাল সবাই চাঁপা দিকে। ভিড়ের মধ্যে যারা চেনে চাঁপাকে, তারা অবাক হল ও দেখে। বলল,—কেন? কী হয়েছে?

—ভুল মানুষকে মারছেন আপনারা।

থেঁকুরে লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল,—ওরে আমার ভ'ড়ি সাক্ষী মাতাল রে! আমি এখনও চোখের মাথা খাইনি। কম লেবু রঙের ফতুয়া আমি ঠিক দেখেছি।

চাঁপা বলল,—আমি অনেকক্ষণ থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি। ঐ লোকটি অনেক আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এ রাস্তায়, এমন সময় ঠিক ঐরকমই কমলালেবু রঙের ফতুয়া-প একটা লোক পালাতে পালাতে ঐ হারটা ফেলে গেল এই রাস্তায় তাই দেখে—

কিন্তু কে বিশ্বাস করবে চাঁপার কথা? প্রথমত লো একেবারেই অচেনা। দ্বিতীয়ত একই দিনে একই ক্ষণে দু-দু লোক কমলালেবু রঙের ফতুয়া পরে একই রাস্তায় উপস্থিত হবে, এই বা কেমন ছেলে ভুলোনো গল্প বাপু?

সাগরের কপালের খানিকটা কেটে গিয়েছিল। রক্ত পড় তা' থেকে।

রক্ত দেখে চাঁপা চিৎকার করে বলল,—শুধু শুধু একটা ভ মানুষকে মেরে তোমরা রক্ত বের করে দিয়েছ। লজ্জা করছে তোমাদের?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন টিপ্পনি কেটে বলে উঠল, চোরটার জন্যে সোহাগীর মেয়েটার দরদ অমন উথলে পড়ছে মানিক?

ঠিক এমনি সময় আরেকটি নারীকণ্ঠের হুঙ্কারে থতমত গেল সবাই।

কয়লাওলার সেই বিপুলা মুখরা গিন্নিটি তার সেই এঁটো নিয়ে হাজির হল রণক্ষেত্রে। চিৎকার করে সে তার মাতৃভাষায় বলল, তার সরল বঙ্গার্থ হল,—

—কোথাকার ড্যাকরাগুলো জুটেছে রে এখানে? যাকে ত চোর বলে গালাচ্ছে আর মারছে যারা, তাদের কি জন্মের ঠিক নে মানুষটা পনেরো মিনিটেরও আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে এখা আমার ছেলেটাকে ধুলো থেকে টেনে তুলল, সেই তো হয়ে বারো মিনিটেরও বেশি। ভারি আমার ফতুয়া দেখনেওয় এসেছে! ফতুয়াকা বাচ্চা শালা সব। হট্, হট্, আপনা ঘর সব, নেহি তো—

নেহি তো যে কী, সেটা জানবার আগেই হাল্কা হয়ে যেতে লা ভিড়টা একটু একটু করে।

বিপুলকায়া হিন্দুস্থানী রমণীটি চিৎকার করে বলল,—শালালোক্ মারা উস্‌কো,—আদমি হো তো মাফি মাঙ লেও উস্‌ নেহি তো থানামে লে চলে গা সব কোই কো।

মাপ কেউ চাইল না বটে। কিন্তু ভিড়টা গোরুতে চ শালপাতার ঠোঙার মতো চেছেপুঁছে পরিষ্কার ফাঁকা হয়ে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে।

কপালে হাত চেপে সাগর উবু হয়ে বসেছিল রাস্তায়। চাঁ ইচ্ছে করছিল নিরপরাধ এই মানুষটার কপালটা ধুইয়ে দিয়ে এ

ন্যাকড়ায় কালি জড়িয়ে দেয়। কিন্তু অচেনা একটা মানুষকে সেকথা কি বলা যায় নাকি?

কয়লাওলা-গিন্নি নিজের গালে বাঁ-হাতের ঠোনা মেরে বলল,—দেখো বেচারাকো হাল! তো কাঁহা রহতে হো তুম? এঁহা ঘুমতে থে কিস লিয়ে?

তাকাল সাগর কয়লাওলা-গিন্নির দিকে। বলল,—এই বাড়িটার দোতলার ঘরে সোহাগী বলে আছে একজন, তার হাতে ঠানদির দেওয়া কটা টাকা দিতে এসেছিলুম। এখানে চিনি না তো কাউকে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম কেমন করে উঠি দোতলায়।

শুনে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল চাঁপার। তাদেরই ঘরে আসতে গিয়ে অমন মানুষটার কিনা এত বড় দুর্ভোগ!

কয়লাওলা-গিন্নি এবার চলে যেতে যেতে এঁটো খুন্তিটাকেই নিজের গালে ঠেকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল,—শুনো বাৎ! এহি তো হুয় সুহাগীকা লেড়কি চম্‌পা।

জানে সাগর। চাঁপাকে দেখেই চিনেছে সে। কিন্তু কেমন করে বলে যে, চিনি তোমায়? কেমন করে বলে যে, একদিন চাঁপার পিছু পিছু সে এসেছিল এইখানে?

সাগর তাই না-চেনার ভান করে বলল,—ও, তুমিই বুঝি সোহাগীর মেয়ে চাঁপা?

—হ্যাঁ।

—ভালই হল। এই টাকা কটা তোমার হাতেই দিয়ে যাই। ঠানদি পাঠিয়ে দিয়েছে। ভামাঠাকুরের শরীরটা ভাল নেই কিনা, তাই আমার হাত দিয়েই পাঠাতে হল ঠানদিকে। এই নাও।

—না। আমি তো নেব না।

—কেন?

—মার টাকা, মার হাতেই দিতে হবে আপনাকে। আসুন ওপরে আমার সঙ্গে। আমার মার সঙ্গে দেখা করে যান।

অগত্যা চাঁপার পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে হল সাগরকে। কাঠের সিঁড়ি। নড়বড়ে। হাতলটা ভাঙা। উঠতে উঠতে কাঠের সিঁড়ির ধাপের ফাঁক দিয়ে ছাঁট-কাগজের গুদোমটা দেখা যায়। সমস্ত ঘরটা ভর্তি শুধু কাগজ আর কাগজ। আগুন লাগলেই হয়েছে আর কি!

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠিয়ে কাঠের পাটা পাতা সরু বারান্দার প্রান্তে তার নিজের হাতে তৈরি সেই ছোট্ট ঘরটিতে সাগরকে বসিয়ে চাঁপা আগে গেল তার মাকে খবর দিয়ে বিছানা-টিছানাগুলো টেনেটুনে একটু ঠিকঠাক করে আসতে।

ঘরে ঢুকে দেখল, ঘুমিয়ে পড়েছে সোহাগী। বার দুয়েক আবছা-গলায় ডেকেও সাড়া পেল না যখন, তখন একফালি ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, একটু তুলো আর টিন্‌চার আয়োডিনের শিশি নিয়ে সেই ছোট্ট ঘরটিতে ফিরে এল চাঁপা। বলল,—মা ঘুমিয়ে পড়েছে। সহজে তো ঘুমোতে পারে না। ঘুমোচ্ছে দেখে ডাকতে ইচ্ছে হ'ল না। তবে, একটু পরেই ঘুম ভেঙে যাবে। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ ঘুম হয় না। নিশ্বাসের কষ্ট হলেই উঠে পড়ে। আপনি ততক্ষণ এইগুলো লাগিয়ে নিন দিকিনি।

সাগর বলল,—ঐ শিশিতে কী ওটা?

—টিন্‌চার আয়োডিন্।

লাফিয়ে উঠল সাগর শুনে।

—ওরেব্‌ বাবা! ওসবে আমি নেই। ভীষণ জ্বালা করে!

মানুষটার কাণ্ড দেখে হাসি পাচ্ছিল চাঁপার। কিছুক্ষণ আগেও শনিমহারাজের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মাস্‌ল্ ফোলাচ্ছিল যে জোয়ান লোকটা, তার এমন ছেলেমানুষী ভয় দেখে হাসি না পেয়েই বা যায় কোথায়।

চাঁপা বলল,—সেপটিক হলে তখন দেখবে কে?

—কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না।

—টিন্‌চার আয়োডিনে এত ভয়?

—আহা, ভয় কেন? কথা হচ্ছে যে, কাটাটা যে কপালে। টিন্‌চারাইডিন্ ফুঁ দোব কেমন করে?

—আমি ফুঁ দিয়ে দোব'খন।

কথাটা বলেই ফেলল চাঁপা। আর, বলে ফেলেই কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল ওর। অচেনা একটা পুরুষমানুষের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কপালে ফুঁ দেওয়াটা যে খুব সহজ কাজ হবে না, সেটা বলবার আগে মাথাতেই আসেনি ওর। এখন মনে হল, লোকটা টিন্‌চার আয়োডিন্ লাগাতে রাজি না হলেই ভাল হয়।

কিন্তু রাজিই হয়ে গেল সাগর। বোধ হয় অচেনা একটা মেয়ের কাছে নিজের অসাধারণ দুঃসাহসটা প্রমাণ করবার লোভেই রাজি হয়ে গেল সে। বলল,—ঠিক আছে, লাগাচ্ছি।

শিশির ছিপি খুলে তুলোয় বেশ খানিকটা টিন্‌চার আয়োডিন্

ঢেলে ফেলল সাগর। তারপর তুলোটাকে কপালের কাটার কাছাকাছি এনেই বলল,—কই ? ফুঁ ?

চাঁপা বলল,—আহা, লাগান আগে, তবে তো।

—উঁহু, লাগাবার আগে থাকতে ফুঁ চালাতে হবে। তা' না হলে ওরেব, বাবা!

চাঁপা এগিয়ে এল সাগরের কাছে। ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁ দিল সাগরের কপালে। সাগর হেসে ফেলে বলল,—সুড়সুড়ি লাগছে।

চাঁপা এবার খপ করে সাগরের হাত থেকে টিনচার আয়োডিন লাগানো তুলোটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ঝপ করে বসিয়ে দিল সাগরের কপালের কাটার ওপরে।

উহু-হু-হু, করে সাগর ছিট্‌কিটিয়ে উঠতেই চাঁপা বলল,—কাপড়ের ফালিটা নিজে নিজে বেঁধে ফেলুন। আমি দেখে আসছি মা উঠল কি না।

চলে গেল চাঁপা।

কাপড়ের ফালিটা হাতে নিয়ে সাগর চুপচাপ ঐ চাঁপার কথাটা ভাবতে লাগল বসে বসে। আর, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল চাঁপার বিচিত্র ঘরটাকে।

ছেঁড়া মাদুর, কাগজ, পিজবোর্ডের টুকরো ইত্যাদি কত কী দিয়েই না বানানো হয়েছে এই ঘরটাকে। কাগজের গুদোম থেকে মাসিক পত্রিকা চেয়ে এনে তারই ছবি কেটে কেটে লাগিয়েছে চাঁপা দেওয়ালে। মেঝেয় মাদুর পাতা। তারই একধারে একটা কাঠের ছোট চৌকির ওপর চাঁপার পড়ার বই গুছোনো রয়েছে। মোটা মোটা সব বই। যত্ন করে তাতে খবরের কাগজের মলাট দেওয়া। বই-এর প্রথম পাতায় মেয়েলী হস্তাক্ষরে যত্ন করে নাম লেখা,—চম্পা ভট্টাচার্য। কী সাংঘাতিক! এত সব মোটা মোটা বই পড়ে ঐ চাঁপাটা ?

চাঁপার কাছে নিজেকে যেন অনেক ছোট বলে মনে হতে থাকে সাগরের। মনে পড়ে যায় মায়ের কথা। মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, সাগর ইস্কুলে যায়, সাগর লেখাপড়া শিখে জজ-ব্যারিষ্টার হয়। কিন্তু হল কই তা' ? বাপ যে সেই ছোটবেলাতেই জুতে দিল সাইকেল সারানোর কাজে। মা যা-যা চেয়েছিল জীবনে, তার কোনোটাই হল না। যার জন্যে আজ আবার নতুন করে মন কেমন করতে থাকে সাগরের। মা যেন একটা ছোট মেয়ে হয়ে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে সাগরের সামনে। যেন কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলছে,—কিছু পেলুম না রে সাগর, কিছু না।

আজ যদি বেঁচে থাকত মা, তাহলে সাগর তার মাকে আধ হাত চওড়া লাল পাড়ের শাড়ি কিনে দিত ছ' খানা। চওড়া-পাড় শাড়ি পরতে বড় ভালবাসত মা। কিন্তু কে আর কিনে দিয়েছে মাকে চওড়া পাড়ের শাড়ি। চিরটাকাল সরু পাড়ের আধময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরেই কাটিয়ে গেল মা-টা। সাগরের রোজগার করা অবধি কিছুতেই যে বেঁচে রইল না মা, তা' না হলে আজ একেবারে দেখে নিত সাগর।

দূর, ছাই! যত সব কান্না-পাওয়া ভাবনাগুলো ছেয়ে আসছে কেবল মনে!

উঠে দাঁড়াল সাগর। চাঁপার বিচিত্র ঘরের পিজবোর্ডের দেয়ালের ফুটো দিয়ে চোখ মেলে দিল বাইরের দিকে।

সন্ধ্যা তখন গাঢ় হয়ে গেছে। জ্বলে উঠেছে রাস্তার বাতি। একটা কুলপি-বরফওলা হেঁকে বেড়াচ্ছে গলির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত। পাঁঠার ঘুগনির বাক্সটাকে রোয়াকের ওপর নামিয়ে বসেছে ঘুগনিওলা। বেলফুলের মালা নিয়ে হাঁক পেড়ে গেল একটা মালী। এরই মধ্যে দু-চারটি টলটলায়মান ব্যক্তিকে মোষের খাটালের রাস্তা পার হয়ে রাত-জাগা বস্তিটার মধ্যে ঢুকে পড়তে দেখা যায়। একটা নিচু জাতের মাতাল তো রাস্তায় থেবড়ি খেয়ে বসে চিৎকার করে নিতান্তই অশ্লীল গান ধরে ফেলেছে একটা।

দেখেশুনে গা ঘিন্‌ঘিন্ করছিল সাগরের। একটা চিন্তা তার সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে রাখে;—এরই মধ্যে, এই অশ্লীল আর নোঙরা পরিবেশের মধ্যেই বাস করতে হয় সোহাগী আর চাঁপাকে! জ্যাঠাঠাকুরের সাধ, মেয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষের মতন নিজের পায়ে দাঁড়াক। মেয়ে সভ্য হোক, ভদ্র হোক। সোহাগীও তাই চায়। ঠানদি-বুড়িরও ইচ্ছে তাই। কিন্তু কেমন করে হবে তা? এই পরিবেশের মধ্যে থেকে ভাল থাকা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার যে!

ফিরে আসে সাগর ঘুলঘুলি থেকে। বসে পড়ে আবার মাদুরের ওপর। চাঁপার জ্যামিতির ছবি আঁকবার ইনস্‌ট্রুমেন্টবক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিছুটা। চাঁপার ইতিহাসের খাতায় কম্পাস দিয়ে একটা অদ্ভুত জটিল আল্‌পনা-জাতীয় নক্সা এঁকে বসে সাগর। জ্যামিতির কম্পাসের সাহায্য নিয়ে নক্সার ফুল আঁকা সাগরের বহুদিনের বাতিক। ছোটবেলায় ওদের বাসার দুলাল দাদার ইনস্‌ট্রুমেন্টবক্স নিয়ে কত নক্সা এঁকেছে সাগর।

নক্সাটা শেষ ক'রে কী খেয়ালে তার তলায় চাঁপার নামটাই গোটা-গোটা অক্ষরে লিখে ফেলল সাগর।—কুমারী চম্পা। 'ভট্টাচার্য' কথাটা লিখতে গিয়ে থেমে গেল একবার সাগরের হাত। কী ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর কেমন একটা বিশেষ জোর দিয়েই লিখে ফেলল পদবীটা।—কুমারী চম্পা ভট্টাচার্য।

ঠিক এমনি সময় ফিরে আসে চাঁপা। সাগর তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে দেয় খাতাটার। চাঁপা বলে,—আমার বাবা অসুস্থ বলছিলেন না তখন ?

—হুঁ।

—কী অসুখ ?

—সামান্য একটু জ্বর, আর গাঁটে গাঁটে ব্যথা।

—ভয়ের কিছু নেই তো ?

—না, না, কিছু না।

—ভয়ের কিছু থাকলেও বলবেন না আমার মায়ের কাছে। মিথ্যে করেও বলবেন যে, ভয়ের কিছু নেই, সাধারণ জ্বর। মায়ের শরীরটা বড় দুর্বল কি না, তাই বলছি।

—দুর্বল হোক আর সবলই হোক, যা সত্যি তাই-ই তো বলেছি। সামান্য অসুখ।

—আমার ইনস্‌ট্রুমেন্ট বক্সটা নিয়ে কী করছিলেন ?

—না কিছু না। এমনি। এমনি দেখছিলুম।

সাগর তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেলল বাক্সটাকে।

চাঁপা বলল,—আসুন তাহলে। মা উঠেছেন ঘুম থেকে। আপনার কথা সব বলেছি মাকে।

Himalaya
Bouquet
TALCUM POWDER
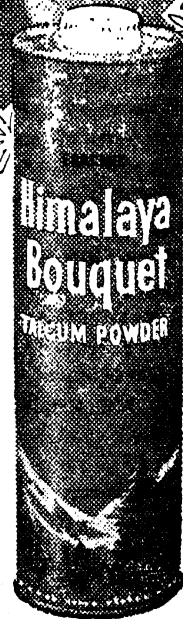
চাঁপার সঙ্গে সাগর গিয়ে ঢুকল সেই ঘরে, যে ঘরে আজ ক'মাস ধরে সোহাগী বিছানায় শুয়ে তিলে তিলে ক্ষয় করে চলেছে নিজেকে।

সোহাগীকে ভাল করে দেখে নিল সাগর। বলল,—সাগর আমার নাম। ঠানদি ভালবাসে আমায়, তাই আমার হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছে আপনাদের জন্তে কিছু টাকা। এই নিন।

হাত বাড়িয়ে টাকা ক'টা সোহাগীর শয্যাপ্রান্তে রেখে দিল সাগর অতি সন্তর্পণে।

চাঁপা বলল,—বাবার সামান্ত অসুখ মা। একটু জ্বর, আর গাঁটে গাঁটে ব্যথা। তাই না সাগর বাবু?

—হুঁ।

সোহাগী তার কোলাটে চোখ দিয়ে দেখছিল সাগরকে একদৃষ্টে। জীবনে অনেক মানুষ দেখেছে সোহাগী। অনেক জাতের অনেক অবস্থার অনেক মেজাজের পুরুষ মানুষ। পুরুষ মানুষের মুখ দেখলেই বলে দিতে পারে সে,—লোকটা কোন্ ধাঁচের। সাগরকে দেখে বড় ভাল লাগল সোহাগীর। সাগরের ঐ চওড়া বুকটার তলায় যে একটা মহৎ সরল প্রাণ আছে, সোহাগী তা' বেশ টের পেয়ে গেছে।

—কোথায় থাক গো তুমি বাছা?

সোহাগী শুধাল।

—সে অনেক দূর। মেডিকেল কলেজ-টলেজ ছাড়িয়ে আরো অনেক ওদিকে। কেন বল তো?

—নাঃ, এমনি। মা আছেন?

—উঁহু।

—বাবা?

—নাঃ।

—আছে কে সংসারে?

—দুটো সতাতো ভাই, দামোদর আর বরাকর। আমার ট্রোভ-মেরামতীর দোকানে কাজ করে।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা? বোসো।

চাঁপা তাড়াতাড়ি কাঠের টুলটা পেতে দিল সাগরের পাশে।

সাগর বসল।

সোহাগী বলল,—ঠানদি কে হন তোমার বাবা?

সাগর বলল,—শোনো কথা! ঠানদি ঠানদিই হয় আমার; আবার কে হবে? পিসি কি কারোর মাসি হয়, না মামা কারুর কাকা হতে পারে? ঠানদি ঠানদি ছাড়া আর কী হতে পারে বলো?

সাগরের হাত-মুখ নেড়ে কথা বলার ধরণ দেখে বেশ মজা লাগছিল চাঁপার। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল,—ঠানদির বেলায় কিন্তু একটা কথা আছে।

—কী?

—বাবার মা, না মায়ের মা? পিতামহী না মাতামহী?

—কোনো মহীই নয় গো সে।

সোহাগী বলল,—তবে?

গড়গড় করে সব কথা বলে গেল সাগর। তার মার মৃত্যুর কথা। শ্মশান থেকে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঠানদির খাওয়ানোর কথা। তার বাপের আরেকটা বিয়ে করার কথা। বাপের বন্ধু সেই হাবুলকাকার আশ্রয়ে সাগরের বড় হয়ে ওঠার কথা। সেই হাবুলকাকার কাছ থেকে ষ্টোভ সারানোর কাজ শিখে এখন বড় রাস্তার ধারে কত বড় একটা দোকান দিয়েছে সাগর, তার কথা। সব কিছু বলে থামল যখন সাগর, চাঁপার মনে হল, মস্ত লম্বা একটা মালগাড়ি যেন পাশ করে গেল তাদের ষ্টেশনের সামনে দিয়ে।

সোহাগী বলল,—ঠানদির মতন অমন মানুষ আর হয় না। প্রাণে বুড়ির কত মায়া কত দয়া! আমার চাঁপাকে খু-উ-ব ভালবাসে।

সাগর বলল,—যতই বাসুক, আমার চেয়ে বেশি কাউকে ভালবাসে না ঠানদি, এ আমি বলে দিলুম। আমার চেয়ে কাউকে বেশি ভালবাসলে বুড়ির টেংরি খুলে নেব না!

সাগরের রকম দেখে হেসে ফেলল সোহাগী। চাঁপা মুখে আঁচল চাপা দিয়েও আটকাতে পারল না হাসিটাকে। একটা খুক্ খুক্ শব্দ ক'রে সেটা উপচে পড়ল আঁচলের বাইরে।

সাগর কেমন বোকা-বোকা চোখে চাঁপার মুখের দিকে চেয়ে বলল, —নাও ঠ্যালা। হাসির কথাটা কী হল রে বাপু? যাক্, চললুম এখন।

সোহাগী বলল,—বাঃ! সে কী হয়? চাঁপা যে উনুনে চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছে।

সাগর টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল,—ওরেব বাবা! চা-টা চলে না আমার।

—তাহলে একটু সরবৎ করে দিক নেবুচিনি দিয়ে?

—কিছু না। সেই কাল রাত্তিরে একটা মড়া নিয়ে এসেছি এখানে, এখনো পর্যন্ত বাড়ি ফেরা হয়নি। আর দেরী করব না বাড়ি গিয়ে শুতে হবে আরামসে।

—তাহলে আরেকদিন আসবে কথা দাও?

—আসব।

—কথা দিচ্ছ?

—হুঁ গো। বলছি তো। আজ তবে চলি।

—এস বাবা। দুর্গা দুর্গা।

চলে গেল সাগর।

সিঁড়ি পর্যন্ত সাগরকে এগিয়ে দিয়ে চাঁপা তাড়াতাড়ি এসে তার খুপরি-ঘরের ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে দাঁড়াল।

সাগর চলে যাচ্ছে। জোওয়ান সাগর। সরল হৃদয়বান সাগর। সুখ-দুখের অনেক পোড়-খাওয়া শক্ত বলিষ্ঠ সাগর।

গলির বাঁকে সাগর অদৃশ্য হয়ে যেতেই চাঁপা ফিরে এসে দাঁড়াল মার কাছে।

সোহাগী বলল,—কী সুন্দর মন ছেলেটার! আবার আসতে বলেছিস?

চাঁপা বলল—তুমিই তো বলেছ।

—আমি তো বলেছিই। তুই তো বললে পারতিস একবার।

চাঁপা মুখ নিচু করে বলল,—বলেছি। [ ক্রমশ।

# বাংলা ধ্রুপদ গানে রামমোহনের দান

শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা আজকের নয়, বরং বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ইহার রেওয়াজ ভারতের সঙ্গীত দরবারে সসম্মানের সহিত স্থান লাভ করিয়া আসিতেছে, একথা সকলেই জানেন। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে ধ্রুপদ গান বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে।

শ্রদ্ধেয় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন—"ধ্রুপদ শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল ঈশ্বর বিষয়ক বর্ণনা" সুতরাং ধ্রুপদ গানও মার্গ সঙ্গীতের অন্তর্গত আদি ভারতীয় সঙ্গীত।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে যে খেয়াল এবং ঠুংরী গাওয়া হইত তাহার বেশীর ভাগই পশ্চিমা বাঈজীদের দান। ("বাংলা ধ্রুপদ গান ও রামমোহন রায়," ৭।৮ পৃঃ)। ইহা ছাড়াও তৎকালীন টপ্পা, বৈষ্ণব পদাবলী, রামপ্রসাদী এবং নিধুবাবু বা নিধিরামের—(নিধিরাম গুপ্ত ১৭৪১—১৮৩৪) টপ্পা সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। গ্রাম্য যাত্রা, পাঁচালী ও কবিগান বা কবির লড়াই ও বাংলার আসর জমাইয়া রাখিয়াছিল।

ইহার কিছু কাল পরে যুগ প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম ধ্রুপদ সঙ্গীতের নবধারার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনার জন্যে যে গানগুলি গাওয়া হইত তাহা ধ্রুপদ সঙ্গীতেরই অন্তর্গত। রামমোহন রায়ের সঙ্গীত গ্রন্থে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে যে বত্রিশটি সঙ্গীত প্রকাশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে তেইশটির তাল, আড়ঠেকা, দুইটি ঝাঁপতাল, দুইটি একতালা, একটি আড়া, একটি তেওরা এবং একটি ধামার। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষায় রচিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম ধ্রুপদ গান। ইহার রচনা কাল, ১৮২৬ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ।

রামমোহনের পরবর্ত্তীকালে তাঁহার উত্তর সূরীগণের অন্যতম পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিগণও বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রচিত "সঙ্গীত মুক্তাবলী"র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। বেচারাম রচিত ঐ গ্রন্থে তিন শত ছিয়াত্তরটি সঙ্গীত এবং তাহার সুর, মাত্রা ও তাল সন্নিবেশিত আছে। ইনিও বেহালায় একটি ব্রাহ্ম সমাজ ও উপাসনাগার স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই রকম বহু ধ্রুপদ রচয়িতার হাতে পড়িয়া, সেই রামমোহনের যুগ হইতে (১৭৭২—১৮৩৩) আরম্ভ করিয়া সুন্দরীমোহন দাস (১৮৫৭—১৯৫০) পর্য্যন্ত পাঁচশতের অধিক বাংলা ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী এবং টপ্পার চালে ব্রাহ্ম সঙ্গীত রচিত হইয়াছে এবং বাংলা দেশের বহু গান ব্রাহ্ম সমাজে ও অন্যত্র পরিবেশিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার কল্পে যে দুই মহাত্মা সবিশেষ চেষ্টা করিয়া আজ বাংলা ধ্রুপদ গানকে এতখানি সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এঁদের দানও কম নয়।

## ষ্টারস্ অব টুমরো

রেকর্ডে গানের প্রবহমান স্রোতে কত গান আসে, কত গান যায়। আজ যে গান লোকের মুখে মুখে, কাল সে গান লোকে ভুলে যায়। তাই এক সময়ে যে রেকর্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়, অল্পসময়ে সে রেকর্ড বিক্রয় না হওয়ায় তৈরী করা বন্ধ হয়, রেকর্ডের ক্যাটালগ হতেও বাদ পড়ে। এই ধারা পৃথিবীর সব দেশে চিরদিন চলছে।

কিন্তু প্রবহমান স্রোতের মধ্যেও মাঝে মাঝে এক একটি দ্বীপ দেখা দেয়, এক একটি স্থির বিন্দুর মত যা দীর্ঘকাল মানুষের মন আকর্ষণ করে। চলমান গীতিস্রোতের মধ্যেও তেমনি কিছু কিছু গান এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে যা কিছুতেই মন থেকে মুছতে চায় না। পাঠক পাঠিকাদের প্রত্যেকের মনেই এমন দুচার দশবিশটি গান এমন স্থান জুড়ে আছে যে সে গানের একটি কলিও যদি কেউ গুণগুণিয়ে গায় তবে তিনি উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন, তার অনেক আনন্দ-বেদনা মথিত মধুর স্মৃতি মনে পড়তে থাকে। সেই গানগুলি আর তখন নিতান্তই গান থাকে না, "আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে" তাকে এক অনন্তসৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তোলেন শ্রোতা বা গায়ক নিজেই। পুরাতন গানের চিরায়ত রূপ এভাবেই সৃষ্ট হয়।

আমরা শুনে সুখী হলাম, গ্রামোফোন কোম্পানী সম্প্রতি এইরকম চিরায়ত চিরপরিচিত এবং চিরনবীন গান আনকোরা নতুন শিল্পীর কণ্ঠে, আধুনিকতম যন্ত্রসঙ্গীতে সমৃদ্ধ করে নতুন একটি সিরিজের রেকর্ড প্রকাশ করছেন। হিজ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ডের এই সিরিজের নামটিও হয়েছে চমৎকার—আগামী দিনের কলাকুশলীবৃন্দ বা ষ্টার্স অব টুমরো (Stars of Tomorrow) এই সিরিজে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ হতে বাছাই করা আনকোরা নতুন

শিল্পীদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। জুলাই মাসে চারখানা রেকর্ডে আটখানা হিন্দুস্থানী গান "ষ্টার্স অব টুমরো" সিরিজে প্রকাশিত হচ্ছে—শিল্পীদের কেউ সুপরিচিত নন, কিন্তু গানগুলি বহু খ্যাত, বহু পরিচিত। আর গাওয়া হয়েছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাতে মূল সুরের এতটুকু ব্যত্যয় না ঘটে—আর সেখানেই তো নির্ভর করছে এই সিরিজের সার্থকতা। আমরা আশা করি, "ষ্টার্স অব টুমরো" সিরিজের রেকর্ডগুলি অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

—শতাব্দী সামন্ত।

# রেকর্ড-পরিচয়

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস ও কলম্বিয়া প্রকাশিত এ মাসের বাংলা রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:—

## 'এইচ-এম-ভি'

N 82975 প্রখ্যাত সুরকার অভিজিতের সুরে গাওয়া শিল্পী শ্যামল মিত্রের দু'খানি আধুনিক গান 'একটি পারিজাত' ও 'হংস পাখা দিয়ে'—অপূর্ব।

'এতো মেঘ এতো যে আলো' আর 'পত্র লিখেছ চেনা চেনা আখরে'—শিল্পী উৎপলা সেনের মনোমুগ্ধকর দু'খানি আধুনিক গান বেরিয়েছে N 82976 রেকর্ডে।

বিষয়বস্তু, সুরের নতুনত্ব আর পরিবেশনে গুণে অনবদ্য N 82977 রেকর্ডে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'সাতটি মোটে দিন' ও 'ফুল নেবে গো'—দু'খানি আধুনিক গান।

রমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে N82978 রেকর্ডের সুন্দর দু'খানি আধুনিক গান—'বেদনার দীপ জ্বেলে যাই' এবং 'ও ময়না কথা কয় না'।

ইলেক্‌ট্রিক গীটারে N 87573 রেকর্ডে 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' ও 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়' রবীন্দ্র-গীতির সুর বাজিয়েছেন শিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

## কলম্বিয়া

GE 25100 রেকর্ডে—'তারা ঝিলমিল্' ও "না না ডেকো না" দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন মধুর উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

GE 25101 রেকর্ডে—গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠের দু'খানি শ্যামা-সঙ্গীত 'কে রে মনোমোহিনী' এবং 'দিবা নিশি ভাব রে' অতুলনীয়।

GE 25102 নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ডে—'নীল মেঘ দেখে' ও 'সারা রাত্রি ধরে'—দু'খানি আধুনিক গানের অনবদ্য রেকর্ড।

GE 25103 উদীয়মান শিল্পী প্রশান্ত ভট্টাচার্যের মধুর দরদী কণ্ঠের 'নতুন নতুন নামে ডাকো—' 'তোমার আমার দু'টি মনের'—দু'খানি শ্রেষ্ঠ আধুনিক গান।

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের, গাওয়া 'অগ্নিশিখা' বাণী চিত্রের দু'খানি গান 'আয় আয় আয়রে' ও 'আমি আজ নতুন আমি'—GE 30508 রেকর্ডে বেরিয়েছে।

এ ছাড়াও 'খনা' বাণী চিত্রের চার খানি গান—'সে মধুলগন' ও 'তোর মনের কথা' GE 30509—এবং 'দিগন্তে ঐ অশ্রু জমেছে' আর 'আমার ব্যথার পাণ্ডুর চাঁদ'—CE 30510 রেকর্ডে গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় (বসু)।

# আমার কথা (৮৭)

## শ্রীগৌর গোস্বামী

বাংলা তথা ভারতের অন্যতম নিজস্ব যন্ত্রসম্পদ বাঁশের বাঁশীতে সুর মূর্চ্ছনা দ্বারা মানব মনকে মাতিয়ে তোলা যায়—তাহা ভারত-খ্যাত বংশীবাদক স্বর্গত পান্নালাল ঘোষের সুযোগ্য উত্তর-সূরী শ্রীগৌর গোস্বামীর শিল্পী-জীবন অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হয়। "অনাদৃত ও অপাংক্তেয়" বাঁশীর মাধ্যমে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর প্রকাশ ও বাঁশীকে আজ প্রভৃত জনপ্রিয় করার জন্য শ্রীগোস্বামী বহুলাংশে দায়ী।

তাঁহার নিজের কথায় জানা যায়:—

শ্রীগৌর গোস্বামী

১১শে শ্রাবণ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কালীঘাটে মাতুলালয়ে আমার জন্ম। ঠাকুরদাদা পণ্ডিত ৺বলাইচাদ গোস্বামী কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ও তেরটি ভাষা আয়ত্ত করেন। তাঁহার নিজস্ব লেখা বহু পুস্তক ও সংগৃহীত অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজী আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্যক রূপে অধ্যয়নের জন্য ঠাকুরদাদার নিকট আমাদের শিমুলিয়া গোস্বামী বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সেই সময় তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। বাবা পণ্ডিত বীরেশ্বর গোস্বামী ও মা শ্রীমতী সরযু দেবী

হলেন সাউথ সুবারবন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ৺অতুল ভট্টাচার্য্যের কন্যা।

আমি কমলা স্কুলে (শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা) প্রথমে পড়ি ও পরে আর্য্য মিশন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় সাংসারিক অসুবিধার জন্য চাকুরী গ্রহণ করি।

মামার বাড়ী ও আমাদের বাড়ী গানের চর্চ্চা থাকায় প্রথম বয়সে সতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গান শিখি। গান ভাল না লাগায় দাদা (বীণকার ও সেতারী) ৺ব্রজেশ্বর গোস্বামীর পরামর্শে ছেলেবয়সে তাঁহার নিকট বাঁশীর প্রথম পাঠ লই। আমার দিদি শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী পূর্ব্বে রেডিওতে গাহিতেন। দাদার কথামত পান্নালাল ঘোষের শিক্ষাধীন হই। বাঁশীকে "জাতে"-এ তুলিবার জন্য তাঁহার অফুরন্ত পরিশ্রম ও উহার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনা—আমার মনকে সচকিত করিয়া তোলে। বাঙ্গালা দেশে তাঁহার ঠিকমত কদর না হওয়ায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি সুদূর বোম্বাই-এ যান। বিদায়ের সময় তিনি আমায় বলেন যে ঘরে ঘরে বাঁশীকে অন্যতম বাদ্যযন্ত্র হিসাবে অনুপ্রবেশ করাইবার দায়িত্ব গ্রহণ কর। জানি না আমি এ ব্যাপারে কতদূর সমর্থ হইয়াছি। এর পর আমি পণ্ডিত শিবাপশুপতি মিশ্রর পুত্র রামকিষণ মিশ্রর নিকট বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর তালিম নিতে আরম্ভ করি। ডঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখি।

ছাত্রবয়সে রেডিওতে গল্পদাদুর আসরে বাঁশী বাজাই প্রথম। পরে ১৯৩৯-৪২ সালে উহাতে শিল্পী হিসাবে থাকিয়া '৪৩ সালে সহঃ সঙ্গীত-পরিচালক হই। ১৯৪৬-৪৭ সাল হইতে Music Supervisor পদে নিযুক্ত রহিয়াছি।

আমি প্রথম 'ভাইবোন' ফিলমে সঙ্গীত-পরিচালক হই। ১৯৫০ সালে ইংরাজী ছবি RIVER-এ ভারতীয় সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করি। এছাড়া উড়িয়া, আসামী ও হিন্দী ছবির সঙ্গীত পরিচালকরূপে কার্য্য করিয়াছি। বর্ত্তমানে নির্মীয়মান কয়েকটি বাঙ্গালা ছবিতেও লিপ্ত রহিয়াছি।

দাদা আমাদের বাড়ীতে "Students orchrestra" বলে একটি সঙ্গীত সম্প্রদায় খোলেন। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্য হইতে যন্ত্রী খুঁজে বাহির করা। উক্ত দল নিখিল বঙ্গ মিউজিক সম্মেলনে পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়। অজিত বসু, গোপেন বসু, মিহির ভট্টাচার্য্য, আমি ও আরও অনেকে উহার নিয়মিত সদস্য ছিলাম।

সঙ্গীত সম্মেলনের প্রথম দিকে বাঁশী বাজানর সুযোগ পাওয়া যেত না। তজ্জন্য আমার বন্ধু শ্রীকমলকুমার (বসাক)-এর সাহায্য অতুলনীয়। 'ঝঙ্কার'-এ প্রথম, 'তানসেন'-এ দ্বিতীয় ও 'সাদারং'-এ তৃতীয় সুযোগ পাই—এরপর নিয়মিত নিমন্ত্রিত হই সঙ্গীত-সম্মেলনগুলিতে।

আমি শ্রীমতী মায়া দেবীকে বিবাহ করিয়াছি। আমার ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বনাথ দাস, অমৃতলাল রায়, হিমাংশু বিশ্বাস ও ছাত্রী মায়া চ্যাটার্জ্জি এবং আরও অনেকে নিপুণ ভাবে বাঁশীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

## ॥ পুরাতন বাংলা গান ॥

ভজন

ঘর আও সজন মিঠ বোলা
তেরে দেখনেকো সব কছু ছোড়ো কাজর তেল তমোলা।
জো নহীঁ আবে রৈন বিহাবে ছিন মাসা ছিন তোলা,
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর কর ধর রহে কপোলা ॥

—মীরাবাঈ

খ্যাল

রঙ্গ ঢঙ্গ অত সুন্দর রূপ
নিরঞ্জন কৌন বনাইরি।
নবঘন বদন সে জগ উজর-ভাবে
শোভা বরণন নহি জাইরি

—অনন্তলাল

ধ্রুপদ

জয় প্রবল বেগবতি সুরেশ্বরি জয়তি জয় গঙ্গে
ত্রিজগত তারিণি জগ কলুষ নাশিনি পার্ব্বতি
রঙ্গনাথ সুতপর নেক করহর তপন সুতভয় অন্তিমে।
তুয়া নীর নিরমল করত চল চল তীর তট অতি শোভিনী
নগ নন্দিনি ইথ মকর দিনকর চন্দ্রি মাঘমে দেহি পদ যুগ ভাগমে ॥

—বদু ভট্ট

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

## পাঁচ

॥ খ ॥

সেদিন সুন্দর সাহেব শিবনাথকে যে কথাটা বলেছিল কিছুতেই যেন শিবনাথ সে কথাটা ভুলতে পারে না।

অদম্য একটা জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষালাভের স্পৃহা নিয়েই সে কলকাতা শহরে এসেছিল এবং এ কথাটা সত্যি যে সরকার মহাশয়ের সাহায্য না পেলে তার পক্ষে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হওয়া আদৌ সম্ভবপর ছিল না।

তখনকার দিনে সরকার মশাই যে একজন কলকাতা শহরে ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন তাই নয়, তাঁর প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল সমাজে সর্বত্র।

এবং তাই তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর পরিচিত গৌরমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ধরে মহাত্মা হেয়ারের স্কুলে শিবনাথকে ফ্রি ছাত্ররূপে ভর্তি করে দেওয়া। এবং শুধু ভর্তি হলেই তো হবে না, সরকার মশাই তাকে আশ্রয় দিয়ে তার লেখাপড়া শিখবার যাবতীয় ব্যয় বহন না করলেও তার পড়াশুনা হতো না।

অবশ্যি এটা ঠিকই, সরকার মহাশয়ের পক্ষে তাঁর বিরাট ভবনে বহু আত্মীয়, অনাত্মীয় আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে কারো 'পরে নজর রাখা সম্ভবপর ছিল না।

এবং সে ক্ষেত্রে সুন্দর সাহেবের মত একজন দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে যেতে পারলে যে শিবনাথের যথেষ্ট সুবিধা হবে লেখাপড়ার, সেটাও বুঝতে পেরেছিল সে।

অথচ সে যদি সুন্দর সাহেবের গৃহে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেই কারণে যদি সরকার মহাশয় অসন্তুষ্ট হন, সে ক্ষেত্রে যেমন তার লজ্জা ও মনঃকষ্টের অবধি থাকবে না সেটাও যেমন তার এক চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, তেমনি আরো একটি চিন্তারও কারণ হয়েছিল, সুন্দর সাহেব পর্তুগীজ, বিধর্মী, আর সে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান তার গৃহে গিয়ে স্থান নিলে লোকে যদি নিন্দে করে।

তরুণ শিবনাথ কি করবে বেচারী ভেবে পায় না।

একদিকে জাতের ভয়, সমাজের ভয় ও সেই সঙ্গে এত সাধের তার শিক্ষা ব্যবস্থা কোন কারণে যদি তা অর্ধপথেই নষ্ট হয়ে যায় তবে যে জীবনই বৃথা এবং অন্য দিকে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সম্ভাবনা।

কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত অবিশ্যি ইংরাজী শিক্ষা আজকের মত এমনি অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজকের দেশের লোক বুঝতে পেরেছে সবার মন থেকে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে হলে একমাত্র ইংরাজী শিক্ষার দ্বারাই তা সম্ভবপর।

টোলে এবং পাঠশালায় সংস্কৃতচর্চা করে যে কিছু হবে না সেকথা আজ দেশবাসী বুঝতে পেরেছে।

জ্ঞানচক্ষু অবিশ্যি দেশবাসীর ধীরে ধীরে উন্মীলিত হয়েছিল বহু বৎসর ধরেই।

এ দেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে পাকাপোক্ত ভাবে যাওয়ার পর থেকে যত এদেশে ইংরাজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং ক্রমশ যত রাজ্য পরিচালনার জন্য শাসনকার্যের সুবিধাতে আইন-আদালতের সৃষ্টি হতে লাগল, এখানে ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়ের ভিড়ও তত বাড়তে লাগল। বিশেষ করে কলকাতা শহরে ইংরাজ বণিকদের যত বাণিজ্য বিস্তার লাভ করতে লাগল সেই সূত্রে এদেশীয় লোকের মেলামেশাও তাদের সঙ্গে বেড়ে চলে।

এবং বাণিজ্যের ব্যাপারে এদেশের লোকেদের ইংরাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় তারা ক্রমশ বুঝতে পারছিল, ইংরাজী শিক্ষা ব্যতিরেকে ওই বিদেশী ইংরাজ শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে তারা তো চলতেই পারবে না অন্যান্য ব্যাপারেও বিশেষ সুবিধা হবে না।

এবং ঐ সময় ইংরাজ-বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যারা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল নানা দিক দিয়ে তারা দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

তাই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনেই প্রথম তাদের ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষা দেবার আকাঙ্খা জন্মায়। আদিপর্বে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার মূলে ছিল দুটি সংস্থা। একটি কলকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরে শ্রীরামপুরে কেরী, মার্সম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের খৃষ্টধর্ম প্রচার সংস্থা ও খৃষ্টানধর্মাবলম্বীদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রচেষ্টা ও দ্বিতীয়ত বিলাত থেকে যে সব সিবিলিয়ান কর্মচারীরা শাসনকার্যের জন্য এদেশে আসত তাদের এদেশীয় ভাষা, রীতিনীতি ও এদেশীয় লোকেদের চরিত্র ও মনোভাব বুঝবার জন্য তাদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী স্থাপিত এ শহরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহায্যে যেমন একদিকে পরোক্ষ ভাবে এদেশে ইংরেজদের

মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা চলতে লাগল, তেমনি অন্যদিকে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ছেলেরা যাতে ইংরাজী ভাষা শিখতে পারে তারই চেষ্টায় কলকাতা শহরের জায়গায় জায়গায় ইংরাজী স্কুল গড়ে উঠলো।

চিৎপুর সার্বরণ সাহেবের স্কুল, আমড়াতলায় মার্টিন বাউলের স্কুল, আরটুন পিট্রাসের স্কুল একে একে গড়ে ওঠে।

গড়ে উঠলো কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, এবং তারও অনেক পর কলকাতা শহরে হিন্দু কলেজের পত্তন।

সেটা হচ্ছে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী।

দেশবাসীর মনে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে, সেই প্রয়োজনীয়তাতেই মহাত্মা হেয়ারের উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে পরবৎসরই অর্থাৎ ১৮১৮, ১লা সেপ্টেম্বর, স্কুল সোসাইটি নামে একটি সভা গঠিত হয়।

সম্পাদক হলেন তার হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব।

স্কুল সোসাইটির কাজ হলো কলকাতা শহরে জায়গায় জায়গায় নতুন ভাবে ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল স্থাপনা করা।

নতুন নতুন স্কুল গড়ে উঠলো ঠনঠনিয়া, কালীতলা এবং আরপুলী প্রভৃতি জায়গায় জায়গায়। শিবনাথ পড়ছিল হেয়ারের কলুটোলার ব্রাঞ্চ স্কুলে।

অরিন্দম সরকারের বাড়ি চেতলায় সেখান থেকে প্রত্যহ পদব্রজে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে শিবনাথকে যেতে হয় কলুটোলার ব্রাঞ্চ স্কুলে।

প্রত্যহ যাতায়াত করতেই কম সময় যায় না।

অতখানি পথ যাতায়াত করে রাত্রের দিকে শিবনাথ এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে পড়তে বসলে সহজেই দুচোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে।

পাঠ্য পুস্তকও শিবনাথের সব ছিল না সে কারণে স্কুলের পরে আবার কালীতলায় সহাধ্যায়ী নরেন্দ্রর কাছে যেতে হতো।

ঐ কারণে গৃহে ফিরতে আরো দেরি হয়ে যেত।

প্রায় প্রত্যহই কালীতলায় নরেন্দ্রের গৃহে যেতে হতো বলে রাত করে তাকে গৃহে ফিরতে হতো।

যে সময় গৃহে ফিরত সরকার মশাইয়ের গৃহে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে যেতো। তাই অনাহারেই রাতটা কাটাতে হতো তাকে, বেশীর ভাগ রাতই।

প্রায়ই উপবাস দিতে দিতে শিবনাথ যে দুর্বল হয়ে পড়ছিল ক্রমশঃ কথাটা মিথ্যা নয়, মিথ্যা বলেনি সুন্দরসাহেব, এ ভাবে উপবাস দিলে যে ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়বে, তাহলে পড়াশুনা করবে কি করে।

সুন্দর সাহেব যে ভাবে আশ্বাস দিয়ে গেলেন তাতে করে তাঁর গৃহে আশ্রয় পেলে সেদিক থেকে সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

সপ্তাহখানেক শিবনাথ নানা ভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করলো, কিন্তু কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

সরকার মশাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যে কথাটা বলবে সে সাহসও হয় না।

যদি সরকার মশাই অসন্তুষ্ট হন। যদি তিনি তাকে তিরস্কার করেন। পরামর্শ দেবার মতও তো কেউ নেই। নচেৎ পরামর্শ একটা নেওয়া যেতো।

আসলে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবার মত সাহসই ছিল না মনে শিবনাথের। নচেৎ ভেবেছে কতবার, দয়াল অবতার হেয়ার সাহেবকে সে কথাটা বলবে।

হেয়ার সাহেব কতজনের কত ব্যবস্থা করে দেন, তাঁরও হয়ত একটা ব্যবস্থা করে দিতেন তার কথা সব শুনলে।

কিন্তু সাহস পায়নি।

শুধু সাহস পায়নিই নয় মহাত্মা হেয়ারকে সামান্য ব্যাপারে বিরক্ত করতেও মন তার সায় দেয়নি।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কথাও মনে হয়েছিল।

কিন্তু তাঁকেও সে বলতে পারেনি কিছু।

ফলে পূর্বের মতই তার বেশীর ভাগ দিন উপবাসেই কাটতে লাগল।

এমনি করে আরো মাসখানেক কেটে গেল।

প্রত্যহ সকালের দিকে পাল্কীতে চেপে হেয়ার সাহেব তার স্কুলগুলি পরিদর্শন করতে আসতেন।

সেদিন একটু দেরি হয়েছিল শিবনাথদের স্কুলে আসতে হেয়ার সাহেবের।

সেদিন শিবনাথেরও স্কুলে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।

আগের রাত্রি উপবাসে গিয়েছে এবং সেদিনটা ছিল আবার অরন্ধন। সরকার মশাইয়ের গৃহে রন্ধনাদি হয়নি।

কাজেই সকালেও সেই উপবাসের পর খালি পেটে ক্ষুধার্ত শিবনাথ দীর্ঘপথ হেঁটে আসতে আসতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

বেচারীর পা দুটো যেন আর চলছিল না।

স্কুলের সামনে যখন এসে পৌঁছাল, স্কুল বসে গিয়েছে।

ভয়ে ভয়ে সে স্কুলে ঢুকতে যাবে হেয়ার সাহেবের পাল্কী-বেহারাদের হুস্ হুস্ শব্দে চমকে একপাশে সরে দাঁড়াল শিবনাথ।

হেয়ার সাহেবের পাল্কী দেখে তার ভয়ও হয়েছিল।

কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী হেয়ার সাহেব।

এখুনি হয়ত শুধাবেন তার দেরি হলো কেন।

হলোও তাই, শিবনাথের প্রতি হেয়ার সাহেবের নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেয়ার সাহেব পাল্কী থামিয়ে পাল্কী থেকে নামলেন।

হেয়ার সাহেবের অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল।

তাঁর স্কুলের বিশেষ করে ক্রি ছাত্রদের কারো নামই তিনি ভুলতেন না। প্রত্যেককেই তাঁর মনে থাকত।

হেয়ার সাহেব ডাকলেন, শিবনাথ, এদিকে আইস।

ধীর কুণ্ঠিত পদে সে ডাকে শিবনাথ হেয়ার সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল মাথা নীচু করে।

স্কুলে আসিতে তোমার এত বিলম্ব কেন শিবনাথ?

শিবনাথ চুপ করে থাকে।

হেয়ার সাহেব শিবনাথের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

শিবনাথের অনাহারক্লিষ্ট মুখখানি হেয়ারের দৃষ্টি বুঝি আকর্ষণ করে।

হেয়ার শুধান, কি হইয়াছে শিবনাথ? তোমার মুখ এত শুষ্ক কেন? কোন অসুখ হয় নাই তো!

ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শিবনাথ ঐ স্নেহভরা কথাগুলিতে আর অশ্রু রোধ করতে পারে না।

তার শীর্ণ শুষ্ক দুই গাল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

কি হইয়াছে শিবনাথ?

হেয়ার এগিয়ে এসে সাগ্রহে শিবনাথের স্কন্ধে একখানি হাত রাখলেন।

বল শিবনাথ কি হইয়াছে।

শিবনাথ তখন ধীরে ধীরে সব কথাই বললে।

হেয়ার সাহেব তো অবাক।

বললেন, বল কি। কাল রাত হইতে তুমি উপবাসী! চল আমার সঙ্গে।

কিন্তু স্কুল যে বসে গিয়েছে—

বসুক—চল—

হেয়ার সাহেব শিবনাথকে তাঁর পাল্কীতে তুলে নিয়ে সর্বাগ্রে গেলেন এক মিঠাইওয়ালার দোকানে। সেখানে পেট ভরে ক্ষুধার্ত শিবনাথকে খাওয়ালেন।

তারপর তাকে সঙ্গে করে নিজে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

যাবার সময় বলে গেলেন, কাল তুমি স্কুলের ছুটির পর আমার বাসায় যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে শিবনাথ। কেমন।

শিবনাথ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

পরের দিন যথাবিধি শিবনাথ হেয়ার সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করল।

সুন্দর সাহেবের প্রস্তাবের কথা আগের দিনই শিবনাথ হেয়ার সাহেবকে বলেছিল।

হেয়ার সাহেব কয়েকটি স্কুলের বালককে পাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর বাইরের ঘরে বসে। শিবনাথকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, আইস শিবনাথ, বসো। একটু অপেক্ষা কর। ইহাদের পাঠ বুঝাইয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিব।

শিবনাথ এক পাশে চুপ চাপ বসে হেয়ার সাহেবের পড়ানো শুনতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ছেলেরা বিদায় নেবার পর হেয়ার সাহেব বললেন, দেখ শিবনাথ, আমি ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার আপাতত ওই সুন্দর সাহেবের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

সেখানেই যাবো।

হাঁ। ইতিমধ্যে আমি তোমার জন্য অন্য একটি আশ্রয়ের অনুসন্ধানে থাকিব। আশ্রয় মিলিলেই তোমাকে আমি সংবাদ দিব।

আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন।

আমার ইচ্ছা তাই তুমি করো।

শিবনাথ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

অতঃপর হেয়ার সাহেব শিবনাথের পড়াশুনা সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নাদি করতে শুরু করেন।

কথায় কথায় রাত হয়ে গিয়েছিল হেয়ার সাহেবের খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ খেয়াল হতেই ত্রস্তে উঠে দাঁড়ান, ইস অনেক রাত হইয়া গেল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তো তোমার আহারও কিছু হয় নাই। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষুধার্ত বোধ করিতেছো। চল—আগে কিছু আহার করিয়া লইবে—তারপর আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিব।

শিবনাথ বলে, না, না—তার কোন প্রয়োজন নেই, আমি একাই চলে যেতে পারবো।

হেয়ার সাহেব বলেন, তা হয়ত পারিবে কিন্তু আমি তোমাকে এই রাত্রে একাকী এই দীর্ঘ পথ যাইতে দিতে পারি না।

সে রাত্রে মিঠাইওয়ালার কাছ থেকে শিবনাথকে পেট ভরে খাইয়ে সরকার মশাইয়ের গৃহে সঙ্গে করে এনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন হেয়ার সাহেব।

পরের দিনটা ছিল রবিবার।

স্কুল বন্ধ।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর শিবনাথ গৃহ থেকে বের হয়ে কুলীর বাজারের উদ্দেশে চললো।

হেয়ার সাহেব পরামর্শ দেওয়ায় যেন শিবনাথ মনের মধ্যে জোর পায়।

সুন্দর সাহেবের গৃহেই সে আশ্রয় নেবে স্থির করেছে। কিন্তু তার পূর্বে সুন্দর সাহেবের সঙ্গে তার একবার দেখা হওয়া দরকার। সেদিন সুন্দর সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কথাটা তাকে বলেছিলেন বটে কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর মতের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেটাও যে তার জানা দরকার।

কুলীর বাজারে সরকার মশাইয়ের বাগান বাড়িতে শিবনাথ যখন গিয়ে পৌঁছালো, শীতের রৌদ্র অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে।

পায়ে পায়ে গিয়ে বাগান বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল শিবনাথ।

বাড়িতে ঢুকবার মুখেই পাশাপাশি দুটো সুউচ্চ নারিকেল গাছ তারই একটার মাথায় একটা চিল বসে মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠছে। শীতের অপরাহ্নের স্তব্ধতায় সে ডাক বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত একটা শান্ত স্তব্ধতা যেন চারিদিকে।

একটু অগ্রসর হতেই একটা জামরুল গাছ চোখে পড়ে, পীতবর্ণে পাতাগুলো মন্থর শীতের হাওয়ায় টুপ টাপ করে খসে খসে পড়ছে।

সামনেই চোখে পড়ল শিবনাথের বিরাট একটা দরজা, হাঁ-করছে খোলা।

এদিক ওদিক তাকাল শিবনাথ কিন্তু কাউকেই চোখে পড়ল না একটা মানুষও তো দেখছে না শিবনাথ, কেউ নেই নাকি।

মুহূর্তের জন্য বুঝি থমকে দাঁড়ায়।

নারিকেল গাছের মাথায় চিলটা যেন থেকে থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠছে।

কিছুক্ষণ খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় পায়ে পায়ে ভিতরে প্রবেশ করল শিবনাথ।

সামনেই একটা টানা বারান্দা।

পশ্চিম দিক থেকে থেকে অপরাহ্ণের খানিকটা সূর্যের আলো সেই বারান্দার 'পরে এসে পড়েছে।

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল শিবনাথ।

তাকাতে তাকাতেই নজরে পড়ে পশ্চিম দিকেরই একটা ঘরের দরজা খোলা।

সেইদিকেই অতঃপর এগিয়ে যায় শিবনাথ।

খোলা দরজা-পথে উঁকি দিতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল শিবনাথের।

ঘরের মধ্যে জানালা ঘেঁষে একটি পালঙ্ক, সেই পালঙ্কের 'পরেই শুয়ে আছে একটি মেয়ে।

মেয়েটি একদৃষ্টে দরজার দিকেই নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল।

ছোট একটি উপাধানের 'পরে মাথাটা রেখে তাকিয়ে ছিল মেয়েটি দরজার দিকে।

শীর্ণ শুষ্ক এক স্তবক ফুলের মতই যেন মনে হচ্ছিল মুখখানি মেয়েটির।

কি এক বিষণ্ণ বেদনার ক্লান্তি যেন সেই শীর্ণ মুখখানিতে ছড়িয়ে রয়েছে। রুক্ষ কেশভার গুচ্ছে গুচ্ছে উপাধানের দু'পাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

শয্যার শায়িতা একমাত্র ঐ মেয়েটি ছাড়া ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় আর কোন প্রাণী ছিল না। পশ্চিমের জানালা-পথে অপরাহ্ণ সূর্যের খানিকটা আলো মেয়েটির শয্যার 'পরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

গায়ের উপর একটা সূক্ষ্ম কারু কাজ করা পশমের চাদর। কটিদেশ পর্যন্ত চাদরটা টানা। শয্যার পাশেই একখানি হাত ভর।

মোমের মতই শাদা হাতটা।

দুজনে দুজনার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

কারো ওষ্ঠে কোন শব্দ নেই।

তারপর এক সময় নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে পায়ে পায়ে খোলা দরজা পথে শিবনাথ ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে নিজেও বুঝি বুঝতে পারে নি।

হঠাৎ এক সময় শীর্ণ অথচ পাতলা ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট দুটি নড়ে উঠে মেয়েটির। ক্ষীণ ক্লান্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, তুমি কে!

আমি শিবনাথ!

মেয়েটির ডাগর দুটি কৃষ্ণ-কালো চক্ষু তারকা অশ্রুতে যেন হয় যেন টলমল করছে।

তুমি!

শিবনাথ শুধায়।

আমি মৃন্ময়ী!

মৃন্ময়ীর কথাটা শেষ হলো না বাইরের দালানে একটা ভারী জুতোর মচ-মচ শব্দ শোনা গেল।

মেয়েটির কানেও বোধ হয় শব্দটা প্রবেশ করেছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে।

শিবনাথ চকিতে পিছন ফিরে খোলা দরজার দিকে তাকাল।

জুতোর শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

একটু পরেই দরজা-পথে দেখা গেল বিরাট এক মনুষ্যমূর্তি।

সেই কুর্তা ও পাতলুন পরিহিত, মাথায় টুপি—সুন্দর সাহেব।

সুন্দরম বোধ হয় প্রথমটা চিনতে পারে নি শিবনাথকে।

ভ্রূ দুটো তার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

গম্ভীর ভরাট গলায় শুধায়, কে?

আ-আমি—

কে!

আজ্ঞে, আমি শিবনাথ।

[ ক্রমশঃ।

# মানবের জয়গান

সন্তোষকুমার দে

কোন্ দূর হতে বন্ধুর পথে যাত্রা হয়েছে শুরু
মহামানবের বিজয় রথের গতি নয় মন্থর
গিরিগুহা হতে নামিয়াছে পথে, সে পথের শেষ নেই
পাথরে তামায় ব্রোঞ্জে লৌহে ইস্পাতে স্বাক্ষর।
যাযাবর জাতি ছড়িয়ে পড়েছে দূর হতে দূর দেশে
যেখানে তাহার চরণ চিহ্ন সেখানেই তার জয়,
নব পরিবেশ, নব নব ভাষা, নব জাতি উদ্ভব,
নব সভ্যতা বিকাশিল কত অভিনব বিস্ময়।
রচে তারা বেদ গান,
মনের গহনে বিশ্বরাজের করে অনুসন্ধান।

হাজার হাজার বছর ঘুরেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বলী
মানুষের কাছে অবারিত হয় প্রকৃতির অঞ্জলি।
কয়লা-তৈল-বিদ্যুৎ হতে পরমাণু তার গতি
অসের শক্তি আয়ত্তে পেল মানুষের সন্ততি।

চলে অভিযান শূন্যে শূন্যে, যাবে সে গ্রহান্তরে
এতটুকু এই মাটির পৃথিবী আর নাহি মন ভরে।

তবু চলে হানাহানি
জাতিতে জাতিতে চায় যে মাতিতে বিভেদের হেন গ্লানি।

হবে হবে এর শেষ
মানুষে মানুষে বিভেদের দিন হয়ে যাবে নিঃশেষ।
গাহি তাই আজ মানবের জয়গান,
শান্তির কোলে মিলাবে মিলিবে অমৃতের সন্তান।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

## নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের গ্রীষ্মের ছুটি—

প্রায় এগার সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর গত ১লা জুন (১৯৬২) জেনেভায় সপ্তদশ রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সদস্যগণ দুইটি বিষয়ে একমত হইতে পারিয়াছেন। এই দুইটি বিষয়ই রুটিন মাফিক ব্যাপার। প্রথম বিষয়টি কার্য্যবিবরণীর রিপোর্ট। এই রিপোর্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে দাখিল করা হইবে। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্মেলনের গ্রীষ্মাবকাশ গ্রহণ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থার ডীন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের ভ্যালেরিয়ান জোরিণ মিলিত ভাবে এই রিপোর্টের খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন। জেনেভা-সম্মেলনে এ পর্য্যন্ত যে-সকল বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে সেগুলির নীরস বিবরণ এই রিপোর্টে স্থান পাইয়াছে। সম্মেলনের সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই রিপোর্ট অনুমোদন করিয়াছেন। গ্রীষ্মকালের অবকাশ গ্রহণের ব্যাপারেও সদস্যগণ একমত হইয়াছেন। দীর্ঘ একাদশ সপ্তাহ ধরিয়া পণ্ডশ্রম করিবার পর সকল সদস্যই যে বিশ্রাম উপভোগ করিতে চাহিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। এই গ্রীষ্মাবকাশ ১৫ই জুন হইতে আরম্ভ হইবে এবং স্থায়ী হইবে এক মাস। সম্মেলনের এই দুইটি সিদ্ধান্তই রুটিন মাফিক হইলেও সম্মেলনে আলোচনার বাস্তব চিত্রই উহার মধ্যে প্রতিফলিত রহিয়াছে।

নিরস্ত্রীকরণ এবং পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ রাখা সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গ এবং সোভিয়েট শিবিরের পক্ষ হইতে যে-সকল প্রস্তাব জেনেভা সম্মেলনে উত্থাপিত এবং আলোচিত হইয়াছে এবং আটটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সদস্যগণ যে-ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন সেগুলি পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন। এখানে সেগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া কোন আলোচনা আমরা করিব না। নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়া এবং পশ্চিমী শিবিরের মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে সেগুলিকে দুর্লঙ্ঘ্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। জেনেভা সম্মেলনে প্রায় এগার সপ্তাহ ধরিয়া আলোচনা চলিলেও এই ব্যবধান একটুও হ্রাস পায় নাই। পরমাণু অস্ত্রের সমূহ বিপদ সম্পর্কে শুধু বিশ্ববাসীই যে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন তাহা নয়, পরমাণু অস্ত্রের অধিকারীগণও এই বিপদকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তাই তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হইবার মত কারণ সৃষ্টি হইলেও উভয় পক্ষই উহাকে এড়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরমাণু অস্ত্র সজ্জার প্রতিযোগিতা অব্যাহত ভাবেই চলিতেছে। নিরস্ত্রীকরণ, বিশেষ করিয়া পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য নিরপেক্ষ শক্তিবর্গ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয় রাষ্ট্রের উপরেই চাপ দিতেছেন। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আটটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি জেনেভা সম্মেলনে উপস্থিত আছেন। পরমাণু অস্ত্রের বিপদ এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমূহের চাপের জন্য নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন চালাইয়া যাওয়াই অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

বার্লিন সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনারও কোন অগ্রগতি হয় নাই। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কোন পথের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হইয়াছে। প্রায় একমাস আলোচনা স্থগিত থাকার পর গত ৩০শে মে (১৯৬২) মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব রাস্ক এবং সোভিয়েট প্রতিনিধি আনাতোলী ডোব্রিনিন (Anatoly Dobrynin) দুই ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা করেন। মার্কিণ সরকারী কর্ম্মচারীরা মনে করেন এই আলোচনা শুধু বৃত্তাকারে আবর্ত্তিত হইতেছে। বার্লিন সংক্রান্ত মীমাংসার কোন সূত্র সম্পর্কে শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে মতৈক্য হইলেই চলিবে না, পশ্চিম জার্ম্মাণীর উহাতে সম্মতি আবশ্যক। কিন্তু ডাঃ এডেনুয়ের কোন রকম আপোষ মীমাংসা অপেক্ষা স্থিতাবস্থা বজায় রাখারই পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। গ্রীষ্মাবকাশের পর আবার নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আলোচনার গতি যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে ছুটির পরবর্ত্তী আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে এতখানি দুরাশা পোষণ করা সম্ভব নয়। মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন, রাশিয়া 'elusive Pimpernel' এর মত আচরণ করিতেছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় কতক বিপ্লবীকে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যাইত না। তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য এই বাক্যাংশ ব্যবহৃত হইত। রাশিয়া মার্কিণ প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে ভণ্ডামি এবং যুদ্ধের হুমকী দেওয়ার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ব্যর্থ হইলে এবং উহার প্রতিক্রিয়া গুরুতর বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। শীর্ষ সম্মেলন হইতে উহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই কিন্তু যুদ্ধাশঙ্কা হয়ত আবার হ্রাস পাইবে।

## আইখম্যানের ফাঁসী—

গত ৩১শে মে বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রের কিছু পূর্ব্বে রামলে কারাগারে ইহুদী নিধন যজ্ঞের হোতা, নাৎসী জার্ম্মাণীর ইহুদী সংক্রা গেষ্টাপো বিভাগের প্রাক্তন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এডলফ আইখম্যানকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। এই কারাগারটি জেরুজালেম এবং তে

আভিভের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। তাঁহার ফাঁসী হইয়াছে স্থানীয় সময় রাত্রি ১১টা ৫৮ মিনিটের সময়। গ্রীণউইচ সময় অনুযায়ী রাত্রি তখন ৯টা ৫৮ মিনিট এবং ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুযায়ী সময় তখন রাত্রি ৩টা ২৩ মিনিট। গত ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৬১) তাঁহার প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। তিন দিন পূর্ব্বে ইসরায়েলের সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া এইরূপ মন্তব্য করেন যে, আত্মতৃপ্তি, উর্দ্ধতন নেতৃবর্গের সন্তুষ্টি বিধান এবং নিজের রক্তপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্ত তিনি ঐ সমস্ত অবর্ণনীয় ও ভয়াবহ অনুষ্ঠানে মাতিয়া ছিলেন। ফাঁসীর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ইসরায়েলের প্রেসিডেণ্ট আইখম্যানের দণ্ডাদেশ মকুবের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার এই অগ্রাহ্যের ঘোষণায় আছে মাত্র ২৬টি রূঢ় শব্দ। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এডলফ আইখম্যানের ক্ষেত্রে অপরাধীকে ক্ষমা অথবা দণ্ড হ্রাস করার ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মেঝের উপর একটি চতুষ্কোণ এবং কৃষ্ণবর্ণ ট্রেপ ডোরের (trap door) উপর এবং তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ফাঁসীর দড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার হাত ও পা-ও বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কালো আবরণ পরিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার পায়ের নীচের ট্রেপ ডোর খুলিয়া যায়, ফাঁসীর দড়িও গলায় আঁটিয়া বসে। তিনি অন্ধকার গহ্বরে ঝুলিয়া পড়েন। কারাগারের ডাক্তার পরে বলিয়াছেন যে, তৎক্ষণাৎ আইখম্যানের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় নাই। কারণ, এই কবর নয়া নাৎসীদের তীর্থস্থান এবং ফ্যাসীবাদের প্রেরণা স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। পুলিশ লঞ্চের উপর তাঁহার মৃতদেহ দাহ করা হয় এবং ভস্মাবশেষ ছড়াইয়া দেওয়া হয় ভূমধ্য সাগরের জলে।

১৯৬০ সালের মে মাসে ইসরাইল-গুপ্তচররা যখন আইখম্যানকে আর্জ্জেণ্টিনায় গ্রেফতার করে তখনই বুঝা গিয়াছিল মৃত্যুদণ্ডেই তিনি দণ্ডিত হইবেন। ছয় লক্ষ ইউরোপীয় ইহুদী হত্যার জন্ত তিনি দায়ী। আইখম্যানের দৃষ্টিতে ইহা নগণ্য অপরাধ হইলেও অভিযুক্তদের কাছে উহাই অত্যন্ত গুরুতর, মৃত্যুদণ্ড-ও তাঁহার অপরাধের তুলনায় পর্য্যাপ্ত নয়। কে আইখম্যানকে শাস্তি দিতে অধিকারী, তাঁহার কি শাস্তি হইবে ইহাই ছিল প্রধান প্রশ্ন। তিনি যখন ব্যাপক ভাবে ইহুদী হত্যার অপরাধ অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন ইসরাইল রাষ্ট্র ও তাহার আইনকানুনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবু ইসরাইল রাষ্ট্র তাঁহার বিচারের এক্তিয়ার গ্রহণ করিয়াছিল দুইটি কারণে। একটি কারণ ইসরাইলের প্রধান মন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়নের ভাষায় বলিতে পারা যায়, ন্যায় বিচারের জন্ত নৈতিক নির্দ্দেশ ('an inner moral imperative' to see justice done)। আইখম্যানের বিচারের ব্যাপারে অন্যান্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা দ্বিতীয় কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্ত বৃহৎ চতুঃশক্তি আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়াছিলেন। নুরেমবুর্গে এই ট্রাইব্যুনাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেন। কিন্তু এই ট্রাইব্যুনালের অস্তিত্ব এখন আর নাই। ইসরাইল এই ট্রাইব্যুনালের পুনর্গঠনের জন্ত দুই-দুইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু দুইবারই তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আইখম্যানের কৌসুলী পশ্চিম জার্ম্মাণীকে বিচারের এক্তিয়ার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মাণী নিষ্ক্রিয়ই ছিল। যে-দিন রাত্রে আইখম্যানের ফাঁসী হয় সে-দিন তাঁহার কৌসুলী তাঁহাকে পশ্চিম জার্ম্মাণীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত পশ্চিম জার্ম্মাণ আদালতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানব অধিকার সংক্রান্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমিশনের নিকটেও এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্ত তাঁহার কৌসুলী আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে অপরাধের জন্ত ইসরাইলের আইন অনুসারে আইখম্যানের প্রাণদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। এ ক্ষেত্রেও ইহুদী জনসাধারণের মধ্যে মতভেদ দেখা গিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ফাঁসীতে তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন যে, ফাঁসী দিলে তাঁহার প্রতি দয়াই প্রদর্শন করা হইবে। তাঁহাকে নেজেভে (Negev) যাবজ্জীবন ক্রীতদাসরূপে কাজ করিতে নিয়োগ করা উচিত অথবা কপালে তাঁহার কাহিনী লিখিয়া তাঁহাকে পৃথিবী ভ্রমণে বাধ্য করা উচিত। অধিকাংশ ইহুদীর কাছেই আইখম্যানের বিচার শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত বিচার নয়, উহা সমগ্র নাৎসী সন্ত্রাসবাদের বিচার। নাৎসী জার্ম্মাণী যে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া ছিল আইখম্যানের ফাঁসী তাহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের প্রতীক। বিচারের সময় তাহার সাফাই ছিল। তিনি আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন মাত্র। ফাঁসীর প্রাক্কালেও তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে যুদ্ধের এবং পতাকার বিধান প্রতিপালন করিতে হইয়াছে। আমি প্রস্তুত আছি। (I had to obey the rules of war and my flag. I am ready) তাঁহার মুখে উচ্চারিত শেষ কথা "Gsttesglaubiger"। এই জার্ম্মাণ কথার অর্থ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। যেসব খৃষ্টান নাৎসী পার্টির নির্দ্দেশে ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়াছিল অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত তাহাদের জন্ত এই শব্দটি তৈয়ার করা হইয়া ছিল। ইসরাইলের আদালতের রায়ে বলা হইয়াছে যে, একজন সৈনিক সব সময় তাহার বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে পারে না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, তাহার একটা সীমা আছে যাহার বেশী কোন সৈনিক যাইতে পারে না। এই সীমা রেখার নাম মানবতা। আইখম্যানের ফাঁসীর সংবাদ ইসরাইলের অধিবাসীরা শান্ত ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। ইসরাইলের বাহিরে অধিকাংশেরই অভিমত এই যে, আইখম্যানের বিচার এবং শাস্তি ন্যায় সঙ্গত-ই হইয়াছে। কিন্তু আইখম্যানের চিতাভস্ম ভূমধ্যসাগরের সলিল রাশিতে বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে নাৎসীবাদের শেষ চিহ্নও কি বিলুপ্ত হইয়াছে।

## আলজেরিয়ায় শেষ মরণ-কামড়—

আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেই ১লা জুলাই (১৯৬২) আলজেরিয়া সম্পর্কে গণভোট গ্রহণ করা হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভোটে আলজেরিয়া যে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, অবসান হইবে আলজেরিয়ার ১৩২ বৎসরের পরাধীনতা তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৫৪ সালের ১লা নবেম্বর হইতে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে ৭ বৎসর ৮ মাস পরে ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই হইবে তাহার সাফল্যময় পূর্ণ সমাপ্তি। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম অপেক্ষাও এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে। স্বাধীনতা দাবীর অপরাধে আলজেরিয়ার মুসলমানগণ যেরূপ নৃশংসভাবে নিহত

হইয়াছে ইতিহাসে বোধ হয় তাহার তুলনা নাই। এদিকে গত ৮ই মার্চ্চ সরকারী ভাবে যুদ্ধ বিরতির পর হইতে আলজেরিয়া ফ্রান্সের (Algerie Francaise) এই দাবীর শেষ মরণ-কামড় আরও শক্ত করিয়া দাঁত বসাইয়াছে।

দুই মাস হইতে চলিল আলজেরিয়ায় যুদ্ধ বিরতি হইয়াছে, কিন্তু শান্তি ফিরিয়া আসে নাই। গুপ্ত সৈন্য-বাহিনীর (O. A. S) নায়ক প্রাক্তন ফরাসী জেনারেল রাওল সালামকে গ্রেফতার করা সম্ভব হইয়াছে। এই গ্রেফতারের ফলে গুপ্তসৈন্যবাহিনী কতখানি দুর্ব্বল হইয়াছে, ওরান এবং আলজিয়ার্সে যে ভাবে মুসলমানদিগকে হত্যা করা হইতেছে উহা হইতে তাহা কিছু বুঝিবার উপায় নাই। ওরান এবং আলজিয়ার্সের রাজপথে মুসলমানদের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা একরূপ দৈনন্দিন দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে। মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকেও রেহাই দেওয়া হইতেছে না। বস্তুত গত ১৮ই মার্চ্চ যুদ্ধবিরতির পর হইতে গুপ্ত-সৈন্যবাহিনী যে মুসলমান হত্যাকাণ্ড করিয়াছে গত ২০শে এপ্রিল সালান গ্রেফতার হওয়ার পরেও তাহার তীব্রতা হ্রাস পায় নাই। গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর মুসলিম-বিরোধী সন্ত্রাসবাদের মূলে দুইটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। একটি উদ্দেশ্য পাল্টা সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিতে মুসলমানদিগকে প্ররোচিত করা। তাহারা কতদিন আর পড়িয়া পড়িয়া মার খাইবে। দৈনিক প্রায়—২০টির অধিক হত্যা করা হইতেছে। টিউনিসে অবস্থিত অস্থায়ী আলজেরিয় সরকার পর্য্যন্ত মুসলমানদিগকে রক্ষা করিতে ফরাসী বাহিনীর অসামর্থ্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। মুসলমানরা প্রত্যাঘাত করিবে না, ইহা আশা করাও সম্ভব নয়। সম্প্রতি একটি চলন্ত মোটর গাড়ী হইতে মুসলমানরা গুলীবর্ষণ করিয়া ১৭ জন ইউরোপীয় হত্যা করিয়াছে এবং আহত হইয়াছে ৩৫ জন। এই ঘটনা ঘটিয়াছে আলজিয়ার্সে। টিউনিসস্থিত অস্থায়ী আলজেরিয়া সরকার মুসলমানদিগকে প্রত্যাঘাত করিতে বিরত থাকিতে নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মুসলিম নেতারা হয়ত তাঁহাদের নীতির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। উল্লিখিত গুলীবর্ষণের জন্ত দায়ী মেজর সি আজেদিন। তিনি আলজিয়ার্সে জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতা। তিনি বলিয়াছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া নিরোধ করিবার জন্তই তিনি এই কাজ করিয়াছেন। তিনি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি কয়েক দিনের মধ্যে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলে আবার তাঁহারা আঘাত হানিবেন। কিন্তু ইউরোপীয় সন্ত্রাসবাদীরা পাল্টা আঘাত হানিতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা দুইদিনে ১১ জন মুসলমানকে হত্যা করিয়াছে।

মুসলমানরা যদি ব্যাপক ভাবে সন্ত্রাস নীতি গ্রহণ করে তাহা হইলে ফরাসী সৈন্যবাহিনী কি করিবে তাহা বলা কঠিন। তাহারা যদি মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে শান্তি-চুক্তির কিছুই আর অবশিষ্ট থাকিবে না। গুপ্তসৈন্যবাহিনীর একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। গুপ্তসৈন্যবাহিনীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল, সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্য দ্বারা ওরান এবং আলজিয়ার্সে মুসলমানদিগকে কোণঠাসা করিয়া রাখা। এই ভাবে আলজিরিয়ার প্রধান সহরগুলিতে ইউরোপীয়দের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আলজিরিয়ার পল্লী অঞ্চলগুলিতে থাকিবে মুসলমানদের অধিকার। এইভাবে কার্য্যতঃ আলজিরিয়া বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এই উদ্দেশ্য যে কতকটা সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মুসলমান পুরুষরা তাহাদের মহল্লার বাহিরে বড় যায় না। ইউরোপীয়দের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিবার জন্ত মুসলমান স্ত্রীলোকেরাই পথে বাহির হয়। কিন্তু আলজিয়ার্সে গুপ্তবাহিনী ৪০ জনেরও অধিক মুসলমান স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছে।

কিছুদিন হয় গুপ্ত সৈন্যবাহিনী মুসলিম হত্যা ছাড়াও আরও দুইটি কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছে : একটি পোড়ামাটি নীতি, আর একটি ইউরোপীয়ানদের আলজেরিয়া ত্যাগ। ফরাসী সরকার স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আলজেরিয়ার যে সকল উন্নতি-সাধন করিয়াছেন, ইউরোপীয়দের আলজেরিয়া ত্যাগের পূর্ব্বে সেগুলি সমস্তই ধ্বংস করাই হইল পোড়ামাটি নীতির উদ্দেশ্য। স্বাধীন আলেজেরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত যাহাতে ইউরোপীয় ম্যানেজার টেকনেশিয়ানদের সাহায্য না পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যেই ইউরোপীয়দের আলজেরিয়া ত্যাগের নীতি গৃহীত হইয়াছে। গত ৩১শে মে (১৯৬২) গুপ্ত সৈন্যবাহিনী আকস্মিকভাবে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এই যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্য ছিল আলজেরিয় জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের সহিত গোপন আলাপ-আলোচনা দ্বারা ইউরোপীয়দের জন্ত এভিয়ান চুক্তি অপেক্ষাও অধিকতর সুবিধা আদায় করা। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীশ্রেণীর একদল প্রতিনিধি রোচের নোয়েরে (Rocher noir) প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী শাসন পরিষদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, ইউরোপীয় স্বতন্ত্রপাটির স্বীকৃতি যে সকল সহরে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বেশী সেই সকল সহরের বিশেষ মর্য্যাদা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইউরোপীয়দের বলিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব দাবী করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। এই সাক্ষাৎকারের ফল কি হইয়াছে তাহা জানা যায় না। কিন্তু টিউনিসস্থিত অস্থায়ী আলজেরীয় সরকার সুস্পষ্ট ভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতির পর আবার পোড়ামাটি নীতি এবং ইউরোপীয়দের আলজেরিয়া ত্যাগ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। আলজেরিয়া স্বাধীন হইলে গুপ্ত বাহিনীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ফরাসী সৈন্যবাহিনী আর থাকিবে না, ফরাসী পুলিশের স্থান গ্রহণ করিবে মুসলিম পুলিশ। গুপ্ত বাহিনীর ফরাসী আলজেরিয়ার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

## লাওস-সঙ্কটের সমাধান—

অবশেষে লাওস-সঙ্কটের একটা সমাধান হইয়াছে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে লাওসের তিন প্রিন্স একমত হইয়াছেন। এক বৎসর পূর্ব্বে ভিয়েনা সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রেসিডেন্ট কেনেডী বলিয়াছিলেন যে, শুধু একটি মাত্র বিষয়ে—লাওসে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি এবং মঃ ক্রুশ্চেভ একমত হইয়াছেন। অতঃপর এক বৎসরের মধ্যে দক্ষিণপন্থী লাওস সরকারের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স বোন ওঁম্, প্যাথেট লাওয়ের নেতা প্রিন্স সৌফানৌভং এবং নিরপেক্ষ দলের নেতা সুভান্না ফৌমা লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে একমত হওয়ার জন্ত পাঁচবার সম্মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু বোন ওঁমের অনমনীয় জেদের জন্ত

পাঁচবারই সম্মেলন ব্যর্থ হয়। গত মে মাসে (১৯৬২) প্যাথেট লাও বাহিনী নামথা সহরটি দখল করায় লাওসের সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠে। সমগ্র লাওস প্যাথেট লাও বাহিনীর দখলে চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা প্রতিরোধ করিবার জন্য মার্কিণ সপ্তম নৌবাহিনীর নৌসৈন্য থাইল্যাণ্ডে অবতরণ করে। অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, লাওসে আবার ব্যাপক এবং ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এইরূপ গৃহযুদ্ধে সমগ্র লাওস প্যাথেট লাও বাহিনীর হাতে চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নিরোধের জন্য মার্কিণ বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ হইতে পারে এবং হস্তক্ষেপ করিলে উত্তর ভিয়েটনাম, কম্যুনিষ্ট চীন এবং সোভিয়েট রাশিয়াও নীরব দর্শক হইয়া থাকিবে না এইরূপ সম্ভাবনাও বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ অবস্থা সৃষ্ট হইলে লাওসে যদি তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের সূচনা না-ও হয়, তাহা হইলে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার উহাতে জড়িত হইয়া পড়া রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না।

লাওসের উল্লিখিত আসন্ন সঙ্কটের প্রাক্কালে নিরপেক্ষ নেতা প্রিন্স সুভান্না ফৌমা এক চরম প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তিনি জানাইয়া দেন যে, হয় ১৫ই জুনের মধ্যে লাওসে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইবে, না হয় তিনি তাঁহার প্যারীর বাসভবনে ফিরিয়া যাইবেন এবং এই ব্যাপারে তিনি একেবারে হাত ধুইয়া ফেলিবেন। অবশেষে গত ৭ই জুন লাওসের তিন প্রিন্স ষষ্ঠবারের জন্য সম্মেলনে মিলিত হন এবং দপ্তর বণ্টন সম্পর্কে একটা মীমাংসা হয়। জেনেভায় চতুর্দ্দশ শক্তির সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন লাওসের প্রধানমন্ত্রী হইলে নিরপেক্ষ পন্থী সুভান্না ফুমা এবং তাঁহার দলই পাইবেন দেশরক্ষা দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর। বৌন ঔমের দল তাহাতে এতদিন রাজী হন নাই। তাঁহাদের যুক্তি ছিল, সুভান্না ফৌমা যতখানি নিরপেক্ষ তাহা অপেক্ষা বেশী কম্যুনিষ্ট অনুরাগী। গত জানুয়ারী মাস হইতে মার্কিণ সাহায্য বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ দুইটি দপ্তর বৌন ঔম নিজের হাতে রাখিবার দাবী ছাড়েন নাই। একদিকে প্যাথেট লাও কোয়ালিশন সরকার গঠন করিতে ইচ্ছুক থাকা এবং সমগ্র লাওস প্যাথেট লাওয়ের হাতে চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা এবং আর একদিকে সমগ্র দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় গৃহযুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়ার আশঙ্কায় বৌন ঔমের প্রতি আমেরিকার চাপ বৃদ্ধি অবশেষে বৌন ঔমকে ঐ দুইটি দপ্তরের দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। তিন প্রিন্সের ষষ্ঠ সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করিয়া যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে সুভান্না ফুমা প্রধানমন্ত্রী হইবেন। প্যাথেট লাওয়ের নেতা সৌফানোভং এবং দক্ষিণপন্থী দলের সামরিক অধিনায়ক জেনারেল ফৌমি নোসাভান ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হইবেন। এবং বৌন ঔম আর মন্ত্রিসভায় থাকিবেন না।

মতৈক্য হওয়া সম্ভব হওয়ায় প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এবং রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ উভয়েই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই কোয়ালিশন সরকার কার্য্যকরী হইবে কিনা সে-সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। মঃ ক্রুশ্চেভ প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর নিকট এক বাণীতে বলিয়াছেন যে, লাওসীয় সমস্যার সমাধানের জন্য একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হওয়ায় এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইয়াছে যে, এই পথেই বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর মনোভাব সংযত। লাওস সম্পর্কে তিন প্রিন্সের মতৈক্যকে তিনি আশাপ্রদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, লাওসে তো শুধু আরম্ভ মাত্র এবং এক অস্থায়ী ব্যাপার। কি ভাবে এই মতৈক্য কার্য্যকরী হয় তা দেখিবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি আমরা পারি তাহা হইলে অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করিতে পারিব। তাঁহার এই উক্তির মধ্যে লাওসের মতৈক্য কার্য্যকরী হওয়া সম্পর্কে একটা সন্দেহের ভাব প্রকটিত রহিয়াছে। প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁহারা একমত হইবেন, এই বিষয়েও তাঁহাদের মতৈক্য হইয়াছে। ইহার ফল দাঁড়াইবে এই যে, প্রত্যেক দলই যে-কোন বিষয়ে ভেটো প্রদান করিতে পারিবে। কেহ কেহ মনে করেন, যে অবশেষে কম্যুনিষ্টরাই প্রাধান্য লাভ করিবে এই আশাতেই তাঁহারা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে সম্মত হইয়াছেন। তা ছাড়া মার্কিণ সরকারের দৃষ্টিতে প্যাথেট লাওয়ের সমস্যাটা এখনও রহিয়া গিয়াছে এবং এ সমস্যাটি বড় সহজও নয়। লাওসের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই তাহাদের দখলে। প্যাথেট লাও বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া সৈন্যদিগকে জাতীয় বাহিনীতে গ্রহণ করা সাফল্যের সহিত কার্য্যকরী হইবে কি না, মার্কিণ সরকার এই প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তা ছাড়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া উভয়েই বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের কথা বলিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অনুমান করে যে, প্যাথেট লাওকে সাহায্য করিবার জন্য ১০ হাজার উত্তর ভিয়েটনামী সৈন্য লাওসে আছে। সোভিয়েট রাশিয়াও বলিবে যে, উপদেষ্টা হিসাবে তিন শত মার্কিণ সৈন্য তো লাওসেই রহিয়াছে, তা ছাড়া পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র থাইল্যাণ্ডে রহিয়া গেল বিপুল সংখ্যক মার্কিণ সৈন্য। প্যাথেট লাও থাইল্যাণ্ড হইতে মার্কিণ সৈন্য অপসারণের দাবী করিবেই, ইহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সে দাবীকে আমল দিবে না তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

## দক্ষিণ ভিয়েটনামের সমস্যা—

লাওস উষর এবং ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দেশ হইলেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় উহার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উহার চারিদিক ঘেরিয়া থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ ভিয়েটনাম, কম্যুনিষ্ট চীন, উত্তর ভিয়েটনাম, ব্রহ্মদেশ এবং কাম্বোডিয়া এই ছয়টি রাষ্ট্র রহিয়াছে। এই ছয়টি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক রূপ এবং প্রকৃতি যে বিভিন্ন, তাহা কাহারও অজানা নয়। থাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ ভিয়েটনাম পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুরাগী। ব্রহ্মদেশ এবং কাম্বোডিয়া নিরপেক্ষ। চীন ও উত্তর ভিয়েটনাম কম্যুনিষ্ট দেশ। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরে এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলের দেশগুলি সদ্য স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি যে দুর্ব্বল, তাহা অনস্বীকার্য। এই দেশগুলি পশ্চিম শক্তিবর্গ এবং কম্যুনিষ্ট শিবিরের টাগ অব ওয়ারের বিষয়বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার লাওস সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা, নিরপেক্ষ লাওসে সামরিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে কম্যুনিষ্ট অনুরাগী লাওটিয়রাই সুযোগ

সুবিধা পাইবে। উত্তর ভিয়েৎনাম লাওসের প্যাথেট লাও অধিকৃত অঞ্চলের ভিতর দিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েটকং বা কম্যুনিষ্ট গরিলাদিগকে সাহায্য প্রেরণ করিয়া থাকে। মার্কিণ সরকারের সামনে প্রশ্ন এই যে, উত্তর ভিয়েৎনাম কি লাওসের নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত লাওসের ভিতর দিয়া ভিয়েটকংদিগকে সাহায্য করা বন্ধ রাখিবে? মার্কিণ সরকার এবং মার্কিণ সরকার সমর্থিত এবং মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের কাছে যে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তুই বৎসর ধরিয়া ভিয়েটকং গরিলাদের অভিযান চলিতেছে। ভিয়েটকং এবং তাহাদের সমর্থকদের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারী বাহিনীতে সৈন্ত সংখ্যা তুই লক্ষ। তাহাদের সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে ৯ হাজার সৈনিকের একটি মিশন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অবস্থান করিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও ভিয়েটদিগকে নির্ম্মূল করা যেমন সম্ভব হয় নাই, তেমনি জনসাধারণেরও আর্থিক অবস্থারও কোন উন্নতি হয় নাই। দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের সমস্তা যে সামরিক সমাধানের সমস্তা নয় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট নো দিন দিয়েম তাহা বুঝিতে চাহেন না। তিনি ডিক্টেটরের মতই শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার প্রধান গুণ তিনি ভয়ানক কম্যুনিষ্টবিরোধী। তাঁহার এই গুণের জন্ত মার্কিণ সরকার তাঁহার ডিক্টেটরী নীতিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। সামরিক দিক হইতেই ভিয়েটকং এবং তাহাদের সমর্থকদিগকে দমন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমানে যে নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা প্রত্যেক গ্রামকে তুর্গে পরিণত করা। যেখানে তাহা সম্ভব হইতেছে না সেখানে নূতন গ্রাম-তুর্গ নির্ম্মাণ করা। এই নূতন সামরিক পদ্ধতি কতখানি সাফল্য লাভ করিবে তাহা বলা কঠিন। ভিয়েটকংদিগকে বিতাড়িত করা হয়ত দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু গ্রাম-গুলিকে ভিয়েটকং শূন্ত করিয়া রাখা অসম্ভব। সেইজন্তই গ্রামগুলিকে তুর্গে পরিণত এবং গ্রাম তুর্গ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামগুলিতে স্থায়ীভাবে সৈন্ত রাখা অসম্ভব ব্যাপার। তা'ছাড়া আরও একটা বিষয় ভাবিবার আছে। বলা হইয়া থাকে যে, ভিয়েটকংরা জবরদস্তি করিয়া কৃষকদিগকে তাহাদের দলে ভিড়াইয়া থাকে। ভিয়েটকংদের সন্ত্রাসবাদের অধিকতর সরকারী সন্ত্রাসবাদ প্রয়োগ, সমাধানের পথ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কৃষকদের জীবনযাত্রামানের উন্নতি করিতে না পারিলে সৈন্তবাহিনী দ্বারা কোন সমাধান সম্ভব হইবে না। ভিয়েটকংরা যদি উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে লাওসের ভিতর দিয়া সাহায্য পাইতে থাকে, তাহা হইলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমস্তা আরও কঠিন হইয়া উঠিবে, এই আশঙ্কা মার্কিণ সরকার উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

# শতং বদ মা লিখ

কোন চুক্তিপত্র বা কোন কিছুতে সই করার আগে ভালো করে চিন্তা না করলে তা পরিণামে সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে পারে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল ইংল্যাণ্ডে লর্ড জাষ্টিস মেলিস এক আইন পাশ করেন, এ সম্বন্ধে তাতে বলা হয় যে, সাধারণ ক্ষেত্রে কোন চুক্তিপত্রের সই যদি জাল না হয় তাহলেই আইনতঃ তা সিদ্ধ হতে বাধ্য। যাঁর সই তিনি যদি কিসে সই করছেন তার অর্থ না বুঝে সই করে থাকেন তাহলেও আইনের চোখে তার বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। ইংল্যাণ্ডে আজও এই আইন অনুসারেই কাজকর্ম নিষ্পন্ন হয়ে চলেছে। ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের এসেক্সে ঘটিত একটি ব্যাপারে উপরোক্ত আইনের সমর্থন পাওয়া যায়, এক ভদ্রলোক নিজের পুরাতন মোটরকার ও মাসিক দশ পাউণ্ড নয় শিলিং হারে মোট তিনশো সাতাত্তর পাউণ্ড দেওয়ার চুক্তিতে একটি নূতন মোটরকার খরিদ করেন। কথামত এক মাসের টাকা দেওয়ার পরই তাঁর আর্থিক অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তাঁদের জানিয়েছেন যে চুক্তিমত টাকা দিতে তিনি অক্ষম ও নূতন গাড়ীটি ফেরৎ দিয়ে চুক্তি হতে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছুক। গাড়ীটি ফেরৎ দিয়েও কিন্তু তাঁর রেহাই হয় না, চুক্তির খেলাপ করার জন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ বাবদ তু'শো ছয় পাউণ্ড তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নেয় সহজেই। সব কিছু কেনা-বেচার আগেও ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষকেই বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রের ধারাগুলি বুঝে নিতে হয়, নচেৎ একবার স্বাক্ষর হয়ে গেলে পর আর কোনই পথ থাকে না। সম্পত্তি বেচা-কেনা ব্যাপারে বিশেষ ভাবেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথে বসাও বিচিত্র নয়, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এ কথাটি বিশেষ ভাবেই খাটে, স্বভাবতঃ আইন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হওয়ার দরুণ মেয়েরা অতি সহজেই একটি ছোট্ট স্বাক্ষরের ফলে দারুণ বিপদের মধ্যে পড়ে যেতে পারেন, যার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথ-ই আর খোলা থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে মেয়েদের ঠকিয়ে সম্পত্তি বেহাত করে নেওয়াটা এখনও প্রায় পুণ্য কার্য্যের মধ্যেই গণ্য হয়ে থাকে। অতএব যে কোন চুক্তিপত্রে সই করার আগে ভালো করে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করুন, তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করুন, তারপর কলমটি তুলে নেবেন হাতে।

ধারাবাহিক আত্ম-জীবনী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**পরিমল গোস্বামী**

১২

আমি ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে শশিশেখরকে বলেছিলাম, আপনার নিজের জীবন-কথা একটুখানি লিখে দিন, খুব ইনটারেস্টিং হবে। বলেছিলেন না না, সে কেমন হবে। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই যুগান্তর সাময়িকীর জন্য একটা লেখা তৈরি করলেন—তার নাম দিলেন "নির্বিকার নির্বিচার শশিশেখর।" আমাকে জানালেন, লেখা তৈরি।

কিন্তু লেখাটি নিয়ে দেখি নিজে নিজের ক লিখছেন না, অন্যের হয়ে লিখছেন। অথচ কে যে লিখছেন তার নাম নেই। তখন আমি আমাদের বুড়োদা অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে ধরলাম, দাদা, বিপদ উপস্থিত—বাঁচান। লেখাটি আপনার নামে ছেপে দিচ্ছি। সর্বংসহ প্রেমাঙ্কুর রাজি হলেন, এবং আমিও আরাম বোধ করলাম। সেটি ছাপা হয়েছিল যুগান্তর সাময়িকীতে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩তে।

লেখাটির আরম্ভ ছিল এই রকম—"শশিশেখর নামের উপর নিবিড় মেঘের ছায়ার মতন ম্লেচ্ছ ইংরেজী ছদ্মনাম এস, এস, বসু ঢাকা আছে। হঠাৎ তাঁকে বাংলা কলম ধরতে দেখে এই ধূম্ররাশি বেষ্টিত প্রাচীন বহুজনবিদিত নামকে ইংরেজী বন্ধনলতা ছিন্ন ক'রে বাংলা সাহিত্যের হাটে বসিয়ে অনেকেরই ইচ্ছা হয়েছে জিজ্ঞাসা করেন কস্ত্বং? নতুন না আশি বছরের পুরাতন কলম?

"পশ্চিমের এক বিখ্যাত কাগজ একবার পাঠকদের আগ্রহ মিটিয়েছিল এস, এস সত্য না মিথ্যা? [এই প্রশ্ন তুলে।] তা প'ড়ে ষ্টেটসম্যান (১৮-৯-১৯০৩) লিখল "বাংলা দেশে এঁর পরিচয় দান বাতুলের কাজ। ঘরোয়া কথার মতন এস, এস, বোস নাম পাঠকের মুখে মুখে আছে।

..."শশিশেখর বলেন, আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্য পড়ি না, বুঝি না।' অথচ শোনা যায় তিনি জয়দেব চণ্ডীদাস মধুসূদন বায়রন সেক্সপীয়ার ইত্যাদি অনর্গল আউড়ে যান। তিনি বলেন 'আমি সাংবাদিক নই, একবার মাত্র একটি ডেলি পেপার এডিট করেছিলাম, কিংবা নিউজ সিনডিকেট খুলেছিলাম ব'লে আমাকে সাংবাদিক বলতে পারেন। তেমন তো আমি নৌকার ব্যবসা করেছিলাম, তা বলে কি আমি মাঝি?

...বলেন বটে সাহিত্যিক নই কিন্তু অনেক বৃদ্ধ পাঠক ষ্টেটসম্যানের এই লীডিং আর্টিকল পড়েছেন—

In the paragraph ( in the moral and material progress in India, 1903-4 ) dealing with the publication in the U. P., the only piece of literature in the proper sense is said to be the Humorous Sketches by Mr. S. S. Bose who will doubtless be flattered and gratified by this official notice—Statesman 25-8-05.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যোগীন বোস, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এঁকে পূর্ণিমা সম্মেলনে নিয়ে যেতেন এবং অন্যান্য বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

শশিশেখর বসু বাংলায় বরাবর লিখবেন বলেই প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর হল না তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে। মাসিক বসুমতীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম এবং কয়েকটি কৌতুক প্রবন্ধ ছাপাও হয়েছিল।

**রাজশেখর সন্দর্শনে**

একটা গল্পে পড়েছিলাম এক ভদ্রলোক কয়েকজন লোককে উপদেশ দিচ্ছিলেন—"সব কাজেই নিচে থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হয়, এক লাফে উপরে ওঠা যায়না। জীবনে সফল হ'তে হ'লে নিচে থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

একজন শ্রোতা তা শুনে বলল, "আমার দ্বারা তা হবে না মশায়।" কেন হবে না? "হবে না, কারণ আমি কুয়ো খুঁড়ি।"

আমার অবস্থাও প্রায় এই লোকটার মতো। আমিও উপর থেকে খুঁড়ে নিচে নামছি। প্রথমে বড়দা শশিশেখর, তারপর মেজদা রাজশেখর। (তার আগে অবশ্য গিরীন্দ্রশেখরকে দেখেছি, তাঁর গবেষণাগত রচনা-পাঠ শুনেছি, কিন্তু অপরিচয়ের দূরত্বে থেকে।)

রাজশেখরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্ব-প্রস্তুতির কথা আগেই বলেছি। শশিশেখর কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাড়ী থেকে আমাকে তুলে নিলেন ১৭ই আগষ্ট (১৯৫৩)। আমরা পৌনে আটটায় রওনা হয়ে ৭২, বকুল বাগান রোডে গিয়ে পৌঁছলাম। রাজশেখরকে

আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল। নিচের তলায় তাঁর বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। বড় একখানা টেবিল, তার একদিকে রাজশেখর, বিপরীত দিকে আমরা।

অল্প দু-একটা কথায় আমাদের আলাপ আরম্ভ হল। রাজশেখর স্বল্পবাক। আমি প্রায় হতবাক। গুণী লোকের সান্নিধ্য কেমন একটা অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে। মনের চোখে মাত্র তা ধরা পড়ে। তার মধ্যে আনন্দ, বিস্ময় এবং আরও বহু রকম সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট ভাব মিলিয়ে থাকে। তাই সে সময়কার মনের অবস্থা ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না।

তাই প্রথমেই আলাপ ঠিক জমল না। তারপর একটু একটু ক'রে অবস্থা সহজ হয়ে এলো। কথা রাজশেখরই বলতে লাগলেন বেশি। আমি তাঁকে শুধু দেখতে এসেছি। তাঁর মূর্তি ছাপা ছবিতে ভিন্ন দেখিনি। কিন্তু তবু আমি তাঁকে দেখেছি। দেখেছি শ্যামানন্দের ভিতর, গাণ্ডেরিরামের ভিতর, পেলব রায় বিরিঞ্চিবাবার ভিতর। জগদ্গুরু, নাদু মল্লিক, আই কেদার চাটুজ্জে, নো জু গার্ডেন, জাবালী, নন্দলাল ইত্যাদি সবার মধ্যেই দেখেছি তাঁকে। কিন্তু সামনে যিনি প্রত্যক্ষ তাঁকে দেখে, অন্তত তাঁর মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই তিনি নাদু মল্লিক না বিরিঞ্চি বাবা।

এর কয়েক দিন আগে 'নিকষিত হেম' নামক একটি গল্প পাঠিয়েছেন আমাকে যুগান্তর পূজা-সংখ্যার জন্য। সেই প্রসঙ্গে রাজশেখর বললেন, গল্পটা অন্য একখানা কাগজের জন্য লেখা ছিল, আপনি পেয়ে গেলেন। আমি বললাম, আমি আদায় ক'রে নিয়েছি, সমস্ত পাপ আমার, সব পাপ কাসেম আলির, আপনি শুধু গল্প দিয়ে খালাস।

একটুখানি মৃদু হাসলেন শুনে।

পাঠকদের সম্বন্ধে মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই যে, কাসেম আলির প্রসঙ্গটা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্প থেকে নেওয়া।

শুনলাম রাজশেখর কারও অনুরোধ পেলেই লিখে দেন না, শীতকালে অবসর সময়ে নিজের মন থেকে লিখতে আরম্ভ করেন। অর্থাৎ চাপে প'ড়ে লেখার অভ্যাস নেই। কথাটা শুনেই একটা আঘাত পেলাম। নিজের অবস্থাটা স্মরণ করলাম। চাপে না পড়লে যে কখনও কলম ধরে না, তার কাছে এটি একটি আশ্চর্য সংবাদ। শুনেছি বিধাতা আনন্দ থেকে বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বিধাতাকে অনুকরণ করিনি কখনও, তাই সে অভিজ্ঞতাও আমার নেই। কারও আছে শুনলে চমকে উঠি।

শশিশেখর আমার ডান ধারে বসে আছেন। তিনি কানে কম শুনতে আরম্ভ করেছিলেন তাই রাজশেখরের মুখের মৃদু সুরের কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল না। রাজশেখরও কানে তখন কম শুনতেন, কিন্তু খুব বেশি কম নয়। তিনি তাঁর বড়দার প্রসঙ্গ তুললেন। বড়দা নির্বিকার। তিনি আমাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি ও ইচ্ছামত সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। অসুস্থ মানুষ, কিন্তু অত্যন্ত ভাল মানুষ বলেই আমার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করলেন। তিনি যে কি পরিমাণ ভাল মানুষ ছিলেন, তার পরিমাপ করা আমার সাধ্য নয়। আজ তাঁকে স্মরণ করলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হই, আনন্দে চোখে জল আসে।

রাজশেখর বলতে লাগলেন "আপনি দাদাকে বাংলা লেখাচ্ছেন কিন্তু উনি বরাবর ইংরেজীতেই লিখেছেন। দাদার Marriage of Elephants অদ্ভুত ভাল রচনা। ভেবেছিলাম আমিই ওটা থেকে বাংলা অনুবাদ করব, কিন্তু এখন বোধ হয় দাদাই পারবেন।

দাদা কিন্তু পাশে বসে আছেন চুপ ক'রে। অসুস্থ বোধ করছেন মনে হ'ল।

এই সময়ের কিছু আগে 'কথা সাহিত্য' মাসিকপত্র রাজশেখর বিশেষ সংখ্যা রূপে দেখা দেয়। তাতে আমার একটি রচনা ছিল। লেখাটির নাম ছিল 'মহাবিদ্যা'র জগদ্গুরুর উদ্দেশে। (এই রচনাটি আমার ম্যাজিক লণ্ঠন নামক বইতে সঙ্কলিত হয়)।

লেখাটির প্রথম দিকটা একটুখানি উদ্ধৃত করি।—

"জগদ্গুরু, তোমার কাছ থেকে মহাবিদ্যার পাঠ নেবার জন্য তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কেউ কি তোমার ঠিকানা জানে? তুমি যে-অমৃতের অধিকারী তার একটুখানি না পেলে যে আর চলে না। সবাইকে প্রশ্ন করি, তুমি কোথায়। যে অমৃত লুকানো তোমার সে কোথায়!

"শুনতে পাই ওরা দীক্ষা নিয়ে নিয়েছে; সেই ওরা—সেই হোমরাও সিং, চোমরাও আলি, লুটবিহারীর দল।

"কিন্তু শুধুই কি শুনতে পাই! বুঝি না কি! মর্মে মর্মে কি উপলব্ধি করি না প্রতিদিন?

"করি জগদ্গুরু।

"চায়ে যখন মিষ্টির টান পড়ে। খেতে বসে যখন দাঁতে পাথর ভাঙি। যখন কাপড় কিনতে গিয়ে জাল এবং ওষুধ কিনতে গিয়ে জল কিনে আনি। একসের ওজনে যখন তেরো ছটাক পাই। তখনই তো বুঝতে পারি এ তোমারই মায়া।"...

'রাজশেখর বিশেষ সংখ্যা'য় এই লেখাটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জগদ্গুরুর শিষ্য হয়ে দেশসুদ্ধ লোক সুখে আছে, আমিও তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, এ সব কথা সর্বভারতীয় চোরের রাজত্বে সবাই খুব পছন্দ করেছিলেন। গড্ডলিকা বইয়ের মহাবিদ্যার জগদ্গুরুও চুরি বিদ্যা শেখানো জন্য কলেজ খুলেছিলেন। (কলেজই বলা চলে, কারণ কলেজকে মহাবিত্তালয় বলা হয়)।

রাজশেখরও বললেন আমি লেখাটি পড়েছি। আমার মহাবিদ্যা [illegible] দুর্বল ছিল।—কিন্তু আপনি ওকে উদ্ধার ক'রে ওর মর্যাদা দি[illegible]ছেন।

আমি বললাম, মহাবিদ্যা একটি উৎকৃষ্ট স্যাটায়ার, সেই জন্যই আমি তার ভিতর থেকে আপনার জগদ্গুরুকে বেছে নিয়েছি।

এই লেখাটি অনেকে পছন্দ করেছিলেন। এবং কেন করেছিলেন তার হেতু বর্ণনা করেছিলেন শশিশেখর। তিনি একখানা চিঠিতে আমাকে জানিয়েছিলেন, সকল মানুষের মধ্যেই একটি ক'রে চোর আছে, সেজন্য চোরদের কথা আমাদের এত ভাল লাগে।

বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে কথা উঠল। তিনি ভাষার উপর জোর দিলেন। বললেন ভাষার অনাচার হচ্ছে খুব বেশি, একে আটকানো যাচ্ছে না। বললেন ইংরেজীর যে সব পরিভাষা তৈরি হয়েছে তার ব্যাপক ব্যবহার হয় তো দেখিতে হবে। বললেন, তাঁর রচিত পরিভাষাই সরকার বেশির ভাগ নিয়েছেন। বলে একখানি পরিভাষার সংকলন ড্রয়ার থেকে বা'র ক'রে আমাকে দেখালেন।

বাংলাভাষায় অতিরিক্ত ছেদের চিহ্নের ব্যবহার বা পাংচুয়েশনের

বাড়াবাড়ি তাঁর ভাল লাগে না। আমি বললাম রবীন্দ্রনাথ তো জিজ্ঞাসার চিহ্ন কদাচিৎ ব্যবহার করেন। জিজ্ঞাসার চিহ্নের স্থলে দাঁড়ি। আরও প্রাচীন বাংলায় দাঁড়ি পর্যন্ত ব্যবহার হয়নি, কমা তো নয়ই। বললাম, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা করা যায় না। কোনো ইংরেজের লেখায় পড়েছি, তিনি তাঁর কোনো লেখার বিশেষ স্থানের কমা ছাড় গেলে বড়ই বিচলিত হয়ে পড়তেন। আরও বললাম, অনেক সময় পাংচুয়েশনের ভুলে ভয়ানক সব কাণ্ড ঘটতে পারে। আমি প্রায় চোদ্দ বছর আগে একটি গল্প লিখেছিলাম যাতে চিঠিতে যথাস্থানে একটি কমা না থাকাতে নায়ক-নায়িকার মধ্যে চূড়ান্ত ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ হয়।

এইভাবে আরও দুএক মিনিট কথা চলার পরই শশিশেখর একটুখানি অস্থির বোধ করতে লাগলেন, তাই আলাপ ঐখানেই বন্ধ করে সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। 'কার্যকরী' কথাটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তিনি শুধুই কথাটা উল্লেখ করে বলেছিলেন, এ রকম কত যে কথা বাংলাভাষাকে নষ্ট করেছে তার শেষ নেই। এ বিষয়ে তিনি এর দুবছর পরে একখানা চিঠিও দিয়েছিলেন আমার এক চিঠির উত্তরে।

কার্যকরী কথাটা কি ক'রে যে চলছে তা বোঝা যায় না। আমি নিজে অবশ্য এ শব্দ ব্যবহার করি না, যেমন করি না লজ্জাকরী, দুষ্করী বা অপমানকারী, কার্যকর লজ্জাকর দুষ্কর এবং—অপমানকর কথাই ব্যবহার করি। ১৯৫৫ তে রাজশেখর আমাকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন সেখানা এই—

১৭ বকুলবাগান রোড
২৩-১-৫৪

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ২১ তারিখের চিঠি গতকাল পেয়েছি। খবরের কাগজে (এবং অনেক নামজাদা লেখকের বই এ) নিরঙ্কুশ বাংলা ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে, তার ত বাধা দেওয়ার শক্তি কারও আছে মনে হয় না। "কার্যকরী উপায়', 'কলিকাতায় গ্রীষ্মের দাবদাহ (forest fire) ইত্যাদি নিত্য নূতন idiom দেখা যাচ্ছে।...

আপনার
রাজশেখর বসু

সে দিন রাজশেখরের কাছ থেকে হঠাৎ বিদায় নিয়ে আসায় মনের যেন একটা অতৃপ্তি রয়ে গেল, কিন্তু উপায় ছিল না। শশিশেখরের গভীর স্নেহের উপর এভাবে অত্যাচার করতেও লজ্জা কম পেলাম না। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য হলেও রাজশেখরের প্রীতির পরিচয় পেয়ে ধন্য হলাম। তিনি মৃদুস্বরে কথা বলেন এবং কম কথা বলেন, কিন্তু মানুষটির পরিচয় তাতে গোপন থাকে না।

রাজশেখর বসু সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নেননি কখনও। এইখানে তাঁর গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য স্পষ্ট। প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানী হয়েও ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলেন, আদর্শবাদী ছিলেন, বাঙালীকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে সমস্ত জীবন চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞানী চরিত্রের সঙ্গে খুব মেলে না। আর রাজশেখর সাহিত্য সাধনার মধ্যেও বিজ্ঞানীর মনোভাবটি বরাবর রক্ষা ক'রে গেছেন। তিনি সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গতি মানুষের শঠতা প্রতারণা প্রভৃতিকে সাহিত্যের মধ্যে একই বিশ্লেষণ করেছেন এবং রসমণ্ডিত করেছেন। কোথাও কাউকে উপদেশ দেননি। প্রবন্ধেও না, গল্পেও না। এ রকম ঠাণ্ডামাথা, যাকে সোজা বাংলায় বলে স্থিরমস্তিষ্ক—লোক সহজে দেখা যায় না। রাজশেখরের এই অনুদ্বিগ্ন এবং অনেকটা উদাসীন (হয় তো বা বাইরের দৃষ্টিতে উদাসীন) চরিত্র দেখে মনে হয় প্রবণতা থাকলে তিনি উঁচুদরের খুনী হতে পারতেন। নিজে সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে একের পর এক মানুষ খুন ক'রে যেতেন। কিন্তু প্রবণতা ছিল এর বিপরীত। বন্দুক দিয়ে পাখী শিকার করতে পারতেন না, গাছের ফল লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাতেন। নিরামিষ খেতেন ছেলেবেলা থেকে।

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হবার কৌশল তিনি সম্ভবতঃ ছেলেবেলা থেকেই জানতেন। পরবর্তীকালে যে জীবনদর্শন তাঁকে স্থিরচিত্ততায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা তাঁর একখানি চিঠিতে কিছু পরিমাণ প্রকাশ হয়েছে।

চিঠিখানা লিখেছিলেন ১৯৫৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে। তখন আমার পারিবারিক একটি সঙ্কটকাল উপস্থিত। তিনি লিখছেন—

...চুপ করে সয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মহাভারতের সেই শ্লোক—সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্, প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ (সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যা পাবে অপরাজিত হৃদয়ে মেনে নাও)—এর চাইতে ভাল উপদেশ নেই।

রাজশেখর চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হ'লে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ উপদেশ তিনি বাইরে থেকে লৌকিকতারূপে বর্ষণ করেননি, নিজের সমস্ত অন্তরের বিশ্বাস থেকে করেছেন, এবং এটি তাঁর শুধু বিশ্বাস ছিল না, ধর্ম ছিল।

শশিশেখরকে আমি ইংরেজী ছাড়িয়ে বাংলা লেখায় উৎসাহিত করেছি এজন্য রাজশেখর আমার প্রতি প্রীত ছিলেন। শশিশেখরের খুব প্রশংসা করতেন তিনি, এবং বকুলবাগান রোড থেকে মাসে অন্তত একবার বিবেকানন্দ রোডে 'বড়দা'কে দেখতে আসতেন। ১২-১০-৫৭ তারিখে আমাকে রাজশেখর একখানা চিঠি পাঠান—

প্রীতিভাজনেষু,

আমার বিজয়ার নমস্কার জানবেন। আপনি সন্তানসহ সুস্থ থাকুন, শান্তিলাভ করুন, এই কামনা করি।

আমার দাদার একটি হিন্দী কবিতা আমার এক ভাইঝির কাছে আছে। তার নকল এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে কালীপূজার সময় যুগান্তরে প্রকাশ করতে পারেন।

আপনার
রাজশেখর বসু

## মা যা হুইয়াছেন

শশিশেখর বসু

কহো কালী হামে
কৌন লুটা তুমে
খোপড়ি তোড়েগা হাম।

বোলো মা কালিকে
তুমারা শাড়ি কে
কিতনা থা মায়ী দাম ?
শাড়ি মোল দেগা,
তুমহে পিনাহে গা,
এহি তো বেটাকে কাম।
রহাঁকে বঙ্গালী
ঝুট মুট কালী
দেওয়ে ফুল কেলা আম।
ঝুটে মা-মা বোলে
খুব চন্দহ্‌ মিলে,
রুপয়া উসুল কাম।
চন্দহ্‌ কি রুপয়া
সব গল্ গয়া
খানা পিনা ধুমধাম।
বোম বোম কালী
কলকাত্তা বালী
তোবা তোবা রাম নাম।

রাজশেখর জানতেন না, এই কবিতাটি কিছুদিন আগেই আমি শশিশেখরের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে ছেপে দিয়েছিলাম।

১৯৫৫ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখে রাজশেখর আমাকে লেখেন—

…'যা দেখেছি যা শুনেছি' এই নাম দিয়ে দাদার একটি রচনা-সংগ্রহ ছাপা হচ্ছে।…আপনার উৎসাহেই দাদা বাংলা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেজন্য আমার ইচ্ছা—তাঁর বইএর একটি ছোট ভূমিকা আপনি লিখে দেন।…

এ আদেশ আমি পালন করেছিলাম। কিন্তু আমার ভূমিকায় যে অংশে সামান্য একটুখানি রাজশেখরের কথা ছিল, সেই অংশটুকু তিনি সযত্নে বাদ দিয়ে পরিবর্তিত আকারের ভূমিকাটি আমাকে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। দাদার বইয়ের ভূমিকায় নিজের নাম জড়িত ক'রে দাদার গৌরব বাড়ানোর কল্পনা সম্ভবত তাঁর পছন্দ হয়নি। এই জিনিসটি আমার খুব ভাল লেগেছিল।

ভূমিকায় শশিশেখরের চরিত্রের একটি দিকের কথা আছে। তিনি বলতেন, শব্দ ব্রহ্ম। কোনো শব্দই খারাপ নয়। সেজন্য তাঁর মুখে বা কলমে কিছু আটকাত না। বুঝতেও পারতেন না যে, তা আধুনিক বিচারে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেজন্য তাঁর লেখা থেকে অপ্রকাশিতব্য শব্দ বা কথা বাদ দিয়ে নিতে হত। তাঁকে লিখে জানিয়ে দিতাম—বড়দা, এখন এসব চলে না। বড়দা ক্ষুব্ধ হতেন শুনে। কারণ স্বাধীনভাবে লিখতে না দিলে তাঁর লেখাই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই একবার তিনি আমাকে 'ভূমিকম্প' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠিয়ে তার সঙ্গে চিঠিতে লিখেছিলেন—( ১১-১২-৫৪ )।

"ভূমিকম্প পাঠালাম, একদম নিরামিষ। ভাই, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট ও বাগবাজারে যাতে আপত্তি, তাতে তো বঙ্কিমের আপত্তি নেই!

যথা—"দুর্লভ ছোটে। হায় কাছা খুলিয়া গিয়াছে।" ( দেবী চৌধুরাণী ) ১ম খণ্ড।

"ছুটিতে যুবতীদের কাপড় খুলিয়া পড়ে।" ( ঐ ৩য় খণ্ড )।

"কি রে মাগী!"—চন্দ্রশেখর ( মাগী দেদার )।

"ভাই একটু লাইসেন্স না দিলে আমার নাম ডুববে। ভূমিকম্প প্রবন্ধে এসব কিছু নেই। ভূঁইকম্পে যখন ছুটছিলাম, তখন কাছা ঠিক ছিল।"—শশিশেখর।

'যা দেখেছি যা শুনেছি' বইয়ের ভূমিকায় এই চিঠি এবং অন্য আরও একখানা চিঠি উদ্ধৃত করেছিলাম শশিশেখরের চরিত্র উদ্‌ঘাটনে। "ভাই একটু লাইসেন্স না দিলে আমার নাম ডুববে।"—এই একটি কথায় সবখানি চরিত্র প্রকাশিত।

রাজশেখর বসু যে স্থিরচিত্ত ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ একান্তে বাস করতে ভালবাসতেন, তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় শশিশেখরের লেখা রাজশেখরের বাল্যকাল প্রবন্ধে। তিনি এক জায়গায় লিখছেন—

"দ্বারভাঙায় পড়ার সময় রাজশেখরের বয়স যেমন বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য এবং সায়েন্স বাড়তে লাগল। আমরা ভাই-ভগ্নী ও বাঙালী ঝি রাই, চণ্ডী ও গোবিন্দ বামনিকে নিয়ে থিয়েটার করতাম। রাজশেখর রামতারণের দোকান থেকে বাংলা ছ' আনা দামের নাটক পছন্দ ক'রে আনত, ও নিজে পার্ট না নিয়ে ডিরেক্‌সন দিত। আমি কৈকেয়ী সাজতাম, রাই ঝি দশরথ সেজে আমার মান ভাঙাত।…রাজশেখর কখনো বিদ্যা ফলাত না। পেটের মধ্যে বিদ্যে পুঁজি করা থাকত। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তবে বলত।"

এর পর আর একটি দিন আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। সে দিনটি ১৯৬০ সালের ২২শে জানুয়ারী। এ দিনের কথা আমি তখন অন্যত্র লিখেছি। সেই কথাগুলি আবার কিছু পুনরাবৃত্তি করছি।

২২শে জানুয়ারী ১৯৬০। এই তারিখের কয়েকদিন আগে—( ১০ই জানুয়ারী ) ইতস্ততঃতে নববর্ষের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। তার মধ্যে এই প্যারাগ্রাফ দুটিও ছিল:

"এ বছর ( ১০-১-১৯৬০ ) শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুকে সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হবে। ( এ ভবিষ্যদ্বাণী, আমি যে নিমন্ত্রণ-পত্রখানা পেয়েছি তা দেখে করছি।) দেশ তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে তাঁর প্রথম আবির্ভাব থেকেই। সে শ্রদ্ধার পরিমাণ কত, তা গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের বইয়ের তাঁর দেওয়া ইনকামট্যাক্সের পরিমাণ দেখা সম্ভব হ'লে জানা যাবে। তবে কিছুকাল হ'ল এক শ্রেণীর সমালোচক তাঁর সম্পর্কে একটা মস্তবড় আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন এই যে, তিনি আর আগের মতো লিখতে পারেন না।

"এই আবিষ্কার মস্ত আবিষ্কার সত্যিই নয়। কারণ এ কথার সঙ্গে আরও যোগ করা যেত—রাজশেখর বসু আগের মতো দৌড়তে পারেন না, কঠিন জিনিস চিবোতে পারেন না, ইত্যাদি। কিন্তু এই 'আগের মতো' মানে কি?…কোনো জিনিস চিরদিন এক রকম থাকে না, এটি আবিষ্কারই নয়। পরিবর্তনই জীবনের লক্ষণ।… মানুষ যে রসসৃষ্টি করে তা তার সজ্ঞান সৃষ্টি, তাই তার পরিবর্তন আছে। মানুষ যদি একটি ফজলি আমের গাছ হ'ত, তা হ'লে সে গাছ বৃদ্ধত্বের চরমে পৌঁছেও একই স্বাদের আম ফলাত।"…

আরও কয়েকটি প্যারাগ্রাফ এর পরে ছিল, এবং তাতে আমি

এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম যে, যদি বলি রাজশেখর বসু আগেই এখনকার মতো লিখতে পারতেন না, তা হলে কথাটা একই দাঁড়ায় না কি? ইত্যাদি।

এই লেখাটিই শুধু লিখেছিলাম, সেদিনকার সভায় আমি যেতে পারিনি। আমি রাজশেখরকে একখানা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম, "আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন আমি দূর থেকে যুগান্তরের পাতাতেই করলাম।"—আর লিখেছিলাম "আপনি দীর্ঘজীবী, দীর্ঘতরজীবী হোন, এই কামনা করি।"

আমার চিঠির উত্তর পাব আশা করিনি, কিন্তু উত্তর পেলাম! এত হৈ চৈ-এর মধ্যেও তাঁর কর্তব্য বাঁধা পথে চলে। তিনি জানালেন—( ১২-১-৬০ )

"প্রীতিভাজনেষু পরিমলবাবু, আপনার ৮ তারিখের চিঠি পেয়েছি। তুষারকান্তিবাবুর কাছে শুনেছি, আপনি আমার সম্বন্ধে যুগান্তরে লিখেছেন। এখনও পড়তে পারিনি।···চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় মাসে একদিন এখানে আসেন। যদি আপনার অসুবিধা না হয় তবে একই গাড়িতে তিনি আর আপনি এখানে আসতে ( আর ফিরে যেতে ) পারেন। আমি চিঠি লিখে দিন স্থির ক'রে আপনাকে জানাতে পারি। বেলা চারটা নাগাদ। আপনার সম্মতি পেলে সুখী হব।

'দীর্ঘজীবী, দীর্ঘতরজীবী' হবার আশীর্বাদ আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আপনি সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন। আমি চটপট নিষ্কৃতি চাই।

—আপনার, রাজশেখর বসু

এর উত্তরে সম্মতি জানাবার পর তার উত্তর পেলাম ১১শে জানুয়ারী—

"প্রীতিভাজনেষু, আপনার ১৪/১-এর চিঠি। আগামী শুক্রবার ২২শে জানুয়ারী বিকালে আন্দাজ পৌনে চারটের সময় আপনার কাছে গাড়ি যাবে। চারুবাবু থাকবেন। আশা করি আপনি এখন সুস্থ আছেন।

আপনার
রাজশেখর বসু"

[ ক্রমশঃ।

# আমাকে ক্লান্ত করো

## প্রদীপকুমার চৌধুরী

কবিতা, আমাকে ক্লান্ত করো—
তোমার কটাক্ষে আমার স্নায়ুতে ক্লান্তি আনো।
কত যুগ যুগ ধরে কোণারক হ'তে
প্রাচীন ভেনিসে আমি শুধু খুঁজেছি তোমাকে।
তাজমহলের খবর খনন করে
মনে মনে
চেয়েছি মেলাতে সম্রাট-প্রিয়ার সাথে।
আবার কখনো ট্রামে-বাসে
অনিকেত দৃষ্টি মেখে খুঁজেছি কোথায়?
কখনো ভেবেছি মাটির ফসলে তুমি
অথবা বনজ-বালা।

কোনখানে পেলাম না কোমল-যন্ত্রণা!
কবিতা, আমার তুমি কোমল-যন্ত্রণা,
আমার ক্লান্তির-ঝর্ণা—আমার আনন্দ!

সীতা অথবা হেলেন কেউ নেই আর
লঙ্কা কিংবা ট্রয় হবে নাকো ছারখার।
সভ্যযুগে যুদ্ধ প্রয়োজন হীন—
সবে শান্তি চায়।
আমি শুধু ক্লান্তি চাই
তোমার কোমলে··চেতনায়,
সাইরেন দ্বীপের মেয়ের মতো
কবিতা, আমাকে ক্লান্ত করো··ক্লান্ত করো!

# ল্যাণ্ডস্কেপ

## শ্রীঅভি-শ্যামল

এক পাল রামছাগল তাড়িয়ে নিয়ে
আগে ও পিছনে ক'টা লোক—
চলেছে
বেহালার ট্রাম-লাইন পার হয়ে
কেল্লার মাঠের দিকে।

দূরে
সড়কের বাঁকে
চিনেবাদাম বেচতে বসে
এক দেহাতী
কাকে যেন তার দেশোয়ালী ভাষায়
কিছু বলছে।···

আর
ছাতিম গাছের তলায় বসে
কোন নিষ্কর্মা বেকার
ঘোলাটে-চোখে
দূরের সেক্রেটারিয়েটের দিকে চেয়ে
সিগ্রেট ফুঁকে চলেছে
যার কাছে পৃথিবীটা এখন মৃত।

ডাইনে গোরা ছাউনী
বাঁয়ে রেস কোর্স
ট্রামের জানালায় বসে দেখি
শহরের ল্যাণ্ডস্কেপ।

# বিচিত্র যাদু-কথা

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অজিতকৃষ্ণ বসু

পরে যা জেনেছিলাম তা এখনই বলে ফেললে আমার কাহিনী শোনবার পক্ষে সুবিধা হবে। সুতরাং এখনই বলে ফেলি, এই 'মাদারি' ভ্রাতৃদ্বয়ের বড়টি অর্থাৎ প্রধান খেলোয়াড়টির নাম রশিদ রহমান, এরা কলকাতায় চলে এসেছে মীরাট থেকে। মীরাটের বাসিন্দা এরা, পথে-ঘাটে যাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়ানো এদের পেশা।

কয়েকটি টাকার খেলা দেখাল রশিদ রহমান, তাতে ওর চমৎকার হাতসাফাই দেখে প্রীত হলাম। অতি সাবলীল, জড়তাবিহীন হাতের কাজ তার। প্রথমে একটি রূপোর টাকা ডান হাতের আঙুলে বাজিয়ে দেখিয়ে পরিষ্কার বাঁ হাতের তালুর ওপর রেখে বাঁ হাত সে মুঠো করল। অর্থাৎ একটি রূপোর টাকা রইল তার বাঁ হাতের মুঠোয়। রশিদ বলল "যাদুমন্তরে বাঁ হাতের এই এক টাকাকে আমি দু'টাকা বানিয়ে দেবো।" বলে ডান হাতটা ঝলির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে যখন বার করে আনল তখন পরিষ্কার দেখা গেল তার ডান হাতে একটি রূপোর টাকা। এই টাকাটি যেন কেউ দেখতে পায়নি এই ভাব দেখিয়ে সে তার বাঁ হাতের মুঠোর ভেতরে ফেলে দিল, মুঠোটা সিকি সেকেণ্ডের জন্য খুলে। দুটি টাকার ঠোকাঠুকি লেগে একটি আওয়াজও শোনা গেল যেন।

"দেখুন আপনারা, বাঁ হাতের এই এক টাকাকে আমি দু'টাকা বানিয়ে দিচ্ছি।" বলল মাদারি রশিদ রহমান। (বলেছিল হিন্দুস্থানী ভাষায় অবশ্য ; আমি তার বাংলা তর্জমা করে দিলাম)।

দর্শকদের অনেকে বলে উঠলেন "এতে আর বাহাদুরি কি আছে? এই তো দেখলাম আরেকটা টাকা ঝুলি থেকে তুলে তুমি বাঁ হাতের মুঠোয় ফেলে দিলে, যেখানে একটা টাকা আগেই ছিল। এক আর একে দুইতো হবেই।"

তখন আস্তে আস্তে বাঁ হাতের মুঠো খুলে রশিদ দেখিয়ে দিল এক আর একে মিলে দুই না হয়ে শূন্য হয়েছে, তার বাঁ হাতের মুঠোয় একটি টাকাও নেই। কি আশ্চর্য! কোথায় গেল জলজ্যান্ত দু-দুটো টাকা?

এই দিয়ে শুরু করে এই ধরণেরই কয়েকটি টাকার খেলা কিছুক্ষণ দেখাল রশিদ। বাল্যকাল থেকে অনবরত অভ্যাস করে করে তার হাতের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি অবস্থান তার চলাফেরার মতোই অনায়াস সহজ হয়ে গেছে তার কাছে। নিরক্ষর এই মাদারির খেলা দেখাবার ভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ স্থূলতা বা গ্রাম্যতা ছিল বটে, যাকে ইংরেজিতে বলা যায় 'ক্রুডনেস' (crudeness) কিন্তু ওর হাতের দক্ষতা পরম উপভোগ্য, এবং যে-কোন যাদু-শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকরণীয় এবং লোভনীয়।

একথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে বাংলার অতুলনীয় 'বৈঠকী' যাদুকর ডি. পি. দাসের ("দুর্গাপতি") কথা। টাকার খেলায় তাঁর সমকক্ষ যাদুকর ভারতে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি, এবং এজন্যই তাঁকে বলা হতো ভারতের "নেলসন ডাউন্‌স্‌"। এখানে বলে রাখি মার্কিণ যাদুকর টমাস নেলসন ডাউন্‌স (Thomas Nelson Downs) ছিলেন টাকার খেলায় পৃথিবীর সেরা ওস্তাদ। ভদ্রলোক তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে ছিলেন আইওয়া-র (Iowa) একটি রেল ষ্টেশনে বুকিং ক্লার্ক। টিকেট বিক্রির কাজে খুচরো টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি নানারকম বিচিত্র হাত-সাফাইর কৌশল আবিষ্কার এবং রপ্ত করে ফেললেন। ক্রমে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল টাকা পয়সার নানারকম ভেল্কি-বাজিতে হাত এমন পাকা হয়ে গেছে যে, তিনি পেশাদার যাদুকর হয়ে অনায়াসে আসর মাৎ করতে পারেন। এই বিশ্বাসের জোরে তিনি চলে গেলেন নিউইয়র্ক শহরে, সেখানে গিয়ে প্রমোদ-জগতের বড় বড় বুকিং এজেন্ট বা দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। চেষ্টা বিফল হল না। তিনি সুযোগ পেলেন মঞ্চে তাঁর যাদুশক্তির পরিচয় দিতে। মঞ্চে সর্বপ্রথম যেদিন পেশাদার যাদুকর রূপে পদার্পণ করলেন, সেদিন তাঁর নিজস্ব পোষাকের অভাবে নেলসন ডাউন্‌স্‌কে ধারকরা ড্রেস-স্যুটে মঞ্চে হাজির হতে হয়েছিল। প্রথম থেকেই তাঁর যাদুর খেলা যাদুরসিকদের আকর্ষণ করল এবং কালক্রমে তিনি যাদুকরদের প্রথম সারিতে এসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টাকার যাদুকর বা King of Coins বলে পরিগণিত হলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টাকার খেলাটির নাম ছিল 'কৃপণের স্বপ্ন' (The Miser's Dream)—এ খেলায় যেখান সেখান থেকে (এমনি কি হাওয়া থেকেও) টাকা ধরে ধরে যাদুকর শূন্য পাত্র বা শূন্য টুপি ভরে ফেলেন। টাকার খেলার ভেতর এ খেলাটি একটি 'ক্লাসিক' (classic) বা স্থায়ী সম্পদ। এ খেলাটি আমি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে দেখেছি অধুনা অবসর-প্রাপ্ত, যাদুকর যতীন্দ্রনাথ রায়কে, যাদু-জগতে যাঁর পেশাদারি নাম ছিল "রয় দি মিষ্টিক" (Roy the Mystic)।

মার্কিণ যাদুকর নেলসন ডাউন্‌স্‌ অন্যান্য খেলাতেও সুদক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্ব ছিল টাকার খেলায়। তেমনি যাদুকর ডি. পি. দাসও ("দুর্গাপতি") অন্যান্য নানারকম জিনিষ

নিয়ে হাত-সাফাইর খেলায় পাকা হলেও টাকার খেলাতেই ছিল তাঁর প্রধান বিশেষত্ব।

একটি মজার গল্প শুনেছিলাম এই ডি. পি. দাসের সম্বন্ধে। একদিন ট্রেণে কলকাতা থেকে কোথায় যেন যাচ্ছেন তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু। ট্রেণে সেদিন প্রত্যেকটি কামরায় বেজায় ভিড়। বন্ধুটি যাদুকর ডি, পি, দাসকে বললেন, "যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে তো মনে হচ্ছে কোথাও বসবার জায়গা পাওয়া যাবে না। আপনি তো ম্যাজিকের দৌলতে অনেক রকম অসাধ্য-সাধন করে থাকেন। দু'জনের বসবার জায়গা করতে পারেন তো বুঝি আপনি সত্যিকারের ম্যাজিশিয়ান।"

ম্যাজিশিয়ান ডি. পি. দাস বললেন, "আগে উঠে তো পড়া যাক একটা কামরায়। তারপর দেখা যাবে।"

দুজনে কোনোরকমে একটা কামরায় উঠে পড়লেন। ট্রেণ ছেড়ে দিল। কামরা ভর্তি। বসবার জায়গাগুলো সব আগে থেকেই দখল হয়ে আছে। দীর্ঘ পথ এভাবে ঠায়ে দাঁড়িয়ে যেতে হলেই তো হয়েছে!

তখন ম্যাজিশিয়ান ডি. পি. দাস করলেন কি? না, কামরার কাঠের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাওয়া থেকে একটি টাকা ধরে সেটি দিয়ে এমন আশ্চর্য ভেল্কি দেখাতে লাগলেন যে, দেখতে দেখতে সারা কামরায় অভূতপূর্ব বিস্ময়ের আবহাওয়া সৃষ্টি হল! এমন অবিশ্বাস্য তাজ্জব ব্যাপার কামরার যাত্রীরা আর কখনো দেখেননি। টাকাটা এক হাত থেকে অন্য হাতে কি ভাবে চলে গেল, তারপর কি ভাবে আধুলিতে এবং তা থেকে পয়সায় পরিণত হল, কারও বোধগম্য হলো না। অসাধারণ ম্যাজিশিয়ান ইনি, সে কারও জানতে বাকি রইল না। কিন্তু সামান্য দু-তিনটি খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েই থেমে গেলেন ডি, পি, দাস। অনুরোধ এলো—ঠিক যেমনটি আশা করেছিলেন ডি, পি, দাস—আরো খেলা দেখাবার।

কিন্তু খেলা আর দেখাতে পারবেন না বলে ক্ষমা চাইলেন "দুর্গাপতি"। বললেন—তিনি বৈঠকী যাদুকর, দাঁড়িয়ে খেলা দেখাতে তাঁর বড় অসুবিধে হয়, বেশ ভালো করে গ্যাঁট হয়ে বসতে না পারলে তিনি জমিয়ে ম্যাজিক দেখাতে পারেন না। ম্যাজিশিয়ানদের সাধারণতঃ ষ্টেজ দরকার হয়, কিন্তু তাঁর ষ্টেজ দরকার নেই, একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসবার জায়গা পেলেই হয়, সেইখানে বসে বসে তিনি তাঁদের সবাইকে অনেকক্ষণ ম্যাজিক দেখাতে পারবেন।

বেশ আরাম করে বসবার জায়গা হয়ে গেল একধারে—ম্যাজিশিয়ান ডি, পি, দাস এবং তাঁর সহকারী বন্ধুটির জন্য। সারা পথ দিব্যি আরাম করে বসে গেলেন তাঁরা, সারা পথ সবাইকে অত্যাশ্চর্য হাত-সাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে আর সেই সঙ্গে ম্যাজিশিয়ানোচিত খোস-গল্প বলে বলে মাতিয়ে রাখলেন যাদুকর "দুর্গাপতি" ওরফে ডি, পি, দাস। বন্ধুটি স্বীকার না করে পারলেন না, ডি, পি, দাস ম্যাজিশিয়ান বটে! ম্যাজিকের জোরেই তো দিব্যি বসবার জায়গার ব্যবস্থা করে ফেললেন একরকম অনায়াসেই।

এমনি আশ্চর্য ওস্তাদ ছিলেন ডি, পি, দাস। তাঁকে বলা যেতে পারত এভার-রেডি (ever-ready) বা সদা-প্রস্তুত যাদুকর। যখন তখন যেখানে সেখানে খেলা দেখিয়ে জমিয়ে দিতে পারতেন শুধু একটু আরাম করে বসবার জায়গা পেলেই হল।

১৯৫২ সালে ডি, পি, দাসের মৃত্যুতে শুধু বাংলা নয়, সারা ভারত একজন অসাধারণ যাদুকরকে হারিয়েছে, যার জুড়ি মেলা শক্ত।

ডি, পি, দাস থেকে এবার ফিরে আসি আবার রশিদ রহমান প্রসঙ্গে, ডি, পি, দাসের সঙ্গে যার কোনো তুলনা হয়না। (হাত-সাফাইর খেলায় অমন সূক্ষ্ম নিখুঁত ষ্টাইল বা প্রদর্শন-শৈলী শ্রেষ্ঠ মাদারিদেরও আছে কি না বলা শক্ত।)

কয়েকটি টাকার হাত-সাফাই খেলা বা কনজুরিং (conjuring) দেখিয়ে তারপর যে খেলাটা দেখাল রশিদ রহমান, সেটাই তার আসল খেলা সেদিনের মতো। আমার সঙ্গে যে বন্ধুটি ছিলেন, তাঁর জবানিতে এ খেলাটির বর্ণনা নিম্নলিখিত রূপ। তিনি তাঁর পক্ষে যতটা সাধ্য নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটি আমার নয়। যাদুর খেলায় অবলম্বিত বিভিন্ন কৌশল সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল নন বলে তাঁকে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে ফেলা যায়।

মাদারি দুটি খালি ঝুড়ি মাটির ওপর উপুড় করে রাখল। একটা ময়লা, ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে, লুঙ্গিপরা রোগা কালো মানুষ এই মাদারি। একটা চাদর দিয়ে ঐ উপুড় করে রাখা খালি ঝুড়ি দুটিকে ঢেকে দিল সে। তারপর তার বাঁ ধারের ঝুড়ির দিকে দেখিয়ে বললো ওটার তলায় একটা জানোয়ার এসে যাবে, আর তার ডান ধারের ঝুড়িটার দিকে দেখিয়ে বলল এই ঝুড়িটার তলায় একটা কলের গান এসে যাবে। ওর কথা শুনে আমরা ভাবলাম লোকটা আজে-বাজে বকে যাচ্ছে, আসলে অন্য খেলা দেখাবে—জানোয়ার আসবে বা কলের গান আসবে, এসব ভাঁওতা মাত্র। এসব কথা বলে আমাদের আনমনা করে দিচ্ছে অন্য কোনো বিশেষ মতলবে। নইলে দুটো খালি ঝুড়ি পরিষ্কার দিনের আলোয় আমাদের চোখের সামনে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল, ওদের তলায় জানোয়ার আর কলের গান আসবে কোথা থেকে?

দর্শকদের ভেতর থেকে একটি ছেলেকে চাদর ঢাকা ঝুড়ি দুটো থেকে অল্প কিছু দূরে নিজের মুখোমুখি বসিয়ে দিল মাদারি। তারপর আবার ঝুড়ি দুটির এধারে এসে বাঁধারের ঝুড়িটার সামনের দিকটা উঁচু করে (যেন ঝুড়ির ভেতরটা দেখা যায়) ঐ ছেলেটিকে প্রশ্ন করল—ঝুড়ির তলায় জানোয়ার এসেছে কি না। ছেলেটি বলল ঝুড়ি খালি, জানোয়ার টানোয়ার কিছু আসেনি।

মাদারি বলল "না, জানোয়ার এসেছে। তুমি মিছে কথা বলছ।"

ছেলেটি জোর গলায় বলল "না, আসেনি। তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ।"

ঝুড়িটা আবার যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়ে মাদারি তারপর ডান ধারের ঝুড়িটার সামনের দিকটা তুলে সেই ছেলেটিকে প্রশ্ন করল,—"এ ঝুড়ির তলায় কলের গান এসে গেছে?"

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল "না, আসেনি।"

এবারেও আগের বারের মতোই অভিনয়। মাদারি বলল "তুমি মিছে কথা বলছ, ঝুড়ির তলায় কলের গান এসে গেছে।" ছেলেটি বলল "মোটেই আসেনি। তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ।"

ডান ধারের ঝুড়িটিও আবার যেমন ছিল তেমনি মাটির ওপর রেখে দিল মাদারি। তারপর বাঁ-ধারের ঝুড়িটার যে দিকটা তার সামনে, সে দিকটা ডান হাতে একটু তুলে বাঁ হাতটা ঝুড়ির তলায় চালিয়ে দিয়ে বলল "দেখি, জানোয়ার এসেছে কিনা।" সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝাঁটকা টানে বাঁ হাতটা বার করে এনে ডান হাতটাও ঝুড়ি

থেকে সরিয়ে এনে বাঁ হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে মাদারি বলল "কাট্ দিয়া।" অর্থাৎ ঝুড়ির তলায় যে জানোয়ার এসেছে (সে সাপ হোক, বাঁদর হোক বা যাই হোক) সে মাদারির হাতের আঙুলে কামড় লাগিয়ে দিয়েছে। মাদারির অভিনয় এত বাস্তব যে, আমাদের মনে হল সত্যি বাঁ হাতের আঙুলে কামড় খেয়েছে লোকটা।

একটু পরেই দেখা গেল চাদরঢাকা ঝুড়িটা ঠেলে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে জানোয়ারটা, আর মাদারি ঝুড়িটা দুহাতে নিচের দিকে চেপে জানোয়ারটাকে ঝুড়ির তলায় আটকে রাখবার চেষ্টা করছে। আমরা জানোয়ারটাকে দেখতে পেলাম না বটে—দেখবো কি করে? সে যে ঝুড়ি আর চাদরের তলায় অদৃশ্য—কিন্তু আমাদের পরিষ্কার মনে হলো কোনো একটি প্রাণী ঝুড়ির ঢাকা থেকে বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট্ করছে। খুবই অদ্ভুত মনে ব্যাপারটা। যা হোক, মাদারির যাদুর বলেই হোক, বা ধস্তাধস্তির ফলে হয়রান হয়েই হোক, সেই অদৃশ্য জানোয়ারটার দাপাদাপি আস্তে আস্তে কমে গেল, সে যেন ঝিমিয়ে পড়ে একেবারে শান্ত হয়ে গেল। ঝুড়িটা যেমন ছিল তেমনি শান্তভাবে চাদরের তলায় মাটির ওপর উপুড় হয়ে রইল।

তার বাঁ ধারের ঝুড়িটা শান্ত হতেই তার ডান ধারের ঝুড়িটার তলায় বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গান শোনা যেতে লাগল। আমরা চমকে উঠলাম। ব্যাপার কি! ভুতুড়ে কলের গান শুরু হয়ে গেল নাকি ঝুড়ির তলায়?

প্রথম চমকের ধাক্কাটা সামলে উঠে এক ভদ্রলোক বললেন—"বুঝতে পারলেন না? ট্রানজিস্টর (Transistor) রেডিও সেটে গান হচ্ছে।"

অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন আজকাল তো এমন ছোট ট্রানজিস্টর রেডিও সেটও পাওয়া যায় যা অনায়াসেই পকেটে লুকিয়ে নেওয়া যায়। সেই রকম ছোট্ট একটা সেটই মাদারির কাছে ছিল, এবং তাকেই এক ফাঁকে গোপনে তার ডান ধারের ঝুড়ির তলায় চালান করে দিয়েছে মাদারি। আর সেই ছোট্ট রেডিও সেটেই গান বাজছে ঝুড়ির তলায়, তাই আমরা শুনতে পাচ্ছি।

ভদ্রলোকের কথায় আমিও মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তাতো বটেই। তা ছাড়া আর কি হতে পারে? অবশ্য ট্রানজিস্টার সেটটিও যত ছোটই হোক, হাতের মুঠোর ভেতর তো নিশ্চয়ই ধরে না। আমাদের এতগুলো সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সেটাই বা কখন, কি করে ঝুড়ির তলায় চালান করে দিল, সেটাও কম বিস্ময়কর নয়। বাহাদুরি আছে মাদারির। ওর হাত-সাফাইর তারিফ করলাম।

কিন্তু আসল বিস্ময় তখনো বাকি ছিল। মাদারি বলল "কি বলছেন বাবুসাহেব? কলের গান নয়?"

ভদ্রলোক বললেন "হ্যাঁ, কলের গান তো বটেই। পকেট রেডিও সেটে যে গান বাজছে, তাকে কলের গান তো বলা চলেই।"

মাদারি হেসে বলল "গানের এ কল তো পকেটে ধরবে না বাবু। এই দেখুন।"

বলে চাদর তুলে ঝুড়িটা তুলতেই দেখা গেল ছোট্ট পকেট রেডিও সেট নয়, ডালা-তোলা একটি পোর্টেবল গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড বেজে চলেছে—হিন্দী ছায়াছবির একখানা জনপ্রিয় গান। অতবড় জিনিষটা কোথা থেকে, কি করে, কোন ফাঁকে গিয়ে বাজতে শুরু করল ঐ ঝুড়ির তলায়?

[ক্রমশঃ।

# উপনিবেশ

বন্দে আলী মিয়া

আমার অগ্নিশিখা তুমি কি দেখেছো কভু
কৈশাখী বিদ্যুৎ মেঘে!
আমার পুষ্পধনু দেখেছো কি কোনোদিন
মাধবী রাত্রির ধ্যানে!
আমার কামনা দাহ অনুভব করেছো কি
নির্জন বাসক শয্যায়!
কখনো শুনেছো কি গো আমার বুকেতে বাজে
বিদায়ের করুণ বেহাগ!

আমার জীবন তৃষ্ণা আজিকে কাঁদিয়া ফেরে
ফেলে আসা সায়রের কূলে,
সূর্য্যের তপস্যা করে অনন্ত বসুন্ধরা
কখনো কি দেখেছো গো চেয়ে!
তোমার উদয় তারা আকাশের দিকে দিকে
ফেলিয়াছে বিষাদের ছায়া—
আমার ধূসর দ্বীপে এসেছে পথিক পাখী
দেখিয়াছ কভু কিগো তারে।

তোমার বেপথু মন এখনো অতন্দ্র চোখে
জাগিতেছে অনাদি প্রহর।
তুমি কি শুনিতে পাও—নাগিনী ফেলিছে শ্বাস
আমার এ দুয়ারের পাশে!
আমার অনন্ত ক্ষুধা এখনো প্রতীক্ষা করে
চির-চেনা একটি রাতের,
উছলি পড়িছে আজ মদের পাত্র হতে
এককণা নীল বুদ্‌বুদ।

আমি যে ভুলিতে চাই পুরানো গানের মতো
পরিচিত একটি অতীত,
আমার নিঃসঙ্গ দিন ডুবিয়া গিয়াছে কবে
সাহারার মরু বালুকায়।
তোমার ফিমির জালা এখনো ভাসিয়া আসে
দক্ষিণের হিম সমীরণে—
পুরাণো পৃথিবী মোর যাযাবর এ জীবন
যুগে ফিরে চিরদিন তরে।

## বিশ্ব ফুটবলে ব্রেজিলের শ্রেষ্ঠত্ব

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবারও ব্রেজিল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করেছে। এই সম্মান তাদের প্রথম নয়। গত বছরও তারা এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জ্জন করেছিল।

এবারকার ফাইন্যালে তারা ৩-১ গোলে চেকোশ্লাভকিয়া দলকে পরাজিত করার গৌরব অর্জ্জন করে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে দলগত ঐক্যের যে বিশেষ প্রয়োজন আর ইহা না হলে কোন খেলায় সাফল্য অর্জ্জন করা যায় না, তাহা ব্রেজিল দলের এবারকার খেলায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে।

১৯৩০ সালে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। সেই উদ্বোধনী বছর থেকেই ব্রেজিল একমাত্র দেশ যারা চূড়ান্ত পর্য্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। এই সাফল্য সত্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

এবার ১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে লীগ প্রথায় খেলার পর প্রত্যেক গ্রুপের প্রথম দুটি দলকে কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলার অধিকার দেওয়া হয়। তার পর সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল হয়।

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি স্যার ষ্ট্যানলী রোস বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলের প্রতিনিধিদের এক আবেদনে বলেছেন যে, কোন কোন প্রতিনিধি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের রীতি পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলেও উহা করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে, ইউরোপের দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলিত হওয়া উচিত।

চারটি ষ্টেডিয়ামে এবার খেলার ব্যবস্থা হয়। এই সব ষ্টেডিয়ামে কত দর্শক বসিতে পারে, তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :—

| | |
|---|---|
| স্যান্টিয়াগো | ৭৭ হাজার |
| আরিক | ২৬ হাজার |
| ভিনাডেলমার | ৩৫ হাজার |
| রংকাগুয়া | ২৬ হাজার |

এবার মোট ৩২টি খেলায় মোট গোল হোয়েছে ৮৯টি। ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্বোচ্চ গোলদাতাদের মধ্যে আছেন ছয়জন খেলোয়াড়। গারিঞ্চ ও ভাভা (ব্রেজিল), এ্যালবার্ট (হাঙ্গেরী), ইভানভ (সোভিয়েট ইউনিয়ন), স্যানচেজ (চিলি) ও জেরকেভিক (যুগোশ্লাভিয়া)। এঁরা প্রত্যেকেই চারটি করে গোল করেছেন।

এবারকার খেলার পরিচালনা সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। খেলোয়াড়রা দৈহিক বল প্রয়োগ করে খেলার নীতি গ্রহণ করায় খেলার আকর্ষণ বিশেষ ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে চিলি ও ইতালী এবং আর্জ্জেন্টিনা ও বুলগেরিয়ার খেলা উল্লেখ করতে হয়। এই খেলা দু'টিতে ৭৬টি "ফ্রি কিক" হয়েছে বলে প্রকাশ।

এবারকার খেলায় উচ্চ মানের পরিচয় পাওয়া যায়নি। চিলি ও যুগোশ্লাভিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান পেলেও খেলার কলাকৌশলের বিচারে হাঙ্গেরীর উচ্চ স্থান পাওয়া উচিত ছিল।

সব জায়গাতেই টিকিটের কালোবাজার দেখা যায়। এখানে একটা নতুন জিনিষ দেখা গেছে।

প্রতিযোগিতার উদ্যোগ কমিটির দু'জন সভ্য টিকিট বিক্রয়ের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে জেলে প্রেরিত হন। একজনের নাম আর্ব্বিভ ক্রোম্যান। তিনি ৪০০০ ডলার নিয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। অপর জনের নাম মাক্সিও পেরেরো ডেল পিনো। তিনি ২০০০ ডলার নিয়েছেন বলে পুলিশের সন্দেহ।

## চূড়ান্ত পর্য্যায়ের খেলার ফলাফল

### কোয়ার্টার ফাইন্যাল

ব্রেজিল (৩): ইংলণ্ড (১), চেকোশ্লোভাকিয়া (১): হাঙ্গেরী (০), যুগোশ্লোভিয়া (১): পশ্চিম জার্ম্মাণী (০), চিলি (২): রাশিয়া (১)।

### সেমি ফাইন্যাল

ব্রেজিল (৪): চিলি (২), চেকোশ্লোভিয়া (৩): যুগোশ্লাভিয়া (১)।

### ফাইন্যাল

ব্রেজিল (৩): চেকোশ্লোভিয়া (১)।

## প্রাথমিক পর্য্যায়ের খেলার ফলাফল

উরুগুয়ে (২) : কলম্বিয়া (১), চিলি (৩) : সুইজারল্যাণ্ড (১) ব্রেজিল (২) : মেক্সিকো (০), আর্জ্জেন্টিনা (১) : বুলগেরিয়া (০) রাশিয়া (২) : যুগোশ্লোভিয়া (০), হাঙ্গেরী (২) : ইংলণ্ড (১) চেকোশ্লোভাকিয়া (১) : স্পেন (০), পশ্চিম জার্ম্মাণী (০) : ইতালী (০), ব্রেজিল (০) : চেকোশ্লাভাকিয়া (০), ইংলণ্ড (৩) : আর্জ্জেন্টিনা (১), যুগোশ্লাভিয়া (৩) : উরুগুয়ে (১), চিলি (২) ইতালী, (০) হাঙ্গেরী (৬) : বুলগেরিয়া (১), রাশিয়া (৪) : কলোম্বিয়া (৪), পশ্চিম জার্ম্মাণী (২) : সুইজারল্যাণ্ড (১) স্পেন (১) : মেক্সিকো (০), রাশিয়া (২) : উরুগুয়ে (১) পশ্চিম জার্ম্মাণী (২) : চিলি (০), হাঙ্গেরী (০) : আর্জ্জেন্টিনা (০) ব্রেজিল (২) : স্পেন (১), যুগোশ্লোভিয়া (৫) : কলম্বিয়া (০) ইতালী (৩) : সুইজারল্যাণ্ড (০), মেক্সিকো (৩) চেকোশ্লোভাকিয়া (১), ইংলণ্ড (০) : বুলগেরিয়া (০)।

## প্রাথমিক পর্য্যায়ের লীগ তালিকা

১নং গ্রুপ

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | পঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রাশিয়া | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৮ | ৫ | ৫ |
| যুগোশ্লাভিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৮ | ৩ | ৪ |
| উরুগুয়ে | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৬ | ২ |
| কলম্বিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৫ | ১১ | ১ |

২নং গ্রুপ

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | পঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্ম্মাণী | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | ৫ |
| চিলি | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৫ | ১ | ৪ |
| ইতালী | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ২ | ৩ |
| সুইজারল্যাণ্ড | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ৮ | ০ |

৩নং গ্রুপ

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | পঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রেজিল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | ৫ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৩ | ৩ |
| মেক্সিকো | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৩ | ৪ | ২ |
| স্পেন | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ৩ | ২ |

৪নং গ্রুপ

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | পঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হাঙ্গেরী | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৮ | ২ | ৫ |
| ইংলণ্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৩ | ৩ |
| আর্জ্জেন্টিনা | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৩ | ৩ |
| বুলগেরিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৭ | ১ |

## ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভা

সম্প্রতি পুরীতে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক সভা হয়ে গেছে। বেশ নির্ব্বিঘ্নে যে সভাটি হয়েছে তা সভার ফলাফল—অর্থাৎ নব নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তাদের তালিকা থেকে ভাল ভাবে উপলব্ধি করা গেছে। সেই পুরাতন স্বনামধন্য ব্যক্তিরাই পুনরায় ভারতীয় ফুটবলের ভাগ্য বিধাতা নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তবে এবার তাঁরা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন। কারণ প্রতি বছর নির্ব্বাচনের রীতি সংশোধন করে কর্ম্মকর্ত্তাদের কার্য্যকালের মেয়াদ তিন বৎসরের করা হয়েছে এবং একই কর্ম্মকর্ত্তা দু'বার অর্থাৎ একাদিক্রমে ছয় বৎসরের বেশী কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না বলে ঠিক হয়েছে। এ যেন মৌরসীপাট্টা! নিম্নে সেই স্বনামধন্য মহাপুরুষদের নামের তালিকা দেওয়া হলো—যাঁদের ওপর তিন বছরের জন্য ভারতীয় ফুটবলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার পড়েছে। সভাপতি—শ্রীএম, দত্ত রায়। সহঃ সভাপতি—শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ও শ্রীশিবকুমার লাল। সম্পাদক—জনাব কে, জিয়াউদ্দিন। কোষাধ্যক্ষ—শ্রী আর, কে, ট্যাণ্ডন। তথ্য সমীক্ষক—শ্রী এস, এল, ঘোষ।

## জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

এইবারকার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা—সন্তোষ ট্রফি মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিচালনায় বাঙ্গালোরে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে।

## জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

ভারতের তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের উৎসাহ দানের জন্য জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। এই নব প্রবর্ত্তিত প্রতিযোগিতাটি সেপ্টেম্বর মাসে আই, এফ, এ'র পরিচালনায় বার্ণপুরে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে।

## ঘানাতে ভারতীয় ফুটবল দল প্রেরণ

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের এবারকার সভায় ঘানাতে একটা ভারতীয় ফুটবল দল প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

পুরীর সমুদ্র সৈকতে ভারতের ফুটবলের ভাগ্য বিধাতারা নিজেদেরই ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য এবার এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, মামুলি একটা কোচিং কমিটি করে দিয়েই তাঁরা দায় সেরেছেন। ভারতের তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের নতুন কোন পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ করেন নি।

ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হউক এটিই সকলের দাবী।

## বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতার তারিখ

প্রতি বছরই সকল রাজ্যের এবং দলের সুবিধার জন্য নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন ভারতের বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির তারিখ বেঁধে দেন। এবারও তার ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হ'লো :—

(১) আই, এফ, এ, শীল্ড (কলকাতা)—সেপ্টেম্বর মাসে। (২) দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতা (দিল্লী) ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই অক্টোবর। (৩) রোভার্স কাপ (বোম্বাই) ১৫ই অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বর। (৪) ডুরাণ্ড কাপ (দিল্লী) ১৫ই নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর। (৫) জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা।—ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহ থেকে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হবে।

## দ্বিতীয় টেষ্টেও পাকিস্তান পরাজিত

ইংলণ্ড ও পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটি সম্প্রতি হয়ে গেল। ইংলণ্ড এই টেষ্টে পাকিস্তানকে নয় উইকেটে পরাজিত করে উপর্য্যুপরি দ্বিতীয় জয় লাভের অধিকারী হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে "রাবার" লাভের পথ সুগম করে নিয়েছেন।

পাকিস্তান পরাজিত হলেও দ্বিতীয় টেষ্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে সমর্থ হয়। তবে প্রথম ইনিংসে মোটেই সুবিধে করতে পারেনি। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক জাবেদ বার্কি ও নসিমুল গণি দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে যে ভূমিকা গ্রহণ করেন—তা সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁদের ব্যাটিং-এ অপূর্ব দৃঢ়তা দেখা যায়

তাঁদের খেলা দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে। বার্কি ও নসিমুল গণি—উভয়েই ১০১ রাণ করে আউট হন।

ইংলণ্ড দলের টম গ্রেভনীর ব্যাটিং সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়। তিনি ১৫৩ রাণ করেন। বোলিং-এ প্রথম ইনিংসে ট্রুম্যান ৬টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে কোল্ডওয়েল ৬টি উইকেট পেয়ে সাফল্য অর্জন করেন।

## ইংলণ্ডের অধিনায়ক পরিবর্ত্তন

প্রথম দু'টি টেষ্টে ডেক্সটার ইংলণ্ড দলের অধিনায়কত্ব করেন। কিন্তু তৃতীয় টেষ্টে কলিন কাউড্রের উপর নেতৃত্বের ভার পড়েছে। সকলেই তাঁর সাফল্য আশা করেন।

রাণ সংখ্যা

পাকিস্তান—১ম ইনিংস ১০০ (নসিমুল গণি ১৭; ট্রুম্যান ৩১ রাণে ৬ উই:। ও কোল্ডওয়েল ২৫ রাণে ৩ উই:)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ৩৭০ (টম গ্রেভনী ১৫৩, ডেক্সটার ৬৫; ফারুক ৭০ রাণে ৪ উই:)।

পাকিস্তান—২য় ইনিংস ৩৫৫ (জাভেদ বার্কি ১০১, নসিমুল গণি ১০১, ইমতিয়াজ আমেদ ৩৩; কোল্ডওয়েল ৩৫ রাণে ৬ উই: ও ট্রুম্যান ৩৫ রাণে ৩ উই:)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস (১ উই:) ৮৬ (ষ্টুয়ার্ট নট আউট ৩৪ ও ডেক্সটার নট আউট ৩২)।

## এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল

দিল্লীর ইম্পিরিয়াল হোটেলে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্ম্মপরিষদের এক সভা হ'য়ে গেছে। এই সভায় জাকর্ত্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমসের ভারতীয় প্রতিনিধি দল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর স্থির হয়েছে যে ৭৮ জন প্রতিযোগী, ৮ জন ম্যানেজার, ৫ জন শিক্ষক ও একজন রন্ধনকারী মিলে ভারতীয় দল গঠিত হবে।

সাঁতার ও বাস্কেটবলের মান প্রেরণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। গত এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল তৃতীয় স্থান পাওয়ায় ভলিবল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বর্ত্তমানে ভারতের ভলিবল খেলার মান উন্নত হয়েছে বলে রাশিয়ান শিক্ষক অভিমত প্রকাশ করেছেন। নিম্নে মনোনীত প্রতিনিধি দলের তালিকা দেওয়া হ'লো:—

হকি—১৬ জন খেলোয়াড়, একজন ম্যানেজার ও একজন 'কোচ'।

এ্যাথলেটিকস—১৬ জন ও দুজন ম্যানেজার। পুরুষ ও মহিলা উভয় মিলিয়ে।

কুস্তি—৭ জন কুস্তিগীর, একজন ম্যানেজার ও একজন 'কোচ'।

ভলিবল—১১ জন খেলোয়াড়, একজন ম্যানেজার ও একজন 'কোচ'।

মুষ্টিযুদ্ধ—৪ জন মুষ্টিযোদ্ধা ও একজন 'কোচ'।

ভারোত্তোলন—৩ জন ভারোত্তোলনকারী ও একজন ম্যানেজার।

রাইফেল স্যুটিং—একজন রাইফেল চালক।

ফুটবল—১৬ জন খেলোয়াড়। একজন ম্যানেজার ও একজন 'কোচ'।

টেনিস—৪ জন খেলোয়াড় ও একজন ম্যানেজার।

বিরাট একটি দলকে প্রেরণের ব্যবস্থা হয়েছে। আর এর জন্য খরচও হবে অনেক। ভারতীয় দল কিরূপ সাফল্য অর্জন করে এটাই দেখার জন্য সকলে ব্যগ্র।

# হৃদ্‌রোগ কি ঠেকানো যায়?

হার্ট অ্যাটাক বা হৃদ্‌রোগের আঘাত কেন হয়, আজও সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন কারণ বার করা যায় নি। ডাক্তাররা অবশ্য বলেন যে, হার্ট বা নাকি একটা মুঠোর মত বস্তু তার মধ্যে রক্ত সঞ্চালনে এতটুকু ত্রুটি হলেই হৃদ্‌রোগের আবির্ভাব ঘটে এবং তার থেকেই আসে আঘাত। হৃদয়ের চারিপাশের রক্তবহা নাড়ীগুলির উপর মেদবৃদ্ধিতে যে চাপ পড়ে প্রধানতঃ তাই হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ। বর্ত্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগের চরম অবস্থাকে রোধ করা যায় বলেই চিকিৎসকরা মত পোষণ করেন, তাঁদের মতে হৃদরোগের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট হৃদযন্ত্রকে চরম অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা সম্ভব। কয়েক রকম অস্ত্রোপচারের সাহায্যে রক্তবহা নাড়ীগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা সম্ভব আর তাতে চরম পরিণতি অর্থাৎ করোনারী থ্রম্বসিস অফ হার্ট-এর হাত থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। এ ধরণের অস্ত্রোপচারের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল এই যে, ঠিক কোথায় রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়, সে জায়গাটি সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা। বর্ত্তমানে নতুন ধরণের শক্তিশালী এক্স-রে ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় হৃদ্‌রোগের চিকিৎসার পথ অনেক সুগম হয়ে গেছে। আরও কয়েক রকম নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার দ্বারা হৃদ্‌রোগের আবির্ভাবমাত্রই চিকিৎসকরা সেটা ধরে ফেলে একেবারে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারেন, যাতে রোগ বিস্তার লাভ করতেই পারে না। বহু রকম শক্তিশালী ঔষধও আবিষ্কৃত হয়েছে, দুষ্ট হৃদযন্ত্রকে যা চরম পরিণতির হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। অত্যধিক মেদবৃদ্ধি হৃদযন্ত্রের দুর্ব্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ বলেই চিকিৎকরা মত পোষণ করেন আর সেজন্যই মেদবৃদ্ধি নিবারণ করাটাকে তাঁরা হৃদযন্ত্রের সুস্থতার পক্ষে অপরিহার্য্য বলেই ঘোষণা করেন। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর মতে মানুষকে সুস্থ জীবন লাভ করতে হলে সময় থাকতে সতর্ক হতে হবে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান নাকি এতটাই উন্নতিলাভ করেছে যে, সর্ব্ব প্রকারের আধি-ব্যাধিকেই তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম, যদি সময় থাকতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

# বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

## বাইশ

কোনও পূজা সিদ্ধ হয় না, সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম না নিলে, তাঁকে প্রণাম না করলে সর্বাগ্রে। কাশীর দ্বিতীয় পর্বের সূচনাও কাশীর দিদিমার অদ্বিতীয় কথা দিয়ে না করলে, বোধন না করে দুর্গাপূজায় বসার ব্যর্থতা হয় অব্যর্থ। তা ছাড়াও কারণ ঘটে গেছে ভাস্করানন্দ সরস্বতীর কথা দিয়ে দ্বিতীয়বার কাশীকাণ্ড আরম্ভ করবার মুহূর্তে কাশীর দিদিমাকে স্মরণ করার। ভাস্করানন্দের কথা লিখবার প্রতিশ্রুতিকালে প্রার্থনা করেছিলাম, অংমারম্ভ শুভায় ভবতু। দিব্যদ্যুতিময় সেই দিবাকরের কাছে জানিয়েছিলাম মর্ত্যের আকুলতা, যেন তিনি প্রকট হন এই রচনায়। গংগাজলেই যেমন গংগা পূজা, তেমনই সূর্য হেসে শিশিরের বুকে এসে ধরা না দিলে, ধরায় কে আছে যে হতে পারে প্রভাত-মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার দিবাকর-দর্পণ? তাই বলেছিলাম তিরোভাব-আবির্ভাবের ঘণ্ট-নির্ঘণ্টের শুকনা গাংগে নামুক তোমার দিব্য জীবনের, তোমার দীপ্ত জীবনের দুঃসহ বেদনার, দুর্বহ আনন্দের অফুরাণ কৌতুক-এর উদ্দাম বন্যা। কাঁদাও, হাসাও, ভালোবাসাও সে তুমি! যে তুমি আনন্দভাস্বর সেই তুমি ভাস্করানন্দ এসে দাঁড়াও আমার গানের এপারে! কলমের মুখে নয় কেবল আমার সম্মুখে হও আবির্ভূত তুমি! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান মুছে দিয়ে দাঁড়াও আরেক বার, হে অপূর্ব যে অভূতপূর্ব! পুঁথির পাতায় নয় চোখের পাতায় পড়ুক তোমার প্রেমাঞ্জন! দুচোখে পড়ুক তোমার তৃতীয় নয়নের আলো! অমর আনন্দের ভাস্কর তুমি! তুমি ভাস্করানন্দ! সরস্বতী কৃপা করুন, ভাস্করানন্দ সরস্বতীকে আবাহনের মুহূর্তে! সেই কৃপা যা পংগুকে দেয় পা; পাহাড় ডিংগোবার প্রেরণা। যা সেই করুণা যা মূককে করে জীবনমন্ত্র উচ্চারণে উন্মুখ!

এ প্রার্থনার কথা জানাইনি কাউকে। কাশীর দিদিমাকে পাঠিয়ে ছিলাম বার্দ্ধক্যে বারাণসীর প্রথম খণ্ড। তাঁকেও জানাইনি কার নাম করে, কাকে প্রণাম করে ভারতাত্মা কাশীর দ্বিতীয়, অদ্বিতীয় কাণ্ড, প্রকাণ্ড দুঃসাহসের পাথায় ভর করে, না, সম্পূর্ণ নির্ভর করে যার কথা বলতে যাচ্ছি, তাঁরই ওপর, আবার আরম্ভ হচ্ছে তার যার আরম্ভ নেই। কাশীর দিদিমা তার সোনারপুরার অন্ধকার ভাংগা বাড়ির লণ্ঠন জ্বালা আলোর প্রায় অন্ধ চোখের কালোয়, বাঁকা বাঁকা অক্ষরে, বিরামচিহ্নহীন চিঠিতে জানিয়েছেন আশীর্বাদ। তাঁর সংগে পাঠিয়েছেন একখানা বই। ছেঁড়া খোঁড়া, কত প্রাচীন বলা শক্ত, একখানা চটি পুস্তক নয় পুস্তিকা! পুস্তিকার সংগে আশীর্বাদী পত্রে দুটি কথা যোগ করে দিয়েছেন কাশীর দিদিমা, 'বইখানা পড়ে দেখো। কাশীর কথা লিখতে এই বই যদি তোমার কাজে লাগে তো ভালো! না লাগে তো আরও ভালো!

গলা-পচা প্রাচীন সেই পুস্তিকার খুলে দেখি প্রথম পাতা। সেখানে যাঁর নাম লেখা তাঁকে প্রণাম করেই আরম্ভ করবার সংকল্প করেছিলাম বার্দ্ধক্যে বারাণসীর দ্বিতীয় অদ্বিতীয় উপাখ্যান। ভাস্করানন্দের জীবন কথা-ই সে সেই পুণ্য পুস্তিকায় প্রকাশিত। বইখানা হাতে নিয়ে সেই রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হলো রোমকূপে, যার আনন্দ, যার বেদনা, যার বিস্ময় যার বার্তা অনুভব করা যায়; ব্যক্ত করা যায় না।

বইখানা হাতে নিয়ে মনে হলো, মানুষের মাথায় বিনামেঘে বজ্রপাত-ই হয় না কেবল। কখনও কখনও অসীমের আলো অযাচিত এসে পড়ে সীমার কপালে; অনন্তের আনন্দাশ্রু টলমল করে অন্তের কপোলে। জীবনের বদ্ধদ্বার খুলে যায় কখনও কখনও বিনা প্রয়াসে! সংশয়ের অন্ধকার-আচ্ছন্ন অন্ধকার চোখে ভরে যায় জল। দুই চোখের সেই জল যা তৃতীয় দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যে হলেও করে সুনিশ্চিত উজ্জ্বল!

অব্যক্ত আনন্দের ভাস্কর ভাস্করানন্দের অলৌকিক স্পর্শে আনন্দভাস্বর কাশীর এই দ্বিতীয় অধ্যায়, অদ্বিতীয় এই সন্ধ্যালোকে হোক স্পন্দিত!

আনন্দ-অবাধ কাশীর আনন্দবাগ! ভারতের তদানীন্তন সেনাধ্যক্ষ স্যর উইলিয়াম লকহার্ট আনন্দবাগে উপস্থিত সেদিন। তাঁর সর্বাংগে ঝলমল করছে পদক, তারকালাঞ্ছিত যুদ্ধের অংগভূষণ; আর তিনি যাঁর সামনে উপস্থিত তাঁর অংগে কৌপীন্ পর্যন্ত নেই। আকাশের মতো নির্মল, নির্মম উলংগ এই সন্ন্যাসীর কাছে স্যর উইলিয়াম্ গল্প করছেন। তাঁর দিগ্বিজয়ের দুরন্ত রোমহর্ষক কাহিনী। আফ্রিদিদের হারাবার কূটনীতি আর দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠা তাঁর নিজের পরাক্রমের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন শুনছেন সশিষ্য আনন্দবাগের সদানন্দ সেই সন্ন্যাসী। হঠাৎ কি খেয়াল হয় নাগা সাধুর, লকহার্টকে পড়ে-থাকা একটি অদূরবর্তী পেন্সিলকে তুলে দিতে বলেন তাঁর হাতে। লকহার্ট চেষ্টা করেন, পারেন না। অবলীলাক্রমে যে হাত তুলে নিয়েছে ভারি ভারি রাইফেল, এখন সেই অপরাজিত দুই বাহুর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়, কিন্তু হালকা একটা পেন্সিল কোন্ শক্তিতে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। লকহার্ট যদি তার উৎস জানতো, তাহলে সে শক্তির নয়, নিরাসক্তির উপাসক হতো। আনন্দবাগের

নগ্ন ওই সন্ন্যাসী, যাঁর নাম ভাস্করানন্দ সরস্বতী, তিনি এমনি করেই অহংকারের উদ্ধত পক্ষ ভগ্ন করতেন। লকহার্ট যখন পেন্সিল ওঠাতে ব্যর্থ হলেন, তখনই অব্যর্থ কাজ করলো ও হোলিম্যান অফ কাশী, ভাস্করানন্দের উপদেশ: যুদ্ধে জয়লাভ অথবা পরাজয় এর কোনওটার জন্যেই, কৃতিত্বের জন্য অহংকার অথবা ব্যর্থতার জন্যে হতাশার অর্থ নেই কোনও। যাঁকে তিনি জেতান তাঁকে তিনি শক্তি দেন, যাঁকে হারান তাঁর শক্তি করেন হরণ। শক্তি নয়; নিরাসক্তির উপাসনাই ঈশ্বর-নির্ভরতা।

সাধারণ মানুষ, অসাধারণ নির্বোধ কীর্তিমান কেউ কেউ বলেন, শুনি, সন্ন্যাসীরা সমাজের কি কাজে আসেন? গুহায় অথবা আশ্রমের নিরুপদ্রব নির্জনে ঈশ্বর চিন্তার চেয়ে বড় সামাজিক অপরাধ নাকি আর কিছু নেই। মানুষের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কাজ, কাজ, কাজ। কর্মই ধর্ম; কর্মই ঈশ্বর। যাঁরা এমন কথা বলেন তাঁরা যে সবাই সর্বক্ষণ কর্মব্যস্ত এমন মনে করবার কারণ নেই কোনও। তবু তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ সত্যি সত্যি কখনও কখনও থাকেন, কর্ম যাদের ধ্যান, কর্ম যাদের জ্ঞান, কর্ম যাদের ভগবান। সেই কর্মযোগী পুরুষরা যোগী পুরুষদের কর্ম বুঝতে না পেরে ভাবেন তাঁরা অলস, তাঁরা পরজীবী, তাঁরা সমাজের, সংসারের শত্রু! এবং এই সব কর্মীরাই মনে করেন, যে যুদ্ধজয়ের, যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ তাঁদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি। আসলে যারা শব ছাড়া কিছু নয়, তারাই মনে করে তারা সব। পিঁপড়ে থেকে বাসব পর্যন্ত সকলের এই অহংকারকে ভাঙতেই কৃষ্ণ থেকে রাম রাম থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত সকল 'নিরাসক্তি'র আবির্ভাব শক্তির দম্ভ চূর্ণ করতে।

যোগীদের মধ্যে কর্মীশ্রেষ্ঠ, এবং কর্মীদের মধ্যে যোগীজ্যেষ্ঠ বিবেকানন্দর পর্যন্ত এমন ভ্রান্তি ঘটেছিলো একবার। ক্ষীর-ভবানীর পবিত্র প্রস্রবণ-এর সামনে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির মতন যোগাসীন স্বামিজীর ধ্যানভংগ হয় হঠাৎ। দেখেন সামনের হিন্দুমন্দির ভগ্ন। স্বামিজীর নয়নে ক্রোধাদিত্যের রক্তরাগ ফেটে পড়ে মুহূর্তে। মনে মনে ভাবেন। মুসলমানরা এই হিন্দুমন্দির যখন ধ্বংস করে তখন বাহুতে অমিত শক্তি আর হৃদয়ে অবারণ ভক্তি সম্বল দুর্জয় একজন হিন্দুও কি ছিলো না, যে বাধা দিতে পারত তার জীবনের বিনিময়ে? আমি যদি বেঁচে থাকতাম, তাহলে বাঁচিয়ে রাখতাম মাতৃমন্দিরকে ধ্বংস দশা থেকে!

ভাবনায় ছেদ পড়ে। দৈববাণী বাজে আকাশের বুকে। জগজ্জননীর জেগে ওঠে তীব্র তিরস্কার: মুসলমানরা আমার মন্দির যদি ধ্বংস করে থাকে তো তাতে তোর কি? তুই রক্ষাকর্তা আমার?

বিস্ময়বিচলিত স্বামিজী বুঝে উঠতে পারেন না, এ দৈববাণী না তাঁর শ্রবণের বিভ্রম। পরের দিন আবার দৃঢ় সংকল্প হন দুর্জয় দুর্নিবার দামাল জীবন-নদী যিনি রামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। যাঁর পুণ্য পবিত্র পূর্ণ পরিচয় আজও পর্যাপ্ত প্রদীপ্ত নয়, সেই স্বামী বিবেকানন্দ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, ভিক্ষালব্ধ অর্থে তিনি জীর্ণমন্দিরকে আবার যৌবনের দীপ্তি দেবেন, দেবেন জীবনের সম্মান। মনে করার সংগে সংগে, একসংগে ধ্বনিত হয় দিক্‌বিদিকে মাতৃ-কণ্ঠ: যদি আমার ইচ্ছা হয় তাহলে এই মুহূর্তেই কি এই ভাঙা মন্দির সুবর্ণরাঙা সপ্ততল হতে পারে না? এই মন্দির যে ধ্বংস হয়েছে সে তবে আমার ছাড়া কার ইচ্ছায় আর?

মা'র ছাড়া আর কার? মা'র একার ইচ্ছা ছাড়া এ-কার ইচ্ছায় হতে পারে আর!

বিবেকানন্দ ক্ষান্ত হন; ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত হন না আর। মাতৃমন্দির সংস্কার করার ব্যর্থ অহংকার নয় কেবল, তাঁর আমূল পরিবর্তন ধ্বনিত হয় শিষ্যাদের কাছে উক্ত একটি স্বীকৃতিতে: 'আমার কর্মের স্পৃহা স্বদেশপ্রেম সমস্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। হরি ওঁ! আমি ভুল করিয়াছিলাম, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।'

আমি যন্ত্র না, আমিই যন্ত্রী,—এইতেই যতেক যন্ত্রণা! আমি যন্ত্রী নই, যন্ত্র মাত্র!—এইতেই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি!

অহংকারী কর্মীর মতো পণ্ডিতমূঢ় আছে অসংখ্য যারা বলে, 'তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্রী,'—এই বলে চুপ করে বসে থাকলে খাওয়া জুটবে? যারা শোনে তারা সংগে সংগে সায় দেয়, সত্যিই তো, কর্ম না করে ধর্ম ধর্ম করলে খাওয়াবে কে? পরাবে কে? কিন্তু কেউ বলে না, এই পণ্ডিতমূঢ়দের যে, কিছু না করে চুপ করে বসে থাকো দেখি একবার, দেখবো তোমার সাধের তুলনায় সাধ্য কতদূর। চলার চেয়ে না চলা, বলার চেয়ে না বলা, শক্তির চেয়ে নিরাসক্তি যে কত বড়, কাশীর আনন্দবাগে আনন্দের ভাস্কর, ভাস্করানন্দ সরস্বতী তারই একমাত্র প্রমাণ নন। লকহার্ট উপলক্ষ মাত্র, আমাদের লক্ষ্য করেই তাঁর এই চিরন্তনী বাণী জয়-পরাজয়ের কর্তা সেই একজন। আমি যেমন তোমার শক্তি হরণ করেছি, আর তাই তুমি এই পেন্‌সিলটিও তুলতে পারলে না, তিনিও তেমনই

ইচ্ছে করলে হরণ করতে পারতেন তোমার শক্তি, হারিয়ে দিতে পারতেন তোমাকে আক্রিদিদের মতোই !

ধন বা জয় বা ধনঞ্জয় ভব সংসারে সবাই নিমিত্ত মাত্র,—ভারত-বর্ষের এই মৃত্যুহীন বাণীর জীবন্ত প্রমাণ দেবার জন্মেই ত্রৈলংগ থেকে ভাস্করানন্দ থেকে এখন পর্যন্ত আগত, অনাগত বহু মহামানবের পদক্ষেপ ঘটেছে এবং ঘটবে।

একথা যে বলা হয় যে সকলের জন্যে নিরাসক্তি নয়, সে-কথা আপাত সত্য হলেও শেষ পর্যন্ত সত্য নয়। সত্য নয় তার কারণ যে কেউ এ-কথা বলে না, বা, বললেও তার কাজে তার সত্য প্রমাণিত হয় না। যিনি বলতে পারেন 'তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী,' তিনিই ভাস্করানন্দ সরস্বতীর মতো কোটিকে গোটিক। যখনই লকহার্টের মতো কেউ মনে করে যে সেই সব, তখন রাইফেলধারী হাত দিয়ে পেনসিল তুলতে না দিয়ে ভাস্করানন্দ প্রমাণ করেছেন, লকহার্ট শব মাত্র ; আসলে তিনিই সব যাঁর ইচ্ছায় অক্ষৌহিণী সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই কেবল অক্ষয় হয়ে থাকেন।

আকাশ, আকাশচারী পাখী আর সন্ন্যাসীরই কেবল নেই সঞ্চয়ের অধিকার। কাল-বৈশাখীর খেলা ভাংগার খেলা, আশ্বিনের নিরুপম নীল, আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণ, রামধনুর বিচিত্র রং,—আকাশেই সব, তবু আকাশ এ-সবের কারুর নয়। কাউকে ধরে রাখে না সে, তাই বার বার এরা ধরা দেয় আকাশের বুকেই। ওই আকাশের মতোই নয় আকাশের মতোই নির্লিপ্ত, নির্মম নিরাসক্ত যে সেই যথার্থ সন্ন্যাসী। ভাস্করানন্দ সরস্বতীর মুখের কথাই ছিলো : সাধুর সম্বল আকাশবৃত্তি, অন্য সম্বলে তার অধিকার কি ?

কাশীর রাজা পাঠিয়েছেন প্রচুর সুস্বাদু পাকা ফল ; ভাস্করানন্দর পায়ে প্রণাম। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাকে বিলিয়ে দিয়েছেন স্বামিজী। অদূরে দাঁড়িয়ে ভক্ত রামচরণ। একটি ফলের টুকরোও ভাস্করানন্দের মুখে উঠলো না,—এই দুঃখ সে রাখবে কোথায়। সমস্ত ফল নিঃশেষে বিতরিত হবার আগে, সেবক রাম তেওয়ারি সরিয়ে ফেলে কিছু ফলপাকড় ; পরের দিন ভাস্করানন্দের খাবার পেতে দেবার বাসনায়। যাঁর সমস্ত বাসনা সোনা হয়ে গেছে সেই ভাস্করানন্দের দৃষ্টি এড়ালো না সেবকের ফল-সরানো। হাসতে হাসতে বললেন : রামচরণ, তোম্ পরমহংসকো ভাণ্ডারা বনাতে হো ? তারপর হো-হো করে হাসতে লাগলেন আবার। একটু বাদে অপ্রতিভ ভক্তকে ভালোবাসতে আবার ভগবান ভাস্করানন্দ বললেন : তুমি কি জানো না যে, আমার ভক্তদের মুখে আমি রোজ কি পরিমাণ খাই ?

সেই এক সুরে বাঁধা। শ্রীরামকৃষ্ণ গলায় ক্ষতর জন্যে খেতে পারেন না। শিষ্যরা বলেন, মা-কে বলবার জন্যে যাতে তোমাকে খেতে দেন। ঠাকুর বলেন : মা-কে বলেছিলাম আমাকে খেতে দাও। মা বললেন সে কি-রে ? এতগুলো ভক্তের মুখ দিয়ে রোজ এত খাস, তবু বলিস, খেতে দাও !

এ যে দেখতে পায়, সে কিছু না করলেও খেতে পায় ! যে দেখতে না পায় সে সারাজীবন ক্ষেতে কাজ করে। তবু বলে : খেতে দাও, আরোও খেতে—। খেতে পেয়েও সে সারাজীবন কেঁদে কাটায় ; কেঁদে কাটায় সে।

জীবনের শেষ দিন, অশেষ দিন পর্যন্ত ভাস্করানন্দ সরস্বতীর জল পান করবার কোনও পাত্র পর্যন্ত ছিলো না। অনাবৃত অংগে, ( প্রখর শীত জর্জর ঝিল্লিমুখর আনন্দবাগের ভূমিশয্যায় বাঁ-হা ওপর মাথা রেখে কাটিয়ে গেছেন ভূমার স্বপ্নে আচ্ছন্ন আনন্দ ভ ভাস্করানন্দ। নিদারুণ জলতৃষ্ণায় জল খাওয়া হয়নি। যতক্ষ কেউ তার লোটা এগিয়ে দিয়েছে জলভরে। করপুটপাত্র সম্বল উলংগ সন্ন্যাসীকে পাথরের পানপাত্র দান করা মাত্র তিনি তা লোককে দিয়ে দেন।

সাধু দর্শনে স্ত্রীলোকেরা এলে কখনও কখনও কারুর কাছ ( চেয়ে নেওয়া কটিবস্ত্রাবৃত হতেন সেই সময়টুকুর জন্যে ভাস্করান তারপর ে টি বস্ত্রাচ্ছাদন দিলেও তা দূরে নিক্ষেপ করতেন অনা হেলায়।

এই ভাস্করানন্দকে রূপে ভোলাবার জন্যে একদল গণিক পাঠিয়েছে এক রাজা। ঋষ্যশৃংগ ঋষিকে ভোলাতে যেমন ব পাঠাতে হয়েছিলো বারাংগনাকে। ধ্যানভংগে ক্রুদ্ধ ধূর্জটির তৃত দৃষ্টিতে আবির্ভূত হলে প্রলয়ের বজ্রাগ্নিশিখা পালিয়ে যায় রূপস দল। শুধু সেই বারাংগনাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো একজন। নড় পারল না সে এক পা-ও। বিপুলকায় এক সাপ জড়িয়ে রইলো তা সর্বাংগ। রাজা সেই অবস্থায় তার পাঠানো পতিতাকে রেখে পালি গেল।

সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সাপ নেমে গেল গা থেকে, অভিশাপ-মুক্ত হলো অহল্যা। সেই দূষিতদেহ রমণী এই প্রথম রমণীয়ের সাক্ষা পেলো জীবনে তাঁর আশীর্বাদে যাঁর কৃপায় কেবল রত্নাকর বাল্মীকি হয় না,—অভিনেত্রী বিনোদিনীর চৈতন্যের হয় উদয়।

স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী গার্হস্থ্য জীবনে ছিলেন কানপুরে অন্তর্গত মৈথেলালপুর-এর মিশ্রীলাল মিশ্রের সন্তান। নাম, মতিরাম তাঁর মতিরামের বিবাহ হবার পর যেদিন তাঁর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে সেদিনই সন্ন্যাস জীবন গ্রহণের জন্যে বেরিয়ে পড়েন। দুগ্ধ-ফেননিভশয্যার আরাম, প্রিয়তমা রমণীর সান্নিধ্য, পুত্রমুখনিরীক্ষণের সৌভাগ্য, সব অস্বীকার করে বুদ্ধদেব একদিন যেমন বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে, ঠিক সেই ইতিহাসেরই পুনরাবর্তন ঘটে গেছে কতবার মহা-মানবের সাগরতীর ভারতবর্ষে, কত লোক-এর জীবনে বুদ্ধের জীবন জয়যুক্ত হয়েছে। এ-কথা আমরা ভারতবর্ষের আত্মার ইতিহাস জানি না বলেই তা অজানা।

কাশী ভারতবর্ষের সেই আত্মা। ভাস্করানন্দ সরস্বতী সেই আত্মার আত্মীয়।

গৃহত্যাগের পর মোতিরাম উপস্থিত হন উজ্জয়িনীতে। পূর্ণানন্দ সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন সাতাশ বছর বয়সে। নতুন নাম হয়, ভাস্করানন্দ সরস্বতী। সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশের আগে জন্মস্থানে ফিরে আসেন একবার। একমাত্র পুত্র তাঁর তখন পরলোকে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে যজ্ঞোপবীত ত্যাগী ভাস্করানন্দের আরম্ভ হয় তীর্থপরিক্রমা। এবং এক সময়ে কাশীতে এসে পৌঁছলেন তিনি। তাঁর তখনকার জীবন্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় কি পরমাশ্চর্য তপস্যার জ্যোতির্দীপ্ত তাঁর আননে আনন্দ যুক্ত হয়েছিলো সেদিন। শীতের দুরন্ত দিনে উলংগ সাধুকে এক মাছের মতো ভেসে যেতে দেখেছে, এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণীই বলছে, যে এই একই মানুষকে দেখা গেছে রৌদ্রদগ্ধ বালুর 'পরে নিষ্ঠ র

নিদাঘবেলায় শুয়ে থাকতে এমন ভাবে যেন পুষ্পের ওপর বসে আছে কোনও মধুপ। শীতে-গ্রীষ্মে-বর্ষায়-বসন্তে অনন্যমনে অনন্যমনার আরাধনায় আত্মবিস্মৃত, আত্মস্থিত ভাস্বরানন্দের সামনে আহার্য উপস্থিত করলে তিনি কেবল তাকান একবার। তারপর হেসে চলে যান কোথায় কে জানে! [ ভারতের সাধক : প্রথম খণ্ড ]

যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেলে মণিকে তুচ্ছ মানি, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোলায় যে সুধা, বসুধায় এমন কে আছে যে নিতে পারে তার গুরুভার। 'এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে' তার মধু পান করে যে, তাকে তৃপ্ত করবে কোন্ খাদ্য? দু' মুঠো অন্ন কেমন করে হবে তাঁর বরাদ্দ। যাঁর আরাধ্য স্বয়ং অন্নপূর্ণা!

ভাস্বরানন্দ সরস্বতীর দিব্যজীবন লৌকিক এই জগতে অলৌকিক অবিনশ্বর শক্তির পদ্মরাগমণির প্রদীপ্ত ছটা। কাশীর আনন্দবাগ সেই ছটায় ভাস্বর সেদিন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মনীষী স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র বসে আছেন পায়ের কাছে। বলছেন: আপনি যে বলেন এ জগৎ স্বপ্নবৎ, তার প্রমাণ পাই কোথায়? আপনার পা ছুঁই যখন তখন রক্ত-মাংসের সত্যকেই তো স্পর্শ করি। বলতে বলতে পা ছোঁন ভাস্বরানন্দের। সেই হাত মাথায় ঠেকাবার আগেই দেখেন,—ভাস্বরানন্দ স্বামী সেখানে নেই। একটু বাদে আবার দেখেন, এই তো সেই স্বামিজী বসে আছেন তাঁর সামনে, বলছেন: এই আছি, এই নেই,—তবু এই আমি-কে বলতে হবে সেই-আমি। জগৎ যদি স্বপ্নবৎ না হয় তা হলে তা থাকতে-থাকতেই থাকে না কেন?

রহস্যের জগতে আমরা যারা দিশাহারা তাদের অবগত করাতে জগতের রহস্য যাঁরা আসেন মরলোকে ভগবানের দূত তাঁরা যেখানেই থাকুন তাঁরা সবাই ৺কাশীর লোক। ৺কাশী কেবল তাঁদেরই আলোক।

মৃগনাভির গন্ধ, কৌস্তুভের দ্যুতি, কৃষ্ণের জন্যে রাধার আকুতি যেমন গোপন করা যায় না, তেমনই যোগশক্তিতে যোগ্যশ্রেষ্ঠ ভাস্বরানন্দ আত্মগোপন করে থাকতে পারেননি কোথাও। কখনও কখনও ধরা দিয়েছেন নিজেই। অযোধ্যার রাজা ফিরে যাবেন ভাস্বরানন্দকে প্রণাম করে অযোধ্যায়। স্বামিজী তাঁকে যেতে দেবেন না। অনুনয়-বিনয় কিছুতেই কি ভাস্বরানন্দের মত হবার নয়? পরের গাড়িতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অযোধ্যার রাজা শুনলেন যে, ট্রেণে যাবার জন্যে তিনি পীড়াপীড়ি করেছিলেন স্বামিজীকে, সে ট্রেণ পথের মধ্যে চুরমার হয়ে গেছে।

ট্রেণ নয়। মানুষের অহংকার ভেংগে চুরমার করে দেবার জন্যে, বুভুক্ষুকে মুমুক্ষু করে তোলবার জন্যে যাঁরা জেগে আছেন, যাঁরা জেগে থাকেন নির্জন গুহার অন্ধকারে, নিঃসংগ হিমালয়ের উন্মুক্ত বক্ষ অবিমুক্ত কাশীর গংগাতীরে তাঁরা কি সমাজের শত্রু অকর্মার দল? অর্জুনই যোদ্ধা আর শ্রীকৃষ্ণই অযোদ্ধা,—একথা যে বলবে সে কি মহাভারতের পাঠক অথবা মহান ভারতের মানুষ?

কাকে বলে কর্ম, আর কাকে অকর্ম, কাকে বলে বিদ্যা আর অবিদ্যা কি, কে বলবে সে কথা? যে পণ্ডিতের 'দর্শন' হয়নি, সেই দর্শনের পণ্ডিত? না, বইয়ের পাতায় নয়, চোখের পাতায় যাঁর নেমেছে সেই করুণাঘনের নীলাঞ্জন ছায়া, জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় নয়, ব্যথায় বেদনায়, কান্নায় যে গলিয়েছে করুণার পাষাণকে, সে-ই কেবল বলবে, বলতে পারবে, এ বসুন্ধরা কার? তোমার-আমার, না তাঁর একার? এক আকার যাঁর, তোমার-আমার-তার সকলের মধ্যে যিনি একাকার?

আনন্দবাগে আসন পাতবার আগে ভাস্বরানন্দ বলিয়ে নিয়েছিলেন জমির মালিককে দিয়ে, যে, এখানে দর্শনার্থীর ভিড় যেন না হয়। সে কথা দিয়েও রাখতে পারেননি জমির মালিক আমেটির রাজা। মধুলোভী মৌমাছির পথ আটকাবে কে? আমটির রাজা আনন্দবাগের মালিক; কিন্তু আনন্দের অধীশ্বর যদি সেখানে আসন পাতেন তা হলে প্রত্যাখ্যানে নিরানন্দ হয় কেমন করে সে ভূমি। এইখানেই একদিন এক রাণী কেঁদে পড়েন মোকদ্দমায় হেরে। স্বামিজীর কথায় উচ্চতর আদালতে মোকদ্দমা নিয়ে গিয়ে শেষে জয়লাভ করে স্বামিজীকে কিছু দিতে চান! স্বামিজী বলেন: আমি সন্ন্যাসী,—আমাকে তুমি কি দিবে?

ভূমার সন্ধান যে পেয়েছে ভূমি তাকে কি দেবে আশ্রয়? 'মা'-র ছেলে কেন হাত পাতবে 'তো'-মার কাছে।

মানুষ তার সমস্ত কীর্তির চেয়ে মহৎ কারণ কোনও সাম্রাজ্য তাকে ধরে রাখতে পারে না,—সাজাহানকে উপলক্ষ করে উচ্চারিত এই কবি-কথিত উক্তির উৎস মানব প্রেমের মহৎ অধিষ্ঠাত্রী তাজমহল। মানুষ তার কীর্তির চেয়ে বড়,—এর সব চেয়ে বড় প্রমাণ সাজাহান নন; তাজমহল হতে পারে না এর একমাত্র উৎস। সাজাহান মমতাজকে ভালোবেসেছিলেন সবুজ পোকা যেমন ভালোবাসে আগুনকে। সে আগুন নিভে গেলে অসময়ে, সবুজ পোকার আকাশভরা কান্নাকে চিরকালের কবিতা করে গেছেন সম্রাট; পাথরের কঠিন বুকে বিরহের করুণ রাগ তাজমহল। সবুজ পোকার বাসনার মধ্যে যেটুকু সোনা সেটুকু মরেনি যে তার প্রমাণ ওই মহৎ কবিতা। তবু মমতাজের কাছে কিছু চেয়েছিলেন সম্রাট; কিছু পেয়েছিলেন। পাওয়া বন্ধ হলেও চাওয়া ফুরোয়নি যার তাজমহল তারই তৈরী। চাওয়ার চেয়ে বড় পাওয়ার সন্ধানে সে লোকলোকান্তরের যাত্রী সেই মানুষই কেবলই তার সমস্ত কীর্তির চেয়েও মহৎ, কারণ কোনও দিন কোনও সাম্রাজ্য তাকে ধরে রাখতে পারেনি।

তবুও সাজাহান নয় তার একমাত্র, তাজমহল নয় এ কবিতার একমাত্র দৃষ্টান্ত। কিছুতেই নয়। রূপের চেয়ে অপরূপ যে বড়, কীর্তির চেয়ে মানুষ যে বড়, তার জন্যে যেতে হবে তীর্থে, তার জন্যে প্রণাম করব তীর্থংকরকে। তাজমহলে নয়, কাশীতে গংগার ঘাটে যাঁরা বসে আছেন অনাদিকাল থেকে, আত্মার সুরভি আচ্ছন্ন যাদের চোখে পাওয়ার নেশা নয়, দেওয়ার করুণা ধারা বইছে, বেদনার অশ্রু হচ্ছে উল্কাত, মানুষকে তার উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর করতে না পারার ব্যথায় বিদীর্ণ হচ্ছে যাদের বুক;—তাঁরাই কেবল তাঁদের সমস্ত কীর্তির চেয়ে যথার্থ মহৎ। বিষয়কর্মী জগতে আনে কোলাহল, উন্মাদ দিগ্বিজয়ের স্বপ্নে রণকর্মীরা তুলছে জীবনসিন্ধু মন্থন করে মৃত্যু-হলাহল আর ধ্যানের আসনে ধূর্জটির মতো নিস্তব্ধ জীবনকর্মী সেই কোলাহল থেকে দূরে পান করছে হলাহল কিন্তু উদগীরণ করছে অমৃত: নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই চোখ নিয়ে যে না কাশীতে যাবে তারও বিশ্বনাথের মন্দির দেখা হবে; দেখা হবে না কেবল এই সত্য, যে, সমস্ত বিশ্বই আসলে সেই বিশ্বনাথের মন্দির!

কুরুক্ষেত্রকে যারা কেবল কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র বলে জানবে তারাই পার্থকে শুধু মানবে তার নায়ক বলে: কুরুক্ষেত্রকে যারা জীবনমরণ রংগভূমি বলে মানবে তারা জানবে ও যুদ্ধ কখনও শেষ হবার নয়, এবং ওর একমাত্র নিয়ামক,—পার্থ নয়, পার্থসারথি! শুভের সংগে অশুভের, সুন্দরের সংগে অসুন্দরের, আলোর সংগে কালোর, রৌদ্র-মেঘের খেলাই পাণ্ডব-কুরুর চিরন্তন রণক্ষেত্র। সেই রণ মরণে শেষ হয় না; ব্রজ-শরণে অশেষ হয়। আজও অব্যাহত সেই যুদ্ধে আমরা পার্থকে-ই মনে করেছি নায়ক, তাই ব্যর্থ হচ্ছি আমরা। পার্থসারথির পরিবর্তে ব্যর্থসারথি আজ পৃথিবীকে ঠেলে দিচ্ছে প্রলয়ের কোলে। তবু হতাশ হবার নেই কিছু, কারণ, তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সংশয়ের রাত্রির তিমির নিবিড় হলে তবেই উদয়ের পথে শোনা যাবে সেই সোনায়-পান্নায়, খোদিত আশ্বাস: সম্ভবামি যুগে যুগে।

অসম্ভবকে সম্ভব আর সম্ভবকে অসম্ভব করতেই আসেন ভগবানের দূতেরা। ভাস্করানন্দ সরস্বতীও তার ব্যতিক্রম নন। লৌকিক জগতে অলৌকিক প্রকাশ তাঁদের কেবল সংশয়ের কুজ্ঝটিকা কাটিয়ে অবিনশ্বর আশ্বাস জাগানোর। মেঘের গায়ে লাগানোর রামধনুর রং। বিষয়মরুর মরা বুকের তল খুঁড়ে দেখানোয় অমরা ফল্গু নদী। এই আশা নিয়ে,—আর কোনও প্রত্যাশা নিয়ে নয়। সীমার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা নিয়ে; কাঁদা-হাসার জীবন গংগা যমুনায় আলো আশায় ঘট ভরে নিয়ে যাবার ডাক দিতে আসেন এঁরা বহুদূরের কোন্ বন থেকে। সংগে নিয়ে আসেন সেই সুধা বসুধাকে যা-ই কেবল করতে পারে ব্যাধিমুক্ত।

ভাস্করানন্দ সরস্বতীর মধ্যে ঈশ্বরপ্রতিম সেই মানুষটিকেই দেখেছিলেন মার্ক টোয়েন। বলেছিলেন ইংলিশম্যান পত্রিকার প্রতিনিধিকে তাই যে, তাজমহলের রূপ কখনও এই অপরূপের সংগে দাঁড়াতে পারে না তুলনায়। *পাথর দিয়ে তৈরী প্রেমের কবিতা তাজমহলের রূপ হোক যত বিস্ময়কর, তবু তা বচনীয়। রক্তমাংসের তাল দিয়ে তৈরী এই মানুষটির অন্তরাত্মার আলো যে অনির্বচনীয়। কত মানুষ এই একটি মানুষের ওপর আস্থা রাখে তার ইয়ত্তা নেই।* মার্ক টোয়েনের কাছে দৈনিকপত্রের প্রতিনিধি আশা করেছিলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে নতুন কোনও তামাশা। ব্যংগ বা রংগ দিয়ে মার্ক টোয়েনকে যারা মেপেছে তারাই পরিমাপ করতে পারেনি হাকলবেরির ফিন-এর অমর লেখককে। হাসির তলা দিয়ে অশ্রুর বন্যা অবারিত করেছেন মার্ক টোয়েন। নিজের দুঃখকে যিনি পরের হাসি করেছেন, ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। কারণ ভাস্করানন্দ সরস্বতী, পরের পাপ, অপরের অপরাধ অন্যের দুঃখকে গ্রহণ করেছিলেন হাসিমুখে!

যার জাত নেই আর যে অভিজাত, সামান্যের দৃষ্টি থেকে যারা কেবল কাচ, আর যারা অমূল্য কাঞ্চন, তাদের দুজনকেই সমমূল্য জ্ঞান করতেন যিনি তিনিই ভাস্করানন্দ। রাজা-মহারাজা-পণ্ডিত পরিবেষ্টিত কোনও দিন, কোনও দিন আবার নীচু তলার লোকদের সংগেই গলাগলি, যা কিছু বলাবলি সেদিন কেবল তাদেরই সংগে। কে বলবে কোন রূপটা আসল, আসলে যে অপরূপ সেই উলংগ সন্ন্যাসীর। সবাই তেলী,—নগণ্য মানুষ এসেছে গণ্যমান্যের আসরে। স্বামী তাঁকেই ডেকেছেন সর্বাগ্রে: আমার বাপ আয়!

শেষ জীবনে সেই অশেষ জীবনেশ্বর এসেছিলেন আরেকবার জন্মস্থান, মৈথেলালপুরে। সেখানে তখন ভাস্করানন্দের ম আকাশের ভাস্করের চেয়েও ভাস্বর! তাঁকে সম্মান জানাবার আয়োজিত আসরে মান্যগণ্যেরা উপস্থিত। থেকে থেকে ভাস্করান জহুরী চোখ খুঁজে বেড়ায় অনুপস্থিত কাকে যেন। ভাস্করানন্দ আ করেন, ভীড়ের মধ্যে লছমন মালা বলে কে আছে,—তাকে বার ব সে আজ আমায় টানছে, পূর্ণিমা যেমন টানে সিন্ধুকে। লছমন মাছ ধরে খায়। মূর্খ, দরিদ্র, দীনজন্মা। লছমন মালাকে করে ভাস্করানন্দ ফিরছিলেন আনন্দবাগে। তাঁর জীবনের আনন্দমে যাদের নাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়, তার মধ্যে লছমন অবিস্মরণীয়। রাজরাজড়া এনেছে তাঁর দুয়ারে হাতে নিয়ে ফু পুষ্পমাল্য। তবু সে মালার চেয়ে লছমন মালার দাম যে সেকথা কে বুঝবে সে ছাড়া, মালা যার কাছে মূল্যবান যার কাছে মন-ই অমূল্য। লছমন মালার ভেদজ্ঞান দূর হয়েছে ভাস্করানন্দ সরস্বতী তাকে রাজা এবং জ্ঞানীর চেয়ে বড় করতেন বরাবর।

কাউকে অযাচিত কৃপা করতেন, কাউকে প্রত্যাখ্যান কর অনায়াসে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ভূতনাথ ঘোষকে করছেন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে। অন্যদিকে, দীক্ষাপ্রার্থী চণ্ডী বসুকে বলছেন তোমাকে দীক্ষা দেব, তবে তার আগে কুল কাছে দীক্ষা নিতে হবে তোমাকে। চণ্ডীবাবু স্বামিজীর বুঝলেন না। তিনি বুঝলেন, ভাস্করানন্দ তাঁকে দীক্ষা দিতে না আসলে, তাই কুলগুরুর কাছে দীক্ষার কথা তুললেন। কাশীতে কোথায় পাবেন সুদূর পূর্ববংগের সেই কুলগুরুকে! কথা ভাবতে ভাবতে কাশীর পথ দিয়ে চলেছেন ব্যাধিগ্রস্ত চণ্ডী বসু। বহুমূত্র রোগে ভুগছেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে জী সায়াহ্ন সময় আসন্ন। *এমন সময় দেখেন অদূরে কাশীর রাস্তা হেঁটে চলেছেন তাঁর কুলগুরু! তাঁর কাছে দীক্ষার পর, ভাস্কর সরস্বতীও তাঁকে বিমুখ করেন না আর। এবং চণ্ডীচরণ ভাস্করা শিষ্য হবার পর দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকেও বেঁচে যা*

[ ভারতের সাধক: প্রথম খ

*বাঁকা বাঁকা কাঁপা কাঁপা অক্ষরে কাশীর দিদিমা* ভাস্করান দুটি দুরন্ত দয়া করার ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন, যা, ভাস্করান জীবনীতে পাওয়া যাবে না। একবার কাশীর দিদিমার ক মৃত্যুশয্যায় বলে ওঠে, আনন্দবাগের ঠাকুরের মাথা থেকে ফু নিয়ে এসে আমাকে দাও; আমি সেরে যাব। দিদিমা এবং তঁ তাঁর মা-ও বেঁচে, দুজনে ছুটলেন আনন্দবাগে। কেঁদে করজো দাঁড়িয়ে আছেন দিদিমার মা। আপনা থেকে ফুল এসে পা হাতে। মেয়ের মাথায় সেই প্রসাদীফুল এসে পড়তেই কালব্যা অকালে প্রস্থান করে অগত্যাই। এবং আরেকবার কাশীর দিদিমা ভাইকে নিয়ে তাঁর মা গংগায় ভরাডুবির অবস্থা হল ঝড়ের নৌকায় ওই ভাই-ই একমাত্র বংশধর কাশীর দিদিমার পিতৃলোকে দিদিমার মা ভাস্করানন্দের নাম নিচ্ছেন আর বলছেন। 'তু বলেছিলে তোমার শিষ্য কখনও নির্বংশ হয় না। সে কি তোমা মুখের কথা কেবল? মনের কথা নয়!'

[ক্রমশঃ

# দিকপাল পতন

সৃষ্টির অভিসারে এবার পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। ছবি বাবু আজ নেই। নতুন নতুন ভূমিকায় নব-নব রূপসৃষ্টি করতে তাঁকে আর দেখা যাবে না। শুধু সাধারণ রঙ্গমঞ্চ নয়, এবারে জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকেই চিরকালের মত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন বাঙলার তথা ভারতের অন্যতম দিকপাল নট ছবি বিশ্বাস।

অন্যান্যের তুলনায় কিছুটা বিলম্বেই রঙ্গজগতে আবির্ভাব ঘটেছিল ছবিবাবুর কিন্তু অভ্যুদয়ের অত্যল্পকালের মধ্যেই যে বিরাট গৌরবের আসনে তাঁর অধিষ্ঠান ঘটেছিল তার মর্য্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। জীবনে অসংখ্য চরিত্রের রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস। দক্ষ শিল্পীর অনন্যসাধারণ প্রতিভার যাদুকরী স্পর্শে চরিত্রগুলি দর্শকসাধারণে এনেছে আলোড়ন, জাগিয়েছে বিস্ময়, রচনা করেছে নতুন ইতিকথা। একটি শতাব্দীর প্রায় এক চতুর্থাংশ কাল নাট্যজগৎ পেল ছবি বিশ্বাসের সেবা। তার এই পঁচিশটি বছরের ইতিহাসে ছবি বিশ্বাস অন্যতম রূপকার, এবং তার প্রতিটি অধ্যায়ে অঙ্গীভূত হয়ে আছেন এই স্রষ্টা শিল্পী। নিরলস সাধনায় ও ঐকান্তিক অনুরাগে নাট্যজগতকে যে কতখানি সমৃদ্ধ করে গেলেন ছবি বিশ্বাস, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য, নাট্যজগতের পুষ্টি সাধনে তাঁর বলিষ্ঠ অবদান অবিস্মরণীয়। নাট্যজগতের অভিনয়ের মান উন্নীত হয়েছে যে সকল দিকপাল গুণীদের কৃপায় নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে ছবিবাবু এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী।

শিল্পী হিসেবে তাঁকে চেনেন না এমন লোক বাঙলাদেশে নেই, ভারতেও এমন লোক বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই এটা উপলব্ধি করবেন যে শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও ছবি বাবু অনেক বড়, সেদিক দিয়েও তিনি তুলনাবিহীন।

ছবিবাবুর প্রয়াণে বাঙলার নাট্যজগত আজ নিঃস্ব। এত বড় ক্ষতিপূরণ হওয়া শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসাধ্যও, তাঁর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট অধ্যায়ে যবনিকা পড়ল, সৃষ্টির সাধনায় আত্মমগ্ন সমাহিতচিত্ত এক শিল্পসাধকের অন্তর্ধান ঘটল, রূপদেবতার আরাধনার মন্ত্রোচ্চারণ সমাপ্ত হল

তাঁর ব্যক্তিত্বকে জানাই শ্রদ্ধা, তাঁর প্রতিভার উদ্দেশে উৎসর্গ করি সনম্র অভিবাদন আর তাঁর সাধনার উদ্দেশে নমস্কার।

# রঙের একটি সরণি

( Sergei Eisenstein লিখিত আত্মচরিতের কণিকা )

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

আমার প্রিয় ভাবধারা একটা বিরাট অন্ধকারের স্তূপের মূর্তি নিয়ে সব কিছু রঙ গ্রাস করে আমার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্পর্কে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে—অপেক্ষা করছে···

গিয়োভার্ণো ব্রুনো এবং প্লেগ—এই দুই সৃষ্টির মাঝে অপর একটি আগন্তুকের আবির্ভাব হোলো। একে গণিতের সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব। হার্শেল নক্ষত্রটি ( Uranus ) সংখ্যাহীন তারকার মাঝে শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যে যেমন অনেক আগেই দেখা গিয়েছিলো এ যেন অনেকটা সেই রকম।
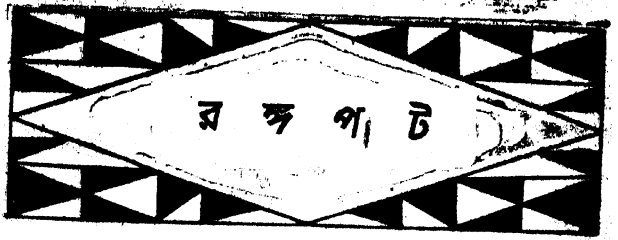
ছায়াছবি সবাক হয়ে কি এনেছিলো? সুরকারদের জীবন-কথাই তো?

রঙের সমাগমে এসেছে চিত্রকরদের আত্মচরিত। এবং দুই একত্রিত হয়ে? দুই-ই নিঃশেষিত হয়েছে এখন তৃতীয়ের সন্ধান প্রয়োজন। কবি চরিত কথায় কি হবে? এই ভাবেই পুশকিনের জীবনী চিত্রের পরিকল্পনা হয়েছিলো। আইভ্যান গ্রজনীর উদ্ভবও এই থেকে।

এলো যুদ্ধ, তারপর বিজয়। বিজিত জার্ম্মাণী থেকে এলো একরাশ বিশ্রী রঙিন ছবি, সেই সংগে ত্রিস্তর রঙিন ছবির একটি নেগেটিভ।

যুদ্ধের আগেই যে সব রঙিন ছবির পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিলো, এবার যুদ্ধশেষে তা নতুন ভাবে রূপ নিলো। অবশ্য রঙের প্রতি প্রবল আকর্ষণ চোখ ও কানের দুই বিপরীত দিক থেকেই জেগে ওঠে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু রঙেরই ব্যাপার, যাত্রা বজায় রেখে দেখা ও শোনার বিরাট সমস্যা সমাধানে যা সক্ষম।

মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী গীতা সিং সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।

সকল চিত্রের সূচনায় ( পুডভকিন ও আলেকজান্দ্রভ 'সবাক চিত্র সম্বন্ধে' এক বিবৃতিতে আমার সংগে স্বাক্ষর করেছিলেন ) অভিনন্দন জানিয়ে আমি রঙের বিষয়ে লিখেছিলাম (The Third Dimension in Cinema) যে নতুন কিছুই এর দ্বারা ছায়াছবির রাজ্যে সংযোজিত হবে না। তারপরে আমরা দেখা ও শোনার সমন্বয় সাধনের সম্ভাবনার আভাস পেয়েছিলাম। অবশেষে বাণীচিত্রে পরিণত হয়ে প্রতিচ্ছবি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। সবাক চিত্র হাতে কলমের কাজ চিত্র ব্যবসায় প্রসারে মূলধন নিয়োগের সামিল হয়েছে। ছবিতে রঙের সংযোজনার সংগে সংগে সুরসঙ্গতি ও বিভিন্ন বর্ণ সমাবেশ যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি সাদা-কালোর সংকীর্ণ গণ্ডী শতধা চূর্ণ হয়েছে।

এবার কথা ছেড়ে ব্যবসায় আসা যাক। দ্বিতীয় খণ্ড আইভ্যান দি টেরিবল-এর দুটি অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরণের দৃশ্যের সমাবেশ হয়েছে, যেমন হাসি-কান্না, সান্ত্বনা-অবসাদ, উত্থান-পতন প্রভৃতি। এগুলি সবই রঙিন ছায়াছবির বাস্তব উপাদান। কি-ই না ঘটেছে এখানে? Prokofiev যে আমার আগে Alma-Ata ত্যাগ করেছিলেন এটা সত্য ঘটনা। আগে থেকে সংগীতাংশ রচিত ও গৃহীত না হওয়ায় আইভ্যানের ভোজ-এর Oprichinki-র নাচের দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণ সম্ভব হয়নি। কাজেই এই দৃশ্যগুলি চিত্রায়িত করতে আমাদের মস্কোয় যেতে হয়েছিলো। তার ওপর Prokofiev অসুস্থ হওয়ায় এবং War and peace ও Cindrella ছবিতে তাঁর চুক্তি থাকায় সেই গ্রীষ্মে তিনি অর্কেস্ট্রার সাহায্য দিতে পারেননি। শরৎ যায় যায় শীত এসে পড়ে, দৃশ্যপট তৈরি হয়ে পড়ে রইলো গ্রীষ্মের পথ চেয়ে। দেরি হয়ে গেল সংগীত গ্রহণে।

এই সময়ে Dom kino-তে রঙের আলোচনার জন্যে এক সভা আহুত হোলো। আমরা যেটা নিয়ে কেউই কাজ করিনি এমনই বিষয়ে শুধু তর্কাতর্কি আলোচনা চললো। এই নিষ্ফলা সম্মেলনের সব চাইতে যন্ত্রণাকর ব্যাপার হচ্ছে জার্মানি ও আমেরিকায় প্রস্তুত কিছু রঙিন ছবির বিনা মূল্যে প্রদর্শনী। অবশ্য সেইসংগে যুদ্ধের আগে আমাদের তৈরি দুই বা তিন নেগেটিভ পদ্ধতির রঙিন ছবিও ছিলো—তার জন্যে খুব বড়াই করা গিয়েছিলো। এখন আমাদের

চিত্রগ্রহণের অবসরে পরিচালক রাজেন তরফদার এবং শিল্পী কণিকা মজুমদার

আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত "এক টুকরো আগুন"-এর একটি চি বিশ্বজিত ও তন্দ্রা বর্মণ। ছবিটি পরিচালনা করছেন বিনু বর্ধ

রূপালি পর্দায় 'A miserable splendour of costu এবং 'An imitation painted cheek' দেখানো যেতে প সৃজনীশক্তির উদ্ভব হয় গাত্রদাহ থেকে।...

এই সব বহিরাগত নোংরামি থেকে দেখা দিলো প্রকৃত রঙিন 'The potsdam conference', রঙ প্রভৃতি এর কতক অংশ ছিলো খুবই বিসদৃশ। cecilienhof প্রাসাদের কতক ঘরের ছবি দেখা গেল—টকটকে লাল কার্পেটে মোড়া। ঘরের দৃশ্যে পর্দা ভরে গেল; তার কোনাকুণি সাজানো আর্ম চেয়ারের সারি লাল কুশনে মোড়া। রঙের কাজ হয়ে গেল! আবার দেখা গেল sans-souci-র চীনা ক্লাব-এ কয়েকটি দৃশ্য—কিছু সোনালি চীনা মূর্তি বেশ স্বচ্ছন্দ ভ চলাফেরা করলো। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হোলো আশপ সবুজ শোভা বা সাদা পাথরের সিঁড়ির পাশ থেকে দেখা

সব রঙই—লাল, সাদা কালো সোনালি—নিপুণ ফুটে উঠলো। মনে হয় সর্বসমক্ষে একে হাজির করা চলতে পারে।

আইভানের ভোজের দৃশ্যটি গ্রীষ্ম পর্যন্ত পড়ে রই এ দৃশ্যটি অন্ধকার রাত্রে জারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের এবং তঁ হত্যা করার—সব ষড়যন্ত্র অগ্ন্যুৎপাতের মতো ফেটে পড় এই বিস্ফোরণটি রঙিন হতে পারবে না কেন? নাচের দৃ

রক্তের প্রয়োগ চলবে, তারপর ভোজের শেষে জাদের হত্যার করুণ দৃশ্যটি কালোর সাদার মিশ্রিত হয়ে তৈরি হবে যাতে করে তার ছবির মাঝে ভয়াবহতা রক্ষা করবে।

আমার নিজস্বতা বজায় রেখে আগের রঙিন দৃশ্যগুলির সংগে মিলিয়ে এই মর্মান্তিক দৃশ্যটি কি ভাবে তোলা যায়? ছায়া ভরা গির্জা, মৃত্যুর অন্ধকার তার আনাচে-কানাচে যেন অপেক্ষমান, অস্ফুট আর্তনাদ ইতস্তত অনুরণিত এমনই একটি রঙিন পরিবেশ?

রঙ! রঙ···উজ্জ্বল চোখধাঁধানো রঙ···কখন তার হাতে আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম? কোথায়?

আমার টেবিলে লাল-নীল পেন্সিল কিংবা নীল বিছানায় লাল বালিশটির ডোরা-কাটা দাগ দেখতে না পেলে মনটা আমার ভারী হয়ে ওঠে···রঙচঙে ড্রেসিং গাউনটি আমার যখন চোখের সামনে ঝকমক্ না করে···আমি কতো খুশি হই আমার ঝকঝকে বিছানার চাদরে ঢেউ-খেলানো রঙিন ফিতে যখন দেখতে পাই···অথবা মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের সূচীশিল্পের নিদর্শনটি মৃত্যু-দিনের প্রতীক শাদা মেক্সিকান কাগজে আঁটা লাল দেয়ালে দেখি···মেক্সিকোবাসী ভারতীয়দের ধর্মীয় চিহ্ন কালো মুখোশে রক্তক্ষত নিয়ে অপ্রত্যাশিত রূপে সঞ্চরমান··· দেখি···কতো আনন্দ পাই! —অনুবাদ: রমেন চৌধুরী।

## ছায়াছবির উৎসব

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর ছোট বড় মিলিয়ে অন্ততঃ গুটি ছয়েক Film festival অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইতালীর ভেনিস-এ, ফরাসী দেশের 'ক্যানে'-তে, জার্মাণীর খোদ বার্লিন শহরে গ্রেট বৃটেনের এডিনবরায়, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাহা বা খোদ প্রাগ শহরে এবং রাশিয়ার খোদ মস্কো শহরে যে অনুষ্ঠানগুলি হয়—

মঞ্জুলা সরকার—ছায়াছবির বাইরে

বাসবী নন্দী—ছায়াছবির বাইরে

মোটামুটি সেইগুলিই বড় ও মেজ গোত্রের। এ ছাড়াও ছোটখাটো অনুষ্ঠান এদেশে ওদেশে রয়েছে, কিন্তু সেগুলি এখনও তেমন বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি। যে ছ'টি অনুষ্ঠানের নাম উপরে করা হল, সেগুলি বিখ্যাত হলেও তাদের মধ্যে কৌলিন্যের অনেক পার্থক্য রয়েছে। ফরাসী দেশের ক্যানে-তে এবং ইতালীর ভেনিস-এ যে অনুষ্ঠান দুটি হয়, কৌলিন্যের বিচারে সেই দুটিই প্রধান এবং উৎসবের জৌলুসও সেই দুটিতেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ক্যানে-তে ও ভেনিস-এ পুরস্কার পাওয়া চলচ্চিত্রের কদরও অনেক বেশি দেখা যায়, জগতের বিভিন্ন দেশের চিত্রনির্মাতা, ব্যবসায়ী ও দর্শকদের মধ্যে।

এই সব চলচ্চিত্র উৎসবে কি হয় বা হয়ে থাকে—স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগে সাধারণ মানুষের মনে। কি হয় বা হয়ে থাকে বলতে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের প্রদর্শন ও বিচারকগোষ্ঠীর দ্বারা সেগুলির গুণাগুণ পর্যালোচনা ও সেই হিসাবে পুরস্কার দেওয়া-নেওয়া ছাড়া আর কি বা কি কি ঘটে উৎসবে—প্রশ্ন বা কৌতূহল যে সেই সম্বন্ধে বলা বাহুল্য। উৎসবের উদ্যোক্তাদের অবশ্য এ সম্বন্ধে যে উত্তর হবে, তা না জানা বা শোনা থাকলেও খুব অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। বিভিন্ন উৎসবের বিভিন্ন উদ্যোক্তাগোষ্ঠী একবাক্যে বলবেন যে, বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রশিল্প এবং সেই সব শিল্পের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা যাতে পরস্পরকে জানতে পারেন, বুঝতে পারেন এবং সেই জানা ও বোঝার মধ্যে দিয়ে শিল্পের ক্ষেত্রে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারেন—চলচ্চিত্র উৎসবের সেইটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে গৌণ উদ্দেশ্যের কথাও তাঁরা উল্লেখ করতে ভুলবেন না। চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষ যত সহজে পরস্পরের দেশ ও সমাজকে আশা ও আকাঙ্খাকে জানতে পারে, সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে পরস্পরের প্রতি, এমন আর নাকি কিছুতে নয়। দূরকে নিকট এবং পরকে ভাই করবার নাকি কিছু মন্ত্র—তাঁদের মতে—গুপ্ত

হয়েছে সত্যিকার ভাল চলচ্চিত্রের মধ্যে। ভাল চলচ্চিত্র বলতে আবার বিশেষ দেশ বা জাতের দেশীয় বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিনিধিমূলক ছবি।

চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্বন্ধে এ সব গেল ভাল ভাল কথা? তবে এ ছাড়াও কিছু কথা আছে। সে কথা হ'ল—উদ্যোক্তাদের মহৎ উদ্দেশ্য কতখানি সিদ্ধ হয় উৎসবগুলিতে? উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য যতখানি সিদ্ধ হচ্ছে, তার চেয়ে উপস্থিত উপভোক্তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে কতগুণ বেশি? অন্ততঃ ভেনিস-এ ও ক্যানে-তে।

ভেনিস ও ক্যানে শহরে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসব দুটি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর কিছু ঐ জাতীয় তথ্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে একটি বিশিষ্ট বিলিতি পত্রিকায় এবং তার ফলে জানবার সুযোগ হয়েছে আমাদের।

বিলিতি পত্রিকায় প্রবন্ধসূত্রে যিনি ভেনিস ও ক্যানে শহরের চলচ্চিত্র উৎসব দুটির বাইরের জৌলুষের আড়ালে ঢাকা ভিতরের কলুষ ও পাপের খবর পরিবেশন করেছেন, তিনি উপরোক্ত দু'টি উৎসবেই যোগদানকারী প্রত্যক্ষদর্শী একজন সাংবাদিক। প্রবন্ধসূত্রে দু'-চারজন খ্যাতনামা ও নাম্নীর নামও তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের সারমর্ম বা তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে মোটামুটি এই—

"সূর্য্যশিখা"র চিত্রগ্রহণকালে পরিচালক বিষ্ণু বর্দ্ধন ও কর্মসচিব সমর ঘোষসহ উত্তমকুমার

প্রতি বছর যে মাসে ক্যানে-তে এবং সেপ্টেম্বরে ভেনিস-এ এক মেয়ে এসে ভীড় ক'রে থাকে। এই মেয়েদের অধিকাংশই সুন্দ জীবনের উচ্চাভিলাষ সকলেরই তাদের চিত্রতারকা হওয়া এবং যে-কোনও মূল্যে। বলা বাহুল্য উৎসবে আসার উদ্দেশ্য তাদের কো প্রযোজক বা পরিচালকের নজরে পড়া। আর সেই নজরে পড় জন্য তাদের অসাধ্য কিছুই নেই, কিছুতেই তারা পেছপাও ন বিখ্যাত ফরাসী পরিচালক জঁ্যা রেনোয়া যিনি ভারতে এসেছি এবং আমাদের এই কলকাতা শহরে বসেই 'দি রিভার' ছবি গেছেন। তিনি বলেছেন এক তারকাযশোপ্রার্থিনী জনৈক —"It is no longer true that you must sl a lot to succeed; all that is necessary is to to bed." অর্থাৎ, সাফল্যের জন্য তোমার ভাল ঘুমের প্রয়ে কথাটি আর এখন সত্য নয়; এখন শুধু বিছানায় শুলেই চ (কারু সঙ্গে)।

রেনোয়া বললেও কথাটা কিন্তু পুরো সত্য নয়। অ "go to bed" করলেও যে সাফল্য আসে, অভিলাষ পূর্ণ সেই সব মেয়েদের—এমন মনে করবার কোনও কারণ ে কেন না, সাধারণতঃ যে সব প্রযোজক ও পরিচালকেরা উৎ আসে, তারা সকলেই আসে তাদের ছবি নিয়ে এবং সেই ছ জন্য পুরস্কারের তদ্বির করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে পার্টি ও পিকনি আয়োজন করতে তাদের নিশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না। বি সময় থাকলেও মনের অবস্থা—। আর অন্যদিকে শিকারীর তৎপর। অভিনেতাদের মতন প্রযোজক পরিচালকদের চে তো আর মার্কামারা নয়। কাজেই প্রযোজক বা পরিচ হিসাবে পরিচয় দিতে তাদের আটকায় না। ফলে সাফ মূল্য, প্রযোজক বা পরিচালকদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য বে ভাগ ক্ষেত্রেই নেকড়ে ও শৃগালদের ভোগে লাগে।

এই সব চলচ্চিত্র উৎসবের বাহ্যতঃ প্রধান আকর্ষণ যদিও জগতের খ্যাতনামা ও খ্যাতনাম্নীরা, কিন্তু আসল প্রধান আ এই মেয়েদের পাল। উৎসবের আসল জৌলুষ এরাই। সব সুন্দরী যুবতী যারা নিজেদের দেখাতে ব্যস্ত—মাথা থেকে পর্যন্ত পর্য্যাপ্তভাবে—ওদেরই উপস্থিতি ভীড় বাড়ায় চলা

অনুরাধা গুহ—ছায়াছবির বাইরে।

উৎসবের। সত্যিকার জনপ্রিয় খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীরা কদাচিৎ যোগ দিতে আসেন এই সব উৎসবে। এলেও যে ভাবে পর্দানশীন হয়ে থাকেন, তাতে শুভ ও বিশেষ ক্ষণ ছাড়া আকাশের তারকাদের মতন তাদের সুদূর দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য হয় না সাধারণের। সেই সৌভাগ্যের আশাও কেউ করেও না আজকাল, কিম্বা আশা করলেও সেই ক্ষণিকের দর্শনে মজুরী পোষায় না কারুর ক্যানেতে বা ভেনিস-এ ছুটে যাবার। সেই ছুটে যাওয়া সার্থক হয় তাদের তারকাযশো-প্রার্থিনী এই সব সুন্দরী মেয়েদের দিয়ে—নিজেদের দেখাতে যারা ব্যস্ত। প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে, প্রতি চাহনীতে, যাদের একটি বক্তব্য, একটি মাত্র প্রার্থনা বা প্রশ্ন মুখরিত—কে নিবি রে কিনে আমায়?

এই সব উৎসবে জনপ্রিয়াদের উপস্থিতির ঘটনাটা ক্বচিৎ কখনোর ব্যাপার হলেও জনপ্রিয়দের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অন্য রকম। জনপ্রিয়রা অর্থাৎ অভিনেতাদের বেশ কিছু সমাগম হয়ে থাকে এই সব উৎসবে। না হবে কেন? সুদর্শন এক ফরাসী অভিনেতা উনিশ শো আট সালের ক্যানে উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন সস্ত্রীক। প্যারীর ট্রেণ থেকে ক্যানে ষ্টেশনে নেমে চারিদিকে তাকিয়ে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল তাঁর। সেইসঙ্গে খেদোক্তি একটা বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে—Seeing all these ravishing dishes here, I dont know why I brought my own snack।" এই সব চর্বচোষ্য দেখে কেন যে নিজের টিফিনটুকু (অর্থাৎ স্ত্রীকে) বয়ে আনলাম তা বুঝতে পারছি না।"

ঐ সব চর্বচোষ্য বা সুন্দরী যুবতীরা ছাড়া আরেকদল মেয়ের ভীড় হয় উৎসবে। সংখ্যায় এরা অবশ্য নগণ্য কিন্তু গণ্যমান্যতায় প্রথম শ্রেণীর। কারু স্বামী কোটিপতি শিল্পপতি, কারু স্বামী কোনও দেশের রাষ্ট্রদূত, কারু স্বামী পত্নীর জন্য মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রেখে স্বর্গত। এদের কারবার জনপ্রিয়দের নিয়ে। সন্ধ্যেকে সকাল ক'রে দেওয়া পার্টি দিতে থাকেন তাঁরা সেলুলয়েডের প্রেমিকদের অর্থাৎ সেই সব জনপ্রিয়দের সাময়িক ভাবে প্রিয়জন করবার প্রয়োজনে। এই দলের মেয়েদের মধ্যে অর্থের চেয়েও আভিজাত্য যার যত বেশি, সাফল্যের সম্ভাবনাও তাঁর তত অধিক। চলচ্চিত্র প্রেমিক নায়কদের কাছে অভিজাত ঘরের মেয়েদের চেয়ে বড় আকর্ষণ বুঝি আর নেই। না থাকবারই কথা। নিজেদের জীবনে ঐ একটি জিনিষেরই তাদের অভাব।

টাকা খরচ ক'রে যে একটি জিনিষ এখনও কেনা যায় না, কিনে পরা যায় না কোট প্যান্টের মতন বা ধারণ করা যায় না এমন কি ময়ূরপুচ্ছের মতনও—তা হল ঐ আভিজাত্য। ফলে কাউন্টেস অমুক এবং কাউন্টেস অমুকের পার্টিতে যা ভীড় জমে, উৎসব-প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনকালে তার অর্ধেকও দেখা যায় না প্রেক্ষাগৃহে।

ক্যানে ও ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে তাই বর্তমান পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে চলচ্চিত্র সেখানে আজকাল গৌণ পণ্য, মুখ্য পণ্য বা Merchandise of Venice হ'ল ঐ সব মেয়েরা। আর সেই সব পণ্যের Merchant of Venice স্বয়ং Sex Peerরা।

সাধারণ উৎসবের সাফল্য হিসাবে করা যায় উৎসব শেষে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট দিয়ে। উচ্ছিষ্টের পরিমাণ যত বেশি, উৎসবের উদ্দেশ্য ও আয়োজন তত বৃহৎ ছিল বলে সহজেই যেন অনুমান করা যায়। চলচ্চিত্র উৎসবগুলি সম্বন্ধেও সে-কথা বুঝি সমান সত্য। —আনন্দ।

## প্রশ্নোত্তরে নরেশচন্দ্র মিত্র

প্রশ্ন :—জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে আপনার মত কি ?

উত্তর :—এর পরিচালনভার যদি সরকার গ্রহণ করেন তা হলে ফল সন্তোষজনক হবে না।

প্রশ্ন :—কেন ?

উত্তর :—সরকারের হাতে এর পরিচালন ভার গেলে এটি একটি নিছক সরকারী প্রচারশালায় পরিণত হবে।

প্রশ্ন :—তা হলে এই ভার কার হাতে যাওয়া উচিত ?

উত্তর :—জনসাধারণের, বিশেষ করে এ বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ, এর সঙ্গে যাঁরা জড়িত, এ বিষয়ে যাঁরা নির্ভরশীল—বিশেষ করে তাঁদেরই হাতে।

প্রশ্ন :—এই নাট্যশালার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ কি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয় উচিত ?

উত্তর :—পারিশ্রমিক ভিত্তিতে। অবৈতনিক হলে চলবে না, তা হলে তাঁদের কাজে উৎসাহ বা উদ্যম কোনটারই না আসার সম্ভাবনাটাই অধিক।

প্রশ্ন :—আগেকার বাঙলা নাটকের তুলনায় এখনকার বাঙলা নাটক প্রসঙ্গে আপনার মত কি ?

উত্তর :—মান অনেক নেমে গেছে।

প্রশ্ন :—একটু বিস্তারিত ভাবে বলবেন ?

উত্তর :—এখনকার নাটকের মধ্যে না আছে গল্প, না আছে সঙ্ঘাত, না আছে বিষয়বস্তু সর্বোপরি অধুনাকালীন নাটকে নাটকীয়তার অভাব সবচেয়ে বেশী।

প্রশ্ন :—তা হ'লে এ যুগের নাটকের মধ্যে কি পাওয়া যাচ্ছে ?

উত্তর :—খানিকটা কায়দা-কৌশল আর কিছু কথার মারপ্যাচ।

"নিশীথে"র চিত্রগ্রহণের প্রাক্কালে অন্যতম পরিচালক সরোজ দে (অগ্রগামী গোষ্ঠী) এবং শিল্পী সুপ্রিয়া চৌধুরী

প্রশ্ন :—একটি নাটকে পরিচালকের দায়িত্ব আপনার মতে কতখানি ?

উত্তর :—অনেকখানি। অনেকখানিই বা বলি কেন, সব দায়িত্বই তাঁর।

প্রশ্ন :—পরিচালকের মধ্যে কোন কোন গুণাবলী থাকা আপনি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন ?

উত্তর :—নিজে বড় শিল্পী না হ'লে বড় পরিচালক হওয়া যায় না। আলো প্রভৃতি আনুসঙ্গিক বিষয়াদি সম্বন্ধেও তার সম্যক ধারণা থাকা দরকার। crafts senseও প্রয়োজন।

প্রশ্ন :—তখনকার দিনে নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি কি ভাবে হোত ?

উত্তর :—নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে তিন চার মাস নিয়মিত মহড়া চলত। সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা এগারোটা অবধি এই মহড়া চলত। আবার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে দুপুরেও মহড়া চলত।

প্রশ্ন :—আজকের নাটকের মধ্যে যে সব অভাব আপনার চোখে ধরা পড়েছে তার দূরীকরণের কি কোন উপায় নেই ?

উত্তর :—কেন নেই ? আছে বৈকি। সরকার প্রতিযোগিতা-মূলক কোন আয়োজন করলেই হয়। প্রতিযোগিতার ফলে অনেক ভালো জিনিষ আস্বাদ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে ?

কিন্তু স্থান কোথায় ? সুযোগ কোথায় ? আকাদামীর ছাপ নিয়ে যাঁরা বেরিয়ে আসছেন তাঁরা কতটুকু সুযোগ পাচ্ছেন তাঁদের নৈপুণ্য দেখাবার তা যদি না হল তাহলে ঐ শিক্ষাগ্রহণের তাৎপর্য্য কি ? আসলে একট আশার বাণী শুনিয়ে কতকগুলি সম্ভাবনাময় তরুণের ভবিষ্যত এইভাবে নষ্ট করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : তুলনামূলক ভাবে নানাদিক দিয়ে চলচ্চিত্র উন্নত হলেও এমন কোন দিক আছে যেদিকে রঙ্গমঞ্চ তার কাছে অনতিক্রম্য ?

উত্তর : প্রধানতঃ একটি দিক দিয়ে বিচার করলে রঙ্গমঞ্চ চলচ্চিত্রের কাছে অনতিক্রম্য, মঞ্চে contact এর যে আবেদন পর্দায় সেটা নেই, থাকতে পারে না ছবিতে direct flesh and bloodএর যোগাযোগ নেই, ষ্টেজে সেটা আছে। সকল দিক দিয়ে বিপুল উন্নত হলেও এদিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চ ছায়াছবির কাছে অনতিক্রম্য।

প্রশ্ন : জাতীয় জীবন গঠনে নাট্যশালার ভূমিকা কি ?

উত্তর : বিরাট ভূমিকা। মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম রঙ্গমঞ্চ। এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এর বক্তব্যও effective' সেইজন্যে প্রত্যেক লোকালয়ে এর প্রতিষ্ঠা দরকার, এর প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের আধিক্য সমাজের পক্ষে মঙ্গলকরই। এ ব্যাপারে জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গেও এই মতই ব্যক্ত করা চলে।

## বধূ

আজকের দিনে নারীর স্থান পুরুষের পিছনে নয়, পুরুষের পাশে আজ আর তার পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। জীবনের দুঃখ, সুখ হাসি, কান্নায় পুরুষের সঙ্গে তাকে সমান অংশ গ্রহণ করতে হবে, জীবনের চলার পথে পুরুষের সঙ্গে তাকে সমান তা'লে পা ফেলতে হবে। পুরুষ আর নারী আজ সমান ছন্দে জীবনের অভীষ্টে গিয়ে পৌঁছবে। তাই শিক্ষায়, দীক্ষায়, সকল দিক দিয়েই নারীকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে এবং বিশেষ করে শিক্ষার আলোক ছাড়া নারীর আজ "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়",

জীবনের অন্দরমহল থেকে বহির্মহলে আসার ছাড়পত্রই হবে তার শিক্ষা। এই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে আজ কত অপরিহার্য সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই বিমল ঘোষ প্রোডাকসানসের "বধূ"র কাহিনী রূপ নিয়েছে সংসারের কল্যাণী বধূর মমতাময়ী দীপ্তি তার অকল্যাণকে দূর করে, অসুন্দরকে পরাভূত করে, সেই সঙ্গে তার শিক্ষার আলো সংসারে নতুন ছন্দ আনে, নতুন গান আনে, নতুন রশ্মি আনে।

শৈলেশ দের রচিত এই কাহিনীর চিত্রায়ণ যেমনই তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনই সময়োপযোগী। আজকের সমস্যা সঙ্কুল সমাজের এই ছবি সমাধানের যে বলিষ্ঠ দিক নির্দেশ দিয়েছে তা অভিনন্দনীয়। ছবিটির পিছনে যে বিরাট নিষ্ঠা, শ্রম স্বীকার ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাও প্রশংসনীয়। সমগ্র কাহিনীর প্রয়োগনৈপুণ্য, ঘটনাসংস্থাপন, চরিত্রসৃষ্টি, গঠন কৌশল, বিন্যাস রীতি সর্বতোভাবে সাধুবাদার্হ। এই ছবিটির ব্যাপক ও যথাযোগ্য সমাদর আমরা কামনা করি।

ভূপেন রায় পরিচালিত এই ছবিতে স্বর্গত শিল্পী ছবি বিশ্বাসের অভিনয় এক অসামান্য চরিত্রসৃষ্টি। তাঁর অভিনয় এই ছবির প্রাণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাবিত্রী চাট্টোপাধ্যায় বধূর চরিত্রটি এক অপূর্ব রূপ দিয়েছেন, তাঁর রূপায়ণ চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরীর অভিনয়ও নৈপুণ্যের স্পর্শে উদ্দীপিত। অন্যান্য ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিশ্বজিৎ, রবীন মজুমদার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সরযূবালা দেবী, অনুভা গুপ্তা, সন্ধ্যা রায়, জয়শ্রী সেন, মেনকা দেবী, মঞ্জুলা সরকার প্রভৃতির অভিনয়ও যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ্য।

## তরণীসেন বধ

ভারতের সর্বকালবন্দিত ধর্মগ্রন্থ বা মহাকাব্যগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি চরিত্রের সন্ধান মেলে যারা অতি অল্প স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও গুরুত্ব ও মহিমায় অনেকের তুলনায় বেশী উজ্জ্বল। সমগ্র রামায়ণ মহাগ্রন্থে বালক তরণীসেন অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে চিত্রিত হলেও অসাধারণ ভগবদ্‌ভক্তি ও অলোকসামান্য আত্মবিসর্জনের জন্যে আবালবৃদ্ধবনিতার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে এক চিরকালীন আবেদন নিয়ে। এই তরণীসেনের জীবনকাহিনী অবলম্বন করে এই ভক্তিমূলক ছায়াছবিটি গড়ে উঠেছে। অশোক-কাননে সীতার প্রতি অত্যাচার থেকে শুরু করে শ্রীরামচন্দ্রের অস্ত্রে তরণীসেনের প্রাণবিয়োগ পর্যন্ত ছবিতে স্থান পেয়েছে।

তরণীসেন বধ ছবিটি নির্মাতাবৃন্দের সাফল্যের নিদর্শন। সমগ্র ছবিটিতে তাঁরা এক ভক্তির সম্মিগ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। কাহিনীর গ্রন্থনে কিছু মহাভাবতের কাহিনী সন্নিবেশিত হলেও কাহিনীর মাধুর্য বা আবেদন তাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। ছবিটির দৃশ্যপট পরিকল্পনা অসামান্য শক্তির পরিচায়ক। এর আবেদন দর্শকের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করে দাগ কেটে যায় এবং মনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে। পরিচালকের পরিচালন নৈপুণ্যে চরিত্রগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটেছে। আজকের এই অবিশ্বাসের যুগে এই জাতীয় বিশ্বাস ও ভক্তিধর্মী ছবির প্রসার জনগণের মধ্যে যত ব্যাপকতর হয় ততই সর্বসাধারণের মঙ্গল। সেজন্যে চিত্র-নির্মাতাবর্গ আমাদের ধন্যবাদার্হ।

এই উপভোগ্য ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্রসারথি পরিচালিত এই ছবির নাম-ভূমিকায় অভূতপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন শ্রীমান তিলক। তরণীসেনের অভিব্যক্তি, ব্যাকুলতা, দেশপ্রেম তিলকের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিলকের এ অভিনয় ভোলবার নয় বিশেষ করে রামের বাণে আহত হয়ে রামের পদপ্রান্তে মিলিত হওয়ার দৃশ্যটি দর্শককে হতবাক করে দেয়। তিলকের পরেই রাবণ ও সরমার ভূমিকায় যথাক্রমে নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারাণী দেবীর অভিনয়ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। এঁরা ছাড়া গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, প্রবীরকুমার, সুনীত মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দ্রাণী সারখেল প্রভৃতির অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

## অগ্নিশিখা ও অতলজলের আহ্বান

বর্তমানে শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে "বধূ" এবং "তরণীসেন বধ" ছাড়া আরও যে সকল ছবি সগৌরবে প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে অগ্নিশিখা ও অতল জলের আহ্বান এর নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবি দুটির পরিচালক যথাক্রমে রাজেন তরফদার ও অজয় কর। উভয় ছবিই স্বর্গত নট ছবি বিশ্বাসের অবিস্মরণীয় অভিনয়সমৃদ্ধ।

# সংবাদবিচিত্রা

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রগণ্য সেনাপতি, আত্মত্যাগ দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের মূর্তিমন্ত প্রতীক, জনগণ মন অধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় ভাস্বর গৌরবোজ্জ্বল মহান জীবনের চিত্ররূপদানের অভিনন্দনযোগ্য পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন আর, বি, ফিল্মস। সুভাষচন্দ্রের জীবনের বিরাটত্ব, সাধনা এবং আদর্শ সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও প্রচার করা নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। আজকের সমস্যাসঙ্কুল, যন্ত্রণা প্রপীড়িত, হৃতসর্বস্ব সমাজে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বরেণ্যপুরুষদের জীবনের গৌরবের আলোয় চির ভাস্বর কাহিনী আবার নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে, দিতে পারে নবজীবনের, দিতে পারে আলোর। ছবিটি বাঙলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ছবিটি পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে বিখ্যাত পরিচালক "ভুলি নাই" খ্যাত শ্রীহেমেন গুপ্তের প্রতি। শ্রীগুপ্ত একদা সুভাষচন্দ্রের একান্ত সচিব ছিলেন। ভারত সরকারের অনুমোদন পেলেই চিত্র নির্মাতারা কাজ শুরু করবেন। ছবিটির মধ্যে নেতাজীর ঐতিহাসিক অন্তর্ধান দেশের বাইরে মুক্তিবাহিনী গঠন এবং দেশের বন্ধনমোচনের জন্যে সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টা প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা যদি ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করতে সমর্থ হয় তা হ'লে এই ব্যাপারেই শ্রীগুপ্তকে জার্মাণী, জাপান, পেনাং, মালয়, আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করে এই সাধু কল্পনায় চূড়ান্ত রূপ দিতে হবে।

প্রকৃতির লীলাভূমি ভূস্বর্গ কাশ্মীর অপরূপ সৌন্দর্যের যাদুপুরী। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে একটি প্রামাণ্য ছবি গৃহীত হচ্ছে। এই প্রামাণ্যচিত্রের নির্মাতা কিন্তু ভারত নয়, ফ্রান্স। কাশ্মীরের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের মনোরম শোভা আকৃষ্ট করেছে ফ্রান্সকে। যেমন করেছে

জানা বিশ্বকে। একটি ফরাসীচিত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মঃ বিলে গিলে এবং মঃ টমাস চিত্রগ্রহণের ভার নিয়ে কাশ্মীরে এসেছেন। জগদ্বিখ্যাত ডাল হ্রদ এবং মোগল কাননগুলির ছবি তোলা শেষ হয়েছে। চিত্রটি আগামী বর্ষের প্রারম্ভে ইউরোপের প্রায় সকল প্রেক্ষাগৃহেই প্রদর্শিত হবে। এই দু'জন বর্তমানে কাশ্মীরের জীবন ধারা এবং সংস্কৃতির অনুশীলনে নিমগ্ন।

পৃথিবীর সমস্ত শহরগুলির মধ্যে সিনেমা দেখার রেকর্ড সব চেয়ে কার বেশী এ বিষয়ে পরিসংখ্যানের সাহায্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ জেনেছেন যে হংকংই সকলের অগ্রণী। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য নগর বা জনপদ-গুলির তুলনায় হংকং-এর চিত্রাসক্তিই সব চেয়ে বেশী এবং প্রকট। এই তথ্যটি সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিসংখ্যানিক বর্ষপঞ্জী ( ১৯৬১-র ) মাধ্যমে।* এ বিষয়ে হংকং-এর পরবর্তী আসন দুটি যথাক্রমে লেবানন এবং ইস্রায়েলের অধিকারভুক্ত।

পৃথিবীর পূতপবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে বাইবেল অন্যতম। আজও সহস্র সহস্র নরনারীর জীবনধারা পরিচালিত হচ্ছে বাইবেলের ভাবাদর্শে। অসংখ্য পুরুষের, অসংখ্য নারীর প্রতিটি কর্মে, ধ্যান-ধারণায় পাওয়া যাচ্ছে বাইবেলের অনুশাসনের সুস্পষ্ট প্রভাব। বিদেশের চলচ্চিত্র জগতের গৌরবময় জয়যাত্রার মূলেও আছে বাইবেলের অনেকখানি অবদান। নানাভাবে বাইবেল চলচ্চিত্রলোককেও সমৃদ্ধির পথে অগ্রগমনে সহায়তা করেছে। বাইবেলের নানা কাহিনীর চিত্ররূপ সামগ্রিক ভাবে ছায়ালোকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। বিখ্যাত প্রযোজক দিনো-দ্য-লরেন্তিস এবার সম্পূর্ণ বাইবেলের চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হচ্ছে এই যে, এতাবৎকাল যতদূর জানা যাচ্ছে, যে বাইবেলের এক একটি কাহিনী অবলম্বন করেই এক একটি ছবি রূপ নিয়েছে কিন্তু লরেন্তিস দিতে চলেছেন সমগ্র বাইবেলের চিত্ররূপ। ঘোষিত হয়েছে Bible—Cover to Cover. এর চিত্রনাট্য রচনার ভার নিয়েছেন স্বনামধন্য বৃটিশ কবি-নাট্যকার ক্রিস্টোফার ফ্রাই। এর নির্মাণ-ব্যয়ের অঙ্ক নির্ধারিত হয়েছে দশ লক্ষ পাউণ্ড।

বর্তমানকালকেই চলচ্চিত্রের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে যে গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে চলচ্চিত্রের অভিনবত্বের অভিযান শুরু হয়েছে। তার দিগন্তের পরিধি বিস্তৃত হতে শুরু হয়েছে। তার আঙিনায় নতুনের পদসঞ্চার শ্রুত হচ্ছে। নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আজ চলচ্চিত্রের জয়যাত্রা। এই নতুনত্বের সাধনা বোধহয় অনেকদূর এগিয়ে যাবে যদি জাভাটিনি তাঁর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জন করতে পারেন। জাভাটিনি একটি ছবি নির্মাণ করতে চলেছেন যার কোন চিত্রনাট্য নেই, নেই কাহিনীর পটভূমি, নেই কোন নির্দিষ্ট শিল্পী, শিল্পীরা কেউ জানতেই পারবে না যে তাঁরা এই ছবিতে অভিনয় করছেন, প্রয়োজনমত ক্যামেরাগুলি গোপনে তাদের কাজ সেরে যাবে। সারা ছবিটির মধ্যে রোমকে, রোমের প্রতিটি সমাজকে, সেখানকার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মধারাকেই রূপ দেবেন জাভাটিনি। তাঁর সম্প্রতি প্রদর্শিত 'টু উওমেন' ছবিটির চিত্রনাট্য ইনিই রচনা করেছিলেন। এই দুঃসাহসিক এবং অভিনন্দনীয় প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক এবং চলচ্চিত্রের আর এক অভিনব অধ্যায় রচিত হোক কামনা করি।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

প্রখ্যাতনাম্নী লেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর লেখা, "ছায়াসূ[illegible] কাহিনীটির চিত্রায়ণ পরিচালিত হচ্ছে ভারতের তরুণতম পরিচা[illegible] পার্থপ্রতিম চৌধুরীর দ্বারা। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে নির্মলকুমার, বিশ্বনাথন, অনুভা গুপ্তা, শর্মিলা ঠাকুর প্রভৃতি। * * * পঙ্করথীর পরিচালনায় শ্রীমতী করুণা সেনের "বিনিপাত" কাহিনী চলচ্চিত্রের রূপ নিচ্ছে। সুরযোজনা করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শিশি[র] বটব্যাল, আশীষ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শুভ্র সিংহ, মঞ্জু সান্যাল প্রভৃতি। * * * "মউঝুরি" ছবিটির পরিচালনা করছেন শিব ভট্টাচার্য এবং মান্না দে-এর সুরসংযোজক। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, জহর রায়, ধীরাজ দাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুলা সরকার, দীপিকা দাস প্রভৃতি শিল্পীরা এই ছবিটিতে অভিনয় করছেন। * * * পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের আগামী চিত্রোপহার "সুবর্ণরেখা"। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ এর সঙ্গীত পরিচালক। চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন অভি ভট্টাচার্য, জহর রায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও রুবি মিত্র প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। * * * "চিমনি" ছবিটির পরিচালনভার গ্রহণ করেছেন মোহন বিশ্বাস। আলোকচিত্রায়ণের দায়িত্ব নিয়েছেন শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে আছেন—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মুকুল মুখোপাধ্যায় ও আরতি ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পিবর্গ।

## সৌখীন সমাচার

গঙ্গাপদ বসুর "অংশীদার" নাটকটি সম্প্রতি অভিনয় করলেন কলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই নববর্ষ মিলনোৎসব সমিতি। নাট্যকারের পরিচালনায় নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন বাগচী, সত্য গোস্বামী, রঞ্জিত চক্রবর্তী শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * প্রবীণ নাট্যসেবী ভানু চট্টোপাধ্যায়ের "আজকাল" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন শ্যামবাজার অগ্রণী সঙ্ঘ। রূপায়ণে ছিলেন পঙ্কজ গুপ্ত, মিহির সরকার, চন্দন বিশ্বাস, তপন চট্টোপাধ্যায়, ব্রততী সরকার প্রভৃতি। * * * কালীঘাট ব্যায়াম সমিতির সদস্যরা সম্প্রতি নাট্যকার ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চোর" নাটকটি অভিনয় করলেন। চরিত্রগুলির রূপ দেন অরবিন্দ ঘোষ, দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্য বণিক, হরিশ ঘটক, কমল বসু, আশীষ সিমলাই, রাণু মুখোপাধ্যায়, বীণা সেন, চায়না বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। * * * ইনডোরের সদস্যরা সম্প্রতি বীরু মুখোপাধ্যায়ের "স্বপ্নশেষ" নাটকের অভিনয় করলেন। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হন বিজন মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ হালদার, শিবাজী সেন, তারাপদ রায়, সবিতা দাস প্রভৃতি। নির্দেশক ছিলেন দেবেন দাস। * * * ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার্স ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ পৃথ্বীশ সরকার রচিত "লবণাক্ত" নাটকটি নিবেদন করলেন। সন্তোষ দত্তের পরিচালনায় বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমল চক্রবর্তী, নিরঞ্জন দে সরকার, জ্যোতিরিন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, তৃষ্ণা দত্ত, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

## জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ (মে-জুন, '৬২)

অন্তর্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে): কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারী অর্থের অপচয় ও অপব্যয়ের অভিযোগ—সর্বশেষ অডিট রিপোর্টে (১৯৬২) চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে): 'পাইলটদের বেতনাদি বৃদ্ধির জন্য আলোচনা চালাইতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত নয়'—লোকসভায় জাহাজী মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুরের উক্তি।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে): 'কাশ্মীরের পাক্ অধিকৃত অঞ্চলকে 'আজাদ কাশ্মীর' স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে রূপান্তরের চেষ্টা হইলে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে'—কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের সতর্কবাণী।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৮ই মে): কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুই কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—লোকসভায় শিক্ষাসচিব ডাঃ শ্রীমালির ঘোষণা।

৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে): ১৮ দিন পর কলিকাতা বন্দরের পদত্যাগকারী পাইলটদের কার্য্যে যোগদানের সিদ্ধান্ত—বন্দরের অচলাবস্থার অবসান।

৬ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে): খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের সমস্যা সম্পর্কে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানী সচিব শ্রী কে, ডি মালব্যের সহিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বৈঠক।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২১শে মে): 'চায়না টু-ডে'র (দিল্লীস্থ চীনা দূতাবাসের পত্রিকা) বিরুদ্ধে ভারত সরকার কর্তৃক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত—কূটনৈতিক রীতি লঙ্ঘনের অভিযোগ।

৮ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে): এম্-বি-বি-এস পরীক্ষার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) তারিখ পিছাইয়া দিবার দাবীতে মেডিক্যাল ছাত্রদের বিক্ষোভ—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ দশ ঘণ্টা আটক—পরিণতিতে পুলিশের লাঠিচালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ।

শিয়ালদহ ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে বাফারের সহিত ইঞ্জিনের সংঘর্ষ—৬০ জন যাত্রী আহত।

৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে মে): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-বি-বি-এস পরীক্ষা বাতিল—উপাচার্য্য শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ীর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ—ছাত্রসমাজ কর্তৃক পুলিশের লাঠিচালনার নিন্দা।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে): পূর্ব পাকিস্তান হইতে নবাগত শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—কলিকাতায় মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ রায়ের সহিত কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার বৈঠক।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে): অত্যাবশ্যক পণ্য মূল্য বৃদ্ধির কারণ তদন্ত ও প্রতিকার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণে রাজ্য সরকার (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক কমিটি নিয়োগ।

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৬শে মে): কলিকাতায় ভারতীয় বার্ত্তাজীবী ফেডারেশনের দশম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন—উদ্বোধক: কেন্দ্রীয় আইন সচিব শ্রীঅশোক সেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে): পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মাইগ্রেশন বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের দৃঢ় দাবী—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে (কলিকাতা) বিরাট জনসভা—পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্য্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ।



বার্ত্তাজীবী ফেডারেশন (ভারতীয়) সম্মেলনে ভারত সরকারের নিকট বার্ত্তাজীবীদের জন্য দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠনের দাবী।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে): 'সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে যাত্রী বিমান ও হেলিকপ্টার ক্রয়ের প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে'—লোকসভায় প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীকৃষ্ণমেননের বিবৃতি।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে): 'ফৌজ সংযত কর—আর এক পা-ও অগ্রসর হইও না'—নয়া চীন সরকারের প্রতি ভারতের কঠোর সতর্কবাণী।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে): এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ বিজয়ের শেষ পর্য্যায়ে ভারতীয় অভিযাত্রী দল—২৭,৯০০ ফুট উর্দ্ধে শিবির স্থাপনের দাবী।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে): পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নূতন করিয়া দলে দলে উদ্বাস্তু আগমন—উদ্ভূত কঠিন সমস্যা লোকসভায় নিবিড় আলোচনা।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন): দিল্লীর বিড়লা ভবন (গান্ধীজীর হত্যাস্থান) জাতীয়করণের দাবীতে প্রবল বিক্ষোভ—সমাজতন্ত্রী নেতাদের লোকসভাকক্ষ ত্যাগ—বিড়লা ভবনের সম্মুখে দলবদ্ধ বিক্ষোভ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন): ভারতীয় এভারেষ্ট অভিযাত্রী দলের অভিযান পরিত্যক্ত—আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় ৪ শত ফুট নীচু হইতে প্রত্যাগমনে বাধ্য।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন): দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকে প্রস্তাব: হিন্দীর পূর্ণ বিকাশ সাপেক্ষে ইংরাজীই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম থাকিবে।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন): 'বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলিকাতা) উপাচার্য্য ও মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডীনের নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে'—বিক্ষোভকারী মেডিক্যাল ছাত্রদের সহিত আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের দৃঢ় দাবী।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন): হিন্দীর পাশাপাশি ইংরাজীকে সহযোগী সরকারী ভাষা করার জন্য পার্লামেণ্টে শীঘ্রই বিল পেশ—স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন): দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব গৃহীত—অবিলম্বে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার আহ্বান।

কংগ্রেসের নূতন সভাপতিপদে শ্রী ডি সঞ্জীবায়া নির্ব্বাচিত।

তিব্বতস্থ ভারতীয় বাণিজ্য এজেন্সীসমূহ বন্ধ—চীন-ভারত সম্পর্কের আরও অবনতি।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন): ভারতকে সাহায্যদানের প্রশ্নে পশ্চিমীদের গঠিত 'এড ইণ্ডিয়া ক্লাবের' দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব—লোকসভায় সদস্যদের কঠোর সমালোচনা।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ (৮ই জুন): বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্কট পরিহারের

জন্ত সরকারী ও বে-সরকারী সকল খাতেই আমদানী হ্রাস—লোক-সভায় অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই'র ঘোষণা—

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ( ৯ই জুন ) : বৃটেন কর্তৃক শীঘ্রই ভারতকে বিনা সর্ত্তে ১২ কোটি টাকা ঋণদানের প্রস্তাব।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ ( ১০ই জুন ) : অবিলম্বে বাতিল এম্‌-বি-বি-এস পরীক্ষা আরম্ভের জন্ত কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু ও ২৪ জন পৌরসভা কাউন্সিলারের ( কলিকাতা ) আবেদন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ( ১১ই জুন ) : অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ( চিত্র ও নাট্য ) শ্রীছবি বিশ্বাসের ( ৬২ ) জীবনাবসান—যশোহর রোডে মোটর দুর্ঘটনায় শোচনীয় মৃত্যু।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন) : সূতী ও পশমী বস্ত্র, ঔষধ, নিউজ প্রিণ্ট প্রভৃতির ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক হ্রাস—কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্য-ব্যবস্থা।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ ( ১৩ই জুন ) : বাতিল এম-বি-বি-এস পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিস্থিতি অপরিবর্ত্তিত—বিশ্ববিদ্যালয় ( কলিকাতা )। কর্তৃপক্ষের সহিত মেডিক্যাল ছাত্রদের মীমাংসা-আলোচনা ব্যর্থ।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ ( ১৪ই জুন ) : আসামের গোয়ালপাড়া জেলা ও করিমগঞ্জে বন্যার তাণ্ডব—প্রচণ্ড প্লাবনে কাছাড়ের সহিত রেল ও সড়ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ ( ১৫ই জুন ); রাজসাহী ( পূর্ব্ব পাকিস্তান ) হইতে পলায়নপর ১৫শত সাঁওতালের উপর পাক্ ফৌজের গুলীবর্ষণ—১০ জন নিহত ও ১৫০ জন আহত হওয়ার সংবাদ।

**বহির্দেশীয়—**

১লা জ্যৈষ্ঠ ( ১৫ই মে ) : মার্কিণ সপ্তম নৌবহর হইতে থাইল্যাণ্ডে সৈন্যাবতরণ—লাওস সীমান্ত অভিমুখে সৈন্যদলের অভিযাত্রা।

২রা জ্যৈষ্ঠ ( ১৬ই মে ); পশ্চিম ইরিয়ানের উত্তর উপকূলে ইন্দোনেশীয় গেরিলা ফৌজ ও ওলন্দাজ নৌবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ ( ১৭ই মে ) : চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে বহু লক্ষ চীনা নর-নারীর হংকং-এ ( বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল ) পলায়নের উদ্যোগ—পর্ত্তুগীজ ম্যাকাওয়েও ৮০ হাজার চীনা শরণার্থীর ভীড় করিবার সংবাদ।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ( ১৯শে মে ) : কাশ্মীর প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের পুনরায় বৈঠক অনুষ্ঠানে ভারতের বিরোধিতা—রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী ঝা কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদ প্রেসিডেন্টের নিকট পত্র প্রেরণ।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ( ২০শে মে ) : আর্জেন্টিনায় পার্লামেণ্ট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত বন্ধ এবং রাজনৈতিক দলগুলির কার্য্যতঃ বিলুপ্তি।

৭ই জ্যৈষ্ঠ—২১শে মে : লণ্ডন হইতে করাচী আগমনের পরই ফিজো ( নাগা বিদ্রোহী নেতা ) উধাও—'ডন' ( করাচী ) পত্রিকায় চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

৯ই জ্যৈষ্ঠ ( ২৩শে মে ) : গুপ্ত সামরিক সংস্থার ( ও-এ-এস্ ) প্রধান ফ্রান্সের প্রাক্তন জেনারেল সালানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সামরিক আদালতের রায়।

'লাওসের ব্যাপারে মার্কিণ হস্তক্ষেপ বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে ... —সোভিয়েট ইউনিয়নের সতর্কবাণী।

১০ই জ্যৈষ্ঠ ( ২৪শে মে ) : মার্কিণ লেঃ কমাণ্ডার ম্যালকম কার্পেণ্টারের ( তৃতীয় মার্কিণ মহাকাশচারী ) অরোরা—৭ মহা... যানে তিনবার পৃথিবী পরিক্রমা।

১২ই জ্যৈষ্ঠ ( ২৬শে মে ) : মধ্য আলজিয়ার্সে সশস্ত্র পুলি... সন্ত্রাসবাদীদের ( ও-এস-এস ) মধ্যে তীব্র লড়াই।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ( ২৮শে মে ) : রুশিয়া কর্তৃক নূতন কৃ... উপগ্রহ 'কসমস—৫' মহাকাশে উৎক্ষেপণ।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ ( ২৯শে মে ) : নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের শেয়ার বা... চূড়ান্ত বিপর্য্যয় অত্যধিক মূল্যে শেয়ার বিক্রিত হওয়ায় বি... সকল বাজারে প্রতিক্রিয়া।

পশ্চিম ইরিয়াণে যুদ্ধবিরতির জন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের আর এক দফা আবেদন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ( ১লা জুন ) : মহাঘাতক এডলফ আইখম্যা... ( ৫৬ ) শেষ পর্য্যন্ত ফাঁসি—

২০শে জ্যৈষ্ঠ ( ৩রা জুন ) : রোডেশীয় ফেডারেশন ভাঙি... দেওয়ার জন্ত দৃঢ় দাবী—লাগোসে ১১টি আফ্রিকান রাজ্যের পর... সচিবদের সম্মেলনে জরুরী প্রস্তাব।

২১শে জ্যৈষ্ঠ ( ৪ঠা জুন ) : গুপ্ত সামরিক সংস্থার ( এ-এ-এস ) দ্বিতীয় নেতা প্রাক্তন জেনারেল জোহোর মৃত্যুদণ্ড বহাল—দণ্ডাদেশে... বিরুদ্ধে আপীলের আবেদন ফরাসী আদালতে নাকচ।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ ( ৮ই জুন ) : সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইনে... অবসান ও নূতন সমাজতন্ত্র চালু—রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক্ জাতী... পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ ( ১০ই জুন ) : ভারতকে টেক্কা দিয়ে পাকিস্তা... রকেট শক্তিতে পরিণত—৭ই জুন প্রথম রকেট উৎক্ষেপণের সংবাদ।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ( ১১ই জুন ) : লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠ... সম্পর্কে প্রিন্সত্রয়ের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ ( ১৩ই জুন ) : প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান কর্তৃ... পাকিস্তানের নূতন মন্ত্রিসভা ( ১৩ জন সদস্য সমন্বিত ) গঠন—পররা... সচিব পদে মিঃ মহম্মদ আলিকে নিয়োগ।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ ( ১৫ই জুন ) : রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষ... কাশ্মীর সংক্রান্ত বিতর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে পুরোপু... সমর্থন—ভারত ও পাকিস্তান দুই পক্ষের প্রত্যক্ষ আলোচনা... মীমাংসার এক মাত্র পথ বলিয়া স্যার প্যাট্রিক ডীনের ( বৃটি... প্রতিনিধি ) অভিমত প্রকাশ।

## এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কলিকাতা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন প্রাচীর মূর্তির একাংশের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্তিটিতে সতীদাহের জন্ত সতীকে দাহ করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে—ইহাই প্রতীয়মান।

আলোকচিত্র শ্রীচিত্ত নন্দী কর্তৃক গৃহীত।

## কলকাতায় মহামারী

"কলেরা নিরোধের জন্য নানাবিধ জরুরী কাজ দশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিবার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দেশ দিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষও তোড়জোড় করিতেছেন না তাহাও নয়। কিন্তু কলেরার প্রকোপ কমিতেছে না। বরং ৩০শে জুন আন্তিক সপ্তাহে কলেরার প্রকোপ আরও বেশী বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ সপ্তাহে ৪৪৪ জন কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং কলেরায় মারা যায় ১১৩ জন। পূর্ববর্তী সপ্তাহে ৩৫৩ জন কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং কলেরায় মারা যায় ৮১ জন। সুতরাং ২৩শে জুন আন্তিক সপ্তাহের তুলনায় ৩০শে জুন আন্তিক সপ্তাহে কলেরার প্রকোপের হঠাৎ বৃদ্ধিটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহার কারণ লইয়া আলোচনার ক্ষমতা আমাদের নাই। এবার কলেরার প্রাদুর্ভাব অন্যান্য বার যে সময় হয় সেই সময় হয় নাই বলিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ হয়ত কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, এবার আর কলেরার আক্রমণ হইবে না। কিন্তু ইহাও আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ার পূর্বে উহা নিরোধের জন্ত প্রতিষেধক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব, বিশেষ করিয়া বস্তী অঞ্চলে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবই মহামারীর মূল কারণ, ইহা আমরা শুনিয়াছি। মালিকের অনুমতি ছাড়া বস্তীতে নলকূপ বসানো যায় না, ইহাও নূতন কথা নয়। কলিকাতায় কলেরার আক্রমণ এই প্রথম হইল তাহাও নয়। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু বস্তী অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবার জন্ত আইন প্রণয়ন করা কেন হয় নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।"

—দৈনিক বসুমতী।

## উদারনৈতিক জহরলাল

"পূর্ব-পাকিস্তানে খাদ্য শস্যের অভাব। পাকিস্তান সরকারের নিকট হইতে ভারত সরকারের নিকট সেই অভাব পূরণের অনুরোধ আসিয়াছে। ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিয়াছেন যে, আমেরিকা হইতে পঁচিশ হাজার টন গম বোঝাই যে দুইটি জাহাজ ভারতে আসিতেছে তাহা ভারতের বন্দরে না ভিড়াইয়া সোজাসুজি পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়ানো হউক। প্রতিবেশী রাজ্যের খাদ্যসঙ্কটে এইরূপ ত্বরিত-সাড়া মনুষ্যোচিত কাজ। কাজেই ভারত সরকারের পাকিস্তানের প্রতি এই মৈত্রী-প্রকাশে স্বাভাবিক অবস্থায় আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। পাকিস্তান পরে এই প্রেরিত গম ফেরত দিবে বলিয়াছে। তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও বর্তমানে প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু একটা প্রশ্ন না তুলিলে নিজেকে, শুধু নিজেকে কেন দেশকেও এক কপট উদারতার দ্বারা প্রতারিত করা হইবে। ভারত মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করিয়াছে ভাল কথা, কারণ কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া, প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীর অভাব ঘটুক, কোন ভারতবাসীই তাহা চাহে না। কিন্তু মিত্রতার হস্ত যাহার প্রতি প্রসারিত সে যদি সে হস্ত সাদরে গ্রহণ না করিয়া হাত গুটাইয়া রাখে বা প্রসারিত হস্তের উপর নির্মমভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে একতরফা মৈত্রী চালাইয়া যাওয়া সম্ভব কি না, কতদিন চালাইয়া যাওয়া সম্ভব, এবং চালাইয়া যাওয়া আদৌ উচিত কি না, অনিবার্যভাবেই সে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু নিধনের, হিন্দুদের প্রতি অকথ্য নির্যাতনের, পূর্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দুবিতাড়নের এবং বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে পূর্ব-পাকিস্তানের নোয়াখালি জেলার চৌমোহনীতে এখনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগুরু মুসলমানদের বর্বর তাণ্ডবের পরিপ্রেক্ষিতে এই মৈত্রীর মাহাত্ম্য আমরা হৃদয়ঙ্গম বা হজম করিতে পারিতেছি না, একথা অকপটে স্বীকার করিব। কিন্তু একথাও বলিব যে, এই উদারতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার যদি পাকিস্তানকে হিন্দুমেধ যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিবার অর্থাৎ পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপদ বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে অতীতের তিক্ত স্মৃতি সত্ত্বেও এই উদারতা প্রদর্শনে কেহ আপত্তি করিবে না।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## আসামী বাঙালী ভাই ভাই

"আসামের কাছাড় জেলায় বাঙালীদের বিরুদ্ধে আসামীদের বিরূপ মনোভাব শান্ত হইয়া আসিয়াছে। সত্য হইলে নিঃসন্দেহে ইহা সুসংবাদ। যাঁহারা এক বৎসর পূর্বের এবং এক বৎসর পরের কাছাড়ের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই এরূপ কথা বলিতেছেন। পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের অবাধ প্রবাহে কাছাড় জেলায় যে বিপর্যয়কর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার গুরুত্ব আসামের অসমীয়াগণ এতদিন সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বহু অবাঞ্ছিত ঘটনার আবর্তনের ফলে এখন হয়তো তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, কত গুরুত্বপূর্ণ বিপদের আশঙ্কা তাঁহারা নিরুদ্বিগ্নভাবে এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আসাম ও ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলের অবস্থা বিপজ্জনক। এই বিপদের আশঙ্কাই আসামে বাঙালী ও অসমীয়াদের ভেদবুদ্ধি অবসানের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে আশা ও আনন্দের বিষয়।"

—যুগান্তর।

## সংকট পরিত্রাণ

"আমরা পূর্বেই বলিয়াছিলাম—ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থসংস্থানের যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সরকার পরিকল্পনা রূপায়ণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার নিজস্ব একটি পাপচক্র আছে এবং তাহার আবর্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই দুরূহ। সাম্রাজ্যবাদীদের না চটাইয়া এবং দেশের বৃহৎ শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ না করিয়া পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের নীতি সফল হইতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সহিত বহির্বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাইতে না পারিলে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ

সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে না পারিলে এ সংকটের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদী চাপের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই প্রসঙ্গেই বলা দরকার যে, কমিউনিষ্ট পার্টি পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থানের যে বিকল্প নীতিগুলি সরকারের নিকট পেশ করিয়াছে তাহার গুরুত্ব সমধিক বাড়িয়া যাইতেছে। সরকার কি এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে প্রস্তুত আছেন?" —স্বাধীনতা।

## বন্যা নিয়ন্ত্রণ

"আমাদের দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত চেষ্টা চলিতেছে, সে নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা যতদিন পরিপূর্ণরূপে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত না হয়, অন্ততঃ ততদিনের জন্য বন্যা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া বন্যার্তদের ত্রাণকার্যের জন্য এমন একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া রাখা উচিত, প্লাবন দেখা দিবা মাত্র যাহা ত্রাণ ও সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। তাহার ফলে আর কিছু না হোক, অহেতুক বিলম্বজনিত অথবা দুর্ভোগের মাত্রা হ্রাস পাইবে। আসামের বন্যা বর্তমানে যে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য অনুরূপ উদ্যোগ-আয়োজন দরকার। সরকারী প্রচেষ্টার সহিত যদি বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘনিষ্ট সহযোগিতা স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে একক সরকারী উদ্যোগে সেবাকার্য সন্তোষজনকভাবে সাধিত হওয়া সম্ভব হইবে না। এমন কি, অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সেনাদলের সহায়তা আহ্বান করারও প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সমগ্র প্রচেষ্টাকে সামরিক পর্যায়ে উন্নীত করা এ কর্মপন্থার সর্বশেষ কার্যক্রম।" —জনসেবক।

## পরিণাম

"বলা বাহুল্য, ভারত এত দিন যে ভাবে বসিয়াছে, এখন তাহার পরিণাম ভুগিতে হইতেছে। মার্কিণ সরকার উদ্বৃত্ত ভারতীয় চিনির পরিস্থিতি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য নখদর্পণে রাখেন। কিন্তু নিজেদের চিনি-আমদানীর পরিমাণ স্থির করার সময় তাঁহারা ভারত সম্বন্ধে বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মাণি বা জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। ভারত গোয়া হইতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন লোপ করায় বা রুশ-বিমান কিনিতে সচেষ্ট হওয়ায় জাপানে কোনও বিরূপ আবহাওয়া সৃষ্টির প্রশ্ন উঠে না। জাপান চীনের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট। উহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও জাপান-বিরোধী মনোভাব দেখা দিতেছে না। কিন্তু মার্কিণ নিস্পৃহতার ফলে ভারতকে সাহায্য করার ব্যাপারে জাপানের উৎসাহ হ্রাস পাইতে পারে। কানাডা প্রভৃতির মনোবৃত্তিতেও এই পরিবর্তন দেখা দেওয়া সম্ভব। বিদেশ হইতে আমদানি, বিদেশী লগ্নি বা বৈদেশিক দান [illegible] জিনিষ নয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ারও বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু পররাষ্ট্র নীতির দৌর্বল্যে ভারত যেভাবে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটে পড়িয়াছে, তাহা তুলনাহীন। এই দিক দিয়া জাতিগত দৃঢ়তা অপরিহার্য। উহার পরিবেশও বর্তমান। কিন্তু কাজে লাগাইবার মত উৎসাহ বা দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব সহজে মিটিবে না।" —লোকসেবক।

## অহিংস বর্বরতা

"কৃষ্ণনগর সীমান্তে অহিংস বর্বরতার চরম দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। পাকিস্থানী নরক হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় তিনটি নারী বি[না] পাশপোর্টে ভারতে পা দিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে বাধি[য়া] সীমান্ত পার করিয়া দিয়া নেহরুর সীমান্ত রক্ষীরা তাহাদের মনিবে[র] মান এবং নিজেদের রুটি বাঁচাইয়াছে। মনে পড়ে বৃটিশ রাজত্বে খোদা খিদমতগারের উপর গুলিবর্ষণের জন্য বৃটিশ কমাণ্ডারের আদে[শ] গাড়োয়ালী সৈনিকেরা অমান্য করিতে দ্বিধা করে নাই। মানবতা[র] বিরুদ্ধে বন্দুক না তোলার শাস্তি তাহারা মাথা পাতিয়া নিয়াছিল। লাখে লাখে পাকিস্থানীর পশ্চিমবঙ্গে স্থান হইতে পারে, স্থান হয় ন[া] তিনটি অসহায় লাঞ্ছিতা নারীর। হাজার বছরের গোলামীর মনোবৃ[ত্তি] মুছিতে সময় লাগে ইহা ঠিক, বিশেষতঃ সেই দেশের কর্ণধার যখন হ[ন] মোগলের গোলাম।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

## কংগ্রেসে দলাদলি

"আভ্যন্তরীণ দলাদলি ও কুৎসিত ক্ষমতা লোলুপতাই যে কংগ্রেসে[র] শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম বাধা, ইহা আজ কাহারও অবিদিত নহে। রা[জ্য] কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও যে এই দলাদলির বিষময় প্রতিক্রিয়া মর্মে ম[র্মে] উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহা বিশেষ আশার কথা। দেশব্যাপী কংগ্রেসে[র] নির্বাচন আসন্ন। নেতৃবৃন্দ যদি সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত ন[া] হন, তবে কংগ্রেসে নূতন রক্ত সঞ্চারের আশা সুদূরপরাহত নহে। তাঁহারা কঠোর হস্তে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইলে আইনজ্ঞ, চিকিৎস[ক] ও শিক্ষিত যুবকদের কংগ্রেসে যোগদানের দুস্তর বাধা অপসারিত হইতে পারে এবং বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টিকারী মণ্ডল কংগ্রেসের দায়ি[ত্বে] আসীন তথাকথিত 'মণ্ডলেশ্বর'দের রাজত্বেরও অবসান ঘটিতে পারে। নব নির্বাচিত সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়া এই কঠোর দায়িত্ব পাল[নে] প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা[র] উপরেই কংগ্রেস নূতন রক্ত সঞ্চারের সম্ভাবনা নির্ভরশীল।"

—জনবাণী (কলিকাতা)

## চাষ ও চাষী

"এই প্রসঙ্গে চাষীদিগকেও একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যাঁহারা সেচের ব্যবস্থা বলিয়া এতদিন চীৎকার করিয়া আসিয়াছে[ন] তাঁহাদের মনে রাখা উচিত হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সরকা[র] যে বৃহৎ নলকূপের জল বিদ্যুতের সাহায্যে পাম্প করিয়া ও নলের সাহায্যে মাঠে মাঠে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন তাহার ব্যয়ভারও আনুপাতিক হারে সেচ কর হিসাবে কৃষকদের বহন করিতে হইবে যেমন হয় ক্যানেল এলাকার কৃষকদের। আমাদের মনে হয় জলসেচের ফলে যদি কৃষকের ধান, পাট, ডাল প্রভৃতি শস্য উৎপাদন-বৃদ্ধির দরুণ বিশেষ করিয়া দুই বা তিন ফসল পাওয়ার দরুণ আয়বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে কৃষকও সেচের জন্য কর দিতে হয়ত আপত্তি করিবে না। তবে সরকারের নিকটও আমাদের এখন হইতে নিবেদন যেন এই সেচ কর সহাইয়া সহাইয়া বসান অর্থাৎ প্রথম বছর বিনাপয়সায় এবং পরবৎসর কিছু কম এই ভাবে ক্রমে ক্রমে যেন এই কর ধার্য করেন।" —নদীয়া দর্পণ।

## হেড পোষ্ট অফিস চাই

"বিশ্বদূতে সংবাদ মেদিনীপুর জেলায় পোষ্ট অফিসের কাজ অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় ডাক ও তার বিভাগীয় কর্মচারী সমিতি কার্য্যের সুবিধার জন্য মেদিনীপুরস্থ হেড পোষ্ট অফিস ছাড়াও এই জেলায় আরো তিনটি হেড অফিস খোলার দাবি তুলিয়াছিলেন। তাহাতে কর্তৃপক্ষ আপাততঃ আর একটি হেড অফিস মঞ্জুর করিয়াছেন এবং জেলার কোন মহকুমা সাব-পোষ্ট অফিসকে হেড অফিস স্তরে উন্নীত করা যায় তৎসম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা চলিতেছে। বর্ত্তমানে আমাদের তমলুক পোষ্ট-অফিসে কাজ বেশী, লোক কম। তাহাতে জনসাধারণকে কিছুটা দুর্ভোগ ভুগিতে হয় এবং ডাকবিলি ও ডাক পাঠানো দিনে একবারের বেশী হইতে পারিতেছে না। তবে হেড অফিস করিবার পোষ্টালবিধানে কয়েকটি বিশেষ সর্ত্ত আছে। যেমন হেড অফিসের অধীনে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সাব পোষ্ট অফিস ও ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস থাকা চাই, সেখানে উপযুক্ত সংখ্যক করণিক ও কর্ম্মীর কাজ করার সুবিধা কিম্বা প্রয়োজনমত বিল্ডিংটি বাড়াইবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা আবশ্যক, তারপর, ইহার সহিত আর, এম, এস, যুক্ত থাকে ত ভালই, নচেৎ রেলষ্টেশনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়া চাই। এতদ্ব্যতীত প্রস্তাবিত স্থানে সাবট্রেজারী ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক আছে কি না এবং উহার ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণাদির আশা ভরসা প্রভৃতি কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় আছে। সেই সব দিক বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতেছি জেলার মধ্যে তমলুকের সাব পোষ্ট অফিসটিই হেড অফিস হইবার অগ্রাধিকার পাইতে পারে। কারণ উল্লিখিত সর্ত্তাবলী ইহার দ্বারা যত সহজে পূর্ণ হইতেছে, অন্যান্য মহকুমা সাব পোষ্ট অফিসগুলির ততটা সুযোগ-সুবিধা নাই।"

—প্রদীপ (মেদিনীপুর)।

## মধ্য স্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ

"জমিদারী উচ্ছেদের এবং মধ্য স্বত্বাধিকার উচ্ছেদের ফলে ভূমিহীন কৃষক কতটুকু সুবিধা পাইয়াছে সে সম্পর্কে আলোচনা না করিয়া আমরা এক্ষণে সরকারের নিকট এই আবেদন মাত্র করিব যে মধ্য স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে সরকার যে জমি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, সেই ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য অর্থ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত প্রাপককে প্রদান করিলে বহু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরমতম উপকার লাভ করিতে পারেন। বহু জেলাতে তত্তৎ স্থানের কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে অবহিত হইয়াছেন। বহু মধ্যবিত্ত মধ্য স্বত্বাধিকারী অতি মাত্রায় বিব্রত হইয়া আমাদিগকে এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বলায় এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার করুণ চিত্রের বর্ণনা করায় আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের মহকুমার তথা জেলার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণকে এ সম্পর্কে অবহিত হইয়া অনতিবিলম্বে মধ্য স্বত্বাধিকারীদিগের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ দান করিয়া তাঁহাদের দুঃসময়ে সঙ্কটের অবসান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহাদের জন্য এই অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা অতীতে বহু দরিদ্রকে অন্নদান করিয়াছেন, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত বা নিজের প্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবায় বহু ব্রাহ্মণকে নিয়োজিত করিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অসহায়া বিধবার সংখ্যাও নগণ্য নহে।"

—কাশী বান্ধব।

## মাছি তাড়াও

"সাঁৎসেঁতে বস্তুর উপর ডিম পাড়ে, সেখানে কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া একরকম পোকা বাহির হয়। পরে ঐ পোকা হইতে পূর্ণাঙ্গ মাছির উৎপত্তি হয়। সুতরাং পচনশীল আবর্জ্জনাদি বিনষ্ট করিতে পারিলে মাছির উৎপত্তি হইতে পারে না। পচনশীল আবর্জ্জনাদি একত্র করিয়া পোড়াইয়া ফেলাই মাছি ধ্বংসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আবর্জ্জনা পুড়াইয়াও ফেলা যায় অথবা কীট নাশক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে—নিদেন পক্ষে কেরোসিন ছড়াইয়াও কিছুটা কাজ হইতে পারে। মোটকথা বাড়ীর আনাচে-কানাচের সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিলেই মাছি ধ্বংস হইতে পারে। আমরা আশা করি জনগণ নিজেদের স্বাস্থ্যের কথা তথা জীবনের কথা চিন্তা করিয়াই মাছি ধ্বংসের অভিযানে আত্মনিয়োগ করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিপূর্ব্বেও মাছি ধ্বংসের অভিযান চালাইয়াছেন; কিন্তু এমত একটি জরুরী ও প্রয়োজনীয় কাজে জনগণ উপযুক্তরূপ সাড়া দেন নাই। সরকারের একক চেষ্টায় এই অভিযান যে সফল হইতে পারে না—এই কথাটা অনস্বীকার্য্য এবং পূর্ববর্ত্তী অভিযান এতৎ কারণেই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। এবারকার অভিযানে আর সেই ভুল না করার জন্য আমরা জনগণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাইতেছি এবং বর্ত্তমানে কলিকাতা সহরে যে শত শত লোক কলেরায় মারা যাইতেছে সেই কথাটা স্মরণ রাখিতে বলিতেছি।"

—গণরাজ (আগরতলা)।

## লোক সভায় পাকিস্তান প্রসঙ্গ

"পূর্ব্ব পাকিস্তানের সম্প্রতি যে সমূহ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে ও যাহার কিছু কিছু কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খুবই পৈশাচিক ব্যাপার। এ সম্পর্কে গত ৪ঠা জুন তারিখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন যে, সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্তানে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহা যে অত্যন্ত গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছিল, তাহা পাকিস্তান সরকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যদিও এই হাঙ্গামায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের কত লোক হতাহত হইয়াছে কিংবা তাহাদের কি পরিমাণ সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে পাকিস্তান সরকারের প্রেরিত উত্তরে সে সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নাই। তথাপি লোকসভায় শ্রীনেহেরু এই উত্তর হইতে যে অংশ পাঠ করিয়া শোনাইয়াছেন—তাহাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল এবং তাহা দমন করিয়া অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাইফেলধারী একটি শক্তিশালী দলকে নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। ১১০৮ জন লোককে গ্রেপ্তার এবং অন্য বহু লোকের বিরুদ্ধে চার্জসীট দেওয়া হইয়াছে।"

—নীহার ( কাঁথি )।

## শোক-সংবাদ

### ছবি বিশ্বাস

বাঙলা তথা ভারতের জনগণ অভিনন্দিত নট, বাঙলার নাট্যজগতের গৌরবময় ইতিহাসের অন্যতম রূপকার এবং বর্ত্তমান বাঙলার চলচ্চিত্রজগতের একচ্ছত্র সম্রাট নটকুলতিলক ছবি বিশ্বাসের গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ৬২ বছর বয়েসে এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় জীবননাট্যের যবনিকাপাত ঘটেছে। বারাসত মহকুমার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়ার সম্ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিবারের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান ইনি। ১৯০০ সালের ১৩ই জুলাই কলকাতায় এঁর জন্ম। এঁর প্রকৃত নাম শচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস। হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজে ইনি পাঠ গ্রহণ করেন। পেশাদারীভাবে অভিনয় শুরু করার আগে ইনি সৌখীন অভিনয় ও যাত্রাদিতে অংশ গ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেন। বাঙলার পেশাদারী অভিনয় জগতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র প্রথম স্থাপিত হয় প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে, সেই যোগসূত্র জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট ছিল। পেশাদারী অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশের অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর নৈপুণ্য, খ্যাতি ও যশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং আপন প্রতিভায় ও দক্ষতায় রঙ্গজগতের এক বিরাট আসনে ইনি সমাসীন হন। বাঙলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট হিসেবে তিনি রসিকজনের স্বীকৃতি লাভ করেন। অসংখ্য চলচ্চিত্রে ও নাটকে তাঁর অনবদ্য অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর অমর হয়ে আছে। দর্শক সাধারণের হৃদয়ে এই জনপ্রিয় শিল্পীর আসন মৃত্যু কোন দিন অপহরণ করতে পারবে না। রূপ, রস ও বৈচিত্র্যের বন্দনা তাঁর জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো, বিভিন্ন ধরণের চরিত্রে বিভিন্ন রূপসজ্জায় বিভিন্ন ধারার অভিনয়ে তিনি যে অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন তা তাঁর অসামান্য শক্তিরই উজ্জ্বল নিদর্শন। ছবি বিশ্বাস কিছু দি অধুনালুপ্ত কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের কর্তৃত্বভার নিয়ে "সুন্দরম" না দিয়ে মঞ্চ প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রতিকার যার যেথা ঘর নামক দুখানি ছায়াছবির পরিচালনাও তিনি করেন শেষোক্ত ছবিটির প্রযোজকও তিনি ছিলেন। সঙ্গীত নাট আকাদামী তাঁকে চিত্র ও মঞ্চাভিনেতার অভিজ্ঞান পত্র দেন। ইঁ কিছুকাল আঞ্চলিক ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য ও অভিনেতৃ সঙ্ঘে সভাপতি ছিলেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বাঙলার রঙ্গজগতে ইন্দ্রপতন ঘটল। এই বিরাট ক্ষতি অপূরণীয়।

### অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত

সুবিখ্যাত সাংবাদিক ও বিপ্লবী অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ৭ই জ্যৈ ৭২ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি আপন জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সংবাদপত্রের উন্নতিসাধনে ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন পত্রিকার বার্ত্তা সম্পাদকরূপে তিনি যে অভূতপূর্ব দক্ষতা ও কর্মশক্তি এবং সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। সাংবাদিক জগতে আপন প্রতিভা ও শক্তিতে এক বিশেষ সম্মানজনক আসন অধিকারে ইনি সমর্থ হন দেশবন্ধুর নেতৃত্বে ইনি কংগ্রেসের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ইনি ছাত্রাবস্থা থেকেই জড়িত ও মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম সেনানী হিসেবেও নানা নির্য্যাতন ইনি ভোগ করেছেন

### রমেশচন্দ্র সেন

স্বনামধন্য শক্তিমান সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন গত ১৮ই জ্যৈ ৬৮ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যসং সাহিত্য সেবক সমিতির ইনি প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘকাল ধরে এ প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। কাজল শতাব্দী, কুরপালা, গৌরীগ্রাম, মালঞ্চীর কথা, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, মৃত অমৃত, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, সারিক প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থগু তাঁর সৃজনীশক্তির নিদর্শন। তাঁর অনলস সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠ আসক্তি সাহিত্য সমাজে তাঁকে একটি বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। আয়ুর্বেদ বিদ্যাতেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং সে ক্ষেত্রেও তিনি যশ ও সুনাম লাভ করেছিলেন।

### ফণীভূষণ রুদ্র

কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফণীভূষণ রুদ্র গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ ৭৫ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আপন অধ্যবসায়ে, শক্তিমত্তায় এবং অমায়িকতায় ইনি যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর অর্জন করেন। দাতা হিসেবেও ইনি প্রসিদ্ধ। জনকল্যাণার্থে বহু অর্থ ইনি দান করে গেছেন। রবীন্দ্রমেলার সাধারণ সম্পাদক ও নিখিল ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটির সদস্য শ্রীসুরঞ্জন রুদ্র তাঁর অন্যতম পুত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
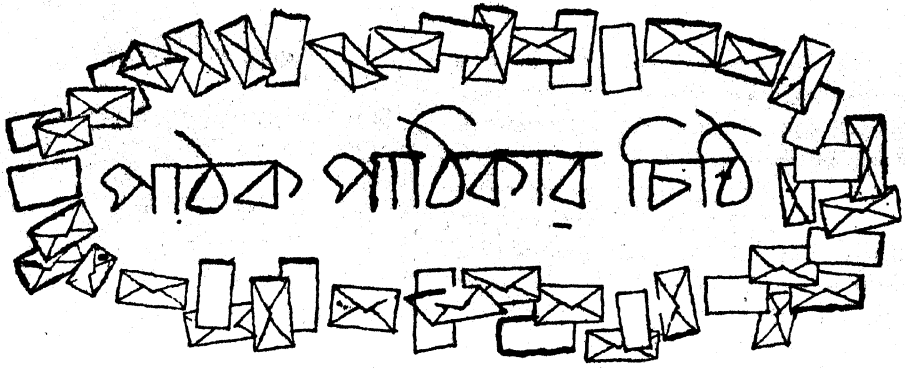
## পত্রিকা সমালোচনা

### এ দেশে পতিতাবৃত্তি নিবারণ কি সম্ভব ?

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সব দেশে গণিকাবৃত্তি চলে আসছে। সমাজসম্মত দাম্পত্য-জীবনের বাহিরে অসুখী পুরুষদের যৌনলিপ্সা উপশমের উপায় হিসাবে। যদিও আজ য়ুরোপে মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পেশাদারী গণিকাবৃত্তি ঘৃণিত, তবুও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, পৃথিবীর সব দেশের, সব সমাজের এ রকম নারী যথেষ্ট আছে যারা একাধিক পুরুষকে সঙ্গ দিচ্ছেন। সে সমাজে থেকেই হোক কিংবা পানশালা, নৃত্যশালা, নাইট ক্লাব বা ক্যাবারে অপেশাদারী মুখোসেই হোক।

আধুনিক সভ্যতার বিলাস ব্যসন, উত্তেজক আবহাওয়ায় অনেকের পক্ষে যৌবনসত্তাকে দমন করা সম্ভব হয় না। ফলে, Neurosis রোগে আক্রান্ত হয়, নয়, হাজার বিকল্প পথে যাত্রা হয় শুরু। প্রকৃতি যে ভাবেই হোক, সুদে-আসলে তার দাবী আদায় করে নেয়। প্রাচীন সমাজে সব দেশেই যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসম্মত বিবাহের ব্যবস্থা ছিল, বিকল্প পথও ছিল। তবে, বিবাহের পরও যে, পুরুষেরা পতিতালয়ে যায় না, তা নয়; যৌন অসামঞ্জস্যের জন্য কিংবা বিকৃত খেয়াল চরিতার্থের জন্য কেউ কেউ ও-পথে পা দেয়।

আমাদের জাতীয় জীবনে, ধন বণ্টনের অসাম্যতার বজ্জাতি যত দিন থাকবে, ততদিন নয়া-মানবতাবাদ কিংবা 'গান্ধীয় ব্রহ্মচর্যে'র দোহাই পেড়ে পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদ অসম্ভব শুধু নয়, হাস্যকরও বটে। য়ুরোপে যে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশ আইন করে পতিতাবৃত্তি বন্ধ করেছে, সেখানে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দেহবেসাতির পণ্য সাজিয়ে বসেছে, অপেশাদারী মুখোসে নাইট ক্লাব, ম্যাসাজ ক্লিনিক, নৃত্যশালা, পানশালা, হোটেল-রেস্তোরাঁর অন্তরালে। খাস কোলকাতায় 'ম্যাসাজ-হোম' বন্ধ হয়েছে, কিন্তু ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে 'সুইট হোম' (হোটেল-কাম-রেষ্টুরেন্ট, মিষ্টির দোকান) এবং বিশেষ শ্রেণীর 'নার্সিং হোম'। এই সব 'সুইট হোমে' ১৬ বছর থেকে ২৭।২৮ বছরের মেয়েদের 'সরবরাহ-কারিণী' হিসাবে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন অ-বাঙালী পরিচালিত এই রেস্তোরাঁগুলির অন্ত কোন ভূমিকা আছে কিনা। বাঁচার তাগিদে যে সমস্ত মেয়েরা মান-সম্মান খুইয়ে দেহের বিনিময়ে চাকুরি নিয়েছিল 'ম্যাসাজ হোমে', তারাই কি ফিরে এসেছে 'সুইট-হোমে'। না অন্য কোথাও ভদ্র-চাকুরী পেয়েছে। পতিতাপল্লীর বাড়িউলীদের মত, এখানেও মধ্যবর্তী দালাল এবং মালিকেরা দেহপসারিণীদের অর্থের এক বিরাট অংশ আত্মসাৎ করছে। এরা এবং ক'লকাতা সহ তামাম ভারতে যে সব রাঘব বোয়ালেরা নারী ব্যবসা চালাচ্ছে, তারাও সোচ্চার কণ্ঠে বলছে, পতিতাবৃত্তি বন্ধ করা হোক। এবং হলে তাদের সোনায়-সোহাগা।

বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণ-সর্বস্ব শাসন ব্যবস্থায়, নৈতিক মেরুদণ্ড-হীন, উদ্দেশ্য-হীন নোঙর ছেঁড়া সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, রাতারাতি সমাজতান্ত্রিক (সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণ নয়) শাসন ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন। সেই জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। কারণ সমাজ আর রাষ্ট্রের দাপটে আমরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী থেকে পরিবারে পরিবার থেকে ব্যক্তি মানসে অনুপ্রবিষ্ট। জড়তা আর অদৃষ্টবাদীর নিষ্ক্রিয়তা আমাদের পেয়ে বসেছে। কারণ, উদ্দেশ্য পরিপূরণের পথে বারবার বাধা এলেই 'reflex of purpose'-দুর্বল হবেই। সেই জন্যেই আমদের জীবনে আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, ভবিষ্যতও নেই। নেই, পুরানো জড় নীতিবোধ-মূল্যবোধ-অভ্যাস কর্মগুলি ভেঙে চুরে ফেলার সামগ্রিক চেতনা। দেশে কোন নেতা নেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার, যারা আছে তারা নেতা নয়, রাজনৈতিক 'অভি'নেতা। বুদ্ধিজীবীরাও নিশ্চুপ, নয় তাদের 'বুদ্ধি'শ্রমও বেণেগোষ্ঠীর স্বার্থে নিয়োজিত।

আসল কথায় আসা যাক, যে সমাজে দু'মুঠো ভাতের জন্য, মা-বৌ বোনকে পণ্য করতে হয়, সেখানে কি লাভ হবে লাইসেন্সধারী ত্রিশ-বত্রিশ হাজার পতিতাকে উদ্ধারাশ্রমে, অনাথাশ্রমে কিংবা ভেগ্রান্টস হোমে পাঠিয়ে। সেখানকার দুর্নীতি দুষ্কৃতির ইতিহাস কারও অজানা নয়। ভবিষ্যতে তা হবে না, সে গ্যারান্টি কে দেবে। 'ক্লাই গার্ল' বলে পরিচিত যে সব মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাস্তায়-পার্কে-ময়দানে, দাঁড়িয়ে থাকে ল্যাম্পপোষ্টের তলায় অন্ধকারে পেটের তাগিদে, তাদের সমস্যা কে সমাধান করবে? পতিতাদের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই এই অধঃপতিতাদের। বরং পতিতারা সমাজের বাইরের আর এরা আমাদের ঘরের, সমাজের। যখন দু'বেলা নয়, সারাদিনে দু'মুঠো ভাতও জোটে না, শাড়ির বদলে গামছা ওঠে অঙ্গে, তখন তারা কি করবে? আত্মবিক্রয়, না আত্মহত্যা? Indian Penel codeএর জবাব দেবে না, সরকারও দায়িত্ব অস্বীকার করছে। তারা ত ইচ্ছে করে পতিতাদের চেয়েও গ্লানিকর আর অন্তহীন অবমাননার অধঃপতিত জীবনের পঙ্কে নিমজ্জিত হয় না, হতে বাধ্য হয় এই সব অভাবের মেয়েরা, পঙ্গু পিতা, অসুস্থ মা,

:বকার ভাইয়ের ভরণ পোষণ করার জন্ত, শিশুদের মুখে দিনান্তে দু'ফোটা 'জলদুধ' দেওয়ার জন্ত। সমাজ আর রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী তারাই—কারণ তাদের পেটের দায়, আর যারা অপরাধ করল তাদের দারিত্ব নেই কানাকড়িও। পতিতালয় সম্পূর্ণ বন্ধ হবার আগেই, খাস কলকাতায় 'হোয়াইটওয়ের'···ফুটপাথ জুড়ে যে ব্ল্যাকওয়ে রিগ্যাল অব্দি ক্যামাক ষ্ট্রীটের কথা বাদই দিলাম, ক্রীক রো থেকে শুরু করে রেড রো-র ধার অব্দি, ইলিয়ট রোড থেকে আরম্ভ করে ছাতাওয়ালা গলির লালবাজারের সীমানা পর্যন্ত অর্থাৎ সমস্ত মধ্য ক'লকাতা জুড়ে অক্টোপাশের বাহু ছড়িয়ে আছে, যে 'Lovers Paradise', 'Empty House' রাতের বেলায় এবং এডিস্ন্য ষ্ট্রীটের মাঝে মাঝে ক্যাসানোভা, বার, হোটেল, রেস্তোঁরায় দিনের বেলাতেই চলছে নারী মাংসলোভী পশুদের ঘৃণ্য বেচাকেনা তা বন্ধ করার কি প্রয়োজন নেই। পতিতা সমস্যার চেয়ে এ সমস্যা জরুরী কম কিসে? সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধন বণ্টনের সাম্যতা, ব্যক্তির রুচি এবং এবং রীতির দাবী অনুযায়ী বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী এবং পুরুষ আত্মনির্ভরশীল যতদিন না হচ্ছে, ততদিন মানবতাবাদের দোহাই দিয়ে এই অমানুষিকবৃত্তি, যা পশুদের মধ্যেও নেই, তা বন্ধ করা অসম্ভব। আইনের নামে পতিতালয় বন্ধ হবে ঠিকই, বেনামে চলবে ততদিন, যতদিন দারিদ্র্য নামক পাপ থাকবে সমাজে। এবং যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তা মেনে নেওয়াই হবে শুভবুদ্ধির কাজ, নচেৎ সমাজের যেটুকু এখনও আছে তা ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যাবে। এই অন্তবর্তীকালে, যৌনব্যাধি, যা সমাজের উপর পতিতাদের প্রতিশোধ, তা যাতে পতিরা পতিতাদের কাছ থেকে আমদানী করে সতীদের উপহার এবং পুত্র-কন্যাদের কৃতজ্ঞ না করতে পারে, য়ুরোপ বা জাপানের মত সরকারী চিকিৎসায় পতিতাদের নীরোগ করে আংশিক রোধ সম্ভব। প্রয়োজনবোধে পতিতাদের উদ্ধার করে তাদের ভবিষ্যত ভরণ-পোষণের ভার সরকারের নেওয়া উচিত। 'কুমারী মাতা' এবং 'জারজ সন্তান' সমাজকে স্বীকার করে নিতে হবে, যাতে একবার ভুলের জন্য সারাজীবন জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ না করতে হয়। আমরা বেদ, উপনিষদের দোহাই দিই, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজে 'কানীন' (কুমারীর সন্তান), 'গুঢ়জ' (পিতা অজ্ঞাত বা নাম গুপ্ত রাখা হয়, সে রকম সন্তান), 'ক্ষেত্রজ' (ক্ষেত্রে কৃষি নিয়োগ করে ফসল উৎপন্ন করার মত সন্তান) সন্তানেরা স্বীকৃত ছিল। সম্ভব হলে, যৌবনাগমের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে, এ বিষয়ে ছেলেমেয়েরাই এগিয়ে আসা উচিত।

যুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী চৌদ্দ বছরের অভিনব বণিক গণতন্ত্রে পচন ধরেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এই পচনশীল সমাজদেহকে সম্পূর্ণ সুস্থ না করতে পারলে, খেয়ে-পরে বাঁচার সুযোগ না দিতে পারলে পতিতাবৃত্তি, দুর্নীতি, দুষ্কৃতি কিছুই দূর হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার। সেইজন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। বর্তমানের 'চিন্তাতার-পিষ্ট, দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের অনুশাসনজাত মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি'র পরিবর্তে 'কল্যাণময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপযোগী মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি' গড়ে তুলতে হবে। বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে বলিষ্ঠ সামগ্রিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।—কুমার গুপ্ত। ২৭১, আপার চিৎপুর রোড, ক'লকাতা-৫।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী ধীরা সেনগুপ্ত, সন্ধ্যা, বর্ধমান কম্পাউণ্ড, লালপুর, রাঁচী (বিহার) * * * শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বার্ণ র‍্যাণ্ড কোং ডাক—মগমা, ধানবাদ * * * প্রধান শিক্ষক, বেলিয়াবেড়া কে. সি এম, এইচ, এম স্কুল, ডাক—বেলিয়াবেড়া, মেদিনীপুর * * * শ্রীমতী এন, বি, দে, ধাত্রী, সেপন টি এষ্টেট, ডাক—সেপন, শিবসাগর আসাম * * * শ্রীসমরেশ সাহা, কোলাঘাট, মেদিনীপুর * * * গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার, শিলচর, ডাক—শিলচর, কাছাড়, আসা * * * শ্রীঅশোককুমার মাইতি, খাটিয়াল, বারবাঘিয়া, জেলা—মেদিনীপুর (কাজলাগড় হয়ে) * * * শ্রীমতী সুষমা দত্ত, অবধারক—ডক্টর জে, কে, দত্ত ডাক—বারলোগঞ্জ, মুসৌরী (উত্তর প্রদেশ * * * শ্রীমতী ডলি মুখোপাধ্যায়, অবধারক—শ্রীএন, এন, মুখোপাধ্যায় থানা রোড, ডাক—ডুমকা, সাঁওতাল পরগণা * * * শ্রীমতী সাধনা নন্দী, অবধারক—ডক্টর এস, সি, নন্দী, ১৫ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ কলকাতা ৬ * * * ডক্টর এস, কে, রায়, এম, ও, অ্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড, ডাক—খেলারী পালামৌ * * * সচিব রাজনারায়ণ সাধারণ পাঠাগার, ডাক—রাজনগর, জেলা—বীরভূ * * * মেট্রন, দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ হাসপাতাল, খড়্গপুর, মেদিনীপু * * * Mr. B. Shankar, 32, Lemon Street, Centur Hotel Block, Serembon, Malaya * * * শ্রীমধুসূদন দলুই জামলপুর, ডাক—রামপুরা, জেলা—মেদিনীপুর, * * * শ্রীমতী আরাধনা গুপ্ত, নার্স, জামু হাসপাতাল, ডাক—জামু, মুঙ্গের।

১৩৬৯ সালের বার্ষিক মূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম মাসিক বসুমতীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি—সুজাতা মুখার্জ্জী পরাশিয়া (মধ্যপ্রদেশ)।

Sending Rs. 15/- towards subscription fo Monthly Basumati for the new year 1369 B. S Kindly continue sending my copies as usual.—Mr Kamala Ganguly, Bangalore-18.

Sending Rs. 15/- as annual subscription fo Monthly Basumati.—Ramkrishna Mission Seva shrame, Aminabad, Lucknow.

Rs. 15/- is sent herewith, the yearly subscrip tion of Basumati.—Geeta Basu, Tezpur (Assam).

Rupees Fifteen only being the annu subscription to Monthly Basumati from Baisakh Choitra 1369 B. S.—Anil Krishna Sarkar, Gov Pleader, Purulia.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—Mr Arati Mitra Mazumder, Cachar.

Sending herewith Rs. 15/- being the subscrip tion for Monthly Basumati.—Mamatarani Gabu Jalpaiguri.

Sending Rs. 15/- towards the annual subscrip tion of Masik Basumati.—Ramkrishna Missio Seva Protisthan, Calcutta.

Rs. 15/- is sent for the annual subscription fo the year 1369 B, S,—Secretary, Suhrid Sangha Dhanbad,

## সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

লোকটিকে
চিনে রাখুন
এই-ই অপরাধী! এই লোকটা এবং এর মত আরও অন্যান্য দুষ্কৃতকারী রেলের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি চুরি ও ধ্বংস করে থাকে। এই ধরনের চুরি প্রভৃতি কাজে আপনার নাগরিকবোধ নিশ্চয়ই আহত হয় এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে রেলকর্তৃপক্ষের হাতে এই অপরাধীকে আপনি ধরিয়ে দেবেন। জাতীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে আপনার সহযোগিতা অপরিহার্য।
যাত্রী ও মালগাড়ীর সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি চুরি ও তার ইচ্ছাকৃত ধ্বংস সাধনের ফলে প্রতি বছর পূর্ব রেলওয়ের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ১১ লক্ষ টাকা।
পূর্ব রেলওয়ে

ফোন ৩৪-৩০১৫
ফোন ৩৪ ৪৮৪৮
এইচ. পি. সরকার
এণ্ড কোং
জুয়েলার্স
• আধুনিকতায়
• নির্ভরতায়
• মৌলিকতায়
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট • বহুবাজার ষ্ট্রীট •
শাখা :- ১২৫ এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

## চিমনি-লণ্ঠন

—শ্রীদিলীপ রায় অঙ্কিত

( প্যাষ্টেল )

৩০"×২২"
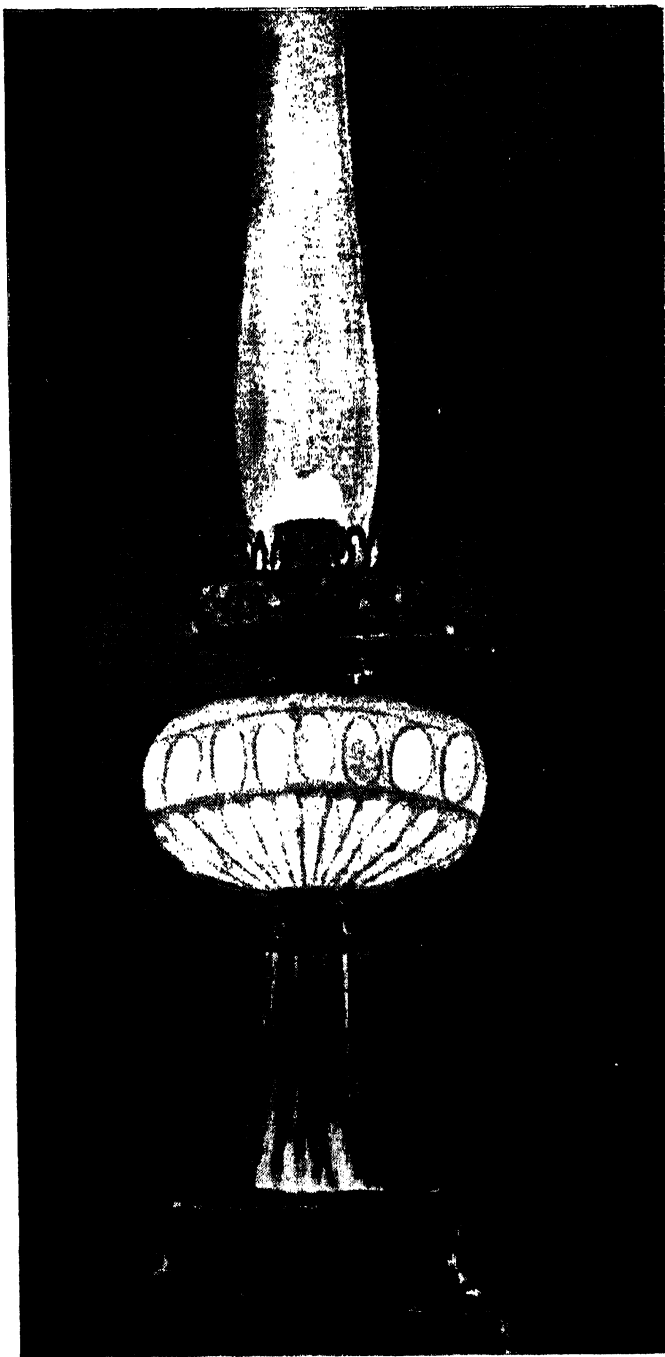
স্বপনের মোহজাল রচে...
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ
সুরভিত কেশতৈল।
প্যামিকোকো
মৃদু সুরভিত
নারিকেল তৈল।
হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
পরিশোধিত ও
সুগন্ধিত কেশতৈল।
ভৃঙ্গামলা
ভৃঙ্গরাজ ও আমলা
সহযোগে প্রস্তুত
মহোপকারী
কেশতৈল।
যোজনগন্ধা
অনুপম
সুরভি নির্য্যাস।
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্
প্রাইভেট লি:
কলিকাতা-৪
নিত্য প্রসাধনের সার্থকতায় প্রতিটি অপরিহার্য . .

৪১শ বর্ষ, আষাঢ়—১৩৬১ ] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [ ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

# কথামৃত

### দক্ষিণেশ্বরে

দক্ষিণেশ্বর হইতে বলরাম বসু এবং অন্যান্য সঙ্গিগণের সহিত গৌরীমা প্রত্যাবর্তন করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার চিত্ত গুরুপাদপদ্মেই নিবদ্ধ রহিল। তিনি স্থির করিলেন, পরদিবস গিয়া ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবেন।

পরদিবস প্রত্যূষে গৌরীমা পুনরায় বাহির হইলেন। বলরাম বসুর দারোয়ান ঐদিন কোনপ্রকার আপত্তি না করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গঙ্গার ঘাটে যাইয়া স্নানান্তে তিনি দারোয়ানকে বলিলেন, "তুমি যাও এখন, আমার যেতে দেরী হবে। দাদাবাবুকে বলো, আমার জন্য যেন না ভাবেন।" দারোয়ানকে বিদায় দিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। সঙ্গে দামোদর, আর দুইখানি পরিধেয় বস্ত্র।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের সদর দরজার সন্নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন; গৌরীমাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "তোর কথাই ভাবছিলুম।"

ঠাকুরের সহিত দীর্ঘকাল অদর্শন এবং দামোদরের সিংহাসনের উপর তাঁহার চরণযুগল দর্শনের কথাপ্রসঙ্গে, গৌরীমা ঠাকুরকে বলিলেন, "তুমি যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, আগেত তা বুঝতে পারিনি, বাবা।" উত্তরে ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে এত সাধনভজন কি ক'রে হ'ত?"

ঠাকুরের সেবাশুশ্রূষার উদ্দেশ্যে, নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে নহবৎখানায় বাস করিতেন। গৌরীমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও, একজন সঙ্গিনী এলো।"

শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত লজ্জাশীলা ছিলেন, কোন পুরুষমানুষের সম্মুখে বাহির হইতে হইলে নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেন। এমন-কি, পরবর্তিকালেও নিজের ভক্তসন্তানগণের সকলের সহিত তিনি কথা

বলিতেন না। গৌরীমাকে সঙ্গিনী পাইয়া, বিশেষতঃ বাহিরের কাজের পক্ষে, তাঁহার খুব সুবিধা হইল। গৌরীমাও দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া পরমারাধ্য গুরুদেব এবং গুরুপত্নীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে না থাকিলে গৌরীমা কলিকাতায় থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার মন দক্ষিণেশ্বরেই পড়িয়া থাকিত। বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থানকালে ঠাকুরকে দর্শন করিবার ইচ্ছা একদিন এতই প্রবল হইল যে, আহারান্তে হাতমুখ ধুইতেও তাঁহার ভুল হইয়া গেল। সেই অবস্থাতেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিবার সময় তাঁহার জ্ঞান হইল, এঁটো হাত তখনও ধোওয়া হয় নাই। লজ্জিত হইয়া তিনি হাতমুখ ধুইতে গেলেন।

এই সময়ের কথায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেবাসঙ্গী পূজনীয় রামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "* * শ্রীযুক্তা গৌরী দিদিমণি * * শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রিয়শিষ্যা। মেয়েদের ভিতরে ঠাকুর ইহাকে অত্যন্তই স্নেহ ও ভালবাসিতেন এবং ইনি নিজহস্তে ঠাকুর যাহা ভোজনাদিতে খুবই প্রীতিপ্রসন্ন হইতেন ঐ সমস্ত উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী তৈয়ারি করিয়া পরমযত্নে সেবাদি কত সময় করাইতেন। এবং অতি সুকণ্ঠে নহবতে ঠাকুরকে কতোই অতিশয় ভাব ও মহাভাব সংযুক্ত গান এবং কীর্ত্তনাদিতে সমাধিস্থ করিয়া দিতেন। এতা আমি প্রত্যক্ষে কতোই আনন্দিত হইতাম, * * আরোও ঠাকুর বলিতেন যে গৌরী মহাতপস্বিনী এবং মহাভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী। * *"

গৌরীমার একবার মনে হইয়াছিল, মহাপ্রভু যেরূপ নবদ্বীপে ভক্তবৃন্দ লইয়া মহাভাবে মত্ত হইতেন, সেইরূপ ঠাকুর একবার দেখাইলে, সেই লীলাদর্শনে তিনি জীবন সার্থক করিবেন। কিন্তু প্রকাশ করিয়া কাহাকেও কিছু বলেন নাই। একদিন অনেক ভক্ত ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গৌরীমা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া আনিয়া ঠাকুরকে পরিবেশন করিলেন। এই সময় ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার প্রেমাবেশ উপস্থিত হইল। দুই নয়ন বাহিয়া প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। ঠাকুর মাত্র দুই-এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়াছিলেন, গৌরীমার মহাভাব দেখিয়া তিনিও প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিলেন। উপস্থিত সকলে ভাবের বন্যায় একে অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, ঠাকুর সকলের বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা আনিয়া দিলেন।

আর এক দিনের ঘটনা। গৌরীমা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গদেব কীর্ত্তনানন্দে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যাইতেন। ঠাকুরের সেইরূপ ভাবের বন্যা আসে, কিন্তু তিনি কখনও আছাড় খাইয়া পড়িয়া যান না। একদিন গৌরীমা, রামচন্দ্র দত্ত এবং আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। ভগবৎ-প্রসঙ্গ বলিতে বলিতে ঠাকুর প্রেমাবেশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং টলিতে টলিতে কেহ ধরিবার পূর্ব্বেই ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, এমন ত কখনো হয় নাই। ইহাতে গৌরীমা মর্ম্মাহত হইলেন,—কেন আমার মনে এমন কথার উদয় হলো? আমার জন্যই ঠাকুরের অঙ্গে আঘাত লাগলো। রামচন্দ্র দত্ত এই নূতন লীলারঙ্গের মধ্যে কোন রহস্য আছে মনে করিয়া ঠাকুরের নিকট প্রশ্ন করিলেন। ঠাকুর শুধু ঈষৎ হাসি গৌরীমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্দ্র দত্ত তখন গৌরীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই এর কারণ জানেন।" গৌরী অগত্যা তাঁহার মনে যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিলেন।

ঠাকুর একবার পানিহাটি যাইতেছিলেন। দুইখানা নৌকা ভাড়া করা হইয়াছিল। কয়েকজন মহিলাভক্তসহ গৌরীমা দ্বিতী নৌকাতে ছিলেন। আড়িয়াদহের কাছে একস্থানে ঠাকুর নৌকা লাগাইতে বলিলেন। সেখানে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া জনৈকা মহিলা নিবিষ্টচিত্তে শিবপূজা করিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহার সমক্ষে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর নিজেও ভাবাবিষ্ট হইলেন, আর সে ভক্তিমতী মহিলার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। কিছুক্ষণ পর সেই মহিলা মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাববিহ্বল অবস্থা ঠাকুর পুনরায় নৌকায় আসিয়া উঠিলেন।

একদিন কয়েকজন মহিলাসহ গৌরীমা কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে খড়দহে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যাওয়া স্থির হইল। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আসিয়া তিনি মহিলাদিগকে বলিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখে আসি ঠাকুর আছেন কি-না।" ঠাকুরের ঘরে গিয়া তিনি দেখেন, ঠাকুর সমাধিস্থ, অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। হাতের কাছে দৈত্যশিশু প্রহ্লাদের একখানি চিত্র পড়িয়া আছে। তিনি বুঝিলেন, প্রহ্লাদের চিত্র দেখিয়াই ঠাকুরের ভাবের উদ্দীপনা হইয়াছে। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর বলিলেন, "জ-জ-জল।" তিনি জল দিলেন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল।

গৌরীমার সহিত কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বলিলেন, "ঘাটে যে মেয়েদের রেখে এলি, ওরা ত এতক্ষণ ছটফট্ কচ্ছে!" ঠাকুরের অবস্থা দেখিয়া গৌরীমা তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, তখন যাইয়া মহিলাদিগকে লইয়া আসিলেন। বিদায়কালে ঠাকুর বলিলেন, "আমি আজ শ্যামকে কোলে করেছিলুম। শ্যামের বেশ পরিবর্ত্তন হয়েছে, পরনে কল্কাপেড়ে কাপড়, মাথায় মুকুট।" খড়দহে যাইয়া মহিলাগণ দেখিতে পাইলেন, শ্যামসুন্দর সম্বন্ধে ঠাকুরের বর্ণনা সত্য।

গৌরীমার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবী কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ব্রজবালা এবং আরও দুই-একজন আত্মীয়ও ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। গিরিবালার রচিত সঙ্গীত তাঁহারই সুমধুর কণ্ঠে শুনিতে ঠাকুর ভালবাসিতেন। কিন্তু গিরিবালা অপরিচিত লোকের সম্মুখে গাহিতে বড়ই লজ্জানুভব করিতেন। ঠাকুরও ছাড়িতেন না, তাঁহার সঙ্কোচ বুঝিয়া বলিতেন, "আচ্ছা, আমি সব লোক ঘর থেকে বের ক'রে দিচ্ছি! সেই গানটি আর একবার গাও, মা।" ঠাকুরের আদেশে গিরিবালা দেবীকে অগত্যা গাহিতে হইত—

হর-হৃদি-পদ্মে মায়ের পাদ-পদ্মে কি এতই শোভা,
কত যোগী ঋষি চিন্তে যাঁরে, চিন্তামণির মনোলোভা।
যেন মুক্তি-অভিলাষী নখরে পড়েছে শশী,
বিনাশে হৃদি-তামসী তরুণ অরুণ জিনি আভা।
'কিঙ্করী' মনেরে বলে, পুজ ও-পদ-কমলে,
রাখিয়ে হৃদি-কমলে মনে মনে দাও রে জবা।

—গৌরীমা গ্রন্থ হইতে।

# যুগাবতার

শ্রীশশিভূষণ পাল

অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেও খৃষ্টান পাদরীরা তাঁদের ধর্মের মহিমা প্রচারচ্ছলে হিন্দুদের পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে হাটে-বাটে "চোর লম্পট" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বুঝিবার বা বিশ্লেষণ করিবার যোগ্যতা তাঁদের মোটেই ছিল না।

প্রাচীনতম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত জগতের যে একটা দীর্ঘ সংস্কৃতিধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অতীতের গৌরব বর্তমান কতখানি রক্ষা করিতেছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীনযুগের বিরাট পুরুষ। তিনি পূর্ণ ভগবান, না ভগবানের অংশ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের বিচার্য নয়। তাঁহাকে মানবের সর্বোচ্চ আসনেও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। মানব যতই উচ্চস্তরে অধিরোহণ করুক না কেন, ষড়ৈশ্বর্যের পূর্ণতম বিকাশ তাহাতে সম্ভব হয় না। শ্রীকৃষ্ণের জীবন পরার্থতাময়—মানবের কিংবা অবতারের পর্যায়ভুক্ত তিনি নহেন। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মমার্গে তিনি পূর্ণভাবে বিচরণ করিতেন। পরিপূর্ণ কর্মদ্যোতনা দ্বারাই তিনি আর্যাবর্তে পূর্ণ অবতাররূপে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

প্রিয় ভাবের পূর্ণ সার্থকতা এবং উপাস্য-উপাসক ভাবের চরমোৎকর্ষ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় দেদীপ্যমান। সেখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে জিতেন্দ্রিয়, অনাসক্ত ও মহাযোগীরূপে দেখিতে পাই। পূর্ণ বিহারের অন্তর্দেশ হইতেই তিনি ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া আদর্শ রাজনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষাদান কল্পে মথুরায় গমন করেন। ইহাই তাঁহার পূর্ণ নির্লিপ্ততার পরিচায়ক। কর্তব্যের অনুরোধেই তিনি অতর্কিতে ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া অধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত কর্মজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল। যখন ভারত ব্যাপিয়া অধর্মের প্লাবন প্রবাহিত হইতেছিল—কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, বাণ, দুর্যোধন প্রভৃতির প্রবল অত্যাচারে ও অনাচারে মানবকুল ত্রাহি-ত্রাহি আর্তনাদ করিতেছিল, তখন তিনি মানুষী শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্র অবলম্বন পূর্বক সমাজে ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র-লীলায় তিনি পাণ্ডবগণকে কেন্দ্র করিয়া অধর্মের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রামের নিমিত্ত অর্জুনের সারথ্য-স্বীকার করেন। তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা ছিল অনন্যসাধারণ। চতুঃষষ্টি দিবস সান্দীপনী মুনির আশ্রমে বাস করিয়া তিনি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। গীতায় শাশ্বত বাণী তাঁহার সর্বতোমুখী জ্ঞানের অনুপম নিদর্শন। অস্ত্রবিদ্যা তিনি কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই বটে, কিন্তু রণশাস্ত্রেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

তাঁহার কর্মধারায় কূটনীতির অভিব্যক্তি যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সহজ ও সরল-পথে কৃতকার্যতার সম্ভাবনা না থাকিলে, কুটিল-পথে গমন করাও যে অযৌক্তিক নহে, উহাও ছিল তাঁহার অন্যতম নীতি। ভীষ্মবধ তাঁহার কূটনীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ দৌত্যকার্যে বৃকস্থলে গমন করিলে তাঁহার আগমন-বার্তা অবগত হইয়া হস্তিনায় মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র নানাবিধ মনোজ্ঞ উপচারে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনপূর্বক অভীষ্ট-সিদ্ধির কামনা করিয়াছিলেন। দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধন সুযোগ বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনের নিমিত্ত আমন্ত্রণ করেন। দুর্যোধনের ব্যাজস্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"দূতগণ কার্য-সমাপনান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে। দৌত্যকার্যে কৃতকার্য হইলে আমি অবশ্যই আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব; কারণ, পর-প্রদত্ত অন্ন প্রীতিসহকারে তখনই ভোজন করা বিধেয়। আপদ্‌গ্রস্ত হইলেও পর-প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিবার বিধি রহিয়াছে। আপনি সরল মনে আমাকে ভোজন করাইতে অভিলাষ করেন নাই, আর আমি আপদ্‌গ্রস্তও হই নাই; সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি আপনার অন্নগ্রহণ করিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি মহামতি বিদুরের পর্ণকুটীরে গমন করিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন।

বৈরাগ্যের দিক দিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য কর্মানুষ্ঠানের মধ্যেও ছিলেন নিস্পৃহ এবং অনাসক্ত। কংস-নিধনের পর তিনি মথুরার রাজ্যভার সমর্পণ করেন উগ্রসেনকে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়, ধর্ম, দয়া ও দৃঢ়তার সহিত রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে উগ্রসেনকে উপদেশ দেন।

শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন—"ন শ্রেয়ঃ সততং তেজঃ, ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা।" তিনিই বলিয়াছিলেন পার্থকে—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ…।"

কংসপক্ষীয় অসুরগণ মথুরার নানা স্থানে বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিচক্ষণতায় অচিরকালমধ্যে সর্ববিধ উপদ্রবের পরিসমাপ্তি ঘটে। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য দিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে। সহদেবের প্রদত্ত বিপুল উপঢৌকন তিনি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

অনাচার ও অত্যাচার ধ্বংস করিয়া পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করাই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। তাঁহার পক্ষপুটাশ্রিত, গর্বিত বলদৃপ্ত উদ্ধত ও অনাচারলিপ্ত যাদবগণও যখন দুর্নীতিপরায়ণতার চরম সীমায় উঠিয়াছিল, তখন তিনি সেই এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই তাঁহাদের সকলের ধ্বংস সাধন করেন। পুত্র, মিত্র, জ্ঞাতি বা ভ্রাতা বলিয়া তিনি কখনও কাহারও দুর্নীতির প্রশ্রয় দান করেন নাই। প্রভাস-লীলাই তাঁহার অনুপম চরিত্রের পরিসমাপ্তি।

ভগবানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ব্যতীত কেবল কর্মানুশীলন দ্বারাই যে মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে না, তিনি তাঁহার দৈনন্দিন কর্মসূচীতে উহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। যে গাণ্ডীব লইয়া অর্জুন শত্রুজয় করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ-বিহনে নিজশক্তিতে তিনি উহা উত্তোলন করিতেও অসমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল নিপুণ রাজনীতিজ্ঞই ছিলেন তাহা নহে। সমাজ উন্নয়নেও তাঁহার কৃতিত্ব অপরিমেয় ছিল। সম্বর দৈত্য নিহত হইলে তৎপত্নী মায়াদেবীর সহিত তিনি প্রদ্যুম্নের পরিণয় কার্য সম্পাদন করেন।

ধর্মের, সমাজের এবং চিরাচরিত রীতির বিপর্যয়ের ফলে যে বিপ্লব সূচিত হয়, উহার অন্তর্দেশ হইতেই ঐশ্বরিক বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সমাজবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্মবিপ্লবেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকে। ঐ প্রকার ধর্মবিপ্লবের যুগেই জগতের কল্যাণবিধানার্থে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা, কুরুক্ষেত্রলীলা এবং সর্বশেষে প্রভাসলীলায় মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়াছিলেন। দ্যূত-ক্রীড়ার কুৎসিত অভিনয়কে কেন্দ্রীভূত করিয়া ক্লৈব্যাশ্রিত রাজন্যবর্গের, স্বামীর, অভিভাবকদের ও স্বজনগণের সমক্ষে রাজসভায় পাঞ্চালীর অমানুষিক নিগ্রহ মানবধর্মের বিপ্লবজনিত পরিস্থিতিতেই সম্ভব হইয়াছিল। ধর্মের সহায়ক শ্রীকৃষ্ণ অসহায়া পাঞ্চালীর সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন, কারণ ধর্মে ছিল পাঞ্চালীর পরমনিষ্ঠা ও অবিচলিত বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল যুগ-প্রয়োজনে। তিনি তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতায় সর্বধর্মের সমন্বয়, সর্বভূতে সমদর্শন এবং সর্বমত-সহিষ্ণুতার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। উহা সর্বকাল, সর্বদেশ ও সর্বলোকের হিতার্থেই পরিকীর্তিত হইয়াছিল।

সর্বপ্রকার ক্লীবত্ব, দৌর্বল্য ও ভয় পরিহার করিয়া দোদুল্যমানচিত্ত অর্জুনকে ভারত-সমরাঙ্গণে অমৃতের সন্ধান দিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলিয়াছিলেন—

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।"

তাঁহার অবদান অনন্যসাধারণ, অনুপম। পশুবলদৃপ্ত দুর্বৃত্তগণের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে বসুন্ধরা যখন উপপ্লুত, তখন তিনিই ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয়—এই মহতী শিক্ষা বিশদরূপে লোকায়ত্ত করিবার জন্য অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন; স্বয়ং অস্ত্রগ্রহণ না করিয়াও বুদ্ধিবলে যে অভীষ্টসিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি সপ্রমাণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাজন্যশক্তিকে সংঘবদ্ধ করিয়া ভারতে এক আদর্শ ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত কর্মী, আদর্শ ধর্ম সংস্থাপক ও উদারমতাবলম্বী। আর ছিলেন নিপুণ রাজনীতিজ্ঞ, শাশ্বত শান্তির সংস্থাপক ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রধান ঋত্বিক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যে অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে চিন্তা করে, যাহা তাহার নাই আমি তাহাকে তাহা দেই, যাহা তাহার আছে আমি তাহা রক্ষা করি।

কৃষ্ণ ও বলরাম—উভয়েই যুগাবতার। কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, সেই সুরে উন্মাদিনী হইয়া আয়ানের গৃহ হইতে কলসী কাঁকে ছুটিয়া আসিলেন যমুনা-পুলিনে কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি অতীন্দ্রিয় ভাবসম্পন্না রাধা; ছুটিয়া আসিল যতেক গোপিগণ। ভাসিয়া গেল সকলে কলঙ্ক-সাগরে, কিন্তু কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই ভক্তিমতী গোপাঙ্গনাদিগকে। শ্রীকৃষ্ণ স্নানরতা আকণ্ঠ-নিমগ্না গোপাঙ্গনাদের বসনভূষণ অপহরণ করিলেন—আমাকে লাভ করিতে হইলে ঘৃণা, লজ্জা আর ভয়, এই তিনটি রিপু জয় করিতে হইবে। বাঁশীর সুরে অনুগতজনকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন যেমন, তেমনই আবার রক্ষাও করিয়াছেন—বাঁশীতে নহে, সুদর্শনচক্রে! আর বলরাম? তিনি কি শুধুই ছিলেন হলধর? ভূগর্ভ-নিহিত অশেষ অমূল্য ধনরত্ন ভূমি কর্ষণ করিয়া আহরণ কর—ভূগর্ভে হল প্রোথিত কর, তবেই রত্ন মিলিবে। ধনরত্ন শস্যসম্পদ শুধু আহরণ করিলেই কৃতার্থম্মন্য হওয়া সম্ভব হয় না, উহাদিগকে রক্ষাও করিতে হইবে। স্তুতিবাদে নহে, অনুনয়ে বিনয়ে নহে, রক্ষা করিতে হইবে নিজের বাহুবলে, শক্তি-সামর্থ্যে, তাঁহার অপর হস্তে গদা উহারই প্রতীক।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম—উভয়েই যুগাবতার। সৃষ্টির উহাই আদি ও সনাতনী নীতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব সমাজের পথ-প্রদর্শক রূপে লোকস্থিতির প্রয়োজনে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এই দুই যুগাবতার। তাঁহাদের বাঁশী এখনও বাজিতেছে, সুদর্শনচক্র এখনও ঘূর্ণিত হইতেছে, হল এখনও ভূমি কর্ষণ করিতেছে, আর এখনও গদা অরাতিকুলে আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। তাঁহারা ছিলেন সর্বযুগের প্রতীক।

# ভালোবাসা

### শ্রীবিমল রায়

কল্পনাকে ভালোবাসি।
একদিন চুপিচুপি
জিজ্ঞাসি',
'ওগো, কল্পনারাণি,
বলো সত্যি করে
কতটুকুন ভালোবাসো মোরে?'

মুচকি হেসে কল্পনারাণী
বললে মুখে প্রেমের রেখা টানি',
'শুনবে তাই, প্রকাশ?
ঐ অতোখানি—' বলে
নরম কোমল আঙুল দিয়ে
দেখিয়ে দিলে আকাশ।

# ধম্মপদং

## যমকবগ্গো (১)

১। মন চলে সদা ধর্মের আগে মনোজাত সব ধর্ম।
মন্দ মনেতে যে করে ভাষণ অথবা মন্দ কর্ম,
দুঃখ যে তার নিত্যসঙ্গী, নিশিদিন রহে কাছে,—
অবিরত যথা শকটচক্র ঘোরে বলদের পাছে।

২। মন চলে সদা ধর্মের আগে মনোজাত সব ধর্ম।
প্রসন্ন মনে যে করে ভাষণ, প্রসন্ন মনে কর্ম,
সুখ তার হয় নিত্যসঙ্গী, সাথে থাকে দিবারাত্রি,
ছায়া যথা ফিরে কায়ার পিছনে—বিচ্ছেদহীন সাথী।

৩। এই বুঝি মোর ঘটে পরাজয়, এই বুঝি কেউ হাসে।
এই বুঝি কেহ আক্রোশভরে আমারে বধিতে আসে।—
যে থাকে এরূপ চিন্তামগ্ন—অন্তরে সদা ভয়,
সংসারে তার শত্রুতা কভু উপশম নাহি হয়।

৪। এই বুঝি মোর ঘটে পরাজয়, এই বুঝি কেহ হাসে।
এই বুঝি কেহ আক্রোশভরে আমারে বধিতে আসে।—
যে নহে এরূপ চিন্তামগ্ন, নহে শঙ্কিত, ভীত,
সংসার মাঝে শত্রুতা তার সদা রহে প্রশমিত।

৫। বৃথা বিস্তার কৌশলজাল বুকে বহি বিদ্বেষ,
বৈরীরে হানি বৈরিতা তব কভু না হইবে শেষ।
নিষ্ফল হবে বজ্র অস্ত্র, বরুণ, অগ্নি, পাশ।
ধর্মেতে কয় ভালবেসে হয় শুধু বৈরিতা নাশ।

৬। কলহমত্ত মূর্খেরা কভু চিন্তা না করে মনে,
নিত্য চলেছে মৃত্যুর মুখে পলে পলে প্রতিজনে।
মানসে যাঁহার মরণের রূপ সদা প্রতিভাত রয়,
অন্তরে তাঁর দ্বন্দ্ব কলহ সমূলে ধ্বংস হয়।

৭। রমণীয় রূপে মুগ্ধ যে জন—দেহসম্ভোগকারী,
আয়ত্তহীন ইন্দ্রিয় যার,—অলস, অমিতাহারী,—
সারহীন তরু ঝঞ্ঝায় যথা ধূলায় লুটায়ে পড়ে,—
মার আসি ধরে সে হীনবীর্যে অতি অবহেলা ভরে।

৮। যে নহে মুগ্ধ রমণীর রূপে—দেহসম্ভোগহীন,
পরিমিত ভোজী, ইন্দ্রিয়জয়ী, নিরলস নিশিদিন,—
ঝঞ্ঝার ঘায়ে পর্বত যথা অনড়, অকম্পিত,
সেই মতো থাকে সুদৃঢ়বীর্য, মার হতে নহে ভীত।

৯। সংযমহীন, সত্যশূন্য, আবিলতা যার মনে,
শোভেনাকো কভু কাষায়-বস্ত্র সেই অযোগ্য জনে।

১০। সংযমী যিনি, অন্তরমল যাঁহার সতত মুক্ত,
কাষায়-বস্ত্র ধারণ করিতে তিনি শুধু উপযুক্ত।

১১। অসত্য যার সত্য সমান, সত্যে মিথ্যা মানে,
প্রকৃত সত্য নহে প্রতিভাত কভু তাহাদের স্থানে।

১২। সত্যেরে যাঁরা জানেন সত্য, মিথ্যা অসত্যকে,
প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হয় সদা তাঁহাদেরই চোখে।

১৩। যে গৃহের চালা অবহেলা ভরে অতি অযতনে ছাওয়া,
রুধিতে পারেনা সে গৃহ কখনো বর্ষার জল-হাওয়া।
অযতনে বাঁধা চিত্ত তেমনি শোভন-চিন্তা হারা,
রুধিতে পারে না বহে যবে বেগে কামনার খরধারা।

১৪। যে গৃহের চালা দৃঢ়তার সাথে অতি সাবধানে ছাওয়া,
প্রতিরোধ করে সে গৃহ সতত বর্ষার জল-হাওয়া।
নিষ্ঠায় বাঁধা চিত্ত তেমনি দুষ্ট চিন্তাহারা,
প্রতিরোধ করে বহে যবে বেগে কামনার খরধারা।

১৫। ইহলোকে পাপী অনুতাপে মরে, পরলোকে অনুতাপ,
উভয় লোকেতে দহে অনুতাপে, স্মরিয়া আপন পাপ।

১৬। ইহ পরলোকে সাধু থাকে সুখে আনন্দরসে ভরি,
উভয় লোকেতে থাকে আনন্দে আপন পুণ্য স্মরি।

১৭। ইহলোকে পাপী ভোগ করে দুখ, দুখ পায় পরলোকে,
উভয় লোকেতে ভোগ করে দুখ কৃতকর্মের শোকে।

১৮। কৃতপুণ্যের এ জগতে সুখ, পর জগতেও তাই,
উভয় লোকেতে সন্তোষ লাভ করে সে সর্বদাই।

১৯। বুদ্ধের বাণী অহরহ মুখে আচরণে করে অন্য,
গো গণনকারী রাখাল তুল্য, নহে সে শ্রমণ গণ্য।

২০। বুদ্ধের বাণী স্মরি কদাচিৎ আচরণে যিনি ধন্য,
কামদ্বেষহীন, সম্যক্‌জ্ঞানী সেই সে শ্রমণ গণ্য।

## অপ্পমাদবগ্গো (২)

১। অপ্রমাদেতে নির্বাণ-পথ নির্ণীত করে প্রাণে,
প্রমাদে যে পথ প্রমুক্ত হয় মৃত্যু সে পথ আনে।

২। বিবেচনাশীল, শুদ্ধ-আচারী, স্মৃতিধারী, সংযত,
প্রমাদশূন্য বীর্যবানের খ্যাতি বাড়ে অবিরত।

৩। প্রমাদশূন্য সংযম পরে যে দ্বীপ উঠেছে জেগে,
সে দ্বীপ কখনো প্লাবিত না হয় বন্যার খর বেগে।

৪। সদ্য দুগ্ধে দধি নাহি জমে পাপ বিলম্বে জ্বলে,
সেইমতো মূঢ় অতি ধীরে ধীরে চাপা-আগুনেতে জ্বলে।

৫। মূঢ় যদি হয় শিল্পনিপুণ, ধনমর্যাদাশালী,
মহাদম্ভেতে বুদ্ধি তাহার বিলুপ্ত হইবে খালি।

৬। অজ্ঞ যে জন, হৃদয়ে সতত পোষণ করে এ আশা,
কূট-কৌশলে লভিবে সেজন জনতার ভালবাসা।—
গৃহী, সন্ন্যাসী চলিবে সকলে নির্দেশ মানি তার,
মূঢ়জনচিতে বাড়ে এইরূপে দুরাশা অহঙ্কার।
৭। প্রজ্ঞাবিহীন মূর্খেরা সদা ঘোরে প্রমাদেরই পাকে,
বিজ্ঞ রাখেন সম্পদ সম প্রমাদশূন্য তাকে।
৮। — — —
৯। সুস্থ সবল দ্রুতগতিশীল তুরঙ্গ অবহেলে,
শক্তিবিহীন অশ্বেরে যথা পিছনেতে যায় ফেলে,—
প্রমাদমুক্ত প্রবুদ্ধ যাঁরা, ধীর সংযত মনে,
পাছে ফেলি যান ক্ষিপ্রগতিতে সুপ্ত প্রমাদীজনে।
১০। অপ্রমাদেরই পথ অনুসরি জনসেবী মাঘবান,
দেহের অন্তে স্বর্গে লভিল দেবতার সম্মান।
১১। বিজ্ঞ যে জন প্রমাদেরে সদা দর্শন করে ত্রাসে,
প্রমাদশূন্য পন্থা লক্ষি মোহ-বন্ধন নাশে।
১২। বিজ্ঞ যে জন প্রমাদেরে সদা দর্শন করে ত্রাসে,
পরাজয় কভু না গ্রাসে তাঁহারে নির্বাণ কাছে আসে।

### চিত্তবগ্‌গো (৩)

১-২। সুনিপুণ হাতে সহজে যেমন শরনির্মাণকার,
আঁকাবাঁকা তীরে সরলতা আনে বক্রতা নাশি তার।—
সেইরূপ সদা অতি দুর্দম চিরচঞ্চল মনে,
আবিলতা নাশি ঋজু করি তোলে সহজে মেধাবীজনে।
ডাঙায় তুলিলে মৎস্য যেমন ধড়ফড়ি চাহে জল,
সেইমতো জ্ঞানী মারের ভুবন ত্যজিবারে চঞ্চল।
৩। দুর্দম অতি লঘু সে চিত্ত যথেচ্ছা গতি তার,
সংযমি তারে সাধু পান সুখ অন্তরে আপনার।
৪। দুরক্ষ্য অতি সূক্ষ্ম চিত্ত সদা যথাতথা গামী,
মেধাবী সে চিতে করেন রক্ষা, সংযত, সুখকামী।
৫। অতি দূরগামী, অশরীরী চিত গুহাশায়ী একাচারী,
যে করে নিরোধ মারবন্ধন সেই সে ছেদনকারী।
৬-৭। সত্যের পথে না চলে যে জন, অশান্ত যার মন,
প্রজ্ঞা তাহার পূর্ণতা লাভ না হইবে কদাচন।
পাপ নাহি যাঁর অন্তর মাঝে কামনা-মুক্ত মন,
পুণ্য পাপের অতীত সে জন নাহি তাঁর জাগরণ।
৮। কুমোরের গড়া ঠুনকো বাসন মানুষের দেহখানি,
দৃঢ়তায় বাঁধ চিত্ত আপন এই কথা মনে জানি।
মারেরে হানিয়া প্রজ্ঞা-অস্ত্র জয়ী হও সেই রণে,
লব্ধ জয়েরে রক্ষিও সদা আসক্তিহীন মনে।
৯। অচিরে এ দেহ পাইবে বিনাশ অন্যথা নাহি তায়,
ব্যবহার-হীন পড়ে রবে ভূমে দগ্ধ-কাষ্ঠ প্রায়।
১০। বৈরীতে করে বৈরীর ক্ষতি বিদ্বেষ-বিষে জ্বলি,
তার চেয়ে ক্ষতি মন যবে যায় মিথ্যার পথে চলি।
১১। মঙ্গল তব যত নাহি করে মাতা পিতা জ্ঞাতিগণ,
শতগুণ তার মঙ্গল আনে সুপথে চলিলে মন।

### পুপ্‌ফবগ্‌গো (৪)

১-২। দেবলোক আর যমলোক সহ কে নিবে বিশ্ব জিনে?
সুগন্ধ ফুল ধর্মপদের কোন্ মালী নিবে চিনে?
দেবলোক আর যমলোক-জয়ী বুদ্ধশিষ্য আসি,
চয়ন করিবে ধর্মপদের সুগন্ধ ফুলরাশি।
৩। এই দেহ হায় মরীচিকা প্রায় ফেনাসম যায় ভাসি,
দৃষ্টি এড়াও মৃত্যুরাজের মারণ-অস্ত্র নাশি!
৪। বিষয়-বিষের-পুষ্প চয়নে যে জন ভুলিয়া থাকে,
ঘুমন্ত গ্রামে বন্যার মতো যম আসি ধরে তাকে।
৫। বিষয়-বাসনা মিটে নাকো কভু তৃপ্তি না পায় নরে,
অপূরণ আশা থাকিতে থাকিতে মরণ আসিয়া ধরে।
৬। অম্লান রাখি বর্ণ-গন্ধ ফুলে মধু খায় অলি,
সেইরূপ গ্রামে ভিক্ষা লভিয়া মুনি দূরে যান চলি।
৭। কী লাভ খুঁজিয়া অন্যের কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি রন্ধ্র,
চিন্তিও সদা আপন কর্ম আপনার ভালমন্দ।
৮-৯। সুভাষিত বাণী না করি পালন, যে বা অবহেলা করে,
সৌরভহীন ফুলের মতন নিষ্ফল হয়ে ঝরে।
সুভাষিত বাণী যে করে পালন, সফল জীবন তার,
সুন্দর ফুল সার্থক যথা সৌরভে আপনার।
১০। ফুলরাশি হতে গাঁথা যায় যথা বিচিত্র ফুলসাজ,
জাত-মনুষ্য সাধে সেইরূপ নিয়ত পুণ্যকাজ।
১১-১২। অনুকূল বায়ে গন্ধ ছড়ায়ে টগর চামেলি ফোটে,
শীল-সৌরভ বিশ্ব আকুলি প্রতিকূল বায়ে ছোটে।
সুগন্ধিফুল টগর চামেলি উৎপল চন্দন,
শীল-সজ্জন যে জন তাঁহার সৌরভ অতুলন।
১৩। চন্দন আর টগর পুষ্পে সুগন্ধ পরিমিত,
শীল-সৌরভ তা হতে অধিক, দেবলোকে প্রবাহিত।
১৪। অপ্রমাদেতে বিহার যাঁদের শীল-সম্যক জ্ঞানী,
মার তাঁহাদের গতিপথ কভু নাহি পায় সন্ধানি।
রাজপথ পাশে আবর্জনার পঙ্ক প্রণালী মাঝে,
জনমে পদ্ম গন্ধযুক্ত অতি অপরূপ সাজে।
মোহান্ধ জনসঙ্ঘ সেরূপ আবর্জনার রাশি,
বুদ্ধশিষ্য পদ্মের মতো উঠে তাহে উদ্ভাসি।

### বালবগ্‌গো (৫)

১। ক্লান্তজনের যোজনেক পথ সুদীর্ঘ অতিশয়,
নিদ্রাহীনের রজনী সতত দীর্ঘই মনে হয়।
সত্যধর্মে অজ্ঞ যে জন মনে হয় শুধু তার,
অন্তবিহীন দুঃখেতে ভরা দীর্ঘ এ সংসার।
২। সমসাথী যদি নাহি মিলে পথে অথবা শ্রেষ্ঠতর,
একা চল পথ, সুদৃঢ় চিত্তে, অজ্ঞেরে পরিহর।
৩। আমার রয়েছে আপন পুত্র, আছে নিজস্ব ধন,
এই ভেবে সদা হতেছে বিনাশ, বুদ্ধিবিহীন জন।
আপনিই সে যে নহে আপনার দুর্জ্ঞেয় এই সূত্র,
না বুঝিয়া ভাবে ভ্রান্ত মানব আপনার ধনপুত্র।

৪। যে পারে আপন মূঢ়তা দেখিতে সেই পণ্ডিত হয়,
আমি পণ্ডিত, এ চিন্তা যার, তারে মহামূঢ় কয়।

৫। দর্বী না জানে ব্যঞ্জন-স্বাদ মূঢ় সেই মতো ভবে,
পণ্ডিত সাথে আজীবন থাকি ধর্ম কভু না লভে।

৬। মুহূর্তকাল বিজ্ঞ সে পেলে পণ্ডিত সংবাদ,
লভে সে ধর্ম,—রসনা যেমন লভে ব্যঞ্জন-স্বাদ।

৭। কটুফলদায়ী পাপে রত যেই নির্বোধ মূঢ়জন,
আপনি হইয়া আপন শত্রু সদা করে বিচরণ।

৮। যে কাজ করিলে অনুতাপ আনে, রোদন যাহার ফল,
সাধুগণ সদা বিরত সে কাজে নাহি হেরে মঙ্গল।

৯। অনুতাপহীন যে কাজ করিলে পুলকিত হয় মন,
সুখময় সেই কর্মে নিরত সদা সাধু-সজ্জন।

১০। যতদিন ফল না ফলে পাপের মূঢ় ভাবে মধুময়,
ফলিলে সে ফল দুঃখ-যাতনা ভোগে সে সুনিশ্চয়।
মূঢ়জন যদি থাকে প্রতিমাসে কুশাগ্র ভোজে রত,
নহে সে তুল্য বিজ্ঞজনের ষোড়শাংশের মতো।

### পণ্ডিতবগ্গো ( ৬ )

১। বিজ্ঞ যে করে ত্রুটি উল্লেখ, অথবা তিরস্কার,
গুপ্তধনের সন্ধানদাতা যোগ্য সে ভজনার।

২। যে করে শাসন, উপদেশে রোধে কর্ম নিন্দনীয়,
অসাধুর তিনি অপ্রিয় সদা ধার্মিকজন-প্রিয়।

৩। মন্দ সঙ্গী না কর ভজনা, না ভজ পুরুষাধমে,
কল্যাণকারী মিত্রে ভজিও, ভজ পুরুষোত্তমে।

৪। ধর্ম-অমৃত-রস পানে জ্ঞানী রহে প্রসন্নচিত,
আর্য-ধর্মে জ্ঞাত পণ্ডিত সতত আনন্দিত।

৫। জলসেচকেরা যেমন ইচ্ছা সিঞ্চিত করে বারি,
অসরল শরে ঋজু করি তোলে শর নির্মাণকারী,
তক্ষক যথা কাষ্ঠ কুঁদিয়া রূপ দেয় মনোমত,
পণ্ডিতজন সেইরূপ সদা আত্মদমনে রত।

৬। পর্বত যথা কাঁপে না হাওয়ায় কিংবা ভীষণ ঝড়ে,—
স্তুতি ও নিন্দা পণ্ডিতজনে চঞ্চল নাহি করে।

৭। ত্যাগ-ব্রতধারী মহৎ পুরুষ, কামনায় নহে রত,
নীরব সতত দুঃখে ও সুখে, সুস্থির সংযত।

৮। আবিলতাহীন স্বচ্ছ যেমন গভীর হ্রদের জল,
পণ্ডিত সদা ধর্ম শ্রবণে সেই মতো নির্মল।

৯। যেজন না চাহে আপনার লাগি অথবা পরের জন্য,
রাষ্ট্র, পুত্র, বিত্ত করিতে মন্দ উপায়ে পণ্য,
না করে কামনা ধনসম্পদ সেই ধার্মিক জন,
প্রজ্ঞাপূর্ণ শীলবান্ নামে সদা অভিহিত হন।

১০-১১। পার হ'ল যারা এ ভবসাগর গণি কর পল্লবে,
বাকি যত নর করে ধড়ফড় সংসার-কূলে সবে।—
অনুগামি সদা ধর্মের পথ মরণেরে জয় করি,
চলি যান তাঁরা নির্বাণ লভি পরপারে উত্তরি।

১২। পণ্ডিতজন পাপ পরিহরি শুক্লধর্মে রত,
সংসার ত্যজি আশ্রয় করে চির সন্ন্যাসব্রত।

১৩। কামনাবিহীন, ধ্যান-নিমগ্ন, চিত্তেরে রাখি শুচি,
পণ্ডিত করে আপনা মুক্ত কলঙ্ক-কালি মুছি।

১৪। উপাদান ত্যজি লভে বোধিজ্ঞান অপাপ অর্হৎ-গণ,
ইহলোকে হেরি পরিনির্বাণ তৃষ্ণামুক্ত হন।

**অনুবাদক : রামপ্রসাদ সেন**

# মহারাণী জয়াবতী

**অজয়কুমার সিংহরায়**

ত্রিপুরার ইতিহাসে এই মহীয়সী রাজমহিষীর নাম স্বমহিমায় চির উদ্ভাসিত। সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়েও রাজমহিষীর কর্তব্য অপরূপ দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন তিনি। স্বামীর পবিত্র বংশের ঐতিহ্য, সুনাম বজায় রাখার জন্য নিজের দুঃখ বিপদকে অবহেলায় অস্বীকার করেছিলেন এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ত্রিপুররমণী। এমন কি কর্তব্য পালনের পবিত্র ক্ষেত্রে নিজের পরমাত্মীয়জনও তাঁর কাছে রেহাই পায়নি। রাজ-বংশকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবার পর নিজের কর্তব্য সুচারুরূপে সমাধা করে পতির জলন্ত চিতায় আরোহণ করেছিলেন "ত্রিপুর-সতী" মহারাণী জয়াবতী। ত্রিপুরার ইতিহাস আজিও সেই মর্মন্তুদ অথচ রোমাঞ্চকর কাহিনী সাদরে লালন করছে তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। ত্রিপুরার ঘরে ঘরে আজিও তাঁর স্মৃতি, তাঁর নাম ভাস্বররূপে বিরাজমান।

প্রায় চার শ' বছর আগেকার কথা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অতিক্রান্ত। সিংহাসনে স্বনামধন্য "সম্রাট"-পদবাচ্য নৃপতি বিজয়-মাণিক্য সগৌরবে রাজত্ব করছেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী বিচক্ষণ দৃষ্টিপাতে রাজ্যের কোথাও নেই এতটুকু অমঙ্গল, অভাব অথবা বিশৃঙ্খলার ছায়াপাত।

কিন্তু কি কুক্ষণেই না তিনি আবিষ্কার করেছিলেন গোপী-প্রসাদকে। শুধু আবিষ্কারই নয়, বিশ্বাসের অমৃত-বারি সিঞ্চনে তিনি সযত্নে গড়ে তুলেছিলেন বিরাট এক বিষবৃক্ষ।

বিচক্ষণ নীতি-পরায়ণ বিজয়-মাণিক্যের এই মারাত্মক ভুলের বিষময় ইতিহাস কখনো বিস্মৃত হয়নি। এবং তারই ফলে ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে ভয়াবহ ঘটনার অশুভ আবির্ভাব।

গোপীপ্রসাদ ছিল মহারাজার অনেক রাঁধুনীর একজন।

অবশেষে প্রধান পাচকের কৃপায় রাজাকে পরিবেশন করে খাওয়াবার ভার পেলো সে। প্রতিদিন রাজদর্শনের সৌভাগ্য হলো তার।

বিজয়মাণিক্য ছিলেন অশেষ গুণান্বিত, বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান নৃপতি। জ্যোতিষবিদ্যায় ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, এবং জ্যোতিষে তিনি অত্যুৎসাহী ছিলেন, একথা বললে বেশী বলা হবে না। সেইজন্যই হয়তো তিনি গোপীপ্রসাদের ঘৃণিত জীবনের চরম ছেদচিহ্ন তখনই টেনে দেননি যখন একদিন খাবার সময়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন নূতন পাচকের হাতে দুর্লভ এক জ্যোতিষ-চিহ্ন! একই রাজ্যে দু'জনের হাতে সেই চিহ্ন দেখা দিলে রাজ্যের শান্তি আর শৃঙ্খলা যে অটুট থাকেনা, একথা রাজা বিজয়মাণিক্য বোধ হয় তখনও বিশ্বাস করতেন না। বিশেষ করে সেই চিহ্ন যদি দেখা দেয় সাধারণ এক রাঁধুনীর হাতে।

মানুষ চিনতে পারতেন বলে গর্ব ছিলো বিজয়মাণিক্যের। গোপীপ্রসাদ যে অসাধারণ বুদ্ধিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর সাহসী বীর, সে কথা জানতে তাঁর বাকী থাকেনি কিন্তু অন্তর চিনতে তখন ভুল হয়েছিলো তাঁর। এবং সেই ভুলের মাশুল তিনি না দিলেও দিয়েছিলো একজন। সে কথা পরে বলছি।

গোপীপ্রসাদকে রাজার খুবই ভাল লেগে গেল। পাচকের কাজ থেকে ছাড়িয়ে তিনি তাকে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলেন।

একদিন বেড়িয়ে ফেরার পথে গোপীপ্রসাদের গৃহের সম্মুখে একটি পরমা সুন্দরী বালিকাকে আপন মনে খেলতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজা। খুঁটিয়ে দেখলেন তাঁর অবয়ব, চলাবলার ধরণ। তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা সেই মুহূর্তে বলে উঠলো—এই মেয়েই তাঁর বংশের আদর্শ কুলবধূ।

মেয়েটিকে শুধালেন : তোমার নাম কি মা ?

বালিকা নতকণ্ঠে জানালো : জয়াবতী।

—বাবার নাম ?

—গোপীপ্রসাদ।

বিজয়মাণিক্য সেইদিনই স্থির করলেন, জ্যেষ্ঠ কুমার অনন্তের বধূরূপে ঘরে আনবেন জয়াবতীকে।

গোপীপ্রসাদ তখন রাজ্যের ভক্ত বিশেষ। রাজার অনুগ্রহ-পুষ্ট, ক্ষমতার শিখরে তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী গোপীপ্রসাদ। তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই যেন। বিজয়মাণিক্যের মনেও তখন দেখা দিয়েছে অনাগত বটিকার সম্ভাবনা। ছেলেরা মানুষ হয়নি, গোপীপ্রসাদের লোভ আর লালসা ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একদিন বিজয়মাণিক্য শপথও করিয়ে নিলেন গোপীপ্রসাদকে। যদিও বিগ্রহের সম্মুখে চিরদিন সে রাজানুগত থাকবে বলে শপথ করেছিলো কিন্তু তবু রাজার মন যেন সায় দেয়নি তার শপথ বাক্যে।

তাই বিজয়মাণিক্য এবার তাকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে নিলেন।

এক শুভলগ্নে মহা ধূমধামের সঙ্গে যুবরাজ অনন্তের সঙ্গে জয়াবতীর বিয়ে হলো। কম্পিত পায়ে যুবরাজের হাত ধরে ত্রিপুরার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন বালিকা জয়াবতী। অলক্ষ্যে বিজয়মাণিক্যের চোখে সেদিন দেখা দিয়েছিল আনন্দের ধারা, অলক্ষ্যেই আবার আনন্দাশ্রু সংবরণ করলেন রাজা।

কারণ তাঁর সব আশা ভরসা এখন অনন্তকে ঘিরে। দ্বিতীয় পুত্র দুর্জয়কে তিনি সুদূর উড়িষ্যায় পাঠিয়েছিলেন উড়িষ্যাপতি বন্ধুবর মুকুন্দদেবের কাছে। বলেছিলেন, দুর্জয় যেন আর ফিরে না আসে। রাজ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় গা না ভাসিয়ে জগন্নাথদেবের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর আরাধনা করলে হয়তো দুর্জয়ের জীবনের মোড় ফিরে যাবে।

আর অনন্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। স্বভাব চরিত্র রাজানুগ না হলেও রাজ্য তো আর রাজাহীন হতে পারে না। তাই তাকে মানুষ করবার ভার নিলেন নিজে। আর গোপীপ্রসাদের উপর সঁপে দিলেন অনন্তের মঙ্গলামঙ্গল—রাজ্যের ভবিষ্যৎ।

কারণ বিজয়মাণিক্য বুঝেছিলেন, তাঁর পরলোকের ডাক এসেছে। তবু আরও কিছুকাল বেঁচে থাকার বাসনা তাঁর ছিল। অনন্ত যে বড়ো নির্বোধ, জয়াবতী নিতান্ত বালিকা। আর গোপীপ্রসাদ নিরতিশয় লোভী। তাছাড়া কেমন করে ভুলবেন তিনি তাঁর জীবনের দুষ্টগ্রহ দৈত্যনারায়ণের কথা? সেও ছিল তাঁর শ্বশুর, রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিজয়মাণিক্যকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অন্তরের পুঞ্জীভূত অসহ্য যন্ত্রণা সেদিন কি তাঁকে তিলে তিলে দগ্ধ করেনি?

এ হেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও বিজয়মাণিক্য নিজের অজ্ঞাতসারে সেই কাঁটার বোঝাই চাপিয়ে গেলেন অনন্তের মাথায়। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে রাজবৈদ্য বাসু রায়ের অক্লান্ত চেষ্টাতেও তাঁর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।

সিংহাসনে রাজা হয়ে বসলেন অনন্তমাণিক্য, মহারাজ বিজয়-মাণিক্যের অযোগ্য পুত্র। আর তাঁর অভিভাবক, মন্ত্রণাদাতা, পরিচালক, একাধারে রাজ্যের সর্বস্ব—গোপীপ্রসাদ।

জয়াবতী তখন ছোট। কতই বা বয়স হবে তাঁর! কিশোরী বালিকা। তখনও পুতুল-খেলা পেলে তাঁর মন ভরে ওঠে। তবু পিতার প্রকৃতি ভালভাবে অনুধাবন করেছিলেন এই অসাধারণ বুদ্ধিমতী বালিকা। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর পিতার সর্বনাশা আকাঙ্ক্ষা একদিন তাঁর জীবনে প্রলয়ের সৃষ্টি করবেই।

সিংহাসনে আরোহণ করেও অনন্ত প্রায় প্রতিদিনই শ্বশুরের বাড়ী খেতে যেতেন। আর সেখানেই গোপীপ্রসাদ তাঁর উপর বৃষ্টিধারার মতো উপদেশ বর্ষণ করতো। কিন্তু বলা বাহুল্য, সে বর্ষণ জমিকে উর্বরা না করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো তার সকল সম্ভার।

পরনির্ভর অনন্ত বুঝতে পারেননি শ্বশুরের মতলব। বালিকা জয়াবতী বুঝেছিলেন। সেইজন্যই বার বার স্বামীর হাতে ধরে মিনতি জানাতেন : ওগো, তুমি আর ওখানে যেও না। আমার ভয় করে। সব কথা খুলে বলতে পারতেন না। বলতেন : এখন তুমি রাজা। তোমার মর্যাদার উপর দৃষ্টি রেখো। রোজ রোজ শ্বশুরের বাড়ী খেতে যাওয়া কি তোমার শোভা পায়?

অনন্ত, রাজার হলেও, পিতার বাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন। ভেবেছিলেন, গোপীপ্রসাদ তাঁর পরম হিতৈষী। জয়াবতীর কথা শুনে বললেন : সেকি ? উনি তোমার বাবা, আমার শ্বশুর। ওঁর মর্যাদা কি কম ? তাছাড়া বাবা ওঁর হাতেই আমাদের রেখে গেছেন। তুমি কিছু ভেবো না।

অনন্ত হেসেই উড়িয়ে দেন জয়াবতীর আকুল মিনতি। জয়াবতীর মন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে।

অবশেষে একদিন এলো সেই ভয়াবহ দিন।

এতদিন গোপীপ্রসাদ গোপনে পথের কাঁটা অনন্তকে সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত করছিলো। সবই যখন সে করছে, তখন রাজা হয়ে বসতেই বা বাধা কি ? বাধা যে, তাঁকে স্বহস্তে নিঃশেষ করবার মতো প্রবৃত্তি হলো না কারও। বারবার বিফল হয়ে গোপীপ্রসাদ ভাগিনেয় বীরমর্দনের উপর এই ঘৃণিত কাজের ভার দিলো।

মামার ভাগিনেয় বীরমর্দন। ৺বিজয়মাণিক্যের অনুগ্রহে সামান্য সেনানী থেকে সৈন্যাধ্যক্ষের সম্মান লাভ করেছিলো সে। এতদিন পরে বিশ্বাসঘাতক উপকারীর ঋণ নিঃশেষে মিটিয়ে দিলো।

গোপীপ্রসাদের গৃহে তারই নির্দেশে নির্মমভাবে সে হত্যা করলো রাজাকে। গোপীপ্রসাদের মনোবাসনা চরিতার্থ হলো। এবার সে ত্রিপুরার পবিত্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করবে।

রাণী জয়াবতীর কাছে পৌঁছুলো এই হৃদয় বিদারক দুঃসবাদ। পাগলিনীর মতো আলু থালু বেশে ছুটে এলেন রাণী। স্বামীর মৃতদেহখানি জড়িয়ে ধরে বুঝি ভেঙ্গে পড়লেন বেদনায়, ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু না, নিজেকে সংবরণ করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাণী জয়াবতী, বিজয়মাণিক্যের কুলবধূ। সম্মুখে গোপীপ্রসাদকে দেখে রোষে দুঃখে আহত ফণিনীর মতো জ্বলে উঠলেন বেদনায় : শয়তান, এ তোমার কাজ। তুমি এর যোগ্য প্রতিফল পাবে।

তাঁর সেই ভয়ঙ্করী রূপ দেখে তখন শয়তানও বোধ করি ভয় পায়। গোপীপ্রসাদের মুখে জোগায় না একটি উত্তরও। নিঃশব্দে পিছু হটে পালায় সেই নিষ্ঠুর লোভী জন্তুটা।

কিন্তু পরিত্রাণ নেই জয়াবতীর হাত থেকে। তার পিছু ধাওয়া করে দরবার-কক্ষে ছুটে গেলেন জয়াবতী। সহস্র চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন অসূর্য্যম্পশ্যা ত্রিপুররাজ-মহিষী। সিংহাসনে উপবিষ্ট গোপীপ্রসাদকে লক্ষ্য করে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন : রাজসিংহাসন নিয়েছো, রাজমহিষীই বা বাকী থাকে কেন ? তাকেও গ্রহণ করো। এইবলে সিংহাসনের বাঁ দিকের আসনে বসতে ছুটলেন জয়াবতী, পতিবিয়োগ-বিধুরা ত্রিপুর-সতী।

গোপীপ্রসাদ একলাফে সিংহাসন ছেড়ে লজ্জায় মুখ লুকায়। সে রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে যায় চন্দ্রপুর গ্রামে। পুরোনো রাজধানী রাঙ্গামাটির নাম বদলিয়ে রাখে উদয়পুর।

ওদিকে জয়াবতী তখনও নিভিতে দেননি তাঁর স্বামীর চিতা। নেভেনি তাঁর মনের আগুনও। সহমরণে তখন তিনি যান নি, কারণ, কর্ত্তব্য যে তখনও বাকী।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের মধ্যমরাণীর গর্ভে জাত একটি পুত্র তখনও জীবিত, তাঁর নাম অমর। তাঁকেই সিংহাসনে বসাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন মহারাণী। পবিত্র ত্রিপুরার সিংহাসনে বসে গোপীপ্রসাদের মতো একজন হীন, কামুক, অর্থ গৃধ্নু, লোভী, অনাচারী রাজা রাজত্ব চালিয়ে যাবে, এ যে তাঁর চিন্তারও বাইরে। হোক না সে তাঁর পিতা, তবু স্বামীর বংশে এতবড়ো অনাচার তিনি সহ্য করবেন না কখনও।

অসুর-নিধন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতির অপেক্ষায় দিন গোণেন জয়াবতী।

পাঁচ বৎসর পরে এলো সেই শুভলগ্ন।

উদয়মাণিক্য নাম ধারণ করে গোপীপ্রসাদ পাঁচ বৎসরকাল ত্রিপুরার বুকে অত্যাচার অবিচারের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিলো। তারপর ১৪৯৮ শকে ১৫৭৬ খৃঃঅব্দে হঠাৎ একদিন এই নরপশুর জীবনান্ত ঘটলো, অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে। অনেকের সুদৃঢ় বিশ্বাস তার জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছিলেন জয়াবতী, বিশ্বাসী বৈদ্যের সহায়তায়। স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন সতী।

গোপীপ্রসাদের পর তার পুত্র জয়মাণিক্য নাম নিয়ে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসলো। কিন্তু মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যেই তার সুখের রাজত্ব বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে। পিতার সঙ্গে পুত্রও প্রায়শ্চিত্ত করে গেলো বিশ্বাসঘাতকতার।

ততদিনে মহারাণী অমরকে পাদপ্রদীপের আলোকে তুলে ধরেছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, গায়ের অলঙ্কার যা ছিল, সমস্তই তিনি অকাতরে তুলে দিয়েছিলেন অমরের হাতে। সৈন্য সংগ্রহ হলো সেই অর্থে। জ্বালাময়ী বাক্যবাণে সৈন্যদের উত্তেজিত করলেন জয়াবতী। নব উৎসাহে উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো ত্রিপুরসৈন্য। রাণী জয়াবতীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অমর জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন দিনে দিনে। তারপর অমর জয়মাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা কম হলেও, তারা প্রত্যেকেই ত্রিপুর-সিংহাসনের পবিত্রতারক্ষার জন্য জীবন-পণে উদ্দীপ্ত। অন্যদিকে জয়মাণিক্যের বেতনভুক সৈন্যরা সংখ্যায় বেশী হলেও আদর্শবিহীন দুর্বল। অবশেষে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অমরের প্রচণ্ড অসির আঘাতে জয়মাণিক্যের মস্তক ধূলি-লুণ্ঠিত হলো। তার সঙ্গে বীরমর্দনও বাদ গেলনা।

ত্রিপুরার অনাদৃত রাজমুকুট এতদিন পরে রাজবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর মস্তকে শোভা পেতে লাগলো। অমর 'অমর মাণিক্য' নাম ধারণ করে ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

মহারাণী জয়াবতীর স্বপ্ন সার্থক হলো এতদিনে, কর্ত্তব্য হলো সমাধা। রাজবংশের কলঙ্ক, রাজ্যের কাঁটা উৎপাটন করে, ত্রিপুরার সিংহাসন বিপন্মুক্ত ক'রে—তাঁর কাজ ফুরালো।

অনন্তমাণিক্যের চিতা তখনও বহ্নিমান। এইবার সতী উৎফুল্ল অন্তরে পতির চিতায় আরোহণ করলেন।

তাঁর নশ্বর দেহটি ভস্মীভূত হলেও, মহারাণী জয়াবতীর জলন্ত দেশপ্রেম, অবিচল নিষ্ঠা আর উদার আত্মত্যাগের কাহিনী এখনও অবিনশ্বর হয়ে রয়েছে লোকের মনে—ইতিহাসের পাতায়। এখনও ত্রিপুরসতী নামে তাঁকে স্মরণ করে ত্রিপুরার আবালবৃদ্ধ-বনিতা। ভক্তিভরে পূজা করে তাঁর নাম।

৪৮

হে শ্রীচৈতন্য, হে দয়ানিধি, আমাতে তোমার দয়া হোক। যে দয়ায় সমস্ত খেদ অনায়াসে দূরে যায়, যা নির্মল, বিশদ, যা আনন্দবর্ধন, যা সমস্ত শাস্ত্রবিবাদ নিরস্ত করে, যা অখণ্ড ভক্তিসুখের উৎস, যার চিরন্তন মর্যাদা একমাত্র মাধুর্যে, সেই অসামান্য কৃপা আমার জীবনে প্রকাশিত করো। দামোদর প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ল।

'ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল।' প্রভু দামোদরকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম তুমি আসবে। তুমি না এলে কার কাছে সেই অন্তরঙ্গ কথা, কৃষ্ণ কথা ব্যক্ত করি ?

'তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ জেনেও আমি তোমার সঙ্গে না এসে কাশী গিয়েছিলাম'। বলে দামোদর, 'আমার অপরাধের মার্জনা নেই। কিন্তু, আমি তোমাকে ছাড়লেও তুমি আমাকে ছাড়োনি, কৃপার দড়ি গলায় বেঁধে আমাকে এখানে টেনে এনেছ।' 'মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা। কৃপারজ্জু-গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥'

প্রভু দামোদরের নির্জন বাসস্থান ঠিক করে দিলেন।

কিন্তু তুমি কে ?

আগন্তুক প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। আমি গোবিন্দ। ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য। তিরোধানের সময় ঈশ্বরপুরী বলে দিয়েছেন এখন থেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করো। তাই এসেছি নীলাচলে।

'আমার প্রতি পুরীশ্বরের কী কৃপা, কী স্নেহ! নিজের ভৃত্যকে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু, সার্বভৌমকে লক্ষ্য করলেন প্রভু: 'গুরুর সেবক মান্যপাত্র, তাকে দিয়ে অঙ্গ সেবা করা কী সঙ্গত হবে ?'

'কিন্তু গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করবে কী করে!' বললে সার্বভৌম।

'ঠিক বলেছেন।' গোবিন্দকে আলিঙ্গন করলে প্রভু।

গোবিন্দ শূদ্র। তা হোক। ঈশ্বরপুরীর সেবা আর সঙ্গে তার চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে গোবিন্দের চিত্তে প্রীতি-ভক্তির লাবণ্য, কে আর তা জাতি-কুলের বিচার করে ? দাসীপুত্র দরিদ্র বিদুরে ঘরে ভোজন হয়নি শ্রীকৃষ্ণের ? শুধু ভক্তির খোঁ করো। কৃষ্ণে শুধু ভক্তির অপেক্ষা।

'ভট্টাচার্য কহে—গুরু-আজ্ঞা বলবান।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্র পরমাণ॥'

গোবিন্দ পেল শ্রীঅঙ্গ সেবার অধিকার। প্রভু আরো দুই ভৃত্য ছিল—রামাই আর নন্দাই, কি তারা গোবিন্দের অধীন। প্রভুর সমস্ত কার্যের নির্বা ভার গোবিন্দের হাতে, গোবিন্দই সর্বেসবা। এমন বি যারা প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাদেরও তদার গোবিন্দ। প্রভুর কিসে আরাম হবে—এই একমা গোবিন্দের বিচার, গোবিন্দের সমাধান।

মুকুন্দ দত্ত এসে বললে, 'ব্রহ্মানন্দ ভারতী এসেছে তোমাকে দেখতে। তাঁকে নিয়ে আসব এখানে ?'

'না, তিনি আমার গুরুস্থানীয়, ঈশ্বরপুরীর সতী তাই আমি নিজে তাঁর কাছে যাব। তাঁর মর্যা আমাকে রক্ষা করতে হবে।'

ভক্তসঙ্গে প্রভু গেলেন ব্রহ্মানন্দের স্থানে গিয়ে দেখলেন, ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম পরে আছে।

'ভারতী গোঁসাই কোথায়?' প্রভু জিগগেস করলেন মুকুন্দকে।

'সে কী? তিনি তো তোমার সামনেই বসে রয়েছেন।' মুকুন্দ অবাক মানল।

'না, ইনি হতে যাবেন কেন? ভারতী গোঁসাই চামড়া পরবেন কেন? তুমিই একঁকে অন্য মনে করছ। তুমিই অজ্ঞান।'

ব্রহ্মানন্দের তখন জ্ঞান হল। আমার চর্মাম্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পছন্দ করছেন না। হয়তো এই চর্মে ত্যাগের দম্ভই প্রকাশ করা হচ্ছে, আর যেখানে দম্ভ সেখানেই ভগবৎশূন্যতা। ঠিকই তো, মৃগচর্ম পরে কই এখনো তো সংসার-সমুদ্র পার হতে পারিনি, শুধু অহঙ্কারকেই সার করেছি। আর পরব না চর্মাম্বর।

প্রভু তার মনের ভাব বুঝে নিলেন। আনালেন সুতোর বহির্বাস। ব্রহ্মানন্দ বেশ পরিবর্তন করলেন। অহমিকার ভার থেকে মুক্ত হলেন নিমেষে।

তখন প্রভু তাঁর চরণবন্দনা করলেন।

'তোমার আচরণ লোকশিক্ষার জন্যে, তাই তুমি আমাকে, আমি শুধু গুরুস্থানীয় বলে, প্রণাম করলে। কিন্তু দ্বিতীয়বার তুমি নতিস্বীকার কোরো না।' বললেন ব্রহ্মানন্দ, 'বর্তমানে নীলাচলে দুই ব্রহ্ম প্রকট—অচল আর সচল। অচল মন্দিরে আর সচল তুমি। অচল শ্যামব্রহ্ম আর সচল গৌরব্রহ্ম। আজন্ম আমি নিরাকার ধ্যান করেছি, কিন্তু কী আশ্চর্য, তোমাকে দেখামাত্রই আমার অদ্ভুত অনুভব হচ্ছে। অনুভব হচ্ছে যেন স্বয়ং কৃষ্ণ আমার সামনে উপনীত হয়েছেন। মনে আর চোখে—দু জায়গায়ই কৃষ্ণ দেখছি আর মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হচ্ছে। আমার বুঝি বা সেই বিল্বমঙ্গলের অবস্থা।'

কী বলেছিল বিল্বমঙ্গল? বলেছিল, আমরা অদ্বৈতপথের পথিকদের আরাধ্য ছিলাম, স্বানন্দ-সিংহাসনে সর্বদা পূজা পেতাম। হায়, কোনো গোপবধূলম্পট শঠ বলপ্রয়োগ করে আমাদের তার দাস করে ফেলেছে।

অদ্বৈতমার্গে সকলের পূজা পেয়ে যে আনন্দ পেতাম, কৃষ্ণদাস্যের আনন্দের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। কৃষ্ণদাসের কত বড় ভাগ্য। যিনি অজিত, যিনি সর্ববিশ্বের অধীশ্বর, অদ্বৈতপন্থীদের ব্রহ্ম যার অঙ্গকান্তিমাত্র, তাঁকে জয় করতে পারে—বশীভূত করতে পারে—একমাত্র তাঁর দাস। স্বতন্ত্র হয়েও কৃষ্ণ তাঁর দাসের কাছে পরাজিত, দাসের কাছে পরাধীন। 'কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ। আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥'

উদ্ধবকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ: 'উদ্ধব, তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা সেরূপ নয়, নয় বা শঙ্কর, নয় বা সঙ্কর্ষণ, নয় বা লক্ষ্মী—এমন কি, আমি নিজেও আমার সে রকম প্রিয়তম নই। 'আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে।'

প্রভু বললেন, 'তুমি যে আমাকে কৃষ্ণের তুল্য দেখছ, সে আমার মহিমা নয়, তোমারই মহিমা, তোমারই কৃতিত্ব। কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রীতি, তাই সর্বত্র তোমার কৃষ্ণস্ফুরণ। যাদের ইষ্টে অনুরাগ তারা বস্তুতে বস্তুর স্বরূপ দেখেনা, ইষ্টেরই স্ফূর্তি দেখে।

'প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেমা হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়॥'

সার্বভৌম মীমাংসা করে দিলেন। বললেন, 'প্রভু তুমি কৃষ্ণরূপে ভারতীকে দর্শন দিচ্ছ বলেই ভারতী তার কৃষ্ণপ্রেমের গুণে তোমাকে দেখছে কৃষ্ণরূপে। একদিকে তোমার কৃপা, অপরদিকে ভারতীর প্রেম। তুমি যদি কৃপা না করো কে তোমাকে দেখে? আর যদি দর্শকের প্রাণে প্রেম না থাকে, তাহলে কৃষ্ণ সামনে উপস্থিত থাকলেও তাকে দেখে তার সাধ্য কী।

'বিষ্ণু, বিষ্ণু।' উচ্চারণ করলেন প্রভু। বললেন, এ যে তুমি অতিস্তুতি করছ। অতিস্তুতি নিন্দারই নামান্তর।'

কাশীশ্বর গোসাঁই ঈশ্বর পুরীর আরেক সেবক। সেও এসে উপস্থিত হল। তাকেও প্রভু গ্রহণ করলেন সসম্মানে।

নদনদী যেমন সমুদ্রে এসে মেলে, তেমনি সকল ভক্ত মিলল এসে মহাপ্রভুতে।

'এবার যদি অভয় দাও,' সার্বভৌম বললেন প্রভুকে, 'আরেক কথা নিবেদন করি।'

'করো। কিন্তু যাচ্ঞা যোগ্য হলেই পূরণ করব, নচেৎ নয়।'

'মহারাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন।'

কানে হাত দিলেন প্রভু, নারায়ণ স্মরণ করলেন। বললেন, 'অন্যায় কথা বলো কেন? আমি সংসার-ত্যাগী বিরক্ত সন্ন্যাসী, রাজদর্শন বা স্ত্রীদর্শন উভয়ই আমার পক্ষে বিষতুল্য।' 'সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন। স্ত্রীদরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥'

'তুমি যা বললে তা আমি জানি।' বললেন সার্বভৌম, 'প্রতাপরুদ্র রাজা বটে কিন্তু সে ভক্তোত্তম। সে জগন্নাথের সেবক।'

'হোক। তবু সে রাজা, সে বিষয়ী। কাঠের তৈরী নারীমূর্তি স্পর্শ করলেও মনের বিকার ঘটে, তেমনি রাজার আসক্তি না থাকলেও তার বেশে-বাসে আড়ম্বরে চিত্তচাঞ্চল্য অসম্ভব নয়।' প্রভু রুষ্ট হলেন: 'অমন কথা আর মুখে আনবেনা। যদি বলো তো আমি নীলাচল ছেড়ে চলে যাব।'

সার্বভৌম ভয় পেলেন। রাজাকে জানালেন মহাত্যাগী সন্ন্যাসী রাজদর্শনে অনিচ্ছুক।

প্রতাপরুদ্র কটক ছেড়ে পুরীতে সোজা উপস্থিত হলেন। সঙ্গে নিলেন রামানন্দকে। রামানন্দ রাজার হয়ে মিনতি করবে প্রভুকে, প্রভুর মন গলাবে।'

'আমি রাজাকে বললাম, বিষয়কর্ম আমার আর ভালো লাগছেনা, যদি অনুমতি করেন পুরীতে গিয়ে চৈতন্যচরণে অবস্থিত হই।' বলতে লাগল রামানন্দ। 'আর রাজা এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তোমার নামে তাঁর প্রেমাবেশ হল! বললেন, তুমি যে বেতন পেতে তাই পাবে, বিষয়কর্ম থেকে ছুটি দিলাম তোমাকে, তুমি গিয়ে সেই পরমকৃপালু ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা কর। আরো বললেন, আমি ছার, অধম, এ জন্মে আমার অধিকার নেই তাঁকে দর্শন করি। কিন্তু বলো, কোনো জন্মেও কি আমি ধন্য হবনা দর্শনে? প্রভু, সজলচোখে বললে রামানন্দ, 'রাজার সে কী আর্তি।'

'রায়, ভক্তের প্রতি যার প্রীতি, তার প্রতিই ভগবান প্রসন্ন।' বললেন প্রভু, 'তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ। রাজা যখন তোমাতে প্রীতিমান তখন তাকে ভাগ্যবান বলতে হয়। ভক্তের আরাধনা করে সে কৃষ্ণের প্রসাদ অর্জন করবে।'

মহাদেব কী বললেন পার্বতীকে? বললেন, 'হে দেবি, সমস্ত দেবদেবীর আরাধনার চেয়ে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, আর বিষ্ণুর আরাধনার চেয়েও শ্রেষ্ঠ তার ভক্তের আরাধনা।

কৃষ্ণপ্রীতির একমাত্র হেতু প্রেমভক্তি। আর প্রেমভক্তির মূল মহৎ-কৃপা। কৃষ্ণভক্তেরাই মহৎ। তাদের কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণ প্রাপ্তির পথ নেই। 'মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি হয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥' সেই হেতু যারা কৃষ্ণের ভক্তের ভক্ত তারাই ভক্তত্তম।

'রায়, কমললোচনকে দেখলে?' জিগ্গেস করলেন প্রভু। 'গিয়েছিলে মন্দিরে?'

'এখন যাই, দেখে আসি।' উঠল রামানন্দ।

'সে কী, তুমি জগন্নাথ দর্শন না করে আগে এখানে এসেছ?'

'কী করব, মন আগে আমাকে এখানেই টেনে এনেছে। চরণ রথমাত্র, হৃদয়ই সারথি। হৃদয় এ দিকেই অভিমুখী।'

'না, না, যাও, শিগ্গির দর্শন করো।'

প্রভু এখনও বিমুখ, প্রতাপরুদ্র ম্লান হয়ে গেলেন। বললেন, 'জগাই-মাধাই পর্যন্ত উদ্ধার পাবে, প্রতাপরুদ্রই বাদ পড়বে একা। জগৎ উদ্ধার হবে ঠিকই কিন্তু প্রতাপরুদ্র জগতের বাইরে। সকলের প্রতিই তিনি কৃপা করবেন নির্বিচারে আর আমি সকল ছাড়া। তবে এক কথা জেনে রেখো, সঙ্কল্পে দৃঢ় রাজার কণ্ঠস্বর: 'তাঁর যেমন প্রতিজ্ঞা রাজ দর্শন করব না—আমার তেমনি প্রতিজ্ঞা, তাঁর দর্শন না পেলে আত্মহত্যা করব। যদি তাঁর কৃপাই না পাই, কী হবে আমার রাজমুকুটে, বিলাস বৈভবে?' 'কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ।'

'তুমি অধীর হয়ো না।' সার্বভৌম চাইলেন আশ্বাস দিতে: 'তুমি পাবে প্রভুর করুণা। যিনি প্রেমাধীন তিনি গাঢ় প্রেমকে কী বলে অস্বীকার করবেন?'

তাহলে এস এক কাজ করা যাক। রথযাত্রার দেরী নেই, রাজবেশ ছেড়ে প্রতাপরুদ্র তাতে যোগ দিক। প্রভু যখন রথের আগে প্রেমাবিষ্ট হয়ে নাচবেন, রাজা একাকী ভাগবত পড়তে পড়তে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করবে, আর প্রভু তখন বৈষ্ণবজ্ঞানে প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করে ধরবেন।

গোপীনাথ রাজাকে বললে, গৌড়দেশ থেকে প্রায় দুশো ভক্ত প্রভুর সঙ্গে মিলতে আসছে পুরীতে। রাজা আদেশ দিলেন সকলের স্থান করে দাও। আহারের ব্যবস্থা করো, আদর-অভ্যর্থনায় যেন ত্রুটি না হয়।

অট্টালিকার ছাদে গিয়ে উঠল রাজা। সঙ্গে সার্বভৌম আর গোপীনাথ। কীর্তন করে যারা

আসছে, তাদের মধ্যে যে কয়েকজনকে পারো, চিনিয়ে দাও।

'ঐ স্বরূপ দামোদর। ইনি প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর।'

'আর উনি?'

'উনি গোবিন্দ। প্রভুর অঙ্গ সেবক।'

'আর ঐ যার গলায় মালা দিল, সেই অমিততেজ মহান্ত কে?'

'উনি অদ্বৈত আচার্য। প্রভুর মান্য পাত্র। সর্বশিরোধার্য।'

একে একে সকলকে চিনিয়ে দেওয়া হল। এরা সকলেই চৈতন্য-জীবন, চৈতন্যগত-প্রাণ।

রাজা বললেন, 'এত তেজ কখনো দেখিনি, শুনিনি এমন প্রেম-সঙ্কীর্তন। এ কী করে সম্ভব হল?'

'এই প্রেম-সঙ্কীর্তন শ্রীচৈতন্যের সৃষ্টি।' বললেন সার্বভৌম, 'এই কৃষ্ণ নামকীর্তনই কলিকালের ধর্ম।'

'অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম-প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন॥
সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই তো সুমেধা, আর কলিহত জন॥'

যে সঙ্কীর্তন-প্রধান যজ্ঞে প্রভুর ভজন করে, সেই সুবুদ্ধি, সুমেধা, আর বাকি সকলে কুবুদ্ধি, কলিহত। যত রকম যজ্ঞ আছে তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্তনই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

রাজা জিগ্গেস করলেন, 'শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্যদেবই যদি কৃষ্ণ, তবে পণ্ডিতেরা তার প্রতি বিমুখ কেন?'

'যার প্রতি প্রভুর কৃপা হয় সেই প্রভুকে চিনতে পারে কৃষ্ণ বলে।' বললেন ভট্টাচার্য্য, 'আর যার প্রতি কৃপা নেই সে পণ্ডিত হলেও, শাস্ত্র প্রমাণ নিজের চোখে দেখলেও, পারে না চিনতে। ভগবানকে ভগবান বলে অনুভব করতেও ভগবানের কৃপা দরকার।'

'দেখ, দেখ' রাজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'এরা সব জগন্নাথ না দেখে আগেই চৈতন্যের বাসার দিকে ছুটেছে।'

'এই তো স্বাভাবিক। প্রেমের এই তো গতি-মতি। যার প্রতি প্রাণের অত্যন্ত টান, সেই চৈতন্য ছাড়া এদের আর কোনো অনুসন্ধান নেই।' সার্বভৌম হাসলেন। 'আগে প্রভুর সঙ্গে দেখা করে শেষে প্রভুকে নিয়েই এরা দর্শন করবে জগন্নাথকে।'

'ভবানন্দের ছেলে ঐ বাণীনাথকে দেখছ?' রাজা কৌতূহলী হলেন। 'পাঁচ-সাত জন মুটের মাথায় করে মহা প্রসাদ নিয়ে চলেছে।'

'হ্যাঁ, প্রভুর বাসায় নিয়ে যাবে। গৌড়দেশ থেকে যারা এসেছে, যাদের দেখলেন কীর্তনে, তাদের জন্যে।'

রাজা অবাক মানলেন। 'সে কী? যেদিন তীর্থস্থানে পৌঁছুনো যায়, সেদিন মুণ্ডন আর উপবাস করাই বিধি। তবে এরা তা না ক'রেই অন্নাহার করবে কেন?'

'রাগমার্গে যারা আছে, ইষ্টের প্রীতিসাধনই যাদের ধর্ম,' বললেন সার্বভৌম, 'তারা ওসব বিধি-বিধান মানে না। প্রভুর হাতের প্রসাদ নিলে যদি প্রভু প্রীত হন, তাহলে উপবাসে আর তাঁর কোন প্রীতি? আমি তো প্রভাতে শয্যায় বসেই প্রভুর হাতের প্রসাদ নিলাম। প্রাতঃসন্ধ্যা করিনি, স্নান করিনি, এমন কি বাসিমুখ ধুইনি—প্রসাদের চেয়ে আর কী আছে বলুন সদাচার? ভগবান কৃপা করে যার হৃদয়ে ভক্তির প্রেরণা জাগান, তার আর কিসের লোকধর্ম, কিসের বেদবিধি?'

রাজা নামলেন অট্টালিকা থেকে, আদেশ দিলেন, সকলের যেন স্বচ্ছন্দ হয় সর্বত্র। আর, আপনারা যান, কাশী মিশ্রের আবাসে বৈষ্ণবমিলন দেখে আসুন। সে মিলনে প্রতাপরুদ্র অনুপস্থিত।

মিশ্রের আবাসে স্থান কম কিন্তু বৈষ্ণব অসংখ্য। তবু কী আশ্চর্য, স্থানের অভাব হল না। নিজের কাছেই প্রভু সকলকে বসালেন, শ্রীহস্তে মালাচন্দন দিলেন। অদ্বৈতকে বললেন, 'তোমাকে পেয়ে আজ আমি পূর্ণ হলাম।'

'ঈশ্বরের এই-ই স্বভাব।' বললেন অদ্বৈত, 'যদিও নিজেই তিনি পূর্ণ, তবু ভক্তসঙ্গেই তাঁর সুখোল্লাস।'

দামোদর পণ্ডিতকে বললেন, 'দামোদর, তোমার উপরে আমার সগৌরব প্রীতি, কিন্তু তোমার ছোট ভাই শঙ্করের উপর আমার কেবল শুদ্ধ প্রেম। তুমি শঙ্করকে আমার কাছে রাখো।'

দামোদর বললে, 'শঙ্কর আমার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু, প্রভু, তোমার কৃপায় ও এখন আমার বড় ভাই।'

শিবানন্দ সেনকে দেখে প্রভু বললেন, 'আমাতে তোমার অনুরাগ তেমনি গাঢ়ই আছে।'

তাতে আর সন্দেহ কী। দণ্ডবৎ হয়ে ভূতলে পড়ল শিবানন্দ। হে অনন্ত, বহু বহুকাল আমি এই সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত আছি, এখন, এতদিন পরে তট পেয়েছি, তুমিই আমার সেই তট। আর তুমি? তুমিও পেয়েছ তোমার দয়ার সর্বোত্তম পাত্র পেয়েছ। সে পাত্র আমি—আমি ছাড়া আর কে? আমিই নীচের নীচ, পতিতের পতিত, শূন্যের শূন্য।

একবার নীলাচলে আসতে একটা কুকুর সঙ্গী হয়েছিল শিবানন্দের। অনেক পয়সা দিয়ে পার করিয়েছিলেন খেয়া। একদিন রাতে বাসায় ফিরে জানলেন সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু কুকুরকে কেউ দেয়নি একমুঠো। কোথায় কুকুর? কুকুর নিরুদ্দেশ। সেই রাতে উপবাসী রইল শিবানন্দ। পরদিন প্রভুর চরণদর্শন করতে এসেছে, দেখল প্রভুর কাছটিতে বসে আছে আর প্রভুর দেওয়া প্রসাদী নারকেল খাচ্ছে। আর বলছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

কুকুরের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করল শিবানন্দ, আর বললে, 'আমার অপরাধ মার্জনা করুন।'

'মুরারি গুপ্ত কোথায়?' প্রভু ব্যাকুল হলেন।

বাইরে পড়েছিল মুরারি, দন্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ধরে, কাছে এসে দাঁড়াল। আমি মানুষ নই, আমি পশু, আমি দীনাতিদীন, অপদার্থ।

প্রভু আলিঙ্গনের জন্যে হাত বাড়ালেন, মুরারি পিছু হটল। প্রভু যত এগোন, মুরারি ততই সরে যায়। বলে, 'আমার এই পাপকলেবর তোমার স্পর্শযোগ্য নয়।'

এমন কথা বোলো না। প্রভু আলিঙ্গন করলেন মুরারিকে। সযত্নে সস্নেহে তার গা থেকে ঝেড়ে দিলেন ধুলোবালি।

'কিন্তু হরিদাস? হরিদাসকে তো দেখছি না।' প্রভু উন্মনা হয়ে উঠলেন। 'সে কি আসেনি পুরীতে?'

'এসেছে।' কে একজন বললে, 'পথপ্রান্তে পড়ে আছে।'

'সে কী কথা! তাকে ডেকে নিয়ে এস।'

'ওঠ, ওঠ, প্রভু তোমাকে ডেকেছেন।' ভক্তেরা ডাকতে লাগল হরিদাসকে। 'শিগগির চলো।'

হরিদাস বললে, 'আমি নীচ জাতি। মন্দিরের কাছে থাকবার আমার অধিকার নেই।'

'না, না, চলো, তোমাকে ডেকেছেন প্রভু।'

'নির্জন বাগানের মধ্যে যদি স্থান পাই তাহলে সেখানে একলা পড়ে থাকি।' বললে হরিদাস, 'যেখানে থাকলে জগন্নাথের সেবকরা আমাকে, আমার ছায়াকেও ছুঁতে পাবেন না, সেইরকম জায়গা পেলে থাকি।'

প্রভু শুনলেন এই দৈন্যের কথা। কাশী মিশ্রকে বললেন, 'কাছাকাছি একটি নির্জন কুটীর ঠিক করো, সেইখানে হরিদাস থাকবে।' বলে নিজেই আনতে গেলেন হরিদাসকে।

আলিঙ্গনের জন্যে হাত প্রসারিত করলেন প্রভু।

হরিদাস বললে, 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি নীচ অস্পৃশ্য, হীনজাতি।'

'তোমাকে স্পর্শ করতে এসেছি পবিত্র হতে।' প্রভু হরিদাসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তুমি সর্বক্ষণ নামকীর্তন করছ, তার অর্থ সর্বক্ষণ সর্বতীর্থে স্নান করছ, যজ্ঞ করছ, দান করছ, তপস্যা করছ। চতুর্বেদ অধ্যয়ন করছ নিরন্তর। তুমি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী থেকেও পবিত্রতর।

> 'ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
> ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপ-দান॥
> নিরন্তর কর চারি বেদ-অধ্যয়ন।
> দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন॥'

দেবহূতি বলছে কপিলদেবকে, 'যার মাত্র জিহ্বাগ্রে তোমার নাম, সে যদি কুক্কুর-মাংস ভোজীও হয়, সেই গরীয়ান, সেই সদাচারী, সেই তপস্যা করেছে, হোম করেছে, তীর্থস্নান করেছে, সেই সত্যিকার বেদাধ্যায়ী।'

নির্দিষ্ট কুটীরে হরিদাসকে নিয়ে গেলেন গৌরসুন্দর। বললেন, 'তুমি এখানে থাকো, এখানেই নামকীর্তন করো। প্রত্যহ এখানে এসে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। মন্দিরের চূড়া দেখবে এখান থেকে, চূড়ার চক্র দেখবে। তাতেই হবে। তোমার জন্যে আসবে প্রসাদান্ন।'

[ক্রমশঃ।

# প্রেমের কাহিনী

শ্রীজয়শ্রী বসু

## এলিজাবেথ ব্যারেট ও রবার্ট ব্রাউনিং

ইংরাজী-সাহিত্যের—শুধু ইংরাজী-সাহিত্যই বা বলি কেন, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে—এলিজাবেথ ব্যারেট এবং রবার্ট ব্রাউনিং-এর প্রেম-কাহিনী তার অসাধারণ বিশেষত্বের জন্যেই অমর হয়ে আছে। স্বামি-স্ত্রী দুজনেই সে যুগের প্রথম শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলা কবি, এমনটি আর দেখা যায়নি। কবিতার মধ্য দিয়েই এঁদের প্রেম শুরু হয়েছিল কেউ কাউকে দেখার আগেই। কঠোর পিতার কবল থেকে প্রায় ইনভ্যালিড শয্যাশায়িনী এলিজাবেথ ব্যারেটকে নিয়ে পলায়ন এবং বিবাহের কাহিনী রোমান্টিকও বটে, রোমাঞ্চকরও বটে। সেই কাহিনীই বলছি।

এলিজাবেথের বাবা এডোয়ার্ড মোলটন ব্যারেট ছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের একজন বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, এবং বেশ অদ্ভুত চরিত্রের। ভদ্রলোক অত্যন্ত গোঁড়া এবং ধার্মিক ছিলেন, যাকে বলে ধর্মভীরু। পরিবারনিষ্ঠ মানুষ, অথচ পরিবারের প্রত্যেকের ওপর নির্মম কড়া শাসন, সবাইকে তাঁর হুকুম এবং খেয়াল-খুশীমত চলতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হলে চলবে না, পান থেকে চুণ খসলে হুলুস্থুলকাণ্ড, তিনি রেগে অগ্নিশর্মা।

বৃটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত জ্যামেইকা দ্বীপে তাঁর ছিল বিরাট আখের চাষ, তাতে তিনি অসংখ্য কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসকে খাটাতেন বেশ কঠোর ভাবেই। সেই ক্রীতদাসদের ওপর কড়া শাসন চালাতে চালাতেই বোধ হয় স্বভাবটা তাঁর অত্যন্ত কঠোর হয়ে গিয়েছিল। সেই কঠোরতা থেকে তাঁর পরিবারেরও কেউ রেহাই পাননি। ভদ্রলোকের মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল, যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ক্রীতদাস খাটানো বন্ধ হয়ে গেল। তাতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হল প্রচুর। সেই খারাপ মেজাজের ঝাল তিনি বোধ করি ঝাড়তে লাগলেন নিজের সন্তানদের ওপর। কর্তৃত্ব খাটাবার নেশা এমনি ভয়ঙ্কর।

শ্রীব্যারেটের সন্তান-সংখ্যা এগারোটি। এলিজাবেথ সর্বপ্রথম। শ্রীমতী ব্যারেট যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তবু তিনি ছিলেন স্বামী আর সন্তানদের মাঝামাঝি একটুখানি আড়াল। তিনি মারা যাবার পর শ্রীব্যারেটের একার ওপর পড়ল এগারোটি সন্তানের সম্পূর্ণ ভার। কে জানে, হয়তো অবিচ্ছিন্ন কর্তৃত্বের এমনি ধারা সুযোগ পেয়ে তিনি খুশীই হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, শ্রীব্যারেটের অদ্ভুত চরিত্র ছিল। সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল তাঁর কোনো সন্তানের ত্রিসীমানায় যেন প্রেমের সম্ভাবনা না আসে, এ বিষয়ে তিনি ভয়ানক হুঁসিয়ার ছিলেন। প্রেম বা বিবাহের কথাই তাঁর কোনো ছেলে বা মেয়ে ভাবতে পারবে না, এই যেন ছিল তাঁর বাড়ীতে অলিখিত আইন। ও ধরণের চিন্তা করাই যেন মহা পাপ, মহা লজ্জার কথা।

এলিজাবেথকে এই পৈতৃক খামখেয়ালী ততটা আঘাত করেনি, কারণ তিনি ছিলেন শয্যাশায়িনী ইনভ্যালিড। পনেরো বছর বয়সে টাটুঘোড়ার পিঠে চড়তে গিয়ে দেহের একটি শিরায় কি ভাবে যেন টান লেগে গিয়েছিল, তারপর একটি রক্তবাহী শিরাও ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে তিনি ইনভ্যালিড। দিনে রাতে বেশির ভাগ সময় থাকতেন বিছানায় শুয়ে, অথবা সোফায় দেহ এলিয়ে। তিনি ভাবতেন এই ইনভ্যালিড ভাবেই তাঁকে জীবন কাটাতে হবে, তাই প্রেম, বা বিবাহের চিন্তাকে তিনি মনে স্থান দিতেন না, এ জীবনে তা সম্ভব হবে না ভেবে।

কিন্তু এলিজাবেথের ছোট বোন হেনরিয়েটা একটি যোগ্য যুবকের প্রেমে পড়ল। ছেলেটি হেনরিয়েটাকে বিয়ে করতে চাইল। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করার আগে হেনরিয়েটা বাবার অনুমতি চাইতে গেল। হেনরিয়েটার এই ভীষণ প্রস্তাব শুনে শ্রীব্যারেট তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, তাঁর হুকুমে বেচারা হেনরিয়েটাকে নতজানু হয়ে পিতার কাছে ক্ষমা চাইতে হ'ল তার এই মহাপাপের জন্য। বাড়িতে সেদিন হুলুস্থুল ব্যাপার। হেনরিয়েটার কান্নাকাটিতে এলিজাবেথের প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি বাপকে বোঝাতে গেলেন, কিন্তু তিনি অনড়। মেয়ে বিয়ের কথা ভাবছে, এত বড় পাপকে তিনি ধার্মিক বাবা হয়ে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারবেন না। এমি অদ্ভুত চরিত্রের বাপ ছিলেন শ্রীব্যারেট। মেয়েরা যে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, সে সুবিধা ছিল না, কারণ মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করার এখনকার মত সুযোগ ছিল না সেই ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংলণ্ডে। শ্রীব্যারেটের ছেলেমেয়েরা তাঁর অবিচার সয়ে থাকতো নিছক অর্থনৈতিক কারণে।

বাড়িতে এমনি দম বন্ধ করা অপ্রিয় আবহাওয়ায় থাকতেন এলিজাবেথ। তাঁর প্রধান আনন্দ ছিল বই পড়া। প্রচুর বই ছিল তাঁর ঘরে শেলফে সাজানো। সারাদিন বই পড়ে পড়ে ডুবে থাকতেন এলিজাবেথ। শুধু পড়তেন না, কবিতাও লিখতেন। তাঁর বইয়ের শেলফের ওপর সাজানো থাকত বিখ্যাত মনীষীদের আবক্ষ মূর্ত্তি, দেয়ালের গায়ে ঝলানো থাকতো তখনকার সাহিত্য জগতের দিকপালদের ছবি: ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কার্লাইল, টেনিসন, রবার্ট ব্রাউনিং। দশ বছর বয়সেই এলিজাবেথ ফরাসী আর ইংরেজী ভাষায় বিয়োগান্ত নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন, তেরো বছর বয়সে "ম্যারাথনের যুদ্ধ" ( The Battle of Marathon ) নামে একটি এপিক কাব্য রচনা করেছিলেন; কন্যা-গর্ব্বিত শ্রীব্যারেট সেই কবিতাটি পরম আনন্দে বই আকারে ছেপে ছিলেন। এলিজাবেথ অল্প বয়সেই গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। বাইশ বছর বয়সে এলিজাবেথ ব্যারেটের একটি কবিতা-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, তারপর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে কবিতা লিখতে থাকেন!

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, যখন এলিজাবেথের বয়স আটত্রিশ বছর, তখন তাঁর আরো দুটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাদের ভেতর একটিতে ছিল তাঁর বিখ্যাত এবং চমৎকার কবিতা "শিশুদের কান্না" (The cry of the children)। সে যুগে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশুরাও কারখানায়, খনিতে এবং অন্যত্র হাড়ভাঙা মজুরি করত, তাদেরই বেদনায় ব্যথিতা হয়ে এই কবিতার মাধ্যমে আর্তনাদ করে উঠেছিলো এলিজাবেথ ব্যারেটের দরদী কবি-হৃদয়। এই কবিতাটি পড়ে বিখ্যাত মার্কিণ কবি এবং গল্পলেখক এডগার এ্যালেন পো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এই দুটি কবিতার বই পড়ে সমালোচকরা ঘোষণা করলেন ইংলণ্ডের কাব্যজগতে এলিজাবেথ একজন অসামান্য প্রতিভা, ভিক্টোরিয়ান যুগের তিনিও নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ কবি।

বই দুটি প্রকাশিত হবার পর মুগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে অনেক চিঠিই এসেছিলো, তাদের ভেতর একটি চিঠি রীতিমতো অসাধারণ। এ চিঠি এলিজাবেথ পেলেন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। বেশীর ভাগ চিঠিই তিনি অবহেলায় পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, যাকে উচ্ছ্বাস বলে, কিন্তু এ চিঠির জাতই আলাদা।

চিঠিটি এই রকম:

"প্রিয় কুমারী ব্যারেট, আপনার কবিতাবলী আমি সারা অন্তর দিয়ে ভালবাসি।·····আপনি কি জানেন, একবার আমার প্রায় আপনার সঙ্গে দেখা হবার উপক্রম হয়েছিল। (আপনার আত্মীয়) শ্রীকেনিয়ন আমাকে বলেছিলেন 'কুমারী ব্যারেটের সঙ্গে আপনি দেখা করবেন?' তারপর দেখা করবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ফিরে এসে বললেন, আপনি তখন দেখা করবার মত সুস্থ নন। সে আজ কয়েক বছরের কথা। সে দিনের কথা স্মরণ করে আমার মনে হয় যেন দূরদেশে ভ্রমণ করতে করতে আমি এমন জায়গায় এসে পড়েছিলাম, যেখানে একটি মাত্র পর্দার আড়ালে রয়েছে একটি পরম বিস্ময়। কিন্তু শুধু সামান্য একটু বাধার জন্য দরজাটা যেন আধখোলা হয়েও আবার বন্ধ হয়ে গেল। আমি হাজার হাজার মাইল দূরে ফিরে গেলাম নিজের ঘরে, বিশ্বের সেই পরম বিস্ময় আমার না-দেখাই রইল।"

চিঠির তলায় স্বাক্ষর ছিল তখনকার একটি বিখ্যাত নাম: রবার্ট ব্রাউনিং।

এই চিঠি থেকেই যে চিঠি-বিনিময় শুরু হল, পৃথিবীর প্রেমের ইতিহাসে আর সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

ব্রাউনিং-এর চিঠিখানা এক প্রতিষ্ঠাবান কবির লেখা এক প্রতিষ্ঠাবতী কবিকে, রীতিমতো 'সাহিত্যধর্ম' চিঠি। এলিজাবেথও সে চিঠির যোগ্য জবাবই দিলেন। লিখলেন—"আপনি এত বড় কবি, আমার কবিতা আপনার ভালো লেগেছে, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি আপনার প্রতি সেজন্য কৃতজ্ঞ।" সর্বশেষে লিখলেন—"আপনি লিখেছেন দেখা হলো না। কিন্তু যে সুযোগ আমি হারিয়েছি, আশা করি ভবিষ্যতে সে লোকসানের ক্ষতিপূরণ হবে। শীতকালে আমার অবস্থা সত্যিই অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, তখন আর কারও সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা থাকে না। কিন্তু শীতের পর বসন্তে দেখা অসম্ভব নয়।"

এই চিঠি পড়ে কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর মনে পড়ল তাঁর প্রিয় কবি শেলি-র বিখ্যাত কবিতার একটি বিখ্যাত লাইন:

"শীত যদি আসে, তবে বসন্ত কি বেশী দূরে থাকতে পারে?"
(If winter comes, can spring be far behind)

এবার রবার্ট ব্রাউনিং-এর (Robert Browning) কথা কিছু বলি।

রবার্ট ব্রাউনিং ছিলেন এলিজাবেথ ব্যারেটের চাইতে বছর ছয়েকের ছোট। তাঁর বাবা ছিলেন ব্যাঙ্কের কর্মচারী, সাহিত্যে উৎসাহী। একমাত্র সন্তানের ইচ্ছা কবি হবার, তার সব রকম সুযোগ সুবিধা তিনি করে দিলেন। রবার্ট সুযোগ পেলেন বিভিন্ন ভাষা শিখবার, বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য পড়বার, আর প্রচুর ভ্রমণের। মিশতে লাগলেন সাহিত্যিক মহলে। রবার্ট ব্রাউনিং-এর শিক্ষা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতোই হয়েছিল। স্কুল কলেজে পড়েননি রবার্ট ব্রাউনিং। তাঁর শিক্ষা ছিল বিদ্যায়তনী-শিক্ষার চাইতে অনেক বেশী প্রত্যক্ষ, বাস্তব, জীবন। আর তাঁর কবি-প্রতিভার বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি বাইরের প্রকৃতির চাইতে মানুষের মনস্তত্ত্বে বেশী উৎসাহী। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির বদলে মানুষের মনের নানা বিচিত্র অনুভূতি আর চিন্তাধারা নিয়ে কারবার। আর তিনি ছিলেন আনন্দময়, আশাবাদী মানুষ, এই আশাবাদে ভরা তাঁর কবিতা। এলিজাবেথের কাছে যখন প্রথম চিঠি লেখেন, তখনই তিনি সাহিত্যজগতে খ্যাতিমান।

সারা শীতকালটা দুজনের চিঠির বিনিময় চলল। চিঠিতে থাকতো সাহিত্য-বিষয়ক নানারকম আলোচনা। শেষকালে এক চিঠিতে এলিজাবেথকে রবার্ট ব্রাউনিং লিখলেন আসন্ন বসন্তের ইঙ্গিত জানিয়ে। তার জবাবে এলিজাবেথ লিখলেন: "হাঁ, গত শীত ঋতুটা জীবন নিয়ে কোনোরকমে অতিক্রম করেছি, বসন্ত ঋতু আবার আসছে আমার জীবনে, সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।" এ চিঠিতে এলিজাবেথের এমন অসুস্থতার ইঙ্গিত ছিল, যার দরুণ তিনি আর বেশীদিন নাও বাঁচতে পারেন। এই বিষাদের সুর ঘা দিল রবার্ট ব্রাউনিং-এর হৃদয়ের তন্ত্রীতে। তিনি জবাবে যা লিখলেন, তার সারমর্ম হচ্ছে, "আমার অন্তরের ঐকান্তিক কামনা যদি সত্য হয়—এ পর্যন্ত যা বরাবর হয়ে এসেছে—তাহলে পুব-হাওয়াকে আমি যেমন বেপরোয়াভাবে তুচ্ছ করি, আপনিও তাই করতে পারবেন।" তলায় সই করলেন, "চিরদিনের জন্য আপনার রবার্ট ব্রাউনিং।"

জবাবে এলিজাবেথ লিখলেন: "কত সহৃদয় আপনি! কি মধুর আপনার কথাগুলো! এরা আমার অন্তরকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়, আমার বিস্ময় জাগায়। আপনি আপনাকে অনেক বাড়িয়ে দেখেন জেনেও তবু ভালো লাগে আপনাকে পরম বন্ধুরূপে ভাবতে। ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন।"

এ সময়ে এলিজাবেথ ব্যারেট উনচল্লিশ বছরের কুমারী, এবং রবার্ট ব্রাউনিং তেত্রিশ বছর বয়সের কুমার। আর তখন পর্যন্ত এঁরা কেউ কাউকে চোখে দেখেননি!

তারপর এলো বসন্তের প্রথম মাস। আগে একটি চিঠিতে এলিজাবেথ ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন—বসন্তে দেখা হবে, সে ইঙ্গিত মানেই প্রকারান্তরে প্রতিশ্রুতি! এসেছে সেই প্রতিশ্রুতি রাখবার সময়, এসেছে বসন্ত। ভীতা, সন্ত্রস্তা হয়ে উঠলেন উনচল্লিশ বছর

বয়সের কুমারী এলিজাবেথ ব্যারেট। বিগত-যৌবনা তিনি, দীর্ঘকাল অসুস্থতার দরুণ শীর্ণা, মলিনা। যদি আসেন তাঁকে দেখতে, নিশ্চয় নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা পাবেন বেচারা ব্রাউনিং, ফিরে যাবেন হতাশা নিয়ে। এই ভেবে এলিজাবেথ লিখলেন: "আপনি হয়তো ভাবছেন আমাকে দেখা আপনার পক্ষে মূল্যবান অভিজ্ঞতা হবে। আমি কিন্তু তা মোটেই ভাবতে পারছি না। আপনি যদি তা জেনেও আসতে চান, আসতে পারেন। আপনি এলে লাভটা আমারই হবে, আপনার নয়। একবার এলে নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার আপনার আর আসতে ইচ্ছা হবে না।" আসবার একটা তারিখ ও সময় ঠিক করে জানিয়ে দিলেন চিঠিতে।

রবার্ট ব্রাউনিং এলেন। অনেকক্ষণ আলাপ হলো দুজনের।

সেদিন বাড়ী ফিরেই ব্রাউনিং এলিজাবেথকে চিঠি লিখলেন: "আপনাকে কি আমি অনেক বিরক্ত করে এসেছি? হয়ত অতিরিক্ত বেশীক্ষণ থেকেছি, কিংবা বেশী জোরে কথা বলেছি। অনুগ্রহ করে জানাবেন, আর আমার 'দয়া'-র কথা কখনও বলবেন না।"

এই চিঠির জবাবে এলিজাবেথ লিখলেন: "আপনি মোটেই অপ্রিয় বা অশোভন কিছু করেননি। আগামী মঙ্গলবার নিশ্চয়ই আসবেন।" নীচে লিখলেন: "আপনার বন্ধু।"

এর পরে ব্রাউনিং যে চিঠি লিখলেন, তাতে ছিল খোলাখুলি এলিজাবেথের প্রতি তাঁর প্রেম-নিবেদন।

এই প্রেমপত্র পেয়ে এলিজাবেথের এত আনন্দ হয়েছিল, তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না, কি করে এটা সম্ভব হল! অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি লিখলেন: "এরকম চিঠি আপনি আর লিখবেন না। ওরকম চিঠি পেলে, আমি আর আপনার সঙ্গে দেখা করব না। আপনার বন্ধুত্বই আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকুক। আগামী মঙ্গলবারে না এসে তার পরের মঙ্গলবার আসুন। সেদিন আমরা সাহিত্যের আলোচনা করব।"

এই চিঠি পেয়ে ব্রাউনিং একটু শংকিত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করে তিনি ভয়ানক ভুল করেছেন। সুতরাং এর পর থেকে তিনি খুব সাবধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। ব্রাউনিং সপ্তাহে একদিন এলিজাবেথকে দেখতে যেতেন। নানা বিষয়ে তাঁদের আলাপ-আলোচনা হত। এলিজাবেথ সসংকোচে তাঁর বয়সের ইঙ্গিত করলেন। একটি চিঠিতে তাঁর বাবার অদ্ভুত ব্যবহারের কথাও লিখলেন। এমন অন্তরঙ্গভাবে নিজের জীবনের এত কথা জানাচ্ছেন বলে ব্রাউনিং এলিজাবেথকে চিঠিতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন।

হঠাৎ কিছুদিনের জন্য ব্রাউনিং-এর চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। এলিজাবেথ খুব চিন্তিত হয়ে লিখলেন: "আমার মনে হয় কোন কারণে আপনাকে বিরক্ত করেছি। এতদিন আপনার চিঠি না পেয়ে এই চিন্তাই আমাকে বিব্রত করছে।"

তাঁর নীরবতায় এলিজাবেথ কষ্ট পাচ্ছেন জেনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ব্রাউনিং লিখলেন:—

"আপনি কি কখনও দেখেছেন, আপনার কথায় কিংবা কাজে আমি বিরক্ত হয়েছি? আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাকে বলতে দিন যে, আমি আপনাকে সারা অন্তর দিয়ে শুধু এই একবার ভালোবেসেছি। আপনার প্রভাব আমাকে এমন অভিভূত করেছে যে, আমার ফিরে আসবার আর পথ নেই।......"

এলিজাবেথকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করলে তিনি জীবন সার্থক মনে করবেন, পরিষ্কার ইঙ্গিতও দিলেন এই চিঠিতে।

ব্রাউনিং ভয় করেছিলেন এলিজাবেথের অসুস্থতা তাঁদের মিলনের পথে দুর্লংঘ্য বাধার সৃষ্টি করবে, কিন্তু তাই শেষকালে তাঁদের মিলনের সহায় হলো।

শীতকালে লণ্ডনের আবহাওয়া এলিজাবেথের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক, তাই ১৮৪৫-৪৬এর শীতকালে উক্ত আবহাওয়ায় ইতালীর পিসা বা মাল্টা শহরে যাবেন বলে এলিজাবেথ ঠিক করলেন। ডাক্তারদের ইচ্ছা, তিনি অবশ্যই যান। কিন্তু এলিজাবেথের যাওয়া তাঁর বাবার ইচ্ছা নয়। তিনি মৌনং অসম্মতিলক্ষণং প্রকাশ করলেন। এলিজাবেথ বিষম দোটানায় পড়লেন। বাবার অমতে তিনি কিছু করতে চান না, অথচ স্বাস্থ্যের খাতিরে হাওয়া-বদল তাঁর একান্ত আবশ্যক। তিনি ব্রাউনিং-এর শরণ নিলেন। তাঁকে জানালেন: "এ অবস্থায় আমি কি করব, আপনি ঠিক করে দিন।" ব্রাউনিং এলিজাবেথকে বিয়ে করতে চাইলেন। এবারও এলিজাবেথ রাজী হলেন না। তিনি ব্রাউনিংকে লিখলেন:—

"আপনি আমাকে যে এত গভীরভাবে অভিভূত করেছেন, যা আমার ভাবনার অতীত ছিল। এখন থেকে জানবেন আমি সম্পূর্ণ আপনারই; এবং নিজেকে একান্তই আপনার মনে করি বলেই এভাবে আপনার অনিষ্ট করতে আমি কখনোই রাজি হতে পারি না।"

এই চিঠির উত্তরে ব্রাউনিং প্রাণের অন্তরতম ব্যাকুলতা জানিয়ে যে চিঠি লিখলেন, তা শুধু তাঁর মতো কবিরই লেখা সম্ভব। তিনি এবার নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলেন, বিবাহ হোক বা না হোক—তাঁরা দুজন দুজনের।

এলিজাবেথের ইতালীতে যাওয়া হল না। পিতাকে অসন্তুষ্ট করে যেতে চাইলেন না তিনি, যদিও তাঁর এই একগুঁয়ে স্বার্থপরতায় হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। শীতকাল যত কাছে আসতে লাগল ব্রাউনিং এলিজাবেথকে ততই বোঝাতে চাইলেন যে তাঁদের বিয়ে হোলে ব্রাউনিং খুব সুখী হবেন। কিন্তু ব্রাউনিং তাঁর জন্য এভাবে 'আত্মত্যাগ' করবেন, এতে এলিজাবেথ রাজি হতে পারলেন না।

কিন্তু নাছোড়বান্দা একনিষ্ঠ প্রেমিক রবার্ট ব্রাউনিং। শেষ পর্য্যন্ত রাজি হলেন এলিজাবেথ। এলিজাবেথের বাবা রাজি হবেন না, সুতরাং বিয়ে করতে হবে তাঁর অমতে পালিয়ে। পালিয়ে গিয়ে এলিজাবেথ এক গীর্জায় রবার্ট ব্রাউনিংএর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তারপর কবি দম্পতি চলে গেলেন ইতালীতে।

বাকি জীবনের বেশীভাগই তাঁরা ইতালিতেই থাকতেন। সেখানে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। দীর্ঘ পনের বছরের বিবাহিতা জীবনে আর কখনও তাদের বিচ্ছেদ ঘটেনি। তাঁদের কবিখ্যাতি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। অবশেষে ১৮৬১ সালের জুন মাসে ব্রংকাইটিস রোগে এলিজাবেথ মারা যান।

এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রবার্ট ব্রাউনিং আরো আঠাশ বছর বেঁচেছিলেন। এই আঠাশ বছর ধরে তিনি যে অতি উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করে গেছেন, তার পেছনে প্রেমময়ী পত্নীর অশরীরী প্রেরণা ছিল।

## স্বামী যুবরাজ য়্যালবার্টকে লেখা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পত্র

বাকিংহাম প্যালেস
১২ই জানুয়ারী ১৮৪০

টোরিংটন নিজে এই চিঠি তোমাকে দেবেন। তুমি বিলম্বে যাত্রা শুরু কোর না। একটু আগে কোরো, তা হলে ভ্রমণটা ব্যস্ততার মধ্যে হবে না। ভ্রমণটি উপভোগ করতে পারবে।

আজ আমি চার্চে যাইনি। এখানে এখন ভীষণ ঠাণ্ডা, শীতের প্রকোপ খুব বেশী। আবার ১৬ তারিখের মধ্যে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকেও আমাকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। কারণ আমাকে পার্লামেন্টের উদ্বোধন করতে হবে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। প্রতিবার ভাষণ শুরু করার আগে আমাকে বিয়ের ব্যাপার ঘোষণা করতে হয়; বোঝ তো তখন কি রকম অবস্থায় আমায় পড়তে হয় অথচ উপায়ও নেই। আমার পক্ষে এটা খুব লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু জান, আমি একবারও ব্যর্থ হইনি, বা কোন প্রকার জড়তার বশীভূত হই নি, আর এই নিয়ে ঐ ঘোষণা ছবার হবে।

বাকিংহাম প্যালেস
১৭ই জানুয়ারী ১৮৪০

আমি অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে লক্ষ্য করলুম যে, আমি প্রথানুযায়ী তোমার বাবাকেই আমন্ত্রণ জানাই নি। খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার এটা।

পিসীমার ১ মৃত্যুজনিত শোকপালনকালেই আমি কিন্তু তোমাকে চিঠি লিখছি সচিত্র কাগজে, প্রথানুযায়ী শোকপত্রে নয়, কারণ তোমাকে শোকপত্রে চিঠি লিখতে আমি কোনমতেই পারব না।

পিসীমার মৃত্যু অবশ্য আমাদের বিবাহকে কোন প্রতিকূল অবস্থায় ফেলবে না। ঐ সময়টুকু শোকপালন হবে না; বিবাহের শুভকার্য্য নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেলে আবার শোকপালন যথারীতি চলবে।

গতকাল লর্ড মেলবোর্ণ তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে এক অনবদ্য ভাষণ দিয়েছেন।

বাকিংহাম প্যালেস
৩১এ জানুয়ারী ১৮৪০

উইণ্ডসারে আমাদের থাকার ইচ্ছেটা তোমার চিঠিতে জানিয়েছ। কিন্তু ওগো প্রিয় য়্যালবার্ট, একটা বিষয়ে তুমি দেখছি আদৌ বুঝতে পারছ না। আমার প্রিয়তম জীবনাধিক, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি রাণী, আমি সিংহাসনে সমাসীনা। সেই সংক্রান্ত কাজগুলি আমার জন্যে কোনমতেই বন্ধ থাকতে পারে না, পার্লামেন্টে অধিবেশন এখন চলছে, আমার উপস্থিতি সেখানে অপরিহার্য্য, তাই এ সময়ে লণ্ডনের বাইরে থাকা যে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব আর অনুচিতও। এখানে দু'তিনদিনও আমার পক্ষে সুদীর্ঘ একটি সময়।

স্বাঃ—ভিক্টোরিয়া আর

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪০ ২

প্রিয়তম,

কেমন আছ আজ? রাত্রে ঘুমিয়েছ? আমি খুব শান্তিতে বিশ্রাম যাপন করেছি। আজ খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধও করছি। আবহাওয়া কি মনে হয়? আমার ধারণা বৃষ্টি বন্ধ হবে।

আমার হৃদয়ের অয়স্কান্ত মণি, জীবনদয়িত, ওগো বিয়ের বর, তুমি প্রস্তুত হবার আগে একটিবার আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।

তোমারি চিরবিশ্বস্তা
স্বাঃ ভিক্টোরিয়া, আর

## বেলজিয়ামের রাজা প্রথম লিওপোল্ডকে লেখা ভিক্টোরিয়ার চিঠি

কেনসিংটন প্যালেস
২১ এ মার্চ ১৮৩৬

পরম পূজনীয় মামা,

আজই সকালে আমাদের সকলের প্রিয় ফার্ডিনাণ্ড ৩ এখান থেকে বিদায় নিলেন। আমরা সকলেই তাঁকে বিদায় দিতে উপস্থিত ছিলুম আর, কি বলব মামা, তাঁকে বিদায় জানাতে মন এত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল যা লিখে প্রকাশ করা যায় না। তাঁকে আমার খুব ভালো লাগে। তিনি সকল দিক দিয়েই এক কথায় চমৎকার; আচারে আচরণে বিনয়নম্রতায় সারল্যপূর্ণ সৌজন্যে তিনি এখানে সকলেরই অন্তর জয়ে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বাঙ্গীন সফলতা সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত; তাঁর

১ রাজা তৃতীয় জর্জের তৃতীয়া কন্যা রাজকুমারী এলিজাবেথ (১৭৭০-১৮৪০)

২ এইদিনই ভিক্টোরিয়া ও য়্যালবার্ট পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৩ ভিক্টোরিয়ার মামাতো-দাদা। য়্যালবার্টের বাবা ও লিওপোল্ডের মধ্যবর্তী ভ্রাতা ফার্ডিনাণ্ডের পুত্র। জন্ম ১৮১৬, মৃত্যু ১৮৮৫। পর্তুগালের রাণী দ্বিতীয় মেরিয়া (১৮১৯-১৮৫৩) এঁর সহধর্মিণী।

এখনকার অভিব্যক্তিই তাঁর ভবিষ্যতের সাফল্যের পূর্বাভাস। তাঁর মত বিচক্ষণ তীক্ষ্ণধি এবং মেধাবী মানুষ যদি বিচক্ষণ অভিজ্ঞ উপদেষ্টার সহায়তা পান তা হলে তো কথাই নেই। তোমাকেও তিনি ভয়ানক ভালোবাসেন। তোমার সম্বন্ধে সর্বদাই এক উচ্চ ধারণা তিনি মনের মধ্যে পোষণ করে থাকেন। ফার্ডিনাণ্ড চলে গেলেন ঠিকই তবে এখানে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটি বিরাট ছাপ তিনি রেখে গেলেন।

## ভিক্টোরিয়াকে লেখা অগ্রজা ফিওডোরার ৪ পত্র

স্টাটগার্ট

১৬ই এপ্রিল ১৮৩৬

আমাদের দুজন কোবার্গীয় মামাতো ভাইদের ৫ তোমার ভালই লাগবে বলে আমি আশা করি। তারা অন্যান্যের তুলনায় অনেক বড়। আমি তাদের দুজনের প্রতিই যথেষ্ট উচ্চ মনোভাব পোষণ করি। আর্নেষ্ট আমার খুবই প্রিয়। যদিও য়্যালবার্ট খুবই বুদ্ধিমান এবং সুন্দর, তবু আর্নেষ্ট যেন সরলতা ও মহত্বের এক মূর্ত প্রতীক। তাদের সম্বন্ধে তোমার মতামত জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইলুম।

## ভিক্টোরিয়াকে লেখা রাজা লিওপোল্ডের পত্র

১৩ই মে ১৮৩৬

আমার আদরের খুকী,

তোমার সেজ জ্যাঠা মহাশয়ের অদ্ভুত আচরণে ৬ আমি সত্যই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। প্রিন্স অফ অরেঞ্জ এবং তাঁর দুই ছেলেকে ঠিক এই সময়ে নিমন্ত্রণ করা এবং এই নিমন্ত্রণ অন্যের উপর অর্পণ করা সত্যিই এক অদ্ভুত ব্যাপার।

এদিকে ইংল্যাণ্ড থেকে আমি এক প্রায়-দরবারী পত্র পাই, তাতে জানানো হচ্ছে যে, তোমার আত্মীয়েরা এ বছর কেউ ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ না করেন, এই ইচ্ছাই তাঁদের প্রবল। রাজা ও রাণীর আত্মীয়েরাই কেবল ইংল্যাণ্ডে আসতে পারেন এবং রাজত্ব চালাতে পারেন। সত্যই আমি এরকম অদ্ভুত আচরণের নিদর্শন কখনও শুনিও নি বা দেখিও নি। এই ঘটনায় আমি আশা করি তোমার দৃঢ়তা এবং অবিচল মনোভাবের প্রকাশ ঘটবে। আজকের দিনে বৃটিশ উপনিবেশগুলি থেকেও দাসত্ব প্রথার অবসান ঘটেছে। আমি ভেবে পাই না যে খেয়াল খুশী অনুসারে কেবলমাত্র তোমারই ভাগ্য কেন নিয়ন্ত্রিত হবে? তুমি তাদের ক্রীতদাসী নও আর যেখানে তোমার অস্তিত্বের পিছনে রাজাকে দু পেনিও খরচ করতে হয় নি! আমার অনুমান যে আমার ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ বিশেষ সিদ্ধান্ত দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে। আমার আজ আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, অরেঞ্জ কুলের প্রতি দুর্বলতাবশত: রাজা তোমার আত্মীয়দের সঙ্গে যৎপরোনাস্তি দুর্ব্যবহার ও অসম্মান করতে পারেন। তবে এতে ঠিক তারা তোমার অতিথি, তাঁর নয়, সুতরাং সেদিক দিয়ে তার কোন মূল্যই নেই এবং তাতে কিছুই আসে যায় না।

## বেলজিয়াম-রাজকে লেখা ভিক্টোরিয়ার পত্র

২৩শে মে, ১৮৩৬

পরম পূজনীয় মামা,

গত বুধবার আর্নেষ্টমামা ৭ এবং তাঁর দুই ছেলে—আমার দুই ভাইয়েরা এখানে এসে পৌছেছে। আর্নেষ্টমামাকে বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের ভালো দেখাচ্ছে। আর আমার ভাই দুটি যেন সকল আনন্দের আধার, অফুরন্ত প্রাণসম্পদের এক মূর্ত প্রতীক। আমি বিশদভাবে এদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না, কারণ তুমি তো এদের দেখতে পাবেই। শুধু এইটুকু বলছি যে, তারা দুজনেই অপূর্ব, চমৎকার, সুন্দরতর—তরুণ যুবকদের ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। য়্যালবার্টের তো কথাই নেই, সে অনন্যসাধারণ সুপুরুষ—আর্নেষ্ট সম্বন্ধে সে বিশেষণ আমি অবশ্যই প্রয়োগ করব না। তবে বলব যে হ্যাঁ, সেও চমৎকার, মধুভাষী, সদালাপী, উদারচেতা। ওরা ঠিক আমারই মত সঙ্গীতানুরাগী।

৭ই জুন, ১৮৩৬

পরম পূজনীয় মামা,

এই চিঠি আর্নেষ্টমামার হাত দিয়ে পাঠাচ্ছি, তিনি যেদিন তোমার কাছে পৌঁছবেন, সেইদিনই তুমি এ চিঠি তাঁর হাত থেকে পাবে।

মামা, তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব, তা ভেবে পাচ্ছি না, য়্যালবার্টের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তুমি যে আমায় কতখানি ভরিয়ে তুলেছ, তা আমিই জানি, আর তা আমিই উপলব্ধি করছি। তার প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ আমার কাছে এক অপরূপ রূপ নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। তার সবকিছুর মধ্যেই এক অনবদ্য সুন্দরের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আমি খুঁজে পাচ্ছি।

তোমার আদরের এবং
অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধা ভাগ্নী
স্বা: ভিক্টোরিয়া

---

৪ ভিক্টোরিয়ার সহোদরা। ভিক্টোরিয়ার জননী ডাচেস অফ কেণ্টের (১৮০৬-১৮৬১) প্রথম স্বামী লেন্নিঞ্জেনের যুবরাজের (১৭৬৩-১৮১৪) ঔরসজাত কন্যা। ডাচেসের দ্বিতীয় সন্তান। জন্ম ১৮০৭, মৃত্যু ১৮৬২। হোহেনলো-লেঞ্জেনবার্গের যুবরাজের (১৭৯৪-১৮৬০) সহধর্মিণী।

৫ সেক্স-কোবার্গ গোঠার ডিউক দ্বিতীয় আর্নেষ্ট (১৮১৮-১৮৯৩) এবং তাঁর অনুজ য়্যালবার্ট।

৬ ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে য়্যালবার্টের বিবাহ হোক, এই ছিল লিওপোল্ডের প্রবল ইচ্ছা। য়্যালবার্টের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার পরিচয় হোক, তারা দুজনে দুজনকে জানুক—এই অভিলাষে লিওপোল্ড য়্যালবার্ট ও আর্নেষ্টের লণ্ডনযাত্রার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু চতুর্থ উইলিয়ম এই ব্যাপার জানতে পেরে প্রবল আপত্তি ঘোষণা করেন। তিনি চাননি যে, ভিক্টোরিয়ার মাতৃকুলের কারুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হোক; কারণ ভ্রাতৃবধূকে তিনি কোনদিনই সুনজরে দেখতে পারেননি। তাই ঠিক সেই সময়েই তিনি প্রিন্স অফ অরেঞ্জ ও তাঁর দুই পুত্রকে ইংল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ জানান। উদ্দেশ্য, প্রিন্সের কনিষ্ঠপুত্র আলেকজাণ্ডারের সহিত ভিক্টোরিয়ার বিবাহ দেওয়া। ঈশ্বরের ইচ্ছায় লিওপোল্ডের ইচ্ছাই শেষ অবধি কার্যে পরিণত হয়েছিল।

৭ সেক্স-সালফিল্ডের ডিউক প্রথম আর্নেষ্ট (১৭৮৪-১৮৪৪)। ভিক্টোরিয়ার বড়মামা এবং য়্যালবার্টের বাবা।

উইণ্ডসার কাসল
১লা অক্টোবর, ১৮৩৯

পূজনীয় মামা,

রবিবার তোমার চিঠি পেলুম। সেজন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ। গতকাল য়্যালবার্টের একখানা চিঠি পেলুম। সে লিখছে যে, ছ' তারিখের আগে তারা বেরুতে পারবে না। আমার মনে হয় যে, এখানে আসার জন্যে একটা আগ্রহ বা ব্যাকুলতা তাদের মধ্যে নেই। এতে আমি ভয়ানক মর্মাহত হয়েছি।

আলেকজাণ্ডারের ৮ কাছ থেকে কাল একটি চমৎকার চিঠি পেলুম। সে লিখছে যে য়্যালবার্ট এখন আরও অনেক উন্নতি করেছে। তবে দৈহিক উচ্চতায় অগাস্টাসকে ছাপিয়ে যেতে পারে নি। সে আগের তুলনায় আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আলেকজাণ্ডারের দ্রষ্টা হিসেবে বিপুল খ্যাতি আছে, সে সম্বন্ধেও আমি কোনমতেই দ্বিমত নই। সেজন্যে তার মতকে আমি একটা ভয়ানক রকমের মূল্য দিই।

আমার ভায়েদের অভ্যর্থনার জন্যে আমি গাড়ী পাঠাব। সঙ্গে এক ভদ্রলোকও থাকবেন তাদের যথাযথ আপ্যায়ন করার জন্যে। উলউইচে কিংবা টাওয়ারে যেখানে তুমি জানাবে সেইখানেই গাড়ী যাবে। তারা যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল। আমার এখানে মন্ত্রীদের ভীড়। আগামী সোমবার এখানে সেজজ্যাঠাইমা আসছেন, দু'রাত এখানে কাটিয়ে যাবেন।

তোমার অনুগতা ভাগ্নী
স্বা: ভিক্টোরিয়া আর

উইণ্ডসর ক্যাসল
১২ই অক্টোবর ১৮৩৯,

পরম পূজনীয় মামা,

অত্যন্ত খারাপ এবং প্রায় বিপজ্জনক যাত্রা পথ অতিক্রম করে প্রিয় ভাইয়েরা গত বৃহস্পতিবার সাড়ে সাতটার সময় এসে পৌঁছেছেন। তা সত্বেও তাদের বেশ দেখাচ্ছিল। প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির অভাবে তারা ভোজসভায় উপস্থিত হতে পারে নি। আর্নেস্টকে এখন বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। য়্যালবার্টের কথাই নেই; তার রূপসম্পদের যেন শেষ নেই, এক অসীম রূপলোকের সে যেন একচ্ছত্র অধীশ্বর, যত দিন এগিয়ে যাচ্ছে তার সৌন্দর্য যেন ততই অপরূপ হয়ে উঠছে। গতকাল আমরা ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ উপভোগ করেছি, নৈশভোজের পর নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দের আস্বাদ পেয়েছি। ওরা সঙ্গী হিসেবে অত্যন্ত লোভনীয়; ওদের এখানে পেয়ে যে কি পরিমাণ লাভবান হয়েছি, তা কি করে বোঝাব বল তো?

তোমার অনুগতা ভাগ্নী
স্বা: ভিক্টোরিয়া আর

উইণ্ডসর কাসল
১৫ই অক্টোবর, ১৮৩৯

পরম পূজনীয় মামা,

আমার সম্বন্ধে, আমার মঙ্গলকামনায় তোমার শুভকামনা ও হিতাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই জেনেই অসঙ্কোচে বলতে পারছি যে, এ চিঠি তোমাকে আনন্দ দেবে, তা আমি জানি। আমি মন বেঁধে ফেলেছি, একটি নির্দিষ্ট সুরে আমার মন গাঁথা হয়ে গেছে। একটি লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। আজ সকালে য়্যালবার্টকে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি। আমার কথা শুনে আমার প্রতি তার যে গভীর প্রীতির পরিচয় পেলুম তা অনবদ্য। আমি বুঝলুম আমার চোখের সামনেই যে আনন্দের সিংহদ্বার, অফুরন্ত আনন্দের চাবিকাঠি, অনন্ত আনন্দের কোষাগার। আমার জন্যে আমায় ভালবেসে যে অপূর্ব আত্মত্যাগ ও করল তার বিনিময়ে আমার যারা যতটুকু সম্ভব তাই দিয়েই ওকে রাঙিয়ে তুলব, নিজেকে নিঃশেষে পরিপূর্ণভাবে ওর হাতে তুলে দেব। দিনগুলো মনে হচ্ছে যেন একটা ঘোরের ভিতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে—একটা যেন স্বপ্ন, সুন্দর স্বপ্ন নিটোল স্বপ্ন। আজ তোমার কাছে স্বীকার করছি মুক্তকণ্ঠে যে, গত বসন্তেও আমার যে ধারণা ছিল যে তিন চার বছরের মধ্যে বিয়ে করার চিন্তাই আমার মধ্যে আসতে পারে না তিলেকের জন্যেও, সে ধারণা আমার আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে য়্যালবার্টকে দেখে। এখন আমি মনে করি পার্লামেন্টের অধিবেশনের পরেই আমাদের বিয়ের তারিখটি নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমার এই মনে করার পিছনে য়্যালবার্টেরও পূর্ণ অনুমোদন রয়েছে।

এ সব কথা লুইসিকে বলতে পার কিন্তু তার আত্মীয়দের যেন কোনমতেই না বল, এই আমার অনুরোধ।

তোমার অনুগৃহীতা ভাগ্নী
স্বা: ভিক্টোরিয়া আর

## ভিক্টোরিয়াকে লেখা প্রথম লিওপোল্ডের চিঠি

উইসবাডেন
২৪শে অক্টোবর, ১৮৩৯

পরম কল্যাণীয়া ভিক্টোরিয়া,

তোমার চিঠি যে পরিমাণে আনন্দ দিয়েছে, সে রকম আনন্দ অন্য কিছু থেকে পাওয়া যেতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

য়্যালবার্টের মধ্যে তুমি এমন অনেক কিছু দেখতে পাবে, যা তোমার জীবনের সুখশান্তির পক্ষে অপরিহার্য। তার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবনের অনেককিছু মিল আছে, সেই মিলই তোমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনকে মধুময় করে তুলবে। তুমি বলেছ, এ তার আত্মত্যাগ—অনেক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কথাটি ভুল নয়, তবে তা সত্বেও আমি বলব, অনেকখানি। তাই বা কেন, তার সবখানি হৃদয় ভরিয়ে তুলবে তুমি—তোমার সহানুভূতি দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে। তোমার প্রেমের প্রগাঢ়তা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখুক তার হৃদয়ের সর্ব অংশে পড়ুক তোমার স্বাক্ষর। অন্যান্য সর্বপ্রকার সমস্যার কাঁটা তার জীবন থেকে একেবারে উপড়ে ফেলতে পারে তোমার ভালোবাসার গভীরতা।

তুমি তোমার ভায়েদের সামনের মাসেও রাখতে চেয়েছ, তোমার এ পরিকল্পনার প্রতিও আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমার মনে হয়, তাহলে য়্যালবার্টকে আরও গভীরভাবে, আরও নিবিড়ভাবে, আরও ব্যাপকভাবে জানবার, বোঝবার, চেনবার সুযোগ তুমি পাবে। তাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবার পাবে অফুরন্ত অবকাশ।

তোমার প্রতি অজস্র স্নেহশীল
তোমার মামা
স্বা: লিওপোল্ড আর

---

৮ খুব সম্ভব রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮১৮-১৮৮১) পরবর্তীকালে যাঁর একমাত্র কন্যার (১৮৫৩-১৯২০) সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার মেজ ছেলে এডিনবারার এবং সেক্সকোবার্গের ডিউক য়্যালফ্রেডের (১৮৪৪-১৯০০) বিবাহ হয়েছিল।

## শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

[ পশ্চিমবঙ্গের নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ]

সহজেই বলা যেতে পারে—পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদে এবার যে মানুষটি আসীন হলেন, তিনি আপনার আমার মতোই একজন সাধারণ ঘরেরই লোক। জীবনের গোটা পঁইষটি বছরই তিনি কাটিয়ে এলেন সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ-বেদনা তিনি শুধু অন্তর দিয়ে উপলব্ধিই করেননি, তাদের সমব্যথী হয়ে ভোগ করেছেন দিনের পর দিন। জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও আজও তিনি মনে প্রাণে সেই পল্লীগ্রামেরই একজন। কথাবার্ত্তায় সেই সাবেকি পাড়াগেঁয়ে ঠাট, পল্লীগ্রামের সেই সাধারণ মানুষগুলি আজও রাজভবনে তাঁর খাবারঘরের প্রধান সঙ্গী। তাদের নিয়ে একাসনে বসে খেতে কুণ্ঠা তো দূরের কথা, তিনি গৌরব অনুভব করেন। তাদের কাঁধে হাত রেখে আজও সমব্যথীর মত তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন, প্রতিকারের সাধ্যমত চেষ্টা করেন। তাই তিনি কারুর কাছেই আজ দূরের মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র নন,—কাছের মানুষ সর্বজন-শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লচন্দ্র।

১৮৯৭ সালে বিহারের সাহাবাদ জেলায় প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গত গোপালচন্দ্র সেন ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার; তাঁদের পৈতৃক বাসভূমি সেনহাটি গ্রামে। তাঁর শৈশব কাটে বিহারেই; তখন বিহার, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা একই শাসনাধীন ছিল।

দেওঘর আর. কে. মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৮ সালে তিনি স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে

ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেন। বি, এস, সি পাশ করার পর তিনি একাউন্টেন্সী পড়েন এবং একটি বিখ্যাত একাউন্ট্যান্ট ফার্ম্মে আর্টিকল ক্লার্ক নিযুক্ত হন। চার্টার্ড একাউন্টেন্সী পড়ার পর তিনি বিলেত যাওয়া স্থির করেন—এবং পাসপোর্টও সংগ্রহ করেন। কিন্তু এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিল। প্রফুল্লচন্দ্র তাতে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না; যোগ দিলেন অসহযোগ আন্দোলনে—বিলেত যাওয়া ভুলে গেলেন। নিজের কর্ম্মকেন্দ্র বেছে নিলেন আরামবাগে; কারণ ঐ সময় দ্বারকেশ্বর নদীর বন্যায় আরামবাগের মানুষগুলির দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। তিনি এই দুর্গত মানুষগুলির সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন
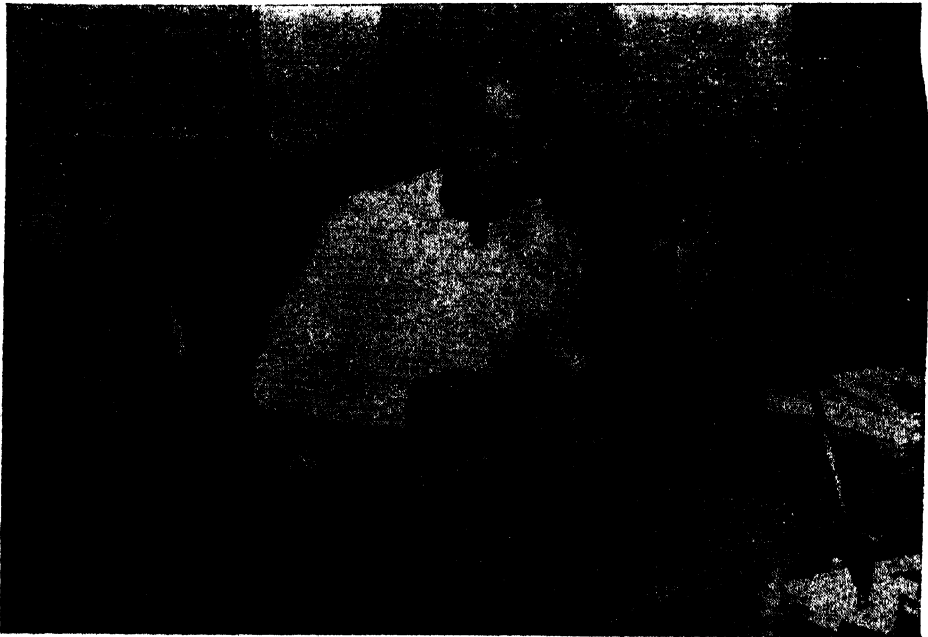
আরামবাগের আর্ত্ত মানুষগুলির দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো; ভালবাসলেন এই মানুষগুলিকে, ভালবাসলেন আরামবাগকে। আরামবাগই হয়ে উঠলো তাঁর কর্ম্মসাধনার কেন্দ্র, আর এখানকার মানুষগুলি হল তাঁর পরম আত্মীয়। কালক্রমে 'আরামবাগের গান্ধী' বলে তিনি সারা বাংলায় পরিচিত হয়ে উঠলেন। একটি সংগঠন গড়ে তুললেন বড় দঙ্গলে এবং এক নিষ্ঠাবান সহকর্ম্মী সাগরের নামে স্থাপন করলেন 'সাগর কুঠি'। এখান থেকে দুঃস্থ জনগণের মাঝে তিনি খদ্দর প্রচার সুরু করলেন ও কুটীরশিল্পের মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করলেন। আরামবাগ তখন ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের কবলে। এই মারাত্মক রোগের আক্রমণের হাত থেকে মানুষগুলিকে বাঁচাবার জন্যে প্রফুল্লচন্দ্র প্রখ্যাত চিকিৎসক ও দেশসেবী আশুতোষ দাসের সহকর্ম্মীরূপে সেবা-কার্য্য সুরু করলেন। শুধু মানুষের বিপদে-আপদেই নয়, সকল সময়েই তিনি গরীব-দুঃখীর সঙ্গে এমন ভাবে মিশতেন যে, সকলেই মনে করতো তিনি তাঁদেরই একজন। কত রাত গরীব-দুঃখীর পাশে শুয়েই তিনি কাটিয়েছেন। শুনেছি, গ্রামের লোকের তখন এত অভাব ছিল যে, মশারি কেনবারও পয়সা তাদের জুটতো না। মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তিনি গায়ে কেরোসিন মেখে ঐ গরীব-দুঃখীদের মতই রাত্রে ঘুমতেন—তথাপি মশারি ব্যবহার করতেন না।

আরামবাগে বসেই তিনি নিয়মিতভাবে চরকায় সূতা কাটতেন; সূক্ষ্ম সূতাকাটায় প্রফুল্লচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। এক বার তিনি হুগলী শিক্ষার্থীদের অল্প সময়ের জন্য শিক্ষকতাও করেছেন।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্যের সময় বাংলাদেশে আইন অমান্য পরিষদ গঠন করা হয়। শ্রীসেন তার চতুর্থ সভাপতি মনোনীত হন। স্বরাজ্য আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন নো-চেঞ্জারের দলে। তিনি অভয় আশ্রমেরও সদস্য ছিলেন। ১৯৩০, ৩২, ৩৪, ৪০ ও ৪২ সালে প্রফুল্লচন্দ্রকে নানা কারণে ইংরেজ সরকারের পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। পুলিসের হাতে তাঁহাকে বহু নির্য্যাতনও ভোগ করতে হয়; তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবিচল ছিলেন। সর্বসাকুল্যে সাড়ে এগার বছর তিনি জেলে ছিলেন; জেল থেকে মুক্তি পেয়েই তিনি তাঁর কর্ম্মকেন্দ্র আরামবাগে চলে যেতেন। এই সময় হুগলী জেলায় নানা আন্দোলনে নেতা রূপে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি হুগলী জেলা কংগ্রেসের সদস্য, বি পি সি সি ও এ আই সি সিরও সদস্য। এক সময় তিনি হুগলী গ্রুপ খাদিগ্রুপের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৩২ সালে যখন দেশময় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল, সেই সময় পুলিস তাঁর প্রতিষ্ঠিত আরামবাগের সাগরকুঠিতে হানা দেয়, ঐ কুঠির যাবতীয় সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ কুঠিটিকে থানায় পরিণত করা হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। এই সময় ক্যাবিনেট মিশনের পর দেশে গণ-পরিষদ গঠন করা হয়; প্রফুল্লচন্দ্র তার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। দেশ তখনও বিভক্ত হয়নি।

১৯৪৭ সালে যে ছায়া মন্ত্রিসভা ও স্বাধীনতা লাভের পর যে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গে গঠন করা হয়, প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। ১৯৪৮ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় প্রফুল্লচন্দ্র অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রীরূপে তাতে যোগদান করেন। এই সময় আরামবাগের এক উপনির্ব্বাচনে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। ১৯৫২ সালের বিধানসভার সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের কাছে পরাজিত হন কিন্তু বিধান পরিষদের নির্ব্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। মন্ত্রিসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যদপ্তরের দায়িত্ব তখন তাঁর ওপর অর্পিত ছিল। ১৯৫৭ সালে ও ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি আরামবাগ কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে আসেন। এই সময় ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে যে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, তাতেও তিনি খাদ্য সরবরাহ, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর গত ১ই জুলাই তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় তাঁকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্ব্বাচিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী হয়েও ব্যক্তিগত জীবনে এখনও তিনি সেই সাধারণ মানুষই আছেন। কাজকর্ম্মের অবসরে যেটুকু তিনি সময় পান, সেই সময়টুকুতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাঁধে হাত রেখে গল্পগুজব করতেও তিনি দ্বিধা করেন না। অকৃতদার প্রফুল্লচন্দ্রের বেশভূষা বলতে সেই খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবী—বাড়ীতে খদ্দরের বেনিয়ান। খাওয়া-দাওয়াতেও কোন পারিপাট্য নেই; ভাত খান কম; রুটি আর একটা ভাল তরকারী হলেই তিনি খুসী; নরম মাংস রান্না হলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। প্রফুল্লচন্দ্রের দুটি নেশা—একটি বইপড়া আর একটি ব্রীজ খেলা। ইংরাজী, হিন্দী, বাংলাভাষায় তিনি সমান পারদর্শী।

বিপুল জনপ্রিয়তার জন্যে আজ তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যবিধাতা হয়েছেন। আশা করা যেতে পারে যে, দরদী মন নিয়ে এতদিন তিনি সাধারণ মানুষের সেবা করেছেন, আজ শাসন-কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্যে প্রতিভাদীপ্ত কর্ম্মময় পুরুষ সর্বজন-শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লদা নিশ্চয়ই চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।

## শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

[ প্রখ্যাতা লেখিকা ]

বিরাট অথচ রক্ষণশীল পরিবারে বর্দ্ধিত—মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ—বাড়ীতে পড়াশুনা—তার জন্য অখণ্ড অবসর পাওয়া—সুনির্ব্বাচিত পুস্তক ও পত্রিকা নিয়ে মায়ের গ্রন্থাগার—সেখান থেকে প্রচুর বইপড়া—এইগুলি মিলিয়া যেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর পরবর্ত্তী লেখিকা-জীবন গড়িয়া উঠে।

১৩১৫ সনের পৌষ মাসে কলিকাতায় আশাপূর্ণা জন্মগ্রহণ করেন, পিতা ৺হরেন্দ্র নাথ গুপ্ত আর্ট স্কুল হইতে পাশ করিয়া অঙ্কন শিল্পে নিজেকে যুক্ত করেন। তাঁহার অঙ্কিত বহু রঙীণ ছবি তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আদি নিবাস হুগলীজেলার বেগমপুর। মাতা ৺সরলা সুন্দরী দেবী ছিলেন ৺অমৃতলাল রায়ের ভগ্নী। আশাপূর্ণা দেবীর সেজ কাকা রমেন্দ্র নাথ গুপ্ত শিল্পকলার সাথে লেখনী চালনা করিতেন। পনের বৎসর বয়সে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সহিত কৃষ্ণনগর (গোয়াড়ী) নিবাসী শ্রী কালিদাস গুপ্তের বিবাহ হয়।

মাতার পড়িবার খুব আগ্রহ ছিল,—তজ্জন্য তিনি প্রচুর পুস্তক কিনিয়া একটি নিজস্ব লাইব্রেরী সৃষ্টি করেন। তাঁহার পুত্রকন্যারা গভীর উৎসাহে প্রায় প্রতিটি পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি পড়িত। আশাপূর্ণা দেবীও তন্মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। পড়া হইতে লেখা প্রেরণা নিজে থেকেই আসে। শিশুপত্রিকা শিশুসাথী-তে প্রথ

প্রকাশের বৎসরে 'বাহিরের ডাক' নামে তাঁহার বার বৎসর বয়সে লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক তখন গল্প পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে জানান। 'পাশাপাশি' গল্প উহাতে প্রকাশের পর সম্পাদক প্রচুর উৎসাহ দেন। তারপর বহুদিন শিশুদের জন্য লিখিতে থাকেন।

আটাশ বৎসর বয়সে 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রথম বয়স্কদের জন্য গল্প লেখেন। মৌচাক, পাপিয়া (ঢাকা) ও খোকা-খুকু (দুইবার প্রতিযোগিতা পুরস্কার সহ)-তে নিয়মিত তাঁহার লেখা মুদ্রিত হইতে থাকে। 'শিশুসাথী' হইতে লেখার জন্য তিনি প্রথম পুরস্কৃত হন। ইহার পর 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় নিজে থেকে দুইটি গল্প পাঠান ও উহা মনোনীত হয়।
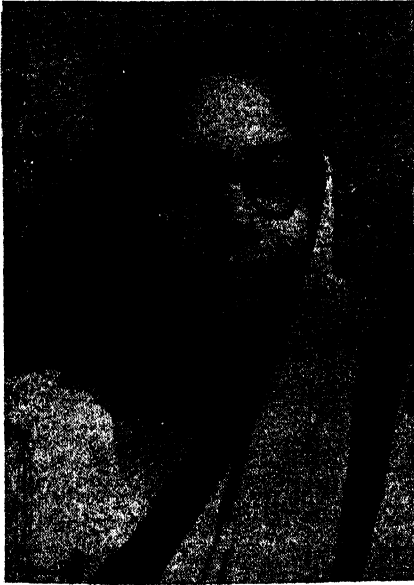
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' লেখেন।

তাঁহার বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি স্বয়ং কোন পত্রিকায় লেখা পাঠাইতেন না—সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করিলে উহা প্রেরণ করিতেন।

তিনি ভারতবর্ষের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সাহিত্য সম্মেলনেও যোগদান করিয়াছেন।

এই পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি শিশুসাহিত্য, গল্প ও উপন্যাস তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।

যদিও তাঁহার সাংসারিক ও সাহিত্য-জীবন একত্রীভূত—তথাপি তিনি সংসার-জীবনকে প্রথম স্থান ও সাহিত্য-জগতকে পরবর্তী স্থানে মনোনীত করিয়াছেন।

পরিপূর্ণ গৃহবধূ ও জননী এবং বিশেষ ভাবে সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ থাকায় শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট গল্প ও উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের সমাজ-চিত্র অতি নিপুণভাবে প্রতিফলিত হয়।

## শ্রীনীতীশচন্দ্র লাহিড়ী

[ আন্তর্জাতিক রোটারী-ক্লাবের সভাপতি ]

অতি সাম্প্রতিককালে এই একটিমাত্র বাঙ্গালীর নাম করা যেতে পারে, যিনি আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়ে বাংলা তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

রোটারী-ইণ্টারন্যাশনাল ৫৭ বছরের পুরাতন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় তো দূরের কথা, কোন এশিয়াবাসীও এই সংস্থাটির সভাপতি হতে পারেননি; শ্রীলাহিড়ী এই পদে নির্বাচিত হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব হাতে-কলমে প্রমাণ করলেন।

শ্রীলাহিড়ী কোলকাতা সহরেই মানুষ হয়েছেন; সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে এন্ট্রান্স আর স্কটিশ-চার্চ্চ কলেজ থেকে ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসে তিনি ভর্ত্তি হন। তারপর এম-এ ও আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কোলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এই সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নীতীশবাবুকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল মামলা পরিচালনের দায়িত্ব দেন। অদ্ভুত ধীশক্তি দিয়ে তিনি সেই মামলাটির বিষয় অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নিয়ে এরূপ দক্ষতার সঙ্গে সেটি পরিচালনা করে যান যে, স্যার আশুতোষ প্রকাশ্যভাবেই তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি। আইন-ব্যবসায় তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর; তৎসত্ত্বেও তিনি এ কাজে বেশীদিন লিপ্ত থাকেন নি। তাঁর ঝোঁক পড়লো আর একটি ক্ষেত্রে এবং আইন-ব্যবসা ছেড়ে তিনি সেই দিকেই মন দিলেন।

ম্যাডান কোম্পানী তখন চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে নেমেছেন, কিন্তু তেমন নাম-ডাক হয়নি। ম্যাডান কোম্পানীর কর্তাদের সঙ্গে নীতীশবাবুর আলাপ ছিল, আস্তে আস্তে চলচ্চিত্র ব্যবসার সঙ্গে তিনি এই সূত্রে পরিচিত হতে লাগলেন। সেটা প্রায় ৪০ বছর আগেকার কথা; এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে তিনি অন্ততঃ এইটুকু বুঝতে পারলেন, ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। কিছুকাল পরেই আমেরিকার বিখ্যাত চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার কোম্পানী তাঁদের ভারতীয় শাখা দপ্তরের প্রধান পরিচালকরূপে শ্রীলাহিড়ীকে নিযুক্ত করেন। তিনি কলম্বিয়া পিকচার্স নামক একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বাঞ্চলীয় শাখার ডাইরেক্টররূপেও কিছুকাল কাজ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে ভারত সরকারের প্রচার দপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৬ সালে তিনি কোলকাতা রোটারী ক্লাবে যোগদান করেন; পরে এই ক্লাবের তিনি সভাপতিও হয়েছিলেন। তারপর তিনি রোটারী ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন এবং এই সংস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সেবা করার তাঁর সৌভাগ্য হয়।

গত ৮ই জুন লস্ এঞ্জেলেসে রোটারী ইণ্টারন্যাশনালের যে ৫৩তম বার্ষিক অধিবেশন বসে, তাতে শ্রীলাহিড়ীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতিপদে নির্বাচিত করা হয়। ইতিপূর্বে এশিয়ার আর কোন অধিবাসীই এই বহুসম্মানিত পদে নির্বাচিত হন নাই। পৃথিবীর ১২৮টি দেশে ১১৩০০ রোটারী ক্লাব আছে; এদের মোট সদস্যসংখ্যা ৫ লক্ষ ২৫ হাজার।

সভাপতি নির্ব্বাচিত হবার পর নীতীশবাবু সারা বিশ্বের অসংখ্য দেশ থেকে প্রচুর অভিনন্দন পেয়েছেন। গত ১১ই জুলাই মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট শ্রীকেনেডি নীতীশবাবুকে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্মানিত করেন।

কালিফোর্ণিয়ার কলেজ অব মেডিসিন তাঁকে অনারারী উপাধি "হিউম্যান লেটার্স" দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

আন্তর্জ্জাতিক রোটারী ক্লাবের সভাপতি হিসাবে নীতীশবাবু গত ১লা জুলাই তাঁর কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর সদর দপ্তর ইণ্ডিয়ানার ইভানষ্টনে, সেখানেই তিনি থাকবেন। আন্তর্জ্জাতিক রোটারী ক্লাবের সভাপতি হিসাবে তিনি সম্প্রতি তাঁর প্রথম ভাষণ ওয়াশিংটন রোটারী ক্লাবের ৫০তম বার্ষিক উৎসবে দিয়ে এসেছেন।

শ্রীনীতীশচন্দ্র লাহিড়ী

৭০ বৎসর বয়স্ক নীতীশবাবু এখনও অফুরন্ত কর্ম্মশক্তিতে ভরপুর। আন্তর্জ্জাতিক মানবগোষ্ঠীর মিলিত উদ্যমে জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগের মূল আদর্শকে মাথায় নিয়ে তিনি সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন। মাস তিনেক আগেও তিনি কোলকাতায় একবার এসেছিলেন; আবার যখন আসবেন, আন্তর্জ্জাতিক সম্মানের গৌরব নিয়েই তিনি দেশে ফিরবেন; নিশ্চয় সেদিন বাঙ্গালী তাঁকে যথাযথ সম্মান দিতে ভুলবে না।

## শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

( চক্ষুচিকিৎসা শাস্ত্র বিশারদ )

উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলার চাঁদবালী বন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক বাস ভাটপাড়ার নিকট মাদরাল গ্রাম। তৎকালে কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত কোনও রেলপথ ছিল না। সেইজন্য জাহাজে করিয়া চাঁদবালী পর্য্যন্ত আসিতে হইত এবং সেখানে হইতে ষ্টিমার যোগে কটকে আসিতে হইত। চাঁদবালীর ষ্টিমার কোম্পানীর অধীনে তাঁহার পিতা একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। চাঁদবালী হইতে তাঁহার পিতা কটকে বদলী হন। কটকের Ravenshaw Collegiate School হইতে Matric পাশ করেন এবং Revenshaw . College-এ I. Sc পড়েন, কিন্তু ঐ সময় Revenshaw College বিহার Universityর অন্তর্গত হওয়ায় তিনি উত্তরপাড়া College হইতে ১৯১৮ সালে I.Sc পাশ করেন। কটকে তাঁহাদের বাড়ীর সন্নিকটে Medical School-এ চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার ধারা ও discetion ইত্যাদি দেখিয়া উত্তর জীবনে একজন সুচিকিৎসক হইবার প্রেরণা ও সঙ্কল্প তখন হইতেই তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ১৯১৮ সালে আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজে (তৎকালীন বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ) ভর্ত্তি হন এবং ১৯২৪ সালে কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। মেডিক্যাল কলেজে উচ্চ-শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে চক্ষু চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশারদ হইবার জন্ত সঙ্কল্প করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি খ্যাতিবান ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ মত অবৈতনিক ভাবে চক্ষু বিভাগের হাউস সার্জ্জনের পদে প্রায় দেড় বৎসর সুষ্ঠু ভাবে কার্য্য করেন।

১৯২৭ সাল হইতে তিনি স্বাধীন ভাবে চক্ষুচিকিৎসক হিসাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে অবৈতনিক সার্জ্জন হিসাবে যোগদান করেন এবং চার বৎসর সুনামের সহিত কার্য্য করেন। ১৯২৯ হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত কর্পোরেশন খিদিরপুর হাসপাতালে অবৈতনিক চক্ষু সার্জ্জন পদে নিযুক্ত হন। এই দুই প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত হইবার সময় কৃতী ডাঃ সুধীরকুমার বসু তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯৩৬ সাল হইতে কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে অবৈতনিক চক্ষু সার্জ্জন এবং L.M.F Course-এর চক্ষু শিক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৩৮ সালে D. O. M. S পড়িবার জন্ত লণ্ডন যাত্রা করেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র ব্যানার্জী

১৯৩৯ সালে D.O.M.S. (Lond.) এবং D.O. (Oxford) দুইটাই পাশ করেন। Oxford-এ অধ্যয়নকালে Oxford Eye Hospital-এ একমাসের জন্ত হাউস সার্জ্জন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য যে সেই সময় এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। ১৯৩৯ সালের শেষভাগে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাঁহার F. R. C. S. পড়া হইল না, এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর পুনরায় Calcutta Medical School-এ যোগদান করেন। যুদ্ধের পরে Calcutta Medical School ও Calcutta National Medical Institute দুইটি একত্র হইয়া Calcutta National Medical College হয়। তিনি ১৯৫১ সালে এখানকার চক্ষু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের প্রধান চক্ষু চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং এখন পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু শাস্ত্রের Under Graduate ও Post Graduate পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন।

সাধারণ অবস্থা হইতে মানসিক দৃঢ়তায় ও একাগ্রতায় তিনি জীবনে সাফল্য অর্জ্জন করেন। বাস্তবের কঠিন জীবনপথে অনেক দুঃখ, বাধা ও বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া আজ তিনি যশস্বী হইয়াছেন স্বীয় কর্ম্ম-নৈপুণ্যে ও দক্ষতায়।

# মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ

**অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়**

সেই প্রথম বোধ হয় মেয়েদের কলকাতায় প্রকাশ্যে নাচালেন, কত সপক্ষ বিপক্ষ সমালোচনা কাগজে,—কিন্তু যাঁরা দেখলেন, তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ !

প্রথম দিন দেখে এসে এত ভালো লাগল যে, বাবাকে দেখাবার অত্যন্ত আগ্রহ হল। বাবা সে-কালের ব্রাহ্ম, উদারচেতা হলেও, তখন যেমন শিক্ষিত সমাজ নাচ-গানকে বর্জন করে চলত, তিনিও তাই করতেন। অনেক চেষ্টায় তাঁকে রাজী করালাম 'নটীর পূজা' দেখতে। বাবা দেখে এসে বললেন,—'যেন ১১ই মাঘের উপাসনায় যোগ দিয়ে এলাম।'

এই ছোট্ট একটু মন্তব্যে বোঝা যায় এ ক্ষেত্রে গুরুদেবের অসাধারণ শক্তি ও অবদান। শিক্ষিত মানুষের মন থেকে মুহূর্তে বহু দিনের সংস্কার খসে পড়ল, নাচ-গানের মাধ্যমে শুচিশুদ্ধ নির্মল আনন্দ উপভোগ করে কৃতার্থ হল!

'তারপর আরও নাটকে,—তাসের দেশ, তপতী, মায়ার খেলা প্রভৃতিতে গুরুদেবকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। গুরুদেবের রচিত বর্ষামঙ্গল, প্রথম দিন জোড়াসাঁকোতে, বড় বড় পদ্ম, কেয়াফুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি বর্ষার ফুল দিয়ে সভা সাজানো,—গেরুয়া সিল্কের আলখাল্লা গায়ে ঋষিপ্রতিম গুরুদেব এসে দাঁড়িয়ে প্রথমে পড়লেন,—'হৃদয় আমার নাচে রে, আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে'। শ্রোতাদের মনও যেন সমান তালে বর্ষার উৎসবে নেচে উঠল!"

তাঁর নট-কুশলতার বিষয় আরও অনেকের নিকটেই শুনি। চেহারা, আবৃত্তি, কণ্ঠস্বর, সজ্জা, সবই ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ, সুষমা-মণ্ডিত। এমন কি, মঞ্চ-সজ্জায়ও তিনি আনেন এক যুগান্তকারী পরিবর্তন! নাচেও, এক সুষ্ঠু ছন্দোময়, শালীনতা-পূর্ণ ভাবধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এদিকটিও অসাধারণ, অবিস্মরণীয়!

## (৮)

সেকালের ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও বিশিষ্ট দিনে আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত পূজনীয় ৺ব্রজনী দাস মহাশয়ের পত্নী, অধুনা শান্তিনিকেতনবাসিনী, আমাদের বর্ষীয়সী, স্নেহশীলা, মাসীমা শ্রদ্ধেয়া ক্ষীরোদা দাস, অনুরুদ্ধা হয়ে বলেন,—গুরুদেবকে তিনি তাঁর অতি অল্প বয়স থেকেই দেখে আসছেন, তবে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপনের পর তাঁদের শিলং বাসকালে, গুরুদেব দু একবার ওখানে গিয়ে তাঁর এক বন্ধুর আবাসে কিছুকাল ছিলেন,—সেই সময়েই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়।

গুরুদেবের মধ্য বয়সের চেহারা মাসীমার চোখে ঠিক যীশুখৃষ্টের অনুরূপ মনে হত। সেই উজ্জ্বল শ্বেত-কান্তি, ঈষৎ-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ ও শ্মশ্রুশোভিত সুগঠিত বদনমণ্ডল, উন্নতনাসা, বিশালনেত্র, সুদীর্ঘ দেহযষ্টি, গৌরবর্ণ আলখাল্লায় আবৃত মূর্তিখানা যেন কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নিখুঁত খোদিত মূর্ত্তি।

একদিন মাসীমা তাঁকে নিজ আলয়ে আহারে নিমন্ত্রণ করেন। কোলের ছেলেটি পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের দুরন্ত বালক। সকলকে সাবধান করে দিলেন, যেন মাননীয় অতিথির আহার স্থানে গিয়ে সে কোন বিপ্লব না বাধায়। তাকেও নানামতে বুঝিয়ে, স্থানান্তরে রেখে তিনি আহার্য্য দানে ব্যস্ত, শিশুটি বিদ্যুদ্‌গতিতে সকলের অলক্ষ্যে সেই নিষিদ্ধস্থানে, নিজের ছোট চেয়ারখানা টেনে এনে বিজ্ঞের মত স্থান গ্রহণ করল। কিছুতেই তাকে সরানো যায় না, গুরুদেব বললেন, থাক, ওকে তোমরা দূরে পাঠিও না। তবুও মাসীমা তাকে অন্যত্র পাঠাবার প্রচুর চেষ্টার পর অকৃতকার্য্য হয়ে, হার মেনে বললেন, 'কি দুষ্টু ছেলে—কিছুতেই কি একে বাগ মানানো যায় না?' গুরুদেব স্মিতহাস্যে বললেন, 'আমি দুষ্টু ছেলেদের ভয়ানক ভালবাসি, একে তোমরা শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিও। এদের মত দুষ্টুদের জন্যই আমি আশ্রম করেছি; সারাদিন মাঠে-ঘাটে প্রচুর দুষ্টুমি করবে ও তার সঙ্গে লেখাপড়াও ভালোবেসে শিখবে।'

মাসীমার তখন কয়েকটি স্কুলগামিনী কন্যাও ছিল, তারা ইংরেজী স্কুলে পড়ছে শুনে দুঃখ প্রকাশ করে, মেয়েদেরও শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিতে বললেন। মাসীমা স্বামীর চাকুরীস্থল শিলং ছেড়ে অতদূর শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কেমন করে একা থাকবেন বলায়,—মুহূর্তে সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়ে বললেন, 'ভয় কি? তোমরা রথীর বাড়ীর একপাশে থাকবে, সেই তোমাদের দেখাশোনা করতে পারবে, কিছু ভয় নেই!' আকাশের মত উদার মনে সব সময়ই এগিয়ে আসতেন সকলের অসুবিধা-নিরসনে।

শিলং বাসকালেই এলো তাঁর জন্মদিন। সেদিন ওখানকার বন্ধুবান্ধব সকলকেই তাঁর আবাসে নৈশ-ভোজনে নিমন্ত্রণ করা হল। আহারাদির পর অনেকে অনুরোধ করলেন, একখানা গান গেয়ে শোনাবার জন্য। বিনীতভাবে গুরুদেব বললেন, এখানে দিনু আছে, আরও অনেক গায়ক-গায়িকা আছেন, তাঁদের সামনে কি আমি

গাইতে পারি ? আর আমার গান ত আমি দিনুকে দিয়ে খালাস,—সব ভুলে যাই, সুর একটুও মনে থাকে না, এখন এখানে গাইলে, সকলে বেসুরো গাইছি বলে হাসবে।'

তবুও একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে গান ধরলেন ; কণ্ঠস্বর একটু সরু, কিন্তু অসম্ভব মিষ্টি ও জোরালো,—প্রকৃত সুরদার কণ্ঠ। গাইতে যখন আরম্ভ করলেন, তন্ময় হয়ে গেয়েই চললেন, একটার পর একটা, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত। শ্রোতারা রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে সঙ্গীত-সুধা পান করে পরমপরিতৃপ্ত হলেন !

সেকালের শিলং-মহিলা-সমিতিতে তাঁকে একদিন নিমন্ত্রণ করা হল। মাসীমাই 'নাথ হে, প্রেম-পথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও' গানখানি গাইলেন। গুরুদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'বাঃ নির্ভুল সুরে তুমি কি করে এখানে আমার গান শিখলে ?' মাসীমা স্বরলিপি থেকে শিখেছেন বলায়, এবং সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত স্বরলিপি সম্বলিত, তদানীন্তন 'আলাপিনী' ও 'বীণাবাদিনী' নামক সঙ্গীত মাসিক পত্রিকা দুটির গ্রাহিকা বলায় ততোধিক সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন,—স্বরলিপির মাধ্যমে সঙ্গীতশিক্ষা খুব ভাল, এতে সুর অবিকৃত থাকে।

মাসীমার একটি কিশোরী কন্যার গান শুনে গুরুদেব এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, যতদিন শিলং-এ ছিলেন, ততদিন আগ্রহের সঙ্গে তাকে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সকলকে দেওয়াটাই যেন ছিল তাঁর সহজাত ধর্ম, তাতে ছিল না উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়র বিন্দুমাত্র বিভেদ !

তিনি শিলং-এর লোক-নৃত্য, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি প্রাদেশিক সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হবার আগ্রহ প্রকাশ করায়, খাসিয়া, নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য আদিবাসীর নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি খাসিয়াদের তীরধনুক নিয়ে বীরত্বব্যঞ্জক নৃত্য দেখে প্রচুর আনন্দ পান ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর ঐ আনন্দে আনন্দিত হয়ে সহরবাসীরা বিদায় প্রাক্কালে খাসিয়া তীরধনুক উপহার দিয়েছিলেন,—যা বোধহয় এখনও রবীন্দ্র যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

## ( ৯ )

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সন্তোষ মিত্র মহাশয় এখানকার প্রাচীন ছাত্রদের অন্যতম। তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের গোড়ার দিকে, ১৯১০ সালে শান্তি-নিকেতনে আসেন। পাঠ সমাপ্ত হবার পর, দীর্ঘ কর্ম্ম-জীবন, শ্রীনিকেতনে গুরুদেবের আদর্শে কাটিয়ে, এখন শ্রীপল্লীতে বাড়ী, খেত, খামার, গরু, বাছুর প্রভৃতির পরিচর্য্যায় অবসর-জীবন যাপন করছেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। তিনি সহজ, সরল, মমতাময়ী দিদির ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধ করলেন। শুনলাম তিনি তাঁর শৈশবে, তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে এখানে এসেছেন। গুরুদেবের কথা কিছু জানতে চাওয়ায় অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন,—'তাঁর ন্যায় মহদ্ ব্যক্তির কথা আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর বলা কি সম্ভব ?' তবুও আমি দু-একটি ছোট খাট ঘটনা, যা তাঁর মনে আছে, শুনতে চাওয়ায় একটু ভেবে বললেন,—

'যদিও আমি শান্তিনিকেতনে বহুকাল আছি, তবুও গুরুদেবকে কোন দিন কোন আহার্য্য দেওয়ার কথা ভাবতেই পারি নি। এখানকার অনেক মহিলারাই অনেক কিছু মিষ্টি মিঠাই স্বহস্তে তৈয়ারী করে তাঁকে পাঠাতেন, আমি শুনতাম আর ভাবতাম, গুরুদেব পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান,—সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর মেলা-মেশা, আহার্য্য—পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য ! আমার বিদুরের ক্ষুদ কুঁড়ো তাঁকে আর কি দেব ? তিনিই বা তা পছন্দ করবেন কেন ? তবুও হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই মনের গহন কোণে তাঁকে কিছু খাওয়াবার ইচ্ছা যে লুকিয়ে ছিল না, তা বলতে পারি না।

দিন যায়—আমাদের তখন ক্ষেত-খামার হয়েছে। গোলা ভরা ধান-চাল ;—হঠাৎ একদিন গুরুদেবের পুরাতন ভৃত্য মহাদেব একটি ছোট কৌটো হাতে এসে বলল, 'বাবা মশাই আমাকে আপনাদের এখানে পাঠিয়েছেন।'

'কেন ? কি ব্যাপার ?'

'আপনাদের ঘরে নাকি ভাল মুড়ি থাকে ; তিনি বললেন, আজ তাঁর মুড়ি খেতে ইচ্ছে হয়েছে, তাই আপনাদের কাছ থেকে দুটি মুড়ি নিয়ে যেতে।'

রাজাধিরাজ মহারাজের কুটীরবাসী দরিদ্র রাজভক্ত প্রজার নিকট এ কী আবেদন ! মহাদেবকে বললাম, 'তুমি একটু আগে কেন বললে না, আমি টাটকা মুড়ি ভাজিয়ে গরম গরম দিতাম।'

সে বলল, 'আমি কি করে জানব বলুন,—বাবা মশাই ত এখনি বললেন,—আর আপনাদের বাড়ী থেকেই নিতে বললেন।'

দেবতার ভোগে কি ব্যবহৃত জিনিষ দেওয়া চলে ? আবেগ-কম্পিত-বক্ষে ভাণ্ডার খুঁজে অব্যবহৃত পাত্র থেকে এক কৌটো মুড়ি মহাদেবের হাতে দিয়ে, পরিতৃপ্ত হলেও, মনটা বড়ই খুঁত খুঁত করতে লাগল যে, টাট্‌কা—গরম জিনিষটি দেওয়া হল না ; পর দিন আবার নূতন মুড়ি ভাজিয়ে ও ঘরের গরুর দুধের ছানা থেকে সন্দেশ তৈরী করে, দুখানা থালায় নৈবেদ্যের আকারে সাজিয়ে, স্বামীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম উত্তরায়ণে।

গুরুদেব তখন একটু অসুস্থ—নিকটে ছিলেন সেবা-পরায়ণা দৌহিত্রী নন্দিতা। নন্দিতার হাতে থালা দুখানি দেওয়ায় সে বলে, 'আপনি নিজে গিয়ে দিন, দাদামশাই খুসী হবেন।' দ্বিধাগ্রস্ত, কুণ্ঠিতভাবে সন্তোষ দা ভিতরে ঢুকতেই গুরুদেব 'কি এনেছিস রে,—দেখাত ?' বলে ঢাকা খুলে দেখে কি খুসী ! বললেন, 'রেখে যা, ওরে এ জিনিষ পাওয়া যায় না, সেবা দেব।'

গুরুদেবের চরিত্রের একটি দিক যা অন্নপূর্ণাদির মনে উজ্জ্বল,—তা হল তাঁর সকলের প্রতি সমদৃষ্টি। সেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, বাল-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষে কোন প্রভেদ ছিল না। সে যেন আকাশের রবির দীপ্তি,—একবার সূর্য্যোদয় হলে, ক্ষুদ্র ডোবা থেকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত কেউ কি সে কিরণ-লাভে বঞ্চিত হয় ?

যখনই যে দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁর নিকটে যেত,—তিনি হয়ত লেখায় মগ্ন,—লেখাটি সরিয়ে রেখে বলতেন, 'কে ? তুমি ? আচ্ছা বোস বোস ! মুখে স্মিত-হাস্য, বিরক্তির কণামাত্র সেখানে ঠাঁই পেত না। তারপর হৃদ্যতা-পূর্ণ আলাপ-আলোচনায় প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, তিনি আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন। তাঁর এই ভালোবাসা থেকে উত্তরায়ণের বাগানে কর্ম্ম-রতা সাঁওতাল মেয়েনরাও বাদ যেত না।

শুনেছিলাম, এই সাঁওতাল মেয়েনেরই এক সুন্দর গল্প। গুরুদেব উত্তরায়ণের চওড়া বারান্দার এক কোণে টেবিল চেয়ার পেতে,

লেখায় মগ্ন। বাগানের ঘাস পরিষ্কার-রতা এক মেলেন বিকেলে বাড়ী যাবার সময় এসে পাশটিতে দাঁড়ালো; গুরুদেব মুখ তুলে চাইতেই মেয়েটি বলে উঠল, 'হ্যাঁ রে, তুর কি কোন কাজ নেই? সকাল বেলা যখন কাজে এলাম, তখন দেখলাম এইখানে বসে কি করছিস;—দুপুরেও দেখলাম এখানেই বসে আছিস,—আবার সন্ধ্যাবেলা আমাদের ঘরে যাবার সময় হয়েছে,—এখনও তুই এখানেই বসে আছিস; তুকে কি কেউ কোন কাজ দেয় না?'

গুরুদেব নিজেই সরস ভঙ্গীতে এই গল্পটি করতেন ও সহাস্যে সকলকে বলতেন, 'দেখেছ, মেলেনটার কি বুদ্ধি! আমার স্বরূপটা একেবারে ধরে ফেলেছে!'

অন্নপূর্ণাদির উত্তরায়ণে উপস্থিতিকালের ক্ষুদ্র একটি ঘটনা,—এক ভদ্রমহিলা একখানি খাতা হাতে গুরুদেবের ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন,—সাহস করে ভিতরে ঢুকতে পারছেন না। অন্নপূর্ণাদি দেখতে পেয়ে 'কি চাই' জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন, আমি দূর থেকে এসেছি কবির দুছত্র লেখার আশায়,—পাব কি? অন্নপূর্ণাদি বললেন,—'চলুন, ঘরে তিনি কাজ করছেন—বলে দেখুন!'—বলে তাঁকে গুরুদেবের সামনে হাজির করলেন। গুরুদেব তখন কাগজপত্র ছড়িয়ে নিজের লেখায় মহাব্যস্ত; কিন্তু আগন্তুক মহিলাটি আসামাত্র 'কি চাই?' বলে মুখ তুলে তাঁর আবেদন শুনলেন, ও তৎক্ষণাৎ নিজের কাগজ-পত্র সরিয়ে মুহূর্তে ভদ্র মহিলার খাতায়—চার লাইন কবিতা লিখে দিলেন। ম'হলাটি এত সহজেই সফলমনোরথ হয়ে গুরুদেবের পদধূলি মাথায় নিয়ে উজ্জ্বল মুখে বেরিয়ে গেলেন!

গুরুদেবের অসুস্থতার একটি বর্ণনা অন্নপূর্ণাদি করলেন। তিনি মনের দিকে যেমন বিরাট ছিলেন, দেহের দিকেও তাই; সুন্দর সুগঠিত দেহ শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সব সময় পরিচ্ছদে আবৃত থাকত, পার্শ্বচররাও তাঁর বদন-মণ্ডল এবং হাত ও পায়ের পাতা ভিন্ন শরীরের অন্য কোন অংশ কখনও দেখতে পেত না। একদিন তিনি স্নান-ঘরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান; তখনি ধরাধরি করে নিকটবর্তী একটি বড় চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় রাখা হয়,—দূরের শয্যায় নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হল না।

তৎক্ষণাৎ খবর গেল কলকাতায়। স্যার নীলরতন সরকার, ডাক্তার সত্যসখা মৈত্র প্রভৃতি বড় বড় অনেক ডাক্তার এসে পড়লেন। স্যার নীলরতন দেখেই বললেন, 'ইরিসিপ্লাস্'—এখনই ইঞ্জেক্‌শন দেওয়া দরকার। শান্তিনিকেতনে সে ওষুধ পাওয়া যায় না,—ভাগ্যক্রমে ডাঃ সত্যসখা মৈত্রের ব্যাগ খুঁজে ওষুধটি পাওয়া গেল, ও প্রাথমিক চিকিৎসা আরম্ভ হল। দিন তিন চার তাঁর আচ্ছন্ন ভাবে কেটে গেল—কিন্তু যেই একটু জ্ঞান হল,- কারো কোনো সেবাই নিতে চান না; বাথরুম যাওয়া, বেশ পরিবর্তন করা, সব নিজে করবেন, অতি দুর্বলতা সত্ত্বেও।

তিনি খুব বড় বাড়ী, অট্টালিকা, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন মোটেই পছন্দ করতেন না,—সর্ব্বদাই বলতেন, আমাকে তোরা খুব কম খরচে ছোট একখানা বাড়ী করে দে,—যার জন্য 'শ্যামলী', 'পুনশ্চ' প্রভৃতি বাড়ীগুলো নির্ম্মিত হয়েছিল।

গুরুদেবের ডাক্তারী বিদ্যার কথাও শুনলাম। তাঁর ছিল বায়োকেমিক ওষুধের বাকস,—যার যখন প্রয়োজন, এসে দাঁড়ালেই, অতি মনোযোগের সঙ্গে রোগের বিবরণ শুনে, এমন সুন্দর ওষুধ দিতেন যে, সকলেই তাতেই সুফল পেতো।

অন্নপূর্ণাদি কয়েকটি শিশু সন্তান নিয়ে থাকতেন শ্রীনিকেতনে,—ছেলে মেয়ের অসুখ বিসুখে ছুটে আসতেন গুরুদেবের নিকট,—তিনিও ওষুধ বিতরণে মুক্ত-হস্ত, হাত-যশের গুণে নিরাময় হতে দেরি হত না।

শ্রীনিকেতনে একটি ছোট বাড়ীতে তাঁরা বাস করতেন, কিন্তু গুরুদেব যখনই এদিকে আসতেন, তাঁদের বাড়ী পায়ের ধুলো দিয়ে কুশল-সংবাদ নিয়ে যেতেন। একবার আলুর মরশুমে অনেক আলু কিনে তাঁরা তক্তপোষের নীচে বালি ছড়িয়ে, তাতে সঞ্চিত রেখেছেন, যাতে বর্ষায় চড়া দামে আলু আর না কিনতে হয়। গুরুদেব এসে ঘরে বসে বললেন,—'এ-কিরে! তোরা এত কাঁটাল খেয়েছিস্ যে,—এত বীচি শুকিয়ে খাটের তলা বোঝাই করেছিস?' বোধ হয় খাটের নীচে প্রায়ান্ধকারে ওগুলো তাঁর কাঁটাল-বীচিই মনে হয়েছিল ও পরিমাণ দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন; পরে যখন শুনলেন কাঁঠাল-বীচি নয়, আলু,—তখন কি প্রাণ খোলা হাসি!

মাঝে মাঝে তিনি নাকি শ্রীনিকেতনেও কয়েকদিন করে থাকতেন; সেখানে তাঁর বাসস্থানটি ছিল বড়ই অদ্ভুত! একটি গাছের উপরে একখানা কাঠের ঘর, কবি-মনের উপযুক্তই বটে!

গুরুদেবের দরদী-মনের স্পর্শ-পাওয়া অন্নপূর্ণাদির জীবনের একটি করুণ কাহিনী শুনি—

বারো বৎসর বয়স্কা শান্তিনাম্নী প্রথমা কন্যাটি এখানে স্কুলে যায়; ভালো ছাত্রী, নাচ-গানেও সমান দক্ষতা অর্জন করছে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গুরুদেব বলেছিলেন, 'ওকে তোরা ভাল করে নাচ শেখা,—ওর ভিতরে বস্তু আছে।'

একদিন শান্তি আম্রকুঞ্জে স্কুলে গিয়েছে, হঠাৎ কোলাহল উঠল, সে গাছ থেকে পড়ে অজ্ঞান! অন্নপূর্ণাদি ছুটে গিয়ে দেখেন, তাকে ষ্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছুটো ক্লাশের মধ্যে ছুটির সময়টুকুতে সহপাঠিনীদের সঙ্গে গাছে চড়ে কাঁচা আম খেতে গিয়ে এই বিপত্তি! এখানকার বড় ডাক্তার বাবু তখন সবে নূতন এসেছেন, দেখে শুনে ভাঙ্গা হাতখানায় 'প্লাষ্টার' করে বললেন,—'২।১ দিন পর কলকাতায় নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার।' অন্নপূর্ণাদি অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, যদি কলকাতায় নিতেই হয়, তবে আজই যাব,—ডাক্তার বাবু আপনিও সঙ্গে চলুন। ডাক্তার বাবুর হাতে অজস্র কাজ, মাথা নেড়ে বললেন, 'সেত সম্ভব হবে না,—এত কাজ ফেলে আমি যাই কি করে? আজকের মতো ওকে বাড়ী নিয়ে যান, তার পর ভেবে চিন্তে যা হয় করবেন।'

অন্নপূর্ণাদি নিরুপায় হয়ে মেয়েকে বাড়ী নিয়ে এলেন। জ্ঞান হওয়া-মাত্র শান্তি 'আমার পা গেল' বলে চীৎকার সুরু করে দিল। বাঁ হাত, বাঁ পা, কোমরের একটা হাড়, সব ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ। মেয়ের কষ্ট দেখা জননীর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল, ছুটে গেলেন তাঁর আরাধ্য-দেবতা গুরুদেবের নিকট। সব শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার বাবুকে ডেকে পাঠালেন, ও বললেন,—যদিও তোমার অনেক কাজ, তবুও আজই তুমি শান্তি ও তার মাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে ওকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে এসো। এ কাজ সকল কাজের চেয়ে বেশী দরকারী। তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিচারক মহাদেবকে পাঠাতে লাগলেন, বায়োকেমিকের পুরিয়া হাতে দিয়ে,—ও কেমন আছে জেনে আসতে। যদি ঐ ওষুধে কষ্টের বিন্দুমাত্র লাঘব হয়!

অর্থের অনাটন,—ফ্রি বেডে ভর্ত্তি,—অনেক তদ্বির দরকার, সেজন্য

গুরুদেব কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ডা: সত্যসখা মৈত্রের নিকট দিলেন অনুরোধ-পত্র!

কলকাতায় কারমাইকেল হাসপাতালে মেয়েটি ভর্ত্তি হল এবং বোধ হয় গুরুদেবের চিঠিখানার জন্যই অন্নপূর্ণাদি সুদীর্ঘকাল মেয়ের পাশটিতে থাকার অনুমতি পেলেন।

মেয়াদী কালের পরে প্লাষ্টার খুলে দেখা গেল 'সেটিং'এর ভুলে হাড় সুন্দর ভাবে যোড়া লাগে নি, মেয়ে হাঁটা-চলা করতে অক্ষম। তখন ডাক্তাররা নিরুপায় হয়ে বললেন,—'এতদিন হাসপাতালে আছে, ওকে এখন বাড়ী নিয়ে যান, ও কিছুকাল ভাইবোনদের সঙ্গে বাড়ীর আরাম উপভোগ করলে, আবার মাস কয়েক বাদে নিয়ে আসবেন,—আমরা আবার চেষ্টা করে দেখব, কি করতে পারি!'

অন্নপূর্ণাদি নিজের ও কন্যার দুরদৃষ্টে মর্ম্মাহত হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। দু'হাতের নীচে দুটি 'ক্রাচ' দিয়ে শান্তি একটু হাঁটতে লাগল; অন্নপূর্ণাদি, সন্ন্যাসী-প্রদত্ত, দৈব, ডাক্তারী, যে যা বলে,—তাই চেষ্টা করে দেখতে লাগলেন, মেয়েও একটু একটু করে আরোগ্যের পথে পা বাড়াতে লাগল। দুটি 'ক্রাচের' স্থানে একটি 'ক্রাচ', তারপর ক্রাচবিহীন ভাবে খুঁড়িয়ে, একটু একটু হাঁটতে লাগল। পড়াশুনায় বিষম ব্যাঘাত,—নাচের কথা ত ভাবাই যায় না। ডাক্তারদের কথামত মাস কয়টি পার হয়ে যাবার পর, আবার অন্নপূর্ণাদি পড়লেন বিষম ভাবনায়! অগতির গতি গুরুদেবের কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইলেন, 'এখন কি করি?'

গুরুদেব বললেন, 'শোন্, কলকাতার ডাক্তারদের দেখিয়ে একবার ত এই হলো;—আবার তোর মেয়ের কি দশা হয় কে জানে? হয়ত মরে যাবে। তার চেয়ে কলকাতায় নাই বা গেলি, ও যা আছে তাই থাক, না হয় একটু খুঁড়িয়ে হাঁটবে তাতে আর কি হয়েছে? আমি তোকে মেয়ে নিয়ে কলকাতায় যাবার পরামর্শ দিই না, তবে তোদের যদি ইচ্ছা হয় আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারিস্।'

অন্নপূর্ণাদি গুরুদেবের কথা শুনে আর কলকাতায় গেলেন না: আস্তে আস্তে শান্তি প্রায় স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে লাগল, না জানলে তার চলার সামান্য ত্রুটিটুকু আর বোঝা যায় না। বর্ত্তমানে সে বিবাহিতা ও দুটি সন্তানের জননী!

গুরুদেবের শান্তিনিকেতন থেকে শেষ যাত্রার চিত্র একটুখানি পেলাম,—অন্নপূর্ণাদির কাছে; দুধারে আশ্রমবাসী সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন অশ্রু-সজল-চক্ষে, কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর দেহখানা এনে তোলা হল একটি বাসে শায়িত-অবস্থায় বাস্ চলল,—'কিচেনের পাশ দিয়ে। লম্বা লম্বা খুঁটি পোতা হয়েছে,—নূতন 'ইলেক্ট্রীক লাইট' আসবে,—তারই অসমাপ্ত তোড় জোড় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! 'বাসে' শুয়ে গুরুদেব পার্শ্বচরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সব কী?' অনেক দিন অসুস্থ হয়ে নিজের কামরায় আবদ্ধ থাকায়, নবাগত কাজগুলোর বিশেষ কিছু জানতেন না; সমষ্টি সব জানানোর পর বললেন,—'তাহলে তোমরা এবার এখান থেকে পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নূতন আলো আনছো।'

এ কী তাঁর নিজের জীবনের কথাও বলে গেলেন! আর ত তাঁর অতি প্রিয় শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন না। কয়েক দিন পর যখন সেই উদার, সৌম্য মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এক মুষ্টি ছাই একটি আধারে করে নিয়ে আসা হল, তখন শান্তিনিকেতনের গগন পবন হাহাকারে ভরে উঠল। শ্রাবণের আকাশ মানুষের সঙ্গে সমান তালে অশ্রু বর্ষণের ভিতর দিয়ে তাঁর বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করল!

ভস্মাধারটি তাঁর শেষ শয়ন-কক্ষের প্রাচীর-গাত্রে, যেখানে তাঁর পিতা মহর্ষিদেবেরও ভস্মাধার স্থাপিত আছে, সেখানে রক্ষিত হল। শুনলাম,—তাঁর আদেশ ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর যেন কোন মঠ, মন্দির কি স্মৃতিচিহ্ন না রাখা হয়, এমন কি ধূপ, ধূনা, ফুল, চন্দন দিয়েও স্মরণ না করা হয়।

কবি কি প্রতিটি মানুষের মনে অমর হয়ে বেঁচে থাকবেন জেনেই এই নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গেলেন? বাইরের স্মৃতিচিহ্ন না থাকলেও দেশবাসীর মনে, তিনি তাঁর গান, রচনার ভিতর দিয়ে চিরজীবী হয়ে থাকবেন, যতদিন না বাংলা ভাষা লোপ পায়!

এখানে একটি কথা মনে এলো,—যে 'যান' তাঁর প্রিয় শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর দেহ শেষবার বহন করে নিয়ে গিয়েছে, তাঁর পুণ্য-স্পর্শে জড়িত—সেটি নাকি এখন অনাদরে অব্যবহার্য্য রূপে পড়ে আছে শ্রীনিকেতনের মাঠে। তাকে তার যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিৎ নয় কি?

( ১০ )

হঠাৎ পরিচিত হলাম, এখানকার প্রাচীনতম শিক্ষক ৺জগদানন্দ রায় মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে। বয়স সত্তরের কাছে, রোগ-শোকের ছাপ দেহে সুস্পষ্ট। সহজ, সরল, অমায়িক ব্যবহার—প্রথম পরিচয়ের পর নামটি জানতে চাওয়ায় বেশ একটু রহস্যের সৃষ্টি হয়। নাম বলতে খুবই লজ্জিত হলেন ও ইতস্ততঃ করতে লাগলেন; নানাভাবে জিজ্ঞাসায় জানলাম, বঙ্কিম-যুগের মানুষ তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেব অত্যন্ত আদরে মেয়ের নাম দিয়েছিলেন,—'দুর্গেশ-নন্দিনী'। কিন্তু পরের যুগে সে নাম অচল হওয়ায়, সংক্ষিপ্ত হয়ে দুর্গা দেবীতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঐ 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নামটিই খুব মধুর নয় কি? যাহোক,—তাঁর মুখে তাঁর স্বনামধন্য স্বর্গগত পিতৃদেবের কথা কিছু শোনা গেল।

দেশ নদীয়ায়, কৃষ্ণনগর স্কুলে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত নবীন জগদানন্দ; জটিল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সহজ, সরল মাতৃভাষায় প্রকাশ করে তখনই যশস্বী, এমন দিনে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বাস কালে একবার তাঁকে ডেকে পাঠালেন। এলেন তিনি,—অনেক আলাপ আলোচনা চললো দুজনের মধ্যে। গুরুদেবের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তাঁকে বাহিরের কর্ম্ম-পাশ ছিন্ন করে টেনে আনলো, শিলাইদহের ছোট্ট স্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষক-রূপে। এই স্কুলটিকেই বোধ হয় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের জনক বলা যায়। পরবর্ত্তীকালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ এখানে আজীবন বিজ্ঞানাচার্য্য রূপে পূজিত হয়ে, এখানেই প্রায় সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। গুরুপল্লীর নিজ বাড়ী ও জমিজমা, অকাল-বৈধব্য-বিড়ম্বিত শিশু-সন্তান-বর্তী এই কন্যাকে দিয়ে যান।

শ্রদ্ধেয়া দুর্গাদেবীর নিকট তাঁর ঊর্দ্ধতন পিতৃপুরুষের এক অপরূপ কাহিনী শোনা গেল। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর সভাসদ গোপাল ভাঁড়ের কীর্ত্তি-কলাপ কোন্ বাঙ্গালী না জানেন? সেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল একটি মাত্র কন্যা,—আদরিণী মেয়ের নাম চাঁদিনী। রূপে গুণে অতুলনীয়া, বয়সের সঙ্গে মেয়ে চাঁদের মত বতই ষোলকলায়

পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল, মহারাজাও ততই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলেন। উত্তরাধিকারিণী এমন মেয়ের উপযুক্ত বর কোথায়? মেয়ে সন্তান, বিবাহ দিতেই হবে, কিন্তু কোথায় যোগ্য পাত্র?

একটি তরুণ ব্রাহ্মণ-কুমার টোল খুলেছেন পাশের গ্রামে—মালী পোতায়,—নাম চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর ছড়িয়ে পড়তে লাগল দিকবিদিকে,—সূর্য্যকিরণের মত। গুণগ্রাহী মহারাজা তাঁকে সভাপণ্ডিতের আসনে বরণ করতে ইচ্ছুক হয়ে আমন্ত্রণ পাঠালেন।

তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ, যজ্ঞোপবীত-ধারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমার যেন অগ্নির ন্যায় জ্যোতিষ্মান, মহারাজকে কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক শুনিয়ে অভিভূত করে গেলেন। বিদ্যুৎ গতিতে মহারাজার মনে হয়, এই ত আমার চাঁদিনীর যোগ্য পাত্র, একেই আমি জামাতৃপদে বরণ করব। তারপর সংসারে অনাসক্ত জ্ঞান-যোগী ব্রাহ্মণ-কুমারটিকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে, চাঁদিনীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজের করে নিলেন।

পাঁচখানা গ্রাম জুড়ে তাদের স্বাধীনভাবে আরামে থাকার জন্ত বৃহৎ আবাস, জলাশয় ও বহু ধন-রত্ন যৌতুক দিলেন। ক্রমে এই দম্পতি অনেক পুত্র-পৌত্র রেখে পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করার পর বংশধরদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দারুণ মারামারি, বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। জগদানন্দ রায় মহাশয় ঐ বংশেরই একজন—মামলা-মোকদ্দমা ঝগড়া-বিবাদে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে অংশীদারদের নিজের সমগ্র অংশ দান করে প্রায় এক বস্ত্রে গৃহ-ত্যাগ করেন ও দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের জীবন বরণ করেন। কিন্তু অবশেষে স্বোপার্জ্জিত অর্থে শান্তিনিকেতনে ঘরবাড়ী জমিজমা সম্পত্তি সবই করেছিলেন।

দুর্গাদেবী তাঁর ১২।১৪ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে আসেন, তাঁর নিকট গুরুদেবের কথা শুনতে চাওয়ায় বললেন—'আমি তাঁকে যখন প্রথম দেখি, তখন তাঁর দেহ উন্নত, ঋজু, কাঁচা-পাকা চুল ও সামান্ত গোঁফ-দাড়ি ছিল। সাদা থান ধুতি কোঁচা ঝুলিয়ে পরিপাটি করে পরতেন, পায়ে নাগরা জুতো। অল্পবয়সী মেয়েরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে বলতেন—তোরা রাঁধতে পারিস ত? ভাল করে রান্না শিখিস। 'মহিলারা লাউঘণ্ট, শুক্তানী প্রভৃতি খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জন রেঁধে পাঠালে খুব খুসী হতেন, ও অল্প অল্প খেয়ে দেখতেন।'

দুর্গাদেবীর ছোট বয়সেই বিয়ে হয়েছিল, যশোর জেলার কোনো গ্রামে। কিছুদিন শ্বশুর-বাড়ী থেকে, তিনি যখন শান্তিনিকেতনে আসতেন ও গুরুদেবকে প্রণাম করতে যেতেন, তিনি রহস্ত করে বলতেন—'আমারও শ্বশুরবাড়ী যশোর জেলায়। ওখানে ভৈরব নদ, কপোতাক্ষ নদী আছে, না রে,—ভারী সুন্দর! ও দেশের রান্না বড় ভাল, আর বড়ি, আমসত্ত্বের তুলনা হয় না, ওখান থেকে যখন আসবি আমার জন্ম বড়ি, আমসত্ত্ব নিয়ে আসিস—কেমন?'

সন্ত-বিবাহিতা ছোট মেয়েটি ঘাড় দুলিয়ে বলত—তা যাই বলুন, ওদেশে যত নদ-নদীই থাক আর রান্না যতই ভাল হোক, আমার কিন্তু এই শান্তিনিকেতনই বেশী ভালো লাগে।

প্রাণ খোলা হাসি হেসে তিনি বলতেন,—ঠিকই বলেছিস, আমাদের এই শান্তিনিকেতনই সব চেয়ে ভাল।

একটি ছোট ঘটনা তাঁর মুখে শুনলাম। ঘটনাটি ছোট কিন্তু এর ভিতর দিয়ে কবির দরদী-মনের খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়।

মালদহের এক জমিদারের পাঁচ ছয় বৎসরের অনধিক একটি শিশুপুত্র শান্তিনিকেতনের শিশু-বিভাগে ভর্তি হয়ে খেলাধূলা, মনের আনন্দে দিন কাটায়; তার জন্মদিনে তার বাবা প্রচুর দই সন্দেশ মিষ্টি-মিঠাই লোক-মারফত আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। বোধহয় কোন অনিবার্য্য কারণে নিজেরা আসতে পারেননি। সেদিন আশ্রমে আনন্দের সাড়া জাগল,—শিশুটিকে কেন্দ্র করে সকলেই পেট ভরে মণ্ডা মিঠাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। ছেলেটিও সকলের সঙ্গে আহার-বিহার আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটায়। রাত্রে শোবার ঘণ্টা পড়লে সকলেই যে যার শয্যায় আশ্রয় নিল।

রাত্রি অনেক,—গুরুদেব কিছুতেই বিশ্রাম নিতে পারছেন না, মন চঞ্চল হয়ে উঠল। অতরাত্রে দেহলির উপর থেকে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বীথিকার পাশ দিয়ে, প্রায়ান্ধকার শিশু-বিভাগে ঢুকলেন। গ্রীষ্মকাল, দরজা খোলা, শিশুরা সারি সারি মশারী খাটিয়ে তার নীচে ঘুমে অচেতন। গুরুদেব আস্তে আস্তে চলে গেলেন পূর্ব্বোক্ত শিশুটির পাশে, খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকার পর শুনতে পেলেন, মশারীর ভিতর থেকে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ! শিশুটির অত রাত্রে মা বাবার কথা মনে পড়ে চোখের জলে বালিশ ভিজছে। গুরুদেব জননীর স্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে, গল্প বলে, ঘুম পাড়িয়ে, তবে সেখান থেকে এলেন। শিশুটির অন্তর্বেদনা কি তাঁর অন্তরকে এতই স্পর্শ করেছিল যে, গভীর রাত্রে তাঁকে অতদূরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল?

[ ক্রমশঃ।

# বিগতা

## কৃতী সোম

এখনো কেন আবারো কেন
স্মৃতির ভাঁড় চাখো?
অতীত এবং বর্ত্তমানে
গড়ছ ভাঙা সাঁকো?
সে-চোখে আজ সে-মুখে আজ
ঝরে কি চুনী পান্না?
তোমার কথা ভেবে সে-মন
কাঁদে তো আর-না।

রাতভর তো মেঘের মতো
আরেক বুকে গলে
তোমার বুক জ্বালিয়ে দিয়ে
ব্যথার দাবানলে।
নেশার মতো তবুও কেন
জড়ায় তার কথা
মনের ভাঁজে, সে তো আজ
স্বপ্ন এক, গতা।

# বিদ্রোহী বিশ্বনাথ

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

**হারাধন দত্ত**

বিশ্বনাথের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি বৈদ্যনাথ ঘোষকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এই বৈদ্যনাথের বাসস্থান সম্ভবত কৃষ্ণপুরে ছিল। কৃষ্ণপুর আজিও গোপ-অধ্যুষিত। বৈদ্যনাথ জাতিতে গোয়ালা ছিল। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বৈদ্যনাথকে বাগ্‌দী বলেছেন—এ উক্তিও ভ্রমাত্মক। বিশ্বনাথের অন্য অনুচরদের মধ্যে পীতাম্বর, মুসলমান মেঘা, কৃষ্ণসর্দার, সন্ন্যাসী, নলডুবো প্রধান। এই নলডুবো সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। নলডুবো সম্পর্কে নানা কাহিনী দিগ্‌নগর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ১৩ অন্যত্র সরকারী বিবরণে দেখি—"Naldaha as his name inplied, had the faculty of diving and remaining under water for a long time." ১৪

বিশ্বনাথ দস্যুদলপতি হয়ে প্রথমেই তার প্রণয়ীর হত্যাকারী মেঘাইকে জব্দ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। বিশ্বনাথ মাঝে মাঝে পাঁচকড়ি সর্দারকে অপদস্থ করার চেষ্টা করতো। কিন্তু ভাগিনেয় মেঘাইয়ের সহায়তায় সে প্রায় অজেয় ছিল। উভয়ের মনোমালিন্য ক্রমশঃ বেড়েই চলে। পাঁচকড়ি নীলকুঠীর বলে বিশ্বনাথ ও তার দলবলকে গ্রাহ্যই করতো না। মেঘাইকে একা রেখে একদা পাঁচকড়ি কৃষ্ণনগরে যাত্রা করে। এই অবসরে বিশ্বনাথ মেঘাইকে বন্দী করে। জনশ্রুতি, আসাননগরের নিকটবর্তী পঞ্চাননতলায় মেঘাইকে প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্বনাথের আরাধ্যা দেবী কালীর নিকটে বলি দেওয়া হয়। পীতাম্বর শতেক দুন্দুভির মরণবাদ্যের মধ্যে মেঘাইয়ের শিরশ্ছেদ করে। এই পীতাম্বরকেও পাঁচকড়ি কোন স্ত্রীলোকের গৃহে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। পাঁচকড়িও মনে মনে সঙ্কল্প করে, যে-কোন প্রকারে হোক বিশ্বনাথকে সে অবলুপ্ত করবেই। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকদের সহায়তায় সে বিশ্বনাথ ও তার দলবলকে ধরিয়ে দেয় ও তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে।

বিশ্বনাথ অচিরে 'বিশে ডাকাত' নামে সারা বাংলাদেশে অভিহিত হলেন। দেশ ও দেশান্তরে তার লুণ্ঠন কার্য্য অব্যাহত হয়ে চলল। নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তিনি আস্তানা করলেন। জগতি, দেবীপুর, মেহেরপুর, স্বরূপগঞ্জ, নৈহাটী, সোমড়া, ত্রিবেণী, নাকাশীপাড়া, কালনা, দিগ্‌নগর প্রভৃতি স্থানে বড় বড় ও লোমহর্ষক লুণ্ঠন কাহিনীর কথা দেশবাসী বিস্ময়ের সংগে শ্রবণ করল। কোম্পানীর কুঠী লুণ্ঠনও অব্যাহত থাকল। শান্তিপুরে কোম্পানীর কুঠী-লুণ্ঠন এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়ের ছিল দেশ জোড়া খ্যাতি। তখন কোম্পানী প্রচুর কাপড় সওদা করত শান্তিপুর থেকে। এজন্য শান্তিপুরে কোম্পানীর একটি কমারশিয়াল রেসিডেন্সী স্থাপিত হয়। এই রেসিডেন্টের মাহিনা ছিল বছরে ৪২,৩৫১ টাকা। Imperial Gazette of Indiaর দশম খণ্ডের একস্থলে আছে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কমারশিয়াল এজেন্ট কর্তৃক শান্তিপুর থেকে বছরে দেড়লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের তাঁতবস্ত্র বিলাতে চালান যেত। বিশ্বনাথ বিপুল বিক্রমে শান্তিপুরের এই কুঠী আক্রমণ করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। এছাড়া মুর্শিদাবাদের ধনী সওদাগর সায়েস্তা খাঁর কর্মচারী মহম্মদ মোবারিক ও বদপুর কাছ থেকে নদীয়া জেলার সীমানায় তেরো হাজার টাকা লুণ্ঠন সমগ্র দেশে ত্রাসের সঞ্চার করে। হুগলীর সোমড়া ও ত্রিবেণীর লুণ্ঠনকাহিনী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সুন্দর বিবৃত করেছেন। ১৫ উইলিয়াম হাণ্টার কালনার নন্দীবাড়ী লুণ্ঠনের কথা তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ১৬ এছাড়া বিভিন্ন নীলকুঠী লুণ্ঠনের ইতিহাস বিভিন্ন গ্রন্থ ও সরকারী বিবরণে স্থানলাভ করেছে। এই সকল দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনের ইতিহাস আমরা এখানে সবিস্তারে আলোচনা করার পক্ষপাতী নই। বিশ্বনাথের এই ভয়াবহ অভ্যুত্থানে দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। কিন্তু বিশ্বনাথের এই অত্যাচারের মধ্যে একটা উদারতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সেকালের গোঁড়া সমাজ নেতারা বিপদের আশঙ্কায় দিন গুণতে লাগল। গরীব দুঃখীরা কিন্তু ততটা বিচলিত হয়নি। তাঁর দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপে মহত্ব, দেশপ্রীতি, দানশীলতা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, শিশুর প্রতি দয়া ও অনুকম্পা দরিদ্রের প্রতি অবিমিশ্র সহানুভূতি প্রভৃতি গুণ ও চরিত্র-মহত্ব তাঁকে মনুষ্যত্বের গরিমায় মণ্ডিত করে। মানুষ যেখানে নির্যাতিত হয়েছে—নারীর সম্ভ্রম যেখানে উপেক্ষিত হয়েছে—ঐশ্বর্য্যশালীর অত্যাচার যেখানে স্পর্দ্ধিত হয়েছে—দারিদ্র্যের তাড়নায় যেখানে অশ্রু বিগলিত হয়েছে—সেইখানেই বিশ্বনাথ উপস্থিত হয়েছেন। সেজন্য এই দস্যু বিশ্বনাথকে দেশের লোক 'বিশ্বনাথবাবু' বলে ডাকত। সেদিনকার বিদেশী ইতিহাসকারগণ বিশ্বনাথের চরিত্রের ঐ মহত্বকে মর্য্যাদা দেননি।

বিশ্বনাথ কখনও অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেন না। ধনী ব্যতীত দরিদ্র গৃহী ও পথচারীর ক্ষতি কখন তাঁর দ্বারা হয়নি। কোন স্থলে লুণ্ঠন করবার পূর্বেই বিশ্বনাথ পূর্বাহ্ণে সংবাদ পাঠিয়ে দিতেন। Hunter সাহেবও লিখেছেন—"Biswanath Babu exercised his vocation in broad day light, sending previous notices of his designs to those whom he intended to plunder, provided his demands were not complied with." নারীর প্রতি বিশ্বনাথের শ্রদ্ধার ইয়ত্তা ছিল না। বিশ্বনাথ একবার দিগনগরের ঐশ্বর্য্যশালী চক্রবর্তীদের গৃহ আক্রমণ করেন। এই সময়ে বিশ্বনাথের

---

১৩ বিশ্বনাথ উপন্যাস।

১৪ Statistical Account of Nadiya—W. W. Hunter.

১৫ শিশুসাথী। পৌষ—১৩৬৫।

১৬ Statistical Account of Nadia. P-159.

শিষ্য বৈদ্যনাথ একজন মহিলাকে তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে এবং তার কোলের শিশুকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে বিশ্বনাথ বিচলিত হন এবং মুহ্যমান হয়ে পড়েন। পরে বৈদ্যনাথকে তিরস্কার করে বলেন "তুই কি মা'র পেটে জন্মাসনি।" নীলকুঠী আক্রমণ কালে Mrs. Fady এবং সোমড়ার বিধবা মেয়েটির উপর তিনি যে উদারতা প্রদর্শন করেন—তাও তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বব্যঞ্জক। এছাড়া ঐতিহাসিক কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় লিখেছেন—"এই সুবৃহৎ দলের প্রত্যেকের উপর তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বর্তমান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল যেন কেহ কদাচ স্ত্রীলোক, শিশু ও গোজাতির উপর কোন অত্যাচার না করে।"১৭

বিশ্বনাথ ছিলেন কালীভক্ত। বাল্যকালে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে অনুরক্ত হন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাক্তধর্মই তাঁর উপাস্য হয়। তাঁর পূজার্চনার কেন্দ্রটি আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী কামাখ্যাচরণ নাগের জন্মভূমি চন্দননগর ও শিক্ষাব্রতী রাধাকান্ত ভাদুড়ীর স্মৃতি-বিজড়িত শোনগর্চ্চা গ্রামের নিকটেই বিশ্বনাথের কালীপূজার স্থানটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সাম্প্রতিক কালে ইহা 'কালীতলা' নামে সমধিক প্রচারিত। স্থানটি কৃষ্ণনগর—কৃষ্ণগঞ্জ বাসরুটের উপর অবস্থিত। কালীতলার সন্নিকটেই সুবৃহৎ জলাভূমি—নাম, ডাকাতেগাড়ি। সম্ভবতঃ বিশ্বনাথ মৃতদেহগুলি এখানকার জলে নিক্ষেপ করতেন কিংবা লুকিয়ে রাখতেন। সেজন্যই এ জলাভূমির নাম ডাকাতেগাড়ি। বিশ্বনাথের পুণ্যস্মৃতির সংগে এগুলি চির বিজড়িত। নিশীথ অভিযানে যাত্রা করার পূর্বে বিশ্বনাথ ও তাঁর সম্প্রদায় কালীর পাদপদ্মে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করতো। লুণ্ঠিত অর্থের অধিকাংশই তিনি শারদীয়া পূজায় ব্যয় করতেন। বিশ্বনাথ মহাসমারোহে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা উৎসব করতেন। এ সময়ে তিনি নিজের মা'কে একবার দর্শন করতেন। এই উপলক্ষে বিশ্বনাথ স্বহস্তে বৃদ্ধ, শিশু ও দারিদ্র্যদুষ্ট দেশবাসীদের অন্নবস্ত্র-বিতরণ করতেন। বিজয়া দশমী উপলক্ষে নাকাশীপাড়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গল ব্রাহ্মণীতলায় বিশ্বনাথ ও তাঁর সম্প্রদায় মহাসমারোহে একত্রিত হতেন এবং ধুমধামের আয়োজন থাকত।

এদের রণকৌশলও ছিল। বিশ্বনাথ সাধারণতঃ পাল্কী, পানসী, কিংবা রণপা সহযোগে লুণ্ঠনে যেতেন। রণযাত্রার পূর্বে তাঁর সম্প্রদায় কালি-আলকাতরা, সাদা রং ও সিন্দুরে মুখমণ্ডল রঞ্জিত করে নিত। শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকেরা প্রজ্জ্বলিত মশালে শোভিত হত। যুদ্ধক্ষেত্রের সমীপবর্তী হওয়ার পূর্বেই তাঁর দলবল সমস্বরে গগন-বিদারী এক বীভৎস চীৎকারে গৃহীকে সচকিত, ভীতি-বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলত। এই শব্দের প্রতিধ্বনিতে নিস্তব্ধ আকাশ বিকট শব্দ-তরঙ্গে মথিত হোত। গৃহস্বামীর বুকের রক্ত ভীতিতে হিমশীতল হয়ে উঠত। এই শব্দ "ডাকাতের কুলকুলি" নামে খ্যাত! বিশ্বনাথ এই প্রণালীতেই যুদ্ধযাত্রা ও লুণ্ঠনকার্য্য চালাতেন।

ইংরেজ আমলের সেই উষালগ্নে আমাদের দেশে নীলকরদের খুব প্রভাব ছিল। নীলকরদিগকে জমিদারী ইজারা দেওয়া হোত। ইজারা দিতে জমিদার বাধ্য হতেন। আইনে সুবিচার ছিল না। যে অপরাধে দেশীয় জমিদারেরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতেন—সেই অপরাধে ইউরোপীয় নীলকরেরা মুক্তিলাভ করতো। সামান্য কারণে চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলত। খুন, দাঙ্গা হাঙ্গামা ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। নীলকরেরা যে কত নিরীহ চাষী ও কত নিঃসহায় স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করেছে, তার সীমা-সংখ্যা ছিল না। নরহত্যার অপরাধে কোন নীলকর সাহেবের দণ্ড হয়েছে—ইতিহাসে এমন নজির নেই। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত নীলকর-সাহেবরা। বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা, নিরীহ প্রজাদের কয়েদ করবার ত' অবধিই ছিল না। নীলকরদের অত্যাচারে সেকালের বাংলাদেশ ত্রাস্ত হয়ে উঠেছিল। আর এই নীলচাষের বেশী প্রচলন ছিল নদীয়া ও যশোহর জেলায়। নদীয়া যশোহরের পল্লীপুরে আজও নীলকরদের অত্যাচারের কথা প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে শোনা যায়। বিশ্বনাথের অভ্যুত্থান ভূমিতে—বিশেষ করে চূর্ণীর তীরে তীরে—হাঁসখালী, ময়ূরহাট, কৃষ্ণপুর, বাবলাবন, রাণীনগর, চন্দননগর, চৌগাছা, খালবোলিয়া, গোবিন্দপুর, গোপালপুর, আসাননগর প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে সুবৃহৎ অট্টালিকাময় নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ আজও চোখে পড়ে। এক সময়ে এই সমস্ত অঞ্চলে যে নীলকর সাহেবদের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ছিল, এই সমস্ত পুরা স্মৃতি হতেই তা অনুভব করা যায়। এই নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সেকালে কেউই ছিলনা। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের অস্তিত্বই ছিল না। ১৮৪৫ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নীল আন্দোলন ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং ১৮৬০ এর দিকে নীল আন্দোলন সার্থকতা লাভ করে। বিশ্বনাথ সর্দারকে বাংলাদেশে নীল-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও প্রথম পথিকৃৎ বলে আমি অভিহিত করতে চাই। উনবিংশ শতকের প্রথম দশক। সেকালে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন একপ্রকার অবাস্তব ছিল। বিশ্বনাথ এককভাবে সেকালের এই দুর্দ্ধর্ষ অপ্রতিহত নীলকরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করে নীল আন্দোলনের প্রথম শহীদ হন। ডাকাত হিসাবেই আমরা বিশ্বনাথের গল্প শুনে এসেছি—কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথমদশকে তিনি নানাক্ষেত্রে বাংলাদেশের লাঞ্ছিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইংরেজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। বিশ্বনাথ বাংলায় নীল-আন্দোলনের প্রথম অগ্রপথিক—এবিষয়ে মতান্তর হওয়ার অবকাশ নেই। এটাই বিশ্বনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—বিশ্বনাথ বিদ্রোহী।

উনিশশতকের প্রথম দশকের শুরুতেই বিশ্বনাথের ক্রিয়াকলাপ নীলকুঠী লুণ্ঠনের মধ্যে সীমিত ছিল। নীলকর সাহেবদের জব্দ করা তাঁর অন্যতম প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়েছিল। সেকালের সরকারী বিবরণে এই সমস্ত কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ আছে। "In the course of a report upon the police submitted by Mr. Secretary Dowdeswell in 1809 abstracts are given of three Nadia cases which had recently came before the Calcutta Court of circul. A short account of these cases may be given, as it is concerned with the last exploit of famous outlaw, by name Biswanath Sarder, who for years terrorised the district."১৮ তখন নদীয়ায় স্যামুয়েল

১৭ নদীয়া কাহিনী। পৃ-৬০।

১৮ Nadia Gazette. P. 29

ফেডী নামক এক পরাক্রান্ত কুঠিয়াল ছিল। ফেডীর নীলকুঠী তদানীন্তন জেলাশাসক মিঃ ইলিয়টের বাংলোর পাশে ছিল। চাপড়া থানার পলদা বিলের কাছে ঝাউতলায় যে ভগ্নপ্রায় নীলকুঠী আছে, অনেকে এই কুঠীকেই ফেড়ীর নীলকুঠী বলে মনে করে থাকেন। বিশ্বনাথ একদা এক দিপালীরাত্রে এই নীলকুঠী আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেন। এই আক্রমণে ফেডীর অনেক অনুচর নিহত হয়। মিসেস ফেডী পুষ্করিণীতে মাথায় কালো হাঁড়ি চাপা দিয়ে জীবনরক্ষা করেন। বিশ্বনাথ এই ইংরাজ মহিলার জীবন রক্ষার্থে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বিশ্বনাথের আদেশে মেঘা ( বিশ্বনাথের মুসলমান অনুচর ) মিঃ ফেডীকে বাগ্‌দেবীখালের তীরভূমিতে এক জঙ্গলে আনয়ন করে। বিশ্বনাথের দলবলের সকলেই ফেডীর প্রাণদণ্ড কামনা করে। বিশ্বনাথ এদের কথায় কর্ণপাত করেননি। ইংরেজ হত্যার পরিণতির কথা চিন্তা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ফেডী সকাতরে সেদিন প্রাণভিক্ষা করেছিল এবং বিশ্বনাথের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিল—জীবনে সে এই কাহিনী কোথাও প্রকাশ করবেনা। কিন্তু মুক্তিলাভ করার পরই বিশ্বাসঘাতক ফেডী বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দেয় এবং বিশ্বনাথসহ কয়েকজন অনুচরকে দিনাজপুর জেলে প্রেরণ করা হয়।

বিশ্বনাথ সেই জেল হতে অনুচর-বৃন্দসহ মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হন এবং ফেডীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর হন। এ সম্বন্ধে Hunter এর Statistical Account of Nadia, নদীয়া কাহিনী, প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে। Nadia Gazette'এ দেখা যায়—The gang then determind to wreck their vengeance upon him and between 3 and 4 A.M. on 27th Sept. 1808, they attacked Mr. Faddy's house. He and Mr. Lediard were awakened by the report of a gun fire and on rising, found the house sourrounded by dacoits who in spite of all resistane ( in course of which one of the gang was shot dead ) forced their way into the Bunglow from all sides and then seized Mr. Faddy after a considerable struggle in which he was strangled. Mr. Lediard's gun having repeatedly missed fire, he received a severe spear-wound in his breast and was disabled from further resistance. Biswanath then called upon Mr. Faddy to deliver his head Paik, who appeared to be the immediate object of the vengeance of the gang, and to point out where his own money was. The dacoits repeatedly dragged Messrs. Faddy and Lediard to a short distance from the house, treating them with great insult and indignity, some proposing to put them to death and others to cut off their ears and nose. At the approach of the day the dacoits returned carrying their all the arms in the house, about Rs. 700 in cash and other property to a considerable amount."

এরপর বিশ্বনাথ পলায়ন করেন। তাঁকে অনুসন্ধান করার জন্য বৃটিশ শাসকগণ তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু বিশ্বনাথের সন্ধান মেলে না। এই সময় বাংলা সরকার Mr. Blaquiere নামক একজন ইংরেজকে নদীয়ার জেলাশাসক ইলিয়টের সহকারীরূপে—আরও সশস্ত্রবাহিনীসহ প্রেরণ করেন। শান্তিপুরের সন্নিকটস্থ মুসলমান সম্প্রদায় ব্ল্যাকওয়ারকে সহায়তা করে। কৃষ্ণনগরে এক লুণ্ঠনকালে—এই মুসলমান সম্প্রদায়ের সহায়তায় বিশ্বনাথের কয়েকজন সহকর্মী বন্দী হন। বিশ্বনাথ সেবারেও পলায়ন করলেন। অনুসন্ধান আরও তীব্রতর হয়ে উঠল। এই সময়ে বিশ্বনাথের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাঁচকড়ি সর্দার ও তাঁর অন্যতম অনুচর বৈদ্যনাথ ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতায় বিশ্বনাথের গোপন আস্তানার কথা ইংরেজ শাসকদের অজানা রইল না। শান্তিপুরের মুসলমান সম্প্রদায় এবং পাঁচকড়ি ও বৈদ্যনাথের সহায়তায় কুলিয়ার নিকটবর্তী এক অরণ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজরা বিশ্বনাথ ও তাঁর সঙ্গীগণকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। এই সময় বিশ্বস্ত অনুচর মেঘা বিশ্বনাথের হস্তে এক তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রদান করতে অগ্রসর হয়! কিন্তু বিশ্বনাথ সেদিন অস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করেননি। তাঁর অনুচরবর্গকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার আদেশ দিয়ে নিজেই ধীর, শান্ত, উন্নত বীরপদক্ষেপে ফেডীর সম্মুখে উপস্থিত হন এবং বলেন "ফেডী, তুমি তোমার প্রতীজ্ঞাভঙ্গ করে এক মহা অপরাধ করেছ—আমি আজ পর্য্যন্ত কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিইনি—যা করেছি আমার দেশের অগণিত অত্যাচারিত মানুষের কল্যাণেই করেছি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি এই ভালবাসা যদি অন্যায় হয়—তাহলে যে কোন প্রকার শাস্তি আমি সহাস্যে গ্রহণ করবো।" এই সদর্প বক্তব্যেই তিনি জেলাশাসক ইলিয়টের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বিশ্বনাথ মৃত্যুকালেও যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তা সত্যকার বীর ও বিদ্রোহীর পক্ষেই সম্ভব। বিশ্বনাথের বিশ্বস্ত অনুচর কিন্তু এই কাফেরদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। চিরজীবনের সাথী সেই তীক্ষ্ণধার অসিফলক আপনার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে মেঘা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। পরে বিশ্বনাথের অনুচরগণও বৈদ্যনাথ ও পাঁচকড়িকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। বিশ্বনাথের বিচার হয়। বিচারে বিশ্বনাথ অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নিজ গ্রামের মাঠেই তাঁর ফাঁসি দেওয়া হয়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—"ঠগবগের খালের মাঠে বাঁশবেড়িয়া কুঠীর দক্ষিণে ফাঁসি হয়। সে ফাঁসি-কাঠ আজও রহিয়াছে।" কেউ বলেন গঙ্গার তীরভূমে ব্রাহ্মণীতলার মাঠে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।" Hunter সাহেব লিখেছেন—"Biswanath and a dozen of his companions were tried, convicted and capitally sentenced, they were hung on scaffold on the riverside. Tkis corpses were caged and suspended from a Bat tree (Ficus Indica) for public exhibition and as a warning to the evil-doers."[১১]

[১১] Statistical Account of Nadia, p, 161

বাংলার নীল আন্দোলনের উষালগ্নের এই অগ্রপথিকের দুঃসাহসিক বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণাস্থল হয়েছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়, সেকালের নীল আন্দোলনের উপর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি বিশ্বনাথকে নীল আন্দোলনের অগ্রপথিকের সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু বিশ্বনাথ সম্বন্ধে তাঁর লিখিত পরিচয় সর্বাংশে সত্য নয়। অনেকাংশে কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক। বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথকে তিনি বাঁশবেড়ের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। এই উক্তি সত্য নয়। এছাড়া তিনি নীল আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ নেতা বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসকে এই বিশ্বনাথ কাহিনীর সংগে যুক্ত করেছেন।২০ চৌগাছার পটভূমিকায় বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাসের নীল আন্দোলনের কাহিনী আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।২১ ১৮৪১ সালে বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস নীল আন্দোলনের অন্যতম বার্তাবাহী হিসাবে দেখা দেন। এই সময়ের বহু পূর্বেই বিশ্বনাথের ফাঁসি হয়। বিশ্বনাথ, বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বরের পাইক বাহিনীর সংগে যুক্ত ছিলেন—লেখকের এই উক্তিও যুক্তিহীন এবং কাল্পনিক।

বিশ্বনাথের এই শোচনীয় পরিণতিতে চূর্ণীতীরের নদীয়ার জনপদ বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। গল্প, উপকথা, গাথা ও পল্লীগীতিতে বিশ্বনাথের অমর-কথা কাহিনী লালিত হতে থাকে। বিশ্বনাথের আবির্ভাবে নদীয়ার নীলকর সাহেবরা ক্ষণকালের জন্য শান্ত হয়েছিল। বিশ্বনাথের মৃত্যুর সংগে সংগেই নীলকরেরা আবার রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। আজও নদীয়ায় চূর্ণীতীরের পল্লীছায়ায় পল্লীগায়ক ও চারণের গানে তার বীরত্ব গাথা নিয়ত গীত হয়ে থাকে। ডাকাতে-গাড়ি, কালীতলা ও আসাননগর অঞ্চলে আজও একটি প্রবাদ কথা পল্লীবৃদ্ধ ও পৌরজনের মুখে শোনা যায়—

> ওরে রফি দেখে যা কি দশা যে হোল,
> আসানগরের মাঝে আশা ফুরাইল।

সেদিনও আধুনিক বাংলা কাব্যের এক খ্যাতিমান কবি বিশ্বনাথের নাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করে তাঁকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে রেখেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নদী চূর্ণীর কথা ভাবতে গিয়ে চূর্ণীতীরে বিদ্রোহী বিশ্বনাথের কথা স্মরণ করেছেন। কবির কয়েকছত্র রচনা এখানে উদ্ধৃত করে বিশ্বনাথ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

> তরুণী না বক্ষতরণী পণ্যের ভারে গর্বিত,
> পূজা শেষ তবু পুষ্পাঞ্জলি দেখিছ হতেছে অর্পিত।
> কূলে কূল তব দস্যুর থানা, আনন্দ ছিল মন্দনা—
> করি আমি দেবীচৌধুরাণীর এ জল মূর্তি বন্দনা।
> আবার তোমার ঘাটে ঘাটে পাট, বাজে মৃদঙ্গ নিত্য যে,
> রচিয়াছ বটে কতই নগরী, রচেছ কতই তীর্থ যে।
> বিশে বদে রানা বিষম দাপটে করিল ও নীর কম্পিত,
> মানুষে মানুষে বিবাদ দেখেছ, দেবতা মানুষে সংপ্রীত।২২

২০ বাংলার নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী-সমাজ।
২১ রবিবাসরীয় আলোচনা, আনন্দবাজার। ১০ই বৈশাখ ১৩৬৮।
২২ কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা। (চূর্ণীতীর)

## রৌদ্রদগ্ধা

### শিবদাস চক্রবর্তী

মনের সমস্ত কথা বলা হয়ে গেলে,
মুখোমুখী বসে-থাকা স্তব্ধ অবসর
সহসা যেমন করে হয়ে ওঠে ভারী
অনির্দেশ্য বেদনায়,—
রৌদ্রদগ্ধা এ পৃথিবী ঠিক সেইভাবে
চেয়ে আছে বৃষ্টি-হারা আকাশের দিকে
নিষ্ফল প্রার্থনা শেষে নিরুপায় প্রার্থীর মতন।
তৃষ্ণায় কাতর কণ্ঠ, সারা দেহ উত্তাপে জর্জর
নিদ্রাহীন দুই চোখ দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে পাণ্ডুর
আশ্বাসের ছায়া নেই, খাঁ খাঁ করে আরক্ত রৌদ্দুর
আকাশে বর্ষণহীন গর্বিত গর্জন।
দেয়নি সে কোন কিছু তবু সে করেনি প্রত্যাখ্যান—
সাময়িক কালো মেঘ মাঝে মাঝে আনে এ বিশ্বাস;
কদাচিৎ চকিত তড়িৎ
জাগায় মনের কোণে
পূর্বতন দাক্ষিণ্যের প্রায় ভুল-হয়ে-যাওয়া স্মৃতি।
দহন অনেক হলো, সমাগত ফসলের দিন,
তবু কি আগের মতো এখনো সে রবে উদাসীন?

## পরিক্রমা

### বিদ্যুৎ কুমার দে রায়

অনেক শহর অনেক শহর
দেখে দেখে হয়রান,
অনেক পথের পীচ বাঁধা বুক
করছে এখনও গান।
অনেক আলোর রঙীন রেশন
তীব্র সঙ্গোপনে
টানবে হয়তো কোনো ইঙ্গিতে
অথবা সে নির্জনে;
দেখেছি দেখেছি শহরের লোক
ট্রাম বাস রেলগাড়ি,
কিন্তু এসব মনে হয় মিছে
প্রাণ হয়ে ওঠে ভারি।
কারাগার যেন প্রাসাদের সীমা
নিষ্ঠুর অভিলাষে
সাজায় নিত্য প্রাণের পশরা
সব সেকি উচ্ছ্বাসে।
তাই তো এখন মন
চায় শুধু নির্জন।

# প্রাচীন ভারতের কামান ও বারুদ

উশাকর

প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের অন্যতম কারণ, তিনি যুদ্ধে কামান ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ভারতে পাণিপথের যুদ্ধেই প্রথম গোলা-বারুদের ব্যবহার হয়। তাহা ছাড়া এইরূপ একটা প্রবাদও আছে যে, নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্র ভারতের মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া বৌদ্ধধর্ম রক্ষা করিবার জন্য বারুদ ও পটকা (ভিন্দুক গোলক) প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিবার জন্যই প্রধানতঃ তিব্বতে যান। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশেই প্রথম বারুদের আবিষ্কার হয় এবং তিব্বতীয়গণ চৈনিকগণের নিকট হইতেই বারুদ ও পটকা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু একথা অনেকে বিশ্বাস করিবেন না যে, চৈনিকদেরও বহু পূর্ব্বে ভারতীয়গণ বারুদ আবিষ্কার করিয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে আগ্নেয় যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। অগ্নিপুরাণের মধ্যে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে অস্ত্রসকলকে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা:—যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত। এ সকল অস্ত্র ভিন্ন আগ্নেয় অস্ত্রেরও উল্লেখ আছে। যদিও ঐ সকল অস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। উইলসন্ সাহেব 'শতঘ্নী' নামক অস্ত্রকে আগ্নেয় অস্ত্র অনুমান করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন হিন্দুগণ মহাযন্ত্র নামক একপ্রকার আগ্নেয় যন্ত্র যুদ্ধকালে ব্যবহার করিত। শুক্রাচার্য্য প্রণীত শুক্রনীতি নামক সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রে নালিক ও বারুদের বিষয় উল্লেখ করা আছে এবং বারুদ প্রস্তুত প্রণালীও লিপিবদ্ধ আছে। এখানে নালিক ও অগ্নিচূর্ণ সম্বন্ধে শুক্রনীতির কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করিলাম।

(নালিক যন্ত্র)

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধ্বং ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চ বিতস্তিকম্।

নালিক দুই প্রকার। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র; কিঞ্চিৎ বক্র এবং উর্দ্ধ অর্থাৎ লম্বা ও পঞ্চ বিতস্তি (বিতস্তি শব্দের অর্থ অর্দ্ধহস্ত) পরিমাণ ও মূলস্থানে ছিদ্রযুক্ত।

মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবচূর্ণধৃক্ মূলকর্ণকম্।

তাহার মূলে এবং অগ্রে লক্ষ্যভেদ-সূচক দুইটি তিলবিন্দু থাকিবে এবং মূলে ছিদ্রস্থানে কর্ণ অর্থাৎ কাণ থাকিবে; অগ্নিজনক প্রস্তর সেই স্থানে যন্ত্রাবদ্ধ থাকিবে।

সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলি বিলান্তরম্।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণ সন্ধাত্রী শলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্।

এই নালিকাস্ত্রটি উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গে গ্রথিত এবং তাহার মূল ধারণ করিবার স্থানও কাষ্ঠনির্ম্মিত। মধ্যম অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয় এইরূপ বিল অর্থাৎ মধ্যে ছিদ্র থাকিবে। তাহার গাত্রে অগ্নিচূর্ণের সংঘাতকারী শলাকা আবদ্ধ থাকিবে।

লঘু নালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ।
যথা যথাতু ত্বক্ সারং যথাস্থান বিলান্তরম্।
যথা দীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদী তথা তথা।

ইহার নাম লঘুনালিক। ইহা পদাতি সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্যেরা ধারণ করিবে। এই লঘুনালিকের বেধ যেমন মোটা হইয়া থাকে, ছিদ্রও তেমনি লম্বা ও দূরভেদী হইয়া থাকে।

মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্য সম সন্ধানভাজিযৎ।
বৃহন্নালিক সংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠবুধ্ন বিবর্জ্জিতম্।

এইরূপ নালিক যন্ত্র যদি বড় হয় এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত বুধ্ন অর্থাৎ মূল বা ধরিবার স্থান না থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম বৃহন্নালিক।

প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্।

ইহা এত বড় হইতে পারে যে, ইহাকে শকটাদি দ্বারা বহন করিতে হয় এবং ইহা বিজয়প্রদ শোভন-অস্ত্র। পাঠকগণ লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে, তাৎকালিক লঘুনালিক এবং বৃহন্নালিক বর্ত্তমান কালের গাদা-বন্দুক ও গাদা-কামান প্রায় একই বস্তু।

সুবর্চিলবণাৎ পঞ্চপলানি গন্ধকাৎ পলম্।
অন্তর্ধূম বিপক্কার্কস্নুহ্যাদ্যঙ্গারতঃ পলম্।
শুদ্ধা সংগ্রাহ্য সঞ্চূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেদ্রসৈঃ।
স্নুহ্যর্কাণাং রসোনস্য শোধয়েদাতপেন চ।
পিষ্ট্বা শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ খলু।

সোরা ৫ পল, গন্ধক ৫ পল, ধূমবদ্ধ করিয়া দগ্ধ করা আকন্দ্য হী অর্থাৎ সীজ প্রভৃতি কাষ্ঠের কয়লা ১ পল, সংশোধিত ও চূর্ণ করিয়া তাহা সীজ কি অর্করসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। পরে তাহা শর্করার ন্যায় চূর্ণের নাম অগ্নিচূর্ণ। ইহা নালাস্ত্রে ব্যবহার করিতে হইবে। তাৎকালিক অগ্নিচূর্ণ এবং বর্ত্তমান কালের বারুদের মধ্যে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, অগ্নিচূর্ণে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার হইত, বর্ত্তমান কালের বারুদেও সেই সকল দ্রব্যই ব্যবহার হয়, কেবল যা ভাগের তফাৎ।

গোলো লৌহময়ো গর্ভ গুটিকঃ কেবলোঽপিবা।
সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতুময়োঽপিবা।
লৌহসারময়ং চাপি নালাস্ত্রন্ত্বন্যধাতুজম্।
নিত্য সম্মার্জনস্বচ্ছ মস্ত্রং পত্তিভিরাবৃতম্।

লৌহময় গোল, তাহার গর্ভে অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা কি কেবল অর্থাৎ নিরেট, ইহা বৃহন্নালাস্ত্রের ব্যবহার্য্য। লঘুনালের জন্য সীসনির্ম্মিত গুটিকা কি অন্য ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গুটিকা নির্ম্মাণ করিবে। লৌহের সার অর্থাৎ খাঁটি লৌহ কি তদ্বিধ অন্য ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত নালাস্ত্র নিত্য মার্জন দ্বারা স্বচ্ছ রাখিতে হইবে। পদাতি ও অশ্বারোহিগণ তাহা ব্যবহার করিবে।

ক্ষিপন্তি চাগ্নি যোগাচ্চ গোলং লক্ষ্যেষু নালগম্ ।
নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দত্তাত্তত্রাগ্নি চূর্ণকম্ ।
নিবেশয়েত দণ্ডেন নালমূলে তথা দৃঢ়ম্ ।
ততশ্চ গোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্ ।
কর্ণ চূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ ।

নালাস্ত্রগত গুটিকা অগ্নিসংযোগ দ্বারা লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে। তাহার বিধান এইরূপ—প্রথমতঃ নালাস্ত্রটি শোধন করিতে হইবে, পরে তাহার মধ্যে অগ্নিচূর্ণ প্রদান করিতে হইবে, তাহা দণ্ডদ্বারা নালমূলে দৃঢ় প্রোথিত করিতে হইবে। তাহার পরে তাহার মধ্যে গুলিকা দিতে হইবে। কর্ণস্থানে অগ্নিচূর্ণ দিতে হইবে, সেই কর্ণস্থ অগ্নিচূর্ণে অগ্নি দিতে হইবে। এইরূপ করিয়া সেই গুলিকা লক্ষ্যে নিপাতন করিতে হইবে।

লক্ষ্যভেদী যথা বাণো ধনুর্জ্যা বিনিযোজিতঃ ।
ভবেত্তথা তু সন্ধায়—

ধনুকের জ্যা দ্বারা বাণ যেমন বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, ইহাও সেইরূপ বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করিবে।

সমং ন্যূনাধিকৈ রংশরগ্নিচূর্ণান্যনেকশঃ ।
কল্পয়ন্তি চ তদ্বিত্তাশ্চন্দ্রিকাভাদিমন্তিচ ।

অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বকথিত দ্রব্য এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের ভাগের ন্যূনাধিক্য বশতঃ অনেক প্রকার অগ্নিচূর্ণ হইয়া থাকে। তাহা তদ্বিদ্যাবিশারদেরা কল্পনা করিয়াছেন—তাহা চন্দ্রিকাতুল্য দীপ্তিযুক্ত।

---

এই প্রবন্ধ রচনার জন্য রামদাস সেনের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'হিন্দুদিগের আগ্নেয় অস্ত্র' নামক প্রবন্ধের সাহায্য লইয়াছি। এই প্রবন্ধের কিছু ত্রুটি জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক সংশোধন করিয়াছেন।

# বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার তৎকালে লইয়াছিলেন, তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম।···সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না, তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।···

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

···মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।···কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানবদনে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

···বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন।···বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান, তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল।···সাহিত্যমহারথী বঙ্কিম, দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালনা করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন··· বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

—রবীন্দ্রনাথ : 'আধুনিক-সাহিত্য'।

# শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দিন যায়। আসে।

আবর্তিত হয় কাল। আসে ফাল্গুন। উতলা হয় পবন।

চারদিকে মত্ত মধুপের অবিরাম গুঞ্জন, কুসুম-সৌরভে আমোদিত বন-বনাঞ্চল, চূত-মুকুল-সুবাসিত কাননভূমি, আনন্দিত বিহগ-কূজন।

গগনে প্রাক্ পূর্ণিমার চাঁদ।

বিমুগ্ধভাবে চেয়ে থাকেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

অপার বিস্ময়ে দেখেন প্রকৃতির শোভা, দেখেন জাগ্রত বসন্তের আনন্দলীলা। ইচ্ছা হয় এই আনন্দের অংশভাগিনী হবার।

কিন্তু বিমর্ষ হয়ে ওঠে অন্তর, সায় দেয়না, সাড়া দিতে চায়না, মিলতে চায়না সকলের সঙ্গে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মনে পড়ে পূর্ণিমার দিনে নবদ্বীপের গগনে উদিত হয়েছিলেন নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ।

সেদিনও প্রকৃতি ছিল এমনি আনন্দ-চঞ্চল।

তিনি যেন শুনতে পান সেদিনের আনন্দিত চরাচরের পরম উল্লাসের প্রতিধ্বনি।

আগামী কাল শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-উৎসব, পুণ্য জন্মতিথি।

সারা নবদ্বীপ তাই গভীর আনন্দে মেতে উঠেছে।

নীরব, নিষ্ক্রিয়, নিরাসক্ত থাকবেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া?

তিনিও তাই আয়োজন করেন স্বামীর জন্মতিথি উদযাপনের। সে উপলক্ষ্যে কীর্তনানন্দে সাড়া দেন সকলের সঙ্গে।

ফাল্গুনের দিনগুলি কেটে যায়, এই শুভদিনের আশায় ও অনুষ্ঠানের আয়োজনে। শেষ হয় ফাল্গুন।

আসে চৈত্র মাস, ভরা বসন্তের দিন।

চাতকের কূজন ও কোকিলের মত্ত কুহুরবে দিগন্ত নিনাদিত হয়, পুষ্প-মধুপান-বিভোর মধুকর, মধুকরী।

বিষ্ণুপ্রিয়ার চিত্ত আকুল হয় বিরহ-বেদনায়।

স্বামী দূরদেশে।

ব্যাকুল বসন্তের এমন দিনগুলি যে কিছুতেই কাটতে চায়না।

শরবিদ্ধা হরিণীর মতো ছটফট করতে থাকেন বিষ্ণুপ্রিয়া। মধু-ঋতুর এই লগ্নে শূন্যতায় হাহাকার করে তাঁর অন্তর।······

বৈশাখ।

খর বৈশাখ।

মেঘমুক্ত আকাশ।

বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে সাধ জাগে—এমন দিনে স্বামীকে কাছে পাওয়ার সাধ। কুঙ্কুম-চন্দন অঙ্গ শোভিত সেই নয়ন-বিমোহন রূপ যদি একবার দেখতে পেতেন!

রুদ্র বৈশাখের তপন-তাপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-শোক তীব্রতর দুঃসহ হয়।·····

জ্যৈষ্ঠমাসে খরতর হয় রবি-কর।

একদিকে প্রচণ্ড মার্তণ্ড-তাপ, অপরদিকে বিরহানল। জলোজ্ঝিত মীনের মতো অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হন স্বামিবিরহিণী। ইচ্ছা হয় অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।·····

আষাঢ়ে নব-বর্ষা সমাগমে আনন্দে নাচে শিখিকুল।

মত্ত কেকারবে বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়।

নদীয়ার পথে-ঘাটে বেরোতে পারেন না, কোথাও যেতে পারেন না শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

বন্দিনী সীতার মতো অন্তঃপুরে দিন কাটে বিরহিণীর।

মেঘের মাদল বাজে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, ময়ূরের নাট নিকটতর হয়, ডাহুকী ডাকে, বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর বেদনায় মথিত হয়। দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগে প্রিয়-মিলনের।···

শ্রাবণ দিনের বারিধারা ঝরে অবিরল, আসে শ্রাবণী রাত্রি।

ঘন অন্ধকার।

বৃষ্টি পড়ে ঝুম ঝুম।

একাকিনী বিনিদ্র রজনী যাপন করেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

বাইরে অবিরাম বৃষ্টিধারা, বিদ্যুৎ ঝলক, মেঘ গর্জন।

চকিত চমকিত হ'য়ে ওঠেন সঙ্গীহীনা, সাথীহারা বিষ্ণুপ্রিয়া।

সারারাত্রি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেন ঐ—ঐ বুঝি এলেন প্রাণপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ—

'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে', 'গোপন চরণ ফেলে।'

কখনও দু'চোখ ভরে আসে অশ্রুতে, কখনও আবেশে মুদ্রিত হয় নয়ন যুগল।

এমনি করে কাটে বারি-ঝরা শ্রাবণের বিলম্বিত রাত্রি।·····

আসে ভরা ভাদ্রের দিন।

আকাশের মেঘ রঙ বদলায়, কখনও বারিপাত, কখনও তপ্ত তপনদ্যুতি।

খর-রৌদ্রতাপে অস্থির হয়ে ওঠে ধরাবাসী। আবার বারি ঝরে। সকলে সুখস্বপ্নে বিভোর হয় শয়ন-মন্দিরে। কিন্তু অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দির শূন্য।

"ই ভর বাদর মাহ ভাদর শূণ মন্দির মোর।"

যেন কাটতে চায়না সময়। রাত্রি আসে, বেদনায় ম্রিয়মাণ হন বিষ্ণুপ্রিয়া।

আশ্বিন মাস।

শরতের বর্ণাঢ্য প্রকৃতি হাস্যময়ী। সোনার আলোয় ঝলসিত দশদিক। আনন্দময়ীর আগমনী-গান শোনা যায়। প্রোষিত-ভর্তৃকাদের উৎসাহ আয়োজনের শেষ নেই। আশায় দিন গোণে তারা। প্রবাসী ফিরে আসবে ঘরে। তাদেরও বুঝি খুশীর অন্ত নেই আর। আশা, আনন্দ, উদ্দীপনা, ব্যস্ততায় মুখর হয়ে ওঠে সারাটি দেশ। কিন্তু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে আশা নেই, উৎসাহ নেই।

সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গ আসবেন না ফিরে, যোগ দেবেন না এই আনন্দ-যজ্ঞে।

যথাসময়ে সকলেই আসে ঘরে।

সাড়া পড়ে যায় গৃহে গৃহে।

মিলনের বাঁশি বিচিত্র মধুর রাগিণীতে বাজে।

একাকিনী দিন কাটান শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

তাঁর অবস্থা "হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে।"

কিন্তু স্বামীর ওপর তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, সীমাহীন ভক্তি। তিনি তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। জীবনে-মরণে শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁর একমাত্র নির্ভর।.....

কার্ত্তিক মাসের হিমেল হাওয়া প্রবাহিত হয়।

নিরাবরণ থাকেনা কেউ। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ অনাবৃত দেহ, কৌপীন পরিহিত। তাই, ভাবনার অন্ত নেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার। তাঁর প্রাণবল্লভ কেমন করে এই হিম-বাত্যা সহ্য করবেন কুসুমপেলব দেহে ?.....

অগ্রাণে মুখর হয় গৃহাঙ্গন।

উৎসবে মেতে ওঠে গৃহীরা। ঘরে আসে নতুন ফসল। অভাবের তাড়না নেই, দুশ্চিন্তার ভাব নেই, গৃহগুলি যেন সর্ব-সুখের আকর।

কিন্তু কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ ? তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে নেই। কান্ত-হীনা কান্তিহীনা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ, সর্বজীবের প্রতি করুণাবিগলিত তাঁর হৃদয়, সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন তাই।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তাঁরই চরণাশ্রিতা, নিবেদিতা।

তিনিও মনে মনে তাঁর রাঙা চরণের ছায়া যাচ্ঞা করেন।.....

পৌষে নিদারুণ শীত। হিম-জর্জর প্রকৃতি। বনচর ক্রৌঞ্চ-মিথুন নিভৃত নীড়ে সঙ্কুচিত। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া একাকিনী।

নবদ্বীপ ত্যাগ করে কোন দূর দেশে ভ্রমণ করছেন তিনি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় জলন্ত চিতানলে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

স্বামী প্রবাসী।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মনে হয় অবিচার করেছেন তাঁর স্বামী। সন্ন্যাসব্রতী হয়ে তিনি যথার্থ ধর্মপালন করছেন না। সংকীর্তনের অধিক সন্ন্যাস তো ধর্ম নয়। স্বামীর উপর অভিমান হয় তাঁর। সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী হয়ে তিনি যে তাঁর অনুগতা পত্নীর উপর চরম অন্যায় করেছেন।.....

মাঘের দুরন্ত শীতে বন্য পশুরাও আর্তনাদ করে।

কান্তবিরহবিধুরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া স্বামিবিরহে আর যেন প্রাণ ধারণ করতে পারবেন না।...

বিষ্ণুপ্রিয়া নারী। নারীত্বের বিকাশ মাতৃত্বে। জননী হবার সৌভাগ্য ঘটেনি তাঁর। তাই মাঘের দুঃসহ শীতের রাত্রিতে এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি আক্ষেপ করেন :

"এই তো দারুণ শেল রহিল সংপ্রতি
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি।"

এই বিলাপবাণীর মধ্যে ধ্বনিত হয়—চিরন্তনী নারীর মর্মভেদী কান্নার সকরুণ সুর।

ঘুরে ঘুরে আসে বৎসর। আনন্দ-বেদনা রোমাঞ্চ হর্ষ ভরা দিন।

বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাহীন বেদনায় ফেলেন নীরব গোপন অশ্রু।

উদাসী শ্রীগৌরাঙ্গ দক্ষিণদেশ ভ্রমণান্তে ফিরে এলেন নীলাচলে।

ভক্তের নয়নে দেখা দিল আনন্দাশ্রু, নীলাচলবাসীরা মেতে উঠলো আবার। পুলক-বন্যা প্রবাহিত হল।

শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তাদের এ আনন্দের ভাগ দিতে হবে।

শচীদেবীর মন্দিরে ভক্তেরা নিয়ে গেল এই শুভ-সংবাদ। সংবাদ শুনে তাঁরাও নিমগ্ন হলেন আনন্দের অমিয়-সাগরে। চোখের আড়ালে রয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। তবু, তিনি বিরাজ করছেন নয়ন-সম্মুখে। লীলাময় তিনি। তাঁর লীলার যে বিরাম নেই।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাবেন—তাঁর মতো সুখী কে ?

সিন্ধু-কূলে প্রেম-কীর্তন-মত্ত তাঁর প্রাণনাথ। হরিনাম-সুধাপানে অগণিত নরনারী সুখসাগরে মগ্ন। তবে তিনি কেন দুঃখ পাবেন ?

মুহূর্তেই বিরহ-বিচ্ছেদ-বেদনা অনাবিল তৃপ্তির তলে ডুবে যায়।...

নবদ্বীপবাসী ভক্তকুল যাবেন নীলাচলে।

অনুমতি নিতে হবে শচীমাতার, উপহার নিতে হবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীহস্তের।

আয়োজন চলে। যথাসময়ে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করবে ভক্তবৃন্দ।

জ্যৈষ্ঠের খর-রৌদ্রে ক্লান্তি আসবে না তাদের। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন-স্বপ্নবিভোর যারা, তাদের আবার ক্লান্তি কি, ভয় কী ? তারা চির ক্লান্তিহীন, অকুতোভয়।

শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া পরম উল্লাসে প্রস্তুত করতে থাকেন নানা খাদ্যসামগ্রী।

আয়োজন সম্পূর্ণ।

যাত্রার উদ্যোগ করলেন ভক্তেরা।

শচীদেবী শ্রীবাসকে আদেশ করলেন, নিমাইকে বলো, যেন একবার দেখা দিয়ে যায়।

অদূরে নীরবে দণ্ডায়মানা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁরও তো আর অন্য সমাচার নেই।

জননী-জায়ার সন্দেশ-বাহী আকুল ভক্তবৃন্দ নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে চললো।...

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পেলো দর্শনার্থী ভক্তেরা।...

জন্মাষ্টমী দিবসে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে উপহার দিলেন একখানি বহুমূল্য প্রসাদী বস্ত্র। মহাপ্রভু তখন সংজ্ঞাহীন, কীর্তন-বিভোর।

চৈতন্যোদয়ে তিনি দেখলেন সেই লোভনীয় উপহার।

পরমানন্দ পুরীকে শুধালেন, এই উপহার নিয়ে কী করি, বল?

: জননী শচীদেবীকে পাঠিয়ে দাও।

আপত্তি করলেন না শ্রীগৌরাঙ্গ।

তিনি জানেন, ঐ বস্ত্রে প্রয়োজন নেই শচীমাতার। তিনি বধূমাতাকেই বস্ত্রটি দেবেন। খুশী হবেন জননী, খুশী হবেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। প্রিয়তমা প্রাণলক্ষ্মী বুঝবেন, তাঁর প্রাণপ্রিয় জীবন-বল্লভ আজো বিস্মৃত হননি প্রেমাভিলাষিণীকে।······

নবদ্বীপে ফিরলো ভক্তেরা।

সঙ্গে নিয়ে এলো প্রসাদ ও বস্ত্র।

নিতাই শচীমাতাকে শোনান শ্রীগৌরাঙ্গের কাহিনী। শচীমাতা তন্ময় হয়ে শোনেন, অন্তরালবর্তিনী গুণ্ঠনবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর গর্বে গর্বিতা হন। যুগপৎ আনন্দ ও বেদনার অশ্রুতে সিক্ত হয় গণ্ডদ্বয়।···

নবদ্বীপ—নীলাচল।

দূরত্ব ঘুচে গেছে এ দুটি স্থানের।

নীলাচল থেকে নিয়মিত সংবাদ নিয়ে আসে ভক্তেরা।

শ্রীগৌরাঙ্গের কথা অধিকতর উৎসুক হয়ে শোনেন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া।

নিমাই-এর কাহিনীই যে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সঞ্জীবনীসুধা। তাঁরা শোনেন, বিমুগ্ধচিত্তে শোনেন সে-কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে।

মনশ্চক্ষে দেখেন—তাঁদের প্রাণপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ আজো রয়েছে ঠিক তেমনি আপনভোলা, কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি।

বিচ্ছেদব্যথা ও বিয়োগ-বেদনা সীমাহীন তৃপ্তির রূপ পরিগ্রহ করে।

শচীমাতা বধূকে পরান নিমাই-প্রেরিত শাড়িখানি। বৎসরান্তে রাজা প্রতাপ রুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে উপহার দেন বহুমূল্য বস্ত্র। তিনি সেটি পাঠান নবদ্বীপে।

পূর্ণযৌবনা বিষ্ণুপ্রিয়া, সীমন্তিনী।

শচীদেবী নিমাই-প্রদত্ত বস্ত্রখানি পুত্রবধূকে না পরিয়ে ক্ষান্ত হন না কিছুতেই। নিমাই তো রয়েছে, বিদেশে গেছে শুধু। কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ, গৃহলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সেজন্য যোগিনী সাজবে কেন? যাদের স্বামী বিদেশে যায়, তাদের কি সাধ-আহ্লাদ করতে নেই?

একটি দিনের স্বপ্ন-প্রতীক্ষায় কেটে যায় এক একটি বৎসর।···

শচীমাতা ভাবেন—নিমাই একবার আসবে তাঁর কাছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরের কোণে ক্ষীণ দীপশিখার মতো জ্বলে আশার আলোক—একদিন স্বামীর দর্শন পাবেন।···

সেদিন গঙ্গার ঘাটে এসেছেন শাশুড়ী-বধূ।

নবদ্বীপের লোকেরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে, অপরপারে কুলিয়ার বিরাট জনতা। নবদ্বীপবাসীরা সংবাদ পেয়েছে—শ্রীগৌরাঙ্গ পদার্পণ করেছেন সেখানে, প্রভাস-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে অগণিত ধর্মপিপাসু নরনারী। আনন্দের বান ডেকেছে কুলিয়ায়। মহাপুরুষের শুভাগমনে ধন্য হয়েছে কুলিয়াবাসী। নদীর দুই তীরে সমবেত জনতার হর্ষধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সুদূর দিগন্তে। উন্মাদ আগ্রহে শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন করছে এপারের জনতা। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা দেখলেন—লক্ষ লোকের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন এক সৌম্যকা পুরুষ। ধন্য হলেন শচীমাতা। লক্ষ লোকের বন্দনাগান জন[ে] শোকাকুল প্রাণে জাগালো আনন্দের সাড়া।

প্রাণভরে দেখলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। দেখলেন সেই দিব্য জ্যোতি মহাপুরুষকে। তিনি তাঁর স্বামী। সারাবিশ্বের প্রাণে আলো তুলেছেন তিনি। সে কী সহজ কথা?·····

·····নবদ্বীপে সংবাদ এলো—দশমীর দিনে নবদ্বীপে অব[তীর্ণ] হবেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পথপানে চেয়ে আছেন। ক্ষণে ক[্ষণে] মনে জাগছে বিচিত্র ভাব: ঐ তিনি আসছেন—আসছেন শচীনন্দ[ন] আসছেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ। তন্ময় হয়ে যান বিষ্ণুপ্রিয়া। মা[ঝে] মাঝে বিস্মৃতি আসে—না, না, তাঁর স্বামী সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হ[ন] নি। মনে হয় প্রবাসী স্বামী ফিরে আসছেন তাঁর প্রাণপ্রিয়ার কাছে অননুভূতপূর্ব শিহরণ জাগে সর্বদেহে, সুন্দরতর মনে হয় এই সুখ[-] স্বপ্ন ও পুলকাবেগে মুদে আসে নয়ন। প্রিয় আগমন আসন্ন। তা[ই] বুঝি হর্ষমুখর হয়েছে ধরণী।

মনে মনে ভাবেন—স্বামীর আগমনের দিনে কী করবেন?

শ্রীরাধিকার ভাবোল্লাস দেখা দেয় তাঁর মধ্যে।

বহুদিন পরে স্বামী আসছেন। প্রথম দর্শনে অবগুণ্ঠনতলে আরক্ত অধরখানি ঢেকে রাখবেন লজ্জানতা কুলবধূ। প্রাণভরে চে[য়ে] থাকবেন তাঁর মুখের দিকে। চোখে চোখে মিলন হলে লজ্জা[য়] অধোবদনা হবেন, কিংবা মুচকি হেসে পালিয়ে যাবেন—"পালটি চল[ে] যায় ঈষদ্ হসিয়া।" রসিক নাগর আসছে। দীর্ঘ বিরহের পর প্রাণপ্রিয়র সঙ্গে দেখা।·····

পরিণীতা বধূর মনে খেলে যায় পুলক-বন্যা। ভেবে স্থির করতে পারেন না—কেমন করে যোগ্য অভ্যর্থনা জানাবেন শ্রীগৌরাঙ্গকে।

কুলিয়া থেকে নবদ্বীপে বাচস্পতি মিশ্রের গৃহে পদার্পণ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এই বার্তা পেলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা।

কিন্তু তাঁরা যে বাচস্পতি-মিশ্রের গৃহে যেতে পারেন না। তাঁরা যে অন্তঃপুরচারিণী। বাইরে যাবার অধিকার নেই।···

নবদ্বীপ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন নবদ্বীপচন্দ্র। ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁর জন্মস্থানের দিকে। পরিচিত পথঘাট বৃক্ষলতা, পরিচিত লোকজন সবই নতুন মনে হচ্ছে আজ। যেন এক আশ্চর্য অভাবনীয় মায়া জড়ানো। শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন অশ্রুপূর্ণ। জন্মভূমির মায়ায় নবদ্বীপে এসেছেন তিনি। জননীর আকর্ষণও কি কম? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁর ভালবাসাও কি হ্রাস পেয়েছে এতটুকু? সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন তিনি। কিন্তু তাতে তাঁর অন্তরের প্রেম তো নষ্ট হয়ে যায়নি। বিশ্বজনের মধ্যে তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন অকৈতব প্রেম। সর্বজীবে দয়াময় করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ।

নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

সঙ্গে অনুগামী ভক্তবৃন্দ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর আগমন-বার্তা পেলেন। অন্তরাল থেকে একবার পতিমুখ দর্শনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই জনসমুদ্রের মধ্যে কি প্রাণভরে দেখা যায় সেই শ্রীমুখকান্তি?

আলুলায়িতকুন্তলা, নিরাভরণা, অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

তিনি জানেন তাঁর স্বামী নারীমুখ-দর্শন করেন না। কোন্ সাহসে তিনি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন? লোকে কী বলবে? কুলবধূ রাজপথে নেমে আসবেন কোন্ লজ্জায়? ভাবতে লাগলেন শুধু।

কতদিন পরে এসেছেন প্রাণনাথ, জীবনবল্লভ। মন যে আর প্রবোধ মানে না। না না, স্বামীর কাছে আত্মপ্রকাশের লোভ সংবরণ করতে পারবেন না তিনি। তাঁর অন্তরের অন্তরাল থেকে কে যেন বলে উঠলো—স্বামীই তো তোমার ইহকাল পরকাল, স্বামীই তোমার পরম আশ্রয়। তাঁর কাছে যেতে ভয় কী তোমার? লজ্জা? স্বামীর কাছে স্ত্রীর আবার লজ্জা কিসের?·····

সংযম হারালেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

ভুলে গেলেন, তাঁর পরিধানের বেশ মলিন, সম্পূর্ণ নিরাভরণা তিনি। এ বেশে স্বামীর কাছে যাওয়া শোভা পায় না।

স্থির করলেন, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করে নিঃসংকোচে নির্ভয়ে এগিয়ে যাবেন। গললগ্নীকৃতবাস হয়ে লুটিয়ে পড়বেন, কাতর আর্তনাদে। শ্রীরাধিকার মতো আত্মোৎসর্গ করবেন:

"দেহি তুলসী তিল এ দেহ সমপলু।"

অবগুণ্ঠনবতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা। বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দেখলেন। বুক কাঁপতে লাগলো দুরু দুরু। চরণ চললো না আর। বজ্রাহতের মতো ভূলুণ্ঠিত হলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। সংজ্ঞাহীনা হলেন অভিসারিকা। এ অবস্থায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেখলেন এক মধুর স্বপ্ন:

···পতিপ্রেমাকুলা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সকল বাধা উপেক্ষা করে অগ্রসর হচ্ছে শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে। নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে ভক্তকুল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব্ধ, হয়তো বা বিস্ময়ের ভান করছেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অবিচল। সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বতীর মতো উদ্দাম তাঁর গতি। শ্রীগৌরাঙ্গের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়ে সকরুণ কণ্ঠে তিনি নিবেদন করলেন,—প্রভু! আমি তোমার দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া।···"বিষ্ণুপ্রিয়া"—অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সন্ন্যাসীর মুখে বেদনার ছায়া। বললেন, বল—বল বিষ্ণুপ্রিয়া, কী তোমার প্রার্থনা?···

অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার দু'নয়নে।

তিনি বললেন রুদ্ধকণ্ঠে,—স্বামি, ত্রিজগৎ উদ্ধার করেছ তুমি, আমি তোমার চরণাশ্রিতা, আমায় কি উদ্ধারের উপায় বলে দেবেনা দয়াময়?

অপরাধীর মতো নতমুখে শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন,—বিষ্ণুপ্রিয়া, কৃষ্ণপ্রিয়া হও তুমি। তোমাকে ছাড়া যে আমার শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই না।···

তারপর কিছুক্ষণ নীরব শ্রীগৌরাঙ্গ। পাদুকা খুলে দাঁড়ালেন ভূমির উপর। বললেন, সাধ্বি! সন্ন্যাসী আমি। তোমায় দেবার মতো সম্বল তো আমার নেই। আমার এই পাদুকা তোমায় দিলাম। এই পাদুকা নিয়ে তুমি ভুলে থাকতে পারবে বিরহ-বেদনা।·····

স্বপ্নভঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেখলেন অঙ্গন শূন্য।

যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে পড়ে রয়েছে একজোড়া কাঠ-পাদুকা। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পাদুকাদ্বয় শিরে রাখলেন, চুম্বন করে হৃদয়ে ধারণ করলেন, অশ্রু-প্লাবিত হলো গণ্ডদ্বয়।

দূরে লক্ষ লোকের যুগপৎ হরিধ্বনি শোনা গেল।···

জন্মভূমি-দর্শন সমাপ্ত, সমাপ্ত সন্ন্যাসীর কর্তব্য। হয়তো শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁর প্রেমের ঋণও শোধ হয়ে গেছে। তিনি যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মুক্তির উপায় নির্দেশ করে দিয়েছেন।···

বিজয়া-দশমী দিবসে নবদ্বীপধাম ত্যাগ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। জননী ও জন্মভূমির কাছ থেকে নিলেন চিরবিদায়।···

বিদায় নিয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

কিন্তু জননী ও গৃহিণীর কথা মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি।

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে রইলেন শিষ্য দামোদর। তাঁদের সংবাদ বয়ে আনতে লাগলেন শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে। দামোদরের অনুপস্থিতিতে তাঁদের রক্ষাকর্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভৃত্য ঈশান।

শ্রীগৌরাঙ্গের কাছ থেকে ফিরে আসেন দামোদর।

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে হয় নিমাই ফিরে এসেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরিত উপঢৌকন পেয়ে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবেন—প্রিয়জনের মধুর স্পর্শ লেগে রয়েছে তাতে। তৃপ্তির স্বাদ লাভ করেন তাই।

শচীদেবী একান্তে বসে দামোদরের সঙ্গে কথোপকথন করেন। নিমাই-এর কুশল প্রশ্ন করেন, জানতে চান তাঁর সংবাদ—কোথায় আছে সে, কেমন আছে,—এমনি আরও কত খুঁটিনাটি। গৃহান্তরাল-বর্তিনী বিষ্ণুপ্রিয়া শোনেন, মুগ্ধ হন।···

দিন যায়।

চিন্তা, জাগরণ ও উদ্বেগে কৃশাঙ্গী হন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। মলিন হয় সোনার অঙ্গ বিরহে ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায়। তিনি কখনও প্রলাপ বকেন, কখনও বা অসুস্থ বোধ করেন, কখনও উন্মাদিনীরূপ ধারণ করেন, মূর্ছিতা হন কখনও। মৃতপ্রায় হয়ে আছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বামীর স্মৃতি তিনি যে ভুলতে পারছেন না। শূন্যহৃদয়া বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বামিত্যক্ত পাদুকাই তাঁর একমাত্র সম্বল।

পাদুকাযুগল সামনে রেখে তিনি থাকেন ধ্যানমগ্না।

মনে হয় তাঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী, সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাঁকে, দীক্ষা দিচ্ছেন অভয়মন্ত্রে, বলছেন—"শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, সর্ব দুঃখ দূরে যাবে, স্বার্থ ভুলে সর্বজীবের কথা চিন্তা কর। জীবের কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি আমি। তুমি আমার সহায় হও কল্যাণময়ি! জীবের কঠিন হৃদয়ে করুণাসিন্ধু প্রবাহিত করাই আমার জীবনের ব্রত। তাই তো আমি ছেড়ে এসেছি আমার সর্বস্ব। আমার এ মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের সাথী হও তুমি। তুমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া,—আমার কৃষ্ণপ্রিয়া।"

চোখ মেলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেখেন—ফুলে ফুলে বিচিত্র সৌন্দর্যময়ী ধরণী, নবদ্বীপ কীর্তনানন্দে বিভোর, কীর্তন ও নৃত্যের রোল চারদিকে, কী এক অপূর্ব উদ্দীপনায় সাড়া দিয়েছে সকলে। ভাববিহ্বল গৌরাঙ্গ-ভক্তেরা স্বার্থচিন্তা পরিহার করেছে সানন্দে। স্বার্থলেশশূন্য এক পরম আনন্দ-সুন্দর জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন তপশ্চারিণী, ঋদ্ধি-সিদ্ধিপ্রদায়িনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। তপস্যাসিদ্ধ তাঁর পূততনু দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল।·····

আষাঢ় মাস।

অবিরাম বৃষ্টিপাতে প্লাবিত ধরণী।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ধ্যানোপবিষ্টা। ক্ষোভ-মুক্ত তাঁর অন্তর। মুক্তি-

মন্ত্র পেয়েছেন তিনি। সংসারের কামনা-বাসনা জয় করেছেন সেই অমোঘ মন্ত্রবলে।

তাঁর মনে হলো—দূরাগত বংশীনাদ ভেসে আসছে, আসছে আরো কাছে ; যেন ডাকছে।

মধুর, সোহাগভরা আবেগমাখা সে ডাক।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শুনলেন, কান পেতে শুনলেন, বাহ্যজ্ঞান হারালেন।

অনির্বচনীয় তৃপ্তি-সম্পূরিত তাঁর হৃদয়।·····

অতর্কিতে স্তব্ধ হলো বংশীনিনাদ।

স্পষ্ট সুমধুর কণ্ঠে কে ডাকলো : বিষ্ণুপ্রিয়া !

এ যে তাঁর স্বামীরই পরিচিত সুধাকণ্ঠের সোহাগমাখা ডাক, প্রেমময়ের আন্তরিক আহ্বান।

চকিত চমকিত হলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

উন্মাদিনীর মতো ছুটে এলেন বাইরে। কেউ কোথাও নেই—নেই সেই বহু আকাঙ্ক্ষার দুর্লভ ধন।

আষাঢ়ের আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে।

দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। চেয়ে রইলেন বর্ষণ-মুখরা প্রকৃতির দিকে। উদাস আকুল হলো মন।

ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা।

একটি বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। সে-নিশ্বাস ছুটলো দূরে—ঝড়ো হাওয়ার পাখায় ভর করে।·····

স্বামীর মুখোচ্চারিত "বিষ্ণুপ্রিয়া" ডাক তিনি আর শুনতে পাবেন না জীবনে।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার।

অকস্মাৎ নিভে গেল গৃহের সন্ধ্যা-দীপ।

কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নির্বিকার। অন্ধকারে পথ হারাবার ভয় যে আর নেই তাঁর। তিনি হয়েছেন—জননী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের অগণিত ভক্তের পরমারাধ্যা দেবী।

সমাপ্ত

# সর্বহারা লোকটিকে

## মনোজকুমার ঘোষ

ভাবে সে ভাবুক যতো হারাণো সুখের স্মৃতিগাথা
আহা, সোনার হরিণ হ'য়ে
মৃত্যুর পাষাণভার যদি বুকে ধরে !
এই শেষ রাত্রি তার—
চেলি-লাল দিগন্তের শেষ অঙ্গরাখা
যদি আনে শান্তি তার, যদি ভালোবাসা ;
কাঁদে তো কাঁদুক ঐ
সিঁদুরের টিপটাকে কোঁপানো ঠোঁটের মাঝে ধরে।

কেমন আহ্লাদেভরা নূপুরের ঝম ঝম ঘমে
সে এখন স্বপ্ন দ্যাখে
রাজায়-প্রজায় যুদ্ধ, রাণী ও সখীর দল
নিস্তরঙ্গ জলে শুয়ে দামামার তালে তালে কাঁপে !
অপরাহ্ণ শেষ হলে
মদির রক্তস্রোতে হৃদলের ইচ্ছেগুলো আরো রাঙা হোল।
এমনি আশ্চর্য সাঁঝে
সাঁজোয়া সৈনিকটিকে কক্ষচ্যুত গ্রহের গতিতে
বিভ্রান্ত অদৃষ্ট আনে অন্তঃপুরে
অকরুণ—হতভাগ্য খোজাটির পাশে।

নূপুরের শব্দ গাঢ় হোল—
দ্রুত আরো দ্রুত তার অকস্মাৎ দুর্বার গতিতে
হায়, সেই সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।
সামনে প্রহরী :
বিষণ্ণ শূন্যতা ঘিরে অসহায় মৃত্যুদূত
ভোর
এমন রাতের পর হায় শুধু কান্না নিয়ে এলো।

# অভিমান

## শ্রীনারায়ণচন্দ্র রেজ

রূপ মাঝে তোমার অযুত মানিক জ্বলে
তাই তোল বুঝি ফণা,
তোমার গরিমার সৌরভ কি আর
পাপড়ি মেলে ছাড়বে না ?
যে ফুল আপন অন্তরমধু
আপনার রাখে জমা করে'
ভ্রমর আসে আর ফিরে যায় শুধু
সমর্থ না হয় তৃষ্ণা নিবারে,
জীবন তার অরণ্যেই লুপ্ত হবে
আলো বাতাসের অগোচরে,
কে বলিবে কবে
তার স্থান হবে দেবপদমূলে অর্ঘ্য তরে ?

জান না কি মধুপের গুঞ্জনে
আর তোমার মধুপানে
আনন্দ-হিল্লোল জাগে প্রকৃতির প্রাণে,
তাই তো আদৃত তুমি পুষ্পোদ্যানে ;

হে প্রিয়, আমার মানসরবি
আবৃত তব অভিমান-ছায়ে,
কিরণে ভাসে তার হতাশার ছবি,
বিষাদে ম্রিয়মান হ'য়ে।

বিক্ষুব্ধ আকাঙ্ক্ষা মম চাহিয়াছে
যাইতে তোমার অন্তর মাঝে,
যেথায় শুধু হৃদয়ে হৃদয় মিশিয়াছে
চির-সুন্দর সেথা বিরাজে।

# ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন-পঞ্জী

বিধানচন্দ্রের রাজনৈতিক
জীবনের দীক্ষাগুরু

   

কর্মযোগী বিধানচন্দ্র

১৮৮২ : ১লা জুলাই বেলা ১০টা ২০ মিনিটে জন্ম ।

১৮৯৬ : ১৫ই জুন পাটনা শহরে মাতৃদেবী অঘোরকামিনীর পরলোকগমন। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৯৯ : পাটনা কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯০১ : পাটনা কলেজ হইতে গণিতশাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি। পিতা প্রকাশচন্দ্র রায়ের সরকারী কার্য হইতে অবসর-গ্রহণ ।

১৯০৬ : কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হইলেন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে সহ-চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জনরূপে কার্য আরম্ভ। কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ।

১৯০৮ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, ডি, ডিগ্রী লাভ।

১৯১১ : এম, আর, সি, পি, ( লণ্ডন ) এবং এফ, আর, সি, এস ( ইংলণ্ড ) ডিগ্রী লাভ। প্রথমোক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। ৭ই ডিসেম্বর পিতা প্রকাশচন্দ্রের পরলোকগমন।

১৯১৬ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত। ৩৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ ভবন ক্রয়।

১৯১৯ : সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া তদানীন্তন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ।

১৯২২ : রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ।

১৯২৩ : ৩০শে নবেম্বর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়া উত্তর ২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যাল অমুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক স্বতন্ত্র প্রার্থিরূপে ( স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক সমর্থিত ) বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯২৫ : স্বরাজ্য দলে যোগদান। রোগশয্যায় শায়িত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান। অধিবেশনে তদানীন্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বরাজ্যদল কর্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত। দেশবন্ধু সম্পাদিত ট্রাষ্ট ডীডে ট্রাষ্টি মনোনীত; চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৮ : জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় ৪৩তম অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৯ : নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কংগ্রেসের লাহোর ( ৪৪তম ) অধিবেশনে যোগদান।

১৯৩০ : কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত। লবণ আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে বেআইনী ঘোষিত নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগষ্ট মাসের অধিবেশনে যোগদান, গ্রেপ্তার ও ছয় মাসের জন্য কারাবরণ; সেপ্টেম্বর মাসে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত।

বক্তৃতারত বিধানচন্দ্র

মহাজাতিসদনের দ্বারোদ্ঘাটনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি স্থাপন ও উহার কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৪ : কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি দান।

১৯৪৬ : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মতে মালয়ে দুর্গত ভারতীয়দের সাহায্যের জন্ত মেডিকেল মিশন প্রেরণ ও পরিচালনাদির ভার গ্রহণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দুর্গত কলিকাতা-বাসিগণের ত্রাণে সহকর্মিগণ সহ সেবাকার্য।

১৯৪৭ : চক্ষু চিকিৎসার জন্ত আমেরিকা গমন। ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সংযুক্ত প্রদেশের (এখনকার উত্তর প্রদেশ) রাজ্যপাল নিয়োগ। অনুপস্থিতিতে স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুর সাময়িক ভাবে নিয়োগ। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যপালের পদত্যাগ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচকমণ্ডলী হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯৩১ : কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কর্পোরেশনের পক্ষে সম্বর্ধনা।

১৯৩২ : দ্বিতীয়বার কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত।

১৯৩৩-৩৪ : স্বরাজ্য দলের পুনরুজ্জীবন এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি পুনঃপ্রবর্তনে উদ্যোগী। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ এবং আলোচনান্তে সেই প্রচেষ্টায় তাঁহার (গান্ধীজীর) সম্মতিদান।

১৯৩৫-৩৬ : বিগ-ফাইভ-এর মধ্যে ভাঙ্গন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন পরিচালনার জন্য কংগ্রেস ইলেকশন কমিটি গঠন ও সভাপতি নির্বাচিত। মনোনয়ন সম্পর্কে শরৎবাবুর সঙ্গে মতানৈক্য এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের দরুণ সভাপতির পদত্যাগ।

১৯৩৯ : গান্ধীজীর অনুরোধে পুনরায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ; ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ এবং কংগ্রেসের নীতির পরিবর্তন, আইনসভা বর্জনের নীতি গ্রহণে মতভেদ ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা।

১৯৪১ : বার্মা প্রত্যাগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্ত বেঙ্গল সিভিল প্রটেকশন কমিটি গঠন এবং সভাপতির পদ গ্রহণ।

১৯৪২ : গান্ধীজীর সম্মতিক্রমে যুদ্ধ উপলক্ষে ভারত সরকারের অনুরোধে সামরিক চিকিৎসক বাহিনী গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত।

১৯৪৩ : গান্ধীজীর অনশনের সময় (ফেব্রুয়ারী মাসে) উপস্থিতি। মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে প্রথম অভিভাষণ।

১৯৪৮ : জানুয়ারী মাসে গান্ধীজী নয়াদিল্লিতে অনশন আরম্ভ করায় কলিকাতা হইতে দিল্লি গমন। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত পঃ বঙ্গ মন্ত্রিসভার পতনের পর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত ও নূতন মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫২ : স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানমতে ভারতের প্রথম নির্বাচনে কলিকাতা বৌবাজার কেন্দ্র হইতে বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত। দ্বিতীয়বার কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা নির্বাচিত এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত।

১৯৫৪ : ২৪শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে ভাষণ দান।

১৯৫৬ : ১৫ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দান।

১৯৫৭ : ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনে সভাপতি। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে (মার্চ মাসে) বৌবাজার নির্বাচকমণ্ডলী হইতে বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত। সর্বসম্মতিক্রমে দলের নেতা নির্বাচিত এবং পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ।

১৯৬১ : প্রজাতন্ত্র দিবসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 'ভারত রত্ন' উপাধিতে ভূষিত।

১৯৬২ : তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কলিকাতা চৌরঙ্গী কেন্দ্র এবং বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া কেন্দ্র হইতে বিধানসভায় নির্বাচিত এবং ১১ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা গঠন
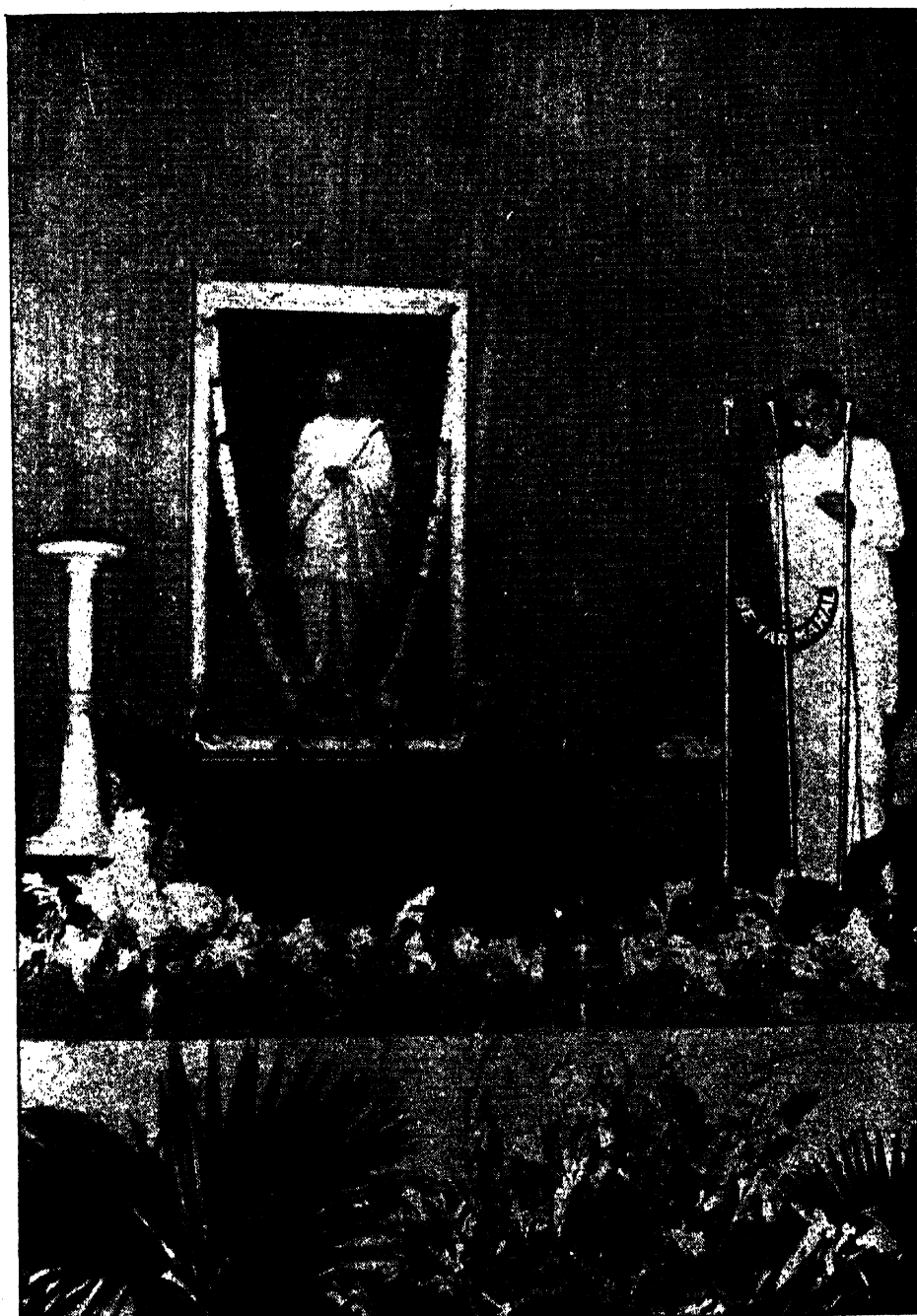
মহাজাতিসদনের দ্বারোদঘাটনদিবসে ভাষণদানরত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

আত্মজন পরিবৃত্ত অন্তিমশয়ানে বিধানচন্দ্র

বিখ্যাত বাসভূমির সম্মুখে শোকসন্তপ্ত জনতা
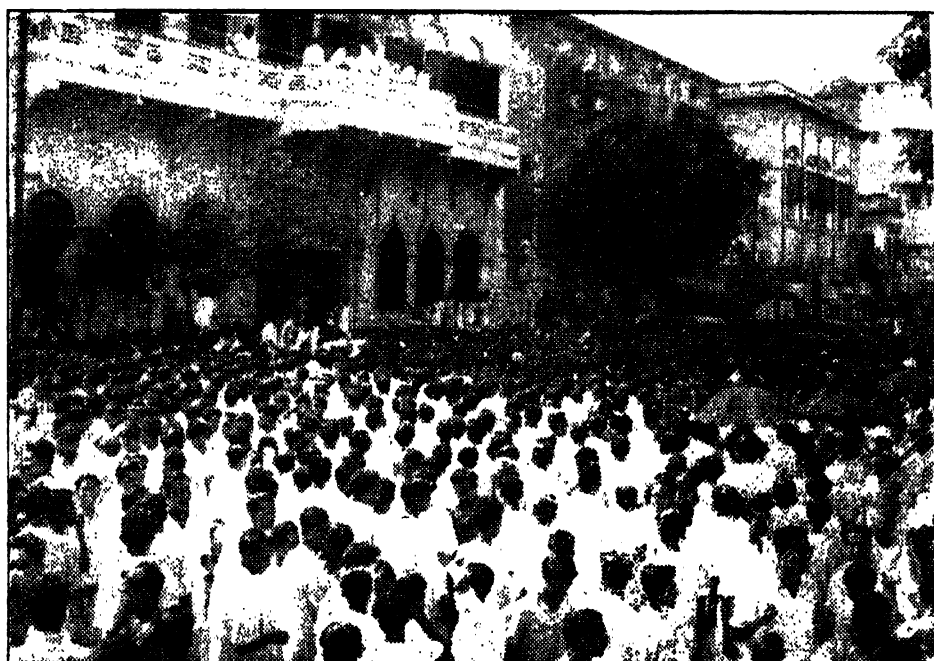
হরিচরণ শুয়ে ছিল পাশের ঘরে। মাঝের দরজাটা আমি এপার থেকে খিল এঁটে দিয়ে শুয়েছিলাম। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তবে কি গত রাত্রিতে স্বামী বাড়ী ফেরেননি। মনে মনে সেই বন্ধুটির মুণ্ডপাত করতে করতে দরজার দিকে এগোলাম। খিল খোলবার পর যা দেখলাম তা বিশ্বাস করতে পারলাম না। দু'চোখ রগড়ে ভাল ক'রে দেখলাম। না, ঠিকই দেখছি। ভুল নয়—আমার স্বামী-ই বটে। কিন্তু এ-ঘরে এই অবস্থায়। খালি তক্তাপোষে, বিনা বালিশে শুয়ে আছেন! আর হরিচরণই বা গেল কোথায়! সবই যেন ভোজবাজীর খেলা বলে মনে হচ্ছে! তবু গিয়ে তাড়াতাড়িতে ওকে ঠেলে তুললাম—ভীত, চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে বললেন—ওঃ তুমি! এখানে কেন?

বা-রেঃ, এ তো বাড়ী। এখানে থাকব না তো কোথায় যাব?

ভুল তিনি বুঝতে পারলেন এতক্ষণে। বললেন—ওঃ, মনে পড়েছে।

আমি তাকে বললাম—ভিতরের ঘরে গিয়ে শোবার জন্য। জড়িত নয়নে তিনি গিয়ে ধপ করে আমার পরিত্যক্ত বিছানায় শুয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণের মধ্যেই তাঁর নাক ডাকতে আরম্ভ করবে। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। আমি ইচ্ছে করেই আর ডাকিনি তাকে।

খেতে বসে আমি শুধালাম—কাল কত রাত্রে ফিরলে এবং কোথায় গিয়েছিলে?

ফিরতে বোধ হয় তিনটে হয়েছিল। আর কোথায় গিয়েছিলাম, তা জিজ্ঞেস ক'র না কোন দিন।

তাই মেনে নিলাম।

কয়েক দিন পরে আবারও অনুরূপ ঘটনা। সেদিন ভোরের দিকে ফিরতে দেখেছি আমি—হয়ত বিষ্টুবাবুর ওখান থেকে।

আমার মনে খটকা লাগল। এখানে আসবার দিনই অনেক রাত্রিতে ফিরেছিলেন; কোথায় ছিলেন, জানি না। আবার এখানে এসেও রাত্রিতে প্রায়ই বাড়ী থাকেন না। তবে কি রাত্রিতে চুরি, ডাকাতি—

আর ভাবতে পারলাম না। মাথাটা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল। উঠে গিয়ে বালতির জল বেশ খানিকটা চোখে-মুখে ঝাপ্টা দিতে সে ভাবটা কেটে গেল।

এরপর পর-পর কয়েক দিন রাত্রিতে স্বামী আর বেরোলেন না। আমি ভাবলাম, হয়ত বা মতের পরিবর্তন হয়েছে। ইতিমধ্যে একদিন কোথা থেকে দশ টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন রেখে দাও, কত কি দরকার হয় ত সংসারে। তা ছাড়া, সব সময় আমি ত' থাকি না আবার। তবে হরিচরণকে সব সময়ই পাবে। আমি না থাকলেও ও থাকবেই থাকবে। ওকে আমার বলাও আছে।

প্রায় হপ্তাখানেক পর আবার তিনি বললেন—এবার ফিরতে কয়েক দিন দেরী হবে। এইটে রেখে দাও। বলে পঞ্চাশটা টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

আমার মুখ দিয়ে তখন-তখনই কথা বেরোল না। খানিক পরে শুধালাম—কোথায় যাবে, কতদূরে, জানাতে আপত্তি আছে কি?

কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে বললেন তিনি—হ্যাঁ আছে। তা ছাড়া, মেয়েমানুষের অত খবরে দরকারই বা কি?

আচ্ছা, ভুল হয়েছে মাপ চাইছি।

একদিনই তো বলে দিয়েছি—কোথায় যাই, জিজ্ঞেস ক'র না কোনদিন।

এত অল্পেতে চটে যেতে এর আগে ওঁকে কোনদিন দেখিনি।

হপ্তাখানেক পরে যখন ফিরলেন, তখন দেখলাম তাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। আমার চোখ ফেটে জল এসে গেল। তবু জিজ্ঞাসা করতে ভয় হল—কোথায় গিয়ে কেমন করে এ সম্ভব হল।

এই অবস্থায় একদিন বিষ্টুবাবু এলেন। এর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আমার পরিচয় হয়নি।

একপাশে আমি বসেছিলাম তক্তাপোষের উপরেই—এবার উঠে দাঁড়ালাম। বিষ্টুবাবু অপর কোণে বসে বললেন—উঠলেন কেন বৌদি, বসুন না। আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমি তবু বসতে পারলাম না, দাঁড়িয়ে রইলাম। তা হলে আমি আসি, আপনি ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি কখনও বসতে পারব না। বললেন তিনি।

মৃদুস্বরে আমি বললাম—বসুন, আমি আসছি। বলে ভিতর থেকে একটা মোড়া এনে মেঝেয় রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টুবাবু উঠে গিয়ে সেটাতে বসলেন। তারপর আমাকে বললেন—আপনি খাটে গিয়েই বসুন, যেমন বসেছিলেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর নিজেই বললেন—ও একটু গোঁয়ার মত, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

বিষ্টুবাবু বললেন—তাই যদি না হত, তবে এ দুর্ঘটনা অন্ততঃ এড়ানো যেত।

কিছুতেই দরজা খুলছে না দেখে ঐ বাড়ীরই ঢেঁকিশাল থেকে ঢেঁকি খুলে এনে দমাদম ঘা দেওয়া চলতে লাগল দরজায়। একটা দরজা খুলে পড়ে গেল। ওকে যেতে বলেছিলাম পরে, নূতন লোক কিনা, [illegible]। কি[illegible] ওর ঝোঁক সবার আগে যাওয়ার জন্যেই।

দরজার পাশেই লুকিয়ে ছিল সে-বাড়ীর ছোট কর্ত্তা। ইয়া দশা-সই চেহারা। দরজার ভিতরে পা দিতেই ঝেড়ে দিল এক ডাণ্ডা। ভাগ্যি মাথার মাঝ দিয়ে যায়নি। তা হলে সে ওখানেই অক্কা পেয়ে যেত। যা হোক, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি ওকে ডাক্তার দেখিয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিয়ে তবে বাড়ী ফিরেছি। আচ্ছা এবার আসি বৌদি; হাতজোড় করে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালেন।

দুই-তিন দিন পর বিষ্টু বাবু এলেন একজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে। দেখে আশ্চর্য্য লাগল—ডাক্তার নীরবে তার কাজটুকু সমাধা করে দিয়ে চলে গেল।

যেদিন সন্ধ্যের পর বিষ্টু বাবু এসে বসলেন। ইতিমধ্যে স্বামীও অনেক সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমরা তিনজনেই গল্পগুজব করছি। রাত অনেক হয়েছে। কাজেই বিষ্টু বাবুকে আমি অনুরোধ করলাম—রাত তো অনেক হল। যদি আপত্তি না থাকে, রাত্রির আহারটা এখানেই সমাধা করুন না কেন।

হাসলেন তিনি—আচ্ছা তাই হবে। আর আপত্তি! মেয়েদের হাতের রান্না যে কতদিন খাইনি। বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—আর এমন দিনও যায়, বৌদি, খাওয়াই জোটে না হয়ত। ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়েও দিন কাটাতে হয়।

রান্নাঘরে গিয়ে সবাই বসলাম। কথা-বার্ত্তার মাঝখানেই বিষ্টু বাবু বলে উঠলেন—আচ্ছা বৌদি, আপনিও তো আমাদের কাজে কিছু সাহায্য করতে পারেন।

হাসলাম আমি—লাঠি ধরব না বন্দুক! কোনটারই তো অভ্যেস নেই।

না, না,—হাসির কথা নয়।

তা আপনাদের কাজটা কি জানতে পারি?

হেসে বললেন বিষ্টু বাবু—মানে, আমাদের কাজ ঠিক আপনাকে করতে হবে না। আর আমাদের কাজ? সে না—হয় না-ই শুনলেন। তবে বলছিলাম কি—আপনি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করেন, তবে আমাদের অনেক উপকার হয়। অথচ—

মাঝ পথে আমি বলে উঠলাম—যথা?

ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমরা শুধু আপনার মারফৎ খবরটা পেতে চাই।

কি খবর—কিসের খবর?

এটুকু আর বুঝলেন না। গলা খাটো করে তারপর বললেন তিনি—বাড়ীর ভিতরকার খবর চাই। হাঁড়ির খবর। মেয়েমানুষ বলে আপনার তো সে সুবিধা প্রচুর বৌদি! যেতে হবে বড়লোকের বাড়ী, প্রতিপত্তি বিস্তার করতে হবে অন্দর মহলে। তারপরের খবরটুকু চাই আমাদের।

আমি যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ছি। অস্ফুটস্বরে বললাম—আমি তো লেখাপড়া জানিনে, শাড়ী গয়নাও তেমন নেই, আর—

বাধা দিলেন বিষ্টু বাবু—আর? আর যা যা লাগে, সে-সব আমরা যোগাব। শাড়ী, গয়না, আংটি, ঘড়ি—সব দেব, কোন চিন্তা নেই আপনার।

ক'দিন আমাকে তালিম দেওয়ালেন বিষ্টু বাবু এখানে এসে এসে। একদিন ওদের আস্তানাতেও নিয়ে গেলেন।

সুরু হয়ে গেল আমার সহর পরিক্রমা। আগে থেকে সেলাইয়ের বিদ্যাটা কিছু জানা ছিল। প্রথম প্রথম তাতে ভর করেই পাড়ি জমাতাম। পাশাপাশি সহরগুলোতে কোন কার্যের প্রতিনিধি সেজেও গিয়েছি। সুন্দর মুখের জন্য অভ্যর্থনা ভালই পেয়েছি।

নানান জায়গায় হরেক রকমের মিথ্যা কথা বলে বলে এমনই তখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, আমি নিজেই বুঝতে পারিনে সময় সময়—কোন্‌টা মিথ্যে আর কোন্‌টা সত্যি।

বাড়ী বাড়ী ঘুরে বাড়ীর অন্দরমহলের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর জানতে বাকী থাকত না। সেগুলো এসে বলতাম এদের। তারপর তারা হানা দিত সেই সেই বাড়ীগুলোতে,—অবশ্য আমাকে শুধু বাড়ী চিনিয়ে দিতে হত।

এই রকম ভাবে এক ডাকাতি করতে গিয়ে সেবার বাড়ীর বড় ছেলেকে (এ বাড়ীতে আমি সেলাই শেখাতে যেতাম) ওরা এমন নির্য্যাতন করে যে, দিন চার পাঁচ পরে সে হাসপাতালে মারা যায়। বৌ-টার সে কি কান্না! প্রতিদিনকার মত সেদিনও আমি ওদের বাড়ী গিয়েছি। কিন্তু তার কান্না দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আমারও চোখে জল এসে গেল। আমি বললাম—কি আর করবে ভাই! ইচ্ছে করে, ও মুখপোড়াদেরও অমনি করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারি।

পরদিন থেকে ও বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম; বিষ্টু বাবুকে বলে দিলাম—আমার দ্বারা এ কাজ আর হবে না।

সে কি বৌদি, এতে আবার আপনার কি হল? তা ছাড়া, এত ভাবপ্রবণতা এ লাইনে তো চলবে না। একটু শক্ত হতে হবে।

শক্ত? এর চেয়ে আর কি শক্ত হব? মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের পরম নির্ভর কেড়ে নিলাম—আরও শক্ত হতে বলছেন আপনি? আপনি কি মানুষ না পাথর?—বলে এক মুহূর্ত্ত আমি আর দাঁড়াইনি তার সামনে।

এর কয়েকদিন পরে আমরা ওখান থেকে চলে যাই। এবার বিষ্টু বাবু স্বয়ং আমাদের পথ দেখিয়ে আনেন। এখানেও বিষ্টু বাবুর আস্তানা আছে।

আস্তানা গাড়লাম এসে এক চা-বাগানের অনতি দূরে। চারিদিকে সবুজের মেলা। চা-গাছের সমারোহ। স্নিগ্ধ শ্যামলিমার সম্ভার, অতি দূরের ধূমল পাহাড় আকাশ-ছোঁয়া বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক নদীর কিনারা থেকে সুরু করে একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পীচের রাস্তা যেন এক দৌড়ে এসে লুকিয়ে গেছে চা-বাগানের মধ্যে। এখানে এসে স্বামীর শরীর ভাল কাটছিল না।

সেদিন স্বামীর ছিল অল্প অল্প জ্বর। বিষ্টু বাবু সেদিন ওঁকে তার 'কাজের' জন্য টানতে চাইলেন; কিন্তু আমি ওঁকে মোটেই যেতে দিলাম না। শরীরের অসুস্থতা দেখিয়ে নিবৃত্ত করলাম। বিষ্টু বাবু একটু অসন্তুষ্ট হলেন। তা হোন তিনি। সর্ব্বনাশ হলে তার আর কি? আমাকেই পথে বসতে হবে।

বিষ্টু বাবুকে বললাম একজন ডাক্তার ডেকে দিতে; অথবা ওঁকে হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিতে।

দেখি,—নির্ব্বিকার উত্তর এল বিষ্টু বাবুর। বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না।

পরের দিন সারাদিন আর কারোরই দেখা পেলাম না। মনে

মনে বিষ্টুবাবুর উপর বেশ রাগ হচ্ছিল। ওখানে থাকতে তো—যা হোক যাই হোক, একটা লোক তো ছিল সর্ব্বক্ষণের জন্য। কিন্তু এখানে? সারাদিন আমি ওঁর মাথার কাছে বসে। কপালে হাত দিয়ে জ্বর বেশি মনে হলে, মাথায় বেশ করে জল ঢালি।

অনেক রাত্রে বিষ্টুবাবু এলেন, সঙ্গে এনেছেন, একরাশ ফলমূল। আমি চেঁচিয়েই বললাম—আবার কার সর্ব্বনাশ করেছেন। দিল দরিয়া মেজাজে বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে পরে বললেন—সর্ব্বনাশ! মোটেই না। ওদের এটুকু গেলে কিছুই হয় না। অনেক—আছে ওদের। থাক—তারপর, ও কেমন আছে?

ভাল নয়।

সে কি!

হ্যাঁ তাই। দেখুন না।

কাছে এসে এগিয়ে দেখলেন বিষ্টুবাবু। সত্যিই তো! তারপর তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

আসছি!—বলে যেন ছুটে চলে গেলেন বিষ্টুবাবু।

ঘণ্টাখানেক পরে মোটরের শব্দ শুনে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—বিষ্টুবাবু নামছেন মোটর থেকে সঙ্গে একজন ডাক্তার।

দু'জনে ঘরে ঢুকলেন। রোগী পরীক্ষা করে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝলেন সে-কথা বিষ্টুবাবু। তখুনি ডাক্তারের হাত চেপে ধরে বলেছিলেন বিষ্টুবাবু—ডাক্তার, ওকে বাঁচাতেই হবে, যত টাকা লাগে—

কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল আসবার উপক্রম। ডাক্তার শুকমুখে বললেন—আচ্ছা, এ কথা তো আপনাদের অজানা নেই যে, আমরা ভগবান নই। চেষ্টা করতে পারি মাত্র—

বাধা দিয়ে বিষ্টুবাবু আবার বললেন—হ্যাঁ, তাই করো ডাক্তার, যা টাকা লাগে, ভাবনা নেই।

অসুখ আরো বাঁকা পথে মোড় নিল। ডাক্তারও দু'-তিন দিন এসে গেলেন। দিন সাতেক যমে-মানুষে টানাটানি করবার পর মানুষেরই হার হল।

কিন্তু এবার আমি? আমি কোথায় যাব? যে-পথে পা বাড়িয়েছি, তাতে এই পথ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই। তবে এ-কথা ঠিকই, বিষ্টুবাবু আমার প্রতি অতি সম্ভ্রমসূচক ব্যবহারই করেছেন। এখন এখানে থাকলেও হয়ত বিরক্ত হবেন না।

একদিন স্পষ্টই শুধালাম—আমি যদি এখানে থাকতে চাই আপত্তি আছে? অবশ্য নিজের খরচটা চালিয়ে নেবার উপায় করে নেব যা' করেই হোক।

আপত্তি! হো হো করে হেসে ওঠে বিষ্টুবাবু। তারপর বললেন—আপনাদের দৌলতেই তো আমাদের টু-পাইস হয়েছে।

রয়ে গেলাম ওখানেই। বিষ্টুবাবু রোজই একবার করে আসতেন। বাসায় কাজ করবার জন্যে একজন মেয়েমানুষও ঠিক করে দিয়েছিলেন তিনি। রাত্রে সে বাসায় শুয়ে থাকত।

মাঝে মাঝে দু'একদিন আসতেন না; আমি বুঝতাম এর কারণ। কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করতাম না।

সেদিন বিষ্টুবাবু বলে গেলেন একটু সজাগ থাকতে, তিনি আসবেন শেষ-রাত্রের দিকে। ভয়ের কোন কারণ নেই। জানালায় টোকা দেবেন, আর একটা কাগজ ফেলে দেবেন, তাতে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকবে। সে-চিহ্ন না থাকলে দরজা যেন না খোলা হয়। এই বলে আমার হাতে একটা কাগজ দিলেন। তাতে চিহ্ন আঁকা ছিল। চিহ্নটা দেখে নিয়ে কাগজটা খুব সাবধানে রেখে দিতে বললেন।

রাত্রি বোধ হয় তিনটার কিছু বেশি হবে। কিছুক্ষণ আগে চা-বাগানেই হয়ত পেটা-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিয়েছে তিনটা। ঘুম নেই আমার চোখে।

হঠাৎ জানালায় টোকা পড়ল। আমি শ্বাসরুদ্ধ করে পড়ে রইলাম। কিন্তু সাঙ্কেতিক কাগজ আর আসে না। আমি দরজা খুলতে পারি না ভয়ে। একবার মনে করলাম—পাশের ঘরে ঝি-টা শুয়ে আছে ডাকি তাকে। কিন্তু তখনই জড়ানো সুরে মিহি করে কে যেন বলল—লক্ষ্মী, দরজা খোল, রাণী। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি ভীত কণ্ঠে শুধালাম—কে?

একটা অকারণ হাসির তরল শব্দ ভেসে এল—আমি গো আমি। তার পরই জড়ানো কণ্ঠে—আমাকে চেন না, এঁ্যা!

চুপে-চুপে গিয়ে ডাকলাম দাসীটাকে। এতক্ষণ তার নাক ডাকছিল। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আমি গিয়ে গায়ে হাত দিতে-না-দিতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল—কি দিদিমণি কি হয়েছে? আমি ইসারায় তাকে চুপ করতে বললাম—আমার মুখে আঙুল চাপা দিয়ে। তারপর তাকে চুপে চুপে বললাম ঘটনাটা। সে আমার ঘরে এসে জানালার উপর উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে ফিস ফিস করে বলল আমার কাছে—বিষ্টুবাবু গো দিদিমণি। জানালার নীচে বসে পড়ে বিষ্টুবাবু তখন গুনগুন করে কি যেন গাইছেন। আমি তাকে বললাম—যা, নিয়ে আয় ঘরে।

ও গিয়ে তার হাত ধরতেই তিনি ওর হাত দুটি ধরে বিপুল বেগে তার দিকে আকর্ষণ করতে গিয়ে এক ঝটকা খেয়ে পড়তে গিয়েও টাল সামলে নিলেন। তার কথার কিছুটা অংশ তবু কাণে এল—কেন পাগলামী করিস রাণী, আয় কাছে আয়। আচ্ছা, এবার আমি খু-উ-ব লক্ষ্মী ছেলের মত হয়ে যাব। দেখ না পরীক্ষা করে।

এ-কথার পরে সে তার হাত ধরল। আশ্চর্য্য, সত্যিই এবার আর কোন রকমের বিসদৃশ আচরণ করেননি।

রাতটা কাটল তার আমার ঘরেই। দাসীটিকেও রাত্রির মত এ ঘরেই শুতে বললাম।

পরদিন তার ঘুম ভাঙল অনেক বেলাতে।

মেঘে মেঘে সেদিন সকাল থেকেই অন্ধকার করে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে মধ্যে মধ্যে। দূরে কোথাও বৃষ্টি নেমেছে বোধ হয়।

বেলা প্রায় ১টা। বিষ্টুবাবু ধীরে ধীরে উঠে একেবারে রান্না ঘরে গিয়ে হাজির। কালকের রাত্রির সেই ঘটনার পর থেকেই ওকে দেখলেই আমার কেমন ভয় হচ্ছিল। তাই তাকে ফেরাবার উদ্দেশ্যে বললাম—এখানে এলেন কেন? আমি আপনার চা দিয়ে আসতাম ও ঘরে। যান, আমি আসছি।

ধীরে ধীরে আচ্ছন্নের মত চলে গেলেন উঠে। একেবারে বেরিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম—দেখেও কিছু বলিনি।

যাওয়ার সময় পিছন ফিরে একটু বিদ্রূপ, কিছুটা বা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন বলে আমার মনে হল।

এরপর থেকে মিট্টু বাবু, আমার কোন খোঁজ খবর নেওয়ার আগ্রহ দেখাননি। আমিও কিছু উচ্চবাচ্য করিনি। গরীব হয়েছি বলে কি এতই অবহেলার সামগ্রী, নারীত্ব কি এতই তুচ্ছ? মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলাম—এ ভালই হল। নিজের পায়ে দাঁড়াবার সময় এল এবং সৎ পথে উপার্জনের পথ খোলা হল এখন থেকে।

সেলাই শেখানোতে জোর দিলাম। বেশ ক'টি ঘর ছাত্রীও জুটে গেল। কোন রকমে আমার সংসার যাত্রা চলতে লাগল। মিট্টু বাবুর কথা আর মনেও আসে না। তা ছাড়া, সময়ও আমার নেই বললেই চলে।

চৌধুরীরা এক কালে মস্ত বড় লোক ছিল। বাড়ীতে শুধু লেখাপড়ার চর্চ্চাটাই তেমন নেই। তা বাদে, গান-বাজনা, সেলাই-ফোঁড় ইত্যাদি সব শিখত এককালে—এখনও কিছু কিছু শেখে, ও-বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা।

ও-বাড়ীরই মেয়ে আরতিকে শিখাতে যেতাম সেলাই বোনা। ছোট ছেলে রবি শিখত সেতার। সেতারের আসর বসত বাইরের ঘরে। তারপরই ছিল আরতির সেলাই-শেখার ঘর।

সেদিন আমার কাজ শেষ করে আমি বৈঠকখানায় এসে দাঁড়িয়েছি। রবির হাতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেতার। রাগ-রাগিণীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ বিস্তার হাওয়ায় যেন পাখা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের ভিতর। রবি তন্ময় তারের সুরের জালে,—

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তে মুহূর্ত্তে থেমে গেল বিকট এক ঝঙ্কার তুলে সেই সুরলোকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আমি সখেদে বললাম—ইস্, থামলেন কেন?

নির্দ্বিধায় সে বলল—আপনাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। বসুন না!

না থাক, আর একদিন শুনব। তবে কিনা বাজনাটা আমার খুব ভাল লাগে।

বেশ, তাই হবে। তবে এখনও আমার হাত কাঁচা তো।

আমি আর দাঁড়ালাম না। সারাটি পথ শুধু ঐ চিন্তা করতে করতেই এলাম—কি অপূর্ব্ব মিষ্টি হাত! ভবিষ্যতে কত বড় বাজিয়ে হবে সে! দেশ-বিদেশে ছড়াবে কত নাম!—এক সময় নিজেরই হাসি এল—দূর, এসব কি ভাবছি আমি! রবির নাম হবে, যশ হবে, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কি আছে!

সেদিন আমার ছাত্রীর শরীর ভাল ছিল না। তাই সেলাই-বোনার কাজ কিছুই শেখা হল না। আমি ওকে টেনে নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে, চল—তোমার দাদার সেতার শুনব। তখন ও-ঘরে ওস্তাদ ছিলেন; তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ওস্তাদ চলে গেলে আমি বললাম—এবার আপনার হোক একখানা।

প্রথমে মৃদু বিলম্বিত লয়ে, পরে ক্রমে ক্রমে দ্রুত লয়ে ধাপে ধাপে উঠতে লাগল সুরের মূর্চ্ছনা; মীড়-গমকের চমকে ঘরখানা গম-গম করতে লাগল। ঝঙ্কারের রেশ দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটে ঘরের হাওয়ার ওজন করল ভারী। কখন যে সেতার থেমে গিয়েছে ঠিক খেয়াল করতে পারিনি। চমক ভাঙল রবির ডাকে—কেমন লাগল?

পাশে তাকিয়ে দেখি আরতিও নেই! আমি বললাম—আরতি কোথায়?

খেতে গিয়েছে। রাত অনেক হল তো?

এঁ্যা, তাই নাকি—সর্বনাশ!

হাসল রবি মিষ্টি করে—কেন? একা ভয় করবে? আচ্ছা, আমি-ই না হয় একটু এগিয়ে দেব দরোয়ানের সঙ্গে গিয়ে। কিন্তু বাজনা কেমন লাগল বললেন না তো!

এমন আশ্চর্য্য বাজনা আমি কখনও শুনিনি।

এ আপনার অতি বিনয়।

কোন কারণ নেই।—কথাগুলো আমার যেন স্পষ্ট হল না।

সেদিন রবি সত্যিই এসেছিল আমার সঙ্গে আমাকে এগিয়ে দিতে। পথে শুধিয়েছিল—সত্যি আমার সেতার বাজনা ভাল লাগে আপনার?

হ্যাঁ, আমারও এককালে সখ ছিল কিনা।

তাই নাকি! তা বেশ তো, এখনও তো শিখতে পারেন!

কেমন করে?

রবি যেন কি ভাবছে, কানে গেল না তার কথা। ইতিমধ্যে বাড়ী এসে গিয়েছি। তাই বললাম—এবার আপনি যান।

রবিই হাত তুলে নমস্কার করল; আমিও প্রতিনমস্কার করলাম। রবি ঘুরে দাঁড়ালে আমি বাড়ীর চৌকাঠে পা দিয়েও আবার দাঁড়ালাম কয়েক মিনিট। চেয়ে রইলাম ওদের গমন পথের দিকে।

বাড়ীতে কতকগুলি জরুরী কাজ থাকায় আমি রবিদের বাড়ীতে যেতে পারিনি। সন্ধ্যার পরই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে চমকে দেখলাম—রবি দাঁড়িয়ে, হাতে তার কাপড়ের ঢাকনায় মোড়া সেতার।

আপনি! একেবারে গরীবের বাড়ীতে সশরীরে! দারোয়ান কই?

আনিনি, ইচ্ছে করেই। তা বসতে বলবে না নাকি!—এমন মিষ্টি হাসল।

না—না, সেকি, আসুন!

ঘরে একখানা মাত্রই চৌকি। তার উপরেই নিয়ে বসালাম তাকে।

চা-জলখাবার তৈরি করে এনে দিলাম। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বসতে বললেন। বাধ্য হয়েই বসলাম ঐ চৌকিরই এক কোণে জড়-সড় হয়ে।

হঠাৎ রবি বলে বসল—তুমি বললাম বলে রাগ করোনি তো!

হেসে বললাম—না।

বলল আবার—কতদূর পর্য্যন্ত জানো দেখি, ধরো সেতারটা।

এগিয়ে দিলেন তার সেতার, ধরবার সময় তার হাতে আমার হাত লেগে গেল। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। সর্ব্ব অঙ্গ যেন শিথিল হয়ে গেল। সেতারটা পড়ে গেল তার কোলে। অল্প হেসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কি হল?

কিছু না—সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে তাড়াতাড়ি সেতারটা তুলে নিলাম।

আড়ষ্ট, শঙ্কিত ভাবটা কাটাতে কিছুটা সময় গেল। রবি তাড়া দিতে লাগল—কই নাও, আরম্ভ করো।

ধীরে ধীরে আরম্ভ করলাম। রবি হাতে ওর তাল রাখতে লাগল। একখানা গৎ-বাজানো শেষ হলে থামলাম। রবি প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

রবি প্রশ্ন করল—কোথায় শিখেছিলে? মনে হচ্ছে এককালে বেশ চর্চা ছিল।

দেশে আমাদের গাঁয়ে এক পুরুত ঠাকুরের ছেলের কাছে। আমরা দাদাঠাকুর বলে ডাকতাম তাকে। ওর এক দাদা আমাদের বাড়ীতে মাসিক তিন টাকা মাইনেয় পুরুতগিরি করতেন। গৃহে রাধামাধবের পূজা হত রোজ। দা' ঠাকুর গান জানতেন ভাল। তিনিই জোর করে সেতার এনে আমাকে শেখাতে লাগলেন। বড় হয়ে তা বন্ধ হয়ে গেল। সেলাই শিখি তার পরে—অবশ্য দেশেই।

এবার আমি বললাম—আপনার একখানা হোক।

দাও বলে সেতারটা টেনে নিলেন।

সে কি বাজনা! যতক্ষণ বাজছিল, ততক্ষণ আর এ জগতের কথা মনে ছিল না। থামবার পরেও সারা ঘরে সঙ্গীত-জগতের অশরীরী আত্মারা যেন থরময় ভাসছিল।

থামল সেতার। চুপচাপ দুজনেই।

হঠাৎ রবি শুধাল—তোমার না সেতারের সখ ছিল বলছিলে সেদিন। এখনও তা আছে নিশ্চয়ই!

হ্যাঁ।

শিখবে?—আমি শেখাব তোমাকে।

আকাশের চাঁদ পেলুম হাতে। বলে কি রবি! হ্যাঁ-না কোন কথাই বেরোল না আমার মুখ দিয়ে।

আপত্তি আছে? তোমার এমন মিষ্টি হাত! একটু থেমে বলল—আমি প্রতি রবিবার যেদিন আমার ওস্তাদ না আসে, সেদিন তোমাকে এসে শিখিয়ে যাব।—এ তোমাকে শিখতেই হবে। তোমারও তো সেদিন ছুটি।

এত কথার উত্তরে আমি শুধু বললাম—বেশ।

এর পর থেকে প্রতি রবিবারই রবি আসতে লাগল। আমাকে সেতার শেখানোর জন্যে তার অপরিসীম আগ্রহের কথা ভাবলে আজও আমার মাথা নত হয়ে আসে, আর আসে চোখে জল।

রবি একদিন বলল—এ ভাবে তো অসুবিধা হবে। প্রতিদিন রেওয়াজ করার দরকার এবং তার জন্যে প্রয়োজন নিজস্ব একটি সেতারের।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। অত টাকা আমি কোথায় পাব? রবিও নিরুত্তরে ব'সে।

দেখি,—বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রবি উঠে পড়ল সেদিন।

এর পরের রবিবার রবি আর এল না। আমার মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। পরের দিন ওদের বাড়ীতে গিয়ে শুনি—রবিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

আমার বুকটা কি এক অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠল।

শরণাপন্ন হতে হল বিষ্টুবাবুর। বিষ্টবাবুকে সব খুলে বললাম, শেষে অনেক অনুনয়-বিনয় করে বললাম—ওকে যে করেই হোক জামিনে বের করে আনতেই হবে। টাকার জন্যে ভাববেন না, আমি যোগাব।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বিষ্টুবাবু তাকালেন আমার দিকে। হেসে বললেন তারপর—বেশ তাই হবে। কিন্তু, কেন ধরল তাই বললেন না।

কি জানি, তা তো বলতে পারি না।

তবে? আচ্ছা দেখি, থানায় গেলেই সব টের পাওয়া যাবে।

থানাতে যেতেই বিষ্টুবাবুকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন ছোট বাবু। চা-সিগারেট আনতে বললেন।

লোকজনের ভীড় কিছু কমলে বিষ্টবাবু কথা পাড়লেন। শুনলেন—একটা হার চুরির ব্যাপারে ধরা পড়েছে রবি। ওর বড় বোন ক'দিনের জন্যে এখানে এসেছে—ছেলে-পুলে হবে। এই বোনের হার চুরি হয়েছে।

থানা থেকে ফিরে বিষ্টুবাবু বললেন আমাকে—এখন জেলে নিয়ে যাবে, যদি না জামিনে বের করে আনতে পারা যায়।

কোর্টবাবু থেকে আরম্ভ মোক্তারের মুহুরী পর্যন্ত জামিনের ব্যাপারে অপূর্ব একতা—এক প্রাণ। বিভিন্ন বহরের প্রণামী বিভিন্ন দেবতার।

জামিনে বের করে আনলাম রবিকে। অবশ্য বিষ্টুবাবু না থাকলে সেদিন হত কিনা সন্দেহ। পুলিসের—থানারই হোক বা কোর্টেরই হোক—সবই ওর চেনা। তাদের প্রত্যেকটি আইনের ফাঁক ওর জানা আছে, আর সেগুলো বন্ধ করতে যে মাল-মশলা দরকার, তা-ও পাকা মিস্ত্রির মত নিপুণ হাতে করতে পারেন।

এবার আর এক অসুবিধা, কিছুতেই রবি বাড়ী যাবে না। সেদিনের মত কোন ব্যবস্থা করা গেল না। আবারও বিষ্টবাবুকে বলতে হল। শেষে হোটেলে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত হল।

রবির সঙ্গে দেখা করে একবার আমার ওখানে আসতে বলেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রি ন'টার সময় ও এল আমার বাসায়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জানলাম—হারটা সরিয়েছিল বাড়ীর চাকরকে দিয়ে। সে ওর হাতে এনে দিয়েছিল ঠিকই। খোঁজ পড়তে যখন পাওয়া গেল না সে-হার, তখন পুলিসে খবর দিতেই হল। পুলিস প্রথমে ধরে নিয়ে গেল চাকরটাকে। মার-ধোর করে ওর কাছ থেকে কথা বার ক'রে। ও শেষে বলে ফেলে—দাদাবাবুকে দিয়েছি। আবার এল পুলিস, ধরল রবিকে।

আমি প্রশ্ন করলাম হারটা এখন কোথায়?

রবি এক জুয়েলারী ফার্মের নাম বলল সেখানে বন্ধক রেখে টাকা এনেছে দু'-শ। জানা-শোনা দোকান যেতেই বার করে দিয়েছে।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কেন এমন কাজ করতে গেলে? কিছুতেই চোখের জলের বেগ মানাতে পারলাম না।

হাসল রবি—এতেই কেঁদে ফেললে! কেঁদো না লক্ষ্মী, শোন,—বলে আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে ফেলল—তোমার জন্যে।

বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাইলাম—আমার জন্যে! আমার জন্যে তোমার চোর অপবাদ হবে!—এ আমি জীবন গেলেও সহ্য করতে পারব না।

হেসে বলল—পাগলী! কি করবে? চুরি তো সত্যিই করেছি। না হলে তোমার সেতার—

মুখে হাত চাপা দিলাম তার। আমি চমকে উঠলাম। খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম—যা করেছ ভালই করেছ। এখন আমি যা বলি তাই করো। একটা চিঠি লিখে দাও জুয়েলারের নামে, হারটা আমাকে দিয়ে দিতে। এই নাও লেখো—বলেই কাগজকলম এগিয়ে দিলাম।

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করল, তারপর আমি যেই একটু সুর চড়িয়ে বললাম—লেখো বলছি, অমনি সে হেসে লিখে দিল আমার কথামত।

চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে সে বলল—কিন্তু থানায় যে স্বীকার করেছি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম আমি—তাতে কি, থানায় স্বীকার করার কোন মূল্য নেই। কোর্টে বলবে, থানায় মার-ধোরের ভয়ে মিছে কথা বলেছি।

মিথ্যে কথা বলব ?

দুহাত ধরলাম তার—লক্ষ্মী, একথাটা তোমাকে বলতেই হবে।

তার পরে ?

তারপরের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি ও চলে গেল।

পরদিন সকালে গেলাম চিঠি নিয়ে সেই জুয়েলারী ফার্মে। নগদ টাকা মিটিয়ে দিয়ে নিয়ে এলাম সেই হার। দোকানদার অবশ্য অনর্থক আজে-বাজে কথা বলে আমাকে বেশ খানিকক্ষণ দেরি করিয়ে দিল। যখন সে শুধাল—রবিবাবু আপনার কে হয়? আমি উত্তরে বললাম—তাতে কি দরকার আপনার ?

দোকানদার সুর নরম করে বলল—আচ্ছা, মাপ করবেন, অন্যায় হয়েছে।

হ্যাঁ, একশবার।

মুখ গম্ভীর করে টাকা এগিয়ে দিয়ে দোকানদারকে বললাম—নিন,—গুণে নিন।

নিঃশব্দে টাকা গুণে নিয়ে হারছড়াটা বার করে দিল সে। আমিও নীরবে বেরিয়ে এলাম হারটা নিয়ে। যেন অনুভব করতে লাগলাম, আমার পিছনে একজোড়া কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি অগাধ ঔৎসুক্যে জেগে রয়েছে।

হার নিয়ে এসে রবিকে ডাকলাম ওর হোটেলে গিয়ে। বেরিয়ে এল ও। বললাম—বাড়ী চল। হার নিয়ে এসেছি।

হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে রইল সে আমার মুখের দিকে। আমি মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললাম—তাকিয়ে দেখছ কি? নাও, তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি।

কোন কথা না বলে, ধীরে ধীরে কি ভাবতে ভাবতে সে চলে গেল ভিতরে। হোটেলের চার্জ মিটিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে আনতে আধ-ঘণ্টার বেশি দেরি লাগেনি তার।

বাড়ী পৌঁছেই আমি দরজার কড়া নাড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দাঁড়াল ছাত্রী আরতি। কি যেন বলতে যাচ্ছিল, দাদার দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল—দাদা! বলেই ছুট দিল বাড়ীর মধ্যে। একেবারে মাকে ধরে নিয়ে এল। বাড়ীময় তখন হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে।

সবাই এল, এল না শুধু বড় বোন। সে তখন দোতলায় বসে ছেলের সোয়েটার বুনছে।

আমি আরতির হাতে হারছড়াটা এক রকম ফেলে দিয়েই বললাম—হারটা আমিই নিয়েছিলাম।

রবি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। তাই আমি অতি দ্রুত এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম—তোমার দিদিকে দিয়ে দিও। বলেই আর দাঁড়াইনি।

দু'তিন দিন পর শুনি, ও হার ওর দিদির নয়, থানাতে ওরা ডাইরী করেছে, আমার নামোল্লেখ করে যে, হার আমি শুধু চুরিই করিনি, সে সম্পর্কে জালিয়াতিও করেছি ওদের সঙ্গে।

# সমুদ্র

স্বলতা সেনগুপ্ত

সাগর, আমার শেষের সন্ধ্যা তোমার কূলে
বদ্ধ-মনের দুয়ার হেথায় দিলেম খুলে,
প্রথম যেদিন হেরিনু তোমার এ জলধারা
মহা বিস্ময়ে বাক্য হারা,
চমকি, থমকি দাঁড়ানু থামি
ধন্য আমার পথের শ্রান্তি, ধন্য আমি
তুমি অনুপম, উপমা, তুলনা গেলেম ভুলে।

তোমার মুখর বালুকা কণায়,
তুষার-শুভ্র ফেনার ফণায়
বড়ো স্নেহ করে, শীকরে শীকরে
আমারে ছুঁলে
বুলালে সে ছোঁয়া তাপিত বক্ষে
তব দরশন পিয়াসী চক্ষে
কত বার-বার সে স্নেহ পরশ দোলা দিয়ে গেল রুক্ষ চুলে।

প্রভাত সমীরে বসন উড়ায়ে
ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ কুড়ায়ে
বাঁধি আঁচলে
না মেনে বারণ ঝাঁপ দিয়ে পড়ি অথৈ জলে—
শিশুর মতন খেলার ছলে।
গুরু গর্জনে আপনার কথা শুনাও নাকি!
সারা নিশিদিন যে ডাকাডাকি—
সে ডাক ছড়ায়ে পড়ে দিকে দিকে
কাছে টেনে আনে ব্যাকুল পথিকে
সুর বেজে ওঠে নব জীবনের মর্মমূলে।
হে উর্মিরাজ, তুমি জীবন্ত, সুন্দর আর ভয়ঙ্কর
তনুতে শোভিত কাজল কোমল নীলাম্বর
গগন লুটায়ে পড়িছে অঙ্গে
চাঁদিনী মিলায় খর-তরঙ্গে
ভাবনা আমার ঢেউয়ের দোলায় পড়িছে দুলে
দূরের বন্ধু, রবে সৌরভ স্মৃতি মুকুলে।

# গঞ্জ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অবিনাশ সাহা

## ১৭

অতীতকে ভুলে যেতেই চায় চাপালতা। কিন্তু অতীত ওর গহন মনে প্রতিনিয়তই ঝড় তোলে—ওকে কাঁদায়। যশোদা মজুমদার কৌশলে ওকে বন্দী করে ফেলেছে। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাগ্য দেবতাই ওকে এখানে টেনে এনেছেন। নিরুপায় ও। এ কারাগার থেকে ওর আর মুক্তি নেই। কিংবা কেউ ওকে মুক্তি দিলেও ও আর মুক্ত দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারবে না। বন্দী বিহঙ্গীর মতোই ওর প্রাণের উৎস শুকিয়ে গেছে।

না, মুক্তি ও চায় না। মুক্তির বদলে ও চায় বর্তমানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে—অতীতকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে। কিন্তু বিপদ হয়েছে অতীত আজো ওকে পলে পলে কুরে খাচ্ছে।... চাপালতার মনে সুখ নেই। ক'দিন নিঃসঙ্গ জীবন চলেছে। নবীন চৌধুরী খুন হবার পর থেকে মজুমদার বড় একটা তালপুকুরে আসছেন না। এলেও রাত কাটান না, সাধারণ খোঁজ-খবর নিয়ে চলে যান। অবশ্য চাপালতার তাতে কোন রকম হায় আপসোস নেই। ও বরং খুশী। খুশী এজন্যে, এ কদিন ওকে অভিনয় করতে হচ্ছে না।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি দিয়ে একাকীই জানালায় বসেছিল চাপালতা। বসে বসে হয়তো অতীতের রোমন্থনই করছিল। সহসা দৃষ্টি দিগন্তে প্রসারিত হয়। চারদিক জুড়ে থৈ থৈ করছে নীরন্ধ্র অন্ধকার। কোথাও কোন আলোর চিহ্ন নেই। ওর জীবনের থরে থরেও ঘনীভূত অন্ধকার। চাপালতার দু'চোখ বেয়ে জল আসে। সে জল শুকোতে না শুকোতেই কানে আসে কোলাহলমুখর জনতার আনন্দ-ধ্বনি। দেখতে দেখতে চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে। আকাশে লক্ষ তারার ঝলমলানি। হাউই, রংমশাল আর আতশবাজীর রোশনাইতে উজ্জ্বল। উচ্ছল ব্যাণ্ডের মনোহর সুরলহরী। চাপালতার দৃষ্টি দিগন্তের অন্ধকার থেকে ফিরে এদিকে আকৃষ্ট হয়। বরবধূ চলেছে মিছিল করে। জীবন স্বপ্নে বিভোর দুটি কচিপ্রাণ। ওদের অধরে অনুরাগের সলজ্জ হাসি—চোখে দিগ্বিজয়ের নেশা—বুকে সহস্র শিখা কামনার আগুন। সহসা আগুনই বোধ হয় জ্বলে ওঠে চাপালতার বুকের ভেতরে। একদা ওরাও এমনি করে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওর রূপের সুখ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল মুখে-মুখে। নতুন বউ দেখতে এসে নতুন তারকার আবির্ভাবই দেখেছিল অনেকে। কিন্তু কি হলো? সেই রূপই ওর কাল হলো। এখন তো সর্বাঙ্গ বিষে জর্জর।...

চাপালতা শরাহত হরিণীর মতোই জানালা থেকে ছুটে পালায়। বালিশে মুখ গুঁজে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। অতঃপর দূরের কথা দু'দিন পরে ওর নিজের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ওকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু কি করতে পারে ও? কোনদিন তো এ জীবন ও কামনা করেনি! তবু কেন নিয়তি ওকে এ পথে টেনে আনলে?

বংশীর ঝড়েই ওর জীবনের ঝড় শুরু। সে ঝড়ে মহেন্দ্র ডুবলো ও বাঁচলো। বাঁচলো শয়তান মজুমদারটার জন্যেই। রক্ষক হয়ে ভক্ষক হলো পিশাচ। আবার হাত-পা বেঁধে প্রেমের অভিনয় করতেও ওর আটকাচ্ছে না। হায় সেদিন যদি ওকে খুন করতে পারতো কিংবা নিজে আত্মহত্যা করতো।

মিছিল চলে যায় চাপালতার কান্না থামে না। পাশে কেউ নেই যে সান্ত্বনা দেয়। দাসুর-মা ক'দিন হয় ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। একা নিঃসঙ্গ জীবন। এমন একা যে বনের পশুপক্ষীর পর্যন্ত সাড়াশব্দ নেই। মজুমদারের আসার সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কেঁদে এক সময় স্থির হয় চাপালতা। উঠে বসে। বসে ভাবে, এই সময়। এ সময়ে গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ঝাঁপ দিলে কেউ বাধা দেবে না।

ঝাঁপ দিতেই ওঠে চাপালতা, সহসা জানালার ধার থেকে ফিসফিস শব্দ ভেসে আসে। ও কি মহেন্দ্রর অতৃপ্ত প্রেতাত্মা! সুযোগ বুঝেই কি ওকে ও উদ্ধার করতে এসেছে? ওগো দাঁড়াও দাঁড়াও আমি আসছি। দাঁড়াও।...চাপালতা ঘুরে দাঁড়ায়।

ফিসফিসানী এবার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওর নাম ধরেই ডাকছে আগন্তুক। কিন্তু এ তো মহেন্দ্রর গলা নয়! কে তবে?—ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয় চাপালতার। কিছুতেই সাড়া দিতে পারে না।

অপরিচিত কণ্ঠ আবার ওর নাম ধরে ডাকে, 'দোর খোল লক্ষ্মীটি—ঠাণ্ডায় মলাম—চাপা—চাপালতা—চাপালতা।...

চাপালতা এবার ভয় কাটিয়ে ওঠে। ভূত প্রেত নয়, এতো স্পষ্ট মানুষের গলা! নিশ্চয় মজুমদার এসেছে। ঘাটের মড়া, ক'দিন পরে আজ হয়তো আবার ওর স্বেচ্ছাচারিতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ও কি মরতেও দেবে না আমাকে?..রাগে গোঁ গোঁ করতে করতেই দোর খুলে একপাশে দাঁড়ায় চাপালতা।

আগন্তুক এদিক ওদিক চেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে প্রবেশ করে।

সেদিকে চেয়ে শিউরে ওঠে চাঁপালতা—এ তো মজুমদার নয়, কে তবে?

আগন্তুকও কি করবে ভেবে পায় না। তাড়াতাড়ি টর্চের বোতাম টিপে নিজের মুখের ওপরে ধরে। অসহায় করুণ মুখ।

এবার ওকে চিনতে পারে চাঁপালতা। তাই নির্ভয়ে প্রশ্ন করে, আপনি।

হ্যাঁ আমি। বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। আশা করি ব্রাহ্মণকে তুমি ফেরাবে না।

কি চাই আপনার?

শুধু একটু আশ্রয়—অন্তত আজকের রাতটার জন্যে।

কেন কি হয়েছে?

গেচু ধরা পড়েছে—পুলিশ আমাকেও খুঁজছে।

চাঁপালতা কিছু বুঝতে পারে না। ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে।

রাখাল বলেই যায়, নবীন চৌধুরীর—

কথা শেষ করতে পারে না রাখাল, চাঁপালতা গর্জে ওঠে, আপনারা খুন করেছেন ওঁকে?

আমরা নিমিত্ত মাত্র। নিয়তি তাঁর কাজ করেছেন।

চুপ করুন। চলে যান এখান থেকে, নয় তো আমি নিজে পুলিশ ডাকবো।

তা তুমি পারবে না চাঁপা। ঐ যা তোমাকে 'তুমি' বলে ডাকছি, কিছু মনে করছো না তো?

চাঁপালতা সে কথার সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে ঘৃণায় ফেটে পড়ে, ছি ছি ছি, ব্রাহ্মণ হয়ে এমন জঘন্য কাজ আপনি করলেন?

রাখালও এ কথার সরাসরি কোন জবাব দেয় না। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তাই নিজের প্রয়োজনের কথাই বলে, শুকনো একটা কিছু দিতে পারো মা? আর টিকতে পারছিনে।

মা—চাঁপালতার মুখের রং নিমেষে পালটায়। সত্যি যেন ওর নিজের পেটের সন্তান বিপন্ন। ওর কাছে আশ্রয়প্রার্থী। মুখে কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরের ঘরে চলে যায়। নীচু পর্দায় রাখা হ্যারিকেনটা আস্তে করে উসকিয়ে দেয়। আলনার দিকে তাকায়। ধোপা বাড়ি থেকে আজকেই ধুয়ে এসেছে মজুমদারের এক পরস্ত জামা কাপড়। তা থেকে একটা ধুতি আর ফতুয়া টেনে নিয়ে ফিরে আসে।

রাখাল হাত বাড়িয়ে ওগুলো হাতে নেয়—পাশ ফিরে পরতে থাকে।

চাঁপালতা আবার চলে আসে ভেতরের ঘরে। রাত্রের খাবার ও খায়নি। মজুমদারের বরাদ্দ দুধ আর খাবারও ঢাকা দেওয়া রয়েছে। স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে তাড়াতাড়ি দুধটুকুই গরম করে। তারপর একটা বাটিতে ঢেলে নিয়ে আবার ফিরে আসে রাখালের কাছে। ধীর স্থির মাতৃমূর্তি—কোনরকম জড়তা নেই।

জামা কাপড় পালটিয়েও শীত কাটিয়ে উঠতে পারে না রাখাল। হাতের কাছে ধূমায়িত দুধের পাত্র দেখে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে।

চাঁপালতা সেদিকে লক্ষ্য করে অনুরোধ জানায়; এটুকু খেয়ে নিন, পরে চায়ের ব্যবস্থা করছি।

দুধের বাটিটা হাতে নিয়ে রাখাল বলে, তোমার সেবার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে মা। কিন্তু তার আগে তোমার কাছে আমার একটা আর্জি আছে। বলো তুমি আমাকে নিরাশ করবে না?

এসব কথা পরে শুনবো, আগে খেয়ে নিন।

না মা, পরে নয়, আগেই তোমাকে কথা দিতে হবে। আমরা উভয়েই ব্রাহ্মণ সন্তান। তোমার মুখের কথা পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হবো।

ব্রাহ্মণ সন্তান!—কথাটা কানে আসতেই সংকোচে জড়টুকু হয়ে যায় চাঁপালতা। কি মর্যাদা আজ ওর আছে? ও তো জাত খুইয়ে বসে আছে। যশোদা মজুমদারের⋯না না, সে কথা ও মুখে আনতে পারবে না। ওর পাপে সাত পুরুষ নরকে পচছে। মহেন্দ্রর প্রেতাত্মা মুক্তি পাচ্ছে না—ঘৃণার থুৎকার ফেলছে মহেন্দ্র ওর দিকে। না না, ওর কোন মর্যাদা নেই। ব্রাহ্মণ সন্তান ও গত জন্মে ছিল, এ জন্মে নয়।

⋯অন্তর্জ্বালায় মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না চাঁপালতার। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাখাল সবই বোঝে। বুঝেই আর এক ধাপ এগিয়ে যায়, আমি কি তবে ফিরে যাবো মা?

বাইরে প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি পড়ছে। ব্রাহ্মণ অতিথি—বয়সে রাখাল ওর বাবার বয়সীই হবে। না জানি কতক্ষণ ভিজেছে বেচারা। সারাদিন হয়তো খাওয়াই হয়নি⋯চাঁপালতা বাধা দেয়, না না, আপনি যাবেন না। আমি কথা দিচ্ছি, সাধ্যের অতীত না হলে আপনার সব কথাই আমি রাখবো।

তোমার পক্ষে অসম্ভব এ রকম কিছু বলবো না মা।

তা হলে আর দেরী করবেন না—চুমুক দিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

রাখাল তাই দেয়—কিছুটা সুস্থবোধ করে। তারপর ঢোক গিলে নিজের কথায় আসে, বেশী কিছু নয় মা। শুধু দু' তিন দিনের জন্য তোমার কাছে একটু আশ্রয় চাই।

আমার আশ্রয় কি আপনার পক্ষে নিরাপদ হবে?

গঞ্জে একমাত্র তুমিই আমাকে আশ্রয় দিতে পারো মা। না না, আমি স্তোকবাক্য বলছিনে। আমি ভেবে দেখেছি, পুলিশ কোন ক্রমেই তোমাকে সন্দেহ করতে পারবে না। এবং তা পারবে না জেনেই এই ঝড়-জলে তোমার কাছে এসেছি।

চাঁপালতা কি বলবে ভেবে পায় না।

রাখাল বলেই চলে, জান মা, কাল রাত থেকে আজ সারা দিন আমার কি ভাবে কেটেছে?

চাঁপালতা ঘাড় নাড়ে। ও কিছুই জানে না।

রাখাল বলে যায়, কাল রাত থেকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়েছি রাজাদের গড়ে।

বলেন কি!

সত্যি বলছি মা। কথায় কথায় দফাদারের কাছে সংবাদ পেলাম, পুলিশ গেচুকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছে। সুতরাং আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। রাত দুপুরেই সব কিছু ছেড়ে ঢুকলাম গিয়ে গড়ে।

সে যে ভীষণ জায়গা গোসাঁইজী।

সাপের ভয় বাঘের ভয় আমাকে রুখতে পারেনি। আমি বাঁচতে চেয়েছি এবং এখনো তাই চাই। কিন্তু কেন তা জানো? তোমরা

হয়তো বলবে স্বার্থসিদ্ধির জন্তে। আমিও তা অস্বীকার করছিনে। টাকা-পয়সা জমি-জায়গা আমার চাই এবং তার সঙ্গে চাই দাসত্ব থেকে চিরমুক্তি। চিরকাল ওরা আমাদের হাত-পা বেঁধে খুন করছে—এবার ওদের পালা।

মুক্তি আমিও চাই গোসাঁইজী, কিন্তু তার কি কোন উপায় আছে?

আলবৎ আছে। তুমি আমাকে সাহায্য করলে নিশ্চয় আমরা এগিয়ে যেতে পারবো।

গোসাঁইজী—

আমি জানি মা তোমার বুকে তুষের আগুন জলছে।

সে আগুন কি কোন দিন নিভবে?

কেন নিভবে না মা? সে ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি।

কি ব্যবস্থা গোসাঁইজী?

বেশী কিছু নয়। শুধু এই পুরিয়াটা মজুমদারের দুধের বাটিতে মিশিয়ে দেবে, বলতে বলতে উঠে গিয়ে জামার পকেট থেকে একটা টিনের কৌটো বার করে রাখাল। তার ভেতর থেকে একটা কাগজের পুরিয়া। পুরিয়ায় রয়েছে তীব্র বিষ—পটাসিয়াম সাওনাইড।

চাপালতা সহসা এ প্রস্তাবে সায় দিতে পারে না। বলে, এ যে মহাপাপ!

আত্মরক্ষায় পাপ পুণ্যের বিচার করতে নেই মা।

আত্মরক্ষা তো আমি করতে পারিনি গোসাঁইজী।

তোমার একার কথা না ভেবে সমস্ত নারী জাতির কথা ভাবো।

কিন্তু—

এতে কোন কিন্তু নেই। মনে রেখো, যশোদা মজুমদারদের মতো দানবদের নিধন করতে না পারলে কোন নারীই মুক্তি পাবে না।

বিষ প্রয়োগে কি সেটা সম্ভব?

হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু আপাতত এ ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই।

না না, এ কাজ আমি কিছুতেই করতে পারবো না। ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি, মানুষ মারা মহাপাপ। আপনি আমাকে মাপ করুন।

আমি মাপ করলেই কি তুমি মাপ পাবে? আমার কথা ছেড়ে দাও। নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করো এবং বলো, মনে মনে কি তুমি মজুমদারের মৃত্যু কামনা করছ না?

হয়তো করেছি—কিন্তু সে ঈশ্বরের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

ঈশ্বর যা কিছু করেন আমাদের হাত দিয়েই করেন।

চাপালতা এ কথায় আর কোন জবাব খুঁজে পায় না।

রাখাল বলেই যায় শোন চাঁপা, তোমার আমার পথ অভিন্ন। চলো আমরা পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে যাই।

দয়া করে আমাকে একটা দিন ভেবে দেখবার সময় দিন।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু আমি বলছি, শত্রুর নিধনেই আমাদের মুক্তি। নবীন চৌধুরী তার যোগ্য দণ্ড পেয়েছে। চেষ্টা করলে যশোদা মজুমদারও তা পাবে এবং মানবেন্দ্রনাথও বাদ যাবে না।

তা যদি পারেন—

পারতেই হবে মা—নারায়ণ আমাদের সহায়।

প্রয়োজন হলে আমি জান দেবো গোসাঁইজী।

সাবাস, এই তো ব্রাহ্মণ সন্তানের কথা। মা, মৃত্যু তো কারো একদিন ছাড়া দু'দিন হয় না। তবে আর ভয় কিসের ?

মৃত্যুকে কোন দিন আমি ভয় করিনি। একদিন মরতেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। কেন পারিনি জানেন ?

খুব জানি। তুমি প্রতিশোধ চাও।

হ্যাঁ, তাই চাই। এমন প্রতিশোধ যে পিশাচটা সারা জীবন দগ্ধে দগ্ধে মরবে। বিষ প্রয়োগ করে যদি ওকে মেরেই ফেলবো তা হলে আর ওর শাস্তি হলো কি ?

শোন মা, তোমার চেয়ে বয়েসে আমি ঢের বড়—তার ওপর চল্লিশ বছর নায়েবী করছি। সুতরাং আমার কাছে ভাবালুতার কোন দাম নেই। আমি মনে করি, ছলে বলে কৌশলে শত্রুকে নিধন করাই আমাদের ব্রত হওয়া উচিত।

ব্রহ্মরোষ যখন পড়েছে তখন অসুরকুল ধ্বংস হবেই। আগুন খেয়ে নেবেন, রাত কম হলো না, চাঁপালতা ঈষৎ হেসে প্রসঙ্গান্তরে যায়।

রাখালও সমতা রেখেই জবাব দেয়, বাঁচালে, সত্যি খুব খিদে পেয়েছে।

বারান্দায় বালতীতে জল আছে, হাত মুখ ধুয়ে নিন—আমি আসছি।

মজুমদার আসবে ভেবে গোবিন্দজীর ভোগ সরিয়ে রেখেছিল চাঁপালতা। লুচি, তরকারী, ছানার পায়েস, ফল। থালাশুদ্ধ সবই রাখালকে পরিবেশন করে।

আসনে বসতে গিয়ে রাখাল আপত্তি তোলে, একি, সবই যে আমাকে দিয়ে দিলে। নিজে খাবে কি ?

আমার জন্ত অন্ন ভোগ আছে। আপনি বসুন।

কিন্তু—

ভয় নেই, আপনার কৌটোর মতো কোন মহৌষধ আমার—

মহৌষধ জানা না থাক মহামৃত কেমন হয়েছে আগে তাই চাখতে দাও, চাঁপালতাকে বাধা দিয়ে একটা লুচি ছিঁড়ে মুখে দেয় রাখাল।

চাঁপালতা কাছে বসে তদারক করতে থাকে।

রাখাল বলে, এ যে দেখছি রাজভোগ !

হেসে চাঁপালতা উত্তর দেয়, এখন তার শত্রুর ভোগে লাগুক।

শত্রুর মুখে তো ছাই পড়ে জানি।

ছাই শত্রুর শত্রুর মুখে পড়ুক।

সে তো তোমার ওপর নির্ভর করছে, অর্থপূর্ণ হাসি হাসে রাখাল।

হাসির উত্তরে চাঁপালতাও হেসে হেসেই বলে, বলেছি তো, একটু সময় চাই।

সে তো মঞ্জুর হয়েই গেছে। এখন বসে পড়ো—রাত হয় তো আর বেশী নেই।

অতিথি নারায়ণ, তাঁর সেবার আগে—

তাহলে এক ছিলিম তামাক সাজো—অবশ্য যদি পাট থেকে থাকে।

পাট ভালই আছে কিন্তু শূদ্রের হুঁকো চলবে তো ?

জল ফেলে দিলে আপত্তি নেই।

সে আর বলতে হবে না। আচ্ছা গোসাঁইজী, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

কি বলো ?

আমাকে মজুমদারের লোক জেনেও কোন সাহসে আপনি আমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছেন ?

মহাপ্রসাদ হাতে নিয়ে তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না। বিপদ বুঝেই অঙ্ক কষতে বসলাম। দেখলাম, তুমি ছাড়া গঞ্জের আর কারো সাধ্য নেই আমাকে আশ্রয় দেয়।

অঙ্ক ঠিক ঠিক মিলেছিল ?

সম্পূর্ণ মিলেছিল বলবো না। কিছু ভাগশেষ ছিল।

তা হলে ?

পুরুষকে এ ঝুঁকি নিতে হয় মা।

আর একটা প্রশ্ন, গেছু কি বিশ্বাস করবার মতো কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ?

জানিনে মা তুমি ভাগ শেষের শেষ ফল কি না। তবু তোমাকে অকপটেই সব কথা বলছি। পরীক্ষা না করে এ শর্মা এক পাও কোথাও নড়ে না।

উঠলেন যে, পায়েসটুকু খেয়ে ফেলুন ?

আর পারবো না, হাত ধোবার জল দাও।

চাঁপালতা লজ্জায় পড়ে। ভাবে, হয়তো ওর অসংলগ্ন প্রশ্নেই গোসাঁইজী আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। তবু দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে ভরসা পায় না।

রাখাল হুঁকো টানতে টানতে আবার আগের কথায় ফিরে আসে, আচ্ছা মা তোমার সে রাত্রের কথা মনে আছে ?

কোন রাত্রের কথা বলুন তো ?

সেই যে দক্ষিণপাড়ার নাটকের আসর পণ্ড হলো।

তা আর মনে নেই ! সে তো ভীষণ ব্যাপার।

সেই ভীষণ ব্যাপারের আসল হোতা কে জানো ?

মজুমদারের কাছে শুনেছি, নবীনবাবুই দলবল নিয়ে—

না, নবীনবাবু নয়। আমার ইঙ্গিতে গেছু একা রণে নেমেছিল।

বলেন কি !

তোমার গোবিন্দজীর নামে শপথ করে বলছি, আশ্চর্যের হলেও এ-ই প্রকৃত ঘটনা। গেছুর আর কোন পরীক্ষার ফল জানতে চাও ?

আজ্ঞে না, দয়া করে এবার উঠুন।

কোথায় ?

মন্দিরের ভেতরে। ওর চেয়ে ভাল নিরাপদ জায়গা আর কোথাও নেই।

বেশ চলো।

একটু দাঁড়ান, বাইরেটা একবার ভাল করে দেখে আসি।

তার আর দরকার হবে না। পুলিশ এখনো আমার নাগাল পায়নি।

তবে চলুন।

চলো।

বৃষ্টি তখনো গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া দিচ্ছে।

সমগ্র তালপুকুর অঞ্চল নিস্তব্ধ। কোথাও কোন লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। চারদিক জুড়ে তখনো খা খা করছে ঘন অন্ধকার। চাঁপালতা অতি সন্তর্পণে দোরের খিল খোলে। রাখাল আগে পা বাড়ায়। টর্চের বোতাম টেপে। না, সত্যি কেউ কোথাও নেই। চাঁপালতাও বেরিয়ে আসে। দুজনে সমান তালে পা ফেলে চলতে যায়। সহসা পেছন থেকে কানে আসে বিক্ষিপ্ত পদ-ধ্বনি। দুজনেই আঁৎকে ওঠে। রাখাল তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে আবার টর্চের বোতাম টেপে। কিন্তু পালাবার আর পথ পায় না। উল্টো দিক থেকে চার পাঁচটা টর্চের আলো একযোগে ওর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কি করবে দু'জনের একজনও ভেবে পায় না। রমণী দারোগা সে কাঁকে খোলা পিস্তল হাতে দ্রুত এগিয়ে আসেন। সঙ্গী আরো পাঁচজন রাইফেলধারী সেপাই। রাখাল নিরুপায়। নিরুপায় হয়েই গ্রেফতার বরণ করে। কিন্তু চাঁপালতা ছিটকে গিয়ে ঘরের খিল বন্ধ করে দেয়! বিছানায় লুটিয়ে পড়ে রাখালের দেওয়া পটাসিয়াম সাইওনাইডের পুরিয়াটা হাতে নেয়। মুখে দেবার আগে শুধু একবারটি মনে পড়ে ওর বাছাদের কথা। কিন্তু কি করতে পারে ও? শয়তানের রাজ্যে হয়তো কারো নিস্তার নেই। কেউ হয়তো রক্ষা পাবে না ওরা। না না, তা কেন হবে? গোবিন্দজী কি ওর শেষ প্রার্থনাও কানে নেবেন না? নিশ্চয় নেবেন। যে কাজ ও অসমাপ্ত রেখে যাচ্ছে সে কাজ ভবিষ্যতের মানুষ নিশ্চয় সমাপ্ত করবে। ঠাকুরই ওদের সহায় হবেন।...

চোখের পলক মাত্র। তার পরেই হাতের পুরিয়া মুখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে যায় চাঁপালতা। কিন্তু তার আগে আর একবার স্মরণ করে ঠাকুরকে। জগৎ মিথ্যা—ব্রহ্ম সত্য। জগতের কারো বিরুদ্ধে আজ আর ওর কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু ঠাকুরের পরিবর্তে নয়নপটে ভেসে ওঠে মতেন্দ্রর প্রতিচ্ছবি। ভেসে ওঠে সেদিনের সেই নৌবিহারের সুখ-স্বপ্ন—সেই মধুর স্মৃতিবিজড়িত শুভদৃষ্টির পরমক্ষণ। না না, আত্মহত্যা তো ও করতে যাচ্ছে না। ও যাচ্ছে দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয়ের সান্নিধ্যে। দাঁড়াও—দাঁড়াও ওগো তুমি দাঁড়াও, বলতে বলতে নিঃশেষে হাতের পুরিয়া মুখে ঢেলে দেয়। পুলিশ দোর ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করেও ওর নাগাল পায় না। চাঁপালতার চাঁপাফুলের মতো রং ততক্ষণে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

## ১৮

চাঁপালতাকে বোধ হয় সত্যি ভালবেসে ফেলেছিলেন যশোদা মজুমদার। তাই ওর বিষ খাওয়ার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না। রাগে জ্বলে ওঠেন।

খবর দিতে এসে মানবেন্দ্রনাথ বিভ্রাটে পড়েন।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে গড়গড়া টানছিলেন মজুমদার। হাতে মুখে তখনো জল দেননি—মানবেন্দ্রনাথ শ্লথপদে এসে মুখোমুখি দাঁড়ান। চোখ মুখের ভাব থমথমে।

মজুমদার ওঁর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হন। ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেন, কিছু বলবে মানু?

মানবেন্দ্রনাথ চিন্তাজড়িত কণ্ঠেই উত্তর দেন, আজ্ঞে রাখাল গোসাঁই ধরা পড়েছে।

বলো কি! বাঁড়ের শত্রু তা হলে বাঘে খেলো! কিন্তু তোমাকে এতো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? কোন রকম—

আজ্ঞে—

কি হয়েছে খুলে বলো? ঐ দেখো, কি ভাবছো?

আজ্ঞে রাঙা কাকীমা বিষ খেয়েছেন।

মানু, উল্লসিত মুখ নিমেষে বজ্র গম্ভীর হয়ে ওঠে মজুমদারের। হয়তো বা ফানুসের মতোই ফেটে যান। থর থর করে কাঁপতে থাকে সর্বাঙ্গ। মুখের কথা শেষ করতে পারেন না। গড়গড়ার নলটা হাত থেকে খসে পড়ে।

মানবেন্দ্রনাথের মধ্যেও কাঁপুনি শুরু হয়। একটা আগ্নেয়গিরির সামনেই যেন ও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওকে আজ ভয় পেলে তো চলবে না। মানবেন্দ্রনাথ থিতিয়ে থিতিয়েই বলতে থাকেন, অভাবিত ব্যাপার। নচ্ছার গোসাঁইটা আবার আমাদের ঠাকুরবাড়িতেই ধরা পড়েছে। পুলিশ নাকি ওকে রাঙা কাকীমার সঙ্গে আলাপ করতে দেখেছে।

চুপ করো, রাগে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন মজুমদার। হিংস্র শ্বাপদের মতো তেড়ে আসেন।

মানবেন্দ্রনাথ কয়েক পা পেছিয়ে যান। কি করবেন ভেবে পান না।

মজুমদার ক্ষ্যাপা কুকুরের মতোই গজরাতে থাকেন, চাঁপা বিষ খেয়েছে না তোমরা ওকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছ? কি—উত্তর দাও! ভেবেছ, যশোদা মজুমদার মরে গেছে—না? এই কে আছিস—বিশে হরে—আমার বন্দুক—আমার রাইফেল—

মানবেন্দ্রনাথ এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই মজুমদারকে নিরস্ত্র করবার মতো কোন ভাষা খুঁজে পান না। এখন গা ঢাকা দিতেই মনস্থ করেন।

এমন সময় ত্রস্তপদে ছুটে আসেন হৈমবতী—মজুমদারের খোদ মহিষী। রাইফেল এগিয়ে দিয়ে হৈমবতী বলেন, এই নাও তোমার রাইফেল। গুলি বোঝাই আছে—চেঁচিয়ো না। কি দাঁড়িয়ে রইলে কেন—চালাও গুলি!—রাগে অভিমানে থরথর করে কাঁপতে থাকেন।

মজুমদার বোধ হয় সহসা চোখের সামনে ভূত দেখেন। তবু ওঝার মতোই গর্জে ওঠেন, মেজবৌ—

উত্তরে হৈমবতীও গর্জে উঠতেই যাচ্ছিলেন—মানবেন্দ্রনাথ বাধা দেন। দুহাত দিয়ে আগলিয়ে সকাতরে অনুরোধ জানান, দয়া করে আপনি এখান থেকে চলে যান মেজ কাকীমা—আপনার দুটি পায়ে পড়ছি, বলতে বলতে হৈমবতীর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নেন।

কিন্তু হৈমবতী দমেন না। গলার স্বর তীব্র করেই চেঁচাতে থাকেন, কেন যাবো—কিসের জন্তে যাবো? একটা ছিনাল মাগী মরেছে তার জন্তে শোক উথলে উঠেছে! রাইফেলটা তুই আমাকে দে মানু। হয় আমি মরবো না হয়—

কথা শেষ করতে পারেন না হৈমবতী, মজুমদার ভেঙে পড়েন যেন মহা প্রলয়ের পর শ্মশানের বৈরাগ্য। ধরা গলায় মজুমদার বলেন, তাই হোক মেজবৌ। তোমরা আমাকে রাইফেল দে উড়িয়ে দাও। তোমাদের সকলের হাড় জুড়োক।

নাটকীয় পট পরিবর্তন। মানবেন্দ্রনাথ নিজের কানকে নিজে

বিশ্বাস করতে পারেন না। মানবেন্দ্রনাথ ভাবেন, এই কি সেই যশোদা মজুমদার—যাঁর রুদ্ররোষ থেকে কেউ কোন দিন অব্যাহতি পায়নি।

মানবেন্দ্রনাথের মতো হৈমবতীও হতবাক হন। কোন দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি মজুমদারকে এভাবে দেখবেন। কত মান অভিমান, কত নিরম্বু উপবাস, কত চোখের জল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। জামা খুললে এখনো ওর পিঠের ওপরে হাণ্টারের দাগ দেখা যাবে। প্রতিবিধান তো দূরের কথা কোন দিন প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত ভরসা পায়নি, সত্যি কি মানুষ কাকাই ওর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।···হৈমবতী মজুমদারের কথার কোন উত্তর দিতে পারেন না। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

হৈমবতীর সঙ্গে সঙ্গে মজুমদারও চেয়ারের হাতলে মুখ লুকোন। দু'চোখের কোণে জলও দেখা দেয়। জল দেখা দেয় হয়তো নিজের অভাবিত পরাজয়ের কথা ভেবেই। আবার চাঁপালতার শোকেও সে জল ঝরতে পারে।

মানবেন্দ্রনাথ সত্য কাঁপরে পড়েন। কাকে. সামলাবেন ভেবে পান না। কিছুক্ষণ নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর হৈমবতীকে এক রকম জোর করেই হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে রেখে আসেন।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতেই বেরিয়ে যান হৈমবতী। সত্যি আজ ওর লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছে। বাড়ি ভর্তি ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী। এরপর আর কেমন করে ও ওদের মুখ দেখাবে?···

হৈমবতীকে পৌঁছে দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ আবার ফিরে আসেন। এসে মজুমদারের চেয়ারের পাশে চুপটি করে দাঁড়ান। কোন রকম সাড়া শব্দ নেই মজুমদারের। ঠিক সেই একই ভাবে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন। মনে হচ্ছে কোঁপাচ্ছেন। তাই কি বলে সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পান না। এদিকে আবার দেরী করারও উপায় নেই। এ বেলার মধ্যেই চাঁপালতার মর দেহের সংকারের ব্যবস্থা করতে হবে।···সময়ের কথা ভেবে বাধ্য হয়েই মুখ খোলেন মানবেন্দ্রনাথ। মজুমদারকে লক্ষ্য করে সহানুভূতিসূচক কণ্ঠেই শুধোন, আপনি কি তালপুকুরে একবার যাবেন না কাকাবাবু?

একটু আগে ওকে গুলি করতে চেয়েছিলেন মজুমদার। কিন্তু এখন ওকেই সবচেয়ে আপনার মনে হয়। মনের ভেতরে ঝড় বইছে। সে ঝড়ে এতক্ষণ একাই তোলপাড় হচ্ছিলেন। হয়তো আর কিছুক্ষণ গেলে দম বন্ধ হয়ে মারাই যেতেন। সংসারের সবাই তো আজ ওঁর নিন্দায় পঞ্চমুখ। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের প্রশ্নে কিছুটা আশ্বস্ত হন। চেয়ারের হাতল থেকে মুখ তুলে তাকান। তারপর ধরা গলাতেই জবাব দেন, না বাবা, আমার মতো ঘাতককে আর এর ভেতরে টেনো না। যা করবার তুমিই করো।

কিন্তু—

এতে কোন কিন্তু নেই। আমার উপস্থিতিতে চাঁপার মরদেহও ঘৃণার মুখ ফিরিয়ে নেবে। হয়তো—না না, সে কথা থাক। তুমি আমাকে রেহাই দাও।

দোর্দণ্ড প্রতাপ যশোদা মজুমদারের অবস্থা দেখে বেদনায় টনটন করে ওঠে মানবেন্দ্রনাথের বুকের ভেতর। চাঁপালতার মুখখানিও নয়নপটে ভেসে ওঠে। নিজের মায়ের মতোই ওকে উনি স্নেহ করতেন। কিন্তু কি দুর্বার নিয়তি!··মানবেন্দ্রনাথ জলভরা চোখেই আবার শোধান, আমাদের অজ্ঞাত পুরোহিতদের মতো তালপুকুরেই কি ওঁর দেহের সমাধি দেবো?

না না, সমাধি নয়। চাঁপালতা তো কোন দিন বৈষ্ণব ছিলেন না। চাঁপালতা ছিলেন সনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবা। হিন্দু মতেই ওঁর দেহের সংকারের ব্যবস্থা করো। ওঁর স্বামীর চিতার পাশেই রচনা করো ওঁর চিতা এবং সম্ভব হলে তুমিই ওঁর মুখাগ্নিটা—আবেগে কণ্ঠ জড়িয়ে যায় মজুমদারের। মুখের কথা শেষ করতে পারেন না।

আমিই রাঙা কাকীমার শেষকৃত্য করবো কাকাবাবু। মজুমদারের অসমাপ্ত কথাটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে সমাপ্ত করেন মানবেন্দ্রনাথ।

মজুমদার বল্লেন, হ্যাঁ, তাই করো বাবা। ওঁর ছেলেমেয়েরা অনেক দূরে রয়েছে এখন তুমিই সে কাজ করো।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মজুমদার বংশের মর্যাদাই উনি পাবেন?

না না, ও কথা মুখে এনো না। দয়া করে উনি আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছেন আর ওঁর নাম মজুমদার বংশের সঙ্গে জড়িয়ো না। মজুমদারেরা ওঁর কেউ নয়—কেউ নয়।···

মানবেন্দ্রনাথ এরপর আর কোন যুক্তি খুঁজে পান না। নিজের কর্তব্য করতেই মন স্থির করেন। খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলেন, তাহলে আমি আসি কাকাবাবু?

হ্যাঁ, এসো বাবা।

অনুমতি পেয়ে দরজার দিকে পা বাড়ান মানবেন্দ্রনাথ।

মজুমদার পেছু ডাকেন, একটু দাঁড়াও বাবা।

ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ায় মানবেন্দ্রনাথ। কাছে আসেন।

মজুমদার বল্লেন, চাঁপাদেবীর এক ছেলে এক মেয়ে এখনো নাবালক, ওদের যেন—

ওদের কোন রকম অসুবিধে হবে না কাকাবাবু। আপনার মানু বেঁচে থাকা অবধি ওরা নিয়মিত ভাতা পাবে।

মজুমদারের হয়তো আরো কিছু বলার ছিল, কিন্তু কিছুতেই আর দম রাখতে পারেন না। বুক ঠেলে কান্না আসছে। কান্নার স্বরেই বিদায় দেন মানবেন্দ্রনাথকে, তুমি শতায়ু হও বাবা, এসো।

নীরবেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান মানবেন্দ্রনাথ। দু'গণ্ডই অশ্রু সিক্ত।

মানবেন্দ্রনাথ বেরিয়ে যান মজুমদার আবার হাবুডুবু খেতে থাকেন। আবার শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়। প্রভাত সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে দক্ষিণের বারান্দা উদ্ভাসিত। সোনালী কিরণে ঝলমল করছে ভুবন গগন; কিন্তু এতো আলোতেও মজুমদারের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। চারদিক জুড়ে থৈ থৈ করছে নীরন্ধ্র অন্ধকার। সে অন্ধকারে মজুমদার বংশের খ্যাতি, যশ, গৌরব সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আর তা যাচ্ছে ওরই মহাপাপে। চাঁপালতা বিষ দিতে চেয়েছিল, পারেনি। কিন্তু তাতে ওঁর পরাজয় হয়নি। ওঁর প্রেতাত্মা অভিশাপের মতোই আজ হৈমবতীর কাঁধে ভর করেছে। হ্যাঁ হৈমবতী—যে হৈমবতী সাত চড়ে কোনদিন কথা বলেনি। কথা বলা তো দূরের কথা কোন দিন মুখ তুলতে পর্যন্ত সাহস পায়নি। কিন্তু আজ ও বিদ্রোহী। হয়তো চাঁপালতার মতো কোনদিনই ও
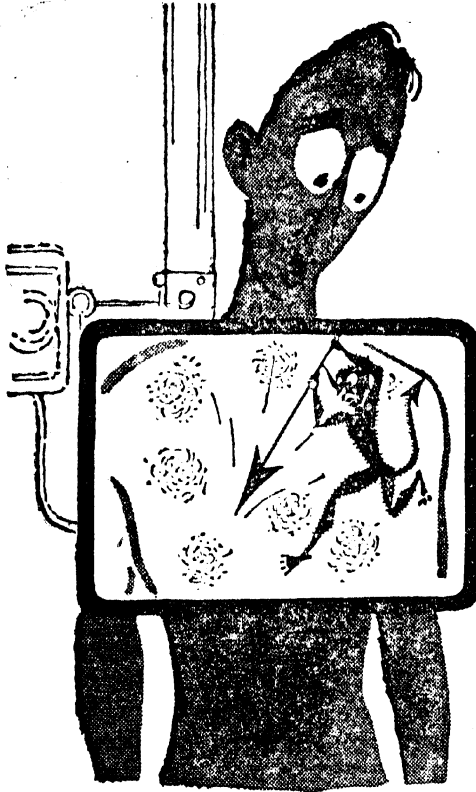
TUSSANOL

আমাকে রাসায়নিক বিষ দিতে পারবে না। কিন্তু অন্তর্বিষে ও-ও যে জয়জরী আজ। ছোবল উদ্যত করেই তো ও আজ এগিয়ে এসেছিল।

না না, আর রক্ষা নেই। মজুমদার বংশের সৌভাগ্য-সূর্য আজ অস্তগামী। শুধু মজুমদার বংশেরই বা কেন? গঞ্জের সব বাবু ভুঁইএাদের হালই তো এই। তা না হলে নিতাই সদা আর নবীন চৌধুরী এভাবে খুন হবে কেন? ছুনিয়ায় কে কবে শুনেছে খাতক আর নায়েব এমন বেপরোয়া হতে পারে? পীতাম্বর মাষ্টারের মতো সামান্য একজন শিক্ষকেরই-বা কি করে অমন স্পর্দ্ধা হতে পারে?···ভাবতে ভাবতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মজুমদার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়চারি শুরু করেন। সহসা দেয়াল আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয় নিজের পূর্ণাবয়ব। নিজের চেহারা দেখে নিজেই আঁৎকে ওঠেন। একি হাল হয়েছে ওর! না না, এ কিছুতেই হতে পারে না। ছোটলোকদের এই ঔদ্ধত্য কিছুতেই বরদাস্ত করবে না ও। কেন করবে? এ ঈশ্বরের ন্যায় বিচার। ওদের জন্মই হয়েছে আমাদের সেবার জন্য। জন্ম-জন্মান্তরের বিধান এ। ঈশ্বর যাকে যা দেন তাতেই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেই আদর্শ ভ্রষ্ট হতে চলেছে। এখানেই ওদের প্রতিরোধ করতে হবে।···

শোকে, দুঃখে, অভিমানে ভেঙে পড়েছিলো মজুমদার আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। দ্রুত ছুটে যান অস্ত্রশালায়। নিজের হাতে চাবি দিয়ে খোলেন ভূ নিরন্ধ্র অন্ধকার কুঠরির বন্ধ-দরজা। কাতারে কাতারে সাজানো রয়েছে লাঠি, সোঁটা, বল্লম, ঢাল, তরোয়াল, বন্দুক। অনেককাল এগুলোর ব্যবহার নেই। এখনকার শাসন চলেছে শুধু তর্জনী উঁচিয়ে। তার সঙ্গে বড় জোর রক্তচক্ষুর এক ঝলক প্রসারিত দৃষ্টি। না না, এ অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে। শক্ত হাতে এখন আবার ঐ পুরোনো অস্ত্রগুলোরই ব্যবহার করতে হবে।···
দেয়াল-গাত্রে তাকিয়ে মজুমদারের বুকের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। সে রক্তের গতিবেগ আরো বেড়ে যায় পূর্ব-পুরুষের কথা স্মরণ করে। হ্যাঁ, এই অস্ত্রের সাহায্যেই মজুমদার বংশের তক্ত-তাউস পত্তন হয়েছিল। কুলজি ঘেঁটে ও দেখেছে, ওর ঊর্ধতন সপ্তম পুরুষ সদানন্দ মজুমদার এক সময় রাজাসনের গড় থেকে সদরে কাঠ চালান দিতেন। সামান্য রজত মূল্যের বিনিময়ে গড়ের ইজারা। বিষধর সাপ আর বাঘের ভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কমই জুটতো। জুটলেও বেশীদিন টিকতে পারতো না। সদলবলে সদানন্দ ছিলেন অসীম শক্তিশালী।

গড় থেকে কাঠ কেটে বংশীর জলে চালি ভাসিয়ে দিতেন সদানন্দ। চালির সঙ্গে নিজেও ভেসে চলতেন। একটানা দু'তিন মাস। কিন্তু সদানন্দ এ সময়ে অলস জীবনযাপন করতেন না। বংশীর দু'কূল ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ ছিল। কোন পাড়েই লোকজনের তেমন বসতি ছিল না। গঞ্জ তখনো গঞ্জ নামে অভিহিত হয়নি—ছোট্ট গ্রাম আনন্দ নগর। আনন্দ নগরকে পুব পাড়ে রেখে বংশীর ওপর দিয়ে চলতো অঞ্চলের সেরা বাণিজ্যপোত—বড় বড় গস্তি নৌকো। কোনটায় থাকতো ধান চাল, কোনটায় বা পান পাট। আবার নানাবিধ মনোহারি দ্রব্য কিংবা জামা-কাপড়ও থাকতো কোন-কোনটায়। এ ছাড়া ধন-দৌলতসহ যাত্রী-নৌকোও চলতো এপথেই। সুযোগ পেলে সদানন্দ এর সব কিছুই গায়ের জোরে দখল করতেন। গড়ের ইজারাদার হয়ে জলকরের দাবী হয়তো ফাউ হিসেবেই করতেন। সরাসরি একে হয়তো অনেকে মনে মনে ডাকাতিই বলতো। কিন্তু মুখে কেউ কোন রকম টঁ্যা ফুঁ করতে সাহস করতো না।

সুবা বাংলায় তখন নবাবী শাসন কায়েম। জেলা শাসনের ভার ছিল কাজীর ওপর। কিন্তু কাজীর কাজ আসলে করতেন এই বর্গাদার আর ইজারাদাররা। সেদিক থেকে সদানন্দ কালে কালে একজন খুদে নবাব হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন।

সদানন্দের অধস্তম পঞ্চম পুরুষ দেবানন্দ মজুমদারও উত্তরাধিকার সূত্রে খুদে নবাবত্বই লাভ করেন।

পলাশীর পরে তখন সবে শুরু হয়েছে কোম্পানীর আমল। রবার্ট ক্লাইভের দরবারে দেশী মস্তানদের আসর জমজমাট। বেইমানীর ভাগফল হাতে হাতে পেতে শুরু করেছে অনেকে। দেবানন্দ খোদ দরবারী না হলেও বকলমে কিছু ইনাম পান। দেবানন্দই প্রকৃতপক্ষে মজুমদারবংশের জমিদারী কায়েম করেন। এবং সে স্বত্ব পাকাপাকি-ভাবে গড়ে ওঠে 'পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্টের' আশীর্বাদে।

ওর বেশ মনে আছে, পিতামহ ইন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা। বংশীর জলে পানসী ভাসিয়ে বাঈজী নাচাতেন ইন্দ্রনাথ। জলবিহার চলতো রাজা-মহারাজা আর সাহেব-সুবোকে নিয়ে। কখনো কখনো বাঈজীতে অরুচি ধরলে তলব হতো গৃহস্থ ঝি-বউয়ের। স্বেচ্ছায় তারা কেউ ধরা না দিলে বরকন্দাজ পাঠিয়ে ধরে আনা হতো দিন দুপুরে। চলতো হৈ হুল্লোড় আর রংবাজী। প্রায় ক্ষেত্রেই স্বামী উপহার দিতো বউকে—বাপ মেয়েকে। কারো কোন রকম প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। থানা পুলিশ সব হাতের মুঠোয়।

ইন্দ্রনাথ ইহলোকে ইন্দ্রত্বই ভোগ করে গেছেন। লাট কিস্তির জন্যেও কোনদিন ভাবতে হয়নি ওঁকে। আবার ধার দেনাও বড় একটা করতে হয়নি। খাতাঞ্চী হয়তো জানালো, ক্যাশ শূন্য—টাকা জমা না হলে টাকা দেবার উপায় নেই।···

উত্তরে ইন্দ্রনাথ হয়তো ভ্রূ কুঁচকে এক ঝলক তাকালেন। তাকিয়েই পাইক পেয়াদাকে হুকুম দিলেন তৈরী হতে। মহাল সফরে যাবেন উনি—নির্দিষ্ট সময়ে রওনা হবেন—কারো যেন অন্যথা না হয়।···

পাইক পেয়াদার সঙ্গে সঙ্গে পানসীর সাজ সজ্জাও চলতে থাকে। বোঝাই হতে থাকে বাক্স বাক্স মদ, সোডা আর সিগারেট। চাটুকার ইয়ার বন্ধুদেরও তলব দেওয়া হয়—সঙ্গে পিয়ারী বাঈজীকে। ঢাকার মুন্নী বাঈজীর মেয়ে পিয়ারী বাঈজীকে। খুব—খুব-সরু চেহারা পিয়ারীর। বয়েস চল্লিশের কোঠায়। কিন্তু বয়েসের চেয়ে জৌলুস বেশী। সে জৌলুসে ইন্দ্রনাথ ডগমগ।

পানসী ভেসে চলে নৃত্যেরই তালে তালে—মহাল থেকে মহালে। বকেয়া খাজনা এক কথায় আদায় হয়। সঙ্গে নজরানার সিকি, আধুলি, টাকা, মোহর। কারো না দিয়ে নিস্তার নেই। নিস্তার ওর বাবা রাজেন মজুমদারের কাছেও কেউ পায়নি। সম্পত্তি বাড়াতে না পারলেও কোন কিছু খুইয়ে যাননি বাবা। মান সম্ভ্রমও যথা নিয়মে রক্ষা করেছেন। সব ছিল অথচ এখন কিছুই নেই। বিরাট ভাঙনের মুখে মজুমদার বংশ। না না, এ কখনো হতে পারে

না। মাথা উঁচু করে আবার ওদের দাঁড়াতেই হবে। দরকার হলে অস্ত্রও ধরতে হবে। কিন্তু এখন ঐ শঙ্কর মাছের লেজের চাবুকটাই যথেষ্ট। বড্ডো বাড় হয়েছে মেজবৌর। ওটার সাহায্যেই ওকে শায়েস্তা করতে হবে।···

ভাবতে ভাবতে এক লহমায় দেয়ালের গা থেকে চাবুকটা টেনে নেন মজুমদার। দ্রুত পা চালাতে যান হৈমবতীর ঘরের দিকে। কিন্তু পারেন না। পেছন থেকে কার যেন অট্টহাসি শুনে থম্‌কে দাঁড়ান। কুঠরির চারদিক জুড়ে ফেটে পড়ছে বীভৎস সে হাসি—সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে সর্বত্র। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। দিবালোকেও চোখ মেলে তাকাতে পারেন না মজুমদার। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকেন। কাঁপতে কাঁপতেই আবার শুনতে পান, কে যেন ওর নাম ধরে গর্জন করছে—শয়তান, কোথায় পালাবি? রক্ত চাই—তোর বুকের রক্ত—রক্তের বিনিময়ে রক্ত। হা-হা-হা।···

কে—চাঁপা? বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার প্রাণের চেয়েও তুমি আমার আপনার। লক্ষ্মীটি, এভাবে আমাকে ভয় দেখিও না। ক্রোধ সম্বরণ করো। বলো, কি চাই তোমার? টাকা, গয়না, শাড়ী, যা চাইবে সব দেবো। শুধু—না না, আমি তোমাকে খুন করিনি। বেশ তো হৈমবতীকে কিছু বলবো না। এই আমি চাবুক ফেলে দিচ্ছি। বিশ্বের কোন নারীকেই আর আমি কোনদিন লাঞ্ছনা দেবো না। তুমি স্থির হও—স্থির হও লক্ষ্মীটি। উঃ—চোখ বুজেই কাৎরাতে থাকেন মজুমদার। হয়তো বা মূর্চ্ছাই যান।

হৈমবতী সে শব্দ শুনে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে মানবেন্দ্রনাথ দাস-দাসী, যে যেখানে ছিল। সকলে মিলে মজুমদারকে ধরাধরি করে এনে খাটে শুইয়ে দেয়। যথা সময়ে কবরেজ আসেন। নাড়ী টিপে রোগ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন গঞ্জের বিখ্যাত গুরুশরণ কবরেজ। মোটামুটি সিদ্ধান্তেও পৌঁছান। কিন্তু মুখ ফুটে সে রোগের কথা ব্যক্ত করতে সাহস পান না। মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণই স্পষ্ট হয়ে উঠছে মজুমদারের মধ্যে। আনুষঙ্গিক ওষুধ আর বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে সেদিনের মতো উঠে পড়েন গুরুশরণ।

পক্ষকাল চিকিৎসা চলছে। ওষুধ, পথ্য, শুশ্রূষায় বিরাম নেই। মজুমদার অবশ্য এখনো পাগল হয়নি। তবে বেশী দেরী আছে বলেও মনে হয় না। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েই ভাবেন যশোদা মজুমদার, ওর বংশের আর রইলো কি? সামনে লাট কিস্তি অথচ কোষাগার শূন্য। নবীন চৌধুরীও আজ নেই যে সম্ভ্রম রেখে কর্জ করেন। গঞ্জের লগ্নি-কারবারীদের সকলের অবস্থাই আজ সমান। কেউ কাউকে দেখবার নেই। তিন সাল কারো টাকা আদায় হয়নি। শুধু আদায় হয়নিই নয়, গাঁটের কড়ি খরচা করে তমসুক পালটে নিতে হচ্ছে। অনেকে আবার টিপসই কিংবা দস্তখত দিতেও নারাজ। তা ওদেরই বা আর দোষ কি? মোল্লা মৌলভীরা যে ভাবে সকলকে কুসলাচ্ছে, তাতে ক'জনের সাধ্য মাথা ঠিক রাখে? বিশ্বম্ভর উকিল তো সেদিন স্পষ্টই বলে গেলো, নালিশ করেও কোন কায়দা হবে না। সরকার থেকে শিগগীরই নাকি ঋণসালিশী বিল আসছে। চড়া সুদ আদায় নাকি একেবারেই বন্ধ হবে। আসলও পাওয়া যাবে বিশ-পঁচিশ বছরের সহজ কিস্তিতে। বেশ হবে, নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে মরবে সুদখোরগুলো। হতভাগারা যদি একবারও ভেবে দেখতো, টাকা প্রতি মাসিক দু'তিন আনা সুদ কি কেউ কখনো দিতে পারে? সুদের লোভেই ওদের ভরাডুবি হলো। এমন গাড়ল দুনিয়ায় কোথায় আছে যে বেশী সুদের লোভে নিজের মেয়ে-বউর গায়ের গয়না কম সুদে বাঁধা দিয়ে লগ্নি করে? চাষী-মজুর তো মরেছেই, এবার ওরাও মরবে।···ভাবতে ভাবতে বিছানার ওপরে উঠে বসেন মজুমদার। বসে আবার ভাবেন, এ কখনো হতে পারে না। চাষী, মজুর, সুদখোর—যার খুশি নিপাত যাক, জমিদারকে শির উন্নত করে দাঁড়াতেই হবে। মজুমদার-বংশ কখনো ধ্বংস হতে পারে না। না-না-না।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। বাড়ির লোক অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সকলের সঙ্গে হৈমবতীও ঘুমে অচেতন। শয্যা নেবার আগে মজুমদারকে নিয়মিত ওষুধ দিয়ে গেছেন হৈমবতী। কোন রকম উৎকণ্ঠা নেই। মজুমদারকে দিন কয়েক বেশ স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। কখনো কখনো ধন্দ ধরে থাকলেও কোন রকম চেঁচামেচি নেই। হৈমবতী নিশ্চিন্তেই ছিলেন, সহসা মজুমদারের বিকট চীৎকারে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসেন। সহসা কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু মজুমদারের মাথায় হয়তো খুনই চেপেছে। হয়তো বা বিকারগ্রস্তই। জোরে জোরেই চেঁচাতে থাকেন মজুমদার কে—কে তুই ওখানে?—চাঁপা? কি চাই তোর রাক্ষুসী? তুই আমার সোনার সংসার ছারখার করেছিস। তোকে আমি জ্যান্ত পুতে ফেলবো।—গলা টিপে মেরে ফেলবো। না না, গলা টিপে নয়—রাইফেল দেগে। এই—কে আছিস, আমার রাইফেল—আমার বন্দুক···চেঁচাতে চেঁচাতেই কয়েক পা এগিয়ে যান। কিন্তু বেশীক্ষণ দম রাখতে পারেন না। উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন। আবার হাঁপাতে হাঁপাতেই বাকরুদ্ধ হয়ে নেতিয়ে পড়েন।

হৈমবতী ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন ওঁকে। ঘুমন্তপুরী নিমেষে আবার জেগে ওঠে। মানবেন্দ্রনাথ চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে হাজির হন। বালতি বালতি জল ঢালা হয় মজুমদারের মাথায়। হৈমবতী গুরুশরণের দেওয়া একটা বটিকা মধুর সঙ্গে খলে গুলে খাইয়ে দেন। ধীরে ধীরে দু'চোখ বুজে আসে মজুমদারের।

**সমাপ্ত**

"The cruelest lies are often told in silence."
—*R. L. Stevenson*

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

বারি দেবী

সুব্রত'র ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সে চলে গেছে এলাহাবাদে তার সাগর পারে যাবার আয়োজন চলছে।

শোকের আগুনে পোড়া মনের দগদগে ঘা টা সময়ের প্রলেপ লেগে আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসতে লাগলো। আমার মামাতো বোন শান্তাদি বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে মধ্য প্রদেশের বল্লারশা থেকে চিঠি লিখেছেন মাকে: পিসিমা! খুকিকে নিয়ে এখানে চলে আসুন কিছুদিনের জন্য। এখানকার জল হাওয়া ভালো, প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। মনের পরিবর্তন হবে।

মন্দ লাগলো না শান্তাদির ডাকটা।

মাকে বললাম—চলো না মা, ঘুরে আসি ক'দিনের জন্য।

মা বললেন—তুই যা-না খুকি। ওঁকে ফেলে, আমার তো যাওয়া হয় না।

তাই তো…।

বাবার প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং ছবিটাতে মা প্রতিদিন নিজ হাতে বাগান থেকে ফুল তুলে মালা গেঁথে পরিয়ে দেন। সকালে চা দেন, বাবার ছবির সামনে টেবিলের ওপর। দুপুরে ও রাত্রে খাবার দেন, সন্ধ্যায় দেন কফি তৈরী করে ঠিক সেই আগের মতো। এই নিত্য কর্ম ছেড়ে মা তো যেতে পারবেন না। পরলোক বিশ্বাসী মায়ের মন, এই সহজ পথেই শান্তি খুঁজে পেয়েছিলো। বাবার সঙ্গে এই সহজ বিশ্বাসের সেতুবন্ধন দ্বারা তিনি যোগাযোগকে অবিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন।

হায়! আমিও যদি মায়ের মতো, ঐ রকম সংস্কার বিশ্বাসী মন পেতাম। মায়ের বারংবার তাগিদে, আর নিজের অন্তরের শূন্যতার যন্ত্রণায়, অবশেষে আমি একাই রওনা হলাম বল্লারশায়, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে।

শান্তাদি, আর ওঁর স্বামী সঞ্জয় চাটার্জি গাড়ী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন ষ্টেশনে। বল্লারশায় কোনো যান-বাহন নেই।

পেপারমিলের কয়েকখানি ভ্যান ও মোটর আছে উঁচুতলার কর্মচারীদের জন্য। সেজন্য ওখানে যেতে হলে, আগে খবর দিয়ে রাখতে হয়।

ওঁদের সঙ্গে এসেছিলেন আরো একজন! শান্তাদি আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন? ওঁর নাম—যোগরাজ যোগলেকার! ভদ্রলোক মারাঠি, কিন্তু প্রথম দর্শনে ওঁকে আমার ইউরোপীয়ান মনে হয়েছিলো! ঠিক সেই ধরণের শাদা রং; লালঠোঁট, চোখে গভীর সমুদ্রের নীল রং!—তবে চুলগুলো রং-এর সঙ্গে মানানসই, সোনালী নয়; একেবারে বাংলার কালোকেশ! কথাবার্তায় মনে হ'ল, একটা পার্বত্য গাম্ভীর্য ওঁর চার ধারে পরিমণ্ডল রচনা করে ওঁকে যেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

ঠিক কথাই লিখেছিলেন শান্তাদি…কি অপূর্ব জায়গা এই বল্লারশা। পেপারমিলের কলোনী। পরিচ্ছন্ন পিচের রাস্তাটি ঘন গাছের ছায়ায় ঘেরা। খেলার মাঠ, সুন্দর পার্ক, ক্লাব সবই আছে। নেই খালি কোনো জমকালো দোকান, বাজার। মানে পয়সা খরচ করতে চাইলে তা করা যাবে না। সিনেমাও নেই। শুনলাম, এখান থেকে দু'মাইল দূরে মারাঠা বস্তিতে সপ্তাহে একদিন হাট বসে সেই দিন ভ্যানে চড়ে প্রত্যেক বাড়ীর গিন্নীরা যান, এক সপ্তাহের বাজার করে আনবার জন্য। তারপর মাছ মাংস ডিম থেকে কাঁচা সব্জি পর্যন্ত সব থাকে রেফ্রিজেটরে।

কাঁচা সব্জি অবশ্য কিছু কিছু মারাঠি গ্রাম্য মেয়েরা, বিক্রি করতে আসে এখানে। দুধও প্রতিদিন তারা দিয়ে যায়। এ, বি, সি, কোয়াটার্সে থাকেন, হাজার, দু'হাজারি, কর্মীরা। তার পরের নম্বরের কোয়াটার্সে থাকেন নিম্ন বেতনের কর্মচারীরা। 'উপরতলার সোসাইটি আলাদা। এঁদের ক্লাবটি এঁদেরই উপযুক্ত আর নিচুতলার জন্য আছে অন্য ক্লাব। এ ছাড়া ব্যাচিলরদের জন্যও আছে ব্যারাক। কলোনীর শেষ প্রান্তে আছে শ্রমিকদের কোয়াটার্স। এখানে স্কুলও আছে। তবে সেখানে উঁচুতলার ছেলেমেয়েরা পড়ে না। তারা পড়ে নাগপুরে বিলিতি স্কুলে, থাকে সেখানকার বোর্ডিংএ।

এখানকার আকাশ কত বড়! কি গভীর নীল রং তার। পার্বত্য মালভূমির পথগুলো, উঁচু নিচু ঝোপ, জঙ্গলে ভরা। সরু সরু পায়ে চলা সুরকির লাল রাস্তাগুলো, উঁচু নিচু টিলার ওপরে, বনে, জঙ্গলে, ছড়ানো। পিচের রাস্তা আছে মাত্র দুটি। প্রত্যেক কোয়ার্টারে আছে অজস্র ফুল, আর চারিধারে ঘন পল্লবে ঢাকা, শাল, মহুয়া, দেবদারু সেগুন, প্রভৃতি গাছের শ্যাম সমারোহ। কলোনীর গণ্ডির বাইরে এখনও আছে গভীর জঙ্গল। দূর থেকে ওগুলোকে কালো কালো পাহাড় বলে মনে হয়।

কয়েক মাইল দূরে আছে একটা ছোট গ্রাম মারাঠা বস্তি। কলোনীর পাশ দিয়ে কল কল শব্দে বয়ে চলেছে ওয়ার্দ্ধা নদী। সেখানে আছে বিরাট আকারের ওয়াটার পাম্প। সারা কলোনীতে

পরিস্রুত জল যায় এখান থেকে। চব্বিশ ঘণ্টাই জল থাকে কলে। বড় বড় অফিসারদের কোয়ার্টার্সে আছে টেলিফোন। ঐ ফোন গৃহিণীদেরই কাজে লাগে বেশী। কর্তারা কাজে গেলে, গৃহিণীরা ফোনে গল্প করে অবসর কাটান।

ভারি চমৎকার জায়গা বল্লারপা। সারা কলোনীটা যেন এক পরিবারের অঙ্গ বিশেষ। সকালে বা বিকেলে সুসজ্জিত হয়ে বেড়াতে বেরোনো এখানকার রেওয়াজ। অবশ্য বেশী দূর এগোনো যাবে না।

মিসেস সিনার সঙ্গে হল দেখা, মিসেস মৃগ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, মিষ্টার লাল অথবা মিস নন্দ বেড়িয়ে ফিরছেন অথবা, চাড্ডা পরিবার লনে পাইচারী করতে করতে, বাগানের তদারক করছেন। এদের সবার সঙ্গে দেখা হবে, আর গল্পও জমবে পথের ধারে। নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেওয়া যায়, যন্ত্রদানবের ভয় নেই এখানে।

সন্ধ্যেবেলাটা এখানকার চমৎকার। বেড়ানোর শেষে, কোনোদিন বা ক্লাবে, বেশীর ভাগ, এক এক দিন এক একজনের বাড়ীতে জমা হন সকলে। তারপর চলে জোরালো মজলিশ। তাস খেলা, হাসি গল্প, গান, তার সঙ্গে চলে, চা কফি, কাজুবাদাম, বিস্কুট। আবার কারুর বাড়ীতে নবাগত আত্মীয় বা আত্মীয়া এলে, চলে পার্টির ধুম। আমাকে প্রথমেই নেমন্তন্ন করলেন, মিসেস চানদানী।

সন্ধ্যা ছ'টায় আমরা গেলাম চানদানীর কোয়াটারে। গিয়ে দেখলাম, ওপরতলার অনেকেই এসেছেন। এইটাই নাকি এখানকার নিয়ম। শান্তাদির কাছে পরে জেনেছিলাম ব্যাপারটা। একবাড়ীতে কোনো উৎসব বা ভোজনপর্ব থাকলে, অন্য বাড়ীর গৃহিণীরা এসে সে বাড়ীর গৃহিণীকে সাহায্য করবেন। যিনি যেটি ভালো জানেন, তিনি সেই খাবারটি তৈরী করবেন। তারপর টেবিল সাজাবেন সকলে মিলে, এমন কি ঘর দোরও সুরুচি কায়দায় সাজাবেন সকলে।

ভারি ভালো লেগেছিলো আমার এঁদের এই প্রথাটি। টেবিলের সামনে গিয়ে, বিস্মিত হলাম। বাপ রে এ কি চায়ের ব্যাপার।

একটি বিরাট টেবিলে সাজানো, থরে থরে খাবার। এতে, আছে পাঞ্জাবী, মারাঠি, মোগলাই, সব রকম খাবারের সঙ্গে, দৈ-বড়া, চানাচুর, পকৌরী; এমন কি ক্ষীরের বরফি, ছানার গোলাপজামও বাদ যায়নি।

শান্তাদি বুঝিয়ে দিলেন, এখানকার পার্টি এই ধরণেরই হয়। চা পর্ব্ব, এবং রাতের আহার, মিলিয়ে এই বুফে পার্টি। সব শেষে আইসক্রিম। তারপর গান বাজনা, আবৃত্তি। প্রত্যেককে এর অংশ গ্রহণ করানো, এখানকার বাধ্যতামূলক আইন। চানদানীর পর, চার পাঁচ দিন অন্তর চললো এই ধরণের পার্টি।

মিসেস মৃগ, মিসেস সিন্‌হা, মিসেস লাল, মিসেস নন্দ—মিসেস স্বামীনাথন। টেলিফোন বাজলেই শান্তাদি বলতেন—ঐ এলো বুঝি তোর নেমন্তন্ন।

শেষে রীতিমত ভয় ধরে গেলো। জিজ্ঞেস করলাম—শান্তাদি! আরো কত মিসেস বাকি আছেন?

—কেন রে? ভালো লাগছে না? এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলি? সহাস্যে জবাব দিলেন শান্তাদি।

—না, না শান্তাদি, ভারি চমৎকার লাগছে আমার। বিশেষ করে তোমার প্রতিবেশীদের। সন্ধ্যার আসরগুলো আনন্দে ভরপুর করে রাখেন ওঁরা। আমরা তো কলকাতায় বসে ধারণাও করতে পারি না যে, এমন একটি চমৎকার জায়গা আছে, যেখানে নেই রাজনীতির ঝড়, বাজে হৈ-হাঙ্গাম', হুজুগ, ধুলো, ধোঁয়া। নেই মানুষে মানুষে ঠোকাঠুকি। এমন কি চোর-ডাকাতও নেই।

চমৎকার রাস্তাঘাট, অথচ পয়সা উড়িয়ে দেবার মত দোকান পসার, হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা এসব কিছুই নেই। এমন জায়গা ছেড়ে সত্যিই আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। তবে কি জানো, যে রকম হারে এখানে খাওয়া-দাওয়া চলেছে, আর ভালো জল-হাওয়ার গুণে সব হজমও ঠিক হচ্ছে, তাই বড় ভাবনা হচ্ছে যে, তোমাদের ঐ মিসেস চাড্ডার মতো শেষে দু'মণি গতর নিয়ে না ফিরতে হয় আমার। বললাম আমি।

হা-হা শব্দে হেসে বললেন সঞ্জয়দা।—শোনো, শোনো, তোমার বোন কি বলছে। তা এতই যখন ভালো লেগেছে জায়গাটা, তখন এইখানেই ওর চিরস্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত করে দেওয়া যাবে। আরে, মাত্র তিনটে বছর তো, সুব্রতটা চো করে ঘুরে একটা বড়গোছের মিস্ত্রির ছাপটা নিয়ে এলেই,—ব্যস্!

—যান, আপনার সব তাতেই ঠাট্টা।—বলে উঠে যাচ্ছিলাম। আমার হাতটা ঝপ করে চেপে ধরে আমাকে নিজের পাশে বসিয়ে ছিলেন সঞ্জয়দা। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—খুব ভালো খবর আছে শোনো। এই অক্টোবরের শেষ সপ্তাহেই সে আসছে। এখান থেকে কোচিন হয়ে সাগরপাড়ি দেবে, কেমন খবরটা?

—এমন আর কি নতুন খবর শোনালেন। জবাব দিলাম আমি।

শান্তাদি উল বুনছিলেন পাশে বসে। ছেলেপুলে নেই, তাই হরদম্ রকমারী ফ্যাসানের সোয়েটার বোনেন সঞ্জয়দার জন্যে। এছাড়া পাড়ার বান্ধবীদের বাচ্ছাদেরও বুনে দেন। এবারে বুনছেন, সুব্রত'র জন্য।

বোনা থামিয়ে শান্তাদি বললেন—সুব্রতকে সি-অফ্ করতে কিন্তু আমি যাবোই খুকিকে নিয়ে, তোমাকে এখন থেকে বলে রাখছি। তোমার সঙ্গে তো এ পর্যন্ত কোথাও যেতেই পেলাম না।

ইচ্ছে যখন করেছো তুমি, সে ইচ্ছেয় বাধা দেয় এমন ক্ষমতা এ তল্লাটে কার আছে বলো? তবে আমার এখন ছুটি মিলবে না, সেই বুঝে ব্যবস্থা কোরো। জবাব দিলেন সঞ্জয় দা।

—সে তো জানিই। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন শান্তাদি—ছুটি পেলেই সোজা যাবে এলাহাবাদে। আবার ফিরবে এখানে। এই তো করলে সারাজীবনটা ধরে। সখ সাধ তোমার নেই বলে কি আমারও থাকবে না?

—কি করি বলো? হতভাগা মিস্ত্রিটার গলায় যেদিন মালা দিয়েছো, সেদিন থেকেই তো বুঝেছো যে এছাড়া তার আর দ্বিতীয় পথ নেই। আমির-ওমরাহের ঘরণী যদি হতে পারতে, তাহলে, সাধ আহ্লাদগুলোও এমন করে মার খেতো না।

—মরণ আর কি? চল্লিশ পার হয়েও ছেলেমি গেল না।—

হাতের বোনাটা খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সবেগে ঘর ছেড়ে ছুটে পালালেন শান্তাদি।

সঞ্জয়দা, ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে পাইপে মনঃসংযোগ করলেন,—আর বাঁ হাতটি তাঁর ঘন ঘন নামা ওঠা করতে লাগলো, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটার ওপর।

এরকম ঝগড়া ওঁদের প্রায় লেগেই আছে। আবার ওঁদের অনুরাগ পর্বটিও তেমনি চমৎকার। খাবার টেবিলে প্রতিদিন শান্তাদি মাছের কাঁটা বেছে না দিলে, খাওয়া হয় না সঞ্জয়দার। বেরোবার সময় সঞ্জয়দার গলায় টাই বেঁধে দেওয়া, চুল আঁচড়ে ও জুতো পরিয়ে দেওয়া শান্তাদির নিত্য কর্মের তালিকায় আছে।

আবার ব্লাডপ্রেশার মাঝে মাঝে বাড়ে সঞ্জয়দার সেজন্য,—তার জন্যে কম তেল, ঘি, মশলা দিয়ে আলাদা করে নিজে হাতে রান্না করেন তিনি। এর জন্যে প্রতিমাসে কেনেন শান্তাদি দেশ-বিদেশের ম্যাগাজিন,—রান্নার বই।—তাব থেকে নতুন নতুন রান্না নিয়ে সেটিকে আবার তেল, ঝাল, বাদ দিয়ে সঞ্জয়দার জন্যে নিজের প্রক্রিয়ায় তৈরী করেন। কারণ পাছে এক ধরণের খাবার খেতে ওঁর খারাপ লাগে সেজন্য দিনরাত শান্তাদির দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

আবার শান্তাদি যখন যাবেন ক্লাবে বা পার্টিতে সঞ্জয়দা তখন আলমারী খুলে ওঁর শাড়ী ব্লাউস নির্বাচন করতে বসবেন। তারপর বাগান থেকে শাড়ীর সঙ্গে মানিয়ে ফুল তুলে এনে, নিজে হাতে শান্তাদির খোঁপা সাজিয়ে দেবেন। শাড়ীতে আর শান্তাদির গায়ে মাখিয়ে দেবেন আতর অথবা সেন্ট লাভেণ্ডার।

দেশ-বিদেশ থেকে বেশ মোটা টাকা খরচ করে সঞ্জয়দা দামী দামী সুগন্ধি নির্য্যাস কেনেন শান্তাদির জন্যে।

ঝন্ ঝন্ ঝন্। বাজলো ফোনের ঘণ্টিটা। গোসলঘর থেকে বেরিয়ে এসে শান্তাদি রিসিভারটা তুলে নিয়ে খুব নিচু গলায় কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে ঘরে এসে দূরে বসলেন বোনাটা নিয়ে।

সোজা হয়ে বসলেন সঞ্জয়দা। পাইপটা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার? কে ফোন করছিলো?

—হাড় জ্বালাতন। রোজ রোজ আর ভালো লাগে না এই যন্ত্রণা। ভুরু বাঁকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিলেন শান্তাদি।

—যন্ত্রণা! সেকি? কে আবার যন্ত্রণা দিলে তোমাকে? বিস্মিত প্রশ্ন সঞ্জয়দার কণ্ঠে।

—নয় কেন? অপরাধের মধ্যে আমার বোন এসেছে। তার জন্যে রোজ রোজ তাকে নিয়ে লোকের বাড়ীতে হাজরে দিতে হবে, আবার খেতেও হবে। কেন রে বাপু? চুরির দায়ে কি কেউ ধরা পড়েছে? যে রোজ কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে?

—ওঃ। এই কথা? হা। হা। হা। হাসির ঢেউ খেলে গেলো সঞ্জয়দার সর্বাঙ্গ দিয়ে।

—তা আজ আবার কে যন্ত্রণার আয়োজন করলো?

—কে আবার যোগলেকার।

একটু হাসির বিদ্যুৎ চমকে গেলো সঞ্জয়দার চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। ঠিক আছে, ভয় কি? এ যন্ত্রণার হাত থেকে এখুনি তোমাদের আমি রক্ষে করছি। ব্যস্ত ভাবে সঞ্জয়দা, উঠে গিয়ে

কোনে হাত ঠেকাতেই, ছুটে গিয়ে ওঁর হাতটা চেপে ধরে বললেন

—ঢের বাহাদুরী হয়েছে থাক লোকের কাছে আমাকে ছোট করতে পারলে যে তুমি আহ্লাদে দশখানা হও সে আমার জানা আছে।

—তাই নাকি। তা এ খবরটা তো এতদিন আমার জানা ছিলো না, তা, তুই কিছু বুঝেছিস খুকি? মানে আমি ওঁর শত্রুপক্ষ? না মিত্রপক্ষ? মিট মিট করে হাসছেন সজ্জনদা।

—ওকে আবার ঝগড়ার মধ্যে টানা কেন? ও ছেলেমানুষ ও কি জানে? নাও এখন চানের ঘরে ঢোকোতো? ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের, যে কাজে যেতে হবে, সে কথাটাও এই আমাকেই খেয়াল করিয়ে দিতে হবে। বুড়ো খোকাকে সামাল দিতে দিতে আমার জীবনটাই গেলো। সজ্জনদার হাতখানা ধরে ঝাঁকুনি দিলেন শান্তাদি।

—না গো না। যতক্ষণ এ অধম আছে, ততক্ষণ কার ক্ষমতা তোমার জীবন নেয়। যমের দেশে গিয়ে আগে আমি ঘর বাঁধবো, তবে তো তুমি যাবে। শান্তাদির হাতখানা নিজের দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরে বললেন সজ্জনদা।

—শত্রুর কি আর সাধ করে বলি তোমায়? পরম শত্রুর ছাড়া কি আর সাত সকালে কেউ এমন করে গালাগালি দেয়? কান্না উছলে উঠলো শান্তাদির গলায়।

—গালাগালি আবার কখন দিলাম তোমায়?

—ওহো। বুঝেছি, বুঝেছি। তা ঠিক আছে। আর কোথাও তোমাকে নিয়ে না যাই, ঐ যমের দেশে যাবার সময়, এমনি করে পাকড়ে একেবারে পরলোকের সঙ্গিনী করে নিয়ে যাবো। এই তোমায় কথা দিলাম। কেমন খুশি তো?

শান্তাদিকে আরো কাছে টেনে নিয়ে হাসছেন সজ্জনদা। শান্তাদির চোখে জল, মুখে হাসি।

বিকেল পাঁচটায় আমরা রওনা হলাম, যোগরাজ যোগলেকারের বাড়ির দিকে। পেপারমিলের গেট আর কাঁটাতারের সীমানা পেরিয়ে, ছোট ছোট ঝোপ, আর হাল্কা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। এইটাই পাওয়ার হাউসে যাবার সর্টকাট্‌ পথ। অনেকটা ঢালু নেমে আবার ওঠা। জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই। তার চারপাশে অসংখ্য নাম না জানা বুনো গাছ আর লতা। কোথাও ফুটেছে থোলো থোলো, হলুদ আর বেগুনি রং-এর ফুল। কোথাও বা শাদা ফুলের ঢেউ।

একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বুনো গাছপালার গন্ধ।

বন্ধনহীন বাতাসের উদ্দাম ঢেউ খেলছে গাছের শাখায় লতায় ফুলে। কি চমৎকার!

হাঁটতে হাঁটতে মজুদুরদের কোয়ার্টার আর ছোট খাট মারাঠা বস্তি পেরিয়ে আমরা এসে পড়লাম পাওয়ার হাউস কলোনীর চওড়া পিচের রাস্তাটার ওপর। এবার সুরু হলো চড়াই পথ। বেশ খানিকটা চড়াই পথে চলবার পর একটা বাঁক ঘুরে আমরা পেলাম সমতল রাস্তা।

এমন উঁচু নিচু রাস্তায় হাঁটা তো অভ্যেস নেই, তাই বড় শ্রান্তবোধ হচ্ছিলো। একটা বড় পাথরের ওপর বসে পড়লাম।

অনেক উঁচুতে উঠেছি। এখান থেকে ভারি চমৎকার লাগছে পেপারমিলের কলোনীটাকে। মনে হচ্ছিলো, কোনো নিপুণ শিল্পির হাতে আঁকা একখানি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছবি কলোনীর কোয়ার্টারগুলো ছোট ছোট খেলাঘরের মতো সাজানো, সেখানে ঝিক্‌ মিক্‌ করছে আলো, যেন একঝাঁক জোনাকি জ্বলছে কোন্‌ জঙ্গলের মাঝখানে।

চারিপাশে ঘন বনের ছায়ায় মিশেছে বেলাশেষের ম্লান অন্ধকার দূরে দেখা যাচ্ছে, গোণ্ডা রাজাদের ভগ্নদুর্গ আর তার পায়ের নিচে; রুপোলী পাতের মত ঝিক্‌মিক করছে ওয়ার্দ্ধা নদী!

—ওরে আর কত জিরোবি রে? ওঠ, ওঠ, সন্ধ্যে হয়ে গেলো যে।

শান্তাদির তাড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—দূর থেকে বল্লারশাকে কি চমৎকার দেখতে লাগছে শান্তাদি। তাই···

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। খুব সুন্দর। বারো মাস এই জঙ্গলে থাকলে আর সুন্দর লাগতো না। নে নে, পা চালা।

আরেকটু বসবার ইচ্ছেটাকে দমন করে চললাম শান্তাদি আর সজ্জনদার সঙ্গে। আর বেশী দূর যেতে হলো না। একটি ফটকের সামনে এসে থামলেন ওঁরা।

ফটকের বাইরে পেতলের নেমপ্লেটে তখন সূর্যাস্তের আবির-রং আলো ঝিলমিল করছিলো। সেই রঙিন আলোতে জ্বলে-ওঠা অক্ষর ক'টি যেন আজও দেখতে পাই। "যোগরাজ যোগলেকার"।

ফটক পেরিয়ে ভেতরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। কি অপরূপ গোলাপবাগিচা। রক্তলাল, গোলাপী, গৈরিক, সোনালী, সাদা—হাজার হাজার গোলাপের উপবন। কি রং-এর রোশনাই। বাগানের ভেতর দিয়ে লাল সুরকির সরু পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে করিডরের সামনে। বাতাসের ঝলকে ঝলকে ভেসে আসছে অপূর্ব সুরভি। মনে হচ্ছে যেন গোলাপ জলের ঝরণা থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে গোলাপ নির্য্যাস। এমন লম্বা-চওড়া বৃহদাকারের গোলাপ গাছ আর তার এমন ঠাসবুনুনি বাগিচা আমি এর আগে আর দেখিনি। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি ওদের দিকে। মনে হচ্ছিলো, ওরা যেন আমাকে চমকে দিয়ে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে।

শান্তাদি আমার হাতটা ধরে টেনে বললেন—কি রে, তুই শুধু গোলাপ দেখেই যাবি? না, মালিকের সঙ্গে মোলাকাৎ করবি?

গোলাপের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বারান্দার দিকে চাইলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে যোগলেকার। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে মৃদু হাসির সঙ্গে আমাদের স্বাগতম্‌ জানাচ্ছে। [ ক্রমশঃ।

"I never was happy till I was settled in India."

*—Sir William Jones*

বিজ্ঞানবার্তা

# বিশ্বে গতি, প্রকৃতি ও প্রগতি

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 'পালামৌ'-এ লিখেছেন 'রাত্রির অন্ধকারে দূরদূরান্তরের দীপশিখাগুলি মনুষ্যবসতির পরিচয় দেয়। 'পালামৌ'র পাহাড় ও বনাঞ্চলে তখন মনুষ্যবসতি বিরলই ছিল। আমাদের অন্ধকার রাত্রির সহস্র সহস্র নক্ষত্র খচিত মহাকাশের দিকে তাকিয়ে আমরাও কি ঐ একই মন্তব্য প্রকাশে সমর্থ নই? বৈজ্ঞানিক বলবেন কখনও নয়, কারণ আমাদের সূর্য ব্যতীত অন্য কোন তারকার আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের দূরবীণে গ্রহ আবিষ্কৃত হয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিকের সততা ও সাধুতা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বহির্ভূত বলে যেরূপ গ্রহণের অযোগ্য; ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তিতে হয়তো সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। আমাদের সূর্য অপেক্ষা শত গুণ, সহস্র গুণ এমন কি লক্ষ গুণ বৃহৎ নক্ষত্রলোকের খবর পাওয়া গেছে। সূর্য অপেক্ষা শত গুণ, সহস্র গুণ অধিক শক্তিশালী নক্ষত্রেরও খবর পাওয়া গেছে। আমাদের পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য ঐ সব নক্ষত্রলোকের গতি ও শক্তি। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অর্থাৎ বিশ্বই গতিশীল। কেহই স্থির নয়। 'গচ্ছতি' ইতি জগৎ। পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে সেকেণ্ডে ২ মাইল বেগে, সূর্য পরিক্রমা পথে সেকেণ্ডে ১৮ মাইল বেগে ঘুরিতেছে এবং সূর্য তার গ্রহ ও উপগ্রহ সমেত সেকেণ্ডে ১৭৫ মাইল বেগে ছুটে চলেছে। শুধু আমাদের সূর্য নয় মহাকাশে বহু নক্ষত্রই সূর্যাপেক্ষা অধিক গতিশীল, কেহ সেকেণ্ডে ৪০০ বা ৫০০ মাইল বেগে, কেহ সেকেণ্ডে ১০০০ কিংবা ১২০০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে আমাদের পরিচিত ব্রহ্মাণ্ডের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে। নক্ষত্র সমূহ উত্তপ্ত বাষ্পের সমষ্টি হলেও তাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তাদের ভর লৌহ ও ইস্পাতের ভরের প্রায় শতগুণ অধিক। কোন বাষ্পের এত অধিক শক্তি দেখে বৈজ্ঞানিক (পৃথিবীর) তাঁর সত্য ও তথ্য বহুলাংশে সংশোধনে বাধ্য হয়েছে। এই যে অনন্ত নক্ষত্রলোক খচিত মহাকাশ ব্যাপী গতি ও শক্তি এর সার্থকতা কোথায়? এর উত্তরে বলা চলে স্রষ্টার ও সৃষ্টির আনন্দ। মৃৎশিল্পী, চিত্রশিল্পী, চারুশিল্পী, কারুশিল্পী যেরূপ তার শিল্প সৃষ্টিতে মহা আনন্দ বোধ করেন, স্রষ্টা তেমনি তাঁর সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করেন। সৃষ্টির ক্রমপরিণতি ও ক্রমবিকাশে তিনি আনন্দ উপভোগ করেন।

শুধু কি গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রই গতিশীল, গ্রহের অন্তর্গত বায়ু, মেঘ ও জল গতিশীল। এতবড় গতির আবর্তে গ্রহের অন্তর্গত প্রাণীকুলের মন প্রাণও অস্থিরতা ও চঞ্চলতায় পরিপূর্ণ। মেঘে বৈচিত্র্য, আলোর বৈচিত্র্য, বায়ুর বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ঋতুতে বিভি সময়ে প্রাণীকুলের জীবনে বৈচিত্র্য আনয়ন করে। বৈচিত্র্য জীবনের উপভোগ্য। শুধু পৃথিবীতে কেন, সমগ্র বিশ্বে স্থিরতা ও অচঞ্চলতার স্থান কোথায়? বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা যে আমাদে রক্তে মাংসে মজ্জাগত; সেকথা ভুললে চলবে কেন। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার রীতি-নীতি, এমন কি ধর্মানুষ্ঠানও আমরা নূতনত্ব খুঁজে বেড়াই। এখানে একটি চমকপ্রদ গল্প বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ফরাসী দেশের এক তরুণী নব সাজে সজ্জিত হয়ে ছুটে চলেছিল। তার ছুটে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়েছিল "আমার সাজ-পোষাক হয়তো পুরাণো ও সেকেলে ধরণের হয়ে গেছে, অতএব সর্বাপেক্ষা আধুনিকতম নবীন পোষাক আমার প্রয়োজন। তজ্জন্য আমি আধুনিকতম নবীন পোষাকে সজ্জিত হতে যাচ্ছি।" সুন্দরী তরুণীর এই উক্তি হাস্যাস্পদ ও অতিরঞ্জিত মনে হলেও পরিবর্তনশীল বিশ্বে নবীনের আহ্বান আমাদের মনে প্রাণে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করে। নবীনতা সজীবতা মনে প্রাণে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করে। নবীনতা সজীবতা আনয়ন করে, প্রাচীনত্ব জড়তা আনয়ন করে। নূতন যত অবাস্তব ও অসত্য হোক, তাকে আমরা সাদর আহ্বান জানাই। নূতন গান, নূতন ছন্দ, নূতন অভিনয়, নূতন পোষাক পুরাতন অপেক্ষা মিথ্যা হোক, অসুন্দর হোক, অপ্রয়োজনীয় হোক, নূতনের চাকচিক্য আমাদের বিচার বুদ্ধিকে বহুলাংশে বিমূঢ় করে।

মহাকালের সত্য ও নূতনের আহ্বানে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ইতিহাসে এরূপ নজীরও আছে। পুরাতন রীতি, নীতি, সমাজ ব্যবস্থা বহুলাংশে অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জীর্ণবস্ত্রের মতই ধূলি ধূসরিত অবজ্ঞাত অবস্থায় বিরাজমান থাকে। যুগধর্মের প্রচণ্ড আলোড়নে ও আঘাতে শাশ্বত সত্যও প্রচুর উপেক্ষিত হয়েছে। মহাসত্য হতে বিচ্যুতির ফলস্বরূপ হয়তো কোন জাতির অধঃপতনও ঘটেছে, (যেমন রোম সাম্রাজ্যের) কিন্তু মানুষের সহজাত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে সন্তুষ্ট থাকে না। মহাসত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্যই যুগে যুগে সর্বদেশে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে থাকে। মার্টিন লুথার মধ্যযুগীয় পঙ্কিল জরাজীর্ণ ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে সংস্কার না করলে হয়তো খৃষ্টধর্ম বহুলাংশে ব্যাহত হোত, এমন কি বহু ইউরোপবাসী ক্যাথলিক ধর্মের যুক্তিহীন অসারত্ব ও অত্যাচারে জর্জরিত হোয়ে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হোত। ভগবানের প্রেরিত দূত লুথার ন্যায় ও সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর খৃষ্টধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ফলস্বরূপ, প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম যেমন প্রতিষ্ঠিত হোল, ক্যাথলিক ধর্মের বহু অনাচার, অবিচার ও অত্যাচার সংশোধিত হোল।

অনুরূপভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলা দেশে খৃষ্টানধর্মের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল তখন হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য ভগবানের প্রেরিত দূত রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়। শুধু কি তাই, ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার পর নূতন প্রথায় ব্রাহ্মধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হলেন—ব্রাহ্মবান্ধব, কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন প্রথায় (নব-বিধান) মূলেও আছে আমাদের মনের গতি ও প্রকৃতির

পরিচয়। অনুরূপভাবে, মহাকালের সত্যাসত্য ও ন্যায়নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম যখন দিগন্তব্যাপী বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্লাবনে ভেসে যাচ্ছিল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন ঈশ্বর প্রেরিত দূত জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য। মহাকালের মহাসত্য, যেমন ধর্ম, ন্যায়, নীতি ও শাস্ত্র, নদীর জলধারার ন্যায় বহু পথ অতিক্রম করলেও এদের খাদ ঠিকই থাকে, শীতকালে হয়তো ক্ষুদ্র জলধারাগুলি এদের কোনক্রমে বাঁচিয়ে রাখে কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে আবার দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ধর্মের স্রোতগুলি কখনও বেগবতী বর্ষার মত, কখনও আবার মন্থর ধীরগতি স্রোতস্বিনীর মত। প্রাবল্যে ও প্রাচুর্যে কখনও প্রাণবান, কখনও ক্ষীণ কলেবরে ধীর স্থির শান্ত। কিন্তু মৃত্যু বা ধ্বংসের প্রশ্ন উঠে না। সুন্দর ও সুসজ্জিত গৃহ যেরূপ কিছুকাল পরে ধূলি ও ধূমার অপরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, ঝাঁট দেওয়ার অভাবে; মহাপুরুষদের যুগে যুগে আবির্ভাবের কারণও তদ্রূপ অধর্ম ও অসত্যের গ্লানি ও মলিনতাকে ঝাঁট দিয়ে দূরীভূত করা। ধূলি ধূমাও গ্যাস শুধু পৃথিবীকেই মলিন করে, এমন নহে; মহাকাশের অর্দ্ধেক ভর ঐ ধূলি ও গ্যাস, অর্থাৎ নক্ষত্র গ্রহ, উপগ্রহ যদি মহাকাশের অর্দ্ধেক ভর সৃষ্টি করে থাকে, বাকি অর্দ্ধেক ভর সৃষ্টি করেছে ঐ মহাকাশের ধূলি ও গ্যাস। সেখানেও প্রতিদিন ভাঙ্গাগড়ার ক্রিয়া চলেছে সমভাবে। প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রোড়ে কোথায় কোন নূতন দ্বীপ জন্মগ্রহণ করলো এবং কোথায় কোন দ্বীপ আগ্নেয়গিরিতে কিংবা প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস হোল; কে তার খবর রাখে।

বিশ্বরহস্যের মূলেই ভাঙ্গাগড়া। এই অনিত্য পরিবর্তনশীল ভাঙ্গাগড়ার মূলে রয়েছে গতি অর্থাৎ পরিবর্তন। শিশুরা গতিশীল উড়োজাহাজ, রেলগাড়ী ও ষ্টিমার দর্শনে আনন্দে নৃত্য করে, বয়স্ক ও বৃদ্ধেরা মনে আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু উভয়বিধ আনন্দের মধ্যে প্রভেদ আছে। বৃদ্ধেরা জানে যে ঐ সব যান গতিরই প্রতীক এবং দীর্ঘ দিন উহাদের দর্শনে তাহাদের আনন্দও বহুলাংশে হ্রাস হয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে উক্ত যানগুলি অনাবিল আনন্দের কারণ, এবং ঔৎসুক্যে পরিপূর্ণ। ঔৎসুক্যই জ্ঞানের গতিপথের পাথেয়। জ্ঞানের ঔৎসুক্যই শিশুর ক্রোড়ে বাঁশী কিংবা দম-লাগানো গাড়ীর স্বল্প স্থায়িত্বের জন্য দায়ী; অর্থাৎ বাঁশীর সুন্দর সুর এবং গাড়ীর গতির কারণ অনুসন্ধানে শিশুর অনুসন্ধিৎসু মনে উহার মূল কারণ খুঁজে বেড়ায়। সুতরাং সে বাঁশীকে ও গাড়ীকে ভাঙ্গিয়া উহার বিশ্লেষণে মনোযোগ দেয়; ঠিক পাকা বৈজ্ঞানিকের মত। অজ্ঞানতাই ভীতির কারণ; অন্ধকার ও মৃত্যু উভয়ই আমাদের নিকট ভীতিপ্রদ, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের নিকট অজ্ঞাত। গতি ও জ্ঞান জীবনে আলো ও আনন্দ দান করে। জ্ঞানে নির্ভরতা।

অবসর বিনোদনের সময়ই মানুষের অন্তর্নিহিত এই গতির স্বরূপ বিশেষ ভাবে প্রকট হয়, কঠিন রূঢ় কর্মক্ষেত্রে নয়। দর্শকবৃন্দের সুবিধার্থে নাট্যকার তাঁর নাটকে যে বিভিন্ন রসের সমাবেশ করে থাকেন তার কারণও ঐ একই। একই বীররসব্যঞ্জক কিংবা করুণরসসিক্ত নাটক শ্রোতার নিকট অধৈর্য, অসারতা ও তিক্ততা আনয়ন করে। অতএব নাট্যকার অপ্রাসঙ্গিক ও মিথ্যা হলেও তাঁর নাটকে হাস্য ও বীভৎস রসের অবতারণা করে থাকেন। অনুরূপ ভাবে সমাজ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, দেশের আচার রীতিনীতিকে ও মহাকালের সার্বজনীন সত্যকে কিছু মাত্র উপেক্ষা না করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের যুগোপযোগী পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজন—রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে। সেরূপ রাষ্ট্রই সজীব, সুস্থ ও প্রাণবন্ত হয়। আমাদের ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুষ্ঠু সমাজ পরিচালনায়—কর্ম বা পেশা অনুযায়ী। কিন্তু সেই বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাণশক্তি যখন লুপ্ত হোল, তখন চতুর্বর্ণের আর সার্থকতা রইল কোথায়? চক্রবর্তী বা ভট্টাচার্য যদি মদ, গাঁজা, আফিংয়ের দোকানের লাইসেন্সের জন্য আবগারী বিভাগে ধর্ণা দেয় তখন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব আর রইল কোথায়? সমাজ যে সেই সনাতন পন্থা পরিহার করেছে তা সমাজ ও দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। গতি ও জ্ঞানের আলোকেই প্রতিটি ব্যবস্থার পরিমাপ হওয়া উচিত। সত্য ও জ্ঞানের আলোকে যার প্রতিষ্ঠা তার ভিত্তিও চিরস্থায়ী।

মহাকালের বিরাট গতির আবর্তে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারকা সবাই এগিয়ে চলেছে, এখানে স্থবিরের স্থান কোথায়? যে সূর্য, তাঁর গ্রহ ও উপগ্রহদের সঙ্গে নিয়ে সেকেণ্ডে ১৭৫ মাইল বেগে ব্রহ্মাণ্ডের নাভিদেশে ছুটে চলেছে, সেখানে আমরা ধীর নিশ্চল হয়েও মহাকাশের এক অংশ হতে অন্য অংশে ছুটে চলেছি, যদিও আমরা এই বিরাট গতিবেগ অনুভব করি না। এই বিরাট গতিবেগ জীবের দেহ ও মনে অজ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করে, যে প্রভাব দুরতিক্রম্য ও অলঙ্ঘনীয়। মহাকাশের ক্রোড়ে আমরা কাল যেখানে ছিলাম আজ সে স্থান হতে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে চলে এসেছি, এক বৎসর বাদে কোটি কোটি মাইল দূরে পৌঁছাব—সূর্যসারথি দ্বারা।

উদ্ভিদের বীজ হতে ফুলের পরিণতি, ফুল হতে ফলের পরিণতি একই গতির আবর্তে ক্রীড়া করে। সূর্যকিরণ দ্বারা সৃষ্ট বাষ্প বাতাসের আন্দোলনে উচ্চ পাহাড় পর্বতাদি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আবার মেঘ ও জলের সৃষ্টি করে। নিরন্তর ক্রীড়াশীল এই গতির আবর্তে কেহই স্থির নয়। প্রাণিগণ শৈশব হতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়। তারপর আসে মৃত্যু; কিন্তু সেখানেই তার গতির শেষ নয়। নদী ও মেঘের ঘূর্ণায়মান আবর্তের ন্যায় আবার ফিরে আসে এই পৃথিবীতে নব কলেবরে ও নবরূপায়ণে। আধ্যাত্মিকেরা তার কারণ নির্ণয় করেছেন মোহ; তা সে অর্থের মোহ, জ্ঞানের মোহ, ভালবাসার মোহ বা যে কোনরূপ মোহই হতে পারে। পৃথিবীর শৈশবে, বর্তমান বৃদ্ধ পৃথিবীর চেহারা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সামান্য কয়েক কুট বাষ্প মেঘেই তার সীমানা নির্দ্ধারিত ছিল এবং সেই বাষ্প মেঘ ছিল অতিশয় উষ্ণ। তারপর উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তরল পিণ্ডাকৃতি ছিল এবং পৃথিবীর স্তর হাজার হাজার মাইল পুরু ছিল না, ছিল সামান্য কয়েক মাইল মাত্র এবং পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্তনে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যয়িত হোত না—হোত কেবল দুই-চারি ঘণ্টা। তারপর উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তরল পিণ্ডাকৃতি ক্রমশ শক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হোল। পৃথিবীতে সৃষ্ট হোল মাটি। তারপর জল উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্ট হোল। নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত ও নির্বিকার মহাকালের গতির আবর্তে পৃথিবীও মৃত্যুমুখে পতিত হবে, ঠিক আজিকার মঙ্গলগ্রহের ন্যায়। লাল রক্তিম মরুভূমি সম মঙ্গলগ্রহের নশ্বরতার কারণ কি? বৈজ্ঞানিক বলবেন অক্সিজেনের নিঃশেষতা অর্থাৎ মাটি, বালি, পাথরের মধ্যে যে অক্সিজেন প্রবেশ করে সে আর

মুক্ত হয় না, ফলস্বরূপ গ্রহের ও উপগ্রহের মৃত্যু ঘটে। ( oxidation of earth and rocks by oxygen )। সৌরজগতে সর্বগ্রহেরই ঐ এক ইতিহাস এবং ক্রম-পরিণতিও এক। যার সৃষ্টি হয়েছে তার ধ্বংস অনিবার্য।

এই অধৈর্য ও চঞ্চলতাপূর্ণ মনপ্রাণ সম্পূর্ণ ধীর, স্থির ও সুস্থির অবস্থায় আনয়ন করা যায় একমাত্র সহজাত বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে কঠোর ধ্যান ধারণা ও অভ্যাস দ্বারা অন্তর্মুখী করা গেলেই, অপার্থিব আনন্দ ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়া চলে। কিন্তু উহা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের মন এক দিকে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধের দিকে ধাবমান অন্য দিকে কাম, ক্রোধ ও লোভের পশ্চাতে ধাবমান। ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বীয় বশে আনয়ন করেই স্থির ও স্থিতপ্রজ্ঞার সাহায্যে সেই অপার্থিব জ্ঞান ও আনন্দ করায়ত্ত হয়। এবং জন্ম মৃত্যুর এই অভিশাপ হতে মুক্ত হয়ে ধীর, স্থির, নির্বিকার পরমপুরুষের সঙ্গে মিলন সম্ভব।

# অনন্যা

## কাকলী বসু

তাকে যখন বলি : এদেশে আর মন টেকে না
চল পালাই নীল আকাশের সুদূর নীলাংগনে
অথবা কোন্ আদিমযুগের নীল পাহাড়ের ধারে
কিংবা কোন সাগরবেলায় ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে।
( মনে মনে যদিও জানি প্রস্তাবটা বাস্তব নয় মোটেই
বর্তমানের প্রান্ত সীমায়, তবুও যেন কি এক অধীরতায়
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি কৃতাঞ্জলিপুটে সমুৎসুক। )

ম্লান প্রদোষের দ্বিধায় তখন অস্তগামী সূর্য্য অধোমুখি
শেষ ছায়াটি ফেলে রাখে লজ্জারাংগা কপোল সীমায় তার
সে কয় হেসে : তাই কি হবে ঠিক? যদিও দেশে স্নিগ্ধ
প্রলেপ নেই, উষর মাটি রুক্ষ, ক্রন্দসী। মানবতা
বিপন্ন আজ, দেশের মাটি ভ্রাতৃঘাতী পূর্বদেশের প্রান্তদ্বারে।
তবুও দেখে ভেবে, বিপন্নপ্রাণ আছে বেঁচে শুধু
মনের টানে। আজও দেশের প্রাণধারাটি ফল্গু নদী।

তাপসী প্রাণের উত্তাপেতে মনের সীমা যখন আকাশচারী
তখন যদি তাকে বলি : এদেশ ছেড়ে কাশ্মীরে যাই চলো
কিংবা শিলং, মুসৌরী কি দার্জিলিং-এর বরফ ঢাকা চূড়ায়।
কাজল কালো চোখের সীমায় দীঘল ছায়া ফেলে, গুঞ্জন
সে তোলে : রুগ্ন বাবা, যক্ষ্মারোগে মাও শয্যাশায়ী,
ভাইটি ছোট, সম্বল তো মাষ্টারী, টিউশনি—অকম
সংসার। এদের ফেলে কেমন করে পালিয়ে যাব বলো?

আমি ভাবি, বিংশযুগের এ এক প্রিয়া, মূর্তিমতী ক্ষমা
রুক্ষ উষর শিবিশিলায় স্নিগ্ধা স্রোতস্বিনী—নিরুপমা।

# সন্ধ্যা

## শ্রীপুতুল চৌধুরী

শিল্পী মনের তুলির টানে রয়েছে যে আঁকা,
দিগন্তের ঐ গোধূলিতে পথের রেখা বাঁকা ;
ঐ নিশানায় সূর্য নামে অস্তাচলের পথে,
রাঙিয়ে দিয়ে দিগন্ত তাল সোনার আলোর রথে।

কালো রঙের ওড়না গায়ে সন্ধ্যা এল ছুটে,
কালোয় ঢেকে আলোর রেখা সব নিয়েছে লুটে।
তারায় ভরা আকাশ পথে সন্ধ্যা জ্বালে দীপ,
আলোয় আলোয় জ্বলছে যেন আকাশ ভরা টিপ।

তুলির টানে মুছে দিয়ে বনানীর ঐ আলো,
ঢেকে দিয়ে সবুজ রেখা করে দিয়ে কালো ;
কল্যাণী ঐ বধূর বেশে সন্ধ্যা যেন দাঁড়ায় এসে—
জ্বালিয়ে দিয়ে প্রদীপখানি মধুর হাসি হেসে।

অস্তাচলে সন্ধ্যারাগে বাজে আলোর বীণ,
ঝঙ্কারে তার ভরে গেল পথের রেখা ক্ষীণ।
ঐ ইশারায় বিহঙ্গিনী ফিরছে কুলাতে,
স্নেহ কাতর শাবকেরে অঙ্গে দুলাতে।

সন্ধ্যা-বাতাস গন্ধে ভরা হাসনাহানার বাসে,
স্ফটিক সম চামেলিরা স্নিগ্ধমধুর হাসে।
সন্ধ্যা নামে শান্ত পদে শুভ্র যূথীর গন্ধে,
বিশ্বপিতার বন্দনা গায় সুন্দরেরি ছন্দে।

# আমার দেখা ডাঃ বিধানচন্দ্র

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ডাঃ কে, এল, দে বললেন : জ্বর যখন কিছুতেই যাচ্ছে না তখন ডাঃ বি, সি, রায়কে আনার ব্যবস্থা করি।

জমিদার বাবু বললেন : হ্যাঁ, তাই করতে হয়।

আজ পাঁচ সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, অনেক ডাক্তার হার মেনে গেলেন, এমন কি ডাঃ অমল রায়চৌধুরীও রোগ নিরূপণ করতে পারছেন না। কাজেই এখন শেষ চেষ্টা···তাঁর মুখে বিষাদের কালোছায়া। একটা অমঙ্গলের আশংকায় সমস্ত বাড়ীটা যেন থম্ থম্ করছে।

আমি ছিলাম রোগীর তত্ত্বাবধানে। আমায় জিজ্ঞেস করা হল। আমি সানন্দচিত্তে সমর্থন জানালাম। আমি পল্লীর মানুষ। ছোটবেলা থেকে সুদূর পল্লীতে বাস করেই বিধান রায়ের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলাম। বিধানচন্দ্র নাকি রোগীর ঘরে ঢুকতেন না। রোগীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রোগীর মুখের দিকে তাকিয়েই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখে দিতেন। মরা মানুষও তাঁর স্পর্শে জীবিত হয়ে উঠতো—এমনি সব কথা। স্বর্গ বৈদ্য ধন্বন্তরীর কথা পড়েছিলাম। সেই 'ধন্বন্তরী' বিধানচন্দ্র রায় যখন মর্ত্যের মাটির বুকে নেমে এসেছেন, তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য কে না চায়?

ডাঃ কে, এল, দে বিকেলে ফোন করে জানালেন : পরদিন সাড়ে দশটায় ডাঃ বি, সি, রায় আসবেন।

হেমনগরের জমিদারের ছেলের টাইফয়েড (আপাততঃ ডাক্তাররা তাই বলেছেন) চিকিৎসার জন্যে কলকাতা আনা হয়েছে। দেশবন্ধু পার্কের উপরেই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সাড়ম্বরে চিকিৎসা পর্ব চলেছে। অজস্র অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ঔষধপত্র, সেবা যত্নের কোন ত্রুটী নেই। ডাঃ কে, এল, দে প্রায় সময়ই উপস্থিত থাকছেন। কলকাতার অনেক নাম করা ডাক্তার দেখে যাচ্ছেন, ওষুধ দিচ্ছেন কিন্তু জ্বর আর ছাড়ছে না। কাজেই ডাঃ বিধানচন্দ্রের জন্যে সকলেই উদগ্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

১৩৩৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস। সেদিন আকাশ ছিল ঘোলাটে মেঘে থমথমে। দোতলার দক্ষিণের দিকে রোগীর ঘর। দক্ষিণ-পূর্বে দেশবন্ধু পার্কের দিকে খোলা বারান্দা। থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, পার্কের গাছগাছড়া ও মারাঠা ডিচের চলমান লঞ্চ ও নৌকাগুলি দেখা যাচ্ছে।

আমি রোগীর ঘরের জানালা দিয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম ডাঃ বিধানচন্দ্রের আগমন। একখানা মোটর এসে গেটে থামলো। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। জমিদার বাবু আগে, পেছনে ডাঃ ক্ষীরোদ বাবু আর মাঝখানে উন্নতদেহ বিরাট পুরুষ মর্ত্যের 'ধন্বন্তরী' ডাঃ বিধানচন্দ্র।

রোগীর ঘরের দিকে যেতেই ভৃত্য নেপালচন্দ্র বললে : খোকাবাবু টাট্টিপর গিয়া।

আমরা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম। ডাঃ বিধানচন্দ্রের সময়ের মূল্য অনেক। দেরী হলে তিনি হয়তো বিরক্তিবোধ করবেন। কিন্তু ঠিক উল্টো। বিধানচন্দ্র নিজেই বললেন বেশ শুভ লক্ষণ, টাইফয়েড কেস যখন, ইুলটা একটু নিজে চোখে দেখে যেতেও পারবো। ওকে বিরক্ত করো না পায়খানা করতে দাও। আমি বলছি। এসো হে ক্ষীরোদ, আমরা ঐ বারান্দায় বসি। তখনই তাড়াতাড়ি পূবের বারান্দায় চেয়ার দেওয়া হল। সবাই আমরা বসলাম। ক্ষীরোদ বাবু বিধানচন্দ্রের ভৃত্য।

বিধানচন্দ্র দেশবন্ধু পার্কের দিকে তাকিয়ে বললেন : একদিন কি ছিল এইখানে। দক্ষিণে উল্টোডাঙ্গা মেইন রোড থেকে উত্তরে আর, জি, কর রোডে মাঝামাঝি যায়গায় ছিল জঙ্গল ও খাল খন্দে ভরা মাঝে মাঝে দু'একখানা বাড়ী, দু' একটা বস্তী। মারাঠা ডিচের পার দিয়ে কয়েকটা গুদামের মত ছিল, আর ছিল চোর বদমাসের আড্ডা। সন্ধ্যার পর এসব যায়গায় আসতে লোকে রীতিমত ভয় পেতো। আজ ধীরে ধীরে সেই নরক কুণ্ড স্বর্গের নন্দন কাননে পরিণত হচ্ছে। আমি পৌরপতি থাকা কালেও এই দিকটার বিশেষ করে দেশবন্ধু পার্কের সম্প্রসারণ ও সংস্কার কিছুটা হয়েছিল মনে হয়। কালে কালে হয়তো আরো কত উন্নতি দেখে যাব।

কথা প্রসঙ্গে ডাঃ ক্ষীরোদবাবু (ডাঃ কে, এল, দে) বললেন : এঁরা তো স্যার সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন ছেলের জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না দেখে। অনেক ডাক্তারও দেখিয়েছেন বটে।

জমিদার বাবু বললেন : আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনার হাতেই খোকা আরোগ্য লাভ করবে। এবারে হেসে উঠলেন ডাঃ রায় : এই বিশ্বাসই তো আমার সৌভাগ্য সৃষ্টি করেছে। সকলেরই বিশ্বাস বিধান রায় দেখলেই রোগী ভাল হয়ে ওঠে। অথচ আমি নিজেকে কোনদিনই এমন বিরাট একটা কিছুই মনে করতে পারি না। একজন বড় ডাক্তার হয়ে ওঠার জন্য কোনও দিন চেষ্টাও করিনি। তবে যেটুকু আমি করি সব সময়ই মনে প্রাণে করি। অনেক সময় ভাবি আমার মৃত্যুকালে কোন ডাক্তার এসে দেখলেই আমি ভাল হয়ে যাব? বলেই হেসে উঠলেন···একটু থেমে আবার বললেন : দেখো ক্ষীরোদ, বিলেত থেকে আসার পরেই আমার এই সৌভাগ্যের সৃষ্টি

একদিনের ঘটনা শোন, বিলেত থেকে আসার বছরখানেক হবে হয়তো। মেডিক্যাল কলেজের বারান্দা দিয়ে চলেছি রর দিকে। এক ভদ্রলোক হন্ত দন্ত হয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস ন: আচ্ছা, ডা: বি, সি, রায় কোন্ ওয়ার্ডে আছেন বলতে ?।

আমি পরিচয় না দিয়ে বললুম: কেন, বলুন তো? ভদ্রলোক ন, আমার স্ত্রীর খুব অসুখ। দীর্ঘদিন হল নানা ব্যাধিতে ন, কত ডাক্তারই দেখালুম মশাই আর কত টাকাই ঢাললুম রোগকে তারা সারাতে পারলেন না। ভেবেছি এবার ডা: সি, রায়কে দিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করি। তিনিই বা কি ।

আমি বললুম: তিনি তো মশাই আমারই মত নতুন ডাক্তার। বিলেত থেকে এসেছেন। আপনার স্ত্রীর দীর্ঘদিনের রোগ। বড় বড় সাহেব ডাক্তার থাকতে বি, সি, রায়কে কেন?

তা হোক নতুন ডাক্তার, বি, সি, রায় পুরাতনের বাবা···যেন চটে উঠলেন ভদ্রলোক বললেন: আমার সময় নষ্ট করবেন না, নেন তো বলে দিন কোথায় আছেন তিনি।

রোগের ইতিহাস সব শুনে হেসে বললাম: আমি ডা: বি, সি, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি একটু পরেই যাচ্ছি। বুঝলে ক্ষীরেদ বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রক্ষা করতে পেরেছিলাম কেসে।

ভৃত্য নেপাল এসে খবর দিলে: খোকাবাবু, এখন শুয়ে আছেন। ডা: বিধানচন্দ্র এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন মনে হল মাথা ঠেকে যায় চৌকাঠে। ঘরে ঢুকলেন তিনি। রোগীর শরীর চেক্ যন্ত্র দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন তিনি, সংগে দু'একটা রসিকতাপূর্ণ কথা বলে রোগীকে হাসাবার চেষ্টাও লন। জিজ্ঞেস করলেন: কি, অসুবিধে হচ্ছে খোকা। া নীরব।

: আমার কথার উত্তর দিলে না তো। আচ্ছা, এবার যা জিজ্ঞেস করবো তার উত্তর নিশ্চয়ই দেবে জানি···বলেই হেসে আবার প্রশ্ন করছেন: বলতো তোমার কি খেতে ইচ্ছে হয়।

এবার কিন্তু খোকা চট্ করে উত্তর দিল: রসগোল্লা! উত্তর শুনে ডা: বিধান চন্দ্র হেসে বললেন: বাবা, পোলাও নয়, মাংস নয়, একেবারে রসগোল্লা। একেবারে অসম্ভব দাবী।···খানিক চিন্তা করে বললেন: বেশ খাবে রসগোল্লা, তবে একবারে একটার বেশী নয়। কেমন খুসী হলে তো?

দীর্ঘদিন পরে খোকার মুখে হাসি ফুটলো।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র উঠে হাত ধুয়ে বাইরে যেতে যেতে বললেন: রোগ তো প্রায় সেরে এসেছে। একচল্লিশ দিনে জ্বর ফুল রেমিশন হবে। সবই ঠিক আছে। যে ওষুধ চলছে, তাই চলবে। আর একটা ওষুধ আমি লিখে দিচ্ছি। আর খোকাকে দুটো একটা করে রসগোল্লা দেবেন। বাগবাজারের টাটকা রসগোল্লা। ও আমার মানরক্ষা করেছে যে পোলাও মাংস খেতে চায় নাই। রসগোল্লা নিশ্চিন্ত মনে দেবেন কিছু হবে না।

ঠিক একচল্লিশ দিনের রাত্রিশেষে জ্বর ছেড়ে গেল।

সে আজ কত দীর্ঘ দিন আগের কথা। আমার জীবনে এদিকে মূল্য কিছু থাকলেও এটা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। কারণ ডা: বিধান রায় জীবনভর কত রোগী দেখেছেন, কত রোগ নিরাময় করেছেন। কিন্তু এই ক্ষণিক দেখার ভিতর থেকে তাঁর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল তার মূল্য অনেক। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম সদালাপী ধৈর্যশীল, রসিক বিধানচন্দ্রকে। রোগীর প্রতি এই যে তাঁর সহানুভূতি এই যে মিষ্টি কথা, এই যে অমায়িক ব্যবহার। এর দ্বারাই তিনি জয় করতে পেরেছিলেন অগণিত মানবের মন, এই করে অর্জন করতে পেরেছিলেন অযুত মনে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। একজন বলেছেন, জীবনের এগুলি তুচ্ছ ঘটনা কিন্তু তারই মধ্যে দিয়ে যে মানুষটিকে দেখা যায়, বৃহৎ রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক আলোচনায়, ততোধিক বৃহৎ বক্তৃতা মঞ্চে বা লোকারণ্যে তাঁকে যেন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**প্রতিমা দাশগুপ্ত**

তুলারাশি থেকে সূর্য্যের গতিপথ পরিবর্ত্তিত হোয়ে বৃশ্চিকে উপনীত হোয়েছে···বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি কিছুদিন পূর্ব্বে গত হোয়েছে, এই সময়টাতে রাজপুত-ছত্রীরা সামান্য কিছু উৎসবের আয়োজন করে থাকে। নতুন কিছু শস্য ঘরে আসে তারই স্বল্প-উৎসব। ···ভোরে উঠেই দুই শাশুড়ী-বউতে অবগাহন স্নান করে এসেছে। তারপর রাজোয়ারিকে ঘরের কাজে লাগিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের তদারক করতে গেছে দ্রৌপদী। কিছু কালাকন্দ আর বালুশাহী তৈরি করবে···ময়দার ময়ান আগের রাতেই মেখে রেখেছে···তবে ময়দার তালটা আরও ভালো করে ঠাসতে হবে।···চুলার মধ্যে মোটা দুটো কাঠ গুঁজে দিল দ্রৌপদী।

ছোট কাঁসার একটা বাটিতে ঘন করে গোলা চালের গুঁড়ো দিয়ে নক্শা আঁকছিল রাজোয়ারি ঘরের দাওয়ার উপর।···এক ঘণ্টাও হয়নি সকাল হোয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে দিনের আলো প্রখর হোয়ে উঠেছে। সে আলোর মধ্যে প্রকট হোয়ে উঠেছে রাজোয়ারির পরণের নতুন নাগেসারি রংয়ের শাড়ী।···দেখতে দেখতে ঘরের দেহলি শ্রীমণ্ডিত হোয়ে উঠলো রাজোয়ারির আঁকা সুচারু আলিম্পনে। চালের গুঁড়ো কম পড়ে গেল···না হোলে আলপনার পাশে পাশে মুক্তা ঝাড় এঁকে দিত রাজোয়ারি।

গোলার পাত্রটা হাতে করে উঠে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে কে বলে উঠলো, "বারে বহু বাঃ। বড়ি আচ্ছি নক্শা বনায়া।"

চমকে মুখ ফিরিয়ে রাজোয়ারি দেখলো বর্ষীয়সী একটি স্ত্রীলোক সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আলপনার দিকে। স্ত্রীলোকটিকে রাজোয়ারি কখনও দেখেনি এর আগে তাই একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে···শুকনো শীর্ণ চেহারা। এক মাথা ভর্ত্তি অগোছালো কাঁচা পাকা চুলের বোঝা···সারা গায়ে মোটা মোটা হাড়গুলো প্রকট হোয়ে আছে রুক্ষ চামড়ার নীচে।···বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে মস্ত বড় একটা বেশর কান পর্য্যন্ত রূপার শিকলি দিয়ে টানা।···শীর্ণ তাম্রাভ গলার উপরে প্রকাণ্ড একটা পিতলের হাঁসলি।

রাজোয়ারির বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে স্ত্রীলোকটি ক্ষয় হোয়ে যাওয়া একসারি দাঁত বের করে আবার হাসলো "তুম ক্যায়সি মুঝকো পছানেগি বহু? তুমহারি শাস মুঝকো বহুৎ জানতি।"

উঠে দাঁড়িয়ে রাজোয়ারি বললো, "তব উনকো বুলাই দেতি।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে স্ত্রীলোকটি রাজোয়ারির আপাদমস্তক চেয়ে দেখলো তারপর মুগ্ধ কণ্ঠে বললো, "বাহ বড়ি সুন্দর বহু আনলি পর্ব্বতকা বাপ-মাঈ···।"

অপ্রস্তুত হোয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রাজোয়ারি···পরে দ্রুতপদে চলে গেল রান্না ঘরের দিকে।···কিছুক্ষণ পর দ্রৌপদী শাড়ীর আঁচলে ভিজে হাতটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো রান্না ঘর থেকে···স্ত্রীলোকটির দিকে দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্র অকৃত্রিম আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলো "আরে আরে কিতনি সৌভাগ হ্যায় মেরি! আকাশকা চান্দ উতার আয়ি মৃত্তিকা পর।"

সরবে হেসে উঠলো স্ত্রীলোকটি···"বাপরে বাপ! বহুত কুসিদতা শিখাই তুঝকো পর্ব্বত কা বাপ।"

রাজোয়ারি সলজ্জে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সে দিকে চেয়ে একটু হেসে স্ত্রীলোকটি আবার বললো "বড়ি সুন্দর বহু আনলি দ্রৌপদী"···বলতে বলতে স্ত্রীলোকটির কণ্ঠে অভিমান উপচে ওঠে···"আর পর্ব্বতের বিহার সময় আমাকে তো নিয়োটনা দিলি না···."

অপ্রস্তুত হোয়ে ওঠে দ্রৌপদী। স্ত্রীলোকটির অবস্থা তাদের চেয়ে অনেক ভালো···আর তাদের সঙ্গে দ্রৌপদীর পরিবারের পরিচয়টা এত স্বল্প যে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না···। স্ত্রীলোকটি আজ তার দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে···মনে মনে আশ্চর্য্যই হোয়ে যায় দ্রৌপদী···মুখে অপ্রতিভ হাসি টেনে এনে বলে "পর্ব্বতের বহু তো তোমাদেরই বহু। আপনা ঘরাণার সঙ্গে নিয়োটনার কি প্রয়োজন বহিন?"

এবার স্ত্রীলোকটি বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে বিদরির কাজ করা একটা বড় পাত্র বের করে আনলো···"থোড়া মিঠাই লে আয়ি···পরবকা দিন"···পাত্রের ঢাকনাটা খুললো স্ত্রীলোকটি। লোভনীয় বরফি আর সোনালী রংয়ের বুন্দিতে আকণ্ঠ ঠাসা পাত্রটি।

ডান হাতটা গালে ঠেকিয়ে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে দ্রৌপদী বললো, "আচ্ছা! কি তোমার দানিশ জিজি? বেফয়দা এত খরচ করলে?"

কৌটোটা তার হাতে তুলে দিতে দিতে মুখ ঝামটা দিয়ে স্ত্রীলোকটি বললো, "আমাকে দানিশ শেখাতে আসিসনি তো। তোকে তো দিইনি দিয়েছি পর্ব্বতের বহুকে।"

"তবে পর্ব্বতের বহুও তোমাকে এমনি ছাড়বে না তার ঘরের মিঠাইও তোমাকে খেয়ে যেতে হবে···"তার পর রাজোয়ারির

দিকে চেয়ে বললো···"এ বন্ধু, ছাড়িস না যেন কিষেণলালের মাকে··· ঘরে নিয়ে যা, বসতে দে···পাটি পেতে গপসপ কর···আমি আসছি এখুনি।"

বলতে বলতে বিদ্যুৎগতিতে চলে যায় দ্রৌপদী রান্না ঘরের দিকে। নিজের ঘরে এনে সমাদরে পাটি পেতে বসিয়ে স্ত্রীলোকটির হাতে একখানা পাখা গুঁজে দেয় রাজোয়ারি। মৃদু মন্দ হাওয়া খেতে খেতে স্নেহপূর্ণ স্বরে স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন করে "তোমার বাপের বাড়ী কোথা বউ?" মুখ থেকে অচলগড় নামটা বের করা মাত্র আনন্দ ও বিস্ময়ের সুরে স্ত্রীলোকটি বলে, "আরে আমার কিষেণলালের বউ তো অচল গড়ের পাশের গাঁয়েরই মেয়ে···যেয়ো বউ একদিন আমাদের বাড়ী··· কত খুশী হবে কিষেণের বউ তোমাকে দেখলে"···তার পর হঠাৎ গলার স্বর খাটো করে বললো, "তুমি খুব ভালো গান গাইতে পারো না?"

সচমকে তার দিকে মুখ তুলে তাকায় রাজোয়ারি···আপনা হোতেই চোখের দৃষ্টি ভীত হোয়ে আসে।

লক্ষ্য করে স্ত্রীলোকটি হাসে, "ভয় পেয়ো না গাইতে বলবো না তোমাকে। আমি জানি তোমার শ্বশুর ঘরে শের ঢুকবারও 'তারতিব' আছে, তবু গান ঢুকবার সাধ্য নেই।"

দ্রৌপদীর হাতের তৈরি বড় এক রেকাব ভর্ত্তি মিষ্টি খেয়ে বিদায় গ্রহণ করলো স্ত্রীলোকটি। তার আনা পাত্রটি শূন্য করে ফেরত দিলো না দ্রৌপদী, ঘরের তৈরি মিষ্টিতে পূর্ণ করে দিল, বললো, "আমারও তো কিছু দেওয়া দরকার কিষেণলালের বউকে।"

যেতে যেতে স্ত্রীলোকটি পুনর্ব্বার স্মরণ করিয়ে দিল দ্রৌপদীকে "পাঠিয়ে দিস এক আধ দিন বহুকে আমার ঘরে···কত খুশী হবে কিষেণের বউ।"

সমুগ্ধ বিস্ময়ে তার চলার পথে তাকিয়ে দ্রৌপদী ভাবলো "কত নিরহঙ্কারী অহল্যা! এত দৌলৎমন্দ ঘরের আওরৎ হোয়ে পা দিল আমাদের মতো গরীবের ঘরে।"

নিজের শয্যায় অলস শয়নে শুয়েছিলেন ওস্তাদ মিনহাজউদ্দীন। রাত্রি গভীর হয়েছে। কিন্তু ঘুম আসছে না চোখে। যশেন্দ্র দেব আজ তাঁকে এত্তেলা দেননি। কর্ম্মহীন দিবসের অপর্য্যাপ্ত অবসর আর বিনিদ্র রজনীর প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভরে উঠছে অস্বস্তিতে। কিছুক্ষণ পর উঠে পড়লেন ওস্তাদজী শয্যা থেকে, আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালেন কক্ষ সংলগ্ন চত্বালের ওপর। বাহিরে রন্ধ্র বিহীন অন্ধকারের মধ্যে দলবদ্ধ জোনাকি উদ্দাম হোয়ে উঠেছে তাদের উল্লাস নৃত্যে। ধরিত্রী বারবার সজ্জিতা হোতে লাগলো শত সহস্র দীপালিকায়···। সেই দিকে তাকিয়ে মিনহাজউদ্দীনের মস্ত কল্পনা বিচিত্র রং এর পক্ষ ধারণ করে বেরিয়ে এলো নৃত্যচ্ছন্দে···খুঁজে ফিরতে লাগলো চারধারে কোথায় তাদের মানস কমল। ক্ষণিকের জন্ত তাঁর উদাসীন মুখের ওপর চকিত সুখের হাসি দেখা দিয়ে গেল। নিজেকে যখন পূর্ণ ভাবে নিবেদন করতে পারবে তখনই বিকশিত হোয়ে উঠবে তোমার সুন্দর মূর্ত্তি···তার জন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

কিষেণলালের মার আমন্ত্রণে তাদের বাড়ী এর মধ্যে বার কয়েক বেড়িয়ে এসেছে রাজোয়ারি। প্রথমে সে গিয়েছিল শাশুড়ীর সঙ্গে আর দুবার একলাই গেছে। কিষেণলালের মা কিন্তু পুত্রবধূর মনটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। পঞ্চমবারের গর্ভভারে মন্থরা কিষেণলালের স্ত্রীর উদাসীন মুখ দেখে মনে হয়নি যে বাপের বাড়ীর দেশের মেয়েটিকে দেখে সে সত্যিই খুশী হোয়েছে। কিন্তু তার সহস্র ক্ষতি পূরণ করেছে কিষেণলালের মা। আদরে আপ্যায়নে একেবারে মাথায় তুলে ধরেছে রাজোয়ারিকে। খাবার না খাইয়ে কখনও তাকে যেতে দেয় না, বিপুল আগ্রহ সহকারে তার গান শুনতে চায়। এই শেষোক্ত আকর্ষণের টানেই রাজোয়ারি আগ্রহ করে আসে তাদের বাড়ী···কিষেণলালের বউএর প্রত্যক্ষ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী অনুভব করেও।···

তৃতীয় দিন রাজোয়ারিকে বাড়ী পৌঁছে দিতে সঙ্গে সঙ্গে এল কিষেণের মা। বললো, "কিষেণলালের বউ তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না সেজন্ত যেন মনে তুমি কোন আফসোস করো না···বোঝোই তো চার চারটে ছেলের মা···তার ওপর আবার গা ভারী···তাতেই এমনটা হোয়েছে···আসলে মেয়ে ও খারাপ নয়।"

ত্রস্তে রাজোয়ারি বলে ওঠে, "মা, না, সে কি···আফসোস করবো কেন?"

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলবার পর আবার বলে কিষেণের মা, "আমার ঘরের বউটার যদি তোমার মতো এত সুন্দর গলা থাকতো···" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে···"দুনিয়ার নিয়মই এই···যে যা চায় না ভগবান তাকেই তা দেয়। দ্রৌপদীর ঘরে এমন সুন্দর গান জানা একটা বউ এর কি দরকার ছিল? যারা গানের কিছু বোঝেই না···তারা দাম দিতে পারবে তোমার?"

কোন উত্তর না দিয়ে নত মুখে হাঁটতে থাকে রাজোয়ারি। যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো কিষেণের মা, "আচ্ছা বউ···?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকালো রাজোয়ারি।

"আমাদের রাজা সাহেব গান বাজানার বড় সমঝদার আদমী··· গানের জন্ত একেবারে পাগল···একবার তাঁকে যদি তোমার গান শোনাও···মোহিত হোয়ে যাবেন তিনি।"

কথা শেষ হোলো না কিষেণের মার···দু'চোখ কপালে তুলে সভয়ে রাজোয়ারি বললো, "কি বলছো তুমি?"

"কেন দোষ কি তাতে?"

"রাজা আর দেওতা এক সমান। ভগবানের কাছে বোসে ভজন গাওয়া কি দোষের কথা?"

সে তত্ত্ব কথা রাজোয়ারি বোঝে না···পুনর্বার ভীত স্বরে বলে : "বুড়ো বয়সে কি মাথা খারাপ হোয়েছে তোমার ?"

আর কোন কথা না বলে রাজোয়ারির দিকে নীরবে চেয়ে থাকে কিষেণের মা···নিষ্প্রভ চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে ওঠে।··· পৃথিবীতে যত বিশেষণ আছে···এইটিকেই সব চেয়ে অপছন্দ করে কিষেণের মা।···

রুদ্র বৈশাখ এসেছে তার তাপ দগ্ধ প্রলয় দাহ নিয়ে। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে অবসন্না ধরিত্রী ক্লান্ত শয়নে শায়িতা হোয়ে আছে। দূর দিগন্ত সীমায় সারিবদ্ধ শীর্ণ কাপাসের গাছগুলি মাঝে মাঝে ঈষৎ আন্দোলিত হোচ্ছে···মনে হোচ্ছিল অস্থি চর্মসার একদল প্রেত যেন দগ্ধ দিগন্ত জুড়ে প্রকট দুই দাঁতের পঙক্তি বিস্তার করে নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। অদূরে প্রান্তর ভরে অর্কমন্দার ফুলের রাশি তাদের মেলা সাজিয়ে বসেছে।···তালপাতার তৈরি একটা ছত্রী মাথার উপর ধরে রাস্তার ধার ঘেঁষে, গুলমোহর গাছের ছায়ার নীচে নীচে হেঁটে যাচ্ছিল কিষেণলালের মা। নিজের বাড়ী থেকে প্রায় মাইল খানেক পথ হেঁটে এসেছে সে···বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে এই দুপুর রোদ মাথায় করে কেউ বেরোয় না।···একটা বড় গোহুমের ক্ষেতের কাছাকাছি এসে তার দ্রুত পদক্ষেপ হঠাৎ মন্থর হোয়ে এলো। ···দিগন্তপ্রসারী গোহুমের ক্ষেত পূর্ণ হোয়ে আছে শস্যভারে। কয়েকজন লোক পাকা ফসলগুলি বড় ত্বরান্বিত দিয়ে কেটে স্তূপাকার সাজিয়ে রাখছে। হঠাৎ ক্ষেতের ভিতর হোতে বজ্রজন্তুর মতো একটা চীৎকার ধ্বনি ভেসে উঠলো, "এ উল্লুগ! অন্ধা হো গই না ক্যায়া রে, আধা ফসল তো জখম কর দিয়া।"

কিষেণলালের মায়ের পদক্ষেপ আরও একটু মন্থর হোলো কিন্তু চীৎকারটা সে শুনতে পেয়েছে বলে মনে হোলো না, তবে আর একটু এগিয়ে গেল সে গোহুমের ক্ষেতের দিকে।

খালি গায়ে অঙ্গোছাটাকে মাথায় জড়িয়ে ক্ষেতে জন-মজুর খাটাচ্ছিল পর্ব্বতলাল আর হাঁফাচ্ছিল হাপরের মতো।···পরণের খাটো ধুতিটা মালকোচা দিয়ে এঁটে পরেছে, অনাবৃত বাদামী রংয়ের শরীরটা সিক্ত, আর্দ্র হোয়ে উঠেছে। আবার সে একটা চীৎকার করে উঠলো, "আরে তেরি মুখ দেখনে কো লিয়ে লে আয়া না ক্যায়া? এতনা সুন্দর মুখ তো তেরি নেহি হায়। এইসা যব বৈঠ রহে কাম্ কৈঁকে তব একঠো লাল পয়সা ভি নেহি মিলে গা।" আরও কি বলতে যাচ্ছিল সে ক্রুদ্ধ গর্জনে, কিন্তু থেমে গেল হঠাৎ। ক্ষেতের বাইরে নারী মূর্ত্তিটির দিকে দু' দণ্ড ভালো করে চেয়ে দেখে বিস্মিতস্বরে পর্ব্বতলাল বলে উঠলো, "আরে মৌসি! কিধার চলতি এ দোপহর মে!"

কিষেণলালের মা যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে চমকে জেগে উঠলো, পর্ব্বতলালের মুখের দিকে চেয়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "আরে পর্ব্বত, মেরি বহুত ডর লাগ গ্যয় থে পহলে।"

হেসে পর্ব্বতলাল আবার প্রশ্ন করলো, "তা এ দুক্কর রোদে কোথায় চললে মৌসি?"

"আর বলিস না। যাচ্ছি ছুসুরা গাঁয়ে। তেরা মৌসা কো চাচেরি বহিন্ রহতি হায় উধার তো খবর মিলা উস্‌কা বহুৎ জুড়িতাপ উঠা, পানুগোটি ভি নিকালা—ঐসে মুঝকো ভেজা দেখনে কো লিয়ে।"

"তা মৌসা আপনে নেহি গ্যাই? কিষেণলাল ভি তো যা সকতা।"

"কোন্ ভেজেগি বুড়া মানুষ কো এতনা দূর? আর কিষেণ কা তো ছুটানই নেহি মিলতে।" ঠোঁট উল্টে বললো কিষেণের মা।

হেসে পর্ব্বতলাল উত্তর দিল, "তা ঠিক। তবে কিষেণলাল তোমার এত হুরমৎওয়ালা আদমী, ছুটি পেলেও কি দুপুর রোদে তোমায় নিয়ে বেরুতো?···যা আক্কেলী শরীর ওর।···তা রোদ মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছ কেন মৌসি? এসো না ভেতরে, ছায়ায় বসবার জায়গা আছে।"

"না রে, এতনা দূর যানা-আনা পড়েগা। বসলে অনেক দেরী হোয়ে যাবে।" উত্তর দিল কিষেণের মা।

তবু উপরোধ করে পর্ব্বতলাল, "কত আর দেরী হবে? বসে জিরিয়ে যাও খানিক। আমার ভঁইসের গাড়ী জুতে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো এখন"—বলতে বলতে আলের বেড়ার গায়ে লাগানো আলগা কাঁটা তারের বেড়াটা খুলে দেয় সে।

পর্ব্বতলালের অনুরোধ এড়াতে না পেরেই নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে যেন মাথার ওপরের ছাতাটা মুড়ে ক্ষেতের ভেতর ঢোকে কিষেণলালের মা। একটা বড় পাতাওয়ালা গাছের নীচে ছিটে কঞ্চি দিয়ে খুবরির মতো একটা ঘর তৈরি করেছে পর্ব্বত···সেখানে কিষেণের মাকে নিয়ে ঢোকে।···লাল শক্ত মাটির দাওয়ার ওপর ছোট একটা চাটাই বিছিয়ে বসতে বলে তাকে। একখানা হাতপাখাও এনে দেয়···তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "এ পসিনাতে একেবারে নাহায়ে উঠেছো। ঠাণ্ডা পাণি পিয়োগি থোড়া?"

"দে বাবা দে। পিয়াসে একেবারে ছাতি পর্য্যন্ত শুখা হোয়ে গেছে।"

অদূরে রক্ষিত কালো সোরাই থেকে বড় এক পালি ভর্ত্তি জল ঢেলে তুলে দেয় পর্ব্বত কিষেণের মায়ের হাতে। ঢক্ ঢক্ করে এক মুহূর্ত্তে জলটা নিঃশেষ করে একটা তৃপ্তি ধ্বনি তুলে আবার পাত্রটা তুলে দেয় কিষেণের মা পর্ব্বতলালের হাতে, "দে, দে, আর একটু দে। শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল।"

শূন্য পালিটা পাশে ঠক্ করে নামিয়ে রেখে পর্ব্বতকে প্রশ্ন করে "তেরি বাপ নেহি আয়া আজ?"

"না মৌসি। বাবুর তবিয়ৎটা কদিন থেকে ভালো যাচ্ছেনা।··· তাই ক্ষেতির সব তদারকি কাজ কাম আমাকেই চালাতে হোচ্ছে। আর বল কেন? এ এক ঝঞ্ঝাট। একটু ক্ষণের জন্ত অন্তদিকে চোখ ফেরালেই এ বেশরম্ আলিসি আদমীগুলো ফাঁকি দেবে কাজে···চুরি, দুষ্টামি করবে। সব ঝামেলা আমাকেই পোহাতে হয়। ভালো এক জ্বালা হোয়েছে আমার। এই ফসল উঠবার সময় এমন কেউ নেই যে আমাকে থোড়া মদৎ দেয়।"

"তা ঠিকই বলেছিস···একা মানুষ কাঁহাতক আর পেরে উঠবি বল, একটা ভাই টাই থাকলেও বা তোর একটু আরাম মিলতো সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলে কিষেণের মা।

পর্ব্বতলাল উত্তর দেয়, "যা বলেছো মৌসি, আর ভালো লাগে না এ চাষা ভূষোর কাজ কিষেণলালকে বলে দেখোনা রাজবাড়ীতে যদি একটা কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারে আমাকে, দুপুর রোদে বোসে মাথার চাঁদি ফাটাতে ইচ্ছে করে না আর।

হেসে কিষেণের মা উত্তর দেয়, "কিষেণের কাজটাই বুঝি ভেবেছিস

খুব আরামের? রাজা রাজড়াদের মেজাজ তো জানিসনা সব সময় ভয়ে কাঁটা হোয়ে থাকতে হয়”···তার পরেই অন্য কথা পাড়ে সে। “সে দিন তোর বহু দেখে এলাম পর্ব্বত···ভারী সুন্দর বউ হোয়েছে তোর, চোখ আছে তোর বাপ মায়ের···। আমার ঘরের বউটা যদি এমন সুখরা হোতো!”

বিরক্ত হোয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় পর্ব্বত, তোমাদের ঐ এক কথা। “চাষীর ঘরের বউ সুন্দর অসুন্দরে কি হবে? ঘরের কাজকর্ম্ম জানলেই হোলো, সেদিন শুনলাম তুমি গিয়েছিলে মিঠাই উঠাই নিয়ে···। বহুৎ ইহসান হ্যায় তুমহারি মৌসি”—বলতে বলতে কৃতজ্ঞতা উথলে ওঠে তার গলায়।

“আরে যানে দে, ভারী তো মিঠাই লেই” তারপরে আবার অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করে কিষেণের মা, “তা তোর বউ তো শুনলাম বেশ গান বাজানাও জানে”···আস্তে আস্তে অলস ভাবে একটা হাই তোলে সে, পর্ব্বতলাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে···“শুনলে? কার কাছে শুনলে বল তো?”

এবার আড়মোড়া ভেঙ্গে মস্ত একটা হাই তুলে কিষেণের মা বললো, “শুনলাম আবার কার কাছে? নিজের কানেই শুনলাম কিষেণ শুনলো তার বউও শুনলো” তারপর চমক ভেঙ্গে বলে উঠলো “হায়রে-হায়। বেলা একদম পড় গিয়া। পর্ব্বতলাল! এবার ছুটি দিয়ে দে বাবা! আমি উঠি।” “কিন্তু পর্ব্বত যেতে দেয় না তাকে।

রাজোয়ারি মাঝে মাঝে কিষেণলালের মা বউয়ের কাছে বেড়াতে যায় তা জানে সে কিন্তু সেখানে গিয়ে গান করার কথাটা··· “তোমাদের ওখানে গিয়ে গান গায় নাকি বহু?” খানিকটা তীব্রতা ঝলসে ওঠে পর্ব্বতের কণ্ঠে···।

“কেন এর মধ্যে ত্তাকসীরটা কি হোয়েছে?” উত্তর দেয় কিষেণের মা “এত মিঠা আর সুরেলা আওয়াজ তোর বহুর! কিষেণের বউ আর তোর বউ মিলে যখন সীতাতালাওতে নাহাতে যায় তখন রাস্তার লোক অবধি দাঁড়িয়ে পড়ে তোর বউয়ের গান শোনে।” পর্ব্বতলালের দুই চোখের দৃষ্টি কিন্তু তখন স্থির হোয়ে গেছে।

লক্ষ্য করে কিষেণের মা বললো, “উঠতি উমরের লড়কী মনে খুশী তো লাগবেই আর যার যেদিকে ঝোঁক, তোদের বাড়ীতে তো আর গাইবার জো নেই।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপালের উপর হাত রেখে পর্ব্বতলাল বলে, “মৌসি, এ সব ললাটের লিখন। যো খাড়কা ফল গলে মে ডাল দিয়া উগরামে আর নেহি সকতা উসকো।”

মৃদু একটা ধমক দেয় কিষেণের মা “হোয়েছে কি তাতে? পাড়ার লোক যদি দু’-এক খানা গান শুনেই ফেলে ঘরের বউ-এর কি এসে যায় তাতে? নামাকুলের মতো কথা বলিস কেন?”

“সে কথা কানেও তোলে না পর্ব্বত বলে চলে “ওর এই বদখুলুকী আর ছাড়াতে পারলাম না। আমাদের ঘরের বউ গাইবে গান? আমার দাদী কোনদিন গায়নি আমার মা গায়নি ও-ও গাইবে না। গাইতে হোলে চিরদিনের মতো বাপের বাড়ী গিয়ে গান করুক।” তার পর চারদিক তাকিয়ে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি “তাই তো
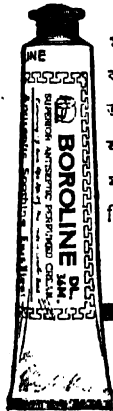
মৌসি বেলা একদম চলে গেছে। চলো এবার পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে।"

মুনিষদের ডেকে ছাড়া মোষ দুটো ধরে এনে গাড়ী জুততে বলে কিষেণের মার সঙ্গে বেরিয়ে আসে খুপরি থেকে। গাড়ী জোতা হোলে একটা লোক এক বোঝা ক্ষেতের আখ তুলে দেয় গাড়ীতে। চালকের আসনে বোসে পর্ব্বত কিষেণের মাকে ছইএর ভেতর ঢুকতে বলে।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে একটু ইতস্তত করে কিষেণের মা বলে, "আজ আর তুসরা গাঁয়ে গিয়ে কাজ নেই পর্ব্বত অনেক দেরি হোয়ে যাবে আমাকে বরং বাড়ীতেই পৌঁছে দে।" বিনা প্রতিবাদে রাজী হোয়ে যায় পর্ব্বতলাল। সে দিন আর কুটুমবাড়ী যাওয়া হোলো না কিষেণের মার।

হাসি হাসি মুখে বাড়ী ঢুকলো কিষেণের মা।···সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে তখন।

রাজবাড়ী থেকে কিষেণলাল তখনও ফেরেনি। ফিরতে তার প্রায় রাত এগারোটা হবে। বাড়ীতে পা দিতেই একটা তীব্র চীৎকার আর স্ত্রীকণ্ঠের গর্জ্জন কানে ঢুকলো কিষেণের মার। আট বছরের ছেলেটাকে অপর্য্যাপ্ত প্রহার দিচ্ছে কিষেণলালের বউ। ছুটে গিয়ে সে ছেলের বউ-এর হাত চেপে ধরলো···

"কি হোলো? আহা! অমন করে মারিসনা বহু।"

ঝঙ্কার তুলে উত্তর দিল বহু, "না মারবেনা সোহাগ করে খিসুসা খেতে দেবে।"

"কি করেছে কি?"

জানতে চায় কিষেণের মা। উত্তরে জানা গেল মার হাত বাক্স থেকে পয়সা বের করে নিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে বেদিয়াদের 'আরগুন' দেখে এসেছে ছেলেটা।

দরদভরা কণ্ঠে কিষেণের মা বলে "তাই বলে মারে এমন করে? আহা চড় খেয়ে গাল দুটো ফুলে উঠেছে—আও লাল! মেরি পাশ" রোরুদ্যমান ছেলেটার হাত টানে সে।

"যাও, যাও, অত সোহাগ জানাতে হবে না"···

এক ঝটকায় শাশুড়ীর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয় তার বউ।

"নিজের পেটেরটার মাথাতো চিবিয়ে খেয়েছো···এখন আমারটাও খাও···"

বলতে বলতে ছেলেটার হাত জোরে ধরে টেনে চলে যায় সে সেখান থেকে।

কিষেণের মা সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে পরে মনের দুঃখে ঘরের কোণায় গিয়ে বসে আর বিড়বিড় করে বলে "ক্যায়সি মেরি কিস্মত জল্‌না।"

রাত সাড়ে এগারোটায় কিষেণলাল বাড়ী ফেরে। তার বউ তখন কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে অঘোর নিদ্রায় মগ্না। তার মা বোসে থাকে ছেলের খাবার আগলে। ছেলের পায়ের শব্দ শুনে উৎকর্ণ হোয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে। কিন্তু না ভয় নেই আজ নিঃশব্দে বাড়ী ঢুকেছে কিষেণলাল। যে দিন গান গেয়ে বাড়ী ঢোকে সেদিন প্রমাদ ঘটে। তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায় বাড়ীতে। বউকে হিড়হিড় করে টেনে নামায় খাটিয়া থেকে। বলে, "আমি সারাদিন খেটে খুটে এলাম আর মালদারকা বেটী পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে ওঠ শীগগির আমার খানা ঠিক কর।" বউও ছাড়বার পাত্রী নয়, শেষে সমানে সমানে লেগে যায়···পাড়া-পড়শীরা ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে।

আবার এক একদিন পা টিপে ঘরে ঢোকে। মার সঙ্গে চোখাচোখি হোতেই ঠোঁটে অঙ্গুল চেপে বলে, "কথা বলোনা। ঘুম ভেঙ্গে যাবে বাচ্চাদের আর বহুর।" বলতে বলতে সন্তর্পণে খাটিয়ার কাছে গিয়ে একদৃষ্টে বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর মার কাছে এসে দুঃখ করে বলতে থাকে "আহা! ছেলেমানুষ আমার বাড়ীতে এসে মরে গেল খাটতে খাটতে···শুকিয়ে একেবারে আধখানা হোয়ে গেছে" বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে বারবার। এই শেষোক্ত ব্যাপারটিতে মার সব চেয়ে বেশী ভয়। আজ তার ব্যতিক্রম দেখে মনে মনে ভারী খুশী হোয়ে উঠলো তার মা।

জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কিষেণলাল খেতে চাইলো মার কাছে।

হাসি মুখে ছেলের খাবার ঠিক করতে গেল তার মা। পরিপাটি করে আসন বিছিয়ে খাবার বেড়ে দিল তার সামনে। তারপর আহাররত ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো।

"আজ এত দেরী হোলো কেন তোর?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে খেতে খেতে অস্পষ্ট কণ্ঠে কিষেণলাল প্রশ্ন করে তার মাকে।

"এদিকে তোর আর কত দূররে মাঈ?"

তামাক পাতা খাওয়া কালো দাঁতের সারি বের করে স্বার্থক হাসে তার মা।

"থোড়া সবুর কররে বাপ। কাজ পাক্কা করতে গেলে কাঠখড় পোড়াতে হয় অনেক···"

তা পোড়াতে রাজী আছে কিষেণলাল। জুৎ করে বোসে সলা পরামর্শ করতে হবে মার সঙ্গে। তার আগে পেটটা ঠাণ্ডা হোক··· মুখে মাকে বলে, "দে আর দু'খানা রুটি দে।"

···আজ সন্ধ্যা উৎরে যাওয়া মাত্রই খেয়ে নিয়েছে পর্ব্বতলাল। অন্যদিন বাপের সঙ্গে বোসে খায়···আজ আর তার সে ধৈর্য্য ছিলো না···। দ্রৌপদীকে তাড়া লাগিয়ে অস্থির করে তুলে এক রকম আধসিদ্ধ তরকারি দিয়েই খেয়ে নিয়েছে পর্ব্বত···তারপর নিজের ঘরে ঢুকে চিৎপাত হোয়ে শুয়ে পড়েছে চার পাইয়ের ওপর। শুয়ে শুয়ে ছটফট করছে আর হিসাব করছে মনে মনে···এইবার বাবু খেতে আসবে তারপর মাঈয়া আর গানাওয়ালী খেতে বসবে··· তারপর বাসনপত্র ধুয়ে তুলে যে যার ঘরে শুতে যাবে। দেরী হবে··· আর ঘণ্টাগুলো এত ঢিমিয়েও চলতে পারে। বিরক্তিতে এপাশ ওপাশ করতে লাগলো পর্ব্বতলাল। সময় অবশেষে কাটলো। কান খাড়া করে পর্ব্বত শুনলো রান্না ঘরে শিকল পড়েছে···। এইবার···।

রাজোয়ারি যখন ঘরে আসে তখন দেখে পর্ব্বত একেবারে ঘুমিয়ে কাদা হোয়ে আছে। আজ কিন্তু সে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো···। চার পাইয়ের উপর সিধা হোয়ে উঠে বোসেছে পর্ব্বতলাল···। রাজোয়ারির দিকে চোখাচোখি হওয়ামাত্র ভীষণ একটা হাসি হাসলো সে···তারপর উঠে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রাজোয়ারির সামনা সামনি দাঁড়িয়ে বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলো—

"ঘুঘুড়া মিদ্ গেল বছড়ী জাগল
কামেট চোরে নিল কাগই মাগজ…"
দিবসই বছড়ী কার-ভরে ভা-অ।
রাতি ভইলে কামরু জাজ ॥

…নির্বাক বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইলো রাজোয়ারি পর্বতলালের মুখের দিকে।

গান থামিয়ে প্রশ্ন করলো রাজোয়ারিকে পর্বত।

"কিযেণলাল আর রাস্তার লোককে গান শোনাবার জন্ম বাড়ী বাড়ী ঘুরতে আর সীতাতালাওতে নাহানার জন্ম যেতে হবে কেন? এর চেয়ে ভালো বারগায় রেখে আসতে পারি তোমাকে… যাওগি উধার?"

এবার ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হোলো রাজোয়ারির। যেমন করেই হোক তার গান গাওয়ার কথাটা পর্বতলালের কানে গেছে।… কোন কথা বলার প্রবৃত্তি হোলো না তার।

চুপ করে থাকা রাজোয়ারির দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে পর্বত বললো "চুপ কেঁও? কুছ জবাব তো দেও।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে রাজোয়ারি কথা বললে "দেখো, হো খিয়া আদমী লোগো কো খানেকা চীজ হায়… উহি তম্বুরা বন যাতে গুণী কো হাত কা পরশ পর"…তারপর অল্প একটু হেসে বললে, "ঐ সি খালি খিয়া তো খোল ঠোঁই মিলি তুমহারা…তম্বুরাকা আহ্বান তুমহারা জীওন মে আউর কভি নেহি আয়েগা।"

রাজোয়ারির এই সব কথাগুলোর মর্মোদ্ধার করা যখন সম্ভবপর হোয়ে ওঠে না পর্বতলালের কাছে, তখনই আরও বেশী চটে ওঠে সে। একটা হুঙ্কার দিয়ে চারপাই থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠলো "চোপ, জিয়াদা বাত শুননে নেহি মাংতা। ঘরকা জোরু বহ এই সি বাহারকা আদমী লোগোঁকো গানা শুনাইকে ঘুমতী হমলোঁগ উসকি ক্যায়া কহ্‌তা জানতি? উসকি কহতা রণ্ডি। উসকী জাখা হমারা অন্দরমে কভি নেহি হোগি।"

পূর্ণ দৃষ্টি মেলে রাজোয়ারি তাকালো পর্বতলালের মুখের দিকে রাগ, অভিমান বা ভর্ৎসনার কোন চিহ্ন ছিলো না স্থির চাহনির মধ্যে। কোন প্রতিবাদ সে করলো না—বহুক্ষণ শুধু ভাবাহীন, নিরুৎসুক চোখের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে চললো সে পর্বতলালকে। বিদ্বেষের যে বীজটি বহুদিন থেকে প্রোথিত হোয়েছিল, মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হোয়ে উঠলো বোধ হয় তা এতদিনে।

আরও কিছু বাণ তূণীরে বদ্ধ ছিল পর্বতলালের কিন্তু রাজোয়ারির ভাবাহীন দৃষ্টির নৈঃশব্দের মাঝখানে একটা ধাক্কা খেয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে গেল বেরিয়ে আসতে পারলো না। এগিয়ে এসে বদ্ধ দরজার খিলটা খুলে দিল রাজোয়ারি আর আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো "ঠিক উসকি জাখা তুমহারি ঘরমে নেহি হোগি—ম্যয় যাতি" খোলা দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় সে। পর্বতলাল একবার হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে উদ্যত হয় শেষ পর্যন্ত আর দেয় না।

প্রভাতের অতিথিয়া রাত্রির অন্ধকারে ছিন্ন শুক হোয়ে পড়লো উদ্যানের পুষ্প বিতান তলে। চন্দ্রেলীর স্বল্প জীবন নিঃশেষে লীন হোয়ে যাচ্ছে নীচে ঘাসের স্তুপের মধ্যে। কম্পিত দীপ শিখার মতো বারবার শিহরিত হোয়ে উঠছে বনরাজের পাতাগুলি। দক্ষিণ হাতের উপর চিবুকের ভর রেখে আজকেও কাঞ্চনমালা বোসেছিলেন তাঁর প্রিয় উদ্যানের মধ্যস্থলে। যে বহির্মুখী চরণ দুখানি ভালোবাসার শিকলে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি, কার নিষ্ঠুর হাতের আকর্ষণে ছিন্ন হোয়ে গেছে তা। পৃথিবীর কি শক্তি আছে বসন্তকে তার মৃত্তিকা শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধবার? তবু মানুষ শুধু আশা রাখতেই পারে। যে শুভদীপের পুণ্যময় আলো আজকের এই দুঃস্বপ্নের যবনিকাপাত ঘটাবে সেই আগামীকালের হাতে এখন থেকেই পরিয়ে রাখলেম আমার প্রীতির রাখি…।

জাগ্রত ধরণীর ক্রোড়ে শত-সহস্র মানবশিশু গভীর সুপ্তিতে মগ্ন। জনশূন্য বালুকাময় প্রান্তরের উপরে শ্রান্ত পথিকের মতো কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র উদয় হোলো অর্দ্ধরাত্রে, আপন আসনে। উদভ্রান্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলো একটি নারীমূর্ত্তি। দূর থেকে অস্পষ্ট তাকে দেখা যাচ্ছিল তার দেহের অস্পষ্ট কয়েকটি রেখা। কে আজ তাকে জোর করে বিশ্বের প্রাঙ্গণে টেনে এনেছে, অন্ধকার ভেদ করে কাদের লাখ লক্ষ বিদ্যুৎভরা চোখের চাহনি প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে তাকে। শুধু দূর গগনের সপ্তর্ষি বিগলিত উজ্জ্বল্যের করুণাধারায় অভিষিক্ত করে দিল অপমানিতা মেয়েটির মস্তক।

সূর্য্য তখনও উদিত হয়নি, তখনও সুপ্ত অরণ্যানি মুখর হোয়ে ওঠেনি প্রভাতী বন্দনায়। সে নিদ্রাপুরীর মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ অসম্বদ্ধ পদক্ষেপ থমকে থেমে পড়লো রাজোয়ারির।

তরুণ সূর্য্য পূর্বাশার প্রান্তদেশে পদ্মরাগ রঙে উজ্জ্বলিত হোয়ে

উঠলো। প্রভাতী নক্ষত্র শুভ্র হোতে শুভ্রতর হোতে হোতে অদৃশ্য হোয়ে গেল গগনগাত্র হোতে। বনতল বারবার প্রতিধ্বনিত হোলো পাখীর কাকলীতে। ঘরের বাইরে মাটির দাওয়ার ওপর দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল পর্ব্বতলাল।

শোওয়ার ঘরের উন্মুক্ত দরজা দুটি বারবার খুলে যাচ্ছিল মৃদু বাতাসের তাড়নায়। সম্মুখে কার পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে সে তাকালো। দ্রৌপদী এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। পরিশ্রমজনিত উত্তেজনায় স্থূল দেহ তার ক্রমাগত ফুলে উঠছে। সিক্ত পরিধের নানা জায়গায় কর্দ্দম কলঙ্কিত হোয়ে রয়েছে। অনুমানে পর্ব্বতলাল বুঝলো সীতাতালাওএর দিকে গিয়েছিল তার মা।

ছেলের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে দ্রৌপদী। সগর্জ্জনে বলে ওঠে "তু···তু বে-ইহসান বেইমান, ঘরকা বাহার করলি মেরি বহুকো। আভি যা, ঢুণ্ডকে লেআ বহুকো মেরি, নেহি তো কভি তুঝকো ঘুঁষনে নেহি দেওগি মেরি ঘরপর, যা আবভি যা"—বলতে বলতে সত্যি সত্যি সবল হাতে ছেলের ঘাড় ধরে ঠেলে দেয় দ্রৌপদী। অন্য ঘর হোতে বৃদ্ধ কমলাপৎ শশব্যস্ত হোয়ে দৌড়ে আসে খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

রাজোয়ারির ভীরু নয়নের উপর সুগভীর পল্লব বারবার লজ্জাভারে নত হোয়ে পড়ছিল। পিছনে দণ্ডায়মানা কিষেণলালের মা তাকে সাহস দিচ্ছিল "লাজ নেহি করো বেটিয়া। পরমেশ্বর আর রাজা এক হি সমান।"

যশেন্দ্র দেব রাজোয়ারিকে দেখেই চিনেছেন এই সে মেয়ে, দ্বিপ্রহরের যে নিস্তব্ধতা সজীব আর হোলির সে বৈকালটি মুগ্ধ হোয়ে উঠেছিল এরই কণ্ঠনিঃসৃত ভূপালী আর কাফির মীড়ে। কিষেণলালের মুখে তার গৃহে রাজোয়ারির আগমন বার্ত্তা শুনেই যশেন্দ্র দেব তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছেন আজ সন্ধ্যায় তাঁর জল মহলে। সঙ্গে কিষেণলালের মাও এসেছিল। অদূরে মেঝের উপর উপবিষ্টা নিস্পন্দ রাজোয়ারিকে লক্ষ্য করে যশেন্দ্রনাথ দেব বললেন "দুবার মাত্র তোমার অর্দ্ধ সমাপ্ত গান শুনবার সৌভাগ্য আমার হোয়েছে আমি ধারণা করতে পারিনি আমারই রাজ্যে এমন একটি সুকণ্ঠ অনাদৃত হোয়ে ধূলোর সঙ্গে মিশে আছে। তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আজ তোমার একটি গান আমাকে শোনাও।"

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বিহ্বল-দৃষ্টিতে রাজোয়ারি তাকালো সম্মুখের দিকে। মেত্রির একচ্ছত্র অধিপতি তার মতো মূল্যহীনা একটি স্ত্রীলোকের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন এত সনির্ব্বন্ধ ভাবে। পুনরায় যশেন্দ্র দেব প্রশ্ন করলেন "কি নাম তোমার?"

তাড়াতাড়ি কিষেণের মা জবাব দিল "ওর নাম রাজোয়ারি দয়া পরবর!" তারপর রাজোয়ারির দিকে তাকিয়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললো, "এত লজ্জা বাসছো কেন? মহারাজা তোমাকে গান শোনাতে বলছেন এতো সৌভাগ্যের কথা।" যশেন্দ্র দেব তীব্র দৃষ্টিপাত করলেন তার দিকে। সভয়ে চুপ করলো কিষেণের মা।

যশেন্দ্র দেব আবার বললেন, "সঙ্কুচিত হওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু আমি অনুরোধ করছি ভীত তুমি হোয়ো না।" এই বার রাজোয়ারির দেহ ঈষৎ কম্পিত হোয়ে উঠলো অল্প কিছু সময় অতিবাহিত হোলো ধীর গুঞ্জন ধ্বনি উঠলো রাজোয়ারির কণ্ঠে তারপর মৃত্তিকা পাত্র পূর্ণ হোয়ে উঠতে লাগলো স্বর্গের অমৃতরস নিঃস্রাবে। প্রথমে কম্পিত ও ভগ্ন হোলো রাজোয়ারির কণ্ঠ তারপর অশ্রু জলের করুণ রাগে জীবন্ত হোয়ে উঠলো সে সঙ্গীত···

"একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর,
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হম্ যাওয়ব কোন পুর"

কণ্ঠ তার থেমে চলছে সুসমচ্ছন্দেই কিন্তু কথা সুরের পিছনে চলছে অতি সঙ্কোচের সঙ্গে। কিন্তু অপূর্ব্ব সে কণ্ঠস্বর জন্মান্তরার্জ্জিত তপোফল না থাকলে কণ্ঠে আসে না এ সুর। সে সুরের রেশ মানুষকে শুধু বিহ্বলই করে তোলে না একেবারে মর্ম্মের মূল দেশ পর্য্যন্ত গিয়ে প্রবেশ করে। গভীর রাত্রে দিগন্তে কালপুরুষ যখন কোন নক্ষত্রকে ডেকে নেয় নিজের কাছে···তখনই বোধ হয় মূর্ত্ত হোয়ে ওঠে এ সঙ্গীত। বিশ্বের বেদনায় সে সঙ্গীত শতদলের দল কাঁপতে থাকে থর থর করে। এক অহৈতুকী আনন্দ বেদনায় দুই চোখ সজল হোয়ে উঠলো যশেন্দ্র দেবের। যখন চোখ উন্মীলন করলেন তখন রাজোয়ারির সঙ্গীত সমাপ্ত হোয়েছে। কিছুক্ষণ নীরব রইলেন তিনি পরে রাজোয়ারির মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "রাজোয়ারি" আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর কম্পিত হোয়ে উঠলো "তুম্ চলেগি মেরা সাথ? সারা রাজস্থান মে, নেহি নেহি সারা ভারত মে তুমহারি নাম ম্যয় প্রচার কর দেগা।"

গভীর রাত্রে ছটফট করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো পর্ব্বতলাল। যখন কাছে ছিলে তখন বুঝতে পারিনি তোমাকে ছাড়তে এত কষ্ট হবে, আজ দেখে যাও···দিন আমার আর কাটে না। যদি আগে জানতাম, কখনও তোমাকে যেতে দিতাম না এমন করে, আজ আমি তোমাকে খুঁজে বের করবোই। দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায় পর্ব্বতলাল। ঘোর কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অন্ধকার গলিত হোয়ে নেমে এসেছে চারধারে। সে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতে লাগলো বিদ্যুতের চকিত আলো। রাশীকৃত গম্ভীর নিরানন্দ মেঘদল একত্রিত হোতে লাগলে সুদূর আরাবল্লী পাহাড়ের শৈল শিখর চূড়ে।···দূর দিগন্তের প্রান্ত-সীমায় দেখা যায় এক মহা অরণ্যের আভাস। কত অজানা রহস্য কত অকথিত বাণী গুপ্ত হোয়ে রয়েছে তার অভ্যন্তরে, সে অরণ্যকে উদ্দেশ করেই ঘর ছেড়ে এগিয়ে চলেছে পর্ব্বতলাল দ্রুত পদক্ষেপে। প্রকৃতির নিস্তব্ধ প্রাণ সহসা স্পন্দিত হোয়ে উঠলো দূর থেকে ভেসে আসা মহাকালের রুদ্র ডমরুনাদের সঙ্গে সঙ্গে।···মহাদেবের প্রলয় পিনাক টঙ্কারে আর্ত্ত পৃথিবী থরথর করে কেঁপে উঠলো···হাহাকার করে উঠলো নিবিড় অরণ্য বক্ষে করাঘাত করে···পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘভারকে সবল দুহাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বারবার বিদ্যুৎ তার তীক্ষ্ণ, শ্বেত, রুদ্র হাসি হাসতে লাগলো···তার মধ্যে বারবার হারিয়ে যেতে লাগলো পর্ব্বতলালের আর্ত্ত চীৎকার···"আ যাও রাজোয়ারি, কিধার হ্যায় তুম? ম্যয় জোর পুকারকে বোলতা মেরা জীওনমে আর তুম্‌কো কুছ নেহি বোলুঁ···আ যাও রাজোয়ারি আ যাও।"

ঝটিকাময়ী দুর্য্যোগ রজনীর অবসান হোলো···শান্ত পৃথিবী কলহান্তরিতা নায়িকার মতো নত মুখেনতি স্বীকার করলো প্রত্যুষের কাছে।···অস্পষ্ট আলো ছায়ার মধ্যে···বৃহৎ বন অভ্যন্তরে যেন আদিম পৃথিবীর প্রথম উষার আবির্ভাব হোলো। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

রাহা ছিলেন সাধারণ লোক
নিজের স্ত্রী
... ছেলেমেয়ে
ছোট্ট একটি বাড়ী
ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পড়ালেন
তারা যখন বড় হলো
মেয়েদের বিয়ে দিলেন বেশ ঘটা ক'রে
ছেলেকেও ভালো চাকরীতে ঢোকালেন
এখন খুশিমনে অবসর নিয়েছেন

জন্ম, কর্মযাত্রা পেছে তখনও পর্ব্বতলাল আকণ্ঠে চীৎকার করে রাজোয়ারিকে খুঁজে ফিরছে। একদল কাঠুরিয়া বনের মধ্যে কাঠ সংগ্রহ করতে এসে দেখতে পেয়ে বাড়ী পৌঁছে দেয় তাকে।

সংবৎসরান্তে বসন্ত আবার ফিরে এলো। তপস্যারত সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙানোর মতো চপল দখিন হাওয়া ভেসে এলো, হাসির এক তরঙ্গাঘাতে উড়িয়ে নিয়ে গেল তার গায়ের ভস্মরাশি···এই বছর সঙ্গীত প্রতিযোগিতার দরবার বোসেছে জৌনপুরে। যে বীণায় তার জোনদিন ঝঙ্কৃত হয়নি লোকারণ্যের মাঝে···বিশ্ববীণাযন্ত্রের উপর তাকে আজ নিজ হাতে পড়াতে হবে কঠিন তন্ত্রী, এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে রাজোয়ারি। এক সংসারের প্রতিটি দিবস সব ভুলে যশেন্দ্র দেব উৎসর্গ করেছেন শুধু রাজোয়ারিকে শিক্ষা দানে। এ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্য দুমাস পূর্ব্বে হোতে 'আটৈ' হোতে আর একজন বিখ্যাত ওস্তাদ গায়ককেও যশেন্দ্র দেব আনিয়েছিলেন রাজোয়ারিকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যশেন্দ্র দেবের মানস লোকের কল্পনা আজ মূর্ত্ত হোতে চলেছে। জৌনপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বহু বিস্তীর্ণ শ্বেত প্রস্তরের সভামণ্ডপ আজ প্রভাতে নানা দেশের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ও প্রতিযোগীদের সগৌরবে অঙ্গে ধারণ করেছে মুখরিত হোয়ে উঠেছে বিশাল সভাকক্ষের বৃহৎ স্তম্ভ, ভিত্তি, প্রাচীর···অগণিত জনমণ্ডলীর গুঞ্জন ধ্বনিতে। আজ প্রভাতেই প্রতিযোগিতার আরম্ভ।

যশেন্দ্র দেবের পিছন পিছন কুণ্ঠিত পাদক্ষেপে রাজোয়ারি প্রবেশ করলো সভাগৃহে। এইবার তাকে ছিন্ন হোয়ে যেতে হবে যশেন্দ্র দেবের স্নেহপূর্ণ নির্ভয় আশ্রয়বাস থেকে···প্রতিযোগীদের মধ্যে বিছাতে হবে তার স্বতন্ত্র আসন। ভীত চোখের চাহনিতে রাজোয়ারি তাকালো যশেন্দ্র দেবের দিকে। মৃদু হেসে সস্নেহে তাঁর দক্ষিণ হাতখানা একবার ছোঁয়ালেন যশেন্দ্র দেব রাজোয়ারির মাথার ওপর···তারপর চলে গেলেন শ্রোতৃমণ্ডলীর আসন লক্ষ্য করে। সে হাতের ছোঁওয়ার মধ্যে রাজোয়ারি কি বরাভয়ের আশ্বাস পেলো হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি শান্ত হোয়ে এলো আস্তে আস্তে। প্রথমেই একজন যোধপুরী গায়কের গান দিয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হোলো। পঞ্চমস্বরে বসন্ত রাগ ধ্বনিত হোয়ে উঠলো তার কণ্ঠে···একটিমাত্র গানের কলি অর্দ্ধ প্রহর ধরে নানা ভাবে ঘুরিয়ে তিনি সঙ্গীত সমাপ্ত করলেন। শান্ত-সমাহিত মেঘ রাগ দিয়ে মারাঠী এক গায়িকা তাঁর সঙ্গীত আরম্ভ করলেন। 'নটমল্লা'র রাগে তেলেনা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ গীতকার। রাগ-রাগিণীর অপূর্ব্ব সমন্বয়ে পূর্ণ হোয়ে গেল সভাস্থল। শ্রোতৃমণ্ডলী নিস্পন্দ হোয়ে আকণ্ঠ পান করে চলেছেন সে সঙ্গীত সুধা। পঞ্চম বারে ডাক পড়লো রাজোয়ারির। বিহ্বলের মতো উঠে দাঁড়ালো সে নিজের আসন থেকে। বিশাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে ছোট সঙ্গীহীন তরীর মতো দিশাহারা হোয়ে উঠেছে সে। চারদিকে একবার তাকালো সে···ঐ তো সম্মুখেই বোসে আছেন যশেন্দ্র দেব। নিবিড় শ্যাম বিটপীর মধ্যে বিশাল বনস্পতি সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালো অবজ্ঞাত ছোট গাছটির দিকে। আর তার ভয় কিসের?

তানপুরায় ঝঙ্কার দিলেন পরীক্ষক ওস্তাদদের অন্যতম একজন। কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা নেওয়া হোলো। রামকেলি রাগে ছোট একটি প্রভাতী বন্দনা আরম্ভ করলো রাজোয়ারি···তার জড়তাহীন স্বর কম্পিত হোয়ে উঠলো প্রথমে···তার পর আস্তে আস্তে অবিচল প্রদীপ শিখার মতো ক্রমেই ঊর্দ্ধগ্রামে উঠতে লাগলো সে স্বর। সমাপ্ত হোলো যে গান। পৃথিবী ব্যাপ্ত করে একটি বিরাট করুণা রাশি দ্রবীভূত হোয়ে চতুর্দ্দিক বাষ্পাকুল করে তুললো।

তারপর আদেশ হোলো তার ওপর আড়ানা রাগিণী গাইবার। দুই চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে বোসে রইলো রাজোয়ারি তারপর ধ্বনিত হোলো তার কণ্ঠ···

"ছন্দর ন্যারোরী হৈ পিয়রবা
চঞ্চল চপল চখন লখন
দোয়ে দোয়ে যোয়ে যোয়ে
কিয় মুসকানী বানী"···

সে সঙ্গীত নির্ঝর ধারার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো তার মনো ঝঙ্কার···সরস্বতী মানস সরোবরে শ্বেতপদ্ম ফুটে উঠলো। সুরে বন্যায় প্লাবিত হোয়ে গেল সভাস্থল···শ্রোতৃবর্গ নিস্তব্ধ নিথর। ক্রমে রাজোয়ারির গান শেষ হোলো, কিন্তু মিলিয়ে গেল না তার রেশ কক্ষে চতুর্দিকের প্রাচীরে বারবার প্রতিধ্বনিত হোতে লাগলো তার মীড় মহাশ্বেতার শুভ্র বসনাঞ্চল থেকে প্রসাদী পুষ্প ধীরে বর্ষিত হোয়ে রাজোয়ারির মস্তকে।···

পর পর অতিবাহিত হোলো পৃথিবীর আরও কয়েকটি ঋতু ধরিত্রী ক্রন্দায়মানা হোলো পিকরাজের অন্তর্ধানে ঝরাফুলের ডাং উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বসন্ত সখা চলে গেল তার ফুল ফোটানো পালা সমাপ্ত করে। দিগন্তরালে দেখা গেল তীব্র ভৈরবের ক্ষমাহী রুদ্র পিঙ্গল চোখ, তার অগ্নিবর্ষণের পর নেমে এলো বর্ষা তার বিপু জল ভরা মেঘের রথে আরোহণ করে মল্লার রাগিণীতে গীতিময় হোয়ে উঠলো বনবীথিকা···পিপাসার্ত্তা ধরণী প্রাণ ভরে পান করে বারিদের প্রথম জল ধারা। অবিরাম বর্ষণ শেষে ক্লান্ত শ্রাবণ বিদা গ্রহণ করলো তার শেষ মল্লারের সকরুণ তানের সঙ্গে দিয়ে গেল তা শেষ উপহার কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু।···তারপর পৃথিবী কান পেতে শুনলো শরৎ সঙ্গীত উড়ন্ত বলাকার চঞ্চল পক্ষে ভেসে এলো সুদূরে আহ্বান। 'লুনী' নদীর স্রোতে লাগলো অধীর মাতন সোনা রং এর আবীর নিয়ে উদ্দাম ক্রীড়ায় মত্ত হোলো ফসলের ক্ষেত।

মকই-এর গোড়াগুলো সযত্নে খুঁড়ে দিচ্ছিল পর্ব্বতলাল। অ বোধ হয় দিন পনরো তার পরেই কাটবার সময় হবে! এবারে মতো এতো ভালো মকই বহু দিন তাদের ক্ষেতে ফলেনি। এ মনে হাতের খুরপি চালিয়ে যাচ্ছিল পর্ব্বত, হঠাৎ পিছনে এক হাসির গমক আর তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ শুনে পিছন ফি তাকালো। তাদেরই প্রতিবেশী রঘুপতি···পেছনে দন্ত বিকাশ ক দাঁড়িয়ে আছে হাতের মুঠোয় ধরা একখণ্ড কাগজ। পর্ব্বতলালে সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র কৌতুক উজ্জ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো সে···

"এ ভাই পর্ব্বত! বহুৎ মশহুর বন গেই তুম্ হে আজ।"

হাতের খুরপিটা মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়ায় পর্ব্বতলাল ব "ক্যায়সে?"

মুঠোর মধ্যে ধরা আধময়লা কাগজের টুকরোটা রঘুপতি মে ধরে তার চোখের সামনে "এইসে।"

খবরের কাগজে ছাপা অস্পষ্ট একটি নারী মূর্ত্তি স্থির নি

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে আছে। কোলের কাছে শুইয়ে রাখা একটি বাঁশ। হিঙ কিনতে গিয়েছিল রঘুপতি দোকানী মুড়ে দিয়েছে এই কাগজটাতে। ছবিটা দেখেই চমকে ওঠে রঘুপতি, যেটুকু সন্দেহ ছিলো নীচের খবর আর নামটা পড়তেই উড়ে গেছে তা কর্পূরের মতো। পর্ব্বতলাল নীরবে কাগজের ওপর থেকে ফিরিয়ে নেয় তার দুই চোখ। আবার হেসে ওঠে রঘুপতি "নীরব কাহে ভেইয়া? এতনি বড়ি নামী আর খেতাবধারী লড়্কী কি পতি হ্যায় তুম···আউর এতনা আচ্ছা সন্দেশ সে আয়া তুমহারা পাশ তুহ খানা পিনা তো করহাও। দেখোতো,"··· বলতে বলতে আর একবার ছবিটার দিকে তাকায় রঘুপতি···"জাবীজি হমলোগোঁকা কিতনী দিলওয়ারি দুষ্ট কি দেমে তি ফুল পাই গিয়োপর।"···ক্রমাগত হাসতে থাকে রঘুপতি হি হি করে।

কাগজটা আস্তে আস্তে তুলে দেয় পর্ব্বতলাল রঘুপতির হাতে। তারপর পেছন ফেরে সে পিছন থেকেই উত্তর দেয়···"যো সন্দেশ লে আয়া মেরা পাশ···ঐঠো ফিন বেচো দুসরা আদমী কো পাশ বহুৎ খানা মিল যায়েগে তুমহারা।"

বঙ্কিম উত্তেজিত মুখে প্রায় একরকম দৌড়েই আসেন অন্দরের ভিতর যশেন্দ্র দেব। চীৎকার করেন "রাজোয়ারি, কি ধার হ্যায় তুম?" ভিতরে কি কাজে ব্যস্ত ছিল রাজোয়ারি দ্রুতপদে বাইরে এলো সে ডাক শুনে···। আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে তাকে উদ্দেশ করে বললেন যশেন্দ্র দেব, "আমার কামনা তোমার সাধনা সফল হোয়েছে রাজোয়ারি!" হাতে ধরা লম্বা একখানা কাগজ তিনি গুঁজে দিলেন রাজোয়ারির হাতে "সঙ্গীত ভারতী উপাধি লাভ করেছো তুমি।"

আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হোয়ে উঠলো রাজোয়ারির দুই চোখ··· মুদ্রিত নয়নে চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ তারপর হাঁটু গেড়ে বোসে দুহাতে পায়ের ধূলা মাথায় নিল যশেন্দ্র দেবের পরে কাগজখানি ঠেকালো কপালে। আবেগ কম্পিত দুই হাতে রাজোয়ারির মাথাটা চেপে ধরলেন যশেন্দ্র দেব···"এইখানেই থেমে পড়লে চলবে না রাজোয়ারি এইবারে তোমাকে ঢুকতে হবে বিশ্ব সঙ্গীতের দরবারে।"

নতমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো রাজোয়ারি পরে অস্ফুটকণ্ঠে বললো, "কিন্তু কালহি হম হে এহাঁসে প্রস্থান করনা চাহিয়ে রাজাজী।"

অবাক হোয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন যশেন্দ্র দেব···"সে কি কোথায় যাবে তুমি?"

ম্লান হেসে ওপরের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করে রাজোয়ারি "ভগবান যো ঘরকা নির্দ্দেশ দিয়া উধারই চলনে পড়েগা মহারাজা।"

আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝে স্তম্ভিত হোয়ে গেলেন যশেন্দ্র দেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "পর্ব্বতলালের ঘরে আবার ফিরে যেতে চাও নাকি তুমি?"

বিষণ্ণ হাসি হাসলো রাজোয়ারি "স্ত্রীলোকের সে ঘর ছাড়া অন্ত ঘর আর কোথায়?" অতিমাত্রায় আহত হোলেন যশেন্দ্র দেব রাজোয়ারির কথা শুনে। যে অন্তর্নিহিত প্রতিভা ওমরে মরছিল পর্ব্বতলালের সকলের তিরস্কার আর গঞ্জনায় গ্রাম্য অশিক্ষা আর ক্ষুদ্র কলহের মধ্যে···সেই নিরক্ত পাদপে যেথে ফুল করে ফুটে ওঠা। সঙ্গীহীনা একটি শ্রীময়ী তরুকে উৎপাদন করে এনে পরিচিত করিয়ে দিলেন তিনি বিরাট বিশ্বের বন মেলায়··· পরিণামে কি এই কৃতজ্ঞতা লাভ করলেন তিনি?···বিস্তৃত কক্ষের মধ্যে দু' একবার পদচারণা করলেন যশেন্দ্র দেব···তারপর এসে দাঁড়ালেন অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকা রাজোয়ারির সম্মুখে বললেন, "কিন্তু তুমি ঠিক জানো স্ত্রীর উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে পর্ব্বতলাল তার ঘরে নিয়ে যাবে তোমাকে?"

সহসা এ কথায় উত্তর দিতে পারলো না রাজোয়ারি।

আর একটু হেসে আবার বললেন যশেন্দ্র দেব···"স্ত্রী পুরুষের শুধু একটিমাত্র সম্পর্কই এরা জেনে এসেছে তাই আমার আশঙ্কা হয় রাজোয়ারি।···দেবতার পূজায় ত্রুটি ঘটলে সস্নেহে তিনি তা ক্ষমা করেন, কিন্তু মানুষের বিচারে সামান্যতম ত্রুটিরও মার্জ্জনা নেই। তোমার মতো একটি প্রতিভা এমন অকালে বিনষ্ট হোয়ে যাক্। এ আমার ইচ্ছা নয় রাজোয়ারি।"

তবু মৌন হোয়ে রইলো রাজোয়ারি। একটা উদ্গত নিঃশ্বাস দমন করে যশেন্দ্র দেব বললেন: "ঠিক আছে। তুমি যাবে তা হোলে।"

"দেখনু সে এক রুদ্ধ দুয়ার গেল না তার
চাবিই পাওয়া,
দুলছে কি এক কুহেলি জাল···যাহার পারে
যায় না চাওয়া।
মুহূর্ত্তকাল 'তোমার' 'আমার' একটি দুটি
ক্ষণিক কথা
তাহার পরে দোঁহার মাঝে বিস্মরণের
বইলো হাওয়া"···

স্বগত উচ্চারণ করলেন ওস্তাদ মিনহাজউদ্দীন। দিন ছুটে চলে রাত্রির সন্ধানে···তমসার অন্ধকারে রাত্রি খুঁজে ফেরে দিনকে··· অনন্তকাল ধরে দুজন শুধু দুজনকে খুঁজেই ফেরে, কেউ পায় না কাউকে। নিজের কক্ষে বাতায়নের সম্মুখে একখানি আরাম কেদারায় বোসে মিনহাজউদ্দীন চেয়েছিলেন বাইরের দিকে। উত্তর মধ্যাহ্নের

বেলা পাখীর ক্লান্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে অবসান হোতে থাকে। শরতের শেষ সোনালী আলোর অঙ্গুরীয়কের উপর আকাশের নীলা পাথরটি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হোয়ে উঠতে থাকে। ওস্তাদজীর কাছে তাঁর অখণ্ড অবসর দুঃসহ হোয়ে উঠেছে। মহারাজা দীর্ঘদিন রাজ্য ছাড়া। নানা লোকে নানা কথা বলে ওস্তাদজীকে বোধ হয় আর প্রয়োজন নেই মহারাজার। একতারাকে সঙ্গী করে বাউলের বেশে আবার হয়তো তাঁকে দাঁড়াতে হবে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু যে স্বপ্ন দিয়ে এক মায়াপুরী রচনা করেছিলাম কোনদিন পেলেম না সেখানে প্রবেশের অধিকার···। বিকট দর্শন এক দৈত্য উন্মুক্ত তরবাল হাতে অষ্টপ্রহর অধিষ্ঠিত সে প্রাসাদের সিংহদ্বারে। কিন্তু তাতেই কি সব শেষ? মর্ত্যালোকে না পাওয়ার ক্ষোভ মানসলোকে স্বপ্ন কমল হোয়ে ফুটে রইলো···। দুই চোখ বুজে চুপ করে পড়ে রইলেন মিনহাজউদ্দীন···। একটি পরমানন্দময় মিলনানুভূতির মধ্যে ক্ষণেকের জন্ত যেন লয়প্রাপ্ত হোয়ে গেল তাঁর আকারগত অস্তিত্ব।

যশেন্দ্র দেবের দুই পায়ের উপর উপুড় হোয়ে পড়ে রইলো রাজোয়ারি। প্রণাম যেন তার শেষ হোতে চায় না। দু'হাতে ধরে তাকে তুলে ওঠালেন যশেন্দ্র দেব। আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন "এ পৃথিবীর ধূলি জুড়ে তোমার চিহ্ন অক্ষয় করে রাখতে চেয়েছিলাম···দিন না যেতেই সে রেখা উড়ে গেল সে ধূলার সঙ্গে সঙ্গেই।"···

সজলনয়নে রাজোয়ারি উত্তর দিল "দুখীমত বননা মহারাজা।"

একটা নিঃশ্বাস ফেললেন যশেন্দ্র দেব "আশীর্ব্বাদ করি, ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা হও তুমি" একটু চুপ করে থেকে বললেন "রাজোয়ারি বহিন! যেদিন তোমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন উপস্থিত হবে···সেদিন আমাকে স্মরণ করতে দ্বিধা করো না। মৈত্রির রাজ অন্তঃপুর চিরদিন সসম্মানে তোমাকে স্থান দেবে।"

রাজোয়ারি উত্তর দিল···"আমার সে গর্ব্বের মুকুট চিরদিন সগৌরবে আমি মাথায় ধারণ করবো।"···রাজোয়ারি চলে গেল। এই দেড় বৎসরের আনন্দময় স্মৃতি চোখের জলে মুছে দিয়ে সে অন্তর্হিতা হোলো আবার তার পুরাতন পরিবেশের সন্ধানে।

গৃহপালিত উটটিকে সাধ্যমতো সুসজ্জিত করে তুলেছে পর্ব্বত লাল। লাল নক্সা কাটা রেশমী কাপড়ে মুড়ে দিয়েছে তার পিঠটা শুভ্র কড়ির মালা ঝলিয়ে দিয়েছে গলায়···ঘরে রাখা বহুপুরাতন ও বিবর্ণ এক টুকরো কিংখাব দিয়ে কাঠের চৌকি ঢেকে তৈরি হোয়েছে উটের উপর বসবার আসন। তারপর উটটাকে চালিয়ে এনে ষ্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে সে। বেছে বেছে তাকেই রাজবাড়ী থেকে উট নিয়ে ষ্টেশনে থাকবার জন্ত হুকুম করা হোলো কেন, তা সে নিজেই জানে না। ষ্টেশনের বাইরে থেকেই সে শুনলো ট্রেন আসার শব্দ···উদগ্রীব নয়নে খাড়া হোয়ে দাঁড়ালো সে।

···অবগুণ্ঠনবতী একটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে পর্ব্বতলালের উটের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন রাজবাড়ীর বৃদ্ধ এক কর্ম্মচারী। বিস্মিত পর্ব্বতলালের চোখের সম্মুখ দিয়ে মহিলাটিকে উঠিয়ে দিলেন উটের পিঠে রাজবাড়ীর বৃদ্ধ কর্মচারীটি। তারপর মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললেন "তা হোলে এবার আমি যাই মা।" অবগুণ্ঠনের অন্তরালে দুই হাত যুক্ত করে তাঁকে নমস্কার জানালো মহিলাটি।···

চারিধারের প্রকৃতিতে এক মহা উদাসীনতার ছাপ···বৃক্ষশাখা রিক্ত···ফল উৎপাদনে নিরাসক্ত···শুষ্ক গুঞ্জার ডালে মধুকর শুধু গুঞ্জন করে ফেরে। সূর্য তেজ আতপ্ত হোলো···পথচারিণী রমণীদের পদাঘাতে রুক্ষ ভূমির লাল ধূলা চক্রাকারে উপরে উঠতে লাগলো···. সবিনয়ে পর্ব্বতলাল মহিলাটিকে প্রশ্ন করলো, "কোথায় তাকে পৌঁছে দিতে হবে।"

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাবো।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে পিছন ফিরে তাকায় পর্ব্বতলাল। অবগুণ্ঠন সরিয়ে তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো রাজোয়ারি।

পর্ব্বতলালের শিথিল হাতের মুঠি হোতে রাশটা আলগা হোয়ে যায়···থমকে থেমে পড়ে উটটা। রাজোয়ারি আবার হাসে···"চলো দেরি হোয়ে যাচ্ছে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাশটা আবার শক্ত করে ধরে পর্ব্বতলাল। নীরবে গাড়ী চলতে থাকে। মনের মধ্যে যে ভাব-তরঙ্গ বার বার আছড়ে পড়তে থাকে তা বাইরে প্রকাশ করবার ক্ষমতা চিরদিনের মতো আজও হয় না পর্ব্বতলালের। এতদিনের বিচ্ছেদের মরুময় শূন্যতার মধ্যে রচে ওঠে শুধু দিগন্তপ্রসারী এক স্মৃতিপট।··· রাজোয়ারিই তাকে প্রথম প্রশ্ন জানায়···"সব আচ্ছা হায়? মা' কি দেহি আচ্ছি হায়?"

মার প্রশ্ন উঠতেই পর্ব্বতলাল নীরবে শুধু উপরে আকাশের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করে।

কপালের উপর হাত রেখে সখেদে রাজোয়ারি বলে ওঠে···"হায়, হায়, মাতাজী আউর নেহি হায় মেরি।"

···একটা ঢালু জায়গায় অযত্নবর্দ্ধিত হোয়ে রয়েছে রাশি রাশি বন্য রৌদ্রবরণ ফুল···তার উপর বার-বার পড়ছে উড়ন্ত মেঘের ছায়া। তারই পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে গাড়ী চালায় পর্ব্বতলাল···আর তখনই তার প্রথম কথা বলে রাজোয়ারিকে উদ্দেশ করে···"বহুৎ দুখ পায়া তুম হমারা ঘরমে···আর কোই অভিমান মেরা 'পর আজ আর নেহি রাখখো রাজোয়ারি।"

সে কথার উত্তর না দিয়ে রাজোয়ারি বলে ওঠে, "কি ধার যাতা তুম?"

"কেঁও?" পর্ব্বতলাল বলে, "রাজবাড়ী নেহি যাওগি?"

হেসে ওঠে রাজোয়ারি···"এতনা দূরসে আয়ি রাজবাড়ী যানে কো লিয়ে? তুম্হারা ঘর পর গাড়ী চালাও···মেরি আপনা ঘর যায়েগি···সমঝা···আপনা ঘর।" বিস্ময়াহত হোয়ে পিছন ফিরে এক দৃষ্টে রাজোয়ারির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পর্ব্বতলাল। এই মার্জ্জিত বেশা···শুচিস্মিতা নারীটি তার মতো একটা চাষার ঘরকে এখনও আপনা ঘর বোলে অভিহিত করছে?···

···রাজোয়ারি কিছুতেই আর হাসি চাপতে পারে না···মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে ওঠে খিল খিল করে। পর্ব্বতলালের বিস্মিত মুখটাকে বহুদিন আগের বিবাহরাত্রের সেই 'নাদামে'র মতোই প্রতীয়মান হয় আজ আবার তার কাছে।

# শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনের আদর্শ

শ্রীপ্রমদারঞ্জন ঘোষ

### শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ নূতন নয়—

গোড়াতে এই প্রশ্ন উঠবে যে, শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনের আদর্শ কি এমন একটা জিনিস যার স্বপ্ন শ্রীঅরবিন্দের পূর্বে কেউ কখনও দেখেননি? এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা এই যে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যুগে যুগে এই স্বপ্ন দেখে এসেছেন—The Life Divine গ্রন্থের ৪৩৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন: It is a keen sense of this possibility which has taken different shapes and persisted through the centuries—the perfectibility of society, the Alwar's vision of the descent of Vishnu and the gods upon earth, the reign of the saints, (সাধুনাম্ রাজ্যম্) the city of god, the millenium etc". আমাদের দেশের দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার নামক বিষ্ণু ভক্তির পথ—প্রবর্তক আদি সন্তগণ পৃথিবীতে বিষ্ণুর ও দেবগণের অবতরণের কথা বলেছেন; মানুষ ও মানব সমাজ একদিন সকল অপূর্ণতার উর্দ্ধে উঠবে অনেকের এ বিশ্বাস আছে; পৃথিবীতে সাধুগণের রাজ্য—রাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একদিন হবে, এই অনেকের বিশ্বাস; মধ্যযুগের খৃষ্টানগণের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর সহস্র বর্ষ পরে খৃষ্ট পৃথিবীতে আবার স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন—ইত্যাদি কথা বস্তুত মানুষের দিব্য-জীবন লাভেরই স্বপ্ন। তাই এ কথা বলা চলে না যে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনের আদর্শ একটা অভূতপূর্ব আজগুবী ব্যাপার। তবে একথা ঠিক যে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনের আদর্শ আর উপরোক্ত আদর্শ ও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঠিক এক নয়। দিব্য-জীবন বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী বঝতেন তা আমরা বোঝার চেষ্টা করবো।

শ্রীঅরবিন্দ নানা প্রসঙ্গে দিব্য-জীবন কথাটি উল্লেখ করেছেন, যথা সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে দিব্য-জীবন বা মানবের দেব-জন্ম-লাভই হলো সৃষ্টির লক্ষ্য; এবং মানবের দিব্য-জীবন লাভ না-হওয়া পর্যন্ত জগতের ক্রমবিকাশের ধারার পরিসমাপ্তি হবে না। যোগ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে ব্যক্তিগত জীবনে দিব্য-জীবন লাভের জন্যই যোগ-সাধনা। তবে আমরা দেখবো যে তাঁর যোগের লক্ষ্য নিজের দিব্য জীবন-লাভ শুধু নয়, পৃথিবীতে দেব-মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করার জন্যই তাঁর যোগ-সাধনা। আমরা ইহাও দেখবো যে শ্রীঅরবিন্দ একদিন সত্য বিশ্বাস করতেন, একদিন এই পৃথিবীতেই দেব-মানব-সমাজ গড়ে উঠবে এবং এইখানেই তাঁর যোগের বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আরেকটি অভিমত উল্লেখযোগ্য, মানব-মনের স্বাভাবিক অহং বুদ্ধি ও ভেদ-বুদ্ধির উর্দ্ধে, অর্থাৎ মানস-স্তর থেকে অতি-মানস বিজ্ঞানের স্তরে না ওঠা পর্যন্ত চরম সত্য ব্রহ্মকে জানা যায় না। এবং ব্রহ্মকে জানা ও ব্রহ্ম হওয়া একই কথা। দিব্য-জীবনের অর্থও তা-ই। অতিমানস কথাটা আরো বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হবে।

এ কথাটা সত্য যে কোন সুস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই কবলে খেয়ে-পরে এবং সুখের সন্ধানে ছুটে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। জীবনের লক্ষ্য কী, কিসে জীবনের সার্থকতা প্রভৃতি প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে উদয় হয়; এবং একটা সার্থক মানবতার আদর্শ তাকে অনুসরণ করতে হয়। এই আদর্শ আবার প্রত্যেক মানুষের ধর্ম বিশ্বাস বা "শ্রদ্ধা" অনুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে—নাস্তিক আর আস্তিকের জীবনাদর্শ ভিন্ন না হইয়া পারে না। মানুষের মধ্যে কেউ mystic কেউ আবার intellectual, mystic ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ এবং ঈশ্বরকে জানা যায় এই তাঁর বিশ্বাস। যিনি intellectual তাঁর নিকট বুদ্ধি-বৃত্তির চরম উৎকর্ষই মুখ্য। এবং সত্যকে জানবার উপায় তাঁর মতে বিচার বুদ্ধি। বিচার বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তাই একজন mystic ও একজন intellectual এর জীবনের সার্থকতার আদর্শ যে এক হতে পারে না, তা সহজেই অনুমেয়। প্রচলিত বিভিন্ন জীবনাদর্শের ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনাদর্শের মধ্যে পার্থক্য কী, তার একটু বিচার করলে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

### দুই শ্রেণীর জীবনাদর্শ

প্রচলিত জীবনাদর্শগুলি শ্রীঅরবিন্দ দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যাঁরা ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না, কিংবা ঐ সব তত্ত্ব নিয়ে কোন প্রকার আলোচনা করতে যাঁরা নারাজ, তাঁদের জীবনাদর্শের নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন The ideal of mundane development বা ঐহিক উন্নতির আদর্শ। আর যাঁরা আস্তিক তাঁদের আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ The ideal of religious conversion বা ধর্ম বুদ্ধি প্রণোদিত প্রকৃতি-পরিবর্তনের আদর্শ, এই আখ্যা দিয়েছেন। এই দুই আদর্শের পার্থক্য বোঝা দরকার।

### ঐহিক উন্নতির আদর্শ

প্রথমোক্ত আদর্শ অনুসারে মানুষ হলো দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট এক জীব। অবশ্য এই শ্রেণীর আদর্শবাদীদের সকলের আদর্শ যে এক, তা নয়। তাদের মধ্যে একদল যে আদর্শে বিশ্বাস করেন তার নাম The religion of humanity। এই আদর্শটি আজকাল অনেকের নিকট সমাদৃত, এবং তার কথা আমাদের পরে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ম প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস করেন না বলে এঁরা মনে করেন পরকালের দিকে না তাকিয়ে ইহকালেই দেহ-প্রাণ-মনের যথা সম্ভব বিকাশেই জীবনের সার্থকতা। কেবল নিজের নয় সকলের—সমাজের, দেশের এবং সম্ভব হলে সর্বমানবের—উন্নতি-সাধনই এঁদের কাম্য: আর উন্নতি কথাটিও এঁরা অতি বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করে থাকেন—মানবের সর্ববিধ উন্নতিই এঁদের কাম্য। যথা মনের উন্নতি-সাধন বলতে এঁরা কেবল জ্ঞানের প্রসার বোঝেন না, মানুষের মনের সকল বৃত্তিরই অনুশীলন বোঝেন। আমাদের দেশে আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুশীলন বা ধর্মতত্ত্বে এই আদর্শের ব্যাখ্যা করেছিলেন: তবে এঁদের সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের তফাৎ এইখানে

যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, এবং ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথাও তিনি বলেছেন, কিন্তু এঁদের ঐহিক উন্নতির আদর্শে ভক্তিবৃত্তি-চর্চার কোন স্থান নেই। এঁদের মতে মানুষের চিত্তবৃত্তি বিবিধ; তাই সকল বৃত্তিরই চর্চা প্রয়োজন। যথা কেবল মানুষের জ্ঞান-স্পৃহার নয়, তার সৌন্দর্য-তৃষ্ণারও চরিতার্থতা প্রয়োজন; মানুষের দয়া মায়া প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির দাবীও মেটানো প্রয়োজন—সমাজের ও দেশের ও সর্বজগতের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ-বিসর্জন এঁরা কর্তব্য মনে করেন। মানুষ স্রষ্টা, তাই তার সৃজনী শক্তির বিকাশের সুযোগ দেওয়া অবশ্য-কর্তব্য। দেহের স্বাস্থ্য ও দৈহিক উন্নতি এঁদের মতে অবহেলার জিনিষ নয়। সংক্ষেপে এই ঐহিক উন্নতির আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন The perfection of the inner individual and the perfection of the outer living (Synthesis of yoga p. 704) অর্থাৎ মানুষের অন্তরের বৃত্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশ আর বাইরের জীবনের চরম উন্নতি। তিনি ঐ পুস্তকে (৭০৫ পৃষ্ঠা) আরো বলেন এই intellectual, volitional, ethical, emotional, aesthetic and physical training are all so much to the good, অর্থাৎ এই বিবিধ বৃত্তির অনুশীলন শ্রীঅরবিন্দের মতে সকলই কল্যাণকর। কিন্তু তাঁর মতে শেষ পর্যন্ত এ উপায়ে জীবনের চরম সার্থকতা হয় না। তিনি বলেন এ আদর্শ full and wide, কিন্তু sufficiently full and wide নয়। আমরা দেখেছি তাঁর যোগ world-shunning নয়; তাই তিনি উপরোক্ত গুণ সমূহের অর্জনেরই পক্ষপাতী, বর্জনের নয়, কিন্তু তাঁর পূর্ণ মানবতার আদর্শ মানবের সকল বৃত্তির অনুশীলন এবং ঐহিক উন্নতির আদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর এই ঐহিক উন্নতির আদর্শ যে অসম্পূর্ণ তার কারণ এ আদর্শের গোড়ায় গলদ মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা—মানুষ তো কেবল দেহ-প্রাণ-মন নয়, মানুষ আবার spirit বা আত্মাও। তাই এই আদর্শে দেহ প্রাণ মনের বাইরের কোন জিনিসকেই আমল দেওয়া হয় না বলে এ আদর্শে আত্মার অগ্রগতির কোন অবকাশ নেই। তাই আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের মনঃপুত নয়।

## ধর্মবুদ্ধি প্রণোদিত স্বভাব-পরিবর্তনের আদর্শও অসম্পূর্ণ

দ্বিতীয় আদর্শও অর্থাৎ ধর্মবুদ্ধি প্রণোদিত স্বভাব-পরিবর্তনের আদর্শও শ্রীঅরবিন্দের মতে অসম্পূর্ণ। অবশ্য এ আদর্শের সংগে অনেক বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ একমত; কারণ এ আদর্শে মানুষকে কেবল দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট জীব বলে গণ্য করা হয় না, এবং ঈশ্বর আত্মা পরকাল প্রভৃতিও স্বীকার করা হয়। তবে এ আদর্শে এমন কতকগুলি বিষয় স্বীকৃত হয় যা শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন না; যথা এ আদর্শবাদীদের অনেকের বিশ্বাস মানুষ স্বভাবতই পাপ-প্রবণ এবং ভগবানের কৃপায়ই হউক বা শাস্ত্রবিধির অনুসরণ দ্বারাই হউক স্বভাবপাপী মানুষকে নতুন মানুষ, নিষ্পাপ মানুষ, হয়ে উঠতে হবে। শ্রীঅরবিন্দও মনে করেন দিব্যজীবন লাভের প্রথম সোপান মানুষের প্রাকৃত স্বভাবে স্বভাবের পরিবর্তন। কঠোপনিষদের কথা দুশ্চরিত থেকে বিরত না হলে শ্রেয়লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে জীব ঈশ্বরের সনাতন অংশ; মানুষের মন অজ্ঞানাচ্ছন্ন সত্তা, কিন্তু নিজেকে পাপী বলে অবসাদগ্রস্ত হওয়া তাঁর মতে নিতান্ত ভুল। বিশেষত এই আদর্শবাদীর সংগে তাঁর প্রধান বিরোধ এই যে তিনি তাঁদের মতন একথা মানেন না যে ইহকালে নয় পরকালেই কেবল মানবজীবনের সার্থকতার স্বপ্ন সফল হবে; তাঁর মতে এ পৃথিবীতেই মানব একদিন দেহ-মানব হয়ে উঠবে। (The Life Divine P. 937) এবং এই আদর্শের অসম্পূর্ণতা দেখাতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেন এই আদর্শের প্রধান ত্রুটি এই যে "The inner change of the whole being" যা হলো দিব্যজীবনের লক্ষণ তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। তিনি আরো বলেন এই দ্বিতীয় আদর্শের লক্ষ্য হলো "a credal adherence, a formal acceptance of its ethical standards and a conformity to institution ceremony and ritual—অর্থাৎ এই আদর্শের অনুসরণকারীরা বিশেষ একটা ধর্মমতে বিশ্বাস করা দরকার মনে করেন, এবং নীতি-বিধি, প্রচলিত ব্যবস্থাদি ও প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি মেনে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু এ আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-মানবতার আদর্শের সংগে খাপ খায় না। তবে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-মানবতার বা Integral perfection এর আদর্শ কী?

## শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ মানবতার আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণ মানবতার লক্ষ্য এভাবে ব্যক্ত করেছেন: "A divine perfection of the human being is our aim." (Synthesis of *yoga* P. 703)। এ কথাটাই আরো একটু বিস্তৃত করে ঐ পুস্তকের ৭০৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন: "a living of man in the Divine and a divine living of the spirit in humanity." এই বাক্য দুইটির মর্ম বুঝলে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-মানবতার লক্ষ্য কী, এবং উপরোক্ত আদর্শ দুটির সংগে তাঁর আদর্শের পার্থক্য কোথায় তা-ও বোঝা যাবে। উদ্ধৃত প্রথম বাক্যটি থেকে জানা যায় যে মানব-জীবনের লক্ষ্য হলো ভাগবৎ জীবন বা দিব্যজীবনের পূর্ণতা লাভ, কেবল মানব দেহ, প্রাণ ও মনের উন্নতি নয়। এ আদর্শের অনুরূপ আদর্শ পাওয়া যায় খৃষ্ট শাস্ত্রের উক্তিতে, "Be ye holy and perfect even as your Father in heaven is holy and perfect;" এবং আমাদের শাস্ত্রেরও এই বচনে: "বিষ্ণু ভূত্বা বিষ্ণুং যজেৎ"। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উপরোক্ত দ্বিতীয় বাক্যটিতে মর্ত্য জীবন ও ভাগবৎ জীবনের সম্পর্ক দেখিয়েছেন—মানুষকে যেমন ভাগবৎ জীবন লাভ করতে হবে তেমনি এ মর্ত্য জীবনেই ভাগবৎ জীবন বিকশিত করে তুলতে হবে। দেখা গেল উপরোক্ত Mundane development-এর আদর্শ ও Religious conversion-এর আদর্শ এই উভয় আদর্শ থেকেই শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ভিন্ন।

## দিব্যজীবন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণসমূহ

মানব জীবনের এই পূর্ণতার আদর্শে পৌছাতে হলে কী প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা: "We must know then first, what are the essential elements that constitute man's total perfection; secondly, what we

mean by a divine as distinguished from a human perfection, ( synthesis of yoga, P. 703 ). অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রথম জানা দরকার পূর্ণ জীবন লাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় গুণগুলি কী ; দ্বিতীয়ত পূর্ণ জীবনের মানবীয় ও দিব্য আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর synthesis of yoga গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। নিম্নে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা গেল।

প্রথমত দিব্যজীবন লাভের পক্ষে সমতা, শক্তি, বীর্য ও শ্রদ্ধা এই গুণ চারটি একান্ত আবশ্যক। সমতার মূলে থাকে এ ধারণা যে সর্বভূতে রয়েছেন একই ঈশ্বর। তাই গীতার ভাষায়, বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে যেমন, তেমনি তথাকথিত অস্পৃশ্য ব্যক্তিতে, এমন কি ইতর প্রাণীতেও সমদৃষ্টি প্রয়োজন—অর্থাৎ সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, এ বিশ্বাস অটুট রাখা প্রয়োজন। সমতার অপর লক্ষণ সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি সকল অবস্থায় অবিচলিত থাকা। সমত্ববান ও যোগযুক্ত গীতার মতে একার্থক। তারপর দিব্যজীবনে দেহ প্রাণ মনের শক্তির চরম বিকাশ হয়ে থাকে। আবার বীর্যবান ব্যতীত অন্ত কারো পক্ষে আত্মা লভ্য নয়—মুণ্ডক উপনিষদের কথা ( ৩-২-৪ ) "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য", আর শ্রদ্ধাও একান্ত আবশ্যক ; ছান্দোগ্য উপনিষদে আরুণি ঋষির নিজ পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উপদেশ ( ৬-১২-২ ): "শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি"—শ্রদ্ধার সংগে চরমতত্ত্বের আলোচনা করতে হয় ; শ্রদ্ধা ব্যতীত চরম জ্ঞান লাভ হয় না, এ-ই হলো ঋষির বক্তব্য। শ্রদ্ধার অপর একটি অর্থ বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস বা আস্থা। বেদান্ত ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। শ্রীঅরবিন্দও বলেন সাধনার আরম্ভ শ্রদ্ধায় ; যার ঈশ্বরে ও আত্মায় বিশ্বাস নেই তার পক্ষে দিব্যজীবনের সাধনা সম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় কোন সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণায় বিশ্বাস আবশ্যক নয় ; কোন বিশেষ ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলেও চলে, থাকলেও কোন ক্ষতি নেই ; কিন্তু দিব্যজীবনের সম্ভাবনায় আত্মার অগ্রগতিতে বিশ্বাস—অতটুকু শ্রদ্ধা শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় একান্ত আবশ্যক।

### মানস-স্তর থেকে অতিমানস স্তরে উঠা

দিব্যজীবন লাভের পক্ষে উপরোক্ত সমতা প্রভৃতি গুণগুলিই যথেষ্ট নয়, ইতিপূর্বে এই পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে দিব্যজীবন লাভ করতে হলে সাধককে মানস-স্তর থেকে অতিমানস-স্তরে উঠতে হবে। কথাটির দ্বারা শ্রীঅরবিন্দ কী বুঝতেন ? বস্তুত এই অতি মানস তত্ত্বটি শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল ভিত্তি। তাই শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাষার সাহায্যে আমাদের এই তত্ত্বটি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। ইতিপূর্বে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ভিত্তি তাঁর দার্শনিক মতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে এই super mind বা অতিমানস তত্ত্বটির একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তার একটু পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। স্মরণ রাখতে হবে অতিমানস বা অতিমানস বিজ্ঞানের প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ super mind কথাটি ব্যবহার করেছেন ; এবং এই super mind কথাটির দ্বারা তিনি বুঝতেন সচ্চিদানন্দের অভ্রান্ত জ্ঞান। অতিমানস বিজ্ঞানের আর মানস-জ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর the life divine গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা হলে অতিমানস ও মানসজ্ঞানের স্বরূপ ও দুয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে। তাঁর কথা: "In us consciousness is mind ; and our mind is ignorant and imperfect, an intermediate power that has grown, and is still growing, towards something beyond itself. There were lower levels of consciousness that came before it and out of which it arose ; there must evidently be higher levels to which it is itself arising. Before our thinking, reasoning and reflecting mind there was a consciousness unthinking but living and sentient, and before that there was the sub-conscious and the unconscious." এই উক্তিতে বলা হয়েছে যে মানুষের মন একদিকে সচ্চিদানন্দের অভ্রান্ত বা পূর্ণজ্ঞানের অপরদিকে জড়ের সুপ্তজ্ঞানের এক মধ্যবর্তী অবস্থা। মানব মনের বিকাশ হয়েছে মনের স্তরের নিম্নবর্তী কয়েকটি স্তর থেকে। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মন যে সব নিম্নবর্তী স্তর বিকশিত হয়েছে, তা হলো মানব মনের নিম্নেকার পশুর সহজ জ্ঞানের ( instinct ) স্তর, তার নীচে উদ্ভিদাদির অবচেতন এবং সর্বনিম্নে জড়ের সুপ্ত চেতন। অপর দিকে মানবমনের নিম্নে যেমন উপরোক্ত সহজ জ্ঞান, অবচেতন ও সুপ্তজ্ঞানের স্তর তেমনি মানবমনের উর্ধ্বেও শ্রীঅরবিন্দ আবার over mind, ( অধিমানস ) Intuition, illumined mind ( প্রবুদ্ধ মন ), Higher mind ( উচ্চতর মন ) ইত্যাদি কয়েকটি মানবমনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু সচ্চিদানন্দের Super mind বা অভ্রান্তজ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট কয়েকটি স্তরের কথা বলেন ; এবং মানবমনের গতি উর্ধ্বমুখে ঐ Super mind—এর অভিমুখে। শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস একদিন মানবমন সচ্চিদানন্দের অতিমানস স্তরে উঠবে। সে দিন মানব দিব্যমানব হয়ে উঠবে।

### সাধকের স্বচেষ্টা ও ভগবানের অনুগ্রহ

দিব্য জীবন প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আরেকটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। পূর্ণ-জীবনের মানবীয় আদর্শে যাঁরা আস্থাবান তাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না ; তাই তাঁদের আত্মোন্নতির মূলে থাকে শুধু তাঁদের স্বচেষ্টা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বারবার একথা বলেছেন যে ভাগবৎ জীবন বা দিব্যজীবন একদিকে প্রথমে সাধকের স্বচেষ্টা অপর দিকে পরে যথাসময়ে ভগবানের অনুকম্পা বা grace, এ দুয়ের ফল। সাধকের স্বচেষ্টাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন সাধকের তরফে aspiration বা ভগবৎ অভিমুখী ascent ; আর ভগবানের অনুকম্পা হলো শ্রীঅরবিন্দের মতে ভগবানের descent, পূর্ণ-জীবনের মানবীয় ও ভাগবৎ আদর্শের মধ্যে এই একটি প্রধান পার্থক্য।

### দিব্য রূপান্তরের তিনটি ধাপ

সাধকের আস্পৃহা ও ভগবানের অনুকম্পা এ দুয়ের ফল সাধকের জীবনের দিব্য রূপান্তর। এই দিব্য রূপান্তরের পথ দীর্ঘ ও সময়-সাপেক্ষ। শ্রীঅরবিন্দ এই পথে তিনটি ধাপের কথা বলেন।

সাধক এক একটি ধাপ অতিক্রম করেন, সংগে সংগে তাঁর উপলব্ধিও উন্নততর হতে থাকে; আর তাঁর জীবনের ও চেতনারও ধাপে ধাপে রূপান্তর হতে থাকে। এই ক্রমশ উন্নততর তিনটি ধাপের প্রথমটির নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন Psychic Awakening বা অন্তরাত্মার জাগরণ। সাধন পথে দ্বিতীয় ধাপ হলো Spiritual Transformation—বাংলায় বলা যেতে পারে অধ্যাত্ম রূপান্তর বা আত্মার সত্য উপলব্ধি। সাধনার তৃতীয় ও শেষ ধাপের নাম তিনি দিয়েছেন Supramental Transformation—বাংলায় অতিমানস রূপান্তর বলা যেতে পারে।

### Psyche অন্তরাত্মা বা চৈত্য পুরুষ

Psyche ও psychic awakening কথা দুটির দ্বারা শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝাতে চান তা প্রথমে দেখা দরকার। psyche কথাটি একটি গ্রীক শব্দ। কথাটির মূলগত অর্থ যা শ্বাসগ্রহণ করে; অর্থাৎ জীবিত থাকে; মানুষের ক্ষেত্রে তা হলো soul। পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মা কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে soul কথাটির ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রাচ্য দর্শনে যাকে আত্মা বা জীবাত্মা বলা হয় তা, আর ইংরেজী soul কথাটি ঠিক এক নয়। অনেকে, যথা স্বামী বিবেকানন্দ, আত্মা অর্থে ইংরেজী soul কথাটির ব্যবহারের বিরোধী ও self কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। শ্রীঅরবিন্দও আত্মা অর্থে self বা spirit কথা দুটির ব্যবহারই সমীচীন মনে করেন। তিনি psyche কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে ইংরাজীতে soul এবং বাংলায় "অন্তরাত্মা" "চৈত্যপুরুষ" কথা দুটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে আত্মা বা জীবাত্মা আর যাকে তিনি অন্তরাত্মা বা soul বলেন, তা ঠিক এক বস্তু নয়।

### জীবাত্মা ও অন্তরাত্মার মধ্যে সম্পর্ক

জীবাত্মা আর যাকে শ্রীঅরবিন্দ অন্তরাত্মা বা psyche বলেন এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী তা আমরা দেখবো। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর Lights on Yoga গ্রন্থের ২৫শ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল:

"The phrase 'central being' in our yoga is usually applied to the portion of the Divine in us which supports all the rest and survives through death and birth. This central being has two forms—above it is Jivatman, our true being, of which we become aware when the higher knowledge comes—below it is the Psychic being which stands behind mind, life and body."

উপরের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে মানুষের দেহ প্রাণ মনের কেন্দ্রে, তাদের ধারক ও আশ্রয় হয়ে রয়েছে পরমাত্মার এক সনাতন অংশ। পরমাত্মার এই সনাতন অংশ জীবন-মৃত্যুর অতীত। যখন আমাদের জ্ঞান পূর্ণতর হয় তখন আমরা পরমাত্মার এই সনাতন অংশকে জীবাত্মা বা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে জানতে পারি; আর যখন জ্ঞান অপরিপক্ক থাকে তখন জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। অপরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় অন্তরাত্মা বা Psychic being এর উপলব্ধি হয়, আর পরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় যে জীবাত্মার উপলব্ধি হয় দুই-ই জীবনের কেন্দ্রস্থিত পরমাত্মার সনাতন অংশের দুটি বিভিন্ন রূপ। সংক্ষেপে জীবাত্মার উপলব্ধির মূলে যে জ্ঞান তা পূর্ণতর জ্ঞান; আর অন্তরাত্মার উপলব্ধির মূলে যে জ্ঞান তা হলো আত্মজ্ঞানের প্রথম ধাপ।

জীবাত্মা আর অন্তরাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Lights on Yoga গ্রন্থের ১০ম পৃষ্ঠায় এ কথাগুলিও বলেছেন: "The true being may be realised in one or both of two aspects —the Self or Atman and the Soul or Antaratman, Psychic being, Chaitya Purusha The difference is that Atman is felt as universal; the other (Psychic being) as individual supporting the mind, life and body, এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে জীবাত্মার উপলব্ধি হলো একটি Universal Consciousness। অন্যত্র Universal Consciousness এর প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ Cosmic Consciousness কথাটি ব্যবহার করেছেন। Universal বা Cosmic Cosciousness বলতে কী বোঝায়? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ৪৮৫ পৃষ্ঠায় Cosmic Consciousness কথাটির এ অর্থ করেছেন: "Spirit knows itself as the self of all, knows all as itself and in itself." অর্থাৎ সাধকের যখন আত্মার উপলব্ধি হয় তখন তিনি নিজেকে সকলের আত্মা বলে জানেন; সকলকে নিজ থেকে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করেন। পক্ষান্তরে সাধকের যখন অন্তরাত্মার উপলব্ধি মাত্র হয় তখন সাধক নিজেকে দেহ প্রাণ মনের অতিরিক্ত এক বিশেষ ব্যক্তি বলে উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ তখনও সাধকের এ উপলব্ধি হয় না যে সর্বভূতে একই আত্মা বিদ্যমান। মোট কথা অন্তরাত্মার উপলব্ধি নিম্নতর উপলব্ধি—মানুষ যে দেহ প্রাণ মনের অতিরিক্ত আত্মা এ উপলব্ধি; আর জীবাত্মার উপলব্ধি হলো উচ্চতর উপলব্ধি, সর্বভূতের সংগে সাধকের ঐক্যানুভূতির উপলব্ধি। একটি উপমা দ্বারা দুই উপলব্ধির ঐক্য ও পার্থক্য বোঝান যায়:

গাঢ় কুয়াশা সূর্যকে একেবারে অদৃশ্য করে রাখে; কুয়াশা একটু হালকা হলে আকাশের স্থান বিশেষ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে; তখন আকাশের ঐ বিশেষ স্থানে সূর্যমণ্ডলের আভাস পাওয়া যায়; সর্ব আকাশে তখনও সূর্যালোক দেখা যায় না কিংবা সূর্যের দীপ্ত রূপের অনুভূতিও তখন হয় না। তারপর কুয়াশা যখন সম্পূর্ণ কাটে তখন আকাশের সর্বত্র একই সূর্যালোক উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সূর্যও প্রকটিত হয়। তেমনি অজ্ঞান—তিমিরাচ্ছন্ন মানুষের নিকট আত্মা সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে—দেহ প্রাণ মনকেই সে তার সব বলে জানে। কিন্তু যখন অন্তরাত্মা জাগে তখন নিজের মধ্যে সাধক অন্তরাত্মার আলো উপলব্ধি করেন; সর্বভূতে যে একই আত্মা বিদ্যমান এ বোধ তখনও দূরে। এ বোধ জন্মে তখন যখন অজ্ঞান দূর হয়, যখন জ্ঞান পূর্ণতর হয়। অর্থাৎ অন্তরাত্মার উপলব্ধি জ্ঞানের প্রথম ধাপ, আর জীবাত্মার উপলব্ধি হয় জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায়। এই দুই উপলব্ধির সংগে সংগে সাধকের জীবনও পরিবর্তিত (transformed) হতে থাকে—সাধক জীবনের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠে থাকেন।

## চৈত্যপুরুষের স্বরূপ ও কাজ

এই চৈত্যপুরুষ বা অন্তরাত্মার স্বরূপ ও তার কাজ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ অনেক কথাই বলেছেন। তিনি বলেন অন্তরাত্মা হলো মানুষের True Conscience; তার কাজ হলো পথ দেখিয়ে সাধককে ভগবানের অভিমুখে নিয়ে যাওয়া। সাধক যে জীবনে সাধু (saint) ও জ্ঞানে ঋষি হয়ে উঠেন তা এই অন্তরাত্মারই জন্যে। শ্রীঅরবিন্দ অন্তরাত্মাকে আবার sun-flower বা সূর্যমুখী ফুলের সংগে তুলনা করেছেন। সূর্যমুখী ফুলের মুখ সব সময়ই সূর্যের দিকে থাকে। তেমনি পরমাত্মার সনাতন অংশ বলে অন্তরাত্মার দৃষ্টি সব সময় পরমাত্মার উপর, সত্য, শিব, সুন্দরের উপর নিবদ্ধ থাকে। তাই অন্তরাত্মা সাধকের অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক True Conscience। কোন কোন সাধক যে জীবনে অন্তরাত্মার নির্দেশে চলাই শ্রেয়: মনে করে থাকেন তার দৃষ্টান্ত গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিস্। সক্রেটিস্ তাঁর পথ প্রদর্শক এক Daemon বা অন্তরদেবতার কথা বলেছেন। সকল সংকটে তাঁর এই daemon সক্রেটিসের পথ নির্দেশ করতেন; এবং এই Daemon-এর নির্দেশ সক্রেটিস্ সানন্দচিত্তে মেনে চলতেন। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে এই অভিযোগ আনা হলো যে, তিনি দেশের যুবকদের ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করেছেন। এ অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড। কথিত আছে সক্রেটিস্ প্রথমে বিচারালয়ে এ অভিযোগের কী উত্তর দেবেন মনে মনে তার আলোচনা করছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর Daemon-এর নিকট নির্দেশ পেলেন: "বিচারালয়ে এ অভিযোগের কী উত্তর দিবে তার আলোচনায় ক্ষান্ত হও।" সক্রেটিস্ তাঁর এ নির্দেশ মেনে নিলেন এবং অভিযোগের উত্তরে কী বলবেন সে আলোচনায় ক্ষান্ত হলেন।

আবার এই অন্তরাত্মাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "A Divine spark of God, the ever pure flame of the Divine, the hidden guide, the inner light or inner voice of the mystic." (The Life Divine P. 207) এই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ক্রমে ক্রমে দীপ্ত হুতাশন হয়ে উঠে; অর্থাৎ সাধনা যত অগ্রসর হতে থাকে অন্তরাত্মার উপলব্ধিও ততই স্ফুটতর হতে থাকে। এই অন্তরাত্মার জ্ঞান Changer, grows and develops from life to life (The Life Divine P. 208)—অর্থাৎ জন্মে জন্মে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দ জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন; গীতায় বলা হয়েছে "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে" (৭-১৯); শ্রীঅরবিন্দও এখানে সেরূপ অভিমতই প্রকাশ করলেন।

## প্রাকৃত মানুষ কেন অন্তরাত্মার খোঁজ রাখে না—

প্রাকৃত মানুষ এই অন্তরাত্মার কোন খবর রাখে না কেন, শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন। তিনি বলেন এ কথা ঠিক যে অন্তরাত্মাই মানবের দেহ প্রাণ মনের ধারক ও আশ্রয়; বস্তুত অন্তরাত্মাকে দেহাদির "রাজা" বলা চলে। কিন্তু এই "রাজা" থাকেন আড়ালে; দেহ প্রাণ মনাদি কোষের আড়ালে, চিত্তের গোপন কুঠরীতে, উপনিষদের ভাষায় "গুহায়াং নিহিতং" হয়ে অন্তরাত্মা অবস্থিত। অন্য কথায় বলা চলে যে দেহ প্রাণ মন অহংকার প্রভৃতি কোষ দ্বারা আচ্ছাদিত বলে অন্তরাত্মা আমাদের নিকট অজ্ঞাত, কিন্তু কখনো কারো কানে কানে অন্তরাত্মার বাণী ধরা পড়ে। তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা On the Intimations of Immortality from Recollections of early childhood.

## Psychic Awakening বা অন্তরাত্মার জাগরণের ফল

অন্তরাত্মা জাগ্রত হলে, অর্থাৎ সাধকের অন্তরাত্মার উপলব্ধি হলে কী হয়? সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: "When one realises the Psychic being (there follows) a sense of union with the Divine and dependence upon it, and sole consecration to the Divine alone." অর্থাৎ তখন সাধকের এ বোধ জন্মে যে ঈশ্বর তাঁর থেকে দূরে নন; তখন সাধক অন্তরাত্মার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁর এ বোধ জন্মে যে অন্তরাত্মাই তাঁর নিয়ন্তা ও পথপ্রদর্শক এবং অন্তরাত্মার নির্দেশেই জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে সাধক তখন কৃতসংকল্প হন। সাধক তখন দিব্যরূপান্তরের সাধনার প্রথম সোপানে আরোহণ করেছেন। তিনি পথ পেয়েছেন; কিন্তু তখনও তাঁর সম্মুখে দীর্ঘ পথ।

## অধ্যাত্ম রূপান্তর বা Spiritual Transformation

দিব্য রূপান্তর সাধনার দ্বিতীয় ধাপ হলো অধ্যাত্ম রূপান্তর। সাধনার এই ধাপে উঠলে সাধকের আত্মার অনুভূতি লাভ হয় এবং এ বোধ জন্মে যে সর্বভূতে একই আত্মা বিদ্যমান—এসব কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। এই অনুভূতির একটি আনুষঙ্গিক ফল এই যে সত্য ও জ্ঞানের আলোতে, শান্তি ও আনন্দে সাধকের আনন্দে জীবন পূর্ণ হয়। এ অবস্থায় দেহে আত্মবুদ্ধিরও অবসান হয়; ফলে দেহের সুখ-দুঃখ আর দেহীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, তখন জীবাত্মার উপমা যেন শুষ্ক নারিকেল। কী অর্থে তিনি এ উপমা দিয়েছেন, তা জানা যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের নিম্ন উদ্ধৃতি থেকে: "নারিকেল জল শুকিয়ে গেলে তার শাঁস খোলা থেকে আলাদা হয়ে যায়। তেমনি আত্মজ্ঞান হলে দেহাত্ম-বুদ্ধি চলে যায়—দেহের সুখ-দুঃখে দেহীর সুখ-দুঃখ বোধ হয় না।" জীবাত্মার অনুভূতির আর একটি ফল হলো এই যে The individual is aware of the eternal being that he is (The Life Divine, p. 792)। ইহা তো "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" মুণ্ডক উপনিষদের (৩-২-৯) ঐ বিখ্যাত কথাটিরই প্রতিধ্বনি।

## শ্রীঅরবিন্দের মতে অধ্যাত্ম রূপান্তরে সাধনার পরিসমাপ্তি নয়

অধ্যাত্ম রূপান্তরে কি সাধনার পরিসমাপ্তি? শ্রীঅরবিন্দ এখানে অধিকাংশ ভারতীয় ঋষিদের সংগে একমত নন। শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বারবার বলা হয়েছে "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" অর্থাৎ যাঁরা আত্মাকে জানেন—আত্মাকে জানা আর পরমাত্মাকে জানা একই কথা—তাঁরা অমৃত হন। তাই ভারতীয় ঋষিদের অনুশাসন "আত্মানং বিদ্ধি"—আত্মাকে জান। কেবল ভারতীয় ঋষিগণ নয় গ্রীস প্রভৃতি দেশেও সাধকগণ 'Know thyself' এই বাক্যটিকে জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে গ্রীসের এক বিখ্যাত মন্দিরের দ্বারে গ্রীক ভাষায়

Know Thyself' কথা দুটি উৎকীর্ণ ছিল। এই ছিল ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের ঋষিগণের সাধনার শেষ লক্ষ্য। ভারতের ঋষিগণ সমাধির সাহায্যে এই আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে এ হলো ব্যক্তিগত মুক্তি, আর এ মুক্তি তাঁর মতে তাঁর Integral মুক্তির আদর্শের একটা নয়। ব্যক্তিগত মুক্তি তাঁর সাধনার লক্ষ্য হলেও চরম লক্ষ্য নয়। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে অধ্যাত্ম রূপান্তরই সাধনার শেষ কথা নয়; সাধনার শেষ ধাপ হলো Supramental Transformation বা অতিমানস রূপান্তর।

### অতিমানস রূপান্তর বা দিব্য-রূপান্তর

দিব্য-রূপান্তর, বা Supramental Transformation, অর্থাৎ এই পৃথিবীই একদিন স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে। শ্রীঅরবিন্দের এই স্বপ্ন তাঁর আগে অন্য কোন যোগী ঋষি দেখেননি। আমরা এই পুস্তকে ( ৭১ পৃষ্ঠায় ) দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের মতে অতীতে super mind তত্ত্ব ভারতে ও অন্য দেশেও কারো কারো কাছে অজ্ঞাত ছিল না; সমাধির সাহায্যে অতীতের সাধকদের কেউ কেউ অতিমানস স্তরে উঠতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, What was missed was the way to make it integral for the life and to bring it down for transformation of the whole nature, even of the physical nature ( The Riddler of this world P. 31 ) অর্থাৎ অতীতের সাধকদের সিদ্ধি integral বা পূর্ণসিদ্ধি ছিল না; কেন না তাঁরা সর্বজীবনের, মন প্রাণ দেহের প্রত্যেকটির পরিবর্তন চাননি। দ্বিতীয়ত super mind বা অতিমানস বিজ্ঞানেই তাঁরা সমাধির সাহায্যে উঠতে চেয়েছিলেন; অতিমানস বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে সর্বজীবনের, এমন কি দেহেরও পরিবর্তন করবার উপায় তাঁদের জানা ছিল না।

পূর্ণসিদ্ধি বলতে শ্রীঅরবিন্দ বোঝেন সংক্ষেপে Transformation of mind, life and body; দ্বিতীয়ত তাঁর মতে অতিমানস বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনার উপায় হলো "descent of the Supramental Divine through self-giving and surrender". অর্থাৎ সাধকের আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের ফলেই কেবল পৃথিবীতে একদিন দেবতার অবতরণ সম্ভব হবে, মানব-দেবমানব হয়ে উঠবে। পরে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের self-giving ও self-surrender কথা দুটির আবার উল্লেখ করতে হবে। দিব্যরূপান্তর সম্বন্ধে যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে এবং পাঠকদের মনে যে সব প্রশ্ন ও সংশয় জাগা সম্ভব এখানে তার একটু উল্লেখ করা দরকার।

### দিব্য-রূপান্তর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

শ্রীঅরবিন্দের আগে কোন যোগীই তো সমগ্র মানুষের, অর্থাৎ মানুষের দেহ-প্রাণ-মন প্রভৃতি সর্ব অঙ্গের কিংবা সমগ্র মানব সমাজের দিব্য-রূপান্তরের কথা বলেন নি। তবে কি শ্রীঅরবিন্দের দিব্য রূপান্তরের স্বপ্ন একটা অবাস্তব জিনিস? এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: "I know with absolute certitude that the supramental is a truth, and that its advent is in the very nature of things inevitable. The question is as to the when and how. ( Sri Aurobindo on Himself and on the mother, p. 233 ), অর্থাৎ একদিন মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, মানব দেব-মানব হয়ে উঠবে। তবে সেদিন কবে আসবে? সে সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। সে ভবিষ্যৎ সুদূর ভবিষ্যতও হতে পারে; কিংবা অনতিদূর ভবিষ্যতও হতে পারে। তবে শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস প্রথম প্রাণী থেকে মানবের স্তরে পৌছুতে যেমন লক্ষ লক্ষ বছর কেটেছে, মানবের পক্ষে দেব-মানবের স্তরে পৌছুতে অত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন না-ও হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগ মানুষের উচ্চতর স্তরে উঠবার ব্যাপারটিকে হয়ত ত্বরান্বিত করবে।

মানবের দিব্য-রূপান্তর স্বপ্ন অবাস্তব না হলেও তার সম্বন্ধে নানা সংশয় ও ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। কী ভাবে পৃথিবীতে দেব-মানব সমাজ গড়ে উঠবে? এক কালে পৃথিবীতে অতিকায় সরীসৃপের যুগ ছিল; আজ তারা সব লুপ্ত। পৃথিবীতে দেব-মানবের আবির্ভাব হলে আজিকার মানুষ কি লোপ পাবে; না, আজিকার মানুষ ও ভাবী দেব-মানব কি একই সময়ে পাশাপাশি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে? কথাটার খুব যে গুরুত্ব আছে, তা নয়, এ হলো অনাগত ও অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা। তবে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, It is the individual who receives the intuition ( The Life Divine, p. 773 )। অর্থাৎ অতিমানস-বিজ্ঞান ব্যক্তি বিশেষই প্রথমে লাভ করবেন; সমগ্র মানব সমাজ একই সময়ে এই জ্ঞানের অধিকারী হবে, এ আশা করা যায় না। আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা সমাজের সম্মুখে নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, সমাজকে ক্রমে ক্রমে উন্নত স্তরে উপনীত করবেন এই কথাটাই যুক্তিযুক্ত। তবে একথা ঠিক যে একদিন পৃথিবী হবে দেব-মানবের বাসভূমি।

অনেকের মনে আবার এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পারে যে পৃথিবীতে অতিমানসের অবতরণের ফলে রাতারাতি ভোজবাজির মত মানুষের আমূল পরিবর্তন ঘটবে—পৃথিবী রাতারাতি স্বর্গ হয়ে উঠবে, পৃথিবীর মানুষ দেবতা হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ একখানা পত্রে বলেছেন: "All that is absurd. The descent of the supramental means that the power will be there in the earth-consciousness as a living force." ঐ পত্রেই তিনি তাঁর এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়েছেন: পৃথিবীর ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন প্রাণী জগতে মানুষের মন-বুদ্ধির আবির্ভাব হলো; কিন্তু তা বলে কি সকল প্রাণীই মানুষের মতন বুদ্ধি লাভ করলো? আর মানুষে মানুষেও কি বুদ্ধির দিক থেকে বিস্তর ব্যবধানে রয়ে গেল না? জ্ঞানী-শিরোমণি সক্রেটিস এবং একজন অসভ্য রেডইণ্ডিয়ান বা আমেরিকার আদিম অধিবাসীর মধ্যে ব্যবধান কী বিপুল! আসল কথা উচ্চতর জ্ঞানের স্তরে উপনীত হতে হলে মানুষকে সেজন্য সাধনার সহায়ে প্রস্তুত হতে হবে। রাতারাতি পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠবে না।

### দেহের দিব্য-রূপান্তর

দিব্য-রূপান্তর প্রসঙ্গে সবচেয়ে দুর্বোধ্য হলো দেহের দিব্য-রূপান্তর কথাটির দ্বারা শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝাতে চেয়েছেন। নানাস্থানে তিনি

এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ৮৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন: The body will be turned by the power of the spiritual consciousness into a true and fit and perfectly responsive instrument of the spirit." অন্যত্র তিনি বলেছেন: "The body will be responsive to the light and able to carry out all that the free mind could demand of it." কথা দুটির অর্থ স্পষ্ট। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে এ কথাটাই অপ্রিয় সত্য যে তার অন্তর যা চায় দেহ তাতে বাধা ঘটায়। কিন্তু অতিমানসের অবতরণের ফলে যে মানুষ মুক্ত হবেন, তাঁর দেহ ও অন্তরের মধ্যে এ বিরোধ থাকবে না—তাঁর দেহ তাঁর মনের একটি উপযুক্ত ও আজ্ঞাবহ যন্ত্র হয়ে উঠবে।

শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত কথার অর্থ স্পষ্ট; কিন্তু মানব দেহের রূপান্তর ঠিক যে কী হবে তা তো জানা গেল না। এ প্রসঙ্গে দৈহিক অমরতা ও মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বিভিন্ন স্থানে যা বলেছেন তার একটু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: Science itself begins to dream of the physical conquest of death." অর্থাৎ আজ বিজ্ঞান দৈহিক অমরতার স্বপ্ন দেখছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের আয়ুসীমা অনেক বেড়েছে এবং আরো বাড়বে। কিন্তু অতি উৎসাহী বৈজ্ঞানিক যা-ই বলুন না কেন, বিজ্ঞান যে একদিন সত্যি-সত্যিই মৃত্যুকে জয় করবে, এই পৃথিবীতেই মানুষ শুধু বিজ্ঞানের কল্যাণে (অতিমানসের অবতরণের ফলে নয়) দৈহিক অমরতা লাভ করবে, বিজ্ঞানের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি? ভবিষ্যদ্বাণী করবার দরকার নেই। অন্য কারণেও এরূপ দৈহিক অমরতার স্বপ্ন যে অবাস্তব অন্তত অনাবশ্যক শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকেই তা দেখানো যায়।

শ্রীঅরবিন্দের মতে বিশ্বের বিধানে মৃত্যুর একটা স্থানও প্রয়োজন রয়েছে। আমরা দেখি মৃত্যুর ভিতর দিয়েই নবজীবনের সূচনা হয়—বীজ বিনষ্ট হয়ে গাছের জন্ম দেয়। আর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর অভিমত নিম্নলিখিত ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন: "The material or physical causes of death are not its sole or true cause; its true and inmost reason is the spiritual necessity for the evolution of a new being." (The Life Divine, p. 732). অর্থাৎ মৃত্যু কেন ঘটে থাকে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে মৃত্যুর দৈহিক কারণগুলিই মৃত্যুর একমাত্র বা প্রকৃত কারণ নয়; মৃত্যু ঘটে থাকে এজন্যে যে নইলে নবজীবনের উন্মেষ সম্ভব হয় না। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে বলা হয়েছে "বহুনাম জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" অর্থাৎ বহু জন্মের পর জ্ঞানলাভ করে মানুষ ভগবানকে লাভ করে। দিব্য-জীবনের পথে বার বার মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করতে হয়। এ জন্যেই বিশ্বের বিধানে মৃত্যুর স্থানও প্রয়োজন।

কিন্তু অতিমানসের অবতরণের ফলে দেহের কী পরিবর্তন ঘটবে তা এখনও বলা হয়নি; এবং স্পষ্ট করে কোথাও শ্রীঅরবিন্দ বলতে পারেন নি, কিংবা বলতে চান নি। কেন তা আমরা দেখবো। একস্থানে তিনি যা বলেছেন তা এই: "Even body, if it can bear the touch of super mind, will become more aware of its own truth—will gain an occult knowledge of body cells and tissues which may one day become conscious and contribute to the transformation of the physical being. মানব দেহ লক্ষ লক্ষ কোষের সমষ্টি। সে কোষগুলির প্রত্যেকটি জীবন্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণাগারে দেহ থেকে কিয়ৎসংখ্যক কোষ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, জীবন্ত কোষগুলির জৈবক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যাদির ব্যবস্থা করে বছরের পর বছর অনির্দিষ্ট-কালের জন্য কোষগুলিকে জীবিত রাখতে সক্ষম হয়েছেন; এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোষগুলির বংশবৃদ্ধিও হয়েছে। এ পরীক্ষিত সত্য; এবং এর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অতিমানস অবতরণের ফলে একদিন কোষগুলি কেবল জীবন্ত না থেকে সচেতনও হয়ে উঠতে পারে—একথাটাকে শ্রীঅরবিন্দ সম্ভব মনে করেন। তাঁর উপরোক্ত উদ্ধৃতির এই মর্ম। কথাটাকে তিনি একটা সুনিশ্চিত ব্যাপার না বলে একটা সম্ভবপর ব্যাপার বলে বর্ণনা করেছেন।

আসল কথা, অতিমানসের অবতরণ এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা। তার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা যে সম্ভব নয়, তা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "জগন্নাথের রথ" প্রবন্ধে বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে জগন্নাথের রথ যেদিন জগতের রাস্তায় বের হবে, অর্থাৎ অতিমানসের অবতরণ পৃথিবীতে সত্যই ঘটবে সেদিন পৃথিবীর বক্ষে সত্যযুগ নামবে। কিন্তু "জগন্নাথের রথে"র প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেউ জানে না; কোন জীবন-শিল্পী আঁকিতে সমর্থ নয়। তাই অতিমানসের অবতরণের ফল কী হবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অবাস্তব ও অনাবশ্যক। এ কথাটা তাঁর ১৯৪১ সনের একখানা চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। তাঁর কথা: "My speculations about an extreme form of divinisation (অর্থাৎ দিব্যরূপান্তর) are something in a far distance and are no part of preoccupations of the spiritual life in the near future." (Sri Aurobinda On Himself And On The Mother p. 286).

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অপর একখানা পত্র থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি আমরা তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করতে পারি। উদ্ধৃতিটি এই: "In a supramental world imperfection and disharmony are bound to disappear. * * * But what, how, by what degree it will do it is a thing that ought not to be said now—when the light is there, the light itself will do its work. It will establish a perfection, a harmony. * * *—for the rest, well, it will be the rest—that is all." (Letter p. 51, Sri Aurobinda Circle—Third number)

একদিন যে মর্ত্যে অতিমানসের অবতরণ ঘটবে এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ নিঃসন্দেহ। অতিমানসের অবতরণের ফলে পৃথিবীর দিব্য রূপান্তর যে ঘটবে তা-ও নিঃসন্দেহ। তবে কী ভাবে, কখন তা ঘটবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা নিরর্থক। তা না করে দিব্যজীবনের পথে চলতে ইচ্ছুক সাধকের সম্মুখে শ্রীঅরবিন্দ যে কর্মের আদর্শ স্থাপন করেছেন তার আলোচনাই শ্রেয়স্তর। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ এক মহামূল্যবান অবদান। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা তার আলোচনা করবো।

প্রশান্ত চৌধুরী

১৯

গঙ্গার ধারের অঞ্চলটার মানুষগুলোর দিনরাত্রি গড়িয়ে চলে একই তালে, একই ভঙ্গিতে। বাইধর শতপথি তার তেলচিটে বাক্সের উপর ব'সে স্নানসারা মানুষের কপালে চন্দনের ছাপ দেয় ;—পুণ্যলোভাতুরেরা আবক্ষ গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে সূর্যদেবকে নমস্কার জানায় ;—কুস্তিগীরেরা ভোরবেলা ডনবৈঠক দেয় ;—চিত্রগুপ্তবাবু রেলিঙ ঘেরা ঘরের মধ্যে ব'সে জাবদাখাতায় চিরনিদ্রাভিভূত মানুষগুলোর নাম-ধাম লেখেন ;—ঠানদি তার দোকানঘরের খুপরির মধ্যে ব'সে কেনাবেচা করে আর অতীত হাতড়ায়, ;—রাজীব সরকার ষ্টিমারঘাটের টিকিটঘর থেকে পারাপারের টিকিট দেয় আর, জীবনের সব দুঃখকষ্ট'ক তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে ;—ক্যামেরাবাবু দুলাল সাহা শবদেহের ফোটো তুলে সংসার চালান ;—কালী পাগলা মড়ার খাটের ফুলের মালা গলায় দিয়ে মালগাড়ির লাইনে ব'সে চেঁচায়,—'বৌ কই ? বৌ কই আমার' ;—বুড়ো বিরুয়া ডোম সন্ধ্যেবেলা তাড়ি খেয়ে বুক ফুলিয়ে গল্প করে কত বিখ্যাত মানুষের চিতা সাজিয়েছে সে এই শ্মশানে ;—চুণীলাল বিশ্রামভবনের সামনের রাস্তায় ডালা সাজিয়ে পুজোর ফুল আর এলাচদানা বিক্রি করে ;—শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দিরের জটাধর সাধু মৌজসে ছিলিম চড়ায়,—কাঠের দোকানের ছোকরা মালিক ঘি-আতপচাল-কড়ি নতুন কাপড়ের টুকরো দিয়ে সরা সাজিয়ে রাখে খদ্দেরদের জন্যে, আর ছোকরা বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমার ষ্টারদের গল্প করে ;—রাতজাগা বস্তির হতভাগিনী মেয়েগুলো মেয়েদের ঘাটে চান সেরে ফেরবার পথে শ্মশানের মধ্যে উঁকি দিয়ে মড়া দেখে যায় ;—গোড়েন ঘাটে খড়ের নৌকা এসে লাগল ;—মাঝিরা নৌকার মধ্যে জ্বলন্ত উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে গান গায় ;—ভূতনাথ আর চিনিবাসের মতো দিন-ভিখিরিরা গঙ্গার ঢালু তটে ভিক্ষের চাল সেদ্ধ করতে দিয়ে পেটে হাত বুলোয় ;—মড়িপোড়া বামুন তারাচরণ শর্মা জটাউলী বুড়ির চ্যাটাই-মোড়া ঘরের মধ্যে গাঁজা টানে ;—খাবারের দোকানের কারিগরগুলো কচুরি লুচি ভাজতে ভাজতে হিমসিম খায় ;—নিষ্কর্মা বাউণ্ডুলের দল রুক্ষ চুলে খড়িওঠা গায়ে চানের ঘাটের একধারে ব'সে ছোট কল্‌কেয় দম দেয় ;—শ্মশানের চুল্লির ধোঁয়ায় আকাশের চোখ জ্বালা করে ;—ছোটবড়ো অগুন্তি মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে আকাশের কানে তালা ধরে যায় ;—আর এরই ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে ফেলে এ-অঞ্চলে সকাল আসে, সন্ধ্যা হয়।

সেদিন সন্ধ্যা নেমে আসেনি তখনও। পশ্চিমের সূর্য তখনও ওপারের নতুন মন্দিরটার চুড়োর কাছে ঝক্‌মক্ করছে। পেন্‌সনার বুড়োদের জটলা বসেনি তখনও গঙ্গার ধারে। ঠেলাগাড়ির যে দুটো কুলি দুপুরে চান সেরে ভিজে-কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে গামছা জড়িয়ে ঘুম দিয়েছিল ঘাটের চাতালে শুয়ে, তাদের কাপড় শুকিয়ে খড়মড়ে হয়ে গেলেও ঘুম থেকে ওঠেনি তারা তখনও। এমনি সময়টাতে ঠানদি হঠাৎ কী মনে করে তার ছোট্ট দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল পথে।

চলতে ফিরতে আজকাল একটু কষ্ট হয় ঠানদির। সকালের গঙ্গাস্নানেও ছেদ পড়ে যায় একেকদিন। কোমরটা বেঁকেছে। চোখেও কম দেখছে আজকাল। তবু সেই নড়বড়ে শরীরটাকে নিয়ে ঠুকঠুক করে হেঁটে চলল ঠানদি বড় ঠাকুরের মন্দিরের দিকে।

ঠানদির পক্ষে পথটা অনেকখানিই। মাঝপথে তাই জগন্নাথের মন্দিরের চাতালে ব'সে জিরিয়ে নিতে হল কিছুক্ষণ। তারপর আঁচল থেকে একটুখানি দোক্তাপাতা নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে আবার চলতে সুরু করল ঠানদি; তারপর একসময় মুরারিমোহনের শনিঠাকুরের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মুরারিমোহন ছিল না তখন মন্দিরে। একটু আগেও মন্দিরের চাতালে ব'সে গল্প করছিল রাজীব সরকারের সঙ্গে। আজ আবার সন্ধ্যের সময় মিসেস রায়ের ঘরে গিয়ে তাঁর ঘর-বন্ধন করে দিতে হবে। সঙ্গে গিয়ে ব্যাপার-স্যাপার সব দেখবার ভারি সখ রাজীবের। তাই সেজেগুজে হাজির হয়েছিল এসে। ঘর-বন্ধনের ব্যাপার নিয়েই গল্পগুজব চলছিল দুজনের,—হঠাৎ পেটটার মোচড় দিয়ে উঠতে

রাজীবকে বসিয়ে রেখে বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে গেছে। রাজীব একলা ব'সে অশ্বত্থগাছের নিচে পাঁপড় বেলার কসরৎ দেখছিল, ঠানদিকে দেখতে পেয়ে বলল,—আরে! ঠানদি যে!

হাঁপাচ্ছে ঠানদি। পরিশ্রম হয়েছে। বলল,—মুরারি দাদা কোথায় গো রাজীব দাদা?

রাজীব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ঠানদি বুড়িকে ধরে বসিয়ে দিতে দিতে বলল,—বাড়ি গেছে। কাল কোন্ বিয়েবাড়িতে গণ্ডে-পিণ্ডে গিলে পেট নামিয়েছে। তা'তুমি হঠাৎ এ-পাড়ায় কেন গো?

—একটু দরকার ছিল মুরারিদাদার সঙ্গে।

—তা' শ্যামাঠাকুর কিংবা আর কাউকে পাঠালেই তো পারতে। এমনি করে রাস্তায় মুখ থবড়ে পড়ে মরবে নাকি শেষকালে?

—শ্যামাঠাকুর কখনো রাজি হয় এখানে আসতে?

—কেন? রাজি না হবার কী আছে?

—এক মন্দিরের পুরুৎ হয়ে আরেক মন্দিরের কবচ চাইতে তার মন সরবে কেন? তার একটা মান-সম্মান আছে তো।

—এই মরেছে। তোমাকেও কবচে ধরেছে? এ-বয়েসে আবার কবচ নিয়ে কী করবে গো? পরমায়ু বাড়াতে চাও নাকি?

—ষাট বালাই! আরো পরমায়ু? তাড়াতাড়ি যাবার কিছু থাকে তো দে দাদা, চলে গিয়ে হাড় জুড়োই। অনেক দেখেছি রে দাদা;—আর ভাল লাগছে না। সব কেমন ফ্যাস্‌কা-ফ্যাসকা লাগছে?

—তবে আবার কবচ কেন? দোকানের খদ্দের বাড়াতে চাও?

—নিকুচি করেছে খদ্দেরের।

—তবে?

—একটা মেয়ের জন্যে কবচ চাইতে এসেছি দাদা। সে আমার নাতনি হয়।

—নাতি-নাতনির তো আর তোমার লেখাজোখা নেই গো ঠানদি। অগুনতি নাতি-নাতনি তোমার। এটি তার মধ্যে কোনটি গো?

—চাপা তার নাম।

—নামটি তো মিষ্টি বেশ।

—মেয়েটাও।

—থাকে কোথায়?

—ঐ তো। ঐ যে জলের কলটা?

—হ্যাঁ।

—ঐ কলের গায়ের ঐ দোতলার ঘরটায় থাকে।

—তা' কবচ কী হবে?

—মেয়েটা যাতে সুখে থাকে,—ও' যা হতে চায়, তাই যেন ও' হতে পারে,—তারই জন্যে। তুই জানিস না দাদা, বড় অভাগী ঐ মেয়েটা। আজ কতকাল হতে চলল, বিছানায় শুয়ে আছে ওর মা-টা। ঐ বিছানা ছেড়ে ওঠা আর এ-জন্মে হবে না ওর। তার জন্যে ভাবি না। মরলেই বাঁচে সে। হাড় জুড়োয়।

—অসুখটা কী?

—কী আর বলব তোকে দাদা। যে-খারাপ অসুখে রাত-জাগা বস্তির মেয়েগুলো ভুগে ভুগে মরে,—সেই ব্যাধি। মেয়েটার বরাত

কেমন ভাখো,—জন্মাল কাঁটাপুকুরের ময়রাদের ঘরে, বাস করতে হল কিন্তু হতভাগা বস্তিতে।

হাসপাতালে সোহাগী জন্মাল কেমন করে,—কেমন করে কুসুমের মেয়েটা মরে যেতে দাইকে দিয়ে মেয়ে বদল করে নিলে কুসুম,—সব কথা শোনাল ঠানদি রাজীবকে। তারপর বলল,—নিজে আর ফিরে যাবার পথ পেল না বলে ঐ সোহাগী তার মেয়ে চাঁপাকে আবার ফিরিয়ে দিতে চায় ভদ্দরলোকের ঘরে। মেয়েটা লেখাপড়া শিখবে, ভদ্দর হবে;—হাসপাতালের নার্স কিংবা ইস্কুলের মাষ্টারনী কিংবা কোনো ভদ্দরলোকের ছেলের বৌ হয়ে তার সংসার দেখবে,—এই ওর সাধ। আর এই দেখবার আশাতেই সোহাগী ওর প্রাণটাকে ধুকধুক করেও জিইয়ে রেখেছে এখনও পর্যন্ত। তা' নাহলে এতদিনে কবে ওর মরে যাওয়ার কথা।

—হুঁ। বুঝলুম। কিন্তু তার সঙ্গে কবচের কী সম্পর্ক?

—চারিদিকে কী আগুন নিয়ে তার মধ্যে ঐ মা-বেটিতে বাস করছে বুঝতেই তো পারছ দাদা তোমরা।

—তা তো পারছি।

—সেই আগুনে মেয়েটাকেও যেন পুড়তে না হয়,—চাঁপাটা যেন ঐ আগুন পেরিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে,—তারই জন্তে একটা রক্ষাকবচ চাইতে এসেছি মুরারিদাদার কাছে। শুনেছি, বড়ঠাকুরের কবচ হাতে বাঁধলে নাকি—

—গুষ্টির পিণ্ডি হয়।

—মন্দিরে ব'সে অমন কথা বলিসনি দাদা। বড় রাগী লোক বড়ঠাকুর। শাস্ত্রে আছে নিজের ভায়ের মুণ্ডু উড়ে গেছল ওঁর দৃষ্টিতে।

—প্রহ্লাদের উপাখ্যানটা জানা আছে তোমার ঠানদি?

—ও বাবা! তা' আর জানিনে। চণ্ডীপাঠকের কথকতার আসরে রোজ প্রেতিদিন যেতুম যে।

—হিরণ্যকশিপু যখন জিজ্ঞেস করল যে, 'তোর ভগবান কোথায় থাকে?'—তখন কী বলেছিল প্রহ্লাদ?

—পেল্লাদ বলেছিল,—সব্ব এস্থানেই তাঁর অবস্থিতু। জলে ডাঙায় ধুলোয় কাদায় বিক্ষে পত্রে ফুলে ফলে, সকল জায়গাতেই তিনি আছেন। চোখে দেখা যায় না, তবু আছেন।

—ঠিক যেমন হাওয়া। কি বল?

—ঠিক বলেছিস দাদা। ঠিক যেন হাওয়া।

—তা' ঠানদি গো, হাওয়া পাবার জন্তে কী করতে হয় তোমাকে? হাত জোড় করে ফুল-বেলপাতা দিয়ে অং বং করে তার স্তব করতে হয়, না ঘরের জানলাটা খুলে দিলেই হাওয়া আপনি এসে ঢোকে? শনিমহারাজ কি ঘুষ-খাওয়া কাজী যে, কবচের ঘুষ দিলেই মামলায় জিতিয়ে দেবে, আর কবচ হাতে না বাঁধলেই তার ভিটেমাটি চাটি করে ভিটেয় ঘুঘু চরাবে! শনিমহারাজকে যদি দেবতা বলেই মানছ, তাহলে তাঁকে এমন ছোট ভাবছ কেন ঠানদি?

রাজীবের কথাগুলো শুনতে শুনতে অনেকদিন আগেকার একটা মানুষের কথা মনে পড়ে যেতে লাগল ঠানদির। গঙ্গার ধার থেকে পুবমুখো সোজা হাঁটলে টেরাম-রাস্তার ও-ধারে যে শালকাঠের গোলাটা, আছে, তারই ধারে ছিল মানুষটার হোমিওপ্যাথিক্ ওষুধের দোকান। অধর ডাক্তার ছিল তার নাম। ছোট ছোট সাদা চুলে ফর্সা মাথাটা যেন কদমফুলের মতন দেখাত। দয়ায় মায়ায় সেবায় অমন একটা সাঁচ্চা মানুষ ঠানদি ভাখেনি আর। সেই মানুষটাও বলত এই একই কথা। বলত,—আপিসের বড় সাহেবদের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে তোদের এমন স্বভাব হয়েছে যে, দেবতার পায়ে তেল দিয়ে কাজ গুছোতে চাস হতভাগারা?

রাজীব বলল,—ভাবছ কি ঠানদি। বাড়ি যাও। ওই কবচ বাঁধার বোকামী আর কোর না বাপু।

—কবচ তাহলে নেব না বলছিস রাজীবদাদা?

—না গো। নেবে না। হেঁটে-কেঁটে যেও না, একটা রিক্সা ভাড়া করে গুটি গুটি দোকানমুখো এগোও দিকিনি। দাঁড়াও, একটা রিক্সা ডেকে দিই।

—না দাদা, রিক্সা-ফিক্সা ডাকিসনি। লোকে দেখলে বলবে কী? বলবে, বুড়ি বড়মানুষ হয়েছে। ও আমি পারব না বাপু। আমি ঠুকঠুক করে ঠিক চলে যাব।

—তারপর অন্ধকারে পড়বে যখন ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে, তখন কে সেবা করবে তোমার?

—তোরা করবি।

—দায় পড়েছে।

ঠানদির শত আপত্তি সত্ত্বেও রাজীব একটা রিক্সা ডেকে জোর করে তুলে দিলে ঠানদিকে। রিক্সার সামনের পর্দাটা ফেলে দিয়ে লজ্জায় গুটিয়ে-সুটিয়ে বসল ঠানদি। রিক্সা চলতে লাগল ঠুং-ঠুং করে।

সে কতকাল আগে।...

বাবুঘাটের ধারে যে রাস্তা, গঙ্গার ধার ধরে ধরে সেই রাস্তা দিয়ে ল্যাণ্ডো গাড়ি হাঁকিয়ে কতদিন বিকেলে হাওয়া খেয়ে বেড়িয়েছে ঠানদি। পাশে থাকত শোভানবাবু। শীতকালের বিকেলে পায়ের ওপর কল্কাদার পশমী শাল চাপিয়ে বসতেন শোভানবাবু মেনকাকে পাশে নিয়ে। ঘোড়ার লাগাম তুলে দিতেন মেনকার হাতে। বলতেন,—হাঁকাও দেখি।...

রাস্তা দিয়ে পল্টনের গোরারা হেঁটে বেড়াত হাতে ছোট লাঠি নিয়ে। শিস দিত তারা ফুর্তিতে। ফিরিঙ্গি মেয়েদের নিয়ে হাসাহাসি করত। জাহাজঘাটায় বিলিতি মানোয়ারী জাহাজে ইংরেজ-সরকারের ফ্ল্যাগ উড়ত পতপত করে।...

সেই মেনকা আজ ঠানদি হয়ে গুটিয়ে-সুটিয়ে পর্দা ঢাকা দিয়েও রিক্সায় চেপে যেতে লজ্জায় মরছে।

ঠানদির রিক্সাটা চোখের আড়াল হয়ে যেতেই বিড়ি ধরিয়ে ফেলল একটা রাজীব। তারপর চুপচাপ বসে বসে হাঁটু নাচাতে লাগল।

মুরারিমোহন এসে পড়ল একটু পরেই। রাজীব বলল—তোমার একটা ক্ষতি করে দিয়েছি ভাই।

—কী?

—একটা খদ্দের ভাগিয়েছি।

—ধ্যাৎ।

—সত্যি। ঐ শ্মশানের ধারের ঠানদিকে চেন তো?

—খুব।

—একটা কবচ নিতে এসেছিল। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদেয় করে দিয়েছি।

—বড় কাজ করেছ। দাও বিড়ি দাও একটা। নিজেই টানছে।

রাজীব বিড়ি বের করে দিল। রাজীবের বিড়ির আগুন থেকে বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল মুরারি। ঠিক এমনি সময় ক্ষেতচষা ট্রাকটরের মতন বিদিকিচ্ছিরি শব্দ করতে করতে সেদিনের সেই হুডওলা মান্ধাতার আমলের ঝড়ঝড়ে ফোর্ড গাড়িটা এসে দাঁড়াল শনিমন্দিরের সুমুখে। গাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন সেদিনের সেই মানুষটি,—মাথার আর গোঁফের চুলের পাক দেওয়ার কায়দায় সাবেকি কলকাতাকে যিনি ধরে রেখেছেন নিজের মুখটুকুর মধ্যে।

ফোর্ডগাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজটা যদি বা থামল, সুরু হল ফোর্ডগাড়ির মালিকের ইঞ্জিনের আওয়াজ!

—বলি, কোথায়, কোথায়? সেই বুজরুকটা কোথায়? য়্যাঁ? এই যে। পা নাচিয়ে সিগ্রেট ফোঁকা হচ্ছে। য়্যাঁ!—বলি চারিদিকে ঢাক পিটিয়ে পাবলিসিটি তো খুব হচ্ছে, এদিকে আমার যে অতগুলো টাকা জলে গেল, তার গুণগার কে দেবে শুনি? য়্যাঁ?—বলে কি না ইংরিজি 'জি' কিংবা 'জে' দিয়ে যে-ঘোড়ার নাম, সেই ঘোড়া ধরলে সিওর উইন্! আমি শালা যে-প্লেটে যতগুলো 'জে' আর 'জি' দিয়ে ঘোড়া ছিল, সবগুলোর পেছনে এক কাঁড়ি টাকার বেট্ ধরলুম। শালা এক ব্যাটাও প্লেসে এল না? ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি? লোক ঠকানোর ব্যবসা ফেঁদেছো? য়্যাঁ!—আমার পিসতুত ভায়রাভাই লালবাজারে কাজ করে। দেখে নেব তোমাকে।

মুরারি বলল,—হ্যাঁ হ্যাঁ, সকলেই সব করবে।

তেড়ে ফুঁড়ে লাফিয়ে উঠলেন এবার ভদ্রলোক,—কী? এতবড় কথা। নিজে বুজরুকি ধাপ্পা মেরে আবার আমারই ওপর চোটপাট? য়্যাঁ?—ঠিক আছে, বুঝিয়ে দেব মজাটা। আমার নাম—

নামটা বলবার আগেই মুরারিমোহনকে এক ধমক দিয়ে রাজীব অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে হাত জোড় করে বলল,—আমার ভাইটি একটু মাথা-গরম মানুষ, ওর কথা ধর্তব্যের মধ্যেই আনবেন না। কী হয়েছে আমাকে যদি বলেন একটু দয়া করে—.

—ওঃ, আপনি বুঝি বড় ভাই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেদিন এসেছিলুম,—ওঃ হো, আপনিও তো ছিলেন সেদিন এখানে।

—ছিলুম।

—তবে আবার ন্যাকামী করা হচ্ছে কেন শুনি? য়্যাঁ?

—'জে' বা 'জি' দিয়ে নামওলা ঘোড়া ধরেও আপনি বাজি হেরে গেছেন কেন, এই তো আপনার নালিশ?

—হ্যাঁ।

—অমন হয়েই থাকে।

—হয়ে থাকে মানে?

—নীলা ধারণ করেছেন কখনো?

—করেছি।

—ফল পেয়েছেন?

—পেয়েছি। ভাঁহা হায়ের মামলায় জিতে গেছি।

—আবার এমন অনেকে আছেন, নীলা যাদের সয়নি। যা করতে গেছেন, ঠিক তার উল্টোটি হয়েছে। এই যেমন ধরুন আমাদের গ্রামের নিবারণবাবুর কেসটা।

—গল্প শুনতে আসিনি। আমি একটা হেস্তনেস্ত করতে এসেছি।

রাজীব শান্ত কণ্ঠে বলল,—গল্প নয়, সত্য ঘটনা। মর্মান্তিক করুণ এক সত্য ঘটনা। গল্পটা শুনুন। শোনবার পরেও যদি আপনার কিছু বলবার থাকে বলবেন, আমরা ঘাড় হেঁট করে অপরাধ স্বীকার করে নেব।

—সটকাটে সারতে হবে। সময় নেই।

রাজীব বলল,—নিশ্চয়ই। যথা সম্ভব সংক্ষেপেই সারব। মুরারি ততক্ষণ মহাশয়ের জন্যে একটু ভাল চায়ের জোগাড় করো দিকিনি। কই, পা-টা গুটিয়ে ভাল করে বসুন দিকিনি মশাই।

মুরারি চলে গেল। ভদ্রলোকটি বসলেন পা-গুটিয়ে। রাজীব সুরু করল,—বড় পয়সাওলা লোক ছিলেন নিবারণবাবু, বুঝলেন। ঝি-চাকর, দরোয়ান-খানসামা, বাড়ি-গাড়ি, স্ত্রীপুত্র-পরিবার নিয়ে দিব্যি সুখে ঘরকন্না করছিলেন, হঠাৎ ঘাড়ে ভূত চাপল, বড়সড় দেখে একটা নীলার আংটি কিনতে হবে।

—কিনলে?

—হ্যাঁ, কিনলেন; কিন্তু কপালে সইল না।

—কি হল?

—সর্বনাশের ওপর সর্বনাশ। বড় ছেলেটা বাপের অমতে একটা অসবর্ণ মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তুলল,—মেজ ছেলেটা বাপের ব্যবসাতে না ঢুকে কবিতা লিখতে সুরু করল, ছোট ছেলেটা তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করল!—এ সমস্ত আঘাত যদিও বা ভদ্রলোক সহ্য করেছিলেন, সবচেয়ে শেষের আঘাতটায় একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি। ঠিক করলেন, এ বিড়ম্বনাময় জীবন আর রাখবেন না।

—শেষের আঘাতটা কী?

—স্ত্রীর সঙ্গে কলহ।

—ব্যস্, তাইতেই?

—তাইতেই মানে? স্ত্রীর সঙ্গে কলহটা কি বড় সোজা আঘাত নাকি?

—বেশ। কী হল তারপর?

—নিবারণবাবু ঠিক করলেন, পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করবেন।

—করলেন?

—হ্যাঁ। করতে গেলেন। হাতে তখনও রয়েছে সেই নীলার আংটি। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। ওপারের বাঁশঝাড় থেকে ঝিঁঝি পোকার একটানা শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। নিবারণবাবু পুকুরঘাটে এসে দাঁড়ালেন। মাথার ওপরকার কোটি কোটি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেললেন। বললেন,—'হে তারায়-ভরা আকাশ, হে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ, তোমাদের কাছ থেকে আজ আমি চিরবিদায় নিচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মানুষ কষ্ট পায়, কাঁদে;—আমি কিন্তু হাসিমুখেই বিদায় নিচ্ছি। এ-সংসার আমার কাছে অসহ্য। আমি মরতে পারলেই বাঁচি।' এই বলে নিবারণবাবু একটি একটি করে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন, আর একটু একটু করে পুকুরের জল উঠতে লাগল তাঁর পা থেকে হাঁটু, হাঁটু থেকে কোমর, কোমর থেকে

বুক পর্যন্ত! ··নিবারণবাবু তারপরেও নামতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে। জল আবার উঠতে লাগল,—বুক থেকে গলা, গলা থেকে চিবুক, চিবুক থেকে নাকের ডগা, নাকের ডগা থেকে···তার পর কী হল বলুন দিকি?

—কি জানি।

—লোকটার আত্মহত্যা করা হল না।

—যাক্!

ভদ্রলোকটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন যেন।

রাজীব এবার খিঁচিয়েই উঠল প্রায়,···যাক্ মানে? আত্মহত্যা করতে পারলে যে-মানুষটা বেঁচে যায়,—আত্মহত্যায় ফেলিওর হয়ে তার বেঁচে থাকাটা যে কী কষ্টকর বুঝতে পারছেন?

—এখন পারছি। কিন্তু লোকটার ডুবে মরা হল না কেন?

—ঐ নীলার আংটি। ঐ নীলাই দিল না ডুবতে।

—তার মানে?

—নাক ছাড়িয়ে জল যেমনি চোখের কাছ অবধি পৌঁচেছে, অমনি হঠাৎ নিবারণবাবুর মনে পড়ে গেল যে তিনি সাঁতার জানেন। ব্যস্, তক্ষুণি হাত পা ছুঁড়ে সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে এসে হাজির। বুঝুন একবার নীলার কাণ্ডটা। ঠিক চরম-মুহূর্তে কি না মনে করিয়ে দিলে যে নিবারণবাবু সাঁতার জানেন! ভদ্রলোক পুকুরে ডুবেও যে শান্তি পাবেন একটু। সেটুকু পর্য্যন্ত হতে দিলে না!

ভদ্রলোক কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গিয়ে শুধু বললেন,—হুঁ।

রাজীব বলল,—তবেই দেখুন, যে নীলা কাউকে লাখপতি করে, সেই নীলাই আবার কাউকে ভিখিরি করে দেয়। নীলা যে স্যাকরা দিয়েছে, তাকে দোষ দিয়ে তো আর লাভ নেই কিছু। আসল কথা হল, সব জিনিস সকলের সহ্য হয় না। ঘোড়দৌড়টা আপনার সইছে না। দোষটা মুরারিভায়ার নয়, আপনার ধাতের। তা' নাহলে নির্ঘাৎ ফল দিত।

—ঘোড়দৌড়টা আমার ধাতে সইবে না বলছেন?

—দেখতেই পেলেন। তা নাহলে অমন জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদী ফুলের নাম পেয়েও কি না হেরে এলেন?

—যা বলেছেন। এ পর্যন্ত রেসের মাঠে যত পেয়েছি, তার পঞ্চাশগুণ দিয়ে এসেছি।

—ওটি ত্যাগ করুন।

—একেবারে?

—একেবারে। ও-মাঠের দিক মাড়াবেন না আর। বরং এক কাজ করুন।

—বলুন।

—সংসারে নতুন কোন মানুষ জন্ম নিয়েছে হালফিল?

—একটি নাতি হয়েছে। আর দিন পনের বাদে তার অন্নপ্রাশন।

—ব্যস্, ঐ 'জি' কিংবা 'জ' দিয়ে সেই নাতির নাম রাখুন গিয়ে। দেখবেন, ঐ নাতিই আপনার সংসারে আনন্দের বাণ ডাকিয়ে দেবে একেবারে।

—ঠিক হবে বলছেন?

—হতেই হবে। জাগ্রত ঠাকুরের ফুল। ইয়ার্কি-ঠাট্টা তো আর নয়।

বলেই নিজের কান মলে ঢিপ করে একটা পেন্নাম ঠুকে ফেলল রাজীব। দেখাদেখি ভদ্রলোকটিও ভক্তিভরে তিন-চারটে পেন্নাম ঠুকে হাত পেতে বললেন,—চরণামৃত্তর একটু।

রাজীব তাম্রকুণ্ড থেকে একটুখানি চরণামৃত ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলল,—এই যে।

শনিমহারাজের চরণামৃত পান ক'রে এবং বুকে মাথায় ঠেকিয়ে উঠে পড়লেন ভদ্রলোক। বললেন,—চলি। না বুঝে যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, ক্ষমা করে নেবেন। চলি তাহলে এখন।

রাজীব বলল,—আসুন। তবে রেসের মাঠে আর যেন খবরদার নয়।

গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করতে করতে ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন,—এ জীবনে আর নয়, বাব্‌বা!

ক্ষেতচষা ট্র্যাকটরের বিকট আওয়াজ তুলে মান্ধাতার আমলের সেই মোটরগাড়িটা ফিরে চলে গেল আবার।

একটু পরেই চায়ের দোকানের ছোকরাটাকে সঙ্গে নিয়ে মুরারিমোহন ফিরে আসতেই রাজীব বলল,—কিছুক্ষণ আগে যেমন তোমার একটা খদ্দের ভাগিয়েছিলুম,—এখন তেমনি তোমার বেঁকে-যাওয়া একটা খদ্দেরকে পিটিয়ে সিধে করে দিয়েছি ভায়া,—শোধবোধ হয়ে গেল।

মুরারি বলল,—কী বলে ভাগালে লোকটাকে?

রাজীব বলল,—সে অনেক গল্প। কিন্তু এবার আমাদের সেই মিস রায়ের আস্তানার দিকে যেতে হবে না? সূর্য তো অনেকক্ষণ ডুবে গেছে।

সূর্য অস্ত যাবার পর থেকেই অস্থির হয়ে ঘর-বার করছেন মিসেস

রায়। পনের টাকা অ্যাডভান্স করে এসেছেন মুরারিমোহনকে। উপোষ করেছেন আজ সকাল থেকে, বিকেলবেলাতেই চান-টান সেরে তসরের শাড়ি পরে তৈরি হয়ে আছেন।

পঁচাত্তর টাকা খরচ চেয়েছে মুরারিমোহন। ফী-টা একটু বেশিই। তা' হোক্। তাই দিয়ে ওই জেরিনা মুখপুড়ীর দাপটটা যদি ভাঙা যায় তো বেঁচে যান মিসেস রায়। বয়েস হয়ে গেছে। চোখের কোলের চামড়ায় কোঁচ ধরেছে বেশ। নাকের দুধার থেকে ঠোঁটের প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা দাগ দুটো গভীর হয়ে উঠছে ক্রমেই। পেন্ট-পাউডারেও ঢাকা পড়ছে না ঠিক। চোয়ালের কাছে মাংসের ঢিপলি গজাতে শুরু হয়ে গেছে। তবু আছে এখনও রূপ। এখনও যা আছে, তাই দিয়ে আগরওয়ালা, বোস সাহেব, এ্যাটর্নি মিত্তির, ব্যারিষ্টার শেগল,—সকলকেই ধরে রাখা যেত অনায়াসে আরো কটা বছর। হঠাৎ ঠিক পাশের ফ্ল্যাটেই ওই জেরিনা ছুঁড়িটা এসে মিসেস রায়ের বাড়া-ভাতে ছাই দিয়েছে। ছুঁড়িটার ঠোঁটদুটো পুরু, গালের হাড় উঁচু, নাকটাও থ্যাবড়া মত একটু। থাকবার মধ্যে আছে শুধু একজোড়া সুন্দর চোখ, আর যৌবন। যৌবন যেন উপচে পড়ছে মেয়েটার সারা দেহে!

ওই এক গা যৌবন নিয়ে ওই কমবয়েসী মুখপুড়ী মেয়েটা সেজেগুজে বসে থাকে বারান্দায়। গুনগুন্ করে গানের কলিও ভাঁজে। মিসেস রায়ের ফ্ল্যাটে ঢুকতে গেলে বারান্দাটায় মানুষের চোখ পড়েই। চোখ পড়লেই মুচকি হাসে জেরিনা। হেসে মিসেস রায়ের অতিথিদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে যায়।

ওই হাসির বাণ মেরে আগরওয়ালা আর অ্যাটর্নি মিত্তিরকে ভাগিয়ে নিয়েছে ওই মুখপুড়ি জেরিনা। বোস সাহেব এবং ব্যারিষ্টার শেগল অনেক দিনের লোক বলেই আছেন এখনো বটে; কিন্তু কবে বলতে কবে যে তাঁরাও ঠাঁই বদল করেন তা' কে বলতে পারে?

তাই আজ পঁচাত্তর টাকা খরচ করে শনিঠাকুরের মন্দিরের মুরারিমোহনকে দিয়ে ঘর-বন্ধন করাবেন মিসেস রায়। আর কিছু নয়,—এ-ঘরে যে-মানুষ ঢুকবে, সে আর যেন ঘর বদল না করে কোনোদিন।

মিসেস রায়ের বুড়ি দাসীটি বসবার ঘরটাকে আজ সকাল থেকেই ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে রেখেছিল। এখন আরেকবার ঘর মুছে ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরটাকে ভরিয়ে তুলল পাখা নেড়ে নেড়ে।

মিসেস রায় রাস্তার বারান্দার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন এতক্ষণ। ঘরে গিয়ে বললেন,—ধুনোর ঘর যে একেবারে অন্ধকার করে দিলে গোপালের মা; চোখ জ্বালা করবে যে।

দাসী বলল,—অন্ধকার করে রাখতেই যে বলেছিলেন গো মুরারি-ঠাকুর। মনে নেই?

বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দাসী মিসেস রায়ের দিকে। সেই ধুনোর ধোঁয়ার পর্দার ভিতর দিয়ে তসরের শাড়ি পরা মিসেস রায়কে আজ যেন কেমন নতুন দেখাল দাসীর চোখে। পাখাটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে দাসী বলল, আজ তোমায় কী সোন্দর দেখতে লাগছে মা গো।

—আর থাক্, ঢঙ করিসনি বাছা,—ধুনো দিচ্ছিস ধুনো দে।

—ঢঙের কথা নয় গো মা। সত্যি, আজ তোমায় এলোচুলে তসরের শাড়িতে এমন ধারা দেখাচ্ছে যে গড় করতে সাধ হচ্ছে আমার।

বলে সত্যি সত্যিই দাসী গড় হয়ে পেন্নাম ঠুকে দিলে একট মিসেস রায়ের পায়ে।

আর ঠিক এমনি সময় রাজীবকে সঙ্গে নিয়ে মুরারিমোহ এসে পা দিল চৌকাঠে।

—মিসেস রায় আছেন নাকি?

—ওঃ হো, এসে পড়েছেন? আসুন আসুন।

—ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরখানা যা করে রেখেছেন। ভাল ক দেখাই যাচ্ছে না কিছু। তা' অবশ্য ভালই হয়েছে। ঘর-বন্ধনে সময় ঘর এমনি আঁধার থাকাই ভাল।

মিসেস রায় এগিয়ে এলেন সামনে। বললেন,—সোফাকৌচ স ও ঘরে সরিয়ে রেখেছি আজ। চলুন ও-ঘরেই বসবেন গিয়ে।

মুরারিমোহন বলল,—উঁহু, এখন আর বসা-টসা নয়। আ কাজ। ঘর-বন্ধনের কাজটা সেরে নিই আগে, তারপর নিশ্চি হয়ে বসা যাবে কিছুক্ষণ। কই-হে, এসো রাজীবভায়া, ক্রিয়াকাণ্ডগু সেরে ফেলা যাক আগে।

মুরারিমোহনের পরনে এখন ঘোর বেগুনী রঙের চেলির কাপ এবং সেই রঙেরই চাদর জড়ানো গায়ে। কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁ টোটা কেটে বেশ একটা তান্ত্রিক-তান্ত্রিক ভাব এসে গেছে ত চোখেমুখে।

মিসেস রায় বললেন,—সেই যে সেদিন জলশোধন সূত্রবন্ধ কি সব বলেছিলেন, আগে সে সব করতে হবে তো মুরারি বাবু?

—হবে মানে? সে কি এই আপনার এখানে এসে করব জন্যে ফেলে রেখে দিয়েছি নাকি ভেবেছেন? ও কি আপন দু-এক ঘণ্টার কাজ? আজ সকাল থেকে পাক্কা সাতটি ঘণ্টা ঐ জল শোধন আর সূত্রবন্ধন করতেই কেটে গেছে। কই রাজীব, মিসেস রায়কে দেখাও না একবার জিনিসগুলো।

আসবার সময় তামার একটা ঘটিতে দইয়ের ঘোল ভরে এনেছি মুরারি। আর, বড়রাস্তার দোকান থেকে খানিকটা কালো সু কিনে নিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে অনেকটা পৈতের মতন ক বেঁধে রেখেছিল মুরারি। মিসেস রায়ের ফ্ল্যাটে ঢোকবার আ সে দুটো রাজীবের হাতে চালান করে দিয়েছিল সে। মুরা নির্দেশে রাজীব সেই ঘোলের ঘটি আর কালো সুতোর পৈতে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল মিসেস রায়কে।

দেখে দুহাত জোড় করে ভক্তিভরে কপালে ঠেকিয়ে মিসেস র বললেন,—আমাকে তাহলে কী করতে হবে এখন?

—উপোস করে আছেন তো?

—হ্যাঁ। জর্দা-সুপুরিটা পর্যন্ত মুখে দিইনি।

—ব্যস্। এবার শুধু চুপচাপ বসে বসে দেখুন কী আ করি। আর, মনে মনে মহারাজের স্তোত্র পাঠ করুন। মন্ত্র জানা আছে তো?

—না।

—ঠিক আছে। আমি লিখে এনেছি কাগজে। সে দেখে দেখে পড়লেই চলবে।

ধুনোর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সেই ঘরের একধারে ব'সে শনিদে পাঠ করতে লাগলেন মিসেস রায়, দাসী ধুনুচিতে আরো ধুনো দি পাখার বাতাস করতে লাগল, আর মুরারিমোহন ডিং মেরে

সারা ঘরে ঘুরতে ঘুরতে দুর্বোধ্য কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল আর ঘাটির ঘোল ছড়াতে লাগল চারিদিকে।

ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রাজীব চুপচাপ দেখছিল কাণ্ডকারখানা। মুরারিমোহনের বুজরুকির খেলা দেখে হাসি পাচ্ছিল তার খুব।

শনির স্তোত্রপাঠ, ধুনোর ধোঁয়া, আর মুরারিমোহনের লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ানর খেলা বেশ কিছুক্ষণ চলবার পর থামল যখন, তখন ধোঁয়ার ঠেলায় চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে রাজীবের।

মুরারি ডাক দিল,—রাজীব ?

—বলো দাদা।

—লোহার হুকটা আর হাতুড়িটা নিয়ে তুমি তৈরি হও এবার।

—হয়েছি।

—দেয়ালের নৈঋত কোণে পুঁতে দাও হুকটা। দেখো, ন'বারের কম বা বেশি ঘা মেরো না যেন হুকের মাথায়। তাহলেই সর্বনাশ।

পাঁচটা হাতুড়ির ঘায়েতেই দেয়ালের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছল হুকটা। চারটে ফাল্‌তু ঘা মারতে হল রাজীবকে। আর, নটা ঘা মেরে রাজীব হাতুড়িটা সরিয়ে নিতেই মুরারিমোহন চক্ষের নিমেষে সেই কালো সুতোর পৈতেটাকে হুকে ঝুলিয়ে দিয়েই বলে উঠল,—জয় মহারাজ।

ব্যস্ হয়ে গেল ঘর-বন্ধন।

—হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ।

—ফল পাওয়া যাবে তো ঠিক ?

—যাবে না মানে ? আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে এ-ঘরে যে অতিথি পা দেবে একবার, আর সে কোনোদিন ভুলেও যাবে না অন্য কোনো ঘরে। বিশেষ করে আজ প্রথম এ ঘরে পা দেবেন যিনি, তাঁকে এখানে একেবারে বজ্র বাঁধনে বাঁধা পড়তে হবে। তবে কথা হচ্ছে, সবই মহারাজের ইচ্ছে। তিনি ইচ্ছে করলে নর্দমার জলেও তুফান তোলেন কি না। ভয় নেই, ফল আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। ঐ তো আপনাকে বললুম সেদিন ময়ূরী দেবীর কথা। আমিই তো ঘর-বন্ধন করে দিয়েছিলুম তাঁর। তারপর বসন্ত রোগে একটা চোখ পর্যন্ত গলে গেল ময়ূরী দেবীর। তবু কৈ, মেরুণ রঙের ঐ বড় মটোর গাড়িখানাকে কেউ হটাতে পারলে ময়ূরী দেবীর দোর থেকে অন্য কারুর দরজায় ?

ঘরের জানালা-দরজার কপাটগুলো খুলে দিয়েছিল দাসী। বাইরের হাওয়া এসে ঘরের ধোঁয়া উড়িয়ে দিল সব। এতক্ষণে রাজীব স্পষ্ট করে দেখতে পেল মিসেস রায়কে।

মিসেস রায় বললেন,—আসুন এবার ও-ঘরে, একটু চা-মিষ্টি খেয়ে যেতে হবে।

চা-মিষ্টি খেয়ে এবং নগদ বাটটি টাকা পকেটে পুরে রাজীবকে নিয়ে বেরিয়ে গেল যখন মুরারি, তখন ফ্ল্যাটের সিঁড়িতে আলো জলে উঠেছে।

সারাদিনের উপোসের পর মিসেস রায়ের কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছিল আজ নিজেকে। চুল বেঁধে তসরের শাড়িটা বদলে নাইলনের ফিনফিনে শাড়িটা পরবার জন্তে দাসী বারবার তাগাদা দিয়ে রান্নাঘরে মাংস চড়াতে গেছে। মিসেস রায়ের কিন্তু বাঁধা হয়নি চুল, বদলানো হয়নি তখনো তসরের শাড়িটা। সোফায় গা এলিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন তিনি।

···এইবার আর ভয় নেই জেরিনা মুখপুড়ীকে। আর ভয় নেই। আর কাউকে কেড়ে নিতে পারবে না সে। সাতদিনের মধ্যে এঘরে পা দেবে যে, সে আর কোনোদিন অন্য ঘরে পা দেবে না। আর আজ ? আজ কে আসবে প্রথমে ? বোস সাহেব, না ব্যারিষ্টার শেগল ? দুজনের মধ্যে যেই আসুক, বজ্র-বাঁধনে বাঁধা পড়তে হবে তাকে মিসেস রায়ের কাছে।

···কে এলে ভাল হয় ? বোস সাহেব, না শেগল ? বোস সাহেবের পাক ধরেছে চুলে, খাবার পর বাঁধানো দাঁত খুলে ধুয়ে নিতে হয় ; কিন্তু অগাধ পয়সা মানুষটার। আর শেগল ? জোওয়ান শক্ত, বলিষ্ঠ ;—কিন্তু পয়সার বেলায় মুঠি তেমন আলগা নয়। এঘরে আজ প্রথমে কে পা দিলে সবচেয়ে খুশি হন মিসেস রায় ?

···সবচেয়ে ভাল হয়, যদি দু'জনে আজ একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে এসে ঢোকেন ঘরে। সেই ভাল, সেই ভাল, সেই হোক্।

এমনি সময় বাইরের দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠতেই দাসী খুলে দিলে দরজাটা।

চম্‌কে উঠলেন মিসেস রায়।

এখনো তসরের শাড়িটা বদলানো হয়নি তাঁর। চুল বাঁধা হয়নি। মুখে পেন্টমাখা হয়নি একটুও। বোস সাহেব কিংবা শেগল যেই আসুক, এবেশে এই অবস্থায় দেখলে ভাল লাগবে কি তার ? নিশ্চয়ই লাগবে না। দাসীটা যেন কী। আমি তৈরি হয়েছি কি না, না জেনেই দরজাটা খুলে দিলে। পালাবারও পথ নেই এঘর থেকে। উঃ মাগো! আজ কি না এই লেখা ছিল মিসেস রায়ের বরাতে!

দাসীর গলা পাওয়া যাচ্ছে ও-ঘরে,—এই ভাখো, মা গো ভাখো কে এসেছে ভাখো একবার।

বলতে বলতে মানুষটাকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এ-ঘরে এসে হাজির হল দাসী।

মিসেস রায় অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে খোকার মত দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের সেই শনিঠাকুরের মন্দিরের সামনে দেখা সেই শক্ত সমর্থ জোওয়ান ছেলেটা,—সাগর যার নাম।

[ ক্রমশঃ

## Marriage Lines

The way to hold a husband is to keep him a little bit jealous. The way to lose him is to keep him a little bit more jealous. *H. L. Mencken.*

## অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

# সমাজদর্শনে রবীন্দ্রনাথ

প্রতিমা ভট্টাচার্য্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর রত্নপ্রসূ বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠতম সন্তান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ভারত তাঁর পরশে ধন্য, জগৎ তাঁর গীতিচ্ছন্দে মুখর। "তাঁরই মহিমায় মহিমান্বিত "বাঙ্গালী আজি গানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।"

রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু যুগধর্ম্মের কবি তিনি নন ; দেশ, কাল আর যুগের সীমা ছাড়িয়ে তিনি অসীমের অনুসন্ধানী। উপনিষদের রসে পুষ্ট তাঁর কবিচিত্ত, তাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-এর উপাসক তিনি। কিন্তু তারও উপরে তাঁর পরিচয় রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের কবি, রূপাতীত এক লিরিক্যাল জগতে তাঁর কবিমনের বিচরণ। তবু মানবদরদী তিনি, তিনি মানুষের কবি, বিশ্বমানবতার কবি। তাই তাঁর রোম্যাণ্টিক জগৎ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একমুহূর্ত্তের জন্যেও যখন তিনি বাস্তবের মানুষের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন তখনই দরদীর অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে রেখাপাত করেছে মানুষের ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশা, ত্রুটি-বিচ্যুতির আলো আর আঁধারের খেলা। শুধু সেই মুহূর্ত্তটির জন্যেই তিনি তাকিয়েছেন মানুষের সমাজের দিকে, তার মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করেছেন তিনি, সমাজে আমাদের মত মানুষের দল কোথায় ব্যথাহত, কোথায় তাদের জ্ঞানালোকের অভাব, কোথায় তাদের চিত্তবৃত্তির সংকীর্ণতা। তখনই লিরিক কবি হয়ে উঠেছেন সমাজদর্শনের কবি, সমাজের প্রতি তাঁর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী তখনই দেখিয়েছে সংস্কারের পথ। আদর্শের কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা তখনই দেখেছি মানবসমাজের দরদী সমালোচকরূপে সোনার তরী, নৈবেদ্য আর গীতাঞ্জলির গীতিধর্ম্মী কবিকে গল্পগুচ্ছ, পুনশ্চ আর শেষ সপ্তকের যুগে তাই আমরা সমাজ দার্শনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ধারক আর বাহক। বর্ত্তমানের প্রগতিকে গ্রহণ করতে তিনি স্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু প্রগতির নামে চরম কৃত্রিমতার যে বিলাস তাঁর সমকালীন ভারতীয় সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিলো, সেই আত্মবিস্মৃতি কবি সহ্য করতে পারেননি। আধুনিক নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার বিলাসে ক্ষুব্ধ কবি তাই ফিরে যেতে চেয়েছিলেন পূর্ব্বের সেই সরল অরণ্য জীবনে। কবির বাণী তাই :—"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষটুকুই শুধু গ্রহণ ক'রে যে ভারত

"হেথা মত্ত স্ফীত স্ফূর্ত্ত ক্ষাত্রিয় গরিমা<br>
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমার"—

মহিমায় মহিমান্বিত প্রাচীন ভারতকে বিস্মৃত হ'তে চেয়েছিলো সে ভারত কবিকে আঘাত করেছিলো তীব্র ভাবে। তাই আহত কবি সেদিনকার সমাজের বিরুদ্ধে আর্ত্তনাদ ক'রে বলেছিলেন—

"এই পশ্চিমের কোণে রক্ত রাগ রেখা<br>
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা<br>
তব নব প্রভাতের—<br>
এ শুধু দারুণ সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি।"

এই "দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী"র "তীব্র বিষে ভরা" "কুটিল ফণা" আর "গুপ্ত বিষদন্তে"র হাত থেকে মুক্তি নিয়ে তাই অরণ্য জীবনে ফিরে যেতেও কবির আপত্তি ছিল না। সেদিনের যে ভারতবাসী বিদেশী বুলি আর বিদেশী পোষাকের ময়ূরপুচ্ছে আপনাকে সজ্জিত ক'রে পরিচয় দিয়েছিলো চরম আত্মবিস্মৃতির, তাদের সেই অবিমৃষ্যকারিতা সমগ্র জাতির অপমান হয়ে বেজেছিলো কবির বক্ষে। কৃত্রিম ভোগের বিরুদ্ধে, অসমীচীন অনুকরণের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির হ'য়ে তাই ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ভারতের দেবতার চরণে কবি জানিয়েছিলেন কাতর আবেদন —

"রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,<br>
তুমিই প্রাণের প্রিয়।<br>
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব<br>
তোমারি উত্তরীয়।"

কিন্তু কবি শুধু সমালোচনাই করেননি। যেখানে দেখেছিলেন তিনি দেশবাসীর ব্যথা আর বেদনার প্রকাশ, সেখানেও তাঁর দরদী মনের বীণা বাণীময় হ'য়ে উঠেছিলো বিক্ষোভের তীব্রতায়। তাই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পৈশাচিকতায় নিপীড়িত ভারতবাসীর দুঃখে দুঃখী কবি নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে বেজে উঠেছিলো তাঁর কণ্ঠস্বর :—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা<br>
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা<br>
তোমার আদেশে।<br>
যেন রসনায় মম<br>
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর-খড়্গ সম<br>
তোমার ইঙ্গিতে।"

তৎকালীন ভারতীয় সমাজের ভীরুতা আর অসাড়তায় আবদ্ধ ভারতবাসীকে জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন কবি, "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির" সেই স্বর্গলোকে। আপন সীমায় বদ্ধ ভারতবাসীর জাগরণের চারণ কবি তাই দুর্দম প্রেরণায় আপনি ছুটে যেতে চেয়েছেন অজানার পানে, গেয়েছেন—

"ইহার চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন,
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

বঙ্গ-জননীর সন্তানদলকে তাঁরই সাথে সুর মিলিয়ে তিনি গাইতে আহ্বান জানিয়েছিলেন "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী।" জাগরণের কবি বঙ্গসন্তানকে বন্ধনমুক্ত মানুষ ক'রে তুলতেই চেয়েছিলেন মনে-প্রাণে, মনুষ্যত্বের আহ্বানেই তাঁর এই বাণী :—

"সাত কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙ্গালী ক'রে মানুষ করোনি।"

তীব্র বিলাসিতা আর অনুকরণের বিরুদ্ধে কবি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। কিন্তু অনুদারতায় আপনাকে সংকীর্ণ ক'রে প্রগতির পথে বেড়া দিতে তিনি কোনও দিনই চাননি। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী যুগের যে ভারতীয় সমাজে বহির্বিশ্বের সংস্পর্শ থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে অনুদার স্বাতন্ত্র্যটুকুকেই বড় করে তুলতে চেয়েছিলো সে সমাজের জাগরণের প্রয়োজন কবি একান্ত ভাবেই অনুভব করেছিলেন। এই জাগরণের বৈপ্লবিক সংস্কারের জন্যে কবি রুদ্রবীণায় ঝংকার তুলতে চেয়েছিলেন, বোঝাতে চেয়েছিলেন ভারতবাসীকে, দেওয়া আর নেওয়া, মেলা আর মেলানোর মাধ্যমেই দেশের উন্নতি, জাতির উৎকর্ষ। তিনি বলেছিলেন সংকীর্ণতায় স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল হয় না, বিনষ্ট হয়। তাই প্রাচীনকালের উদার ভারতের "মহা ওঁকার ধ্বনির" যজ্ঞশালায় সকল মানবকে আহ্বান জানাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি ভারতবাসীকে। বলেছিলেন উদার আহ্বানে ভারত যেদিন মহামানবের মিলন-তীর্থক্ষেত্রে সকল মানুষকে জানাবে আবাহন, সকল বাণীকে করবে আনয়ন, সেদিন ভারত হয়ে উঠবে "আপন স্বরূপে আপনি ধন্য।" সেদিনই সকলের ঊর্দ্ধে উজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠবে মহিমময় ভারতের মহিমান্বিত স্বাতন্ত্র্য।

এর পর রবীন্দ্রনাথের সমাজ দর্শনের" দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় সমাজের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে। সেখানে তিনি দেখেছেন ভারতবাসী অসীম সংস্কারে অনুদার, মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে তাই সে আপন শুচিতা রক্ষায় যত্নশীল, মানুষকে ঘৃণা করে সে আপন ঊর্দ্ধাসনে সমাসীন থাকতে সচেষ্ট। সমাজের এ ভ্রান্তি রবীন্দ্রনাথ বিদূরিত করতে চেয়েছিলেন। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, মানুষের অপমান তাঁকে আহত করেছিলো অন্তরে অন্তরে। তাই ভারতবাসী শুনেছিলো তাঁর সেই আহত অন্তরের সাবধান বাণী :—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন মানুষের অপমান মানুষের নয়, সে অপমান তার প্রাণের ঠাকুরের অপমান। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের কবি, উপনিষদের কবি তাই ভারতকে শুনিয়েছেন অমৃতবাণী :—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।"

অনুদারতার গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি ভারতবাসীকে জাগাতে চেয়েছিলেন সেই সত্যজ্ঞানের অমৃতলোকে যেখানে মানুষ "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং" পরব্রহ্মের উপাসক। সকল খণ্ডতার উর্দ্ধে যেখানে মানুষ পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানবান, নিরর্থক সংস্কারের মৃত্যুর উর্দ্ধে সেখানে সে অমৃতের যাত্রী। সংস্কারবদ্ধ ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত করেছিলো যে যুগে অসংখ্য কুসংস্কারের মরুবালুরাশি, সেদিন একান্ত মনেই কবি এই সংস্কারমুক্তির জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সমাজের প্রতি সমবেদনাশীল কবির ক্ষুব্ধ অন্তর সেদিন অনেক দুঃখেই আত্মপ্রকাশ ক'রে বলেছিলো :—

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।"

এ পর্য্যন্ত সমাজদর্শনের কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি গভীরের অনুসন্ধানী কবি রূপে, আত্মসমালোচনায় তিনি কঠোর, আত্মবিশ্লেষণে তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, সত্যপথ নির্দেশে তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী। কিন্তু আমাদের মত অতি সাধারণ মানুষের যে কবি একদিন গেয়েছিলেন—

"আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।"

সেই কবির সন্ধানও আমরা পাই, তাঁর সমাজ-নিরীক্ষার মাধ্যমে। সমস্ত জাতির ত্রুটির বিরুদ্ধে যে কবি অভিমানাহত, সমগ্র জাতির ব্যথা বেদনায় যে কবি বেদনাহত, সাধারণ দীন মানুষের দুঃখও কিন্তু সেই কবির অন্তরে সৃষ্টি করেছিলো গভীর বেদনার ক্ষত। কবি দেখেছিলেন আমাদের দেশের দীন মানুষ যারা, দিন আনা দিন খাওয়ার সন্তোষে যারা সন্তুষ্ট, যাদের হাতে জাতির অগ্রগতির পথ নির্ম্মাণের ভার, তাদের স্বার্থ আমাদের সমাজে ব্যাহত ; তাদের দীনতা আমাদের দেশে উপেক্ষিত। যাদের "ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী," তাদের সেই কারুণ্য-কবিকে বিচলিত করেছিলো, কবি বুঝেছিলেন সমাজের এই সম্প্রদায়ের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই সমগ্র সমাজের, সমগ্র জাতির মঙ্গল। তাই গেয়েছিলেন তিনি—

"এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সমাজের নানা প্রথা যে কেমন ক'রে নিয়ে আসে দুর্দ্দৈবের ঘনঘটা সে কথাও উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিবাহকালে পণপ্রথার ভয়াবহতা কেমন ক'রে বিনষ্ট ক'রে চলেছিলো কত মধুর জীবনের অঙ্কুর, রবীন্দ্রনাথের সেই উপলব্ধিরই প্রকাশ ঘটেছে গল্পগুচ্ছের দেনা-পাওনা গল্পে। দরিদ্র পিতার একমাত্র কন্যা নিরুপমার অভিজাত শ্বশুরালয় প্রতিদিনকার অজস্র নিপীড়নে কেমন ক'রে অকালে ঝরিয়ে দিয়েছিলো তার জীবন-কুসুম, তারই করুণ কাহিনী এই "দেনাপাওনা"। দরিদ্র পিতার পণের টাকা শোধের অক্ষমতার অপরাধ তিলে তিলে ধ্বংস ক'রে দিয়েছিলো তাঁর একমাত্র আদরিণী কন্যার জীবন। এ গল্পের অশ্রুসজল অধ্যায়ের মাধ্যমে কবির সহানুভূতিময় সমাজ-নিরীক্ষাই আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার এই করুণ ট্রাজেডী, এই রাক্ষসী কুপ্রথার অত্যাচারের সমাধানেরও পথনির্দ্দেশ রয়েছে "যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ" গল্পে। সেখানে এই বিধ্বংসী কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপেই আবির্ভূত হয়েছে বিভূতিভূষণ, যে পিতার সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে মূর্ত্ত প্রতিবাদরূপে দাঁড়িয়ে উঠে নিজে ছাদা পরিবেশন করেছে বরযাত্রীদলের পাতে। দেনাপাওনার যে রায়বাহাদুর তনয় প্রতিবাদে জানাতে গিয়েও সফল হয়নি, সেই দলেরই আরও একটু অগ্রগামী তরুণ এই বিভূতিভূষণ। এই দুটি গল্পের গভীরে রবীন্দ্রনাথের এইটুকুই নির্দেশ, যে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের জাগরণেই অবসিত হবে, আজকের সমাজের অমানিশার অন্ধকার।

বাল্যবিবাহের ভীষণ প্রথা ভীত, সন্ত্রস্ত বালিকা বধূর জীবনকে যে কেমন ক'রে দুর্ব্বিষহ ক'রে তুলতো তারই প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের "বধূ" কবিতা। সেখানে অবোধ, গ্রাম্য বালিকা বধূ অজস্র বিধিনিষেধের পাহারায় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে অহরহ মৃত্যু কামনা ক'রে বলে :—

"দীঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভালো।"

আবার কখনও বা ক্রন্দনক্লান্ত বালিকা আপন আক্ষেপে আপনি ভাবে :—

"হেথায় বৃথা কাঁদা
দেওয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে
আপন কাছে।"

শ্বশুরালয়ের স্নেহহীন পরিবেশ বালিকার অন্তরে আপন মায়ের ছবি জাগায়। অশ্রুসজল বালিকার বক্ষে দুঃখের ক্রন্দন জাগে :—

"ফুলের মালাগাছি
বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।"

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন পরিণত বয়সে সকল পরিবেশ, সকল নূতনত্ব, সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কঠোরতা বোধশক্তির প্রভাবে সহ্য করা সহজ হ'য়ে ওঠে, কিন্তু অবোধ বালিকা বধূর এই অব্যক্ত বেদনার ক্রন্দন সত্যই অসহনীয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সমাজের বাল্যবিবাহ প্রথার বিরোধী।

সমাজে কুলকৌলীন্যের সংস্কার যখন দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তখন সেই কৌলীন্যের যূপকাষ্ঠে হিন্দুসমাজের কত প্রাণ যে বলি হ'য়েছিলো সে কথা অজানা নয়। সমাজের এই কৌলীন্যের পৈশাচিকতায় দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিহরিত হয়েছিলেন ভয়ে, বিস্ময়ে। এই ভীতিরই প্রকাশ তাঁর :—

"মা কেঁদে কয় মঞ্জুলি মোর
ঐ তো কচি মেয়ে।"

কৌলীন্যের বলি কবিকল্পিত মঞ্জুলিকার বিয়ে হোলো এক

তীর্থপথযাত্রী বৃদ্ধের সাথে। ছ'মাস না যেতেই হাতের শাঁখা খসিয়ে ফিরে এলো সে কুলীনপিতার কাছে। মেয়ের ম্লানমুখ দর্শনের থেকে মুক্তি পেলেন মা, সংসারের মায়া কাটিয়ে। তারপর পিতা যেদিন সংসারধর্ম্ম পূর্ণ করার জন্যে কলপ মেখে আর একটি নববধূ ঘরে আনলেন, সেদিন পিতার সুশীলা মঞ্জুলিকা যখন পাড়ার পুলিন ডাক্তারের সঙ্গে মিলে "গেলেন দোঁহে ফরাক্কাবাদ চ'লে", তখন রবীন্দ্রনাথ আর তাকে দোষারোপ করতে পারলেন না। শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন সমাজের কঠোরতার দিকে : বললেন, মঞ্জুলিকা এই অবিচারের বিরুদ্ধে মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহেরই প্রতীক।

মানুষের যে অজস্র বুদ্ধিহীন সংস্কার প্রতিপদে মানুষকে ক'রে তুলেছিলো বিভ্রান্ত, তার বিরুদ্ধে কবির তীব্র বিক্ষোভবাণী ধ্বনিত হ'য়েছিলো বারংবার। তাই বিসর্জ্জনের মৃতবৎসা মাতা যখন একমাত্র জীবিত সন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে নিষ্ফল হাহাকারে ফিরে পাওয়ার আবেদন জানায়, তখন তার কারুণ্যের অন্তরালে বেজে ওঠে কবি রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিক্ষুব্ধ কণ্ঠ। তার তাৎপর্য্য নির্ব্বোধ সংস্কারের পরিণাম এমনই ভীষণ। "দেবতার গ্রাসে" মাসীর অসতর্ক মুহূর্ত্তের একটি মুখের কথাকে কেন্দ্র ক'রে অবোধ বালককে যখন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তার আর্ত্ত "মাসী" আহ্বানের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি অসহায় ব্যক্তির তীব্র অভিশাপ বর্ষিত হয়, সমগ্র সমাজের উপর। রবীন্দ্রনাথ এই জীর্ণ সংস্কার থেকে সমাজের মুক্তি চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত সংস্কারমুক্ত সমাজের অভ্যুদয়। "অচলায়তনের পঞ্চক" এই জ্ঞানদীপ্ত, সংস্কারমুক্ত সমাজের যোগ্য দীক্ষাগুরু।

সমাজের শিক্ষার মাঝে কোথায় কতটুকু ত্রুটি রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাকে খুঁজেছে গভীর ক'রে। তারপর কবি ত্রুটিমুক্ত, দোষমুক্ত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলনে এক পরিপূর্ণ শিক্ষার পথ নির্দ্দেশ করেছেন। সে শিক্ষায় সংস্কারের জীর্ণতা নেই, কিন্তু আছে ভারতীয় স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বলতা ; সে শিক্ষায় অনৈক্যের খণ্ডতা নেই, আছে অমৃতলাভের পরিপূর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন সেই সমাজকে, যে সমাজে বিভিন্ন ধর্ম্মধ্বজীর মতভেদের সংকীর্ণতায় মানুষ হয়েছিলো বিভ্রান্ত। রবীন্দ্র সেই ভ্রান্তিমুক্তির পথ নির্দ্দেশ ক'রে মানুষকে শুনিয়েছিলেন সত্যবাণী, মত যাই হোক্, যাত্রাপথ সকলেরই সেই এক মহান্ লোকে, যে লোক আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বল, উপনিষদ যাকে বলেছে :—

"তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

রবীন্দ্রনাথ কবি, বিশ্বকবি অধ্যাত্মবাদী কবি, প্রেমের কবি, রোম্যাণ্টিক কবি, তবু সর্ব্বোপরি তিনি মানুষের কবি। তাই আর সকল পরিচয়ের ঊর্দ্ধে দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে কবির সেই পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ মানবপ্রেমিক। তাই মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথ মানুষের সমাজের দিকে তাকিয়ে, তাদের দুঃখ-বেদনাকে উপলব্ধি করেছেন, পথ নির্দ্দেশ করেছেন তাদের ভ্রান্তি মুক্তির। সমাজকেও তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাঁর সেই পরিপূর্ণতার জগতে, যেখানে তিনি উপনিষদের মহীয়সী মৈত্রেয়ীর সঙ্গে একই সুরে উদাত্তকণ্ঠে বলেন :—

"যেনাহং নামৃতাস্যাম্।
কিমহং তেন কুর্য্যাম্।।"

রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার পূজারী। সমাজের সংকীর্ণতার খণ্ডতা, সংস্কারের জীর্ণতা, ভ্রান্তির মত্ততা তাঁকে দুঃখার্ত্ত করেছিলো। সভ্যতার নামে বিলাসের স্রোতে আত্মবিসর্জ্জনের তাই কবি ছিলেন বিরোধী, আবার স্বাতন্ত্র্যের নামে সংকীর্ণতার প্রশ্রয়ও তাঁর অনুমোদন পায়নি।

তিনি দেশবাসীকে সংস্কারের ঊর্দ্ধে, বিভ্রান্তির বহিঃপ্রদেশে এক উন্মুক্ত উদারসমাজের স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাদের "সত্যং শিবং সুন্দরম্" এর পরম জ্যোতির্লোকে। বৈদিকযুগের মন্ত্রদ্রষ্টার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই তিনি গেয়েছিলেন জাগৃতির বাণী :—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" আজও বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সমাজের এই জাগৃতি—বাণীকে উপেক্ষা করার সময় আসেনি।" কবিদৃষ্টিকে অনুসরণ করেই তাই আজও আমাদের চলতে হবে তাঁরই প্রদর্শিত পথে, ত্রুটি মুক্তির আলোকে আমাদের সেই মহান্ লোকে ঘটবে উত্তরণ, যেখানে আমরা উঠবো, জাগবো, নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রার্থনা করবো প্রাপ্য বর, বলতে পারবো অবিচলিত মুক্তকণ্ঠে—

"তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

কবির বাণীই তাই আত্মোপলব্ধির বাণী :—

"আত্মানং বিদ্ধি।"

# চলন্তিকার পথে

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

আভা পাকড়াশী

কথায় কথায় জেনেছি বিমল আর কালোবরণ থাকে কোন্নগরে সেখান থেকে ওরা রোজ ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে। এদের দুজনের আকৃতি-প্রকৃতিতেও বেশ সাদৃশ্য আছে। কালোবরণ যেন বড় ভাই আর বিমল ছোট। সব ব্যাপারেই বিমল আর অন্য সকলেও নির্ভর করে ওর ওপরে। কালোবরণ সত্যিই নির্ভরযোগ্য ; ভারী গোছালো স্বভাব ওর। এদের মধ্যে বিমলই সবচেয়ে লম্বা আর মাঝে মাঝে বেশ এক-একটা মজার মজার কথা বলে। দীপ্তিশ আর নব থাকে শ্যামবাজারে, চাকরী করে ষ্টেট-ব্যাঙ্কে। দীপ্তিশের চোখে চশমা, লম্বা ও পাতলা চেহারায় আছে একটু রাশভারী আর রোয়াবী ভাব আর নবর চেহারাটি যেন নবকার্ত্তিকের মতই। তবে স্বভাবটি মোটেই সেনাপতিসুলভ নয় বরং একটু আরামপ্রিয় আর নন্দদুলাল গোছেরই। ভারী শান্তশিষ্ট। সারাদিন এরা হাঁটে হাফপ্যাণ্ট আর হাফ-সার্ট পরে। হাতে থাকে লম্বা লাঠি আর মাথায় থাকে তোয়ালের পাগড়ি। চার বন্ধু পণ করেছে উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ শেষ করে একেবারে হরিদ্বারে পৌঁছে দাড়ি কামাবে। এ পথে আর ও ঝঞ্ঝাট নয়। তাই এদের চারজনের মুখেই বেশ এক-একটি বাবাজী মার্কা দাড়ি গজিয়েছে ইতিমধ্যেই। এই ঠাণ্ডায় কোথায় গেল আবার দীপ্তিশ? জিজ্ঞেস করি ওদের। এখানে আজ অন্ধকার তাই রামওয়ারার মত সেই বরফের শোভা থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা। ওরা কি দেখছে বাইরে?

আগাপাস্তলা কম্বলমুড়ি দিয়ে হাতে একটা ফ্লাস্ক নিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকল দীপ্তিশ। অনেক খোসামুদি করে দোকানদারের কাছ থেকে এই গরম জলটুকু চেয়ে এনেছে ওরা। তারপর আমার বাস্কেট

ছাতড়ে বেরুল চায়ের পাতা আর চিনি। কেদারের পথে এগুলি অকেজোই পড়েছিল, ওখানে তো দু'পা হাঁটলেই পাওয়া যেত এই পানীয়টি। তৈরী হল র-চা। তারপর সেই অমৃত পান করা হল সকলে আউন্স মেপে মেপে। ঐ ঠাণ্ডার প্রকোপের মধ্যে ঐটুকু চা-ই যেন মন্ত্রের কাজ করল। নিমেষে হাত-পা গরম হয়ে উঠল। অনেক রাত পর্য্যন্ত গান আর তাস চলল। ইচ্ছে এই ভাবেই রাতটা কাটান কিন্তু ক্লান্ত শরীর তা মানবে কেন?

সবাই গুটিসুটি হয়েই ঘুমোচ্ছিলাম। ভোর রাত্রে হঠাৎ একটা আর্তনাদ আর হাউমাউ চিৎকারে জেগে উঠলাম সবাই। কি হল? কি ব্যাপার? অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বিমল বলে, শেয়ালে আমার পা ধরে টানছিল বৌদি। ঐ কালোবরণকে জিজ্ঞেস করুন, ও দেখেছে। এদিকে আগাপাস্তলা কম্বলমুড়ি দেওয়া কালোবরণ হাসছে না কাঁদছে বুঝতে পারছি না। অনেক কষ্টে উদ্ধার হল যে, সেই সন্ধ্যের কালোবরণের রাখা লুচি তো শক্ত টিনের চাকতি হয়ে গিয়েছিল তাই খেতে পারে নি আর সেই লুচির গন্ধে একটা বুনো বেড়াল ঢুকেছিল তাঁবুর মধ্যে। সেটা বিমলের পায়ের ওপর দিয়ে যাবার সময় ও আবার তাকে স্পর্শ করে ফেলেছে কালোবরণের ঘাড়ে, তাই সেও অমনি করে চেঁচিয়েছে। তবে ও ওটাকে বেড়াল বলে বুঝতে পেরে হাসছিলই, কাঁদছিল না। আমার তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল প্রথমে। পরে হাসাহাসির চোটে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন প্রকৃতির তাগিদে বাইরে যেতে গিয়ে দেখা গেল যেটুকু জল ছিল ঘটিতে আর ওয়াটার বটলে সবই জমে বরফ হয়ে আছে। কেদারের শেষ চটি রামওয়ারাতে ঐ চোরকুঠুরিটির মধ্যে থাকার দরুণ অন্তত এই দুর্ভোগে পড়তে হয়নি। প্রাণান্ত চেষ্টা করল সকলে মিলে, কিন্তু স্টোভটা কিছুতেই জ্বলল না, অগত্যা বরফই ভরসা।

সকাল হতেই উৎফুল্লমুখে খবর নিয়ে এলো ও যেতে দিচ্ছে যাত্রীদের। খুলেছে পথ। তবে পথ নয় বিপথ। যেখানে ধ্বস নেমেছে ঠিক সেখানে সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করেছে একটি বরফের বিরাট চাই। সেইটিই হয়েছে উপস্থিতের পথ। পথিকের পারাপারের উপায়। উন্মুখ যাত্রীরা চলেছে আকুল হয়ে সেই গোকুলচন্দ্রের দর্শনের আশায় যেন বলছে—

> তোমার মূরতি দেখিব বলিয়া
> বহুদূর হতে এসেছি চলিয়া
> খোল খোল ওগো মন্দির দ্বার
> এখনি কোর না বন্ধ।

জয় বদরীবিশাল কি জয়। বলে আমরাও যাত্রা করলাম। আজ আবার সমানে তুষারপাত হচ্ছে। সকলের চেহারাই তুলো মাখা মনে হচ্ছে। এবার এসেছে সেই বরফের ব্রিজ। ওটি আবার সমান নয়। বাচ্ছাদের স্লিপের ব্যবস্থা মত ঢালু হয়ে জমেছে এই বরফের চাই। ঐ ঢালের ওপর সিঁড়ি কেটে দিয়েছে P. W. Dর লোকেরা। দু' দিকে ধরার কিছুই নেই। এ পাশে বড় বড় পাথর আর বরফের চাই নিয়ে বিপুল বেগে খল খল করে বয়ে চলেছে অলকনন্দা, আর ওপাশে অতল গভীর খাদ। বরফে খালি পা পিছলে যাচ্ছে। মনে পড়ছে কেদারে সেই সাংঘাতিক শেষ পথটুকু পার হবার কথা। সেই দুর্ভাটির ভি যাবার ভয়াবহ দৃশ্যের কথা।

পাছে ও বরফের চাইটি ধ্বসে যায় তাই এক সঙ্গে অনে যাত্রীকে যেতে দিচ্ছে না P. W. Dর লোকেরা। ওধার থে দর্শন শেষে যারা ফিরছে তাদের একদল ছেড়ে দিচ্ছে তারা পা হয়ে এলে তারপর আবার এদিক থেকে কিছু যাত্রীদের যে দিচ্ছে। এখন ওদিকের যাত্রীরা নামছে তাই আমরা দাঁড়িয়ে আছি একভাবে ঠায় বরফের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ পাও জমে বর হয়ে যাচ্ছে। আগু পিছু নড়ারও উপায় নেই। তবেই হবে তুষা সমাধি। একটা অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমার মনটা কেম যেন উৎকণ্ঠ ভয়ে ছেয়ে গেছে। আমরা একটা লাইন বেঁধে দাঁড়ি রয়েছি। সব চেয়ে আগে আছে ও তারপর গোরা, গোরার পেছ কালোবরণ, বিমল আর নব, নবর পেছনে শঙ্কর তারপর আমি আমা পেছনে দীপ্তিশ তার পেছনে আবার আমাদের দুই কুলি। দীপ্তি পেছন থেকে বলে পা দুটো মাঝে মাঝে নাড়ান বৌদি না হলে আ চলতেই পারবেন না পরে।

এবার আমাদের লাইন এগুচ্ছে, ওকি হল সবাইকে দিল তো এক সঙ্গে পার হতে? ওকে আর গোরাকে দেখছি পেছ ওরা তিন বন্ধুও আছে, হে ভগবান রক্ষা কোর ওদের? যে ওদের পা না পিছলে যায়, ওকি গোরাটা আবার লাইন ছে ধারের দিকে যাচ্ছে কেন? ভয়ে চোখ বন্ধ করি। দীপ্তিশ ব কেন ভয় পাচ্ছেন ওই দেখুন গোরা সকলের আগে বেরি গেল। ওর কালো ওয়াটারপ্রুফ-পরা ছোট চেহারাটি একটি বিন্দু মত টুপ করে ওদিকে নেমে গেল। যাক্, বোধ হয় নির্বিঘ্নে পেরি গেল ওরা। এবার আমাদের পালা।

শঙ্করকে সামনে নিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছি, ওর কানে কা বলছি খুব সাবধান বাবা, পা টিপে টিপে, লাঠি বরফে গেঁ গেঁথে এগোও। বেশ খানিকটা উঠে এসেছি আমাদের পেছ পিঁপড়ের সারির মত লোক উঠছে। সর্বনাশ, হঠাৎ গে শঙ্করের পা পিছলে! হড়-হড় করে নেমে আসছে—ও তলিয়ে যাবেই তার সঙ্গে তাসের ঘরের মত একের পর এ আমরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। সবাই গেল গেল বলে হৈ হৈ ক চিৎকার করে ওঠে। আমি আতঙ্কে ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেছি। হঠ দীপ্তিশ পেছন থেকে তার লাঠিটা বরফের ওপর গেঁথে দিয়ে চিৎক করে বলে, শঙ্কর এটাকে চেপে ধর, তবে পড়বি না, ধর ধর, ওটা হাত বাড়া। ধরেছে, পাক খেয়ে নেমে আসার মুখে ধরে ফেলে লাঠিটা। সবাই চিৎকার করে সমস্বরে, জয় বদরী বিশাল কি।

অনেক যাত্রীরা শঙ্করের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওরই মধে ভয়ে আর ঠাণ্ডায় ছেলেটার চোখ-মুখ নীল হয়ে উঠেছে। আমি অঝোরে কাঁদছি ওর হাতটা ধ'রে। এবার P. W. D দু'জন লোক আমাদের দুদিক থেকে ধ'রে পার করে দি সেই প্রাণঘাতী পথ।

ওপারে পৌঁছে দেখি আর এক কাণ্ড! গোরাকে খুঁ পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের বিপদের কথা বলাও হল না। ও ভয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। একবার শুধু বলল, জিদ করে এলেই ভাল হত দেখছি। আমার তখন কোনরকম বোধশক্তিই

আর। কেমন যেন ঝিম ধরে গেছি। শালের ওপরটা বরফে ভিজে উঠেছে। ওয়াটারপ্রুফ ছিল না আমার। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। মনে হচ্ছে এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাব আমি। দীপ্তিশ আমাকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, এই বৌদি, অমন করে কাঁপছেন কেন? পড়ে যাবেন যে—ঐ দেখুন, দাদা আসছেন গোরাকে নিয়ে।

আগে এসে পড়ে তারপর ঠাণ্ডার চোটে গোরা P. W. D.-র একটা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে আগুন পোয়াচ্ছিল। ওর গোরা গোরা ডাক শুনে সেই ট্রেনের মধ্যে পাওয়া আমার বাঙাল দেশী মা ওকে খুঁজে এনে দিয়েছে। আমার কাছে এসে বুড়ী বলছে তখন—"এই ধর তোমার গৌরাজ রে।" আমি তক্ষুণি তাকে পাঁচটা টাকা দিলাম। ভগবান কখন যে কার দ্বারা কি উপকার করান কিছুই বলা যায় না।

হঠাৎ বিমল হাত পা ছুঁড়ে বিকট চিৎকার করে গেয়ে ওঠে—

"যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।

আসিতে তোমার দ্বারে।"—ওর বেসুরো চিৎকার আবার হাসিয়ে দেয় সকলকে। তুষারপাত বন্ধ হয়ে সোনার বরণ রোদ উঠেছে এতক্ষণে। শুধু শঙ্কর ভারী একটা মজার কথা বলল, ওর ছেলেপুলেদের ও নিশ্চয় বারণ করে দেবে এই পথে আসতে। বেচারী অতি কষ্টে পড়েই কথাটা বলেছিল, কিন্তু আমরা সকলেই হেসে উঠলাম। এরপরও অনেক চড়াই ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠি আমরা। কারণ বারটার সময় মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে।

ওই দেখা যাচ্ছে মন্দিরের চূড়া। এসে গেছি, পৌঁছে গেছি প্রভু তোমার দ্বারে। দাও প্রভু দর্শন দাও। তোমার মোহন মূর্ত্তিখানি দর্শন করে, সব কষ্টের লাঘব করি। নৈবেদ্যের থালা হাতে ওর পাশে পাশে ঢুকলাম মন্দিরে। মস্ত বড় মন্দির। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠলাম। সুন্দর রঙিন কারুকার্য্য করা মন্দিরের গায়। হবে না কেন? ওতো আর ছাইভস্ম মাখা শ্মশানচারী মহাদেবের মন্দির নয়। কেদারেশ্বরের মন্দিরের বিশালত্বে আর বিরাটত্বে আছে একটা প্রাচীর্যের প্রকাশ। আর এই নয়ন বিমোহন শ্যামরায়ের মন্দিরে আছে মন ভোলান রংরসের ছড়াছড়ি। বাৎসল্যে, প্রেমে, সখ্যভাবে, কোনরূপে কমতি আছে এই শ্রীকৃষ্ণে? তাই তাঁর আবাস গৃহ এই মন্দিরেও আছে কারুকলা, ছলা কলার ছড়াছড়ি দুরু দুরু বুকে ভেতরে ঢুকলাম—এবার আমার ভাঁটায় পড়া দেহতরী উজান বেয়ে সার্থকতার পারে এসে নোংগর ফেলেছে।

কিন্তু একি দেখছি আমি? কোথায় সেই নবজলধরশ্যাম? এই মরণ পণ করে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসে একি দেখছি আমি, মূর্ত্তি কোথায়? এ যে সোনা, হীরে, মণি, মুক্তো? সোনার মুকুট? হীরের, কণ্ঠি, মণির মালা আর মুক্তোর সাতনরী? বিগ্রহ কই? দিশেহারা হয়ে একে ওকে ওদের সবাইকে জিজ্ঞেস করি—কি দেখছ? বল তোমরা কি দেখছ? আমার মতই সোনা দেখছ, না তাঁকেও দেখছ। ছলনাময় এ তোমার কেমন ছলনা? একি রহস্য তোমার আমার সংসারী পাপীমনকে তুমি কি এমনি করেই পরীক্ষা করছ প্রভু?

আকুল হয়ে কেঁদে ফেলি। ওরা সান্ত্বনা দেয়, বলে আমরাও তো কেবল সোনা দেখছি—অনেক করে পূজারীকে বলতে তিনি একটা জায়গা নির্দেশ করেন আঙুল দিয়ে। ঐ উৎকট ভীড়ের মধ্যে থেকে কোনরকমে উঁকি মেরে সেইদিকে যেয়ে একটিবার বিদ্যুচ্চমকের মত যেন ছোট্ট একটি শিশুমুখের আভাস পেলাম। মন ভরল না তাতে। শুনলাম রাত্রের শয়ন আরতির সময় পুষ্পাভরণে সজ্জিত হবেন গোপাল। তখন তাঁর আসল মূর্ত্তিটি দেখা যাবে। এখন তিনি রাজবেশ পরেছেন। তাই তাঁর ছোট্ট দেহ একতলা সমান উঁচু অলঙ্কারের বোঝার মধ্যে লুকিয়ে গেছে। ভাল, তবে তাই হবে, সন্ধ্যে বেলাই দেখব আমার রাখালরাজাকে। পুজো শেষে বেরিয়ে এসে দেখি ও ঐ মন্দিরের সেক্রেটারীকে বলে কয়ে সুন্দর একটি ঘর জোগাড় করেছে। ঐ মন্দিরের গায়েই সেই সুন্দর কাঁচের জানলা ঘেরা ঘরটি। দুটি খাটও আছে তাতে। মেঝেটি পুরু কার্পেটে মোড়া। এঁর দয়ায় আমরা মহাপ্রসাদও পেলাম আর পেলাম চারটি ভুটিয়া কম্বল।

চতুর্দিকে বরফ জমে আছে। ঘর থেকে নামতেই বরফ—মন্দিরের চত্বরে বরফ। তবুও বরফের মধ্যেই ওরা গেল ব্রহ্ম কপালে পিণ্ড দিতে। ওখানে ব্রহ্মার কপাল পড়েছে, যেমন গয়ায় আছে চরণ। এই ব্রহ্ম কপালে সবাই পিণ্ড দেয়। কারণ ওখানকার মাহাত্ম্য হল এই যে আত্মা প্রেতযোনি থেকে মুক্ত তো হবেই, উপরন্তু আর কখনও তার জন্মও হবে না। গয়ায় শুধু মুক্তই হয়। আমার শাশুড়ী মারা গেছেন সম্প্রতি। ও গেল তাই মার নামে পিণ্ড দিতে। বিমল আর নবও গেল ওর সঙ্গে। বিমলের বাবা প্রায় বছর দুয়েক আগে মারা গিয়েছেন। [ ক্রমশঃ।

## মনের মালতী

### জয়শ্রী চক্রবর্ত্তী

এতক্ষণে রাত শেষ হতে চলেছে···। শেষ রাতের ঘুমে ঢুলু ঢুলু চাঁদটাও নেতিয়ে পড়ছে। তবু ঘুম এলো না মালতীর চোখে। এমনি করেই পার হচ্ছে রাতগুলো। দু'-চোখে নেশা। তবু চোখের পাতা পড়ে না। মরা মনটাও থামে না। সেই অনেক সাধের জীবনটি একলা বসে কাঁদে। নিরিবিলি রাতটাতে ভাবনা-ভরা মন মালতীর। থৈ পায় না সে। চেনা-জানা ছবিগুলো পা ফেলে ফেলে আসে। কত দিনকার কত কথা। শতটা ব্যথা। সেই অভিমানী মূক হৃদয়টা কাঁদে। বুকের ব্যথা মুখেও এসে কথা কয় না। তবু, বিগত স্মৃতির স্বপ্নছায়াটা এই মরা মনটাকে করে শান্ত। ভালও লাগে। আর সেই মিষ্টি ভাল লাগাটা ঐ স্বপ্ন ছায়ার মধ্যেই ছড়িয়ে থাকে। সোহাগ ধরে না। আবেগে মরে না। কত···রূপ। কত মধুর। মালতী তাকালো।···জানলা ভেঙে···দুষ্ট দু'টি চোখ গুটি গুটি হেঁটে চলে। ঐ পৃথিবী···ঐ আকাশ···ঐ চাঁদের আলোর দেশে। সব ফিরে পেতে সাধ যায়··· ঐ দিকে তাকালে। মালতী হাসলো! রাশি রাশি হাসি ছড়িয়ে পড়লো—কালো রাতের বুকে। ফুলে ফুলে উঠলো সে। মালতী ভাবলো—এত কল্পনাতেও এত সুখ! তবু সে চমকে উঠলো! কি চাইছে সে? অনেক। অনেক কিছু। যা মেটেনি তার। যা তার—এই শুভ্র কলির মত জীবনটাকে ভরাতে পারেনি। সেই অবাক চাওয়ার কাঙালপনা! তন্দ্রা যায়···পালিয়ে।···আশ্চর্য!

যেন্দাও নেই। দুরন্ত আবেগে মালতী সোজা হয়ে বিছানায় বসলো। শ্রান্ত দেহটাতে অদ্ভুত তৃপ্তি।

দূরের আকাশটা কি সুন্দর। সুন্দরী চাঁদ। মুখটেপা মিষ্টি মিষ্টি হাসি যে ভাসিয়ে দিচ্ছে।···কাঁপছে দুরু দুরু বুকে। মুঠো মুঠো আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে···কাশফুলের বনে। মাতাল হাওয়ায়। মালতীর ঘরে। শুধু একা সে। পৃথিবী ঘুমিয়ে। বাক্সের মত ঘুমুচ্ছে···বাড়ীর বাকি মানুষগুলো। এ আধো আঁধার···ও আধো আলো। আলোয় কালোয় সব একাকার। আপনা। মিঠে মিঠে গন্ধ ভাসছে। ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে···মালতীর চার পাশে, ফুলের গন্ধমাখা একটি রাত। রঙিন নিশার নেশা। আর এক রাতের কান্না এখানে এসেছে পা টিপে।···

জীবনের সেই একটি সোহাগের রাত। ভাললাগার রাত। বসন্তের শুরু। গাছে গাছে পাতা। নতুন ফুল। ঘুম ভাঙা কলির চোখ মেলা মুখ। রঙে রসে প্রকৃতি একাকার। ফাল্গুনের মাতাল হাওয়াটা উন্মত্ত নেশায় মত্ত। উৎসব রাতের শেষ প্রহরটা চুপি চুপি জেগে। বাসর শয্যায় মালতী একা নয়, পাশে সুমন্ত। অচেনা মুখ। অজানা অনুভূতি। নতুন আমেজ নতুন স্পর্শ। চাঁদও ছিল আকাশে। ফুল ফুটেছিল অনেক মালতী সেজেছিল নতুন ঢঙে। সলাজ চাউনিতে কেঁপেছিল তার দু' চোখ। হেসেছিল সেই ভাললাগার মনটি।

স্বামী টেনে নিয়েছিল কাছে। কানে কানে ডেকেছিল নতুন নামে। মিষ্টি কথার সুরে। ঝরা ফুলের মত ঝরে পড়েছিল মালতী। দুলে দুলে ঘুমিয়ে পড়েছিল—শেষ বাসর রাতের চাঁদ। হেসে খেলে সে বছরটা ঘুরে এলো আর এক ফাল্গুনে। শ্বেত শিউলী শুভ্র কলির মত আর একবার সাজলে মালতী। লুটিয়ে পড়ে কাঁদলো সে। সুমন্ত ফিরে এলো না। পৃথিবীর বুক ফাটলো। গাছের সব পাতা গেল ঝরে। শূন্য ঘরে মালতী একা। একলা মেয়ে সে। আজও। এমনি করেই কেটে গেছে আর একটা বছর। শত দুঃখের রাত পার হয়ে আসা একটি সাধের জীবন-মরা মন।

একটা মস্ত সংসারের মেয়ে সে। শতটা কোলাহল। মা-বাবা, দাদা-বৌদি···মিতু, মিতুর স্বামী আরও অনেকে। এই মস্ত সংসারের বুকে বইছে—বিশাল আনন্দের ঢেউ। মালতী ওখানে নেই। জায়গাও বুঝি নেই। বহু দূরে সরে আসা—একলা মেয়ে সে। একলা বসেই কাঁদে।

মনে পড়ে আর একটি চির চেনা মুখকে। যে মুখের কথা ভাবতে আজ কেন এতদিন পর ভাল লাগে মালতী তা জানে না। নতুন নেশারী চোখের পাতায় পাতায় দুলতে থাকে সেই মুখ। একটি স্বপ্ন নেশা। কই এমন করে তো কখনও সে দেখেনি মানসকে? কি দেখেছিল কিনা—আজও তা মালতী বুঝতে পারে না। চিরকালই ভীরু লাজুক চোখে সে দেখেছিল··শ্রদ্ধায় ভরা সে মুখ। সে মুখে কোন আকর্ষণ ছিল না। জাগতো না নেশা। কাছে কাছে থাকা। তবু মালতী চায়নি—আজকের মত করে মানসকে ভাবতে। কোথায় যেন ছিল বাধা। উৎকণ্ঠার কাঁটা। আশ্চর্য! আজ সে সব কিছু মনে হয় না। কাঁটা নয়। মালতীর মনে ফুল ফুটেছে। মাতাল গন্ধে শিরায় শিরায় নেশা জেগেছে। সব হারিয়ে সব পাওয়ার পাগলামী। পাগলের চিন্তাটা এই বোবা—নিস্তব্ধ রাতে অস্থি উন্মাদনায় কেঁপে ওঠে।

অনেকদিনের মরে যাওয়া দিনগুলো—সামনে এসে দাঁড়ায়। বসন্ত নয়। শরতের স্বপ্নমাখা একটি সন্ধ্যে। তারও আগে এসেছিল বসন্ত। মালতী বড় হয়েছে। শাড়িটা সবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরতে শিখেছে। লাজুক মন আর ভীরু দুটি চোখ। পা ফেলায় খেলেও কেঁপে ওঠে মালতী। ঝরা ফুল ··· বেণীটা—ঠোঁটের কোণে আর উপচে পড়ে না। শুধু উঁকি মারে। সেই নতুন দেখার নেশায়—মানস অন্ত মানুষ। মায়ের দুটি তার ছড়িয়ে পড়লো···নতুন মালতীর সর্বাঙ্গে। ছোট-মা—হোল মালতীলতা। মন সর্বস্ব মানসের মনের মালতী। ভীরু পায়ে সরে এলো। একরাশ ফুটন্ত ফুল ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিল বাতাসে কেঁদে উঠলো অনেক দূরের পাখীটা।

মাটি ভরা পথ। মিঠে মিঠে গন্ধ। স্বপ্নভরা শরতের সন্ধ্যা ওরা হেঁটে চলেছে দুজনে। মালতী আগে মানস পেছনে। ভরা নিঃশ্বাসের ভারে বাতাস গুমোট, বুক ফাটে মালতীর। কথা ফোটে না। কথা বলে মানস।

—মালু, তোমার কি মন নেই? যদি থাকে, তবে বল আমার দিকে ফিরে তাকাও।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো মনের মালতী। সারা দেহে ব্যথা বুকে কথা। মুখে স্তব্ধতা। সলাজ চাউনিতে কান্না। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে; গাল বেয়ে বুক ভেজে। সব কিছুকে ভাসিয়ে দিয়ে।

কাছে সরে এলো মানস। আরও একবার বললে—কি আশ্চর্য! মন তোমার।

সাঁঝের আকাশে চাঁদের হাসি। পথে বিছানো কলকে ফুলের রাশি। গন্ধভরা বাতাস। সোহাগে ঝরা। আবেগে ভরা। মালতী কাঁদছে ফুলে ফুলে। দুলে দুলে উঠছে তার সর্বাংগ। সব বলার কথা গলায় আটকে থাকে।

মানস বলে—কেঁদো না, কথা বল। আমার দিকে তাকাও, আমি তোমারই। তবু, তুমি কি আমার নও?

—না না, না। মালতী সবেগে সরে দাঁড়ালো। এ হয় না, সব ভুল। আর সবাই বলবেই বা কি? ছিঃ, অমন করে মালতী নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না।

মানস হাসলো বিবর্ণ দাঁতের হাসি।—এত জাতের অহংকার? সমাজের অনুশাসন? ভুলে যেতে পার না? ভেঙে চুরমার করে যদি নাই আসতে পারলে, তবে যাই। আর ডেকো না।

ফিকে আঁধারে মুখ ঢেকে পালালো সে। মুখ লুকোল মালতী। একা একা ফিরে চললো। সারা পথে কান্না ছড়িয়ে দিয়ে, বুকে ব্যথা টেনে টেনে।

ঘরে ঢুকতে মালতীর সারা শরীর কেঁপে উঠলো। লুটিয়ে পড়লো বিছানায়। কান্নায় ভিজে গেল সাজানো শয্যা। রাত কেঁদে কেঁদে শেষ হোল। ভোরের আকাশে অদ্ভুত শান্ততা। আশ্চর্য! শান্ত মালতীর মন। সারাদিন সে ঘুরে-ফিরে বেড়ালো। গুন্ গুন্ করে গান গাইল। সাত সকালে স্নান সেরে, সংসারের ছোটখাটো কাজে মন দিল। কোথাও নেই বিরক্তি।

তার দিন দু'য়েক পর দুপুরে বেড়াতে এলেন মাসীমা। পাশের অনেকগুলো বাড়ী পেরিয়ে ওঁদের বাড়ী। কথা বলতে বলতে মানসের কথা তুললেন তিনি, ক'দিন পরেই ছেলেটা চলে যাবে বিদেশে। ওখানেই থাকবে বলে স্থির করেছে মানস। চাকরীটাও পাকা। আঁচলে চোখ মুছলেন মাসীমা। কখনো ছেলেকে ছেড়ে থাকেননি।

মালতীর মা সান্ত্বনা দিলেন। চুপ করে সব শুনলো মালতী। সরে এলো ঘর থেকে। কান দুটো চেপে ধরলো শক্ত হাতে। তবু অবাধ্য মন, শান্ত হোল না। বারান্দায় বসে খেলছিল মিনুর মেয়েটা। কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে মালতী ডাকলো—আমি যাচ্ছি। মা খোঁজ করলে বলবি—ছবিদের বাড়ী গেছি।

ছুটে নেমে এলো পথে। মিনুর মেয়েটা খেলায় মেতে উঠলো।

কাশফুলের বন পাশে ফেলে—আঁকা বাঁকা মেঠো পথ অনেকটা। ও'পাশে ফণী মনসার ঝোপ। আকন্দ পাতার ঝাড়। এক নিশ্বাসে মালতী চলে এলো সবখানি পথ শেষ করে। দাঁত বের করা একতলা ইটের বাড়ীর বুকে—আশ্চর্য নীরবতা। কই এমন তো কখনো হয়নি? এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো মালতী। শান্ত চোখে আলতো দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সব দিকে। সেই দোলন চাঁপা আর কৃষ্ণচূড়ার গাছ। সেই আকাশ। সেই পৃথিবী। তবু কি নেই নেই। কি যেন সব হয়ে গেল। চোখ ঘষে নিয়ে মালতী এগিয়ে গেল। কত চেনা এই বাড়ীর সব কিছু।—এইখানেই তো কতদিন, মানস তার সংগে দুষ্টুমী করেছে। পেছন থেকে চোখ টিপে ধরেছে। দোপাটি ফুলের তাল ছুঁড়ে দিয়েছে তার গায়ে। কেঁদে কেঁদে নালিশ করেছে মালতী। মাসীমা বকেছেন ছেলেকে। মানস মুখ টিপে টিপে হেসেছে। মজাও পেয়েছে।

মালতী চলে এলো সেই ঘরটাতে। অনেক চেনা আর জানা। খাটের বিছানায় শুয়ে একা একা এ'পাশ—ও'পাশ করছিল মানস। পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকিয়ে থমকে গেল। মালতী খুব কাছে এগিয়ে গেল। থমথমে চোখে তাকিয়ে রইলো মানসের দিকে। ঘরে মৃত্যুর নীরবতা। বাতাস নেই কোথাও। অসহ্য গুমোট। মালতী ধরা গলায় বললো—সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছে মানুদা?

মানস তাকালো। আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মায়া মমতার ছিটে ফোঁটা নেই। দৃঢ়স্বরেই বুঝি সে জবাব দিল—হ্যাঁ যাব বৈকি! যেতেও হবে আমাকে।

আর কিছু নয়। মালতী সরে এলো। অভিমানে দুজনেই চোখ ফেরালো। আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে—মালতী ছুটে এলো পথে। ছুটে ছুটেই বাড়ী ফিরলো। আর শেষ দেখা সেদিন থেকে।

মানস চলে গেল বিদেশে। এর মধ্যেই মালতীর জীবনে সব ঘটে গেল। বিয়ে হোল। ফুলও ঝরলো। ঝরা ফুল মালতী একা। চার বছর কেটেছে তার পর থেকে। বিদেশ থেকে কখনো কখনো আসে মানস। মালতীর সংগে দেখা হয় না। মাসীমা আসেন এখনও। আগের মতন তেমন নয়। অসুখে ভোগেন প্রায়।

ছেলের বিয়ে দিয়ে এবার নিশ্চিন্ত হতে চান। মেয়ে খুঁজছেন শহর পর্যন্ত। মা সেদিন ওদের বাড়ী থেকে ঘুরে এসে সেই সব গল্পই করছিলেন। শুনছিল বাড়ীর সকলে। দাদা বৌদি, মিনু—মিনুর মেয়েটাও। দূরে মালতী। কাছে আসতে পারে না। সব কথা শুনতেও চায় না। তবু শোনার জন্যেই সে কান পেতে থাকে আড়ালে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বুঝি দম বেরিয়ে আসতে চায়। ছুটে চলে আসে নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে নিজেকে শান্ত করে দেয়।

ক'দিন পর খবর এলো ও'বাড়ী থেকে। মানসের বিয়ে ঠিক, সব পাকাপাকি। ছুটি নিয়ে আসছে সে বিয়ে করতে। এ' বাড়ীতেও আনন্দের সোরগোল, কত দিনের কত মেলা মেশা দু'বাড়ীর। সুখে দুঃখে কোথাও অমিল নেই। এত আনন্দের মাঝেই—মানস এলো বিদেশ থেকে সকলে ঘিরে ধরলো তাকে। কতদিনের কত চেনাজানা মানুষগুলো। এ বাড়ীর সকলেও। মা, মালতী নয়। সে একা। আর সেই একাকে জড়িয়ে ধরে—কাঁদছে—তার অভিমানী হৃদয়টা। হঠাৎ কি মনে হোল মালতীর। ছোট চিরকুটে লিখলো ক'টি কথা। যে কথা কখনো মালতী বলেনি। বলতে চায়নি। আশ্চর্য, মালতী আবার অভিমানে মুখ ফেরালে। চার বছরের অভিমানহত হৃদয়টা—এতদিনেও শান্ত হতে পারল না। চিরকুটটা ছিঁড়ে কুচিয়ে দিল জানলার বাইরে। ভেসে গেল—বাতাসের স্রোতে মালতীর জীবনের মতই। ঘনিয়ে এলো—সন্ধ্যের মায়া মাখা অন্ধকারটা। আস্তে আস্তে ছেয়ে ফেললো—ওদের ছোট বাড়ীটাকে। মালতীর ঘরে।

মা এলেন, ও বাড়ী থেকে। সেই দুপুরে গিয়েছিলেন—এলেন সন্ধ্যের পরে। মানসের ভাবী বৌয়ের গল্পে মা মেতে উঠলেন। রূপে গুণে এমন মেয়ের নাকি জোড়া মেলে না। যদিও তাঁরও শোনা কথা। তবু এই সব শোনা কথা—কত সুন্দর করে—গুছিয়ে সাজিয়ে তিনি বলে চললেন আর সে সব রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগলো—বাড়ীর কাক পক্ষীটা অবধি। না, মালতী নয়। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে সরে এসেছে কখন। ওরা দেখতে পায়নি। মালতী একাই অনুভব করলো—কি আশ্চর্য এক চেতনা। চাপা কান্নাটা উচ্ছ্বসিত আবেগে ফেটে পড়তে চাইল।

না, কাঁদেনি। সেদিনও রাত ভোর হোল। রাত শেষের চাঁদও মরে গেল। আশ্চর্য মালতীর চোখে ঘুম এলো না। সকালের মিঠে রোদটা জানলায় উঁকি মারলে এসে—মালতীর সংগে চোখো-চোখি হয়ে—হেসে গড়িয়ে পড়লো—সারা ঘরখানাতে। মালতী হাসলো। বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ালো—বড় আয়নাটার সামনে, চমকে উঠলো আজও মালতী। এত রূপ যেন—সাদা সাজেও ঢাকা পড়তে চায় না। শিথিল কবরী খসে—বেণীটা লুটিয়ে পড়েছে শীর্ণ কটিতটে। গায়ের রং আরও একটু খুলেছে বলেই মালতীর মনে হোল, এত ফর্সা কি সে ছিল? সিঁথিটাও অদ্ভুত সাদা দেখাচ্ছে, মুখ থেকেও সরে যায়নি আগের সৌন্দর্য। শুধু ক্লান্তির কালো ক'টি রেখা পড়েছে আয়ত দু'চোখের কোলে। ও' কিছু নয়। আঁচলের খুঁটে মালতী চোখ মুছে নিলে। সব আছে। সব ঠিক। এমন কি মনটাও। যেটার কথা বলতো মানস। (মালু তোমার কি মন নেই কিছুই বুঝতে পার না?) হ্যাঁ, আজ সব বুঝতে পারে মালতী। মানস যদি এখুনি ঠিক এমনি সময়ে এসে দাঁড়াতো পাশটিতে—তাহলে সে নিশ্চয় বোঝাতে পারতো কত সাধ ছিল এই মনে। কত রূপ এই দেহের কানায় কানায়। মালতীর নিজের

চোখেও অসহ্য লাগে। সরে এলো আয়নার সামনে থেকে। সারা দেহে গুছিয়ে নিল, মাটিতে লুটিয়ে পড়া কাপড়খানা। দরজা খুলে আস্তে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বারান্দায় বসে—বৌদির কোলের ছেলেটা গলা ফাটিয়ে কাঁদছে। মালতী তুলে নিলে ছেলেটাকে। পরে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলো—বৌদি তুতু কাঁদছে—ওর খাবার হয়েছে কি?

উনুন থেকে গরম দুধ নাবাতে নাবাতে বৌদি জবাব দিল—হয়েছে ঠাকুরঝি।

এগিয়ে এসে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলে বৌদি। পরে মালতীর দিকে চেয়ে বললো—চটপট কাপড় ছেড়ে নাও ঠাকুরঝি মা ও-বাড়ী গেছেন। কাজ রয়েছে অনেক।

মালতী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আজই তো মানসের বিয়ে। মা এই কদিনই ও বাড়ীর কাজের চাপে ব্যস্ত। মালতী তাড়াতাড়ি চলে গেল—বাসি পাট সারতে। তারই খানিক পরে ফিরে এসে সে বসলো রান্নাঘরে। কাজ করতে করতেই ননদভাজের গল্প চললো। তুচ্ছ হাসি তামাসার কথা। বৌদিই বেশী বলে। মালতী মুখ টিপে টিপে হাসে। মন খোলা হাসিটা হারিয়ে গেছে। মরা মনটা সহজ হতে পারে না।

মিতু এলো ও' বাড়ী থেকে। হাসিখুসী মুখে ঘরে ঢুকলো। নতুন কাপড়খানা সে পরে নিলে। তোলা গয়নাগুলোও। উৎসব বাড়ীতে সাদাসিধে সাজে মানায় না। একটু নতুন করে সাজলো মিতু। মালতী চেয়ে চেয়ে দেখলো।

তাকালো সে নিজের দিকে। এত সাদা সাজে কি তাকেও মানায়? দু'-চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মালতী নিজেকে সামলে নিলে। মিতু চলে গেল। সমস্ত বাড়ীতে এক মুঠো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে।

বিকেলে ডাক পড়লো বৌদির, মানসকে সাজাতে হবে। তা' ছাড়া শুভ কাজে সধবাদেরই আগে ডাক পড়ে। মালতী আগে ভাগে পাঠিয়ে দিল তাই বৌদিকে। আরও আগে গেছে—বাড়ীর বাকি সব।

শূন্য বাড়ী। মালতী একা। মন ফাঁকা! গোটা দুনিয়াটাই বুঝি আজ তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কেউ নেই। এমন সময়ে কেউ একটু পাশে এসে দাঁড়ায়। এই মরা মনটাকে একটু সোহাগে ভিজিয়ে দেবার মত—মালতীর সেই মনের মানুষটাও আজ নেই। সেই বসন্তরাঙা ফাল্গুনের—ছবিটাও ফিকে হয়ে গেছে। শুধু রক্তঝরা ক্ষতের মত জ্বলে রয়েছে··শরতের একটি সন্ধ্যে একটি ব্যথা! হলুদ ছাওয়া—কল্কেফুলের বন ভেঙে সেদিন যে চলে গিয়েছিল—আর সে ফিরে আসবে না মালতীর জীবনে। মনের মালতীর মন নেই। মন সর্বস্ব মানস তাই আনতে চলেছে মনের মানুষ। তবু মনহীন মনের মালতীর দু'চোখ ঝাপ্সা হয়ে ওঠে। মন মরে কেঁদে।

কেঁদে কেঁদেই এলো আজকের সন্ধ্যেটা। কেমন ছেঁড়া ছেঁড়া মন নিয়ে। ভিজে ভিজে চোখে। ছোট বাড়ীটাতে নিঃশ্বাসও পড়ে না। শাঁখ বাজিয়ে মালতী ঘরে এলো। মন তার মানে না। মনমাতাল মেয়ে—তাকালো, মেঘভাসা হাসি হাসি আকাশটার দিকে। টিপ টিপ করে জ্বলছে তারার আলো! অসংখ্য—অগুণতি। মাধবীলতার গাছটা গোটা পাঁচিলটাকে ছেয়ে ফেলেছে। মিষ্টিফুলের গন্ধ! গন্ধে মাতাল মগ্ন-রাত। ক্রমশঃই রাত চুলছে! অস্থির নেশা জড়ানো তন্দ্রা!

ওরা সকলে বাড়ী ফিরেছে। এক সময় দরজা খুলে দিয়ে—মালতী আবার এসেছে ঘরে। শক্ত করে খিল এঁটে দিয়েছে দরজায়। ঘরের আলোটা জ্বালা। মালতীর শূন্য ঘরে আজ এসেছে একটি সোহাগের রাত। সাদা ফুলের মত বিছানায় ঝরে পড়লো মালতী। দু'চোখে তন্দ্রালু আবেশ। সোনা ঝরা রাতে সোনালী স্বপ্ন আসে নেবে।

মালতী সাজলো। অনেক দিনের তুলে রাখা গয়না আর বেনারসী শাড়ীতে ঝলমলিয়ে উঠলো সে। মন সর্বস্ব মানস আজ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখুক—কত মনের ঘটা এই মেয়েটার।

ইস মুখ যে ফিরিয়ে রইলে?···আর বুঝি কিছু জানতে ইচ্ছে করে না? মন পাগলের মনের কি ছিরিই না হয়েছে! ওকি! চলে যাচ্ছো যে ভারি? যেও না লক্ষ্মীটি! আজ আমার যে বাসর রাত। দেখছো না—আমি ক-ত সেজেছি! বিশ্বাস কর স-ব তোমার জন্যে। ঠিক তোমার মনের মতনটি হয়েছি। কাছে এসো। তোমাকেও সাজিয়ে দিই। কি সুন্দর দেখাচ্ছে বলতো? আর দেরী নয় কিন্তু··· না, আলোটা জ্বলুক! অন্ধকার ভয় করে! কি সুন্দর মিষ্টি স্পর্শ বলতো তোমার? আমি কি ছাই আগে জানতাম? চেয়ে দেখো কি সুন্দর ওই আকাশ কত আলো এই বাসর ঘরে। কত ভাল লাগা এই মনে। ওকি! তুমি কাঁদছো? এখনও বুঝি অভিমান যায়নি? ছিঃ অমন কোর না। এমন সময় মুখ ফিরিয়ে থাকতে নেই। হাসতে হয়। খু-উ-ব কাছে আসতে হয়। নইলে···সব আলো নিভে যাবে। সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার আসবে ঘিরে। তুমি হারিয়ে যাবে···। মনের মালতী মরে যাবে···।

ওগো! তুমি অমন করে চলে যেও না।···চলে গেলে তু-মি? উঃ ভগবান! এত অন্ধকার···?

বন্ধ দরজার বুকে আর্তনাদ উঠলো! ধাক্কা দিয়ে চলেছে মিতু। মালতীর ঘুম ভাঙলো! দরজা খুলে দিতে মিতু বললো—এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছো? মানুদা বৌ নিয়ে এসেছে দেখবে চল।

মালতী চোখ রগড়ে নিলে। সব কেমন আবছা! বাসর রাতের অন্ধকার কি কাটেনি?

## এ্যাকসিডেণ্ট

### আইভি রাহা

সমস্ত বাড়ীটা কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা বোবা কান্না যেন থমকে আছে বাড়ীটাকে ঘিরে। কোথা যে কি হোয়ে গেল। অপরাধ কারো নয়। এটা একটা দুর্ঘটনা; কিন্তু তবু একটা অপরাধ বোধের যন্ত্রণা সবার মনকেই নাড়া দিয়ে যাচ্ছে।

দিনের চিতা বুঝি নিভে এলো। সন্ধ্যার আবছা ওড়না ছড়িয়ে পড়ছে দিনের সবটুকু আলোকে ঘিরে।

না—এখনও থামেনি চন্দ্রার কান্না। সেই সকাল থেকে মেয়েটা কাঁদছে। বাবার ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে। শোকাহত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে বার বার। মা, ঠাকুমা, দাদারা কেউ পারেনি থামাতে ওর কান্না। মা অনেক বোঝালেন। ওর মাথার

খোকা খোকা রেশমের মত চুলগুলোও হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন অনেক। কিন্তু চন্দ্রা শুনলো না কোন কথা। সকাল থেকে উঠলো না; কিছু খেলো না।

কে জানতো মেয়েটা এমন ভাবে ভেঙে পড়বে! এ বাড়ীর ছোট মেয়ে চন্দ্রা। বাবা আর ঠাকুমার অনেক আদরের। কাউকে ও ও মানে না। কারো কথা শোনেও না। তাই মা বোঝাতে এসে হার মানলেন। বিরক্ত হলেন দাদারা। চন্দ্রার সেই এক কথা—"আমার খোকনকে তোমরা ফিরিয়ে এনে দাও।"

কিন্তু কে ওকে বোঝাবে, যে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। কত আশা আর আনন্দের স্বপ্ন নিয়েই না ভোর হয়েছিলো আজকের। সামনে পূজো। খুসীর আমেজ লেগেছে সবার মনে। মা আর দাদারা দোকান ঘুরে নিয়ে আসে নতুন জামা কাপড়ের স্তূপ। মাঝে মাঝে চন্দ্রাও যায় ওদের সঙ্গে। বেশ কাটে দিনগুলো।

বেলা তখন অনেক। বাবা আর কাকা গেছেন অফিসে। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে নীচে আসছিল চন্দ্রা; খোকনকে নিয়ে। হঠাৎ কি যে হোল? পা পিছলে একেবারে নীচের সিঁড়ির ধাপে এসে ঠেকলো ওদের শরীর দুটো।

মা, দাদারা, ঠাকুমা ছুটে এলেন। সকলেই ব্যস্ত হলেন চন্দ্রাকে নিয়ে। কিন্তু খোকন? তার কি হোল? চন্দ্রা নিজের আঘাত ভুলে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো খোকনের ক্ষত বিক্ষত ছোট্ট শরীরটা। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে নাড়া দিলো। চীৎকার করে ডাকলো 'খোকন'—।

যে সুন্দর দুষ্টু দুষ্টু চোখ দুটো দিয়ে খোকন চেয়ে থাকতো চন্দ্রার দিকে। চন্দ্রা পাশে নিয়ে শুলে যে চোখ দুটো চুপ করে বুজিয়ে রাখতো; সেই চোখ আর খোকন খুললো না! চন্দ্রার সব ডাক ব্যর্থ করে দিয়ে ও চিরদিনের মত হোল নিশ্চুপ। খোকনের ছোট্ট শরীরটার ওপর এসে পড়েছিলো চন্দ্রার ভারি দেহটা। তাই খোকনের ছোট ছোট হাত পা গুলো ভেঙে গুড়িয়ে যেতে একটুও দেরী হয়নি। চন্দ্রার ক্ষোভ, মা আর ঠাকুমা খোকনকে না দেখে আগে ওকে তুলতে গেলো কেন?

বাবা বাড়ী এসে শুনলেন সব। চন্দ্রার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আস্তে হাত রাখলেন মাথার ওপর। চন্দ্রা বাবাকে দেখে ফুঁপিয়ে উঠলো। বাবা ওকে শান্ত করার একটুও চেষ্টা করলেন না। জানেন সে চেষ্টা বৃথা। বেরিয়ে গেলেন গম্ভীর হয়ে।

ফিরলেন অনেক রাতে। তখন চন্দ্রার সারা দিনের ক্লান্ত শরীর-টায় নেমে এসেছে ঘুমের ঢল।

বাবা অনেক দোকান ঘুরে কিনে আনা নতুম পুতুলটা শুইয়ে দিলেন চন্দ্রার পাশে। এটাও ঠিক খোকনের মত দেখতে। ঠিক খোকনের মত শোয়ালে চোখ বোজে আর তুললেই চোখ দু'টো মেলে ধরে।

পাঁচ বছরের ছোট্ট চন্দ্রা নিত্য দিনের মত ঘুমন্ত হাতখানি রাখে নতুন খোকনের গায়। বাবার মুখে হাসি ফোটে। হাঁফ ছাড়েন মা আর ঠাকুমা।

## নির্জ্জন স্মৃতি

শ্রীইলা দত্তচৌধুরী

সেই সুরকী ঢালা পথ।
মনে পড়ে, পাহাড়ী সহরের—
একটা নির্জ্জন টিলা ঘেরা,
আঁকা বাঁকা তার সর্পিল গতি।
দু'দিক থেকে পাইনের শান্ত ছায়া
আর নিবিড় ইউক্লিপটাসের ফাঁকে ফাঁকে,
সোনালী রোদ আর রূপোলি মেঘের—
ঝিকিমিকি লুকোচুরি খেলা।

এই বোবা পথটাও—
দশটা পাঁচটায় হয়েছে মুখর।
অফিসযাত্রীদের ব্যস্ততার সাথে,
সে ছিল এ পথের নিত্য সহচর।
আমার উৎকণ্ঠী মন খুঁজেছে—
সে সুন্দরকে সকাল সন্ধ্যায়।
যৌবনের কোমল পাপড়ি মেলেছে যার ধারে,
সেই সহস্র স্মৃতি বিজড়িত পথ—
আজো আমার সত্তায় আছে মিশে।

## আবর্ত্ত

শ্রীমতী বসু

কোন দিন কোন ক্ষণে
কোন এক বিস্মৃত লগনে,
রূপ নিয়েছিল এ আমার
কেহ নাহি জানে।

কোন দিন কোন পথে,
কোন এক অরূপ আলোতে,
মোর আমি যাবে যে মিলাতে,
কেহ কি তা জানে?

শুধু এই জানি,—
অলক্ষ্যের এক হাতছানি
মোরে ডাকে বারে বারে
তবু নাহি পারে
ধরিয়া রাখিতে কভু টানি।

আবর্ত্তের বিরাট চাকায়
বাঁধা ছন্দে আসে আর যায়,
আদি নাই, অন্ত নাই, লয় নাই তার
যায় আমি, আসে আমি শুধু বারে বার
এ এক বিরাট রূপ অক্ষয় আমার।

## খেতে হবে—কতটুকু ?

বাঁচবার জন্যে নিয়মিত খেতে হবে এবং সুষম খাদ্য খেতে হবে, এই নিয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু, একটি প্রশ্ন এর পরও যে-টি থেকে যায়, কতটুকু খেতে হবে আর সকলের জন্যেই খাওয়ার একই নিয়ম চলতে পারে কি না। এর প্রাথমিক সহজ উত্তর : সকলেরই এক রকম খাদ্য-ব্যবস্থা হতে পারে না, তবে একটি বিধি প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলা চলে, সুস্থ ভাবে দীর্ঘদিন বাঁচতে হলে সহজপাচ্য পরিমিত খাদ্য খাওয়া চাই আর সেইটি নিশ্চয়ই নিয়ম রক্ষা করে। সময়ের খাদ্য সময়ে খাওয়া একটি বড় জিনিস, যেমন বড় জিনিস হলো আগাগোড়া ঐ পরিমিত খাদ্য গ্রহণ।

কে কতটুকু খাবে, কার পক্ষে কতটুকু খাদ্য না হলে হতে পারে না, এ স্থির করা কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও খাদ্যের পরিমাণ নিজের মনে স্থির করে নিতেই হবে, কেন—এর উত্তরে আবারও বলতে হয়, যে বাঁচবারই জন্যে, নিরাময় দীর্ঘায়ু লাভের প্রত্যাশায়। চলতি কথায় বলা হয়—খাও, দাও, আনন্দ কর। কিন্তু যখন তখন যদৃচ্ছা খেয়ে চললে শেষ অবধি টাল সামলানো যায় না, এই নিয়ে পরীক্ষাই নিষ্প্রয়োজন। বাঁচবার জন্যে খাওয়া কি খাওয়ার জন্যে বাঁচা—এই প্রশ্নটিও অনেক সময় হেঁয়ালিস্বরূপ ঠেকে। অথচ ভেবে দেখলে দেখা যাবে—দুই-এর কোনটিই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার জো নেই, পরন্তু দুই-ই সম ভাবে গ্রাহ্য। মোট কথা, খাদ্য গ্রহণের প্রশ্নটি সকল মানুষের বেলাতেই নিজ নিজ বিচার বিবেচনা তথা মন ও রুচির উপর নির্ভর করছে।

সংসারে নানা ধরণের লোক দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কৃশকায়, কেউ মোটা, কেউ বা মাঝারি ধরণের। সকল মানুষেরই দৈহিক ওজনও এক থাকে না—অনেকে স্বাভাবিক ওজনবিশিষ্ট, আবার অনেকের ওজন স্বাভাবিক পর্যায় অপেক্ষা কম, অনেকের বেশীও বটে। আজকের জগতে বিশেষত: আমাদের এই ভারতে সাধারণ মানুষ কতটুকু খেতে পায়? পরিমিত সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য অনেকের ভাগ্যেই এদিনে জুটে না। ফলে এই দাঁড়ায় যে, দেহ কাঠামোগুলো আশানুরূপ মজবুত হওয়া দূরে থাক, অকালেই ভেঙে পড়ে। হিসাব করলে দেখাও যাবে তাই, মেদবহুল লোকের চেয়ে রোগাদের সংখ্যাই এখন বেশি। বলতে গেলে সব দেশেই আবশ্যক পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রপীড়িত। অনুন্নত জীবনযাত্রার মান বহু ক্ষেত্রে স্পষ্টত: বিদ্যমান—যার ছাপ দেহের ওপর একদিন পড়বেই।

পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য যদি না পাওয়া গেল, তা হলে ভয়ঙ্কর রোগ দেখা দিবার আশঙ্কা থেকে যায়। টি-বি বা যক্ষ্মার মতো বড় বড় ব্যাধি দেহ-কাঠামোতে অনুপ্রবেশের সুযোগ খুঁজে প্রধানতঃ এই পথ ধরেই। চর্বিযুক্ত বা মেদবিশিষ্ট লোকেরা এই দিক থেকে বরং কিছুটা নিরাপদ। তবে মেদবহুল লোকদের চেয়ে স্বভাবতঃই যারা কৃশ, তাদের মৃত্যুহার নাকি অনেক কম, নমুনা পর্যবেক্ষণের ফলাফল দেখেই বিশেষজ্ঞরা এইরূপ বলতে চেয়েছেন। অতিমাত্র মুটিয়ে গেলে শরীরে কতকগুলো বিশেষ দুরারোগ্য রোগ সূচিত হবার আশঙ্কা থাকে, চলতে-ফিরতে খেতে শুতে অসুবিধা তো রয়েছেই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এর ভিতর জীবনবীমাকারীদের (রোগা-মোটা সকলেরই) পরমায়ু সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা চালানো হয়। তাতে নাকি এই জিনিসই দেখতে পাওয়া গেছে—শীর্ণকায় অথচ দৃঢ় কাঠামোর লোকেরা সাধারণতঃ অনূন ৬০ বছর বয়স অবধি বাঁচতে পারছেন। এই শ্রেণীর প্রতি দশ জনের মধ্যে তিন জনেরই নাকি আটের কোঠায় যেয়ে জীবন শেষ হচ্ছে। অপর দিকে ৩০ বছর বয়সেই অত্যধিক মুটিয়ে গেছেন, গড়পড়তা এমন ১০ জন লোকের মধ্যে ৮০ বছরে পদার্পণের আশা রাখতে পারেন নাকি একজন মাত্র।

ওজন মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায় কেন, এই প্রশ্নটি তুললে প্রথম উত্তরই হবে—খুব বেশিরকম খাওয়া অর্থাৎ শরীর রক্ষা বা পুষ্টির জন্য যে পরিমিত খাদ্য চাই, তার চেয়ে বরাবরই অধিক খেয়ে চলা। শরীর-বিজ্ঞানী বা চিকিৎসকরা সকলকেই এই দিকটায় বিশেষ হুঁসিয়ারী দিয়ে থাকেন। দেহে শক্তি সঞ্চারের জন্য খাদ্য যথেষ্ট গ্রহণ করলেই হবে না, বাড়তি খাদ্যটা সত্যি যাবে কোথায়? বাড়তি চর্বি বা মেদ এই থেকেই তৈরী হতে থাকবে—শরীরের অভ্যন্তর থেকে ওটা অমনি বের করে দেওয়া কঠিন ব্যাপার।

স্বাস্থ্যবিধিতে খাদ্য প্রসঙ্গে বহুমূল্যবান নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কত সংখ্যক লোক সেই সব নির্দেশ বা কানুন মেনে নিয়ে তবে খাদ্য গ্রহণ করেন? সর্বোপরি খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নটি তো রয়েছেই—যার দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকা চাই প্রতিক্ষণে। ভেবেচিন্তে কেউ নিজে এই স্থির না করতে পারলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পদক্ষেপ করাই হবে শ্রেয়। গোড়াতেই বলতে চাওয়া হলো—সকল মানুষের জন্য একটি খাদ্য-তালিকা বেঁধে দেওয়া চলে না। কায়িক শ্রম যারা করবেন, তাদের একটু বেশি পরিমাণ খেতে হবে বৈ কি! কিন্তু যে-সব নারী বা পুরুষ শুধু মানসিক কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত, তাদের খাদ্য হবে ভিন্ন ধরণের, খাদ্যের পরিমাণও হবে স্বতন্ত্র অর্থাৎ কম। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যারা মাত্রায় অধিক খাওয়ার জন্য লুব্ধ হবেন, তাদের নিয়ম করে পাশাপাশি শরীর চর্চাটিও না করে গেলে নয়।

সোজা কথায়—প্রয়োজনের চেয়ে কম খাওয়া বা বেশি খাওয়া কোনটিই চলতে পারে না—বাছাই করে পরিমিত খাদ্য গ্রহণের জন্যেই মনে তাগিদ থাকা আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে নাদুস-নুদুস স্ফীতকায় লোকদের একটু সম্মানের চোখে দেখা হয়। ধ'রে নেওয়া হয় যে, বাড়তি চর্বিটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ—জীবনে সাফল্যের পরিচায়ক। কিন্তু চিকিৎসক বা শরীর-বিজ্ঞানীদের শরণাপন্ন হলে এই কথাই শুনতে হবে যে, স্থূলতা সভ্যতার একটি বড় ব্যাধি। বেশ ভেবেচিন্তে নিয়ম করে পরিমিত খাদ্য গ্রহণের দিকে ঝোঁক থাকাই সর্বোপরি মঙ্গল বলে জানতে হবে।

## পণ্য উৎপাদন ও বাজার দর

মানুষের শ্রম, অর্থ ও ব্যবস্থাপনায় যে-কোন পণ্যই উৎপাদিত হোক, তার বাজার দর কি হলো না হলো, সেটাই বড় কথা। কৃষি পণ্য বা শিল্পজাত পণ্য—সকল ক্ষেত্রেই কয়েকটি সূত্র ধরে পণ্য মূল্য নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। পণ্য উৎপাদনের পর পণ্যের উপযুক্ত দাম যেখানে পাওয়া গেলো, সেখানে সাধারণতঃ কোন প্রশ্ন ওঠে না। উৎপাদিত পণ্যের বাজার না পেলেই কিংবা বাজার দর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কমতি হয়ে পড়লেই যত গোলযোগ।

যে-কোন ব্যবসায়ী বা উদ্যোগী সংস্থাকেই উৎপাদনের পরিকল্পনা-কালে কয়েকটি জিনিস না ভাবলে নয়। উৎপাদিত পণ্য বা শিল্প শেষ অবধি বাজারে হাজির হলে তার কাটতি কি পরিমাণ হবে এবং কতটা দ্রুত, সর্ব্বোপরি এসকল হবে বিশেষ বিবেচ্য। সাধারণ অবস্থায় সরবরাহ ও চাহিদা বিষয়ক অর্থনৈতিক সূত্রটি ধরেই বাজার দর নিরূপিত হয়ে থাকে। বাজার যতটা ব্যাপকতর পাওয়া যাবে, বিনিয়োগকৃত মূলধন ঘরে ফিরে আসবে সেই অনুপাতেই, এমনি আশা রাখা চলে। অত্যাবশ্যক পণ্যের চাহিদা মোটামুটি অব্যাহত থাকে বলে এর বাজার দর যতটা হবে, অত্যাবশ্যক নয়, এমন পণ্যের দাম সেই পরিমাণে না হওয়াই স্বাভাবিক। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়—যে জিনিস ক্ষয়িষ্ণু ও অল্পসময় স্থায়ী, তার বাজার বড় হয় না, আবার উৎপাদিত পণ্যের স্থানান্তরকরণের সুবিধা যেখানে থাকবে না, সেখানেও বাজার সম্প্রসারিত করা কঠিন। সহজ কথায় একাধিক বিষয়ের ওপর বাজারের আয়তনবৃদ্ধির গুরুত্ববহুল প্রশ্নটি নির্ভর করে।

গোড়াতেই যে-কথাটি বলা হলো—জিনিসের দাম বা পণ্যের বাজার দর মূলতঃ তার চাহিদা ও যোগান দ্বারাই নির্ণীত হয়। একসময় ধনবিজ্ঞানীরাও মনে করতেন যে, উৎপাদনের ব্যয়ের ওপরই বাজার দর স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়—এ সম্পূর্ণ ঠিক নহে; দ্রব্যমূল্য নির্দ্ধারণে চাহিদা, সরবরাহ এবং সেই সঙ্গে পণ্যের উপযোগিতা এই কয়টি প্রশ্নের প্রভাবই বেশি। সেইজন্যে অবশ্য এ-ও বলা চলবে না যে, উৎপাদনের ব্যয় কোন ভাবেই পণ্য মূল্যকে প্রভাবিত করে না। বাজার দর নিরূপণের বেলায় এই জিনিসটিকেও বিবেচনার মধ্যে রাখতেই হবে। বাজারে পণ্য নিয়ে হাজির হলেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার বহুল সম্ভাবনা থেকে যায়। জিনিসের মূল্য নির্দ্ধারণে এই প্রতিযোগিতার প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলে চলবে না। আলোচ্য ব্যাপারে সময়েরও যে একটি প্রভাব বা গুরুত্ব রয়েছে, তাও যথার্থ মেনে নেবার।

উৎপাদনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া থেকে পণ্যের বাজার পাওয়ার বিষয়টি আলাদা করে দেখবার নয়। দুইএর মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, সেইটি যতই স্পষ্ট, ততই গুরুত্ববহুল। একটি পণ্যের উৎপাদন তখনই সম্পূর্ণ হলো বুঝতে হবে, যখন উহা কোন ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর হাতে যেয়ে পড়লো। অর্থাৎ বাজার দরটি ঠিকভাবে নিরূপিত হয়ে মূল্য আদায় হয়ে আসলেই উৎপাদনের সার্থকতা। আজকের দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য বাজার বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের যে সুযোগ হয়েছে বছর পঞ্চাশেক পূর্ব্বেও সেইটি এইভাবে ছিল না। তখনকার বাজার ছিল বলতে গেলে নিতান্ত স্থানীয় ও সীমিত। এখানে একটি অভিনব মান ও উপযোগিতাসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করলে অল্প সময়ের ভিতর যে পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে পাওয়া যেতে পারে, আগের দিনে সে সম্ভাবনা ছিল কোথায়?

উৎপাদন শেষে পণ্যের উপযুক্ত বাজার দর পেতে হলে শিল্পো-দ্যোগীকে আগে থেকেই কতকগুলো জিনিস ভাবতে হয়। অগ্রসর দেশগুলোতে জীবন-যাত্রার মান বেড়ে যাওয়ায় মানুষ অত্যাবশ্যক পণ্য ছাড়াও শখ ও রুচিমাফিক নানা পণ্য ক্রয় করছে। এতে নিত্য-নূতন উৎপাদনের উদ্যম-উৎসাহ স্বতঃই না জুটে পারে না। বিস্তৃত বাজার পাওয়ার জন্যে বিজ্ঞাপন মারফৎ বা অন্য ভাবে প্রচার অভিযানের গুরুত্বও আজকের দিনে সমধিক স্বীকার্য্য। ক্রেতা ও বিক্রেতার মিলনক্ষেত্র হলো বাজার—উৎপাদিত পণ্য বা শিল্প-সামগ্রীর মূল্য শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের দর কষাকষির দ্বারাই নির্ণীত হয়ে থাকে, এ বলা বাহুল্য।

## পল্লীঅঞ্চলে কর্ম্মসংস্থান

দেশে জনবল বা লোকসংখ্যা যে-হারে বেড়ে চলেছে, সেই অনুপাতে নিশ্চয়ই কর্ম্মসংস্থান বাড়েনি বা বাড়ছে না। অথচ নতুন নতুন মানুষের জন্যে নতুন নতুন কর্ম্মসংস্থান না হলে নয়। দারিদ্র্য ও বেকারীর অভিশাপ থেকে ভারতকে যদি মুক্তি পেতে হয়, সেক্ষেত্রে সকলের আগেই চাই উপযুক্ত কর্মসংস্থান। শুধু সহরেই এই ব্যবস্থা হলে চলবে না, পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে হবে।

একথা ঠিক, ভারতের যে-দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে, সেগুলোতে নূতন কর্ম্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্বই দেওয়া ছিল। কিন্তু এই দিকটায় নির্দ্ধারিত লক্ষ্য পূরণ হয়েছে, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে যে-পরিমাণে শিল্প-সংস্থা ( কি বৃহৎ কি হাল্কা ) হওয়া উচিত ছিল, সে এখন অবধি হয়নি। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ বছর তিন আগেই এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, তৃতীয় যোজনায় সাধারণ উন্নয়ন সূচীর মাধ্যমে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তো করতেই হবে, পরন্তু পল্লী অঞ্চলসমূহে কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনা রচনাকালেও উন্নয়ন পরিষদের এই বক্তব্যটির ওপর নজর রাখা হয়, তা অবশ্য আশার কথা।

লক্ষ্য অনুযায়ী সুফল না মিললেও এটা ঠিক যে, দেশের জনবলের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ইতোমধ্যে একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। পল্লীবাসীর কর্ম্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলতে হবে। গ্রামাঞ্চলে পর্য্যাপ্ত কাজ না পাওয়ার জন্যেই সহর এলাকায় কর্ম্মপ্রার্থী লোকের ভীড় বেড়ে চলেছে দিন দিন। কিন্তু এটা জাতির প্রত্যাশিত অগ্রগতির লক্ষণ বলতে পারা যাবে না আর তারই জন্যে অবস্থা-ব্যবস্থার রূপান্তর প্রয়োজন—বিকেন্দ্রীকরণ নীতি সাগ্রহে অনুসরণ করা আবশ্যক।

কর্ম্মসংস্থান সৃষ্টি ও লোকবলের সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সাথে কয়েকবারই সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। উক্ত সম্মেলনসমূহে যে অভিমত ব্যক্ত হয়, তা-ও বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করবার। বলা হয়েছে যে, যে-সব অঞ্চলে বেকার সমস্যা ও আধাবেকার সমস্যা বেশি, সেই সকল অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় করতে হবে এবং তার জন্যই পরিপূরক পরিকল্পনা হিসাবে পল্লীবাসীর কর্ম্মসংস্থান সূচী চালনা করতে হবে।
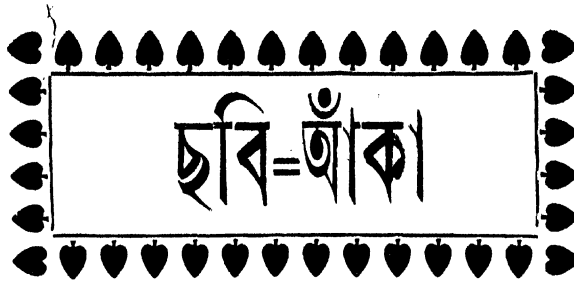
জুল্‌ফিকার

নবগোপাল বাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল,—মিত্র ষ্টুডিওর মালিক নবগোপাল মিত্র। ভদ্রলোক দুঃখ করে বলেছিলেন :

ছবি এঁকে কি আর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয় এদেশে? আমাদের সময় আর্টস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে, হয় ইস্কুলের ড্রইং মাষ্টারী নয়ত সাইনবোর্ড লেখার কাজ নিতে হত। সিনেমাশিল্প তখনও প্রসার লাভ করেনি।···এই ধরুন না কেন আমার নিজের কথাই,—আর্ট স্কুল থেকে ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করে বছর সাতেক কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করেছি জীবিকা অর্জ্জনের! নিরুপায় হয়ে শেষটায় ফোটোগ্রাফির শরণ নিতে হয়েছে।

এই ত সেদিন ভ্যান্ গগের একখানা ছবি তিন লাখ টাকায় বিক্রি হল, এক টুকরো ক্যানভাসের ওপর খানিকটা রঙের পোঁচ —তারই দাম তিন লাখ! শুনে চমকে হয়ত তিন লাফ দিয়ে উঠবেন কেউ, কেউ বা হাসবেন অবিশ্বাসের হাসি, কেউ হয়ত কাঁধ ঝাঁকা দিয়ে বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গীতে বলবেন, স্রেফ বড়মানষেমী।···তা' বেড়ালের বিয়েতে আমাদের দেশেও ত' এককালে লাখটাকা খরচ হয়েছে।

তরুণ ইনটেলেকচ্যুয়াল সম্প্রদায়ের ধারণা যে, সাহিত্যের তথা আর্টের ক্ষেত্রে তাঁরাই হচ্ছেন একমাত্র বোদ্ধা—যাকে বলে 'কনয়সিওর'। আর হালের কবিতার মত সাম্প্রতিক চিত্রকলাও অবোধগম্য। যেন কেন ন জ্ঞাতব্যম্‌···। একজিবিশানে গিয়ে শুনি, চৌখুপী আর বিভিন্ন বর্ণের তির্য্যক ফালি আঁকা কিম্ভুত ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে চুকলিদার আদ্দির পাঞ্জাবী আর লাল টুকটুকে শুঁড় তোলা চটী পায়ে রুক্ষ-কুন্তল এক যুবক উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করছেন, 'এ রিয়্যাল পিস্ অব আর্ট!' শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের ডায়ালেকটিক ভাবটা কী জোরালো ভাবেই না ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! ··স্যুররিয়্যালিষ্টিক ও কিউবিষ্টিক ঢং-এর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ!'··· পরিচিত ও অর্দ্ধপরিচিত ডজনখানেক নাম উচ্চারিত হতে শুনি— 'গগ্যাঁ, মাতিস, লরেন্সিন, মিরো, স্যালভেডর ডালি, পল ক্লী, ক্যাণ্ডিনস্কি···'

এদের ভাব দেখে মনে হয় যে ছবি যত বেথাপ্পা ও দুর্বোধ্য হবে তার আর্টিষ্টিক মানও তত উঁচুতে! এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। ডেনমার্কের একজন শিল্পী একবার এক ডেয়ারী ফার্ম্মে গিয়ে একখণ্ড রকসল্ট কুড়িয়ে পান। গরুতে চেটে চেটে একটা অদ্ভুত চেহারা করেছিল ওটার। মজা দেখবার জন্য লবণের টুকরোটা ভদ্রলোক আর্ট গ্যালারীতে পাঠিয়ে দিলেন। আশ্চর্য্য সে বছর ভাস্কর্য্যের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হল। ওঁর কাজ দেখে শিল্প সমালোচকেরা স্তম্ভিত। এ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের এরূপ বোল্ড সৃষ্টি নাকি সচরাচর চোখে পড়ে না। কবির ভাষায়—

'মনে হয় সৃষ্টি চায় কথা কহিবারে,
বলিতে পারে না স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ রূপ যেন নিল এই কাজে।

শিল্পী মহলে যাঁরা ঘোরা-ফেরা করেন তাদের কথা না হয় বাদ দিলুম, যারা ঘোরাফেরা করেন না, মুরুব্বিয়ানাতে তাঁরাও কম যান না। একজনকে বলতে শুনলাম, 'লাল রংটা বড্ড চড়া হয়েছে, ওর সাথে একটু সেপিয়া মিশিয়ে দিলে টোনটা ঠিক হত' (অথচ সেপিয়া রঙ যে কি সে সম্বন্ধে বক্তার ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট)। কেউ বললেন 'বাঁ হাতি আকাশ একদম ফাঁকা, গোটা দুই উড়ন্ত পাখী এঁকে দিলে ছবিটার ব্যালান্স হত।' কারো মতে আড়াআড়ি লম্বা না হয়ে উপর নীচ লম্বা হলে ছবিটার কম্পোজিশনের দুর্ব্বলতা ঢাকা পড়ত।

সত্যি। আজকাল কোন কিছু ব্যাপারে বিজ্ঞে জাহির করার ভাবটা অনেক বেড়েছে আগের চেয়ে।

অর্থের কাছে আর্টিষ্টিক সেন্সটা বিসর্জ্জন দিতে না পারায় আমাদের সময়ে শিল্পীদের অনেককে চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ছবির ব্যাপারে তখন দেশের লোকের রুচি অত্যন্ত মামুলী ও হীন ছিল, এখনকার আবহাওয়া জনসাধারণকে অনেক প্রগতিশীল করে তুলেছে। কিউবিজিম ঢং-এ আঁকা ছবি মাড়োয়ারীর বাড়ীর দেওয়ালে ঝুলতে দেখা যাবে।

বছর ত্রিশের আগের কথা বলছি।

ময়ূরপঙ্খী নাওয়ে গা এলিয়ে এক রাশ রঙ-বেরঙ ফুলের শয্যায় শায়িতা, স্বল্পবাসা, পীনবক্ষা এক গোলাপবরণী, এক হাতে এক প্যাকেট বিড়ি (মনোমোহিনী ডি-লাক্স বিড়ি) উঁচু করে ধরে আছেন, অন্য হাতটা শিথিল ভঙ্গিতে নৌকার পাশে পাশে ভেসে-চলা রাজহংসের গ্রীবার উপর ন্যস্ত। গাছের আনত শাখা ও পল্লবের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে বড়মানুষের নন্দদুলাল ছেলের হাস্যরত মুখের মত গোলাকার চন্দ্র।

কলুটোলার এই প্রসিদ্ধ বিড়ি ব্যবসায়ীর ফরমাইজ মত ক্যালেণ্ডারের এই ছবিটা এঁকে দিলে নগদ ষাটটি টাকা পকেটে আসত। সবে পাশ করে বেরিয়েছি তখন। এ-ধরণের ছবি আঁকতে শিল্পী-মন বিদ্রোহ করে বসল। অথচ আমাদের এক বন্ধু জিতেন শিকদার ছবিটা বেশ ফলাও করে এঁকে পুরো একশোটি টাকা আদায় করে ছেড়েছিল। শিকদার এখন বোম্বাইয়ে, ফিলমের কাজে মোটা টাকা রোজগার করে। মস্ত বাড়ী, ক্যাডিলাক গাড়ী।

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY GLUCOSE BISCUITS
KOLAY Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

'ছবি আঁকতে গিয়ে অনেক সময় বেখাপ্পা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ছবি আঁকাটা যত সহজ মনে হয় আপনাদের তত সহজ কাজ নয়। বিশেষতঃ ফরমাইসী ছবি।...একবার মালদার এক জমিদার-বাড়ীতে ছবি আঁকতে গেছি। মেজো বাবু সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন—তাঁরই ছবি করতে হবে। ফোটো দেখেই যখন ছবি হচ্ছে, তখন কলকাতায় বসে আঁকলেই বা কি এমন ক্ষতি হত?...না ওঁরা চান—আঁকাটা ওঁদের সামনেই হোক, যাতে মাঝে মাঝে এসে ওঁরা চেক করে যেতে পারেন, মুখের আদলটা ঠিক ঠিক ওৎরাচ্ছে কিনা!...

পোর্ট্রেটটা অর্দ্ধেক আঁকা হয়েছে, এমন সময় ছোট কর্ত্তা এসে প্রস্তাব করলেন, 'মেজদার পায়ের নীচে, একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার এঁকে দিতে হবে।' মেজবাবু যদিও কোন ব্যাঘ্রশিকারের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে উঠতে পারেন নি, ঘুঘু মেরেছেন অনেক, আর একবার একটা বুনো শূয়োর মেরেছিলেন—সাড়ে পাঁচ মণ ওজনের। শিকারে তাঁর বেজায় সখ ছিল।

ছবিটা আঁকা হয়েছে বসার ভঙ্গীতে, তানপুরা হাতে। ধ্রুপদী হিসেবে মেজো কর্ত্তার সত্যিই নাম ডাক ছিল। সামনের জায়গায়ই স্বল্পপরিসর। তার মধ্যে বাঘ আঁকতে গেলে সেটা নির্ঘাৎ বেড়ালের মত দেখাবে,—চিতা বাঘ হলেও।...তা ছাড়া তানপুরা আর বাঘের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো কি সোজা কথা! তানপুরার বদলে হাতে যদি একটা বন্দুক, কি একটা তলোয়ার নিদেন পক্ষে যদি একটা সড়াকও থাকতো, তা' হলে না হয় কথা ছিল।...যা হোক, অনেক ভেবে-চিন্তে, মগজ ঘামিয়ে পরলোকগত, মধ্যম চৌধুরী মশায়কে একটা বাঘ ছালের ওপর বসিয়ে দিলুম, আর বাঁ ধারে এঁকে দিলুম বিকট ব্যাদান একটা শার্দ্দূল শির। মধ্যম কর্ত্তার সঙ্গীত ও মৃগয়া পটুত্ব এই দ্বিবিধ গুণের যুগপৎ নিদর্শন রেখে অনেক কষ্টে ছবি শেষ করলুম।

পারিশ্রমিক মিললো, কিন্তু আড়াইশোর বদলে দু'শো। প্রশ্ন হল পুরো বাঘটা আঁকা হয় নি কেন?

একটা গোটা মানুষের ছবির জন্য আড়াইশো টাকা ধার্য্য হলে একটা পুরো বাঘের জন্য পঞ্চাশ টাকা এমন আর বেশী কি? জল অব থি জানা না থাকলেও এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। জিতেন শিকদার হলে বলত, 'কেন বাঘের মুণ্ডুটা আর ছালের কি দাম নেই?'...হয়ত আরো গোটা পঁচিশেক টাকা আদায় করে ছাড়ত।

## প্রায়শ্চিত্ত

### এ, ডি, মিলার

জন্ পড়ে চিঠি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে,
হাসির ঝিলিক্ খেলে যে ওষ্ঠপ্রান্তে।
"তোমার পিতা যে খাঁটি ইংরেজ, রীতিতে এবং নীতিতে
এবং তিনি যা বলেছেন, তা সত্যিই, যদি জান্‌তে।
কিন্তু এ কোন যুদ্ধের কথা,
শুনি নি ত' কভু সৈনিকে—
'আঠারোশো-বারো' সালেতে আমরা
ছিলাম, নয় কি সৈনিকে?"
"ঠিক কথা জন্।
সেই যুদ্ধেই একদল সেনা আগুনে জ্বালায় ওয়াশিংটন্।
মনে করে দেখো,
তুমিও ছিলে সে দলীয়।"
—"আমরা এ কাজ করতে পারি না, প্রিয়।"
"আমরা সেদিন শহরে ছিলাম।"
—"সত্যি, কি আমি পুড়িয়েছিলাম?"
"ওয়াশিংটন আগুনে পোড়াই
অবস্থা দেখে সভয়ে পালাই—"
"কি লজ্জা ও দুঃখের কথা বলো ত!
লোকে করে ঘৃণা তাদের সাধ্যমত।
কিন্তু আমিও বলে রাখি শোনো
অনেক সময় রয়েছে এখনও—.
বুঝলে?
শীঘ্রই জেনো এমনও দিন আসবে,
তোমার পিতাও সব দোষ ভুলে—
আমাদের ভালবাসবে।"

অনুবাদ—ভাস্কর দাশগুপ্ত

## বারিশ পাস্তারনক

### শ্রীমতী রমলা চট্টোপাধ্যায়

তোমারে প্রণাম করি
শ্রদ্ধা করি তোমায়
যেখানের স্টিল ফ্রেমে যবনিকা বাঁধা
একনায়কের জড়বাদে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি
পড়ে আছে আড়কাঠি বেড়াজালে।
ভ্রান্ত বুর্জোয়াবাদের ছুঁৎমার্গে
শুচিবায়ুগ্রস্ত যেখানের নেতৃত্ব
সাহিত্য আর শিল্প যেথায়
রাজনীতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ
সাংবাদিকতা বদ্ধ পিঞ্জরে
যেখানে স্বাধীন মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার
অস্তিত্ব নেই,
তুমি সেখানের কবি।
হাজারো বিরুদ্ধতার প্রাচীর ডিঙিয়ে
আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে
তোমার মুক্তিকামী হৃদয়ের কথা
সত্য স্বাধীন সরলতায় যা স্বচ্ছ,
তার মূল্য বিশ্বের স্বাধীন মানুষ দিয়েছে।
স্বদেশের লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার মধ্যেও
তুমি ছিলে স্বাধীন, স্বাধীন ছিল তোমার হৃদয়
মন-প্রাণ আর মতবাদ।

আজ তুমি ইহজগতের বাইরে
স্বর্গীয় আহ্বান পেয়েছে তোমার আত্মা
তুমি ধন্য সাধনা ধন্য তোমার
তোমায় প্রণাম করি।

### কবি কর্ণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৮৩। বৎস-লালসায় ধেনু যেমন করে ছুটে আসে, তেমনি ব্যগ্রচরণে এগিয়ে এসে ব্রজেশ্বরী বললেন,—

'অনেকক্ষণ না খেয়ে রয়েছিস গোপাল। শুখিয়ে যাচ্ছিস, পেট পড়ে গেছে তোর, ঢিলে হয়ে গেছে কোমরের বাঁধন। আর ওদিকে দেখ, অমন সবুজ মাঠ পেয়েও মুখে ঘাস তুলছে না স্বেচ্ছাচারী ধেনুর পাল। তোর শুকনো মুখ দেখে, তোকে না খেতে দেখে, ওরাও ছেড়েছে খাওয়া!

৮৪। তাই বলছি গোপাল, মায়ের কথা শোন, একটিবার এখন বাঁশী বাজানো বন্ধ রাখ।···হাত দিয়ে তো খেতে পারবি না, আমিই না হয় তোর চাঁদ মুখে খাবার তুলে দি,···একটু খা। যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা, আচার্য্যেরা এই বিধানই তো দেন। খাও গোপাল, এই এনেছি···নরম নরম পুলিপিঠে···এখনো গরম রয়েছে কুসুম কুসুম,···আর এনেছি মোটা সর-পড়া দই। বলরাম আর সহচরদের সঙ্গে নিয়ে যথারীতি তোর খেয়ে নেওয়াটাও তো দরকার।"

৮৫। বটু বললেন,—

"মা-জননী যা বলছেন ঠিকই বলছেন, অন্যথাচরণ উচিৎ নয়। আমারো পেটের মধ্যে চাগিয়ে উঠছে আশা-মিটিয়ে-খাবার প্রবল বাসনা।"

৮৬। যিনি রসবান্ তিনি কিন্তু বললেন,—

"একটা মুহূর্তও যে কেটে গেছে এমন তো মনে হচ্ছে না, মা। অথচ সকলেই বলছেন অনেকক্ষণ কেটে গেছে। আশ্চর্য্য। না না, গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়। তাহলে বল, কখন আমায় খেতে দিবি মা?"

৮৭। ব্রজধামের যখন এই হেন অবস্থা, ইন্দ্রদেব তৎক্ষণে ক্রোধের রথে সমাসীন হলেও ঐরাবতে আরোহণ ক'রে বেরিয়ে পড়েছেন ইন্দ্রপুরী থেকে। বজ্র-পবিত্র তাঁর পাণি। লোকে লোকে ক্রন্দন জেগেছে ঐরাবতের গতিরাগে। 'ঘনাঘন'—মেঘের পর্বে পর্বে স্পন্দিত হচ্ছে তাঁর নিশ্চল প্রেমের নিবিড়তা।

ইন্দ্রদেব ছুটে এলেন ব্রজভূমির অভিমুখে। এতক্ষণে সেখানে কি কাণ্ডটাই না ঘটেছে, কী ধ্বংস, কী বিনষ্টি,···দেখবার লোভে, ফণাধর সর্পের মত ফুঁসতে ফুঁসতে, সেখানে পৌঁছেই তিনি দেখতে পেলেন,—

প্রলয় ঘনঘটার প্রগাঢ়তা ভেদ করে ঊর্দ্ধে লাফিয়ে উঠেছে গিরি-গোবর্দ্ধনের শিখর-গ্রাম। গিরির সানুতে সানুতে বর্ষাভাব-সুখের মহানন্দ উপভোগ করছে দলে দলে পশুপক্ষী; গিরির মেখলা জুড়ে বিশ্রাম করছেন তাঁরই জলধরের পাল; আর প্রলয়-বন্যায় ধুয়ে গিয়ে মুক্তোর ছাতার মত ঝকঝক করছে গিরিতট।

৮৮। দেখেই বিদ্যুদ্বর্ণ হয়ে উঠল ঈশ্বরাভিমানীর ক্রোধ। তপ্ত রোষে পঙ্কজ হয়ে গেল তাঁর হৃদয়। এর পরে বজ্রধ্বনি তুলে যখন প্রলয়ঙ্কর বিরাট মেঘদল তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, যখন বললেন,—'নমুচিসূদন, দয়া কর,'—তখন তিনি অগ্রাহ্য করলেন তাঁদের আবেদন উপরোধ ও দয়া ভিক্ষা। তাঁর সমস্ত প্রাণ ঘিরে তখন একমাত্র জ্বলছে অকল্যাণ-বাসনার আগুন। তিনি তাই পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্তমে উত্তেজিত করে তুললেন মেঘেদের। উপরোধ ঠেলতে পারলেন না তাঁরা ইন্দ্রের। পুঞ্জীভূত হলেন এবং আরম্ভ করে দিলেন আসার-বর্ষণ।

৮৯। পুরন্দরের ভয়ে এবং উপদেশে উত্তেজিত হয়ে, রণসাজে সজ্জিত দেহ, পুনর্ব্বার আক্রমণ করলেন মহাপ্রলয়ঙ্কর প্রভঞ্জন-সঙ্ঘ। তাঁরা উড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন গিরিরাজকে।

অতএব শ্রীগোবর্দ্ধনের বহির্মণ্ডলে যখন বিপুল যন্ত্রণায় সৃষ্টি করতে লাগল শিলাপাত, মহাঝড় এবং অতিবর্ষী মেঘেদের বজ্রাঘাত, তখন গিরিরাজের অন্তর্মণ্ডলে শ্রীহরি সংহার করতে লাগলেন সেই ক্লেশ··· লীলামৃতের বৃষ্টি ঝরিয়ে, কমলগন্ধি মুখমারুতের ঝড় বইয়ে এবং হাস্য-জ্যোৎস্নার প্রপাত-ধারায় নিজের নীলকান্ত দেহের জ্যোতিঃ ছড়িয়ে।

গিরিরাজের তখন বহির্ভিতে মেঘ,···আর অন্তর্ভিতে মেঘবরণ মুকুন্দ; বাহিরে ইন্দ্রদেবের ধনু,···আর অন্তরে শিখিপিখণ্ডের শরাসন; বাহিরে অতিবর্ষণ, বিদ্যুতে বিদ্যুতে সংঘর্ষণ, স্বর্ণলতার সৃষ্টি, ···আর ভিতরে, নিষ্কম্প শম্পার মত একজোড়া কুবলয়-নয়নে অনির্বচনীয় শুভ লাবণ্যের বৃষ্টি। বাইরে ভিতরে সমান সমান, কিন্তু তবুও গিরিরাজের নিক্তিতে একটু যেন ভার পড়ল বেশী,···তাঁর মধ্যে যে হেতু রাজমান ছিলেন বিবস্বান কৌস্তুভ।

৯০। এমন সময় আবার বেজে উঠল বাঁশরী। কলনাদে সকলের হৃদয় থেকে নিমেষে দূর হয়ে গেল কৃষ্ণের শ্রম-শঙ্কা। শ্রীকৃষ্ণ আবার বাজালেন বাঁশরী, তরঙ্গিত করে তাঁর নয়নাঞ্চল।

৯১। মাধুর্য্য-ধুর্য্য-সভায় যিনি ধুরন্ধর, তাঁর অকলঙ্ক চন্দ্রমুখে মধু-মধুর বেজে উঠল মুরলী। যখন বাজল তখন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন পৌরজন,—

"বেণু বাজাচ্ছেন গিরিধারী! আর ওদিকে দেখ বাঁ কানের নীল পদ্মটিকে নীচের দিকে বাঁকিয়ে দিয়ে, লীলাভরে জয় দিয়ে, উপর দিকে লাফিয়ে উঠছে দক্ষিণ জলতার ডগাখানি; যেন বলতে চায়,—

'আমার এই ভঙ্গি দিয়েই শ্রীভগবান শৈলটিকে তুলে ধরতে পারতেন,···ও বাঁ হাতের তাঁর কোন প্রয়োজনই ছিল না ব্যবহারের।'

৯২। গিরি-গর্ত্তের বিরাট উদরে, দামোদরের আদর ও অনুগ্রহে পুষ্ট হয়ে, ব্রজবাসীরা বিরাজ করতে লাগলেন নিথর-নিস্তব্ধতায়। তাঁরা উপলব্ধি করলে ,···সময় সেখানে সরসতার আতিশয্যে রসময় হয়ে উঠেছে,···নিরস্ত হয়ে গেছে নিখিল উপদ্রব,···এবং শ্রীকৃষ্ণের

চেয়ে তাঁদের পরমতম আর কিছুই নেই। সকলের নানান মন নিবদ্ধ হয়ে গেল সেই একে।

তাঁদের মধ্যে (বিপ্র-পৌরাদি) কেউ কেউ অভিভূত হলেন বিস্ময়ের অদ্ভুত-রসে; (শ্রীরাধিকাদি গোপীদের) কেউ কেউ রতিময় শৃঙ্গাররসে; (বিদূষকাদি) কেউ কেউ পরিহাস প্রিয় হাস্যরসে; (সুবলাদি সখাদের) কেউ কেউ উৎসাহময় বীররসে; (রক্তক-পত্রক আদি দাসেদের) কেউ কেউ প্রীতিমধুর করুণরসে; বলতে কি সকলেরই ধীশক্তি আলোড়িত হয়ে উঠল পঞ্চরসের প্রবল আবর্ত্তে। কেবল বাৎসল্যরসে আচ্ছন্ন হয়ে থাকায় স্বস্তি অনুভব করতে পারলেন না মা-জননী ব্রজরাণী।

১৩। তিনি তখন আর কি করেন। পরিপাটি করে পান সাজতে বসলেন এক খিলি। আদর ফুটে উঠল একটি একটি করে এলাচের দানা ছাড়ানোতে, সরু সরু করে সুপুরি কোচানোতে, ভুরভুরে কর্পূর আর লবঙ্গের কুঁচি দিয়ে রসিয়ে, পানের পাতাগুলি গুছিয়ে সযতনে খিলি বাঁধানোতে। তারপরে এক খিলি হাতে নিয়ে তিনি বললেন,—"দুলাল আমার, বাঁশী বাজানো এখন বন্ধ রাখ। নাদে কি কখনও পেট ভরে? শ্রান্তি দূর করতে হলে খেতে হয়। কেন অমন করে আমার মনটাকে নাড়িয়ে দিচ্ছিস বলতো? পরিপাটি করে পানটি সেজেছি, এটি খা, খেলে খাবার খেতে ইচ্ছে হবে। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল, আর দেরী করতে নেই গোপাল। যদি বুঝি আমার অপেক্ষা করিস, তাহলে বলরাম কিন্তু অপেক্ষা করতে পারবে না, খিদের জ্বালায় সে ছটফট করছে। না হয় আমার মঙ্গলের জন্যেই পানটা খেলি।"

এই বলে নন্দরাণী সুবলকে ডেকে বললেন,—"সুবল তুই আর কৃষ্ণ একপ্রাণ, দে, ওকে এই পানটা খাইয়ে দে। দেখি তোর কেমনধারা ভালবাসা।"

এই বলে নন্দরাণী সুবলের হাতে তুলে দিলেন পানের খিলি।

১৪। পাওয়াও যেই অমনি সুবলসখা সকলকে চমকিয়ে দিয়ে কৃষ্ণের অগুরু-মাখানো হাতখানি থেকে ছিনিয়ে নিলেন তাঁর বাঁশরী, আর তারপরেই উত্তরীয়ের আঁচলা দিয়ে মুখ মুছিয়ে, খাইয়ে দিলেন পান। যেমনটি খুসি করে দিলেন মাতৃ-হৃদয়, ঠিক তেমনটি লাল টুকটুকে করিয়ে দিলেন গিরিধারীর অধরপুট।

১৫। কিন্তু বহির্মণ্ডলে তখনো প্রশমিত হয়নি ঐরাবত-বাহন ইন্দ্রের দুঢ়রোষ। আর শান্তই বা হয় কি করে,···যদি ইন্দ্র-প্রেরিত মেঘসঙ্ঘের যাবৎ-শক্তি বর্ষণ-সত্ত্বেও, ঝঞ্ঝাবায়ুর যাবৎ-শক্তি শ্বসন-সত্ত্বেও গিরিগোবর্দ্ধনের মেখলা-পরিসর থেকে ধূলোগুলো উড়ে যায় আর এতটুকুও না ভেঙ্গে, যদি না-ভেঙ্গে গিরিচর পশুপাখী, যদি না ঝরে গাছের এক খণ্ডও পল্লব?

দূর দূর সমুদ্র থেকে বহন করে নিয়ে এসে জল ঢালতে লাগলেন মেঘদল, কিন্তু সে জল পাহাড়ের গা বেয়ে মাটিতে পড়ে সমুদ্রেই আবার ফিরে গেল; মেঘেদের লাভ হল শুধু গেলা আর ওগরানো, ক্ষোভের হল একশেষ।

মহানিলদের চলারও শেষ নেই, জলধরদের ঢালারও শেষ নেই। তাঁরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলেন ইন্দ্রেরই চরণে। কিন্তু তাতেও ইন্দ্রের রাগ পড়ল না। দৃষ্টিহীন হলেই মানুষ যে অন্ধ হয় তা নয়, ক্রোধান্ধ হয়ে বস্তিষ্ট মানুষই···পরমান্ধ।

১৬। সপ্তদিন সপ্তরাত্রি,···বিশ্ব-ভঞ্জন প্রলয়-প্রভঞ্জনদের সঙ্গে নিয়ে, অবিশ্রান্ত চলল প্রবল বলাহকদের রূঢ় আক্রমণ। কিন্তু অবাক কাণ্ড এত করেও তাঁরা প্রীত করতে পারলেন না ইন্দ্রকে। শতকোটি বজ্রের চেয়েও যিনি কুটিল, সপ্ততন্তু যজ্ঞ ভঙ্গে ক্রোধের যার অন্ত নেই, তিনি কি প্রীত হতে পারেন পরাজয়ে? প্রীতির বদলে তাঁর গর্জ্জন করে উঠল ক্ষুব্ধ নির্দ্দেশ, 'ভাঙো, ভাঙো, ভূমিসাৎ কর ব্রজধাম।'

আদেশ পালনের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কিছুই ঘটল না গিরিরাজের পরিবেশে, মাথার খুলি ফাটব-ফাটব হল বলাহকদের, এমন কি প্রাণ হারালেন কয়েকটি বীর,···ইন্দ্রদেবের তখন টুকরো টুকরো হয়ে গেল মদ-গর্ব্ব। লজ্জা, লজ্জা। সে লজ্জায় লোপ পেয়ে গেল তাঁর ইন্দ্রালয়ে ফিরে যাবার স্পৃহাও।

১৭। এই সাতটি দিন···ইন্দ্রের মনে হল···সাতটি যুগ; গিরিধারীর পরিজনদের মনে হল···সাতটি ঘণ্টা। বলিহারি যাই শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের অভিরমণীয়তায়। এ বৈভব ভবেরও অগোচর, কমল-ভবেরও অগোচর। এই বৈভবের কৃপায় যে নগাধিপ নিশ্চল, তিনিও হলেন করকমল-গত; লোক-লোকান্তরের তপ্ত অনুতাপ ব্যর্থ হল, শিল-বৃষ্টি-জল-ঝড় সহস্র উপদ্রব মিলিয়ে গেল বাতাসে, নগাধিপ রইলেন নিরুপদ্রুত, দ্রুত উদ্বর্ত্তিত হল তাঁর শরীর, জলস্থলে যেন ঝকঝকে হয়ে উঠলেন তিনি। বলিহারি যাই তাঁরও বৈভবের।

১৮। এমন কি সেই ব্রজপুরে, তার গোপুরে, তার ঘরের চালের পাড়ে পাড়েও···বিপদের অভাববশতঃ অনির্ব্বচনীয় ভাবে ফুটে উঠল এই বৈভবের প্রভাব আর তার শোভার নির্ভরতা। যেন এইমাত্র মঙ্গলস্নান সেরে তীরে উঠলেন ব্রজধাম।

১৯। দেখতে দেখতে যেন,···

জন্মান্তর গ্রহণ করলেন গগন;

অঙ্কুরিত হল সবুজের দল;

নষ্টাৎ দশায় এসে অক্ষতমিস্রা উদগীর্ণ করলেন প্রকাশনামা পদার্থটিকে; এবং এই মুহূর্ত্তে যেন অদিতির গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন কিরণমালী, ও সেই মুহূর্ত্তে যেন ধরাতলকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরলেন আদিবরাহ।

দেখতে দেখতে যেন সবুজ ডালপালা মেলে বেড়ে উঠল তরু-লতিকার গুল্ম-বীথিকার নবীনতা; উন্মাদব্যাধি থেকে বিনির্মুক্ত হয়ে, অপস্মারের আঘাত থেকে ছাড়া পেয়ে, সত্ত্ব প্রকৃতিস্থ হলেন পবন; এবং পাতিব্রত্য-ব্রত রক্ষা করতে গিয়ে সমুদ্রনাথ বরুণের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে, যেন এবার নামমাত্র শরীরধারিণী হলেন নদ-কামিনীরা। ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান-স্বরূপ সম্পত্তির সামনে দাঁড়িয়ে কামাদির যেমন অবস্থা হয় তেমনি কোথায় যেন দ্রুত বিদ্রুত হয়ে গেল মেঘেদের সমারোহ;···এবং অহোরাত্রিরূপ সাতটি গর্ভের পর কাল-ভার্য্যা যেন এইমাত্র সবে প্রসব করলেন তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান···এই অক্ষতন অহটিকে।

গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ তখন সানন্দে বলে উঠলেন,—"হে আর্য্যপাদগণ, প্রনষ্ট হয়ে গেছে কষ্টদায়ক অতিবৃষ্টি। অধুনা বিলীন হয়ে গেছেন প্রলয়ঙ্কর মেঘদল। স্তিমিত এখন তিমির, পঙ্কহীন পৃথিবী। সপ্তাহকাল পরে আজ যেন নয়ন মেলেছেন সূর্য্যদেব। আপনাদের পুরীগুলিও ফিরে পেয়েছে তাদের পূর্ব্ব-রূপ।

অতএব অবিলম্বে এখন আপনাদের নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থা করা সমীচীন।"

১০০। গোবর্দ্ধনধারী শ্রীভগবানের বাণী শুনে সকলের যেন ঘোর কেটে গেল। আহ্লাদে বিগলিত-তনু বিপুল উৎসাহে তাঁরা তখন ধেনুদের এগিয়ে দিয়ে আরম্ভ করে দিলেন স্থানত্যাগ।

১০১। শরাসন থেকে হুঙ্কার দিয়ে বাণ যেমন করে বেরোয়, তেমনি করে বেরোতে লাগল ধেনুরপাল। তাদের মধ্যে আবার কতকগুলি, যারা ভগবানের সর্ব্বাতিপ্রধান আনন-মাধুর্য্য পান করতে করতে নিজেদের কল্পনা করে'ছিল ভিন্ন-সুখের জীব, তারা হঠাৎ মাধুর্য্য-সুধাপানে বাধা পেয়ে বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠল। চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখল। তারপরে যখন দেখল···সবাই বেরোব বেরোব করছে কিন্তু কই কৃষ্ণ তো বেরোচ্ছেন না,···তখন দু-পা এগিয়ে গিয়েও আবার যেই ফিরে বসতে গেল গিরি-গর্ত্তে, অমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর করুণা-শিথিল কটাক্ষের নিষ্কম্প উপদেশ দিয়েই যেন নিমেষে নিষ্ক্রান্ত করে দিলেন তাদের।

বিল-ভূমির গহ্বর থেকে চতুর্দ্দিকে দেখতে দেখতে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল গাভীদের স্নিগ্ধ সমারোহ। এ যেন এক পাতাল ভেদ করে শেষ নাগের সহস্র ফণা-নিষ্ক্রান্তির ছবি! অন্ধতমিস্রা ত্রস্ত জ্যোৎস্নাজাল যেন ভূগর্ভ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসছে প্রাচুর্য্যে! উদ্ধত-আস্ফালনে এ যেন অদ্রীন্দ্রের স্ফটিকজন্মা অসংখ্য শিকড়জালের পায়ে-হেঁটে-বেড়ানোর ভ্রান্তি।

১০২। কৃষ্ণের বাণী-বিক্রমে এতই নির্ভয় হয়ে পড়েছিলেন আভীরেরা, যে প্রথমেই তাঁরা বড় বড় হাই তুলতে লেগে গেলেন, প্রাণ খুলে, দন্তকৌমুদীর বিচ্ছুরণে বদন আলোকিত ক'রে। গিরিতল-বিবর থেকে তারপরে যখন তাঁরা বেরোলেন তখন সর্ব্বমুখে বন্‌বন্ করে চরকি ঘুরছে হাস্য এবং উৎসাহের।

তারপরে সমুত্থান করলেন আভীর-ললনারা···কৃষ্ণে বিনিহিত তাঁদের নয়নকোণ।

শ্রীগোপযুবতীদের প্রথম উত্থান দেখে মন বললে,—"একি! দিনের বেলাতেও···ভূগর্ভ থেকে···প্রজ্জ্বলন্তী সিদ্ধৌষধির উত্থান দেখছি না কি?"

দ্বিতীয় উত্থান দেখে আরো চমকে গেল মন, বললে,—"না না, এঁরা আলোর মঞ্জরী··পাহাড়-থেকে-ঝরে-পড়া দিব্যরত্নের। নিশ্চয়ই।"

তৃতীয় উত্থান দেখে মোহিত হয়ে গিয়ে মন এবার বলে ফেললে,—"ভুজঙ্গদের দেশ থেকেই এঁদের উত্থান। না হয়েই যায় না। সাপের ফণার মণির মতই তো জ্বলছেন এঁরা।"

১০৩। ক্রমে বিনির্গত হলেন সহচরেরাও। শ্রীকৃষ্ণ তখন করতলে শৈলটিকে নিয়ে স্বয়ং পার হয়ে গেলেন শৈল-সীমা, পদধারণ করলেন ব্রজভূমিতে; এবং শৈলটিকে কুসুমময় একটি কন্দুকের মত বামপাণি থেকে শিথিলিত করে, নিক্ষেপ করে দিলেন যথাস্থানে।

[ ক্রমশঃ।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

**আতাইচ, আতিষ**—[ সং অতিবিষা, হিং অতীস্, মং অতিবিষ, গুজং অতনসনীকলী, কং অতিবিষা, তেং অতিবাসা, আসাম, সিকিম—শেত্তোবিখুম, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে—সফেদ বিখ ] ক্ষুদ্র ক্ষুপ-বিং, aconitum heterophyllum, a. palmatum. পর্যায়—বিশ্বা, বিষা, প্রতিবিষা, উপবিষা, শৃঙ্গী, অরুণা, শ্বেতকন্দা, ভঙ্গুরা, ঘুণবল্লভা, অতিসারঘ্নী।

**আতিষ**—অতিবিষা দ্রং।

**আতৃপ্য**—আতা দ্রং।

**আত্মগুপ্তা**—অলকুশী দ্রং।

**আত্মমূলী**—দুরালভা লতা দ্রং।

**আত্মরক্ষা**—মহেন্দ্রবারুণী বৃক্ষ, মাকাল গাছ।

**আত্মোদ্ভব**—মাষপর্ণী বৃক্ষ।

**আদা**—[ সং আর্দ্রক, হিং আদ্রক, মং আলং, গুজং আদু, কং অল্ল, তেং অল্লং, ফাং জিঞ্জি, অং জিঞ্জিবিলতর, ইং ginger ] হরিদ্রাবর্গের মূল শাকের কন্দের নাম আদা, zingiber officinale. শুকাইলে শুঁঠ। প্রকারভেদ—বন আদা z. casumunar ; জঙ্গলী আদা, z. capitatum. পর্যায়—আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, শুণ্ঠী।

**আদানী**—হস্তিঘোষা বৃক্ষ।

**আদা-বর্নী**—[ ইং thyme-leaved herpestis ] ব্রাহ্মী herpestis monniera.

**আদারিবিদ্ধী**—আনেরী (?), অম্লবেতসের তুল্য পুষ্পযুক্ত লতাবিং।

**আদিত্যপত্র**—ক্ষুপবিং। অর্কপত্রের মত পাতা। পর্যায়—অর্কপত্র, অর্কদল, সূর্যপত্র, তপনচ্ছদ, কুষ্ঠারি, বিটপ, সুপত্র, রবিপ্রিয়, রশ্মিপতি, রুদ্র। শব্দং।

**আদিত্যপুষ্পিকা**—রক্তপুষ্প, অর্ক বৃক্ষ, রাঙা আকন্দ গাছ।

**আদিত্যভক্তা**—হুড়হুড়িয়া। পর্যায়—বরদা, অর্কভক্তা, সুবর্চলা, সূর্যলতা, সূর্যাবর্তা, অর্ককান্তা, মণ্ডূকপর্ণী, সুরসম্ভবা, সৌরী, সুতেজা, অর্কহিতা, বরিষ্ঠা, মণ্ডূকী, সপ্তনামা, দেবী, মার্কণ্ডবল্লভা, বিক্রান্তা, ভাস্করেষ্টা ॥ শব্দং ॥

**আর্দ্রক**—আদা দ্রং।

**আধর্বিক**—অড়হর দ্রং।

**আনন্দী**—আমকপাতা।

**আনার**—[ ফাং অনার, ইং pomegranate] ডালিম, punica granatum.

**আনারস**—[ সং অনংনাস, হিং অনানস্, অনন্নাস্, তাং অনাস পণ্ডাম, তেং অনসপণ্ডু, কং সফরঙ্গী, মং অনলস, গুজং সহরী, ইং pine apple, European jack fruit (?)] কেয়াজাতীয় গাছ, ananas sativa, bromelia ananas. আমেরিকার ব্রেজিল দেশে 'ননস' (nanas) জন্মে—পর্তুগীজ ভাষায় 'অনানস'। ঐ স্থান হইতে ভারতে আসে।

**আপস্তম্বিনী**—জিঙ্গিনী লতা (?)।

**আপাঙ্, আপাঙ্গ**—অপামার্গ দ্রং।

**আবটা**—[ সং অশ্মন্তক ] অশ্মন্তক দ্রং।

**আপেল**—আপেল গাছ, pyrus malus.

**আপ্য**—কুড় বৃক্ষ।

**আফিং, আফিম**—[ সং আপস, অফেন, অহিফেন, ইং opium] ছোট গাছ, অনেকটা শিয়ালকাঁটা গাছের মত, papaver somniferum. ফল যাহাকে ঢেঁড়ী ( সং খসখস ) বলে, ঢেঁড়ী ভাঙ্গিলে যে আঠা বাহির হয় তাহাকে আফিং ও ভিতরের বীজকে পোস্ত ( সং খসতিল ) বলে। ভারতে পূর্বে জানা ছিল না, গ্রীকরা ইহার আবিষ্কর্তা, তাহারা ইহাকে opion বলিত ( গ্রীং opos)।

**আবলুস**—[সং তিন্দুক, হিং ও ফাং আবনূস, ইং Indian ebony] বৃক্ষ বিং। গাছে কাঠ ফল, diospyros ebenum.

**আম, আম্র**—[ সং আম্র, আম্রতাম্র, হিং আম, মং আম্বা, আঁবা, গুজং আম্বো, কং মাবিন ফল, তেং মাবিডি, ফাং আম্বা, অং অম্বজ, ওং আম্বতাম্র ] মিষ্ট রসাল ফল, mangifera indica নানাপ্রকার আম আছে তন্মধ্যে কয়েকটি—দেশী, লেঙড়া, বোম্বাই, কিসনভোগ, মালদহ, সুন্দর সা, গোপালভোগ, বিশ্বনাথ চাটুজ্যে, বৃন্দাবনী, মোহনভোগ, মান্দ্রাজী, ফজলি, গোলাপ খাস ইত্যাদি। এ ছাড়া লতা আম, বুনো আম ( mangifera sylvatica ) আছে। পর্যায়—অম্র, চূত, রসাল, সহকার, কামশর, কামবল্লভ, কামাঙ্গ, কীরেষ্ট, মাধবদ্রুম, মদিরা-সখ, ভৃঙ্গাভীষ্ট, সীধুরস, মধূলী, কোকিলোৎসব, বসন্তদূত, অম্লফল, মোদাখ্য, মন্মথালয়, মধ্বাবাস, সুমদন, অলিপ্রিয়, পিকরাগ, নৃপপ্রিয়, প্রিয়াম্বু, কোকিলাবাস মাকন্দ, ষট্‌পদাতিথি, মধুব্রত, বসন্তদ্রু, পিকপ্রিয়, স্ত্রীপ্রিয়, গন্ধবন্ধু ॥ শব্দং ॥

**আম-আদা**—[ সং আম্রহরিদ্রা, হিং আমহলদী, তাং সামেদি-আল্লাম, তেং কারু-পাসুপু, যাবনিক অমহলদা, ইং mango ginger ]

হরিদ্রাদি বর্গের মূল শাক বি°, curcuma amada, c. indica. পর্যায়—কর্পূরহরিদ্রা, দার্বী, ভেদা, আম্রগন্ধা, সুরভীদারু, দারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরভী, সুরনায়িকা, হরিদ্রা ॥ শব্দ ॥

আমম্লোকা—Vitis indica.

আমড়া—[ স° আম্রাতক, হি° অম্বাড়া, ত° মরিমঞ্চেতি, তে° টেরিমনোডী, ও° আম্বড়া ই° wild mango, hog-plum ] অম্লফল বৃক্ষ; sapondias mangifera. প্রকারভেদ—বিলাতী আমড়া (ই° otaheite apple) spondias dulcis. পলিনেশিয়ার গাছ। পর্যায়—আম্রাত, পীতন, কপীতন, বর্ষপাকী, পীতনক, কপিচূড়া, অভ্রবাটিক, ভৃঙ্গীফল, রসাঢ্যা, তনুক্ষীর, কপিপ্রিয়, অম্বরাতক, অম্বরীয়, কপিচূড়, আম্রাবর্ত্ত।

আমণ্ড—এরণ্ড বৃক্ষ দ্র°।

আমন্ত্র—ভ্যারাণ্ডা গাছ দ্র°।

আময়—কুড়।

আমরুড—পেয়ারা দ্র°।

আমরুল—শাক বি°, অম্বষ্ঠা oxalis corniculata. পর্যায়—চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্তশঠা।

আমরুল—[ স° অম্ললোনী, হি° আমবোতি, ও° আম্‌লিতি ] অম্লরসযুক্ত ছোট শাক বি°, oxalis conniculata. পর্যায়—অম্লবতী, অম্লবাস্তুক।

আমর্ত্তকী—সোনামুখী দ্র°।

আমলক, আমলকী, আমলা—[ স° আমলক, হি° আঁমরা, দৌলা, আঁওকা, অওরা, ম° আম্বঠ্‌ঠা, গুজ° আঁবলা, ক° নেল্লি, তে° উসরকায়, উ° অওা, ফা° আমলঝ:, আ° অমলজ ও° অগ্‌লা ] অতি বৃহৎ আরণ্যগাছ, emblica officinalis, emblica myrobalam, ভুঁইআমলা, ছোট লতাবি°, phyllanthus niruri, p. urinaria. পর্যায়—তিষ্যফলা, অমৃতা, বয়স্থা, কায়স্থা, শ্রীফলা, ধাত্রিকা, শিবা, শান্তা, ধাত্রী, অমৃতফলা, বৃষ্যা, বৃত্তফলা, রোচনী, কর্ষফলা, তিষ্যা।

আমলকুচি—অম্লকুচি দ্র°।

আমলি—তেঁতুল tamarindus indica. তেঁতুল দ্র°।

আম-হলদী—আমআদা দ্র°।

আমহলুদ—আমআদা curcuma zedoarica, পর্যায়—কর্চূর, দ্রাবিড়, কর্শ্য, দুর্লভ, গন্ধমূলক, বেধমুখ্য, গন্ধসার, জটাল, কম্পক, শটী।

আমুথ—বেউড়, বাঁশ।

আমুপ—কাঁটাযুক্ত বাঁশ।

আমুরলাতমী—আমুরা দ্র°।

আমুরা—বৃহৎ বৃক্ষবি°। আমুর-লাতমী amoora cacullata.

আম্বহলদ—আমআদা দ্র°।

আম্রগন্ধক—আমআদা দ্র°।

আম্রাত, আম্রতক, আম্রবর্ত্ত—আমড়া দ্র°।

আম্লকুচি—আমলকুচি caesalpinia digyna.

আম্লবেতস—তেঁতুলগাছ।

আম্লা, আম্বিকো—তেঁতুলগাছ।

আয়তচ্ছদা—কলাগাছ।

আয়াপান—লোমরাজিবর্গের শাকবিশেষ, eupatorium ayapana, eupatofum repandum. আমেরিকা হইতে আনীত।

আয়ুধধর্মিনী—জয়ন্তীবৃক্ষ দ্র°।

আর—রেফলবৃক্ষ।

আরদাব—সোনালু দ্র°।

আরটী—স্থলপদ্ম, বামুনহাটি।

আরণ্যমুগা—মকাপর্ণী।

আরস আড়স—লোনাভাণ্ডি, solanum verbascifolium.

আরামশীতলা—সুগন্ধিপত্রযুক্ত বৃক্ষবি°।

আরারুট—এরারুট, হরিদ্রাদিবর্গের মূলশাকবি°। [ হি° তিখুর (টিখুড়), চিখুড় ] ১ শটি গাছের মত গাছ, curcuma angustifolia. ২ বিদেশী গাছ maranta arundinacea.

আরেবত—সোঁদাল গাছ।

আর্গবধ—সোঁদাল গাছ।

আর্তগল—নীলঝাঁটি।

আর্দ্রক, আর্দ্রশাক—আদা।

আলকুশী—বর্ষজীবী লতা, mucuna pruriens de. ইহার লতা ও পাতা সীমগাছের ন্যায় ও ছোট ছোট লোম দ্বারা আবৃত। পর্যায়—আত্মগুপ্তা, অজহা, অজড়া, আর্ষভী, অব্যান্ডা, ঋষ্যপ্রোক্তা, কণ্ডুরা, কপিপ্রভা, কপিকচ্ছু, কুণ্ডলী, কপিরোমফলা, গুপ্তা, চণ্ডা, গুরু, জড়া, তীক্ষ্ণা, দুরভিগ্রহা, দুস্পর্শা, প্রাবৃষায়ণী, প্রাবৃষা, প্রাবৃষেণ্যা, বদরী, বহুরিকা, বনশূকরী, বীশরোম, বানরী, মর্কটি, মহর্ষভী, রোমবল্লী, রোমালু, শিম্বী, শুকপিণ্ডী, শূকশিম্বা, শূকশিম্বী, স্বগুপ্তা, স্বয়ংগুপ্তা।

আলগলতা—লতাবি°, cymbidium tessalloides.

আলগোছ—[ স° অমরবল্লী, ব্যোমবল্লিকা, দুস্পর্শা, ও° নির্মূলী ] কলম্বাদিবর্গের পরবৃক্ষজীবীলতা, cuscuta reflexa কোথাও কোথাও ইহাকে 'আলপুষী' লতা বলে। 'আকাশবল্লী' হইতে স্বতন্ত্র। আলগোসা—[ ই° round headed dodder ] cuscuta capilata.

আলাধ-ফেনা—opuntia dillanii.

আলিয পাইস—[ ই° allspice ] pimenta vulgarius. আমেরিকার গাছ।

আলু—[ স° আলু, গলন্তিকা, সংস্কৃত নামের আলু বিলাতী গোল আলু নহে। উড়িষ্যায় আলু অর্থে 'খাম-আলু' বুঝায়। আলু বিবিধ প্রকার—

(১) শকরকন্দ আলু—[ সাং° খণ্ডকর্ণ ] কলম্বাদিবর্গের লতাবি°, ipomoca batatas. মিঠাআলু, শর্করাখণ্ড আলু, লালবর্ণ বলিয়া রক্তআলু, রাঙাআলু, (২) গোল-আলু—বিলাতী আলু solanum tuberosum. আদিস্থান—আমেরিকা। (৩) নীল আলু, (৪) পির আলু randia uliginosa. (৫) খাম-আলু [ স° দণ্ডালু, ও° অম্বআলু (স্তম্ভাকার) ] dioscerea alata. (৬) চুপড়ী-আলু—[ স° পিণ্ডালু, ও° হাণ্ডিয়া আলু ] d. alata. var. globosa (৭) গরানিয়া আলু—লম্বা আলু d. alata var. rubella (৮) লাল গরানিয়া আলু, d. alata var. purpurea. (৯) কুকুর আলু—বন আলু d. anguina. (১০) বুনো আলু—বৃহৎলতা d. bulbifera. সবুজবর্ণ (১১) কাঁটা আলু—কণ্টকপূর্ণ লতা, আলু বড় d. pentaphylla. (১২) মৌ আলু—[ স° মধ্বালু ] d. spinosa. (১২) ছোট কাঁটা আলুর গাছ—নামান্তর সুষুনি আলু d. fasciculata. (১৪) শাঁখআলু—শাঁখের মত আকার ও রঙ pachyrhizus anglulatus. (১৫) গজা আলু—গয়া আলু, মিকুই আলু manihot utilissima. নামান্তর শিমুলী আলু। [ ক্রমশঃ।

# হলুদ দুপুর, কুমারী মন

আশানন্দ চৌধুরী

মণিকা নিজেই জানে না দুপুর বেলাটা কেন তার কাছে হলুদ রঙের বলে মনে হয়। আকাশটা যেন বিরাট একটা পেয়ালা, হলুদ রঙের ছোপ দিয়ে কে যেন সেটাকে উপুড় করে ধরেছে—আর তার ছায়া এসে পড়েছে এখানে, সেখানে—খানিকটা মণিকাদের বাড়ীর দাওয়ায়, কিছুটা সামনের বাড়ীর কার্নিশে।

কেন যে এমন মনে হয় কে জানে? আর কোন রঙ না, কেবল হলুদ রঙে কোথায় যেন একটা বোবা কান্নার করুণ বিষণ্নতা লুকিয়ে আছে।

মণিকাদের সামনের গলিটা হঠাৎ যেন বড় রাস্তার থেকে ছিট্‌কে এসে পড়েছে। সোজা আসতে বাধা পেয়ে ঠিক তাদের সিঁড়ির কাছটায় ইংরেজি "এস" অক্ষরের মত বেঁকে গেছে। একটা দীর্ঘ, জীর্ণ রুগ্ন লোক হঠাৎ যেন পেটে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় শরীরটাকে বাঁকিয়ে শুয়ে আছে। এই গলিটার সঙ্গে মণিকার যেন একটা অদৃশ্য মিল আছে। অকারণেই মণিকার মনের ভেতরটা কেমন কোরতে থাকে।

বাড়ীর ভেতরে উঠোনের এক কোণায় একটা আধমরা শিউলি গাছ আছে। ফুল ফুটতে মণিকা কোন দিন দেখেনি। হয়ত কখন কোন সময় দু'চারটে সবুজ পাতা দেখা দেয়। ব্যস ঐ পর্য্যন্তই। সেই সবুজ মরে গিয়ে পাতাগুলি আবার ফিকে হলুদ হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

ঐ শিউলি গাছটার দিকে তাকালেই মণিকার দু'চোখ ছল ছল করে উঠে। ঐ শিউলি গাছ আর মণিকার মা দুজনেই অতৃপ্ত, অপূর্ণ।

মায়ের দীর্ঘরুগ্নতা মণিকার বাবাকে সহৃদয় করে তুলেনি। এক এক সময় মণিকার মনে হয় বাবা যেন ঠিক এ রকমটি চেয়েছিলেন, রুগ্ন মা-ই যেন বাবার দুষ্কর্মের জন্য দায়ী। গোড়াতে এমনটি ছিল না। যত্ন আত্তি কিছুটা হতো। ধীরে ধীরে সব বদলে গেল। এখন আর চিকিৎসা নেই, ভালো খাওয়া দাওয়া নেই মা শিউলি গাছটার মত মরে বেঁচে আছেন। ভালো করে এখন মায়ের গলার শব্দও শোনা যায় না। কলে আটকে-পড়া ইঁদুরটার মত চিঁ চিঁ করে কথা বলেন। মুখের কাছে কান না পাতলে কিছুই বোঝা যায় না।

ঠিক দুপুর বেলাটায় যত ভাবনা মণিকাকে চারদিক্ থেকে গ্রাস করে। কোন কূল কিনারা নেই। পুরীতে সমুদ্র দেখে মণিকা এমনি করেই ভেবেছিল—কোথায় তীর?

রোদেও মানুষের ছায়া পড়ে। মণিকা ফিরে তাকায়—বাবা কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। মণিকার গা'টা ঘিন ঘিন করে উঠে। মনটা যেন তেড়ে আসে বিদ্রোহ করার জন্য।

আশ্চর্য! লোকটার কোন ভণিতারও দরকার হলো না। একটু আম্‌তা আম্‌তা করতেও দেখা গেল না। কর্কশ কতগুলি কথা মণিকার কানের ভেতর আগুনের হলকার মত আস্তে আস্তে আনা-গোনা করতে লাগল—ভাবনার বিলাস আর কত কাল চলবে? বসে বসে অন্নধ্বংসের রেওয়াজ আধুনিক কালে অচল। দায়িত্ব শুধু আমার একলার নয়। তুমি এবং মণ্ট—দু'জনকেই রোজগারে বেরুতে হবে।

প্রতিবাদ করতেও মণিকার লজ্জা হলো। এমন কথা বাবার মুখ থেকে শুনতে হবে, এতটা মণিকা কোন দিন আশা করেনি। নিজের গরজেই এই শ্বাসরুদ্ধ পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল।

এর পর থেকেই মণিকার চাকরীর জীবন সুরু। মুক্তির আনন্দ, গ্লানি থেকে মুক্তি।

ঘটনাগুলি আকস্মিক। অস্বস্তি, আর অশান্তির কালোছায়া অঙ্গে জড়িয়ে মাংসল পায়ে থল্ থল্ করে এগিয়ে আসে। জানান দিয়ে আসলে অন্ততঃ কিছুটা তৈরী থাকা যায়। আকাশে মেঘ জমলে, মেঘের গুরু গুরু শব্দ হলে বাড়ীর বৌ, ঝিরা যেমন শুকনো কাপড় চোপড় ঘরে তুলে আনে। এ তা' নয়। তৈরী হতে সময় দেয় না, বিড়াল পায়ে আসে, ভয় ভয় করে।

বিতৃষ্ণা আর ভীতি মণিকাকে অস্থির করে তুলে। মনের কোমল বৃত্তিগুলি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। অথচ প্রতিঘাত করার ক্ষমতা নেই। বাবা যেন মণিকার দেহে একটা দূষিত ক্ষত। অঙ্গচ্ছেদের ভয়ে দারুণ অনিচ্ছায়ও পুষে রাখতে হয়।

কয়েক মাস আগেও বাবা মণ্টুর পড়ার খরচ চালাতেন। ইদানিং বন্ধ করেছেন। মণ্টুর আর বি, এ পড়া হলো না। এমন নির্লজ্জও মানুষ হতে পারে? কেন যে খরচ বন্ধ করলেন একটা সাধারণ কৈফিয়ৎ দেখিয়েও নিজেকে লজ্জামুক্ত করলেন না। (অবিশ্যি লজ্জার মত একটা বাজে জিনিষকে তিনি যদি আমল না দেন।)

এখনো মাস মাস চারশ' টাকা করে পেনশন্ পান। নিজেই খরচা করেন সব। মাঝে মাঝে মণিকার কাছেও হাত পাততে দ্বিধা করেন না। আর লজ্জা পেলেই বা চলবে কি করে? ভালো পোষাক, পানীয়, রাত্রির অভিসারের যাবতীয় খরচা চারশ' টাকাতে যে চলে না।

মাঝে মাঝে মণ্টুর পৌরুষ মাথা তুলে গর্জাতে থাকে। অনেক কষ্টে মণিকা ঠেকিয়ে রাখে। সেদিন ত চীৎকার করে বলেছে—

জানিস দিদি ওর কীর্তি! ও মনে করে চিরদিন চুপ করে থাকব, না। জানি না বুঝি ও খারাপ পাড়াতে রাত কাটায়। আরো সব কীর্তি দেবো একদিন ফাঁস করে। মণ্টুর বুকটা হাপরের মত উঠা-নামা করে।

মণিকা লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। বাধা দেওয়ার ক্ষীণতম শক্তিটুকুও খুঁজে পায় না।

মণ্টুকে নিয়েই মণিকার অস্থিরতা বেড়ে উঠে। মা'র কথা চিন্তা করে লাভ নেই। মানুষটা নিশ্চিন্তে শেষ দিনটার জন্য একটি পা বাড়িয়ে বসে আছেন। কেবল শুধু সেই কটা দিন। তারপর মণিকা একটি দিনও অপেক্ষা করবে না। এই বাড়ীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাবে। মা'র কথা ভেবে ভেবে মণিকা চঞ্চল হয়ে উঠে। বেচারী মা! বড় শান্ত, নিরীহ মানুষটি। ভাল, মন্দ কোন কিছুতেই আসক্তি নেই। নিজের অধিকারটুকুও জোর করে খাটাতে পারেন নি কোনদিন। এমন মানুষকেও কম দুঃখ পেতে হলো না। ক'দিনই বা ভুগলেন! কিন্তু কত অবহেলা পেলেন? ভাবনার ভারে মণিকা অবসন্ন।···মা তখন রোগশয্যায়। মায়ের সেবার জন্য ভাড়াটে নার্স এলো। শেষ অবধি বাবার সেবার ভারই নার্সকে নিতে হলো। অবিশ্যি বাবা অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। নার্সের সেবায় তুষ্ট হয়ে তাকেও একটা ভালো ম্যাটারনিটি হোমে পাঠিয়েছিলেন। তারপরের ঘটনা আরো কুৎসিত। ভাবতেও সঙ্কোচ আসে।

মণিকার কানের কাছটা গরম হয়ে জ্বালা করতে লাগল। তবু বাঁচোয়া—মানুষের ভাবনাগুলি আকার ধরে লোকের চোখে ফুটে উঠে না, ভাগ্যিস কেউ জানতে পারে না কার মনে কি ভাবনা।

আর একদিনের বেদনার, লজ্জার কথা মণিকা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবে না।

আকাশে ঘন মেঘের ঘটা। জল পড়ছে তো পড়ছেই। কে যেন আকাশটাকে দিয়েছে ফুটো করে। রাতও কম না। বাবা এখনো ফেরেন নি। মণিকা জেগে বসে আছে, কারণ কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সদর না খুললে কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকবে না। কিন্তু ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কখন যে মণিকাকে ঘুমের মায়ায় জড়িয়ে দিয়েছে মণিকা জানতেই পারেনি। কোলাহল শুনে মণিকা বারান্দায় এসে দেখে—বাবার সমস্ত পায়ে কাদা মাখানো, চোখ দুটি ভাঁটার মত ঘোলাটে লাল। হাতে জুতো নিয়ে অসংলগ্ন কণ্ঠে অশ্লীল গালাগাল করছেন আর মণ্টু সবলে বাবার জামার কলার চেপে ধরেছে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে একটু দূরে মা-ও রেলিং ধরে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন অশরীরী একটা প্রেতাত্মা। এ ঘটনার পর মা' বেশীদিন আর বাঁচেননি।

মণিকার অফিসে ছাঁটাইয়ের হিড়িকের জন্য ষ্ট্রাইক চলছে কদিন ধরে।

মণিকার উপায় নেই। গোপনে অফিস করছে দিন কয়েক। হয়ত কারো চোখে পড়েছে, তা না হলে সেদিন সুলেখা দেখা হতেই মুখ ফিরিয়ে নিল একটি কথাও বললো না। অথচ সুলেখার সঙ্গে তার সব চাইতে বেশী ভাব ছিল। অত সব ভাবলে মণিকার চলে না।
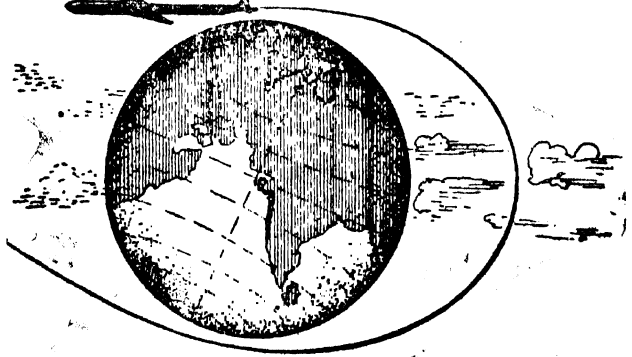
মায়ের অসুখের সময় অনেকগুলি টাকা দেনা হয়ে গিয়েছে। মণ্টুকেও কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে। মণিকা ভাবে তিনশত কর্মচারীর ভেতর সে একলা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে কিই বা আসে যায়! সব চাইতে বড় ভাবনা নিজেকে বাঁচাতে হবে এই অশুচি পরিবেশ থেকে, মণ্টুকে আর দশজনের মত মানুষ করতে হবে।

আজকাল মণিকা বাড়ী ফেরার কোনরকম তাগিদ অনুভব করে না। বাড়ীতে তার নিশ্বাস আটকে আসে, বুকটা টিপ টিপ করে। তাই অনেক সময় অকারণে ঘুরে বেড়ায়। বাস ষ্টপে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকটা যেন ছেলেদের মত। এমনি অনেক ছেলে বাসষ্টপে অকারণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে, এদিক সেদিক দৃষ্টির জোনাকি জ্বালে।

আলগোছে কে যেন কনুইটা ছুঁয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে দেখে সমীর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। দুপুরের হলুদ ছায়ায় সমীরকে অদ্ভুত মনে হয়। কিছুক্ষণ মণিকা কোন কথাই বলতে পরেনি। মণিকা ভাবছে—সমীর কি ভাববে যদি জানতে পারে সে গোপনে অফিস করেছে।

মণিকার কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল।

—ভাবছিলাম কি তোমার সঙ্গে দেখা করি। ভালোই হলো দেখা পেয়ে গেলাম।

মণিকা সমীরের হাতে একটুখানি ঠেলা দিয়ে বললো—চল খানিকটা হেঁটে ওদিকটায় যাই। এখানে দাঁড়িয়ে কথা হবে না।

—না তার চাইতে আমাদের সেই রেষ্টুরেণ্টে।

ছোট রেষ্টুরেণ্টের কেবিনে দুজনে মুখোমুখি বসে চা ও খাবার খাচ্ছে।

সমীরের দৃষ্টি অনুসরণ করে মণিকা কোমরের কাছে খালি জায়গাটুকু আঁচলে ঢেকে দিল। পুরুষ মানুষগুলি এমনিই; তার বাবাও এমনি করে তাকিয়ে থাকত যখন নিরু-ঝি আঁটসাট দেহে ঢেউ তুলে ঘরের কাজ করতো। সমীরের সঙ্গে তার বাবার দৃষ্টির তুলনা করতে গিয়ে মণিকা বড়ই লজ্জিত হলো। না! সমীর ঐ রকমই না। আর তাকালেই বা কি? মণিকা ত' জানে সমীর তাকে কথা দিয়েছে। মণিকার এমনি কত কথা মনে পড়ে। একদিন সমীর তার খোঁপার নিচে খালি জায়গাটায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল—মণিকা! তোমার শরীরটা নরম এঁটেলমাটি। সৃষ্টির সজীবতা আছে প্রচুর। মণিকা সমীরের ঝাঁকড়া চুল টেনে দিয়েছিল জোরে। বাবা! চুল ত না, যেন ঘন অরণ্যের সমারোহ। এখনো বুকের উপর গলার কাছে সমীরের এক ঠোঁট জায়গা কেমন জ্বালা জ্বালা করে মণিকার। অথচ কোন গ্লানি থাকে না। সেই বেদনাতে পুলকের দোলা লাগে। সেতারের রিমঝিম ঝঙ্কার ওঠে শিরায় শিরায়। সেই উপলব্ধির কথা প্রকাশ করা যায় না, অনুভব কোরতে হয়।

মণিকা মৃদু কণ্ঠে বলে—একটা অন্যায় করে ফেলেছি। তোমার কাছে ক্ষমা পাবো কিনা জানি না।

—কি?

—গোপনে অফিস করেছি দিন কয়েক। বাগচি প্রমোশনের আশা দিয়েছে।

—চাকরীতে, না বাগচির গৃহকোণে?

—আপাততঃ চাকরীতে।

—আমার দাবীটা কি মাঠে মারা যাবে?

—তোমার চাওয়ার ভেতর কোন ফাঁকি না থাকলে, তোমার দাবীকে ঠেকিয়ে রাখে কে?

—তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমিও ত' অফিস করেছি লুকিয়ে। ইচ্ছে ত' করে হাজার জনের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখি। কিন্তু শক্তি নেই, মনের জোর নেই। এই ধর আমার কথা, বাসন্তীর বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। এই সময় যদি ছাঁটাইয়ের লিষ্টে পড়ি, কি অবস্থাটা হবে। আরো কত সমস্যা। মা বুড়ো হয়েছেন। ক'দিনই বা আর আছেন। তাঁর কত আশা। আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারবে না?

—না করে উপায় কি? মণ্টুর একটা কাজ না হলে আমিই বা মুক্তি পাই কি করে?

মনুমেণ্টের ময়দানে সন্ধ্যা নামে। মণিকার মনে হয় সন্ধ্যারও একটা রঙ আছে। আর সেই রং নীল। এই রঙের ছায়া পড়ে না কোথাও। সমস্ত নীলটুকু গায়ে মেখে নিজেই যেন বিভোর হয়ে থাকে। এই সময়টুকু মণিকার নিজস্ব, বড় ভালো লাগে, স্নিগ্ধ, মধুর। এই মিঠে ফিকে অন্ধকার মণিকার সব ক্লান্তির প্রলেপ, সব অবসাদের মধুর সান্ত্বনা। এই একক জীবনের অবলুপ্তি একদিন আসবে—যেমন দীর্ঘদিনের শেষে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া নামে। মনের সমস্ত বিশ্বাস, আর ভরসা দিয়ে মেখে মেখে ভাবনাগুলিকে নাড়াচাড়া করতে মণিকার খুব ভালো লাগে। ছোট ছেলে যেমন লজেন্সটাকে জিভ দিয়ে একটু একটু নাড়ে, জিভের তলায় অনেকক্ষণ জাগিয়ে রাখে, যেন স্বাদটুকু তাড়াতাড়ি না ফুরিয়ে যায়—মণিকা ঠিক তেমনি করে ভাবে।

মণ্ট জানে না বাড়ী ছাড়ার আগে দিদির সঙ্গে বাবার কি কথা হয়েছিল। কেবল মনে পড়ে বড় একটা স্যুটকেস নিয়ে দিদির সঙ্গে দিদির বন্ধু অণিমাদির বাড়ী এসে উঠেছিল। তারপর দিন কয়েক পরে অণিমাদির সহায়তায় শ্যামবাজার অঞ্চলে দু'রুমের একটা ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিল।

এই শুচিশুভ্র আশ্রয়ের জন্য মণ্টুর মন দিদির প্রতি মমতায় ভরে উঠে। মাঝে মাঝে বাবার স্মৃতি মণ্টুকে পীড়িত করে তুলে। ভাবনাও আসে—তার দেহেও ত' সেই রক্ত যদি কোনদিন সেই পরিণতি আসে, বাবার মত এমন হৃদয়হীন হয়ে উঠে···। মণ্টু আর ভাবতে পারে না। পাগলের মত আপন মনেই থু থু ছিটোতে থাকে আর মনে মনে কিসের সংকল্পে দৃঢ় কঠিন হয়ে উঠে।

ষ্ট্রাইক ভেঙ্গেছে, বহুলোকের কপালও ভেঙ্গেছে। মণিকার প্রমোশন হওয়া সত্ত্বেও মন ভরে নি। আরও কত কি যেন পাওয়ার কথা ছিল। বুকটা মণিকার খালি খালি লাগছে, বারে বারে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে। মণিকার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। কত আশা ছিল মণিকার—এক আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে সে আর সমীর প্রাণভরে নিশ্বাস নেবে, সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, একই সুখদুঃখে হাসবে কাঁদবে। আজ যেন জীবনের কোন অর্থই নেই। সমীরের নাম ছাঁটাইয়ের লিষ্ট থেকে বাদ যায়নি।

অনেকদিন পরে সমীর এসেছে দেখা কোরতে। দুপুরের হলুদ ছায়া ম্লান হয়ে এসেছে।

মণিকার বিছানায় বেশ আরাম করে দু'পা তুলে বসেছে সমীর। সমীরকে আজ বেশ হাল্কামনের লোক মনে হচ্ছে। মণিকা ভাবছে—কি অদ্ভুত লোক রে বাপু। এমন বিপদেও লোকের হাসি আসে? হয়ত ভাণ করে হাসছে। এ-সব ন্যাকামী মণিকার দু'চোখের বিষ।

সমীর ঠোঁট কামড়ে বলে—আসানসোলে একটা কাজ পেয়েছি, চলে যাবো ২৫শে। মাঝে মাঝে কোলকাতা এলে তোমার কাছেই থাকবো, কি বল?

এই ছোট এইটুকুন কথা যে মণিকার চোখের জল খুঁচিয়ে বার করে নেবে, মণিকা ভাবতেই পারে নি।

এই কটা দিন সমীরের কি করে চলবে মণিকা জিজ্ঞেস কোরতে পারে নি। শুধু একখানি কাঁপা কাঁপা হাত বহু যত্নে সঞ্চিত এক মুঠো টাকা নিয়ে সমীরের কোলের উপর শিথিল হয়ে পড়ে রইলো।

মণিকার মায়ের অসুখের সময় সমীরও এমনি করে টাকা দিয়েছিল মণিকার হাতে গুঁজে—পরস্পরকে যদি বিপদে-আপদে এমনি করে দিতে না পারি, শান্তি কি করে পাবো? আমাদের মধ্যবিত্তদের ভালোবাসার দাম কোথায় এমনি করে যদি না পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসতে পারি। সেদিন মণিকাও কুন্ঠিত হয়নি হাত পাততে।

আজ মাইনে পেয়েছে মণিকা। প্রয়োজনের অতিরিক্তই বটে। জীবনে এমনি বিড়ম্বনা একদিন আসে। অপ্রয়োজনে অনেক আসে। মন্টুও নেই। সেও চাকরী নিয়ে সুদূর পাটনায় চলে গেছে। সমীরও কাছে নেই—যার হাতে সব তুলে দেওয়া যেত। মণিকার দৃষ্টি বারে বারে ঝাপসা হয়ে উঠে। অকারণে সেই শিউলি গাছটার কথা মনে পড়ে। জানতে ইচ্ছে করে একদিনের তার বন্ধ্যাত্বের অপবাদ ঘুচলো কিনা! আহা অন্তত দু'-একটি ফুল ফুটুক না।

এমনি করে কখন যে কি ভাবে কেটে গেল! আগে আগে সমীরের চিঠি আসত—কত আশা, কত রোমাঞ্চ ছিল। এখন ভাঁটার টান। মণিকা ভাবে হয়ত সময় পায় না, হয়ত মায়ের অসুখ, হয়ত সমীর অন্য কোথাও চলে গেছে বদলি হয়ে। কত কি ভাবে মণিকা।

মণিকা ত' জানে না—আসানসোলের ছোট একটি বাড়ী উৎসবের কল-কোলাহলে মুখরিত।

আজ মণিকার জন্য কেউ অপেক্ষা করে বসে নেই। তবু ভালো মণিকা জানলো না।

মণিকা সখ করে একটি কাকাতুয়া পুষেছিল। কদিন ধরে বিশ্রী কর্কশস্বরে অহরহ কিসের যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হয়ত ছাড়া পাওয়ার আবেদন। কিন্তু মুক্তিতে কি যে বেদনা, কষ্ট মণিকা ছাড়া আর কে জানে?

মণিকা খাঁচা খুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকে। মন হাহাকার করে। আলো হলুদ ছায়া। একলা ঘরে মণিকার দিন যেন শেষ হতে চায় না। তবু মণিকা আশা করে জীবনের মৌন সমুদ্রে বুদবুদ একদিন ফুটে উঠবেই, এই একলা ঘরে মণিকার মায়ার ছায়ায় সমীর ক্লান্ত পায়ে এসে ধরা দেবেই।

মণিকার এই আশা, কুমারীমনের এই কামনা মিথ্যে হয়েও বেঁচে থাক।

---

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের শাসনের নাম গণতন্ত্র বা রিপাবলিক, যাতে রাজার কোন স্থান নেই। তাই পৃথিবীতে যে-সব পুরাণো রিপাবলিক আছে, সেগুলোর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রাজতন্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান করে, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে। বৃটিশ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত বড়লাট শাসিত ডোমিনিয়ন ভারত যে বৃটিশ রাজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, তাঁর সম্মতিক্রমে রিপাবলিক হতে চললো, এটা দুনিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার।

তাই এটা ঠিক বুঝতে না পেরে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল স্মাটস বললেন,—ডোমিনিয়ন আপোষে রাজাকে উড়িয়ে দিয়ে রিপাবলিক হবে, অথচ ডোমিনিয়নের সব সুযোগও ( ইম্পিরিয়্যাল প্রেফারেন্স, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের সাহায্য প্রভৃতি ) ভোগ করবে,—এটা কেমন করে হতে পারে?

'৪৭ সালে ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক লিখেছিলেন, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসটা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের চেয়ে ভাল,—কারণ ওর মধ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স তো আছেই, উপরন্তু আরো কিছু সুখ-সুবিধা আছে।

এই জন্যে ভারতকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করার আগে বৃটেনকে অন্যান্য ডোমিনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ করতে এবং তাদের সম্মতি নিতে হয়েছিল। নতুন রিপাবলিক্যান ষ্ট্যাটাসও তাদের সম্মতি সাপেক্ষ। তাই '৪৯ সালের কমনওয়েলথ কনফারেন্সে গিয়ে শ্রীনেহেরুকে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে স্মাটস্‌দের বোঝাতে হয়েছিল,—তাঁরা যা মনে করছেন, ব্যাপারটা ঠিক তা-ও নয়, আর আইনের দিক থেকেও নতুন ব্যবস্থায় কোনো বাধা নেই।

তিনি ওঁদের বুঝিয়ে দিলেন যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ যে আমাদের বড়লাট নিযুক্ত করেন, সে তো আমাদের দলের একজনকেই এবং আমাদেরই সুপারিশে,—কারণ তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কাউকেই জানেন না। আমরা সুপারিশ করি, তিনি নিয়োগপত্র দেন। সুতরাং আমরা যদি সুপারিশের বদলে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেই তাঁকে রিপোর্ট দিই, তাহলে আমাদের নির্বাচিত সেই প্রেসিডেন্টকেই তাঁর ডোমিনিয়নের শাসক রূপে গ্রহণ করতে রাজা ষষ্ঠ জর্জের আপত্তি হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? ভারতের জনগণকে স্বাধীনতা দেখাতে হলে বর্তমান বড়লাটের শাসন তুলে দিতেই হবে,—কিন্তু আমরা রিপাবলিক হয়েও যখন কমনওয়েলথেই থাকবো, তখন আমাদের ষ্ট্যাটাস ঠিকই থাকবে। বৃটিশরাজকে আমরা কমনওয়েলথের প্রধান,—কমনওয়েলথের ঐক্যের প্রতীক, এইভাবেই মেনে নিয়ে আমাদের আনুগত্য বজায় রাখবো।

আর যেহেতু কমনওয়েলথের কোনো ধরা বাঁধা সংবিধান নেই, বহুকাল ধরে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে নানা নতুন নতুন ব্যবহারবিধি ( convention ) গড়ে উঠেছে সুতরাং ভারত ডোমিনিয়ন সম্পর্কে এই নতুন ব্যবস্থাটাকে যদি আপনারা একটা নতুন convention রূপে মেনে নেন, দেখবেন, এ ব্যবস্থা কমনওয়েলথের পক্ষে ভবিষ্যতে একটা চমৎকার সুবিধাজনক ব্যবস্থা বলে প্রমাণিত হবে।

স্মাটসের দল ব্যাপারটা বুঝলেন, এবং নেহেরুর প্ল্যান মেনে নিলেন এবং নেহেরুর বৈধতা-প্রতিভার তারিফ করলেন।

জনগণ এবং তাদের তথাকথিত বামপন্থী প্রগতিশীল নেতাগণ এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সোরগোল তুললে, নেহেরু নাকি স্বাধীন ভারত রিপাবলিককে কমনওয়েলথের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছেন। এই সব রাজনৈতিক পণ্ডিতদের এটা হুঁস নেই যে, ভারত তখনও interim dominion, ruled under the 1935 constitution as amended by the India Independence Act which provided the new set up in the Central Govt. ১৯৩৫ সালের শাসনবিধি এবং তার ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট কর্তৃক সংশোধিত কেন্দ্রীয় নতুন শাসনব্যবস্থা, এগুলো যে '৫০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ ছিল, এ হুঁস ছিল না বলেই, কিম্বা এদিকে চোখ বুজে থাকার গরজেই,—তাঁরা বুঝতে পারেননি, যা বলতে চাননি যে '৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী রিপাবলিক হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারত ছিল ইণ্টারিম ডোমিনিয়ন, পাকা ডোমিনিয়ন নয়; বুঝতে পারেননি যে, রাতারাতি গভর্ণর জেনারেল ইণ্টারিম প্রেসিডেণ্ট হওয়ার অর্থ বড়লাটেরই খোলস পরিবর্তন এবং নতুন সংবিধান চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত সব ব্যবস্থাই ইণ্টারিম; বুঝতে পারেননি যে, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস সম্পূর্ণ ও পাকা করতে হলে যে নতুন সংবিধান প্রয়োজন,—আমাদের তথাকথিত কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী সেই সংবিধানই তৈরী করেছে,—সম্পূর্ণ স্বাধীন রিপাবলিকের সংবিধান নয়;—শাসনযন্ত্রটাকে রিপাবলিকের রূপ দিয়ে জনমন গণ অধিনায়ক

ভারত ভাগ্য বিধাতারা—ইংরেজ ও কংগ্রেস একযোগে নতুন সংবিধানের মধ্যে বৃটেনের সর্বপ্রকার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছে ;—বুঝতে পারেননি যে,—ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেয়ে কলোনি ভারত ইংরেজের কৃপায় এই প্রথম কমনওয়েলথ কনফারেন্সের চৌকাঠ পার হয়ে ডোমিনিয়নগুলোর প্রধান মন্ত্রীদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসার অধিকার পেয়েছে,—কমনওয়েলথ ছাড়ার প্রশ্নও ওঠে না,—এবং ইণ্টারিম ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রীর সে কথা উত্থাপন করার অধিকারও নেই।

নতুন সংবিধান অনুসারে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত পার্লামেণ্ট যখন পাকা ডোমিনিয়নের পার্লামেণ্ট হবে,—তখন সেই পার্লামেণ্টে কমনওয়েলথ ছাড়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। (কিন্তু আজ পর্যন্ত সে চেষ্টা কেউ করেননি)।

আর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সকলেই চেপে গেছেন। স্মাটসের দল যে সমস্যার কথা তুলেছিলেন এবং শ্রীনেহেরু তার যে সমাধান ব্যাখ্যা করেছিলেন,—সেগুলোকে আইন ও বৈধতার ছাঁচে ঢালাই করে একটা নতুন ব্যবস্থার রূপ দেওয়ার বৃটেন এক নতুন আইন পাশ করলে,—কনসিকোয়েনসিয়্যাল প্রভিশন অ্যাক্ট,—যাতে বলা হল, রিপাবলিক হওয়ার ফলে, বৃটিশ আইনে ভারতের যে সব অধিকার ছিল, সেগুলো বদলাবে না,—সবই আগের মতই থাকবে,—as if India had not been a Republic,—ভারত রিপাবলিক না হলে যা হ'ত।—অর্থাৎ রিপাবলিক হওয়ার পরেও ভারতের ডোমিনিয়নের ষ্ট্যাটাস অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এই আইন বৃটিশ পার্লামেণ্টে পাশ হল '৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই,—এবং পার্লামেণ্টের ঐ অধিবেশনের উপসংহার কালে—(১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৯)—রাজা ষষ্ঠ জর্জ তাঁর বক্তৃতায় বললেন,—India's assumption of the status of a Sovereign Independent Republic, while remaining full member of the British commonwealth was an historic agreement"—অর্থাৎ ভারত যে সভারেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিপাবলিকও হবে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের পূর্ণ সদস্যও থাকবে,—এটা হল একটা ঐতিহাসিক চুক্তি। সঙ্গে তিনি বৃটিশ কলোনিগুলোর জনগণের স্বায়ত্তশাসনের পথে অগ্রগতির আর একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন গোল্ডকোষ্ট (ঘানা)। ভারতের বন্দোবস্তের সাফল্যের পর সে ব্যবস্থা গোল্ডকোষ্টেও চালু হতে চলেছে,—দ্বিতীয় কালা ডোমিনিয়ন রূপে।

আমি তখন "কাঁঠালের আমসত্ত্ব" নামে প্রবন্ধ লিখে রিপাবলিক্যান ডোমিনিয়নের ব্যাখ্যায় লিখেছিলুম,—"পাৎলুন পরে হ্যারিংটন সাহেব সেজে অচেনা লোকের কাছে চাল মেরে বেড়ালে কি হবে, ফুলো বাগদীর বাপ তাকে ফুলো বলেই ডাকবে।" সে প্রবন্ধ তখন ছাপা হতে পারেনি।

যাই হোক,—'৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেসী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে তে রিপাবলিক ঘোষিত হল এবং দেশজোড়া মহোৎসব হল। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের সকল কারণ ও সম্ভাবনা অপসারিত হল,—এবং শ্রমিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের "ইঁদুর" সামনেকার প্রধান বাধারও অবসান হল। ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক সংগঠনের পথও পরিষ্কার হল।

এ বিষয়ে ভারতের পুঁজিপতির দল এবং তাঁদের পলিটিক্যাল পার্টি কংগ্রেস এবং নেহেরু সরকারও অবহিত ছিলেন,—এবং তদনুযায়ীভাবে প্রস্তুতও ছিলেন।

গান্ধী-নেহেরুর ভক্ত পিসি যোশীর নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি '৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের মহোৎসবে সামিল হয়েছিল, এবং পশ্চিমবঙ্গের সেক্রেটারী ভবানী সেন ফতোয়া দিয়েছিলেন—সর্বত্র কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে কংগ্রেসী ঝাণ্ডা ওড়াতে হবে, তার পাশে কমিউনিষ্টদের লাল ঝাণ্ডাও ওড়াতে হবে,—কিন্তু জনগণের তরফ থেকে আপত্তি হলে লালঝাণ্ডা নামিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি কোনো কমিউনিষ্ট তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়াতে দ্বিধা করে, তা হলে সে প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য হবে।

কমিউনিষ্ট অ-কমিউনিষ্ট,—সচেতন অচেতন সমগ্র চাষা-মজুর শ্রেণী আশা করেছিল, এইবার তাদের দুর্বিষহ জীবনের বিড়ম্বনার অন্তত কিছুটা আসান হবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সুতরাং তাদের দাবী-দাওয়ার আন্দোলন দেখতে দেখতে প্রবল হয়ে উঠলো,—এবং ধর্মঘটের হিড়িকও সুরু হল। কমিউনিষ্ট পার্টি স্বভাবতই এইসব আন্দোলন ও ধর্মঘট প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করলো। ক্রমে পুঁজিপতি-সরকারও দমন নীতি ও নির্যাতন সুরু করলে। শ্রেণী-সংঘর্ষ সুস্পষ্ট ও ব্যাপক হয়ে উঠলো।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৭ সালেই এসেছিল সবচেয়ে বড় ধর্মঘটের জোয়ার। সরকারী হিসাব মতেই,—ধর্মঘট ও লক-আউটের ফলে মোট এক কোটি সাড়ে ষাট লাখ কাজের দিন নষ্ট হয়েছিল। শুধু বাংলা দেশেই এই সংখ্যাটা ছিল প্রায় ৬০ লাখ।
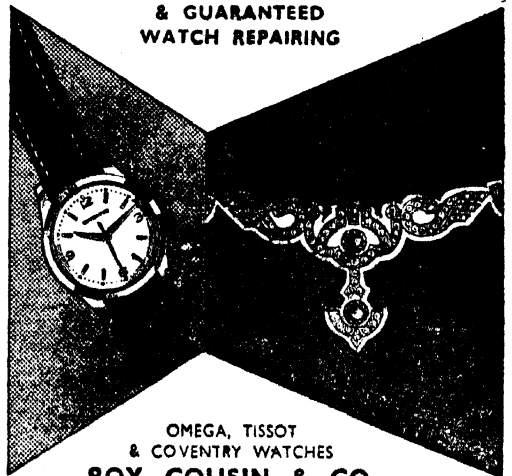
এই সব অর্থনৈতিক ধর্মঘট ছাড়াও ১৯৪৭ সালে সারা ভারতে ২১৬টি রাজনৈতিক ধর্মঘট হয়েছিল, তাতেও অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় ২৬৮০০০ শ্রমিক, এবং তাতে কাজের দিন নষ্ট হয়েছিল প্রায় ৬ লাখ।

১৯৪৮ সালেও প্রথম তিন মাসেই অর্থনৈতিক কারণে ধর্মঘট হয় ৪১৪টি, এবং তাতে কাজের দিন নষ্ট হয় প্রায় ৪০ লাখ। বাংলা দেশে এর অংশ '৪৭ সালের তুলনায় আরো বেশী ছিল। এই ধর্মঘটের লড়াই ক্রমেই বেড়ে চলেছিল, বিশেষত বাংলা দেশে। সুতরাং এই সময়ে সরকারী দমনযন্ত্রকে আরো জোরদার করা হল পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন পাশ করে।

এই নতুন সরকারী আক্রমণের প্রতিবাদে কমিউনিষ্ট পার্টি ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে কলকাতা ও সহরতলীর এক লাখ শ্রমিক একদিনের জন্যে ধর্মঘট করে। এই রাজনৈতিক ধর্মঘটের সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলনের অ-কমিউনিষ্ট দলগুলো কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হয়ে দাঁড়ায় সরকারী দমননীতির সহায়ক ধর্মঘট ভাঙ্গার হাতিয়ার স্বরূপ।

এই অবস্থায় ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়, এবং সরকার কমিউনিষ্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিনা বিচারে বন্দী করতে সুরু করে। কমিউনিষ্ট পার্টি গা-ঢাকা দেয়। তখন বাংলার পুলিসমন্ত্রী ছিলেন কট্টর কমিউনিষ্ট-বিরোধী কিরণশঙ্কর রায়।

কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডেকার্স লেনের বিরাট অফিস, "স্বাধীনতা" কাগজের অফিস ও প্রেস, বইয়ের দোকান ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, রেড এড হসপিট্যাল, সবই পুলিস সীল করলে। লোকে মনে করেছিল, এর ফলে দেশজোড়া শ্রমিক বিক্ষোভ ফেটে পড়বে—কিন্তু কিছুই হল না। চাষা-মজুররা যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল।

বোধ হয় শ্রীনেহরুও একটা দেশজোড়া শ্রমিক বিক্ষোভ আশা করেছিলেন। একটা গল্প শোনা গিয়েছিল,—তিনি নাকি দিল্লী থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে টেলিফোনে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সে সময়ে কিরণশঙ্কর রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ রায় শ্রীনেহরুকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলেন। নেহরু কিরণশঙ্করকে বলেন,—তোমার সাহস আমার চেয়ে বেশী। কিরণশঙ্কর জবাব দেন,—আপনার জনপ্রিয়তা আছে,—সুতরাং জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ও হয়ত আছে; কিন্তু আমার ও দুটোর কোনোটাই নেই।—যেমন স্বচ্ছ দৃষ্টি, তেমনি স্পষ্ট কথা।

ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেই একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে। ধর্মঘটের লড়াইয়ের মুখে যোশীর লড়াই বিমুখতার ফলে পার্টি আবিষ্কার করে ফেলেছে,—যোশী মার্কসবাদ বিরোধী চূড়ান্ত সংস্কারবাদী,—এবং এতকাল ধরে পার্টির নাকে দড়ি দিয়ে সে রিফর্মিজমের রাস্তায় ঘুরিয়ে পার্টির দফা রফা করেছে।—স্বাধীনতা,—নেহরুর প্রগতিশীলতা।—এই সব বিরাট ভুয়ো কথায় পার্টি এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে যোশীর পাল্লায় পড়ে।

সুতরাং '৪৮ সালের গোড়াতেই যোশীকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে তারা রণদিভেকে জেনারেল সেক্রেটারী করেছে, এবং রিফর্মিজমের পথ ছেড়ে "রেভোলিউশনারী ওয়ে" ধরেছে। এবং তারপর থেকে পার্টির মধ্যে বিরাট ও বিপুল মতভেদের হুড়োহুড়ি লেগে গেছে।

হুড়োহুড়ি মানে,—মতভেদ বহুমুখী,—এবং ঘরোয়া লড়াইয়ের ফল বাইরে শ্রেণী-সংঘর্ষ এবং সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপরও ফলছে—আটকাটা পার্টির বিভিন্ন গ্রুপ একে অন্যের বিরোধিতা করে,—মার্কসবাদ ও রুশ চীন নিয়ে যার মাথায় যত বিদ্যের বোঝা ছিল, সকলে তা উজাড় করে সকলের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে,—নানা রকমের উল্টোপুল্টো থীসিস এবং "পোলেমিক" এর (যুক্তিতর্কের)। লড়াইয়ে কে কত লম্বা—১০, ২০, ৫০, ১০০ পাতা—লিখতে পারে তার কম্পিটিশন লেগে গেছে।

রেভোলিউশনারী-ওয়ে ধরা হল তো প্রশ্ন উঠলো,—রাশিয়ান ওয়ে,—না, চায়না ওয়ে? শত শত পাতা লেখা চালাচালি হল, আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে কোথায় রাশিয়ার বা চায়নার সঙ্গে কতটা মিল আছে বা অ-মিল আছে। তার—সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধেই ধারণার বিভিন্নতা মিলে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামটা দাঁড়ালো তেএঁটে।

জেনারেল সেক্রেটারী রণদিভে রাশিয়ান-ওয়ের প্রবক্তা, তিনি বললেন, আমাদের দেশের বুর্জোয়ারাই এখন সরকারী ক্ষমতা পেয়েছে, সুতরাং বুর্জোয়া-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই আমাদের কাজ,—এবং শ্রমিকশ্রেণীই সে বিপ্লবের শক্তি,—কাজেই সহরে ও শিল্পকেন্দ্রে শ্রেণী সংঘর্ষই তার প্রধান পন্থা, যা রুশিয়ার বিপ্লবে হয়েছে।

তাঁর বিরোধীরা রিফর্মিজমের পথ ছাড়ার কল্যাণে ঠিক করলেন, স্বাধীনতাটা ভুয়ো, সুতরাং ভারতীয় ধনিকরা আসল ক্ষমতা পায়নি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই এখনো অপ্রত্যক্ষ ভাবে ভারত শাসন করছে, সুতরাং তারাই এখনো প্রধান শত্রু,—তাদের হাতিয়ার ফিউড্যালিজম—জমিদার-শ্রেণী। কাজেই বুর্জোয়া-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবস্থা এখনো আসেনি। আমাদের এখনো লড়তে হবে ইম্পিরিয়্যালিজম ও ফিউড্যালিজমের বিরুদ্ধে, এবং চীনের মতন জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের এখনো জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

তার জবাবে কথা উঠলো, চীন "আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের" বিরুদ্ধে লড়েছে, এবং তাদের বিরোধী "জাতীয় বুর্জোয়াদের" সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। আমাদেরও তাই করতে হবে।

তার জবাবে কথা উঠলো, চীনে শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে চারটে বড় বড় হাউস—সুং, কুং প্রভৃতি সরকারী ক্ষমতারও মালিক, তাই তাদের বুরোক্রেটিক বুর্জোয়া বলা হয়েছে। তাদের নীচেকার স্তরের বুর্জোয়ারা অনেকখানি নীচে, ছোট ছোট কাজ-কারবারের মালিক, ওপরতলার চার হাউসের সঙ্গে তাদের স্বার্থের কোনো মিল নেই, তাই তাদের জাতীয় বুর্জোয়া বলা হয়েছে। আমাদের দেশে এই রকম বড় কারাকওয়ালা স্তর নেই। আমাদের দেশে বুরোক্রেটিক কারা, জাতীয় কারা?

তখন ঠিক হল, বৃহৎ পুঁজিপতিদের একটা দল, যারা সাম্রাজ্যবাদীদের দলে ভিড়ে গেছে—তাদের সঙ্গে কাজ-কারবারে—জড়িয়ে তাদেরই মতন ছোট বণিকদেরও শোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। এই অস্পষ্টতা ও গোঁজামিল, অর্থনীতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই পাণ্ডিত্যের বাগাড়ম্বর কাজের ক্ষেত্রে কোনো সঠিক নির্দেশ দিতে পারে না। পার্টির ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিটের এক প্রোফেসর (অজিত রায়) বললেন,—শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে

কর্মরত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

আলোকচিত্র—বসুমতী

বাঙলার গৌরবরত্ন সেই
শ্রেষ্ঠ মানব

জনপ্রিয় নায়কের শেষযাত্রা।

রাতের প্রহরী —শান্তি বসু

সুবোধ ও সুশীল —পি, জি, দাস

চল কোদাল চালাই — —এন. রামকৃষ্ণ

বেদেনী —অনিল ভট্টাচার্য

প্রাণপাশ বিস্তার করে যে একচেটিয়া পুঁজিপতির দল সমাজের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, তারাই ঐ সাম্রাজ্যবাদী এবং ফিউড্যাল জমিদারদের সগোত্র এবং জনগণের শত্রু।

কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা তাঁকে পাত্তা দেন না—ভারতে মনোপলি ক্যাপিট্যাল এখনো গজায়নি। শেষে অজিত রায় স্বাধীন ভাবে এক বই লিখে বাজারে ছেড়ে দেখালেন,—ভারতে মনোপলি ক্যাপিটাল কেমন ভাবে কতখানি গড়ে উঠেছে এবং দিন দিন শশিকলার মতন বেড়ে উঠেছে,—কতগুলো বড় বড় ভারতীয় ধনিকগোষ্ঠি কতগুলো বড় বড় ব্যাঙ্কের পরিচালক,—কত ডজন ডজন বড় বড় শিল্পের ডিরেক্টর,—এবং দেশী-বিলাতী কত শিল্প-ব্যবসায়ে এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

তারপরে পার্টি ঠিক করলে, আমাদের শত্রু দুটো নয়, তিনটে,—ইম্পিরিয়্যালিজম এবং ফিউড্যালিজমের সঙ্গে মনোপলি ক্যাপিট্যালও বটে।

কিন্তু চায়না-ওয়েই যদি ওয়ে হয়,—তাহলে সংগ্রামের মূল শক্তি কৃষক,—মূলকেন্দ্র গ্রামাঞ্চল, এবং সরকারী হামলার প্রতিরোধ,—সশস্ত্র সংগ্রাম পর্যন্ত। এই আদর্শের ফলেই গড়ে উঠেছিল তেলেঙ্গানা। গ্রামাঞ্চলে এইরকম ঘাঁটী থাকলে সহর ও শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের লড়াইয়েরও একটা মস্ত সুবিধে হবে এই যে,—সহরে সরকারী হামলায় পর্যুদস্ত হলে জঙ্গী মজুররা এই সব গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটীতে আশ্রয় নিতে পারবে, এবং তাদের সাহচর্যে গ্রামাঞ্চলের জঙ্গী কৃষকরাও আধুনিক ধরণে লড়াই চালাবার কায়দাও শিখতে পারবে।

এই ভাবে লড়াই এগিয়ে চলবে, যতদিন না সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখলের অবস্থা পেকে ওঠে। ইতিমধ্যে সহর বা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের লড়াই সশস্ত্র সংগ্রাম ও ক্ষমতা দখলের দিকে যাবে না।

কিন্তু জেনারেল সেক্রেটারী রণদিভে তা মানতে চান না। ওদিকে চায়না-ওয়ে ওয়ালারা গ্রামাঞ্চলে ছোট বড় রেড পকেট তৈরী করে চলেছেন। ক্ষেতমজুররা হয়েছে সংগ্রামের প্রধান শক্তি,—তাদের ধর্মঘটও সুরু হয়েছে। তাদের সহযোগী বলে ধরা হয়েছে গরীব চাষাদের,—এবং শত্রু বলে ধরা হয়েছে জমিদার জোতদারদের, সঙ্গে ধনী বা সম্পন্ন কৃষকদের তো বটেই,—এমন কি মাঝারী স্তরের কৃষকদেরও।

খাদ্যাভাবে জর্জরিত নীচের স্তরের লোকগুলো খেটে-খুটে যে ধানের চাষ করে, তার অনেকখানি গিয়ে জোতদার ও বড় চাষীদের গোলায় ওঠে। সংগ্রামী গরীব চাষা ও ক্ষেতমজুররা মাঠ থেকে ধান কেটে আনার চেষ্টা করে, জোতদারদের দলবল বাধা দেয়,—দাঙ্গা হয়,—জোতদারেরা ধান কেটে নিয়ে গেলে সংগ্রামী বুভুক্ষু চাষা ও ক্ষেতমজুররা সেই ধান লুঠ করে আনে,—জোতদারেরা পুলিস ডাকে,—পুলিস গুলী চালায়,—পুলিসের সঙ্গে চাষাদের লড়াই হয়,—নতুন সশস্ত্র পুলিস এসে সংগ্রামী চাষাদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে চুরে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, নির্বিচারে চাষাদের গ্রেপ্তার করে, মারে,—পুলিস আসার খবর পেয়ে পুরুষরা পালায়, পুলিস এসে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে,—ক্রমে মেয়েরাও স্থানে স্থানে প্রতিরোধে নামে, রাত্রের অন্ধকারে হঠাৎ দেখা যায় জোতদারদের ঘরে আগুন লেগেছে, মাঝারী চাষাদের ওপরও গরীবরা হামলা করে, তারা বড় চাষী এবং জোতদারদের দিকে সরে যায়, এই রকমের সংগ্রাম বাংলার গ্রামাঞ্চলে চললো কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে—এবং শেষ পর্যন্ত চাষারা কোণঠাসা হল এবং পরাজিত হল।

এই পদ্ধতির বিরোধীরা তখন রুশিয়ার নজীর দিয়েই প্রমাণ করে দিলে, সেখানেও বিপ্লবের দুটো ধাপ ছিল, প্রথম ধাপের কাজ বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশন সম্পূর্ণ করা, এবং সে ধাপে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর মূল মিত্রশক্তি সমগ্র কৃষক শ্রেণী; আর দ্বিতীয় ধাপ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং তার সংগ্রামে ছোট কৃষক এবং ক্ষেতমজুর প্রধান মিত্রশক্তি, ধনী চাষাদের জমিদার জোতদারের দোসর বলে গণ্য করা, এবং মাঝারী চাষাদের নিষ্ক্রিয় করা।

আমাদের দেশে ওই প্রথম ধাপটার অবস্থা, সুতরাং যা করা হয়েছে, তা ভুল, অতি বামপন্থী বাহাদুরী মাত্র, তাই হার হয়েছে, আন্দোলনই বানচাল হয়ে গেছে।

যোশী ছিল সরকারী হামলার সক্রিয় প্রতিরোধেরই বিরোধী এবং তাই তেলেঙ্গানারও বিরোধী। রণদিভে সক্রিয় প্রতিরোধের বিরোধী নয়—কিন্তু গ্রামাঞ্চল প্রধান সংগ্রামের ক্ষেত্র, এই নীতির বিরোধী,—এবং তাই তেলেঙ্গানারও বিরোধী।

প্রতিরোধপন্থীদের কথা হল, যোশী সংস্কারবাদী, আর রণদিভে অতিবামপন্থী বাহাদুরীবাদী। দুটো ভুলেরই ফল এক। প্রতিরোধের সংগ্রাম হল বিপ্লবের রিহার্স্যাল, পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে উন্নততর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে এগোতে হবে, তবে না একদিন বিপ্লব সম্ভব হবে!

তারা নজীর দেখিয়ে নিজেদের কথার প্রমাণ দিলে, যোশীপন্থী কেরালা পার্টি সরকারী হামলার প্রতিরোধ না করেই সরে পড়েছিল, তার ফলে সেখানে পার্টির ইজ্জৎ গিয়েছিল,—সভ্যসংখ্যাও কমে গিয়েছিল, এবং গণ-আন্দোলনও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে অন্ধ্রপার্টি প্রতিরোধ-পন্থী বলে, সেখানে তারা সরকারী হামলায় দলে দলে জেলে গিয়েও, গুলী খেয়ে দলে দলে জখম হয়ে এবং মরেও সফল হয়েছিল—পার্টির ইজ্জৎ ও সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং গণ-আন্দোলন আরো জোরদার হয়েছিল।

তারপর হায়দ্রাবাদে ভারতীয় সৈন্য গিয়ে যখন তেলেঙ্গানার কৃষক রাজত্ব ধ্বংস করলে, তখন কমিউনিষ্ট পার্টি নেহেরুর নাম দিলে Fascist Nehru, The Servitor of British Imperialism—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলাম ফ্যাসিষ্ট নেহেরু।

কলকাতায় বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের এক প্রতিবাদ মিছিলের ওপর পুলিশ হামলা করলে (১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বলে) পুলিসের ওপর এক বোমা পড়ে, এবং পুলিস গুলী চালিয়ে পাঁচজন মহিলাকে নিহত করে।

কমিউনিষ্ট ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে ইউনিভারসিটি ও কলেজের ছাত্রেরা প্রতিবাদ মিছিল করতে রাস্তায় বেরুলে পুলিসের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে—রাস্তায় ব্যারিকেড করে বোমা ও গুলীর যুদ্ধ হয়—মুখ্যমন্ত্রীর নাম হয় খুনী বিধান রায়—দিনের পর দিন কমিউনিষ্টদের বে-আইনী পত্রিকায় ধিক্কার চলে—এক কাগজ বে-আইনী ঘোষিত হলে ভিন্ন নামে কাগজ বেরোয়—ছাপাখানার নাম থাকে না—কাগজ ছাপা হয় গুপ্তভাবে। ফেরারী কমিউনিষ্টদের গুপ্ত

আড্ডায় বোমা তৈরী হয়, অ্যাসিড বাল্ব তৈরী হয়, তাই নিয়ে চলে পুলিসের সঙ্গে লড়াই।

জেনারেল সেক্রেটারী রণদিভে পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক নীতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে খাঁটি হিটলারী পদ্ধতিতে পার্টির নেতাদের তাড়িয়ে দেওয়া এবং পদচ্যুত করা, পলিটব্যুরো বা সেন্ট্রাল কমিটির সঙ্গে পরামর্শ না করেই নিজের নামে খুসীমত আদেশ-নির্দেশ চালাতে থাকেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতাদের সমালোচনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, চেপে দিয়ে সমগ্র দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে প্রায় একাই ম্যানেজ করতে থাকেন। বিতাড়িত হওয়ার ভয়ে প্রাদেশিক নেতাদের দু-এক জন তাঁর দোসররূপে নিজ নিজ এলাকার হিটলার হয়ে ওঠেন। বাংলার এমনি দুজন নেতা ছিলেন রবি ও গৌর—( ছদ্মনাম ) রবি প্রাদেশিক হিটলার, গৌর তাঁর দোসর।

এর মধ্যে কলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে ( ওয়েলিংটন স্কোয়ার ) কিম্বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে ( ঠিক মনে নেই )—যুগোশ্লাভিয়ার কয়েকজন যুবক নিমন্ত্রিত ফ্রোটারন্যাল ডেলিগেটরূপে আসে এবং তাদের নিয়ে অসম্ভব রকম ঘটা করা হয়। সভায় মার্শাল টিটোর নাম উঠলেই তুমুল হর্ষধ্বনি চলতে থাকে। তারপর যখন রুশিয়ার কর্তাদের সঙ্গে টিটোর বিবাদ বাধে এবং টিটোকে কমিনফর্ম থেকে বয়কট করা হয়, তখন থেকে প্রচার সুরু হয়, টিটো একজন ইম্পিরিয়্যালিষ্ট স্পাই। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিও কোমর বেঁধে ঐ কথা প্রচার করতে থাকে।

ভিয়েৎনাম তখনও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। সেখান থেকে একদল যুবক প্রতিনিধি গোপনে পলায়ন করে কলকাতার সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের নিয়েও ঘটা হয়েছিল। এবং সম্মেলনে ছাত্র-কংগ্রেসের "বোসগপ" নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রের দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর কার্যকলাপের প্রশংসা করে এক প্রস্তাব আনলে কমিউনিষ্ট ছাত্র ফেডারেশনের দল যখন তাদের পুরানো ঐতিহ্য অনুসারে তার বিরোধিতা করে, তখন গণ্ডগোল বেঁধে সভা পণ্ড হয় এবং প্যাণ্ডালে আগুন লাগাবারও চেষ্টা হয়।

তারপর ডিকসন লেনে এক বাড়ীতে ভিয়েৎনাম ডেলিগেটদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হলে সেখানে এক সশস্ত্র হামলা হয় এবং দুজন কমিউনিষ্ট আততায়ীদের গুলীর আঘাতে নিহত হয়। তাদের একজন ছিল লেডী অবলা বসুর পালিত পুত্র। সে খুনের কোন কিনারা হয় না।

বাংলার কমিউনিষ্ট হিটলার বেপরোয়া ফতোয়া দিলেন, জেলে কমিউনিষ্টরা বসে খেয়ে খেয়ে বাবু হয়ে যাচ্ছেন, এটা ভাল কথা নয়, তাদেরও জেলের মধ্যেই লড়াই করা দরকার। সুতরাং সে লড়াই হলও, এবং বন্দী কমিউনিষ্ট কয়েকজন গুলীর আঘাতে নিহতও হল,—বহু জন আহতও হল। মেয়ে কমিউনিষ্ট বন্দীরাও এ লড়াই থেকে বাদ যায়নি।

হিটলারী ক্ষমতা এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, তিনি এক থীসিস লিখে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, মাও-সে-তুং চীনের বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কারণ তিনি সর্বতো ভাবে রুশিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট কাগজগুলোতে তার কড়া সমালোচনা বেরোতে পরে হিটলারকে মাপ চাইতে হয়েছিল।

বুর্জোয়া জগতে তখন মাও এশিয়ার টিটো বলে গণ্য। বৃটেন তার হংকংএর ব্যবসার ঘাঁটি বাঁচাবার জন্তে নয়া চীনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর শ্রীনেহেরুও স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিলেন,—পাছে মাও সর্বতোভাবে রুশিয়ার সঙ্গে মিলে যান, তাই তিনি তাঁকে আগলে রাখার জন্তেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন।

যাই হোক, প্রোলেটারিয়্যান রেভোলিউশনের দফা রফা হয়ে গেল। এর সঙ্গে আর এক আন্তর্জাতিক ব্যাপারের চমৎকার এক কাকতালীয় সম্পর্কও দেখা গেল। ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টি যখন রিফর্মিষ্ট ওয়ে ছেড়ে রেভোলিউশনারী-ওয়ে ধরেছে, তখন দেখা গেল মস্কো থেকে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত লয় হেণ্ডারসন ভারতে বদলী হলেন। কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও সোভিয়েট বিরোধী প্রচার ও সংগঠন কার্যে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্র বিভাগের পয়লা নম্বর বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত।

তাঁর আমলেই কমিউনিষ্টদের বিপ্লবের পথ ধরাটা এক কেলেঙ্কারীতে পর্যবসিত ও খানচাল হল। তারপরই তিনি বদলী হলেন ইরাণে, তখন প্রধান মন্ত্রী মোসাদ্দেক তৈলশিল্প জাতীয়করণের জন্তে লড়ছেন। লয় হেণ্ডারসনের আমলেই মোসাদ্দেকের পতন হল, এবং জেনারেল জাহিদীর সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। আবার ঠিক তার পরেই লয় হেণ্ডারসন আমেরিকায় ফিরে গেলেন এবং "মূল্যবান কাজের জন্তে" রাষ্ট্রীয় প্রশংসা ও সম্মান পেলেন।

এদিকে কমিউনিষ্ট রাজ্যে রণদিভে গোষ্ঠিরও পতন হল। পদচ্যুত নেতাদের বাধ্যতামূলক আত্মসমালোচনায় তাঁরা সকলেই এক বাক্যে বললেন,—আমি মার্কসবাদও ভাল বুঝি না, আর আমার স্বভাবেও মধ্যবিত্ত-সুলভ ব্যক্তিগত বাহাদুরীর দুর্বলতা আছে, এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আদর্শও বদ্ধমূল, তাই আমি এত ভুল এবং অপকর্ম করেছি।

এরপর পার্টি নেহেরুর কাছে বৈধ পার্লামেন্টারী পথে চলার মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পেলো, নেহেরু হলেন পার্টির হিরো। আমার বিপ্লবের সন্ধানও শেষ হল।

**সমাপ্ত**

# কেন তুমি ফিরে গেলে

## গোবিন্দ গোস্বামী

ভোরের শিশিরে দেখি পূর্যের বিস্ময়
ঘাসের সবুজে তার প্রতিবিম্ব যতো,
তোমার চাঁদের মুখে আমার প্রণয়
হাজার জোনাকী-জ্বলা আকাশের মতো।

নির্জন দিনের শেষে রাত্রির কুয়াশা
বিস্মৃতির পাল তুলি দূরতম দেশে—
আমার মনের মুক্তি খোঁজে তার ভাষা,
কেন তুমি ফিরে গেলে, এত কাছে এসে ?

## রুমানিয়ার উপকথা

### শ্রীজয়দেব রায়

রুমানিয়া দেশে সাইমন নামে এক চাষা বাস করত। তার ছিল গ্রেগরি নামে একটি অশ্বতর। সাইমনের বুদ্ধিশুদ্ধি খুব বেশী ছিল না ব'লে লোকে তাকে 'বোকা সাইমন' ব'লে ডাকত।

একদিন বোকা সাইমন তার গ্রেগরিকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছে, গ্রেগরির গলায় বাঁধা আছে একটা মোটা দড়ি।

ছুটি ধূর্ত লোক পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দেখে একজন অপরজনকে বলল—ঐ খচ্চরটাকে চুরি করতে পারবি?

দ্বিতীয় জন হেসে বলল—দেখ না, এখনই আমি ওটাকে চুরি করছি। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করো। আমি খচ্চরটার বদলে নিজে দড়িটা গলায় পরব, তুমি সেই ফাঁকে সেটায় চড়ে পালিয়ে যেও।

এই বলে সে ধীরে ধীরে খচ্চরটার পেছন খানিকটা গিয়ে এক সময়ে সেটার গলা থেকে দড়িটা খুলে নিজের গলায় পরল। তারপর সাইমনের পেছন পেছন চলতে লাগল।

প্রথমজন তৎক্ষণাৎ খচ্চরের ওপর উঠে সরে পড়েছে। দ্বিতীয় চোর সাইমনের পেছনে পেছন অনেকক্ষণ গেল। তারপর যখন সে দেখল প্রথম চোর অনেক দূর চলে গিয়েছে, তখন সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সাইমন এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছিল। হঠাৎ দড়িতে টান পড়তে সে ফিরে দাঁড়ালো, দেখল একটা লোকের গলায় দড়িটা বাঁধা আছে আর তার খচ্চরটা কোথাও নেই।

সাইমন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—এ কি? তুমি কে? আমার সেটা কোথায় গেল?

চোর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল—আমিই আপনার খচ্চর ছিলাম। শুনবেন আমার গল্প, আমি ছিলাম আমার বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, তিনি আমার ওপর অনেক আশা রেখেছিলেন; কিন্তু আমি মোটেই ভাল ছেলে ছিলাম না, আমার দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তা ছাড়া আমি ছিলাম অত্যন্ত অলস, লেখা পড়া করতাম না; আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে এক যাদুকরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যাদুকরও আমার দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হয়ে আমাকে একটা খচ্চর বানিয়ে দিলেন; তারপর আমাকে আপনার কাছে বিক্রি ক'রে দিলেন। তবে, তিনি বলে রেখেছিলেন যদি কোন দিন আমি আমার চরিত্রের জন্য—অনুতপ্ত হই, তা হলে আবার মানুষ হতে পারব। আজ যখন আপনার পেছন পেছন আসছিলাম, আমার অনুতাপ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার মানুষ হয়ে উঠেছি। এখন আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দিন, আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে যাই।

সাইমন সব শুনে খুব দুঃখিত হ'ল, সে তার গলার দড়ি খুলে তাকে বাড়ী চলে যেতে বলল।

চোর পালিয়ে যেতে সে চিন্তিত হয়ে বাড়ী ফিরে এসে তার বউকে সব কথা খুলে বলল, ভাবতে পারো, ঐ নির্বোধ পশুটা সত্যিকার একজন মানুষ ছিল, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হ'লে সে আবার তার নিজের দেহ ফিরে পেয়েছে।

তার বউও অতি সরল, সে সব কথা নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করল, বলল—আহা রে, ওকে আমরা কোন দিন মানুষের মতো ক'রে তো দেখিনি। যাক্ গে, বেচারা যে আবার তার মায়ের কাছে ফিরে যেতে পেরেছে তাতেই আমার আনন্দ হচ্ছে।

সাইমনও বলল—হ্যাঁ, কাল আর একটা খচ্চর কিনে আনব।

পরদিন সে যেখানে খচ্চর, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি বিক্রি হয় সেখানে একটা নতুন পশু কিনতে গেল। গিয়ে সে চমকে উঠল—আরে, আমার সেই গ্রেগরি এখানে কি ক'রে এলো? আবার সে কি ক'রে খচ্চর হয়ে গেল? তাকে আবার বিক্রিই বা করছে কেন?

সাইমন তার খচ্চরকে চিনতে পেরেছিল কাটা ডান কান আর লেজে সাদা দাগ দেখে। সে ব্যস্ত হয়ে এসে গ্রেগরির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—হায় হায়, তুমি বাবা, আবার যাদুকর সন্ন্যাসীকে বিরক্ত করেছিলে বুঝি? এততেও তোমার সুবুদ্ধি হ'ল না? আবার তুমি অভিশাপে খচ্চর বনে গেলে? যাই হোক বাবা, জেনে শুনে আর আমি তোমাকে কিনতে পারি না।

এই বলে সে আর একটা জন্তু কিনে নিয়ে দ্রুত বাড়ী ফিরে এসে বউকে সব কথা বলল—গ্রেগরিকে ইচ্ছা করেই কিনলাম না, কে জানে কবে আবার তার অনুতাপ হবে আর আবার মানুষ হয়ে উঠবে। বার বার কেনবার পয়সা আমার নেই।

## ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

### দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

### চার

বাংলার নাম-ধাম

পুরাণে আছে, চন্দ্রবংশে এক রাজা ছিলেন। নাম তাঁর বলি। বলির ছিল পাঁচ ছেলে। তাঁদের নাম হোল—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।

বলির ছিল মস্ত রাজ্য। মারা যাবার আগে বলি ভাবলেন, আমি মারা গেলে ছেলেরা রাজ্য নিয়ে গোলমাল করতে পারে। তাঁর স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি কুরুক্ষেত্রের কথা। তাই তিনি তাঁর রাজ্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে দিলেন পাঁচ রাজকুমারকে। রাজকুমারগণ তাঁদের রাজ্যের নাম রাখলেন নিজেদের নাম অনুসারে। বঙ্গ রাজকুমারের ভাগে যে অংশ এল, সে অংশের নাম হোল বঙ্গ; আর সে অংশ গঙ্গার সৃষ্ট নতুন ভূখণ্ডটি।

আগে বাংলা ছিল জলাভূমি। জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেত সব জমিকে। তাই জলকে বাধা দেবার জন্ত এক রকমের মাটির বাঁধ দেওয়া হোত। তাকে বলত 'আল'। বঙ্গ আর আল এই দু'টো কথার যোগে হয় বঙ্গাল। তিরুমলয় নামে এক জায়গায় একটা শিলালিপিতে একথাটা আজও লেখা আছে। কত যুগের কত ঝড়-ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রক্ষা করে রেখেছে এই শিলালিপিটি বাংলার পুরানো নাম বঙ্গাল।

কালক্রমে এই বঙ্গাল লোকের মুখে মুখে হয়ে গেল বাঙ্গালা, বাংলা বা বাঙ্‌লা। আজ আবার সে হারিয়েছে তার পূর্বদিকের অর্ধাঙ্গ। তাই তার পশ্চিম দিকের নাম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

আমাদের দেশের সীমা কতবার যে পাল্টিয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এ জগৎটাই পরিবর্তনশীল। ভাঙা আর গড়া চিরদিন চলেছে। মানুষের দেওয়া সীমারেখা যে চিরদিন এক থাকবে, এটা আশা করা দুরাশা। বাংলাদেশ কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। কালে কালে তার কত কি নাম হয়েছে। সে সব নামধাম আগে ভাগে বলে রাখি, নইলে শেষে মুশকিলে পড়তে হবে।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম বাংলার প্রথম পরিব্যাপ্তি। বর্তমান বাংলার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার কতকাংশ আর বিহারের ভাগলপুর, ও মুঙ্গের জেলা জুড়ে ছিল অঙ্গ রাজ্য। বর্তমান বাংলার (অবিভক্ত বাংলার কথা বলছি) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভাগকে বলত বঙ্গ। একাদশ শতকের শেষাশেষি বঙ্গের দুটি ভাগ ছিল—উপবঙ্গ ও অনুত্তরবঙ্গ। বঙ্গের উত্তরভাগ উপবঙ্গ। উপবঙ্গের উত্তর সীমায় ছিল পদ্মা। বঙ্গের দক্ষিণভাগ অনুত্তরবঙ্গ। সমুদ্র পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল অনুত্তরবঙ্গ। বর্তমান বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় ছিল কলিঙ্গ। উড়িষ্যার পুরী, গঞ্জাম ও বালেশ্বর জেলা এবং বাংলার মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ নিয়ে ছিল কলিঙ্গ। বাংলা দেশের উত্তরভাগের নাম ছিল পুণ্ড্র। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র মাঝখানে ছিল সুহ্ম। সুহ্ম পরে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—সুহ্ম ও ব্রহ্ম। সুহ্মর পরে নাম হয় রাঢ়। রাষ্ট্র কথাটার অপভ্রংশ রাঢ়। রাঢ় আবার দু'ভাগে বিভক্ত। অজয় নদী তাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। অজয় নদীর উত্তরে যে অংশ তার নাম উত্তর রাঢ় ও ব্রহ্ম। অজয় নদীর দক্ষিণে যে অংশ তার নাম দক্ষিণ রাঢ় বা সুহ্ম। বাংলা দেশের দক্ষিণাংশের নাম হয়েছিল সমতট। কলিঙ্গের মেদিনীপুর অংশের নাম হয় এক সময় তাম্রলিপ্তি। বাংলাদেশের প্রাচীন সীমানাবিন্যাস ছিল এই রকম। ছিল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত।

ষষ্ঠ শতক থেকে দেখা গেল একটা নতুন জনপদের উত্থান। সে জনপদ গৌড়। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে শশাঙ্ক হলেন বাংলার রাজা। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তিনি এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করেন। তাঁর আমল থেকে বাংলা প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—বাংলার উত্তর ভাগে পুণ্ড্র, পূর্বভাগে বঙ্গ, আর পশ্চিম ভাগে গৌড়। এই সময়ে বঙ্গাল, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, বরেন্দ্র, দণ্ডভুক্তি, উত্তর রাঢ়, ও দক্ষিণ রাঢ় জনপদগুলি ছিল। কিন্তু উপরিউক্ত তিনটি জনপদের নামের কাছে এই জনপদগুলি হয়ে গিয়েছিল ম্লান। পূর্ব-দক্ষিণ বাংলায় গড়ে ওঠে বঙ্গাল জনপদ। পুণ্ড্রর কতকাংশে নাম হয় তখন বরেন্দ্র। তাম্রলিপ্তির নাম হয় দণ্ডভুক্তি। বর্তমান শ্রীহট্টে ছিল হরিকেল। বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ।

শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা সমস্ত বাংলার নাম দিয়েছিলেন গৌড়। গৌড় নামটা গুড় থেকে হয়েছে। তাই বুঝি সেই সব রাজারা গৌড় নামে গুড়ের মিষ্টতার স্বাদ পেয়েছিলেন ও বঙ্গনামের অনাদর করেছিলেন নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন গৌড়েশ্বর বা গৌড়াধিপ নামে। সমস্ত বাংলাদেশের বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নি। হিন্দু রাজারা গৌড় নামে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হয়নি। মুসলমান আমলে এই চেষ্টা সফল হয়, আর এই চেষ্টা পূর্ণ পরিণতি পায় আকবরের আমলে, যখন সমগ্র বাংলা দেশ "সুবে বাংলা" নামে পরিচিত হয়। সুবে বাংলা ছিল বর্তমান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকাংশ নিয়ে। আর এই ব্যবস্থা ছিল ১৯১২ পর্যান্ত। ১৯১২ সালে ইংরেজ প্রথম বঙ্গ ভঙ্গ করে। তার ফলে বাংলা দেশ থেকে বিহার ও উড়িষ্যা বাদ যায়। বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে যে বাংলাদেশ, সে-বাংলার সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ সাল। দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ। দু'শো বছরের পরাধীনতার পর বাংলা তথা ভারত স্বাধীন হোল। স্বাধীনতার সাথে ঘটল অঙ্গচ্ছেদ। বাংলা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ।

## টুটুর ভাবনা

### প্রভাকর মাঝি

কি ফ্যাসাদে আছি ভাই ছেলেটাকে নিয়ে
বলতে পারি না দিন যায় কোথা দিয়ে।
এমন দুপুর-রোদে চোখ যদি বোজে
কেবল বাইরে যেতে ফন্দী ও খোঁজে।
চোখ পিট-পিট করে শুয়ে ঐখানে,
যেন ভাজা মাছ খেতে উল্টে না জানে।
"লক্ষ্মী খোকন"—যত বলি মিঠে সুরে,
"বাইরে যাবে না গনগনে রোদ্দুরে।
এখন শান্ত হয়ে ঘুমোও মানিক"—
হাঁ, তখন চুপ করে থাকবে খানিক।
তারপর আমি যেই চোখ বুজি ভাই,
শান্ত খোকন আর শান্তটি নাই।
খুট করে খিল খুলে সাত-তাড়াতাড়ি,
সটান পৌঁছে যাবে ছানুদের বাড়ী।
নয়তো সে হুটোপুটি ক'রে সারা ঘরে,
খাতা, বই-পত্তর এলোমেলো করে।
ভগবান না করুন,—যদি কিছু হয়
আমাকেই ভুগতে তো হবে সে সময়।
পড়তে বসেই ঢুলে পড়ে সন্ধ্যায়
ওর কথা ভেবে চোখে ঘুম চলে যায়।
আমার ভাবনা আর জানাই বা কাকে ?
বললো দুপুরে টুটু কাল টুম্পাকে।

## এক বিচিত্র প্রাণী

### গৌর আদক

প্রথমেই পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের কাছে বলছি যে, এখানে যে প্রাণীটির কথা বলছি এটি একটি সমুদ্রের মাছ। মাছের কথা শুনে তোমরা তোমাদের কৌতূহলটাকে নষ্ট করো না। কারণ তোমরা সকলেই আমিষভোজী, নিরামিষ ভোজী নও, মাছের সঙ্গে তোমাদের নিকট সম্পর্ক। পুকুরের রুই, কাতলা, কৈ, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের মাছও খেয়েছ, কারণ আজকাল মাছের বাজারে বহু রকম সমুদ্রের মাছও আমদানি হয়। তা হয়তো তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে, বিশেষ করে যারা মাছের বাজারে গেছ। তবে তোমরা যে সমস্ত সমুদ্রের মাছ খেয়েছ বা দেখেছ এই সমস্ত সমুদ্রের মাছের মধ্যে বিশেষ কোন বিচিত্রতা নেই, কারণ এই সমস্ত মাছ অতি সামান্য পুকুরের রুই, কাতলা, শিঙি, কৈ, মাগুরের মতনই। তাই মাছের বিচিত্রতার কথা বলতে গেলেই বলতে হবে গভীর সমুদ্রের মাছের কথা, যেখানে প্রতিটি মাছের মধ্যেই পাওয়া যায় বেশ বিচিত্রতা। সে এমনি বিচিত্র যে না দেখলে তোমরা কল্পনাই করতে পারবে না। তবু তোমাদের কাছে এই রকম এক বিচিত্র ধরণের মাছের কথা লেখার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

এর আগে হয়তো তোমরা অনেকেই কিছু কিছু মাছের গল্প শুনে থাকবে। এইটাই যে তোমাদের কাছে প্রথম তা নয় কারণ মাছ তো আর এক রকম নয়, মাছ বহু রকমের আছে, সমুদ্রের তলায় প্রায় লক্ষ লক্ষ রকম মাছের ঘর বাড়ি। তার যদি সব রকম মাছের একটা নামের তালিকা দেওয়া হয়, তাহলে এ রকম কাগজের পাতা যে কতগুলো শেষ হবে তার আর ইয়ত্তা থাকবে না। এই রকম লক্ষ লক্ষ ধরণের মাছের ভিতর থেকে বেছে নিয়ে একটি মাছের গল্পই বলি শোন।

ভূমধ্য সাগরের গভীর জলের প্রাণী "টরপেডো মাছ"। এর চেহারা এবং স্বভাব দুইয়ের মধ্যেই আছে বেশ বৈচিত্র্য। বেহালা বাদ্যযন্ত্রের মতন আবছা কালচে রং-এর চেহারা, তার উপর লাগানো সংখ্যায় অধিক কয়েকটি জলীয় পদার্থ পূর্ণ লম্বা লম্বা নল আর সেই নলের চারিধারে গায়ের উপর গোল গোল কালো রং-এর দাগ। আচমকা দেখলে মনে হয় ঠিক যেন একটি মৌচাক। টরপেডোর গায়ের ঐ জলীয় পদার্থপূর্ণ নলগুলি ওদের কোন বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, নলগুলি ওদের জীবিকা নির্ব্বাহ এবং আত্মরক্ষা করার অস্ত্র। জলীয় পদার্থপূর্ণ নলগুলির মধ্যে থাকে ওদের বৈদ্যুতিক শক্তি।

আমরা বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করি বা যার দ্বারা বিজলী বাতি, পাখা, ইলেকট্রিক হিটার প্রভৃতি জিনিষ ব্যবহার করি ঐ বৈদ্যুতিক শক্তি আর টরপেডোর গায়ের বৈদ্যুতিক শক্তি একই, এর মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তবে বাড়িতে ব্যবহার্য্য বৈদ্যুতিক শক্তির মধ্যে ভোলটেজের কম বেশি হয় কিন্তু ওদের শরীরের বৈদ্যুতিক শক্তির কোন কম বেশি হয় না। ও সব সময় একই ভাব থাকে। এবং আমরা বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করি তা বৈজ্ঞানিক মতে নানা রূপ কল কব্জা বসিয়ে উৎপাদন করতে হয়, কিন্তু ওদের শরীরের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করার জন্য কোন কল কব্জার দরকার হয় না, প্রকৃতি ওদের এ বিষয় যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং প্রকৃতিই ওদের কল কব্জা।

প্রকৃতি দেবী যদি আজ তাঁর এই করুণ কৃপা না করতেন ওদের উপর, তাহলে হয়তো ওরা প্রতি মুহূর্তেই সমুদ্রের অন্যান্য শক্তিশালী প্রাণীর কবলে পড়ে নিহত হতো। কিন্তু প্রকৃতির এই করুণ কৃপায় ওরাও আজ সমুদ্রের অন্যান্য শক্তিশালী প্রাণীর মধ্যে একটি। শুধু তাই নয় ওরা এই শক্তির দ্বারা উপকৃত হচ্ছে নানা দিক দিয়ে। শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করে নিজের জীবন রক্ষা করা এবং দৈনন্দিন জীবনের আহারের উপযোগী শিকার ধরায়, এই দু'দিক দিয়ে ওরা উপকৃত হচ্ছে এই শক্তির দ্বারা।

শিকার ধরার কৌশলটা ওদের বড়ই বিচিত্র। শিকার ধরার সময় ওরা বালির নিচে চোরের মতন ঘাপটি মেরে বসে থাকে, শুধু চোখ দুটি বার করে। তখন কোন প্রাণী ঘূণাক্ষরে একবারও টের পায় না যে, তাকে ধরবার জন্য চোরের মতন লুকিয়ে আছে তার শত্রু। যখনই কোন প্রাণী ওদের সামনে দিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ ওরা ওদের বৈদ্যুতিক শক্তি পূর্ণ চেহারাটি নিয়ে বালির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মাতালের মতন টলে পড়ে তার গায়ে এবং তার গায়ে গা লাগবার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণীটি একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। অচৈতন্য হয়ে যাবার পরই ওরা সেই প্রাণীটিকে অম্লান বদনে আহার করে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করে।

ওরা এই শক্তির দ্বারা যে কত দিক দিয়ে উপকৃত হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এই জন্য এই শক্তির কাছে ওরা চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছে, কারণ এই শক্তি ওদের জীবন ধারণ করার একমাত্র সহায়ক।

## যাদু দেশলাই

### যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

যাদুকরের হাতে আছে একটি তাস, যেমন ধরো হরতনের বিবি—দেখতে দেখতে সবার চোখের সামনে হঠাৎ সেটা হয়ে গেল একটা দেশলাই। যাদুকর সেই দেশলাই থেকে আবার একটি কাঠি বের ক'রে এক দর্শকের সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। কাণ্ডকারখানা দেখে তো সবাই অবাক। খুব বেশীদিনের কথা নয়, এই তো সেবারও লণ্ডন যাবার পথে সাউথাম্পটন থেকে লণ্ডনগামী ট্রেণের
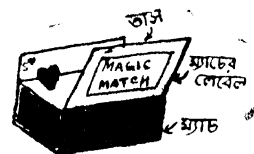
কামরায় কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র ও ইংরেজ ভদ্রলোককে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম এই মজার ব্যাপারটা দেখিয়ে। আর অবাক হবারই তো কথা। চোখের সামনে এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলে অবাক না হয়ে কি পারে কেউ।

কেমন করে এই অদ্ভুত খেলাটা দেখানো সম্ভব হয় তাই শোন এখন। আসলে ঐ তাসটাতেই কিন্তু আছে যত কিছু কারসাজি।

বেছে বেছে এমন একটি তাস সংগ্রহ করবে যা চওড়ায় হবে একটি লম্ব দেশলাই লম্বায় যতটুকুন ততটুকুন। যদি এ মাপের তাস না পাও তবে ধার থেকে কাঁচি দিয়ে কিছু কিছু অংশ ছেঁটে নিলেই ঠিক মাপ মতন হবে। যে মার্কার দেশলাই ব্যবহার করবে সেই মার্কার অন্য একটি দেশলাই থেকে ছবিটা তুলে নিয়ে তা আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেবে এই তাসের পেছনের দিকে এক ধার ঘেঁসে আড়াআড়ি ভাবে। এইবার এই ছবিটা তাসের যতটুকুন জুড়ে আছে ততটুকুন অংশ ভাঁজ করে নেবে তাসের কাটা যেদিকে আছে সেদিকে। এর পরে আঠা দিয়ে আলোচ্য দেশলাইটাকে লাগাবে তাসের পেছনের দিকে যে পিঠে ছবি লাগানো আছে সেই দিকে ছবিটার ধার ঘেঁসে। আঠা ভাল ভাবে শুকিয়ে গেলে তাসের বাকী অংশটুকুন কাটার দিকে ভাঁজ করে মুড়ে এনে দেশলাইর উপর চেপে দেবে আর সবার উপরে চেপে রাখবে ছবি-সাঁটা অংশ। এখন তাসটাকে খুলে ধরে হাতের চেটোতে লুকিয়ে থাকবে তাসের ও-পিঠে লাগানো দেশলাই। হাতের কেরামতিতে তাস ভাঁজ করে নিলেই বেরিয়ে আসবে দেশলাই। এ-পিঠ-ও-পিঠ ঘুরিয়ে দেখালেও তাসের পাত্তা পাওয়া যাবে না। [ ছবি দেখ ]

যাদুবিদ্যায় উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা লেখকের সঙ্গে A. C. Sorcer. Magician, Post Box 16214, Cal-29 ঠিকানায় পত্রালাপ করতে পারেন।

## ছোটদের বায়না

### শশাঙ্কজীবন চক্রবর্ত্তী

সারাদিনে ধরাবাঁধা,—চব্বিশ ঘণ্টা,
কেন থাকে,—গোণা গাঁথা,—বল দেখি ভণ্টা ?
দু'-চারটে ঘণ্টা কি,—কম করা যায় না,—
ভগবান শুনবে-না,—ছোটদের বায়না ?
সকাল সাতটা থেকে,—দশটা না থাকলে,—
থাকতে হয় কি বসে,—বই খাতা আগলে ?
তেমনি,—রাত্রিবেলা,—ছ'টা থেকে নয়টা,
নাই যদি থাকে,—তবে,—করি কার ভয়টা ?
এই ছ'টা ঘণ্টাই—কী যে হয় কষ্ট,
খুলে আর বলব কি,—সোজাসুজি স্পষ্ট,
শুনলে বুড়োরা ঠিক,—মেরে দেবে গাঁট্টা,
এক্ষুণি,—গুড়োদের,—গুণে গুণে আটটা !
পড়তে বসেই কত,—নদী বয় চক্ষে,
পড়ে কি সে-সব,—গুরুজনদের লক্ষ্যে !
সুরু থেকে,—তাঁরা রন—ভুরু দু'টি কুঁচকে,
দুরু দুরু বুকে,—কাঁদি,—আমরা যে পুঁচকে !
অথচ দিনেরা কিছু,—হলে,—কম লম্বা,—
সরস্বতী-কে বেশ,—দেখাতুম,—রম্ভা !
পড়ার ঘণ্টাগুলো,—হলে নিশ্চিহ্ন,
থাকতো কি করবার,—খেলাধুলো ভিন্ন !
শুনেছি ত মন দিয়ে,—পারে যদি ডাকতে,
ভগবান পারেন না চুপ করে থাকতে,—
আয় না রে,—সব্বাই,—বলে দেখি,—আয় না,
বিধাতা শোনেন কি-না,—ছোটদের বায়না ॥

## চোর

### সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাসে ভীষণ ভীড়। একটা সিট খালি নেই; কমল দাঁড়িয়ে আছে। পরণে হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট। হাতে একটাও পয়সা নেই। ইচ্ছে করেই কমল এই ভীড়ে উঠেছে। ও জানে যে, এই ভীড়ে কণ্ডাক্টরকে ফাঁকি দেওয়া কিছুই কঠিন নয়। আজ কমলকে কিছু পয়সা নিয়ে তবে বাড়ী ফিরতে হবে। আজ তিনদিন হলো পেটে কিছু পড়েনি। বাবার চাকরী গেছে দু'মাস হলো। প্রথম প্রথম তবু দিন চলতো। আস্তে আস্তে মায়ের সমস্ত গয়না গেল, আর কিই বা ছিল মায়ের। হাতের চুড়ি আর কানের দুল। মা রোজ বাবাকে কথা শোনায়, কমলের ভীষণ খারাপ লাগে।

বাবা কিন্তু নীরবে শুনে যান্। কোনও কথার প্রতিবাদ করেন না। বাবা চিরকালই শান্ত প্রকৃতির। বাবার জন্য কমলের কষ্ট হয়। মা কেন বাবাকে এতো কথা শোনান, বাবা তো চাকরীর চেষ্টা করেন, কিন্তু না পেলে কি করবেন ? ছমাসের মাইনে বাকী হওয়ার জন্য স্কুল থেকে কমলের নাম কাটিয়ে দিয়েছে। নাইন পর্য্যন্ত পড়া ছেলেকে কে কাজ দেবে ?

আজ সকালবেলায় বাবা বেরিয়েছেন রোজকার মতন চাকরীর সন্ধানে। কমল ভালভাবেই জানে যে আজকেও বাবাকে বাড়ী ফিরে মায়ের গঞ্জনা শুনতে হবে। আর মাকেই বা কি দোষ দেবে। পরনে শতছিন্ন কাপড়, গায়ে একটাও গয়না নেই। মায়ের অতো সুন্দর চেহারা কি হয়ে গিয়েছে। কাল রাত্রে বাবা দুপয়সার মুড়ি এনেছিলেন। দুপয়সার মুড়ি কি তিনজন খাবে ? মা নিজে না খেয়ে কমলকে দিয়ে দিয়েছেন। সে মুড়ি আর কমলের গলা দিয়ে নামেনি। আজ যে করেই হোক কিছু হাতে নিয়ে তবে বাড়ী ফিরবে।

"কালীঘাট কালীঘাট" কণ্ডাক্টরের চিৎকারে কমলের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। বাস এসে থামলো কালীঘাটের একটা জায়গায়। নামছে দুই-একজন যাত্রী, কিন্তু উঠছে তার অনেক বেশী। ভীড় ক্রমশ বাড়ছে। কমলের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা লোক। ছোট ছেলে কমল তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না, বাসের ঝাঁকুনিতে লোকটা খালি কমলের গায়ের ওপর এসে পড়ছে। লোকটার বাম পকেট কমলের ডান হাতের কাছে। কমল একবার ভাবে দেবে নাকি হাত ঢুকিয়ে ? কিন্তু অনভ্যস্ত হাত উঠতে চায় না, হঠাৎ কমলের মায়ের শুকনো মুখটা মনে পড়ে, ও আর কিছু চিন্তা করতে পারে না, লোকটার পকেটে কমলের ডান হাত ঢুকে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে লোকট "চোর চোর" বলে চিৎকার করে হাতটা ধরে ফেলে।

কমলের গলাটা চেনা চেনা মনে হয়, অন্যসব যাত্রীরাও চিৎকার করে ওঠে। বাস থেমে যায় মাঝপথে। লোকটি কমলকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেয়। অনেক যাত্রী বাস থেকে নেমে পড়ে। কমলের গায়ের ওপর কিল, চড় পড়তে থাকে। ভীড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ লোকটি কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "কমল তুই !"

এতক্ষণে কমল লম্বা লোকটার মুখ দেখতে পায়, "বাবা তুমি !"

# মৃত্যুঞ্জয়নামা

অজাতশত্রু

হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠল বুকের মধ্যে। পরিশ্রমসাধ্য কোনও কাজ করতে গিয়ে নয়। এমন কি, চলতে-ফিরতে গিয়েও নয়। শুয়ে শুয়েই। প্রথমে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বুকের মধ্যে। তারপর কষ্ট।

উঠে বসেও কমল না কষ্টটা। ফের শুয়ে পড়েও না। বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। বাড়তে বাড়তে তারপর—

তারপর, হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল, হঠাৎই তেমন আবার মিলিয়ে গেল এক সময়। স্বস্তির সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস সেই সঙ্গে বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। যমবসিসেরই একটা ধাক্কা বোধ হয় কাটানো গেল।

শুধু কষ্টটা কমে যাওয়া বা অস্বস্তিটা কেটে যাওয়া নয়, মনের স্বস্তির সঙ্গে শরীরও যেন আশ্চর্য সুস্থ হয়ে উঠল। মনের সঙ্গে সঙ্গে এবং মনের মতনই হাল্কা। বেশ সহজেই উঠে বসা গেল বিছানায়। অনায়াসেই নেমে দাঁড়ানো গেল খাট থেকে। স্বচ্ছন্দে হেঁটে একটু ঘুরেও বেড়ানো গেল ঘরময়। কষ্ট, ব্যথা বা অস্বস্তি—কিছুই আর নেই। বরং একটু যেন আরামই হচ্ছে বুকের মধ্যে।

কিন্তু ঘরের সকলে হঠাৎ ঐ ভাবে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে কেন খাটের কাছে? ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রয়েছে কেন বিছানার দিকে?

কী দেখছে?

দেখতে হ'ল কী দেখছে সকলে! দু'পা এগিয়ে দাঁড়াতেই সকলের মাথার উপর দিয়ে দেখা গেল বিছানাটা এবং বিছানার উপরে—

দেখে অবাক হতে হ'ল ভীষণ রকম। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখবার মতনই এক দৃশ্য বটে। অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব। বিছানা ছেড়ে উঠে এসেও ঐ ভাবে বিছানায় শুয়ে থাকা কখনও সম্ভব কারো পক্ষে?

কী অবস্থায় সম্ভব, সেটা খেয়াল হ'ল তারপর।

নিশ্চয়ই তাই হয়েছে, তাহলে!!

অর্থাৎ, মৃত্যু হয়েছে তাঁর—বুঝতে পারলেন বিধানচন্দ্র!!!

বুঝতে পেরে, ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে আবার একটা ভীষণ ধাক্কা খেলেন বিধানচন্দ্র।

ভাগ্যিস আগেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর, নইলে এ-ধাক্কাটা সামলানো রীতিমত কঠিন হ'ত তাঁর পক্ষে। অন্ততঃ এত সহজ হ'ত না সামলানো। সামলানো এবং সামলে উঠে পরিস্থিতিটা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করা।

পরিস্থিতিটা শুধু আকস্মিক নয়, অভূতপূর্বও। দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে অনেকবার অনেক রকম দুরূহ পরিস্থিতিতে পড়েছেন তিনি, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ীও হয়েছেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এ-রকম পরিস্থিতি এই প্রথম। প্রথম এবং একেবারে আনকোরা নূতন। সুদীর্ঘ আশি বছরের সুপ্রচুর এবং বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলির কোনওটার সঙ্গেই মিল নেই এতটুকু। সেগুলির কোনওটায় সম্ভাবনাও নেই এতটুকু হদিস বা আসানের।

আবার নেই বলে যে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবেন (বা দাঁড়িয়ে।) এমনও চরিত্র নয় তাঁর। পরিস্থিতিটা আয়ত্তে না আনা বা আসা পর্যন্ত যেমন শান্তি নেই, আয়ত্তে আনবার জন্যে আবার তেমন ক্লান্তিও নেই চেষ্টার।

পরিস্থিতিটা সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে উঠতেই প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল বিধানচন্দ্রের। তারপর এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। লোকজনের ঐ ভীড়ের মধ্যেই কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন ঘরে বা বাইরে। খুঁজে না পেয়ে, দেখতে না পেয়ে অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তারপর গলা তুলে হাঁক ছাড়লেন—"কৈ, কে এসেছো? সামনে এসে দাঁড়াও।"

কিন্তু সামনে আসা দূরে থাক, সাড়াই পাওয়া গেল না কারোর। ঘরের মধ্যে বা বাইরে কারো কানে সে ডাক, সে হাঁকডাক পৌঁছেছে বলেও মনে হ'ল না।

কারো সাড়াশব্দ নেই দেখে প্রথমে বেশ একটু আশ্চর্যই হয়ে গেলেন বিধানচন্দ্র। হিসেবপত্তর কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল তাঁর। তারপর যেন নিজেকে বোঝাতেই মনে মনে বলে উঠলেন—"অবস্থা দেখছি সবলোকেই সমান। আর হবে নাই বা কেন? কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে! লোকজন তো আর পয়দা হয় না পরলোকে, ইহলোক তো মরেই তবে গিয়ে জড়ো হয়। ফলে এখানে যেমন আঠারো মাসে বছর ওখানেও বোধ হয় তাই দাঁড়িয়েছে অবস্থা। তা করুক, কত দেরি করবে! আমারও তাড়া নেই এমন কিছু।"

বলে ঘরের মধ্যেকার ঘটনায় আবার মনোনিবেশ করলেন তিনি।

উপনিষদ থেকে পাঠ করছে একজন। বাসাংসি জীর্ণানি—। মর্মার্থ—বস্ত্র যেমন দেহের আচ্ছাদন, দেহও তেমনি আত্মার আচ্ছাদন ছাড়া আর কিছু নয়। একটি বহির্বাস অন্যটি অন্তর্বাস। জীর্ণ হলে একটির মতন অন্যটিও অকাতরে ত্যাগ করতে হয়।

কিন্তু সে তত্ত্বকথা মর্মে ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে না ঘরে উপস্থিত কারোরই। অস্থি মাংসচর্মের জীর্ণ বস্ত্রটির উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হচ্ছে শোক ও শ্রদ্ধা, অশ্রু ও উচ্ছ্বাস।

কেনই বা নয়? ভাবলেন বিধানচন্দ্র। স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষের পাড়ে-রেখে-যাওয়া জামা-কাপড় বুকে জড়িয়েই তার জন্যে কাঁদে মানুষ এবং কেঁদে প্রকাশ করে বিগতের জন্যে স্নেহ ও প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা। কালস্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষের বেলাতেই বা তার অন্যথা হবে কেন?

বাইরে রাস্তায় ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে কলরোল। জল সমুদ্রের নয়, জনসমুদ্রের। শহরের পথে পথে প্রবহমান মানুষের ধারা প্রায় ভূমিকম্পের মতনই একটি ঘটনায় দিক পরিবর্তন করে এইখানে এসে সকলে মিলিত হয়েছে তারা।

মন্দিরে যতদিন বিগ্রহ বিরাজ করে, ততদিন অর্থী-প্রার্থীদের নিয়ে সেখানে রাজত্ব করে পাণ্ডাদের দল। দেবতার প্রতি ততদিন সাধারণ মানুষের যত না ভক্তি, তার চেয়ে বেশি সন্দেহ। তারপর একদিন যখন শোনা যায় মন্দির থেকে অন্তর্ধান করেছে বিগ্রহ, তাদের অন্তরেও তখন বিপ্লব ঘটে যায়। অন্তর্হিত হয় সন্দেহ, বিগ্রহহীন মন্দিরের উদ্দেশে তখন এইভাবেই তরঙ্গ তুলে ছুটে আসে তারা। জাগ্রত বিগ্রহের প্রাপ্য মন্দিরকে নিবেদন করতে, মহাত্মার মূল্য তাঁর পরিত্যক্ত জীর্ণ বাস ঐ দেহটিকে দিয়ে যেতে।

আশি বছরের জীবনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা ঘটনা মনে পড়ছিল বিধানচন্দ্রের। ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হঠাৎ কনুইয়ের কাছ থেকে কার যেন গলা কানে এল—"আমি এসেছি স্যর!"

ফিরে না তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবেই বিধানচন্দ্র বললেন—"হ্যাঁ, অনেকেই তোমরা এসেছো দেখছি।"

—"আজ্ঞে না, আমি আপনাকে নিতে এসেছি।"

—"কোথায়? রোগী দেখতে, না, সভাপতিত্ব করতে কোনো সভায়?"

—"আজ্ঞে, সে সব নয়। আমি এসেছি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।"

—"কী দেখাতে? উদ্বাস্তু কলোনী, না, বস্তি? জঞ্জাল-জমা কোনো রাস্তা, না, কোনো হাসপাতালে নোংরামি? কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই এসে থাকো, দেরি করে ফেলেছো। আর আমাকে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই কোথাও। চোখে দেখেও কোনো অন্যায়, কোনো অত্যাচারের প্রতিকার করবার উপায় নেই আমার। আমি মারা গেছি। বিশ্বাস না হয়, ঐ দেখো বিছানায়।" বলে এতক্ষণে লোকটির দিকে ফিরে তাকালেন বিধানচন্দ্র। তাকিয়ে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল লোকটিকে। বললেন—"তুমি, তুমি সেই ইয়ে না?"

—"আজ্ঞে, তাহলে চিনতে পেরেছেন?"

—"পেরেছি কিন্তু কোথায় তোমাকে দেখেছি বলো তো?"

—"আমাকে ভর্তি ক'রে নেবার জন্য চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আপনি—যাদবপুর হাসপাতালে। ডাঃ কুমুদশঙ্করের কাছে।"

—"মনে পড়েছে। তা সেরেছিল যক্ষ্মা?"

—"আজ্ঞে না। ভর্তি হইনি তো সারবে কী ক'রে?"

—"সে কী? ভর্তি করেনি কুমুদ?"

—"আজ্ঞে, দোষ তাঁর নয়। আমারই। হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম বছর বারো তেরো বয়সের একটি ছেলেকে নিয়ে তার মা এসেছে, কিন্তু ফ্রি বেডের অভাবে ভর্তি করতে পারছে না। তখন ভেবে দেখলুম—আমার তো বয়েস হয়েছে। সেরে উঠলেই বা ক'দিন বাঁচবো! ভেবে চিন্তে আপনার চিঠিটা দিয়ে দিলুম বিধবাটিকে!"

—"তা ভালোই করেছিলে! কিন্তু তারপর নিজে সারলে কী ক'রে?"

—"আজ্ঞে, কৈ আর সারলুম? সারলে কি আর সুযোগ হোত আজ আপনাকে এসে নিয়ে যাবার!"

—"ও, তাহলে তুমিই এসেছো আমাকে নিয়ে যেতে! মানে, নিয়ে যেতে এখান থেকে!"

—"হ্যাঁ, স্যর!"

—"তুমি একাই না—"

—"আজ্ঞে, অনেকেই আসছিলেন আপনাকে নিয়ে যেতে। তারপর গোলমাল হয়ে সব ভেস্তে গেল।"

—"কী রকম?"

—"আজ্ঞে, আপনার অভ্যর্থনা কমিটির কে সভাপতি হবেন তাই নিয়ে বেধে গেল হাঙ্গামা। ডাক্তারদের দল বলল—উনি যখন ডাক্তার তখন ওঁর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হওয়া উচিত একজন ডাক্তারের। শিক্ষক-অধ্যাপকেরা বলল—উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, কাজেই শিক্ষাবিদ কারুর সেটা হওয়া উচিত। দেশসেবকদল বলল—না, সে অধিকার আমাদের। ব্যস, গোলমালে, চীৎকারে সভা পণ্ড। সবাই এখন অসহযোগ ঘোষণা ক'রে বসে রয়েছেন। শেষমেষ আমার প্রতি হুকুম হোল আসবার জন্যে! তা স্যর, এবার রওনা হলে হোত না?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো। আমি তো তৈরী হয়েই বসে আছি!"

পথে যেতে যেতে বিধানচন্দ্র বললেন—"যা ব্যাপার বলছো, তাতে তো মনে হচ্ছে নরক গুলজার!"

—"আজ্ঞে, নরক নয়, স্বর্গ!"

—"স্বর্গ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"সেখানেও দলাদলি, খেয়োখেয়ি?"

—"আজ্ঞে, সব জায়গায় নয়। শুধু আমাদের বাঙালী পাড়ায়—"

—"বাঙালী পাড়া? বাঙালী-গুজরাটী বলে পাড়াও আছে নাকি স্বর্গে?"

—"আজ্ঞে, না, আর কারু নয়—পাড়া শুধু বাঙালীদেরই আছে। আর যে পরিমাণ বাঙালীরা স্বর্গে আসছে আজকাল, তাতে বাঙালী-পাড়া হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী? আজকাল বাঙালীরা—বিশেষ ক'রে কলকাতার লোক যদি হয় তো কথাই নেই—মরার পর বেশির ভাগই সোজা চলে আসছে স্বর্গে!"

শুনে প্রথমে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন বিধানচন্দ্র। তারপর

বিবেচনা ক'রে দেখলেন—না, আশ্চর্যের কিছু নেই এ-ব্যাপারে। পুণ্যের ভাগ যাদের কম, তাদেরই তো স্বর্গবাসটুকু হয়ে যায় আগে। তারপর শুরু হয় অনন্ত নরক ভোগ। পুণ্যাত্মাদের নরকবাস আগে, তারপর অনন্ত স্বর্গভোগ। যুধিষ্ঠির নরকদর্শন ক'রে তবে স্বর্গে যেতে পেরেছিল। অন্যরা প্রথমে গিয়েছিল স্বর্গে।

সেই সঙ্গে হঠাৎ একটা খটকা লাগল বিধানচন্দ্রের মনে। নিরসন করবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন, প্রশ্ন করলেন—"গোড়ায় কোথায় নিয়ে চলেছো আমায়? স্বর্গে নাকি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আর তার কোন আগাগোড়া নেই।"

—"কী রকম? নরকে যেতে হবে না পরে?"

—"আজ্ঞে না। সাধারণতঃ বাঙালীদের—বিশেষ ক'রে কলকাতার বাসিন্দাদের কাউকেই তা যেতে হয় না।"

—"বলো কী? নিয়মকানুন সব পাল্টে গেছে নাকি?"

—"আজ্ঞে না। স্বর্গের নিয়মকানুন অনুযায়ীই হয়েছে এই ব্যবস্থা। সুপ্রিমকোর্টে দরখাস্ত ক'রে কর্তাই ব্যবস্থাটা করিয়ে নিয়েছেন।"

—"সুপ্রিম কোর্ট?"

—"সুপ্রিম কোর্ট বলতে ধাম দরবার।"

—"ধাম দরবার?"

—"আজ্ঞে, দিল্লীশ্বরের যেমন আম দরবার, জগদীশ্বরের তেমনি যে দরবার বসে বৈকুণ্ঠধামে, তাকে ধাম দরবার বলা হয়।"

—"বুঝলুম। এখন কর্তাটি কে বলো তো?"

—"কর্তা বলতে কর্তাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। স্বর্গের আইনের একটা ধারা দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন—আজকের দিনের বাঙালীদের—বিশেষ করে কলকাতায় যাদের জন্মমৃত্যু—তাদেরকে মৃত্যুর পর নরকে পাঠানো আইন সঙ্গত হচ্ছে কি না? আজন্ম নরকে যারা বাস করছে, মৃত্যুর পর আবার নতুন করে নরকে পাঠানো তাদের চলতে পারে কি না কেননা সংশ্লিষ্ট আইনের ধারায় রয়েছে যে, নরকবাস পূর্ণ হলেই স্বর্গবাস শুরু।"

—"তারপর?"

—"তারপর আর কি? কথা বলতে পারলো না কেউ। বাঙালীদের সিধে স্বর্গবাসের ব্যবস্থা হয়ে গেল।"

শুনে খ' হয়ে গেলেন বিধানচন্দ্র। সেই সঙ্গে নিশ্চিন্তও। আবার চলতে শুরু করলেন। চলতে চলতে বললেন—"তা হলে বলছো আর ভাবনা নেই। বাঙালী হিসেবে অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা আমারও হয়ে রয়েছে!"

—"আজ্ঞে, না। মানে, বাঙালী হিসেবে হয়নি।"

—"তার মানে?"

—"আজ্ঞে আপনি বাঙালী, না পাটনায় জন্মেছেন বলে বিহারী, তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল! শেষ মেষ নিরাপত্তা আইন জারী ক'রে সে প্রশ্নের নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।"

—"কি রকম?"

—"আপনার নরকে ঢোকা বন্ধ করা হয়েছে ঐ আইন জারী ক'রে।"

—"নরকে ঢোকা বন্ধ করতে? নরকে সাধ ক'রে ঢুকতে চায় নাকি কেউ?"

—"চায় না কেউই। চাইবার কথাও নয়। তবে আপনি হয়তো চাইবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।"

—"আমি চাইবো? কেন?"

—"আজ্ঞে, একটা কথা আছে না—স্বভাব যায় না মলে এতদিন ওপারে এক নরককে স্বর্গ বানাবার চেষ্টা করে এসেছেন। এ পারে এসে সে-স্বভাব আপনার তাই সহজে বদলাবে বলে ধারণা নয় কারুর। এ-অবস্থায় নরকে আপনাকে ঢুকতে দিলে নরক হয়তো আর নরক থাকবে না। মানে রাখবেন না আপনি। সেই আরেক স্বর্গ ক'রে তুলবারই চেষ্টা করবেন। তাতে নরকের নিরাপত্তা নষ্ট হবে এবং নরকের সঙ্গে স্বর্গেরও।"

—"কেন?"

—"ভেবে দেখুন না, কী মূল্য থাকবে তখন স্বর্গের? স্বর্গ বা স্বর্গে আসবার কড়ি কি সবে পুণ্যের? কানাকড়িও না!"

শুনে থমকে দাঁড়ালেন বিধানচন্দ্র। স্বর্গের দিকে আর যেন এগোতে চাইল না তাঁর সত্তা।

একটা গভীর ভাবে তিনি ভেবে দেখেননি ব্যাপারটা। দেহান্তের এত তাড়াতাড়ি বুঝি ভাবাও যায় না। আর মর্ত্যে বসে তো নয়ই।

নিশ্চিন্ত, নির্বিঘ্ন, নিরুদ্বেগ স্বর্গবাসও মৃত্যু বখনও কখনও শাস্তি হয়ে ওঠে মানুষের কাছে।

মানে, মানুষের মতন মানুষের!

## সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

### বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রদত্ত শিল্প-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা মালা, শিল্পজগতের এক অমূল্য সম্পদ, বহু পূর্বেই এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এই মহামূল্য গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশ শিল্পরসিক সমাজে যে এক বিশেষ ঘটনা বলেই স্বীকৃত হবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। 'বাগেশ্বরী বক্তৃতাবলী,' শিল্পের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশক, শিল্পকলা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংজ্ঞা, তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচারবিষয়ক প্রবন্ধগুলির সাহিত্যিক মূল্যও অসীম। অবনীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষার যাদুতে প্রবন্ধগুলি এক অনন্যসাধারণ মর্যাদায় উদ্ভাসিত। পড়তে পড়তে পাঠকের চিত্ত স্নান করে ওঠে এমন এক রসের ধারায়, চলে যায় এমন এক রূপলোকের পাথার পুরীতে যার তুলনা বিরল। বাংলা সাহিত্য ও শিল্পজগতে অবনীন্দ্রনাথ যে অবিস্মরণীয় সে কথাই সোচ্চার হয়ে উঠেছে আলোচ্য রচনার ছত্রে ছত্রে। শুধুমাত্র শিল্প-জিজ্ঞাসুই নন সাহিত্যবোধসম্পন্ন যে কোন পাঠকের কাছেই বর্তমান গ্রন্থটি অমূল্য বলে বিবেচিত হবে। সুন্দর মূল্যবান প্রচ্ছদ, উচ্চাঙ্গের আঙ্গিকও বইটির মূল্যমান বাড়িয়ে তোলে। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। লেখক—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশক—রূপা এ্যাণ্ড কোং ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—বারো টাকা।

### দ্বারকানাথ ঠাকুর

জাতীয় জীবনের নব গঠনে গত শতাব্দীতে যাঁরা এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, অজ্ঞতা অশিক্ষা ও জড়তার জাল অতিক্রম করে যাঁরা এক আলোকোজ্জ্বল নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাঁদের কল্যাণে সেদিন দেশ জুড়ে নবজাগরণের বিপ্লব জন্ম নিয়েছিল অক্ষয় কীর্তি যুবরাজ দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্থান তাঁদের অনেকেরই পুরোভাগে। নব ভারতের চিরপ্রণম্য রূপকারদের মধ্যে রামমোহনের পাশেই যে নামটি অমর হয়ে আছে, সেটি দ্বারকানাথের জীবনের শুষ্ক তটভূমিতে যাঁরা নতুন চেতনার নতুন জীবনবোধের নতুন উদ্দীপনার প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন দ্বারকানাথ সেই ইতিহাসবন্দিত পুরুষদের অগ্রনায়ক। শুধু তাই নয় রামমোহনের পর তিনিই প্রথম জন যিনি ভারতের মহিমা বিদেশে প্রচারে সফলকাম হন। এই জনবন্দিত লোকনায়কের জীবনী রচনা করে প্রভূত যশ অর্জন করেন স্বর্গত সাহিত্যরথী কিশোরীচাঁদ মিত্র। ইংরাজী ভাষায় লিখিত সেই জন সমাদৃত বর্তমানে অপ্রাপ্য গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ আত্মপ্রকাশ করে বহু জনের কৌতূহল নিরসন করেছে। প্রকাশকবৃন্দের এই উত্তম সর্বতোভাবে সাধুবাদার্হ। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও সম্পাদনা করেছেন কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। মূল রচনার অনুবাদ ছাড়াও সম্পাদকের টীকা-টিপ্পনি এই গ্রন্থের এক অসাধারণ সম্পদ। তাঁর টীকা টিপ্পনি বিবিধ তথ্যের পরিবেশন করেছে এবং নানাবিধ অজ্ঞতার অবসান ঘটিয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে সমগ্র ভাবে সেই যুগটির আলেখ্য ফুটে উঠছে, এবং বিদেশে বাঙালী দ্বারকানাথ যে সর্বত্র প্রাচ্যটি রাজদরবারে, পোপের কাছে কি স্বতঃস্ফূর্ত সমাদর ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। সর্বাঙ্গীণ জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে লোকনায়ক দ্বারকানাথের অক্লান্ত সাধনা এই গ্রন্থে অতীব দক্ষতা সহকারে বর্ণিত হয়েছে। সম্পাদকের অসাধারণ অধ্যবসায়, বিশ্লেষণীশক্তি, ও ইতিহাস চেতনা সর্বোপরি প্রভূত শ্রমের স্বাক্ষর এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে রইল। গ্রন্থে ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধে বহু তথ্য, বংশলতিকা এবং তৎকালীন সমাজের বিবিধ ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়ে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই সারগর্ভ ও তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রকাশক—সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড, ২২ ষ্ট্রাণ্ড রোড কলকাতা-১। দাম—আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

### হুগলী জেলার ইতিহাস ( প্রথম খণ্ড )

বাঙলা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে হুগলী জেলার অবদানের অন্ত নেই। বাঙলার বাইরে বাঙলার যে অপ্রতিহত খ্যাতি সর্বজন-স্বীকৃত, তার মূলেও হুগলী জেলার দান অনেকখানি। বাঙলার মুখ যাঁরা নানা দিকে উজ্জ্বল করেছেন সেই রত্নকল্প মনীষীদের অনেকেই হুগলী জেলার সন্তান। উপযুক্ত ইতিহাসের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু গৌরবময় কীর্তি কালের ব্যবধানে বিস্মৃতির অতল তলে বিলীন হয়ে যায়। অনেক কীর্তিমান পুরুষ ভবিষ্যতের স্মৃতির মিছিলে থেকে যান অনুপস্থিত। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে এই জাতীয় গ্রন্থাদির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব জাতীয় জীবনে অপরিসীম। গ্রন্থটির লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের এক অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। একক প্রচেষ্টার এই অভূতপূর্ব সফলতা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ দাবী করার যোগ্যতা রাখে। গ্রন্থটিতে হুগলী জেলা সম্বন্ধীয় অজস্র তথ্যের সমন্বয় ঘটেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের হুগলীর দিকপাল সন্তানদের সচিত্র জীবনী, হুগলীর আনুপূর্বিক ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ, তার বিভিন্ন যুগের সামাজিক চিত্র জাতীয়-জীবনে তার গুরুত্ব, তার মহিমা, এবং অজস্র চিত্রে গ্রন্থটি পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধানীদের কাছে এই গ্রন্থের আবেদন অনতিক্রম্য। বহু লুপ্ত গৌরবের প্রতি লেখক আলোকপাত করে মহৎ কর্ম করেছেন, গ্রন্থটি পূর্ণায়নে লেখক যে কি বিপুল পরিশ্রম, অসাধারণ ধৈর্য ও অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা নেই। অনেক অজানা তথ্য ও বিবরণের সঙ্গে এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠক সাধারণ পরিচিত হবেন যার মহিমা ও তাৎপর্য সীমাহীন। আমরা লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রকাশক—মিত্রাণী প্রকাশন, ২ কালী লেন, কলিকাতা-২৬। দাম—সাত টাকা মাত্র।

## কবিমানসী

রবীন্দ্র গবেষকদের মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সাহিত্যসেবী জগদীশ ভট্টাচার্য একটি মুখ্য নাম। তাঁর সারগর্ভ লেখনী রবীন্দ্র সম্পর্কিত বহু মূল্যবান রচনার জন্ম দিয়েছে। কবিমানসী রচনায় তিনি যে অসাধারণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তা সগৌরবে স্বীকার্য। কবিগুরুর এক অন্তরঙ্গ জীবনালেখ্য কবিমানসী। জীবনী বলতে যা বোঝায় এ গ্রন্থ সেই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। তাঁর জীবনের এক অন্তরঙ্গ দিকের এক অভিনব আলেখ্য এই গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নানা দিক নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই, কিন্তু এই বিশেষ দিকটি নিয়ে আলোচনার তাৎপর্য অনস্বীকার্য। তাঁর কবিমানসের প্রেরণার আকর অর্থাৎ কবিচিত্তের মানসসঙ্গিনী যাঁরা তাঁদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিখুঁৎ এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। সাধারণের অন্তরে পুঞ্জীভূত রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার নানা উত্তর এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি এক মহার্ঘ সম্পদ বিশেষ। প্রকাশক—ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—বারো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা সম্বন্ধে এক বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে পরোক্ষে গদ্য কবিতার এক সামগ্রিক বিশ্লেষণ করেছেন। গদ্য কবিতার রীতি ও প্রকৃতি সুষ্ঠু ভাবে বিচার করে তিনি দেখিয়েছেন যে রচনামাত্রই যেমন সাহিত্য পদবাচ্য হয় না, গদ্য কবিতা মাত্রই তেমনই কবিতা নয়! রস বা শ্রী-ই সেই আসল বস্তু যার ছোঁয়ায় রচনা কাব্য হয়ে উঠতে পারে, আবার এই কাব্য রসাশ্রিত রচনা মাত্রই নয় গদ্য কবিতা, তার ও এক আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস সহজ সচেতনতায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল আর সেটাই তাঁর গদ্যকবিতার প্রাণসত্তা। ধারাবাহিক বিশ্লেষণে লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার এই প্রাণসত্তাকে উদঘাটিত করে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্র রচনার বহুবিধ উদধৃতি সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করেছেন, জিজ্ঞাসু পাঠক বর্তমান রচনাটির মাধ্যমে রবীন্দ্রপ্রতিভার এক বিশেষ দিক সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। বাংলা গবেষণা গ্রন্থের ভাণ্ডারে আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। লেখকের শৈলী উচ্চাঙ্গের। বইটির আঙ্গিক শোভন ছাপা ও বাঁধাই উচ্চ মানের। লেখক, ধীরানন্দ ঠাকুর, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, দাম—বারো টাকা।

## রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য

রবীন্দ্র শতবার্ষিক উপলক্ষে, রবীন্দ্র রচনার পটভূমিতে অসংখ্য গবেষণামূলক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, আলোচ্য পুস্তকটিও তাদেরই অন্যতম। বর্তমান রচনার বিষয়বস্তু 'রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য'। রচনাটিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে আলোচনার সুবিধার্থে। রূপক বা প্রতীক বলতে কি বোঝায় রচনার প্রথমাংশে লেখক তারই একটি পরিচয় বিধৃত করেছেন বিশদ ভাবে, এর পর তিনি দেখাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের রূপক রচনার প্রাণসত্তাকে। এই নাট্যগুলির মাধ্যমে রবীন্দ্র-মানসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাকেও নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন লেখক, সমগ্র জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে মনুষ্যত্বের সাধনা করে গিয়েছেন তাঁর সমগ্র রচনাই যে তারই দ্বারা ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত, এটাই লেখকের মূল বক্তব্য, তাঁর মতে অন্যান্য রচনার মত রূপক নাট্যেও রবীন্দ্রনাথের এই মানবিক আবেদনটাই মুখ্য। লেখকের আন্তরিকতার স্বাক্ষরে তাঁর রচনার প্রতিটি ছত্র সমুজ্জ্বল, অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি আরব্ধ কর্ম সমাধা করেছেন, যার ফলে তাঁর রচনাটি এক মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হওয়ার মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। লেখকের শৈলী একাধারে সরল ও ভাবগ্রাহী, যা বিষয়বস্তুকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক হয়ে উঠেছে। আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটিকে সাদর স্বাগত জানাই। ছাপা বাঁধাই ও আঙ্গিক উচ্চমানের। লেখক—শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, দাম—দশ টাকা।

## নবজীবনোপনিষদ ( প্রথম পর্ব, প্রথম সংস্করণ )

কঠোর বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে যুগে যুগে মানুষ চেয়েছে মুক্তি, অন্বেষণ করেছে এমন এক জগতের যেখানে পার্থিব লাভ লোকসানের মোটা হিসেবটাকে কিছুক্ষণের জন্যও বিস্মৃত হওয়া যায়, তাই আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্খা তার সহজাত। এই ধরণের তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে আলোচ্য গ্রন্থটি কম মূল্যবান নয় এবং এর আবির্ভাব অভিনন্দনযোগ্য বলেই পরিগণিত হবে। লেখক ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যাত্মবাদের চর্চা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাঁর এই রচনা তারই স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল। গ্রন্থখানি একান্ত ভাবেই ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভূমিকাবাহী হওয়া সত্বেও রচয়িতার আন্তরিকতায় সহজেই পাঠক মননে দাগ কাটে। লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে একমত হতে না পারলেও তাঁর বিশ্বাস ও আন্তরিকতায় সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে যাঁদের ঔৎসুক্য আছে তাঁরা বর্তমান গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই মনে হয়। লেখকের শৈলী সাধারণ। ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভাবেই বিষয়োচিত। লেখক—শ্রীসংগ্রাম সিংহ দেবশর্মণ (তালুকদার), প্রকাশক—শ্রীঅধীরচন্দ্র সুর, ১২/১ হরিপাল লেন, কলিকাতা—৬ দাম—ছয় টাকা।

## বহু বিচিত্র

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সৈয়দ মুজতবা আলী অতি পরিচিত এক নাম। তাঁর রচনার এই সংকলন গ্রন্থটি পাঠক সমাজে যে একটা খুশীর ঢেউ তুলবে একথা সহজেই অনুমেয়। ডাঃ আলীর রচনার বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়েছে এই সংকলনে, প্রকৃতপক্ষে সেটাই বোধ হয় সংকলন গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। লেখকের যা সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য বৈদগ্ধ্য ও সরসতার সার্থক মিশ্রণ, তারই পরিচয়ে আলোচ্য গ্রন্থটিও সমুজ্জ্বল। লেখকের ভৌগোলিক পরিধি এত বিস্তৃত, পাণ্ডিত্য এত গভীর, যে বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করে এলাম। বহু দেশের বহু মানুষ একান্ত অন্তরঙ্গতায় ধরা দেয় মনের দিগন্তে, লেখকের সরসোজ্জ্বল বাকভঙ্গীর সোনার যে দিগন্ত জড়ানো। ডাঃ আলীর রচনার এক সামগ্রিক রূপ ধরা দেয় আলোচ্য সংকলনটির মাধ্যমে আর সেটাই এর সবচেয়ে বড় পরিচয়। লেখকের ভাষা ও

শৈলী সর্বজনপরিচিত সুতরাং সে সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার চেষ্টা করা বাহুল্য মাত্র। বইটির প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রকাশক—ময়ূখ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ দাম—ছয় টাকা।

## বার্ধক্যে বারাণসী ( প্রথম পর্ব )

মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশমান বার্ধক্যে বারাণসীর প্রথম পর্ব গ্রন্থাকারে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠক পাঠিকারও অপরিচয় নেই, তাই সে সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থটি বারাণসী সম্পর্কিত। লেখক নীলকণ্ঠ। এ কথা মিথ্যা বা অতিরঞ্জন নয় যে আজকের দিনে যাঁদের লেখনী এক অভিনব বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত নীলকণ্ঠের আসন তাঁদের অনেকেরই পুরোভাগে। বারাণসী সংক্রান্ত রচনায় তিনি মামুলি সাল তারিখের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। এই প্রথম পর্বে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে সযত্নে পরিহার করে গেছেন—তিনি রচনা করেছেন কাশীর অন্তরের ইতিহাস। লিপিবদ্ধ করেছেন কাশীর আত্মার বাণী। বিভিন্ন দিক থেকে কাশীকে প্রত্যক্ষ করে কাশীর এক আশ্চর্য রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, সেই রূপকে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে সাহিত্যের পাতায় চিরস্থায়ী করলেন নীলকণ্ঠ। তাঁর ক্ষণ কালীন কাশীদর্শনকে এই গ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্যের জগতে দিলেন চিরকালীন প্রতিষ্ঠা। কাশীতে তিনি সাধারণ ভ্রমণকারী নন, সেখানে সেই অরূপতীর্থের তিনি অপরূপ তীর্থঙ্কর, সেই পরিচয়ই গ্রন্থের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী প্রাঞ্জল বর্ণনা এবং রসাশ্রয়ী আলোচনা গ্রন্থটিকে পরম আকর্ষণীয় করে তুলেছে। গ্রন্থটি কেবলমাত্র গ্রন্থকারের বলিষ্ঠ লেখনীরই পরিচায়ক নয় তাঁর প্রগাঢ় অনুভূতির স্পর্শেও প্রদীপ্ত। এক অপূর্ব আঙ্গিকে বারাণসীর এই সাহিত্যভাষ্য পাঠক সমাজে বিপুল সমাদরে বিভূষিত হোক, এই কামনা করি। প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## লেনিন

বর্তমান যুগে যুগমানব অভিধায় যাঁদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, লেনিনের নাম নিঃসন্দেহে তাঁদেরই প্রথম সারিতে। রাশিয়ার এই চিন্তাশীল যুগনায়কের জীবনী তাই শুধু এক মহাপুরুষের জীবনালেখ্য মাত্র নয়, এক বিশেষ যুগের মানস আত্মার প্রকৃত রূপায়ণ। আলোচ্য গ্রন্থে লেনিনের জীবন, কর্মধারা ও চিন্তার এক সংক্ষিপ্ত অথচ সুষ্ঠু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সাম্যবাদের জনক মানুষের বাঁচবার পথ বলে যে পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তারই মাঝে নিহিত রয়েছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ। সাম্যবাদ নিয়ে আজকের দিনে তর্ক বিতর্কের সীমা নেই, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করেন যে, লেনিন এ বিষয়ে যতদূর ভেবেছেন, যতটা আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের ধারণাকে কর্মের মাঝে মূর্ত করে গিয়েছেন, তার সঙ্গে অন্য কারুরই তুলনা হয় না। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম যুগনায়কের এই জীবনী তাই নানা কারণেই বিশেষ মূল্যবান। বর্তমান পুস্তকটিকে প্রামাণ্য বলাও বোধ হয় সেজন্যই অসঙ্গত নয়। লেখকের শৈলী সহজ ও সাবলীল, সাধারণ পাঠকের বিশেষ উপযোগী। ছাপা বাঁধাই ও আঙ্গিক সাধারণ। অনুবাদিকা—ইলা মিত্র, প্রকাশক, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—এক টাকা ষাট নয়া পয়সা।

## বহ্নি-বর্ণিনী

অচিন্ত্যকুমারের নবতম গল্প সংকলন এই গ্রন্থ। নানান পত্র-পত্রিকায় তিনি সাম্প্রতিক কালে যে সব গল্প প্রকাশ করেছেন, তারই কয়েকটি চয়িত হয়েছে এই গ্রন্থে। অচিন্ত্যকুমারের অনন্য সংলাপ সম্পদে আলোচ্য গল্পগুলি সমৃদ্ধ, বস্তুত সেটাই এদের প্রাণসত্তা, ভাবতেও বিস্মিত হতে হয় কি অপরিমেয় ঔজ্জ্বল্য আজও অম্লান হয়ে রয়েছে তাঁর শৈলীতে। বিদ্রূপে ব্যঞ্জনায় রসে ও নিখুঁত আঙ্গিকে প্রত্যেকটি রচনাই প্রমাণ করে যে সাহিত্যের এক বিশেষ পরিসরে অচিন্ত্যকুমার আজও অনন্য। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তিনি কোন ভাব বিলাসের আশ্রয় নেননি, সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ বিষয়বস্তু, বর্তমান সমাজের বিভিন্ন দিক যার মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। সমাজ সচেতন লেখকের সমস্ত লক্ষণই তাঁর রচনায় সমুপস্থিত, তীক্ষ্ণধার সংলাপে বিদগ্ধ শৈলীতে, বলিষ্ঠ উপস্থাপনায় তাঁর বক্তব্য যেন খাপখোলা তলোয়ারের মতই মর্মভেদ করে। কৌশলী কথাকারের পরিণত সাহিত্যকর্মের, সার্থক ফসল হিসাবেই গণ্য হওয়ার দাবী রাখে আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনা। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

## কন্যাসু

বাঙালী সমাজে কন্যাদায় আজ এই অগ্রগমনের যুগেও এক বিপুল সমস্যা, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েই মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তাকে সংপাত্রস্থা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পান না কিছুতেই। বাঙালীর এই বিশেষ সামাজিক কর্তব্যকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বনফুলের সাম্প্রতিকতম এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ব্রজেন্দ্রবাবু এক আদর্শবাদী খাঁটি বঙ্গসন্তান, তাঁর একমাত্র দুহিতা উষার বিবাহ সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে কাহিনী এবং এই উপলক্ষে তাঁর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। খণ্ড খণ্ড চিত্রের সাহায্যে কাহিনীতে প্রাণসঞ্চার করতে বনফুল অদ্বিতীয়, বর্তমান রচনাটিও তাঁর সেই অনন্যশক্তির স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল। বস্তুত বলবার আন্তরিকতায় বাঙালী সমাজের এই বিশিষ্ট দিকটি যেন নতুন করেই পাঠক-মানসে ঘা দেয়। ভাষার মৌলিকতা ও ভঙ্গীর যে সরলতা বনফুলের একান্ত নিজস্ব, সেই দুটি বিশেষ সম্পদে আলোচ্য রচনাটিও সমৃদ্ধ। আমরা বইটি পড়ে আনন্দলাভ করেছি, একথা অনস্বীকার্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—বনফুল। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## নাইবা দিলেম নাম

নবাগত লেখকদের মধ্যে অল্প দিনেই যাঁরা কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাঁদেরই অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি স্বল্প কলেবর উপন্যাস. বিষয়বস্তুতে নূতনত্ব বিশেষ কিছু না থাকলেও বলবার সহজ সরল ভঙ্গীতে রচনাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। স্নিগ্ধ মধুর এক প্রেমের কাহিনী স্বাভাবিক ভাবেই পাঠক মানসে দোলা দেয়। লেখকের ভাষা সাবলীল, ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ, আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—প্রশান্ত চৌধুরী। প্রকাশক—টি. এস. বি. প্রকাশন, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছ'টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

## সম্পাদকের বৈঠকে

আলোচ্য রচনাটি জলসা পত্রিকার পাতায় প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, লেখক স্বনামধন্য সাংবাদিক, সাহিত্যই তাঁর জীবন, সাহিত্যই তাঁর জীবিকা। জীবন ও জীবিকার যুক্ত অঙ্গনে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন, সংগ্রহ করেছেন যে সব মধুর স্মৃতির টুকরাগুলিকে মনের মণিকোঠায়; তারই স্মৃতিচারণ করেছেন বর্তমান রচনার মাধ্যমে। সরস বৈদগ্ধে রচনাটি আগাগোড়া আকর্ষণীয়. সাহিত্যিক সম্বন্ধে পাঠকের মনে যে স্বাভাবিক কৌতূহল তার রসদ যোগাবার উপকরণ রচনাটিতে প্রচুর পরিমাণেই উপস্থিত। অতি মনোরম সুখপাঠ্য এই রচনাটি সাংবাদিক-লেখকের সার্থক সাহিত্যিকে রূপান্তরিত হওয়ার এক প্রামাণ্য দলিল, আমরা লেখকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করি। লেখকের ভাষারীতি অত্যন্ত সাবলীল ও সরস। গ্রন্থটির আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—সাগরময় ঘোষ। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২. দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## জলভরা মেঘ

রহস্য ও রোমাঞ্চ জাতীয় রচনার তালিকায় ঠিক না পড়লেও তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে। এক অভিনেতা ও তার দুজন নায়িকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কাহিনী, লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও তাঁর রচনায় একটা সহজ সাবলীলতার ভাব বিশেষভাবেই লক্ষণীয়, এবং সেজন্যই বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে না পারলেও তাঁর রচনা পড়তে গিয়ে পাঠক ক্লান্ত হয়ে পড়েন না। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা বৈচিত্র্যে ভরা এই সংক্ষিপ্ত রচনাটি সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে সহজেই। লেখকের শৈলী নিতান্তই সাধারণ, বিষয়বস্তুর উপযোগী এইটুকুই তার একমাত্র পরিচয়। ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—সেবা প্রকাশনী, ৬৫।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দু টাকা মাত্র।

## প্রমত্ত প্রহর

বর্তমান সাহিত্যের আসরে 'বাণী রায়' এক চিহ্নিত নাম। আলোচ্য উপন্যাসটি এই লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকার প্রাথমিক রচনাগুলির অন্যতম। ত্রয়ী সমস্যা প্রেমের জগতে অতি সাধারণ ঘটনা, আলোচ্য উপন্যাসটির বিষয়বস্তুও এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই গঠিত। গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে অসাধারণত্ব না থাকলেও ভাষা ও শৈলীর বেগে রচনাটি রীতিমত আকর্ষণীয়, লেখিকার ভাষা যে কতটাই সমৃদ্ধ তারই এক নতুন পরিচয় যেন উদ্ঘাটিত হয় রচনাটির মাধ্যমে। বর্ণনাভঙ্গী রীতিমত দুঃসাহসিক হয়েও যে অশ্লীলতার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়নি, তা শুধু এই কাব্যগন্ধী বিদগ্ধ ভাষারীতির কল্যাণে। লেখিকার অপরিণত বয়সের রচনা বলেই সম্ভবত যথোপযুক্ত সংযমের পরিচয় এতে নেই, দৈহিক প্রেমের মুখর বন্দনা স্থানে স্থানে সুনীতির বেড়া অতিক্রম করে গেছে বটে, তবু তারই মধ্যে লেখিকার মূল বক্তব্য অকথিত নয়। দেহকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিলেও দেহাতীত প্রেমের জয়গানই যে তিনি করতে চেয়েছেন উপন্যাসের উপসংহারে, সেই ইঙ্গিতই প্রধান। বাণী রায় শক্তিমতী কথাশিল্পী, বৈদগ্ধ্যে মননশীলতায় তিনি অদ্বিতীয়া, শুধু এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে বিচার না করে তার সামগ্রিক রূপায়ণই যে সার্থক সাহিত্যকারের প্রধানতম ধর্ম, একথা তিনি যেন বিস্মৃতা না হন এটুকুই আমাদের কামনা। বইটির প্রচ্ছদ শিল্পশোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখিকা—বাণী রায়, প্রকাশক—অর্চনা পাবলিশার্স, ৮ বি রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা—৭ দাম—পাঁচ টাকা।

## শ্বেতকরবী

আধুনিককালে শক্তিমান কথাশিল্পীদের মধ্যে রমাপতি বসু একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বাঙলা দেশের পাঠকসমাজে এঁর রচনা যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আলোচ্য উপন্যাসটি তাঁর শক্তিমত্তার এক আশ্চর্য নিদর্শন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দেশ-বিভাগকে পটভূমি করে উপন্যাসটি রচিত—এরা সমাজের জীবনধারায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে লেখকের লেখনীতে সেই কাহিনীই দক্ষতা সহকারে চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটি বৈশিষ্ট্যের স্পর্শে ভরপুর। গতি স্বচ্ছন্দ ভাষা মনোরম। ঘটনা সংস্থাপনে কাহিনী বিন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতে সৃজনধর্মী লেখক আশানুরূপ নৈপুণ্যই প্রদর্শন করেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য, সহানুভূতি ও তীব্র সমাজচেতনার পরিচয় গ্রন্থের পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে। প্রকাশক—জ্ঞানতীর্থ, ১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—দু'টাকা মাত্র।

## ভাষণাবলী

সাহিত্যরসিক সমাজে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। বাঙলা সাহিত্যের জয়যাত্রার ইতিহাসে এই সম্মেলন একটি বিরাট অধ্যায় অধিকার করে আছে। সাহিত্যের জয়গান ঘোষণায় তার প্রচারণায়, ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণে তার প্রসারে এর অবদান অনস্বীকার্য। সর্বোপরি সারা ভারতের ঘরে ঘরে বাঙলা-সাহিত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়ায় বিরাট তার ভূমিকা যেমনই গৌরবময় তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছরে এর অধিবেশন বসল কলকাতা মহানগরীতে। এর বিভিন্ন শাখায় যে দিকপাল-বৃন্দ পৌরোহিত্য করলেন, আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁদের ভাষণগুলিরই একটি সংকলন। ভাষণগুলি বক্তাদের প্রগাঢ় দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। তাঁদের বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচায়ক তাঁদের ভাষণসমূহ। ভাষণগুলি আপন আপন

বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নানা তথ্য ও জ্ঞানের আকর, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অপূর্ব নিদর্শন। গ্রন্থটিতে বক্তাদের সচিত্র পরিচিতি সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্যে সম্মেলনের কলকাতা শাখার সম্পাদক শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা অভিনন্দন জানাই। তাঁর সম্পাদনা নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের এবং প্রশংসার দাবী রাখে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রতি বছরই এই সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সাধারণ্যে তার প্রচারও ঘটে, কিন্তু উদ্বোধকদের ও মূল সভাপতির ভাষণগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হল। গ্রন্থটিও সম্পাদক কর্তৃক ৭ ছুতোর-পাড়া লেন, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

## খাদ্য সুস্থ ও অসুস্থ শরীরে

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক শরীরের বিভিন্ন অবস্থায় খাদ্যের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বাঙ্গালীর পাকপটুতা বিখ্যাত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজনীয় তা প্রায়শঃই অবহেলিত থাকে। সেই সম্বন্ধেই লেখক অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তেল মশলা যুক্ত উগ্র খাদ্য নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করায় পাকস্থলী দোষযুক্ত হয়ে পড়ে, এজন্যই অপেক্ষাকৃত সহজ পাচ্য রন্ধন প্রণালী প্রচলিত হওয়া সমুচিত। বর্তমান রচনাতে সে সম্বন্ধে নানাবিধ উপায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খাদ্যকে সহজ পাচ্য করেও যে স্বাদু করা সম্ভব, লেখক একথা বলেছেন, ও কয়েকটি বিশেষ ধরণের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীও এতে স্থান পেয়েছে। স্বাস্থ্য জাতির পক্ষে এক অমূল্য সম্পদ—তাই স্বাস্থ্য রক্ষার কয়েকটি সাধারণ নিয়মের প্রতিও সকলেরই অবহিত হওয়া উচিৎ, আর সেজন্যই এ ধরণের রচনার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য, শারীর বিজ্ঞানী লেখকের গবেষণা প্রসূত যে সব খাদ্য প্রকরণ এতে স্থান পেয়েছে, পাঠক যদি তাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হন, তবেই তাঁর রচনা প্রকৃত সার্থকতার রস আস্বাদন করতে পারে। লেখকের ভাষারীতি সহজ ও সরল, বিষয়বস্তুর পরিপোষক। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। লেখক—ডাঃ সরলরঞ্জন দাশগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীসুনীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম, এস-সি, তেলির বাগ ভবন, পি ৩, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

# তামসী

### সুকন্যা পুরকায়স্থ

বাতিটা নিভিয়ে দাও।
জোনাকিরা জ্বলে মরে হাওয়ার উল্লাসে :
এখনই রাতের সড়কে অসংযত পদধ্বনি
এবং অন্ধকার ডানার আড়ালে উষ্ণ অশ্রুপাত !
এখনই তো মেঘের ডমরু বুকের সঙ্গমে শব্দিত হ'বে—
হতাশ্বাস ; যেহেতু আকাশে অনেক নক্ষত্র বিচলিত,
আলোর মৃত্যু······
বেদনায় পৃথিবী নির্বহতা নদী !

গুমটির ঘর থেকে শেষ রাতের ট্রামখানি
ঘণ্টা বাজিয়ে নেমে গেল,
নগরীর পরিক্রমা পথে হকারের দল
আর গঙ্গাতীরে পুণ্যার্থী বায়স।···
গ্যাসের আলোর নীচে এখনো বারংবার
শিহরিত কান্নার শরীর
যেহেতু একটি শয্যা শুধু আমরণ ব্যগ্র প্রতীক্ষায়
দু'হাত বাড়ায় !

আহা, রাতের শাড়িটা কে কেড়ে নিলো,
বড় লজ্জা···বড় লজ্জা :
বাতায়ন বন্ধ করে দাও, সকলে বিদ্রূপ করে,
চাই না—চাই না প্রভাতের নিকরুণ আলো !

# যাযাবর পাখী

### তরুলতা ঘোষ

কেন আর গাও পৌষালী শীতে মেঘমল্লার গান,
রামধনু-আঁকা অপরিচয়ের দুস্তর-মরু প্রান্ত—
এখনও গলেনি কুয়াশ-জটিল সময়ের ব্যবধান,
তীর্থপথিক যাযাবর পাখী সাময়িক দিগ্‌ভ্রান্ত।

হিমেল হাওয়ায় রিক্ত শাখার বাসনার জ্বালা কাঁদে,
বিজন বনের মর্মরে কাঁদে অতীতের ইতিহাস,
যাযাবর পাখী, তুমি ধরা দিও ভবিষ্যতের ফাঁদে
তুষার-গলানো তপ্ত পরশ আনে যদি মধুমাস।

যাযাবর পাখী, চেনার আলোয় নিজেরে দেখেছ তুমি,
রামধনু-আঁকা মরু-প্রান্তের পেয়েছ নিমন্ত্রণ,
অপরিচয়ের যবনিকা ভেদি জীবন-স্বপ্ন চুমি
ঝলমল করে ভবিষ্যতের একটি সোনালী-ক্ষণ।

অনাদিকালের ভাণ্ডার ভরা সোনার নিমেষপুঞ্জ,
দুখ-সাধনার তিমিরান্তক সূর্য্য-সফল দিন
যদি এনে দেয় মরু-প্রান্তের রামধনু রাঙা কুঞ্জ
যাযাবর পাখী, জীবনোৎসবে শুধিয়ো তাহার ঋণ।

অপরিচয়ের প্রান্তে আছে যে বহু সাধনার ধন,
অজানা কালের দূর-দিগন্তে ঝলিছে সোনার খনি
জীবন-ব্যাপ্ত তমসার তীরে তিমিরান্তক ক্ষণ,
দুখ-সাধনার আবরণে ঢাকা প্রেমের পরশমণি।

# বার্ধক্যে বারানসী

নীলকণ্ঠ

ভাবনা শেষ হবার আগেই, দুর্ভাবনার শেষ হয়। দিদিমার ভাই চীৎকার করে ওঠে: তীরে এসে গেছি মা! আর ভয় নেই। তাঁর মা তাকিয়ে দেখেন তাদের তীরে উত্তীর্ণ করে দিয়ে উঠে যাচ্ছেন ভাস্করানন্দ!

দেবতার গ্রাস থেকে যে ছিনিয়ে আনে মায়ের সন্তানকে, কি দেব আমরা তাকে? কি দিতে পারি,—কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে অভিষিক্ত প্রণাম ছাড়া আর কি দেব সেই দেবতার চেয়েও দয়ায় বড় মানব-প্রেমিককে।

কিন্তু কাশী কি কেবল ধর্মের? না, অধর্মেরও। ধর্মের ষণ্ড আর অধর্মের পাষণ্ড যেখানে অন্ধগলিতে গলাগলি করে আছে। বিশ্বের নাথের সেখানে বিশ্বের যতেক অনাথের সংগে একত্রে বাস, সেই বিস্ময়ের আবাসভূমি এই বারাণসী। এখানে বুভুক্ষু আর মুমুক্ষু, এখানে রমণীয়ের আর রমণীর ভক্ত, এখানে মহাত্মা আর দুরাত্মার একই সংগে আসা-যাওয়া বারবার; বাধা না পেলে যার লীলা পোষ্টাই হয় না। সেই বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করতে বিশ্বনাথই তাই পাঠান, শত্রুর মুখোস-পরা অকৃত্রিম ভক্তকে।

কাশীর ইতিহাস কেবল মন্দিরে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। মন্দির ধ্বংসের ইতিবৃত্তের মধ্যেও বিশ্বনাথের কৃপাকে দেখতে হবে। যার ইচ্ছায় সপ্ততল স্বুবর্ণ মন্দির ওঠে শূন্যে মুহূর্তের মধ্যে, তাঁর ইচ্ছেতেই কেন যবনের হাতে তাঁর বাসস্থান হয় অপবিত্র, এ না বুঝলে বোঝা হলো না হিন্দুর ধর্মকে।

কাশীতে গিয়ে কেবল মন্দিরে-মন্দিরে মাথা ঠুকলে। শিবের মাথায় গংগাজল ঢাললে মণ মণ, গংগায় স্নান করলেও রোজ, পুণ্য না হলেও শূন্য হয়ে যেতে পারে সব সঞ্চয়, কিন্তু পতিতের মধ্যে, পতিতার মধ্যে, বিশ্বের অনাথের মধ্যে বিশ্বনাথকে যে দর্শন করেনি সে একাধিবার বেনারস গেছে; কিন্তু ৺কাশী যায়নি একবারও।

যে গেছে শুধু সেই জানে, কাশী হিন্দুর কি এবং কে? সেই হিন্দুর কাশীকে একদা হিন্দু এক ভেংগে চুরমার করে দিতে গিয়েছিলো কেন, সেকথার অল্পই লেখা আছে ইতিহাসে। তার অনেকটাই কিংবদন্তী। সেই কিংবদন্তীর নায়ক, কালাপাহাড়।

## তেইশ

রাবণ না হলে রামের, দুর্যোধন ছাড়া যুধিষ্ঠিরের, কংস ব্যতীত কৃষ্ণের, মাতাল ভক্ত ছাড়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের, জগাই-মাধাই উদ্ধার না করা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যেরও মুক্তি কই? আলো না হলে অন্ধকারের, কালো না হলে সাদার, রাগহীন অনুরাগের, কাঁটাবিহীন ফুলের, বিরহের ম্লানছায়াশূন্য মিলনের রক্তরাগের, মেঘের মেলা ছাড়া রোদের খেলার, পরাজয়ের সুগভীর বেদনা ব্যতিরেকে জয়ের গভীর আনন্দ কোথায়? বিশ্বনাথের মন্দির ভাংগতে যদি না আসে কালাপাহাড়, তাহলে অবিশ্বাসের রৌদ্রকক্ষ বক্ষ বেদনায় বিস্ফারিত হবে কেমন করে? পাহাড়ের বুক ফেটে তবে কেমন করে উৎসারিত হবে করুণাধারার উৎস। দুর্গম মরুপর্বত পেরিয়ে তারা আসবে বার বার ভুবনমনোমোহিনীকে লুণ্ঠন করতে; লুটে নিয়ে যেতে অমিত ঐশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। মন্দিরের পবিত্র প্রাংগণকে করবে অপবিত্র; মায়ের গায়ে তারা হাত দেবে। মশালের আলোয় জলে উঠবে কালো রাত; ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর থেকে ছিটকে ছিটকে পড়বে স্ফুলিংগ। হয়রাজের হ্রেষাধ্বনিতে কাঁপবে কাপুরুষের বুক। মানুষের রক্তে মাতাল নরখাদক নর, লুব্ধ যারা, ক্ষুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ, আত্মার দৃষ্টিহারা শ্মশানকুক্কুরের দল বীভৎস চীৎকারে যখন হানা দেবে তাকে, মূর্তি ভেংগে গুঁড়িয়ে দেবে মাটিতে তখনও তারা জানবে না, সেই ভাগ্যনিহত হতভাগ্যের দল যে তারা তাঁকেই আঘাত করবে উদ্যত তিনি কেবল ওই মাটির মূর্তিতে নেই; 'মা'-টির গায়ে যে অভিমানী হাত দিয়েছে সেই বিদ্রোহেরও তিনিই মূর্ত বিগ্রহ। তিনি রামে তিনিই পরশুরামে। মহিষাসুরের মার ছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী 'মা'-র আবির্ভাব যে অসম্ভব।

কালাপাহাড় এসেছিলো কাশীতে হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রকে রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে। হনন করতে তাঁকে অগ্নি যাকে দগ্ধ করতে পারে না; পবন পারে না স্পর্শ করতে, না পারে প্লাবন যাকে স্থূচ্যগ্রভূমি সরাতে।

কালাপাহাড়ের আসল নাম কেউ বলে কালাচাঁদ রায়; কেউ বলে রাজীবলোচন। দুর্ধর্ষ কালাচাঁদ জন্মে হিন্দু, রক্তে ব্রাহ্মণ। বীর্যবান, বলবান, বেপরোয়া বাল্যকাল থেকে। নিপুণ অশ্বারোহী, নির্ভীক চিত্ত। বাঙলা ও পারসি ভাষায় পণ্ডিত, কালাচাঁদের ইতিহাস কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। শোনা গেছে যে তিনি অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় মামার বাড়িতে মানুষ হন। তাঁর বিবাহ হয় একই সংগে দুটি কন্যার সংগে। খানিকটা সত্য আর অনেকটাই কল্পনায় মেশানো, এই বিবাহের, কারণ নাকি এই যে, দুজনের মধ্যে ছোটোটিকে তিনি বিবাহ করতে চেয়েছিলেন আর বড়র বিবাহ না হলে তা অসম্ভব ছিলো বলে, বড়টিকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি গৌড়-সম্রাটের ফৌজদার হন এবং যবন-সম্রাটের দুহিতার দুর্নিবার প্রণয়ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে মুসলমানীকে বিবাহ করে জাত দেন। এই যবনী-বিবাহ সম্পর্কেও অনুমিত হয় যে সম্রাটের ভয় নয়, সম্রাট-

চন্দ্রার একনিষ্ঠ প্রণয়ের ফলেই কালাচাঁদ নিজের জীবন-যৌবন ব্যর্থ হবে জেনেও পরিণয়ে বাধ্য হন।

এর পরই আরম্ভ হয় অনুতাপের পালা। প্রায়শ্চিত্ত করেও পুনরায় হিন্দু সমাজে ঢুকতে না পেরে, পুরির জগন্নাথ মন্দিরে ধর্ণা দিয়েও, প্রত্যাদেশ না পেয়ে ক্ষেপে যান। তখন থেকে তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হয় যবনের হয়ে হিন্দু মন্দির ধ্বংস। কালাচাঁদ তখন থেকেই লোকের কাছে কালাপাহাড়!

কোনও কোনও কল্পনায় ব্যক্ত হয়েছে যে শৈশবে কালাচাঁদের হাত দেখে করকোষ্ঠিকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কালাচাঁদ কালে কালাপাহাড় হবে!

সেই একদা কালাচাঁদকে যখন কালাপাহাড় বলে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নাম শুনলেই আতংকে, ঘৃণায় শিউরে উঠছে, তখন তার নাম শোনা গেলো কাশী থেকে অদূরে! যৌবনের মধ্যাহ্ন তখন জীবনের সায়াহ্নে গড়িয়ে এসেছে প্রায়। কিন্তু তখনও ক্রোধের আশ্চর্য রাগ মিলিয়ে যায়নি মনের আকাশ থেকে। সমস্ত অন্তর জ্বলেছে তৃষ্ণার্ত মরুভূমির মতো ধূ-ধূ করে। যত হিন্দু মন্দির বিধ্বস্ত, যত হিন্দু ললনার সম্মানহানি করছে তার সৈন্য, নিঃসংগ সেই মানুষের মনের মরুর তৃষ্ণা বাড়ছে তত। শান্তি নেই; শ্রান্তি নেই। শুধু হিন্দু-নিধনের হিন্দু-মন্দির নির্বংশকরণের সঙ্গে ভুলে থাকার চেষ্টা নিজের অতীত; নিজের উৎস।

শংখঘণ্টা মুখরিত উত্তরবাহিনী গংগার বক্ষে অনাদিকাল থেকে দণ্ডায়মান কাশীর রাজপথে সেদিন শ্রুত হলো অশ্রুত-পূর্ব অশ্বক্ষুরধ্বনি, সচকিত বিহ্বল ধর্মার্থীর দল, হিন্দু বিধবা, মন্দিরের পাণ্ডা, কান থেকে কানে ছড়িয়ে গেলো সেই ভয়-বার্তা, কালাপাহাড়! বিশ্বনাথের পায় জানতে চাইলো মুমূর্ষুর দল বাঁচার উপায়। চির অচল বিশ্বনাথের মূর্তিহীন মূর্তি সে প্রার্থনার উত্তরে রইলো অবিচল। সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে গেছে নিশীথ রাত্রে তখন মত্ত ষণ্ডের মতো হা হা রবে এলো মশালের আলোয় রাতের আকাশ রাংগা করে যবন সৈন্যেরা একদা হিন্দু-শ্রেষ্ঠ কালাচাঁদের নয়, তখন যবনের চেয়েও হিন্দুর প্রতি প্রতিহিংসায় বেশি যবন কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে!

মন্দিরের পর হিন্দু মন্দিরের মাথা লুটোয় মাটিতে। অচল বিশ্বনাথ তবু সচল হয় কই। কিন্তু নির্বিকার থাকতে পারেন না এক হিন্দু বিধবা। ধর্ষিতা সেই রমণী এসে দাঁড়ালেন কালাপাহাড়ের সামনে। বললেন: দেখো তো আমাকে চিনতে পার কি না? কালাপাহাড় তাঁকে চিনলো; তার মাতুলানী কালাপাহাড়ের সামনেই তিনি আত্মহত্যা করেন অভিশাপ দিতে দিতে। কালাপাহাড় টলে ওঠে সেই মুহূর্ত।

কালাপাহাড় এই ঘটনার পর কোথায় নিরুদ্দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সে কিংবদন্তীও সে সম্পর্কে একান্ত নীরব!

সেদিন বিশ্বনাথের মন্দিরকে যারা রক্ষা করতে পারেনি তাদের নিশ্চল নিবীর্য কর্মকীর্তিহীন বাহুকে নিন্দা করে লাভ নেই! কারণ বাহুতে যিনি বীর্যের সঞ্চার করেন, শিরায় শোণিত, তিনিই সংবরণ করেন রক্ষা মন্ত্র! কেন করেন, এ নিয়ে বাদানুবাদে চলে বিবাদমত্ত হওয়া, কিন্তু উত্তর দেওয়া চলে না এর। অথবা ক্ষীরভবানীর তীরে মহাশক্তি বিবেকানন্দর কানে যে দৈববাণী যে দিব্যবাণীর অগ্নিমন্ত্র করেছিলেন উচ্চারণ, পুনরাবৃত্তি করা চলে তার: আমাকে তুই রক্ষা করিস, না তোকে আমি। কিংবা বলা চলে, তার সমস্ত দিগ্বিজয়ের কীর্তি নিয়ে, অনুতাপের নিয়ে অনিঃশেষ অনল কালাপাহাড় মুছে গেছে ভেসে গেছে মহাকালাবর্তে,—জেগে আছেন এখনও চিরনিদ্রিত, চিরজাগ্রত যিনি জগৎ ভাংগা গড়া যাঁর একমাত্র খেলা, একপলকের লীলা যাঁর, এক ঝলকের আলো-আঁধার!

কেবল কালাপাহাড় কি? ঔরংজেব এসেছে আরও পরে। এবং স্বয়ং বিশ্বনাথের মন্দিরকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চেয়েছে। বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করে সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর মন্দিরের পাথর দিয়ে মসজিদ তৈরী করেন। অচল বিশ্বনাথ তখন সচল হয়েছিলেন বলে হিন্দু ভক্তের বিশ্বাস। তাঁর নীল কণ্ঠে অভয় আশ্বাস উচ্চারিত হলো, বিশ্বনাথের অন্তর্ধানে অনাহারক্লিষ্ট ভক্তদের কাণে: আমি আছি জ্ঞানবাপীর মধ্যে। মন্দিরের দক্ষিণের জমিতে আমাকে প্রতিষ্ঠা করে নূতন করে পূজা কর। নূতন মন্দিরে বিশ্বনাথকে প্রতিষ্ঠা করবার সময়ে যে কোণে প্রথম রাখা হয় সেই কোণ থেকে তাঁকে সরিয়ে আনা যায়নি আর মধ্যস্থলে। যবনাক্রমণের সময়, বিশ্বনাথের বাহন বৃষভ মূর্তি চৈতন্যযুক্ত হয় এবং চীৎকার করে ওঠে। এই বৃষমূর্তিকে কেউ স্থানান্তরিত করতে পারেনি আজও!

ঔরংজেব তারা হীরামণিমাণিক্যের ঘটা নিয়ে, দিগ্বিজয়ের দীপ্তছটা নিয়ে মিলিয়ে গেছে কবে! বিশ্বনাথ তাঁর অচল আসনে আছেন আজও অবিচল।

যিনি জ্ঞানবাপীতে অন্তর্ধান করেন, যিনি আদেশ করেন নূতন প্রতিষ্ঠা, যিনি অহল্যাবাঈকে দিয়ে নিজের মন্দির তৈরীর, রণজিৎ সিংকে দিয়ে সেই মন্দিরের মাথা সোনা দিয়ে মুড়ে দেবার প্রেরণা দেন আবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীকে দিয়ে অপহরণ করিয়ে সোনা, সোনার সরু পাত দিয়ে মাত্র ঢেকেছেন নিজের মন্দিরের মাথা, তিনি কি ইচ্ছে করলেই, যবনদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হতেন। যে বলবে, এ আমাদের দোষ তাঁর নাম নিয়ে ঢাকা দেবার চেষ্টা। সে যদি যে কেউ হয় তবে তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না; কিন্তু সে যদি হয় বিবেকানন্দ, মন্দির-সংস্কারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তবে সে শুনতে পাবে সেই অনাদিকণ্ঠে এই আদি জিজ্ঞাসার জবাব: আমারই ইচ্ছায় মুসলমানরা যদি আমার মন্দির নষ্ট করে থাকে, তাতে তোর কি।

কালাপাহাড় তাঁর ভক্ত না তাঁর শত্রু কে বলবে? যাঁর ইচ্ছায় রত্নাকর রামভক্ত হয়, তাঁর ইচ্ছাতেই রামভক্ত হয় কিনা রাবণ, বলব কি করে? কংস কৃষ্ণের চেয়েও কৃষ্ণভক্ত কি না জানবে কে?

ঈশ্বর কোনও চার-হাত-পা সমন্বিত মূর্তি নন। ঈশ্বর এক অনাদি, অনন্ত অনুভূতি মাত্র। অনুভূতির অতীত এক অনুভূতি। তিনি সুখে দুঃখে, সন্তান জন্মে সন্তান মৃত্যুতে আছেন। তিনি রণে আছেন, আছেন শান্তিতে। তিনিই শকুনি হয়ে পাশা খেলায় হারাচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে; দুঃশাসন সেজে সাজমুক্ত করবার চেষ্টা করছেন দ্রৌপদীকে। তিনিই শংখচক্রগদাপদ্মপাণি,—দ্রৌপদীকে জুগিয়ে যাচ্ছেন বাস। অর্জুনকে বলছেন যুদ্ধ কর, বুদ্ধর মুখে বলছেন, যুদ্ধ বন্ধ কর। তিনিই ঈশ্বর যিনি

মলে আছেন ; আছেন পরিমলে। যিনি পুণ্যে এবং পাপে, তাপে এবং অন্তাপে, তাপে এবং অনুতাপে বিরাজমান।

যারা বলে পাপকে ঘৃণা কর ; পাপীকে নয় !—তারা পৃথিবীর সব চেয়ে অসত্য অর্দ্ধসত্য বলে। পাপকে ঘৃণা করবে যে সে পুণ্যকে ভালোবাসবে কোন্ অধিকারে ? অন্ধকারকে যে পরিহার করবে আলোকে গলার হার করবে,—এমন আকাশ কোথায় ? রাবণের পরস্ত্রী-হরণের পাপ ছাড়া সীতার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ কোথায় জননী-গর্ভে, ধরণী-ক্রোড়ে !

কালাপাহাড়েরা আসবে বারবার তবেই তো শংখের মুখে শোনা যাবে শংকাহরণের বাণী : সম্ভবামি যুগে যুগে !

পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর পদধ্বনি আজ ! পরম মানবিক বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়ে দিতে এসেছে পরমাণবিক যুগ। ধ্বংসের দূতেরা বলছে : বসুন্ধরাকে দেব রসাতলে। সমস্ত রসের তলে যিনি, তিনিও আসছেন আবার। যিনি ধ্বংসের দূত। তিনিই যে বিশ্বাসের অগ্রদূত। গেলো ! গেলো !—রব উঠছে যত পশ্চিমাকাশে,—পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করে পাখীর কলরবে তত জাগছে আশ্বাস : এলো ! এলো। বিশ্বত্রাস যিনি তিনিই যে বিশ্বনাথ ! মারমূর্ত্তিতে যিনি,—'মা'-র মূর্ত্তিতে তিনিই যে আশা দেন আবার ! আশংকা যেমন সত্য, আশা সত্য তার চেয়েও বেশি ! কালাপাহাড় যত সত্য, কাশী সত্য তার চেয়ে কম নয়। কালাপাহাড়কে ভাংগতে হবে বলেই, কালাপাহাড় ভাংগতে আসে বিশ্বনাথের মন্দির !

নশ্বর বিশ্বে এই বিশ্বাসই কেবল অবিনশ্বর ! এই বিশ্বাসই স্বয়ং ঈশ্বর !

এই বিশ্বাসের মধ্যেই বেঁচে আছে ভারত ! ভারতেই বেঁচে আছে এই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের, সেই বাঁচার স্থানই-ই কাশী ! কাশীর আত্মা আগত এবং অনাগত যত মহাত্মা !

এই বিশ্বাসের মৃত্যু নেই। কাশী মৃত্যুঞ্জয় ! সেই কাশী যা আজকের নয় ; নয় কালকের। অনাদি এবং অনন্তকালের সেই কাশীর ইতিহাস কে লিখবে !

বিদেশী ঐতিহাসিকের মুখর ভাষণে, কাশীর যে ইতিবৃত্ত বইয়ের পাতায় পাওয়া যায় সে তার দেহের ওজনে মাপ। কাশীর সেই আত্মার কোনও ইতিহাস নেই, কারণ কোনও দেশে কালে নেই পরিমাপ যন্ত্র।

ঐতিহাসিকের চোখেও কাশী অতি প্রাচীন সহর। আর্যদের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের সংগে সংগে কাশীর পত্তন হয় [ Picturesque India—কেন্ ]।

কিন্তু কাশীর সেই ইতিহাস এই 'বার্ধক্যে বারাণসী' নয়। কাশী যাঁদের আত্মার সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আজও,—কাশীর ইতিহাস কেবল তাদেরই। নিজেদের ধ্যান আর ধারণা দিয়ে। দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন আরাধনার অমৃত, তিল তিল করে যারা কাশীকে করেছেন তিলোত্তমা তাঁদের শব-সাধনার, সব-সাধনার লিখতে বসেছি ইতিহাস ; এখানে কত্তো মন্দির আছে, এ নগরের বয়স কত্তো, কারা ছিলেন বংশপরম্পরায় কাশীর নৃপতি, তার তালিকা নয় কাশীর কর্মের আর মর্মের, জীবনরসঞ্জারিত ধর্মের নয় পরিচয়। তথ্য নয় ; তত্ত্ব। শক্তি নয় ; নিরাসক্তি। কাশী কেবল মুমুক্ষুর নয়। মূর্খ্য এবং জ্ঞানী, পাপ এবং পুণ্য, রাজা এবং প্রজা, অভিজাত এবং অজ্ঞাতকুলশীল,—কাশী সকলের। কিন্তু সকলের ওপর কাশী যে কোটিকে গোটিকের তাঁদের জীবন-বৃত্তান্তই প্রধানতঃ

কাশীর ইতিবৃত্ত। কাশী যাঁদের আরাধনার অস্থিমেদমজ্জায় গঠিত, আজও তাঁদের সাধনা লোকচক্ষুর আড়ালে কখনও, কখনও সর্বজন-সমক্ষে, অব্যাহত। তাঁরা বারবার ঘুরে ঘুরে আসেন এই কাশীতে; আরবার তাঁরা আসবেন, এই আশার যেখানে মৃত্যু নেই, সেই অজরা, অমরা কাশীকাণ্ডের যাঁরা মূল তাঁদের নাম করি; আর প্রণাম করি এমনই একজন অবিস্মরণীয়কে আজ, কাশীর আকাশবাতাসে গংগায়, পথেঘাটে যাঁর জীবনের মধু ক্ষরিত হবে চিরকাল;—তাঁর পুণ্যপবিত্র নাম, মধুসূদন সরস্বতী;—যাঁকে প্রণাম করলেই হয়ে যায় সরস্বতী পূজা সমাপ্ত।

মধুসূদন সরস্বতী কাশীর তা-ই, পূর্ণিমার রাত তাজমহলের যা!

সুদীর্ঘজীবী মধুসূদনের জীবনের প্রান্তরপ্রান্তে যখন গোধূলির আলো আঁধার মুহূর্ত দীর্ঘ ছায়া ফেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে আনছে শেষের অশেষ ক্ষণ, তখন একদিন মহাযোগসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথের বিদেহী সত্তার আবির্ভাব হয় মধুসূদনের স্থূলচক্ষে। গংগা স্নান সেরে সিঁড়ি ভেংগে উঠে আসছেন উপরে; তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সূক্ষ্ম জ্যোতির্দেহে স্বয়ং গোরক্ষনাথ। জীবন্ত গংগা-যমুনা দাঁড়িয়ে মুখোমুখী। প্রভাতরবির প্রসন্ন কর স্পর্শ করেছে জ্ঞানরত্নাকর মধুসূদন সরস্বতীর ভাগ্যবান ললাট। পাখীর কাকলী, গংগার কুলুকুলু, অদূর থেকে ভেসে আসা প্রভাতী পূজার শংখঘণ্টার পবিত্র শব্দ নিস্তব্ধ চরাচরে অভ্যর্থনা করতে উদ্যত সেই যুগলদর্শনকে। যোগী গোরক্ষনাথ একটি পাথর তুলে ধরলেন মধুসূদনের চোখের সামনে। সূর্যের আলোকে হারমানানো তার দীপ্তি হেরে গেলো মধুসূদনের নিরাসক্ত দৃষ্টির কাছে। গোরক্ষনাথের বিদেহী কণ্ঠ তখন সেই পাথরের পরমাশ্চর্য ক্ষমতাকে বিবৃত করলো: এই পরমকাম্য পাথর আমি কাকে দেব ভেবে পাইনি, তোমাকে দেখবার আগে। এ বস্তুর কাছে যে বস্তু চাইবে তাই পাবে তুমি। তোমাকে দিলাম এই দুর্লভ রতন।

হাসিতে দুচোখ ভরে গেলো মধুসূদন সরস্বতীর, সেই আশ্চর্য অনুপম অন্তরের অজ্ঞ বেদনার অশ্রুজল থেকে উৎসারিত অনন্তের হাসি,—বিশ্বের বিচিত্র বাঁশিতে যার সুর মর্ত্যলোকে হয় কচিৎশ্রুত। ফুল যেমন করে বলে পাখিকে প্রয়োজন নেই তার কৃত্রিম রংএর, তেমনই করে গ্রহীতার সেই হাসি বললো দাতাকে: প্রয়োজন কি সেই পাথরের তার কাছে, অনাবশ্যক ভার ছাড়া যার মধুসূদনকে দেবার আর কিছুই নেই। যে ধনে ধনী হলে মণিরে মণি বলে মানে না স্বয়ং ভগবানের নীল নয়নমণি,—ভক্ত, সেই ধনবান, ঐশ্বর্যবান, সব চাওয়া-পাওয়ার উর্দ্ধে যার অবস্থান সেই মধুসূদনকে পরীক্ষার পালা তবু শেষ হয় না, গোরক্ষনাথের। তিনি সব জেনেও পীড়াপীড়ি করতে থাকেন মধুসূদনকে পাথর নেবার জন্যে। মধুসূদন স্বীকৃত হন একটি সর্তে। সর্ত হচ্ছে, মধুসূদন সেই পাথর নিয়ে তাঁর যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন। গোরক্ষনাথ মেনে নিলেন সর্ত। তখন মধুসূদন পাথরটি গ্রহণ করলেন এবং সেই মুহূর্তেই বিসর্জন দিলেন গংগায়।

গোরক্ষনাথ তাকিয়ে আছেন তখন সেই দিকে যেখানে তাঁর যত কিছু দেওয়াকে না-দেওয়া করে হারিয়ে গেছে সেই পাথর অতল জলের অতলে। মধুসূদনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তারপর বললেন: শুধু তুমি নও; আমিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি মধুসূদন। তোমাকে ছাড়া এমনি আর কারুর হাতে নয় দেবার, চেয়ে দেখো ওই গংগার জলের দিকে আর আনন্দে উৎসারিত আমার চোখের জলের দিকে, সে সিদ্ধান্ত আমার অভ্রান্ত। তাকে অপ্রমাণ করবার উপায় তোমার হাতেও এই মুহূর্তে আর নেই। [ ভারতের সাধক: দ্বিতীয় খণ্ড ]

মধুসূদন, সরস্বতীর কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে হার মানেননি জীবনে। সরস্বতীও হার মানতে রাজি ছিলেন বুঝি তাঁর কণ্ঠহারে শ্রেষ্ঠ ভূষণ, মধুসূদন সরস্বতীর কাছেই কেবল। কাশীর পণ্ডিতেরা এই প্রতিভার দিকে তাকিয়ে পলক ফেলতে বিস্মৃত হয়েছেন বহুবার। বিস্মিত তাঁরা বলেছেন:

বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদন সরস্বতী।
মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥

জ্ঞানের এপার-ওপার জেনেছেন দুজন। সরস্বতীর জ্ঞানের পার জেনেছেন মধুসূদন; মধুসূদনের জ্ঞানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন শুধু সরস্বতী।

জীবনের প্রথমঃ দিবসেও যেমন, জীবনের প্রথম দিবসেও মধুসূদনের চেহারা এক। সর্বশেষ দিনে যেমন অনিঃশেষ দানের মহিমায় অশেষ দীপ্ত দুর্মূল্য দুর্লভমণি ফেলে দেওয়া জলে, প্রথম দিনেও তেমনই রাজার কাছ থেকে পিতাকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরতে দেখে জগতের যিনি রাজা কেবল তাঁর জন্যেই আকুল হওয়া।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে অদ্বিতীয় এই প্রতিভার আবির্ভাব দক্ষিণ বাঙলার চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় পণ্ডিত পুরন্দরাচার্যের পুত্ররূপে। পুত্রকে নিয়ে স্বাধীন দক্ষিণ বংগেশ্বর দর্পনারায়ণের দ্বারে উপস্থিত প্রবীণ পণ্ডিত পিতা। পুত্রের প্রতিভার পরিচয় দিতে চান রাজসমীপে। কিন্তু সময় হয় না রাজার সেই বালককবীরের কাব্য প্রতিভায় কান দেবার। সময় না হবার কারণ অবজ্ঞা নয়; দুঃসময়। মানসিংহের নেতৃত্বে দিল্লির বাদশা সৈন্য প্রেরণ করেছেন দর্পনারায়ণের দর্প চূর্ণ করতে। তাই সময় নেই কাব্যালোচনার। প্রত্যাখ্যাত পুরন্দর পুত্রকে নিয়ে ফিরছেন নদীপথে।

অনন্ত কাল ধরে বয়ে যাওয়া নদীর ওপর রাত নামছে, নির্জন, নিরুপম নিস্তব্ধ রাত তার কালো পাখা মেলে নেমে আসছে তরল-সলিল নদীর বুক স্নিগ্ধতায় ভরে দিতে। শেষ বিহংগ বন্ধ করেছে তার পাখা। নীলাঞ্জন ছায়ায় সমস্ত নদীতীরে মানুষের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বিষণ্ণতার জীবন্ত দুই প্রতিমূর্তি বসে আছেন চুপ করে নৌকার ছই-এর নীচে। পিতা পুরন্দর; পুত্র মধুসূদন।

দীর্ঘ স্তব্ধতার ঢাকা খুলে গেলো হঠাৎ। প্রত্যাখ্যাত পিতার কোল ঘেঁসে পুত্র মধুসূদন বললো: বাবা, তুমি ফিরে যাও বাড়িতে। রাজার প্রাসাদ নয় আর; জগতের যিনি রাজা তাঁর প্রসাদ পাবার জন্যে পথে নামব আমি। দেখি, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন কি না।

মাথার ওপরে রাত্রির প্রহরের চাঁদের আলো সেই এসে পৌঁছলো নদীর জলে। আকাশের আশীর্বাদ এসে পৌঁছলো পৃথিবীর কপালে। যাত্রা হলো সুরু। জীবনের জয়যাত্রা!

[ ক্রমশঃ।

# বর্ধমান জেলার ভাদু গান

**শৈলেনকুমার দত্ত**

ভাদর মাসে ভাদু পুজো এনেছি আমরা
সন্ধ্যে বেলায় শীতল দিতে
কড়কড়ে কড়াই ভাজা ;
ঘরে ভাদু পুজো কর-গে দু'দশ মজা।
চাট এনেছি লঙ্কা মরিচ
আর নিমকী দানা ভাজা ॥

ভাদ্র মাসে ভাদু পুজো বাংলার একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ। বর্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে এই তিরিশটি দিনে যে প্রাণ-চাঞ্চল্য, যে আমোদ-আহ্লাদ দেখা যায় তার তুলনা নেই। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় মাটির একটি সুন্দর নারীমূর্তি মাথায় নিয়ে একদল লোক বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। হারমোনিয়াম ডুগি-তবলা বাঁশী ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে এক বিচিত্র মধুর সুরে মোহিত হয়ে গান গায়—

চৌতি রাতে ভাদু গো তুমি
বলে গেলে মোর কানে কানে,
আমার মালা তোমার গলে
তোমার মালা আমার গলে ॥
কিংবা
মালা বদল করব আজি তোমার সনে
চৌতি রাতে ফুল বাসরে
জাগবো ভাদু আজ দু'জনে ;
নিয়ে গিয়ে রাখবো ভাদু
এই হৃদয়ের মন্দিরে ॥

সারা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম, অন্নচিন্তা, সাংসারিক অভাব অভিযোগ ভুলেও যে কি করে এরা এত চাঞ্চল্যে ঐ কটা দিন ঘুরে বেড়ায়—নিজের চোখে না দেখলে সেটি বিশ্বাস করা যায় না। সাধারণত চাষী বা মুটে মজুররাই এই উৎসব পালন করে থাকে। ধান চাষের আনন্দে, সবুজ চারা গাছের টলমল চাউনি দেখে এরা যেন মাতাল হয়ে ওঠে। গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে ঘুরে এরা প্রকাশ করে এদের আনন্দ—

বনে তোলা ফুল হল না আমার
হল না আমার মালা গাঁথা,
বনের কুসুম তুলতে গেলাম
ভেঙে গেল ভাদু প্রেমলতা।
কোন সকালে গেছ গো ভাদু
এখনও ফিরে এলো নাকো ॥

হিসেব করলে দেখা যায় এদের বেশীর ভাগ গানই রোমাণ্টিক। সবল বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যসবল চাষীদের অন্তরেও যে প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়—

কাতলা দীঘির জলে গো ভাদু
পালিয়ে গেয়ে লুকায়েছে গো
কাতলা দীঘির জলে—
ভয়ের কারণ পুরায়েছে গো
পাতাল পুরীর তলে।
সাঁঝের প্রদীপ সন্ধ্যাকালে

চাঁদের আলো যখন জ্বলে—
মা'য়ের হাসি মা'য়ের হাসি
দোলে গো ভাদু ধেয়ের পরে ॥

শুধু সুন্দর সুন্দর গান গেয়েই এরা শান্ত হয় না। অন্য দু'একটি দলের সামনা সামনি হলে বাগযুদ্ধও হয়। কতকটা তরজা লড়াই-এর মত। এতে কিন্তু যে দল জিততে পারবে তাদেরই জয়জয়কার। সেদিনের সমস্ত পাওনা তো তাদের ধরে দিতে হবেই উপরন্তু অনেক সময় তাদের খাওয়াবার খরচও দিতে হয়। এদের এই লড়াইটি খুবই উপভোগ্য। প্রেমের গান গাইতে গাইতে হঠাৎ কেমন করে যে এমন কঠিন হয়ে ওঠে সেটি লক্ষ্য করবার মত। একটু নমুনা দি,—

বল্ রে গণ্ডমুখ্যু ভাদুর গুরু কে
জল তো সবাইকে ধোয়ায়
জলকে ধোয়ায় কে—
কাশীতে ওই দেখে এলাম
একটি ফুল ফুটেছে ;
ফুলটি নড়ে বুটটি পড়ে
এ কথাটি বলে দে ॥

কিন্তু এই লড়াই-এর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল এরা কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণ করে না। ভাষার শৈথিল্যও খুব বেশী দেখা যায় না।

ভাদুকে সামনে রেখে এই কটি দিনে এরা নিজেদের সমস্ত অভাব অভিযোগ প্রয়োজন অভিমত—গান এবং ছড়ায় গেয়ে 'বাবু'দের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ক্যানেলে জল পেয়ে চাষের কি হল এবং তার জন্যে তাদের কি কর দিতে হল সেটিও সুন্দর ভাবে গেয়ে চলে—

কেনেল এল ভালই হল
ভাবনা কি তাই বল না।

সাড়ে পাঁচটা কেনেল করে
নিচ্ছে ভাদু ঘরে ঘরে ;
সব নিলে গো ঘটি বাটি
কিছুই বাকী রাখলে না ॥

ঠিক এই ধরণের আরও অনেক কথা দু-এক স্থানে প্রকাশ পেয়েছে—

আজকে নতুন শাসনায়
এলেন গো ভাদু ভারতে
বাবু ভাইরা বসে আছেন
বসে আছেন গদীতে।
মন্ত্রীরা সব ফন্দী এঁটে
বারো আনা দর করেছে।
হায় রে বরাত নাই কারও হাত
অকালে হয় মরিতে
ওই বিনা দোষে পুলিশ এসে
তানসেন গুলি চালাচ্ছে ॥

এই ভাবে একটি মাস গাওয়া শেষ হলে শেষ দিনটিতে এরা ভাল বাজনা ইত্যাদি ভাড়া করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আসে। তারপর ভাদুর মূর্ত্তিটিকে কাছের কোন নদী বা দীঘিতে ভ'সান দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সেই দিনটি ওদের বিরাট আমোদ-আহ্লাদে কাটে। রাজকন্যা ভাদুরাণীর অকালমৃত্যুর জন্যে তাঁর ছোট্ট জীবনকে এরা যেন প্রাণচঞ্চল করে, আবার তুলে রাখে পুরো একটি বছরের জন্যে।

## মির্জা গালিবের কয়েকটি দ্বিপদী

### সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

১। জলের কণা যখন মেলে এসে নদীর বুকে সেই তো শান্তি তার
ব্যথার সীমা ছাড়ায় ব্যথা যবে সেই তো তখন ব্যথার প্রতিকার।

২। বলছো তুমি দেবেই নাকো দিল, যদি মোর পাও কুড়িয়ে
দিল, কোথা যে কাড়বে বঁধু সে তো তোমার' হাতেই প্রিয়ে।

৩। প্রেমের ছোঁয়ায় এই জনমেই পান করেছি জীবন সুধা
সকল ব্যথার প্রলেপ সে মোর, শান্তি বিহীন সে মোর ক্ষুধা।

৪। মিলন-পিয়াস প্রিয়ামুখস্মৃতি হিয়ায় বাকি তো কিছু নাই।
দাবানল সেথা জ্বলেছে এমন হয়ে গেছে সব পুড়ে ছাই।

৫। উজ্জ্বল আশার মগন যে জন তার কথা কী বলার আছে,
চন্দ্রকলা মুক্তকৃপাণ দুইই সমান তাহার কাছে।

৬। আমার ক্ষতে কি আর প্রলেপ পারবে দিতে বন্ধু-ইয়ার,
জখম ভরে ওঠার আগে নখ কি রে ভাই বাড়বে না আর ?

৭। দেখলে তারে আমার মুখে খুসীর ঝলক খেলায় যবে
হায় ভাবে সে আমার রোগের হালটা বুঝি ভালই তবে।

৮। ভাবনা কিসের ? জামিন আমি ; চাওনা বারেক এদিক পানে,
নাই প্রতিশোধ তার কোন যে হায় মরেছে আঁখির বাণে।

৯। মিলব না আর প্রিয়ার সনে এই ছিল মোর ললাট লিখন
পথ চাওয়া মোর অশেষ হতো অন্তবিহীন হলেও জীবন।

১০। স্বর্গ মনে নরকটারে মিলাই যদি দোষ কি প্রভু ?
ঘোরার লাগি আরও খানিক জায়গা তাহে মিলবে তবু।

১১। অনেক ভালো এ মাটির পেয়ালা মোর,
জামশেদ শা'র যাদু পেয়ালার চেয়ে,
মোর পেয়ালাটি ভেঙ্গে যদি যায় পারি
যত চাই ভাই কিনিতে বাজারে যেয়ে।

(কথিত আছে পারস্যের বাদশা জামশেদের একটি যাদু-পেয়ালা ছিল। তার দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জানতে পারতেন। একবার পেয়ালাটি ভেঙ্গে যায়, সঙ্গে সঙ্গে এর যাদুশক্তিও লোপ পায়।)

১২। তোর আশাতে রইছি বেঁচে এই জানা তোর ভুল-রে মিতে,
আশাই যদি রইত আমার মরেই যেতাম সেই খুসিতে।

১৩। কাজের নেশায় ছোটায় কত জীবন-তৃষা ব্যাকুল হিয়ার
মরণ যদি রইতো না-তো বাঁচার মজা রইতো কি আর ?

১৪। যতক্ষণ হিয়া আছে ভাই
ব্যথা হতে কোথা পরিত্রাণ।
না থাকিলে প্রহারের ব্যথা
জীবনের ব্যথা হানে বাণ।

১৫। হৃদয়ে ভরসা ছিল মোর
ভেবেছিনু সে আমারি, হায়,
জানিতাম কি-গো প্রেম-পণে
মজিবে সে এক লহমায় ?

১৬। দেবদূতেরা লিখল যে লেখ তার নজিরে
হায় বিধাতা হয় কেন গো মোদের বিচার ?
কেউ কি ছিল মোদের কথা বলার লাগি ?
একতরফা কেমন এ-গো তোমার ব্যাভার ?

১৭। বোঝেই না সে কোন্ কথা হায় বলি
এ-ওতো জানি বুঝবে না সে কভু—
জিহ্বা মোরে না দেও যদি আরেক
দেও গো ওরে আরেক হৃদয় প্রভু।

১৮। সে রমণী অপ্সরী-আনন, তার মনে ছিল ভাষ্য মোর।
(তাই) আছিল যে বান্ধব আমার আজি সেই প্রতিদ্বন্দ্বী মোর।

১৯। সয়েছি প্রহার করাল কালের আমি ক্রীতদাস
তোমারে তবু-তো ভুলিনি-কো কভু, ওগো সুহাস

২০। তার চোখে যে ইসারা অর্থ তার অন্য কিছু, জানি
সংশয়ে আকুল হিয়া শুনি তাই তার প্রেম-বাণী

২১। করেছি যে পাপ প্রভু তার লাগি যদি শাস্তি পাই
না—করা পাপের তরে হতাশায় লাগি কেন
প্রশংসার বাণী হেথা নাই ?

২২। পুরিল না যত কাম
হৃদয়েতে তার ক্ষত
স্মরণে আছে আমার,
করিলাম যত পাপ
হায় খোদা এ মিনতি
চাহিও না হিসাব তাহার।

২৩। ঈর্ষা কহে
প্রতিদ্বন্দ্বী
কেমন ভাগ্যবান,
তার প্রতি মোর প্রিয়ার হিয়ার টান;

বৃদ্ধি কহে
বেবাক ফাঁকি
হৃদয়হীন এ নারী,
কারো হৃদয় ছোঁয় না হৃদয় তারি।

২৪। যতক্ষণ দূতী আসে ফিরে
লিপি এক লিখে রাখি আর,
জানিই তো কী বারতা বহি
আনিবে সে আমার প্রিয়ার।

২৫। মোর নাম অপবাদো কিবা
সে তো নহে রাজী শুনিবারে,
আশা তাই বৈরির বচন
হয়তো বা বিরূপিবে তারে।

২৬। চলিলাম কত পথ কতদিন কত পান্থ সনে,
পথের প্রভুরে আজো চিনি নাই তবু জানি মনে।

২৭। বিচ্ছেদ রজনীগুলি স্মরণেতে যবে দেয় দেখা,
কতদিন আছি পৃথিবীতে ভুলি তার হিসাবের লেখা।

২৮। আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী গেল যেতে তার দ্বারে সহস্রেক বার,
এর চেয়ে ছিল ভাল কোথা যাও নাহি যদি জানিতাম
উদ্দেশ তাহার।

২৯। গোপন কটাক্ষে কভু ব্যক্ত লক্ষ প্রেম হৃদয়ের,
গোপন কটাক্ষ কভু সমতুল লক্ষ শৃঙ্গারের।

৩০। জীবন-তুরঙ্গ ধায় পূর্ণ বেগে, কে বা জানে কোথা থেমে যাবে,
হস্তে বল্গা নাহি আরোহীর, চরণে তো নাহিকো রেকাবে।

৩১। সকল কাজের সহজ হওয়া সহজ কি ভাই?
মানুষেরো মানুষ হওয়ার সাধন যে চাই।

## রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস ও কলম্বিয়া রেকর্ডে প্রকাশিত নতুন গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:—

### 'এইচ-এম-ভি'

N 82975—শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'একটি পারিজাত পারি বাতে' ও 'হংসপাখা দিয়ে' দু'খানি আধুনিক গান। পরিবেশন গুণে অপূর্ব।

N 82976—সুধাকণ্ঠী উৎপলা সেনের গাওয়া দু'খানি গান—'এতো মেঘ এতো যে আলো' এবং 'পত্র লিখেছো চেনা চেনা আখরে'—সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মধুর গান।

N 82977—'সাতটি মোটে দিন' ও 'ফুল নেবে গো'—বিষয় বস্তুর নতুনত্বে ভরা দু'খানি আধুনিক গান—গেয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 82978—নবাগতা শিল্পী রমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি মিষ্টি মধুর আধুনিক গান—'বেদনার দীপ জেলে' এবং 'ও ময়না কথা কয় না'।

### কলম্বিয়া

GE 25100—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠের আধুনিক গান—'তারা ঝিল মিল' ও 'না-না ডেকো না'।

GE 25101—'কে রে মনো মোহিনী'—এই রামপ্রসাদী ও 'দিবানিশি ভাব রে'—দু'খানি শ্যামা সঙ্গীত—হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে পরিবেশন করেছেন গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

CE 25102—নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুক্ষরা কণ্ঠের দু'খানি আধুনিক গান—'নীল মেঘ দেখে' ও 'সারা রাত্রি ধরে'।

GE 25103—উদীয়মান শিল্পী প্রশান্ত ভট্টাচার্যের দু'খানি আধুনিক গান—'নতুন নতুন নামে ডাকো' ও 'তোমার আমার দু'টি মনের'—সংগীত রসিকদের খুশী করবে।

GE 19101—'ওরে রূপের কন্যা রে' এবং 'কোথায় আছে দীন দরদী'—দু'খানি পল্লী গীতি গেয়েছেন মমতাজ আলি ও সম্প্রদায়। বাংলার মেঠো সুরের মধুরতায় ভরা মরমী গাথা।

## আমার কথা (৮৮)

### শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী

'বিনম্রা, লজ্জাশীলা, শান্তপ্রকৃতি সংযত-বাক ও পরিপূর্ণা গৃহস্থ-বধূ শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী যে বেহালায় সুরের মূর্চ্ছনার মাধ্যমে শ্রোতাদের সম্মোহিত রাখেন—ইহা নিঃসন্দেহ—তদুপরি গৃহস্থালীর কাজকর্মে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া আনন্দ লাভ করেন। সংসার ও সঙ্গীত উভয়ই সুনিপুণ ভাবে চালনা করেন—ইহা পূর্বে জানিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতে জানিতে পারি:—

"আমি ১৯৩৭ সালে শিলং সহরে ভূমিষ্ঠ হই। পিতা আসাম রাজ্যের রাজ্যপালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার

শ্রীবিমলরঞ্জন দে ও মাতা শ্রীমতী সুরুচিবালা দেবী। আমাদের আদি নিবাস শ্রীহট্ট। শিলং সরকারী বালিকা বিদ্যালয় হইতে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

পিতা খুব সঙ্গীতপ্রিয়, কিন্তু সুযোগ না থাকায় নিজে সঙ্গীত শেখেন নাই তবে কন্যাদের সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করান। আমার দিদি শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্তরায় কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে সেতার বাজাইতেন। আট বৎসর বয়সে আমি আসামের মতি মিশ্রের নিকট কণ্ঠসঙ্গীত ও বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করি। ১৯৫৩ সালে পিতা প্রফেসর ভি, জি যোগকে দুই মাসের জন্য শিলং-এ আনান। তাঁহার নিকট আমি বেহালা বাজনার বিভিন্ন রীতিনীতি শিখি। প্রত্যহ

শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী

চোদ্দ-পনের ঘণ্টা রেওয়াজ ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উহার মাধ্যমে অভ্যাস করিতে থাকি। শিক্ষণীয় বিষয় পূর্বে কণ্ঠে গাহিয়া পরে বাজাইতাম। কারণ বেহালা হল ধৈর্যের জিনিষ—স্বরোদ বা সেতার বাজান অপেক্ষা উহাতে অধিক পরিশ্রম প্রয়োজন। উক্ত বৎসরে লখনৌ মরিস কলেজের প্রাইভেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিয়া পর বৎসর তথা হইতে 'সঙ্গীত বিশারদ' উপাধি পাই। তথায় শ্রীযোগের ( JOG ) নিকট নিয়মিত শিক্ষাও লই। ১৯৫৪ সালে নিখিল-ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মধ্যে প্রথম হইয়া আমি প্রথম-পুরস্কার ( বিষ্ণু দিগম্বর ) এবং লিখিত পরীক্ষা খুব ভাল হওয়ায় বিশেষ স্বর্ণ-পদক পাই। ইহাই আমার সম্মেলনে প্রথম যোগদান। শিলং-এ থাকাকালীন আসাম প্রাদেশিক সঙ্গীত সম্মেলন ও তথাকার বহু স্থানে বেহালা বাজাই। ১৯৫৩ সালে শিলং বেতার কেন্দ্র হইতে কণ্ঠ-সঙ্গীত ও বেহালায় অংশ গ্রহণ করি। কিছুদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ আমাকে প্রথম সারির শিল্পী হিসাবে মনোনীত করেন।

১৯৫৬ সালে কলিকাতায় আসিয়া ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর নিকট শিক্ষাধীন হই ও স্থানীয় বেতার কেন্দ্র হইতে বেহালার মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশনা করিতে থাকি। ভারতের প্রায় সমস্ত বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়াছি।

১৯৫৯ সালে দিল্লী বেতার কেন্দ্র হইতে জাতীয় প্রোগ্রামে বেহালা বাজাই। ১৯৬০ সালে আমার বাজনা গ্রামোফোন রেকর্ডে সন্নিবিষ্ট হয়। বর্তমানে আমি আলী আকবর কলেজ অব মিউজিক-এ অধ্যাপিকা রহিয়াছি।

আমার শ্বশুর মহাশয় ডাক্তার শ্রীবিনয় ধরচৌধুরী ( গৌহাটী ) গানবাজনায় খুব আগ্রহী এবং তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমার অন্যতম পাথেয়। আমার স্বামী শ্রীবাদল ধরচৌধুরী ঠুংরী গায়ক হিসাবে গৌহাটী বেতার কেন্দ্র হইতে সঙ্গীত পরিবেশনা করিতেন।

আমার বাজনায় যে গায়কী ও গৎকারী একত্রীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা আমার বেহালার শিক্ষাগুরু শ্রীযোগের স্বার্থহীন শিক্ষা প্রচেষ্টার ফল বলিয়া আমি মনে করি। তিনি উহা একাকী ( Solo ) বাজনার জন্য ভিন্নরূপ নিয়মপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন।"

শ্রীমতী ধরচৌধুরী রন্ধনকার্যে ও আলপনা দেওয়ায় বিশেষ পারদর্শিনী।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২১

বিভূতি সরকারের সপ্তাহের খবরের অফিসের দরজায় কোম্পানীর ষ্টেশনওয়াগন দাঁড়িয়ে।

ধীরাপদ ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে ইতস্তত করল একটু। লাবণ্য সরকার বোঝাপড়া করতে এসেছে তা হলে। সঙ্গে সিতাংশুও এসে থাকতে পারে। ধীরাপদ ঠিক কি উদ্দেশ্যে এসেছে নিজেও জানে না। তিনটে দিন আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটিয়ে কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছে। প্রথমেই মনে হয়েছে বিভূতি সরকারের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তাঁর অফিসের লোকের কাছে টেলিফোনে খোঁজ নিয়ে জেনেছে তিনি ফিরেছেন।

তাড়াতাড়ি সুলতান কুঠিতে ফেরার তাড়া ছিল। গণুদার ছেলে মেয়েরা নয় শুধু, গত দু'দিন ধরে সেখানে আর একজন তার জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষায় বসে থাকে। অমিতাভ ঘোষ। গত পরশু থেকে সে ধীরাপদর কাছে আছে। তার ঘরে থাকে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ধীরাপদ সোনাবউদির ঘরে থাকে। তিন দিন ধরে সেই চিঠিখানা তার পকেটেই ঘুরছে। এক-মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না, ওটা কাছ-ছাড়া করতে পারে না। ঘুমের ঘোরেও চিঠির কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মনের এই অবস্থায় স্নায়ু-বিধ্বস্ত অমিতাভ ঘোষকে সামলানো বিড়ম্বনা বিশেষ। এই ঝামেলা এড়াতেই চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষোভে উত্তেজনায় অবিশ্বাসে আত্মতাড়নায় অসহায় শিশুর মত যে তাকেই শুধু আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে, তাকে সে ফেরাবেই বা কেমন করে। উল্টে চিন্তিত হয়ে তাকে ডাক্তার দেখাতে হয়েছে, চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। প্রয়োজনে ধমক-ধামকও করতে হয়। অমিতাভ ক্ষেপে ওঠে, কিন্তু আরো বেশি কাছে আসে।

তার ওখানে আছে সে এ খবরটা চারুদির বাড়ির বা অফিসের কেউ জানে না। তার কড়া নিষেধ, কেউ যেন না জানে।

সকলের অগোচরে বিভূতি সরকারের ওখান থেকে ফিরে আসবে ভেবেও পারল না। থাকলেই বা লাবণ্য অথবা সিতাংশু, ধীরাপদ তার কর্তব্য-বোধে এসেছে। বরং ভালই হয়েছে। তারা মুখে না বলুক, মনে মনে বুঝবে সে-ও নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট বসে নেই। ক'দিন ধরে শুধু এই কারণেই হয়ত সিতাংশু বিমুখ তার ওপর।

কিন্তু সে নেই। বিভূতি সরকারের ঘরে লাবণ্য একাই বসে। ভিতরে ঢোকার আগে ধীরাপদকে আবারও দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। লাবণ্যর তীক্ষ্ণ অপমানকর কটূক্তি কানে এলো। কোনো কিছুর জবাবেই সম্ভবত এক ঝলক তরল আগুনের ঝাপটা মেরে সে চুপ করল। বিভূতি সরকার মাথা নিচু করে কাগজ দেখছেন।

ধীরাপদকে এ-সময়ে এখানে দেখবে লাবণ্য আদৌ আশা করেনি মনে হল। আর মনে হল, দেখে অখুশিও হয়নি। বরং এই আবির্ভাব সুবাঞ্ছিত যেন।

কাগজ ফেলে বিভূতি সরকার সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। হাসি খুশি দেখে একটুও বিড়ম্বিত মনে হল না তাঁকে। বরং এতক্ষণই যেন অসহায় বোধ করছিলেন, তাকে দেখে বল-ভরসা পেলেন।

—আসুন আসুন, কি ভাগ্য, বসুন। সকালে আপনি টেলিফোন করেছিলেন?

—হ্যাঁ। ধীরাপদ একটা চেয়ার টেনে বসল। খুব সহজ-মুখেই কুশল প্রশ্ন করল, কেমন আছেন?

বিভূতি সরকারের খাজ-পড়া ফর্সা মুখ অমায়িক হাসিতে ভরে উঠল।—ভালো থাকি কি করে বলুন, কাগজ চালানোর কি-যে দায় কেউ বোঝে না। ওই দেখুন না, লাবণ্যর উদ্দেশে ইশারা, সেই থেকে রেগেই অস্থির—আমি কাগজ দেখব না কে আপন কে পর সেই সেন্টিমেন্ট নিয়ে বসে থাকব? খবরের মত খবর পেলে কাগজওয়ালার আপন-পর জ্ঞান থাকে!

ধীরাপদ লক্ষ্য করল নির্বাক ক্রোধে লাবণ্যর মুখ আবারও লাল হয়ে উঠছে। অগ্নিক্ষরণের পূর্বাভাস। ধীরাপদ মাথা নাড়ল। কথাটা মিথ্যে নয়।

বিভূতি সরকার বললেন, চাকরি যারা করছে তাদের সঙ্গে এ-লেখার কি সম্পর্ক? এটা নিজেদের মান অপমান ভাবছে কেন তারা! আপনাদের কোম্পানীর এ-রকম একটা ব্যাপার—যে পেত সেই ছাপত। দুচার দিনের মধ্যে অন্যান্য কাগজেও রিপোর্ট বেরুবে দেখবেন। সকলে শুধু প্রমাণের অপেক্ষায় আছে।

ধীরাপদ শান্ত মুখে জানান দিল, যাতে না বেরোয় সে-ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভূতি সরকার তার মুখের ওপর চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন একটা। বললেন, কিন্তু কাগজের স্বার্থ দেখলে না লিখে

পারবে কি করে। ধরেছি যখন, আমার তো আরো অনেক লেখার আছে।

—কোন স্বার্থ দেখে তুমি লিখেছ আর কোন্ স্বার্থের কথা ভেবে তোমার আরো লেখার আছে আমরা জানি না ভেবেছ, কেমন? রাগ সামলাতে না পেরে লাবণ্যর গলা চড়ল আরো, কত টাকা পেয়ে তোমার ওই স্বার্থের জ্ঞান টনটনিয়ে উঠেছে? তুমি আমাকে বললে না কেন, আমি তার ডবল টাকা দিতুম—

আশ্চর্য এরে পরেও বিভূতি সরকার হাসলেন। হেসে ধীরাপদর দিকে চেয়ে বললেন, শুনলেন কথা? তারপর লাবণ্যকে বললেন, খবরটা তোকে আগে জানিয়ে রাখার ইচ্ছে ছিল, বার দুই টেলিফোনও করেছিলাম—কিন্তু তোকে ধরতে হলে তো কাজ ফেলে টেলিফোন নিয়েই বসে থাকতে হয়। কাজের চাপে পরে আর মনেও ছিল না—

কথাটা সত্যি নয় ধীরাপদর বুঝতে দেরি হল না। হয়ত লাবণ্যরও না। আর জেরা না করে রাগে বিতৃষ্ণায় গুম হয়ে বসে রইল সে। বিভূতি সরকার শুনিয়ে রেখেছেন, কাগজে তাঁর আরো লেখার আছে। আছে যে ধীরাপদ জানে। একটু চুপ করে থেকে খুব নির্লিপ্ত সুরে বলল, যে ব্যাপারে মাথা দিয়েছেন মনে না থাকারই কথা।···কিন্তু, আপনি এঁর দাদা বলেই বলছি, এ-রকম একটা রিস্ক আপনি নিলেন কি করে? যেটুকু লিখেছেন, কোম্পানী তো চুপ করে বসে থাকবে না।

হাসিটুকু বজায় রেখেই বিভূতি সরকার ঈষৎ তপ্ত প্রশ্ন ছুঁড়লেন, কেন, কোর্টে দু'-দুটো কেস উঠেছে সেটা মিথ্যে নাকি?

মিথ্যে নয়। কিন্তু কেস রিপোর্ট করার বাইরেও আপনি অনেক কথা লিখেছেন।···তিন হাজার টাকা আপনি হাতে পেয়েছেন, আরো লিখলে আরো দু'হাজার পাবেন জানি। কিন্তু কোনো প্রমাণ হাতে না নিয়ে শুধু পাঁচ হাজার টাকার জন্যে এই ঝুঁকি কি করে নিলেন জানি না।

বিভূতি সরকার বিচলিত হয়েছেন একটু বোঝা গেল। সঠিক টাকার অঙ্কটা এইভাবে আর একজনের মুখ থেকে শুনবেন আশা করেননি হয়ত। ফলে যে-কারণে অস্বস্তি সেটাই জোর দিয়ে তুচ্ছ করতে চাইলেন। বললেন, সে-জন্যে ভাবি না, দরকার হলে প্রমাণও সবই হাতে আসবে।

ধীরাপদ মুচকি হাসল একটু। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভালো কথা। কিন্তু আসার আগে কোনো কাগজওলা এ-রকম ঝুঁকি নিতে পারেন জানা ছিল না। গোলযোগ যদি হয়, পাঁচ হাজারের পাঁচ গুণ দিয়েও এর জের সামলানো যাবে না হয়ত। আচ্ছা, চলি—

—বসুন বসুন, একটু চা খান, আর আলোচনাটা উঠলই যখন—

—না, আর বসব না, তাড়া আছে।

—তা'হলে আমিই যাব একদিন আপনার কাছে। কবে যাব বলুন, আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ তো কিছু নেই—

—নেই-ই বা বলি কি করে, সম্ভব হলে আপনার এই কাগজ তুলে দেবার চেষ্টাও কোম্পানীর তরফ থেকে তো আমাকেই করতে হবে। ধীরাপদ নির্লিপ্ত, এর পর আপনি আর কতটা এগোবেন তাই বরং ভাবুন। আচ্ছা, নমস্কার।

বেরিয়ে এলো। এসে কাজ হয়েছে। বিভূতি সরকার আপাতত আর কিছু লিখবেন মনে হয় না। লোভের সঙ্গে ভয়ের একটা সহজাত যোগ আছে। এর পর তাঁর মন সুস্থির হতে সময় লাগবে। অমিতাভ জানতে পেলে ক্ষেপে যাবে। তবে জানার আশঙ্কা কম। অমিতাভর অজ্ঞাতবাসের খবর বিভূতি সরকারের পাবার কথা নয়। এক, অমিতাভ নিজে যদি আসে। তাও আসবে না হয়ত, কারণ, কাগজের মারফত যা সে করতে চেয়েছিল তা করা হয়ে গেছে। এখন তার মাথায় দিবা-রাত্র শুধু কোর্ট ঘুরছে।

··লাবণ্যর গম্ভীর মুখেও চাপা বিস্ময় লক্ষ্য করেছে ধীরাপদ। দাদাটি হঠাৎ এভাবে ঘায়েল হবেন ভাবেনি বোধ হয়। অবশ্য ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে, তবু খুশি হয়েছে মনে হল।

দাঁড়ান—

ধীরাপদ দাঁড়াল। একেবারে অপ্রত্যাশিত আহ্বান নয়। লাবণ্য কাছে এসে বলল, গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দেখেও চলে যাচ্ছেন কেন? উঠুন—

দু'জনে স্টেশনওয়াগনে উঠল। মুখোমুখি দুটো বেঞ্চিতে বসল। ড্রাইভারের উদ্দেশে লাবণ্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল, বাড়ি—

ধীরাপদর দিকে ফিরল, আপনি এখন যাবেন কোথায়?

বাড়ি।

কোন্ দিকে?

সুলতান কুঠি।

সেখানেই আছেন এখন?

হ্যাঁ।

চেয়ে রইল একটু। ধীরাপদ ভাবল, তাকে সুস্থ দেখাচ্ছে না এ-কথাই বলবে এবার। কিন্তু তা বলল না। বলল, বাড়ি পরে যাবেন, আমার ওখানে চলুন, আপনার সঙ্গে দরকারি পরামর্শ আছে।

লাবণ্যর এই জোরের সুরটা অনেকদিন বাদে শুনল। জোরের কারণও আছে বইকি। সোনাবউদির ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে কম ঝুঁকি নেয়নি। ডাক্তারের যা করার কথা নয় তাই করেছে। ধীরাপদর জন্যেই করেছে। যখনই মনে পড়ে, ধীরাপদ অবাকই হয়। অথচ, সেই এক সন্ধ্যার পরে লাবণ্য এ নিয়ে আর এতটুকু কৌতূহল প্রকাশ করেনি, একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেনি। ভুলেই গেছে যেন।

বুকের কাছটা জালা-জালা করে উঠল। বুক-পকেটে সোনাবউদির চিঠিটা মাঝে মাঝে এমনি জালা ছড়ায়। মাঝের এই তিনটে দিনের যে-কোনো দুর্বল মুহূর্তে ওটা হয়ত লাবণ্যকে দেখিয়েই ফেলত। যদি না চিঠিতে ওই শেষের কথা ক'টা লেখা থাকত।··ভগবানের কাছে সোনাবউদির শত-কোটি প্রার্থনা, লাবণ্য যেন ওকে চিনতে পারে। উদগত অভিমানে ধীরাপদ রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল, উনি নিজেই যেন কত চিনতে পেরেছেন। চিঠিটা কালই বাক্সে রেখে দেবে।

লাবণ্য সামনের দিকে ঝুঁকল একটু, ঈষৎ আগ্রহে বলল, দাদা তো বেশ ঘাবড়েছে মনে হল, যা বলে এলেন ভাঁওতা না সত্যি?

এ-প্রসঙ্গ উঠবে জানে। কিন্তু ধীরাপদর ভালো লাগছে না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, সত্যি।

কিন্তু দাদা যে বলল অনেকদিন ধরে খুঁটিনাটি অজস্র প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, এমন কি কাজ-কর্ম খাতা-পত্র হিসেব নিকেশের বহু ফোটো-কপি পর্যন্ত আছে।

সে সব তাঁর কাছে নেই।

আপনাকে কে বললে?

অমিতবাবু।

একটু চুপ করে থেকে লাবণ্য আবার জিজ্ঞাসা করল, তাঁর সঙ্গে আপনার ঘীগগির দেখা হয়েছে?

ধীরাপদ জবাব দিল না, দৃষ্টি বাইরের দিকে।

এটুকুতেই লাবণ্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, বলল, আমার সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করতেও আপনার আপত্তি বোধ হয়?

ধীরাপদর দু'চোখ আপনিই আবার তার দিকে ফিরল।—আপত্তি নয়, আজ ভালো লাগছে না।

লাবণ্যর এবারের নীরব পর্যবেক্ষণ অনুকূল নয়।—ভালো আপনার কোনদিনও লাগে না। কিন্তু আপনার মনে কখন কি আছে খোলাখুলি বললে একটু বুঝে-সুঝে চলার চেষ্টা করা যেত।··যখন-তখন অপমান হওয়ার ভয় থাকত না।

যখন তখন অপমানের অনেক নজির মজুত আছে ধীরাপদ জানে। এই ক্ষোভ সত্ত কোনো কারণ প্রসূত কি না বুঝে উঠল না। চেয়ে রইল।

লাবণ্য শান্তমুখে বলে গেল, কাল পথে আপনার রমেন হালদারের সঙ্গে দেখা, পথ আগলে তাদের দোকানে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্যে দু'হাত জুড়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করল। তার আর কাঞ্চনের দোকান, আপনি দোকান করার টাকা দিয়েছেন—আপনার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

রমেনের স্বভাব জানা আছে। তবু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, এতে অপমানের কি হল? কিন্তু চুপ করেই রইল, অযথা বিতর্ক করার মত মনের অবস্থা নয়।

লাবণ্য এখানেই শেষ করার জন্তে এ-প্রসঙ্গ তোলেনি, সে চুপ করে থাকল না। একটু অপেক্ষা করে বলল, আপনাকে এ-রকম উদারতার খেসারত দিতে হবে জানলে চুরির ব্যাপারটা তুচ্ছ করেও ওকে আদর করে রেখে দিতাম।

সোনাবউদিকে চিন্তায় তোলার সার্টিফিকেট দিয়ে লাবণ্য হয়ত অনেকটাই কিনে ফেলেছে তাকে। নইলে এর জবাবে ধীরাপদর বলার কথা, ভগ্নিপতি সর্বেশ্বরের কাছ থেকে টাকা না নিলে চাকরি যাবার পরে অন্তত চুরির ব্যাপারটা তুচ্ছই ভাবতে পারত সে।

কিন্তু জবাব না পাওয়াটাও তাচ্ছিল্যের সামিল। নিরীহ মন্তব্যের সুরে লাবণ্য এবারে জিজ্ঞাসা করল, এতগুলো টাকা দিলেন, ওই মেয়েটাও আপনার চোখে বেশ ভালই বলতে হবে··তাই না?

নিরুপায় ধীরাপদ তার মুখ বন্ধ করার জন্তেই জবাব এড়িয়ে বলল, আমি যাই করে থাকি, কাউকে অপমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে করিনি, আপনার সঙ্গে রমেনের কোনদিন রাস্তায় দেখা হবে ভেবেও না। এ আলোচনা থাক্—

অকারণ ঝগড়ার মত শোনাবে বলে হোক, বা তার মুখে-চোখে শ্রান্তির ছাপ লক্ষ্য করে হোক, লাবণ্য আর কিছু বলল না। আরো কয়েক পলক দেখল শুধু, তারপর রাস্তার দিকে ঘুরে বসল।

গাড়ি থামতে নামল তারা। আগে লাবণ্য, পিছনে ধীরাপদ। সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠল। লাবণ্য আগে আগে, ধীরাপদ পিছনে। পিছনের দৃষ্টিটা এত কাছে প্রতিহত হচ্ছে বলে অস্বাচ্ছন্দ্য। সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকেই ধীরাপদর ভিতরে ভিতরে কে বুঝি সজাগ হয়ে উঠতে চাইছে। সজাগ হলে একটা মৃত্যুর অবরোধও খানিকক্ষণের জন্তে মিলিয়ে যেতে পারে, অনুভব করছে। কতকাল ধরে যেন এই চেনা-বিস্মৃতির থেকে অনেক দূরে সরে আছে সে।

সামনের বসার ঘরের দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে। বাড়িতে ঝি-চাকরও নেই বোঝা গেল। হাত-ব্যাগ থেকে চাবি বার করে লাবণ্য তালা খুলল। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল, তার পরের ঘরটারও।—আসুন।

যে-ঘরটায় রোগী থাকত সেই ঘরের ভিতর দিয়ে লাবণ্যকে অনুসরণ করল। ঘরটা খাঁ-খাঁ করছে, জানালাগুলোও বন্ধ।

পরের ঘরটাও অন্ধকার। ধীরাপদ চৌকাঠের এধারে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অভ্যাসংলগ্ন দেয়ালের সুইচ টিপে লাবণ্য আলো জেলে আবার ডাকল, আসুন—

ধীরাপদ পায়ে পায়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। ঘরের মাঝামাঝি একটা ইজিচেয়ার, অদূরে একটা সৌখীন ছোট টেবিল আর একটা চেয়ার। টেবিলে টেলিফোন, খানকতক বই আর বড় ব্যাগটা। ইজিচেয়ারটা একটু টেনে দিয়ে লাবণ্য বলল, বসুন—

ঘরের জানালাগুলো খুলে দিল। বাইরেটা অন্ধকার। একটা জানালা বরাবর ফুটপাথ-ঘেঁষা ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে। ঘরের জোরালো আলোয় ওটা বিচ্ছিন্ন মনে হয়।

ইজিচেয়ারে বসে ধীরাপদ ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। এত বড় ঘরে যেখানে যা থাকলে মানায় তেমনি পরিপাটি ভাবে সাজানো-গোছানো।

ইলেকট্রিক হীটার জেলে লাবণ্য কেটলিতে চায়ের জল চড়ালো। তারপর এ ধারের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে তোয়ালে দিয়ে ভিজে হাত-মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এলো। তোয়ালে রেখে ছোট টেবিলটার দিকে এগোলো। টেলিফোনের নম্বর ডায়েল করল। কথা শুনে বোঝা গেল কোথায় ফোন করছে। মেডিক্যাল হোমে জানিয়ে দিচ্ছে, তার যেতে দেরি হবে।

রিসিভার রেখে চা করতে বসল। তাক থেকে আগে ঝকঝকে দুটো পেয়ালা নামিয়ে গরম জলে ধুয়ে নিল বেশ করে, তারপর চায়ের অন্যান্য সরঞ্জাম নামালো।

ধীরাপদর চোখ দুটো আবারো অবাধ্য হয়ে উঠছে। একটা মৃত্যুর ছায়াও আড়ালে সরে যাচ্ছে। এই ঘর, এই ঘরের বাতাস, ওই শয্যা, আসবাবপত্র, এই ইজিচেয়ারটা—সব কিছুর মধ্যে এক সবল মাধুর্যের স্পর্শ লেগে আছে। জীবনের তাপ ছড়িয়ে আছে। এমন কি ঘরের এই নীরবতাটুকুও স্পর্শবাহী। সচেতন হয়ে ধীরাপদ নিজেকে আবার সেই পুরুষকারহীন গোপনতার কবরের তলায় ঠেলে দিতে চেষ্টা করল। লাবণ্যর চা করা হয়ে এলো। এখনি ফিরবে। ফিরলে তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু তার আগে আরো কয়েকটা মুহূর্ত হাতে আছে।···ওই দেহতটের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি তরঙ্গ বড় বেশি চেনা। হাতের মুহূর্ত ক'টা নিঃশেষেই খরচ করছে ধীরাপদ।

লাবণ্য উঠল। আগে ঘরের কোণ থেকে একটা ছোট টিপয় এনে সামনে রাখল। তারপর চা দিল, প্লেটে বিস্কুট। বলল, ঘরে আর কিছুর ব্যবস্থা নেই।—নিজের পেয়ালাটা নিয়ে বিছানায় বসল সে।

সামান্য কথা ক'টা অকূল বিস্মৃতির সমুদ্র থেকে বাস্তবে ফেরার আশ্রয়ের মত। তার দিকে চেয়ে ধীরাপদর মনে হল, এতক্ষণ মহিলা নিজের সমস্যা নিয়েই মগ্ন ছিল, আর কোনো দিকে খেয়াল ছিল না। চোখে-মুখে এখনো গম্ভীর চিন্তার ছাপ। কাচের ওপর থেকে হাতে ঘষে আবছা বাষ্প-কণা মুছে দেবার মত করে দুটো দরদী হাতে ওই মুখের চিন্তার প্রলেপ মুছে দিতে পারলে ধীরাপদ দিত।

চায়ের পেয়ালা আর বিস্কুট তুলে নিয়ে বলল, সব ব্যবস্থারই তো ওলট-পালট দেখছি। খাওয়া-দাওয়া চলছে কোথায়?

বলার এই সুরটা একটুখানি ব্যতিক্রমের মত লাবণ্যর কানে লাগার কথা। লাগল কি না বোঝা গেল না। চা খেতে খেতে দেখল একটু। তারপর ক্ষুদ্র জবাব দিল, বাইরে।

ধীরাপদ চা খাচ্ছে। বিস্কুট চিবুচ্ছে। আর সহজতার আবরণে মুখখানা ভরাট করে তুলছে। এই সান্নিধ্যে আর কিছুক্ষণ কাটাতে পারলে মাঝের ক'টা দিন সাময়িকভাবে অন্তত ভোলা যাবে।

লাবণ্য চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখল। দরকারী পরামর্শের সূচনায় মুখখানা আরো গম্ভীর। টিপয়টা হাত দুই তিন সরিয়ে রেখে প্রস্তুত হয়ে বসল। বলল, আপনার মস্ত একটা শোকের ব্যাপার চলেছে বুঝতে পারছি, কিন্তু এদিকে যা শুরু হয়েছে আপনি না দেখলে চলে কি করে?

এদিকে যা-ই শুরু হোক, লাবণ্যর উক্তির শুরুটা ধীরাপদর পছন্দ হয়নি। শোকের ব্যাপারটা যে বড় ব্যাপার নয় কিছু, প্রকারান্তরে তাই বলা। তবু রাগ করল না, একটু আগের ভালো লাগাটুকু ছেঁটে দিতে মন চায় না। জবাব দিল, আমার আর কি দেখার আছে বলুন, সিতাংশুবাবু তো উকীল-ব্যারিষ্টারের পরামর্শ নিচ্ছেন···

মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়ে গেলে এই কোম্পানী থাকবে? আর কিছু না হোক, সুনাম তো নষ্ট হবেই—

সুনাম গেলে কতটা গেল ধীরাপদ জানে, আশ্বাস দেবার নেই কিছু। বলল, কোম্পানীর মালিকরা এতবড় ভুলের রাস্তায় এগোলে আমি আপনি ভেবে আর কি করতে পারি? বড় সাহেব আসুন···

মনঃপূত হল না, ঈষৎ অসহিষ্ণু সুরে বলল, অমিতবাবুও খুব নির্ভুল রাস্তায় এগোচ্ছেন না।

আমি সব মালিকদের কথাই বলছি। তবে রিসার্চ ল্যাবরেটারি একটা হলে গণ্ডগোল এতটা পাকাতো না হয়ত।

জবাবে এবারেও বক্র ঝাঁঝই প্রকাশ পেল। রিসার্চ ল্যাবরেটারি তো সে-দিনের কথা, গণ্ডগোল পাকানোর মাল-মশলা তিনি যে অনেক আগে থেকে সংগ্রহ করছেন, সেটা বুঝতে কারো বাকি নেই।

অপ্রিয় বাদানুবাদ এখনো এড়াতেই চায় ধীরাপদ, তাই চুপ করে রইল। বললে এবারে অনেক কথাই বলা যেত। রমণীটির ক্ষোভ তাতে আরো বাড়ত বই কমত না।

খানিক গুম হয়ে থেকে লাবণ্য বর্তমান সমস্যার আর একদিকে ফিরল।—ও কথা থাক, এদিকে দাদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেমন তা তো জানেন, কিন্তু সে যা করেছে, বড় সাহেবের কাছে মুখ দেখানো দায় হবে। এরই বা কি করা যাবে?

ধীরাপদর আবারো ভালো লাগছে। তার রাগ ক্ষোভ স্বার্থ ইচ্ছে অনিচ্ছে, এমন কি তার বলিষ্ঠতার মধ্যেও একটা বস্তুতন্ত্রীর স্পষ্টতা আছে যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর মিল। এই মিল থাকলে মনের দিক থেকে সম্ভ্রম বা বিদ্বেষের ব্যবধান ঘোচে।

সিতাংশুবাবুকে বলুন কড়া করে অ্যাটর্নির চিঠি দিক—

সিতাংশুবাবুকে বলব কেন, আপনি দিতে পারেন না?

ধীরাপদর হাসি পাচ্ছিল। গোপন করতে হল। তার ওপর এই নির্ভরতার দাবিও নতুন লাগছে।—পারি, কিন্তু তাতে তো বড় সাহেবের কাছে আপনার মুখ দেখানোর সমস্যা যাবে না, সিতাংশুবাবুর মারফত উকীলের চিঠি গেলে তিনি হয়ত তাঁর বাবাকে বোঝাতে পারবেন আপনার পরামর্শ মতই এ কাজ করা হয়েছে —আপনি দাদা বলে খাতির করেন নি।

বিদ্রূপ করতে চায়নি। বরং ভালো যাকে লেগেছে, সহজ ঠাট্টার ছলে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে মগ্ন হবার বাসনাই ছিল। কিন্তু লাবণ্যর বর্তমান মানসিক অবস্থায় রসিকতাটুকুর বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। নিষ্পলক চেয়ে রইল কয়েক নিমেষ।

এই ব্যাপার ঘটেছে বলে আপনি তা'হলে মনে মনে খুশি, কেমন?

বেগতিক দেখে ধীরাপদ এবারেও অন্তরঙ্গ ঠাট্টার সুরেই জবাব দিল, খু-উ-ব।

আপনি সব সময় আমার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করেন কেন? আপনার আমি কখনো কোনো ক্ষতি করেছি?

বিস্মৃতির আবেশ গেল। বুক-পকেটে সোনাবউদির চিঠিটা খড়খড়িয়ে উঠল বুঝি। ক্ষতি না করার খোঁচায় লাবণ্য সরকার তার বুকের তলায় ক্ষতটার ওপরেই আঘাত দিয়ে বসল। তার সাহায্যে সোনাবউদির দেহ বিনা বিড়ম্বনায় চিতায় তোলা গেছে,

স্বীভূত করা গেছে—সেই ইঙ্গিত ভাবল। আবারও মনে হল, এই জোরেই কথাবার্তার এমন সুর পালটেছে, ধরণ-ধারণ বদলেছে।

তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল, আস্তে আস্তে বলল, না, অনেক উপকার করেছেন।

লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল, উপকার করার কথা আপনাকে বলা হয়নি। তারপর শুধু রেগে মন্তব্য করল,' উপকার সর্বত্র আপনিই করে বেড়ান দেখছি, আমারও করেছেন বার কয়েক উপকার। সেই ভরসাতেই আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করার ইচ্ছে ছিল, আপনার তাতে আপত্তি থাকলে থাক—

আপত্তি নেই, বলুন।

পরামর্শের মেজাজে তিক্ত খোলও থাকুক সমস্তটা ছোট নয়। ভদ্রলোকের ধীরবতার সেই উপলব্ধিটাই বড় হয়ে উঠল হয়ত। বলল, লাবণ্য আপনার কথায় তখন ভয় পেলেও চুপ করে বসে থাকার লোক নয়। এরপর অমিতবাবুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ছুটবে নিশ্চয়, আর অমিতবাবুও তো তাকে বিপদে ফেলার জন্যে এ-কাজ করান নি—

ধীরাপদ বলল, আপাতত তাঁর দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

লাবণ্য সঠিক বুঝে উঠল না, ঈষৎ বিস্মিত।—কেন, তিনি চারু দেবীর ওখানে নেই এখন?

অর্থাৎ চারুদির বাড়ি অথবা তাঁর সঙ্গে অমিত ঘোষের সম্পর্কটা বিভূতি সরকারের অজ্ঞাত নয়।—না, আমার ওখানে আছেন?

সুলতান কুঠিতে?

হ্যাঁ।

মুখে বিস্ময়ের রেখা পড়তে লাগল। এ খবরটা আপনি বলেন নি তো?

শুধু বিস্ময় নয়, ধীরাপদর মনে হল খবরটা শোনার পর তার সত্যতায় কতটা বিশ্বাস করা যেতে পারে সেই খটকাও লেগেছে। এতবড় একটা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ঘোচানোর প্রতিশোধে মেতে উঠেছে যে লোক, সে সকলকে অবিশ্বাস করে তার ঘরে তারই সঙ্গে আছে, এটা খুব সহজভাবে নিতে পারার কথাও নয় হয়ত। তবু দৃষ্টিটা ধারালো হয়ে উঠল ধীরাপদর, ভিতরে ভিতরে একটা উষ্ণ স্রোত ওঠা-নামা করতে লাগল।

খানিক চুপ করে থেকে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, তিনি সব সময়েই বাড়িতে থাকেন?

এখন থাকছেন। শরীর খুব অসুস্থ, বড় ডাক্তার দেখছেন। ডাক্তারের নামও বলে দিল।

গাম্ভীর্যের ওপর চকিত উদ্বেগের ছায়া পড়ল।—কি হয়েছে?

নতুন কিছু নয়, যা হয় তাই এবারে আরো বেশি মাত্রায় হচ্ছে।

লাবণ্য তেতে উঠছে। অসুখ নিয়েও বিশদ আলোচনার বাসনা নেই বুঝেছে হয়ত। অনুচ্চ সংযত স্বরেই বলল, হলে ডাক্তার তা কমাবে কি করে? আপনি বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাঁকে ফেরাতে চেষ্টা করছেন, না কি আপনিও ডাক্তারের ভরসাতে আছেন?

দু'জোড়া চোখের নিষ্পলক বিনিময়। ধীরাপদর মুখে এখনো সংযমের মুখোশ আঁটা।—আপনার কি মনে হয়?

জবাব পেল না। কিন্তু এই মুখও যদি অন্তরের দর্পণ না হয় তাহলে ধীরাপদর এতকালের এত দেখার গর্ব মিথ্যে। এই দর্পণে সংশয়ের ছায়া দুলছে। ধীরাপদ নিজেকে যতটা বুঝছে এখনো, সে বিচলিত হবে না, সাবুতের মধ্যে থাকবে।

লাবণ্য কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিল কি।—তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার।

বলব। তিনি আমার ওখানে আছেন, সেটা কারো জানার কথা নয়।

বক্তব্য বুঝে নিতে সময় লাগল না। লাবণ্যর উষ্ণ দুই চোখ আবারও তার মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ হল।—তাহলে আর যাব না। আপনিই আমার হয়ে তাঁর কাছ থেকে দয়া করে জেনে নেবেন, আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিই, এই তিনি চান কি না। আমি জিজ্ঞাসা করেছি বলবেন। এ-পর্যন্ত তাঁর অনেক অন্যায় আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু এবারে তিনি মাত্রা ছাড়িয়েছেন। মামলায় নার্সিং হোমকে জড়িয়ে তিনি আমাকেও অপদস্থ করতে চাচ্ছেন। তাঁকে বলবেন, এ রকম ব্যবহার তিনি কেন করছেন আমি জানতে চেয়েছি।

এমনি এক সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল বুঝি। সেটা আসা মাত্র অন্তস্তলের সব বোঝাবুঝির অবসান। মুখ বুজে ধীরাপদও অনেক সহ্য করেছে এতক্ষণ। যা জানতে চায়, এবারে তা সে খুব স্পষ্ট করেই জানাবে। দেরি করলে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে, তবু সুশোভন অবকাশ দরকার একটু। ততক্ষণে ধীরাপদর নিজের ভিতরটা আর একটু শান্ত হোক, মুখভাব আরো একটু সংযত হোক, নির্লিপ্ত হোক।

—তাঁর ধারণা, আপনি দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলেছেন।… একদিন ঠিক ওই কথাগুলোই বলছিলেন। বোধ হয় সেইজন্যেই…

অমিত ঘোষের এই ধারণাটা লাবণ্য জানত না এমন হতে পারে না। কিন্তু আর একজনের মুখ থেকে সেটা শোনার প্রতিক্রিয়া যতটা দেখবে আশা করেছিল, তার থেকে বেশি ছাড়া কম দেখল না। বসার ভঙ্গী বদলালো, মুখের রক্ত-বদল হল, আয়ত চোখে আগুন ছুটল। পদমর্যাদা আর আত্মবোধের খোলসটাও ভাঙল বুঝি।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানের পরদা চিরে দিয়ে গেল।—আর উনি? নিজে উনি ক'নৌকোয় পা দিয়ে বেড়াচ্ছেন? তাঁর কাছে একটা ফোটো অ্যালবাম আছে, সেটা একবার দেখে নেবেন, তারপর তাঁর ধারণার কথা শুনতে বসবেন।

অতটাই ক্রুদ্ধ না হলে এই উক্তি করার আগে লাবণ্য ভাবত একটু। দেখতে যাকে বলছে সেই রমণীটি বর্তমানে সন্তান-সম্ভবা এ খবরটা ধীরাপদ জানাতে গিয়েও চেপে গেল। তার থেকেও সরস কিছু বলার আছে। তাকে দেখতে বলা হয়েছে বলেই যেন দ্বিধাগ্রস্ত জবাবটা বেরুলো মুখ দিয়ে।—দেখেছি। আগে আপনার গোটা কয়েক ছবি আছে। পরেরগুলো পার্বতীর…।

লাবণ্য স্তব্ধ খানিকক্ষণ। লোকটাকে যেন আবার একেবারে গোড়া থেকে দেখা শুরু করা দরকার। দেখতে গিয়ে তার মুখটা বেশ করে ঝলসে নিল আগে। অনুচ্চ কঠিন স্বরে বলল, ও…তাঁর ধারণার সঙ্গে আপনার ধারণার বেশ মিল হয়েছে তা'হলে। থামল একটু, দেখছে। যত বিরোধ আর যত বিদ্বেষের মূলে যেন শুধু এই একজন, আর কেউ নয়। ওই নির্বিরোধী মুখের ওপর চরম একটা আঘাত হেনে বসল তার পর।—আমি যেমনই হই আর যত নৌকোয় পা দিয়ে চলি, আমার জন্যে কাউকে চাকরি খুইয়ে পাগল হয়ে জেলে

যেতে হয়নি, আর, আমার জন্যে কারো বউকে আত্মহত্যা করেও জ্বালা জুড়োতে হয়নি। বুঝলেন?

ধীরাপদর হঠাৎ একি হল। মগজের মধ্যে এ কার দাপাদাপি চলছে সে, চেয়ার থেকে কে তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিল। পায়ের নীচে মাটি দুলছে, সমস্ত ঘরটা দুলছে, দেয়ালের আলোটা একটা আগুনের গোলার মত জ্বলছে। ধীরাপদ জানে না সে কি ভাবছে, জানে না সে কি করবে। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, একেবারে মুখের কাছে। পায়ের সঙ্গে পা ঠেকেছে, হাত দুটো থাবার মত লাবণ্যর দুই কাঁধে চেপে বসছে, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকছে।

কি বললে?

এই প্রতিক্রিয়া আর এই স্পর্শ। দেখার জন্য লাবণ্য প্রস্তুত ছিল। সর্বাঙ্গের রক্তকণাগুলো ছোটাছুটি করে মুখের ওপর ভীড় করল, তারপর সেখানেই স্থির হল।

ধীরাপদ আরো একটু ঝুঁকল, হাত দুটো কাঁধ-ঘেঁষে মাংসর ওপর আরো জোরে চেপে বসল। তেমনি অস্ফুটকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করল, কি বললে তুমি?

এবারেও লাবণ্য জবাব দিল না। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না। নিজেও নড়ল না। তার আগে সে যেন শেষ দেখে নিচ্ছে। দুঃসাহসের দৌড় দেখে নিচ্ছে।

—আমার জন্য কাউকে জেলে যেতে হয়নি, আমার জন্য কারো বউ আত্মহত্যা করেনি।···কিন্তু তোমার জন্য তিলে তিলে নিজেকে হত্যা করেছি আমি। করছি। অধঃপতনের একেবারে তলায় এসে ঠেকেছি। দুঃসহ উত্তেজনায় আরো মৃদু, আরো নির্মম কঠিন স্বরে ধীরাপদ বলে গেল, শুধু তোমার জন্য, বুঝলে? একদিন আমি খেতে পেতাম না, কার্জন-পার্কের বেঞ্চে বসে হাওয়া খেয়ে দিন কাটত। কিন্তু সেই ক্ষুধার জ্বালায়ও এভাবে মাথা খুঁড়িনি কখনো। তুমি আমার অনেক—অনেক ক্ষতি করেছ।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। আরো রূঢ়, আরো কঠিন কিছু। বলতে যাচ্ছিল, শুধু নিজের স্বার্থে তৃষ্ণার জল দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায় যে, পুরুষের এই ক্ষতি সে বুঝবে কেমন করে?

বলা হল না।

তার হাতের মুঠোয় এক রমণীর দেহ। পুরুষের এই সান্নিধ্যেও তীক্ষ্ণ, অবিচলিত। দুই চোখের বিদ্বেষ আর বিদ্রূপের বন্যা ধীরাপদর ঝুঁকে-পড়া মুখে এসে ভাঙছে। আঘাতে আঘাতে একটা যাতভরা শূন্যতায় গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ঘরের বাতাসও যেন এক অপরিসীম অবজ্ঞার ভারে থমকে আছে।

এক ঝলক তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শে ধীরাপদ আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। স্পর্শটা মুখের ভিতর দিয়ে, হাতের ভিতর দিয়ে, পাঁজরের ভিতর দিয়ে বক্ষের পাতালে এসে মিশল। শিরায় শিরায় বহুদিন যে শিখা জ্বলে জ্বলে উঠতে চেয়েছে আজ আর কেউ সেটা নিবিয়ে দিল না। যে গ্রাসের নেশা বহুবার দু'চোখে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে আজ আর কোনো ভ্রূকুটিতে সেটা বাধা পেল না। ইতিহাসের আদিপর্বের যে-পুরুষ ক্ষুব্ধ থেকে বহুবার ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছে, আজ আর কেউ তাকে শেকলে বেঁধে টেনে নিয়ে গেল না।

ধীরাপদ এদিক-ওদিক তাকালো একবার। কাঁধ থেকে একটা হাত নেমে এলো। দেয়ালের গায়ের সুইচে খট করে শব্দ হল একটা।

অন্ধকার। অন্যায় নির্দয় দুই বাহুবেষ্টনে বন্দিনী আত্মসমর্পণকারীর বিপুল বিভ্রম।

ধীরাপদ চোখ মেলে তাকালো। বাণীভূত মহা-নৈঃশব্দের গভীর থেকে প্রাণের প্রথম জাগরণের মত। বিস্মৃতির স্তরে স্তরে চেতনার বিদ্যুৎ। কতক্ষণ কেটেছে জানে না। যতক্ষণই হোক, অনন্তকালের কোনো ছোট শিকলে সেটা ধরবার মত নয়। সময়ের বেড়া ডিঙিয়ে অস্তিত্বের রক্তসমুদ্রে পার হওয়ার এই যাত্রা কি সম্ভব? ধীরাপদ স্বপ্ন দেখে উঠল?

সামনের দিকে তাকালো। স্বপ্ন নয়।

আস্তে আস্তে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়াল। বিবিক্তা-অঙ্গের অভিযোগে দেহের শিরাগুলো স্পন্দিত হল দুই-একবার। ঘরের অন্ধকার এখন আর জোরালো লাগছে না। বাইরের ল্যাম্প-পোস্টটা দীর্ঘ দূত পাঠাতে চেষ্টা করছে হয়ত অনেকক্ষণ হয়েই। ধীরাপদ আর একবার ঘুরে তাকালো। যার দিকে তাকালো সে শয্যায় মিশে আছে তখনো। মুখ দেখা যায় না। কিন্তু ধীরাপদ জানে আবছা অন্ধকারের পরদা ঠেলে দু'চোখ মেলে সে তাকেই লক্ষ্য করছে নিঃশব্দে।

বুকের কাছে সেই থেকে খস খস করছিল কি। এখন হাত ঠেকাতে মনে পড়ল। সোনাবউদির চিঠিটা। নিস্পন্দ কয়েক মুহূর্ত। নিজের অগোচরেই খামটা হাতে উঠে এলো। দুমড়ে গেছে একটু। আঙুল করে সেটা ঠিক করে নেওয়ার ফাঁকে আবারও শয্যার দিকে ফিরল একবার। তারপর খামটা টিপয়ের ওপর রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

রাস্তা। অন্ধকার ধারের দিকটা ছেড়ে কখন আলোর ধারটা ধরেই চলতে শুরু করেছে। ধীরাপদ যেন নিজেরই নিভৃতের কোনো একটা দরজায় কান পেতে আছে। বিবেকের অস্ত্র হাতে কেউ বেরুবে ওই দরজা খুলে। তাকে বিধ্বস্ত করবে, খণ্ড খণ্ড করে হৃৎপিণ্ডটা কাটবে। কিন্তু সাড়াশব্দ নেই কারো। উল্টে মনে হচ্ছে কত কালের, কত যুগের আত্ম-নিপীড়নকারী একটা জমাট-বাঁধা অবরোধ যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হল লঘু পায়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে সে। সুলতান কুঠি পর্যন্ত কি হেঁটেই পাড়ি দেবে নাকি! ঘড়ি দেখল, রাত মন্দ হয়নি।

ট্যাক্সির প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

পরদিন।

নিয়মিত অফিসে এসেছে। নিয়মিত কাজ নিয়েও বসেছে। মনটা কাজে বসছে না খুব। তবু তেমন অশান্তিও নেই কিছু।

সচকিত হল। ঘরে কারো পদার্পণ ঘটেছে। না তাকিয়েও এই নিঃশব্দ পদার্পণ সে অনুভব করতে পারে। লাবণ্য টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল চুপচাপ। ধীরাপদ ফাইল থেকে মুখ তুলল। কয়েক নিমেষে লাবণ্য গত কালের দেখাটাই যেন শেষ করে নিল। তারপর হাতের খামটা তার সামনে টেবিলের ওপর রেখে যেমন এসেছিল তেমনি ধীর মন্থর পায়ে ফিরে চলল।

সোনাবউদির চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

ধীরাপদর দু'চোখ দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল তাকে। রাগ নয়, তাপ নয়, হয়ত বাসনাও নয়—কি একটা যাতনার মত অনুভব করছে। এই যাতনার নাম কি ধীরাপদ জানে না।

[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ]

## উইম্বলডনে অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি এই ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি হয়েছে। এবার সিঙ্গলস্ ফাইন্যালে গতবারের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার সহজেই নিজ দেশীয় খেলোয়াড় মার্টিন মুলিগ্যানকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার বিজয়ী হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

উইম্বলডনের ইতিহাসে পর পর দু'বার বিজয়ী হতে পেরেছেন এরূপ খেলোয়াড়ের সংখ্যা খুবই কম। এর আগে বৃটেনের ফ্রেড পেরি, আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ও অস্ট্রেলিয়ার লিউ হোড এই সাফল্য অর্জন করেছেন। লিউ হোড ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে, ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে এবং এর আগে ফ্রেড পেরি ১৯৩৪-৩৬ সালে একাদিক্রমে তিনবার উইম্বলডন জয়লাভের কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।

এবার উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় রেকর্ড সংখ্যক দর্শক সমাগম হয়। ২১৫,০০০ জন দর্শনী দিয়ে খেলা দেখেছেন।

এবারকার প্রতিযোগিতায় প্রায় প্রতিদিনই অভাবনীয় ঘটনা দেখা যায়। পুরুষদের সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়ান রড লেভার একমাত্র খেলোয়াড়—তাঁর সম্পর্কে যা আশা করা গিয়েছিল, সেটাই হয়েছে। আহত হওয়ার জন্য ভারতের রমানাথন কৃষ্ণাণ, অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন ও ম্যাকিনলের বিদায় গ্রহণ অশুভ ঘটনা বলা চলে। খ্যাতনামা মহিলা খেলোয়াড়রা স্নায়ুযুদ্ধে জর্জরিত হয়ে বিদায় নিয়েছেন। এর মধ্যে আছেন মার্গারেট স্মিথ, মারিয়া বিউনো ও ডার্লিনি। ভেরা সুকোভা বাছাই করা খেলোয়াড়ের তালিকাভুক্ত হননি। তাঁর সাফল্য সম্পর্কে কেউই উচ্চ আশা পোষণ করেননি। কিন্তু তিনি ফাইন্যালে উন্নীত হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। নতুন মহিলা সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়ান সুসম্যান (যুক্তরাষ্ট্র) বাছাই করা খেলোয়াড়ের তালিকায় সর্বনিম্ন অষ্টম স্থান পান। তিনি সাফল্য অর্জন করে সকলকে বিস্মিত করেছেন।

এবার প্রতিযোগিতায় ইতালীর নিকোলা পিত্রাঞ্জেলী যুগোশ্লাভিয়ার পিলিকের সঙ্গে খেলায় একটা রেকর্ড হয়েছে। প্রথম সেটের নিষ্পত্তির জন্য ৪৬ গেম পর্য্যন্ত খেলার দরকার হয়। পিত্রাঞ্জেলী এই খেলায় ২৪-২২, ৬-২ ও ৬-৪ সেটে জয়ী হন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উইম্বলডনের ইতিহাসে দীর্ঘতম খেলাটি হয় ১৯৫৩ সালে। এই খেলায় বাজপ্যাটি ও ড্রবনী যোগদান করেছিলেন। ৯৩টি গেমের পর খেলার মীমাংসা হয়। এই খেলা শেষ করতে সময় লাগে ২৭০ মিনিট। পাঁচ সেটের পর এই খেলায় ড্রবনী জয়ী হয়েছিলেন।

উইম্বলডনে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিম্নে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ডের খতিয়ান দেওয়া হ'লো :—

(১) চারজন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় সিঙ্গলস সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। এর পূর্বে উইম্বলডনের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত কোন দেশ এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি।

(২) দুই ভাই নীল ফ্রেজার ও জন ফ্রেজার সিঙ্গলসে সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

(৩) দু'জন খেলোয়াড় বাছাই করা না হয়েও সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

(৪) গত সাত বছরের মধ্যে ছয়বার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে।

এবার ভারতের রমানাথ কৃষ্ণাণের উপর অনেক কিছু আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু তিনি সকলকে হতাশ করেন। নিম্নে সকল খেলার ফলাফল দেওয়া হ'লো :—

পুরুষদের সিঙ্গলস—রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-২ ও ৬-১ সেট মার্টিন মুলিগানকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—বব হিউইট ও ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া) ৫-৭, ৬-২ ও ৬-৪ সেটে বোরিস জোভানভিক ও নিকোলা পিলিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস—মিসেস কারেন হান্স সুসম্যান (যুক্তরাষ্ট্র) ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে মিসেস ভেরা সুকোভাকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—সুসম্যান ও বিলি জিন ৫-৭, ৬-৪ ও ৭-৫ সেটে মর্ফিট সান্ড্রা ও রেনি সুরম্যানকে (দক্ষিণ আফ্রিকা) পরাজিত করেন।

## কৃষ্ণাণের পঞ্চম স্থান লাভ

ইংলণ্ডে বিখ্যাত "ডেইলী মেইল" পত্রিকার স্পোর্টস বিশেষজ্ঞরা বিশ্ব টেনিসের ক্রমপর্য্যায়ের এক তালিকা রচনা করেছেন। তাতে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণাণের স্থান পঞ্চম। নিম্নে বিশ্ব টেনিসের ক্রমপর্য্যায়ের তালিকা দেওয়া হ'লো :—

১ম—রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া), ২য়—রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া), ৩য়—এম. সানটানা (স্পেন), ৪র্থ—নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া), ৫ম—রমানাথ কৃষ্ণাণ (ভারত)।

## এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের তোড়জোড়

জাকার্তায় আগষ্ট মাসের ২৪শে থেকে চতুর্থ এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য জোর তোড়জোড় চলছে। বিভিন্ন খেলাধূলার জন্য এক বৃহদাকার ষ্টেডিয়াম নির্ম্মিত হয়েছে।

এই ষ্টেডিয়ামে এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রধান বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হবে। এখানে এক লক্ষ দর্শকের বসার আচ্ছাদিত আসনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই ষ্টেডিয়াম গঠনে রাশিয়ার কর্মীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের উপদেশ অনুসারে এই ষ্টেডিয়াম গঠিত হয়েছে এবং এ কার্য্যে তাঁদের কৃতিত্বই সর্ব্বাধিক। দশ হাজার দর্শকের আসন বিশিষ্ট একটা খেলাধূলার আচ্ছাদিত বড় দালান। হকি ও টেনিস খেলার ষ্টেডিয়াম। সুইমিং পুল ও এথলীটদের থাকবার পল্লী আধ মাইলেরও কম দূরত্বের মধ্যে প্রধান ষ্টেডিয়ামটা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।

সভাপতি সুকর্ণ ও রাশিয়ার সহকারী প্রধান মন্ত্রী শ্রীএনাষ্টাস মিকোয়ান প্রধান ষ্টেডিয়ামের উদ্বোধনের পর ছয় দিন ধ'রে বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের এক মহড়া চলে। তাতে ইন্দোনেশিয়ার আড়াই হাজার এথলীট যোগদান করেন। তা ছাড়া উজবেকিস্তান থেকে আগত এবং ২৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত রাশিয়ান দলটিও এই মহড়ায় যোগদান করে।

ভারত থেকে এক বিরাট দল প্রেরিত হবে। এই দলে ৭৮ জন প্রতিযোগী ও ১৬ জন কর্মকর্ত্তাসহ মোট ৯৪ জন সদস্য থাকবেন বলে ঠিক ছিল। কিন্তু দু'একজন বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্ত মাথাপিছু চার হাজার পাঁচশত টাকা খরচ পড়বে। অর্থাৎ ৯৪ জনের জন্ত মোট লাগবে চার লক্ষ তেইশ হাজার টাকা। জানা গেছে যে, খরচের শতকরা ৬০ ভাগ সরকার দেবেন, আর বাকি চল্লিশ ভাগ ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া ফেডারেশনকে যোগাড় করতে হবে।

## ভারতীয় হকি দল গঠিত

গত এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের হকি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে ভারতের বিশ্বশ্রেষ্ঠত্ব ভেঙ্গে দেয়। ভারত যাতে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে তার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হয়েছে। তবে ভারতীয় হকি ফেডারেশন আরও একজন দলভুক্ত করার জন্ত কাউন্সিল অব স্পোর্টসের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। যদি ১৭ জন অনুমোদিত হয় তা'হলে গোলরক্ষক ক্লিষ্টিকে দলভুক্ত করা হবে ঠিক হয়েছে।

ভারতীয় দল ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে মালয়ে ৬টি ম্যাচ খেলবে। মালয়ে এই অল্প সফরের উদ্দেশ্য হ'লো ভারতীয় দল যাতে ঐ অঞ্চলের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

রোম অলিম্পিকের অভিজ্ঞতার পর তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড়ের দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দল গঠন ও শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বের সকল শক্তিশালী হকি দলের সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ খেলেছেন।

খ্যাতনামা খেলোয়াড় গুরুদেব সিং ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন।

আশা করা যায়, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যোগ্য পরিচয় দেবার জন্ত শ্রম স্বীকার করবেন। দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি সব সময় তাঁদের পেছনে আছে। সকলেই চান ভারতীয় দল হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করুক। নিম্নে ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হ'ল :—

এস. লক্ষ্মণ (সার্ভিসেস), পৃথিপাল সিং (পাঞ্জাব), ব্রজলাল শর্ম্মা (উত্তরপ্রদেশ), পিয়ারা সিং (সার্ভিসেস), দেশমুখ (সার্ভিসেস), এ্যান্টিক (রেলওয়ে), চরণজিৎ (পাঞ্জাব), নির্ম্মল (রেলওয়ে), গুরুজিৎ সিং (পাঞ্জাব), যোগীন্দার সিং (বাংলা), যাদব সিং (পাঞ্জাব), গুরুদেব সিং (পাঞ্জাব)—অধিনায়ক, দর্শন সিং (পাঞ্জাব), ডি প্যাটেল (সার্ভিসেস), হামিদ (রেলওয়ে), আর্ম্মান (রেলওয়ে)। ম্যানেজার—জে: জেরিসন।

কোচ—গুরুচরণ সিং।

## এথলীট নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ

এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী ভারতীয় এথলীট দলের মনোনয়ন পর্ব্ব শেষ হয়েছে। এই দলে একজন মহিলা সহ সতের জন সদস্য থাকবেন। খ্যাতনামা এথলীট মিলখা সিং ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন।

এই দলে রাজস্থানের এলিজাবেথ ডেভনপোর্ট একমাত্র মহিলা সদস্য। সি. রাজশেখরণ (মাদ্রাজ), এন. ফেরাও (মহারাষ্ট্র), প্রীতম সিং (সার্ভিসেস), জগদীশ সিং (পাঞ্জাব) ও যোগীন্দার সিং (সার্ভিসেস)—এই পাঁচজন এথলীট আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হবার সুযোগ পেয়েছেন।

মিলখা সিং ৪০০ মিটার ছাড়াও ২০০ মিটারেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। গুরুবচন সিং ১১০ মিটার হার্ডলসের জন্ত দলভুক্ত হয়েছেন। মহীন্দার সিং ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার বিভাগের জন্ত নির্ব্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু মাত্র পনের মিনিটের ব্যবধানে উভয় অনুষ্ঠান হবে বলে তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রীতম সিংকে ১৫০০ মিটারের জন্ত দলভুক্ত করা হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের বাছাই করা ৫৪ জন পুরুষ ও মহিলা এথলীটকে নিয়ে দু'মাস বৈদেশিক "কোচের" অধীনে রেখে ভারতীয় দল গঠনকল্পে দু'টি ট্রায়ালের ব্যবস্থা হয়। উপযুক্ত "কোচের" শিক্ষাধীনে রাখলে যে ফল বেশ ভাল হয়, তা এবার প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম ট্রায়াল অনুষ্ঠানে আটজন ভারতীয় এথলীট এশিয়ান ও ভারতীয় রেকর্ডের সমান অথবা অতিক্রম করেছেন। সত্যিই এটা কৃতিত্বের পরিচায়ক এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে এথলীটদের একটা নির্দ্ধারিত মান বেঁধে দেওয়া হয়। ১৮ জন নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। নিম্নে ট্রায়ালের রেকর্ডগুলি দেওয়া হলো :—

এশিয়ান রেকর্ড

১০০০০ মিটার দৌড়—তারলোক সিং (সার্ভিসেস)। সময়—৩০ মি: ১৭'৪ সে:। পূর্ব্ব রেকর্ড ৩০ মি: ৪৮'৪ সে:।

১০০ মিটার দৌড়—এন. ফেরাও (বোম্বাই) ও রাজশেখরণ (মাদ্রাজ)। সময়—১০'৬ সে:। দুইজনেই পূর্ব্বের এশিয়ান ও ভারতীয় রেকর্ডে সমান।

১৫০০ মিটার দৌড়—অমৃত পাল (সার্ভিসেস)। সময়—৩ মি: ৫১'৭ সে:। মহীন্দর সিং (সার্ভিসেস)। সময়—৩ মি: ৫০'১ সে:। প্রীতম সিং (সার্ভিসেস)। সময়—৩ মি: ৫২'৮ সে:।

গোলা ছোঁড়া—জি. ইরাণী (বোম্বাই)। দূরত্ব—৫০ ফুট ১ৡ ইঞ্চি। যোগীন্দর সিং (সার্ভিসেস)। দূরত্ব—৪১ ফুট ৩ৡ ইঞ্চি।

চূড়ান্ত দল গঠনকল্পে আর একটি ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল

ভারত ক্রীড়া পরিষদের অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি শ্রীজয়পাল সিং, জেনারেল থিমায়া ও শ্রীসন্ধীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করেন। নিম্নে মনোনীত এথলীট দলের নাম প্রদত্ত হ'লো :—

১০০ মিটার দৌড়—পি· রাজশেখরণ ( মাদ্রাজ ) ও এন. কেরাও ( মহারাষ্ট্র )।

৪০০ মিটার দৌড়—মিলখা সিং ( পাঞ্জাব ) ও মাখন সিং ( সার্ভিসেস )।

৮০০ মিটার দৌড়—দলজিৎ সিং ( সার্ভিসেস ) ও মহীন্দর সিং ( সার্ভিসেস )।

১৫০০ মিটার দৌড়—অমৃত পাল ( সার্ভিসেস ) ও প্রীতম সিং ( সার্ভিসেস )।

৫০০০ ও ১০০০০ হাজার মিটার দৌড়—ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস)।

৪X৪০০ মিটার রিলে—মিলখা সিং ( পাঞ্জাব ), মাখন সিং ( সার্ভিসেস ), দলজিৎ সিং ( সার্ভিসেস ) ও জগদীশ সিং ( সার্ভিসেস )।

ডেকাথলন—গুরবচন সিং ( দিল্লী ), গোবিন্দার সিং ( সার্ভিসেস )।

সট পাট—ডি· ইরাণী ( মহারাষ্ট্র ) ও যোগীন্দার সিং ( সার্ভিসেস )।

ডিসকাস নিক্ষেপ—পরদ্যুম্ন সিং ( সার্ভিসেস ) ও বলকার সিং ( সার্ভিসেস )।

মহিলা বিভাগ

বর্শা নিক্ষেপ—ই· ডেভনপোর্ট ( রাজস্থান )।

## ভারতীয় কুস্তিগীরদের নাম ঘোষণা

ছয় সপ্তাহব্যাপী কঠোর অনুশীলনের পর এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য দশজনকে লইয়া ভারতীয় দল গঠিত হয়েছে। ভারত এবার সর্বপ্রথম গ্রীক-রোমক পদ্ধতির কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে। সেই জন্য প্রথমে সাতজন ঠিক থাকলেও পরে দশজন কুস্তিগীর নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হয়েছে। নিম্নে মনোনীত কুস্তিগীররা কোন্ কোন্ বিষয়ে যোগদান করবেন তার তালিকা প্রদত্ত হ'লো :—

ফ্রি ষ্টাইল—মালওয়া ( পাঞ্জাব )—ফ্লাইওয়েট, নারায়ণ ঘুণে ( মহারাষ্ট্র )—ব্যাণ্টাম ওয়েট বাসবানা মাতুর ( মহারাষ্ট্র )—ফেদার ওয়েট, উদয়চাঁদ ( সার্ভিসেস )—লাইট ওয়েট—লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডে ( উত্তরপ্রদেশ ),—ওয়েল্টার ওয়েট, সজ্জন সিং ( সার্ভিসেস )—মিডল ওয়েট, মারুতি মানে ( মহারাষ্ট্র )—লাইট হেভি, জি, আঞ্জলকার ( মহারাষ্ট্র )—হেভি ওয়েট।

গ্রীক-রোমক পদ্ধতি—মালওয়া ( পাঞ্জাব )—ফ্লাই ওয়েট, নারায়ণ ঘুণে ( মহারাষ্ট্র )—ব্যাণ্টাম ওয়েট, উদয়চাঁদ ( উত্তরপ্রদেশ )—লাইট ওয়েট, ভীম সিং ( ছোট ) ( সার্ভিসেস )—ওয়েল্টার ওয়েট, সজ্জন সিং ( সার্ভিসেস )—মিডল ওয়েট, বিশ্বনাথন সিং ( সার্ভিসেস )—লাইট হেভি ওয়েট ও আঞ্জলকর ( মহারাষ্ট্র )—হেভি ওয়েট।

## ভারতের চারজন মুষ্টিযোদ্ধা মনোনীত

এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারতের চারজন মুষ্টিযোদ্ধা মনোনীত হয়েছেন। কলকাতায় ট্রায়াল মুষ্টিযুদ্ধের পর ভারতীয় দল গঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, ১৯৫৮ সালে টোকিওতে তিনজন মুষ্টিযোদ্ধা প্রেরণ করা হয়েছিল। নিম্নে মনোনীত মুষ্টিযোদ্ধাগণের নাম প্রদত্ত হ'লো :—

এল· টি· ডি'সুজা ( রেলওয়ে )—লাইট মিডল ওয়েট, হাবিলদার পদম বাহাদুর মল ( সার্ভিসেস )—লাইট ওয়েট, এস· এম· সরকার ( সার্ভিসেস )—মিডল ওয়েট ও পরসারাম কৃষণ ( সার্ভিসেস )—ব্যাণ্টাম ওয়েট। ম্যানেজার—খোরাজন লীডার সি· আব্রাহামস।

## ভারতীয় টেনিস দলে চারজন অন্তর্ভুক্ত

জাকার্তার এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে টেনিস প্রতিযোগিতায় চারজন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দলটি গঠিত হয়েছে। ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণাণ অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। অপর তিনজন খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লাল ও আখতার আলি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। তবে কৃষ্ণাণের যোগদান সম্পর্কে এখনও নিশ্চয়তা নেই। তিনি যাতে এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করেন তার চেষ্টা চলছে।

## পলি উম্রীগড়ের অবসর গ্রহণ

ভারতের চৌকস টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উম্রীগড় শারীরিক অসুস্থতার জন্য টেষ্ট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। উম্রীগড় গত চার বছর যাবৎ পিঠের ব্যথায় ভুগছিলেন। চিকিৎসকের অভিমত অনুযায়ী তাঁকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। গত মার্চ মাসে তাঁর ৩৬ বছর পূর্ণ হয়। তিনি গত ১৪ বছরে ৫৯টি টেষ্টে খেলেছেন। এবারের কলকাতার টেষ্টে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে কাজ চালান ছাড়া সরকারীভাবে আটটিতে তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন। তিনি মোট রাণ করেছেন ৩৬৩১। তার মধ্যে ১৯৫৫-৫৬ সালে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত টেষ্টে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি সর্বোচ্চ রাণ তোলেন ২২৩। বোলিং-এ তাঁর খ্যাতি কম নয়। উম্রীগড় ৩৫টি টেষ্ট উইকেট দখল করেছেন।

উম্রীগড়ের অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন। ১৯৪৮ সালে বোম্বাইতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধেই তাঁর টেষ্ট খেলা সুরু হয়েছিল—আবার তাঁর শেষ টেষ্ট খেলাও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। এরূপ ঘটনা খুব কম দেখা যায়। উম্রীগড়ের অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ভারতের পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি। ভারতের প্রতিটি ক্রিকেট অনুরাগীই এতে দুঃখ অনুভব করেছেন।

## ডুবন্ত অবস্থায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম

আমেরিকার ফ্রগম্যান ফ্রেড বালডাসার বিশ্ব সন্তরণ-জগতে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বয়স মাত্র ৩৮ বৎসর। কিন্তু তিনি সন্তরণের ইতিহাসে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তা অভূতপূর্ব্ব। তিনি সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ জলের নীচে ডুবন্ত অবস্থায় অর্থাৎ ডুব-সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

কেপগ্রিজনে থেকে স্যাণ্ডউইচের সোজাসুজি দূরত্ব ২২ মাইল; কিন্তু প্রবল ঝড় ও তরঙ্গের তীব্রতার জন্য বালডাসারকে দ্বিগুণ পথ সাঁতরাতে হয়েছে। ফ্রগম্যানের পোষাক পরে বালডাসার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র নিয়ে ক্যাগেতে জলে নামেন এবং জলতলের পনের ফুট নীচে দিয়ে সাঁতরে ইংলণ্ডের স্যাণ্ডউইচ উপকণ্ঠে এসে হাজির হন। এই দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁর সময় লাগে ১৮ ঘণ্টা এক মিনিট।

ভারতের সাঁতারুও ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার সম্মান অর্জন করেছেন। এখন দেখবার বিষয় যে, ভারতের কোন্ সাঁতারু প্রথম ফ্রগম্যান বালডাসারের গৌরবের পথ অনুসরণ করেন।

ধারাবাহিক আত্ম-জীবনী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**পরিমল গোস্বামী**

## ১৩

### ৭২, বকুলবাগান রোড

অবশেষে ( ১৯৬০ এর ) ২২শে জানুয়ারি। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আমি বিকেল প্রায় সাড়ে চারটের সময় ৭২ বকুল-বাগান রোডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। সঙ্গে রইল হিমানীশ, একটি মুভি ক্যামেরা ও একটি নতুন ৩৫ মিলিমিটার জারমান 'কালার স্ন্যাপ' ক্যামেরা।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে আরও শীর্ণ বোধ হ'ল। একটু যেন অস্বাভাবিক শীর্ণ। কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপের পরেই ভিতরের পরিচিত মানুষটি যখন দেখা দিল তখন বাইরের ছেহারা ভুলে গেলাম। সরস চরিত্র বয়সে বাড়ে না। যেমন, আজও এই ১৯৬২ তে যদি কেউ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে দেখেন তবে হঠাৎ তাঁর দৈহিক শীর্ণতায় চমকে উঠবেন, কিন্তু তাঁর গল্প বলা আরম্ভ হ'লে সে সব আর কিছু চোখে পড়বে না। মনে হবে যুবক প্রেমাঙ্কুরকে দেখছেন। চারুচন্দ্রও তাই।

৭২ নং বকুলবাগান রোডের বাড়িতে এর প্রায় চার বছর আগে গিয়েছিলাম শশিশেখরের সঙ্গে, সে কথা আগে বলেছি। কিন্তু রাজশেখরকে তখন যেমন দেখেছিলাম, সেদিনও ঠিক তেমনিই দেখলাম বরং আগের অপেক্ষা কিছু সুস্থই মনে হল। একটা বেশ খুশি-খুশি ভাব মুখে লেগে ছিল। সম্ভবত চারুচন্দ্রের দেখা পেয়ে। বাঞ্ছিত লোকের সঙ্গ পেলে সমস্ত স্নায়ু প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

আমরা দোতলার বারান্দায় সবাই বসেছি। শুনলাম চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেন একটু পরেই আসবেন। আমি তাঁর জন্য একটু উদ্বিগ্ন হলাম এই ভেবে যে তখনও বারান্দায় একটুখানি রোদ ছিল, এর পরে এলে মুভি ক্যামেরায় আর তাঁর ছবি তোলা যাবে না। শীতের পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার ছায়াতে রঙীন ফিল্ম প্রায় অচল। যাই হোক, তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের তিনজনের সিনে-ছবি একসঙ্গে তোলা হ'ল। অন্য ক্যামেরাতেও তোলা হ'ল। এবং পরে আমি ব'সে আলাপ করতে করতে রাজশেখরের ছবি তুললাম।

সেই তাঁর শেষ ছবি।

যতীন্দ্রকুমার সেনকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু না দেখলেও আমাদের ভিতরে পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল, এবং সে আকর্ষণ তাঁর প্রতি আমার যেমন ছিল তাঁর ছবির জন্য, আমার প্রতি তাঁরও তেমনি ছিল আমার ফোটোগ্রাফের জন্য।

রাজশেখরের প্রথম বইগুলিতে তাঁর আঁকা ছবিগুলি তখন চমকপ্রদ লেগেছিল এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম জেগেছিল মনে। শুনলাম তিনিও আমার ফোটোগ্রাফ অনেক মনে রেখেছেন। এবং একখানা রঙীন ফোটোগ্রাফ' (একটি ময়ূরের, যুগান্তর পূজা সংখ্যায় ছাপা) কেটে বাঁধিয়ে রেখেছেন বললেন। এটি গুণীজনের বিশুদ্ধ উদারতা।

তিনি এসেছিলেন বারান্দার রোদটুক পার হয়ে গেলে তবু সেই আলোতে হিমানীশ ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরায় তাঁর কয়েকটা ছবি তুলল।

যতীন্দ্রকুমার খুব রসিক ব্যক্তি। অবশ্য একথাটা না বললেও চলত, কেননা সমধর্মী না হ'লে রাজশেখরের সঙ্গে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হবে কেন। যেমন হয়েছে চারুচন্দ্রের ক্ষেত্রে। এই সময়টা যতীন্দ্র কুমার চোখের অসুখে ভুগছিলেন, ক্যাটারাক্ট হয়েছিল। কাটতে হবে অনেক পরে। চোখ দুটি 'কালো চশমায় ঢাকা। এক বছর অন্তত তাঁর অন্ধকারে বাস। তবে তখন মনে হয়েছিল রাজশেখরের সান্নিধ্যে এলে তিনি আলো দেখতে পান, এবং মনে হ'ল যেন রাজশেখরও কানে আরও পরিষ্কার শুনতে পান। আমি লক্ষ ক'রে দেখলাম যতীন্দ্রকুমার পাঁচ ছ হাত দূরে ব'সে স্বাভাবিক কণ্ঠে যত কথা বললেন, রাজশেখর তা সবই শুনতে পেয়েছিলেন। অবশ্য যতীন্দ্র কুমারের কণ্ঠ খুবই সতেজ এবং সবল। তীক্ষ্ণতা বেশি। এবং রাজশেখরও খুব বেশি বধির ছিলেন না।

রাজশেখরের গল্পের সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের ছবির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। ইংরেজী-সাহিত্যে ডিকেন্স-এর বিখ্যাত চরিত্রগুলি যেমন শুধু লেখার ভিতর দিয়ে নয়, ছবির ভিতর দিয়েও পরিচিত হয়ে গেছে—মিষ্টার পেকস্নিফ, বারনাবি রজ, স্মাইক, মিক'বার, যুরায়া হীপ, মিষ্টার পিকউইক, স্যাম ওয়েলার ইত্যাদি। বাংলা-সাহিত্যে তেমনি পরশুরামের গণ্ডেরিরাম, শ্যামানন্দ, নেপাল ডাক্তার, তারিণী কবরেজ, হাকিম সাহেব, নন্দ, বিপুলা মল্লিক, লম্বকর্ণ, লাটুবাবু, শাঁকচুন্নী, কারিয়া পিরেত, বঙ্ক, নকুড়মামা প্রভৃতি ছবির ভিতর দিয়ে আমাদের প্রিয়তর হয়ে উঠেছে।

তাই এই তিন প্রাচীন গুণী বন্ধুর মিলন-পরিবেশে আমার যোগ দেওয়া আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা অবশ্যই। এঁরা তিনজনেই আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সবাই প্রায় ১৬ থেকে ১৮ বছরের বড়। এবং এই বয়সের প্রসঙ্গটাও উঠল একটা মজার ব্যাপারে। ইতিমধ্যে ভাল ভাল খাবার এসে পড়েছে। চারুবাবুর চোখ দুটি যেন গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে একটা খুশির আলো বিকিরণ করতে লাগল। এবং তিনিই বয়সের প্রসঙ্গটা তুললেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কেন, সে কথা তখন বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছি।

তাঁর আহারের সঙ্গীরূপে আমি সেখানে নতুন। এবং তিনি যে বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, সে বিষয়ে তিনি সচেতন। তাই কৈফিয়ৎ স্বরূপ আগেই আমাকে শুনিয়ে রাখলেন যে, তাঁর বয়স ৭৭ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রত্যেকটি দাঁত যথাস্থানে আছে। অতএব খাওয়ার ব্যাপারে তিনি যে প্রাণ খুলে (এবং মুখ খুলে) একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন, সেটা যেন আমি আগেই ধ'রে নিই, এবং দেখে-শুনে চমকে না যাই, এইরকম ভাব।

খেতে খেতে বললেন, "আমি ৭৭, যতীন্দ্রকুমার ৭৮ এবং রাজশেখর ৮০।" এবং ঐ এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারণ করলেন, "আপনি আমাদের তুলনায় শিশু—নিতান্ত শিশু।" কথাটির উপর একটু বেশি জোর দেওয়ার কারণ সম্ভবত: এই যে, আমি একটিমাত্র কচুড়ি খেয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

যতীন্দ্রকুমার রসিক ব্যক্তি, কিন্তু তিনি শিল্পীমানুষ, স্বভাবতই রসিক। কিন্তু চারুবাবু বিজ্ঞান সেবা করেছেন আজীবন। হঠাৎ মনে হতে পারে বিজ্ঞান ও রসসৃষ্টি অথবা রসগ্রহণ ক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কেন ঠিক নয় তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলতে পারে। এখানে তা করব না। তবে আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর অনেকবার দিতে হয়েছে যে, রাজশেখর বসু অন্যকে হাসান, কিন্তু নিজে হাসেন না কেন। এখানে এ সম্পর্কে একটিমাত্র কথা বলে রাখি—বিজ্ঞান ও রসসৃষ্টি যে বিষম গুণসম্পন্ন নয়, রাজশেখরের এই ব্যবহারও তার আর একটি প্রমাণ। নিজে স্থিরবুদ্ধি, বিশ্লেষক, অন্যের চরিত্র উদ্‌ঘাটক। এ কাজটি নির্বিকার ভাবে অবশ্যই করা চলে। এবং শুধু রাজশেখর বসু নন, প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত আচরণ শিল্পীর পক্ষেই এ কথা খাটে। সবই মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে। বাল্যকাল থেকে কোনো ব্যক্তি চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ক'রে এসেছেন, তাঁর পক্ষে হঠাৎ তা বদলাবার কোনো হেতু নেই।

রাজশেখর বসুর এই ব্যবহার সম্পর্কে কোনো এক বিশেষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে আমি পৃথক একটি রচনা লিখেছিলাম। তাতে অনেকটা এই রকম বলা হয়েছিল যে, শরৎ চাটুজ্জে গল্প লিখে অনেককে কাঁদিয়েছেন অতএব তিনি নিজে লোকের সামনে সব সময় কাঁদতেন না কেন, এমন প্রশ্নও তাহ'লে উঠতে পারে। কিন্তু এ প্রশ্ন অবান্তর। অন্যকে কাঁদালে নিজে কাঁদা, অথবা অন্যকে হাসালে নিজে হাসা, কম্প্যালসরি নয়।

কিন্তু একথাটিও হয় তো অনেকের জানা নেই যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য রসরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর অনেক তথ্যগত রচনায় তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরসতার মিশ্রণে নীরস তথ্যকেও রসসমৃদ্ধ ক'রে পাঠকের তৃপ্তি দিয়েছেন। তিনিও ঐ একই কারণে বিজ্ঞানসেবী এবং সাহিত্যিক যুগপৎ।

প্রসঙ্গত অনেক কথা বলা হয়ে গেল। রাজশেখরের বারান্দায় ব'সে আমাদের বয়স, দাঁত এবং খাওয়ার প্রসঙ্গে কথা চলছিল এমন সময় শ্রীমান্ কাঞ্চনকান্তি বসু লঘু পায়ে এসে রাজশেখরের কোলে উঠে নির্বিকার ভাবে ব'সে পড়ল। রাজশেখরও নির্বিকার।

বেশ পরিপুষ্ট দেহটি, ল্যাজটিও প্রশংসাযোগ্য। রাজশেখর বললেন, "ডজনখানিক আছে।" প্রশ্রয় বেশি পেয়েছে ব'লে বোঝা গেল। বললেন, এবং একটুখানি মৃদু হেসে অথচ গম্ভীর সুরে, "একটির নাম উত্তমকুমার। কিন্তু সে নিজের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলাতে সবাই তার নাম বদলে রেখেছে খোক্কস।"

এরকম প্রত্যেকটি আলাপ আমার মনে এক অদ্ভুত বিস্ময় জাগাচ্ছিল। প্রত্যেকটি কথা কানে আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি আমার মনে হচ্ছিল যে সেই ১৯৬০-এর ২২শে জানুয়ারি তারিখটি বিশ্ব ইতিহাসে আর ফিরে আসবে না, বাংলাদেশের এক মহাসম্মানিত ব্যক্তির মুখ থেকে সেই মুহূর্তে যে সব কথা উচ্চারিত হচ্ছে তাও হাওয়ায় সামান্য তরঙ্গ তুলে শূন্যে মিলিয়ে যাবে, তবু তা শূন্যে মিলিয়ে যাবার ক্ষণে আমার মর্মে তার যেটুকু স্মৃতিই রেখে যাক, তাকে কাগজে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। তাই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়েই শুনছিলাম রাজশেখরের কথাগুলি। সে সময় দুটি ক্রিয়া আমার মনে চলছিল সমান্তরাল ভাবে। এক হচ্ছে তাঁর কথাগুলো মনে রাখবার চেষ্টা, আর এক হচ্ছে কি ভাবে সেদিনের সব ঘটনা সাজালে সবটা মিলে একটা সম্পূর্ণ ছবি হ'তে পারে মনে মনে তার একটা খসড়া তৈরি করা।

বিড়াল প্রসঙ্গ সবাই উপভোগ করলাম বলা বাহুল্য। আমার কাছে ব্যাপারটা নতুন, এবং রাজশেখরের প্রাইভেট লাইফের সঙ্গে এক ডজন বিড়ালের এই যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এ কথাটা ইতিপূর্বে আর কেউ প্রচার করেছেন কি না মনে পড়ল না, কিন্তু আমার কাছে এর গুরুত্ব অন্যান্য বড় বড় ঘটনার তুলনায় কিছুমাত্র কম মনে হয়নি। সুতরাং প্রচারের দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হয়েছিল।

হঠাৎ সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি, চারুচন্দ্র প্লেটে পরিবেশিত আধ ডজন কুচুরি ও বড় বড় গোটা কত সন্দেশ নিঃশেষে উদরস্থ করে প্রফুল্ল মনে আলাপে যোগ দিয়েছেন। আলাপের অবশ্য কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না, কোনোটাই মহাকাব্যের বিস্তার পায়নি, সবই খণ্ড কাব্য। অর্থাৎ যখন যেটা মনে আসে। এক প্রসঙ্গ ভেঙে দিয়ে অপর প্রসঙ্গে যাওয়ার গরজটা আমারই ছিল সে দিন। কিন্তু তবু প্রসঙ্গগুলো আপনা থেকেই ভেঙে যাচ্ছিল, কারও ইচ্ছায় ভাঙছিল না।

রাজশেখরের প্রথম লেখার কথা তুললাম। তিনি আগে যা সব লিখেছেন তা ছাপা হয় নি। চারুচন্দ্র বললেন "সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড প্রথম ছাপা গল্প" যতীন্দ্রকুমার সেন সংশোধন করলেন "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড।" আরও বললেন "এ গল্পের মূলে একটা ইতিহাস আছে।"

রাজশেখর বললেন, "যুগান্তরে এবারে আপনাকে দাঁড়কাগ দিয়েছিলাম। সত্যিই একটা মেয়েকে দাঁড়কাগ বলা হত।" যতীন্দ্রকুমার যোগ করলেন, "স্কটিশ চার্চ কলেজের কাছাকাছি থাকত মেয়েটি, রং ছিল তার কালো।"

'যদি ভাবেন ওঁকে খুশী করা সহজ...'

SUNLIGHT
SOAP
Rs.10,000 Reward!

আমি রাজশেখরকে বললাম, "আপনি অনেককাল বিহারে কাটিয়েছেন, সেজন্য আপনার গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য বেড়েছে।"

রাজশেখর বললেন, আঠারো বছর কাটিয়েছেন বিহারে।

আমি বিহারের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, সম্ভবত ভূষণ্ডীর মাঠে নামক গল্পটির কথা স্মরণ ক'রে। বিহারের পরিমণ্ডল রক্তে না মিশলে এ রকম একটি গল্প লেখা হ'ত না এমন কথা আমার অনেক দিন মনে হয়েছে।

আবার অন্য প্রসঙ্গ। বাইরের অন্য একটা পথের দিকে চেয়ে ছিলাম। ও পথটার নাম কি প্রশ্নে জানা গেল অনেক কথা। জানা গেল, এদিকের বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত হয় কারণ ও পথটার নামও বকুলবাগান রোড, এ পথের অনেকগুলো ডালপালা আছে, তাই ধাঁধা লাগে। বললেন, "এই রাস্তাতেই বাড়ি করেছি তার মূলে একটি সেণ্টিমেণ্ট। বাবা কর্পোরেশনের কালেকটর ছিলেন, তিনি ১০ বকুলবাগান রোডে থাকতেন। বকুলবাগানকে আর ছাড়তে ইচ্ছা হ'ল না।" যতীন্দ্রকুমার বললেন, এ পথে এমন ধাঁধা লাগে যে নিজেরই বাড়ি চিনে আসা শক্ত হয়। বাড়ি তৈরির সময় মিস্ত্রিরা যে ঝাঁটার ঝাণ্ডা বাঁধে বাড়ির মাথায়, দূর থেকে সেই নিশানা ধ'রে এ বাড়িতে আসতে কতবার ভুল হয়েছে।

পথের প্রসঙ্গে পথের নাম বদলের কথা উঠল। প্রত্যেকটি নামের একটি ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস নষ্ট করা ঠিক নয়। পথের নাম বদলে রাজশেখরের আপত্তি আছে, তাঁর এটি পছন্দ নয়। আমি নিজেও এর বিরুদ্ধে অনেক লিখেছি, কিন্তু আমাদের এবং আরও অনেকের লেখা প্রতিবাদ কোনো সময়েই সাময়িক গরজকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। হাতে হাতে যেখানে ফল পাওয়া যাচ্ছে সেখানে ইতিহাসের দোহাই পাড়া ভুল, কারণ যে জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সে জাতির অতীত ইতিহাসে শ্রদ্ধা কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

এই আলাপ চলার সময় আমি সঙ্গের ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরাটিতে রাজশেখরের ছবি তুলছিলাম। আমি পাশেই ব'সে ছিলাম, এবং তিনি একটি ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে আধ শোওয়া অবস্থায় ছিলেন। ক্যামেরাটি টাটকা নতুন, আমার নয়, সরোজ আচার্য সদ্য জারমানি থেকে এনেছে। ওতে ফোটো-ইলেকট্রিক সেলের এক্সপোজার মিটার বসানো। ক্যামেরাটি দেখে রাজশেখর কিছু কৌতূহলী হলেন। বললেন, "আজকাল চমৎকার সব ক্যামেরা বেরিয়েছে দেখলে আবার ক্যামেরা ব্যবহার করতে ইচ্ছা হয়। 'আবার ইচ্ছা হয়' মানে এ বিদ্যা তাঁর অজানা নয়। আগে তিনি ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন।

## চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেনের ফোটো তোলার অভিজ্ঞতা

একথা শুনে যতীন্দ্রকুমারের ক্যামেরার স্মৃতি জেগে উঠল। তাঁর মুখে শোনা গেল, আগে তিনি বড় ফিল্ড ক্যামেরা ব্যবহার করতেন। অবশ্য ফিল্ড ক্যামেরা ভিন্ন আগে অন্য ক্যামেরা এদেশে কেউ ব্যবহার খুব কমই করেছে। ছোট ছবি আগে অচল ছিল, যদিও মিনিয়েচার ক্যামেরা আজ থেকে ৫০ বছর আগেই এদেশে পাওয়া যেত। ছোট ক্যামেরা লোকের অপছন্দ ছিল, তার নানা কারণ আছে। সে সব কথা আলোচনা এখানে করব না। যদিও এ বিষয়ে নানা কথা সেদিন হয়েছিল। তবে চিত্রধর্মী ফোটোগ্রাফ তখন তোলার কথা এদেশে কেউ কল্পনা করেনি। শুধু মানুষের ছবি তোলা, এবং সেও আবার যার ছবি, তাকে চেনা গেলেই যথেষ্ট মনে করা হ'ত। এবং আমি জানি, পিছনের অবিকৃত বাজে পটের ছবিটি স্পষ্ট হলে, লোকের তা আরও ভাল লাগত। অর্থাৎ কোনো জিনিস, তা যত অবান্তরই হোক, ফোকাসহীনতার ফাঁকিতে পড়বার উপায় ছিল না।

আমরা অতঃপর পরস্পর ফোটোগ্রাফ তোলার অভিজ্ঞতার গল্প শুরু করলাম। যতীন্দ্রকুমারের বেশ একটি মজার গল্প মনে পড়ল। তিনি এক যুবকের স্ত্রী-সমেত ফোটো তোলার অনুরোধ পেয়েছিলেন। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে শুনলেন, বধূটি সম্পূর্ণ অসূর্যম্পশ্যা, অতএব কোনো শিল্পীর দৃষ্টির সামনেও তিনি বেরোবেন না। শিল্পী যত বড়ই হোক, পরপুরুষ তো বটেই। তিনি একমাত্র তাঁর নিজস্ব পরমপুরুষটি ভিন্ন আর কাউকে মুখ দেখাতে অক্ষম।

অথচ ফোটোও তোলাতে হবে!

ব্যবস্থা হ'ল, যতীন্দ্রকুমার ক্যামেরার ফোকাসিং-ক্লথ থেকে মাথা বা'র করতে পারবেন না, এবং ঐ কালো কাপড়ের আড়ালে মাথা ঢেকেই সব কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু ওদিকে যে ফোকাসিং স্ক্রীনের উপর—অর্থাৎ গ্রাউণ্ড গ্লাসের উপর সব চেহারাটাই দেখা যাচ্ছে, তা উক্ত পরমপুরুষের জানা ছিল না। যতীন্দ্রকুমার নিতান্ত ভালমানুষ সেজে শুভকার্য সমাধা করলেন। সতীধর্ম সম্পূর্ণ রক্ষা পেল, পরপুরুষের দৃষ্টিতে যে সব বিপর্যয় ঘটতে পারত, সে সব আর ঘটবার সুযোগ পেল না।

ফোটোগ্রাফি বা যে-কোনো আধুনিক কালের দান প্রথমে শহরের লোকের অভ্যর্থনা পায়, পল্লী-অঞ্চলে তার প্রচার বা প্রসার হ'তে অনেক দেরি হয়। নতুন যা-কিছু, তা নিয়ে কত সন্দেহ, কত ভয়। ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে অনেক পল্লীবাসীর মনেই এ ধারণা আছে যে, ফোটো তোলালে আয়ু ক'মে যায়, অকাল মৃত্যু হয়। সব দেশেই এ ধরনের গোঁড়ামি আছে, এবং স্বভাবতই আছে।

শুনলাম, রাজশেখর আমার যুগান্তরে প্রকাশিত সেই 'ইতশ্চেতঃ'র প্যারাগুলি পড়বার সুযোগ পেয়েছেন ইতিমধ্যে। তিনি আমাকে বললেন, তাঁর কোনো আত্মীয় বলেছিলেন, জন্মদিন সভায় ঐটে পড়লেই হ'ত, আর কিছু করবার দরকার হ'ত না।

একটু থেমে বললেন, "আমার লেখার মধ্যে ভাল, মাঝারি, খারাপ—তিনই আছে।"

এ কথাটা বললেন তাঁর সমালোচকদের প্রসঙ্গে। ইতশ্চেত তে সেই কথা লিখেছিলাম, আগে বলেছি। আমি তার উত্তরে বললাম, "কোনো একটি গল্প আর একটি গল্পের সঙ্গে শিথিল-ভাবে তুলনা না করাই বোধ হয় ভাল, কারণ প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়বস্তু আলাদা, তাই এক একটা গল্প এক একটা পৃথক রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তবে পাঠকেরা বড়ই গোঁড়া। একবার যা ভাল লেগেছে, বার বার তাই চায়। অন্যরকম দিলে মনে করে ঠকাচ্ছে।"

এখানেও নতুনকে হঠাৎ মেনে নেওয়ায় মনের গোঁড়ামি স্পষ্ট। পাঠকেরা যে ভাবে একটা লেখার সঙ্গে অন্য আর একটা লেখার তুলনা করে, তার মধ্যে চিন্তার কোনো প্রশ্ন থাকে না, এটি আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

রাজশেখর আমার ঐ কথায় হেসে বললেন, "আমার লেখা হিন্দুস্থানীরা বোধ হয় বেশি পছন্দ করে, বই বেরোতে না বেরোতে হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ হয়ে যায়।"

এ হাসির পিছনে হয় তো একটুখানি বেদনা ছিল। দুবার দুটি কথা বললেন—দুটিই তাঁর শেষ বয়সের লেখার সমালোচকদের বিরুদ্ধে আমি যে মন্তব্য করেছিলাম সেই প্রসঙ্গেই বলা। লেখার মধ্যে "ভাল, মাঝারি ও মন্দ" দুইই আছে, এবং "হিন্দুস্থানীরাই বোধ হয় বেশি পছন্দ করে"—এই দুটি কথা খুব সহজভাবে বলা হলেও সহজ কথা নয়।

শেষের লেখা সম্পর্কে আমার নিজের মত কিছু ভিন্ন, এবং সে কথা ইতস্ততঃতে যথেষ্ট বলা হয়েছিল, যদিও সেটি বিস্তারিত আলোচনা নয়।

যতীন্দ্রকুমারকে আমি বললাম, "পরশুরাম এখন যখন অজস্র লিখছেন সেই সময় আপনি চোখ খারাপ করে বসলেন, ও দুইয়ের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক পাঠক হতাশ হয়েছে, এবং এখনকার গল্পের বিরূপ সমালোচনার জন্য আপনার দায়িত্বও কম নয়।"

এ কথার তো কোনো উত্তর নেই, অতএব যতীন্দ্রকুমার এর উত্তরে আমাকে একটি নতুন কথা শোনালেন, বললেন, "রাজশেখর নিজে এককালে ভাল ছবি আঁকতেন। গণ্ডেরীরাম ও শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, এ দুটি মূর্তি কেমন হবে তা রাজশেখর পোষ্টকার্ডে ফাউনটেন পেন দিয়ে এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ঠিক তাই এঁকেছি। অনেক চরিত্রই তাঁর পরিচিত কারো না কারো চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে আঁকা।"

রাজশেখর নিজেও বলেছিলেন এখনও তিনি সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারেন। কিন্তু চোখের জন্য বেশিক্ষণ পারেন না। এ কথায় মনে হ'ল 'এককলমী' আসলে রাজশেখর নিজে। একটি মাত্র চুলের তুলি, অর্থাৎ যার চেয়ে সূক্ষ্ম তুলি আর হয় না, সেই তুলিতে যিনি ছবি আঁকেন তাঁকে বলা হয় এককলমী। জোর ক'রে বলতে পারব না, ভাষাতাত্ত্বিক নই, তবে শুনেছি কথাটা সত্য।

রাজশেখর চিত্রশিল্পী ছিলেন, এ কথাটা আমার কাছে নতুন হ'লেও কানে অস্বাভাবিক লাগেনি। তাঁর লেখার মধ্যে যে সংযম, অনেক সময় চরিত্র চিত্রণে যে ফোটোগ্রাফধর্মিতা, কথার মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা, মনে হল যেন তাঁর আঁকা ছবির মধ্যেও সে গুণ থাকা সম্ভব। যতীন্দ্রকুমারের কথা শুনেই গণ্ডেরীরাম, শ্যামানন্দ প্রভৃতির ছবি জেগে উঠল মনে। যতীন্দ্রকুমারের ঐ মূর্তিগুলি যদি রাজশেখরের হাতে আগে রূপ পেয়ে থাকে, তবে চকিতে রাজশেখরের একটি কথার অর্থ আমার কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। যেদিন প্রথম রাজশেখরের সঙ্গে দেখা করতে যাই, সে দিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আজকালকার ছবি তিনি পছন্দ করেন না। আলট্রা মডার্ণ শিল্পীদের কথা নয়, আধুনিক কালে গল্পে যে সব ছবি দেওয়া হয় অর্থাৎ ইলাস্ট্রেশন, তা তাঁর পছন্দ নয়। এ কথাটি আমি ইতিপূর্বে প্রকাশ করিনি, কেন না এতে তাঁর চিত্র সমালোচনা ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন ওঠে, এবং আরও পরে তাঁর চলচ্চিন্তা নামক বইতে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর যে রচনা পড়েছি, তাতেও তাঁর মতামত পড়ে এ বিষয়ে যে তিনি খুব চিন্তা করেছেন এমন মনে হয়নি। যাই হোক, যতীন্দ্রকুমারের ছবি যদি তাঁর শিল্পবোধের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে সুর মেলাতে পেরে থাকে, তবে ছবি বিষয়ে তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করা চলে।

( ক্রমশঃ )

# বিধানচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে

## সমরেন্দ্র ঘোষাল

সেদিন তোমার জন্মদিনের সুর
যখন তোমার জীবন-বীণায়
সুন্দরের রাগ-নিঃসৃত দ্যোতনায়
অভিনন্দিত করছিল তোমারই প্রভাব-সৃষ্ট
তোমার কর্মোজ্জ্বল তুমি কে,
ঠিক সেই সময়ই নির্মম অমোঘ
জীবন-হয় মৃত্যুর সাথে মিতালী করে
যাত্রা করলে তুমি এই লোকের জনগণমনের রাজা
পরলোকের পারলৌকিক রাজ্যে
বুঝি তাই তোমার জীবন-বীণার সুর
থেমে গেল প্রাণ-ছেঁড়া তারের ছন্দপতনে।
বেজে উঠল বিসর্জনের রাগিণী,
সে রাগিণীর বিষণ্ণ মূর্চ্ছনায়
মূর্চ্ছিত হল আকাশ, বাতাস, চাঁদ, তারা, ফুল।
আর মর্মাহত হল
তোমারই স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট
তোমারই ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল
অপরিসীম বেদনায় জর্জরিত
তোমারই দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।
কোনখানে কোনবারের জন্যও
কোন পাখী সেদিন গেয়ে ওঠেনি।
কোনও কলিও ভুল করে সেদিন
ফুল হয়ে ফুটে উঠতে চায়নি।
শুধু আষাঢ়ী আকাশের চোখ চিরে
গলে গলে পড়েছিল অনন্ত শোক
কান্না হয়ে হয়ে।
হে বাংলার সুখ-দুঃখের বিগত ভাগ্যনিয়ন্তা!
আমাদের জীবনের প্রতিটি প্রশ্বাসে,
প্রতিটি মুহূর্তে তোমার উপস্থিতির উপলব্ধি
শুধু এই কথাই মনে করাবে চিরদিন
"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

# বিচিত্র যাদু-কথা

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অজিতকৃষ্ণ বসু

'মাদারি' রশিদ রহমানের ঝুড়ি আর গ্রামোফোনের অত্যাশ্চর্য যাদুখেলার যে "হুবহু" বর্ণনা আমার বন্ধুবর দিয়েছেন, সেটি তাঁর ধারণায় হুবহু বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হুবহু নয়; তিনি যাদুর বিভিন্ন কৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন বলেই কয়েকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার তাঁর বর্ণনা থেকে বাদ পড়ে গেছে, যা আমার নজর এড়ায়নি। খেলাটি আমি নিজের চোখে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না দেখলে শুধু বন্ধুবরের বর্ণনা থেকে ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারতাম না, এবং ঐ বর্ণনাটিকে নিখুঁত বলে মেনে নিলে রশিদ রহমানের খেলাটিকে সত্যি 'অলৌকিক' যাদু বা 'মিরাকল্' বলেই মনে হতো।

একথা অবশ্য ঠিক যে খেলাটির শেষ যখন দেখলাম—যে ঝুড়ি খালি দেখানো হয়েছিল তারই তলায় অপ্রত্যাশিতভাবে একটি পুরোদস্তুর পোর্টেব্‌ল্ গ্রামোফোনের আবির্ভাব এবং তাতে একটি রেকর্ড বেজে চলেছে, তখন হঠাৎ একটু বিস্ময়ের চমক লেগেছিল মনে, কারণ মাদারিরা নানারকম এলোমেলো কথা বলে থাকে বলেই রশিদ রহমান ঠিক কি খেলাটা দেখাবে তা আগে আন্দাজ করতে পারিনি। ভেবেছিলাম গ্রামোফোন আনবার প্রতিশ্রুতিটা ভাঁওতা (misdirection) মাত্র, এই ভাঁওতায় ভুলিয়ে সে আসলে অন্য খেলা দেখাবে।

তারপর প্রথম বিস্ময়ের ঝোঁকটা কেটে গেলে, তখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রশিদ রহমানকে পর পর কি কি করতে দেখেছিলাম, একে একে যথাক্রমে ভেবে গেলাম। ফলে খেলাটির কৌশলটি কোথায়, সেটা অনুমান করে নিতে পারলাম। দু' একটি খুঁটিনাটি বিষয় বন্ধুবর নজর করেননি, কারণ সেগুলো তাঁর কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি, কিন্তু খেলার আসল ওস্তাদিই ছিল ঐ আপাত-তুচ্ছ খুঁটিনাটির ভেতরে। পৃথিবীর অধিকাংশ যাদু খেলার মজাই এই যে, আসল কৌশলটুকু থাকে এমন আপাততুচ্ছ খুঁটিনাটির ওপর, যার ওপর দর্শকদের নজর পড়ে না এবং যা থেকে দর্শকদের নজর অন্যদিকে কৌশলে সরিয়ে রাখেন যাদুকর।

এই জন্যই যাদুবিদ্যার কলাকৌশল সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল নন, তাঁরা অন্য বিদ্যায় যত বড় পণ্ডিতই হন না কেন, শুধু তাঁদের মুখে কোনো 'অলৌকিক', অসম্ভবকে-সম্ভব-করা ব্যাপারের বর্ণনা শুনেই তাকে অলৌকিক বলে মেনে নিতে নিজেকে রাজি করাতে পারি না, মনে সন্দেহ থেকে যায় তাঁর বর্ণনা সম্পূর্ণ নয়, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি-নাটি তাঁর বর্ণনা থেকে বাদ পড়ে গেছে, যেগুলো বাদ না পড়লে তাদের ভেতর থেকেই রহস্য সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতো। এবং সেই জন্যেই পল ব্রান্টনের (Paul Brunton) গ্রন্থে (A search in secret India) মিশরী যাদুকর মাহমুদ বে-র যে 'অলৌকিক' যাদুখেলার বর্ণনা আছে (যে বর্ণনার কথা আগেই বলেছি), তা সত্যিই অলৌকিক কিনা, না সাধারণ 'লৌকিক' যাদু-ক্রীড়ার মতো তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা আছে, সে বিষয়ে ঠিক নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

উক্ত গ্রন্থেই পল ব্রান্টন বলেছেন, তিনি দক্ষিণ ভারতের রাজামন্দ্রি শহরে একজন 'মেকি' যোগীর যাদুখেলা দেখেছিলেন। খেলাটি হচ্ছে, একটি টবের মাটিতে আমের আঁটি পুঁতে তা থেকে অল্প সময়ের ভেতর ক্রমে ক্রমে চারা, চারা থেকে ছোট্ট গাছ, ছোট গাছ থেকে আম জন্মানো। অবশ্য আমের আঁটি থেকে বিভিন্ন ধাপে ধাপে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত আমশুদ্ধ গাছে পরিণতি দর্শকদের সোজাসুজি চোখের সামনে ঘটেনি, প্রতিটি পরিবর্তনের আগে টবের ওপর কাপড়ের আড়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল।

ব্রান্টন লিখছেন, তিনি পরে এই লোকটিকে সাত টাকা দিয়ে (তখনকার দিনে সাত টাকার মূল্য কম ছিল না) তার কাছ থেকে খেলাটির কৌশল জেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলছেন, এ লোকটি আসল যোগী নয়, বুজরুক মাত্র। এবং তারপরেই বলছেন, এ ধরণের বুজরুক থাকলেও এমন 'ফকির' বা যোগীও আছেন, যাঁরা ফাঁকির খেলা দেখান না, ছল-চাতুরির ধার ধারেন না, যাঁরা সত্যিকারের অলৌকিক যাদু-শক্তির অধিকারী।

পুরীতে এই ধরণের একজন 'খাঁটি' যাদুকরের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন বলে লিখেছেন। এ যাদুকর পাজামা পরা, মাথায় পাগড়িওয়ালা একজন মুসলমান। পল ব্রান্টন তাঁর সঙ্গে গেলেন তাঁর তাঁবুতে। তাঁবু ঠিক নয়, চার কোণে চারটি খুঁটি ঘিরে পুরু কাপড়ের আড়াল, ছাত নেই। একটি কাঠের টেবিলের ওপর দু' ইঞ্চি মাত্র উঁচু কতকগুলো পুতুল টেবিলের ওপর রেখে যাদুকর দূরে সরে গেলেন। তারপর তাঁর হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণহীন পুতুল-গুলো যেন জীবন্ত হয়ে নাচতে নাচতে টেবিলের ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগলো যাদুকরের হাতের ছোট্ট যাদুলাঠি নাড়ানোর তালে তালে। পুতুলগুলো নাচতে নাচতে টেবিলের কিনারায় যেতেই হুঁসিয়ার হয়ে ভেতরের দিকে সরে আসতে লাগল, পাছে টেবিলের বাইরে পড়ে যায়! পরিষ্কার দিনের আলো, বিকেল চারটা তখন। ব্যাপারটার

ভেতর কোনো রকম চালাকি আছে সন্দেহ করে ব্রান্টন টেবিলটি পরীক্ষা করলেন, পুতুলগুলোর ওপর হাত চালিয়ে দেখলেন, কিন্তু সুতো বা অন্য কোনো রকম চালাকি খুঁজে পেলেন না। তাহলে ঐ পুতুলগুলো অমন জীবন্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে টেবিল থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা সাবধানে এড়িয়ে নাচছিল কি করে?

শুধু তাই নয়, এরপর পল ব্রান্টন টেবিলের যে কোনো অংশের কথা বলতে লাগলেন। যাদুকরের হুকুমে পুতুলগুলো অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে টেবিলের ঠিক সেই অংশে গিয়ে জড় হতে লাগল। আশ্চর্য!

পুতুলখেলার পর টাকার খেলা, অথবা পুতুলের যাদুর পর টাকার যাদু। যাদুকরের অনুরোধে পল ব্রান্টন টেবিলের ওপর একটি টাকা রাখলেন। টাকাটি সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলের ওপর নাচতে নাচতে যাদুকরের দিকে অগ্রসর হয়ে টেবিল ছাড়িয়ে মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঠিক যাদুকরের পায়ের কাছে থেমে গেল। যাদুকর সেটি তুলে নিয়ে পকেটস্থ করে সালাম জানালেন।

তারপর আংটি। হাত থেকে আংটি খুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন পল ব্রান্টন। সেই যাদুকর 'ফকির' দূরে দাঁড়িয়ে উর্দুতে হুকুম করতে লাগলেন, আর সেই হুকুম তামিল করে সেই হুকুমেরই ছন্দে ছন্দে আংটিটি টেবিলের ওপর থেকে শূন্যে উঠে আবার নেমে আসতে লাগল, যেন কোনো অদৃশ্য আকর্ষণে সেটি উঠছে আর নামছে; দূর থেকে যাদুকরের বাজনার তালে তালে টেবিলের ওপর আংটির নাচ।

তারপর যাদুকর তাঁর থলি থেকে বার করলেন একটি লোহার পাত—আন্দাজ আড়াই ইঞ্চি লম্বা আর আধ ইঞ্চি চওড়া। পল ব্রান্টন পরীক্ষা করে দেখলেন তার সঙ্গে কোনো সুতো সংলগ্ন নেই। পরীক্ষিত পাতটি রাখা হলো টেবিলের ওপর। যাদুকর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হাতে হাত ঘসে হাত গরম করে নিয়ে লোহার পাতটির ইঞ্চি কয়েক ওপরে হাত দুটি শূন্যে রাখলেন। শূন্য পথেই হাত দুটি পিছন দিকে সরিয়ে আনতেই ঐ দুটি হাতের রহস্যময় অদৃশ্য আকর্ষণে লোহার পাতটিও টেবিলের ওপর দিয়ে ঐ দিকেই সরে যেতে লাগল। টেবিলের ওপর থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোহার পাতটি তুলে দেখলেন পল ব্রান্টন। এ রহস্যের কোনো সমাধান খুঁজে পেলেন না।

ভালো বখশিস দিলেন পল ব্রান্টন। খুশী হলেন যাদুকর, কিন্তু এই খেলাগুলোকে ভোজবাজির খেলা বলতে তিনি আপত্তি করলেন। বললেন, "না, এগুলো মোটেই ভোজবাজি নয়, ফাঁকির খেলা নয়। যা দেখলেন সব সত্যি, সব ঠিক, কোথাও ফাঁকি বা চালাকি নেই। এ খেলা দেখিয়ে যে আমি টাকা নিই, তা টাকার লোভে নয়। সেই টাকা দিয়ে আমার স্বর্গীয় ওস্তাদের স্মৃতি মন্দির গড়ব বলে।" এই যাদু-শক্তিমান ফকিরের মুখে পল ব্রান্টন তাঁর জীবনের যে কাহিনী শুনলেন তা এই রকম:

"তের বছর বয়সের রাখাল তখন আমি। আমাদের গাঁয়ে এলেন এক কঙ্কালসার চেহারার ফকির। একরাতের আশ্রয় চাইলেন আমাদের বাড়িতে। পেলেন। ধার্মিক পুরুষদের ওপর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল বাবার। ফকির একরাতের জন্য এসে এক বছরেরও বেশি থেকে গেলেন। আমরা টের পেয়েছিলাম, তিনি কতকগুলো অদ্ভুত, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। একদিন খাবার সময় সেই বৃদ্ধ ফকির কয়েকবার বিশেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, কেন বুঝলাম না। ভারি অদ্ভুত মনে হলো। পরদিন ভোরবেলা রাখালী করতে মাঠে গেছি, এমন সময় ফকির এসে আমার পাশে বসলেন। বললেন, 'বাছা, তুই ফকির হতে চাস?' ফকিরের জীবন সম্বন্ধে আমার তখন কোনোরকম পরিষ্কার ধারণা ছিল না, কিন্তু ও জীবন বেশ বাধাবন্ধনহীন আর বেশ রহস্যময় বলে আমার মনে হতো। আমি তাই বললাম, 'হ্যাঁ, আমি চাই ফকির হতে।' ফকির তখন একথা আমার বাবা-মাকে বলে জানালেন, তিন বছর বাদে তিনি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য আসবেন। আশ্চর্য এই যে, এই তিন বছরের ভেতরই আমার বাবা আর মা দু'জনেই মারা গেলেন, কাজেই তিন বছর বাদে ঠিক তাঁর কথামতো ফকির যখন আমায় নিয়ে যেতে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে যেতে আমার আর কোনোরকম বাধা ছিল না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম তাঁর সঙ্গে। ঘুরলাম অনেক জায়গায়। তিনি ওস্তাদ, আমি তাঁর সাকরেদ। আজ আপনি আমাকে যেসব অদ্ভুত ব্যাপার করতে দেখলেন, সেগুলো আমার সেই ওস্তাদেরই শেখানো।"

পল ব্রান্টন শুধালেন, "এগুলো কি সহজেই শেখা যায়?"

ফকির যাদুকর হেসে বললেন, "সহজে নয়, বহু বছর সাধনা করে করে তবে এ শক্তি আয়ত্ত করতে হয়।"

ফকিরের এই কথা সত্যি বলে তিনি বিশ্বাস করেন। একথা লিখেছেন পল ব্রান্টন, কারণ ঐ অদ্ভুত ব্যাপারগুলোর কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা বা কোনোরকম ফাঁকিবাজির ফাঁক-সম্ভাবনা তিনি খুঁজে পাননি। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, ফাঁকি-সম্ভাবনার জায়গাগুলো হয়তো ব্রান্টনের নজর বা বুদ্ধির দৌড় এড়িয়ে গেছে।

পল ব্রান্টন বারাণসীর বিখ্যাত সাধুপুরুষ বিশুদ্ধানন্দের সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে একটি অধ্যায় লিখেছেন; অধ্যায়টির নাম "বারাণসীর যাদুকর" (The wonder-worker of Benares)।

এতে তিনি বিশুদ্ধানন্দের যে অসামান্য যাদুক্ষমতার জন্য তাঁকে 'বারাণসীর যাদুকর' বলেছেন, তার দুটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। তাদের কথাই বলছি।

"আপনি আশ্চর্য কেরামত কিছু দেখতে চান?" শুধালেন বিশুদ্ধানন্দ।

"যদি আপনার দয়া হয়।" বললেন পল ব্রান্টন, দোভাষী মারফত।

"তাহলে দিন আপনার রুমালটি।" বলে বিশুদ্ধানন্দ ব্রান্টনের রুমাল চেয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "যে কোনো গন্ধ আপনার পছন্দ, আমি আপনার এই রুমালে এনে দেবো এই কাচের লেন্সটির মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো ফেলে। কি গন্ধ আপনার পছন্দ, বলুন।"

পল ব্রান্টন বললেন, "যুঁইফুলের গন্ধ আনতে পারেন?"

সেই লেন্স অর্থাৎ আতস-কাচের মধ্য দিয়ে ব্রান্টনের রুমালের ওপর দু' সেকেণ্ড সময়মাত্র সূর্যের আলো ফেলেই বিশুদ্ধানন্দ রুমালটি ফিরিয়ে দিলেন ব্রান্টনের হাতে। ব্রান্টন নাকের সামনে রুমালটি ধরে দেখলেন, সত্যিই তাজা যুঁইফুলের প্রাণ-মাতানো গন্ধে ভরে গেছে রুমালটির একদিক। রুমালটি তিনি পরীক্ষা

করে দেখলেন, একটুও ভেজেনি, অর্থাৎ রুমালে লুকিয়ে এসেন্স ঢেলে দেওয়া হয়নি।

ব্যাপারটি আরেকবার করে দেখাতেও রাজি হলেন বিশুদ্ধানন্দ। এইবার পল ব্রান্টন ফরমায়েস করলেন গোলাপী আতরের গন্ধ। রুমালটি বিশুদ্ধানন্দের হাতে দিয়ে কড়া নজর রাখতে লাগলেন যেন বিশুদ্ধানন্দ কোনোরকম কৌশল বা হাতসাফাই করতে না পারেন। না, কোনোরকম হাতসাফাই করলেন না বিশুদ্ধানন্দ। রুমালের অন্য এক কোণে আতস-কাঁচের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো ফেলে রুমালে এনে দিলেন গোলাপী আতরের গন্ধ।

পল ব্রান্টনের অনুরোধে তৃতীয়বারে রুমালে আরেকরকম গন্ধ এনে দিলেন বিশুদ্ধানন্দ, বলা বাহুল্য, পল ব্রান্টনেরই ফরমায়েস মতো।

"এবার আমি নিজেই গন্ধ পছন্দ করব।" বললেন বিশুদ্ধানন্দ। "এবার রুমালে এমন ফুলের গন্ধ এনে দেব, যে ফুল শুধু তিব্বত ছাড়া আর কোথাও ফোটে না।" বলে আতস-কাঁচের মধ্য দিয়ে সূর্যালোক ফেললেন রুমালের বাকি, অর্থাৎ চতুর্থ কোণটিতে। পল ব্রান্টন রুমাল নিয়ে ঐ কোণটি শুঁকে দেখলেন সত্যিই সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি নতুন ধরণের সুগন্ধ এসে গেছে!

বিস্মিত ব্রান্টন রুমালটি পকেটে পুরে ভাবতে লাগলেন একি করে সম্ভব? বিভিন্ন রকমের গন্ধদ্রব্য কি তিনি তাঁর কাপড় চোপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন? না, পরনে তাঁর অতি হালকা বেশ, নানারকম গন্ধদ্রব্য লুকিয়ে রাখবার সুবিধা তাতে ছিল না। তাছাড়া গন্ধ পছন্দ করেছিলেন ব্রান্টন নিজে, আর পছন্দ করার পর সর্বদা নজর রেখেছিলেন বিশুদ্ধানন্দের হাতের ওপর। আতস কাচটিও পরীক্ষা করে দেখলেন, তাতে সন্দেহজনক কিছু নেই।

ব্রান্টনের মনে হলো, এর মূলে কি তবে সম্মোহন বিদ্যা, হিপ নোটিজম? কিন্তু নিজের ডেরায় ফিরে রুমালটা আরো কয়েকজনকে দেখালেন তিনি, তাঁরাও রুমালে চার রকমের গন্ধ পেলেন। সুতরাং বোঝা গেল ব্যাপারটা হিপ্‌নোটিজম্‌ নয়।

এর দিন কয়েক পরে বিশুদ্ধানন্দের ভবনে আবার এলেন পল ব্রান্টন। সূর্যালোকের সাহায্যে আরেকটি আশ্চর্য ব্যাপার করে দেখাবেন অলৌকিক শক্তিধর যাদুকর বিশুদ্ধানন্দ। সেদিন একটি মৃত চড়াই পাখির দেহে প্রাণ সঞ্চার করে সবাইকে বিস্মিত করলেন বিশুদ্ধানন্দ। সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হলেন পল ব্রান্টন। প্রথমে তিনি ভালো করে দেখলেন চড়াই পাখিটি সম্পূর্ণ প্রাণহীন। বিশুদ্ধানন্দ মৃত পাখিটির দুই চোখে সেই আতস কাঁচটির মধ্য দিয়ে সূর্যালোক ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল পাখিটির দেহে। পাখিটি কিছুক্ষণ ঘরের ভেতর উড়ে বেড়াল। তারপর পড়ে গেল মেঝের ওপর, আব্যর প্রাণহীন। সূর্যালোকের মাধ্যমে তার মৃতদেহে কিছুক্ষণের জন্য প্রাণসঞ্চার করেছিলেন বিশুদ্ধানন্দ।

পল ব্রান্টন লিখেছেন—এসব অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড কি করে সম্ভব হয়, এ রহস্যের সমাধান তিনি জানতে চেয়েছিলেন যাদুকর বিশুদ্ধানন্দের কাছে। বিশুদ্ধানন্দ বলেছিলেন, "আপনাকে আমি যা দেখিয়েছি, তা যৌগিক কিছু নয়, এর মূলে আছে সৌর-বিজ্ঞান, যা আয়ত্ত করলে সূর্যের তাপ দিয়ে অনেক কিছু আশ্চর্য ব্যাপার করা যায়। আপনারা যেমন নানা রকমের বিজ্ঞান পড়াশুনা করে আয়ত্ত করেন, সৌর-বিজ্ঞানও তেমনি আয়ত্ত করা যায়। এ বিজ্ঞান আমি তিব্বতী গুরুর কাছে শিখেছি বটে, কিন্তু ভারতের প্রাচীন কালের যোগীরাও এ বিজ্ঞান জানতেন।"

"আপনার এ বিদ্যা আপনি আপনার শিষ্যদের শেখাবেন না?" প্রশ্ন করলেন ব্রান্টন।

বিশুদ্ধানন্দ বললেন "যে পর্যন্ত না আমার দীক্ষাদাতা সেই তিব্বতী গুরুর আদেশ না পাবো, সে পর্যন্ত কাউকে শেখাতে পারব না।"

"কিন্তু আপনার গুরু সেই সুদূর তিব্বতে।" বললেন পল ব্রান্টন। "আপনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হবে কি করে?"

"আত্মিক স্তরে তাঁর সঙ্গে সর্বদাই আমার যোগাযোগ রয়েছে।" বললেন, বিশুদ্ধানন্দ।

পল ব্রান্টন বিশুদ্ধানন্দকে 'অলৌকিক' শক্তিসম্পন্ন যাদুকর বলেছেন, যদিও তাঁর সৌর-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাটা মেনে নিতে পারেননি। সন্দেহ করেছেন, ব্যাপারগুলো আসলে যৌগিক, সৌর-বিজ্ঞানের কথাটা শুধু চোখে ধূলো দেবার জন্যে ভাঁওতা মাত্র।

ভারতের সাধকদের মধ্যে অলৌকিক যাদুশক্তির অধিকারীর অভাব নেই। অলৌকিক যাদুবিদ্যা, ভীতি, শ্রদ্ধা আর বিস্ময় দাবি করতে পারে বটে, কিন্তু তার চাইতে আমাকে বেশি আকর্ষণ করে 'লৌকিক' যাদু, যাতে ব্যাপারটা 'অলৌকিক' বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মূলে থাকে ফাঁকির কৌশল। চোখের সামনে দেখছি অতি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে, মনে হচ্ছে, লৌকিক কোনো উপায়ে এর ব্যাখ্যা চলে না, তখন যদি নিশ্চিত জানি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ লৌকিক, এর লৌকিক ব্যাখ্যা রয়েছে, শুধু ফাঁকিটা কোথায় ধরতে পারছি না, এই যে ধাঁধার রোমাঞ্চ, এইখানেই তো আসল মজা। তাই লৌকিক কৌশলের ওপর ভিত্তি যার, সেই আধুনিক যাদুবিদ্যা শুধু আমারই নয়, শিল্প-রসিক এবং আনন্দ-রসিক মাত্রেরই প্রিয়।

[ক্রমশঃ।

# উইলো ক্ষেতের ধারে

( W. B. Yeats-এর "Down by the Salley Gardens" )

উইলো ক্ষেতের পাশে প্রেমিকাকে দেখলাম।
তুষার-ধবল চরণে সে উইলো ক্ষেতের ওপারে গিয়েছে
এবং আমায় বলেছে: 'ভালবাসাটাকে সহজে গ্রহণ কর,
যেমন সহজে উইলো গাছে পাতা গজায়।'
সে আদেশ মানিনি সেদিন—
কেননা, তরুণ ও অজ্ঞ ছিলাম।

তটিনী সমীপে কোন এক মাঠে দু'জনে দাঁড়ালাম।
আমার বিনত কাঁধে তুষার-ধবল হাত রাখলো সে,
এবং আমায় বলল: 'প্রিয়তম! জীবনটাকে
সহজ করেই নাও, যেমন সহজে সবুজ মাঠে ঘাস জন্মে।'
তারুণ্য আর অজ্ঞতা ছিল বলে মানিনি সে কথা;
হায়! তারুণ্যের পরে সারাটা জীবন কাঁদলাম!

অনুবাদক: মনোময় চক্রবর্তী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

## পাঁচ

।। গ ।।

সেদিন রাত্রির আলো-অন্ধকারে আবছা আবছা শিবনাথ সুন্দরমকে দেখেছিল। লম্বা-চওড়া দৈত্যাকৃতি চেহারাটাই শিবনাথের চোখে পড়েছিল এবং সে দেখাটাও ছিল ঝাপসা ঝাপসা। কিন্তু আজ দিনের আলোয় চেহারার সবটাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওর চোখে পড়ে।

লোকটার চেহারা, বিচিত্র তার পোষাক কেমন যেন শিবনাথের বুকের মধ্যে ভয় জাগায়। নিজের নামটা কোন মতে উচ্চারণ করে তখনো ভয়ে ভয়েই যেন সুন্দরমের দিকে তাকিয়ে ছিল শিবনাথ।

সুন্দরমও তাকিয়ে ছিল শিবনাথের মুখের দিকে। তখনো সে যেন শিবনাথকে ঠিক চিনে উঠতে পারেনি। আপন মনেই তাই সে বলে, শিবনাথ!

আজ্ঞে।

শিবনাথ!

আজ্ঞে।

কোথায় তোমাকে দেখেছি বল ত?

আজ্ঞে অরিন্দম সরকার মশাইয়ের গৃহে—

কোঁচকান ভ্রূ যুগল সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরমের সরল হয়ে আসে। সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ—চিনেচি—

আজ্ঞে আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনার এখানে এসে থেকে পড়াশোনা করবার জন্ত।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলেছিলাম তো, তা—থাকবে তুমি?

অনুগ্রহ করে যদি আপনি স্থান দেন—

আরে নিশ্চয়ই। অনুগ্রহ কি বলচো! থাকবে বৈকি। তা জিনিষপত্র তোমার সব কোথায়? এনেচো?

আজ্ঞে না।

তবে?

কাল-পরশু নিয়ে আসবো।

বেশ। বেশ—চলে এসো তুমি এখানে, কোন কষ্ট হবে না তোমার। পাশেই আরো দুটো ঘর আছে—একটায় আমি থাকি, অন্যটায় তুমি থাকবে। কেমন?

আপনি যেমন বলবেন।

হ্যাঁ, চলে এসো, থাকো তুমি এখানে। এ বাড়িতে দেখতেই পাচ্ছো লোকজনের মধ্যে আমি—আর ঐ আমার অসুস্থা স্ত্রী—জনা দুই ভৃত্য—আর একজন ছত্রী ব্রাহ্মণ আছে। ইচ্ছা করলে তুমি তার হাতেই খেতে পারো আর তা যদি না চাও তো নিজে রান্না করেও তুমি খেতে পারো।

আপনি যেমন বলবেন।

আমি আর কি বলবো? তোমার যেমন খুশি, সুবিধা—তেমনি করবে।

যে আজ্ঞে।

চল, বাইরে গিয়ে তোমাকে বাড়িটা ঘুরে দেখাই—

সুন্দরম শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। লম্বা টানা বারান্দাটা দিয়ে পাশাপাশি যেতে যেতে এক সময় মৃদু-কণ্ঠে ডাকে সুন্দরম, শিবনাথ!

আজ্ঞে—

আমার স্ত্রীকে দেখলে তো?

দেখলাম। কি হয়েচে ওর?

খুবই অসুস্থ ছিল, তবে একটু একটু করে এখন সুস্থ হয়ে উঠছে।

ওর জন্যই আমার চিন্তা—আমি তো সর্বদা ঘরে থাকি না, থাকতেও পারি না। একা একা ঘরের মধ্যে শয্যার 'পরে অমনি পড়ে আছে। কথাটাও যদি বলতে পারতো—

শিবনাথ যেন চমকে ওঠে, কেন—উনি—

না। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—

শিবনাথ যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। একটু আগে যে তার সঙ্গে কথা বললো, সে কথা বলতে পারে না কেন সাহেব বলচে!

সুন্দরম তখন আবার বলে চলেছে, অবিশ্যি ভিষগ রত্ন বলেছেন—কথা আবার ও বলতে পারবে। তা তুমি থাকলে ও একজন সঙ্গীও তো পাবে।

শিবনাথ কি জানি কেন চুপ করেই থাকে।

সুন্দরম বলে, তাহলে তুমি কিন্তু আর দেরি করো না। কাল-পরশুর মধ্যেই চলে আসবে। হ্যাঁ, ভাল কথা,, সরকার মশাইকে বলেচো তো?

আজ্ঞে এখনো বলিনি—

বলোনি এখনো? আগামী কালই বলো।

তাই বলবো।

বাড়ির সম্মুখ ও পশ্চাতের দিকে অনেকখানি করে খোলা জায়গা। সেখানে নানা ধরণের ফল ও ফুলের গাছ। কতপ্রকারের ফলের গাছই যে আছে। আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল, পিয়ারা। বড় বড় অনেকগুলো নারিকেল গাছ। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে অনেকটা হেলে পড়েছে। রোদের তেজ কমে এসেছে। বাড়ির পশ্চাৎদিকেই খাল। বাঁধান ঘাটও আছে। একটু আগেই বোধ হয় জোয়ার এসেছে। জোয়ারে খালের জল স্ফীত হয়ে ঘাটের অনেকগুলো ধাপ ডুবিয়ে দিয়েছে। ঘুরে ঘুরে সুন্দরম শিবনাথকে নিয়ে সব কিছুই দেখাল। অবশেষে আরো ঘণ্টাখানেক বাদে শিবনাথ সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে চলে গেল। সুন্দরম নিজে তাকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

ফেরার পথে শিবনাথ সুন্দর সাহেবের কথাই ভাবে। সুন্দর সাহেব লোকটা যেমন দৈত্যের মত লম্বা-চওড়া দেখতে, ব্যবহারটা কিন্তু তেমন নয়। ভয় পাবার মত কিছুই নেই। মাঝে মাঝে দরাজগলায় হো হো করে কথা বলতে বলতে হেসে উঠছিল। প্রাণখোলা হাসি। আরো মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল একখানি কৃশ মুখ। রুগ্না শয্যাশায়িনী সুন্দর সাহেবের স্ত্রীর মুখখানি। অমন দৈত্যের মত সুন্দর সাহেব, কিন্তু কত ছোট তাঁর স্ত্রী। কিন্তু ওকথা বললে কেন সুন্দর সাহেব—তার স্ত্রীর কথা বন্ধ? কথাই যদি বন্ধ হবে তবে কেমন করে সে শিবনাথের সঙ্গে কথা বললে? সুন্দর সাহেব কি তবে মিথ্যা বলল?

কিন্তু তার কাছে মিথ্যা বলেই বা লাভ কি! সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায় শিবনাথের। আরো ভাবে শিবনাথ, আজই সে সন্ধ্যার দিকে সরকার মশাইকে কথাটা জানাবে। জানাবে সে সুন্দর সাহেবের কাছে চলে আসতে চায়।

পথ নেহাৎ কম নয়। কুলীর বাজার থেকে চেতলা অনেকটা পথ। ক্রমশ: দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে। শিবনাথ চলার গতি বাড়িয়ে দেয়।

দেরি করে না শিবনাথ। সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পরে অরিন্দম সরকার যখন সেজেগুজে ফুলবাবুটি হয়ে পাল্কী গাড়িতে চেপে রাত বিহারে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বহির্মহলে এসে দাঁড়িয়েছে, শিবনাথ গিয়ে সামনে দাঁড়াল।

কে?

আজ্ঞে আমি শিবনাথ।

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হলো অরিন্দম সরকারের, শিবনাথ?

আজ্ঞে আপনার আশ্রয়ে এখানে থেকে লেখাপড়া করি।

তা কি চাই?

একটা নিবেদন ছিল। কোনমতে সংকোচের সঙ্গে কথাটা বলে শিবনাথ।

কিসের নিবেদন?

হাতে সুগন্ধী গোড়ের মালা জড়ান ছিল, সেই মালার গন্ধ শুকতে শুকতে কথাটা বলে অরিন্দম সরকার।

আমি অন্য জায়গায় আশ্রয় একটি পেয়েছি, যদি আপনার অনুমতি হয় তো—

আশ্রয়?

আজ্ঞে—

কোথায়?

কুলীর বাজারে সুন্দর সাহেবের গৃহে—

কথাটা কানে যেতেই যেন চম্‌কে ওঠে অরিন্দম সরকার। বলে, কি, কি বললে?

পুনরাবৃত্তি করে কথাটার শিবনাথ।

সেখানে গিয়ে তুমি থাকবে!

যদি অনুমতি করেন।

জান সে ম্লেচ্ছ—ক্রেশ্চান—আর তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান—

আজ্ঞে রন্ধন আমি নিজের হাতেই করে আহার করবো।

অরিন্দম সরকার যেন অতঃপর ক্ষণকাল কি ভাবল, তারপর বললে, বেশ—জাত নষ্ট করতে চাও। যাবে, তবে মনে রেখো—সমাজে কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে সমাজে আর তোমার স্থান হবে না।

কথাটা বলে অরিন্দম সরকার আর দাঁড়াল না। দেরি হয়ে যাচ্ছে, সোজা গিয়ে পাল্কী গাড়িতে উঠে বসল।

কচুয়ান গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল কিন্তু শিবনাথ তখনো দেউড়ির এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। পণ্ডিত মশাইয়ের শেখানো একটি শ্লোক মনে পড়ছিল তার—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্মো ভয়াবহ:।

তবে কি সে যাবে না?

যত কষ্ট হোক এইখানেই সে পড়ে থাকবে।

কিন্তু মহাত্মা হেয়ার। হেয়ার সাহেব তাকে সুন্দর সাহেবের ওখানেই যাবার কথা বলেছেন। এরপর সে সুন্দর সাহেবের গৃহে না গেলে হয়ত মহাত্মা হেয়ার তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

পরের দিন স্কুলে আবার শিবনাথের হেয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

প্রাত্যহিক স্কুল পরিদর্শনে তিনি এসেছিলেন। শিবনাথের সঙ্গে দেখা হতেই তাকে তিনি কাছে ডাকলেন, শিবনাথ!

আমাকে ডাকছিলেন?

সসম্ভ্রমে শিবনাথ সামনে এসে দাঁড়ায়।

যে সুন্দর সাহেবের কথা বলিয়াছিলে তাহার গৃহেই এখন অবস্থান করিতেছো তো?

আজ্ঞে না।

সে কি, এখন ক্লেশ ভোগ করিতেছো!

আজ্ঞে কাল-পরশুর মধ্যেই যাবো।

হ্যাঁ, আর বিলম্ব করিও না। যথাশীঘ্র সম্ভব সেখানে চলিয়া যাও। আমার মনে হয় সর্বতোভাবে সেখানে তোমার সুবিধাই হইবে।

সাহেব আর দাঁড়ালেন না। সোজা গিয়ে তাঁর পাল্কীতে উঠে বসলেন।

পরের দিনই শিবনাথ স্কুলের ছুটির পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পাঠ্য পুস্তক ও জামা-কাপড়গুলি একটা বোঁচকায় বেঁধে কুলীর বাজারে সুন্দর সাহেবের গৃহের দিকে রওনা হলো।

সুন্দর সাহেবের গৃহে যখন সে গিয়ে পৌঁছাল সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে বেশ অন্ধকার।

সোজা একেবারে অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করল শিবনাথ। এবং বোঁচকাটি হাতে বারান্দা অতিক্রম করে পায়ে পায়ে মৃন্ময়ীর ঘরের দিকেই এগিয়ে গেল। ঘরের এক কোণে একটি উঁচু কাষ্ঠখণ্ডের উপর একটি সেজবাতি জ্বলছিল। তারই আলোয় ঘরটি আলোকিত।

মৃন্ময়ী একই ভাবে শয্যায় শুয়ে ছিল একাকী ঘরের মধ্যে।

ঘরের দরজায় এসে শিবনাথ দাঁড়াতেই তার পদশব্দে শয্যায় শায়িতা মৃন্ময়ী চোখ তুলে সামনের দিকে তাকায়। দু'জনার চোখাচোখি হয়। শিবনাথ দরজার চৌকাঠেই দাঁড়িয়ে যায়।

মৃন্ময়ীর চোখের তারা দুটি যেন মনে হয় আনন্দে চক্ চক্ করে উঠলো।

এসো, ঘরে এসো—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন শিবনাথ? মৃন্ময়ীই আহ্বান জানায়। তবু শিবনাথ যেন ইতস্তত করে।

তার যেন মনে পড়ছিল সেদিনকার সুন্দর সাহেবের কথাটা। তার স্ত্রীর অসুখে কথা বন্ধ। কথা নাকি বলতে পারে না।

মৃন্ময়ী আবার ডাকে, কই এসো—

শিবনাথ পায়ে পায়ে এবারে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

সাহেব কোথায়? তিনি কি গৃহে নেই?

মৃন্ময়ী মৃদুকণ্ঠে বলে, না।

কখন ফিরবেন তিনি?

তা তো জানি না। তারপরই মৃন্ময়ী বলে, তুমি তো এখানেই থাকবে, তাই না?

হ্যাঁ—তাই তো এলাম।

তারপরই যেন দু'জনারই কথা ফুরিয়ে যায়।

একজন শয্যায় শুয়ে, অন্যজন তারই সামনে বোঁচকাটা বগলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল মৃন্ময়ীর মুখখানি শিবনাথ। দুর্গাপূজার সময় সরকার বাড়িতে দুর্গা প্রতিমার পাশে যে লক্ষ্মী ঠাকরুণের মুখখানি শিবনাথ দেখেছে, যেন ঠিক তেমনি মুখখানি। যেমনি সুন্দর, তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি স্বর্গীয় এবং তার মধ্যেই যেন রয়েছে করুণ বিষণ্ণতার একটি ছাপ। দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন কিসের ক্লান্তি।

মৃন্ময়ীই আবার কথা বলে, কি দেখছো অমন করে শিবনাথ আমার মুখের দিকে চেয়ে?

হঠাৎ শিবনাথ বলে ফেলে, তোমাকে!

আমাকে?

হ্যাঁ—তুমি খুব সুন্দর।

মৃদু হাসিতে ভরে যায় যেন মৃন্ময়ীর মুখখানি।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ? ঘরের কোণে ঐ যে চৌকিটা আছে ওটা নিয়ে এসে এখানে বোস। বোঁচকাটা নামিয়ে রাখ।

শিবনাথ অতঃপর ঘরের কোণ থেকে চৌকিটা নিয়ে এসে মৃন্ময়ীর শয্যার অনতিদূরে বসল বটে, তবে বোঁচকাটা তার কোলেই ধরা থাকে।

এখানে তুমি কোথায় ছিলে শিবনাথ?

সরকার মশাইয়ের গৃহে।

কে কে তোমার আছে?

কেউ নেই।

কেউ নেই? মা-বাবা—ভাই-বোন?

না।

আচ্ছা শিবনাথ!

কি?

কৃষ্ণনগর কোথায় তুমি জান?

শুনেচি। কখনো সেখানে যাই নি।

ওঃ আমার বাড়ি কৃষ্ণনগরে।

যে প্রশ্নটা এতক্ষণ ধরে শিবনাথের মনের মধ্যে কেবলই আনাগোনা করছিল সে প্রশ্নটা যেন আর চেপে রাখতে পারে না শিবনাথ। নিজের অজ্ঞাতেই যেন প্রশ্নটা বের হয়ে আসে। বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

কি?

মৃন্ময়ী শিবনাথের মুখের দিকে তাকায়।

সুন্দর সাহেব বলছিলেন—

কি? কি বলছিল সে?

তুমি নাকি—

কি আমি?—

কথা বলতে পারো না। অসুখে তোমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মাথা নেড়ে মৃন্ময়ী বলে, হ্যাঁ—

কিন্তু—

তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলি না। তাই তাঁর ধারণা আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কেন? কেন বল না? সে তো খুব ভাল লোক।

সব কথা তুমি জান না, সব কথা শুনলে—

কি কথা?

বলবো, সব তোমাকে বলবো। যদি—যদি তুমি আমাকে—

কি?

এখান থেকে উদ্ধার করতে পারো। আমাকে আবার আমার মা-বাবার কাছে দিয়ে আসতে পারো।

শিবনাথ কথাটা শুনে যেন একটু অবাকই হয়। বলে, কেন, সুন্দর সাহেবকে তুমি বললে—

না, সে আমাকে যেতে দেবে না—

যেতে দেবে না?

না।

মৃন্ময়ীর চোখের কোণ দুটি জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

[ ক্রমশঃ।

## ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ—

গত ডিসেম্বর হইতে চীন সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ লইয়া যে সমস্ত চিঠিপত্র বিনিময় হইয়াছে, সেগুলি সরকারী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত পত্র অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও বিরোধের গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে নাই, তথাপি উভয় পক্ষই এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রয়োজন পুনরায় উপলব্ধি করিয়াছেন। যেমন ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের এক পত্রে চীন সরকার বলিয়াছেন যে, "প্রধান মন্ত্রী নেহেরু সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন (গত ফেব্রুয়ারী মাসে পুণার জনসভায় নেহরুর বক্তৃতার উল্লেখ করা হইয়াছে) তাহা কার্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া চীন সরকার আশা করেন। চীনা ও ভারতীয় জনসাধারণ পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, চীন ও ভারত সমগ্র এশিয়ার দুইটি প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তি। চীন ও ভারতের ভৌগোলিক নৈকট্যের পরিবর্তন করিতে পারে এইরূপ কোনো শক্তিই কোনো কালে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে না। যত দেরীতেই হউক না কেন, কোনো দিন না কোনো দিন চীন ও ভারতের সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করিতেই হইবে। চীনা ও ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থে এবং এশিয়া ও বিশ্বের শান্তির জন্য বিলম্বে সমাধান হওয়া অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র হওয়াই কাম্য। ভারত সরকার এই বিষয়টি গভীর ভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।" চীন সরকারের চিঠির মধ্যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার যে আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা উপেক্ষা করা রাষ্ট্রনীতির দূরদর্শিতার দিক হইতে সঙ্গত হইবে না। বলা বাহুল্য যে, ভারত সরকারও উহা উপেক্ষা করেন নাই। ১৩ই মার্চ তারিখে ভারত সরকার এই পত্রের জবাবে বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বনেই যে বিশ্বাসী, এই তথ্য নিশ্চয়ই চীনেরও জানা আছে। "ইদানীং কালে সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় এলাকার ক্ষতি ও জীবনহানির মতো গুরুতর ঘটনা সত্ত্বেও ভারত সরকার এই নীতিতেই অটুট রহিয়াছেন।"

একথা নিঃসন্দেহ যে, বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে হিমালয়ের যে সীমানা নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, চীন কর্তৃক উহা লংঘন কেবল দুঃখের নহে, ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, এই সীমান্ত-বিরোধ অবলম্বন করিয়া এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়াছে উহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দূরপ্রসারী হইতে বাধ্য। অথচ ভারতবর্ষ এবং নয়াচীন উভয়েই মাত্র অল্পদিন পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে এবং উভয়েই বৈদেশিক আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নূতন সমাজ গঠনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। অথচ যে সীমানা লইয়া বিরোধ সে অঞ্চলগুলিতে এ[...] কোনো বৃহৎ জনবসতি কিংবা কাঁচামাল ও প্রকৃতির ঐশ্বর্য ন[...] যাহা দুই রাষ্ট্রের কাহারও আর্থিক সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে পা[...] অথচ দুঃখের কথা এই দুরধিগম্য অঞ্চলগুলি লইয়া উভয় পক্ষে[...] মধ্যে এমন তীব্র ও তিক্ত বিরোধ দেখা দিয়াছে যাহা সাম[...] প্রস্তুতির সম্ভাবনাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। কিন্তু নয়াচীন [...] সমাজতন্ত্রের আশীর্বাদের দ্বারা তার রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিতে চা[...] কিম্বা ভারতবর্ষ যদি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির পথে নূতন কল্যা[...] রাষ্ট্রের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে তাহা হইলে হিমাল[...] বরফমণ্ডিত কিম্বা অরণ্য-কণ্টকিত অঞ্চল লইয়া এই বিরোধ জীয়াই রাখা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কর্ম নহে।

সম্প্রতি লাওস সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের পরে শ্রীকৃ[...] মেনন ও মার্শাল চেন ই-র মধ্যে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে ই[...] উল্লেখযোগ্য দুইজনের কেহই এমন ইঙ্গিত করেন নাই যে লাদা[...] লইয়া যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা আছে। মার্শাল চেন ই বলিয়া[...] যে, লাদাকের বিরোধ একটা স্থানীয় ব্যাপার মাত্র, উহা হই[...] যুদ্ধ বাধিবে না। শ্রীমেনন বলিয়াছেন যে, উভয় পক্ষই বলিতে[...] এ জমি আমার। আসলে ব্যাপারটা আলোচনা সাপেক্ষ। আম[...] আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে উভয় দেশের নেতারা এক টেবি[...] বসিয়া দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যার এক[...] মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন। তাহাতে বিশ্বশান্তি রক্ষার পথ সুগ[...] হইবে।

## পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা—

সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা আবার নূত[...] ধরণের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করিবেন, কারণ পারমাণবিক অ[...] পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত ইহা ছা[...] তাঁহাদের গত্যন্তর নাই।

এই যুক্তি উড়াইয়া দিবার নয় কারণ আত্মরক্ষার পবিত্র অধিকা[...] প্রত্যেক দেশেরই আছে। ইতিহাস স্মরণ করিলে দেখা যাইবে যে জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বার বার সাম্রাজ্য[...] বাদী দেশগুলির আক্রমণ ঠেকাইতে হইয়াছে। বিপ্লবের পরেই চৌদ্দ[...] পুঁজিবাদী দেশের সশস্ত্রবাহিনী নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে চারিদি[...] হইতে ঘিরিয়া মারিবার চেষ্টা করে। তারপর দ্বিতীয় মহাযু[...] হিটলারের প্রধান লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্র ধ্বংস করা। দ্বিতী[...] মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর আবার নতুন করিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া যুদ্ধের জন্য তৈরি হইতেছে

সারা পৃথিবীতে শত শত সামরিক ঘাঁটি গাড়িয়া সেগুলিতে রকেট ও পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করা হইতেছে।

এই অবস্থায় সোভিয়েতের পক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ছাড়া উপায় কি?

এখানে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার জন্ম দোষী কে, এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে দেখিতে হইবে কে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে। কে প্রথম অ্যাটম বোমা ব্যবহার করিয়াছিল এবং ব্যবহার করিয়াছিল বেসামরিক জনসাধারণের উপর? এই অপরাধ করিয়াছিল আমেরিকা। কে প্রথম হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করে? সেও আমেরিকা। কে প্রথম বিদেশে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে? আমেরিকা। কে প্রথম মহাশূন্যে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করিয়া সারা দুনিয়ার আবহমণ্ডল দূষিত করিতেছে? সেও আমেরিকা। এই সব পরীক্ষা কার বিরুদ্ধে? এগুলি যে প্রধানত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাহা অনস্বীকার্য। মস্কোতে যে বিশ্বনিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইয়া গেল, মহাকাশে মার্কিণ পারমাণবিক অস্ত্রাঘাত তাহারই বিরুদ্ধে।

আমেরিকা এ পর্যন্ত ২৪০ বার পারমাণবিক অস্ত্র ফাটাইয়াছে। তাহার সহিত যদি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরীক্ষাগুলি ধরা যায় তাহা হইলে নাটো জোটের মোট পরীক্ষার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬০-এর মত। সে ক্ষেত্রে সোভিয়েতের পরীক্ষার সংখ্যা ১০০-এর কোঠা ছাড়ায় নাই। এই অবস্থায় পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত করার ব্যাপারে কাহার প্রধান দায়িত্ব। অবশ্যই আমেরিকার। সম্প্রতি "নিউ ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় সোভিয়েতের পুনরায় অস্ত্র পরীক্ষার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক পি, এম, এস, ব্ল্যাকেট লিখিয়াছেন যে, আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার সংখ্যাধিক্যের অর্থ, সোভিয়েতের তুলনায় আমেরিকার অস্ত্রাগারে অধিক পরিমাণ অস্ত্র মজুত হওয়া। সেই কারণে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে সেই স্তরে উঠিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। অধিকন্তু ব্রিটিশ ও ফরাসী অস্ত্রাগারে যে পারমাণবিক অস্ত্র জমা হইতেছে তাহাও যে সোভিয়েত রাশিয়ারই বিরুদ্ধে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীকে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও লাভ করিবার অধিকার দেওয়া হইতেছে। ইহা যারপর নাই বিপজ্জনক। কারণ বাগী জার্মাণ জঙ্গীবাদীরা সেই অস্ত্র হাতে পাইলে বেশি দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। এইখানেই তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা নিহিত। সেইজন্ত জার্মাণীতে দুইটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান এবং উভয়ের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনার প্রশ্ন আর ঠেলিয়া রাখা উচিত নয়।

## জার্মাণ শান্তি মীমাংসা—

জার্মাণ শান্তি-মীমাংসা সম্পর্কে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া অভিমত বিনিময় চলিতেছে। সম্প্রতি এ সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট দ্বয়ের মধ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার পর সতেরো বৎসর কাটিয়া যাওয়া সত্বেও এখনো পর্যন্ত জার্মাণ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নাই এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—এই তিনটি পশ্চিমী শক্তি এখনো পর্যন্ত ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে পশ্চিম বার্লিনে দখলকারীর অধিকার ভোগ করিতেছে। পশ্চিম বার্লিনকে পরিণত করা হইয়াছে আক্রমণাত্মক "নাটো" জোটের একটি ঘাঁটিতে, ইহার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হইল শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলি ও সর্বোপরি জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যাহার কেন্দ্রে এই পশ্চিম বার্লিন অবস্থিত।

নাৎসী জার্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভূতপূর্ব মিত্র দেশগুলি—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—তাহাদের নীতিগুলি যুক্ত করিয়াছিল সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্য লইয়া। তাহাদের এই নীতির ফলে জার্মাণি দুই ভাগে ভাগ হইয়া যাইবার পর, পশ্চিমী শক্তিগুলি জার্মাণীর পশ্চিমাংশকে এক সমরবাদী ও প্রতিশোধপরায়ণ রাষ্ট্রে পরিণত করার ঝুঁকি লয়, যে রাষ্ট্রের নীতি ও গতিপরিণতির লক্ষ্য হইল জার্মাণ জনগণের যথার্থ জাতীয় স্বার্থের ও শান্তির স্বার্থের বিরোধী। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মিত্র দেশ, যে জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে জার্মাণ ভূখণ্ডের উপরে, যে রাষ্ট্রের নীতি ও উন্নয়নের লক্ষ্য সমগ্র জার্মাণ জনগণের জাতীয় স্বার্থের ও শান্তির স্বার্থের সম্পূর্ণ উপযোগী, যে জার্মাণ জনগণ জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদের এ্যাডভেঞ্চার বিলাস ও আক্রমণাত্মক নীতির জন্ম তাহাদের বুকের রক্ত দিয়া ও বিরাট দুঃখকষ্ট সহিয়া মূল্য দিয়াছে।

ইউরোপের কেন্দ্রে যে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জেরগুলিকে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে এবং পশ্চিম বার্লিনে "নাটো"র এক যুদ্ধঘাঁটি স্থাপন করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে এই জটিল অবস্থাকে যেরূপ 'আছে' সেইরূপ থাকিতে দেওয়ার অর্থ হইবে আগুন লইয়া খেলা করা। ইহার অর্থ হইবে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে এক সামরিক সংঘর্ষের বিপদ জীয়াইয়া রাখা।

জার্মাণ শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছুক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহ এই মর্মের বিবৃতিগুলিতে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, যে জার্মাণ প্রশ্নের

শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় অংশ গ্রহণ করিতে পশ্চিমী শক্তিগুলির অস্বীকৃতি এবং পশ্চিম বার্লিনকে তাহাদের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে রাখার ইচ্ছা ওই শক্তিগুলির সদিচ্ছার প্রমাণ এবং পশ্চিম বার্লিনের জনগণের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার কামনার প্রমাণ।

পশ্চিম বার্লিনের জনগণের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিতে পারে তিনটি পশ্চিমী শক্তির দখলকারী ফৌজের পশ্চিম বার্লিনে অবস্থিতি নহে—যে কথা জার্মাণ শান্তি মীমাংসার বিরোধীরা দাবী করিতেছেন; ইহাকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিতে পারে একমাত্র ঐ ফৌজের অপসারণই। ইহা বিশেষরূপে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে যদি আমরা সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের ধারাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখি—যে-প্রস্তাবে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে এক মুক্ত বেসামরিকীকৃত পশ্চিম বার্লিনের মর্যাদা সম্বন্ধে কড়াকড়ি রকম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আন্তর্জাতিক গ্যারাণ্টিকে সুনিশ্চিত করিয়া তোলা হইয়াছিল।

এ কথা সকলেই জানে যে সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট পশ্চিমী শক্তিগুলির সহিত মতৈক্যে পৌঁছিবার জন্য অর্ধ পথ আগাইয়া গিয়া এই ব্যবস্থায় রাজি হইয়াছিল যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনটি পশ্চিমী শক্তির দখলকারী সেনাবাহিনীর বদলে রাষ্ট্রসংঘের পতাকাবাহী অন্য কতকগুলি রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সেখানে মোতায়েন থাকিবে। এই বছরের গত ১০ই জুলাই তারিখে মস্কোয় সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্য বিশ্ব-কংগ্রেসে সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের প্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভ ইহা ঘোষণা করেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তাগণ সহ নেতৃস্থানীয় পশ্চিমী কর্মকর্তাগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে বর্তমানে যে প্রধান প্রশ্নটি সম্পর্কে শক্তিগুলির মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে তাহা হইল পশ্চিম বার্লিন হইতে ত্রিশক্তির দখলকারী সেনাবাহিনীকে অপসারিত করিয়া লইবার প্রশ্ন।

হাঁ, ইহাই হইল সোভিয়েত পক্ষেরও প্রধান মীমাংসাধীন বিষয়। ইহা জানা কথা যে অন্যান্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সুনির্দিষ্ট মতভেদ রহিয়াছে—যেগুলি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতবিনিময়মূলক আলোচনার কালে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। কিন্তু তিন পাশ্চাত্য শক্তির দখলদারী ফৌজের অস্তিত্বই হইল মতৈক্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা। পশ্চিম বার্লিনে "নাটো"র সামরিক ঘাঁটি রক্ষায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্মত হইবে না এবং এই সম্মতির সমস্ত আশাই হইল নিতান্ত অবাস্তব। ইউরোপের কেন্দ্রে ও রাষ্ট্রসমূহের সমাজতান্ত্রিক কমনওয়েলথ-এর অভ্যন্তরে এমন একটি বারুদের পিপে রাখিতে সম্মতি দেওয়া অসম্ভব যে-পিপেটি যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ইউরোপের শান্তিকে চিরতরে খতম করিয়া দিতে পারে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর খুব সম্প্রতি এমন একটি বিবৃতি দিয়াছে যাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে পশ্চিম বার্লিনে ত্রিশক্তির সেনাবাহিনীকে মোতায়েন রাখার প্রশ্নে ও "নাটো"র এক সামরিক ঘাঁটি হিসাবে পশ্চিম বার্লিনকে রাখার প্রয়োজনে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট তাহার পূর্বেকার অবাস্তব নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকেই আঁকড়াইয়া আছে। অতএব, ইহাই যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী হয় তাহা হইলে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যান্য শান্তিপ্রয়াসী রাষ্ট্রগুলির সহিত একযোগে জার্মাণ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের বিষয়টির মীমাংসা করিতে হইবে এবং উহারই ভিত্তিতে পশ্চিম-বার্লিনের অবস্থার মীমাংসা ঘটাইতে হইবে। পশ্চিমী শক্তিগুলির যোগদান ব্যতিরেকেই জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হইলে সেই দেশের সমগ্র ভূখণ্ড ব্যাপিয়া এক নূতন অবস্থা দেখা দিবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জেরগুলি হইতে মুক্ত হইয়া জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহা জমি ও আকাশসীমার মধ্য দিয়া যে যোগাযোগ ও পরিবহনের পথগুলি গিয়াছে সেইগুলির উপরে ইহার নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। একথা বারম্বার বলা হইয়াছে যে, এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর পশ্চিম বার্লিনকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি এক মুক্ত বেসামরিকীকৃত নগরী হিসাবে গণ্য করিবে—ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত ফলাফলসহ।

অর্থাৎ, জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সহিত শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্র সেই একই ভাবে চলিবে যে ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার কয়েকটি "নাটো" মিত্রদেশ সমরবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যতম দেশ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিনা সম্মতিতে জাপানের সহিত এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র শান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর এক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে ও চলিবে, জার্মাণ শান্তি মীমাংসার বিষয়টি সম্পর্কেও সে এই নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স অথবা পশ্চিম জার্মাণি—কোনো রাষ্ট্রের সহিতই সম্পর্কের অবনতি ঘটানো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে। সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট বেশ কিছু বৎসর ধরিয়া ধৈর্যের সহিত প্রয়াস চালাইতেছিল যাহাতে তাহার ভূতপূর্ব মিত্রদেশগুলির সহিত মতৈক্যের ভিত্তিতে জার্মাণ শান্তি মীমাংসার সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধান হইতে পারে। সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট এখনো ইহা আশা করে যে, বর্তমান অবস্থাও এক জার্মাণ শান্তিচুক্তির অভাব যে এক সামরিক সর্বনাশের অভিমুখেই চলিয়াছে তাহা পশ্চিম জার্মাণি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তি উপলব্ধি করিবে।

জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সহিত এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিলে—যদি পশ্চিমী শক্তিগুলি নিতান্তই কোনো মতৈক্যে আসিতে রাজি না হয় তাহা হইলে মধ্য ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ রূপে বদলাইয়া যাইবে, যুদ্ধের জেরগুলি চুকাইয়া ফেলিয়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কোন্নয়নের পথ পরিষ্কার হইবে, পশ্চিম বার্লিনের অবস্থা স্বাভাবিক হইবে এবং যে সব বিতর্ক বহু বৎসর ধরিয়া আন্তর্জাতিক মন কষাকষি বাড়াইয়া তুলিতেছে ও ইউরোপে এক অসুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে সেই সব বিতর্কের অবসান ঘটাইবে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির এই শান্তিপূর্ণ পথই সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট প্রধান কর্তৃক সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্য বিশ্ব-কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে ঐকান্তিকতার সহিত ঘোষিত হইয়াছে।

—আম্যমাণ।

Never doubt your wife's judgment—look who she married.

—*George Noble.*

## আষাঢ়, ১৩৬৯ ( জুন-জুলাই, '৬২ )

**অন্তর্দেশীয়—**

১লা আষাঢ় ( ১৬ই জুন ) : নয়াদিল্লীতে পরমাণু অস্ত্র বিরোধী সম্মেলনের উদ্বোধন—উদ্বোধনী ভাষণে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক ভারতের এক তরফা নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব।

মেডিক্যাল ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় ( কলিকাতা ) কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধের অবসান—২৩শে জুলাই স্থগিত এম-বি-বি-এস পরীক্ষার তারিখ ধার্য্য।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর (৮০) লোকান্তর।

২রা আষাঢ় ( ১৭ই জুন ) : দিল্লীতে শ্রীনেহরুর ( প্রধান মন্ত্রী ) সহিত বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব মিঃ ডানকান স্যাণ্ডিসের বৈঠক—ইউরোপীয় সাধারণ বাজার, রুশ জঙ্গী 'মিগ' বিমান ক্রয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা।

৩রা আষাঢ় ( ১৮ই জুন ) : আণবিক অস্ত্র-বিমুক্ত অঞ্চল গঠনের জন্য শ্রীনেহরুর আবেদন—দিল্লীতে পরমাণু অস্ত্র বিরোধী সম্মেলনে বক্তৃতা—একক নিরস্ত্রীকরণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে পরমাণু শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান।

৪ঠা আষাঢ় ( ১৯শে জুন ) : চীন সরকারের নিকট ভারতের কড়া নোট—'কাশ্মীরের প্রশ্নে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ভারত মানিবে-না।'

৫ই আষাঢ় ( ২০শে জুন ) : পূর্ব পাকিস্তানের নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন প্রশ্নে লোকসভায় তুমুল হট্টগোল—অবিলম্বে সর্ব্বরকম সাহায্যের সরকারী প্রতিশ্রুতি দাবী।

৬ই আষাঢ় (২১শে জুন) : তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণে আমেরিকা কর্ত্তৃক ভারতকে আরও প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা ঋণদানের সম্মতি।

৭ই আষাঢ় ( ২২শে জুন ) : সীমান্ত প্রশ্ন মীমাংসার জন্য চীন সরকারের নিকট ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর পুনরায় প্রস্তাব।

৮ই আষাঢ় ( ২৩শে জুন ) : রাজসাহী ( পূর্ব্ব-পাকিস্তান ) হইতে নবাগত সাঁওতাল শরণার্থীদের দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের সরকারী সিদ্ধান্ত।

৯ই আষাঢ় ( ২৪শে জুন ) : হুগলী নদীর ( গঙ্গা ) উপর নূতন সেতু নির্ম্মাণের পরিকল্পনা—প্রয়োজনীয় অর্থদানে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সম্মতি।

১০ই আষাঢ় ( ২৫শে জুন ) : ভারতের বিরুদ্ধে পাক নেতৃবৃন্দের অব্যাহত বিষোদ্গার—পাকিস্তানী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের তীব্র প্রতিবাদ।

১১ই আষাঢ় ( ২৬শে জুন ) : কলিকাতা মহানগরীতে কলেরার মহামারী ঘোষণা—বিভিন্ন ওয়ার্ডে ব্যাধির প্রকোপ।

১২ই আষাঢ় ( ২৭শে জুন ) : প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পাণ্ডু-আমিনগাঁও ফেরী সার্ভিস বন্ধ—ব্রহ্মপুত্রের দুইতীরে হাজার হাজার যাত্রী আটক।

১৩ই আষাঢ় ( ২৮শে জুন ) : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ( ১৯৬২ ) ফলাফল প্রকাশ—স্কুল ফাইন্যালে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর শতকরা ৪২.৮৬ জন এবং উঃ মাঃ পরীক্ষায় শতকরা ৫৮.১ জন কৃতকার্য্য।

১৪ই আষাঢ় ( ২৯শে জুন ) : কোশী ও বাগমতীর জলস্ফীতিতে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত—সহর্ষ, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর ও মুঙ্গের জেলায় ( বিহার ) বিস্তর ক্ষতি।

১৫ই আষাঢ় ( ৩০শে জুন ) : কলিকাতায় রাষ্ট্রপতি হিসাবে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের প্রথম উপস্থিতি—হাওড়া ষ্টেশন হইতে সরাসরি অসুস্থ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার বাসভবনে সাক্ষাৎকার।

১৬ই আষাঢ় ( ১লা জুলাই ) : জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, স্বনামধন্য চিকিৎসাবিদ্, 'ভারতরত্ন' ডাঃ বিধানচন্দ্রের জীবনদীপ নির্ব্বাণ—৮১তম জন্মদিবসে মহান্ জননেতার কর্ম্মমুখর জীবনের সমাপ্তি—দেশের সর্ব্বত্র যুগপৎ গভীর শোকের ছায়াপাত।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি 'ভারতরত্ন' শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের (৮০) এলাহাবাদে জীবনাবসান।

১৭ই আষাঢ় ( ২রা জুলাই ) : কর্ম্মযোগী ডাঃ রায়ের মৃতদেহ লইয়া মহানগরীতে ( কলিকাতা ) অভূতপূর্ব্ব শোকযাত্রা—কেওড়াতলা বৈদ্যুতিক চুল্লীতে দেশনায়কের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও কৃষিসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত।

১৮ই আষাঢ় ( ৩রা জুলাই ) : 'রাজসাহী হইতে প্রত্যহ প্রায় তিন শত শরণার্থীর মালদহে আগমন হইতেছে'—মালদহ সফরান্তে শ্রীনেহরুর ( প্রধান মন্ত্রী ) নিকট ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির নেতা শ্রীএন্-সি চ্যাটার্জীর লিপি।

১৯শে আষাঢ় ( ৪ঠা জুলাই ) : শিল্পনগর দুর্গাপুরের নাম 'বিধান নগর' করার জন্য প্রস্তাব—ময়দানে ( কলিকাতা ) বিরাট শোকসভায় পরলোকগত ডাঃ রায় 'কর্ম্মযোগী' আখ্যায় ভূষিত—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীঅতুল্য ঘোষকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করিয়া বিধানচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠন।

ভারতের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের বেতন ও মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি—দেশাই ( বিচারপতি ) ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদ প্রকাশ—রোয়েদাদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ব্যাপক অসন্তোষ।

২০শে আষাঢ় ( ৫ই জুলাই ) : কলিকাতাকে কলেরা বিমুক্ত করার জন্য কয়েকটি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে কর্পোরেশন ও সরকারের যৌথ সিদ্ধান্ত।

২১শে আষাঢ় ( ৬ই জুলাই ) : চীন কর্ত্তৃক কাশ্মীরের উপর, ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব অস্বীকার—লাডাক অঞ্চলে নূতন রাস্তা ও সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণের সংবাদ।

২২শে আষাঢ় (৭ই জুলাই) : প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ বোম্বাই অঞ্চলে প্রায় এক শত যাত্রীবাহী ইটালীয় বিমান-বিধ্বস্ত—পুণা হইতে ভূপালের পথে ভারতীয় বিমানবহরের একটি ক্যানবেরা বিমানও নিখোঁজ।

২৩শে আষাঢ় ( ৮ই জুলাই ) : পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা হিসাবে রাজ্যের অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত।

২৪শে আষাঢ় ( ৯ই জুলাই ) : শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের ( মুখ্যমন্ত্রী ) নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ সম্পন্ন।

ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রী বি, পি, সিংহ কর্তৃক কলিকাতা হাইকোর্টের শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন।

'কেরলে কংগ্রেস পি-এস-পি কোয়ালিশন সরকারই চলিবে'—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

২৫শে আষাঢ় (১০ই জুলাই): চীনা সৈন্যদল কর্তৃক লাডাক এলাকায় ভারতীয় ঘাঁটি পরিবেষ্টন—ভারত সরকারের তীব্র প্রতিবাদ।

২৬শে আষাঢ় (১১ই জুলাই): 'ত্রিপুরা রাজ্যে অন্ততঃ ত্রিশ হাজার পাকিস্তানী নাগরিক বসবাস করিতেছে'—রাজ্যের চীফ কমিশনার শ্রীএন, এম্ পটনায়ক কর্তৃক তথ্য প্রকাশ।

২৭শে আষাঢ় (১২ই জুলাই): 'গালোয়ান উপত্যকাস্থিত ভারতীয় ঘাঁটি (লাডাক) কিছুতেই ছাড়া হইবে না'—চীনা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের কঠিন সঙ্কল্প ঘোষণা।

২৮শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই): ভারতীয় এলাকায় চীনের নয়টি নূতন ঘাঁটি স্থাপনের সংবাদ—ভারতের আর এক দফা প্রতিবাদ।

২৯শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই): গালোয়ান হইতে চীনা সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ—ভারতীয় ফৌজের দৃঢ়তা ও ভারত সরকারের সতর্কবাণীর জের।

৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই): কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থলে 'বিধানচন্দ্র দিবস' পালন—কর্মযোগী ডাঃ রায়ের স্মৃতিতে সর্বত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই): 'কর্মচারী ছাঁটাই প্রতিরোধের জন্য আইন প্রণয়ন প্রশ্নটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে'—রাজ্য বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহারের ঘোষণা।

### বহির্দেশীয়—

২রা আষাঢ় (১৭ই জুন): অবিলম্বে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী—প্রাদেশিক আইনসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মুলতুবী প্রস্তাব পাশ।

৩রা আষাঢ় (১৮ই জুন): লাহোরে বিরাট জনসভায় পাকিস্তানে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্মিলিত দাবী জ্ঞাপন।

৫ই আষাঢ় (২০শে জুন): পাক্-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের আদেশক্রমে পাকিস্তানে ৮ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত ভারতীয় সামরিক অফিসার লে: কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের দণ্ড ৪ বৎসর হ্রাস।

৭ই আষাঢ় (২২শে জুন): কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের সুপারিশ—রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ।

৮ই আষাঢ় (২৩শে জুন): কাশ্মীর সংক্রান্ত আইরিশ প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'ভেটো' প্রয়োগ—নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের দরদী পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের (আমেরিকা সমেত) চক্রান্ত বানচাল।

শেষ অবধি লাওসে ত্রিদলীয় মন্ত্রিসভা (কোয়ালিশন) গঠন—প্রধান মন্ত্রীপদে নিরপেক্ষতাবাদী প্রিন্স সুভন্না ফৌমা নিযুক্ত।

৯ই আষাঢ় (২৪শে জুন): দশ বৎসর গৃহযুদ্ধ চলার পর সমগ্র লাওসেই অস্ত্রবিরতি—অস্থায়ী লাওস সরকারের প্রথম নির্দ্দেশনামা।

১১ই আষাঢ় (২৬শে জুন): বিচ্ছিন্ন কাটাঙ্গার সহিত আপোষ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ—কঙ্গোলী প্রধান মন্ত্রী আদোলার ঘোষণা।

১৩ই আষাঢ় (২৮শে জুন): স্যার উইনষ্টন চার্চিল (বৃটেনের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী) হোটেলে পড়িয়া যাইয়া গুরুতর আহত।

১৬ই আষাঢ় (১লা জুলাই): আলজিরিয়ার সর্বত্র প্রতীক্ষিত গণভোট গ্রহণ—ফ্রান্সের সহযোগিতায় স্বাধীনতার প্রস্তাবে ব্যাপক সমর্থন ঘোষিত।

১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই): ১৩২ বৎসরব্যাপী পরাধীনতার পর সংগ্রামী আলজিরিয়ার স্বাধীনতা অর্জ্জন—অস্থায়ী সরকারের হাতে ফ্রান্সের ক্ষমতা হস্তান্তর।

২১শে আষাঢ় (৬ই জুলাই): নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিণ ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ফকনারের (৬৪) জীবনাবসান।

২২শে আষাঢ় (৭ই জুলাই) রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—১৫জন নিহত ও ২২জন আহত—অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ।

২৩শে আষাঢ় (৮ই জুলাই): পাকিস্তানে আয়ুবী শাসনতন্ত্রের অবসান এবং তৎস্থলে নয়া গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের দৃঢ় দাবী—ঢাকায় বিরাট জনসমাবেশে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত।

২৪শে আষাঢ় (৯ই জুলাই): মস্কো-এ নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব শান্তি সম্মেলন আরম্ভ—ভারত সমেত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের যোগদান।

২৫শে আষাঢ় (১০ই জুলাই): মহাশূন্য পথে টেলিভিশন প্রেরণের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আমেরিকা কর্তৃক 'টেলষ্টার' উপগ্রহ (কৃত্রিম) কক্ষপথে স্থাপন—বার্তা আদানপ্রদানের সর্ব্বাধুনিক ব্যবস্থার সর্বত্র বিস্ময় সঞ্চার।

২৭শে আষাঢ় (১২ই জুলাই): আটলাণ্টিকের পরপারে (ইউরোপ) 'টেলষ্টার'-এর মারফৎ প্রথম টেলিভিশন চিত্র প্রেরণ—পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী মার্কিণ বার্তাবহ কৃত্রিম উপগ্রহের কৃতিত্ব।

২৮শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই): বৃটিশ মন্ত্রিসভায় চাঞ্চল্যকর রদবদল—অর্থমন্ত্রী সেলুইন লয়েড সহ ৭ জন মন্ত্রীর পদত্যাগ—প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান কর্তৃক মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন।

২৯শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই): মহাকাশচারীদের উপর মহাজাগতিক বিকিরণের সম্ভাব্য ফলাফল পরীক্ষার চেষ্টা—আমেরিকা কর্তৃক বেলুনযোগে মহাশূন্যে বানর, ইঁদুর ও গোবরে পোকা প্রেরণ।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই): এক মাস বিরতির পর জেনেভায় আবার ১৭ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ।

### এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি পৌরাণিক নিদর্শনের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রটি শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত।

বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক রেনোয়াঁ
মুক্তঅঙ্গন ষ্টুডিওতে পরিচালনারত

# রে নো য়াঁ

( পৃথিবীখ্যাত পরিচালকের চিন্তাধারা )

এ দেশের দর্শক সাধারণের পিপাসুচিত্তে আনন্দরস সঞ্চারে বিদেশী ছবিগুলির ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। এই সর্বজনবিদিত তত্ত্বটি সম্পর্কে আজকের দিনে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবু, এই বিপুলচিত্র সম্ভারের মধ্যে এমন কতকগুলি ছবি আসে যেগুলি এক চিরন্তন আবেদন নিয়ে স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকে, স্মৃতির পট থেকে তাদের স্বাক্ষর কখনো মুছে যায় না। কি আঙ্গিকে, কি বিন্যাসে, কি কাহিনীর বলিষ্ঠতায়, কি অভিনয় দক্ষতায়, কি পরিচালন নৈপুণ্যে যে কোন কারণেই হোক সেই বিশেষজাতীয় ছবিগুলি মনের মধ্যে এক বিশেষ আসন অধিকারে সমর্থ হয়। রিভার সেই বিশেষজাতীয় ছবিগুলির অন্যতম। রিভার আমাদের মধ্যে স্মরণীয়। কলকাতায় গৃহীত হয়। পরিচালক জাঁন রেনোয়াঁর কৃতিত্বের একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

রেনোয়াঁকে শুধু পরিচালক বললে ভুল হয়। আসলে তিনি জীবনরসিক, তিনি জীবন রসের সন্ধানী, বৈশিষ্ট্যের এবং বৈচিত্র্যের এই মানুষটির মধ্যে এক অপূর্ব সম্মেলন ঘটেছে। রেনোয়াঁর আর একটি প্রধান গুণ মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন সেদিক দিয়ে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের অলিখিত ভাষা সম্বন্ধেও তাঁকে বিশেষজ্ঞ বললে হয় না অতিরঞ্জন।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত "দাদাঠাকুর" চিত্রের নাম ভূমিকায় স্বর্গত ছবি বিশ্বাস

রেনোয়াঁ সেই কাহিনীরই চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হন যার সঙ্গে তিনি তাঁর অন্তরের ভাষার মিল খুঁজে পান। যে কাহিনীর বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের বক্তব্য মিলে যায় তারই চিত্ররূপ দিতে তিনি অগ্রসর হন। যার বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর আপন বক্তব্য মেলে না তার মধ্যে যত সম্ভাবনার ঔজ্জ্বল্যই থাক—রেনোয়াঁর স্পর্শ থেকে সে থেকে যাবে চিরবঞ্চিত।—রেনোয়াঁর নতুন ছবি "কাপোরাল ইপিঙ্গল"। এই ছবিটি তাঁর পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না এমন কি এর কাহিনীর সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন না, একজন এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন গল্পটি পড়ে তিনি আনন্দ পান অর্থাৎ মনে মনে মিল পাওয়া যায়। তিনি বুঝতে পারলেন যে এই কাহিনীর সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। এর সঙ্গে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মিলিয়ে দিতে পারবেন।

লা গ্রাঁদ ইলুসিয়াঁকে দর্শক সাধারণ পেল কি করে? আসলে এর বৈশিষ্ট্যই মুগ্ধ করেছিল রেনোয়াঁকে। এর মধ্যে এক নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রমের অঙ্গীকার দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। রেনোয়াঁ সন্ধানী। তাই যে কাহিনীটির মধ্যে তিনি গতানুগতিকতা বর্জনের চিহ্ন পান তাকেই গ্রহণ করেন। মামুলী পথ পরিহার করে রূপ নিয়েছিল ইলুসিঁয়ার কাহিনী। দেখা দিয়েছিল সে অভিনব বৈশিষ্ট্যে এবং বলিষ্ঠ বক্তব্যে সমৃদ্ধ হয়ে। রেনোয়াঁ ঘটনার চেয়ে সময়ের উপরই বেশী জোর দেন। তাঁর ধারণা সময়ই ঘটনার নিয়ন্ত্রণকর্তা। প্রথম মহাযুদ্ধের থেকেও ১৯১৪ সালটিকে তিনি বেশী প্রাধান্য দেন, তাঁর মতে ১৯১৪ সাল সময়টিই মহাযুদ্ধ সম্ভবপর করেছিল। সময়ই

যখন কিশোরী ছিলাম—এই পর্য্যায়ে পৃথিবীবিখ্যাত কয়েকজন বিদেশিনী অভিনেত্রীর আলোকচিত্র দুই পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশ করা হল। তন্মধ্যে আছেন—যথা : আন্টোনেলা লুয়ালি ( ইতালি )

ইলুসিয়ঁার মত "লা বেল অ তাঁরজু" প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। এই ছবিকে রেনোয়াঁ অবশ্য ঠিক ছবি হিসেবে খুব মূল্য দেন না একে সুসংস্কৃত প্রামাণ্যচিত্র হিসেবেই তিনি নির্মাণ করেছেন। এ তাঁরই নিজের ধারণা। এই ছবির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রামাণ্যচিত্র তিনি দিয়েছেন—সে সমাজ আজ বদলে গেছে তা তিনি বারংবার স্বীকার করেন এবং তা স্বাভাবিক বলেই মনে করেন, তথাপি একটি সমাজের অবস্থা নিপুণভাবে অঙ্কিত করতে পারার একটি আলাদা মূল্য আছে। রেনোয়াঁর মতে বহির্বাস্তবতা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তা আসলে হচ্ছে অন্তর্সত্যের একটি অভিব্যক্তি বা প্রতীকমাত্র।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসঙ্গীতের মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে যেমন এক বিষাদকরুণ সুর ভেসে আসে তেমনই নানাদিক দিয়ে মিলন সত্ত্বেও প্রাচী ও প্রতীচির মধ্যে কি যেন এক বৈষম্যের বীজও ফুটে ওঠে যেটা এক অদৃশ্য বাধার প্রাচীরের রূপ নিয়ে পূর্ব আর পশ্চিমকে এক নির্দিষ্ট জায়গায় কিছুতেই মিলতে দিচ্ছে না। আপনার আমার মত এবিষয়ে রেনোয়াঁও কম সচেতন নন। তাঁর মতে রাজনীতি আজ পৃথিবীকে বহুধাবিভক্ত করে ফেলেছে আর এই বাধাগুলোও অলীক নয় কিন্তু তাঁর নিজস্ব ভাবধারা বলছে যে এগুলো অনলীকও নয় তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন যে সহস্র বাধার মধ্যে এক বলিষ্ঠ মিলনের শক্তিও অস্তিত্ববিহীন নয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে আজকে আন্তর্জাতিক পৃথিবীর রূপ বদলে দেয়। এক একটি নির্দিষ্ট সময় আসে যখন সমাজের অবয়ব ভিন্নরূপ ধারণ করে। সময়ের প্রভাবে সমাজকে একটা বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়, এই পরিপ্রেক্ষিতে ইলুসিয়ঁার কাহিনী গড়ে উঠেছিল—সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এই বক্তব্যই প্রচারিত হয়েছিল। ১৯১৪ সালের ইয়োরোপ কেবলমাত্র রাজনীতিরই অন্তর্গত ছিল, রেনোয়াঁর অভিমতে ১৯৩৯ এর ইয়োরোপ কেবলমাত্র রাজনীতিরই নয় সঙ্ঘবদ্ধতারও, এই সময়ে সঙ্ঘবদ্ধতার এক বিরাট আবেদন জেগেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেকটা এই সঙ্ঘবদ্ধতা থেকেও জন্ম নিয়েছিল। এই সঙ্ঘবদ্ধতাই বলতে গেলে হিটলারকে পরাজিত করে। রেনোয়াঁ কোন কিছুরই স্থায়িত্বে বিশ্বাসী নন—তাঁর ধারণা কিছুই চিরকালের দাবী নিয়ে আসে না। তিনি বলেন জীবনের গতি থেকেই চলচ্চিত্রে গতি আসে। জীবনের চলার পথে আমরা নিয়ত যে গতিবেগ দ্বারা পরিচালিত হই সেই গতিবেগকে যথাযথভাবে চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করতে পারলে সেই ছবি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে।

জ্যাকলিন গথিয়ার ( ফ্রান্স )

চলচ্চিত্র জগতে যে নতুনত্বের উপাসনা প্রতীয়মান হচ্ছে সেই উপাসনার প্রথম মন্ত্রোচ্চারণের গৌরব ইটালির প্রাপ্য। চলচ্চিত্র জগতের এই নবদিগন্তের দ্বারোম্মোচন ইটালিই প্রথম করে। রেনোয়াঁর মতে কোন কিছুই সকল দেশে একসঙ্গে হতে পারে না। এই নতুনত্বের সাধনার সূত্রপাত ইটালি করেছে ঠিকই, তবে ইংল্যাণ্ড পরবর্তীকালে যদি তাতে যোগ দেয় এবং তার ফলে রসিকসমাজে খুব একটা কিছু অভিনব উপহার দেয় তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। রেনোয়াঁ লক্ষ্য করেছেন যে, ইংল্যাণ্ডের জীবনধারার পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। কয়েক বছর আগেও এই দেশের মানুষগুলির আচার-আচরণ পদক্ষেপ অত্যন্ত বাঁধাধরার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, রেনোয়াঁ আধুনিককালে কয়েকটি বৃটিশ সাংবাদিককে দেখেছেন নিপোলিটানদের মত ব্যবহার করতে এমন কি তিনি লক্ষ্য করেছেন যে সেদিক দিয়ে নিপোলিটানদেরও আজ বৃটিশ অতিক্রম করে গেছে। তিনি দেখেছেন যে এক হোটেলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁরা যেভাবে আনন্দ-কৌতুকে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তা থেকে ঠিক ইংল্যাণ্ডের আমাদের মনের মধ্যে গাঁথা মূর্তিটি কল্পনা করা যায় না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলেও সব চেয়ে যেটি লক্ষ্য করার বিষয় সেটি হচ্ছে ওখানকার চলচ্চিত্রের তটভূমিকে এই পরিবর্তনের ঢেউ স্পর্শ করতে পারেনি। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের স্পষ্ট স্বাক্ষর ধরা পড়েছে কিন্তু ছায়াছবি এই পরিবর্তনের গণ্ডী থেকে অনেক দূরে। ছায়াছবির মধ্যেই তার সেই নির্দিষ্ট রূপের প্রকাশ এখনও ঘটে চলেছে।

রেনোয়াঁ ব্যক্তিত্বের পূজারী। ব্যক্তি থেকে যে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব সেই ব্যক্তিত্ব চিরদিন পেয়ে থাকে তাঁর শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। রেনোয়াঁ মনে করেন যে জগতে আজ পর্যন্ত যত কিছু বিরাট সৃষ্টি, আন্দোলন, রূপান্তরণ প্রভৃতি ঘটেছে কয়েকটি মানুষই বলতে গেলে তার মূল। তাঁদের কয়েকজনের প্রচেষ্টায় বীজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। অবশ্য কালক্রমে তাঁদের পাশে অনেকে এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সারা জাতি

রোসানা পোডেষ্টা (ইতালী)

এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁদের কণ্ঠে মিলিয়েছে কণ্ঠ। তাঁদের দিয়েছে অকুণ্ঠ সহযোগিতা কিন্তু তাদের নিজেদের পাশে টেনে আনাও তো কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। চলচ্চিত্রের মধ্যে যে নতুন আন্দোলন দেখা দিয়েছে তার মূল তাঁর মতে "কেহিয়ারস গ্রুপ", ইংল্যাণ্ডের প্রামাণ্য চিত্রজগতেও এই নতুনত্বের অভিযানের পথ দেখিয়েছিলেন কাভালকান্তি।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রামাণ্য চিত্র খুব কি একটা প্রাধান্যের অধিকারী? তারও উত্তর পাওয়া গেছে, চিন্তাশীল পরিচালকের কাছ থেকে। তাঁর মতে চলচ্চিত্রের সামগ্রিক উন্নয়নে এর বিরাট ভূমিকা। নিজের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন যে এটি বলতে গেলে শিক্ষার্জনের প্রধান সহায়ক। নতুন

সোফিয়া লোরেন (ইতালি)

ইলানোরা রোসি ড্রাগো (ইতালি)

জিনা লোলোব্রিজিডা (ইতালি)
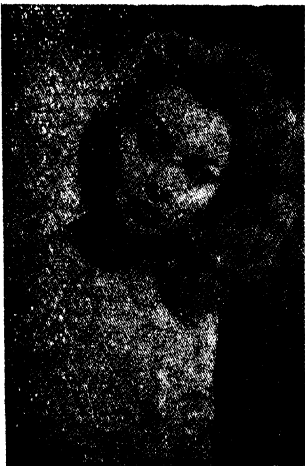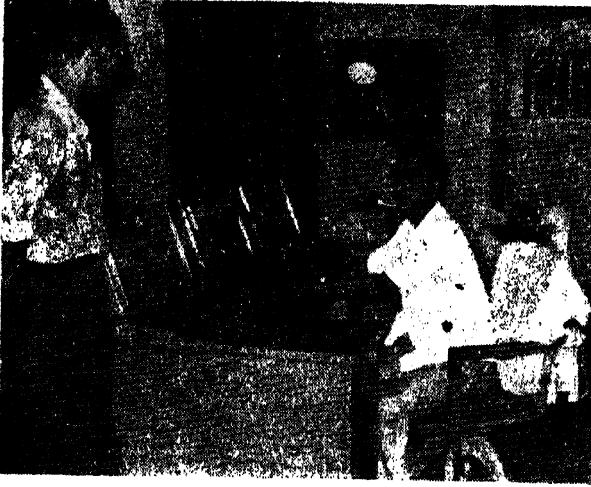
কর্মরত অবস্থায় শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সহকারী সৌম্যেন চট্টোপাধ্যায়

রেনোয়াঁ বলিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। ক্রফার ছবিতে তাঁর মতে কিছু কিছু ভুল ত্রুটি বা শূন্যতা কিম্বা অসংহতি থাকলেও তার মধ্যে এক বিরাট মানবিক আবেদন আছে যা ছবিটির বিরাট সম্পদ এবং যাকে স্বীকার না করার পিছনে কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।

রেনোয়াঁ শুধু চলচ্চিত্রকেই সমৃদ্ধ করেননি, রঙ্গমঞ্চ তাঁর দ্বারা নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। রঙ্গমঞ্চেরও কল্যাণে ইনি বিরাট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আপাততঃ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এঁর প্রত্যক্ষ যোগটা ছিন্ন হয়েছে। বোধ করি সাময়িক, কারণ এটা তিনি একবার নিজে বলেছিলেন যে কোন কিছুই তিনি ত্যাগ করেননি তবে থিয়েটারেরই মধ্যে এখন তিনি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না যা তাঁর চিন্তাধারাকে আকর্ষণ করতে পারে। [ ক্রমশঃ।

পরিচালকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন এইখান থেকেই নানাভাবে হয়ে থাকে, তাঁদের যাত্রারম্ভের এইভাবেই পথ প্রশস্ত হয়। অনেক বিশিষ্ট পরিচালকের জীবনেতিহাসের পাতাগুলোয় চোখ বোলালে এ সম্বন্ধে ধারণা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে রেনঁরি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

আজকের দিনে ইংল্যাণ্ডের য়্যাঙ্গরি ইয়াঙ্গ মেনদের বিষয়ে চতুর্দিকে খুবই শোনা যাচ্ছে। এঁরা এক বিশেষ ধারণার অনুসরণকারী। এঁরা মনে করেন যে—যে কাহিনীর মধ্যে কোন স্বীকারোক্তি নেই তা কাহিনী পদবাচ্যই নয়। ক্রফার "জুলে এত জিম" ছবিখানি প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচক তো বলেই ফেললেন যে ওর মধ্যে কিইবা গুরুত্ব আছে, কোন স্বীকারোক্তিই যেখানে নেই। আশ্চর্য, স্বীকারোক্তি নেই বলে তার কোন গুরুত্বকে এই ধারা অনুসারীর দল স্বীকৃতি দিতে রাজী নন। রেনোয়াঁ গুরুত্ব দেন মানবিক আবেদনে,

চিত্র গ্রহণের অবসরে শব্দযন্ত্রী সৌম্যেন চট্টোপাধ্যায়সহ শিল্পীদ্বয়: পার্শ্বপ্রতিম শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী ও সমরকুমার।

# মঞ্চাভিনয় প্রসঙ্গে বারটল্ট ব্রেখট

প্রখ্যাত নাট্যকার বারটল্ট ব্রেখটের মতবাদ প্রচারের পূর্বে জার্মাণী তথা ইউরোপীয় নাটকে আঙ্গিকের প্রাবল্য ছিল বেশী। কিন্তু ব্রেখটের আগমনের পর মঞ্চ জগতে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে; আমাদের মনে হয়, তিনি অল্প বয়সে যদি মারা না যেতেন তাহলে বিশ্ব মঞ্চাভিনয়ে অনেক আঙ্গিক বর্জিত নূতনত্ব আনয়ন তাঁর পক্ষে সম্ভব হত।

আশ্চর্যের কথা এই যে, যে ব্রেখটের নাম তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অনেকের কাছেই অজানা ছিল, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রখ্যাত নাট্যকার হিসেবে বারটল্ট-এর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ তিনি সংস্কারবাদী ছিলেন না—অত্যধিক নীতি নির্ভর ছিলেন তিনি। পূর্বসূরীদের বক্তব্যকে ব্রেখট কখনও অন্ধভাবে সমর্থন করেননি। তাই নাটকের আঙ্গিকের উগ্রতার বিরুদ্ধে তিনি নানা কথা বলেছেন—প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক ষ্ট্যানিসলভস্কির মতকে তিনি মেনে নেননি। বাস্তববাদ ও সাংকেতিকতা তাঁর নাটকে এ দুয়েরই স্থান আছে, কিন্তু কোনটিই একেবারে উগ্র হয়ে ওঠেনি।

একটি ক্ষেত্রে ব্রেখট ও ষ্ট্যানিসলভস্কির মধ্যে চূড়ান্ত মতবৈষম্য দেখা যায়। আশ্চর্য এই যে, উভয়ের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। ষ্ট্যানিসলভস্কি বলেন, নাটকের সাসপেন্স এমন অবস্থায় আসবে যখন অভিনেতা ও দর্শক এক সত্তা হয়ে যাবে, দর্শক নিজেকে অভিনেতা মনে করে হাসবে, কাঁদবে,—অর্থাৎ এই জাতীয় ইলুউশন সৃষ্টির ফলে নাটকাভিনয় রসগ্রাহী হয়ে ওঠে। অথচ এ মতবাদে ভ্রান্তি আছে। কেন না, সাধারণ অর্থে যাকে সাসপেন্স বলা হয়, নাটকে সাসপেন্স বলতে তার চেয়েও বেশী কিছু বোঝায়। 'নাটকের সাসপেন্স হচ্ছে, সেই জিনিস—যে জিনিস সম্বন্ধে দর্শক পূর্বেই ধারণা করে বসে থাকবে, শুধু তার এইটুকু আগ্রহ থাকবে

আচ্ছা দেখি না—ঘটনার ত' পরিণতি এইরকম হবে বুঝতে পারছি, কিন্তু কেমন করে ত' হয়।'

তাই ব্রেখট ষ্টানিসলভস্কির উপরোক্ত মতকে সমর্থন করেননি। তাঁর মতে শিল্পী ও দর্শকের একাত্মতাই নাটকের চরমোৎকর্ষের পরিচয় দেয় না। ব্রেখটের মতে দর্শক থাকবে নিজের মধ্যে। তাহলেই তার মন সমালোচনার অনুসারী হতে পারবে। শিল্পীর সঙ্গে নিজেকে সে identify করবে না। একে বলা হয় ব্রেখটের Theory of Alienation.

আগেই বলেছি, নাটকে আঙ্গিক অভিনয়কে ছাপিয়ে ওঠার বিরুদ্ধে ব্রেখট এগিয়ে গেছেন। ফাঁকা বাক্যে, আঙ্গিক সর্বস্বে ও রচনার সম্বন্ধহীন রূপকল্পনায় কোন নাট্যাভিনয়ই শিক্ষিত দর্শকদের পরিতৃপ্ত করতে পারে না—একথা বলেছেন ব্রেখট নিজে। আশার কথা, বাংলা দেশের নাট্যরসিক মহল থেকে বর্তমানে নাটকে আঙ্গিকের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা করা হচ্ছে। তার কারণ, আলো আর দৃশ্যসজ্জার ভেল্কী দেখিয়ে এক জাতীয় দর্শককে অবশ্য মুগ্ধ করা যায় কিন্তু সত্যকার শিল্পরসিকদের মনে আনন্দ দিতে পারে না। অভিনয় ম্যাজিক নয়, বিপরীতে বলা যায় অভিনয় হচ্ছে জীবনবৃত্তের অনুকরণ। সেখানে আঙ্গিক কেন প্রধান হবে?

ব্রেখটের নাট্য প্রযোজনায় অভিনয়ের স্থান ছিল তাই সর্বাগ্রে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর নাটকগুলি বিচার্য। নাটককে মঞ্চে ত্রুটিহীনভাবে উপস্থাপনার স্বপ্নই শুধু তিনি দেখেন নি। তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল যথেষ্ট। তিনি লণ্ডনের ম্যালেস থিয়েটারে তিন সপ্তাহের জন্য একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন—যার প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করেন তৎকালের রূপবতী অভিনেত্রী ব্রেখট-জায়া Helene Weigll—।

মাননীয় অশোক সেন মহাশয় লিখেছেন: বাক্যজালে, রচনারীতিতে, প্রয়োগকৌশলে লোকের চোখ ঝলসিয়ে দেবার বা ধাঁধা লাগানোর কোন প্রচেষ্টা ব্রেখট কখনও করেননি। স্বাভাবিক ভাবে সহজ সত্যকে তিনি সবার সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচনায় সত্য সঙ্গীত এবং কাব্যের এমন একটা সমতাপূর্ণ সংযোজন থাকতো যা সাধারণ নাট্যকারদের মধ্যে দেখা যায় না।—ব্রেখট সম্বন্ধে বর্তমান মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য।

—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## দরাজ হৃদয় দুর্গাদাস

### শ্রীঅখিল নিয়োগী

সোনালী কণ্ঠস্বরের অধিকারী দুর্গাদাসের কথা আজকের দিনের দর্শকবৃন্দ ভুলে যেতে বসেছেন।

দুর্গাদাস ছিলেন জাতশিল্পী। এই 'শিল্পী' কথাটা আমি দুই অর্থে ব্যবহার করছি।

তাঁর প্রথম-জীবন শুরু হয় ছবি আঁকা নিয়ে। গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে (তখনও কলেজ হয়নি) তিনি ছবি আঁকা শিক্ষা করেন।

তখন মেয়ে-মডেল বসিয়ে ছবি আঁকার প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সেই ব্যবস্থা চালু আছে কি না জানা নেই। আমাদের সময় পর্য্যন্তও মেয়ে-মডেল বসিয়ে 'Life Study' করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

দুর্গাদাস এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এবং এখানকার পাঠ সাঙ্গ করে ম্যাডান কোম্পানীতে কিছুদিন সিনেমার 'টাইটেল' লিখেছিলেন। পরে ষ্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড গঠিত হলে সেখানে কিছুদিন 'সিন পেইণ্টার'রূপে কাজ করেছিলেন।

নির্মীয়মাণ "এক টুকরো আগুন" এর একটি দৃশ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্মণ।

কলকাতার দক্ষিণ দিকে কালিকাপুর বলে একটা গ্রাম আছে। দুর্গাদাস সেখানকার জমিদারের সন্তান। নিজেরা সখ করে সেইখানে ছেলেবেলায় মঞ্চ তৈরী করে অভিনয় করতেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি "কর্ণার্জ্জুন" নাটকে ছোট্ট বিকর্ণের ভূমিকায় পাদপ্রদীপের সামনে দেখা দেন। আর সেই সঙ্গে বাঙলা দেশের নাট্য রসিকদের চিত্ত জয় করে নেন।

এমন সুন্দর সুগঠিত দেহ এবং সোনালী কণ্ঠস্বরের অধিকারী সম্প্রতি আর কেউ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

আমার বেশ মনে আছে—একবার একটি পালা নাটক রেকর্ড করাতে আমরা মেগাফোন থেকে দল বেঁধে দমদম হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের কারখানায় যাই। নাটকটির নায়ক ছিলেন দুর্গাদাস। রেকর্ড করার আগে একবার করে প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করবার রীতি প্রচলিত আছে। বিদেশী শব্দ-ধারক দুর্গাদাসের গলা শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,—Golden Voice !!

এই সোনালী কণ্ঠস্বরের অধিকারী মানুষটি কেমন দরাজ হৃদয়ের মালিক ছিলেন—সেকথা ভেবে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

একবার কোনো একটি রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ অভিনেতাদের এবং নেপথ্য কর্মীদের বহু টাকা বাকি ফেলেন। সবাই এসে দুর্গাদাসকে এই সমস্যার সমাধান করতে বিশেষভাবে বলেন। তখন দুর্গাদাস কর্তৃপক্ষকে জানান যে, সবাইকার প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে না দিলে তিনি অভিনয় করবেন না। তখনকার দিনে দুর্গাদাস না নামলে যে আলোড়নের সৃষ্টি হত—দর্শকদের মধ্যে—সে কথা স্মরণ করে কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেন।

মাধবী মুখোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

আর একবার অন্য একটি রঙ্গালয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দুর্গাদাসের কি নিয়ে মতান্তর ঘটে। কর্তৃপক্ষ দুর্গাদাসকে সায়েস্তা করবার জন্য ঘোষণা করে দেন যে তিনি অসুস্থ। তাঁকে বাদ দিয়েই অভিনয় হবে।

দুর্গাদাস চুপচাপ—এই কিল হজম করলেন, কোনো প্রতিবাদ করলেন না। অভিনয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা তিনি নিজে সেই রঙ্গালয়ের টিকিট ঘরের সামনে গিয়ে হাজির। তাঁকে দেখেই দর্শকবৃন্দের ভীড় জমে গেল। তখন তিনি নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, বন্ধুগণ! আমি অভিনয় করতে প্রস্তুত। কিন্তু কর্তৃপক্ষই আমাকে মঞ্চে নামতে দিচ্ছেন না। এই খবর শুনে দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিরাট ক্ষোভের সঞ্চার হল। তাদের চাপে পড়ে—সেদিন বিক্রীর সব টাকা কর্তৃপক্ষকে ফেরৎ দিতে হল!

আবার তিনি কেমন বন্ধু-বৎসল ছিলেন সে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলি।

মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীর জে, এন, ঘোষ একটি "রেকর্ড নাটুকে দল" গঠন করেন। তাতে স্থির হল নাট্যকার মন্মথ রায় নাটক লিখবেন, দুর্গাদাস সেই নাটক পরিচালনা করবেন এবং নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন; ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় নাটকের সুর-সংযোজনা করবেন, আর আমি নাটকের প্রয়োজনীয় গান রচনা করবো। 'খনা' পালা দিয়ে এই পরিকল্পনা সুরু হল। স্বর্গত জে, এন, ঘোষ আমাদের কাছে বলেছিলেন—এই 'খনা' পালার একলক্ষ "সেট" তখনকার দিনে বিক্রী হয়েছিল।

এই নাটকগুলির রিহার্সেল রুম দুর্গাদাসের কৌতুক আলাপনে ক্ষণে ক্ষণে হাস্যমুখরিত ও রসাল হয়ে উঠত। কাজ যখন চলত তখন সবাই নিষ্ঠা সহকারে নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে মেতে থাকতেন।

কাজ শেষ হলেই হাল্কা হাসির হল্লা বয়ে যেত চারদিকে। এ ব্যাপারে নাট্যকার মন্মথ রায় দুর্গাদাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতেন।

কোনো দিন হয়ত আমাদের এই দলটি আবদার সুরু করত, —দুর্গাদা, আজ আমাদের খাওয়াতে হবে। খাওয়ানোর ব্যাপারে দরাজ দুর্গাদা একেবারে মুক্ত হস্ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানিব্যাগ খুলে ফেলতেন। যা হাতের মুঠোয় উঠত তুলে দিয়ে বলতেন,— যাও, নিয়ে এসো পছন্দমত খাবার।

এই ভাবে আমাদের নাটুকে দলের আসর মাঝে মাঝে দিব্যি জমে উঠত।

এক একদিন কাজি নজরুল ইস্লাম এসে সেই আসরে হাজির হতেন। সেদিন গল্পে, গানে, কৌতুকে ঘরখানি যেন আন্দোলিত হতে থাকত। কাজিদার আকাশ ফাটা চীৎকারে স্বয়ং জে, এন, ঘোষ অফিস ছেড়ে সেখানে চলে আসতেন। তিনিও কম রসিক মানুষ ছিলেন না! কালো গোল-গাল মানুষটি। সব সময়ে পানে ঠোঁট দুটি লাল। সবাই আড়ালে রসিকতা করে বলত, টিকেতে আগুন জ্বলে উঠেছে। কিন্তু মানুষটি ছিলেন ভারী মজলিশি। কাজ আর গল্প একেবারে হাত ধরাধরি করে চলত। তাতে কাজও এগিয়ে যেতো দ্রুত গতিতে?

ঘোষমশাই নিজেও খুব খাওয়াতে ভালোবাসতেন। রিহার্সেল রুমে, আর নিজের বাড়ীতে তিনি প্রায়ই আমাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন।

কাজ আর আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে যেতো। কী মজার দিনগুলিই না আমরা পেছনে ফেলে এসেছি!

তখন দুর্গাদা রঙমহল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। থিয়েটারের দিন মেগাফোন রিহার্সেল রুম থেকে সোজা রঙমহলে চলে আসতেন গাড়ী করে। অধিকাংশ দিন আমরাও সেই গাড়ীরই সোয়ার হয়ে যেতাম। কারণ তখন আমি আর মন্মথবাবু রঙমহল-রূপবাণীর উল্টোদিকের রাস্তা অভয় গুহ রোডে থাকতাম।

এক একদিন মেগাফোন থেকে ফিরতে—পথে বেশ মজার কাণ্ড ঘটত।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের কাছে গাড়ী আসতেই দুর্গাদা চীৎকার করে উঠতেন, গাড়ী রো-কো!

আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠতাম।

—দুর্গাদা, ওদিকে থিয়েটারের সময় হয়ে গেল যে! আপনাকে যেতে হবে, মেকআপ নিতে হবে—তারপর ত ড্রপ উঠবে।

কিন্তু দুর্গাদা একেবারে নির্বিকার।

তিনি তখন আমাদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে ঢুকেছেন—আর একটি পাঁপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে আলুর পাঁপড় চাইছেন—

আমি হয়ত বললাম, দুর্গাদা, করছেন কি? একবার ঘড়ির দিকে তাকান—

দুর্গাদা স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, আরে এ তোমাদের বৌদির হুকুম। আলুর পাঁপড় কিনে নিয়ে যেতে হবে। থিয়েটার শেষ হবার পর কিনতে এলে তখন কি আর দোকান খোলা থাকবে? কাজেই এখুনি ফরমাসগুলি কিনে গাড়ীতে রাখতে হবে। থিয়েটারের পর তখন কি মূর্তিতে বেরুবো—সে কথা কে বলতে পারে?

আমাদের মুখে তখন আর বাক্যি নেই!

সেদিন হয়ত রঙমহলে থিয়েটার সুরু হতে একটু দেরীই হয়েছিল।

দুর্গাদাসের উপস্থিত বুদ্ধি আর কৌতুকী মনের একটু হদিশ দিচ্ছি—

একবার নাট্য নিকেতন মঞ্চে একটি নাটক অভিনীত হচ্ছে। নাটকটি সামাজিক। আর বলা বাহুল্য সেই নাটকের নায়ক স্বয়ং দুর্গাদাস।

খুব সুন্দর অভিনয় হচ্ছে। সত্যিকথা বলতে কি নাটক বেশ জমে উঠেছে।

একটি দৃশ্য তখন অভিনীত হচ্ছে। নায়ক, নায়িকার কাছে প্রেম নিবেদন করছে। নায়কের কথা গাঢ় ও মন্থর হয়ে উঠেছে নায়ক নায়িকার গোপন সান্নিধ্য কামনা করে তাই অধরের ভাষা হ্রাস পেয়েছে; মৃদুকণ্ঠে চলেছে প্রেমের অস্ফুট কাকলী।

সবাই স্তব্ধ হয়ে নাটক উপভোগ করছে। এমন সময় পিছন দিকের একটা সিট থেকে হেঁড়ে গলায় চীৎকার শোনা গেল—Louder please।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাদাস তাঁর অভিনয় বন্ধ করে দিয়ে পাদ-প্রদীপের সামনে এগিয়ে এলেন। তারপর সেই হেঁড়ে গলায় অনুকরণ করে প্রেম নিবেদন সুরু করে দিলেন।

খানিকটা বাদে সে 'অ্যাক্টিং'-ও বন্ধ করে দিয়ে হাসি মুখে বললেন, মাফ করবেন, এই রকম হেঁড়ে গলায় প্রেম নিবেদন করলে—আমার নায়িকা পালিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যনিকেতনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে যেন একেবারে ফেটে পড়ল।

আর একবার আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। কোনো একটি অভিনয়ে দুর্গাদাস তাঁর সহ অভিনেত্রীকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরেছেন দর্শকবৃন্দের মাঝখান থেকে কে যেন চীৎকার করে উঠল, গেল গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাদাস দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাতখানা খুলে ধরে বললেন, এই দেখুন মোটেই শক্ত করে ধরিনি। আপনাদের চোখের ভ্রম সৃষ্টির জন্যেই ওই রকম প্যাঁচ দেখাতে হল।

বলা বাহুল্য দর্শকবৃন্দ তাঁর এই কৌতুক প্রাণ ভরে উপভোগ করত।

এখন যে সময়ের কথা বলছি তখন সিনেমা জগতে নির্বাক যুগ চলছে। দুর্গাদাস তখনই বেশ নাম কিনেছেন। আমরা তখন সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে (Govt. Art School) পড়ি। দুর্গাদাস মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মতো শিল্প-বিদ্যালয়ে গিয়ে হাজির হতেন। যোগেনবাবুর ক্লাশেই তিনি বেশী যেতেন। কেন না যোগেনবাবু তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। আর এই বিদ্রোহী, বেপরোয়া ছাত্রটির প্রতি তাঁর একটা স্নেহের টান ছিল।

শিল্প-বিদ্যালয়ে দুর্গাদাস এলেই ছাত্ররা তাঁকে দেখবার জন্য আর তাঁর কথা শোনবার উদ্দেশ্যে ভীড় করে দাঁড়াতো। তিনিও বেপরোয়া ভাবে সবাইকে মজার কথা শোনাতেন। কোনো দিন বলতেন, ষ্টুডিওতে পেসেন্স কুপারের সঙ্গে স্যুটিং ছিল। অভিনয় করতে করতে রুদ্ধ রে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল বলে পালিয়ে এলাম।

কোনো দিন এসে বলতেন, সবিতা দেবী আজ দুপুরে নেমন্তন্ন করেছে। তাই ভাবলাম, হেঁটে-চলে ক্ষিদেটা বাড়িয়ে নিয়ে যাই।

এই সব মুখরোচক কথা বলতেন, আর ছাত্রদের মুখের দিকে তাকাতেন। তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন ছাত্ররা এই জাতীয় রসালো কথাই পছন্দ করে বেশী।

মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছায়াছবি "আরতির" প্রধান ভূমিকায় মীনাকুমারী

সব চাইতে মজার কথা তাঁর প্রবেশ ও প্রস্থান ছিল অদ্বিতীয়। শুধু রঙ্গমঞ্চেই নয় চলতি জীবনেও তিনি তাঁর আসা-যাওয়া দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিতেন।

দুর্গাদাসকে নিয়ে একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল সেই গল্পটা আমি বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেক বার বলেছি, আর সবাই সেই রসালো কাহিনী উপভোগ করেছেন। এখানেও সেই গল্পটি বলার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

তখন আমি রূপবাণী সিনেমার প্রচার-সচিব। থাকি—উল্টো দিকের রাস্তা অভয় গুহ রোডে।

নাট্যকার মন্মথ রায় তখন বালুরঘাটে ওকালতি করেন। মাঝে মাঝে থিয়েটার সিনেমা রেকর্ডের কাজে কলকাতায় এলে আমার বাসায় ওঠেন। তখন মজলিশ বেশ ভালো করে জমে ওঠে। রূপবাণীতে সেই সময় অনেকেই রাত্রে বেড়াতে ও গল্প করতে যেতেন। আমার বসবার ঘরটাই ছিল আসল আড্ডাখানা।

এইখানে অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস, D. G. (ধীরেন গাঙ্গুলী) শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায় প্রভৃতি অনেকেই যেতেন। চা খাওয়া আর গল্প চলত।

এখন যেখানে শ্রী সিনেমা,—সেখানে ছিল কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার। সেই সময় ওখানে একটি নামকরা বিদেশী ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল। ছবিখানির প্রশংসা সবাই শুনেছি, কিন্তু কারো দেখা হয়ে ওঠেনি।

রূপবাণীতে প্রচার-সচিবের ঘরে বসে স্থির হল—দুর্গাদা, D. G. মন্মথ রায় এবং আমি একদিন নাইট-শো'তে ছবিখানি দেখতে যাবো।

দরাজমনা দুর্গাদা বললেন, পাশ নেবার দরকার নেই, ছবি দেখাবো আমি।

তখন সবাই আরো খুশী।

নির্দ্ধারিত রাত্রে আমরা রূপবাণীতে মিলিত হলাম।

দুর্গাদা'র অধিনায়কতায় আমরা চারজন কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারের দিকে রওনা হলাম।

দুর্গাদা আর কাউকে পয়সা দিতে দিলেন না। তা ছাড়া তখন তিনি চিত্রজগতে ও মঞ্চরাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি নিজে আমাদের ছবি দেখাচ্ছেন—এইটেই সবাইকার কাছে গর্ব্বের কথা। সুতরাং আমরাও কেউ টিকিটের পয়সা দিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। যথারীতি দুর্গাদা প্রথম শ্রেণীর চার খানি টিকিট কিনলেন আমরাও সুবোধ ছেলের মতো তাঁর সঙ্গে গিয়ে আসন গ্রহণ করলাম। তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন যে, অন্ধকার হলে তবে তিনি প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করবেন। নইলে কৌতূহলী দর্শক তাঁকে একেবারে ঘিরে ধরবে।

যাই হোক, আমরা সবাই মিলে ছবিখানি উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ ইণ্টারভ্যালের আলো জ্বলে উঠল। দুর্গাদা দীর্ঘদেহ মন্মথ রায়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেললেন। বললেন, মোনা, আমায় ঢেকে-ঢুকে রাখিস, নইলে এক্ষুণি ভীড় জমে যাবে।

খানিক বাদে দুর্গাদা বললেন, এই লেমনেডওয়ালাকে ডাক,— আমি তোদের লেমনেড খাওয়াবো।

লেমনেডওয়ালা চারটি লাল রঙের লেমনেড কাঁচের গেলাসে ঢেলে আমাদের হাতে তুলে দিলে। আমরা মহানন্দে সেই বরফ-দেওয়া লেমনেড পান করতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে আর একটি নাটক যে দিব্যি জমে উঠেছিল সে-কথা আমরা কিছুই জানতে পারিনি! ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, আমাদের আর একটি সাহিত্যিক বন্ধু সামনের দিকে বসে আমাদের কাঁচের গ্লাসে লাল রঙের পানীয় খেতে দেখে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। পরদিন দুপুরবেলা কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের দোকানগুলিতে তিনি এই মুখরোচক সংবাদ পরিবেশন করেছেন এবং সবাইকে টীকা-টিপ্পনী দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অখিল নিয়োগী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় গেছে! একেবারে প্রকাশ্য স্থানে বসে মদ্যপান সুরু করেছে!

আমি যখন বিকেলের দিকে কলেজ স্ট্রীটে হাজির হলাম তখন সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি সুরু করে দিলেন। পরে অবশ্য এই মুখরোচক তথ্যটি ফাঁস হয়ে গেল!

আমার সাহিত্যিক বন্ধুটি এ খবর রাখতেন না যে, সিনেমা-হলের মাঝখানে বসে মদ্যপান করা যায় না! এই মধুর সন্দেশটি যখন পরে দুর্গাদাসকে পরিবেশন করলাম—তাঁর হাসি দেখে কে!

নাটক অভিনয়ে দুর্গাদাস প্রবেশ ও প্রস্থানের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করতেন। তিনি বলতেন, এমন ভাবে মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে হবে যে, দর্শকের মনে যেন স্থায়ী ছাপ থাকে। অবশ্য যে ভূমিকায় তিনি অভিনয় করছেন—প্রবেশ ও প্রস্থান যেন তার অনুরূপ হয়। মঞ্চে প্রবেশ করে বিশেষ কোন স্থানটিতে দাঁড়াতে হবে সেটা তিনি অঙ্কের মতো অনুসরণ করতেন। এইজন্যে অতি প্রথম থেকেই তিনি দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। বিকর্ণ থেকে সুরু করে—দিলদার, ভীমসিংহ, চন্দ্রগুপ্ত, মুলকচাঁদ ধুধুরিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি ছোট বড় চরিত্র রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত হয়ে উঠত।

একবার রবীন্দ্রনাথের একটি নাটকে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত একটি লোকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই ভূমিকাটিতে কোনো সংলাপ ছিল না। শুধু ভাবের অভিব্যক্তিতে তিনি সেই ছোট চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

দুর্গাদাস মাঝে মাঝে রিক্সা করে চলতে খুব ভালোবাসতেন। থিয়েটার শেষে বাড়ী ফেরবার মুখে তিনি প্রায়ই রাস্তায় নেমে রিক্সা করে ঠুন ঠুন করতে করতে এগিয়ে যেতেন। চলা কালে পথের ঝির ঝিরে হাওয়াটি তাঁর কাছে খুব মধুর ছিল।

সেকালে দুর্গাদাস মদ খেয়ে টং হয়ে সব সময় চলাফেরা করে— এই কথাটা ভারী চালু ছিল। কিন্তু আমরা জানতাম—এই কথাটা সত্যি নয়। অনেক সময় তিনি অনেক লোককে এড়াবার জন্যে মাতালের ভাণ করতেন।

একবার থিয়েটার থেকে বেরিয়েই তিনি এমন এক ভদ্রলোকের সামনা-সামনি পড়ে গেলেন যে, চট্ করে মাতালের ঢঙে টলতে টলতে রিক্সাতে গিয়ে থপাস করে শুয়ে পড়লেন। তারপর হাতটা নাটকীয় ভাবে তুলে আদেশ করলেন, সামনা চলো—

পরে এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, আমি তক্ষুনি মাতাল না হলে ভদ্রলোক যে আমার কাছে থিয়েটারের পাশ চেয়ে বসতেন।

এমনি মজার মানুষ ছিলেন দুর্গাদাস।

এই দুর্গাদাস আবার কেমন বন্ধু-বৎসল ছিলেন—তার একটা মজার গল্প বলছি।

তখন তিনি কলকাতার চলতি থিয়েটারগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চীৎপুর অঞ্চলে "রঙ্গমহল" নামে একটি থিয়েটার পরিচালনা করছিলেন।

সেই সময় নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের লেখা "আবুল হাসান" নাটকে তিনি নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছিলেন। পরিচালনা ও নায়কের ভূমিকায় তাঁকে অসামান্য পরিশ্রম করতে হচ্ছিল।

একদিন তিনি সেই নাটক দেখতে মন্মথ রায় ও আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। বারে বারে বলে দিলেন, সময় মতো ড্রপ উঠবে। আমরা যেন আদৌ দেরী না করি। আমাদের তিনি "Long & Short of the Story" বলে ডাকতেন। মঞ্চ জগতের মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও আমাদের ঐ নামেই অভিহিত করতেন।

যাই হোক,—সেদিন "রঙ্গমহলে" পৌঁছুতে আমাদের একটু দেরী হয়ে গেল।

ওখানে পৌঁছে দেখি, সদর রাস্তায় একটি লোক পাইচারী করছে। আমরা পৌঁছুবামাত্র লোকটি এগিয়ে এসে বললে, দুর্গাবাবু আপনাদের জন্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তিনি কিছুতেই ড্রপ তুলছেন না। কেবলি খবর নিচ্ছেন—আপনারা এসেছেন কিনা।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে অপরাধীর মতো তাকালাম। তারপর দ্রুতবেগে লোকটির পেছন পেছন গিয়ে আসন গ্রহণ করলাম।

একটা অঙ্ক শেষ হয়ে গেলে আমরা ভেতরে গিয়ে দুর্গাদার অভিনয়ের প্রশংসা করতে যাবো—এমন সময় ধমক দিয়ে তিনি আমাদের থামিয়ে দিলেন।

হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তোদের আমি সময় মত আসতে বলিনি? ড্রপ তুলতে আমার দেরী হয়ে গেল!

আমরা কিন্তু এই ধমকানিতে এতটুকু দমলাম না। মনে মনে জানলাম, এটা তাঁর স্নেহের শাসন। বাঙলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক দুর্গাদাস আমাদের জন্যে দেরী করে নাটক সুরু করলেন—এটাও ত' ইতিহাস হয়ে রইল।

দুর্গাদা খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন—সেটা আগেই বলেছি তিনি নিজে কি ভাবে ভাত খেতেন তাই এবার জানাচ্ছি। গরম ভাতে ঘি ঢেলে দিয়ে তাই দিয়ে সমস্ত ভাতটা মেখে নিয়ে তিনি খেতে সুরু করতেন। সেই যে ছড়ায় আছে না—

খোকন সোনায় কে মেরেছে?
কে বলেছে কী?
তাহার পাতেই দেবো ঢেলে
গরম ভাতে ঘি!

তখনকার সময়ের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা দুর্গাদাস সম্পর্কে একটি বড় সুন্দর কথা বলেছেন।

তিনি হাসতে হাসতে একদিন মন্তব্য করলেন, অভিনয় আমরা অনেকেই করি। দর্শকদের হাততালিও কুড়োই। কিন্তু সোনার চুড়ির হাততালি একমাত্র দুর্গাদার ভাগ্যেই জোটে।

কথাটা মিথ্যে নয়।

দুর্গাদাসের অভিনয় নৈপুণ্য অবলোকন করে মেয়েরাই হাততালি দিত বেশী।

## খনা

সর্বযুগের নারীসমাজের আদর্শ হিসেবে যাঁরা এক চিরন্তন আবেদন নিয়ে অমর হয়ে আছেন খনা তাঁদেরই একজন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধির শিখরপ্রান্তে উপনীত করতে পেরেছিলেন যে বরণীয়া ভারতকন্যার দল খনার আসন তাঁদেরই মধ্যে। ভারতীয় নারীত্বের মর্যাদা বিবর্ধিত হয়েছে যাঁদের কল্যাণে খনার নাম তাঁদের অনেকের পুরোভাগে, এই মহীয়সী মহিলার জীবন যেমন গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল তেমনই বেদনা ও আঘাতে করুণ, নারীকুলের গৌরব এই মহীয়সীর পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবে মৃত্যুবরণ ভারতের ইতিহাসে এক চরম অগৌরবের অধ্যায়।

খনার অসামান্য জীবনের চলচ্চিত্ররূপ বর্তমানে সগৌরবে প্রদর্শিত হচ্ছে। পরিচালনা করেছেন বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটিতে পরিচালকের ইতিহাসচেতনা, জীবনবোধ ও সমাজ সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিটির মধ্যে আলোচ্য যুগটিকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করতে পরিচালক সমর্থ হয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে খনার চরিত্রটির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেছে। পরিচালকের মুন্সীয়ানার ছাপ ছবিটির মধ্যে পরিস্ফুট। প্রতিটি চরিত্র যথাযথ বিকশিত। কাহিনীর বিস্তারে এবং বিন্যাসেও যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। খনার জীবনের করুণ পরিণতি পরিচালকের পরিচালননৈপুণ্যে এবং দক্ষ শিল্পীর সার্থক অভিনয়ে দর্শকচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সামগ্রিকভাবে ছবিটি দর্শক সাধারণের মনে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার করে।

নামভূমিকায় অভূতপূর্ব অভিনয় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। ইতিহাসের পাতা থেকে রূপালী পর্দায় চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন শিল্পী। খনার অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দবেদনা সংঘাত মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর অভিনয়ে। মিহিরের ভূমিকায় প্রবীরকুমারও প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ প্রভৃতির অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

# সংবাদবিচিত্রা

বিশ্ববিখ্যাত সেতারিয়া রবিশঙ্করের প্রতিষ্ঠিত "কিন্নর"এর শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন হ'ল গুরুপূর্ণিমার দিন। সঙ্গীতের প্রসারকল্পে ও অনুশীলনে এই গীত বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা। উদ্বোধন দিবসের অনুষ্ঠানে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজার্চনা হয় এবং এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্যে রবিশঙ্করকে বহুজনে অভিনন্দন জানিয়ে যান। বাঙলার গৌরব যাঁরা পৃথিবীতে বাড়িয়ে তুলেছেন, আজকের দিনে রবিশঙ্কর তাঁদের মধ্যে একটি বিশেষ নাম। সঙ্গীতের প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কিন্নর তাঁর উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে সফল করে তুলুক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে কিন্নর একটি বিশেষ ছাপ রাখতে সক্ষম হোক ও সর্বশেষে কিন্নরের উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার শচীন দেববর্মণ রাশিয়া থেকে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে রাশিয়া অভিমুখে সস্ত্রীক যাত্রা করেছেন।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে লণ্ডনে আয়োজিত ভারতীয় চলচ্চিত্র সমারোহের উদ্বোধন করার আমন্ত্রণ পেয়েছেন ভারতের বিশিষ্ট প্রযোজক পরিচালক বিমল রায়। এগারো দিনব্যাপী এই সমারোহের উদ্বোধন হবে আগামী ১১ই অগাষ্ট ন্যাশনাল থিয়েটারে।

চেকোশ্লোভাক অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভারতীয় চিত্র "গঙ্গাযমুনা"র মাধ্যমে অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের প্রখ্যাত অভিনেতা দিলীপকুমারকে একটি বিশেষ ডিপ্লোমা দ্বারা সম্মানিত করেছেন। দিলীপকুমারই প্রথম ভারতীয় শিল্পী যিনি এই সম্মানলাভ করলেন।

প্রকৃতির লীলাভূমি ভূস্বর্গ কাশ্মীরে একটি স্থায়ী ষ্টুডিও নির্মাণের আয়োজন চলছে। জম্মুর প্রখ্যাত ধনী শ্রীএস, কে, গুপ্ত এই ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বোম্বাইয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট কলাকুশলীর সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। অল্পকালের মধ্যেই কাশ্মীরেই একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনাও তাঁর আছে।

ডক্টর চার্লস চ্যাপলিনকে এবার ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। সম্প্রতি তাঁরাও চ্যাপলিনকে "ডক্টর অফ লেটার্স"এ বিভূষিত করলেন। অক্সফোর্ড থেকে সম্মানিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চার্লস একটি পুত্ররত্ন লাভ করেছেন। চার্লসের বয়েস বর্তমানে ৭৪। সহধর্মিণী উনার বয়েস বর্তমানে ৩৮।

আজ থেকে দু' বছর পূর্বে স্বর্গত আগা খাঁর পুত্র এবং বর্তমান আগা খাঁর পিতা প্রিন্স আলী খাঁ এক মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্তে খেসারৎ হিসেবে অভিনেত্রী রিটা হেওয়ার্থের গর্ভজাত তাঁর কন্যা যশমীন খানকে (১৬) প্যারিসের আদালত ১০,১০০ পাউণ্ড দানের রায় ঘোষণা করেছেন।

আজকের দিনের চলচ্চিত্রের বিশ্বব্যাপী জয়যাত্রার দিনে পশ্চিম জার্মাণী থেকে প্রাপ্ত একটি সংবাদ রসিক সমাজকে আশ্চর্য করে দেবে। পশ্চিম জার্মাণীর মত পৃথিবীর একটি উন্নত ও আলোকপ্রাপ্ত দেশে চলচ্চিত্র তার প্রভাব বিস্তারে বিফল হয়েছে, আমরা এই সিদ্ধান্তেই আজ উপনীত হতে পারি। পশ্চিম জার্মাণীর চিত্রগৃহের সংখ্যা সাড়ে ছ' হাজারের কিছু বেশী। দর্শকদের অভাবে চিত্রগৃহগুলি ক্রমশঃই নিদারুণ অভাবের সম্মুখীন হতে চলেছে। চলচ্চিত্রের প্রতি সাধারণের অনাসক্তিই এইভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, নিদারুণ আর্থিক ক্ষতি ক্রমশঃই ব্যাপকতর হয়ে ওঠায় কিঞ্চিদধিক চোদ্দ শত প্রেক্ষাগৃহ তাঁদের দ্বার বন্ধ করে দিলেন, উপায়ান্তর না থাকাতেই তাঁদের এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

প্রখ্যাত কথাশিল্পী বনফুলের "কষ্টি" নামক রসোজ্জ্বল কাহিনীটি "বর্ণচোরা" নাম নিয়ে বনফুল-অনুজ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছায়াচিত্রের রূপ নিচ্ছে। চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, গঙ্গাপদ বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর, রেণুকা রায়, সন্ধ্যা রায়, সীতা দে, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। সুরযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। * * * খ্যাতনামা সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে "অভিসারিকা" চিত্রটি গড়ে উঠেছে কমল মজুমদারের পরিচালনায়, সুরযোজনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন নির্মলকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সমরকুমার, মিণ্টু দাশগুপ্ত এবং সুপ্রিয়া চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা। * * * বিখ্যাত সাহিত্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীজাত "এক টুকরো আগুন"-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন চিন্ময় বর্ধন। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিশ্বজিৎ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বুবু গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, তন্দ্রা বর্মণ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা সেন, আভা মণ্ডল, প্রভৃতি তারকাবৃন্দ। * * * "একলা চল রে" ছবিটির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে। এতে অভিনয় করেছেন, দীপক মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, স্বর্গীয় তুলসী চক্রবর্তী, মলয়া সরকার, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ শিল্পিগোষ্ঠী। * * * চিত্ত বসুর পরিচালনায় "শুভবৃষ্টি" ছবিটি গৃহীত হচ্ছে। স্বর্গত ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অরুণ মুখোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, মমতাজ আহমেদ, পার্থপ্রতিম, সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায়, দীপিকা দাস, সীতা দে, নিভাননী প্রমুখ শিল্পিবৃন্দকে নিয়ে এক আকর্ষণীয় ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

## সৌখীন সমাচার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দুই পুরুষ" নাটকটি সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন ছদ্মবেশী নাট্য সংস্থা। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আদিত্য হাজরা, নীলমণি হাজরা, সনৎ মুখোপাধ্যায়, নিখিল ভট্টাচার্য অনুপম বসু, নৃপেন দাশগুপ্ত, ভারতী চক্রবর্তী, হাসি মৈত্র প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। * * * ভাগলপুরের সঙ্গীত সমাজ নাট্য গোষ্ঠী "কাঞ্চনরঙ্গ" অভিনয় করলেন। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস সিংহ, নীলিমা চট্টোপাধ্যায়, বীণা বসু রায়, প্রভৃতি। * * * আলমবাজারের "নাট্যশ্রী" গোষ্ঠী অমিয় সেন-শর্মার "শেষ অঙ্ক" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনা করেন গোপাল বসু ও প্রতাপ রায়। রূপায়ণে ছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, হরেন অধিকারী, প্রতাপ রায়, সৌরেন গুঁই, সৌরেন সেনশর্মা ও নীলিমা চক্রবর্তী ···যাদবপুর ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের উদ্যোগে সলিল সেনের "নতুন ইহুদী" নাটকটি সম্প্রতি অভিনীত হল। জ্যোতির্ময় দাশের পরিচালনায় চরিত্রগুলির রূপদান করেন কমল দত্ত, অরুণ বিশ্বাস, দীপক ঘোষ, নান্টু মৌলিক, শ্যামল দত্তচৌধুরী, কৃষ্ণেন্দু দাস, দিলীপ রায়, নাড়ু দাস, মাখন পাল, মিহিরলাল দাস, মণিকা মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * জুয়েলস ক্লাব সম্প্রতি কিরণ মৈত্রের "বারো ঘণ্টা" নাটকটি নিবেদন করলেন। চরিত্রগুলির রূপ দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সুবোধ তালুকদার, সুনীল দত্ত, জয়ন্ত দাশগুপ্ত, প্রশান্ত গোস্বামী, প্রবোধ নাথ, নিরঞ্জন মিত্র, অধীর সাহা, বীথিকা ভট্ট ইত্যাদি।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত প্রথম ও তৃতীয় হইতে অষ্টম এবং সর্বশেষ চিত্রটি ব্যতীত অন্যান্য আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী, ও শান্তিময় সান্যাল কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

## আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠতা

"স্বাধীনতা লাভের ১৪ বৎসর পরে ভারত সরকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। একটি সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের দেশরক্ষা দপ্তর একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দেশরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন পরিষদ গঠন করিয়াছেন। একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জামাদির নির্মাণে, উৎকর্ষতায় সাহায্য করিতে পরিষদ গবেষণা কার্য চালাইবেন। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি অন্ত দেশ হইতে ক্রয় করিয়া কোন দেশই সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হইতে পারে না। নিজের দেশে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিলেই শুধু হইবে না, ঐগুলির উৎকর্ষ সাধনের জন্তও গবেষণা করা প্রয়োজন। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির পক্ষে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সাহায্য ছাড়া এই ধরণের গবেষণা চালানো সম্ভব নয়, এত দিন এইরূপ একটা ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই ধারণা যে ভুল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র তাহা প্রমাণ করিয়া নিজের দেশের বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় রকেট তৈয়ার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের এই সাফল্য ভারতকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে উৎসাহিত করিয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ভারতকে সামরিক শক্তিশালী হইতে হইলে আধুনিক উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র ভারতের নির্মাণ করিতে হইবে এবং অন্তান্ত সামরিক শক্তিশালী দেশের সহিত তাল রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। নিজের চেষ্টা যত্ন ছাড়া অন্তের সাহায্যে সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হওয়া অসম্ভব।"

—দৈনিক বসুমতী।

## সুন্দরবনের উন্নতি

"সুন্দরবন অঞ্চলের গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের কাজেকর্মে সেই গুরুত্বের কোনও স্পষ্ট স্বীকৃতি নাই। তা যদি থাকিত, সুন্দরবন-অঞ্চলের উন্নয়ন-কর্ম তবে ত্বরান্বিত হইত। সে-কাজ কিছুমাত্র ত্বরান্বিত হয় নাই; বস্তুত এই অঞ্চলটি আজও আগের মতই অনাদৃত অবহেলিত হইয়া আছে। অথচ খাদ্য-সরবরাহের ব্যাপারে প্রধানত যে-কয়টি অঞ্চলের উপর এই রাজ্যকে নির্ভর করিতে হয়, সুন্দরবন তাহার অন্ততম। শুধু শস্য কেন, অন্তান্ত সম্পদেও পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলটি কিছু কম সমৃদ্ধ নহে। বস্তুত সুন্দরবনকে যদি পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় বৈষয়িক সম্ভাবনার একটি প্রধান অবলম্বন বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তবে মোটেই বাড়াইয়া বলা হইবে না। রাজনৈতিক দিক হইতেও এই অঞ্চলটির গুরুত্ব সমধিক। তৎসত্ত্বেও যদি এই অঞ্চলটিকে অবহেলা করা হয়, তবে তাহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। অবহেলার অভিযোগটা মোটেই ভিত্তিহীন নয়। প্রাকৃতিক সম্পদে সুন্দরবন সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখানকার জনসাধারণের দারিদ্র্য আজও ঘোচে নাই। রাজনৈতিক গুরুত্ব সত্ত্বেও সেখানে উপযুক্ত রাস্তাঘাটের আজও একান্ত অভাব। অবহেলার ফিরিস্তি বাড়াইয়া লাভ নাই শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অবিলম্বে এই অবহেলার অবসান হওয়া দরকার। বলিষ্ঠ পরিকল্পনা লইয়া এমনভাবে এই অঞ্চলটির উন্নয়ন-কর্মে হাত দেওয়া দরকার, সুন্দরবনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আর-পাঁচটা প্রাগ্রসর অঞ্চলের বৈষম্য যাহাতে ঘুচিয়া যায়। এই বৈষম্যকে অনেককাল ধরিয়া জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে; আর জিয়াইয়া রাখা ঠিক নয়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## জাল ও ভেজাল

"জাল ঔষধ নির্মাণের কারখানা ভারতবর্ষে ব্যাঙের ছাতা মতো গজাইয়া উঠিয়াছে দুর্ভাগ্যক্রমে মেধাবী বিজ্ঞানকর্মীরাও বেকারী বিপাকে পড়িয়া এই জাল ব্যবসায়ে সাহায্য করিতে বাধ্য হন ইহাও আরেকটি সামাজিক সমস্যা। অন্ধকারের সুড়ঙ্গ পথে ইহাদের লেনদেন আর মুনাফার বিকৃত ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জাল ঔষধ উৎপাদন বন্ধ করার উপায় নির্ধারণের জন্ত তদন্ত কমিশন গঠন করিয়াছেন। ইহা সময়োপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অপরাধীদের চরমতম শাস্তি দিবার জন্য আইন সংশোধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ইহা ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে কার্যে পরিণত করার জন্য সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষভাবে তৎপর হইতে আমরা বলিব। শ্রীচ্যবন যাহা বলিয়াছেন তাহা যে শু কথার কথা নয় সরকারকে এ বিষয়ে তৎপর হইয়া তার প্রমাণ দিতে হইবে। নতুবা জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়া আসিবে না এবং এই পাপচারী সমাজ-বিরোধীরাও এই মারাত্মক ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইবে না। ইহাদের মৃত্যু দণ্ড চাই—কারণ, ইহারা সমগ্র জাতিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি করিয়াছে। যে দেশের আইন খাদ্যে ভেজাল কিংবা ঔষধে ভেজালের পাপ-চক্রান্তকে বন্ধ করিতে পারে না সে আইন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না, তাকে দুর্বল করে। রাষ্ট্রদ্রোহের জন্ত মৃত্যুদণ্ড আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন নাশ এবং জীবনীশক্তি হ্রাসের জন্ত যাহারা মুনাফার লোভে সুস্থ মস্তিষ্কে দিনের পর দিন এই চক্রান্ত করিতেছে তাহারা শুধু রাষ্ট্রদ্রোহীই নয়, মানবদ্রোহী। মানুষের শত্রুর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। এ বিষয়ে ভারতের জনমতে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। সরকারের মনে সন্দেহ থাকিলে এ বিষয়ে জনমত সংগ্রহ করিয়া লোকসভায় আইনের খসড়া পেশ করিতে পারেন। আমরা অবিলম্বে সরকারকে এ বিষয়ে আগাইয়া আসিবার জন্ত আরেকবার প্রার্থনা জানাইতেছি।"

—যুগান্তর

## পঞ্চায়েত রাজ

"এদেশে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠা করা নাকি কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশ্য, সারা দেশে অনেক পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছে। তৃতীয়

পরিকল্পনায় আরও হইবে। পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক সঙ্গতি কী ভাবে আরও বাড়ান যাইতে পারে যে সম্পর্কে অবস্থা বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া সুপারিশ করিবার জন্য একটি কমিটিও নিয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন পঞ্চায়েতের কোন প্রস্তাব মনোমত না হইলে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত অফিসার যে ভাবে তাহা উপেক্ষা করেন তাহাতে পঞ্চায়েত রাজ সম্পর্কে এই ধরনের আমলারা যে খুব শ্রদ্ধাশীল তাহা মনে হয় না। এমনি অভিযোগ প্রায়ই পাওয়া যায়। জানা গেল বীরভূম জেলার মাড়ুর থানার বিভিন্ন পঞ্চায়েত হইতে উক্ত অঞ্চলে টেষ্ট রিলিফের কাজ ও গ্রাইশোল দিবার ব্যবস্থা করার জন্য বি-ডি-ও-র নিকট অনুরোধ জানান হয়। কিন্তু পঞ্চায়েতগুলির এই অনুরোধের প্রতি বি-ডি-ও বধির থাকেন বিভিন্ন এলাকা হইতে এই ধরনের এবং আরও অন্য ধরনের নানা অভিযোগ প্রায়ই প্রকাশিত হয়। এইরূপ পরিস্থিতির অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়।" —স্বাধীনতা।

## পরিবার পরিকল্পনা

"কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বন্ধ্যাকরণ প্রয়োজন হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার ব্যাপক প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে এই উপায় একবার গ্রহণ করিলে পর পরে ইচ্ছা জাগিলেও সন্তানজননের ক্ষমতা থাকিবে না। এই বোধ এরূপ বন্ধ্যাকৃতের মনে যে উদ্বেগ জাগায় তাহাতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়া খুবই সম্ভব। তাহা ছাড়া অস্ত্রোপচার সম্পর্কে মানুষের মনে যে স্বাভাবিক ভীতি আছে, তাহাতে ইহার ব্যাপক প্রসারেও অন্তরায় আছে। ভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে ইচ্ছামত জন্মনিয়ন্ত্রণ সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর না হইলেও অন্তত পক্ষে শতকরা পঞ্চাশটি এবং সম্ভবত আরও অধিক ক্ষেত্রে সম্ভবপর বলিয়া বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত হইয়াছে। সেই ব্যবস্থার প্রতিই অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। এই বিপুল পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত বহু ভেষজ ও রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া সম্ভব যাহা আরও সুন্দরতর ফল প্রদান করিবে। সরকার হইতে কয়েকটি ক্ষেত্রে এরূপ পরীক্ষাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইতেছে। সেজন্য শ্রীমতী নায়ারের এই উক্তির সহিত আমরা একমত যে, "আমাদের দেশের উপযুক্ত সহজ ও নূতন পন্থা আবিষ্কারের দিকে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের অধিক দৃষ্টি দেওয়া উচিত।" —জনসেবক।

## কলিকাতার আবর্জ্জনা

"কলিকাতার আবর্জ্জনা অপসারণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত এতদিনে হইয়াছে এবং উপযুক্ত লোকের হাতে সেই দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলারেরা নিজেদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন। নিজেদের অক্ষমতায় তাঁহারা লজ্জিত হন নাই, বরং সরকারের নূতন ব্যবস্থার নিন্দা পঞ্চমুখে সুরু করিয়া দিয়াছেন। কর্পোরেশনের প্রতিটি সভায় যাহারা "আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টান্সের" নামে নিজেদেরই পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের নির্ব্বিচারে কটূক্তি করিয়া নিজেদের অঙ্গে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে, তাহাদের পক্ষে সরকারী ব্যবস্থার আপত্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ডি· আই· জি· প্রণব সেনকে ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স নিয়া কাজে নামিতে হইতেছে। কর্পোরেশনের শ্রমিকবাহিনী তবে কি জন্য আছে? ইহারা কি বসিয়া বেতন পাইবে এবং ৩০ জন খাটাইয়া ৮০ জনের হাজিরা লেখার বন্দোবস্তের খেলা এখনও চলিতে থাকিবে? অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য আইন কেন এই শ্রমিকদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না এবং কাজ করিতে অসম্মত হইলে কেন তাহাদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না আমরা তাহা জানিতে চাই।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

## ক্যানেলের ব্যর্থতা

"এ বৎসর জ্যৈষ্ঠের প্রথমদিকে প্রাকৃতিক বৃষ্টির জল পাইয়া চাষী বীজ ছড়াইল। জুলাইয়ের প্রারম্ভেই সেই বীজের চারা দেখা দিল; হঠাৎ প্রাকৃতিক বর্ষণ বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে চারা বাঁচানো ও বীজতলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। চাষী স্বাভাবিক ভাবেই আশা করিয়াছিল জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ক্যানেলের জলে বৃষ্টির অভাব দূর করিবে। কিন্তু জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্যানেলের সেচ এলেকায় শতকরা ত্রিশ ভাগ জমিতেও জল সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে অধিকাংশ বীজচারা মরিয়া গিয়াছে বা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। সেচ বিভাগের জল সরবরাহের এই মর্ম্মান্তিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও পূর্ণহারে জলকর ধার্য্য করায় কি যৌক্তিকতা আছে তাহা কৃষকদের বোধগম্য নহে। গত ১৯৫৮ সাল হইতে আমরা অগ্রগামী কৃষকসভা সেচ ও কৃষি কর্ত্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ভিত্তিতে প্রতি অঞ্চলে এক বা দেড়শত বিঘার বীজক্ষেত্র ক্যানেলের ধারে তৈরী করার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। আজ প্রতিশ্রুত কালে জল সরবরাহে সেচ বিভাগের ব্যর্থতা ঐরূপ বীজক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতেছে। ক্যানেলের জল সরবরাহের বিধিনিয়ম ও সে সম্পর্কে আপত্তি দিবার প্রথাদি সম্পর্কে বিশেষ প্রচার অধিকর্ত্তা ময়ূরাক্ষী যোজনা, বারংবার পূর্ণাঙ্গ প্রচারের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কার্য্যকালে ক্যানেলের ব্যর্থতা গোপন করিয়া অন্যায় সেচকর ধার্য্যের মোহে সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই।" —বীরভূম।

## পাকিস্তানী হানা

"ত্রিপুরার ১২০ মাইল সীমান্তের অধিকাংশটাই পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এই সীমান্ত এমন যে, উহার সবটুকু—সর্ব্বক্ষণ পাহারা দিয়া রাখা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, ত্রিপুরা সীমান্তে এমন বাড়ীও রহিয়াছে যাহার অর্দ্ধেকটা ভারতীয় এলাকায়, অপরার্দ্ধ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া রাস্তাঘাটও একেবারে নাই বলিলেও চলে। সুতরাং এমন সীমান্তকে একেবারে দুর্ভেদ্য করিয়া তোলা যে সম্ভব নয়—অন্ততঃ বিপুল ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সুযোগে পাকিস্তানী দুর্ব্বৃত্তগণ হামেশাই ত্রিপুরার সীমান্তবর্ত্তী গ্রাম সমূহে হানা দিয়া থাকে এবং সীমান্তবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জনগণ পাকিস্তানী চোর, ডাকাত ও দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা বিশেষ ভাবে নিগৃহীত হইয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় প্রত্যহই কোন কোন পত্রিকায় পাকিস্তানী দুর্ব্বৃত্তদলের হানার সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। পাকিস্তানী দুর্ব্বৃত্তদলের হানায় ত্রিপুরার বহু হিন্দু-মুসলমান আদিবাসী নাগরিক নিহত হইয়াছে, বহু আহত এবং ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। ইহা ছাড়া দলবদ্ধ পাকিস্তানী দুর্ব্বৃত্তগণ ত্রিপুরার বে-আইনী প্রবেশ

করিয়া হামেশাই বনজ সম্পদ অপহরণ করিয়া নিয়া যায়। এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪শে জুলাই সোনামুড়া মহকুমার নির্জনপুর শাল বাগানে বে-আইনী প্রবেশক্রমে একদল পাকিস্তানী দুর্বৃত্ত বহু মূল্যবান বনজসম্পদ লুট করিয়া নিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকদিন পূর্ব্বে সাব্রুম অঞ্চলের জনৈকা ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা সহ ৮টি পরিবারের ৭ জনকে গুরুতররূপে আহত করিয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া—বহু হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী যে পাকিস্তানীদের আক্রমণে নিহত হইয়াছে—তাহা তো আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে সীমান্তের জনগণকে রক্ষার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।"

—গণরাজ ( ত্রিপুরা )।

## জাতীয় অপচয়

"স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বর্ত্তমান বৎসরের উত্তীর্ণের হার অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। প্রায় লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রায় আটাশ হাজার ছাত্রছাত্রী ফেল করিয়াছে। এই আটাশ হাজার ছাত্রছাত্রী কেন পাশ করিতে পারিল না, সে কৈফিয়ৎ কে দেবে? মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জবাব কি আমরা জানি না। জনসাধারণ দেখিতে পাইল, বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সহিত শতকরা আটাশ জন ছাত্রছাত্রী নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। কেন পারিল না, সে কারণ আজ কে বিশ্লেষণ করিবে? এই আটাশ হাজার ছাত্রছাত্রী সকলেই নিশ্চয় বুদ্ধিহীন নয়, অভিভাবকদের পড়ার খরচ যোগাইতে প্রাণান্ত হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে শিক্ষকদের বেতনহার সন্তোষজনক, বিত্তালয়ের বিল্ডিং বাবদ হাজার হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে, তবুও ছাত্রছাত্রীদের উত্তীর্ণের হার সন্তোষজনক হইতেছে না কেন? উপযুক্ত তদন্ত কমিশন ব্যতিরেকে ইহার আসল রহস্য উন্মুক্ত করা সম্ভব নয়।"

—ভাগীরথী ( কালনা )।

## ময়দা

"পরের নিকট ভিক্ষার ঝুলি পাওয়া ভারত সরকার এতদিন দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ইত্যাদি লোক-দেখানো পরিকল্পনা রূপায়ণের দ্বারা এ দেশবাসীকে তাজ্জব বানাইয়া আসিয়াছেন। এবার নূতন ধরণের তাজ্জব কারবার—একেবারে পিলে চমকানো ব্যাপার। মার্কিণ মুলুকের সস্তার ময়দা আনিয়া চড়া দামে এখানে বিক্রয় হইতেছিল। সেই ময়দার মাধ্যমে আসিয়াছে নানা রোগ। পক্ষাঘাত, গাত্রদাহ, পা-ফোলা বা ভারী বোধ হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। এই উৎপাতের সুরু হয় প্রথম মালদহে, তাহার পর কেরালায় এবং তৎপরে আসামের দারাং-এ এবং এখন নদীয়াতে। মালদহে ময়দার এবং সরিষার তৈলের নমুনা পূর্ব্বেও পরীক্ষা হইয়াছিল কিন্তু মার্কিণ মার্কা আটাই যে উহার কারণ তাহা বলা হয় নাই। দারাং-এ একটি ক্যাথলিক স্কুলের ছাত্ররা ঐ মার্কিণ ময়দা খাইয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইবার পর, এখন আসল কারণটি জানা গিয়াছে। এতদিনে ভারত সরকার সতর্ক হইয়াছেন। উড়িষ্যা সরকার সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"কন্‌ট্রাক্ট নাম্বার সি, টি (এফ, এফ) ৫২২২০৭," "ক্যাথলিক রিলিফ—ভারত" এবং "অল পারপাস্ ফ্লাওয়ার—এনরিচ্‌ড এণ্ড ব্লিচ্‌ড" মার্কা থলিয়ার মার্কিণ ময়দা যেন কেহ না ক্রয় করে। "ট্রাইক্রেসিল ফস্‌ফেট" নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ, মার্কিণ ময়দার সহিত ( সম্ভবতঃ জাহাজে আসিবার সময় ) মিশিয়া গিয়া এই বিপত্তি ঘটাইয়াছে। এদেশের লোক চা এবং পানের খয়ের-সুপারিতে পর্য্যন্ত ভেজাল খাইতে অভ্যস্ত। ঘি-তেল-চাল ইত্যাদির কথা না বলাই ভাল। ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসীই এখন এক-একটি বিষকন্যা, বিষ-পুরুষে পরিণত হইয়াছেন। এ হেন নৈষ্টিক অবস্থাতেও মার্কিণ বিষ হজম করা যাইতেছে না। পঞ্চত্বপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সরকার, বিলম্বে হইলেও, সাবধান হইয়াছেন। কিন্তু হুঁশিয়ারী কত দূর ফলপ্রদ হইবে তাহা বিধাতাই জানেন। চোরাকারবারী এবং অসাধু ব্যবসায়ীর দল, যাহাদের গুদামে মার্কিণ ময়দা মজুত আছে, তাহারা পুলিসে বাজেয়াপ্ত করিবার পূর্ব্বেই যে দেশী ময়দার সহিত তাহা পাচার করিবে না—তাহার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রতি সরকারী টেষ্ট হাউসকে সতর্ক হইতে হইবে।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী

## আসাম সমস্যার একদিক

"আসাম কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির একটি প্রস্তাব ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত নির্বাচনে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ হইতে কমিউনিষ্টদের বিলুপ্তি কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ৎ খুঁজিতে গিয়া তাহারা কাছাড়ের ভাষা সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ভাষা দাঙ্গা আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন যে এই সকল দাঙ্গায় প্রধান ভূমিকা কংগ্রেসীরাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহে যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহারা দাঙ্গাবাজ কি করিয়া হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। কোনো কোনো কমিউনিষ্ট নেতা সত্যাগ্রহকে সাক্ষাৎভাবে সমর্থন না করিলেও, তাহারাও যে সত্যাগ্রহের পশ্চাতে আছেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সত্যাগ্রহী হত্যার সময় উপস্থিত ছিলেন। সত্য ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্যও দিয়াছেন; কিন্তু এই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি মনোবৃত্তি নির্বাচনকালে তাহাদের বিশেষ সাহায্য করে নাই; কিন্তু এখন দেখিতেছি কমিউনিষ্ট পার্টি এই পরাজয়কে ঢাকিতে গিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে দাঙ্গাবাজ আখ্যা দিতেও দ্বিধা করিতেছেন না। বাস্তবিকই ইহাদের স্বরূপ বুঝা কঠিন। আমরা জিজ্ঞাসা করি—এই মিথ্যাচার আর কতদিন?"

—জনশক্তি ( শিলচর )।

## ক্যানেলে দৃষ্টি দিন

"জানিনা কোথা দিয়ে কখন কি ঘটে যায়। দিন কয়েক আগে বর্দ্ধমান সহরের কাছে আমিরপুরে ডি ভি সির প্রধান ক্যানেলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়—ফলে কয়েকখানি গ্রাম প্লাবিত হয়। জল সরবরাহ বন্ধ থাকে। কেবল এই অঞ্চল নয়—হুগলী জেলা অঞ্চলেও জল সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। ইহা দামোদরের বামতীরের কথা। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলেও জল সরবরাহ পর্য্যাপ্ত নহে। এখনো অনেক গ্রামে জল পৌছায় নাই। এখানেও সেই বাঁধ ভাঙ্গার কথা। জল ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি সোনামুখী অঞ্চলে প্রধান ক্যানেলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। কেন বাঁধ ভাঙ্গে? কেন তার উত্তর দিবেন না। মামুলী অজুহাত—ইঁদুর। কেন বাঁধ পর্য্যবেক্ষকেরা কি করেন? যাদের ওপর

বাঁধের তদারকী তার জন্য তাহারা কি ঘুমাইয়া থাকেন? মেইন ক্যানেলের বাঁধভাঙা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। যে ক্যানালে অজস্র শাখা ক্যানেলের জল সরবরাহ নির্ভর করিতেছে সেই ক্যানেলের উপর কেন সতর্ক দৃষ্টি হইতেছে না? জলকর লইবার বেলায় সব হাতিয়ার মজুত অথচ তি তি সিয় পাকিলতিতে চাষী সময়ে চাষ করিতে পারিল না তাহার খেসারৎ কে দিবে?" —বর্দ্ধমান বাণী।

---

এই সংখ্যায় প্রকাশিত বাঙলার অমর সন্তান স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের তিরোধানের পর গৃহীত তৎসংক্রান্ত আলোকচিত্রসমূহ মাসিক বসুমতীর জন্য বিশেষভাবে শ্রীমোনা চৌধুরী গ্রহণ করিয়াছেন।

---

## শোক-সংবাদ

### স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র নামযুক্ত বাঙলার বিশ্ববিখ্যাত সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গত ১লা আষাঢ় ৮০ বছর বয়েসে দেহরক্ষা করেছেন। সংসারাশ্রমে তাঁর নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ সিংহরায়। ১৯০১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইনি ক্রমশঃ ঠাকুরের ভাবধারা ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। ১৯০৬ সালে শ্রীমা এঁকে দীক্ষা দেন। ১৯০৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। ১৯২২ সালে মিশনের অছি ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৪৭ সালে তিনি মিশনের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং গত মার্চ মাসে ইনি মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

### ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় তরণীর দিগ্‌দর্শী কর্ণধার এবং বাঙলার গৌরব বিবর্ধনকারী শ্রদ্ধেয় জননায়ক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গত ১৬ই আষাঢ় গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিবহুল জীবনে যবনিকাপাত ঘটেছে। জীবনের অশীতিবর্ষপূর্তির শুভ দিনটিতে জন্মদিনের আনন্দঘন পরিবেশে মৃত্যু এসে এই বিরাট পুরুষের নশ্বর জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল। প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতিবংশীয় স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায়ের এবং স্বর্গীয়া অঘোরকামিনী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বিধানচন্দ্রের জন্ম পাটনায়। এই অক্লান্তকর্মা মানুষটির সারা জীবন অসাধারণ প্রতিভা ও অফুরন্ত শক্তি ও অপূর্ব অভাবনীয় কৃতিত্বের অমলিন স্বাক্ষরে আলোকিত। কর্ম এবং জনসেবা ছিল তাঁর মহান জীবনের আদর্শ ও মূলমন্ত্র। জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তিনি ছিলেন অফুরন্ত কর্মশক্তির এক উৎসবিশেষ। তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মানবতাবোধ এবং স্বদেশপ্রীতি বাঙলাদেশকে যে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে তার তুলনা নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে, কলকাতার পৌরপালরূপে, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রথম বেসরকারী সভাপতিরূপে, আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজের (তখন কারমাইকেল) প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তার প্রধান তত্ত্বাবধায়করূপে, জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে তিনি নানাভাবে দেশের ও জাতির সেবা করে গেছেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ক্যান্সার ইন্‌স্টিটিউট, ক্যালকাটা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি পত্তনকাল থেকে তাঁর সেবা পেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি যে দৃঢ়তা, নৈপুণ্য এবং কর্মোদ্যমের পরিচয় দিয়ে গেছেন ইতিহাসই তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আজকের দিনে বাঙলাদেশের এই ঘোর সমস্যাসঙ্কুল প্রহরগুলিতে বিধানচন্দ্রের মত সুদক্ষ ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতার অভাব মর্মে মর্মে অনুভূত হবে। আমাদের জাতীয় জীবনে তিনি যে বিরাট আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে সে আসন অনির্দিষ্টকালের জন্যে শূন্য হয়ে থাকল। তাঁর মহাপ্রয়াণ সারা বাঙলার পক্ষে এক নিদারুণ ক্ষতিরই নামান্তর মাত্র।

### ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী

প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী গত ১৩ই আষাঢ় ৬২ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। ঐতিহাসিক হিসেবে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এঁর রচনাদি এঁর অপরিমিত জ্ঞান ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ছিলেন।

### অর্জুন রায়

বাঙলার স্বনামধন্য স্থপতি অর্জুন রায় গত ২৬শে আষাঢ় ৫৩ বছর বয়েসে গতায়ু হয়েছেন। ইনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় জে, এন, রায়ের পুত্র। ইনি গ্লাসগো থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এ, বি, এম, সি ডিগ্রী পান ও জার্মাণীতে স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। দেশে ফিরে এসে ইনি কয়েকটি চলচ্চিত্রে শিল্পনির্দেশ দেন। বোকারো শহর, তিলাইয়ার নতুন অতিথিশালা এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-ভবনের নক্সা ইনিই প্রস্তুত করেন। কলকাতার লাইট হাউস, পূর্ণ প্রমুখ আরও কয়েকখানি চিত্রগৃহের নক্সাও ইনিই করেন। স্থপতি হিসাবে এঁর সাধনা এবং কীর্তি সর্বজনের সাধুবাদ অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তাঁর প্রয়াণে বাঙলা দেশ একজন শক্তিমান স্থপতিকে অকালে হারাল।

### প্রমীলা ইসলাম

কবি নজরুলের জীবনসঙ্গিনী প্রমীলা ইসলাম গত ১৫ই আষাঢ় ৫৫ বছর বয়েসে লোকান্তরযাত্রা করেছেন। ঢাকা জেলার মণিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তেওতা গ্রামের বসন্তকুমার সেনের কন্যা প্রমীলা ১৯২৪ সালে সেদিনকার বাঙলার তরুণ-মানসলোকের একচ্ছত্র অধীশ্বর কাজী নজরুলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। জীবনের শেষ একুশটি বছরব্যাপী নিদারুণ পক্ষাঘাতের একটানা নিষ্ঠুর আক্রমণের পর মৃত্যু এসে তাঁকে অমৃতলোক ও পরমশান্তির সিংহদ্বারের সন্ধান দিয়ে গেল।

### শৈলবালা দেবী

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শৈলবালা দেবী গত ৩০শে আষাঢ় ৮৩ বছর বয়েসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র।

---

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

## পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়,—মাসিক বসুমতীর ১৩৬৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত সংখ্যায় ৩৩০ পৃষ্ঠায় "মেয়েরা কি চায়" নামে একটি ছোট প্রবন্ধ পাঠ করলাম। প্রবন্ধের এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে—"প্রকৃতিতে মেয়েরা পরনির্ভরশীলা। লতার সার্থকতা যেমন বৃক্ষাশ্রয়ে, পুরুষের দেওয়া আশ্রয়েই তেমনি নারী প্রকৃতির স্বভাবজ প্রবণতা ও স্বার্থকতা। গৃহের কোণ যদি সুখের হয়, তাহলে তা ফেলে বাইরে ছুটবেন কম মেয়েই। তবুও যে আজ বাইরের জগতে তাঁদের দেখা যায়, সে কেবল জীবিকার তাগিদে।" কথাটি সত্য। লোকে বলে—"পুরুষ তমাল তরু প্রেম অধিকারী, নারী সে মাধবীলতা আশ্রিতা তাহারি।" লাউ, কুমড়া, শসা, ঝিঙ্গা ইত্যাদি লতা গাছ একটু বড় হলে ইহাদের শাখা হতে আকর্ষ (স্প্রীং এর মত পাকানো সরু লম্বা অংশ) বের হয় এবং ঐ আকর্ষ নিকটবর্ত্তী শক্তকাণ্ডযুক্ত তরুকে জড়িয়ে ধরে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। এইভাবে লতা গাছগুলো বৃক্ষাশ্রয় গ্রহণ করে—কিছুদিনের মধ্যে নিজেদের ফলে ফুলে শোভিত করে তোলে। লতার সার্থকতা যেমন বৃক্ষাশ্রয়ে, সেরূপ নারীজীবনের স্বার্থকতাও পুরুষের দেওয়া আশ্রয়ের মাধ্যমে। তারা প্রকৃতিতে পরনির্ভরশীলা। এবং যৌবনের প্রারম্ভে পুরুষের আশ্রয় ও সান্নিধ্য লাভ করে তারা (নারীরা) নিজেদের জীবনকে ফুলে ফলে শোভিত করে সার্থক করে তুলবার ইচ্ছা করে, মাতৃত্বের মাধ্যমে নারীজীবনের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। স্বামী-পুত্র পরিবৃত সুখনীড় রচনাই তাদের কাম্য এবং ঈশ্বরের নারীসৃজনের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নারীরা পরিজনের কাজ করে, স্বামীর সান্নিধ্যে বসবাস করে নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে ও স্তন্য দিয়ে, সন্তানের মুখে মা ধ্বনি শুনে যে আনন্দলাভ করে, বহির্জগতে গিয়ে পরিজনের কাজের পরিবর্তে অফিসের নীরস কাজ করে, স্বামীর সান্নিধ্যের পরিবর্তে অন্যের সান্নিধ্যে থেকে, নিজের সন্তানকে কোলে নেওয়ার পরিবর্তে অফিসের ফাইল বগলে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে, সন্তানের মুখে মা ধ্বনি শোনার পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সারাদিন কথা শুনে মনে হয় শান্তি পায় না। অনেক নারীই বলে, গৃহকোণই নারীদের সুখের, বহির্জগৎ নয়। শারীরিক মঙ্গলের জন্যও উপযুক্ত বয়সে বিয়ের মাধ্যমে পুরুষের সান্নিধ্য মেয়েদের প্রয়োজন। যেখানে নারীরা বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র পথে পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং মেয়ের অভিভাবকরাও নিজ নিজ মেয়েদের সে সুযোগদানের জন্য আগ্রহশীল, সেখানে বর্ত্তমানে ব্যতিক্রম দেখা যায় কেন? কিছুদিন পূর্বেও আমাদের সমাজে মেয়েরা বহির্জগতে গিয়ে কাজ করা ঘৃণার ও অনুচিত বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু বর্তমানে কেন দলে দলে মেয়েদের চাকরির সন্ধানে বহির্জগতে দেখা যায়? যখন মেয়েরা দেখে যে, দেশে দ্রুত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে অভিভাবকদের তাদের ভরণপোষণে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে, আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ গৃহকোণ দুঃখভরা হয়ে উঠেছে, সমাজের অমঙ্গলজনক, অসামাজিক, অবাঞ্ছিত ও অপকারী পণপ্রথা তাদের (মেয়েদের) পুরুষের আশ্রয় ও সান্নিধ্য লাভে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে, তখন তাদের জীবিকার তাগিদে দলে দলে বহির্জগতে বের হতে হয়, যেটি মেয়ে বা তার পিতার কাম্য নয়। যদি সরকার কঠোর হস্তে কালোবাজারীদের দমন করে দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং সে ভাবে দেশের প্রত্যেকটি পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে মেয়েরা বাল্যকালে পিতৃগৃহে কষ্ট পাবে না, যুবকেরাও বিয়ের মাধ্যমে যুবতীদের আশ্রয় দিয়ে নিজেরও আশ্রিতার জীবনকে সার্থক ও পূর্ণ করে তুলতে আগ্রহশীল হবে, ফলে মেয়েদের বিয়েও সহজ হবে। আর পিতা ও পতিগৃহের কোণ সুখের হলে মেয়েদের বহির্জগতে এসে চাকরি করার ইচ্ছা ও আবশ্যকতা থাকবে না।—শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ৩০ই, ঘারিক জঙ্গল রোড, পোঃ—ভদ্রকালী, জেলা—হুগলী।

মহাশয়,—আপনার মাঘ মাসের (১৩৬৮) 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি মহাশয়ের "পরমহংসের আবির্ভাবের পূর্বাভাস" নামধেয় প্রবন্ধটি পাঠে প্রভূত আনন্দলাভ করিলাম। অধর্ম্ম ও অনাচারের বন্যায় প্লাবিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত নর-নারীকে শাশ্বত ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ ও সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া পাপ-ভার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কলুষ-তাপ জর্জ্জরিত এই পৃথিবীতে ক্ষমা, করুণা ও প্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক অবতার "শ্রীশ্রী ঠাকুরের" পূণ্য আবির্ভাব অতি সুন্দর ভাবে লেখক উক্ত প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবিত, ক্রম-ক্ষীয়মান হিন্দুধর্ম্মের লাঞ্ছনা ও দুর্দশা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রাঞ্জল ভাবে প্রতিফলিত করিয়া সৃষ্টি ও সনাতন ধর্ম্মরক্ষাকল্পে, সৃষ্টির আধারভূতা নির্গুণ ও নিরবয়ব মাতৃশক্তির সগুণ ও সাকার প্রকাশ, তিনি তাহার নিপুণ কলমে অতি সুন্দর ভাবে ফোটাইয়াছেন। প্রবন্ধ লেখককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া আমাদিগকে আরও অনুরূপ ভাল ভাল প্রবন্ধ পরিবেশন করিয়া বিমল আনন্দ দানের অনুরোধ জানাইতেছি।—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়, ৮/১ ভুবনমোহন ব্যানার্জি রোড, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীরণজিৎকুমার সিংহ, গ্রাম—বৈজনাথপুর, ডাক—লাঙুলিয়া, জেলা—বীরভূম * * * ডক্টর এম, এল, ভুঁইয়া, দক্ষিণ আমলাপটী, ডাক—মোহনাঘাট, ডিব্রুগড় * * * শ্রীমতী মাধুরী পাল, অবধারক—শ্রী এম, এ, পাল, শ্রীসোমঘাট রোড, ডাক—করিমগঞ্জ, * * * প্রদেশ এগ্রিকালচার অফিসার, কুন্ডাহিট, ডাক—কুন্ডাহিট, জেলা—সাঁওতাল পরগণা * * * শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, বেড কট, মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা * * * শ্রীশশাঙ্কশেখর মান্না, শিক্ষক, রাজবল্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাক—সন্ধিপুর, জেলা—মেদিনীপুর * * * ব্লক ডেভেলোপমেণ্ট অফিসার, সদর-ইষ্ট ব্লক হেড কোয়ার্টার, জিরান্টা, ত্রিপুরা * * * শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী, অবধারক—শ্রীএন, আর, চৌধুরী টি, টি ( পি ), লিমিটেড, ডাক—ত্রিবেণী ( হুগলী ) * * * শ্রীইরশাদ আলী বেরভূঁইয়া সচিব, কমিউনিটি সেণ্টার, ডাক—কাভজিচেরা, কাছাড় * * * শ্রীমতী অণিমা চক্রবর্তী, ১৬-ডি, ডোভার লেন, কলকাতা ২৯ * * * শ্রীমুনিশ্বর বর্মণ, হিল মৌজাদার সাব-ডিভিসান, ডাক—পূর্ব কর্ণকপুর, গ্রাম—দালাইচেরা, জেলা—কাছাড় ( আসাম ) * * * Sm. Madhuchhanda Banerjee, C/o Dr. S. P. Banerjee, Asst Surgeon, P. O. Kongnya, Nagaland. * * * শ্রী এ, কে, চৌধুরী, ২৩ ওয়াক দেওয়ারী, পুণা-. * * * শ্রীমতী আরতি দে, অবধারক—শ্রী এন, জি, দে, এ, এস, এম, রাজতগড় রেলওয়ে ষ্টেশান, ডাক—থুমটুনী, জেলা—কটক, উড়িষ্যা * * * শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র, গ্রাম—বেনাপুর, ডাক—কুলীনগ্রাম, জেলা—বর্ধমান * * * শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধারক—ডক্টর কে, সি, ব্যানার্জী, "নিরাময়" সাসারাম, শাহবাদ * * * শ্রী এম, রায়, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, ডাক চাপাডাঙা ( পশ্চিমবঙ্গ ) * * * শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩, রমণী চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা—২৯ * * * শ্রীমতী সরস্বতী রায়, অবধারক শ্রীজগদানন্দ রায়, স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসার, ডাক-করিমপুর, জেলা নদীয়া * * * সচিব, ডোমচাঁচ সাহিত্য মন্দির, ডাক-ডোমচাঁচ, জেলা হাজারীবাগ ( বিহার ) * * * শ্রীধনেন্দ্রকুমার পাটওয়ারী, শিক্ষক, সমরেন্দ্রগঞ্জ স্কুল, ডাক-সমরেন্দ্রগঞ্জ ( সাবরুম ), জেলা ত্রিপুরা * * * সচিব, চার্চ রিক্রিয়েশান ক্লাব, ন্যাশনাল কোল ডেভেলোপমেণ্ট করপোরেশান, ডাক-বৈকুণ্ঠপুর, সুরগুজা ( মধ্যপ্রদেশ ) * * * শ্রী এস, কে, দাস, এম, আর, এফ, সেকসান, মেটিরিওলজিক্যাল অফিস, পুণা—৫ * * * গ্রন্থাগারিক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচার লাইব্রেরী, গোল পার্ক, কলকাতা—২৯ * * * শ্রীবনেশবিজয় পাণ্ডে, গ্রাম—কিশোরপুর, ডাক-শ্যামসুন্দরপুর, পাটনা ( পাশকুড়া মেদিনীপুর হয়ে ) * * * শ্রীমতী সুধা রায়, অবধারক: ডক্টর ডি, এম, কর্মকার, ডাক এবং টি, ই, রাজমাই, আপার আসাম * * * প্রধানশিক্ষক, বন-নিত্যানন্দ সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়, ধালাই, ডাক-ধালাইবাজার, জেলা কাছাড় * * * সচিব, তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার, কাশীপুর, ডাক-পঞ্চকোট রাজ, জেলা পুরুলিয়া * * * শ্রীমতী শ্রীলেখা মিত্র, অবধারক ডাঃ অমল মিত্র, ১২৭ বিজয়চাঁদ রোড, বর্ধমান * * * শ্রী এ, কে, সেনগুপ্ত, কর্মাধ্যক্ষ, সোদপুর ওয়ার্কশপ, ডাক-সুন্দরচক, জেলা বর্ধমান * * * শ্রীমতী শান্তি ঘোষ, অবধারক শ্রী পি, সি, ঘোষ, এগ্রি-হর্টিকালচারিষ্ট সি, এফ, টি, আর, মহীশূর—২ * * * অবৈতনিক সচিব, ইণ্ডিয়ান টি প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশান পোষ্ট বক্স নং ৭৪ জলপাইগুড়ী * * * সচিব, বিদ্যাসাগর পাঠাগার থাকুন্দা, মেদিনীপুর * * * শ্রীমনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ ব্যানার্জীপাড়া ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী * * * শ্রীবদ্রীচাঁদ সরকার, গ্রাম মুড়াগাছা, ডাক-শাহাজপুর ( কালনা হয়ে ), জেলা বর্ধমান * * * সচিব, সর্বোদয় সম্মেলন, পাঁচগাছিয়া, ডাক-ফুলেশ্বর ( কণ্টাই হয়ে ), মেদিনীপুর।

আমার প্রিয় মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা বাবদ ৭'৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। মাধবীলতা দেবী, জলপাইগুড়ি।

Like love, Masik Basumati is a many splendoured thing. Kindly renew my subscription Miss Mahasveta Dutta, Sholapur, ( Maharashtra )

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। রেণুকা মুখার্জী বরোদা।

১৩৬৯ সালের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইতেছি। Chinmoyee Ganguly, Deoria ( U. P. ).

In payment of one year's subscription. Your monthly magazines are being greatly appreciated by me.—Mrs. V. L. Austin, Nowgong.

Rupees fifteen is sent herewith towards annual subscription of monthly Basumati for the current year—Sm. Saraswati Debi. Puri, Orissa.

এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। Sm. Chabi Moitra, Deoria. U. P.

বৈশাখ হইতে এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর মূল্য অগ্রিম পাঠাইলাম। Mrs. Anasuya Chowdhuri, Gaya.

Herewith Rs. 15·00 only being the annual subscription of the Monthly magazine 'Basumati' for the year 1369-70 B. S.—Koomber Indian Club, Cachar.

১৫৲ মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠালাম। Mrs. Tutu Rani Mitra, Poona.

১৩৬৯ সালের চাঁদা ১৫৲ পাঠালাম। কৃষ্ণা সান্যাল, লক্ষ্ণৌ।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। Mrs. Bina Ghose, Bombay—12.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিজে মাসিক বসুমতী পড়িয়া আনন্দ পাই এবং অন্যকেও পড়িতে দিয়া থাকি। মাসিক বসুমতীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। শ্রীমায়া দাশগুপ্ত, বি, এ, আসাম।

Herewith find remittance of annual subscription for 1369 B. S. of Rs. 15·00 ( fifteen only ) Mrs. Uma Basu, B, A. P.o. Siliguri ( Darjeeling )

আমাকে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা কোরে নেবেন। ১৫৲ টাকা পাঠালাম, মায়া ব্যানার্জী, সীতারামপুর, বর্দ্ধমান।

আমি বহু বৎসর যাবৎ মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। শ্রীমতী সুরুচি সেন নিউ দিল্লী।

বর্ত্তমান বৎসরের ( বাংলা সন ) চাঁদা ১৫৲ মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠালাম। Mrs. Asha Mazumdar Aligarh U. P.

সূচীপত্র

## সূচীপত্র





শ্রীরামপুরের
এস. চক্রবর্তীর
স্পেশাল গোল্ডেন
XX
নস্য
লক্ষ্মী এজেন্সী
৪৩/১. ষ্ট্র্যাণ্ড রোড • কলিকাতা-৭

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র



---

# নূতন প্রকাশিত হইল !

শারদীয়া ৺মহাপূজার পূর্ব্বে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অর্ঘ-উপচার। 'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন ও যথাযথ রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন জানন্তি। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

## আমার দেখা মেয়েরা

( রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি )

মূল্য চার টাকা

---

রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু সি-আই-ই প্রণীত

## উপেক্ষিতের উপকারিতা

গ্রন্থখানি অমূল্য। সেকালে দ্রব্যগুণ বিষয়ে চর্চ্চা মাত্র গন্ধবণিক সমাজ করিতেন। স্বদেশী গাছগাছড়ার গুণাগুণ সম্বন্ধে গ্রন্থখানির বিশিষ্ট লেখক ৺রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুর পিতার পরামর্শ তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণও লইতেন। পিতার অভিজ্ঞতা হইতে এবং দীর্ঘকাল নিজের গবেষণার ফলে যে গ্রন্থখানি বাঙ্গালার গৃহস্থ তথা চিকিৎসক সমাজে আদৃত, তাহাই আমরা পাঠকদের হস্তে অর্পণ করিতেছি। মাত্র ভৈষজ্য প্রয়োজনে নহে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় বাঙ্গালার এই উপেক্ষিত দ্রব্যগুলি কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে, কি ভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহার বাস্তব পরামর্শও লেখক দিয়াছেন। ইহার সহিত যে সকল বহু প্রাচীন ও ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ গ্রন্থে প্রকাশ করা হইয়াছে, সেগুলি প্রতি গৃহস্থ ও চিকিৎসকগণ প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করিবেন।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী—৪১৬ পৃষ্ঠা এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত।

মূল্য আড়াই টাকা

---

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

## হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেই দিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ ধ্বংস করিয়াছে য়ুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি এনি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোরী ও কিশোরের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্ম্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

---

বহুকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইল

—রোমাঞ্চ-রহস্য-গ্রন্থ—

## রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্ত নদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, জীবন-পথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা, ছলনা ও প্রেমের লীলায় চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোমহর্ষণ সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

---

৺সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

## ছত্রপতি শিবাজী

যে বীরবর হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত প্রদান করিয়া জননী জন্মভূমির পূজা করিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণবরেণ্য, অনুদিন স্মরণীয় ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর উদার-চরিত্র জন্মভূমিভক্ত ও ভারতীয় বীর চরিত্র পাঠে অনুরক্ত মহাত্মাদিগের করকমলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করেন অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বিপ্লবী সত্যচরণ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৩৫০ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ, কার্ডবোর্ড বাঁধাই। মূল্য দুই টাকা।

---

বসুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

ফোন ৩৪-৫০১৫
ফোন ৩৪ ৪৮৪৮
এইচ, পি, সরকার
এণ্ড কোং
জুয়েলার্স
• আধুনিকতায়
• নির্ভরতায়
• মৌলিকতায়
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট • বহুবাজার স্ট্রীট •
শাখা :- ১২৫ এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা ১২

।। মাসিক বসুমতী ।।

শ্রাবণ, ১৩৬৯

(জলরঙ)

## রঙ্গনটি

—শ্রীসুভো ঠাকুর অঙ্কিত

স্বপনের মোহজাল রচে . .
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ
সুরভিত কেশতৈল।
পামিকোকো
মৃদু সুরভিত
নারিকেল তৈল।
হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
পরিশোধিত ও
সুগন্ধিত কেশতৈল।
ভৃঙ্গামলা
ভৃঙ্গরাজ ও আমলা
সহযোগে প্রস্তুত
সহায়কারী
কেশতৈল।
যোজনগন্ধা
অনুপম
সুরভি নির্য্যাস।
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্
প্রাইভেট লি.
নিত্য প্রসাধনের সার্থকতায় জোটাট্টি অপরিহার্য্য . .
UPCO

৪১শ বর্ষ, শ্রাবণ—১৩৬৯ ] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [ ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

# কথামৃত

## স্বামিজী-প্রসঙ্গে

গৌরীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহাদিগের জননীদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব বর্ত্তমান ছিল। গৌরীমা বয়সে স্বামিজী অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন এবং তাঁহাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত স্বামিজীর আচরণ বালসুলভ সরলতায় পূর্ণ ছিল। স্বামিজী নিজেও বলিতেন, "ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি।" এই অধ্যায়ে তাঁহাদিগের জীবনের কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করা হইল।

গৌরীমার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবীকে স্বামিজী 'দিদিমা' বলিয়া ডাকিতেন। দিদিমার বহুমুখীন গুণের জন্য স্বামিজী তাঁহার খুব সুখ্যাতি করিতেন। উভয়ের মধ্যে বহুবিধ আলোচনা এবং পরিহাসও চলিত। দর্শনশাস্ত্রের তর্ক যখন উঠিত, দিদিমা বলিতেন, "ভারী ত আমার সাধু! খিড়কি দোর দিয়ে পালিয়েছ, তোমাদের আবার বাহাদুরি কি? আমাদের মত সংসারের জ্বালা সয়ে যদি ভগবানকে ডাকতে পারতে, বুঝতুম, হাঁ, মরদ।" স্বামিজীও পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিতেন, "দিদিমা, সংসারের মোহ এখনো কাটাতে পাচ্ছ না, তোমাদের কি উপায় হবে!" দিদিমার সহিত এইরূপ প্রসঙ্গে স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন, "এত বড় দুনিয়াটা ঘুরে এলুম, কোথাও ত কথা কইতে ভাবতে হয়নি, কিন্তু দিদিমার কথার জবাব দিতে হিসেব ক'রে কথা কইতে হয়!"

একবার গৌরীমা, তাঁহার মাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং স্বামিজী হরিদ্বারে এক বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। একদিন গৌরীমা বাহিরে গিয়াছেন, এমন সময় এক ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হইল। গিরিবালা তাহাকে দান করিবার মত ঘরে কিছুই পাইলেন না। কতকগুলি আম গৌরীমা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—দামোদরের ভোগের জন্য। ঠাকুরদেবতার উদ্দেশে রক্ষিত কোন দ্রব্যের অগ্রভাগ ভোগের পূর্ব্বে তিনি কাহাকে কখনও দিতেন না। গিরিবালাও তাহা জানিতেন। স্বামিজী সেই আমগুলি দেখাইয়া বলিলেন, "দিদিমা আঁব ত রয়েছে কতকগুলো, দুটো ওকে দাওনা।" দিদিমা কন্যাকে ভালরূপ চিনিতেন, বলিলেন, "আরে বাপ্‌রে, এক্ষুণি এসে প্রলয় ঘটাবে।"

গৌরীমার আচারনিষ্ঠার বিষয় স্বামিজীও জানিতেন, তথাপি সরলপ্রকৃতি দিদিমাকে লইয়া একটু রঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তা ব'লে গরীব ভিকিরীকে শুধুহাতে ফিরিয়ে দেবে, দিদিমা ?" বৃদ্ধা তখন দুই-তিনটি আম আনিয়া ভিখারীকে দিলেন।

এদিকে গৌরীমা আসিবামাত্র, নিতান্ত ছেলেমানুষের মত তাঁহার নিকট স্বামিজী অভিযোগ করিলেন, "ও গৌরমা, দেখেছ কাণ্ডটা! দিদিমা তোমার দামুর ভোগের ঐ আঁব ভিকিরীকে দিয়ে দিয়েছেন। দামুর ভোগ ওতে ত আর হবে না।" ইহাতে দুঃখিত হইয়া গৌরীমা গর্ভধারিণীর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

তাঁহার দোষে দামোদরের ভোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধা সেই জন্য কন্যার কথার কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু স্বামিজীর আচরণে তিনি অবাক হইলেন। তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া স্বামিজী মনে মনে খুব কৌতুক বোধ করিতেছিলেন, এবং এক সময় তাঁহাকে নিরালায় পাইয়া খুব সহানুভূতির সুরে বলিলেন, "দেখলে ত দিদিমা তোমার মেয়ের কাণ্ডটা! সামান্য দুটো আঁবের জন্যে কি বকাটাই না ব'কলে।" দুঃখের মধ্যেও দিদিমা তখন হাসিয়া বলিলেন, "তা দাদা, তুমিও ত ঠাকুরটী কম নও। চোরকে বল চুরি করতে, আবার গেরস্তকে বল সজাগ থাকতে!" এইবার দুইজনই খুব হাসিতে লাগিলেন।

হরিদ্বার হইতে গৌরীমা পুনরায় কেদারনাথ এবং বদরীনারায়ণজী দর্শনে গমন করেন। আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইয়াও স্বামিজী, গিরিবালা দেবী এবং তাঁহার পুত্র অবিনাশচন্দ্র তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে গৌরীমার ভ্রমণোপযোগী কতকগুলি বস্ত্র স্বামিজী ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন।

আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে গৌরীমার কাছে স্বামিজী একদিন মা কালীর প্রসাদ খাইতে চাহিলেন। গৌরীমা সেই দিনই ভোগের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বামিজী এবং ঠাকুরের আরও কয়েকজন ভক্তসন্তানসহ কালীঘাটে গেলেন। কালীঘাটে মায়ের সেবায় গিরিবালা দেবীর এক অংশ ছিল। দেবীর ভোগরন্ধনের জন্য মন্দিরে তাঁহাদের একখানি পৃথক্ ঘরও ছিল। গৌরীমা সময় সময় ঐ ঘরে ভোগ রন্ধন করিয়া মা কালীকে নিবেদন করিতেন। ঐ দিনও মা কালীকে ভোগ নিবেদন করিয়া তিনি সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

তাঁহার হাতের রান্না প্রসাদ খুবই সুস্বাদু হইত বলিয়া স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন, "গৌরীমা, তুমি ম'রে গেলে তোমার ডান হাতখানা কেটে রেখে দেবো; আমাদের যখন পেসাদ খেতে হবে, তোমার ঐ হাত আমাদের রেঁধে দেবে!"

একবার গৌরীমা ও স্বামিজী তারকেশ্বর গিয়াছেন। সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ এবং স্বামী অদ্বৈতানন্দও (বুড়ো গোপাল) ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পদব্রজে গমন করেন। পথিমধ্যে একটা পুকুরের সিঁড়িতে বসিয়া গৌরীমা দামোদরের পূজা এবং ভোগ সমাপন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পল্লীর কয়েকটী মহিলা আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। এ-কথা সে-কথার পর তাঁহারা গৌরীমাকে প্রশ্ন করিলেন, "ওঁরা আপনার কে হন?"

তিনি উত্তর করিলেন, "ওরা আমার ছেলে।"

স্বামী অদ্বৈতানন্দের বয়স ছিল বেশী। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মা, ঐ বুড়ো সাধুটিও আপনার ছেলে?"

গৌরীমা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "ওটী আমার সতীন-পো।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে স্বামী অদ্বৈতানন্দকে উপলক্ষ করিয়া স্বামিজী কৌতুকচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, "ভাগ্যিস্ বুড়ো হই নি, তা হ'লে আমাকেও আজ সতীন-পো হ'তে হতো।"

একবার বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থানকালে অকস্মাৎ স্থানান্তর হইতে স্বামিজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই বলিলেন, "গৌরীমা, শীগ্‌গির খেতে দাও আমায়, ভারী ক্ষিদে পেয়েছে।" তখন রাত্রিকাল, গৌরীমার কাছে সেদিন কোনপ্রকার খাদ্যসামগ্রী ছিল না। তিনি ভাবনায় পড়িলেন,—এত রাত্রিতে কোথায় কি পাওয়া যায়; অথচ কিছু না হইলেও নরেন সারারাত্রি উপবাসী থাকে। গৌরীমা তখন একজন পরিচিত দোকানদারের বাড়ী গিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। দোকানদার বাহিরে আসিলে তিনি বলিলেন, "তোমার দোকান খুলে কিছু খাবার না দিলে সাধু উপবাসী থাকেন।" দোকানদার কিছু খাবার দিলে তদ্দ্বারা স্বামিজীর ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলেন।

সেই রাত্রিতেই গৌরীমার পূজিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোখানি লইয়া স্বামিজী হাতরাস চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেই ফটোর সমক্ষে তিনি হাতরাসের 'ষ্টেশন মাষ্টার' শরৎচন্দ্র গুপ্তকে দীক্ষা দান করেন। ইনিই স্বামী সদানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য।

স্বামিজী প্রথমবার বিদেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গৌরীমা তাঁহার জন্য ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া গেলেন। ঠাকুরের বীর সন্তান পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিয়াছেন, গৌরীমা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দিলেন। বহুদিন পর উভয়ের সাক্ষাৎ। কুশলপ্রশ্নাদির পর স্বামিজী বিদেশের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "আমি কিন্তু ওদের কাছে তোমার কথা ব'লে এসেছি। তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাব—আমাদের ভারতবর্ষেও কেমন মেয়েমানুষ জন্মায়।"

গৌরীমার আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া স্বামিজী সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছুদিন পর স্বামিজী বারাকপুর আশ্রমে গমন করেন এবং স্থানটী দেখিয়া প্রীত হন। আশ্রমের ভবিষ্যৎ কার্য্য-পরিচালনা বিষয়ে গৌরীমার সহিত তাঁহার অনেক আলোচনা হয়।

গৌরীমার নারী-শিক্ষার আদর্শ শুনিয়া স্বামিজী বলেন, "আমেরিকায় দেখে এলুম, কত বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েরা কুমারী থেকে জ্ঞানার্জ্জন করে, দেশের সেবা করে, অথচ কেমন পবিত্র। আর আমাদের দেশে শিক্ষা আরম্ভ হ'তে না হ'তেই আট বছরের শিশুকে বিয়ে দেওয়া হয়! এটা বন্ধ করতে পার, গৌরীমা? এমন শিক্ষা দিতে হবে মেয়েদের, যাতে এদেশে আবার গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতীর উদ্ভব হয়। আমার আশা হচ্ছে, আরও উচ্চ আধারের মেয়েরা এখান থেকে বেরোবে।"

ভগিনী নিবেদিতা এবং আরও দুইটী বিদেশীয়া মহিলাকে স্বামিজী যেদিন গৌরীমার সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন, সেই দিনের কথা বলিয়া স্বামিজী বড়ই আমোদ অনুভব করিতেন, "নিবেদিতা তখন বাংলা কিছুই জানেন না, গৌরীমাও ওদের ইংরিজি কথা সব বোঝেন না; অথচ উভয়ে উভয়কে মনের কথা বোঝাতে উৎসুক। তখন ইসারায় আলাপ চললো। মুখ নড়ে, হাত নড়ে, মাথাও নড়ে, কিন্তু কেউ কারুর ভাষা বোঝেন না। সে এক মজার দৃশ্য!"

—গৌরীমা গ্রন্থ হইতে।

# স্বস্তিক

শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগে যুগে ভারত হ'তে প্রচারিত হ'য়েছে সত্য, প্রেম ও শান্তির বাণী। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে সত্য, শিব, সুন্দরের উপাসক ভারতে উচ্চারিত হ'য়েছিল স্বস্তির মন্ত্র :

স্বস্তি মাত্র উত পিত্রে নো অস্তু
স্বস্তি গোভ্যো জগতে পুরুষেভ্যঃ
বিশ্বম্ সুভূতম্ সুবিদত্রম্
নো অস্তু জ্যোগেব দৃশেম্ সূর্যম্।
( অথর্ব ১।৩১।৪ )

আমাদের মাতার কল্যাণ হ'ক, পিতার কল্যাণ হ'ক। আমাদের গোধনের মঙ্গল হ'ক। বিশ্বের সকল প্রাণীর মঙ্গল হ'ক। সমগ্র বিশ্ব উত্তম ধন ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে পরিপূর্ণ হ'ক। আমরা চিরকাল সূর্য দর্শন করতে থাকি। অর্থাৎ আমরা যেন দীর্ঘায়ুলাভ করি।

যে স্বস্তিবাচনের দ্বারা আর্যেরা সমগ্র বিশ্বে সুখ ও শান্তির সাম্রাজ্য গঠনের কল্পনা করেছিলেন, তারই সাঙ্কেতিক অভিব্যক্তি এই স্বস্তিক চিহ্ন। আয়ু, আলোক, সূর্য ও আকাশের বোধক; চিরন্তন সত্য, শাশ্বত শান্তি এবং দিব্য ও অনন্ত ঐশ্বর্যমণ্ডিত সৌন্দর্যের প্রতীক, বিশ্বের আদি মাঙ্গলিক চিহ্ন এই 'স্বস্তিক'।

হিন্দু সংস্কৃতির আদিকাল থেকেই তার সঙ্গে স্বস্তিকের অবিচ্ছিন্ন ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক চলে আসছে। প্রতীক-উপাসনা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। অধ্যাত্মতত্ত্বের গূঢ় বিষয়গুলিকে প্রতীকের মাধ্যমে বোধগম্য ক'রে ধর্মকে সরল করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ। স্বস্তিকের ঐতিহাসিকতা অনুসরণ করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাচীনতার দিক থেকে স্বস্তিক বেদের সমকালীন।

স্বস্তিকের শাব্দিক অর্থ অনুধাবন করলে জানা যায় যে, স্বস্তিক হঠযোগের একটি আসনের নাম। আয়ুর্বেদের শল্যচিকিৎসা শাখায় স্বস্তিক নামক একটি যন্ত্রের উল্লেখ আছে। এই যন্ত্রের দ্বারা শরীরের ভিতরে প্রবিষ্ট শলাকাদি বের করা হ'ত। চতুষ্পথ বা চৌরাস্তার বদলে স্বস্তিক শব্দের ব্যবহার প্রাচীন স্থাপত্যগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। অলিন্দ অথবা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদকেও স্বস্তিক বলা হ'ত। শূদ্রক-রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের একটি দৃশ্যে এক চোরকে চারুদত্তের গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় এই চিন্তা করতে দেখা যায় যে, সে স্বস্তিক সন্ধি ( সিঁধ ) কেটে ঘরে ঢুকবে না কলস-সন্ধি কেটে। সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে স্বস্তিক এমন একটি মাঙ্গলিক চিহ্ন—যার উপযোগিতা ধার্মিক অনুষ্ঠান থেকে আরম্ভ ক'রে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত সমভাবে স্বীকৃত। হয়ত এই কারণেই আজও স্বস্তিককে যেমন দেখা যায় পূজার ঘট ও মঙ্গল-কলসে, তেমনই দেখতে পাওয়া যায় ব্যবসায়ীদের দাঁড়িপাল্লায় ও সিন্দুকে। হিসাবের বহি-খাতায় তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও স্বস্তিক অঙ্কিত হয় যেমনটি হ'ত হাজার হাজার বছর আগেকার পুঁথিতে। প্রাচীন হাতে-লেখা পুঁথিতে স্বস্তিককে সমাপ্তির চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হ'ত। নৌশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থেও স্বস্তিক-নৌকার বর্ণনা আছে। এই ধরণের নৌকা সেকালে রাজাদের ব্যবহারার্থ বিশেষভাবে নির্মিত হ'ত। মাঙ্গলিক প্রতীকসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় স্বস্তিকের খ্যাতি সর্বাধিক বিস্তারলাভ করেছিল।

'স্বস্তিক' নামক পুস্তকে উইলহেল্ম বলেছেন যে, স্বস্তিক-চিহ্ন বিশ্বজনীন। পৃথিবীর প্রাচীন জাতিগুলির ধার্মিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য উৎসবের মধ্যে স্বস্তিকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য নয়, যদিও বিভিন্ন দেশে কালের প্রভাবে তার আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে অল্পবিস্তর। তিনি বলেন যে, স্বস্তিকের জন্মস্থান ও উৎপত্তিকাল সঠিক জানা না গেলেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বেই ভারতে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। অন্যান্য অনেক পণ্ডিত কিন্তু ভারতকেই স্বস্তিকের জন্মভূমি হিসাবে স্বীকার করে থাকেন এবং তাঁদের মতে এশিয়ার নানাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকও সে-সব দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। শ্রীসতীশচন্দ্র কালা তাঁর পুস্তক 'মহেন-জো-দাড়ো ও সিন্ধু-সভ্যতা'তে স্বস্তিক-অঙ্কিত মুদ্রা ও ফলকের বিবরণ দিয়েছেন। দক্ষিণ-ভারতেও কতকগুলি স্বস্তিক-সমন্বিত প্রাচীন পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

স্বস্তিক ও চক্র উভয়ই সূর্যের প্রতীক। প্রাচীন পারস্যে স্বস্তিককে অগ্নি ও জ্যোতির প্রতীকরূপে গণ্য করা হ'ত। ইরানের একটি অতি পুরাতন পারসিক মন্দিরের দ্বারে সূর্য, চন্দ্র ও স্বস্তিকের চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে। সি, জে, ব্রাউন লিখিত 'কয়েনস্ অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে স্বস্তিক ও বোধিবৃক্ষের চিত্রযুক্ত কয়েকটি মুদ্রার বর্ণনা আছে। মুদ্রাগুলি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তৈয়ারী করা হয়েছিল ব'লে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। মুদ্রাপৃষ্ঠের ঐ চিত্র থেকে অশোকের সময়ে স্বস্তিকের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়। অশোকের শিলালিপিসমূহেও স্বস্তিকের আধিক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৌদ্ধ ও জৈন গুহাগাত্রেও স্বস্তিকের ছড়াছড়ি। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে স্বস্তিকের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে সবিস্তার। স্বস্তিকের স্থান ও কালোপযোগী একাধিক অঙ্কন-পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে এই সকল গ্রন্থে। কল্যাণসূচক হওয়ায় বৈদিক-পরবর্তী যুগে বিভিন্ন বস্তুর—এমনকি ব্যক্তির নামের সঙ্গেও স্বস্তিক শব্দটি যুক্ত করা হ'ত। বাল্মীকি-রামায়ণে স্বস্তিক-চিত্রিত পোতের কথা আছে। মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধ-বধ-প্রকরণে স্বস্তিক নামধারী একটি নাগের উল্লেখ আছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্বস্তিক-শোভিত ছিল।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে স্বস্তিকের কেন্দ্র দ্বারা সূর্য এবং চারটি খণ্ডিত বাহুদ্বারা তার চতুর্দিক পরিভ্রমণকারী গ্রহ-উপগ্রহাদি-মণ্ডল সূচিত হয়। আবার অনেকে যজ্ঞাগ্নি-উৎপাদক ঘর্ষণরত দুটি অরণির সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে স্বস্তিকের ব্যাখ্যা করে থাকেন। জৈন মতে ইহা জিন-দেবতাদের চব্বিশটি উত্তম লক্ষণের মধ্যে একটি এবং

স্বস্তিকই সকল কর্মবিজ্ঞানের আধার। জৈন-দর্শনানুসারে পরস্পর ছেদনকারী দুটি স্বস্তিক রেখা আত্মা ও পুদ্গলের (যার সংপ্তে শরীর-মন ও প্রাণ সৃষ্ট হয়) প্রতীক। দুটি রেখা পরস্পরকে কাটার ফলে চারভাগে বিভক্ত হয়। এই চারটি খণ্ড প্রাকৃত জগতের চারটি ক্রম—পূর্ববর্তীসর্গ, বনস্পতিসর্গ, মনুষ্যসর্গ ও দেবসর্গ অথবা দেব, নরক, তির্য্যক ও মনুষ্য—এই চারটি গতির দ্যোতক। জৈনদের অক্ষত পূজার সময় অঙ্কিত স্বস্তিকের ওপর তিনটি বিন্দু স্থাপিত হয়। বিন্দু তিনটিকে রত্নত্রয় অর্থাৎ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র বলা হয়। মধ্যস্থান 'সিদ্ধিশিলা' অর্থাৎ মুক্তিস্থান নামে অভিহিত। জৈন পুরোহিত কর্তৃক আশীর্বাদের সময়েও স্বস্তিক-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধধর্মেও স্বস্তিকের স্থান অতি উচ্চে। ভগবান বুদ্ধের চরণের এবং অনেক স্থানে বক্ষের দিব্যলক্ষণ হিসাবে বৌদ্ধরা পবিত্র স্বস্তিকের ধ্যান করে থাকেন। চীন ও জাপানে বুদ্ধের পাদপদ্মপূজার প্রবর্তন ও প্রচলন হওয়ায় বিদেশে স্বস্তিকের প্রচার অনেক ত্বরান্বিত হয়েছিল। জাপানে বুদ্ধমূর্তির অঙ্গে এই চিহ্ন বিশেষভাবে অঙ্কিত করা হয়।

যে সব পুণ্যকামী জাপানী তীর্থযাত্রী ফুজিয়ামার শৃঙ্গে আরোহণ করেন, তাঁদের সেখানে স্বস্তিক-লাঞ্ছিত কলসের জল পান করতে দেওয়ার প্রথা আছে। তাঁদের ধারণা, মনজীর (স্বস্তিকের) অন্তর্নিহিত শক্তি কলসস্থিত জলে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে ঐ জল দীর্ঘায়ু প্রদান করে। কোরিয়াবাসীরা নিত্যব্যবহার্য পাল্কী ও তাঞ্জামেও স্বস্তিক এঁকে রাখত। চীনে এই চিহ্ন প্রাচুর্য ও অসংখ্যতার বোধক। প্রাচীন চীনেও স্বস্তিক সূর্য, আলোক, কল্যাণ ও দীর্ঘায়ুর প্রতীকরূপেও পরিগণিত ও পূজিত হত। 'তাং'-বংশীয় রাজা 'বু' সমগ্রদেশে স্বস্তিক উপাসনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে সময়ে চীনাদের মনে স্বস্তিকের প্রভাব এত গভীরভাবে পড়েছিল যে, তারা ঘরের আসবাব-পত্রেও সযত্নে মাকড়সা পুষত এবং তাদের জালে সৌভাগ্যের প্রতীক স্বস্তিক চিহ্ন আবিষ্কার করতে চেষ্টা করত। তাদের ধারণানুযায়ী স্বস্তিকের জন্ম আকাশে কয়েকটি বিশেষ নক্ষত্রের মিলনের ফলে। তিব্বতেও স্বস্তিকের আদর যথেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। তিব্বতীয়রা দেহে উল্কিদ্বারা স্বস্তিক এঁকে রাখত। ওদেশে মঠে, মূর্তিতে ও পতাকায় স্বস্তিকের অন্ত নেই। ব্যাবিলনের লোকেরা স্বস্তিকের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই পরিচিত ছিল। নিউজীল্যাণ্ডের আদিবাসী মাওরীদের মধ্যেও স্বস্তিক মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে স্বীকৃত। আলজীরিয়া ও মিশরেও স্বস্তিক-চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে এবং সেখানকার লোকেরা মনে করে যে, তাদের দেশে স্বস্তিকের আমদানি হয়েছে গ্রীস থেকে। প্রাচীন গ্রীসে তৈজসপত্রে ও মাটির বাসনে স্বস্তিক অঙ্কনের রীতি ছিল। সাইপ্রাস দ্বীপে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিতে স্বস্তিক-চিহ্ন পাওয়া গেছে। ক্রীটে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন রজত-মুদ্রাতেও এই চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এর থেকে ইউরোপেও স্বস্তিকের অস্তিত্বের প্রাচীনতা আন্দাজ করা যেতে পারে। ইতালীতে প্রাপ্ত কয়েকটি স্বস্তিকের নমুনা থেকে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইউরোপে রোমই স্বস্তিকের প্রবর্তক। উইলহেল্ম এই মত প্রকাশ করেছেন যে, আদিখৃষ্টানদের মধ্যেও পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীকরূপে স্বস্তিক ধারণ ও অঙ্কনের প্রথা ছিল। ক্রসকেও অনেক পণ্ডিত রূপান্তরিত স্বস্তিক বলে থাকেন। অধুনা যে কয়প্রকারের ক্রস প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে ক্রস পোটেন্ট ও ক্রস ক্রসলেটের আকৃতি সত্যিই অনেকটা স্বস্তিকের মত। স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত অ্যাবারডীনে চল্লিশটি অক্ষর ক্ষোদিত একটি পাথরের ফলক পাওয়া গিয়েছে। অক্ষরগুলির ঠিক মধ্যখানে স্পষ্ট স্বস্তিক-চিহ্ন বিদ্যমান। লিপিটির পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি কিন্তু ওখানে স্বস্তিকের দ্বারা কোন বিশেষ সংখ্যা সূচিত হয়েছে অনুমিত হয়। হয়তো প্রাচীন চীনের মত ইউরোপেও স্বস্তিকের আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক অর্থ ছাড়া একটা গাণিতিক অর্থও ছিল।

আমেরিকায় ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের অনেক আগেই স্বস্তিকের আবির্ভাব হয়েছিল। সেখানে খননকাজের ফলে এমন কতকগুলি জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে স্বস্তিকের সুস্পষ্ট চিহ্ন পুরাতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রাচীন আমেরিকার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের প্রকৃত ইতিহাস যথেষ্ট সংখ্যক নির্ভরযোগ্য প্রমাণাভাবে অজ্ঞাত থাকলেও, অনেক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, আমেরিকায় বৌদ্ধ প্রচারকেরা পদার্পণ করেছিলেন এবং ঐ স্বস্তিক-চিহ্ন তাঁদেরই দান। কিছুকাল পূর্বে আমেরিকায় প্রাচ্য পদ্ধতিতে নির্মিত একটি দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি বুদ্ধের কি কোন হিন্দু দেবতার, তা' এখনও নিরূপিত হয়নি। স্বস্তিক-আসনে উপবিষ্ট এই মূর্তিটি এখনও গবেষণাধীন রয়েছে। চমনলাল তাঁর 'হিন্দু-আমেরিকা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমেরিকার আদিবাসী-দের নানা উৎসবানুষ্ঠানে স্বস্তিকের দর্শন যথেষ্টই মেলে।

পরিচিত রূপ ছাড়া স্বস্তিকের আরও দুটি অঙ্কন-পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্রে আছে। একটির নাম শ্রীবৎস ও অপরটির নাম নন্দ্যাবর্ত। ওঁ শব্দের সর্বভারতীয় রূপ নিরীক্ষণ করলে তাকেও (ওঁ) স্বস্তিক বলা যেতে পারে। সনাতন শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ওঁ অখণ্ড চিদানন্দের সত্তার প্রতীক, ভগবানের অক্ষর-রূপ। তাত্ত্বিক অর্থে ওঁ ও স্বস্তিকের তাদাত্ম্য অনস্বীকার্য। ভারতের পার্সী সম্প্রদায় স্বস্তিককে 'অপস্তিক' বলেন। সূর্যের গতির সঙ্গে স্বস্তিকের একটা সম্বন্ধ আছে এবং আদিত্য, অগ্নি, আরোগ্য ও সমৃদ্ধির মূল এই স্বস্তিক, পার্সীদের এই ধারণা। অগ্নি-উপাসক পার্সীদের পবিত্র ধার্মিক 'বুই'-এরও প্রতীক এই স্বস্তিক। কারণ ঐ 'বুই' কৃত্যে অধ্বর্যু বা ঋত্বিকেরা স্বস্তিকাকারেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে থাকেন। পার্সীদের চারিদিক ও চারিকালের প্রার্থনারও প্রতীক এই স্বস্তিক।

বৈদিক যুগে যার উদ্ভব—সেই স্বস্তিকের মর্যাদা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ ও বহুলাংশে অবিকৃতই আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে কল্যাণকর 'স্বস্তিক' আজও বিরাজমান শুধু ভারতে নয়, এশিয়ার মাটিতে। আজ ভারতে বাণিজ্য-পোতগুলি আবার স্বস্তিক-চিহ্নিত হয়েই সমুদ্রবক্ষে ভাসমান। অবশ্য অনেকে অতীতকে তার নিজস্ব রূপে ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু তা হবার নয়। বর্তমানের সঙ্গে হাত মিলিয়েই সংস্কৃতিকে অগ্রসর হ'তে হবে। তাই স্বস্তিক নিজ আকৃতিতে জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে কিনা—সে তর্ক নিরর্থক। তবে স্বস্তিকের উচ্চাদর্শকে স্মরণে রাখতেই হবে, সে আদর্শ কালজয়ী। তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রগতির পথে অগ্রসর হলেই মনুষ্যজাতি তার অতীত ও বর্তমান উভয়কেই অতিক্রম করে এক অধিকতর উজ্জ্বল ও উন্নততর অবস্থায় উপনীত হ'তে পারবে।

# জনৈক বৈষ্ণবের অপযশ খণ্ডন

শ্রীত্রিদিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের গুরু শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর * শ্রীগদাধরের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একজন অনুরাগী ও প্রিয়ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, 'নরহরি ও গদাধর এক আত্মা, একপ্রাণ' ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ছিলেন 'গদাধরের প্রাণনাথ', শ্রীপ্রভুকে 'প্রাণনাথ' ভাবিয়া মধুরভাবে ভজনা করিবার প্রবর্ত্তক ছিলেন শ্রীনরহরি ঠাকুর। তিনি 'সরকার ঠাকুর' নামেও অভিহিত হইতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ-শাখা বর্ণনায় শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীমুকুন্দদাসের নাম উল্লেখ আছে। যথা—

"খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥"—চৈঃ চঃ আদি, ১০।৭৬

শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য শ্রীলোচনদাস ঠাকুর অপূর্ব্ব পদকর্ত্তা ছিলেন। উভয়েই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিতেন। ইঁহারা দেখিলেন যে, অন্যান্য কবি ও লীলা-লেখকগণ শ্রীগৌরাঙ্গের যে লীলাবর্ণন করিয়াছেন, তাহা কেবল ঐশ্বর্য্যভাবপূর্ণ। মাধুর্য্যভাবের বর্ণনা না থাকিলে প্রেমিক ভক্তগণের চিত্তবিনোদন হইতে পারে না এবং শ্রীগৌরাঙ্গই যখন শ্রীকৃষ্ণ, তখন তাঁহাকে সখ্য ও মধুরভাবেই ভজন করিতে হইবে। ইঁহারা নদীয়া-নাগরীদের হৃদয়ভাব অবলম্বন করিয়া এবং গৌরাঙ্গসুন্দরকে নাগররূপে ভাবিয়া যে সকল লালিত্যপূর্ণ পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কবিত্বে, মাধুর্য্যে ও কোমলতায় বঙ্গ-সাহিত্যে তাহা চিরদিন গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু অতিশয় নিষ্ঠাপরায়ণ বৈষ্ণবগণ এই নাগর-নাগরীতত্ত্ব প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না! তাঁহাদের মধ্যে 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় ছিলেন অন্যতম। তিনি যে এই তত্ত্বকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দান করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার নিজ উক্তি হইতেই প্রকাশ পায়। যথা—

"স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি করে॥"
—চৈঃ ভাঃ আদি ১৩।৫৮৬০

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবেরা প্রেমিক ভক্তগণের এই নাগর-নাগরীরূপ উপাসনাকে শ্রীপ্রভুর সম্ভ্রমহানিকর ও কতকাংশে গ্রাম্যতাদুষ্ট মনে করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাহা বহুল প্রচার ও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও, শ্রীপ্রভুর নৈষ্ঠিক ভক্তই হউন বা প্রেমিক ভক্তই হউন, সকলের বিবরণই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে শ্রদ্ধার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-রচিত এই 'চৈতন্য-ভাগবত' একখানা পরম উপাদেয় অদ্বিতীয় লীলাগ্রন্থ। ইহার আদি নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। পরে শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখিত হইলে ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'চৈতন্য-ভাগবত' রাখা হয়। অপার্থিব প্রেম ও ভক্তিতে ওতপ্রোতভাবে অনুভাবিত হইতে না পারিলে এরূপ একখানা গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয় না। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ মানুষের রচিত বলিয়া মনে হয় না, ইহা যেন বৃন্দাবনদাসের মুখে শ্রীচৈতন্যেরই উক্তি! এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মধুর লীলা ও তাঁহার ভক্তগণের কাহিনী অতি মধুর ভাষায় ও সহজ সরল পদ্যে লিখিত আছে। ইহা পাঠ করিলে অতি কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়, অন্তরে ভক্তি ও প্রেমের ভাব সঞ্চারিত হয়। গৌরভক্তগণ সাধারণতঃ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থকেই একমাত্র প্রামাণিক লীলাগ্রন্থ গণ্য করিয়া তাহা নিত্য পাঠ ও পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু অগ্রে 'চৈতন্য-ভাগবত' পাঠ না করিলে লীলা-পাঠ সম্পূর্ণ হয় না। আবার অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর লীলা বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থপাঠে উদ্যোগী হন, কিন্তু গ্রন্থে গভীর শাস্ত্রালোচনা দেখিয়া বেশীদূর অগ্রসর না হইয়াই নিবৃত্ত হন। তাঁহাদেরও অগ্রে চৈতন্য-ভাগবত পাঠ করা উচিত। চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঠাকুরের উক্তিসমূহ হইতেই এরূপ নির্দ্দেশই সূচিত হয়। তিনি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে 'বেদব্যাস' আখ্যা দিয়াছেন এবং নিজগ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার নিকট অশেষ ঋণ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। যথা—

"অরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল।

---

* প্রবন্ধলেখক বৈষ্ণবগ্রন্থানুরাগী এবং বৈষ্ণবগ্রন্থরচয়িতাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। এইরূপ একজন পূজার্হ গ্রন্থকর্ত্তা সম্বন্ধে কয়েক বৎসর যাবত একটি ভ্রান্ত ধারণা ও ক্লেশকর অপবাদ প্রচার লাভ করিয়া আসিতেছে। তাহা সম্পূর্ণভাবে নিরসন করিবার উদ্দেশ্য নিয়াই এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে, কাহারও উপর কোন দোষারোপ করিবার প্রবৃত্তি নিয়া নহে।

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণ-ভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহাঁ আনি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেই মহা বৈষ্ণব হয় তৎক্ষণ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি যেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ॥
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৮।২১-৪০

* * *

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥"

—ঐ আদি ৮।৭৫-৭৬

* * *

"চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তিঁহো ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে॥
প্রভুর লীলামৃত তিঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ॥"

—ঐ আদি ১৩।৪৬-৪৮

এতদ্ভিন্ন গ্রন্থের আদিখণ্ডের আরও অনেকাংশে চৈতন্যমঙ্গলই (চৈতন্য-ভাগবতই) যে তাঁহার প্রামাণিক গ্রন্থ, ইহা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়া বিনয়ের অবতার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন-দাসকে বহু প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় যে একজন অসাধারণ বৈষ্ণব ও গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বর্দ্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থানান্তর্গত (শ্রীপাট) দেনুড় নামক স্থানে (প্রাচীন নাম দেন্দুড়) তাঁহার শেষজীবনের ভজনকুটি ও তুলসীমঞ্চ রক্ষিত আছে এবং তথায় তাঁহার একটি কল্পিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখনও নিত্য সেবা পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী যাবত তাঁহার ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সম্বন্ধেও একটি অপবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক হইলেও বেদনাদায়ক। তাঁহার সম্বন্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে শ্রীগদাধর, শ্রীমুরারি, শ্রীমুকুন্দ প্রভৃতি গৌরাঙ্গভক্তদের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে লিখিয়া থাকিলেও, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতে শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরের নাম একবারও উল্লেখ করেন নাই। এই অনুল্লেখের বিবিধ কারণও অনুমিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মুখ্য কারণটি এই যে, শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর নাগর-নাগরীতত্ত্বের প্রবর্ত্তক ও উপাসক ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন বা শ্রদ্ধাবান ছিলেন না এবং নিজগ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অন্যান্য মহামহিমদের পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে চাহেন নাই। যাঁহাদের দ্বারা এরূপ একটি অপবাদ সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছেন যে, চৈতন্য-ভাগবত একখানা সামান্য কাব্যগ্রন্থ নহে। নিজ উপাস্য দেবতা শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। যথা—

"অন্তর্যামি নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা॥"—

চৈঃ ভাঃ আদি-১৫।২৮৫-২৮৭

এই লীলাগ্রন্থে অতি শ্রদ্ধা ও নিপুণতার সহিত অনেক ভক্ত্যাখ্যান লিখিত আছে। তাহা পাঠ করিলে যে কোন ব্যক্তির নেত্র সজল হয়। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন যে, এরূপ ভক্ত্যাখ্যান শুনিলে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয়, কারণ তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, যথা—

"এ বচন মোর নহে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্ত্যাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য—১০।২০৭-২০৮

কোনও অবাঞ্ছিত কারণে ভক্ত্যাখ্যান ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করাও যে একটি অপপ্রচার এবং তাঁহার ন্যায় একজন বৈষ্ণব ও লীলালেখকের পক্ষে একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাহাও তিনি নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। এমতাবস্থায় পরমভাগবত শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়

কোন অবৈষ্ণব মনোভাবদ্বারা প্রভাবিত হইয়া শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরের ন্যায় শ্রীপ্রভুর একজন প্রিয় ও অনুরক্ত ভক্তের আখ্যান তাঁহার লীলাগ্রন্থে বর্ণনা করিতে বিরত থাকিবেন, এমন কি একবারও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ না করিয়া অতি অমার্জ্জিত সঙ্কীর্ণতা ও প্রাকৃতজনসুলভ লঘুতার পরিচয় দিবেন,—ইহা যে একটি নিতান্ত কষ্টকল্পনামাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তথাপি ইহা একটি বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এরূপ একটি কল্পনার প্রথম সূত্রপাত দৃষ্ট হয় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত একটি ইংরাজি প্রবন্ধে, যাহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার লীলা-লেখকগণ তাঁহাদের প্রধান প্রধান গ্রন্থাদিতেও শ্রীনরহরি ঠাকুরপ্রমুখ অনেক বিশিষ্ট গৌরাঙ্গভক্তের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল ঐ সময়কার দুইখানা প্রধান লীলাগ্রন্থ, যদিও শেষোক্ত গ্রন্থখানা প্রথমখানার কিছুপরে লিখিত হইয়া থাকিবে। এই উভয় গ্রন্থকে উদ্দেশ করিয়াই হয়ত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিমতটি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গলে তাঁহার গুরু শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধে বহু উক্তি থাকায় পরবর্ত্তী কালের সুধীগণ শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরোক্ত অভিমত কেবল চৈতন্য-ভাগবত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং অভিমতটি কোন মনুষ্য-সুলভ ভ্রমত্রুটি-প্রসূত কিনা, তাহা বিচার না করিয়াই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে (গৌরাঙ্গ ৪৪৪) শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল (দ্বিতীয় সংস্করণ) ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩৪১) শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্রসঙ্কলিত শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তিনিও প্রথমোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ও দ্বিতীয় গ্রন্থের উপক্রমণিকায় শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরের নাম একবারও উল্লেখ করেন নাই—এই অনুমানই নির্ব্বিচারে সমর্থন করিয়াছেন এবং কি কি কারণে বিক্ষুব্ধ হইয়া তিনি তাহা করিয়া থাকিবেন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে উক্ত ভূমিকায় নিম্নরূপ একটি মন্তব্য করিয়াছেন, যথা—"শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীগদাধরকে বাদ দিলে যেরূপ অঙ্গভঙ্গ হয়, সেইরূপ নরহরিকে বাদ দিলেও লীলা অসম্পূর্ণ থাকে। তাই নরহরির নাম একেবারে বাদ না দিয়া তিনি যে প্রভুর চামর ঢুলাইতেন তাহা এই ভাবে উল্লেখ করিয়া বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভগেবতে লিখিয়াছেন :—'কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়'।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মস্তকে ছত্র ধরিতেন এবং কোন ভাগ্যবন্ত চামর ঢুলাইতেন, এই উক্তি 'চৈতন্য-ভাগবতে'র অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা—

"ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায়।"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।৪৫-৪৬

কিন্তু শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরই যে প্রভুর চামর ঢুলাইতেন, গ্রন্থে তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তাহা পাওয়া যায় শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী দ্বিতীয় সংস্করণের ১৫০ পৃষ্ঠায় ধৃত শ্রীপ্রভুর অপর একজন লীলাসঙ্গী শ্রীগোবিন্দ ঘোষের একটি পদে, যথা—

"...নিতাই গদাইসহ ভোজনে বসিলা গোরা
আনন্দে নেহারে ভক্তবৃন্দ।
ভোজন সমাপি গোরা করিলেন আচমন
অদ্বৈত তাম্বুল দিল মুখে।
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে
চামর ঢুলায় অঙ্গে সুখে।..."

সুতরাং চৈতন্য-ভাগবতে চামর ঢুলাইয়া শ্রীপ্রভুকে সেবা করা প্রসঙ্গে যে প্রকারান্তরে ভাগ্যবান বা ভাগ্যমন্ত শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এইরূপ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে শ্রীপ্রভুর মুখে তাম্বুল দিতেন, তেমন কোন স্পষ্টোক্তিও চৈতন্য-ভাগবতে নাই ( মাত্র নিম্নরূপ বর্ণনা আছে, যথা—

"তাম্বুল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য।"—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১১

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুই যে সেই 'অতি প্রিয় ভৃত্য' ছিলেন, উপরোক্ত পদে তাহাও জানা যায়।

ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি, ভাগবতরত্ন মহাশয় তাঁহার পি-এচ-ডি ডিগ্রীর জন্য যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি পেশ করেন, তাহা ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিও এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া ও শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের আলোচনাদি অবলম্বন করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিশেষ কোন কারণ বশতঃ তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরের নাম একবারও উল্লেখ করেন নাই। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি তাঁহার প্রবন্ধে (শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান ২৬১ পৃঃ) আরও একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ উদ্দেশ্যের প্রধান হেতু ছিল যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে ও অন্যান্য লীলালেখকগণ শ্রীপ্রভুর নবদ্বীপলীলা প্রসঙ্গে তাঁহার গুরু শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরের নাম একবারও উল্লেখ না করায় তিনি তাঁহার গ্রন্থে নবদ্বীপে যে শ্রীপ্রভুর সহিত শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার পরিচয় দিবেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বা তাঁহার চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থ সম্বন্ধে যে শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের এমন কোন ক্ষোভের কারণ ছিল, তাহা তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের 'সূত্রখণ্ড' পাঠে বুঝা যায় না। যথা—

"শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে।"

—চৈঃ মঃ সূত্রখণ্ড।

আজ প্রায় চারিশত বৎসর গত হইল শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সাধনোচিত ৺গৌরধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন অশোভন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তিনি তাঁহার 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরের ন্যায় একজন বিশিষ্ট গৌরাঙ্গভক্তের নাম একবার পর্য্যন্তও উল্লেখ করেন নাই—এই অভিযোগের উত্তর দিতে

তিনি এখন অক্ষম। সক্ষম থাকিলেও তিনি হয়ত 'অমানিনা মানদেন" বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তূষ্ণীম্ভাবই আশ্রয় করিতেন। কিন্তু একটি সৌভাগ্য এই যে, তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি যে কাল্পনিক মাত্র এবং তৎসমর্থনে এত সব আলোচনা, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠেই জানা যায়। তিনি তাঁহার গ্রন্থে 'ভাগ্যবান' শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরকে যে কেবল তাঁহার চামর ঢুলাইয়া সেবাকার্য্য-বর্ণনা দ্বারাই প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াও নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সহিত তাঁহার যোগাযোগের বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নবদ্বীপে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীপ্রভু যখন লক্ষ্মীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমুকুন্দ (শ্রীনরহরি ঠাকুরের ভ্রাতা), শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীগোপাল ও শ্রীগোবিন্দ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া 'চৈতন্য-ভাগবতে' লিখিত আছে। যথা—

"কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
রামকৃষ্ণ, নরহরি, গোপাল, গোবিন্দ॥"
—চৈ: ভা: মধ্য ১৮।৭৩-৭৪

নবদ্বীপে শ্রীপ্রভু যখন কীর্ত্তনাদিতে মত্ত থাকিতেন কিংবা ভাবাবেশে নৃত্য করিতেন, তখন যে শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর তাঁহার সাহচর্য্য করিতেন, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ-তরঙ্গিণী (২য় সং) গ্রন্থে ধৃত শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসুদেব ঘোষ, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি অন্যান্য লীলাসহচরদের পদেও উল্লেখ আছে। যথা—

"...স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি নীর।
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দমুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥"
—(শিবানন্দ ২২৮ পৃ:)

"...কাঁচা কাঞ্চনমণি গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ।
ও নব কুসুমদাম গলে দোলে অনুপাম
হিলন নরহরি অঙ্গ॥..."
—(বাসুদেব ১৮০ পৃ:)

"...বাসুদেব রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পঁহু নরহরি সঙ্গ॥..."
—(গোবিন্দ ১৮০ পৃ:)

ডা: মজুমদারও লিখিয়াছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ৪৬-৪৭ পৃ:) যে, নবদ্বীপে শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর মহাশয় কেবল গান গাহিয়া ও সেবা করিয়া শ্রীপ্রভুর প্রিয় হইয়াছিলেন, ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহার আর কোন প্রাধান্য ছিল না। তিনি মনে করেন যে, এই কারণেই শ্রীকবিকর্ণপুর ও শ্রীমুরারি গুপ্ত তাঁহাদের প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে নবদ্বীপ-লীলা প্রসঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু নবদ্বীপে শ্রীপ্রভুর সহিত শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরের সেবা ও কীর্ত্তনরূপ দুইটি যোগসূত্রই 'চৈতন্য-ভাগবতে' যথাস্থানে ও যথাযথভাবে বর্ণিত থাকা দৃষ্ট হয়। সুতরাং চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে যে অপবাদটি এতদিন প্রচলিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ অযথার্থ ও ভিত্তিহীন জানিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই সন্তোষলাভ করিবেন।

# সাম্যসংস্থাপক মৃত্যু

(জেম্স্ শার্লীর কবিতা)

মোদের বংশ বিভবগর্ব্ব
বস্তুর ছায়া, প্রকৃত কিছুই তাহারা কখনো নয়;
কঠোর নিয়তি করিবে খর্ব্ব;
রাজাদের শিরে রাখিতে হস্ত যম নাহি করে ভয়।
রাজদণ্ড ও রাজার মুকুট
ভেঙে হয় চুর, সব ঝুটমুট,
ধূলিতে সমান হবে সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য সবি,
কাস্তে এবং কোদালের সাথে মিলাতে ছাড়ে না 'ভবি'।
কতক মানুষ তরবারি নিয়ে জগতে কীর্ত্তিমান্,
বধিয়া মানুষ যশের মুকুট মাথায় স্থাপন করে:
তবুও কিন্তু হয় অবনত, ঘুচে যায় সম্মান,
পরস্পরকে পোষ মানাবার কত না পন্থা ধরে!

কেহ অচিরাৎ কেহ পরে কিছু,
নিয়তির কাছে মাথা করে নীচু,
ছেড়ে চলে যায় শেষ-নিঃশ্বাস তাহারা সুনিশ্চয়,
বন্দী বনিয়া মৃত্যুর কাছে হামাগুড়ি দিতে হয়।
মানের মুকুট ললাটে তোদের বিশুষ্ক হয়ে যায়;
কেন তবে করো ক্ষমতা-দম্ভ, বিকট অহঙ্কার!
যমের বেগুণী বেদীর সমীপে হয় সবে অসহায়,
দ্যাখো সেইখানে বিজয়ী-বলির বহে শোণিতের ধার!
লুটাইয়া শির ভূলি' সম্মান
ঠাণ্ডা কবরে করিবে শয়ান,
স্মরণীয় হয়ে রহিবে কেবলি ভালো ভালো কাজগুলি,
বিলাবে গন্ধ, কুসুমিত হবে ধরণীর সেই ধূলি!

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

# ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা

শ্রীচারুচন্দ্র তত্ত্বভূষণ

ভারত হইতে ইংরাজ তাহার শাসন-ক্ষমতা উঠাইয়া লইয়া ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করিবার পর দেশীয় শাসকবর্গ শাসনভার গ্রহণ করিয়া যে সকল বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইলেন, উহারই অন্যতম জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে—ভারতীয় রাষ্ট্রভাষার সমস্যা। ইংরাজ ক্ষমতালোভী ভারতীয়দের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া এবং নিজেদের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক স্বার্থকে ভারতের একাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে—ভারত হইতে নিজেদের শাসনকার্য্য গুটাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের স্বপক্ষে টানিয়া আনিয়া উহাদের জন্য একটি ভিন্ন মুস্লিম রাজ্য গঠন করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। এ বিষয়ে ইংরাজদের দোষ দেওয়া যায় না। ভারতের কংগ্রেসদলীয় নেতৃস্থানীয়দের ক্ষমতা-লোলুপ চিত্ত দুর্দ্দমনীয় হইবার ফলেই ভারতের এই নিদারুণ অঙ্গচ্ছেদে তাঁহাদের হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয় নাই।

ভারতে ভারতীয়দের দ্বারা ভাবী শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য যে সংবিধান দিল্লীতে লিপিবদ্ধ হইল, তাহাতে ভারতের সর্ব্বপ্রান্তের উন্নত প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দিবার পর ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধেও আলোচনা উঠে। সেই আলোচনাতেই দেখা গেল সংবিধান গড়িবার জন্য যে কমিটি সংগঠিত হইয়াছিল, উক্ত কমিটির সকল সদস্যই সম্মিলিতভাবে হিন্দিভাষাকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। অন্যান্য উন্নততর প্রাদেশিক ভাষা থাকিতে ঐ সকল উন্নতভাষাকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র হিন্দি-ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে নির্ব্বাচন করার কি কারণ হইতে পারে, এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের মনীষিবর্গ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন না। হিন্দিভাষার এতাদৃশ পোষকতাহেতু যদি অন্যান্য অহিন্দিভাষীদের মনঃক্ষোভের কারণ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে হিন্দি-শাসকবর্গের কি কর্ত্তব্য নহে যে—একমাত্র হিন্দিভাষার পোষকতার কারণগুলি দর্শাইয়া অন্যান্য অহিন্দি প্রদেশবাসীদের মনঃক্ষোভের কারণকে উপশম করা? কিন্তু তাহা করা হয় নাই। অন্যান্য অহিন্দি প্রদেশের চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা উদাসীন থাকিয়াই দিল্লীর এই উন্মত্ততাকে স্বাগত অভিনন্দন করিতে হাত বাড়াইয়াছেন—বিশেষ করিয়া, বাংলাদেশের বিবুধেরা নির্ব্বাক্ হইয়াই হিন্দি রাষ্ট্রভাষারূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবার পূর্ব্বেই, নিজেরা হিন্দিভাষাকে সাত্‌তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। পল্লীতে পল্লীতে হিন্দিভাষা শিক্ষার জন্য বিহার ও উত্তর-পশ্চিম দেশীয় হিন্দি পণ্ডিতদের নিযুক্ত করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের হিন্দিভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশের হিন্দিভাষী পণ্ডিতদের এই সময়ে পোয়া-বারো বলিলেই হয়। দলে দলে দেশ হইতে নির্গত হইয়া একখানি হিন্দি 'শিক্ষামঞ্জরি' হাতে লইয়া বাংলার সর্ব্বপ্রান্তকে হিন্দিভাষা শিক্ষার অচলায়তন করিয়া তুলিতেছেন। শুধু ইহাই নহে। প্রাতঃকালে রেডিও যন্ত্রের প্লাগটি যথাস্থানে লাগাইবার পর যখন আকাশবাণীর আসর নহবতের প্রভাতী সঙ্গীতে জমিয়া উঠে, তাহার পরই শোনা যায় একটি হিন্দিভাষা শিক্ষার ক্লাশ পরিচালনা। সম্ভবতঃ হিন্দিভাষায় শিক্ষিত 'কোবিদ্' উপাধি প্রাপ্ত কোন বাঙ্গালী সন্তান হিন্দিভাষা শিক্ষা প্রচার কল্পে ক্লাশ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা নিত্যানুষ্ঠানরূপে রেডিওর কর্ম্মসূচীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। একটি মেয়েকে (কোন ছেলের বোধ হয় যোগ্যতা নাই) নিত্য হিন্দিভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। আমরা জানি না, এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি দিল্লীর ওপর-ওয়ালাদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে গৃহীত হইবার আদেশ আছে কিনা।

হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হইবে কেন এবং ইহার স্বপক্ষে কোনও সদ্‌যুক্তি আছে কিনা,—এ বিষয়ে দিল্লী হইতে পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলা হয় নাই। ভারত-শাসন স্বদেশীয়দের হাতে আসিবার পর হইতেই ভারতের অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের পূর্ব্বেই হিন্দিওয়ালারা হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য লাঠি কাঁধে করিয়া ভারতের নানা-প্রান্তে প্রচারে লাগিয়া গিয়াছেন। কোনও অহিন্দি প্রদেশের অসম্মতি থাকিলে উহা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

কেন এরূপ হইতেছে, ইহা কি কেহ চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন? চিন্তা করিয়া দেখিবার কি কেহ অবসর পাইতেছেন না? ভারতে এতগুলি উচ্চস্তরের ভাষা বিদ্যমান থাকিতে, হিন্দি-ভাষার মধ্যে এমন কি মহিমা অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল যে, ভারত শৃঙ্খলমুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দিভাষা সকল ভাষার উপরে স্থানলাভের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল? ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া দেখা অহিন্দি প্রদেশবাসী কাহারও উচিত বলিয়া বিবেচিত না হইবার কারণ কি? ভারত ইংরাজের শাসনমুক্ত হইবার পর দিল্লীর মসনদে বসিয়া ভারত শাসন করিবার অধিকার যাঁহাদের হস্তে দৈবাধীন আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই মাতৃভাষা হিন্দি। এই অপ্রত্যাশিত শাসন-শক্তির অধিকারী হইয়াই ইঁহারা হিন্দিভাষাভাষী দেশগুলিকে একত্রিত করিয়া সমগ্র হিন্দিভাষী দেশটির আয়তন এমনভাবে বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছেন যে, অন্যান্য প্রদেশের ভোট-সংখ্যা হইতে হিন্দিভাষীর ভোটাধিক্য ভারতে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর যেন স্থায়ী হইয়া থাকে। এই কূটনৈতিক চালে হিন্দিভাষীদের সুযোগ ঘটিল এই যে, বৃহদায়তনযুক্ত

বিশাল হিন্দি প্রদেশ হইতে ভোট-সংখ্যার আধিক্য বশতঃ প্রধান-মন্ত্রিত্বপদ হিন্দিভাষীর উপরেই ন্যস্ত থাকিবে, এবং সেই প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইলেই মন্ত্রিসভার সদস্যগুলিও অর্থাৎ অন্যান্য মন্ত্রীও উক্ত প্রদেশ হইতেই প্রধানমন্ত্রী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। ইহাই রাজনীতির স্বতঃসিদ্ধ ব্যবস্থা।

এইভাবে শাসনশক্তি হিন্দিভাষীদের কক্ষপুটে আসিয়া পড়ায় শক্তিমদে মত্ত হইয়া ইঁহারা একজোটে হিন্দিভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দিভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদাদান করার মত হিন্দিভাষার ভাষা হিসাবে প্রকৃষ্টতা তেমন কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দি সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা যাঁহার আছে, তিনিই একথার সত্যতা স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, হিন্দিভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে সমগ্রভারতে নিজ অধিকার বিস্তার করিবার সুযোগ পাইতেছে কি করিয়া? ভারতীয় সংবিধানে যখন বিভিন্ন প্রদেশেরই মর্য্যাদা-বিশিষ্ট ভাষাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, তখন প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সকল ভাষাকে অতিক্রম করিয়া হিন্দিভাষার স্থান শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত হয় কেন? এবং অন্যান্য অহিন্দি প্রদেশে হিন্দিভাষার প্রতি বিরুদ্ধভাবের কোনও লক্ষণ প্রকাশ করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিবারই বা কারণ কি? এ সকল প্রশ্ন অহিন্দি প্রদেশের সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই মনে উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

হিন্দিভাষা ভারতীয় অন্যতম বিশিষ্ট ভাষা হিসাবে স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে কিনা,—ইহার অনুকূলে যুক্তি অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে হিন্দি রাষ্ট্রভাষারূপে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাইতে বাধ্য করান এবং তৎকারণে এ ভাষার বিস্তৃতির জন্য কোটি কোটি অর্থ সরকারী অর্থকোষ হইতে ব্যয় করা সমীচীন হইতেছে কিনা, ইহা সর্ব্বপ্রদেশের লোকদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ করি। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষারূপে ভারতের সর্ব্বপ্রান্তকে চাপ দিয়া মানাইয়া লইবার কোনই সদ্‌যুক্তি হিন্দি শাসকবর্গের থাকিতে পারে না। তাঁহারা শাসন-ক্ষমতা লাভ করিয়া এমনি মোহাভিভূত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের দেশীয় ভাষার গুণাগুণকে চিন্তা না করিয়া ক্ষমতার জোরে অন্যান্য প্রদেশের পণ্ডিতবর্গের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই নিজের মাতৃভাষাকে জগতের সমক্ষে রাষ্ট্রভাষারূপে সচল করিতে উন্মত্ত হইয়াছেন। ইহার পরিণতি যে শুভ হইতে পারে না, ইহা তাঁহাদের ধারণার মধ্যেই আসিতেছে না। সাহিত্য হিসাবে এ ভাষার উৎকর্ষ যদি থাকিত, তাহা হইলে যে-কোন প্রদেশের হস্তেই শাসন-ক্ষমতা আসুক না কেন, নির্ব্বিচারে হিন্দিভাষা সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রভাষারূপে নিশ্চয়ই গৃহীত হইত।

একথা সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, হিন্দিভাষার সাহিত্য হিসাবে সে উৎকর্ষ মোটেই নাই। এ সম্বন্ধে আরও আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে, কেননা ভারত পরদেশীয় শাসন হইতে মুক্ত হইবার পর, ভারতে রাষ্ট্রভাষা প্রবর্ত্তনের সমস্যা এখন সঙ্গীন হইয়া দেখা দিয়াছে। গুরুতর সমস্যাকে বালকের ক্রীড়ারূপে ব্যবহার করিতে গেলে ইহার অশুভ পরিণতি আমাদিগকেই ভুগিতে হইবে, এবং অনৈক্যের যে আঘাতে ভারতকে স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতে হইয়াছে, আবার এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ভারতের শ্মশান-যাত্রার চিতা আমাদিগকেই প্রস্তুত করিতে হইবে।

যে প্রদেশের হিন্দি মাতৃভাষা, সেই প্রদেশের শিক্ষিতের সংখ্যা মহম্মদীয়ান যুগ হইতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, অতি নগণ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে এবং রাজর্ষি পরীক্ষিতের পরলোক-গমনের পর ভারতের ব্রহ্মাবর্ত্তভূমি, যাহা ব্রহ্মবিদ্যার পীঠভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এবং যাহা বর্ত্তমানে ভৌগোলিক মানচিত্রে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশরূপে ইংরাজ আমল হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আছে—সেই ভূখণ্ড ব্রহ্মবিদ্যার পীঠভূমি হইলেও এবং পরীক্ষিৎ কথিত যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞভূমি বলিয়া নির্ণীত হইলেও, মুসলমান আক্রমণ ও উহাদের ঐ প্রদেশে রাজ্যবিস্তৃতির দ্বারা মুসলমানদের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমগ্র ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রবিষ্ট হইবার পর ব্রহ্মর্ষি-সেবিত ব্রহ্মাবর্ত্তভূমি কতখানি কলুষিত হইয়াছিল,—গবেষকের চক্ষু দিয়া বিচার করিলে তাহা দেখা যাইতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাও দেখা যাইবে যে, মুসলমান যুগ হইতে বৃটিশ যুগ পর্য্যন্ত বিদ্যার পীঠভূমি ঐ সারস্বত প্রদেশের অধিবাসীদের মুস্লিম সংস্কৃতির ছাঁচে ঢালিয়া ঐ প্রদেশবাসীদের সংস্কৃতির বিনাশ সাধন করিতে কতখানি চেষ্টা হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ মুসলমান-অধিকারভুক্ত হইলেও, সেই দেশের অধিবাসীরা উহাদের ন্যায় আপনাদের সত্তাকে ডুবাইয়া দেয় নাই। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে, যাহা অধুনা পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের দুর্ভাগ্যবশতঃ পাকিস্তানরূপে পরিণত। মুসলমানদের যে সংখ্যাধিক্যের কারণে হিন্দুর আদরের ভূমি আজ মুসলমানরাজ্যে পরিণত এবং মুসলমানী ধর্ম্মান্ধতায় আরবরাষ্ট্রকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছে, সেই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-অধিবাসীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও আপনাদের সত্তাকে মুসলমানি সত্তায় কখনও ডুবাইয়া দেয় নাই।

এ প্রসঙ্গ আলোচনার হেতু এই যে, যে সময়কার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি অর্থাৎ মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যে বিদ্যার আলোচনা হইত ঐ প্রদেশে, উহা ছিল দেবভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত—যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'Purified language'। তখনকার কালে কত লোক শিক্ষা লাভ করিত, ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা গোমূর্খ হইয়া কেবল হলচালনা করিত কিনা,—ইহার সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও, একথা সত্য যে, তদানীন্তনকালে দেশজ মাতৃভাষার দ্বারা জনসাধারণের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগমাত্রই ছিল না। একথাও সত্য, মুসলমান যুগে পাণ্ডিত্যের খ্যাতিলাভ হইত সংস্কৃত বিদ্যাধিকারের দ্বারা। প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিলেও উহা পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য হইত না। এই কারণে প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়া বাংলা দেশে কৃত্তিবাসের এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তুলসীদাসের, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলন করিতে বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেননা, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ ভারতীয় দেব ভাষার প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধালুচিত্ত হওয়ায় ধর্ম্মপুস্তকাদি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হইলে পণ্ডিতসমাজে উহা আদৃত হইত না। আজ পর্য্যন্তও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা তুলসীদাসের রামায়ণকে বাল্মীকি রামায়ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন না। তখনকার সময়ে ভারতীয় সাংস্কৃতিক কৃষ্টি সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই প্রচারিত হইত।

এ সকল মুসলমান রাজত্বের সময়কার কথা। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষ যখন হিন্দু রাজন্যবর্গ দ্বারা খণ্ড খণ্ড ভাবে শাসিত হইত, তখন

প্রদেশগত বিভাগে বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষা বিভিন্নই ছিল। একথা সত্য, একটা প্রাদেশিক ভাষার উৎকর্ষ যত অধিকভাবেই জাগিয়া উঠুক না কেন, ঐ ভাষাকে সার্ব্বভৌমভাবে একটা বিশাল দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষীরা অনুকূলচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না। কোনও প্রদেশবাসীর হস্তে দৈবানুগ্রহে শাসনক্ষমতা আসিয়া পড়িলে, সেই ক্ষমতার জোরে সেই দেশের মাতৃভাষাকে বিশাল ভারতবর্ষে বলপূর্ব্বক রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিতে গেলে, শাসকদের রাজনৈতিক জ্ঞানাভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসকরা যে এক্ষেত্রে যথেষ্ট ভুল করিতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা অনস্বীকার্য্য নহে যে, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাপেক্ষা হিন্দিভাষার উৎকর্ষ কম আছে। বাংলা ও তামিল ভাষার ন্যায় ইহার তত উৎকর্ষ না থাকিলেও, এ ভাষার বিস্তৃতি ভারতের বহুলাংশ জুড়িয়া আছে। ভারতের যে অংশটার মধ্যে এই ভাষায় কথোপকথন হয়, তাহা হইল,—সমগ্র উত্তর-ভারত অর্থাৎ পশ্চিম-পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ, এবং পূর্ব্বদিকে বাংলা প্রদেশ,—ইহারই মধ্যস্থল-ভূমিটি অধিকার করিয়া আছে হিন্দিভাষা। এই হিন্দিভাষা চারিটি প্রধান কথ্যভাষায় বিভক্ত, যথা—রাজস্থানী, পশ্চিমী হিন্দি, পূর্ব্বাঞ্চলী হিন্দি এবং বিহারী হিন্দি। মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যেকটি দেশগত ভাষার উৎপত্তিস্থল বিভিন্ন। পশ্চিমী হিন্দি যাহাকে বলা হয়, তাহা পাঞ্জাবীভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। পশ্চিমী হিন্দির কথ্যভাষার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাঞ্জাবের 'বাঙ্গারু' নামে একটি কথ্যভাষার প্রচলন আছে। মথুরা অঞ্চলে সুমিষ্ট ব্রজভাষা প্রচলিত। অন্য একটি ভাষার প্রচলন দেখা যায়, যাহাকে বলা হয় কনৌজি; ইহার সহিত ব্রজভাষার সাদৃশ্য আছে। অন্য আর একটি ভাষা পাওয়া যায়, যাহাকে বলা হয় বুন্দেলী। ইহা বুন্দেলখণ্ড ও তৎসংলগ্ন নর্ম্মদা নদীর চারিপাশ জুড়িয়া প্রচলিত। দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষাও পশ্চিমী হিন্দির অন্তর্ভুক্ত। অযোধ্যা প্রান্তের ভাষা অবধী।

মুসলমান রাজত্বের পর এ অঞ্চলের মধ্য দিয়া নবাগত মুসলমানদের সহিত মেলামেশার সুবিধার জন্য এবং রাজকীয় শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ মুসলমান নৃপতিবর্গ একটি ভাষার প্রচলন করেন। মুসলমানেরা ভারতে শুধু রাজ্য বিস্তারেই মনোযোগ দেয় নাই, ইহার সঙ্গে ছিল সমগ্র ভারতকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার উগ্র মনোভাব। শুধু তীক্ষ্ণ তরবারী দেখাইয়া ধর্ম্মান্তরিত করিবার মনোভাব তাহাদের ছিল না। মুসলমান নৃপতিরা ইচ্ছা করিলে পারস্য ও আফগানিস্থানের ন্যায় ভারতের সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে বিশাল মুসলমানজাতিরূপে পরিণত করিতে পারিতেন। নয়শত বৎসর রাজত্বেও তাঁহারা তাহা করেন নাই। যে কতক সংখ্যক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা মুসলমানদের ধর্ম্মে অকপটতা ও ঐকান্তিকতা দেখিয়াই আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং ইহার সহিত উহাদের যোগশক্তিরও অপ্রাচুর্য্য ছিল না। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের পূর্ব্বেই যোগী মইমুদ্দিন চীৎসী আজমীরে আসিয়া তাঁহার যোগশক্তির অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেন। তখন হইতেই ধর্ম্মসংক্রান্ত ভাবের আদান-প্রদান চলিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত পারস্য, আফগানিস্তান, তুর্কীস্থান হইতে বহু ব্যবসায়ী নবীন মুসলমান-ধর্ম্মে উদ্বোধিত হইয়া ভারতের পশ্চিম প্রান্তে দলে দলে আসিয়া ঠাঁই লইতে থাকে। এইভাবে মুসলমান ধর্ম্মান্ধদের ব্যবসা ও ধর্ম্মপ্রচার—এই উভয় উদ্দেশ্যে ভারতে বসবাস করা হেতু পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য পারস্যভাষা ও তাৎকালিক পাঞ্জাব ও উত্তর-ভারতীয়দের মাতৃভাষার সহিত মিশিয়া একটা সহজবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হয়। ইহার পর মোগল রাজত্বের কালে আকবর বাদশাহের সময় হইতেই এই ভাষা উর্দ্দু নাম ধারণ করে। উর্দ্দু শব্দের অর্থ সৈন্যশিবির। মুসলমান নৃপতিগণ যুদ্ধার্থ অবিরত সৈন্য শিবিরে থাকিয়া তত্রত্য জনসাধারণের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের জন্য যে ভাষার সৃষ্টি করেন, উহা সমগ্র উত্তর-প্রদেশে বিস্তৃতিলাভ করে। কথিত আছে, রাজা টোডরমল্ল ঐ প্রদেশের সমগ্র হিন্দুগণকে পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করেন, এবং বাধ্যতামূলকভাবে এই ভাষা শিক্ষা করিবার ফলে উত্তর-পশ্চিম দেশীয়দের পূর্ব্বতন সংস্কৃতের অপভ্রংশ 'প্রাকৃত ভাষা' যাহা সমগ্র অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল, উহার সহিত মিশিয়া একটি দোঁয়াশলা ভাষার সৃষ্টি হয়। টোডরমল্ল শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণকে পারস্যভাষায় ভাষান্তরিত করেন। এই সময় হইতে যে দোঁয়াশলা ভাষার উদ্ভব হইয়া সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, উহাই হিন্দি বা হিন্দুস্থানী ভাষারূপে পরিচিত হয়।

এক্ষণে যে হিন্দিভাষা সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রভাষারূপে ভূতের মত চাপিয়া বসিতে চলিয়াছে, উহাই উল্লিখিত সঙ্করভাষা এবং এই ভাষাই সমগ্র উত্তর-পশ্চিম, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও বিহার অঞ্চল জুড়িয়া রহিয়াছে। তবে, মূলতঃ ইহা হিন্দি হইলেও, প্রত্যেক স্থানের ভাষার কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম আছে। মারোয়ারী নেওয়াতী, জয়পুরী ও মালভী—এই কয়টি কথ্যভাষা রাজস্থানের। মারোয়ারী উন্নত, তবে ইহার 'ভোকেবুলারী' উত্তর-ভারতীয়দের কথ্যভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে। বিহারেও ভাষার ব্যতিক্রম আছে। মৈথিলী, ভোজপুরী এবং মাগহি—এই তিনটি কথ্যভাষা চলে বিহারে। এ ভাষাগুলির মধ্যে মৈথিলী শ্রুতিমধুর, অশ্রাব্য ভোজপুরী ও মাগহি।

এই সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তন মুসলমান রাজত্বকালেই হিন্দিভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। ঐ সকল প্রদেশের সত্তা মুসলমানি সত্তার সহিত এমনভাবে মিশিয়া যাইতে লাগিল যে, তত্তৎ প্রদেশের লোকেরা ঋষি-ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা ভুলিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং ঐ দেশবাসীর প্রাচীন সাংস্কৃতিক সত্তাকে এখন শবদেহের গাদার মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য।

হিন্দি প্রকৃতপক্ষে কোন একটি দেশের প্রাচীন ভাষা নহে, ইহা একটি কথ্যভাষার অনিশ্চিত সংজ্ঞা। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সংস্কৃত হইতে হিন্দির উৎপত্তি, কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে। যে দুই-চারিটি শব্দের সাক্ষাৎ মিলে, উহা 'প্রাকৃত' ভাষার অপভ্রংশ। যাঁহাদের হিন্দিভাষার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, ঐ দেশবাসীরা যে হিন্দিভাষা পুস্তকে ও বক্তৃতায় ব্যবহার করেন, তাহার বহুলাংশ মৌলানা ও মৌলবী-সাহেবদের কথিত উর্দ্দুই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের ছেলেমেয়েদের পুরাপুরি হিন্দিওয়ালা বানাইবার জন্য যে সকল পাঠ্যপুস্তক স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হইতেছে, সেই সকল পুস্তক নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পুস্তকগুলির ভাষার মধ্যে ঋষিগণের পূত চন্দনের গন্ধ নাই, আছে কেবল মৌলানা ও মৌলবীগণের উগ্র পিঁয়াজী গন্ধ।

হিন্দি নামে এই কথিত ভাষা সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে সাধনা ও নাম দেবের দ্বারা। এ সংবাদ পাওয়া যায় আদি গ্রন্থ হইতে। ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ স্যার গ্রিয়ার্সন অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে হিন্দি, পাঞ্জাবী, মারাঠী-ভাষা জাগিয়া উঠে 'প্রাকৃত' ভাষার শেষাবস্থা হইতে। রাজস্থানের চারণেরা, যেমন পৃথ্বীরাজের রাজ-দরবারে চাঁদ বারদই, রাজা হামীরের বীর-চরিতের রচয়িতা জগনায়ক,—ইঁহারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া রাজস্থানের নৃপতিগণের অনেক কাহিনী পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। অতঃপর হিন্দিভাষায় যাহা যাহা রচিত হইয়াছে, সকলই পদ্যাকারে, গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য হিন্দি ভাষায় নাই বলিলেই হয়। হিন্দি কাব্যে ছন্দ অধিক, যাহা অন্য ভাষায় বিরল। উত্তর-পশ্চিমের সন্তজনেরা লোকশিক্ষার জন্য যে উপদেশাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা জগতে মিলে না। ভাবে ও ভঙ্গীতে অতুলনীয়। ভগবদ্ ভজন বিষয়ে যে সকল দোঁহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকরা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। হিন্দি পদ্যে দোঁহা একটি ছন্দ, এতদ্ব্যতীত সোরাঠা, চৌপাই, কুণ্ডলিয়া, সাভাইয়া ইত্যাদিক্রমে কয়েকটি ছন্দ হিন্দি কবিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল সন্ত যখন মুসলমান ভাব-প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুরা ভাসিয়া চলিয়াছে, তখন হিন্দুদের মৃতকল্প ধর্ম্মে প্রাণদান করিবার জন্য চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া, হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হিন্দিভাষার মাধ্যমে পদ্যাকারে রচনা করেন। কিন্তু গদ্য রচনা উঁহাদের একটি মাত্রও নাই। উঁহাদের রচনা হইতে বুঝা যায় যে, তখনকার সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তভূমির হিন্দুরা নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতি বিসর্জ্জন দিয়া মুসলমানী সংস্কৃতিতে কতখানি আত্মাহুতি দিয়াছিল।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে—ভারতের রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা সমাধানের উপায় কি? ভারত ব্রিটিশ-শাসন-মুক্ত হইবার পর সে যদি নিজেকে সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করে—যোগীদের জীবন্মুক্ত হইলে যেমন হয়—তাহা হইলে তাহার রাষ্ট্রভাষার সমস্যা সমাধান করিতে কোনই বেগ পাইতে হইবে না। আমাদের এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, ভারতের আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাচ্ছন্দ্যকে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে কিনা, না, গোটাকয়েক বিলাত-প্রত্যাগত ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লোকেরা ভারতের শাসনভার ইংরাজের নিকট হইতে ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, জনকয়েক ধুরন্ধর ভারত শাসনের সংবিধান রচনার দ্বারা শাসন-ক্ষমতা চালাইলেই কি মনে করা যাইবে ভারত শৃঙ্খলমুক্ত? ইংরাজের ঢংএ ডিমোক্রেশী চালাইবার ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঁহাদেরই শাসন-ঠাট্‌টি যথাযথ বজায় রাখিয়া যদি উঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালী উঁহাদেরই মত হুবহু এ দেশে চালাইতে থাকি উঁহাদেরই ইংরাজি নাম করণে এবং জন কয়েক শিক্ষিত গোষ্ঠী ভোটের বংবাজি দেখাইয়া শাসনক্ষমতার লোভে অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত সহরবাসী বা গ্রামবাসীদের চক্ষুগুলি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া হেঁচকা টানিতে টানিতে পোলিংবুথে লইয়া গিয়া, নিশানারূপী মন্ত্রটি কানে শুনাইয়া যদি ভোটাধিকার হয় এবং এসেমব্লি ও পার্লামেণ্ট নামক মহাসভায় বসিয়া পার্টির জয় গান করা হয়, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে—ভারত পরাধীনতারূপ শৃঙ্খলমুক্ত? এখনও যে দেশে শিক্ষা ও শিক্ষিতের মর্য্যাদা নির্ভর করে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগত খৃশ্চিয়ান মিশনারি সম্প্রদায় হইতে এবং দেশীয় উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রিলাভ হয় ইংরাজ রাজ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবং বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ গৌরবলাভ হয় ইংলণ্ডের ন্যায় 'ডক্‌টরেট' উপাধি লাভ করিয়া, সেই দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছে, কে বলিবে? সুতরাং এক কথায় ইহাই বলা যায় যে, ভারতের শাসনক্ষমতা জন কয়েক মুষ্টিমেয় ইংরাজি-শিক্ষিত এবং উঁহাদের সহিত ভারতের রক্তচোষা বড় বড় পুঁজিপতিরা প্রত্যক্ষভাবে ভারতের ভাগ্য-বিধাতৃরূপে কার্য্য করিলেও ইঁহারা যে বিলাতি দেব-গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া ভারতের অগণিত অশিক্ষিত জনমণ্ডলীকে পরিকল্পনার মায়াজালে আচ্ছন্ন করিয়া অন্ন-বস্ত্রের কল্পনাতীত দুঃখ-সাগরে ডুবাইয়া যেভাবে প্রাণবিনাশের আয়োজন চালাইতেছেন, ইহার পরেও যদি ভারত মনে করে যে, ভারত স্বাধীনতা-সুখ লাভ করিতেছে, তাহা হইলে বায়স্কোপের এই ব্যঙ্গ-চিত্র শিশু-মহলেই উপভোগ্য হইবে। পরন্তু বয়স্করা বুক চাপড়াইয়া এই স্বাধীনতার বিষ-বাষ্পে দম্ আটকাইয়া পরলোক যাত্রা করিবে। যুদ্ধ করিয়া যদি এ দেশের স্বাধীনতা লাভ হইত, তাহা হইলে ইহা অকাট্য সত্য যে, সর্ব্বভারতের সংহতি রক্ষার উপায় অন্যভাবে গড়িয়া তুলিবার আয়োজন হইত। ভাবিলে অবাক হইতে হয় যে, যে দেশ অর্থবলে ও জনবলে বলীয়ান, সেই দেশের অগণিত জন-সমষ্টিকে একটি ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট দ্বীপের একটা সমবায়-কোম্পানি ভেড়ার পালের মত শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছে। জগতের ইতিহাসে কাপুরুষত্বের ও নির্বীর্য্যতার এরূপ হীন পরিচয় একমাত্র মেষের খোঁয়ার সদৃশ এই ভারতেই পাওয়া যাইবে, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথায়ও নাই। কেন এরূপ হইয়াছে? ভারতে সংহতির অভাব। জগতের রাজনীতির সংবাদ যাঁহারা জানেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, পরাধীনতার একমাত্র কুফল এই যে, দেশবাসীই দেশের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, ঐক্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, বিশ্বাসঘাতকতা হয় জাতির অলঙ্কার। তাই দেখা যায় গোটা রাজস্থান বীরত্বের পীঠভূমিরূপে পরিচয় লাভ করিলেও বিশ্বাসঘাতকতার প্রেতরাজ্যরূপে আত্মবিকাশ করিয়াছিল।

যুদ্ধ-বিজয়ে স্বাধীনতা আইসে নাই বলিয়া ভারতে সে ঐক্য-শক্তির জাগরণ হয় নাই। ইহারই বিকৃত পরিণতি—একটা দেশের অনুন্নত কথাভাষাকে বিভিন্ন প্রদেশের মতামত গ্রহণ না করিয়া সংখ্যাধিক্যের জোরে জোর করিয়া রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করান—ইহাই অনৈক্যের ভয়াবহ মূর্ত্তি। অনেকেই আমাদের দেশে মনে করেন যে, ইংরাজেরাই পাঞ্জাব হইতে কন্যাকুমারিকা এবং আসাম হইতে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত ভারতের সকলেরই ভাষাগত, ভাবগত ও ব্যবহারগত ঐক্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজ ভারতীয়দের মনে ঐক্যের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইংরাজি শিক্ষা সর্ব্বভারতে চালাইয়া ইংরেজ লাভবান হইয়াছে; ভারতবাসী ইংরেজের দেবোপম সংস্কৃতিলাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে; উহা আত্মবিনাশের দুর্লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতে সংহতিশক্তি জাগে নাই। জাগিতেও পারে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া ইংরাজি বুলি আওড়াইয়া ভাবের আদান প্রদান করিলেই কি মনে করা যাইবে যে, ভারতের সমগ্র প্রদেশগুলিতে ভাবের ও ভাষার ঐক্য সাধন হইয়াছে? বিদেশাগত ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি,

পরাধীন দেশের পক্ষে শত্রুর ন্যায় কাজ করে। রাজনীতিজ্ঞ সুচতুর ইংরাজেরা উহা বুঝিয়াই, এদেশকে সমূলে বিনাশের জন্য এই পন্থার অনুসরণ করিয়াছিল। এখনও যাঁরা মনে করেন যে, ইংরাজি ভাষার বিলুপ্তি ভারতের সর্বনাশের কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, এবং যাঁহারা স্থির নিশ্চয় করিয়া আছেন যে, ভারতকে ইংরাজ তাহার নিজ কালচার দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে এবং ইহাও যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই ইঙ্গ কালচারে ভারতের প্রকৃত মনুষ্যত্বের গুপ্তবীজমন্ত্র নিহিত রহিয়াছে, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজী কাল্‌চারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে, তাঁহাদের এ উৎকট মনোভাব একটা অধ্যাত্ম-ভাবসমৃদ্ধ এবং পাশ্চাত্য-ভাববিরুদ্ধ দেশের পক্ষে কতখানি অমঙ্গলের কারণ হইবে, ইহা তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা রাখেন না। অবশ্য একথা সত্য যে, আশৈশব বিদেশীভাষাকে 'রপ্ত' করিয়া নিজেদের পণ্ডিত বলিয়া বুঝিবার শক্তি যাঁহাদের জন্মিয়াছে, তাঁহাদের এ মনোভাবকে দোষ দেওয়া চলে না; কেননা, ইহা বিদেশী সংস্কৃতি হইলেও, উপাসকের কাছে উপাসিত কখনও নিন্দার্হ হতে পারে না।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা-সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, এমন জটিলতম সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে বহু যুক্তি রহিয়াছে। তবে এ কথা সত্য যে, হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা এবং তৎকারণে ভারতের সর্বপ্রান্তীয় লোকদের এ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করানোর অর্থ দেশের বিনাশ-যজ্ঞের আহুতির আয়োজন ছাড়া আর কিছুই নহে। নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ ও উন্নত বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিতে হিন্দি-ওয়ালাদের আপত্তি কেন? একটা প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার আকাঙ্ক্ষা যদি স্বার্থান্ধ জনকয়েক কংগ্রেস-ভক্তদের মনোভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিঃস্বার্থ হইয়া উন্নত ভাষা বাংলার কথা ভাবিয়া দেখিতে দোষ কি? দোষ অনেক আছে, ভারতের ভাগ্য বিড়ম্বনায় তাহা বলা যায় না।

আমাদের অভিমত এই। ভারত একটি বিশাল দেশ, বিভিন্ন ভাষাভাষী এদেশে বাস করিতেছে। তামিল, তেলেগু, মারাঠী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, বাংলা ও উৎকল—এসকল প্রাদেশিক ভাষার সকলগুলিই উন্নত স্তরের। কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন একটি প্রাদেশিক ভাষাকে উন্নত জ্ঞানে রাজপোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করাইলে উহা দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের ন্যায় উপহাসাস্পদ হইবে, তাহার কারণ এই যে, এইসকল প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি এবং ইহাদের উন্নতি খুব সাম্প্রতিক, এসকল ভাষায় প্রাচীনত্বের তথা সার্বভৌমত্বের কোনই চিহ্ন নাই। কাজেই পৃথিবীর সর্বজাতির কাছে এ-সকল ভাষা শ্রদ্ধার্জন করিতে পারিবে না। তুলসীদাস বা রবীন্দ্রনাথ বা তিলককে দেখাইয়া একটা প্রদেশের ভাষাকে রাষ্ট্ররূপ দিতে গেলে জগতের সম্মুখে তাহার স্থান হইবে না।

পৃথিবীর সর্ব স্বাধীন জাতি তাহার জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যের খোঁজ লয় জাতির প্রাচীন সাংস্কৃতিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে। ভারতকে খুঁজিয়া তাহা বাহির করিতে হইবে। ভারত অসভ্য জঙ্গলী জাতির দেশ নহে; এই ভারতবাসী মুসলমান বা ইংরাজের অধীনে আসিয়া জঙ্গলিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে নাই। ভারতেরও একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে, তাহার সাংস্কৃতিক জ্ঞান-ভাণ্ডার অমূল্যনিধি-পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে সামান্য সামান্য জ্ঞান আহরণ করিয়া ব্যাস, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য ভারতক্ষেত্রে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই ভারতেরই অপূর্ব জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিয়া দেখান হইয়াছিল কুরুক্ষেত্রের রণ-প্রাঙ্গণে ভারতীয়দের ন্যায় কাপুরুষত্ব-প্রাপ্ত অর্জুন সমক্ষে। এই জ্ঞান-ভাণ্ডার সর্ব বিশ্বের জ্ঞানান্বেষীকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে। পাশ্চাত্যের ম্যাক্সমূলার ও শোপেনহায়ার স্তম্ভিত হইয়াছে।

সেই জ্ঞান-ভাণ্ডারের দরজাটি আমাদেরই খুলিয়া দেখিতে হইবে। দরজার চাবি দিয়া গিয়াছিলেন ঋষিরা আমাদেরই হাতে অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বিরাট আয়তনবিশিষ্ট মহারাজ ভরতের রাজধানী এই ভারতবর্ষের হাতে। আমরা ঐ চাবি পাশ্চাত্য-দেশীয়দের হাতে সমর্পণ করিয়া উহাদের উদ্ভাবিত জ্ঞান আহরণের জন্য ছুটিয়া চলিয়াছি। এখন আমাদের দেখিতে হইবে সেই জ্ঞান-ভাণ্ডারের স্বরূপ ছিল কি, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য কি ছিল, তাহা দেখিতে হইবে। ঐ জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে যে বৈখরী শব্দ নিনাদিত হইয়া সর্বভারতীয়দের হৃদয়-মন্দিরকে ঝঙ্কৃত করিয়াছিল, সেই শব্দ, সেই ভারতীয় সার্বভৌম ঐতিহ্যের ভাষা খুঁজিয়া উহাকে ভারতের বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য চির উদিত হইয়া থাকিবে, এ ভাষার খ্যাতি বিশ্ব জুড়িয়া বন্দিত হইবে। কেননা, ইহা ভারতের প্রাচীনতম সংস্কৃতি। ভারতের এ প্রাচীনতম সংস্কৃতির সংবাদ বিশ্বের কে না জানে?

# আশ্রয়

### বীরু চট্টোপাধ্যায়

হোক না নির্জন দ্বীপ, হে নাবিক, তবু তো আশ্রয়!
নোনাজল নোনামৃত্যু থেকে তবু হয়েছ নির্ভয়।
নারিকেল কুঞ্জে কুঞ্জে মদমত্ত বাতাসেরা দোলে,
সাগরেতো ঢেউএ ঢেউএ শ্বেতজিহ্ব ক্রুর ফণা তোলে!
ঝরণার মিঠে জল, আর কিছু মিঠে ফল, আর কিবা চাই।
নিশ্চিত মরণের, বৃথা প্রাণ হরণের ভয়, সেতো নাই।
একদিন দেখা দেবে, কাছে এসে তুলে নেবে তোমার জাহাজ—
ততদিন থাকো হেথা সারাদেহ ঘিরে করি বন্যতার সাজ।

# ◎ ডুয়ার্সের অরণ্যে পুরাকীর্তি ◎

**স্বামী পরমানন্দ পুরী**

কয়েকদিন হলো ডুয়ার্সে এসেছি। চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের জীবনালোকে শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম প্রচারের কাজ চলছে। অকস্মাৎ চোখে পড়লো খবরের কাগজের এই হেডিং—

"গভীর অরণ্যে প্রাচীন দুর্গ"
'সম্রাট স্কন্দ গুপ্তের আমলে নির্মিত বলিয়া অনুমান।'

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ (মফঃস্বল শুক্রবার) December 1, 1961 আনন্দবাজার পত্রিকার অষ্টম পৃষ্ঠায় (নিজস্ব প্রতিনিধি) সংবাদটি এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উত্তরবঙ্গের গভীর অরণ্যে এক অতিকায় প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, দুর্গটি অন্ততঃ একহাজার বছরের পুরাতন।

এই নব আবিষ্কৃত দুর্গ ভারত-ভুটান সীমান্তে জলদাপাড়া মৃগয়া-ভূমির নিকট অবস্থিত। আকার চৌকো এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় এক বর্গ মাইল। বড় বড় ইঁটে তৈরী দশ ফুট চওড়া এবং ত্রিশ ফুট উঁচু দেওয়ালের ধরণ দেখিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উহা গুপ্ত যুগে সম্রাট স্কন্দ গুপ্তের আমলে নির্মিত।

দুর্গের চারিদিকে ঘন বন। পশ্চিমে তোর্সার উপনদী মলঙ্গী, এবং পূর্বে বানিয়া নদী। উত্তর-পশ্চিমে আর একটি পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবত উহা গুপ্ত যুগে তৈরী কোন দেবমন্দির।"....ইত্যাদি।

বানিয়া ধ্বংসাবশেষের পশ্চিমদিকের প্রাচীরে ৮ ফুট উচ্চ এবং [illegible] ফুট প্রস্থ খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। বাম থেকে—ডাঃ অজিত গাঙ্গুলী, Hing chung, স্বামী পরমানন্দ, ডাঃ যতীন পাল, ডাঃ সুনীতি সিংহ।

এই সংবাদ প'ড়ে অবধি ঐ স্থানটি দেখবার আগ্রহ প্রবল হতে লাগলো; শেষে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬১ রবিবার হাসিমারার মালাঙ্গী চা-বাগান থেকে M/s Macha Brothersএর Director, Mr. Mawing আমাদিগকে জীপে করে নিয়ে চললেন। ডাঃ সুনীতি সিংহ, ডাঃ যতীন পাল, ডাঃ অজিত গাঙ্গুলী ও আমি চললাম বানিয়া ধ্বংসাবশেষ দেখতে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের হাসিমারা ষ্টেশনকে ডান হাতে রেখে এবং 'সুভাষিণী' চা-বাগানের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে, হাসিমারা airfieldকে বামদিকে রেখে আমরা চললাম জলদাপাড়া 'গেম স্যাংচুয়ারী'র দিকে। স্যাংচুয়ারীর অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীউমাপদ সাহা আমাদিগকে পথের নির্দেশ দিলেন আর সেই সাথে সহাস্যে আমন্ত্রণ জানালেন অন্যান্য বছরের মত এবারও যেন একদিন বন্যগণ্ডার দেখতে আসি।

জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারী ছেড়ে 'কোদালবস্তী' হয়ে আমরা 'চিলাপাতা' সংরক্ষিত অরণ্যে প্রবেশ করলাম। এই বনভূমিরই একদিকে 'বানিয়া' নদীর তীরে ঐ ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। দীর্ঘকাল থেকে এদিকের লোকপ্রবাদ যে—ঐ ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে পুরাণ-বর্ণিত নলরাজার রাজধানী। সেজন্য 'নলরাজার বাড়ী' হিসাবে এ অঞ্চলের অনেকেই ঐ ধ্বংসাবশেষকে জানেন। আমাদের সঙ্গী ডাঃ গাঙ্গুলী এবং Mr. Mawing বললেন যে, দীর্ঘকাল পূর্বে তাঁরা 'নলরাজার বাড়ী' হিসাবেই এই ধ্বংসাবশেষ দেখতে এসেছিলেন।

আমরা বেলা প্রায় দশটার সময় গহন অরণ্যে প্রবেশ করলাম। বড় রাস্তায় জীপ রেখে প্রায় ২ ফার্লং মত অরণ্যের মধ্যে গিয়েই ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। দীর্ঘ প্রাচীর। কোথাও পাঁচ ফুট উঁচু, কোথাও আট ফুট এবং কোথাও ১৪' ফুট পর্যন্ত উচ্চতা এখনও আছে। প্রস্থে চার ফুট। উত্তর ও দক্ষিণে লম্বা; প্রাচীরের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে পরিখার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর দিকে প্রাচীরটি বিভিন্ন কোণে বিভক্ত। পশ্চিমদিকে প্রাচীরের গায়ে ছোট খিলান এবং একটি বড় খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে। পশ্চিমদিকের প্রাচীরের গায়ে প্রতি পঁচিশ ফুট অন্তর ত্রিশ ফুট দীর্ঘ এবং প্রায় বিশ ফুট প্রস্থ ঘর ছিল ব'লে মনে হয়; ঐ ঘরের উচ্চতা এখনও দশ ফুট পর্যন্ত আছে। প্রাচীর পরিবেষ্টিত স্থান গভীর অরণ্যে পরিণত এবং শ্বাপদ-সঙ্কুল। যে কোন মুহূর্তে জীবন সংশয়াপন্ন হতে পারে—অজগর, বাঘ ও বন্য-হস্তীর দ্বারা। প্রথম দিন আমরা একটি ধ্বংসাবশেষেরই মাত্র তিন দিক দেখে ফিরে আসি। তারপর পুনরায় ২৪শে ডিসেম্বর রবিবার জের্সা, সুভাষিণী, মালাঙ্গী, সাতালী

প্রভৃতি বাগানের এবং হাসিমারা বিত্তালয়ের অনেক বিশিষ্ট বন্ধুগণসহ গিয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করি। এইদিন প্রথম দিনের দেখা ধ্বংসাবশেষের চারিদিক পরিক্রমা করি এবং আরেকটি পৃথক প্রাচীরযুক্ত ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই। এইটিও প্রথমটির মতই গঠিত।

এই ধ্বংসাবশেষে যে ইট দেখলাম, ঐ ধরণের ইট সারনাথ ও কুশীনগরের ধ্বংসাবশেষে দেখেছি। প্রাচীরের প্রস্থও যা দেখলাম, তাতে ঐ সকল স্থানের স্থাপত্যের সাথে সাদৃশ্য আছে। ইটগুলো অনেকটা টালীর মত অর্থাৎ দৈর্ঘ ১০″ বা ১২″ বা ১৫″, প্রস্থ ৮″ এবং উচ্চতা ১½″ ইঞ্চি। উচ্চতা ও প্রস্থ একই, এখানের ইটের; কিন্তু দৈর্ঘ নানা ধরণের। প্রাচীরের উত্তরদিকে কতকগুলো পাথর পড়ে থাকতে দেখলাম—সেগুলোর আকৃতি ২′ দৈ: × ১′ প্র: + ১′ উ:। এই ধরণের পাথর সাধারণত দরজা-জানালার উপর ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের পাথরও সারনাথ প্রভৃতি স্থানে দেখেছি।

এই ধ্বংসাবশেষ দেখলে মিস্ত্রীর কাজ ও নির্মাণ-কৌশল, প্রত্যেকটি ইটের জোড়াই, খিলান, ইটের প্রকৃতি, মসৃণতা এবং নিখুঁত সমাপন (finishing) প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা তো করতেই হবে, পরন্তু বিস্মিতও হতে হবে। প্রাচীরের উপর এক একটি যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছে—তাদের বিশালতা, প্রাচীনতা দেখলেই অনুভব করা সহজ হয় যে, এই ধ্বংসাবশেষ কত প্রাচীন!

এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে হলে বন-বিভাগের সহায়তা অবশ্যই নিতে হবে। শিলিগুড়ি-কোচবিহার মোটরপথে 'শীলবাড়ীঘাট' নেমে 'চিলাপাতা' A. C. F. Office-এ গিয়ে সেখান থেকে হাতী ও সঙ্গী প্রভৃতি সাথে নিয়ে এই অরণ্যে প্রবেশ করাই ভাল। 'চিলাপাতা' বন-বিভাগের কার্যালয় থেকে দুই মাইলের মধ্যেই এই ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এ অঞ্চলের বন-বিভাগের কর্মকর্তাগণের সহৃদয় ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

# ॥ একটি মহৎ মৃত্যু : তাঁতিয়া টোপে ॥

প্রতিমা চক্রবর্তী

মেজর এনিস ইংরেজের হয়ে অনেক ওকালতী করলেন, ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে অনেক বোঝালেন। বললেন, এতে আপনার বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না। কোম্পানী আপনার ভালোর জন্যই এই প্রস্তাব করেছে।

রাণী বললেন, মেজর সাহেব, আপনি দেখছি অদ্ভুত কথা বলছেন। কোম্পানী আমার রাজ্য খাস করে নিচ্ছে, আর আপনি বলছেন,—আমার তেমন কোনও ক্ষতি হচ্ছে না।

মেজর এনিস মৃদু হেসে বললেন, কোম্পানী এ জন্য আপনাকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দিতে রাজী হয়েছে।

—আমার রাজ্য?

—রাজ্য থাকবে কোম্পানীর দখলে।

—শাসন কর্তৃত্ব?

—শাসন কর্তৃত্ব কোম্পানীর।

রাণী সহ্য করতে পারলেন না। উদ্ধত কণ্ঠে বললেন,—চুপ করুন মেজর সাহেব! ইংরেজের হয়ে আপনি অনেক ওকালতী করেছেন। আপনার কথা আমার আর শুনতে ইচ্ছে করছে না।

—আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। বিষয়টা ভালো করে ভেবে দেখুন।

—খুব বুঝেছি! আমাকে আর বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। আমি কোম্পানীর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।

মেজর এনিস গম্ভীর হয়ে বললেন,—আর একবার ভেবে দেখুন। কাজটা কিন্তু ভালো করছেন না।

—আপনি ফিরে যান এনিস সাহেব। ফিরে গিয়ে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের বলুন যে, ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই কারো কর্তৃত্ব মানতে রাজী নয়। সে স্বাধীনভাবেই রাজ্য চালাবে। ঝাঁন্সীর উপর কোম্পানীর কর্তৃত্ব করবার কোনই অধিকার নেই। রাজা গঙ্গাধর মারা গেলেও, রাণী লক্ষ্মীবাই এখনও জীবিত আছে।

রাণীর উত্তরে এনিস সাহেব মোটেই খুশী হলেন না।

রাণী শেষ পর্যন্ত ইংরেজের কর্তৃত্ব মানতে রাজী হলেন না।

ইংরেজরাও রাণীর সংগে দুর্ব্যবহার শুরু করলো।

ইংরেজের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাণী বিদ্রোহিণী হলেন। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালো। ইংরেজ সেনাপতি হিউরোজ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। সুযোগ বুঝে ঝাঁন্সী অবরোধ করলেন।

লক্ষ্মীবাই কি আর করেন। তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু নানাসাহেবের কাছে সাহায্য প্রার্থিনী হয়ে দূত পাঠালেন।

পেশবা নানা সাহেব রাণীর বাল্যবন্ধু। রাণী লক্ষ্মীবাই ইংরেজের হাতে বিপন্না শুনে তিনি তাঁর বিচক্ষণ সেনাপতি তাঁতিয়া টোপেকে ডেকে পাঠালেন। পেশবা বললেন,—টোপে, তুমি তৈরী হও! ঝাঁসীর রাণী আজ বড়ই বিপন্না হয়ে আমার সাহায্যপ্রার্থিনী। তাঁকে এই বিপদের দিনে সাহায্য করতেই হবে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন,—বন্ধু, তোমাকে আজই রওনা হতে হবে। সৈন্য নিয়ে তুমি ঝাঁসীর দিকে রওনা হও, দেরী কোর না!

—আপনার আদেশ কোনও দিন অমান্য করিনি, আজও করবো না। আমি আজই সৈন্য নিয়ে ঝাঁসীর দিকে রওনা হবো। আপনি আশীর্বাদ করুন—আমরা যেন জয়ী হতে পারি!

নানা সাহেবের আদেশে অসংখ্য সৈন্য ঝাঁসী অভিমুখে রওনা হয়েছে! বেতোয়া নদীর তীরে তাঁতিয়া শিবির তৈরী করলেন!

ইংরেজ সেনাপতি হিউরোজ যখন দেখলেন অসংখ্য সৈন্য ঝাঁসীর দিকে এগিয়ে আসছে, তিনি তখনই অদ্ভুত সতর্কতা অবলম্বন করে নতুন ভাবে সৈন্য সাজালেন। এদিকে রাণী খবর পেলেন, নানা সাহেবের আদেশে তাঁতিয়া টোপে তাঁকে সাহায্যের জন্য সৈন্য নিয়ে ঝাঁসীর দিকে এগিয়ে আসছেন।

রাণী আনন্দে ঘন ঘন তোপ দাগতে সুরু করলেন! তোপ দেগে তাঁতিয়া ও তাঁর সৈন্যদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন আর নিজেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন! যুদ্ধ সুরু হলো! কিন্তু ইংরেজের আক্রমণ টোপের সৈন্যেরা সহ্য করতে পারলো না—ছত্রভংগ হয়েই পালাতে সুরু

করলো। সৈন্যেরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলো। বাধ্য হয়ে তাঁতিয়াকে পিছু হটতে হলো!

রাণী লক্ষ্মীবাই রাজ্য রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পেরে উঠলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা গেলেন! ইংরেজরা জয়ী হলো—ঝাঁসী অধিকার করে নিলো!

ইংরেজরা ঝাঁসী অধিকার করে নিলেও, নানা সাহেব আর তাঁর সেনাপতি তাঁতিয়াকে দমন করতে পারলো না! তাঁরা দু'জনেই স্বতন্ত্র ভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে চললেন!

তাঁতিয়া একদল সৈন্য নিয়ে রওনা হলেন জয়পুরের দিকে। জয়পুর তখন কোম্পানীর শাসনে বিক্ষুব্ধ!

তাঁতিয়া ভাবলেন জয়পুরের বিদ্রোহীরা নিশ্চয়ই তাঁর সংগে যোগ দেবে, স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তুলবে। কিন্তু তাঁতিয়ার এ আশা পূর্ণ হলো না। তাঁতিয়া মহা মুশকিলে পড়লেন! তিনি কি আর করেন! শেষে তাঁর সেনাদল নিয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ইংরেজরা তাঁতিয়াকে ধরার জন্য চারদিকে চর পাঠালো! চরেরা তাঁতিয়ার সন্ধান করে বেড়াতে লাগলো! তাঁতিয়ার তখন চারিদিকে শত্রু! তিনি তাই অন্য উপায় না দেখে রওনা হলেন বুঁদির দিকে। ভাবলেন, বুঁদির রাজা রামসিংহ নিশ্চয়ই তাঁকে আশ্রয় দেবেন, সাহায্য করবেন—স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইন্ধন যোগাবেন।

কিন্তু তাঁর এ আশা ব্যর্থ হলো!

কাপুরুষ রামসিংহ খবর পেয়েও তাঁর সংগে দেখা করলেন না।

তাঁতিয়াকে বুঁদি ছেড়ে পালাতে হলো!

আশ্রয় আর সাহায্যের জন্য তাঁতিয়া অনেক দেশ—অনেক রাজ্য ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু কোনও সাড়া পেলেন না,—কেউই তাঁকে আশ্রয় দিতে, সাহায্য করতে রাজী হলো না।

রাজাদের ব্যবহারে তাঁতিয়া বিস্মিত হলেন! ভাবলেন, কার জন্য যুদ্ধ করবেন? যে দেশের মানুষ এতো স্বার্থপর, সে দেশের জন্য যুদ্ধ করে কি লাভ?

এদিকে তাঁতিয়া টোপে আর নানা সাহেবকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। পুরস্কার ঘোষণা করলো ইংরেজ সরকার। প্রচার করে দিলো—যে তাঁতিয়া টোপে আর নানা সাহেবকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে আনতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

বিশ্বাস-ঘাতকেরা অর্থের লোভে তাঁদের সন্ধানে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো!

খবরটা তাঁতিয়ার কানে গেল। তাঁতিয়া হুঁসিয়ার হয়ে গেলেন। শেষে সৈন্যদের বিদায় দিয়ে পারণের গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করলেন। এই বনে একদিন তাঁর এক পুরোণো বন্ধুর সংগে দেখা হয়ে গেল। বন্ধু মানসিংহ তাঁতিয়াকে গভীর অরণ্যে একাকী ঘুরে বেড়াতে দেখে বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখানে? আপনার সৈন্যদল কোথায়?

তাঁতিয়া মানসিংহকে দেখে খুবই খুসী হলেন! বললেন,—সবই আমার অদৃষ্ট! বন্ধু, ভারতের যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা আর সফল হলো না। আজ আমি বিপন্ন। চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি!

মানসিংহ ক্রুর হাসি হেসে বললেন,—বন্ধু, কোনও ভয় নেই। আপনি এই অরণ্যে বিশ্রাম করুন। নিশ্চিন্তে থাকুন—সৈন্য সংগ্রহ করে সংগ্রাম জয়যুক্ত করুন! তাঁতিয়া মৃদু হেসে বললেন,—বন্ধু, তা আর সম্ভব নয়। এ দুর্ভাগ্য শুধু আমার একার নয়, আপনাদেরও!

মানসিংহ জিজ্ঞেস করলেন,—কেন?

তাঁতিয়া গম্ভীর হয়ে বললেন, সে অনেক কথা—পরে বলবো!

একটু থেমে তাঁতিয়া বললেন, বন্ধু, আমি এখন আপনার আশ্রয়ে কিছুদিন থাকতে চাই। আমাকে একটু আশ্রয় দেবেন? ইংরেজ আমার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, ক'দিন যে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো জানিনা।

মানসিংহ হাসতে হাসতে বললেন, নিশ্চয়! তাতে কি হয়েছে! আপনি আমার আশ্রয়ে থাকলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

মানসিংহ তাঁতিয়াকে আশ্রয় দিলেন, কিন্তু গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কুণ্ঠা বোধ করলেন না।

তাঁতিয়া বিশ্বাস করে মানসিংহকে অনেক গোপন কথা বলেছিলেন। মানসিংহ তা ইংরাজের কানে তুলে দিয়ে, তাঁতিয়াকে ধরিয়ে দিয়ে, অদ্ভুত আনন্দ পেলেন। মনে করলেন একটা মস্ত কাজ করলাম।

সেদিনটা ছিলো ইংরাজী আঠারোশো উনষাট সালের সাতই এপ্রিল! গভীর রাত। পারণের গভীর অরণ্যে নিজের শিবিরে তাঁতিয়া বিশ্রাম করছিলেন।

হঠাৎ ইংরাজ সেনাপতি মাডের সৈন্যরা তাঁর শিবিরের সামনে এসে দাঁড়ালো!

তাঁতিয়া নিরুপায় হয়ে বন্দী হলেন!

চোখ মেলে দেখলেন—একদল ইংরেজ সৈন্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে আর তাদের সংগে রয়েছেন তাঁরই বন্ধু ও আশ্রয়দাতা বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ! মানসিংহ যে এরকম কাজ করবেন, তা তাঁতিয়া ভাবতেও পারেন নি। সেজন্য তিনি বিস্মিত হলেন। বিস্মিত হলেন মানসিংহকে দেখে। পরদিন সকালে সৈন্যেরা তাঁতিয়াকে বন্দী করে মাডের শিবিরে নিয়ে এলো। সুরু হলো বিচার!

বিচার হলো সামরিক বিধান অনুসারে! বিচারে বিচারকেরা তাঁতিয়ার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন! বিচারের শেষে সেনাপতি মাড সাহেব তাঁতিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে?

তাঁতিয়া গম্ভীর হয়ে বললেন,—মাড সাহেব, আমি আমার কর্তব্য করেছি, দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি। আমি বীরের মতো যুদ্ধ করেছি।—কাপুরুষের মতো স্ত্রী আর শিশুর রক্তে আমার হাত কলঙ্কিত করিনি। কাউকে ফাঁসীর হুকুম দিইনি বা অযথা নির্য্যাতন করিনি। সুধু এই টুকুই বলতে চাই!

মৃত্যুপথযাত্রী একজন সেনাপতির কাছ থেকে এমন জবাব এর আগে আর কেউ শুনতে পেয়েছে কি না তা আমার জানা নেই!

সত্যি সত্যিই তাঁতিয়া টোপে সেদিন মাড সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে এই কথাই বলেছিলেন। কাপুরুষের মতো করুণা ভিক্ষা করেননি বলেই আমরা আজো তাঁকে ভুলতে পারিনি,—কোন দিন পারবো বলে মনেও হয়না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদ হিসেবে চিরদিনই তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন!

# নজরুলের জ্যোতিষ-চর্চ্চা

এম, আবদুর রহমান

সাহিত্য-শিল্পীর জীবন-আলেখ্য তাঁর রচনাশৈলী এবং শিল্প-কর্মের মধ্যে তাঁর জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অল্প-বিস্তর রূপায়িত হয়ে ওঠে, কিন্তু তাতে তার স্রষ্টা আসল মানুষটির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, যিনি যাই হোন-না কেন, তাঁর জীবনের অনেক দিক আছে। এই দিক্‌গুলির কোন কোনটি পর্দা-ঢাকা থাকলে, আমরা তাঁকে ষোল আনা দেখতে পাব না। আর এই না দেখতে পাওয়ার দরুন তাঁর শিল্পী-মানস, তাঁর স্বপ্ন-সাধ এবং তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টির কোন কোন অংশের সূচনা-ইতিহাস এবং সৃজন-রহস্য আমাদের নিকট অজ্ঞাত থেকে যাবে।

যাঁর শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, সেই শিল্পীর জীবন-বৈচিত্র্য জানবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কাজি নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী ও বুলবুল কবিরূপে, চারণ কবি এবং গজল-গানের স্রষ্টারূপে দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছেন। সাহিত্যের সাধকরূপে পেয়েছেন সর্বজন-স্বীকৃতি। তাঁর কাব্য, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে প্রচুর। তাঁর জীবন-ইতিহাসও বের হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু মানুষ নজরুলের অনেক কিছু আজিও আমাদের নিকট অপরিচিত রয়ে গিয়েছে। অপরিজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে তাঁর খেয়ালী মনের অনেক বাতিকের ( Hobby ) কাহিনী। বাঁধন-হারা বিদ্রোহী কবি করতেন জ্যোতিষ চর্চা। কর-রেখা পাঠ ক'রে ব'লে দিতেন অজানা ভবিষ্যতের ইঙ্গিকথা। তাঁর জীবনের এই গোপন অধ্যায়ের কথা আমরা অল্পই জানি। অভিজ্ঞ এবং ওয়াকিবহাল ব্যক্তিগণ এ-বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করবেন, এই আশায়—বক্ষ্যমান প্রবন্ধের অবতারণা।

খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নিজ নিজ পেশা এবং সাধনার নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়াও এক একটা বাতিক বা নেশা থাকে, যাকে Hobby বলা যেতে পারে। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের Hobby ছিল ছবি আঁকা। খেয়ালের বশে এক দুই ক'রে তিনি অনেক চিত্র অঙ্কন ক'রেছিলেন। সে সব চিত্র আজ বিশ্ব-দরবারে প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছে। বিশিষ্ট Hobby বলতে যা' বুঝায়, কবি নজরুল ইসলামের তা' অবশ্য ছিল না। তবে যৌবনকালে তাঁর ঝোঁক বা খেয়াল ছিল অনেক রকমের। এই খেয়ালের বশে তিনি একদিন আরম্ভ করেন—জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চা, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এক বিশেষ বিভাগ—হস্তরেখা-বিদ্যা। এই বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য তিনি ইংরাজি বাঙলা অনেক বই কিনেছিলেন এবং কোন গুরু-বরণ না ক'রে বই পড়ে তিনি "ওস্তাদ" জ্যোতিষী হতে চেয়েছিলেন। অবসর সময়ে তিনি এই সব বই পড়তেন আর হাত দেখতেন নিজের, আপন জনের, বন্ধু আর ভক্তদের। এইভাবে পড়াশোনা, বিচার-বিবেচনা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বেশ কিছুটা জ্ঞান অর্জন ক'রেছিলেন। তবে, ওস্তাদ জ্যোতিষী হতে পারেননি।

কবি তাঁর জ্যোতিষ-চর্চার কথা বাইরের কাউকে বড় জানতে দিতে চাইতেন না, প্রিয়জনদের মধ্যেই ছিল তাঁর "পশার" সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে তাঁর দুর্বলতা কোথায় তিনি তা জানতেন, তবু তাঁর খেয়ালী মন মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠত হাতের লেখা পাঠ করবার জন্য। অজানাকে জানবার এবং অন্ধকারে আলোকপাত করবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। এই আকাঙ্ক্ষা তাঁকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল—আধ্যাত্মিক সাধনার পথে, মানব-জীবনের গূঢ় রহস্য সন্ধানের দিকে। কবি-জ্যোতিষী হয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকতে চাননি, তিনি হতে চেয়েছিলেন সুফী কবি। তাঁর পরিণত বয়সের রচনাশৈলীতে তার সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

যিনি বিদ্রোহী কবিরূপে খ্যাত, যিনি গোঁড়ামীর উপর কুঠার হানেন, ধর্মের চুল-চেরা বিচার এবং আইন-শৃঙ্খলা যিনি মানতে চান না, যিনি বিজ্ঞানের ভক্ত এবং তারুণ্যের উপাসক, সেই বিদ্রোহী কবি কিনা করেছিলেন জ্যোতিষ-চর্চা এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম-সাধনা। কিন্তু মুখে বললে আর বই-এ লিখলে কী হবে? আসলে তিনি বাল্যে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন, সেই পরিবেশে ছিল "দরবেশী" আবহাওয়া। তাঁর পিতা ছিলেন সুফী মানুষ। পীরের মাজার আর মসজিদ নিয়ে তিনি পড়ে থাকতেন। বালক নজরুল তা দেখেছেন। শুধু দেখেছেন বললে সবটা বলা হ'ল না। কিশোরকালে নজরুল নিজেও সেই মসজিদ আর মাজারের সেবা করেছেন। "বিধির-বিধান মানার" উপদেশ-বাণী তাঁর মনের পর্দায় অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর সেই কিশোর জীবনে। "শরিয়তে ইসলাম" যদিও জ্যোতিষ-শাস্ত্র-চর্চায় উৎসাহ দেয় না, তথাপি দেখা যায়, মুসলীম পীর, ফকির আর সুফী দরবেশরা হাত দেখে হরহামেশাই "গায়েবী" কথা ( ভবিষ্যৎ-বাণী ) বলে থাকেন।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও তিনি পরবর্তী জীবনে বাল্যকালের উক্ত ধর্মীয় প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেননি। যুবক নজরুলের এমন দু'-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তখন তাঁর সান্নিধ্যে থাকতেন, যাঁদের কাছে তিনি জ্যোতিষ-চর্চা করতে সঙ্কোচবোধ করতেন। তাঁর এই বন্ধুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ কমরেড মুজফফর আহমদ সাহেব। নজরুল আপন ছেলেদের হাত দেখতেন মাঝে মাঝে। একদিন চোখে পড়ে গেল মুজফ্‌ফর সাহেবের। তিনি তিরস্কার করলেন কবিকে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর সাহেব লিখেছেন—"সে ( নজরুল ) আবার হাত দেখতে জানত। এই জন্য আমি তাকে একদিন খুব বকেছিলাম। বলেছিলাম : হাত দেখা যদি তোমার নেশা হয়ে থাকে," অন্যদের হাত তুমি দেখতে পার, কিন্তু নিজের ছেলেদের হাত তুমি কিছুতেই দেখতে পাবে না।" ১

কবি নজরুলের নিজের ছেলেদের হাত দেখার ব্যাপারে একটা ইতিহাস আছে। কবির প্রথম সন্তান আজাদ-কামাল—অন্য নাম কৃষ্ণ মোহাম্মদ—মারা গিয়েছিল কচি-কাঁচায়। দ্বিতীয় সন্তান অরিন্দম খালেদ—ডাক নাম বুলবুল—মারা গিয়েছিল

---

১ নজরুল প্রসঙ্গে—১২৪ পৃঃ

মাত্র চার বছর বয়সে। ছেলেটি ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান। স্মরণশক্তি ছিল তার অসাধারণ। একবার কি দু'বার শুনলে যে কোন গান সে মুখস্থ করে ফেলত। কবির অঢেল স্নেহের অধিকারী ছিল সে। কবি তার হাত দেখতেন। ছেলেটির কর-রেখা দেখে কবি পিতার মনে হয়েছিল—সে স্বল্পায়ু হবে। যে কোন কারণেই হোক, ছেলেটি অল্পবয়সে "এন্তেকাল" করায় কবির ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর হস্তরেখা-বিচার নির্ভুল। তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র যথাক্রমে সব্যসাচী ইসলাম এবং অনিরুদ্ধ ইসলাম যখন ছোট, তখন তিনি তাঁদের হাত দেখতেন ; তাঁর ধারণা হয়েছিল—এ ছেলে দুটিও দীর্ঘায়ু হবে না। কবিবন্ধু মুজফ্ফর সাহেব এজন্য কবিকে ধমক দিয়ে ছেলেদের হাত দেখতে বারণ করেছিলেন। এরূপ ভাবালুতা তিনি পছন্দ করতেন না। ২ সেই থেকে কবি আর তাঁর ছেলেদের হাত দেখতেন না এবং তাঁর সামনে অন্যের হাতও দেখতেন না।

সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক "কবি নজরুল" নামে বিদ্রোহী কবির জীবন-কথা লিখেছেন। তিনি কবির সংস্রবে কাটিয়েছেন অনেকদিন। কবির অনেক জীবন-কাহিনী তাঁর ব্যক্তিগতভাবে জানা। তিনি তাঁর উক্ত বই-এ লিখেছেন : "তিনি ( কবি ) চেরোর সামুদ্রিক বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। অবসর সময়ে প্রায়ই হাতের রেখা বিচার করতেন। নিজের হাতের শিরোরেখা ভাঙ্গা থাকায় মস্তিষ্ক-পীড়ার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন।" ৩

লাঙল এবং গণবাণী ( পরে লাঙল, গণবাণীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল ) পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। বীরভূম-সরডাঙ্গার সামসুদ্দীন হোসেন মরহুম ছিলেন পর পর উক্ত পত্রিকা দুটির কর্মসচিব। তিনি এককালে আমাদের কীর্নাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকও ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা কবি নজরুলের হাত-দেখার কথা শুনেছি। তিনি বলতেন : "কাজি নজরুল নিজেই নিজের হাত দেখে আর বলে—তার দারিদ্র্য ঘুচবে না—হাতে টাকা এলেও থাকবে না।"

বিদ্রোহী কবির অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের মিঃ হবিবুল্লাহ বাহার এবং বেগম সামসুন নাহারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি এই 'বাহার-নাহার ভাই-বোনকে তাঁর "সিন্ধু-হিন্দোল" কাব্য উৎসর্গ করেছেন। কবি চট্টগ্রামে তাঁদের বাড়ীতে একাধিকবার গিয়েছিলেন এবং বেশ কিছুদিন ক'রে কাটিয়ে এসেছিলেন। সেদিনের এই ভাই-ভগ্নী এখন পূর্ব-পাকিস্তানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতনামা। শ্রদ্ধেয়া বেগম সাহেবা "নজরুলকে যেমন দেখেছি" নাম দিয়ে একখানা বই লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন : "তিনি ( কবি নজরুল, চট্টগ্রামে থাকা কালে) দুপুরে কখনও কিছু পড়তেন—কখনও করতেন পামিস্ট্রীর চর্চা। কখনও দাবা খেলায় মশগুল থাকতেন।··· ভাইয়ের ও আমার হাত গণনার ফলাফল তিনি পৃথকভাবে লিখে দিয়েছিলেন। রহস্যের যবনিকা সরিয়ে ভবিষ্যতের গর্ভে আলোকপাত ভারি মজার মনে হ'ত। তাছাড়া জ্যোতিষী হচ্ছেন স্বয়ং কবি। মনে আছে, গভীর আগ্রহ ও ঐকান্তিক বিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করতাম,—দেখুন তো, কতখানি পড়াশোনা লেখা হাতে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাওয়া কপালে অর্থাৎ হাতে লেখা আছে নাকি ?···

···জ্যোতিষী কবির রচিত আমার সেই দীর্ঘ ভাগ্য-লিপিতে তিনি বার কয়েক লিখেছিলেন—স্বাস্থ্যভঙ্গ, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, প্রিয়জন-বিয়োগ, স্নেহ-মমতার অভাব হবে না কোনদিন। আর একটা কথা লিখেছিলেন, Partial satisfaction of ambition. ···উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র আংশিক পূর্ণ হবে। আজ মনে হয়, সত্যি তো মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কি কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে ? ৪

কবির একাধিক বন্ধু ও শিষ্য ভক্তদের কাছে কবির হাত-দেখার ফলাফল লিখিত অবস্থায় আছে, সেগুলি তাঁরা দয়া করে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করলে কবির জীবনের অজানা অধ্যায় পাঠ করার সুবিধা হয় এবং কবির পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রণয়নে সাহায্য করা হয়। আমরা এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করার পর কবির জ্যোতিষ-চর্চার নেশা কেটে যায়। তার পূর্ব পর্যন্ত এক যুগের অধিককাল ধরে তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্র চর্চা করেছিলেন। "জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। হস্তরেখা-পাঠে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসামান্য" ব'লে কবির জীবনী-লেখকদের কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। ৫ উক্ত সময়ে কোন একদিন তিনি লালগোলার বিখ্যাত যোগী বরদাচরণ মজুমদার মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি কোরাণশরীফ, গীতা এবং যোগসাধনার বই-কেতাব ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করতেন না। সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এবং নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া তিনি কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না। কথা-বার্তাও কইতেন না। নির্জন নিরালায় ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে তিনি খোঁজ করছিলেন সেই পরমপ্রভুর রূপজ্যোতিঃ। কবি বলেছেন :

"ওগো আমার পরমগতি<br>
ওগো আমার পরমপতি<br>
বহু সে কাল বাহির দ্বারে<br>
দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে<br>
এবার দেহের দেউল ভেঙ্গে<br>
দেখব নিঠুর, তোমার জ্যোতি।" (শেষ আরতি)

ঐ সময়ের কিছু পূর্ব হতে তাঁর মস্তিষ্কপীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর এই মূর্চ্ছিত মনের পূর্বাভাষ তিনি কি আগেই জেনেছিলেন ? জেনেছিলেন নিজের কর-রেখা পাঠ করে ? তিনি একদিন বলেছিলেন :

"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না,<br>
কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না,<br>
নিশ্চল নিশ্চুপ—<br>
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধ-বিধুর-ধূপ।"<br>
( গুবাক তরুর সারি )

২ নজরুল প্রসঙ্গে—পৃঃ ১৪৪

৩ কাজি নজরুল—১৩ পৃঃ

৪ নজরুলকে যেমন দেখেছি—পৃঃ ৭৩

৫ জোনাব আজহারউদ্দীন খান লিখিত "বাঙলা সাহিত্যে নজরুল"।

# খ-তত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব ও পাতাল-তত্ত্ব

শ্রীগোবিন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

খনা ও মিহিরের জীবনেতিহাস যা আমাদের লব্ধ হয়েছে, তা' হতে দেখতে পাই যে, উভয়েই সিংহলে রাক্ষস কর্ত্তৃক লালিত-পালিত হয়েছেন। উভয়েই নিজ নিজ অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন এবং পরে রাক্ষসরা তাদের কুড়িয়ে পেয়ে পরম আদরে লালিত-পালিত করেছিল। খনা ও মিহিরকে যথাযোগ্য জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিল ঐ রাক্ষসরা। দেখতে পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে রাক্ষস বা অনার্য্যরা অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিল। ইহার পরে ভারতবর্ষের আর্য্যদের মধ্যে বরাহই ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী; কিন্তু ভারতীয় জ্যোতিষে 'খ'-তত্ত্বের কোন বিশেষ উল্লেখ নেই! আধুনিক পাশ্চাত্য দেশসমূহে বা প্রাচীন ভারতবর্ষে 'খ'-তত্ত্বের যা আলোচনা হচ্ছে বা হয়েছিল, তা প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারোদ্‌ঘাটনোপযোগী চাবি-কাঠিও নয়।

প্রাচীনকালে ভারতে এই খ-তত্ত্বের আলোচনা বহুল পরিমাণে হয়েছিল। ইহার আভাস মাত্র আজ বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানতে পারা যায়। প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের গ্রন্থাবলী যা কালচক্রের ধ্বংসলীলার পরেও আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাতে মাত্র এক শতটি নক্ষত্রের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু তাও ইঙ্গিত মাত্র। ভারতীয় জ্যোতিষ সার্থকতা লাভ করবে সেদিন, যেদিন এই 'খ' তত্ত্ব পুনরুদ্ধার করতে পারবে। বর্ত্তমান রুশ ও আমেরিকা বা অন্যান্য প্রগতিশীল দেশসমূহ জড়-বিজ্ঞানে যে সাফল্য অর্জ্জন করেছে বা করছে, তা একমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রের অধুনা বিলুপ্ত খ-তত্ত্বের অন্তর্গত।

স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 'খ'-তত্ত্বই হোল সৃষ্টির প্রেরণাদায়ক। 'খ'-তত্ত্বের মারফতে কল্পনার অসীম সাম্রাজ্যে আরোহণ করে দর্শন, সাহিত্য, আধ্যাত্মিক চেতনার প্রেরণা যেমন লাভ করা যায়, তেমনই ঐ 'খ'-তত্ত্বের আর এক দিক বস্তুরাজ্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির রহস্য জ্ঞাত হওয়া যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জ্যোতিষশাস্ত্রই সকল শাস্ত্রের মূল এবং আদি। জ্যোতিষী হওয়া সহজসাধ্য নয়। যোগী হওয়া সহজ কিন্তু জ্যোতিষীর স্থান আরও উর্দ্ধে,—ঈশ্বরের এক ধাপ নীচে মাত্র। জ্যোতিষী হতে পারে সেই যে 'খ'-তত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব ও পাতাল-তত্ত্ব সম্যক অধিগত করতে সমর্থ হবে—উভয় দিক হতে। জ্যোতিষী একাধারে সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, জড়বিজ্ঞানী সব কিছুই। ভারতের জনসাধারণের মনে যেদিন থেকে এই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এসেছে, সেদিন থেকেই তার পতন ঘটেছে। এ পতন ঘটা স্বাভাবিক; কারণ জ্ঞানের মূল উৎসের সন্ধান দেয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র। সেই জ্যোতিষশাস্ত্র অবহেলার বস্তু তো নয়ই; বরং বিশ্বের সকল দেশের সকল মানবেরই অবশ্য চর্চ্চার বস্তু। অবশ্য সকলেই যে এই দুরূহ শাস্ত্র অধিগত করে আত্মদর্শনের পূর্ণ এবং উচ্চ সোপানে উঠতে পারবেন তা নয়। তবে এর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ ভালবাসা প্রত্যেক মানবেরই থাকা বাঞ্ছনীয়।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ভারতের শাসকসম্প্রদায় তথা জনসাধারণ এ হেন জ্যোতিষশাস্ত্রের পরিপোষক কোন ব্যবস্থাই করেন নাই; তার পুষ্টিসাধনের কথা স্বতন্ত্র। তবে আশার বিষয় এই যে, বর্ত্তমান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলন কিছু কিছু হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে ভারতের দুইটি জ্যোতিষীর নাম না করলে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ঘটবে মনে করে উল্লেখ করছি যে, বাঙ্গালোরের স্বনামধন্য জ্যোতিষী এ্যাষ্ট্রোলজিক্যাল ম্যাগাজিনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীরমন ও বাঙ্গালাদেশের স্বনামধন্য জ্যোতির্বিদ দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সাপ্তাহিক 'রাশিচক্র' স্তম্ভের লেখক—নামটি মনে হয় ভৃগুজাতক-নামধারী প্রফেসর দ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য। এঁরা দুজনই ভারতের প্রকৃত গৌরব পুনরানয়নের ব্রত গ্রহণ করে জ্যোতিষ চর্চ্চায় নেমেছেন। এঁরা আদর্শবাদী বলে প্রশংসনীয় এবং সম্মানার্হ।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগৎ ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা জানার পরই এক লাফে 'খ'-তত্ত্বে উঠতে চাইছে এবং এই চাওয়ার ফলে সাময়িক কিছু অগ্রগতি ঘটলেও পাতাল-তত্ত্বের জ্ঞান না থাকাতে 'খ'-তত্ত্বের জ্ঞান ঊর্দ্ধ-গামী হতে পারছে না সম্যকরূপে। আজ কাগজে দেখতে পাচ্ছি রাশিয়ার কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মনে পাতাল-তত্ত্বের প্রতি ঝোঁক এসেছে বা জেগেছে। তাঁরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি আছে জানবার দুর্নিবার আগ্রহ বোধ করছেন। এই আগ্রহ রুশকে হয়তো কিছু সাফল্য দিতে পারে; কিন্তু তাতেও মুস্কিলের আসান ঘটবে না কারণ যেইমাত্র পাতালতত্ত্বের কিছুটা তাঁরা জানতে পারবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁদের অজ্ঞাতসারে 'খ'-তত্ত্বে কিছু অগ্রগতি ঘটে যাবে। ফলে ভূতত্ত্বের অনেকটাই হারাতে হবে। এইরূপ অবস্থাই ভারতেরও হয়েছে অতীতে। ভারত পাতালতত্ত্বের চরমে পৌঁছে অর্থাৎ সাংখ্য দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনের মূলে গিয়েছে যেইমাত্র, সেইমাত্র 'খ' তত্ত্বের অসীম কল্পনা-রাজ্যে গিয়ে পড়েছিল। খতত্ত্বের বস্তুবাদকে সম্যক দেখবার পূর্ব্বেই কল্পনা-স্রোতে অর্থাৎ মহাশূন্যের অনাহত নাদের মূর্চ্ছায় তন্ময় হয়ে ভূতত্ত্বকে হারিয়েছে। ভূতত্ত্বকে হারানোর অর্থ হোল কুলকুণ্ডলিনীকে হারান। সুতরাং মহর্ষির পতঞ্জলি কৈবল্য যোগের দারস্থ হয়ে পড়েছিল। ভূতত্ত্বকে হারাণোর ফলেই 'খ'-তত্ত্বের অন্তর্গত বস্তুবাদের মই বেয়ে বাস্তব জগতে অবরোহণ করে কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ-সূত্র স্থাপিত করতে পারেনি। ইহার ফলে আধুনিক ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের পরে 'খ' তত্ত্বের একটা দিকের অসীম ভাবধারা হারাণোর সঙ্গে সঙ্গে পাতালতত্ত্বকে তো হারিয়েছেই, এখন ভূতত্ত্বকেও হারাতে হয়েছে। তিন তত্ত্বের অন্তর্গত সংযোগ-সূত্রের কথা চিন্তাই করা যাচ্ছে না। বর্ত্তমান আমেরিকা বা রাশিয়ারও এই পরিণতি ঘটবে। ভারত যদি সজাগ ও সচেষ্ট হয় এখন থেকে তাহ'লে এককালে ভারত তার অতীত লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে শুধু নয়, ভারত বিশ্বে নব-যুগের সূত্রপাত করতে পারবে।

খনা ও মিহির রাক্ষসদের আলয়ে থেকে ভূতত্ত্ব ও পাতালতত্ত্ব যথারীতি শিক্ষালাভ করে একদিন মাহেন্দ্রক্ষণে নিজ দেশ ভারতে ফেরবার সঙ্কল্প করলেন। রাক্ষস-সর্দ্দার জানতে পেরে বাধা দিলেন না; বরং বললেন, "ওরা মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করেছে নিজ নিজ পা বাড়িয়ে দিয়ে; ওদের গমনে বাধা দেবার সাধ্য নেই কারো—আমারও না।" একজন অনুচরকে ডেকে বললেন, "এদের সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত পৌঁছে দাও; আর ফিরে আসবার সময় ওদের হাতে ভূতত্ত্ব ও পাতালতত্ত্বের দু'খানা বই দিয়ে দিও; আর 'খ'-তত্ত্বের বইখানি তোমার রুচি অনুযায়ী যে কোন প্রশ্ন করে এবং তার সদুত্তর পেলে দিয়ে দিও।"

জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি রাক্ষস-সর্দ্দারের কি অসীম অনুরাগ, কি অসীম ভক্তি। রাক্ষসরাজের এ দৃষ্টান্ত অতুলনীয়।

খনা ও মিহিরকে রাক্ষসরাজ প্রকৃত ভালবাসতেন। কিন্তু স্নেহের দুর্দ্দমনীয় টান জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি সম্মান দেখানোর ক্ষেত্রে পরাজিত ও বন্দী হয়েছে।

যাহোক সমুদ্রতীরে এসে রাক্ষস অনুচর পুস্তক দুখানি দিয়ে সম্মুখে একটা আসন্ন-প্রসবা গাভীকে দেখে প্রশ্ন করলেন মিহিরকে "আচ্ছা, বল তো, ঐ গাভীটার কি রঙের বাচ্চা হবে?" খনা অনেকটা দূরে ছিলেন তখন।

মিহির গণনা করে বলেন,—"ঐ গাভীটার সাদা রঙের বাছুর হবে।" কিছুক্ষণ পরে গাভীটা প্রসূত হোল, দেখা গেল যে, উহার বাছুর হয়েছে কালো রঙের। রাক্ষস-অনুচর খ-তত্ত্বের পুস্তকটি না দিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন; আর মিহির ক্ষোভে, অপর দুখানি পুস্তকই সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

খনা 'কি হোল' 'কি হোল' করতে করতে ছুটে এসে সবিশেষ জানতে পারলেন। খনা স্বয়ং গণনা করেও বললেন মিহিরকে,—"তুমি তো ঠিকই গণনা করেছ, তোমার গণনার তো ভুল হয়নি একটুকুও।"

সহসা খনা বাছুরটার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, বাছুরটার রঙ সত্যই সাদা। মিহির এই দেখে বিস্মিত হয়ে যান। খনা বলে—"মাতা চাটেনি তখনো তোমাদের দেখার সময়ে তাই কালো দেখিয়েছিল।"

সমুদ্রের জলে পুস্তক দু'খানির খোঁজ উভয়ে করলেন, কিন্তু পাওয়া গেল না। হায়! সামান্য বোঝার ভুলের জন্য বা সামান্য সময়ের অপেক্ষার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রে দ্রাবিড়-সভ্যতার যা দান তা পৃথিবী হতে ধুয়ে মুছে গেল চিরকালের জন্য। পরবর্ত্তীকালে খনা ভারতে এসে মুখে মুখে ছড়ার মাধ্যমে কতকগুলি সাধারণ সূত্র মাত্র দিয়ে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু তা ভাসা জ্ঞান মাত্র—খনার পাণ্ডিত্যের নিদর্শন নয়।

ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় জ্ঞান যদিও প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের লুপ্ত পুস্তকাদি উদ্ধারের দ্বারা কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু পাতাল-তত্ত্ব বা খ-তত্ত্বের কিছুই নিদর্শনসূচক পুস্তক আজ বর্ত্তমান নেই। 'খ' তত্ত্বের পুস্তকাদি যদি আজ আমরা পড়তে পেতাম তা'হলে আলোকের বিচিত্র লীলা ও আন্দোলনের বহু ব্যাখ্যা খুঁজে পেতাম বলে আমার বিশ্বাস। এমন কি 'খ' তত্ত্ব অবগত হতে পারলে জীব ও ঈশ্বরে, জড়ে ও জীবে এবং পরমাত্মা ও চেতন, অচেতন, প্রাণী বা বস্তুর পার্থক্য খুঁজে বার করতে পারা সম্ভব হ'তো। আমার মনে হয়, আন্দোলন-তত্ত্ববাদ জানতে পারা যেত। আন্দোলন-তত্ত্ববাদ সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে মানব আজ নব নব বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃতিকে দাস করতে পারতো। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বোধ করি তা নয়; বর্ত্তমান রুশ ও আমেরিকা ক্ষমতার অতি সামান্য ভগ্নাংশটুকু পেয়েই ধ্বংসমুখী হয়ে পড়েছে। কি করে ধ্বংসের মাধ্যমে নিজ নিজ সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যায়, তারই চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করছেন। ফলে সৃষ্টিমূলক কার্য্যে অবতরণ করবার পূর্ব্বেই তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সঙ্কুচিত হতে পারে, এমন কি, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও বিচিত্র নয়।

# আজও

দিব্যেন্দু লাহা

আজও শকুনেরা অস্থির লোভে ওড়ে দল বেঁধে আকাশে
পূতিগন্ধময়, স্তূপাকার শব, গন্ধ তাহারি বাতাসে।
আজও বিদেশী তরী নিয়ে যায় ভরি অমূল্য সম্পদ
দিয়ে যায় আহারের পদ, আর বোতলে বিলাতী মদ।
আজও বাণিজ্যপোতে, অবিরাম স্রোতে অতি-মুনাফা আশায়
বঞ্চিত করি দেশে, সঞ্চিত মুদ্রার নামে বিদেশে পাঠায়।
আজও দেখি ধনীর দুয়ারে, প্রাচুর্য্যের উচ্ছিষ্ট-অন্ন
খায় ভাগ করে মানুষে কুকুরে—পুরায় উদোর-রন্ধ্র।
দুর্দ্দান্ত শীতের রাত, শুনি হিমাঙ্কের কিঞ্চিৎ উপরে—
জীর্ণদেহ, শীর্ণ শীতার্ত্ত শিৎকারে, থাকে পড়ে পথ পরে।

আজও মরে শত শত নৈসর্গিক বিপৎপাতে নয়
দূর্বিষহ হিমের প্রবাহে, ভাবে তাহে ভাগ্য-বিপর্য্যয়।
আজো কাঞ্চন-কৌলিন্যে হয় মানুষের মূল্য নিরূপণ
শ্রমের মর্য্যাদা নিয়ে আজও তাই দ্বন্দ্ব অনুক্ষণ।
আজো দেশে রেষারেষি, ভোলে তারা শতাব্দীর মেশামেশি
ভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত, সভ্যতা বর্জ্জিত, জীব-ছদ্মবেশী।
আজও চলে আয়োজন, বিশ্বব্যাপী আয়ুধ ঝন্ ঝন্
শুনে আশায় উদ্দীপ্ত শকুন! কবে ফাটে মেগাটন?
তাই বলি ওহে বিজ্ঞ, কখনও কি করেছ জিজ্ঞাসা
আজও কেন মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা সর্বনাশা?
যতদিন বন্ধু, পৃথ্বী হতে শকুনেরা না হবে নিঃশেষ
ততদিন পাবে না শান্তি, হবে না সুন্দর-পরিবেশ।

# বিশ্বজয়ী মল্ল গামা

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক মল্লক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্তমান জগতে যদিও কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে এদেশে ব্যাপকভাবে কুস্তি-চর্চার অভাবে ও বর্তমান জাতীয় সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে, তবে এমনটি চিরদিন ছিল না। এই শতাব্দীরই প্রথম ভাগে ভারত পর পর তিনবার বিশ্ববিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছিল। ভারতের এই প্রতিভাকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যিনি সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন, তিনি হলেন অমৃতসরের গোলাম পালোয়ান। আজ থেকে ৬২ বছর আগে ১৯০০ সালে প্যারিসে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করে নিজেকে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীর হিসেবে প্রমাণিত করেছিলেন। এরপর যিনি ভারতীয় কুস্তিকে মল্লজগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তিনি হলেন লাহোরের বড় গামা। ভারতীয় কুস্তির এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তাঁর খেলার চাতুর্যে পাঞ্জাববাসীর চিত্ত জয় করে প্রথম আলোড়ন তোলেন ১৯০৮ সালে মল্লের দেশ পাঞ্জাবের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান গোলামউদ্দিনকে পরাস্ত করে। তারপর সেই আলোড়নের উত্তাল তরঙ্গমালা এসে আঘাত করে সাত সাগর তের নদীর পারে ইংল্যাণ্ডে—লণ্ডনেরআলহামব্রা ক্রীড়ানুষ্ঠানে ১৯১০সালে।

শ্বেতাংগের দেশে শ্বেতাংগের শ্রেষ্ঠত্ব কালা-আদমীর করায়ত্ত হবে—এ অসহ্য। এদিকে ইংল্যাণ্ডের তখন এমন কোন বড় পালোয়ান ছিলেন না, যিনি গামার সাথে পাল্লা দিতে পারেন। কাজেই শ্বেতাংগের মান বাঁচাবার জন্যে আহ্বান পৌঁছল আটলাণ্টিকের পরপারে আমেরিকার দরবারে। এলেন সে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীর ডাঃ বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাংকলিন্ রোলার গামাকে ঘায়েল করবার জন্যে। শুভদিনে রোলারের সাথে গামার লড়াইও হল পশ্চিমী নিয়মে মোটা গদীর ওপর 'ক্যাচ্চ্-অ্যাজ ক্যাচ্চ ক্যান্' ঢংয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পশ্চিমীদের সমস্ত আশা ধূলিসাৎ করে রোলারকে পর পর দু'বার চিৎ করে গামাই জয়ী হলেন। শ্বেতাংগ দর্শকরা রোলারের পরাজয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিন্তু শ্বেতাংগেরা তাতেও দমবার পাত্র নন। আবার তাঁদের আহ্বান পৌঁছল পূর্ব-ইউরোপে পোল্যাণ্ডের দরবারে। এলেন বিশ্ববিশ্রুত মল্ল স্ট্যানিস্‌লস্ বিস্কো। কেউ কেউ বলেন জিবিস্কো। আসল নাম স্ট্যানিস্‌লস্ সিগন্‌ভিচ্ বিস্কো।

১৯১০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনের আলহামব্রা টুর্ণামেণ্টে গামা ও বিস্কোর মধ্যে শক্তি-পরীক্ষার দিন ধার্য হ'ল। বিজয়ীর পুরস্কার ছিল 'জন্ বুল্ প্রাধান্য পেটি' নামে একটি সোনার কোমরবন্ধ আর নগদ ২৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৪ হাজার টাকা। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে গামা ও বিস্কো, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই শ্রেষ্ঠ মল্ল আসরে নামলেন। এ যেন সাদা-কালোর ইজ্জতের লড়াই—শ্বেতাংগ জেতে, না কালা আদমী জেতে।

লড়াই চললো ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে। শ্বেতাংগের ভরসাস্থল বিস্কোর সাথে গামার যে ঐতিহাসিক লড়াই হয়েছিল, তা' মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বা চিত্তাকর্ষক হয়নি। বিস্কোর আত্মরক্ষামূলক ও কূর্মবৃত্তির লড়াইএ শ্বেতাংগ দর্শকরা পর্যন্ত সেদিন লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে বিস্কোর উদ্দেশে গালমন্দ দিচ্ছিল।

গোধূলির অন্ধকারে দিনের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এলে কর্তৃপক্ষ সেদিনকার মতন লড়াই বন্ধ করে পরবর্তী ১২ই সেপ্টেম্বর পুনরায় লড়াই হবে বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ১২ই সেপ্টেম্বর শ্বেতাংগের আশা-আকাংখায় ছাই ঢেলে দিয়ে বিস্কো ভয়ে গামার সাথে আর লড়তে এলেন না। ফলে কর্তৃপক্ষ উপস্থিত গামাকেই বিজয়ী বলে গণ্য করে বিজয়ীর প্রাপ্য সমস্ত পুরস্কারই বড় গামাকে দিয়ে দেন।

এইভাবে ১৯১০ সালে লণ্ডনে গামা বিস্কোকে হারিয়ে ইউরোপীয় মল্ল-সমিতি কর্তৃক 'বিশ্বজয়ী মল্ল' বলে স্বীকৃত হলেন। গামাই প্রথম ভারতীয় মল্ল, যিনি ইউরোপীয় মল্ল-সমিতি কর্তৃক সরকারীভাবে 'বিশ্বজয়ী' আখ্যা লাভ করেন। গামা-বিস্কোর কুস্তি-প্রহসনের কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ ভারতীয় দল লণ্ডন যাবার আগেই জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুযুৎসুবিদ্ 'তারো মিয়াকে' ২১ জন যুযুৎসুবিদ নিয়ে লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় মল্লদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। দীর্ঘদিনেও কেউ 'তারো মিয়াকে-র' সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগুলেন না দেখে, একদিন গামা নিজেই সদলবলে তারো মিয়াকে 'এক ল্যাংগটি' আহ্বান করে ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের দলের তিরিশ জন যুযুৎসুবিদকেই তিনি এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একে একে পরাস্ত করবেন, অর্থাৎ তিনি প্রত্যেককে হারাবার জন্যে গড়ে মাত্র দু'মিনিট ক'রে সময় নিলেন। রোলার ও বিস্কো বিজয়ী গামার এই 'এক ল্যাংগটি' (নন্-ষ্টপ রেষ্ট্‌লিং কন্‌টেষ্ট) আহ্বানে তারো মিয়াকে প্রমাদ গুনলেন এবং শেষে ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে লড়াইতে আর অবতীর্ণ হলেন না। ইউরোপ-অভিযানে ইংল্যাণ্ডবাসীর চোখে যে মায়াকাজল পরিয়ে দেন, তাতে ছুটে আসে তারা গামাকে অভিনন্দিত করতে। দিকে দিকে ধ্বনিত হ'তে থাকে তাঁর ক্রীড়াশৈলীর অপরূপ কাহিনী। তারপর

বিশ্ববাসী বড় গামাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীরের ডালি উপহার দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়।

এরপর ভারতে এসেই গামা একে একে ভারতীয় মল্লদের হারাতে লাগলেন। প্রথমেই ১৯১১ সালে তিনি তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রহিম পালোয়ানকে এলাহাবাদে মাত্র ৪৫ মিনিটে পরাস্ত করে বিজয়ীর পুরস্কার একটি 'গুরুজ' লাভ করেন। এই লড়াইতে প্রধান বিচারক ছিলেন এলাহাবাদের বৃটিশ পুলিশ কমিশনার সাহেব। এখানেই বড় গামা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীরের মর্যাদা 'রুস্তম-ই-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত হন। এর পর একে একে চান্দা সিং, গোরা পালোয়ান, কালা পরতাপ, ইন্দোরের কামরুদ্দিন্-আল্-মাসুর আলি খান্ ও গামু বালিওয়ালা প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত পালোয়ানেরা বড়গামার কাছে পরাস্ত হতে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে আহ্বান আসতে থাকে বড় গামার কাছে। বিজয়লক্ষ্মীও ছুটে চলেন মল্লযুদ্ধের এই আদর্শ যোদ্ধার যাত্রাপথ ধরে। বহু পুরস্কার, বহু সম্মান তাঁর করায়ত্ত হয়।

এই সময় ১৯১৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বাংলার তথা ভারতের আর এক মল্লবীর গোবরবাবু তৎকালীন 'বৃটিশ এম্পায়ার রেষ্টলিং চ্যাম্পিয়ান' জিমি এসেন্-কে পরাস্ত করে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের কুস্তি প্রাধান্য' লাভ করেন, যা এর আগে আর কোন ভারতীয় মল্লই পারেননি। অবশ্য গামার সাথে গোবরবাবুর কোনদিন শক্তিপরীক্ষা হয়নি। যদিও গোবরবাবুর এ সাধ অনেকদিন পর্যন্ত ছিল, কিন্তু অনেক কারণেই তিনি সে সুযোগ কোনদিনই পাননি।

১৯১৬ সালে বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম) হট্টগোলের মাঝেই পণ্ডিত বিদ্যাধর পালোয়ান (বিদ্যো-পণ্ডিত)-এর সাথেও বড় গামার এক লড়াই হয়। তাতেও গামা বিদ্যাধর পণ্ডিতকে হারিয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেন। অভিজ্ঞ মল্লরা বলেন, বিদ্যাধর পণ্ডিত নাকি গামার চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠতর মল্ল ছিলেন এবং গামা তাঁকে ভাগ্য-বলেই হারিয়েছেন। ভাগ্যবলেই হো'ক আর বাহুবলেই হো'ক, ভারতের তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পেশাদার মল্ল পণ্ডিত বিদ্যাধর পালোয়ানকে হারিয়ে গামার বিশ্বজয়ী সুনাম অক্ষুন্নই রইলো। সেই বছরেই গামা হোসেন বক্স মুলতানিয়াকেও সহজেই পরাস্ত করেন। লড়াই হয়েছিল কলকাতায়, আর প্রধান বিচারক ছিলেন বাংলার তৎকালীন লাট বাহাদুর। এই লড়াইতে জয়লাভের পুরস্কারস্বরূপ গামা পেয়েছিলেন আর একটি সুন্দর 'গুরুজ'। 'গুরুজ' ভারতীয় কুস্তিগীরদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১৯১০ সালে বিস্কোর ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় বিস্কো যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তবে ১৯১০ সালের বিস্কোর 'কূর্মাবতার' লড়াই নিয়ে বিলিতী কাগজে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল, তার জের ১৩ বছর পর ১৯২৩ সালেও বজায় ছিল। ১৯২১ সালে 'জগজ্জয়ী' ষ্টেচারকে হারিয়ে লিউইস্ প্রথম জগজ্জয়ী হন। সেই বছরই বিস্কো লিউইসকে হারিয়ে আমেরিকা মল্ল-সমিতি কর্তৃক 'বিশ্ব-প্রাধান্য' লাভ করেন। কিন্তু ১৯২২ সালে পাণ্টা কুস্তিতে লিউইস্ বিস্কোকে পরাস্ত করে দ্বিতীয়বার 'বিশ্ব-প্রাধান্য' লাভ করেন। ১৯২৫ সালে উয়েইন্ 'বিগ্'মান্-এর হাতে আবার লিউইস-এর পরাজয় ঘটে। লিউইস-এর সাথে মান্-এর তিনবার লড়াই হয়েছিল, আর তিনবারই লিউইস্ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন।

কিন্তু মান্-এর মান বেশীদিন রইলো না। সে-বছরেই বিস্কো মান্‌কে পরাস্ত করে 'গুরু ওজনে মল্ল-প্রাধান্য' লাভ করেন। 'জগজ্জয়ী' আমেরিকান্ মল্ল মান্-কে হারাবার পর গামাকে হারিয়ে হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে বিস্কো পাগল হয়ে উঠলেন। তাই তিনি ১৯২৬ সালে কলকাতায় গামার সাথে তাঁর শক্তি-পরীক্ষা দিতে এসেও হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলার দরুন লড়াই না করেই নিরাশ হয়ে দেশে ফিরে যান।

সেবার বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেও বিস্কো আবার এদেশে রওনা হন এবং ১৯২৭ সালের শেষভাগে ভারতে এসে উপস্থিত হন। মল্ল-জীবনে বিস্কোর চরম লক্ষ্যই ছিল গামাকে লড়াইতে হারিয়ে পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। শেষে ১৯২৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী পাতিয়ালায় প্রসিদ্ধ কুস্তি দংগলের শেষ দিনে বিস্কো গামার সাথে লড়বার সুযোগ পান। কুস্তি আরম্ভ হয়েছিল বিকেল সোয়া চারটায়, মল্ল-ক্ষেত্র তখন লোকে-লোকারণ্য। পাতিয়ালার মহারাজা, ভূপালের নবাব বাহাদুর আর দিল্লীর মিঃ গ্রাসুকক সাহেব ছিলেন সেদিন গামা-বিস্কোর ঐতিহাসিক লড়াই-এর বিচারক। সেদিন কুস্তি হয়েছিল ভারতীয় প্রথায়, ঝুরো মাটির ওপর। কিন্তু এত আয়োজন, এত প্রস্তুতি, এত প্রচার—সব শেষ হয়ে গেল মাত্র কয়েক মুহূর্তে।

লড়াই সুরু হবার বাঁশী বাজার সাথে সাথে বিস্কো তাঁর কোণ থেকে এগিয়ে এসে সেলামী নিলেন। তারপর কয়েক পা পিছিয়েই পুনরায় ঝড়ের বেগে এসে গামাকে আক্রমণ করেন। গামাও মুহূর্তেই 'দো-দস্তি-তাক্' লাগিয়ে বিস্কোর দু'টো কাঁধকেই মাটিতে চেপে ধরলেন। কুস্তির সুরু থেকে শেষ—ব্যবধান মাত্র ৯ সেকেণ্ড। কুস্তি সুরুই বা হলো কখন, আর শেষই বা কখন কেমন করে হোলো, তা' তখনো অনেকে লক্ষ্যই করতে পারেননি। কিন্তু হঠাৎ বিস্কোর বুকের ওপর গামাকে চ'ড়ে বসতে দেখে উপস্থিত বিশ হাজার দর্শক আনন্দে উল্লাস-ধ্বনি করে উঠল।

লণ্ডনের কুস্তিতে বিস্কো ছিলেন আত্মরক্ষী আর গামা ছিলেন আক্রমণকারী। কিন্তু পাতিয়ালার কুস্তিতে বিস্কো ছিলেন আক্রমণকারী আর গামা ছিলেন আত্মরক্ষী। কুস্তির সব রকম মার-প্যাচ আর কায়দা-কৌশল গামার আয়ত্তাধীন থাকলেও আত্মরক্ষাত্মক কুস্তিতে তিনি ছিলেন পৃথিবীতে অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আক্রমণকারীর ভূমিকা নিতে গিয়েই বিস্কোর ভাগ্যে ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটেছিল।

গামার সাথে লড়াই-এ পরাজিত হলেও বিস্কো যে একজন অসাধারণ মল্ল ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর দিক্‌পাল প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ মল্লের সাথেই শক্তি পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে তিনি অবিস্মরণীয় মল্লের দলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সরকারীভাবেও তিনি ২ বার আমেরিকার মল্ল-সমিতি কর্তৃক 'জগজ্জয়ীর' আসন লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া বয়সের হিসেবেও তিনি ছিলেন গামার চেয়ে ৯ বছরের বড়।

বিস্কোর জীবনের সব চেয়ে বড় আশা ছিল, তিনি গামাকে হারাবেন। কিন্তু সে-সুযোগ জীবনে তিনি আর পাননি। পাতিয়ালার পরাজয়ের পর বিস্কো নীরবে ভারত ছেড়ে স্বদেশে চলে গেলেন। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, এবার হয়তো বিস্কো গামার

প্রাধান্য স্বীকার করবেন। কিন্তু দেড় বছর যেতে না যেতেই ১৯২৯ সালের ২১শে অক্টোবর গামা, গোবর, ছোট গামা এবং ভারতের অন্যান্য প্রধান মল্লের উদ্দেশে বিস্কো পুনরাহ্বান ঘোষণা করলেন। তাঁর কয়েকটি সর্তও ছিল মূল্যহীন, আর অজুহাতও ছিল অর্থহীন। তাঁর মতে তিনি নাকি ভারতীয় প্রথায় লড়তে গিয়েই গামার কাছে পাতিয়ালায় হেরেছিলেন। অথচ ভারতীয় পালোয়ানদেরও বিদেশে গিয়ে লড়তে হয় বিদেশী প্রথায়। কিন্তু তাঁরা তো কোনদিন এ বিষয়ে কোন ওজর-আপত্তিও তোলেননি। ১৯১০ সালে লণ্ডনে গামাকেও রোলার ও বিস্কোর সাথে বিলাতী-প্রথায় লড়তে হয়েছিল। অথচ মল্ল-সমাজের সাধারণ নিয়ম যে, বিজেতার সাথে বিজিত পুনরায় লড়তে চাইলে বিজেতাকে যে কোন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সেলামী দিতে হয়, আর সে টাকা দিতে হয় জয়-পরাজয়ের কোন প্রশ্ন না তুলেই। এই জন্যেই গামার পক্ষেও এ ক্ষেত্রে বিস্কোর পুনরাহ্বান গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য গোবরবাবু বিস্কোর এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু সর্তাদিতে মতের মিল না হওয়ায় বিস্কো-গোবর লড়াইও আর হয়নি।

এরপর ইউরোপীয় আর একজন মল্ল জেস পিটার্সেন গামার সাথে লড়ার জন্যে পাতিয়ালার মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করে এদেশে আসেন। প্রথম শ্রেণীর মল্ল না হয়েও তিনি গামার সাথে লড়বার সুযোগ পেয়ে যান শুধু সাদা চামড়ার দৌলতে আর ইংরেজ-ভক্ত পাতিয়ালার মহারাজের অনুগ্রহে।

এবারের এই কুস্তিও হয়েছিল ভারতীয় প্রথায়। বিচারক ছিলেন কাশ্মীরের মহারাজা আর বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজী। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময় কুস্তিও আরম্ভ হল। দেখা গেল পিটার্সেন গায়ে অপর্যাপ্ত তৈলাক্ত দ্রব্য মেখে আখড়ায় নেমেছেন। তার ফলে প্রথমটা গামার পক্ষে কোন প্যাঁচ-কসা-ও সম্ভব হচ্ছিল না। পরে গামা বিরক্ত হয়ে আখড়া থেকে কিছু মাটি তুলে পিটার্সেনের পায়ে মেখে দিলেন, আর সেই পা'খানা ধরেই ১ মি: ৪২ সেকেণ্ডে ইউরোপীয় মল্ল জেস পিটার্সেনের খেল খতম করে দেন। মল্লযুদ্ধের গতানুগতিক নিয়ম-কানুন বা কায়দা-কৌশলের বাঁধাধরা প্যাঁচ-কে তুচ্ছ করে, সকল প্রকার আক্রমণধারাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে স্বকীয় ভঙ্গীতে তিনি যেমন প্রতিপক্ষকে কাবু করতে পারতেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই সাহস ও দক্ষতাই তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান করে দিয়েছে। "দাঁড়িয়ে লড়তে গামা অদ্বিতীয়"—বলেছিলেন পোল্যাণ্ডের ভুবনবিখ্যাত মল্ল ষ্ট্যানিস্‌লস্ বিস্কো।

১৯৩২ সালের প্রথম ভাগে বিশ্বখ্যাত ইটালিয়ান মল্ল ও মুষ্টিক প্রিমো কার্ণেরা আমেরিকান 'অল্-ইন্' প্রথায় লড়বার জন্যে গামাকে এক আহ্বান জানান। এই 'অল্-ইন্' কুস্তির নামই বর্তমানে বদলে 'অ্যামেরিকান ফ্রী-ষ্টাইল' করা হয়েছে। এই নতুন প্রথাটি মার্কিন মুলুকেই প্রথম চালু হয় ১৯৩০ সালে। ১৯৩২ সালে কার্ণেরা যখন এই প্রথায় গামার সাথে লড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন পর্যন্ত ভারতের কোন মল্লই এই 'অল-ইন' কুস্তি জানতো না। কার্ণেরাও প্রথম এই কুস্তি শেখেন ১৯৩১ সালে। গামার সাথে লড়বার জন্যে বিশ্বজয়ী গামাকে কিছু সেলামীর টাকা দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে কার্ণেরাই সর্ত-স্বরূপ এক লক্ষ পাউণ্ড দাবি করে গামার সাথে লড়তে চান। অবশ্য গামা কার্ণেরার এই অন্যায় ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আহ্বানে ও সর্তে কোন সাড়া দেননি। সাড়া দিলে গামার মতন একজন জগজ্জয়ী মল্লের পক্ষে তা' অপমানজনকই হত। ফলে কার্ণেরাকেও আর ভারতে এসে কোন মল্লের সাথে লড়তে হয়নি।

মূক ও বধির পালোয়ান হিসেবে সে-সময় ভারতে সুনাম অর্জন করেছিলেন পাঞ্জাবের গোংগা পালোয়ান। গোংগা মল্ল হিসেবে নিঃসন্দেহভাবে গামা, গোবর, ইমাম, গোলাম মহিউদ্দিন, আহমদ্ বখ্‌শ্ প্রভৃতির সমকক্ষ ছিলেন। গামাও গোংগাকে কিছুটা ভয়ের চোখেই দেখতেন এবং সেইজন্যেই তিনি নিজেকে সর্বদা ছোট গামা, হামিদ আর ইমাম্ বখ্‌শ্—এই তিনটি জীবন্ত প্রাচীরের আড়ালে রাখতেন। গোংগা ও গামার মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল বটে, তবু গোংগাকে গামার সমসাময়িক মল্লই বলা হয়, এবং গোংগাই ছিলেন গামার একমাত্র ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। আর সবাই তো ছিলেন তাঁর নিজ দলীয়।

গোংগা কিন্তু ছোট গামাকে কুস্তিতে বার বারই হারিয়েছিলেন। হামিদ পালোয়ানও গোংগার কাছে একাধিকবার হেরেছিলেন এবং ইমাম্ বখ্‌শ্-কেও একবার হারতে হয়েছিল। এইভাবে গোংগা গামার সাথে লড়বার অধিকার পেলেন বটে, তবু নানা টালবাহনায় গামা ও গোংগার লড়াই আর হয়নি। আজও কেউ হলপ্ করে বলতে পারেন না, যে, 'গামা-গোবর' বা 'গামা-গোংগা'-র লড়াই হলে ফলাফল কি হত। তাই বলে গোবরবাবু কিন্তু গামাকে সমীহ করেই চলতেন। তিনি নাতি-গুরু-ওজনে জগজ্জয়ী মল্ল হয়েও কোনদিন বড় গামাকে তাঁর আহ্বান জানাননি। অনেকের ধারণা ভারতীয় মল্লক্ষেত্রে গোংগা যখন প্রতিষ্ঠার আসনে অধিষ্ঠিত, তখন গামা লড়াই ছেড়ে দিয়েছেন। এটা কিন্তু সত্যি নয়, কারণ ১৯২৮ সালে গামা যখন পাতিয়ালায় বিস্কোর সাথে লড়েছিলেন, তখন গোংগার বয়স ছিল ৩৪ বছর। একজন মল্লবীরের পক্ষে ৩৪ বছর বয়স কি এতই অল্প? বড় গামার মৃত্যুর পর একদিন গামার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে গোবরবাবু নিজে বলেছিলেন: "বড় গামার সাথে কারুর তুলনাই চলে না।"

১৯৩৬ সালে রুমানিয়ান মল্ল জর্জ ইউনেস্কো লাহোরে গামার সাথে কুস্তি লড়বার জন্যে গামাকে আহ্বান জানান। এই রুমানিয়ান বলী নিজেকে একজন দিগ্বিজয়ী মল্ল ও 'আয়রন-ম্যান' বলেও প্রচার করতেন। ইউনেস্কো লাহোরে গামার সাথে লড়বার কথা ঘোষণা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মতো একজন অখ্যাত মল্লের সাথে লড়বার জন্যে গামার সর্ত ছিল যে, লড়াইতে গামা হারুন বা জিতুন, তাঁকে অগ্রিম এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। গামার এই সর্ত শুনেই ইউনেস্কো পিছিয়ে যান।

সে-বছরেই বিশ্ববিশ্রুত আমেরিকান-মল্ল এডওয়ার্ড 'ষ্ট্র্যাংলার' লিউইস অষ্ট্রেলিয়া সফরে যান। সিডনীতে তিনি একটি ষ্টেডিয়ামের ব্যবস্থা করে হঠাৎ গামাকে এক হাজার পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতিতে এক তারের মাধ্যমে 'আহ্বান' জানান। অবশ্য গামা সে-তারের কোন জবাব দেননি। লিউইস-এর এই আহ্বানে গামার পক্ষে তখন সাড়া না দেওয়ারও অনেক কারণ ছিল। প্রথমত: তিনি গামাকে এক হাজার পাউণ্ড দিতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছে মতো লড়াই হবে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে। অত দূর দেশে যাতায়াতের

অনেক খরচ, তা তিনি বহন করবেন কি না, তারো তার কিছুই উল্লেখ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ প্রতিযোগিতার পূর্বে দু'এক সপ্তাহের জন্যে গামার কুস্তি অভ্যাসের কি ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন বা করবেন, তারও কোন উল্লেখ ছিল না। তা'ছাড়া গামা ছিলেন চির-অপরাজিত মল্ল। মল্ল হিসেবে তিনি জীবনে কখনো কারু কাছেই পরাজয় স্বীকার করেননি। অপরদিকে লিউইস-এর মল্ল-জীবন ছিল জয়-পরাজয়বহুল। যদিও ইতিপূর্বে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে লিউইস পাঁচবার 'জগজ্জয়ী' হয়েছিলেন গোবর পালোয়ান ভিন্ন ভারতের কোন প্রথম শ্রেণীর মল্লকে না হারিয়েই, তথাপি উপযুক্ত চুক্তি-বদ্ধ না হয়ে একটি তারের আহ্বানে গামা বা সেই শ্রেণীর কোন মল্লের পক্ষে কোথাও ছুটে যাওয়াও শোভনীয় হত না।

লিউইস-এর আহ্বানে গামা কোন সাড়া না দেওয়ায় লিউইস-এর কর্মাধ্যক্ষ মিঃ আই অগাষ্ট সিডনী থেকেই লাহোরের 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেটে' এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি গামার জবাব না পাওয়ার দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, লিউইস শীঘ্রই ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়ে যে-কোন ভারতীয় মল্লের সাথে কুস্তি লড়তে প্রস্তুত থাকবেন।

লিউইসও তাঁর কথা রেখেছিলেন, পরের বছর ১৯৩৭ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে উপনীত হয়ে। ভারতবর্ষের কয়েকস্থানে কিছুদিন ঘুরেও বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু কারুর সাথেই কুস্তি লড়বার সুযোগ পাননি। এইভাবে বিফলমনোরথ হয়ে তিনি দেশে ফিরে যান। লিউইস চলে যাবার দু'মাস পরেই নভেম্বর মাসে বোম্বাইতে এক উল্লেখযোগ্য 'কুস্তির দংগল' হয়। সেই দংগলে 'ভারতীয়', 'ক্যাচ্-অ্যাজ-ক্যাচ্-ক্যান্', 'অল্-ইন্' ও 'গ্রীকো-রোমান' এই চার রকমের কুস্তি প্রতিযোগিতাই হয়েছিল। ভারতের বুকে সেই প্রথম 'অল-ইন্' ও 'গ্রীকো-রোমান' কুস্তি প্রতিযোগিতার আমদানী হয়। বোম্বাই-এর এই কুস্তি-দংগলে ভারতবর্ষ ছাড়া ২৪টি দেশের বিখ্যাত মল্লেরা যোগ দিয়েছিলেন। তবে এঁদের মধ্যে বড় বিস্কোর ভাই ভলাডেক্ বিস্কো, ফ্রান্সের চার্লস্ রিগ্যালট্ ও জার্মানীর ক্রেমার বিশেষ খ্যাত ছিলেন। বোম্বের এই দংগলে গামাও দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বয়স তখন ৫৭ বছরেরও ওপরে। তবু কেউ কেউ গামাকে তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আর বৈদেশিক মল্লদের মধ্যেও অনেকের ইচ্ছে ছিল—একবার গামার সাথে শক্তি-পরীক্ষা দেবার। অনেকের আবার ধারণা ছিল যে, গামা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর লড়বার শক্তিও হয়তো আর আগের মতন নেই। এ-সব আলোচনা ক্রমে গামার কানেও গিয়ে পৌঁছয়। তাই দংগল শেষ হ'বার মুখে একদিন গামা সত্যসত্যই তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন—বিশ্রাম না নিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দংগলে সমবেত সমস্ত বৈদেশিক মল্লকে একে একে ধরাশায়ী করবেন। যাকে বলা হয় 'এক-ল্যাংগটি আহ্বান'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গামার এই সাংঘাতিক আহ্বানে মল্লদের মধ্যে কেউই সেদিন সাড়া দিলেন না।

এই ঘটনার পরেও কিন্তু ক্রেমারের প্রবল ইচ্ছে ছিল গামার সাথে একহাত লড়বার। তিনি তা প্রকাশও করেছিলেন। তাই গামা শেষে জানালেন যে, বোম্বের দংগলের চ্যাম্পিয়ানকে যদি ক্রেমার পরাস্ত করতে পারেন, তবে তাঁকে ভারতীয় প্রাধান্যের জন্যে ইমাম বখশ-এর সাথে লড়তে হবে। আর ইমাম্ বখ্শকে হারাতে পারলেই গামা ক্রেমারের সাথে হাত মেলাবেন। এই সর্বপ্রথম গামা তাঁর প্রাচীর-বেষ্টনী আলগা করে হামিদ পালোয়ান ও ছোট গামাকে বাদ দিয়েই ক্রেমারকে চূড়ান্ত সুযোগ দিলেন। বিনা সর্তে অর্থাৎ কোন্ সেলামী না দিয়ে এমন সুযোগ ক্রেমার ভিন্ন আর কোন মল্লই পাননি।

বোম্বের দংগলের শেষ লড়াইএ ভারতের হরবন্ সিং চীনের ওয়াং বক্ চিয়ুংকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান্ হন। অবশেষে ৩১শে ডিসেম্বর হরবন্ সিং-এর সাথে ক্রেমারের ঐতিহাসিক লড়াই হয়। কিন্তু হরবন্ সিং তার পূর্বে ওয়াং বক্ চিয়ুং-এর সাথে লড়াই-এর সময় সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ায় ক্রেমারের মতন একজন বিখ্যাত মল্লের সাথে লড়াই-এ নিজ শক্তি-সামর্থের পরিচয় দিতে পারেননি। কাজেই হরবন্-ক্রেমারের এই লড়াই-এ ভাগ্যক্রমে ক্রেমারেরই জয় হল। অবশেষে ভারত-প্রাধান্যের জন্যে ক্রেমারকে শেষ লড়াই করতে হল ইমাম্ বখ্শ-এর সাথে। বোম্বাইতেই এই লড়াই হয়। কিন্তু সেদিন ইমাম্-এর কাছে ক্রেমার দাঁড়াতেই পারলেন না। মাত্র আধ মিনিটের মধ্যেই লড়াই শেষ হয়ে যায়। ইমাম্ অনায়াসেই ক্রেমারকে চিৎ করে মঞ্চ থেকে চলে এলেন। ক্রেমরের শেষ আশায় ছাই পড়ল। গামার সাথে লড়বার সুযোগ হাতের কাছে পেয়েও তিনি হারালেন।

'গামা পুরুষসিংহ, তাঁর কাছে হার মেনে আমি একটুও ক্ষুন্ন হইনি বা নিজেকে অপমানিত বোধ করিনি।' বলেছিলেন প্রাক্তন ভারত-চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর রহিম পালোয়ান। গামা সত্যিই পুরুষসিংহ। ইংল্যাণ্ডের লোকেরাও গামার নাম দিয়েছিল পাঞ্জাবকেশরী। জীবনে অনেক কীর্তি, অনেক যশ, অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। রাজা থেকে প্রজা সকলেই এই মহামল্লের নামে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে মাথা নত করত। নানা কৃতিত্বের জন্যে রাজা-মহারাজাদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছেনও অনেক। রূপোর গদাই (এক একটির ওজন প্রায় দশ সের) পেয়েছিলেন ৭টি, যা আজো আর কোন মল্ল পাননি।

এখানে আরো কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। লণ্ডনে রোলার ও বিস্কোর ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর গামার শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বের সকল মল্ল ও মল্লযুদ্ধ-বিশারদেরা মেনে নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের এক-চোখোমী ও নেটিভ-মল্ল গামার প্রতি উদাসীনতারও অন্ত ছিল না। ১৯১০ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি লড়াই করেছেন অনেক, পরাস্ত হননি কোনদিন। পরাস্ত করেছেন 'বিশ্বজয়ী' খেতাব ধারী মল্লদের একে একে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বিশ্বের মল্ল-সমিতির কাছ থেকে 'জগজ্জয়ী' খেতাব তিনি কোনদিনই পাননি। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'জন বুল বেল্ট'-এর অধিকারী হয়েও তিনি 'জগজ্জয়ী' উপাধি থেকে বঞ্চিতই হয়ে রইলেন। উপাধি পেলেন আর্ল ক্যাডক্, টেচার, লিউইস, 'বিগ'মান্, বিস্কো, সোনেন্‌বার্গ প্রভৃতি মল্লেরা। অথচ তাঁদের কারুরই গামার সাথে লড়বার সাহস বা যোগ্যতা ছিল না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে একমাত্র বিস্কোই ছিলেন এদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে 'বিশ্বজয়ী' উপাধি পাবার যোগ্যতম মল্ল। আবার এই বিস্কোও দু'বার গামার কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে যান। অপরাজেয় মল্ল বড় গামার সাথে লড়াই না করেই এঁরা 'জগজ্জয়ী' খেতাব পেলেন কি করে? আর তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় এই যে,

১৯৩৭ সালে বোম্বের দংগলে ৫৭ বছর বয়স্ক গামা যখন বিস্কোর ভাই 'বিশ্বজয়ী' ভ্লাডেক বিস্কো, ইউরোপ চ্যাম্পিয়ান ক্রেমার, কিং কং প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত মল্লের উদ্দেশে 'এক-ল্যাংগটি' আহ্বান ঘোষণা করেছিলেন, তখনো এই সব মল্লদের সাহস হয়নি গামার সাথে এক হাত লড়বার। সাদা-কালোর এই বিভেদ থাকলেও বিশ্ববাসী বড় গামাকেই বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীরের সম্মানের ডালি উপহার দিয়ে তাঁকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়।

অবিভক্ত-পাঞ্জাব ভারতের বহু কীর্তিমান মল্ল-বীর প্রসবিনী বলে গর্ব করতে পারে। এই পাঞ্জাবেই বহু খ্যাতিমান মল্ল জন্মগ্রহণ করে বিশ্বের দরবারে ভারতের মান বাড়িয়েছেন। ভারতের প্রথম দিগ্বিজয়ী মল্ল গোলাম পালোয়ান, বসন্ত সিং, ইমাম্ বখশ, গোংগা, মহিউদ্দিন, আহমদ্ বখশ, ছোট গামা, হরবন সিং, দারা সিং প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত মল্লবীরেরা সকলেই পাঞ্জাবী। বড় গামা পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গামার বাবা রহিম মুন্‌ও একজন বিখ্যাত মল্ল ছিলেন। তবে গামার শিক্ষাগুরু তাঁর বাবা রহিম মুন্ ছিলেন না—ছিলেন উত্তর প্রদেশের দোতিয়া রাজ্যের পালোয়ান মীরাবক্স ভুজ্জিওয়ালা। গামার বয়স যখন আট বছর, তখন রহিম্ মুন্ মারা যান। মীরাবক্স-এর কাছেই গামার 'বন্দেশ' অর্থাৎ নিয়মিত কুস্তির চর্চা সুরু হয়। মীরাবক্স আবার দূর সম্পর্কে গামার আত্মীয়ও ছিলেন। প্রসিদ্ধ হিন্দু-মল্ল মাধব সিং-এর কাছেও নাকি কিছুদিন গামা কুস্তি-শিক্ষা করেছিলেন। গামার ভাই ইমাম্ বখশ-ও একজন প্রথম শ্রেণীর খ্যাতিমান মল্ল ছিলেন। গামা যেমন আত্মরক্ষাত্মক কুস্তিতে পৃথিবীতে অতুলনীয় ছিলেন, ইমাম্ বখশ-ও তেমনি আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অথচ ইমাম্-কে গামাই নিজের হাতে কুস্তির যাবতীয় কলা-কৌশল শিখিয়েছিলেন। তবে প্রথম অবস্থায় মাধব সিং-এর কাছেই তাঁর শিক্ষা সুরু হয়েছিল। ইমাম্-কে যোগ্যতম মনে করেই গামা তাঁর পরবর্তী মল্ল হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

সাধারণতঃ ভারতীয় পালোয়ানদের দেহ মেদবহুল হয়ে থাকে। কিন্তু গামার দেহ মেদবহুল হয়েও দৃঢ়বদ্ধ ছিল। বিশ্বের সুদেহী মল্লবীরদের মধ্যে জর্জ হাকেন্সমিথ-এর পরেই বড় গামার নাম উল্লেখ করা চলে। দেহের ভার ছিল ২৪০ পাউণ্ড, দৈর্ঘ্য ৬¾ ফুট, গলা ১৮ ইঞ্চি, বাহু ১৮ ইঞ্চি, গোছা ১৪ ইঞ্চি, কব্জি ৮ ইঞ্চি, বুক (স্বাভাবিক) ৪২¾ ইঞ্চি, কটি ৪১ ইঞ্চি, পাছা ৪৪ ইঞ্চি, উরু ২৭ ইঞ্চি, হাঁটু ১৬¾ ইঞ্চি, মোচা ১৬¾ ইঞ্চি ও নলি ৯ ইঞ্চি।

ব্যক্তিগত জীবনেও গামা ছিলেন বিনয়ী, নিরহঙ্কার ও চরিত্রবান পুরুষ। মেজাজও ছিল খুব ঠাণ্ডা। এমন কি মল্লযুদ্ধেও কোনদিন তাঁকে উত্তেজিত হ'তে দেখা যায়নি। এটিও গামার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ভারতীয় মল্লরা এই আদর্শটি মল্লক্ষেত্রে বজায় রাখতে ভোলেন না, যা বৈদেশিক মল্লেরা আদৌ মনে রাখেন না। গামার এই বহুমুখী গুণের জন্যেই পাতিয়ালার মহারাজা গামাকে এত স্নেহ ও যত্ন করতেন। আহার ও বাসস্থান ছাড়াও মাসিক এক হাজার টাকা তিনি মহারাজের কাছ থেকে পেতেন। ১৯৪৭ সালে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাওয়ায় গামা পাকিস্তানের নাগরিকত্ব লাভ করলেও ভারতবাসীমাত্রই গামাকে স্বদেশবাসী আপন লোক বলে মনে করে গর্ব বোধ করেন। শেষ জীবনে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশ থেকেই তিনি তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তের কাছ থেকে মাসোহারা পেতেন। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আয়ুব খাঁ-ও বড় গামাকে পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকীয় সম্মান 'প্রেসিডেন্টের পদক' ও নগদ পাঁচ হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দিয়ে সম্মানিত করেছেন ; যা' আজো কোন মল্লবীরের ভাগ্যে জোটেনি। যোগ্য পাত্রে সম্মানের ডালি উপহার দিয়ে আয়ুব খাঁ যথার্থই শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন।

নিজের সম্বন্ধে গামা নিজেই বহুবার বলেছেন যে, একান্ত আগ্রহ, অধ্যবসায় ও সাধনাই তাঁকে মল্লযুদ্ধে বিশ্বজয়ীর সম্মান এনে দিয়েছিল—যা বিশ্বের সমস্ত ক্রীড়াবিদদেরই অনুকরণীয়। বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তাঁকে বিশ্বজয়ীর খেতাব অর্জন করতে হয়েছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কোন ভারতীয়ের পক্ষেই জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জনের পথ খুব সোজা ছিল না। ১৯১০ সালে বার বার গামার আহ্বান ইংল্যাণ্ডের ক্রীড়াঙ্গনে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তথাপি তিনি কোন সময় হাল ছেড়ে দেননি। শেষ পর্যন্ত নিজের শক্তিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের একে একে পরাস্ত করে বিশ্বজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জন করে মল্ল-জগতে ভারতকে প্রথম বিশ্বশ্রেষ্ঠের প্রাধান্য এনে দিয়েছিলেন। তাই খেলাধূলার ক্ষেত্রে বড় পালোয়ান বড় গামার নাম চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে।

ভারতীয় কুস্তির ইতিহাসের নবযুগের প্রবর্তক যদিও গোলাম পালোয়ান, কিন্তু বড় গামাই কুস্তির প্রাণস্পন্দনের দ্যোতক। কুস্তির যা কিছু মার-প্যাঁচ, কলা-কৌশল, যা কিছু আর্ট—যা কিছু দর্শনীয় তার সব কিছুরই অধিকারী ছিলেন বড় গামা। তাই কুস্তির দংগলে মল্লযুদ্ধের তিনি [অনন্যপ্রতিভা—আদর্শ মল্লের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মল্লযুদ্ধে যখন শ্বেতাংশ মল্লদের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত, সেই সময় যে ধুরন্ধর ভারতীয় খেলোয়াড় শ্বেতাংগ মল্লবীরদের একচ্ছত্র অধিকারের বিরুদ্ধে সদম্ভে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন—সেই শ্রেষ্ঠত্বকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি হলেন বড় গামা।

কুস্তির ইতিহাসের স্বর্ণযুগে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্ল হিসেবে বা ভারতীয় কুস্তিতে দীর্ঘস্থায়ী সম্রাট হিসেবে বড় গামাকে বর্ণনা করলে গামার প্রতিভাকে ছোট করাই হবে। মল্লযুদ্ধে যা কিছু দর্শনীয়, যা কিছু সুন্দর ও প্রয়োজনীয়, তার সবগুলিরই তিনি অধিকারী ছিলেন—ছিলেন দূরদর্শী। রিং-এ নেমে বিপক্ষের হাতে হাত মেলাবার সাথে সাথেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর যোগ্যতা, মান ও শক্তি বুঝতে পারতেন, বুঝতে পারতেন তার হিম্মৎ। এই বিশেষ গুণের জন্যেই তাঁকে রিং-এর মধ্যে কোনদিন উত্তেজিত হতে দেখা যায়নি। শুধু এই একটিমাত্র গুণের জন্যই রাজা থেকে প্রজা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন মল্লযুদ্ধের এই নিপুণ শিল্পীকে।

শক্তি বা কৌশলে বিশ্বজয়ীর সম্মান বড় গামার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। বহু রণজয়ী বড় গামা বার্ধক্যে ও রণক্লান্ত হয়ে সে আসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন।

গামার বিষয়ে সর্বশেষ কথা এই যে, তিনি শুধু ভারতীয় কুস্তিগীরদের কাছেই স্মরণীয় নন। গামার প্রতিভা কোন বিশেষ জাতি, ধর্ম বা রাষ্ট্রের গর্বের বস্তু নয়। তিনি সকলের—তিনি সর্বকালের।

১৯৬০, ২৩শে মে সোমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লাহোর হাসপাতালে বড়গামার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।
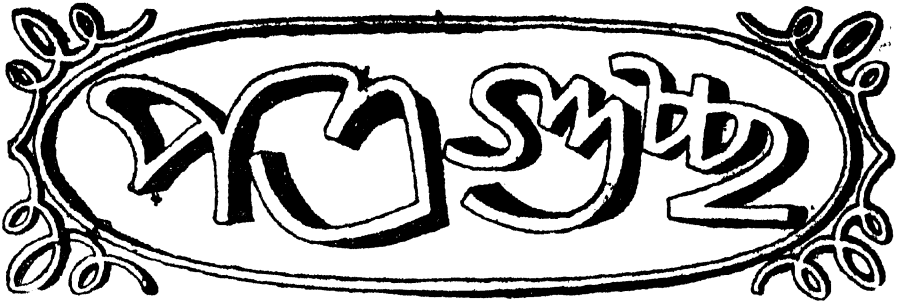
## ভিক্টোরিয়াকে লেখা বেলজিয়মরাজের চিঠি

লিকেন
১৮ই অক্টোবর, ১৮৩৪

পরম কল্যাণীয়াসু,

স্বাস্থ্য একটি মস্ত বড় সম্পদ যা আমরা জীবনের সঙ্গে পেয়ে থাকি। মানবজীবনে স্বাস্থ্য বিধাতার এক বিরাট দান। স্বাস্থ্য-সম্পদ হারালে আমরা যেমনই হতভাগ্য, তেমনই অসহায়। আমি আশা করি, তোমার নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তুমি যথারীতি সচেতন থাকবে এবং যথোপযুক্ত যত্নশীলা হতে কার্পণ্য প্রকাশ করবে না বিন্দুমাত্র। উপযুক্ত আলো হাওয়া এবং প্রয়োজনীয় পরিশ্রম আমার ধারণা তোমার বিশেষ প্রয়োজন। অবকাশ সময় তোমার অধ্যয়নের মধ্যে অতিবাহিত করা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। ইতিহাস পড়া তোমার বিশেষ প্রয়োজন। আমার মতে ইতিহাসচর্চা এখন থেকে তোমার গভীরভাবে শুরু করা দরকার। ইতিহাস অনুশীলন তোমার পক্ষে অপরিহার্য, কারণ তোমার জীবনের ধারা যেভাবে প্রবাহিত হবে সে ক্ষেত্রে ইতিহাস ছাড়া তোমার গতি নেই। ইতিহাসে যত দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করবে, তত মানবচরিত্র এবং রাজনৈতিক জটিলতা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে তোমার জীবনে আসবে এক ব্যাপক ও বিরাট পরিবর্তন, তোমার জীবন তখন সম্পূর্ণভাবে এক ভিন্নতর রূপ নেবে। তার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ নানাপ্রকার জটিলতা এবং কুটিলতার সম্মেলন—ইতিহাস তোমার ভালভাবে জানা থাকলে সেই সব ফাঁদে তোমায় পা দিতে হবে না। নিজের বুদ্ধিতে, জ্ঞানে এবং কুশলতায় সর্বপ্রকার রাজনৈতিক দুর্যোগ তুমি অতিক্রম করতে পারবে। তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা সম্বন্ধে তুমি নিজে সচেতন না থাকলে, স্বার্থপরায়ণ এবং কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে তুমি অনায়াসে জড়িয়ে পড়বে, বিশেষ করে এখনকার কালে—যখন দলাদলি ও স্বার্থসর্বস্বতা প্রকট হয়ে উঠছে, সে ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা তো মোটেই অমূলক নয়। তখনকার দিনে ধর্মবোধ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করেছে, এখনকার দিনে এ ব্যাপারে ধর্মবোধের জায়গায় আসনলাভ করেছে রাজনীতি। অবশ্য এও ঠিক যে, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস বলতে গেলে তাদের দ্বারাই রচিত—যারা এই সব ঘটনাবলীর নিজেরাই রূপকার এবং দলীয় চিহ্ন থেকে মুক্ত নয়। বরং ফ্রান্সের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখতে পাবে, কারণ ফ্রান্সে কিছু নির্ভরযোগ্য স্মৃতিকথা আজ অবধি লেখা আছে। এগুলি বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতিমান ও অবিস্মরণীয় পুরুষদের লেখনী থেকে এই স্মৃতি-আলেখ্যগুলি জন্ম নিয়েছে।

আমার পরম আদরণীয়া,
তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং মামা
স্বা: লিওপোল্ড আর

## বেলজিয়মরাজকে লেখা ভিক্টোরিয়ার চিঠি

টানব্রিজ ওয়েলস
২২এ অক্টোবর ১৮৩৪

পরম পূজনীয় মামা,

তুমি ভাবতেই পারো না যে, তোমার আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ চিঠিখানি আমায় কতখানি গভীর তৃপ্তি এনে দিয়েছে। তোমার চিঠিতে যে মূল্যবান এবং সর্বতোভাবে গ্রহণীয় উপদেশ তুমি আমায় দিয়েছ, সে জন্যে কৃতজ্ঞতা জানানোর মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

অটোগ্রাফগুলির জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ। স্বাক্ষরগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। তারা আমার সংগ্রহের মর্যাদা সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি করবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সালীর[১] স্মৃতিকথা আমার সংগ্রহে নেই, আমি খুব উপকৃত হব যদি তুমি ঐ বইখানি আমায় পাঠাতে পার। ইতিহাস আমার ছেলেবেলা থেকেই প্রিয় বিষয়। বরাবরই ইতিহাস পাঠে আমি গভীর আনন্দ পেয়ে থাকি। ইতিহাস আমি নিয়মিত পড়ে থাকি। বর্তমানে আমি রাসেলের "মডার্ণ ইয়োরোপ" পড়ছি; বইটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য। ক্ল্যারেণ্ডানের "হিষ্ট্রী অফ দ্য রিবেলিয়ান"ও পড়ছি। এই বইটি যদিও নীরস ভাষায় লেখা, তবু গ্রন্থটি নানা তথ্যের আকর। আমি বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মত সম্বলিত গ্রন্থাদি পড়তে চাই, তাতে সকলের মতের মধ্যে একটি মূল সত্যকে আবিষ্কার করা যায় বলে আমি মনে করি এবং একজনের মতবাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হয় না। ইতিহাস ছাড়াও আমি জোন্সের[২] ১৮০৮ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত স্পেন, পর্তুগাল এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের বিবরণাদি

---

১। ফরাসীরাজ চতুর্থ হেনরীর অর্থমন্ত্রী ম্যাক্সিমিলিয়েন ডিউক দ্য সালি। আলোচ্য রচনাটি মধ্যম পুরুষে রচিত।

২। স্যার জন টমাস জোন্স, ব্যারোনেট। রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ার। পেনিনসুলার যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। জন্ম ১৭৮৩, মৃত্যু ১৮৪৩।

পড়ছি। বেশ চমৎকার লাগছে। তা ছাড়া La Rivalite de la France et de l' Espagne par Gaillard ৩ ও রোলিঁ'র ৪ রচনাও পড়ছি।

রাজারাণীদের বংশলতিকা প্রণয়ন করতে আমার খুব ভালো লাগে, আমি সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের রাজবংশের একটি বংশলতিকা তৈরী করেছি—আমার নিজের দেশের ইতিহাস রচনা আমার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

লুইসি মামীকে আমার প্রীতি ও শুভকামনা জানিও।

তোমার স্নেহের এবং কর্তব্যপরায়ণা ভাগ্নী
স্বাঃ ভিক্টোরিয়া

## ভিক্টোরিয়া'কে লেখা লিওপোল্ডের চিঠি

লিকেন
৩-এ জুন ১৮৩৭ ৫

পরম স্নেহের খুকী,

তুমি যে গভীর আগ্রহ এবং অতীব নিষ্ঠা সহকারে তোমার রাজত্বের গুরুতর এবং জরুরী ব্যাপারসমূহে মনোনিবেশ করেছ, এ সংবাদে আমি অভূতপূর্ব এক আনন্দের স্পর্শ পেলুম। এই মনোভাব এবং এই প্রকার ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় যদি তুমি দিয়ে যেতে পার, তা হলে তুমি রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে এক অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বলা বাহুল্য, যুগপৎ সাফল্য এবং সুনাম তোমার দ্বারদেশে এসে দাঁড়াবে আর এই কর্মসাফল্যের মধ্যে তুমি নিজেও অন্তরে এক গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতে সমর্থ হবে। আবার অন্যদিক দিয়ে এই কর্মসাফল্যই তোমার জীবনে এনে দেবে জনপ্রিয়তা এবং সর্বসাধারণের প্রীতি।

তোমার পরিকল্পনা আমাকে নানাভাবে আনন্দ দিয়েছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই যে আজই শুধু নয়, বরাবরই তুমি যাতে চিরদিন নিয়মিত অধ্যয়নে রত থাক সে বিষয়ে তোমাকে চিরদিনই বলে এসেছি। এখন তোমার অধ্যয়নের মান উন্নীত করতে হবে আর গতানুগতিক ধারাও বদলাতে হবে। এ বিষয়ে তোমাকে উপযুক্তভাবে সহায়তা ষ্টকমার ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে ষ্টকমারের কথাই বারবার আমার মনের মধ্যে জাগছে। তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি যিনি এ বিষয়ে তোমাকে পরিচালিত করতে পারেন। শিক্ষনীয় বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী এবং যে সব বিষয়ে শিক্ষাদানে তিনি রীতিমত অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ সেগুলির তালিকাও বিরাট, যেমন (১) ইতিহাস (এবং তার দার্শনিক ব্যাখ্যাসহ), (২) আন্তর্জাতিক আইন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ, (৩) রাজনৈতিক অর্থনীতি, আজকের দিনে যার গুরুত্ব অপরিমেয়, (৪) কালোত্তীর্ণ সাহিত্যসমূহ, (৫) সাধারণ রম্যরচনাদি, (৬) পদার্থবিজ্ঞান এবং তার অন্যান্য বিভাগসমূহ—এমনি বহুবিধ তথ্যগর্ভ, সারগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়সমূহ সবগুলির নামোল্লেখ করতে গেলে সে এক বিরাট তালিকার রূপ নেবে। তা ছাড়া তাঁর অভিমতাদি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিও নির্ভুল, এ ক্ষেত্রে কোন সমালোচক তাঁর ত্রুটি খুঁজে পাবেন না। তাই বলছি, যত তাড়াতাড়ি এই উন্নততর পাঠক্রমে মনোনিবেশ করতে পার ততই মঙ্গল। এ ব্যাপারে সকল সময়ে তুমি ষ্টকমারের সাহচর্যে এবং সান্নিধ্যে নিজেকে উপকৃত করে তুলতে পারলে নিজেই বহুদিক দিয়ে লাভবতী হবে যা তোমার সারা ভবিষ্যতের জন্যে তোমার জীবনে এক অশেষ সঞ্চয় হয়ে থাকবে। বিশেষত: বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে এঁকে চলন্ত অভিধান বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে আসন তুমি অলঙ্কৃত করলে তার জন্যেই তোমাকে গত সাঁইত্রিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্তে আনতে হবে। যে বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন কালে রূপ বদলাতে বদলাতে রাজনীতির ইতিহাস বর্তমান রূপে এসেছে সে সম্পর্কে তোমার সম্যক জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী মামা ও বন্ধু
স্বাঃ লিওপোল্ড আর

## ভিক্টোরিয়াকে লেখা লিওপোল্ডের চিঠি

লিকেন
১৫ই জুন ১৮৩৭

পরম স্নেহের খুকী,

আমার মোটেই ইচ্ছে নয় যে তুমি কারো ক্রীড়নক বা কারো স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্রস্বরূপ হয়ে বিরাজ কর। যদিও তোমার বয়েস নিতান্ত অল্প এবং জাগতিক অভিজ্ঞতা কম তবুও তোমার সত্যনিষ্ঠা, বিজিগীষা এবং দৃঢ় মনোবল তোমাকে সর্বপ্রকার বিপদ থেকে ভবিষ্যতে রক্ষা করে যাবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমার সদগুণাবলীই তোমাকে এই সব জড়তার হাত থেকে রক্ষা করে থাকবে নিয়ত। কোন কাজ হুড়োহুড়ি করে করতে যেও না। সব দিক ভেবেচিন্তে আলো-আঁধার দেখে তাতে হস্তক্ষেপ কোর।

একটি নতুন রাজত্বের সূচনা সব সময়েই আশার বাণী বহন করে, দিকে দিকে আশার মাভৈঃ মন্ত্র ছড়িয়ে দেয়। অদৃশ্য হস্তে মানুষের মনোভূমিতে বপন করে আশার বীজ। প্রতিটি মানুষই এই সময়ে তার নিজস্ব চিন্তাধারার এবং আকাঙ্ক্ষার কিছুটা ছাপ ও প্রকাশ দেখতে চায় রাজশক্তিকে কেন্দ্র করে। তাই তোমাকে যতদূর সম্ভব সকলকে সন্তুষ্ট করে কাজ করতে হবে। অবশ্য এও ঠিক যে সকলের ইচ্ছা পূরণ করা একক শক্তির পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তবু যতটা পারা যায় সাধ্যমত চেষ্টা করা ভালো।

তোমার প্রতি অশেষ স্নেহশীল
তোমার মামা
স্বাঃ লিওপোল্ড আর

---

৩। ফরাসী আকাদামির সদস্য গেব্রিয়েল হেনরি গেলার্ড (১৭২৬-১৮০৬)।

৪। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর চার্লস রোলিঁ (১৬৬১-১৭৪১)। আলোচ্য গ্রন্থটির নাম The Histoire Ancienne.

৫। এই চিঠি লেখার ঠিক দশদিন আগে (২০-এ জুন, রাত ২-১২ মিঃ) ইংল্যাণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়াম পরলোকগমন করেন।

## প্রথম লিওপোল্ডকে লেখা ভিক্টোরিয়ার চিঠি

উইণ্ডসার কাসল
২১শে অক্টোবর, ১৮৩৯

পরম পূজনীয় মামা,

তোমার চিঠি পেয়ে যে কি খুশী হয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম জেনো। তোমার চিঠি আমার কাছে যুগপৎভাবে নিয়ে এল আনন্দ আর সান্ত্বনা। আমি জানতুম যে, আমার চিন্তায় ও কাজে তোমার পূর্ণ সমর্থন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

অধিক অগ্রসর হওয়ার আগে তোমায় জানাচ্ছি, বিষয়টি ঘোষণার ব্যাপারে একটু রদবদল করতে হচ্ছে।

একথা ঠিক যে, এই নির্দিষ্ট বিয়ের ব্যাপারে পার্লামেন্টের কিছুই করার নেই। কি অনুমোদন, কি অননুমোদন, কোন কিছুই করার অধিকার তার এ ব্যাপারে নেই। এ ব্যাপারটি তার ক্ষমতার বাইরে, তাই ঠিক হয়েছে যে, ভায়েরা আগামী ১২ই কি ১৪ই এখান থেকে চলে গেলেই আমি প্রিভি কাউন্সিলারদের সঙ্গে মিলিত হব এবং সিদ্ধান্তটি তখন প্রকাশ করব।

য়্যালবার্ট যেন মূর্তিমন্ত দেবদূত। এক পরিপূর্ণ প্রাণসম্পদে ভরপুর, একটি নিটোল জীবন। তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে আমার যা করণীয়, তা করার ক্ষেত্রে কোনদিনই কোন অসম্পূর্ণতা আমার পক্ষ থেকে থাকবে না। আমার সর্বস্ব দিয়েও আমি চেষ্টা করব, তাকে দিতে আনন্দ, দিতে শান্তি, দিতে পরিতৃপ্তি।

তুমি যুবরাজ মেত্তেরনিকের সঙ্গে দেখা করেছ জেনে সুখী হয়েছি। আরও সুখী হয়েছি তোমাদের সাক্ষাৎকার সফল হয়েছে জেনে।

তোমার স্নেহের
স্বাঃ ভিক্টোরিয়া আর

## ভিক্টোরিয়াকে লেখা বেলজিয়ামের রাণীর[৬] চিঠি

লিকেন
৯ই নভেম্বর ১৮৩৯

আমার পরম আদরের ভিক্টোরিয়া,

তোমার সম্পর্কে এখন যে বিরাট বিষয়টি আমাদের সমস্ত মনঃপ্রাণ অধিকার করে আছে, আমাদের দিনরাত্রির যেটা এখন একমাত্র চিন্তা, যা এখন আমাদের সমস্ত হৃদয় অধিকার করে আছে—সেই সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে মন ভয়ানকভাবে উন্মুখ ছিল। সেই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করছি। এ ব্যাপারে আমার প্রতি তুমি যে ঐকান্তিক অনুরাগ এবং সুগভীর আস্থার পরিচয় দিয়েছ, তার জন্যে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

৬ লিওপোল্ডের দ্বিতীয় সহধর্মিণী (১৮১২-১৮৫০) ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের মেয়ে। লিওপোল্ড প্রথমপক্ষে বিয়ে করেছিলেন ভিক্টোরিয়ার বড়জ্যাঠামশায় ইংল্যাণ্ডেশ্বর চতুর্থ জর্জের মেয়ে সার্লোটিকে (১৭৯৬-১৮১৭)।

তোমার চিঠিটা যখন পড়লুম তখন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল আর মনে মনে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল—"ঈশ্বর, তাকে সুখী কর এখন এবং চিরকাল", তোমার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অনন্ত আশীর্বাদ বন্যার বেগে তোমার উপর ঝরে পড়ুক, তাঁর করুণা তোমায় প্লাবিত করে দিক। তাঁর দাক্ষিণ্য তোমার জীবনে পূর্ণতা এনে দিক। তোমার সারা জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে আনন্দের দীপ্তি থাক অনির্বাণ আর গভীর প্রেমই জ্বালাতে পারে সেই আনন্দের দীপ।

তুমি সংশয় প্রকাশ করেছ যে, তুমি তার উপযুক্ত হতে উঠতে পারবে কি না বা তার যোগ্য সহধর্মিণী হতে পারবে কিনা। প্রেমের প্রগাঢ়তা মনের মধ্যে বিনয়গুণেরও জন্ম দেয়। আমরা যা ভালবাসি তা সকল সময়েই নিবাড়ি নিয়ে আমাদের সামনে দেখা দেয়, স্বভাবতঃই তখন তার তুলনায় নিজেকে অনেকখানি অযোগ্য বলে মনে হয়। স্বাভাবিক নিয়মই তো এই, তবু এই অনুভূতির মধ্যেও আবার এক অবর্ণনীয় আনন্দকে আস্বাদ করা যায়, এই অনুভূতিই নিজের প্রেমকে আরও জীবন্ত, বলিষ্ঠ, নিটোল করে তোলে।

তোমার অনুরাগিণী
স্বাঃ—লুইসি

## সাসেক্সের ডিউককে[৭] লেখা ভিক্টোরিয়ার চিঠি

উইণ্ডসার কাসল
১৪ই নভেম্বর, ১৮৩৯

পূজনীয় কাকা,

আমার প্রতি সকল সময়েই আপনি যে গভীর স্নেহের পরিচয় দিয়ে এসেছেন, তাই থেকে এ ধারণা আমি নিশ্চয়ই করতে পারি যে, আমার সারা ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট ঘটনার প্রতি আপনার নিশ্চয়ই আগ্রহ থাকবে। তাই আর অধিক কালক্ষয় না করে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি আমার মামাতো ভাই য়্যালবার্টের সঙ্গে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি। তার মহত্ব ঔদার্য দৃঢ়তা প্রমুখ বিভিন্ন গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁরা পূর্ণমাত্রায় আস্থাবান, যাঁরা তার সংস্পর্শে এসেছেন।

ব্যাপারটি এখনও সাধারণ্যে অপ্রচারিত বলেই অনাত্মীয় মহলে এ বিষয়ে আপনাকে ঘোষণা না করার সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার স্নেহের ভাইঝি
স্বাঃ—ভিক্টোরিয়া আর

[ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পত্রাবলী ন'টি বৃহদায়তনখণ্ডে সংকলিত। সেই অসংখ্য পত্রের মধ্যে সামান্য সংখ্যক কয়েকখানি পত্রের মাসিক বসুমতীর গতপূর্ব সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশ সমাপ্ত হল। ভবিষ্যতে এই কৌতূহলোদ্দীপক ও বিবিধ তথ্যসমৃদ্ধ পত্রগুলির মধ্যে আরও অধিক সংখ্যক পত্র প্রকাশ করার আমরা বাসনা রাখি। পত্রগুলি অনুবাদ করেছেন কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।—স ]

৭ রাজা তৃতীয় জর্জের ষষ্ঠপুত্র অগাস্টাস। ভিক্টোরিয়ার কাকা। জন্ম ১৭৭৩, মৃত্যু ১৮৪৩।

# গ্যেটের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন

**শ্যামাদাস সেনগুপ্ত**

কৈশোরে প্রথম প্রেম গ্যেটের ব্যর্থ হয়। গ্যেটের মানসী গ্রেচেন নাম্নী মহিলা কবিকে ভাই-এর চোখে দেখেছিলেন। ফলে কবির স্পর্শালু হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়। জন্মস্থান ফ্রাঙ্কফার্ট শহর কবির কাছে অসহ্য লাগল। আর এই সময় কবির পিতা আইন পাঠের জন্য কবিকে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। পিতার কঠোর শাসনের হাত থেকে রেহাই পাবেন এই আশায় কবি লাইপজিগে চলে আসেন। কবির আইনজ্ঞ পিতা গ্যেটেকে আইনজ্ঞ হিসাবে দেখবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। ইতিমধ্যে ছেলেকে তিনি নানা কলায় শিক্ষিত করেছিলেন। ছেলে আইন পাশ করে প্যারিস থেকে ঘুরে এসে সারা শহরকে চমক লাগিয়ে দিক, এই ছিল গ্যেটের পিতার ইচ্ছে।

প্রধান জিলাশাসকের নাতি হয়ে গ্যেটে বুঝতে পেরেছিলেন, সৎলোকের পক্ষে আইনজীবিকায় টিকে থাকা সম্ভব নয়, কারণ সেখানে উৎকোচ আর প্রলোভন রয়েছে। তাঁর পিতাই এর যথেষ্ট প্রমাণ। বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও চার দেওয়ালের মাঝে তিনি বন্দী ছিলেন। আইনকে জীবিকা হিসাবে নিলে জীবন যে বোঝা হয়ে উঠবে, একথা গ্যেটে বুঝেছিলেন। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে, কবিতায় আনন্দ আছে। সে-আনন্দপূর্ণ কাব্যশক্তি বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর কাব্য পূর্ণ না হোক, সুন্দর ও নির্দোষ একথা তিনি বুঝেছিলেন।

তাঁকে কেন্দ্র করে সংসারে একটা দ্বন্দ্ব জেগেছিল। গ্যেটে এই মনোভাব এই ভাবে প্রকাশ করেছেন : ছেলেদের ঈশ্বরের কৃপায় পেয়েছি বলে তাদের আমরা গঠন করতে পারি না। ঈশ্বর-প্রদত্ত সন্তানকে আমরা ভালবাসি, গ্রহণ করি। তাদের গঠন কর—তারা নিজেদের পথ নিজেরাই নির্বাচন করুক। কারণ এক এক শিশু এক এক স্বতন্ত্র প্রবণতা নিয়ে জন্মায়। তারা প্রত্যেকে নিজেরাই নিজেদের উন্নত করুক—এতে তারা সুখ ও শান্তি পাবে।

নিজের পথ নিজে বেছে নিতে না পারায় কবি ক্ষুব্ধ হন। গোলাপ ফুল না হয়ে তিনি কাঁটাগাছই যেন হতে চেয়েছিলেন।

গ্যেটে যখন লাইপজিগে আসেন তখন শরৎকাল। সেখানে সে-সময় পুস্তক প্রদর্শনী চলছিল। পোল, রাশিয়ান, শ্লাভ প্রভৃতি বিদেশীর আগমন কবির ভালই লেগেছিল। গ্যেটের জন্য দুখানা ঘর ভাড়া করা হয়েছিল। আর সেই ঘর থেকে স্থানীয় আদালতের ভিতরকার দৃশ্য দেখা যেত। লাইপজিগের অধিবাসীদের কবির ভালই লেগেছিল। তিনি বুঝতে পারলেন, ফ্রাঙ্কফার্টের অধিবাসীরা কতগুলো বাঁধাধরা নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংস্কারের মধ্যে দিন যাপনে অভ্যস্ত।

ফ্রাঙ্কফার্টের জীবনযাত্রা ছিল অতীত ঐতিহ্যপন্থী। লাইপজিগে সর্বদা কর্মচঞ্চল ভাব ছিল। শহরটি ছিল ব্যবসাকেন্দ্র। সব জায়গায় ছিল একটা অতি-আধুনিকতার ছাপ। তা ছাড়া শহরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। কবি বুঝলেন লাইপজিগ হল তাঁর উপযুক্ত স্থান। লাইপজিগ শহরটিকে তদানীন্তন জার্মানীর প্যারিস বলা হত। কবি ফ্রাঙ্কফার্ট থেকে প্রশংসা-পত্র সঙ্গে এনেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রশংসা-পত্র মারফৎ সহজেই যেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে মিশতে পারেন। ফলে সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকজনের সঙ্গে মিশতে তাঁর অসুবিধা হয় নি।

আইনের ছাত্র হিসাবে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হন। অধ্যাপক এর্নেষ্টির সিসেরোর "বক্তৃতা" বিষয়ক বক্তব্য গ্যেটে শুনলেন। এই অধ্যাপকের কাছ থেকে ল্যাটিন সাহিত্যের ওপর আর কিছু বেশী আশা করেছিলেন। বক্তৃতা বা অন্য আলোচনা শুনে কবি নতুন কিছু পাননি। এর পর অধ্যাপক গেলের্ট প্রদত্ত জার্মাণ সাহিত্য ও ছন্দ বিষয়ক বক্তৃতা তিনি শুনলেন। কবির কাছে এ-বক্তৃতাও নীরস বলে মনে হল। এই অধ্যাপক ছিলেন ভাববিলাসী, তাই কবির সঙ্গে আন্তরিকতাও তেমন গড়ে ওঠেনি। জার্মাণ সাহিত্যে Fable লিখে এই অধ্যাপক অমর হয়ে আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কিছুতেই তিনি তৃপ্তি পান নি। এরপর ইতিহাসের অধ্যাপক বোওমের সঙ্গে গ্যেটের পরিচয় হয়। অধ্যাপক-পত্নী কবির ফ্রাঙ্কফার্টের হাবভাব, চালচলন ও প্রাদেশিক ভাষা শুনে বিরূপ মন্তব্য করতেন। কবির প্রিয় লেখকদের প্রতিও অধ্যাপক-পত্নী কটাক্ষ করতেন। এ-সব কবির কাছে অসহ্য বলে মনে হত। গ্যেটের কবিতার দুর্বলতা বিষয়ে ইনি অবহিত ছিলেন। জনৈক সাহিত্যের অধ্যাপক গ্যেটের কবিতার তীব্র সমালোচনা করেন। এরপর অধ্যাপক-পত্নীর পুনরায় অশোভন মন্তব্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে গ্যেটে তাঁর লেখা কবিতা, গল্প, আঁকা ছবি ও তাঁর সমস্ত জীবনের কর্মসূচী রান্নাঘরের অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে দিলেন। তিনি ভাবলেন কবি হওয়ার সাধ তাঁর বৃথা। ফলে জীবনও অসহ্য হয়ে উঠল। নিজের ওপর সন্দেহও জেগেছিল কবির। ঘটনা এত চরমে উঠেছিল যে, অধ্যাপক-পত্নী শ্রীমতী বোওম কবির উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিলেন না ; তীব্র বিদ্বেষে গ্যেটে শ্রীমতী বোওমের সান্নিধ্যে যেতেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গ্যেটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিল দলাদলি। অধ্যাপকদের দলাদলি আর রেষারেষির বিষময় ফল ছাত্রদের ভোগ করতে হত। নিজেদের গবেষণার কাজ অধ্যাপকগণ ছাত্রদের দিয়ে খাটিয়ে করে নিতেন। বাইরের পৃথিবীতে যে কী ঘটছে, সে-বিষয়ে প্রবীণ অধ্যাপকেরা খবর রাখতেন না।

অধ্যাপকগণ নিজেদের বিদ্যার জাহাজ বলে মনে করতেন। গ্যেটে এসেছিলেন আইন পাঠ করবার জন্য। অথচ তাঁর আকর্ষণ ছিল পদার্থবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের ওপর। কবির শুভাকাঙ্ক্ষীরা কবিকে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তিনি আইনের ছাত্র, আইনশাস্ত্রের প্রতি গ্যেটের অনুরাগ হওয়া উচিত। এ-সব দিকে গ্যেটের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অভিনয় দেখে সন্ধ্যা কাটাতেন। কবিতা লিখতেন। লাইপজিগে যখন তিনি এসেছিলেন তখন তাঁকে শান্ত [illegible] ছেলের মত মনে হয়েছিল। এখানে এসে [illegible] হয়ে উঠলেন। তাঁর মনোভাব হল, পাখীর মত কুঞ্জে কুঞ্জে তিনি বিচরণ করবেন

ঊর্দ্ধাকাশের মুক্ত বাতাস তিনি নেবেন। ছোট ডানা নিয়ে অসীম শূন্যে বিহার করবেন, কূজনে মুখরিত করবেন প্রতিটি কুঞ্জ।

হাতে তাঁর সময় ছিল না। এমন কি, বোনকে পত্র দেওয়ার সময় কবির হাতে ছিল না। পাখীর মাংস ছাড়া অন্য কোন কিছুর মাংস কবির মুখে রুচত না। এই সময় গোটের জনৈক বন্ধুর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, গোটকে দেখলে হেসে লুটোপুটি খেতে হবে। মানুষ যে নিজেকে এত দ্রুত পালটিয়ে ফেলতে পারে, গোটে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লাইপজিগে তিনি ফতো-কাপ্তান হয়েছিলেন। তাঁর গুণ দেখলে লোক ভালবাসবে আর দোষ দেখলে বিরক্তির উদ্রেক হবে। নারীদের মন পাওয়ার জন্য এমনভাবে থাকেন যে লোকের সঙ্গে মিশতে চান না। হাসির পাত্র হিসাবে অন্য লোকের কাছে তিনি নিজেকে জাহির করতে চাইতেন। তাঁর হাব-ভাব দেখে না হেসে থাকা যায় না। ইসারার উপায়ও অদ্ভুত। পাথরের অনুভূতি থাকলে হয়ত পাথরকে নিবৃত্ত করা যায়, কিন্তু গোটের জ্ঞান কেউ আনতে পারবে না—নিবৃত্তি করা ত দূরের কথা।

তাঁর পোষাক সকলের হাসির খোরাক জোগাত। লাইপজিগে আসবার সময় অনেক পোষাক এনেছিলেন। বাড়ীতে দর্জি ছিল। সেই পোষাকগুলো মাপ নেওয়ার বহুদিন পর তৈরী করা হত। ফলে পোষাকগুলো মানানসই হত না। আর পোষাকগুলোও ছোট, বড় বা অদ্ভুত ধরণের হত। ফলে সকলে কবির পোষাক দেখে হাসত। অবস্থা শেষে এমন দাঁড়াল যে, গৃহের সব কিছু পোষাক তিনি বর্জন করলেন। একদিন একজন অভিনেতা কবির জবরজঙ্গ পোষাক পরে মঞ্চে হাস্যরসিকের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রেক্ষাগৃহে এক তুমুল হাসির তুফান তুললেন। কবিও প্রমাদ গণলেন, কারণ কবি বুঝলেন জবরজঙ্গ পোষাক-পরা অবস্থায় কবিকে অন্য গ্রহের অধিবাসী বলে মনে হত। অচিরেই কবি নতুন পোষাক বানালেন। দর্জির মোটা বিল মেটাতে কবির পিতা চাপা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

ক্লাসে তিনি আইনের বক্তৃতা শুনতেন না। উপরন্তু ব্যঙ্গাত্মক ছবি আঁকতেন নোট না লিখে। অবশ্য এর মধ্যে কোন অভিসন্ধি ছিল না। অবশ্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না বলা শক্ত হবে। তবে উদ্দেশ্য থাকলেও দুরভিসন্ধি ছিল না।

ক্লাসে বসে তিনি ছবি আঁকতেন। তাঁর ছবি দেখে বন্ধুরা আনন্দ পেত। এই সময় তিনি ওয়াল্টেজ নাচের তালিম নিতেন। অধিকাংশ সময় তাস খেলে সময় নষ্ট করতেন। এসব থেকে বোঝা যায় জীবনে তাঁর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তবে নানা বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতেন। বুড়ো তরুণীকে বিয়ে করেছে দেখে তিনি ব্যঙ্গ ও কৌতুক করতেন; তরুণী বধূ কত ফিট উঁচু ও কত রোগা, সে-বিষয়ে তিনি উল্লেখ করতেন। বর ঢ্যাঙা, না গোবর-গণেশ, এ-বিষয়েও তিনি ফোড়ন কাটতেন।

লাইপজিগে জনৈক চিকিৎসক-অধ্যাপকের গৃহে তিনি যেতেন। যেসব ছাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়ত, তাদের সঙ্গে এইখানে গোটের পরিচয় হয়। অবশ্য প্রথম প্রথম এখানে গোটের খুব অসুবিধা হত। গোটের স্বদেশীয় বন্ধু হর্ণ এই সময় লাইপজিগে এসে গোটেকে খুব উৎফুল্ল দেখেন নি। গোটের ভগিনীর ভবিষ্যৎ স্বামী শোলাজার চাকরী উপলক্ষে লাইপজিগ হয়ে কর্মস্থলে যাবার সময় সনকফ পরিবারের গৃহে ওঠেন। স্বাভাবিক প্রবণতাবশতঃ ফ্রাঙ্কফার্টের অধিবাসীদের শ্রীমতী সনকফ সাদরে আপ্যায়ন করতেন। শোলাজার আসবার পর থেকে গোটে এই পরিবারে আহার করতেন। এই সনকফ পরিবারের ছিল মদের ব্যবসা। কেটহেন সনকফ ছিলেন সে-গৃহের অনূঢ়া কন্যা, সুশ্রী মেয়ে। কুমারীর হৃদয়ে উষ্ণ ভাব ছিল। গোটেকে তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তাঁর এক বন্ধুর পত্র থেকে জানা যায় যে, সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে সনকফ পরিবারের স্থান অতি নীচে। গোটে সেই পরিবারের কন্যার প্রেমে পড়েছেন। সেই যোষা পূর্ণ বিকশিত। খুব দীর্ঘাঙ্গী না হলেও সুন্দর গোলাকৃতি মুখ। অনিন্দ্যসুন্দরী সেই কন্যা না হলেও নম্র, শান্ত ও খোলা ভাব আছে সেই যোষার মুখে।

গোটে সামাজিক মর্যাদাকে স্বীকার করেন নি। কারণ সামাজিক মর্যাদার বেড়ী সমাজ পরিয়েছে—এই ছিল কবির মত। গোটে তাঁর প্রেয়সী বিষয়ে সহোদরাকে লিখে জানান, তাঁর প্রেয়সী বেশী লেখাপড়া জানে না বটে, তবে হৃদয় আছে তাঁর প্রেয়সীর। একদিন কেটহেন সনকফ এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যান। প্রেয়সীর পার্শ্বে আসীন সেই পুরুষটাকে দেখে কবির মন অসূয়ায় ভরে যায়। পরে যখন মানসী জানালেন যে, লোকটার সঙ্গ এড়াবার তিনিও চেষ্টা করছিলেন, তখন গোটে আশ্বস্ত হন। মনের অশান্তি ও সন্দেহের মেঘ তাঁর দূর হল। সহোদরা কর্ণেলিয়াকে লিখলেন, কুমারী সনকফকে ভোলা যায় না। উত্তম রমণী সে, সততা আছে। আপ্ততা আছে। কবির প্রতি লক্ষ্য রাখে। এইজন্য তিনিও তাঁকে ভালবাসেন। সামান্য শিক্ষা তাঁর প্রেয়সীর, এ জন্য তাঁর মানসী লজ্জিত নন। এই কারণে কেটহেন সনকফকে তিনি আরও বেশী ভালবাসেন।

তারপর তিনি বোনের কাছে প্রশ্ন করেছেন এই বলে যে, এই শ্রেণীর মেয়েকে ভালবেসে তিনি কী নিন্দনীয় কিছু করেছেন? তিনি আরও লিখেছিলেন যে, বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ইতিহাসের নাম নয়জন সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে রেখেছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি বারটী কবিতা লিখে কেটহেন সনকফের নাম অনুযায়ী নাম দেবেন। তারপর নাটকীয় সুরে লেখেন—ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর যেমন সম্পর্ক নেই, সেইরূপ তাঁর কবিতার সঙ্গে কেটহেন সনকফের কোন সম্পর্ক নেই।

কল্পনাবিলাসী morbid ভাব কবির অন্তরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে কেটহেন সনকফকে তিনি ভালবাসতেন সেই প্রেয়সীকেই তিনি 'অভিশাপগ্রস্ত রমণী' বলেছেন। গোটের পত্র মারফৎ আরও জানা যায়, এই প্রেয়সী রমণীকে এমন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে নরকে তিনি নেমে গিয়েছেন। এই কেটহেন সনফকের সহিত লোসং রচিত একটি নাটকে গোটে অভিনয়ও করেছিলেন।

এই সময় গোটের সঙ্গে বেহরিশ নামক এক ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। এই ভদ্রলোকের সাহিত্যে প্রচুর অনুরাগ ছিল। এই ভদ্রলোকের প্রভাব ও ব্যক্তিত্বকে গোটে উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বীকার করেছেন। ইনি জনৈক জার্মাণ কাউন্টের ছেলেকে পড়াতেন। ধূসর রঙের পোষাক পরে হাতে তরবারি নিয়ে ইনি সর্বদা বার হতেন লোকের মধ্যে। বুদ্ধিদীপ্ত ভাব থাকলেও এই ভদ্রলোকের একটু গ্রাম্য দোষ ছিল। লাইপজিগের সম্ভ্রান্ত সমাজ থেকে বেহরিশ ও

গ্যেটে বহিষ্কৃত হন। উভয়ের আদিম ও বন্য জীবনযাপন প্রণালী এর জন্য দায়ী। উভয়ের পানাহারের কোন মাত্রাও ছিল না। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে বেহরিশের অঙ্গ থেকে তামাকের গন্ধ বার হত।

গ্যেটের চরিত্রে তখন পুরোমাত্রায় বিরোধ। বাসনা নিষ্ফল হওয়ায় তিনি ভীষণ কল্পনাবিলাসী হয়েছিলেন। তাঁর দ্বন্দ্ব বেশ বোঝা যায় এই উক্তি থেকে—একবার এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। আবার পরক্ষণেই অন্য এক বন্ধুকে বলেছেন, তিনি পূর্ণ মানুষ; সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বেঁচে আছেন। লাইপজিগে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইন পাঠের জন্য পাঠান হয়েছিল। নিজের যৌবন ও শিক্ষাকে প্রবঞ্চনা করবার জন্য তাঁর যা ইচ্ছে তাই কবি করতেন। যৌবনের শক্তি নিঃশেষ হল কী না—এই বিষয়ে যত না সচেতন ছিলেন, তার চেয়ে বেশী সচেতন ছিলেন এই ভেবে যে, আয়াসহীন জীবনযাত্রার পরিমাণ কী হতে পারে। অবশেষে পরিণামে হলও তাই। সমস্ত পরিবার থেকে কবিকে বহিষ্কার করা হয়।

এর ফলে সামাজিক সকল সম্পর্কে ছেদ টানলেন। আসরে ও জলসায় যাওয়া তিনি বন্ধ করলেন। অশ্বারোহণে বার হতেন না। অভিনয় দেখাও ছেড়ে দিলেন। এইভাবে একে একে সব পরিত্যাগ করলেন।

বন্ধুদের সাহচর্য পরিহারের জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন এই বলে যে, বন্ধুরা আর কোন লোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন না, ফলে তাঁর অর্থ বাঁচবে। আবার পরক্ষণেই বন্ধু বেহরিশকে বলেছেন, এই প্রচেষ্টা তাঁর প্রহসনমাত্র। প্রহসনের উদ্দেশ্যে এই সব কাজ তিনি করেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে-সব যুবকেরা জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী হতে চায়, এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের সুর তাদের থাকবে। প্রেমে যে চপলতা ছিল, একথা তিনি বুঝতেন। কেটচেন সনকফের স্বামী তিনি হতে পারবেন না—এই সন্দেহ কবির মনে জেগেছিল। সম্পূর্ণ অধিকারের দাবীও তিনি জানান নি। তবে তিনি একথাও ভাবতে পারতেন না যে, তাঁর হাত থেকে মানসী চলে যাবে। এই প্রেমে কবি-মানসের কোন উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় নি। তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন বিয়ে হবে না। তাই বিচ্ছেদের পর লিখেছিলেন বন্ধু বেহরিশকে এই বলে যে, ছাড়াছাড়ি হয়ে তিনি সুখী হয়েছেন, প্রেমের মারফৎ জীবন তাঁদের সুরু হয়েছিল; শেষ হবে বন্ধুত্ব দিয়ে; কারণ প্রেমের পরও বন্ধুত্ব থাকে। ভালবেসে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। লোকদের ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকে এবং নিজেকে ভাঁড়ের ভূমিকায় হাসির পাত্র হিসাবে খাড়া করে বলেছেন, যৌবনে যদি ফাজলামি বা বাচলপনা না করি তবে বুড়ো বয়সে ভাববার কী পুঁজি থাকবে? সম্ভবতঃ এই ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব থেকে তিনি দুখানা নাটক লেখেন।

লাইপজিগে বাইটকফ্ নামক এক ছাপাখানার মালিকের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। এই ভদ্রলোকের এক ছেলে সুরকার ছিলেন ও পিয়ানো বাজাতে পারতেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ফলে গ্যেটে সঙ্গীতের আসরে যাতায়াত করতেন এবং সম্ভবতঃ ইনিই গ্যেটের কবিতায় প্রথম সুর দেন। জার্মানী সঙ্গীতের দেশ। উত্তরকালে প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণ গ্যেটের বহু কবিতায় সুর দিয়েছেন। এসব আসরে গ্যেটে নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতেন না। সক্রিয় অংশ নিতেন কখনও বাঁশী বাজিয়ে, আবার কখনও চেলো বাজিয়ে। চেলো বাজিয়ে হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। কবির আয়াসহীন জীবনের মোড় ফেরালেন শিল্পী ওয়েজার। ইনি ছিলেন চিত্রাঙ্কন ও স্থাপত্য-শিল্পের অধ্যক্ষ। এই কলারসিক তরুণ প্রতিভাবান গ্যেটেকে দেখে কবির চরিত্রের ত্রুটি না ধরে, গ্যেটের চরিত্রের উত্তম দিকটার প্রতি নজর দেন। এই অধ্যাপক সৃজনধর্মী শিল্পী ছিলেন না বটে, কিন্তু গ্যেটের বন্য আদিম চরিত্রের মধ্যে একটি সৃজনশীল শিল্পসত্তা আবিষ্কার করেছিলেন। শিল্পী ওয়েজারের সংস্পর্শে এসে গ্যেটের জীবনে এক সমস্যা দেখা দিল। শিল্পী হবেন, না কবি হবেন—এই ভাবনা কবিকে পেয়ে বসল। সেই অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে গ্যেটে খোদাই-এর কাজ করতেন এবং ছবি আঁকতেন।

স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে বৃদ্ধ শিল্পী ওয়েজার গ্যেটেকে শিল্পকাজ শেখান, ফলে গ্যেটের বন্য আদিম চরিত্রে এক পরিবর্তন আসে। চারিত্রিক উন্নতি যা কিছু হয়েছিল, তা শিল্পী ওয়েজারের জন্য। গ্যেটেও স্বীকার করেছিলেন এই অধ্যক্ষ শিল্পীর কাছে তাঁর শিল্পশিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। কবিতার ক্ষেত্রে গ্যেটের ধ্যানধারণার সম্প্রসারণ পরবর্তী জীবনে গ্যেটের সম্ভব হয়েছিল, এই শিল্প কর্ষণার জন্য। এই শিল্প দৃষ্টিই বিজ্ঞানী হিসাবেও তাঁর জীবনকে সহায়তা করেছিল। এখানে বলা অসঙ্গত হবে না যে, বিজ্ঞানী হিসাবে কবিগুরু গ্যেটের দুইটী মৌলিক অবদান আছে। একটি অবদান হল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী, অপরটী হল উদ্ভিদের রূপান্তর বিষয়ক উদ্ভাবন। শিল্প ঋজু, সহজ, সরল আদর্শের বিকাশ—ওয়েজারের এই বাণী গ্যেটেকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তিনিও বুঝলেন ঋজু আবেদনই শিল্প সামগ্রীর পূর্ণতা। অধ্যাপক-দুহিতা ফ্রেডারিক ওয়েজার গ্যেটেকে উৎসাহ দিতেন। অচিরেই এই কুমারী গ্যেটের বান্ধবী হলেন, অভ্যাগত অতিথি হিসাবে অধ্যাপকগৃহে কবির অবারিত দ্বার ছিল। এই সময় ধাতুর পাতের ওপর নানা রকম নক্সা তিনি আঁকতেন। খোদাই-শিল্পী ষ্টক নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি প্রচুর সাহায্য পান। এই সময় বই বাঁধানো কাজে তাঁর উৎসাহ আসে। চিত্তবিনোদনের জন্য বই বাঁধিয়ে প্রচুর আনন্দ পেতেন। বিশেষতঃ চিত্রশিল্পের ওপর গ্যেটের আকর্ষণ উগ্র হল। ছবি বিষয়ে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিবহাল করবার জন্য এক চিত্র-প্রদর্শনী দেখার উদ্দেশ্যে তিনি ড্রেসডেনে যান। বিভিন্ন দেশের শিল্পকলা বিষয়ে অবহিত হলেন। যদিও সমগ্র ইউরোপের বহুবিধ ছবি সেই প্রদর্শনীতে ছিল, তবু তার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল ওলন্দাজ শিল্পীদের আঁকা ছবি। ওলন্দাজ শিল্পীদের রচনাশৈলী ও প্রতিকৃতি বিশেষতঃ নিসর্গ ছবি তাঁর মনে সাড়া তুলেছিল। বস্তুর অবস্থান, স্থিতি, আলো ও ছায়ার প্রাঞ্জল প্রয়োগ যে ছবিকে প্রাণবন্ত করে তোলে, এই কথা তিনি সম্যক্‌ভাবে বুঝতে পারলেন। ছবির মধ্যে এই গুণ যে শিল্পীর শিল্পীকে উন্নতমার্গে নিয়ে যায় এবং শিল্পী যদি প্রকৃতির রূপে শিল্প সচেতনভাবে তুলে ধরে, তা হলে সে চিত্র সকল শ্রেণীর লোকের কাছে সজীব হয়ে ধরা দেয়—এই কথা তিনি বুঝলেন। এর পূর্বে ইতালীয় চিত্র বিষয়ে এক অন্ধশ্রদ্ধা ছিল। সে শ্রদ্ধায় হয়ত তাঁর শিল্পমন যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল না।

ওলন্দাজ শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখে গ্যেটের মানসিক পটভূমিকা আরও বিস্তৃত হয়।

শিল্পমানস গ্যেটের পরিশীলিত হয়েছিল ওয়েজারের কাছ থেকে। লিখনভঙ্গির উন্নতির জন্য গ্যেটে ওয়েল্যাণ্ড নামক মনীষীর কাছে কৃতজ্ঞ। ইনি গোঁড়া ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তবে ধর্মের গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ধর্মীয় গোঁড়ামির মধ্যে যে লেখকের চিরাচরিত অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তা গ্যেটের স্বীকৃতি থেকে জানা যায়। ভাবকে সহজ ও সরল করবার গুণটা গ্যেটে ওয়েল্যাণ্ডের কাছ থেকে পান। শিল্পী ওয়েজারই ডাইল্যাণ্ডের লেখার সঙ্গে গ্যেটেকে পরিচিত করে দেন।

গ্যেটের জীবনে আর একজন শিল্পী যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। ইনি হলেন ভিঙ্কেলমান। প্রাচীন শিল্পকলার প্রতি গ্যেটের আগ্রহ এই ব্যক্তি সঞ্চারিত করেন। উত্তরকালে গ্রীক, রোম প্রভৃতি শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আকর্ষণ দুই-ই বৃদ্ধি পায়। ফলে গ্যেটে দা-ভিঞ্চি, রাফেল, মাইকেল এঞ্জালো ও রেমব্রাণ্টের শিল্পকলার ওপরে পরিণত বয়সে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং বহু প্রবন্ধ লেখেন।

কর্মব্যস্ততার মধ্যেও লাইপজিগে গ্যেটে বহু নাটক দেখেন। মধ্যে মধ্যে তিনি নাটকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। ছোট ছোট টাইপ চরিত্রে হাস্যরসিকের ভূমিকায় সুনিপুণভাবে তিনি অভিনয় করতেন। লাইপজিগে থাকার সময় তিনি দুইখানা নাটক লেখেন। নাটক দুখানার ইংরাজী অনুবাদের নাম যথাক্রমে The Lover's Human ও The Accomplices। ছন্দে লেখা ফরাসী চিরায়ত সাহিত্যের মত ও পথ তিনি অনুসরণ করেছিলেন। এই সময় প্রখ্যাত নাট্যকার লেসিং-এর একখানা নাটক পড়ে গ্যেটে অনুধাবন করলেন যে, যুগের সমস্যাকে নাটকের পাত্রপাত্রীর মধ্যে অনুধাবন করতে হবে। লেসিং-এর নাটক পড়ে তিনি আরও বুঝলেন যে, নিজের কল্পনাকে বাস্তব ঘটনার মধ্যে রূপায়িত করতে হবে। লেসিং-এর সাহিত্যসৃষ্টি সঙ্কুচিত স্থান থেকে বন্দীভাবের বাহনকে মুক্তি দিয়েছিল। উপরে বর্ণিত প্রথম নাটকে কবির সঙ্গে কেটচেন সনকফের ব্যক্তিগত জীবনের ইঙ্গিত আছে। দ্বিতীয় নাটকে আছে কৈশোরের মানসী গ্রেচেনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কাহিনীর ইতিবৃত্ত।

[ আগামীবারে সমাপ্য।

# সমুদ্রের দিকে চলো

নচিকেতা ভরদ্বাজ

মাটির গভীরে যদি কোনো স্বাদ থাকে,
প্রাণের গভীরে অন্তঃশীলা
*ফল্গুর বিশুদ্ধি আছে—প্রত্যক্ষের প্রয়োজনে দেখাই যায় না।*
*উৎসের আবেগে তবু দুই কূল জেগে ওঠে—নদী হয় লীলা,—*
*ফাল্গুনের রূপকল্প ফলভারে নম্র হয়। মাংসের মুহূর্ত-হাসনা*
*যদিও উদ্ধত থাবা—চোখে তবু কান্নার প্রপাত!*
*সে প্রপাতে জন্ম নেয় মানুষের আর এক নির্জন শরীর*
আলোর অপার্থিব ;—সে তখন পথ চলে
পার হয়ে চলে যায় ভিড়।

শঙ্খের মতন শাদা হাতে তার—উদাত্ত বুকে, ঘাড়ে—
—ধীরবহ, দেহের দুয়ারে
স্নিগ্ধ পদ্মরাগ আলো ; তবু স্বর্ণ-মৃগের ব্যাপারে
মায়াবী মারীচ ঘোরে—রাবণেরে দিয়েছে সংবাদ।
তবু যে নিজের মুখ দেখবার একখানি নিশ্চিত আয়না
রয়েছে নিজেরই বুকে : সেইখানে বার বার দেখে
বুঝেছে রূপের ঘরে নেমে আসে ছায়াচ্ছন্ন রাত,

কান্নার কামনা সত্য, তবু সত্য আকালের হাত
তাকে যে সান্ত্বনা দেয় :
রাবণের অপমৃত্যু বার বার রামের বিবেকে।

রূপসী মাটির ঘরে রূপের গভীরে তারা
রূপকথা-বঙের বিশ্বাসে
শিশুর মতন স্নেহে খোঁজে দূর আলোর বর্ণনা!
একথা কাউকে জানি কিছুতেই বোঝানো যাবে না
মানুষ তবুও কেন মানুষীর কাছে ফিরে আসে—
নদীর মতন তার স্নিগ্ধ দুটি স্তনে মুখ রেখে
ছায়ার মতন তার সুগন্ধী এলো চুলে
কান্নার পাথীর মত সব ঢেকে
সে চেয়েছে অন্য স্বাদ—অন্য ঋতু শুদ্ধির বেদনা।

সমুদ্রে নেমেও বুঝি তাই তারা নোনা জল থেকে
মেঘ তুলে নিয়ে আসে, ঝুম্ ঝুম্ বৃষ্টির রূপোলী
ফসলের আভিজাত্যে হৃদয় ছড়িয়ে দেয়
মুঠো মুঠো কান্নার অঞ্জলি।

**শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী**

৬ই মে আমরা পুরী থেকে ষ্টেশন-ওয়াগনে চড়ে ভুবনেশ্বর অভিমুখে রওনা হই। অতিক্রম করে যাই কত সর্পিল পথ, কত ঘনবসতি, কত গ্রাম-উপবন, কত স্রোতস্বিনী, কত দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তর, স্পর্শ করে যাই পবিত্র সাক্ষীগোপালের পদতল, দর্শন করে যাই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতা সাক্ষীগোপালকে। ঘুরে ঘুরে দেখি তাঁর ক্ষুদ্র মন্দিরটি, তার অঙ্গের শিল্প-সম্পদ আর মূর্তি-সম্ভার, মহা পবিত্র ভুবনেশ্বরে উপনীত হই। লিঙ্গরাজের মন্দিরের সামনে এসে আমাদের মোটর থামে।

অভিহিত ভুবনেশ্বর একাম্রকানন নামেও স্কন্দ পুরাণে। বিবাহ করেন কৈলাসপতি মহাদেব, হিমালয়-দুহিতা গিরিকুমারী গৌরীকে, বাস করেন এসে সপত্নী শ্বশুর-আলয়ে হিমালয়ে। মাতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে ক্রুদ্ধা হন গৌরী। পরিত্যাগ করেন স্বামীর সঙ্গে পিতৃগৃহ। প্রসিদ্ধ তীর্থ প্রয়াগ অতিক্রম করে, তাঁরা বৃষভবাহনে, দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গার তীরে বারাণসী ধামে উপনীত হন। আশুতোষের আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন সেখানে একটি স্বর্ণনগর, পরিপূর্ণ সুদৃশ্য হর্ম্যরাজিতে। মহা পবিত্র সেই নগর, বাস করেন এসে সেই নগরে কত মহারাজা, কত নৃপতি, কত শ্রেষ্ঠী। পরিণত হয় বারাণসী ভারতের অন্যতম প্রাচীনতম মহাসমৃদ্ধিশালী নগরে, মহাতীর্থে পরিণত হয় কাশীর মণিকর্ণিকাও।

বহুবর্ষ অতিবাহিত হয়, মহাতীর্থ বারাণসীতে কোটি লিঙ্গ স্থাপন করে, পশুপতি কৈলাসে ফিরে যান। আসে দ্বাপর যুগ। কাশীরাজ অধিরোহণ করেন বারাণসীর সিংহাসনে। মহাপরাক্রমশালী তিনি শিবের বরে, মনস্থ করেন গিরিব্রজ ( মগধ ) রাজ মহাশক্তিশালী জরাসন্ধের হত্যার প্রতিশোধ নিতে, হত্যাকারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আঘাত করতে। তাঁকে বার বার যুদ্ধে আহ্বান করেন।

অবগত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ পশুপতির বরের কথা। নিক্ষেপ করেন তিনি তাঁর হস্তে ধৃত সুদর্শন চক্র, দ্বিখণ্ডিত হয় তার আঘাতে কাশীরাজের মস্তক, ভস্মীভূত হয় তার দীপ্তিতে মহাসমৃদ্ধিশালী বারাণসী নগরও।

মহাকুপিত হন পশুপতি, বৃষভারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হন, হস্তে নিয়ে পাশুপত। ভস্মীভূত হয় সুদর্শন চক্রের তেজে তাঁর হস্তের পাশুপতও। ভীত, কম্পিত বৃষধ্বজ তখন পুরুষোত্তমের স্তব-স্তুতিতে নিযুক্ত হন। সন্তুষ্ট হন তাঁর স্তুতিতে পুরুষোত্তম, অবতীর্ণ হন তাঁর সম্মুখে, গরুড়বাহনে, পদ্মাসনে, বনমালায় অলঙ্কৃত হ'য়ে। তাঁর শিরে শোভা পায় মুকুট, কণ্ঠে হার, কর্ণে কুণ্ডল, মণিবন্ধে কেয়ূর। বাম অঙ্কে তাঁর কমলাদেবী, দক্ষিণপার্শ্বে সত্যভামা।

বলেন বাসুদেব, কেন তাঁর এই দুর্গতি? কোন্ সাহসে তিনি ক্ষুদ্র নরের পক্ষ নিয়ে বাসুদেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন?

বিশ্বনাথ স্বীকার করেন তাঁর নিজের দোষ। কৃত অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন। সন্তুষ্ট হন মূলাধার ভগবান। বলেন যেতে হবে তাঁকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে, আম্রকাননে। মহা পবিত্র এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। সেখানে দক্ষিণ-সাগরের তটভূমে, নীল গিরিতে, দেহ চতুষ্টয় ধারণ করে, নীলকান্ত মণিময় বিগ্রহে আমি অবস্থিত। বলেন শ্রীকৃষ্ণ, তবেই স্থায়ী হবে তাঁর গৌরীর সঙ্গে ধরাধামে বাস, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে বারাণসী নগরীও।

আশুতোষ সম্মত হন, বিরাজ করেন এসে আম্রকাননে গৌরীর সঙ্গে, পরিচিত হন ত্রিভুবনেশ্বর নামে, অভিষিক্ত হন কোটি লিঙ্গের রাজ পদে। মহাপবিত্র তীর্থে পরিণত হয় আম্রকাননও।

পুরুষোত্তমের পথে, উপনীত হন এই আম্রকাননে মালবাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন। সঙ্গী তাঁর দেবর্ষি নারদ, পথ-প্রদর্শক সসৈন্যে ওড়রাজ। তিনি দান করেন দেবতার প্রীত্যর্থে বিপ্রগণকে অসংখ্য হস্তী, তুরগ, ধনরত্ন, বসন আর বিভূষণও। বিন্দুসরোবরের পবিত্র জলে স্নান করে, অর্চনা করেন ত্রিভুবনেশ্বরকে ভক্তিভরে। সন্তুষ্ট হন তাঁর অর্চনায় ত্রিভুবনেশ্বর, বলেন—পূর্ণ হবে নৃপতির মনস্কাম; দর্শন হবে নীলমাধব। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও এই ভুবনেশ্বরে এসে শম্ভুকে দর্শন করেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই ভুবনেশ্বরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল উড়িষ্যায় কলিঙ্গের শাসন। অলঙ্কৃত করেন যখন নন্দবংশের নৃপতিরা মগধের সিংহাসন পাটলিপুত্রে, রাজত্ব করেন কলিঙ্গ দেশে মহাপরাক্রমশালী রাজারাও, স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী এই ভুবনেশ্বরের নিকটে তোষলীতে। কলিঙ্গ বিজয়ের পর দীক্ষিত হন মৌর্য-সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মে, পরিণত হন প্রিয়দর্শী, ধর্মাশোকে, লিপিবদ্ধ করেন ভুবনেশ্বরের নিকটে ধউলিগিরি বা ধবলগিরিতে তাঁর অনুশাসন। প্রচারিত হয় বুদ্ধের বাণী শক্তির আর অহিংসার ধবলগিরির শীর্ষদেশ থেকে, পরিণত হয় ধবলগিরি বৌদ্ধ-মহাতীর্থে। আবার এই ভুবনেশ্বরের পূর্বদিকে শিশুপালগড়ে রাজধানী স্থাপন করেন ভারত-বিজয়ী, কলিঙ্গশ্রেষ্ঠ চেৎবংশের

মহাপরাক্রমশালী খারবেল, পরিচিত কলিঙ্গনগর নামেও। বিবাহ হয় চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীরের পিতৃষ্বসার কলিঙ্গনৃপতি জিতারির সঙ্গে। দীক্ষিত হন তিনি জৈনধর্মে। বাস করেন তিনি ভুবনেশ্বরের নিকটে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে। কঠোর তপস্যা করে তিনি লাভ করেন সিদ্ধি, পরিণত হন অর্হতে। পরিণত হয় খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিও জৈনমহাতীর্থে, বাসস্থান কত জৈন শ্রমণের। সেখান থেকে প্রচারিত হয় জৈনধর্ম, হয় মহাবীরের বাণী সারা কলিঙ্গ দেশে। ধবলগিরিতে আর খণ্ড ও উদয় গিরিতে, তার পর্বত শীর্ষে বৌদ্ধ আর জৈনেরা ধর্ম প্রচার করেন। বাস করেন কত শত মুনি ঋষি তার প্রান্তরে, তার বনে-উপবনে, নিযুক্ত থাকেন তাঁরাও কঠোর তপস্যায়। মহাতীর্থে পরিণত হয় ভুবনেশ্বর, রূপ পরিগ্রহ করে এক মহাপুণ্য ভূমির। কেন্দ্রস্থল হয় বিভিন্ন ধর্মের আর সভ্যতার, বিভিন্ন সংস্কৃতির আর কৃষ্টিরও যুগে যুগে। গড়ে ওঠে একে একে এই পুণ্যভূমি ভুবনেশ্বরের বুকে জৈন, বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণব সংস্কৃতি আর কৃষ্টি।

তান্ত্রিক মতাবলম্বী তার কর বংশের নৃপতিরা, তাঁরা নির্মাণ করেন কপালিনীর মন্দির ভুবনেশ্বরে, পূজিত হন সেই মন্দিরে তান্ত্রিক দেবী বিকটাকারা, চামুণ্ডা, শোভিত হয় তার গর্ভগৃহের প্রাচীর-গাত্র সপ্ত মাতৃকা ও আর পনেরটি তান্ত্রিক দেবী-মূর্তি দিয়ে। পরিণত হয় কপালিনীর মন্দির প্রধান তান্ত্রিক পীঠে, তান্ত্রিক মতবাদের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলেও পরিণত হয় ভুবনেশ্বর।

গাড়ী থেকে নেমে, স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি মন্দিরের দিকে। দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ববিখ্যাত লিঙ্গরাজের দেউল, বৃহত্তম ও সুন্দরতম মন্দির ভুবনেশ্বরের। অন্যতম বৃহত্তম ও সুন্দরতম মন্দির ভারতেরও—সহরের কেন্দ্রস্থলে এক মহা মহিমময় মূর্তিতে, উর্দ্ধে তুলে আছে তার ১৬৫ ফুট উচ্চ শির। দাঁড়িয়ে আছে পাঁচশত কুড়ি ফুট দীর্ঘ ও চারিশত পঁয়ষট্টি ফুট প্রস্থ চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে, সঙ্গে নিয়ে আছে কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দিরের সমষ্টি। বেষ্টিত হ'য়ে আছে মন্দিরটি সাড়ে সাত ফুট গভীর সুউচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে। মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য ভিতরের দিকে, প্রাচীরের সংলগ্ন একটি সুউচ্চ মঞ্চও আছে। প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত দেশে ভেট-মণ্ডপ, একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, মিলিত হন এখানে, মহা আড়ম্বরে, লিঙ্গরাজ তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে রথযাত্রা থেকে ফিরে এসে।

দাঁড়িয়ে আছে উত্তরে, দক্ষিণে আর পূর্বে, তিনটি প্রবেশ-দ্বার মন্দিরের। *পরিচিত উত্তরের মহিমময় প্রবেশ-দ্বারটি সিংহদরজা নামে। নির্মিত পীর দেউলের অনুকরণে; বিভিন্ন দ্রাবিড় মন্দিরের প্রবেশ পথের মহামহিম গোপুরমের সঙ্গে; দুইপাশে নিয়ে আছে এই সিংহ দুয়ার দুইটি জীবন্ত, দুর্দ্ধর্ষ সিংহ।*

পূর্ব প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে, একটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আমরা প্রাঙ্গণে উপনীত হই। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মন্দিরের সুউচ্চ মঞ্চে উপস্থিত হই। মন্দিরটি একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বিভক্ত হ'য়ে আছে চারি অংশে। বিমান অথবা দেউল, অভিহিত শ্রীমন্দির নামেও। জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির।

সঠিক জানা যায় না কে এই মন্দিরের নির্মাতা। উল্লিখিত আছে মাদলা পঞ্জীতে, কেশরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা, মহাপরাক্রমশালী যযাতি কেশরী সুরু করেন এই মন্দিরের দেউল আর জগমোহনের নির্মাণ, শেষ করেন সেই নির্মাণ ললাটেন্দু কেশরী, ৬৬৬ খৃষ্টাব্দে। অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা বলেন কেশরী বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা উদ্যোত কেশরী নবম শতাব্দীতে এই মন্দিরের দেউল আর জগমোহনটি নির্মাণ করেন। চোড়গঙ্গ শ্রেষ্ঠ নরসিংহদেব নাটমন্দিরটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নির্মিত হয় ভোগ-মন্দিরটিও, নির্মাণ করেন গঙ্গবংশের অধিনায়ক ভীমদেব, পরিচিত অনঙ্গ ভীমদেব নামেও অলঙ্কৃত করেন তিনি উড়িষ্যার সিংহাসন ১২১১ থেকে ১২৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কপীলেশ্বরদেব দান করেন বহু সম্পত্তি, লিঙ্গরাজের প্রতিদিনের সেবার ও পূজার জন্য। লেখা আছে মন্দিরের অঙ্গের বিভিন্ন শিলালেখে।

পঞ্চরত্ন দেউল—এই বিমানটিই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের বিস্তার করে আছে আধিপত্য সমস্ত ভুবনেশ্বর সহরের উপর, উন্নত করে আছে সুবিশাল স্পর্ধিত, তার গগনচুম্বী মহামহিম শির। গর্ভগৃহে বিরাজ করেন মন্দিরের আরাধ্য-দেবতা শ্রীলিঙ্গরাজ মহাপ্রভুর এক বিশাল শক্তিপীঠ; পূজিত হন শ্রীশ্রীলিঙ্গরাজদেব হরিহররূপে। প্রবর্তন করেন এই হরিহরের পূজা গঙ্গবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবই। নিষিদ্ধ হয় পূর্ব প্রচলিত শুধু হরের পূজা, মহাতীর্থে পরিণত হন লিঙ্গরাজ পবিত্র তীর্থ শৈবদের, পুণ্যতীর্থ বৈষ্ণবদেরও। মিলন হয় এখানে শৈব ও বৈষ্ণবের। আজও প্রতিদিন সমাগত হন এখানে, সহস্র যাত্রী, আসেন কতশত পরিব্রাজকও, ধন্য হন শ্রীভুবনেশ্বরকে পূজা দিয়ে, সার্থক হয় তাঁদের জীবন এই মন্দিরের অঙ্গের সুন্দরতম অলঙ্করণ দেখে।

আমরাও ভক্তিভরে দেবাদিদেব হরিহরকে পূজা দিয়ে, মন্দির দর্শন সুরু করি।

দেখি, বিমানটি একটি প্রস্তরনির্মিত চতুর্ভুজ ভিত্তির ক্ষেত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বিস্তৃত হ'য়ে আছে তার ভিত্তির পার্শ্বদেশ ছাপান্ন ফুট পরিধি নিয়ে। রচিত হয় তলাপত্তনের উপর সাড়ে দশ ফুট দশটি পংক্তি দিয়ে; উঁচু বিমানের জঙ্ঘা, বিভক্ত হয় বাড়, উর্দ্ধ জঙ্ঘা, উর্দ্ধবারাণ্ডি, বন্ধন, নিম্নবারাণ্ডি ও নিম্নজঙ্ঘাতে। উর্দ্ধজঙ্ঘার উপরে কনক পাগের অঙ্গও রচিত হয় একের পর এক অনুরূপ অনুভূমিক ক্রমহ্রস্বায়মান সারি, উপনীত হয় একশ পঁচিশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত গ্রীবা বা বেকীতে পর্যন্ত। গ্রীবার উপর সুবিশাল *বৃত্তাকার শিরাযুক্ত আমলক-শিলা, স্কন্ধে নিয়ে আছে সিংহ। তার উপরে কলস। কলসের উপরে শোভা পায় ত্রিশূল, শিবের প্রতীক।*

বাড়ের শীর্ষদেশে, পাগের অঙ্গেও রচিত হয় একের পর এক অনুরূপ নয়টি অনুভূমিক সারি। তার উপরে একটি রেখ দেউল, ক্ষুদ্র সংস্করণ তার নিজের। রেখ দেউলের উপর ছয়টি অনুরূপ সারি, তার উপরে আর একটি রেখ দেউল। তার উপরে চারিটি সারির উপর আরও একটি রেখ দেউল। আবার একটি সারির উপর একটি একটি রেখ দেউল। ক্রমহ্রস্বায়মান এই রেখ দেউলগুলিও স্পর্শ করে বিমানের গ্রীবা। রেখের বারাণ্ডির অঙ্গে শোভা পায় একটি লক্ষ্মীমূর্তি।

অনুরূপ অনুভূমিক পংক্তি দিয়ে জঙ্ঘার উপরিস্থিত রাহুপাগের

অঙ্গও শোভিত হয়। রাঢ়ের শীর্ষদেশে, উদগত শিলাখণ্ডের উপর পদ্মভো বিরাজ করেন, দুইপার্শ্বে নিয়ে দুইটি সিংহ। তার একটি সিংহ, মহাশূন্যে লম্বিত তার দেহ। জগমোহনের বিপরীত দিকের রাহপাসের অঙ্গে, ষষ্ঠ ভূমিতে একটি অপরূপ সিংহ।

জঙ্ঘার কেন্দ্রস্থলে শোভা পায় উন্নম্ব বন্ধনী, বন্ধনীর শীর্ষদেশে ক্ষুদ্রতর দেউল। অঙ্গে নিয়ে আছে এই দেউলের গাত্র মূর্তিসম্ভার। সুস্পষ্ট নয় এই মূর্তিগুলি, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের নির্মম হস্তে।

দাঁড়িয়ে আছে বিমানের তিন দিকে—দক্ষিণে, উত্তরে আর পশ্চিম কেন্দ্রস্থলের সুগভীর কুলুঙ্গির সন্নিকটে তিনটি দ্বিতল মন্দির। এই তিনটি কুলুঙ্গিতে পার্শ্ব দেবতারা বিরাজ করেন। তাঁদেরই মোহন এই মন্দিরগুলি শীর্ষে নিয়ে আছে বিমান। স্পর্শ করে আছে পীঠের নিম্নতল, কুলুঙ্গির শীর্ষদেশ। অভ্যন্তর ভাগে গর্ভগৃহ, সেই পার্শ্ব-দেবতারা বিরাজ করেন। খুব সম্ভব পরবর্তী কালে নির্মিত।

অপরূপ সুন্দরতম এই কুলুঙ্গির ভিতরের পার্শ্বদেবতার মূর্তিগুলি, শ্রেষ্ঠদান উড়িষ্যার ভাস্করের, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের। পরিদৃশ্যমান তাঁদের অঙ্গের বহুমূল্য, সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত বসনের প্রতিটি ভাঁজ।

পশ্চিমের কুলুঙ্গির ভিতরে, গর্ভগৃহের পিছনে এক বৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ময়ূর-বাহনে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় বহুমূল্য রত্ন-খচিত হার, বাহুতে বাজু। জীবন্ত এই ময়ূরটিও, বিস্তৃত তার পুচ্ছ। শোভিত পদ্মের সম্মুখভাগ ও সূক্ষ্মতম লতাপুষ্প দিয়ে। তাঁর দুই পাশে ক্ষুদ্র দেবতারা দাঁড়িয়ে আছেন। ঊর্দ্ধে দুই উড়ন্ত অপ্সরা, হস্তে নিয়ে মালা। পটভূমিতে কীর্তি মুখের, মুখগহ্বর থেকে বিলম্বিত মুক্তার ঝালর।

উত্তরের কুলুঙ্গির ভিতর প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর সিংহের অঙ্গে হেলান দিয়ে চতুর্ভুজা পার্বতী দাঁড়িয়ে আছেন। নিবদ্ধ দেবীর আননে সিংহের দৃষ্টি, তাঁর দুইপাশে অন্য দেবীরা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের পাশে দুই বাদকের দল—কেউ করতাল বাজান, কেউ ডমরু, কেউ বীণা। ঊর্দ্ধে মালা হস্তে দুই অপ্সরা। পটভূমিকায় এক সুবিশাল কীর্তিমুখ। দেবীর কণ্ঠে শোভা পায় মালা, বাহুতে বাজু, মণিবন্ধে কঙ্কণ, বামপদে মল, অঙ্গে কারুকার্যখচিত সূক্ষ্ম বসন। অপরূপ এই মূর্তিটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে!

দক্ষিণের কুলুঙ্গির ভিতরে লম্বোদর, চতুর্ভুজ দেবতা গণেশ দাঁড়িয়ে আছেন, পার্শ্বে নিয়ে আছেন বাহন মূষিক, আর একটি ঝালরযুক্ত কুঠার। সর্পাকৃতি তাঁর পদের ভূষণ, সর্পাকৃতি তাঁর অঙ্গের যজ্ঞোপবীতও। অপরূপ এই মূর্তিটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের দেখি স্তব্ধ হয়ে। দেখি বারাণ্ডির অঙ্গের কুলুঙ্গির ভিতর দিকপতিদের মূর্তিও। দেখি, মেষবাহনে অগ্নি, সামনে নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। কুলুঙ্গির ভিতর থেকে ইন্দ্রের মূর্তিটি অপসারিত হয়েছে। অবশিষ্ট আছে শুধু বিভিন্ন জন্তুর মূর্তি, ঐরাবত, মূষিক, ময়ূর ও আরও অনেক জন্তু। দেখি, মহিষ-বাহনে যম। দেখি, একটি পদ্মের উপর বসে আছেন নৈঋত। মকর-বাহনে বরুণ, মৃগবাহনে পবন, বৃষবাহনে ঈশান আর কুবেরকেও দেখি।

গর্ভগৃহে বিরাজ করেন বিশালকায় দেবতা লিঙ্গরাজ। ঊনিশ ফুট স্কোয়ার এই গর্ভগৃহটির পরিধি, ক্রমশীর্ণায়মান হ'য়ে চিমনির আকারে ঊর্দ্ধে উঠে তার ছাদ। দেবতাকে ভক্তিভরে পূজা দিয়ে, তাঁর মস্তক স্পর্শ করে, জগমোহনে উপনীত হই। পরিচিত জগমোহন পীঢ়া দেউল নামেও। সমসাময়িক শ্রী দেউলের, বিস্তৃত হ'য়ে আছে জগমোহন বাহাত্তর ফুট দীর্ঘ ও ছাপান্ন ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, উন্নত করে আছে একশ ফুট উঁচু শির। চৌত্রিশ ফুট উঁচু তার বাড়ও, বিভক্ত হয়ে আছে পাঁচটি ভাগে—ঊর্দ্ধ-জঙ্ঘা, ঊর্দ্ধ-বারাণ্ডি বন্ধন, নিম্ন-বারাণ্ডি আর নিম্ন-জঙ্ঘাতে, অনুরূপ বিমানের বাড়ের। চতুষ্কোণ বাড়ের শীর্ষদেশে, ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠে যায় জগমোহনের গর্ভগৃহের ছাদ ও ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডের আকৃতিতে, শীর্ষে নিয়ে আমলক শিলা আর চূড়া। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখি তার সুমহান রূপ। দক্ষিণ প্রবেশপথে উপনীত হই।

শোভিত হ'য়ে আছে প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশ লক্ষ্মীর মূর্তি দিয়ে। নাই নবগ্রহের মূর্তি, নাই কোন শিল্প-সম্ভার উদগত অংশের অঙ্গেও। উদ্‌গত অংশের আর লক্ষ্মীর মূর্তির মাঝখানে পাড়ের অঙ্গে, মূর্তি দিয়ে কত পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়। দেখি, দাঁড়িয়ে আছে বৃক্ষের নীচে, দুইটি বিবসনা, পীনোন্নত-বক্ষা পরমা রূপবতী নারী মূর্তি দ্বারের দক্ষিণ পাশে। বাম পাশেও একটি। দেখি প্রথম পীঢ়া আর উদগত অংশের মধ্যবর্তী স্থান তিনটি ক্ষুদ্র রেখ দেউল দিয়ে অলঙ্কৃত। উদত স্তম্ভের আর রেখ দেউলের মাঝখানে চারিটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দুইটি নর ও দুইটি নারী।

দেখি একটি বাতায়ন, রচিত পাঁচটি স্তম্ভ দিয়ে! ভূষিত এই স্তম্ভের অঙ্গও কত অপরূপ উলঙ্গ নারীর মূর্তি দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে নারী বৃক্ষের নীচেও, অনবদ্য বিভিন্ন ভঙ্গীতে। দেখি স্তব্ধ হয়ে, উড়িষ্যার ভাস্করের এক সুন্দরতম সৃষ্টি। অলঙ্কৃত হয়ে আছে বাতায়নের চারিদিক তিনটি করে বন্ধনী দিয়ে, বুকে নিয়ে আছে প্রথম দুইটির অঙ্গ ঝালর, তৃতীয়টির অঙ্গে শোভা পায় কত জন্তুর মূর্তি, অস্পষ্ট কালের করালে।

শীর্ষে নিয়ে আছে দুই পাশের উদগত স্তম্ভ, সুন্দরতম বামনের মূর্তি, নিযুক্ত তারা পীঢ়া উত্তোলনে। প্রথম পীঢ়া আর নিম্নতম পীঢ়ার মধ্যবর্তী স্থানেও রচিত হয় তিনটি ক্ষুদ্র রেখ দেউল। অপরূপ, সুন্দরতম প্রান্তদেশের উদগত স্তম্ভের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, ভূষিত ঝালর ও জন্তুর মূর্তি দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে হস্তীযূথ নিম্নতম পীঢ়ার নিম্নাংশে। দেখি অঙ্গে নিয়ে আছে পিরামিড অংশ একের পর এক নয়টি পীঢ়া, তার উপর একটি প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠের উপর আবার অনুরূপ সাতটি পীঢ়া, তার উপর বেঁকী। রচিত হয় পীঢ়ার গাত্রে মূর্তি দিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য। যুদ্ধ করেন পদাতিক সৈন্যগণ, হস্তে নিয়ে অসি আর ধনুর্বাণ। দেখি অশ্ব আর হস্তীও, কেউ পৃষ্ঠে নিয়ে আরোহী, কেউ আরোহী-বিহীন, ভূষিত তাদের অঙ্গ বহুমূল্য ভূষণে।

দেখি, চতুর্থ পীঢ়ার অঙ্গে রচিত কয়েকটি উদগত ক্ষুদ্র পীঢ়া দেউল, তাদের ফাঁকে ফাঁকে কপাট। ঊর্দ্ধে উদগত শিলার উপরে জগমোহনের সিংহ, বীর বিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরের একটি কপাটের অঙ্গে শোভা পায় একটি শিবলিঙ্গ। তাঁর সামনে উপবিষ্ট দুই পূজারী, নিযুক্ত শিবপূজায়। দক্ষিণের ছয়টি কপাটের অঙ্গে, মূর্তি দিয়ে বর্ণিত হয় রামায়ণের ও মহাভারতের কাহিনী। দেখি

মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন পাণ্ডবগণ। অপরূপ এই দৃশ্যটি, নিখুঁত। নিম্নের দক্ষিণের কপাটের অঙ্গেও চারিটি মূর্তি। তাদের মধ্যে দুজনের হস্তে শোভা পায় ধনুর্বাণ। রাম আর লক্ষ্মণ তাঁরা। লঙ্কেশ রাবণের কারাগার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন সীতাদেবীকে। সংগে আছেন একজন পরিচারিকা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

জগমোহন দেখে, আমরা নাটমন্দির দেখ্‌তে যাই। দাঁড়িয়ে আছে আড়াই ফুট উঁচু ভিত্তির উপর। উনিশ ফুট তার বাঢ়ের উচ্চতা। ক্রমে নিম্ন হয়ে আসছে তার নয়টি খিলান যুক্ত ছাদ। নাই শীর্ষদেশে শ্রী, আমলক, কলসও নাই। বাহান্ন ফুট স্কোয়ার চতুষ্কোণ এই নাটমন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে চারিটি সমকোণী স্তম্ভ। দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি প্রায় দু'ফুট উঁচু চতুষ্কোণ স্তম্ভমূলের উপর, নাই তাদের অঙ্গে কোন শিল্প সম্ভার।

দেখি বিভক্ত হয়ে আছে শিখারা দশটি বন্ধনী দিয়ে, তাকের অঙ্গে রচিত হয়েছে ক্ষুদ্র দেউলের শ্রেণী।

দেখি, নাট-মন্দিরের প্রতিটি প্রাচীরের পাশে তিনটি করে দ্বার। পূর্বদিকের দ্বার দিয়ে ভোগমণ্ডপে উপনীত হতে হয়, পশ্চিমের দ্বার দিয়ে জগমোহনে, সংযুক্ত উত্তর পূর্ব দ্বার দেবতার বাহন বৃষভের মন্দিরের সঙ্গে। দেখি, উত্তর দ্বার দক্ষিণের কেন্দ্রস্থলের দ্বারের তাকের উপর নবগ্রহের মূর্তি। তাদের উপরে বেতাল আর লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছে চারিটি যৌবন মদোম্মত্তা পরমা সুন্দরী নারীও। তাকের উপরে। তাদের উপরে দুই কপাটের অঙ্গে দুই বেতাল, নিযুক্ত নাটমন্দির উত্তোলনে। নাই কোন কারু-কার্য দ্বারের পার্শ্বদেশে, নাই শীর্ষদেশেও কোন শিল্পসম্ভার, নাই নাট-মন্দিরের গাত্রেও, সমৃদ্ধিশালী নয় ভাস্করের হস্তের স্পর্শে। দেখি অলঙ্কৃত বাজুর অঙ্গও কত মূর্তি দিয়ে, মূর্তি কত নর ও নারীর। অশ্লীল এই মূর্তিগুলি, অশোভনও দ্বারের বাজুর অঙ্গে। দেখি, পীঢ়া দিয়ে অলঙ্কৃত উত্তর দিকের কেন্দ্রস্থলের দরজাটির দুই পাশ। বিষ্ণু আর শিব দাঁড়িয়ে আছেন, দুই দ্বারে, প্রহরী তাঁরা মন্দিরের।

সেখান থেকে, ভোগমণ্ডপে উপনীত হই। সমসাময়িক নাট-মন্দিরের তিন ফুট উচ্চ মঞ্চের উপর ভোগমণ্ডপটি দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ষে নিয়ে আছে কলস, কর্পূরী, শ্রী আর বেঁকী। মঞ্চের পাত্রে, খোদিত দুই সারিতে পীঢ়া আর স্তম্ভ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে মূর্তি—মূর্তি কত নর আর নারীর, আছে তারা বিভিন্ন আর বিচিত্র অশ্লীল ভঙ্গীতে, ভঙ্গি কত মৈথুনের। চতুষ্কোণ ভোগমণ্ডপটি অধিকার করে আছে ছাপান্ন ফুট আড়াই ইঞ্চি স্কোয়ার পরিধি। সাড়ে বিয়াল্লিশ ফুট স্কোয়ার তার ভিতরের আয়তন। বাঢ়ের উচ্চতা সাড়ে তের ফুট।

রচিত হয়েছে দুইটি কারুকার্যবিহীন গবাক্ষ ভোগমণ্ডপের পূর্বদিকের সম্মুখ ভাগে, কেন্দ্রস্থলের দ্বারের দুইপাশে, দুইটি করে উত্তর আর দক্ষিণের সম্মুখ ভাগেও।

ভোগমন্দির দেখে, আমরা সোপান অতিক্রম করে, একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হই। বুকে নিয়ে আছে এই কক্ষটি একটি লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি। কালাপাহাড় ধ্বংসে পরিণত করেছেন এই মূর্তিটিকে, অঙ্গে নিয়ে আছে মূর্তিটি তাঁর অত্যাচারের চিহ্ন।

ভোগমন্দিরের বিপরীত দিকে, দু'ফুট মঞ্চের উপর সাত ফুট ব্যাস বিশিষ্ট এক প্রস্তরস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভ বৃষ আর গরুড়, বাহন শিবের আর বিষ্ণুর, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী যুগ্ম দেবতা হরিহরের। দ্রাবিড়স্থানে, শীর্ষে নিয়ে থাকে এই স্তম্ভ শুধু বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্তি; বিষ্ণু-মন্দিরের বিপরীত দিকে। শৈব-মন্দিরে বসে থাকেন বৃষ বা নন্দী, শিবের বাহন, মন্দিরের বিপরীত দিকে, গর্ভগৃহে বিরাজিত দেবতার দিকে মুখ করে।

সেথান থেকে নাটমন্দিরের ভিতর দিয়ে আমরা বৃষভের মন্দিরে উপনীত হই। একটি পীঢ়া দেউল, ক্ষুদ্রতর নির্মিত এই মন্দিরটিও পরবর্তী কালে। বুকে নিয়ে আছে তার গর্ভগৃহ একটি উপবিষ্ট মহামহিমময় বৃষভের মূর্তি। অপরূপ, জীবন্ত এই মূর্তিটি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে।

বার হ'য়ে এসে ঘুরে ঘুরে দেখি বিমানের অঙ্গের শিল্পসম্ভার। রচিত হয় স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ তার দক্ষিণের সম্মুখভাগে, পূর্বদিকের সম্মুখভাগের গাত্রেও হয়। তার কপাটের অঙ্গে একটি সূর্যদেবতার মূর্তি খোদিত। চার-অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে অগ্রসর হন দেবতা সবিতা, সঙ্গে নিয়ে সারথি অরুণ। উত্তরদিকের সম্মুখভাগের বাহুপাসের অঙ্গে কয়েকটি বিষ্ণুর মূর্তি দেখি। পশ্চিমদিকের সম্মুখ-ভাগে, গবাক্ষের দুই পাশে, দুই কপাটের অঙ্গে দুইটি ময়ূর-বাহনে চতুর্ভুজ কার্তিকেয়র মূর্তি দেখি। হস্তে নিয়ে আছেন দেব-সেনাপতি খড়গ, কমণ্ডলু, ত্রিশূল আর ডমরু।

সেথান থেকে গোয়ালিনী মন্দিরে যাই। দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি জগমোহনের উত্তরদিকে, অঙ্গে নিয়ে আছে তার শীর্ষদেশের গম্বুজ বহু উদগত স্তম্ভ। অনুরূপ এই মন্দিরটির শীর্ষদেশ, বিমানের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত সাবিত্রীর মন্দিরের শীর্ষদেশের। দেখি, একে একে লক্ষ্মী-নৃসিংহ, বিশ্বকর্মা, সাবিত্রীদেবী, চণ্ডেশ্বর, নিশাপার্বতী ও একাম্রেশ্বরের মন্দির। তারপর ভাগবতীর মন্দিরে উপনীত হই। পরিচিত পার্বতীর মন্দির নামেও, দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি উত্তর-পশ্চিম কোণে, নির্মিত হয় পরবর্তী কালে। ক্ষুদ্রতর সংস্করণ লিঙ্গরাজের মন্দিরের, বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির। অঙ্গে নিয়ে আছে অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্করণ, সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার ও জীবন্ত মূর্তিসম্ভার—শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার স্থপতির আর ভাস্করের, প্রতীক তাঁদের শাশ্বত কীর্তির। দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে তার অঙ্গের পুষ্পঝালর। পুষ্পের ফাঁকে ফাঁকে খোদিত হয় কত অনুপম মূর্তি, মূর্তি কত দেবদেবীর। অপরূপ শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত তাদের কুলুঙ্গির অঙ্গের চন্দ্রাতপ, কিন্তু নাই তাতে দিকপতিদের মূর্তি, অপসারিত হয়েছে সেগুলি অত্যাচারীর নির্মম হস্তে, ধ্বংসে পরিণত হয়েছে কিছু কালের করালেও। গর্ভগৃহে দেবী পার্বতী পূজিতা হন। অপরূপ এই দেবীর মূর্তিটিও বিস্ময় জাগায় মনে। ভক্তিভরে দেবীকে প্রণতি জানাই।

শ্রদ্ধা নিবেদন করি উড়িষ্যার মহা অভিজ্ঞ স্থপতি আর মহা পারদর্শী ভাস্করকে, যাঁরা নির্মাণ করেন এই মহামহিমময় লিঙ্গরাজের মন্দির, সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির ভারতের, প্রকৃষ্টতমও, জানাই তার নৃপতিদেরও, অমর তাঁরা ইতিহাসের পাতায়। অমর ভুবনেশ্বরও, বুকে নিয়ে আছে লিঙ্গরাজ। ফিরে আসি পাণ্ডার গৃহে, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও হয়নি ম্লান, অক্ষয় হয়ে আছে মনের মন্দিরে।
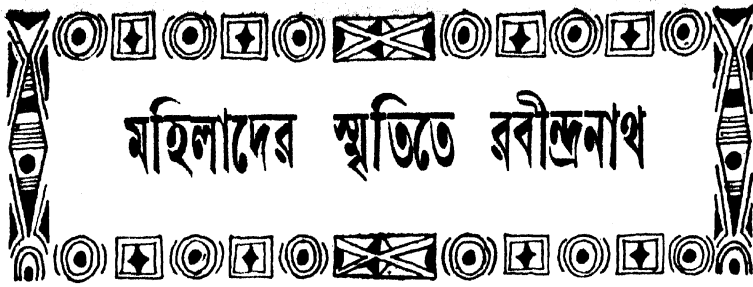
# মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ

**অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়**

( ১১ )

অকস্মাৎ দেখা হল শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী হাসির সঙ্গে। তার স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে পাওয়া গেল, দু-এক কুচি মণি-মুক্তা!

১৩৩২ সালে হাসি এসেছে আশ্রমের প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীতে যোগ দিতে। ভর্তি হওয়ার হাঙ্গাম চুকে গেল, সে একটি বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদেব-সাক্ষাত-মানসে গেল,—উত্তরায়ণে। বয়স তখন তাঁর সত্তরের ঊর্দ্ধে, সুদীর্ঘ দেহযষ্টি ঈষৎ বঙ্কিম, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ,—ততোধিক উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি বিশাল চক্ষু!

দ্বার অবারিত, মেয়ে দুটি ভীরুপায়ে ভিতরে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় গুরুদেব সকল কাজ ফেলে সাদরে বসিয়ে তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ সুরু করলেন। নবাগতা ছাত্রীটিকে তার পৈতৃক বাসস্থান ও অন্যান্য নানা কথা জিজ্ঞাসা করে, পূর্ববাংলার অধিবাসিনী শুনে একটু হেসে বললেন,—'দেখেছ মজা,—পদ্মার এপারের কেউ এখানে আসে না; তা তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে, থাক এখানে।'

দিন গড়িয়ে যায়, হাসি সমবেত কণ্ঠের গানের দলে স্থান পেল। চলছে 'শাপ-মোচন' অভিনয়ের মহড়া। গুরুদেব নিজে সকলকে তালিম দিচ্ছেন,—এ হেন সময়ে হাসির আঙুলে বুনোকুলের কাঁটা ফুটে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড!

শান্তিনিকেতনের অবারিত মাঠে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বুনো কুলের ঝোপ; গাছগুলি বড় কুলগাছের অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ,—ফলগুলিও তাই। হাতখানেক উচ্চ বামন-বৃক্ষের ফলগুলো ক্ষুদ্রতায় মটরদানার সমকক্ষ,—পেকে লাল হয়ে যখন গুচ্ছে গুচ্ছে ঝুলতে থাকে, তখন শোভা হয় বিচিত্র, কিন্তু আস্বাদনে কটু, তিক্ত, কষায়, মিষ্টি, কী যে এতে নেই তা বলা যায় না,—তবে ছোটদের আকর্ষণ করে তীব্রভাবে। সেই আকর্ষণে পড়েই বান্ধবীসহ হাসির এ দশা! দলের অন্যান্য বান্ধবীরা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে 'সেফটিপিন' দিয়ে কাঁটা তুলে দিল, কিন্তু ফল হল সাংঘাতিক! আঙুল বিষিয়ে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে গেল হাসপাতালের বড় ডাক্তার, বিখ্যাত শিল্পী ৺রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দাদা জিতেন চক্রবর্ত্তীর কাছে। তিনি হাতের অবস্থা দেখে ছুরি চালালেন; যন্ত্রণার একটু লাঘব হল, কিন্তু সেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ফোলা হাত নিয়েই অভিনয় দলের সঙ্গে হাসি এলো যোড়াসাঁকোয় ঠাকুর-বাড়ীতে। কলকাতার 'এম্পায়ার' রঙ্গমঞ্চে গুরুদেবের উপস্থিতিতে 'শাপ-মোচনের' প্রথম অভিনয় হবে, তাই তাদের এখানে আগমন।

হঠাৎ গুরুদেবের দৃষ্টি পড়ল হাসির হাতে,—ব্যাপার কী? সব শুনে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করলেন, ছুরি চালনার জন্য। তৎক্ষণাৎ নিজের বায়োকেমিক ওষুধের বাক্স খুলে হাসির আঙুলের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন।

তাঁর হোমিওপ্যাথী ও বায়োকেমিক চিকিৎসায় ছিল অগাধ বিশ্বাস; যিনি অস্ত্রোপচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তাঁরই অমূল্য জীবন-দীপ এক ফুৎকারে নিভে গেল ডাক্তারী ছুরির নির্ম্মম আঘাতে!

( ১২ )

স্বর্গীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রাচীনতম শিক্ষকদের একজন ছিলেন। তিনি জ্ঞান-যোগী তপস্বী, সমস্ত জীবন অতি সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করে, প্রায় নব্বুই বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের কঠোর জ্ঞান-চর্চ্চার ফল, ১০৫ খণ্ডে সমাপ্ত বঙ্গীয় শব্দ (কোষ) ও তৎসঙ্গে নিজের দুটি চক্ষুরত্ন স্বদেশবাসীকে দান করে অমর হয়েছেন। মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন প্রায় শতায়ুর নিকটে এসে দেহ রক্ষা করেন, তখনও তাঁর অশীতিপরা সহধর্ম্মিণী জীবিতা। তিনি আজও গুরুপল্লীর প্রান্ত দেশে, বিশ্বভারতীর ছোট একখানা বাড়ীতে বাস করছেন। পুত্র সন্তান না থাকাতে দু-একটি কন্যা সব সময়ই তাঁর নিকটে থাকেন; কালের স্পর্শে তাঁরাও বৃদ্ধত্বের কোঠায় এসে পৌছে গেছেন।

সুযোগ পেয়ে গেলাম তাঁর কাছে পুরোণো কথা শুনতে। বয়সের ভারে যদিও মেরুদণ্ড ধনুকাকৃতি, দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ, তবুও অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়গুলিই এ বয়সেও বেশ সজাগ ও সুতীক্ষ্ণ।

তিনি বলেন,—হরিচরণবাবু যখন এখানে শিক্ষকরূপে আসেন, তখন সবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পত্তন হয়েছে, ছাত্র ছিল মোটে ছয়টি। সমবায় রন্ধনশালায় আহার ও জীর্ণ পাতার কুটীরে বাস,—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—এই করেই তাঁর এ প্রান্তরে দশ বৎসর কেটে গেল; তখনও পরিবার নিয়ে বসবাস করার উপযুক্ত বাড়ীঘর এখানে মোটেই হয়নি, গুরুপল্লী কিংবা অন্যকোন পল্লীই তখনও গড়ে ওঠেনি। মা জননী কন্যাসহ দেশেই ছিলেন। হরিচরণবাবু এখানে আসার প্রায় বছর দশেক পরে, কিছু বাড়ী ঘর তৈরী হওয়ায় তিনি এখানে আসেন ও সেই থেকে এখানেই আছেন। অবশ্য তখনকার বাড়ীগুলো সবই ছিল মাটির।

তখনকার শান্তিনিকেতন ও গুরুদেবের কথা জানতে চাওয়ায় বললেন,—শান্তিনিকেতনের অল্প কয়েকটি শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য সকলের ভিতরে তখন হৃদ্যতা ছিল প্রচুর; অন্তরের যোগে মনে

হত সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত। সে জিনিষটি এখন আর এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। গুরুদেব থাকতেন দেহলিতে, তাঁর সকলের সঙ্গেই ব্যবহার ছিল একেবারে সমান, সে স্বভাবে তারতম্য বলে জিনিষটির কোন স্থান ছিল না

তাঁরা ছিলেন সে কালের পর্দ্দানশিনা কুলবধূ। দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে শান্তিনিকেতনের অবাধ উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে এসে পর্দ্দার আবরণ আপনি উন্মুক্ত হল। তবুও মাঝে মাঝে লজ্জিত, সঙ্কুচিত ভাবে গুরুদেবের দর্শনে গেলে, তিনি অতি সহজ ভাবে তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়া কথা আলাপ করতেন ও সমাদর করে কুশল প্রশ্ন করতেন। তাঁর নিকটে যাবার জন্য কারও কোনো সময় কিংবা বিধি নিষেধের গণ্ডী পার হতে হত না। একদিন তিনি গুরুদেবের বৈকালিক জলযোগের সময় উপস্থিত হয়ে একটু অপ্রভিত ভাবে ফিরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পশ্চাতে তাঁর ক্ষীণ পদশব্দ গুরুদেবের কান এড়ায় নি, পিছন ফিরে, 'আরে তুমি চলে যাচ্ছ কেন? এসো এসো,' বলে সমাদর করে ডেকে এনে সামনে বসালেন ও বললেন, 'আমি খাচ্ছি বলে তোমার অত লজ্জা কেন? এই দেখ, তোমার সামনে আমি খাব, আমার একটুও লজ্জা করে না।'

একবার কোন ইংরাজ শাসনকর্ত্তা অথবা সেইরূপ পদস্থ কোন মাননীয় ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। মা জননী সে উৎসবে গুরুদেবকে গরদের ধুতি চাদরে সুসজ্জিত দেখে মুগ্ধ হন।

পরে একদিন গুরুদেবকে বলেছিলেন,—'সেদিন ধুতি চাদরে আপনাকে যা সুন্দর লেগেছিল, তা বলা যায় না; কেন আপনি ধুতি পরেন না, ওতে আপনাকে চমৎকার মানায়!

গুরুদেব হেসে বললেন, তোমরা ত আমাকে ঐ রকমই বাড়িয়ে বল। ধুতি পরব কি? কতল্যাঠা—কে কোঁচায়, কে পাট করে, ঐ সব দুঃখেই ত বালিশের ওয়াড়গুলো পরে থাকি,—বলে কী প্রাণ খোলা হাসি!

## ( ১৩ )

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা প্রেমবালা মজুমদার কিছুকাল যাবত শান্তিনিকেতন-বাসিনী। তিনি এখানকার প্রবীণাদের অন্যতমা,—সকলেরই স্নেহময়ী মাসীমা, আলাপিনী-মহিলা-সমিতির বর্ত্তমান সভানেত্রী,—বয়স যদিও সত্তরের কোঠায়, তবুও অত্যন্ত কর্ম্মঠা, স্বাবলম্বিনী, সাহসী ও ধর্ম্ম-পরায়ণা। মাসীমা মহাত্মা গান্ধীর একজন বিশিষ্ট ভক্তও; কিছুকাল সেবাগ্রামে থেকে মহাত্মার সান্নিধ্যে ও অনুপ্রেরণায় সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ!

তাঁর নিকট গুরুদেব সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়ায় বললেন,—একবার শৈশবে তাঁর ১৩ বৎসর বয়সে যুবক রবীন্দ্রনাথকে দেখার ও তাঁর গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। উপলক্ষ্য—মহর্ষি দেবের ৮৩ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। শৈশব-স্মৃতিতে মাসীমার মনে মহর্ষিদেবও উজ্জ্বল,—অপূর্ব্ব শ্বেত-কান্তি, দেব-কল্প ঋষি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জন্মতিথির সেই বিশেষ দিনটিতে, যে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিল, তাকেই একখানা করে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রণীত 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামক পুস্তক বিতরণ করেন। সেখানেই মাসীমা গুরুদেবের কণ্ঠে প্রথম তাঁর নব-রচিত, 'জানি হে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপা-তরণী' গান খানা শুনলেন। অতি সুললিত কণ্ঠ, মাসীমার এত মধুর লেগেছিল যে, বললেন ওরকম কণ্ঠস্বর শোনা যায়না।

বহুকাল পাঞ্জাব প্রদেশে বাস করে, জীবনের বহু ঝড় দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে, শেষ জীবনে ১৯৪০ সালে দুটি ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য মাসীমা এসে শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে বাস আরম্ভ করেন।

গুরুদেবের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালিনী মাসীমার জ্যেষ্ঠ কন্যা সুচেতা কৃপালিনীর আত্মীয়া ও পূর্ব্ব-পরিচিতা, সেই সূত্রে তাঁর এখানে প্রথম অবস্থান, নন্দিতার বাড়ীতে। নন্দিতার সঙ্গেই তিনি জীবন-সায়াহ্নে গুরুদেবের সন্নিকটে গিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য—দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা পুত্র-কন্যার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ভর্ত্তি।

গুরুদেবও তখন অস্তরবির মতই ভাস্বর ও জ্যোতির্ম্ময়; সব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছেলে মেয়েদের কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আছে কি?' মেয়েটির গলা ভাল,—গান শিখতে চায়, ও ছেলেটি নাচ শেখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল, শুনে খুসী হয়ে বললেন, 'বেশ বেশ, এসব দিকে ঝোঁক না থাকলে, শান্তিনিকেতনে পড়তে আসার কোন সার্থকতা নেই।'

ভর্ত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে এসে কোথায় আছ?' নন্দিতার বাড়ী শুনে স্মিত হাস্যে বললেন, 'বুড়ীর বাড়ী? তাহলেই হয়েছে,—আমাদের নিন্দে না করিয়ে ছাড়বে না দেখছি!' আদরিণী দৌহিত্রীকে একটু রাগাবার কি তামাসার সুযোগের সদ্ব্যবহারে তিনি ছিলেন সুপটু।

এর কিছুদিন পর থেকেই গুরুদেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৎসরাধিককাল রোগ ভোগের পর যখন তাঁকে শেষ সময়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, সে দিনটি মাসীমার মনে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে।

যাত্রার দিনটিতে কিছুক্ষণ আগে থেকেই আশ্রম-বাসীতে উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণ পূর্ণ হয়ে গেল,—এর মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, কেউ বাদ গেলেন না। দুধারে ক্রন্দনরত জনতার মধ্যে দিয়ে, আরাম-কেদারায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় রোগীকে এনে তোলা হল, শান্তিনিকেতনের বাসটিতে। গুরুদেব ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছছেন,—মাসীমার নিকটে শুনলাম, সেই শেষ সময়কার রোগজীর্ণ শরীরেরও কি অলৌকিক সৌন্দর্য্য! একটি মানবদেহে এত রূপ ও এত গুণ, এ যেন অচিন্তনীয়!

সকলে একে একে এসে পদধূলি মাথায় নিল। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে ধীরে ধীরে বললেন, ভেবেছিলাম, শান্তিনিকেতনে শান্তিতে মরব,—তা আর ওরা হতে দিল না। সমবেত সকলকে বললেন, 'শান্তিনিকেতন' গান খানা গাইতে,—সকলে সমস্বরে নত মস্তকে গানটি গাওয়ার পর, ধীরে ধীরে জনতা ভেদ করে শান্তিনিকেতনের প্রাণ, আশ্রমবাসী সকলের স্নেহময় পিতা, রাজর্ষি মহামানবকে চিরদিনের মত চক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য করে যন্ত্র-যান বোলপুর ষ্টেশনের পথে অগ্রসর হল।

## ( ১৪ )

পুরোনো কথা শুনতে হলে ঠানদিকে ধরাই চিরাচরিত প্রথা। সেইজন্য শান্তিনিকেতনের ঠানদির পেছনে ঘুরতে লাগলাম। ঠানদি বললেই যে চিত্রটি মনের মধ্যে ফুটে ওঠে, যেমন,—পাকাচুল, লোলচর্ম্ম,

দন্তহীনতা, নাতি-নাতনি-পরিবেষ্টিতা হয়ে গল্প করা ভিন্ন অন্য কর্ম্মে অক্ষম,—এ ঠানদি কিন্তু মোটেই সেরকম নন,—বরং তার বিপরীত; বয়স হলেও শক্ত, সমর্থ, কর্ম্মঠ।

তাঁর 'ঠানদি' নামকরণ হয়েছিল শুনেছি বহুদিন পূর্ব্বে, তাঁর খুবই কম বয়সে। এখানকার প্রাচীন শিক্ষক বিদ্বান, গুণী, বাগ্মী স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়, গুরুদেবের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে আসেন ১১০৮ সালে,—এখন থেকে ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে। তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া কিরণ বালা সেনও তার হু'এক বছর বাদে স্থায়িভাবে এখানে আসেন, ও সেই থেকে এখনও পর্য্যন্ত এখানেই বাস করছেন।

মাত্র বৎসর দুই পূর্ব্বে পরিণত বয়সে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ক্ষিতিবাবু জাগতিক নশ্বর দেহ ত্যাগ করে আপনার সাধনোচিত ধামে গমন করেন। তাঁর 'ঠাকুর্দ্দা' নাম-করণের ইতিবৃত্ত এখানকার অনেকের মুখে শুনেছিলাম

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথমদিকে গুরুদেব শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি সকলকে নিয়ে 'শারদোৎসব' নাটকটি অভিনয় করেন। যুবক ক্ষিতিমোহন বাবু তাতে নিয়েছিলেন, ঠাকুর্দ্দার ভূমিকা। সেই থেকেই তিনি হলেন শান্তিনিকেতনের সকলের ঠাকুর্দ্দা, কাজেই কিরণদিও সেই অল্প বয়সেই ঠানদি! পরে ঠানদির নিকট শুনি, ক্ষিতিমোহনবাবুর আজন্ম বাসস্থান, হিন্দু-শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান, কাশীতে অধ্যয়নকালেই তাঁর সতীর্থগণ 'ঠাকুর্দ্দা' নামকরণ করেছিলেন। ক্রমে তা শান্তিনিকেতনেও প্রকাশ ও প্রচলিত হয়ে পড়ে।

কালক্রমে ক্ষিতিবাবুর ঠাকুর্দ্দা নাম বিস্মৃতির গহ্বরে লুপ্ত হলেও ঠান্‌দি কিন্তু ঠান্‌দিই রয়ে গেলেন! তখন যা ছিল বেমানান, এখন নাতি-নাতনী পরিবেষ্টিতা হয়ে ফুটে উঠেছেন সুষ্ঠু, সুন্দর, আদরিণী ঠান্‌দিরূপে,—অতি মানানসই ভাবে!

শান্তিনিকেতনে সকলের নিকটেই শুনি, ঠান্‌দি এখানকার প্রাচীনতমা গৃহিণী; তিনি অনেক শুনেছেন, অনেক দেখেছেন, পেয়েছেন, কাজেই তাঁর গল্পের ঝুলিটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে অত্যন্ত বৃহৎ! অনেক চেষ্টায় সে ঝুলিটি নেড়ে-চেড়ে যেটুকু পেলাম, তা এই,—

গুরুদেব যখন দেহলিতে ছিলেন, তখন ঠান্‌দিরা ছিলেন তার পার্শ্ববর্ত্তী 'নূতন বাড়ীতে'। সব সময়ই তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের নূতন নূতন গান শুনতে পেতেন, নিজেদের বাড়ীতে বসেই। সেইসব গান আবার সন্ধ্যায় যখন ছাত্রদের শেখাতেন, তখন আশ্রমের সকলেই সেখানে যেতে পারত ও অকুণ্ঠভাবে সে আনন্দের ভাগ নিতে পারত।

প্রতি বুধবার প্রাতে গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করতেন, সুললিত কণ্ঠে—ভাবাবেগে; সে উপাসনা শুনলে সকলের মনই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলেই উপাসনায় যোগ দিতেন, তার মধ্যে পিয়ার্সন সাহেব ও এণ্ড্রুজ সাহেবও থাকতেন। তাঁরা ছিলেন গুরুদেবের অত্যন্ত ভক্ত। তাঁদের একজন বাংলা জানতেন না; প্রতি উপাসনার পরে গুরুদেব সেদিনের উপাসনার সমগ্র বিষয়-বস্তু সেই আসনে বসেই ইংরাজীতে তর্জমা করে বিদেশীকে বুঝিয়ে দিতেন। গুরুদেবের কণ্ঠস্বর এত জোরালো ছিল যে, বাড়ী থেকে ঠান্‌দিরা তা পরিষ্কার শুনতে পেতেন।

গুরুদেবের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রের শৈশবে, অকালে প্রাণবিয়োগ ঘটে; সে ছিল দৈহিক সৌন্দর্য্যে পিতারই অনুরূপ, বোধ হয় বিকশিত হলে, মানসিক সৌন্দর্য্যেও উত্তরাধিকারী হতে পারত, কারণ অতি শৈশবকাল থেকেই তার কবিতা রচনার ও বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অসীম আগ্রহ দেখা যায়। তার হাতে লাগানো একটী মাধবীলতার গাছ ঐ 'নূতন বাড়ীর' শোভাবর্দ্ধন করত। সে লতাটি বোধ হয় আজও জীবিত, এবং পরলোকগত শিশু শমীর এই স্মৃতিচিহ্নটি খুবই যত্নসহকারে সংরক্ষণের যোগ্য।

( ১৫ )

নিকট-প্রতিবেশিনী, গুরুদেবের শেষজীবনের পার্শ্বচর ও প্রতিলেখক,—অধুনা বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগারের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুধীর কর মহাশয়ের বর্ষীয়সী জননী, শ্রদ্ধেয়া কামিনীসুন্দরী কর। বয়স আনুমানিক পঁচাত্তর,—কিন্তু এই বয়সেও বেশ কর্ম্মক্ষম, রন্ধন ও গৃহকর্ম্মে যথেষ্ট পারদর্শিনী। এখনও পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী সম্বলিত একটি বড় সংসারের হাল দৃঢ়হস্তে ধরে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করছেন!

তাঁর ছেলে-মেয়েরা সকলেই শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ছাত্রী-আবাসস্থিতা প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থিনী কন্যাটি (সাধনা কর) কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কামিনী দেবী ফরিদপুরের সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে এখানে আসেন,—সে প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। নীচু-বাংলার নিকট একটি বাড়ীভাড়া করে তিনি থাকেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে, পরিপাটি করে রেঁধে খাওয়ান সন্তানদের,—পাড়াপ্রতিবেশীও তা থেকে বাদ পড়েন না। ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর রন্ধন-পটুতার কথা।

শ্রীযুক্ত সুধীর কর মহাশয় তখন গুরুদেবের কাছে থাকেন,—যখন যা বলেন, তৎক্ষণাৎ লিখে নেন; একদিন গুরুদেব তাঁকে বললেন,—'ওহে, শুনলাম তোমার দেশ থেকে তোমার মা এসেছেন। খুব তোয়াজ করে যে রেঁধে খাওয়াচ্ছেন, তা ত তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে,—তা বেশ ভালই হয়েছে!'

অল্পবয়সী সুধীর কর মহাশয় অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন,—'মার ইচ্ছা,—তিনি আপনাকেও একদিন রেঁধে খাওয়ান।'

গুরুদেব স্মিতহাস্যে বললেন,—'উত্তম প্রস্তাব।'

কর মহাশয় উৎফুল্ল হয়ে বাড়ী গিয়ে মাকে বললেন,—'মা, কাল তুমি গুরুদেবের জন্য কিছু রান্না করে পাঠিয়ে দাও।'

মা বললেন,—'আমি ত বিলাতী রান্না কিছুই জানি না, তিনি কি আমার এই পাড়াগেঁয়ে রান্না পছন্দ করবেন?'

কর মশাই বললেন,—'দেশী রান্নাই গুরুদেব পছন্দ করেন; তুমি আমাদের সাধারণ দেশী রান্না ঝাল-মশলা কম দিয়ে রেঁধে দাও,—দেখো, গুরুদেব খুব খুসী হবেন।'

কর-মা পরদিন রাঁধলেন,—সুক্তোনী, ঝিঙ্গে-পাতুরী, মাছের মুড়োর ডাল, কচি আমের পাতলা ডাল, *মাছের ঝোল, পাটিসাপ্টা ও রস-মাধুরী।

চৈত্র মাস,—বেলা দশটায়ই রৌদ্রের খুব তেজ; জুতো পরতে অনভ্যস্তা সেকালের পল্লী-জননী নগ্ন-পদে, পরিচারকের হাতে সব সাজিয়ে দিয়ে নিজেও তার সঙ্গে চললেন উত্তরায়ণে।

গুরুদেবের খাবার সময়,—তিনি মাত্র খাবার টেবিলে এসে বসেছেন,—পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী একপাশে দণ্ডায়মানা,—পাচক তাঁর নিয়মিত আহার্য্য এনে দিয়েছে,—এমন সময় 'কর-মা' সেখানে

পৌঁছলেন। গুরুদেব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন,—'আপনি আবার এই রোদ্দুরে এত কষ্ট করে নিজে কেন এলেন? দেখুন তো,—এ মোটেই ঠিক হয়নি।'

কর-মা পরিচারকের হাত থেকে আহার্য্য সব একে একে টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বললেন,—'আজ আপনার বাড়ীর খাবার নাই-বা খেলেন, এগুলোই একটু চেখে দেখুন!'

গুরুদেব 'নিশ্চয়ই' বলে তাঁর বাড়ীর খাবার সরিয়ে দিয়ে সেই স্থক্তোনী, পিঠে-পায়েস পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তারপর নানা সহৃদয় প্রশ্ন,—নূতন যায়গায় এসে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা,—প্রভৃতি। গুরুদেব তাঁর রান্না খেয়ে এত খুসী হয়েছিলেন দেখে, এর পর থেকে কর মা মাঝে মাঝে কিছু না কিছু রান্না করে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন! রান্নার মধ্যে দু-এক রকমের মাছের তরকারী সর্ব্বদাই থাকত, কিন্তু পরে যখন শুনলেন গুরুদেব মাছ বেশী পছন্দ করেন না, তখন কর মা তাঁকে বেশীর ভাগ নিরামিষ রান্না ও পূর্ব্ববঙ্গের পিঠে, পুলি করে দিতেন ও তিনিও তা খেয়ে খুব সন্তুষ্ট হতেন!

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ১লা বৈশাখ। তার আগের দিন, গুরুদেব বলে পাঠালেন,—'কাল কয়েকটি বন্ধু বান্ধব খাবে,—ঘি, তেল, আনাজপাতি, চাল, ডাল সব উত্তরায়ণ থেকে যাবে,—কিন্তু রেঁধে দিতে হবে।'

'কর মা' সানন্দে সম্মত হলেন; পর দিন সকাল থেকে কোমর বেঁধে কত কী যে রাঁধলেন! তিনি রান্নার মামুলী জিনিষের অতিরিক্ত চেয়েছিলেন, একটি নারকেল,—সেই নারকেল দিয়ে রাঁধলেন অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন! তেতো শুক্তো, ঝিঙ্গে-পাতুরী, বিট গাজর প্রভৃতি অসময়ের মহার্ঘ্য তরকারী, ডালনা, লাউঘন্ট, চিংড়ে দিয়ে মুড়ি-ঘন্ট, মাছের রসা, কালিয়া, আমের অম্বল ইত্যাদি ইত্যাদি। গুরুদেব বন্ধু-স্বজন সঙ্গে নববর্ষে ফরিদপুরের পল্লী-বাসিনীর হাতের সযত্ন রান্না খেয়ে যেমন পরিতৃপ্ত হলেন, তেমনি কিংবা ততোধিক পরিতৃপ্ত হলেন, রন্ধন-কারিণী!

এখনকার মত সে যুগের মেয়েদের রেস্তোরাঁয় বসে কিংবা রাস্তার ধারের পেঁয়াজি ফুলুরীর দোকান থেকে কিছু কিনে রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে খাওয়া স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!

## ( ১৬ )

শিশু-বিভাগের 'কণাদি'। ২৫।৩০টি বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, বিভিন্ন-ভাষী, বিভিন্ন-প্রকৃতির, ছয় থেকে দশ বৎসর বয়স্ক শিশু নিয়ে কণাদির সংসার! একদল যায়,—অন্যদল আসে,—এ ভাবে সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর এদের তত্ত্বাবধান করে, জীবনের প্রান্তদেশে উপস্থিত হওয়া যে, কতটা সহ্য ও ধৈর্য্যের পরিচায়ক তা সহজেই অনুমেয়!

একদিন বিকেল চারটায় শিশু-বিভাগ-সংলগ্ন কণাদির ঘরে গিয়ে দেখি, একটি শিশু নিয়ে তিনি মহা ব্যস্ত,—চোখ মুখ ধুইয়ে তাকে নিয়ে ঘরে আসায়, জিজ্ঞাসায় জানলাম, 'এই ছোট' ছেলেটির মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। দেখলাম, মায়ের অধিক যত্নে কণাদি শিশুটির নাকে 'গ্লিসারিন' ও তুলো ঢুকিয়ে বললেন, 'এবার যাও, লক্ষ্মী হয়ে খেলা করগে, গাছে চড়া, মারামারির ধারেও যেও না।'

যে ঘণ্টা দুই সেখানে ছিলাম, তারই ভিতরে দেখি—এমনি পাঁচ সাতটি শিশু একটু আদর পাবার কিংবা মনোযোগ আকর্ষণ করার আশায় কণাদির আশে পাশে ঘুরতে লাগল। কেউ বলে, হাত কেটেছে,—কেউ বলে, পেটে ব্যথা লেগেছে, কেউ বলে সাথী মেরেছে আবার একটি ক্ষুদে ছেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, বাগানের মধ্যে বল পড়ে গিয়েছে—খুঁজে পাচ্ছি না। কণাদি কাউকে উপদেশ দিয়ে, কাউকে ষাট বলে, কারুর গায়ে হাত বুলিয়ে, কাউকে বা ওষুধ লাগিয়ে বিদায় করলেন। ছুটির ঘণ্টায় এই সমবয়সী বালকদের ঝগড়া মারামারি, কান্নাকাটি, কুস্তি, বক্সিং, প্রভৃতির আর অন্ত থাকে না।

এতগুলো বাচ্চার ধোপা, নাপিতের ব্যবস্থা থেকে, জামায় বোতাম লাগানো, ঝগড়া মেটানো, খেলাধূলায় কাছে থাকা, শয়ন, পঠন, আবার সপ্তাহে একদিন দূরবর্ত্তী অভিভাবকের নিকট চিঠি লেখানো প্রভৃতি, দুজন ভৃত্য ও একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ ভারই বর্ষীয়সী কণাদির উপর। দিনের প্রধান খাওয়া ওরা যদিও সাধারণ রন্ধনাগারে খায় তবু দুবেলার দুধ, জলখাবারে কণাদির স্নেহসিক্ত হাতের পরশ পেয়ে খুসী হয়। কণাদিও আবার নিজের থেকে মাঝে মাঝে বাচ্চাদের এটা সেটা খাবার করে খাইয়ে তৃপ্তিলাভ করেন।

একটি দুটি আপন সন্তান মানুষ করা কতই কষ্টকর, আর এই নিঃসন্তান বিধবা, মহীয়সী মহিলা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে সমস্ত জীবন পরের ছেলে হাসি মুখে মানুষ করে যাচ্ছেন দেখে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত হয়ে গেল!

তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও গুরুদেব সম্বন্ধে, তাঁর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাওয়ায় অতি ব্যস্ততার মধ্যেও, সসঙ্কোচে যেটুকু বললেন, তা এই—নাম তাঁর শ্রীযুক্তা সুশীলা বালা দত্ত, কিন্তু এ নাম শান্তিনিকেতনে প্রায় অজানিত। তাঁর শিশুকালের ডাক নাম 'কণা'ই সকলের পরিচিত। আশ্রম-শিশুরা তাঁকে বলে মাসীমা। স্বামী সরকারী চাকুরে, সুগায়ক, ৺তৃষিতচন্দ্র দত্ত তখন একক জীবন যাপন করছেন শিলংএ। একান্নবর্ত্তী বড় পরিবারের বধূটি তখনও যান নাই প্রবাসে, স্বামী সান্নিধ্যে। দেশে পাঁচ জনের মধ্যে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে যান, এমনি সময়ে একবার শান্তিনিকেতনের ৺ক্ষিতিমোহন বাবু সপরিবারে শিলং যান; তাঁর বিদ্যাবত্তা, বাগ্মিতা, সহজ সরল জীবন-যাত্রা-প্রণালী ও সুরেলা কণ্ঠের মধুর গানে মুগ্ধ হয়ে তৃষিতবাবু তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন, ও গুরুদেবের নূতন নূতন গান অতি আগ্রহে তাঁর নিকটে শিখতে থাকেন। সেই থেকে উভয়ে অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এর কিছুকাল পরেই স্বামীর আকস্মিক পরলোক গমন কণাদিকে বিহ্বল করে তোলে। তখন বন্ধুপত্নীর নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ক্ষিতিবাবু তাঁকে একবার শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং এই পৃথিবীতে করবার মত কত কাজ আছে, তার নানারূপ আভাস দিয়ে কণাদির নিরানন্দ মনে একটুখানি আনন্দের ছোঁয়া লাগান। সেই আমন্ত্রণে কণাদি আনুমানিক ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবের দর্শন পান। সেবারে কোনই কথাবার্ত্তা হল না, শুধু গুরুদেব দর্শন করে তিনি বাড়ী ফিরে যান।

[ক্রমশঃ।

আলোছায়া

—প্রাণগোপাল পাল

মৎস্যলোভী

—শান্তিময় সান্যাল

—পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়

—তুষারকান্তি রায়
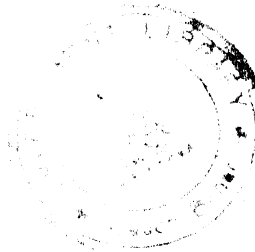
## ॥ শি শু ম হ ল ॥

—রবীন্দ্রনাথ দে

—অশোক চৌধুরী

স্বর্ণমন্দির ( অমৃতসর ) —সুধাবিন্দু বিশ্বাস

উদ্যান ( জয়পুর ) —নারায়ণ সাহা

ভুবনেশ্বর মন্দিরে —শুভাশীষ রায়

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
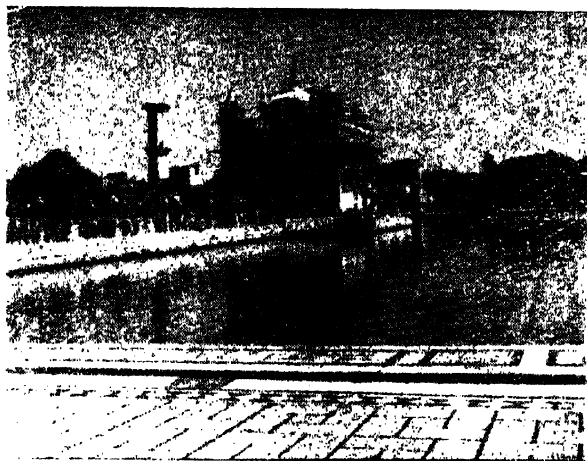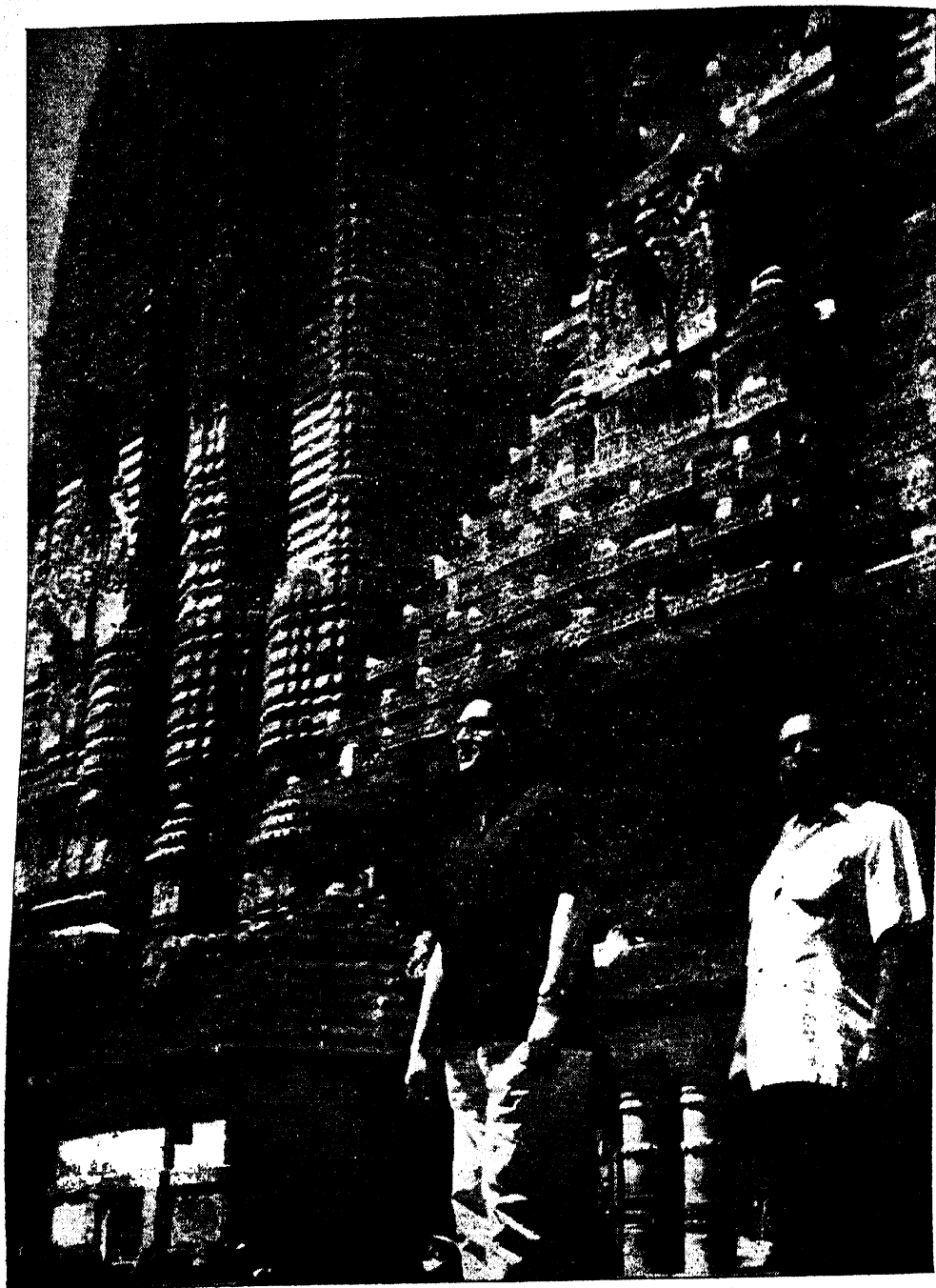
( পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

বাইরের ঢাকা বারান্দায় প্রথমে বসবার ব্যবস্থা হলো। বেশ লম্বা বারান্দাটি বেতের চেয়ার টেবিলে সাজানো। শান্তাদির পাড়ার হোমরা-চোমরা সকলেই প্রায় এসেছেন। পার্টির কাজে হাত লাগাতে এসেছেন,—আবার নিমন্ত্রিতও বটে। এঁদের ভেতর একজন অপরিচিতা ছিলেন। মিসেস চাড্ডা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, নাম ওঁর কমলেশ কাপুর মিসেস চাড্ডার কি রকম বোন হন। থাকেন মাদ্রাজে, সেখানে কোন অফিসে চাকরী করেন। ছুটি নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন। পাঞ্জাবী মহিলাটি বেশ সুগঠনা। দীর্ঘাঙ্গী। উগ্র প্রসাধন প্রলেপের জন্য রংটা বেশ ফর্সাই লাগছিলো। সমানটে মুখের ওপর নাকটা যেন একটু বেশী খাড়া, ছোট ছোট চোখ দুটি জলজ্বলে, চুলগুলো কৃত্রিম উপায়ে কোঁচকানো, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। হাতের ছুঁচোলো নখে আর ঠোঁটে যেন তাজা রক্তের ছোপ লেগেছে।

কমলেশ কাপুরের অঙ্গে ছিলো' গোলাপী সাটিনের হাত কাটা ব্লাউজ, আর ওই রং-এর চুমকির কাজকরা নাইলনের শাড়ী। গলায় নকল মুক্তার মালা আর ডান হাতের মণিবন্ধে বাঁধা একটি হাতঘড়ি। কমলেশ বোধ হয় বসে থাকা জিনিষটাকে কৃপার চোখে দেখে, তাই সে একবারও না বসে, হৈ. চৈ, করে হেসে, নেচে, রঙিন প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কখনও সে যোগলেকারের পেছনে দাঁড়িয়ে ওর দু' কাঁধে হাত রেখে আবদারের ভঙ্গিতে কথা বলছে, অকারণে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, তারপরই সে ছুটে যাচ্ছে মিষ্টার চাড্ডার কাছে অথবা অন্যান্য মিষ্টারদের কাছে। আবার গুন্ গুন্ করে দু' এক কলি ইংরিজি গান গাইতে গাইতে বাগানে ছুটোছুটি করে গোলাপ ফুল ছিঁড়ে এনে কারুর কোটের বাটন হোলে কারুর বা খোঁপায় গুঁজে দিচ্ছে।

ওকে দেখে আমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিলো। বড্ড হাল্কা আর চটুল স্বভাবের মেয়েটির সর্বাঙ্গে যেন এক উগ্র কামনার ঢেউ খেলছে। সকলকার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার নেশায় যেন মাতলামো সুরু করেছে মেয়েটা। ঠিক ওর বিপরীতধর্মী মনে হল, যোগরাজ যোগলেকারকে। শান্ত সংযত কথাবার্তা। গম্ভীর ভরাট কণ্ঠস্বর। কপালে, চিবুকে, চোখে-মুখে এক আশ্চর্য সততা, আর চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্যুতিময় ব্যঞ্জনা, ওকে যেন এক অনন্য রূপ দান করেছে। চা পানের পর সুরু হলো গল্প।

—আমাদের এই বুনো দেশটা কেমন লাগছে আপনার ? পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করলো যোগলেকার !

—চমৎকার ! এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা বনভূমির মাঝখানে ছোট্ট এক উপনিবেশ যেখানে সহরের গোলমাল নেই অথচ সুখ সুবিধেটুকু আছে, আনন্দ আছে, সে জন্য ভারি ভালো লাগছে আমার এ জায়গাটা। জবাব দিলাম আমি।

—এখানকার আসল মালিকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তো ?

—আসল মালিক কারা ? আমি বোকার মত চাইলাম সঞ্জয়দার দিকে।

আমার অবস্থা দেখে, হা-হা করে হেসে উঠলেন সঞ্জয়দা। বললেন—ভাল্লো প্রশ্ন করেছো যোগলেকার।

—তা বটে। মৃদু হাসির সঙ্গে বললো যোগলেকার।—আমরা তো এখন ওদের উদ্বাস্তু করে ছেড়েছি কি-না। মালিক বলে ওদের আর চেনা যাবে কি করে ? তবে আমাদের অত্যাচারের সঙ্গে আপোষ করে এখনও কেউ কেউ টিঁকে আছেন ঐ ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে।

আমি চম্‌কে উঠলাম,—আপনি কি বাঘ-ভালুকের কথা বলছেন ?

—নয় কেন ? মাত্র পাঁচ-ছ' বছর আগে তো এ জায়গাটা সম্পূর্ণ ওদেরই ছিলো। তখনকার এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে, মানুষ তো দূরের কথা, চাঁদ-সূর্যেরও ঢোকবার পাশপোর্ট ছিলো না। তখন সেই আদিবাসীরা এখানে নিঃশঙ্কচিত্তে সংসার করতো। কোথাও হলুদ ডোরাকাটা, অথবা বৈষ্ণবী ছাপযুক্ত বাঘের ডেরা,—কোথাও চঞ্চল নয়না হরিণ পরিবার, আবার বন্যবরাহ,—ভালুক, শেয়াল,—খরগোস, বিচিত্র বিহঙ্গকুল। এরা-ই রাজত্ব করতো এখানে। তবে মানুষ সহ্য করবে কেন অপর প্রাণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতা। বিশেষ করে এত মূল্যবান গাছগাছড়া,—এই সব অরণ্যসম্পদ লাগাবেনা নিজেদের প্রয়োজনে ? আবার পৃথিবীতে মানুষ বেড়েছে,—তার জন্য চাই প্রচুর' জমি। রুজি রোজগারের জন্যেও চাই কলকারখানা।

তাই একদিন এই মধ্যপ্রদেশের অরণ্যের গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ হল, শাবল, গাঁইতি, ডিনামাইট, ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রের বিচিত্র শব্দ ঝঙ্কারে।

সমগ্র অরণ্যটাকে নির্মূল করা গেলো না বটে, তবে তারই মাঝে মাঝে গড়ে উঠলো শিল্পকেন্দ্র।

সেখানে এলো, বিলিতি ছাপমারা ইঞ্জিনিয়ার, গণিত বিশারদ, খনি বিশারদ, কারুশিল্পী, দারুশিল্পী, নগরশিল্পী ইত্যাদির দল তৈরী হলো নানা ধরণের মিল, কারখানা। এই পেপার মিল,—পাওয়ার হাউস্—রেশম মিল—কয়লাখনি ; লোহার কারখানা কত কি তৈরী হলো, মাত্র এই ক'বছরের মধ্যে। তার সঙ্গে সঙ্গে চকচকে পিচের রাস্তা দুধারে আলোর থাম বসানো। বিলিতি টাইপের ফুলে ভরা কোয়াটার্স বাংলো,—সবই হলো। আর ঐ আদিবাসীদের অনেককেই তাড়ানো হলো পৃথিবী থেকে, আবার অন্যকে আশে পাশের ঝোপজঙ্গলে আত্মগোপন করে রইলো—সে জন্য, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ওদের সঙ্গে পার্টিশান করে নেওয়া হলো।

এরপর কেমন করে যেন ওদের সঙ্গে—মানুষদের একটা আপোষ মীমাংসা হয়ে গেলো। এখন ওরা ঐ ঝোপ-জঙ্গলেই থাকে, তবে রাতের অন্ধকারে এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে যাবার জন্য মাঝে মাঝে—আমাদের এলাকাভুক্ত রাস্তা দিয়ে নিঃসাড়ে চলে যায়। সেই সময় মানুষদের সঙ্গে দেখাও মাঝে মাঝে হয়ে যায়,—তবে ওরা কিছু বলে না, আর এখানকার মানুষরাও কিছু বলে না। সেজন্য পাশাপাশি আমরা বেশ শান্তি—আর সদ্ভাব নিয়েই বাস করছি।

যোগলেকারের কথাগুলো বড় ভাল লাগলো আমার। আহা! এমন জায়গাও পৃথিবীতে আছে তাহলে, যেখানে বনের হিংস্র জীব আর তার চেয়েও জঘন্যতম হিংস্র মানুষ পাশাপাশি হিংসা-দ্বেষ না করে ; সংযতভাবে বাস করছে? সংশয় জাগে মনে। বললাম—এখানে তো দেখছি গরু, ভেড়া, ছাগলের পাল অবাধে চরে বেড়ায়। তবে বাঘ ভালুক কি ওদের ওপরও হামলা করে না?

এবার জবাব দিলেন কাবেরী কৃষ্ণমূর্তি। এখানকার প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার পদ্মনাভ কৃষ্ণমূর্তির স্ত্রী।

—ওদের যতটা লোভী আর ভয়ঙ্কর ভাবি আমরা, ওরা কিন্তু আমাদের ধারণার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঠিক ততটা এগুতে পারেনি। মানুষের তো লোভের মাপ জোপ নেই,—তাই সারা পৃথিবীটা দখল করেও সে সন্তুষ্ট নয়, এখন চাইছে চাঁদ তারা দখল করতে। কিন্তু ঐ মূর্খ বেচারীদের অতখানি লোভ রাখবার মতো, মস্তিষ্ক সিন্দুকটা বোধ হয় বড় নয়। সেজন্য ওদের লোভও সীমাবদ্ধ। নিজেদের জায়গায় থাকতেই ওরা ভালোবাসে। অন্যের দখলিভুক্ত জায়গায় সহজে পা বাড়ায় না। তবে ওদের যদি খোঁচা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়, তবে সে অপমান যে ওরা মুখ বুজে সয়ে যাবে, এমন কাপুরুষ ওদের বলা যায় না।

তখন মাঝে মাঝে ওরা প্রতিশোধ নেয় বৈ কি।

তবে আমি তো এখানে সেই গোড়া থেকেই আছি। দেখেছি প্রথম প্রথম, রাত-বিরেতে বেরুতে হলে, এখানকার লোক, বন্দুক বা লাঠি সড়কি হাতে নিয়ে বেরুতো,—কিন্তু যখন দেখা গেলো, চট্ করে একটা বাঘ রাস্তা পেরিয়ে অপর ঝোপের দিকে চলে গেলো, ওদের দিকে ফিরেও চাইলো না, তখন এখানকার মানুষ যেন একটা দিব্যজ্ঞান লাভ করলো। বুঝলো যে,—ওদের হিংসা না করলে, ওরাও করবে না।

বলা যায় মানুষ আর পশু, উভয় পক্ষই উপলব্ধি করেছিলো, ঐ অহিংস কথাটার সারমর্ম। তাই গোরু মানুষ তো দূরের কথা, কোনো দিন একটা ছাগল ছানার দিকেও ওরা নজর দেয়নি। আর এখানকার মানুষেরা ঐ কারণেই কোনো শিকারীকে এখানকার বন জঙ্গলে,—শিকার করতে দেয় না। কারণ একবার রক্তারক্তি করলে, বরাবর তা চলতে থাকবে, আর এখানকার শান্তিও নষ্ট হবে।

মনে ভারি শান্তি পেলাম,—এখানকার অহিংস নীতির কথা শুনে।

কাবেরীদি বাংলাতেই কথা বলেন আমাদের সঙ্গে। এখানে আসার আগে পদ্মনাভ কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন বাংলায় টিটাগড় পেপার মিলে। সেজন্য ওঁরা দুজনেই চমৎকার বাংলা ভাষা শিখেছেন।

শান্তাদির কাছে আগেই শুনেছিলাম যে, যোগরাজ যোগলেকারের মা ছিলেন বাঙালী মেয়ে। শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশোনা করবার সময়, ইংরাজির প্রফেসর দেবরাজ যোগলেকারের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় এবং পরে বিয়ে হয়। যোগরাজ যখন বছর দশেকের তখন মারা যান তাঁর বাবা। তারপর তার মা-ই তাকে মানুষ করে ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যোগলেকার যখন বিলেতে গিয়েছিলো ; সেই সময় তার মা মারা যান। অন্যান্য জায়গায় চাকরী করবার পর এখানে পাওয়ার হাউসের চাকরী নিয়ে আছেন বছর দুয়েক হলো। মায়ের কাছেই যোগলেকার শিখেছে বাংলা। রবীন্দ্র কাব্যের সে একজন অনুরক্ত ভক্ত।

—আর কথা নয়। এবারে সব টেবিলে চলো। বললেন মিসেস লাল।

বেশ বড় গোছের হল। প্রকাণ্ড টেবিলে সাজানো সেই হরেক রকমের খাদ্য। প্রত্যেকে আমরা ডিসে করে খাবার তুলে নিয়ে খেতে সুরু করলাম। খাওয়ার শেষে কফি পরিবেশন করলেন কাবেরীদি।

তারপর সুরু হলো ওখানকার বাধ্যতামূলক প্রথা অনুযায়ী ; প্রত্যেকের গান বা কবিতা অথবা বাজনা। যে যা জানে, তাকে তা দিতে হবে, এ আসরকে। অবশ্য শান্তাদির বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখেছি। পর পর কয়েক জনের পর, এলো আমার পালা। আমি তো ভারি মুস্কিলে পড়লাম। বাবা মারা যাবার পর থেকে গান গাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছি। আমার মুস্কিল আসান করলেন কাবেরীদি।

—ভয় কি তোমার? এসো দু' জনে মিলে প্রোগ্রাম চালাই। আমি বীণায় বাজাবো রবীন্দ্র সঙ্গীত আর তার সঙ্গে গাইবে তুমি। বলো, কোন গানটা বাজাবো।

—আমি বললাম আমার যে কিছু মনে পড়ছে না, আপনি যা হোক বাজান কাবেরীদি।

—আচ্ছা ঠিক আছে।

কাবেরীদি হেসে বীণার কান মুচড়ে সুর সংযোগ করে তার সঙ্গে নিজে মৃদু গলায় গান ধরলেন—"জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।" আমিও গাইলাম ওঁর সঙ্গে। প্রত্যেকের গান বা কবিতার শেষে, তুমুল করতালি দ্বারা শিল্পীকে তারিফ করা হচ্ছিলো, আমাদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হলো না।

এবারে এলো কমলেশ কাপুরের পালা। সে হঠাৎ জেদ ধরে বেঁকে বসলো যে, সে কিছু জানে না, কিছু পারবে না।

—না। না। সে হবে না, এখানকার নিয়ম ভঙ্গ করা চলবে না। সমবেত কণ্ঠের তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। ওকে কিন্তু

সুরভিত কৃষ্ণকোমল কেশপাশে নানা ছাঁদে যখন রচিত হয় সুঠাম কবরী তখন নারীর মুখশ্রী মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে নয়নকে। তাই প্রতি অন্তঃপুরে অনন্য নিষ্ঠায় চলে নারীর কেশ-পরিচর্য্যা। আর এই কেশ-পরিচর্য্যার অপরিহার্য্য

শতাব্দীর সুপরিচিত গুণসম্পন্ন তৈল

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা

কিছুতেই রাজি করানো গেলো না। মনে হলো, ওর কেঁপে ফুলে ওঠা, উচ্ছ্বাসের বেলুনটা, যেন হঠাৎ চুপসে গেছে। কি আর করা যাবে। ওর পরে এলো শান্তাদির পালা। জোড়হাতে বললেন শান্তাদি।

—বারে বারে আপনারা আমাকে এমন করে অপদস্থ করেন কেন বলুন তো? আমি যে নাচ, গান, বাজনা, কবিতা, কিছুই জানি না সেটা এই বল্লারশায় জানে না কে?

—খুব সত্যি কথা। মৃদু হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন যোগলেকার। তবে আপনি যা জানেন, সেটাও তো এই বনগাঁয়ে কেউ জানে না।

এখন কথাবার্তা অবশ্য হিন্দিতেই চলছে। কারণ এই আড্ডারস সকলে সমান ভাবে উপভোগ করবে। যোগলেকারের কথায় যেন হলে হাসির বোমা ফাটলো। হা, হা, হা, হি, হি, হি। এমন হাসির মতো কি ব্যাপার ঘটলো, আমি বুঝতে না পেরে বোকার মতো চাইছি সকলকার দিকে।

বুঝিয়ে দিলেন কাবেরী দি।

এমনি একটি জমজমাট আসরে প্রত্যেকের গান, কবিতা, বাজনা বা নাচের পর, যখন এলো শান্তাদির পালা,—শান্তাদি তো ভারি মুস্কিল পড়েছেন। অথচ কিছু দিতে না পারলে, বাড়ী যাবার ছাড়পত্র মিলবেনা সভার ঘোষণা করা হয়েছে।

ঠিক সেই সময় তাঁর বিপদভঞ্জন হলেন যোগলেকার।

নিচু গলায় বললেন—বাঙালীর মেয়ে,—ছোট বেলায় শিব পুজো, বা ব্রত পার্বণ কিছু করেন নি? বলে দিমনা সেই একটা।

বিব্রত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন শান্তাদি, ঐ স্তোত্র এখানে চলবে?

—নয় কেন? হিন্দি, উর্দু, ফার্সি, ইংরিজি, বাংলা সব কবিতাই যখন চলছে, খাঁটি সংস্কৃত কবিতা অচল হবে কেন? অকূলে যেন কূল পেলেন শান্তাদি।

যোগলেকার প্রচার করলেন—এবারে শান্তা দেবী আপনাদের একটি সংস্কৃত কবিতা শোনাচ্ছেন।

শান্তাদি কাঁপা গলায় আবৃত্তি করলেন: প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং!

সেদিন যে কি বিরাট সহর্ষ হাততালি পেয়েছিলেন উনি, সে কথা আজও ভোলেনি বল্লারশা।

সেজন্যই বলেছে যোগলেকার—আপনি যা জানেন,—তা তো এখানকার আর কেউ জানেন না।

তাই হলো—। শান্তাদি আজ আবার একটি সংস্কৃত কবিতা শোনালেন—

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্‌ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।

প্রচণ্ড হাততালির অভিনন্দন পেলেন শান্তাদি। এবারে এলো যোগলেকারের পালা। ভায়োলিনটা হাতে নিয়ে বললো সে—এখানে কিন্তু আমার সুর জমবে না,—ঐ সুরমহালে না গেলে।

সুরমহাল? আমার কণ্ঠে বিস্মিত প্রশ্ন শুনে, একটু হাসির সঙ্গে বললো যোগলেকার—কোনো বাদসাহী মহল নয়! এই পেছনের বারান্দাটিই আমার সুরমহাল।

এতক্ষণ ওটা দেখা হয় নি তো।

আমি উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম পেছনের ঢাকা বারান্দাটিতে। দেখলাম, বারান্দার প্রত্যেক থামে জড়িয়ে পেঁচিয়ে উঠে এসেছে অসংখ্য লতানে গোলাপ।

বারান্দার ওপরে ছাদ নেই। তারের জালি দেওয়া আর তার ওপরে গোলপাতা ছাদ রচনা করেছে। জালির ফাঁক দিয়ে নেমে এসেছে বারান্দার ভেতরে; হলদে, গোলাপী, লাল, শাদা, গোলাপ ফুলে ভরা লতাগুলো। কেউ বা শূন্যে দোল খাচ্ছে, কোনটি দেয়াল বেয়ে উঠেছে।

ফিকে নীলাভ আলোয়,—জায়গাটিকে স্বপ্নপুরী বলে মনে হচ্ছিলো। এককোণে দাঁড়িয়ে ভায়োলিন বাজাচ্ছে যোগলেকার।

তার অপূর্ব সুর ঝঙ্কারে,—হলের কথার ঝড় হাসির হুল্লোড়, সব থেমে গেছে। উদ্দাম হাওয়ায় দুলছে গোলাপের ঝাড়। ফুলগুলো, যেন শিল্পীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে ওর গায়ে মাথায় আলতো ছোঁয়া দিয়ে। নীরব হলো ভায়োলিন।

এতক্ষণ যেন কোন যাদুকর সুরের মায়াজাল বিস্তার করে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলো।

নিয়মমত, হাততালির ঝড়ও তো ঠিক উঠলো না। সুরের গভীরতায় যেন সবাই হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের চপলতা।

কমলেশ হঠাৎ ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো যোগলেকারের কাছে। আদুরে ভঙ্গিতে বললো—আপনি যদি বাজান, তাহলে আমি গান গাইবো।

—আপনার জানা গান,—আমি হয়তো না-ও জানতে পারি। কারণ গান তো আমি বাজাই না। বললো যোগলেকার।

—ইচ্ছা করলে অবশ্যই পারবেন। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। আমি ফু-লাইন করে গাইবো—আর সেই সুরটা আপনি বাজাবেন। দেখুন না চেষ্টা করে। একটা ইংরিজি গান ধরলো কমলেশ। Patboone এর গান।—

Wel come one, wel come two,
Wel come every one of you.
Wel come new-lovers.

খুবই প্রচলিত গান, সেজন্য যোগলেকারেরও বাজাতে অসুবিধে হল না। গান শেষ করে, শিস দিতে দিতে, বিজয়িনী ভঙ্গিতে হলে ফিরে এলো, কমলেশ কাপুর।

এবারে হাততালির হুল্লোড়ে ঘরের চেয়ার টেবিল[illegible] হয়ে উঠলো।

সারাটা রাত ঘুমের দেখা নেই। কোনো যন্ত্রণা [illegible] নয়। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর আবেগ, অজানা যোনাক, ফিকে তন্দ্রার মাঝে ঘিরে রেখেছিলো আমায়।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। আবছা অন্ধকার আর ভোরের আলোর তখন সুরু হয়েছে লুকোচুরি খেলা। ঘর ছেড়ে বাগানে আসতেই সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধ নিয়ে, হু, হু, করে ছুটে এলো ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস। দেহ মন যেন জুড়িয়ে গেলো। শাল, মহুয়া, ও দেওদারের শাখা নীড়ে তখন জেগেছে সদ্য ঘুম ভাঙা পাখীদের কলকাকলী। কি চমৎকার লাগছে!

লাল কাঁকর বিছানো পথটা ধরে একটু প্রাতর্ভ্রমণের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। দূরে দূরে পাহাড় আর অরণ্যের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, আলোর ছোপ লেগে। আকাশের পূব দিগন্তে লেগেছে অরুণ দেবের রক্তিম পদচিহ্ন। কতক্ষণ চলেছি বা কোন পথে চলেছি তার এতক্ষণ খেয়াল ছিলো না আমার, থমকে

দাঁড়ালাম কার কণ্ঠস্বর শুনে। পাওয়ার হাউস কলোনীর চড়াই পথটার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে যোগরাজ যোগলেকার। তিনিই বলছেন—

—একি? এত ভোরে, আপনি এদিকে যে! হঠাৎ কোনো জবাব মুখে জোগালো না।—তাই তো এত ভোরে একা একা এই পথে কেন এসেছি, বা কোথায় চলেছি, তার কোনো সঙ্গতকারণ নেই তো—একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জবাব দিলাম—ঘুম ভেঙে গেলো তাই···

যোগলেকার ততক্ষণে নেমে এসেছে,—মৃদু হাসির সঙ্গে বললে সে, কি আশ্চর্য। আমিও যে, ঠিক ঐ কারণেই বেরিয়েছি, প্রাতর্ভ্রমণের নেশা নেই আমার।

দু'জনে পাশাপাশি চড়াই পথে চলেছি।—কোন দিকে যাবেন? এখানে তো বনজঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই। বললো যোগলেকার।

—প্রকৃতির ঐ মহাসম্পদই তো দুর্লভ দর্শন আমাদের কাছে। থাকি তো বারো মাস সহরের ইঁট-কাঠের কারাগারে, সেখানে এমন অকল আকাশ, খোলা বাতাস, এমন সবুজ শোভা, এসব তো পাবার উপায় নেই। জবাব দিলাম আমি।

—ও। আপনিও আমার মত বুনো প্রকৃতির নাকি? তা হলে চলুন এই ভোরবেলায় ওই বুনো পথে বেড়াতে খুব ভালো লাগবে। হাল্কা জঙ্গলের ভেতর একটি সরু পায়ে চলা পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। পথটা ক্রমশ বনের ভেতর গিয়ে হারিয়ে গেছে। দেবদারু, শাল, সেগুণ, মহুয়া, হরীতকী, আমলকি, আরো কত জানা অজানা বিশাল বিশাল গাছের গায়ে জড়িয়ে উঠেছে হাজার রকমের লতা ও ও অর্কিড। কোথাও ফুটেছে থোকো থোকো বাসন্তি রং-এর ফুল, কোথাও বা রক্তলাল, বেগুণি, শাদা। কি অপূর্ব রং-এর রোশনাই চারি দিকে। ঝাঁঝালো মিষ্টি ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বনের গন্ধ। পথ নেই। দু হাতে ঝোপ ঝাড় সরিয়ে, ডাল ভেঙে, আমাকে চলার পথ করে দিচ্ছে যোগলেকার।

পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরছে লতার বাঁধন। কাঁটা গাছের আঁচড় লেগে জ্বালা করছে হাত, পা। শাড়ীর অংশ কিছু ছিঁড়ে নিলো বনরক্ষী কাঁটা গাছেরা ওদের রাজত্বে অনধিকার প্রবেশের জন্ম। বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। একটা বড় পাথরের ওপর বসে পড়লাম আমরা দু' জনে।

আহা! কি গভীর শান্তি ছড়ানো চারি দিকে। নিঃশব্দ বনভূমিতে শুধু মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে পাখীদের প্রভাত সঙ্গীত, আর পাতার মর্মর ধ্বনি! ঘন পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে, রাঙা আলো ঝিল্ মিল্ করছে। সেই শান্ত সবুজ গভীর নীরবতার মাঝে যেন হারিয়ে গেলো আমাদের জাগতিক সত্ত্বাগুলো। কথার প্রয়োজন নেই। কোন এক অব্যক্ত ভাবের ধ্যানমৌনী রূপসাগরে অবগাহন করে আমরা ছিলাম নীরব অচঞ্চল। শুধু এক পরমাশ্চর্য অনুভূতি, মুখর হয়ে উঠেছিলো আমার অতল অন্তরে।

সে বলছিলো এই বনভূমি আমার অজানা নয়। আমি একে চিনি! কত কতবার যেন এসেছি এখানে, বসেছি এই শিলাসনে, আর···আর আমার পাশে ছিলো, আজকের এই সঙ্গীটি!

—সাতটা বাজলো, চলুন এবার ওঠা যাক্। বিস্মিত হলাম যোগলেকারের কথায়।

—কি আশ্চর্য্য। দু' ঘন্টা এর মধ্যে কেটে গেছে তো?

বনভূমি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম পাওয়ার হাউস কলোনীর রাস্তায়। পথে তখন সুরু হয়েছে রুজি রোজগারের তাগিদে চঞ্চল মানুষদের পথ চলা। কাচা কোঁচা দিয়ে শাড়ী পরা, আঁট-সাঁট গড়নের দেহাতি মেয়েরা চলেছে দূর গ্রাম থেকে নিয়ে আসা ডিম, দুধ, টাটকা সব্জি সম্ভার বহন করে। বাড়ী বাড়ী এ সব বিক্রি করবে ওরা। কারুর ঝুড়িতে আছে চমৎকার গড়নের কারুকার্য করা মাটির কলসী, পোড়া মাটির খেলনা। ওদের গলায়, হাতে, নাকে রুপোর গহনাগুলো ভারি সুন্দর দেখতে!

—আপনাকে কি পৌঁছে দেব? জিজ্ঞেস করলো যোগালকার।

—না, না, পথ তো আমার অজানা নয়, আপনি শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন? জবাব দিলাম আমি!

—পথ আপনি ভোলেননি, তা জানি, একটু হাসির সঙ্গে বললো যোগলেকার তবুও পেপার মিলের গেট পর্যন্ত আমায় যেতেই হবে, কারণ সিগারেট ফুরিয়েছে। দোকান ওইখানেই কি না।

চড়াইয়ের বাঁকে আসতেই আমাদের নজরে পড়লো, যোগলেকারের বাড়ীর দিক থেকে হন্ হন্ করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে কমলেশ কাপুর। ওর হাতে একরাশ গোলাপ ফুল। কাছাকাছি এসেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো যেন যোগলেকারের ওপর। ওর একটি হাত নিজের হাতে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললো কমলেশ—ওঃ! সেই ভোর ছ'টা থেকে যে বসে আছি আপনার গোলাপ বাগে আপনার জন্তে, এতক্ষণে দেখা মিললো! আপনার মালীটা তো কিছুতেই বলতে চায় না যে কোথায় গেলে মিলবে আপনার দর্শন। যাক্ ভাগ্যিস ঠিক সময়ে বেরিয়ে এসেছি,—তাই তো ধরতে পারলাম আপনাদের।

হাঁ এবারে বলি উদ্দেশ্যটা। দিদির কাছে শুনেছি ব্যাডমিন্টনের হাত নাকি আপনার চমৎকার। সেজন্ত এসেছি আজ বিকেলে, আপনাকে খেলবার জন্ত নেমন্তন্ন করতে। উঃ!—বাবা। এই ভোর বেলায় জঙ্গলে কি করছিলেন আপনারা? শুনেছি তো ওখানে বাঘ ভালুক আছে—ভয় ডর নেই আপনাদের!

মৃদু হাস্তের সঙ্গে নিজের হাতটাকে বন্ধন মুক্ত করে বললো যোগলেকার—বেশ তো যাবো। তবে খুব ভালো খেলবো কি-না জানি না। আমার দিকে চেয়ে বললো সে—আপনিও আসুন মিস্ মুখার্জি। খেলায় যোগ দেবেন।

—Oh। definite. আপনি না হলে তো—খেলাই জমবে না।—বাঁকা হাসির সঙ্গে বলল কমলেশ।—আমি তো যেতাম আপনাদের বাড়ী,—কিন্তু পথেই যখন দেখা পেলাম, তখন এইখানেই বলি। আপনি অবশ্যই আসবেন। এই ধরুন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আপনারা দুজনেই আসবেন, ছ'টায় খেলা সুরু করা যাবে।—দিদি যাবেন,—আপনার দিদিকে বলবার জন্ত। আর এখানে এসে কি শুধু বন জঙ্গলই দেখবেন?

খেলা ধুলো নাচ, গান,—কত রকম মজা আছে, সেগুলোকে নিশ্চয়ই [illegible] দেবেন না।

—অনেক দিন খেলিনি সেজন্ত আপনাদের সঙ্গে তাল দিতে

বোধ হয় পারবো না তবে দর্শকের ভূমিকাটা আমি নিতে পারবো, জবাব দিলাম আমি।—আর বন জঙ্গলের কথা বলছেন। যে কোনো আমোদ-প্রমোদের চেয়ে এই বন্ধ-শোভা আমার কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয় মিস্ কাপুর।

হি। হি। হি: করে হেসে বললো কমলেশ—ও। বুঝেছি। আপনার নিশ্চয়ই কবিরোগ আছে। মানে ঐ স্যাঁৎসেতে রোমান্টিক ভাবের কথা বলছি। আমি কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। ওসব ঝিমুনো ভাব আমার ধাতে সয় না।

নাচ গান, হৈ হুল্লোড়,—ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চালানো,—এই সবই আমার বরাবরকার অভ্যেস কি—না। এগুলো না হলে আমি বাঁচতেই পারি না।

—চমৎকার। ভারি ভালো লাগছে আপনার কথাগুলো শুনতে, জবাব দিলাম আমি।

—সব চেয়ে ভালো লাগছে আপনার মুখে এমন নিখুঁত বাংলা ভাষা।

—ভারি আশ্চর্য লাগছে বুঝি। আমার কাছে কিন্তু এটা মোটেই আশ্চর্যের নয়; সব জিনিষটাই আমি অতি সহজে শিখতে পারি। দুলে দুলে হাসলো কমলেশ। বললো আবার—ঐ দেশ ভাগ হবার পরই আমরা এলাম কলকাতায়—সেই থেকে বসবাস আমাদের একেবারে খাঁটি বাংলা পাড়ায়। কিছু দিনের ভেতরই শুধু বাংলা কথা কেন, বাংলা গান, নাচ, সবই শিখে ফেললাম—মানে সব কিছু হজম করতে আমার মাত্র তিনটে বছর সময় লেগেছিলো।

আচ্ছা—বাই! বাই!—হাঁ আপনার বাগান থেকে-কিছু ফুল চুরি করেছি মিষ্টার। রাগ করবেন না যেন।

জবাবের অপেক্ষা না করেই জোর কদমে এগিয়ে চললো কমলেশ কাপুর।

আমরা দুজনে ধীর পায়ে চললাম, পেপার মিল্ কলোনীর দিকে।

বাড়ী ফিরতেই হৈ, হৈ, করে উঠলেন শাস্তাদি।

—এই সাত সকালে কোথায় গিয়ে ছিলি রে একা একা? আমি তো ভেবেই মরি।

—ভোর বেলার দৃশ্য কি চমৎকার শাস্তাদি। তাই একটু বেরিয়ে ছিলাম। একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জবাব দিলাম আমি।

চা পান করতে করতে টিপ্পনি কাটলেন সঞ্জয়দা—সেকালের গোপিনীরা অভিসারে যেতেন, রাতের অন্ধকারে—কিন্তু একালের —রাধিকারা অনেক বেশী চালাক ওদের চাইতে।—ভোর বেলাটাকেই ওঁরা অভিসারের প্রশস্ত সময় মনে করেন। কেন না এ সময় সাপ খোপেরও ভয় নেই; আবার ভোরের হাওয়া খাওয়া, প্রেম করা, এক সঙ্গেই চলতে পারে। এই আর কি।

সর্বনাশ। ইনি কি সব জানতে পেরেছেন? আমি বোকার মতো চাইলাম সঞ্জয়দার দিকে।

ফাঁস্ করে উঠলেন শাস্তাদি—তুমি বাপু আমার বোনের নামে ঐ সব যা, তা, অপবাদ দিও না বলছি। ও সে ধরণের মেয়েই নয়।

হা:। হা:। হা:। হা:। সঞ্জয়দার দরাজ কণ্ঠের হাসির ধাক্কায়,—উঠোনে কিচির মিচির করছিলো শালিকের ঝাঁক্—ওরা ঝট্পট্ শব্দ করে পালিয়ে গেলো মহুয়া গাছের আড়ালে।

—আহা, শ্রা,—মিছিমিছি রাগ করছো কেন? আমি কি বলছি তোমার বোন কোনো মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিলো?

—বনজঙ্গল—স্রেফ বনজঙ্গলের প্রেমে পড়েছে-ও।

বাঁ হাতের তর্জনীটা আমার দিকে প্রসারিত করে ভাবে গদ্গদ্ সুরে জবাব দিলেন সঞ্জয়দা।

—এত রঙ্গও জানো তুমি।—হেসে ফেললেন শাস্তাদি।

আমিও আশ্বস্ত হলাম।

[ ক্রমশ।

## বরমাল্য

শ্রীমতী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

উচ্ছলিত উৎস হতে  
কারে স্পর্শ করিবারে  
প্রদোষের বাঁশী ওঠে বেজে।  
পুষ্প পল্লবগুলি  
মধুপ গুঞ্জনে উঠিছে চঞ্চলি,  
অরণ্যে পাতায় পাতায় সংগীতে তরঙ্গ তুলি—  
শুনিতেছি আতিথ্যের বাণী।  
তমালের স্তব্ধ ছায়াতল  
রচেছে শয়ন।  
তপস্বিনী একাকী  
সপ্তর্ষির পানে চাহি—  
প্রতীক্ষিয়া আছি।  
সেই পুণ্যক্ষণে, দীনার পদ্মাসনে  
তরুণ সন্ন্যাসী, তুমি দেখা দিলে।  
আলোকের আশীর্বাদে  
মোর বরমাল্য, দিলাম পরায়ে॥

## গোলাপের নেশা

মনিরুল ইসলাম

বাতাসে আজিকে কোন্ কথা বলে যায়:  
নদী নির্ঝর আজিকে কি গান শোনায়:  
সে কি তার জীবন-গানের ছায়া!  
কাছে পেতে চাওয়া একটি মেয়ের ভাষা।

দু'টি কালো চোখে আষাঢ়ের ঘন মেঘ—  
চাহনিতে মেশা হৃদয়ের আবেগ;  
শিশির ঝরানো নীল নীল দু'টি চোখে  
মনের কথাটি বলে যায় আভাসে।

হৃদয়ের তটে আকাঙ্ক্ষার ঢেউ তুলে  
সুরভি মাখানো গোলাপ ফুলের বনে  
অবাক পৃথিবী জীবনের জয়গানে  
মনের আকাশ স্বপ্নের জাল বোনে।

জীবন নেশায় হৃদয় আবেগ থামে  
মন-জানালায় গোলাপের নেশা নামে।

সাগরিকা শ্যাম

ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে রূপোলী ঝরণা ধারা। তারই জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়ে পাহাড়ে গায়ে গা এলিয়ে একটা বড় পাথরের উপর পা ছড়িয়ে বসেছিল রূপসী। তার উন্মুক্ত ঘনকৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম থেকে মুক্তোর মত জল টলমল করে ঝরে পড়ছিল কপালে আর মুখে। রূপসী যেন বিভোর হয়ে বসে আছে। এই ঝরণার জলে অর্দ্ধ নিমগ্না জলকন্যা যেন সে।

অন্যান্য পাহাড়ী মেয়ে-বউরা যে সময় কাপড় কাচতে আর স্নান করতে আসে, রূপসী সে সময় আসে না। ওরা যখন আসে একই সঙ্গে দল বেঁধে আসে। ওদের কলকণ্ঠে মুখরিত হয় অরণ্যানী ঝরণার কল কাকলী যেন মূক হয়ে যায় ওদের সান্নিধ্যে। পাখীরা শীষ দিতে ভুলে গিয়ে ভয়ে যায় উড়ে। রূপসীর ভালো লাগে না এত ভীড়ে স্নান করতে। স্নানটা ওর বিলাস, ঝরণা ওর অনেক কালের মিতা। তাই একাকী এসে ঝরণার জলে অনেকক্ষণ ধরে গা ডুবিয়ে বসে থাকে। জলধারার মৃদু ছন্দের সঙ্গে মনে মনে নিজের অনুভূতির ছন্দ মিলায় সে। ছোটোবেলা থেকেই স্নানের ব্যাপারে ওর এই স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু ছোটোবেলা ওর এই বিলাস নিয়ে পাড়ায় কোনো প্রশ্ন ওঠে নি।

দেহে যখন কৈশোরের রঙ ধরল-মুখের চপল সারল্যে এসে মিলল সলাজ মাধুর্য্য তখনই পাড়া-প্রতিবেশী ওর এই একাকী স্নান করা সম্পর্কে আড়ালে আবড়ালে নানা প্রশ্ন তুলল। কিন্তু রূপসীর বাবা মহাদেব গাঁয়ের মোড়ল বলে কেউ আর সামনা সামনি কিছু বলতে পারল না।

সেদিনও কলসখানা পায়ের কাছে রেখে রূপসী আপন মনে ঝরণার জলে নিজের দেহকে সমর্পিত করে বসেছিল কতকগুলো কাঠ গোলাপ, টগর আর নাগকেশরে ফুলভারে নত ডাল ঝুঁকে পড়েছে জলের উপর। কত রঙ-বেরঙের পাখী উড়ে উড়ে এসে বসছে ডালগুলোর উপর। ঘন সবুজ ডাল পালার ফাঁকে ফাঁকে রূপসীর দেহশ্রী অস্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছিল পাশের উঁচু পাহাড়টা থেকে।

হঠাৎ রূপসীর চোখ গেল সেদিকে। একটি সুদর্শন, সুঠাম দেহ তরুণ পাহাড়ের উপর ঘন-সন্নিবিষ্ট কতকগুলো ঝাউ গাছের ছায়ায় বসে একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। তার চারদিকে কতকগুলো ছাগল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আপন মনে চরে বেড়াচ্ছে। বোধ হয় ছাগল চরাতে এসেছে লোকটা। রূপসীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মাথা নোয়ালো ও। রূপসীর ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রূ যুগল হলো কুঞ্চিত। এ গাঁয়ের সকলকেই সে চেনে। কিন্তু এ লোকটাকে তো আগে কখনো দেখেনি। এত বড় স্পর্দ্ধা, গাঁয়ের সর্দারের মেয়ের দিকে নজর। আচ্ছা, তড়িৎস্পৃষ্টের মতো রূপসী উঠে দাঁড়ালো। কিছু দূরে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা কাপড় চোপড় থেকে গামছাখানা নিয়ে তাড়াতাড়ি হাত মুখ মুছলো। ওড়নাখানা টেনে নিয়ে ভিজে জামা আর ঘাঘরার উপর জড়ালো। এরপর ক্ষিপ্র গতিতে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে চলল অচেনা লোকটির দিক।

অবাক হয়ে লোকটি উঠে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা ও ভাবতে পারেনি। মেয়েটা যে বেসরমের মতো ওর কাছে এসে দাঁড়াবে, তা ওর কল্পনাতীত। রূপসীকে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠতে দেখে ও ভেবেছিল এই অবস্থায় দেখে ফেলেছে বলে বুঝি রূপসী ভয়ে আর লজ্জায় পালাচ্ছে। কিন্তু এখন দেখলো তার বিপরীত। ও-ই এখন কী করে পালাবে তাই ভাবতে লাগলো। কিন্তু পালাবার পথ আর সে পেলো না। রূপসী এসে সামনে দাঁড়ালো। যেন একটা ছিপছিপে কচি সুপুরী গাছ বাতাসে কাঁপছে থরথর করে। উত্তেজিত রূপসীকে দেখে লোকটির এই তুলনাই মনে আপনা থেকে এসে গেল।

"তুমি কে?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিগেস করল রূপসী।

"আমি বীর সিং," স্পষ্ট গলায় জবাব দিল লোকটি। সামনেই যখন এসে পড়েছে তখন সাহস করে সামাল দেওয়া দরকার বইকি!

"বীর সিং! আহা বীরত্বের কি ঢং!" ব্যঙ্গ ভরে সজোরে হেসে উঠল রূপসী।

"কেন?" বীর সিং একটু আহত হয়ে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল।

"কেন? বলি, জোয়ান মরদ না তুমি? রূপ দেখার যদি এত সাধই হয় তবে বুক ঠুকে এসে সামনে দাঁড়াতে পার না ঠিক বীরের মতো? আবার নামের কি বাহার! বীর সিং!" শরীরে ঢেউ তুলে হাসতে লাগলো রূপসী।

"তুমি যে এরকম বেসরম সেটা আগে বুঝতে পারলে আলবত্ত বুক ঠুক এসে সামনে দাঁড়াতে পারতাম—" এবার সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলল বীর সিং।

রূপসী একটু থতমত খেয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার নিজেকে সামলে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "ও হোঃ বুলি তো ঠিক মরদের মতই দেখি" বলতে বলতে প্রসঙ্গ ফিরিয়ে নিল সে, "তুমি কি এ গাঁয়ের লোক?"

"না, পাশের গাঁয়ে থাকতাম।"

"তবে এখানে কেন?"

"ম্যালেরিয়ায় মা বাপ মরে গেলো", বীর সিং নিশ্বাস ফেলে বলল, "তারপর ছোট্ট ঘরটিও বন্যায় গেল ভেসে। এ গাঁয়ের মোড়ল আমার অবস্থা দেখে দয়া করে এখানে জমি জায়গা দিল।"

রূপসী আবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। এধারে ওধারে ছড়ানো ছাগলগুলোর মধ্য দিয়ে একবার ঘুরে বেড়ালো সে। ধবধবে সাদা ছোট্ট একটা বাচ্চা ছাগলকে কোলে তুলে নিয়ে আবার এসে দাঁড়ালো বীর সিং-এর সামনে, বলল, "মোড়ল যদি জানে তুমি গাঁয়ের মেয়েদের দিকে নজর দিচ্ছ তাহলে তোমাকে ধরে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবে বুঝলে হে বোকারাম।"

"মোড়ল জানতেই পারবে না" বোকার মতই হেসে বলল বীর সিং।

"বটে?" তির্যক হেসে হঠাৎ তর তর করে ঝরণার মতই এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যেতে লাগল রূপসী।

"ওকি; বাচ্চা ছাগলটাকে নিয়ে যাচ্ছ কোথায়, দিয়ে যাও," হেঁকে বলল বীর সিং।

রূপসী দাঁড়ালো, "নিয়ে যাব আমার ইচ্ছে, তোমার কি, পারো তো এসে নিয়ে যাও—" ভ্রূভঙ্গী করে ওর দিকে তাকালো রূপসী।

বীর সিং আর বলল না কিছু কিন্তু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। রূপসী আরও কিছুদূর নেমে যেতেই হঠাৎ সে সচকিত হয়ে চেঁচিয়ে ওকে ডাকলো, "এই শোনো, শোনো, তোমার নাম কি?"

আবার থমকে দাঁড়ালো রূপসী, কি ভেবে একটু ইতস্তত করে বীর সিং-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে সে-ও চেঁচিয়ে জবাব দিল, "রূপ্‌সী।" তারপরই তরতর করে নেমে গেল পাহাড়ের বন্ধুর পথ দিয়ে।

ঘরে ফিরে যেতেই রূপসীর কোলে মহাদেব একটা ছাগলছানা দেখে একটু বিস্মিত হলো, বিরক্তও হলো একটু। পাগলী মেয়েটা আবার কার ছাগলছানা কেড়ে নিয়ে এলো কে জানে। মহাদেব সর্দারের আত্মসম্মানে ঘা লাগলো, গম্ভীর গলায় বলল,—"এই রূপসী, তুই ওটাকে কোত্থেকে আন্‌লি?"

রূপসী তার বাবার প্রশ্নকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনল না। উঠোনের মাঝখানে একটা কাঁঠাল গাছ। তারই কচি কচি পাতা পেড়ে নিয়ে গাছতলায় বসল। ছাগলটাকে কোলের মধ্যে নিয়ে আদর করে পাতাগুলো খাওয়াতে লাগল। মহাদেব এবার ধমকী দিয়ে বলল, "বল্‌ শীগগির, কোত্থেকে আন্‌লি ওটাকে?"

রূপসী এবার মহাদেবের দিকে চোখ তুলে তাকালো, নির্ব্বিকার জবাব দিল, "বীর সিং-এর কাছ থেকে।"

মহাদেবের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হলো। বীর সিং তার বন্ধুর ছেলে। তাই বিপদের দিনে ওকে এনে এই গাঁয়ে আশ্রয় দিয়েছে। তা ছাড়া জোয়ান ছেলেটাকে দেখে একটা লোভও জেগেছে মনে। তার নিজের একটা ছেলে নেই—তাই মনে মনে একটা মতলব এঁটেছে সে। রূপসীর জবাবে সস্মিত মুখে বলল, "ও দিল?"—

"দিলই তো, আমি তো আর চুরি করে আনি নি, ওকে বলেই এনেছি।"

মহাদেব আর বলল না কিছু। দাওয়ায় বসে খুসী মুখে বিড়ি ফুঁকতে লাগল। রূপসী অবাক হলো। তার বাবার আগুনের মতো রাগ হঠাৎ জল হয়ে গেল কি করে তা'ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না।

বনে ভরা পাহাড়ের এক পাশে কতকগুলো দীর্ঘদেহ শ্বেত আর রক্তচন্দন গাছ শাখা-প্রশাখা মেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চন্দনবনের ছায়া স্নিগ্ধ নিরালায় কয়েকদিন পরে আবার দেখা হলো—রূপসীর সঙ্গে বীর সিং-এর।

কতকগুলো চন্দনের ডাল ভেঙে ভেঙে এক জায়গায় জড়ো করছিল রূপসী। হঠাৎ হাতে একটা গুলতি নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলো বীর সিং। দুপুরের সূর্য তখন ঠিক মাথার উপর।

"তুমি আবার এখানে কেন?" রূপসীর চোখে কৌতুক ঝলমল করে উঠল।

"পাখী মারব"—বীর সিং-এর বেপরোয়া জবাব।

"পাখী মারায় বীরই বটে, তুমি"—খিল খিল করে হেসে উঠল রূপসী, "এখন একটা বীরত্বের কাজ কর দেখি—ঐ লাল চন্দনের কতকগুলো ডাল ভেঙে দাও তো আমায়। ঐগুলো বড় শক্ত কিছুতেই ভাঙতে পারছি না।"

বীর সিং খুব উৎসাহের সঙ্গে এক হাতে ডাল নুইয়ে ধরে আরেক হাতে লাল চন্দনের ডালগুলো পটাপট ভাঙতে লাগলো। চন্দনের মিষ্টিবাস মৃদু হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে নির্জ্জন পরিবেশটাকে মোহনীয় করে তুলল।

খুসী হয়ে ডালগুলো গুছোতে গুছোতে রূপসী জিগেস করল, "তোমার ক্ষেত-খামারের কাজ নেই? দুপুর বেলা গুলতি হাতে নিয়ে বনে বনে টো টো করছ কেন?"

বীর সিং হেসে উঠল, "ও ক্ষেতখামারের কাজ আমার সকালেই শেষ হয়ে গেছে। একলা আমার জন্য আর কত ধান-চালের জোগাড় করব। এই ভর দুপুরের রোদে কেই বা ক্ষেত-খামার করে?"

"হুঁ" রূপসী বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, "কেউ ক্ষেতের কাজ করছে না আর এই দুপুর রোদে না? একবার দেখোই না গিয়ে, ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে কড়া রোদে ধুঁকতে ধুঁকতে কাজ করছে কত লোক? পেটে ভুখ না থাকলে ঐ রকম সব লোকই বলে?"

"কি জানি?" ঠোঁট উল্টালো বীরসিং বলল, "তুমি তো মহাদেব সর্দারের মেয়ে, তাই না?"

"তুমি কি করে জানলে?" অবাক হবার ভাণ করল রূপসী।

"রূপসীকে গাঁয়ের কে-না চেনে? নাম করতেই সবাই বলে দিল।"

"ও:"—রূপসী এবার ওধারে একটা গাছে জড়ানো মোটা লতা ছিঁড়ে আনল। এ লতা এক সঙ্গে বিনুনীর মতন করে জড়িয়ে গাছের ডালে দোলনা বেঁধে পাহাড়ী মেয়েরা দোল খায়। লতাটা এনে সেটাকে দুভাগ করে ছিঁড়ল রূপসী। তারপর শ্বেত চন্দনের ডাল আর রক্তচন্দনের ডালগুলোকে আলাদা করে বাঁধতে লাগল।

"তুমি আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে—"কর্ম্মরতা রূপসীর দিকে একটু চেয়ে বলল বীর সিং।

জবাব দিল না রূপসী।

কি একটা ভেবে মুখে হালকা হাসির আভা ভেসে উঠল বীর সিং-এর মুখে, বলল, "তোমার বাবাকে আমি একটা কথা বলব।"

"কি কথা?" কৌতূহলী চোখে এবার মুখ তুলে তাকালো রূপসী।

"তোমাকে বলব না," দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল বীর সিং।

চকিতে কি একটা কথা যেন আঁচ করে নিল রূপসী। গম্ভীর হয়ে বলল, "আমাকে না বললে কোনো কাজ হবে না। বাবাকে আমি যা বোঝাই বাবা তাই বোঝে।"

"হোক গে—" জোর গলায় বলল বীর সিং, "মনে রেখো, তোমার বাবা তাঁর বন্ধুর ছেলের কথা শুনবেই।"

"ইঃ, বাবা আমার কথা না শুনে ওর কথা শুনবে। ঠিক আছে, বাবা যাতে তোমার কোনো উপকার না করে তাই আমি দেখব।"

"তাই না কী!" হেসে উঠে বীর সিং ওর দিকে এগিয়ে এল, আচ্ছা, তোমার কানে কানে বলছি, আমি কি চাই।"

"খবরদার তুমি আমার কাছেও আসবে না"—বলেই চোখ পাকিয়ে উঠল রূপসী।

বীর সিং থমকে দাঁড়ালো।

"সাহস বড্ড বেড়ে গেছে না? বাবাকে বলে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেব"—সতেজে বললো রূপসী।

বীর সিং, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুই বলতে পারল না।

কতকগুলি তরুণী কণ্ঠ ভেসে এল একটু দূরের বনান্তরাল থেকে। রূপসী সতর্ক হয়ে বললো, "লহনা, ময়না ওরা আসছে পালাও এখন আর বাহাদুরী করতে হবে না।"

মুহূর্ত মধ্যে বীর সিং বনের অন্য দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু পরেই লহনা, আমিনী আর ময়না এসে দাঁড়ালো চন্দন তলায়। রূপসী তখন খুব মনোযোগের সঙ্গে চন্দনের ডালগুলো বাঁধছে।

"বাঃ রূপসী, তুই তো দেখি বেশ কাজ গুছিয়ে ফেলেছিস?" বলল ময়না।

আমিনী বলল; "রূপসী বেশ আগে আগে এসে ভালো ভালো কাঠগুলো নিয়ে নেয়। কেন আমাদের সঙ্গে আসতে পারিস না? আমরা তোকে খুঁজে এলাম।"

ততক্ষণে রূপসীর কাজ শেষ হয়ে গেছে। কাঠের বোঝা দুটি ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বেশ তো, তোরা যে না আমারগুলো থেকে ভালো ভালো বেছে। আর তোদের এক সঙ্গে না এলেও যাই তো এক সঙ্গে। এক সঙ্গে বসে হাটে কাঠ বিক্রী করি তো।"

"আহা তা কেন, আমরা তোর কাঠ নেবই বা কেন? তোর মতো বুঝি আমরা গতর খাটাতে পারি না।" বলতে বলতে ময়না একটা শ্বেত চন্দনের ডাল ধরে দাঁড়ালো।

আসামের এই বনাঞ্চলে চন্দনের গাছ ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। চন্দনের ব্যবসা সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে গ্রামের লোকেদের। তাই পুরুষেরা যখন দুপুরে ক্ষেতে কাজ করে, মেয়েরা তখন বনে বনে ঘুরে বেড়ায় চন্দন কাঠ সংগ্রহের জন্য। বিকেলে কাঠের বোঝা নিয়ে হাটে বসে। প্রত্যেক এলাকার গাছ ভাগ
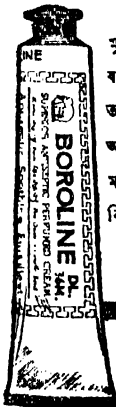
করে বিভিন্ন লোকদের এক্তিয়ারে দেওয়া হয়েছে। এদিককার গাছগুলো ওদের চার জনের এক্তিয়ারে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী কাঠ ওরা কেউ সংগ্রহ করে না।

"তোরা তা হলে কাজ কর। আমি এখানেই একটা গাছ তলায় বসছি। তোদের হয়ে গেলে তোদের সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে যাবো" বলতে বলতে রূপসী একটা ঘন পাতায় ভরা, ছায়ায় ঢাকা গাছের নীচে বসে পড়ল।

"একটা গান কর না রে রূপসী—তোর গলা তো খুব মিঠা।" ওপাশ থেকে লহনা বলে উঠল।

রূপসী একটু হাসল, "গাইতে পারি আমি, যদি তোরাও আমার সঙ্গে গান করিস।"

"ঠিক আছে"—উৎসাহ প্রকাশ করল আমিনী, "তুই আরম্ভ কর।"

একটু গুন গুন করে রূপসী উদাত্তকণ্ঠে গান ধরল—

"রাঙ্গলী বেলিটী সেইটী
ভুমুকি মারিছে সেইরা
ওলাই আহা মোর ধন ঐ
এন্ধার যে নাইকিরা হ'ল।।"
( লাল সূর্য ঐ যে
চোরা চোখে চায় সে
বেরিয়ে এস প্রিয় আমার,
অন্ধকার আর নাই যে। )

একটু গাওয়ার পরেই কাজ করতে করতে তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলালো ওরা তিন জনে। পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় প্রতিধ্বনিত হয়ে তাদের মিষ্টি সুরের রেশ আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তুলল। শ্যামলস্নিগ্ধ বনভূমি যেন হয়ে উঠল—আরও মায়াময় আরও মন মাতানো।...

কিছুদিন ধরে বনের ধারে এসে তাঁবু খাটিয়ে বসেছে একদল শহুরে শিকারী।

হৈ হল্লা করে তারা মাতিয়ে তুলেছে গ্রামকে। পাহাড়ী মেয়েদের অবাধ চলাফেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের অনেকের।

তাদের দলের দুটি লোক, একদিন দুপুরবেলা বন্দুক হাতে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হরিণ শিকারের আশায়। হঠাৎ একটা পাহাড় থেকে তাদের নজরে পড়ল, কিছু দূরেই একটা পাহাড়ের নীচে ঝরণা-ধারার জলে গা ডুবিয়ে পাথরের উপর বসে আছে একটি মেয়ে। দুজনেই তখন থমকে দাঁড়ালো, মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পরস্পরের দিকে চেয়ে।

স্নান করছিল রূপসী। জলের মধ্যে তার দেহ হারিয়ে যাচ্ছিল যেন। পাহাড়ের নীচে এধারে ওধারে ছড়ানো কঠিন উপল-খণ্ডগুলোকে দেখে ভাবছিল সে, কতকাল যে ঝরণার জলে এরা স্নাত হচ্ছে তার খবর রাখে কে? কঠিন পাথর তারও বুকে লেগেছে সবুজের পরশ। মমতাময়ী জলবালারা কোমল শ্যাওলার কারুকার্যময় গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে ওদের উপর। হালকা ভাবনায় আনমনা হয়ে বসেছিল রূপসী। তাই চেয়েও দেখল না—দূরে পাহাড়ের উপর থেকে দুই জোড়া বাসনার্ত্ত চোখ উন্মত্ত ক্ষুধা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

স্নান সেরে একটা বড় গাছের আড়ালে গিয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করল রূপসী। তারপর ঝরণার কাছে দাঁড়িয়ে ভিজে কাপড়গুলো নিংড়োতে লাগল।

ওদিকে পাহাড়ের উপরে যুবক দুটির একটি আরেকটিকে বলল, "দেখেছ কেমন স্বাস্থ্য?"

অপরটি বলল, "তুমিই দেখো—আমি কালও দেখেছি।"

"চল, ওর সঙ্গে গিয়ে একটু রঙ্গরস করে আসি।"—"রঙ্গরস আর করতে হবে না...।"

আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুজনে,—"তবে চল।"

সন্তর্পণে পাহাড়ী পথে নীচে নেমে যেতে লাগল ওরা। কিন্তু অলক্ষ্যে আরও একজন যে তাদের অনুসরণ করে চলেছে তারা তা' জানতেও পারল না।

ঝরণার কাছে এসে একটা গাছের আড়ালে দু'জনে বন্দুক দুটো রাখল। তারপর আরও সতর্ক হয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ পেছনে কিসের একটা শব্দ হতেই রূপসী চমকে ফিরে দাঁড়ালো। আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল, হিংস্র নেকড়ের মতো দুটো লোক তার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। রূপসীর হাত থেকে কাপড় পড়ে গেলো। ভয়ে আশঙ্কায় সে অব্যক্ত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটো এক লাফে রূপসীর কাছে এসে দাঁড়ালো। একজন এসে তার মুখ চেপে ধরল—আরেক জন সজোরে ধরে ফেলল তার একটা হাত।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্রমূর্ত্তিতে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো বীর সিং। গাছকাটার দীর্ঘ ধারালো দা' ঝক ঝক করছে তার হাতে। অনতিদূরে একটা পাহাড়ী পথে গাছ কাটছিল সে। সন্দেহজনক ভাবে দুটো লোক ঝরণার দিকে এগোচ্ছে দেখে মুহূর্তে মন তার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই নিজেকে অন্তরালে রেখে অনুসরণ করছিল ওদের।

যথাসময়ে মৃত্যুদূতের মতই দুজনের সামনে এসে আবির্ভূত হলো সে। আগুন যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠল বীর সিং-এর চোখে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো লোক দুটো। তারা এ রকম সঙ্কটের সম্ভাবনা আগে কল্পনা করে নি। তা'ছাড়া নিরালা বনের মধ্যে সামান্য একটু চেঁচামেচি হলেই সহসা যে কেউ এসে পড়তে পারে এ' আশঙ্কা তাদের ছিলই না। ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে আপনা থেকেই রূপসীকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ওরা। মুহ্যমানের মত দাঁড়িয়ে রইল রূপসী।

ক্ষিপ্তের মতো দা' উঁচিয়ে ওদের দিকে ছুটে গেলো বীর সিং। রূপসীর আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল বীর সিং-এর কাণ্ড দেখে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সে ওর হাত ধরল, "এই, এই মানুষ খুন করিস নে।" বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বীর সিং। সুযোগ পেয়ে লোক দুটো তড়িদ্‌গতিতে জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

দা ফেলে দিয়ে রূপসীর দিকে ফিরে তাকালো বীর সিং। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "ভাগ্যিস জ্বালানী কাঠের খুব দরকার পড়েছিল তাই এসেছিলাম এই ভর-দুপুরে।" রূপসী কিছু বলল না। শুধু সলজ্জ হাসির আভায় আরও আরক্ত আরও অপরূপ হয়ে উঠল তার মুখ।

বীর সিং-এর চোখে চোখ পড়ল রূপসীর। পলকহারা দৃষ্টিতে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত্তে। তারপরেই চোখ নত করল রূপসী। বনহরিণী বাঁধা পড়ল অচ্ছেদ্য মায়াজালে। ধীরে ধীরে বীর সিং-এর বুকে মাথা রাখল ও, মৃদুকণ্ঠে বলল, "যে কথাটা তুই বলতে চেয়েছিলি কয়েক দিন আগে সে কথাটা আজ সন্ধ্যায় বাবাকে বলিস বীর।"

# পূজ্যপাদ শ্রীরূপ-সনাতন

কালিপদ লাহিড়ী

প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরম পণ্ডিত শ্রীরূপ ও সনাতনের যে বিরাট অবদান আছে, একথা সর্বজন স্বীকৃত। পূজ্যপাদ ষড়-গোস্বামিগণের মধ্যে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী পণ্ডিতাগ্রগণ্য। শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষড়-গোস্বামীর চরণ-বন্দনা ক'রে গেয়েছেন ;—

"শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গুরুর করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্নাশ অভীষ্ট পূরণ।"

আবার পরমভক্ত নরোত্তম দাসও তাঁর 'প্রার্থনা' পদাবলীতে শ্রীরূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়ের গুণকীর্তন করেছেন।

"জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তি রসকূপ
যুগল উজ্জ্বল রসতনু।"

বৈষ্ণবাচার্য ষড়-গোস্বামীর অন্ততম ছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামী। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে তাঁর জীবন দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিল।

শ্রীরূপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের (বল্লভ) পুত্র শ্রীজীবপাদ গোস্বামী লঘুতোষিণীর উপসংহারে স্বীয় বংশপরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ সর্বজ্ঞদেব সর্বশাস্ত্রবিশারদ যজুর্বেদী এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ বিদেশ হ'তে বহু বিদ্যার্থী এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্ত 'জগদ্‌গুরু' আখ্যা লাভ করেন। অন্তদিকে তিনি ছিলেন কর্ণাটের রাজা। তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ পিতার ন্তায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর দুই মহিষীর গর্ভে রূপেশ্বর ও হরিহর নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। তিনি যথারীতি দুই পুত্রকে রাজ্য বণ্টন ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য দখল করে নেন। অনন্তোপায় হ'য়ে রূপেশ্বর তখন পৌরস্ত্য দেশের নরপতি শিখরেশ্বরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এঁর পুত্র পদ্মনাভ ভাগীরথী তীরে নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে গিয়া বাস করেন। পদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ এবং তৎপুত্র কুমারদেবই হ'লেন শ্রীরূপ, সনাতন ও অনুপমের পিতা। তাঁর বাস ছিল বাক্‌লা-চন্দ্র দ্বীপে। এঁদের পিতার দেহাবসানের পর এঁরা প্রাচীন গৌড়নগর (মালদহ জেলার অন্তর্গত) মহানন্দা নদীতীরবর্তী মোরগ্রাম মাধাইপুরে মাতুলালয়ে লালিত পালিত হন এবং বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। এঁদের পিতা কুমারদেব মোরগ্রাম মাধাইপুর নিবাসী হরিনারায়ণ বিশারদের কন্তার পাণিগ্রহণ করার পর তিনি সেই স্থানেই স্থায়িভাবে বসবাস করেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এক সময় মাধাইপুর সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল এবং এই স্থানে বহু টোল প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কুমারদেবের তিন পুত্র—শ্রীসনাতন, রূপ ও অনুপম (বল্লভ) সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীরূপ ও সনাতনের গুণগরিমা ও বিদ্যাবত্তার বিষয় তৎকালীন গৌড়ের অধিপতি হোসেন শাহের কর্ণগোচর হয় এবং তিনি পরম সমাদরে রূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়কে রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। বাদশাহ হোসেন শাহ চাইতেন রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং শ্রীবৃদ্ধি। এ জন্ত তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এবং যোগ্যতানুসারে সকলকেই স্থান দিতেন তাঁর রাজদরবারে। রূপ সনাতনের কর্ম কুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে শীঘ্রই শ্রীসনাতনকে মন্ত্রী ও শ্রীরূপকে উপমন্ত্রী পদে বরণ করেন। বলা বাহুল্য যে এই ভ্রাতৃযুগলের প্রচেষ্টায় গৌড়েশ্বরের রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। গৌড়পতি হোসেন শাহ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের বিশ্বস্ততা ও কর্মকুশলতায় অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীসনাতনকে 'দবির খাস' (অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারী) ও শ্রীরূপকে 'সাকর মল্লিক' (অর্থাৎ রেভেনিউ মিনিষ্টার) উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে শ্রীসনাতন হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন।

সেই সময় প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার পথে গৌড়ের রামকেলি নামক স্থানে উপনীত হয়ে কেলিকদম্ব মূলে উপবেশন করেছিলেন। সেই সময় হতে 'রামকেলি' বৈষ্ণব ও হিন্দুদের পরম তীর্থ ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হয়ে আছে। মহাপ্রভুর আগমনকে স্মরণীয় করার জন্ত প্রতি বৎসর সেই উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে। বিভিন্ন স্থান হতে বহু হিন্দু ও বৈষ্ণব এই মেলায় যোগদান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রামকেলির কেলিকদম্ব মূলে যে স্থানে উপবেশন করেছিলেন, সেই স্থানে তমাল বৃক্ষের নীচে মহাপ্রভুর পদ চিহ্ন আজও বিদ্যমান আছে। এই স্থানের অনতি দূরেই গৌড় বাদশাহ হোসেন শাহের প্রধান আমাত্য শ্রীরূপ ও সনাতন সেবিত মদনমোহন বিগ্রহ একটি নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মালদহের বর্তমান ইংরেজ বাজার শহর হতে মাত্র ১২ মাইল দূরবর্তী এই মদনমোহন বিগ্রহের মন্দিরটির সহিত শ্রীরূপ-সনাতনের নামের পুণ্য স্মৃতি যেমন বিজড়িত হ'য়ে আছে, তেমনই গৌড়ের অন্তান্ত প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধ্বংসাবশেষের মত ইহা দ্রষ্টব্য বস্তু মধ্যে পরিগণিতও হয়ে আছে। শ্রীরূপ ও সনাতন তখন গৌড়ে বাস করতেন। কৃপা বিতরণের উদ্দেশ্যেই যে মহাপ্রভুর এই স্থানে আগমন, চৈতন্ত-চরিতামৃতকার তাঁর অমূল্য গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন।

"গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তো মা দোঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন॥"

* * *

"জন্মে জন্মে তুমি দুই কিংকর আমার
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমার করুন উদ্ধার
এত বলি দোঁহার শিরে দিল দুই হাতে
দুই ভাই ধরি, প্রভুর পদ নিল মাথে
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে
সবে কৃপা করি উদ্ধারহ দুই জনে॥"

মহাপ্রভুর আগমনে পরম পণ্ডিত ও জ্ঞানী ভ্রাতৃদ্বয় দণ্ডে

তৃণ ধারণ করে অতি দীনবেশে গলবস্ত্র হয়ে মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর চরণযুগল বন্দনা করলেন।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।

এই শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহ এবং বৈষ্ণব বিনয়ের অবতার শ্রীরূপ ও সনাতন।

মহাপ্রভুর রামকেলি ত্যাগের পর হতেই ভ্রাতৃযুগলের বিষয় সম্ভোগে অনিচ্ছা প্রকাশ পায় এবং ভাবান্তর উপস্থিত হয়। একদিন কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য শেষ করতে অধিক রাত্রি হল। আহারাদির পর বিশ্রাম কালে একটি বিষধর কীট শ্রীরূপকে দংশন করায় তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে তাঁকে শয্যাপার্শ্বস্থ প্রদীপ জ্বালাতে বললেন, ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তিনি অন্ধকারে প্রদীপ খুঁজে না পেয়ে স্বামীর ব্যবহৃত স্বর্ণমণ্ডিত রেশমীবস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করলেন। মূল্যবান বস্ত্র এইভাবে নষ্ট করায় শ্রীরূপ স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলেন।

এর উত্তরে স্ত্রী বললেন "স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। আমি এই বিবেচনা করেই এ কাজ করেছি। কর্ত্তব্য সম্পাদনের সময় বহুমূল্য বস্ত্র অথবা মূল্যবান বস্ত্রকে তুচ্ছ মনে হয়।"

পত্নীর কথায় শ্রীরূপের চৈতন্যোদয় হল। তিনি পত্নীকে বললেন—"তুমি ত তোমার পতির প্রতি কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করেছ, কিন্তু আমি আমার প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিনি। অদ্যাবধি আমি কেবল মূল্যবান বেশভূষা এবং বিষয় সম্ভোগে কাল ক্ষেপণ করেছি।"

এই কথা চিন্তা করার পর তিনি ভাবাবেগে আবিষ্ট হন। এর অল্পকাল পরেই শ্রীরূপ জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীসনাতনের অজ্ঞাতসারে কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমসহ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনোদ্দেশ্যে প্রাসাদোপম গৃহ ত্যাগ করেন। গৃহত্যাগ কালে শ্রীরূপ তাঁর বিপুল সম্পত্তির অর্দ্ধেক দিলেন দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে, এক চতুর্থাংশ কুটুম্বভরণে এবং অবশিষ্ট চতুর্থাংশ দিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতনকে। জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের এবম্বিধ অপরিসীম শ্রদ্ধা তাঁর মহত্ত্ব এবং উদারতার পরিচায়ক।

শ্রীরূপ শুনেছিলেন যে, মহাপ্রভু নীলাচল হতে বনপথে বৃন্দাবনে যাবেন। তিনি কনিষ্ঠভ্রাতা সহ প্রয়াগে এলেন। প্রয়াগে সহস্র সহস্র লোক প্রভুর দর্শনের আশায় সমবেত। কবির বর্ণনায় আছে ;—

"কেহ কান্দে কেহ হাসে, কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়।"

প্রভুর দর্শন ও কৃপা লাভ ক'রে শ্রীরূপ করজোড়ে কৃষ্ণ-স্বরূপ প্রেমাবতারের স্তুতি পাঠ করলেন। প্রয়াগধামে দশদিন অবস্থান কালে মহাপ্রভু শ্রীরূপের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের সঞ্চার করলেন এবং তাঁকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান ক'রে ভক্তি যোগের লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা ক'রলেন ;—

"ধর্মাচারী মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভক্তি—মুক্তি—সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।"

প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন ;—

'শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চন প্রভৃতি দ্বারা এই ভক্তি পরিপুষ্ট হয়। শুদ্ধাভক্তি হতে প্রেম উৎপন্ন হয়।

শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ :—"নিজ সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি ভাবের যে কোন একটিকে আশ্রয় করলে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি লাভ ঘটে।" পরে প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরূপ বৃন্দাবনে আসেন।

শ্রীবৃন্দাবনে এসে শ্রীরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতার অদর্শনে কাতর হয়ে গৌড়ে শ্রীসনাতনের নিকট একটী অষ্টাক্ষর লিপি প্রেরণ করলেন। লিপিতে লিখলেন ;—

"য—রী, য—লা, ই—র, ম—দ"

গৌড়ে সুপণ্ডিত সনাতন সংক্ষিপ্ত অষ্টাক্ষর লিপিপ্রাপ্ত মাত্রেই তার পাদ পূরণ ক'রলেন।

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা ।।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং।
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ।।"

এই শ্লোকটি পাঠ করে সনাতন অবিলম্বে সংসার বন্ধন ছিন্ন করে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপের সহিত মিলিত হবার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। উপর্যুপরি তিন দিবস শ্রীসনাতন রাজদরবারে উপস্থিত না হয়ে গৃহে সাধুসজ্জন পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে উন্মত্ত হলেন। তিনি রাজকার্যে অনিচ্ছা এবং সংসারের প্রতি অনাসক্তির কথা না জানিয়ে বাদশাহকে অসুস্থতার কথা জানালেন। সনাতন ব্যতীত রাজ্যশাসন অসম্ভব বিবেচনা ক'রে বাদশাহ স্বয়ং সনাতনালয়ে উপস্থিত হলে সনাতন তাঁকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করলেন এবং অতি বিনীত ভাবে তাঁকে নিবেদন করলেন, "জাঁহাপনা! আমাকে আপনি রাজকার্য হ'তে অব্যাহতি দিন এবং উজীরের কার্য 'আর একজন দিয়া কর সমাধান'। আমি নিত্য প্রেমের মূর্ত্তপ্রতীক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে আমার হৃদয়রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেছি।" গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ ভাগবত পাঠরত বিরক্ত ভাবাপন্ন শ্রীসনাতনকে বললেন ;

"আমার যে কিছু কার্য
সব তোমা লঞা।
কার্যছাড়ি রহিলা তুমি
ঘরেতে বসিয়া ।।
মোর যত কার্য কাম
সব কৈল নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে
কহ মোর পাশ ।।"

শ্রীসনাতনের রাজকার্যে একান্ত অনিচ্ছা এবং—তাঁর প্রস্তাবে অসম্মত জেনে বাদশাহ অবশেষে সনাতনকে কারারুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন।

পদকর্ত্তা মধুর ছন্দে লিখলেন ;—

"অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে ।।"

আবার কাব্যে স্থান পেলো ;

"এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পালাইব বলি সনাতনেরে বান্ধিলা।"

এই সময় সনাতনের বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। বাদশাহের অনুপস্থিতির সুযোগে শ্রীসনাতন তাঁর অতি প্রিয় কিঙ্কর ঈশানের সাহায্যে এবং স্বীয় বুদ্ধিমত্তার গুণে কারারক্ষক সেখ হবুকে উৎকোচ প্রদান করে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর শ্রীসনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ দর্শনের আশায় অনতিবিলম্বে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গে ভৃত্য ঈশান। কিয়দ্দূর গমন করার পর ঈশানের চিত্তশুদ্ধির উপায় জানতে পেরে তার সঙ্গ পরিহারের উদ্দেশ্যে তাকে গৌড়ে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। অনশনে অর্ধাশনে হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ! বলতে বলতে তিনি জঙ্গলাকীর্ণ পথে একাই চলেছেন। পথশ্রমে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর সনাতন অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনের পূর্বেই বারাণসীধামে তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণ-স্পর্শ এবং প্রেমালিঙ্গন লাভ করে ধন্য হ'লেন। শ্রীবৃন্দাবন হ'তে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে এই মধুর মিলন সংঘটিত হয়। এই সনাতনের কৌপীন, একমাত্র বহির্বাস, একখণ্ড শতগ্রন্থিযুক্ত কন্থা এবং করপাত্র ভিন্ন অন্য কিছুই কিছুই সঙ্গে ছিল না। এই স্থানে মাত্র তিন রাত্রি অবস্থান করার পর তিনি মহাপ্রভু দর্শনোদ্দেশ্যে বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

বৃন্দাবনে মহাপ্রভু ভ্রাতৃযুগলকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করেন এবং কৃষ্ণলীলা স্থলগুলি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হওয়ায় ঐগুলি লুপ্ততীর্থ পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত রূপ ও সনাতনকে আদেশ করেন ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন ক'রে কলির জড়জীবগণের ভবযন্ত্রণা মোচনের আদেশ দেন। মহাপ্রভুর আদেশে ভ্রাতৃদ্বয়—

"অনিকেতন দুঁহে রহে, যত্র বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন।
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি।
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্তন উল্লাস।"
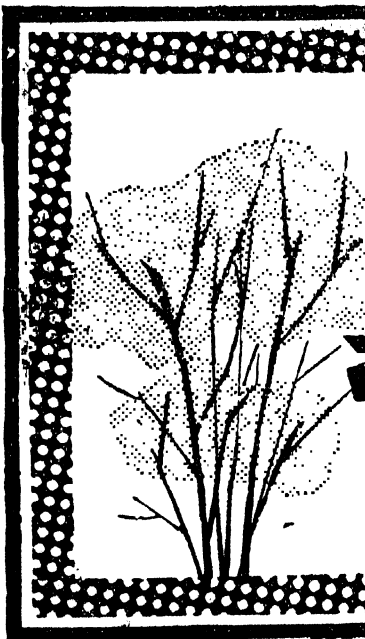
কঠোর তপশ্চর্যা ও ধ্যান-ধারণার ফলে শ্রীরূপ সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীকৃষ্ণলীলা সমূহ নিজেদের মধ্যে উপলব্ধি করেন এবং প্রভুর আদেশানুযায়ী কৃষ্ণলীলার স্থানগুলি আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী ছিলেন একাধারে সুপণ্ডিত, শাস্ত্রবেত্তা কবি ও নাট্যকার। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থগুলি সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। গৌড়ে মন্ত্রিত্ব করার সময়ে কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দের অনুসরণে তিনি "উদ্ধব-সন্দেশ" নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছেন, এবং ভণিতায় জ্যেষ্ঠ সনাতনের নাম উল্লেখ ক'রে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধানুরাগের পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন :—

"কর্ণকরম্বিত কৈরব হাসা—
কলিত সনাতন সঙ্গ বিলাসা।"

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকায় বলেছেন, "শ্রীরূপ গোস্বামী কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এ পর্যন্ত তাহার সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই।" শ্রীরূপ প্রণীত গ্রন্থের একটি তালিকা তিনি দিয়েছেন

এবং তাতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্থান পেয়েছে। লক্ষ গ্রন্থ, ব্রজবিলাস বর্ণন, রসামৃত সিন্ধু, বিদগ্ধ মাধব, উজ্জ্বল নীলমণি, ললিত মাধব, দানকেলী, কৌমুদী, স্তবাবলী, পদ্যাবলী, গোবিন্দ বিরুদাবলী, গোবিন্দ বিরুদাবলী লক্ষণ, মথুরা মাহাত্ম্য, নাটক বর্ণন, লঘু ভাগবতামৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশক ও প্রচারক সুপণ্ডিত শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এম, এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) মহাশয় উল্লিখিত হংসদূত ও উদ্ধব সন্দেশ নামক পুস্তকের নামের কোন উল্লেখ এই তালিকায় দেখা যায় না। সংসারাশ্রমে অবস্থানকালে শ্রীরূপ পদ্যাবলী নামক একখানি অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন ক'রে তিনি অপূর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। এতদ্ব্যতীত, নাট্যশাস্ত্রেও তাঁর দান অপরিসীম। সর্বসমেত এই বিষয়ে তিনি তেরটি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়। একদিন বৃন্দাবনে তিনি বিদগ্ধ মাধব নাটক রচনায় ব্যস্ত আছেন, এমন সময় আচম্বিতে মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হ'য়ে শ্রীরূপের মুক্তার ন্যায় হস্তাক্ষর দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আর একদিন হরিদাস আলয়ে তাঁর রচিত কৃষ্ণমহিমা কীর্তন বিষয়ক অমৃত-নিঃস্যন্দী অপূর্ব শ্লোক শোনামাত্রই ভাবাবেশে আবিষ্ট হন। ভক্ত হরিদাস শ্লোক শ্রবণান্তে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে, মহাপ্রভুর কৃপা ও শক্তি সঞ্চার ব্যতীত ভক্তি রসাশ্রিত এ হেন অনবদ্য শ্লোক রচিত হওয়া সম্ভব নয়। শ্রীরূপ রচিত শ্লোক :—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

অনুবাদ :—

"যাহা জিহ্বাগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিয়া তুণ্ডাবলী লাভের জন্য রতি বিস্তার করে, যাহা কর্ণপথে অঙ্কুরিত হইয়াই অর্বুদ সংখ্যকে কর্ণেন্দ্রিয় লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং যাহা চিত্ত প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে রহিত করে, এতাদৃশ 'কৃ' ও 'ষ্ণ' অক্ষরদ্বয় কিরূপ অমৃতে রচিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।"

পরে আর একদিনের ঘটনা। রায় রামানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, স্বরূপ গোস্বামী, সার্বভৌম প্রভৃতি সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপের নিকট আগমন করেন। রূপ মহাপ্রভু সহ সকল ভক্তের চরণ বন্দনা করার পর সকলেই রূপকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে রূপের ভিতর কৃষ্ণ-রস-ভক্তি সঞ্চার করার নিমিত্ত মহাপ্রভু অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে আদেশ দিলেন। সেই সময় মহাপ্রভুর সহিত রূপের প্রত্যহই মিলন হত এবং মহাপ্রভু রূপকে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ প্রদান করতেন। এইভাবে রূপ প্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হন। এর পর রায় রামানন্দ রূপকে ইষ্ট বন্দনাটি পাঠ করে শোনাতে আদেশ করলেন। রূপ তাঁর সুমধুর ছন্দে গ্রথিত শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন।—

"অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিপুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

অনুবাদ :—

"বহুকাল পর্যন্ত যাহা অর্পিত হয় নাই। উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি সম্পদ দান করিবার জন্য যিনি করুণাবশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সুবর্ণ হইতেও অতি উজ্জ্বলদ্যুতি সমূহ উদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন সর্বদা তোমার হৃদয়ে উদিত হউন।"

এর পর পরমপণ্ডিত রায় রামানন্দ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শ্রীরূপ ললিত মাধবের 'নান্দী' আবৃত্তি করলেন। নান্দী শ্রবণ করে পরমভক্ত রায় রায় অতীব আনন্দিত হ'য়ে রূপকে অভিনন্দিত ক'রে বললেন,—

"রূপের কবিত্ব অমৃতের পুর
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।"

এ বিষয়ে চৈতন্য চরিতামৃতেও উল্লেখ দেখা যায়,—

"রায় কহে তোমার কবিত্ব, অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ 'নান্দী' ব্যবহার॥
রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যসম ভাস।
মুঞি কোন ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ॥"

শ্রীরূপের ভক্তিশাস্ত্র, কাব্য ও নাটকগুলি সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের যে অতি মূল্যবান সম্পদ ও মূল্যবান সংযোজন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সেই সময় মোগল সম্রাটের অত্যাচারে বৃন্দাবন, মথুরাদি হিন্দু তীর্থস্থান সমূহ বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত ও জনশূন্য হয়েছিল এবং বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছিল। তখন শ্রীরূপ গোস্বামী অন্য একটি গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ক'রে মহাপ্রভুর আদেশানুযায়ী বৃন্দাবনাদি লীলা ক্ষেত্র ও তীর্থস্থানগুলি উদ্ধার ক'রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরম পণ্ডিত শ্রীরূপ-সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবন ধামের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল।

বঙ্গ সন্তান শ্রীরূপও সনাতন গোস্বামীর মনীষা, ভক্তিপরায়ণতা অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বিরাট অবদানের কথা হিন্দু ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হ'য়ে আছে এবং থাকবে, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত।

# দুই ঋতু

কৃত্তী সোম

সুতীব্র জ্বলনে জ্বলি, তৃষ্ণার্ত হৃদয়
দাবদগ্ধ গ্রীষ্মের প্রহরে;
হাওয়ার মাতামাতি প্রচণ্ড নেশায়
মনের আকাশ ভাঙে ঝড়ে।

তার চেয়ে ভালো তবু বর্ষা নামুক
কালো মেঘ ধুয়ে ধুয়ে যাক,
আকাশ স্খলিত হোক প্রথম বর্ষায়
জ্বলন্ত হৃদয় জল পাক।

# অলডাস হাকস্‌লি

সুনীলকুমার নাগ

আজকের পৃথিবীতে মানুষের জীবন নানা সমস্যার ভারে ভারাক্রান্ত। শুধু সমস্যা আর সমস্যা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা তো রয়েছেই—একক ভাবে মানুষ যার কোনোই সমাধান করতে পারে না। কিন্তু তা'ছাড়া ব্যক্তি মানুষের জীবনেও নানা রকমের সমস্যা রয়েছে শিক্ষার সমস্যা রুচির সমস্যা আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যা যৌন জীবনের সমস্যা—আরো কতো কি! এই বিভ্রান্তিকর সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ার ফলে একটু সুষ্ঠ এবং সুন্দর ভাবে, শালীনতার সঙ্গে জীবনযাপনের আদর্শ আজকের দিনে নেহাৎ বইয়ের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু স্থির ভাবে চিন্তা করবার ফুরসৎ বলতে গেলে প্রায় কারোই নেই। সকলেই ব্যস্ত। প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত। যাকে বলে প্রাণ রাখতে প্রাণান্তকর অবস্থা!

অথচ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুচিন্তিত পদক্ষেপ এ যুগের মানুষের পক্ষে যতটা প্রয়োজন, দু'শো কি পাঁচ শো বছর তো দূরের কথা, খুব সম্ভব পঞ্চাশ বছর পূর্বেও ততটা ছিলো না। নানা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের পক্ষে যে সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তার মধ্যে কোথায় যেন একটা কিছু মারাত্মক গলদ রয়ে গেছে, তাই প্রতি মুহূর্তে সভ্য জগতের আজ আশঙ্কা—এই বুঝি বিজ্ঞানের আশীর্বাদ অভিশাপ হয়ে দেখা দিলো। পণ্ড হ'লো কোটি কোটি মানুষের কয়েক হাজার বছরের পরিশ্রম। বানচাল হয়ে গেলো সভ্যতা।

ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় অধিকাংশ মানুষকেই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, কাজেই সমগ্র ভাবে মানুষের কথা বা মানব সভ্যতার কথা ভাববার তার অবকাশ নেই। কিন্তু এরই মধ্যে পৃথিবীর এখানে সেখানে এক আধ জন নিজের বা পরিবারের চিন্তা ফাঁকে ফাঁকে বা ওদিকটা একেবারেই ভুলে গিয়ে সাধারণ ভাবে মানুষের ভালোমন্দ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। আজকের পৃথিবীতে এই ধরণের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অন্যতম হলেন অলডাস হাকস্‌লি।

অলডাস হাকস্‌লির Aldous Leonard Huxley, born in 1894, July 26) বর্তমান বয়স আটষট্টি বছর। ব্যক্তিগত জীবনে ওঁর সমস্যার সংখ্যা খুব বেশি নয় মাত্র একটিই, কিন্তু সে অতি মারাত্মক। কিন্তু তৎসত্বেও গত চল্লিশ বছর কি তারও বেশি কাল ধরে উনি মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করছেন। কখনো প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ, কখনো প্রীতিপূর্ণ পরামর্শ, কখনো বা নির্মম বিদ্রূপ করে হাকস্‌লি মানুষকে তার নিজের সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। লিখছেন উনি আজ প্রায় ছেচল্লিশ বছর ধরে এবং কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, জীবনী অর্থাৎ সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগেই নিজের বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কনিষ্ঠ লেখকদের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছেন।

পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায় উত্তর জীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এ রকম বহু লেখককে প্রথম জীবনে ছোটো বড়ো যে কোনো ধরণের রচনা প্রকাশ করবার জন্যে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়েছে—তা' সে কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করবার ব্যাপার হ'ক আর বই হিসেবে হ'ক। সৌভাগ্যবশত হাকস্‌লিকে সে ধরণের কোনো হয়রানি ভোগ করতে হয়নি। তার কারণ, ওঁর পূর্বতন দুই পুরুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি, নাম-ডাক।

অলডাস হাকস্‌লির আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ইংলণ্ডের হাকস্‌লি পরিবার স্বদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলো। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অন্যতম প্রবর্তক টমাস হেনরী হাকস্‌লি ছিলেন অলডাস হাকসলির ঠাকুরদাদা। আর বিখ্যাত 'কর্ণহিল' পত্রিকার সম্পাদক লেনার্ড হাকস্‌লি ছিলেন ওঁর বাবা। হাকসলির মাতৃকুলও ইংলণ্ডের একটি বিখ্যাত পরিবার। হাকসলির মা ছিলেন স্বনামধন্য কবি, নাট্যকার ও সাহিত্য সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ডের ভাইঝি। হাকস্‌লির এক মাসি হাম্পফ্রে ওয়ার্ড তাঁর সময়কার একজন জনপ্রিয় মহিলা-ঔপন্যাসিক ছিলেন। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী জুলিয়ান সোরেল হাকস্‌লি অলডাস হাকস্‌লির বড় ভাই।

এই সমস্ত যোগাযোগ থাকবার জন্যে দেখা যায় প্রথম জীবনে যখন সাময়িক পত্রিকাদিতে রচনা ছাপাবার জন্যে তরুণ লেখককে মনে প্রবল বাসনা জাগে এবং আট লাইনের একটি কবিতা কিম্বা দু' পৃষ্টার একটি গল্প ছাপার অক্ষরে দেখবার জন্যে দিনের পর দি[ন] নানা পত্রিকার অফিসে হন্তে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়—সে বয়সে হাকস্‌লিকে কিছুমাত্র ঝামেলা পোহাতে হয়নি। কারণ সে পত্রিকাগুলির মালিক এবং সম্পাদকদের বেশির ভাগই ব্যক্তিগত ভা[বে] হাকস্‌লিকে চিনতেন এবং টি এইচ-এর নাতি বা লেনার্ডের ছে[লে] হিসেবে বিশেষভাবে জানতেন। কিছু একটা লিখলেই ছাপানো নিশ্চয়তা আছে জেনেও ষোলো-সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত হাকস[লি] কিছু লেখবার চেষ্টা করেননি। যে বয়সে অধিকাংশ ভবিষ্যৎ-লেখক ম[নে] মনে লেখার ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে যান এবং কার্বিতও দু'চারখা[না] খাতা লিখে শেষ করেন।

আসল কথা হচ্ছে সাহিত্যিক হবার কোনো বাসনাই ছিলো না অলডাস হাকস্‌লির। স্কুলের ছাত্রজীবনে এগারো-বারো বছর বয়সেই হাকস্‌লির ইচ্ছে হ'লো ভবিষ্যৎ জীবনে ডাক্তার হবেন। নিজেদের বাড়ী এবং মামার বাড়ীর সকলেও বালক হাকস্‌লির এই ইচ্ছের তারিফ করলেন। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে ডাক্তারী পড়তে সুবিধে হয় স্কুলের পড়াশুনোর গতিও সেইভাবে নির্ধারিত করা হ'লো। কিন্তু কয়েকটা বছর যেতে না যেতেই একটা মারাত্মক সমস্যা দেখা দিলো। আগেই বলেছি হাকস্‌লির ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যার সংখ্যা খুব বেশি নয়; বলতে গেলে এই একটিই। কিন্তু এ অতি মারাত্মক সমস্যা। হাকস্‌লি অন্ধ হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অন্ধ। সতেরো বছর পূর্ণ হবার কয়েক মাস আগের কথা। একদিন হাকস্‌লি অনুভব করলেন যেন চোখের ভেতর জ্বালা করছে। ক্রমশ বাড়তে লাগলো জ্বালার ভাবটা, তারপর একসময় আঁতকে উঠলেন কিশোর হাকস্‌লি, কারণ দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসছিলো। এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হাকস্‌লি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলেন। ডাক্তার বাবুরা বললেন চোখে ওঁর 'কেরাটাইটিস' হয়েছে সারবে কিনা নিশ্চয়ই বলা যায় না, তবে চেষ্টা তো করতেই হবে। তাই শুরু হলো হাকস্‌লির চোখের চিকিৎসা। মাস দুই চিকিৎসা চলবার পরও যখন কিছুমাত্র উন্নতি হলো না চোখের অবস্থার তখন প্রাণখুলে কয়েকটা দিন কাঁদলেন হাকস্‌লি, কিন্তু তারপরেই মনে মনে নিজেকে তৈরী করে নিলেন উনি। জ্ঞানলিপ্সু কিশোর হাকস্‌লি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন অন্ধ অবস্থাতেই পড়াশুনো চালিয়ে যাবার জন্যে। শুরু হলো 'ব্রেইলী' পদ্ধতি পড়াশুনো।

টাইপ ওঁর আগেই শেখা ছিল। পড়াশুনোর ব্যাপারে যখনই লেখবার কোনো প্রয়োজন দেখা দিতো, সে কাজ উনি 'টাইপ' করে সারতেন। জ্ঞানার্জনের লিপ্সা ওঁর এতই প্রবল ছিলো যে অন্ধ হয়ে যাবার পর আত্মীয়স্বজন যাঁকেই যখন কাছে পেতেন হাকস্‌লি অনুরোধ করতেন কিছু পড়ে শোনাবার জন্যে। সাধারণত বিজ্ঞানের বইয়ের দিকেই ঝোঁক ছিলো ওঁর—অন্ধ হবার কয়েক মাস পর্যন্ত হাকস্‌লির বিশ্বাস ছিলো, যে ভাবেই হ'ক ডাক্তারী পড়া যাবে। দৃষ্টিশক্তিহীনতা যে ডাক্তারী পড়ার পক্ষে কতো বড়ো প্রতিবন্ধক, সে কথা উপলব্ধি করবার মতো বাস্তববুদ্ধিটুকু সে সময়ে ওঁর নিশ্চয়ই হয়েছিলো। কিন্তু মানুষের এমনই স্বভাব যে রূঢ় সত্যকে বেশির ভাগ সময়েই সে এড়িয়ে চলতে চায়, এটা নিঃসন্দেহে অবচেতন মনেরই খেলা।

সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় ছ'মাস কেটে গেলো হাকস্‌লির। চিকিৎসা যদিও সমানেই চলতে লাগলো, কিন্তু কোনো রকম সুফল দেখা গেলো না। কিন্তু তবু চলতে লাগলো চেষ্টা। দেশের সেরা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞেরা পরামর্শ দিতে লাগলেন। আত্মীয়স্বজনের সামনে দেখা দিলো একটা কঠিন সমস্যা। সাধারণ ভাবে বিজ্ঞান এবং বিশেষ ভাবে ডাক্তারীর প্রতি হাকসলির যে ঝোঁক, তার পরিবর্তন ঘটানো যায় কি করে? এ সব দিকে যে কোনই সম্ভাবনা নেই—এই অপ্রিয় এবং রূঢ় সত্য কথাটা কে বলবে কিশোরকে? চোখ ভালো হবার যে আর কোনোই আশা নেই—সেই কথাটাই কি তা হলে বিশেষ ভাবে ওর মনে বাজবে না? তা' হলে তো নিশ্চয়ই চিকিৎসকদের সঙ্গেও ওঁর পক্ষ থেকে আর কোনো রকম সহযোগিতা আশা করা যায় না। কি করা যাবে তা' হলে? হাকসলির অভিভাবকস্থানীয়রা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে ওঁর রুচি-প্রবৃত্তির ওপর কোনো রকম জবরদস্তি না করে বরং স্বেচ্ছায় উনি কোন দিকে এগোতে পারেন অন্ধতা সত্বেও সেইটে দেখা যাক। ঠিক হলো ওঁর পড়াশুনোর অভ্যাসটা কাজে লাগাতে হবে। কাজেই বিজ্ঞানের বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলো আরো পাঁচ রকমের বই—জীবনী, ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনী। আর তা' ছাড়া সঙ্গীতচর্চার আয়োজনও হলো কিছু কিছু। বিশেষ করে পিয়ানো এবং বেহালা। কণ্ঠসঙ্গীত চর্চার জন্যও পরিবারের লোকজনেরা ক্রমাগত উৎসাহ জোগাতে লাগলেন ওঁকে।

এই ভাবে মাস দুই চলবার পর একটা পরিবর্তন দেখা দিলো হাকস্‌লির রুচিতে। এই পরিবর্তনের কথা হাকস্‌লি নিজেও বলেছেন পরবর্তী জীবনে। বলেছেন: ছিলাম পুরোপুরি বহির্মুখীন, আর সাহিত্য পাঠের ফলে যেন আকস্মিক ভাবেই যাতায়াতি হয়ে পড়লাম অন্তর্মুখীন। দুদিন আগেও একা একা অত্যন্ত অসহায় বোধ করতেন হাকস্‌লি, কিন্তু এই অন্তর্মুখীনতার ফলে এখন আর একা একা মোটেই কষ্ট হতো না, এমন কি উনি চাইতেন নিঃসঙ্গ থাকতে। বাড়ীর লোকজন প্রথমটা আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে বোধহয় অন্ধতাজনিত বাস্তববোধ জাগবার ফলে ভেতরে ভেতরে কিছু একটা আঘাত পেয়েছেন হাকস্‌লি। কিন্তু অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই সে আশঙ্কা ওঁদের কেটে গেলো। সবাই আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন হাকস্‌লির মধ্যে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন। প্রায় সময়েই গুন্ গুন্ করে গান গাইছেন, ছোটো ছোটো কবিতা রচনা করছেন এমন কি নিজে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলবার চেষ্টা করছেন, তাই কি টাইপরাইটারে ছোটো কয়েকটা গল্প লিখেও ফেললেন।

এই ভাবে আরো মাস দুই কাটবার পর একটা মজার ব্যাপার হ'লো। বাড়ীর লোকজনেরা যে কিছুটা অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে এবং কিছুটা ডাক্তারী থেকে ঝোঁক ফেরাবার জন্যে ওঁকে নানা রকমের সাহিত্যের বই দিতে লাগলেন, এটা বুঝে ফেললেন হাকস্‌লি। কিন্তু বুঝতে পেরেও কোনো রকম হৈ চৈ করলেন না বরং ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা কৌতুক অনুভব করতে লাগলেন। বাড়ীর লোকেরা যে ওঁর রচিত সব কিছুরই একটু বেশি বেশি প্রশংসা করছেন, এটাও কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন হাকস্‌লি। ডাক্তারী পড়বার জন্যে যে ওঁর ইচ্ছে বা আগ্রহ কোন দিন থেকে কমে এসেছিল তা মনে করবার কোনোই কারণ নেই। আসল কথা সাহিত্যকে উনি ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলেন এবং বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা বা লেখার মধ্যে যে একটা এ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ আছে, কিশোর হাকস্‌লির এই জিনিসটা সব চাইতে ভালো লাগলো। এই ক'মাসে যে কয়েকটা গল্প উনি মুখে মুখে 'বানালেন' বা টাইপ করে লিখলেন সে নেহাৎ ছোটো। বলতে গেলে দু'মিনিটে ফুরিয়ে যায়, পড়তে গেলে বড় জোর মিনিট পাঁচেক লাগে। মোটা মোটা উপন্যাসগুলিতে অন্ধ কিশোর হাত বুলোতেন আর মনে মনে ভাবতেন এই রকম মোটা মোটা কাহিনী কি ইচ্ছে করলে তৈরী করা যায় না? হাকস্‌লি অনুভব করলেন যেন ভেতর থেকে কে চ্যালেঞ্জ করছে। কখনো মনে হয় এটা সাধ্যের অতীত কাজ, কখনো

মনে হয় একটু চেষ্টা করলেই পারা যাবে। এমন কিছু অসাধ্য নয়। এই ভাবে কয়েকটা দিন কাটবার পর হাকস্‌লি ঠিক করলেন যে ভাবেই হ'ক একখানা উপন্যাস রচনা করতেই হবে। কাউকে কিছু বললেন না প্রথমটা, একা একা মনে মনে ভেবে নিলেন কি লিখবেন তাই। দিন পনেরোর মধ্যে ঠিক হয়ে গেলো একটা কাহিনী। শেষ পর্যন্ত টাইপ মেশিন নিয়ে বসলেন হাকস্‌লি। সুরু হ'লো অন্ধ কিশোরের সাহিত্য সাধনা। মাস দেড়েকের মধ্যে হাকস্‌লি শেষ করলেন তাঁর উপন্যাস। আত্মীয়স্বজনেরা একে একে সকলেই পড়লেন টাইপ করা উপন্যাসখানা। হাকস্‌লিকে বলবার সময় অবশ্য সকলেই বাড়িয়ে বলতেন উপন্যাস রচনায় তাঁর দক্ষতার কথা। কিন্তু এবার আত্মীয়স্বজনেরা সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময়েও কমবেশি বিস্ময় প্রকাশ করলেন অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি হাকস্‌লির এতখানি প্রবণতা দেখে। এই সময়ে হাকস্‌লির বয়স ঠিক আঠারো।

মাস কয়েক পরের কথা। একদিন সকাল বেলা চীৎকার করে উঠলেন হাকস্‌লি—আলো, আলো, আমি আলো দেখতে পাচ্ছি।

একটুক্ষণের মধ্যে এসে জড়ো হ'লেন বাড়ীর সবাই। খবর দেওয়া হ'লো ডাক্তারবাবুদের। একজন ডাক্তার পকেট থেকে 'ম্যাগনিফায়িং' গ্লাসখানা বের করে হাকস্‌লির হাতে দিয়ে খবরের কাগজখানা এগিয়ে দিলেন চোখের সামনে। বললেন—পড়ো তো খবরের কাগজখানা। হাকস্‌লি ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের সাহায্যে খবরের কাগজের নামটা অনায়াসেই পড়ে দিলেন। উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ডাক্তারবাবুরা। একজন বললেন—এখন মনে হ'চ্ছে ওঁর চোখ ভালো হয়ে যাবে। একেবারে স্বাভাবিক না হ'ক অন্তত অন্ধ-দশায় ওঁকে কাটাতে হবে না। আরো মাস তিনেক পরের কথা। একদিন পরীক্ষার পরে ডাক্তারবাবুরা ঘোষণা করলেন যে হাকস্‌লির অন্ধত্ব ঘুচে গেছে। এখন বলতে হবে ওঁর দৃষ্টি শক্তি একটু দুর্বল মাত্র—তার বেশি কিছু নয়। কারণ দেখা গেলো খবরের কাগজের হেডিং বা সাব হেডিং খালি চোখেই পড়তে পাচ্ছেন উনি আর ম্যাগনিফায়িং গ্লাস এর সাহায্যে খবরের কাগজের ভেতরের অংশও নির্ভুল ভাবেই পড়তে পাচ্ছেন।

দু'বছর অন্ধ হয়ে থাকবার পর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার কথা হাকস্‌লি নিজেই বলে গেছেন যে এ আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ওঁর নিজের এবং আত্মীয়স্বজন সকলের একই অবস্থা। ভাগ্যকে, ভগবানকে এবং ডাক্তারবাবুদের ধন্য ধন্য করলেন সবাই। ডাক্তারবাবুরা জানালেন—দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো বটে, কিন্তু সারা জীবনই এ জন্যে কড়া নজর রাখতে হবে। ক্রমশ চোখ ভালোর দিকেই যাবার কথা, কিন্তু কখনো সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটলেই আবার বিশেষভাবে চিকিৎসা সুরু করতে হবে। হাকস্‌লির জন্যে যে চশমার বন্দোবস্ত করা হ'লো তার কাঁচ প্রায় ম্যাগনিফায়িং গ্লাসেরই মতো।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা দুঃখও পেলেন হাকস্‌লি। অন্ধ-অবস্থায় টাইপ করে যে উপন্যাসখানা রচনা করেছিলেন অনেক খুঁজেও সেখানা পাওয়া গেলো না। নিজেদের বাড়ী, মামার বাড়ী, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী—অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেলো না। প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসখানা স্বচক্ষে দেখতে না পাওয়ার জন্যে খুবই ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়লেন হাকস্‌লি। অন্যান্য সকলেও দুঃখিত কম হ'লেন না। কিন্তু যা হারিয়ে গেছে তার জন্যে বসে বসে হায় হায় করে লাভ নেই। তাই বড়োরা অন্যভাবে উৎসাহিত করতে লাগলেন ওঁকে—ওখানা না পাওয়া গেলো তো হয়েছে কি। আরো তো কতো লিখবে তুমি।

আরো লিখবো?—প্রশ্নটা বারে বারেই ঘুরে ফিরে নাড়া দিতে লাগলো কিশোর হাকস্‌লিকে।

এদিকে চোখ দু'টি কাজ চালানোর মতো ভালো হয়ে যাবার জন্যে পড়াশুনোর প্রশ্নটাও নতুন করে দেখা দিলো। এবার হাকস্‌লি নিজেই বুঝলেন যে, চোখের বর্তমান যে অবস্থা তাতে ডাক্তারী বা অন্য কোনো রকমের বৈজ্ঞানিক ধরণের পড়াশুনোর অনেক অসুবিধে। অকস্মাৎ যে কোনো সময়ে আবার চোখের ব্যারামটা দেখা দিলে সবই পণ্ড হয়ে যাবে। এদিকে সাহিত্যের প্রতিও বেশ একটা অনুরাগ দেখা দিয়েছে। তাই হাকস্‌লি নিজেই ঠিক করলেন সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্ব পড়বেন। আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই সমর্থন জানালেন ওঁকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'লেন হাকস্‌লি। এই সময়ে পুরু কাঁচের চশমা সর্বদাই ব্যবহার করতে হ'তো ওঁকে, কখনো কখনো ম্যাগনিফায়িং গ্লাসও ব্যবহার করতেন।

চোখের এই অসুবিধে সত্ত্বেও একুশ বছর বয়সে ভালোভাবেই বি-এ পাশ করলেন হাকস্‌লি। এটা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের কথা। ইয়োরোপ তখন মহাযুদ্ধের আবর্তে দলিত মথিত হচ্ছিলো।

অন্ধ অবস্থায় যখন একটু একটু করে হাকস্‌লির রুচির পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছিলো কাব্য এবং অন্যান্য সাহিত্যগ্রন্থের সাহায্যে, সেই সময় হাকস্‌লি যে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন তা আর বন্ধ হয় নি। দৃষ্টি ফিরে পাবার পরও প্রত্যহই লিখতেন কিছু কিছু—যার বেশির ভাগ নিজেই নষ্ট করে ফেলতেন। কিন্তু অক্সফোর্ডে ভর্তি হবার বছর খানেক পর থেকে হাকস্‌লি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতা পাঠাতে আরম্ভ করলেন। দু'বছরের মধ্যে এইভাবে ওঁর গোটাকুড়ি কবিতা প্রকাশিত হ'লো। তারপর বি, এ, পাশ করবার পরের বছর ওঁর প্রথম কবিতার বই ছাপা হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো: 'দি বারনিং হুইল।' তার পরের দু'বছরও একখানা করে কবিতার বই প্রকাশিত হ'লো: 'জোনা' এবং 'দি ডিফিট অব ইয়ুথ'। হাকস্‌লির চতুর্থ কবিতার বই 'লেডা' প্রকাশিত হলো ১৯২০ সালে এবং পঞ্চম ও শেষ কবিতার বই বের হ'লো তার প্রায় এগারো বছর পরে।

কবি হিসেবে অলডাস হাকস্‌লির খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা তেমন কিছু নয়। যদিও ইংরেজী কাব্যের যোগ্য সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করেছেন যে, হাকস্‌লির কবি-কর্ম নিঃসন্দেহে নিখুঁত। গদ্যের মতো ওঁর কবিতাগুলিও বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং বেশ একটা বিদ্রূপের সুরে প্রায় প্রতিটি কবিতাই ঝঙ্কৃত। পরবর্তী জীবনে হাকস্‌লি নিজেও বলেছেন যে অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসবার ফলে ভেতরে ভেতরে যে ক্ষোভ দেখা দেয়, জীবনের অনিবার্যতার প্রতি যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, তার ফলে আবেগের স্রোত যেন হঠাৎ থমকে গেলো। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করে সব কিছু বুঝবার আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা একটু অল্পবয়সেই দেখা দিয়েছিলো। ফরাসী থেকেও কিছু-কিছু

কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন হাকস্‌লি, বিশেষ করে ম্যালার্মের।

আজকের দিনে হাকস্‌লির যে খ্যাতি তা প্রধানত ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে কবি হিসেবে নয়। যদিও ওঁর কবিত্বশক্তি বিদগ্ধ মহলে প্রথম থেকেই স্বীকৃতি লাভ করেছিলো।

গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধলেখক হিসেবে হাকস্‌লিকে বুঝবার সুবিধের জন্যে ওঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত উনি যা লিখেছেন, আর দ্বিতীয়তঃ ১৯৩২-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত যা লিখেছেন। ১৯২০ সালে ওঁর প্রথম গল্পের বই 'লিম্বো' প্রকাশিত হ'লো। দ্বিতীয় গল্পের বই 'মরটাল কয়েলস' (১৯২২); তৃতীয় 'লিটল মেক্সিকান' (১৯২৪); চতুর্থ 'টু অর থি গ্রেসেস' (১৯২৪) এবং পঞ্চম 'গোটুগুা' (১৯৩২)। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত উপন্যাসও হাকস্‌লি মোট পাঁচ খানাই লিখেছেন—'ক্রোম ইয়েলো' (১৯২১); 'এণ্টিক হে' (১৯২৩); 'দোস ব্যারেন লীভস' (১৯২৫); 'পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েন্ট, (১৯২৮); এবং 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' (১৯৩২)।

এই গল্প ও উপন্যাসগুলিতে হাকস্‌লিকে দেখা যায় প্রধানতঃ সমালোচক রূপে। একটা কাহিনীর কাঠামোর মধ্যে ফেলে মানব-জীবনের নানা ক্রটি-বিচ্যুতির নির্মম ভাবে সমালোচনা করেছেন হাকস্‌লি। সাহিত্য শিল্প, অর্থনীতি, ধর্ম, যৌন সম্পর্ক, প্রেম-ভালবাসা, রাজনীতি—কিছুই বাদ পড়েনি। মায় পোষাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা, পেশাজনিত ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্ব—জীবনের সমস্ত দিকের অসঙ্গতিকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। ওঁর এই প্রথম দিককার রচনাবলী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে এতই সমৃদ্ধ যে অনেকেই হাকস্‌লিকে স্বনামধন্য জোনাথান সুইফটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ সময়কার অন্তত দু'খানা বই বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে—পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েন্ট এবং ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড।

হাকস্‌লি যখন গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন' ইয়োরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। অধিকাংশ পরিবারই শোকে মুহ্যমান। কেউ বাপ হারিয়েছে, কেউ ভাই, কেউ পুত্র, কেউ বা স্বামী। যুদ্ধ যখন চলছিল তখন বড়ো বড়ো রাজ-নৈতিক নেতারা তথা মিলিটারীর বড়ো বড়ো সেনাপতিরা জোর গলায় বলতেন—এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ, এর পর সভ্য মানুষকে আর কোনো দিন পরস্পরকে ধ্বংস করবার জন্যে লড়তে হবে না। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটু যাঁরা চিন্তাশীল তাঁদের আর বুঝতে বাকী রইলো না যে নেতারা নেহাৎ ভাঁওতা দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ যাকে তাঁরা তখন জোর গলায় war to end war বলেছেন তা' নিতান্তই সামরিক ভাবে প্রেরণা জুগিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবার একটা ছল মাত্র। আরো ব্যাপক এবং মারাত্মক ধরণের যুদ্ধের ইঙ্গিত প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিমানেরা পেয়েছিলেন।

যুদ্ধজনিত শোকের দহন কাটিয়ে উঠবার আগেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলো যে তারা মিথ্যে কথায় ভুলে বা বাধ্য হয়ে নানা ত্যাগ স্বীকার করেছে। যুদ্ধ আবার আসছে। এ তো গেলো একদিকের কথা। আর একদিকের আঘাত তীব্রতর। যুদ্ধ থেমে যাবার পর জীবনটা খুব সুষ্ঠু, সুন্দর এবং নিরুদ্বেগ হবার কথা ছিলো—অন্তত এই রকম জীবনের চিত্র বিভিন্ন দেশের প্রচার বিভাগ থেকে সাধারণ মানুষের সামনে রাখা হ'তো। কিন্তু যুদ্ধ থামবার পর কার্যত দেখা গেলো অসামরিক সাধারণ মানুষের জীবন কী ভীষণ দুর্বহ হয়ে উঠেছে। অসংখ্য নতুন নতুন সমস্যায় ছেয়ে ফেলেছে সমাজ-জীবন। অর্থনৈতিক সমস্যা একটা এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে পুরনো অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব অবস্থার আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে পারিবারিক জীবনে। আগে মেয়েরা চাকুরী যে পরিমাণে করতেন, এখন তার চাইতে বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। ফলে শিশুদের জীবনযাত্রা এবং সাধারণভাবে সংসারযাত্রা একটা নতুন রূপ নিচ্ছে। মেয়েদের এই অত্যধিক বহির্মুখীনতার ফলে মেয়েদের নিজেদের জীবনযাত্রায় যে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিলো তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা অধিকাংশের পক্ষেই দুষ্কর হয়ে উঠলো—ফলে পুরনো শালীনতাবোধ এলো শিথিল হয়ে, নীতিবোধে দেখা দিলো অবক্ষয়-লক্ষণ, যৌন-অভীপ্সা সিদ্ধির ব্যাপক প্রয়াস দেখা দিলো সর্বত্র।

যে পতঙ্গ মৃত্যু অনিবার্য বলে জেনেছে তার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে যেমন বেপরোয়া ভাবে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এ-ও অনেকটা তেমনি যেন। যুদ্ধ থেমে গেলেও সামাজিক জীবন-যাত্রায় এমন একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিলো যে, সাধারণ মানুষ এককথায় বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মের সব কিছুই নেহাৎ 'সেকেলে' হয়ে দাঁড়ালো অধিকাংশের কাছে, অথচ বর্তমানের কাজ চালাবার মতো "রেডিমেড" আদর্শও কিছু নেই, অর্থাৎ ভাবের ঘরে শূন্য—অবস্থাটা যখন এইরকম, সেই সময় হাকস্‌লি আরম্ভ করলেন তাঁর সাহিত্যসাধনা। কাজেই জীবনের ভালোমন্দকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝবার চেষ্টা ওঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হ'লো 'পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েন্ট।'

পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েন্ট-এর সব ক'টি চরিত্রই লণ্ডনের অধিবাসী, ভদ্র এবং শিক্ষিত। চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হলো এরা প্রত্যেকেই এক-একটি ভিন্নমুখী জীবনদর্শনের সমর্থক। পরস্পরের সঙ্গে সর্বদা নিজস্ব জোরালো মতবাদ নিয়ে বিতর্কে ব্যস্ত—তাই পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েন্ট। চরিত্রগুলির প্রত্যেকেই ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। যুক্তি আর আবেগ—কোনটা ছেড়ে কোনটার কাছে সমর্পণ করা যায় নিজেকে? কোনটা বেশি নির্ভরযোগ্য—যুক্তি না আবেগ? সকলেরই ভেতরে ভেতরে এই এক সমস্যা। শুধু একটি চরিত্রের (মার্ক র‍্যামপিয়ন) এই সমস্ত কোনো সমস্যাই নেই, জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে তার একটা স্থির ধারণা আছে। লর্ড এডওয়ার্ড ট্যাণ্টামাউণ্ট বিজ্ঞানভক্ত, তার মেয়ে লুসি মনে করে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ফূর্তি করে বেড়ানো, বারলপ ধার্মিক বেশে একজন পাকা ভণ্ড, নায়ক ফিলিপ কোয়ারেলস একজন ভ্রমণ-বিলাসী পেশাদার লেখক—এইগুলি হচ্ছে উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র। সমস্যা-প্রধান এবং আলোচনামূলক উপন্যাস হিসেবে পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েন্ট ইংরেজী সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই প্রধানত যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হতে থাকে। ছোটো-বড়ো আবিষ্কারের সংবাদ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে যেন প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের নানা দিকে বিজ্ঞানের এই ক্রমোন্নতি নিশ্চয়ই আশা এবং আনন্দের কথা। পঞ্চাশ বছর আগে যে সমস্ত ব্যাধিতে মৃত্যু অনিবার্য ছিলো, আজকের দিনে তার বেশির ভাগই মানুষ নিয়ন্ত্রণ
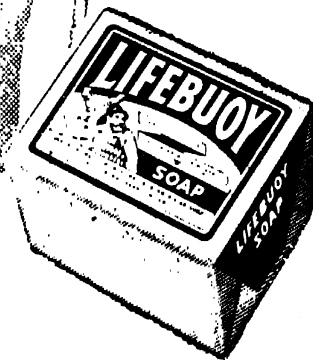
করতে পারছে। শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উন্নতি একদিকে যেমন প্রচুর উৎপাদন করছে, তেমনি নানা শিল্পের প্রসার ঘটার ফলে বহুলোকের কাজকর্মের সংস্থানও হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটার বহু ভালো এবং খারাপ দিক আছে যার বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়। তবে মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে বিজ্ঞান ও শিল্পের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার সমাধানের জন্যে অনুপ্রাণিত হয়েই হাকস্‌লি লিখলেন ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড। নির্দিষ্ট কোনো সমাধান এ বইতে নেই। তবে বিজ্ঞানের অবাঞ্ছিত দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে হাকস্‌লি এ যুগের মানুষকে সজাগ করে দিতে চেয়েছেন এই বইখানার সাহায্যে।

সাধারণত উপন্যাস বলতে যা বোঝায় 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' ঠিক তা নয়। কাহিনীভাগের চাইতে প্রবন্ধ-অংশই বেশি। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর কী হাল হতে পারে, অর্থাৎ মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন ঘটতে পারে সেই সম্বন্ধেই হাকস্‌লি অনুমান করবার চেষ্টা করেছেন। হাকস্‌লি বলছেন আগামী যুগে শিল্পপতিরাই সমাজের আদর্শ পুরুষ বলে গণ্য হবেন। 'ডেমোক্রেসী' টেকনোক্রেসীতে রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ কিনা মানবজীবনের সর্বত্রই যন্ত্রের প্রাধান্য দেখা দেবে। সত্য ও সুন্দরের আদর্শ ভুলে মানুষ সুখ এবং আরামের পূজারী হয়ে উঠবে। সাহিত্য এবং সুকুমার শিল্পের প্রচলন একেবারে বন্ধ হয়ে না গেলেও, শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখবার জন্যে তা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং সেন্সার করা হবে যে তা লোপ পাবারই সামিল হবে। এমনকি আজকের মানুষেরও যে সব নৈতিক আদর্শ তাও থাকবে না। মা-বাপ থাকাটা সে সময়কার নাগরিকদের পক্ষে অসভ্যতা বলে গণ্য হবে—কারণ বিজ্ঞানের কৃপায় আগামী সেই যুগে মানুষ রীতিমতো যান্ত্রিকপদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে। এবং ব্যক্তির বিশিষ্টতার জন্যে শিল্পের যে অসুবিধে দেখা দেয় তা দূর করবার জন্যে মানুষ উৎপাদন করবার সময়েই প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীভাগ করে দেওয়া হবে। কয়েকটি নির্দিষ্ট 'টাইপের' যে মানুষ তৈরী করা হবে তাদের মধ্যে সবচাইতে চৌকসদের বলা হবে 'আলফা' আর নিকৃষ্টতমদের বলা হবে 'এপসাইলন'। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষদের দিয়েই কায়িক শ্রমের কাজগুলি করানো হবে। বিয়ের বালাই থাকবে না। যৌন ব্যাপারে অবাধ মেলামেশা সর্বজনস্বীকৃত হবে। "কারখানায়" যে সব শিশু তৈরী করা হবে তাদের লেখাপড়া শেখানো হবে ঘুমন্ত অবস্থায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে।

বিদ্রূপাত্মক রচনা হিসেবে ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড যে সুইফটের গালিভার্স ট্রাভেলস-এর সঙ্গে তুলনীয় এ কথা ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করেছেন। সাধারণ পাঠকও এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। বিজ্ঞান যে মানবজীবনকে ভবিষ্যতে কি ভাবে কতটা প্রভাবিত করবে তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ থাকতে পারে, কেউ হয়তো হাকস্‌লির ধারণা মেনে নেবেন, কেউ বা নেবেন না। কিন্তু যে সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে হাকস্‌লি এ বই রচনা করেছেন তা' নিঃসন্দেহে লক্ষ লক্ষ পাঠককে মুগ্ধ করেছে, আজো করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমরা আগেই বলেছি একটু স্থির ভাবে চিন্তার প্রয়োজন এ যুগে সবিশেষ—যে কাজের জন্যে আমাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই মোটেই সময় নেই। এ বই পড়বার পরে পাঠক যদি মানব-সমাজে বিজ্ঞানের প্রয়োগ কি ভাবে এবং কতটা করতে হবে, এ কথা ভাবতে উদ্বুদ্ধ হ'ন তা'হলেই হাকস্‌লির শ্রম সার্থক হবে।

হাকস্‌লির এ বইখানাকে এক শ্রেণীর সমালোচক বিজ্ঞান-বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের তা' মনে হয় না। এই বিরূপ মন্তব্যের সাক্ষ্য স্বরূপ তাঁরা এর কাহিনীর পরিণতির কথা বলেন। এর কাহিনী অংশে দেখা যায় নায়ক স্যাভেজ (বর্তমান যুগের যে কোনো সাধারণ মানুষের মতো রুচি ও চিন্তাধারণা বিশিষ্ট) নায়িকা লিনিমার (আগামী যুগের 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডে'র মানদণ্ডে সুসভ্য) যৌন-উন্মাদনার খপ্পরে পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ অন্য ভাবে বলতে গেলে অনাগত 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' মানব-সমাজের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে। বর্তমান সভ্যতার যুগে সমাজজীবনে যে সমস্ত বিষয় আমরা অনুসরণযোগ্য আদর্শ বলে গণ্য করি, সমাজজীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ যে রকম অব্যাহতগতিতে এবং বিশেষ চিন্তা না করেই চলতে দেওয়া হচ্ছে তাতে এ রকম আশঙ্কা অমূলক নয় যে ভবিষ্যতে কোনো দিন বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো কেরামতি দেখাবার জন্যে মানব-সভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। হাকস্‌লি এ বই লেখেন তিরিশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৩২ সালে। সেই সময়ে যন্ত্র-দানব মানুষের সমাজজীবনে যতটা আধিপত্য করতো আজকের দিনে অর্থাৎ তিরিশ বছরের মধ্যে তার আধিপত্য বহুগুণে বেড়ে যায়নি কি? তিরিশ বছরেই যদি এতটা হয়ে থাকে তা' হলে ১০০, ২০০, কি ৩০০ বছর পরে যন্ত্র-প্রধান অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রধান মানব-সভ্যতা যে হাকস্‌লির আশঙ্কিত অবস্থার সৃষ্টি করবে না এ কথা জোর করে বলা যায় না।

হাকস্‌লির গল্প বা উপন্যাসের বেশির ভাগটাই থাকে প্রবন্ধের আকারে। অর্থাৎ লেখক তাঁর বক্তব্য পেশ করতে ব্যস্ত। প্লট যে একটা থাকে তার সার্থকতা প্রধানত প্রবন্ধের অংশকে জোরালো করবার জন্যেই। কাহিনীর মাধ্যমে রস-পরিবেশন কখনই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কাহিনীটি সর্বদাই গৌণ।

প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য-সাধনার কালে অর্থাৎ ১৯৩২ সাল পর্যন্ত হাকস্‌লি অনেকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহও প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে অন দি মারজিন (১৯২৩); প্রপার ষ্টাডিজ (১৯২৭); ভালগারিটি ইন লিটারেচার (১৯৩০); এবং টেক্সটস্‌ এণ্ড প্রিটেক্সটস (১৯৩২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকেই মনে করেন যে শুধু এ যুগেরই নয়, ইংরেজী সাহিত্যে প্রবন্ধের ইতিহাসে যে কোনো প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখকের চাইতে হাকস্‌লি কোনো অংশে কম নন। বস্তুতপক্ষে প্রবন্ধের মধ্যে হাকস্‌লি নিজেকে যতটা পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন, ততটা বোধ হয় গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে পারেন না।

এই সময়ের মধ্যে দু'খানা ভ্রমণকাহিনীও রচনা করেছেন হাকস্‌লি। এ্যালঙ দি রোড (১৯২৫) এবং জেষ্টিং পাইলেট (১৯২৬)। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর জন্যে একেবারে তরুণ বয়স থেকে হাকস্‌লির একটা প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা গেছে, এমন কি এখন পর্যন্ত সুযোগ পেলেই উনি নতুন কোনো একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসেন। তা সে দূর দেশই হোক বা নিজের দেশের বা সহরের কোনো নতুন পল্লীই হোক।

বি-এ পাশ করবার পর হাকস্‌লি প্রথমে কিছুদিন সরকারী

অফিসে কেরাণীর কাজ করলেন, তারপর কিছুদিন করলেন শিক্ষকতা। ১৯২০ সালে উনি বিয়ে করলেন লণ্ডনে বেলজিয়ান শরণার্থী পরিবারের একটি মেয়ে মেরিয়া নীস-কে। এই বছরই উনি শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে বিখ্যাত 'এথেনিয়াম' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের কাজ নিলেন জন মিডলটন মারে-র অধীনে। বছর দুই এই পত্রিকাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার ফলে রকমারী লেখায় অভ্যস্ত হলেন হাকস্‌লি—সাহিত্য সংবাদ, সাহিত্য সমালোচনা, বই সমালোচনা, সঙ্গীত সমালোচনা, সাধারণ প্রবন্ধ ইত্যাদি। এই সমস্ত লেখার অভিজ্ঞতা হবার ফলে অন্যান্য পত্রিকার তরফ থেকে লেখার তাগিদ আসতে লাগলো। শুধু লিখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করবার মতো রোজগার হ'তে লাগলো অল্পদিনের মধ্যেই। এবং ১৯২৩ সালে হাকস্‌লি স্ত্রী এবং শিশুপুত্রটিকে নিয়ে চলে এলেন ইতালীতে। উদ্দেশ্য—প্রথমত লরেন্সের ( ডি, এইচ ) কাছাকাছি থাকা যাবে, আর কিছুটা নিরিবিলি সাহিত্যচর্চা করা যাবে।

দেশ ভ্রমণের তাগিদটা হাকস্‌লির মধ্যে এতই প্রবল যে বেশিদিন এক জায়গায় চুপচাপ থাকতে পারলেন না। ১৯২৬ সালে সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়লেন পূর্ব দিকে। এই সময় কিছুদিন ওঁরা ইন্দোনেশিয়ায় কাটিয়ে যান, ভারতবর্ষেও ছিলেন কিছুদিন। হাকস্‌লি দ্বিতীয়বার ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন গত বছর, অর্থাৎ ১৯৬১ সালে।

১৯২৮ সালে ইতালী ফিরে যাবার পর একাদিক্রমে চারটে বছর আবার লরেন্সের সান্নিধ্যে কাটালেন হাকস্‌লি। মাঝে মাঝে দু'জনে মিলে ফ্রান্স থেকেও বেরিয়ে আসতেন। হাকস্‌লি পূর্ব-সাধকগণের মধ্যে অনেক প্রথম শ্রেণীর লেখকের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। সুইফট্, ভলতেয়ার, ল্যাম্ব, হ্যাজলিট বাটলার, পীকক প্রভৃতি অনেকের প্রভাবই দেখা যায়। কিন্তু এককভাবে বিচার করলে মনে হয় লরেন্সের প্রভাবই সর্বাধিক। দু'জনের সম্পর্ক যে কতটা গভীর ছিলো তা লরেন্স-পত্নী ফ্রিডার কয়েক বছর আগের একটি লেখা থেকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়। ফ্রিডা বলছেন—স্বদেশ-এর বিদেশের অনেকেই আসতেন আমার স্বামীর কাছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাঁরা বুঝতে পারতেন না লরেন্সের ভাবধারণা।

ফলে তাঁরা বিরূপ হয়ে উঠতেন, লরেন্স সম্পর্কে এবং দূরে গিয়ে অনেক সময় অবাঞ্ছিত মন্তব্য করতেন। এর একটা ব্যতিক্রম দেখতাম হাকস্‌লি পরিবার সম্পর্কে। মেরিয়া ও অলডাস ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুনতেন আমার স্বামীর কথা এবং ওঁরা চলে যাবার পর লরেন্সের মুখ চোখ দেখলেই মনে হ'তো ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে উনি আন্তরিক তৃপ্তিলাভ করেছেন ( New Statesman and Nation, Aug. 13, 1955 )।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট এর মার্ক র‍্যামপিয়ন চরিত্রটি হাকস্‌লি লরেন্স-কে দেখেই সৃষ্টি করেছিলেন। এবং ফিলিফ কোয়ারেলস-এর মধ্যে উনি নিজেকে প্রতিফলিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

লরেন্স মারা যান ১৯৩০ সালে। তারপরই হাকস্‌লি ইতালী ছাড়লেন। চলে এলেন ফ্রান্সে। চার বছর কখনো ফ্রান্স, কখনো স্বদেশে কাটালেন। তারপর চলে এলেন পশ্চিম গোলার্ধ দেখতে। দুই আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কয়েকদিন করে কাটাবার পর কয়েক মাস রইলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর আবার স্বদেশে ফিরলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরেও এক জায়গায় থাকতে পারলেন না বেশিদিন। বিভিন্ন সহরে ঘুরলেন কিছুদিন, বার কয়েক ফ্রান্সে এলেন, তারপর—ঠিক তিন বছর পরে আবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চলে এলেন। এবার মার্কিণ দেশে আসবার অন্য একটা কারণও ছিলো দেশ ভ্রমণ ছাড়া। সে হলো চোখের সমস্যা। অন্ধত্ব ঘুচবার পর, অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি কিছুটা ফিরে পাবার পর থেকে বিগত ২৫ বছরে চোখের অবস্থাটা অবশ্য ক্রমশই ভালোর দিকে যাচ্ছিলো। কিন্তু লোকমুখে হাকস্‌লি শুনতে পেলেন যে ডাঃ বেট্‌স নামে এক ভদ্রলোক চোখের চিকিৎসার একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং বহু লোককে অনিবার্য অন্ধত্বের কবল থেকে উনি রক্ষা করেছেন। একথা শুনবার পর আর স্থির থাকতে পারলেন না হাকস্‌লি। মার্কিণ দেশে এসে খুঁজে বের করলেন ডাঃ বেটস-কে। এবং কয়েক মাস তাঁর চিকিৎসাধীন থাকবার পর আশ্চর্য ফল পেলেন। পুরু কাঁচের চশমা বদল করতে হ'লো। সাধারণ চশমাতেই কাজ চলে যেতে লাগলো ওঁর। এমনকি চলাফেরার জন্যে বা বড় টাইপের লেখা পড়বার জন্যেও আর আদৌ কোনোরকম চশমার প্রয়োজন রইলো না। হাকস্‌লির মনে হলো যে চোখের অবস্থার আরো উন্নতির জন্যে অর্থাৎ স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে ডাঃ বেট্‌স-এর কাছাকাছি থাকা দরকার। তাই উনি ঠিক করলেন স্থায়ী ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করবেন। কিছুদিন হোটেলে এবং ভাড়া বাড়ীতে কাটাবার পর লস্ এঞ্জেলস-এ হলিউড হিলস-এর-কোল-ঘেঁষা ছোট্ট একটি বাগান ঘেরা বাড়ী কিনলেন হাকস্‌লি। এটা ১৯৩৮ সালের কথা। সেই থেকে এইখানেই আছেন হাকসলি। অবশ্য মাঝে মাঝে এদেশ-ওদেশ ঘুরতে বেরোন কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা এইটেই।

লস্ এঞ্জেলস-এ আসবার পর বিভিন্ন ছায়াছবি নির্মাতার হয়ে কিছু কিছু কাজ করেছেন হাকস্‌লি। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস' এর কথা। এ ছবির চিত্রনাট্য হাকস্‌লির লেখা।

এবার আমরা হাকস্‌লির সাহিত্য-সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা আলোচনা করবো। প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি সে সময়কার সমাজের চলতি অবস্থাকে হাকস্‌লি কোনো মতেই মেনে নিতে পাচ্ছেন না। যুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকালের নানা জটিল সমস্যা এবং তার কোনো সহজ, সরল এবং আশু সমাধানের লক্ষণ না থাকবার জন্যে যে হতাশা সাধারণ মানুষের মনে দেখা দিয়েছিলো তার হাত থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করবার উপায় হিসেবে হাকস্‌লি বিজ্ঞানের নানা ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে জোরালো ভাষা ও ভঙ্গিতে লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা গেলো মানুষ সে কথায় কান দিলো না। সে সমস্ত সতর্কবাণীকে নেহাৎ সাহিত্যিকের খেয়াল বলে উড়িয়ে দিলো, কেউ বা বিজ্ঞান-বিরোধী বা প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিরূপ সমালোচনা করলো। যদিও সাধারণভাবে ওঁর বইয়ের কাটতি হলো প্রচুর। বিশেষ করে পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট এবং ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড তো লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হলো কয়েকটা বছরের মধ্যে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে এ সব বইয়ের কথা খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছে না এ কথা হাকস্‌লির আর বুঝতে দেরি হলো না। ওদিকে ইতালীতে এবং জর্মণীতে ফ্যাসিজম এবং নাজিজম ক্ষমতা দখল করে

ফেলেছে। জাপান তো বেশ কিছুদিন ধরেই মহাচীনকে গ্রাস করবার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং দিকে দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। মানুষের এবং তার শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার তা' হলে ভবিষ্যৎ কি? হাকসলি প্রশ্ন তুললেন। বিভিন্ন ছোটো বড়ো লেখার মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্নটা তুলে ধরতে লাগলেন পাঠকের সামনে। কিন্তু বিশেষ ফল হলো না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু লেখকই মার্কসবাদকে মুক্তির উপায় বলে মনে করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হাকসলি মার্কসবাদেও আস্থাবান নন। কোনোদিন ছিলেন না, আজো হননি।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো দারুণ বিরক্তি এবং প্রচণ্ড হতাশা হাকস্‌লিকে মারাত্মকভাবে অন্তর্মুখীন করে ফেলেছে। হাকসলি মরমী পন্থায় বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য উনি বরাবরই ভেবেছেন, কিন্তু এবার দৃঢ় হলো ওঁর বিশ্বাস। মরমীপন্থা (*Mysticism*) পৃথিবীতে এমন কিছু নতুন জিনিষ নয়। হাকসলি দাবীও করলেন না জিনিষটা সম্পূর্ণ নিজস্ব বলে। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভক্ত-সাধু-সজ্জনদের জীবনী বাণী আদেশ উপদেশ এবং অনুশাসন খুঁজে খুঁজে পড়তে আরম্ভ করলেন। সাহিত্য এবং দর্শন চর্চা এবার যুগপৎ চলতে লাগলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি যে পুরোপুরিই উদ্দেশ্যমূলক সে কথা হাকস্‌লি খোলাখুলিভাবেই বলছেন প্রথম থেকে। কারণ ওঁর অন্তরে যে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিলো তার ফলে এ কথা বলতে উনি আর দ্বিধাবোধ করেননি যে নিছক সুন্দরসৃষ্টির নেশায় মশগুল হয়ে থাকলে মানুষের জীবন অদূর ভবিষ্যতেই যারপরনাই কুৎসিত হয়ে উঠবে। জীবনধারণের মোড় ফেরাতে না পারলে মানুষের আর কোনো আশা নেই। এবং একটা প্রগাঢ় ধর্ম বিশ্বাস এবং মরমীপন্থার সাহায্যেই এটা সম্ভব বলে হাকস্‌লি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তাই ওর দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যে সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে একটি কল্যাণের বাসনা ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে আইলেস ইন গাজা (১৯৩৬); আফটার ম্যানি এ সামার ডাইস দি সোয়ান (১৯৪০); টাইম মাষ্ট হ্যাভ এ ষ্টপ (১৯৪৪); এপ এণ্ড এসেন্স (৪৮); দি ডেভিলস অব লাউডন (৫২) এবং দি ডোরস অব পারসেপশন (৫৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আইলেস ইন গাজা, আফটার মেনি এ সামার এবং টাইম মাষ্ট হ্যাভ এ ষ্টপ-এ হাকস্‌লি উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন বিশ্বাস, আদব-কায়দা এবং বহুলাংশে অর্থহীন জীবনধারণ পদ্ধতি, লোক-দেখানো প্রেম ও আভিজাত্য ও ভূয়া শিক্ষার গর্বের সমালোচনা করেছেন। এপ এণ্ড এসেন্সে দেখাবার চেষ্টা করেছেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর একটি সহরের সম্ভাব্য পরিণতি। হাকস্‌লি অনুমান করেছেন যে দেড় শ' বছর পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে—কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তার আগেই ঘটবে ব্যাপারটা এবং এ উপন্যাসখানায় লস এঞ্জেলস্‌ সহরের যে বিধ্বস্ত অবস্থার কল্পনা করেছেন হাকস্‌লি, সে রকম অবস্থা বা তার চাইতেও খারাপ অবস্থা পৃথিবীর অধিকাংশ বড়ো সহরের ভাগ্যেই ঘটলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। আফটার মেনি এ সামার-এ এক অপদার্থ কিন্তু ধনী পুস্তক প্রকাশকের বিদ্রূপাত্মক চরিত্র এঁকেছেন হাকস্‌লি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাবলীর মধ্যে 'গ্রে এমিনেন্স' (৪১) একখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। এখানা হ'লো একখানা জীবনী। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী অতীন্দ্রিয়বাদী ও রাজনীতিবিদ ফাদার জোসেফের জীবনকাহিনী লিখেছেন হাকস্‌লি তাঁর নিজের বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। হাকস্‌লির রচনার গুণে জীবনীখানা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'দি ডেভিলস্ অব লাউডন'ও ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত একখানা উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। প্রাচীনকালে একটা মঠের একজন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ পুরোহিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতার হাতে কী শোচনীয় ভাবে প্রাণ দিয়েছিলেন এ উপন্যাসে সেই কাহিনীর মাধ্যমে আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ভুয়ো ধর্মের বিপরীত হিসেবে মরমী-পন্থা বা অতীন্দ্রিয়বাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন হাকস্‌লি।

হাকস্‌লি তাঁর ঠাকুরদা অর্থাৎ টি. এইচ. হাকস্‌লি সম্বন্ধেও বই লিখেছেন একখানা টি. এইচ. হাকস্‌লি এ্যাজ এ ম্যান অব লেটার্স (৩২)। অনেক সমালোচকের মতে টি. এইচ-এর সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে এর চাইতে ভালো বই অদ্যাবধি কেউ লিখতে পারেননি।

হাকস্‌লির একখানা বিচিত্র বই হ'লো দি আর্ট অব সিয়িং (৪৩) যে দৃষ্টিশক্তি হাকস্‌লি একসময় হারিয়ে বসেছিলেন এবং এখনো যে কোনো মুহূর্তে যা হারাবার আশঙ্কায় ওঁর সমস্ত সত্বা সদা-উৎকণ্ঠিত—এই বইখানা সেই সমস্যার ওপরই রচিত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কোনো প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে হাকস্‌লির অকুণ্ঠ সমর্থন। এবং নিজে এ জন্যে দু'খানা উল্লেখযোগ্য বইও রচনা করেছেন—এ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অব প্যাসিফিজম (১৯৩৭) এবং সায়েন্স, লিবার্টি এণ্ড পীস (১৯৪৭)।

হাকস্‌লি নাটক লিখেছেন দু'খানা—দি ডিসকভারি (১৯২৪) এবং দি ওয়ার্ল্ড অব লাইট (১৯৩১)। তা' ছাড়া 'লিখো'য় প্রকাশিত একটি গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন—'দি গিয়োকণ্ডা স্মাইল (১৯৪৮); এই কাহিনীটির যখন পরে ছায়াছবি করা হ'লো 'এ উয়োম্যান্স ভেনজেন্স' নামে তখন তার চিত্রনাট্যও হাকস্‌লিই লিখে দেন।

বর্তমানে লস এঞ্জেলস্‌-এর বাড়ীতে বসে হাকস্‌লি প্রধানত পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকেন। গত কয়েক বছর লেখা অনেক কমিয়ে দিয়েছেন, তবে কিছু কিছু লিখছেন এখনো। ওঁর প্রধান দর্শনের বইখানা (দি পেরেনিয়াল ফিলসফি) যদিও সতেরো বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিলো, কিন্তু এখনো এর প্রতিটি নতুন সংস্করণ উনি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে চলেছেন।

বর্তমান সভ্যতাকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করবার নিশ্চিত উপায় হিসেবে হাকস্‌লি অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে উঠেছেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস যে কতো দৃঢ় তা পেরেনিয়াল ফিলজফির পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন। পরাজিতের মনোভাবের চাপে এটা কোন আকস্মিক বা সাময়িক মনোবিকার নয়। দেশ বিদেশের অতীন্দ্রিয়বাদীদের অভিজ্ঞতা ও বাণী দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভ্যাসের পরে হাকস্‌লি তাঁর এই বইখানা রচনা করেছেন। প্রাচীন চীন ও খৃষ্টান জগতের মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছেন হাকস্‌লি। তবে, এ ব্যাপারে ওর সবচাইতে বেশি ঋণ ভারতবর্ষের কাছে। ভারতের উপনিষদ, গীতা, বেদান্ত, বুদ্ধের শিক্ষা ও কবীরের বাণী প্রভৃতির প্রচুর উক্তি

দিয়ে হাকস্‌লি তাঁর নিজস্ব অতীন্দ্রিয়বাদ ব্যাখ্যা করেছেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এ বইয়ের একটি বিশেষত্ব এই যে যদিও একখানা পুরোদস্তুর দর্শনের বই কিন্তু হাকস্‌লি এ বই লিখেছেন সাধারণ পাঠকের জন্যে। তাই এ বইয়ের রচনা পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল।

দার্শনিক হিসেবে হাকস্‌লির নিজস্ব মতামত কি? উনি কি ভাববাদী না বস্তুবাদী? ভাববাদী তো নিশ্চয়ই? কিন্তু তারপরে ওঁকে আর শ্রেণীভুক্ত করার কাজটা প্রকৃতই দুঃসাধ্য। কারণ যেহেতু ওঁর আসল পরিচয় হলো যে উনি অতীন্দ্রিয়বাদী, সেই জন্যে তাত্ত্বিকবাদীদের নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীতে ওঁকে ফেলা দুষ্কর? কখনো উনি কবীরকে অনুসরণ করে বলছেন—একের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখো, দ্বিতীয়, তৃতীয়ে পরমেশ্বরকে খুঁজলে প্রতারিত হবে। এসময়ে নিশ্চয়ই ওঁকে অদ্বৈতবাদী মনে হবে। কিন্তু আবার যখন ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্বেতকেতুর লবণের উপাখ্যান পাঠকের সামনে রেখে প্রশ্ন করেন—লবণজল ফেলে দেবার পরও লবণাক্ত স্বাদটা যায়না কেন? ঈশ্বর হলেন ঐ স্বাদটার মতো। একথা শুনলে অবশ্যই ওঁকে সর্বেশ্বরবাদী (Pautheist) মনে হবে। এভাবে হাকস্‌লিকে বুঝতে চেষ্টা করা—বৃথা—বরং এই কথাটাই ওঁর পক্ষে সবচাইতে বড়ো পরিচয় যে উনি অতীন্দ্রিয়বাদী।

এমন কথা যেন কেউ মনে না করেন যে হাকস্‌লি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। না তা নয়। উনি পুরোদস্তুর সংসারীই আছেন। এবং উনি বিশ্বাস করেন যে সংসারী থেকেও ঈশ্বরোপাসনা করা খুবই সম্ভব। হাকস্‌লি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে খুবই ভালোবাসেন। কিন্তু আবার এমন কথাও বলেন যে—লোকে পাঁচজনের সঙ্গে মেশে দু'কারণে, হয় তাদের সস্তা আনন্দের সরিক হবার জন্যে আর না হয় তাদের আনন্দের খোরাক জোটাবার জন্যে, কিন্তু আমি এর কোনোটাই পছন্দ করি না। (থিম্‌স এণ্ড ভেরিয়েশনস্‌)

আজকের পৃথিবীর সর্বত্র অবাঞ্ছিত বস্তুতে আকীর্ণ, অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্ত্তে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু তবু সে সব দূর করবার জন্যে কোনো রকম অশিষ্ট, অভব্য পদ্ধতি বা জবরদস্তি করার উনি ঘোরতর বিরোধী। হাকস্‌লি বলেন—উদ্দেশ্যটা কত বড় বা কত মহৎ তার উপর প্রকৃত মহত্ব নির্ভর করে না। কি উপায় করে আমরা ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে অগ্রসর হ'চ্ছি সেইটেই হ'চ্ছে আসল কথা। (এণ্ডস এণ্ড মিনস।)

একেধারে কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক অল্ডাস হাকস্‌লি প্রায় গত ছেচল্লিশ বছর ধরে নানা বিষয় চিন্তা করেছেন এবং এখনো করছেন। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখলে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মাথা নুয়ে আসবে। অতীন্দ্রিয়বাদী হিসেবে বিখ্যাত হবার পর থেকে এক শ্রেণীর পাঠক আজকের দিনে সাহিত্যিক হিসেবে হাকস্‌লিকে যথাযোগ্য স্থান দিতে নারাজ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে যে হাকস্‌লি হঠাৎ একদিন অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে পড়েন নি—যদিও এ বিষয়ে তাঁর প্রসিদ্ধিটা কিছু বিলম্বে হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মূলমন্ত্র হিসেবে এ সম্বন্ধে প্রথম জীবনে হাকস্‌লি যা লিখেছিলেন, সে কথার মধ্যেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। হাকস্‌লি লিখছেন—সুন্দর যদি শুধু সৌন্দর্যের জন্যেই পূজিত হয়, কোনো উচ্চতর নীতিবোধ বা দার্শনিক প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য যদি তার ভেতর না থাকে, তা'হলে সে দৃষ্টিকে আমরা অবশ্যই নিকৃষ্ট বলবো এবং তাকে এড়িয়ে চলা উচিত (প্রপার ষ্টাডিজ)।

# পুরুষ

(ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডলের ৩ ৪ ভাবানুবাদ)

স্বামী প্রজ্ঞাচৈতন্য ভারতী

অতীত ও ভবিষ্যৎ এ বিশ্ব মহান—
সহ বর্ত্তমান,
বিরাট পুরুষ তব সামর্থ বিশেষ। স্বীয় মহিমায়
তোমাতেই তুমি রূপে সব-কিছু প্রতিষ্ঠিত রয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ও ত্রিজগৎখানি-বাস্তব স্বরূপ তব নয়।

—(তুমি যে কি? কেহ নাহি জানে।
মানিতে না চাহিয়াও মানে—
সংশয়েতে ভাবি ক্ষণে ক্ষণে—
'আমিই' কি তুমি সংগোপনে?)
বস্তুতঃ এ মহিমা হইতে অনেক অধিক যে গো তুমি!
কালত্রয় অনুবর্ত্তী সমুদয় প্রাণী

এক পাদে যে তোমার এক চতুর্থ অংশে অবস্থিত।
অবশিষ্ট ত্রিপাদ বা ত্রিচতুর্থ অংশটুকু সংসাররহিত।
অবিনাশী ব্রহ্মামৃত স্বপ্রকাশ হে বিরাজমান!
পুরুষ প্রধান প্রজ্ঞা স্বরূপেতে অব্যক্ত শ্রীজ্ঞান!
অজ্ঞানের কার্য্যরূপ সংসারের ওগো বহির্ভূত,
ঐহিকের দোষ গুণে অস্পৃষ্ট হোয়েও যে-গো—
উৎকৃষ্ট স্বরূপে অবস্থিত।

ফেলেছে। জাপান তো বেশ কিছুদিন ধরেই মহাচীনকে গ্রাস করবার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং দিকে দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। মানুষের এবং তার শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার তা' হলে ভবিষ্যৎ কি? হাকসলি প্রশ্ন তুললেন। বিভিন্ন ছোটো বড়ো লেখার মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্নটা তুলে ধরতে লাগলেন পাঠকের সামনে। কিন্তু বিশেষ ফল হলো না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু লেখকই মার্কসবাদকে মুক্তির উপায় বলে মনে করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হাকসলি মার্কসবাদেও আস্থাবান নন। কোনোদিন ছিলেন না, আজো হননি।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো দারুণ বিরক্তি এবং প্রচণ্ড হতাশা হাকসলিকে মারাত্মকভাবে অন্তর্মুখীন করে ফেলেছে। হাকসলি মরমী পন্থার বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। এ সম্বন্ধে অরবিস্তর উনি বরাবরই ভেবেছেন, কিন্তু এবার দৃঢ় হলো ওঁর বিশ্বাস। মরমীপন্থা (Mysticism) পৃথিবীতে এমন কিছু নতুন জিনিষ নয়। হাকসলি দাবীও করলেন না জিনিষটা সম্পূর্ণ নিজস্ব বলে। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভক্ত-সাধু-সজ্জনদের জীবনী বাণী আদেশ উপদেশ এবং অনুশাসন খুঁজে খুঁজে পড়তে আরম্ভ করলেন। সাহিত্য এবং দর্শন চর্চা এবার যুগপৎ চলতে লাগলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি যে পুরোপুরিই উদ্দেশ্যমূলক সে কথা হাকসলি খোলাখুলিভাবেই বলছেন প্রথম থেকে। কারণ ওঁর অন্তরে যে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিলো তার ফলে এ কথা বলতে উনি আর দ্বিধাবোধ করেননি যে নিছক সুন্দরসৃষ্টির নেশায় মশগুল হয়ে থাকলে মানুষের জীবন অদূর ভবিষ্যতেই যারপরনাই কুৎসিত হয়ে উঠবে। জীবনধারণের মোড় ফেরাতে না পারলে মানুষের আর কোনো আশা নেই। এবং একটা প্রগাঢ় ধর্ম বিশ্বাস এবং মরমীপন্থার সাহায্যেই এটা সম্ভব বলে হাকসলি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তাই ওর দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যে সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে একটি কল্যাণের বাসনা ওৎপ্রোতভাবে মিশে গেছে। এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে আইলেস ইন গাজা (১৯৩৬); আফটার ম্যানি এ সামার ডাইস দি সোয়ান (১৯৪০); টাইম মাষ্ট হ্যাভ এ ষ্টপ (১৯৪৪); এপ এণ্ড এসেন্স (৪৮); দি ডেভিলস অব লাউডন (৫২) এবং দি ডোরস অব পারসেপশন (৫৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আইলেস ইন গাজা, আফটার মেনি এ সামার এবং টাইম মাষ্ট হ্যাভ এ ষ্টপ-এ হাকসলি উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন বিশ্বাস, আদপ-কায়দা এবং বহুলাংশে অর্থহীন জীবনধারণ পদ্ধতি, লোক-দেখানো প্রেম ও আভিজাত্য ও ভূয়া শিক্ষার গর্বের সমালোচনা করেছেন। এপ এণ্ড এসেন্সে দেখাবার চেষ্টা করেছেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর একটি সহরের সম্ভাব্য পরিণতি। হাকসলি অনুমান করেছেন যে দেড় শ' বছর পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে—কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তার আগেই ঘটবে ব্যাপারটা এবং এ উপন্যাসখানায় লস এঞ্জেলস্ সহরের যে বিধ্বস্ত অবস্থার কল্পনা করেছেন হাকসলি, সে রকম অবস্থা বা তার চাইতেও খারাপ অবস্থা পৃথিবীর অধিকাংশ বড়ো সহরের ভাগ্যেই ঘটলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। আফটার মেনি এ সামার-এ এক অপদার্থ কিন্তু ধনী পুস্তক প্রকাশকের বিদ্রূপাত্মক চরিত্র এঁকেছেন হাকসলি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাবলীর মধ্যে 'গ্রে এমিনেন্স' (৪১) একখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। এখানা হ'লো একখানা জীবনী। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী অতীন্দ্রিয়বাদী ও রাজনীতিবিদ ফাদার জোসেফের জীবনকাহিনী লিখেছেন হাকসলি তাঁর নিজের বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। হাকসলির রচনার গুণে এ জীবনীখানা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'দি ডেভিলস্ অব লাউডন'ও ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত একখানা উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস। প্রাচীনকালে একটা মঠের একজন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ-পুরোহিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতার হাতে কী শোচনীয় ভাবে প্রাণ দিয়েছিলেন এ উপন্যাসে সেই কাহিনীর মাধ্যমে আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ভূয়ো ধর্মের বিপরীত হিসেবে মরমী-পন্থা বা অতীন্দ্রিয়বাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন হাকসলি।

হাকসলি তাঁর ঠাকুরদা অর্থাৎ টি, এইচ, হাকসলি সম্বন্ধেও বই লিখেছেন একখানা টি, এইচ, হাকসলি এ্যাজ এ ম্যান অব লেটার্স (৩২)। অনেক সমালোচকের মতে টি, এইচ-এর সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে এর চাইতে ভালো বই অদ্যাবধি কেউ লিখতে পারেননি।

হাকসলির একখানা বিচিত্র বই হ'লো দি আর্ট অব সিয়িং (৪৩) যে দৃষ্টিশক্তি হাকসলি একসময় হারিয়ে বসেছিলেন এবং এখনো যে কোনো মুহূর্তে যা হারাবার আশঙ্কায় ওঁর সমস্ত সত্তা সদা-উৎকণ্ঠিত—এই বইখানা সেই সমস্যার ওপরই রচিত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কোনো প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে হাকসলির অকুণ্ঠ সমর্থন। এবং নিজে এ জন্যে দু'খানা উল্লেখযোগ্য বইও রচনা করেছেন—এ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অব প্যাসিফিজম (১৯৩৭) এবং সায়েন্স, লিবার্টি এণ্ড পীস (১৯৪৭)।

হাকসলি নাটক লিখেছেন দু'খানা—দি ডিসকভারি (১৯২৪) এবং দি ওয়ার্ল্ড অব লাইট (১৯৩১)। তা' ছাড়া 'লিম্বো'য় প্রকাশিত একটি গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন—দি গিয়োকণ্ডা স্মাইল (১৯৪৮); এই কাহিনীটির যখন পরে ছায়াছবি করা হ'লো 'এ উয়োম্যান্স ভেনজেন্স' নামে তখন তার চিত্রনাট্যও হাকসলিই লিখে দেন।

বর্তমানে লস এঞ্জেলস্-এর বাড়ীতে বসে হাকসলি প্রধানত পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকেন। গত কয়েক বছর লেখা অনেক কমিয়ে দিয়েছেন, তবে কিছু কিছু লিখছেন এখনো। ওঁর প্রধান দর্শনের বইখানা (দি পেরেনিয়াল ফিলসফি) যদিও সতেরো বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিলো, কিন্তু এখনো এর প্রতিটি নতুন সংস্করণ উনি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে চলেছেন।

বর্তমান সভ্যতাকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করবার নিশ্চিত উপায় হিসেবে হাকসলি অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে উঠেছেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস যে কতো দৃঢ়তা পেরেনিয়াল ফিলজফির পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন। পরাজিতের মনোভাবের চাপে এটা কোন আকস্মিক বা সাময়িক মনোবিকার নয়। দেশ বিদেশের অতীন্দ্রিয়বাদীদের অভিজ্ঞতা ও বাণী দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভ্যাসের পরে হাকসলি তাঁর এই বইখানা রচনা করেছেন। প্রাচীন চীন ও খৃষ্টান জগতের মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছেন হাকসলি। তবে, এ ব্যাপারে ওর সবচাইতে বেশি ঋণ ভারতবর্ষের কাছে। ভারতের উপনিষদ, গীতা, বেদান্ত, বুদ্ধের শিক্ষা ও কবীরের বাণী প্রভৃতির প্রচুর উদ্ধৃতি

দিয়ে হাকস্‌লি তাঁর নিজস্ব অতীন্দ্রিয়বাদ ব্যাখ্যা করেছেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এ বইয়ের একটি বিশেষত্ব এই যে যদিও একখানা পুরাদস্তুর দর্শনের বই কিন্তু হাকস্‌লি এ বই লিখেছেন সাধারণ পাঠকের জন্যে। তাই এ বইয়ের রচনা পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল।

দার্শনিক হিসেবে হাকস্‌লির নিজস্ব মতামত কি? উনি কি ভাববাদী না বস্তুবাদী? ভাববাদী তো নিশ্চয়ই? কিন্তু তারপরে ওঁকে আর শ্রেণীভুক্ত করার কাজটা প্রকৃতই দুঃসাধ্য। কারণ যেহেতু ওঁর আসল পরিচয় হলো যে উনি অতীন্দ্রিয়বাদী, সেই জন্যে ভাববাদীদের নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীতে ওঁকে ফেলা দুষ্কর? কখনো উনি কবীরকে অনুসরণ করে বলছেন—একের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখো, দ্বিতীয়, তৃতীয়ে পরমেশ্বরকে খুঁজলে প্রতারিত হবে। এসময়ে নিশ্চয়ই ওঁকে অদ্বৈতবাদী মনে হবে। কিন্তু আবার যখন ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্বেতকেতুর লবণের উপাখ্যান পাঠকের সামনে রেখে প্রশ্ন করেন—লবণজল ফেলে দেবার পরও লবণাক্ত স্বাদটা যায়না কেন? ঈশ্বর হলেন ঐ স্বাদটার মতো। একথা শুনলে অবশ্যই ওঁকে সর্বেশ্বরবাদী (Pautheist) মনে হবে। এভাবে হাকস্‌লিকে বুঝতে চেষ্টা করা—বৃথা—বরং এই কথাটাই ওঁর পক্ষে সবচাইতে বড়ো পরিচয় যে উনি অতীন্দ্রিয়বাদী।

এমন কথা যেন কেউ মনে না করেন যে হাকস্‌লি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। না তা নয়। উনি পুরাদস্তুর সংসারীই আছেন। এবং উনি বিশ্বাস করেন যে সংসারী থেকেও ঈশ্বরোপাসনা করা খুবই সম্ভব। হাকস্‌লি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে খুবই ভালোবাসেন। কিন্তু আবার এমন কথাও বলেন যে—লোকে পাঁচজনের সঙ্গে মেশে দু'কারণে, হয় তাদের সস্তা আনন্দের সরিক হবার জন্যে আর না হয় তাদের আনন্দের খোরাক জোটাবার জন্যে, কিন্তু আমি এর কোনোটাই পছন্দ করি না। (থিম্‌স এণ্ড ভেরিয়েশনস্‌)

আজকের পৃথিবীর সর্বত্র অবাঞ্ছিত বস্তুতে আকীর্ণ, অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু তবু সে সব দূর করবার জন্যে কোনো রকম অশিষ্ট, অভব্য পদ্ধতি বা জবরদস্তি করার উনি ঘোরতর বিরোধী। হাকস্‌লি বলেন—উদ্দেশ্যটা কত বড় বা কত মহৎ তার উপর প্রকৃত মহত্ব নির্ভর করে না। কি উপায় করে আমরা ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে অগ্রসর হ'চ্ছি সেইটেই হ'চ্ছে আসল কথা। (এণ্ডস এণ্ড মিনস।)

একেধারে কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক অলডাস হাকস্‌লি প্রায় গত ছেচল্লিশ বছর ধরে নানা বিষয় চিন্তা করেছেন এবং এখনো করছেন। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখলে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মাথা নুয়ে আসবে। অতীন্দ্রিয়বাদী হিসেবে বিখ্যাত হবার পর থেকে এক শ্রেণীর পাঠক আজকের দিনে সাহিত্যিক হিসেবে হাকস্‌লিকে যথাযোগ্য স্থান দিতে নারাজ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে যে হাকস্‌লি হঠাৎ একদিন অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে পড়েন নি—যদিও এ বিষয়ে তাঁর প্রসিদ্ধিটা কিছু বিলম্বে হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মূলমন্ত্র হিসেবে এ সম্বন্ধে প্রথম জীবনে হাকস্‌লি যা লিখেছিলেন, সে কথার মধ্যেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। হাকস্‌লি লিখছেন—সুন্দর যদি শুধু সৌন্দর্যের জন্যেই পূজিত হয়, কোনো উচ্চতর নীতিবোধ বা দার্শনিক প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য যদি তার ভেতর না থাকে, তা'হলে সে দৃষ্টিকে আমরা অবশ্যই নিকৃষ্ট বলবো এবং তাকে এড়িয়ে চলা উচিত (প্রপার ষ্টাডিজ)।

# পুরুষ

(ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডলের ৩৪ ভাবানুবাদ)

স্বামী প্রজ্ঞাচৈতন্য ভারতী

অতীত ও ভবিষ্যৎ এ বিশ্ব মহান—
সহ বর্তমান,
বিরাট পুরুষ তব সামর্থ বিশেষ। স্বীয় মহিমায়
তোমাতেই তুমি রূপে সব-কিছু প্রতিষ্ঠিত রয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ও ত্রিজগৎখানি-বাস্তব স্বরূপ তব নয়।

—(তুমি যে কি? কেহ নাহি জানে।
মানিতে না চাহিয়াও মানে—
সংশয়েতে ভাবি ক্ষণে ক্ষণে—
'আমিই' কি তুমি সংগোপনে?)
বস্তুতঃ এ মহিমা হইতে অনেক অধিক যে গো তুমি!
কালত্রয় অনুবর্তী সমুদয় প্রাণী

এক পাদে যে তোমার এক চতুর্থ অংশে অবস্থিত।
অবশিষ্ট ত্রিপাদ বা ত্রিচতুর্থ অংশটুকু সংসাররহিত।
অবিনাশী ব্রহ্মাবৃত স্বপ্রকাশ হে বিরাজমান!
পুরুষ প্রধান প্রজ্ঞা স্বরূপেতে অব্যক্ত শ্রীজ্ঞান!
অজ্ঞানের কার্য্যরূপ সংসারের ওগো বহির্ভূত,
ঐহিকের দোষ গুণে অস্পষ্ট হোয়েও যে-গো—
উৎকৃষ্ট স্বরূপে অবস্থিত।

দীপেন রাহা

রোজ ট্রাম-ষ্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকে সেই ভিখিরী ছেলেটা। যেন আমারই জন্যে অপেক্ষা করে। আসা মাত্রই শুকনো মুখে হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে আসে। এখন আর সে ভূমিকা করে না। সোজা ডান হাতের শুকনো চেটোটা বাড়িয়ে দেয়। নিয়মমাফিক দু'টি নয়া পয়সা দিই। সে পয়সাটা নিয়ে আগের মত কপালে ঠেকায় না। এ যেন তার হকের পাওনা।

প্রায়ই ভাবি ধমক দিয়ে বন্ধ করে দেবো তার হাসিটা, দাবিটা। কিন্তু পারিনে। একটা-দুটো পয়সার জন্যে ঝড় জল উপেক্ষা করে রুগ্ন ছেলেটা রোজ হাজিরা দেয়। ঠিক যেন টাইম-কিপার। যেদিন তাকে না দেখি মনের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠে। ছেলেটার অসুখ-বিসুখ হয়নি তো! ছেলেটি পয়মন্ত। তার সাথে যেদিন দেখা হয় না, দিনটা যেন বিশ্রী ভাবে কাটে। সামান্য কারণে আপিসে খিটিমিটি লেগে যায়। আমার দুর্বলতার সুযোগও সে নিতে ছাড়ে না। বড় একটা কামাই করে না। আশ্চর্যের বিষয় সে আর কারো কাছে নাকি বউনি করে না। আমারই পাশে দাঁড়িয়ে স্যুট-পরা ভদ্রলোক। দু'-একটা পয়সা চাইলে হয়ত সে পেতেও পারে। কিন্তু চায় না। রহস্যটা মাথায় আসে না। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ-রে তুই এই মোড়ে আর কারো কাছে ভিক্ষে চাস না কেন?

প্রথমটা সে উত্তর দেয় না। শুধু নীরবে হাসে। যার মানে দাঁড়ায় এই সামান্য কথাটা ও জানেন না। উত্তরটা শোনার মধ্যে ধৈর্যও থাকে না। ততক্ষণে ট্রাম এসে যায়। কার আগে কে উঠবে এই নিয়ে ধস্তাধস্তি। ছেলেটা দাঁড়িয়ে দেখে আর উপভোগ করে। তারপর গন্তব্য স্থানে চলে যায়।

সেদিন আবার সেই পুরানো প্রশ্নটা করি এবার জবাব পাই। সে বলে, বাবু সকলের পয়সা সহ্য হয় না। খুশী মনে যারা দেয় না, তাদের দান হজম হয় না। মা-ও বারণ করে তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিতে। আমাকে দেখলে অনেকেই অন্য ফুটপাতে চলে যায়। এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু আপনি···

বিরক্ত হয়ে বলি, তোকে আর খোসামুদি করতে হবে না। ছেলেটা বোকার মত হাসতে থাকে, অথচ রোজ আমাকে বোকা বানায়। সেদিন আমার পাশেই আর এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন ট্রামের জন্যে। লক্ষ্য করছিলেন আমাদের দু'জনকে, দু'জনের কথাবার্তা। ওকে উদ্দেশ্য করে হঠাৎ মন্তব্য করেন, রাজার ভিখিরী।

যদিও অনেকটা বিদ্রূপের মত শোনায়, কিন্তু কথাটা এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি তিনি। ছেলেটার চাল-চলন ঠিক পেশাদারী ভিখিরীর মত নয়। জুটলে ভাল নইলে নয়, এমনি তার হাবভাব। দেখলে মনে হয়, ভদ্রলোকের ছেলে। হয়ত পেটের দায়ে পথে বেরিয়েছে।

দু'জন দু'জনের দুর্বলতার কাছে ধরা দিয়েছি। আমার ধারণা তাকে পয়সা না দিলে দিনটি খারাপ যাবে। তার ধারণা হয়ত এমনি একটা কিছু। কাজেই দেওয়া নেওয়াটা রুটিন কাজের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

জানিনে ছেলেটি কোথায় থাকে। সেও জানে না আমার বাড়ীটা। ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করিনে, সেও সাহস পায় না জানতে।

সীমার কাছে রোজই হিসেব দিতে গোলমাল হয়। শুধু দুটো নয়া পয়সার হিসেব যেন মিলতে চায় না। কোন দিন বলি ভিখিরীকে দিয়েছি, কোন দিন বিড়ি কিনেছি, পান কিনেছি, নানারকম কৈফিয়ৎ দি। কিন্তু কোনটারই যুক্তি খাটে না। দু' নয়া পয়সা দিয়ে কোন জিনিষই বলতে গেলে কিনতে পাওয়া যায় না। তবু কচকচানি লেগেই থাকে। মাত্র চার আনা পয়সা বরাদ্দ। এবং টু দি পাই বলতে যা বুঝায় ঠিক সেই রকম হিসেব দিতে হবে। অন্যথা বরাদ্দ বন্ধ। বন্ধ হলে উপায় নেই। রাহাখরচ না হলে অতখানি পথ পয়দাল চলা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া লেট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। শরীর খারাপ হওয়ারও সম্ভাবনা। খাওয়ার পরই অতখানি হাঁটা সোজা কথা!

ভিখিরীকে পয়সা দেওয়া মানে আস্কারা দেওয়া। সীমা প্রায়ই এ কথা বলে। তা ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তি প্রসার হতে দেওয়া আদৌ উচিত নয়। এতে একটা অকেজো গুষ্টি শুধু বেড়ে ওঠে, দেশের ও দশের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তিপূর্ণ কথাই বলে সীমা। কিন্তু ভিক্ষুকের সংখ্যা দেশে বাড়ে ছাড়া কমে না।

ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে বলি, কে না ভিক্ষে করে? ভারত হাত বাড়ায় আমেরিকা ও ইউরোপের দিকে। শুধু ভিক্ষের ধরণটা আলাদা। সীমা ইকনমিকস-এর ছাত্রী। বলে, ভিক্ষে নয়, ক্রেডিট নেয়। পরে শোধ দেবে। তার জন্যে সুদও দিতে হয়। জানলেন মশাই।

মশাইর মুখ বন্ধ। তর্কে তার সঙ্গে আঁটতে পারিনে। পারি শুধু ভিখিরীটার সঙ্গে। যুক্তি না খাটলেও ধমক দিয়ে বন্ধ করে দিই তার মুখ। সেও বেশ ফ্ল্যাটারী করে। তার মত আর কেউ এমন তোষামোদ করে না। শুনতে ভাল লাগে। বলে, বাবুর দয়ার শরীর। আগের জন্মে দেবতা ছিলেন। বাড়ীতে এলে সীমা বলে, তোমার শরীরে যদি এতটুকু দয়ামায়া থাকে। আগের জন্মে যে কী ছিলে!

মন্তব্যটা শেষ হয় না। যদিও অর্থটা স্পষ্ট।

আপিসেও অনেকটা তাই। তোষামোদ তো দূরের কথা। কাটু কাটু কথা শুনে মাথা গরম হয়ে যায়। শুধু নন্‌সেন্স আর রাবিশ। কোন দিন আগেরটা পরে অথবা পরের শব্দটা আগে আসে এই যা। কেউ সুখ্যাতি করে না। শুধু ভিখিরী ছেলেটা আধ পেটা খেয়ে, উপোস থেকেও সুখ্যাতি করে। বলে, শুধু আপনার দয়াতেই বেঁচে আছি বাবু।

অন্তত একটা লোক রোজ আমার মুখ চেয়ে পথে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে যেন কেমন মায়া পড়ে যায়। প্রায়ই ভাবি আর দশ জনের মত ধমকে বিদেয় দেবো। কিন্তু পারিনে। ছেলেটাকে ভাল লাগার আরেকটা কারণ আছে, তার মধ্যে পেশাদারী ভিক্ষুকের লক্ষণ নেই। কথা বার্তার মধ্যেও নয়।

কথায় কথায় একদিন সীমাকে ভিখিরী ছেলেটির কথা বলে ফেলি। সীমা বলে, এ হতেই পারে না। জাত ভিক্ষুক না হলে ভিক্ষা বৃত্তি চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়।

আমি ভিখিরীটির পক্ষ নিয়ে তর্ক করি, নিশ্চয়ই সে ভদ্রঘরের ছেলে, পেটের দায়ে ভিক্ষে করে।

শেষে তর্কের জের না টেনে বলি, বেশ, একদিন তোমাকে ছেলেটাকে দেখাবো 'খন।

কলেজ ষ্ট্রীট থেকে সীমার জন্যে শাড়ী কিনতে হবে। আজ কাল করে করে আর হয়ে উঠে না। সে আব্দার করে বলে, আজ আপিস যাওয়ার পথে কিনে দিয়ে যাও। রোজ রোজ একই ওজর আপত্তি অর্থাৎ আপিস যেতে দেরী হবে, এ বাহানায় এড়িয়ে যাই। কিন্তু আজ ব্যতিক্রম ঘটে।

সীমাকে নিয়ে ট্রাম ষ্টপেজের কাছে আসতেই দেখি, শ্রীমান দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দু'টো যেন সার্চলাইটের মত ঘুরে ফিরে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অন্যান্য দিনের মত আজও সে কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু হাত বাড়ায় না। সীমাই বোধ হয় তার সঙ্কোচের কারণ।

সীমার দিকে তাকিয়ে ভিখিরীটার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সীমা তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ভিখিরীটিকে নিরীক্ষণ করে।

পেশাদার ভিক্ষুকের লক্ষণগুলো তার চোখ দুটো খুঁজে বেড়ায়। নিরাশ হয়ে ফিরে আসে তার দৃষ্টি। সে প্রশ্ন করে, ভিক্ষে করে খাস কেন? খেটে খেতে পারিসনে।

প্রশ্নটার মধ্যে এতটুকু নতুনত্ব নেই। কিন্তু তিক্ততা আছে। ভাবলাম ছেলেটা হয়ত নীরব হেসেই উত্তরটা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু তা হলো না। খাপ ছাড়া প্রশ্নে সে কেমন যেন বিগড়ে যায়। কর্কশ কণ্ঠে জবাব দেয়, ভিক্ষে করতে গেলে অনেক খাটতে হয় কত যে হাঁটতে হয়, কষ্ট হয় তা আপনারা জানেন না।

অবাক হয়ে গেলাম তার জবাব শুনে। আজ যেন বোবা মুখে কথা ফুটেছে। বিরক্ত হয়ে সীমা সরে যায় খানিকটা দূরে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

সীমা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, এই তোমার রাজা-ভিখিরী! তার কথার মধ্যে ব্যঙ্গের সুরটা ফুটে ওঠে।

ছেলেটা সেই জায়গায় একঠাই দাঁড়িয়ে থাকে। সে যেন তার নিজের অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্যে সঙ্কোচ বোধ করে। চোখ তুলে আমার দিকে সোজাসুজি তাকাবার সাহস যেন তার নেই। আজ সে হয়ত শূন্য হাতে বাড়ী ফিরে যাবে। একেকবার ভাবি তাকে ডেকে পয়সা দু'টো দি, কিন্তু পারিনে। আশঙ্কা হয়, সীমা যদি আবার কোন কটু মন্তব্য করে ফেলে। অনুমানটা একেবারে মিথ্যে নয়। সে আমাকে উদ্দেশ করে বলে, দেখলে তো, জাত ভিখিরীর কথার ধরণটা। সে আমাকে শুনিয়েই ঝালটা খানিকটা মিটিয়ে নেয়।

উত্তরে আমি বলি, সে ঠিকই জবাব দিয়েছে। তবে জবাবটা ভদ্রোচিত হয়নি। আমার ধারণাটাও এক মুহূর্তেই বদলে যায়। কিন্তু তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি নে। থেকে থেকে মনের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠেছে। একটা সামান্য নিয়মের ব্যতিক্রম এমনি মনঃপীড়ার কারণ হবে, তা ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। তার হাত থেকে অত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া ও পয়সা দুটো বাঁচার জন্যে হয়ত স্বস্তি বোধ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেটির করুণ দৃষ্টি, শান্ত চেহারা, মনের মধ্যে যেন ঝড় বইয়ে দেয়। সে হয়ত আর কখনও আমার কাছে হাত বাড়াবে না। দুটি নয়া পয়সা। কিছুই নয়, অথচ যেন কত মূল্যবান। সে না পেয়ে নিরাশ আর আমি দিতে না পেয়ে অনুতপ্ত।

# প্রাচীন ভারতে বিবাহ

মীরা রায়

মানুষ সামাজিক জীব। সৃষ্টির আদি হইতে মানবচিত্তের বহুজনসঙ্গ কামনা তাহাকে গোষ্ঠী রচনা করিয়া বসবাস করিতে তাহার মনে প্রেরণা জাগাইয়াছে এবং আধুনিক সভ্য পরিপুষ্ট সমাজের বিবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছে মানবচিত্তের এই আদিম প্রবৃত্তি। নরনারীর সৃজনকালে বিবাহবিধি বলিয়া কিছু ছিল না। তাহারা ক্রমশঃ পরস্পর একত্রে বসবাস করিয়া সৃষ্টির ধারা রক্ষা করিয়া কোন প্রকারে প্রাণধারণপূর্ব্বক বাঁচিয়া থাকিত। ইহাই আদি সমাজের গোড়াপত্তনের সূত্রপাত। তৎকালে স্ত্রীলোকগণ বহু পুরুষগমনে যেমন কোনরূপ অন্তরায়ের সম্মুখীন হইত না, পুরুষগণও সেইরূপ ইচ্ছানুরূপ স্ত্রীলোকগণকে ব্যবহার করায় তাহাদের বহুপুরুষভোগ্যা বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু ক্রমশঃ সভ্যতার বিকাশের সহিত এইরূপ যথেচ্ছাচারে স্ত্রী-পুরুষের মিলন রীতির অবসান ঘটে এবং নির্দ্দিষ্ট একটি একটি স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ঘর সংসার বাঁধিয়া গোষ্ঠী তথা সমাজ রচনা করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ সুসংহত জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিতে শিক্ষালাভ করিল। তখন হইতেই বিবাহ রীতিটা ধীরে ধীরে মনুষ্যসমাজ জীবনে প্রচলিত হইয়া গেল। যদিও ঐ রীতি ভারতে দেশ ভেদে কুলভেদে আচার বিচার ভেদে বিভিন্ন প্রকার ছিল।

ভারতের আর্য্যসভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার যুগে এই বিবাহ রীতি একটি অতি উন্নত ধরণের সংস্কৃতিযুক্ত অনুষ্ঠান হিসাবে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী আর্য্য সভ্যতার আমলে এই বিবাহ রীতি একটি মার্জ্জিত ধর্মানুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়, যদিও বর্ত্তমানের সঙ্গে সেকালের বিবাহ রীতির বহু পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দুবিবাহ স্ত্রী-পুরুষের ধর্মানুমোদিত একটি পরম পবিত্র সংস্কার, যাহা দ্বারা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন ও মনুষ্যসমাজ সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত হইতে পারে। বেদে এই বিবাহ রীতির নানাবিধ উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক যুগে বরকন্যার বিবাহ হইত যৌবনে এবং সেই সময়ে জাতিগত বিভেদ বিবাহের অন্তরায় সৃষ্টি করিত না। বর ও কন্যা উভয় উভয়কে স্বীয় নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বিবাহ করিতেন। স্বয়ংবর প্রথা হইতেই এই রীতির কিরূপ প্রচলন ছিল তাহা বুঝা যায়। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে এবম্প্রকার বিবাহই সংঘটিত হইত।

পরবর্ত্তী যুগে কুলগত, জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায় স্বীয় স্বীয় পতি পত্নী নির্ব্বাচন প্রথা ক্রমশঃই উঠিয়া গেল এবং অভিভাবকগণ এই নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করিলেন, এই সঙ্গে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিবাহ দিবার রীতি চালু হইল। শাস্ত্রকার মনু বিবাহ রীতিকে আট প্রকার আখ্যা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চার প্রকার বিবাহ মনুর অনুমোদিত এবং অবশিষ্ট আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চার প্রকার বিবাহ শাস্ত্রকারগণের নিন্দিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই চার প্রকার মিলনকে বিবাহ আখ্যা দিয়া সমাজ বন্ধনের আবশ্যকতাকে স্বীকার করা হইয়াছিল। বলপূর্ব্বক যে বিবাহ করা হইত তাহাকে রাক্ষস বিবাহ, গোপনে কন্যা হরণপূর্ব্বক বিবাহকে পৈশাচিক বিবাহ, কামযুক্ত যে মিলন তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ এবং পাত্রীর জন্য অর্থ সম্পদ আদায়পূর্ব্বক যে বিবাহ তাহাকে আসুরিক বিবাহ নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। মনু ইত্যাদির মতে সগোত্রা বা সমপ্রবরা কন্যার পাণিপীড়ন বিধেয় নহে। বৈদিক যুগে নারীর ধর্ম্মে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার ছিল। তাঁহারা ধর্ম্মকার্য্য করিতেন, মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন, সূক্ত রচনা করিতেন এবং পুরুষগণের ধর্ম্মকার্য্য বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন অসম্পূর্ণ থাকিত। স্ত্রী-স্বামীর ধর্মকার্য্যে প্রধান সহায় ও সম্পূরক ছিল। সুতরাং বিবাহ অবশ্য সংস্কার ও ধর্ম্মের সহায়রূপে পরিগণিত হইত। মনুর মতে বিবাহ স্ত্রীলোকদের উপনয়নের ন্যায় সংস্কাররূপ "বৈবাহিকঃ বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিক স্মৃতঃ।"

বেদে বিবাহকে একটি অতি পবিত্র অনুষ্ঠানরূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদে দেখা যায়, নারীগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিবাহের অধিকারপ্রাপ্ত হইতেছেন। "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্" অর্থাৎ কন্যা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা পতিলাভ করিয়া থাকেন। আরও ইহা সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, "অকৃত বিবাহা স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যং চরতি।"

বৈদিক যুগে বিবাহিত জীবনের আদর্শ অতিশয় মহান ও উন্নত ছিল। অথর্ব্ব বেদ বিবাহিতা বধূকে বলেন, "ইন্দ্রাণীব সুবুধা বুধ্যমানা জ্যোতিরগ্রা উষসঃ প্রতিজাগরাসি", ঋগ্বেদ বলেন, "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব, ননান্দরি সম্রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বৈদিক শাস্ত্রে সদ্য বিবাহিতা নারীকে কি মহান উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে নারী সমাজকে নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং উত্তরকালে বহুক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বামীর ধর্ম্মের সহায় না হইয়া সেই 'মহিমময়ী সাম্রাজ্ঞীর' আসনচ্যুতা হইয়া ভর্ত্তার ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহাতে সমাজের একাংশ ক্রমেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক যুগের স্ত্রীশিক্ষা নারীর মনে পূর্ব্বের সম্মানবোধ ও আত্মচেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহা সমগ্র নারীজাতির পক্ষে আনন্দের বিষয়। বেদ নারীকে যে সম্মান ও অধিকার দান করিয়াছিলেন, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ তাহার অনেকাংশ খর্ব্ব করেন। মনুর নারীজাতির প্রতি বহু আক্রমণাত্মক নীতি পরবর্ত্তীকালে নারীকে পুরুষচালিত সমাজে অপাংক্তেয় ও অবহেলিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই সময়ের বিবাহ-রীতিতেও নারীর পুরুষের নিকট অধীনতা বন্ধনটাই প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছিল।

বৈদিক বিবাহে সাধারণতঃ এক পত্নীত্ব ও একপতিত্ব স্বীকার করা

হইয়াছে। পুরুষ যদিও একাধিক বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু নারীর পক্ষে উহা নিন্দনীয় ছিল। ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর ভিতর নারীর একাধিক বিবাহ দেখা গিয়াছে। মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য পুরুষের বহুবিবাহ স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারতের যুগে নারীর বহুপতিত্ব নিন্দনীয় ছিল না। দ্রৌপদী, তারা, মন্দোদরী ইঁহারা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইঁহারা আজও 'পরম সতীর' পর্য্যায়ে পড়েন। বৈদিক যুগে বিবাহ প্রথা চালু থাকিলেও নারীগণকে পরপুরুষগমন করিতে দেখা গিয়াছে এবং ইহা খুব নিন্দনীয় বিষয় ছিল না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি সত্যকামের জন্মসূত্রে মাতা জবালা স্বীকার করিতেছেন "বহ্বহং চরন্তী যৌবনে ত্বামলভে।" অর্থাৎ যৌবনে বহু জনসেবা করিয়া তোমায় প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সত্য ও সহজ উক্তিতে মনে কোনরূপ কালিমা আসিয়া পড়ে না।

বৈদিক যুগে জাতিগত ভেদ বা বর্ণ বৈষম্যজনিত বিবাহে অন্তরায় বলিয়া বিধিনিষেধ কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ শূদ্রার অথবা ক্ষত্রিয় শূদ্রার পাণিপীড়ন করিয়াছেন, এরূপ বহু নজীর আছে। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালেও দেখা যায় এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের নজীর। ইতিহাস দেখাইয়াছে, বণিক-কন্যা দেবীর সহিত সম্রাট অশোকের বিবাহ। ধর্মপ্রচারক মহেন্দ্র ও তাঁহার ভগ্নী সংঘমিত্রা এই বণিক-কন্যার গর্ভজাত। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা শূদ্রা ছিলেন। কোশলরাজ দাসী-কন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করেন। সেই সময় যেমন জাতিভেদ প্রথার কোন রূপ কঠোরতা ছিল না, সেইরূপ নিকট-আত্মীয়ের সহিত বিবাহেও কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যাইত না। মহাভারতে দেখা যায়, অর্জ্জুন মাতুল-কন্যা সুভদ্রাকে হরণপূর্ব্বক বিবাহ করেন। বিদর্ভরাজ শ্রীকৃষ্ণের মাতুল ছিলেন এবং তাঁহার কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন।

ভাই-ভগ্নীতে বিবাহ প্রথা বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রচলন থাকিলেও বৈদিক সাহিত্য তাহার নিন্দা করিয়াছে। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে বলিয়াছেন "সগোত্রায় দুহিতরং ন প্রযচ্ছেৎ।" মনু বর্ণসংকরের ও অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী থাকিয়াও যে অনুলোম বিবাহের বিধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কিছুটা অনন্যোপায় হইয়াই করিয়াছেন। তাহার কারণ সমাজে বহুদিন প্রচলিত ঐ রীতি বিধান দ্বারা তৎক্ষণাৎ তুলিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি Revolution বা ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেন নাই, evolution বা ক্রমবিবর্ত্তমান ধারা সমাজের হিতকারী ইহাই তিনি মত পোষণ করিতেন। অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা বর্ণসংকর সৃষ্টি হওয়ায় বিবাহে জাতিভেদ প্রথা চালু হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন এই বর্ণসংকরের ভয়াবহতা সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাবধান করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ অনুসারে বিবাহের বাধা নিষেধ ক্রমশঃই সমাজে কঠোর ভাবে পালনীয় হওয়ায় বর্ণের ও জাতির পরিশুদ্ধতা বজায় রহিল।

প্রাচীনকালে যখন পাত্রপাত্রী স্বীয় নির্ব্বাচনানুসারে বিবাহ করিতেন তখন পণপ্রথার প্রচলন ছিল না। কালক্রমে অভিভাবকগণের হাতে বিবাহের দায়িত্ব আসিয়া পড়ায় পণপ্রথার সৃষ্টি হয়। কয়েকশ্রেণীর ভিতর দেখা যাইত কন্যাপক্ষ বরপক্ষের নিকট কন্যা বিক্রয় করিত এবং উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দেখা যাইত বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বরপণ গ্রহণ করিত। এই প্রথা অদ্যাবধি আমাদের সমাজে চলিয়া আসিতেছে, সুখের বিষয় যে সরকার এখন এই প্রথা রোধকল্পে আইনের সাহায্য লইতেছেন। বর্ত্তমানে বিবাহ পদ্ধতিতে শাস্ত্রোক্ত বিধির সহিত বহু দেশাচার ও লোকাচার যুক্ত হইয়া বিবাহ অনুষ্ঠান সকল শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট একটি রম্য অনুষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। প্রাচীন বিবাহরীতি শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হোমযজ্ঞ দ্বারা পাণিগ্রহণ, লাজহোম, সপ্তপদী প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানগুলিই ছিল বিবাহের প্রধান অঙ্গ। ঐ সকল ক্রিয়াকলাপগুলি কুলাচার ও দেশাচার ভেদে লোকরঞ্জনী বৃত্তির নিমিত্ত নানাবিধ লোকাচার যুক্ত হইয়া আধুনিক বিবাহ পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছে।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে কয়েকটি সূক্তে সূর্য্যার বিবাহ বর্ণনায় বৈদিক বিবাহের কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় বর্ত্তমান কালের ন্যায় তৎকালেও বরপক্ষীয়গণ কন্যাপক্ষীয়দের বাড়ী আসিতেন, সেই স্থানে নানা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইত। কন্যাকে শয্যা, অলঙ্কার, আভরণ, প্রভৃতি দিয়া সজ্জিত করিয়া বিবাহ দেওয়া হইত। স্বামিগৃহে নারীর মঙ্গল প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত পত্নীকে শিলাতে আরোহণ করাইয়া স্বামী অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেন। পতি ও পত্নী উভয় উভয়কে বরণ করবার পর একত্রে গমন অর্থাৎ সপ্তপদী একত্রে যজন অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং একত্রে ভোজন অর্থাৎ পাকস্পর্শ অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডের পর দাম্পত্য জীবনের সুখ ও পুত্র কামনা করা হইত। পত্নীকে স্বামীর সংসারে কল্যাণরূপা এক মহামহিমময়ী মূর্ত্তিতে কল্পনা করা হইত। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা! এই আদর্শে অনুপ্রেরিত হইয়া যে বিবাহ সংঘটিত হইত তাহাতে ভাবী পুত্রের জননীকে স্বামী সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা দান করিতেন। বিবাহের মন্ত্রের ভিতর দিয়া স্বামী-স্ত্রীকে নিজ পুত্রের জননী হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন। স্ত্রী স্বামীর নিকট শুধু মাত্র স্ত্রীই নহেন পরন্তু তিনি স্বামীর নিকট এইরূপে অভিহিত হইতেন "অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা, ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥"

স্ত্রীর মাহাত্ম্য প্রাচীন হিন্দু বিবাহে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। বৈদিক যুগ ও মহাকাব্যের যুগের পর ইতিহাসের অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে যখন অভিভাবকগণ বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন তখন বরপণ প্রথা বাধ্যতামূলক ভাবে সমাজে চালু হইল। বৈদিক বিবাহে কন্যার পিতামাতা স্বেচ্ছায় কন্যাকে যে অলংকার আভরণ ইত্যাদি দিতেন, সেই রীতিকে মধ্যযুগে বরপক্ষের কর্তৃপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বাধ্যতামূলক দেয় হিসাবে আদায় করিতেন। পাত্রের মর্য্যাদার জন্য যে পণ আদায় করিতেন তাহাই বরপণ হিসাবে দেখা দিল। কন্যাপক্ষকে উৎপীড়ন করিয়া নানাবিধ দ্রব্য বরপক্ষ দাবী করিতেন। কন্যাপক্ষকে নানাবিধ বাধানিষেধের বেড়াজালে বদ্ধ করা হইল। ক্রমশঃ কন্যার বিবাহ 'কন্যাদায়' হইয়া দাঁড়াইল। যেমন করিয়াই হউক পাত্রপক্ষের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদের দাবী মিটাইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়াই সেই সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল নতুবা কন্যার

বিবাহ না হইলে কন্যার পিতাও উর্দ্ধতন পুরুষগণ নরকগামী হইবেন ইহাই ধারণা ছিল।

সেকালে অতি অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় কন্যাগণ যখন প্রাপ্তযৌবনা হইত তখন 'দ্বিতীয় বিবাহের' অনুষ্ঠান হইত। ইহার আড়ম্বর সময় সময় প্রথম বিবাহকেও অতিক্রম করিয়া যাইত। কন্যা এই সময়ে ব্রহ্মচর্য্যের পথ অনুসরণ করিত। এই সময় শূদ্রর মুখদর্শন নিষিদ্ধ ছিল কম্বল শয্যায় শয়ন এবং ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া তিন রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইত। আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র বলেন, বিবাহের পর তিনরাত্রি অথবা দ্বাদশ রাত্রি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কাটাইয়া স্বামী ও স্ত্রী মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে সুসন্তান লাভ হয়। গোভিলীর গৃহ্যসূত্র বলেন বিবাহের পর ত্রিরাত্রিকাল ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন সুসম্ভাবনাপূর্ণ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তীকালে দ্বিতীয় বিবাহে ঐরূপ কন্যা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইত। বর্ত্তমানযুগে প্রাপ্ত-যৌবনা নারীর বিবাহ হওয়ায় দ্বিতীয় বিবাহ প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় ঐরূপ তিনদিন ব্রহ্মচর্য্য পালনের অবকাশ ঘটে না। এখন বিবাহের পরদিন কালরাত্রি বলিয়া যে রাত্রিটিতে স্বামী ও স্ত্রীকে পৃথক রাখার নিয়ম উহাই বোধহয় সেই ব্রহ্মচর্য্যের অবশেষ যদিও ইহার কোন শাস্ত্রীয় ভিত্তি নাই।

বৈদিক যুগে বিবাহ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিচ্ছেদযোগ্য হইত। যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি মনীষিগণ স্বীয় বিধান রচনায় বিবাহচ্ছেদ বা নারীর পুনর্ব্বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন। পরাশর বলেন, 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ, পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।" যদিও নারদীয় মনু এই পাঁচ অবস্থায় নারীকে পুনর্ব্বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সঙ্কীর্ণ করিয়া পুরুষের পক্ষে পত্নী বিচ্ছেদের অধিকারের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। কৌটিল্যের বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে অভিমত হইল "অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম ইতি" অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য এই চার প্রকার ধর্ম্মবিবাহ ইচ্ছা করিলেই বিচ্ছেদ করা যায় না। শাস্ত্রোক্ত বিধি থাকিলেও সহজে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন হইত না। পুত্রের কামনায় বিবাহ, পুত্রের মঙ্গলের জন্য সংসার এই সকল কামনা করিয়া পতি-পত্নী একত্র বসবাস করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত পরস্পর পরস্পরকে মানিয়া লইয়া বিবাহ বন্ধনকে দৃঢ় করিয়া তুলিত। ক্রমশঃ সমাজে বিবাহ বন্ধন এতই সুদৃঢ় হইল যে, একবার বিবাহ হইলে তাহা অচ্ছেদ্য এবং আমরণ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন হিসাবে বিবেচিত হইত। এই সম্বন্ধ শুধু ইহকালেরই নহে স্বামী-স্ত্রী পরকালে উভয় উভয়ের একাত্ম হইয়া জড়িত থাকে এই ধারণা হিন্দু নরনারীর মনে দৃঢ়মূল হইল। স্বামী বা পিতা সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া সমস্ত সংসারের সমতা ও ঐক্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। ইহাতে একটি কুলের ও বংশের ধারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইত। স্বামী বা কর্ত্তার নিকট সমস্ত পরিবারবর্গ আনুগত্য স্বীকার করিতেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে সেই পরিবারবর্গের সমষ্টি কল্যাণে স্বামী আপন সামর্থ্য ও শক্তি নিয়োজিত করিতেন।

এইভাবে কয়েকটি আত্মীয় সংসার একসঙ্গে বাস করিয়া যৌথ পরিবার সৃষ্টি করিল। এই যৌথ পরিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল। সেকালের হিন্দু সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা সর্ব্ব বিষয়ে গুরু দায়িত্ব পালন করিত। নরনারীর বিবাহ, জীবনযাত্রা প্রণালী, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি সকল কিছুই এই যৌথ পরিবারের নীতি ও সুবিধা অনুযায়ী স্থিরীকৃত হইত। এইরূপ পরিবারে বিবাহকালে পাত্রপাত্রীর কথা নগণ্য হিসাবে ধরা হইত, এমন কি তাহাদের পিতামাতা ও বাড়ীর কর্ত্তার ইচ্ছা ও সুখসুবিধার নিকট নিজ অভিপ্রায় বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইতেন, বাড়ীর ও বংশের সকলের সুখ সুবিধা দেখিয়া তাঁহাদের বিবাহ ব্যবস্থা করিতে হইত। বর্ত্তমানে বাল্য বিবাহ প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রীগণ স্বমতে বিবাহ করায় সেকালের বিবাহ রীতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং একক পরিবার গড়িয়া উঠায় যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আধুনিক কালের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বৃত্তি প্রাচীন বিবাহ রীতির ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। পূর্ব্বকালে শাস্ত্র যেসব বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান দিয়াছিল, বর্ত্তমানে আইন সেই সব ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের অধিকার আরও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

# একটি আবিষ্কারের কথা

অলোক ভট্টাচার্য্য

এই বিংশ শতাব্দীরই একজন আবিষ্কারক এবং তাঁর আবিষ্কারের কথাই আজ বলছি। আগেই জানিয়ে দেই আবিষ্কারের কথা—'মাইক্রোফিল্ম' (microfilm)-এর কথা। তোমরা নিশ্চয়ই সিনেমার ফিল্ম বা ক্যামেরার ফিল্ম-এর কথা শুনে থাকবে। 'মাইক্রোফিল্ম'ও ঠিক ঐ ধরণের ফিল্ম। কখনো কাগজের উপর কখনো বা পর্দার 'পর 'মাইক্রোফিল্ম'র প্রকাশ। এই হোল মোটামুটি 'মাইক্রোফিল্ম' সম্বন্ধে সাদা কথা। কিন্তু কেমন ক'রে একজন মানুষের জীবনে এই 'মাইক্রোফিল্মের চিন্তা এলো সেই কথাই এখন শুরু করি।—

আজ থেকে প্রায় সাঁইত্রিশ বা আটত্রিশ বছর আগেকার কথা। ঠিক তখুনি 'মাইক্রোফিল্মের' জন্ম। জন্মদাতা—আমেরিকার নিউইয়র্কের ছেলে জর্জ ম্যাকার্থী। ম্যাকার্থী যখন তিন বছরের ছেলে, তখন তার বাবা মারা গেলেন। তিন বছরের ছেলে মানুষ হ'তে লাগলো এক নিকট আত্মীয়ের কাছে। কিন্তু পড়াশোনা তার ভাগ্য ছিল না বা ধাতে সইতো না। তাই চোদ্দ বছরের ম্যাকার্থী প্রাথমিক স্কুলের বেড়া ভেঙে পালিয়ে এলো এক বে-সরকারী অফিসে। বেতন পেতো মাসে পনেরো ডলার করে। চার বছর চাকুরী করার পর সেই অফিসের চাকুরী ছেড়ে এবারে ঢুকলো এম্পায়ার ট্রাষ্ট কোম্পানীতে ( Empire Trust Company ) সাপ্তাহিক ২০ ডলারের বেতনে। এই সময় ম্যাকার্থী বিয়ে করলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকার চিন্তাও মনে ঢুকলো। কি করবে দু'চারটে ব্যবসায় শুরু ক'রলো, কিন্তু সবই উঠে গেল।

এরই কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৯২৩ সালের এক দুপুরে যখন ম্যাকার্থী একটি ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে দাঁড়িয়েছিল, তখন এক বড় ধনী এলেন ঐ কাউণ্টারে। এসেই কাউণ্টারের কেরাণীর কাছে অভিযোগ করলেন তাঁর তিন শ' ডলারের চেক যখন ভাঙানো হয়নি, তখন কেন তাঁকে তিন শ' ডলার দেওয়া হবে না। কেরাণীটি তো ভড়কে গেল। কেরাণী সেই ভদ্রলোককে চেক দেখে তিন শ' ডলার দিয়ে দিল—কারণ একবার চেক ভাঙালে, ঐ চেকের যাবতীয় তথ্য সব ব্যাঙ্কের খাতায় লেখা থাকে। কিন্তু ঐ ব্যাঙ্কের খাতায় ঐ ভদ্রলোকটির চেকের সম্বন্ধে কোনো কিছু তথ্য লেখা ছিল না। সুতরাং বাধ্য হ'য়েই কেরাণীটি তিন শ' ডলার ঐ ধনীটিকে দিল। প্রমাণ তো নেই যে, ভদ্রলোকটি আরো একবার ঐ তিন শ' ডলারের চেক ভাঙিয়েছিলেন কিনা। এদিকে ম্যাকার্থী কিন্তু সব কিছুই লক্ষ্য ক'রলো আর ভাবলো—সত্যিই তো এই ভাবে বহু লোক কত ব্যাঙ্ককে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। তখুনি ছত্রিশ বছরের ম্যাকার্থীর মনে জেগে উঠলো এক আবিষ্কারের নেশা কি ক'রে এই ব্যাঙ্ক ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করা যায়। তখন থেকে সে চেষ্টা করতে লাগলো কি করে চেক ফ'টোগ্রাফিং মেসিন তৈরী করা যায়। ম্যাকার্থীর কিন্তু ফ'টোগ্রাফী সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান বা ধারণা ছিল না। তবু সে আর তার স্ত্রী দু'জনে মিলে বাড়ীতেই মেসিন তৈরী করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো এবং টাকাও খরচ করলো। কিন্তু কিছুই হোল না। ম্যাকার্থী তবু হাল ছাড়লো না।

১৯ ৪ সালের এক সন্ধ্যায় ম্যাকার্থী সপরিবারে চললো সিনেমা দেখতে। সিনেমা দেখতে গিয়ে চোখে পড়লো এক ধীর গতি ( Slow motion ) সম্পন্ন ছবির দৃশ্য। এই দৃশ্য দেখেই ম্যাকার্থী চললো সিনেমার আলোক চিত্রশিল্পীর কাছে। ম্যাকার্থীর প্রশ্ন হোল যে কোনো গতিতে ( motion ) ব্যাঙ্কের চেকগুলোর ফ'টো তোলা যাবে কি না। আলোক চিত্রশিল্পী এ ব্যাপারে ম্যাকার্থীকে কিছুই উৎসাহ দেখালো না। তখন ম্যাকার্থী চললো এক ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। সব খুলে বললো ইঞ্জিনীয়ারকে। তারপর সেই ইঞ্জিনীয়ার ম্যাকার্থীর কথা মত তৈরী ক'রলো এক মেসিন। মেসিনটা তৈরী হোল চেক বই-এর মাপ মত একটা বেল্ট দিয়ে, সঙ্গে লাগানো থাকলো একটা সিনেমার ক্যামেরা যা দিয়ে ঐ বেল্টের উপর 'চেকে'র ফ'টো উঠবে। তখন ম্যাকার্থী আর ঐ ইঞ্জিনীয়ার দু' জনেই ঐ মেসিনটা ছাড়লো বাজারে। একটার পর একটা ব্যাঙ্কের চেকগুলোর ফটো তোলা হ'তে থাকলো ঐ মেসিন দিয়ে। এই হোল 'মাইক্রোফিল্মের' আদি পর্ব।

ম্যাকার্থী তার মেসিনের নাম দিলো 'চেকোগ্রাফ' ( Checko-graph )। ম্যাকার্থীর ভাগ্যাকাশে দেখা দিল অর্থ এবং যশের সূর্য্য। এখন থেকে জর্জ ম্যাকার্থীকে আমরা ম্যাকার্থী সাহেব বলেই ডাকবো। ১৯২৬ সালে একদিন আমেরিকান ব্যাঙ্কার্স এসোসিয়েশনে ( American Bankers' Association ) শত শত ব্যাঙ্কের মালিকদের সামনে ম্যাকার্থী সাহেব তাঁর আবিষ্কৃত মেসিনের গুণাবলী ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু কেউ-ই উৎসাহিত বোধ করলেন না। কিন্তু একজন করলেন। তিনি হ'লেন ইষ্টম্যান কোডাকের একজন প্রতিনিধি। ইষ্টম্যান কোডাক হচ্ছেন—তোমরা যে কোডাক ক্যামেরা বা কোডাক ফিল্মের নাম জান, সেই কোডাক কোম্পানীর মালিক। যাই হোক সেই প্রতিনিধি তো ম্যাকার্থী সাহেবকে নিয়ে এলেন একেবারে তাঁদের খোদ অফিসে—নিউইয়র্কের রচেষ্টারে ( Rochestor ) ইষ্টম্যান কোডাক তো ম্যাকার্থীকে কিনে নিতে চাইলেন। কিন্তু ম্যাকার্থী চান স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করতে। অবশেষে পঞ্চাশ হাজার ডলার, ম্যাকার্থীর যাবতীয় 'চেকোগ্রাফ' মেসিনের দাম এবং একটি চাকুরী যা ম্যাকার্থী সাহেবের ব্যাঙ্কের জমানো টাকার চেয়ে পাঁচগুণ বেশী, অর্থের বিনিময়ে ম্যাকার্থী সাহেব কোডাক কোম্পানীতে ঢুকলেন। দেখ কোথায় পনরো ডলার আর কোথায় পঞ্চাশ হাজার ডলার তা ছাড়া কত ডলারের চাকুরী একটি। সাধনার পথে থাকলে তোমরাও এত অর্থ যশ পাবে বৈকি।

এদিকে কোডাক কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়াররা করলো কি ম্যাকার্থীর 'চেকোগ্রাফ' মেসিনের কিছু অংশ বদলে এক স্বাভাবিক গতি সম্পন্ন নতুন মেসিন তৈরী করলো নাম দিল—'রেকর্ডাক' ( Recordak)

এর সঙ্গে তৈরী করলো এক সক্রিয় ফিল্ম, যা দিয়ে সব রকমের রঙের চেকের ফ'টো তোলা যায়। এটা কিন্তু ম্যাকার্থীর মেসিনে সম্ভব ছিল না।

১৯২৮ সালে 'রেকর্ডাকে'র উদ্বোধন হ'লো—ম্যাকার্থী সাহেবের পুরনো ব্যাঙ্ক এবং ১৯৩৩ সালের মধ্যে আমেরিকায় দুই শত চুয়াল্লিশটি শহরে প্রায় সাতশ 'রেকর্ডাক' বিক্রি হোল। তখনকার সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক ইংল্যাণ্ডের মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কেও (Midland Bank) 'রেকর্ডাকে'র সাহায্য নিতে হোল। এই সময়ে 'রেকর্ডাকে'র সভাপতি হিসাবে ম্যাকার্থী সাহেব প্রায় ত্রিশ হাজার ডলার সংগ্রহ করেছিলেন। ধন্য সাধনা!

'মাইক্রোফিল্ম' ব্যাঙ্কের যাবতীয় হিসাবপত্তর, দলিল, লেনদেনের হিসাব ইত্যাদির নকল রাখতে পারে। মনে কর—তোমার কোনো একটি চেকবই-এর একটা পৃষ্ঠা হারিয়ে গেল, কিছু ভাববার নেই—'মাইক্রোফিল্মে'র সাহায্যে তুমি তোমার হারানো চেকের হদিস পেয়ে যাবে। তাই, বিশেষ করে, যুদ্ধের অর্থাৎ গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের (Bank of England) সমস্ত রেকর্ড 'মাইক্রোফিল্ম' করে ওয়েলসের (Wales) মাটিতে পুঁতে রাখা হ'য়েছিল—ভবিষ্যতের কথা ভেবে। হিটলারের ভয়ে—পোল্যাণ্ডেও এইভাবে সরকারী-বেসরকারী, ব্যাঙ্কের সমস্ত রেকর্ড মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হ'য়েছিল। শুধু ব্যাঙ্কের চেকের জন্যে নয় 'মাইক্রোফিল্ম'-এর দরকার পড়েছিল বৃটেন থেকে চিঠি পাঠাতে এরোপ্লেনে। প্রায় পনরো হাজার চিঠি 'মাইক্রোফিল্মে'র সাহায্যে পাঠানো হ'তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে। চিঠিগুলো সবই ছিল সরকারী নির্দেশনামা। পরে চিঠিগুলো কাঁচের স্লাইডে লাগিয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে পর্দায় প্রক্ষেপণ করা হোত।

খবরের কাগজের অফিসেও দরকার পড়লো মাইক্রোফিল্মের। সৃষ্টি হোল নতুন ধরণের 'মাইক্রোফিল্ম মেসিন' যা কেবল খবরের কাগজের জন্যই। একটা উদাহরণ দিই—আমেরিকার বিখ্যাত দৈনিক কাগজ 'হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এর একশ বছরের পুরনো ফাইলগুলো একসঙ্গে রাখা হ'লে, প্রায় ১৮১৫৭১ ঘন ফুট জায়গা লাগতো। কিন্তু 'মাইক্রোফিল্মে'র দৌলতে সেই ফাইলগুলো একটা সাধারণ-বুক-কেসে ধরে গেল। ভেবে দেখ কি উপকারিতা মাইক্রোফিল্মের। তাই আজ পৃথিবীর প্রায় সব নামকরা দৈনিক, মাসিক পত্রপত্রিকার অফিসগুলো মাইক্রোফিল্ম দিয়ে তৈরী করে রাখছে পত্র পত্রিকার পুরনো নতুন সংখ্যার দ্বিতীয় প্রস্থ। হয়তো আগামী শতকে ঐ পত্র পত্রিকাগুলো হ'য়ে উঠবে ঐতিহাসিক দলিল। যে মাইক্রোফিল্ম তৈরী হয়েছিলো কেবল ব্যাঙ্কের চেকের হিসাব রাখার জন্যে, আজ তা পৃথিবীর বহু ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে আবশ্যিক হিসাবে। যেমন ব্যবহার করা হয়েছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে। সেখানে পঁচিশ শ' পুরোনো বই, দলিল ইত্যাদি মাইক্রোফিল্ম করা হ'য়েছে। তোমার ইচ্ছে হ'লে—তুমি সিনেমার মত মাইক্রোফিল্ম করা পুরনো সেই বই, দলিলপত্রের ছবি পাবে—যা আগে পড়তে পারতে না।

আজকে ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই মাইক্রোফিল্মের প্রচলন বেশ ব্যাপকভাবেই হ'য়েছে। জানি না আমাদের ভারতের ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের এই অবদান গ্রহণ করা হ'য়েছে। তবে মনে হয় কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে (National Library) মাইক্রোফিল্মের প্রচলন আছে, তালপাতার পুঁথিরও মাইক্রোফিল্ম করা হচ্ছে। আমরা কত পুরনো সংস্কৃতি-সমাজ-সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছি এই মাইক্রোফিল্মের সাহায্যে। যেখানে মনে কর বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই, সেখানে তুমি, সামান্য একটি মোমবাতির আলোয় মাইক্রোফিল্মের সাহায্যে পড়াশোনা করতে পার। একটা ছোট প্রক্ষেপকের সাহায্যে মাইক্রোফিল্মের প্রতিফলন পর্দায় পড়বে। তখনি তুমি পর্দায় দেখতে পারবে পুরনো বই-এর পাতাগুলো।

এবার ম্যাকার্থী সাহেবের কথা শেষ করি। ম্যাকার্থী সাহেব আরো কিছুদিন 'রেকর্ডাকে'র সভাপতি থেকে প্রচুর অর্থ যশ রেখে ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মে দেহত্যাগ করেন। একজন ব্যাঙ্ক কেরাণীর ভুল ম্যাকার্থীর মনে এনেছিল আবিষ্কারের নেশা। সেই নেশায় মেতে ম্যাকার্থী সাহেব যে কীর্তি রেখে গেলেন, তা অম্লান থেকে যাবে চিরদিন।

একজনের ভুল আরেক জনের জীবনে আশীর্বাদ হোল। এই ভাবেই আবিষ্কারের সূচনা যুগে যুগে।

# নীল মেঘ

পুষ্পদল ভট্টাচার্য্য

কিছুদিন আগে কোন একটি দৈনিক পত্রিকায় ভূতের ছেলেমেয়ে হওয়ার গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি পড়ে আমরা হাসছি দেখে আমাদের এক আত্মীয়া বললেন, "ঐ গল্প মোটেই অসম্ভব নয়। কলিকাতার একজন বিখ্যাত ব্যক্তিও নাকি ব্রহ্মদৈত্যের সন্তান ছিলেন। ঐ ব্যক্তি শৈশবে একদিন স্কুলে না গিয়ে কয়েকজন সমবয়সীর সঙ্গে পথে খেলা করছিলেন। সেই সময় তাঁর ব্রহ্মদৈত্য পিতার অদৃশ্য হস্তের কিল চাপড় খেয়ে তিনি পথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। বালকের খেলার সঙ্গীরা বন্ধুকে ঐ ভাবে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। ব্রহ্মদৈত্য বালকের বাড়িতে এসে তার মাকে বলে—"ছেলে স্কুলে না গিয়ে পথে খেলা করছিল, তাই তাকে শাস্তি দিয়েছি। সে অমুক রাস্তায় পড়ে আছে। লোক পাঠিয়ে তাকে তুলে আন। ছেলেকে বলে দিও ভবিষ্যতে যদি লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয় তাহলে তাকে আবার শাস্তি দেব।"

বালকের ঐ ব্রহ্মদৈত্য পিতাকে বালকের মা ছাড়া আর কেউ দেখতে পেত না।

ঐ আত্মীয়ার কথা শুনে আমরা বললাম—"এ কখন সম্ভব যে কেবল একজন মানুষ ব্রহ্মদৈত্যকে দেখতে পেতো অথচ বাড়ির আর কেউ তাকে দেখতে পেত না।"

আত্মীয়া বললেন—"এতে অবিশ্বাসের কি আছে? সব মানুষ যেমন দেব দর্শন পায় না, তেমনি সব মানুষ ভূতও দেখতে পায় না। একবার আমরা একটা ভূতের বাড়িতে ছিলাম। সেখানে আমার বড়দা প্রায়ই নানা রকম মূর্তি দেখতে পেতেন, কিন্তু আমরা কেউ কিছু দেখিনি কখনো।"

তাঁর কথা শেষ হতেই আমরা আবার হেসে উঠলাম। এই সময়ে আমাদের দলের সেরা নাস্তিক রমেনবাবু বললেন—"মাসীমা মিথ্যে কথা বলছেন না। সবাই ভূত দেখতে পায় না। আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, তাহলেই ব্যাপারটা বুঝবে।"

রমেনবাবু ইঞ্জিনিয়ার। কার্য উপলক্ষে তাঁকে অনেকবার অনেক জঙ্গলীস্থানেও গিয়ে থাকতে হয়েছে। এমনি এক স্থানের উল্লেখ করে তিনি বললেন: "সেবার ঐ শহরে বদলী হয়ে গিয়ে একটা পুরানো বাংলো বাড়িতে থাকতে পেলাম। বাড়িটা ছোট হলেও চারদিক খোলা বলে বেশ আলো বাতাস খেলে। বাংলোর চারপাশে অনেকখানি জমি ছিল। তাতে বেশ ভালো বাগান করা যায়। কিন্তু সেখানে কোন বাগান ছিল না।"

বাড়িওয়ালা বললেন—"এখানে বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময়ে জলাভাব হয়। তা ছাড়া এই কাঁকুরে জমিতে কিছু ফলানোও কষ্টকর। তাই আমরা সে চেষ্টা করি না।"

বাড়ির পিছন দিকে কয়েকটা বড় বড় শালগাছ আর অশথ গাছ ছিল। অশথ গাছের নীচে গাছের গোড়া থেকে বেশ খানিকটা তফাতে একটা বাঁধান গোল বেদি ছিল। ভরা গরমের সময়ও এই বেদিটা থাকতো আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা। আমি আর আমার স্ত্রী কমলা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর থেকে খানিকটা রাত পর্যন্ত সেই বেদির একপ্রান্তে বসে গল্প করতাম।

ঐ শহরটা বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল বলে আমার এক বন্ধু নীরেন একবার দিন পনেরোর জন্য আমাদের কাছে বেড়াতে এল। নীরেন যেদিন এল সেইদিনই সন্ধ্যায় আমি, কমলা আর নীরেন খানিকটা বেড়িয়ে সেই বেদির উপর বসবার জন্য বাড়ির পিছন দিকে গেলাম। আমরা গাছের কাছে পৌঁছবার আগেই নীরেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভীতকণ্ঠে বলল—"ওকি! ওকি!"

আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় কি?"

"ঐ যে, ঐ অশথ গাছের নীচের বেদির ঠিক মাঝখানে। দেখতে পাচ্ছ না?"

নীরেন আঙুল দিয়ে স্থান-নির্দেশ করল। আমি আর কমলা সেদিকে চেয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। সময়টা যাকে বলে ভর সন্ধেবেলা। খোলা জায়গায় তখনো ঝাপসা আলো আছে। কিন্তু গাছতলার ছায়াগুলোও কালো হয়ে উঠেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক সেই স্তব্ধতা আরো বাড়িয়ে তুলছে।

আমার হাতে জোরালো টর্চ ছিল। আমি বেদির দিকে এগিয়ে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে সেটাকে ভালো করে পরীক্ষা করলাম। কোথাও কিছু নেই। একটা কুটোও ছিল না বেদির উপর। গাছতলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নীরেন কিন্তু যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টিতে বেদির দিকে চেয়ে রইল। আমি তার কাছে গিয়ে ঠেলা দিয়ে বললাম—"কি দেখছিস তা বলবি তো? না কি পাগলের মতন বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকবি কেবল?"

ঠেলা খেয়ে নীরেন যেন সম্বিত ফিরে পেল। সে ভয়ে কেঁপে উঠে বলল—"ঐ তো, দেখ না। ঐ বেদির ঠিক মাঝখানে একটা জোরালো নীল আলো বাষ্পের মতন কাঁপতে কাঁপতে উপর দিকে উঠছে। একটু উপরে উঠেই সেটা একটি বাষ্পাকার মূর্তি ধারণ করছে—নীলবর্ণ মেমের মূর্তি। মেমের পা দুটো তলার দিকে জোরালো আলোয় হারিয়ে গিয়েছে। তাই পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু হাঁটুর নীচে থেকে গোটা শরীর দেখা যাচ্ছে। ওই বাষ্পাকার নীল মেম থরথর করে কাঁপছে। ওর শরীরের মতই পোশাকও নীল।"

নীরেনের বর্ণনা শুনে কমলা হেসে উঠল—"বাঃ, বেশ অভিনয় করতে শিখেছেন তো ঠাকুরপো? কিন্তু যতই চেষ্টা করুন, আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন না আপনি। আমি আর উনি এ শহরে আসার পর থেকে আজ এক মাস ধরে রোজ সন্ধ্যায় ঐ বেদির উপর বসে থাকি সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত। কখনো ওখানে ভয় পাবার মতন কিছু দেখিনি।"

নীরেন বলল—"না বউদি, আপনাকে ভয় দেখাবার জন্য বলছি না। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঐ বেদির মাঝখান থেকে একটা নীল আলো উঠে মেমের আকার নিয়ে থরথর করে কাঁপছে।"

আমি কমলার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে সেই বেদির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললাম—"এই দেখ, আমরা বেদির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছি। এবার কি বলবে?"

নীরেন যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে বলল—"তোমরা এখন ঠিক সেই নীল আলোর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছ। তোমাদের ঘিরে মেমের শরীর জ্বলছে আর কাঁপছে।"

নীরেনের কথা শুনে আমি আর কমলা হাসতে হাসতে নীচে নেমে এলাম। আমি তার পিঠে থাবড়া মেরে জিজ্ঞাসা করলাম—"আজকাল নেশা করতে আরম্ভ করেছ বুঝি?"

কমলাও হেসে বলল—"নিশ্চয় ঠাকুরপো দ্বারোয়ানের সিদ্ধির লোটায় কয়েকটা চুমুক দিয়েছেন।"

নীরেন কিছুতেই বাগানে থাকতে রাজী হল না। রাত্রেও সে একলা ঘরে শুতে চাইল না। আমার চাকরটাকে তার ঘরে শুতে হল। তারপরের দিনই আমাদের সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করে দুপুরের ট্রেনে শহর ছেড়ে পালাল সে।

এর দিন কয়েক পরে কমলার ছোট বোন শীলা তার বছর দুয়েকের ছেলে মণ্টুকে নিয়ে আমাদের কাছে বেড়াতে এল। শীলারা সন্ধ্যার কিছু আগে এসে পৌঁছেছিল। তাদের স্নানাহার শেষ হতে হতে বাইরে অন্ধকার হয়ে গেল। তাই আমরা বসবার ঘরে বসেই গল্প করছিলাম। ঐ ঘরের একটা জানালা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে অনেক দূর পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। হঠাৎ শীলা সেই দিকে চেয়ে আশ্চর্য ভাবে—"আরে, এ আবার কি?" বলে সেই জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কমলাও উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় কি রে?"

"ঐ তো, তোমাদের অশথ গাছের নীচের ঐ বেদিটার ঠিক মাঝখানে একজন নীল পোশাক পরা মেম দাঁড়িয়ে কি রকম থরথর করে কাঁপছে দেখ না। দেখতে পাচ্ছ না? ওর সারা গা আর জামা কাপড় থেকে একটা নীল আলো ঠিকরে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন মেমটাই আগাগোড়া স্বচ্ছ নীল আলোয় তৈরি।"

এবার আমিও উঠে গিয়ে শীলার পাশে দাঁড়ালাম। কিন্তু বাইরে উজ্জ্বল চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও গাছতলায় কানো আলোটালো দেখতে পেলাম না। পাছে শীলা ভয় পায় তাই বললাম—"ওঃ, তুমি চাঁদের আলোর সেই দৃষ্টিবিভ্রমটার কথা বলছ? হ্যাঁ, জোর চাঁদের আলো থাকলে গাছের ডালের ফাঁক থেকে বেদির উপর জ্যোৎস্না এসে পড়ে ঐরকম একটা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়। আমি আর তোমার দিদিও তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা তো রোজই সন্ধ্যায় ওখানে গিয়ে বসি। ভয় পাবার মতন কিছু দেখিনি কোথাও।

সে রাত্রে আর কোন কথা হল না। ভয়ের কারণ ঘটল পরদিন বিকালে, সূর্য অস্ত যাবার একটু পরেই। আমরা তখনও বাড়ির সামনের বারান্দায় বসে গল্প করছি। একটু আগে চা খাওয়া শেষ হয়েছে। চাকর বাসন তুলে নিয়ে যাবার সময়ে মণ্টুও তার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

ধীরে ধীরে চারদিকে নীরব সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। এ সময়ে আপনিই সব কথাবার্তা স্তিমিত হয়ে আসে। আমরাও কি একটা কথার মাঝখানে থেমে যে যার সামনের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রয়েছি। ঠিক সেই সময়ে বাড়ির পিছন দিক থেকে মণ্টুর ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল—"মা, মা, বাঁচাও বাঁচাও।"

আমরা সকলেই সেই শব্দ অনুসরণ করে অশথ গাছের দিকে ছুটে গেলাম। দূর থেকে মনে হল মণ্টুকে কেউ যেন দু'হাত ধরে জোর করে বেদির উপর টেনে তুলছে। আর মণ্টুও প্রাণপণে পা ছুড়ে প্রতিরোধ করছে। কে যে মণ্টুকে টানছে আমরা তা দেখতে পেলাম না। কিন্তু শীলা—"ওরে সেই মেমটা আমার মণ্টুকে ধরে টানছে রে।" বলে ছুটে গিয়ে দুই হাতে মণ্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরে যেন কার হাত থেকে ছেলেকে সবলে টেনে ছিনিয়ে নিল। তারপর মণ্টুকে বুকে জড়িয়ে নিয়েই ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল শীলা।

আমি আর কমলা খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শীলাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভেতর এলাম। দেখলাম শীলা কমলার পূজার ঘরে দাঁড়িয়ে একহাতে মণ্টুকে বুকে নিয়ে আরেক হাতে দেওয়ালে টাঙান মা কালীর পটটা পেড়ে নিয়ে বারবার মণ্টুর গায়ে মাথায় বুকে ছোঁয়াচ্ছে। মণ্টু মাকে জড়িয়ে ধরে তখনো ভয়ে কাঁপছিল আর ফোঁপাচ্ছিল। কমলাও তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে পূজার ফুল মণ্টুর গায়ে মাথায় বুলিয়ে শীলার হাতে দিল।

মণ্টুকে নিয়ে শীলা আর কমলা শোবার ঘরে চলে গেলে আমি চাকরকে ডেকে মণ্টুকে একলা ছেড়ে দেবার জন্য বকলাম। চাকর বলল, সে যখন চায়ের বাসন ধুচ্ছিল মণ্টু তখন আপন মনে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এ বাড়িতে ভয় পাবার মতন যে কিছু আছে চাকর তা জানত না। তা ছাড়া তখনো ভালো করে অন্ধকারও হয়নি। কাজেই সে মণ্টুর দিকে তত নজর রাখবার দরকার বোধ করেনি।

সেই রাত্রেই মণ্টুর খুব জ্বর এল। বেশ কয়েক দিন ভুগে সে একটু সুস্থ হতেই শীলা বলল—"খুব বেঁচে এসেছিলাম দিদি। আর নয়। এবার ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।"

শীলার চিঠি পেয়ে তার স্বামী প্রতুল এসেছিলেন। তিনি সব ব্যাপার শুনে গাছতলায় গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু আমাদের মতই তিনিও কিছুই দেখতে পেলেন না। এদিকে শীলা তখনো বসবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বলছিল—"মেমটা ওইখানেই রয়েছে।"

মণ্টু আর শীলাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার দিন প্রতুল আমাকে আর কমলাকে নিভৃতে ডেকে বললেন—"হয় তোমরা বাড়ি বদলাও,

আর না হয় ওই বেদিটা ভেঙে ফেল। আমার মনে হয় ওই বেদির নীচে কোন কবর আছে। তাই ওর ভেতর থেকে গ্যাস বেরোয়। কেন না আমি আলো দেখতে না পেলেও যখন ওই বেদির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সে সময়ে মনে হচ্ছিল যেন এক চাঙড় বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ঐ জায়গা থেকে একটু এদিক-ওদিক সরে গেলেই ঠাণ্ডাও কমে যাচ্ছিল। তা ছাড়া এটাও দেখেছি বোধ হয়, ঐ বেদিটা ছাড়া সারা বাড়ির আর কোন গাছের নীচেই অত ঠাণ্ডা নয়।"

কমলা আমাকে বলল—"তুমি ঠাট্টা করবে বলে আমি এতদিন কিছু বলিনি। কিন্তু নীরেন ঠাকুরপো যেদিন ভয় পেয়েছিলেন, সেদিন তোমার সঙ্গে বেদির মাঝখানে গিয়ে যখন দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আমারও মনে হয়েছিল যেন এক চাঙড় বরফের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আর কিছুক্ষণ ওখানে থাকলেই বোধ হয় হি-হি করে কাঁপতে লেগে যেতাম।"

দুজন সাক্ষী পেয়ে আমিও এবার আমার ঐ ধরণের শৈত্যবোধের কথা স্বীকার করলাম। নীরেনকে সাহস দেবার জন্য কমলার হাত ধরে ঐ বেদির মাঝে দাঁড়িয়ে আমারও বেশ শীত করেছিল। তখন সেটা ঐ স্থানের ছায়া-ঢাকা শীতলতার জন্যই হচ্ছে বলে মনকে বুঝিয়েছিলাম।

শীলারা চলে গেলে আমি বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে ঐ বেদিটা ভাঙবার অনুমতি চাইলাম। তিনি খুশী মনেই অনুমতি দিলেন। তাঁর কাছেই শুনলাম মাঝে মাঝে এক-আধজন ভাড়াটে নাকি ঐ বাড়িতে ঐ ধরণের আলো দেখে ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সব ভাড়াটে ভয় পান না। তাই তিনিও সে বিষয়ে কখনো মাথা ঘামাননি। বাড়ীটা এক সময়ে কোন সাহেবেরই ছিল। নানা হাত ফেরতা হয়ে তাঁর হাতে এসেছে।

যাই হোক বাড়িওয়ালার অনুমতিক্রমে তাঁরই সামনে মজুর দিয়ে বেদিটা ভাঙানো হোল। বেদির তলায় কোন কবর পাওয়া গেল না বটে—তবে একটা জীর্ণ মনুষ্য-কঙ্কাল উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেখা গেল। বাড়িওয়ালার নির্দেশে ঐ কঙ্কাল নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে ঐখানে একটা তুলসী বেদি তৈরী করান হোল। তারপর স্থানীয় যে সব লোক ইতিপূর্বে ঐখানে নীল আলো দেখেছিল তাদের অনেককে ডেকে এনে পরীক্ষা করা হয়েছিল। কেউই আর ঐ আলো দেখতে পায়নি। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে আমাদের ঐ বিশ্রাম স্থানটিও হঠাৎ তার শীতলতা হারিয়ে আশপাশের মতই গরম হয়ে উঠেছিল।

রমেন বাবুর বলা শেষ হল। কিন্তু এবার আর আমরা হাসতে পারলাম না। আমাদের মনে হতে লাগল কে জানে হয়তো এই মুহূর্তেই আমাদের আশেপাশে কত অদৃশ্য মানুষেরা রয়েছে যাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কারণ সব মানুষ ভূত কিংবা ভগবানের দর্শন পায় না।

প্রশান্ত চৌধুরী

২০

**শে**ষ অবধি কিনা সাগর এল? ঘর-বন্ধনের পর আজ সন্ধ্যায় সাগর এসে পা দিল প্রথম এ-ঘরে?

সাগরকে আসবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মিসেস রায় ঠিকই। জোওয়ান একটা বলিষ্ঠ যুবকের ওপর ঝোঁক মিসেস রায়ের বরাবরের। কিন্তু আজ এই বয়েসে তাঁর তারচেয়েও বেশি প্রয়োজন এমন একজনের, যাঁর ব্যাঙ্কে আছে মোটা টাকার তহবিল, যাঁর গ্যারেজে আছে খান চারেক গাড়ি। অর্থাৎ মিসেস রায়ের শেষ বয়েসের দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দিতে পারবে যে, এমন একজনকেই আজকের প্রথম অতিথি হিসেবে মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন যখন মিসেস রায়, ঠিক তখনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল কি না নিতান্ত সাধারণ অবস্থার এই শক্তিমান ছেলেটা?

এই ছেলেটাই কি না বজ্র-বাঁধনে বাঁধা থাকবে চিরকাল মিসেস রায়ের কাছে? চিরকাল? মিসেস রায় যখন বুড়ি হয়ে যাবেন, তখনও? তখন আর কী প্রয়োজনে লাগবে ঐ ছেলেটা? বলিষ্ঠ ঐ দেহটা ছাড়া কোনো সম্বল নেই যার, কী দেবে সে সেদিন মিসেস রায়কে?—কান্না পেতে লাগল মিসেস রায়ের।

বোসসাহেবই তো আসেন প্রথমে। কোনো কোনোদিন ব্যারিষ্টার শেগলও এসে পড়েন আগে। যেদিন যাঁর পালা। একই দিনে একই সঙ্গে দুজনে এসেছেন, এমনও ঘটেছে কতবার। অবশ্য দু-জনের কারুরই আসবার সময় হয়নি এখনও। আরো ঘণ্টাখানেক পরে ওঁদের আসবার সময়। কিন্তু এই দুজনের যে-কেউ একজন এসে পৌঁছুবার আগেই তাড়াতাড়ি এই ছেলেটা কেন ঢুকে পড়ল আজ তাঁর ঘরে? বোসসাহেব কিংবা শেগল এসে পড়লে কতো নিশ্চিন্ত হতে পারত মিসেস রায়ের বাকি জীবনটা। যে-নেশার জিনিসটি গলায় না ঢাললে রাত্রে ঘুমই আসে না মিসেস রায়ের চোখে, সেই জিনিসটির বোতল সব সময় মজুৎ থাকতে পারত তাঁর দেরাজে।

নাঃ, মিসেস রায়ের সব আশা নির্মূল হয়ে গেল আজ এই মুহূর্তে। সকাল থেকে উপবাসে থেকে নগদ যাট-টাকা খরচ করে এই ঘর-বন্ধন করাটা সম্পূর্ণ বিফলে গেল তাঁর। আফসোস হতে লাগল, কেনই বা তিনি সেদিন বলতে গেছলেন এই ছেলেটাকে এখানে আসতে। আর, একই যদি ছেলেটা, তো আজই বা এল কেন? আজই এল যদি, তো সবার প্রথমে পা দিল কেন ঘরে?

হতাশায় ভেঙে পড়লেন মিসেস রায়। সোফায় বসে পড়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন,—বসুন।

সাগর এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখছিল মিসেস রায়ের দিকে। সেদিন সেই শনিমহারাজের মন্দিরে যে মিসেস রায়কে দেখেছিল সে, আজকের মিসেস রায় যেন সে মানুষ নন। সেদিন যার নরম দেহের স্পর্শ পেয়ে কান ঝাঁঝাঁ করে উঠেছিল সাগরের,—এ সে মানুষই নয়। এ-এক নতুন মিসেস রায়কে দেখছে সাগর। পরনে তাঁর লালপাড় তসরের শাড়ি, কোঁকড়া কালো এলোচুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে;—দেখতে দেখতে নিজের মরে-যাওয়া মাকে মনে পড়ে যাচ্ছিল সাগরের। মায়ের একটা পুরনো ছেঁড়া ছাপতির শাড়ি ছিল। তসরের শাড়ির মতই রঙ ছিল তার। প্রতি বৃহস্পতিবার সেই শাড়িটি পরে যে মা ঘরে লক্ষ্মীপুজোর আলপনা দিতেন পিটুলি দিয়ে, সেই মাকে মনে পড়ে যাচ্ছিল সাগরের। আশ্চর্য! একটু ছোঁওয়া লাগলেই মায়ের কথাগুলো কেন যে মনে পড়ে যায় সাগরের। মনে পড়া মানেই তো কান্না পাওয়া। সত্যি কেন এমন হয়?

সেই কান্না পাওয়া ভিজে মনটাকে এক লহমায় শুকিয়ে নিয়ে সাগর গলা সাফ করে বলল,—আমাকে আবার আপনি বলছেন কেন? আমি বয়েসে অনেক ছোট আপনার চেয়ে।

বলতে বলতে চট করে হেঁট হয়ে মিসেস রায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে নিলে সাগর। নিয়ে বসল একপাশে জড়োসড়ো হয়ে।

চমকে উঠে শিউরে উঠে তাকালেন মিসেস রায় সাগরের দিকে।

আশ্চর্য! অমন বলিষ্ঠ জোওয়ান শক্তিমান মানুষটাকে যেন এখন নরম সরল একটা কিশোরের মতন লাগছে মিসেস রায়ের চোখে। আশ্চর্য!

তাড়াতাড়ি পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন,—ছিছি, আমাকে নমস্কার করতে কে বলল···

কথাটা শেষ না করেই একটু থামলেন মিসেস রায়। আরেকবার তাকালেন সাগরের দিকে। কথাটা শেষ করলেন এবার,—নমস্কার করতে কে বলল তোমাকে?

সাগর বলল,—বাঃ। আপনি বড় যে!

তা বটে। বয়েস হয়েছে মিসেস রায়ের। বয়েস হয়েছে। যৌবন দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে সুরু করে দিয়েছে এবার। তাই তো এই ধরবন্ধনের ফাঁদ। কিন্তু বাঘ ধরার ফাঁদে এ যে হরিণছানা এসে পড়ল!

তিনি তাকালেন আবার সাগরের দিকে। সাগর কৌচে বসে ঘরের চারিদিক দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। সরল একটি কিশোরের কৌতূহল ওর মুখে চোখে!

দেয়ালে টাঙানো অর্ধোলঙ্গ বিদেশিনীদের ছবিগুলোর জন্যে কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল মিসেস রায়ের। সাগরের চোখ দুটোকে দেয়ালের ছবি থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বললেন,—কী খাবে বল?

—খাব? তাহলে একটা কথা বলি। শুনে হাসবেন না যেন।

—না, না, হাসব কেন?

—সেই প্রথম যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হল না?

—হ্যাঁ।

—সেই যে রাস্তা-খোঁড়ার গর্তর মধ্যে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলেন আপনি।

—মনে আছে।

মনে আছে বটে; কিন্তু কী আশ্চর্য! সেদিনের সেই মনটাকে যেন আর খুঁজে পাচ্ছেন না মিসেস রায়। মনের সঙ্গে চোখটাও যেন বদলে গেছে আজ তাঁর। যে মন নিয়ে সেদিন সাগরকে ডেকেছিলেন তিনি, সে-মনটা আজ কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। যে-চোখ নিয়ে সেদিন দেখেছিলেন সাগরকে সে-চোখটা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে! একেক দিন কী যে পাগলামী হয় মানুষের!

বললেন,—কী যেন একটা হাসির কথা বলতে যাচ্ছিলে তুমি?

—সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে যত বারই আপনার কথা মনে হয়েছে, ততবারই মনে হয়েছে, ঝকঝকে কাঁসার থালায় গরম গরম ফুলকো লুচি আর এক বাটি মাংস সাজিয়ে আমাকে ডেকে আপনি যেন বলছেন,—"কিছু ফেলে গেলে চলবে না। আমার নিজের হাতে রাঁধা।"

হেসে উঠলেন মিসেস রায়। এমন সত্যিকারের হাসি অনেক দিন হাসেন নি। বললেন,—ওমা! কী কাণ্ড! তাহলে তো আজ তোমায় আমার কাছে লুচি মাংস খেয়ে যেতেই হবে।

সাগর বলল,—না। আজ চলবে না। আরেকদিন হবে। পেটে এক ফোঁটা জায়গা নেই। টৈটুম্বুর হয়ে আছে পেট।

—কেন?

—শ্রাদ্ধ-বাড়ির নেমন্তন্ন ছিল। বলেন কেন আর? এই শ্রাদ্ধ-বাড়ির নিরিমিষ্যি নেমন্তন্ন খেয়ে খেয়েই গেল জীবনটা। মাসের মধ্যে গোটা চারেক শ্রাদ্ধ লেগেই আছে।

—সে কী কাণ্ড! এত আত্মীয়-কুটুম তোমার?

—আত্মীয়-কুটুম আবার কে হতে যাবে? পাড়া-বেপাড়ার যেখানে যার মরবে কেউ, অমনি তো ডাক পড়বে সাগরের। কাজেই নেমন্তন্নটা করতেই হয়। এই এদিকের একটা বাড়িতেই নেমন্তন্ন রাখতে এসেছিলুম কিনা, তাই মনে হল, এত কাছাকাছি যখন এসেছি তখন দেখাটা করেই যাই একবার। তাই হঠাৎ এসে পড়লুম।

—তা' সেদিন বুঝি আমার কথা অনেক বার মনে হয়েছিল তোমার?

—হ্যাঁ। আপনার আর চাঁপার কথা। দুজনকেই তো সেদিন প্রথম দেখলুম কি না। চাঁপার কথা সেদিন যতবার মনে হয়েছে, ততবারই মনে হয়েছে, ও-যেন একটা শুকনো পাতকুয়ার তলা থেকে দু'হাত তুলে কেঁদে বলছে,—আমাকে তুলে দাও কেউ।

—তোমার ভাবনাগুলো ভারি অদ্ভুত তো।

—আমি নিজে যে একবার খুব ছোটবেলায় মামারবাড়ির শুকনো পাতকুয়া থেকে একটা লোককে অমনি চেঁচাতে দেখেছিলুম কিনা, তাই।

—চাঁপা কে?

—সে একটা মেয়ে। সে ইস্কুলে পড়ে। উঁচু কেলাসে। কত মোটামোটা বই পড়ে। খুব ঠাণ্ডা, খুব ধীর, খুব দুঃখী।

—দুঃখী কেন?

—হবে না? ও-যে বড় হতে চায়, ভাল হতে চায়।

—তার সঙ্গে দুঃখী হবার কী আছে?

—বাঃ! তা' কি ওকে কেউ হতে দেবে নাকি? ওকে কি কেউ ভাল থাকতে দেবে নাকি?

—কেন? দেবে না কেন?

—ওর মা যে···

বলতে বলতে থেমে গেল সাগর। লজ্জা করতে লাগল ওর।

মিসেস রায় কৌতূহলী হয়ে বললেন,—থামলে যে?

মিসেস রায়ের মুখের দিক থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে সাগর বাধ বাধ গলায় বলল,—আমাদের ঠানদির মুখে শুনেছি, যে মেয়েমানুষদের সোয়ামী নেই, পুত নেই, সংসার নেই, গোত্তর নেই, পদবী নেই,—ওর মা তাই।

শুনতে শুনতে চোখ বুজলেন মিসেস রায়। বোকা উটপাখির মতো চোখ বুজে নিজেকে যেন লুকোতে চাইলেন সাগরের দৃষ্টির সামনে থেকে। কী একটা আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন মনে মনে।

সাগর বলল,—চাঁপার মায়ের কথা শুনে খুব ঘেন্না হচ্ছে বুঝি আপনার?

চমকে উঠলেন মিসেস রায়। থতমত খেয়ে বললেন,—য়্যাঁ? ন্-না। কই না তো।

—আমি বুঝতে পেরেছি, খুব ঘেন্না হয়েছে আপনার;—তাই আপনি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু কি জানেন, আমার ঘেন্না করে না। ধরুন, আমি পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে দুষ্টুমী করে বেড়িয়ে ইস্কুলের এগজামিনে ফেল করলুম এক বছর। তার পরের বছর আমি যদি ভাল করে পড়ে পাশ করতে চাই, আর আপনি যদি আমাকে বই না দেন, খাতা না দেন, কলম না দেন,—শুধু গাল দিয়ে বলেন, 'তুই ফেল্,'—তাহলে সে দোষ কি আমার না আপনার?—

আমি ঠানদির মুখে শুনেছি যে, চাঁপার মা সোহাগী ভাল হতে চেয়েছিল, কিন্তু কেউ ওকে দেয়নি ভাল হবার সুযোগ। এখন ও' অসুখের বিছনায় শুয়ে শুয়েও মেয়েটাকে 'ভাল' রাখতে চাইছে। কিন্তু তাও কি হতে দেবে কেউ? ওর গায়ে কাদা লাগাবার জন্তে হাত নিসপিস্ করছে যে সবাইয়ের।

শুনতে শুনতে নিজের অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে গেল মিসেস রায়ের। ভাল হয়ে থাকবার কত চেষ্টাই তো করেছিলেন এক সময় তিনি। তখন কতই বা বয়েস তাঁর? বড় জোর উনিশ-কুড়ি হবে। মিষ্টার রায় নিজের চাকরির উন্নতির জন্তে একটু একটু করে নিজের স্ত্রীকে যখন ঠেলে দিয়েছেন শয়তানগুলোর দিকে, গোড়ায় গোড়ায় তখন কত কান্নাই না কেঁদেছিলেন তিনি। তার পর? আজ কোথায় মিষ্টার রায়? কতকাল আগে এ-দুনিয়ার লীলাখেলা সাঙ্গ করে বিদায় নিয়েছেন তিনি। কিন্তু পাঁক থেকে উঠে আসা আর সম্ভব হয়নি তাঁর। আর, সত্যি কথা বলতে কি, এ-জীবনটা খারাপও খুব লাগেনি তাঁর কাছে। শুধু, সম্প্রতি যৌবনের বাঁধুনিটা আলগা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় ধরেছে মনের কোণে। আর, তারই জন্তেই তো এই ঘর-বন্ধনের ব্যবস্থা।

সাগরকে কি জানিয়ে দেবেন মিসেস রায় তাঁর প্রকৃত পরিচয়টা? না কি, ইতিমধ্যেই তা জেনে ফেলেছে সাগর? বোধ হয় পারেনি জানতে। আর, পারেনি যখন, তখন গোপনই থাক না ওটা।···

কিন্তু লাভ কি তাতে?···

লাভ? কিছু আছে বৈকি।···

কী সেটা?···

আরেক ধরণের প্রীতির স্বাদ পাওয়া যাবে তাতে।···

মরেছে! নাটুকেপনা সুরু হল দেখছি! আরেক ধরণের প্রীতি বলতে কি ভাই-বোনের প্রীতির কথা মনে মনে ভাবছেন নাকি মিসেস রায়?···

ত ই যদি ভেবে থাকেন তিনি। দোষ কি তাতে?···

দোষ নয়;—হাসবে সবাই।···

কেন হাসবে? কেন?···

হাসির কথা ব'লে। ন্যাকামীর কথা ব'লে। মিসেস রায়েদের মতন স্ত্রীলোকদের মুখে একথা মানায় না ব'লে।···

কিন্তু মুরগী জবাই কোরে তার মাংস বিক্রি করে যে, সে কি টিয়াপাখি পোষে না?···

মনের বোঝাপড়া থামল মিসেস রায়ের। চোখ মেলে তাকালেন সাগরের দিকে। দেখলেন, তাঁরই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ সাগর; তাঁর সঙ্গে চোখাচোখী হতেই চোখ নামিয়ে নিল লজ্জায়।

মিসেস রায় মৃদু হেসে বললেন,—কী দেখছ?

—না, কিছু না, এমনি।

—মা আছেন তোমার?

—নেই।

—দিদি?

—আমি আমার মায়ের এক ছেলে।

—কী মজা ভাখো। তোমার দিদি নেই যেমন, আমারও তেমনি ভাই নেই একটাও! যাক্ অনেক দেরী করিয়ে দিলুম আজ তোমার। আবার কবে আসবে বল?

—যেদিন বলবেন।

—আমি বলতে যাব কেন? যেদিন তোমার নিজের ইচ্ছে হবে, সেইদিনই চলে এস এখানে। দুপুরবেলায় এস, কেমন? সন্ধেবেলা কবে কখন থাকি না-থাকি ঠিক নেই তো। দুপুরবেলায় এলে নিশ্চয়ই পাবে আমাকে। অনেক গল্প করা যাবে তখন। তোমার ঐ চাঁপার গল্প শুনব সেদিন। মনে থাকবে তো?

—নিশ্চয়ই।

উঠে দাঁড়াল সাগর। বলল,—আসি তবে আজ?

—এসো।

দাসী ইতিমধ্যে এক থালা ফল আর মিষ্টি এনেছিল সাজিয়ে। মিসেস রায় বললেন,—এই ভাখো, তোমাকে শুধুমুখেই বিদায় দিচ্ছিলুম মনের ভুলে। ভাগ্যিস দাসী আনল মনে করে।

সাগর বলল,—বললুম যে তখন, জায়গা নেই পেটে।

মিসেস রায় বললেন,—তা' বললে কি হয় সাগর? দিদির বাড়ি থেকে ভাইয়ের কি শুধু-মুখে ফিরতে আছে নাকি? একটা অন্তত মুখে দিতেই হবে তোমাকে। হয় সন্দেশ, না হয় রসগোল্লা। যেটা ইচ্ছে।

সাগর বলল,—তাহলে দুটোই নিচ্ছি তুলে। একটা সন্দেশ আর একটা রসগোল্লা।

সাগর দুটোই এমন ভঙ্গিতে টপাং করে মুখে ফেলে দিলে যে, কাণ্ড দেখে হেসেই ফেললেন মিসেস রায়।

সাগর চলে যাবার পর নিজের সাজের ঘরে এসে ড্রেসিং-টেবলের বড় আর্সিটার সামনে দাঁড়ালেন মিসেস রায়। আর্সির ভিতর দিয়ে দেখলেন নিজেকে।—আশ্চর্য! তসরের শাড়িতে নিজেকে মন্দ দেখাচ্ছে না তো! ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তো, কোন্ সাজে তাঁকে বেশি সুন্দর দেখায়?—নাইলনে না তসরে?

ওদিকের ফ্ল্যাট থেকে জেরিনার হাসির শব্দ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে আগরওয়ালার কণ্ঠস্বরও যাচ্ছে শোনা। আগরওয়ালাকে মিসেস রায়ের কাছ থেকে ভাঙিয়ে নিয়েছে জেরিনা মুখপুড়ী। সেই আনন্দে হাসছে হতভাগী। তা' নিক্, নিক্। নিক্ ও আগরওয়ালাকে। কিন্তু সাগরকে তো পারবে না কোনোদিন কেড়ে নিতে।—সাগরকে পাওয়া ঘটবে না কোনোদিন জেরিনার বরাতে। কিছুতেই না। ঘর-বন্ধনের জোরে ও' যে আজ চিরকালের মত বাঁধা পড়ে গেছে মিসেস রায়ের কাছে।

জেরিনার কেবল পাঁচখানা টেলিফোন-ওয়ালা একটা মস্ত অপিস ঘরই শুধু রইল। আজ থেকে মিসেস রায়ের জন্তে রইল একখানা টেলিফোন-ওয়ালা মাঝারি একটা আপিস ঘরের পাশেই তুলসী গাছের টব-সাজানো একটা খোলা ছাতও! জেরিনাকে আজ হারিয়ে দিয়েছেন মিসেস রায়। কোন্খানে কোথায় যে সে হেরে গেছে, তা সে এখনো বুঝতে পারছে না বলেই হাসছে বোকার মতো। হাসুক।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং করে সন্ধে সাড়ে সাতটা বাজার শব্দ হতেই চমকে উঠলেন মিসেস রায়। সাজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন

তাড়াতাড়ি। বোস সাহেব কিংবা শেগল্ এসে পড়বেন কেউ এবার। তসরের শাড়িটা পাল্টে নাইলনের পাতলা বাহারি শাড়িটা পরতে হবে এবার মিসেস রায়কে। আধুনিক কেতায় কান ঢেকে চুল বেঁধে রঙ মাখতে হবে মুখে। পাৎলা ঠোঁট দুটোকে লিপষ্টিকের কারচুপিতে পুরু করে তুলে সেই ঠোঁটে হাসতে হবে কথায় কথায়।

ওদিকের ফ্ল্যাটে জেরিনা আবার হাসছে হো-হো করে। হাসুক। মিসেস রায়ের কাছে থেকে একটা পাথর-বাঁধানো চৌবাচ্চা কেড়ে নিয়েই ভারি আহ্লাদ ওর। কিন্তু ও'তো জানতেই পারছে না যে, একটু আগেই মিসেস রায় একটা পুরো সাগর পেয়ে গেছেন।

২১

সাগর নয়, গঙ্গাসাগরও নয়, নিতান্তই গঙ্গা। কামারের দোকানের বুড়ো সুবলকে নিয়ে সেই গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল সোহাগীর মেয়ে চাঁপা।

কামারের দোকানের এই বুড়ো সুবলের ওপর সোহাগীর ভারি ভরসা। বাড়ির ঐ ছোট্ট খুপরিটার মধ্যে বসে বসে কোনোদিন যদি বড্ড হাঁপিয়ে ওঠে চাঁপা, তখন নিজের সেই ছোট্ট খুপরি-ঘরের ছোট্ট ফোকরে মুখ দিয়ে লম্বা গলায় ডাক দেয়,—হা-আ-পোর।

কামারের দোকানের বুড়ো সুবলের হাতে প্রকাণ্ড লোহার হাতুড়িটা থেমে যায় অমনি। রোগা ঝিরঝিরে যে ছেলেটা হাপোর টানে, তার দিকে চেয়ে বলে,—আরে থামা ছোঁড়া তোর কোঁস কোঁস। কান পেতে শোন দিকি, শোনা যায় নাকি কিছু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ডাক আসে একটা লম্বা টানা সুরে—হা-আ-আ-পোর।

বাঁ-হাতের শক্ত সাঁড়াসিতে টকটকে লাল যে লোহাটাকে নিয়ে নেহাইয়ের উপর রেখে ঘা মারছিল সুবল, সেটাকে ঝুম করে জলের বালতিতে ফেলে দিয়ে সুবল বলে,—ঐ, ডাক এসেছে আমার দিদি ভাইয়ের। যা দিকিন্ প্যালা, খবর নিয়ে আয় দিকিনি যে হঠাৎ এমন আমায় তলব, কেন তার?

ছোটবেলায় কবে যে ঠিক প্রথম সুবলের 'হাপোর' নামকরণ করেছিল চাঁপা, সেটা আর মনে নেই তার। কিন্তু সেই হাপোর নামটাই রয়ে গেছে আজো পর্যন্ত। আজকাল একেক দিন হাপোর নামে মানুষটাকে ডাকতে লজ্জা করে চাঁপার। মনে হয়, এবার থেকে সুবলদাদা বলেই ডাকবে। মনে মনে ডেকে অভ্যাস করে নেবার চেষ্টাও করে কিছুক্ষণ;—কিন্তু ও-ডাকটা যেন কেমন-কেমন শোনায় চাঁপার নিজের কানে। এতদিন পরে 'সুবলদাদা' বলতে গিয়ে কেমন আটকে যায় চাঁপার। কেমন আরো বেশি লজ্জা করে। তাই সুবলের হাপোর নামটা এখনো রয়েই গেছে চাঁপার গলায়।

কাদের কী পরীক্ষার জন্যে তিন দিন স্কুলের ছুটি ছিল চাঁপাদের। বাড়িতে আটকে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠছিল চাঁপা। তাই আজ ডাক দিয়েছিল বুড়ো সুবলকে,—হা-আ-আ-পোর।

হাপোর থামিয়ে সাঁড়াসি-হাতুড়ি ফেলে দশ মিনিটের মধ্যেই সুবল এসে হাজির।

—কী হুকুম দিদিভাই?

—আজ কিন্তু আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে একটু গঙ্গার ধারে। মাকে বলে আমি রাজি করিয়ে নিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, যাও তুমি মার ঘরে। জিজ্ঞেস কর গিয়ে।

গেল সুবল। দেখা করল রোগপাণ্ডুর সোহাগীর সঙ্গে। বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে চুপচাপ শুয়েছিল সোহাগী। সুবলকে দেখে বলল,—এস সুবল-সখা, কষ্ট দিচ্ছি তোমায় কত। তোমার কাছে আমার কত ঋণ। ঐ ঋণ নিয়েই মরতে হবে। মেয়েটা বেড়াতে যাবার বায়না ধরেছে।

—শুনেছি।

—অসময়ে তোমাকে ডাক দিয়ে কাজকম্ম সব পণ্ড করে দিয়েছে তো হতভাগী?

—ভারী তো কাজ, তার আবার পণ্ড আর অপণ্ড। সন্ধে রইল, রাত রইল,—কাজের সময়ের অভাবটা কি বল না?

কথাটা সত্যি। কাজের সময়ের একটুও অভাব নেই সুবলের। সারাটা দিনই ত্যাখো কাজ চলেছে ওর দোকানে। মাটির উনুনে গনগনে আগুন, নেহাই-এর উপরে টকটকে লাল লোহা, শক্ত হাতুড়িটা দুমদামিয়ে পিটিয়ে চলেছে সেই লাল লোহাকে।

যখনই ত্যাখো, এই ছবি দেখতে পাবে ওর দোকানঘরে। যতক্ষণ না ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে, ততক্ষণ ওর ঐ এক কাজ। এক তিল বিরাম নেই ওর, বিশ্রাম নেই ওর। ওর কাজের সঙ্গে তাল রেখে অষ্টপ্রহর হাপোর টানার জোগান দেবে, এমন মানুষ কোথায় পাবে ও' ভূভারতে? তাই হাপোর-টানার গুটি দশ-বারো মানুষ আছে সুবলের হাতে। বারো থেকে চোদ্দ তাদের বয়েস। এই পাড়ারই রাস্তাঘাটে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায় তারা। রাস্তাতেই গুলি খেলে, লাটু ঘোরায়, ঘুড়িদের নিয়ে মারামারি করে।

তাদেরই একেকজন খেলা ছেড়ে উঠে আসে সুবলের দোকানে। হাপোরের দড়ি ধরে টান মারে ঘণ্টাখানেক। তারপরেই কুড়িটি নয়াপয়সা হাতে নিয়ে লাফ মেরে নেমে পড়ে রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে উঠে আসে আরেকটি ছেলে।

অবিরাম হাপোরের শব্দে বুড়ো সুবল তার বুকের দীর্ঘশ্বাসের শব্দটাকে চাপা দেয়;—উনুনের গনগনে আগুনের সামনে মুখ বাড়িয়ে বসে চোখের জলটাকে শুখিয়ে নেয়;—হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে জীবনের বাকি দিনগুলোকে পিটিয়ে সোজা করতে চায়।

চাঁপা চুল বেঁধে নতুন শাড়ি পরে ভিজে-গামছায় মুখ মুছে তৈরি হয়ে ঘরে এসে ঢোকে। বলে,—কই, চল হাপোর, চল। সন্ধের আগে ফিরতে হবে যে আবার।

বুড়ো সুবলের সঙ্গে গঙ্গার ধারে এসে পিচের রাস্তার ধারে যে লোহার পাইপের বেড়া, সেই বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখছিল চাঁপা।

ভেসে চলেছে গঙ্গা। ছুটে চলেছে গঙ্গা। ছুটে চলার বিরাম নেই তার।

চাঁপা বলল,—জান হাপোর, আমার ইস্কুলের ইংরিজি বইয়ে একটা পদ্য আছে। তাতে বলেছে, সময় চলেছে নদীর মতন। চলেছে তো চলেইছে, থামছে না একবারও। কথাটা বেশ, তাই না?

বুড়ো সুবল কিছু বলবার আগেই ভাঙা ঘষা গলায় কে যেন বলে উঠল,—কথাটা তো বেশ, কিন্তু আমাদের এসব কী বোকামী হচ্ছে বল দিকিনি?

কণ্ঠস্বর আন্দাজ করে চাপা দেখতে পেল, পাইপের বেড়ার নিচে গঙ্গার ইঁট-বাঁধানো ঢালু পাড়ে যেখানে ভিখিরিরা রান্না করে, সেইখানে বসে আছে একটি মানুষ। মুখে তার একমুখ অযত্নবর্ধিত দাড়ি-গোঁফ, চোখের কোণে রাজ্যের ক্লান্তি, জামায় তিন-চার মাসের ময়লা।

বাঁ-হাতের কড়ে-আঙুল দিয়ে কান খুঁটতে খুঁটতে মানুষটা ঘাড় উঁচিয়ে চাপার দিকে তাকিয়ে বলল,—মজার কাণ্ডটা ভাখো একবার! সময়ও চলেছে, নদীও চলেছে। চলেছে ব'লে সময়কে আমরা কত অংশে ভাগ করে কত নামে ডাকছি ;—আজ, কাল, পরশু, তরশু, নরশু, ধরশু ;—পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠো, পাঁচুই। কিন্তু নদীর বেলায়? আজ যে-জলটাকে ঢেউ তুলে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে দেখছি,—সেও গঙ্গা; আবার কাল যে নতুন জলটাকে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে দেখব,—সেও গঙ্গা। কেন রে বাপু? দুটো কি এক জল? জল পাল্টাল, অথচ নামটা পাল্টাবে না? কী মুস্কিলের কথা বল দিকিনি?—কী উত্তর দিচ্ছ না যে?

বুড়ো সুবল তাড়াতাড়ি নিজের মাথায় হাত দিয়ে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে ইসারায় জানিয়ে দিল যে, মানুষটার মাথা খারাপ।

মানুষটা বলল,—কি? বল না? ভাহা বোকামী না?

চাপা বলল,—হ্যাঁ।

—তাহলে পয়সা ছাড়ো দিকিনি কিছু। যা হোক। ক্ষিধে-ক্ষিধে পাচ্ছে। ঝালমুড়ি খাব।

চিনেবাদাম কিনবে বলে সোহাগীর কাছ থেকে চারটে পয়সা চেয়ে এনেছিল চাপা, কী ভেবে ফেলে দিলে মানুষটার হাতের মধ্যে। পয়সা চারটে লুফে নিয়ে মানুষটা বলল,—এই মুহূর্তে ঢেউ তুলে যে-জলটা তোমার সামনে দিয়ে চলে গেল, ঠিক সেই জলটাকে তেমনি করে আর কি তুমি দেখতে পাবে?

চাপা কিছু বলবার আগেই বুড়ো সুবল চেঁচিয়ে বলল,—পয়সা তো পেয়েছ, এইবার ভাগো না বাপু এখান থেকে। তোমার জ্বালায় মানুষ কি দু'দণ্ড মা-গঙ্গার তীরে এসে মনটাও জুড়োতে পারবে না নাকি? আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে!—চল দিদিভাই। এখানে থাকলে ও' তোমায় এক মুহূর্তও তিষ্ঠতে দেবে না।

চাপা ফিসফিসিয়ে বলল,—আহা থাক্। চলে গেলে দুঃখু পাবে মানুষটা। আমার তো অসুবিধে হচ্ছে না কিছু।

মানুষটা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল,—যে জলটা গেল, সে আর ফিরবে না। যে ঢেউগুলোকে দেখলুম, আর তাদের দেখতে পাব না। তাই না?

—হুঁ।

—এই যে তুমি আমায় পয়সা দিলে,—আর কি দেবে কোনোদিন?

চাপার বদলে বুড়ো সুবলই দিল জবাবটা। বলল,—না।

মানুষটা নিজের উরু চাপড়ে বলল,—ঠিক বাৎ। না। আর দেবে না কোনোদিন।

চাপা বলল,—না, না, তা কেন? দেব? আবার দেব আরেকদিন।

মুচকি হাসল মানুষটা। বলল,—সম্ভব নয়।

—কেন?

মানুষটা বলল,—এই যে আজকের বিকেলের আলো, এই যে জলের ধারের খুঁটির ছায়াটা আমার পায়ের বুড়ো আঙুলে এসে ঠেকেছে, ঠিক এই অবস্থায় এই মুহূর্তে এই যে তুমি আমায় পয়সা দিলে,—এ-দেওয়া কি আর কোনোদিন পারবে দিতে? পারবে না।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মানুষটা। পয়সা কটা হাতের তালুতে নাচাতে নাচাতে উঠে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠে এসে চলে যেতে যেতে দাঁড়াল থমকে। চাপার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল,—এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি ;—তোমার মাথার ছায়াটা গিয়ে পড়েছে ঐ ঘুমন্ত-কুকুরটার ল্যাজের ওপর ;—পিচের রাস্তাটার ওপর ঐ যে দেখছ একটা শূন্যোদর সিগারেটের প্যাকেট, তারপরেই একটা কমলালেবুর খোসা, তারপরেই শালপাতার ঠোঙা, তারপরেই খানিকটা জোট্-পাকানো সুতো, তার পরেই একটা ঘুমন্ত কুষ্ঠরোগী। নিতান্তই সামান্য সব তুচ্ছ জিনিস তো ;—কিন্তু জীবনে আর কোনোদিন শত চেষ্টা করেও এমন ছবিটি আর দেখতে পাবে না।

চাপা জবাব দিল না কোনো। রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল আড়ষ্ট হয়ে।

মানুষটা বলেই চলল,—ঐ যে সিগারেটের প্যাকেটের পরেই একটা কমলালেবুর খোসা, তারপরেই একটা শালপাতার ঠোঙা, তারপরেই খানিকটা জোট-পাকানো সুতো, এবং তারপরেই একটা ঘুমন্ত কুষ্ঠরোগী ;—এই সব মিলিয়ে রাস্তার ওপর এই যে বিশেষ একটা দৃশ্য, যে বিশেষ একটা ছবির সৃষ্টি হয়েছে, তেমন ছবি জীবনে আর কোনদিনই পাবে না দেখতে। পাবে কি?

চাঁপা ঘাড় নাড়িয়ে নীরবে বলল,—না।

মানুষটা বলল,—তাই তো আমি জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের প্রত্যেকটি নূতন ছবিকে চোখ মেলে দেখে নিতে চাই। না দেখে করি কি বল? যা একবার এই মুহূর্তে দেখছি, পরের মুহূর্তেই ঠিক সেইটিকে তেমনি করে আর তো পাব না দেখতে।—আমার বাড়ির লোক কিন্তু বোঝে না এই কথাটা। তারা ভাবে আমি বুঝি পাগল হয়ে গেছি। কী মুস্কিলের কাণ্ড বলত?

ঠিক এই সময় গামছা কাঁধে নিয়ে থাঁদু চানের ঘাটের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পথের মাঝখানেই। পড়ন্ত রোদে মানুষটার দেহের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছিল থাঁদুর গায়ে। সেইদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে মানুষটা বলল,—অজানা একটি মেয়ের গায়ে এই যে আমার ছায়া গিয়ে পড়ল,—এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা ঠিক এমনিভাবে আর কি কোনোদিন ঘটবে?

পথ থেকে এক-খাবলা গোবর কুড়িয়ে নিয়ে মানুষটার গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে থাঁদু খ্যারখেরে গলায় ভেঙচিয়ে বলে উঠল,—এই যে অজানা একটা মেয়ে তোমার গায়ে পবিত্র গোবর মাখিয়ে দিলে, ভালয় ভালয় এখান থেকে সরে না গেলে এমন কাণ্ড কিন্তু আবার ঘটবে বলে দিলুম হাড়হাভাতে উনুনমুখো। পাগলামীর আর জায়গা পাওনি। বেরো বলছি হতচ্ছাড়া।

লোকটা কেমন একটা করুণার হাসি হেসে চলে গেল সেখান থেকে। চাঁপা বলল,—ছিঃ থাঁদু, ও কী?

থাঁদু বলল,—যে রোগের যে-ওষুধ। কি বল সুবলদাদু?

সুবল সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলল—আর নয়, এবার বাড়ি চল দিদিভাই।

চাঁপা বলল,—বারে, এখনও তো সূর্যই ডুবল না হাপোর। এরই মধ্যে বাড়ি ফিরব না কিন্তু।

বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সুবলেরও তাড়া ছিল না কিছু। আসল কথা, থাঁদুর কাছ থেকে চাঁপাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় সুবল। কিন্তু তার আগেই ও-দিকের পানের দোকান থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাক দিল দোকানদার,—ও সুবলদাদা তোমাকেই খুঁজছিলুম ক'দিন থেকে। দুটো লোহার কালাম্প করাতে হবে;—এসেই যখন পড়েছ এদিকে, তখন নিজে হাতেই মাপটা নিয়ে যাও না দাদা।

বাধ্য হয়েই এগিয়ে যেতে হল সুবলকে। আর, সেই ফাঁকে চাঁপার গা ঘেঁষে এসে থাঁদু মুচকি হেসে ফিসফিসিয়ে বলল,—এই অবেলায় কেন গঙ্গা-নাইতে এসেছি বল দিকিনি?

চাঁপা বলল,—যাই আমি। সন্ধে হয়ে এল।

থাঁদু বলল,—মেয়েদের চানের ঘাটে সব বসে আছে দেখতে পাচ্ছিস মানুষগুলোকে?

চাঁপা দেখল বটে একবার ঘাড় ফিরিয়ে; কিন্তু উত্তর দিল না কিছু।

থাঁদু বলল,—ভদ্দর লোকের বৌঝিরা এখন চান করে না তো। তাই এখন বড় মজার আড্ডা জমে জলে। চার দিকের চার বস্তির কত জনাই এসে জড়ো হয় এক সঙ্গে। কত সব মজাদার গল্প যে হয় সে আর তোকে কী বলব! একবার যদি শুনিস তো আর ও-জায়গা থেকে নড়তে চাইবি না। মাইরি বলছি। হিহি।

চাঁপা কোনো উত্তর না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল,—কই হাপোর, বাড়ি যাবে না?

পানের দোকানের কাঠের থামের মাপ নিতে নিতে বুড়ো সুবল জবাব দিল,—যাচ্ছি-ই-ই। হয়ে গেছে।

চাঁপা থাঁদুকে এড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল পানের দোকানটার দিকে, থাঁদু চেঁচিয়ে বলল,—সানাইপাড়ার সেই অন্ধ ওস্তাদের মরণ এবার ঘনিয়ে এসেছে, জানিস চাঁপা। যেমন শয়তান, ঠিক তেমনি হয়েছে,—একটা আহা-উহু বলবার পর্যন্ত কেউ নেই কাছে। পরশু দিনকে গিয়ে দেখি, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। মরতে বসেছে, কিন্তু ঘাটের মড়ার লালসা যায়নি এখনো। বলে কি না,—'হ্যাঁগো বনবালা, তোমার বন্ধু সেই চাঁপা এল না?' আমি বললুম, আসবে বৈকি! যেদিন তুমি চিতেয় উঠবে, সেদিন তোমার মুখে নুড়ো জ্বালতে আসবে চাঁপা।

বলতে বলতে আর হিহি করে হাসতে হাসতে থাঁদু মেয়েদের চানের ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল হেলেদুলে।

চাঁপা দু-চার পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে দাঁড়াল গঙ্গার ধারের পাইপের বেড়া ধরে। সূর্য তখন নেমে এসেছে ওপারের নতুন মন্দিরটার চুড়োর ওপর। সামনে কলকল করে বয়ে চলেছে গেরুয়া-গঙ্গার জল। পিছনে মালগাড়ির রেল লাইনের ধার থেকে হঠাৎ কিসের যন্ত্রণায় ককিয়ে কেঁদে উঠল কুষ্ঠরোগীটা!

চাঁপার চোখের সামনে ভেসে উঠল সানাইপাড়ার বস্তির মধ্যেকার একটা অন্ধকার ভ্যাপসা ঘরের ছবি। তার মনে হল, যেন সেই ঘরের সেই অন্ধ বুড়ো ওস্তাদও ঠিক অমনি করে ককিয়ে কাঁদছে একলাটি শুয়ে শুয়ে।

বুড়ো সুবল হাজির হল এসে। বলল,—চল দিদি ভাই, কাজ হয়ে গেছে আমার।

চাঁপা বলল,—কাল বিকেলে আমায় কিন্তু এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে হাপোর।

—কোথায়?

—সানাইপাড়ায়।

[ক্রমশঃ।

# স্বীকৃতি

### এজরা পাউণ্ড

এ কথা লিখছি শুধু চারজন তরে,
আড়ি পেতে পাছে শুনতে হয়তো অপরে।

হে পৃথিবী, আমি তোমার জন্যে দুঃখিত,
যেহেতু এ চার ব্যক্তি তোমার অজ্ঞাত।

অনুবাদ—ভাস্কর দাশগুপ্ত

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

## জুলিয়া

### শিবানী ঘোষ

সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের কন্যা জুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কুতুবমিনারের পানে। মাত্র দু' বৎসর হল সমাপ্ত হয়েছে এই মিনারের নির্মাণ কার্য। কুতুবুদ্দীন করলেন যার সূচনা, ইলতুৎমিস করলেন তার সমাপ্তি। বড় চমৎকার দেখাচ্ছে মিনারটা। গগনভেদী এই সুউচ্চ মিনার হয়ত কালের প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে এইখানে। সেদিনের মানুষ হয়ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই কীর্তির পানে।

অবশ্য এসব কল্পনা জুলিয়ার মনে প্রথমে আসেনি। তাকে এই কল্প-রাজ্যের কাহিনী শুনিয়েছে নাসির। ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির ওরফে নাসিরুদ্দীন মামুদ হল কল্পনা-জগতের মানুষ। কথায় কথায় সে শোনায় আলবীরুণী আর ফেরদৌসীর কাব্যগাথা। একটা সামান্য জিনিষ দেখেই সে এত সুন্দর কাল্পনিক আখ্যান শোনায় যে জুলিয়া অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার মুখের পানে। আর এই কারণেই বোধ হয় সে জয় করে নিয়েছে তার অন্তর।

কিন্তু নাসির তো এখনও আসেনি। কথা ছিল কুতুবমিনারের পাদদেশে সে প্রতীক্ষা করবে তার জন্যে। পিতা এখন গৃহে নেই সেই ফাঁকেই সে এসেছে এখানে। কিন্তু নাসিরই যখন আসেনি, তখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরে নাই বা গেলে?

অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে জুলিয়া। সে চেয়ে দেখে তার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে ইলতুৎমিসের মধ্যম পুত্র মুইজুদ্দীন বহরাম। তাকে দেখে শুকিয়ে ওঠে জুলিয়ার অন্তর। তাকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে সে ঘোরাফেরা করেছে বেশ কিছুদিন। কিন্তু জুলিয়া তাকে এড়িয়ে চলেছে বরাবরই।

মুইজুদ্দীন মৃদু হেসে বলে—এই মিনারের পানে তাকিয়ে এতক্ষণ উন্মনা হয়ে কি এত ভাবছিলে? আমি বেশ কিছুক্ষণ হল দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমার পশ্চাতে, দেখছি তা টেরও পাওনি।

তার কথা শুনে লজ্জা বোধ করে জুলিয়া। শালোয়ারের ওপর জরির আংরাখার বোতামগুলো সে ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছিল। কুতুবমিনারের এই নির্জন পাদদেশে যখন অন্য কোন মানুষ নেই, তখন এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করেনি।

বোতামগুলো এঁটে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হল জুলিয়া। মুইজুদ্দীন তার পথ রোধ করে বলে—এ কি এখুনি চললে কোথায়?

জুলিয়া থমকে দাঁড়ায় তার মুখের পানে তাকিয়ে। মুইজুদ্দীন বলে—শোনো জুলিয়া, আমি শুধু জানতে চাই তুমি আমাকে এত ঘৃণা করো কেন?

জুলিয়া বলে—আমি আপনাকে ঘৃণা করি এ কথা কে বলেছে?

মুইজুদ্দীন বলে—এটা কারও বলার অপেক্ষা রাখে না। তোমার আচরণেই তা টের পাওয়া যায়। কিন্তু ঘৃণা আমাকে যতই করো জুলিয়া, এটুকু জেনে রেখো আমি শীঘ্রই বসতে চলেছি দিল্লীর সিংহাসনে।

জুলিয়া বলে—সুলতানা রিজিয়া থাকতে নিশ্চয়ই নয়।

মুইজুদ্দীন বলে—রিজিয়ার রাজত্বের শীঘ্রই অবসান ঘটছে, এ সংবাদ হয়ত তুমি জানো না। কিন্তু তারপরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হব আমি, তোমার প্রণয়ী নাসিরুদ্দীন নয়।

শেষোক্ত নামটা শুনে কিছুটা বিচলিত বোধ করে জুলিয়া। সে দর্পের সাথে বলে—নাসির কবি, সে কোনদিন দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক, তা আমি চাই না। তবে এ কথাও ঠিক আপনাদের দিদিকে হটানো অত সহজ নয়, রীতিমত হিম্মতের দরকার।

মুইজুদ্দীন বলে—রিজিয়াকে হটানো হিম্মতের দরকার তা জানি। কিন্তু এটুকুও জেনো সে-হিম্মৎ রাখে তার এই ভাই মুইজুদ্দীন। আর ভেবে ছাখো একবার সিংহাসনে বসলে তখন তোমার পক্ষে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে চলা শক্ত। কাজেই আমার অভিপ্রায় তুমি এখুনি আত্ম-সমর্পণ করো আমার কাছে।

জুলিয়া বলে—আমার প্রাণ থাকতে আপনার মতো এক বর্বর নিষ্ঠুরকে কোনদিনই স্বামী রূপে গ্রহণ করবো না। এটুকু আপনি নিশ্চিত জেনে রাখতে পারেন।

তার কথা শুনে মুইজুদ্দীন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—কি তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা! আমারই সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে গালাগালি দিতে তোমার এতটুকু ভয় হল না? তবে ছাখো আমি কতদূর বর্বর আর কতদূর নিষ্ঠুর হতে পারি তা তোমার ওপর দিয়েই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

তার কথা শুনে চমকে ওঠে জুলিয়া। এমন জনশূন্য স্থানে তার ঐ কথাগুলো বলা মোটেই সঙ্গত হয়নি। এখন সত্যি যদি মুইজুদ্দীন বর্বরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর, তাহলে সে একাকিনী কি করবে তার বিরুদ্ধে!

এদিকে মুইজুদ্দীন তার তরবারী কোষমুক্ত করে ধীরপদে এগিয়ে আসছে জুলিয়ার দিকে। তার চোখ দুটো জ্বলছে ঠিক হিংস্র শ্বাপদের মতো। তার ঐ বীভৎস মূর্তি দেখে সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে জুলিয়ার।

সহসা ঘটে গেল এক কাণ্ড। একই অশ্বারোহী বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন মুইজুদ্দীন আর জুলিয়ার মধ্যে। বিস্মিত হয়ে জুলিয়া তাকিয়ে দেখে অশ্বারোহী আর কেউ নন সুলতানা রিজিয়া।

রিজিয়াকে দেখে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ায় মুইজুদ্দীন। রিজিয়া তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন—মুইজ, এই তোমার পৌরুষ! এক সামান্য নারীর সামনে তোমাকে খুলতে হয়েছে তরবারী! এই পৌরুষ নিয়ে তুমি বসতে চাইছো দিল্লীর সিংহাসনে?

রিজিয়ার এই কথার ওপর আর কোন কথা বলতে পারে না মুইজুদ্দীন? মুখে যাই বলুক এই বোনটিকে সে একটু সমীহই করে। তরবারী পুনরায় কোষে আবদ্ধ করে নেয় মুইজুদ্দীন।

রিজিয়া আর কোন কথা না বলে জুলিয়ার হাত ধরে তাকে টেনে তুলে নেয় আপন অশ্বপৃষ্ঠে। তারপর সোজা ছুটিয়ে দেয় তার তুরঙ্গ।

রিজিয়ার এ বীরত্ব কাহিনী কোনদিন ভুলতে পারেনি জুলিয়া। আর সেই কারণেই সেদিন তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল অশ্রুধারা। রিজিয়া আর নেই। মুইজুদ্দীনের চক্রান্তে বিদ্রোহী হল ওমরাহরা। আর তাদের বিদ্রোহের ফলে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হল ঐ বীর বালিকা। আর সব চেয়ে বড় পরিহাস এই যে সেই সিংহাসনে এখন আরোহণ করেছে ঐ মেরুদণ্ডহীন মুইজুদ্দীন। এ হল ১২৪০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

*গিয়াসুদ্দীন বলবন তখন তার অধীনস্থ প্রধান মন্ত্রী। শৌর্য, বীর্য ও বিচক্ষণতায় তখন এই একটি মাত্র লোকই আছেন যিনি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন রাজকার্য। একদিন মুইজুদ্দীন গিয়াসুদ্দীনকে জানায় সে তাঁর কন্যা জুলিয়ার পাণিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এতে আপত্তি জানান গিয়াসুদ্দীন। তিনি কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও বিবাহ দেবেন না।* জুলিয়া মুইজুদ্দীনকে যে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখে না এ সংবাদ তাঁর জানা আছে। কাজেই এ বিবাহ হতে পারে না।

এর উত্তরে মুইজুদ্দীন বলে—কিন্তু আপনারা মেয়ে যে দিন দিন স্বৈরিণী হয়ে উঠছে, সে-সংবাদ আপনি জানেন কি?

গিয়াসুদ্দীন গম্ভীর হয়ে জবাব দেন—মিথ্যে কথা! এ আমি বিশ্বাস করি না।

তাঁর কথা শুনে একটু ক্রুর হাসি হেসে মুইজুদ্দীন বলে—আপনার কথা শুনে আমি এই মনে করে দুঃখ পাচ্ছি যে আপনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। কিন্তু জেনে রাখুন যে সময় আপনি এখানে এসে বসে থাকেন সেই সময়ের কোন ফাঁকে যদি একবার বাড়ী গিয়ে আপনার মেয়ের খোঁজ করেন তবেই বুঝবেন ব্যাপারটি।

এই কথাগুলো কিছুটা চিন্তিত করে তোলে গিয়াসুদ্দীনকে। সত্যি কি তবে জুলিয়া পুরুষের সাথে মেলামেশা করে! একদিন দেখতে হবে তাকে পরীক্ষা করে।

সেদিন কাজের ফাঁকে একবার বাড়ী গেলেন গিয়াসুদ্দীন। গিয়ে দেখলেন বন্ধ রয়েছে জুলিয়ার ঘরের দরজা। কানটা একটু সজাগ করে তাঁর মনে হল ভেতরে কারা যেন কথাবার্তা বলছে। দরজাটা একবার ঠেলবার চেষ্টা করলেন গিয়াসুদ্দীন। কিন্তু দেখা গেল সেটি ভেতর দিক হতে বন্ধ।

সন্দেহের খানিকটা পুঞ্জ মেঘ জমে ওঠে তাঁর অন্তরে। তিনি দরজায় আস্তে করেকটা টোকা দিলেন—ঠক্ ঠক্ ঠক্।

কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। গিয়াসুদ্দীন পুনরায় দরজায় টোকা দিয়ে ডাক দিলেন—জুলিয়া।

তবু কোন সাড়া আসে না। গিয়াসুদ্দীন এবার সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন—দরজা খোলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খোলে জুলিয়া। গিয়াসুদ্দীন চেয়ে দেখে সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ইলতুৎমিস-তনয় নাসিরুদ্দীন। তাকে দেখে তিনি বিস্মিত হন। একজন অপরিচিত পুরুষ রয়েছে তাঁর কন্যার কক্ষে! মেয়ের সম্বন্ধে তাহলে তিনি যা শুনেছেন তা মিথ্যে নয়!

পিতাকে দেখে বিবর্ণ হয়ে ওঠে জুলিয়ার চোখ-মুখ। কোন কথাই সে বলতে পারে না। গিয়াসুদ্দীন তাকে তাচ্ছিল্য সহকারে বলেন—জুলি, তুমি যে এত নিচে নেমে গেছো তা আমি কল্পনা করতে পারিনি। আমি গৃহে না থাকলে একজন যুবক চুপিসারে তোমার কক্ষে আসতে পারে, এ ছিল আমার ধারণার অতীত।

এর কোন উত্তর দিতে পারে না জুলিয়া। মুখ নিচু করে সে দাঁড়িয়ে থাকে নীরবে। তখন এগিয়ে আসে নাসিরুদ্দীন। সে বলে—জুলিকে আপনি মিথ্যে ভর্ৎসনা করবেন না। যদি সত্যই কোন দোষ থাকে তবে সে দোষ আমার। আসলে আপনি হয়ত জানেন না আপনার কন্যার আছে এক বিশেষ কাব্যপ্রীতি। আলবীরূণী আর ফেরদৌসীর কাব্যগাথার প্রতি তার যে কি প্রচণ্ড অনুরাগ আছে তা আপনি জানেন না। সেই কাব্যগাথা ওকে শোনাতেই আমি রোজ আসি তার কক্ষে। অবশ্য এতে আপনার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। সে-অনুমতি আপনার নিকট কখনই পাওয়া যাবে না এই মনে করে জুলিয়া আমাকে আসতে মানা করেছিল বার বার। কিন্তু তার কাব্যপ্রীতি তিলে তিলে শুকিয়ে যাবে এই মনে করেই আমি এই চৌর্য ব্রত অবলম্বন করে তাকে শুনিয়ে যাই কাব্য। তা সত্যই যদি এর জন্য কোন শাস্তি পেতে হয় তবে সে-শাস্তি আমার প্রাপ্য, জুলিয়ার নয়। আপনি আমাকে যে কোন শাস্তি দিন আমি তা মাথা পেতে নেবো।

নাসিরুদ্দীনের কথা শুনে বিস্মিত হন গিয়াসুদ্দীন। তাঁর কন্যার রয়েছে কাব্যপ্রীতি? তিনি চেয়ে দেখলেন সত্যিই কক্ষের মধ্যে রয়েছে ফেরদৌসী আর আলবীরূণীর কাব্যমালা। তিনি এগিয়ে গিয়ে একবার দেখলেন সেগুলি। তারপর বললেন—হ্যাঁ এর শাস্তি তোমাদের দু'জনকেই পেতে হবে।—বলে ধীরপদে বেরিয়ে আসেন কক্ষ থেকে।

গিয়াসুদ্দীন নিজের হাতে শাস্তি দেবেন জুলিয়াকে এ সংবাদ এক আনন্দের জোয়ার আনে মুইজুদ্দীনের অন্তরে। যেদিন সে শুনবে প্রকাশ্য জনতার মাঝে গিয়াসুদ্দীন হত্যা করেছেন তাঁর কন্যাকে, সেদিন কিছুটা প্রশমিত হবে তার অন্তরের ক্ষোভ। কিন্তু তা প্রশমিত হবার আগেই আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে দেশে। মুইজুদ্দীনের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সকলে। তাকে সিংহাসন-চ্যুত করবার জন্যে আবার উঠে-পড়ে লাগল ওমরাহ ও রাজকর্মচারীরা। শীঘ্রই সফল হল তাদের বাসনা। নিহত হল মুইজুদ্দীন। তখন দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হল ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন। সে হল ১২৪৬ খৃষ্টাব্দের কথা।

রাজ্যশাসনের চেয়ে বিদ্যাচর্চাতেই ছিল নাসিরুদ্দীনের বেশী আসক্তি। কাজেই রাজ্যের প্রকৃত কার্যভার গিয়ে পড়লো প্রধান মন্ত্রী গিয়াসুদ্দীন বলবনের হাতে। একদিন গিয়াসুদ্দীন নাসিরকে বললেন—

আমার কন্যার কক্ষে প্রবেশ করে একদিন তুমি যে হঠকারিতা করেছিলে আমি তার শাস্তি এবার তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।

নাসিরুদ্দীন বলে—আপনার শাস্তি আমি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত।

তখন গিয়াসুদ্দীন ডেকে পাঠালেন তাঁর কন্যাকে। কম্পিত বক্ষে সেখানে আসে জুলিয়া। প্রকাশ্য জনতার মাঝে পিতা তার কি শাস্তি বিধান করবেন, তা কিছুই তার জানা নেই। বিশেষ করে নাসিরের প্রতি যদি নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা হয় তাহলে বিদীর্ণ হয়ে যাবে তার বক্ষ।

অপরাধীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ায় জুলিয়া। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাসিরুদ্দীন। অদূরে দাঁড়িয়ে রাজকর্মচারীরা দেখে তাদের দু'জনকে। তখন তাদের কাছে এগিয়ে আসেন গিয়াসুদ্দীন। তিনি সকলের মাঝে বিবৃত করেন তাদের অপরাধ। লজ্জায় তখন হেঁট হয়ে আসে জুলিয়ার মাথা।

এরপর তিনি চীৎকার করে বলে ওঠেন—এবার এদের কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে তা আপনারা বিবেচনা করুন।

নিরুত্তর হয়ে থাকেন রাজকর্মচারীরা। শুধু সেখানে এগিয়ে আসেন এক বৃদ্ধ লোক। তিনি বলেন—আমি বয়সে প্রবীণ। কাজেই আমি নিজের হাতে দেবো এদের শাস্তি।—বলেই তিনি নাসির ও জুলিয়ার হাত দুটি একত্র করে বললেন—এই হল এদের শাস্তি। একজনের ভার চিরকাল বহন করতে হবে অপরজনকে।—ঠিক সেই মুহূর্তে বেজে ওঠে বিভিন্ন বাজনা, আকাশ-বাতাস তখন ভেসে ওঠে বিভিন্ন সুরের লহরীতে।

এই নাসিরুদ্দীন রাজত্ব করেন দীর্ঘ উনিশ বৎসর। অপুত্রক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলে তখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন গিয়াসুদ্দীন বলবন নিজেই। এ হল ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

## চলন্তিকার পথে

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

### আভা পাকড়াশী

ভোগ দিয়ে গেল। এক হাঁড়ি ভাত আর এক হাঁড়ি ঝোল। আমরা ভাবলাম ঐ ঝোলের নীচে আলু আছে নিশ্চয়ই। পথে আসতেও এমনি আলুর ঝোল দিত দোকানদাররা। সেই ঝোল ছেঁচে আলু বের করা হত। ঐ ঠাণ্ডায় এমনি গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত আর ঝোলের মহাপ্রসাদ পেয়ে সকলেই খুব খুশী। ওরাও ততক্ষণে ফিরে এসেছে পিণ্ড দিয়ে। ও বলল, ঐ ঝোল দাও আমরা সকলে আগে চায়ের মত চুমুক দিয়ে খেয়ে নিই, শরীরটা গরম হবে। নীচে তো আলু আছেই।

অর্দ্ধেকের ওপর ঝোল তো শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আলু আর বেরুল না। এই ব্যাপারে সবাই হাসছে কিন্তু বিমল একটু গম্ভীর। যা ওর স্বভাববিরুদ্ধ।

আমি বলি, কি? বাবার জন্য মন কেমন করছে তোমার? পিণ্ড দিয়ে এসে তাঁর কথা মনে পড়ছে না?

ও গম্ভীর হয়ে বলে, না বৌদি আমি ভাবছি, আমার বাবা তো দু'বছর আগে মারা গেছেন। আবার হয়তো ইতিমধ্যে তিনি কোথাও জন্মেও ছিলেন, কিন্তু আজ আমার এই পিণ্ড দেবার দরুণ নিশ্চয় আবার তিনি মারা গেলেন।

সবাই হো হো শব্দে হেসে ওঠে ওর কথায়। একমাত্র আমিই তাকে সান্ত্বনা দিই। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই হবে হয়ত এদের সঙ্গে আমাদের আলাপ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এরা আমার কত আপন, কত পরিচিত। ঐ রকম বিপদের সময় যদি দীপ্তিকা আমার পেছনে না থাকত কি হত, তবে ভাবতেও বুকের রক্তটা শুকিয়ে উঠেছে। এই নিয়েই কি কম অনুযোগ অভিযোগ তুলেছে ওরা? যে হেতু দীপ্তিকা আমার সঙ্গে হাঁটে তাই ভাল মন্দ জিনিষ নাকি আমি তাকেই বেশী করে দিই। এমনি সব ব্যাপারে খুনসুটি করবে ওরা আর সাক্ষী মানবে আমাকে। তবে সত্যিই হয়তো এই স্বল্পভাষী ও স্বল্পাহারী ছেলেটিকে জোর করে খাওয়াতে হয়েছে কখন কখন। কারণ ও কেড়ে খেতে পারত না।

এখন আর আলাদা ঘর খোঁজার প্রশ্নও উঠল না। ঐ ঘরেই মেঝেতে আমাদের বিছানা হল দুভাগে আর ছেলে দুটোকে তুলে দিলাম খাটে। কত দিন পরে ওরা একটু খাটে শুয়ে বাঁচলো। আমরা যেন যাযাবর। নোংরা কাপড়, উস্কো-খুস্কো চুল, সভ্যজগতকে যেন কত পেছনে ফেলে এসেছি। তবু চলার পথে অনেকে আমাকে বলত, তুমি কি করে ভাই অমন ছিমছাম আছ এখন? কিন্তু আমি নিজে তো ছিম-ছামের বিন্দু বিসর্গও খুঁজে পেতাম না নিজের মধ্যে। তবে আমার অভ্যাস বড় করে একটি রোলির টিপ পরা। আর পরনে থাকত সিল্কের ছাপাশাড়ী, তাই এত রোদ বৃষ্টিতে পোড়া চেহারার মধ্যেও হয়ত লোকেরা পরিচ্ছন্নতা খুঁজে বার করত। ঐ টিপের তলাটুকুই ছিল আমার নিজস্ব রং। একটা সাদা গোল দাগ টিপ না পরলেই চন্দনের কৌটার মত বেরিয়ে থাকত। তবে এই পথে বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতা, যার সঙ্গে যখনই গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে সভ্য জগতের কৃত্রিমতা এসে আড়াল করে দাঁড়ায়নি। তাই আমরা অত সহজেই একেবারে অকৃত্রিম ভাবে হরিহরাত্মা হয়ে উঠেছিলাম।

ঐ ছোট্ট ঘরে সবাই মিলে গোল হয়ে বসে পায়ে কম্বল চাপা দিয়ে গল্প করতে করতে আমি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। মনে পড়ছিল আমার ছোটবেলাকার দুষ্টুমীতে ভরা দিনগুলির কথা। আমি মায়ের একটি মেয়ে হলে কি হবে। মানুষ হয়েছিলাম মাসতুতো ভায়েদের মধ্যে। সমানে তাদের সঙ্গে ডাণ্ডগুলি খেলতাম। ক্রিকেটের বল পেটাতাম, ঘুড়ি ওড়াতাম। ঘরের কোণে বসে মেয়েলি পুতুল খেলা বা হাঁড়িকুড়ি নিয়ে খেলা কখনো করেছি বলে মনেই পড়ে না। পরে এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাহাড় ডিঙোতে গিয়ে, কাড়াকাড়ি করে খেতে গিয়ে খালি খালি জীবনের অনেকগুলো বছর যেন পেছিয়ে যেতাম। অবশ্য আমি বরাবরই এমনি কেদারের পথে ছেলেদের সঙ্গেও এমনি হৈ হৈ করে পথ চলেছি। আমার এই ডানপিটে স্বভাবটাকে ও চেনে, তাই অমন করে একা ফেলে যেতে সাহস করে। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে? আবার সন্ধ্যে এলো। বহুদিন পর দেখছি ইলেকট্রিক আলো। ওরা গেল এখানকার উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে। আমি আগেই ওখানে মুখ হাত ধুয়ে এসেছি। আশ্চর্য্য চতুর্দিকে এই বরফ তার মধ্যে এমন গরম জল পড়ছে কুণ্ডে। কেদারেও এমনি ছিল। ভগবান তাঁর দর্শনার্থী যাত্রীদের আরামের জন্য এই ব্যবস্থাটি করে রেখেছেন বোধ হয়। ঐ গরম জলে স্নান করলে সত্যিই গায়ের ব্যথা মরে গিয়ে ভারী আরাম পায় শরীরটা।

আরতির ঘণ্টা বাজতেই খালি পায়ে বেরিয়ে পড়লাম সবাই। পা যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে। মন্দিরের সামনেই দেখি একটি লোহার পাত রাখা রয়েছে। গরম লাল হয়ে উঠেছে সেটি তলায় আগুন রাখার দরুণ। পাণ্ডারা বলল, ওর ওপর দিয়ে হেঁটে এসো মা'জি। কেন এও কি আর এক পরীক্ষা নাকি! না দেখি সবাই তার ওপর দিয়ে দৌড়ে পার হয়ে যাচ্ছে। দেখাদেখি আমিও গেলাম। নিমেষে অসাড় পায়ে সাড় ফিরে এলো। এবার দেখতে পাব আমার সেই রাখাল রাজাকে। সারাদিন মনে মনে এই ক্ষণটিরই অপেক্ষা করেছি। দেখি সুন্দর ফুলসাজে সজ্জিত ছোট্ট এক হাত বংশীধারী গোপাল মূর্ত্তি। তাঁর ওপর অত গয়না চড়ালে কি করে আর দেখতে পাব এঁকে। ভারী নয়নাভিরাম মূর্ত্তিটি। দেখে দেখেও আশ মেটে না যেন। মনের সব ব্যথা, অনুযোগ, অভিযোগ নিমেষে হরে নিল সেই অপরূপ প্রেমময় চক্ষু দুটি। তবে আরতি দেখে মন ভরল না। বড় সংক্ষিপ্ত আরতি। মনে পড়ছিল কাশীর বিশ্বনাথের আরতির কথা, মনে ওমনি একটা আশা নিয়েই গিয়েছিলাম। কর্পূর প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ এক এক করে যাত্রীদের কাছে আনছে আর সবাই তার তাপ নিয়ে তার নীচে রাখা থালায় প্রণামী দিচ্ছে। যা কিছু প্রণামী পড়ছে সব খাতায় লেখা হচ্ছে। প্রায় লক্ষাধিক টাকা প্রণামী পড়ে প্রতি বছর, তা ছাড়া সোনাদানা তো আছেই। এখানে পূজো করার অধিকার আছে একমাত্র দক্ষিণের নামমুদ্রি ব্রাহ্মণের। আর বোধহয় সেই কারণেই এই পথে প্রচুর মাদ্রাজীদের ভীড়।

রাত কাটল। দুই কুলিই মোট ঘাট বেঁধে তৈরী। আমরা একটু বাজারের দিকে গেলাম। ইচ্ছে প্রসাদ দেবার জন্য খান কতক রেকাবি ও আরও কিছু টুকিটাকি জিনিষ কেনা। বদ্রী বেশ বড় শহর। বাজারের রাস্তায় চার পাঁচ ফুট উঁচু হয়ে বরফ জমে আছে। দুধারে দোকান। সুন্দর করে সাজান। ঐ জঘন্য পথ পার হয়ে এখানে এসে এমন মনভোলান শহর দেখে মনে হচ্ছে যেন সেই প্রাচীন দেশের রাজকুমারীর রাজ্যে এসে পড়েছি। সোনার কাঠির স্পর্শে যেন ঘুম ভেঙেছে এই দেশটার। এবার ও এসেছে। সেই সকালে উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল নন্দাদেবীর ছবি তুলতে। বরফাচ্ছাদিত শুভ্র কিরীট নীলকণ্ঠ পিকও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তুলেছে ছবি। চারদিক দেখে এসেছে ঘুরে ঘুরে। এটাই ওর স্বভাব। যেখানে যাবে তার সব কিছু খুঁটিনাটি দেখা চাই। জানা চাই। তাই ওর দৌলতে আমি অনেক কিছু দেখার কষ্ট সহ্য না করেও জেনে নিতে পারি।

এসে বলল, চমৎকার শহর। ডাকঘর, তারঘর, হাঁসপাতাল, রেষ্টহাউস সব আছে এখানে।

হঠাৎ স্কি করার মত করে ওপরের রাস্তা থেকে সড়াৎ করে নেমে এসে চেঁচিয়ে উঠলো বিমল, ইউরেকা ইউরেকা! পেয়ে গেছি বৌদি—

কি পেলে, খুঁজছিলেই বা কি?

ঐ যে মহাপ্রস্থানের পথের সেই চায়ের দোকান, যেখানে, রাণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বসন্তর? হাসির রোল ওঠে আমাদের মধ্যে।

শেষ বারের মত আর একবার বাবা বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করে এবার নেমে চলি আমরা। বড় সুন্দর মনোরম স্থান। দুগ্ধ ধবল তুষারাবৃত হিমালয়ের কোলে সুন্দর সাজানো একটি শহর। বদ্রীনাথের মন্দিরটি প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। ওপরে একটি স্বর্ণ কলস ঝকঝক করছে। মন্দির সংলগ্ন ভোগমণ্ডপ দেখলাম। এখানে ভোগ রান্না হয়। আর রয়েছে লক্ষীদেবীর সুন্দর একটি মন্দির। মূর্তিটিতে যেন মাতৃভাবের অভিব্যক্তি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। পথে পড়ল থানা, পুলিশ ষ্টেশন, অনেকগুলি ধর্মশালা, আয়ুর্বেদিক ঔষধালয় তা ছাড়া এখানে পেয়েছিলাম আমরা আসল শীলাজিত। সকলের জন্যই কিছু কিছু নিতে গিয়ে অনেক কিছুই কেনা হয়ে গেল। এমন কি সেই বিমলের খুঁজে বার করা চায়ের দোকান থেকে একটা চামর পর্য্যন্ত।

এই বদ্রীনাথ উত্তর খাড়োয়ালের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এটি সমুদ্র তল থেকে ১০,২৮৪ ফিট উঁচু। হিমালয়ের কোলে এই বদ্রীনাথ পুরাকালের অনেক স্মৃতিই বহন করছে। এখানে বসেই মুনি ঋষিরা বেদ ও উপনিষদের কিছু কিছু অংশ এক সময়ে রচনা করেছিলেন। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র যে সব কাহিনীতে ভরা সেই সুরাসুরের যুদ্ধ সেও নাকি এখানেই সংঘটিত হয়। তাছাড়া এখানে ছিল মনুসংহিতার স্রষ্টা মনুর আশ্রম। সেই আশ্রমে ছিল একটি বদরিবৃক্ষ। স্বয়ং নারায়ণ এসে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করেছিলেন, সেইজন্য এই স্থানের নাম হয়েছিল বদরিকাশ্রম। এমনি আরও অনেক কাহিনী শুনলাম। গন্ধমাদন পর্ব্বতটা এরই কাছাকাছি ছিল। তা ছাড়া পঞ্চপাণ্ডবের পবিত্র পদচিহ্নও পড়েছিল এখানে। এই পবিত্র দেবভূমি এমনি অনেক কাহিনীর মধ্যে সংযুক্ত হয়ে বিরাজ করছে।

নেমে চলেছি কালকের সেই পথ দিয়ে। আবারও এলো সেই বরফের ব্রিজ। আজ দেখি দুধারে দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে P. W. Dর লোকেরা। নির্বিঘ্নেই পার হয়ে এলাম আমরা। এতক্ষণ একসঙ্গেই ছিলাম আবার দেখি ওরা এগিয়ে গেছে। আবার শঙ্কর আমি আর দীপ্তিশ পথ চলেছি। এখন দর্শনের পর মনটা খুবই পরিতৃপ্ত। ওর কাছে শুনি বিমলের আর নবর বৌ আছে বাড়ীতে। বলি তাদের আনেনি কেন? বলে তারা পারত নাকি আপনার মত হাঁটতে? প্রথমে কেদারের পথে আপনার ঘোড়ায় চড়া চেহারা দেখে আর দাদার পোষাক দেখে আপনাদের বাঙালীই ভাবিনি আমরা। বাজি ফেলে ছিলাম পাঁচ টাকা, ঐ যারা ফিরে গেল ওদের সঙ্গে। পরে আপনাদের কথা শুনে বুঝলাম বাঙালী। পাঁচ টাকার বাজি হারলাম। ওরা সেই টাকায় মজা করে খুব জিলিপি খেল।

এদিক পথে শঙ্করের খুব জ্বর এসে গেল। বেচারী আর হাঁটতে পারে না। ভারী মুস্কিলে পড়লাম। ওদেরও দেখা পাচ্ছি না এখনো পর্য্যন্ত। ভারী রাগ হয় ওর ওপর। এমনি করে এগিয়ে যাবার কি দরকার? শেষে একটা খচ্চড় পেয়ে তাতে শঙ্করকে চড়িয়ে দিলাম। কালকের ধকলেই জ্বরটা এসেছে মনে হয়। রোগা ছেলে নিয়ে যে চটিতেই যাই শুনি ওরা তক্ষুণি সে চটি ছেড়ে গেছে, শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত অবস্থায় একেবারে পাণ্ডুকেশ্বরে এসে ওদের দেখা পেলাম। খুব রাগ করলাম ওর ওপর। বললাম, তুমি কেন নিজের বোঝা বইবে না? এমনি করে অন্যের ওপর ছেড়ে চলে যাবে। তাছাড়া এতটা এগিয়ে এসেছে কেন? দীপ্তিশও তার বন্ধুদের ওপর চটেছিল। তবে রেঁধে রেখেছিল ওরা। খাবার পর রাগটা পড়ে গেল। আবার নব বলল, আমাদের রাগারাগিটা নতুন কিছুই নয়, সেদিন সেখানেই রাত্রিবাস। এখানে পাণ্ডুরাজার সঙ্গেও নাকি কুন্তি দেবীর ঝগড়া হয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে শঙ্করের জ্বরও কমল।

এই ভাবেই হাসি গল্প রাগারাগির মধ্যে দিয়ে আমাদের আত্মীয়তাটা বেড়েই উঠেছিল। এবার সারাপথ আমরা প্রায় এক সঙ্গেই হেঁটেছি। ও নানা রকম গজায় মজার গল্পে মাতিয়ে রাখত আমাদের। তবে ভারী জল কষ্ট পেয়েছি পথে। কেদারের রাস্তায় P. W. D.র কলের জলের বন্দোবস্ত ছিল। ওখানে জল তো নেইই। ঝরণার জলও দুষ্প্রাপ্য। যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম সব সময় সে পথ দিয়ে ফিরতেও পারছি না। কত যে পাহাড় ডিঙোলাম। তার ঠিক নেই। বাসরুট তৈরী হচ্ছে। এপথে আর কিছুদিন পর যাত্রীরা একেবারে যোশীমঠ পর্য্যন্ত বাসেই আসবে। ঐ ঠাণ্ডা থেকে নেমে রোদের তাতটা বড় বেশী লাগছে। আর খালি জল তেষ্টা পাচ্ছে, মাইলের পর মাইল হেঁটেও জল পাচ্ছি না। এক ঢোক, এক ঢোক করে জল খেয়ে কোনরকমে গলা ভিজুচ্ছে সবাই। এই ভাবেই আবার যোশীমঠ, ঝড়কুনা, গুলাবকোঠি পেরিয়ে বেলাকুচি পৌঁছলাম। এখানে আবার সেই দোকানদাররা আমাদের ডাল ভাত রেঁধে দিল। সবাই খুব তৃপ্তি করে খেলাম।

এখান থেকে সোজা এসে পৌঁছলাম পিপ্পলকোঠি। স্যুটকেশটি ঠিক মত ফেরত পেলাম। বাসের টিকিটও করা হয়ে গেল সকলের, ওমা কুলিরা যে আসে না, তাদের তো এখান থেকেই ছুটি দিতে হবে। গোমা আমাদের সঙ্গে আছে আজ প্রায় বার চোদ্দদিন হল। ওদের চানসিংও তাই। সুখে দুঃখে এরাও আমাদের আপন হয়ে পড়েছে। ভাবনা হয় ওদের জন্য। ওদের ছুটিতেও খুব ভাব হয়েছে। এক সঙ্গেই পথ হাঁটে ওরা। গেল কোথায়? বেলাকুচি থেকে তো আমাদের সঙ্গেই বেরিয়েছিল? হল কি? আমাদের সব জিনিসপত্রই যে ওদের কাছে। আজই হল আমাদের এই পদযাত্রার সমাপ্তি, চলন্তিকার অন্ত।

কেদারের পথে অগস্ত্যমুনি থেকে কেদারনাথ পর্য্যন্ত আটত্রিশ মাইল হেঁটে গিয়েছিলাম। আবার ঐ আটত্রিশ মাইল নামা, মোট ছিয়াত্তর মাইল। আর এখানেও এই পিপ্পলকোঠি থেকে বদ্রীনাথ আটত্রিশ মাইল। কিন্তু আসলে আমরা ওঠানামায় আরো অনেক বেশী হেঁটেছি, অথবা কত পাহাড় ডিঙ্গিয়েছি রাস্তা না থাকায়। যাই হোক আমরা পথ হেঁটেছি মোট একশো বাহান্ন মাইল। শুধু কি পথই হেঁটেছি আর কি কিছুই পাইনি? পেয়েছি। এমন কিছুই পেয়েছি যা সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। এই চলার পথে কতরকম কত মানুষের সান্নিধ্যে যে এসেছি তার অভিজ্ঞতাই কি কিছু কম? সেই রাজস্থানীরা যারা আমাকে পাকদণ্ডির পথ পার করে দিয়েছিল। সেই বিনী বষ্টুমী যারা রোজ ঝগড়া করত। সেই মাড়োয়ারী গিন্নী। তারপর এইমাত্র যারা ঠিকানা নিয়ে গেলেন আমাদের কাছ থেকে। এঁরা কলকাতার দক্ষিণে থাকেন। একটা ছাপাখানা আছে এঁদের। দুই যা এসেছেন তীর্থে। কতবার পথে দেখা হয়েছে এঁদের সঙ্গে। মনে হয়েছে কত আপন।

এই যে কত দেবতা দর্শন করলাম, পথের শোভা সুন্দর দৃশ্য দেখলাম

কত মানুষের মনের ছোঁয়া পেলাম এর মূল্যই কি কম ? হয়ত এই চলার পথ সব সময়েই মসৃণ ছিল না। অনেক সময়েই রুক্ষ পথের কাঠিন্যে ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে এই পরিব্রাজক জীবনের পরিসমাপ্তিতে এসে কি যেন একটা হারানোর বেদনা থেকে থেকে কাঁটার মত বাজছে। মনে হচ্ছে আবার আমরা সংসারের সেই বৈচিত্র্যহীন জীবনের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছি। সেখানে নেই নিত্য নূতন পথের হাতছানি, নেই সেই জীবন্ত মানুষের নানা রূপের মিছিল। তবে হ্যাঁ আরাম আছে। আর আছে নিরাপত্তা। এখনই পথের শেষে পৌঁছুই নি এখনো অনেকটা বাসযাত্রা বাকি। আর এখনো সঙ্গে আছে পথের সঙ্গী আমার সেই হঠাৎ পাওয়া চারটি ভাই।

শেষ পর্য্যন্ত এলোই না কুলিরা। এখানে দারুণ স্থানাভাব। অগত্যা আমরা লাষ্ট বাসে বেরিয়ে পড়লাম। শুধু দীপ্তিশ রয়ে গেল, পরদিন কুলিদের নিয়ে রওনা হবে সে। আবার কীর্ত্তিনগরে দেখা হবে। অলকানন্দা আবারও সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন পথ দেখিয়ে, তেমনি বন্ধুর পথ। ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছি। রাতে পৌঁছলাম গৌবর বলে একটা জায়গায়। কালিকম্বলি আলার দোতলা ধরমশালায় স্থান পেলাম। ঘরটি দোতলার ওপর ভালই ছিল। তাদেরই দেওয়া সতরঞ্চির ওপর দুভাগে শোওয়া হল। মাথায় দেওয়া হল পাদুকা। আর ছেলেদের গায় দিলাম আমার শাড়ী। কারণ স্যুটকেশের চাবিটিও আছে ঐ গোমার কাছে বিছানার মধ্যে। শুধু ঐ বাড়তি ভিজে শাড়ীখানি রোদের তাপ বাঁচাতে আমার মাথায় চড়ে এসেছিল। সব সময়েই আমরা যেদিকে পা করতুম, ওরা তার উল্টো দিকে পা করে আমাদের দিকে মাথা করে শুত। আর সকাল হলেই কালোবরণ বিমলকে তোলার জন্য বলত, এই তুই বৌদিদের ওদিকে উঠে গেছিস। ও সড়াত করে নেমে যেত। আবার মিথ্যে করে বলত এই দাদার গায়ে পা লাগছে, ও আবার ওপর দিকে উঠে আসত। শেষ পর্য্যন্ত উঠে বসে নিজের অবস্থাটা পর্য্যবেক্ষণ করত। আর আমরা ওর কাণ্ড দেখে হাসতাম।

আর বাড়ীতে নবর সকালে বিছানায় শুয়ে চা খাওয়া ছিল অভ্যেস। তাই দীপ্তিশ রোজ সকালে উঠে ওদের বাড়ীর চাকরের মত গলা করে বলত, দাদাবাবু, উঠে পড় তোমার চা এনেছি। বেচারী কতদিন ঘুম চোখে হাত বাড়িয়েছে। তাই বলছি, কে বলে আমাদের বাঙালী ছেলেরা পিছিয়ে আছে তারা ভীতু, ঘরমুখো ? তবে কেন এরা এই বয়সে সব রকম আরাম, ঘরের আয়েস ছেড়ে এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছে। কিসের নেশায় ? আমাদেরই মত দুর্গমকে জয় করবার নেশা এদেরও পেয়ে বসেছিল। না হলে আজ এই নন্দা-ঘুণ্টির বাঙালী অভিযাত্রীরা ঘরের মায়া তুচ্ছ করে ঐ দুঃসাহসিক অভিযানের পথে পা বাড়াতে পারত কি ? কোথা থেকে পেল এরা এই দুর্জয় সাহস ? কে দিল তাদের ঐ প্রেরণা ? তাদেরও ঐ একই নেশা টেনে ছিল। ঐ দুর্গম পাহাড়ের ডাক, অজানা পথের হাতছানি অভিযানের নেশা পাগল করে তুলেছিল তাদেরও। তবেই না পেরেছে তারা ঐ বিপুল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে হিমগিরির চূড়ায় পদার্পণ করতে ? তবেই না তারা বিপদ বাধা জয় করে পড়েছে সার্থকতার জয়ের মাল্য আর করেছে ভীরু বাঙালীর কলঙ্ক মোচন, দিয়েছে তাকে চরম সাহসিকতার পরম সাফল্যের গৌরব। [ক্রমশঃ।

# আমার দৃষ্টিতে—জীবন

## "নাগকন্যা"

কবি বলেছেন, "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।"  
আমি সেটা সোজা বাংলায়  
আপনাদের বলি আমুটাকে কমান।  
আমি মৃত্যুর উপাসক।  
জীবনকে আমি দেখি গালিবের দৃষ্টিতে।  
কারণ আমি এসেছি দুদিনের জন্ত  
এ পৃথিবীতে।  
অতএব বাধানিষেধের ডোরে বাধব না জীবনকে।  
সমাজরূপ নদীর যে সমস্ত পঙ্কিল কর্দ্দমময়  
ড্রেইনরূপ শাখা নদী বেরিয়েছে  
অথবা উপনদী পড়েছে,  
সেই সমস্ত নদীতে আমি অবাধে  
ভাসিয়ে দেব গা!  
ভাসার মত জল যদি না থাকে  
তবুও থামব না।  
দেব হামাগুড়ি, পথে পেয়ে যাব জুড়ী  
তার পর···  
হয়ত একদিন আমার জুড়ী  
আদিম যুগের মত তার নখ ও দাঁত দিয়ে  
কামড়ে ধরবে টুটি,  
ধরার ধুলায় দেহ পড়বে লুটি'  
তখন হয়ত কোনো এক লক্কা পায়রার  
মুখে শোনা যাবে, "দোদিন কি এ জমানা  
বীত গয়া।"

পরক্ষণেই সে হয়ত বলবে,  
"বেশ বাবা কাটিয়েছ সংসারের মায়া।  
স্বর্গে পার' ত করগে  
ধাওয়া।"

# তপতী-কাহিনী

## বেলা দে

সূর্যের কন্যা তপতী—তার মতো সুন্দরী আর কোথাও ছিল না। দেখতে দেখতে মেয়েটি বড় হয়ে উঠলো। কিন্তু মেয়েটি যত বড় হতে লাগলো সূর্যের চিন্তাও তত বাড়তে লাগলো। কি করে, কার হাতে এই কন্যা সমর্পণ করবেন।

চন্দ্রবংশের রাজা ছিলেন সম্বরণ সারা জীবন সূর্যের উপাসনা করেছেন। দান, ধ্যান, জপ, তপ, ব্রত উপবাস করে তিনি দেবতাদের তুষ্ট করলেন। আর সূর্যের কৃপায় রূপে গুণে হয়ে উঠলেন অতুলনীয়। সূর্য ভাবলেন—ইনিই হবেন তপতীর যোগ্য স্বামী, এঁর হাতেই কন্যাকে দান করবো।

একদিন রাজা সম্বরণ শিকারে বেরিয়েছেন। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে জল খুঁজছেন—কিন্তু কোথাও জল পেলেন না। জলের অভাবে

ঘোড়া মরে গেল। তখন বাধ্য হয়ে রাজা হেঁটে চললেন। দিক ভুলে তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। দিক ঠিক করবার জন্যে উঠলেন পাহাড়ের উপর। দেখলেন অপূর্ব এক কন্যা। তাঁকে দেখে রাজা মোহিত হয়ে গেলেন। আর মনে মনে ভাবলেন—একে দেখে আমার জীবন সার্থক হলো। এর মত সুন্দরী মেয়ে তো কোথাও দেখিনি! ভাবতে ভাবতে রাজা বড় চঞ্চল হয়ে পড়লেন। তিনি তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন কন্যার দিকে, তারপর বললেন—'কে তুমি এখানে একলা বসে আছ? তুমি কি দেবতা, না অপ্সরী! নাগিনী, দানবী, না মানবী? স্বর্গে, মর্তে, পাতালে আমি এত ঘুরেছি, কিন্তু এমন রূপ কোথাও দেখিনি। তুমি কার কন্যা, কেনই বা এখানে এসেছ? তোমার কথা শোনবার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠেছি।'

এদিকে কথা বলতে বলতে রাজা দেখলেন সেখানে কেউ নেই। কন্যা অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাজা পাগলের মত হয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ওদিকে অদৃশ্য থেকে তপতী দেখলো রাজা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তখন সে রাজাকে ডেকে বললো, 'কেন মাটিতে পড়ে আছেন রাজা, উঠে ঘরে যান।'

মেয়েটির গলা শুনতে পেয়ে রাজা চমকে উঠলেন। একবার মাত্র বিজলীর মত কন্যার রূপ তাঁর চোখে পড়লো। তিনি চীৎকার করে বললেন—'তুমি কে কন্যা, আমাকে দেখা দাও। তোমার কথা শুনে আমি প্রাণ ফিরে পেলাম—এখন সামনে এসে আমার প্রাণ বাঁচাও।'

অদৃশ্য থেকে কন্যা বললো, 'মহারাজ! এ কেমন কথা বলছেন! আমি কি আমার কর্ত্রী? আমি সূর্যের কন্যা তপতী। সূর্যের আরাধনা করে তাঁকে তুষ্ট করুন, তিনি যদি আপনার হাতে আমাকে দান করেন, তবেই আমায় পেতে পারেন।' এই কথা কয়টি বলেই কন্যা অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজা আবার অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এদিকে রাজার খোঁজে মন্ত্রী আর সেনাপতি সৈন্য নিয়ে চারদিকে বেরিয়ে পড়েছেন। খুঁজে খুঁজে তাঁরা এসে পৌঁছালেন পাহাড়ের উপর। দেখলেন, রাজা সেখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। রাজার মুখে-চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে তাঁকে ধরে বসানো হলো। রাজা জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলেন সামনে সৈন্যরা সব দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর রাজা সূর্যের তপস্যা করতে লাগলেন। ওদিকে খবর পেয়ে রাজার পুরোহিত বশিষ্ঠদেব এলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে ভাবলেন—এখন এর উপায় কি? তারপর সান্ত্বনা দিয়ে তিনি চললেন সূর্যের কাছে। সেখানে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বশিষ্ঠ মুনি সূর্যকে প্রণাম করলেন। সূর্য খুসী হয়ে জানতে চাইলেন, কি উদ্দেশ্যে মুনির এখানে আগমন ঘটেছে। মুনি তখন বললেন, 'আমার শিষ্য রাজা সম্বরণ। তিনি চন্দ্রবংশের সন্তান—রূপে, গুণে ত্রিভুবনে তাঁর তুলনা নেই, আর তাঁর মত সূর্যভক্তও কোথাও দেখিনি। আমার প্রার্থনা তাঁর হাতে আপনার কন্যা তপতীকে সমর্পণ করুন। আমার মনে হয়, এর চেয়ে যোগ্য পাত্র আর কোথাও পাবেন না।'

সূর্য বললেন, 'বশিষ্ঠ, মুনিদের মধ্যে তুমি প্রধান, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সম্বরণ প্রধান, আর কন্যার মধ্যে তপতী প্রধান। কাজেই তোমার কথা আমি অগ্রাহ্য করবো না। সম্বরণের হাতেই আমার কন্যাকে দান করব।'

তারপর সূর্যের আদেশে বশিষ্ঠ মুনি তপতীকে নিয়ে গেলেন সেই পাহাড়ের উপর। তাকে দেখে তবে রাজা সম্বরণ তপস্যা ছেড়ে দিলেন। আর সেখানেই বশিষ্ঠদেব সম্বরণের সঙ্গে তপতীর বিয়ে দিলেন—তারপর নিজের আশ্রমে চলে গেলেন। এদিকে রাজা আর রাজ্যে ফিরলেন না। রাজ্য শাসন করবার জন্য মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়ে রয়ে গেলেন তপতীর সঙ্গে অরণ্যে। এখানেই তিনি ভোগে মত্ত হয়ে রইলেন।

ওদিকে রাজ্যে দেখা দিল অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর শত্রুর উপদ্রব। প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের আর সীমা নেই—অনেকেই রাজ্য ছেড়ে চলে গেল।

তখন বশিষ্ঠ মুনি এসে ধরলেন রাজাকে, সমস্ত কথা তাঁকে জানালেন। রাজা তখন নিজের কাজের জন্য অনুতাপ করে তপতীকে নিয়ে ফিরে এলেন রাজ্যে।

আবার বৃষ্টি হলো, সোনার ফসল ফললো। লোকের দুঃখ-দুর্দশা দূর হলো। তপতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলো একটি ছেলে—নাম তার কুরু। এই কুরুর বংশধরেরাই কৌরব ও পাণ্ডব—যাঁরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করেছিলেন, আর যাঁদের নিয়ে মহাভারত লেখা হয়েছে।

## বিবাহ সমস্যা

### বীথিকা দে

আজকাল অনেককেই বলতে শোনা যায় হিন্দু-বিবাহ প্রথাটা উঠে গেলেই ভাল। যেমন রাশি রাশি টাকার শ্রাদ্ধ, তেমনই ঝামেলা। যেমন শোচনীয় অবস্থা হয় বর-কনের, তেমনি হয় বর-কনের অভিভাবকগণের অবস্থা। এর চাইতে রেজেষ্ট্রি বিয়ে অনেক ভাল। জনকয়েক সাক্ষী যোগাড় করলেই হল। এই সাক্ষীর কাজ বর-কনের অভিভাবকগণই করতে পারবেন।

এখানে অস্বীকার করবার উপায় নেই ঝক্কি-ঝামেলা এড়াতে গেলে রেজিষ্ট্রি বিয়েই কাম্য। যাঁরা বিয়ের আগে ভালবেসে নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করেন তাঁদের কথা আলাদা। তবে আমার মনে হয় যেখানে শতকরা পঁচানব্বুই জন ছেলেমেয়ের বিয়ের ঠিক তাদের অভিভাবকরা করেন, সেখানে রেজিষ্ট্রি বিয়ের অনেক কুফলই দেখা যাবে। আজ আমাদের দেশে যৌথ পরিবারের প্রায় অবসান ঘটলেও সব মেয়েকেই শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর-ননদদের নিয়ে ঘর করতে হয়। আর এটা সব মেয়েরই কাম্য। হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে নতুন বউকে শ্বশুরবাড়ীর সম্পূর্ণ অপরিচিত ও নতুন পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করতে হলেও, বিয়ের নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সে নিজের অজান্তেই অনেকটা পরিচিত হয়ে যায়। শাশুড়ী যখন বউকে বরণ করে ঘরে তোলেন, তখন স্বভাবতঃই বধূর মনে তার মায়ের ছবি ভেসে উঠে, বিনা দ্বিধায় তাকে মা বলে গ্রহণ করে নেয়। এমনি ভাবেই শ্বশুর, দেওর, ননদকে বাবা, ভাই, বোন বলে গ্রহণ করে নেয়। সবচাইতে বড় কথা বর-কনের পরস্পরকে গ্রহণ করা। যেখানে বাবা-মার নির্ব্বাচন ও অভিভাবকত্বে বিয়ে হয়, আমার মতে সেখানে যদি রেজিষ্ট্রি বিয়ে হয় তাহলে বর-কনের পক্ষে পরস্পরকে গ্রহণ করা ঠিক ততটা সহজ হবে না, বরং বলা যায় মধুর হবে না।

মা-বাবা যে মেয়েকে পুত্রবধূরূপে নির্ব্বাচন করলেন, সে হয়তো

সুলক্ষণা কিন্তু সুন্দরী নয়। বিবাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনের নির্দ্ধারিত সময়টিতে বরের বাড়ী থেকে বর ও কনের বাড়ী থেকে কনে রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে একটা করে সই করে দেবার পরই কি পরস্পর পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারবে, না কি কোন আকর্ষণ জাগবে? কিন্তু আমাদের হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির আচার অনুষ্ঠানে বর-কনেকে পরস্পরের প্রতি ধীরে ধীরে পরিচিত ও আকর্ষিত করবার গুহ্য তত্ত্ব লুকিয়ে আছে, সে কথা কি অস্বীকার করা যায়? এমন কি তাদের যৌথ জীবনে পরস্পরের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হয়। বর-কনে পরস্পরের প্রতি যেন নির্ভরশীল হয়ে উঠে। কিন্তু রেজেষ্ট্রী বিয়েতে এই আকর্ষণ জাগার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কোথায়? তাই যতদিন না পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনে পাশ্চাত্য দেশের মত স্বয়ং পাত্র-পাত্রীকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে তাদের অবাধ মেলামেশা করার সুযোগ বিবাহের পূর্ব্ব থেকেই, ততদিন পাশ্চাত্য বিবাহ-পদ্ধতি অনুকরণের প্রশ্ন উঠা অবান্তর। তবে যারা ভালবেসে পছন্দমত বিয়ে করবে তারা বিয়ের ঝামেলা না বাড়িয়ে রেজিষ্ট্রী বিয়েই করুক। এই অর্থ-সমস্যার যুগে কিছুটা খরচ বাঁচে বৈকি!

পাশ্চাত্য দেশেও কিছু বিবাহ পিতামাতা বা অভিভাবকদের নির্ব্বাচনে হয়ে থাকে। এস্থলেও বর-কনে রেজিষ্ট্রী খাতায় সই করার বহু পূর্ব্বেই সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হবার, পরস্পরে মেলামেশার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন। যদি আমাদের দেশের মা-বাবারা এ বিষয়ে উদার হতে পারেন, তাহলে তাঁদের নির্ব্বাচনে বিয়ে হলেও রেজিষ্ট্রী বিয়েতে কোন অমত না থাকাই ভাল। সত্যি কথা বলতে কি, টাকার অপচয় কিছুটা বন্ধ হবে, মিথ্যে ঝামেলাও পোহাতে হবে না বর-কনে ও তাদের অভিভাবকদের।

## শিশুরাই সমাজের ভবিষ্যৎ

### স্বর্ণলতা চক্রবর্ত্তী

শিশু না থাকলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। প্রতিটি শিশু গাছের অঙ্কুরের মত একটু একটু করে বাড়তে থাকে। ছোট থেকেই বোঝা যায় যে, শিশুটি বড় হ'লে কিরূপ হবে। আবার কেউ বলেন, শিশু নিজের পিতৃকুল বা মাতৃকুল অনুযায়ী গড়ে উঠবে। আবার কারোর ধারণা যে, একটি বাঁশঝাড়ে অনেক বাঁশ হয়, কিন্তু সরু-মোটা কিংবা বাঁকা ছোট-বড় সবই বাঁশ নামে পরিচিত হয়। সব বাঁশই ঠাকুরের কাঠামো বা ঠাকুরঘরের খুঁটি হতে পারে না। কোন বাঁশে পোল তৈরী হয়, লোকের যাতায়াত করবার রাস্তা হয়, আবার কোন বাঁশ মেথরের ঝাঁটার ভিতরে যে গুঁজি থাকে তা'র প্রয়োজনে লাগে। আরও একটি কথা সব শিশুই যদি ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক ইত্যাদি হ'য়ে জগতে বড় হ'য়ে উঠে তাহলে ছোট কাজ করবার জন্যও ত' লোকের প্রয়োজন। এই জগতে মানুষের যেমন শেষ নেই, কাজও অনেক রকমের আছে, তা' বলে শেষ করা যায় না। প্রতিটি মানুষের অন্তরে ভগবান আছেন। হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি নানা জাত ভগবান করে দেন নি। আমরা নিজেরা কাজের সুবিধার জন্য এক একজনকে এক একটি কাজের ভার দিয়েছি। আমরা তাই সকলের কাজ সকলে করি। সব কাজটাই জগতের নিত্য প্রয়োজন। অতএব সব শিশুরই সমান মর্য্যাদা।

পিতা-মাতা হওয়া ভাগ্যের কথা—ভাগবতে বলে। কিন্তু এই মাতা-পিতা হওয়াও বড়ই কঠিন। শিশুকে ভালভাবে খাওয়া-পরা, ভদ্রতা-সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষা না দিতে পারলে সমাজের লোকে পিতামাতাকে গালাগালি করে। তবে সমস্ত পিতামাতারই ইচ্ছা যে শিশুকে ভাল শিক্ষা দেয়। কোন কোন পিতামাতা স্নেহে অন্ধ হয়ে পুত্রকে শাসন ক'রতে পারে না। আবার কোন শিশু অর্থাভাবে শিক্ষা পায় না। আবার কেউ বা সঙ্গদোষে নষ্ট হয়ে যায়। অতএব বলা যেতে পারে পাঁক কত দুর্গন্ধ, তবু পাঁকে ফোটা পদ্ম কত সুন্দর! শিশু সৎ ও সমাজের অদ্বিতীয় হয়ে উঠলে সমাজের ও পিতা-মাতার গৌরবের বিষয়। অলস ও আরামী শিশু কোন দিন বড় হ'তে পারে না। চেষ্টা ও আগ্রহ শিশুর থাকা চাই। আবার কোন শিশু অর্থাভাবে তার বাসনা-কামনা মনোমন্দিরে লুকিয়ে রেখে নিজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। সকল সময় ধর ধর দেখ দেখ করলে— যে খেলার মধ্য দিয়ে সে নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে তাতে বাধা দিলে তার কর্মশক্তি শিথিল হয়ে পড়ে। ছোটবেলায় খেলাধূলা করলে শিশুর ব্যায়ামের কাজ করা হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার কাজ করে শিশু শক্তিমান ও ধৈর্য্যবান হয়ে উঠে। শিশু দুষ্ট হলে পিতামাতার চিন্তার কারণ হয়ে উঠে। ফেলা, ভাঙ্গা, মারপিট করা ইত্যাদির ভয়ে সর্বদাই ধরে রাখলে শিশু নিজে নিজে ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে না। এমন কি আলস্যতায় ও শত বাধায় তার শরীরের ও মনের বাঁধন ভেঙ্গে যায়। সতত পারব না, হবে কিনা, লোকে কি বলবে ইত্যাদি নানান সমস্যা এসে হাজির হয়। ঈশ্বরের কাছে শত শত কামনা, শিশু যেন কর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা অসাধ্য সাধন দ্বারা পৃথিবীতে ফুলের মত সকলের অন্তরকে জয় করে, নিজে জয়মাল্য ধারণ করতে পারে।

## নাগপাশ

### শেফালী চট্টোপাধ্যায়

গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙ্গে দেখি  
তুমি নেই মোর পাশে।  
দূর ও দিগন্ত আকাশ অনন্ত  
যেন মোরে উপহাসে॥  
মনে হয় যেন ভুলের কুসুমে  
গেঁথেছিনু মোর মালা—।  
বধূ রূপ ধরে দেউলে তোমার,—  
হয়নি ত দীপ জ্বালা।

মনে পড়েনা ত সন্ধ্যা লগনে,  
শঙ্খের ধ্বনি ভেসেছে পবনে,—  
মনে পড়েনা ত তুলসীতলায়  
প্রণাম করেছে সে বধূবেশে!  
তাই আজ যত দুঃখ-তাপ সব,  
হয়েছে আমার যেন বৈভব,—  
"আশার ছলনে নিরাশা গোপনে,  
বাঁধিয়াছে নাগপাশে।"

# কারমেন

প্রস্পেরমেরিমে

যত নারী সব পিত্তের মত তেতো ;
ওদের মোহন মুহূর্ত মাত্র দু'টি—শয্যায় আর মৃত্যুতে।
—পাল্লাদাস।১
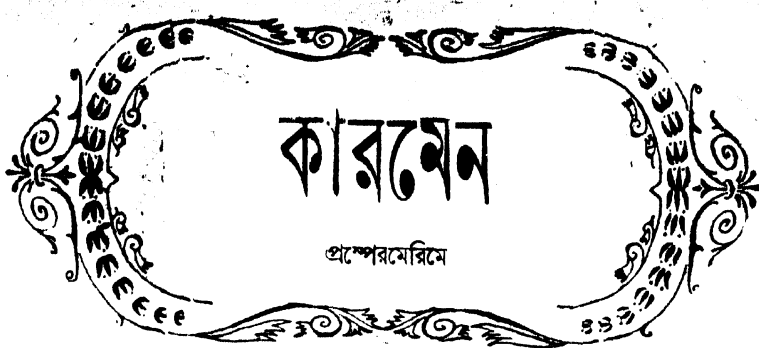
মারবেল্লার প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণে বর্তমান মঁদার কাছাকাছি বাস্তলিপেনি অঞ্চলে ভৌগোলিকরা যখন মুন্দার২ যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান নির্দেশ করেন, আমার সন্দেহ হয় তখন তাঁরা কি বলছেন নিজেরাই জানেন না। অজ্ঞাতনামা লেখকের বেল্লম হিসপেনিয়েনসি পুঁথির৩ নিজস্ব পাঠ অনুসারে এবং ডুাক দ ওসুনার৪ চমৎকার লাইব্রেরীতে সংগৃহীত কিছু তথ্যের ভিত্তিতে আমার এই ধারণা হয়েছে যে সীজার যেখানে প্রজাতন্ত্রের সমর্থকদের বিরুদ্ধে বাজিমাতের চাল চেলেছিলেন, সেই স্মরণীয় স্থানটি মন্তিল্লার আশেপাশে খুঁজতে হবে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের হেমন্তকালে আন্দালুশিয়ায় ছিলাম। এ বিষয়ে আমার অবশিষ্ট সন্দেহটুকু মেটাবার জন্য তখন বেশ বিস্তৃত অভিযান করেছিলাম। শীগ্‌গিরই আমার যে পুস্তিকা বেরোবে তাতে তথ্যনিষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা থাকবে না। অপেক্ষা করে আছি—ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ভৌগোলিক সমস্যা-কণ্টকিত হ'য়ে আছেন আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে অবশেষে তার সমাধান হবে। এই অবসরে আপনাদের একটি ছোট গল্প শোনাতে চাই। মুন্দার যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কিত কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নটিকে এই গল্পটি কোনভাবেই প্রভাবিত করবে না।

কর্দোভা থেকে দুটি ঘোড়া ও একটি গাইড নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। সঙ্গে মালপত্র বলতে সীজারের কমেণ্টারী৫ ও খান-কয়েক সার্ট। একদিন কাসেনার সমতল ভূমির উঁচু টিবিগুলোতে ঘোরাঘুরি ক'রে ক্লান্তিতে ও পিপাসায় মর মর হয়েছিলাম। তাই ভাবছিলাম সীজার ও পম্পে বংশাবতংসরা এখন জাহান্নামে যাক। এমন সময় আমার পথ থেকে বেশ কিছু দূরে বেত ও শর-বনে ভর্তি সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ চোখে পড়ল। বুঝতে পারলাম আশে-পাশে কোথায়ও ঝরণা রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলাম দূর থেকে যা মাঠ বলে মনে হয়েছিল আসলে তা একটা জলা। জলাটার মধ্যে একটা ছোট নদী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সিয়েরা দ কাব্রার দুইটি উত্তুঙ্গ পর্বত প্রাচীরের মাঝখানের সংকীর্ণ গিরিসংকট থেকে ঝরণাটা নেমে এসেছে। ভাবলাম আরো ওপরে উঠলে ব্যাঙ ও জোঁক ছাড়া নির্মল জল, হয়তো বা পাথরের আড়ালে একটু ছায়াও মিলতে পারে। গিরিসংকটের মুখে আসতেই আমার ঘোড়াটা ডেকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার দৃষ্টির বাইরে আর একটা ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করল। একশ' পা' না যেতেই দেখলাম গিরিবর্ত্মটি হঠাৎ বিস্তৃত হ'য়ে একটি স্বাভাবিক এ্যামফিথিয়েটারে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে সমুচ্চ পর্বতের বেষ্টনীতে স্থানটি ঘন ছায়াসমাচ্ছন্ন। কোন পথিকের পক্ষে এর চে'য় আরামদায়ক বিশ্রামস্থান দুর্লভ। খাড়া পাহাড়ের নীচ থেকে ঝরণাটা উচ্ছ্রিত হ'য়ে একটা ছোট জলাশয়ে নেমে এসেছে। জলাশয়ের তলদেশে তুষারশুভ্র বালির কার্পেট বিছানো। ঝরণাধারায় পুষ্ট ও হাওয়ার ঝাপটা থেকে আশ্রিত পাঁচ' ছ'টি সবুজ সুন্দর ছোট ওক গাছ ছোট নদীটির ওপর নিবিড় ছায়া মেলে দিয়েছে। চার পাশে শয্যা রচনা করেছে চিক্কণ উজ্জ্বল তৃণ। ত্রিশ মাইলের মধ্যে কোন সরাইয়ে এমন উপভোগ্য শয্যা মিলবে না।

এমন রমণীয় স্থান আবিষ্কারের গৌরব আমার নয়। আগে থেকেই একটি লোক সেখানে বিশ্রাম করছিল। আমি যখন সেখানে ঢুকলাম তখন লোকটি যে ঘুমচ্ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে জেগে উঠে লোকটি তার ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেল। ঘোড়াটা প্রভুর নিদ্রার সুযোগে চারপাশের ঘাসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছিল। এই নওজোয়ানের দোহারা গড়ন কিন্তু আকৃতি সবল। চোখে গর্বিত ভয়াল দৃষ্টি। এক সময়ে গায়ের রঙ ফরসা ছিল, কিন্তু রোদে পুড়ে এখন সেই রঙ তার মাথার চুলের চেয়েও তামাটে। লোকটি একহাতে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, অন্য হাতে তুলে নিল তামার বন্দুক। স্বীকার করতে বাধা নেই যে, প্রথম দিকে বন্দুক ও বন্দুকওয়ালার ভয়ানক ধরণ-ধারণ দেখে আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। এদেশের

---

১। আলেকজান্দ্রিয়াবাসী গ্রীক কবি ও বৈয়াকরণিক।

২। স্পেনের প্রাচীন শহর। এখানে ৪৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে জুলিয়াস সীজার লাবিয়েনাস ও পম্পের দুই ছেলে ক্নাইয়াস ও সেকসটাসকে পরাজিত করেন।

৩। বেল্লুম হিসপানিয়েনসির লেখকের নাম অজ্ঞাত। মেরিমে লিখছেন :—বেল্লুম হিসপানিয়েনাস সীজার বা তাঁর সেক্রেটারী হির্তিয়াসের লেখা নয়। বইটি রোমান কিংবা স্পেনীয়ের লেখা—সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৪। ডুাক দ ওসুনা স্পেনের একটি বিখ্যাত অভিজাত বংশোদ্ভূত।

৫। জুলিয়াস সীজার লিখিত Commentaries on the Civil War সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ডাকাতের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু কখনও চোখে দেখিনি। তাই তাদের অস্তিত্বে আমি আস্থা হারিয়েছি। তা ছাড়া, এদেশে এত সংগৃহস্থকে মাথা থেকে পা' পর্যন্ত রণসাজে সেজে হাটে যেতে দেখেছি যে একটি আগ্নেয়াস্ত্র দেখে অপরিচিতের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা অনুচিত মনে করলাম। মনে মনে বললাম, ও আমার সার্ট আর এলজেভিরের কমেন্টারী৬ নিয়ে করবেই বা কি? অতএব বন্দুকধারীকে সহজভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে নমস্কার জানালাম। হাসিমুখে বললাম—আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করলাম বোধ হয়। কোন উত্তর না দিয়ে লোকটি আমার পা' থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারপর যেন পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে আমার গাইডকে অনুরূপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল। গাইড এগিয়ে আসছিল। দেখলাম সে হঠাৎ ফ্যাকাসে হ'য়ে থমকে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে আতংকের ছায়া। বিপজ্জনক সাক্ষাৎকার,—স্বগতোক্তি করলাম। কিন্তু বুদ্ধি করে আশংকার কোন লক্ষণ দেখলাম না। ঘোড়া থেকে নেমে গাইডকে ঘোড়ার রাশ খুলে দিতে বললাম। ঝরণার কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে মাথা ও দু'হাত ডুবিয়ে দিলাম। তারপর জিদিওনের অবাধ্য সৈনিকদের৭ মত উপুড় হ'য়ে শুয়ে আকণ্ঠ জল পান করলাম।

গাইড ও অপরিচিত লোকটির প্রতি নজর রাখলাম। গাইড নেহাত অনিচ্ছায় অগ্রসর হচ্ছিল। লোকটির কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বদ মতলব আছে বলে মনে হল না। কারণ সে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছিল আর তার বন্দুকটার মুখ এখন মাটির দিকে। এতক্ষণ সে সেটাকে সোজাসুজি উঁচিয়ে ধরেছিল।

ভাবলাম, লোকটি আমাকে একটুও গ্রাহ্য করল না দেখে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন মানে নেই। তাই ঘাসের ওপর দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বন্দুকধারীর কাছে দেশলাই আছে কি না জিজ্ঞেস করলাম আর আমার সিগারকেস বার করলাম। অপরিচিত লোকটি কোন কথা না বলে পকেট হাতড়ে দেশলাই বার করল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সিগার ধরিয়ে দিতে। বোঝা গেল লোকটি ক্রমে সহজ হচ্ছে। বন্দুকটা তখনও হাতে থাকলেও সে আমার মুখোমুখি বসল। আমার সিগার ধরিয়ে বাকি সিগারগুলোর মধ্যে সেরা সিগারটা বেছে নিয়ে সে ধূমপান করে কি না জিজ্ঞেস করলাম।

৬। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ওলন্দাজ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক এলজেভির ভ্রাতাদের দ্বারা প্রকাশিত কমেন্টারীর সংস্করণ।

৭। বাইবেলে (জাজেস ২য়) আছে যে ইজরায়েল সন্তানদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর তাঁদের সাত বৎসরের জন্য মিদিয়ানাইটদের হাতে সমর্পণ করেন। পরে মিদিয়ানাইটদের অত্যাচারে পীড়িত ইজরায়েল সন্তানদের ক্রন্দনে দ্রবীভূত হ'য়ে ঈশ্বর জিদিওনের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকে ইজরায়েল সন্তানদের রক্ষা করতে বলেন। মিদিয়ানাইটদের সঙ্গে যুদ্ধের আগে জিদিওন ঈশ্বরের আদেশে তাঁর বত্রিশ হাজার সৈন্যকে পরীক্ষা করে মাত্র তিনশ' জনকে বেছে নেন। বত্রিশ হাজারের মধ্যে এই তিনশ' সৈন্যই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তৃষ্ণার্ত হওয়া সত্ত্বেও হাঁটু গেড়ে বসে বা উপুড় হয়ে শুয়ে জর্ডনের জলপান করেনি। হাতের তালুতে জল নিয়ে সেই জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়েই জিদিওন মিদিয়ানাইটদের পরাজিত করেছিলেন।

—হ্যাঁ, মঁসিও,—লোকটি উত্তর দিল।

এই প্রথম কথা শুনলাম ও মুখে। লক্ষ্য করলাম লোকটি ওর 'স'গুলো আন্দালুসীয়দের মত উচ্চারণ করছে না। তা' থেকে আন্দাজ করলাম সে আমার মতই পথিক। তবে অনতিপ্রত্নতাত্ত্বিক। একটা আসল হাবানা রিগালিয়া দিয়ে বললাম, এটা আপনার বেশ ভাল লাগবে। অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা সামান্য নুইয়ে লোকটি আমার সিগার থেকে ওর সিগার ধরাল। তারপর সিগারে প্রথম টান দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল,—আঃ কত দিন সিগারে টান দিইনি।

প্রাচ্যদেশে নুন ও রুটি গ্রহণ করার মত স্পেনে সিগার আদান-প্রদান আতিথ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। লোকটি এখন বেশ কথাবার্তা বলতে লাগল—যা আমি আশা করিনি। নিজেকে মন্তিল্লা প্রদেশের অধিবাসী বলে পরিচয় দিলেও এই জায়গাটা তার বিশেষ পরিচিত বলে মনে হল না। আমাদের আশ্রয়স্থল এই মনোরম উপত্যকার নামও তার জানা নেই। আশেপাশের কোন গ্রামের নামও সে বলতে পারল না। কাছাকাছি কোন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ তেরছা বড় টালি কিংবা খোদাইকরা পাথর তার চোখে পড়েছে কি না জানতে চাইলে সে স্বীকার করল এ সব ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ নেই। অন্য দিকে ঘোড়া সম্পর্কে সে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে প্রমাণ করল। আমার ঘোড়াটায় খুঁতগুলো দেখিয়ে দিল। অবশ্য সেটা কিছু কঠিন ছিল না। নিজের ঘোড়াটার বংশপরম্পরা বর্ণনা করল। ঘোড়াটা কর্দোভার বিখ্যাত অশ্বশালার। সত্যিকারের তেজী ঘোড়া। একেবারে ক্লান্তিহীন। প্রভু ঘোড়াটার প্রশস্তি করলেন,—একবার ঘোড়াটা একদিনে নব্বই মাইল ছুটেছিল। কথাটা বলতে বলতে সে কথার মাঝখানে হঠাৎ বিস্মিত বিরক্তিতে থেমে গিয়েছিল। যেন অনেক বেশি বলা হয়ে গেছে! পরে একটু বিব্রতভাবে ব্যাখ্যা করল—সেবার কর্দোভা যাওয়ার তাড়া ছিল। একটা কেসে জজের আদালতে সওয়াল করার কথা ছিল। এই বলে আমার গাইড আন্তোনিওর দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিল।

ছায়া ও ঝরণা আমাকে এমনি মুগ্ধ করেছিল যে গাইডের থলিতে আমার মন্তিল্লার বন্ধুদের দেওয়া কয়েক টুকরা চমৎকার হ্যামের কথা মনে পড়ল। গাইডকে সেগুলো বার করতে বলে অপরিচিত লোকটিকেও এই সদ্য-আয়োজিত পিকনিকে যোগ দিতে আহ্বান করলাম। যদি সে দীর্ঘকাল ধূমপান না করে থাকে, অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সে নিশ্চয়ই কিছু খায়নি। লোকটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত গিলতে লাগল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা এই গরীব হতভাগার পক্ষে শিকে ছেঁড়ার মত হয়েছিল। কিন্তু আমার গাইড খেল সামান্য, পান করল আরো কম। আর একেবারে নিশ্চুপ হ'য়ে রইল। অথচ যাত্রারম্ভে ওকে একজন অপরাজেয় বাক্যবিশারদ বলে মনে হয়েছিল। আমাদের অতিথির উপস্থিতিই ওকে ভাবিত করেছে। পারস্পরিক সন্দেহ দুজনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখল। কারণটা তখনও নিশ্চিত বুঝতে পারিনি।

ইতিমধ্যে রুটি ও হ্যামের শেষ টুকরা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হ'য়েছে। আমরা দুজনেই আমাদের দ্বিতীয় সিগার শেষ করেছি। গাইডকে ঘোড়ার রাশ লাগাতে বলে আমি আমার নূতন বন্ধুর কাছে বিদায় নিতে চাইলাম। সে আমি কোথায় রাত কাটাব জানতে চাইল।

গাইডের ইশারা লক্ষ্য করার আগেই বলে ফেললাম,—আমি কুয়েরভোর সরাইয়ে যাচ্ছি।

—মঁসিও, ওটা আপনার মত লোকের উপযুক্ত জায়গা নয়। আমিও সেখানেই যাচ্ছি। অনুমতি দেন ত আমরা একসঙ্গেই যেতে পারি।

সাগ্রহে সম্মতি জানিয়ে আমি ঘোড়ায় সওয়ার হলাম। গাইড আমার ঘোড়ার পা'দান ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আবার চোখ ইশারা করল। প্রত্যুত্তরে আমি শুধু শ্রাগ্ করলাম। ওকে জানাতে চাইলাম—আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি। আমরা রওনা হলাম।

আন্তোনিওর রহস্যময় ইশারা ও আতঙ্ক, অপরিচিতের মুখ থেকে নির্গত কয়েকটি কথা, বিশেষ করে সেই নব্বই মাইলের দৌড় ও তার অবিশ্বাস্য ব্যাখ্যা—এই পথিকসঙ্গী সম্পর্কে আমার ধারণা গড়ে তুলেছিল। সন্দেহ নেই যে কোন চোরাইচালানকারী, হয়তো বা কোন ডাকাতের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমার সঙ্গে খেয়েছে ও ধূমপান করেছে এমন লোকের সঙ্গে আমার কোন ভয় নেই—এটুকু বুঝতে পারার মত স্পেনীয় চরিত্রের জ্ঞান আমার হয়েছিল। বরঞ্চ লোকটির উপস্থিতি যে কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রক্ষাকবচের মত। তা ছাড়া, ডাকাত কিরকম হয় দেখতে পেয়ে একটু উল্লসিতই হয়ে উঠলাম। ওদের সঙ্গে ত আর হামেশাই দেখা হয় না। এই জাতীয় ভয়ংকর মানুষের সঙ্গের একটা মোহ আছে—বিশেষত যখন সে শান্ত ও পোষমানা অবস্থায় থাকে।

আশা ছিল ক্রমে এই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটি আমাকে সব খুলে বলবে। তাই গাইডের চোখ ইশারা সত্বেও ডাকাতদের সম্পর্কে কথাবার্তা চালাতে লাগলাম। সকলের মুখে তখন আন্দালুশিয়ার কুখ্যাত দস্যু জোসে মারিয়ার কথা। স্বগতোক্তি করলাম,—আহা! যদি জোসে মারিয়াই আমার পাশে থাকত! এই বীরটির যে সব প্রশংসনীয় কীর্তির কথা আমার জানা ছিল,—বললাম। পঞ্চমুখ হয়ে উঠলাম এই দস্যুর বীরত্ব ও মহানুভবতার প্রশংসায়। কিন্তু অপরিচিতের নিস্পৃহ কণ্ঠ শুনলাম, জোসে মারিয়া একটা বদমাস।

একি ন্যায়বিচার, না অতি বিনয়? মনে মনে বললাম। আমার সঙ্গীটিকে এবার ভাল করে লক্ষ্য করলাম। ওর চেহারা মিলিয়ে নিলাম আন্দালুশিয়ার নানা শহরের দরজায় আঁটা জোসে মারিয়ার চেহারার বিবরণের সঙ্গে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই সে। কটা চুল, নীল চোখ, সুন্দর দাঁত, বড় মুখ, ছোট হাত; মিহি সার্ট, রূপোর বোতামওয়ালা ভেলভেটের ভেষ্ট, পায়ে সাদা চামড়ার পটি ও তামাটে রঙের ঘোড়া। না, আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর ছদ্মবেশ আমরা মেনে চলব।

সরাইয়ে পৌঁছলাম। সরাইয়ের চেহারা লোকটির বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। অর্থাৎ এমন জঘন্য সরাই আগে কখনও আমার চোখে পড়েনি। একটি মাত্র বড় ঘর—একাধারে রান্নাঘর, খাবার-ঘর ও শোবার ঘর। ঘরের মধ্যিখানে একটা চ্যাপটা পাথরের ওপর আগুন জ্বালানো হয়েছে। ছাদের একটি ফুটো দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে ধোঁয়াটা মেঝের কয়েক ফুট ওপরে মেঘের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে জমে থাকে। দেয়ালের ধার ঘেঁসে মেঝের পাঁচ ছ'টি পুরনো কম্বল বিছানো। ওগুলো পথিকদের বিছানা। বাড়ি অর্থাৎ এই সদ্যবর্ণিত ঘরটি থেকে বিশ পা' দূরে একটা চালাঘরের মত রয়েছে। ওটা আস্তাবল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই মনোরম আশ্রয়ে আপাতত একটি বৃদ্ধা ও দশ বার বছরের একটি ছোট মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না। দু' জনেরই রঙ ঝুলের মত কাল। পরনে নোংরা শতচ্ছিন্ন বসন। মনে মনে বললাম, এই তা হলে প্রাচীন মুন্দা বিতিকার জনসংখ্যার অবশেষ। সীজার! সেক্সটাস্ পম্পে! আবার এ জগতে, ফিরে এলে তোমাদের বিস্ময়ের কি আর অন্ত থাকবে?

আমার সঙ্গীকে দেখে বুড়ীটার মুখ থেকে বিস্মিত উক্তি বেরিয়ে এল, সিনর ডন জোসে যে।

ডন জোসে ভ্রূকুটি করে শাসনের ভঙ্গিতে হাত তুলতেই বৃদ্ধা থমকে চুপ করল। গাইডের দিকে তাকালাম। সকলের অলক্ষ্যে ইঙ্গিতে ওকে বুঝিয়ে দিলাম, যে লোকটির সঙ্গে রাত কাটাতে যাচ্ছি তার সম্পর্কে আমার আর কিছু জানতে বাকি নেই।

নৈশভোজন কিন্তু আশাতিরিক্ত ভাল হল। এক ফুট উঁচু একটা ছোট টেবিলে খাবার দেওয়া হল। ভাত ও অগুণতি লংকা সহযোগে একটা ভাজা মোরগ, তেল-লংকা, ও গজপাশো বা এক ধরণের লংকার সালাড। লংকা চর্চিত এই ধরণের তিনটি প্লেট গলাধঃকরণের জন্য বারবার চামড়ার বোতলে ভরা মন্তিল্লার মদের শরণ নিতে হচ্ছিল। মন্তিল্লার এই মদ কিন্তু পরম উপাদেয়। খাওয়া-দাওয়ার পর দেয়ালে একটি ম্যাণ্ডোলিন ঝোলানো দেখে (স্পেনের সর্বত্র ম্যাণ্ডোলিন ছড়ানো) পরিবেশনকারিণী ছোট মেয়েটিকে সে ম্যাণ্ডোলিন বাজাতে পারে কি না জিজ্ঞেস করলাম।

—না। ডন জোসে কিন্তু বেশ ভাল বাজান, মেয়েটি উত্তর দিল।

আমি জোসেকে বললাম, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে কিছু গেয়ে শোনান। আমি আপনাদের জাতীয় সঙ্গীতের ভয়ানক ভক্ত।

—আপনি সদাশয় ভদ্রলোক, আমাকে অকাতরে সিগার বিলিয়েছেন। আপনাকে না বলার ক্ষমতা আমার নেই।—খোস মেজাজে ডন জোসে উত্তর দিল। ম্যাণ্ডোলিনটা দেওয়া হলে সে নিজেই বাজিয়ে গাইতে লাগল। বিষাদ ভরা একটা অদ্ভুত সুর। গানের একটি শব্দও আমি বুঝতে পারিনি।

আমি বললাম,—আমার হয়তো ভুল হতে পারে। আপনি এখন যে গানটি গাইলেন তা স্পেনীয় গান নয়। প্রভিন্সের[৮] দিকে জর্জিকো[৯] শুনেছি অনেকটা তার মত। আর কথা নিশ্চয়ই বাস্ক্ ভাষায়।

—হ্যাঁ, জোসে থমথমে গলায় উত্তর দিল। তারপর ম্যাণ্ডোলিনটা মেঝেয় রেখে এক আশ্চর্য বিষাদাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নিভন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট টেবিলের ওপরের ল্যাম্পের আলো ওর মুখে পড়েছে। একাধারে মহৎ ও দুর্ধর্ষ ওর আকৃতি মিলটনের শয়তানের কথা মনে করিয়ে দেয়। হয়তো তারই মত আমার সঙ্গীও তার

---

৮। স্পেনের বিশেষ অধিকারভোগী অঞ্চল। আলাভা, বিস্কে, গিপাজকোয়া ও ভাভাড়ের কিয়দংশ নিয়ে এই অঞ্চল—মেরিমের পাদটীকা।

৯। সঙ্গীতযুক্ত এক জাতীয় নাচের সুর।

ফেলে-আসা স্বর্গের কথা ভাবছে। কোন স্খলনের জন্ত যে স্বর্গ থেকে সে নির্বাসিত হয়েছে। কথাবার্তা চালাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না। জোসে তখন তার বিষাদ চিন্তায় মগ্ন।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধা ঘরের কোণে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। দড়িতে ঝোলানো একটি চাদর তার আবরু রক্ষা করেছে। কুললনাদের জন্ত এই সুরক্ষিত অন্তঃপুরে ছোট মেয়েটিও বৃদ্ধার অনুগামিনী হল। আমার গাইড তখন দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে তার সঙ্গে আস্তাবলে যেতে বলল। গাইডের কথায় ডন জোসে চমকে সজাগ হয়ে উঠল। রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করল, সে কোথায় যাচ্ছে?

—আস্তাবলে, গাইড উত্তর দিল।

—কেন? কি দরকার? ঘোড়াগুলোর খেতে হবে ত? এখানেই ঘুমাও। মঁসিও আপত্তি করবেন না।

—আমার আশংকা হচ্ছে ওঁর ঘোড়াটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওঁকে ঘোড়াটা দেখাতে চাই। কি করা দরকার উনি বলতে পারবেন হয় তো।

স্পষ্ট বুঝলাম আন্তোনিও আমার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চাচ্ছে। কিন্তু ডন জোসের সন্দেহ উদ্রেক করার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতিতে ডন জোসের প্রতি গভীর আস্থাসূচক ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে হল। আন্তোনিওকে বললাম, ঘোড়ার ব্যাপার আমি কিছু বুঝি না। তা ছাড়া, আমার ঘুম পেয়েছে।

ডন জোসে গাইডকে আস্তাবলে অনুসরণ করল এবং অল্পক্ষণ পরেই একা ফিরে এল। আমাকে বলল, ঘোড়াটার কিছুই হয়নি। কিন্তু আপনার গাইডের কাছে ঘোড়াটা এতই মূল্যবান যে সে ঘোড়াটার ঘাম বার করবার জন্ত ভেষ্ট দিয়ে ঘোড়াটাকে ক্রমাগত ঘষছে। আর এই মজার কাজে সারারাত কাটাবে বলে স্থির করেছে। যা হোক, বিছানার ছোঁয়াচ এড়াবার জন্ত ওভারকোটে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কম্বলের ওপর শুয়ে পড়লাম। আমার পাশে শোয়ার বেয়াদবীর জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে ডন জোসে দরজার সামনে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার আগে বন্দুকটা টোটা ভর্তি করে হ্যাভারস্যাকের নীচে রাখল। হ্যাভারস্যাকটাই ওর বালিশের কাজ করবে। পরস্পরকে 'শুভরাত্রি' জানাবার পাঁচ মিনিট পরেই আমরা গভীর নিদ্রাভিভূত হলাম।

ভেবেছিলাম অত্যধিক পথশ্রমে এমন স্থানেও নিদ্রা সম্ভব হবে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে গায়ে বিশ্রী চুলকুনিতে প্রাথমিক ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চুলকুনির কারণ বুঝতে পেরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। এই অতিথিবিমুখ-ঘরের চেয়ে বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত কাটানো ঢের ভাল। পা' টিপে টিপে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে ডন জোসেকে ডিঙ্গিয়ে বাইরে গেলাম। ডন জোসে তখন বিবেকবানের গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাই তাকে না জাগিয়েই ঘর থেকে বেরোন সম্ভব হল। দরজার কাছে একটি কাঠের বড় বেঞ্চি পাতা ছিল। রাত কাটাবার জন্ত যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে আমি ওই বেঞ্চিতেই গা' এলিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় বার চোখ বুজতে যাচ্ছি এমন সময় একটি মানুষ ও ঘোড়ার নিঃশব্দ অপসৃয়মান ছায়া যেন দেখতে পেলাম। মনে হল আন্তোনিও। লাফিয়ে উঠলাম। এত রাতে আন্তোনিওকে বাইরে দেখে বিস্মিত হয়ে এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে আন্তোনিও থামল। চাপা গলায় প্রশ্ন করল, সে কোথায়?

—ঘরে। ঘুমুচ্ছে। ছারপোকাকে সে পরোয়া করে না। ঘোড়াটাকে কেন এনেছ?

এতক্ষণে আমার চোখে পড়ল আন্তোনিও ঘোড়ার খুরে সযত্নে ন্যাকড়া জড়িয়েছে। আস্তাবল থেকে বেরোবার সময় যাতে শব্দ না হয়।

আন্তোনিও আমাকে বলল, ভগবানের দোহাই! আস্তে কথা বলুন। এই লোকটাকে আপনি জানেন না। আন্দালুশিয়ার সবচেয়ে সাংঘাতিক ডাকাত এই জোসে ন্যাভাড়ো। সারাদিন ধরে এই কথাটাই আকারে ইঙ্গিতে আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আপনি বুঝতে চাননি।

ডাকাত হোক্ না হোক্ আমাদের কি? সে আমাদের কিছু চুরি করেনি। চুরি করার ইচ্ছাও তার নেই, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

—ঠিক। কিন্তু তাকে ধরিয়ে দিলে দু'শ ডুকাত[১০] পুরস্কার পাওয়া যাবে। এখান থেকে সাড়ে চার মাইল দূরে একটা সৈন্যের ফাঁড়ি আমার জানা আছে। ভোর হওয়ার আগেই আমি কয়েকজন যোয়ান নিয়ে আসব। জোসের ঘোড়াটাই নিয়ে যেতাম কিন্তু ঘোড়াটা এমনি বজ্জাত যে ন্যাভাড়ো ছাড়া আর কেউ তার কাছে ঘেঁষতে পারে না।

আমি ওকে বললাম, তুমি চুলোয় যাও। এই বেচারা তোমার কি করেছে যে তুমি ওকে ধরিয়ে দেবে? তা ছাড়া, তুমি কি ঠিক জান যে তুমি যার কথা বলছ ওই সেই লোক?

—নিশ্চয়! একটু আগে আস্তাবলে এসে সে আমাকে বলেছিল, তোর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে তুই আমাকে চিনতে পেরেছিস। আমি কে তা যদি তুই এই সদাশয় ভদ্রলোককে বলিস তবে তোর মাথা গুঁড়ো করে দেব। মঁসিও, আপনি ওর পাশে থাকুন। আপনার কোন ভয় নেই। যতক্ষণ আপনি ওর পাশে থাকবেন ওর কোন সন্দেহ হবে না।

কথা বলতে বলতে আমরা সরাই থেকে কিছু দূরে চলে এসেছিলাম। সেখান থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর সরাইয়ে পৌঁছয় না। আন্তোনিও ঘোড়ার খুরের জড়ানো ন্যাকড়াগুলো খুলে ফেলল। ঘোড়ায় চেপে বসবার উদ্যোগ করল। আমি অনুরোধ করে এমন কি ধমক দিয়ে ওকে ঠেকাতে চেষ্টা করলাম।

উত্তরে ও আমাকে বলল,—আমি একটা গরীব হতভাগা। দু'শ ডুকাত ছেড়ে দিতে পারি না। বিশেষ করে যখন দেশকে একটা আপদমুক্ত করার প্রশ্নও রয়েছে। কিন্তু সাবধান। ন্যাভাড়ো জেগে উঠলে তার বন্দুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন সাবধান! আমি অনেকদূর এগিয়ে গেছি—আমার পক্ষে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার যা ভাল মনে হয় করুন।

শয়তানটা ঘোড়ায় চেপে দুপায়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

গাইডের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। বেশ চিন্তিতও। মুহূর্তকাল চিন্তা করলাম এবং মনঃস্থির করে সরাইয়ে ফিরে এলাম। ডন জোসে তখনও ঘুমুচ্ছে। নিঃসন্দেহ, বহু দুঃসাহসিক অভিযানের

---

১০। স্পেনের প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা।

ক্লান্তি ও অনিদ্রার অপনোদন করছে। তার ঘুম ভাঙাতে জোরে ধাক্কা দিতে হল। তার চোখের হিংস্র দৃষ্টি ও বন্দুকটা বাগিয়ে ধরবার জন্ম দেহের ঝাঁকুনি আমি কখনও ভুলব না। সাবধানী হয়ে বন্দুকটা আগেই বিছানা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম।

তাকে বললাম, মঁসিও, আপনার ঘুম ভাঙাবার জন্ম ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু বোকার মত আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। হঠাৎ এখানে আধ ডজন সৈনিক এসে পড়লে কি আপনি খুশি হবেন?

সে লাফিয়ে উঠে ভীষণস্বরে প্রশ্ন করল, আপনাকে কে বলেছে?

—সৎপরামর্শ হলে কোথা থেকে তা আসছে জানার দরকার কী? আপনার গাইড বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু ওকে এর দাম দিতে হবে। কোথায় সে?

—জানি না। আস্তাবলে। দেখছি, দেখছি। কেউ না কেউ আমাকে বলেছে।

—আপনাকে কে বলেছে? বুড়ীটা নয়?

—যে বলেছে তাকে আমি চিনি না। আর এত কথার দরকার কি? আপনার কি সৈন্যদের জন্ম অপেক্ষা করার কোন কারণ আছে? হ্যাঁ বা না উত্তর দিন: যদি না থাকে তবে সময় নষ্ট করবেন না। নয় তো শুভরাত্রি। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্ম ক্ষমা চাচ্ছি।

—আপনার গাইড। আপনার গাইড। গোড়াতেই আমি ওকে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু ওর হিসাব-নিকাশ পরে হবে। বিদায়, মঁসিও। আপনি আমার যে উপকার করলেন তার জন্ম ভগবান যেন আপনার মঙ্গল করেন। আপনি আমাকে যতটা জঘন্য বলে মনে করছেন আমি ততটা জঘন্য নই। এখনও আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা যে কোন সহৃদয় মানুষের করুণার উদ্রেক করবে। বিদায় মঁসিও। দুঃখ রইল আপনার ঋণ শোধ করতে পারলাম না।

—ডন জোসে, আপনার যদি কোন উপকার করে থাকি তা হলে প্রতিদানে প্রতিজ্ঞা করুন কাউকে সন্দেহ করবেন না। নিন, পথের জন্ম এই সিগার। শুভযাত্রা, এই বলে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। নিঃশব্দে আমার করমর্দন করে সে বন্দুক ও হাভারস্যাক তুলে নিল। আমার কাছে দুর্বোধ্য একটা ভাষায় বুড়ীকে কয়েকটা কথা বলে দৌড়ে আস্তাবলে চলে গেল। একটু পরে শুনলাম জোসে জোর কদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে প্রান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি আবার বেঞ্চির ওপর শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আর ঘুম হল না। ভ্যালেন্সীয়দের মত এক সঙ্গে ভাত ও হ্যাম খেয়েছি শুধু এই কারণেই কোন ডাকাত, সম্ভবত খুনীকে, ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানো সঙ্গত কি না, নিজেকে প্রশ্ন করলাম। আইনের ধারক আমার গাইডের প্রতি কী আমি বিশ্বাসঘাতকতা করলাম না? ওকে কী আমি একটা দস্যুর প্রতিহিংসার মুখে ঠেলে দিলাম না? কিন্তু আতিথেয়তার কর্তব্য? সে ত বর্বর যুগের কুসংস্কার মাত্র। মনে মনে বললাম, ভবিষ্যতে এই দস্যু যত কুকর্ম করবে সব কিছুর অপরাধ আমার ওপর বর্তাবে। কিন্তু এ কি শুধুই কুসংস্কার—বিবেকের এই প্রেরণা যা সকল যুক্তিকে প্রতিহত করে? হয়তো এই অস্বস্তিকর অবস্থায় আমার কৃতকর্মের জন্ম অনুশোচনা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। আমার কৃতকর্মের নৈতিকতা সম্পর্কে অনিশ্চিত ভাবে ভাবছি, এমন সময় আন্তোনিওর সঙ্গে আধ ডজন অশ্বারোহীর আবির্ভাব হল।

আন্তোনিও বুদ্ধিমানের মত সবাইর পিছনে আসছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে ওদের বললাম যে, দু ঘণ্টা হল ডাকাতটা পালিয়েছে। ব্রিগেডিয়ার বুড়ীকে প্রশ্ন করায় সে বলল, সে ন্যাভাড়োকে চেনে কিন্তু সে একা মেয়েমানুষ। প্রাণের দায়ে ন্যাভাড়োকে কখনও ধরিয়ে দিতে সাহস পায়নি। সে আরো বলল, ন্যাভাড়ো তার সরাইয়ে এলে মাঝ রাত্তিরে উঠে চলে যাওয়াই তার রীতি। আমাকে পাসপোর্ট দেখাতে কয়েক মাইল যেতে হল। শেরিফের কাছে ঘোষণাপত্রে সই করে আমি আবার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু করার অনুমতি পেলাম। আন্তোনিও আমার বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখল। কারণ ওর সন্দেহ আমিই ওকে দুশ' ডুকাত থেকে বঞ্চিত করেছি। তবু কর্দোভায় আমরা বন্ধুভাবেই বিদায় নিলাম। সেখানে আমার সাধ্যমত বেশ দরাজ হাতেই ওকে পারিতোষিক দিয়েছিলাম।

## ২

কর্দোভায় কয়েকদিন কাটালাম। সেখানকার ডোমিনিকান গ্রন্থাগারের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে প্রাচীন মুন্দাবিতিকা সম্বন্ধে কৌতূহলকর তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে শুনেছিলাম। কনভেন্টের ফাদাররা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কনভেন্টে সারাদিন কাটাতাম, সন্ধ্যায় শহরে ঘুরে বেড়াতাম। কর্দোভায় সূর্যাস্তের সময় গুয়াদালকুইভিরের দক্ষিণ পারে জেটির ওপর অকর্মাদের বেড়াতে দেখা যেত। সেখানে একটি ট্যানারী থেকে চামড়ার গন্ধ নাকে আসত। এই ট্যানারী চামড়া তৈরীর জন্ম এ দেশের প্রাচীন সুনাম আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কিন্তু অন্যদিকে এখানে এমন একটি দৃশ্য দেখতে পাওয়া যেত যা সত্যি দেখবার মত ছিল। এ্যাঞ্জেলাসের[১১] ঘণ্টা বাজার কয়েক মিনিট আগে জেটির যে দিকটা বেশ নীচু তার প্রান্তে নদীর পারে বহু নারী জড় হত। কোন পুরুষের সাহস ছিল না এই দলের সঙ্গে মেশে। এ্যাঞ্জেলাসের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ধরে নিত সন্ধ্যা হয়েছে। ঘড়ির শেষ ঘণ্টা বাজা মাত্র মেয়েরা পোষাক ছেড়ে জলে নামত। তারপর শুরু হত হৈ চৈ, অট্টহাসি ও তুমুল হট্টগোল। জেটির ওপর থেকে মানুষেরা হাঁ করে চোখে স্নানরতাদের গিলে খেতে চাইত। কিন্তু দেখতে পেত সামান্যই। তবু নদীর গাঢ় নীল জলে অনির্দেশ্য সাদা দেহের রেখা কবিচিত্তকে আলোড়িত করত। একটু কল্পনার আশ্রয় নিলে অপ্সরীসহ ডায়েনা[১২] জলকেলি করছেন মনে করা কঠিন হত না। অথচ এ্যাক্টিয়নের[১৩] অবস্থা ঘটার ভয়েরও কারণ ছিল

---

১১। ঈশ্বরের আবির্ভাবের স্মরণে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সূর্যাস্তের পর রোমান ক্যাথলিকদের ভজন।

(১২) মৃগয়াসক্তা চিরকুমারী গ্রীকদেবী।

(১৩) রাজা ক্যাডমাসের পুত্র। সাইপ্রেস ও পাইনে ঘেরা এক মনোরম উপত্যকার প্রান্তে এক গুহার ভিতরে শীতল ঝরণার জলে ডায়েনা মৃগয়ার পর ক্লান্ত দেহ জুড়াতে আসতেন। একদিন ডায়েনা অপ্সরী-সহ সেখানে জলকেলি করতে এসেছেন। দেবী যখন নিরাবরণা হয়ে স্নানের প্রসাধনে ব্যস্ত হঠাৎ সেখানে এ্যাক্টিয়ন এসে উপস্থিত হলেন। তিনিও সঙ্গীদের নিয়ে মৃগয়ায় এসে দলছাড়া হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। অপ্সরীরা একজন

না। শুনেছি একদিন কয়েকজন তরুণ ফূর্তিবাজ ছোকরা জুটে ক্যাথিড্রালের ঘণ্টিওয়ালার মুঠো ভর্তি করে দিয়ে ঠিক সময়ের বিশ মিনিট আগে এ্যাঞ্জেলাসের ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা করেছিল। যদিও তখনও দিনের আলো মিলিয়ে যায়নি তবু গুয়াদালকুইভিরের অপ্সরীরা এতটুকু দ্বিধা করেনি। সূর্যের চেয়ে এ্যাঞ্জেলাসের ঘণ্টার ওপর ওদের আস্থা বেশী। তাই নির্বিকারচিত্তে স্নানের বেশ পড়েছিল; যদিও সেটা ছিল একেবারেই নামমাত্র ব্যাপার। আমি সেদিন ছিলাম না। আমার সময়ে ছিল নিষ্কলংক চরিত্রের ঘণ্টিওয়ালা আর স্নান গোধূলি। সে সময়ে একমাত্র বিড়ালের পক্ষেই লোলচর্ম কমলালেবুর ফেরিওয়ালা ও কর্দোভার সুন্দরীশ্রেষ্ঠা গ্রিজেতকে১৪ আলাদা করে চেনা সম্ভব ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা চোখে কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না। জেটির রেলিঙে হেলান দিয়ে ধূমপান করছিলাম। জেটি থেকে যে সিঁড়ি নদী পর্যন্ত নেমে গেছে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন একটি নারী। আমার পাশে বসলেন। ওঁর চুলে বড় এক গোছা জুঁই ফুল। সন্ধ্যায় জুঁই ফুল থেকে মদির গন্ধ ভেসে আসছিল। পরনে সাদাসিধা কাল পোষাক। প্রায় সাধারণ পোষাকই বলা চলে—সন্ধ্যায় অধিকাংশ গ্রিজেতের যে পোষাক।

সোসাইটি লেডীরা একমাত্র সকালবেলায়ই কাল পোষাক পরেন। সন্ধ্যায় তাঁরা ফরাসী রীতি অনুযায়ী বেশবাস করে থাকেন। নদীপর্যটিনী হয়ে সদ্যস্নাতা ধীরে মাথার আবরণ ওড়নাটি খসিয়ে কাঁধে ফেলে দিলেন। তারার অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম ইনি যুবতী, সুন্দরী ও সুগঠিতা। দীর্ঘ আয়ত চোখ। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সিগার ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সম্পূর্ণ ফরাসী এই সহবত দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন যে, তামাকের গন্ধ তাঁর বেশ লাগে। এমন কি নরম পাপেলিতো১৫ পেলে তিনি ধূমপানও করে থাকেন। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলতে হবে, আমার সিগার কেসে কয়েকটি পাপেলিতো ছিল। তাড়াতাড়ি কেসটা এগিয়ে দিলাম। তিনি অবহেলাভরে একটি তুলে নিলেন। এক মু১৬ বকশিসের বিনিময়ে একটি ছেলে একটা জ্বলন্ত দড়ি নিয়ে এল। দড়ির জ্বলন্ত প্রান্ত থেকে সিগার ধরালেন তিনি। তারপর সুন্দরী স্নানার্থিনী ও আমি—দুজনে সিগারের ধোঁয়া মিশিয়ে বহুক্ষণ গল্পে মশগুল হয়ে রইলাম। যখন খেয়াল হল দেখলাম জেটিতে শুধু আমরা দুজনই রয়েছি। এর পর আর তাঁকে নেভেরিয়ায়১৭ আইসক্রীম খাওয়ার প্রস্তাব করতে কোন সংকোচ বোধ করিনি। শালীনতাসম্মত দ্বিধার পর তিনি রাজী হলেন। কিন্তু মন স্থির করার আগে কটা বাজে জানতে চাইলেন। আমি আমার রিপিটার ঘড়িটা বাজালাম। ঘড়ির বাজনা শুনে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন।

—আপনাদের দেশের কি সব আবিষ্কার! আপনার দেশ কোথায়? আপনি ইংরেজ নিশ্চয়ই?

—ফরাসী ও আপনার দাসানুদাস। আপনার মাদমোয়াজেল বা মাদাম? কর্দোভা, নয়?

—না।

—নয় তো আন্দালুশিয়া। আপনার মিষ্টি কথা থেকে অনুমান করছি।

—মানুষের উচ্চারণ যখন আপনি এত মন দিয়ে লক্ষ্য করেন তখন আমি কে আপনার কিন্তু বলা উচিত।

—মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে দু' পা' দূরে যীশুখৃষ্টের দেশ আপনার। আন্দালুশিয়ার এই রূপক নাম আমার সুহৃদ বিখ্যাত সেভিলীয় পিকাদর১৮ ফ্রান্সিস্কোর কাছে শুনেছি।

—বাঃ স্বর্গ! এদেশের লোকেরা বলে স্বর্গ আমাদের জন্ম নয়।

—তা হলে আপনি মোরিস্কো বা···আমি থামলাম। ইহুদী কথাটা উচ্চারণ করার সাহস হচ্ছিল না।

—বলুন, বলুন। আপনি বেশ ভাল করেই জানেন আমি বেদেনী। আপনি আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান। কারমেন চিতার নাম শুনেছেন? আমি কারমেন১৯।

পনর বছর আগে এমনি নাস্তিক ছিলাম! জাদুকরীর পাশে বসে কিন্তু আমি ঘৃণায় কুঁকড়ে যাইনি। মনে মনে বললাম, মন্দ নয়। গত সপ্তাহে এক ডাকাতের সঙ্গে নৈশভোজ হয়েছে আর আজ এক ইবলিশের সাকরেদের সঙ্গে আইসক্রীম খাচ্ছি। বিদেশ ভ্রমণের সময় চোখ খোলা রাখা দরকার। জাদুকরীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে জাদুবিদ্যার অনুশীলনে কিছু সময় নষ্ট করেছিলাম। এই জাতীয় অনুসন্ধিৎসা থেকে দীর্ঘকাল মুক্তিলাভ করলেও এ সব কুসংস্কারের

---

পুরুষকে দেখে চীৎকার করে ডায়েনার কাছে গিয়ে নিজেদের দেহ দিয়ে নিরাবরণা দেবীকে আবৃত্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু উন্নতকায়া দেবীকে সম্পূর্ণ আবৃত করা সম্ভব হল না। বিস্ময়ে ডায়েনার মুখ হয়ে উঠল অস্তকালীন সূর্যরশ্মিরঞ্জিত মেঘের মত। হঠাৎ জল নিয়ে এ্যাক্টিয়নের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বললেন, এখন যাও, পার ত বল গিয়ে তুমি ডায়েনাকে নিরাবরণা দেখেছ। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাক্টিয়ন একটি হরিণে পরিণত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। বাইরে তাঁর নিজের শিকারী-কুকুরেরা তাঁকে ছিঁড়ে খেল।

১৪। বহুবল্লভা যৌবনবতী শ্রমিকরমণী। সাধারণত ধূসররঙের পোষাক পড়ত বলে এদের গ্রিজেত বলা হত।

১৫। নরম ছোট সিগার।

১৬ স্পেনের তাম্রমুদ্রা।

১৭। বিশেষ ধরণের আইসক্রীম কাফে। স্পেনের প্রত্যেক গ্রামে এই জাতীয় নেভেরিয়া আছে।

১৮। তোরেরো বা স্পেনের পেশাদার ষাঁড়-লড়নেওয়ালারা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমত মাতাদর; ইনি দলের প্রধান। এঁর বর্শাধারী অশ্বারোহী সহযোগীদের বলা হয় পিকাদর আর পদাতিক সহযোগীদের বান্দেরিল্লেরস্।

১৯। 'মেরিমের কারমেন' নামক বইয়ে দুপোয়া লিখেছেন: কারমেন নামটি একটি পরম আবিষ্কার। প্রাচীন ইতালিতে এই নামটি জাদুমন্ত্র, কাব্য ও সঙ্গীতের দ্যোতনা করত। স্পেনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু কাউন্টেস, বেদেনী, ক্যাষ্টিলবাসিনী ও আরো অনেকে এই নামটি বহন করেছেন। নামটি অসংখ্য নারীর দীর্ঘ চোখের মায়ায় মিশে আছে। তাই এই নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই একটি মোহময় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়।

প্রতি একটা কৌতূহল তখনও বেঁচে ছিল। বেদেদের মধ্যে জাদুবিদ্যা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তা জানার জন্যও আমি উৎসাহিত হয়েছিলাম।

গল্প করতে করতে আমরা নেভেরিয়া ঢুকে একটা ছোট টেবিলে বসলাম। টেবিলটা একটা কাঁচের চিমনি ঢাকা মোমবাতির আলোয় আলোকিত। এতক্ষণে জিতানাকে২০ খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। নেভেরিয়ার অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আইসক্রীম খেতে খেতে আমাকে এমন সুসঙ্গ দেখে বিস্ময়বোধ করছিলেন।

মাদমোয়াজেল কারমেন জাত-বেদেনী কি না আমার গভীর সন্দেহ রয়েছে। অন্তত বেদেদের মধ্যে এতদিন যে সব মেয়ে দেখেছি, কারমেন তাদের চেয়ে বহুগুণে সুন্দরী। স্পেনীয়দের মতে কোন মেয়েকে সুন্দরী বলে পরিচিত হতে হলে তার মধ্যে ত্রিশটি লক্ষণের মিলন হওয়া প্রয়োজন; অথবা অন্যভাবে বলা চলে নারীদেহের তিনটি অংশের প্রত্যেকটিকে দশটি বিশেষণে ভূষিত করে রূপের বর্ণনা করা যায়। যেমন, নারীদেহের তিনটি কাল জিনিষ—আঁখি, অক্ষিপক্ষ্ম ও ভ্রূ; তিনটি সরু জিনিষ আঙুল, ঠোঁট ও চুল ইত্যাদি। অন্যান্যগুলোর জন্য ব্রঁতোম২১ দেখুন। আমার বেদেনী এতগুলি আদর্শ সৌন্দর্য লক্ষণের দাবি করতে পারে না। ওর ত্বক্ বেশ মসৃণ হলেও তামাটে রঙের। বড় টলটলে তির্যক চোখ। সুগঠিত কিন্তু ভারী ঠোঁটের মাঝে খোসা-ছাড়ানো বাদামের মত উজ্জ্বল সাদা দাঁত। দীর্ঘ উজ্জ্বল কাল চুল। কিন্তু তাতে দাঁড়কাকের ডানার নীল রঙের প্রতিফলন। বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আপনাদের ক্লান্ত করতে চাই না। সংক্ষেপে বলা চলে ওর প্রত্যেকটি খুঁতের সঙ্গে এমন একটা গুণ সম্পৃক্ত ছিল যাতে গুণটা তুলনায় অনেক বেশি ফুটে উঠত। এ এক অদ্ভুত বন্যরূপ। প্রথম দর্শনে বিমূঢ় ক'রে দেয়, কখনও ভুলতে দেয় না। বিশেষ করে ওর চোখে যুগপৎ এমন লালসা ও হিংস্রতা ছিল যা এ পর্যন্ত কোন মানুষের চোখে দেখিনি। বেদের চোখ নেকড়ের চোখ—এই স্পেনীয় প্রবাদ একান্ত সত্য। যদি চিড়িয়াখানায় গিয়ে নেকড়ের চোখ লক্ষ্য করার সময় না পান, তবে চড়াই ধরবার জন্য আপনার ওৎপাতা বিড়ালকে দেখুন।

কাফেতে বসে ভাগ্যগণনা করা লজ্জাকর মনে হল। তাই মোহিনী জাদুকরীর সঙ্গে ওর বাসায় যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। সে অনায়াসেই সম্মত হল। কিন্তু সে সময় জানতে চাইল। আবার আমাকে রিপিটার ঘড়িটা বাজাতে বলল।

—ওটা কি সত্যি সোনার? ঘড়িটাকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে সে বলল।

আবার যখন আমরা রওনা হলাম, তখন রাত হয়েছে। প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ। পথ জনহীন। গুয়াদালকুইভিরের সেতু পেরিয়ে, শহরতলির প্রান্তে একটা বাড়ির সামনে আমরা থামলাম। বাড়িটা দেখে প্রাসাদ বলে ভুল করার কোন কারণ নেই। একটি ছোট ছেলে দরজা খুলে দিল। আমার অজ্ঞাত এক ভাষায় বেদেনী ছেলেটিকে কয়েকটা কথা বলল। পরে জেনেছিলাম, ঐ ভাষাই বেদেদের ভাষা রোমানি বা সিপকাল্লি। ছেলেটি আমাদের ঘরে রেখে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। বেশ বড় ঘরটি। আসবাবপত্র বলতে একটি ছোট টেবিল, দুটো টুল আর একটা পেট্রা। ঘরে একটা জলের জগ, একরাশ কমলালেবু ও একগোছা পেঁয়াজ ছিল—তাও আমি ভুলিনি।

যখন ঘরে শুধু আমরা দু'জন রইলাম, বেদেনী পেট্রা থেকে এক প্যাকেট বহুব্যবহৃত তাস, একটা কষ্টিপাথর, একটা শুকনো বহুরূপী এবং ভেলকিবাজির জন্য প্রয়োজনীয় আরো কয়েকটি পদার্থ বার করল। সে কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল বলার দরকার নেই। তবে ভোজবাজির২২ রকম দেখে বুঝলাম সে ওস্তাদ খেলোয়াড়।

কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। একটু পরেই বাধা পড়ল। হঠাৎ ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। ধূসর ওভারকোটে নাক পর্যন্ত ঢাকা একটি লোক ঘরে ঢুকল। সে বেদেনীকে যেভাবে ডাকতে লাগল তাকে ঠিক মধুর সম্ভাষণ বলা চলে না। সে কি বলছিল আমি শুনতে পাইনি, তবে তার গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম লোকটা বিশ্রী মেজাজে রয়েছে। তাকে দেখে জিতানার মুখে বিস্ময় বা ক্রোধ কিছুই প্রকাশ পেল না। বরঞ্চ সে তার কাছে ছুটে গিয়ে আমার সামনে যে ভাষা ব্যবহার করেছে সেই ভাষায় গলগল করে কথা বলতে লাগল। একমাত্র পায়লো কথাটাই আমি বুঝতে পারলাম। এই শব্দটা বলাও হচ্ছিল বারবার। আমি জানতাম বেদেরা নিজেদের মধ্যে পরদেশীকে পায়লো বলে। মনে হল আমাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। আমি একটা অপ্রীতিকর বোঝাপড়ার জন্য তৈরী হতে লাগলাম। ইতিমধ্যেই এক হাতে একটা টুলের পা বাগিয়ে ধরে ঠিক কোন মুহূর্তে ওটা আগন্তুকের মাথায় ছুঁড়ে মারতে হবে মনে মনে আঁচ করছিলাম। আগন্তুক রূঢ়ভাবে বেদেনীকে সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। তারপর এক পা' পিছিয়ে গিয়ে বলল, মঁসিও আপনি?

এবার ওর দিকে তাকিয়ে ওকে চিনতে পারলাম—আমার বন্ধু ডন জোসে। অনুতপ্ত হলাম কেন ওকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচিয়েছিলাম। দেঁতো হাসি হেসে বললাম, তুমি? সেই নওযোয়ান! তুমি অসময়ে মাদমোয়াজেলকে বাধা দিয়েছ। মাদমোয়াজেল এখন আমাকে অনেক মজার কথা বলতে যাচ্ছিলেন। জোসে ভয়ংকর দৃষ্টিতে কারমেনের দিকে তাকাল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, চিরকালের স্বভাব। এবার যাবে।

তবু বেদেনী ওর ভাষায় জোসেকে কি সব বলতে লাগল। ক্রমে ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওর চোখ হয়ে উঠল রক্তজবার মত লাল। দেহের রেখা কুঁকড়ে গেল, পা ঠুকতে লাগল মাটিতে। সে অত্যন্ত

---

২০। স্পেনের বেদেনীকে সাধারণত জিতানা বা জিতানিল্লা বলা হয়।

২১। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক। মেরিমে তাঁর Recueil des Dames বইয়ের কথা বলছেন।

২২। বেদেদের ভোজবাজি সম্পর্কে মেরিমের চিঠি (Correspondance Generale-tome V)। স্পেনের বেদেরা ভোজবাজির জন্য তরবারি, কাপ, লাঠি ও স্বর্ণমুদ্রা আঁকা বড় তাস ব্যবহার করে। কফির তলানিতে ও সীসার টুকরা জলে ফেলেও ওরা অদৃষ্টের লিখন পড়ে।...কিন্তু তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ভোজবাজির একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে একটি চুম্বকপাথর, যাকে ওরা বলে বার্‌কাসি বা ভাল পাথর।

ব্যগ্রভাবে জোসেকে কিছু করতে তাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু জোসে দ্বিধা করছিল। চিবুকের নীচে ওর ছোটখাতের ক্ষিপ্রবেগে যাওয়া-আসা দেখে ব্যাপার কি আর বুঝতে বাকি রইল না। কথাটা হচ্ছে কোন লোকের গলা কেটে ফেলা নিয়ে—আর সেই গলাটা যে আমার এমন সন্দেহ অমূলক বলে মনে হল না। এই বাক্যস্রোতের জবাবে জোসে কাঠখোট্টা গলায় দু-একটা কথা বলছিল মাত্র। শেষে মেয়েলী জোসের দিকে গভীর ঘৃণাভরা দৃষ্টি মেলে ঘরের এক কোণে তুর্কী পদ্ধতিতে বসে পড়ল। একটা কমলালেবু বেছে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে খেতে লাগল।

দরজা খুলে ডন জোসে আমাকে হাতে ধরে বাইরে নিয়ে এল। দুজনে নিঃশব্দে দুশ' পা হাঁটলাম। তারপর জোসে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল—সোজা হেঁটে গেলে আপনি পুলের কাছে পৌঁছে যাবেন। জোসে তখনি পিছন ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশ মনমরা হয়ে বিশ্রী মেজাজে সরাইয়ে ফিরে এলাম। আরো খারাপ লাগল যখন জামা-কাপড় ছাড়বার সময় টের পেলাম—ঘড়িটা খোয়া গেছে। নানা কথা ভেবে পরদিন সকালে ঘড়িটা উদ্ধার করার কোন চেষ্টা করলাম না বা করেজিদরকে২৩ ওটা খুঁজে বার করার কথা বললাম না। কনভেন্টে পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করে সেভিল রওনা হলাম। কয়েক মাস আন্দালুশিয়ায় ঘোরাঘুরির পর মাদ্রিদ ফিরে যাওয়ার পথে কর্দোভা হয়ে যেতে হল। এখানে বেশিদিন থাকার ইচ্ছা ছিল না। কারণ এই সুন্দর শহর আর গুয়াদালকুইভিরের স্নানার্থিনীদের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। তবু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কিছু কারুকর্ময় মুসলমান রাজাদের এই প্রাচীন রাজধানীতে কয়েকদিন থাকতেই হল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

২৩। স্পেনের শহরের শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

## হঠাৎ বৃষ্টি

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

এই তো সবুজ মাঠে সোনা রোদ ভরে ছিল দুরন্ত দুপুরে
রিম্ ঝিম বৃষ্টি এলো শ্রাবণী নূপুরে,
চারদিক ছেয়ে গেছে বৃষ্টি সুরে মেঘলা মেজাজে
পাতা দোলে গাছ দোলে বাতাসের কাজে
সোনালী দিনের স্বপ্ন লীন হয় ফ্যাকাসে আলোয়
পুঞ্জিত বাসনা ভরা ও মেঘ কালোয়;
অথচ একটু আগে রোদ ছিল সোনার সকালে
এখন হঠাৎ বৃষ্টি শ্রাবণের কালে।

মেঘ বৃষ্টি সৃষ্টিময় আশ্চর্য আকাশ
চাপা আলো উপচে আসছে এক রাশ
নবীন চোখেই দেখি সবুজের রঙ কত পাতায় পাতায়
ঝরে ঝরে তার 'পরে বৃষ্টি ঝরে যায়,
দু একটা কাক শুধু ভিজে থাকে ডালে আর ডালে
পায়রা অনেক আছে ও বাড়ির চিলে কোঠা ছাদের আড়ালে।
এপাশে ওপাশে থাকে চড়ুই অনেকগুলো ঠিক
ডানা ঝাড়ে ফুরফুরে শরীরটা ফুলিয়ে অধিক।

বৃষ্টি এলো কাঁচের সার্সিতে
টিপটাপ সুর ঝংকৃতে
আমি বসে চেয়ারেই ঝুঁকেছি টেবিলে
চোখ চাই দূরে দূরে পথে জল বৃষ্টিরই বিলে,
কালো ছাতা সেখানে কত না
শাড় আর ধুতি যত সামলে সুমলে দেখি দ্রুতই চলনা;
জলে জলে ভরা পথ ঘাট
জল ঝরা ঝারি ঝারি মানুষের আজকে বিভ্রাট।

## সন্ধ্যায়

শান্তিময় ঘোষাল

সন্ধ্যা নামে—
রজনীগন্ধা অন্ধকারে ঐঠ কেঁপে।
বাসর ঘরের দ্বারের কাছে,
অবগুণ্ঠিতার মত তুমিও হয়তো জেগে।
তোমার হৃদয় দ্বারে কে ছোঁয়া দিল।
সন্ধ্যায় জ্বালান দীপ,
আমার দেউলে কে নিভিয়ে দিয়ে গেল।
রাতে গাঁথা তোমার দেওয়া
শিউলী ফুলের মালা
আমার গলায় দোলে।

আমি জেগে থাকি।
রাত জাগা নিশাচরের মত
ডানা ঝাপটাই,
অন্ধকার ঘরের কোণটায় বসে।
যেখানে জানালা দিয়ে
এক ফালি চাঁদ আকাশের কোণ থেকে,
উঁকি দিয়ে যায়।

তোমায় নিবিড় করে,—
পাওয়ার স্বপ্ন আর দেখি না;
তোমায় ভুলে থাকার
কল্পনাও মনের মাঝে ধরা দেয় না।
এখানে দরজায় আগল পড়লো,
তোমার জানালা গেল খুলে,
এখানে নৌকা ঘাটে বাঁধা পড়লো,
ওখানে তোমার পালে হাওয়া লেগেছে।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনাবউদির বিশ্বাসে কোথাও ভুল হয়নি। ছেলে গণুদার সঙ্গে দেখা করেছে। রমণী পণ্ডিতের চিঠিতে স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ গণুদা আগেই পেয়েছে। ধীরাপদই লিখতে বলেছিল। আজ সে একটা বিমুখতা দমন করেই এসেছিল দেখা করতে। এসেও মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। কিছু বলতেও পারেনি। সোনাবউদির লেখা চিঠিটা শুধু তার হাতে দিয়েছে।

চিঠি পড়তে পড়তে গণুদা ঘরে বসেছে। পড়া শেষ করেও মুখ ফেরায় নি। না, ধীরাপদ আর রাগ করবে না। সোনাবউদিও সেই অনুরোধই করেছে। না করলেও চলত, শেষ পর্যন্ত রাগ থাকত না। মাঝের এই ওলট-পালটের অধ্যায়টা যেন সত্যি নয়। পরম নির্ভরশীলা বধূর ওপর অভিমানে অবুঝ স্বামী অনেক সময় যেমন মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে, তেমনি মুখ ফিরিয়ে বসেছিল গণুদা।

অনেকক্ষণ বাদে চিঠিটা ফেরত দিয়েছে, ফিরে তাকায়নি। বলেছে, তুমি ব্যবস্থা করো, সইটই যা দরকার আমি করে দেব।

চোখের কোণ দুটো থেকে থেকে আজ আবার সিড়-সিড়িয়ে উঠছে কেন? ধীরাপদ তাড়াতাড়ি উঠে চলে এসেছে।

তাড়াও ছিল। এখান থেকে সোজা অফিসে যেতে পারবে না। আগে বাড়িতে অমিতাভর কয়েকটা ওষুধ পৌঁছে দিতে হবে। আজ সকালেও বড় ডাক্তার দেখে গেছেন তাকে। তার উত্তেজনা বাড়ছে, অস্থিরতা বাড়ছে, নিজেরই বক্ষ বিদীর্ণ করে যেন হাউইয়ের আগুন ছুটিয়েছে সে। সেই আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলছে। ধীরাপদ দিনকে দিন উতলা হয়ে পড়ছে, ডাক্তার আনলেও সে ক্ষেপে যায়। ধীরাপদ তার মেজাজের ওপর মেজাজ চড়ালে তবে একটু ঠাণ্ডা হয়।

অফিসে আসতে সেই দেরিই হল। কিন্তু ভিতরে ঢোকার আগেই হঠাৎ নিস্পন্দ কয়েক মুহূর্ত। অদূরে গাড়ি বারান্দার নীচে বড় সাহেবের লাল গাড়ি। অপ্রত্যাশিত নন তিনি, যে কোনো দিন এসে পড়ারই কথা। তবু এ-রকম ধাক্কা কেন খেল ধীরাপদ নিজেও জানে না।

সিঁড়িতে সিতাংশুর সঙ্গে দেখা। ব্যস্তসমস্তভাবে নেমে আসছিল। দাঁড়াল।—আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? বাবা সেই থেকে আপনাকে খুঁজছেন।

উনি কখন এলেন?

কাল রাতে। ঘরে আছেন, যান—আমি একবার অ্যাটর্নির অফিসে যাচ্ছি।

নেমে গেল। এই নামা দেখে মনে হল তার বল-ভরসা বেড়েছে। ধীরাপদর ঊর্ধ্বগতি আরো একটু শিথিল হল।

বড় সাহেবের ওপাশের চেয়ারে লাবণ্য বসে আছে। থাকবে জানাই ছিল। ধীরাপদকে দেখে আর একদিকে মুখ ফেরালো। হিমাংশু মিত্র দরজার কাছ থেকে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ানো পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে দেখলেন তাঁকে।

বোসো।

তাঁর মুখোমুখি বসে ধীরাপদ সহজভাবেই বলল, আপনি কাল এসেছেন খবর পাইনি—

পাইপ-ধরা মুখে স্বাভাবিক কৌতুকের রেশ।—পেলে কি করতে? একটু থেমে হালকা অনুযোগ করলেন, এই ক'মাসে তুমিই বা ক'টা খবর দিয়েছ?

ধীরাপদ নিরুত্তর বটে, কিন্তু তিনি এসে পড়ায় শুধু ছেলে নয়, সে নিজেও এখন স্বস্তি বোধ করছে। এই একজনের উপস্থিতির প্রভাবই অন্যরকম।

ঘরে ঢুকলেন জীবন সোম। শুকনো মুখ। তাঁকে ডাকা হয়েছে বোঝা গেল। বড় সাহেব তাঁকে বসতে বলে শান্ত গাম্ভীর্যে নির্দেশ দিলেন একটা। পারফিউমারি ব্র্যাঞ্চে অভিজ্ঞ কেমিষ্ট দরকার, কাল থেকে তাঁকে সেখানকার কাজের ভার নিতে হবে। মাইনে এখানে যা পাচ্ছেন তাই পাবেন, আর ওই ব্র্যাঞ্চটা এই কোম্পানীর সঙ্গেই যুক্ত করা হচ্ছে যখন, এখানকার অন্যান্য সুবিধেগুলোও পাবেন। ওখানকার কাজ সম্পর্কে মোটামুটি একটু আভাসও দিলেন তাঁকে।

এই প্রয়োজন কেন হল জীবন সোম মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলেন না। বিদেশ থেকে ফিরে এক রাতের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে আর প্রসাধন শাখার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা স্থির করে ফেলেছেন দেখে ধীরাপদ মনে মনে অবাক। লাবণ্য একভাবেই অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আছে। বড় সাহেবের সঙ্কল্প তার জানাই ছিল মনে হয়।

পাঁচ মিনিটও নয়, জীবন সোম উঠলেন। বড় সাহেবের মুখের পাইপটা হাতে নামল।—আর একটা কথা, আমরা ব্যাংগ্লা করছি

বটে, কিন্তু নিয়মের বাইরে গিয়ে খুব একটা লাভ-টাভ কিছু করতে চাইনে—প্লীজ, রিমেম্বার।

জীবন সোম চলে গেলেন। পাইপটা আবার মুখে চালান দিয়ে বড়সাহেব অনেকটা নিজের মনেই বললেন, চারদিকে এত গলদ …আমি ঠিক জানতুম না। ধীরাপদর দিকে তাকালেন, তুমি জানতে?

লাবণ্যর মুখ এবারে আপনিই যেন এদিকে ফিরল একটু। পলকের দ্বিধা কাটিয়ে ধীরাপদ সহজ জবাব দিল, বরাবর তো একরকমই চলে আসছে দেখছি।

অর্থাৎ এত গলদ তার আমলের নতুন কিছু নয়।

তা'হলেও তুমি আমাকে বলতে পারতে। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে এ-প্রসঙ্গ ছেঁটে দিলেন তিনি।—অমিত এখন কেমন আছে?

অসুস্থতার খবরও পেয়েছেন বোঝা গেল।—ভালো না … খারাপের দিকেই যাচ্ছে।

কোন্ ডাক্তার দেখছেন, তিনি কি বলেন, ভাগ্নে কি করে কি বলে, সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন তিনি। চুপচাপ ভাবলেন একটু, তারপর উঠে দাঁড়ালেন।—চলো।

কোথায় যেতে হবে সঠিক না বুঝেও ধীরাপদ নীরবে অনুসরণ করল তাঁকে। চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় লাবণ্যরও নীরব বিস্ময় লক্ষ্য করেছে। দরজার কাছাকাছি এসে ধীরাপদর আর একবার ফিরে তাকানোর ইচ্ছে হয়েছিল। পারেনি।

লাল গাড়ি সুলতান কুঠির দিকে চলেছে। ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করছে। আধাআধি রাস্তা পর্যন্ত বড় সাহেব চুপচাপ শুধু পাইপ টেনেছেন, একটা কথাও বলেননি। ভাবছেন কিছু বোঝা যায়।

সোজা হয়ে বসলেন এক সময়।—এদিকের ব্যাপার সব কালই শুনলাম। লাবণ্যও এসেছিল। বউমা বললেন, তোমার কে একজন আত্মীয়া মারা গেছেন বলে তুমি চলে গেছ।

ধীরাপদ উৎকর্ণ। এটা কথা নয় কোনো, কথার সূচনা। বড় সাহেব আবারও নীরব বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু তারপর হঠাৎ যা বললেন তিনি ধীরাপদ তার তাৎপর্য খুঁজে পেল না।

—অমিতের জিনিসপত্র বাক্স-টাক্স সবই তো তার ঘরে পড়ে আছে দেখছি, কিছুই নিয়ে যায়নি নাকি?

না বুঝেও ধীরাপদ জানালো, হঠাৎ এসে পড়েছেন একদিন, এসে আর যেতে চাননি।

বড় সাহেব তার দিকে ফিরলেন।—অনেকদিন ধরে সে ব্যবসার যা-কিছু গলদ সব সংগ্রহ করেছে শুনলাম, ছবি-টবিও নাকি তুলে রেখেছে। তার ঘরে সে-সব কিছু নেই। তোমার দিদির কাছেও নেই শুনলাম।…ওই পার্বতী মেয়েটির কাছে থাকতে পারে, আর তা না হলে অ্যাটর্নির কাছে রেখেছে।

ধীরাপদ নিস্পন্দ, কাঠ হয়ে বসে রইল। কোন্ তাড়নায় তিনি সুলতান কুঠিতে চলেছেন মনে হতে বিতৃষ্ণায় ভিতরটা ভরে উঠতে লাগল ক্রমশ। যাচ্ছেন যার কাছে, এ প্রসঙ্গের আভাসমাত্র পেলে তার সমূহ ক্ষতি হতে পারে—এই আশঙ্কাও কম নয়।

কিন্তু ধীরাপদ ভুল করেছিল। সেখানে পৌঁছনোর খানিকক্ষণের মধ্যেই তার ভাবনা গেল, আড়ষ্টতা গেল। মনে করে রাখার মতই কিছু দেখল যেন সে।

অমিতাভ চৌকিতে শুয়ে ছিল। শুকলাল দরোয়ানকে দিয়ে ধীরাপদ একটা চৌকি আনিয়েছিল। মামাকে দেখে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক, ঠিক দেখছে কিনা সেই বিস্ময়।

কি রে, কেমন আছিস?

অমিতাভর চোখের দৃষ্টি বদলাতে লাগল, মুখ লাল হতে লাগল। ক্রুদ্ধ প্রতীক্ষা।

হিমাংশুবাবু এগিয়ে এলেন। দেখলেন। তাঁর এই দেখার চোখ দিয়েই ধীরাপদও যেন নতুন করে দেখল অমিতাভকে। শীর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত আত্মঘাতী একটা স্নায়ুর স্তূপ মনে হল। চকিত দুশ্চিন্তার ছায়া গোপন করে হিমাংশুবাবু তেমনি সহজভাবেই বললেন আবার, দোষ তো করলাম আমি, তুই এখানে পালিয়ে আছিস কেন?

একটা উদ্গত আবেগ দমনের চেষ্টায় অমিতাভ হঠাৎ পাশ ফিরে মাথা গোঁজ করে রইল।

হিমাংশুবাবু শিয়রের কাছে বসে একখানা হাত তার মাথায় রেখে নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন তাকে। পারলেন না। তেমনি হালকা সুরেই বললেন, কি হয়েছে তোর, কিছুই হয়নি। তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে নে, তোর পাল্লায় পড়ে জীবন সোমকে তো সরাতে হল, তুই শুয়ে থাকলে সব দেখে-শোনে কে?

অমিতাভ আরো শক্ত হয়ে পাশ ফিরে রইল তেমনি।

—ভালো হয়ে কি কি চাস তুই আমাকে একটা লিস্ট করে দে, নয়তো নিজেই সব ভার নে, আমি না-হয় লেখাপড়া করে দিচ্ছি। এ-ভাবে পাগলামি করে লাভ কি, শরীর নষ্ট শুধু। আর, অন্য দেশ থেকে একটা আবিষ্কার হয়ে গেছে বলে রিসার্চ তো সব ফুরিয়ে গেল না—

উঠে দাঁড়ালেন। ধীরাপদকে বললেন, তুমি আজকালের মধ্যে ওকে আমার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। ডাক্তারকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিও।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পিছনে ধীরাপদ। ওদিকের ঘরের দোরে উমা আর ছেলে দুটো দাঁড়িয়ে ছিল। সরে গেল। হিমাংশুবাবু চুপচাপ গাড়ি পর্যন্ত এসে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, কেস যদি হয় ওকে বাঁচানো শক্ত হবে, না যাতে হয় সেই চেষ্টা করো।

লাল গাড়ি চোখের আড়াল হয়েছে। ধীরাপদ দাঁড়িয়েই আছে। বিভ্রান্ত যেন।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ চারখানা হয়ে ফেটে পড়ল। উঠে বসেছিল, উত্তেজনায় আক্রোশে চৌকি থেকে নেমে দাঁড়াল।—আপনাকে খুব বিশ্বাস করেছিলাম, কেমন? আপনি কেন মামাকে এখানে নিয়ে এসেছেন? কেন? হোয়াই?

বসুন চুপ করে, বলছি।

আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, আপনি কেন তাকে এখানে নিয়ে এলেন? আমি থাকব না এখানে, আজই কোনো হোটেলে চলে যাব। আপনাকেও বিশ্বাস নেই আর—

চোখে চোখ রেখে ধীরাপদ অপেক্ষা করল একটু, ধীর গম্ভীর মুখে বলল, আমাকে বিশ্বাস না করলে আপনার চলবে?

অমিতাভর আরক্ত মুখ সাদা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। কিছু মনে পড়েছে। মনে পড়তে ধাক্কা খেয়েছে। চৌকিতে বসে পড়ে অস্ফুট-স্বরে বলল, আমার এখানে আসাই ভুল হয়েছে।

যেখানে শুধু সেরা জিনিষই প্রিয়...
পরিবারের জন্য মায়েদের পছন্দ ডালডা
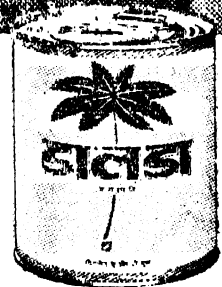
কিছু ভুল হয়নি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ঘর থেকে বেরিয়ে ধীরাপদ শান্ত মুখে উমা আর ছেলে দুটোর খোঁজে গেল।

বড় সাহেব আসার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরীর হাওয়া বদলেছে। ভরা গুমোটের মধ্যে দুই একটা দক্ষিণের জানলা খুলে গেছে যেন। বড় কিছু বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, সে-খবরটা চাপা ছিল না। চীফ কেমিস্টকে যে যতই পছন্দ করুক, ভালবাসুক—প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনায় সকলেরই সঙ্কট। এর মধ্যে বড় সাহেবের প্রত্যাবর্তন কিছুটা নিশ্চিত আশ্বাসের মতই। তাই তিনি আসা-মাত্র ফ্যাক্টরীর সমস্ত বিভাগের কাজে একটা সুগম্ভীর তৎপরতা দেখা গেল। ফলে গাছ থেকে পাকা ফল পড়ার মত ধীরাপদর টেবিলে টপাটপ ফাইল পড়তে লাগল।

এর মধ্যে অফিস সংক্রান্ত কোনো জরুরি কাজেও লাবণ্য স্বেচ্ছায় তার ঘরে আসবে, সেটা দুরাশা ছিল। তবু, তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেও হয়ত এতটা বিস্মিত হত না সে, তার আচমকা *বিস্ময়ের কারণ লাবণ্যর এই পদার্পণ ঘটল টিফিনের বিরতির সময়। অফিসের কাজে অন্তত এ-সময়ে কোনদিন ঘরে আসেনি সে। কখনো এলে হাল্কা কোনো প্রসঙ্গ নিয়েই গল্প-গুজব করতে এসেছে। কিন্তু সে-দিন অনেকদিন বিগত।*

এক-নজর তাকিয়েই ধীরাপদ নতুন কোনো ঝড়ের সংকেত দেখল। স্নায়ুগুলো সব আপনা থেকেই সজাগ সতর্ক হয়ে উঠল।

শিথিল পায়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। আসাটা নকল-পরা শত্রুর সামনে এসে দাঁড়ানোর মতই। ফাইল সরিয়ে রেখে ধীরাপদ সোজাসুজি তাকালো।

আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। যদিও ঠিক এখানে বসে বলার মত কথা নয়···।

কোথাও যেতে হবে?

মুহূর্তের জন্য তপ্ত শ্লেষের ঝলক নামল চোখে।—না, সে-রকম জায়গার অভাবে এখানেই বলার ইচ্ছে।

চেয়ার টেনে বসল। সংযমের আরো কয়েকটা অনড় রেখা পড়ল মুখে। বলল, বড় সাহেব কাল রাতে আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকেছিলেন। কোম্পানীর বিরুদ্ধে অমিতবাবু যা-কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন সেই সব তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করে আনার হুকুম হয়েছে আমার ওপর। তাঁর ধারণা দেখলাম এ-কাজটা বিশেষ করে আমাকে দিয়েই হতে পারে।

ধীরাপদ স্থির, নিশ্চল খানিকক্ষণ। প্রতিক্রিয়া যাই হোক, এই বলতে এসেছে ভাবেনি। নির্লিপ্ত জবাব দিল, ধারণা মিথ্যে নাও হতে পারে, চেষ্টা করে দেখো।

শুধু বলাটা নয়, তুমি বলার ব্যতিক্রমটাও কানে লেগেছে। নিষ্পলক চেয়ে আছে। মাথা নাড়ল একটু।—করব। কিন্তু কথায় কথায় এরপর আরো কিছু বলেছেন তিনি। বাইরে যাবার আগে তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে কিছু সংকল্পের আভাস তিনি আপনাকে দিয়েছিলেন মনে হয়। কিন্তু একদিন আমার ঘরে বসে আপনি আমাকে তার উল্টো বুঝিয়েছেন। মনে পড়ে?

মনে বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই পড়ছে। হৃৎপিণ্ডটা খেতলে দেবার মতই হাতুড়ীর ঘা পড়েছে। সেই একদিনের দহন পিপাসু পতঙ্গের মত্ততাও ভোলবার নয়। শিখাময়ীর মানসিক পরিস্থিতির সুযোগে সেদিন একটা মিথ্যেকে সত্যের খোলসের মধ্যে পুরে দিয়ে বড় সাহেবের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল ধীরাপদ। বলেছিল, পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব কিছু প্ল্যান আছে, সেখানে আর কোনো সম্ভাবনার কারণ ঘটে, সেটা তিনি চান না···। বলে পরোক্ষে সিতাংশুর সঙ্গে অমিতাভকেও জুড়ে দিয়েছিল সে।

লাবণ্যর নির্মম শাণিত দুই চোখ তার মুখে বিঁধে আছে। কিন্তু আজ এই ধাক্কাও সামলে নিতে ধীরাপদর সময় লাগল না খুব। সেদিনের তস্কর-বৃত্তি আজ দস্যু-বৃত্তির দিকে গড়িয়েছে। এই বোঝাপড়ার মুখোমুখি এসে দুর্বলতার বদলে বরং একটা দুর্দম তাড়না নিষ্পেষণ করে নিতে হল আগে। বলল, আমি লোক কেমন তোমায় জানতে বাকি নেই। আজ সোজাটা বুঝে ফেলেছ যখন, ভাবনা কি··

সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য ছিটকে উঠে দাঁড়াল। টেবিলের একটা *ফাইল তুলে সজোরে মুখের ওপর মেরে বসাও বিচিত্র ছিল না। চোখের আগুন কণ্ঠে নেমে এলো।—আপনি অতি নীচ, অতি হীন! এর ফল আপনাকে আমি বুঝিয়ে ছাড়ব।*

জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতই ঘর ছেড়ে সবেগে প্রস্থান করল সে।

ধীরাপদ ফাইল টেনে নিল। কিন্তু একটু বাদেই সেটা ঠেলে সরিয়ে দিল আবার। শুধু সেটা নয়, সবগুলোই। কোনো জড়-বস্তু হাতের কাছে রাখা নিরাপদ বোধ করল না। মাথাটা কি এক সংহার-বাষ্পে ভরাট হয়ে উঠছে। দেবে সকলের সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা সব অভিলাষ ধূলিসাৎ করে? সে তাই পারে এখন, সব-কিছু রসাতলে পাঠাতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান, এই অস্তিত্ব ভস্মস্তূপে পরিণত হলেই বা ক্ষতি কি! ক্রূর তন্ময়তায় ধীরাপদ দেখছিল কি। বিষম চমকে উঠল।

ভস্মস্তূপের মধ্যেও অমিতাভর মুখখানা জ্বলজ্বল করছে।

বিকেলের দিকে বড় সাহেব টেলিফোনে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। নতুন কিছু নয়। এই ডাকাডাকি দিনকে দিন বাড়বে এখন।

নীচে মানুকে কুশল প্রশ্ন করল প্রথম, দোতলার সিঁড়ির মুখে কেয়ার-টেক্‌বাবু। শেষে বউরাণী আরতি। কিন্তু সে যে কুশলে আছে মুখের দিকে চেয়ে সেটা বোধহয় বিশ্বাস হল না। মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে আরতি বলল, সেই গেছেন আর এই এলেন, আপনার শরীরও তো ভালো দেখছি না।

ধীরাপদ লক্ষ্য করল মুখের সেই ধারালো ভাবটা মিলিয়েছে। মিষ্টি, কমনীয় লাগছে মুখখানা। বড় সাহেবের বটের ছায়াই বটে। আজ কেন জানি তুমি বলতেও বাধল না মুখে। হেসে বলল, না, ভালই আছি, তুমি ভালো আছ?

আরতি হাসিমুখে মাথা নাড়ল, ভালো আছে।

বড় সাহেব বিশেষ কোনো প্রয়োজনে আসতে বলেন নি তাকে। ভায়ের খবরাখবর নিলেন। দরকার হলে আরো বড় ডাক্তার ডাকতে বললেন। গতকাল তিনি চলে আসার পর সে কিছু বলল কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। বিভূতি সরকারের ব্যক্তিগত নামে আর সপ্তাহের খবরের নামে উকীলের নোটিস পাঠাতে বললেন। নিজেদের

অ্যাটর্নির পরামর্শ অনুযায়ী খাতা-পত্র হিসেব-নিকেশের ব্যাপারে কিছু উপদেশ দিলেন।

একটানা অনেকগুলো কথা বলে পাইপ ধরালেন তিনি। ইতিমধ্যে আরতি জলখাবার রেখে গেছে। চা দিয়ে গেছে। ফলে ধীরাপদর কথা বলার দায় এড়ানো সহজ হয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্য করছে। গত কালের থেকেও বেশি চিন্তাচ্ছন্ন, গম্ভীর লাগছিল। এখনো অন্যমনস্কের মত পাইপ টানছেন আর ভাবছেন কিছু। পরক্ষণে প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দেহের প্রতি ইন্দ্রিয় সজাগ, উন্মুখ—ধীরাপদ আর একটা খবর শুনছে।

পাইপ-মুখে বড় সাহেব তার দিকে আধা-আধি ফিরে বললেন, কাল রাতে লাবণ্য এসেছিল। অমিতের সম্পর্কে আমার ইচ্ছেটা তাকে জানিয়েছিলাম। বিয়েতে সে রাজি নয় দেখলাম। একটু থেমে তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বলো তো?

ধীরাপদ স্তব্ধ, নিরুত্তর।

তিনি আবার বললেন, তার অমত হতে পারে কখনো ভাবিনি···।

এই স্তব্ধতা লক্ষ্য করলেন না। আর জেরাও করলেন না। নিজেই অন্যমনস্ক তিনি।

পরদিন। ধীরাপদর জীবনের অনেকগুলো দিনের মত এই দিনটার পিছনেও কোনরকম প্রস্তুতি ছিল না।

যথাসময়ে অফিসে এসেছে। বেলা একটা নাগাদ উঠে পড়েছে। সেখান থেকে লাইফ ইন্‌সিওরেন্স অফিসে গেছে। বেরুবার সময় সোনাবউদির ট্রাঙ্ক খুলে পলিসি আর কাগজপত্র সব সঙ্গে নিয়েছিল। লাইফ ইন্‌সিওরেন্স অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে বিকেল। আর অফিসে না গিয়ে সুলতান কুঠিতে ফিরেছে।

ঘরে ঢুকে হতভম্ব। ঘরে কেউ নেই। শূন্য শয্যা।

ও-ঘর থেকে উমা ছুটে এলো। দু' চোখ কপালে তুলে সমাচার জ্ঞাপন করল।—ধীরুকা অফিসে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে সেই মেয়ে-ডাক্তার এসেছিল। প্রায় দু' ঘণ্টা ছিল অমিতবাবুর কাছে। তারপর চলে গেছে। তারপর অমিতবাবু পাগলের মত ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছে। তারপর বাইরে পায়চারি করেছে। সেই মূর্তি দেখে উমারা ঘরের মধ্যে থরথরিয়ে কেঁপেছে। ভাইদের নিয়ে রমণী জ্যাঠার ঘরে পালাবে কিনা ভেবেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অমিতবাবু জামা পরে, আর, কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেছে।

পায়ের নীচে মাটি দুলছে মনে হল ধীরাপদর। বিছানায় গিয়ে বসল। এবারে তার মুখ দেখেও উমা ঘাবড়েছে। কাঁদ কাঁদ গলায় বলে উঠল, তুমি এভাবে তাকিয়ে আছ কেন ধীরু-কা! কি হয়েছে?

সচেতন হল। উমাকে কাছে টেনে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কিছু হয়নি। আমি বেরুচ্ছি একটু, ভাইদের দেখিস—

উঠল। ভাববে না কিছু। আগে টেলিফোনে একটা খোঁজ নেওয়া দরকার কোথায় গেল। বিছানা ছেড়ে নড়া নিষেধ ছিল প্রায়। কোথায় যেতে পারে? ঘড়ি দেখল, সাড়ে পাঁচটা। উমার বর্ণনা যথাযথ হলে বেরিয়েছে যে তাও ঘণ্টা পাঁচেক হয়ে গেল।

···টেলিফোনের ওধারে কেয়ার-টেক বাবুর গলা। না, বড় সাহেব বাড়ি নেই। দুপুরে একজন মহিলার টেলিফোন পেয়ে খুব ব্যস্তমুখে বেরিয়ে গেছেন।···ভায়েবাবু? তিনি এখানে কোথায়! তিনি তো সেই কবে থেকেই উধাও!

ধীরাপদ রিসিভার নামিয়ে রাখল। দুপুরে একজন মহিলার টেলিফোন পেয়ে বড় সাহেব ব্যস্তমুখে বেরিয়ে গেছেন। আবার রিসিভার তুলল, নম্বর ডায়েল করল।···চারুদির গলা। গলাটা ভার ভার। জিজ্ঞাসা করার দরকার হ'ল না, তার সাড়া পেয়েই চাপা উত্তেজনায় বললেন, মস্ত বিপদ গেল, পার তো এসো একবার।

বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল ধীরাপদর। তারপর শান্ত।—কি হয়েছে বলো।

শুনল কি হয়েছে। অমিতাভর স্ট্রোক হয়েছিল। ঘণ্টা দেড়েক অজ্ঞান হয়ে ছিল। তারপর জ্ঞান হয়েছে। চারুদি নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন, তিনিও টের পাননি। পার্বতী তাঁকে ডেকে বলেনি পর্যন্ত। তার টেলিফোনে দু'জন বড় ডাক্তার এসে হাজির হতে টের পেয়েছেন। চারুদির ধরা গলায় উষ্মার আঁচ, মেয়ের সাহস বোঝো একবার। জ্ঞান হবার পরে ঘরেও ঢুকতে দেয়নি, ডাক্তার নাকি বারণ করে গেছে।···হ্যাঁ, খবর পেয়েই এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন, আবার আসবেন বলে গেছেন।

শেষের জবাব বড় সাহেবের প্রসঙ্গে। ফোন ছাড়ার আগে ধীরাপদই জিজ্ঞাসা করেছিল।

ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সচকিত হল। ক'টা ট্যাক্সি চোখের উপর দিয়ে চলে গেল ঠিক নেই। যা ভাববে না ঠিক করেছিল সেই ভাবনাটাই কখন আবার মগজ চড়াও করেছে। আবারও ছেঁটে দিল সেটা। হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সি থামালো। উঠল।···অমিতাভর স্বাস্থ্যের কথাই শুধু ভাবা উচিত এখন। স্ট্রোক হয়েছিল। দেড় ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিল। বড় বিপদের নিশানা ওটা। আবার এ-রকম হলে সামলে ওঠা কঠিন হবে।

চারুদির বাইরের ঘরে ঢুকতেই পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল। সিঁড়ির কাছে লাল গাড়ি দেখে বড় সাহেব আবার এসেছেন ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এখানে আর একজনও আসতে পারে ভাবেনি। নাটকের ছকে বাঁধা একটা দৃশ্য যেন। আর ঠিক এই মুহূর্তে এখানে তার নিজের অবস্থানও অনিবার্য ছিল সম্ভবতঃ। নইলে দশ মিনিট আগেও আসতে পারত, পরেও আসতে পারত।

চৌকাঠের ওধারে বারান্দার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বড় সাহেব। তাঁর পাশে লাবণ্য। সামনে চারুদি। তাঁর সামনে পার্বতী। কেউ যে এলো কেউ টের পায়নি। চারুদির চাপা ঝাঁঝালো উক্তি ধীরাপদর কানেও এসে বিঁধল।

—হাঁ করে দেখছ কি? যা জানার জেনেছ, এখন এদিকে এসে বোসো। সেই থেকে ঠায় দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরে ঢোকা নিষেধ। আমরা গেলে যদি ক্ষতি হয়? আমারা শত্রু না সব। এক মাত্র আপনার লোক তো শুধু ও!

ধীরাপদ নিজের অগোচরে এগিয়ে এলো একটু। পার্বতী কোনো দরজা আগলে দাঁড়িয়ে নেই, বারান্দার মাঝামাঝি চারুদির কাছেই দাঁড়িয়ে। বোধ হয় অমিতাভর খবর নেবার জন্যে তাকে ডাকা হয়েছিল। হয়ত, বড় সাহেব বা লাবণ্য রোগী দেখার জন্যে এগোতে এই বাধা। অবুঝ কর্ত্রীর ক্ষোভ সত্ত্বেও পার্বতীর মুখে রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, ঘৃণা নেই। সহনশীলা, কিন্তু কর্তব্যে বা সঙ্কল্পে অটুট।

তেমনি উষ্ণ গলায় চারুদি এবার বড় সাহেবের উদ্দেশে বললেন, তোমার ওই যে সব কাগজ-পত্র খুঁজছ—সেও ওই ওর কাছেই আছে বলে দিলাম। নইলে যাবে কোথায়? সরোষে পার্বতীর দিকেই ফিরলেন আবার।—কেস না হতেই এই, দরদ দেখিয়ে ছেলেটাকে মারবি? ভালো চাস তো কোথায় রেখেছিস বার করে দে সব! পরে ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে—

জবাবে পার্বতী বড় সাহেবের উদ্দেশে শান্তমুখে বলল, আমার কাছে কিছু নেই।

চারুদি আবারও ঝাঁঝিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগে বড় সাহেব এদিকে ফিরেছেন। ধীরাপদ দাঁড়িয়ে আছে দেখলেন। সেই সঙ্গে বাকি কজনেরও তার ওপর চোখ পড়ল।

কিন্তু ধীরাপদ শুধু লাবণ্যর দিকেই চেয়ে ছিল। তাকে দেখামাত্র লাবণ্যর দু'চোখ দপ করে জ্বলে উঠেছে। পলক না পড়তে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল সে। কাছে এসে দাঁড়াল। মুহূর্তের স্তব্ধতা দুখানা করে তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, কোম্পানীর বিরুদ্ধে অমিতবাবু এ পর্যন্ত যা কিছু সংগ্রহ করেছেন সেই কাগজপত্র, ছবি—সব বরাবর আপনার কাছেই ছিল, এখনো আপনার কাছেই আছে। দিয়ে দিন!

ঘরের মধ্যে একটা বাজ পড়লেও বোধ হয় এমন চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে থাকত না কেউ। চমক কতখানি লেগেছিল ধীরাপদ দেখেনি। এই নিস্পন্দ নীরবতা দেখল। বড় সাহেবের সমস্ত মুখ বিস্ময়াহত, চারুদি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন, বারান্দায় পার্বতীও ঘুরে দাঁড়িয়েছে আবার।

ধীরাপদ একটা সোফায় বসল। সব ভাবনা-চিন্তার অবসান। নিঃশব্দে শেষ দেখার অনুষ্ঠান যেন এটুকু। উত্তেজনা নেই, যাতনা নেই, ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই, পরিতাপ নেই। মাথা নীচু করে চিন্তা করে নিল কি, মুখে হাসির আভাস। উঠল। সকলের নির্বাক চোখের ওপর দিয়ে ভিতরের দিকে এগোলো।

বারান্দার একেবারে শেষ-মাথার ঘরটার দোর গোড়ায় পার্বতী দাঁড়িয়ে। ধীরাপদ ঢোকেনি কখনো, কিন্তু জানে কার ঘর ওটা। পার্বতীর ঘর। অমিতাভ ও-ঘরেই আছে তাহলে।

পার্বতী বাধা দিল না। সে ঘরে ঢুকতে ঘুরে দাঁড়াল শুধু। অমিতাভ এদিকেই চেয়ে আছে। তার চোখে চোখ রেখে ধীরাপদ হাসছে মৃদু মৃদু। হাসবে না তো কি, একেবারে ছেলেমানুষের চাউনি।

আমি তাহলে বিশ্বাসভঙ্গ করিনি। কি বলেন?

সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ ও-পাশ ফিরল। আর তাকাবে না তার দিকে।

ধীরাপদ অস্ফুট শব্দে হেসেই উঠল।—ও-দিক ফিরলেন কেন? ভালই তো করেছেন। আমি খুশি হয়েছি, বুঝলেন?

কিন্তু অমিতাভ ও-পাশ ফিরেই থাকল। ধীরাপদর সকৌতুক দৃষ্টিটা এবারে পার্বতীর মুখের ওপর এসে সজাগ হল একটু। পার্বতীর চোখে নীরব মিনতি।

ধীরাপদ বেরিয়ে এলো। বাইরের ঘরের সেই নির্বাক দৃশ্যের মধ্যে ফিরে এলো।—বসুন। আসছি।

বিশেষ করে কাউকে বলেনি। সকলের উদ্দেশেই বলেছে হয়ত। কারো অনুমোদনের অপেক্ষা না করে বড় সাহেবের লাল গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসল।—চলো।

সুলতান কুঠি।

পড়ার বই হাতে উমা ঠিকে রাঁধুনীকে রান্নার উপদেশ দিচ্ছে। তার ভাই দুটোও মেঝেতে দুটো বই খুলে বসে আছে। উমার কড়া শাসন। ধীরাপদর হাসি পেল। ও-মেয়ে বড় হলে আর একটি সোনাবউদি হবে। চমকে উঠল, না, সোনাবউদি হয়ে কাজ নেই!

পায়ের শব্দে উমা ফিরে তাকিয়েছে। ধীরাপদ নিজের ট্রাঙ্ক খুলে কাগজপত্রের ফাইলটা বার করল। ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে যাবতীয় নিদর্শনের সেই ফোটো অ্যালবামটাও। নিশ্চিন্ত লাগছে। ভারী হাল্কা লাগছে। নিয়তি যেন তাকে দিয়ে ঘাতকের কাজ করিয়ে নিতে যাচ্ছিল। বাঁচোয়া। প্রতিষ্ঠানের সবগুলো প্রত্যাশী মুখ-চোখে ভাসছে। আর আশ্চর্য, সকলকে ছাড়িয়ে তানিস সর্দারের কালো বউয়ের খুশি-ঝরা মুখখানা সব থেকে বেশি ভাসছে চোখের সামনে। ট্রাঙ্ক বন্ধ করে ফাইল আর অ্যালবাম হাতে উঠে দাঁড়াল।

উমা বাধা দিল, তুমি কি আবার বেরুচ্ছ নাকি!

ঘুরে আসছি। রান্না হলে তোরা খেয়ে নিস।

শীগ্‌গিরই ফিরবে তো না কি?

যেতে গিয়েও ধীরাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে তাকালো। একটা উদ্গত অনুভূতি যেন ধীরাপদর গলা দিয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে। অনেক হারিয়ে ওইটুকু মেয়েরও বুকের তলায় অজ্ঞাত ভয় কিসের।

হঠাৎ ধমকেই উঠল উমাকে, ফিরব না তো যাব কোথায়? শীগ্‌গিরই আসছি—

ধীরাপদ হনহনিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

## ২২

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... রাত গভীর এখন। আমি, হীরাপদ চক্রবর্তী, নতুন করে আবার সংসারের হাটের ছবি ভরতি করতে চলেছি। কথা সাজাচ্ছি, ব্যথা নিঙড়ে তুলছি, হাসির বুদ্বুদ ফোটাচ্ছি, কান্নার আবর্তে ডুব দিচ্ছি। ভাবছি এরই নাম সার্থকতা। চোখ ফেরালেই দেখা যায় বুঝি। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় বুঝি। কিন্তু যায় না। ওটা আলেয়া। যত কাছে যাও, ওটা নড়বে সরবে, ওর রঙ বদলাবে রূপ বদলাবে আকার বদলাবে! জীবনের কটা বাঁক ঘুরে আবারও একদিন হঠাৎ এমনি করেই থমকে দাঁড়াতে হবে জানি। কিন্তু সে কবে আমি জানতে চাই না। এই কালটাই তো অন্ধকার গোলক-ধাঁধার মধ্যে পড়ে আলেয়ার হাতছানি সম্বল করে পথ খুঁজে মরছে। আমরা বিচ্ছিন্ন হব কেমন করে? কাল যদি আলেয়া, আশা করতে দোষ কি আমারও এই দিন-জাগা রাত-জাগা লেখনীর কথাগুলো থেকে যাবে? প্রাণী মাত্রেই নাকি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরের বিচরণ শেষে শিব আর সুন্দরের জগতে পৌঁছুবে একদিন। কালের বিধিলিপিও তাই। সুলতান কুঠির নিভৃতি রাতে আমি সেই সুন্দরের জগতটা দেখে নিতে চেষ্টা করছি জেনে যে হাসছে হাসুক। ভাবতে ভালো লাগছে, আলেয়াশূন্য সেই সুদূর সুন্দরকালের মানুষেরা আছে আর আমার এই কথার স্তূপ তাদের কানে পৌঁছেছে। কিন্তু এই আলেয়ার ইতিবৃত্তের মধ্যে বিচরণ করে সেই সুন্দর মানুষেরা কি শিউরে উঠবে, এত উঁচু নীচু এত বিবাদ এত বৈষম্য দেখে তারা কি বর্বর ভাববে আমাদের, এই অশান্ত লোভ, এই কামনা-বাসনার আবর্ত দেখে তারা কি ঘৃণায় কুঁচকে উঠবে? নাকি, যুদ্ধমান এই আমাদের হাড়-পাঁজরের ওপর, ধ্বংসস্তূপের ওপর একদিনের এই আলেয়া-অন্ধ অসম্পূর্ণ লোকালয়ের বিরাট ভস্মস্তূপের ওপর তাদের সেই সুন্দরের জগৎ গড়ে উঠেছে জেনে শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় চোখগুলি তাদের চিকচিকিয়ে উঠবে? তাদের সেই সম্পূর্ণতার মধ্যে ভাগ্যহত কালের একটি সোনাবউদিকেও কি তারা নিঃশব্দে খুঁজে বেড়াবে না?

কে? সোনাবউদি? অনেকক্ষণ ধরে বাতাস-ভরাট ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে তোমার গলার রেশ কানে আসছে। তুমি কি আছ কোথাও? নিঃশব্দ পায়ে আমার চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছ? হাসছ মুখ টিপে?

যত খুশি হাসো, কিন্তু তোমাকেও আলেয়ামুক্ত ভাবিনে আমি। তোমার আকাঙ্ক্ষা তুমি তোমার ছেলেমেয়ের মধ্যে রেখে গেছ, দশ হাজার টাকার একটা সার্থকতার থলে তোমার চোখেও বড় হয়ে উঠেছে। তাদের আমি ভোলাতে চেষ্টা করব তোমাকে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখে এসো কেমন নিশ্চিন্তে নিঃশঙ্কে আর একজনের বুকে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে তারা। আমার কথা আমি রাখব, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে। উমার ভালো বিয়ে দেব, ছেলে দুটোকে মানুষ করব। তারপরেও বলব, তুমি আমার ওপর অন্যায় করেছ, অবিচার করেছ। এমন আর কেউ করেনি। এই যাতনা তুমি বুঝবে না, রণু বুঝবে। দেখা হলে তার কাছ থেকে জেনে নিও কত বড় অন্যায় কত বড় অবিচার তুমি আমার ওপর করেছ।
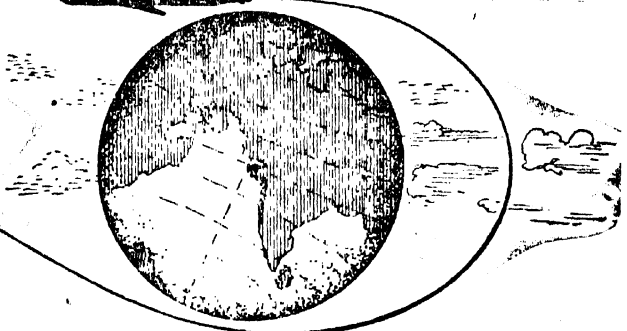
সুলতান কুঠির এটা শেষ রাত। কাল ভোরে আমাদের যাত্রা। মালপত্র সবই চলে গেছে। রাত পোহালে আমরা যাব। নতুন বাড়িতে উঠব। নতুন বাড়ি, নতুন জীবন, নতুন মিছিল, নতুন আলেয়া। শকুনি ভট্টাচার্যের স্মৃতি তো অনেকদিনই মুছে গেছে, একাদশী শিকদারের স্মৃতিও নিশ্চিহ্ন। কোথায় কোন্ আশায় তিনি বুক বেঁধে আছেন এখন আমার জানা নেই। বছর কয়েক আগে সপরিবারে রমণী পণ্ডিতও উঠে গেছেন। ওদিকটা ভেঙ্গে পড়ার আগেই। তাঁর দিন বদলেছে। ভাগ্য গণনার জমাট পসরা খুলে বসতে পেরেছেন। গোড়ায় বাসনার আলেয়া-মুগ্ধ সর্বেশ্বর বাবু রসদ যুগিয়েছেন। তারপর পথ আপনি খুলেছে। দিন ফিরেছে রমণী পণ্ডিতের। দোরে সারি সারি মোটর দাঁড়ায় এখন। মেয়ে কুমুকে সেক্রেটারী করেছেন। দিনের হাল জানেন পণ্ডিত। মেয়েটা সুন্দর হয়েছে দেখতে, ভর-ভরতি। দেখেছি একদিন। আমাকে দেখে কত আদর-যত্ন করবে ভেবে পায় না। পণ্ডিতও খাতির করেছেন। আলোয়ার আলো নাগালের মধ্যে মনে হলে মানুষের উদার হতে বাধে না। কিন্তু তিনি উতলা এখনো, জায়গার সঙ্কুলান হচ্ছে না, মক্কেলদের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়, একটু জায়গা-জমি কিনে বসতে পারলে তবে সুরাহা। সুলতান কুঠিতে তাঁর বাসের স্মৃতি শুধু আমার চোখে লেগে আছে। কিন্তু আমরাও তো যাব। কতকাল ধরে কত মানুষ এমনি গেছে জানি না। আমাদের পরে আর কেউ যাবে না। বাড়িটা বাসের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কলকাতা বড় হচ্ছে। বড় কলকাতা এদিকেও আসবে। এই কঙ্কালটা মাটিতে মিশবে। তার ওপর নতুন ইমারত উঠবে। এখানকার এই নিশুতি রাত তখন ঝিল্লিমুখরিত হবে না, এই অন্ধকারের তপস্যা ঘুচে যাবে, এখানকার প্রথম উষায় ওই গাছগুলোর, ওই আঙ্গিনার, ওই কদমতলার বেঞ্চটার শিশির জলের স্নানব্রত সাঙ্গ হবে।

বড় সাহেবের স্বপ্ন সফল হয়েছে। পাগল ভাগ্নের জন্য তাঁর বুকের একটা দিক এখনো খালি কিনা জানি না। কি-বাবেই তিনি নিখিল ভারত ভেষজ সংস্থার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়ে চলেছেন। শীগ্‌গিরই আন্তর্জাতিক সংস্থারও গণ্যমান্য একজন হবেন শুনছি। তাঁর কারখানা আরো বড় হয়েছে, আরো অনেক ওষুধ তৈরি হচ্ছে। মানুষ কি রোগ-জরা-মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠবে একদিন?

কিন্তু চারুদি কি নিয়ে আছেন? বাড়ি নিয়ে? বাগান নিয়ে? বোধ হয় তাই। বোধ হয় সেই সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারত নিয়েও। ছেলের আকাঙ্ক্ষায় তিনি মেয়ে হারিয়েছেন। বহুদিন হল পার্বতী অমিতাভকে নিয়ে চলে গেছে। সে ভালো করে অসুখ থেকে সেরে না উঠতেই। কিন্তু কোথায় আছে তারা এখন? এই কালের জটিলতায় ছায়া পড়েনি পার্বতী কি এমন জায়গা তার জন্য খুঁজে বার করতে পেরেছে?

তাকে একটিবার দেখতে ইচ্ছে করে। অমিতাভ ঘোষকেও। আর সিতাংশুর বউ আরতিকে। আর তানিস সর্দারের কালো বউটাকেও। কিন্তু থাক। আমার মনে যেটুকু আছে সেটুকু অক্ষত থাক। এও আলেয়া কিনা কে জানে। দেখা না হওয়াই ভালো। দেখা একদিন রমেন হালদার আর কাঞ্চনের সঙ্গে হয়েছিল। দোকানেই দেখা হয়েছিল। তারা ব্যবসাটা আর একটু বাড়ানোর নেশায় মশগুল। আমি পালিয়ে এসেছি। পথে মানুকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল একদিন। কেয়ার-টেক বাবুর নামে আবার তার অনেক অভিযোগ জমে উঠেছে। আধাআধি শুনেই আমি পালিয়েছি। অম্বিকা কবিরাজের দোকানে গিয়েছিলাম, সেখানে তাঁর ছেলে দুই চোখে ক্ষুধার প্রদীপ জ্বেলে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছে। আমি পালিয়ে এসেছি। নতুন পুরনো বইয়ের দোকানে দে-বাবু এখনো শক্ত সমর্থ আছেন—আরো কত বই ছেপেছেন আর ছাপবেন সেই ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন তিনি।

আমি পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায়? নিজের কাছ থেকে পালাবো কেমন করে? এই নিটোল স্তব্ধ রাতে আমার মনে হচ্ছে, ওই আলেয়ার উৎসবের তলায় তলায় একটা পালানোর কান্নাও থিতিয়ে উঠছে, পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে। আকাশ শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার আলেয়ার লালে লাল হয়ে উঠেছে বলে সেই কান্নাটা তেমন করে অনুভব করা যাচ্ছে না এখনো। যাবে যখন তখন গতি হবে কি?···তবু বুকের তলায় কান পেতে শুনছি কি? ক্ষীণ আশ্বাসের মত এ কার ইশারা? কবেকার কোন্ অনন্ত কালের একটা স্মৃতি যেন অতি বৃদ্ধ জটায়ুর মত পাখা ভেঙে পড়ে আছে এখনো। তার মুখে বারতা আছে। সে যেখানে যেতে বলছে—সেটা এক বিস্মৃত ভারতের চতুষ্পথ···। সেখানে এক মহামৌনী সাগ্নিক বসে আছেন। মন বলছে, এঁরই কাছে মন্ত্র নিতে হবে। তোমাকে আমাকে সকলকে। সেই মন্ত্রে মুক্তি। তাঁর আলোয় এই আলেয়ার অভিশাপ ঘুচবে। যোগভ্রষ্ট কর্মের শিকল ভাঙবে।

··· ··· ··· ···

সকাল। রোদ চড়ছে। ধীরাপদ টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উমার ডাকে ঘুম ভাঙল। সে চা নিয়ে এসেছে। কাগজের স্তূপ টেবিলের ওপর বাণ্ডিল করে বাঁধা। কখন বাঁধা হয়েছে ধীরাপদ টের পায়নি। চায়ের পেয়ালা রেখে উমা পাকা গিন্নির মত তাগিদ দিল, বাবারে বাবা, কি ঘুম তোমার, চটপট চা খেয়ে তৈরি হয়ে নাও, আর আধঘণ্টার মধ্যেই তো বেরুতে হবে।

পেয়ালা রেখে ব্যস্ত পায়ে চলে গেল। ধীরাপদ উঠে ঘরের কুঁজোর জলেই মুখ-হাত ধুয়ে নিল। এরই মধ্যে পরিচিত ষ্টেশান ওয়াগনটাও এসে গেছে। চা খাওয়া হতে উমা পেয়ালা নিতে এসে আর এক দফা তাড়া দিয়ে গেল। কিন্তু ধীরাপদ অন্যমনস্কের মত বসে আছে আর হাই তুলছে!···ছেলে দুটোকে নিয়ে শুকলাল দরোয়ান গাড়িতে উঠে জাঁকিয়ে বসল। টিফিন্ ক্যারিয়ার হাতে উমাকেও দেখা গেল তাদের পিছনে।

লাবণ্য ঘরে ঢুকল। জিনিষপত্র সব গোছগাছ করে সেও একটু বেশি রাতে শুয়েছিল। চোখে-মুখে এখনো ঘুমের দাগ লেগে আছে। বলল, কি কাণ্ড, এখনো রেডি হওনি তুমি?

ধীরাপদ তাড়াতাড়ি উঠে দেয়ালের হুক থেকে জামাটা টেনে নিল।—রেডিই তো।

লাবণ্য কাগজের বাণ্ডিলটা হাতে তুলে নিয়ে মুখ টিপে হাসল একটু।—সমস্ত রাত বুঝি লিখেই কাটল?

ধীরাপদ জামা গায়ে চড়িয়ে জুতো খুঁজছে।

নন্দার সৌন্দর্য্যের গোপনকথা...

'ত্বক সৌন্দর্য্যের জন্য
লাক্স-ই আমাদের পছন্দ'

রূপসী নন্দা বলেন—'লাক্স সাবানটি চমৎকার আর রঙগুলিও কি সুন্দর!'

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 121-X52 BO

—বেলা হয়ে গেলো, তাড়াতাড়ি করো। কম করে এক ঘণ্টার পথ এখান থেকে।

চলো।

গাড়ি সুলতান কুঠির আঙিনা ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। ছেলে দুটো শুকলালের গল্প শুনছে। উমা উৎসুক চোখে রাস্তা দেখছে। লাবণ্য নতুন বাড়ির কথা বলছে।···সবে একতলা হয়েছে, দোতলার সবটাই বাকি। তারপর আরো কত ঝামেলা, কত কাজ।

সোৎসাহে বড় ব্যাগটা খুলে বাড়ির ব্লু-প্রিন্ট বার করল সে। টা সঙ্গেই থাকে। নক্সা আঁকা মস্ত নীল কাগজটা খুলে তার কে ঝুঁকল। বলল, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে একদিনও তো য়ে দেখলে না।···দোতলায় এই এতগুলো ঘর হবে। এইটা মনের বারান্দা। ভিতরেও একটা ঢাকা বারান্দা থাকবে—এই যে।

ধীরাপদ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। ভালো লাগছে।

দেখছ না?

দেখছি, বলো। তোমার চেম্বার কোন্‌টা?

বা রে! আমার চেম্বার তো নিচে! এই তো। এটা চেম্বার, এটা বসার ঘর—অবশ্য আপাতত আলাদা করে কিছুই হবে না—নিচেই তো শুতে হবে এখন। তারপর ওপরে দেখো। এদিকের এই বড় ঘরটা আমাদের, এর পাশেরটায় উমা ওরা যে-যে শোয়—মাঝখান দিয়ে দরজা আছে। ওদিকেরটাও ওদের, বড় হলে তো আলাদা ঘর লাগবেই। আর এ-পাশ দিয়ে ঘুরে এই কোণের ঘরটা তোমার লেখা-পড়ার ঘর। বেশ নিরিবিলি হবে—

ধীরাপদ নীল কাগজটার কিছু বুঝছেও না, শুনছেও না, দেখছেও না। লাবণ্যর দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে শুধু। আসলে তাকেই দেখছে। হঠাৎ হাসিই পেল তার। আবারও মনে এই কাল আলেয়া।

**সমাপ্ত**

## ব্যর্থ আশা

### শ্রীইলা দত্ত চৌধুরী

তুমি যেন এক ভাস্বর প্রতিমূর্ত্তি
আর আমি তব—
এক কঠিন প্রকাশ।
দিনান্তের অলস সন্ধ্যায়—
রূপোলি তারার কাজ
যখনও হয় না সারা,
আমার প্রদীপ জ্বলে
অপস্থয় ছায়াপটে—
প্রহরান্তের চরম অপেক্ষা।
প্রকাশ্যে দূতীরা এসে,
এঁকে দিয়ে যায়
কল্পনার আল্পিন।
আমি থাকি চেয়ে
দিক্‌হারা দিগন্তের পানে,
খুঁজে ফিরি, জানি পাবো না যা।
রাতের আসরে তখন শেষ আয়োজন,
আমি যেন কালে-ভাসা
রাত জাগা পাখী,
স্বপ্নের সন্ধান দেই উন্মুখ হৃদয়ে
জাল বুনি সামান্য বিস্মৃতির।
তখন তোমার দীপ
দূরে জ্বলে জ্বলে,
নীলিমায় মিশে গেছে কিসের পিয়াসে।
আরেক না জ্বালা দীপ,
আছে প্রতীক্ষায়
আমার বিবশ বেদনায়,
দীপ্ত হবে তাহার প্রকাশ।

## রবীন্দ্রনাথকে

### কান্তা দাশ

সোনালী আলোর প্রতি ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
অশ্রুর ধারা নীরবে কত মুছেছে বাংলা দেশ,
শিশির ছটায় তোমার শপথ আবেগে টলোমলো
পশুশক্তির ষড়যন্ত্রকে, করবে শুধু শেষ।

বেকারি-হতাশার সব জ্বালা মুছে মুছে
নতুন নতুন প্রহর হোয়েছি পার,
অসহায় হোয়ে ক্ষুধার জ্বালায় তবু
আমরা আজ, করবো না হাহাকার।

নয়নের জল নিজেকে হারিয়ে শুধু
মমতাতে যেন, তোমার প্রয়াসে আজ,
মহামিলনের, মধুর সেই, শাশ্বত জমলিনে
আমরা নেবো, আজকে তোমার কাজ।

কাব্য-গানের স্বপ্নঝরা হাসির মাধুরীতে
তুমি যেমন মুছেছিলে, বাংলার যত শোক,
আঁধার-মুছে, আনন্দেই, দুই চোখের তটিনীতে
আমরা জ্বালাবো স্নিগ্ধছায়ায় উজ্জ্বল দীপালোক,

মহৎ বলেই তোমার সব কাজ
ইতিহাসে শুধু, হবে গতিশীল,
কবি তোমার জন্ম তিথিতে তাই
ফুলের জলসায়, আকাশ খুসীতে নীল।

## পেশায় চাই নেশা

জীবনধারণের জন্যে মানুষের কোন না কোন পেশা বা জীবিকা চাই-ই। পরভৃৎ হয়ে বেঁচে থাকার ভেতর আনন্দ নেই—আজকের দিনে তা প্রায় চলেও না। শ্রম দিয়ে (সেই শ্রম কায়িকই হোক কি মানসিকই হোক) অর্থ রোজগার করতেই হবে—বেকারী সুস্থ মানুষের কাছে অসহ্য।

সমাজ-কাঠামো যেখানে অনুকূল নয়, সকল মানুষেরই সম সুযোগ সেখানে মিলে না, অন্ততঃ মিলবে বলে 'গ্যারান্টি' নেই। উপযুক্ত মানুষটি কর্মক্ষেত্রে ঠিক উপযুক্ত জায়গাটিতে যেয়ে পড়বেন, এই দাবী বা প্রত্যাশা অনেকের বেলাতেই অপূরণ থেকে যায়। এই অবস্থাতেও ভরসাহারা হ'লে চলবে না—মনের মতো পেশাটি গ্রহণ করবার জন্যে যোগ্যতা যেমন অর্জন করতে হবে, সেদিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টাও রাখতে হবে আপ্রাণ। সঙ্কল্প ও দৃঢ়তাই সিদ্ধিকে বহন করে আনতে পারে, এ বিশ্বাস না রাখলে নয়।

এক্ষণে কথা হলো, যিনি যে পেশাই গ্রহণ করুন, ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছাতেই হোক, সেখানেই নিজের দক্ষতা প্রমাণের জন্যে থাকতে হবে বিশেষ তাগিদ। পছন্দসই ভালো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে পূর্ব্বেকার পেশার বদবদল নিশ্চয়ই করতে হবে, কিন্তু নতুন জায়গাতে যেয়েও সেই একই লক্ষ্য থাকা চাই—কর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন।

চলতি প্রবাদই রয়েছে—পেশায় চাই নেশা। যে কাজটি করতে যাওয়া হবে, সেটায় পুরো মন না দিলে হতে পারে না। চাকরিক্ষেত্রে যাঁরা উন্নতি ও সাফল্যের দাবী রাখবেন, কাজের মধ্যে তাঁদের বৈশিষ্ট্য দেখাতে হবেই। ব্যবসাক্ষেত্রেও সে একই কথা—কাজের দারুণ নেশা থাকা চাই। উদ্যোগী ও নিষ্ঠাবান পুরুষ শেষ অবধি পিছনে পড়ে থাকেন না, এর বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

অবশ্য কর্মজীবনে যে পেশা বা জীবিকা বরণ করতে হবে, সেটা যদি মনের মতো মিলে গেলো, তাহলে কাজের নেশা কম-বেশি আসবেই। ক্রমোন্নতির জন্য উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাব সেখানে সহসা হওয়ার নয়। পেশাটি যদি স্বাধীন ব্যবসা না হয়ে চাকরি হলো, তা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিক থেকেও প্রয়োজনীয় উৎসাহ যোগানো চাই। এটা ঠিক থাকলে পেশার নেশা রয়েছে, এমন কর্মী-মানুষের পিছিয়ে পড়ার ভয় থাকে না, পরন্তু অর্থ রোজগার দিন দিন তার বাড়তেই পারে। মোটের ওপর, যে লাইনটিতে যাওয়া হবে, বিকল্প উন্নততর ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সেটা ছাড়া চলবে না। এখানে থেকেই কাজের উন্নতির সাধ্যমত প্রয়াস নিতে হবে আর তা সময়-সুযোগ ফুরিয়ে যাবার আগেই।

## উৎপাদিত পণ্য ও বাজার

কৃষিপণ্যই হোক আর শিল্পজাত পণ্যই হোক—উৎপাদনই বড় কথা নয়, উৎপাদনের পর সেই সব পণ্যের বাজার পাওয়াই বড় কথা। পণ্য-বাজার যত সম্প্রসারিত করা চলবে, মুনাফার অঙ্কও বাড়বার সম্ভাবনা থাকবে তত বেশি, এ ধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্ন যেটা থাকবে—কী উপায়ে উৎপাদিত পণ্যের বাজার পাওয়ার আশা করা চলতে পারে, নিত্য নতুন বাজার সৃষ্টি হতে পারে। এর একটি সোজা উত্তর—যে শিল্পপণ্যই উৎপাদনা করা হোক, বাজার পাওয়ার দাবী রাখলে পণ্যের মান ও উৎকর্ষের দিকে

কঠিন দৃষ্টি না রাখলে নয়। সর্ব্বোপরি পণ্যটির ব্যবহারিক উপযোগিতাও থাকা চাই কিংবা চট করে মন আকৃষ্ট করা চাই ক্রেতা-মণ্ডলীর। যেখানে এসবের অভাব ঘটবে সেখানে বাজার পাওয়া শক্ত, পেলেও তা সীমিত হবে এবং মান উন্নত না করা গেলে সেই বাজার স্থায়ী হবে না, সম্প্রসারিত হওয়া দূরে থাক।

আজকাল প্রতিটি দেশই শিল্প বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিশেষ সচেষ্ট। ভারতেরও এই দিকে চেষ্টার খুব কমতি নেই, অন্ততঃ পরাধীন আমলের চেয়ে এক্ষণে তা ঢের বেশি। এর লক্ষ্য আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো তো বটেই, কিন্তু আরও একটি লক্ষ্য এক্ষেত্রে রয়েছে—বিভিন্ন শিল্পজাত সামগ্রী বাইরে রপ্তানী দেওয়া, বহির্ভারতেও ভারতীয় পণ্যের বাজার পাওয়া। বৈদেশিক মুদ্রা অধিক পরিমাণে পাওয়ার প্রয়োজনেই সরকার এর ওপর জোর দিতে চাইছেন। এই বৃহৎ লক্ষ্য পূরণে সরকার ও শিল্পপতিদের সহযোগিতা চাই, পরিকল্পনার ঐক্য চাই। শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা আনতে পারে, এই জাতীয় শিল্পোদ্যমই কাম্য। সর্ব্বোপরি উৎপাদিত পণ্যের নিশ্চিত বাজার পাওয়ার লক্ষ্যটি রাখতেই হবে—তা দেশের অভ্যন্তরেই হোক, চাই কি দেশের বাইরেই হোক।

## পাদুকা-শিল্প ও ভারত

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাদুকা-শিল্পেরও উন্নতি হয়ে চলেছে আর তা অন্য দেশের ন্যায় এই দেশেও। আজকের দিনে সহরবাসী (ধনী-নির্ধন নির্বিবশেষে) সকলেরই পায়ে জুতা চাই। দূর গ্রামাঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যাবে বেশির ভাগ লোকেরই অন্ততঃ এক জোড়া করে চটি বা জুতা আছে। এই বিপুল চাহিদা মেটাবার জন্যেই পাদুকা-শিল্পের এতটা সম্প্রসারণ হয়ে চলেছে এবং এই অগ্রগতি সহসা বন্ধ হয়ে যাবারও নয়।

ভারতে যে-পরিমিত জুতা তৈরী হয়, তার সবটাই কিন্তু কারখানায় হয় না। ক্ষুদ্র ও কুটীর-শিল্পের মাধ্যমেই জুতা তৈরী হয় বরং বেশি। একটি হিসাবে দেখা যায় যে, এদেশে চামড়ার জুতা তৈরীর জন্য বৃহৎ কারখানা রয়েছে বারোটির মতো। কারখানাগুলো পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ—এই কয়টি রাজ্যে অবস্থিত। নানা ধরণের জুতা এই সমস্ত কারখানায়

তৈরী হয়ে থাকে—শুধু ভারতীয় ডিজাইনেরই নয়, পাশ্চাত্য ডিজাইনেরও।

সরকারী তথ্য ও হিসাব অনুসারে বর্তমানে এদেশে চামড়ার জুতা তৈরী হয় বছরপিছু দশ কোটি জোড়া। উৎপাদিত এই জুতার শতকরা ৯০ ভাগ জুতাই ক্ষুদ্র ও কুটীর-শিল্পের মাধ্যমে তৈরী হয়ে থাকে। বৃহদায়তন কারখানাসমূহে এখনও জুতা তৈরী হয় শতকরা বাকী দশ ভাগ মাত্র। জুতা তৈরীর জন্য কাঁচামাল হিসাবে চামড়ার প্রয়োজন প্রচুর। এই চামড়া অন্যান্য কাজেও দরকার হয় বলে পাদুকা-শিল্পের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চামড়া সরবরাহ বাড়ানো চাই-ই।

জাতীয় সরকার দাবী রেখেছেন—তৃতীয় পরিকল্পনাকালেই আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় জুতা উৎপাদন বাড়তে অনেকটা বেড়ে যেতে পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন না, পাদুকা-শিল্পের পর্যাপ্ত সম্প্রসারণ ঘটলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়বারই সম্ভাবনা। একণে বছরে উৎপাদিত দশ কোটি জোড়া চামড়ার জুতার মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ জোড়াই বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায়। এই থাতে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে থাকে, তার পরিমাণ প্রায় আড়াই কোটি টাকা।

চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের উন্নয়ন পরিষদ পাদুকা-শিল্প সংক্রান্ত একটি হিসাব জুড়েছেন। এই হিসাব থেকে জানতে পারা যায় যে, ১৯৬৫-৬৬ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষাশেষি ভারতে জুতার প্রয়োজন হবে ১৪ কোটি জোড়া। দেশীয় কারখানাগুলোতে এবং ক্ষুদ্র ও কুটীর-শিল্পের উদ্যোগে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে জুতা উৎপাদন প্রত্যাশিত পর্যায়ে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে দাবী রাখা হয়েছে। শুধু আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোই নয়, তৃতীয় পরিকল্পনাকাল শেষে চামড়ার জুতা উৎপাদন এতই বাড়ানো যাবে যে, ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ জোড়া জুতা বাইরে রপ্তানী করাও যাবে, অন্তত: চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পোন্নয়ন পরিষদ এই আশা রাখছেন। আর তা সম্ভব হওয়ার অর্থই হবে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া—বিভিন্ন পরিকল্পনায় রূপায়ণে যার প্রয়োজন অত্যধিক ও অপরিহার্য।

## ভুট্টার চাষ—কয়েকটি কথা

কৃষিপ্রধান দেশ এই ভারতে ধান, গম ইত্যাদির চাষ হয় ব্যাপক ভিত্তিতে, ভুট্টার চাষও কম জায়গা জুড়ে হয় না। বিহারাঞ্চলে এর চাষাবাদ তুলনায় বেশি, অন্যান্য রাজ্যেও এই খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়ে থাকে, যার গুরুত্বও স্বীকার্য্য।

ভুট্টার ভাল রকম চাষের জন্য জল চাই কিন্তু তা অপরিমেয় নয়। অতিরিক্ত জল জমা ( বর্ষার দিনে ) জমিতে যেমন এ ফসল বাঁচে না, তেমনি এর ফলনের মাত্রা কম হয় গরমের দিনে শুকনো মাটিতে। কিছুকাল থেকে বিহারে খরিফ খন্দে ( জুন থেকে সেপ্টেম্বর ) ভুট্টার প্রধান চাষ চলেছে। প্রথম বছরেই প্রায় ১১ লক্ষ একর জমিতে এই চাষ করে দেখা যায়, একর পিছু ফলন হয়েছে গড়ে ছয় মণ। শাহাবাদ জেলার একটি সেচন গবেষণাকেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে ভুট্টার চাষাবাদ করা হয় আর তা নভেম্বর থেকে মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে। বর্ষার জল দাঁড়াবার কিংবা অনাবৃষ্টির আশঙ্কা নেই—এই ভেবেই সময়টি বেছে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দেখা গেছে—ভুট্টা ভালই হবে।

অন্যান্য ফসলের ন্যায় ভুট্টার চাষের বেলাতেও জমিতে সেচ-ব্যবস্থা ও লাঙলের প্রয়োজন হয়। ভাল বীজ চাই—নিয়ম অনুযায়ী বীজ সমূহ দূরে দূরে লাগানোও চাই। গড়ে ১০ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে ভুট্টা গাছগুলো। বীজ বসানোর আগেই ভালো ফলনের জন্য জমিতে বিভিন্ন ধরণের সার ব্যবহার করতে হয়। নাইট্রোজেন, ফসফরিক অ্যাসিড, পটাশ—এসবও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে দেখা যায়।

ভুট্টার গাছগুলোতে প্রচুর ঘনপাতা জন্মে। ভাল ফলন যেখানে হয়, লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, প্রায় প্রতিটি গাছেই শীষ রয়েছে—শীষগুলো লম্বায় প্রায় ৮ থেকে ১১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত আর সেগুলোর বেড় ৬ থেকে প্রায় ৯ ইঞ্চি অবধি। প্রত্যেকটি শীষে দানার সারি থাকে সাধারণত: ১৪টি করে আর দানা পাঁচ শত থেকে প্রায় সাত শত পর্য্যন্ত। জোরদার জমি হলে এবং বীজ, সার ইত্যাদি প্রয়োগে কোন গোলমাল যদি না ঘটে, তা হলে ফলন বেশ ভালোই হয়ে থাকে।

রবি খন্দে ভুট্টার চাষের কথাই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলা হলো। দীর্ঘদিন থেকে একটা প্রশ্ন ছিল—রবি খন্দে এই চাষ চলে কিনা, কিংবা চললেও কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে এটা কতটা লাভজনক হতে পারে। শাহাবাদ জেলার সেচন গবেষণা-কেন্দ্রটিতে এর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা হয়েছে আর সেটা বেশি দিনের কথা নয়। এর জন্যে বীজ, সার, সেচ—এসবের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বীজ যেটা ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ছিল বেশি-ফলনদার 'টেক্সাস—২৬' জাতের ভুট্টার বীজ। ফলন নাকি আশাতীত হয়েছিল।

ভুট্টা চাষের জন্য যেটি চাই—আবহাওয়ার তাপের মাত্রা কম, বিহার এলাকায় তা পাওয়া যায়। সে জন্যেই রবি খন্দে ভুট্টা চাষের পরীক্ষাটি সেখানেই প্রথমে চালানো হয়। বস্তুত:, আবহাওয়ার তাপের মাত্রা নিম্নদিকে থাকলে ফসলে চট করে রোগ ধরতে পারে না, পোকার আক্রমণের আশঙ্কাও কম থাকে। পরীক্ষা শেষে বিশেষজ্ঞরা এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন : "রবি খন্দে শুধু যে ভুট্টার চাষ করা চলে তা-ই নয়, পরন্তু চাষাবাদের পর প্রচুর ফসল পাওয়া সম্ভবপর।" আজকের দিনে বিহারের বাইরেও এ পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলেছে বলে জানা যায়—কৃষিজীবী মানুষের কাছে যতই এ লাভবান বলে গণ্য হবে, সম্প্রসারণ ঘটবে এর সেই পরিমাণেই, এইটুকু বলা যায়।

An archæologist is the best husband any woman can get. Just consider : the older she gets, the more he is interested in her. —*Agatha Christie.*

# কোথায় বেড়াতে যাবেন?

সমর চট্টোপাধ্যায়

ভারতের রূঢ় অঞ্চল দেখতে যাবেন? না, বেশীদূর নয়; কোলকাতা থেকে বড় জোর ১১০ মাইল হবে—যাতায়াতেরও খুব সুবিধে। পশ্চিম জার্মানীর রাইন নদীর শাখা রূঢ় নদীর ধারে রূঢ় অঞ্চল অসংখ্য শিল্পে সমৃদ্ধ বলে আজ সারা বিশ্বে যেমন বিখ্যাত হয়ে আছে, বাংলা দেশের দুর্গাপুর তেমনি আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পনগরীর নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্বে তার মর্যাদার আসন পাকা করে নিয়েছে।

দুর্গাপুর ঐতিহাসিক শহর নয়, মাত্র কয়েক বছর আগে হাজার হাজার মানুষের শ্রমে গড়ে উঠেছে আজকের দুর্গাপুর। গঠন-যজ্ঞ অবিরাম চলছে এবং চলবেও আরও কয়েক যুগ। আর সব উপনগরীর সঙ্গে দুর্গাপুরের তফাৎ অনেক। সাধারণত একটি ভারী শিল্পকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জনপদ; কিন্তু দুর্গাপুর তা নয়; অসংখ্য শিল্পের জন্মভূমি হল এই দুর্গাপুর। অন্য জায়গায় যা নেই, দুর্গাপুরে তা সবই আছে। ছোট বড় যে কোন শিল্প গড়ে তোলার জন্যে যেমন মাটির দরকার, যেমন আবহাওয়া দরকার, যেমন পরিবেশ দরকার তা সবই ঠিক দুর্গাপুরে আছে। শিল্পের জন্যে চাই কয়লা, চাই বিদ্যুৎ—দুর্গাপুরে তারও অভাব নেই। মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে যানবাহনের যেটুকু সুবিধা প্রয়োজন, দুর্গাপুরে তার ব্যবস্থা যা আছে অন্য কোথাও এত সুবিধে নেই। রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে, পাশেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সরাসরি কোলকাতা—দিল্লী। নৌ চলাচলের জন্যে ডি. ভি. সি-র খালও প্রায় তৈরী। দুর্গাপুরের ওপর আজ সারা ভারতের দৃষ্টিই শুধু নিবদ্ধ নয়, বিশ্বের সেরা সেরা শিল্পসংস্থার কারিগর-বিশেষজ্ঞ অর্থ, জ্ঞান আর শ্রম নিয়ে আজ ছুটে আসছেন দুর্গাপুরে। কাজেই শুধু ভারতীয়দের কাছেই নয়, বিদেশীদের কাছেও আজ দুর্গাপুর পরম বিস্ময়ের বস্তু।

এক সময়ে এই দুর্গাপুর ছিল দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতদের দেশ; তাদের হিংস্র উল্লাসে আশেপাশের গ্রামগুলো তটস্থ হয়ে থাকতো। গভীর শালবনের মধ্যে এই সব ডাকাতদের আড্ডা ছিল, বন্য হিংস্র জন্তুদেরও আস্তানা ছিল এই জঙ্গলে। দুর্গাপুরে এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপরই এককালে কত যে ডাকাতি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ডাকাতদের ভয়ে দিনের বেলাতেও কেউ পথ চলতো না। বড় বড় গাছের গুঁড়ি কেটে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে তাই দিয়ে তারা অবরোধ সৃষ্টি করতো, রাত্রে মটর, লরী আটকে যাত্রীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তারা গভীর অরণ্যে ফিরে যেতো।

সেই দুর্গাপুরের দিকে দৃষ্টি পড়লো মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের, যেমনটি পড়েছিল কল্যাণীর দিকে। দুইটিই অবহেলিত উপেক্ষিত গ্রাম, অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করে ডাঃ রায় প্রমাণ করলেন একাগ্রতা, প্রচেষ্টা ও মানুষের শ্রম পাওয়া

নতুন নগর দুর্গাপুর
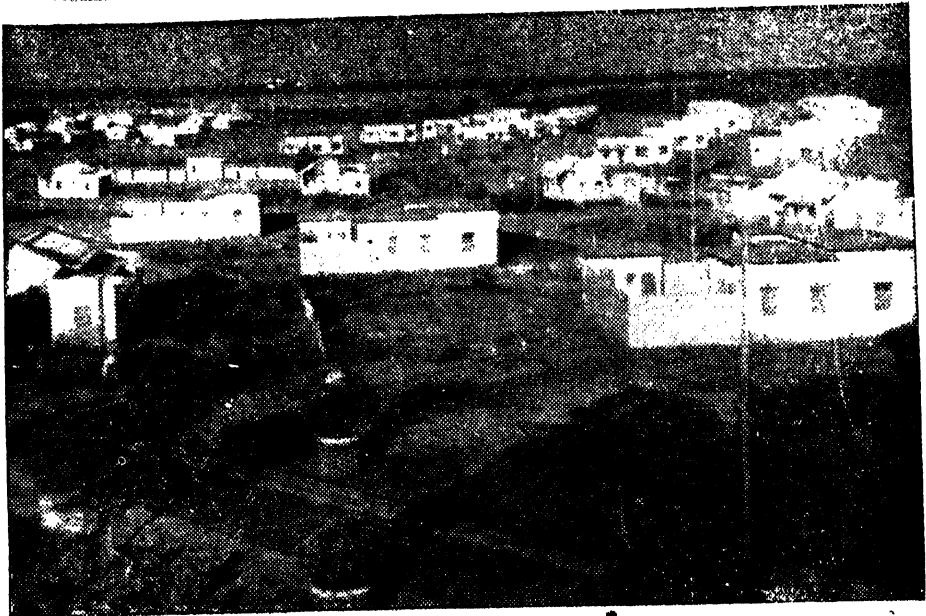
গেলে পিছিয়ে থাকা গ্রামকেও বিশ্বের সেরা সহরে পরিণত করা যায়। সেই সেরা সহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে দুর্গাপুরে; রাশি রাশি সম্ভার নিয়ে সদর্পে এগিয়ে চলেছে দুর্গাপুর বিশ্বের দরবারে।

কোলকাতা থেকে দুর্গাপুর ঘণ্টা চারেকের রাস্তা। ট্রেণও অনেক; ষ্টেশন থেকে নেমেই সহর—রাস্তা সবই প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। এই যে ষ্টেশনের কাছেই ছোট ছোট বাড়ীগুলি দেখছেন এগুলি ডি. ভি. সি. তৈরী করে দিয়েছেন। ডি. ভি. সি-র কর্ম্মচারীরা ছাড়াও বাইরের অতিথিদের থাকবার জন্যে ঘরও এখানে আছে। যদি ডি. ভি. সি-র ঘরে থাকতে হয় আগে থাকতে ডি. ভি. সি-র হেড কোয়ার্টার থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে আনতে হবে।

চলুন, আগে দামোদরের উপর ডি. ভি. সির ব্যারাজটি দেখে আসি। ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই ব্যারাজটির উদ্বোধন করেছিলেন। এত অনুপম দর্শনীয় ব্যারাজ খুব কমই আছে। ব্যারাজের উপর এই চওড়া রাস্তাটি বাঁকুড়া-বর্দ্ধমানের মধ্যে যোগাযোগের পথ করে দিয়েছে। ব্যারাজের নীচে স্লুইস গেটগুলি লক্ষ্য করুন। বর্ষাকালে এই স্লুইস গেটগুলি যখন খুলে দেওয়া হয় জলধারার *দুর্দ্দমনীয় বেগে শীর্ণ দামোদরে আবার প্রাণ সঞ্চার হয়। এককালে এই দামোদর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে বাংলা দেশের কত যে সর্ব্বনাশ করেছে তার হিসাব নেই। আজ সেই দামোদর মানুষের হাতে বন্দী। তার জল ঐ স্লুইস গেটগুলি দিয়ে বর্দ্ধমান, হাওড়া, হুগলী ও বাঁকুড়া অঞ্চলে চাষের জন্যে সুপরিকল্পিত-*ভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্যারাজের ওপাশে ঐ যে খালটি দেখছেন, ওটি বর্দ্ধমান ও হুগলীর নানা গ্রামের মধ্য দিয়ে সরাসরি গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই খাল দিয়ে বড় বড় নৌকা ও ছোট ষ্টীমার চালানোর পরিকল্পনা আছে। দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে যে সব মাল উৎপন্ন হবে, নদীপথে সরাসরি সেগুলি কোলকাতার জাহাজঘাটে বিদেশে বাণিজ্যের জন্য নিয়ে আসা হবে। খালটি খননের কাজ অনেকদিন ধরেই চলছে; কিন্তু কাজকর্ম্মে ত্রুটির জন্য নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। দুই বছর আগে পাল্লারোডের কাছে এই খালের ওপর ডি. ভি. সি-র সেতুটি ভেঙ্গে যায়। সেটি এখন মেরামত করা হয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে খালে এত পলিমাটি জমে আছে যে, তা না সরাতে পারলে নৌ-চলাচলের উপযোগী করা যাবে না। কাজেই খালটি তৈরী হলেও ওটা এখনও অকেজো হয়েই রইল। ওপাশে ঐ থার্ম্মাল বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটিও ডি. ভি. সি-র; দুটি ইউনিটে ৭৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ এখানে উৎপন্ন হয়।

চলুন এবারে দুর্গাপুরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ইস্পাত কারখানা দেখে আসি। শাল-পিয়ালের গভীর অরণ্য কেটে ফেলে তৈরী হয়েছে এই কারখানাটি। 'ইস্কন' নামে কতকগুলি ব্রিটিশ ফার্ম্ম এই কারখানাটি তৈরী করে দিয়েছেন। ২.৫ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে। এই কারখানার এলাকার ভেতর মোট ১৮ মাইল পাকা রাস্তা আছে এবং কারখানার চারদিক ঘিরে যে রেলপথ তারও দৈর্ঘ্য হবে ৭০ মাইল। কারখানার চত্বরে ঢুকতে গেলে আগে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস থেকে। ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেই বাংলার এই একমাত্র সরকারী ইস্পাত কারখানার বিরাট কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতে হবে। কারখানার তিনটি কোকওভেন ব্যাটারি পুরাদমে যেদিন চালু হবে, ৫৪০০ টন করে কোক প্রতিদিন উৎপন্ন হতে পারবে। তিনটি ব্লাষ্ট ফার্ণেস থেকে উৎপন্ন হবে পিগ্ আয়রণ, ৮টি ওপেনহার্থ ফার্ণেস থেকে উৎপন্ন হবে ষ্টীল ইনগট। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে কারখানায় উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুটি ব্লাষ্ট ফার্ণেস, রোলিং মিল, বিলেট মিল ও ৪টি ওপেনহার্থ ফার্ণেসের কাজ শেষ হয়েছে। পিগ আয়রণ ছাড়াও ৪০০০ টন সালফিউরিক এসিড, ৪০০০ টন এ্যামোনিয়া সালফেট এবং ১৭ হাজার টন আলকাতরা এখানে প্রথম বছরেই উৎপন্ন হয়েছে। কারখানার সংলগ্ন নূতন উপনগরীটিও কি সুন্দরভাবেই না গড়ে উঠছে দেখুন। কারখানার কর্ম্মীদের থাকার জন্যে ছোট বড় বাড়ীগুলি এই উপনগরীর প্রধান আকর্ষণ। কারখানার কাজ সম্পূর্ণ হলে এই উপনগরীতে বাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দশ হাজারে এসে দাঁড়াবে।

এবারে চলুন আর একটি কারখানা যেখানে গড়ে উঠছে সেখানে নিয়ে যাই। এটি হ'ল খনির যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা আর এর পাশেই তৈরী হচ্ছে চশমার কাঁচের কারখানা। চশমাও এখানে *তৈরী হবে। এ কারখানাটি রাশিয়ার সহযোগিতায় নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে এই বছরের শেষাশেষি খনিজ যন্ত্রপাতির কারখানাটিতে উৎপাদনের কাজ শুরু হবে। প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার যন্ত্রপাতি এই কারখানায় উৎপন্ন হবে। খনি এলাকায় কাজের জন্য যে ডিজেল ইঞ্জিন প্রয়োজন হয় তাও এই কারখানায় তৈরী হবে।*

আর একটি কারখানা কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই চালু করবেন—সেটি হল এলয় ষ্টীল কারখানা। বছরে ৫০ হাজার টন এলয় ষ্টীল এই কারখানায় প্রস্তুত হবে।

এবারে চলুন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সব কারখানা দুর্গাপুরে চালু করছেন তা একে একে দেখে আসি। ঐ যে দেখুন কোকচুল্লি কারখানা। হ্যাঁ, কারখানাটিতে কাজ চালু হয়ে গিয়েছে। এই কারখানায় দৈনিক ১০০০ টন হার্ড কোক্, ৫০ টন আলকাতরা, দেড় কোটি কিউবিক ফিট কয়লার গ্যাস উৎপন্ন হবে। ঐ সব দ্রব্য উৎপন্ন হবার পর যে ময়লা পড়ে থাকবে তাও কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ঐ ময়লা থেকে আলকাতরা, বেঞ্জল প্রভৃতি তৈরী করা হবে। গ্যাসগ্রিড পরিকল্পনার এই কোকচুল্লি কারখানায় যে বাড়তি গ্যাস থেকে যাবে তা আমাদের একটি মস্ত প্রয়োজনীয় কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কোলকাতায় কয়লার অভাব প্রায়ই দেখা যায়, তা ছাড়া কয়লার ধোঁয়ায় নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিপন্ন। তাই স্থির হয়েছে, কয়লার উনুনের পরিবর্ত্তে গ্যাসের উনুনে রান্না-বান্নার যাবতীয় কাজ করার নাগরিকরা যাতে সুবিধে পান তার জন্যে দুর্গাপুরে উৎপন্ন ঐ গ্যাস কোলকাতায় আনা হবে। ইতিমধ্যেই ঐ গ্যাসের জন্য পাইপ বসানোর কাজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে এই বছরের মধ্যে ঐ গ্যাস নাগরিকদের রান্নাঘরে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে।

দুর্গাপুরে এবং আশেপাশে যে সব শিল্প গড়ে উঠছে তারা যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পায় তার জন্যে রাজ্য সরকার ঐ দেখুন, থার্ম্মাল বিদ্যুৎ-কেন্দ্র তৈরী করেছেন। এই কেন্দ্রে ৬০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

রাজ্য সরকার একটি সারের কারখানা, একটি ঔষধের কারখানা ও কয়লা পরিশোধনের কারখানা এই দুর্গাপুরে স্থাপন করবেন বলে স্থির করেছেন। এই কারখানা নির্ম্মাণের জন্য একটি জাপানী সংস্থা যাবতীয় যন্ত্রপাতি দেবেন।

দুর্গাপুরে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট-বড় আরও অনেকগুলি কারখানা গড়ে উঠছে। বৈদেশিক সাহায্যে এ সি সি ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা এখানে তৈরী করছেন। এই কারখানায় বয়লার, সিমেণ্ট তৈরীর যন্ত্রপাতি, কয়লাখনির যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরী হবে।

কারবন তৈরীর জন্যও এখানে একটি কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। একটি সিমেণ্টের কারখানা স্থাপনের কথাবার্ত্তা চলছে।

এই যে এত শিল্প দুর্গাপুরে গড়ে উঠছে তার জন্যে প্রয়োজন হবে দক্ষ কর্ম্মীর। তাই প্রয়োজনীয় শিক্ষা যাতে কর্ম্মীরা লাভ করতে পারেন তার জন্যে আর একটু এগিয়ে চলুন, দেখতে পাবেন আঞ্চলিক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এলো। ইস্পাত কারখানায় টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটও কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট উপকারে আসছে। শিল্প সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য রাজ্য সরকার একটি ট্রেনিং সেণ্টারও সম্প্রতি এখানে খুলেছেন।

ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় আপনার হল; হয় তো খুসিতে আপনি ভরপুর হয়ে উঠছেন বাংলা দেশের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। নূতন উপনগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালই লাগবে জানি, কিন্তু বাংলা দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক সহরগুলির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, যাঁরা সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আজও গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করেন, দুর্গাপুরের মাটিতে পা দিয়ে তাঁদের অনুসন্ধিৎসু মন আরও কয়েক যুগ যদি পেছিয়ে যেতে চায় তাদেরও কিছু কিছু খোরাক এখনও দুর্গাপুরে পাওয়া যাবে। শাল-পিয়ালের বন অনেক গেছে, এখনও দূরে যা আছে তার মধ্যে খুঁজলে হয়তো অনেক নূতন আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে।

চলুন না ভিরিঙ্গি কালিবাড়ী দেখে আসি। দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে একটু দূরেই শালবনের ধারে এই মন্দির, ঐ জায়গাটাকে বলে ভিরিঙ্গি-নাচন রোড। জঙ্গলের এই অন্ধকার স্থানটিতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে এক সাধক বহুদিন তপস্যা করেছেন। তারপর তিনিই এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করে যান। আজও প্রতি বছর অগ্রাণ মাসে অমাবস্যায় এই কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে বিরাট উৎসবের মেলা বসে, সেদিন অসংখ্য ছাগ বলি দেওয়া হয়। উৎসব শেষ হয়ে গেলে পুরাতন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে আবার নতুন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দুর্গাপুরের পরিবেশ সব দিক থেকে উপভোগ করার মত। শালবনের নীলাঞ্জন ছায়া, তাল-খেজুরের বিক্ষিপ্ত জঙ্গল, মহুয়ার মদির গন্ধ, অবারিত মাঠের প্রান্তর, পিয়ালে ঝিঁ ঝিঁ আর বুনো পাখীদের আর্ত্তনাদ একদিকে যেমন সকলকে আকর্ষণ করবে আর একদিকে আধুনিক সভ্যতার গৌরব নিয়ে দুর্গাপুর বুক ফুলিয়ে দেশী-বিদেশী সকলকে আহ্বান জানাবে। বেড়াতে আসার মতো ও উপভোগ করার মতো সুন্দর জায়গা এই দুর্গাপুর। এখানে থাকা খাওয়ার অসুবিধে নেই; হোটেল তো আছেই, তা ছাড়া খুঁজলে হয় তো দু'একজন আপনার আত্মীয়ের সন্ধানও দুর্গাপুর উপনগরীতে আপনি পেয়ে যাবেন। যদি একদিনে দুর্গাপুর দেখে আসতে চান তাহলে রাজ্য সরকারের ট্যুরিষ্ট ব্যুরোর বাসের সুযোগ আপনি গ্রহণ করতে পারেন। ওঁরাই আপনাকে সব দেখাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

বর্ত্তমান যুগের ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ উপনগরী দুর্গাপুর দেখে নিছক আর পাঁচজনের মতো আপনার মনও গর্ব্ব অনুভব করবে এই ভেবে যে, বাংলা দেশে আজ এমন একটি শিল্পনগরী স্থাপিত হলো যার নাম সারা বিশ্বে এদেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এটা বাংলা ও বাঙালীর কম গর্ব্বের বিষয় নয়।

[ পরের বার মুর্শিদাবাদ চলুন ]।

# গান

সন্তোষকুমার দে

টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ চলিছে ঘড়ি
রাত দিন যন্ত্রের মন্ত্র পড়ি।
পৃথিবীর মাটি জল আকাশে মেঘে
ছুটিছে মানুষ যেন পবন বেগে।
দূর অভিসারী মন উধাও সে অনুখন
চাহে আজ চাঁদে দিতে পাড়ি।

গাঁয়ের সবুজ মাঠে ভিজে কচি ঘাসে
এখনও অজানা ফুল হাসে।
জেট বিমানের ধ্বনি মিলালে সুদূরে
ধীরে ধীরে চিল উড়ে আসে
এখনও উদাসী মন হু হু করে অকারণ
পেলব পরশ পেয়ে দখিনা বাতাসে।

কল কল কল কল, চারিদিকে কল,
সবার জীবন জুড়ে কলশৃঙ্খল।
তবু তারই মাঝে আজো আছে বেঁচে আছে
ফুলের বুকের পরিমল।
একটি হৃদয় আজো আরেক হৃদয় দেয় নাড়ি॥

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

আলুবখরা—[ সং আরুক, আল্লক, হিং আলুবোখরা, কাং অলু ] আলুবখরা prunus insititia.

আবর্ত্তকী—ভদ্রাগুকাবৃক্ষ।

অনবর্তিন—অক্ষশৃঙ্গী বৃক্ষ, গাড়ল শিঙ্গা।

আবিগ্ন—পানি আমলা বৃক্ষ।

আবেগী—বৃদ্ধদারক বৃক্ষ।

আশন, আসন—[ সং অসন, পীতশাল, হিং অসনা, সজ, উং সহাজু, ফলাসগাজু, আং অমরী, নং বিবঠ্ঠা, বিবঠ্ঠ্যাপ গোদ, গুং বীয়াং, হীরাদখন, বীথানোগুঁদ, কং কপিল্লহোণে, তেং মদি, ফাং করম-কশ, ওং অসন ] বৃহৎ বন্যবৃক্ষবিং terminalia tomentosa pentaphore t. প্রকারভেদ—কালী আসন [ ওং মহিষা অসন ], ভুঁড়ী আসন [ ওং আসুয়া আসন ], জীনাসন।

আশয়—কাঁঠাল গাছ।

আসফল, আঁষফল—[ সং আমিষ ] বড় ক্ষুপ nephelium longan, scytalia l.

আশশেওড়া, আস-শাওড়া—[ সং আস্ফোটক, ওং সাহাড়ী ] শাওড়া দ্রং।

আশুকচু—colocasia anticquorum.

আশুপত্রী—শল্লকীলতা।

আশুব্রীহি—আউশ ধান।

আশ্রয়াশ—চিতার গাছ।

আসবদ্রু—তালগাছ।

আসুরী—রাইসরিষা।

আস্ফোট—১ আকন্দ গাছ, ২ নবমল্লিকা।

আস্ফোত, আস্ফোতক—১ আকন্দ গাছ, ২ কোবিদার বৃক্ষ, পলাশ-বৃক্ষ।

আস্ফোতা—সরিষা, হাপরমালি দ্রং। ১ অপরাজিতা, ২ বনকাপাস, গন্ধভাদুলে।

আস্যপত্র—পদ্ম দ্রং।

ইক্ষু—আক দ্রং।

ইক্ষুকাণ্ড—কাশবৃক্ষ, মুঞ্জ গাছ।

ইক্ষুগন্ধা—গোখুরী, কাশতৃণ।

ইক্ষুগন্ধিকা—ভূমিকুষ্মাণ্ড।

ইক্ষুবালিকা—কেশে।

ইক্ষুর—কুলেখাড়া, কোকিলাগাছ, গোখুরী, আক, কেশে।

ইক্ষুশর—কেশে।

ইক্ষ্বাকু—তিতলাউ।

ইক্ষারি—কেশে।

ইক্ষ্বালিক—কুশ, কেশে।

ইক্ষ্বালিকা—খাগড়া।

ইঙ্গিড়—ইঙ্গুদবৃক্ষ।

ইঙ্গুদ, ইঙ্গুদী—[ সং অঙ্গারপুষ্প, তীক্ষ্ণকণ্টক, ক্রোষ্টফল, তৈলফল, পূতিগন্ধ, শূনারি, অনিলান্তক, হিং হিঙ্গন, হিঙ্গন, তেং নঞ্জনদন্, গরিচেটু, বিংগ্রীন মং হিঙ্গনবেঠ ] তাপসতরু, balanites roxburghii, b. Indica, b. Egyptica, বৃক্ষ প্রায় ১৩।১৪ হাত উচ্চ হয়। পূর্বে ঋষিরা এর বীজতৈল ব্যবহার করিতেন।

ইঁচড়—কাঁঠাল দ্রং।

ইচ্ছুক—টাবালেবুর গাছ।

ইজ্জল—হিজল গাছ, জিউলি গাছ, নিচুলবৃক্ষ।

ইংকট—ওকড়া গাছ।

ইদস্কার্য—দুরালভা লতা।

ইদানী—বটপত্রীবৃক্ষ।

ইনানী—বটপত্রীবৃক্ষ।

ইন্দিরালয়, ইন্দিরাবর, ইন্দিবর—নীলোৎপল।

ইন্দীবর—নীলপদ্ম, সাধারণ উৎপল।

ইন্দিবরী, ইন্দীবরী—শতমূলী।

ইন্দীবরণী, ইন্দীবার—নীলপদ্ম।

ইন্দুক—অশ্মন্তক বৃক্ষ।

ইন্দুকমল—শুক্লপদ্ম।

ইন্দুককলিকা—কেয়াফুল।

ইন্দুপুষ্পিকা—বিষলাঙ্গলা, কলিকার গাছ।

ইন্দুভূষণ—নীলপদ্ম।

ইন্দুবাজ—কুমুদ।

ইন্দুরেখা, ইন্দুলেখা—সোমলতা, গুলঞ্চ।

ইন্দুরকানি পানা, ইন্দুরিণী পানা—[ সং উন্দুরকর্ণী ] বর্ষায়ু পানা বিশেষ। পাতা ইন্দুরের কানের মত বাঁকা, salvinia cuculluta.

ইন্দ্রতরু—pinus devataru

ইন্দ্রদারু—দেবদারু।

ইন্দ্রদ্রু—অর্জুনবৃক্ষ, কুটজবৃক্ষ।

ইন্দ্রদ্রুম—অর্জুনবৃক্ষ।

ইন্দ্রপর্ণী—নীলপত্রভূক্তি বৃক্ষবি° ।
ইন্দ্রপুষ্প – লবঙ্গ, ইন্দ্রযব ।
ইন্দ্রপুষ্পা—লাঙ্গলীবৃক্ষ, বিষলাঙ্গলা ।
ইন্দ্রবল্লরী—রাখালশসা দ্র° ।
ইন্দ্রবল্লী—পারিজাতলতা, রাখালশসা ।
ইন্দ্রবারুণিকা, ইন্দ্রবারুণী—মাকাল দ্র° ।
ইন্দ্রবীজ—ইন্দ্রযব, কুরচি দ্র° ।
ইন্দ্রবৃক্ষ—দেবদারু দ্র° ।
ইন্দ্রযব—[ সং কুটজ, কলিঙ্গ ] কুরচি দ্র° ।
ইন্দ্রলাজী—ধান, কলা ।
ইন্দ্রসুরস—নিসিন্দা, সিন্ধুবার বৃক্ষ ।
ইন্দ্রসুরা—রাখালশসা দ্র° ।
ইন্দ্রসুরিস—নিসিন্দা ।
ইন্দ্রসূত—অর্জুনবৃক্ষ দ্র° ।
ইন্দ্রা—১ কাঁটা জামির, ২ রাখালশসা ।
ইন্দ্রানিকা—১ নিসিন্দা, ২ সিন্ধুবার বৃক্ষ ।
ইন্দ্রাণী—১ সোঁদাল, ২ নিসিন্দা ।
ইন্দ্রাশন—১ ভাঙ্গ, সিদ্ধি, ২ কুঁচফল ।
ইভ—নাগকেশর বৃক্ষ ।
ইভকণা—গজপিপ্পলী ।
ইভকেশর—নাগকেশর, mema ibhakana, scindapans officinalis.
ইভগন্ধা—নাগদন্তী, অত্যন্ত বিষাক্ত বৃক্ষ ।
ইভদন্তা—নাগদন্তী বৃক্ষ ।
ইভনিমীলিকা—ভাঙ্গ, সিদ্ধি ।
ইভ্যা, ইভ্যা—স্বর্ণক্ষীরী ।
ইভাখ্য—নাগকেশর বৃক্ষ ।
ইভোষণা—গজপিপ্পলী, লম্বা পিপুল ।
ইল্লকা, ইভ্যা, ইভিকা—শল্লকী বৃক্ষ, বাংলা বৃক্ষ
ইরাবান—বটপত্রী বৃক্ষ ।
ইর্বারু—কাঁকুড় ।
ইর্বারুশুক্তিকা—কাঁকুড়বিশেষ ।
ইষ্‌লাঙলা—[ সং অগ্নিশিখা, লাঙ্গুল, ও° আভালিয়া ] অনন্তা, লাঙ্গলকী, gloriosa superba.
ইষলাঙ্গুলা—[ সং লাঙ্গুল ] কাকড়া hydrolea zeylanica.
ইষীকা—কেশে ।
ইষু, ইষের মূল, ইষুর মূল—[ সং ঈশ্বরমূল, সুনন্দা, বিপপহা, হি° রুদ্রজটা, ফা° জারাবন্দি হিন্দী, তা° ইচ্ছুরামলী, তে° ইশ্বরাব বেরু ] বল্লীলতা বি°, অর্কমূলা, aristolochia indica.
ইষুপুষ্পা—শরপুষ্পা বৃক্ষ ।
ইষ্টা—শমী বৃক্ষ ।
ইষ্টিকা—এরণ্ড বৃক্ষ ।
ইষ্টিকাপথিক—উশীর, বেণা, লামজ্জক নামক তৃণ ।
ইসপ্‌গুল, ইসফগুল, ইসবগোল—[ সং ঈষদ্‌গোল, অশ্ব, গু° উথমুজীরণ, তা° ইস্ফলবিরৈ, তে° ইস্পাগুল, ফা° ইস্পাজা: অ° বজরী কতুনা, পার্শী ভাষায় ইহাকে 'ইস্পগুল' ( ঘোড়ার কান ) বলে ] ঘোড়ার কান বা নৌকার মত ছোট বীজযুক্ত বৃক্ষবি°, plantago ovata. পারস্য দেশ হইতে ভারতে আসে ।
ইস্পন্দ—নারাঙ্গাদি বর্গের শীতকালের ছোট ক্ষুপ বি°, ruta graveolens.
ঈরিকা—বৃক্ষবি° ।
ঈর্বারু—কাঁকুড় ।
ঈষলাঙ্গলিয়া—ইষ্‌লাঙ্গলা দ্র° ।
ঈশানী—শমীবৃক্ষ ।
ঈশ্বরমূল—ইষের মূল দ্র° ।
ঈশ্বরা, ঈশ্বরী—লিঙ্গিনী বৃক্ষ, বন্ধ্যাকর্কোটকী বৃক্ষ, রুদ্রজটা লতা ।
ঈষিকা—কাশ তৃণ ।
উকক্ষি—ageratum cordifolium.
উখল—ভূরিপত্র তৃণবি° ।
উগ্রকাণ্ড—করেলা দ্র° ।
উগ্রগন্ধ—১ হিঙ, ২ রশুন, ৩ কট্‌ফল, ৪ অর্জক বৃক্ষ, ৫ চম্পক, ৬ অজমোদা, জোয়ান, ৭ বচ ।
উচন্তি—[ সং উষ্ট্রকাণ্ডী, রক্তপুষ্পী, কর্ণপুষ্পী ] সরল বৃক্ষবি°, ageratum conyzoides.
উচ্চটা—১ গুঞ্জা, কুঁচ, ২ ভুঁই আমলা, ৩ লশুনবি°, ৪ নাগরমুথা, ৫ চোচ বা চেচুয়া cyperur compressus.
উচ্ছা, উচ্ছ্যা, উচ্ছে—[ সং কন্দুলুচ্ছী, ও° উচ্ছা ] কুষ্মাদিবর্গের প্রতানী লতা, করলা momordica muricata, m. charantia. পর্যায়—কঠিল্লক, সুষবী, শুষবী, সুশবী, সুকান্ত, উগ্রকান্ত, কঠিল্ল, কারবেল্ল, পটু ।
উচ্ছিলীন্ধ—কোঁড়ক, ছাতা ।
উজুটী—গুল্মবি°, bileria ciliata.
উট—ঘাসপাতা ।
উড়ীধান—[ সং নীবার ] বন্য ধানগাছ ।
উড়ীগাব—গাবগাছবি°, diospyros ramiflora.
উডুম্বর, উদুম্বর—১ [ সং ক্ষীরিক, কাকোডুম্বরিকা, হি° কঠুমর, ম° কাঠ্‌ঠাউম্বর, বোথাডা, গু° টেউউম্বর, ক° কাঅত্তি, তৈ° ব্রহ্মমেডিচেট্টু, কাকীবাডুচেট্টু, ফা° অঞ্জীবেদস্তী, অ° তেনবর্রি, কো° খোক্‌সা ] ডুমুর ficus glomerat. ডুমুর দ্র° । ২ যজ্ঞডুমুর [ সং উডুম্বর, হি° গূলর, ম° উম্বর, গু° উম্বরো, ক° অত্তি, তৈ° বাস্তুর্চো ট, ফা° আঞ্জীরে আদম্‌, অ° জমীবট্ ] কাশী অঞ্চলে ইহা তরকারীতে ব্যবহৃত হয় । যজ্ঞডুমুর দ্র° । পর্যায়—জন্তুফল, তপসাঙ্গ, ক্রিমিফল, শীতবল্কল, যজ্ঞাঙ্গ, বিষবৃক্ষ, হেমপুষ্প, ক্ষীরবৃক্ষ, বৃক্ষ, সদাফল, হেমদুগ্ধক, কালস্কন্দ, যজ্ঞযজ্ঞ, সুপ্রতিষ্ঠিত, পুষ্পশূন্য, পবিত্রক, সৌম্য ॥ শব্দ° ॥
উডুম্বরপর্ণী—দন্তীবৃক্ষ ।
উতাস—echites cymosa.
উৎকট—১ তেজপাত, ২ শর, ৩ রক্তেক্ষু ৪ দারচিনি ।
উৎকটা—সৈংহলী লতা ।
উৎকতা—গজপিপুল ।

[ ক্রমশঃ ।

# পাশের জানালা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শংকর যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটল। শেষ পর্যন্ত গোপারও চোখে পড়ল ব্যাপারটা।

কোন ভণিতা না করেই শংকরকে প্রশ্ন করল গোপা: আচ্ছা, কে বল তো এই মেয়েটি?

যেন একটা বিরাট অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছে এমনই মনে হল শংকরকে। শুধু ধরা পড়া নয়, তাকে যেন একঘর লোকের সামনে জেরা করা হচ্ছে। তবু মুখে চোখে অসহায়তার এই ভাবটাকে যতদূর সম্ভব গোপন করে শংকর বলল, কার কথা বলছ?

কেন তুমি কি দেখনি? একটু উত্তপ্ততার ছোঁয়াচ ছিল গোপার কথার মধ্যে। শংকর বোধ হয় সে উত্তাপে সামান্য দগ্ধ হল। মাত্র এক মাস যার বিয়ে হয়েছে তার গলার স্বরে এই ধরণের উত্তপ্ততা শংকর যেন আশা করেনি। তবু সে সমস্ত আবহাওয়াটাকে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা করল। হেসে বলল: আমি শুধু তোমাকেই দেখি—আর কাউকে দেখার ফুরসৎ কোথায়:

গোপা মুখ টিপে হাসতে পারত। রসিকতা করে জবাবও দিতে পারত। কিন্তু সে সব কিছু করল না। গম্ভীর মুখে বলল: দেখবে এস আমার সঙ্গে।

শংকরের হাত ধরে টানল গোপা। অপ্রস্তুত হয়ে উঠল শংকর। সে তখন সবে মুখে সাবান লাগিয়ে রেজারটা বার করতে যাচ্ছে, এমন সময় ওঠাটা আর যাই হোক খুব অস্বস্তিকর।

শংকর প্রতিবাদ জানাল: আরে আরে একটু দাঁড়াও লক্ষ্মীটি, কিন্তু গোপা সময় দিল না শংকরকে। ঠিক টেনে নিয়ে এল। নিয়ে এল শোবার ঘরের জানালার কাছে। পাশের বাড়ির দোতলার জানালার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল গোপা।

: দেখ। শুধু এই কথাটা একবার বলল গোপা তারপর শংকরের মুখের সামনে দড়াম করে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল শংকর। আজ পুরো একটি মাস ধরে সে এই আশংকাই করে এসেছে। সে জানত গোপার চোখে একদিন না একদিন পড়বেই ব্যাপারটা। দোতলার জানালা থেকে একটি বয়স্থা মেয়েকে দিনের পর দিন নিচের ঘরখানির দিকে তাকিয়ে থাকাটাকে খুব খুশী মনে গ্রহণ করবে না গোপা, চাইকি একটা ভুল বোঝাবুঝিরই সৃষ্টি হতে পারে।

প্রথমে তার চোখেও এমন বিসদৃশ ঠেকেছিল ব্যাপারটি। দক্ষিণ কলকাতার একটা কলেজে চাকুরি পেয়ে শংকর তখন টালিগঞ্জের এই ফ্ল্যাটটিতে সবে এসেছে। নিচের তলায় দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট। বাড়িতে তিনটি মাত্র প্রাণী শংকর, তার মা ও একটি চাকর।

ছোট গলির সামনের ঘরখানিকে নিজের জন্যে রাখল শংকর। জানালার ধারে ওর পড়ার টেবিলটা পাতল। তারপাশেই ওর খাট। ইতিহাসের অধ্যাপক শংকর ঘরটিকে এক মুহূর্তে ভালবেসে ফেলল। বেশ ছিমছাম নির্ঝঞ্ঝাট। একটা গলির মধ্যে ওদের বাড়ি। কিন্তু গলিটা ওদের বাড়ি পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে গেছে। বাস রাস্তা অনেক দূর। কাজেই কোন চিৎকার নেই, হৈ-হল্লা নেই, একদম নিরিবিলি। পড়াশুনার পক্ষে আইডিয়াল।

প্রথম দুদিন ঘর সাজাতেই সময় চলে গেল। তারপর তৃতীয় দিনের দিন ব্যাপারটা প্রথম চোখে পড়ল শংকরের।

সকাল বেলা ষ্টেটসম্যানখানা নিয়ে শংকর তার পড়ার টেবিলে এসে বসেছে। এমন সময় কি একটা কারণে জানালা দিয়ে ওপরের দিকে তাকাল শংকর। একটি আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে দোতলার জানালার গরাদ ধরে তার দিকে তাকিয়ে আছে?

শংকর চোখ নামিয়ে নিল ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু সে শুধু কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর জোর করে খবরের কাগজের পাতায় মন বসাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু শংকর দেখল, জেনেভার সামিট কনফারেন্সটিকে সে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিল ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়—এমন কি কলকাতায় সরকারী ডেভেলাপমেণ্ট দপ্তর মধ্যবিত্তদের বাসস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য যে ফ্ল্যাট তৈরি সুরু করেছে এই সুখবরটি পেয়েও সে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত বোধ করল না। শুধু আড়চোখে আর একবার তাকিয়ে দেখল জানালাটার দিকে। মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তেমনই ভাবে। আর শুধু দাঁড়িয়ে থাকা নয়, তাকিয়ে আছে শংকরের দিকে।

পরদিন দেরী করে ঘুম ভাঙল শংকরের। আগের দিন এক বাবুর পাল্লায় পড়ে লাইট শো-এ তাকে সিনেমা দেখতে হয়েছে।

ঘুম ভাঙতে বেলা আটটা। তবু রক্ষে আজ রবিবার। কলেজে যাবার তাড়া নেই।

খবরের কাগজখানা নিয়ে টেবিলের সামনে এসে বসল শংকর। একবার ঢুক ঢুক বুকে তাকালো জানালার দিকে। না, কেউ নেই। শংকর খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেল।

একটু পরেই নারীকণ্ঠের সেই কথাগুলি শুনতে পেয়েছিল শংকর। খুব যে বেলা পর্যন্ত ঘুমনো হচ্ছিল?

শংকর তাকালো জানালার দিকে। মেয়েটি ওকে দেখতে পেয়ে সরে গেল। তারপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল জানালাটা।

শুধু একদিন নয়—বহুদিন। শংকর তো রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে উঠল। বিশেষ করে মেয়েটির মন্তব্যে। হয়ত শংকর একদিন ইতিহাসের রেফারেন্স থেকে কিছু নোট করছে। কলেজে গিয়ে অনার্সের ছেলেদের নোট দিতে হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে হয়ত এই মন্তব্য ভেসে এল: খুব যে পড়াশুনো হচ্ছে দেখছি। ক'টা বাজল সে খেয়াল আছে? কলেজে যেতে হবে না?

শংকর অপ্রস্তুত হয়ে তাকালো ঘড়ির দিকে। তাই তো দশটা বেজে গেছে। দশটা পঁয়তাল্লিশে তার প্রথম ক্লাশ। পড়তে পড়তে একদম খেয়াল নেই।

জানালার দিকে তাকাতেই সরে গেল মেয়েটি। শংকর ভাল করে দেখবার পর্যন্ত সুযোগ পেল না।

শেষ পর্যন্ত ভাল করে দেখবার সুযোগ পেল শংকর। সুযোগটা কৌশলে ওকেই করে নিতে হল। আজ সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। খুব দুঃসাহসী ছেলে হলে সে হয়ত মেয়েটিকে ইংগিত করতে পারত। অথবা চিঠি ছুঁড়ে মারতে পারত। তাতে লেখা থাকত: অমুক দিন অমুক সিনেমা হলের সামনে দেখা কর। তার কলেজ-জীবনের অনেক বন্ধু এরকম কত সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা যখন শংকরের সামনে তাদের বীরত্বের কথা সদম্ভে ঘোষণা করত, তখন মনে মনে বড় আফশোষ হত শংকরের।

কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে নিরাপদ ব্যবধান থেকে যেটুকু করা যায়। বিশেষ করে শংকর এখন অধ্যাপক। একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে সে লোক হাসাতে পারে না। বিশেষ করে এই পাড়াতেই তার অনেক ছাত্র রয়েছে।

শংকর একটা আয়না নিয়ে এল টেবিলের সামনে। এমন করে ফিট করল, যাতে দোতলার জানালার প্রতিবিম্ব এসে পড়ে তার মাঝে।

সে আয়নার সামনে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছায়া এসে পড়ল। সেই মেয়েটি। নিরাপদ ব্যবধান থেকে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল শংকর।

একটা লাল শাড়ি পরেছে। মুখটা এখনও কচি কচি। নাক, মুখ-চোখের গড়ন এমন কিছু খারাপ নয়, রঙও ফর্সা, কিন্তু বড্ড রোগা। সমস্ত চোখে মুখে কেমন একটা বিষাদের ভাব।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরতেই মা তাকে বলেছিল: পাশের বাড়ির মেয়েটা কি বেহায়ার হদ্দ।

জামা ছাড়তে ছাড়তে শংকর বলেছিল: কার কথা বলছ মা?

: কেন, তুই কি দেখিসনি নাকি? পাশের বাড়ির দোতলার ছুঁড়িটা। আজ নিচের তলার ভাড়াটেরা বলছিল, এর আগে এই ঘরে যারা ভাড়াটে ছিল, তাদের ছেলের সঙ্গে নাকি [illegible] করত। শুনি নাকি কি অসুখ, দিনরাত ঐ জানালার ধারে বসে থাকে আর পাড়ার সব ছেলেদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি। জানালাটি বন্ধ করে দিল মা। কিন্তু তাতে আরও বিপত্তি। ঘরে আলো আসা বন্ধ হবার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত পরের যাত্রা ভংগের জন্যে নিজের নাক কাটতে হয় বুঝি।

জানালা বন্ধ করা গেল না। সেই সঙ্গে বন্ধ করা গেল না মার সন্দেহ। মাঝে পড়ে বিপত্তি বাধল শংকরের।

: আমি এবার যাব ওদের মা-বাবার কাছে। জিজ্ঞাসা করব মেয়ের জন্য একগাছা দড়ি জোটে কি না। সোমত্ত মেয়ে এক ফোঁটা শাসন নেই, কি ধরণের বংশ তা বুঝতে পেরেছি।

মার মুখে হাত চাপা দিয়ে সেদিন থামাতে হয়েছিল শংকরকে। ছি-ছি কি লজ্জার কথা।

মা বলেছিল: তা হলে অন্য বাড়িতে চল। এখানে থাকতে ইচ্ছা নেই আমার।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শংকর বলেছিল: বেশ তাই হবে। কিন্তু দোহাই তোমার এখন চুপ কর একটু।

বাড়ীর জন্যে চেষ্টা করেনি শংকর। মাকে এসে বলেছিল: চেষ্টা করছি, কিন্তু পাচ্ছি না। কিন্তু মা নিজেই চেষ্টা সুরু করে দিল, গৃহ নয় গৃহিণী। কোন আপত্তি করল না শংকর। একটা দিন দেখে গোপার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল শংকরের।

বউভাতের নেমন্তন্ন খেতে এসে ওর বন্ধু সুব্রত ওকে চুপি চুপি বলল: তোর সেই বাতায়নিকাকে একটু দেখাতে পারিস?

গোলমালের মধ্যে একদম মনে ছিল না মেয়েটির কথা। ম্যারাপ বাঁধা ছাদ থেকে নিচের ঘরে বন্ধুকে নিয়ে চলে এল শংকর। তাকাল দোতলার জানালার দিকে। ঘর অন্ধকার। বিয়ে বাড়ির উজ্জ্বল আলো এসে আলোকিত কোরছে গলিটা।

পাশের দোতলার ফ্ল্যাটটি অন্ধকার। ইচ্ছে কোরই ওদের কাউকে নেমন্তন্ন করেনি শংকর। তার খুব আপত্তি ছিল না। কিন্তু মা হয়ত সন্দেহ করে বসবে। নয়ত পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকটির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় শংকরের। দু' একবার সামান্য বাক্য বিনিময়ও হয়েছে। টাকমাথা মাঝবয়সী ভদ্রলোক। হয়ত মেয়েটির বাবা, নয়ত নিকট-আত্মীয় কেউ।

কিন্তু সেদিন জানালাটা আর খুলল না। বন্ধুকে নিরাশ করল শংকর। বলল: তোর ভাগ্যে নেই, বাতায়ন খুলল না।

বিয়ের গোলমাল মিটে গেল ক'দিনেই। নতুন বউকে নিয়ে শংকর শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরেও এসেছে।

তারপরেই আর একদিন শংকর দেখতে পেল মেয়েটিকে। দীর্ঘ ছ' মাস এই জানালাটির দিকে নিয়মিত তাকিয়ে এসেছে শংকর। বহুবার চোখাচোখি হয়েছে মেয়েটির সঙ্গে। অপলক দৃষ্টিতে শংকরও তাকিয়ে থেকেছে পাশের ফ্ল্যাটের জানালার দিকে। প্রথম প্রথম চোখাচোখি হতেই পালিয়ে যেত মেয়েটি। চঞ্চলা হরিণীর মত দ্রুত সরে যেত। কিন্তু তারপর আর সরে যেত না। দাঁড়িয়ে থাকত গরাদ ধরে।

সেদিনও মেয়েটি এসে দাঁড়াল। হাতের বইটি মুড়ে উঠে দাঁড়াল শংকর। জানালার কাছে এগিয়ে গেল। তার দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছিল। দোতলা থেকে একতলায় তার ঘরের ব্যবধান অনেকখানি। তবু কেউ যদি দেখে ফেলে তাকে। যদি ঘরে কেউ আসে মা অথবা গোপা?

মেয়েটিকে সেদিন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। যেন অনেকখানি শুকিয়ে গেছে। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটি। দাঁড়াল না দ্রুত সরে গেল। খোলা জানালার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল শংকর, কেউ এল না।

কিন্তু গোপার কাছেও সমস্ত ব্যাপারটা লুকোতে পারল না শংকর। মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। মাকে পারেনি নববিবাহিতা স্ত্রীর কাছেও পারল না।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে গোপা তাকে বলল : জান মেয়েটি খারাপ ?

স্ত্রীকে আদর করে শংকর বলল : পরের কথায় কান দাও কেন ?

গোপা বলল : পর নয়। মা বলছিলেন। পাশের ফ্ল্যাটের সুরমাদিও বলছিলেন। এর আগে যে ভাড়াটে ছিল, তাদের ছেলের সঙ্গে নাকি—

শংকর বলল : কাল থেকে জানালাটি বন্ধ করে দেব।

গোপা বলল : না, জানালা বন্ধ করতে হবে না তোমার। তুমি অন্য একটা বাসা দেখ। এই গলির মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। বাস ধরতে গেলে আধ মাইল হাঁটতে হয়। লক্ষ্মীটি একটা বাসা দেখ তুমি। ট্রাম রাস্তার কাছে।

শংকর হাসল মনে মনে। আসলে এটা একটা অজুহাত। শংকরকে সন্দেহ করছে গোপা। অথবা নিরাপদ ব্যবধানে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। মনে মনে শংকর যে একটু খুশী হল না তা নয়। তা হলে গোপা তাকে ভালবাসতে সুরু করেছে। যেখানে ভালবাসা, সেখানেই তো আশংকা।

কিন্তু গোপা যে এমন তাড়া লাগাবে তা ভাবতে পারেনি শংকর। প্রায় প্রতিদিনই কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পর গোপা তাকে জিজ্ঞাসা করে : কি বাসা পেলে ?

শংকর চেষ্টা করেনি বাসার জন্য। এই ফ্ল্যাটটার ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে তার। বিশেষ করে মাস আটেক ধরে পাশের ফ্ল্যাটের দোতলার জানালাটা তাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। প্রথম বেশ কৌতুক অনুভব করত শংকর। কিন্তু শেষে দেখল এই জানালাটা তার জীবনের সঙ্গে অপরিহার্য ভাবে জড়িয়ে গেছে।

সকালে চা খেতে খেতে একবার জানালার দিকে না তাকালে সকালটা বৃথা মনে হয়। রাতে বাড়ি ফিরে একবার লুকিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। শংকরের সমস্ত গতিবিধি মুখস্থ মেয়েটির কাছে! সেও আসে ঠিক সেই সময়ে।

সেদিন গোপাই এসে সে খবরটা দিল।

: এতদিন পরে হাড় জুড়লো।

: কলেজ থেকে এসে জামা কাপড় ছাড়ছিল শংকর। বলল : কি ব্যাপার ?

: পাশের ফ্ল্যাটের ওরা উঠে যাচ্ছে।

ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারেনি শংকর। জিজ্ঞাসা করল: কাদের কথা বলছ ?

: কার আবার। দোতলার ওই ছুঁড়ি। ওর বাবা নাকি বদলি হয়ে যাচ্ছে জামালপুর। কালই চলে যাবে। যাক্ এতদিন পরে পাড়াটা বাঁচল।

সেদিনের রাতটা ঘুমোতে পারল না শংকর। গোপা ঘুমোচ্ছে

অঘোরে। শংকর উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। জানালাটার কাছে এসে দাঁড়াল।

রাত কত হবে? বারোটার বেশী নয়। তবু গলিটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ কানে আসছে। আলো আর ছায়া সব কিছু মিলিয়ে একটা ভুতুড়ে পরিবেশ।

সেই আলোছায়ায় একটা ছায়ামূর্তিকে দেখল শংকর। মূর্তিটি পাশের ফ্ল্যাটের দোতলার জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। শংকরকে দেখে সরে গেল। একটু পরে শংকর দেখল দোতলার জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

সকাল থেকে লরীতে জিনিস বোঝাই হচ্ছিল। শংকর মন দিয়ে ক্লাসে পড়াতে পারেনি আজ। পুরানো একটা হিসাব কিছুতেই মিলছিল না। বন্ধু সুব্রত জিজ্ঞাসা করল: কী ব্যাপার ভাই? বউদির সঙ্গে কিছু—

শংকর হাসল: না-না। শরীরটা ভাল নেই।

বিকেলে বাড়ি ফিরতেই মা এল হাসিমুখে।

: আপদ বিদায় হয়েছে। ভাবছি বিপত্তারিণীর পুজো দেব। তোর আর বাড়ি দেখতে হবে না খোকা। বাড়িওয়ালা বলছিল, আগামী মাস থেকে পাঁচটাকা ভাড়া কমিয়ে দেবে। আর বৌমারও খুব বেশী এখন ইচ্ছা নেই অন্য কোথাও যাবার।

পড়ার টেবিলটার সামনে এসে বসল শংকর। দোতলার জানালাটা বন্ধ। আর কদিন পরেই হয়ত আবার খুলবে জানালাটা। কিন্তু একটা পরিচিত মুখকে আর কিছুতেই দেখতে পাবে না শংকর। এই কটা মাস যে মুখটা তাকে মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে মুখটা হারিয়ে যাবে চিরকালের মত।

গোপা এসেছিল চা নিয়ে। শংকর বলল: নতুন বাড়ি পেয়েছি, উঠে যেতে হবে তিনদিনের মধ্যে। তুমি বাড়িওয়ালাকে জানিয়ে দিও।

সে কী। আমরা এবাড়িতেই থাকব ঠিক করেছি। মা-কি তোমায় কিছু বলেন নি? গোপা বলল।

: কারুর হুকুম মত আমি চলতে চাই না। আমি বলছি এ বাড়িতে আমি আর থাকতে চাই না, আমার কলেজ যাবার অসুবিধা হচ্ছে। অ্যাণ্ড মাই ওয়ার্ড ইজ ফাইন্যাল।

নিজের গলার আওয়াজের কঠোরতায় লজ্জিত হল শংকর। আবার সে পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়ালো। সে এখন বেরুবে। আজ রাতের মধ্যেই তাকে নতুন একটা বাসা খুঁজে বার করতে হবে।

# চিনি

### শ্রীপঙ্কজকুমার আশ

আমিও চিনি,
তুমিও চেনো,
শুধু তাই-ই নয় সখী—
দু'জনেই দু'জনাকে বেশ ভাল ভাবেই চিনি।
প্রথম দিনের পরিচয় রাত,
আর মৌচাকী মধু আলাপন—
তার একটুও আজোও ভুলিনি,
চিনি, চিনি, বেশ ভাল ভাবেই চিনি।
তুমি সেই বৈশাখী কোন মেয়ে—
চৈতালি—চকিতা,
বিজলী-বিনিন্দিতা, আকাশ-হরিণী;
মণি-গাঁথা ফণী যেন রূপসী-নাগিনী।
চিনি সখী চিনি।
পিউ-বধূ হাসি খুশী—
মদী-মুখী; এলোকেশী,
চির-যৌবনা উর্ব্বশী;
মম মৌ-মন বিহারিণী।
চিনি সখী চিনি।
চিনি, চিনি, আজও আমি চিনি—
দূর্বা-রাঙা-রক্ত দিয়ে,
শুকনো ফুলের ভুলটি নিয়ে,
দু'জনেই দু'জনাকে বেশ ভাল ভাবেই চিনি।

# তবে খুশি হই

### সরিৎ শর্মা

ভোরের রোদের মত যদি আসো দু'চোখের স্বপ্নের শিয়রে—
তবে খুশি হই, দূর আকাশের বিচিত্র মেঘের
পরতে পরতে
যে-খুশি ছড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দ আলোর
রূপোলি পাখায়!

তবে খুশি হই—
সূর্যের রক্তিম হ্রদে, যে হ্রদ আমার মন,
যদি স্নান করো এসে সন্ধ্যার পাখির মত
নিরিবিলি শান্তির গভীরে—

সে-খুশি সুস্নিগ্ধ হয় মরমিয়া নক্ষত্রের
নীলাভ আগুনে!

আর যদি নাড়া দাও, সাড়া দাও
শিকড়ের অনন্ত বিন্যাসে—
সত্তার রাগিণী তুলে এ-মাটিকে ফুল দাও,
ফল দাও, যে-মাটি জীবন,—
আকাশ চাঁদোয়া জুড়ে পাতায় শিশিরে রোদে
ছড়িয়ে হাওয়ার গান, মাতাল প্রাণের
দীপ্ততায় জেলে দাও বিচিত্র বিস্ময়—

খুশির ঐশ্বর্যে তবে
সে-সুষমা পৃথিবীর করপুটে দিয়ে যেতে পারি!

# কুলটা

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

## রাজেন্দ্র যাদব

বাইরের দিকে চেয়েছিলেন উনি। চট্ করে আমার দিকে মাথা ঘুরিয়ে চুলে একটা ঝাপটা দিয়ে নেন: "আমি?" পরক্ষণেই যেন কিছু বিমর্ষ ভঙ্গিতে বলেন, "আমার আর কি করার আছে? সেই একই সকালে ওঠ, ব্রেকফাষ্ট তৈরী করিয়ে দাও, কিংবা প্যারেড থেকে এলে সঙ্গে বসে খাও আর সমস্ত দুপুর বসে বসে মাছি মার। সন্ধ্যের কোন সিনেমা বা সেই অর্ডিনান্স ক্লাব কিংবা এর ওর বাড়ি রিটার্ণ ভিজিট দাও। মজা না লাগলে বীনুর সঙ্গে মার্কেটিং টার্কেটিং করতে চলে গেলাম, না হলে গুড্ডীর সঙ্গে গল্প জমাতে গেলাম···কিটির সঙ্গে একটু আধটু ঘুরে এলাম বা সোয়েটার বুনলাম। সেই বাধাবন্ধ জীবন···বাঁধাধরা মানুষজন··শুধু বীনুর সঙ্গেই যা কিছু মেলে।" কোলে রাখা চশমাটার ডাঁটি ধরে তুলতে ফেলতে থাকেন উনি।

"আর বীনু তো আপনার প্রশংসা ছাড়া থাকতেই পারে না।" আমি দেখছিলাম মেজর তেজপালের উপস্থিতিতে ওই চোখে যে ছায়া বারবার আসা যাওয়া করে তার নামও ছিল না এখন। উনি এমন স্বচ্ছন্দ ভাবে বসেছিলেন যেন কতদিনের পরিচিত মানুষ। জানি না এ শুধু আমার মনেরই কোন ইচ্ছার বাহিক রূপারোপ কিনা। কিংবা অন্যের পাওয়া জিনিসগুলোই আমাদের এত তাড়াতাড়ি ভালো লেগে যায় যাতে আমরা সহজেই নিজের চিন্তার প্রতিফলন দেখতে আরম্ভ করি কি না।

উনি বলছিলেন: বীনুর কথা আর কি বলব। এখানকার আর সবাই তো আমার ওপর বিরূপ। হঠাং চুপ করে কিছু ভাবতে আরম্ভ করেন উনি। আমি দেখি সৌন্দর্যাশাস্ত্র অনুসারে আকর্ষণীয় না হয়েও এই চোখ কম সুন্দর নয়। 'আর সবাই' এর মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই তেজপালও ছিলেন। কিন্তু বিষয়টা এতই কোমল যে স্পর্শ করতেও বুঝি সংকোচ হয়। অধীর ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে আমার সমস্ত মন। আমাকে কিন্তু গান শেখালেন না মিসেস তেজপাল। গভীর আগ্রহের সঙ্গে বুঝি তাই বললাম।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠেন হঠাৎ। "গান!" সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর হয়ে ওঠে গালের টোল দুটি। হাসতে হাসতে দু তিনবার উনি সামনে পেছনে ঝুঁকে পড়েন আর বিদ্যুৎ বাতির মতন ঝলকে ওঠা দাঁতের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই আমি। "সারাদিনই তো গান নিয়েই আছি। এখন আলাদা করে গাইবার কি দরকার আবার?"

ওঁর এত হাসির কারণ বুঝতে পারি না আমি। মনে হয় এই হাসি বড় খামখেয়ালী করা আর সব মিলিয়ে বড়ই নকল। তারপর যেন হঠাৎ আমাকে ওর কনফিডেন্সে এনে বলেন, একদিন খুব প্রাণভরে পুষিয়ে দেব। এত যে আপনি নিজেই বারণ করবেন তখন।

"এখনই শোনান না।" সেইরকম আগ্রহ ভরেই বলি আমি। ভাবি বোধ হয় সব গাইয়েদের মতন দু-একবার না বললে গাইবেন না উনিও। মন থেকে যখন ইচ্ছে হবে তখন না হয় আবার গাইবেন।

হঠাং উঠে দাঁড়ান উনি। চশমার ডাঁটিটা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, "সারা জীবন ধরে শুধু তা হলে অপরের কথাতেই গাইতে থাকি? নো, আই সিমপলি কান্ট। আকবরের সেই কি যেন কবিতার অংশ ওটা—আমার দুঃখের সব আকুলতাকে ওরা গ্রামোফোনে ভরে রাখে, বলে দাম নাও আর ঝরাও দুঃখ।" কথার মোড় ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বলেন, "আরে বড্ড দেরি করে ফেলল বীনু।" চশমার ডাঁটিটা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে বারান্দার অন্য ধারে বাইরের দরজার পাশে গিয়ে বন্ধ দরজার ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে ঐ দিকটা দেখবার চেষ্টা করতে থাকেন।

আমার মুখ থমথম করে ওঠে। স্তব্ধ হয়ে আমি শুধু দেখতে থাকি। উনি হঠাৎ আমাকে এত শক্ত কথা বলে বসবেন এর জন্যে আমি তৈরী ছিলাম না। ওঁকে গান করতে কেন বললাম? রেডিও সিনেমায় আমি ওঁর থেকে ভাল গান শুনেছি। এমন কিছু সত্যি সত্যি অপ্সরী কিন্নরী নয়। আমরা নিজেদের অনবরত ছোট করে করে আসলে এই মেয়েদের অহঙ্কার সত্যি এত বাড়িয়ে তুলেছি। বসে থাকত চুপচাপ। তাই ভদ্রতার খাতিরেই তো কিছু কথা বলতে শুরু করেছিলাম। ওঁর হাসি হাসি মুখের ছবি দেখে আমার কেমন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল আমি ওঁকে যা কিছুই বলব উনি কিছু মনে করবেন না, আর আমার সব কথাও রাখবেন। আর মিথ্যে বলব না নিজেকে আমি এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেও ভাবতাম, তাই ভাবতাম ওঁর আমার কথা নিশ্চয়ই রাখা উচিৎ। বোধ হয় ওঁর ভাব ভঙ্গিও আজ কিছু স্বচ্ছন্দ ছিল। আমি ওঁকে পেছন দিক থেকে দেখতে থাকি। সুডোল শরীর। গোলাপী শাড়ির পাড় আর আঁচল। পাতলা শাড়ির তলা থেকে খানিকটা দেখতে পাওয়া চওড়া কোমরের পটী। কি জানি কেন ওঁর ওপর রাগ কিছুতেই হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কোথাও যেন ও বড্ডই কোমল। উনি এক্ষুণি এদিকে ফিরবেন ভেবে আমি নিজের কাগজ-পত্র গোছাতে সুরু করি।

"আপনার কবিতা লেখা কেমন চলছে?" এদিকে ফিরেই উনি এমন স্নিগ্ধ আর আপন জনের মতন জিজ্ঞেস করেন যেন কিছুই হয়নি আগে। দুটো হাতই ছড়িয়ে টাইপ করতে উদ্যত আমাকে দেখে উনি খিল খিল করে হাসিতে ভেঙে পড়েন: "একটা কথাতেই সমস্ত শান্তি চলে গেল তো? সত্যি আপনারা পুরুষ মানুষরা এত অদ্ভুত বস্তু। আপনারা চাইবেন তাই ফুল ফুটবে, তাই কোকিল গাইবে, ঝরনা বইবে, বাদল ধারা নামবে! আমি দেখি গন্ধবর্ণ যতই আলাদা হোক আসলে মাটি সব একই।"

না, আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে এর কোন কথায় আর আশ্চর্য হব না। উনি যে নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন তা মনে হচ্ছিল না। আমি চুপচাপ অর্থহীন টাইপ করে চলি। একবার মনে হয় কোন শক্ত কথা বলে দিই, কিন্তু তবু চুপ করেই থাকি। "আমার একটা কাজ করে দিন না। আপনার নিজের আর কিছু অন্যের ভালো ভালো কবিতা লিখে দিন।"
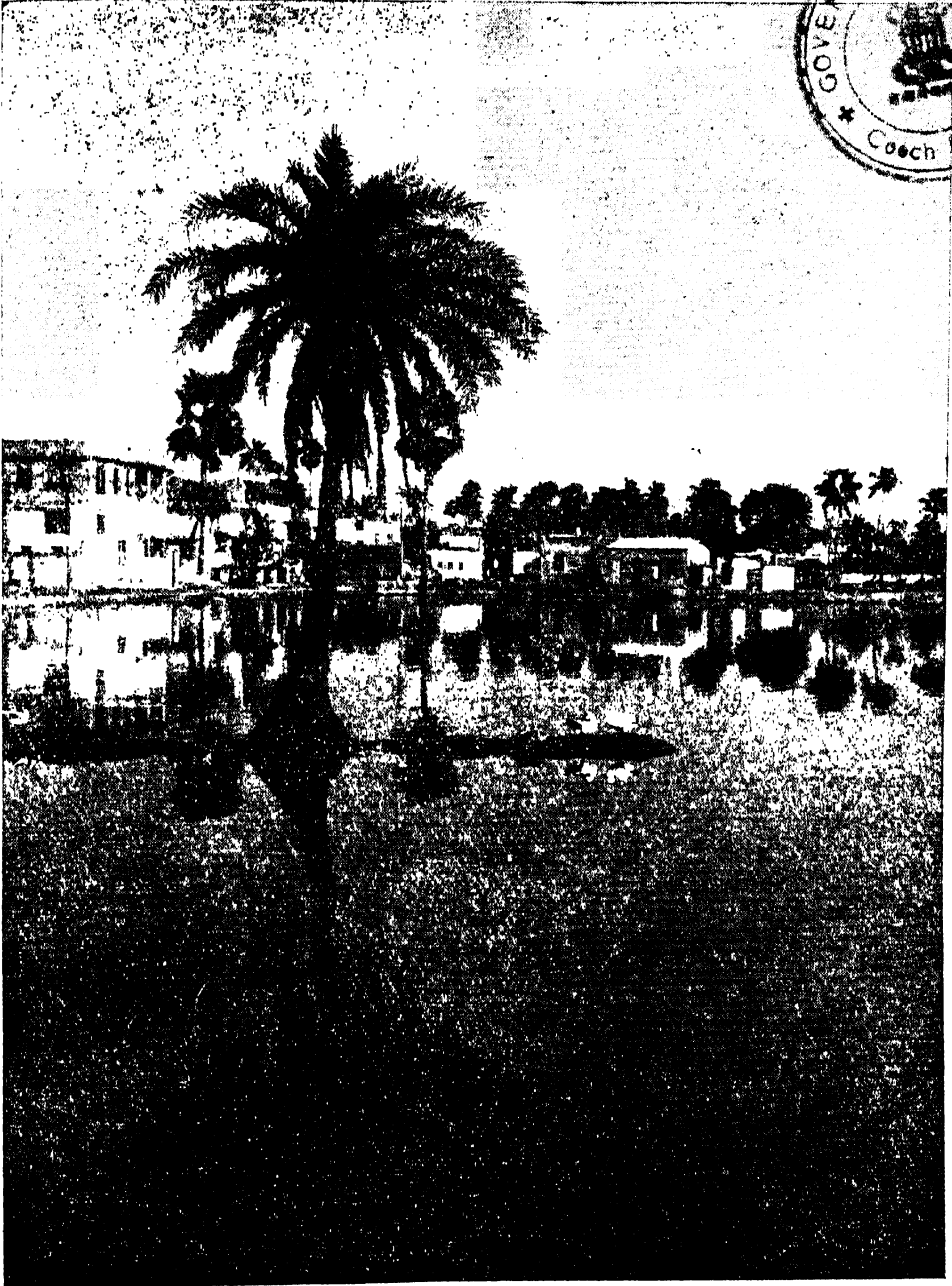
প্রতিচ্ছায়া —বিজয়া দাশগুপ্ত

॥ আ লো ক চি ত্র ॥

সারনাথ মন্দির —মণি চক্রবর্তী
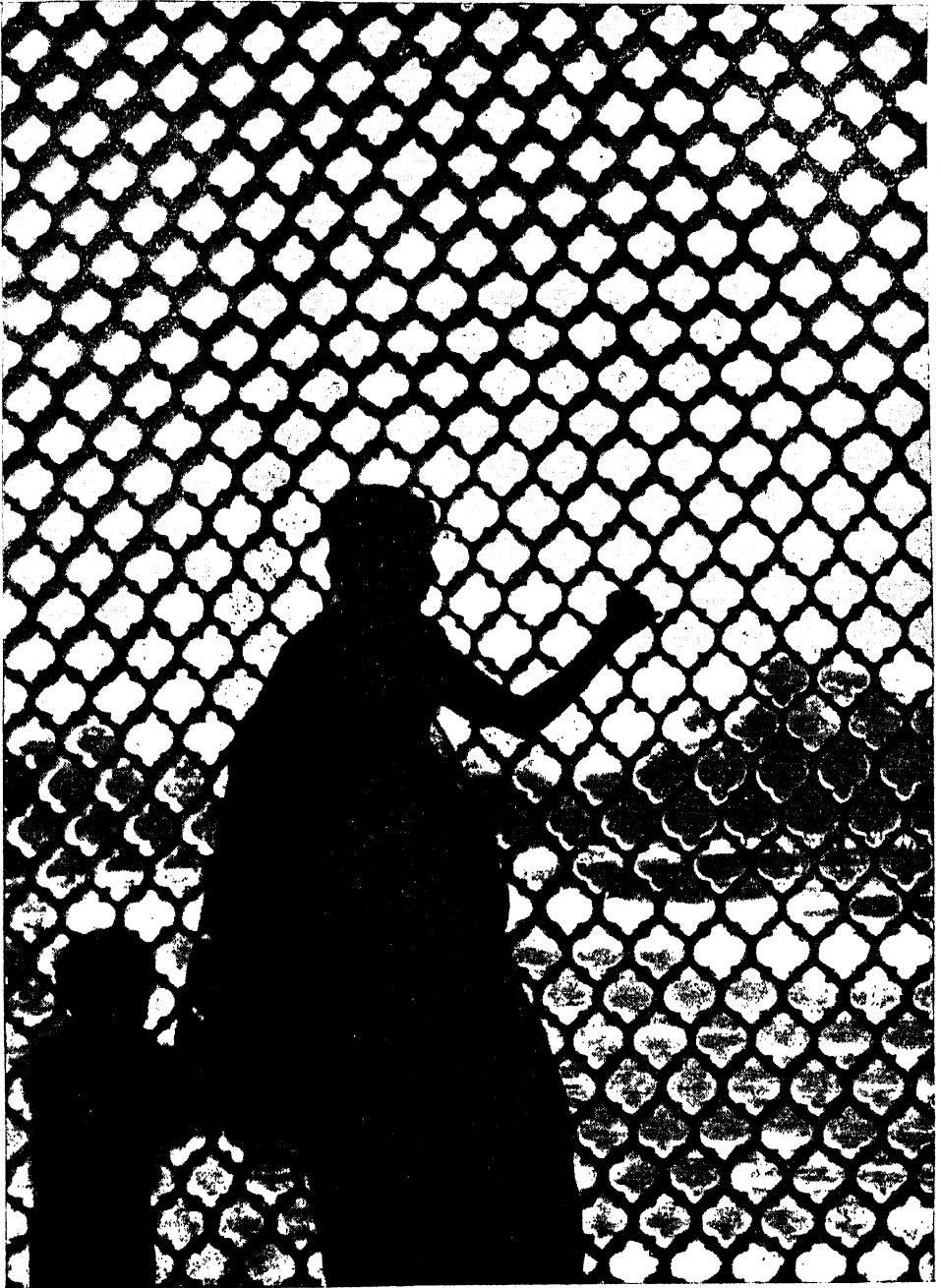
সৃষ্টি বৈচিত্র্য — শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

আনন-পঞ্চ —সত্যরঞ্জন ঘোষ

দার্জিলিং স্মৃতি —ডাঃ অমিতাভ রায়

একটি আধার

—আশীষ বসু

অবাক —বিশ্বজিৎ সেন

একেবারে স্বাভাবিক ভাবে একান্ত অনুরোধের ভঙ্গিতে আবার বলেন উনি।

"আচ্ছা।" মাথা নেড়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলি আমি। পেছন দিকে চুল ঝাপটিয়ে দিতে দিতে আমার দিকে দেখেন উনি, দুপাক ঘোরেন ঘরের মধ্যে। ইস নিজেকে একটা গানের অনুরোধ করাকেও রাখা হল না আর অন্যের কাছে আশা করবেন পৃথিবীর যত বাগার খেটে দেবে ওঁর জন্যে।

"আচ্ছা কোথাও ফাঁদটাদ লাগেনি আপনার এখনও?" মুচকি হেসে বলেন উনি।

মুখ তুলে প্রশ্নবাচক ভঙ্গিতে আমি দেখি ওঁর দিকে। অর্থাৎ এর কি অর্থ?

"বুঝতে পারলেন না?" উনি এমন ভঙ্গিতে হাসেন যেন খুব বড় রকম রহস্য কিছু একটা করতে চলেছেন। 'মানে, কোথাও কোন ফিঁয়াসে-টিঁয়াসে নেই কি?'—যেন গানের অনুরোধ করার সঙ্গে আমার প্রেমিকা থাকার কোন সম্বন্ধ আছে। 'আচ্ছা আপনি তো বললেন না। বীনুকে জিজ্ঞেস করছি আমি। পরমুহূর্তেই উনি স্নানের ঘরের পাশে গিয়ে বীনুর সঙ্গে কথা বলছেন। ওঁর বেতের ডোকচিটা তখনো পড়েছিল চেয়ারের ওপর। হঠাৎ ইচ্ছে তুলে নিচে ফেলে দিই। পরক্ষণে নিজের ছেলেমিতে হাসি আসে নিজেরই। কার্বনটাকে মুঠোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে ফেলতে আবার একবার ইচ্ছে হয় কি ওর ঐ ডোলচির মধ্যে রেখে দিই। তখুনি অন্যদিকের বারান্দা থেকে ভেসে আসে,—

"বাঁরা হায় মুহব্বাত হাসি হায় জামানা।
লুটয়ে হায় দিল নে খুশীকা খাজান।..."

আরে, গান করছেন দেখি উনি। হেসে ফেলি আমি। নিচের গাছটা আমাদের ফ্লাটের ঠিক সামনে দিয়ে উঠেছিল। ঐ স্বর শুনতে শুনতে সেই গাছের শাখার গান গাওয়া কোকিলটা থেমে যায় হঠাৎ।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মিসেস তেজপাল এমন কি করে বসলেন যে পাগল হয়ে গেল তেজপাল। একথা এখনও পর্য্যন্ত বোধগম্য হচ্ছিল না আমার। কোন রকমে কিছুতেই মন না লাগায় চুপচাপ নিচে নেমে আসি। মেজর আয়ারের ফ্লাটে রণবীরের উঁচুস্বরের হাসি শোনা যাচ্ছিল। কারোর বাড়ি টেলিফোন ঝনঝন করছিল। নামতে নামতে কেমন যেন অসোয়াস্তি হচ্ছিল যে কেউ কেন ওটাকে উঠিয়ে নিচ্ছে না। নিচেরতলার বারান্দা বা ভেতরের ঘরের আলোর রেশ বাইরের রাস্তা পর্য্যন্ত এসে পড়েছিল। পর্দার জন্যে নিচের লোকেরা 'রেলওয়ে ক্রিপার' আর 'বেগম বেলিয়া'র দল লতা সামনের দিকে লাগিয়ে নিয়েছিলেন। বেগম বেলিয়ার সূক্ষ্ম রেশমের জালের মতন ফুলের মধ্যে থেকে গ্রামোফোনের শব্দের সঙ্গে উঁকি দেওয়া রেলওয়ে ক্রিপারের বেগুনি ফুল বড় আশ্চর্য্য আর সুন্দর দেখাচ্ছিল। বিলিয়ার্ডস খুব জমে উঠেছিল বোধহয়। বল আর স্টিকের খটরমটরের সঙ্গে মাঝে মাঝে এত নিঃশ্বাস বন্ধ করা নিস্তব্ধতা পেয়ে যাচ্ছিল। আমার মন কোনরকমেই ওদিকে লাগবে না। আমি জানতাম। এমনিই হুগলির ধার পর্য্যন্ত হাঁটবার ইচ্ছেয় আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আসতে যেতে গাড়িগুলো নিজেদের চাকায় চরর করে রাস্তার জল ছড়িয়ে চলে যাচ্ছিল আর হেডলাইটের আলোয় রাস্তার নিচের কালো পিচ চকচক করে উঠছিল। কেল্লার ময়দানের সবুজ ঘাস ভিজে ভিজে হয়েছিল। রাস্তার নিওন-বাতি পাখীর মতন গাছের ভিজে পাতার পেছনে লুকিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। রাস্তার আর একদিকে জুবিলী লাইনসের এই ব্লক আলো-আঁধারে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া মনে হচ্ছিল।

এখন তো কেল্লার কাছেও কোয়ার্টারস তৈরী হয়ে গেছে। আগে আমার খুব ভালো করে মনে আছে ওদিকে কোয়ার্টার তৈরী হবার কোন কথাই ছিল না। এই পথ ধরে তো আমি প্রায়ই মিসেস তেজপালকে কিটির শেকল ধরে আস্তে আস্তে গুনগুন্ করতে করতে ওকে বেরিয়ে নিয়ে আসতে দেখতাম। ওঁর এক হাতে একটা পাতলা-মতন বেত থাকত আর অন্য হাতের কব্জিতে চামড়ার ফিতেটা থাকত জড়ান। এ্যালসেশিয়ান কুকুর কিটি আগে আগে উনি কামানের মতন ঝুঁকে পড়ে পেছন পেছন...নামের সঙ্গে সঙ্গে ওঁর যে ছবি আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে সে ঐ বিরাট শক্তিশালী কুকুর যেন ওঁকে টেনে নিয়ে চলেছে আর উনি পেছনে পেছনে অনুপায় হয়ে টানে পড়ে ছুটে চলে যাচ্ছেন...ভয় হত সামান্য ঠোক্কর লাগলেই এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে...হয়ত মনে এই ছাপটাই পড়ার কারণ যে প্রথম প্রথম ওঁকে এই রূপেই তো আমি দেখেছিলাম।...

আমি 'বাস' থেকে নেমে বইপত্র হাতে কোয়ার্টারের দিকে আসতে আসতে দেখেছিলাম সামনে কিটি মিসেস তেজপালকে টেনে নিয়ে ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কিটির সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে প্রায় দৌড়িয়েই চলতে হচ্ছিল। একবার মনে হয়েছিল না দেখার ভাণ করে চলে যাই। কিন্তু 'উনিও' দেখে ফেলেছিলেন ততক্ষণে। সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর সাদা পটি বাঁধা কনুই-এর দিকে চোখ পড়ে। এখন ওঁকে ঐ পটি কথা কিছু জিজ্ঞেস না করা একান্ত অশিষ্টতা মনে হচ্ছিল। সেদিনের কথা এখনো ভুলিনি আমি। ফাঁসি—শব্দটা মনে মনেই উচ্চারণ করি একবার আর যে ভাবে কথাটা আমাকে বলা হয়েছিল মনে হতেই হাসি পায় আবার। চোখাচোখি হতে' পরস্পর হাসি বিনিময় করি।

'কিটিকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন?' দু কান খাড়া করে সামনের দিকে চেয়ে থাকা ওঁর কোমর পর্য্যন্ত উঁচু কুকুরটির দিকে সমীহের দৃষ্টিতে চেয়ে হেসে জিজ্ঞেস করি আমি। চামড়ার বন্ধনীতে ওর পেটও বাঁধা ছিল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই সময় ওর আর অন্য কিছুতে মনই লাগে না। এমন স্বালাতন করছিল। বললাম, চল তবে তোকেই আগে ঘুরিয়ে আনি।' ওঁর চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। অন্যমনস্ক ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ছড়িয়ে পড়া চুলগুলোকে কানের পাশে আবার সরিয়ে দেন উনি। জিজ্ঞেস করেন: "আজ টাইপ করবেন না?"

"এখন?" আমি ঘনিয়ে আসা অন্ধকার আর লুকিয়ে পড়া দিনের দিকে ইশারা করে বলি: "এখন কি টাইপ করবার সময়? আমার তো আজ পর্য্যন্ত কোন দিন মনে পড়ে না যে এ সময় ঘরে বন্ধ হয়ে থেকেছি আমি কখনো। এদিক সেদিক একটু ঘুরে তারপর টাইপ করতে বসব। আজ প্রচুর কাজ করবার আছে।" পরক্ষণেই আবার

আগের দিনের কথা আমার মনে পড়ে যায়। একটু নিরাসক্ত ভাবে বলি, "আজ ক্লাবে-টেলাবে গেলেন না ?"

"মেজর তেজপাল এন, সি, সি ক্যাম্পে গেছেন তো ?" কুকুরটা ওঁকে ক্রমাগত এদিকে টানছিল। প্রায় সবটাই মেটে রঙ। মাঝে মাঝে কালো লোম। বুকের কাছে হলদে হলদে রঙের নরম লোম। আর অদ্ভুত ধরণের বাদামি চোখ। ওর ঐ চোখের দিকে চেয়ে আমার কেমন ভয় করছিল। কুকুরটা ওঁর কোমরের থেকেও উঁচু ছিল। ইচ্ছে করলে ওঁকে শোলার মতন স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে যেতে পারে। না ঐ ফ্যাশানেব্‌ল ঢং-এর বেত সাহায্য করবে, না ঐ সংগীতময় গলা ওকে আঁটকাতে পারবে। আমি ওপর ওপর বলতে চাই, "ও, এই ব্যাপার। তাই আজকাল গান-বাজনার আওয়াজ কম আসছে।" কিন্তু সাহস হয় না। কে জানে কি জবাব দিয়ে বসবে।

কুকুরের সঙ্গে টানাটানির ব্যস্ততায় উনি আমার কথা-বর্তা শোনবার অবসর পান না। "যাবেন, একটু ওকে হুগলি পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে আসি···কাজ নেই তো কিছু ?" হঠাৎ বলেন উনি।

"চলুন।" হাতের বইগুলো গেটে দরওয়ানের হাতে আমি দিয়ে দিই আর আমরা দু' জনে চলতে সুরু করি হুগলির দিকে। আজ আমার মিসেস তেজপালের মধ্যে আশ্চর্য কিছু মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার যেন ওঁকে কিছু কথা বলার ছিল যা মনে আসছে না। হাতের কুনুইয়ের দিকে দেখে তো হঠাৎ চমকে উঠি : "আরে আপনার হাতে কি হল ?" আমার মনে পড়ে এই কথাই ওঁকে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম।

আদুরে ভঙ্গিতে হাত ঝটকিয়ে উনি বলেন : "এই বাথরুমে একটু পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। খেয়াল ছিল না ম্যাট থেকে পা পিছলে গিয়েছিল।"

"বেশী লাগেনি তো ?" চিন্তাকুল স্বরে আমি প্রশ্ন করি। ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হয় জিজ্ঞেস করি আপনি আমাকে নিজেই কেন বলেননি ? কিন্তু সে একান্তই অনধিকারের কথা হত।

"না।" উনি এমন এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে বলেন যে চুপ হয়ে যেতে হয় আমাকে। আমার মনে হয় এই বাথরুমে পিছলে যাবার কথা ঠিক নয় আর একথা আমি আগেও কখনো অন্য কোনখানে শুনেছি একাধিকবার।

চুপচাপ চলতে থাকি আমরা। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছিল আর গ্যাসের বাতি জ্বালাবার লোক দৌড়ে বাতিগুলো জ্বালিয়ে চলেছিল। সেন্ট জর্জেস গেটের সামনের রাস্তার মধ্যে সবুজ ঘাসে তৈরী দ্বীপ পেরিয়ে এবার আমরা চুপচাপ হুগলির পাড় ঘেঁষা রেলিঙের ধারে ধারে চলছিলাম। মিসেস তেজপালের সঙ্গে চলতে চলতে বড় অস্বস্তি লাগছিল। চেনা কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে ? কালকেই কেউ বলবে—"আপনি সে সময় একটু উঁচুতে ছিলেন তাই আর বিরক্ত করিনি।" কিন্তু ওঁর সঙ্গে চলার এমন এক আকর্ষণ ছিল যে মনে মনেই একটা গর্ব্বে ভরা সন্তুষ্টি হচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে ভয় ছিল যে হঠাৎ সামনে রণবীর বা মেজর তেজপালই না এসে পড়েন। তেজপালের চেহারা কল্পনা করে হঠাৎ যেন সমস্ত মনটা আতঙ্কে ভরে ওঠে। থেকে থেকেই মুখ ফিরিয়ে ওঁর দিকে দেখে নিচ্ছিলাম আর যাতে ধরা পড়ে না যাই তাই দূরে মেঘ, ভেসে যাওয়া মাল-জাহাজ আর ষ্টীমারগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকছিলাম। উনি আস্তে আস্তে গুন্‌গুন্ করতে করতে অকারণেই হাতের বেতটাকে ওপরে নিচে নাচাচ্ছিলেন। কুকুরটা নিঃশব্দে চলছিল। একটা খোলা যায়গায় রেলের লাইন পার হয়ে আমরা নদীর ঠিক ধারের রাস্তায় এসে পড়ার পর উনি আস্তে করে হাসলেন অল্প।

আমি এদিক ওদিক কোন মজার জিনিস আছে নাকি দেখবার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করি ? "কি ব্যাপার হল ?" কিন্তু কোনখানে এমন কিছু চোখ পড়ে না।

"আমার এই হুগলির ধারে বেড়াতে আসা মানুষগুলোর দিকে তাকালে হাসি আসে।" উনি রাস্তার ধারে ধারে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর লাইনটার দিকে দেখিয়ে বলেন : "মাছের দুর্গন্ধ আর জাহাজ থেকে পড়া নোংরা জল ভরা এই নদীর ধারে এসে এরা বোধহয় নিজেদের চৌপাটি, জুহু বা ট্রিপলিকেন-বিচে দাঁড়ান মনে করে।

"এতে হাসির কি কথা আছে ?" আমি অকারণেই ঝুঁকে পড়ে একটা পাথর তুলে নিই সেটাকে দুএকবার লোফালুফি করে লাইনের ওপর ফেলে দিতে দিতে বলি : "এরা তো নিরুপায়। এখানে কোথায় ওরা ট্রিপলিকেন-বীচ বা জুহু চৌপাটি পাবে ?"

"আপনার হাসবার মতন কিছুই মনে হচ্ছে না ?" দেখুন না এখানে এসেও এরা গাড়ির ভেতর বন্ধ হয়ে বসে বসে রেডিও শোনে। বাড়ি তবে কি খারাপ ছিল ? বড় বেশী হলে মাডগার্ডে ঠেসান দিয়ে মুড়ি বা আইসক্রিম খাবে—যেন হুগলির ধারে অত্যন্ত কর্ত্তব্য কিছু একটা করা হচ্ছে।" আমাদের সীমানার মধ্যেও বেড়াতে আসা লোক আসা-যাওয়া করছিল।

"আপনি একথা কেন ভাবছেন না যে বন্ধ গাড়ি তবু ভালো কিন্তু স্ত্রীদের নিজেদের সঙ্গে আনা এদের পক্ষে একটা মস্ত ক্লান্তিকর কাজ। নাহলে এদের বেরোবার ভাগ্য আর কোথায় হয় ? ঐ নিজেদের একঘেয়ে ছোটছোট কথাবার্ত্তা—নিজেকে সবচেয়ে জ্ঞানী মনে করে। কেননা যাদের সঙ্গে মেলামেশা তারা হয় আত্মীয়-স্বজন না হলে চাকর-বাকর আর শেঠজির কৃপা প্রার্থী লোক এইজন্যে সব সময় নিজেকে সকলের থেকে উঁচু ভাববার একটা কমপ্লেক্স সহজেই গড়ে ওঠে এদের। গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে ঘুরলে লোকে যদি সাধারণ মানুষ বলে ভুল করে ? সব সময় আমি যে বড়লোক এই 'কনশাসনেস' না হারিয়ে যায়।

"হু।" উনি যে ভাবে কথাটা বলেন ওঁর নিবিষ্ট মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটু জোরের সঙ্গে উনি বলেন, "দে শুড বি শাট এণ্ড চার্জড ফর দ বুলেটস। এদের কাছ থেকে গুলীর পয়সা নিয়ে এদের গুলী করে মারা উচিৎ।

কথা শুনে এক ভদ্রলোক চলতে চলতে সিগারেট ধরান ভুলে দেখতে থাকেন। এমনিই চারদিকে আসা যাওয়া দৃষ্টি একবার ওর দিকে পড়বে না সে সম্ভব ছিল না ; নিজের এই কথাতে নিজেই খিলখিল করে হাসিতে ভেঙ্গে পড়েন উনি। দুবার চুল ঝাপটান। আজ সমস্ত চুলের গুচ্ছ পেছন দিকে এক করে বাঁধা ছিল আর বড় বড় চাঁপার কলির মতন কান ওপরে দেখা যাচ্ছিল। আমার এ ভাবা বড় অপ্রত্যাশিত আর অসাধারণ লাগে। আমরা এখন ম্যান-অফ-ওয়ার জেটির পাশ দিয়ে চলছিলাম। দুধের মতন সাদা অপূর্ব এক জাহাজ তেরছা আলোর এক রেখা ফেলে দাঁড়িয়েছিল।

ঢালু রাস্তা থেকে প্ল্যাটফরমে লোক আসা যাওয়া করছিল। মাছ বেচা-কেনা করা মানুষগুলোর নিজের দিকে মুগ্ধদৃষ্টির মধ্যে হাতের বেত দিয়ে সাড়ি বাঁচাতে বাঁচাতে মিসেস তেজপাল মাথা নিচু করে যে মিষ্টি ভঙ্গিতে চুল ঠিক করে রাখছিলেন, যাতে আমি মনে না করে পারি না যে, উনি শুধু নিজের প্রতিই নয় লোকের দৃষ্টির প্রতি আর সে দৃষ্টি থেকে সরে পড়া প্রশংসার প্রতি সচেতন আর খুশি-দুইই। কথাটা মুখে আসতে আসতে থেমে যায় যে যাদের আপনি গুলী মেরে দিতে চাইছিলেন ওরাও তো বারবার খসে-পড়া সাড়ির আঁচল আর প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হাসির কথা কিছু বলা কওয়া করছে। কিন্তু বলি: "আপনি বোধহয় ওদের দিকে থেকে ভাবতে চেষ্টাও করেন না?"

"দেখুন, নদীর ধারে আসি তো এইভাবে বসে খোলা হাওয়া খাওয়া উচিত।" বলে উনি বিনা ভূমিকায় ধারের ঘাসে ধপাস করে বসে পড়েন। কুকুরটা ওঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে! এবার আমি দেখি কত বড় কুকুর সেটা। ওর পিঠ এঁর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছিল!

মনে হয় কি আশ্চর্য্য মহিলা···

এক মুহূর্ত এদিক ওদিক চেয়ে বসে পড়ি আমিও। ভেতরে এক অজানিত ভয় আর নাম না জানা পুলক ছিল। পাশে গাছের নিচে আমাদের দিকে পিঠ করে কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে আর এক বাঙালী জোড়া বসেছিল। আমার বারবার মনে হচ্ছিল যেন এক্ষুনি কোন ভারী হাতের থাবা পেছন থেকে এসে আমার ঘাড়ে পড়বে; "কি ভাই, এখানে বসে আছ?" আর আমি ঘুরে দেখব আ রে এতো মেজর তেজপাল। বোধহয় এ বীমুর সেই কথাই ছিল সে যা ভয়ের রূপে মনে মনে গিয়েছিল। আর সেই জন্তেই ওঁর সান্নিধ্য সম্পূর্ণ ভাবে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছিলাম না। কিন্তু মিসেস তেজপালের নিশ্চিন্ত ভঙ্গী দেখে সান্ত্বনাও পাচ্ছিলাম বড়।

উনি অপলক চোখে জাহাজ গুলোকে দেখতে থাকেন। ছোট ছোট কেবিন, রেলিঙ, গ্যালারি, ছাত আর চিমনি আর ভেপু; পায়ে সুন্দর ছুটো নৌকো খেলনার মতন বাঁধা ছিল। দুহাত বুকের ওপর রেখে খালাসিরা এধার ওধার দৌড়াদৌড়ি করছিল। ওপরে ক্যাপ্টেনের কেবিনের সামনে চেয়ার-টেবিল রেখে দুজন অফিসার কাপে করে কিছু খাচ্ছিলেন। একটা চেয়ার খালি পড়ে ছিল। জাহাজের আলো মিসেস তেজপালের চোখে ঝলমল করছিল। পেছনে কেল্লার অন্তদিকের রাস্তা থেকে কনভার্টেবল থেকে সিনেমার কোন গান ভেসে আসছিল। কিছুক্ষণ উনি নিজের মনেই সে সুর গুনগুন করে তুলতে থাকেন। তারপর হঠাৎ মাথা ফেরান। [ ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা :—নীলিমা মুখোপাধ্যায়।
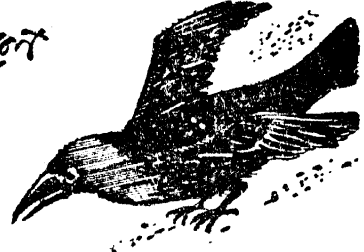
।। ধারাবাহিক উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

## ছয়
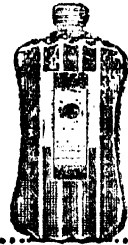
।। ক ।।

বেলগাছিয়াতে মহেন্দ্র সাহার বাগান বাড়িতে এক বিশেষ উৎসব সেদিন।

লক্ষ্ণৌ থেকে এক বাঈজী এসেছে, কস্তুরীবাঈ। সে গান গেয়ে শোনাবে। মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়ির বিরাট হলঘরটার মধ্যে তারই আয়োজন করা হয়েছিল। মেঝেতে বিস্তৃত ফরাস—তারই মাঝখানে ভেলভেটের নরম গালিচা, সেই গালিচায় বসে কস্তুরীবাঈ গাইবে।

মাথার 'পরে বেলোয়ারী ঝাড়-বাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

গালিচার এক পাশে রূপার সুদৃশ্য পাত্রে নানা ধরণের মেওয়া, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনী। অন্য একটা পাত্রে নসান বেলোয়ারী আতর দান। এবং তার পাশে অন্য এক পাত্রে গোড়ের মালা।

অভ্যাগতদের সেই আতর ও গোড়ের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানান হবে।

একটু বেলাবেলিই মহেন্দ্র সাহা তার পাল্কীতে চেপে বাগান বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। ঐ বাগান বাড়িরই একদিকের একটা ঘরে ক্ষীরোদার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্ষীরোদা এসে মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল বটে, কিন্তু সে যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল।

হাসে না, কথা বলে না, কেমন যেন বোবা।

ভৃত্য বৃন্দাবনের 'পরেই মহেন্দ্র সাহা ক্ষীরোদার দেখা শোনার ভার দিয়েছিল। প্রত্যহ কাজকর্ম সেরে একটু রাত্রের দিকেই মহেন্দ্র সাহা সেজেগুজে বাগান বাড়িতে আসত। অর্ধেক রাত্র বাগানবাড়িতে কাটিয়ে আবার সে গৃহে ফিরে যেতো।

কিন্তু সেই প্রথম রাত্র থেকেই ক্ষীরোদার ব্যবহারে মহেন্দ্র সাহা বিস্ময় বোধ করেছে। যে ক্ষীরোদাকে একদিন পাওয়ার জন্য মহেন্দ্র সাহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, যত অর্থব্যয়ই হোক তার জন্য সে পশ্চাৎপদ ছিল না এবং তবু তাকে কিছুতেই করায়ত্ত করতে পারেনি। তবু যে হরনাথ মিশ্রর মতো এক দরিদ্র প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে পড়েছিল সেই ক্ষীরোদাই যখন সে রাত্রে অমন বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে স্বেচ্ছায় তার বাগাম বাড়িতে উঠেছিল, মহেন্দ্র সাহা প্রথমটায় রীতিমত যে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সন্দেহ নেই।

শুধু বিস্ময়ই নয়, সে রাত্রে সিক্তবসনা ক্ষীরোদা যখন এসে নেশাগ্রস্ত তারই দু-বাহুর মধ্যে এলিয়ে পড়ে জ্ঞান হারাল—মহেন্দ্র সাহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন বোবা হয়ে বসেছিল! বুকের মধ্যে বহু-আকাঙ্খিত ক্ষীরোদার যৌবনপুষ্ট দেহটা আঁকড়ে ধরে। সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা কি ঘটেছে, না নেশার চোখে সে স্বপ্ন দেখছে!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন মহেন্দ্র সাহা ক্রমে বুঝতে পারল ব্যাপারটা স্বপ্ন নয়, নেশার চোখে কোন রূপ বিভ্রমও নয়, তখন যেন তার উল্লাসের অবধি থাকে না।

ক্ষীরোদা এসে তার কাছে ধরা দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছে।

আনন্দে বিহ্বল মহেন্দ্র সাহা ক্ষীরোদার জ্ঞানহীন দেহটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বসে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষীরোদার জ্ঞান ফিরে এলে সে চোখ মেলে তাকাল।

চোখ মেলে তাকাতেই মহেন্দ্র সাহা ডাকে, ক্ষীরি—

সেই ডাকেই বোধহয় পর মুহূর্তে ক্ষীরোদার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসে। শশব্যস্তে উঠে বসে সে গায়ের বিস্রস্ত বসন তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে টেনেটুনে ঠিক করতে থাকে।

তোমার শাড়ীটা একেবারে ভিজে গিয়েছে—পাশের ঘরে আমার ধুতি আছে, ভেজা শাড়ীটা বদলে ফেল।

ক্ষীরোদা উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে।

একটা শাদা ধুতি পরে ক্ষীরোদা ঘরের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এবং অনতিদূরে দাঁড়িয়েছিল মহেন্দ্র সাহা।

বাইরে রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

ঝাপসা অন্ধকারে প্রত্যূষের প্রথম আলোর ইশারা।

মহেন্দ্র সাহা এক সময় প্রশ্ন করে, কোথা থেকে অমন করে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে এলে ক্ষীরোদা?

ক্ষীরোদা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কেবলমাত্র একটি প্রশ্নই তখন তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ফিরছিল, এ হঠাৎ সে কি করে বসল ঝোঁকের মাথায়! গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েই বা কেন সে মরতে পারল না। আর কেনই বা সেখান থেকে সোজা এখানে এসে হাজির হলো।

ক্ষীরোদা ! মহেন্দ্র সাহা আবার ডাকে ।

দয়া করুন, ও সব কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না ।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে মহেন্দ্র সাহা । বলে, বেশ, বেশ—জিজ্ঞাসা করবো না । তুমি আমার কাছে এসেছো, তাতেই আমি খুশি হয়েছি ক্ষীরোদা । কোন কথা আমার জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনই বা কি । তা তুমি, আমার কাছেই থাকবে তো ?

থাকবো বলেই তো এসেছি । মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় ক্ষীরোদা ।

বেশ । বেশ—দেখো ক্ষীরোদা, তোমাকে আমি রাজরাণী করে রাখবো । সোনাদানায় গা তোমার মুড়ে দেবো । কেন যে এত কাল তুমি ঐ ভিখিরী বামুনটার ওখানে পড়েছিলে—

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদার চোখের মণি দুটো যেন ধ্বক্-ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে । বলে, তার নামটা শুনতেও আমার ঘৃণা হয়—তার নাম আর আমার কাছে করবেন না ।

না, না—করবো কেন তার নাম । আর তার প্রয়োজনটাই বা কি ! ঠিক আছে—রাত শেষ হয়ে এলো, আমাকে এবারে গৃহে ফিরতে হবে, বেন্দা রইলো—সেই তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে । এদিককার এই দুটো ঘর নিয়ে তুমি থাক—বেন্দাকে বলে যাচ্ছি সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে ।

মহেন্দ্র সাহা ঘর থেকে বের হয়ে গেল ।

পরের দিন একেবারে সন্ধ্যার মুখেই এসে বাগানবাড়িতে হাজির হলো মহেন্দ্র সাহা ।

আজ সাজ-গোজটা যেন তার একটু বেশীই হয়েছিল ।

কিন্তু পাল্কী থেকে নেমে ভিতরে পা দিয়ে বেন্দার মুখে কথাটা শুনে যেন মহেন্দ্র সাহা থমকে দাঁড়াল ।

ক্ষীরোদা নাকি স্নান করেনি, খায়নি, কিছু করেনি ।

সে কি রে ! কেন !

তা কেমন করে বলবো কর্ত্তা । তাকেই শুধিয়ে দেখুন ।

কোথায় সে ।

যে ঘরে ছিল সেই ঘরেই তো আছে ।

মহেন্দ্র সাহা একটু যেন বিস্মিত হয়েই ক্ষীরোদা যে ঘরে ছিল সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল ।

ঘরের মধ্যে দেওয়াল-বাতি জ্বলছিল । তারই আলোয় ক্ষীরোদার 'পরে তার দৃষ্টি পড়লো ! জানালার ধারে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষীরোদা, বাইরের অন্ধকারে জানালা-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে ।

ক্ষীরোদা ?

মহেন্দ্র সাহার ডাকে ক্ষীরোদা ফিরে তাকায় ।

পরনে সাদা ধুতি, তৈলহীন রুক্ষ কেশভার বুকের একদিকে গুচ্ছে গুচ্ছে নেমে এসেছে ।

কিন্তু সামান্য ঐ এক শাদা ধুতিতেই ক্ষীরোদার দেহের যৌবন সুষমা যেন উপচে পড়ছে ।

সত্যিই ক্ষীরোদা সুন্দরী, সন্দেহ নেই তাতে এতটুকু ।

ক্ষীরোদার মত রূপ সত্যিই বড় একটা চোখে পড়ে না সচরাচর ।

কামার্ত্ত দৃষ্টিতে প্রৌঢ় মহেন্দ্র সাহা কিছুক্ষণ পলকহীন সেই দেহ সুষমার দিকে তাকিয়ে থাকে ।

ক্ষীরোদা !

ক্ষীরোদা দেহের বসন একটু টেনেটুনে ঠিক করে নেয় ।

বেন্দার মুখে শুনলাম তুমি নাকি স্নান করনি, খাওনি—

ক্ষীরোদা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে এবারে, আমি কোথায় থাকবো ?

কেন ! এখানেই থাকবে ?

এটা তো আপনার বাগানবাড়ি ।

বাগানবাড়ি তো কি হয়েছে । যেমন ব্যবস্থা তুমি চাও সেই ব্যবস্থাই এখানে হবে ।

না ।—

কি না ?

এই বাগানবাড়িতে প্রতি-রাত্রে আপনার ইয়ারবন্ধুর দল আসে ।

ও এই কথা ! হেসে ফেলে মহেন্দ্র সাহা, তা এলেই বা । তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি ?

এত বড় বাড়ি, তুমি তো থাকবে একধারে ।

কিন্তু—

তা ছাড়া তারা এদিকে আসবেই বা কেন ?

না—আমাকে অন্য কোথায়ও রাখবার ব্যবস্থা করুন ।

অন্য ব্যবস্থা তো এখন বললেই হুট করে হতে পারে না ক্ষীরোদা ।

কেন, আপনার বাড়িতে ।

আমার বাড়িতে !

মহেন্দ্র সাহা যেন আকাশ থেকে পড়ে । বলে, বলো কি ! গৃহে নিয়ে গিয়ে তোমাকে তুলবো । হরনাথ মিশ্রের মত তো আমার মাথা খারাপ হয় নি । যে গৃহে গৃহ-দেবতা রয়েছে সেই গৃহে নিয়ে গিয়ে রক্ষিতা মেয়েমানুষকে তুলবো ।

মহেন্দ্র সাহার শেষের কথায় যেন একটা চাবুক এসে সপাং করে ক্ষীরোদার মুখের 'পরে পড়ে ।

সে রক্ষিতা মেয়েমানুষ, গৃহে তার স্থান নেই ।

মহেন্দ্র সাহা বলে, ছেলেপুলের সংসার আমার, সমাজে দশ জনের মধ্যে বাস করি । সংসার কি বেল্লাল্লাপনার জায়গা, সেজন্য রয়েছে বাগানবাড়ি ।

ক্ষীরোদা অবিশ্যি আর দ্বিতীয় অনুরোধ করে নি ।

মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতেই সে থেকে গিয়েছে । তবে সেই যে সে শাদা ধুতি গায়ে তুলেছিল আজো সেই শাদা ধুতিই তার পরিধানে ।
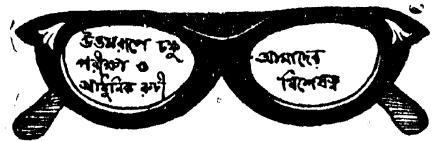
মহেন্দ্র সাহা স্তূপাকার করে দিয়েছে শাড়ীর পর শাড়ী এনে, রাশিকৃত গহনা এনে দিয়েছে, কিন্তু সে সব কিছুই সে স্পর্শ করে নি।

মহেন্দ্র সাহা আপত্তি তুলেছিল, কি ব্যাপার বল তো তোমার ক্ষীরোদা?

কিসের কি ব্যাপার?

এত সব শাড়ী গহনা-গাটি এনে দিলাম তো কই পর না কেন!

ভাল লাগে না।

কি ভাল লাগে না।

ঐ সব গায়ে পরতে।

সে আবার কি কথা?

আমি তো ঐ সব চাইনি, আর চাইবও না কোন দিন সাহা মশাই। আশ্রয় আমি চেয়েছিলাম—আশ্রয় আপনি দিয়েছেন।

কিন্তু কিছুই যদি চাও না তো—আমার কাছে তুমি এলে কেন ক্ষীরোদা?

ক্ষীরোদা মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, জানি না।

মহেন্দ্র সাহা অবাক হয়ে যায়।

ঠিক ব্যাপারটা যেন ক্ষীরোদার বুঝে উঠতে পারে না।

তবে সে-ও আর পেড়াপীড়ি করে না।

মরুক গে, ও যদি না চায় কিছু, তো তারই বা কি এসে গেল।

অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে নিতান্ত একটা ঝোঁকের মাথাতেই সে রাত্রে যখন সোজা গঙ্গার জল থেকে উঠে মহেন্দ্র সাহার আশ্রয়ে এসে ঢুকেছিল ক্ষীরোদা, সে দিন সে সত্যিই বুঝতে পারে নি, কোথায় এসে সে পা দিল।

বুঝতে পারেনি ক্ষীরোদা সেদিন, যে কত বড় একটা কামার্ত পশুর গহ্বরে এসে স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করলো।

কিন্তু বুঝতে ব্যাপারটা ক্ষীরোদার দু'রাত্রির বেশী দেরি হলো না।

ঐ প্রৌঢ় লোকটার কামের উলঙ্গ চেহারাটা যেন ক্ষীরোদাকে একেবারে বোবা করে দেয়।

যেমনই বীভৎস তেমনি যেন পাশবিক।

এক রাত্রিও নিষ্কৃতি নেই।

প্রতি রাত্রে আসে! এবং প্রতি সন্ধ্যায় কথাটা ভাবতে গিয়ে ক্ষীরোদার সর্বদেহ যেন অবশ হয়ে যায়!

পশুটা যেন আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদার দেহের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার পর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত একটা মরণাধিক যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হতে থাকে ক্ষীরোদা।

দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে তার।

কিন্তু তবু কেন জানি ক্ষীরোদা এতটুকু প্রতিবাদ করে না। মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়ি ছেড়ে কোথায়ও চলে যাবার কথাটাও ভাবতে পারে না।

কি করে যে সে ঐ নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে রাতের পর রাত, ক্ষীরোদা নিজেও বুঝি বুঝতে পারে না!

ক্ষীরোদা বাগানবাড়িতে এসে আশ্রয় নেবার পর অনেক দিন মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতে বন্ধু ইয়ারদের নিয়ে কোন আমোদ হৈ-হল্লা হয় নি।

বাগানবাড়িতে নিয়মিত রাতের উৎসবটা যেন ইদানীং বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ সেদিন তাই দ্বিপ্রহরের দিকে বৃন্দাবনকে হলঘরটার চাবী খুলে লোকজন নিয়ে সাফ করতে দেখে, ক্ষীরোদা বৃন্দাবনকে ডেকে শুধায়, কি ব্যাপার বৃন্দাবন? এত তোড়জোড় কিসের?

বৃন্দাবন হেসে বলে, আজ যে এখানে গানের আসর বসবে—

গান?

হ্যাঁ—মস্ত বড় বাঈজী—কস্তুরীবাঈ আসছে—

বস্তুত গানের আসর বসবে জেনে বৃন্দাবন খুশীই হয়েছিল। ক্ষীরোদা এখানে আসবার আগে প্রত্যহ বাগানবাড়িতে আসর বসত ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে এবং প্রত্যহই বকশিসের সঙ্গে আকণ্ঠ সুরা ও নানা উপাদেয় খাদ্য মিলত বৃন্দাবনের। কিন্তু ইদানীং সে ব্যাপার বন্ধ হওয়ায় বৃন্দাবনের কিছুই মিলছিল না। মন মেজাজটা তাই তার ভাল যাচ্ছিল না।

এবং সেই কারণেই ক্ষীরোদার 'পরে কোন দিনই বৃন্দাবন তেমন প্রসন্ন ছিল না। মুখে যদিও সে কথা প্রকাশ করবার মত সাহস ছিল না বৃন্দাবনের।

কিন্তু আজ আসর বসার খবর পেয়ে মনটা তার রীতিমত খুশী হয়ে উঠেছিল, তাই ক্ষীরোদা তাকে প্রশ্ন করায় কস্তুরীর কথাটা জানিয়ে দিয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে পুনরায় বলে, যাক্ বাঁচা গেল বাবা! স্ফূর্তি না হলে বাঁচা যায়, নাচ, গাও—ঢুকু-ঢুকু খাও—তা না বাবা—যত সব পান্তা ব্যাপার—

ক্ষীরোদা শুধায়, কস্তুরীবাঈ সে কে?

সে সব তুমি বুঝবে না। দেখোনি তো—কখনো, শোনওনি জীবনে তাদের গান। আহা শুনো শুনো আজ রাতে। গান তো না যেন কোকিল গাইছে, কুহু, কুহু—

ক্ষীরোদা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বৃন্দাবনের মুখের দিকে।

গরীবের ঘরের মেয়ে—তায় বিধবা—ধনীর বিলাসের কথা সে জানবেই বা কি করে? শুনবেই বা কোথা থেকে।

বৃন্দাবন বলে, সে বছর এসেছিল মোতিহারী থেকে পান্নাবাঈ। কি ঠুংরী আর কি খেয়াল গাইলে। পর পর সাত রাত এখানে মাইফেল বসেছিল।

সাত রাত।

তাই! জেদাজিদির ব্যাপার কিনা, ঐ যে হাটখোলার দত্তরা—নিমে দত্ত—ঐ যে গো ছোট দত্ত—কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল জদ্দনবাঈকে—যেমন গায় তেমনি নাচে। তিনরাত্তির ধরে গান আর নাচ। সেখানকার নাচগান শুনে এসে কত্তার বন্ধু প্রসন্ন ঘোষ বললে, আহা কি গান শুনলাম মহেন্দর—হ্যাঁ—আসর যদি বসাতে হয়তো অমনি—নইলে ছুটকী দাসী—হ্যা-হ্যা—

ছুটকী দাসী কে?

তাও জান না—কত্তার পেয়ারের মেয়েমানুষ ছিল। এই বাগানবাড়িতেই, এখন যে ঘরে তুমি আছো, সেই ঘরে থাকত। আহা—বড় ভাল মেয়ে ছিল, আমাকে কি ছেদ্দাভক্তিই না করত।

কোথায় গেল সে?

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
KOLAY
Glucose
KOLAY
GLUCOSE
BISCUITS
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY Glucose
Glucose
Glucose
KOLAY
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

কোথায় আর যাবে। যেখানে গেলে আর ফেরে না কেউ কোন দিন, সেখানেই গেল।

সেখানে গেল মানে?

গলায় দড়ি দে মরল।

সে কি!

হ্যাঁ—ছোট দত্তর উপর টেক্কা দেবার জন্য কত্তা মোতিহারী থেকে নিয়ে এলো পান্নাবাঈকে এক মুঠো মোহর ঢেলে—হৈ হৈ করে আসর বসালো এখানে। দু'রাত্তির পর তৃতীয় রাত্রি পোহাবার পর যখন সকাল হলো ছুটকীর ঘরে গিয়ে দেখি পরনের শাড়ী গলায় বেঁধে ঝুলছে কড়ি থেকে—

তারপর?

তারপর আর কি! থানা পুলিশ হলো—সব মিটেও গেল।

হল-ঘর থেকে পায়ে পায়ে ফিরে এলো ক্ষীরোদা নিজের ঘরে।

তা হলে তার আগে এই ঘরে আর একজন ছিল।

এবং সে পরনের শাড়ীর আঁচল গলায় পেঁচিয়ে এই ঘরেই আত্মহত্যা করেছে।

সমস্তটা দিন যেন কেমন ঝিম মেরে ঘরের মধ্যে বসে রইলো ক্ষীরোদা।

ক্রমে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার নেমে আসে চারিদিকে। অন্যান্য দিন এই সময়ের মধ্যেই বৃন্দাবনের তাগিদে তাকে মহেন্দ্র সাহাকে রাত্রির অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। ঘোরতর অনিচ্ছা ও আকণ্ঠ বিতৃষ্ণা নিয়েও তাকে গা-হাত ধুয়ে চুল বেঁধে একটা শাড়ী পরতে হয়।

কিন্তু আজ আর বৃন্দাবন এদিকটা মাড়ালও না।

বৃন্দাবন ঐ দিককার আয়োজনেই ব্যস্ত সেই সকাল থেকে।

রান্নাঘরে বড় বড় ডেকচীতে রান্না হচ্ছে মাংস পোলাও-কোর্মা তারই সুগন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করছে।

সন্ধ্যার পরই হল-ঘরের বড় বড় দুটো ঝাড় বাতি জ্বলে উঠলো। এবং আরো কিছুক্ষণ পরে একে একে ইয়ার বন্ধুরা এসে জড়ো হতে শুরু করে।

রাত আটটা নাগাদ মহেন্দ্র সাহার পাল্কীবাহকদের হুম্ হুম্ শব্দ শোনা গেল। মহেন্দ্র সাহা এসে পৌঁছাল।

শুরু হয় সারেঙ্গীর কান মোচড়ান ও সুরের টান মৃদু এক আধটা এবং বাঁয়া তবলার শব্দ।

নিজের ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসে বসে শুনতে থাকে ক্ষীরোদা।

বৃন্দাবন আজ ক্ষীরোদার ঘরে আলোটা পর্যন্ত জ্বেলে দিয়ে যায়নি। আরো কিছুক্ষণ পরে আবার পাল্কীবাহকদের হুম্ হুম্ শব্দ কানে আসে ক্ষীরোদার। পাল্কী এসে একেবারে অন্দরে হল-ঘরের দরজার সামনে নামায় বাহকেরা।

অনেক কণ্ঠের উল্লসিত অভ্যর্থনা, এসো এসো বাঈ—

নমস্তে—মিহি সুরেলা কণ্ঠে শোনা যায়। কস্তুরীবাঈ এলো।

শুরু হয়েছে গান। গানের সুর মূর্চ্ছনা তরঙ্গে তরঙ্গে যেন সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছে।

সমস্ত চেতনা যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল ক্ষীরোদার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষীরোদার যেন মনে হয় অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে কে এসে তার পাশটিতে একেবারে দাঁড়াল।

হঠাৎ শিউরে ওঠে ক্ষীরোদা বুঝি!

অন্ধকারে ক্ষীরোদা দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু সে অনুভব করছে একজন কারো উপস্থিতি, তার একেবারে পাশেই যেন।

ভয়ে কাঁপতে থাকে বুঝি ক্ষীরোদা।

ভয় পেয়েছো?

কে?

আমি।

কে।

আমি গো, আমি—

কথা তো নয় যেন কান্না। কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

এই ঘরে। এই ঘরেই এক রাত্রে ছুটকী দাসী পরনের শাড়ীর আঁচলটা গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ক্ষীরোদা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। অন্ধকারে ছাতের কড়ির সঙ্গে গলায় শাড়ি বেঁধে ঝুলছে একটা দেহ।

দুলছে আর দুলছে।

ক্ষীরোদা নিজের অজ্ঞাতেই পিছুতে থাকে ঘরের দেওয়ালের দিকে কিন্তু ওকি, যত সে পিছিয়ে যায় সেই ঝুলন্ত দেহটা যেন ততই তার দিকে এগিয়ে আসে দুলতে দুলতে।

ক্ষীরোদা আরো পিছোয়, দেহটাও আরো এগিয়ে আসে।

এদিক থেকে ওদিক পিছু হাঁটতে থাকে ক্রমাগত ক্ষীরোদা, ঝুলন্ত দেহটাও দুলতে দুলতে যেন এগিয়ে আসে।

ক্ষীরোদা একটা আর্ত্ত-চিৎকার করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজাটার উপর। কিন্তু দরজাটা বন্ধ ছিল।

জ্ঞান হারায় ক্ষীরোদা, বন্ধ দরজার সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে।

হল-ঘর থেকে একটা উল্লসিত চিৎকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মরে যাই—আহা মরে যাই-রে মরে যাই। বোম কালী নাচনেওয়ালী। [ক্রমশঃ।

১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচনের পর

## বিজয়ী বিধানচন্দ্র রায়কে

**প্রমীলা মিত্র**

সকল হৃদয়ে পাতা আছে চির আসন যাঁর,  
সেই তো পেয়েছে সবার শ্রদ্ধা পুরস্কার!  
সহস্রজনে দেছে মর্য্যাদা নত্র শিরে,  
ফুল হয়ে তারা দুলিছে তোমার কণ্ঠ ঘিরে!

বিধাতা দিলেন যোগ্য হস্তে যোগ্য ভার,  
সেই মনীষীরে প্রণাম জানাই বারংবার,  
আজ শুভদিনে শুভ ইচ্ছার পাঠাই বাণী,  
তুমি আমাদের—আপনারে তাই ধন্য মানি

# কবি কর্ণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর**

১০৪। নিমেষে ঘটে গেল এই বিস্ময়কর ঘটনা। স্নেহের আতিশয্যে 'কি হল কি হল আবার ?'···বলতে বলতে ছুটে এলেন পিতা নন্দ, মাতা যশোদা। যাক, তাহলে যথাস্থলে বসে গেছেন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন !···অতএব স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে পিতৃদেব গাঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণকে বুকে বেঁধে আঘ্রাণ করলেন তাঁর শির। স্নেহাশ্রু ঝরিয়ে আলিঙ্গন করলেন কুতূহলী হলী। আর মা যশোদা বসলেন ছেলেকে কোলে নিয়ে। নিজের দুখানি করকমল দিয়ে, বাৎসল্যের আতিশয্যে, পুত্রের বাম বাহুখানি টিপে দিতে দিতে বলতে লাগলেন,— "পাহাড়ের অতো ভার সইবে কেন গো !···সারা গা'খানা ধ্বসে গেছে,···এক রত্তিও জোর নেই কো গায়ে।" বলতে বলতে মা যশোদা আদর করে চুমু দিলেন কৃষ্ণের বাম করতলে।

১০৫। করপুটে মণিদীপ, দুনয়নে ধারা,···শ্রীরোহিণী এলেন, নীরাজন করলেন কৃষ্ণের।

ব্রজপুরের পুরন্ধ্রীরা এলেন। অনন্ত শুভাশীষের সাথী করে তাঁরা সানন্দে নিয়ে এলেন অতিনিবিড় স্নেহের অব্যভিচারিতা। কৃষ্ণকে পূজা করলেন···দধি, অক্ষত আর দূর্বাঙ্কুরের অর্ঘ্য দিয়ে।

বিপ্রেরা তাঁদের প্রাগলভ্যের বৈশিষ্ট্য দেখাতে দেখাতে, এবং বিপ্র-ভার্য্যারা তাঁদের বিশিষ্ট প্রভার আভাস ছড়াতে ছড়াতে, এগিয়ে এলেন। সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন, অভ্যর্থনা জানালেন সপ্রশংসা।

সনন্দাদি পিতৃব্যেরা,···পিতৃব্যাকুলতায় তাঁরা কেউ কম যান না··· বাৎসল্য-লতাপাশে আবদ্ধের মত কৃষ্ণকে বুকে বাঁধলেন, আঘ্রাণ করলেন তাঁর শির।

আর যাঁরা কৃষ্ণের অনুরাগিণী···উপচীয়মান অনুরাগের অতি-রঞ্জনায় তাঁদের তরল হয়ে গেল লজ্জা। নয়নপ্রান্তের অনুপম দৃষ্টিভঙ্গীটিকে ঘিরে···যেন সেটি শোভার সহচরী···তাঁদের উথলে উঠল এক উৎসবী সুখের ঢেউ। কৃষ্ণকে তাঁরা অর্চ্চনা করলেন না-জানি-কোন্ মনোবিলাসের নৈবেদ্য দিয়ে।

১০৬। এবং ঠিক সেই সময়টিতেই, ঋতুবসন্ত হাসতে হাসতে যমন করে গন্ধ হরণ করেন চৈতালী ফুলের, বৈশাখী ফুলের, ঠিক তেমনি করেই শ্রীকৃষ্ণও হরণ করলেন হৃদয়-সৌরভ দেবতাদের। অতি তুষ্ট হয়ে উঠলেন···আকাশ-পথের প্রসিদ্ধ সিদ্ধেরা, রসিক বিদ্যাধরেরা, শুভগন্ধ গন্ধর্ব, কিন্নর ও কিন্নরীরা। নক্ষত্রের মত শুভ্র কুসুম কীর্ণ করতে করতে তাঁরা স্তবগান করে উঠলেন,—

"জয় হে জয় হে, নন্দাত্মজ জয় হে।···
বৃন্দাবনের রসসুখ দান করে যে মধু···
অতুল গুণবৃন্দের চেয়েও অধিকতর সমৃদ্ধিমান সেই চিন্মধু···
হে ধীর,
হে প্রকটাভীর-শ্যামশরীর,
রয়েছে তোমার যুগল চরণের পদ্মকোষে।
সেই চরণের নখচন্দ্রের
কুরুবিন্দ-প্রভায়,···
তার তন্দ্রাহীন সান্দ্র আভায়,···
হে শ্রীধর, তুমি বিগলিত করেছ
আপন জনের অশেষ শোক।
হে ব্রজবর-বীর,
ভুবনে ভুবনে ছড়িয়ে পড়ুক
তোমার প্রথিত শ্লোক।
জয় হে।

১০৭। জন্মমৃত্যুর দুঃখ ভেদ করে দেয় তোমার মনোহরণ চরণকমলের সেবা। যাঁরা তোমার চরণকমলের ভজনা করেন, তাঁরা তো তোমার বরাভয় পানই,··· যাঁরা কেবল একটিবার মাত্র 'আমি তোমার' এই কথাটি উচ্চারণও করেন, হে নাথ, তাঁদেরও তুমি রক্ষা করে থাকো ইহস্থানে। হে দেব-দেব, হে গোকুলেন্দ্র-পুত্র-চিত্র, তোমার সেবা করেন, তোমায় মাল্যদান করেন, তোমার গাথা গান করেন,···হে প্রভু, তোমার নিত্যসত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তরূপ পার্ষদের সঙ্ঘ। তোমায় নমস্কার, কেবল তোমায় নমস্কার।

উদ্ধত-মদ রোষ-বক্র ইন্দ্রের উদ্ভট বিক্রোশনে উত্তেজিত হয়ে মেঘচক্র নির্মুক্ত করেছিলেন অতিবর্ষণ। হে প্রভু, তুমি সেই বিপুল ক্ষতির পথ রোধ করেছ,···অলস হেলায় উত্তোলন করেছ শৈলাধিপ,···সেবা দিয়ে বিস্তার করেছ ব্রজজনের সন্তোষ। তোমার জয় হোক।

গিরিকে তুমি রূপায়িত করেছিলে লীলাপদ্মের কল্পনায়; করতলটিকে করেছিলে গিরিরাজের তল্পশয়ন; স্বল্প হয়ে গিয়েছিল মেঘ-কল্প ইন্দ্রের অনল্প গর্ব্ব। হে ব্রজজনবন্ধু, হে করুণাসিন্ধু, স্বমহিমায় তুমি বর্ত্তমান। ত্রিভুবনকান্ত হে ভুবনবিহারী, তোমাকে ভজনা করেন রাজরাজেন্দ্রদের শিখরমণির মত এই বিপুল সংসার। কেবল তিনিই ভজনা করেন না···যিনি মদান্ধ।

সান্দ্র-রস-দিগ্ধ তোমার শ্রীঅঙ্গের জয় হোক্।
রাত্রিহীন সেই দেহে চলেছে অসন্দিগ্ধ সুখ-দোহন।
মহৎ এবং অহম্-এর আদি যে প্রকৃতি-পুরুষ, তাঁদেরও আদি এই দেহ।

নিত্য-অনাদি এই দেহের···
কল্পনা চৈতন্য-রস,
ভূষণ করুণা,
ছায়া মিলনের,
শয়ন স্বমহিমায়।

গোপীদের এই রতি-রস-রোপী দেহ···চিৎ-সুখ-শংসী পরমহংসদের ধ্যেয়; জগতের অতিনব্য এই দেহ তাঁদেরও হৃদি বিভাব্য। জয় হোক্, ঐ শিখি-শিখণ্ড-বর-সুন্দর দেহের জয় হোক্। হে প্রভু, হে নবঘন-গঞ্জন, আর্ত্তি দূর কর জগতের।

জয় জয় কৃষ্ণ
প্রণয়-সতৃষ্ণ···
জয় জয় ধীর
ব্রজ-বর-বীর
প্রকটাভীর
শ্যাম-শরীর···
সমর-সুধৃষ্ণ
জয় জয় কৃষ্ণ।

ধর্ম্ম-ধন তো কোন্ ছার, যিনি তোমার চরণ-পঙ্কজে মধুভিক্ষু, মোক্ষও তাঁর কাছে নির্ব্বাসনার বিষয়। তাঁর কৌতূহলও থাকে না সুখের কথায়, ভোগের কথায়, পুত্রকলত্রে, বন্ধুবান্ধবে। সুজন, গুরুজন, তৈজস, ভবন, মহিমা, গরিমা, যশ··ভক্তের সব কিছুই হে ভগবান, তুমি। তুমিই নিরুপাধি কৃপার সমুদ্র···গুণ-রত্নময়।

হে স্তুতি-দুর্গম, তাঁরাই তোমাকে জানেন যাঁরা তোমার প্রেমে বিভোর। যাঁরা গভীর দুঃখে দুঃখী তাঁদের দুঃখ তো তুমিই হরণ করে থাক। আমরা তো কেবল তোমায় স্তব করতেই শিখেছি। আমরা স্তব করে থাকি তোমার ঐ অঙ্গটির··যার অনঙ্গ-তরঙ্গের সুসঙ্গতি তিরস্কার করে অলকদম্বকে; আমরা স্তব করি তোমার ঐ আনন-বিম্বটির··যা শত্রুর হিংসা··যা সুদুর্লভ চন্দ্র-দম্ভের।

হে বন-শোভন, তুমিই আমাদের কাছে বহন করে নিয়ে এসেছে সেই সুখ··যা হত্যা করে লোভকে,··যার উৎকণ্ঠিত আবেশগুলিও পূর্ণ তোমার হর্ষে!

পদ্মকান্তির কবলে পড়েছে তোমার ঐ নয়নযুগ; চাঁচর চিকুরের দীর্ঘ মর্য্যাদায় জেগে উঠেছে শৃঙ্গার-শোভন চামরের চিক্কণ কল্পনা; পক্ক-বিম্বজয়ী মধু-মধুর অধরে স্থির ঝরে পড়ছে মাঙ্গল্যের ঝরণা। হে প্রভু, বসুন্ধরার তুমি গড়েছ উৎসব-পীঠ।

মুক্তার নগরকেও হার মানিয়েছে তোমার কুন্দফুলের মত শুভ্রসুন্দর দন্ত; নক্ষত্রের অম্লান জ্যোতিঃকেও হার মানিয়েছে তোমার চিরভাস্বর হাস্য।

বিলাসের স্বর বেজেছে তোমার বাঁশরীতে। ও নতুন বাঁশরী, ও রতন বাঁশরী···ওকে দেখেও সুখ। ওর ঐ সোনার আভা লেগেছে তোমার কানের কুণ্ডলে। নাচছে কুণ্ডল, নাচছে গালের ঢেউ। তোমার পীবর বক্ষের অক্ষয় সৌভাগ্যের উপর কাঁধ থেকে ঝুলছে,··· দুলছে···উড়ন্ত ভ্রমরের মধুঢালা কোমল মালা। হে প্রভু, তোমার অপার কৃপার বিরাম নেই খেলার।

তোমার বক্ষে রয়েছে মনোহরণ লক্ষ্মী-রেখা; আহা তার চিহ্ন দেখে শঙ্কিত হয়েছে বনমালা। ঐ বুকে··সৌন্দর্য্যের ঐ সুন্দর ঘরে··· অনুপম কৌস্তুভের বাস। ঐ বক্ষের দুয়ার দিয়েই দুষ্প্রবেশ বধূমহলে পদধারণ করেন মনসিজ। তারপরে সেখানেই উন্নতি লাভ ক'রে, নবদর্পণের মত শ্রীকন্দর্প, হে প্রভু, তোমাতেই সমর্পণ করে দেন তাঁর দর্প।

জয় হোক তোমার ঐ বাম বাহুটির··উদ্দর্ম ঐরাবতের রসিক শুণ্ডের মত তোমার ঐ দোর্দণ্ডের আনন্দটির।

গোষ্ঠের তুমি গরিষ্ঠ··মহিষ্ঠ···বরিষ্ঠ। তোমার দয়া নন্দিত করুক আমাদের। হে ব্রহ্মার সংকীর্ত্তিত, নির্জ্জর-দুর্জ্জয় দানব-সূদন নন্দাত্মজ, স্বয়ংপ্রবর্ত্তক হয়ে পালন কর আমাদের।

কালিন্দীর তটপ্রান্তবর্ত্তী কান্ত কাননে বিস্ফুরিত হয়েছে তোমার মহৎ জ্যোতিঃ। আমরা ভজনা করি সেই জ্যোতিঃকে,··যা ভঞ্জন করে ত্রিলোকের শোক, যা রঞ্জন করে স্বভক্তের হৃদয়, যা খণ্ডন করে ভবপ্রবাহ, যা মণ্ডন করে শিখি শিখণ্ড, এবং যার গঞ্জনা উপভোগ করে তমালবরণ তামসিকতা।" —প্রথমা শাখা।

"তোমার জয় হোক। আদরের মহিমায় রঞ্জন কর আমাদের। আমাদের নিয়োজিত কর তোমার চরণ-সেবার প্রীতিতে।

বিনষ্ট কর ভব-ভয়। হে দুর্মদ-নির্দয়, ব্যাধির মত মর্দন কর কাম-মদ, তারপরে আন তোমার কল্যাণ, পূর্ণ কর অন্তর।

হে প্রভু, তুমি বিশারদ।

শারদ-চন্দ্রের মত তন্দ্রাহীন তোমার মন্দহাসি।

ঐ রঞ্জন-কুঞ্জবিহার থেকেই ফুটে উঠেছিল তোমার আর একটী ভাবের ফুল। তখন থেকেই··তোমার ঐ বিস্ময়কর শ্রীমুখ থেকে, কী আনন্দেই না ঝরে পড়ছে কত অক্ষরের কৌতুক,··আর কী আগ্রহই না তুমি দেখাচ্ছ নর্ম্মকথার মর্ম্মরস গ্রহণে!

বিশ্ব-সংশয়-ভঞ্জনকারী তুমিই বিখ্যাত বেদ,··তোমার বাণীর শুদ্ধরসে পূর্ণ আমাদের শ্রুতিসায়র।

ঐ লোল লোচন দুটি সৌন্দর্য্যের খনি। ওরে আজ কী লজ্জাতেই না জড়িয়ে পড়েছে গর্ব্বিত পদ্মের মত প্রেমোম্মত্ত দুনয়নের ঘূর্ণিত বিত্ত!

হে লোচন-রোচন, শুধু তোমার কৃপায়··আসে কল্যাণ, শান্ত হয় আপদ, ঘুচে যায় ভবতাপ।

প্রেম-ভক্তির সৌন্দর্য্য দিয়ে যাঁরা তোমায় ভজেন, শুধু তাঁদেরি·· তাঁদেরি হৃদি-পদ্মাসনে, হে প্রভু, তুমি নিত্য কর বাস।

যমের মত ক্রোধ নিয়ে ইন্দ্র এসেছিলেন। তোমার চণ্ডিমা খণ্ডন করেছে তাঁর পরাক্রম। জয় হোক তোমার চণ্ডিমার মণ্ডনের। হেলা-ফেলার খেলায় তুমি পুত্তলিকার মত তুলে ধরেছিলে শৈলকে। দুলে উঠেছিল তোমার শ্বেতকমলের হংসকুণ্ডল। কী নির্ভয়-সুন্দর সেই বামবাহুর তাণ্ডব! ধন্য তোমার শিল্প, ধন্য তোমার শৈলী।

বাম করপদ্মে আশ্চর্য্য তোমার শৈলোদ্ধরণ! হে মহাবেগবান, এই চরাচরের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য খেচর-ভূচরদের এত বড় বিরাট বিস্ময় উৎপাদন করেও, আশ্চর্য্য, তুমি কেবলমাত্র একটু হেসেছ! বলিহারি তোমার বিচিত্র চরিত্রের পবিত্রতা!

হে গোপবল্লভ, অদ্ভুত তোমার ভুজবিক্রম;··অদ্ভুত তোমার ঐ মরণহীন প্রলয়-মেঘদের অশুভ আক্রমণ থেকে আকুল গোকুলকে রক্ষণ। হে সুপ্রভ, শোভন তোমার প্রথা।

তুমি তুলনাহীন কল্যাণ। তুমি দয়াময় তুমি কামদ। ঘনশ্যাম তোমার ঐ চির-ঘন বিগ্রহ তুমি নিখিলের জাগ্রত অনুগ্রহ। তুমি দক্ষ। বিপক্ষের বিনিগ্রহে তুমি উগ্র; দুষ্টের তুমি কষ্ট; শিষ্টের তুমি ইষ্ট।

তোমার জয় হোক।

যাঁর বরাম্বরের বর্ণচ্ছটায় শিথিল-দম্ভ হয়েছে ফুটন্ত কদম্বের রেণু·· মহামনস্বী-সমাজে যিনি শ্রেষ্ঠ,··মদান্ধ পুরন্দরকে জয় ক'রে যিনি রক্ষা করেছেন গোপ-গোকুল,··তিনি গ্রহণ করুন আমাদের এই স্তবগান।" —দ্বিতীয়া শাখা।

"হে দেব, একদা তোমার ভুজবলে লুণ্ঠিত হয়েছিল পুতনার মত, বকাসুরের মত ভাস্বর অসুরদের গর্ব্ব।

হে দেব, একদা তোমার দক্ষতায় মৃত্যু ঘটেছিল তুঙ্গ ভুজঙ্গম অঘাসুরের।

হে দেব, তুমিই জান কেমন করে সন্তর্পণ করতে হয় বন্ধুদের, কেমন করে পাণ্ডিত্য দেখাতে হয় শত্রুনিপাত-প্রমত্ততায়।

হে দেব, একদা তুমিই দেখিয়েছিলে,··ব্রহ্মার মদখণ্ডন-লীলা,·· তেজের প্রচণ্ড বেগে কালিয়নাগের দমন,··যমুনার রস-পালন,·· দাবানলের গ্রাস থেকে গোধন-রক্ষণ।

হে সুন্দর, তুমিই মোহন সাহস বন্ধুদের।

হে ধুরন্ধর, গোপসুতাদের সৌন্দর্য্য ও অতিপ্রেমার রহস্য-বেগের

মাধ্যমে প্রেমভক্তির অবতারণা···তোমারি কীর্ত্তি। তুমিই হরণ করেছিলে তাঁদের বসন, আবার তুমিই হাসি ও বিলাসের মাধ্যমে তাঁদের সচেতন করে তুলেছিলে অনবদ্য ভাষায়। ধন্য তোমাকে।

বিপ্রবধূদের প্রণয়-সময়ে দৃষ্ট হয়েছিল তোমার উৎসব-রূপ। তাঁদের দেওয়া স্নিগ্ধ অন্ন যখন তুমি গ্রহণ করেছিলে তখন প্রকাশ পেয়েছিল তোমার মুখ্য চতুরতা। যজ্ঞ ও কীর্ত্তির আকস্মিক বিনাশে উদ্ধত-বুদ্ধি পুরন্দর যখন সৃষ্টি করেছিলেন বৃষ্টির প্রলয়, তখন তোমার সংহেলা শৈলোদ্ধরণ-লীলায় প্রকট হয়েছিল তোমার পরিত্রাতার রূপ। সমীচীন হয়েছিল তোমার হর্ষ-প্রকাশ।

ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড-গত নিকৃষ্ট জীবদের অপরাধ-বিনষ্টির তুমিই আশা, তুমিই ভরসা। হে লোচন-রোচন, হে বিভু, তোমার জয় হোক্।

হে উৎসব-বৎসল, তোমার প্রশ্রয়েই অতিসাহসী হয়ে ইন্দ্রকাননের মূলোৎখাত করেছিল গিরিগোবর্দ্ধনের সুস্পষ্ট শিখরাঘাত।

হায় রে, কিম্পুরুষেরাই বা কেমন করে স্তবগান করবেন তোমার? তাঁদের মধ্যে যাঁরা অতি-উদার, হায় ভগবান, তাঁরাও কি ধারণা করতে পারেন তোমার গুণসংখ্যা? সেই কান্ত গুণগুলির তুমিই কি স্বরূপ নও? যাঁরা বিষ্ণু-ভক্তিহীন তাঁদের তুমি দুর্জ্ঞেয়ই। যাঁরা নত, যাঁরা দুর্গত, যাঁরা হীন, অতি দীন,··তাঁদের তো তুমি বেশী করেই রক্ষা কর, বরাভয় দাও।

হে সুন্দর, তোমার অনাবিল কৃপামৃতে আমাদের জীবন ভরিয়ে দাও। তোমার আনন্দের মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়ে প্রসাদিত কর আমাদের ধী। হত হোক মোহের তামসিকতার বেগ,··আমাদের অধীন কর তোমার ভক্তির, তোমার বিরক্তির;—খণ্ডন কর আমাদের অশুভবুদ্ধি। হে অনন্তকান্তি, তোমার কাছে পৌঁছোক আমাদের তমোহীন স্তব। হে ঈশ্বর, তোমার নাম, তোমার শরণ, তোমার করুণা আমাদের গ্রহণ করতে দাও। জয় হোক, তোমার জয় হোক্।

আমরা ভজনা করি সেই মহৎ জ্যোতিঃটিকে,···

যা তক্ষণ করে বিপক্ষের চাতুরী,
যা রক্ষণ করে স্বপক্ষের অনুচরদের,
যা ক্ষণে ক্ষণে বিলিয়ে চলে আহ্লাদ,
যা খর্ব্ব করে গর্ব্বিতের গর্ব্ব।

এই জ্যোতিঃর আবির্ভাব হয়েছে কৃপা-বিপাক-পালিত ব্রজধামে, এবং এই জ্যোতিঃ ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীর মহোৎসব।"

—তৃতীয়া শাখা।

"হে শ্রীবলদেব কনিষ্ঠ, মহিষ্ঠ সুখে তুমি নিষ্ঠাশীল। অশি-সুন্দর অতিবিপুল অতিনিপুণ তোমার পবিত্র ও বিচিত্র চরিত্র। বিশ্বের চমক···তোমার কীর্ত্তি। তোমার অতিসেবায় তিরস্কৃত হয় বিশ্বপাপ। আবার তোমারি হস্তে হয় সংসারের সর্বনাশ। অতএব হে বন্ধনমোচন, হে শোচন-রোচন, তুমিই একাধারে সঙ্কোচ এবং প্রকাশনের নাশন ও রক্ষণের উৎসব।

সাধ্যসাধনা করেও অন্যলোকে যা পায় না, তার চেয়েও অনেক বেশী তোমার সৌভাগ্যের বাহার। তুমি লাভ করেছ··বল্লভ-শ্রেষ্ঠ-কন্যা কলাপণ্ডিতা সুন্দরী শ্রীরাধিকার দর্শনসৌভাগ্য;··আর তার সঙ্গে পেয়েছ তাঁর আধোহাসির, তাঁর আশ্চর্য্য-হাসির সমর্থক শ্রীকন্দর্পকে,··হে শৈলোদ্ধরণ, তুমি সেই কন্দর্পের দর্প। হে প্রভু, তোমার পায়েই স্থান পায় সমস্ত প্রণামের হৃদয়!

হে সর্ব্বদাতা, তোমাকে পূজা করেন শিবব্রহ্মাসম বিচক্ষণ পূজারীরা। তুমিও তাঁদের দৃষ্টিপথে এনে দাও কল্যাণ সাধনের বিলক্ষণ কক্ষ-পথ। মধুর অতিভাগ্যের তুমি দাতা, তুষ্টির সুপুষ্টির তুমি দাতা, তোমায় দেখলে চোখ জুড়োয়। তোমার কীর্ত্তন আর্ত্তের পথ্য।

গোপবধূরা পায়ে পায়ে চলে বেড়ান··রুণ্‌রুণ্ করে বেজে ওঠে তাঁদের নূপুর··ঝুনুঝুনু করে বেজে ওঠে তাঁদের কিঙ্কিণী;··সে দুটির ভয়ে চকিত হয়ে ওঠেন কামদেব;··ডিণ্ডিম বাজিয়ে দেয় তাঁর চণ্ডিমা, ···আর অমনি বধূদের হৃদয়ে জেগে ওঠে, 'এ আমার ও আমার'— ঐ মমকার বিকার;··সেই বিকার থেকে ফুটে ওঠে বিলাস;··হে প্রভু, তুমিই বিশেষিত কর সেই বিলাসের বিকাশটিকে। হে অগম্য, প্রসিদ্ধ সঙ্কর্ষণাদিরও গম্য নয় তোমার প্রচেষ্টা। ধর্ম্মহীনদের বহু তর্কে, বহু বিতর্কে তুমি আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছ; হে প্রভু, ক্রীড়াশীল বারণের মত তুমি তাদের তারণের কারণ হোয়ো। হেলাভরে খেলার ছলে, আমাদের কেবল পুলক দিয়ে যাও।"

তোমার কীর্ত্তন··কে করতে পারে? তোমার তত্ত্ব··আহা সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু, অতত্ত্ববিদ্‌দের কি বিষয় হতে পারে কখনও?

হে হিতকর্ত্তা, হে কল্যাণতম, তুমি রহস্যময়। তোমার আনন্দ-কৌতুকেরও এত আশ্চর্য্য প্রকারভেদ যে মহেশাদি দেবগণও সে বিষয় নিয়ে তর্ক তোলেন না, কুবের-বরুণাদিও তোলেন না। ভগবান, তোমার ঐ প্রেমে-ভরা হাসি নিয়ে ঘর বাঁধ আমাদের হৃদয়ের শোভনতায়, কুশল কর, সবল কর পৃথিবীর অসুর-জর্জ্জর দেবতাদের।

হে অনির্ব্বচনীয় মহোদয় তেজঃ,···
বিদগ্ধ-মুগ্ধ-সুন্দরীদের চুম্বন-কদম্বে তুমি গর্ব্বোজ্জ্বল,···
সুমঞ্জু কুঞ্জে তুমি কুঞ্জরের মত মদ-প্রমত্ত,···
নবাঞ্জনৌঘ-গঞ্জন তোমার রূপচ্ছটা,···
অনঙ্গ-রঙ্গের মঙ্গল-প্রসঙ্গে তুমি সম্বিতের মত তীব্রোন্নত,···
হে গহন, হে গোপন, হে মহিমান্বিত তেজঃ···গ্রহণ কর আমাদের এই কোরক-স্তব।

[ ক্রমশঃ।

## পিঠের গাছ

( কোহ্লানী উপকথা )

মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়

[ ছোটনাগপুরের সিংভূম জেলার পশ্চিম অংশের নাম এক সময় কোহ্লান ছিল। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে রাজকর্মচারী সি. এইচ. বম্পাস সেই দেশে থাকার সময় সেখানকার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি প্রাচীন কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা এবং অন্যান্য নানা দেশের এই ধরণের উপকথার মধ্যে যে সর্বজনীন আবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়, এই কাহিনীগুলির মধ্যেও তার রেশ আছে। কাহিনীগুলি যেমন সরল তেমনি সহজভাবে লেখা।—লেখিকা। ]

এক দেশে এক রাখালের ছেলে আর তার মা ছিল। রাখালের ছেলে সমস্ত দিন ছাগল-গরু চরাতো। তার মা রোজ সকালে তার সঙ্গে দু'খানা করে পিঠে দিতেন। একখানার নাম "ক্ষিদে পিঠে" আর একখানার নাম "বোঝাই পিঠে"। প্রথমখানা খেলে সব ক্ষিদে দূর হয়; "বোঝাই পিঠে" খেলে পেট দমসম হয়ে আসে, মোটে ক্ষিদে পায় না। একদিন রাখাল পিঠে দু'খানা সব খেতে পারলে না। বাকিটুকু সে একটা পাহাড়ের উপর রেখে দিলে। পরদিন গরু চরাতে গিয়ে সে দেখলে, যেখানে সে পিঠেটুকু ফেলে গিয়েছিল, সেখানে একটা মস্ত গাছ হয়েছে। কিন্তু ফলের বদলে গাছে কেবল পিঠে ঝুলছে! দেখে তার ভারি আশ্চর্য বোধ হল। সেই দিন থেকে সে তার মার কাছে পিঠে চাইত না, গাছের পিঠে-ফলই পেড়ে খেত। একদিন সে গাছে বসে পিঠে খাচ্ছে, এমন সময় এক বুড়ী একটা থলে কাঁধে করে সেই গাছতলায় এল। রাখালকে দেখে সে বললে, "আমি বড় দুঃখী বাবা, একখানা পিঠে আমায় দাও।"

সে বুড়ীটা মানুষ নয়। সে একটা রাক্ষসী। রাখাল তা জানত না। বুড়ীর কষ্ট দেখে তার দয়া হ'ল। একখানা পিঠে পেড়ে সে বুড়ীকে দিতে গেল। বুড়ী বললে, "ফেলে দিও না বাবা, মাটিতে যদি পড়ে যায়—ধুলো লাগবে।"

রাখাল বললে, "তবে তুমি কাপড় পাতো, আমি তার উপর ফেলে দেব।"

বুড়ী তাতেও রাজী হল না; সে বললে, "বুড়ো মানুষ বাবা, চোখে ভাল দেখতে পাই না, তুমি নেমে এসে দাও ত' হয়।"

রাখাল তখন একখানা পিঠে নিয়ে গাছ থেকে নেমে এল। যেই সে মাটিতে পা দিয়েছে, রাক্ষসী অমনি তাকে ধরে ঝুলির মধ্যে পুরে বাড়ী চলল। এত বড় বোঝা বয়ে বুড়ী হাঁপিয়ে গিয়েছিল, আর ভারি পিপাসাও পেয়েছিল। সে পথের ধারে বোঝাটা রেখে সামনের নদীতে জল খেতে গেল। একটা লোক তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রাখালের চীৎকার শুনে সে থলের মুখ খুলে দিলে। রাখাল তখন থলেটার ভিতর পাথরের নুড়ি পুরে মুখ আগের মত বন্ধ করে রেখে বাড়ী পালিয়ে গেল। এদিকে রাক্ষসী জল খেয়ে এসে থলে নিয়ে বাড়ী গেল। বুড়ীর এক মেয়ে ছিল। বুড়ী তাকে ডেকে বললে, "আজ ভারি ভাল খাবার এনেছি, থলেটা খুলে দেখ্।"

মেয়ে যখন থলেটা খুলে দেখলে কেবল পাথরের নুড়ি, তখন মার উপর তার ভারি রাগ হ'ল। সে বুড়ীকে খুব গালাগালি দিলে। বুড়ী আর কি করে? মেয়েকে বুঝিয়ে বললে, রাস্তার মাঝে ছেলেটা কেমন করে পালিয়ে গেছে। পরদিন বুড়ীটা আবার সেই গাছতলায় গেল। সেদিনও সেই রকম কৌশলে সে রাখালকে আবার থলের মধ্যে পুরে সোজাসুজি বাড়ী চলে গেল। মেয়ের কাছে থলেটা রেখে সে আগুন ও কাঠ আনতে চলে গেল। মেয়েটা ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই দেখে রাখাল তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, আমায় কেমন করে তোমরা মারবে?"

সে বললে, "তোর মাথাটা ঢেঁকিতে কুটে মারবো।"

রাখাল যেন কিছুই বুঝতে পারলে না, বললে, "সে আবার কি?"

মেয়েটা তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্য নিজের মাথাটা ঢেঁকির গর্তে রাখলে। রাখাল ঢেঁকিটা পা দিয়ে উঁচু করে রেখেছিল, যেই রাক্ষসীর মেয়ে গর্তে মাথা রেখেছে, অমনি সেও পা তুলে নিলে। মেয়েটার মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল। রাখাল তার কাপড়-চোপড় খুলে নিজে মেয়েমানুষের মত পরলে। তার পর মেয়েটাকে ছুলে, কুটে, ঠিকঠাক করে রাখলে। বুড়ী বাড়ী এসে মেয়ে সব গুছিয়ে রেখেছে দেখে ভারি খুসি হল। মেয়ের পোষাক দেখে সে রাখালকে নিজের মেয়েই মনে করেছিল। তার মনে কোন সন্দেহই হয়নি। মাংস রান্না হলে বুড়ী পেট ভরে মেয়ের মাংস খেলে। খেয়ে দেয়ে সে পড়ে পড়ে ঘুমুতে লাগল। রাখাল সেই অবসরে একখানা মস্ত পাথর বুড়ীর মাথায় মারলে। তাতেই রাক্ষসীটা মারা পড়ল। তার যে সব টাকাকড়ি ছিল, রাখাল সব নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাতে লাগল।

## একটি চীনা রূপকথা

গোপাল ভট্টাচার্য

এক যুবক তার বড় ভাইয়ের বাড়ীতে থাকতো। সে ষাঁড়ের যত্ন করতো বলে প্রত্যেকে তাকে রাখাল বলে ডাকতো। তার বৌদি কিন্তু রাখাল তাঁদের সঙ্গে থাকে—এটা চাইতেন না। তিনি তাকে ভাল খেতে দিতেন না। কিন্তু যখন রাখাল মাঠে থাকতো, তিনি তাঁর নিজের এবং স্বামীর জন্য ভাল ভাল খাবার রাঁধতেন। একদিন রাখাল লাঙল চষছে এমন সময় ষাঁড়টি তাকে বললে—বাড়ী গিয়ে মাংস খেয়ে এস। রাখাল বাড়ী গিয়ে দেখল সবাই মাংস খাচ্ছে। ষাঁড়টির সহযোগিতায় বহুবার এমনি হল।

শেষে তার বৌদি রেগে গিয়ে তাকে বললেন, "আমাদের সম্পত্তি থেকে তোমার অংশ তুমি নিয়ে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারো।"

ষাঁড়টি রাখালকে কেবলমাত্র তাকে তার একটি গরুর গাড়ী নিতে বলল। রাখাল তাই সম্বল করে বাড়ী ছাড়ল।

যখন সে ষাঁড়টিকে নিয়ে একটি ছোট নদী পার হচ্ছে, তখন রাখাল সাতটি কুমারী মেয়েকে কাপড় কাচতে দেখল। ষাঁড়টি তাকে বলল—"ছোট কুমারী যে কাপড় ঘাসের ওপর শুকুতে দিয়েছে, সেটি তুমি গিয়ে নাও।" রাখাল তাই করল।

এই কুমারীরা পশ্চিম স্বর্গের অধীশ্বরীর নাতনী। তারা পৃথিবীতে এসে একদিনের জন্য মরণশীল মানবীর হাবভাব দেখাচ্ছিল। কনিষ্ঠা এবং সবচেয়ে সুন্দরী কুমারী প্রতিদিন সুন্দর সুন্দর মেঘ বুনত বলে তাকে বুনুনী বলে ডাকা হতো। যখন সে রাখালকে তার ধোবীখানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে গেল তখন ভাবল—"ওকে দেখে দয়ালু এবং সং বলে মনে হচ্ছে। এই রকম মানুষকে আমি বিয়ে করতে ইচ্ছে করি।" রাখাল কখনো এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেনি, সে তৎক্ষণাৎ তার প্রেমে পড়ে গেল।

যখন তার বোনেদের স্বর্গে ফিরবার সময় হলো, তখন বুনুনী তাদের পিছনে থেকে গেল। তারপর সে রাখালকে বিয়ে করল। ষাঁড়টি তাদের একটি কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে গেল। সেখানে একটি ছোট কুটীর ছিল, সেই কুটীরে তারা সংসার পাতল। রাখাল চাষ করতো, আর তার বউ সুতো কেটে সেই সুতো দিয়ে সুন্দর সুন্দর মেঘের মতো কাপড় বুনতো। তাদের দু'জনেরই সুখেই দিন কাটছিল। পরের বছর বুনুনীর যমজ সন্তান হল—তাদের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

একদিন রাখাল মাঠ থেকে এসে দেখল দুটি হিংস্র শ্যেন বুনুনীকে আকাশে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সে তাদের বাধা দিতে গেল, কিন্তু তখন বড্ড বেশী দেরী হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বুনুনী রাখালের কাছে তার তাঁতের মাকুটা ছুঁড়ে দিল। এর লম্বা সুতোটা একটা মেঘের পথ হয়ে গেল। রাখাল তার ছোট ছেলে আর মেয়েকে ঝুড়িতে বসিয়ে বাঁকে করে ঝুলিয়ে নিয়ে সেই মেঘের পথে ছুটতে ছুটতে স্বর্গের প্রাসাদে উপস্থিত হলো। পশ্চিম স্বর্গের দেবীর সঙ্গে সেখানে তার দেখা হল। তিনি বললেন—"আমার নাতনীর সঙ্গে কোন মানুষের বিয়ে হতে পারে না। সে অবশ্যই স্বর্গে থাকবে আর মেঘ বুনবে।" তিনি তাঁর চুল থেকে একটা কাঁটা নিয়ে একটা রেখা টানলেন। তার একদিকে রইলো বুনুনী, আর একদিকে রাখাল আর দুই শিশু। দেবী বললেন—"তোমরা আর কখনও পরস্পর মিলিত হবার জন্য এই রেখা অতিক্রম করবে না।" সেই রেখাটি নক্ষত্রের একটি রূপোলী নদী হয়ে স্বামীকে স্ত্রীর কাছ থেকে, শিশুকে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

সহসা লক্ষ লক্ষ ম্যাগপাই নামে একরকম পাখী নেমে এসে তাদের ডানা দিয়ে নক্ষত্রের নদীর ওপর একটা সেতু তৈরি করল। ম্যাগপাই পাখী আসা শুভ। বৃদ্ধা দেবী এই ভেবে ভয় পেলেন যে, বুনুনী ও রাখালকে ম্যাগপাই পাখীরা যে সাহায্য করছে, তাতে তাদের প্রতি সমবেদনায় প্রত্যেকের মন গলে যাবে। তিনি তাদের সেতুর ওপর সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিলেন, আর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে—তিনি তাদের বছরে একবার সাক্ষাৎ করতে দেবেন।

যদি তোমরা আকাশে নক্ষত্রের নদীর দিকে তাকাও তবে পশ্চিমে তোমরা একটা খুব উজ্জ্বল তারা দেখতে পাবে। এই হচ্ছে বুনুনী। ঠিক তার অপর পাড়ে আর একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে—তার দু'পাশে দুটি ছোট ছোট নক্ষত্র। একটি রাখাল আর অপর দু'টি তার ছেলে-মেয়ে। প্রতি বছর আগষ্ট মাসে এই নদীতে তারা মিলিত হয়।

# মহীয়সী নারী সরোজিনী নাইডু

## সুজিতকুমার নাগ

ছোট একটি মেয়ে। ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ায়। পিতামাতার আদুরে মেয়ে। পড়াশোনা নিয়ে সব সময়ই থাকে। পুতুল খেলারও সময় নেই। বাবা মেয়েকে নিজে পড়ান। অংক কষতে দিয়েছেন মেয়েকে। অনেকক্ষণ ধরে খাতায় হিজিবিজি দাগ কেটে গেল। মনের খেয়ালে সে লিখে চলেছে। বাবা ঘুরে এসে মেয়ের অংকের খাতা দেখলেন। কোথায় অংক সে কষেছে? অংকের খাতায় দেখেন কবিতা লেখা। বাবা পড়ে দেখলেন, কি সুন্দর কবিতা! ছন্দও রয়েছে। বাবা জিগ্যেস করলেন, 'তুমি লিখেছো বুঝি?' লজ্জায় মেয়ের মুখখানা রাঙিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উত্তর দেয় মাথা নীচু ক'রে, 'হাঁ, আমি লিখেছি।' বাবা মেয়েকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'তোমার কবিতা বড় সুন্দর হয়েছে।' ভবিষ্যতে এই মেয়েটি নামকরা কবি হয়েছিল। এই ছোট মেয়েটির নাম ছিল সরোজিনী নাইডু! সরোজিনী নাইডুর মাও ছোটবেলায় অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতাগুলির ভিতর কাব্যের আভাষ যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল। সরোজিনী কাব্য-প্রতিভা মার কাছ থেকে অর্জন করেছিল।

সরোজিনীর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভূমি ছিল বাংলা দেশে। তিনি হায়দ্রাবাদে কাজ করতেন। তিনি নিজে একজন পণ্ডিত ছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে তিনি পড়াশুনা করেছেন। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের উপরও তাঁর অনুরাগ ছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম কলেজের স্থাপনকার্যে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজেও তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন।

সরোজিনী পিতার কাছ থেকেই প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। বয়স যখন তাঁর বার, তখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। এত কম বয়সে সরোজিনী ছাড়া আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে বা ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়নি।

কয়েক বছর পরের কথা।

সরকার থেকে তিনি বৃত্তি পেলেন। তিনি বৃত্তি পেয়ে বিলাত গেলেন উচ্চশিক্ষা পাবার জন্যে। তখন সরোজিনী সবে পনের বছরের মেয়ে। লণ্ডন ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার চাপে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। তা ব'লে তিনি পড়াশোনা থেকে দূরে সরে থাকলেন না। মনের উৎসাহে ও সাহসে তিনি তাঁর কাজের পথে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

সরোজিনী তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়ই জীবনের যা-কিছু সফলতা লাভ করেছেন। বিলাতে বসেও তিনি কাব্য সাধনা করেছেন। তাঁর কবিতার ছন্দে ও মাধুর্যে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সব কবিতাই তিনি লিখেছেন ইংরাজী ভাষায়। অনেক ইংরাজ লেখকও এই কথা বলেছেন। বলেছেন, তাঁর কবিতা যে কোন ইংরাজ কবির কবিতার

সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভারতীয় কবির কবিখ্যাতি বিলাতে সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বিলাত থেকে তিনি এলেন ইতালী দেশে। এখানকার প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ইতালীতে কিছুকাল থাকার পর ভারতে ফিরে এলেন।

তাঁর বিয়ে হলো মাদ্রাজের এক ডাক্তারের সঙ্গে। সেই থেকে সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়ের নাম হলো সরোজিনী নাইডু। বিয়ের পরও তিনি কবিতা লিখেছেন।

তিনি দেখতে পেলেন, ঘর সংসার ক'রে, কবিতা নিয়ে সুখে জীবন অতিবাহিত করার মধ্যে সত্যিকার কর্তব্য সম্পাদন করা যায় না। ভারতের চারদিকে অসহায়দের দুঃখ-জীবনের ছবি দেখতে পান। এই পরিবেশে তাঁর জীবনকে সুখকর করে তুলতে পারেননি। তাই দেশমাতার সেবার কাজে তিনি এগিয়ে এলেন। দেশমাতার সেবাকে তিনি জীবনের বড় ব্রত বলে বেছে নিলেন।

দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোধা। ভারতের জাতীয় মহাসভার তিনি সভানেত্রী হয়েছিলেন। তিনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের ভাষণে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। দেশকে ভালবাসতে গিয়ে, তিনি অনেকবার কারাবন্দী হয়েছেন। দেশের জন্য তিনি হাসিমুখে সব দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

তারপর·····দেশ স্বাধীন হলো।

আবার দেশের কাজে সরোজিনীর আহ্বান এলো। উত্তর প্রদেশের শাসন কাজের জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হলো রাজ্যপাল। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন নিরিবিলি ভাবে আবার কাব্য দেবীর সাধনায় নিযুক্ত করবেন নিজেকে। রাজ্যপালের জীবন সব সময় কর্মমুখর—তাই তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "আপনারা একটি গায়ক পাখীকে খাঁচায় পুরে রাখলেন—!" তা বলে তিনি কাব্য-কাজ থেকে সরে দাঁড়ান নাই।

রাজ্যপালের ভার গ্রহণ করলেন।

মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি কাজের মধ্যেই ডুবে ছিলেন।

ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাদের মধ্যে সরোজিনী নাইডুর মত জনপ্রিয়তা আর কোন নারী অর্জন করতে পারেননি। তিনি মহাত্মা গান্ধীর একজন অনুগত শিষ্যা ছিলেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে থেকে দেশের অনেক কাজেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর কর্মক্ষেত্রে দেশের অবদান যা, তার চেয়ে বড় তাঁর কাব্য প্রতিভা।

তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে ভারতের শান্তি, সৌম্য, মৈত্রীর বাণী সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও বহন করে নিয়ে গিয়েছে।

# ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

## দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

### পাঁচ

ইতিহাস শুরু হোল

আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।

বাঙালীর ছেলে বিজয় সিংহ যখন বাংলার ছেলে তখন কপিলাবস্তুর ছেলে গৌতম হয়েছেন বুদ্ধ, বেরিয়েছেন পর্যটনে, চলেছেন প্রচারে দেশ-দেশান্তরে।

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার সাড়ে পাঁচ শ' বছর আগেকার কথা। বাংলা-দেশে একরাজা ছিলেন। তাম্রলিপ্তি তাঁর রাজ্য ছিল। রাজার নাম সিংহবাহু। তাঁর দু'ছেলে। বিজয় আর সুমিত্র। বিজয় বড়ই আদুরে ছেলে। আদরে আদরে তার মাথাটি খেয়েছিলেন রাজা। প্রজাদের উপর সে প্রবল অত্যাচার করতে লাগল। নির্য্যাতনে জনসাধারণকে অতিষ্ঠ করে তুলল! রাজাকে তারা বিজয়ের নামে নালিশ জানায়। রাজার এক কানে ঢুকে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। একবার কিন্তু তার অত্যাচার চরমে গিয়ে পৌছল। রাজা আর তাকে রক্ষা করতে পারলেন না। তার বিচার করতে হোল। রাজা বিজয় সিংহকে বললেন, দেশ ছেড়ে চলে যেতে।

বিজয় সিংহ সাহসী। ভয় কাকে বলে, তা তিনি জানেন না। তাঁর বন্ধুরা পরামর্শ দিল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যতই ডানপিটে হোক ছেলে, তার মনে আদর্শবোধ ঠিক বজায় আছে। বিজয় সিংহ বললেন, "তোমরা তো জান রামচন্দ্র দশরথের কথায় বনে গিয়েছিলেন, আমিও বাবার আদেশ মত এদেশ ছেড়ে কালই চলে যাব।"

পরের দিন সকালবেলায় ভালো ভালো কয়েকটা জাহাজ আর সাতশ' সাহসী যুবক নিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চললেন বিজয় সিংহ। সাহসীর জয়যাত্রা। সবারই মনে রোমাঞ্চের স্পর্শ।

দিন যায়, মাস যায়। মাটির দেখা নেই। চার দিকে শুধু জল আর জল। বড় বড় ঢেউ উন্মত্ত হাঙ্গরের মত হাঁ করে এগিয়ে আসে জাহাজগুলো গিলতে। অবশেষে দেখা যায় এক ভূখণ্ড। সিন্দুর টিপের মত। জাহাজ তার দিকে এগিয়ে যায়। দ্বীপখানা ক্রমশ নিকট থেকে নিকটতর হয়ে আসে। যেই উপকূলে জাহাজগুলো ভিড়ে, অমনি সবাই মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। তাদের মনে সে কি আনন্দ! সেদিনটির তারিখ আজ কে বলতে পারে? তবে যীশুখৃষ্ট জন্মাবার পাঁচ শ' চুয়াল্লিশ বছর আগেকার কোনো এক দিন। ঠিক সেদিনই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন।

সিংহলের তখন নাম ছিল লঙ্কা। লঙ্কা ছিল তখন খণ্ডবিখণ্ড। যে বিজয় সিংহের অত্যাচারী হিসেবে দেশে অত কুখ্যাতি, সিংহলের লোকদের কাছে তাঁর তেমনি সুখ্যাতি। তাঁর ও তাঁর সহচরদের সদ্ব্যবহারে লঙ্কার লোকেরা বিমুগ্ধ হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে বিজয় কুবেণী নামে এক রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন। একদিন তিনি কুবেণীর সঙ্গে এক রাজার বিবাহ-উৎসবে গিয়ে তাঁর অনুচরদের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন যুদ্ধ। অতর্কিত আক্রমণে সে রাজা নিহত হলেন। বিজয়ের হস্তগত হোল সে রাজ্য। ক্রমে ক্রমে তিনি লঙ্কার সমস্ত রাজ্য দখল করে নিলেন। কিছুদিন বাদে কুবেণী মারা গেলেন। বিজয়সিংহ মাদ্রাজের এক সুন্দরী রাজকুমারীকে বিয়ে করলেন।

বিজয় সিংহের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর লঙ্কার রাজা হবার জন্যে ছোট ভাই সুমিত্রকে আনবার জন্য দেশে তিনি এক দূত পাঠান। সুমিত্র তখন দেশের রাজা, বিদেশে আর এলেন না। তবে তাঁর ছোট ছেলে পাণ্ডুবাদকে পাঠালেন। আটত্রিশ বছর প্রায় রাজত্ব করে বিজয় সিংহ পরলোকগমন করলেন। লঙ্কার রাজা হলেন পাণ্ডুবাদ। তাঁর বংশ লঙ্কায় অনেক দিন রাজত্ব করেছিল। বিজয় সিংহের বংশের পদবী থেকে লঙ্কার নাম হোল সিংহল। বিজয়-

সিংহের বিজয়কথা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে সিংহল নামে। সিংহলের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে এই ঘটনা লেখা আছে। ঐ গ্রন্থদুটো পালিভাষায় লেখা।

এরপর একশ' দু'শ বছরের কথা আমরা জানি না। এর আগেও তো বাংলার কোন অঞ্চলে কোন রাজা রাজত্ব করেন তার ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা পাই না। আমাদের জীবনেতিহাসেও তো ছেলে বেলার পাঁচ-ছ' বছরের কথা মনে পড়ে না। হয়ত দু'-একটা ঘটনা বিস্মৃতির স্তর থেকে স্মৃতিতে এসে উঁকি মারে কিংবা বাবা-মা, ঠাকুমা জ্যেঠিমার মুখে দু'-একটা ঘটনা শুনি। দেশের ইতিহাসেও প্রাচীনতম অধ্যায়ের কয়েক পাতা আমরা পুরোপুরি পাঠোদ্ধার করতে পারি না।

আলেকজাণ্ডার ভারতের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন বিজয়াভিযানে, সঙ্গে তাঁর শুধু সৈন্যদল ছিল না, ছিল একদল জ্ঞানানুসন্ধানী। তাঁরা লিখে রেখে গেছেন ভারতের তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলারও বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য। সেই সমস্ত তথ্য আমাদিকে শোনায় বাংলার প্রাচীন কথা।

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার সাড়ে তিন শ' বছর আগে ভাগীরথীর দু'তীরে গড়ে উঠে দু'টি রাজ্য। পূর্ব তীরে গঙ্গারাজ্য বা গঙ্গারিডি। এর রাজধানী ছিল গঙ্গানগর। পশ্চিম তীরে প্রাচ্যরাজ্য বা মগধ। এর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। এ দুটি রাজ্য স্বতন্ত্র ভাবে ছিল। কিন্তু এক সময় এরা একত্রিত হয়। এই সম্মিলিত রাজ্যের রাজা হন মহাপদ্ম নন্দ। মহাপদ্ম নন্দ নাপিতের ছেলে ছিলেন। পুরাণে তাঁর কীর্তিকথা বলা হয়েছে। তাঁকে একরাট অর্থাৎ একচ্ছত্র সম্রাট বলা হয়েছে। পাঞ্জাবের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে তাঁর আট ছেলে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ সম্রাট ধন নন্দ। তাঁর রাজত্বকালেই আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার সমস্ত রাজ্য ছারখারে করে এগিয়ে এলেন পাঞ্জাব পর্যন্ত। তাঁর দূত খবর আনল, এর পর মগধরাজ্য। শুনলেন সে রাজ্যের প্রভূত ক্ষমতার কথা। তিন হাজার হাতী, দু'-হাজার রথ, কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, দু' লক্ষ পদাতিক নিয়ে তাদের সৈন্যদল। বীরের মন বীরত্বের সাক্ষাৎ পেতে ইচ্ছুক। আলেকজাণ্ডার এগোতে চাইলেন। কিন্তু সৈন্যরা নারাজ। অগত্যা তাঁকে ফিরতে হোল তাঁর দেশের অভিমুখে।

নন্দ বংশ ধ্বংস করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে এল বাংলারও আধিপত্য। মৌর্য আমলে গোটা বাংলা দেশ না হোক, পুণ্ড্রবর্ধন বা বাংলার উত্তর ভাগে মৌর্য আধিপত্য যে ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে। লিপিটি ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। এই ব্রাহ্মী অক্ষর হোল ভারতের প্রাচীনতম অক্ষর। এর নমুনা—

**ক +, খ C, ঠ O, থ ১, গ Λ**

এই অক্ষর থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে কুটিল অক্ষরের সৃষ্টি হয়। এই কুটিল অক্ষর থেকেই বাংলা অক্ষরের সৃষ্টি। শিলালিপিটিতে লেখা আছে, পুণ্ডনগর ও তার ধারে পাশে দৈবদুর্বিপাকে লোকদের নিদারুণ দুর্গতি ঘটেছে। পুণ্ড্রনগরের মহামাত্য তাদিকে যেন ঋণ হিসেবে ধান দেন। সুদিন এলে প্রজারা রাজকোষে তা ফিরিয়ে দেবেন। এটি কোন মৌর্যসম্রাট লিখেছেন, তা জানা যায় নি। তবে এর থেকে বুঝা গেল যে, বাংলার মৌর্য অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। এখানে থাকতেন একজন মহামাত্র। তিনি করতেন রাজ্যশাসন।

চন্দ্রগুপ্তের সময় বাংলাদেশে জৈনধর্ম বিস্তার লাভ করে। চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন জৈনসূরী ভদ্রবাহু। ভদ্রবাহু পুণ্ড্রবর্ধনের কাছে দেবকোটে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন তিনি। একবার দেবকোটে জৈনদের চতুর্থ শ্রুতকেবলী গোবর্ধন বেড়াতে আসেন। সেখানে ভদ্রবাহুকে দেখে মুগ্ধ হন। গোবর্ধন তার বাবার কাছে গিয়ে ছেলেটিকে প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। তিনি ছেলেটিকে জৈনধর্মে দীক্ষা দেন। জৈনকল্পসূত্র নামে জৈনদের একটি বই আছে। তাতে লেখা আছে যে, তাম্রলিপ্তি, পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ (দিনাজপুর) ও খর্বট (পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষ)—এই চারটি অঞ্চলে জৈনধর্মের কেন্দ্র ছিল। আচারঙ্গসূত্র নামে জৈনদের আর এক ধর্মগ্রন্থ আছে। তাতে লেখা আছে যে, যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ছ' শ' বছর আগে জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ও তাঁর কয়েকজন শিষ্য ধর্ম প্রচারের জন্যে রাঢ় ও সুহ্ম ভূমিতে আসেন। রাঢ় দেশের লোকটিকে বলা হয়েছে নিষ্ঠুর ও বর্বর। তারা তাঁদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিত। কত কি রূঢ় আচরণ করত তাঁদের প্রতি।

অশোকের আগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ বিস্তার লাভ করেনি। অশোকের সময় পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হয়। সাঁচীস্তূপের প্রাচীর ও তোরণ নির্মাণের জন্য পুণ্ড্রবর্ধনের দু'জন লোক কিছু দান করেছিলেন বলে জানা গেছে। তাছাড়া বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোলজন মহাস্থবিরের মধ্যে তাম্রলিপ্তির একজন বাঙালী ছিলেন।

মৌর্যদের অবসান হয়। একে একে কত রাজবংশের উত্থান পতন ঘটে। ওদিকে যীশুখৃষ্টের জন্ম হয়েছে। এক আর দুই শতকে এসে আমরা হাজির হলাম। অন্ধকার অতীতে আলোকপাত করে মানুষ রচনা করেছে ইতিহাস। কোথায় আলো কোথায় আলো—অন্ধকার অতীতের দিকে দিকে মানুষ অভিযান করেছে। একটা পুঁথি, একটা মূর্তি, একটা পাথরের টুকরো, মাটির তলার একটু ভগ্নাবশেষ, দু'একটা মুদ্রা, একান্তে পড়ে থাকা অবহেলিত শিলালিপি, দেশবিদেশের আসা যাওয়ার পথে পথে লিখে-যাওয়া দু'এক ছত্র লিপি—মানুষ সমস্ত জোগাড় করেছে, খুঁজেছে আলো; খণ্ড উপকরণে অখণ্ড ঐতিহ্য রচনা করেছে। অন্ধকার অতীতে এক দুই শতকে এসে আলো খুঁজলাম আমরা। পেলাম সুদূর গ্রীসে। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমি দু'এক কলম লিখে গেছেন তখনকার কথা। ভারতের, বাংলার। তিনি লিখেছেন বাংলার বুকে সে সময় আধিপত্য করছে মুরুণ্ড নামে এক জাতি। ওদিকে কাশী পর্যন্ত কুষাণদের রাজ্য। পরাক্রমশালী তাদের রাজা। কুষাণদের সঙ্গে মুরুণ্ডদের যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয়। কুষাণদের অনেক মুদ্রা বাংলাদেশে পাওয়া গেছে।

এমনি ভাবে বাংলাদেশে আর্যসভ্যতার প্রসার ঘটে। আর্যসভ্যতার আওতায় বাংলা'দেশে এসে পড়ে। ধর্ম প্রচার, ব্যবসা বাণিজ্য, রাষ্ট্র পরিচালনা উদ্দেশে বহুল পরিমাণে উত্তর ভারতের আর্য বাংলা দেশে এসে বসবাস শুরু করে। আর্যরা বহুল পরিমাণে আসায় বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের ঘটল প্রত্যক্ষ সংযোগ। প্রাচীন অধিবাসীদের ভাব প্রকাশের তেমন কোন উন্নত ভাষা ছিল না। সেই পুরনো ভাষায় আর কোন চিহ্ন নেই, শুধু কয়েকটি শব্দ তা আজও চলে আসছে। তেঁতুল, ঢেঁকি ডাগর, বাদুর, লাঠি ইত্যাদি। আর্যদের উন্নত ভাষার প্রতি তারা আকৃষ্ট হোল। সংস্কৃত কোন শব্দকে তারা উচারণ করতে গিয়ে বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করে

বদল। যেমন, সূর্যকে সুজ্জ, চন্দ্রকে চন্দ, মাতাকে মাআ। নাক উঁচু আর্যরা লোকের মুখে বিকৃত ভাবে উচ্চারিত সংস্কৃত ভাষাকে নাকসিঁটকে নাম দিলেন, "প্রাকৃত ভাষা"। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার জন্ম হোল। এই বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার সমন্বয়ে পালি ভাষা গড়ে উঠেছিল। পালি ভাষা লোকের মুখের ভাষা নয়, বইয়ের পাতার ভাষা। বাংলা দেশে যে প্রাকৃত ভাষা গড়ে উঠল, তার নাম পূর্বী প্রাকৃত বা মাগধী প্রাকৃত।

"ধনধান্যে পুষ্পে-ভরা" কবিকল্পিত দেশ সেদিন ছিল বাস্তব। সেদিন বাংলার সমৃদ্ধি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সমৃদ্ধির কাহিনী বিদেশীর কলম থেকে আজও জানতে পারি। পশ্চিমে মিশর, রোম, গ্রীস, আরব আর পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ ছিল। বিদেশ থেকে বাংলার প্রচুর অর্থাগম হোত। তাম্রলিপ্তি বন্দর সেদিন কোলাহলে মুখর। দেশ-বিদেশের জাহাজের ভিড় লেগেই থাকত। বেচা-কেনা, আমদানী, রপ্তানী, কাজের চীৎকার ও হৈ-হুল্লোতে চারদিক ছিল মুখরিত। আর একটি বন্দর ছিল, গঙ্গাবন্দর। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলার বন্দর গঞ্জ-হাট ছিল সরগরম। পুণ্ড্রবর্ধনে খুব আখের চাষ হোত, আখ থেকে তৈরী হোত প্রচুর গুড় ও চিনি। মেদিনীপুরের সমুদ্রতীরে গর্ত করে লবণ তৈরী হোত। টলেমি বলেছেন নিম্নমধ্যবঙ্গে সোনার খনি ছিল। চাণক্যের মত কূট লোকও বাংলার হীরা মণিমুক্তার প্রাচুর্যের কথা বলে গেছেন। সর্ষে, এলাচ, পিপ্পল, ইত্যাদি নানা রকম মশলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হোত। যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হাতী ছিল নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সৈন্যদলেও অনেক হাতী ছিল। বাংলা দেশে হাতী অনেক পাওয়া যেত, নানান দেশে বিক্রি করা হোত। শিল্পকর্মে বাঙালীর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তলোয়ার শিল্প, মৃৎ শিল্প, বস্ত্র শিল্পে বাংলার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্পাস ও রেশমবস্ত্র তৈরীতে বাঙালীর কৃতিত্ব ছিল অনন্য সাধারণ। সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট বস্ত্র তৈরী করতে তারা ছিল ওস্তাদ। এই সমস্ত বস্ত্র এত চিক্কণ ও চমৎকার ছিল যে, সেকালের রোম সাম্রাজ্যের বিলাসী ধনীদের এই বস্ত্র না হলে চলত না। তাই মিশর ও রোমে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস ও রেশমবস্ত্র রপ্তানী হোত। রোমের ঐতিহাসিক প্লিনি দুঃখ করে লিখে গেছেন, রোমের বড়লোকরা কত চড়া দামে বাংলার বস্ত্র ও মশলা কিনে থাকেন আর রোমের সম্পদ বাংলার দুয়ারে জমা করেন। নন্দরাজাদের ধনের পরিমাণ ছিল নিরানব্বই কোটি স্বর্ণমুদ্রা। "মহাবংশ" বইটিতে লেখা আছে, নন্দদের ছিল আশী কোটি স্বর্ণমুদ্রা। এই ধন তিনি গঙ্গার নীচে এক সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রাখতেন। গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে দিলাম, কেউ আবার অভিযান করবে না তো?

## যে টাকা জলে গলে যায়

### যাদুকর বি, দাস ( পুরুলিয়া )

একজন দর্শকের কাছ থেকে একটা টাকা বা আধুলি চেয়ে নিলেন যাদুকর। নেবার আগে দর্শকদের কাউকে দিয়ে যে কোন একটা চিহ্ন দিইয়ে নিলেন, যাতে পরে চেনা যায় যে এটাই সেই আধুলি। আরেক জনের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন একটা রুমাল। তারপর আধুলিটা রুমালের মধ্যে দিয়ে ১নং ছবির মত করে একজনের হাতে ধরতে দিলেন। একটা ছোট কাঁচের গ্লাসে খানিকটা জল দিয়ে রুমালের তলায় সেটাকে বসিয়ে দিয়ে দর্শককে আধুলিটা জলের মধ্যে ফেলে দিতে বললেন। সেটা গ্লাসের মধ্যে টুং ক'রে পড়লো, কিন্তু রুমাল সরিয়ে নিতেই দেখা গেল কোথায় আধুলি, বেমালুম গ'লে গেছে জলে! শেষে অবশ্য যাদুকর আবার অন্য জায়গা থেকে সেই চিহ্নিত আধুলি মালিককে ফেরৎ দিয়ে দিলেন।

খেলাটা বেশ আশ্চর্যজনক হ'লে ও কৌশলটা অতি সামান্য।
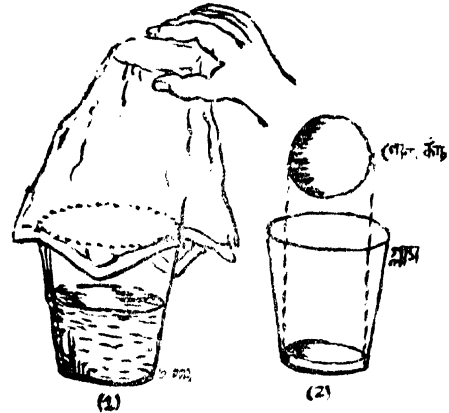
আধুলির মাপের একটুকরো গোলাকার কাঁচই হচ্ছে এটার প্রধান উপকরণ। রুমাল, গ্লাস এসবগুলোতে কোন কৌশলই নেই। সাধারণ ওষুধ খাবার গ্লাস একটু বেছে কিনলে দেখা যাবে যে, তার তলায় গোলাকার কাঁচটা সুন্দর বসে যায়। গ্লাসে জল থাকায় কাঁচটা মোটেই দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, দর্শকের চিহ্নিত আধুলিটা রুমালের তলায় ঢাকা দেবার সময় আগে হতে হাতের তালুতে লুকানো ( ইংরেজীতে যাকে বলে palm করা ) কাঁচের টুকরোটা দর্শককে ধরতে দিয়ে আসল আধুলিটা হাতের তালুতে লুকিয়ে নিয়ে পকেটে ফেললেই হোলো। বাকিটুকু অত্যন্ত সহজ। হাতে কলমে ক'রে দেখে জানাতে ভুলো না, কেমন লাগলো। তাহলে আরও ভালো ভালো খেলা শেখাবার ইচ্ছে রইলো। আমার ঠিকানা:—যাদুকর বি, দাস ( সম্পাদক "ম্যাজিক" ), পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

## খোকার ভবিষ্যৎ

### মোঃ রিয়াজউদ্দীন পাঠান

হ-য-ব-র পড়লে খোকা,
সবাই বলে বড্ড বোকা,
বইটি যদি উলটে ধরে,
তখন সবে ভুলটি ধরে।
জানো না হায় খোকন মণি,
হবে সবার মাথার মণি,
হোক না ছোট অবোধ শিশু
হতেও পারে বুদ্ধ-যীশু।
সবাই ছিলো এমনি তরো,

## সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

### কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা এতদুভয়েরই এক স্বচ্ছ পরিচয় বিধৃত করা হয়েছে। বর্ত্তমানে সাহিত্যের আসরে বিশ্বকবি সম্বন্ধে অসংখ্য রচনা ও আলোচনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, কিন্তু তার মাঝেও যে কয়েকটি রচনা বৈশিষ্ট্যে অনন্য, আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল, আলোচ্য গ্রন্থটি তাদেরই অন্যতম। কবির কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক মুখবন্ধে এক স্থানে বলেছেন যে, মনোহারিত্ব ও বৈচিত্র্য যত বড়ই হোক না কেন, কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত রয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বে বা অন্তর্জীবনে। বর্ত্তমান রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যক্তিত্ব বা অন্তর্জীবনকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাতে সফলকামও হয়েছেন। রবীন্দ্র অনুরাগী বোদ্ধা পাঠকমাত্রই আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করে আনন্দিত হবেন, রবীন্দ্র দিগদর্শনে এই গ্রন্থ পরম সহায়ক। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। আমরা এই প্রামাণ্য সাহিত্য-কর্মটিকে সাদর স্বাগত জানাই। লেখক—কাজী আবদুল ওদুদ। প্রকাশক। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, দাম—বারো টাকা।

### দ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ন

দ্বিজেন্দ্রলালকে নাট্যকার হিসাবেই প্রধানতঃ প্রভূত সাধুবাদ দেওয়া হয়ে থাকে, পাঠক সমাজে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল অপেক্ষা নাট্য-রসিক ও দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালই সমধিক পরিচিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি যে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন কবি ও গীতিকার এ তথ্য সত্যই বাঙ্গালী-পাঠক আজ প্রায় ভুলতে বসেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ গ্রন্থে তাঁর সুযোগ্য পুত্র দিলীপকুমার তারই এক প্রামাণ্য পরিচয় বিধৃত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্য রচনা করেছেন সম্পূর্ণ নতুন টেকনিকে, যে টেকনিক সর্ব্বতোভাবেই তাঁর নিজস্ব, রবীন্দ্র প্রভাবিত যুগেও তাঁর রচনা যে পূর্ণভাবেই রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত ও স্বাতন্ত্র্যে অটল, সেটা বড় কম কাব্যশক্তির পরিচয়বাহী নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য মূলতঃ ত্রিধারা বিশিষ্ট, দেশাত্মবোধক প্রেম-মূলক ও হাস্যরসসঞ্জাত, আলোচ্য সংকলনে এই ত্রিধারারই বিশদ পরিচয় সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর সুবিখ্যাত কাব্য পুস্তকসমূহ যথা মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী, আষাঢ়ে, হাসির গান প্রভৃতি থেকে উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি চয়িত হয়েছে এবং 'গান', শীর্ষক অংশে তাঁর বিখ্যাত গীতিমালা স্থান লাভ করেছে। সামগ্রিক ভাবে দ্বিজেন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে এক ধারণা করা সম্ভব আলোচ্য সংকলনের মাধ্যমে, সংকলয়িতার আন্তরিক প্রচেষ্টায় বর্ত্তমান সংকলন গ্রন্থটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজন মনীষীর সুচিন্তিত সমালোচনাগুলি সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটির মর্য্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের আসরে, বর্ত্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ নয়নাভিরাম ও অপরাপর আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের। সংকলয়িতা—শ্রীদিলীপকুমার রায়, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭, দাম—আট টাকা।

### সত্তর বৎসর, আত্মজীবনী

বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম জননায়ক বিপিনচন্দ্র পালের এই আত্মজীবনী, নানা কারণেই বিশেষ মূল্যবান। পরাধীনতার গ্লানি সম্বন্ধে দেশকে অবহিত করে তোলবার দুরূহ কর্ম যাঁদের জন্য সেদিন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, বিপিনচন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম। বাগ্মী বিপিনচন্দ্রের জ্বালাময়ী বক্তৃতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে সমগ্র দেশের ধমনীতে যে আলোড়ন তুলেছিল তার শক্তি বড় সামান্য নয়। বিস্ময়কর বাক্‌প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি, বস্তুতঃ 'বক্তৃতায় যেন বিপিন পাল,' এই কথাটি সেদিন প্রবাদ বাক্যের মতই লোকের মুখে মুখে ফিরতো এবং আজও অনেকেই বাক্‌প্রতিভার উপমা দিতে উপরোক্ত মন্তব্যই করে থাকেন। বিপিনচন্দ্রের কর্ম্মবহুল জীবনের এক পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় তাঁরই স্বকৃত এই আত্মজীবনীতে, আর সেই সঙ্গে পাওয়া যায় তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের এক প্রামাণ্য পরিচয়। লেখকের শৈলী সাবলীল ও শক্তিশালী, বক্তব্যকে যা সহজেই প্রাণস্পর্শী করে তুলেছে। ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক-বিপিনচন্দ্র পাল, প্রকাশক-যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, কলিকাতা-৬, দাম—সাত টাকা।

### অঘটন আজো ঘটে

আলোচ্য গ্রন্থখানি দিলীপকুমার রায় লিখিত সুবিখ্যাত উপন্যাস 'অঘটন আজো ঘটে'র নাট্যরূপ। এই সুবৃহৎ উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়েছেন সাম্প্রতিক কালের জনপ্রিয় নাট্যকার 'ধনঞ্জয় বৈরাগী।' 'অঘটন আজো ঘটে'র বিষয়বস্তু ঠিক মামুলি নয়, অধ্যাত্মবাদই এর প্রাণসত্তা, এই ঘোর জড়বাদের যুগে বর্ত্তমান গ্রন্থের বক্তব্য পাঠকের যুক্তিগ্রাহ্য যদি বা না হয়, সাধক লেখকের আন্তরিকতায় মর্ম্মগ্রাহ্য।—নাট্যরূপকার বইটিকে নাটকায়িত করার সময় এর মূল সুরকে বিস্মৃত হননি, ভক্তি ও বিশ্বাসের যে সুরটি আলোচ্য রচনার প্রাণসত্তা তাকে আগাগোড়া অবিকৃত রেখেই তিনি আরব্ধ কর্মে সফলকাম হয়েছেন। বস্তুতঃ 'অঘটন আজো ঘটে'র মত হৃদয়াবেগ সম্পন্ন বিস্ময়কর কোন রচনাকে একখানি সফল নাটকে পরিবর্তিত করা সহজসাধ্য নয়। নাটকটি পড়লে একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে এই কঠিন দায়িত্বভার নাট্যরূপকার যথাযথ ভাবেই বহন করেছেন

আর সেজন্যই গ্রন্থটি একখানি সফল নাটকে পরিণত হতে পেরেছে। লেখক—দিলীপকুমার রায়। নাট্যরূপ—ধনঞ্জয় বৈরাগী, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭, দাম—দু' টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

## নিত্য পথের পথী

ভ্রমণমূলক রম্যরচনা বললেই বোধহয় আলোচ্য রচনাটির যথার্থ পরিচয় দেওয়া যায়। লেখক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম যাযাবর সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল। চলার আনন্দে দেশের পর দেশ পরিক্রমায় যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য তা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে আলোচ্য রচনাগুলির মাধ্যমে। লেখকের পরিব্রাজক মনেরও এক সুস্পষ্ট পরিচয় বিধৃত হয়েছে এদের মাঝে ভাষার সৌকর্য্যে কাব্যগন্ধী বর্ণনভঙ্গীতে বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রতিটি রচনা সমৃদ্ধ—আর তা ছাপিয়ে উঠেছে এদের মূলসত্তার প্রধানতম সুরটি, পরিপূর্ণ মানবতাবোধ। দরদী লেখকের মরমী স্পর্শে রচনা ক'টি সম্পূর্ণ ভাবেই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের আসরে আলোচ্য গ্রন্থটি স্বীকৃতি আদায় করে নেবে আপন সামর্থ্যেই। আমরা গ্রন্থটিকে সাদর-স্বাগত জানাই। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## এমন দিনে

কথাসাহিত্যের আসরে লেখক সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর এই নব প্রকাশিত গল্পসংগ্রহটি অনেককেই খুশী করে তুলবে। মোট দশটি গল্প স্থান পেয়েছে এই সংগ্রহে, যার প্রত্যেকটি কোন না কোন পত্র-পত্রিকায় ইতিপুর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পগুলির মেজাজ বিভিন্ন ধরণের—কোনটি আবেগমধুর, কোনটি হাস্যচপল, কোনটি বা করুণ, কিন্তু মেজাজে এক না হলেও দীপ্তির মৈত্রীবন্ধন ঘটেছে এদের মাঝে। পরিচ্ছন্ন শৈলী ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে প্রতিটি রচনাই সমুজ্জ্বল। রসমধুর অথচ গভীর বিশ্লেষণমূলক সৃষ্টিই বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখকের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, আলোচ্য রচনাগুলিও তার পরিচয়বাহী। উপভোগ্য এক গল্প সংকলন হিসাবে বর্ত্তমান গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সাদরে গৃহীত হবে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭, দাম—তিন টাকা পঁচাত্তর নঃ পঃ।

## ব্যোমকেশের ছ'টি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্র ব্যোমকেশের নাম রহস্য রোমাঞ্চের অনুরাগী পাঠকবৃন্দের অপরিচিত নয়। আলোচ্য গ্রন্থে তাকেই কেন্দ্র করে রচিত ছ'টি বিভিন্ন গল্প স্থান পেয়েছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের কাহিনীগুলির অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে নানান সাময়িক পত্রিকার পাতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের বিষয়বস্তু এক ধরণের অর্থাৎ মূলতঃ রহস্য রোমাঞ্চের উপাদানে গঠিত হলেও বৈচিত্র্যে ও স্বাদে তারা ভিন্ন। রহস্যরোমাঞ্চ প্রিয় পাঠক তো বটেই, আর তা ছাড়া নিছক সাহিত্যপ্রিয় পাঠকের কাছেও বর্ত্তমান গ্রন্থের কাহিনীগুলির আবেদন বড় কম নয়। সাহিত্যের এই শাখাটির প্রতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের যে উন্নাসিক অবজ্ঞার ভাব আছে, তা থেকে আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা মুক্ত। আর সে জন্যই সাহিত্যের এই অবহেলিত দিকটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস তাঁর বহুদিনাবধি। এই ধরণের হাল্কা বিষয়বস্তুও যে নিছক সাহিত্যকর্মে পরিণত হতে পারে, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাই প্রমাণ করেছেন। আর সে জন্যই তাঁর রচনা সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে। আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনীগুলি অতি মনোরম, বিশেষতঃ মুখ্য চরিত্র ব্যোমকেশ তো এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। বিশ্বের সুবিখ্যাত রহস্য কাহিনীর অন্যান্য নায়কদের মত লেখকের 'ব্যোমকেশ'ও একটি জীবন্ত চরিত্র, যেন রক্তমাংসের চেহারা নিয়েই সে পাঠকের মনের দরজায় ঘা দেয়। পরিণত স্রষ্টার সার্থক সৃষ্টি এই ব্যোমকেশ। শক্তিমান লেখকের শৈলী সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছুই নেই। আমরা গ্রন্থটিকে সাদর স্বাগত জানাই। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। প্রকাশক-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

## অচিনপুরের কথকতা

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে সমরেশ বসু এক চিহ্নিত নাম। তাঁর অধুনাতম এই উপন্যাস নানা কারণেই উল্লেখ্য। গ্রাম অচিনপুর বা আঁচনা, তার কয়েকটি মানুষ, স্বল্পপরিসর জীবন এই নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল তরুণ বিভাস। স্বার্থ সংঘাতে ভরা সংসারের বিষাক্ত কুটিলতা থেকে যে একদিন পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল অচেনা গাঁ অচিনপুরে। কিন্তু সেখানেও কি ছড়িয়ে ছিল না সেই একই ঘৃণা আর বিদ্বেষের হলাহল, লোভ আর পাপের সমারোহ? তবু পাথরেই গজালো তরুণ কোমল দূর্ব্বাঘাস, সব লোভ সব অপমানকে জয় করে উত্তীর্ণ হল বিভাস নব জীবনে, জয় হল মানুষের। মনোধর্মী এই উপন্যাসে লেখক বর্ত্তমান যুগে মানবাত্মার যে অপমান ঘটছে, বারবার সেই সত্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকের সামনে এবং স্বীয় আন্তরিকতায় সফলও হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে চরিত্র সংখ্যা খুব বেশী না হলেও যে ক'টি আছে তারা উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত, বিশেষ করে তারকেশ্বরের চরিত্রটি রীতিমতই বৈচিত্র্যবাহী। সমরেশ বসু শক্তিমান সাহিত্যকার, তাঁর এই রচনাও সেই পরিচয় বহন করে, আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—ছয় টাকা।

## ফুলমোতিয়া

আজকের দিনে কুশলী কথাশিল্পীদের মধ্যে প্রশান্ত চৌধুরী অন্যতম। "ফুলমোতিয়া" তাঁর পরম সুখপাঠ্য এবং চিত্তাকর্ষক উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ফুলমোতিয়াকে কেন্দ্র করে প্রশান্ত চৌধুরী একটি গ্রাম্য সমাজকে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় চিত্রিত করেছেন। গ্রাম্য সমাজের এক আভ্যন্তরীণ নিখুঁৎ আলেখ্য এই গ্রন্থে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা সর্বোপরি বুদ্ধির জড়তা কি ভাবে মানুষের জীবনে সর্বনাশা দুর্যোগ ঘনিয়ে আনে, যার বীজ সমগ্র সমাজকে বিষাক্ত করে তোলে তারই জীবন্ত চিত্র লেখক এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পাত্র পাত্রী অবাঙালী। ফুলমোতিয়া চরিত্রটি যেন ব্যথা এবং বঞ্চনার এক মূর্ত্ত

প্রতীক। বিশেষ করে লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীতে তার জীবনের হতাশা বেদনা বঞ্চনা জীবন্ত হয়ে উঠে পাঠকচিত্তে এক অনবদ্য অনুভূতির সঞ্চার করে। কাহিনীবিন্যাসে রচনার প্রসাদগুণে, চরিত্র চিত্রণে লেখক যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গী সমাজচিন্তা জীবন বোধ প্রশংসার দাবী রাখে। প্রাঞ্জল ভাষায় মনোরম বর্ণনায় এবং সাবলীল গতি গ্রন্থটিকে পরম আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রকাশক—ক্লাসিক প্রেস, ৩।১-এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম-পাঁচ টাকা মাত্র।

## নফর সংকীর্তন

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিমল মিত্রের অধুনা প্রকাশিত এক উপন্যাস। বনেদী ধনী বংশের মামুলি কাহিনী শুধু লেখকের মুন্সীয়ানার জোরেই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের এক নিখুঁত চিত্রায়ণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়, এবং তাতে তিনি আশ্চর্য্য রকমেই সফল। ধনী জমিদার পত্নীর রোগ আরোগ্যের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একদা দীনা এক রমণীর আত্মদানের। যথাযথ ভাবেই। দরিদ্রা মঙ্গলা সেই গুরু কর্ত্তব্য পালন করে আর আজীবন সেই দুঃসহ গ্লানির বোঝা মাথায় নিয়ে ভারবাহী পশুর মতই নিঃশব্দে দিন অতিবাহিত করে চলে। কিন্তু মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডী শুধু এটাই নয়, একটি নিরপরাধ মানব শিশুর অবহেলিত অপচয়িত জীবন দর্শনই বর্ত্তমান গ্রন্থের মূল উপজীব্য। ধনী গৃহে প্রতিপালিত অনাথ নফর, যে জীবনে জানতেও পারল না তার প্রকৃত আত্মপরিচয়, বুঝতেও পারল না যে, যে গৃহে সে অবাঞ্ছিত আশ্রিতের ন্যায় জীবনের অধিকাংশ দিনগুলিই কাটিয়ে গেল তাই তার পিতৃভূমি, সেখানে তার অধিকার পরান্নভোজী আশ্রিত মাত্রের নয় সেখানে তার অধিকার গৃহস্বামীর। নফরের জীবন ট্রাজেডীই এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য। শক্তিমান কথাশিল্পীর কলমের টানে টানে তাঁর বক্তব্য প্রাণবন্ত হয়েই পাঠকের মনের দরজায় ঘা দেয়। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক বিমল মিত্র, প্রকাশক-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

## যাতায়াতের পথের ধারে

শক্তিমান কবি আবুল কাশেম রহিমুদ্দীন গদ্য রচনাতেও সিদ্ধহস্ত, আলোচ্য গ্রন্থটিই তার প্রমাণ। গ্রন্থটির মধ্যে নানা মানুষের ভীড়। শহর কলকাতায় চলার পথে এমন বহুতর চরিত্রের সন্ধান মেলে যাদের কাহিনী যেমনই বিচিত্র, তেমনই রোমাঞ্চকর। সেই সব কাহিনীই লেখক অনবদ্য দক্ষতার সঙ্গে পাঠককে শোনাচ্ছেন, সেই সব চরিত্রের মিছিল চলেছে এই গ্রন্থে। যাদের জীবনে অজস্র বৈচিত্র্যের ও পরমাশ্চর্য্যতার সময়ে অথচ যাদের কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রে অলিখিত থেকে যায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যারা গুরুত্ববিহীন হয়েই পৃথিবীর চলার পথ থেকে একদিন সরে দাঁড়ায়, লেখক তাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন সাহিত্যের পাতায়, মর্যাদা দিয়েছেন সেই সব অসামান্য কাহিনীর। লেখককে পথ চলতে হয়েছে সবগুলি ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে, সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে এবং জিজ্ঞাসু মন নিয়ে। অনেক হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাতের রহস্য তাঁর কাছে ধরা পড়েছে, তাদের তিনি তাঁর কবিমন নিয়ে বিচার করেছেন, মর্মে মর্মে অনুভব করে "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" সাহিত্য-রূপ দিয়েছেন। তাঁর দরদী, সহানুভূতিশীল এবং বিশ্লেষণধর্মী ও সন্ধানধর্মী মনোভাবের পরিচয় গ্রন্থটির সর্বত্র পাওয়া যায়। চরিত্র-গুলির পরিচর্যাও তিনি করেছেন নিপুণতার সঙ্গে। ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী এবং প্রকাশরীতি সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও যথাপ্রাপ্য সমাদর আমরা কামনা করি। গ্রন্থটি "শ্রীপদাতিক" ছদ্মনামে লিখিত এবং বিশিষ্ট কথাশিল্পী শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর ভূমিকা রচনা করেছেন। প্রকাশক—নবজাতক প্রকাশন, ৬, য়্যাণ্টনিবাগান লেন, কলকাতা-৯। দাম আট টাকা মাত্র।

## পাগল পরাগী

বর্ত্তমানে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার কথা সাহিত্যজগতে প্রায়ই আলোচিত হতে শোনা যায়, কিন্তু এ সত্ত্বেও বইয়ের প্রকাশনা যে বিশেষ কিছু কমে যায়নি, নিত্য নূতন বইয়ের আবির্ভাবই তা প্রমাণ করে দেয়। ব্যাং-এর ছাতার মতই বাঙ্গালা সাহিত্যের কলেবর ক্রমবর্দ্ধমান হলেও, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়ে উঠতে হয়। এমন কয়েকটি রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটার ঘটনা বিরল নয়; আলোচ্য গ্রন্থখানিকেও নিঃসংশয়ে সেই শ্রেণীর রচনার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। বর্ত্তমান উপন্যাসের বিষয়বস্তু এক নিম্নশ্রেণী অন্ত্যজের অগাধ পত্নীপ্রেম, উন্মাদিনী পত্নীর প্রতি রাধু বাগদীর অচল নিষ্ঠাকে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ণনা করেছেন লেখক, যার আদ্যোপান্ত অত্যন্ত ক্লান্তিকর ঠেকে। লেখকের ভাষারীতি অত্যন্ত অপরিণত, বর্ণনাভঙ্গী জলো ও অশালীন। বইটি পড়লে শুধু এই ভেবেই বিস্মিত হতে হয় যে, এ ধরণের রচনাকে অর্থব্যয় করে প্রকাশ করার মত অধ্যবসায় কোন মানুষের থাকতে পারে। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—সুশীল কর, প্রকাশিকা—শ্রীনীহারকণা দেবী, ৫।২৪৭ মগাজাতি নগর, পোঃ আগরপাড়া ২৪ পরগণা, দাম—আড়াই টাকা।

# উদ্বৃত্ত প্রহর

শ্রীতারাশঙ্কর পাণিগ্রাহী

মৃত্যুকম্প্র দু'টি হাতে তুলে নিই উদ্বৃত্ত প্রহর—
ভয়ার্ত্ত রাতের বুকে মনে হয় আমার এ-ঘর,
ঘুঘুর ডানার মতো সকরুণ, বিধ্বস্ত, বিহ্বল···
রোদ্দুরে, বিদ্যুতে, বজ্রে, ঝড়ে, জলে পিচ্ছিল চঞ্চল।

বাইশ বসন্ত গেছে। আমি এক নিঃসঙ্গ নায়ক।
যন্ত্রণার ঘরে জাগি, বুকে নিয়ে বিষাক্ত শায়ক,
পলাশ প্রহর যত কাটিয়েছি কৃষ্ণচূড়া বনে
উদ্বৃত্ত প্রহর সব ব্যর্থ হয় ঘনিষ্ঠ আশ্বিনে।

# বার্ধক্যে

# বারাণসী

নীলকণ্ঠ

## চব্বিশ

দেশের রাজা বিমুখ করলে সব কালের সব দেশের যিনি অদৃশ্য মালিক, যিনি জগতের রাজা তাঁর দিকে মুখ তুললেন মধুসূদন সরস্বতী। চোখের জলে নদীর জলে এক হয়ে যাওয়া সন্ধ্যায় নৌকার ওপর দিয়ে নদীপারের কথা মনে হলো না সেই বালক বীরের। তার মন উন্মুখ হলো সেই সোনার তরীর জন্যে জীবনের বন্ধনমুক্তির তীরে পৌঁছে দিতে পারে যে-ই শুধু। আকাশের তারারা আজ চোখের তারায় জ্বেলে দিলো সহসা সেই দীপ, যার আলোয় চেনা-পথের নিরাপদ রাস্তা ছেড়ে অচেনায়, যুগে যুগে যিনিই কেবল চিরচেনা, তাঁর উদ্দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরুবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন পিতৃপদে বালক মধুসূদন! জ্ঞানবৃদ্ধ পুরন্দরাচার্য দর্শনের পাতায় যাঁকে হাতড়ে মরেছেন এতকাল, আজ তাঁরই আত্মজ, তাঁর আত্মজ চোখের পাতায় তাঁকে দর্শন করবার চাইছে নির্দেশ। কি করে তিনি তাকে বলেন,—'না'? মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভা, স্মৃতিশক্তি, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বিদ্যার পিতৃ অহংকার আজ পুত্রের বিদায় প্রার্থনায় কেঁদে উঠলো করুণ বিপ্রলম্ভে। তবু বলতে পারলেন না, যেতে দেব না। কারণ সেই বিদ্যাবৃদ্ধ আচার্য জানতেন, বালক বিস্ময়ের অন্তরে এসেছে সেই বিস্ময়কর আহ্বান, যার ডাকে সাড়া না দিয়ে মানুষ সকল দেশে সকল কালে একান্ত নিরুপায়! সেই আহ্বান, অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত সেই উদাত্ত আহ্বান একবার যার কানে গেছে কোটি জন্মে আহৃত সুকৃতির কারণে নয়, অহৈতুকী কৃপার অকারণে, তার প্রাণে জেগেছে সর্বনাশের সাধ। যাঁর আশ করলে তিনি সর্বনাশ করেন, তবুও যাঁর আশ করলে তবেই হন যিনি দাসানুদাস,—আজ অপরূপ রূপকথার মতোই আধো আলোছায়ার রাতে নির্জন নদীতীরে নৌকার ওপর অশ্রুধৌত বালকের চোখের সীমায় সহসা ধরা দেয় অসীমের আভাস!

সাক্ষী থাকে শুধু অনন্তকালের সংগে অন্তকালের মুহূর্তের জন্য মাল্যবদলের মিলনক্ষণে আলা পূর্ণচন্দ্র।

চোখের জলে নদীর জলে একাকার অন্ধকারে হঠাৎ ছড়িয়ে যায় বাঁধ ভেঙে চাঁদের হাসি। সেই আলো অলৌকিক, কিন্তু অলীক নয়। সেই আলোতে ভালো করে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করলেন দুর্ভ-ভাগ্য পিতা পুরন্দরাচার্য। দেখলেন সেই দুর্ধর দীপ্তি উদ্ভাসিত অরুণবহ্নি-আলোকিত আননে, সেই ছবি, যে ছবি নিশীথ রাত্রে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত আপন রমণী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করে পথে বহির্গত রাজপুত্র গৌতমকে দেখে থাকে যদি কেউ শুধু সে-ই দেখেছে। সেই ছবি,—নিদ্রিত বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় মুহূর্তে নিমাই-এর মুখে যার আশ্চর্য আলো জ্বলেছিল সে কবে, সেই এক ছবি—সেই 'এক'-এর ছবি যার মনে জেগেছে একবার আর মুছে গেছে জগতের সব ছবি। সেই এক-এর ছবিতে জগতের সব ছবি-র যাতে একদিন হতেই হবে একাকার!

জীবনের চলচ্ছবি মুছে যায় পুরন্দরাচার্যের কাছ থেকে; জেগে থাকে নদীর ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া পুত্রের মুখচ্ছবি! সেই 'এক'-এর জন্যে একান্ত উন্মুখ এক ছবি!

পিতার কাছ থেকে অনুমতি পেলেন মধুসূদন। কিন্তু মায়ের কাছ থেকে? অনেক চোখের জলে আর পুত্রের একটি কথায় শেষ পর্যন্ত কথা দিতে হলো মাকেও। মধুসূদন কথা দিলেন যে তিনি একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন না; শ্রীগৌরাংগ দর্শনে যাচ্ছেন এখন নবদ্বীপে।

নবদ্বীপে-ই তো যেতে হবে প্রথমে; নবদ্বীপ জ্বলেছে যাঁর চোখে, চৈতন্যের প্রথম প্রদীপে ভগবান শ্রীচৈতন্য ছাড়া আর কাকে চোখে পড়বে তাঁর?

যাবার আগে পুরন্দরাচার্য বললেন পুত্রকে: সন্ন্যাস গ্রহণের আগে প্রকৃত জ্ঞান গ্রহণের চেষ্টা কোরো। কবি হলে পুরন্দরাচার্য বলতেন, তিনি শুধু গানের ওপারে নয়, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জ্ঞানের ওপারেও। তবু জ্ঞানের অধিকার না পেলে তাঁর জয়গানের অধিকার থেকে যায় অকরায়ত্ত!

ঘর থেকে পথে নামলেন সেই বালক, পথ থেকে উঠবার সময় হয়নি যার তখনও।

নিঃসম্বল, ঘরছাড়া, পথহারা আত্মহারা এক বালক এসে পৌঁছয় নদীতীরে। যার ওপারে চলেছে পথ নবদ্বীপে পৌঁছবার। পারানীর কড়িবিহীন সেই প্রতিভাধর বিস্ময়কর বালককে কে পৌঁছে দেবে ওপারে? কে পৌঁছে দেবে? কে পৌঁছে দেয় কোনও কোনও ভাগ্যবানের সোনার তরী তাঁর পায় এ পৃথিবীর অসীম সিন্ধু যে কৃপাসিন্ধুর সীমার জন্যে সীমাহীন অশ্রুজলের প্রতীক মাত্র!

কে পার করে আর সে ছাড়া অনাদি অনন্তকাল ধরে পারাপার জানি না যার সে ছাড়া কে আর! পংগুকে যে দেয় পা পাহাড় ডিংগোবার, অন্ধকে যে দেয় আলো। অসীমকে যে দেয় সীমা, দ্রৌপদীকে যে রক্ষা করে দুঃশাসন থেকে, সেই মধুসূদন ছাড়া মধুসূদনকে কে নিয়ে যাবে সেই পারে যার এপারে মধুসূদন, ওপারে সরস্বতী;—মাঝখানে বয়ে চলেছে স্রোতস্বতী,—নিত্যবহমান বলে সে-ই শুধু সৎ, শুধু সতী সে-ই!

দিব্যবিভায় দিগ্‌-দিগন্ত দীপ্ত করে স্রোতস্বতীর অতল থেকে উঠে আসেন সরস্বতী আশীর্বাদ হাতে করে মধুসূদনের মাথায় ঠেকাতে: পার হও তুমি নদী !

পার হও নদী তুমি, তবেই, বিনা পারানীতে, যদি সরস্বতীর বীণা পারে নিতে তুলে হাতে। বাজাতে পার সেই ছন্দে যে আনন্দে সকাল-সন্ধ্যা হয়, বন্ধ্যা বসুন্ধরা হয় ধনধান্য পুষ্পভরা, নদীতে বান ডাকে, সমুদ্র লাগে পূর্ণিমার প্রেম, পাখী গান গায়, বাতাস বয়ে আনে তার খবর অনাদিকাল ধরে, আকাশ যার অভিসারে হয় নীলাম্বরী, সেই নীরব সরস্বতী যাঁর কণ্ঠস্বর তিনি ছাড়া আর কে পৌঁছে দেবে মধুসূদন সরস্বতীকে ওপারে, যে পারে জীবনের কেকা এখনও নীরব কেন, এপারে যার কুহু মুখর হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে—, কে জানে।

একটু বাদেই দেখা গেলো জেলেদের নৌকা আসছে পারানীর কড়িহীন বালককে পৌঁছে দিতে ওপারে !

নন্দপুরচন্দ্রহীন বৃন্দাবনের মতোই নিমাইবিহীন নবদ্বীপ তখন অচৈতন্যপ্রায়। শ্রীগৌরাংগ চলে গেছেন তখন নীলাচলে; নবদ্বীপ ছেড়ে। মধুসূদন তবুও নবদ্বীপেই রয়ে গেলেন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নে। পাঠ করলেন আচার্য মথুরানাথের পায়ের কাছে বসে; কিন্তু শান্তি পেলেন না। শ্রীগৌরাংগের স্বপ্নে বিভোর মধুসূদন। প্রস্তুত হলেন শ্রীগৌরাংগের দ্বৈততত্ত্বের উজ্জ্বল বিকাশের সমর্থনে মহাগ্রন্থ রচনায়। কিন্তু দ্বৈতবাদ সমর্থনের আগে পারংগম হওয়া প্রয়োজন অদ্বৈতবাদে। অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন না করলে দ্বৈতবাদ দাঁড়ায় না। আর অদ্বৈতবাদের জটিল অরণ্যে পৌঁছবার একমাত্র পথ বারাণসী। কাশীতে গিয়ে উঠলেন মধুসূদন স্বামী রামতীর্থের সান্নিধ্যে।

তিনি যাকে আঘাত করবার জন্যে উদ্যত হয়ে এসেছিলেন কাশীতে এসে দেখলেন তিনিই 'সেই'। তিনি এবং ব্রহ্ম অভেদ এই জ্ঞান তাঁকে নবদ্বীপ দেয়নি; দিলো কাশী। তিনি অনুতপ্ত হলেন। বিবেকের কাছে অপরাধী হলেন কেন অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করবার কারণে কপটাচরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন গুরু রামতীর্থের কাছে।

রামতীর্থ বললেন: তুমি আজ যাকে হনন করতে এসেছিলে তাকেই বরণ করেছ, তোমার পাপ কোথায়? তবুও যদি অনুতাপ-অনলে জ্বলতে থাকো অহর্নিশ তাহলে সন্ন্যাস গ্রহণ কর তুমি; সর্বপাপ-মুক্ত হবে মুহূর্তে। আর? আর রচনা কর, দ্বৈতবাদীদের ন্যায়ামৃত গ্রন্থের প্রতিবাদ। এমনভাবে খণ্ডন করো তাকে যাতে অদ্বৈতবাদ অস্বীকারের দুঃসাহস না হয় আর কারুর।

বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর মধুসূদন সরস্বতী সেই মহাগ্রন্থ রচনা করেন যার নাম অদ্বৈতসিদ্ধিঃ। একাধারে নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী এই গ্রন্থে দ্বৈতবাদী আচার্য ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃতকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন।

এই মহাপ্রাজ্ঞ মহৎ বিজ্ঞানী আদ্বতীয় অদ্বৈতবাদী মধুসূদন আবার নিজের কলমের মুখেই বলেছেন: কৃষ্ণের চেয়ে বড়, কৃষ্ণের পর আর কি পরতত্ত্ব আছে তা তিনি জানেন না। এ কথায় যাঁরা মর্মাহত হন মধুসূদন তাঁদের মর্মগত নন। সাকার থেকে নিরাকার,

উপাস্য পরতত্ত্ব থেকে নির্গুণ পরমতত্ত্বে প্রয়াণের পথে মধুসূদনের কৃষ্ণতত্ত্ব, মধুসূদনের অদ্বৈততত্ত্বের খণ্ডন নয়; মুখশ্রীমণ্ডন।

মধুসূদন সরস্বতীর কাছে অদ্বৈতবাদের দুর্বলতা জানতে আসেন দ্বৈতবাদী ব্যাসরাম প্রেরিত কপট দূত। ঠিক যেমন করে নিজের অভিপ্রায় গোপন ক'রে একদিন মধুসূদন গিয়েছিলেন স্বামী রামতীর্থের কাছে। আজ বিধির বিধানে একই উদ্দেশ্যে ব্যাসরাম এসেছেন মধুসূদনের কাছে। পার্থক্যের মধ্যে কেবল এই যে, মধুসূদন জেনেছেন ব্যাসরামের আসার উদ্দেশ্য। তবুও। তবুও বিমুখ করেন না প্রার্থীকে। কর্ণ যেমন প্রাণরক্ষার কবচকুণ্ডল খুলে দেন প্রার্থীকে সব জেনে; কারণ প্রার্থনার উত্তরে 'না' বলতে পারেন নি কারুর কর্ণে মহাবীর কর্ণ, তেমনই মধুসূদন হাসেন তাঁকে হত্যায় উদ্যত মুষ্টিতে তুলে দিতে গিয়ে মধুসূদন-বধের সবচেয়ে সাংঘাতিক মারণাস্ত্র!

একদিন, অনেক দিন আগে নিমাই পণ্ডিত তাঁর পুঁথি ফেলে দিয়েছিলেন জলে, সহপাঠীর চোখে জল দেখে। নিমাই-এর পুঁথি বেঁচে থাকলে তার রচনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এই চিন্তায় ম্রিয়মাণ বন্ধুর চোখের ওপর নৌকা থেকে নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন নিজের কীর্তি —সমস্ত কীর্তির চেয়ে মানুষ যে অনেক মহৎ তারই প্রমাণ দিতে। আজ আরেক দিন, অনেক দিন পরে শ্রীকৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্ত অথচ অদ্বৈতবাদী, অদ্বিতীয় বৈদান্তিক আরেক জন,—একথা জেনে যে তাঁর কাছে অদ্বৈতবাদের রহস্য জানতে এসেছে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্যে, তবুও ফেরালেন না সেই প্রার্থীকে; কেন? এর রহস্য যে অবগত হবে সেই কেবল মর্মগত করতে পারবে বৈদান্তিক মধুসূদনের এই পরমাশ্চর্য প্রণতি শ্রীকৃষ্ণের পায়:

কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।

দুটি সাধনার ধারাই, ভক্তি ও জ্ঞানের, মধুসূদনের মোহানে, মিলিত হয়েছে তারা। তাই সেই মধুসূদনের সংগেই নাম করি এই মধুসূদনের। তাই, সরস্বতীর সংগেই প্রণাম করি মধুসূদন সরস্বতীকেও।

## পঁচিশ

ভারতবর্ষের পথে এই কাশীতে একদিন এসেছিলেন সেই চির পথক্ষ্যাপা হুয়েন সাং। আর ফা-হিয়েন। কাশীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত তাঁদের লিপিতে আশ্চর্য বাস্তব। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও সপ্তম শতাব্দীর কাশীকাণ্ডের সেই বর্ণনা পড়লে রোমাঞ্চিত হতে হয়। ধন-জন-যৌবনের গরিমায় নয়; বিদ্যা, ধর্ম, সংস্কৃতির মহিমায় কাশীর মস্তক সেদিনও সব চেয়ে উন্নত। কাশী এই অনাদি অনন্ত ভারতের মতোই চির নূতন ও চির পুরাতন।

আত্মার যেমন মৃত্যু নেই, তেমনই ভারতাত্মা কাশীও অমর।

এই কাশীবৃত্তান্তের কথা বলতে গিয়ে প্রায় সব বিদেশী পর্যটক এক বাক্যে বলেছেন যে, আর্যদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপনেরও আগে কাশীর পত্তন। হ্যাভেল সাহেব বলছেন যে,...it is not unreasonable to conjecture that even before the Aryan Tribes established themselves in the Ganges Valley, Benares may have been a great centre of primitive Sun-worship, and that the special sanctity with which the Brahmins have invested the city is only a tradition of those primeval days, borrowed, with so many of their rites and symbols, from their turanian predecessors.

[The Sacred City: E. B. Havell]

কিন্তু ঘটে যা তা সব সত্য নয়'; ভারতের আত্মা কাশীর সেই কবি কোথায়,—যাঁকে বলব: 'কবি, তব মনোভূমি' কাশীর জন্মস্থান, ইতিহাসের চেয়ে অনেক বেশি সত্য জেনো।

কাশীই সেই একমাত্র স্থান ভারতবর্ষে যার বয়েস হয়েছে কিন্তু যার বার্দ্ধক্য নেই। চিরকালের সেই ভারত, দিনযাপনের দুশ্চিন্তা, প্রাণধারণের গ্লানি থেকে মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছে যে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় বলে সে ক্ষেত্র বন্ধন-মুক্তির কুরুক্ষেত্র কাশী ছাড়া আর কি! এখনও এর পথের ধুলো সেই পায়ের ছাপে পবিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে আমি যাঁদের পদচিহ্নকেই কেবল বুঝি। ইতিহাস যুদ্ধের নয়; ইতিহাস বুদ্ধের। ইতিহাস যুদ্ধের,—ঠিক; কিন্তু মানুষের ইতিহাস শুভের সংগে অশুভের, ভালোর সংগে মন্দের আলোর সংগে ছায়ার। নিত্যের সংগে অনিত্যের নিরন্তর দ্বন্দ্বের চিরন্তন দর্পণ ছাড়া আর কিছু নয়। এবং কাশী ভারতের অবিনাশী দর্পণ।

ভারতবর্ষের কবি বলেছেন, 'ওরা কাজ করে'! কারা? যারা জলে জাল ফেলে, যারা মাঠে ধান বোনে, যারা তাঁত চালায়। শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংস হলেও বিধ্বংস হয় না যারা, তারা কেবল জেলে-চাষী-তাঁতি-কুমোর-ধোবা-মুচি-মেথর নয়; কবি বললেও—নয়। এরা আমাদের প্রাণধারণের দিনযাপনের অপরিহার্য অংগ। এরা সংসারের চাকা চালু রাখে। ঠিক। কিন্তু সংসার এক চাকায় চলে না। তার আরেক চাকা যারা চালায় তারা জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-ধ্যানী-প্রেমী-সন্ন্যাসী। মানুষের সংসার কেবল ব্রেড নয়; কেবল বাটার নয়; তার ওপরে বাটারফ্লায়ের স্বপ্ন। শত শত সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে যায়, মুড়িয়ে যায় উন্নত উদ্ধত রাজমস্তক, তার ওপরে যারা থাকে মানুষের ধ্যানে, মানুষের অশ্রুতে হাসিতে, বিরহে ভালোবাসায়, গ্রহ-গ্রহান্তরের জয়যাত্রায় ছায়া ফেলে যারা তারাও মানুষের আলো আশার প্রতীক। মানুষের মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে, 'ওরা কাজ করে'। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-কবি-ধ্যানী-প্রেমী-সন্ন্যাসী,—এরা মনের কুমোর মানুষের। অনন্তকাল ধরে মানুষের মন নিয়ে ভাংগা-জোড়ার খেলা শত শত সাম্রাজ্য ভাংগা-চোরার পরেও শেষ হবার নয় কোনওদিন।

কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত ধর্মের সংগে বিজ্ঞানের বিবাহদানের নূতন প্রস্তাবে নূতন কিছু বলবার আনন্দে দেখতে পাই আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন অতি সাম্প্রতিক কালে। রেলিজিয়ান কথাটা জিবে এলে তাদের সেকুলার ব্যাক্তিত্বের জাত যায়; তাই রেলিজিয়ান বা ধর্মের বদলে স্পিরিচুয়ালিজম্ বা আধ্যাত্মিকতার সংগে সায়াল বা বিজ্ঞানের মিতালীর কথা বলেন। তারা হিন্দু ভারতের ধর্ম বা বিজ্ঞান কি, কোনওটারই খবর রাখেন না। হিন্দুর কাছে ধর্ম হচ্ছে তাই যার মধ্যে মানুষের কর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-আধ্যাত্মিকতা ওতপ্রোত হয়ে আছে। ভারতবর্ষের ধর্ম কোনও অদৃশ্যলোকে অদ্ভুত কোনও বায়বীয় আজব বস্তু নয়। ধর্ম বলতে ভারত কি বোঝে আধুনিক ভারত যেদিন আবার তা বুঝবে সেদিনই সে বুঝবে

রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে মানুষের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব কত বেশি কাম্য; কত দুরন্ত প্রয়োজনের।

কেউ কেউ একথাও বলেন ওই দলের যাঁরা দলী সে সাধুরাই ভারতবর্ষের সর্বনাশ করেছে! কারণ সাধুরা কোনও কাজ করে না। সাধু বলতে এরা বোঝে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশকে। সাধু মাত্রই সন্ন্যাসী; কিন্তু সন্ন্যাসী মাত্রই সাধু নয়। শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য নাগ মহাশয় সন্ন্যাসী ছিলেন না প্রচলিত অর্থে। সাধু ছিলেন তিনি; কিন্তু তাঁর চেয়ে বড় সন্ন্যাসী তো সম্ভবত সেকালে এবং একালে, এদেশে এবং ওদেশে। কোথাওই হাত বাড়ালেই মেলে না। স্বামীজী স্বয়ং স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি যে নাগ মহাশয়ের মতো মহাপুরুষ তিনি আর একটিও দেখলেন না।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ধর্মের ইতিহাস; সাধুদের স্বপ্ন আর সাধনা দিয়ে গড়া! কাশী তাই ভারতের মর্ম এবং কর্মকেন্দ্র। ওরা কাজ করে! নিরলস নিরন্তর কাজ করে চলেছে ওরা। ওই যারা পথের ওপর পেতেছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন! রোগ-শোক-দুঃখ-যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মৃত্যু-মহামারী জর্জরিত মানুষের প্রতি মুহূর্তের ভয় বিদূরিত করার, নিঃশংক, নির্মল, নিরুপম মুক্তি মন্ত্র উচ্চারণের দুঃসাহস যাদের! অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতয় মানুষকে নিয়ে যাবার নির্লিপ্ত সাধনা যাদের যুগযুগান্তরের কখনও নিষ্প্রভ হবার নয়। শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংস শেষ পরে আজও ওরা কাজ করে, যাদের ক্রোধে আমরা হনন করেছি, সংশয়ে রক্তাক্ত করেছি। এখন প্রেমে যাকে পুনরাবিষ্কার করব আবার!

পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে প্রলয়ের ঝড় আসছে যখন, মানব সভ্যতা বিলুপ্তির গুণছে বিষণ্ণ প্রহর তখন কবিকণ্ঠে আমরা বলব ওরে বিহংগ, ওরে বিহংগ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোর না পাখা! ভারতবর্ষের, অনাদি অনন্তকালের সেই বিহংগ গান থেমে যাবার নয়, যাদের কণ্ঠে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে প্রথম আহ্বান হয়েছে ধ্বনিত এবং ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে আজও যা বিরামহীন প্রতিধ্বনিত!

সেই ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করছি কাশীর এই ইতিবৃত্তে! কারণ, কাশীই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

[ ক্রমশঃ ]

# কোকিলের প্রতি

( উইলিয়ম্ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "To The Cuckoo" কবিতা )

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

হে প্রফুল্ল নবাগত! শুনিয়াছি আমি,
আজো শুনি' তোরে হই আনন্দচঞ্চল;
হে কোকিল! তোমারে কি সম্বোধিব পাখী,
অথবা ভ্রমণশীল সুস্বর কেবল?
যখন ঘাসের 'পরে রই অবস্থিত
দ্বিগুণিত স্বর তব কানে মোর আসে;
পাহাড়ে পাহাড়ে যেন ব্যাপ্ত হয় তাহা,
যুগপৎ অতি দূরে আবার সকাশে।

যদিও বকিছ বাজে উপত্যকা পাশে
সূর্য্যের আলোক আর ফুলের বিষয়ে,
আনো তুমি মোর কাছে স্বপনকালের
যেন কোনো সুমধুর কাহিনীটি লয়ে।
বসন্তের প্রিয় পাত্র! ডাকি বারংবার,
এমন কি আজো তুমি সমীপে আমার
পাখী নও, কিন্তু এক অদৃশ্য জিনিস,
একটি সুস্বর, এক রহস্য অপার!

এমনি শুনেছি মোর পাঠদ্দশাকালে
বালক ছিলাম যবে, তখন এ-স্বরে
অসংখ্য দিকেতে দৃষ্টি ফিরায়েছি আমি
ঝোপে-ঝাড়ে, তরু মাঝে, নভের উপরে।
খুঁজিতে তোমায় আমি ঘুরিতাম কত
অরণ্যের মাঝে আর সবুজ প্রান্তরে;
এবং এখনো তুমি আশা, ভালোবাসা;
ভরসায় আছি, কভু পাইনি গোচরে।

তবুও শুনিতে পারি এখনো তোমায়;
সমতল ভূমে শুয়ে করি যে শ্রবণ,
শুনিতে শুনিতে যেন হাতে পাই আমি
সেই স্বপ্নময় কাল পুনঃ সুশোভন!
হে সৌভাগ্যশালী পাখী যেথা থাকি মোরা
মনে হয় সে-ধরণী আজিও তদ্রূপ
অবাস্তব পরীদের পুণ্য বাসভূমি
তোমার বাসের যোগ্য অতি অপরূপ!

## কৃষাণী গান

বাংলা দেশের সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে নানাপ্রকার কর্মবান্ধব গানের প্রচলন আছে।

হাল চষিতে চষিতে, জল সেচিতে সেচিতে, ধান কাটিতে কাটিতে কৃষকদের কণ্ঠে কৃষাণী গান গীত হয়। এগুলির সুরের মধ্যেও বেশ একটা তৎপরতা আছে।

সারারাত ধরিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ক্ষেতে ঢল নামিয়াছে। কৃষিপল্লীতে বিহান বেলায় কাজের ডাক আসিয়াছে—

ওরে মকাই বলে উঠল রে জল নামল ক্ষ্যাতে ঢল।
বিহান যায়, কখন কামে যাবি রে।
ক্ষ্যাতের আল ভেঙ্গে দিব, জল তুইলে দিব রে।
জলেতে ডুবিলে মাঠ ফসল কোথা পাবি রে।
আয় তবে যাই বাদল বুঝি আজ নাই রে।।

শুধুই কি তাই, বানের জলে গ্রামের দীঘি ভাসিয়া গিয়াছে; নদীর সঙ্গে পুকুরের সংযোগ স্থাপন হওয়ায় গ্রামের পথে হাঙ্গর পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। কৃষক হাঙ্গর মারিবার জন্ত আহ্বান জানায়—

আয় তবে আয় কদম দীঘির গাঁয়।
খাল বাঁধিতে চল জলে গিয়া নামি রে।
(ওরে) তালগাছের শালতি নামাইয়া রে।
জলেরে চুবেছে ঐ হাট যাবার পথ কই,
হাঙ্গর এসেছে ডোবা খালে রে।
গোরু মহিষ টেনে লয় জলের ভিতর রয়,
চল বর্শা ধনুক নিয়া কুম্ভীর হাঙ্গর খ্যাদাবি রে।।

বসুমতীর কৃপা ভিক্ষা ছাড়া কৃষকদের আর তো অন্ত কোন পায় নাই, তাই তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা হয়—

বন্দে মাতা বসুমতী পুরাণে মহিমা শুনি।
অগতির গতি মাগো ক'র মোরে ত্রাণ।
চাষার ছাওয়াল মোরা রে ভাই, চাষ বিনা আর জানি নাই,
এবার ধররে লাঙল শক্ত কইর‍্যা জেবন থাকতে ছাড়া নাই।

সারা বৎসর ধরিয়া জমির রূপ-রূপান্তরের বর্ণনা করা হইয়াছে নিম্নের গানটিতে। গানটির মধ্যে উদ্দীপনাময় marching সুরের আভাস পাওয়া যায়:

পৌষ মাসে দেলাম পূজা বাস্তুদেবের পায়
মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়।।
ফাল্গুন মাসে দেলাম লাঙল, চৈত্র মাসে বীজ,
বৈশাখেতে চিকচিকানী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ।।
আষাঢ়ে সোনার ধান গেরস্থতে তোলে।
ভাদ্র গেল, আশ্বিন আইল, কার্তিকে দেয় সাড়া
অঘ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখরে আমন ছড়া।।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাউল গানেও কৃষির বহু উপমা দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গ পাটের দেশ, জনগণের অর্থনৈতিক জীবন পাট চাষের উপর কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত। পাট চাষের গান এ দেশের কর্মবান্ধব সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। পাট চাষের বিভিন্ন পর্যায় যেমন, পাট বীজ বোনা হইতে সুরু করিয়া পাট বিক্রয় পর্যন্ত সকল কর্মেরই উপযোগী গান প্রচলিত আছে।

মুসলমান চাষীদের গান তাহাদের আনন্দের উচ্ছলতায় সমবেত কণ্ঠে উদ্গীত হয় পাট কাটার গানে—

পুবের থনে আইলো বাতাস নদী হইল তল
জাগ পিরথিমী সাগর কৈইরা চরায় নামলো ঢল।
কাঁচি-বাগী সঙ্গে লইয়া রে পাট কাটিতে চল;
ও ভাই পাট কাটিতে চল (জোনা ভাইরে)।।

এই গানগুলি এক দিক দিয়া সারি গানের শ্রেণীভুক্ত; সারি গানে যেমন বৈঠার আঘাতের তাল ছন্দের সৃষ্টি করে, পাট কাটার গানে কৃষকদের কাস্তের শব্দের তাল সেইরূপ একটি ছন্দস্পন্দন সঞ্চার করে—

সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত,
আগল দিঘল সমান কইরা শক্তে বাইন্ধো পাত।
হাকিমপুরের মকিম শেখের হাইকে কাঁপে হাত,
তাহার গাতায় কাজ করিতে ডুবাও কেন জাতি?
ও ভাই ডুবাও কেন জাতি?

পাট কাটার বিভিন্ন গানের মধ্যে একটি পারম্পর্যের সূত্র আছে—পাট কাটার কর্মে আহ্বান, সেখানে নানা রঙ্গের মধ্য দিয়া কর্মের সাঙ্গ, সবুজ পাটের গাছগুলি জলে ফেলিয়া পচানো, সেগুলি হইতে পাট বাহির করা, সবশেষে সেগুলিকে হাটে বিক্রয় করা—সমস্ত মিলিয়া একটি কর্মচাঞ্চল্যময় গীতিরঙ্গের পালা জমিয়া ওঠে! প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক গানের মধ্যেও একটি সুরবন্ধন আছে—'সোমান সোমান চলো রে ভাই জোরে চালাও হাত।'

ভরাজমিতে পাটের শাখাপল্লব ঘন হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে অবিরাম চলিতেছে খসখস শব্দে কাঁচি, আর তাহারই তালে তালে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে সুরধ্বনি। হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের আশা-আনন্দের একটি চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছে:

শুন শুন কৃষ্ণ কানাই শুন মন দিয়া,
এই পাট বেচিয়া ইবার দিমুই তোমার বিয়া।
এমুন কন্তা আনমু যেমুন ম্যাগে বজ্রপাত।
ঘরে থ্ইলে ঘর উজ্জ্বাল, মনে থ্ইলে মন,
( হারে ) এমুন কন্তা আনমু যেমুন পুন্নিমাসীর চাঁদ ॥

পাট কাটার কাজের মতো পাটের গানেও পুরুষদের স্থায় মেয়েদেরও একটা অংশ আছে। পাট পচাইয়া তাহার আঁশ ছাড়ানোর কাজ মেয়েদেরই একচেটিয়া, অফুরন্ত কাজের মধ্যেও তাহাদের—কণ্ঠে গুন্‌গুনিয়া উঠে :

বাঁশতলাতে শ্রোত বইছে বইছে পানির ঢল।
আয় আর আয় আয়রে সই পাট বাছিতে চল্।
এই পাটে ইবার কিনমু রূপার মল ॥
পাটে আমার ভাত-কাপড় পাটে ঢাকাই শাড়ী,—
পাটের দৌলতে আমার দাম-বান্দা বাড়ী
আমার পায়ে রূপার মল ॥

কৃষাণী গানের সুসময় আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। এই সময়ে যেমন কাজেরও অন্ত নাই, ভাব-কল্পনারও সীমা নাই। এই সময়ের কর্মতৎপরতার উপরই নির্ভর করিয়া আছে সারা বৎসরের কান্না-বিলাপ। সারা বঙ্গের কৃষক সতৃষ্ণনয়নে পর্জন্যদেবের দাক্ষিণ্যের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে। পূর্ববঙ্গের গ্রাম-প্রান্তরে সেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয় সুরে :

বৃষ্টি না নামিয়া পরাণ করলা বুঝি সারা
ও ম্যাঘ আইস বৃষ্টির পানি হইয়া রে।
( কোরাস ) আল্লা ম্যাঘ দে, আল্লা পানি দে ॥
জোয়াল লইয়া বলদ লইয়া আকুল হইয়া রই,
ম্যাঘের আগে রোদ দেখি ছায়া দেখি কই ?
আসমান হইল টুডা টুডা জমিন হইল ফাডা ॥
ম্যাঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে পানি দিবো ক্যাডা ॥
সোনা ম্যাঘ বাদল হইয়া, পরাণ তাও জুড়াইয়ারে।
( কোরাস ) আল্লা ম্যাঘ দে, আল্লা পানি দে ॥

এইভাবে প্রতি বৎসরই নূতন নূতন বর্ষামঙ্গলের পালা রচিত হয়। বাঙলা দেশের অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর ন্যায় মেঘরাণীও দেবীর আসন লাভ করে। কৃষাণ বধূরা মেঘরাণীর পূজা করে 'নৈলা' গান গাহিয়া। এই সকল গানের মধ্যে তাহাদের অন্তরের উষ্ণতার স্পর্শ পাওয়া যায়—মেঘরাণী তাহাদের কাছে যেন সখীর আদর লাভ করিয়াছে। যেমন :

হ্যাদে লো বুন ম্যাঘরাণী,
হাত পাও ধুইয়া ফ্যালাও পানি।
কাইলা ম্যাঘা ধইলা ম্যাঘা ঘরে আছ নি,
গোলায় আছে বীজধান বুনাইতে পারি নি।
কাইয়্যাতে ধান খাইয়া যায়রে কই বা তুমি রও ?
পরাণ হইল সারা—আইসা, পরাণ দিয়া যাও ॥

বালিকারা ডালা ও কুলা মাথায় করিয়া ঘট, বদনা কিংবা গাড়ু করিয়া জলের ধারা দিতে দিতে বাড়ি বাড়ি ছড়া কাটিয়া বেড়ায়, বসুন্ধরার আশীর্বাদ লাভের জন্ত বসুধারা দেয়।

তারপর তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়, সখী মেঘরাণী অকৃপণ হস্তে বারিধারা বর্ষণ করিয়া চলিয়া যায়। কদমকেশরে বনতলের ভূমি ঢাকিয়া যায়, মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ ভুলিয়া যায়, আঙিনার মাচান ঝিঙা ফুলে ভরিয়া যায়, নবাঙ্কুরিত ধান গাছগুলি মাথা দুলাইয়া শেষ বর্ষণের অভিনন্দন জানায় :

ঝিঙা ফুলে মাচান ছাইল, কদম আইল ওই,
ধানের ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বর্ষার জল করে থৈ থৈ।
যেই না ক্ষ্যাতে আইস্যাছে আজ ঘোলাট জলের বান,
সেই হ্যানেতে ছুইল্যা উঠে নতুন কচা ধান।
গোরু বাছুর বান্ধা পইল, কই গেল হাল মই ॥

—জয়দেব রায়

## কল কে সিতারে

### ( আগামী কালের তারকারা )

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'নাচ-গান-বাজনা' বিভাগে 'টারস অব টুমরো' শীর্ষক প্রসঙ্গে জানিয়েছি—গ্রামোফোন কোম্পানী নতুন সিরিজের যে রেকর্ড বের করছেন তার নাম হয়েছে—'টারস্ অব টুমরো' বা আগামীকালের শিল্পী। সম্প্রতি এই সিরিজের চারখানি রেকর্ড আমরা সমালোচনার জন্ত পেয়েছি। এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। কিন্তু পৃথকভাবে বলবার আগে রেকর্ডগুলি শুনে আমাদের সাধারণভাবে যে ধারণা হয়েছে, তা আগে বলে নিচ্ছি।

এই সিরিজে দেখছি সেই সব গানই স্থান পেয়েছে যা এক সময়ে

ভিন্ন ভিন্ন চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। গানগুলি এক সময়ে মুখে মুখে ফিরত, কোন কোন গান এখনও চালু আছে। এই গানগুলি শুনতে শুনতে আমাদের মত চল্লিশের কোঠায় যাদের বয়স তাদের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। কোন কোন ফিল্মের নায়ক-নায়িকা হয়ত এখনও জনপ্রিয় আছেন—যেমন কিসমতের অশোককুমার, আবার কোন কোন ফিল্ম-এর কথা মনে পড়ে না। কিন্তু গানগুলি শুনে সত্যি ভারি ভালো লাগল।

স্মৃতি মন্থন করে কোথাও কোথাও একটু খটকাও না লেগেছে এমন নয়। মনে হয়েছে—মূল গানের সঙ্গে বাজনা বোধহয় এতখানি উঁচুগ্রামে বাঁধা ছিল না। শিল্পী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনুসরণকারী বাদ্যব্যবস্থায় বোধ হয় কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আনা হয়েছে। কোথাও কোথাও বাজনার তীব্রতায় মিষ্টত্ব নষ্ট হয়েছে। এটা না হলে গানগুলি আরও ভালো লাগত; তাতে সন্দেহ নেই। তবে মোটামুটি এই নূতন সিরিজটি সত্যই সুসম্পাদিত হচ্ছে—এবং গীতিরসিক মাত্রেই এই রেকর্ডগুলিকে সাদর অভিনন্দন জানাবেন।

এবার রেকর্ড ক'খানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি: NAS 1001—অম্বরকুমারের একক গান—"ন জানে কিধর আজ মেরি নাও চলিরে" ('ঝুলা' চিত্র হতে), অম্বরকুমার ও সুরিতার দ্বৈত গান—"তুমহো নে মুঝকো প্রেম শিখায়া" ('মনমোহন' চিত্র হতে)।

NAS 1002—রাজেন্দ্র-র একক গান "নাচো নাচো প্যারে মনকে মোর" ("পুনর্মিলন" চিত্র হতে), মীনা ও রাজেন্দ্রের দ্বৈত গান—"পূজারী মোরে মন্দিরমে আও" ("জাগীরদার" চিত্র হতে)।

NAS 1003—শেফালীরাণী ও তরুণকুমারের দ্বৈত সঙ্গীত "অচ্ছুৎকন্যা" চিত্রের বিখ্যাত গান—"ম্যায় বনকে চিড়িয়া বন বন বলুঁ রে," অপর দিকে "বন্ধন" চিত্রের গান "চল চলরে নও জওয়ান।"

NAS 1004—সুজাতার কণ্ঠে একক গান বিখ্যাত 'কিসমৎ' চিত্রের "অব তেরে সিউআ হায় কি মেরি কৃষ্ণ কানাইয়া" এবং রত্না শর্মার কণ্ঠে বহুবন্দিত 'রতন' ফিল্মের সেই গানটি—"আঁখিয়া মিলাকে পিয়া ভরমাকে চলে নেহি যানা।"

গানগুলি সুনির্বাচিত, সকল শ্রেণীর শ্রোতার মনে আবেগের সৃষ্টি করে। —শতাব্দী সামন্ত

## আমার কথা (৮৯)

### শ্রীপ্রসাদ সেন

শান্তিনিকেতন সঙ্গীত-ভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে কয়েকজন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী বর্তমানে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন, তন্মধ্যে স্বভাব-নম্র, আত্মগরিমাবিহীন ও দরদী সঙ্গীতশিল্পী শ্রীপ্রসাদ সেন অন্যতম।

শ্রীসেন বলেন: "১৩২৭ সালের জুলাই মাসে মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রামে আমার জন্ম। পিতা ৺ধনেশচন্দ্র সেন ও মাতা শ্রীমতী সুরবালা দেবী। স্বগ্রাম ঢাকা বিক্রমপুরের সোনারং ও মাতুলালয় যশোহরের কালিয়া। পরলোকগত আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আমার পিতৃব্য। কর্ম্মব্যপদেশে পিতাকে নানা স্থানে ঘুরিতে হয়—তজ্জন্য বগুড়া জিলা বিদ্যালয়ে আমি পড়ি ও তথা হইতে ১৩৪৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ইহার পর শান্তিনিকেতনে ভর্তি হইয়া সঙ্গীত-ভবনের সরকারী বৃত্তির জন্ম আবেদন করি। ১৩৪৮ হইতে ১৩৫১ সাল পর্যন্ত তথায় পাঠ গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হই।

আমাদের বাড়ীতে গান-বাজনার প্রতি সকলেই আগ্রহী ছিলেন। বাবা ও মার প্রেরণায় আমি গানের দিকে আকৃষ্ট হই। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি পাই।

সঙ্গীত-ভবনে পড়িবার সময় স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ আমায় প্রচুর সাহায্য করেন।

শ্রীপ্রসাদ সেন

১৩৫১ সালের জুলাই মাসে আমি "দক্ষিণী"তে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করিয়া ১৩৫৬ সালে তথা হইতে চলিয়া আসি এবং শ্রীমতী নীলিমা সেনের সহায়তায় "সুরঙ্গমা" নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করি। ১৩৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ পরিচালিত Teachers' Training College-এ রবীন্দ্রসঙ্গীতের লেক্‌চারার নিযুক্ত হই। ১৩৫৩ সালে শান্তিনিকেতন ষ্টুডিও হইতে কলিকাতা আকাশবাণীর জন্য অনুষ্ঠিত "বসন্ত" নাটকে আমি সঙ্গীত পরিবেশন করি। উক্ত বৎসরে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে আমি প্রথম (Solo) রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই। উহার বহির্বিভাগীয় অনুষ্ঠানে আমার গাওয়া অনেকগুলি সঙ্গীত রেকর্ড আছে।

আমি কাশ্মীর, জয়পুর, পাঞ্জাব, দিল্লী (প্রথম সঙ্গীত সম্মেলন), কটক, রাঁচী ও জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতাসরে অংশ গ্রহণ করিয়াছি। কলিকাতার শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের কমিটিতে আমি যুক্ত আছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের আমি অন্যতম পরীক্ষক। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের সহিত আমি প্রত্যক্ষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলাম।"

শ্রীসেনের সহধর্ম্মিণী যশোহর দিঘলকাঁদির ৺চারুচন্দ্র সেন মহাশয়ের দুহিতা শ্রীমতী সুজাতা সেন সাহিত্যতীর্থ বর্তমান বৎসরে বি-এ পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনি গানের প্রতি খুব আগ্রহী এবং লোকশিক্ষা সংসদের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

# ভাগোড়া

# বা

# পলাতক

সুধীরচন্দ্র দে

আজ হতে বাহান্ন বৎসর পূর্বে পোর্টব্লেয়ারে সেলুলার জেলের মধ্যে পাঞ্জাবের এক ডাকাত দলের দুর্দান্ত সর্দার আতর সিং-এর সঙ্গে আলাপ হয় ১৯১০ সালে। আমাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলা নিষেধ ছিলো। কিন্তু জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডাক্তার সকলেই আমাদের সঙ্গে ইংরাজি ভাষায় আলাপ করতো এবং আমরা যে এক বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী, এটা জেলের সাধারণ কয়েদীরা বেশ বুঝতে পারতো। কিন্তু আমরা যে কি অপরাধে জেলে এসেছি, তা কিছুতেই তারা বুঝতো পারতো না। আমরা কি মানুষ খুন করে কালাপানিতে এসেছি? না, ঘর জ্বালিয়েছি? না, কাউকে বিষ খাইয়েছি? না, তবে কি অপরাধ করেছি?—আমরা দেশকে স্বাধীন করবার জন্ত দল বেঁধে চেষ্টা করছিলাম। ইংরাজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে, হিন্দুস্থানে নিজেদের সরকার গঠন করবার জন্ত চেষ্টা করছিলাম। এই সব কথা খুব সরল ভাবে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করতাম। প্রথম প্রথম কিছুতেই বুঝতো না। কিন্তু দেখলাম ক্রমে ক্রমে যেন একটু একটু করে বুঝতে লাগলো আর আমাদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো। সকলে ভালবাসতে লাগলো। মান্ত করতে লাগলো।

এমনি সময়ে আতর সিংও আমাদের কাছে এসে তার জীবনের অনেক কাহিনী বর্ণনা করতো। সে আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। বাঙ্গালীরা মাছ খায় বলে আমাকে সড়ি মচ্ছি খেগো বাবু বলে মধ্যে মধ্যে ঠাট্টা করতো। এই সবল, দৃঢ়, সরল প্রৌঢ় পাঞ্জাবীকেও আমার খুব আপন জন বলে মনে হ'ত। তার জীবনের একটি দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ, তার নিজের কথায় এখানে বিবৃত করলাম; সে কালাপানী হতে কি করে পালিয়ে ছিল তারই কাহিনী:

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে আমরা তিনজন পাঞ্জাবী ও একজন বর্মী ও এক জন বাঙ্গালী একত্রে ভাইপার দ্বীপ হতে পালিয়ে বর্মাতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম, সেই পালাবার কাহিনী যতদূর যা মনে আছে তাই বলছি। তখন এই সেলুলার জেল সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। তখন ভাইপার দ্বীপে শুধু একটি জেল ছিল, সেখানেই সব কয়েদীদের রাখা হত। আমার মকর্দমায় আমরা তিনজন; আমি আতর সিং, ছুতোর সিং ও বিষণ সিং, আমরা তিনজনই একসঙ্গে ভাইপার জেলে এসে বন্ধ হলাম।

তখন ভাইপার জেলে কোন আইন কানুন ছিল না। সাহেব জেলার ও তাহার অনুচর, টিণ্ডাল, জমাদারগণই ছিল জেলের হর্তা-কর্তা। তাদের খুশী খেয়ালমত কয়েদীদের শাসন চলতো। সামান্ত অপরাধে হাত-কড়ি, বেড়ী, মার ধর, বেত, এই সব সাজা দেওয়া হ'ত। কয়েদী একটু বেয়াড়াপনা করলে তাকে রাত্রে ঘুমের ঘোরে কম্বল চাপা দিয়া পায়ে মাড়িয়ে ঢিট করা হ'ত। কত কয়েদীকে এই ভাবে ঢিট করতে গিয়ে চিরকালের মত ঢিট করা হয়েছে। ইহা ভিন্ন জেলে ছিল জ্বর, আমাশয়, যক্ষারোগ; চিকিৎসা বিশেষ কিছু হতো না, দলে দলে কয়েদীরা সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে একেবারেই মুক্তি পেয়ে যেত।

যা'হোক দু' বৎসর জেলের এই কঠোর নির্যাতন ভোগ করার পর আমরা তিনজনে জেলের বাইরে এক তাঁবুতে এলাম। (এখানে ব্যারাকে) রাত্রে বন্ধ থেকে দিনে জঙ্গলে কাঠ কাটা, রাস্তা করা, পাথর ভাঙা, এই সব কাজ করতে হ'ত। এক এক দলে কুড়ি-পঁচিশ জন কয়েদী কাজ করতো। আমরা তিন জনেই এক দলে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেতাম। আমাদের কাটলের জমাদার ছিল একজন পাঞ্জাবী। আমরা পাঞ্জাবী বলে তার নিকট হতে কিছু সদয় ব্যবহার পেতাম। বাইরে এসে দেখতাম এ বন্দের রাজ্য হতে মুক্তি পাবার জন্ত কয়েদীরা গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে অথবা পাথরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে গলা বেঁধে প্রায় প্রত্যহই দুই চারি জন আত্মহত্যা করে। আবার গ্রীষ্মের ছয় মাস দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে যখন মৌসুমী (Monsoon) বায়ু জোরে বইতে থাকে উত্তর-পূর্ব দিকে, তখন কয়েদীরা ছোট ছোট দলে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে ভেলা তৈরী করে, শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে এবং কিছু রুটি ইত্যাদি নিয়ে পালিয়ে দেশে যাবার চেষ্টা করে। তারা সকলেই মরে বা জারাসী জাহাজের হাতে পড়ে। ধরা পড়ে আবার এখানে ফিরে আসে ও ভীষণ দণ্ড ভোগ করে।

আমরা তিনজনেই পালিয়ে যাবার মতলব স্থির করলাম এই মৌসুমী বাতাসে। আত্মহত্যার দ্বারা মুক্তি আমরা পেতে চাই না। বোট্ সংগ্রহ করে পালাবার চেষ্টা করা স্থির করলাম। তিনজনেরই পরামর্শে ঠিক হ'ল কিছু দূরে পোর্ট পয়েণ্টে সরকারি তিন-চার খানা বোট সর্বদাই থাকে পুলিসের পাহারায়। তার মধ্যে হতে একখানা বোট আমাদের জোগাড় করতেই হবে। আমি যে করেই হ'ক বোট নিতে সক্ষম হবো, এ বিশ্বাস আমার ছিলো। আমাদের পালাবার মতলব কি করে যে একজন বাঙালী ও একজন বর্মী বুঝতে পারলো তা আমরা কিছুতেই জানতে পারলাম না। তারা একেবারে আমাদের হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে অনুরোধ করতে থাকলো। পাঁচজন হলে বোট্ চালাতেও সুবিধা হবে এবং বর্মায় পৌঁছে জঙ্গলে বর্মা দেশের একজন সঙ্গী থাকলেও খুব সুবিধা হবে। এই সব কারণে, তাদের সঙ্গে করে নিতে রাজি হলাম।

আমাদের উদ্দেশ্য হল মৌসুমী বায়ু আমাদের "বর্মার পূর্ব দক্ষিণ তীরে বোট পৌঁছিয়ে দেবে—মাল্দালয়ের পূবে; আমরা তখন সেখান থেকে জঙ্গলে ঢুকে শ্যামদেশে—থ্যাইল্যাণ্ডে চলে যাবো ইংরেজ সরকারের হাতের বাইরে। আমরা কাজ করবার ফাঁকে ফাঁকে জঙ্গলে ঢুকে একটা ঝর্ণার ওপারে ঘন কাঁটা বনের মধ্যে একটা জায়গা পছন্দ করে সেখানে একটি ছোট ঝুপড়ি বা ছোট ঘর লতাপাতা দিয়ে তৈরি করে রাখলাম। এবং আমরা শীগগিরই কিছু আটা ও গুড় সংগ্রহ করলাম। জেলের বাইরে আমরা আমাদের রেশন—আটা, ডাল, ইত্যাদি নিজেরা নিয়ে নিজেরাই পাক করে খেতাম। এই রূপে বাইরের সব কয়েদীই রেশন পেত। রবিবারে ছুটি থাকে, সেইদিন বাইরের কয়েদীরা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করবার জন্ত জমাদারকে বলে ছুটি নিয়ে অন্তান্ত তাঁবুতে যায়। পাঁচটার পূর্বেই ফিরে আসতে হয়। আমরাও ঐ রূপে ছুটি

গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে ঝুপড়ি তৈরী করতাম। আর দেরী করা ঠিক নয়।

একদিন জঙ্গলের কাজ শেষ হলে জঙ্গল হতে বার হবার সময় তিন জনেই ফাইলের শেষ দিক থেকে হাতের কাটারী, দা নিয়ে পর পর একে একে ছুটে পালালাম। বাঙ্গালী ও বর্মী ফাইল হতে পালাল। বুঝলাম একটু পরেই আমাদের খোঁজ পেয়ে একটা হুলুস্থুল পড়ে যাবে। অনুসন্ধানী জাহাজ "হোয়াইট সীপ" বোঁ বোঁ করে তীক্ষ্ণ তীব্র আলো ফেলে আন্দামানের চারি দিকের সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে। বন্দুকধারী পুলিশ, আদিবাসী জিরোয়া দল নিয়ে—তীর ধনুক ও কুকুর সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে তল্লাসী চালাবে। তবে তারা এই রাত্রে বার হবে না—কারণ একদল শক্তিশালী আদিবাসী "জারোয়া" কর্তৃক অন্ধকারে তীরাহত হয়ে পুলিশ প্রাণ হারাতে পারে। লোক দেখলেই তারা তীর দিয়ে মেরে ফেলে।

যা হোক আমরা গিয়ে দেখলাম ওরা দু জনেই পৌঁছে গেছে। আমরা সবাই কিছু খেয়েই বাঙ্গালী ও বর্মীকে ঝুপড়িতে রেখে আটা ও গুড় দিয়ে রুটি তৈয়েরী করতে বলে আমি ও ছুতোর সিং জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শোর পয়েন্টে এলাম। সন্ধ্যার পর রাস্তা বা তার পাশে জঙ্গলে কেউই থাকে না। সন্ধ্যার পূর্বেই কয়েদীরা নিজ নিজ ব্যারাক বা তাঁবুতে বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমরা রাত্রে পথ চলতে মনে কোন ভয় করি নাই। পাহাড়ের উপর উঠে নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম তিন-চার খানা বোট সমুদ্রের খাড়িতে ভাসছে, শিকল বাঁধা। আর উপরে ছোট কাঠের খাঁচার মত ঘরে এক বন্দুকধারী পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। দেখলাম তাকে অনায়াসেই আমি কাবু করতে পারবো। তখন আমি খুবই বলিষ্ঠ ছিলাম আর এই ভাবে আমি দেশে বহু সিপাইকে কাবু করেছি। তাই মনে একটুও শঙ্কা হল না। ছুতোরকে বললাম, "আঘাত করো না। আমি গিয়েই পিছন হতে হঠাৎ জাপটে সিপাহীকে ধরবো, তুমি পাগড়ী মুখের মধ্যে পুরে হাত পা বেঁধে ফেলবে, পরে দু' জনে ওকে ঐ কাঠের সঙ্গে বেঁধে রাখবো শব্দ যেন না করতে পারে।"

হঠাৎ সিপাহীকে জাপটে ধরেই পূর্ব ব্যবস্থা মত তার মুখে কাপড় চেপে হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলা হল এবং পরে কাঠের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হল। সে একবার মাত্র ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ছিলো। তার রাইফেল, পকেট থেকে গুলী দশটা এবং নৌকার চাবী, কিছু টাকা পয়সা, যা পেলাম সবই নিলাম। জলে নেমে বোট খুলে, ছুতোরকে নিয়ে বোটে করে বোট সমুদ্রের খাড়ী দিয়ে তীর ঘেঁষে চালিয়ে জঙ্গলে ঢাকা তীর দিয়ে ঝুপড়ীর কাছাকাছি জায়গায় লতাপাতার মধ্যে ঢুকিয়ে বাঁধলাম। সৌভাগ্য ক্রমে বোটের মধ্যে তখনো দাঁড় ও দু খানা ছোট পাল ও একটা হাল পেলাম, দেখলাম ভগবান এবার যেন আমাদের উপর সদয়—আমাদের এই দুঃসাহসিক অভিযানে।

আমরা বোট বেঁধে রেখে ছুটতে ছুটতে ঝুপড়ীতে এলাম। আমাদের পালিয়ে যাবার জন্য এতক্ষণ খুব সাড়া পড়ে গেছে নিশ্চয়, কিন্তু এদিকে কোন গোলমাল শুনতে পেলাম না। কুড়ি-পঁচিশ খানা গুড়ের রুটি ও মোটা বাঁশের চোঙায় মিষ্টি জল ভরা ও মুখ আঁটা তৈরিয়ারা হয়ে গেল। এখন চাই কিছু কাপড় জামা ও টাকা পয়সা। দেরী না করে কিছু খেয়েই এবার চার জনেই দু' মাইল দূরে এক কয়েদী গ্রামে গিয়ে হেডম্যান নম্বরদারের শোবার ঘরে হানা দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলাম। নম্বরদার গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে যেন হতভম্ব হয়ে পড়লো। তাকে হাতের দা দেখিয়ে বললাম, চুপ করে থাকতে, নয়তো কেটে ফেলবো। বাস্ সকলে একেবারে চুপ।

ঘরের কাপড় চোপড় বাক্স ভেঙে টাকা কড়ি যা পেলাম, এই সব এবং একটা পাঁঠা ছাগল নিয়ে ঝুপড়ীতে ফিরবার পথে খাবারে পাঁঠাটাকে কাটলাম ও চার খানা পাঁঠার ঠ্যাং আগুনে সেঁকে নিলাম। খাবার সময় আর হলো না। ঝুপড়িতে এসেই সব জিনিস পত্র নিয়ে ঝুপড়ী হতে সকলে বার হলাম, তখন রাত্র গভীর এবং শেষের দিকে, তবে ভোর হতে তখনও দু'-চার ঘণ্টা দেরী আছে।

সকলে বোটে এসে গুরুজীকে স্মরণ করে, বোট খুলে দিয়ে সমুদ্রে ভাসলাম। আমরা উত্তরের দিকে বর্মা দেশ লক্ষ্য করেই নৌকা ছাড়লাম, দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌসুমী বা ( ট্রেডউইণ্ড ) বেশ জোরে আমাদের পিঠে লাগছে বুঝতে পারলাম। ক্রমে আন্দামান দ্বীপ ছেড়ে খোলা সমুদ্রে পড়লাম। সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউ এসে বোটকে আঘাত করতে লাগলো। বাঙ্গালী দাঁড় রেখে নৌকায় পাল তুলে দিতে বলায় আমরা অন্ধকারে বহু কষ্টে মাস্তুল কাঠে বেঁধে পাল তুলে দিলাম। এইবার দক্ষিণে বাতাসে নৌকা ঢেউ কেটে খুব জোরে চলতে লাগলো। এবার দাঁড় তুলে রেখে বোট ধরে সকলে একটু আরাম করে বসলাম। পিছনে ফেলে আসা আন্দামানের দিকে সকলে নজর দিয়ে দেখতে লাগলাম কোন অনুসন্ধানী জাহাজ খুঁজতে বেরিয়েছে কিনা। আমি ঐ "হোয়াইট সীপ", সাদা অনুসন্ধানী জাহাজকে পূর্বে অনেকবার দেখেছি। তার তল্লাসী বাতি খুব জোরালো, দু' মাইল পর্যন্ত সমুদ্রের উপর সবই চোখে পড়ে জাহাজ থেকে। কিন্তু কোন আলোই চোখে পড়ল না। মনে হয় তখন পর্যন্ত জাহাজ আমাদের তল্লাসে বার হয় নাই। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম

ধরা পড়লে ভাগোড়া কয়েদীর কি নির্যাতন ভোগ করতে হয়, মনে হতে সকলে ভয়ে কাঠ হয়ে ছিলাম। সরকারী বোটটি বেশ বড়ো ছিল, সমুদ্রের ঢেউ-এর ধাক্কায় হঠাৎ ডুববে না, ভরসা করলাম। প্রকাণ্ড আকারের ঢেউ আমাদের বোটটিকে মোচার খোলার মত একবার আকাশে একবার পাতালপুরে ওঠাতে নামাতে লাগল। সে ভীষণ দোলানিতে সকলেরই বমির উদ্রেক হতে লাগল, বিশেষ করে বৃদ্ধ রহিমের। সে একেই ত দুর্বল, বৃদ্ধ, তারপর সমস্ত রাত্র জাগরণ, ছুটাছুটি আতঙ্ক, এই সবে তাকে ভয়ানক অসুস্থ করে তুলেছে বুঝলাম। তাকে বোটের তলাতে শুইয়ে রাখলাম। মংপু বোটের হাল ধরলো, মংপু বেশ সবল ও কর্মঠ—নৌকা চালাতে বেশ বিচক্ষণ।

প্রভাত হ'ল। সূর্যের আভায় পূর্ব দিক রক্ত রাঙে রঞ্জিত হয়ে উঠলো। সেই আলোর দিকে চেয়ে ভগবানকে মনে মনে ডেকে প্রার্থনা করলাম আমাদের যাত্রা যেন সফল হয়।

ক্রমে ক্রমে সূর্যদেব জলের উপরে উঠলেন, রহিম মারা গেল। প্রাণহীন দেহ তার শক্ত হয়ে উঠছে। হায় বেচারা! বড়ো আশা করে তার ছেলেমেয়েদের একবার দেখবার জন্য, অসীম বিপদের

ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছিলো, সে সবই আজ শেষ হ'ল। তার দুর্বল শরীর, প্রৌঢ় বয়সে আর এত কষ্ট সহ্য করতে পারলো না। ভগবানের নিকট রহিমের আত্মার মঙ্গলের জন্ত প্রার্থনা করে আমি ও ছুতোর সিং তাকে সমুদ্রে সমাধি দিলাম। সকলেরই মন অত্যন্ত খারাপ বোধ হতে লাগলো। এই ভীষণ সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে তীরের নাগাল হয়ত আর পেতে হবে না। রহিম আগে গেল, আমরা পরে আসছি।

এ চিন্তাতে কিন্তু বিশেষ ভীত হ'লাম না। বরং এ ভীষণ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাব বুঝে যেন একটু স্বস্তি বোধ করলাম। মন-প্রাণ সকলেরই অবসন্ন।

ভোরের দিকে আকাশের তারা মেঘে ঢেকে গেল। ভীষণ গর্জন করে বৃষ্টি নামলো। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের চক্ষুঝলসান তীব্র আলো ও কড় কড় গর্জনে মনে হ'ল যেন সমস্ত আকাশ ভেঙে আমাদের মাথার উপর পড়ল। সমুদ্রের ঢেউ আরও প্রবল ও প্রচণ্ড হয়ে উঠলো, এইবার যেন সব ধ্বংস হবে মনে হ'ল। দু'জনে খুব শক্ত করে হাল ধরে রইলাম। হাল ভাঙলেই বোট ডুবে যাবে—বর্মি বলতে লাগল।

এই ভীষণ বিপদে বিষণ সিং উঠে ছুতোরের সঙ্গে বোটের জল সেচে ফেলবার কাজে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই বোটে প্রবলভাবে জল উঠতে লাগল। মনে হ'ল যে কোন সময়েই ডুবে যেতে পারে। মৃত্যুভয় যেন আমাদের সজীব করে তুলল। প্রাণপণে সকলে বোটটাকে রক্ষা করতে লাগলাম।

মেঘ দেখেই বোটের পাল নামিয়ে রাখা হয়েছিল। এখন কেবল শক্ত করে হাল ধরা ও বোটের জল সেচা—এই দুই কাজ প্রাণপণে করে যাওয়া। প্রবল বাতাসে বোটটাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝছি না, মরা-বাঁচাও ভবিতব্যের উপর ছেড়ে দিয়েছি। বোট প্রবলভাবে একদিকে ছুটে চলেছে বুঝলাম—তবে কোন্ দিকে? আবার কি আন্দামানের দিকে ভাগ্য নিয়ে যাচ্ছে?

যা হোক, প্রবল বৃষ্টি ভোরের পরেই ক্রমে ক্রমে কমে গেল, ঝড়ও থামল। ভোরের আলো সমুদ্রের ওপরে ফুটে উঠল। আর প্রাণে শক্তি ও ভরসা ফিরে এল। অল্প পরে সূর্যদেব জলের ওপর উঠে পরিচিত বন্ধুর মত আমাদের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। কত আশার বাণী সেই হাসিতে! এখন বুঝলাম প্রবল ঝড়ে আমরা আমাদের অভীপ্সিত উত্তরের দিকেই চলেছি। মনে হ'ল দুদিনের পথ আমরা ঝড়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অতিক্রম করেছি। ঝড় থামবার পরে সমুদ্রও অনেক শান্ত হয়ে এলো। ঢেউয়ের আকার ও বেগ কমে গেল। অসাড় অবশ দেহ-মন একটু সজীবতা লাভ করল। ঝড়-জলে রুটি ও পানীয় জল সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

## আই, এফ, এ শীল্ডের ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত

ভারতের প্রাচীন ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই, এফ, এ শীল্ডের ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত হয়েছে। মোট ৩৮টি দল এবার যোগদান করবে। এর মধ্যে ৯টি বহিরাগত দল। গত বারের যুগ্ম-বিজয়ী মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল এবং দেরাদুন স্পোর্টস এসোসিয়েশন, আই, এ, এফ দিল্লী, ওয়েষ্টার্ণ রেল, হায়দ্রাবাদ একাদশ, মহীশূর একাদশ ও কলকাতার ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড এই মোট আটটি দল সরাসরি দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

ওপরের তালিকায় মোহনবাগান, দেরাদুন ডি. এ. ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং নীচের তালিকায় হায়দ্রাবাদ একাদশ, মহীশূর একাদশ, ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড ও ইষ্টবেঙ্গল দলকে স্থান দেওয়া হয়েছে। তালিকা দেখে মনে হয় মোহনবাগান থেকে ইষ্টবেঙ্গল দলকেই শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। কোন অঘটন না হলে সেমিফাইন্যালে ইষ্টবেঙ্গলকে হায়দ্রাবাদ একাদশ অথবা মহীশূর একাদশের সঙ্গে এবং মোহনবাগানকে ওয়েষ্টার্ণ রেল অথবা ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দলের সম্মুখীন হতে হবে।

আই, এফ, এ শীল্ডের পরিচয় নতুন করে দিতে হবে না। তবে আই, এফ, এ'র পরিচালকমণ্ডলী গত কয়েক বছর প্রতিযোগিতা পরিচালনায় যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন—তা এ বছর যোগদানকারী দলগুলির তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। যে প্রতিযোগিতায় যোগদান ভারতের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ দলগুলির একটা বড় আকর্ষণ ছিল—বর্তমানে তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ অনুভব করতে হয়। খেলার ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত করা ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব ও বেফারীর দুর্বল পরিচালনা সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন দলগুলির যোগদানের আকর্ষণকে কমিয়ে দিয়েছে। বহু ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতের প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা বর্তমানে স্থানীয় প্রতিযোগিতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় সকলেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আশা করা যায় আই, এফ, এ'র পরিচালকমণ্ডলী এই বিষয়ে অবহিত হবেন। নিম্নে এবারের ক্রীড়াসূচী প্রদত্ত হ'লো :—

### প্রথম রাউণ্ড

১। ক্যালকাটা : ভবানীপুর—১লা সেপ্টেম্বর।
২। খিদিরপুর : বনবিহারী জেলা একাদশ—৩০শে আগষ্ট।
৩। রাজস্থান : হাওড়া জেলা একাদশ—২৭শে আগষ্ট।
৪। বাটা : বেনিয়াটোলা—২৭শে আগষ্ট।
৫। ড্যালহৌসী : স্পোর্টিং ইউনিয়ন—২৮শে আগষ্ট।
৬। বি, এন, আর : ২৪ পরগণা জেলা একাদশ, ৭ই সেপ্টেম্বর
৭। হাওড়া ইউনিয়ন : পোর্ট কমিশনার্স—৩০শে আগষ্ট।
৮। ইষ্টার্ণ রেল : হুগলী জেলা একাদশ—৭ই সেপ্টেম্বর।
৯। পুলিশ : জামসেদপুর স্পোর্টিং এসোঃ—২১শে আগষ্ট।
১০। উয়াড়ী : কোর অফ সিগন্যালস—৩০শে আগষ্ট।
১১। জর্জ টেলিগ্রাফ : মুর্শিদাবাদ জেলা একাদশ—১লা সেপ্টেম্বর।
১২। এরিয়ান্স : ইয়ং ষ্টার (এলাহাবাদ)—৩রা সেপ্টেম্বর।
১৩। কটক সম্মিলিত দল : বালী প্রতিভা—২৮শে আগষ্ট।
১৪। চন্দননগর : বার্ণপুর—২১শে আগষ্ট।

### দ্বিতীয় রাউণ্ড

ক। বিজয়ী (১) : বিজয়ী (২)—৪ঠা সেপ্টেম্বর।
খ। বিজয়ী (৩) : বিজয়ী (৪)—৩১শে আগষ্ট।
গ। বিজয়ী (৫) : দিল্লী একাদশ—৮ই সেপ্টেম্বর।
ঘ। বিজয়ী (৬) : বিজয়ী (৭)—১০ই সেপ্টেম্বর।
ঙ। বিজয়ী (৮) : বিজয়ী (৯)—১০ই সেপ্টেম্বর।
চ। বিজয়ী (১০) : মহমেডান স্পোর্টিং—৬ই সেপ্টেম্বর।
ছ। বিজয়ী (১১)—বিজয়ী (১২) ৫ই সেপ্টেম্বর।
জ। বিজয়ী (১৩) : বিজয়ী (১৪)—৪ঠা সেপ্টেম্বর।

### তৃতীয় রাউণ্ড

ত। বিজয়ী (ক) : মোহনবাগান—১১ই সেপ্টেম্বর।
থ। বিজয়ী (খ) : দেরাদুন ডি, এ—৫ই সেপ্টেম্বর।
দ। বিজয়ী (গ) : ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স—১১ই সেপ্টেম্বর।
ধ। বিজয়ী (ঘ) : ওয়েষ্টার্ণ রেল—১২ই সেপ্টেম্বর।
ন। বিজয়ী (ঙ) : হায়দ্রাবাদ একাদশ—১৪ই সেপ্টেম্বর।
প। বিজয়ী (চ) : মহীশূর একাদশ—১৩ই সেপ্টেম্বর।
ফ। বিজয়ী (ছ) : ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড—১৩ই সেপ্টেম্বর।
ব। বিজয়ী (জ) : ইষ্টবেঙ্গল—১২ই সেপ্টেম্বর।

## পাক-ইংলণ্ড টেষ্ট পর্য্যায়ের পরিসমাপ্তি

ইংলণ্ড ও পাকিস্তানের বর্তমান টেষ্ট পর্য্যায়ের পরিসমাপ্তি হয়েছে। পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড সহজেই ১০ উইকেটে পাকিস্তান দলকে পরাজিত করে। ইংলণ্ড বর্তমান টেষ্ট পর্য্যায়ে ৪—০ খেলায় জয়ী হয়। প্রথম টেষ্টে তারা এক ইনিংস ও ২৪ রাণে; দ্বিতীয় টেষ্টে ৯ উইকেটে, তৃতীয় টেষ্টে এক ইনিংস ও ১১৭ রাণে এবং পঞ্চম টেষ্টে ১০ উইকেটে জয়ী হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। চতুর্থ টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। তবে বৃষ্টির জন্য পাকিস্তান দল এই টেষ্টে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

পাকিস্তান দলের এটা দ্বিতীয় ইংলণ্ড সফর। এর আগে ১৯৫৪ সালে ফজল মামুদের নেতৃত্বে পাকিস্তান দল ইংলণ্ড সফরে গিয়েছিল। এই সফরের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে পাকিস্তান একটি টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড দলকে পরাজিত করেছিল।

অষ্ট্রেলিয়া সফরের পূর্ব্বে ইংলণ্ড দলের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান টেষ্ট পর্যায়ে সাফল্য অর্জ্জন প্রতিটি খেলোয়াড়কে অনুপ্রাণিত করবে—সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংলণ্ড দলের ব্যাটিং-এ অধিনায়ক ডেক্সটার, পিটার পারফিট, কলিন কাউড্রে ও টম গ্রেভনী বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এর মধ্যে পিটার পারফিট প্রথম টেষ্টে ১০১ রাণ। তৃতীয় টেষ্টে ১১১ রাণ ও চতুর্থ টেষ্টে অপরাজিত থেকে ১০১ রাণ করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গত বছর কলকাতার "ইডেন উদ্যানেই" তিনি ভারতের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় প্রথম ইংলণ্ড দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইংলণ্ড দলের বোলিং-এ "পেস" অথবা "সিম" বোলার হিসাবে টুম্যান ও ষ্ট্যাথাম এবং "স্পিন" বোলার হিসাবে এলেন ও লক ভাল বল করেছেন। নবাগত বোলার হিসাবে ডেভিড লারটার প্রথম আবির্ভাবেই (পঞ্চম টেষ্টে) বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করেন। এই নবাগত বোলারের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। তিনি ৭ ফুট ৬½ ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন। টেষ্টের প্রথম আবির্ভাবেই তিনি ৯টি উইকেট দখল করেছেন।

পাকিস্তান দলের এবারকার ইংলণ্ড সফর ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। তারা এবার মোটেই সুবিধে করতে পারেনি। দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানদের, বিশেষ করে হানিফের ব্যর্থতা এবং বোলারের অভাবের জন্য পাকিস্তান দলকে এইরূপ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। পাকিস্তানের ব্যাটিং-এ মুস্তাক মহম্মদ, ইমতিয়াজ আমেদ ও অধিনায়ক জাভেদ বার্কি কিছুটা সাফল্য অর্জ্জন করেন। এর মধ্যে মুস্তাক মহম্মদ চতুর্থ টেষ্টে অপরাজিত ১০০ রাণ করে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। পাকিস্তান দলের এবারকার বোলিং-এর দুর্ব্বলতা সব খেলাতেই ধরা পড়েছে। ইংলণ্ড দল এর যথাযথ সুযোগ নিয়ে প্রায় প্রতিটি খেলাতেই চার শতের অধিক রাণ সংগ্রহ করেছে। বোলারের অভাব পূরণের জন্য ফজল মামুদও শেষ পর্য্যন্ত হাজির হন। তিনিও কিছু করতে পারেননি। "পেস" বোলার মামুদ হোসেন ও ডিসুজা এবং "স্পিন" বোলার নসিমুল গনি, নাসিম ও আখতার কোন সময়ই ইংলণ্ড দলের ব্যাটসম্যানদের কাবু করতে পারেননি। ভাল "লেগ স্পিন" বোলার না থাকায় পাকিস্তান দলকে এবার বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়।

পাকিস্তান দলের এবারকার সফরের অভিজ্ঞতা তাদের ভবিষ্যৎ ক্রিকেটের অগ্রগতি হোক—এই আশা করাটা অন্যায় হবে না।

## ক্রীড়া সাংবাদিকের নিগ্রহ

সম্প্রতি দিল্লীর ন্যাশনাল ষ্টেডিয়ামে এশীর ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী ভারতীয় এ্যাথলীট দলের অধিনায়ক মিলখা সিং "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস" সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীভারনন রামকে মারধোর করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মিলখা সিং বর্ত্তমানে পাঞ্জাব সরকারের খেলাধূলা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর। তিনি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রতাপ সিং কাইরণকে সম্বর্দ্ধনা জানান। এই সভা নিয়ে শ্রীভারনন রামের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এরূপ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই "কলঙ্কজনক" পরিস্থিতি ঘটে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা ভালিন্দার সিং এবং হাঙ্গেরী থেকে আগত এ্যাথলেটিক "কোচ" জোসেফ কোভাকসের সম্মুখেই।

লোকসভায় মিলখা সিং-এর আচরণ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী, শ্রীপ্রভাত কর ও শ্রীএস, এন, ব্যানার্জ্জীর প্রশ্নোত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী ডাঃ কে, এল, শ্রীমালী বলেছেন যে, ভারত সরকার ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনকে মিলখা সিং-এর আচরণ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন এবং আরও বলা হয়েছে যে, যত বড় খেলোয়াড়ই হউক না কেন, তিনি ক্রীড়ানুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় না দিলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

মিলখা সিং প্রখ্যাত এ্যাথলীট। তাঁর খ্যাতি শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। এ্যাথলেটিকসে তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। এবার তাঁর ওপর ভারতীয় এ্যাথলীট দলের নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয়েছে। যদি অভিযোগ সত্য হয় তা হলে তাঁর পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেওয়াটা কোন মতে সমর্থনযোগ্য নয়। তাঁর আচরণ খেলোয়াড় মাত্রেরই লজ্জার বিষয়। মিলখা সিং-এর আচরণ সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে, এটা সুখবর সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা যেন ধামাচাপা না দেওয়া হয়, এইটাই এখন প্রশ্ন।

## ভারতীয় ওয়াটারপোলো দলের রাশিয়া সফর

সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্রীড়া দপ্তরের আমন্ত্রণক্রমে ১৩ জন খেলোয়াড় ও ২ জন কর্ম্মকর্ত্তা নিয়ে গঠিত একটি ভারতীয় ওয়াটারপোলো দল অক্টোবর মাসে রাশিয়া সফরে যাবে। তবে এই সফর ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষ।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দলটির তাসখণ্ড অভিমুখে রওনা হওয়ার কথা আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্রীড়া দপ্তর তাদের আমন্ত্রণলিপিতে ক্রাস্নো, তুসাম্বে ও তাসখণ্ডে একটি করে খেলা সমেত ভারতীয় দলের একটি ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত করার প্রস্তাব করেছে। তবে ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশন ক্রীড়াসূচীর সামান্য অদলবদল করার অনুরোধ জানিয়েছে।

## ভারতের ভ্রমণ চ্যাম্পিয়ন জোরা সিং আমন্ত্রিত

এ্যাথলেটিকসে ভারতের একমাত্র মিলখা সিং-ই এ পর্য্যন্ত বিশ্বখ্যাতি অর্জ্জন করে ছিলেন। এবার এই সম্মান আর একজনের ভাগ্যে মিলেছে। ভারতের ভ্রমণ চ্যাম্পিয়ন জোরা সিং জাপানের জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। উক্ত টোকিওর ওমিও সহরে এই প্রতিযোগিতা অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেরা আটজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা এ্যাথলীটকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। এ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে পোল্যাণ্ডের খ্যাতনামা 'কোচ' জাতুজ টারজিনস্কি ও করমোজার চ্যাং সি সেনকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত এ্যাথলীটরা আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

পুরুষ

(১) পেন্টি নিকুলা ( ফিনল্যাণ্ড )—ফিনল্যাণ্ডের কাউটাণ্ডা সহরে এই বছর জুন মাসে তিনি পোলভল্টে ৪'৯৪ মিটার ( ১৬ ফুট ২ই ইঞ্চি ) অতিক্রম করে ১৯৬০ সালে ডন ব্রেগের ( যুক্তরাষ্ট্র ) পূর্ব্ব রেকর্ড ( ৪'৮০ মিটার ) ভঙ্গ করেন। বয়স ২৩ বছর।

(২) ইগর টার—ওভানেশিয়ান ( রাশিয়া )—রাশিয়ার জারেভান সহরে এই বছর জুন মাসে তিনি দীর্ঘ লম্ফনে ৪'৩০৬ মিটার (২১ ফুট ৩ ইঞ্চি) অতিক্রম করে রালফ বষ্টনের ( আমেরিকা ) বিশ্ব রেকর্ড ৮'০৩১ মিটার (১১১৪ ইঞ্চি) ভঙ্গ করেন। বয়স ২৪ বছর।

(৩) ইয়াং চুয়ান কোয়াং ( ফরমোজা )—১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে ডেকাথলনে রৌপ্যপদক লাভ করেন। বয়স ২৯ বছর।

(৪) হেজ জোন ( আমেরিকা )—রোম অলিম্পিকে ১১০ মিটার হার্ডলে স্বর্ণপদক পান। বয়স ২৪ বছর।

(৫) সালভাতোর মোরেল ( ইতালী )—৪০০ মিটার হার্ডলে যোগদানকারী। বয়স ২৩ বছর।

(৬) ইউরী ব্যাকারিনোভ ( রাশিয়া )—হাতুড়ি ছোড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী। বয়স ২৪ বছর।

(৭) জোরা সিং ( ভারত )—২০ কিলোমিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী। বয়স ৩৩ বছর।

(৮) ভিক্টর কোস্কিজারেভ ( রাশিয়া )—ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী।

মহিলা

(৯)। উইলমা রুডলফ ( আমেরিকা ) ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ের তিনি বিশ্ব রেকর্ড করেন। ১৯৬১ সালে ১০০ মিটার দৌড়ে ১১'২ সেকেণ্ডে এবং ১৯৬০ সালে ২০০ মিটার দৌড়ে ২২'৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তিনি বিশ্ব রেকর্ড করেন। বয়স ২২ বৎসর।

(১০)। ইরিণা প্রেস ( রাশিয়া ) ৪,৯৭২ পয়েণ্ট পেয়ে তিনি বিশ্ব পেণ্টাথলন চ্যাম্পিয়ন হন। রোম অলিম্পিকে ৮০ মিটার হার্ডলে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। বয়স ২৩ বৎসর।

(১১)। জোরগোভা ( বুলগেরিয়া ) দীর্ঘ লম্ফনকারী মহিলা। এ্যাথলেটিকসে ভারতের অগ্রগতি হয়েছে যথেষ্ট সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিলখা সিং তার প্রমাণ করিয়ে দেয়। আর একজন এ্যাথলীট বিশ্বখ্যাতি অর্জন করায় ভারতবাসীমাত্রই খুসী হয়েছেন। জোরা সিং সাফল্য অর্জন করুন এটাই সকলে চান।

## অলিম্পিকের টাকা সংগ্রহের অভিনব পন্থা

আগামী ১৯৬৪ সালে টোকিওতে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হবে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে, উহা সংগ্রহের জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। অলিম্পিক সংগঠন কমিটি সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ধরণের সিগারেট বাজারে বিক্রয় করার এবং পেশাদার মোটর সাইকেল রেস প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেছেন। নতুন ছাপের এই সিগারেটের বিক্রয় লব্ধ সমগ্র টাকা অলিম্পিক তহবিলে জমা দেওয়া হবে। এ ছাড়া মোটর সাইকেল রেসিং-এ বেটিং থেকে প্রকৃত অর্থ লাভ হবে। সংগঠন কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাগণ বলেছেন যে, টোকিওতে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার জন্য ১০ বিলিয়ন ইয়েন অর্থাৎ ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার প্রয়োজন হবে। এই টাকার মধ্যে জাপ এ্যাথলীটদের জন্য প্রয়োজন ২'২৭ বিলিয়ন ইয়েন অর্থাৎ ৬,২৬৭, ৭২৬ ডলার ধরা হয়নি।

অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার জন্য কয়েক বছর ধরে প্রস্তুতি পর্ব্ব চলেছে। এর জন্য ব্যয়ও হয়েছে প্রচুর। গত দু বছরে ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ ইয়েন অর্থাৎ ২৫,০৫৭ ডলার ব্যয় করা হয়েছে। এ বছর ৪২ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন অর্থাৎ ১,১৮৬, ২০৬ ডলার ব্যয় করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এখন থেকে ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে অলিম্পিক প্রেক্ষাগার নির্ম্মাণ শেষ হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ১'৭৫ বিলিয়ন ইয়েন অর্থাৎ ৪,৮৬১, ৫০০ ডলার এবং ৮'৩৩ বিলিয়ন ইয়েন অর্থাৎ ২৩,৪৩৫, ২০৮ ডলার ব্যয় করতে হবে।

এইরূপ একটা বৃহৎ ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অনেকখানি—সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এর সাফল্যের জন্য অলিম্পিক সংগঠন কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাগণ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন হবে—সেটা সংগ্রহ করার তাঁরা যে প্রচেষ্টা করছেন—সেটা সত্যই অভিনন্দনযোগ্য।

ইংলণ্ডে টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় প্রখ্যাত টেনিস ক্রীড়াবিদ নরেশকুমারকে বি বি সি কেন্দ্রে, হিন্দী আসরে দেখা যাইতেছে। ( বাম হইতে দক্ষিণে ) নরেশকুমার, মিসেস্ কুমার, মিঃ আর ভার ভিরা ( হিন্দী প্রযোজক )।

প্রভু সমুদ্রস্নান করে এলেন। ভক্তরাও স্নান সেরে জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়াদর্শন করে প্রভুর গৃহে এসে জড়ো হল। এবার পাত পেতে বসে পড়ো।

যার যে স্থান সঙ্গত, তাকে সেস্থানে বসালেন প্রভু। নিজেই পরিবেশন করতে লাগলেন।

প্রভুর হাতে অল্প অন্ন আসে না। একেক পাতে দু' তিনজনের মত ঢেলে দিচ্ছেন।

দিলে কী হবে, সবাই হাত তুলে বসে আছে।

'এ কি, খাচ্ছনা কেন? কী হল?'

'তুমি না বসলে কেউ খাবে না।' বললে স্বরূপ গোঁসাই। 'তুমি বোসো। আমি পরিবেশন করছি।'

'তার আগে হরিদাসকে প্রসাদ পাঠাও।' বললেন প্রভু, 'হরিদাসকে অভুক্ত রেখে আমি বসি কি করে?'

গোবিন্দকে দিয়ে পাঠানো হল প্রসাদ। হরিদাসের আনন্দ দেখে কে!

নিত্যানন্দকে দক্ষিণে নিয়ে প্রভু ভোজনে বসলেন। সন্ন্যাসীরা একদিকে, ভক্তের দল আরেক দিকে। সন্ন্যাসীদের পরিবেশন করল গোপীনাথ আচার্য, আর ভক্তদের করল তিনজন—স্বরূপ, জগদানন্দ আর দামোদর।

আকণ্ঠ খাও আর হরিধ্বনি দাও।

এইসব ভক্তরা তো নবদ্বীপ থেকে এসেছে। প্রভু তখন স্নানযাত্রা দেখে আলালনাথে গিয়েছেন, ভক্তরা আসছে জেনে তাড়াতাড়ি চলে এলেন নীলাচল। সেসব ভক্তদের আপ্যায়নে কি ত্রুটি হতে পারে?

খাওয়ার শেষে সকলকে প্রভু মালাচন্দন পরিয়ে দিলেন। যাও এবার গিয়ে বিশ্রাম করো। সন্ধ্যাকালে আবার মিলব আমরা।

সন্ধ্যাকালে সকলে একত্র হয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সংকীর্তন সুরু করল। চার দলে ভাগ হল কীর্তনীয়ারা। চার দলপতি নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস আর বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বরকে মনে আছে? কাজীদমনের দিন নগরকীর্তনে ছিল, ছিল জগাই-মাধাইকে কৃপা-প্রদর্শনের সময়। ছিল শ্রীবাসের আঙিনায়। আর শ্রীবাস? তার কাপড় সেলাই করত যে মুসলমান দরজি, সেও পর্যন্ত কৃপা পেয়েছিল। আর শ্রীবাসের ভাইঝি নারায়ণী। আহা, তার কথা কে ভুলবে?

প্রভুকে মাঝখানে রেখে চার দল কীর্তন করতে লাগল। মহামঙ্গলধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত আপ্লুত হয়ে গেল। বাজতে লাগল আট মৃদঙ্গ, বত্রিশ করতাল।

আর মধ্যবর্তী প্রভুর নৃত্য দেখ। এমন ললিতদীপ্ত নৃত্য কেউ কোনোদিন দেখেনি।

দলে-দলে ওড়িয়ারা আসতে লাগল আকৃষ্ট হয়ে।

'বেঢ়ানৃত্য' সুরু করলেন এবার। তার মানে নেচে নেচে মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। চার দলের চার বন্ধুর যে কেউ কাছে এসে পড়ছে, তাকেই আলিঙ্গন করছেন। চার বন্ধুই ভাবছে, এ বক্ষপাতে বুঝি একমাত্র আমারই প্রতি পক্ষপাত।

আবার প্রাসাদের ছাদে উঠে রাজা কীর্তন দেখছেন। আর যত দেখছেন, ততই তাঁর উৎকণ্ঠা প্রবল হচ্ছে, কবে আমি তাঁর পদচ্ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াব?

'তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে কিছু বলতে এসেছ।' ভক্ত-সমাবেশ দেখে প্রভু বুঝি একটু চিন্তিত হলেন: 'কিন্তু বক্তব্য কী, তা বলছ না কেন?'

'না বললেও নয়, অথচ বলতে গেলে ভয়।' বললে নিত্যানন্দ, 'তবে ভালো-মন্দ, যোগ্য-অযোগ্য—সব তোমাকে বলা উচিত। শোনো, রাজা প্রতাপরুদ্র বলেছে, তোমার চরণ-দর্শন না পেলে সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।'

শুনে প্রভুর মন বুঝি একটু নরম হল, কিন্তু বাইরে নিষ্ঠুরতা বজায় রেখে বললেন, 'সন্ন্যাসী হয়ে রাজাকে দর্শন দিলে সন্ন্যাসধর্ম নষ্ট হবে। পরমার্থের কথা ছেড়ে দিই, এই দামোদরই আমার নিন্দা করবে দেখো।' বেশ তো, প্রভু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: 'দামোদর যদি বলে, তাহলে তৎক্ষণাৎ দর্শন দেব রাজাকে। এখন দেখ, দামোদরের কী মত?'

'আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব, আমি তোমাকে উপদেশ দেব ?' বললে দামোদর, 'তবে এটুকু জানি, যে তোমাকে স্নেহ করে, তার প্রতি তুমি আবার স্নেহশীল। 'যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র। তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র ॥'

তুমি কি লৌকিক বিধিনিষেধের অধীন ? তুমি সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত। কোন্ বিধি কোন্ নিষেধ তোমার ইচ্ছার অন্তরায় হতে পারে ?

'তোমাকে সাধ্য কী আমরা বলি তুমি রাজাকে দর্শন দাও। তবে এও ঠিক,' বললে নিত্যানন্দ, 'অনুরাগী লোক তার ইষ্ট না পেলে কখনো কখনো দেহ ছেড়ে দেয়। রাজাও সেইরকম অনুরাগী। এখন তুমিই জানো, তুমি সন্ন্যাসের, না তোমার ভক্ত-বাৎসল্যের মর্যাদা রাখবে ? যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীর কথা মনে নেই ? ইষ্ট না পেয়ে তার প্রাণত্যাগের কথা ?'

'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।'
কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িল পরাণ ॥"

যমুনার উপবনে গোচারণ করতে করতে রাখালেরা ক্ষুধার্ত হয়েছে। কৃষ্ণকে বললে, আমাদের শান্তি-বিধান করো। কৃষ্ণ বললে, দেখগে বেদবাদী ব্রাহ্মণেরা স্বর্গকামনা করে আঙ্গিরস যজ্ঞ করছে, সেইখানে আমার নামোল্লেখ করে অন্ন যাচ্ঞা করো। রাখালেরা তখন যজ্ঞ সভায় গিয়ে অন্ন প্রার্থনা করল। ব্রাহ্মণেরা সে প্রার্থনা কানেও তুলল না। সামান্য স্বর্গের আশায় ক্লেশাধীন কর্মেই তারা ব্যস্ত রইল। রাখালেরা ফিরে এল কৃষ্ণের কাছে, বললে তাদের বৈফল্যের কথা। কৃষ্ণ বললে, পরাঙ্মুখ কাকে হতে না হয় ? যারা কার্য-সাধন করতে ইচ্ছুক, তাদের বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। তোমরা এবার ব্রাহ্মণ-পত্নীদের কাছে গিয়ে বলো আমাদের ক্ষুধার্ত হওয়ার কথা। তারা আমাকে ভালোবাসে, সুতরাং আমাতেই বাস করে। আমার নাম শুনলে প্রচুর অন্ন দেবে, কার্পণ্য করবে না।

দ্বিজপত্নীদের কাছে এ কথা বললে, তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। এতদিন তার নামই শুধু শুনেছি, সে এখন কোথায় ? কোথায় বসে আছে ? চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ খাদ্য নিয়ে তারা কৃষ্ণের উদ্দেশে ছুটে চলল, কারু বারণ শুনল না। সাগরাভিমুখিনী নদী কার বারণ শোনে ? প্রাণ বুদ্ধি মন আত্মা, জায়া পুত্র জ্ঞাতি সম্পত্তি যার সম্পর্কীয় বলেই প্রিয়, সে কৃষ্ণের চেয়ে আর আমাদের প্রিয় কে ? বহুতর খাদ্য তারা কৃষ্ণে নিবেদন করল।

কেবল একজন আসতে পারেনি। তার স্বামী তাকে ধরে ফেলেছে, বন্দী করেছে ঘরের মধ্যে। তার আর কৃষ্ণের কাছে যাওয়া হলনা, খাওয়ানো হলনা কৃষ্ণকে।

সে তখন কী করল ? ভগবান কৃষ্ণকে হৃদয় দিয়ে আলিঙ্গন করে দেহত্যাগ করলে।

কৃষ্ণ বললে, 'অঙ্গে অঙ্গে মিলন হলেই যে মানুষের সুখ আর স্নেহ বৃদ্ধি হয়, তা নয়। যারা আমাতে মন সমর্পণ করেছে, তারাই আমাকে পাবে। আমার নাম শ্রবণে, আমাকে দর্শন করে, চিন্তা করে, আমার গুণ-কীর্তন করে যেমন প্রেম জন্মায়, শুধু আমার নিকটে এসে থাকলেও তেমন জন্মায় না।

'তবে এক উপায় আছে।' বললে নিত্যানন্দ, 'তোমাকেও রাজদর্শন করতে হয় না, রাজারও প্রাণরক্ষা হয়।'

'কী উপায় ?'

'তুমি কৃপা করে তোমার একখানা বহির্বাস রাজাকে পাঠিয়ে দাও। বহির্বাসকে রাজা তোমার কৃপার নিদর্শন বলেই মনে করবে নিশ্চয়, আর ভাববে, আমার প্রতি যদি প্রভুর কৃপা থাকে তবে কেন আর আমি জীবন বিসর্জন দিই ? আশা ধরে প্রাণ রাখি, হয়তো একদিন চরণলাভের সৌভাগ্য হবে।

'তুমি যা ভালো বোঝ তা করো।'

নিত্যানন্দ গোবিন্দের থেকে প্রভুর একখানি বহির্বাস চেয়ে নিল, পাঠিয়ে দিল সার্বভৌমকে। সার্বভৌম নিয়ে গেল রাজার কাছে। আনন্দে রাজা অভিভূত হয়ে গেল। বস্ত্র যেন স্বয়ং প্রভু, সেই ভেবে পুজো করতে লাগলো রাজা। রামানন্দ রায়কে ডাকিয়ে বললে, চেষ্টা করে দেখ। এ বিরহ আর তো সহ্য হয় না। আরেকবার বলোগে প্রভুকে। তাঁর বস্ত্র পেয়ে আরো আমার উৎকণ্ঠা বেড়েছে।

রামানন্দ বললে, এবার একবার প্রতাপরুদ্রকে সাক্ষাৎ করতে দিন।

'আচ্ছা তুমিই বিচার করে বলো রাজার সঙ্গে সন্ন্যাসীর কি দেখা করা উচিত ?'

'তুমি তো পরাধীন নও, তোমার কাকে ভয় ? তোমার আবার কিসের বিধি-নিষেধ ?'

'আমি মানুষ, সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করেছি।' বললেন প্রভু, 'আমার সম্পর্কে কেউ প্রতিকূল

আলোচনা করে, তাতে বড় ভয় করি। সাদা কাপড়ে বিন্দু পরিমাণ কালির দাগ যেমন স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, তেমনি সন্ন্যাসীর সামান্য দোষও দৃষ্টির আড়াল থাকে না কোনদিন। সর্বত্র আলোচিত হয়। সুতরাং খুব বেশি সতর্ক হওয়া দরকার।'

'সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্ল বস্ত্র মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥'

রামানন্দ বললে, 'তুমি যত পাপী উদ্ধার করেছ, কিন্তু প্রতাপরুদ্র তোমার ভক্ত, জগন্নাথের সেবক, তার উপর তুমি কেন বিরূপ হবে?'

'পূর্ণ দুধের কলস একবিন্দু সুরাস্পর্শে অপবিত্র হয়ে যায়।' বললেন প্রভু, 'তেমনি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান হলেও, এক 'রাজা' নাম তাকে মলিন করেছে। তবে তোমার যদি আগ্রহ হয়, রাজার ছেলেকে আমার কাছে ডেকে আনো।' পিতা ও পুত্রে স্বরূপতঃ ভেদ নেই, রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা হলে রাজা অনায়াসেই ভেবে নিতে পারবে যে, তারই সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

প্রভুর ইচ্ছায় প্রতাপরুদ্রের ছেলে এল দেখা করতে। কিশোরবয়স্ক রাজপুত্র, শ্যামবর্ণ, কমল-নেত্র, অঙ্গে রত্ন-অলঙ্কার, পরনে পীতাম্বর—দেখেই প্রভুর কৃষ্ণ-স্মরণের উদ্দীপন হল। প্রেমাবেশে তিনি রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। আর অমনি রাজপুত্রে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত হল। নাচতে লাগল, কাঁদতে লাগল কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে।

কী ভাগ্য রাজপুত্রের! ভক্তের দল প্রশংসা করতে লাগল।

প্রভুই শান্ত করলেন রাজপুত্রকে। বললেন, নিত্য আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো।

রাজা আবার পুত্রকে আলিঙ্গন করল। সে আলিঙ্গনে আস্বাদ করল গৌরহরির স্পর্শ।

এগিয়ে আসছে রথযাত্রার উৎসব। প্রভু বললেন, 'গুণ্ডিচামন্দির এবার আমি মার্জন করব।'

রথযাত্রার দিন জগন্নাথ গুণ্ডিচামন্দিরে যান, সাত-আট দিন থাকেন, আবার ফিরতি রথের দিন চলে আসেন। বাকি তিনশো সাতান্ন-আটান্ন দিন মন্দির খালি থাকে। তত দিনে কত যে ধুলোবালি সঞ্চিত হয়, তার হিসেব নেই। সেই সম্বৎসরের ধুলোবালি প্রভু নিজ হাতে প্রক্ষালন করবার ভার নিতে চাইলেন।

'মন্দির মার্জন তোমার কাজ নয়।' বলতে চাইল পড়িছা।

কিন্তু মহাপ্রভুর তো শুধু ভগবদ্‌ভাব নয়, তাঁর আবার ভক্তভাব। তিনি মন্দির মার্জন করবেন কেন? কার জন্যে? জগন্নাথের জন্যে, জগন্নাথ আসবে বলে। এই সেবাই তো ভজন। আর জীবকে ভজন শেখাবার জন্যেই তো প্রভুর ভক্তভাব। আর যেখানে প্রীতি, সেখানে শ্রম শ্রম নয়, কষ্ট কষ্ট নয়, সে কাজে হীনতাও নেই, মলিনতাও নেই।

'না, আমারই যোগ্যকাজ।'

'বুঝেছি এও তোমার এক লীলা। আর রাজা হুকুমজারি করেছেন—প্রভু যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে।'

সুতরাং একশো নতুন ঘট আর একশো নতুন ঝাঁটা নিয়ে এস।

ভক্তদের নিয়ে প্রভাতে প্রভু গেলেন গুণ্ডিচায়। স্বহস্তে ঝাঁটা চালিয়ে ধুলোবালি তাড়িয়ে পরিষ্কার করতে লাগলেন, অবশেষে ঘটে করে ঢালতে লাগলেন জল। বললেন, 'প্রত্যেকে ঝাঁট দিয়ে আবর্জনা আলাদা করে রাখো, কে কত কাজ করেছ, তার পরীক্ষা হবে।'

হল পরীক্ষা। দেখা গেল, প্রভুর সঙ্গে কেউ পারেনি এঁটে উঠতে। প্রভুর সংগৃহীত আবর্জনাই বেশি।

'সভার ঝাটিকা বোঝা একত্র করিল।
সভা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥'

এবার তবে জল আনো। জল ঢালো। জল আনা-ঢালা অধিকতর পরিশ্রমের কাজ, তাই প্রভু পাঁচজনকে রেহাই দিলেন। তারা হল অদ্বৈত, পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, নিত্যানন্দ আর দামোদর। অন্যে জল এনে ঢেলে দেবে আর তোমরা তা দিয়ে প্রক্ষালন করবে। তোমাদের পরিশ্রমের কিছু লাঘব হোক।

প্রথমতঃ মূল মন্দির—জগমোহন পরিষ্কৃত হল। ক্রমে ক্রমে ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, পাকশালা, প্রাঙ্গণ—কিছুই বাকি রইল না। প্রভু নিজ বস্ত্রে সিংহাসন মার্জন করলেন। তারপর জল ঢালার সময় কী উৎসাহ! 'পূর্ণকুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ। শূন্য ঘট লঞা যায় আর শতজন;' কেউ জলঘট এনে মহাপ্রভুর পায়ে দিচ্ছে, কেউ বা জল করে ঢেলে দিচ্ছে পায়ের উপর। ঘটে ঘটে

ঠোকাঠুকি করে কত ঘট ভেঙে যাচ্ছে আবার চলে আসছে নতুন ঘট। আর জল ঢালা, ঘর ধোয়ার সঙ্গে অবিরল কৃষ্ণনাম।

'জল ভরে ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ-হরি-ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণ নাম হইল সঙ্কেত সর্বকামে॥'

কে একটা লোক প্রভুর পায়ে জল ঢেলে সেই জল পান করে ফেলল। প্রভু রুষ্ট হলেন, স্বরূপকে ডেকে বললেন, 'দেখ এর ব্যবহার। ঈশ্বরমন্দিরে আমার পা-ধোয়ান আর সেই জল কিনা পান করল নিজে। অপরাধে আমার কী গতি হবে?'

লোকটার ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিল স্বরূপ গোঁসাই।

কোথায় তাড়াবে, সুবুদ্ধি সরল লোকটা ফিরে এল প্রভুর কাছে। বললে, 'আমি অজ্ঞ, মূর্খ, ব্যবহার জানিনা, আমাকে ক্ষমা না করলে চলে কী করে?'

প্রভু তুষ্ট হলেন। ক্ষমায় করুণায় বদান্য হলেন।

শোধন ক্ষালনের পর সুরু হল কীর্তন। উদ্দণ্ড নৃত্য। 'আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়।'

কিন্তু এ কী হল? অদ্বৈতের ছেলে গোপাল নাচতে-নাচতে অচেতন হয়ে পড়েছে। শ্বাস নেই। অদ্বৈত নৃসিংহের মন্ত্র পড়ে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, তবু চেতনা আসছে না। সবাই কাঁদতে সুরু করেছে। তাকিয়ে রয়েছে প্রভুর দিকে। 'গোপাল, ওঠ।' প্রভু গোপালের বুকে হাত রেখে ডাকতেই চোখ মেলল গোপাল।

এবার চলো, নরেন্দ্র-সরোবরে গিয়ে স্নান করি। শুধু স্নান নয়, সুরু হল জল-ক্রীড়া। সেই ক্রীড়াতেও অধিকতম পটুত্ব গৌরচন্দ্রের।

এবার ভোজন। কৃষ্ণের সেই পুলিন-ভোজন।

'আমাকে লাফরা-ব্যঞ্জন দাও,' বললেন প্রভু, 'আর পিঠা পানা অমৃতগুটিকা ভক্তদের পরিবেশন করো।'

প্রভুর পাশে বসে সার্বভৌম খাচ্ছে, হাসাহাসি করছে।

'কই তোমার সেই আগের জড়-ব্যবহার?' জিগ্গেস করল গোপীনাথ।

'এ সম্পদসিদ্ধি আমার মহাপ্রভুর প্রসাদে।' বললে সার্বভৌম।

'মহাপ্রভু বিনা কেহো নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ-হরি॥
কাঁহা বহির্মুখ-তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গ-সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে॥'

অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ যথারীতি ক্রীড়া-কলহ করছে। 'গালাগালি বোলাবুলি' করছে। সে এক অমৃতের ঝড়, অমৃতের বৃষ্টি।

রথযাত্রার আগের দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব। স্নানযাত্রার পর থেকে মন্দির প্রায় পনেরো দিন বন্ধ। জগন্নাথের 'বেশ' পরিবর্তন হবে। হবে নবীন অঙ্গরাগ। রথযাত্রার আগের দিন বিগ্রহের চক্ষুদান করা হয়, তাই তার নাম নেত্রোৎসব। আর এই নেত্রোৎসবের দিনই মন্দিরের দরজা খোলে, সেই দিন থেকেই দর্শন দেন জগন্নাথ।

কতদিন তোমায় দেখিনি, আজ তুমি চোখ মেলে তাকাবে আমার মুখের দিকে—এত সুখ আমি রাখি কোথায়?

জগন্নাথ-দর্শনে চললেন মহাপ্রভু।

আগে আগে লোক সরিয়ে কাশীশ্বর যাচ্ছে, পিছনে জলকরঙ্গ নিয়ে গোবিন্দ। প্রভুর ঠিক সামনে পরমানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী। একপাশে অদ্বৈত, আরেক পাশে স্বরূপদামোদর। আর আগে-পিছে এখানে-ওখানে অন্যান্য ভক্ত।

আজ মন্দিরে বিপুল ভিড়। ব্যাকুলতার আতিশয্যে ভোগমণ্ডপে দাঁড়িয়ে কারু দর্শন করার অধিকার নেই। কিন্তু কেন কে জানে—প্রভু দর্শন-লোভে মর্যাদা লঙ্ঘন করে চলে এলেন ভোগমণ্ডপে।

দেখলেন জগন্নাথকে।

যত দেখেন, ততই চোখে তৃষ্ণা জাগে। নেত্রের আর সাফল্য কী! কৃষ্ণদর্শনই একমাত্র সাফল্য।

গোপীরা কী তপস্যা করেছিল, যার ফলে দুইনয়নে কৃষ্ণের রূপ তারা পান করছে। যে রূপ লাবণ্যের সারস্বরূপ, যে রূপ অসমোর্ধ্ব, যে রূপ অনন্যসিদ্ধ, যে রূপ প্রতিক্ষণে নবায়মান, যে রূপ যশ আর শ্রী আর ঐশ্বর্যের একান্তধাম।

'ক্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম'। তোমার অদর্শনে ক্ষণার্ধ সময়ও যুগ বলে মনে হয়। তাছাড়া চোখের আবার আচ্ছাদন কেন? কেন অনন্তকাল নিষ্পলক হয়ে চেয়ে থাকতে পারব না তোমার দিকে? [ ক্রমশঃ।

ধারাবাহিক আত্ম-জীবনী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

পরিমল গোস্বামী

( ১৪ )

## শেষ দেখা

১৯৬০ এর ২২শে জানুয়ারি কথা বলা হল। সে দিনের আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলি। রাজশেখরের স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম সেদিন। তখন আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন বললেন। যদিও তাঁর সমস্ত আলাপের মধ্যে একটা শান্তভাব ছিল। আমি অসুখবিসুখ বিষয়ে একটুখানি কৌতূহলী, তাই আরও একটু বিষদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

প্রশ্ন ক'রে ক'রে যেটুকু জানা গেল, তা হচ্ছে এই যে, তাঁর তখন নাড়ীর গতি মিনিটে ৯১।

এটি অবশ্য আমার নিজের বেলায় হলে বলা যেত আমার জ্বর হয়েছে। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় আমার থাকে প্রায় ৭০। কিন্তু বয়স ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই গতি বিভিন্ন হয় এবং জ্বর না হলেও নাড়ীর গতি গড় গতির চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত হ'তে পারে। এমন কি গা বরফের মতো ঠাণ্ডা কিন্তু নাড়ী চলছে মিনিটে ১৩০ বা বেশি। এটি মৃত্যুর লক্ষণ অনেক সময়েই। রাজশেখরের ক্ষেত্রে মিনিটে ৯১, আমার মনে হল তাঁর হৃৎপিণ্ডের একটি ত্রুটির জন্যই হয়েছে। তিনি বললেন, তাঁর হৃৎপিণ্ডের একটি ভেন্ট্রিকল জখম হয়ে গেছে। মনে হল, হয় তো বা এরই জন্য ঐ গতি। কিন্তু এটি আমার অনুমান মাত্র।

হৃৎপিণ্ডের এই খবরটা শুনে দুঃখ হল। কিভাবে জখম হয়েছে, এবং জখম আদৌ কি ভাবে হয়, তা আমার জানা নেই, কিন্তু এ বিষয়টি আলাপের পক্ষে খুব মনোহর বোধ না হওয়ায় রক্তের চাপের কথা তুললাম। কারণ এ বিষয়ে আমি গত সাত আট বছর ধ'রে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

শুনলাম সিস্টোলিক ১৮০, এবং ডায়াস্টোলিক ৯০। আমার নিজের কথা চিন্তা করলাম। এমন অবস্থা আমারও। তবে প্রথমটি ১৫০-৬০ এবং দ্বিতীয়টি ৮০-৯০ থাকলে চাপের কথা আর মনে আসে না। এক দিন, বোধ হয় ১৯৫৫ কি ৫৬ হবে—আমাদের বুড়ো দার (অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর) সঙ্গে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম অনেকদিন দেখা পাইনি কেন? বললেন, তিনি মারা যেতে বসেছিলেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধির ব্যাপার। নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল, অজ্ঞান হয়েছিলেন। কি পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছিল তা জানবার উপায় নেই, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছিল সিস্টোলিক চাপ ২৩০ এবং ঐ চাপ নিয়েই তিনি পথে বেরিয়েছেন!

অতএব ব্যক্তিবিশেষে স্বাভাবিক রক্তের চাপও ভিন্ন। ২৩০ আমার হলে নিজের দু'পায়ে নয়, অন্যদের আট পায়ে চলতে হ'ত নিমতলার দিকে।

রাজশেখরের রক্তের চাপের পরিমাণ শুনে বললাম "তা হ'লে তো আপনার বয়সে সবই প্রায় স্বাভাবিক আছে।" তিনি বললেন, "আগে খুব বেশি ছিল, কিন্তু চাপ কমানোর জন্য অনেক দিন ওষুধ খেয়ে খেয়ে এখন ক'মে এসেছে।"

আর তিন মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটবে এমন কথা মনে আসেনি।

মনে এসেছিল প্রায় দেড় মাস পরে।

১৯৬০-এর ১৯শে মার্চ তারিখে তাঁকে শেষ দেখা দেখেছি তাঁর বাড়িতে। এবারেও তিনি গাড়ি পাঠিয়েছিলেন এবং এবারেও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এবারে যে নিমন্ত্রণ চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়েছিলেন সেখানা অন্যের হাতের লেখা, নিজে শুধু নিচে সইটি করেছিলেন। এ চিঠির তারিখ ১৫ই মার্চ ১৯৬০।

১২-১-৬০ তারিখে আমাকে নিজহাতে লিখেছিলেন, "আমার মৃগী বা epilepsy রোগ, মাসখানিক আগে অনেকবার আক্রান্ত হয়েছি। চিকিৎসা হচ্ছে কিন্তু জড়ভরত হয়ে আছি, সমস্তক্ষণ অস্বস্তি। সারবে আশা করি না।"

এ চিঠিতে প্রথম তাঁকে বাজারের নীল কালি ব্যবহার করতে দেখলাম। এর আগের সমস্ত চিঠি তাঁর নিজ হাতে তৈরি কালো কালিতে লেখা। ভিতরে ভিতরে এমনি বন্ধন কাটতে থাকে। একথা তখনই আমার মনে হয়েছিল। সমস্ত জীবন বাঁধা পথে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে চ'লে, হঠাৎ পথ থেকে স'রে যাওয়া, যতই অনিবার্য বা স্বাভাবিক হোক, হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়।

তাঁর ১৫ই মার্চ তারিখের চিঠি পেলাম পরদিন ১৬ই মার্চ বুধবার। তাতে আমাকে জানালেন গাড়ি পাঠাচ্ছেন, চারুবাবু সঙ্গে

থাকবেন। যাবার তারিখ ১১শে মার্চ। ১৮ই তারিখে চারুবাবু টেলিফোনে আমাকে জানালেন, আমি যেন ১১শে মার্চ প্রস্তুত থাকি।

আমরা বিকেলে রওনা হলাম। এবারের যাওয়ার মধ্যে আমার একটি উদ্দেশ্য ছিল। আমি জানুয়ারি মাসে তাঁর কাছে গেলে সিমানীশ মুভি ক্যামেরায় যে ছবি তুলেছিল, সেই ছবির ফিল্ম এত দিনে পাওয়া গেছে, অতএব এই উপলক্ষে ছবিখানা সেখানে দেখাবার উদ্দেশ্যে প্রোজেকটরটাও সঙ্গে নিলাম। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষেই যে তিনি আমাকে যেতে বলেছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। দেখলাম আরও অনেকে এসেছেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

অতিথিদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে আছে তাঁরা হচ্ছেন পুলিনবিহারী সেন, বিমলচন্দ্র সিংহ, ত্রিদিবেশ বসু, সুশীল রায়, মায়া বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবার। আরও কেউ কেউ ছিলেন, তাঁদের সবাইকে আমি চিনি না।

সন্ধ্যায় কিছু জলযোগান্তে প্রোজেকটরে ছবি দেখানো হল। অনেকের ছবির সঙ্গে একটা অংশ। একই ফিল্মে মাঝে মাঝে তোলা হয়েছে। তাতে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে অধিকাংশই সুকমল ঘোষের গার্ডেন হাউসে আমি কয়েকদিন পরে ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তুলেছিলাম। তাতে দেখা যাবে সজনী, প্রেমেন, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, মনোজ বসু, অতুল বসু, চিত্রিতা দেবী, উদয়শঙ্কর, অমল', ইন্দু দুগার, চিন্তামণি করকে। কিছু পরে (অন্য সময় তোলা) দেখা যাবে—প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় (জংলী দা), বনফুল, বিশু মুখোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচীকে। এই ছবিরই এক অংশে রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আমাকে একত্র দেখা যাবে। এই শেষের তিনের মধ্যে এই কথাগুলো লেখার মুহূর্ত (১১-৮-৬২) পর্যন্ত আমি একা বেঁচে আছি। প্রোজেকটরটি দুবার চালিয়ে ছবি দেখানো হ'ল। রাজশেখর, চারুচন্দ্র প্রভৃতি নীরবে দেখলেন। সিনেমা বিষয়ে আলাপ করলেন শুধু বিমলচন্দ্র সিংহ। এ বিষয়ে তাঁর কৌতূহল এবং অভিজ্ঞতা দুইই যথেষ্ট ছিল।

এপ্রিল মাসটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। শেষ হল এপ্রিল মাসেই।

তারপর একদিন—দুপুরে একটুখানি ঘুমিয়েছি—এমন সময়—তখন সম্ভবত আড়াইটে, কানের কাছে টেলিফোন বেজে উঠল। —সে দিনটি ২৭শে এপ্রিল ১৯৬০।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে বলছি। বাংলা বক্তৃতা বিভাগ। সুধীন চট্টোপাধ্যায়। রাজশেখর বসু মারা গেছেন। অবিলম্বে চলে আসুন রেডিও অফিসে (ইডেন গার্ডেনে) রাজশেখর সম্পর্কে একটি বক্তৃতা রেকর্ড করাতে হবে।

আমি তো স্তম্ভিত। ঘটনাটা উপলব্ধি করতেই কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নানা সুহৃদের কাছে ফোন করলাম, কেউ শুনেছেন, কেউ শোনেননি।

চলে গেলাম রেডিওতে। গিয়ে তখনই সেখানে ব'সে পাঁচ মিনিটের উপযুক্ত একটি কথিকা প্রস্তুত করলাম। তাঁর চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিকের কথা লিখলাম। সমস্ত লেখার মধ্যে একটা বেদনার সুর বাজল। প্রত্যাশিত অবসানই সেটি, কিন্তু তবু সব সময় সে কথা মনে জাগিয়ে রাখা যায় না। কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এমন একটি সংবাদ শুনলে তা স্বভাবতই অপ্রত্যাশিত মনে হয়, মনে আঘাত লাগে।

আমার কথাগুলি প্রায় পাঁচটার সময় রেকর্ড করা হয়ে গেল এবং রাত ৯-২৫-এর সময় ব্রডকাষ্ট করা হ'ল। অবশ্য এ বক্তৃতা যথাসময় বেতারজগতে ছাপা হয়নি। সম্ভবত এটির উপর ততটা গুরুত্ব দেবার দরকার বোধ হয় নি। রাজশেখর বসু আধুনিক যুগে পুরাতনের দলে।

কিছুদিন হ'ল মৃতদেহের পাশে উপস্থিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শেষ গিয়েছি শশিশেখর বসুর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িতে, কিন্তু তাঁর মৃতদেহ দেখি নি। দেখলে মনে আঘাত লাগে। অথচ একদিন মৃত্যু বা মৃতদেহকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতির অন্ত ছিল না। মনকে কঠোরভাবে এ শিক্ষা দিয়েছিলাম।

শুধু তাই নয়, মৃত্যু যাতে ভয়ঙ্কর মনে না হয়, সে জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মৃতদেহের কাছে উপস্থিত হয়েছি, শ্মশানে গিয়েছি। তবে একটি জিনিস আমার কাছে কোনো দিনই ভাল লাগে না, সে হচ্ছে মৃতদেহের ফোটোগ্রাফ ছাপানো। এটি রুচিসঙ্গত বোধ হয় না। মৃত্যুতে অনেক সময়েই মুখের চেহারা বীভৎস দেখায়, তা ছেপে সবাইকে দেখাবার কি দরকার বোঝা যায় না। মৃতদেহ দেখে অনেকের মনে আঘাত লাগে, অনেকের সে আঘাতে মৃত্যু হতে পারে যদি হৃৎপিণ্ড দুর্বল থাকে। সেজন্য মৃতদেহের নিকট দৃষ্টিতে দেখা ফোটোগ্রাফ ছাপার আমি পক্ষপাতী নই। আমার যতদূর জানা আছে, পাশ্চাত্য রুচিতেও এর সমর্থন নেই। এ বিষয়ে রাজশেখর বসুর মতও ছিল খুব স্পষ্ট। শশিশেখর বসুর মৃত্যু হ'লে খবর শুনে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও আমি তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। (খবর বয়ে এনেছিলেন সম্ভবতঃ কৃষ্ণশেখর বসু।) আমি যাবার সময় সঙ্গে ছোট্ট একটি ক্যামেরা পকেটে নিয়ে গিয়েছিলাম। অনেকেই নিকট আত্মীয়দের মৃত্যু হ'লে তাঁদের মৃতদেহের ফোটোগ্রাফ তুলিয়ে রাখেন। সেটি ছাপাবার জন্য নয়, রেখে দেবার জন্য। যদি দরকার হয়, এই ভেবেই ক্যামেরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। সেখানে রাজশেখরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ফোটো তুলিয়ে রাখবার প্রয়োজন আছে কি না। তিনি বললেন, না, ওর কোনো দাম আছে মনে করি না।

দেশে আমার পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন আমার কাছে ক্যামেরা ও প্লেট প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ফোটোগ্রাফ তোলবার প্রবৃত্তি হয় নি।

## চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

চারুচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলবার সুযোগ আগে কখনও হয়নি। কিন্তু যখন হ'ল, তখন তিনি তাঁর শেষ দীপ্তিতে আমার মনের আকাশ রঙীন ক'রে দিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন, এইটেই যা দুঃখ। রাজশেখরকে কেন্দ্র ক'রে যতীন্দ্রকুমার সেনকে নতুন দেখলাম, পরিচয় হ'ল, ভাল লাগল, আরও পরিচয় হ'লে আরও ভাল লাগত। তেমনি পেলাম চারুচন্দ্রকে। রাজশেখরকে ঘিরে যেমন ছিলেন এঁরা, তেমনি এঁদের ঘিরে ছিল একটা সেকালের বৈঠকি মেজাজ। আর ছিল মধুর অবকাশ। এর পূর্বে আমাদের যে একটি বড় আসর বসত সজনী-কেন্দ্রিক বঙ্গশ্রীর ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে, তাতে আমরা প্রত্যেকেই

দায়িত্বহীন অবসরের এক একটি অ্যাটমস্ফিয়ার বা পরিমণ্ডল বয়ে নিয়ে যেতাম। সে স্বাদ তারপরে আর কোথাও পাইনি।

সে আসরে আমরা যারা ছিলাম সেই আমাদের অধিকাংশই আজও আছি, কিন্তু আমরা এখন বিকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এর মূলে যে অনেকখানি ক্রিয়া করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যুদ্ধে আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে বড় বড় কারখানার এক একটা বিভাগ এক একটা স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়, একই জায়গায় রাখা হয় না। আমাদেরও অবস্থা প্রায় সেই রকম হয়েছে। ভবিষ্যতের উপর অনিশ্চয়তার আশঙ্কাই আমাদের বিকেন্দ্রীকরণের কাজ করেছে।

সেই বঙ্গশ্রীর আসর থেকে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেন্দ্র সজনীকান্ত দাস আর নেই।

এই সাতজনেরই বলা চলে অকালমৃত্যু।

সে হিসাবে রাজশেখর বসু এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মৃত্যু যথাসময়েই হয়েছে। কিন্তু তবু বাংলা দেশের পক্ষে তা কি করুণ! বাংলা সাহিত্যের অভিভাবকরূপে তাঁদের মৃত্যু কত বেদনাদায়ক।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যপ্রীতির দিক দিয়ে রাজশেখর বসু ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন একেবারে সমধর্মী। রাজশেখর যখন চিন্তাশীল রচনা লিখেছেন, তখন শান্ত সহজ সরল সুরে এবং ভাষায় লিখেছেন। অথচ গল্প রচনায় ব্যঙ্গ কৌতুক এসেছে অনায়াসে। বিজ্ঞানের পদ্ধতিতেই মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি হাস্যরসের সন্ধান পেয়েছেন। পক্ষান্তরে চারুচন্দ্র নিজের জ্ঞান, বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, তার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক হ'লেও তার মধ্যে তিনি সরসতার মিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে রসসাহিত্যে পরিণত করেছেন। কিন্তু সাহিত্যসেবায় এটি তাঁর একটিমাত্র দিকের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের রূপ দেখা যাবে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদনার মধ্যে। এ ভিন্ন বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকগুলিও বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে একটি ধাপের কাজ করেছে।

চারুচন্দ্রের সাহিত্যরস-প্রীতি কতখানি ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ দেখা যাবে ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বে। আর শুধু তাই নয়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় "বেপরোয়া" নামক যে অনিয়মিত পত্রিকা বা'র করেছিলেন তার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম দেখলে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বেপরোয়া কাগজ মাত্র তিন সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৯২৩ সনে। তার তৃতীয় বা শেষ সংখ্যাখানি বহু যত্নে উদ্ধার ক'রে বনবিহারীবাবু বছর তিনেক আগে (১৯৫১) আমাকে দিয়েছিলেন। মুদ্রণ তারিখে চৈত্র ১৩২৯ সাল। অন্যান্য পরিচয়ে লেখা আছে। প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (পূজা সংখ্যা)—অসাময়িক পত্র, সম্পাদক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য এম-এ। লেখকগণ—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ, শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি, শ্রীতুলসীচরণ ভট্টাচার্য এম-বি, শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য এম-এ।

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তুলসীচরণ ভট্টাচার্যকে আমি ১৯১৮ সালে ডাক্তাররূপে দেখেছি। তিনি আমাদের বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক 'বঙ্গের রত্নমালা' প্রণেতা কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পুত্র, এই পরিচয় জানবার পর বিদ্যাসাগর হষ্টেলে কোন একটি ছাত্রের মুখে ইরিসিপেলাস হওয়ায় তাঁকে 'কল' দেওয়ায় তাঁর কথাটা মনে রেখেছিলাম। রোগী প্রথমে এক কবিরাজকে ডাকেন, কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় কোনো ফল না হওয়ায় তুলসীবাবুকে ডাকা হয়। বড় বড় চুল ছিল, এবং তখনকার চেহারাটি মনে আছে, তার আরও কারণ বনবিহারী বাবুর সঙ্গে তাঁকে পরে (১৯২৫-২৬) দুচার বার দেখেছি। ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন বনবিহারী বাবুর মতনই। হষ্টেলের সেই রোগীর প্রসঙ্গে তাঁর একটি কথা আমার মনে গাঁথা আছে। কবিরাজ রোগীর পাশে উপস্থিত ছিলেন, তুলসীবাবু এসে রোগীর দিকে চেয়ে দেখলেন, এবং শুনলেন উপস্থিত সেই কবিরাজ তাঁকে দেখছেন। তিনি কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন কি চিকিৎসা করেছেন? কবিরাজ বললেন সে অনেক কাণ্ড—কিন্তু কথাটা শেষ হ'ল না। তুলসীবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, দেখুন কোনো কাণ্ড করা আমাদের কিন্তু উদ্দেশ্য নয়, রোগী সারানোই উদ্দেশ্য।

এরপর কি ঘটেছিল তা কোনো মতেই মনে আনতে পারি না। কিন্তু ঐ কথাটা একজন ডাক্তারের মুখে খুব মনোহর বোধ হয়েছিল, তাই মনে আছে। যাতে কিছু অভিনবত্ব আছে তাতেই আমার আকর্ষণ বাল্যকাল থেকে। তারপর বনবিহারী বাবুর চরিত্র দেখলাম এবং তাঁর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। এবং প্রায় ৩৪-৩৫ বছর পরে বনবিহারী বাবুর সঙ্গে পুনরায় গভীরতর অন্তরঙ্গতা হ'ল। তাঁর কথা পরে বলছি।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনোদিন হয়নি, তবে ১৯২৩ সালে নৃতত্ত্ব-কলোজিয়েট পরীক্ষার্থীরূপে এম-এ দেবার আগে তাঁর ভাষাতত্ত্বের একখানা বই পড়েছিলাম, এবং তারও আগে তাঁর কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর কবিতা আমার খুব ভাল লাগত।

'বেপরোয়া'র লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় কবে ঘটে, তা ঠিক মনে নেই, তবে ১৯৩৩ সালে একটি বিশেষ কারণে তাঁর সংস্পর্শে আসতে হয়, সেটি মনে আছে। আমার সেই পরিচয়-কথা গত ১৩৬১ পূজা সংখ্যা বসুধারায় আমি লিখেছি।

বেপরোয়ার সম্পাদক বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার মুখ্য বা গৌণ, কোনো ভাবেই কোনো পরিচয় ঘটেনি।

চারুচন্দ্রের কথা বলছিলাম। 'বেপরোয়া' নামক এমন দুর্ধর্ষ ব্যঙ্গ-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হওয়া অবশ্যই ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি যে সাহিত্য-রসিক কতখানি এবং ব্যঙ্গরচনাতেও যে তাঁর অধিকার কতখানি আছে, তা বেপরোয়ার একটি প্রবন্ধ থেকেও প্রমাণ করা চলে।

এতে 'ইলেকট্রিসিটি' নামক একটি ব্যঙ্গ-রচনা আছে। বিজ্ঞান ও মারাত্মক ব্যঙ্গ একসঙ্গে। লেখকের নাম নেই। একমাত্র বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লেখাগুলি স্বাক্ষরিত। অন্য লেখাগুলির মধ্যে অধিকাংশই বনবিহারী বাবুর লেখা, তিনি নিজহাতে নাম স্বাক্ষর ক'রে আমাকে দিয়েছেন। বাকি রইল ঐ একটিমাত্র রচনা। কিন্তু যেহেতু এর নাম ইলেকট্রিসিটি সেই হেতু আমি অনুমান করছি—এটি চারুচন্দ্রের রচনা। কিছু কিছু উদ্ধৃত করি:

"স্বর্ণ।—ভারত ধর্ম মহামণ্ডল কর্তৃক পরিচালিত একখানি কাগজে দেখা গেল যে 'স্বর্ণের ভিতর একপ্রকার তড়িৎ আছে, যাহা দেহের সহিত মিশ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়গণকে অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত করিয়া তোলে।'—এই জন্যই বিধবার স্বর্ণালঙ্কার বর্জনীয় এবং বিধবা ব্যতীত অন্য সকল স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়কে অনুক্ষণ অতিমাত্রায় উত্তেজিত করিবার জন্য তাহাদিগকে সর্বদা স্বর্ণালঙ্কার-মণ্ডিত রাখা উচিত—তা তাঁহাদের বয়স ৫ মাসই হউক কি ১০৫ বৎসরই হউক।

"লৌহ।—লৌহনির্গত তড়িৎ স্ত্রীপুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করে। হস্তস্থিত লৌহবলয় নারীকে স্বামী-সোহাগিনী করে, তাই সধবা স্ত্রীলোককে হাতে লৌহ ধারণ করিতে হয়। পূর্বে স্বর্ণের গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাই আজকাল শুধু লৌহ তাঁহারা পরেন না, উহাকে স্বর্ণমণ্ডিত করেন। পুরুষের হস্তস্থিত লৌহবলয় মস্তিষ্ক শীতল করিয়া তাহাকে ধীর শান্ত করে, যথা কালীমাতার বালা বা দারোগা সাহেবের বালা।···

"তড়িৎ সম্বন্ধে আর্য ঋষিদিগের প্রকৃষ্ট জ্ঞানের একটি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ লিকেশন—

"আমরা জানি দেহ তড়িতে পূর্ণ। এই দেহস্থিত তড়িৎ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নিশ্চয়ই ল' অভ রিপাল্শন অনুসারে মস্তক ও পদ—শরীরের এই দুই প্রান্তে চালিত হয়। পদসংলগ্ন তড়িৎ ভূগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়। অবশিষ্ট থাকে মস্তকস্থ তড়িৎ। এই তড়িৎকে যদি খুব অল্প পরিসর স্থানে নিবদ্ধ করিতে পারা যায়, তো ঐ তড়িতের পোটেনশিয়াল খুব বেশী হওয়ায় উহার কার্য্যকারী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তড়িৎশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আর্যগণ একথা জানিতেন, তাই তাঁহারা রাখিলেন টিকি। সমস্ত তড়িৎ টিকিতে সংহত হইল। কিন্তু এই টিকির ডগা যদি ফর্‌ফর্ করিয়া উড়িতে থাকে, তো তড়িৎ পয়েণ্ট দিয়া আকাশে লীক করিয়া যাইবে, তাই তাঁহারা টিকিতে ফাঁস দিয়া তাহার ডগাটি মস্তকের দিকে ফিরাইয়া দিলেন।···কিন্তু পাদদেশে চালিত তড়িৎ তো ভূপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া যায়। তাই তাঁহারা বসিবার আসন করিলেন সব নন কন্‌ডাকটরস্—মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম প্রভৃতি।"

চারুচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর আগে লেখা এই ব্যঙ্গ তখন সমাজজীবনে নতুন ছিল। সমাজের বহু অর্থহীন কু-সংস্কারকে এইভাবে ভেঙে দেবার জন্য তখন এঁরা কয়েকজন একত্র জুটেছিলেন।

## বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

এই দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দুর্দান্ত চরিত্রের ব্যঙ্গকার ছিলেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তিনি এখনও জীবিত। স্মৃতিচিত্রণে এঁর অদ্ভুত চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি অনেকখানি বলেছি। কিন্তু তাঁর রচিত ব্যঙ্গ চিত্র বা সাহিত্য যে কতখানি শক্তিশালী, তা না দেখলে বা পড়লে হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত।

আমি 'ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী' নামক ব্যঙ্গগল্প সঙ্কলনের ভূমিকায় (২য় সং) বনবিহারী বাবু সম্পর্কে এক স্থানে লিখেছিলাম, "···যদি ইউরোপের রোজার বেকন বা এমন কি ভোলতেয়রের যুগেও আমাদের দেশের আধুনিক ব্যঙ্গ-রচয়িতারা জন্মাতেন, তা হ'লে···সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণের দরুন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ হতেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

'বেপরোয়া' কাগজে প্রকাশকের নিবেদন ছাপা হয়েছে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর স্বাক্ষরে, ঠিকানা ১০৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, পোঃ সিমলা। প্রথমেই বলা হয়েছে শ্রীশ্রী ঘেঁটুরাজের পূজা উপলক্ষে আপিস সুদীর্ঘকাল বন্ধ থাকাতে পূজার সংখ্যা বেপরোয়া একটু বিলম্বে বাহির হইল।···ইত্যাদি। এ রচনাটিও বনবিহারী বাবুর।

'উপাধি' নামক একটি ব্যঙ্গ প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখছেন—"···বেজাতীর যাহা খসিলে সে মুক্তির জলে লীন না হইলেও লাফাইয়া বেড়ায়, সাধুপুরুষদের তাহা খসিবার নয়। স্বয়ং ব্রহ্মকেও উপাধির জোরে, উপসর্গের জোরে ও নামের জোরে বাঁচিতে হইতেছে!" আমরা ঠাকুরকে চাই না, চাই তাঁহার নাম।···উপাধির জোর না থাকিলে ব্রহ্মকেই ব্রহ্মসাগরে মুক্তি না নির্বাণ লাভ করিতে হইত।

"ঠাকুরবর্গে নিরুপাধি আছেন—এক ঘেঁটু। বেদপুরাণ যাঁহার তত্ত্ব পায় না, তিনি যখন সকলের বড়, তখন ঘেঁটুর চেয়ে বড় আর কে আছে? উঁহার গায়ে সংখ্যা-কারক বোধয়িত্রী বিভক্তি নাই, কোন লিঙ্গবাচী প্রত্যয় নাই, এবং উপসর্গের বালাই নাই, কোন ব্যাকরণের সাধ্য নাই ঠাকুরের ব্যুৎপত্তি ধরে।···"

'বেপরোয়া'র আরম্ভেও ঘেঁটুকে আহ্বান। লিখেছেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃত স্তোত্র রচনাও বনবিহারী বাবুর। ব্যঙ্গের সব্যসাচী তিনি। স্তোত্রটি এই—

> দৃষ্টাঃ স্পৃষ্টা বিমৃষ্টাঃ কচিদপি ন ময়া মাঘবাঘী কৃতাপঃ
> হস্তে বাস্তিক্যালোপাচ্চকিতমতিমতা জাতু নারোপিতঃ soap
> অদ্য প্রোদ্দামদীব্যৎখুজলিচুলকনা—খোসদাদীকৃতোঽহং
> বন্দে মন্দারশোভং তব পদমমলং হে মহাদেব ঘেঁটো।

তারপর—"হে দেবাদিদেব, হে ঘেঁটো, একবার আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হও, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।···শীতলার তবু একটা গাধা আছে, তোমার তাহাও নাই, quack [বা হাতুড়ে] বলিয়া আজিও গাধা কিনিতে পার নাই! ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইও না। এদেশে হাতুড়ের দর কম কিন্তু কদর বেশী।···"

[ক্রমশঃ।

# তোমার চোখে

**পৃথ্বীশ সরকার**

চোখ বুঝি চোখ নয়, যেন এক
সুবিশাল নদী—
আকাশের স্নিগ্ধ ছায়া মেলে আছে
অতল অবধি।

আজ আমি ক্লান্তমন, আজ আমি
অশান্তহৃদয়—
তোমার চোখে যে দেখেছি আমার
একান্ত আশ্রয়।

## শ্রীফজলুর রহমান

[ নিরলস কংগ্রেস-নেতা ও বলিষ্ঠ চিন্তানায়ক ]

বাংলাদেশে যে কয়জন কংগ্রেসী মুসলমান বহু নির্যাতন ও দুঃখ বরণ করে আদর্শ নিষ্ঠায় অচল ও অটল, শ্রীফজলুর রহমান তাঁদের অন্যতম। সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থেকে গত প্রায় ৪০ বছর যাবৎ জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে জনসেবার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শুধু নদীয়াবাসীদেরই নয়, বাংলাদেশের হৃদয়ও তিনি জয় করেছেন।

রহমান সাহেবের বর্ত্তমান বয়স ৫৫ বৎসর। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত কামারী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ইন্‌ষ্টিটিউশন থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর ১৯৩০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাশ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি প্রথম বিভাগে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণনগরে ওকালতি সুরু করেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন সুরু হয় ১৯২৩ সালে। স্কুলের যখন তিনি ছাত্র, তখন নদীয়ার বিখ্যাত দেশকর্ম্মী তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৫ সালে অন্যতম বিপ্লবী কর্ম্মী গোপেন্দ্রনাথ

শ্রীফজলুর রহমান

মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং তাঁর নেতৃত্বে সত্যব্রতী দলে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কোলকাতা অধিবেশনে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে রহমান সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পর বৎসর সদর মহকুমা কংগ্রেস-কমিটির তিনি সভাপতি-পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে নদীয়া জেলা বন্যার প্রকোপে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এই সময় রহমন সাহেব জেলা-কংগ্রেসের রিলিফ-কমিটির সম্পাদক হিসেবে আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৯ সালে নেতাজী

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরওয়ার্ডব্লক গঠন করেন; এই সময় রহমান সাহেবও কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লবে যোগদানের ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। দেশ স্বাধীন হইবার পর তিনি নদীয়া জেলা স্কুল-বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি কালীগঞ্জ কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনেও তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হন। গত সাধারণ নির্বাচনেও তিনি জয়ী হয়ে এসেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরহমান অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, বহু শিক্ষাসংস্থার সভাপতিরূপে তিনি আজও শিক্ষা প্রসারের কাজে ব্রতী আছেন।

গত ২৫ বছরের ওপর তিনি নদীয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক-সমিতির সভাপতি। নদীয়া জেলা পুনর্বাসন সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য হিসেবে তিনি নদীয়ায় বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি ছাত্র অবস্থা থেকেই সুকবি, সুসাহিত্যিক ও সুলেখক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

বর্ত্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি, নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয় সংহতি কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের পশুপালন ও পশু-চিকিৎসা দপ্তরের মন্ত্রী।

বলিষ্ঠ চিন্তানায়ক, নির্ভীক দেশ-প্রেমিক ও শক্তিমান সংগঠক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আজ সর্বজন-বিদিত।

## শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ

[ কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার ]

লোকে ভাবে এক আর হয় এক। বিশ্ববিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলী-হেলনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চালিত হচ্ছে,—জনগণের মনে আজও এ বিশ্বাস অটুট। বিজ্ঞানের যুগে হয় তো একজন লোক বাহ্যতঃ এ বিষয় মেনে না নিলেও, কোন অদৃশ্য হস্তের প্রভাবে মানব-জীবন চালিত হচ্ছে, এ সর্ব্ববাদিসম্মত। মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণে কোন অদৃশ্য হস্তের প্রভাব রয়েছে, এ বিষয় উপেক্ষণীয় নয়। নতুবা যে ইঞ্জিনিয়ার হ'বে, সে হয়তো দেখা গেল চিকিৎসক হয়েছে, আবার

দেখা গেছে যে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করলো, তাকে বিধাতার কঠোর বিধানে রাজ্যপরিচালনার কর্ণধার হতে হলো। এমনিতর অসংখ্য উদাহরণ আমাদের চোখের সম্মুখে বর্ত্তমান রয়েছে। কলকাতার বর্ত্তমান পুলিশ-কমিশনার শচীন্দ্রমোহনের জীবনধারাও অনেকটা এই পথের অন্তর্ভুক্ত। ইনি যে কৃতী পুলিশ-অফিসার বলে সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করবেন, তা হয় তো বাল্যকালে অথবা তরুণ বয়সে কখনও ভাবতে পারেন নি। পিতা শ্রীবীরেন্দ্রমোহন ঘোষ ছিলেন বৃটিশ আমলের নাম-করা ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট। পুত্রও যে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কিম্বা একজন প্রসিদ্ধ আই-সি-এস হবেন, এ ইচ্ছা হয়তো পরিবারের অনেকরই ছিল। শচীন্দ্রমোহনের পক্ষে ঐ সকল পদ লাভ করা বিশেষ কষ্টসাধ্যও ছিল না। কিন্তু তিনি হলেন একজন কৃতী কর্ম্মদীপ্ত পুলিশ অফিসার।

সমাজ-জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হলো দীর্ঘ সাতাশ বছর পূর্ব্বে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি নিরলস ভাবে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কঠোর দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। বর্ত্তমানে কলকাতার নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি ও শান্তি রক্ষার কঠোর দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। কর্ম্মের ও দায়িত্বের প্রতি তিনি কোন অবহেলাই জীবনে করেন নাই এবং আজও তিনি তাঁর কর্ত্তব্যপালনে অবিচল। পুলিশ-প্রধানের কার্য্যে তাঁকে অনেক সময়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেও কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে হয়েছে। নিজের কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদনে তিনি একচুলও বিচলিত হন নি কখনও। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, দেখা গেছে তিনি অকুতোভয়ে প্রফুল্লচিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ বাণী "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এঁর জীবনের মূলমন্ত্র। কর্ম্মই এঁর সাধনা, কর্ম্মই এঁর ধ্যান-জ্ঞান। কর্ম্মের দ্বারাই ইনি জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন। তাই দেখা যায়, পরিণত জীবনেও তিনি সমান ভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কর্ম্ম করে চলেছেন। সত্যিকারের কর্ম্ম-যোগীর উদাহরণ শচীন্দ্রমোহনের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রতিভাত।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদাপ্রফুল্ল, নিরহঙ্কার এবং অত্যন্ত ভদ্র। তাঁর অমায়িক ব্যবহার জনসাধারণকে মুগ্ধ না করে পারে না। যে কোন ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর সহৃদয় অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। যে কোন সৎ লোক তাঁর কাছে সাহায্য ও ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করলে তিনি সর্ব্বতোভাবে তাকে সাহায্য করেন, এ সত্যটি অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। তিনি সত্য ও ন্যায়ের পূজারী। তাই জনগণ তাঁর কাছ থেকে ন্যায় বিচার পেয়ে আসছে। কলকাতার নাগরিকগণ তাঁকে পুলিশ-প্রধান পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে, একথা অবশ্যই বলবো।

শচীন্দ্রমোহনের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় অবিভক্ত বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায়। পিতা বীরেন্দ্রমোহন ঘোষ ছিলেন ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বালক শচীন্দ্রমোহন বিভিন্ন জিলায় জিলায় ঘুরেছেন। ইংরেজী ১৯১৩ সালে শচীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন অবিভক্ত বাঙ্গালার ঢাকা সহরে। বর্ত্তমানে উহা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজধানী। তারপর বহু জিলায় বাল্যজীবন অতিবাহিত করে ১৯২৯ সালে যশোহর জিলা-স্কুল থেকে সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ইনি এসে ভর্ত্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে আই-এস-সি-তে। ১৯৩১ সালে বৃত্তিত্বের সঙ্গে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজেই অর্থনীতি শাস্ত্রে অনার্স পড়তে সুরু করলেন। ১৯৩৩ সালে সসম্মানে বি-এ, অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, ও 'ল' অধ্যয়ন করতে থাকেন। এই সময় ১৯৩৫ সালে তিনি আই-পি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করেন। আই-পি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঐ বৎসরই তিনি পুলিশ বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জিলায় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বিশেষ সুনামের সঙ্গে কার্য্য করেন। দায়িত্বশীল পুলিশ-অফিসার হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ-সুপার ছিলেন। এই সময় মুসলমানেরা প্রসিদ্ধ "মেহার কালীবাড়ী" আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। শ্রীঘোষ নিজের জীবন বিপন্ন করেও মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং কঠোরভাবে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণ করেন। এজন্য তৎকালীন অবিভক্ত বাঙ্গালার মুখ্যমন্ত্রী জনাব সুরাবর্দ্দী সাহেবের বিরাগভাজন হন। তিনি সরকারী বিরাগভাজন হয়েও সম্পত্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য হাঙ্গামাকারীদের দমনার্থে গুলীবর্ষণের আদেশ প্রদান করেন। শ্রীঘোষের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই "মেহার কালীবাড়ী" লুণ্ঠিত হ'তে পারে নাই সেই সময়। ইহাতেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় শ্রীঘোষের কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদনে কিরূপ অবিচল নিষ্ঠা। দিনাজপুরে পুলিশ-সুপার থাকার সময় তেভাগা আন্দোলনও তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। তিনি যে ন্যায়নিষ্ঠ দায়িত্বশীল পুলিশ-অফিসার, তা এখান থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ

দেশ বিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সেবার জন্যই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং ২৪ পরগণা জিলার পুলিশ সুপার হন। তিনি একে একে সহকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল (এ, আই, জি) ও ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল হন। ১৯৫০ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গ বিভাগের পুনর্গঠন হয়, তখন শ্রীঘোষ এই কার্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। পুলিশ বিভাগে তাঁর অভিজ্ঞতা বিশেষ কার্যকরী হয়। গত ১লা এপ্রিল তিনি কলকাতার পুলিশ-কমিশনারের দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনের কথা ইতিপূর্ব্বে বলেছি। তিনি অমায়িক ব্যবহার, সদা প্রফুল্লচিত্ত, নিরহঙ্কার এবং অতিথিবৎসল। অবসর সময়ে সাহিত্য, ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, অর্থনীতি বিষয়ক নানা গ্রন্থ পাঠে তিনি আজও আত্মনিয়োগ করে আসছেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর বিবাহ হয়। এক কন্যা ও এক পুত্র, কন্যাটি এখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ অধ্যয়ন করছে। শ্রীমতী ঘোষও স্বামীর সঙ্গে সমাজ-হিতকর কার্য্যে আগ্রহশীল। তিনি বিদুষী।

শ্রীঘোষ এখনও পূর্ণক্ষম। তিনি কলকাতার পুলিশ-কমিশনারের গুরু দায়িত্ব আরও সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ পরিচালনায় কলকাতা মহানগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আরও উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে, এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। তিনি আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে দেশের ও জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন, জগদীশ্বরের কাছে এ প্রার্থনা জানাবো।

## শ্রীদ্বিজোত্তম চট্টোপাধ্যায়

[ পশ্চিমবঙ্গের লেবার কমিশনার ]

মানুষকে সম্যকভাবে চিনতে হলে তার সংস্পর্শে আসা চাই তা না হলে তাকে ঠিকভাবে চেনা যায় না। শ্রীদ্বিজোত্তম চট্টোপাধ্যায় এ রাজ্যের শ্রম-কমিশনার। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের অভাব-অভিযোগ তাঁকে মেটাতে হয়—দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যে ব্যয় করতে হয়। এ কার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন শীতল মস্তিষ্ক, ধৈর্য্য এবং সর্ব্বোপরি কর্ম্ম-কুশলতা। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এ গুণগুলির বিশেষভাবে অধিকারী। শ্রমিক কল্যাণের জন্যেই তিনি নিজেকে সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসর্গ করেছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মেজাজ হ'বে একটা পদস্থ কর্ম্মচারীর ন্যায় কড়া ও দাম্ভিক। কিন্তু এঁর সান্নিধ্যে এসে আমার সে ধারণা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেল। এঁকে যখন সান্নিধ্যে পেলাম, তখন দেখা গেল সরকারী পদস্থ কর্ম্মচারীর মাঝেও একটি পৃথক সজীব ও সুন্দর মানুষ রয়েছে তাঁকে ঘিরে। সত্যিকারের শ্রমিক সমাজের কল্যাণ যাতে সাধিত হয় তাই রয়েছে এঁর ধ্যান ধারণা।

কলকাতার একটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীদ্বিজোত্তম জন্ম-গ্রহণ করেন ইংরেজী ১৯১২ সালে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পিতামহ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি। হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর পিতা শ্রীগুণময় চট্টোপাধ্যায় বাংলার শাসন বিভাগে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। বাল্যকালে শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর পরিবার, পিতামহ ও পিতৃদেবের কাছ থেকে লাভ করেন অনুপ্রেরণা, যা ভবিষ্যৎ-জীবনে তাঁর পাথেয় হয়ে রয়েছে। কর্ম্ম যে সাধনা তা তিনি তাঁর পরিবারের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের পরিবার "আইনজ্ঞ পরিবার" বলে সুপরিচিত। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের তিন ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি, মধ্যম হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট। কিন্তু শ্রীচট্টোপাধ্যায় সরকারী কর্ম্মের দ্বারা জনসাধারণকে যে সেবা করা যাবে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই সরকারী কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও আশুতোষ কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ১৯৩৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সসম্মানে ডিগ্রি লাভ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ ও আইন পড়তে আরম্ভ করেন, কিন্তু জনসেবার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ১৯৪০ সালে তিনি লেবার-অফিসার হিসাবে সরকারী কার্য্যে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং বিলাতে শ্রম-মন্ত্রীর দপ্তরে শ্রমিক-কল্যাণ ও শ্রম-আইন সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ডেপুটি লেবার কমিশনার পদে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে তিনি আই, এ, এস হন এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ২৪ পরগণা জেলার এডিশনাল জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করে ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের লেবার কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রম-দপ্তরের সঙ্গে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বহুদিন সংশ্লিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর। ভারতে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীচট্টোপাধ্যায় একজন বিশেষজ্ঞ বলা চলে নিঃসন্দেহে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন—বিশেষভাবে শ্রমিক আন্দোলন—ভারতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে শ্রীচট্টোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। শ্রমিকরাও এই উন্নতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তারা জানে কেন তারা ধর্ম্মঘট করছে এবং কি কারণে। অতীতে শ্রমিকেরা তাদের নেতৃবৃন্দের উপরেই নির্ভর করেছে বিশেষভাবে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করলেন। এদিক থেকে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীচট্টোপাধ্যায় অমায়িক, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সদালাপী। তিনি খেলাধূলায় বিশেষ আগ্রহশীল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে পরিচিত ছিলেন। অদ্যাবধি তিনি নৌকো চালান ও অন্যান্য খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থাদি পাঠ করতে ভালবাসেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়ে থাকেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ও তাঁকে এ-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। তিনিও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করেন।

শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা নন্দিতা এ বৎসর সসম্মানে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মত নিরলস কর্ম্মী আরও দীর্ঘজীবন লাভ করে দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করুন—এই প্রার্থনাই আমরা করি।

## শ্রীমতী বীণা ভৌমিক ( দাস )

To C. F. ANDREWS, 112, GOWER STREET, LONDON. "Please exert utmost influence in trying immediately to save Miss Bina Das from brutal punishment of transportation to the Andamans. Andaman Commission definitely reported against deportation of women prisioners. Have cabled personally to Lady Jackson." Sd.—Rabindranath Tagore.

ওঁ উত্তরায়ণ

শান্তিনিকেতন

শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা, "কল্যাণীয়াসু, দ্বীপান্তর-বাসের সঙ্কট থেকে কল্যাণীয়া বীণা নিষ্কৃতি পাওয়ায় আমার মন নিরুদ্বিগ্ন হল। তাকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।"

ইতি—স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩।১২।১৯৩২

... ... ...

উক্ত দুইটী পত্র যাঁহার সম্বন্ধে কবিগুরু লেখেন, তিনি হলেন বর্ত্তমান শতাব্দীর ত্রি-দশকের অন্যতম প্রথম সারির বিপ্লবী-তরুণী ও পরবর্ত্তীকালের প্রবীণা দেশসেবিকা শ্রীমতী বীণা ভৌমিক ( দাস )।

আট ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে সপ্তমা বীণা দেবী ১৯১১ সালের ২৪শে আগষ্ট কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺বেণীমাধব দাস প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন। নেতাজী তাঁহার "ভারত-পথিক" পুস্তকে নিজ জীবন গঠনে বেণীমাধববাবুর স্নেহময় প্রভাবের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মাতা পরলোকগতা শ্রীমতী সরলা দেবী বিশেষভাবে নানা সামাজিক কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বেণীমাধববাবুর আদি নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জিলার সারওয়াতলী গাম এবং শ্বশুরালয় হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে।

বীণাদেবীর শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হয় পিতার নিকট—পরে দুই বৎসর বেথুন স্কুলে পড়িয়া তথা হইতে ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, বেথুন কলেজ হইতে আই-এ ও ১৯৩১ সালে ডায়োশেসন কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। পরে বি, টি, পড়ার সময় ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী সিনেট হলে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কন্‌ভোকেশন-এ ভাষণরত চ্যান্সেলার ও তৎকালীন বাঙ্গালার লাট সাহেব স্যার ষ্টানলী জ্যাক্‌সনের প্রতি রিভলবার হইতে গুলী নিক্ষেপ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধৃতা হন। বিচারের সময় ব্যারিষ্টার শ্রীশৈলেন্দ্র সেন ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। আদালতে তৎপ্রদত্ত বিবৃতিটি ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিচারক তাঁহাকে দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ দেন। তাঁহার ভগ্নী দেশসেবিকা শ্রীমতী কল্যাণী দেবী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দ্বীপান্তরের পরিবর্ত্তে বীণা দেবীকে দেশের মধ্যে জেলে আবদ্ধ রাখার জন্য তাঁহার প্রভাব প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করেন। বিশ্বকবির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে প্রথমে শ্রীমতী বীণা ও পরে ( ১৯৩৩ ) শ্রীমতী কল্পনা, শান্তি ও সুনীতি দেবীর দ্বীপান্তর-বাস রদ হয়।

শ্রীমতী ভৌমিকের বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিপ্লব-পন্থী থাকায় তিনি পুরাতন বিপ্লবীদের জীবনী পড়িতেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বইটি তাঁহাকে খুব প্রেরণা দেয়। জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথে তিনি পিতার নিকট হইতে স্বাদেশিকতার ভাব ও স্বদেশকে ভালবাসার উৎসাহ পান। অবশ্য বেণীমাধববাবু ধর্ম্মীয় ভাবাপন্ন হওয়ায় বিপ্লবী কর্ম্মপন্থা পছন্দ করিতেন না। সেজন্য সিনেট হলের ঘটনার পর কন্যার কর্ম্মধারা অনুমোদন না করিলেও, প্রিয়তমা তনয়ার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। কলেজে প্রবেশের সময় তিনি গুপ্ত দলে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন। কিন্তু গভর্ণর জ্যাক্‌সন সাহেবকে হত্যা করার চক্রান্ত তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন। তবে কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন। সাইমন কমিশন বয়কট করার সময় বীণাদেবী বেথুন কলেজের ধর্ম্মঘটে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। তৎকালীন কলেজ-অধ্যক্ষা মিস্ রাইট বোর্ডিং-এর মেয়েদের ক্ষমা চাহিতে অথবা স্থানত্যাগ করিতে আদেশ দেন। তখন শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু ( নেতাজী ) ও শ্রীমতী লতিকা ঘোষ এক সভায় ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজন বোধে ছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ করিতে হইবে। ইহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীমতী ভৌমিক অন্যান্যের সহযোগে ধর্ম্মঘট চালাইয়া যান। ফলে মিস রাইট ( Wright ) পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কলিকাতা গড়পারে থাকার সময় অন্যতম বিশিষ্ট বিপ্লবী পরলোকগত দীনেশ মজুমদার ( বসিরহাট ) ইঁহাদের লাঠিখেলা শিখাইতেন। তিনি দীনেশচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত পরিচিত হন। দীনেশচন্দ্রের অন্যতমা ভগ্নী অধুনা ময়ূরভঞ্জ ( বারিপদা ) নিবাসিনী শ্রীমতী সুধীরা বসুর সহিত বীণা দেবীর খুবই পরিচয় হয়। সেই সময় তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী কল্যাণী দেবী "ছাত্রীসঙ্ঘ" গঠন করেন—ইহাই প্রথম মেয়েদের ষ্টুডেণ্ট এসোশিয়েশন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডঃ রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌রা ইহার অধিবেশনে যোগদান করিতেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি জানান যে, একবার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সাহায্যের জন্য সাক্ষাৎ করিলে, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং বাঙলার অগ্নিযুগের অন্যতম নেপথ্যনায়ক পরলোকগত ভবতোষ ঘটক মহাশয় ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে সহায়তাস্বরূপ যথাসাধ্য ব্যক্তিগত সাহায্য করেন এবং কলিকাতার ব্যবসায়ী মহল হইতেও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া অসাধারণ দেশপ্রেমের পরিচয় দেন।

শ্রীমতী ভৌমিক ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত জেলে আবদ্ধা থাকিয়া প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। বাহিরে আসিয়া তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ইহাকে গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন ও ইহার শ্রমিক-আন্দোলনে নিজেকে সংশ্লিষ্টা রাখেন। ১৯৪০ সালে তিনি দক্ষিণ-কলিকাতা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদিকা নির্ব্বাচিতা হন। ১৯৪২ সালে পুনরায় ধৃতা হইয়া ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ছাড়া পান। তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়া তাঁহার খুব ভাল লাগে।

১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা মহিলা-কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সময় তিনি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থাগুলির সহিত কার্য্যকরীভাবে যুক্ত থাকেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত নোয়াখালি আশ্রমে কাজ করিতেন এবং গান্ধীজির স্নেহলাভ করেন।

মহিলা মাসিক-পত্র "মন্দিরা"-র সহিত বীণাদেবী প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্টা ছিলেন। তিনি শ্রীযতীশচন্দ্র ভৌমিককে বিবাহ করিয়াছেন
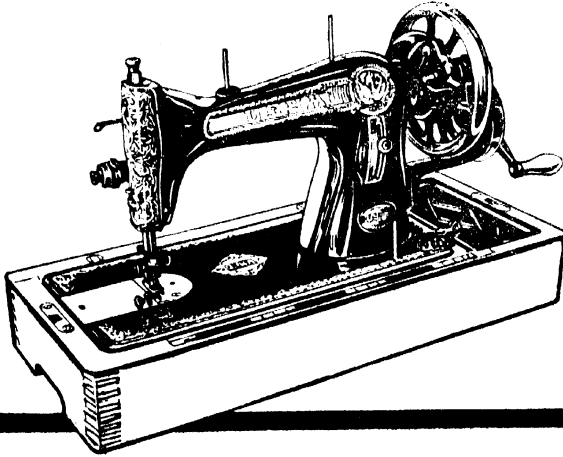
## আকাশপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ—

গ্যাগারিণ ও তিতোভের পর নিকোলায়েভ্ ও পপোভিচ। ১৯৬১ সালে ১২ই এপ্রিল তরুণ রুশ বৈজ্ঞানিক মেজর ইউরি গ্যাগারিণ সর্ব্বপ্রথম মহাশূন্য পরিক্রমার পর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন। আদিকাল হইতে মহাশূন্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মানুষের যে স্বপ্ন, তাহা বাস্তবে পরিণত হইবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেন এই নির্ভীক যুবক। উননব্বই মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার পর আরও উনিশ মিনিট তিনি কক্ষপথে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার চার মাস পরেই মেজর ঘেরমান্ তিতোভের পঁচিশ ঘণ্টা আঠারো মিনিট মহাকাশে অবস্থান এবং সতরবার পৃথিবী পরিক্রমা। রহস্যাবৃত প্রগাঢ় নীলিমার অন্তরালবর্ত্তী মহাশূন্যের সহিত মানুষের পরিচয় এইভাবে ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইতে দেখিয়া পৃথিবীবাসী সেদিন মনোরম বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল—গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণের, অজানাকে জানিবার এবং অদৃষ্টকে দেখিবার দিন নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া তাহারা উৎসাহিত ও আশান্বিত হইয়াছিল। ইহার এক বৎসর পরে নিকোলায়েভ্ ও পপোভিচ এই আশা ও উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন; চন্দ্রলোকের সহিত মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দিন এখন খুবই অদূরবর্ত্তী বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। মহাকাশে দুই জন বৈমানিকের মিলিত বিচরণ, তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর সহিত তাঁহাদের দুই জনের সংবাদ আদান-প্রদান এবারের মহাকাশ-পরিভ্রমণের বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়া, দুই জন মহাকাশচারী তিন দিনেরও বেশী ওজনশূন্য অবস্থায় মহাশূন্যে বিচরণ করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ-মন লইয়া মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বত্রিশ বর্ষ বয়স্ক অবিবাহিত যুবক মেজর নিকোলায়েভ ১১ই আগষ্ট শনিবার দ্বিপ্রহরে মহাকাশ যাত্রা করেন এবং প্রতি সাড়ে আটাশী মিনিটে এক একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। নিকোলায়েভের সমবয়সী একটি কন্যার পিতা লেঃ কর্ণেল পপোভিচ্ রবিবার দ্বিপ্রহরে তাঁহার অনুগামী হন। তিন দিন পরে—১৫ই আগষ্ট বুধবার দ্বিপ্রহরে উভয়ে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়াছেন। নিকোলায়েভ পঁচানব্বই ঘণ্টায় চৌষটিবার এবং পপোভিচ একাত্তর ঘণ্টায় আটচল্লিশ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

## চন্দ্রলোকের পথে—

মহাশূন্যে দুই বা ততোধিক বৈমানিকের মিলিত পরিক্রমণের ব্যবস্থা করিবার কথা রুশ ও মার্কিণ বিজ্ঞানীরা কিছুকাল যাবৎ চিন্তা করিতেছিলেন। চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের জন্য ঊর্দ্ধাকাশে ভাসমান ষ্টেশন স্থাপনের পথে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মার্কিণ বিজ্ঞানীরা মনে করিতেছিলেন যে, আগামী ১৯৬৩ সালের শেষাশেষি একাধিক মহাকাশচারীকে ঊর্দ্ধে পাঠানো তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, এবং তাহার আট বৎসর পরে হয়ত চন্দ্রে মানুষ পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু রকেট নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রবর্ত্তী, এবং তাহার ফলে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা দ্রুততর গতিতে "চন্দ্রের দিকে অগ্রসর" হইতেছেন। আজ পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র দুই জন বৈজ্ঞানিক পৃথিবী পরিক্রমায় সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জন্ গ্লেনই গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অবতরণ করিতে পারিয়াছিলেন। গত মে মাসে স্কট কার্পেণ্টার তিনবার পৃথিবী পরিক্রমার পর নির্দ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা দুই শত মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের জলে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে, রুশ বৈজ্ঞানিক তিতোভ গত বৎসর আগষ্ট মাসেই সতরবার পৃথিবী ঘুরিয়া নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন। এবার নিকোলায়েভ পপোভিচের মহাকাশ পরিক্রমা তো সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মনে গভীর বিস্ময় সঞ্চার করিয়াছে। রুশিয়ার অসাধারণ সাফল্য লক্ষ্য করিয়া স্যার বার্ণার্ড লভেল, মিঃ কেনেথ গাটল্যাণ্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট বৃটিশ বিজ্ঞানীরা মনে করিতেছেন যে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই রুশিয়া চন্দ্রে মানুষ প্রেরণ করিবে।

## রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া—

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ বলিয়াছেন যে, মহাশূন্য সম্পর্কে রুশিয়ার এই গবেষণায় বিন্দুমাত্র সামরিক উদ্দেশ্য নাই—একমাত্র মানব কল্যাণের জন্যই সোভিয়েট ইউনিয়ন এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত এই মর্ম্মের এক প্রস্তাব আছে যে, মহাশূন্য কখনও সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে না। ক্রুশ্চভের উক্তি সেই প্রস্তাব লঙ্ঘিত না হওয়ারই আশ্বাস। বস্তুতঃ, মহাকাশ-সংক্রান্ত গবেষণায় সোভিয়েট ইউনিয়ন যথেষ্ট অগ্রবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও তাহার এই অভিজ্ঞতা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার কোনও ইঙ্গিত এখনও পাওয়া যায় নাই। বরং, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব লঙ্ঘন করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র; সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে সে-ই দুই শত মাইল ঊর্দ্ধে পরমাণবিক পরীক্ষা চালাইয়াছে—ঊর্দ্ধাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা পৃথিবীবক্ষের আধুনিক সংযোগ-ব্যবস্থাগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া শত্রুপক্ষের সামরিক নিষ্ক্রিয়তা আনা সম্ভব কি না, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই প্রশান্ত মহাসাগরে এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। পৃথিবীর (এমন কি, আমেরিকারও) বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ঊর্দ্ধাকাশে এই পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে

মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার পক্ষে ঊর্দ্ধাকাশে পারমাণবিক পরীক্ষা দারুণ বিঘ্নস্বরূপ এবং মহাশূন্যচারীদের পক্ষে বিপজ্জনক। শোনা যায়, স্কট্ কার্পেণ্টারকে নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই মহাকাশে প্রেরণ করা হয়, কারণ মার্কিণ বিজ্ঞানীরা ঊর্দ্ধাকাশে আমেরিকার পারমাণবিক পরীক্ষার পূর্ব্বেই এই অভিযান শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন। নিকোলায়েভ পপোভিচকে মহাকাশে প্রেরণের পূর্ব্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, ঐ সময় ঊর্দ্ধাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হইবে না। যাহা হউক, সোভিয়েট ইউনিয়ন মহাকাশকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিলেও মহাশূন্য সম্পর্কে তাহার তৎপরতায় ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, নিখুঁৎ রকেট নির্ম্মাণে সে আমেরিকা অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রবর্ত্তী ; এই রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তের লক্ষ্যস্থলে নির্ভুলভাবে পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে সে সমর্থ। এই জন্য মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সাফল্য পাশ্চাত্য শিবিরের সমরনায়কদের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে—ইহাকে নির্দ্দোষ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার বলিয়া পশ্চিমের রাজনীতিকরা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ইহা ছাড়া, এই সাফল্যের অসাধারণ রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে সমাজাদর্শের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে ; সমাজতন্ত্রবাদের চ্যালেঞ্জের সমক্ষে পুঁজিবাদ যদি তাহার অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তি প্রতিপন্ন করিতে না পারে, তাহা হইলে শুধু সামরিক বলে উহা স্থায়িত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবে না। মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় পুঁজিবাদী শিবিরের পশ্চাদ্বর্ত্তিতায় তাহার অন্তর্নিহিত নৈতিক অভাব সূচিত হইতেছে ; বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অসাধারণ উন্নতি পৃথিবীর মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করিতেছে—সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য শিবিরের রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে ইহা গভীর মর্ম্মপীড়াদায়ক। ক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন, "সোশ্যালিজম্ ও কম্যুনিজম্ হইতেছে নির্ভরযোগ্য যাত্রাক্ষেত্র, যেখান হইতে মনুষ্যজাতি বিপুল বিশ্বে পরিক্রমায় বহির্গত হইবে।" পাশ্চাত্য শিবিরের প্রচারযন্ত্রের পক্ষে ইহাকে অসার দম্ভোক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বৃথা : কারণ, নিকোলায়েভ্ ও পপোভিচের অতুলনীয় সাফল্যের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া ক্রুশ্চেভ সোশ্যালিজম্, কম্যুনিজমের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সাফল্যের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে'র সখেদ উক্তি,—"আমরা আমাদের যতখানি পশ্চাৎপদ মনে করিতাম, তাহা অপেক্ষা আমরা বেশী পশ্চাৎপদ ; পৃথিবীতে যন্ত্রবিদ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী বলিয়া আমাদের যে খ্যাতি, তাহাই শুধু ইহাতে নষ্ট হয় নাই, মানুষের মন জয় করিবার সংগ্রামেও আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি।"

## ঝঞ্ঝাকেন্দ্র জার্ম্মাণী—

ইউরোপের ঝঞ্ঝাকেন্দ্র জার্ম্মাণী ; তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে এই কেন্দ্র হইতেই হয়ত তাহার সূত্রপাত হইবে। সতর বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণী পরাজিত হইয়াছে ; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার সহিত সন্ধি-চুক্তি হয় নাই—যুদ্ধ-বিরতিকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে জার্ম্মাণীর একাংশে নূতন করিয়া জঙ্গী মনোভাব পুষ্ট হইতেছে। আজ সতর বৎসর পরেও জার্ম্মাণী বিভক্ত এবং তাহার অভ্যন্তরে আত্মঘাতী কলহ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ নির্ব্বাচনের দ্বারা জার্ম্মাণী ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পশ্চিম-জার্ম্মাণীর লোকবল ও শিল্পশক্তিকে সোভিয়েট-বিরোধী সমরায়োজনে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন, এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অতলান্তিক সামরিক জোটের ( ন্যাটোর ) অন্তর্ভুক্ত করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্ম্মাণীর ঐক্যবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা দূর করিলেন। তাহার পর জার্ম্মাণদের প্রতিশোধ-স্পৃহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইল, পরাজিত জার্ম্মাণীর যে সব অংশ সঙ্গতভাবেই পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহা ফিরাইয়া পাইবার জন্য পশ্চিম-জার্ম্মাণবাসীর অন্যায় ও বিপজ্জনক দাবীতে পরোক্ষে উৎসাহ দেওয়া হইতে লাগিল। অথচ, আর একটি বিশ্ব-যুদ্ধ ব্যতীত জার্ম্মাণীর পক্ষে ঐ সব অঞ্চল ফিরিয়া পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বস্তুত: পশ্চিম জার্ম্মাণীকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করিবার পর সেখানে জঙ্গী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা করা হইয়াছে ; জার্ম্মাণ যুবকদের মনে যুদ্ধের দ্বারা "জাতীয় দাবী" পূরণের অলীক স্বপ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছে, শাসনক্ষেত্রে ও সমরবিভাগে হিটলারের সহযোগী প্রাক্তন নাৎসী নেতাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র দেশে আপোষবিরোধী আক্রমণাত্মক মনোভাব গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পশ্চিম-জার্ম্মাণীর নেতৃবৃন্দ এখন পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য জিদ ধরিয়াছেন, কারণ, এই অস্ত্র ব্যতিরেকে জার্ম্মাণীর অস্ত্রসজ্জা অপূর্ণ বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

সন্ধি-চুক্তির প্রস্তাব—জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি-চুক্তি না করিয়া তাহার একাংশকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের এই মারাত্মক প্রচেষ্টা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের দাবী জানাইয়াছে। ১৯৫৮ সালে সর্ব্বপ্রথম সে এই দাবী জানাইয়াছিল, তাহার পর, গত বৎসর ভিয়েনায় প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সহিত মিঃ ক্রুশ্চভের সাক্ষাতের সময় এই সম্পর্কে এক স্মারকলিপি প্রদান করা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাব—জার্ম্মাণীর দুই অংশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি-চুক্তি করিতে হইবে ; পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর শতাধিক মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত যে পশ্চিম-বার্লিনে বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্ব, তাহাকে নিরস্ত্রীকৃত স্বাধীন নগরীতে পরিণত করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করেন না—উহা স্বীকার করিলে বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর পূর্ব্ব সীমান্তও স্বীকার করিতে হয়, যাহার বিরুদ্ধে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জঙ্গী দাবী তাহাদের প্রশ্রয়পুষ্ট। যাহা হউক, ক্রুশ্চভের প্রস্তাবের প্রথমাংশ অর্থাৎ জার্ম্মাণীর দুই অংশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির প্রশ্ন অপরিবর্ত্তনীয়। এই দুইটি অংশ গত সতর বৎসর স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হইয়াছে, বাস্তবক্ষেত্রে ইহাদের বিভেদ সম্পূর্ণ, এই দুই অংশ লইয়া একমাত্র কনফেডারেশন ( স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌমত্ব সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্র ) গঠিত হইতে পারে, যে ব্যবস্থার সহিত জার্ম্মাণ রাজনীতির ঐতিহ্যগত যোগ আছে। বার্লিন সম্পর্কে ক্রুশ্চভ এবং পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইবে না, এই সম্পর্কে সঙ্গত গ্যারাণ্টির ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। জার্ম্মাণী ও বার্লিন সম্পর্কে ক্রুশ্চভের এই প্রস্তাবের পরিশিষ্টে বলা হইয়াছিল যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যদি এই বিষয়ে মীমাংসায় আগ্রহী না হন, তাহা হইলে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তাহার সমর্থক অন্যান্য রাষ্ট্র পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর সহিত স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করিবে, যাহার ফলে জার্ম্মাণীর ঐ অংশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিবে। তখন পূর্ব্ব-জার্ম্মাণ রাজ্যের মধ্য দিয়া বার্লিনের সহিত সংযোগ রক্ষার ব্যাপারে এবং পশ্চিম-বার্লিনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে তাহাদের অনস্বীকৃত পূর্ব্ব-জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের সহিত ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

বার্লিন সম্পর্কে অনমনীয়তা—বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহার মূল প্রস্তাব সংশোধনে সম্মত হইলেও, পশ্চিম-বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব হ্রাসের জন্য তাহার দাবী অপরিবর্ত্তনীয়। কারণ, কম্যুনিষ্ট এলেকার অভ্যন্তরে এই পকেটটি পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সামরিক পর্য্যবেক্ষণের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটীরূপে কাজ করে। যাহা হউক, পশ্চিম-বার্লিনের সহিত সংযোগ রক্ষার ব্যাপারে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই ব্যবস্থায় সম্মত হন যে, সংযোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিশন গঠিত হইবে, যে কমিশনে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীরও প্রতিনিধি থাকিবেন। কিন্তু পশ্চিম-বার্লিনকে নিরস্ত্রীকৃত নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করার ব্যাপারে তাঁহারা অত্যন্ত অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের জিদ—বিজয়ী শক্তিরূপে তাঁহারা বার্লিনে সৈন্য রাখার যে অধিকার পাইয়াছেন, তাহা ত্যাগ করা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত নন। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের এই অনমনীয় মনোভাবের জন্য বার্লিনের প্রশ্নে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ; শেষ পর্য্যন্ত ইহার ফল মারাত্মক হইয়া ওঠা অসম্ভব নয়। ক্রুশ্চভ বলিয়াছেন যে, পশ্চিম-বার্লিনের অধিবাসীর জীবনযাত্রার স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হইলে সেখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেনাবাহিনী থাকিতে পারে—"ন্যাটো" শক্তিবৃন্দের সৈন্য সেখানে কিছুতেই থাকিতে পারে না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—"ন্যাটো" কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সামরিক সংস্থা। এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সামরিক বিন্যাস পরোক্ষভাবে ন্যাটোরই কর্ত্তৃত্বাধীন। সেই সব রাষ্ট্রের সৈন্য যদি কম্যুনিষ্ট এলেকার অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তী সামরিক কেন্দ্ররূপে কাজ করে, তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী তথা সমগ্র কম্যুনিষ্ট শিবিরের পক্ষে নিজেকে নিরাপদ মনে করা কখনও সম্ভব নয়। ক্রুশ্চভের এই উক্তির যুক্তিসঙ্গত তাৎপর্য্য উপলব্ধি না করাটা আপোষ-বিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করেন কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

## আলজেরিয়ায় শান্তি—

দীর্ঘ আট বৎসরের রক্ত ও অশ্রুতে স্নাত স্বাধীন আলজেরিয়া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সূতিকাগৃহেই ভয়ঙ্কর, আভ্যন্তরীণ বিরোধে বিপন্ন

হইয়া উঠিয়াছিল। আল্‌জেরিয়ার যে নয় জন বিশিষ্ট নেতা ১৯৫৪ সালে সশস্ত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়াছিলেন, বেন্ বেল্লা এবং বেল কাসেম্ করিম তাঁহাদের দুই জন। বেন্ বেল্লা ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মী গত ১৯৫৬ সাল হইতে ফরাসী কারাগারে ছিলেন, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এভিয়ন চুক্তি অনুসারে তাঁহারা মুক্তি পান। পক্ষান্তরে বেল্ কাসেম্ করিম বাহিরে থাকিয়া বরাবর কঠোরতম সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন এবং প্রথমে ফারাৎ আব্বাসের প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে ও পরে বেন্ খেদ্দার সময়ে ফরাসীদের সহিত আপোষ-আলোচনাও চালাইয়াছিলেন। গত মার্চ্চ মাসে সম্পাদিত যে এভিয়ন চুক্তি অনুসারে আল্‌জেরিয়ার স্বাধীনতার এবং স্বাধীন আল্‌জেরিয়ার সহিত ফ্রান্সের সহযোগিতার ব্যবস্থা হয়, তাহা প্রধানতঃ বেল কাসেম করিমেরই কীর্ত্তি। বেন্ বেল্লা কারাগার হইতে এই চুক্তি সমর্থন করিলেও উহাতে আল্‌জেরিয়ান্ ফরাসীদের বিশেষ অধিকারগুলির স্বীকৃতি তাঁহার মনঃপূত ছিল না। ইহা ছাড়া, ও-এ-এস্ নামক ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারীদের গোপন সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠানটির সহিত করিম-খেদ্দা এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন; ইহাতেও বেন্ বেল্লা অসন্তুষ্ট হন। এই সন্ধি ও অসন্তোষের জন্য বেন্ বেল্লার জিদ—স্বাধীন আল্‌জেরিয়া গঠনের ভার খেদ্দা ও বেল্ কাসেম্ করিম এবং তাঁহাদের সহযোগীদের হাতে কখনও ছাড়িয়া দিবেন না। গত জুন মাসে লিবিয়াতে যখন আল্‌জেরিয়ান্ জাতীয় পরিষদের বৈঠক হয়, তখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে স্বাধীন আল্‌জেরিয়া গঠনের জন্য বেন্ বেল্লা যে কর্ম্মসূচী উপস্থাপিত করেন, তাহা খেদ্দা-করিম মানিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু বেল্লা যখন লিবারেশন ফ্রণ্টের (এফ-এল-এনের) পলিট্ ব্যুরো বা পরিচালকমণ্ডলী গঠনের জন্য শুধু তাঁহার সমর্থকদের নাম প্রস্তাব করেন, তখন পরিষদের বৈঠকে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। গত ৩রা জুলাই ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এই বিরোধই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজনৈতিক নেতাদের বিরোধে সেনাবিভাগ সংক্রমিত হওয়ায় এক সময় আল্‌জেরিয়ায় গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। শেষ পর্য্যন্ত বেন্ বেল্লার প্রস্তাব অনুসারেই পলিট্ ব্যুরো গঠিত হইয়াছে, তবে ইহা জাতীয় পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই আল্‌জেরিয়ায় গণ-পরিষদের নির্ব্বাচন হইবে। আশা করা যায়, ইহার পর আল্‌জেরিয়ায় গৃহ-বিবাদ আর প্রবল হইয়া উঠিবে না।

—"মিহির"

অন্তর্দেশীয়—

১লা শ্রাবণ (১৭ই জুলাই): অর্থাভাবে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার কার্য্য ব্যাহত—উন্নয়ন সংস্থা চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেন কর্ত্তৃক অসন্তোষজনক আর্থিক অবস্থার বর্ণনা।

২রা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই): 'লাডাক সীমান্ত রক্ষার জন্য ব্যবস্থা জোরদার করা হইতেছে'—চণ্ডীগড়ে ভারতের দেশরক্ষা সচিব শ্রীভি, কে, কৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

৩রা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই): দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মাদ্রাজে রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলন—বিক্ষোভকারী দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম দলের ছয় সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার—স্থানে স্থানে পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ও লাঠি চালনা।

৪ঠা শ্রাবণ (২০শে জুলাই): পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ বাজেটে সীমান্তের জন্য অতিরিক্ত ৭৫ লক্ষ টাকা ও অস্ত্রাদির জন্য ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ।

জাতীয় কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের শুভ-সূচনা—কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরে (অমর কবির জন্মভিটা) জয়ন্তী অনুষ্ঠান।

৫ই শ্রাবণ (২১শে জুলাই): কলিকাতা মহানগরীকে আবর্জনামুক্ত করার অভিযান সুরু—রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, মেয়র প্রভৃতি কর্ত্তৃক অভিযানে উৎসাহদান।

ডুমরাঁও ষ্টেশনে (পাটনার অদূরে) ভয়াবহ ট্রেণ দুর্ঘটনা—মালগাড়ীর সহিত ডাউন অমৃতসর-হাওড়া মেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ—৬১ জন যাত্রী নিহত ও ৫৭ জন আহত।

৬ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই): পূর্বপাকিস্তানভুক্ত যশোহর, খুলনা ও ত্রিপুরা জেলার ভারতভুক্তি দাবী—পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির উদ্যোগে আহূত জনসভায় (কলিকাতা) প্রস্তাব।

৭ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই): পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) সচিব শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের (৬২) কলিকাতায় জীবনাবসান।

৮ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই): কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সঙ্কটের মাত্রা বৃদ্ধি—দুর্গাপুরে ডি, ভি, সি'র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুইটি ইউনিটই বিকল।

৯ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই): বিদ্যুৎ সঙ্কট এড়াইবার জন্য বৃহত্তর কলিকাতায় আঞ্চলিক বিদ্যুৎ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের নয়া পরিকল্পনা।

নেতাজীর অবমাননাকর প্রবন্ধ লেখার জন্য কলিকাতার আদালতে শ্রীমতী প্যাট লার্গে (বোম্বাই) দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত।

১০ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই): 'তৃতীয় যোজনা শেষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় শিল্পনগরী গড়িয়া তোলা হইবে'—রাজ্য-সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই): বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা অভিযান।

জাল ও ভেজাল ঔষধের ব্যবসা সম্পর্কে তদন্তের জন্য রাজ্য সরকার (পশ্চিমবঙ্গ) কর্ত্তৃক কমিশন নিয়োগ। চেয়ারম্যান: স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায়।

১২ই শ্রাবণ (২৮শে জুলাই): স্বর্গত জননেতা ডাঃ বিধানচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনার্থ শ্রীনেহরুর কলিকাতা আগমন।

১৩ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই): কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সভায় প্রধান মন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) ভাষণ—ডাঃ রায়ের স্বপ্নবিজড়িত কলিকাতা নগরীর উন্নয়ন সাধনই প্রধানতম দায়িত্ব।

১৪ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই): বিভিন্ন রাজ্যে মূল্য বৃদ্ধি ও নূতন করের বিরুদ্ধে নানাস্থানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ—আমেদাবাদ ও বরোদায় হরতাল ও হাঙ্গামা—ভূপালে ১৮ জন এম্-এল-এ সহ ২০৬ জন গ্রেপ্তার।

১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই): সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগ (কলিকাতা) চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রশ্ন অমীমাংসিত—সব কয়টি খেলা (২৮ টি) শেষেও মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের সমান পয়েন্ট (৪০ পয়েন্ট করিয়া) লাভ।

১৬ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট): পাটনায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব ডাঃ সুশীলা নায়ারের ঘোষণা—ভেজাল ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় নরহত্যার সমতুল্য।

১৭ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় তুমুল হট্টগোল ও উত্তেজনা—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের (শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন) বক্তৃতাকালে বিরোধী সদস্যদের প্রবল বাধাদান।

১৮ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট): 'গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তভার সরকারের হাতে লওয়া উচিত'—বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশনের সুপারিশ—বিভিন্ন গলদ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য।

১৯শে শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট): সীমান্ত অঞ্চলে (পশ্চিমবঙ্গ) পাক্ হানা ও অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত—রাজ্য বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বেসরকারী প্রস্তাব গ্রহণ।

২০শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট): কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির বৈঠকে (দিল্লী) চীনা ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর মন্তব্য—'লাডাকের অবস্থা গুরুতর: সংঘর্ষের আশঙ্কা রহিয়াছে।'

২১শে শ্রাবণ (৬ই আগষ্ট): পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির (বিহার উড়িষ্যা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ) মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের (পশ্চিমবঙ্গ) অভিনব উদ্যম—সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট নির্দিষ্ট প্রস্তাব সমেত পত্র প্রেরণ।

২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট): মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সহিত মাধ্যমিক শিক্ষক প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাক্ষাৎকার—শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে আলোচনা।

২৩শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট): রাজ্যভুক্ত খনিসমূহ হইতে কয়লা উত্তোলনে পশ্চিমবঙ্গের স্বাধিকার লাভ—সুপ্রীম কোর্টে মামলা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রের সহিত রাজ্য সরকারের বিরোধ মীমাংসা।

২৪শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট): মধ্য প্রদেশে কর বিরোধী বিক্ষোভের জের—প্রজা সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীকামাথ সহ ২৫৬ জন গ্রেপ্তার।

ইংরাজীকে ভারতের সহকারী রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যমের বিরোধিতা—দিল্লীতে সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলনে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত।

২৫শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট): ব্রীজের ফাঁক দিয়া রাস্তার উপর ইঞ্জিন পতন—দমদম জংশনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের আন্দোলনের (ছাত্র নির্যাতন বিরোধী) সমর্থনে কলিকাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘট—পাক্ ডেপুটি হাই-কমিশনারের অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ।

২৬শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট): মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবী (পেন্সন, জীবন-বীমা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি সংক্রান্ত) না মানিলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অবধারিত—দিল্লী বৈঠকান্তে সারা ভারত মাধ্যমিক শিক্ষক ফেডারেশনের ঘোষণা।

২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট): পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উন্নয়নের প্রথম 'প্যাকেজ' প্রস্তাব—বর্দ্ধমান সহরের উপকণ্ঠে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক উদ্বোধন।

২৮শে শ্রাবণ (১৩ই আগষ্ট): কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কয়লাখনি শিল্পের জন্য নূতন বেতন বোর্ড গঠন—চেয়ারম্যান: শ্রীসেলিম মার্চেণ্ট।

ত্রিপুরা সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশ।

২৯শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট): '১৯৬৫ সালের পরও ইংরাজী সহযোগী ভাষা থাকিবে'—সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

গণজীবনের মান উন্নয়নে সুসংবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থা গঠনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের আহ্বান—স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির প্রতি বাণী।

৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট): ভাবগম্ভীর পরিবেশে কলিকাতা সহ ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন—শ্রীপান্নালাল দাসগুপ্ত সমেত দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীদের (পশ্চিমবঙ্গ) মুক্তিলাভ।

৩১শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট): সাত মাসে (জানুয়ারী—জুলাই, ১৯৬২) ১১ শত ট্রেণ দুর্ঘটনা—লোকসভায় সরকার পক্ষের বিবৃতি।

৩২শে শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট): ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ত্রিপুরা সীমান্ত রক্ষার ভার গ্রহণ—দেশরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

## বহির্দেশীয়—

১লা শ্রাবণ (১৭ই জুলাই): বৃটেনের বর্তমান পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নির্বাচনের দাবী—ম্যাকমিলান মন্ত্রিসভার বিপর্যয়ের পর বিরোধী শ্রমিক দলের প্রস্তাব।

২রা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই): পেরুতে সামরিক অভ্যুত্থান—সৈন্যবাহিনী কর্তৃক প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ, পার্লামেণ্ট প্রভৃতি দখল—প্রেসিডেণ্ট প্রাডো গ্রেপ্তার।

৩রা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই): মহাকাশের মধ্য দিয়া মার্কিণ কৃত্রিম উপগ্রহ 'টেলষ্টার' মারফৎ বার্তা প্রেরণের অভিনব উদ্যম—নিউইয়র্ক হইতে প্রেরিত সংবাদ লণ্ডনে ধৃত।

৫ই শ্রাবণ (২১শে জুলাই): লাওসের নিরপেক্ষতা রক্ষা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদিত—আনন্দপূর্ণ পরিবেশে জেনেভার ১৪-জাতি লাওস সম্মেলনের সমাপ্তি।

৬ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই): খুলনায় বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের লাঠিচালনা—দুইজন কেন্দ্রীয় পাক্ সচিবের সম্বর্দ্ধনাকালে কৃষ্ণপতাকা ও পাদুকা সঞ্চালন।

৭ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই): ভারতস্থ প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশগুলির (পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল ও ইয়ানন) আইনতঃ হস্তান্তর—ফরাসী সেনেটে শেষ পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট চুক্তি অনুমোদন।

১০ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই): আলজিরিয়ার মহম্মদ বেনখেদ্দা (উপ প্রধান মন্ত্রী) দল কর্তৃক আলজিরীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা—ওরানে বেন বেল্লার পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদর কার্য্যালয় স্থাপন।

১৪ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই): 'এড ইণ্ডিয়া ক্লাব' কর্তৃক তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্বিতীয় বৎসরে ভারতকে আরও ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি—পশ্চিমীদের প্রতিশ্রুত মোট সাহায্যের পরিমাণ ১০৭ কোটি ডলার।

১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই): ওলন্দাজ ইন্দোনেশীয় বৈঠকে (ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত) পশ্চিম-ইরিয়ান বিরোধ সম্পর্কে বোঝাপড়া—১৯৬৩ সালের মে মাসের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার হাতে ইরিয়ানের হস্তান্তর।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নূতন মালয়েশিয়া রাষ্ট্র (ফেডারেশন) গঠনের উদ্যোগ—বৃটেন ও মালয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত।

১৮ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট): সীমানা (পাকিস্তানের সহিত) নির্দ্ধারণের কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা—পূর্ব পাকিস্তান, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারীদের বৈঠকান্তে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার।

২০শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট): রাশিয়া কর্তৃক পুনরায় ৪০ মেগাটনী বোমা বিস্ফোরণ—বায়ুমণ্ডলে দ্বিতীয় বৃহত্তম আণবিক পরীক্ষা।

তিন শত বৎসর বৃটিশ শাসনাধীনে থাকার পর জামাইকার স্বাধীনতা লাভ।

২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট): বেন খেদার নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী আলজিরীয় সরকারের সকল ক্ষমতার অবসান—উপ প্রধান মন্ত্রী বেন বেল্লার পলিটিক্যাল ব্যুরোর হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত।

২৫শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট): কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মধ্যস্থতার চেষ্টা—করাচীতে সাংবাদিকদের নিকট পাক্ পররাষ্ট্র সচিব মহম্মদ আলির ইঙ্গিত।

বনগাঁ (পশ্চিমবঙ্গ) হইতে দেড় শত গজের মধ্যে পাকিস্তানী সশস্ত্র ফৌজ কর্তৃক পরিখা খনন।

২৬শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট): ভোস্তক-৩ যোগে সোভিয়েটের তৃতীয় মহাশূন্যচারীর (মেজর নিকোলায়েভ) মহাশূন্য পরিক্রমা—প্রতি সাড়ে ৮৮ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ।

২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট): আরও একজন রুশ মহাশূন্যচারীকে (কর্ণেল পেপোভিচ) পৃথিবী প্রদক্ষিণ কক্ষে স্থাপন—মহাকাশে নিকোলায়েভ ও পোপোভিচের ঐতিহাসিক সংলাপ—বিশ্বের সর্বত্র বিস্ময়ের সঞ্চার।

২৯শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট): দুই জন সোভিয়েট মহাশূন্যচারীর যুগপৎ পৃথিবী পরিক্রমা অব্যাহত।

৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট): রুশ মহাকাশচারীদ্বয়ের সুস্থ-দেহে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ—গ্রহান্তরে অভিযানের দিন আসন্ন বলিয়া রুশ সরকারের দাবী।

৩২শে শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট): ১লা অক্টোবর (১৯৬২) হইতে পশ্চিম ইরিয়ানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাসন বলবৎ—ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার রিক্‌হেয়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ টীমের সুপারভাইজার নিযুক্ত।

# শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে

শ্রীঅখিল নিয়োগী

সে কতকাল আগের কথা—আর্ট থিয়েটার যখন রাতারাতি দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"র অভিনয়-স্বত্ব ক্রয় করে নিলেন—তখন অক্লান্ত-কর্ম্মী স্বপ্নদ্রষ্টা শিশিরকুমার এতটুকু দমে না গিয়ে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে নতুন 'সীতা' রচনা করিয়ে মনোমোহন থিয়েটারে অভিনয় করাতে লাগলেন।

মনোমোহন থিয়েটার ছিল বিডন ষ্ট্রীট আর সেণ্ট্রাল এভেনিউয়ের সঙ্গম স্থানে। মনোমোহন থিয়েটারকে ভেঙ্গে ফেলে সেণ্ট্রাল এভেনিউ নিজের পথ করে নিয়েছে।

কিন্তু তখনকার দিনে দেশের নাট্যরসিকবৃন্দ—"কার কার কণ্ঠস্বর" শোনবার জন্যে এই মনোমোহন থিয়েটারে দিনের পর দিন ভীড় করে দাঁড়াতেন। তখন আমরা কলেজের ছাত্র। তখনো শিশিরকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। আসল জানাশোনা হল নাট্যাচার্য্যের আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার পর।

শিশিরকুমারের অধিনায়কতায় যোগেশচন্দ্রের "বিষ্ণুপ্রিয়া" অভিনীত হবে—রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আমেরিকা-ফেরৎ সতু সেন। এই সদা-কাজে-ব্যস্ত সতু সেনই আমায় সর্বপ্রথম আলাপ করিয়েদিলেন শিশিরকুমারের সঙ্গে।

তখন ছবি আঁকাটাই আমার পেশা ছিল। কিছু দিন আগে সরকারী শিল্প-বিদ্যালয় থেকে কমার্শিয়াল আর্ট শিখে থিয়েটার-সিনেমায় পোষ্টার আঁকছি, নজরুল, অচিন্ত্য, প্রবোধ প্রভৃতি তরুণ লেখকদের বইয়ের প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করছি, আর সন্ধ্যেবেলায় রূপবাণীর প্রচার-দপ্তর পরিচালনা করছি। ছবি আঁকার কথা শুনে শিশিরকুমার খুসী হলেন। বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন।

স্বয়ং শিশিরকুমারের স্বাগত আহ্বান—তখনকার দিনে এর চাইতে বড় সম্মান আর কি হতে পারে? তখনকার দিনে সংস্কৃতির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ছিলেন—শিশিরকুমার। তাঁকে ঘিরে প্রায় সন্ধ্যায় মজলিশ বসত। সেখানে হাজির হতেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী চারু রায়, শিল্পী যামিনী রায়, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। এই আলোচনা-সভায় দেশী-বিদেশী সাহিত্যের, নাটকের অনুশীলনের কত যে আলোচনা হত—তার যেন শেষ ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই আলোচনা-সভায় উপস্থিত থাকলে মনে হত, জ্ঞানের ভাণ্ডার বুঝি পূর্ণ হয়ে গেল।

তখন আমরা ছিলাম শ্রোতা। কথা বলতাম না। শুধু সেই গুণী-জন-সভার একপাশে নীরবে নিজের ঠাঁই করে নিতাম। যেদিন অন্য কাজের তাগিদে আসতে পারতাম না—রাত্রিতে শোবার সময় মনে হত,—আজকের দিনটি বুঝি বৃথায় গেল।

এই সময়টার বেশ কিছুদিন বাদে—শিশিরকুমার আমায় একদিন ডেকে পাঠালেন। শিশিরকুমারের সদয় আহ্বান! সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে হাজির হলাম। যেন সৌর জগতের সভা বসেছে। শিশিরকুমারকে ঘিরে তখনকার দিনের দিক-পালদের আলোচনা চলছে।

নাট্যাচার্য্যআমাকে দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, আসুন নিয়োগী মশাই। আমি একটা নতুন কাজে হাত দিয়েছি,—আপনাকে সাহায্য করতে হবে। শিশিরকুমারকে সাহায্য করবো, এ ত নিজেরই গৌরবের কথা।

শিশিরকুমার আলোচনা-চক্র থেকে উঠে এসে—আমাকে নিয়ে একটু আড়ালে গেলেন। তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" গল্পটিকে সিনেমার রূপ দিচ্ছি। এই নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনার সমস্ত দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।

"শেষ অঙ্ক"এর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর।

ইতিপূর্বে টালিগঞ্জের সিনেমা-জগতে কিছু কিছু দৃশ্য ও পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করেছি। তাই বিন্দুমাত্র না ভেবে উত্তর দিলাম;—নিশ্চয়ই। আপনার যদি কোনো কাজে লাগতে পারি—তা'হলে নিজেকে সত্যি গৌরবান্বিত মনে করবো।

শিশিরকুমারের একটি অনুরোধ যে আমাদের কাছে কতখানি ছিল—সে কথা আজ এতদিন পরে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

এই "বিচারক" গল্পের চিত্ররূপ ও দৃশ্যপট নিয়ে অনেক সন্ধ্যা শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে কাটাতে হয়েছে। তাতে মানুষটির অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। আর শুধুই কি জ্ঞান?—সেই সঙ্গে আনন্দ বিতরণ। বুঝি তার তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" নির্বাক ছবিরূপে জন্মলাভ করেছিল। আজকের দিনের দর্শকেরা অনেকেই সে কথা জানেন না।

শিশিরকুমার রঙমহলে ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের পালা সাঙ্গ করে বেশ কিছু দিন প্রবোধচন্দ্র গুহের সহযোগিতায় নাট্য-নিকেতনে সদলবলে যোগদান করেন। এইখানেই প্রথম নীহারবালা ও রাণীবালা তাঁর কাছে অভিনয় শিক্ষা করবার সুযোগ লাভ করেন।

শিশিরকুমার কি ভাবে অভিনয় শিক্ষাদান করতেন—সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটেছিল নাট্য নিকেতন মঞ্চে।

প্রতি সন্ধ্যায় তিনি ছোট-বড় সবাইকে অভিনয় কলা শিক্ষাদান করতেন। অতি নগণ্য দূত, প্রহরী আর দৌবারিক থেকে সুরু করে রাজা-রাণী, বাদ্‌শা-বেগম সবাইকেই তিনি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাদান করতেন।

এই শিক্ষাদান কার্য্যে কখনো তাঁকে ক্লান্ত হতে কিম্বা বিরক্ত হতে দেখিনি।

একজন দূত কি ভাবে মঞ্চে প্রবেশ করে কুর্ণিশ করে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াবে—এই বিষয়টি যে তিনি নিজে বার-বার আসা-যাওয়া করে কতবার দেখাতেন—তা গণনা করে শেষ করা যেত না! আমরা—যারা প্রেক্ষাগৃহে বসে এই শিক্ষাদান-প্রণালী দেখতাম—তারা মাঝে মাঝে দূতের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠতাম।

কিন্তু শিশিরকুমার নির্বিকার। তাঁর মুখে এতটুকু বিরক্তির ছাপ নেই! যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্পী সর্বদোষমুক্ত না হবে—তিনি কিছুতেই তাকে ছাড়বেন না। এ ব্যাপারে তাঁর ধৈর্য্য দেখে আমাদের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকৃত না। নামকরা শিল্পী—তাঁদেরও এব্যাপারে রেহাই ছিল না। "ষ্টেজে মেরে দেবো"—এই কথাটিকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। "অনুশীলন করে—আয়ত্ত করো"—এইছিল তাঁর মূল-মন্ত্র।

অধ্যাপনার কাজে যেমন তিনি ছাত্রদের অনুশীলন করাতেন, ঠিক তেমনি মঞ্চের ওপর বিভিন্ন শিল্পীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতেন।

রাণীবালা তাঁকে গুরুরূপে পেয়েছিলেন বলেই পরবর্ত্তী জীবনে অভিনয়ে এত বেশী সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলেন।

এইভাবে কত শিল্পীকে যে তিনি গড়ে-পিটে 'মানুষ' করেছিলেন, সে খবর নাট্যামোদীরা অনেকেই রাখেন না। শৈলেন চৌধুরী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, নীতীশ মুখোপাধ্যায়—অনেকেই তাঁর ছাত্র।

শিশিরকুমারের অবসর যাপনের প্রথা ছিল সম্পূর্ণ আর এক ধরণের। বিশ্বরূপা মঞ্চের পেছন দিকে যে কোয়ার্টার, সেইখানে শিশিরকুমার থাকতেন। বেশ কিছুদিন ওখানে বাস করেছেন নাট্যনিকেতনের প্রবোধচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা। তারপর এখানে নীড় বাঁধেন নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার।

শিশিরকুমারের কাছে এই কোয়ার্টারে মাঝে মাঝে যেতাম।

যখনি গিয়ে হাজির হয়েছি—দেখেছি,—একটা লুঙ্গী পরে ইজি-চেয়ার কিম্বা ক্যাম্বিসের চেয়ারে শুয়ে শিশিরকুমার বিদেশী নাটক পড়ছেন। মুখে ধরা আছে মোটা চুরুট।

এই ঘরোয়া পরিবেশে তাঁকে যখন-তখন দেখবার সুযোগ পেয়েছি বলেই তাঁর এই মুখখানিই সব সময় মনে পড়ে। এই সময় তিনি কত রকম মজার মজার গল্প করতেন। দেশী-বিদেশী কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। যখন-তখন ইচ্ছে মত তিনি আমাদের আবৃত্তি শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিতেন।

কাব্য নিয়ে অলস স্বপ্ন দেখার সেই সোনালী-রূপোলী দিনগুলি আমাদের জীবনে আর ফিরে আসবে না।

শিশিরকুমার যাঁকে স্নেহ করতেন—অভিনয় দেখার জন্য 'পাশ' দেবার ব্যাপারে তাঁর সম্পর্কে একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন।

সুপ্রিয়া চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

এ ব্যাপারে আমি নিজে একজন প্রধান সাক্ষী। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কত ভাবে যে তাঁকে বিব্রত করেছি—আজকের দিনে ভাব্তে বস্লে সঙ্কোচের সীমা থাকে না।

কিন্তু মজার কথা এই যে, কখনো তিনি আমায় বিমুখ করেননি। আমার দিক থেকে সকল রকম উপদ্রব তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন।

এই সময়ে আমি একবার একটা প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

আমার প্রস্তাবটা ছিল, তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী ছেলেবেলা থেকে গল্প করে বলে যাবেন—আমি সেগুলো নোট করে নেবো। তারপর গল্পের মতনই সহজ ভাষায় লিখে তাঁকে অবসর সময়ে শোনাবো। তিনি সেই লেখা মঞ্জুর করলে আবার নতুন করে গল্প শোনার পালা শুরু হবে। এইভাবে তাঁর বিচিত্র জীবনী গল্পের ভেতর দিয়ে লেখবার আমার বাসনা ছিল। গবেষণা নয়,—গল্পের জীবনী।

প্রথমে তিনি সম্মত হন নি। শেষে আমার অনুরোধে রাজি হয়েছিলেন।

পরে অবশ্য তাঁর কয়েকজন চ্যালা-চামুণ্ডার প্রবল আপত্তিতে এই পরিকল্পনা ভেসে যায়। আমি যদি আদা-নুন খেয়ে লেগে থাকতে পারতাম—তা হলে বোধ করি শিশিরকুমারের জীবনের অনেক মজার মজার গল্প আদায় করে নিতে সক্ষম হতাম।

শিশিরকুমারকে ছোটদের মাঝখানে নিয়ে এসে গল্প বলানোর একটা পরিকল্পনাও আমার ছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অবনীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে বাঙলা দেশের অনেক প্রবীণ জ্ঞানী-গুণী বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে শোভাবাজার-রাজবাড়ীতে আমি গল্পের আসর বসিয়েছিলাম।

"কাঁচাপাকা" চিত্রে—মলয়া সরকার।

য়্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র সম্পর্কিত একটি অধিবেশনে লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী, সত্যজিত রায়, জগন্নাথ কোলে প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

শিশিরকুমারকেও আমি সম্মত করিয়েছিলাম। কিন্তু তথা-কথিত সাঙ্গ-পাঙ্গদের ষড়যন্ত্রে আমার সেই সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য-মণ্ডিত হতে পারেনি!

শিশিরকুমার সম্পর্কে আর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। আমাদের দেশে একটি চলতি কথা আছে যে, নষ্টচন্দ্র দেখলে অখ্যাতি রটে। কিন্তু নষ্টচন্দ্র না দেখেও একবার আমার নিন্দা ছড়িয়ে পড়েছিল—শিশিরকুমারের দৈনন্দিন বৈঠকে।

ব্যাপারটা ভেবে দেখ্তে গেলে হাস্যকর সন্দেহ নেই।

কে একজন সমালোচক "শ্রীঅ" নাম দিয়ে একটি সাময়িক পত্রিকায় অত্যন্ত কঠোর ভাষায় শিশিরকুমারের সমালোচনা করে-ছিলেন। শিশিরকুমারের মজলিশে প্রত্যহ আসা-যাওয়া করেন—এমন দু'একজন ব্যক্তি এই নিয়ে শিশিরকুমারের কান ভারী করেন এই "শ্রীঅ" যে আমি ছাড়া আর কেউ নয়—এই কথাটাই তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

পরে অবশ্য শিশিরকুমার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং ওই লেখা যে আমার নয়—সে কথা নিঃসন্দেহে জানতে পেরে লজ্জিতও হয়েছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে কোনো কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে এক-সঙ্গে গিয়েছি এবং বক্তৃতা দেবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। 'মাইক' বস্তুটিকে তিনি আদৌ সুনজরে দেখতেন না। ওটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলতেন,—আমি অমায়িক ব্যক্তি, কাজেই মাইকের প্রয়োজন আমার নেই।

কেউ তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে এলে তাঁর সঙ্কোচের অবধি ছিল না। সেই জন্যে কোনো যায়গায় গিয়ে সম্বর্দ্ধনা নিতে তিনি একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যখন গুণীজন-সম্বর্দ্ধনায় তাঁর সম্মানের আয়োজন করেন—তখন প্রথমটা তিনি কিছুতেই রাজী হননি। পরে অবশ্য সবাই মিলে অনুরোধ করাতে—তিনি সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারেন নি।

"বন্ধ কোরো না পাখা"-র স্যুটিং-এর অবসরে সস্ত্রীক চিত্রতারকা উত্তমকুমার।

এই প্রীতিপদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন—নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী। মঞ্চ ও ছায়া জগতের অধিকাংশ শিল্পী এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

একটি জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপনের কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। যখন তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে সরকারের কাছ থেকে বহু-সর্ত বিজড়িত প্রস্তাব এলো, তিনি এককথায় অস্বীকার করেছিলেন দায়িত্ব গ্রহণ করতে। মিল্টনের একটি কথা তিনি প্রায়ই উচ্চারণ করতেন—

"Better to reign in Hell than to serve in Heaven".

শিশিরকুমারের সঙ্গে শেষ দেখা কাশীপুরের এক বিয়ে-বাড়ীতে। গৃহকর্তা আমায় ডেকে বললেন, আপনি শিশিরকুমারের সঙ্গে গল্প করুন, আমিত' ছুটাছুটিতে ব্যস্ত।

একটি নির্জন ঘরে তিনি আমাদের বসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

অনেক বিষয়েই আলোচনা চলতে লাগলো। আমি কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার নিতে এত অনিচ্ছুক কেন ?

তিনি এক মুহূর্ত্ত চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বিরক্তির সুরে উত্তর দিলেন, Oh! that is really vulgar!

অসুন্দর পরিকল্পনাকে তিনি কোনো দিনই সহ্য করতে পারতেন না!

শিশিরকুমার জীবনে মরণে সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী।

## রহস্যময়ী মেরিলিন মনরো

হলিউডের প্রখ্যাতা চিত্র-অভিনেত্রী, রূপকথার নায়িকা "মেরিলিন মনরো" পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, রাত্রি ৩।৪০ মিঃ তিনি অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবনে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর হাতে ছিল টেলিফোনের রিসিভার। মরবার সময় কি তাঁর বাঁচার ইচ্ছে হয়েছিল ? কিন্তু সেকথা আজ আর জানার উপায় নেই, সব কিছুর উর্দ্ধেই চলে গেছেন তিনি।

শেষ মুহূর্তে হয়ত তাঁর সত্যি বাঁচার ইচ্ছেই হয়েছিল। কারণ,জীবন যে মহামূল্যবান! এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন নিজের জীবন দিয়ে। তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়েছেন তিনি। তাই হয়ত নিজের অতীত রোমন্থন করে বাঁচার জন্য শেষবারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

হলিউডের বিখ্যাত ফ্যাশান সুন্দরী "মিস্‌ফিট" মেরিলিন মনরোর একটা অতীত ছিল। সে অতীত বড় গ্লানিময়, দুঃখদায়ক। এডওয়ার্ড মরটেনসান ও গ্রেডা বেকারের অবৈধ সন্তান নরমা জীন্ ( Norma Jean )—চিত্র-জগতে তিনি প্রতিষ্ঠিতা—মেরিলিন মনরো। জন্ম লস এঞ্জেলস্-এ ১৯২৫-এর ১লা জুন। মনরো পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই তাঁর পিতা, মা'কে ছেড়ে নিরুদ্দিষ্ট হ'ন। আর নিজে যখন জন্মালেন, তখন তাঁর মা উন্মাদিনী। তাই শিশু বয়স থেকেই লস-এঞ্জেলেস্-এর অনাথ শিশুদের সাথে অনাথ-আশ্রমেই মানুষ। তারপর ৫ বছর বয়স থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত ঝিয়ের চাকুরী। সেই সময় তিনি তাঁর মনিবের পেয়িং গেষ্ট দ্বারা নারীর সম্পদ সম্ভ্রম হারান। তাই বোধ হয় সমস্ত পুরুষ-জাতেরই ওপর তাঁর আক্রোশ।

ইউরোপে সবেমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামা শান্ত হয়েছে যখন, তখন মনজ্জার জীবন-সংগ্রাম হ'ল সুরু। সেটা ১৯৪৬ সাল, আর বয়স ২১ বছর। সদ্য বিবাহ বিচ্ছেদ করে এসেছেন জীবনের প্রথম ভালবাসা এক পুলিস-কর্মচারীর সঙ্গে ৪ বছর ঘর করার পর। হলিউডের "ব্লু বুক স্কুল অফ চার্মসে" এসেছে নরমা জীন ফ্যাসান গার্ল হতে। মনে আশা যদি চিত্রাভিনেত্রী হওয়া যায়। কিন্তু স্বীকৃতি মিলল না জীবনে। বাধ্য হলেন ফটোগ্রাফারের মডেল হতে। পর পর ৫ খানা বইতে মডেল হিসাবে ছবি প্রকাশ হবার পর "টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স"এর অভিনেতা পরিচালক বেন লায়ন তাঁকে ডেকে নিয়ে এলেন সামান্য একটু অভিনয়ের জন্য তাঁর বই "সামার লাইটিং"এ। কিন্তু সেখানেও স্বীকৃতি নেই। তারপর কলম্বিয়া পিকচার্স-এর "লেডিস অফ দি কোরাস", সেখানেও ইতি। তারপর এম, জি, এম-এর "দি এস্‌ফাল্ট জাঙ্গল", সেখানেই উদীয়মানা অভিনেত্রী হিসাবে স্বীকৃতি। এই সময় হলিউডের চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ "হ্যারী ব্রাও"এর সহায়তায় তিনি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের নির্ধারিত শিল্পী হিসাবে মনোনীতা হ'ন। "হাউ টু ম্যারী এ মিলোওনেয়ার", "দেয়ার ইজ নো বিজনেস্ লাইক শো বিজনেস" ইত্যাদি চিত্র ও সেই সঙ্গে জীবনের দ্বিতীয় পুরুষ সানফ্রানসিসকোর বিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় জো ডি ম্যাগোকে বিবাহ। তারপর একে একে বিখ্যাত চিত্র "সেভেন ইয়ার ইচ্", "দি প্রিন্স এণ্ড দি শো গার্ল", "সাম লাইক ইট হট" এবং সর্বশেষ ছবি "দি বীলিওনেয়ার"। এর মাঝে আবার বিবাহ বিচ্ছেদ করে ঘর বাঁধলেন প্রখ্যাত লেখক ও চিত্র-নাট্যকার আর্থার মিলারের সাথে। কিন্তু সে ঘরও রইল না—তৃতীয়বার বিবাহ বিচ্ছেদ। বহু পুরুষকে নিয়েই তাঁর চতুর্থবার ঘর বাঁধার কল্পনা হলিউডের অলিন্দে অলিন্দে শোনা গেছে। তিনবার বিবাহ বাসর রচনা করেও তিনি শান্তি পাননি। তাই বোধ হয় চতুর্থ পুরুষের আবির্ভাবের পদধ্বনি যেদিন শোনা গেল, সেই সময়েই তাঁর আত্মহত্যা। অসুখী বিবাহগুলিই কি তাঁর আত্মহত্যার কারণ?

অনেকের ধারণা—ডিন্ মার্টিনের বিপরীতে সেঞ্চুরীর নির্মীয়মান ছবি "সামথিং হ্যাজ গট্ টু গিভ" চিত্রে তাঁকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভবই এই আত্মহত্যার কারণ। তাই যদি হবে তবে তিনি তো ইতালীর বিখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠান "টিটেনাস" থেকে অভিনয় করার ডাক পেয়েই ছিলেন! তবে কেন এই আত্মহত্যা?

চিত্র-জগত নিয়েই তো তিনি সম্পূর্ণ নন! তাঁরও আশা ছিল, আসক্তি ছিল, আর ছিল ভগবানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভালবাসা। তাতে তিনি ঘর বাঁধতে পারেন নি সত্যি, কিন্তু চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বের অভিনন্দন পেয়েছেন, কিন্তু শান্তি পান নি। তাই পৃথিবীর ওপর রাগে, অভিমানে, দুঃখে বার বার চীৎকার করে ঘরের দেয়ালে মাথা খুঁড়েছেন। নিজের আহত রক্তাক্ত ললাট নিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন কিন্তু তাতে পৃথিবীর বা দেওয়ালের কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। চিরদিনের খামখেয়ালী "মিসফিট" রহস্যের মাঝেই থেকে গেলেন।

—মোনা চৌধুরী

"ধূপছায়া" চিত্রের একটি দৃশ্যে—বিশ্বজিত এবং সন্ধ্যা রায়।

## কাজল

আজকের দিনের গতি ও প্রগতির যুগে যন্ত্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শুধু প্রয়োজনই নয়, বিজ্ঞানের যুগে যন্ত্রের গুরুত্বও অপরিমাপ্য। নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ এসেছে। নানা-প্রকার কল্যাণকর অনুশীলনের আজ শেষ নেই—সে ক্ষেত্রে যন্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই যন্ত্রের প্রভাবে মানুষও যখন নিজেও একটি যন্ত্র-বিশেষে পরিণত হয়, তখনই ঘনিয়ে আসে দুর্যোগ পরিপূর্ণ সফলতার সম্ভাবনার মধ্যে থেকে প্রতীয়মান হয় ধ্বংসের এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। যন্ত্রের সাধনায় যে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করে তোলে দেশের বৃহত্তর কল্যাণকামনায়, এমন একটি সময় আসে যে মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না যে, নিজে সে কখন যন্ত্রের বশীভূত হয়ে গেছে। তার নিজস্ব সত্তা যন্ত্রের সঙ্গে মিশে গেছে, তার জীবন আজ যন্ত্রের তালে তাল রেখে চলেছে, তার প্রতিটি আচরণ যন্ত্রচালিত। যন্ত্রের সঙ্গে তার আর কোন প্রভেদ থাকে না, তার নিজস্বতা তখন সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত "কাজল"-এর নায়ক এই-জাতীয় চরিত্র-গুলির অন্যতম প্রতীক। অসাধারণ অধ্যবসায় অভূতপূর্ব পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তার ছাত্রজীবন অতিবাহিত। নিষ্ঠার পুরস্কার মিলল স্বপ্ন সফল হল। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেল।—তারপরই শুরু হ'ল সংঘাত। দ্বিমুখীন··একদিকে কর্মজীবনে আর একদিকে পারিবারিক জীবনে, তারপর গল্পের রসমধুর পরিণতি।

কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনার গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। "কাজল" পরিচালনায় তাঁর যুগোপযোগী চিন্তাধারা প্রশংসনীয়। শিল্পের প্রগতি যন্ত্রের গুরুত্ব, গল্পে প্রধান আলোচ্য হ'লেও, একমাত্র নয় সেই সঙ্গে মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কয়েক ক্ষমতাপ্রাপ্ত শয়তান কি ভাবে মানুষের মুখোস প[রে] সমাজের সর্বনাশ করে চলছে, তারও একটি বলিষ্ঠ ইঙ্গিত এ[ই] ছবির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। কাহিনীবিন্যাসে, ঘটনা সংস্থাপনে প্রয়োগনৈপুণ্যে ছবিটি বিশেষ উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে, এ[ই] যুগোপযোগী বক্তব্য দর্শকচিত্তে রেখাপাত করবে, তদুপরি এ[র] মাধ্যমে যে বলিষ্ঠ ইঙ্গিত প্রচারিত হ'ল, তা নিঃসন্দেহে

বিশ্বজিত: সদ্য ক্রীত গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে।

সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। অভিনয়াংশে ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ী সান্যাল অনবদ্য, নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় যথাক্রমে অসীমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী সুঅভিনয়ই করেছেন। তাঁদের অভিব্যক্তি এবং আন্তরিকতা প্রশংসার দাবী রাখে। দীপক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় তাঁর অভিনয় শক্তির পরিচায়ক। কুমার রায় নিষ্প্রভ, তাঁর জড়তা এখনও ঘোচে নি, সেইজন্যে তাঁর অভিনয়ে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া গেল না। অন্যান্য চরিত্রে নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, খগেন পাঠক, মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়, সমরকুমার, অপর্ণা দেবী, কমলা মুখোপাধ্যায়, চিত্রিতা মণ্ডল, রমা দেবী, আরতি দাস প্রভৃতি শিল্পীরা অবতীর্ণ হয়েছেন।

এর সুর-যোজনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র প্রভৃতি শিল্পিবর্গ এই ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন।

### মায়ার সংসার

সত্যানুরক্তি ও ন্যায়নিষ্ঠার ফলপ্রাপ্তি জীবনে ঘটবেই। আজীবন সত্যের সাধনা কখনও বিফলতা বরণ করে না। যে জীবন সত্যের আলোয় উজ্জ্বল সে জীবনের ভাগ্যাকাশে অন্ধকার যদিও বা ঘনিয়ে আসে—সে অন্ধকার সাময়িক—সে জীবনের ভাগ্যাকাশে কালোমেঘ কখনও স্থায়িত্বলাভ করে না, করতে পারে না। আপাতদর্শনে যা আমরা দেখে থাকি সেইটেই শেষ কথা নয়, এক্ষেত্রে মূলকথা যে আপাতদৃষ্ট সাময়িক দুঃখকষ্টের শেষ আছে কিন্তু তারপর এই দুঃখকষ্টের পাহাড় পেরিয়ে ত্রিযামরাত্রির অবসানে যে আলোকোজ্জ্বল আনন্দ দেখা দেয় সে আনন্দের শেষ নেই—তা অশেষ। "মায়ার সংসার" ছবিটির কাহিনীর মধ্যে এই সত্যেরই প্রচার হয়েছে। এক ভাগ্য-বিড়ম্বিত সত্যাশ্রয়ীর জীবনকে কেন্দ্র করে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

ছবিটি আবেগপ্রধান। কাহিনী রচনা ও ছবিটি পরিচালনা করেছেন কনক মুখোপাধ্যায়। পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার পরিচয়ও স্পষ্ট পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে দর্শকের অনুভূতির সূক্ষ্ম স্তরে তিনি সাড়া জাগিয়েছেন। ছবিটি আবেগ-প্রধান এবং রসসমৃদ্ধ; এর আবেদন দর্শকচিত্ত স্পর্শ করতে সমর্থ হয় এবং সাধারণ্যে একবলিষ্ঠ আদর্শ প্রচার করে। অভিনয়াংশে অভূতপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন ছবি বিশ্বাস। তাঁর অভিনয় ভোলবারনয়। অসিতবরণ ও সন্ধ্যারাণীর অভিনয়ও অসাধারণ। দৃঢ়তা ও কমনীয়তার সমন্বয়ে তাঁদের অভিনয় সুন্দর হয়ে উঠেছে। কমল মিত্র, বিকাশ রায়, বিশ্বজিত, দীপ্তি রায়, সুলতা চৌধুরীর অভিনয়ও বিশেষভাবে উপভোগ্য এবং তৃপ্তিদায়ক। এঁরা ছাড়া নবকুমার, তরুণকুমার, শ্রীমান তিলক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শিখা বাগ প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এই ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

## সংবাদবিচিত্রা

বিশ্ববিখ্যাত সেতারিয়া রবিশঙ্কর কর্তৃক সাঙ্গীতিক শিক্ষাকেন্দ্র "কিন্নর"-এর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পাঠকসাধারণ আশাকরি অনবগত নন। "কিন্নর"-এর মাধ্যমে আগামী নভেম্বর মাসে রবিশঙ্কর "মেলোডি য্যাণ্ড রিদম" নাম দিয়ে একটি অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করবেন বলে
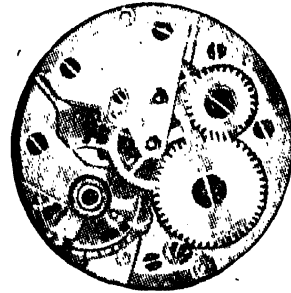
জানা গেল। এই অনুষ্ঠানে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত সর্ববিধ ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে। কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গই নয়, লোকসঙ্গীত বা অন্যান্য ধরণের সঙ্গীতগুলিও অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত। অনুষ্ঠানটিতে কেবল সঙ্গীতের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হবে না—মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত প্রভৃতির অভিনবত্বের দিকেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি দেওয়া হবে। বাংলার গৌরব এই গুণী শিল্পীর পরিকল্পনা সার্থক হোক—এই কামনা করি।

বোম্বাইয়ে সোভেক্সপোর্ট জানিয়েছেন যে মস্কো, লেনিনগ্রাদ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যান্য স্থানগুলিতে বাঙলা ছায়াছবি "হেডমাষ্টার" প্রদর্শিত হবে। ছবিটি রুশ ভাষায় ডাব করা হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে দি "দ্ব ফাইনাল পোষ্ট"। হেডমাষ্টার ছবিটির কাহিনীকার সুখ্যাত সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীবি. গোপাল রেড্ডি তাঁর সাম্প্রতিক কলকাতা সফরকালে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন যে বাঙলা চলচ্চিত্রের পূর্ব গৌরব এবং পূর্ব মহিমা ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকার বিশেষভাবে যত্নবান হয়েছেন এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপায় নির্ধারণের জন্যে সরকার একটি কমিটি গঠনে যত্নশীল। শ্রীরেড্ডি জানান যে এই কমিটি শুধু বাঙলা ছায়াছবির জন্যেই কারণ বাঙলার মত বোম্বাই বা মাদ্রাজের সমস্যা এত প্রকট ও ব্যাপক নয়। তিনি আরও বলেন যে, যে সকল সমস্যা দ্বারা বাঙলার ছায়াচিত্রশিল্প আজ ক্রমশঃই ক্ষতির সম্মুখীন তা যদি রোধ করা না হয়, তা হলে তা এক বিরাট "জাতীয় দুঃখ" এরই নামান্তর হবে।

ফিল্ম ফাইন্যান্স করপোরেশনের চেয়ারম্যানরূপে শ্রীএন. ডি. মেহরোত্রার কার্যকাল শেষ হয়েছে। তাঁর আসনে এবার স্থলাভিষিক্ত হলেন শ্রীজি. বি. কোটাক। ইনি বোম্বাইয়ের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সৌরাষ্ট্র সরকারের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী।

ভারতীয় ছায়াছবিগুলিতে প্রয়োজনবশতঃ ভারতের যে সব মানচিত্র দেখানো হয় সেগুলি ভ্রান্তিমুক্ত নয়। এই ভ্রান্তিপূর্ণ মানচিত্রের প্রদর্শন সকল দিক দিয়েই ক্ষতিকর এবং ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির সহায়ক। সম্প্রতি প্রোডিউসার্স য্যাসোসিয়েশানকে এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সার্স-এর চেয়ারম্যান নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই প্রয়োজন যখনই দেখা দেবে তখনই চিত্রনির্মাতাগণ যেন ডেরাডুনের সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে ভারতের মানচিত্র সংগ্রহ করেন। এই মানচিত্র যেমনই নির্ভরযোগ্য, তেমনই নির্ভুল।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিদেশে রপ্তানি এবং প্রদর্শনের জন্যে সেন্সার সার্টিফিকেটের আর প্রয়োজন হবে না—এক পত্রের দ্বারা তথ্য ও প্রচার দপ্তর বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স য্যাসোসিয়েশানকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। পত্রে আরও জানানো হয়েছে যে সেন্সারে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন বন্ধ হওয়ায় তার পরিবর্তে প্রেরককে একখানি নির্ভরযোগ্য চিত্রনাট্য এবং একটি সার্টিফিকেট—যাতে লেখা থাকবে—যে এর মধ্যে অশ্লীল বা আপত্তিকর কিছু নেই—পেশ করতে হবে।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের সভাপতিপদে পরিচালকবর্গ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডারিল জানুক। প্রথম শ্রেণীর চিত্রবিদ হিসেবে জানুক বিপুল খ্যাতির অধিকারী। জানুকের পূর্বে এই আসনে গত কুড়ি বৎসরকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন মিঃ স্পিরস পি. স্কোরাস। বর্তমানে তিনি পরিচালকবর্গের চেয়ারম্যানের আসনে সমাসীন হলেন।

বর্তমানকালে বহু আলোচিত ও আলোড়িত ছবিগুলির মধ্যে "ললিটা" অন্যতম। রুশসাহিত্য ললিটা শুধু ছবি হিসাবেই নয় গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করার পরমুহূর্ত থেকে বিপুল আলোড়ন এনেছে। বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন জন তাকে দেখে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বর্তমানে ছায়াছবি হিসেবে তার সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেচে। ছবিটির নায়িকা সু লিওনকে লণ্ডনে এসে এই ছবি দেখতে হবে, কারণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিয়মানুযায়ী যাঁদের বয়েস আঠারো হয়নি তাঁরা এ ছবি দেখবার অধিকার পাবেন না। সু লিওনের বয়েস এখনও আঠারো হয় নি। সেইজন্যে তাঁকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

খ্যাতনামা চিত্রনট জ্যাক হকিন্স বর্তমানে চিত্রনির্মাতা। তিনি এবং পরিচালক গায় হ্যামিলটন উভয় মিলে "ট্রি-কাসল" নামক চিত্র প্রতিষ্ঠানটির পত্তন করেছেন। এঁদের প্রথম ছবিতে হকিন্স নিজে অভিনয় করবেন কি না এখনও জানা যায় নি। ভবিষ্যতে য্যামেরিকার হাস্যরসশিল্পী জুডি হলিডের সঙ্গে একটি ছবি করার বাসনা হকিন্সের আছে।

প্রখ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্ণের (৩৪) সুইজারল্যাণ্ডের বাড়ীর সমস্ত মূল্যবান সম্পদাদি চুরি হয়ে গেছে। অড্রে বা তাঁর স্বামী অভিনেতা মেলফেরার (৫০) উভয়েই সুইজারল্যাণ্ডের বাইরে। তাঁরা না আসা পর্যন্ত স্থানীয় পুলিশ অপহৃত সম্পদসমূহের মূল্য নির্ধারণ করতে পারছেন না।

পিতা, সহধর্মিণী ও পুত্রসহ এক ঘরোয়া পরিবেশে বিশ্বজিত।

# রঙ্গপট প্রসঙ্গে

অশীতিপর শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক এবং হাস্যার্ণব হিসেবে রসিকসমাজে বিপুল শ্রদ্ধা ও সমাদরের অধিকারী। তাঁর জীবন বৈশিষ্ট্যে এবং বৈচিত্র্যের এক অনবদ্য সমন্বয়! তাঁর অভিনব জীবনকাহিনীর "দাদাঠাকুর" নাম দিয়ে চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন সুধীর মুখোপাধ্যায়। নামভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন, স্বর্গত নট ছবি বিশ্বাস। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু, বীরেশ্বর সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, সুলতা চৌধুরী, সীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং সুরারোপ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। * * * লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে "অভিযান" ছবিটি গৃহীত হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায়। শ্রীরায় এর চিত্রনাট্য রচনা ও সুরযোজনার ভারও গ্রহণ করেছেন। চরিত্রায়ণে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, বীরেশ্বর সেন, কালীপদ চক্রবর্তী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, রেখা দেবী এবং ওয়াহিদা রেহমান। * * * প্রখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধের "ন্যায়দণ্ড" চলচ্চিত্রের রূপ নিচ্ছে মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায়। রূপায়ণে আছেন—জহর গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, রাধামোহন ভট্টাচার্য, আশীষকুমার, রবি ঘোষ, তরুণকুমার, প্রেমাংশু বসু, তমাল লাহিড়ী, বুবু গঙ্গোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সবিতা বসু, তন্দ্রা বর্মণ, তপতী ঘোষ, মঞ্জুলা সরকার প্রভৃতি। সুরযোজনা করছেন—ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ। * * * কথাশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "সাত পাকে বাঁধা" উপন্যাসটি চলচ্চিত্রের রূপ নিচ্ছে। অভিনয়াংশে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, প্রশান্তকুমার, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী এবং সুচিত্রা সেন। * * * সপ্তশিখা গোষ্ঠী "রক্ততিলক" ছবিটি পরিচালনা করছেন। এই ছবিতে যে সব শিল্পীরা বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্ মজুমদার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, মণি শ্রীমানী এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

# সৌখীন সমাচার

লব্ধপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত নাটক "দুই পুরুষ" মঞ্চস্থ করলেন কালচারাল য়্যাসোসিয়েশান। সুধীর দত্তের পরিচালনায় বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিলেন—বরুণ সেনগুপ্ত, লক্ষ্মীকান্ত রায়, অনন্তনারায়ণ পণ্ডিত, নিমাই সরকার, সীতা ঘোষ, অজন্তা চৌধুরী প্রভৃতি। * * * "পরিচিতি" গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করলেন "পথের শেষে" নাটকটি। সুধীর ভট্টাচার্যের পরিচালনায় বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন—হরিপ্রসাদ চৌধুরী, প্রণব গৌতম, গৌরাঙ্গ দত্ত, সুশান্ত বসু, মেনকা ভট্টাচার্য, উমা দত্ত প্রভৃতি। * * * পশ্চিমবঙ্গ যুব ছাত্র উৎসবে ক্যালকাটা মেরি মেকার্স ক্লাব নিবেদন করলেন শৈলেশ গুহনিয়োগীর "ঝুমুর" নাটকটি। চরিত্রগুলির রূপ দেন বিশ্বনাথ দাস, শিবকুমার শর্মা, রঞ্জন রায়, কমল চন্দ, বেলা রায় প্রভৃতি। * * * জলপাইগুড়ী শহরের আর্য নাট্যসমাজ গৃহে অগ্রণী গোষ্ঠীর প্রযোজনায় পৃথ্বীশ সরকারের "লবণাক্ত" নাটকটি অভিনীত হ'ল। রূপায়ণে ছিলেন—অপূর্ব ঘোষ, বিশ্বনাথ কর্মকার, মনোজিৎ রায়, প্রতুল ভৌমিক, বিভূতি দত্ত, দীনেন্দ্র ঘোষ, হীরেন্দ্র সান্যাল, সুকুমার চক্রবর্তী, ল্যাডলি রায়, আরনা মুৎসুদ্দি, অঞ্জলি গঙ্গোপাধ্যায়। * * * অলীকার নাট্যগোষ্ঠী মিহির সরকারের "হারানো স্মৃতি" নাটকটি অভিনয় করলেন। অভিনয়াংশে ছিলেন—গণেশ চট্টোপাধ্যায়, শেখর বসু, গণেশ দে, দেবব্রত মিত্র, আরতি মিত্র, অন্নপূর্ণা হাজরা।

এই সংখ্যায় প্রচ্ছদে বাঙলা কথাচিত্র "অভিযান" এর নায়িকা বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী ওয়াহিদা রেহমানের একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করা হইল। ষ্টুডিওতে চিত্রগ্রহণের অবসরে মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে হেমেন মিত্র এই আলোকচিত্রটি গ্রহণ করেন।

## ॥ অন্যান্য ছবি ॥

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি (প্রথম ও ষষ্ঠ সংখ্যক চিত্রটি ব্যতীত) সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী ও মোনা চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত।
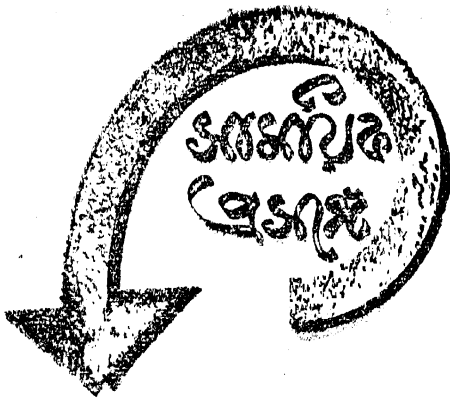
## কোম্পানী আইন ও ব্যবসা

গত বুধবার কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কোম্পানী আইনের এডমিনিষ্ট্রেটর শ্রী ডি এল মজুমদার বলিয়াছেন যে, উক্ত আইনের প্রয়োগের ব্যাপারে সরকার এবং শিল্পের মধ্যে একটা বুদ্ধির লড়াই চলিতেছে। কোম্পানী আইনে যে সকল ফাঁক আছে শিল্পগুলি তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর একদিকে সরকার কোম্পানী আইনের পরিচালন ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন, যাহাতে আইনের উদ্দেশ্য যথার্থ প্রতিপালিত হয়। শ্রীমজুমদার মনে করেন যে, ভারতের শিল্প ব্যবস্থায় একচেটিয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শিল্প উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও একচেটিয়া ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় বলিয়াই আমাদের ধারণা। উহা প্রতিরোধ করা যে সহজ নয়, তাহা আমরাও স্বীকার করি। একচেটিয়া ব্যবসা গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করা সঙ্গত নয়। ছোট ছোট নিয়োগকারীদের সমস্যাও সাংবাদিকরা উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে নূতন শেয়ার ক্রয় করা কঠিন। শ্রীমজুমদারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানী আইন সংশোধন করিয়া উহার প্রতিকার করা সম্ভব নয় বলিয়া তিনি মনে করেন। শ্রীমজুমদার আরও বলিয়াছেন যে, অনেক কোম্পানীই কাগজে-কলমে আইন পালন করেন, কিন্তু আইনের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পালন করেন না। আইন করিয়া আইনের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পালন করাইতে বাধ্য করা যায় বলিয়া আমরা মনে করি না। উহার জন্য আচরণের মানের উন্নতি সাধিত হওয়া আবশ্যক। আইনের ফাঁকও বন্ধ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তবে যথাসম্ভব ফাঁক বন্ধ করিবার জন্য কোম্পানী আইনের সংশোধন করা আবশ্যক।

—দৈনিক বসুমতী।

## উদ্যম চাই, দূরদৃষ্টি চাই

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের কথাই ভাবা যাক। বাহির হইতে যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে আসেন, শুধু দার্জিলিং দেখিয়াই তাঁহাদের খুশী থাকিতে হয়। অথচ, সুন্দর একটি পরিকল্পনা লইয়া কাজ করিলে এ-রাজ্যের আরও কয়েকটি স্থানকে যে টুরিষ্ট আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত করা যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, শুধুই বিদেশী টুরিষ্টদের কথা আমরা ভাবিতেছি না, ভাবিতেছি ভারতীয় পর্যটকদের কথাও। তাঁহাদের পর্যটন-স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা এ-যাবৎ হইয়াছে, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যৎসামান্য। ভাল রাস্তা নাই, মোটামুটি ভাল হোটেল নাই, রাত্রিবাস ও আহারের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত। এখনও অনিশ্চিত। তাই, ঘর ছাড়িয়া কোথাও বাহির হইবার আগে এ-রাজ্যে পর্যটকের উৎসাহ বারেবারেই স্তিমিত হইয়া আসে। অথচ, বিদেশী এবং স্বদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ-স্পৃহাকে মূলধন করিয়া কত সহজেই এ-রাজ্যের বিভিন্ন স্থানকে, এমন কী, অর্থনৈতিক দিক হইতেও রাজ্যের উন্নত করিয়া তোলা যাইত। পর্যটকরা তাহাতে খুশী হইতেন, স্থানীয় অধিবাসীদের সাচ্ছল্যও তাহাতে বাড়িত বই কমিত না। টুরিজমের উপরে ভিত্তি করিয়াই সেই সমৃদ্ধির দুয়ার খুলিয়া দেওয়া যাইত।

এখনও যায়। তার জন্য কিছু টাকা ঢালিবার অবশ্যই প্রয়োজন হইবে। কিন্তু তার চাইতেও বেশী প্রয়োজন হয়তো উদ্যমের, দূরদৃষ্টির।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## একটি আনন্দের বিষয়

ভারতের বৈদেশিক শাসনের অবসান হইলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ডিগ্রী, ডিপ্লোমার মোহ দূর হয় নাই। কতকগুলি বিষয়ে অবশ্য এখনও উহার প্রয়োজন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশে গিয়া শিক্ষা লাভ করিতে যে বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা বহন করার সামর্থ্য বহু মেধাবী ছাত্রেরই নাই। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে এফ, আর, সি, এস পরীক্ষার দুইটি অংশের প্রথম অংশের পরীক্ষা যাহাতে ভারতেই গৃহীত হইতে পারে সেজন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভারতে এই পরীক্ষা গ্রহণে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সম্মত হইয়াছেন এবং ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস হইতে প্রতি বৎসর কলিকাতাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এফ, আর, সি, এস (ফেলো রয়াল কলেজ অব সার্জন) পরীক্ষার জন্য প্রতি বৎসর বহু ডাক্তার বিলাত যায়, এবং দুই পরীক্ষায় পাশ করিয়া আসিতে যে সময় ও অর্থ ব্যয় হয়, কলিকাতায় প্রথমাংশের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থায় তাহা বহুল পরিমাণে লাঘব হইবে। শুধু তাহাই নহে, এই সময় ভারতের তথা কলিকাতার চিকিৎসকগণ এদেশেই রোগীর চিকিৎসায় রত থাকিতে পারিবেন। ডাঃ রায় বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে তিনিই সর্বাধিক আনন্দিত হইতেন। কারণ, তাঁহারই সুদীর্ঘ চেষ্টার ফলে এই ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের এই অনুমোদনও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

—যুগান্তর।

## নারীর জীবন-সংগ্রাম

ভারত হইতে মনুর বিধান ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া ক্রমেই অপসৃত হইতেছে। পুরুষ রোজগার করিবে এবং স্ত্রীলোক অসূর্যম্পশ্যা হইয়া অন্দরমহলে পিতা, স্বামী ও পুত্রের সেবা করিবে—এই দিন ক্রমেই শেষ হইতেছে। শুধু ভারতের সংবিধানেই নয়, জীবন সংগ্রামের সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকারভাগিনী হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় বি-এ, বি-এস-সির সাতটি বিষয়ে মেয়েরা প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করায় বিদ্যার ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয় লইয়া আসিতেছে। সর্বসাকুল্যে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা

এতই সীমিত যে মেয়েরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে চাকুরীপ্রার্থিনী হওয়ায় বেকার সমস্যাই আরো তীব্রতা ধারণ করিতেছে। তাই শুধু অধিকার ঘোষণার প্রশ্ন নয়, রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সেই ঘোষণা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা না করা হইলে এই অধিকার ও ঘোষণা অর্থহীন হইয়া পড়ে। আর সম্ভবতঃ মান্ধাতার সময়ে মনু সংবিধানের নিম্নজাতির মেয়েদের পর্দানশীন রাখা হয় নাই। তাই বৃটিশ আমল পার হইয়া কংগ্রেস রাজত্বেও নারী শ্রমিকদের কম বেতন এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার আরো সংকীর্ণ। চা বাগানে মেয়ে শ্রমিকের বেতন আইন করিয়াই কম দেওয়া হয় এবং রাজমিস্ত্রির যোগানদার প্রভৃতি কাজে আজও নারী শ্রমিক নিযুক্ত হয়। কারণ, কম পয়সায় ইহাদের শ্রমশক্তি ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু এই সমস্ত নারী শ্রমিকদের দুর্ঘটনাগুলিতে মৃত্যুর জন্ত দায়িকদে সরকার প্রায়শই খুঁজিয়া পান না।

—স্বাধীনতা।

## সেই পুরাতন বন্যা

ব্রহ্মপুত্রের প্রলয়ঙ্কর প্লাবনে আসামের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। প্লাবনের ধ্বংসলীলার হাত হইতে দুর্গত মানুষদের উদ্ধার ও তাহাদের রক্ষা করার প্রশ্নই আজ একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গতজনকে রিলিফ এবং অবরুদ্ধ লোকদের উদ্ধারকার্যে অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিবার জন্ত আসামে সামরিক বাহিনীকে নিয়োগ করা হইয়াছে। অসংখ্য মানুষের গৃহ গিয়াছে, সঞ্চিত সম্পদ গিয়াছে, ফসল গিয়াছে; গরু, বাছুর, মহিষ ভাসিয়া গিয়াছে। আসাম সরকার ত্রাণকার্য্য ও সাহায্যদানের জন্ত অর্ডিন্যান্স বলে দেড় কোটি টাকা আপাততঃ মঞ্জুর করিয়াছেন। আসাম বিধানসভা বর্ত্তমানে চালু না থাকায় জরুরী সরকার অর্থ সরবরাহের জন্ত অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছেন। বন্যার ফলে আসামের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো অনুমানের বাইরে। এদিকে আসামের এই অবস্থা ওদিকে বিহারের বন্যার সংবাদও গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির বন্যার সংবাদও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ভয়াবহ বন্যায় বিপন্ন জনগণকে সাহায্যদান এবং তাহাদের বাঁচাইয়া রাখার গুরুদায়িত্ব পালনের প্রশ্নই বর্তমানে প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে; সংশ্লিষ্ট সরকার ও জনসাধারণ ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবেন বিশ্বাস করি। —জনসেবক।

## বিনা নোটিশে ধর্ম্মঘট

ট্রাম শ্রমিকেরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে যে, ১লা আগষ্ট তাহারা ধর্ম্মঘট করে নাই, কাজে গড়হাজির ছিল এই মাত্র। ট্রাম কোম্পানীর একটি নিয়ম আছে যে, চার দিন পর্য্যন্ত যে কোন শ্রমিক কারণ না দর্শাইয়া কাজে অনুপস্থিত হইতে পারিবে এবং তার জন্ত বেতন কাটা যাইবে না। ইহারা এখন ঐ নিয়মের দোহাই পাড়িতেছে। প্রথমে ধর্ম্মঘটি ইউনিয়ন বলিয়াছিল যে, এই কাজে সব ইউনিয়নের সম্মতি আছে। অন্তেরা জানাইয়াছে—না, তাহা নাই। লেবার ডিরেক্টোরেট বিষয়টি তদন্ত করিয়াছেন এবং আমরা জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারাও ঐ পাইকারী অনুপস্থিতিকে ধর্ম্মঘট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রমমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার সেদিন যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন তাহা বজায় থাকিবে সহরবাসী ইহা আশা করে। ট্রাম কোম্পানীর ঐ উদ্ভট নিয়মের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। ট্রাম শ্রমিকেরা সংলোক হইলে ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিত এবং কর্তৃপক্ষ সহরতলীর বাস আগের বারের মত সহরে আসিবার আদেশ দিতে পারিতেন। তাহাতে লোকের সেদিনকার ঐ অসহ্য কষ্ট ক্ষতি এবং দুর্গতি হইত না। একটি লোক প্রাণ হারাইত না। অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসে বিনা নোটিশে ধর্ম্মঘটের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

—যুগবাণী, ( কলিকাতা )

## শিক্ষায় গলদ

বুনিয়াদী শিক্ষা বিভিন্ন রাজ্যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী সম্প্রতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ডাক্তার জাকির হুসেন এই বুনিয়াদী শিক্ষার একজন সমর্থক ও পরিচালক ছিলেন। তিনি ব্যর্থতার প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দীর্ঘদিনের পর বুনিয়াদী শিক্ষার কাঠামো কেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহার কারণ নির্ণয় কেহই করিতেছেন না। আমাদের যে সামান্য অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্নিহিত আদর্শ ও কর্মনীতি সম্বন্ধে যাহাদের কোনো ধারণা নাই এবং স্বভাবতঃ যাহারা জীবনে ইহার আদর্শ প্রতিপালনে অসমর্থ তাহাদের উপর বুনিয়াদী শিক্ষা দানের ভার পড়িয়াছে। ত্যাগ নিষ্ঠা আচার ও আচরণ দ্বারা যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে না পারে, তাহার পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তোলা অসম্ভব। কার্য্যক্ষেত্রে ইহাই হইয়াছে। এই ব্যর্থতার জন্ত হাহাকার করিয়া লাভ নাই। আমাদের শিক্ষা-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন ছাড়া আর উপায় কি? দেশের শিক্ষা পদ্ধতি আজ আপোষ্য পোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

—জনশক্তি ( শিলচর )

## ভেজাল ঔষধ

পশ্চিমবঙ্গ এবং অপর কয়েকটি রাজ্য সরকার ভেজাল বা নিম্নমানের ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের দায়ে কয়েকটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন। কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ঔষধ ত্রিপুরায় নাই—এমন কথা কেহ জোর করিয়া নিশ্চয়ই বলিতে পারেন না। যদি থাকিয়া থাকে—তবে বহু ব্যক্তির জীবন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এমত একটি গুরুতর ব্যাপার সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ইহা নেহাত মারাত্মক কথা সন্দেহ নাই। বেশ কিছুদিন পূর্ব্বেই উপরোক্তরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই সরকারের এই সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা অতীব দুঃখের সঙ্গে বলিতে বাধ্য যে, কল্যাণ ধর্ম্মী রাষ্ট্রের সরকার উপরোক্ত ঘটনার ব্যাপারে সঙ্গত তৎপরতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে—সরকার গোপনে তদন্ত চালাইতে পারেন না। পারেন—নিশ্চয়ই। কিন্তু এতদিনে এই সম্পর্কে সরকারী তরফ হইতে ঘোষণা প্রদান করা উচিত ছিল। কারণ, ঐ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই ঔষধ সম্পর্কে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এই সম্পর্কে যদি সরকার এখনও কোন তদন্ত না চালাইয়া থাকেন তবে অবিলম্বে

তদন্ত করার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা দাবী জানাইতেছি এবং তদন্ত যদি চালাইয়া থাকেন তবে উহার ফলাফল ঘোষণা করার অনুরোধ জানাইতেছি। —গণরাজ ( আগরতলা )

### বেদানুবাদিকার সম্মান লাভ

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট শ্রীযুক্তা পুষ্প দেবীকে তাঁহার "উপনিষদ নির্মাল্যের" জন্য ১৯৬২ সালের "লীলা পুরস্কার" দিয়াছেন। ইনি তাঁহার পিতৃদেবের ইচ্ছামত স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্যে দুরূহ বেদের বাণী সরল কাব্যে পরিবেশন

শ্রীযুক্তা পুষ্প দেবী

করিয়াছেন। তিনি স্কুল কলেজ কথিত কোন শিক্ষা পান নাই। তিনি ভূতপূর্ব আই, জি, আর স্বর্গত রায়বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গণিতের অধ্যাপক স্বর্গত শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীশান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী।

## শোক-সংবাদ

পশ্চিমবাঙলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় গত ৭ই শ্রাবণ ৬২ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। পশ্চিমবাঙলার প্রবীণ কংগ্রেস নায়কদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯২০ সালে ইনি ভারতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে মধ্যকলিকাতা জেলা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক ও ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে বিধানসভায় তিনি নির্বাচিত হন। ঘোষ মন্ত্রীসভায় ইনি কারা ও রাজস্বমন্ত্রী ও রায় মন্ত্রীসভায় ইনি শ্রম এবং স্বরাষ্ট্র ( পুলিশ ) মন্ত্রী ও সদ্যগঠিত সেন মন্ত্রীসভায় ইনি স্বরাষ্ট্র ( পরিবহন ) মন্ত্রী নির্বাচিত হন। মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্রজন যিনি পশ্চিমবাঙলার তিনটি মন্ত্রিসভাতেই স্থানলাভ করেছিলেন। * * * ভারতীয় ভাস্কর্যজগতের ইতিহাসের নবরূপকার, জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং প্রথম ভারতবাসী এ, আর, সি, এ হিরন্ময় রায়চৌধুরীর গত ১১ই শ্রাবণ ৭৮ বছর বয়েসে জীবনাবসান ঘটেছে। শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে ইনি অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর জেনিংএর সহকারীরূপে ইনি সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। কলকাতার সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ইনিই প্রথম মডেলিংএর দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯১৪ সালে ইনি এ, আর, সি, এ উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে কিছুকাল কাশ্মীরে অধ্যাপনা করেন। আত্মসম্মানজনিত বিরোধ ঘটায় অধ্যাপনায় ইস্তফা দিয়ে জয়পুরের শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদগ্রহণ করেন, তারপর শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদারের আহ্বানে লক্ষ্ণৌ সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে কারুবিভাগীয় তত্ত্বাবধায়করূপে যোগদান করেন। এঁর প্রতিভা দেশে ও বিদেশের রসিকসমাজ কর্তৃক সগৌরবে স্বীকৃত। এঁর ছাত্রদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রদোষ দাশগুপ্ত এবং ভাগিনেয় প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। * * * বর্ধমানের প্রবীণ কংগ্রেসনায়ক ও অবিভক্ত বাঙলার কংগ্রেসকর্মী দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র গত ৭ই শ্রাবণ ৮০ বছর বয়েসে গতায়ু হয়েছেন। দেশবন্ধু গঠিত পল্লীসংস্কার সমিতির ইনি ছিলেন সম্পাদক। ইনি নিখিলবঙ্গ জেলা বোর্ড সভাপতি সঙ্ঘের, অবিভক্ত বাঙলার বর্ধমান জেলা বোর্ডের এবং বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। * * * মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র সাহিত্যরথী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী চারুবালা দেবীর গত ৩০এ শ্রাবণ ৮৪ বছর বয়েসে প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। ইনি স্বর্গত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন এবং বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও জননায়ক শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। * * * বাঙলার বিখ্যাত নাট্যবিদ রণেন রায় গত ৩০এ শ্রাবণ মাত্র ৪২ বছর বয়েসে অকস্মাৎ লোকান্তরিত হয়েছেন। ইনি কিছুকাল সিটি কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। কয়েকটি সেক্সপীয়রীয় নাটকে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে ইনি বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউরোপে আট বছর অবস্থান করে নাটকাভিনয়ে এবং টেলিভিসন অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন এবং বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। ইনি ক্যালকাটা থিয়েটার সেন্টারের নাট্যবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং লিটল থিয়েটার দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি স্বর্গত সাহিত্যনায়ক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও জননেতা শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় ছিলেন। * * * প্রবীণ সাংবাদিক বলাই দেবশর্মার গত ১৮ই শ্রাবণ ৭০ বছর বয়েসে জীবনবিয়োগ ঘটেছে। বাঙলার অগ্নিযুগের অন্যতম কর্মী হিসেবে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সুলেখক হিসেবে তিনি খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও ইনি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ইনি দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেশবন্ধুর নারায়ণ পত্রিকার পরিচালনভারও ইনি গ্রহণ করেন। * * * প্রখ্যাতনামা ব্যবসায়ী হরিমোহন পাল গত ১৪ই শ্রাবণ ৬১ বছর বয়েসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি স্বনামধন্য স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের কনিষ্ঠ পুত্র ও স্বর্গীয় স্যার হরিশঙ্কর পালের অনুজ ছিলেন। ইনি কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন ও ব্যবসায়ী মহলে যথেষ্ট খ্যাতি ও যশ অর্জন করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
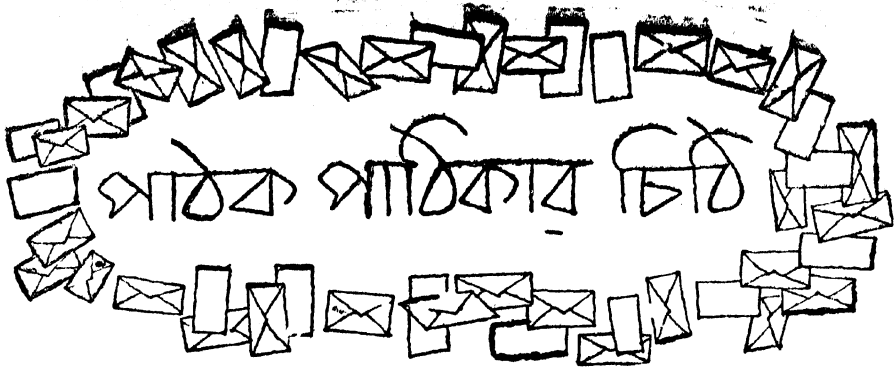
### "পতিতাবৃত্তির প্রতিকার" এবং সমালোচনা প্রসঙ্গে

মহাশয়,

মাসিক বসুমতীর গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লিখিত "পতিতাবৃত্তির প্রতিকার" প্রবন্ধটি এবং উহার পক্ষে—বিপক্ষে সমালোচনা আমি পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধটিতে সমালোচনার কিছুই নাই। লেখকের প্রস্তাবিত পথ একদিকে যেমন দেশ থেকে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের সহায়ক, অন্যদিকে হিন্দু সমাজ ও ভারতের কল্যাণকর। সরকার এবং হিন্দু সমাজপতিদের কর্ত্তব্য হিন্দু সমাজ থেকে পণ-প্রথা উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে প্রত্যেক হিন্দু মেয়ের যৌবনের প্রারম্ভে বিনা পণে বিনা যৌতুকে বিয়ের ব্যবস্থা করা, এর ফলে যৌনক্ষুধা পুরণের জন্য বা পেটের দায়ে মেয়েদের পতিতাবৃত্তি করতে হবে না, ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকলে ভারতীয় মুসলমানদের ভারতের বুকে দ্বিতীয় পাকিস্তান সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হবে। আশা করি সরকার ও হিন্দু সমাজপতিরা এই ব্যাপারে আর অন্ধের মত চলে হিন্দু জাতি ও ভারতের ভাবী সর্ব্বনাশ করবেন না। এই সম্পর্কে এইটিও উল্লেখ করতে চাই যে, পরিকল্পনা নীতিও হিন্দু সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর।

চিঠিখানি আশা করি মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করিয়া সুখী করিবেন। ইতি—কুমারী মালতী সেন, কাদাই, বহরমপুর, (পশ্চিমবঙ্গ) ২০।১।৬২ ইং।

মহাশয়,

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত সংখ্যার ৩৩০ পৃষ্ঠায় "মেয়েরা কি চায়" নামে একটি ছোট প্রবন্ধ পাঠ করলাম। প্রবন্ধের এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে—'প্রকৃতিতে মেয়েরা পরনির্ভরশীলা। লতার সার্থকতা যেমন বৃক্ষাশ্রয়ে, পুরুষের দেওয়া আশ্রয়েই তেমনি নারী প্রকৃতির স্বভাবজ প্রবণতা ও সার্থকতা। গৃহের কোণ যদি সুখের হয়, তা হলে তা ফেলে বাইরে ছুটবেন কম মেয়েই। তবুও যে আজ বাইরের জগতে তাঁদের দেখা যায়, সে কেবল জীবিকার তাগিদ।"

কথাটি পরম সত্য। রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত মেয়েরা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মেয়ে মনে করে—"পুরুষ তমালতরু প্রেম-অধিকারী, নারী সে মাধবী লতা আশ্রিতা তাহারি।" লতা গাছ একটু বড় হলে নিকটবর্ত্তী একটি তরুকে আশ্রয় করে উপর দিকে উঠতে থাকে এবং নিজেকে ফুলে-ফলে শোভিত করে তোলে। সেরূপ শতকরা ৯৯জন মেয়ে ইচ্ছে করে যৌবনের প্রারম্ভে একটি পুরুষের আশ্রয়ে এসে নারীজীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে। মেয়েদের সুখ সংসারে, স্বামীপুত্র পরিবৃত গৃহে, অফিস বা কলকারখানায় নয়; তাদের দেহের গঠন গৃহকর্ম, সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের উপযোগী, বহির্জগতে গিয়ে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার উপযোগী নয়। মেয়েরা তা ভালভাবে জানে এবং এই কারণে স্মরণাতীত কাল থেকেই মেয়েরা বিয়ের মাধ্যমে পুরুষের আশ্রয় লাভ করে নিজেদের কর্মক্ষেত্রকে গৃহকোণে সীমাবদ্ধ রাখতে বেশী আগ্রহশীল, নারীপ্রকৃতির স্বভাবজাত প্রবণতা তা-ই।

বস্তুত: গৃহকোণই মেয়েদের আনন্দদায়ক। তবুও বর্ত্তমানে মেয়েদের বাইরের জগতে দেখা যায় কেন? এর কারণ হল খাদ্য-দ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি। বর্ত্তমানে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য এতই বেড়েছে যে দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিজনদের ভরণপোষণ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, অনেককে মাসান্তে ঋণ করতে হয়, ফলে অন্য পরিবারের একটি মেয়েকে স্ত্রীরূপে নিজের গৃহে আনতে ভয় পায়। আর বেকার যুবকদের তো বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না। আবার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকেরাও অনেক সময় আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য নিজেদের ঘরের অবিবাহিতা মেয়ের ভরণপোষণে অসমর্থ হয়ে পড়েন। ফলে অনেক মেয়েকে গৃহকোণ ছেড়ে বহির্জগতে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। যদি সরকার দ্রব্যমূল্য হ্রাসের এবং সেভাবে দেশবাসীদের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে পারতেন, সেই সঙ্গে দেশের বেকার সমস্যারও সমাধান করতে পারতেন, তবে যুবকেরা বিয়ে করতে ভয় পেতো না। 'আর যতদিন মেয়ের বিয়ে না হয়, ততদিন অভিভাবকেরাও মেয়ের ভরণপোষণে অসুবিধা ভোগ করতো না। ফলে মেয়েদের অর্থোপার্জনের জন্যে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না।

তবে জিনিসপত্রের মূল্য সাধারণ নাগরিকদের ক্রয়-ক্ষমতার ভেতরে আসলেও যে একেবারে ব্যতিক্রম হবে না, তা হলফ করে বলা চলে না। কারণ অনেক ব্যবসায়ী আছে, যারা তাদের দোকানের বিক্রী বাড়াবার জন্য সুন্দরী, সুশিক্ষিতা ও সুগঠনা মেয়ে নিয়োগ করে থাকেন। আবার এমন কতক উচ্চপদস্থ অফিসারও দেখা যায়, যাঁদের আকর্ষণ নারী কর্মচারীর প্রতি—সেও সুন্দরী, সুশিক্ষিতা ও সুগঠনা নারী কর্মচারীর প্রতি, তাঁদের মতে, যেন নারী কর্মচারী ছাড়া অফিসের কাজ চলে না, যুবকদের যেন আর কাজের যোগ্যতা নেই বা দেশে হাজার হাজার যুবক যে চাকরির অভাবে হায়

[illegible] করছে, কেউ আবার বেকার জীবনের জালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করছে, এইটি যেন তাঁরা জানেন না। ফলে সকল সময়ে কিছু কিছু মেয়েকে বহির্জগতে দেখা যাবে। এইটি যেন ষাঁড় ও বলদগুলোকে গোয়ালে বেঁধে গাভীগুলোকে বাছুরহীনা রেখে ঐ গাভী দিয়ে মাঠে লাঙ্গল টানানোর ব্যবস্থা। এর চেয়ে বেশী বলা যায় না, কারণ ভেজালের যুগে ভেজাল খেতে খেতে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিও ভেজালযুক্ত হয়ে পড়ায় ভালমন্দ সব কথারই সমালোচনা হতে দেখা যায়।

তবে এইটি ঠিক যে, দেশে দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি যুবকের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা হলে তারা বিয়ের মাধ্যমে প্রত্যেকে একটি করে মেয়েকে আশ্রয় দিতে ভয় পাবে না। দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও প্রত্যেকটি যুবকের আয়ের ব্যবস্থা হলে দেশবাসীদের স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে, যাহা বিনা পণে বিনা যৌতুকে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পক্ষেও সহায়ক। আর যৌবনের প্রারম্ভে মেয়েরা পুরুষের আশ্রয়ে আসতে পারলে জীবিকার তাগিদে তাদের বহির্জগতে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ স্বামীপুত্র পরিবৃত সুখনীড় রচনাই নারীজীবনের কাম্য, গৃহকোণ ছেড়ে বাইরে গিয়ে চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা নয়। শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বি-এ, দ্বারিক জঙ্গল রোড, পোঃ—ভদ্রকালী, জেলা—হুগলী।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,—অগ্রহায়ণের মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীসুব্রতকুমার পালের হর্মোনকথা অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স পড়লাম। এবং পড়ে মুগ্ধ হলাম। কলেজে পাঠ্যাবস্থায় হর্মোন সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছি। কিন্তু হর্মোন-তত্ত্ব যে এত রসপূর্ণ এবং সৌন্দর্যময় তা শ্রীসুব্রতকুমারের লেখা পড়েই বুঝতে পারলাম। লেখককে ধন্যবাদ জানানর ভাষা আমার নেই। লেখক সম্ভবতঃ নতুন; কিন্তু রচনা-কৌশলে এবং পরিবেশন-দক্ষতায় তিনি অনেক নামকরা বিজ্ঞান-লেখকের অনুকরণযোগ্য বলে বিবেচিত হবার দাবী রাখেন। এমন একজন তরুণ কৃতী লেখককে আবিষ্কার ক'রে বসুমতী সম্পাদক আমার মত অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এই সূত্রে মাননীয় সম্পাদক এবং শ্রদ্ধেয় লেখককে একটি অনুরোধ সামান্য একজন অনুরাগী পাঠিকা হিসাবে—আজকাল প্রায় বাড়িতেই ডায়াবেটিস দেখা যায়; ইনসুলিন নামক হর্মোনের অভাবই এই রোগের মূল কারণ। লেখক যদি ইনসুলিন সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা করেন তবে, প্রীত হবো। আর একটি অনুরোধ, শ্রীপালের লেখা ধারাবাহিক ভাবে প্রতি মাসে বসুমতীর পাতায় দেখতে পেলে আনন্দিত হবো। ধন্যবাদান্তে ইতি—শ্রীমতী রঞ্জনা চ্যাটার্জ্জী, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা।

## "মাসিক বসুমতীর" পুরাতন সংখ্যা বেচিতে চাই

"মাসিক বসুমতীর" ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন এবং অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র সংখ্যাগুলি প্রায় অবিকৃত অবস্থা। ( সংখ্যাগুলির আবশ্যক পৃষ্ঠাগুলি ঠিক আছে )। মূল্য : প্রতি সংখ্যার পূর্বতন মূল্য এবং ভিঃ পিঃ করার খরচ। বিনীত—শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, গ্রাম ও পোঃ—গাজিপুর, জেলা—হাওড়া। ২২।৩।১৯৬২।

মাসিক বসুমতী ১৩৬২—১১টি সংখ্যা ( ভাদ্র বাদ ) ১৩৬৩—১০টি সংখ্যা ( আষাঢ় ও আশ্বিন বাদ ) ১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৩৬৬ এবং ১৩৬৭ সব সংখ্যা—এক সঙ্গে নিলে বিশেষ সুবিধায় পাওয়া যাবে। —শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী রেল ষ্টেশন, নদীয়া।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, গ্রাম—বাঘান, আয়াগাঁ, ডাক—কদমতলা ( ভি/নগর ), জেলা—ত্রিপুরা * * * শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়, হাউস অফ্ লেট অন্নদাকিশোর চট্টোপাধ্যায়, বার্জ টাউন, ডাক ও জেলা—মেদিনীপুর * * * প্রিন্সিপ্যাল, সতীশচন্দ্র, শিল্প-বিদ্যালয়, শিক্ষা নিকেতন, কলানবগ্রাম, বর্দ্ধমান * * * শ্রীমতী মৃদুলা চক্রবর্ত্তী, অবধায়ক জে, পি, চক্রবর্ত্তী, গাবতলা রোড বুড়শিবতলা, নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া * * * শ্রীমতী বাণী দত্তরায় অবধায়ক ননীগোপাল দত্তরায়, ২১১১, আপার চেলিডাঙ্গা, ডাক—আসানসোল, জেলা—বর্দ্ধমান * * * শ্রীমতী এ, বন্দ্যোপাধ্যায় অবধায়ক টি, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-এস-এস এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর, ষ্টোরস্ পারচেজ, দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট, কোরাপুট, উড়িষ্যা * * * শ্রীশরৎচন্দ্র মাঝি, পেশকার কানিয়াচক্ সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প, কানিয়াচক্, মালদহ * * * ত্রিদিবনাথ ভাদুড়ী, ডাক—লস্করহাট, পশ্চিম দিনাজপুর * * * শ্রীমতী অপর্ণা ভট্টাচার্য্য অবধায়ক বি, ভট্টাচার্য্য মেডিক্যাল অফিসার ইন্‌চার্জ বিজোলিয়ান ডিসপেনসারি, ডাক—বিজোলিয়ান্, ভিলওয়ারা ( রাষ্ট্র ) * * * দীপককুমার চক্রবর্ত্তী অবধায়ক জে, এন্, ঘোষ, ডি ৩৭।৪৮ গোধওয়ালিয়া, বারাণসী * * * খান্‌সাহেব মহম্মদ আফজার, ভাইস-চেয়ারম্যান, কো-অপারেটিভ লাইব্রেরী নওগাঁ, রাজসাহী, পূর্ব পাকিস্তান * * * ডাক্তার এন, সি, চৌধুরী, জি, বি, রোড, গয়া * * * ডাক্তার নবকুমার সিংহ, গ্রাম ও ডাক—করকাই, জেলা—মেদিনীপুর * * * সেক্রেটারী, প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য মন্দির, ২৫ ডি রোড, এলাহাবাদ ৩, ইউ, পি * * * শ্রীমতী তমশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় অবধায়ক বি, পি, বন্দ্যোপাধ্যায়-ঈদগামোহল্লা, ডাক ও জেলা—বাঁকুড়া * * * শ্রীমতী শ্যামলী গিরি অবধায়ক নারায়ণপ্রসাদ গিরি এম-এ, বি-টি, গ্রাম ও ডাক—দ্বারিকনগর, ভায়া নামখানা, জেলা—২৪ পরগণা * * * গোলোকবিহারী চটরাজ, ডাক—বোলপুর, জেলা—বীরভূম * * * প্রধান শিক্ষক ভবনন্দপুর জুনিয়র হাই স্কুল, ডাক—বাউটিয়া, জেলা——বীরভূম * * * শ্রীমতী রেখা মুখোপাধ্যায় অবধায়ক পি, সি, মুখোপাধ্যায় ও সন্স, সুভাষ রোড, আলিগড়, ইউ, পি, * * * ক্যাপ্টেন এস, এন, বসাক, ২৭।২৮ জুবিলী হোটেল, ডাক—জলন্দর ক্যাণ্ট, পূর্ব পাঞ্জাব * * * শ্রীপ্রভাত বসু, পোষ্ট বক্স নম্বর ১৫৪ কোচ কোষ্ট—ঘনা, পশ্চিম আফ্রিকা * * * শ্রীমতী নিয়তি সেন, এম-এইচ-ডি ধামনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডাক—ধামনগর, জেলা—বালেশ্বর, উড়িষ্যা * * * সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ পাঠাগার, গ্রাম ও ডাক—কাষ্টসোড়া, বীরভূম * * * শ্রীমতী মায়ারাণী বন্দ্যোপাধ্যায় অবধায়ক ভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম ও পোঃ—লাধরকা, জেলা—পুরুলিয়া * * * সেক্রেটারী, পাইকর সত্যেন্দ্র পাবলিক কাম্ গভর্ণমেণ্ট স্পনসার্ড, গ্রাম্য লাইব্রেরী, ডাক—পাইকর, জেলা—বীরভূম * * * টি, পি, মুখোপাধ্যায়, করকাটা কলিয়ারি, ডাক—খাসারি, জেলা—পালামৌ।

সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

## সূচীপত্র

## সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

(রেখাচিত্র)

মহিষাসুরমর্দিনী
—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস অঙ্কিত

স্বপনের মোহজাল রচে . .
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ
সুরভিত কেশতৈল।
পামিকোকো
মৃদু সুরভিত
নারিকেল তৈল।
হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
পরিশোধিত ও
সুগন্ধিত কেশতৈল।
ভৃঙ্গামলা
ভৃঙ্গরাজ ও আমলা
সহযোগে প্রস্তুত
মহোপকারী
কেশতৈল।
যোজনগন্ধা
অনুপম
সুরভি নির্য্যাস।
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা
নিত্য প্রসাধনের সার্থকতায় প্রতিটি অপরিহার্য . .
UPCO

৪১শ বর্ষ, ভাদ্র—১৩৬৯ ] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [ ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

# কথামৃত

গৌরীমা একাকী কলিকাতা হইতে কামারপুকুর এবং জয়রামবাটী পদব্রজে যাইতেছিলেন। সেকালের রাস্তাঘাট এখনকার মত সুগম এবং নিরাপদ ছিল না। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে জাহানাবাদের নিকটে তিনি একদল ডাকাতের চক্রান্তে পড়িলেন। তাহারা মনে করিয়াছিল, মায়ের সঙ্গে টাকাপয়সা এবং ঠাকুরের মূল্যবান অলঙ্কার আছে। ডাকাতেরা ভালমানুষ সাজিয়া মায়ের সহিত চলিল এবং তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি দেখাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ঠাকুরের পূজা করিবার উদ্দেশ্যে গৌরীমা এক গাছতলায় বসিলেন।

ডাকাতেরা ভোগের জন্য গ্রাম হইতে নানাজাতীয় খাদ্য-সামগ্রী যোগাড় করিয়া আনিয়া দিল। পূজান্তে দামোদরের ভোগ নিবেদন করিবার সময় বাধা পড়িল। গৌরীমার মনে ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন তিনি সেই লোকগুলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। ভোগের সামগ্রী ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া তিনি তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোরা অতি পাষণ্ড, ঠাকুরের ভোগের জিনিষে বিষ মেখে দিয়েছিস!"

তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহাদের দুরভিসন্ধি তিনি কি করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা ভাবিয়া ডাকাতগণ বিস্মিত এবং ভীত হইল। সন্ন্যাসিনীকে দৈবশক্তিসম্পন্না বুঝিয়া তাহারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। গৌরীমা তখন বলিলেন, "তোরা দুষ্কর্ম্ম ছেড়ে দে, মুনিষের কাজ ক'রে সংসারধর্ম্ম পালন কর। ঠাকুর তোদের উদ্ধার করবেন।" তিনি আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। ডাকাতেরা কিয়দ্দূর পথ দেখাইয়া চলিল, পরে মায়ের কথামত ফিরিয়া গেল।

জয়রামবাটীতে পৌঁছিয়া গৌরীমা এই ডাকাতদের কাহিনী বিবৃত করিলেন। সকলে রুদ্ধশ্বাসে তাহা শুনিয়া বলিলেন, "ডাকাতদের হাত থেকে খুব বেঁচে গেছেন আপনি।" শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "ঠাকুরই ওকে রক্ষে করেছেন।"

সুযোগ পাইলেই গৌরীমা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাইয়া কিছুদিন থাকিতেন। কলিকাতা, বৃন্দাবন, জয়রামবাটী, পুরী, কোঠার প্রভৃতি স্থানে এইরূপে তিনি দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বাস করিয়াছেন।

তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহের কথায় বেলুড়ের এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তা নিকুঞ্জবালা দেবী বলিয়াছেন,—বেলুড়ে নীলাম্বর

মুখার্জ্জির বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে অবস্থানকালে একদিন গৌরীমাকে একটা বৃশ্চিক দংশন করে। সেদিন মাতাঠাকুরাণীর কি ব্যাকুলতা! সারারাত্রি তিনি ঘুমান নাই, গৌরীমার পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে পুরীধামের এক ঘটনা বলিয়া গৌরীমা খুব আনন্দ অনুভব করিতেন। একদিন মন্দিরে ঠাকুর দর্শনের পর শ্রীশ্রীমা ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, অক্ষয়বটের মূলে সন্তানগণকে লইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। গৌরীমা, গোলাপমা-প্রমুখ মায়েরা তৎক্ষণাৎ 'আনন্দবাজার' হইতে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ প্রসাদ আনিয়া শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। শ্রীশ্রীমা স্বহস্তে স্তরে স্তরে প্রসাদ সাজাইয়া রাখিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাহার পর সকল সন্তানকে প্রসাদের চতুর্দ্দিকে বসিতে বলিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "তোমরা এখন সকলে একটু একটু মহাপ্রসাদ আমার মুখে দাও।" সন্তানগণ একে একে মায়ের মুখে প্রসাদ দিলেন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী মাতাঠাকুরাণীও সকলের মুখে প্রসাদ দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

একবার দুর্গাপূজার সময় ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, মা ঠাকরুণ যদি পূজার দিনে এ বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলা দেন তবেই আমার পূজা সার্থক হবে। শ্রীশ্রীমা ঐ সময় বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। গৌরীমাও পূজা উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। মহাষ্টমী পূজার দিন গৌরীমাকে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "আমার মন টানছে, গিরিশ যে আমায় বড্ড ডাকছে।" গৌরীমা সোৎসাহে বলিলেন, "ভক্তের প্রাণের টান, চল-না একবার।"

তখন গৌরীমা কয়েকজন মহিলাসহ শ্রীশ্রীমাকে লইয়া পায়ে হাঁটিয়াই গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমাকে সেদিন এভাবে নিজের গৃহে পাইয়া গিরিশচন্দ্র আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং তাঁহার যথোচিত পূজা করিয়া বলিলেন, "আজ গিরিশের পূজা সার্থক, গিরিশের জীবন ধন্য!"

১৩১৬ সালে কলিকাতার অন্তর্গত শান্তিনাথতলায় বিপিনকৃষ্ণ চৌধুরীর বাড়ীতে গৌরীমা কিছুদিনের জন্য বাস করিতেছিলেন। একদিন দুপুর বেলা ঐ বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া তিনি একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ চাহিয়া দেখেন, শ্রীশ্রীমা আসিয়াছেন। আজ তাঁহার পরিধানে একখানি গেরুয়া বসন, মাথার কেশ আলুলায়িত, চলন অতি দ্রুত—সবই অস্বাভাবিক রকমের! ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "ও মা গৌরি, তুমি এখানে থাক? আমি তোমার কাছেই এলুম।" তাঁহাকে এমন অসময়ে একা এই বেশে আসিতে দেখিয়া গৌরীমা বিস্মিতচিত্তে একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন, "ওমা, কি ভাগ্যি, তুমি এসেছ! এখানে বসো মা।" তাহার পর ডাকিলেন, "ও আশু! [১] ও কেনা! [২] তোরা কোথা গেলি সব, শীগ গির আয়। মা ঠাকরুণ যে এসেছেন।"

শ্রীশ্রীমা বাধা দিয়া বলিলেন, "কাকেও ডেকো না, ঘরে চল।" এই বলিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন, গৌরীমাও নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। ঘরে আসিয়াই তিনি গৌরীমাকে মাটিতে শোয়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দুইহাতে ঝাড়িতে লাগিলেন। গৌরীমা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীমা ঝাড়া শেষ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মা, তুমি ভেবো না, আমিও চাট্টিখানি নিয়ে চললুম।" তিনি ফিরিয়া চলিলেন। গৌরীমা তাঁহার পশ্চাৎ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িলেন।

ঘরে জনৈকা বালিকা লেখাপড়া করিতেছিল। সে গৌরীমার যাওয়া এবং আসা দেখিল, কিন্তু ইতিমধ্যে কি-যে ঘটিল, তাহার কিছুই বুঝিল না। গৌরীমা সেদিন একটা আবেশের মধ্যে রহিলেন, কাহারও সহিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারিলেন না। সেই দিনই তাঁহার প্রবল জ্বর হইল এবং পরের দিন সারা দেহে বসন্তের গুটিকা প্রকাশ পাইল। রোগ এমন ভীষণ অবস্থা ধারণ করিল যে, চিকিৎসকগণ গৌরীমার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন।

ওদিকে উদ্বোধন-ভবনে শ্রীশ্রীমায়েরও ঐ সময় বসন্ত হইল। ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল গৌরীমাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "মায়ে ঝিয়ে ভাগাভাগি ক'রে রোগ-ভোগ নিয়েছেন, আমরা তার কি করব!"

শ্রীশ্রীমা রোগশয্যা হইতে তাঁহার বালিকা-শিষ্যার জন্য চিন্তিত হইয়া স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা শরৎ, গৌরীদাসীর ত ঐ অবস্থা, ওখানে জায়গাও কম, খুকীকে এখানে এনে রাখ!" এদিকে গৌরীমাও রোগযন্ত্রণার মধ্যেই বালিকাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, "দ্যাখ্, আমি মরে গেলে তুই কিছুতেই বাড়ী ফিরে যাবি নি: মা ঠাকরুণের কাছে গিয়ে থাকবি।" গৌরীমার অবস্থা দেখিয়া বালিকা সেই স্থানে থাকিয়াই দামোদরের পূজা করিত এবং মায়ের পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং আশুতোষ চৌধুরীর গর্ভধারিণী গৌরীমার এই রোগে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া দিবারাত্র যেরূপ অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীশ্রীমা এইজন্য আশুতোষ চৌধুরীর গর্ভধারিণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার মেয়ের যা সেবা করলে, মা, এ জন্মেই মুক্ত হ'য়ে যাবে।" সুরেন্দ্রনাথ সেনের দীক্ষাগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দও এইভাবে গৌরীমাকে সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য শিষ্যকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া দিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। গৌরীমার আরও কয়েকজন ভক্তসন্তান এবং আত্মীয় এই সময় তাঁহার সেবার জন্য নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

মঙ্গলময় ঠাকুরের ইচ্ছায় গৌরীমার জীবন রক্ষা পাইল। আরোগ্যলাভের কিছুকাল পর শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি প্রায় আড়াই মাস উদ্বোধন-ভবনে বাস করেন।

এই সময় গৌরীমা এক ব্রত উদ্‌যাপন করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নিয়মিতরূপে চণ্ডীপাঠ করিতেন এবং প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় নবম্যাদি কল্পারম্ভের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ দিবস বিধিমত চণ্ডীপাঠ এবং হোম করিতেন। চণ্ডীপাঠের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "কলিকালে চণ্ডীপাঠ মহাযজ্ঞ।"

—গৌরীমা গ্রন্থ হইতে।

(১) আশুতোষ চৌধুরী (২) নীরদমোহিনী দেবী

# গীতা-জননীর অনুধ্যান

"গঙ্গাসমীরণ"

## পাঠ

"ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্॥
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্।
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥

## ভাবার্থ

হে অম্ব, অর্থাৎ জননী। মহাভারতের মধ্যে তোমাকে গেঁথেছিলেন প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব; অর্জুনকে বোঝাবার জন্য তোমাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন স্বয়ং ভগবান নারায়ণ, তুমি ভবদ্বেষিণী অর্থাৎ পুনর্জন্মনাশিনী; তুমি অদ্বৈতসুধাধারাবর্ষিণী; তুমি অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্তা। তোমাকে আমি অনুধ্যান করছি।

## বিশ্লেষণ

"মাগো তুমি আমার হৃদয়মাঝে উদয় হও"—এইটুকু-ই হ'ল এই শ্লোকের মর্ম্মকথা। অবশিষ্ট অংশ মায়ের বিশেষণ। অনুগত সন্তান ধ্যান করছেন কা'কে? গীতা-জননীকে। মায়ের রূপ কেমন? মা অষ্টাদশ অধ্যায়ে রূপায়িতা। মায়ের স্থিতি কোথায়? মা মহাভারতের মধ্যমণি। কে মাকে এমন স্থানে সন্নিধান করলেন? প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব। মায়ের ঐশ্বর্য্য কেমন? মা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ভগবতী। মায়ের গুণ কি? মায়ের প্রধানতঃ দুটি গুণ—মা ভবদ্বেষিণী এবং অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী। গীতার উদ্ভব হয়েছিল কেমন ক'রে? স্বয়ং ভগবান নারায়ণ গীতা গান করেছিলেন। কী উপলক্ষ্যে ভগবান গীতা গান করেছিলেন? অর্জ্জুনকে জাগিয়ে তোলবার জন্য।

## কৃষ্ণ-ত্রিবেণী

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে গীতাকে কেন্দ্র ক'রে তিনজনের নাম রয়েছে—নারায়ণ, অর্জ্জুন, ব্যাস। ভগবান গান গাইছেন, অর্জ্জুন গান শুনছেন, ব্যাসদেব গানের মালা গ্রন্থন করে গেছেন। বক্তা, শ্রোতা, প্রবক্তা তিনজন-ই কিন্তু কৃষ্ণ। বক্তা তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—যিনি "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"১। শ্রোতা অর্জ্জুন—যাঁর একবিংশ নামের মধ্যে একটি নাম "কৃষ্ণ"২। প্রবক্তা মহামতি ব্যাসদেব—যাঁর আসল নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি জানবার জন্য অর্জ্জুন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তার উত্তরে ভগবান ২৪টি মন্ত্রে তাঁর নিজের অনন্ত বিভূতির মধ্যে প্রধান প্রধান বিভূতি বর্ণনা করে, সেই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস।" এই স্বীকৃতির মধ্যে একটি পরম সত্য নিহিত রয়েছে—সেই "এক"-ই বহু হ'য়ে, বিচিত্র ভূমিকাতে গীতা-লীলা করেছেন। আসলে কৃষ্ণ-ই গীতার বক্তা, কৃষ্ণই গীতার শ্রোতা, আবার কৃষ্ণই গীতার প্রবক্তা। গীতা এক অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-ত্রিবেণী-সঙ্গম।

এই রকম ত্রিবেণী-ধারা জীবের চিত্তভূমিতে নিত্যপ্রবাহিত, নিত্যসংযুক্ত। প্রত্যেক ভক্তের মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, শ্রোতা এবং প্রবক্তা। সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হ'য়ে তিনি অহরহ অমৃতবাণী শোনাচ্ছেন। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকাতে তিনিই জীবের বুকে আশা উদ্দীপনা জাগাচ্ছেন। স্মৃতিরূপে তিনিই আবার চিত্তপটে অমৃতবাণীর মালা-গ্রন্থন করছেন।

## ভবদ্বেষিণী

গীতাধ্যানে গীতার দুটি বিশেষণ বিশেষ লক্ষ্যণীয়—"ভবদ্বেষিণী" এবং "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী"। "ভব" মানে এমন বস্তু যা হয় বা জন্মায়। "ভূ"-ধাতু থেকে "ভব" শব্দ উৎপন্ন। "ভূ" মানে হওয়া। যা হয়, তা চিরকাল থাকে না, যার জন্ম আছে তার বিনাশ আছে। এই হ'ল অনাদিকালের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ"।৩ "ভব" মানে অনিত্য সংসার—যা' পরিবর্ত্তনশীল, যা' নাশবান। আসার পরে চলে যাওয়া, যাওয়ার পরে আবার আসা। মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্ম—"ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"। সৃষ্টির আদিযুগ থেকে চলেছে এই আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তন। কারণ কী? বাসনা, সংস্কার। যে-কারণে এই যাতায়াত ঘটে, সেই কারণের প্রতি—অর্থাৎ বিষয়বাসনার প্রতি—দ্বেষ জন্মায়, জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্য সঞ্চারিত হয় গীতার কল্যাণে। সেই জন্যই গীতা ভবদ্বেষিণী অর্থাৎ পুনর্জন্মনাশিনী।

## অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী

জীবকে কেবল ভব-বিমুখ ক'রেই গীতা ক্ষান্ত হয় না; ভব-নদী পার হবার উপায় নির্দেশ করে। গীতা বর্ষণ করে অদ্বৈত অমৃতধারা। মানুষের সামনে রয়েছে দুটি বড়ো সত্য—মৃত্যু আর অমৃত। অমৃতকে লাভ করলে মৃত্যুভয় দূর হয়; অমৃতকে লাভ করতে না পারলে মৃত্যু

---

১ শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮

২ ফাল্গুনী, জিষ্ণু, শ্বেতবাহন, কিরীটী, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী, ধনঞ্জয়, পার্থ, শক্রনন্দন, গাণ্ডীবী, মধ্যমপাণ্ডব, শ্বেতবাজী, কপিধ্বজ, রাধাবেধী, সুভদ্রেশ, গুড়াকেশ, বৃহন্নল, ঐন্দ্রি, অর্জ্জুন।

৩ গীতা ২।২৭

এবং পুনর্জ্জন্ম অনিবার্য্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে—"প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ—মৃত্যুঞ্জয় হতে হবে; জন্মমৃত্যুর দোলা থেকে নিষ্কৃতিলাভ করতে হবে। কেমন করে তা' সম্ভব? যিনি অমৃতস্বরূপ তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে তা' সম্ভব এবং সহজ। কেমন ক'রে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়? এই প্রশ্নের উত্তর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে শ্রীমধুসূদনের শ্রীমুখনিঃসৃত ৫৭৪টি সুধাধারাবর্ষিণী মন্ত্রমালাতে। সেই অমৃতবাণীর মধ্যে ভাল মন্দ, আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্ব নেই। সেই জন্যই বোধ করি গীতা অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী।

## মধ্যে মহাভারতম্

গীতাধ্যানের রচয়িতা বলেছেন ব্যাসদেব গীতাকে গ্রথিত করেছেন "মধ্যে মহাভারতম্"—মহাভারতের মধ্যস্থলে, মহাভারতের মর্ম্মভূমিতে। সাধারণতঃ "মহাভারত" বলতে একখানি গ্রন্থ বুঝায়। গ্রন্থখানির আকার বিরাট; তাই নামের আদিতে বলা হয়েছে "মহা"। গ্রন্থের বিষয়-গৌরবের ভার আছে; তাই নামের অন্তে বলা হয়েছে "ভারত"। নৈমিষারণ্যে মহর্ষি শৌনকের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন লোমহর্ষণ সূতের পুত্র উগ্রশ্রবা। মহর্ষি শৌনক এবং অন্যান্য মুনিগণের অনুরোধে উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে মহাভারত আবৃত্তি করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন এই গ্রন্থটি মহান্ এবং ভারবান বলেই এর নাম মহাভারত ৪। পুরাকালে দেবগণ তুলাদণ্ডের একধারে সরহস্য চারখানি বেদ এবং অন্যধারে মহাভারত স্থাপন করে দেখলেন যে, আকারে এবং বিষয়-গৌরবে মহাভারত-ই বেশী ভারী। তখন থেকে এই বিরাট গ্রন্থখানি "মহাভারত" নামে বিখ্যাত। হিব্রু বাইবেল, হোমারের ইলিয়াড্, ফার্দুসীর শাহনামা এবং বাল্মীকির রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের আকার অনেক বড়। আর, মহাভারতের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে কথিত আছে :—

> ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ
> যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যা' আছে, সেই কথাই সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃতভাবে অন্যত্র আছে; মহাভারতে যে-বিষয়ের আলোচনা নেই, তা অন্য কোথাও নেই। "যা' নাই ভারতে তা' নাই ভারতে"।

এহেন বৃহদাকার এবং বিষয়গৌরবে ভারবান মহাভারত-গ্রন্থের মধ্যস্থলে গীতার স্থান, গীতার অবতারণা হয়েছিল ভীষ্মপর্ব্বের ২৫ থেকে ৪২ অধ্যায়ে। স্থূলদৃষ্টিতে ঐ অংশকে মহাভারত-মহাকাব্যের মধ্যস্থল বলা যায় না, সেকথা ঠিক। কিন্তু গীতার জন্ম মহাভারত-উপাখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র এবং পঞ্চপাণ্ডব আশৈশব কুন্তী ও গান্ধারীর স্নেহচ্ছায়ায় সমভাবে লালিত; দুর্য্যোধনের দম্ভ, দর্প, রাজ্যলিপ্সা এবং পরশ্রীকাতরতা-বৃত্তিকে শকুনি ইন্ধন দিয়েছেন; জতুগৃহদাহ, অক্ষক্রীড়া, রাজসভায় দ্রৌপদীর অপমান, পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে; কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের ক্ষীণতম আশাদীপটি নির্ব্বাপিত; স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য-ও ব্যর্থ হয়েছে; আসন্ন যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে ভারতের ইতিহাসের পট-পরিবর্ত্তন। আকাশে তখন একাদশ গ্রহের সন্নিবেশ। যুগান্তকারী যুদ্ধের প্রাক্কালে, দুর্জ্জয় রণদামামার তুমুল শব্দের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছিল শ্রীমধুসূদনের বাণী—মধ্যে মহাভারতম্।

"মধ্যে মহাভারতম্"—এই বর্ণনার আরও বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। "মহাভারত" শব্দের অর্থ কেবল মহাভারত নামক গ্রন্থ নয়। ভারত ও বৃহত্তর ভারত বলতে যে বিরাট ভূখণ্ড, তারও নাম মহাভারত। তা' ছাড়া ঐ ভূখণ্ডের যে কৃষ্টি, তার ধারকের নামও মহাভারত। এই দুই অর্থেও মহাভারতের মধ্যমণি এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ঐতিহাসিকদের মতে কম-বেশী তিন হাজার বছর পূর্ব্বে গীতার প্রচার হয়েছিল। তখন থেকে গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোভূষণ, সমভাবে সর্ব্বসম্প্রদায়ের নমস্য, কল্যাণের জননী। সার্থক গীতা গ্রথিতা মধ্যে মহাভারতম্।

মহাভারত-গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু যে কেবল আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব তা' নয়। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের শত সহস্র কণ্টকময় সমস্যার বিবৃতি ও সমাধানে মহাভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাভারতের মধ্যে আছে একটি বিরাট, প্রাচীন সভ্যতার বহুবিচিত্র জীবন-সাধনার সর্ব্বাঙ্গীন চিত্রাঙ্কন। উপনিষদ্ রহস্য-বিদ্যা; তার জন্ম গহন অরণ্যের জনহীন মৌনভূমিতে; তার সাধনা মুষ্টিমেয় উচ্চাধিকারীর মধ্যে নিবদ্ধ। মহাভারত কিন্তু সকলকে নিয়ে, সকলের জন্য। মহাভারতে আমরা পাই—একাধারে শ্রুতি, স্মৃতি, রাজনীতি সমাজনীতি, সমরনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ইতিহাস ও সাহিত্য মহাভারতের লীলাকেন্দ্র নির্জ্জন তপোবন নয়, কর্ম্মমুখর কোলাহলময় লোকালয়। এই মহাভারত বিশ্বমানবের জীবন-বেদস্বরূপ।

## পার্থায় প্রতিবোধিতাং

মহাভারতের মধ্যমণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মহাভারতযুগে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে জাগিয়ে তোলবার জন্য গীতার জন্ম। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে কৌরব পক্ষ ও পাণ্ডব পক্ষ যুদ্ধের প্রতীক্ষায় পরস্পরে সম্মুখীন। অজেয় অর্জ্জুন ধনুকখানি তুলে, শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ত হয়ে, সারথি হৃষীকেশকে বললেন—"দুই সেনার মাঝামাঝি রথখানাকে রাখো ত! দেখা যাক্, কার কার সঙ্গে লড়তে হবে—দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের কতোটা দৌড়!" তখনো পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থা—হাতে গাণ্ডীব, বুকে বল, মনে আত্মনির্ভরতা। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে-ই অর্জ্জুন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। চোখের সামনে তিনি দেখলেন—মাথা দেবার জন্য যুদ্ধে নেমেছে অতি নিকট-আত্মীয় ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও তার ভাইরা, মাতুল শকুনি, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ ইত্যাদি বন্ধুগণ এবং তা'ছাড়া সহস্র সহস্র আপনার জন। এ দৃশ্য দেখে অর্জ্জুনের দেহে ও মনে যে প্রতিক্রিয়া হল, তা অতি সাধারণ কাপুরুষের উপযুক্ত। তাঁর শরীর শীর্ণ, মুখটি শুকিয়ে গেছে, উত্তেজিত হয়ে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে, মন ঘুরছে, তিনি অমঙ্গল লক্ষণ-ই দেখছেন, স্বজনবধে কোনও সুখ দেখতে পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় অর্জ্জুন বিজয় চান না, রাজ্যভোগ চান না। শত্রুপক্ষ তাঁকে হত্যা করলেও তিনি তাদের

---

৪ চত্বারঃ একতঃ বেদাঃ ভারশ্চৈকমেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্ ॥
চতুর্ভ্যো সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোহধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।
মহত্ত্বাৎ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে ॥

হত্যা করতে প্রস্তুত নন। পৃথিবী তো দূরের কথা, ত্রৈলোক্যের রাজত্ব পেলেও তিনি আত্মীয়বধের পাপে লিপ্ত হ'তে চান না। অনেকগুলি যুক্তি দ্বারা নিজের সিদ্ধান্তকে সমর্থন ক'রে অর্জ্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন এবং শোকে উদ্বিগ্ন হ'য়ে রথের উপর ব'সে পড়লেন। দীর্ঘ বক্তৃতার পর অর্জ্জুন উপসংহারে বললেন "ন যোৎস্যে ইতি"—যুদ্ধ করবো না—এই বলে মৌন অবলম্বন করলেন।

এইবার আরম্ভ হল "পার্থায় প্রতিবোধিতা" গীতা। অর্জ্জুনকে জাগাতে হবে। অর্জ্জুন মোহগ্রস্ত, মিথ্যাশোকাচ্ছন্ন, অর্জ্জুন আদর্শ-ভ্রষ্ট। ধর্মযুদ্ধের প্রাক্কালে সেনানায়কের শোকবিহ্বলতা পাণ্ডবের পক্ষে মর্মান্তিক বিপর্যায়, বিশ্বব্যাপী নিদারুণ অমঙ্গলের কারণ। অতএব ভগবান স্বয়ং ভার নিলেন অর্জ্জুনকে প্রতিবোধিত করবার।

প্রথম সম্বোধনেই শ্রীকৃষ্ণ আরম্ভ করলেন প্রশ্নবাচক বাক্যবাণ দিয়ে:—হে অর্জ্জুন, আর্য্যগণের অযোগ্য, অধর্ম্মকর, কুখ্যাতিজনক এই মোহ তোমার এই বিষম সঙ্কটকালে কোথা থেকে উপস্থিত হ'ল? ৫ তারপরেই তীব্র ভর্ৎসনা এবং স্পষ্ট আদেশ: তুমি ক্লীবের মত আচরণ ক'রোনা: তুমি ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াও।৬ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, যিনি একদা মহেশ্বরের সঙ্গে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন, যাঁর শৌর্য্যবীর্য্য জগদ্বিখ্যাত, তাঁকে ধাক্কা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—তুমি নপুংসকের মতন আচরণ করো না, মনের তুচ্ছ দুর্বলতার অধীন হ'য়োনা। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে Shock therapy.

এই রকম কড়া চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনের আত্মসম্মান জাগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ দুটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন—পার্থ আর পরন্তপ। পার্থ মানে পৃথার পুত্র। পৃথা দেবী দেবানুগ্রহে যে পুত্রগুলি লাভ করেছিলেন, তাঁর সেই তনয়গুলির প্রত্যেকেই বীর্য্যের জন্য প্রখ্যাত। সুতরাং অর্জ্জুন কেন কাপুরুষ হতে যাবেন? পরন্তপ মানে শত্রুগণের সন্তাপকারী। শত্রুসেনাকে নির্ম্মূল করাই অর্জ্জুনের শোভা পায়, তাদের দেখে চোখের জল ফেলার মধ্যে গৌরব নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মোট ৫৭৩ মন্ত্র গান করে ভগবান ধাপে ধাপে প্রিয়সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে নানা রকম উপদেশ দিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "মন দিয়ে সব কথা শুনলে তো? তোমার অজ্ঞান দূর হয়েছে কি?৭

গীতা শ্রবণের পর অর্জ্জুন যেন নতুন মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটলো। তিনি শান্তভাবে ভগবানের উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন: "তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে আত্মজ্ঞানের স্মৃতি ফিরে এসেছে: আমার চিত্তস্থির হয়েছে, সংশয় তিরোহিত হয়েছে।" এই সমাহিত অবস্থায় উপনীত হয়ে তখন অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন—"তোমার কথা অনুসারেই কাজ করবো—করিষ্যে বচনং তব।" এই অর্জ্জুনই ছিলেন গীতার প্রথম অধ্যায়ে বিষাদের বিগ্রহ, স্বজনবান্ধবের হত্যার আশঙ্কায় মুহ্যমান, আত্মবিস্মৃত, অস্থিরচিত্ত এবং সন্দেহের দোলায় দোলায়িত। গীতার আদিতে অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিষণ্ণ, ব্যর্থতাবাদীর "ন যোৎস্যে" মূর্ত্তি। গীতার অন্তে অর্জ্জুন—দৃঢ়সঙ্কল্প, জ্ঞাননিষ্ঠ, ভক্ত কর্ম্মযোগীর "করিষ্যে বচনং তব" মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে ভগবদ্বাণী—"যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করো, আমাকে কিন্তু ধরে থেকো!" শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে আছে যুক্তির পর যুক্তি, তত্ত্বের পর তত্ত্ব: কিন্তু মূল কথা—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে, আত্মসমর্পণ ক'রে, ধর্মযুদ্ধ করো। ভয় কি? আমি তো আছি!

অর্জ্জুনের মতি-পরিবর্ত্তন মানে মহাভারতে যুগান্তরের সূচনা, সমগ্র গীতাখানি অর্জ্জুনের চেতনার সংবোধনা—গীতা "পার্থায় প্রতিবোধিতা।"

### ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং

গীতার অশেষ বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, এই শাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত। গীতার আবির্ভাবের পূর্বে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে শোনা গিয়েছিল "ঋষিরুবাচ", "ব্যাস উবাচ", "বাল্মীকিরুবাচ" ইত্যাদি। "শ্রীভগবান উবাচ" এই শুভ-সংবাদটি বিশ্বজগৎ প্রথম শুনেছিল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপলক্ষ্যে। সর্ব্ব উপনিষদের সার এই অপূর্ব্ব গান গীত হয়েছিল ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং।

৫ গীতা ২।২

৬ গীতা ২।৩

৭ গীতা ১৮।

## শ্রীবিবেকানন্দ

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঘন মেঘ মাঝে যথা বিদ্যুত-বাহিনী
তেমতি তোমার গীত আলোকিত কাহিনী!
মন্দ্রেরি মহারোলে
সচকিত আঁখি খোলে
অন্তরে পশে প্রভা বিজ্ঞান-দায়িনী।

দিকে দিকে বিচ্ছুরি' আলোবাণী-ফলকে
বিদূরিলে তমোরূপ কুঞ্জর-দলকে;
নিরমল হ'ল চিত
বিতর্ক-বিরহিত
ক্রমে শুভ বিম্বিত, হেরি নিষ্পলকে!

মহাবীর সুন্দর, অনঙ্গ-বিজয়ি,
সন্ন্যাসী-শিরোমণি, অসঙ্গ-বিষয়ি!
করম-যোগের কথা
বেদান্ত-মানবতা
বুঝালে, যা সর্ব্বথা অধীনতা-বিলয়ী।

ধীরে ধীরে ব্যথিত হ'তেছিনু শয়নে
ভাস্বর তনু তব নিরখিনু নয়নে!
আমারে কৃপার লাগি'
জাগ তুমি বৈরাগি!
প্রণতি জানিও, নিও উত্তর অয়নে।

# ভক্তি বৃত্তি

স্বর্গত সুরেশচন্দ্র নন্দী

( অপ্রকাশিত ব্যাখ্যা সংকলন )

ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধা-প্রেম-অনুরাগ-ঐশ্বর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার ভক্তি-শাস্ত্র সকল শ্রেণীর মানবের ভক্তি-বৃত্তির কথায় পূর্ণ। সকল শ্রেণীর মানবের হৃদয়ে ভক্তিবৃত্তি বিদ্যমান। পরম শিব শ্রীভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ অথবা অনুপনীত ব্রাহ্মণ ভেদে সকল মানুষই ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের অধিকারী।—

ব্রহ্মক্ষত্র বিশঃ শূদ্রা স্ত্রিয়শ্চাত্রাধিকারিণঃ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থোবানুপনীতোথ বা দ্বিজঃ॥

শিবোপনিষৎ ৬৬ অধ্যায়—শ্লোক ২

শ্রীভগবান শিব মুখনিঃসৃত বাণী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কেবলমাত্র দুর্লভ মানব-দেহধারীগণই ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে। কিন্তু পরম ভাগবত গোস্বামীপ্রবর রোমহর্ষণ-সুত জগদ্বাসীকে ইহা অপেক্ষাও অপূর্ব্ব কথা শুনাইয়াছেন। তাঁহার উক্তিটি এইরূপ: এই বৃত্তি যথাযথভাবে অনুশীলিত হইলে শুধু মানব কেন, কীট পক্ষিগণও যদি উহার অনুশীলন করে, তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঊর্দ্ধগতি—মুক্তিলাভ হয়। যে সকল মনুষ্য জ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীহরিতে চিত্ত সমাপন করে, তাহাদিগের যে কিরূপ সদ্গতি লাভ হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

কীটপক্ষিগণাশ্চ হরৌ সন্ন্যস্ত চেতসাম
উর্দ্ধামেব গতিং মন্যে কিং পুনঃ জ্ঞানিনাংনৃণাম্।

গরুড় পুরাণম্ ২৩ অধ্যায়—শ্লোক ৩১

ইহা অপেক্ষা অপূর্ব্ব কথা আর কি আছে? সর্ব্ব জীবের মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, কারণ শ্রীভগবান বাসুদেবের চরণে নিষ্কাম ভক্তিযোগ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রকৃত বৈরাগ্য অর্থাৎ বিষয়-বিতৃষ্ণা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান সাধক বা ভক্তহৃদয়ে স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি॥

—ভাগবত ৪।২৯।৩৭

নৈমিষারণ্যে অনুষ্ঠিত ঋষি-সভায় শ্রীভগবান ব্যাসদেব-শিষ্য গোস্বামীপ্রবরসূতও ঠিক এইরূপ কথাই ঋষিগণকে বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তিটি এইরূপ: শ্রীভগবান বাসুদেবের চরণে প্রয়োজিত ভক্তিযোগ দ্বারাই ভক্তের হৃদয় বিষয়-বৈরাগ্য ও অহেতুক তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদ হৈতুকম্॥

—ভাগবত ১।২।৭

উপরোক্ত দুইটী বাণী সমভাব প্রকাশক। উভয় উক্তির সারমর্ম-কথা—শ্রীভগবানের শ্রীচরণে নিষ্কাম ভক্তি অর্পিত হইলে, ভক্ত অচিরে বৈরাগ্য ও দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীহরির করুণা লাভ করে।

ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন দ্বারাই যে শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, উহা ভগবদোক্তিতেই স্বপ্রকাশ। শ্রীভগবান বাসুদেব স্বয়ং বলিয়াছেন, আদি মধ্য অন্তহীন সপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ, অব্যয় এবং অদ্বয় আমার যে রূপ আছে, তাহা ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের দ্বারাই অনুভব্য ও লভ্য।

মদ্রূপং অদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্ত বিবর্জ্জিতম্।
সপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যাজানাতি চ অব্যয়ম্॥

—বাসুদেবোপনিষদ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে চিরসখা ভক্ত ও শিষ্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ত্রিভুবনের ভক্তবৃন্দকে ঠিক এইরূপ উপদেশই দিয়াছেন—আমার এইরূপ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান কিংবা যজ্ঞ দ্বারা কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র অনন্য-ভক্তি দ্বারাই ভক্তগণ আমাকে যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া এইরূপ দেখিতে ও আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসিমাং যথা॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪

গীতা ১১।৫৩, ৫৪

শ্রীভগবানের স্বরূপ দর্শন বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীভগবান শ্রীশঙ্কর এইরূপ বলিয়াছেন, মদীয় স্বরূপ কাহার প্রত্যক্ষগোচর নহে। কোন ব্যক্তিই চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে পায় না। যাহারা হৃদয় অর্থাৎ শ্রদ্ধাভক্তি-মনীষা অর্থাৎ সম্যগ জ্ঞান ও মন অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা পরিকল্পিত আমার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয় তাহারাই অমৃতময় হইয়া যায়।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি মে স্বরূপং
ন চক্ষুষা পশ্যন্তি মাস্তু কশ্চিৎ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তং
যে মাং বিদুস্তে হ্যমৃতা ভবন্তি॥

শিবোপনিষদ ৬২ অধ্যায়, শ্লোক ১৫

শ্রুতি বলিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে। তাঁহাকে কেহ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। হৃদয় অর্থাৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি-মনীষা অর্থাৎ সম্যগ জ্ঞান ও মনন অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমৃতত্বলাভ করেন।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। ৯

কঠোপনিষদ ২য় অধ্যায়, ৩য় বল্লী মন্ত্র ৯

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা এইরূপ বলিয়াছেন, হে কুন্তীনন্দন! ভোজন, হোম, দান, তপস্যা প্রভৃতি যে কর্ম্মই তুমি কর, তৎসমুদায় এইরূপভাবে সাধন কর যেন উহা আমাতেই অর্পিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতেই সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

গীতা ৯।২৭

সর্ব্বজীবের কল্যাণার্থ শ্রীভগবান শঙ্কর জগদীশ্বরী শঙ্করীকে উপলক্ষ করিয়া নিখিল জীবপ্রবাহের উদ্দেশে বলিয়াছেন—মানব সর্ব্বদা যে অশন, বসন, দান, অধ্যয়ন, যজন-যাজনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা এইরূপ ভাবে করে যেন, উহা ব্রহ্মেই অর্পিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতেই যেন ঐ সমস্ত কর্ম্ম করে।

যৎ করোতি সদালোকে দানাধ্যয়ন যাজনম্।
অশনং বসনং বাপি কুর্ব্বীত ব্রহ্মসাৎ প্রিয়ে।

শিবোপনিষদ ৪র্থ অধ্যায় ২১ শ্লোক

এই ব্রহ্মার্পণ বা শ্রীকৃষ্ণার্পণ বুদ্ধির উদয় হয় কখন? ভগবাদাকারা মনোবৃত্তি বা ভক্তিবৃত্তি শ্রীভগবানের দিকে যখন ধাবিত হয়, তখনই এই বুদ্ধির উদয় হয়। এই প্রকার ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন দ্বারাই শ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের কথাই সূচিত করিয়াছে। শ্রীভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—ভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই তিনি প্রকাশিত হন।

অপসংবাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম।

ব্রহ্মসূত্র ৩য় অধ্যায়, ২য় পাদ, ২৪ সূত্র

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন শ্রীভগবান কীর্ত্তিত হইলেই শীঘ্র প্রকাশিত হন এবং ভক্তগণকে অনুভব করাইয়া থাকেন।

স সংকীর্ত্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভব ত্যনুভাবয়তি ভক্তান্।

ভক্তি সূত্র, ৮০

সুতরাং ভক্তিবৃত্তি যথাযথভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে অনুশীলিত হইলে কেবল দুর্লভ মানব দেহধারী মানবই যে মুক্তিলাভ করে তাহা নহে, এমন কি পক্ষীকীটাদিও যদি উহার অনুশীলন করে তাহা হইলে তাহারাও অচিরে মুক্তিলাভ করিবে। ভক্তিশাস্ত্রে নানা শ্রেণীর মানবের ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা উল্লিখিত আছে। আজ আমরা প্রীতি, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার ভক্তিশাস্ত্র হইতে আত্মারাম মুনীশ্বরগণ এবং স্বয়ং শ্রীভগবান সকল শ্রেণীর মানবের ভক্তিবৃত্তির কথা যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে কতকগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম।

## জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর ভক্তিবৃত্তি

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত, সখা ও শিষ্য উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! যাহারা আমার সর্ব্বাত্মা ও সচ্চিদানন্দ রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া বা না করিয়াও কেবলমাত্র শ্রীনন্দনন্দনরূপ অনন্যভাবে আমাকেই ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি ভক্ততমগণের মধ্যে গণ্য মনে করি।

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্য ভাবেন তেমে ভক্ততমা মতাঃ।৪

ভাগবত ১১।১১।৩৩

শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাণী জ্ঞানী-অজ্ঞানী ব্যক্তির কথা বুঝাইতেছে।

## বিষয়াসক্ত-অনাসক্তের ভক্তিবৃত্তি

বিষয়াসক্ত ও বিষয়ে অনাসক্তের ভক্তিবৃত্তির কথা শ্রীভগবান এইরূপ বলিয়াছেন:—হে উদ্ধব! আমার ভক্ত ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করিতে করিতে বিষয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও প্রায়শঃ ভক্তিবৃত্তির প্রভাব দ্বারাই উহাতে অভিভূত হয় না।

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈর জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়শঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।

ভাগবত ১১।১৪।১৮

শ্রীভগবান তাঁহার এই অমৃতময়ী বাণী দ্বারা বিষয়-আসক্ত ও বিষয়-অনাসক্ত ভক্তের ভক্তিবৃত্তির কথা সখা, ভক্ত ও শিষ্য উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন।

## কদাচারী ও সদাচারীর ভক্তিবৃত্তি

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিরসখা ভক্ত ও শিষ্য অর্জ্জুনকে কদাচারী ও সদাচারীর ভক্তিবৃত্তির কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—যদি অতি দুরাচারপরায়ণও একনিষ্ঠা ভক্তি সহকারে অর্থাৎ বাসুদেব বুদ্ধিতে অন্য দেবতাকে ভজনা না করিয়া আমাকেই ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকেও সাধু বলিয়া গণ্য করিবে। কারণ উত্তম সাধু, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি নির্ম্মল হইয়াছে। আমার সেই কদাচারী ভক্তও সত্বর ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া চিরশান্তি লাভ করে। কদাচারীই যদি পরমা গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সুকৃতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষি প্রভৃতি যে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর কথা কি?

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ। ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। ৩১
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। ৩৩

গীতা ৯ম অধ্যায় ৩০।৩১।৩৩

এই ভগবদোক্তি কদাচারী ও সদাচারীর ভক্তিবৃত্তির পরিচয় দিতেছে।

## মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষের ভক্তিবৃত্তি

পরম ভাগবত গোস্বামীপ্রবর সূত মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষের ভক্তিবৃত্তির প্রসঙ্গে কি বলিয়াছেন, তাহা শুনুন—হে শৌনক! অবিদ্যা বন্ধন হইতে যে সমস্ত মানব মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, সেই সমস্ত মুমুক্ষু মানব ঘোর মূর্ত্তি ভৈরবদিগের পরিত্যাগ করিয়া শান্ত মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণের বিভূতি সকলকে উপাসনা করিলেও তাহাদিগের মনোমধ্যে অন্য দেবতার প্রতি কোন প্রকার দোষ ভাব স্থান পায় না।

মুমুক্ষবো ঘোররূপাংহিত্বা ভূতপতিনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তাভজন্তিহ্ন সুয়বঃ।

ভাগবত ১।২।২৬

গোস্বামী প্রবরের এই উক্তি হইতে আমরা মুমুক্ষ মানবের ভক্তিবৃত্তির কথা বুঝিতে পারি। পুনশ্চ তিনিই মুক্ত পুরুষের ভক্তি

সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করুন :—হে শৌনক! অহঙ্কাররূপ চিৎজড়ের গ্রন্থি হইতে নির্ম্মুক্ত আত্মারাম মুনীশ্বরগণও শ্রীহরির গুণেই আকৃষ্ট হইয়া শ্রীহরিতে অহেতুকী ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ॥ ভাগবত ১।৭।১০

## সকাম ও নিষ্কাম ভক্তের ভক্তিবৃত্তি

সকাম ও নিষ্কাম ভক্তের ভক্তিবৃত্তি কিরূপ, তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্যসখা প্রিয় শিষ্য ও ভক্ত অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনুন: ব্রহ্মের সহিত যুক্ত তত্ত্বদর্শী পুরুষ দর্শন, শ্রবণ স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রাযাপন, শ্বাস গ্রহণ, আলাপ আলোচন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষু উন্মেষ নিমেষ করিয়াও মনে করেন ইন্দ্রগণই ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহের কার্য্য করে, আমি কিছুই করিতেছি না।

যিনি আসক্তি ত্যাগপুর্ব্বক কর্ম্মফল ব্রহ্মে অর্পণ করেন, তিনি জলস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় আসক্ত বা পাপ দ্বারা কলঙ্কিত হন না।

ব্রহ্মের সহিত যুক্ত পুরুষ কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া বাসনার দ্বারা সংসারাবদ্ধ হয়।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥
ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা।
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম।
অযুক্তঃ কামকারণে ফলে সক্তো নিবধ্যতে।

গীতা ৫।৮।৯।১০।১২

শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত উক্তিতে নিষ্কাম ও সকাম ভক্তের ভক্তি বৃত্তির লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে।

## ভক্তিসাধন সিদ্ধ ও অসিদ্ধের ভক্তিবৃত্তি

স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানীভক্ত শ্রীভগবান ব্যাসতনয় গোস্বামীপ্রবর শুকদেব ভক্তি সাধন অসিদ্ধ এবং ভক্তিসাধন সিদ্ধ ব্যক্তিগণের ভক্তি-বৃত্তির কথা এইরূপ বলিয়াছেন: বাসুদেবপরায়ণ কোন কোন মহানুভব কেবল ভক্তিবৃত্তির প্রভাব দ্বারাই ভাস্করের কুজ্ঝটিকা বিনাশের মত পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-পরায়ণঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কাৎস্নেহ নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ভাগবত ৬।১।১৫

ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাণী ভক্তিসাধন-অসিদ্ধ মানবের ভক্তিবৃত্তির কথা বুঝাইতেছে।

শ্রীভগবান ঋষভদেব পুত্র যোগিশ্রেষ্ঠ হবি বিদেহরাজ নিমিকে বলিয়াছেন, হে মহারাজ! ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনায়ও শ্রীহরির চরণাশ্রিত মানবগণ যাহাদের চিত্ত দেবদুর্ল্লভ শ্রীভগবানের চরণ পথ হইতে কখনও লব নিমেষাদির জন্যও বিচলিত হয় না, সেই সকল মনুষ্যই বিষ্ণু-ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ত্রিভুবন বিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ
স্মৃতির জিতাত্ম সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ পদার বিন্দা।
ল্লব নিমেষার্দ্ধম পিযঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ভাগবত ১১।২।৫৩

যোগীরাজের উক্তি ভক্তিসাধন সিদ্ধ ভক্তের ভক্তিবৃত্তির কথা বুঝাইতেছে।

## ভগবৎপার্ষদ দেহ প্রাপ্তের ভক্তিবৃত্তি

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে ভগবৎ পার্ষদ দেহ প্রাপ্ত ভক্তগণের ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা দুর্ব্বাসা মুনিকে এইরূপ বলিয়াছেন :— হে মুনিবর! আমার সেই সকল নিষ্কাম ভক্ত আমাতে আত্মসমর্পণ হেতু সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য নামক চারিপ্রকার মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও, সেই মুক্তি চতুষ্টয়ের কোন একটিরও আকাঙ্ক্ষা করে না। তাহারা আমার সেবানন্দে এতই বিভোর যে, সকল মুক্তির প্রতি সততই তাহাদের তুচ্ছ বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। যখন তাহারা পরমানন্দ স্বরূপ মুক্তিই আকাঙ্ক্ষা করে না, তখন অনিত্য বস্তুর প্রতি যে তাহাদের আকাঙ্খা প্রীতি জন্মে না তাহা বলাই বাহুল্য।

মৎ সেবয়া প্রতীতংতে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কাল বিপ্লুতম্॥

ভাগবত ৯।৪।৬৭

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাণী হইতে আমরা ভগবৎ পার্ষদ দেহ প্রাপ্ত ভক্তগণের ভক্তিবৃত্তির কথা বুঝিতে পারি।

## নিত্য পার্ষদ ভক্তের ভক্তিবৃত্তি

নিত্য পার্ষদ ভক্তের ভক্তিবৃত্তির কথা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ প্রদত্ত জ্ঞান ভক্তি লাভ ধন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা কি বলিয়াছেন শুনুন— হে দেবগণ! যে স্থানের সরোবর সকলের জল অতি স্বচ্ছ ও অমৃততুল্য সুস্বাদু এবং তটসকল প্রবালময়, সেই সরোবর-তটের নিকটবর্ত্তী নিজ কমল-বনে উপবেশন করিয়া শ্রীরুক্মিণী লক্ষ্মী দেবী দাসীগণের সহিত তুলসীপত্র দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে করিতে হঠাৎ সরোবর-সলিলে নিজ পৃষ্ঠদেশ-বিলম্বিত সুকুঞ্চিত কুন্তলাবলী ও সুন্দর নাসিকা-যুক্ত শ্রীমুখের প্রতিচ্ছবি অবলোকন করেন। তৎক্ষণাৎ এই চিন্তাই তাঁহার মনে স্থান পায়—যেন শ্রীভগবান নারায়ণ আমার মুখচুম্বন করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর হৃদয়ে এইরূপ মধুর ভাবের উদয় হইয়াছিল।

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপসু
প্রেয্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম।
অভ্যচ্চতী স্বলকমুন্নস সমীক্ষ্য বক্ত্র
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ। ভাগবত ৩।১৫।২২

নিত্যপার্ষদ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর হৃদয়স্থ শ্রীবিষ্ণুভক্তি বৃত্তির সন্ধান দিতেছে।

## নিত্য সিদ্ধভক্তের ভক্তিবৃত্তি

দেবর্ষি নারদ পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার অনুজ্ঞা মত গার্হ্যস্থাশ্রম গ্রহণ না করায় অভিসম্পাতগ্রস্ত হয়েন। দেবর্ষি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট বর-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনাটি এইরূপ :—হে জগৎপতে! এই বরদান করুন, যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, হরিভক্তি যেন কোন কালেই আমাকে ত্যাগ না করে। আমি সকল অবস্থাতেই শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ হইতে পারি। হে পিতামহ! যে সকল

াধু নিরন্তর সকলেরই প্রার্থনীয় হরি চরণারবিন্দের ভক্তি-মধু পান করিয়া থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগেরই পবিত্র স্পর্শ লাভ করিয়া বসুন্ধরাও পবিত্র হইয়া থাকে। এই কারণেই এই বর প্রার্থনা করি, হে পিত: ! হরিভক্তি যেন কোন অবস্থাতেই আমাকে ত্যাগ না করে।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ৮ম অধ্যায়।

দেবর্ষির প্রার্থনা-বাণী দ্বারা নিত্য সিদ্ধভক্তের হৃদয়স্থ ভক্তিবৃত্তির পরিচয় পরিস্ফুট।

### প্রীতি-লক্ষণা ভক্তিবৃত্তি

ভক্তি-শাস্ত্র শ্রীগীতায় শ্রীভগবান-কথিত তাঁহার প্রিয় পুরুষ বা ভক্তের সহিত একমাত্র ভক্তরাজ প্রহ্লাদেরই তুলনা হইতে পারে। প্রহ্লাদ শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—হে নাথ ! হে অচ্যুত ! যে যে সহস্র যোনিতে পরিভ্রমণ করি অর্থাৎ জন্মে জন্মে পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অথবা মনুষ্য দেহধারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেও, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার সর্ব্বদা ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে। অবিবেকী ব্যক্তিগণের বিষয় ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি আছে, তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার এই হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কোন কালে অপসৃত না হয়।

নাথ যোনি-সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্ব চ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ১৮
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ১৯

বিষ্ণুপুরাণম্ ১।২০।১৮-১৯

ভক্তরাজ প্রহ্লাদের এই উক্তি একমাত্র একনিষ্ঠ ভক্তের প্রীতি-লক্ষণা ভক্তিবৃত্তির কথাই প্রকাশ করিতেছে।

### প্রেম-লক্ষণা ভক্তিবৃত্তি

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সাধুগণ যে অহৈতুক প্রেম হৃদয়ে অনুভব করেন, পণ্ডিতগণ উহাকেই নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দুগ্ধের ধবলতার ন্যায় যাঁহারা রাধিকায় ও আমাতে সম্পূর্ণ অভেদ জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগেরই অহৈতুক প্রেমলক্ষণা ভক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহারাই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অহৈতুকং প্রেমঞ্চ সদ্ভিরাশ্রিতং
তচ্চাপি সন্তঃকিল নির্গুণং বিদুঃ।
যে রাধিকায়াং ময়ি কেশবে মনাক
ভেদং ন পশ্যন্তি হি দুগ্ধ শৌক্লবৎ ॥
ত এব মে ব্রহ্মপদং প্রয়ান্তি তং
অহৈতুক স্ফূর্জ্জিত ভক্তি লক্ষণাঃ ॥ ৩২

গর্গ সংহিতা (বৃন্দাবন খণ্ডম্), ১৫ অধ্যায় শ্লোক ৩১, ৩২

এই ভগবদুক্তি একনিষ্ঠ ভক্তের অহৈতুক প্রেমলক্ষণা ভক্তি-বৃত্তির পরিচয় পরিস্ফুট করিয়াছে।

### প্রেমানুরাগ রঞ্জিত ভক্তের ভক্তিবৃত্তি

এইবার আমরা প্রেমানুরাগ-রঞ্জিত-হৃদয় ভক্তের ভক্তিবৃত্তির কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

মন্ত্রিবর অক্রুর কৃষ্ণবলরামকে মথুরায় আনয়ন করিবার জন্য মহারাজ কংস কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। কারণ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে দর্শন করিয়া জন্ম সফল করিতে পারিবেন এই আনন্দেই তিনি আত্মহারা হইয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রথে বসিয়া তিনি কি চিন্তা করিতেছিলেন? তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ চিন্তাই স্থান পাইয়াছিল—আমি ভারতে এমন কি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি—নিষ্কামভাবে এমন কি দান ও উত্তম যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছি, যাহার পুণ্যফলে অদ্য আমি স্বয়ং পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব? আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছি, ভক্তিযুক্ত হইয়া সাধুগণের এমনকি সেবা করিয়াছি, যে পুণ্যকর্ম্মের জন্য আজ আমার শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন ও দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শন ঘটিবে? পৃথিবীতে তাহাদেরই জন্ম সফল, যাহারা সুরেশ্বর শ্রীভগবানকে সচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আমি সেই সুদুর্লভ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব।

কিং ভারতে বস্তুকৃতং কৃতং ময়া
নিষ্কারণ দানমলং ক্রতুত্তমম্।
তীর্থানাং বা দ্বিজসেবাং শুভং
যেনাদ্য দ্রক্ষ্যামি হরিং পরমেশ্বরম্ ॥৩
তপঃ সুতপ্তং কিমলং পুরা কৃতং
যৎ সেবনং ভক্তিযুতঃ ময়া কৃতম্।
যেনৈব মে দর্শনমদ্য দুর্লভং
শ্রীকৃষ্ণদেবস্য পুরোভবিষ্যতি ॥৪
তেষাং ভবো বৈ সফলো মহীতলে
যন্নেত্রগামী শ্রীভগবান সুরেশ্বরঃ।
কৃতার্থ তদ্দর্শনমদ্য দুর্লভং
সদ্যঃ কৃতার্থো ভাবিতাস্মি সর্ব্বতঃ ॥

গর্গ সংহিতা ( মথুরাখণ্ডম্ ) ৩য় অধ্যায় শ্লোক ৩।৪।৫

মহাভাগ্যবান অক্রুর এই রূপ শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বপ্রকৃতির চারিধারে শুভ চিহ্ন সকল লক্ষ্য করিয়া পুলকে রোমাঞ্চ-কলেবর হইলেন। তিনি দেখিলেন—কাহার জন্য তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন, ধরাপৃষ্ঠ কৃষ্ণপাদপদ্মচিহ্নিত যব ও অঙ্কুশযুক্ত কুঙ্কুমরাগযুক্ত পরাগরঞ্জিত ধূলি উড়িতেছে।

কৃষ্ণপাদাব্জচিহ্নানি যবাঙ্কুশযুতানি চ।
তদ্রাগযুক্পবাগানি রজাংসি স দদর্শ কৌ ॥ ৭

গর্গ সংহিতা ( মথুরা খণ্ডম্ ) ৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৭

ইহা দেখিয়া অক্রুরের হৃদয় প্রেম ভক্তি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি অস্থিরচিত্তে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সেই ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরাম প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

তিনি রথে উঠিয়া ক্ষণকাল মধ্যে নন্দালয়ে উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন বলরাম ও গোপগণসহ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন। সেই দেবপুরাণ পুরুষ পরেশ কমলনয়ন শ্যামবর্ণ বলরাম ইন্দ্রনীলমণি ও হীরক শৈলের ন্যায় দ্বারদেশে অপেক্ষমান। বালার্ক কিরণোপম মুকুট শোভিত চিন্ময়তুল্য বসন পরিহিত শরতের মেঘতুল্য রূপরাশি রামকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া অক্রুর সত্বর রথ হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া ভক্তিভরে নত হইয়া উভয়ের পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। শ্রীভগবান শ্রীপতি অক্রুরের বদন ঘর্মসিক্ত ও শরীর রোমাঞ্চিত দর্শন করিয়া স্বয়ং ভক্ত অক্রুরকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুমোচন করিলেন।

ভক্ত অক্রুরের প্রেমানুরাগরঞ্জিত হৃদয়ের অবস্থান কি সূচিত করে? প্রেমানুরাগরঞ্জিত ভক্তিবৃত্তির লক্ষণই সূচিত করিতেছে।

এইরূপ নানা শ্রেণীর ভক্তের ভক্তিবৃত্তির পুণ্য কথায় ভক্তিশাস্ত্র পূর্ণ।
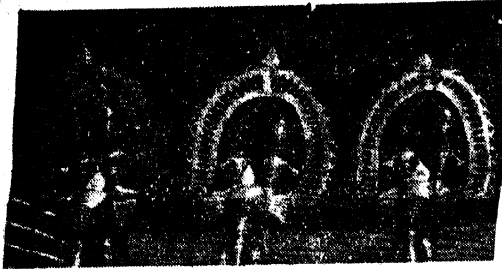
লক্ষ্মী-নারায়ণ

# মোমগলানো ধাতু-শিল্প
## বা
## ডোকরা কাজ

আশীষ বসু

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শিল্প পদ্ধতি কিন্তু ডিজাইনের দিক থেকে তা যেন অতি আধুনিক চিত্রকলার সমপর্য্যায়ভুক্ত, এমন একটি শিল্প পশ্চিম বাঙলায়, বলতে গেলে এই আমাদের কলকাতার কাছেই রয়েছে। সকালের ট্রেণে গিয়ে ধীরে সুস্থে যেখান থেকে বিকেলের ট্রেণে ফেরা যায়।

গুষকরা-আউসগ্রাম কি বাঁকুড়া থেকে ডোকরা কাজের কারিগর আনতে গিয়ে সে কি বিপদ! প্রথমে তো কেউ আসতেই চায় না। পরে অনেক বলে কয়ে রাজী করানো গেলো। কিন্তু মহাজন? তার কাছে দেনায় যে আপাদমস্তক, জমি জায়গা-ভিটে মায় বাসন কোষণ অবধি বন্ধক, তার ওপর আবার দাদনের টাকা খেয়ে বসে আছে গেল সনের মন্দার বাজারে।

তবু সবদিক থেকে সামলে-সুমলে তো হাওড়ায় এনে ফেলা গেলো। কিছুতেই বসবে না ট্যাক্সিতে। পায়ে হেঁটে যাবে। গাড়ীতে গাড়ীতে যদি ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। যা আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে সব। ট্যাক্সিতে তো বসানো গেল অনেক সাধ্য-সাধনা করে। পাশ থেকে একটা করে গাড়ী যায় আর সে আমার কাছে সরে এসে বসে ভয়ে। উৎকণ্ঠায় তার প্রাণ যায় যায়। ট্যাক্সিচালক রসিকতা করে বললেন, কোথায় পেলেন?

মন বসেই এসেছিল। কাজ কর্ম্মও এগোচ্ছে। নতুন নতুন পরীক্ষাও চলছে। হাত খুলছে ডোকরা কামারের। সাহস বাড়ছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ কথা নেই, একদিন সকালে দেখি কাজ কর্ম্ম বন্ধ করে বসে আছে। জামা কাপড় গোছানো, বাক্স-প্যাটরা নিয়ে তৈরী। মাইনে পেলে এখুনি রওনা হবে দেশে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? কথার কোনও জবাব নেই। আবার জিজ্ঞাসা করি। এ ওর দিকে তাকায়। অর্থাৎ, কথাটা আগে বলবে কে? বুঝলাম, গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। একজনকে ডেকে নিয়ে গেলাম আড়ালে। অনেক সাধ্য-সাধনা করে তার কাছ থেকে জানা গেল আসল কথাটা। গতকাল (এতদিন এরা সহরে বেশী বেড়ায় নি) চৌরঙ্গীর ওদিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল না যাদুঘর কি যেন সব দেখতে গিয়েছিলো, সেখানে দেখে কি না এক সাহেব এক মেমসাহেবকে হাত ধরে রাস্তা পার করাচ্ছে। কেন মেমসাহেব কি বাচ্চা, কচি মেয়ে নাকি যে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়বে। যে দেশে এমনি অনাচার

পেতলের পাখী—ডোকরা কাজ
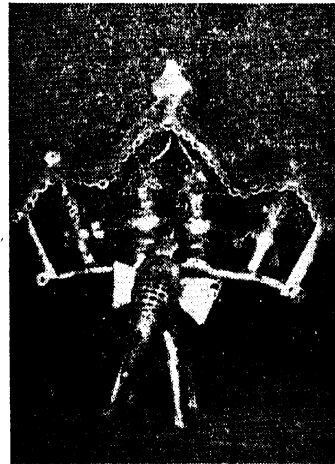
ডোকরা গজলক্ষ্মী

আর স্লেচ্ছ ব্যাপার, সে দেশে আর থাকবে না। হাজার টাকা দিলেও না।

বাঁকুড়া সহর পেরিয়ে নোংরা ফেলার মাঠ। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে হামেশা, পাশে ভাগাড়, শকুনির ভীড়। তারই পাশে নতুন চটী। পাশাপাশি কখানি মাটির ঘর, খড়ের চালা একটা ছোট বস্তি। আর সেই বস্তির একমাত্র প্রাণকেন্দ্র তার দেশী মদের ভাটিখানা। নতুন চটী। ডোকরা কামারের গাঁ।

দিনে গিয়ে রাতেই ফিরে আসা যায়। বাঁকুড়া নয়, আরও কাছে বর্দ্ধমানের গুষকরা ষ্টেশন থেকে নেমে আউসগ্রাম। দরিয়াপুর সকালে ৭টার ট্রেণে হাওড়ায় চড়লে সাড়ে দশটা নাগাদ পৌছনো যাবে। আবার ধীরে, জিরিয়ে বসে ফিরুন পাঁচটার ট্রেণে। রাত দশটায় ফের কলকাতায়। শান্তিনিকেতন যেতে গুষকরা পথে পড়ে।

ডোকরা কামারেরা, যতদূর জানা যায় এক যাযাবর শ্রেণী। এদের আগের নাম কামার কারোর মতে 'ঢেপো' কামার। বাঁকুড়া আর বর্দ্ধমানের লোকেরা একই শ্রেণীর বলেই মনে হয়। শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, ডোকরা জাতীয় কাজ রয়েছে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে, কেওঞ্জর, ঢেনকানালে, এমন কি মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যেও। এটিকে সর্বাঙ্গীনভাবে আদিবাসী শিল্প বলা যায়।

কাজের শেষে ফাইল ( উঁকা ) দিয়ে পালিশ তোলা হচ্ছে

ডোকরার ছাঁচ—রোদে শুকোচ্ছে

আসলে কাজটা ঢালাই পিতলের। মোমের ছাঁচে ফেলা। মোমকে গলিয়ে সরু দড়ির মতো করে পাকিয়ে নেওয়া হয় আর সেই মোমের হারের সাহায্যে তৈরী হয় নক্সা। ইঁদুরের মাটি দিয়ে, তুষ দিয়ে মেখে তৈরী হয়েছে ঢালাইয়ের ছাঁচ আর সেই ছাঁচকে মোমে মুড়ে তার ওপর গরম পেতল ঢেলে দিলে মোমের ছাঁচ যাবে অতি সহজে গলে আর সেই গলা অংশে তৈরী হল সরু সরু পেতলের ডিজাইন। অনেকটা ফটোতে যেমন নেগেটিভ থেকে প্রিণ্ট হয়।

ইংরেজরা এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন Cire-Perdu Casting বা Lost-Wax Casting, আমরা বলবো মোম গলানো ঢালাই পদ্ধতি। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এই পিতল ঢালাইয়ের কাজ আজও হতে দেখা যায়। ভারতবর্ষ তার অন্যতম।

ডোকরা কামারের ঢালাই পেতলের লক্ষ্মী-নারায়ণ, ছত্রপতি, গণেশমূর্ত্তি, কালীপ্রতিমা, মাছের জালি-কাটা, পান-বাটা, চাল মাপার কুনকে, পাখীর মূর্ত্তি আজ কলকাতায় অনেক আধুনিক পরিবারের ড্রইংরুমের ষ্ট্যাণ্ডে শোভা পেতে দেখা যাচ্ছে।

আগেই বলেছি, ডোকরা কাজের নক্সা অত্যন্ত আধুনিক, বিজ্ঞান-সম্মত ও জ্যামিতিক। অনেক গবেষকদের মতে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ডিজাইন হোল বাঁশের আর বেতের কাজের।

ডোকরার মোম গলানো কাজ দেখলে হঠাৎ বেতের কাজের কথা মনে হয় যে তা ঠিকই। তবু ডোকরা কামারের কাজকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শিল্প-পদ্ধতি বলতেই হবে।

# নজরুল : কয়েকটি কবিতার উৎস

আবদুল আজীজ আল্-আমান

"হিং টিং ছট্", কি "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ", কি "বলাকা" কবিতা রচনার পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে তা আজ আমাদের কারো অজানা নয়। বাল্মীকির কণ্ঠে পৃথিবীর আদি কবিতা প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ওঠার মূলেও সমকালীন ঘটনার ইতিহাস তীব্র বেগ সঞ্চার করেছিল। সমসাময়িক ঘটনাবলীতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে পৃথিবীর কমবেশী সকল কবিই কিছু না কিছু কবিতা লিখেছেন। স্বভাব-কবি নজরুলেরও অনেকগুলি কবিতা সমকালীন ঘটনার আবর্তে জন্মলাভ করেছে। নিম্নে আমরা কোন্ কবিতার পিছনে কি ঘটনার রহস্য লুকিয়ে ছিল তার বিস্তারিত আলোচনা করছি।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির নাম "মুক্তি"। কবিতাটি ত্রৈমাসিক "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"র ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল; ইং ১৯১৯ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। নজরুল কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন "ক্ষমা" কিন্তু সম্পাদনাকালে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'ক্ষমা'-র পরিবর্তে 'মুক্তি' নামকরণ করেন। কবিতাটির পাদটীকায় নজরুল লিখে দিয়েছিলেন, "ইহা সত্য ঘটনা"। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে এই দরবেশের কথিতরূপ মৃত্যু ঘটে। তাহার পবিত্র সমাধি এখনও 'হাত বাঁধা ফকিরের মজার শরীফ' বলিয়া কথিত হয়।"

—লেখক।

উক্ত সত্য ঘটনাটি এই: রাণীগঞ্জ শহরে হঠাৎ এক অদ্ভুত-দর্শন ফকিরের আবির্ভাব ঘটে। গোঁফ-দাড়িতে মুখ ভর্তি, মাথায় লম্বা জটা, হাত-পায়ের নখ কোনদিন কাটা হয়নি। সমগ্র দেহের তুলনায় পা দু'টো অত্যন্ত ছোট। মোটা লোহার শিকল দিয়ে হাত দু'টো তার সব সময়ই বাঁধা থাকতো। এটি বুঝি ছিল তার পার্থিব সকল কিছু বিসর্জনের প্রতীক। গলায় ঝুলতো একটা মগ-জাতীয় টিনের পাত্র। মলিন ছিন্ন বসন পরে ফকির শহরের সারা পথ অতি ধীরে পরিক্রমা করত। নিশ্চলভাবে কোথাও দাঁড়াত না। ফকিরটি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল যে তার মুখের কথা কেউ কোনদিন শুনতে পায়নি। হাত বাঁধা থাকতো বলে কেউ কেউ তাকে 'হাত বাঁধা ফকির' এবং কথা বলতো না বলে কেউ কেউ 'মৌনী ফকির' বলে অভিহিত করতেন। ছেলেমেয়ের দল নানা ভাবে ফকিরকে অত্যাচার করতো—কখনো কখনো রক্তাক্ত দেহেও তাকে পথে পথে ফিরতে দেখা গেছে। চলতি পথের ধারে বিরাট এক বটগাছের তলায় ছিল ফকিরের বাসা। একদিন ভোরে মাল বোঝাই এক গরুর গাড়ীর চাকা ফকিরের দেহের ওপর দিয়ে চলে যায় এবং সেই আঘাতেই করুণ ভাবে হাত বাঁধা মৌনী ফকিরের মৃত্যু ঘটে। এই মর্মন্তুদ ঘটনাকে অবলম্বন করে কিশোর কবি নজরুল লেখেন 'মুক্তি' কবিতাটি।

কোন কোন নজরুল-জীবনীকার বলেছেন যে নজরুল যখন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আসানসোলে আবদুল ওয়াহেদের রুটির দোকানে কাজ করতেন (১৯১৪ খৃঃ) তখন এই কবিতাটি লেখেন; কিন্তু এ তথ্য সত্য নয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষে কবিতাটি লিখিত হয়েছিল—নজরুল তখন রাণীগঞ্জের শিয়াড়শোল রাজার স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস অর্থাৎ নবম শ্রেণীর ছাত্র।

প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে নজরুল এ কবিতায় তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেননি। কবিতাটির আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'-র সমিল যুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দের অনুকরণ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তবে কবির শেষ জীবনে অধ্যাত্মবাদের প্রতি যে আকৃতি দেখা গিয়েছে, তার স্পষ্ট সূচনা এ কবিতায় রয়েছে। কবিতাটি আজ পর্যন্ত কোথাও পুনর্মুদ্রিত হয়নি। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা হিসেবে এর একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'-র উক্ত সংখ্যাটি পাওয়া আজ প্রায় দুর্লভ। কালের অগ্রগতিতে যেখানে যা দু' এক কপি আছে তাও অল্প দিনের মধ্যেই হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কবিতাটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত। ১০৬ লাইনের এই সুদীর্ঘ কবিতাটির কয়েকটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম:

কবিতাটির সূচনা এই:

রাণীগঞ্জের অর্জ্জনপটির বাঁকে—  
যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে  
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে' বৌ কলস কাঁখে।  
সেই সে বাঁকের শেষে···  
ভুলে যাওয়ার সে কোন নিশি ভোর,  
"আজান" যখন শহুরেদের ভাঙলে ঘুমের ঘোর,  
অবাক হ'য়ে দেখ্‌লে সবাই চেয়ে,  
শুক্‌নো নিমের গাছটা গেছে ফলে ফুলে ছেয়ে।···

দরবেশ ফকিরের বর্ণনা :

দেখে কিন্তু লাগল সবার তাক,
এ কোন মহাব্যাধিগ্রস্ত অবধূত নির্ব্বাক ?
সে কি ভীষণ মূর্ত্তি !
ঈষৎ তার এক চাহনিতে থেমে গেল
গোলমাল সব স্ফূর্ত্তি ।
জটপাকান বিপুল জটা,
মেদিনী-চুম্বিত শ্মশ্রু, গুম্ফগুলো কটা,
সে এক যেন জটিলতার সৃষ্টি—
অনায়াসে সইতে পারে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি,
পা দু'টো তার বেজায় খাটো বিঘৎ খানিক মোটে,
দন্ত-প্রাচীর লঙ্ঘি অধর ছুঁতেই পায় না ঠোঁটে,
চক্ষু ডাগর, নাকটা বেজায় খাঁদা
মস্ত দু'টো লোহার শিকল দিয়ে হাত দু'টো
তার সব সময়ই বাঁধা ।···

দরবেশের মৃত্যুর দৃশ্য :

হঠাৎ সেদিন সেই পথেরি বাঁকে
নিশি ভোরেই
বোঝাই গরুর গাড়ী হেঁকে যাচ্ছিল খুব জোরেই
গোট্টা গাড়োয়ান
ভৈরবীতে গেয়ে গজল গান ।
'হো হো' করে হঠাৎ ফকির উঠ্‌ল বিষম হেসে।
গাড়ী শুদ্ধ দামড়া বলদ চমকে উঠে এসে
পড়ল হঠাৎ ফকিরেরই ঘাড়ে,
চাকা দু'টো চলে গেল একেবারে বুকের হাড়ে,
মড়মড়িয়ে উঠ্‌ল পাঁজর যত !

চড়ুই পাখীকে নিয়ে নজরুল যে কবিতাটি লিখেছিলেন তার জন্মেতিহাসও কম কৌতুককর নয়। বিরাট এক দালান-বাড়ীর কড়িকাঠে বাসা বেঁধেছিল একটা চড়ুইপাখী। ডিম পেড়ে তা' দিয়ে একটা বাচ্চা তুলেছিল সে। একদিন কিশোর নজরুল যখন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে খেলায় মত্ত, হঠাৎ দেখা গেল বাচ্চাটা কড়িকাঠ থেকে নীচেয় পড়ে গেছে। এগিয়ে এল সবাই। দুষ্টু বুদ্ধিতে কেউ কম যায় না। বাচ্চাটার পায়ে বাঁধা হ'ল সুতো। চলল খেলা। পাখীটা যখন প্রায় আধমরা হ'য়ে এসেছে, কার যেন একটু দয়া হ'ল। পাখীটাকে কড়িকাঠে তুলে দেবার প্রস্তাব করল সকলে। দেখা গেল ইতিমধ্যেই বিরাট একটা মই কাঁধে নিয়ে নজরুল এসে হাজির। বাচ্চাটা তখন থর থর করে কাঁপ্‌ছে কিছুটা ভয়ে, কিছুটা মৃত্যুর আশঙ্কায়। দেওয়ালে মই লাগিয়ে নজরুল-ই তুলে দিলেন বাচ্চাটাকে। এ ঘটনা কিশোর কবির মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। সেদিনই বাসায় ফিরে গিয়ে তিনি লিখ্‌লেন এই কবিতাটি—২৬ লাইনের কবিতা :

মস্তবড় দালান বাড়ীর উঁই লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট একটি চড়াইছানা কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছে মাকে ।···
হৃদয়-আবেগ রুধতে নেরে' উড়তে গেলে অবোধ পাখী
ঝুপ করে সে গেল পড়ে—ঝরল মায়ের করুণ আঁখি ।
ইত্যাদি ।

কবিতাটি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। সম্প্রতি কবি-বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে" গ্রন্থে কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন ।

কোরবাণী বিশ্বের মুসলিমদের কাছে একটি পরম পবিত্র অনুষ্ঠান। এই উৎসবে তারা পশু কোরবাণী (জবাই) করে। বলা বাহুল্য, পশু জবাইটা একটা প্রতীক মাত্র। নিজের যা' কিছু পরম-প্রিয় তা' আল্লার নামে উৎসর্গ করতে হ'বে এবং পশু কোরবাণীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সকল রিপুকে জবাই করে মনকে কালিমা শূন্য করাই হ'ল এই অনুষ্ঠানের মূল কথা। কিন্তু তরীকুল আলম নামে একজন উচ্চশিক্ষিত মুসলমান (ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন) কোরবাণীর মধ্যে বর্বর যুগের চিহ্ন দেখ্‌তে পান। এ বিষয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সে প্রবন্ধে এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে বহুতর যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন। তাঁর মূল বক্তব্য এই : কোরবাণী উৎসবে আমরা ব্যাপকভাবে যে নিরীহ পশু হত্যা করি তা' বর্তমান সভ্য-সমাজের উপযোগী নয়। এই অযথা রক্তপাতের মধ্যে আদিম যুগের বর্বরতা লুকিয়ে রয়েছে। কোরবাণী করে আমরা যে আনন্দলাভ করি তা' পৈশাচিক উল্লাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

নজরুল এই প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাঁর বিদ্রোহী-মন গর্জ্জনমুখর হ'য়ে ওঠে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লেখেন তাঁর প্রথম যুগের সর্ববিখ্যাত কবিতা "কোরবাণী"। এ কবিতার একদিকে যেমন আছে তরীকুল আলমের ভিত্তিহীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণধার প্রতিবাদ তেমনি অন্যদিকে আছে ইস্‌লামের এই পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি সুদৃঢ় সমর্থন। তা' ছাড়া এ কবিতাটি লেখার সময় খেলাফৎ আন্দোলন চরম পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। নবীন তুর্কীর নওজোয়ানেরা দেশের আজাদীর জন্যে অকাতরে নিজেদের 'জান-কোরবাণ' করছিল। 'কোরবাণী' কবিতায় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে এ ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। মরণ-ভীতু ভারতবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করে নেতাজী যেমন বলেছিলেন "Give me blood and I will give you freedom" তেমনি খুন দেখে যারা ভয় পায় তাদের উদ্দেশ্যে কবি লিখলেন :

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !
দুর্ব্বল ! ভীরু ! চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন ।

সুতরাং কোরবাণীকে যে ভীরু কাপুরুষের দল বর্ব্বর যুগের চিহ্ন বলেন কবি সেই তুহীন-কাতর ভীতুদের 'চুপ খামোশ' বলেছেন খুন না দিলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না : "আজাদী মেলে না পস্তানোয়"। তাই বীরের এ রুধির ধারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের নামান্তর :

ঐ খুনের খুঁটীতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ !
আজ আল্লার নামে জান কোরবাণে ঈদের পূত বোধন ।

সুতরাং কোরবাণীতে যে রক্তপাত ঘটে তা' বীরধর্ম্ম উদযাপনে

প্রতীক। দুর্বল, ভীরুদের কাছে এ পবিত্র অনুষ্ঠান ভীতির অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দেবে। কবিতাটি প্রথমে "মোসলেম ভারত"-এর ১ম বর্ষের ৫ম সংখ্যায় ( ভাদ্র, ১৩২৭ সাল ) প্রকাশিত হয় এবং পরে "অগ্নিবীণা" কাব্য-গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়।

নজরুলের প্রথম যুগের আর একটি সাড়া জাগান কবিতার নাম "খেয়াপারের তরণী"। কবিতাটি ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা ( শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল ) "মোসলেম ভারতে" প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি সম্পর্কে ১৩২৭ সালের ( ১৯২০ খৃঃ ) নারায়ণ পত্রিকা মন্তব্য করেন : "গোড়ায় একটি ছোট মেয়ের আঁকা ছবি—খেয়া পার। নজরুল তার উপযোগী একটি কবিতা লেখেন।" এ তথ্যটি ভুল। ছবিটি ছোট মেয়ের আঁকা নয়—শিল্পী অনেকগুলি সন্তানের জননী। চিত্রশিল্পীর নাম নওয়াবজাদী মেহেরবানু খানম। ইনি ঢাকার বিখ্যাত নওয়াব স্যার আহসান উল্লাহ, বাহাদুরের কন্যা ও নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, বাহাদুরের ভগিনী। এঁর স্বামীর নাম খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আজম।

নজরুল-জীবনীকার ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : "ঢাকার নবাব পরিবারের কোন মহিলা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশের জন্যে একটি ছবি পাঠান"। এ তথ্যটিও ঠিক নয়। প্রকৃত ব্যাপারটি এই : 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কর্ণধার জনাব আফজাল-উল হক সাহেব কোন কারণ বশতঃ একবার ঢাকায় যান। নবাব-পরিবারের সাথে তিনি পরিচিত হন এবং কোনপ্রকারে উক্ত ভদ্রমহিলার আঁকা দু'টি ছবি নিজ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সংগ্রহ করে আনেন। দু'খানি ছবিই ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথমটি তিন রং-এ ( tricolour ) এবং দ্বিতীয়টি এক রং-এ। দ্বিতীয় চিত্রখানি বিক্রমপুরের উত্তরে প্রবহমানা ধলেশ্বরী নদীর উভয় তীরবর্ত্তী শ্যামল বৃক্ষরাজি সম্বলিত একখানি প্রকৃতি চিত্র আর প্রথম চিত্রটি তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ গর্জনোন্মুখ নদীতে খেয়া পারাপারের দৃশ্য। দু'টি তরণী তরঙ্গসঙ্কুল নদীর বুকে ভাসমান—তারা পরপারের যাত্রী। চিত্রে একটি তরণীকে নিমজ্জমান অবস্থায় দেখান হ'য়েছে, কিন্তু অপরটি শত ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগ অতিক্রম করে অবলীলাক্রমে যাত্রী পারাপারে ব্যস্ত। প্রথমটি পাপের নৌকা আর দ্বিতীয়টি পুণ্যের। শেষোক্ত নৌকার চারটি দাঁড়ের মাথায় আরবী অক্ষরে ইস্‌লাম ধর্মের প্রথম চারজন খালিফার নাম—আবুবকর, উস্‌মান, উমর, আলী লেখা আছে। হাল ও পালের মধ্যে যথাক্রমে লেখা আছে হজরত মোহাম্মদ ও শাফায়াত ( মুক্তি )।

ঢাকা হ'তে চিত্রটি সংগ্রহ করে এনে জনাব আফজাল-উল হক সাহেব এর একটি পরিচিতি লিখে দেবার জন্যে নজরুলকে অনুরোধ করেন। চিত্রটি দেখে নজরুল অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েন যে সেদিনই তাঁর বিখ্যাত কবিতা "খেয়াপারের তরণী" লিখে ফেলেন। "মোসলেম ভারত"-এর উক্ত সংখ্যার ২৮৫ পৃষ্ঠায় সৈয়দ এমদাদ আলী 'এই ভাবে চিত্রটির পরিচিতি দিয়েছেন : 'ইহা একখানি ধর্মচিত্র। পাপের নদী উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নদীতেই কাণ্ডারীহীন গোমরাহীর তরণী আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া আরোহী সহ নিমজ্জিত হইতেছে। তাহার হালের দিকটা মাত্র ডুবিতে বাকী আছে—তার উদ্ধারের কোন আশা নাই। কিন্তু যাঁহারা "তওহীদের" তরণীতে আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা বাঁচিয়াছেন। কারণ এই তরণীর কর্ণধার স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (সঃ)। তাঁহার চারি প্রধান আসহাব এই তরণীর বাহক। উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করিয়া তওহীদের তরণী কেমন অবলীলাক্রমে চলিয়াছে। যাঁহারা এই তরণীতে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের কোন ভয় নাই ; কারণ তাঁহাদের জন্য সাফায়াতের ( মুক্তির ) পাল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেদিন বিপুল বিশ্ব রেণু হইতে রেণুতে পরিণত হইয়া যাইবে, যেদিন মহাপ্রলয় সঙ্ঘটিত হইয়া মহাবিচারের দিন সমাগত হইবে সেই দিন এই পাল মুক্ত হইবে। 'তওহীদ' অবলম্বনকারিগণ সেই দিন বিনা আয়াসে 'ফানাফিল্লায়' যাইয়া পঁহুছাইবেন,—আত্মা সেদিন মহানন্দে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবে।"

আর নজরুল চিত্রটির পরিচিতি দিলেন এই ভাবে :

যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়াপার,
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জ্জেছে কে আবার ?...
নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ !
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ !...
তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী।
লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে।
অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জ্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জ্জন !
পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্ম্মেরি বর্ম্মে-সু-রক্ষিত দিল্-সাফ !
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতে ও
কাণ্ডারী আহ্‌মদ তরীভরা পাথেয়।
আবুবকর্ উস্‌মান উমর আলী হায়দার
দাঁড়ী এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর !
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি মুখে সারিগান লা শারীক আল্লাহ্ !...

এ কবিতাটির ব্যাপক প্রশংসা করে কবি মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারতের সম্পাদককে যে সুদীর্ঘ পত্র লেখেন তার সামান্যতম অংশ এই :

..."এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডমরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে ;—বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য—'লা শরীক আল্লাহ' —যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছে।

বস্তুতঃ কবিতাটি আপন স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যে নজরুলের প্রথম যুগের সৃষ্টির মধ্যে অনন্য হ'য়ে আছে।

# বাঙলার বিষ্ণু-পঞ্জর

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী

মাত্র হাজার দুই বছর বা তারও কম সময় নিয়ে বাঙালীর অতীত ইতিহাস। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে বাঙালীর জাতীয়ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। বাঙালীর প্রতিভার বিকাশ তখনই পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, আর দেশ-বিদেশের মনীষীরা বাঙালীর কাছে জ্ঞানলাভের জন্য ছুটে আসে।

তখন এখানে জ্ঞান লাভের জন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে,—একটির নাম নালন্দা, অপরটির নাম বিক্রমশীলা ও আর একটির নাম ওদন্তপুর।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন বাঙালী। তাঁর নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। চীনদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত য়ুয়াং চুয়াং এই শীলভদ্রের পদতলে বসেই জ্ঞান লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সাঙও নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করেন।

এই সময় আর একজন বাঙালী মনীষীর দীপ্ত প্রতিভায় দিকদিগন্ত আলোকিত হয়ে ওঠে। তাঁর নাম চন্দ্রগর্ভ, ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার এক রাজার ছেলে। কিশোর বয়সেই তিনি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং জীবনের সমস্ত অনায়াসলব্ধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে শিক্ষকের ব্রত গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ'ন। তাঁর পরিচালনায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ভারতের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র এশিয়ায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। চন্দ্রগর্ভের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান দেখে আচার্য্য শীলভদ্র তাঁকে "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" উপাধিতে ভূষিত করেন। আজ এই নামে তিনি এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

আমাদের এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হ'য়ে যায়, আর তার জায়গায় গড়ে ওঠে ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘর—টোল বা চতুষ্পাঠী। আড়ম্বরের দিক থেকে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি যেমন জগতের শীর্ষস্থানীয় হয়ে আছে, তেমনি স্বল্প আয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমাদের এই টোলগুলিরও জগতে তুলনা হয় না।

সাধারণ লোকে এই সব টোল বা চতুষ্পাঠীকে চৌবাড়ী বলতো। চারিদিকে মেটে দেওয়াল দেওয়া খড়ের লম্বা লম্বা ঘর, তাতে থাকতো কতকগুলি ছোটো ছোটো কুঠরি, আর এরই এক একটি ছিল এক-একটি ছাত্রের বাসস্থান। আপন আপন গৃহস্থালীর কাজ ছেলেরা নিজহাতেই সম্পাদন করতো, কারও সঙ্গে কারও সম্বন্ধ ছিল না।

সেদিন এদেশে জ্ঞান আহরণ ছিল তপস্যা, আজকের মতো অর্থকরী হয়ে ওঠেনি। সেই জন্য কষ্ট স্বীকার করেও বিদ্যার্জ্জন করতে ছেলেরা সর্ব্বদাই ছিল হাসিমুখ। ফলে শিক্ষার সঙ্গে তাদের মনুষ্যত্ব ও আত্মনির্ভরশীলতাও জেগে উঠতো। অধ্যাপক ছাত্রদের চাল দিতেন, আর তাদের নিজেদের সংগ্রহ করে নিতে হ'ত রান্নার সব উপকরণ। ভাতের সঙ্গে ডাল বা তরিতরকারির ব্যবস্থা সবদিন হয়ে উঠতো না। যেদিন বা 'সিধা' পাওয়া যেত, তার ওপরই সমস্ত ব্যবস্থা নির্ভর করতো। রাতে পাতা জেলে পড়তে হ'ত। আসবাবের কোন বালাই ছিল না,—সম্বলের মধ্যে ছিল একটি মাদুর, আর একটি লোটা। পড়ার বই ছিল অধ্যাপকদের মুখে মুখে, ছেলেরা তাই শুনে শুনে শিক্ষা করতো,—আর হাতে লেখা যে-সব পুঁথি ছিল, তা থেকে নিজহাতে নকল করে নিয়ে পড়তো।

বাঙলার ছেলেরা এই কঠোরতার ভেতর দিয়ে বহুযুগ ধরে শিক্ষা লাভ করে এসেছে এবং তার ফলে এদেশে রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ, গদাধর, রঘুনন্দন, বুনো রমানাথ প্রভৃতি এমন সব মনীষী টোল থেকে বেরিয়েছেন, যাঁদের জোড়া আজও পৃথিবীতে মেলে না।

বাঙালী বুদ্ধির সব চেয়ে বড় পরিচয় যে নব্যন্যায়ে, তার জন্মও এই টোলের পণ্ডিতদের হাতে। মিথিলা ছিল ন্যায়শাস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু সেখানে ছিল এই নিয়ম যে, বিদেশী ছাত্র মিথিলায় গিয়ে টোলে বসে ন্যায়ের পুঁথি শুধু পড়তেই পাবে, নকল করে তা' দেশে আনতে পারবে না। ফলে ন্যায়শাস্ত্রের পঠন-পাঠন মিথিলার টোলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল একজন বাঙালী পণ্ডিতের দ্বারা। তাঁর নাম রঘুনাথ চক্রবর্তী, বাড়ী শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ডে। রঘুনাথ নবদ্বীপে হরিনাথ ঘোষের বাড়ীতে টোল খুলে ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করলেন। বাংলায় ন্যায়-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। দেখতে দেখতে সারা ভারতে রঘুনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো,—পাঞ্জাব, কনৌজ, তামিল, দ্রাবিড় দেশ থেকে ছেলেরা দলে দলে এসে তাঁর টোল ভরে গেল। বাঙলায় যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হ'ল, তাকে বলে নব্য-ন্যায়, আর মিথিলায় যা' পড়ানো হ'ত তাকে বলে প্রাচীন ন্যায়। প্রাচীন ন্যায়ের তুলনায় নব্য-ন্যায় আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল। মিথিলায় তখন বড় নৈয়ায়িক ছিলেন পক্ষধর মিশ্র। রঘুনাথের প্রতিভায় পক্ষধরের প্রতিভা ম্লান হয়ে যায়, আর টোলের এই বাঙালী পণ্ডিতের প্রতিভার জ্যোতি সে-দিন নিখিল বিশ্বে যে আলো জ্বালিয়ে দেয়, তা' আজও কেউ নেবাতে পারেনি!

বাঙালীর প্রতিভার আর এক পরিচয় তার 'স্মৃতিশাস্ত্রে'। যাঁর নিয়মে বাঙালীর সামাজিক জীবন আজও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁর নাম রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। তিনিও নবদ্বীপের এক টোলের পণ্ডিত। এই রঘুনন্দনের বিধানেই বাঙালী আজও ধর্ম্ম-কার্য করে, তার পুত্র কন্যা বিবাহ-বাসরে মিলিত হয়, আর বিধবারা একাদশীর দিনে নিরম্বু উপবাস পালন করে। একজন টোলের পণ্ডিতের চিন্তাধারা যুগ যুগ ধরে একটা জাতকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে রেখেছে যে, তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম দেখাবার ক্ষমতা এখনও কারও হয়নি।

যে তন্ত্র মেনে আমরা আজ ৺কালীপূজার অনুষ্ঠান করি, তা'রও জন্ম এক বাঙালী পণ্ডিতের হাতে। তাঁর নাম কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এঁরও বাড়ী নবদ্বীপে। টোলের পাঠ শেষ করে কৃষ্ণানন্দ সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করেন, আর বাঙালীকে উপহার দিয়ে যান শক্তি-পূজার এক নতন তন্ত্র—'তন্ত্রসার।' নবদ্বীপের এই পণ্ডিতপ্রবর তন্ত্রের

যে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন, তা' কেউ 'বিদূরিত করা তো দূরের কথা, পাশ্চাত্য-জগতে পর্যন্ত তা' চমক লাগিয়ে দিয়েছে। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি মনস্বী জন্ উড্রফ এরই আলোকে আকৃষ্ট হয়ে তন্ত্রগ্রন্থের উদ্ধার-সাধনে প্রবৃত্ত হন।

বাঙলার ইতিহাসের আর একটি বড় ঘটনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। এমন বিরাট পুরুষের আবির্ভাব বাঙালীর জীবনে আর হয়নি। তাঁর প্রেরণায় একদিকে যেমন বাঙালীর সামাজিক জীবনকে দৃঢ় ও সংহত করবার বিপুল চেষ্টা দেখা দিল, অন্যদিকে তেমনি ভক্তির বন্যাও বয়ে চললো। অনুষ্ঠানের কঠোরতা মুক্ত করে চৈতন্যদেব ধর্মকে এক নব-অনুরাগে রঞ্জিত করে তুললেন, আর সেই গৌরবময় আদর্শ তিনি উচ্চ-নীচ ভেদে সকলের কাছে পৌঁছে দিলেন। বাঙালী তা'র পরিপূর্ণ রূপের সন্ধান পেল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভেতর, তাঁর সম্বন্ধে কবির সার্থক উক্তি,—'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' বাঙালী এতদিন ঘরমুখো হয়েই কাটিয়েছে, দেহে আর মনে বড় একটা তাকে বাইরে যেতে হয়নি, বড় জোর পুরী, মিথিলা, কাশী পর্য্যন্ত সে ঘুরে এসেছে। কিন্তু এখন থেকে সে'ভাব আর তার রইলো না। বাঙালী বুঝলো—নদীয়ার পথে পথে যে প্রেম শ্রীচৈতন্য স-শিষ্যে বিলিয়ে গেলেন, সেই প্রেম-ফল্গুর ধারা বয়ে সকলকে এগিয়ে চলতে হ'বে, কোন জাত নেই, কোন ধর্ম নেই, অনন্তশক্তি মহিমময়ের এক বিশ্বমানবতা প্রতিলোকে সমভাবে পরিব্যাপ্ত! কি অক্ষয়, সীমাহীন, অবাস্তবের মূর্তি সে! চিরদিন বাঁশীর গান মানুষকে শুধু আকুল করেই এসেছে, এ কোথায় নিয়ে যেতে চায়, কেউ তা' জানে না! বিশ্বের দরবারে তাই নতুন করে বাঙালীর পরিচয় দেওয়ার দরকার হ'ল, আর সে-জন্য বৃন্দাবনের ভজন-কুটীরে নব-বেদ রচনায় বসে গেলেন বাঙলার রূপ, সনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীগণ।

তারপর বাঙালী বহুদিন ধরে অলস জীবন-যাপন করলো। তারপর ভাঙন এবং জাগরণের এক স্বপ্নময় মুহূর্ত্তে বাঙালী মুসলমান খৃষ্টান ও হিন্দু সভ্যতার সংঘর্ষে আর এক নবপর্য্যায়ে গড়ে উঠলো। বহুদিনের নিষ্ক্রিয়তার পর বাঙালী পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংস্পর্শে এল, আর প্রথম পরিচয়ের উন্মাদনায় একেই সে তার নব বেদ বলে আঁকড়ে ধরলো।

'দেশের ঠাকুরকে জুতো মেরে' 'বিদেশী কুকুরকে কোলে ধরে' সে কিছু আনন্দ পেল সত্য; কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণিক। তার যে বিদ্যা ও জ্ঞানগরিমার দীপ্তি একদিন নিখিল বিশ্বের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল, তারই স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আবার তার দৃষ্টি ঘরে ফিরে এসেছে।

তরুণ-বাঙলার আজ বড় আনন্দের দিন। এই নবীন যুগে ঘরে-বাইরে নানা সংঘাত-সংশয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বিষাদ তা'কে অভিভূত করে তুলেছে বটে; কিন্তু দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ সে শ্রেষ্ঠ নেতা পেয়েছে—রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্র, অরবিন্দ। বাঙালী আজ তাই আসল রূপ-দক্ষের মতো আপন ভাব-সম্পদ নিজের আদর্শে গড়ে তুলতে গর্ব্ব পায়। সে আজ ইতিহাস খোঁজে, ঐতিহ্য খোঁজে, শতধা-বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে নিজের সত্তাটুকু ভাল করে যাচাই করে নিতে চায়, অবাধ উন্মুক্ত তার গতি, শুভ্র সরল তার পথ, অজানা অনন্ত তার যাত্রা।

# রবীন্দ্রনাথের প্রতি

### প্রমোদ সাহা

প্রশ্ন—

সেই ছেলে কাকে যেন পাবে বলে সারাটা সময়
আনন্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে, আশ্চর্য্য, যন্ত্রণার সব সমন্বয়
তার আলু থালু চুলে সোহাগ জানায়!! সে ভেবেছে
কার হবে জয়? আনন্দের? না সময়ের পুচ্ছ তাড়নায় সব সমর্পণ?
দক্ষ ক্রীড়াবিদ যত কিছু নিয়ে গেছে
তার প্রতি মমতার বিলাস কোথায়?

কি চায় সে :—

আকাশে বাতাসে, পাথায় পাথায়, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
সমভূমি, নদী-নালা—ঝর্ণার জলে, মাঠে মাঠে, মনে দেহে
ফলে ফুলে, সমুদ্রে, প্রেয়সীর স্বর্ণাভ ওষ্ঠে, ওই যুবকের চোখে
রজনীগন্ধা, শিউলী, কৃষ্ণচূড়া রং-বেরং-এর ফুল,
শুধু উজ্জ্বল হরিদ্রাভ ফুল
চারিদিকে উদ্বেলিত আনন্দের সর্বগ্রাসী ঢেউ।
সে অপেক্ষমান
এখন সেই আকাঙ্ক্ষার প্রেয়সী এসে নিয়ে যাক্ তাকে।

মনে হয় :—

সময়ের মুষ্টি হতে যে সকল স্বর্ণবিন্দু পাওয়া গিয়েছিল
এখনও তা পাওয়া যাবে—এ পাওয়ার শেষ নেই শেষ নেই
আহা মাঝে মাঝে তাই মনে হয়, এ সময় বিচারক নয়।

তবু—

বিমুগ্ধ অভিসারের পথ বন্ধ, আশীর্বাদ পাওয়া গেল
চিতাভস্ম রূপে। যৌবনের পুষ্পলাবী আকাঙ্খারা
হঠাৎ উঠাও।
কালো পাথরের বুকে ঠুকে ঠুকে নাম লিখিবার
অক্লান্ত প্রয়াস কত বৃদ্ধের!

তাই—

এই সুন্দর নতমুখী সকাল বেলায়
তোমাকে আবার জাগাতে ইচ্ছে করল, রবীন্দ্রনাথ
একবার ওঠ, নিশ্বাস নাও, তারপর এই বিশাল ভূমির বুকে
একসাথে আনন্দের গান সুরু করি এসো।
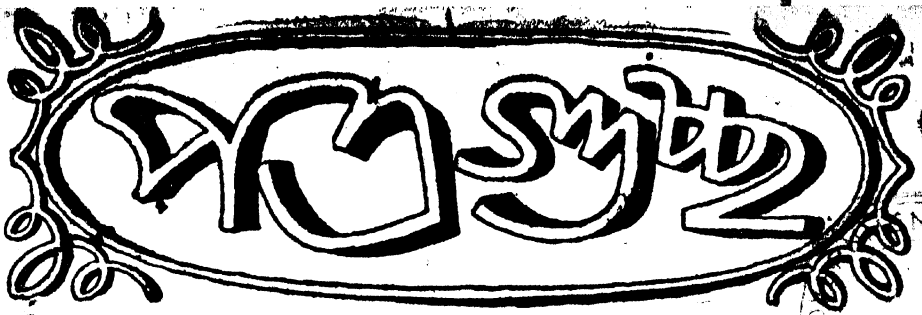
## ॥ সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী ॥

### স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

10. 1. '13
D. A. G's Office, Rn

প্রিয় উপীন,

তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দু'দিন পূর্ব্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও চরিত্রহীন পেয়েছি। তোমাদের ওপরে বেশি দিন রাগ করে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নেই, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে সত্যই অনেকটা রাগ এবং দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতাম এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয় না, তখন নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি উপীন, আমার এই একটা ভারী বদ স্বভাব আছে যে একটুতেই মনে করি লোকে যা করে তা ইচ্ছে করেই করে। ইচ্ছা না করেও যে কেউ কেউ অভ্যাসের দোষে আর একরকম করে, আমার নিজের সম্বন্ধে সে কথা মনে থাকে না। Sensitive বলে একটা কথা যে আছে, আমার সেটা অপর্য্যাপ্ত রকমের বেশি। সুরেনকে আজ হপ্তা দুই একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। আজ পর্য্যন্ত তার জবাব পেলাম না। এরা কেনই বা লেখে, কেনই বা লেখা বন্ধ করে। তুমি 'কাশীনাথ' সমাজপতিকে দিয়ে ভাল করনি। ওটা 'বোঝার' জুড়ি, ছেলেবেলার হাত পাকানোর গল্প। ছাপানো তো দূরের কথা, লোককে দেখানও উচিৎ নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না, একা বোঝাই যথেষ্ট হয়েছে।

আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোট গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না—ওটা তোমরা পাঁচজনেই কর। প্রবন্ধ লিখব এবং পাঠাবও। চরিত্রহীন কবে সম্পূর্ণ হবে বলতে পারি না। প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়েছে মাত্র। হয়তও যে সমাজপতির কাছে পাঠিয়ে দেব তাও বলা ঠিক হয় না। এক তুমি যদি কলিকাতায় থাকতে তোমার কাছে পাঠাতাম। ইতিমধ্যে তুমি সমাজপতিকে লিখে দিয়ো কাশীনাথ যেন প্রকাশ না করে। যদি করে তো আমি লজ্জায় বাঁচব না। তুমি দু'একটা গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ, যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণিকে?

এ কথাটা শুধু গোপনে তোমাকেই লিখচি। গিরীন তখন ছোট ছিল যখন আমি সংসারের বাইরে চলে আসি। এত বৎসরের পরে আমাকে বোধ করি তার মনেও নেই। উপীন আর একটা কথা যদি তোমাকে,—একদিন তার একখানা বই কিনতে চাই, তুমি নিষেধ করে বলো যে শুনলে সে দুঃখ করবে। আজ পর্য্যন্ত আমি সেই কথা মনে করেই কিনি নি। একখানা স্পষ্ট করে চেয়েও ছিলাম—অথচ, সে পাঠালে না। ছেলেবেলায় তার অনেক চেষ্টা সংশোধন করে দিয়েচি। আমি লিখতাম বলেই তারাও লিখতে সুরু করে। ও বাড়ীর মধ্যে আমিই বোধকরি প্রথমে ওদিকে নজর দিই। তার পরে ওরা চাঁচল থেকে হাতে লিখে মাসিক পত্র বার করত। আজ সে আমাকে একখানা পড়তেও দিলে না। সে হয়তো মনে করে, আমার মত নির্ব্বোধ মূর্খ লোকে তার লেখা বুঝতেও পারে না। যাক এজন্য দুঃখ করা নিষ্ফল। সংসারের গতিই বোধ করি এই। আমার শরীর আজকাল ভাল। আমাশা সেরেচে। আজকাল পড়াটা প্রায় বন্ধ করেচি। আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা (oil painting) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। তোমার সেই বড় উপন্যাস লেখার মতলব এখনো আছে তো? যদি না থাকে তো ভারী খারাপ। ওকালতিও করা চাই, এটাকেও ছাড়া চাই না।

আমার কলিকাতা যাওয়া (এদেশ ছেড়ে) বোধ করি হয়ে উঠবে না। শরীরও টিকবে না বুঝচি, কিন্তু না টিকাও বরং ভাল কিন্তু ওখানে যাওয়া ঠিক নয় এই রকমই মনে হচ্ছে। আমার ফাউন্টেনপেন তোমার হাতে অক্ষয় হোক ও কলমটা অনেক জিনিসই লিখেচে—খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি 'চন্দ্রনাথ' পাঠানো সম্ভব হয় এবং সুরেনের যদি অমত না থাকে, তা হলে যা সাধ্য সংশোধন করে ফণিকে পাঠাব। চিঠির জবাব দিয়ো।

—শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon
26. 4. 13.

শ্রীচরণেষু,

তোমার চিঠি পাইয়া যতটা আশ্চর্য্য হইয়াছি, তাহার শতগুণ ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমাকে দ্বেষ করিবে, এই কথাটা যদি

আমি নিজেও বলি, তাহা হইলেই কি তুমি বিশ্বাস করিবে ? আমার কলিকাতার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান আছে—আমি অনেক কথাই ভুলি বটে, কিন্তু, এ সব কথা এত শীঘ্র তো নয়ই, বোধ করি কোন দিনই তো ভুলি না। যাই হৌক, এ লইয়া আমি জবাবদিহি করিব না। আমি বেশ জানি একবার যদি তুমি নিভৃতে আমার মুখ এবং আমার কথা মনে করিয়া দেখ, তখনই বুঝিতে পারিবে—আমাকে তুমি বিদ্বেষ করিবে এ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। এ কথা আমি তো উপীন কল্পনা করিতেও পারি না। তবে এই বলি তোমার যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করিতে পার, আমি তোমাকে আমার তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ, আত্মীয় এবং সম্পর্কে মান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিব এবং ইহা চিরদিনই করিয়াছি। তোমাদের আপোষের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে পারে, তাই বলিয়া আমি কি তার মধ্যে যাইব? তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি বলিয়াছি তুমি আমাকে দ্বেষ কর। কি করিয়া আমার সম্বন্ধে তুমি ইহা বিশ্বাস করিলে ? আমার অনেকরকম দোষ আছে। তাই বলিয়াই আজ তুমি এই কথাই বিশ্বাস করিলে এবং আমাকে তাহা লিখিতে সাহস করিলে। আমি মন্দ বলিয়া কি এত অধম ? আমি মনে জ্ঞানে এমন কথা কল্পনা করিতে পারি—এই আজ নূতন শুনিলাম। আমাকে তুমি গভীর আঘাত করিয়াছ যদি বেশি দিন আর না বাঁচি, এটা তোমার মনেও একটা দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে, যে আমাকে তুমি নিরর্থক দুঃখ দিয়াছ। তোমার চিঠি পাইয়া অবধি কেবলি ভাবিয়াছি তুমি আমাকে না জানি কত নীচই না মনে কর। আমি বোধ করি মূর্খ এবং নীচ বলিয়াই তুমি আমার সম্বন্ধে (সম্প্রতি কলিকাতায় এত ঘনিষ্ঠতা এত কথাবার্ত্তা হইয়া যাইবার পরেও) এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ। না হইলে মনে করিতে না এমন হইতেই পারে না। আমার শপথ রহিল উপীন, আমাকে পত্র পাইবামাত্রেই লিখিবে তুমি আর এ কথা বিশ্বাস কর না। আমি সুরেনকে কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম আমার মনে হয়, আমাকে বিদ্বেষ করিয়াই যেন এ সব ছাপা হইতেছে। তার কারণ, আমিও সমাজপতিকে লিখি ওগুলো আর ছাপাইবেন না। তথাপি আমাকে কোন উত্তর না দিয়েই ছাপা হইতে লাগিল। যাই হৌক এখন ভিতরকার কথাটাও জানিতে পারিলাম। তুমিও যে ঐ কথা সমাজপতিকে বলিয়াছিলে তাহা এখন আরো জানিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম। তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না। আমি মানুষের হৃদয় বুঝি। তুমি যেমন তোমার অন্তর্যামীর কাছে নির্ভয়ে, অসঙ্কোচে বলিতে পার "আমি শরতকে সত্যই ভালবাসি", আমিও ঠিক তেমনি জানি এবং তেমনি বিশ্বাস করি।

যাক এ কথা। শুধু একটা চন্দ্রনাথ লইয়াই এত হাঙ্গামা। অথচ, সেটা যে কি রকমভাবে ফণী পালের কাগজে বাহির হইবে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমরা সব দিক না বুঝিয়া সব দিক না সামলাইয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকটা নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছ। এবং তাহারি ফল ভুগিতেছ। দোষ তোমাদেরি—আর বড় কারু নয়। ফণী পালের জন্য তুমি কতকটা যে false position-এ পড়িয়াছ তাহা প্রতি পদে দেখিতে পাইতেছি।

আমি আরো বিপদে পড়িয়াছি। একে আমার, একেবারে ইচ্ছা নয় 'চন্দ্রনাথ' যেমন আছে তেমনি ভাবে ছাপা হয়, অথচ সেটা খানিকটা ছাপা হয়েও গেছে, আবার বাকিটাও হাতে পাই নাই। সুরেনের বড় ভয়, পাছে ও জিনিষটা হারিয়ে যায়। ওরা আমার লেখাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে—বোধ করি তাই তাদের এত সতর্কতা।

আর একটা কথা উপীন। প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে, চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায়··প্রভৃতির লেখা চার-পাঁচটি উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। এদিকে যমুনাতেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সমাজপতিও registery চিঠি ক্রমাগত লিখচেন, কোন্ দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে বলে, এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধু বান্ধব Club প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে, কি করি ? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর শুরু থেকে History জান।

বড় ভাল নেই, ৭।৮ দিন প্রায় জ্বর জ্বর কচ্চে—অথচ স্পষ্ট জ্বরও হচ্চে না। যদি আবশ্যক বিবেচনা কর, এই পত্র সুরেনকে দেখাইও। তোমরা আপোষে ঝগড়া করিয়া মর, কিন্তু আমি যে এক সময়ে তোমাদের শিক্ষক ছিলাম—বয়সের সম্মানটাও অন্ততঃ দিয়ো।

সেবক—শরৎ

ফণীবাবু! উপেনকে এই পত্রখানা আপনি পড়িয়া পাঠাইয়া দিবেন।

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 10. 5. 1913.

প্রিয় উপেন, আজ তোমারও চিঠি পাইলাম, প্রমথরও চিঠি পাইলাম। তুমি যে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ, ইহাতে যে কত তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি, তাহা লিখিয়া জানাইতে যাওয়া পাগলামি। তুমি যে আর মনে ক্লেশ পাইতেছ না কিম্বা দুঃখ করিতেছ না, ইহা হইতেই বুঝিলাম যে অতি সহজভাবে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছ। আমি নিজেকে মূর্খ বলিয়াছিলাম—সেটা কি মিছে কথা ? তোমাদের কাছে আমি কি পণ্ডিত বলিয়া নিজেকে মনে করিব, আমি কি এত বড় আহাম্মক ? না হয়, বানাইয়া গল্প লিখিতে পারি—এতে পাণ্ডিত্য কোথায় ? যাক্। B.A., M.A., B.L., এ টাইটেলগুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, তাহাই জানাইলাম। প্রমথ লিখিতেছে, গল্পগুলো তাদের Evening Club এ অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছে। D. L. Roy এত প্রশংসা করিয়াছেন যে, তাহা বিশ্বাস হইতে চায় না। দিদির নারীর মূল্য নাকি "অমূল্য" হইয়াছে। বিজুবাবু বলেন, এ রকম গল্প রবি বাবুরও বোধ করি নাই। [এমন] প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় আর কখন পড়েন নাই! সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন, ফণী এইভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুদিন পরে হোক দশ দিন পরে

রোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তবে চেষ্টা করা চাই—পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা। আমি তাকে ছোট ভায়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজ। তবে, আজকাল এত বেশী অনুরোধ হইতেছে যে, আমার দশটা হাত থাকিলেও ত পারিয়া উঠিতাম বলিয়া মনে হয় না। 'চরিত্রহীন' তার কাগজে বার হবে না, এ কথা কে বলিয়াছে? আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়েছি। তবে, সে যদি ধরিয়া বসিত যে সেই প্রকাশ করিবে, তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত, কিন্তু তাহারা সে দাবী করে না। বোধ করি manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে "মেসের ঝি" বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে, তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত একদিন আপশোষ করিবে কি বস্তুই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে। আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপরে যাহার ভরসা নাই অবশ্য সে ও রকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহির করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্য্যের কথা নয়, কিন্তু নিজেই তাহারা বলিতেছে চরিত্রহীনের শেষ দিকটা (অর্থাৎ তোমরা যতদূর পড়িয়াছ তার পরে আর ততটা) রবিবাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (style এবং চরিত্র বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই যে, লোক ইচ্ছা করিয়া একটা "মেসের ঝি"কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম। আর এক কথা—তাহারা দাম দিয়া লেখা ক্রয় করিবে—তখন তাহাদের অভাব হইবে না, কিন্তু দাম দিলেই যে সকলের লেখাই পাওয়া যায় না, এইটা তাহারা আমার সম্বন্ধে এইবার বোধ করি বুঝিয়াছে। যাই হোক—চরিত্রহীন আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণীকে পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব না। তবে প্রমথ ফণীর হাতে সেটা দিবে না, কেন না, ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে। তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকেরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না। আর কিছু নয়। তবে, প্রমথ লোকটি শুধু যে আমার বাল্যবন্ধু তা নয়, আমার পরম বন্ধু এবং অতি সৎ লোক। সত্যই ভদ্রলোক। তাকে আমি বড় ভালবাসি। সেই জন্যই ভয় করিয়াছিলাম তাহার জোর জবরদস্তিকে আমি পারিয়া উঠিব না। এ বিষয়ে সঠিক সম্বাদ পরে দিব।

তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু, এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ, তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্রও কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু diplomatic চাল চালিয়াছ—তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া "আমরা" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে। 'পথ নির্দ্দেশ' এবং 'রামের সুমতি' সম্বন্ধে আমার অভিমত 'পথ নির্দ্দেশ'টাই ভাল। তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝিবে না। আমিও অনেকের অনেক রকম মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে, রামের সুমতি যদিও বা লেখা যায়, পথ নির্দ্দেশ লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না। ও রকম গোলযোগ circumstanceএর ভেতরে থেই হারাইয়া একটা হ-য-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়ত ধৈর্য্যের অভাবে শেষ হবার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে। আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এদেশের লোকের মত দুটো গল্পই superlative degreeতে Excellent। দ্বিজুবাবু বলেন গল্পের আদর্শ। ফণীর কাগজে প্রতি মাসেই যাতে এই রকম একটা কিছু বার হয় তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত। তবে, আমি আর বড় ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট করে যেন লিখতেই পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা এইখানে আমার বলবার আছে। আমি ত চন্দ্রনাথকে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় আছি, অবশ্য গল্প (plot) ঠিক তাই থাকবে। তার পরে হয় চরিত্রহীন, না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু যমুনার বার করা চাই। আর প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার। তা না হলে শুধু গল্পেতেই কাগজ যথার্থ "বড়" বলে লোকে স্বীকার করে না। আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ করি গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য করেই। এ বিষয়ে তোমার অভিমত জানাবে। যদি গল্প লেখার কাযটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু novel ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি। তা না হইলে দেখচি রাত্রেও খাটিতে হয়। আমার শরীর ভাল নয়, রাত্রে লিখিতে পারি না এবং পড়াশুনার ক্ষতি হয়। সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব লিখলে আবার লোকে হয়ত সব্যসাচী বলে ঠাট্টা করবে। আবার অন্য কাগজেও কিছু কিছু দিতে হবে।

'দেবদাস' ও 'পাষাণ' পাঠিয়ে দিয়ো, আমি re-write করবার চেষ্টা দেখব। আচ্ছা, ফণী ৩০০০ কপি ছাপিয়ে টাকা নষ্ট করচে কেন? তার গ্রাহক কি কিছু বেড়েচে? আমার বোধ হয় না। তবে খুব ভরসা আছে আসচে বছরে ওর কাগজ একটি শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যেই দাঁড়াবে।

ফণীর ক্রমাগত আশঙ্কা হয় আমি বুঝি তাকে ছেড়ে আর কোথাও লিখতে সুরু করব। কিন্তু এ আশঙ্কার হেতু কি? সে আমার ছোট ভায়ের মত—এ কথাটা কেন যে সে বিশ্বাস করতে পারে না, তা সেই জানে। আমি জানি না।

তোমার ক্রয় বিক্রয় গল্পটা সত্যই ভাল। কিন্তু, আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি করে শেষ করলে জানি না। একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই।

সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিলে না কেন? তাকে আমার হাতের কলম দিয়েচি, কেন না, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দিবার নাই। সে তার কি সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা করে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম দেওয়ার বাকী আছে। যোগেশ মজুমদার কোথায়? পুঁটু, বুড়ি এবং সৌরীন এদের জন্যও আমার কলম ঠিক করে রেখেচি—একদিন পাঠিয়ে দেব।

গিরীন কি বাঁকিপুরে ফিরেচে ? তাকে জবাব দিতে পারিনি, সে কোথায় আছে জানিতে পারি নাই বলিয়া। ফটো ত আমার নাই— কোন দিন ও কথা মনেও হয় নি। আচ্ছা।

আজ এই পর্য্যন্ত।

হাঁ আর এক কথা। সুধাকৃষ্ণ বাগচি একটা written statement পাঠিয়েছে। সে বলে সমস্ত কথা মিথ্যা। ভালই। আমি জানি কোন্‌টা মিথ্যা। যাই হোক লোকটা যখন deny কচ্চে তখন ঐখানেই শেষ করা উচিত। তা ছাড়া বুড়ো মানুষ। —শরৎ।

14, Lower Posoungdoung Street,
Rangoon
২২শে আগষ্ট '১৩

প্রিয় উপীন,

অনেকদিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমিও অনেকদিন আমাকে কোন সম্বাদই তোমার দাও নাই। নাই দাও সে জন্য দুঃখ করিতেছি না বা অনুযোগ করিতেছি না। ২।৩ মাস পরে সম্ভবতঃ আমাদের আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তখন সে সব কথা হইতে পারিবে।

এ মাসের যমুনা পাইয়া তোমার "লক্ষ্মীলাভ" পড়িলাম। এ সম্বন্ধে আমার মত তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি "বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কায নাই।" আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেকদিন পড়ি নাই। হয়তো তোমার best এটি। অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই লোকের দোষ দেখানো, সংসারের দুঃখের দিকটা ফুলিয়া বলা ইত্যাদি কিছু নাই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্মল এবং পবিত্র। মধুর, অতি মধুর। এই আমি চাই। পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে, তবে আর সে গল্প কি ? বড় ভালো হয়েছে উপীন, আমি আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। যেন মাঝে মাঝে এমনই গল্প পড়তে পাই। অবশ্য আমাকে খুসী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এতবড় সুখ্যাতিতে হয়তো তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়তো আমার সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোর না গর্ব্ব করচি—কিন্তু আমার আত্মনির্ভরই বল, আর prideই বল—এই আমার নিজের ধারণা। এমন গল্প অনেকদিন পড়ি নি। শুনেছি, তোমার আর একটি বড় এবং ভাল গল্প বেরিয়েছে। বলিতে পারি না সেটি কেমন। কিন্তু যদি তাবে মাধুর্য্যে এমনটি হয়ে থাকে ত। হলে সেও বিশ্বের খুব ভাল গল্পই হয়েছে।

তা ছাড়া তোমাদের লেখার styleটি বড় সুন্দর। আমি যদি এমনই সুন্দর ভাষা পেতাম, ভাষার ওপর এমনি অধিকার থাকত, তা হলে বোধ করি আমার গল্প আরও ভাল হোত। অবশ্য আমি নিজের সহিত তোমার তুলনা করছি না, তাতে তুমিও লজ্জা বোধ করবে। কিন্তু খুশী হলে আমি আর রেখে চেপে বলতে পারিনে।

কেমন আছ আজকাল ? আমি বড় ভাল নই—এই বর্ষাকালটা আমার বড় দুঃসময়। ১০।১২ দিন জ্বর হয়েছিল, দুদিন ভাল আছি। আমার ভালবাসা জেন। ইতি—শরৎ।

# আমি হারিয়ে গেছি

## শ্রীঅজয়কুমার নাগ

এই বিশ্বের বিশাল জনস্রোতে
আমি হারিয়ে গেছি :
হারিয়ে ফেলেছি আমার সমস্ত সত্তা
সমস্ত চেতনা আমার বিলুপ্ত হয়েছে—
শুধু একটা পঙ্গু মন—একটা নির্জীব মানুষ হয়েছি
তোমাকে দেখে,
বিশ্ব ব্যাপী তমসার মাঝখানে
আমি হারিয়ে গেছি ;
ভেদ ক'রে আসতে পারিনি কুয়াশায় ঘেরা
সেই তমসার মসৃণ জাল।

আমি হারিয়ে গেছি :
আমি হারিয়ে গেছি সমবায়ী মন নিয়ে
সমবায়ীদের ভিড়ে ;
আবার হারিয়ে গেছি
কোন এক উত্তেজনার বশে,
উত্তেজিত মনকে বার বার বুঝিয়েও
পারিনি—হারিয়ে গেছি আমি

তবু :
যখন দেখেছি কঠিন রাজপথে প্রেতের মিছিল
শীতের অন্ধকারে যখন দেখেছি
জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ,
যখন দেখেছি তাদের চোখে বুভুক্ষার জ্বালা
অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের দল।

তখন :
আমি তখন হারিয়ে যাইনি।
অনুভব করি জঠর সংগ্রামের শেষের প্রহর,
তারপর চলে যাবে এশিয়ার
বিস্তৃত শ্মশান কবরে,
ভাবি যখন সংগ্রাম চালাবো তাদের নিয়ে,
তখনি তোমার হাল্‌কা ওড়্‌নাখানি
আমার চিন্তিত ললাটে মৃদু বলিয়ে যায়,
তখনি তোমাকে দেখে

আমি হারিয়ে গেছি :
আমি হারিয়ে গেছি তোমাকে নিয়ে।
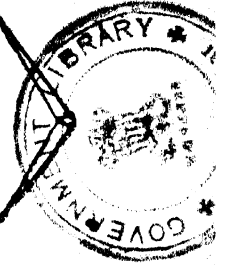
### অরহন্তবগ্গো (৭)

১। ভ্রমণ অন্তে সংসারপথ বীতশোক হন যাঁরা।
বিমুক্ত তাঁরা, বন্ধনহীন, অন্তরদাহহারা।

২। স্মৃতিমান্ আর উদ্যোগী যারা, সংসারসুখ ফেলে।
হংসের মতো জলাশয় ত্যজি উড়ে যায় অবহেলে।

৩। শূন্যতা আর অনিত্যভাব, বিমোক্ষ আদি যাঁর।
আয়ত্তাধীন, সকল বিষয় সম্যক্ অধিকার।
যে জন সতত তৃষ্ণাশূন্য, ভোজনে নির্বিকার।
আকাশেতে ওড়া পাখির মতন দুর্জ্ঞেয়গতি তাঁর।

৪। তুরঙ্গ যথা সারথির বশ, ইন্দ্রিয় বশ যাঁর।
তৃষামানহীন, শ্রেষ্ঠপুরুষ প্রিয় হন দেবতার।

৫। স্তম্ভ অথবা ধরণীর মতো সুব্রত সুস্থির,—
স্বচ্ছ হ্রদেতে সর্বদা যথা নির্মল থাকে নীর,—
অবিচল সদা অষ্টধর্মে, নীরব নির্বিকার।
সুব্রতজন না লয় জনম সংসারে কভু আর।

৬। সম্যগ জ্ঞানী, বিমুক্ত যিনি নাহি মনে যাঁর ভ্রান্তি।
শেষ হয় তাঁর কথা ও কর্ম, বিরাজে স্নিগ্ধ শান্তি।

৭। জন্ম নিরোধি, আসক্তি ছেদি, নির্বাণ জানে যেই।
অলীক বাক্যে বিশ্বাসহীন, পুরুষোত্তম সেই।

৮। গ্রামে, অরণ্যে, সিন্ধুপুলিনে ভিক্ষু যেথায় থাকে।
সাধনার বলে সেই অঞ্চলে সুন্দর করি রাখে।

৯। রমণীয় বনে জনগণ কভু নাহি দেখে উল্লাস।
তৃষ্ণাশূন্য ভিক্ষু সেথায় আনন্দে করে বাস।

### সহস্সবগ্গো (৮)

১। কী লাভ শুনিয়া অনর্থ কথা শত সহস্রবার।
অর্থযুক্ত একটি বাক্যে মঙ্গল সবাকার।

২। অনর্থ শ্লোক শুনি সহস্র বাড়ায় সতত ভ্রান্তি।
শ্রেয় সেই শ্লোক, একটিতে যার চিত্তে বিরাজে শান্তি।

৩। অনর্থপদপূর্ণ শতেক গাথা কেহ যদি ভাবে।
এক গাথা ভাল শ্রবণে যাহার, সন্তোষ মনে আসে।

৪। যদি কেহ রণে সহস্রজনে জিনে সহস্রবার।
তা হতে শ্রেষ্ঠ, আত্মবিজয়ী,—মহৎ যুদ্ধ তাঁর।

৫। যে পারে জিনিতে জনসাধারণ, তার জয় হতে শ্রেয়।
আপন চিত্ত যদি করে জয় সংযমশীল কেহ।—

৬। ব্রহ্মা না পারে সে জয়ে জিনিতে, দেবতা বা গন্ধর্ব।
মার আসি তবু না পারে করিতে লব্ধ সে জয়ে খর্ব।

৭। বহু ব্যয় করি যে করে যজ্ঞ শতেক বর্ষ লাগি।
যে পূজে ক্ষণিক পুণ্যপুরুষে, তা হতে ভাগ্যভাগী।

৮। অরণ্যে পশি অগ্নির সেবা যেবা বহুকাল করে।
শ্রেয় তার চেয়ে পুণ্যপুরুষে পূজিলে ক্ষণেক তরে।

৯। বৎসরব্যাপী হোমাদি যজ্ঞ করিলে অনুষ্ঠান।
পুণ্যাভিলাষী পরিণামে তার যেই শুভ ফল পান,—
—মহাপুরুষেরে করিলে প্রণাম, যে পুণ্য লাভ হয়,—
চারি অংশের একাংশ সম তুল্য সে ফল নয়।

১০। প্রবীণজনেরে প্রণমি যে জন, সম্মান দেয় তাঁরে।
সুখ, বল আর আয়ু ও বর্ণ চারিগুণ তার বাড়ে।

১১। শতাব্দিজীবী হয়ে যদি কেহ থাকে সংযমহীন।
শ্রেয় তার চেয়ে শীলবান্, ধ্যানী বাঁচিলে একটি দিন।

১২। সংযমহীন, প্রজ্ঞাশূন্য বাঁচে যদি শতবর্ষ।
একদিন বাঁচি প্রজ্ঞাবানের তা হতে অধিক হর্ষ।

১৩। অলস-জীবনে যে হীনবীর্য শতাব্দিজীবী হয়।
দিবস-জীবন বীর্যবানের তুল্য সে কভু নয়।

১৪। শতায়ু যে জন, উদয়-বিলয় দর্শনে নিশ্চেষ্ট।
উদয়-বিলয় জ্ঞাত পুরুষের দিবস জীবনই শ্রেষ্ঠ।

১৫। সেই শ্রেয় যে বা একদিন বাঁচি অমৃতপদ জানে।
শতায়ুরে ধিক্ ! শতবরষেও যে না দেখে নির্বাণে।

১৬। ধর্ম না জানি বাঁচে যেই জন একশত বৎসর।
শ্রেয় তার চেয়ে দিন-আয়ু যেবা ধর্মেতে তৎপর।

### পাপবগ্গো (৯)

১। দ্বিধায় জড়িত পুণ্যকর্মে পাপে রত হয় মন।
কল্যাণকর কর্ম সাধিয়া পাপে কর নিবারণ।

২। একবার কেহ করে যদি পাপ সাধে তা বারংবার।
পাপের চিন্তা প্রসবে দুঃখ বর্ষিয়া পাপভার।

৩। সঞ্চিত করে পুণ্য যে জন, সুখলাভ হয় তার।
পুণ্যকর্মে ইচ্ছা জাগায়,—সাধে তা বারংবার।

৪। অপরিপক্ক পাপের কর্মে পাপী দেখে মঙ্গল।
পক্ক হইলে কর্ম তাহার, মেলে সে পাপের ফল।

৫। পক্ক না হলে পুণ্যকর্ম ধার্মিক হেরে মন্দ।
ফলের প্রসাদ পায় সে যখন,—অন্তরে মহানন্দ।

৬। পাপেরে কখনো অবহেলা ভরে মেপনা ক্ষুদ্রমাপে।
ফোঁটা ফোঁটা জলে ভরে যথা ঘট, পাপী ভরে ছোট পাপে।

৭। না করিও হেলা অল্পপুণ্যে,—বিন্দু বিন্দু জলে।
ভরে ওঠে ঘড়া, সাধু যথা ভরে অল্প পুণ্য ফলে।

৮। অস্ত্রবিহীন বণিক না যায় বিপদের পথপরে।
জীবন যে চায় খায় না সে বিষ,—সাধু পাপ পরিহরে।

৯। অক্ষত-হাতে রাখিলে গরল নিষ্ফল ক্রিয়া তার।
পাপ না পরশে সেইরূপ কভু নিষ্পাপ মন যাঁর।

১০। নির্দোষ অতি, কলঙ্কহীন, শুদ্ধপুরুষজনে।
মূঢ় যদি কেহ হানে তাঁহাদের অন্যায় আচরণে,—
যেমন বায়ুর বিপরীত দিকে ছুড়িলে বালুকারাশি—
সেইরূপ বেগে পাপ আসি তারে নিমেষেই ফেলে গ্রাসি।

১১। আত-মনুষ্য জনমে নরকে, হয় যদি পাপাচারী।
অর্হৎ লভে নির্বাণ-সুখ, সুগতি পুণ্যকারী।

১২। সাগরে, গুহায় লুকাবে কোথায়, স্বর্গেতে খোঁজো ঠাঁই?
পাপকাজ করে ত্রিভুবনে তব নিস্তার কোথা নাই।

১৩। সাগরে গুহায় লুকাবে কোথায়, স্বর্গেতে খোঁজো ঠাঁই?
মৃত্যুর হাতে ত্রিভুবন মাঝে নিস্তার তব নাই।

## দণ্ডবগ্‌গো (১০)

১। মৃত্যুর ভয়ে ত্রস্ত যে জন, দণ্ডে শঙ্কা করে।
বধের কারণ না হইও তার, না হান সে ভীত নরে।

২। ভালবাসে যে বা আপন জীবন, দণ্ডে শঙ্কা করে।
বধের কারণ না হইও তার, না হান সে ভীত নরে।

৩। সুখকামী জীবে দণ্ড যে দেয় আপন সুখের লাগি।
আত্মসুখী সে, পরলোকে কভু নাহি হয় সুখভাগী।

৪। আপন সুখের লাগিয়া যে জন সুখকামী জীব পরে।
না হানে দণ্ড, পরলোকে সেই মহাসুখ ভোগ করে।

৫। কাহারে না বল কর্কশ বাণী, উত্তরে পাবে তার।
রোষ জাগরূক কর্কশ কথা কর্কশ ব্যবহার।—

৬। অন্তরে রবে প্রতিশোধ জেগে—ভাঙা পাত্রের মতো।
নিশ্চল রহি লভ নির্বাণ থাকি সদা সংযত।

৭। দণ্ডে গোপাল গরুরে চরায়,—জরা ও মৃত্যু আসি।
বার বার করে জন্ম সূচনা জীবের আয়ুরে গ্রাসি।

৮। নির্বোধ কভু পাপ করমের পরিণাম নাহি স্মরে।
রহে সে অগ্নিতে আপনার কৃত কলুষকর্ম তরে।

৯-১২। অস্ত্রহীনেরে দণ্ড হানিয়া যে জন শাসন করে।
দশদশা মাঝে একদশা আসি তারে নিশ্চয় ধরে।—
নিদারুণ দুখ ভোগ করে সে-ই, ক্ষতি বা কঠিন রোগ।
হতে পারে তার চিত্তবিকার, রাজদণ্ডের ভোগ।—
জ্ঞাতীর বিয়োগ, অপবাদ আর অঙ্গ, অর্থহানি।
আগুনেতে তার পুড়ে যেতে পারে আপনার গৃহখানি।
এ দশ দুখের যে কোনো দুঃখ প্রজ্ঞাবিহীন যারা।
ভোগে ইহলোকে।—নরকে জন্মে মৃত্যুর পরে তারা।

১৩। উলঙ্গ থাকি, জটাধরি শিরে, অনশন করি তায়।
শয়ন ভূমিতে, ভস্ম-পঙ্ক লেপন করে যে গায়।
আত্মপীড়ন করে যেই জন, উৎকট তপে রয়,—
সংশয়শীল মানুষের মন পবিত্র নাহি হয়।

১৪। সজ্জিত থাকি বসনে-ভূষণে আচরণ যাঁর সাম্য।
শান্ত, দান্ত, সংযত যিনি সবার মৈত্রী কাম্য।
পোষণ করেন সকলের হিত অন্তরে যেই জন।
তিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু হন।

১৫-১৬। শিক্ষিত ঘোড়া করে যেইরূপ কশাঘাত নিবারণ।
কোথা আছে হেন পাপরোধকারী, নিন্দাবিরত জন?
শিক্ষিত ঘোড়া কশাঘাতে যথা হয় মহা বেগবান,—
বিদ্যা আচরি কর সেই মতো সত্যের সন্ধান।
সমাধিতে থাকি শ্রদ্ধা, ধৈর্য করিয়া সমন্বয়।
স্মৃতির প্রভাবে সীমাহীন দুখে সহজেই করে জয়।

১৭। প্রণালী-খনক জলগতি যথা যে দিকে ইচ্ছা টানে।
শর নির্মেতা ঋজু করি তোলে সহজে ধনুক-বাণে।
সূত্রধরেতে কাষ্ঠ নোওয়ায় নিজ প্রয়োজন মতো।
সেই মতো সদা পণ্ডিতজন আত্মদমনে রত।

## জরাবগ্‌গো (১১)

১। নিত্য বিশ্ব জ্বলিছে দুঃখে বিষের ধোঁয়ায় কালো,
থাকিবে কি সদা মোহেতে অন্ধ, খুঁজিবে না কভু আলো

২। চিত্রিত দেহ দর্শনে-জাগা ভ্রান্তিরে কর দূর।
অনিত্য ইহা, বাসনাপূর্ণ, ক্ষতময় রোগাতুর।

৩। এই দেহ সদা রোগের আবাস, ভঙ্গুর অতিশয়।
ঘৃণিত এ কায়, জীবনের শেষে মরণেই পায় লয়।

৪। শরতে যেমন কপোতবর্ণ অলাবু ছড়ান রয়।
মানুষের দেহ-অস্থি তেমন,—তাহে মোহ কেন হয়?

৫। এ দেহ-নগর রক্ত মাংস অস্থি আদিতে গড়া।
কপটতাময়, জরা ও মৃত্যু মান সম্মানে ভরা।

৬। রাজরথ যথা জীর্ণতা পায় হলেও সুচিত্রিত।
সেইরূপ হয় মানুষের দেহ জরাভারে নিপীড়িত।
মহজ্জনের ধর্মে কখনো জীর্ণতা নাহি ধরে।
ধর্ম-আলাপে রত হন তাঁরা মিলিলে পরস্পরে।

৭। বলদের মতো অল্পশ্রুতের বাড়ে বয়সের ভার।
আর বেড়ে ওঠে দেহের মাংস, প্রজ্ঞা না বাড়ে তার।

৮-৯। করেছি ভ্রমণ সংসার মাঝে জনম জনম আমি।
বুঝিতে পারিনি কে গড়িল গৃহ, কোন্‌জন গৃহস্বামী।
বার বার ভবে জনম গ্রহণ কেবলই দুঃখময়।
হে গৃহকারক! দেখিনু তোমারে, কাটিল আমার ভয়।
চূর্ণ করেছি গৃহ-রচনার উপকরণাদি যত।
তৃষ্ণাশূন্য চিত্ত আমার আজি নির্বাণগত।

১০-১১। ব্রহ্মচর্য না পালে, না আনে যৌবনে যেবা ধন।
মাছহীন জলে বকের মতন নিরুপায় সেইজন।
ব্রহ্মচর্য না পালে, না আনে যৌবনে যে বা ধন।
ফেলে দেওয়া যেন জীর্ণ ধনুক পড়ে থাকে সেইজন।

## অত্তবগ্‌গো (১২)

১। আপনারে যদি প্রিয় ভাব তুমি সুরক্ষ রাখ তায়।
পণ্ডিত রবে সতর্ক চিতে একযাম ত্রিযামায়।

২। আপনারে আগে নিযুক্ত করি মঙ্গল-বিষয়েতে।
উপদেশ দিলে অন্য জনেরে হবে না দুঃখ পেতে।

৩। অন্যেরে যাহা দিতেছ শিক্ষা, আপনারে সেই মতো।
শিক্ষিত কর, আত্মদমন, বড় সে কঠিন ব্রত।

৪। নিজেই তুমি যে নিজ আশ্রয়, অন্য তো কেহ নয়।
অতি দুর্লভ আশ্রয় লাভ, আত্মদমনে হয়।

৫। মণিরে বজ্র বিচূর্ণ করে, দোঁহে পাষাণেরই অংশ।
নিজ কর্মেতে উদ্ভূত পাপ, নিজেরেই করে ধ্বংস।

৬। শালমহীরুহে মালুবালতিকা ধ্বংসের লাগি ধরে।
দুঃশীলতায় জড়ায়ে আপনা, আপনিই লোকে মরে।

৭। অসাধুকর্মে ক্ষতি আপনার, সে কাজ সহজে হয়।
হিতকর সাধুকর্ম সাধন দুষ্কর অতিশয়।

৮। উপদেশদাতা আর্য-অর্হৎ ধর্মজীবন ধরে।
পাপ দৃষ্টির বশে যেই মূঢ় তাঁরে আক্রোশ করে।
ফল উদ্‌গমে সতত যেমন ধ্বংসই পায় বাঁশ।
কৃত কর্মেতে ডেকে আনে পাপী আপন সর্বনাশ।

৯। নিজ পাপে লোক দুঃখে ক্লিষ্ট, অপাপে দুঃখ হরে।
শুচি ও অশুচি তৈরি নিজের, কে কারে শুদ্ধ করে।

১০। পরের লাগিয়া আপন ইষ্টে না দাও বিসর্জন।
অন্তরে জানি আপনার হিত-সাধনায় দেহ মন।

## লোকবগ্‌গো ( ১৩ )

১। হীনধর্মের সেবা না করিবে প্রমাদে না রবে রত।
বর্জিয়া চল মিথ্যাদৃষ্টি ছাড়ি সংসার পথ।।

২—৩। উত্থিত হও, প্রমাদে কখনো উঠ নাকো উন্মুখী।
কল্যাণকর ধর্ম আচরি পরলোকে হও সুখী।
শুভধর্মের করিও পালন অশুভধর্ম ছাড়ি।
ইহ-পরলোকে সুখী রহে সদা যে জন ধর্মচারী।

৪। জলবুদ্‌বুদ সমান জগৎ যে জন দেখিতে পায়।
মরীচিকা জ্ঞানে, মৃত্যুরাজেরে সহজে এড়ায়ে যায়।

৫। দেখ দেখ এই চিত্রিত দেহ রাজরথ সমতুল।
অজ্ঞ যা দেখি মোহেতে অন্ধ, বিজ্ঞ না করে ভুল।

৬। প্রমাদ বিহারী হয়েও যেজন প্রমাদ ছেড়েছে পরে।
মেঘবিমুক্ত শশী যেন সেই জগতের তম হরে।

৭। অল্পই লোক দেখা যায় এই আঁধার জগৎ পরে।
অল্পই লোক জালছেঁড়া পাখি স্বর্গে গমন করে।

৮। শূন্যের পথে উড়ে যায় হাঁস, যায় সে ঋদ্ধিবান্।
মারে পরাভবি সংসার হতে ধীরজন চলি যান।

৯। পরলোকে যেবা বিশ্বাসহীন সাধিতে সেজন পারে।
পাপের কর্ম,—মিথ্যাভাষী সে সত্যধর্ম ছাড়ে।

১০। কৃপণ না যায় দেবলোকে কভু, প্রশংসে নাহি দান।
দানে অনুমোদি ধীর সদাশয় পরলোকে সুখ পান।

১১। ধরণীর পরে রাজত্ব লভি স্বর্গেতে গেলে কেহ।
এ তিন ভুবন অধিকারী হতে স্রোতাপন্নই শ্রেয়।

## বুদ্ধবগ্‌গো ( ১৪ )

১—২। বিজয় যাঁহার ছিদ্রশূন্য জয়ী যে সকল যুদ্ধে,
কোথা লয়ে যাবে, অসীমদর্শী সেই পথহীন বুদ্ধে?
যার বাঁর ভবে জনমদায়িনী তৃষ্ণা হতে যে ঊর্ধ্বে।
কোথা লয়ে যাবে, অসীমদর্শী সেই পথহীন বুদ্ধে।

৩। বিরাগ প্রশমি প্রশান্ত চিত, ধ্যানরত মুনিগণ।
স্মৃতি-মান্ অতি প্রবুদ্ধ তাঁরা দেবতার প্রিয় হন।

৪। মানব জনম দুর্লভ অতি জীবন রক্ষা যুদ্ধ।
সত্যধর্ম শ্রবণ কঠিন, দুর্লভ অতি বুদ্ধ।।

৫। পাপ পরিহরি সকল প্রকার পুণ্যেতে লহ দীক্ষা।
পবিত্র কর আপন চিত্ত এই বুদ্ধের শিক্ষা।।

৬—৭। স্বর্ণ সিন্ধু প্লাবনেতে নাহি তৃপ্তি যে কামনার,—
এই কথা সদা বুদ্ধ শিষ্য অন্তরে জানি সার।
দুঃখেতে ভরা ক্ষণ স্বাদ দায়ী সম্পদে নহে ভোগী।
তৃষ্ণার ক্ষয় করিবার লাগি রন সদা উদ্যোগী।।

৮-১২। ত্রয়েতে ত্রস্ত মানব সকল শরণ লইয়া ফিরে।
পর্বতে, গাছে, বনে, উপবনে, চৈত্যে বা মন্দিরে।
এ শরণ তার নহে উত্তম, নিরাপদ কভু নয়।
এ বৃথা শরণে না হয় মুক্তি, না যায় দুঃখ ভয়।
বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘে যে জন শরণ লভিতে চায়,—
দুঃখেরে জানি, দুঃখ নিরোধি, দুঃখে শান্তি পায়।
অষ্টমার্গ, চতুর্সত্য সম্যক জ্ঞানে জানি।
আপদবিহীন এ মহাকারণ উত্তম বলে মানি।
এই উত্তম শরণ লভিলে জীবের মুক্তি আসে।
এই উত্তম শরণ লভিলে সর্বদুঃখ নাশে।।

১৩। দুর্লভ অতি মহাপুরুষের জনম আবির্ভাব।
যে কুলে জনম, সে কুলের হয় সুখগৌরব লাভ।।

১৪। বুদ্ধগণের জনম সুখের, সুখে প্রচারিয়া ধর্ম।
সঙ্ঘ-একতা অতি সুখপ্রদ, সুখদায়ী তপ-কর্ম।।

১৫-১৬। শোক সন্তাপ প্রপঞ্চ আদি যেই জন করে জয়।
সেই জন রহে তুষ্টচিত্তে, সতত অকুতোভয়।
পূজার্হ এই বুদ্ধে পূজিলে, অথবা তাঁহার শিষ্যে।
পুণ্যের তার নাহি পরিমাপ তুলনা নাহিকো বিশ্বে।

## সুখবগ্‌গো ( ১৫ )

১-৩। বৈরীজনের বৈরিতা মোরা অবৈরিতায় ঢাকি।
বৈরিতাভরা মানুষের মাঝে অবৈরী হয়ে থাকি।
তৃষিতের মাঝে বাস করি তবু থাকি মোরা অনাতুর।
আতুরজনের মধ্যে বিরাজি তৃষ্ণা করিয়া দূর।
উদ্‌বেগভরা মানুষের মাঝে মোরা উদ্‌বেগহারা।
উদ্‌বেগহীন মোরা তারি মাঝে উদ্‌বেগে থাকে যারা।

৪। সুখে বাস করে কিঞ্চনহীন সতত বুদ্ধগণ।
দেবতার মতো অদৃশ্য থাকি তাঁরা প্রীতিভোজী হন।

৫। বিজয়েতে করে বৈরী প্রসব, পরাজিত থাকে দুখে।
এ-দুয়ের যিনি অতীত মানব, সেইজন থাকে সুখে।

৬। কামনার মতো নাহিকো অগ্নি, জীবনের মতো দুখ
বিদ্বেষ সম নাহি কোনো পাপ, নির্বাণ সম সুখ।

৭। ক্ষুধা মহাদুখ, মহাদুখময় এই জীবনের ধারা।
জ্ঞানে যেইজন, নির্বাণ সুখ অনুভব করে তারা।

৮। পরম সে লাভ, আরোগ্য লাভ, সন্তোষে ধন মানি।
বিশ্বাস ভবে জ্ঞাতির সমান, নির্বাণে সুখ জানি।

৯। উপশম আর বিবেকের রস পান করে যেইজন।
ধর্মপ্রীতির রসে হয় তার পাপ-জ্বালা নিবারণ।

১০-১২। আর্যগণের দর্শন শুভ, সঙ্গও সুখময়।
নির্বোধজনে না দেখিলে চোখে সর্বদা সুখ হয়।
অজ্ঞের সাথে বাস করে যেবা সুদীর্ঘকাল ধরি।
অনুশোচনায় মরে সেইজন আপন ভ্রান্তি স্মরি।
অজ্ঞের সাথে বাস করা আর শত্রু সঙ্গে বাস,—
সমতুল তাহা, চিত্তে জাগায় দুঃখ ও নৈরাশ।
আর্য সঙ্গ সতত সুখের জ্ঞাতি সঙ্গের মতো।
ধীর, ব্রতবান, প্রাজ্ঞ, সুমেধ যেইজন বহুশ্রুত,—
আর্য ও সৎ যেই পথে যান যাও সেই পথ ধরি।
চন্দ্র যেমন গগনের পথ চলি যায় অনুসরি।

## প্রিয়বগ্‌গো (১৬)

১-৩। অযোগে আত্মনিয়োগী যে জন যোগে করে পরিহার,
হিতে করে ত্যাগ, প্রিয়বস্তুর সন্ধান শুধু যার,—
প্রার্থনা করে তাহারি সঙ্গ যেইজন যোগভঙ্গ,—
*ত্যজ প্রিয়জনে, না কর কখনো অপ্রিয়জনসঙ্গ।*
*প্রিয়ে না দেখিলে দুঃখ উপজে, অপ্রিয়ে দেখা তাপ।*
*না হও কখনো প্রিয়-অনুরাগী, প্রিয় বিচ্ছেদে পাপ।*
*প্রিয়জন যার নাহি সংসারে, অপ্রিয় নাহি কেহ।*
*লোভ, দ্বেষ আদি বন্ধন হারা,—সেইজন ভবে শ্রেয়।*

৪। *প্রিয়জন হতে শোকের জন্ম প্রিয় হতে আসে ভয়।*
*প্রিয়-বিমুক্ত যে জন তাঁহার নাহি শোক নাহি ভয়।*

৫। প্রেম হতে হয় শোকের জন্ম প্রেম হতে আসে ভয়।
প্রেম বিমুক্ত যেজন তাঁহার নাহি শোক নাহি ভয়।

৬। রতি হতে হয় শোকের জন্ম রতি হতে আসে ভয়।
রতি বিমুক্ত যেজন তাঁহার নাহি শোক নাহি ভয়।

৭। কামনা হইতে শোকের জন্ম কামনা হইতে ভয়।
কামনামুক্ত যেজন তাঁহার নাহি শোক নাহি ভয়।

৮। তৃষ্ণা হইতে শোকের জন্ম তৃষ্ণায় আসে ভয়।
তৃষ্ণামুক্ত যেজন তাঁহার নাহি শোক নাহি ভয়।

৯। ধর্মে বসতি, কর্মে নিষ্ঠা, শীলদর্শন যাঁর।
সত্যবাদী যে, সেইজন সদা প্রিয় হন জনতার।

১০। কামনামুক্ত, উৎসাহ যিনি বাক্যাতীতের প্রতি।
ব্যক্ত নহেক অন্তর যাঁর তিনি সে উর্ধ্বস্রোতই।

১১-১২। প্রবাস হইতে গৃহে ফিরে যবে জ্ঞাতি ও মিত্রগণ,—
গৃহবাসী সবে জানায় হরিষে স্বাগত-সম্ভাষণ,—
সেইরূপ কৃত পুণ্যজনেরা পরলোকে যান যবে।
পরলোকবাসী মহা উল্লাসী স্বাগত জানান সবে।

## ক্রোধবগ্‌গো (১৭)

১। অভিমানহারা, বন্ধনহীন যে নহে ক্রোধের দাস।
নামরূপহীন অকিঞ্চনেরে দুঃখ না করে গ্রাস।

২। জাত ক্রোধ যেবা সংযত করে, ভ্রান্ত রথেরে প্রায়।—
সেই সে সারথি, সাধারণলোকে বৃথা রশি ধরি যায়।

৩। —

৪। সত্য ভাষিও, না করিও ক্রোধ, প্রার্থীরে তোষো দানে।
মানুষেই পায় দেবতার পদ এ তিন অনুষ্ঠানে।

৫। অহিংস যাঁরা, নিত্য যাঁদের দেহ থাকে সংযত।
লভে যন তাঁহারা বিচ্যুতিহীন ধ্রুবনির্বাণ পথ।

৬। জাগ্রত যাঁরা নিশিদিনমান শিক্ষায় মন রত।
বিষয়তৃষ্ণা সমূলে বিনাশি তাঁরা নির্বাণগত।

৭-১০। *আপনারে সবে ভাবে আধুনিক শিখিয়া নিন্দাতত্ত্ব।*
*জানে না এ প্রথা যুগ যুগ ধরে অজ্ঞেরই করায়ত্ত।*
*নীরব রহিলে নিন্দিবে লোকে, বহু ভাষণেও তাই।*
*পরিমিতভাষী যেজন তাহারও নিস্তার কভু নাই।*
*শুধু নিন্দিত অথবা কেবলি প্রশংসা শুধু লভে।*
*অতীতে এমন ছিল না মানব, ভবিষ্যতে না হবে।*
*সম্যগ্‌জ্ঞানী দিনে দিনে তাই করিয়া নিরীক্ষণ।*
*নির্দোষী, শীল, মেধাবীজনের খ্যাতিগানে রত হন।*
—দেবগণ তাঁরে প্রশংসা করে, প্রশংসে ব্রাহ্মণ।
জম্বুনদীতে সুজাত স্বর্ণে নিন্দিবে কোনজন।

১১-১৪। কায়িক দুষ্টকর্ম নিবারি কায়ে কর সংযত।
কায়িক দুষ্টকর্ম বর্জি সুকর্মে হও রত,
দুষ্টবাক্য নিবারি সতত বাকে কর সংযত।
দুষ্টবাক্য বর্জিয়া হও শিষ্টবাক্যে রত।
মানসিক দুষ্কর্ম নিবারি মনে কর সংযত।
মানসিক দুষ্কর্ম বর্জি সুকর্মে হও রত।
তাই সংসারে সংযমশীল মহাপণ্ডিতগণ।
কায়ে সংযত, বাকে সংযত, মনে সংযত হন।

অনুবাদক—রামপ্রসাদ সেন

A husband is either a fool who tells his wife everything that happens, or a liar who tells her a lot of things that never happen.

—*New York Mirror.*

# গ্যেটের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন

(শেষাংশ)

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত
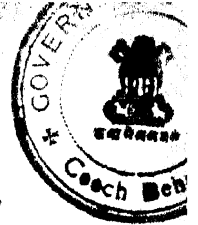


এই সময় দুইজন পুরাতনপন্থী সাহিত্যসেবীদের প্রতি ব্যঙ্গ-কবিতা লিখে তদানীন্তন যুগের তথাকথিত কবিতার ধারক ও বাহকদের তীব্র আক্রমণ করেন। সেই সময় গটশেট নামক জনৈক পুরাতনপন্থী কবির সঙ্গে গ্যেটের সাক্ষাৎ হয়। এই প্রখ্যাত ধুরন্ধর সাহিত্যিককে সুনিপুণভাবে উপহাস করে গ্যেটে জানালেন, পুরাতন ধ্যানধারণার যুগ আর নাই এবং উক্ত কবিকল্পিত যুগ শেষ হয়ে গেছে। আর একজন কবি ক্লোপ্তিয়াস নিজের লেখার মুন্সীয়ানার জন্য খুব বড়াই করতেন। গ্যেটে পুনরায় ব্যঙ্গ-কবিতা লিখে সেই লেখকের গজেন্দ্রগতি কাব্যের প্রতি কটাক্ষ করলেন। ফ্রাঙ্কফার্টে পরিচিত মহলে কবি-হিসাবে নাম কিনলেও, লাইপজিগে কবি-হিসাবে প্রতিষ্ঠা তিনি পাননি; উপরন্তু কবিকে টিটকিরি সইতে হত। ফ্রাঙ্কফার্টে শেষের দিকে বছরে পাঁচশত কবিতা তিনি লিখেছিলেন—এই কথা অনেকে বলে থাকেন। শব্দচয়নে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মাতৃভাষা জার্মাণ ছাড়া ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাতেও তিনি কবিতা লিখেছেন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, অধ্যাপক-পত্নী বোওমের বিপরীত মন্তব্য শুনে তাঁর কাব্যশক্তি বিষয়ে কবি সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। এর ফলে তাঁর কবি-জীবনে ভিতরে ও বাইরের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। বাইরের সংঘর্ষের সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপখাইয়ে নিতেন। ভিতরের বিক্ষোভ কবিকে অত্যন্ত পীড়া দিত। তিনি ভাবতেন অনুভূতির সামান্য অংশকে যদি তিনি প্রকাশ করতে সমর্থ হতেন! তবে, তাঁর কবি-সত্তার মধ্যে যে প্রকৃতির দান আছে, এ-কথা তিনি বুঝেছিলেন। একবার তিনি এর পূর্বে ভেবেছিলেন, কবি হওয়ার বাসনা তিনি পরিত্যাগ করবেন। তারপর তিনি বুঝলেন স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যধারা তাঁর মধ্যে উৎসারিত। যখন তিনি বুঝলেন কেটহেন সনকফকে আর পাবেন না তখন বুঝলেন তিনি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যেতেন যদি না কাব্যশক্তি উৎসারিত হত তাঁর অন্তরে। তাঁর কাব্যশক্তি বিরহে ও দুঃখে কবির ব্যক্তি-জীবনে প্রলেপ বুলিয়েছে।

লাইপজিগে জীবনযাত্রার কোন নিয়ম না পালনের জন্য গ্যেটে পীড়িত হন। জুলাই মাসে প্রচুর রক্তপাত সুরু হয়। হৃৎপিণ্ডের রোগ হয়েছে বলে ডাক্তারেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। ফ্রেডারিকা ওয়েজার মাঝে মাঝে এসে কবিকে সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন। কবি ভাবলেন তাঁর ক্ষয়রোগ হয়েছে। ফ্রেডারিকা ওয়েজার বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতেন। গ্যেটের বিমর্ষভাব এইভাবে কাটাতেন। অনেক কারণে এই অসুখ গ্যেটের হয়েছিল। লাইপজিগে গৃহ হতে আসবার সময় দুর্গম পথে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে বুকে আঘাত পান। এ-আঘাত সামান্য ছিল না। তাছাড়া অঙ্কনের তালিম নেওয়ায় এ্যাসিডের প্রয়োজন হত। এই এ্যাসিডের তীব্র গন্ধ শরীরকে বিষিয়ে দিয়েছিল। উপরন্তু অত্যধিক মদ্যপানের জন্য কবির হজমশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। কফি পানের জন্য আন্ত্রিক গোলমাল আরও বৃদ্ধি পায়। রুশো নির্দেশিত পথে জীবনযাপন

করার জন্য শরীর দ্রুত অবনতির পথে যায়। এই সব অনাচারের সঙ্গে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। ফলে শরীর ভেঙ্গে যায় এত যে, কবি ভাবলেন যক্ষ্মাই তাঁর হয়েছে। কুমারী বন্ধু ফ্রেডারিকা ওয়েজার কবিকে মৃদু উপহাসের সুরে বলতেন—প্রবঞ্চিত প্রেমিক তিনি, কেটহেন সনকফকে কবি পাননি বলে স্বপ্নবিলাসী কবি ভাবছেন, তাঁর যক্ষ্মারোগ হয়েছে এবং সেই রোগে তাঁর মৃত্যু হবে, এই চিন্তা কবিকে পেয়ে বসেছে। অবশ্য স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কবি প্রচুর সেবাযত্ন পান। এই সেবাযত্নের মাঝে কবি কেটহেন সনকফের পত্রের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। ঈষৎ সুস্থ হলে কবি ফ্রাঙ্কফার্টে ফিরে যান। এ-শহর ছাড়বার পূর্বে প্রেয়সী কেটহেনকে দেখার এক দুর্নিবার বাসনা জাগে তাঁর। তিনি ভাবলেন এই বোধ হয় শেষ বিদায়। শেষবারের জন্য সাক্ষাৎকারের জন্য গিয়েও প্রেয়সীর গৃহদ্বার হতে ফিরে এলেন। ভিতরে প্রবেশ করতে তাঁর আর সাহস হল না।

এই অসুস্থ অবস্থায় গৃহে এলে কবির মা এবং বোন কবিকে সহজ অবস্থায় গ্রহণ করলেন। স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে কবির দৈহিক ও মানসিক দুঃখ দূর করে দেবার জন্য তাঁরা উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন। রাথ গোটে পুত্রের এই বিষাদমূর্তি দেখে চুপ করে রইলেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই অসুস্থ অবস্থায় কোন কথা বলা সমীচীন হবে না। এরপর কবির অবস্থা আরও অবনতির দিকে নামে। গ্যেটের অবস্থা হয়েছিল জাহাজডুবির পর নাবিকের অবস্থার মত। গৃহে ফিরে গ্যেটে বুঝতে পারলেন সংসারের মাঝে অলক্ষ্যে একটা অশান্তি বিরাজ করছে।

রাথ গোটে কন্যাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নিজের আদর্শে। কী ভাবে নিজেকে ঘটনার সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে হয়, এ-কথা কর্ণেলিয়া জানতেন না। পিতার প্রতি ভয়, ভক্তি বা শ্রদ্ধা কোন কিছু প্রদর্শন করতেন না কর্ণেলিয়া। জার্মাণ, ফরাসী, ইংরেজী ভাষা এবং ইটালী সঙ্গীতের যে পাঠ পিতা দিতেন সেইটুকু যন্ত্রচালিতের মত করে রাখতেন। বিক্ষোভ বা অশ্রদ্ধা কোন কিছু কর্ণেলিয়া পিতাকে জানান নি।

ভাইবোনের খুব মিল ছিল। লাইপজিগ থেকে গ্যেটে বোনকে এই বলে পত্র লিখতেন, ফ্রাঙ্কফার্টের সাধারণ মহিলা হলেই চলবে না; সমগ্র বিশ্বের নারীর প্রতীক হতে হবে। গৃহে এসে লক্ষ্য করলেন পিতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর ছত্রছায়ায় বোন হাঁফিয়ে উঠেছে। কবিজননী সংসারে শান্তি পাবার জন্য ধর্মকে বেছে নিয়ে ধর্মকেই আঁকড়িয়ে ধরেছিলেন। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসিনী গ্যেটেকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচান। এই সন্ন্যাসিনীর নাম ফ্রাউলিন ফন্ ক্লেটেনবুর্গ। সন্ন্যাসিনী রূপে ইনি গ্যেটের কাছে প্রতিভাত না হলেও, এক বিশিষ্ট প্রতীকরূপে ইনি কবির জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গ্যেটেকে পুত্র বা ভ্রাতৃরূপে না দেখলেও তিনি কবিকে বলেন যে, গ্যেটে যদি ধর্মকে স্বীকার না করেন, তা হলে ক্ষতি নাই, তবে বেঁচে থাকতে

হলে একজনকে স্বীকার করতে হবে—এবং এই স্বীকৃতি না থাকলে কবি জীবনে শান্তি পাবেন না। এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র ছিল বিশ্বাস ও মুক্তি। সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ে একজন চিকিৎসক ছিলেন। লবণ জাতীয় একটা ওষুধের এক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে—এ-কথা গ্যেটে শুনেছিলেন। গ্যেটের অবস্থা যখন সঙ্কটজনক, তখন সেই লবণজাতীয় ওষুধটা প্রয়োগ করা হয়। গ্যেটের ওপর এই ওষুধ বাস্তবিকই ভোজবাজির মত কাজ করেছিল। কবিরও অগাধ বিশ্বাস বাড়ে সেই ওষুধের প্রত্যক্ষ ফলে। গ্যেটে সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বিশ্বাসী হন। মন্ত্রপূত দৈবী প্রভায় এই মহীয়সী রমণী প্রতিফলিত—এই কথা গ্যেটে বুঝেছিলেন। তবু গ্যেটে রহস্যের সুরে বলতেন ভগবানের কাছে তাঁকে জবাব দিতে হয়েছে, কারণ কবির কাছে ভগবানের কিছু পাওনা ছিল; রোগভোগে প্রায়শ্চিত্ত কবির হয়েছে—রোগভোগের পর অতীত ঘটনার অনুশোচনা না করাই ভাল। এই শুনে সেই সন্ন্যাসিনী কবিকে ভগবৎ-বিরোধী মনে করেছিলেন, বস্তু অর্থাৎ সেই লবণের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা দেখে কবি রহস্যবাদী হয়ে পড়লেন। ফলে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতি এবং সেই ডাক্তারের প্রতি কবির অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। গৃহে একটা ছোট রসায়নাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুর রহস্য বুঝে তিনি বলেছিলেন—বিশ্বাসের মধ্যেই মুক্তি আছে। এই থেকে বোঝা যায়,—নিষ্ফল বাসনা থেকে যে বিক্ষোভ গ্যেটের জেগেছিল, তার নিবৃত্তির জন্য এই মহিলার প্রভাব অনস্বীকার্য্য। অনেকে বলে থাকেন যে, ভগবৎ বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর কবির ভবিষ্যৎ-জীবন পিরামিডের সৌধ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। গ্যেটে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ইতিহাস গভীরভাবে পড়তে থাকেন এই সময়। কবি-জননী 'I am the life and the resurrection' বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। গ্যেটে ষ্টামবার্গে গিয়ে বলেছিলেন—এই রোগভোগ-অন্তে তাঁর জীবনে আলোক উৎসারিত হয়েছিল। তিনি প্রার্থনা-সভায় যাতায়াত সুরু করেন। ভগবানকে ভয় করলে জ্ঞানের বীজ উপ্ত হয় এবং বিনয় ও নম্রভাব মানুষের জীবনে উত্তরণ আনে, এ-কথাও তিনি বুঝেছিলেন।

কবি সেই ধর্মসংঘে সব কিছু সত্তা বিলীন করে দেননি। সেই ধর্মসংঘ থেকে বহুবিধ গুণ তিনি আহরণ করেছিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর মানসিক পরিবর্তন আসে। লাইপজিগে যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, সে সব কবিতা কবির কাছেই গূঢ়সঞ্চারী বলে মনে হল না। এই ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে কবির বিপরীত মন্তব্যও শোনা যায়। তিনি বলেছিলেন, সেই ধর্মীয় পরিবেশ বধ্যভূমির মত আর সেই বধ্যভূমিতে এক জল্লাদের কাছে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে।

লাইপজিগের উন্মাদ জীবনের কথা ভেবে গ্যেটে ভাবতেন তিনি উন্মাদ হয়ে যাবেন। এই কথা স্মৃতিপথে এলে ধর্মসঙ্গ তাঁর অসহ্য লাগত। কবির মনে হল তিনি ফ্রাঙ্কফার্ট শহরে নির্বাসনে আছেন। স্বদেশীয় নারীরা কবির কাছে হল নীরস, কোন মেয়েই তাঁর মনে ধরত না; সেখানকার মেয়েরা কবির মনে রোমাঞ্চও জাগায় নি। *এই প্রসঙ্গে কবির একটা মন্তব্য বলা যেতে পারে। লাইপজিগে তিনি বলেছিলেন—সেখানে থাকলে পুড়ে নিঃশেষ হতে হয়।*

*কেটহেনের স্মৃতিই কবিকে বিশেষ পীড়া দিত। তিনি বুঝেছিলেন—যে প্রেমিক যত দূরে সরে যায় প্রেয়সীর সান্নিধ্য থেকে, সে-প্রেমিক* তত হতভাগ্য, কারণ সে প্রেমিকের প্রেম স্বীকৃতি পেয়েও বঞ্চিত হয়েছে। আর যে প্রেমিক প্রথমেই প্রত্যাখ্যাত, সে প্রেমিকের ভবিষ্যতে ঘৃণা পাবার আশঙ্কা থাকে না। বঞ্চিত প্রেমিক কাউকে কিছু প্রকাশে অসমর্থ, কারণ একদিন যে সে প্রেম আস্বাদন করেছিল।

কেটহেন সনকফের কাছে লিখিত পত্র থেকে জানা যায় পূর্বে তিনি বদমেজাজী ছিলেন। তবে তখন তিনি সজীবতা ফিরে পেয়েছেন। কবির প্রফুল্ল ভাব থেকে বাড়ীর লোকজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। কবির বুকের রোগ সেরে যায়। তবে হজমের গণ্ডগোল অনেকদিন যাবৎ কবিকে পীড়া দিয়েছিল। মরণের পর কবিকে লাইপজিগে যেন কবর দেওয়া হয়—এই কামনা কবি করতেন। কবির মনে হত সাধুসন্ন্যাসীদের কবর দর্শন করে কেটহেন সনকফ অন্ততঃ একবার কবির কবরে যাবেন। জ্ঞানস্পৃহা জাগরণে তাঁর পিতা সহায়তা করেছিলেন যথাযথভাবে। কবি পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এই সময় কবিরচিত একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। সে রচনায় কবির নাম ছিল না। স্বাক্ষর সমন্বিত একটি রচনার কপি গ্যেটে কেটহেন সনকফকে পাঠান। সেই কুমারী যদি সেই রচনার একটি অক্ষর না দেখতেন অথবা সেই রচনায় বহ্ন্যুৎসব সাধনে ব্রতী হতেন, তবেও কবি দুঃখিত হতেন না—এই মনোভাব তখন কবির হয়েছিল।

এরপর কবির কাছে সংবাদ আসে ক্যানে নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কেটহেনের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। কবির সবচেয়ে দুঃখ হল এই ভেবে যে, এই ক্যানে নামক ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই পরিবারের পরিচয় তিনিই করে দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন সে-বিবাহ হয়ত হবে না। হঠাৎ কবির দীপ্ত ভাব ফুটে উঠল। প্রিয়তমাকে লিখলেন যে তিনি গ্যেটে এবং গ্যেটেই আছেন—পূর্বে তাঁকে ভালবেসে প্রেয়সীর অংশ ছিলেন—এখন তিনি সব সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন। কবি বুঝলেন বাসি প্রেমের কদর থাকে না। মেয়েদের মন নিরেট পাথর। ধূলো আর ধোঁয়ার মতই নারীদের প্রেম। হাওয়া লাগলে আর ঝাড়লে তা সরে যায় চকিতে। প্রিয়তমার বিবাহ উপলক্ষ্যে কোন কিছু লিখে অভিবাদন বা উচ্ছ্বাস সেই দম্পতিকে জানালেন না; কারণ যে কবিতা তখন বার-হবে-অন্তর থেকে, তা বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বাপর যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হবে না। মস্তিষ্কের উন্মাদে সব কবিতা এলোমেলো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

শিল্পকলাই কবির প্রিয় বস্তু হল। এই সময় তিনি জার্মাণ গ্রন্থকারদের সমস্ত প্রতিনিধিমূলক রচনা শেষ করলেন। ল্যাটিন গ্রন্থকারদের উল্লেখযোগ্য রচনার সহিত তিনি পরিচিত হলেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডীয়ান সেক্সপীয়ার ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান মলিয়েরের রচনার পাঠ সমাপ্ত করলেন। ভলটেয়ারের আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ভলটেয়ারের রচনাও তাঁর পাঠ্যসূচী থেকে বাদ গেল না। স্বদেশীয় নাট্যকার লেসিং-এর রচনাও গ্যেটের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। তবে লেসিং-এর রচনার ওপর কবির সমালোচনার ভাব ছিল। তবে লেসিং যে ক্ষণজন্মা পুরুষ, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। লেসিং-এর সহিত সাক্ষাৎকারের *প্রচেষ্টা পরে তাঁর ব্যর্থ হয়। এই সময় ওয়েল্যান্ড ও সেক্সপীয়ারের পর স্বদেশীয় লেখক ভাইল্যাণ্ড কবির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন।*

ভাইমার্স্তু জার্মাণ সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন। উত্তরকালে গ্যেটে, শিলের, ভাইল্যাণ্ড ও হার্ডার জার্মাণ সাহিত্যে নবযুগ আনেন।

কবি ক্রমশঃ সুস্থ হন। মা ও বোনের স্নেহ এবং পরিচর্য্যা কবির মননকে সুরভিত করেছিল। গ্যেটেকে শ্রীমতী এলিজাবেথ গ্যেটে বাইবেলের বিখ্যাত অংশ শোনাতেন—স্যামেরিয়া পর্বতে তুমি আঙুর বপন কর—বপনকারীরা বীজ বুনবে আর বাঁশী বাজাবে। Rath গ্যেটে ঠিক করলেন, গ্যেটে সুস্থ হয়েছে যখন তখন সময় হরণের প্রয়োজন নাই। সুতরাং গ্যেটেকে ষ্ট্রাসবার্গে পাঠাবার ঠিক করলেন আইনপাঠ শেষ করবার জন্য। পূর্বে বলা হয়েছে, পুত্রকে প্যারিস ঘুরিয়ে আনবার ইচ্ছে গ্যেটের পিতার ছিল। উদ্দেশ্য ছিল আদব-কায়দায় যাতে ছেলে ফরাসীয় হয়ে ওঠে। ষ্ট্রাসবার্গ শহর ফ্রান্সের সীমান্তে অবস্থিত। সুতরাং ফরাসী আবহাওয়া—যা তাঁর পিতা চেয়েছিলেন তা সেই নগরীতে ছিল। আর সেই সময় জার্মাণীর জাতীয় স্পৃহার অভাব ছিল। ফরাসীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তখন জার্মাণীতে পরিব্যাপ্ত। আচার-ব্যবহারে রোমানদের জীবনযাত্রা-প্রণালী জার্মাণরা শিখত। অবশ্য সেই সময় জাতীয় স্পৃহার জাগরণ আনবার চেষ্টা করছিলেন জার্মাণ জনগণের কবি ক্লোপষ্টোক।

গ্যেটের পিতার নিজের জীবনে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তা পূরণে তিনি অপারগ হন। পুত্র মারফৎ সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিকশিত হোক—এই বাসনা তাঁর উদগ্র হয়ে উঠেছিল। আর গ্যেটেই ছিলেন তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্রসন্তান। আর যে ছেলেমেয়ে হয়েছিল, তারা মারা যাওয়ার পর গ্যেটের ওপর তাঁর সব চেয়ে বেশী আস্থা ছিল। আর গ্যেটেও ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিল যথাক্রমে অশ্বব্যবসায়ী, দর্জ্জি ও হোটেলের মালিক। বংশের এই পরিচয়সূত্র পরিবর্ত্তনে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। স্বীয় বংশমর্য্যাদায় তখনও তাঁরা উচ্চক্ষেত্রে সমাসীন ছিলেন না। সুতরাং যাত্রার উদ্যোগ চলতে লাগল। বিদায়ের পূর্বে পিতাপুত্রের সংঘর্ষ লাগল গৃহের স্থাপত্য ও অলংকরণ বিষয় নিয়ে। গ্যেটের পিতা স্বয়ং বসতবাটীর সংস্কার করেছিলেন। ছাত্র হয়ে মত প্রকাশে অনেকটা স্বাধীন হয়েছিলেন গ্যেটে। আর গৃহের অলংকরণ এবং শিল্পবোধ বিষয়ে রাথ গ্যেটের প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল। গৃহের সিঁড়ির গঠনপদ্ধতি নিয়ে পিতার প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে গ্যেটে নিজের মত জানালেন। গৃহের দর্পণগুলির সংস্থাপনে কোথায় ত্রুটী, তা-ও তিনি জানালেন। তিনি আরও পিতাকে জানালেন ফ্রাঙ্কফার্টের গৃহ-সংস্থাপন লাইপজিগের চেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের। যে বসতবাটী নিয়ে পিতার গর্ব ছিল, সেই গর্বের ওপর তিনিই আঘাত হানলেন। অসুস্থ অবস্থায় গৃহে এসে পিতার অলক্ষ্য শাসনের বেড়ী দেখেছিলেন, তার ফলে হয়ত কবির চাপা অসন্তোষ ফেটে পড়েছিল। তা ছাড়া পিতার অধ্যাপক-সুলভ মনোভাব গ্যেটের ভাল লাগে নি এবং অচিরেই তিনি আইন পাঠ শেষ করবার জন্য ষ্ট্রাসবার্গে চলে যান।

# বিপ্রলব্ধার প্রতি, নায়কের প্রার্থনা

**শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু**

আমি যদি অস্বীকার করি
আমি যদি বিস্মৃত হই পূর্ণ করে দিতে :
প্রত্যাশায় শ্রান্ত স্নায়ুগুলি
প্রতিজ্ঞার প্রখর পৌরুষে,
উচ্ছ্বাস-মুখর উৎসবে।

আমি যদি বিড়ম্বিত হই
বুঝে নিতে অস্পষ্ট লীলার কুহেলী ;
চেয়ে নিতে ঠোঁট থেকে, মুখ থেকে, বুক থেকে
অপূর্ব প্রাণের বর্ণালী,
আমি যদি দ্বিধাগ্রস্ত হই।

মনের প্রান্তরে মেঘ যদি বোনে আশঙ্কার ছায়া,
কর্ত্তব্যের কুশাঘাতে যদি দেখি বিচলিত মায়া,
একবার যদি ভুল হয়
দেখে নিতে সন্ধ্যা-নিরালায়
কেমনে, ধীরে ফিরে যায় সূর্য্যের গোপন নিঃশ্বাস
তোমার কুলায়ে।

কেমনে আমার প্রেম সত্তার শতদল মেলি
আলিঙ্গন করে সেই অস্পষ্ট লীলার কুহেলী,
যদি ভীত হই তারে রূপ দিতে
তোমার আঁখিতে, হাসিতে—সৃষ্টির ঝংকৃত মাটিতে।
যদি ফিরে যায় ক্ষণ প্রতীক্ষার মরু পার হয়ে,
কী দিয়ে ফিরাব তায় ?

দিনান্তের কোলাহল যবে শেষ হবে
আঁধার চিতায় ;
সন্ধ্যার সৌম্য প্রেম গোধূলীর শান্ত উৎসবে
ধূসর বাসরঘরে জানাবে বিদায়
সকল দ্বিধায়, সব ভয়, জড়তায় ;
অদ্ভুত সুগন্ধে তবে
নিঃশব্দ আঁধার ধারায় ফুল ফুটে রবে।
সে নিশীথে
বারে বারে সত্তার তমিস্র সঙ্গীতে
আমি যেন তুমি হয়ে যাই
তোমার মাঝারে।

# উইলিয়াম ফক্‌নার

সুনীলকুমার নাগ

বছর পনেরোর একটি ছেলে। কবিতা লেখে ছেলেটি। ছেলেটি তার প্রতিটি কবিতার প্রতিটি ছত্রের মধ্যেই সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। চেষ্টা করে যাতে প্রতিটি রচনাই সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে, অমরত্ব লাভ করে—মানুষকে আনন্দ দিতে পারে, প্রেরণা যোগাতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতো যত্নের সৃষ্টি, এই কিশোরের প্রায় প্রতিটি রচনাই আত্মীয়স্বজন এবং পাড়াপড়শীর হাসির উদ্রেক করতে লাগলো। অবজ্ঞার হাসি, তাচ্ছিল্যের হাসি। এঁরা সবাই না হাসলে কি হতো বলা যায় না—হয়তো সেটা খুবই সহৃদয়তার কাজ হতো, কিন্তু ভবিষ্যতে তার ফল খারাপও হতে পারতো। কারণ, ওই অল্পবয়সে 'তারিফ' পেলে কিশোরের নিশ্চয়ই নিজেকে উন্নত করবার চেষ্টা অনেকটা কমে যেতো। যাই হ'ক, সে সময়ে তাঁরা না হেসে পারতেন না, তাই হাসতেন। একটি পনেরো বছরের ছেলের কোনো লেখায় যদি ক্রমাগতই দশ বছরের বালকের মত অশুদ্ধ ব্যাকরণ, উদ্ভট, অলীক অগোছালো চিন্তা ও আবেগের এবং বাসনার সমাবেশ ঘটতে থাকে তা' হলে হাসি পাওয়াটা এমন কিছু অস্বাভাবিক হয় না। বলাই বাহুল্য যে যিনি যতো বেশি অবজ্ঞা দেখাতেন, এ কিশোর তাঁর ওপর ততো বেশি বিরক্ত হ'তো। সেই সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও হ'তো—যেটা সব চাইতে দরকারী কথা বর্তমানে। লোকে যতো হাসতো, কিশোরটির ততই জেদ চেপে যেতো ভেতরে ভেতরে এমন কিছু রচনা করবার জন্যে, যাতে ওঁদের হাসি অর্থাৎ উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার হাসি বন্ধ করা যায়, যাতে তাঁরা তারিফ করতে বাধ্য হন।

পনেরো বছর বয়সে যার কবিতার এই অবস্থা, সেই ব্যক্তির বাহান্ন বছর বয়সে তাঁর সাহিত্য-সাধনার চরম স্বীকৃতি হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন—তবে কবি হিসেবে নয়, ঔপন্যাসিক হিসেবে। এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা যে ব্যক্তির বাস্তবজীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিলো, মানুষ হিসেবে তাঁর বিরাটত্ব এবং সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয়ই কোনো প্রকার আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এই ব্যাপারটা সম্ভব করে তুলেছিলেন মার্কিণ সাহিত্যিক উইলিয়াম ফক্‌নার (25th September 1897—6th July 1962)।

ফক্‌নার নোবেল পুরস্কার পাওয়া সত্ত্বেও অনেক মার্কিণ সাহিত্যিকের তুলনায়ই আমাদের দেশে অনেক কম পরিচিত। কেন এটা হ'লো তা নিয়ে প্রচুর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আমরাও বর্তমানে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে ফক্‌নারের জীবন সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

দুঃখ কষ্ট মানুষকে মানুষ করে তোলে, পৃথিবীকে জানতে বুঝতে সাহায্য করে, জীবনের মূল্য সম্পর্কে সজাগ করে তোলে,—এ সমস্ত বই-পুস্তকের কথা শুনতে খুব ভালো, অপরকে প্রেরণা যোগাবার জন্যে বলতে পারলেও নিঃসন্দেহে প্রচর আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়—

কিন্তু যে ব্যক্তিকে বাস্তবজীবনে এই দুঃখকষ্ট প্রত্যক্ষ করতে হয়, সে জানে এ কথাটার মধ্যে কি মারাত্মক বিষ রয়েছে। অসাধারণত্ব বলতে সাদামাটা ভাবে যা বোঝায় তার অনেকখানি সহজাতভাবে মানুষের মধ্যে না থাকলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দুঃখকষ্ট মানুষকে অমানুষ করেই তোলে। পৃথিবী তথা জীবন সম্পর্কে সমস্ত ভাবধারণাকে বিষিয়ে দেয়।

ফক্‌নারের জীবন সর্বতোভাবেই যাকে বলে দুঃখকষ্টের জীবন এবং সে দুঃখকষ্টের ভার বহুবার বালক, কিশোর এবং যুবক ফকনারকে নুইয়ে ফেলেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু তাঁকে ভাঙতে পারেনি, পরাজিত করতে পারেনি।

সাধারণভাবে লেখাপড়া শেখা বলতে যা বোঝায়, ফকনারের ভাগ্যে তার কিছুই জোটেনি। অর্থাৎ কোনো ইস্কুল কলেজের ডিগ্রি তিনি অর্জন করেননি। পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন তা' নয়, দৈন্যদশার জন্যে পড়াশুনো চালিয়ে উঠতে পারেননি বলে। যখন ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন কিছুটা আকস্মিকভাবেই পড়াশুনোয় অর্থাৎ ইস্কুলের নিয়মমাফিক পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তে হ'লো ফকনারকে। কয়েকটা বছর কাটলো নেহাৎ ছন্নছাড়াভাবে—শেষ পর্যন্ত লেগে গেলেন যুদ্ধের কাজে। প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি ফকনার কানাডায় এসে রাজকীয় বিমানবাহিনীতে নাম লেখালেন। ওঁকে পাঠানো হ'লো ফ্রান্সে। ফ্রান্সে বিমান-যুদ্ধের সময় দু'খানা জার্মাণ বিমান উনি ঘায়েল করেছিলেন।

এইখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। ইস্কুলে যে সামান্য কয়েক বছর ফকনার গিয়েছিলেন, সে সময়ে ছাত্র হিসেবে উনি এমন কিছু বুদ্ধিমত্তা বা অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে পারেননি, যাতে কর্তৃপক্ষের নজরে পড়তে পারেন। অনেক মাষ্টার মশাই তো বিরক্তই হতেন ইস্কুলের পড়াশোনার প্রতি ওঁর মনোযোগের অভাব দেখে। বাড়ীতে সবাই দেখতেন ফকনার কদাচিৎ ইস্কুলের বই পড়ছেন। কিন্তু পড়ছেন উনি প্রায় সব সময়ই এবং সে সব কোনোটাই ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক নয়—পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর প্রায় সব রকম বই-ই পড়তেন উনি—কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস, ধর্ম, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি। স্কুলের পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে বৈমানিক হিসেবে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বছর আষ্টেক সময়ের মধ্যে দেখা গেলো ফকনার এতো বিষয়ে এতো বিভিন্ন রকমের এবং এতো বেশি সংখ্যায় বই পড়ে ফেলেছেন যে যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রির জন্যেও তার অর্ধেকও পড়াশুনোর প্রয়োজন হয় না কারো। আসল কথা হচ্ছে, অপরের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে পড়াশোনায় কোনো আগ্রহবোধ করতেন না ফকনার, যদিও প্রকৃতপক্ষে পড়াশোনার জন্যে ওঁর প্রবল ইচ্ছে ছিলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যাঁরা যুদ্ধের কাজ করেছিলেন, বিশেষ করে তরুণেরা, তাঁরা পড়াশুনোর জন্যে অনেক রকম সুযোগ সুবিধে পেয়েছিলেন মার্কিণ সরকার তথা মার্কিণ দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে। এর মধ্যে একটি হলো স্কুলের পড়া শেষ না করেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করা। এ সুযোগটা ফকনারও নিলেন। গ্র্যাজুয়েট হবার আশায় ভর্তি হলেন মিসিসিপির অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন নিয়মিত ক্লাশও করলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাটা আর দিলেন না। ছাত্র হিসেবে ফকনার প্রায় দু'বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ছাত্র হিসেবে ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ফকনার। সে হ'লো কর্মচারী হিসেবে। প্রথমে উনি খুব সামান্য একটা কাজই নিয়েছিলেন। সে হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীগুলিতে রং লাগাবার শিল্পীর কাজ। এ কাজটা অল্প কিছুদিন করবার পরই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-অফিসের পোষ্টমাষ্টারের পদটা খালি হ'লো, তখন ফকনার একটা আবেদন করলেন এই চাকুরীটা পাবার জন্যে। কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করলেন ওঁর আবেদন। ফকনার পোষ্টমাষ্টার হয়ে গেলেন। কয়েক মাস পরেই এ চাকুরীটা চলে গেলো। কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করলেন যে ফকনার কাজে অমনোযোগী এবং এই কারণেই ওঁর চাকুরীটা চলে গেলো। এ সময়ে ফকনারের বয়স পঁচিশের বেশি নয়, এর পরেও আর একবার অমনোযোগিতা তথা অযোগ্যতার দায়ে চাকুরী গিয়েছিলো। তখন উনি নিউ ইয়র্কের একটা বইয়ের দোকানের কর্মচারী ছিলেন।

পঁচিশ বছর পর্যন্ত দেখা যায় ফকনার তাঁর লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হচ্ছেন দৈন্যদশা এবং পরিবেশের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। ধাবিত হচ্ছেন বটে, কিন্তু এ যেন অনেকটা দিশেহারার মতো। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এবং কাজকর্মের শেষে বাড়ী ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত লেখবার চেষ্টা করতেন উনি। বলাই বাহুল্য, কবিতাই লিখতেন। কিন্তু গত ক'বছরের মধ্যে নানাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের এতো রচনা উনি পড়ে ফেলেছিলেন যে, বহু ফিকিরফন্দি করে যে সামান্য সময়টুকু উনি কাব্যচর্চার জন্যে পেতেন এবং তারই মধ্যে এক-আধটা যা লিখতেন—কিছুক্ষণবাদে তা' আবার উনি নিজেই ছিঁড়ে ফেলতেন। কারণ, নিজের ত্রুটি ধরে ফেলবার মতো শক্তি ও সাহস ওঁর হয়ে গিয়েছিল। কিছুটা ভাবে বিভোর না হলে যে কবিতা লেখা যায় না—কাব্যচর্চার অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে, এ কথা তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এবং ঠিক লেখবার সময় নিজের লেখার ভালোমন্দ কারো পক্ষেই বিচার করা সম্ভব হয় না। তবে পরে হয়তো অনেকেই পারেন। ফকনার পারতেন দেখা যায়। কারণ, এই সময়কার অধিকাংশ কবিতাই রচনার দু' একদিন বাদে উনি নিজেই নষ্ট করে ফেলতেন।

কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ ফকনারের হ'ক আর নাই হ'ক, কাব্যচর্চার মানদণ্ড যে ওঁর কতো উচ্চগ্রামে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলো, তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রত্যেকটি লেখা শেষ হবার পর উনি ওঁর প্রিয় কবিদের রচনার পাশাপাশি রেখে বিচার করতেন—যেই মনে হ'তো নিজের রচনাটি তেমন সুবিধের হয়নি, তখুনি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিতেন কাগজখানা এবং হয়তো নিজেই একটু অবজ্ঞার হাসি হাসতেন নিজের অক্ষমতা দেখে। নিজের কবিতার বিচার ফকনার সাধারণত করতেন ওঁর সব চাইতে প্রিয় কবি ওমর খৈয়ম এবং সুইনবার্ণের রচনার পাশাপাশি রেখে।

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভয়ের। কারণ, এ ভাবে বেশিদিন চলতে থাকলে বেশির ভাগ লোকের পাগল হয়ে যাবার কথা। আর ফকনারের কয়েকটা বছরই তো কেটে গেলো এইভাবে। নিজের কাব্যচর্চার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠলেন উনি মনে মনে। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেও বলেছেন যে না লিখে উনি

পারতেন না। প্রাত্যহিক জীবনের অবশ্য-কর্তব্য কর্মের মতোই একটা নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়ালো ওঁর কবিতা লেখা এবং পরে তা ছিঁড়ে ফেলা। অতি সামান্য অবস্থা থেকে নিজের অসীম উৎসাহ, আগ্রহ এবং অধ্যবসায়ের ফলে নিজেকে এতোখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ফকনার কিন্তু আর যেন পারছিলেন না। এই রকমই যদি চলতে থাকতো তা' হ'লে কি হ'তো বলা যায় না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে এতোদিন পর ফকনার একজন মানুষ পেলেন—যিনি প্রকৃতই বুঝতে পারলেন ওঁকে, এবং ওঁর মনের প্রকৃত অবস্থাটা। এঁর নাম শেরউড এণ্ডারসন—সে সময়কার মার্কিণ দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে একজন দিক্‌পাল ব্যক্তি।

সেবার অক্‌সফোর্ড থেকে নিউ অরলেন্স বেড়াতে এসেছিলেন ফক্‌নার, সেইখানেই পরিচয় হ'লো এণ্ডারসনের সঙ্গে। এণ্ডারসন প্রথম পরিচয়েই লক্ষ্য করলেন ফকনারের ভেতরের প্রতিভাকে, যদিও তখন পর্য্যন্ত ওঁর কোনো উল্লেখযোগ্য রচনাই বই হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। এ-কথা সে-কথার পর এণ্ডারসন বললেন ওঁকে—গল্প-উপন্যাস লেখবার চেষ্টা করো না কেন?

—আজ্ঞে, এতোদিন ধরে চেষ্টাচরিত্র করে কবিতাই পারছি না লিখতে, *বিনীতভাবে ফকনার নিজের অক্ষমতার কথা বললেন, গল্প-উপন্যাস, সে তো আরো কঠিন ব্যাপার।*

*—প্রত্যেকটা ব্যাপারই কঠিন, পৃথিবীতে কিছুই সহজ নয় উইলিয়াম। তবে যার প্রকৃতির সঙ্গে যে কাজটা বেশি খাপ খায়, সে কাজটা তার পক্ষে অন্য আর পাঁচটা কাজের চাইতে একটু সহজসাধ্য হয় এইমাত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এণ্ডারসন সহৃদয়ভাবে বলতে লাগলেন ফকনারকে কাছে বসিয়ে।* সরাসরি কবিতা রচনার চেষ্টা উনি বন্ধ করতে বললেন না, বললেন—যখন প্রকৃতই ভেতর থেকে কোনো প্রেরণা বোধ করবে তখন কবিতা অবশ্যই লিখবে। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি গল্প-উপন্যাস লিখলে নিজের এবং দেশের অশেষ উপকার করতে পারবে।

কথাটা শুনে প্রকৃতই অভিভূত হয়ে গেলেন ফকনার। এমন থা, অর্থাৎ ওঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাহিত্যশক্তি সম্বন্ধে এতো বড়ো থা আজ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও কেউ, এমন কি মিথ্যে আশা দেবার ন্যেও বলেনি। আর আজ কিনা শেরউড এণ্ডারসন বলছেন মন ধারা কথা?

—অবিলম্বে উপন্যাস লেখবার চেষ্টা করো, কারো মতো লেখবার ষ্টা করবে না, নিজের মতো লিখবে, নিজে যা জানো তাই লিখবে। াবার বললেন এণ্ডারসন।

—কিন্তু আমার লেখা ছাপাবে কে? সংশয়ের সঙ্গে বললেন কনার।

কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন এণ্ডারসন—আরে াগে তো লেখো, ছাপাবার কাগজ, কালি, বই বিক্রির দোকান, কনবার খদ্দের, পড়বার পাঠক—এ সবের কথা আগেই ভাবছো কেন?

একটুক্ষণের মধ্যেই নিজের ছেলেমানুষী বুঝতে পারলেন ফকনার। াই লজ্জায় আর বললেন না কিছু এরপর। সোজা বাড়ী ফিরে লেন এবং ফিরে এসে উপন্যাস রচনার জন্যে প্রস্তুত করতে লাগলেন নজেকে।

কয়েক সপ্তাহের চেষ্টায় ফকনার তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনার কাজ শেষ করে আবার এলেন এণ্ডারসনের কাছে। উদ্দেশ্য উনি একটু পড়ে দেখবেন। এণ্ডারসন ছিলেন মানুষ হিসেবে প্রকৃতই দরদী স্বভাবের। উনি শুধু ফকনারের পাণ্ডুলিপি পড়েই দেখলেন না, প্রকাশের বন্দোবস্তও করে দিলেন। এতোদিনে ফকনার সাহিত্যসাধনার কাজে প্রকৃত আস্থা পেলেন। এটা ১৯২৬ সালের কথা। ফকনারের এই প্রথম উপন্যাসের নাম হলো "সোলজারস পে।"

ক্ষুদ্র একখানা কাব্যগ্রন্থ "দি মার্বল ফন" এর দু' বছর আগে ফকনার প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু সে বই সাহিত্যের আসরে ওঁকে কোনোদিক দিয়েই সাহায্য করতে পারে নি।

'সোলজারস পে'-র পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ফকনার আরো প্রায় তিরিশখানা বই লিখেছেন—বেশির ভাগই উপন্যাস, তবে কয়েকখানা গল্পের বই এবং আরো একখানা কবিতার বইও প্রকাশ করেছেন।

ফকনারের উপন্যাসগুলির মধ্যে "সারটরিস" এবং "দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি" (১৯২৯); এ্যাজ আই লে ডাইং (১৯৩০); স্যাঙকচুয়ারি (১৯৩১); লাইট ইন আগষ্ট (১৯৩২); পাইলন (১৯৩৫); এ্যাবস্যালম, এ্যাবসালম (১৯৩৬) এবং ইনট্রুডার ইন দি ডাস্ট (১৯৪৮) *বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং এই উপন্যাসগুলি শুধু যে মার্কিণ সাহিত্যেরই সেরা বই তাই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও স্থায়ী সংযোজন।*

*এ ছাড়া ফকনারের আরো অনেকগুলি বই আছে: মসকুইটোস (১৯২৭), দিস থারটিন (১৯৩১),* আইডিল ইন *দি* ডেসার্ট (১৯৩১), সালমাগুণ্ডি, দিস আর্থ, মিস জিলফিয়া গ্যাণ্ট (১৯৩২) কবিতার বই —এ গ্রীন বাউ (১৯৩৩), ডকটর মারটিনো (১৯৩৪), (এখানা গল্প সংকলন); দি আনভ্যানকুইসড (১৯৩৮); দি ওয়াইল্ড পামস (১৯৩৯); দি হ্যামলেট (১৯৪০); গো ডাউন মোজেস (১৯৪২) (এখানাও গল্প সংকলন); নাইটস গ্যামবিট (১৯৪৯), কলেকটেড স্টোরিজ (১৯৫০), রিকোয়েম ফর এ নান, নোটস অন এ হরসথিপ (১৯৫১), মিররস অব চারট্রেস ষ্ট্রীট (১৯৫৩), এ ফেবল (১৯৫৪) এবং দি টাউন (১৯৫৭)।

পাঠক সমাজের কাছে সারটোরিস, দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি, স্যাঙ্কচুয়ারি এবং ইনট্রুডার ইন্ দি ডাস্ট-ই সব চাইতে জনপ্রিয়। কিন্তু ফকনারের নিজের ধারণা একটু ভিন্নরকম। ফকনারের নিজের বিশ্বাস যে এর কোনটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। ওঁর নিজের বিশ্বাস যে এ্যাজ আই লে ডাইং-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই কথাই বলতেন উনি। কিন্তু ১৯৫৪ সালে 'এ ফেবল' প্রকাশিত হবার পর থেকে উনি বলেছেন যে, এইখানাই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—এ্যাজ আই লে ডাইং-এর স্থান তার পর।

লেখক হিসেবে ফকনারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। শেরউড এণ্ডারসন ফকনারকে শুধু "উপন্যাস লেখো" এই পরামর্শ টাই দেন-নি। কি লিখতে হবে, অর্থাৎ কি লেখা ফকনারের পক্ষে সম্ভব বা উচিত—সে উপদেশও দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা কথাই এণ্ডারসন ফকনারকে বলতেন। সে হ'লো এই যে—যা জানো, অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমায় ব্যক্তিগত ধারণা আছে, সেই সম্পর্কে লিখবে। ফকনার এ সময়ে নিউ অরলেন্স-এ এণ্ডারসন পরিবারের কাছাকাছিই থাকতেন এবং রোজ বিকেলেই ওঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হ'তো।

যাই হ'ক, এণ্ডারসনের কথা শিরোধার্য করে নিলেন ফকনার। উপন্যাস লেখবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সমস্যা হ'লো আসল ব্যাপারে। কি লেখা যায়? কাদের কথা লেখা যায়? কাদের বিষয় আমি জানি? এই প্রশ্নগুলি ফকনারের ভেতরে ভেতরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করলো। বইপত্র যা এ যাবৎ পড়েছেন, একটু চিন্তা করেই বুঝতে পারলেন ফকনার যে সব এতো এলোপাথারিভাবে হয়ে গেছে যে, তার ফলে কল্পনা শক্তিটাই যেন কেমন অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় নিজেরই কাছে। আর ভালোভাবে জানবার যে কথা এণ্ডারসন বললেন, ফকনার ভেবে দেখলেন, নিজেদের ছোট্ট সহর অর্থাৎ মিসিসিপির অক্সফোর্ড এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়া বলতে গেলে আর কোনো জায়গা সম্বন্ধেই ঘনিষ্ঠভাবে জানা নেই।

মানসিক প্রস্তুতির কিছুটা অভাব সত্ত্বেও কলম ধরলেন ফকনার। পর পর দু'খানা উপন্যাস এণ্ডারসনের সুপারিশেই এক প্রকাশক প্রকাশ করলেন। আর্থিক দিক দিয়ে লেখক বা প্রকাশক, কারোই বিশেষ সুবিধে হ'লো না এ উপন্যাস দু'খানার জন্যে।

ফকনার কিছুটা হতাশ হ'লেন নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ঠিক করলেন কিছুদিনের জন্যে নিজেদের সহর অর্থাৎ অক্সফোর্ডে ফিরে আসবেন। এণ্ডারসন বাধা দিলেন না। শুধু আর একবার মনে করিয়ে দিলেন—যে সম্পর্কে এবং যাদের সম্পর্কে জানো, ঘনিষ্ঠভাবে জানো, সেই সম্পর্কে এবং তাদের সম্পর্কেই লিখবে। গল্প-উপন্যাসে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকটা গৌণ, কাহিনীটা এবং তা বলার ধরণটাই প্রধান।

অক্সফোর্ডে ফিরে এসে ইলেকট্রিক সাপ্লাই স্টেশনে একটা চাকুরী নিলেন ফকনার এবং সুরু হলো নতুন করে উপন্যাস লেখার আয়োজন। এবার একটা বিষয়ে উনি বদ্ধপরিকর হলেন। সে হ'লো এই যে—যা উনি জানেন, অনেকের কাছে তা যতোই তুচ্ছ মনে হ'ক না কেন, তা সততার সঙ্গে বলবেন আর যা জানেন না তা জানবার ভান করবেন না, তাতে লোকে যতই গেঁয়ো মনে করুক।

এইখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন, যা হয়তো এ আলোচনার সুরুতেই বলা উচিত ছিলো। ফকনার কেন দেশের বাইরে, তা ইয়োরোপেই হ'ক আর আমাদের দেশেই হ'ক—অনেক মার্কিণ সাহিত্যিকের চাইতে কম পঠিত, তার মূল কারণও আমরা এখানেই পাবো।

ফকনার পরিবারের স্থায়ী বসবাস মার্কিণদেশের দক্ষিণাঞ্চলে। মার্কিণ দেশ বলতেই আমাদের মনে সাধারণতঃ নিউইয়র্ক, স্যানফ্রান্সিসকো, বোষ্টন, ওয়াশিংটন, হলিউড প্রভৃতি সমস্ত বড়ো বড়ো সহরের পত্রিকায়-দেখা ছবি মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। গৃহ-যুদ্ধের পর থেকে একই রাষ্ট্রের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণাঞ্চল ভাবধারণার দিক থেকে মার্কিণ দেশের উত্তরাঞ্চলের চাইতে কিছুটা অন্যভাবে চলতে থাকে। উত্তর হয়ে উঠতে লাগলো শিল্পসমৃদ্ধ আর দক্ষিণ পড়ে রইলো গতানুগতিকভাবে জমি আঁকড়ে। উত্তরের পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনযাত্রায় ঘটতে লাগলো দ্রুত পরিবর্তন আর দক্ষিণাঞ্চলের রক্ষণশীলতা দেখা দিলো প্রবলভাবে। ফকনারের ছেলেবেলা পর্যন্ত ত বটেই, এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ফকনারের যখন আঠারো কি বিশ বছর বয়স সে পর্যন্ত মার্কিণ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের এই ছিলো অবস্থা। ফকনার পরিবার কয়েক পুরুষ ধরেই এ অঞ্চলের বেশ অবস্থাপন্ন এবং মান্যগণ্যদের অন্যতম ছিলেন। গৃহযুদ্ধের সময়ে এঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে যান এবং পরে আর কোনো সময়েই এঁরা পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হননি। কয়েক পুরুষ ধরে একই জায়গায় (অর্থাৎ অক্সফোর্ড সহরে) বাস করবার ফলে জ্ঞাতি-গোষ্ঠিরা সংখ্যায় হয়ে পড়ে অনেক। উইলিয়াম ফকনার ছেলেবেলায় জ্যেঠা-কাকা আর পিসিদের হিসেব ঠিক রাখতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতেন। এর ওপর আবার ফকনারদের এক ঊর্ধতন পুরুষ—উইলিয়াম ফকনারের প্রপিতামহ ছিলেন এ অঞ্চলের একজন 'হিরো' বিশেষ। ছোটো বড়ো বহু যুদ্ধের বীর সৈনিক, পরোপকারী, পরিণত বয়সে বড়ো ব্যবসায়ী এবং লেখক। এই প্রপিতামহ এবং তাঁর সময়কার গল্পই বিভিন্ন জ্যেঠা-খুড়ো এবং পিসি-জ্যেঠি-খুড়ীর কাছ থেকে বিভিন্নভাবে শুনতে শুনতে বছরের পর বছর কেটে গেছে ফকনারের এবং এর যে প্রভাব, তা থেকে উনি কখনোই নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

এর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন মনোভাবযুক্ত নরনারী ফকনারের প্রতিটি গল্প, উপন্যাসে দেখা দিতে লাগলো। কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, একান্ত নিজস্ব—অথচ লোকগুলিকে পরিচিত মনে হয়। একটির পর একটি উপন্যাস বেরুতে লাগলে আর প্রবীণদের মুখে এবং পত্র-পত্রিকাদিতে আলোচনা সুরু হয়ে লাগলো—তাইতো, অমুক সময়ে এই রকম একটা লোক তো অক্সফোর্ডে ছিল শুনেছি। আরো একটা কাজ করলেন ফকনার—একটা নতুন দেশ সৃষ্টি করলেন—রীতিমতো একটা কল্পনার রাজ্য। তাঁর কাহিনীগুলিতে অক্সফোর্ড সহরের কথাই বলা হচ্ছে, কিন্তু অন্য নামে—সেখানে সহরটির নাম জেফারসন এবং গোটা অঞ্চলটির নাম হলো ইয়কনাপাটাওফা। এ নাম দুটো মার্কিণ দেশের ভৌগোলিক মানচিত্রে নেই (শেষোক্ত নামের অবশ্য একটি নদী আছে), কিন্তু মার্কিণ দেশের সাহিত্যের মানচিত্রে এ দু'টি অক্ষয় নাম।

ইয়কনাপাটাওফা-র যে কিংবদন্তীর রাজ্য সৃষ্টি করেছেন ফকনার, তার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল সারটোরিস-এ। সারটোরিস পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে এ উপন্যাসে। এক সময়ে পরিবারটির তেজারতি ব্যবসা ছিল এবং প্রচুর জমির মালিক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর সুরুতে দেখা যায় সারটোরিসদের সে প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিত্ত-সম্পত্তি কিছুই নেই। কালের স্রোতে সবই ভেসে গেছে, পরিবর্তনশীল সমাজজীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ওঁরা—মানসিক স্থৈর্য এবং অসাধারণ সহনশীলতা এ উপন্যাসের চরিত্রগুলির সর্বপ্রধান গুণ।

দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি-তে দেখা যায় আর একটি পরিবার—কম্পশন পরিবারের ক্রমাবনতির কথা। অনেক পাঠক এবং সমালোচকের মতে এইখানাই ফকনারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনটি চরিত্রের বিগত দিনের স্মৃতিমন্থনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মূল কাহিনী পরিবেশন করা হয়েছে। এ উপন্যাসে একটি মূল তত্ত্বচিন্তা আছে ফরাসী দার্শনিক এবং সাহিত্যিক জাঁ-পল সার্ত্র যেদিকে সর্বপ্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন একটি প্রবন্ধ লিখে। বিষয়টা হলো 'কাল' অর্থাৎ সময় সম্পর্কে। ফকনার বলছেন: বিশেষ কোনও

কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে—এটা মানুষের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। মানুষ মাত্রেই নানা বিপদ, বাধা-বিপত্তির শিকার হয়ে পড়ে তার দৈনন্দিন জীবন ধারণের জন্যে। যখন সমস্ত বাধা সে অতিক্রমনে সক্ষম হলো বলে মনে করতে পারে তখন অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয় যে তার সত্তার সবচাইতে বড়ো বাধা—কালের গণ্ডী তাকে আরো কঠিন বাঁধনে জড়িয়ে ফেলেছে—কালের অনুশাসন মেনে চলতে চলতে সে 'বিচ্ছিন্ন কালের' দাস হয়ে পড়েছে—'মহাকালের' হাতছানি সে দূর থেকে দেখেই তৃপ্ত থাকতে বাধ্য।

"এ্যাজ আই লে ডাইং"-এ দক্ষিণাঞ্চলবাসীদের অঞ্চলপ্রীতি, মমতা ও আকর্ষণ দেখা যায় চরমে পৌঁছেছে। আনসে ব্রানডেন তাঁর মুমূর্ষু স্ত্রীকে কথা দিলেন যে মৃত্যুর পর তাঁকে জেফারসনে এনে কবর দেওয়া হবে। বর্ষীয়সী নারী ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও স্বদেশের মাটিতে শেষ আশ্রয় লাভ করা যাবে এই আশ্বাস পেয়ে শান্তিতে চোখ বুজলেন। এখান থেকে জেফারসন সহরের দূরত্ব অনেকটা, পথের বাধা-বিপত্তিও অনেক। কিন্তু সমস্ত কিছু কঠিন পরিশ্রম এবং দুঃসাহসের সঙ্গে তাঁর ছেলেরা অতিক্রম করে, তাঁর শবটি জেফারসনে এনে সমাধিস্থ করলো—এই হলো মোটামুটিভাবে গল্পাংশ। আধুনিক যুগের মানুষদের কাছে যা মনে হতে পারে একটা অর্থহীন বা যুক্তিহীন খেয়াল বা ভাবাবেগ—ঠিক সেই জিনিষটির জন্তেই ঐ নারীর পরিবারের লোকজন কী কষ্ট স্বীকারটাই না করলেন! "সেণ্টিমেণ্ট" কথাটা আজকাল নেহাৎ হালকাভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফকনার যে সময়কার কাহিনী লিপিবদ্ধ করছেন এ উপন্যাসে সে সময় ব্যক্তির "সেণ্টিমেণ্ট"-ই ছিল তাঁর পক্ষে সব চাইতে প্রয়োজনীয় কথা—বলতে গেলে তাঁর সমস্ত সত্তাই এই সেণ্টিমেণ্ট কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো—এবং পরস্পর মানুষ এই সেণ্টিমেণ্টকে শ্রদ্ধা করে চলতো।

লাইট ইন্ আগষ্ট-এ দেখা যায় একটি গর্ভবতী কুমারী মেয়ে লেনা তার প্রণয়ী লুকাসের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হচ্ছে।

এ্যাবসালম্,—এ্যাবসালম্-এ একটি দরিদ্র শ্বেতকায় ব্যক্তির লুপ্ত গৌরব ও অবস্থা ফিরিয়ে আনবার নিষ্ফল প্রয়াসের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দি হ্যামলেট এবং দি টাউন—একই সূত্রে গাঁথা দু'খানা উপন্যাস। দক্ষিণাঞ্চলবাসীদের জায়গাজমি গ্রাস করবার দুর্দমনীয় স্পৃহা হচ্ছে এ কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

অঞ্চল-বিশেষকে কেন্দ্র করে ফকনার তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস এবং গল্প লিখেছেন সত্যি, কিন্তু প্রতিটি চরিত্রই সঠিক গুণসম্পন্ন করবার চেষ্টা করেছেন এবং যোগ্য সমালোচকদের মতে এ দিক দিয়ে ওঁর সাফল্য অতুলনীয়। কাজেই বলতে হয়—আঞ্চলিক কাহিনী বলে ফকনারের উপন্যাসের যে পরিচিতি সেইটেই শেষ কথা নয়। ওঁর যে কোনো প্রধান উপন্যাস পড়লেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। তবে একটা কথা—মার্কিণ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সেণ্টিমেণ্ট সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা এবং শ্রদ্ধা থাকা চাই।

মৃত্যুর পূর্বে ফকনার আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পঁয়ত্রিশ একরের বিরাট খামার কিনেছেন উনি এবং এই খামারের চাষবাস উনি নিজেই দেখাশুনো করতেন। ফকনার সাধারণত সকালের দিকে লিখতেন এবং বিকেলের দিকে খামারের কাজ দেখতেন আর না হয় মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়তেন বা বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোতেন।

১৯৩৯ সালে শ্রেষ্ঠ গল্প রচয়িতা হিসেবে সে বছরের জন্তেও হেনরী মেমোরিয়াল পুরস্কার লাভ করেন ফকনার। ১৯৫৪ সালে 'এ ফেবল' প্রকাশিত হবার পর শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার—পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে লাভ করেন নোবেল পুরস্কার। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত হলিউডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চিত্রনাট্যকার হিসেবে।

নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করবার সময় ফকনার যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, অল্প কথায় ফকনারের সাহিত্যসেবার আদর্শ তার মধ্যে পাওয়া যায়—···সমস্ত কিছু অতিক্রম করে মানুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে টিকে থাকবে, কারণ মানুষের মন আছে, আত্মা আছে, হৃদয় আছে, সে আত্মত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নয়। কবি এবং সাহিত্যিকদের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত সম্পর্কে লেখা—যাতে এ যুগের মানুষ অতীত যুগের মানুষদের মতো কষ্ট স্বীকার করতে পারে, তার হৃদয় প্রশস্ত হয়, তার বুকে প্রাচীনদের মতো সাহস ও শক্তি ফিরে আসে, যাতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সে হাসিমুখে আত্মত্যাগে এগিয়ে আসে এবং যে-কোনো অবস্থায়ই হ'ক না কেন নিজের মর্যাদা এবং গৌরবময় অতীতের কথা যাতে মনে রাখতে পারে—তার জন্তে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রেরণা জাগানো······।

# অপাংক্তেয়

### অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

ওরা বলে আমি নীচ পাইলক, স্পর্শ-অধীর
ওদের কামনা পা' দিয়ে মাড়িয়ে যাই।
বৃথা ফিরে যায় দৃষ্টির কালো মায়াবী ভাষার তীর—
আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ, আমি আনন্দ কুড়োতে ভরাই।

নীরস কালের পায়ে বাঁধা শুধু ছটফট করে দিনটা।
ওরা বলে আমি আগাছারও ছোট, দারুণ স্বার্থপর;
আমি উন্মাদ, পুড়িয়ে দিয়েছি সব আশা, সুখ চিন্তা—
স্বেচ্ছায় গড়া আমার জীবনে পার্থক্যের নির্জন বালুচর।

ওরা তবু আসে নিত্য নূতন মন-ভোলানিয়া রূপে,
চামড়া সাজিয়ে ভেলকি দেখায়—আমি দেখি হাড় মজ্জা।
ওদের ইচ্ছা প্রণয় ব্যূহের গভীর অন্ধকূপে
বাসর সাজাই: আমি রচি শেষ শয্যা।

# মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিকে গুরুদেব ও ক্ষিতিবাবুর মধ্যে আলাপ-আলোচনায় কি স্থির হ'ল জানা নেই, কিন্তু কণাদি ক্ষিতিবাবুর মারফত সংবাদ পেলেন যে, গুরুদেব শিশু-বিভাগের জন্য তাঁকে চান।

শুনলাম, সে সময় শিশু-বিভাগে কোন মহিলা ছিলেন না। শুধু দাস-দাসী ও শিক্ষক, তাদের কচি মনের মায়ের অভাবটি পূর্ণ করতে অপারগ, সে-কথা গুরুদেব বোধহয় মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন। সে সময় তিনি নাকি বলতেন—'আমরা বাচ্চাদের শিক্ষা দিতে পারি, কিন্তু তাদের মাতৃস্নেহের ক্ষুধা মেটাবো কি করে? উপযুক্ত মানুষের অভাবে এ বিভাগটি বোধহয় তুলেই দিতে হবে। তাছাড়া আরও অসুবিধা, সম্পূর্ণ মাইনে-করা লোক দিয়ে ত এ কাজ হবার নয়!'

এমনি দিনে কণাদিকে দেখে তাঁকেই বোধহয় এ-কাজের উপযুক্ত মনে করে ক্ষিতিবাবুর মারফত ঘন ঘন তাগিদ পাঠাতে লাগলেন, শীঘ্র এসে এ-কাজের ভার নেবার জন্য।

কণাদি সেকালের গৃহস্থ-বধূ, এভাবে কোন কাজ করা দূরে থাক, কখনও নিজের গণ্ডীর বাহিরে যান নাই; অনেক ইতস্তত: করে এ দায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা নিজের আছে কিনা সে-বিষয়ে বিষম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে অবশেষে গুরুদেবের আহ্বানে সাড়া দিলেন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। গুরুদেব দেহত্যাগ করার মাত্র ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে এসে তাঁর শিশু-বিভাগের ভার নিলেন ও সেই থেকে সুষ্ঠুভাবে এ কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের অসুস্থতা ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা সত্ত্বেও। বয়স যদিও এখনও সত্তর পূর্ণ হয়নি, তথাপি শরীর সে তুলনায় অনেক জীর্ণ।

কর্ম্ম-ভার গ্রহণ করেও তাঁর মনের দ্বন্দ্ব ঘোচে না, একদিন গুরুদেবকে গিয়ে বললেন, আপনার যে কাজ মাথায় নিলাম, তার কি উপযুক্ত আমি? কোন বোর্ডিং-হষ্টেল চালাবার মত বিদ্যা কি অভিজ্ঞতা ত' আমার নেই, আমি কি পারবো এ কাজ চালাতে? গুরুদেব বললেন, কে বলছে তোমাকে বোর্ডিং-হষ্টেল চালাতে? আমি ত সে রকম গতানুগতিক বোর্ডিং-হষ্টেল তৈরী করিনি; তুমি শিশুদের মধ্যে থেকে একটুখানি বাড়ীর আবহাওয়া সৃষ্টি কর, শিশুরা যেন মনে করে মার বাড়ী থেকে, মাসীমার বাড়ীতে এসেছি,—মনে যেন তাদের কোন দুঃখ না থাকে।

বুধবার এখানে ছুটির দিন, সেদিন কণাদি বাচ্চাদের নিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করতে যেতেন উত্তরায়ণে। গুরুদেব শিশুদের দেখে খুসী হতেন ও নিজের হাতে তাদের প্রত্যেককে লজেন্স, টফি দিতেন। কণাদিকেও শিশুদের সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন। তার মধ্যে কণাদির এখনও যা মনে আছে, তা বর্ষা সম্বন্ধে। গুরুদেব বলতেন, 'বাচ্চাদের কিন্তু মনের আনন্দে বৃষ্টির জলে ভিজতে দিও, আর পার ত তুমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিও। বর্ষার জলে অসুখ করেনা, —শরীর ভাল হয়!'

আরও বলতেন,—আমার ছেলেদের সুন্দর সুন্দর গল্প বোলো, কিন্তু দেখো, তারা যেন কোন প্রাদেশিক উচ্চারণ না শেখে। তাদের স্বাভাবিক খেলাধূলায় বাধা দিও না, তবে দৃষ্টি রেখো যেন হাত পা না ভাঙ্গে।

কণাদি এখানে প্রথম আসার পর গুরুদেব তাঁকে সাধারণ রন্ধন-শালায় খেতে বলেছিলেন, কিন্তু স্বপাক ভিন্ন অন্য কিছু আহার না করায় কণাদি নিজের ঘরটিতেই অনেকদিন রেঁধে খেয়েছেন। বহু বৎসর পরে তাঁর আঙ্গিনায় একটি রান্নাঘর-জাতীয় ছোট ঘর নির্ম্মিত হল।

গুরুদেব এবারে কণাদিকে আরও একটি কাজের ভার দিলেন, নব-নির্ম্মিত ঘরটিতে 'ডোমেষ্টিক সায়েন্সে'র মেয়েদের হাতে-কলমে রন্ধন-শিক্ষা দিতে হবে প্রতি বুধবার ও ছুটির দিনে। এ-কাজের ভারও কণাদি সানন্দে গ্রহণ করলেন;—মেয়েরা মহা আনন্দে রান্না করে দু'একটি অতিথিভোজন করাতো ও গুরুদেবকেও কিছু কিছু রন্ধন-বিদ্যার পরিচয় দিয়ে আসতো। এই প্রসঙ্গে গুরুদেব কণাদিকে বলতেন, শিক্ষার্থিনীদের চপ, কাটলেট, মাংস প্রভৃতি ব্যয়বহুল রান্নার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ঘরের সাধারণ রান্নাগুলোও ভালভাবে শেখাবে।

একবার গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে কণাদি গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেলেন, একাকিনী। গুরুদেব তখন ছিলেন 'শ্যামলি'তে; এক কোণে বসে তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছেন দেখে, কণাদি স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন, তাঁর সেই রোগ-জীর্ণ-বার্দ্ধক্যেও হস্তের দ্রুত-সঞ্চালনের দিকে।

ক্ষণ-পরেই গুরুদেব তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে নিকটে আহ্বান করায়, কণাদি প্রণাম করে বললেন, 'সামনের ছুটিতে কলকাতা যাচ্ছি, তাই প্রণাম করতে এলাম।' গুরুদেব আশীর্ব্বাদী হস্ত মস্তকে রেখে বললেন, 'সাময়িকভাবে যাচ্ছ, যাও, কিন্তু এ স্থান যেন কখনোই ত্যাগ কোরো না।' বলতে বলতে আবেগে কণাদির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো, বললেন—'গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ মস্তকে বর্ষিত হয়েছে, নইলে 'গ্লকোমা'-লাঞ্ছিত দুটো চোখ চারবার অপারেশনের পর দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে, আবার কেমন করে অন্যের সাহায্য বিনা চলাফেরা, কাজ-কর্ম্ম সবই করতে পারছি?'

এরপর থেকেই গুরুদেব ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু দিনে একবার তাঁর আশ্রম পরিদর্শন না করলে ভাল লাগে না, তাই চক্রযুক্ত চেয়ারে বসিয়ে একটু একটু মন্দির অথবা আম্রকুঞ্জ পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে আনা হত। শিশু-বিভাগ একটু দূরে, সে পর্য্যন্ত আর নিয়ে যাওয়া হত না। সেই চক্র-যুক্ত চেয়ারে বসে তিনি আম্রকুঞ্জে শিশুদের সাহিত্য-বাসরে যোগ দিতেন, তাঁকে ঘন বৃক্ষের ছায়ায় শিশু-পরিবৃত হয়ে এমন মানাতো যে—আম্রকুঞ্জ সেদিন যেন সজীব হয়ে উঠত। শিশুদের প্রতি তাঁর যে কী গভীর মমতা ছিল, তা তাঁর সামান্য দু'একটি কথায় পরিষ্কার পরিস্ফুট হয়। তিনি বলতেন, শেষ জীবনটা আমি উত্তরায়ণে না থেকে দেহলিতে থাকব। ওখান থেকে সব সময়ই আমার চপল শিশুদের দেখা যাবে। তাঁর আর একটি অন্তিম ইচ্ছা যা আর পালন করার সময় হয়ে ওঠে নি, তা তিনি চলৎশক্তি যাবার পর প্রায়ই বলতেন,—আমাকে একটা বলদটানা 'পুসুপুসু' জাতীয় গাড়ী করে দাও, তাতে করে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবো।'

এর কিছুদিন পরেই মহামানবের সুদীর্ঘ মহৎ জীবনের উপরে হল চির-যবনিকা-পাত! দীপ্ত সূর্য্য অকস্মাৎ লুক্কায়িত হলেন, চিরদিনের মত পশ্চিম-দিগন্তে!

## ( ১৭ )

শান্তিনিকেতনের প্রাচীন ছাত্র, গুরুদেবের প্রিয়পাত্র, স্বনাম-ধন্য চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয়ের পত্নী, শ্রদ্ধেয়া বীণা দে। তিনি সুহাসিনী, সুভাষিণী, সুদর্শনা—যেন স্রষ্টার তৈরী একটি অনবদ্য নারী-মূর্ত্তি! স্বভাবটিও চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ কোমল, সুন্দর। *চিত্রশিল্পীর বাড়ীর নাম 'চিত্রলেখা',—একদিন সেখানে যাই, বীণাদির নিকট কিছু শোনার আশায়।*

*সৌজন্য-পূর্ণ-ভাবে বললেন,—তিনি আশৈশব রবীন্দ্র-কাব্য-অনুরাগিনী ও তাঁর দর্শনাকাঙ্খিনী। মুকুল বাবুর সঙ্গে পরিণীতা হবার পর, গুরুদেবকে প্রথম দর্শন করেন একটি জাপানী-জন-সভায়।* ১৯৩২ সালে কলকাতার 'নিপ্পন'-ক্লাবে এক বিরাট সভায় জাপানের এক সুবিপুল ঘণ্টা উপহার দেওয়া হয়,—বৌদ্ধ কৃষ্টি-কেন্দ্র সারনাথে। কবিগুরু ছিলেন সে সভার প্রধান অতিথি।

মুকুল বাবু তখন কলকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ,—সস্ত্রীক আমন্ত্রিত হয়ে, সে সভায় গুরুদেবকে দেখে, নব-পরিণীতা বধূকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সান্নিধ্যে যান। বীণা-দি পাদ-স্পর্শ করে প্রণাম করার পর, নববধূর নাম বীণা শুনে গুরুদেব আনন্দিত হয়ে, মধুর রহস্যে বললেন,—'সে কিরে,—তুই বীণা দিয়ে কি করবি? বীণা ত আমার এলাকায় পড়ে। তারপর,—'বস আমার পাশটিতে', বলে, সযত্নে পাশে বসিয়ে বললেন,—তোমাকে যে আমার অতি পরিচিত মনে হচ্ছে,—আবার দেখা কোরো।

এর পরের দর্শন, শান্তিনিকেতনে,—গুরুদেবের বাসস্থান উত্তরায়ণে'। এবারেও, গুরুদেব সাদরে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রাঁধতে জান?' গৃহস্থ-কন্যা, রন্ধনপটু, বীণাদি সলজ্জ ভাবে মুখে 'হ্যাঁ' বলার সঙ্গে মনে মনে স্থির করলেন,—'গুরুদেব যখন রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁকে একদিন রেঁধে খাওয়াতে হবে।'

গুরুদেব কি কি জিনিষ খেতে ভালবাসেন, স্বামীর নিকট তার সন্ধান নিয়ে জানলেন,—তপসে মাছ, চন্দ্রপুলি, ও 'আইসক্রিম' তাঁর অতি প্রিয়! এর অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে—তথা বোলপুরে দুষ্প্রাপ্য; এমন কি তখন এখানে বরফ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। বীণাদির তাঁকে এই জিনিষ কটি খাওয়াবার এত আগ্রহ হয়েছিল যে—কলকাতা থেকে 'আইসক্রিমের' যন্ত্র, বরফ, তপসেমাছ, সংগ্রহ করে—নিজের হাতে সযত্নে রেঁধে, উত্তরায়ণে নিয়ে গেলেন—স্বামীসহ।

তখন কোণার্কবাসী গুরুদেব সব দেখে খুব খুসী, কিন্তু পরিমাণ সম্বন্ধে বললেন,—তোমরা আমাকে কি ভেবেছ? আমি কি এত খেতে পারি? তোমরাও আমার সঙ্গে বোসো।' কিন্তু কৃতী ছাত্রী গুরুদেবের প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে বললেন,—এটুকু ত আপনার জন্যই আনা—আমাদের অংশ বাড়ীতে প্রচুর আছে।' তখন গুরুদেব,—'অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে, তোমরা বাড়ী গিয়ে খাও, আমার এখানে বৌমা আছেন,'—বলে তাঁদের পিতার মত স্নেহে, বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। বীণাদির মনে কিন্তু, সামনে বসে খাওয়াতে না পারার একটু আফশোষ রয়ে গেল।

কিছুকাল পর,—চার বৎসরের শিশু কন্যাটি নিয়ে, বীণাদি মাঝে মাঝে যেতেন উত্তরায়ণে—গুরুদেবকে প্রণাম করতে। শিশুটী কিছুতেই মাথা নীচু না করায়, তিনি হেসে বলতেন,—'আহা, থাক না,—কেন ওকে বিরক্ত কর' মাথাটা উঁচু করেই থাকতে দাও পৃথিবীতে, যতদিন পারে!' তারপর দুহাত ভরে লজেন্স বিস্কুট দিয়ে আদর করতেন। বীণাদি বলতেন,—'এই মেয়ে আপনার আশ্রমে পড়াশুনা করে গড়ে উঠবে।' তখনকার না ভেবেচিন্তে, এই 'দশ কথার এক-কথাই', ভবিষ্যতে হয়ে উঠল অক্ষরে অক্ষরে সত্য। *সে সময় তাঁরা কলকাতাবাসী হলেও, কিছুকালের মধ্যে স্থায়িভাবে এসে শান্তিনিকেতনে বাস করেন,—ও সুদর্শন', সুশীলা কন্যাটি এখানকার স্কুলের নিম্নশ্রেণী থেকে, কলেজ বিভাগের শেষ এম-এ পরীক্ষায় সসম্মানে কৃতকার্য্য হয়ে, এখনও পর্য্যন্ত 'ডক্টরেটের' জন্য বিশ্ব-ভারতীর বৃত্তিধারিণী কৃতী ছাত্রী!*

একদিন বীণাদি গিয়েছিলেন তাঁর দর্শনে, যোড়াসাঁকোয়। সেদিন ঘরখানা তখনও নির্জন। সুযোগ পেয়ে বীণাদি একটি প্রশ্ন করলেন,—'যা চাওয়া যায়, তা কি পাওয়া যায়?'

গুরুদেব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললেন,—'তা যায়, আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক হলে পাওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়,—খানিকটা। বীণাদি আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—'চাওয়াটা কি দোষের?' তিনি বললেন,—'মোটেই নয়।'

বীণাদি,—'তাহলে কেন গীতায় লিখেছে, কিছু চাইতে নেই, মনকে রাখতে হবে নিষ্কাম?'

গুরুদেব—'চাইতে হবে,—কিন্তু সদ্বস্তু,—না চাইলে কিছুই পাওয়া যায় না।'

বীণাদির অনেক দিনের মানসিক দ্বন্দ্ব নিরসন হল,—মনের পেয়ালা সুধা-বিন্দুতে ভরে গেল!

## ( ১৮ )

শ্রদ্ধেয়া ননীবালা রায়, শান্তিনিকেতনের প্রাচীনাদের অন্যতমা। তিনি বাল-বিধবা,—বহুকাল পূর্ব্বে একটি শিশুকন্যাসহ এখানে আসেন, বড়মার সঙ্গে পরিচিতি সূত্রে। স্নেহ-প্রবণা বড়মা তাঁকে

সমর্পণ করেন গুরুদেবের হাতে, তিনিও সানন্দে তাঁকে যথাযোগ্য কাজে নিযুক্ত করেন।

ননীবালাদির মনে হয়, বিভিন্ন মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোঝার একটা অসাধারণ ক্ষমতা গুরুদেবের ছিল। তিনি যাঁর যেখানে স্থান, সেখানেই তাঁকে আসন দিতেন।

ননীবালাদি যখন এখানে এলেন, বয়স তখন ত্রিশের নীচে, বীতস্পৃহ,—পৃথিবীর একমাত্র বন্ধন,—কিশোরী কন্যা। এখানকার বিদ্যালয়ে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে কিছুকালের মধ্যেই ননীবালাদিকে নিযুক্ত করলেন, সুরুল গ্রামে তাঁর নব-পরিকল্পিত সমাজ-কল্যাণ কর্ম্মে। এ কাজে অগ্রণী ছিলেন উদারচেতা শিক্ষক ৺কালীমোহন ঘোষ মহাশয়।

গুরুদেব প্রাণ-কেন্দ্র,—তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশী-বিদেশী অনেকেই এগিয়ে আসতে লাগলেন, এই পরোপকার যজ্ঞে তাঁকে নানা প্রকারে সাহায্য প্রদানের পুত-সঙ্কল্পে! সেদিনের সেই মহাপ্রাণদের শ্রম-দান, অর্থ-দান, সহানুভূতি-দান প্রভৃতিতে পরিপুষ্ট হয়ে এসে নব-অঙ্কুরটি আজ শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হয়ে শ্রীনিকেতন পল্লী শিক্ষণ-কেন্দ্রে পরিণত!

ননীবালাদি প্রমুখ আরও দু-চারটি পরোপকারিণী মহিলা নিয়ে গড়ে উঠল নারী-উন্নতিমূলক গ্রাম-সেবাকেন্দ্র। গুরুদেবের উপদেশ মত তাঁরা আশেপাশের গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার জন্য শ্রীনিকেতনে স্থাপন করলেন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের কাজ প্রাতঃকালে সীমাবদ্ধ, মধ্যাহ্নে বয়স্কাদের সাধন-শিক্ষা ও রামায়ণ মহাভারত পাঠ প্রভৃতি, গ্রাম্য কুলবালাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিমূলক কাজ; এর সঙ্গে যুক্ত হত মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সব কাজ।

সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এই পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা মহিলা কটির আর শ্বাস নেবার ফাঁকও থাকত না। গোড়ার দিকে তাঁদের আবার অনেক হাসি-টিট্‌কারীও শুনতে হত, যাঁদের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন, তাঁদেরই নিকট! মনে দুঃখ হলেও দমে পড়তেন না, শুধু গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে ও কালীমোহন বাবুর আশ্বাসে। কালীমোহন বাবু বলতেন, তোমরা কাজ চালিয়ে যাও, থেমো না, দেখো পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের নিস্বার্থ সেবার মর্ম্ম বুঝে, ওরাই আবার তোমাদের গলায় মালা দেবে। এ বাক্যও অল্প সময়ের মধ্যেই সফল হয়েছিল। মাঝে মাঝে ননীবালাদি গুরুদেব সকাশে এলে তিনি অতি আগ্রহে গ্রামের সংগঠনমূলক কাজের খবর নিতেন। গ্রাম-উন্নয়ন কার্য্যে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম, এজন্য বহু চিন্তা করতেন, অনেক সুপরিকল্পিত নির্দ্দেশ দিতেন। গুরুদেব ননীবালাদিকে বলতেন, 'তোমরা প্রতি গ্রামে যদি একটি মেয়েকেও যথার্থ শিক্ষিতা করে তুলতে পার, তবে তাকে দিয়েই আবার সেই গ্রামে অনেক কাজ হবে। বহুজনকে ভাসা-ভাসা শেখানোর চেয়ে, উপযুক্ত একজনকে ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া অনেক বাঞ্ছনীয়।'

সেই সময়ে মিস্ গ্রীণ নামে এক মার্কিণ মহিলা স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে এই গ্রাম-সেবাকর্ম্মে সাহায্য করছিলেন। তিনি ছিলেন ধাত্রী-বিদ্যা-পারদর্শিনী; কাজেই ঐ দিকের কাজগুলো কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। ক্রমে তাঁর দেশে ফিরে যাবার সময় এলো, কিন্তু তাঁর স্থান পূরণ করবে কে? গুরুদেব চিন্তিত হলেন; অনেক চেষ্টায় একটি সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করে, ননীবালাদিকে কলকাতার 'ইডেন' হাসপাতালে রেখে, মাতৃমঙ্গল কার্য্যে সুশিক্ষিতা করিয়ে আনেন। তারপর ননীবালাদি বহুদিন—প্রায় বারো বৎসর ঐ কাজ সুনামের সঙ্গে সম্পন্ন করে, এখন সেবা-পল্লীর নিজ বাটীতে নাতি, নাতনী, কন্যা, জামাতা পরিবৃতা হয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছেন। শান্তিনিকেতনে আসার প্রাক্কালে যে কন্যাটি ছিল বিজ্ঞা শিশু,—সে আজ মানসিক ঐশ্বর্য্যশালিনী, পুত্র-কন্যার জননী, বিশ্ব-ভারতীর স্নাতকোত্তীর্ণা, বোলপুর স্কুলে শিক্ষাদাত্রী পরিপূর্ণা নারী।

ননীবালাদির নিকট আরও পাই, গুরুদেবের শোক-সন্তপ্ত চিত্তের একটি করুণ চিত্র। গুরুদেবের প্রথমা কন্যা অপূর্ব্ব সুন্দরী, পুষ্প-পেলবা, 'বেলা' অসময়ে কীট-দষ্টা হয়ে শয্যা-শায়িনী। রোজ প্রাতঃকালে গুরুদেব যোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে একটু দূরে জামাতৃ-সদনে যান মেয়েকে দেখতে, ও সেখানে প্রিয়তমা কন্যার রোগ-শয্যার পাশে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসেন; মেয়ের অবস্থা ক্রমশঃই ডাক্তারদের আয়ত্তের বাইরে, দ্রুত অবনতির পথে,—এমন দিনে এক প্রভাতে গিয়ে শোনেন,—সব শেষ, প্রাণাধিকা বেলার পৃথিবীর খেলা চিরদিনের মত সমাপ্ত! শুনেই চলে এলেন নিজ বাড়ীতে।

মুখে বাক্য নেই, আঁখিতে নেই অশ্রু, সোজা ঘরে প্রবেশ করে বসলেন যোগাসনে।

সেই ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শন করে, বাড়ীর আত্মজনেরা নিকটে যাওয়া দূরে থাক, সে ঘরটিতে প্রবিষ্ট হতেও ভীত, সন্ত্রস্ত। ক্রমে বেলা বাড়ে, আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু তিনি পাথরের মূর্ত্তির মত একাসনে বসে।

অনেকক্ষণ এভাবে বসে থাকার পর, উঠে এলেন সহজ মানুষ হয়ে। বাহ্যিক শোকের প্রকাশ তাঁর কখনোই দেখা যেতো না। জীবনে তাঁকে অনেক প্রিয়-বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে, সব দুঃখই প্রকাশ পেয়েছে সঙ্গীতের সুধা-ধারায় ভগবানের প্রতি আত্ম-নিবেদনের মধ্য দিয়ে, তাঁর সেই শোকাশ্রুতেই আজকের মানুষ করছে অমৃত-স্নান।

## ( ১৯ )

শান্তিনিকেতনের প্রাচীনা গৃহিণীদের অন্যতমা মনোরমাদি। বয়সের তুলনায় অনেক শক্ত, সহজ, সরল, প্রাচীন মানুষটি,—উদারচেতা, মাতৃ-ভূমির একনিষ্ঠ ভক্ত, পরোপকারী শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

সহৃদয়া মাতৃসমা মহিলা বললেন,—তিনি তাঁর প্রথম পুত্র সুগায়ক,—বর্ত্তমানে সঙ্গীত-ভবনের রবীন্দ্র-সঙ্গীত-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের ছয়মাস বয়সে এখানে আসেন,—সে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা।

৺কালীমোহন বাবু বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের অগ্নিময় যুগের বীর যোদ্ধা। দেশ-মাতৃকার আহ্বানে, অশেষ দুঃখ বরণ করার সম্ভাবনা মস্তকে নিয়ে,—তিনি কলেজী-শিক্ষা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন, জননীর সেবার দীন ভৃত্যরূপে!

গ্রামে গ্রামে সুবক্তা কালীমোহন বাবু স্বাদেশিকতায় ঘুমন্ত দেশবাসীকে জাগ্রত করার সাধনায় নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে, কিছুকালের মধ্যেই স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েন। সেই সূত্রে গিরিডিতে

গিয়ে এক ডাক্তারের মাধ্যমে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয়ের সূচনা। তারপর এই ভগ্ন-স্বাস্থ্য, স্বদেশ-ভক্ত খাঁটি মানুষটিকে গুরুদেব নিয়ে স্থান দেন তাঁর শান্তিনিকেতনে।

তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথম অধ্যায়, গুরুদেব তাঁকে নিযুক্ত করেন শিশু-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরূপে। তিনিও সানন্দে শিশুদের পুত্রের অধিক যত্নে প্রতিপালন করতে ও শিক্ষা দিতে লাগলেন।

সুদূর পূর্ব্ববঙ্গ বাসিনী কিশোরী বধূ মনোরমাদি শান্তিনিকেতনে আসেন কালীমোহন বাবু আসার ২।৩ বৎসর পরে। যেদিন প্রথম এখানে এলেন, তার পরদিনই স্বামী বললেন, শিশু-সন্তানটি নিয়ে যেতে হবে গুরুদেব দর্শনে। পল্লীবধূর মহা মুস্কিল,—একে মাথায় একগলা ঘোমটা, তার উপর বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ! ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো, হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগল। কালীমোহন বাবু বললেন;—ঘোমটা কমাতে হবে, এখানে ওটা অচল, যেতেই হবে বিকেলে!

মনোরমা দি অপরাহ্নে হৃষ্টপুষ্ট ছ'মাসের শিশু শান্তিদেবকে কোলে নিয়ে, দুর্গানাম স্মরণ করে চললেন স্বামীর পিছু পিছু।

গুরুদেব তখন থাকেন মন্দির-সংলগ্ন শান্তিনিকেতন ভবনে। কালীমোহন বাবু সস্ত্রীক প্রণামাদি করে বসার পর, গুরুদেব শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মোটা-সোটা গোলগাল, কালো কুচকুচে ছেলেটি, মাথায় কোঁকড়ানো চুলের রাশি। হাতে, গলায় সোনার গহনা, কোমরে কোমরপাটা, শিশুটির দিকে খানিক দেখে, গুরুদেব কালীমোহন বাবুকে বলে উঠলেন—বাঃ। এই তোমার ছেলে? এযে কৃষ্ণ-ঠাকুর! খুব সুন্দর।

তারপর মনোরমাদির লজ্জা সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। গুরুদেবের গান, আবৃত্তি, পাঠে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে,—রান্না, খাওয়া তুচ্ছ করে ছুটে যেতেন, সঙ্গীত-সুধা পান করতে। তখন দিনু বাবু গান শেখান; গুরুদেবের বর্ষার গানগুলো তাঁর মুখে অপূর্ব্ব হয়ে ফুটে উঠত। বর্ষার দিনে তিনি একবার গান সুরু করলে, সেদিনের শান্তিনিকেতনের সকলে ছুটে আসত, সম্মোহিত হয়ে, নিজের কাজ ফেলে! দিনু বাবুও অসাধারণ গায়ক, একবার আরম্ভ করলে অক্লেশে গেয়ে যেতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

নাটকাদি মঞ্চস্থ করার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই চলত তার প্রস্তুতি; সেখানে বেশী বাহিরের জনসমাগমের নিয়ম ছিল না, কিন্তু মনোরমাদিরা কয়েকজন প্রতিমাদির সাহায্যে দূর থেকে দেখার একটু সুবিধা করে, রোজই আসতেন। গুরুদেব ও দিনুবাবু দু'জনেই শেখাতেন প্রাণ ঢেলে। গুরুদেবের শিক্ষা এতই হৃদয়গ্রাহী হত যে, মনোরমাদি বললেন,—'এখনকার নাটকাদিতে আমরা আর তেমন প্রাণের স্পর্শ পাই না, সবই যেন মনে হয় প্রাণ-হীন! গুরুদেব এত সুন্দর ভাবে নিজে করে দেখাতেন যে, তাঁর নট কুশলতায় আমরা মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কথার কী ভঙ্গী! পুরুষের অংশ পুরুষের গলায়, মেয়ের অংশ মেয়ের গলায়, এ যে না শুনেছে, তাকে বোঝানো যায় না!'

সুরুলে গ্রাম-সেবার কাজ আরম্ভ করেই কালীমোহন বাবুকে সুযোগ্য মনে করে সেখানে পাঠালেন দলপতির ভূমিকায়। গ্রামে গ্রামে ঘোরা ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করায় তিনি বহুকাল পূর্ব্ব থেকেই অভ্যস্ত ছিলেন, কাজেই এই নিঃস্বার্থ পরোপকার-ব্রত খুসী মনে মাথায় তুলে নিলেন গুরুদেবের আশীর্বাদের সাথে। বহুদিন একাজ করে এখানেই হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ করেন তিনি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে।

শ্রীনিকেতনে ছয় বৎসর কাটিয়ে, সন্তান-সন্ততিসহ মনোরমাদি শান্তিনিকেতনেই থাকতেন পুত্র-কন্যার শিক্ষার সুবিধার জন্য—গুরুদেব তাঁদের এত খোঁজ রাখতেন যে, অপরাহ্নে তাঁর নিকট গেলে, পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জানতে চাইতেন এবং সেদিন দ্বিপ্রহরে মনোরমাদি কি রান্না করলেন, তা পর্য্যন্ত অনায়াসে বলে দিয়ে তাঁকে চমৎকৃত করে দিতেন।

কৃতী ছয় পুত্র ও এক কন্যার জননী মনোরমাদি গুরুদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন, 'তাঁকে আমরা মানুষ না ভেবে দেবতারই মত ভক্তি করতাম। তাঁরই দয়ায় এখানে ঠাঁই পেয়ে ধন্য হয়েছি, না হলে কোথায় ভেসে যেতাম, কে জানে! তিনি ছিলেন অত্যন্ত বড়, আমাদের ধারণার বাইরে, কিন্তু সাধারণ ছোটখাটো মানবতার দিকেও তিনি মহান্!

( ২০ )

কবিগুরুর আদরিণী পুত্র-বধূ,—সৌন্দর্য্য, সংস্কৃতি ও ঠাকুর-বাড়ীর ঐতিহ্যের প্রায় সর্ব্বশেষ ধারক, শান্তিনিকেতনের প্রতিমা-বৌঠান। সার্থকনামা তিনি, একাধারে রূপের প্রতিমা, গুণের প্রতিমা, সংস্কৃতির প্রতিমা! বাস করেন বর্ত্তমানে উত্তরায়ণের এক কোণে অবস্থিত 'কোণার্কে'।

মনে প্রশ্ন জাগল,—এই বাড়ীটির নাম, গুরুদেব 'কোণার্ক' রেখেছিলেন কেন? এক কোণে বলে, না, পুরীর নিকটে সূর্য্য-মন্দির-সমন্বিত যে কোণার্ক-তীর্থ আছে তাকে মনে করে? প্রতিমাদি বললেন, "বোধ হয় এক কোণে অবস্থিত বলেই এর 'কোণার্ক' নাম-করণ হয়েছিল।"

বাড়ীটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সম্মুখাংশ অনেকটা মন্দিরের সম্মুখভাগে যেরূপ একটি খোলা প্রকাণ্ড নাট-মন্দির থাকে সেইরূপ নাট-মন্দির বিশিষ্ট, অথচ অত্যন্ত সুসমঞ্জস। অবশ্য পাঁচটি বাড়ীর সমষ্টি উত্তরায়ণের প্রধান ও বৃহৎ বাড়ী উদয়ন, খুবই সুন্দর, কবিত্ব ও সুষমা-ব্যঞ্জক,—তবুও তদপেক্ষা অনেক ছোট কোণার্কও সৌন্দর্য্যে কম নয়। এই বাড়ীগুলি কার পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত জানতে চাওয়ায় প্রতিমাদি বললেন,—এখানকার বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের পরিকল্পনায় ও তৎসঙ্গে তাঁর স্বামী, গুরুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনেক চিন্তার ফল সংযুক্ত হয়ে এই সুন্দর পুরী গড়ে উঠেছে। চতুর্দ্দিকের নানা-প্রকার নূতন বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সুন্দর বাগানের সমষ্টি সবই রথীদা'র পরিকল্পনায় গঠিত। উত্তরায়ণের বাড়ী, বাগান এখন স্বদেশী, বিদেশী, প্রত্যেকের চক্ষেই এক সম্ভ্রমপূর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দের উদ্রেক করে।

কোণার্কের প্রধান কক্ষটিতে ঢুকেই দেয়াল-জোড়া অজন্তার ন্যায় এক বিরাট বুদ্ধের প্রাচীর-চিত্র চোখে পড়ে। এটি কার অঙ্কিত জানতে চাওয়ায় প্রতিমাদি বললেন, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নির্দ্দেশ-ক্রমে তাঁর ছাত্রগণ কর্ত্তৃক এটি অঙ্কিত। গুরুদেব যখন এই বাড়ীতে প্রথম বাস করেন, তখন উপরের আচ্ছাদন খড়ের ছিল—পরে তা পাকা করা হয়। একপাশে উন্মুক্ত আকাশতলে, নানাধরণের

উপবেশন-বেদী-সম্বলিত প্রকাণ্ড চত্বরটিও সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে সবেতেই একটি নূতনত্বের ছোঁয়া দর্শককে আনন্দ দেয়।

এবার আলাপিনী-মহিলা-সমিতির আদি কথা জানতে চাওয়ায় শুনি—প্রতিমাদি যখন নব-বধূ-রূপে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করেন, তার কিছুকাল পরে তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে এই সমিতির প্রথম আরম্ভ,—নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। তিনি এ কাজে প্রতিমাদিকে খুবই উৎসাহ দিতেন, কারণ তিনি চাইতেন যে, এখানকার প্রত্যেকেই আশ্রম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের উন্নতি-বিধানে কিছু করুক। প্রতিমাদিই এখানে প্রথম মেয়েদের আনন্দ-মেলার প্রবর্ত্তন করেন।

সমিতির প্রধান পরিচালিকা প্রতিমাদি, বয়োজ্যেষ্ঠা বড়মাকে (দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর) প্রথম সভানেত্রীরূপে মনোনয়ন করেন,—সে আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা। তখন আশেপাশের গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা বিস্তারের কাজই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। বহুকাল পরে বিশ্ব-ভারতী এ কাজ নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ায় ও ৺ইন্দিরাদি শেষজীবনে শান্তিনিকেতনকে স্থায়ী আবাসরূপে গ্রহণ করায় এবং বড়মার স্থানান্তরে গমনে—প্রতিমাদিই ইন্দিরাদিকে এর সভানেত্রী করেন। সেই থেকে ইন্দিরাদি আনন্দের সঙ্গে, এই ক্ষুদ্র সমিতিটির লালন-পালনের ভার নেন ও স্বীয় আবাসে এর প্রত্যেক অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত। বর্ত্তমানেও শ্রদ্ধেয়া প্রতিমাদি আলাপিনীর যুগ্ম-সভানেত্রীর একজনের আসন অলঙ্কৃতা করে আছেন। দৈহিক অসুস্থতার দরুণ এখন আর তেমন সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে না পারলেও তিনি এর পরম শুভার্থিনী।

## ( ২১ )

অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হল শান্তিনিকেতনের 'শৈল বৌঠানে'র সঙ্গে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদি ছাত্র ও তৎপরে শিক্ষক,—৺রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আজীবন সংযুক্ত,—৺সন্তোষকুমার মজুমদার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী,—'শৈল বৌঠান'। তিনি বিখ্যাত 'ইক-মিক কুকারের' আবিষ্কর্ত্তা স্বর্গীয় ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের একমাত্র কন্যা।

আজকাল বেশীর ভাগ সময় কলকাতায় থাকায় এতদিন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। তিনিই বোধ হয় শান্তিনিকেতনের প্রাচীনতমা মহিলা। বয়স ষাটের কোঠায়,—অতি অমায়িক, সদালাপী, হাসিখুসী শৈলদি নব-পরিচিতাকে সাদরে গ্রহণ করে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন; শুনলাম, তিনি প্রতিমা বৌঠানেরও পূর্ব্বে ১৯১০।১২ খৃষ্টাব্দে নববধূরূপে শান্তিনিকেতনে আসেন; তখন এখানে মহিলা বলতে প্রায় কেহই ছিলেন না,—গুরুদেব স্বয়ং বরণ করে তাঁকে পুত্রবধূরূপে ঘরে নিয়েছিলেন।

শুনি, শৈলদির বিয়ে হয় ১৩।১৪ বৎসর বয়সে। বিবাহের পক্ষকাল পরে যখন এলেন শান্তিনিকেতনে, তখন এখানে শিক্ষকদের পরিবার সহ থাকার কোন বাড়ী-ঘর নেই; তাঁদের তখন 'শয়নং যত্র তত্র, ভোজনং সমবায় রন্ধনে'র অবস্থা। মজুমদারদা তাঁকে নিয়ে গিয়ে উঠলেন সোজা শান্তিনিকেতন-ভবনের দোতলায়, গুরুদেবের তৎকালীন আবাসে। গুরুদেব দু'হাত প্রসারিত করে 'সন্তোষের বউ,—এসো, এসো' বলে যেন বধূবরণ করে তাঁকে ঘরে নিয়ে বসালেন। সে বরণে যদিও কুলো-ডালা ছিল না, কিন্তু অন্তরের মাধুর্য্যে উজ্জ্বল, সে বরণ শৈলদির মনে আজও উজ্জ্বল।

বালিকাবধূর বড়ই মন খারাপ,—কেবলি প্রিয় ছোট ভাইটির কথা মনে পড়ে, ও সদ্য পিতৃগৃহ বিচ্ছেদ-ব্যথায় চোখ ছল ছল করে। গুরুদেব যে কে, তা না জেনেই, আবোল তাবোল নানা কথায় তাঁর নিকট হৃদয়-ভার লাঘবের চেষ্টায় বধূটি ঘুরে ফিরে কেবলি ভাইয়ের কথা বলায়, গুরুদেবও যেন শিশু হয়ে,—সেই ছোট ভাইটি হয়ে, নানা গল্পে, রসালো কথায়, তাকে আনন্দ দিতে লাগলেন।

একদিন মহর্ষি-ভবনে থেকে, প্রভাতে গুরুদেব বললেন,—'চল, আজ তোমাকে একটা সুন্দর যায়গায় নিয়ে যাব।' পায়ে মল, নাকে নোলক, পেড়ে-সাড়ি পরণে, মাথায় ঘোমটা,—ছোট্ট বউটি চলল, ঝুম ঝুম করে মল বাজিয়ে,—লম্বা-চওড়া, আলখাল্লা-পরিহিত বিরাট পুরুষ, জগদ্বিখ্যাত গুরুদেবের পিছু পিছু, বড় রাস্তা দিয়ে। দুঃখের কথা, তখনও আজকের মত আলোক-চিত্রের প্রাচুর্য্য ছিল না; কেউ যদি এ চিত্র তুলে রাখত, তবে একখানা দেখবার মত ছবি হত!

বেশ খানিকটা দূরে, নীচু বাংলায় গিয়ে বললেন,—'বড়'বৌমা, দেখ তোমার জন্য কী এনেছি!'

কর্ম্মরতা বড়মা,—শ্রদ্ধেয়া হেমলতাঠাকুর বেরিয়ে আসতেই বললেন, 'আজ থেকে সন্তোষের বউকে তোমার জিম্মা করে দিলাম।'

স্নেহময়ী বড়মা ছোট বউটিকে সাদরে গ্রহণ করে, কন্যার মত যত্নে নিজের নিকট রাখেন প্রায় মাসখানেক।

দিন যায়,—দেহলি বাড়ীটিতে শৈলদিরা কিছুদিন ছিলেন। ক্রমশঃ প্রথম পুত্র জন্মাবার পর মজুমদার দা, গুরুদেবের নিকট হতে এক পত্র পেলেন: তিনি লিখেছেন,—'শুনলাম তোমার একটি পুত্র হয়েছে, অতি আনন্দের কথা। এবার তুমি গৃহস্থ,—গৃহস্থ হলেই তার একটি গৃহের প্রয়োজন; শুনেছি কিছু জমি পেয়েছ, সেই জমিতে এবার একটি গৃহ নির্ম্মাণ করে, সুখে কালাতিপাত কর।'

এর কিছু পূর্ব্বেই মজুমদার দা শান্তিনিকেতন-সংলগ্ন, 'সুপুর-জমীদারী' থেকে একশো টাকার বিনিময়ে একশো বিঘা সুন্দর সমতল জমী পেয়েছিলেন। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে তিনি এখানে বাঁধলেন একটি সুখনীড়।

আজকের পিয়ার্সন হাসপাতাল ও সেবা-পল্লী সবই ছিল মজুমদার-দার সম্পত্তির মধ্যে।

সমস্ত পাঠ্য এবং কর্ম্ম-জীবন এখানে কাটিয়ে অকালে,—প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সাধনোচিতধামে গমন করেন।

বাল্যে শিশু-ভ্রাতার বিরহে আকুল হয়ে, সেই যে গুরুদেবের নিকট অন্তর খুলে দিয়েছিলেন, গুরুদেবও বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, শিশুমনের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়েছিলেন, সেই থেকে শৈলদির তাঁর নিকট যাতায়াত, আলাপ-আলোচনা ছিল অবাধ সঙ্কোচহীন।

ঘরকন্না, সন্তান-পালন প্রভৃতি ঘরোয়া মেয়েলি ব্যাপারে গুরুদেবের আদেশ-নির্দেশগুলি ছিল যেন মা-ঠাকুমার সমপর্য্যায়ের প্রবীণা গৃহিণীর! শৈলদির সন্তানাদি হবার অনেক পর বলতেন—'তোমরা একালের মেয়েরা ছেলে মানুষ করতে জান না। আমাদের সময়ে শিশুকে তেল মেখে রৌদ্রে ফেলে রাখত; তার ফল এই আমাকেই দেখ না, এত ঝড়-ঝাপ্টা, রোগের আক্রমণ অগ্রাহ্য করে,

এত বয়সেও কেমন দিব্যি বেঁচে আছি'—বলেই সাদা ধবধবে হাত দু'খানা একটু খুলে দেখাতেন।

এক সময় বলেছিলেন, 'শৈল, তোমরা যে ক'টি মহিলা এখানে আছ, সকলে মিলে সপ্তাহে এক দিন সমবায় রন্ধন-শালায় রাঁধবে।' শৈলদিরা বহুদিন এ-নির্দেশ পালন করে চলেছিলেন।

গুরুদেব শিশু-বিভাগের বাচ্চাদের পড়ানোর ভারও এক সময়ে শৈলদির উপরে ন্যস্ত করেছিলেন এবং তিনিও তা আনন্দে গ্রহণ করেছিলেন। একবার তিনি শিশুদের ঘুড়ি উপহার দিয়েছিলেন, সে এক মজার কাণ্ড! কলকাতা থেকে এক টাকায় ১২৮ খানা ঘুড়ি কিনে সব ছেলেকে একটি করে ঘুড়ি দিলেন। সেদিনের শান্তিনিকেতনের আকাশ রংবেরং-এর ঘুড়িতে রঙ্গিন হয়ে উঠল। এতে যত খুসী ছেলেরা, ততোধিক খুসী গুরুদেব।

গুরুদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে, বহু পাশ্চাত্য দেশবাসী জ্ঞানী, গুণী, মহাপ্রাণ, শান্তিনিকেতনে বসবাস করে গেছেন। শৈলদি আচার-পরায়ণা প্রাচীনা হওয়া সত্বেও তাঁদের সঙ্গে অতি সহজে মেলামেশা করে, তাঁদের চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এখনও তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছেন,—মিঃ পিয়ার্সন, এণ্ডরুজ, উইন্টারনিস, বোগদানা এলমহার্ষ্ট, মিঃ ও মিসেস বাকে, মিঃ ও মিসেস টেনকোনো, মিসেস ভ্যানাগান, সিলভাঁ লেভি, মাদাম লেভি প্রভৃতি। সিলভাঁ লেভি পাণ্ডিত্যে যত বড়ই হউন না কেন, স্বভাবে ছিলেন একেবারে সরল, ছোট্ট শিশু!

শুনলাম, গুরুদেব বলতেন, 'পিয়ার্সন ও এণ্ডরুজের মত মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না ঘটলে, পাশ্চাত্য-সভ্যতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত।'

এঁরা সকলেই ছিলেন গুরুদেব ও ভারতের প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধাশীল। অতি মনঃসংযোগে এঁরা শিখতেন—বাংলা, সংস্কৃত গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন প্রাচ্য রীতিনীতি। এণ্ডরুজ সাহেব তাঁর জাতীয় পোষাক ত্যাগ করে ধরেছিলেন ভারতের ধুতি ও কুর্ত্তা। সকলেই জানেন, আজীবন অভ্যস্ত না থাকলে ধুতিপরা কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার; কিন্তু আহারে, পরিধানে, মনেপ্রাণে তাঁরা হতে চেষ্টা করতেন গুরুদেবের দেশের মানুষ। এ সবেরই মূল—গুরুদেবের প্রতি তাঁদের অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

গুরুদেবের কথা বলতে বলতে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে শৈলদির গুরুদেব সম্বন্ধে দু'একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা মনে পড়ল। শুনলাম—মজুমদারদা স্বর্গীয় হবার পর শৈলদির নব-বিবাহিতা পুত্র-বধূর হাতে গুরুদেব কিছু খেতে চেয়েছিলেন। এর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর হঠাৎ মংপু যাওয়া স্থির হয়। শৈলদি একথা শুনেই পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যে উপকরণ পেলেন, তাই দিয়ে গজা ও ক্ষীরের পেরাকী তৈরী করে নব-বধূর হাতে পাঠিয়ে দিলেন উত্তরায়ণে। নিজে একটু পরিশ্রান্ত থাকায় বললেন—পরে যাবেন। বৌমা খাবার নিয়ে গিয়ে দেখেন, গুরুদেবের দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ।

বৌমাকে দেখে খুসী হয়ে খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর খাবার রাখিয়ে বললেন—বিকালে রওনা হবার পূর্ব্বে চায়ের সঙ্গে খেয়ে দেখবেন।

গ্রীষ্মকাল, অতিরিক্ত রৌদ্রের তেজ হওয়ায় শৈলদি সেদিন আর উত্তরায়ণে যেতে না পারায় ও গুরুদেব সেইদিনই অপরাহ্ণে কলকাতা চলে যাচ্ছেন শোনায়, অত্যন্ত দুঃখিত মনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বসে এই সবই চিন্তা করছিলেন। গুরুদেবের তখন স্বাস্থ্য খারাপ, বয়স হয়েছে, কতদূরে যাচ্ছেন, আবার কবে দেখা হয় কে জানে—একবার তাঁকে প্রণাম করা হল না, এই সব মনের ভেতরে কেবলি তোলপাড় করতে লাগল। পরদিন ভোরে একজন খবর দিলেন, 'গুরুদেবের কাল কলকাতা যাওয়া হয়নি—ষ্টেশনে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন।'

চমকিত শৈলদি তৎক্ষণাৎ গুরুদেব-দর্শনে ছুটে গেলেন। গুরুদেব তখন ছিলেন উদীচীর দোতলায়, নীচে মীরাদির সঙ্গে দেখা।

মীরাদি বললেন—'শৈল, তোমাদের খাবার খেয়ে 'বাবামশায়' কাল খুব খুসী হয়েছেন। আমাকে বলে গিয়েছিলেন, আমি যেন নিজে গিয়ে একথা তোমাকে জানাই। দাসদাসী দিয়ে যেন জানানো না হয়, সে বিষয়ে বারবার সতর্ক করে ষ্টেশনে গেলেন, কিন্তু কি হল জানিনা—একটু পরেই ফিরে এলেন। ওপরে আছেন—যাও, দেখা করো গিয়ে।'

শৈলদি উপরে গিয়ে প্রণাম করায় গুরুদেব স্মিতহাস্যে বললেন, 'তোমার কল্যাণ হউক। বৌমাটি তোমার লক্ষ্মী, কাল যে তাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়েছিলে, তা কে করেছিল?' শৈলদি নিজেই করেছেন বলায়—বললেন, 'খাবার খুব ভাল হয়েছিল, আমি খুব খুসী হয়েছি। তা এবার থেকে ত সবই বৌমার হাতে যাবে—বৌমাটি ভালো, তোমার খুব সুখের ঘর-সংসার হবে।' শৈলদি বললেন, 'সবই আপনার আশীর্ব্বাদে।'

তারপর শৈলদি আগেরদিন তাঁর কাছে আসতে না পারায় ও তাঁর শান্তিনিকেতন ত্যাগের পূর্ব্বে প্রণাম করতে না পারায় কি রকম মন খারাপ হয়েছিল বলাতে, তিনি সহাস্যে নিজের হাত দুখানি অঞ্জলিবদ্ধ করে বলেছিলেন,—'তোমার নৈবেদ্য ঠিক আমার কাছে পৌঁছেছে।'

যখন ঐ কথা কটি বলছিলেন, তখন শৈলদি তাঁর এমন একটি অসাধারণ রূপ দেখেছিলেন, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, সেটি যেন শৈলদির আরাধ্য ইষ্টদেবতারই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রূপ।

আরও একবার শৈলদি গুরুদেবের এইরূপ অলৌকিক রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। শেষ কলকাতা যাত্রার পূর্ব্বে গুরুদেব অত্যন্ত অসুস্থ, কোন বাইরের আগন্তুককে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না; শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ছেলে মেয়ে সব সময় তাঁর শুশ্রূষার জন্য নিকটে থাকে ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী দেখাশোনা করেন, এমন সময়ে শিল্পী নন্দলাল বসুর এক দূর-সম্পর্কিতা আত্মীয়া তাঁদের বাড়ী এলেন, গুরুদেবকে দর্শন করার এক বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। নন্দলাল বাবুর ছেলে যদিও শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন, তবুও তাঁরা সকলেই বললেন, এ অসাধ্য, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই পারে না।

মহিলাটি অত্যন্ত দুঃখিত মনে ভাবেন, শান্তিনিকেতনে এসেও একবার গুরুদেবের দর্শন পাব না? বাক্য নয়, লেখন নয়, শুধু একবার চোখের দর্শন! তাতেও বঞ্চিত হব? আমার ভাগ্যই খারাপ। তাঁর দুঃখ শুনে অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিলেন, শৈল-বৌঠানের নিকট যেতে,—গুরুদেবের নিকট সব সময়ই তাঁর অবারিত দ্বার,—যদি দর্শন সম্ভব হয়, তবে তাঁর মাধ্যমেই হতে পারে।

মহিলাটি অনুরোধ জানালেন শৈল বৌঠানকে। শুনে তিনি বল্লেন, কথা নয়, অন্য কিছু নয়, শুধু একবার দেখা,—আচ্ছা দেখি যদি সুবিধা করতে পারি।

শৈলদি পরদিন মহিলাটিকে নিয়ে উত্তরায়ণের বারান্দায় বসিয়ে নিজে গেলেন গুরুদেবের শোবার ঘরে; একতলার একটি কামরায় তখন তাঁর শোবার ব্যবস্থা, পাশের বারান্দা বড় বড় ফুলের টব দিয়ে ঘিরে সেখানে একটু বসার ব্যবস্থা। শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে ভিন্ন সেখানে যাবার কোন পথ নেই। গুরুদেব তখন সেই ছোট ঘেরা জায়গাটুকুতে আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট, তিন চারটি ছেলেমেয়ে ও প্রতিমা দেবী আশেপাশে উপবিষ্ট, শৈলদি শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন গুরুদেবের পিছনটিতে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল, কারও মুখে কোন কথা নেই, হঠাৎ কর্তৃপক্ষীয় একজন এসে খবর দিলেন, একটি জাপানী চিত্রকর এসেছেন তাঁর একখানা চিত্র গুরুদেবকে উপহার দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে। গুরুদেবের সম্মতিক্রমে ফুলের টব সরিয়ে রাস্তা করে তাঁকে নিয়ে আসা হল সম্মুখ পথে। ক্ষণপরে সে বিদায় নেওয়ার পর হঠাৎ গুরুদেব মুখ ঘুরিয়ে বল্লেন,—'শৈল? তুমি?' মুহূর্তে গুরুদেবের রোগক্লিষ্ট মুখের পরিবর্তে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আনন শৈলদির নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হল। শৈলদি অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে পূর্ব-বর্ণিত মহিলার অভিলাষ জানানোয় গুরুদেব উজ্জ্বল মুখে তাঁকে নিয়ে আসতে বললেন ও সম্মুখের রাস্তা দিয়েই তাঁকে এনে গুরুদেবকে দর্শন করালেন। গুরুদেব সেই উদ্ভাসিত আননে নিঃশব্দে মহিলাটির মস্তকে হাত রেখে, নীরব আশীর্বাদে তাঁকে ধন্য করলেন।

## ২২

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে গুরুদেবের দর্শন পাই মুহূর্তের জন্য। সেই মুহূর্তটি এতই স্মরণীয় যে, লিখে রাখি খাতার পাতায় 'ক্ষণ-স্মৃতি' নামে। সেই জীর্ণ খাতার 'ক্ষণ-স্মৃতি' থেকে কিছু তুলে ধরি,—

শান্তিনিকেতনের একটি দিনের স্মৃতি ও কবিগুরুকে মুহূর্তের জন্য দেখা, মনে চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল হয়ে রইল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের' রজত-জয়ন্তী উৎসব হয় কলকাতায়। এই উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের অনেক বৈজ্ঞানিকের আগমন হয় এখানে। দাক্ষিণাত্য প্রবাসী আমরাও বহুদিন পর পুণা থেকে কলকাতা আসি এই উপলক্ষ্যে।

বিজ্ঞান-সভার কাজের পর, ঐ সভার অভ্যর্থনা-সমিতি ২।১ দিন স্থানীয় ও তৎপার্শ্ববর্তী বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলো দেখাবার বন্দোবস্ত করেন বরাবর,—এবারে বাইরের দ্রষ্টব্য স্থানের অন্যতম শান্তিনিকেতন হওয়ায়, আমরা সাগ্রহে তাতেই নাম দিলাম।

চার দাদাই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র। শিশুকালে তাঁদের বলা এখানকার গল্পগুলো কত না আগ্রহে শুনেছি তাঁদের মুখে,—

'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন'···

'বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন'···

গানখানায় অত অল্প বয়সেই রোমাঞ্চ অনুভব করে, স্থানটি দেখার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঘটনাচক্রে বোম্বাই-প্রবাসী হয়ে পড়ায়, মধ্য-জীবন পর্য্যন্ত গুরুদেব তাঁর শান্তিনিকেতন দর্শন ছিল স্বপ্নের অগোচর।

এই হঠাৎ-পাওয়া-সুযোগে অতি আনন্দে 'স্পেশাল-ট্রেণ'-যো রাত্রিবেলা হাওড়া থেকে রওয়ানা হয়ে, আমরা ৫০।৬০ জন বিভি দেশের অধিবাসী একত্রে এক সুন্দর প্রভাতে বোলপুর ষ্টেশনে এ নামলাম।

ষ্টেশনটি বড়ই অপরিষ্কার, ধূলি-ধূসরিত রাস্তা ও মাছিপূর্ণ খাবারে দোকান মনে ভীতি জাগায়। শান্তিনিকেতনের 'বাস' সহযোগে খো মাঠের মধ্য দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শান্তিনিকেতন। এখা এসেই মনে হয় যেন অন্য রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েছি; ধূলো নেই, ময় নেই, পরিষ্কার মাঠঘাট, দূরে দূরে অল্প কয়েকখানা বাড়ী।

মহিলাদের একটু বিশ্রামের জন্য নিয়ে যাওয়া হল 'শ্রী-ভবনে শ্রী-ভবন তখন নূতনের মতই ঝকঝকে ও শ্রীমণ্ডিত। দোতলা বাড়ী নীচের 'হল'-ঘরটির দেয়াল, কলা-ভবনের ছাত্রদের আঁকা চমৎকা ফ্রেস্কো-ছবি-অলঙ্কৃত।

এই ছাত্রী-আবাসের পরিচালিকা একটি মাদ্রাজী মহিলা, তাঁ সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম। উপরতলায় ছোট ছোট ঘরে মেয়েদের থাকা সুন্দর ব্যবস্থা; প্রত্যেক মেয়ের পড়ার টেবিলে গুরুদেবের ছোট এক 'ফটো' টাটকা ফুল অথবা মালা দিয়ে সাজানো। মেয়েদের মধ্যে প্রায় সবই অবাঙ্গালী, বাঙ্গালী মেয়েদের সংখ্যা এতই নগণ্য দে দেখে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। আরও একটি জিনিষ, যাতে অত্য বিস্মিত হই তা—পাঞ্জাবী, গুজরাতী, আসামী, মাদ্রাজী, সিন্ধি, সিংহ মেয়েদের মুখের অবিকৃত বাংলা ভাষায় কথোপকথন।

সমস্ত দিন সব দেখেশুনে আশাতিরিক্ত আনন্দ লাভ করে, সন্ধ্যা গোধূলি-লগ্নে গুরুদেব-দর্শন! এখানে যা দেখি, যা শুনি, সবই নূতনে ভরা। উন্মুক্ত-আকাশ-তলে গাছ-তলায় শিক্ষাদান, বাহ্য-আড়ম্বর-বিহী কলা-ভবন, সঙ্গীত-ভবন সামান্য কাঁচা ঘরে প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার ও তাতে অমূল্য গ্রন্থরাজি, যা দেখি তাতেই চমক লাগে, মনে দোলা দেয়। মহর্ষিদেবের সাধনপীঠ ছাতিমতলা ও মর্ম্মরবেদী, যায় 'তাল-ধ্বজ নামে তালগাছ কেন্দ্র করে মাটীর কাঁচা বাড়ীটি—উত্তরায়ণের বাড়ী গুলোর গম্ভীর সৌন্দর্য্য ও বাগানের লতানো আম-লিচু-সফেদা-পেয়ারা গাছগুলো পর্য্যন্ত।

ফুলে-ফুলময় বিচিত্র উত্তরায়ণের বাগানের ভিতরে একটি অদ্ভু ধরণের সুউচ্চ ঘর। নীচে কংক্রিটের সরু সরু দোতলার সমান উঁ কয়েকটি থামের উপরে চতুর্দ্দিকে কাঁচ দেওয়া এই ঘর ও ছো বারান্দাটি যেন বাংলার চাষীরা ফসল পাকলে তা পাহারা দেবার জ ক্ষেতের মধ্যে যে মাচান তৈরী করে তারই অনুরূপ।

অনেক দিন রোগ-ভোগে গুরুদেব বড়ই দুর্ব্বল, চলাফেরায় অক্ষ বেশী কথা বলাও ডাক্তারের নিষেধ। ছোট বারান্দাটিতে একখানি আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট, ছোট সিঁড়ি দিয়ে আমাদের দু'জন ক তাঁকে দর্শন করিয়ে তৎক্ষণাৎ নীচে নিয়ে আসার ব্যবস্থা।

দুরু দুরু বক্ষে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, গোধূলি রক্তিম আলোয় তিনি যেন আমার চক্ষে এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ম দেবলোকবাসীরূপে প্রতিভাত হলেন। শুনেছিলাম, তিনি অপূ দেহসৌন্দর্য্যের অধিকারী, কিন্তু তা যে এতটা সুন্দর, তা ভাবিনি— এ যেন কল্পনাতীত।

আশ মিটিয়ে দেখার উপায় নেই, পশ্চাতে অপেক্ষমান জনসমষ্টি সম্মুখে আসার জন্য ব্যগ্র, এত বড় দলটির ভিতরে মাত্র তিনটি বঙ্গ-বালার মধ্যে, আমিই গুরুদেবের গলার স্বর একটুখানি শোনার আশায় বলি 'প্রবাসী বাঙ্গালী আমরা, বহুদূর থেকে এসেছি, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল।' তিনি মাথায় হাত রেখে, নীরব আশীর্ব্বাদের পর বললেন—'আমি রোগে অশক্ত, তোমাদের বোধ হয় কিছুই আদর-যত্ন হল না।'

স্থান-ত্যাগের তাগাদায়,—কী যে অকৃত্রিম যত্ন পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, চতুর্দ্দিকে তাঁর অনুপম সৃষ্টি দেখে কত আনন্দ পেয়েছি,—তা আর বলার সময় হল না। গভীর শ্রদ্ধায় নত হয়ে তাঁর সম্মুখ হতে চলে এলাম।

সন্ধ্যার পর দিকে দিকে বিজলী-বাতি জ্বলে উঠে স্থানটি অপরূপ শোভা ধারণ করল। তখন মনে যে প্রশ্ন বিরাট আকার ধারণ করেছিল,—আজ পঁচিশ বৎসর পরে তা সফল-স্বপ্নে পরিণত।

মনে হয়েছিল, বাঙ্গালী স্বাস্থ্যান্বেষণে, মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়ে, কত দূর-দূরান্তরে স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপন করেছে; ঘরের পাশের এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, স্বাস্থ্যে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে মনের আনন্দে দলে দলে শিক্ষিত মানুষ এখানে বাস করে না কেন? নিজেরাই যে জীবন-সায়াহ্নে আবার এখানে স্থায়ীভাবে বাস করব,—শান্তিনিকেতন যে আমাদের বার্দ্ধক্যের শান্তি-নিলয় হবে, তা কি সেদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলাম? আরও মনে হয়েছিল, গুরুদেবের এত কষ্টের, এত সংগ্রামের, এত স্বার্থত্যাগের ভিতরে যে বিশ্বভারতীর জন্ম,—তা যেন তাঁর নশ্বরদেহের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস না হয়,—যেন দেশবাসীর সম্মিলিত চেষ্টায় তা উত্তরোত্তর আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তবেই হবে তাঁর প্রতি আমাদের সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন।

সন্ধ্যার পর একটি মাটির ঘরে বিদেশাগত অতিথির দলটিকে দেখানো হয় চিত্রাঙ্গদা নৃত্য-নাট্য,—কবিগুরু ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় নীরবে বসেন দর্শকদের মধ্যস্থানে। তাঁর আদরিণী দৌহিত্রী নন্দিতা অপূর্ব্ব নৃত্য-কুশলতা দেখান চিত্রাঙ্গদারূপে। ঘরে অখণ্ড নীরবতা, শুধু মধ্যে মধ্যে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার,—'সাধু সাধু' রব (এটি বিদেশীদের পূর্ব্বেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে, হাততালির চটপট শব্দে গুরুদেব অত্যন্ত বিরক্ত হন, তার বদলে তিনি প্রবর্ত্তন করেছেন 'সাধু সাধু' রব।) জীবনের অনেক প্রথম-দেখার আনন্দে মন ভরিয়ে,—এখানকার উদার আতিথেয়তায় দেহ-মনের খোরাক যুগিয়ে, মধ্যরাত্রে,—প্রভাতের ছেড়ে-আসা ট্রেণটিতে আবার কলকাতা যাত্রা।

# স্বপ্নের দেশে

(W. B. Yeats-এর "The lake Isle of Innisfree" কবিতার ছায়ানুবাদ।)

স্বপ্নের দেশে মন মোর ছোটে
অন্তরও ছুটে যায়
থাকিব সেথা জীর্ণ কুঁড়েতে
নিরজন নিরালায়।
সেথা বনে বনে মৌমাছি দলে
গুনগুন রব ক'রে
সাথীহারা মোর জীবন কাটিবে
আমার সেই কুঁড়ে ঘরে।
হৃদি-মন সবে শান্তি চাহিছে
শান্তি চাহিছে পরাণ
গোধূলিতে সেথা ঝিঁঝিঁ গায়
ঘুমপাড়ানো গান।
আলোয় আলোয় পূর্ণ সেথা
মাঝরাতেরই প্রহর
সন্ধ্যা সেথা পূর্ণ করে
বিহগের কণ্ঠ স্বর।
সেই যে সেথা তুলিতে আঁকা
স্বপ্নময় মহাদেশ
হ্রদজলে সেথা স্নান করিয়ে
ঝাড়া দেয় তার কেশ।
সেই যে সেথা কল্পিত দেশে
সুমিষ্ট হ্রদ-জল
ঝর ঝর ঝর্ণার মত
বহি যায় অবিরল।
অন্তর মাঝে ভেসে আজি ওঠে
কল্লোল সেই ধ্বনি
রাজপথে আজ দাঁড়ায়ে আমি
স্বপ্নেরও জাল বুনি।

অনুবাদক—মণি দাস

নন্দিনী —এন. রামকৃষ্ণ

[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না। ]

ছোটা হাজরী

—প্রিয় পাল
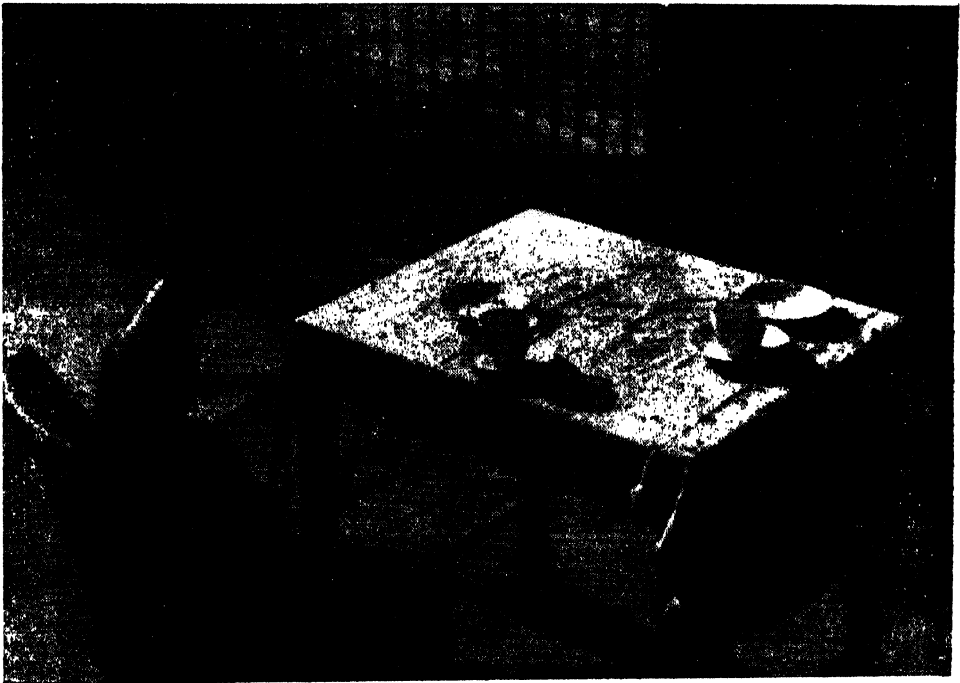
নৈঃশব্দ ( কাশ্মীর ) —শিবানী চট্টোপাধ্যায়

কোলাহল ( হাওড়া ব্রীজ ) —শান্তিময় সান্যাল

মঞ্জুমধুর

—সোনা চৌধুরী

জলের শিকার

—শান্তিময় সান্যাল

# ভাগোড়া

# বা

# পলাতক

( শেষাংশ )

সুধীরচন্দ্র দে
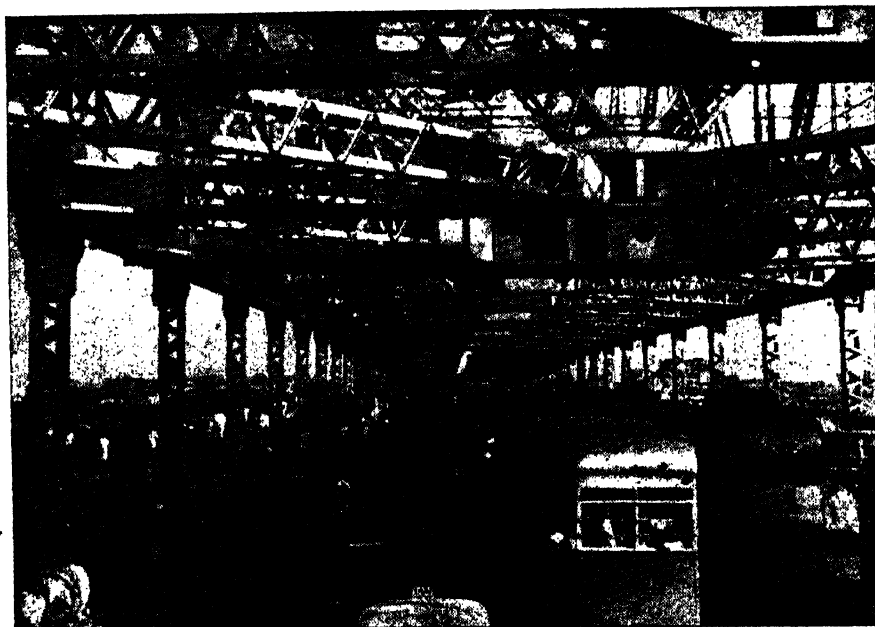
বেশ ক্ষুধা বোধ করলাম। পচা পাঁউ দু-এক খণ্ড রুটি যা পেলাম সকলে ভাগ করে খেলাম। বোটের মধ্যের নোনা ও মিষ্ট মিশ্রিত জলও একটু একটু খেলাম। একটু বেলা হলে মংপু "মক্কি" "মক্কি" বলে চীৎকার করে উঠলো। চেয়ে দেখলাম বোটটা মাইলব্যাপী মৎস্যের ঝাঁকের মধ্যে এসে পড়েছে। শোল মাছের মত বড়ো বড়ো সাদা রঙের মাছ বোটের চারিদিক ঘিরে আছে। বোট গায়ে লাগায় কয়েকটা লাফ দিয়ে বোটের মধ্যেও পড়ল, অনেকগুলিকে হাত দিয়েও ধরা গেল, কাটারি দিয়ে মাছগুলি কেটে বোটের উপর শুকাতে দেওয়া হল। প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় কিছু মাছ ঐ অবস্থায়ই উদরসাৎ করা হল।

আরও দু'দিন এইভাবে বোটের মধ্যে কেটে গেল, তবে এই দু'দিনের মধ্যে আর ঝড়বৃষ্টি হয় নি এবং জোর বাতাসে বোট তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছিলো। এই দুদিনের অনাহার, অনিদ্রা, বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আমাদের অর্দ্ধমৃত করে রাখলো। আমরা প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে এক প্রকার তন্দ্রাঘোরেই এই দুদিন কাটালাম। তবে বাঁচবার ইচ্ছা প্রবল ছিল সকলেরই মনে; সুতরাং বোটের হাল ধরা ও ঝড় থেমে গেলেই পাল তুলে দেওয়া ঠিক মতই হ'ল। আমি এই ক'দিনেই হাল ধরা ভালমত শিখে নিয়েছি। পাল তুলে দেবার পরে বোটের গতি বেশ বৃদ্ধি পেল। বিকালের দিকে ঢেউয়ের আকার ও বোটের দোলন যেন একটু কম বোধ করতে লাগলাম।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যার পরে বহু দূরে সমুদ্রের ওপর একটা জাহাজের আলো দেখতে পেলাম, কিন্তু জাহাজ আমাদের দেখতে পেল না, দূর দিয়ে চলে গেল। রাত্রে বোটের দোলন, ঝাঁকুনি কম থাকায় আমরা এক এক জন হালে বসলাম আর সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। এইভাবে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। আমি ইতিমধ্যেই বোটের হাল ধরার কৌশল শিখে নিয়েছি।

পঞ্চম দিনের প্রভাতে আবার সূর্যদেবকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানালাম যেন শীঘ্র গিরই এ যন্ত্রণার শেষ হয়। তখন আর কথা বলবার বা নড়াচড়ার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে—কোন গতিকে বোটের হাল চেপে ধরে থাকা ভিন্ন আর কেউই বসে নেই।

বেলা বেড়ে উঠলে মংপু চীৎকার করে উঠলো, "আমরা এসে গেছি, আমরা দেশে এসে গেছি"। কি ব্যাপার? দেখলাম কয়েক গোছা ঘাস বোটের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তীর নিকটবর্তী তারই নিদর্শন। সকলে উঠে বসলাম। এখন আমাদের পরিচয় কি দেওয়া যাবে তীরে উঠলে, সেই বিষয়ে একটা পরামর্শ করে নির্দিষ্ট পন্থা স্থির করতে হবে। আমার আগে থেকেই একটা উপায় স্থির করা ছিল মনের মধ্যে, সেইটাই সকলের মনঃপুত হল। আমরা কয়েদীর পোষাক পূর্বেই বদল করে ফেলেছি। বন্দুকটা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখলাম এবং সকলেই মৎস্য ব্যবসায়ী—এই পরিচয় দিব স্থির করলাম। মাছ কিনতে অনেক ব্যবসায়ী বর্মার নিকটবর্তী সমুদ্রে বোট নিয়ে ঘোরা-ফিরা করে। আমরাও সেই রকমের একটি দল, ঝড়ের মধ্যে পড়ে দূর সমুদ্রে ভেসে গিয়ে পড়েছিলাম। অনাহার, অনিদ্রায় আতঙ্কে অর্দ্ধমৃত; এই পরিচয় দিয়ে তীরে উঠবো, পরে অবস্থা বুঝে অন্য একটা গল্প রচনা করে নিতে হবে। কিছু সময় পরে বহু দূরে তীরের সূক্ষ্ম রেখা সমুদ্রের প্রান্তে একটা কালির দাগের মত দৃষ্টি গোচর হল। জেলেদের একখানা নৌকার সঙ্গে দেখা হল, অদৃষ্ট আমাদের সুপ্রসন্ন, আমরা সেই নৌকা হতে এক টুকরি মাছ কিনে বোটে উঠালাম—টাকা কিছু সঙ্গে ছিলো, এবার আমাদের পরিচয় বিশ্বাস্য হবে।

জেলেরা বিপদের কথা শুনে আমাদের প্রতি খুব সমবেদনা প্রকাশ করলো এবং তাদের নৌকা থেকে কিছু চিঁড়া মুড়ি আমাদের খেতে দিলো, তারা সকলেই বর্মী—মংপু তাদের ভাষায় আমাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলল। তাদের মাছ ধরা শেষ হয়ে যাওয়ায় এক সঙ্গেই আমরা তীরের দিকে চললাম। সন্ধ্যার পরেই আমরা তীরে পৌঁছলাম। সকলেরই দুশ্চিন্তায়, ভয়ে অন্তরে কম্প উপস্থিত হল। যদি লোকে আমাদের সন্দেহ করে ধরে ফেলে, তবে সে মৃত্যু থেকেও ভয়াবহ হবে। আমি সকলকে কথা বার্তা বলতে পূর্ব হতেই নিষেধ করে রেখেছিলাম লোকের সঙ্গে কথা বার্তা যা বলবার দরকার পড়ে, তা আমিই বলবো, আর সকলে আমার সঙ্গে থাকবে এবং কোন কথা বলবে না।

আমি মংপুকে সঙ্গে নিয়ে বোটটাকে একটু অন্ধকারে আড়ালে নিয়ে একটা চিহ্নিত স্থানে ডুবিয়ে রেখে সকলে তীরে উঠলাম। কাপড়ের পুঁটুলী করে বন্দুক তার মধ্যে রাখলাম। মংপুকে এবার সকলের আগে ঐ মাছের টুকরী মাথায় করে যেতে বললাম, কোন পুলিশ পাহারায় আছে কি না সজাগ দৃষ্টিতে দেখতে উপদেশ দিলাম। কারণ আমাদের পালানোর সংবাদ নিশ্চয় বর্মার পুলিশ জানতে পেরেছে এবং সমুদ্র কূলে পাহারা দিচ্ছে। মাছের বাজারে মাছের টুকরী নিয়ে মাছ বিক্রয় করলাম। কিছু রুটি-তরকারী কিনে এক গাছতলায় সকলে বসে কিছু কিছু খেলাম—প্রাণ ভরে জল খেলাম। গাছের তলাতেই ক্লান্ত অবশ দেহে সকলে শুয়ে পড়তে লাগল। অমন প্রকাশ্য স্থানে রাত্রে ঘুমালে বিপদ হতে পারে! কারণ রাত্রে পুলিশ পাহারায় বেরুবে ও আমাদের সন্দেহ করবে। সুতরাং আমি কাকেও ঘুমাতে দিলাম না।

ইতি মধ্যে ভাগ্যক্রমে এক পাঞ্জাবী কাঠের ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ঐ গাছতলা দিয়ে যাবার সময় আমাকে পাঞ্জাবী লোক দেখে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁকে আমাদের ইতিহাস বেশ করুণ ভাবে বললাম, তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র হয়ে আমাকে ও আমার দলের অপর তিন জনকে এই রাত্রের মত তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন, ঝড়ে নৌকা ডুবে আমাদের টাকা পয়সা কাপড় জামা সবই সমুদ্রে ভেসে গেছে শুনে তিনি দুই তিনটা পাজামা ও পাগড়ী আমাদের দিলেন ও সুখাদ্য খেতে দিলেন। আমরা খেয়ে তাঁর দেওয়া নির্দিষ্ট ঘরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অসাড়ে মরার মত গভীর ঘুমে রাত্র ভোর হ'ল। সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের, সহানুভূতি ও সাহায্য না পেলে সেদিন আমাদের যে কি গতি হ'তো, তা' কল্পনা করা যায় না! তাঁর দয়া ও সাহায্যের কথা জীবনে কখনও ভুলব না। আমাদের টাকা

ক্ষতি সব নষ্ট হয়ে গেছে, এখনি আবার নূতন করে আমাদের ব্যবসা করবার জন্ম টাকার খুবই দরকার, শুনে তিনি রেঙ্গুণে তাঁর এক ধনী পাঞ্জাবী বন্ধুর নিকট পত্র দেবেন এবং ঐ চিঠি নিয়ে আমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন—নিশ্চয় তিনি আমাদের কোন একটা ব্যবসাতে লাগিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর নিজের কাঠের ব্যবসা রেঙ্গুণে ও মৌলমেনে আছে বললেন। তিনি নিজ হতে আমার হাতে দশটি টাকা দিয়ে আমার হাত ধরে এই সামান্য সাহায্য নেবার জন্ম কাতর অনুরোধ করলেন। আমি নিতে বাধ্য হোলাম।

আমরা খুব ভোরেই ভদ্রলোকের ওঠবার পূর্বেই নিঃশব্দে বার হয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম। জঙ্গলের কাছাকাছি এসে দোকান থেকে আবশ্যকীয় আটা, চিনি, কিছু মিষ্টি, দেশলাই, কিছু ছোলা রুটি এই সব নিয়ে জঙ্গলের পথে রওনা হলাম। তখনও বেশী লোক বাইরে চলাফেরা আরম্ভ করে নাই। যত শীগগির আমরা এ স্থান ত্যাগ করতে পারি ও জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে পারি ততই মঙ্গল, ধরা পড়বার ভয় আমাদিগকে পাগল করে দিল।

বিশাল শাল ও সেগুনের বন। বেশ প্রশস্ত রাস্তা, বনের মধ্যে গেছে। কাঠ কেটে ঐ পথেই গাড়ীতে আনা হয়। সেই পথ ধরে আমরা চললাম বেশ জোরে। ঘণ্টা দুই পরে আমরা বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। সকলেরই ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় একটা ঝরণার ধারে সুন্দর একটা স্থানে সকলে বসলাম। হাত মুখ ধুয়ে রুটি খেলাম ও বিশ্রাম করলাম—মংপু বললো—এই বনের মধ্যে দিয়ে বরাবর পূর্ব দিকে গেলে মেনাম নদী পড়বে এবং নদী পার হলেই শ্যামদেশ আর সেখানে ধরা পড়বার ভয় নাই। এখন থেকে স্বাধীনতার বাতাস যেন আমাদের উৎসাহ আনন্দে সজীব করে তুলতে লাগলো। অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর আবার আমরা পূর্ব দিকের পথে চলা শুরু করলাম। কিছু দূর এলে আর পূর্ব দিকে রাস্তার চিহ্ন নাই রাস্তা ঘুরে উত্তর দিকে গেছে। আমাদের পূর্ব দিকেই যেতে হবে। সুতরাং আমরা ছোট ছোট ঝোঁপ কাঁটা ভেঙ্গেই চলতে সুরু করলাম। সন্ধ্যার পূর্বে দিনের আলোতে একটা ঘন ঝোপের পাশে একটি পরিষ্কার জায়গায় সকলে বিশ্রামের জন্য বসলাম। রাত্রের খাওয়া এখানেই শেষ করে গেলে ভাল হয় মনে করে ক'খানা রুটি ও কিছু ডাল আলু সিদ্ধ করে সকলে খেয়ে নিলাম। রাত্রে কোথায় কি অবস্থায় পড়তে হয় তার কিছুই স্থিরতা নাই।

খাওয়া শেষ করে রাত্রবাসের কি করা যায়, চিন্তা করতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে এখন বিষণ সিং সর্বাপেক্ষা দুর্বল। সে এখনও পথের ক্লান্তি একটুও কাটিয়ে উঠতে পারে নাই, বয়সেও সে সর্বাপেক্ষা বড়ো। তার কথা মত ঐখানে একটা বড়ো গাছের তলা পরিষ্কার করে চারিদিকে শুকনা কাঠের একটা বেষ্টনী করে তাতে আগুন জেলে আমরা মাটিতেই শুবার ব্যবস্থা করলাম। তবে বনে জঙ্গলে বাঘ ভালুকের ভয় থাকায় পালা করে এক একজন বন্দুক নিয়ে জেগে পাহারা দেব স্থির করে প্রথমেই আমি বন্দুক নিয়ে জেগে থাকলাম। অপর তিন জনকে ঘুমোতে বললাম। এ জঙ্গল সম্বন্ধে মংপুর অভিজ্ঞতা আছে। সে বলল যে বাঘ এখানে আছে, তবে মানুষ খেগো নয়ত নয় ভালুকও আছে। বাঘকে বিশ্বাস নাই, সাবধানে থাকা খুবই উচিৎ। লোকালয় বা রাস্তা থেকে আমরা বহু দূরে থাকায় মনে অনেক শান্তি পেলাম, তবে শীঘ্রই বিপদ কাটিয়ে শ্যামদেশে উপস্থিত হবার জন্ম সকলেরই প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

রাত্রে কোন বিপদ হ'ল না। পালাক্রমে পাহারা দেওয়া ও চারিদিকে আগুন জেলে রাখা হল। অসাড় দেহে সকলই ঘুমাতে পেরে ক্লান্ত শরীর মন সকালে একটু তাজা হয়ে উঠলো, সকালেই আবার কিছু খেয়ে নিয়ে চলা সুরু করলাম। গাছের আকার ক্ষুদ্র হয়ে এল, এখন আমাদের পথ অনেকটা দা দিয়ে জঙ্গল কেটে তৈয়ার করতে হচ্ছে। লতা পাতা ও ছোট ছোট গাছের ঝোঁপে মাথার উপরের আকাশ আবার ঢাকা পড়ে গেল—কোন দিকে যে আমরা চলেছি তা বুঝবার আর উপায় থাকলো না, যা হোক আন্দাজ করে পূর্ব মুখেই চলতে লাগলাম। পায়ের নীচে মাটি যেন আর্দ্র বোধ করতে লাগলাম। মংপু বলল যে, আমরা কোন নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছি মনে হয়। হয়ত এই নদী পার হলেই শ্যামদেশ, সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। কিন্তু ঝোঁপজঙ্গল ভেঙ্গে দ্রুত অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

দুপুরের পূর্বেই সকলে ক্লান্তি বোধ করায় আর অগ্রসর না হয়ে একটা পরিষ্কার মত স্থান পছন্দ করে সকলে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আজ সাত-আট দিন পরিশ্রম, উপবাস, দুশ্চিন্তা সব মিলে আমাদের শরীর মন অবসন্ন। দুপুর হ'য়ে উঠলো তবুও কেউ যেন আর উঠতে চায় না। বিষণ ও ছুতোর ত ঘুমিয়ে পড়লো—যা'ক আমরা আবার কাঠ জেলে রুটি করে সকলে খেয়ে নিলাম। আমরা প্রায় নিঃশব্দেই সর্বদা থাকি কথাবার্তা খুব কমই নিজেদের মধ্যে বলি। আকাশের সূর্য দেখতে না পেয়ে কোন দিকে যে চলেছি এখন, কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। সূর্য—ডুববার পূর্বেই জঙ্গলে অন্ধকার নেমে এলো—। আমাদের কিছু দূরে একটা সরু পথের আভাস দেখতে পেলাম, মংপুকে বললে সে উঠে দেখে এসে বললো যে ওটা জানোয়ারদের চলার পথ, সন্ধ্যার পরেই এ পথ দিয়ে বন্য জানোয়ারেরা যাওয়া-আসা করবে। হরিণ, বন্য শুয়ার এই সবের পায়ের দাগ দেখলাম। সকলেরই মনে বড়ো ভয় হ'লো। রাত্রে এখানে কি করে কাটান যাবে। এখানে মাটিও খুব নরম হয়ত নিকটেই নদী আছে কিন্তু জঙ্গল এত ঘন যে সামনে বা পাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিছু দূরে আমরা একটা বড় শাল গাছ ছেড়ে এসেছি গাছটি একপাশে হেলে পড়েছে। আবার আমরা ফিরে সেই গাছের কাছে এলাম—এবং গাছের উপরে রাত্রে থাকবার ব্যবস্থা করলাম—। ক্ষুধার কষ্টে, ক্লান্ত দেহে যেন আর নড়তে চায় না। সমুদ্রে যে কষ্ট করে মাটিতে পৌছেছি। এই জঙ্গলে যেন তা অপেক্ষা বেশী কষ্ট হতাশা আমরা ভোগ করতে লাগলাম। গাছের ডাল কেটে এক একটা বসবার মত স্থান গাছের উপরে করে নিলাম। এবার সকলে এক এক মুঠা ছোলা চিবিয়ে জল খেয়ে নিলাম।

তখন অন্ধকার হয়েছে। সকলে জিনিষপত্র নিয়ে গাছের ডালে বেঁধে রেখে রাত্রের মত গাছে থাকবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছি। মংপু বলে উঠলো, "ঐ শোন শুয়ারের দলের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ, একপাল বুনো শুয়ার—যাচ্ছে"—। আমি বন্দুক নিয়ে নিঃশব্দে

এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেও বুঝলাম হ্যাঁ অনেকগুলো বুনো শুয়ার যাচ্ছে সাম্‌নে বড়ো বড়ো দুই-তিনটা দাঁতাল যাচ্ছে অন্ধকারে আবছায়ামত। সাম্‌নেরটাকে গুলী করে মারলাম। বাকি সবগুলো চারিদিকে ছুটে পালাল জঙ্গল উলট্ পালট্ করে। অন্ধকারে মংপু ও আমি খুঁজে শুয়ারটাকে বের করলাম। মস্ত বড়ো দাঁতাল শুয়ার। বন্দুকের শব্দ শুনে ছুতোর ও বিষণ সিং এসে উপস্থিত হ'ল। চার জনে ধরাধরি করে গাছের নীচে এনে শুয়ারটিকে কেটে আগুনে ফেলে ও কিছু সিদ্ধ করে নুন দিয়ে সকলে আনন্দ করে পেট ভরে খেলাম। কয়েক খণ্ড আগুনে সেঁকে বেশ করে শুকিয়ে সঙ্গে নেবার জন্য রাখলাম। এদিকে আটা, চিনিও শেষ। লবণ কিছু আছে দেখলাম।

গাছের উপর কোন প্রকারে রাত কাটিয়ে একটু পরিষ্কার হতেই আবার চলা সুরু করলাম—আবার যেদিকে চলেছিলাম সেদিকে আর চলতে সকলেই আপত্তি করলো। কাদা ভেঙে ঝোপ, কাঁটা জঙ্গল ভেঙে চলা অসম্ভব। মাটিও ক্রমে ক্রমে কাদার মত হওয়ায় পায়ে লেগে যাচ্ছে, পথ চলা দায়। সুতরাং আমাদের শুকনা শক্ত মাটিতে না গেলে এই পথে কাদার মধ্যেই বেধে আটকে মরে থাকতে হবে। যে কোন একটা লোকালয় শীঘ্র না পেলে সকলেরই এক সঙ্গে মরতে হবে। এইবার প্রকৃতই সকলের মৃত্যু ভয় হল। ভাবতে লাগলাম এ কষ্টের চাইতে সমুদ্রের মধ্যে ডুবে মরাই শ্রেয় ছিলো।

যা হক আবার ফিরে কাঁটা জঙ্গল পথ ধরে আমাদের পূর্ব পথে দু ঘণ্টা ধরে চলে শুকনা মাটির 'পরে এসে পৌঁছলাম। তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, সূর্যের অবস্থান তখনও নিশ্চয় করে বুঝা যাচ্ছে না—তবুও উত্তর পূর্ব দিক আন্দাজে ঠিক করে—চলতে লাগলাম—যাতে জঙ্গলের বাইরে নদীকে পাই ও পার হওয়া সম্ভব হয়। কাদা পথে—চলে নদীর কিনারায় পৌঁছানো সম্ভব হ'ত না—এবং এই ভীষণ জঙ্গল পার হবার কোন নৌকাও পাওয়া সম্ভব নয়। জঙ্গল শেষ হলে নিশ্চয় লোকালয় ও নৌকা পাবার সম্ভাবনা হবে।

আমরা চুপচাপ, ধীরে ধীরে চলে কিছু পরে বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে আর চলতে পারলাম না—কাঁটা কেটে, রাস্তা করে সকলের কষ্টের একশেষ হয়েছে—কাঁটাতে কাপড় জামা হাত পা সব ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়েছে, ক্লান্ত শরীরে আর কত কষ্ট সহ্য হয়? যা ভাগ্যে থাকে তাই হবে, ভেবে দুপুরের পরে সকলে আর একটু চলে বড়ো বড়ো গাছের বনে ঢুকলাম—নীচেটা খুব পরিষ্কার শুকনা পাতা ভিন্ন গাছের তলাতে আর কোন জঙ্গল বা কাঁটা ছাড়া কিছুই নাই। একটা পরিষ্কার জায়গায় সকলে বিশ্রামের জন্য বসলাম এবং রাত্রেও সেখানে আগুন জেলে এক এক জন পাহারায় জেগে সকলে রাত কাটালাম। সকলে অনেকটা সুস্থ বোধ করায় আবার চলতে আরম্ভ করলাম। এই ভাবে আরও দু'দিন জঙ্গলে দিগভ্রান্ত হয়ে আমরা উত্তর পূর্বে না যেয়ে ভুল পথে ঘুরে চলেছি বুঝলাম। কারণ তিন চার দিনের মধ্যে ঐ জঙ্গলের পথ শেষ হওয়া উচিৎ ছিল মংপু বলল। যা হক প্রাণপণে অবসাদ শারীরিক যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে সকলে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। বিকালের দিকে বন যেন একটু পাতলা হয়ে এলো মনে হল। সকলেরই ভয়ানক তৃষ্ণা পাওয়ায় এক স্থানে সকলে বসে ঝরণার সন্ধান করতে লাগলাম। মংপুই এই বনে আমাদের বিশেষ সহায় হল—সেই জলের সন্ধান করে, জল এনে সকলকে দিয়ে প্রাণ বাঁচাল। আর কেউ নড়তে চাইল না। একবার বিশ্রাম করতে বসলে শরীর আর চলতে চায় না। রাত্রে সেইখানেই থাকলাম, খুব সকালেই চলা শুরু করলাম। এবার একটু জোরে পা ফেলে চলতে সকলকে বললাম—কারণ বোধ হতে লাগলো যখন জঙ্গল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তখন শীঘ্রই আমরা লোকালয় দেখতে পাবো।

দ্বিপ্রহরের পরে বনের গাছ বেশ ফাঁকা ফাঁকা দেখা গেল এবং গাছের গায়ে আলকাতরার দাগ দেওয়া দেখে বেশ বুঝলাম নিশ্চয় লোকালয় নিকটে হবে। বৈকালের দিকে একটা মহিষের দেখা পেলাম, নিশ্চিন্ত মনে লতা-পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে অনেক পাহাড় আছে দেখলাম। বন থেকে বার হবার পূর্বে একটা পাহাড়ের আড়ালে বসে নিকটের একটা জলাশয় দেখে সকলে ভাল করে স্নান করে নিলাম। কাপড় জামাও সকলে ধুয়ে একটু পরিষ্কার করে নিলাম। গত দশ বারো দিনে স্নান ত' হয় নাই, অধিকন্তু জঙ্গলের মধ্যে পথ চলায়, শরীর মাটিতে মাখা ও কাপড় জামা ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই স্নান করে ও বস্ত্রাদি ধুয়ে একটু গা রগড়ে পরিষ্কার হলাম। নতুবা এই বেশে গেলে গ্রামের লোকে ডাকাত বলে সহজেই বিশ্বাস করতো।

সন্ধ্যার পূর্বে একটু পথের নিশানা ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। বন শেষ হল। গাভীর ডাক শুনতে পেলাম। এত ক্লান্ত অসাড় দেহ নিয়ে আর চলতে পারি না। একটা আশ্রয় শীঘ্র চাই নতুবা পড়ে গিয়ে মারা যাবো। সাম্‌নের মাঠে কয়েকটি লোক কয়েকটি গরু ও মহিষ নিয়ে ঘরের দিকে ফিরছে দেখতে পেলাম। তারা আমাদের জামা কাপড় ও শরীরের চেহারা দেখে ও বন্দুক দেখে ভয়ে গ্রামের দিকে দৌড় দিলো। দূরে একটি গ্রাম দেখা গেল। মংপু চিৎকার করে তাদিকে অনেক বুঝাতে লাগলো, কিন্তু তারা কিছুতেই আমাদের নিকট এলো না। অগত্যা তাদের অনুসরণ করে আমরা একটি ছোট নদী পার হয়ে একটি বর্মী গ্রামে উপস্থিত হলাম। বন্দুক এবার আর গোপন করি নাই, হাতেই ছিল। আমাদের আগমনের পূর্বেই গ্রামের মধ্যে খুব সাড়া পড়ে গেল। মাঠের সেই লোকদের কাছে সকলে আমাদের বিষয় শুনেছিলো। আমাদিগকে ঘিরে অনেক লোকে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলো। মংপু সব উত্তর দিল। বললো, "আমরা রেঙ্গুনের এক কাঠ ব্যবসায়ীর লোক, বনের মধ্যে পথ হারিয়ে—না খেয়ে, না ঘুমিয়ে এই চেহারা হয়েছে।" তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, আমাদের এত কষ্ট, এই মরণপণ অভিযান সবই বৃথা হয়ে গেছে। আমরা সেই ইংরাজ রাজত্ব ব্রহ্মদেশেই এসে উপস্থিত হয়েছি। ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা!

তারা আমাদের একটা ঘরে বিশ্রাম করবার জন্য স্থান দিলো। এবং রুটি ভাত তরকারি খেতে দিলো। পেট ভরে খেয়ে আমরা সেই ঘরেই মাদুর ও চ্যাটাই-এর 'পর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে গ্রামের মোড়ল এসে বেশ হাসি মুখে কথাবার্ত্তা বলল। সকাল বেলায় নদী হতে স্নানাদি সেরে

চা-রুটি খেয়ে পুনরায় এক ঘুম দিলাম। গ্রামবাসিগণের মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম। বেশ বুঝলাম ওরা আমাদের ডাকাতের দল বা জেলভাঙ্গা কয়েদী বলে সন্দেহ করছে। যাহক আমরা শীগ্‌গিরই পুনরায় পালিয়ে দুই মাইল দূরে নদী পার হয়ে শ্যামদেশে যাবো স্থির করলাম। দু'মাইল দূরে নদী এবং পার হবার ঘাট আছে জানতে পারলাম। সেদিনও আমরা অঘোরে ঘুমালাম, শরীরের জড়তাও অনেকটা দূর হয়েছে। আজই শেষ রাত্রে পালাব ঠিক করে রাখলাম। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই কুড়ি-পঁচিশ জন গ্রামবাসী টাঙ্গি, দা কাটারী, বন্দুকসহ আমাদের কাছে এসে আমাদের বন্দুক নিয়ে তাদের সঙ্গে গিয়ে একটা বন্য শুয়ার শিকার করে দেবার জন্য অনুরোধ করল। শুয়ারটি খুব ক্ষতি করছে, বুঝলাম আমাদের স্বাধীনতার মেয়াদ ফুরিয়েছে। আমাদের রাইফেলটি তাদের বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু। কারণ ক'টা গুলী আছে, এটা কোথায় পেলেন ইত্যাদি প্রশ্ন হতে লাগলো।

এটি আমাদের ব্যবসায় মালিকের, বন-জঙ্গলে আসবার সময় আমরা এটা নিয়ে আসি বাঘ ভালুকের ভয়ে। ছুত্তোর সিংকে এক ফাঁকে বললাম যে এখনই আমাদের পুলিসের কাছে ধরিয়ে দিবে, বেশ বুঝছি শিকার করা একটা মিথ্যা চালাকি, ওদের ক'টাকে মেরে চল আমরা পুনরায় বনে ঢুকে পড়ি, পরে যা হয় হবে। কিন্তু ছুত্তোর কিছুতেই স্বীকৃত হ'ল না, বললে এই আমাদের নিয়তি। পুলিসের হাতেও নিশ্চয় বন্দুক থাকবে।

ওদের সঙ্গে না গেলে ওরা হয়ত তখনই আমাদের ঘিরে ফেলবে, এই সব চিন্তা করে; যেন সত্য সত্যই আমরা শিকারে যাবার জন্য খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি এমন ভাব দেখিয়ে রাইফেলে গুলী পুরে তাদের সঙ্গে সকলেই চললাম। মংপু সকলের পিছনে আসতে লাগল। সে হয়ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার সুবিধা করবার মতলবে। বিপদ যে এখনই ঘটবে সে মংপুর মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারলাম। এখনও সন্দেহ করি যে বর্মী গ্রামবাসিরা পূর্ব হতেই সতর্ক করায় সে পিছু পিছু ধীরে ধীরে আসছিল।

পরবর্তী ইতিহাস বড় সংক্ষেপ ও বড়ই করুণ, আমাদের পক্ষে। আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল; এত দুঃখ কষ্ট, অনাহার অনিদ্রা, বিপদের সঙ্গে দুর্দান্ত লড়াই সবই পরমুহূর্তে বৃথা বিফল হয়ে গেল।

গ্রামের বাইরে একটা খালের কিনারে গাছের আড়ালে আমাকে বন্দুক নিয়ে বসতে বললো, কিছুদূরে একটা ঘন ঝোঁপ দেখিয়ে বললো যে শুয়ারটা ঐ ঝোঁপে আছে, তাড়া দিলেই সে আমার পাশ দিয়ে ছুটে পালাবে, তখনই গুলী করতে হবে। ছুত্তোর ও বিষণ অন্যদিকে জঙ্গলের আড়ালে, ওদের নির্দ্দেশ মত দা হাতে বসলো। ওরা কয়েক জন ঝোঁপের উপর লাঠি দিয়ে শুয়ারকে তাড়া দিতে লাগল সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে। হঠাৎ আমার পিঠে শক্ত কিছুর খোঁচা লাগতেই আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি দুই জন কনেষ্টবল আমার পিঠে ও মাথায় বন্দুক ধরে আছে আমাকে হাত তুলে উঠে দাঁড়াতে বলল। আমি হুকুম তামিল করা মাত্র দুই জোড়া হাতকড়ি আমার হাতে পরিয়ে দিল ও রাইফেল নিয়ে নিলো। তখন আর ওয়ার মারার প্রয়োজন করার দরকার না থাকায় সকলে একত্র হয়ে গ্রামের দিকে ফিরল। বিষণ সিং ও ছুত্তোর সিংএর হাতেও হাতকড়া পড়িল। মংপুকে আর কোথাও দেখলাম না সে এই গোলমালের সুযোগে গ্রামবাসি বর্মীদের সহযোগে পালিয়ে গেছে বুঝলাম। আমরা তার বিষয় জানি না বললাম।

আমরা তিন জনেই বর্মী থানায় নীত হ'লাম। আমরা আন্দামানের পলাতক সন্দেহ করেই আমাদের ধরেছিল। আমাদের পালাবার সংবাদ তারা পূর্বেই পেয়েছে। সেখান থেকে হাতকড়া বেড়ি পরে সেই মহারাজা জাহাজে আবার কালাপানি প্রেরিত হলাম। মংপুর কোন খবর আর পেলাম না। বুঝলাম সে তার দেশের ভিতরেই পালিয়েছে যা হক আন্দামানে এলে আমাদের পলায়ন, মোল্লা ও বন্দুক চুরি, সিপাইকে বেঁধে মারা ইত্যাদি নানা অপরাধের বিচার করা হ'ল, বিচারে সব ক'টি অপরাধে মোট আমাদের প্রত্যেকের আবার একটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'ল। এখন ডবল জীবন দণ্ড ভোগ করছি আর জেল হতে বাইরের কাজে আমাদের যেতে দেয় না। ভাইপার জেল হতে পাঁচ বৎসর এই সেলুলার জেলে এসে নারকেল ছোবড়া বার করার কঠিন কাজ করে যাচ্ছি। তবে জেলার থেকে সবাই আমার প্রতি কোন অত্যাচার আর এখন করে না আমিও দিন কাটাচ্ছি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। যখন যে অবস্থায় থাকি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করি। এখানেই শেষ নিশ্বাস ফেলবো।

দুই বৎসর পরে মংপুর গ্রামের একজন বর্মী কয়েদী দেশ থেকে নতুন আসে। কথা প্রসঙ্গে তার নিকট মংপুর পরবর্তী ইতিহাস অবগত হলাম। মংপু আমাদের গ্রেপ্তারের সময় গোলমালের মধ্যে পালিয়ে দেশে যায় এবং প্রকাশ করে দেয় যে সে জেল হতে অব্যাহতি পেয়ে দেশে এসেছে। প্রায় এক মাস পরে, গুজব রটে যে সে আরও কয়েকজন কয়েদী এক সাথে কালাপানি থেকে পালিয়ে এসেছে। পুলিশ এসে তাকে ধরতে যায়। সে ধরা দেয় না। তার একটি মাত্র অল্প বয়সের পুত্র ছিল, তাকে সে অসীম স্নেহ কোরত! কোথা থেকে একটা বন্দুক গুলী জোগাড় করে তার ঘরের মেঝেতে গর্ত করে, সব জানলা দরজা বন্ধ করে ছেলে কোলে করে সেই গর্তে বসে। এবং পুলিসের কেউ কেউ যখনই কোন দরজা জানলার কাছে আসে তখনই গুলী করে, পুলিস তার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তাকে গুলী করা থেকে বিরত থাকে।

পুলিস নানা প্রকার বুঝিয়েও তাকে নিরস্ত্র করতে পারল না এই ভাবে দুই ঘণ্টা সে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং এর মধ্যে এক সময়ে পুলিস ছেলেটিকে বাঁচিয়ে তাকে গুলী করে ও তাতেই সে মারা যায়। ছেলেটি বেঁচে যায়।*

[* ভবিষ্যতে এই লেখকের তথ্যবহুল ও অজ্ঞাত মূল্যবান রচনার নিদর্শন আরও প্রকাশিত হইবে।—স ]

# নিষিদ্ধ এলাকা

কালপুরুষ

১১

মানুষের মন সব সময়েই উৎসুক হয়ে আছে নূতন কিছু শুনবার, নূতন কিছু জানবার জন্যে। মন মানুষের জটিল, আরও জটিল কুমারী মেয়ের মন। সে মন জটিল আর একগুঁয়ে আর প্রতিহিংসাপরায়ণ। এদের মধ্যে যারা বয়সের দিক থেকে আইনের ছাড়পত্র পায় না, তারা শুধু যে অসময়ীর আক্রোশে ফেটে পড়ে তাই নয়,—মা বাবা, ভাই-বোন এমন কি তাদের স্নেহ-মায়া-মমতা হেলায় তুচ্ছ করে অবিশ্বাস্য কাহিনী গড়ে তোলে তাদেরকে ঘিরে।

হৃষ্টপুষ্ট, স্বাস্থ্যবতী, চঞ্চলা উদ্দাম মনীষা মেয়েও বটে, কুমারীও বটে; তবে ঠিক সাধারণ মেয়ের মত নয়।

সকাল নয়টা হবে। হাতে একখানা 'রোল' করা সাদা কাগজ, পরণে বাসন্তী রঙের শাড়ী, গায়ে কালো রঙের ব্লাউজ, পিঠের দিকে তার "ভি"; পায়ে শান্তিনিকেতনী কাজ-করা স্লিপার, এক কথায়—অত্যাধুনিক ফ্যাশনের বেশভূষা। আগুনের মত রং তার। এসে ঢুকল থানায়। মুখখানা থমথম করছে—ফর্সা মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। সোজা ঢুকে পড়েছে অফিস-ইন-চার্জের ঘরে।

শান্ত্রী বাধা দিচ্ছিল—এদিকে, এদিকে? সে-কথায় কান না দিয়েই মনীষা ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ঘরে।

শান্ত্রীর কথাতেই ও· সি· মুখ তুলেছিলেন একখানা ম্যাপ থেকে। ইঙ্গিতে শান্ত্রীকে বললেন—থাক।

কাগজশুদ্ধ হাতখানা তুলে নমস্কার করল মনীষা।

প্রতি-নমস্কার করে ও· সি· বললেন—বসুন। সামনেই একখানা চেয়ারে বসে পড়ল মনীষা। ও· সি· পর্য্যবেক্ষণের দৃষ্টি নিয়ে কি যেন দেখলেন মনীষার থমথমে লাল ফর্সা মুখখানায়। কোন কথা বললেন না বা শুধালেন না।

রোল-করা কাগজের ভাঁজ খুলে এবার মনীষা এগিয়ে ধরল ও· সি·'র দিকে।

কি আছে ওতে?

Complaint

স্পষ্ট ইংরাজী কথা শুনে এবার ও· সি· বিস্মিত হলেন। তবে সে-ভাবটা দমন করে বললেন—ঐ দিকে দিন। ইঙ্গিতে শান্ত্রীকে ডাক দিলেন।

এঁকে ঐ ঘরে নিয়ে যাও। যান আপনি, ও ঘরে লোক আছে, ডায়েরী নেবে তারা।

ও ঘরে আমি যাব না, আপনি-ই এটা লিখে নিন, please.

দেখুন, এটা কাজের সময়। বিরক্ত করবেন না। কোন difficulty হবে না আপনার।

মনীষা তবু নড়ল না।

শান্ত্রীকে ডেকে বড়বাবু বললেন—এঁর কি অভিযোগ আছে—আচ্ছা থাক; ছোটবাবুকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোটবাবু আসতেই বড়বাবু বললেন—এঁর কি অভিযোগ আছে, একটা ডায়েরী লিখে নিন।

চলুন ও ঘরে।—ছোটবাবু বললেন।

এবার বাধ্য হয়ে উঠল মনীষা।

মনীষা বলে গেল, ছোটবাবু লিখে নিলেন। শেষে সই করতে দিয়ে যখন নাম লেখা শেষ হয়েছে, তখন মনীষাকে উদ্দেশ করেই ছোটবাবু শুধালেন—আপনারই নাম মনীষা সেন?

একটু চমকে উঠল মনীষা, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

কি যেন একটা হাতের মুঠোয় পেয়েছেন, এমন একটা আবিষ্কারের গর্ব্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছোটবাবুর মুখ। তিনি বাহ্যতঃ নির্লিপ্তভাবে উত্তর করলেন—না, এমনিই বলছিলাম। একটু বসুন, আসছি, বলে ছোটবাবু উঠে গেলেন বড়বাবুর ঘরে। মেলে ধরলেন তাঁর সামনে ডায়েরী বই। দেখালেন তিনদিন আগেকার আর একটা ডায়েরী।

বড়বাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ডুবে গেল তিন দিন আগেকার সেই ডায়েরীর মধ্যে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিয়ে তিনি শুধালেন—Are you sure?

Almost, Sir.

আচ্ছা ওঁকে arrest করুন।

তাই করা হল।

মনীষা অবাক।

মনীষার সে বিস্মিত ভাবটা কাটলে শুধাল—আমাকে কেন অ্যারেষ্ট করলেন, জানতে পারি কি?

একটু বিদ্রূপ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না ছোটবাবু। তিনি হেসে বললেন—জানেন না, না? আপনার মা যে ডায়েরী করেছেন তিনদিন আগে—আপনি নিরুদ্দেশ।

হেসে উঠল মনীষা—তাই নাকি? তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠল।

ছোটবাবু কাজ করতে করতেও লক্ষ্য রাখছিলেন মনীষার দিকে। এক অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে কতকগুলি অস্বস্তিকর মুহূর্ত্ত কেটে যেতে লাগল। দেয়ালের বড় ঘড়িটা টক্ টক্ শব্দে ঘা দিয়ে চলেছে সেই মুহূর্ত্তগুলির মাথায়। শান্ত্রীর 'অ্যাবাউট টার্ণ' করার সময় জুতোর 'খটাস্' শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসছে।

এই নীরবতা ভঙ্গ করে মনীষা-ই কথা বলল প্রথম—ডাকা।

পুলিশ অফিসারের কান এড়ায়নি কথাটা যদিও আপাতদৃষ্টিতে

মনে হয় কেউ শোনেনি। তিনি শুধালেন—কে তাকা? তার সম্বন্ধে ঐ বিশেষণটা প্রয়োগ করলেন জানতে পারি কি?

আপনাদের সম্বন্ধে বলিনি 'ডেফিনিট্লি'—হাসল মনীষা।

যাক, তবু ভালো। মৃদু হাসলেন পুলিশ অফিসার।

এক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা মহিলা ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঢুকেই কোন কথা না বলে মনীষাকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন—কোথায় ছিলি মা, এ দু' তিন দিন? চল, বাড়ী ফিরে।

মুখ ঝামটা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল মেয়ে, বলল—যাও, বাড়ী যাব না। মা প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন, কোন রকমে চেয়ারটা ধরে সামলে নিলেন।

মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল মায়ের দিক থেকে—কোন কথা বলল না।

হঠাৎ ও· সি· ঘরে ঢুকলেন। ছোটবাবু বললেন, স্যার, আমি যা আপনাকে বলেছিলাম ঠিক তাই, ইনিই সেই মনীষা সেন—নিরুদ্দিষ্টা; আর উনি তার মা।

হুঁ—গম্ভীর স্বরে বড়বাবু বললেন। তবে এখন তো বাড়ী যাবেন—মায়ের সঙ্গে? মনীষাকে উদ্দেশ করেই বললেন তিনি কথাগুলো।

ঝাঁঝিয়ে উঠল মনীষা—কেন? বাড়ী যাব না আমি।

চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল উপস্থিত কর্তব্যরত থানার পুলিশ অফিসারদের মধ্যে। রসের সন্ধান পেয়েছে তারা। তা ছাড়া, এই বয়সের হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের প্রায় সকলেরই বক্তব্য এক, সিদ্ধান্ত এক—বাড়ী যাব না।

ও· সি· নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন এবং ডাকালেন ছোটবাবুকে। নির্দেশ দিলেন—মনীষাকে এস· ডি· ও'র সামনে হাজির করতে আর তার মাকে বাড়ী ফিরে যেতে বলবার জন্যে। এখন ও মেয়ে সব যুক্তি তর্কের বাইরে।

তাই হল।

মা চলে যাওয়ার সময় আর একবার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—মা, চল মা।

মেয়ে বসে রইল কাঠের পুতুলের মত। অফিস-ঘরের দরজা দিয়ে মায়ের মূর্ত্তির দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল মনীষা। আপন মনেই বলল—যাব না, কখখনো না। তুমি থাকতে আর ও-বাড়ীতে যাব না।

সে তো আমাদের জানা-ই আছে। কিছু মনে করবেন না, আপনাদের বয়সের মেয়েরা বেরিয়ে আসে তিথি-ক্ষণ না দেখেই। তাই তাদের অতিথি হতে হয় রাজদরবারে অথবা অন্যত্র। আপনিও ব্যতিক্রম হবেন না সে-নিয়মের।—মন্তব্য করলেন ছোটবাবু।

এর উত্তরে মনীষা বিড় বিড় করে কিছু একটা বলল বটে, কিন্তু [illegible] বোঝা গেল না।

বেলা ১০-টার কিছু পরে হাজির করা হল মনীষাকে, এস-ডি-ও'র [illegible]নে। তিনিও তাকে বললেন বাড়ী ফিরে যেতে।

চোখ ছলছল করে এল মনীষার—আপনিও তাই বলছেন? [illegible]ড়ী ফিরে গেলে মা'র যে কি অসুবিধা তা তো আপনি জানেন না! [illegible] জন্তে—এই দেখুন—বলে বাঁ হাতের কাপড়টা সরিয়ে ব্লাউজের [illegible]হাটা একটু টেনে ধরল মনীষা—দেখুন একদিন সত্যি সত্যি গরম খুন্তির মাথা ঠেসে ধরেছিল এখানে। দাগ মিলোয়নি আজও মিলোবেও না কোনদিন। আরও আছে এমন অসংখ্য চি[illegible] ছোটখাটো অত্যাচারের।

এস· ডি· ও তবু একবার বললেন স্নেহমিশ্রিত সুরে—তা হোক বাড়ী ফিরে যাও। এরপর আর পথ খুঁজে পাবে না।

ক্ষিপ্র গতিতে উঠে মনীষা জড়িয়ে ধরল এস· ডি· ও'র পা ঘটনাটা এত অতর্কিতে ঘটে গেল যে দণ্ডায়মান পুলিশ অফিসার পর্য্যন্ত ধারণাই করতে পারেননি, এমন কাণ্ড ঘটতে পারে।

মায়ের কাছে ফিরে মা আমাকে বাধ্য করবে—শেষ হল না তা বক্তব্য, অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল তার কণ্ঠ।

আচ্ছা পা ছাড়ো, শুনি তারপরে। তবে তো ব্যবস্থা হবে।

না, কথা দিন, মায়ের কাছে পাঠাবেন না; তবেই আমি ছাড়ব

আচ্ছা বেশ, এখন থাকবে অন্য আশ্রয়ে।

পা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মনীষা। সত্যিই সে কেঁদেছে, গালে তা দাগ রয়েছে তখনও।

এস· ডি· ও বললেন—তোমার বক্তব্য তুমি লিখে পাঠিও তারপর আমি দেখব, কি ব্যবস্থা করা যায়।

অতঃপর সব চাইতে নিরাপদ, প্রমাণিত-অপ্রমাণিত অপরাধে বিচিত্র সব মানুষের মিলনক্ষেত্র, কারাকক্ষের অন্তরালে এসে আশ্র[য়] নিতে হল তাই সেদিন মনীষাকে।

মনীষা সেদিন তরঙ্গ তুলেছিল থানা থেকে আদালত পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের মনে, জিজ্ঞাসা জাগিয়ে রেখেছিল তার কেসে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মহলের অন্তরে; আর তার বিদ্যুদ্বরণী মা-ও কম বিস্ম[য়] সৃষ্টি করেনি সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের মনে।

মনীষার কথা আমাদের কানেও পৌঁছেছিল। চাক্ষুষ পরিচ[য়] হতেই শুধালাম—কেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে এ ভাবে? মায়ে[র] স্নেহ কি এতই [illegible]দার হয়ে পড়ল এতদিন ধরে তোমায় মানুষ করবা[র] পরে?

উত্তরে সে যা বলল—তা বোধ হয় না বললেই ভাল হত অন্তত আমি এ ধরণের উত্তর প্রত্যাশা করিনি।

এ রকম কেসের অনেক মেয়েকে পিতামাতার স্নেহ-মায়া-মমতা[র] বাঁধন বিস্বাদ মনে করে বেরিয়ে আসতে দেখেছি অজানা অচেনা পথে কিন্তু তাদের মুখেও এ রকম উত্তর পাইনি। সঙ্গী-হীন জীবনে[র] একাকিত্ব ঘুচাবার মনোমত পথে পা দিয়েছে তারা। রঙ্গিন জীবনে[র] স্বপ্ন ছেয়ে ফেলেছে তাদের মনের আকাশ। যুক্তি তর্কের হিসা[ব] তারা মানেনি, মানতে চায়নি বাঁধা পড়বে বলেই তারা বাঁধন কেটেছে

বলল মনীষা—বেরোতে বাধ্য হয়েছি। মায়ের চালচলন ভালো লাগেনি; প্রতিবাদ করেছি, চুপ করে থাকতে পারিনি—এই আমার অপরাধ।

হুঁ, বুঝেছি।

হাসল মনীষা। আমার এ উত্তরে অর্থ বুঝবার মত বয়স এবং শিক্ষা-দীক্ষা তার আছে। তাই সে নিজেই ফিরে তার উত্তর দিল—

যা বুঝেছেন, তা নয় কিন্তু।

জমাদার এসে দাঁড়াল। আমাদেরও ওর সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য সরকারী ভাবে ততক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই ওকে নিয়ে যেতে বললাম।

আমার কিন্তু কতকগুলি কথা বলবার আছে আপনার কাছে।

তা আজ তো আর হবে না। আচ্ছা, কাল সকালে এস। আজকে যাও।

আমার মনেই ছিল না। ডাক্তারবাবু দৈনন্দিন রাউণ্ড সেরে এসে অফিসে বসেই প্রথমেই পাখা-ওয়ালাকে হেঁকে বললেন—জোরে।

তারপর আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—বেশ তো ছিল, এতদিন, খালি-ই ছিল ফিমেল ওয়ার্ড। ওটিকে আবার আমদানী করলেন কোথা থেকে?

আমি সংক্ষেপে বললাম মনীষার ইতিহাস, যা জেনেছিলাম এবং যা শুনেছিলাম। ডাক্তারবাবু হাতটা একবার ঘুরিয়ে বললেন—বুঝেছি, ও মেয়ের হয়ে গিয়েছে। সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটাকে ফেলে দিয়ে জুতোর তলায় চেপে বললেন ডাক্তারবাবু—আচ্ছা আসি। বলেই উঠে পড়লেন।

মনীষা খবর পাঠিয়েছিল আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

এল মনীষা। একটা রাত্রির কারাবাসের চিহ্ন যেন অপরিসীম বেদনার অসহ্য চাপ সৃষ্টি করেছে তার দেহে ও মনে। কালকের সে হাসি-খুশী চঞ্চল ভাবটা আর নেই। ধীর, স্থির, গম্ভীর হয়ে গিয়েছে সে। চিন্তার ঝড় বয়ে গিয়েছে হয়ত তার উপর দিয়ে।

বলল—আমার নালিশ আমার মায়ের বিরুদ্ধে।

বাধা দিয়ে বললাম—আমরা তো তার কিছু করতে পারিনে।

পিটিশান ফর্ম তো একখানা দিতে পারেন—ম্লান হেসে বলল।

হ্যাঁ, তা অবশ্যই পারি। এই তো কথা?

আরো আছে। মা কেন আমার উপর এমন করে—বলতে পারেন? মারধোর করতেও বাধে না। মেয়ে বলে মায়ের অনাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারব না?

গেট-ওয়ার্ডার এসে খবর দিল, একজন ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আনতে বললাম।

গেট-ওয়ার্ডার চলে গেলে মনীষা বলল—বোধ হয় মা এসেছে।

সত্যিই হয়েছে মনীষার কথা। মনীষার মা-ই বটে। বয়স হয়েছে তার, কিন্তু দেহের গঠন-মাধুর্য্য বয়সকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে। রং আজও কাঁচা সোনার মত। বিধবা। পরণে চওড়া পাড় ধুতি ছন্দ-পতন ঘটিয়েছে।

সঙ্গে একটি ছেলে এসেছিল—বছর দশেক বয়স হবে তার। শুধালাম, এটি কে?

ছেলে; আর ঐটি আমার মেয়ে।

এক অস্বাভাবিক চীৎকার করে উঠল মনীষা—না। তোমার মেয়ে নই আমি।

মা কোন কথা বললেন না। খানিক চুপ করে থেকে মনীষা নিজেই আবার বলতে লাগল—আবার এখানে এসেছ জ্বালাতে! বাড়ীতে করে আশ মেটেনি, থানাতেও ছাড়োনি, আবার এখানে—

আমি এবার গম্ভীর স্বরে বললাম—তোমার সঙ্গে তো কোন কথাই হয়নি। আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তোমার মায়ের।

এই দেখুন তো, ওর স্বভাবই ওই রকম। ভাল কথা বুঝলেও বুঝতে চাইবে না। আহত পশুর বেদনার্ত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ওর মায়ের গলায়।

নিরপেক্ষ মন্তব্য করে দুকূল রক্ষা করতে চেষ্টা করতে লাগলাম আমি—মা বাবা তো সকল সময় সন্তানের মঙ্গল-কামনাই করে থাকেন।

অস্ফুট মন্তব্য শোনা গেল মনীষার—সব মা-বাবা নয়।

মনীষার মায়ের কানে কথাটা গিয়েছিল। তিনি একটু উষ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন এবার ওকেই—কি তোমার অমঙ্গলটা করলাম, শুনি।

কি করোনি তুমি? আমি কঠিন হয়ে উঠেছিলাম বলেই পারোনি। না হলে তুমি—তুমি নিজের পথে টেনে নিতে আমাকে। তোমার ঘাটতি পূরণ করতে আমাকে দিয়ে।

দেখ, এসব কথা বলবার জায়গা নয় এটা—আমি মাঝ পথে বলতে বাধ্য হলাম।

মনীষা লজ্জিত হল। এক মিনিট চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়াল, বললে—ভিতরে যাব। বলে দিন জমাদারকে।

জমাদার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকতেই সে এসে নিয়ে গেল।

মনীষার মা এরপর যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। মনীষা চলে যেতেই আমাকে বোধহয় শুভানুধ্যায়ী হিসাবেই শুধালেন—কি করা যায়, বলুন তো?

জটিল প্রশ্ন। সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা বিষয়ের অসংখ্য জিজ্ঞাসা এই অবস্থায় 'কি করা যায়'—এর সঙ্গে জড়িত। আর ওদের ঘরোয়া খবরও আমার জানা নেই যে, এই মুহূর্ত্তে একটা সুচিন্তিত মতামত দিতে পারি। যে ঘটনার পরিণতি এই অবস্থায় টেনে এনেছে মনীষাকে, মনীষার মাকে, তারও সবটা শোনা হয়নি।

তবু এর আগে যেমন দেখেছি, সেই ভাবেই বলে ফেললাম, ও বোধহয় কাউকে ভালবাসে। সম্ভব হলে তার সঙ্গেই ওর বিয়ে দিয়ে দিন।

চমকে উঠলেন মনীষার মা। কি যেন একটু ভেবে বললেন—দেখুন, তা হয় না।

বুঝতে পারলাম না, তিনি এমন ভাবে চমকে উঠলেন কেন। এরপর তাকে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতে দেখলাম। এই অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেকে উদ্দেশ করে বললেন—এই, চল্। আচ্ছা আসি—নমস্কার।

চলে গেলেন বিদ্যুদ্‌বরণী।

তিন-চার দিন পরে এলেন আর এক ভদ্রমহিলা। বিধবা। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। দেখা করবেন মনীষার সঙ্গে।

খবর দেওয়া হল মনীষার কাছে। এল না সে। স্পষ্ট বলে পাঠাল—শরীর খারাপ, সে দেখা করতে পারবে না কারো সঙ্গে। মিথ্যা কথা ওর,—আজ সকালেও দেখেছি ওর হাসি-খুশি চেহারা, অফুরন্ত উৎসাহ কথা বলায়; তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে শরীর এমন অসুস্থ হওয়ার কথা নয় যে, ফিমেল ওয়ার্ড থেকে অফিস পর্য্যন্ত আসা চলে না!

ভদ্রমহিলা ম্লান হেসে বললেন—দেখা করবে না, সন্দেহ ছিল আমার মনে। তবু এলাম তার মায়ের অনুরোধ এড়াতে না পেরে আর আমাদের সমিতির কিছু কাজে-ও।

সমিতি! তার সঙ্গে মনীষার সম্পর্ক কি?

আছে। কিন্তু সে তো মস্ত এক কাহিনী। তবে সংক্ষে

বলে যাই, ঠিক মনীষার সঙ্গে সমিতির সম্পর্ক না থাকলেও তার মায়ের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমন কি এর থেকেই নাকি ওদের সংসার চলে অতি কষ্টে।

কিন্তু মনীষা শুনেছি ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েছে—

বাধা দিয়ে বললেন তিনি—হাঁ পরীক্ষাও দিয়েছিল, পাশ করতে পারেনি। আবারও পড়বে বলে। তবে সে-সব অন্য কথা। বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন।

আচ্ছা, এবার আমি আসি—হু' হাত তুলে নমস্কার করে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। আমিও হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করলাম। দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে কি একটা কথা মনে পড়াতে তিনি আবার ফিরে এলেন, খুব নীচু স্বরে বললেন—দেখুন, কোন পুরুষ মানুষ যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তা হলে সহসা দেখা করতে দেবেন না।

বেশ।

পুরুষ মানুষ কেউ আসেনি মনীষার সঙ্গে দেখা করতে।

সেদিন সকালে মনীষাকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলাম। এতদিন এসেছে ও, কোনদিন দেখিনি এমন। বরং চঞ্চলতায়, উচ্ছলতায় তাকণ্যে ভরিয়ে রেখেছে ফিমেল ওয়ার্ড। জমাদারণী কিছু বলতে গেলে ও স্নেহমধুর শাসন বাক্যে নিবৃত্ত করেছে তাকে—থামো তো বুড়ী। আমি জানি কি বে-আইনী। তোমার চাকরির ভয় নেই। বলে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল হয়ত।

একদিন একটা খুরপী চেয়েছিল মনীষা।

*কি হবে?—সন্দিগ্ধ সুর স্বরে পড়েছিল জমাদারণীর কণ্ঠে।*

*হেসে ফেটে পড়েছিল মনীষা। বলেছিল—রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার গলায় বসাব।*

না বাবা, ও সব অস্ত্রপাতি আমি এনে দিতে পারব না।

*সত্যিই জমাদারণী খুরপীর কথা জমাদারকে বা অন্য কাউকে বলেনি। শেষে মনীষা নিজেই একদিন বলেছিল এ-কথা।*

ওয়ার্ডের ভিতরে একটা ছোট বাগান ছিল। মনীষার ইচ্ছে ছিল, অবসর সময়টুকু ওখানেই কাটায় গাছগুলোর পরিচর্য্যা করে। তাই সে খুরপী চেয়েছিল।

আরও একদিন মনীষা বলেছিল—আমার নামে পয়সা জমা আছে, তা থেকে একখানা খাতা এনে দিতে বল আমাকে জেলারবাবুকে ব'লে।

জমাদারণী তার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিল এই বলে যে, সাদা কাগজ কোন আসামীর কাছে ভিতরে থাকতে পারে না।—বে-আইনী। আর কি হবে বাপু সাদা কাগজের খাতায়?

কৌতুক করবার লোভ সম্বরণ করতে পারল না মনীষা, তাই বলল—চিঠি লিখব।

সঙ্গে সঙ্গে জমাদারণী বলল—সে জন্যে তো আমাদের সরকারী কাগজ আছে। তাই নিলেই হয়।

সে চিঠি নয়।

পীরিতের চিঠি? চোখ মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল জমাদারণী—তা খাতা কেন? পীরিতের লোক বুঝি অনেক?

এবার মনীষা কঠিন হয়ে দাঁড়াল—দেখ, মুখ সামলে কথা বলো, বলছি। তোমাদের বুঝি ছিল অনেক বয়সকালে?

বাইরের দরজায় ধাক্কার শব্দ। জমাদার ডাকাডাকি করছে—জল দেওয়ার জন্যে। স্নানের জল, পানীয় জল নিয়ে বাইরে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যেই পা বাড়িয়েছে, তখনই জমাদারকে মনীষা বলে তার খাতার কথা। তার পয়সা থেকে একখানা খাতা এনে দেওয়া হল।

মনীষার অসুখ দেখে ডাক্তারবাবুকে সংবাদ দেওয়া হল। এলেন ডাক্তারবাবু। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা অন্তে তিনি বললেন—বিশেষ কিছু নয়, অল্পেই সেরে যাবে।

দ্বিতীয় দিনও জ্বর কমল না কিছুতেই। আবারও ডাক্তারবাবু এসে দেখলেন। এবার শোনা গেল, রাত্রিতে জ্বরের মধ্যে মনীষা মাঝে মাঝে বিড়-বিড় করে বলছে—আমি এখানে থাকতে পারব না, থাকলে মরে যাব। ব্যবস্থা করো, অবনী।

জমাদারণীর ঘুম ভেঙে গেছে হয়ত, আর শুনে ওর ভয় হয়ে গিয়েছে। ও মাথায় জল ঢেলেছে বেশি করে। তাতে খানিকটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

ডাক্তারবাবু বললেন—চলুন, চলুন অফিসে।

বেরিয়ে এলাম দুজনে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধুঁকি ... শুধালেন ডাক্তারবাবু—বুঝলেন কিছু?

হাসলাম আমিও—কিছুটা।

আচ্ছা অবনী কে? সে-ই তো, মনে হচ্ছে নাটের গুরু।

জানি না, তবে আপনি যা অনুমান করেছেন আমার অনুমানও তাই। *কিন্তু এখন তো চাকরি বাঁচাতে হলে আলেয়ার পিছনে ছুটলে চলবে না।*

আলেয়া? হাঁ, তাই বটে। তবে কি জানেন, আলেয়ার দূরের মোহটাই ওর মনে জেগে আছে।

*সিগারেট* ফেলে দিয়ে আধ-পোড়া অংশটুকু জুতোর তলায় চাপতে চাপতে বললেন—এই ধরণের কেস আজকাল এত বেশি হচ্ছে যে, আমাদেরও যেমন হয়রানির একশেষ, পুলিসেরও তেমনি।

কেন?

মেডিক্যাল একজামিনেসন, বয়স-পরীক্ষা এক্স-রে—একটা নাকি? আবার প্রায় কেসেই ওরা refuse করে পরীক্ষা করাতে—বয়স্থা মেয়ে তো। আবার ওদিকে আইনের বেড়াজালের মধ্যে ঘুরপাক খেতে হয় পুলিসকে। আমার মতে একেবারে কোর্টে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে ডেকে তার ইচ্ছানুযায়ী পথে যেতে দেওয়াই ভাল। সর্ত্ত এই থাকবে যে, যদি কোনদিন সে তার ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসতে চায়, পারবে না। অবশ্য মা-বাবাকে একটু কঠিন হতে হবে। আর একটা কথা কি জানেন, আধুনিক যুগের হাওয়াতে ভেসে বেড়ায় এমন সব প্রলোভন যাতে ছেলেমেয়েদের বয়সটাকে বুদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে দেয় না। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। কই দিন, খাতাটা দিন।

দিলাম খাতাটা। অর্থাৎ মেডিক্যাল অফিসারের 'মিনিট' বই।

ডাক্তারবাবু লিখে দিলেন—মনীষাকে বাইরের হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে। ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত হবে ওখানে।

হাসপাতালে পাঠাবার পর মনীষার মাকে আমরা একখানা চিঠি দিলাম ওর অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে। বলা হয়েছিল তাতে, ইচ্ছা করলে নিজের খরচে তিনি এসে ওকে দেখে যেতে পারেন।

বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধু, আমায় ক্ষমা কর।

নিজের অন্তর দিয়ে একদিন আমার অন্তরটা পরিষ্কার দর্পণের ত পড়তে পেরেছিলে। সে কথা দ্বিধা সংকোচে লজ্জায় আটকে াসছিল আমার মুখে, তুমি এগিয়ে এসে সেই থেমে পড়া বাক্যটি ড়িয়ে নিয়েছিলে। অত্যন্ত সহজ গলায় হাসি মুখে বলেছিলে, ভালবাসি, এই ত।'

তোমার সহজ সুন্দর হওয়ার এই প্রচণ্ড ক্ষমতায় আমি যুগপৎ বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম। সঙ্গে নিজের অক্ষমতায় কিছুটা জ্জিত ও বিব্রতও। আমার লজ্জিত, বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে মি আমার পিঠে আলতো ভাবে হাতটা রেখে খুব নীচু স্বরে প্রায় াস গলায় বলেছিলে—'আমি ও!'

ওটা সুরুও নয়, শেষও নয়। সুরু তারও আট মাস আগে। ষ অঙ্ক গত কাল সমাধা হয়ে গেছে তোমার অগোচরে। আজ এই ঠিটা অবশেষ মাত্র।

মাধু, মানুষের হৃদয়কে জয় করবার অফুরন্ত সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তামার চেহারায়, চরিত্রে। সেই সবার হৃদয়কে হাসি মুখে পাশ াটিয়ে কাটিয়ে কি করে আমার মত একটি সাধারণ চেহারার, তারো য়ে সাধারণ চরিত্রের একটি ছেলের হৃদয়ে স্থান খুঁজে নিলে, ভাবতে ালে আমি বিস্ময় বোধ করি, সাথে অফুরন্ত গর্ব্বও। হাঁা মাধু, গর্ব্ব রবার মতই মেয়ে তুমি। তোমাকে ত আজ দেখছি না। দেখছি ই তিনটি বছর ধরে। আর আট মাস ধরে তোমাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে নেছিও। সত্যিই তুমি অনন্যা।

কিন্তু ভিখারী হ'য়েও সে রাজেন্দ্রাণীর প্রত্যাশাকে প্রত্যাখ্যান রে নিজে শতটা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছি, তার জন্য কে দায়ী। মাধু, তুলের জন্যই এই শেষ সিদ্ধান্ত আমায় নিতে হোল। আজকের নটি তোমার আমার চোখে একটি অনাস্বাদিত আনন্দের দিন ব'লে র্দ্দিষ্ট ছিল। আমি জানি, সারারাত তুমি আগত দিনটির কথা ভবে ভেবে খুশীর জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। চেষ্টা করেও চোখের পাতা এক করতে পারনি। প্রত্যাশিত এই দিনটির প্রতীক্ষায় তুমি যে কি আকুল হ'য়ে সময় কাটাচ্ছিলে, সে কথা আমার চেয়ে আর কে বেশি জানে!

আর তোমার সেই আনন্দের রাত-জাগা চেহারাটা স্মরণ করতে করতে আমারও রাত ভোর হ'য়ে গেছে, চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। দুঃখে বেদনায় আমার চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আমাকে যেন বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। একবার নিজের দিকে চেয়ে অবাক হ'য়েছি। কেন আমি এমন করছি! কিসের জন্য? সে আমার সুখ, সে আমার আনন্দ, সে আমার জীবন, যার আমার সুখে সুখ, আমার আনন্দ অন্তরে প্রতিবিম্বিত হয়, তাকে কার ভয়ে, কিসের আশঙ্কায়, কোন দুর্ব্বুদ্ধির তাড়নায় সরিয়ে দিচ্ছি। নিজের হাতে এ মৃত্যু আমি কিসের জন্য টেনে আনছি আপন জীবনে। মিতুলের জন্য, মাধু মিতুলের জন্য।

সবাই বলত, আমি লাজুক, মুখচোরা। হয়ত তাই। নয়ত তোমার সাথে সেই প্রথম দিন থেকেই ত' আলাপ হ'তে পারত। সেই তিন বছর আগে! সহকর্ম্মীরা প্রত্যেকেই ত' তোমার সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

আমি পারি না। মেয়েদের সাথে সহজ ভাবে মিশতে না পারার লজ্জা আমাকে আরো লাজুক করে তুলছিল।

আমি দেখতাম, আরো পাঁচটি মেয়ের সাথে এক হ'য়ে মিশছ, হাসছ, ফাইল লেজার খাতায় কাজে ডুবে যাচ্ছ, সহকর্ম্মী সহকর্ম্মিণীদের সঙ্গে মাত্রা রেখে হাসি ঠাট্টাও করছ, সব শেষে বাড়ী ফেরার আগ্রহে আর পাঁচজনের মতই শেষ সময়টুকুর জন্য উদ্‌গ্রীব আগ্রহে কব্‌জি উল্টে ঘড়ি দেখছ ঘন ঘন।

সব কিছু পাঁচজনের মত হোলেও, সত্যিই তুমি পাঁচজনের মত সাধারণ ছিল না। পরিমিতিবোধ, মাত্রা রেখে চলা, বলা, হাসা, বসা তোমাকে একটি সুন্দর ব্যক্তিত্বে প্রস্ফুটিত ক'রে রেখেছে। যেন একটা গণ্ডি পর্যন্ত অগ্রসর হ'বে, তার বেশি এগোনার সাধ্য নেই তোমার কাছে। তোমার এই সপ্রতিভতাযুক্ত

ব্যক্তিত্ব আমার মনে শ্রদ্ধার ভাব এনে দিত। হয়ত আমার এটুকুর অভাব ছিল ব'লেই।

ব্যক্তিগত ভাবে তোমার সাথে পরিচয় না থাকলেও, তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জেনেছিলাম। শুনতাম আমার সহকর্মীদের মুখে। আর পাঁচটি মেয়ের চেয়ে তোমার আলোচনাতেই ওরা উৎসাহ পেত বেশি। এতে আমি দোষ দেখি না। আমি নিজের মন দিয়েই ত বুঝতে পারছিলাম, যে না মিশেও তোমাকে কত ভাল লাগা যায়। কিন্তু আলোচনার মোড় যখন তোমাকে ঘিরে কুমারী মেয়ের আলোচনার মত নানান রস'সঞ্চিত বাক্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠতে চাইত, বিষণ্ণ ও বিরক্ত চিত্তে আমি সে স্থান থেকে উঠে আসতাম। আমার মনে হোত একটি পবিত্র দেবীমূর্ত্তিকে ওরা যেন কাদাজলে ছিটিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

কারণ সর্ব্বাংশে কুমারীর মত দেখালেও তুমি ত কুমারী নও। পতিহারা একটি কন্যার জননী। আর ঐ উৎসুক ব্যাকুলতা বাড়ী ফেরার; তোমার সেই তৃষ্ণার্ত্ত মমতাময়ী স্নেহান্ধ মাতৃমূর্ত্তিটি আমার হৃদয়ে কি একটা আবেগের সৃষ্টি করত যে!

সেই প্রথম দিনটির কথা তোমার মনে আছে মাধু?

কি আকস্মিক ভাবেই না পথের মাঝখানে দেখা হ'য়ে গেল! যেন এটুকুরই অপেক্ষা ছিল মাত্র। ভেতরে ভেতরে সত্যিই কি নিজেদের অজ্ঞাতেই আমরা এতদূর এগিয়ে ছিলাম! নয়ত এত দ্রুত পরিণতির দিকে আমরা ছুটে গেলাম কি ক'রে? চাক্ষুষ পরিচয় ছাড়া মৌখিক আলাপ তোমার সাথে কটা হ'য়েছে, হাতের কড় গুণে বোধহয় ব'লে দেওয়া যেত।

বাসটা ধরবার জন্য আমি প্রায় ছুটছিলাম। কাঁধে চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে পরিচ্ছন্ন বেশবাসে, একটি সুন্দর ফুটফুটে নধরকান্তি বছর আট ন'য়েকের কন্যার হাত ধরে রাস্তা পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলে তুমি। ঠিক এ সময়েই আমার চোখে চোখ প'ড়ে গেল। ট্রামটার জন্য আমিও আটকা প'ড়ে গিয়েছিলাম। ওটা পেরিয়ে গেলেই ছুটে ও ফুটপাতের বাসটা ধরব। কিন্তু তার আগে তুমিই আমায় ধরে ফেললে—ও-মা, আপনি এখানে! এদিকে থাকেন নাকি?

সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগে বাসটা হাতছাড়া হ'য়ে গেল। বিব্রত স্বরে বললাম—না, এদিকে থাকি না। এমনি···

বেড়াতে এসেছিলেন বুঝি? তা চলুন না আমাদের বাড়ী! এই ত সামনেই···

আমি সহজ হবার চেষ্টায় সত্য কথা বলতে চাইলাম—ঠিক বেড়াতে নয়। এই একটু কাজে······

তারপর মেয়েটির গাল টিপে দিয়ে আদর জানিয়ে বললাম—আপনার মেয়ে বুঝি?

তুমি হেসে বললে—হ্যাঁ। তারপর মেয়ের দিকে চেয়ে বললে—মিতুল, তোমার আরেকটা কাকু। দিলীপ কাকু।

আমার দিকে চেয়ে বললে—অফিসের অনেকেই আমার বাড়ীতে বেড়াতে আসেন। মিতুর তাই অনেক কাকু। আসুন।

এক সাথেই রাস্তা পার হোলাম আমরা। একটু ইতস্তত ক'রে আমি ষ্টপেজটার কাছে দাঁড়াতে চাইলাম। তুমি কৃত্রিম ধমকের স্বরে বলে বলে উঠলে—কিসের এত তাড়া বলুন ত! রোববারে না হয় একটু সময় নষ্ট হোলই। আসুন, আসুন।

আপত্তি জানবার মত কিছু আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বাধ্য হ'য়েই সঙ্গ নিতে হোল।

মেয়েটি কলকল ক'রে কথা বলছিল। তুমি মাঝে মাঝে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলে; কখনও একটু বিরক্তি ভাব নিয়ে মৃদু ধমকে থামতে বলছিলে। কিন্তু মিতুলের বয়সটাই এমন, যে সমস্ত কিছুই তার কৌতূহলের উদ্রেক করে। আর কৌতূহল নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজেও শান্তি পায় না, অন্যকেও শান্তি দেয় না।

আমি বললাম—খুব চঞ্চল বুঝি? কিন্তু খুব চালাক মেয়ে।

মিতুলের দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলাম—নাম কি তোমার?

মিতুল মার কাঁধে ঝোলান ব্যাগটা নিতে চাইছিল। উত্তর না দিয়ে নাকিস্বরে আব্দার ধরল—ব্যাগ দাও। আমার ব্যাগ দাও।

—ছিঃ। নাম জিজ্ঞেস করলেন, বললে না। বল, নাম বল।

মিতুল অপ্রসন্ন চোখে আমার দিকে চেয়ে দায়সারা ভাবে কর্ত্তব্য সারল—আমার নাম মধুমিতা সেন। এবার দাও।

আমরা দু' জনেই হেসে উঠলাম। তুমি কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে এনে ওর হাতে তুলে দিলে। ভেতরে ঘুঙুরের ঝুম ঝুম শব্দ কানে এলো। আন্দাজ করলাম মেয়েকে নাচের স্কুল থেকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছ।

মিনিট পাঁচ সাতের হাঁটা পথটুকুতে মিতুলের কথাই শুনতে শুনতে এলাম। একবার তুমি মেয়েকে আদর করে ধমক লাগালে—এই নূতন কাকু তোমার কি নিন্দে করবেন, দেখ! এত কথা বললে কেউ ভাল বলে? আমার দিকে হেসে বললে—ওর কথার উত্তর দিতে আর শুনতে কান মুখ আমার ঝালাপালা হওয়ার যোগাড়। বিশ্বশুদ্ধ ওর জানা চাই। মাতৃত্বের মধুর একটি বাৎসল্যের হাসি তোমাকে অপরূপ করে তুলেছিল। একটি হলদে রংয়ের ছোট দোতলা বাড়ীর সিঁড়িতে পা দিলে তুমি। ঠিক মুখোমুখি উল্টো দিকের বড় ফ্ল্যাট বাড়াটায় আমি একবার নজর বুলিয়ে নিলাম, এই কিছুক্ষণ আগে এই বাড়ীটার দোতলার একটি ফ্ল্যাট থেকেই বিদায় নিয়েছি কে জানত, তোমার এত কাছাকাছি দু' ঘণ্টা ক'রে সময় কাটিয়ে যাচ্ছি। আমাকে ওদিকে তাকাতে দেখে তুমি জিজ্ঞেস করলে—ও বাড়ির কাউকে চেনেন নাকি?

—ও বাড়ীতে এই মাস দুয়েক যাবৎ একটা টিউসনি নিয়েছি দোতলার ফ্ল্যাটে। কে জানত, যে আপনি এত কাছে থাকেন!

আমি বেশ সহজ হ'য়ে উঠছিলাম।

তুমি শুধু হেসে বললে—ও-মা! দেখুন দিকি কাণ্ড! রোজ আসছেন, অথচ একদিনও দেখা হ'চ্ছে না।

এটি তোমার পিতৃগৃহ। বাপ-মা ভাই-বোনের স্বচ্ছল সংসার কিন্তু চাকরি নেওয়ার পর তুমি নিজেকে পৃথক ক'রে একপাশে সরিয়ে এনেছ। দোতলার একেবারে কোণের ঘরে তোমার সংসার দেখলাম। সুন্দর ছিমছাম সাজান ঘরটি। এককোণে যৎসামান্য রান্নার সরঞ্জাম। একটা ষ্টোভ, একটা ডিটার।

ঘরে এসে ষ্টোভ ধরিয়ে চায়ের কেটলি চাপিয়ে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলে। টেবিলের সামনের চেয়ারটাতে আমি বসেছিলাম। আমার ঠিক মুখোমুখি দেওয়ালে, তোমার পেছন দিকে একটি বড় অয়েল পেণ্টিং করা সুদর্শন যুবকের ছবি। মিতুলের মুখটি যেন হুবহু বসান। চিনতে কষ্ট হোল না।

আমি মিতুলকে কাছে টানতে গেলাম। মিতুল ধরা না দিয়ে ছুটে পালাল, তুমি স্নেহার্দ্র স্বরে অভিযোগ করলে—অস্থির একেবারে! একমুহূর্ত্ত যদি স্থির হ'য়ে থাকে!

তারপর হঠাৎই বলে উঠলে—আপনি বড় লাজুক। এত লজ্জা কিসের বলুন ত!

যতটুকু সহজ হ'য়ে এসেছিলাম, সব আবার মিলিয়ে গেল। একটি মেয়ের মুখে পুরুষের লজ্জার কথা শোনার চেয়ে লজ্জার বোধ হয় আর কিছু নেই।

বিব্রত হেসে বললাম—না, না লজ্জার কি আছে!

তুমি আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসি চাপলে। চা খেতে খেতে অফিস, বাড়ী, সিনেমা, রাজনীতি, অফিসের দু'-চারজনের ব্যক্তিগত গল্প, আমার মা ভাই বোনের গল্পের ভেতর কখন যে আবার সম্পূর্ণ সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিলাম, বুঝতেই পারিনি। তোমার শোনার এবং বলার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার সুর বাজছিল যে আমার বলার মধ্যে আমি একটি আনন্দের সুর অনুভব করছিলাম। হঠাৎ দমকা বাতাসের মত মিতুল কোথা থেকে ছুটে এসে তোমায় দু' হাতের বেড়ে জড়িয়ে ধরল। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে মেয়ের হাত ছাড়িয়ে দিলে। আমারও চমক ভাঙলো। গল্পে এমন মেতে গিয়েছিলাম, যে সময়ের আর হিসেব ছিল না। ফেরার পথে তুমি গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে হাসিমুখে বললে—ছাত্র পড়িয়ে সময় সুযোগ পেলে আসবেন মাঝে মাঝে। হেসে সম্মতি জানিয়ে আমি রাস্তায় পা বাড়ালাম।

শুধু যেন এই ক্ষণটুকুরই অপেক্ষা ছিল! তারপর কত দ্রুত, নির্দ্বিধায় আমরা পরস্পরকে চিনে নিলাম! একটি মধুর পরিসমাপ্তির জন্যে উভয়েই ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলাম। আমার বিধবা মায়ের সম্মতি আদায় করতে কিছু সময় চেয়েছিলাম তোমার কাছে। তোমার বাবা, দাদা এ বিষয়ে উদার ও আধুনিক। মেয়ের সুখই তাদের কাম্য। তাঁরা সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন।

মাও ছেলের সুখই চেয়েছিলেন। কিন্তু আজীবনের সংস্কার তাঁকে পথ আটকে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু যবে থেকে আমার হাসিমুখ গম্ভীর হোল, সব-কিছুতে একটা বৈরাগ্যের ভাব লক্ষিত হোল, মা ভয় পেয়ে আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন—দীলু, অমন মুখভার ক'রে থাকিস না বাবা! আমার বড় কষ্ট হয়। তুই যাতে সুখে থাকিস, সেই আমার সুখ। আমার আর আপত্তি নেই।

এটুকু ছলনায় ভুলিয়ে মার সম্মতি আদায় করলাম। তুমি হেসে বলেছিলে—যদি মা এততেও রাজী না হ'তেন?

আমি বলেছিলাম—মাকে চিনি ব'লেই ত' ঐ সম্মতির ওপর অত জোর দিয়েছিলাম, নয়ত মার কুপুত্র হ'য়ে তাঁর সম্মতি-অসম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই সুখী হ'তে পারতাম।

মাধু, তোমার-আমার মাঝে আর কোন গোপনীয়তা ছিল না। তুমি তোমার বিবাহপূর্ব্ব জীবন ও বিয়ের পরের ছটো বছরের অফুরন্ত সুখের গল্প আমায় শুনিয়েছিলে। মিতুলের বাবার কথা বলতে বলতে শেষের দিকে গলা ভার হয়ে এসেছিল। তার শেষ দিনের খুঁটিনাটি আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে তোমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। নিত্যদিনের মত খেয়েদেয়ে সুস্থ মানুষ আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে আদর করে তার জন্য উৎকণ্ঠা মনে নিয়ে অফিস বেরিয়ে গেল। তুমি স্বামীকে নিজের শরীর সম্বন্ধে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলে। প্রয়োজন হলে পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে দিয়ে ফোন করবে, সেটুকু ভরসা দিয়ে স্বামীকে অফিস পাঠালে।

বোধ হয় আধঘণ্টাও হয়নি। নাইতে যাবে ব'লে তেল ঘষছিলে মাথায়। এমন সময় সমস্ত আকাশটাই যেন মাথার ওপর ধ্বসে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লে মেঝেতে। এই প্রচণ্ড আঘাত দেহে মনে সহ্য করা তোমার পক্ষে যে কতখানি মর্ম্মান্তিক হয়েছিল, সে আমি বেশ বুঝতে পারি। জ্ঞান ফিরে এলে আর এক সৃষ্টির বেদনায় তুমি কাতর হ'য়ে উঠেছিলে। শেষ আর শুরুর সেই অবর্ণনীয় অবস্থার কথা বোঝাতে গিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলে। আমি বুঝেছিলাম, ভাষা দিয়ে বোঝানোর ক্ষমতা তোমার নেই। অন্তর দিয়েই আমি সেটা স্পর্শ করতে পেরেছিলাম। একটি হাত তোমার পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে একটি সমব্যথী হৃদয়ের সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পেয়েছিলাম।

তুমি মুখে হাতচাপা দিয়ে কান্নাচাপা স্বরে বলেছিলে—বাসের চাকায় থেতলে যাওয়া চেহারাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না দিলীপ। সে যে কি অসহ্য কষ্ট···

দৃশ্যটা যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। বলেছিলাম—তোমার মিতুল আছে। ঐ তোমায় ভুলিয়ে দেবে তোমার কষ্ট! মাধু, এমন উতলা হ'য়ো না।

তুমি আমার হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে আবেগ-মথিত স্বরে বলেছিলে—মিতুলকে নিয়ে আমি অনেক ভুলেছি সত্যি দিলীপ! কিন্তু কষ্ট কি শুধু মনের?

দিলীপ, লজ্জা পেও না। আমি আগে তোমার মনের ঐশ্বর্য্য দেখেই ভুলেছিলাম। কিন্তু মনটা ত' দেহছাড়া নয়। সুপ্ত কামনা আমায় পাগল ক'রে তুলেছে। দেহে-মনে আমি তোমার প্রার্থনা করছি। দিলীপ, কাঁপছ কেন?

সত্যি কাঁপছিলাম। একটু আগে তোমার কান্নাভরা মুখ আমায় বেদনায় আপ্লুত ক'রে তুলেছিল। আমি জানি, কঠিন, অপ্রিয় যে-কোন সত্যই তুমি প্রকাশে দ্বিধা কর না। সত্যকে আবরণ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা তোমার নেই। তোমার দুঃখটাও যেমন নির্ভেজাল, তোমার এই নির্লজ্জ উক্তিটার ভেতরও কোন ভাবাবেগ নেই।

কিন্তু আমি ত' দুর্ব্বল। সুপ্ত কামনাকে বাঁধ দিয়ে দিয়ে আটকে রাখার যন্ত্রণায় আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি প্রতি মুহূর্ত্তে। তোমার এই স্পষ্ট স্বীকৃতির মাঝে আমার সেই বালির বাঁধ ধ্বসে পড়তে চাইছিল, দুর্ব্বার চেষ্টায় নিজেকে ধরে রাখতে আমি কাঁপছিলাম থরথর ক'রে।

কিন্তু পারছিলাম না। বালির বাঁধ আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল শেষ পর্য্যন্ত। দৃঢ় নিষ্পেষণে আবদ্ধ করে আমার শরীরের সাথে এক করে মিশিয়ে দিতে চাইছিলাম তোমাকে। তুমি কি আপত্তির কথা তুলতে যাচ্ছিলে, মুখ দিয়ে তোমার মুখ চেপে ধরলাম।

পার্ক থেকে ফিরে এসেছে মিতুল। বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে পরদার কাপড়টা দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে এদিকে! তুমি ছুটে গিয়ে ওকে টেনে আনার আগেই, ও ছুটে পালাল। কপালে হাত চাপা দিয়ে আমি বসে পড়েছিলাম। সে মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যু কামনা করছিলাম। ঈশ্বর, এই পশুত্ব থেকে আমায় মুক্তি দাও!

আর কি অসাধারণ তোমার মনোবল। এগিয়ে এসে আমার কাঁধে আলতো একটা হাত রেখে যেন আমাকে সান্ত্বনার সুরে বললে—রেজেষ্ট্রী অফিসে একবার খোঁজ নাও। যতশীঘ্র বিয়েটা সেরে ফেলা দরকার।

তারপর একটু হেসে বললে—মিতুলকে তোমার এত ভয়?

ভয়? হ্যাঁ, সে মুহূর্ত্তে মিতুলকে আমি ভয়ই করেছিলাম। মিতুলের চোখে আমি বিদ্যুতের প্রতিভাস দেখেছিলাম। দেখে ছিলাম কান্না আর আগুন মিশে গিয়ে কি এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

দেখেছিলাম ঐ কচি কমনীয় টুসটুসে মুখটিতে ঘৃণা আর আশঙ্কা মিশে বিকৃত হ'য়ে গেছে।

অথচ মিতুল আমায় ভালবেসেছিল। দিলীপ কাকু বলতে ইদানীং সে অজ্ঞান। নিয়মিত আমার হাতের বিস্কুট, লজেন্স আর মজার মজার গল্প শুনে সে আমার বাধ্য হয়ে উঠেছিল। আর আমার দিক থেকে ঐ সুন্দর মাখন নরম শিশুটিকে ভালবাসার তাগাদা ত' ছিলই। তোমাকে আর মিতুলকে আমি অবিচ্ছিন্নভাবেই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম। সামান্য অদর্শনে মিতুল আমার উপর অভিমান করত—এত দেরী করে এলে কেন? তোমার সাথে আর কথা বলব না। কক্ষণো না। একেবারে আড়ি।

আমি তার কোমল শিশু শরীরটি বুকের কাছে টেনে এনে অপরাধীভাবে মাপ চাইতাম—না, না। মিতু সোনা আর কক্ষণো দেরী হবে না। তোমার কথা বন্ধ হ'লে আমায় কাঁদতে বসতে হবে।

মিতুল আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আদর করত—আচ্ছা, আচ্ছা। আড়ি তুলে নিলাম।

আমাদের এই মান ভাঙ্গান খেলায় তোমার মুখে সে কি এক অপার্থিব আনন্দের হাসি ফুটে উঠতে দেখেছি, অমন সঞ্চয় আমার এই উনত্রিশ বছরের জীবনে আর এক কণাও নেই।

সেই মিতুলের চোখে আমি বিদ্রোহের আগুন ঝলসে উঠতে দেখলাম। যে পিতাকে সে চক্ষেও দেখেনি, একমাত্র পিতৃনাম ছাড়া যার আর কিছুই সম্বল নেই, সেই পিতার প্রতিভূ হ'য়ে সে যেন তার মান রাখতে তার এত ভাল লাগা দিলীপ কাকুর শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল। ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তার জলভরা আগ্নদৃষ্টি আমার ওপর স্থির নিবদ্ধ হয়েছিল।

মাধু, ন' বছর বয়সটা কি সত্যই অবজ্ঞা করার মত! কিছু বুঝতে না পারার কষ্ট, আর আধ বোঝা অনুভূতিটার আশঙ্কা, ভয়, এ বয়সটাকে অনেক সময় হৃদয়হীন ক'রে তোলে, অল্প বোঝার যন্ত্রণার সাথে অনেক কল্পনা অবাস্তবতা মিলে এ কিশোর বেলাটা পরিপূর্ণ থাকে। তা ছাড়া মিতুলের বুদ্ধিও তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছিল।

ফলে কি এক আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মেয়েটা সর্ব্বদা সতর্ক হ'য়ে থাকত। তোমার আমার একাকীত্বে ও বিশ্বাস হারিয়েছিল। ধমকেও তুমি ওকে আমার উপস্থিতিতে বাইরে পাঠাতে পারতে না। অবাধ্য মেয়ের মত মুখ গুঁজে ও খাটের এককোণায় পুতুলের বাক্স নিয়ে বসত। মিতুলের সেই কলকলানিও আমার সামনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে মিতুল আমায় তার সবচেয়ে বন্ধু ব'লে জেনেছিল, সে মিতুল এই পনেরটা দিন আমায় এড়িয়ে গেছে। লজেন্স বিস্কুট হাত থেকে তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়েছে। অবশ্য তোমার অলক্ষ্যে। আদর করে কাছে টানতে গেছি কেমন নিস্পৃহ স্বরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে—ভাল লাগছে না। ছেড়ে দাও।

মাধু, আমি ভয় পাচ্ছিলাম। সত্যিই আমি আতঙ্কিত হ'য়ে উঠছিলাম। তুমি এ সব একেবারেই বুঝতে পার নি। হয়ত মিতুল তোমার চোখে এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু ছাড়া আর কিছুই নয়। এতটা তার সম্বন্ধে আন্দাজ করা তোমার পক্ষে ধারণাতীত। তুমি এই পনের দিনে আমার ভাবান্তরও লক্ষ্য কর নি। আমিও মিতুলের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনছিলাম! কি একটা সূক্ষ্ম অপরাধ বোধ মিতুলকে আমার বিচারক আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছিল যেন।

কিন্তু তোমার আসন্ন মধুর চিন্তায় এ পালা, বদলের দৃশ্য মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় নি। আমার অন্তরে মিতুলের স্থান, আর মিতুলের অন্তরে আমার স্থান, সেই পুরোণো সুখ, আনন্দ তোমাকে উদ্বেল ক'রে তুলেছিল। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছিলে, যা নিয়ে তোমার চরম দুশ্চিন্তা হওয়ার কথা, সেই কঠিন পরীক্ষাটারই কি সুন্দর পরিণতি, ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানিয়েছিলে। ভালবাসার সাথে আমার উপর সামান্য কৃতজ্ঞতা আর মিতুলের উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবোধ। ইদানীং তুমি মিতুলের কাছেও যে কতটা উচ্ছল ও অবারিত হয়ে উঠছিলে সে আমার চোখকে এড়িয়ে যায় নি। ভেবেছিলাম ওটুকু চেপে না রাখতে পারা খুশী, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি ওটা বোধহয় কিছুটা কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতি স্বরূপ ঘুষও।

মাধু, যেদিন তোমার কাছে মিতুল অভিযোগ আনত, সেদিন কি বলে ওকে বুঝ মানাতে? তুমি বুঝতে পারনি, মিতুল তোমার কাছ থেকেও কত সরিয়ে নিচ্ছিল নিজেকে। তুমি ঠাট্টা করে বলেছিলে—মিতুল আজকাল কি রকম লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে উঠেছে, দেখেছ দিলীপ! ন' বছর পুরে দ'শে পড়ল যে! বড় হয়ে গেছে; না মিতু সোনা!

তোমার আদরের ফাঁস থেকে মাথা গলিয়ে মিতুল ধীর পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

তুমি সামান্য চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিলে—কি যে হোল মেয়েটার!

আমি একবার ভেবেছিলাম, আমার সন্দেহের কথাটা প্রকাশ করি। কিন্তু মাত্র চারটা দিন আর বাকী। ভেতরের উন্মুখতা আমার মনকে চোখ ঠেরে সরিয়ে দিল। মনকে এই বোঝালাম—ওটা নিতান্তই আমার মনগড়া। নয়ত সর্ব্বাগ্রে মিতুলের পরিবর্ত্তন তোমারই ত চোখে পড়ার কথা। তুমি যখন নিশ্চিন্ত, আমি কেন ভেবে মরি?

তারপর গতকাল! দু' জনেই ছুটি নিয়েছিলাম মাস খানেকের। অফিসের বন্ধুরাই সাক্ষী সাজার জন্য উদ্গ্রীব হ'য়েছিলেন। তোমার দাদাও।

সারাটা বিকাল দু'জনে ঘুরে ঘুরে দু'জনের তহবিল থেকে একরাশ জিনিষ পত্র কিনলাম। আমার টাকা দিয়ে কিনলাম তোমার শাড়ী সায়া জামা, গলার হার। তুমি কিনলে ধুতি, পাঞ্জাবীর কাপড়, আংটি, বিছানার চাদর, আরো টুকিটাকি কত কি!

তোমার ঘরে ঢুকে একরাশ হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। অফিস ছুটির পর সব দল বেঁধে এসে হাজির হয়েছে। আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে ওরা। ফুল এনেছে কে! কাঁচের গ্লাসে ইতি মধ্যেই সাজিয়ে রেখেছে। ওরা আবদার ধরল, এমন নিয়েমিষ বিয়েতে চলবে না। কাল ওরা আসবে। ঘর সাজাবে, বর কনে সাজাবে। হুল্লোড় করবে। দোকান থেকে খাবার আনিয়ে শুভদিনে ওদের মিষ্টিমুখ করাতে হবে।

হাসি ঠাট্টার সাথে ওরা কাড়াকাড়ি করে কাপড় জামা জিনিষপত্র দেখতে লাগল। মিতুলকে আমি কোথাও দেখতে পেলাম না। কে যেন জিজ্ঞেস করল তোমাকে—মিতুল কোথায়?

তোমার চোখমুখ দিয়ে খুশী উপচে পড়ছিল। হেসে বললে—নীচে মার কাছে।

আর একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করলাম। দেওয়ালে তোমার স্বামীর ফটোটি নামিয়ে ফেলা হয়েছে। চৌকো এক টুকরো দেওয়াল ঢাকা পড়ে থেকে আশ পাশের দেওয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অত্যন্ত বেশি সাদা প্রকট বেমানান দেখাচ্ছে। যেন সযত্নে নিজেকে আলাদা করে রাখতে চাইছে।

উন্মনা হ'য়ে পড়েছিলাম। মিতুলের ভয়টা আবার আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে চাইছিল, কে একজন আমার কাঁধে হাত রেখে আমায় অভিনন্দন জানাল—তুমি ভাগ্যবান দিলীপ। যাহোক, আমরা কাল আসছি। সৌভাগ্যের দিনে বন্ধুদের স্মরণ রাখতে হয়, জান ত!

ওরা ফিরে যাওয়ার পর আমিও উঠে দাঁড়ালাম। কিছু কাজ আমার বাড়ীতেও আছে। মা অনুষ্ঠান বাদ দিতে চায় না। যৎসামান্য হলেও তার আয়োজন কম নয়।

তুমি এলোমেলো হ'য়ে যাওয়া ঘরদোর গুছোতে গুছোতে বললে—যাবার পথে খাবারের দোকানে অর্ডার দিয়ে যেও। সব মিলিয়ে ওরা জনা তিরিশেক হবে।

বললাম—আচ্ছা।

তুমি বললে—মিতুলকে নীচ থেকে পাঠিয়ে দিও ত! জামাটা ওর গায়ে ফিট্ করবে কি না কে জানে! তাড়াতাড়ি ওর মাপটা নিয়ে যাওয়া হয়নি। সুন্দর দামী লাল টুকটুকে একটা ফ্রক কিনেছি মিতুলের জন্য। পছন্দটা অবশ্য তোমার। সমস্ত কিছুর উপর একটা গুনগুনানী গান অন্তর থেকে ওঠে আসতে চাইছিল।

—এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা সফল হোল কার!

নীচে নেমে তোমার মার ঘরে উঁকি মারলাম—মিতুল আছে?

তাড়াতাড়ি উনি উঠে এলেন। নিজের মায়ের মতই উনি আমাকে স্নেহ করেন। বস্তুত তোমাদের বাড়ীর প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর স্নেহ আমি পেয়েছি। তোমার মা, বাবা, দাদা, বৌদি, বিধবা বড়দিদ। তুমি বলেছিলে, আমার মত শান্ত নম্র লাজুক ছেলেকে ভাল না বেসে নাকি পারা যায় না! আসলে মিতুলের ওপর আমার আন্তরিক টানটাই ওঁদের চোখে স্নেহাঞ্জন বুলিয়ে দিয়েছিল।

মা বললেন—এই ত ছিল। বোধ হয় উপরে গেছে।

নিশ্চিন্ত মনে আমি পা বাড়ালাম।

টানা বারান্দা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি। হঠাৎ আমার চোখ গেল একেবারে বারান্দার শেষ কিনারে। ঘন অন্ধকারে পা ঝুলিয়ে কে যেন বসে আছে! কে, মিতুল? চোখকে তীক্ষ্ণ করে চেয়ে দেখি, হ্যাঁ মিতুলই বটে।

অকস্মাৎ আমার পা যেন মাটিতে গেঁথে গেল। যে অন্ধকারকে মিতুলের যমের মত ভয়, সেই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন আঁধারে সমস্ত ভয় ভাবনার উর্দ্ধে উঠে ওখানে সে কি করছে? অল্প ফোঁপানির শব্দ আসছে। মিতুল কি কাঁদছে?

সবলে নিজেকে শিকড় ছেঁড়ার মত তুলে নিয়ে ধীর পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।

হ্যাঁ কাঁদছে। বারান্দার দেওয়ালে কপালটা রেখে কি এক দুঃসহ কান্নায় ভেসে যাচ্ছে মেয়েটা। সে যে কি করুণ অসহায় একটি ভঙ্গি।

সেকেণ্ড কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে ওর পাশে বসে পড়লাম। কি বলব! কি জিজ্ঞেস করব! শুধু আলতো ভাবে একটা হাত রাখলাম ওর কাঁধে। আমার সেই স্পর্শের মধ্যে অপরাধ স্বীকারের ছোঁওয়া ছিল।

চমকে উঠে মিতুল আমার দিকে মুখ ফেরাল। পর মুহূর্তেই যেন বন্য বাঘিনীর মত ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল।

আমার সেই হাতটি টেনে নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে কামড়ে ধরল। শুধু তাই নয়, হাতটা দাঁতে ঝুলিয়ে রেখে মুঠো ভরে আমার চুল খামচে ধরল। কামড়ে, আঁচড়ে, খামচে সে তার ভেতরের অবরুদ্ধ আক্রোশের যাতনায় যেন শতধা হ'য়ে ফেটে পড়তে চাচ্ছিল। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তার সেই ক্ষিপ্তোন্মত্ত আচরণের ভেতর তার জ্বালা যন্ত্রণা স্পষ্ট পড়তে পারছিলাম।

মুখে সে কিছু বলছিল না। শুধু ফোঁপাচ্ছিল মাঝে মাঝে। আর ফুঁসছিল ও।

আমি তার সমস্ত ঝড়-ঝাপটা গা পেতে সইলাম। যখন ও হাঁপিয়ে পড়েছে, বললাম—মিতুল, আর আমি আসব না। আর তোমার ভয় নেই। এবার ঘরে যাও। তোমার মা তোমাকে ডাকছেন।

কি বিচিত্র শিশু চরিত্র। শত্রুকে পরাজিত করে মিতুল আবার আমাকেই জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

আমি তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে রইলাম বুকে। এক সময় সে নিজেই আমার কোল থেকে উঠে দাঁড়াল। ওর মায়ের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম—মিতুল, আমার মিতুসোনা······

একটা কথা না বলে মিতুল ছুটে গেল সে ডাকের দিকে। অনেকদিন পর আবার সে বোধ হয় তার মাকে পুরোন দিনের মত জড়িয়ে ধরবে।

মাধু, তুমি বলবে আমার ভালবাসা কি তবে সুতোর মত এত সরু হয়ে ঝুলেছিল? একটু নাড়া পেতেই দু' টুকরো হয়ে গেল?

আমার প্রেম সূক্ষ্ম সুতোর মত ছিল, না, মোটা কাছির মত, শত টানাটানিতেও যার বন্ধন মুক্ত হয় না; তার খবর আমার চেয়ে তুমি ভাল জান। কারণ অনেক কথা অনেক উপলব্ধিই আমি প্রকাশ করতে পারতাম না, যদি না তুমি এগিয়ে এসে আমার সাহায্য করতে। একেবারে জলের মত পড়তে পেরেছিলে বলেই নিজেকে এগিয়ে ধরতে তোমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। তোমার সেই কঠিন কর্ম্ম ঘেরা গণ্ডি পার হ'তে আমার যদি বা সংকোচ এসেছে, তুমি হাত

ধরে গণ্ডির ভেতর টেনে নিয়েছ। মাধু, মিতুলকে যে ভালবাসতে চেষ্টা করেছি, সেও ত তোমারই জন্ত।

এ কথা আমি আমার অনুভূতি দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম, যে মিতুলকে ভালবাসতে না পারা, অর্থ, তোমার ভালবাসা অর্ধেক হারান। তোমাকে আমি পুরোপুরিই চেয়েছিলাম, জোড়াতালি দিয়ে কোন রকম নয়। কিংবা একটা সাময়িক উত্তেজনার ঘোরেও নয়। তাই আমার দিক থেকে মিতুলকে ভালবাসার প্রচেষ্টা ছিল।

তারপর একদিন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, সত্যিই চেষ্টার ফল ফলেছে। তোমার মতই অন্তর দিয়ে মিতুলকে স্নেহ করার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারছি আমি।

মিতুল আমার মনে এমন ভাবে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, যে একজনকে বাদ দিয়ে আরেক জনকে ভাবতে পারছি না। সেদিন বিশ্বের সেরা সুখী মনে হয়েছিল নিজেকে।

কিন্তু দৃষ্টিটা এক চক্ষু হরিণের মত হয়ে গিয়েছিল। শুধু নিজের দিকটাই দেখেছি। মিতুলকে মানিয়ে নিতে গিয়ে যেমন ভালবেসে ফেলতে পেরেছি, ও-ও তেমনি আমাকে ভালবেসে ফেলে পরে আমায় মানিয়ে নিতে পারবে কি না সেটুকু ভাবার সময় পায়নি।

অনেক আগেই আমাদের এই মীমাংসার দু দিক ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু মিতুলের বয়সটাকে আমরা উপেক্ষা করেছি; আমার উপর টানটাকেই ওর সমস্ত সত্তার স্বীকৃতি ব'লে ধরে নিয়েছি। তা যে নয়, সেটা মাত্র দিন পনের আগে আমি বুঝতে পারলাম। আর পরের কয়টা দিন মনকে চোখ ঠেরে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছি। মিতুলকে তোমার আমার মধ্যে প্রাচীর বলে ভাবতে চাইনি। যদি বা ভেবেছিও, তার সমাধানও সাথে সাথে ক'রে নিয়েছি। প্রাচীরকে ধাক্কা মেরে ফেলে বাধা সরিয়ে ফেলব। কিন্তু কে জানত, প্রাচীরটাই আমার মনে এমন ভাবে গেঁথে বসেছে, যে শুধু মাত্র ধাক্কা দিয়ে আর তাকে ঠেলে ফেলা যায় না।

জানি, এ পত্র তোমায় ব্যথার সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আকুল কান্নায় তলিয়ে যেতে যেতে কূল পেতে তুমি আবার পাশে নিশ্চিন্ত সুপ্তিমগ্ন মিতুলের গায়ে হাত রাখবে। তখন কি ঘুণাক্ষরেও তোমার মনে হবে ও একটা বাধা একটা প্রাচীর। না মাধু, আমি জানি এর উল্টোটাই তোমার মনে হবে। মনে হবে এই ত' আমার কূল, এই ত আমার জীবন। এতদিন একে আশ্রয় করেই ত আমার চরম সর্ব্বনাশ হ'য়ে গিয়েও সুখে, আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছে। আমি জানি মাধু। আমি চিনি তোমায়। একদিন প্রাণ সর্ব্বস্ব স্বামী হারিয়েও এই মিতুলই তোমায় আনন্দ দিয়েছে, আমি জানি মিতুলকে হারিয়ে এমন কি তুমি তোমার জীবনও চাও না। সব কিছুর ঊর্ধ্বে তোমার মাতৃত্বের স্থান। জানি মাধু, নইলে যে তুমি আমার শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে।

মাধু, তোমার, মিতুল দু' জনের মনেই আমি সমান ভাবে বেঁচে থাকতে চাই। বলেছি ত অল্পেতে আমার মন ভরে না। এত কাল যেমনি ভাবে ছিলাম, তেমনি ভাবেই থাকতে দাও আমায়। সেই আমার অনেক। তার বেশি লোভ করতে গিয়ে সবটাই হারাতে চাই না। দাঁড়িপাল্লার ওজনে মিতুলের পাল্লা অনেক ভারী। মূর্খের মত আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে চাই না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, মিতুলকে স্নেহ দিতে পেরেছি বলেই, তোমার ভালবাসা এমন অফুরন্ত ভাবে পেয়েছি।

আমার মানিয়ে নেওয়ার শক্তি থাকলেও, মিতুলের সেই প্রচণ্ড আক্রোশ বহ্নি থেকে কিছুতেই আমার নিস্তার থাকবে না।

তাই শেষ পর্য্যন্ত নিজের মৃত্যুশেলের মত এ আঘাত নিজেকেই হানতে হোল। হয়ত মিতুল একদিন তোমাকে এ দুঃখ থেকেও উত্তীর্ণ করে দেবে। কিন্তু আমার এ দুঃখ ভরা জয় চিরজীবনের মত সঙ্গী হয়ে রইল। মাধু, আমায় ক্ষমা কর। ইতি—হতভাগ্য দিলীপ।

# কৃপণের ধন

সেদিনটা ছিল হাড়কাঁপানো এক শীতের দিন কার্লিংহাম পল্লীর ছোট্ট সরাইখানার সামনে ডাকগাড়ীটা থামতেই যাত্রীরা সব হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ে ভিতরে প্রবেশ করল। প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর তাপে নিজেদের গরম করে নিতে সুরু করল তারা। শীঘ্রই আবির্ভাব হল রঙিন পানীয়ের ও আর তার দু-এক পাত্র উদরস্থ হতে না হতেই, বাইরের মত শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশটাও ভরে উঠল তাদের এক সুমধুর আকাঙ্খিত উষ্ণতায়। কিন্তু সকলের ভাগ্যেই কি ঘটেছিল এতটা আরাম ও আয়েস? মোটেই না, তা না হলে রুদ্ধ বাতায়নের সার্সি ভেদ করে তাদের চোখে পড়ল কেন যে একটা নিঃসঙ্গ মানুষ সেই হিম শীতল আবহাওয়ার মধ্যে শূন্য শকটের ছাদটাতে একাকী উপবিষ্ট? —আহা গরীব বুড়ো মানুষটা কত কষ্টই না পাচ্ছে! স্বতঃই মনে হোল তাদের, যখন তারা দেখল লোকটার রূপালী চুলে ভরা মাথাটা হেঁট হয়ে ঝুলে পড়েছে বুকের উপর, হাত দুটো উষ্ণতার প্রত্যাশায় বিবর্ণ পুরোণো কোটটির পকেটের মধ্যে ঢোকানো। করুণ দৃশ্যটি অনেকের মনেই জাগিয়ে তোলে একটা আন্তরিক সহৃদয়তা, পূর্ণ এক পাত্র সুরা তারা পরিচারকের দ্বারা পাঠিয়ে দিল শীতার্ত বৃদ্ধের কাছে। এই অপ্রত্যাশিত উপহারটি পেয়ে বুড়ো তো আনন্দেই আটখানা। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই জানত না যে সেই শীতকাতর অসহায় চেহারার বৃদ্ধ ইচ্ছে করলে তাদের সকলকেই এক সঙ্গে কিনে পকেটে ফেলে রাখতে পারে। তার নাম নীল্ড জন ক্যামডেন নীল্ড, সেই প্রদেশের বিখ্যাত কৃপণ ধনী। পাঁচ ফুটের সামান্য কিছু উঁচু মাথায়, খর্ব্বাকৃতি মোটা সোটা এই বৃদ্ধটিকে বুঝি কুদর্শনই বলা যায়। তার পোষাক যত দূর জীর্ণ হতে পারে তাই, নীল রং এর একটি তালি দেওয়া কোট গায়ে তাতে লাগানো আছে কয়েকটি বৃহদাকার পিতলের বোতাম, বাদামী রং-এর পুরানো প্যান্টে জায়গায় জায়গায় রিপু করা, মোজাজোড়া শতচ্ছিদ্র, এমন কি পায়ের জুতো জোড়াও তালি মারা। জীবনে কখনও বুরুষ দিয়ে কোট ঝাড়ত না সে, তাতে নাকি কাপড় ছিঁড়ে যায় তাড়াতাড়ি, সবুজ রং-এর বড় সড় একটি সস্তা কাপড়ের ছাতি ব্যবহার করত। তবে কস্মিন কালেও তাকে কেউ কোন ওভারকোট পরতে দেখেনি, বুড়ো বলত তার নাকি ওভারকোট কেনার মত পয়সা নেই। ভগবানের দেওয়া চরণযুগলই ছিল তার প্রধান যানবাহন তবে অপরের গাড়ীতে বিনা পয়সায় চড়ার সুযোগ বিশেষ ছাড়ত না সে, তা সে গাড়ী বস্তা বোঝাই মালটানা গাড়ীই হোক বা আবর্জনা বাহী মেথরের গাড়ীই হোক। নিজের বিস্তৃত জমিদারী দেখা-শোনা করে বেড়াবার সময়, নিজের চাষী প্রজাদের খামার বাড়ীতেই সে আতিথ্য গ্রহণ করত সচরাচর, যাতে থাকা ও খাওয়ার জন্য খরচটা বাঁচাতে পারে। সহরে চেলয়া অঞ্চলে তার একটি বড় অট্টালিকা ছিল, চূড়ান্ত সস্তা দামের আসবাবে সাজানো, এমনকি শয়নকক্ষের জন্য পর্য্যাপ্ত বিছানাপত্র পর্যন্ত সে প্রাণ ধরে কিনতে পারেনি। সেই শ্রীহীন অট্টালিকায় দুটো বুড়ো চাকর নিয়ে বাস করত নীল্ড, ওর প্রিয় সঙ্গী ছিল একটা বড় কালো বিড়াল। মাঝে মাঝে, যদি ও কদাচিৎ, গ্রামের সরাইখানায় কোন কোন অতিথিকে সে নিমন্ত্রণ করে পানভোজনে আপ্যায়িত করত, একবার একটা রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে এক পাউণ্ড দান করেছিল , আর সেটা হল ওর পক্ষে এক স্মরণীয় দিন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নীল্ডের অর্থগৃধ্নুতা ছিল একান্ত ভাবেই স্বভাব সিদ্ধ, তার বংশের আর কারুরই মধ্যে এই প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয়নি, এমন কি ওর নিজের পিতা জেমসের চরিত্র ছিল ঠিক এর বিপরীত। নীল্ডের পিতা জেমস্ যে শুধু চিরদিনই ভাল ভাবে আরামে দিন কাটিয়ে গিয়েছিল তা নয়, তার প্রকৃতিতে এক সহজাত ঔদার্যও লক্ষিত হোত। অনেক জায়গায় খোলা হাতেই দান করতে অভ্যস্ত ছিল জেমস্। 'বাপ কা বেটা' কথাটা একেবারেই খাটত না এই অত্যাশ্চর্য্য কৃপণ মানুষটির বেলায়, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃ সম্পত্তি ওয়ারিশন সূত্রে লাভ করার পর থেকেই 'জন নীল্ডের' এক মাত্র ধ্যান জ্ঞান ছিল কি করে সেটা ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া যায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে নীল্ডের মৃত্যু হয়, সমাধি কার্যের সময় ছোট গির্জাটি কৌতূহলী দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যাদের মনে এক মাত্র কৌতূহল ব্যতীত আর কোন ভাবেরই উদয় হয়নি। সত্যকার শোক বোধ হয় কেউই অনুভব করেনি সেদিন, ওই কৃপণ মানুষটির জন্য। তার সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধেও কেউ অবহিত ছিল না যদিও সেটা জানতে উৎসুক ছিল অনেকেই। নীল্ডের শেষ নির্দ্দেশ বা উইল যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন একটা বিস্ময়ের ঝড় বয়ে গিয়েছিল দেশে। পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি যার বর্ত্তমান মূল্য এক কোটি পাউণ্ডেরও বেশী, নীল্ড দান করে গিয়ে ছিল সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে, তার এক মাত্র বাসনা ছিল যে, ইংলণ্ডেশ্বরী যেন ওই সম্পত্তি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করেন। জীবনে যে ব্যক্তির নাম শোনেননি, সেই অজ্ঞাত পরিচয় মানুষটির শেষ ইচ্ছা, সর্ব্বস্ব সমর্পণ সেদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে যে কতটা বিস্ময় চকিতা করে তুলেছিল তা সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য সমগ্র দেশের ভাগ্যবিধাত্রীর কাছেও এই বিপুল সম্পদ অবহেলার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। নীল্ডের উইলে আর কারুর উল্লেখ মাত্র না থাকলেও মহারাণী স্বাভাবিক সহৃদয়তা বশে তার পুরাতন ভৃত্য বর্গও উইলের যুগ্ম ট্রাষ্টিদ্বয়কে দরাজ হাতেই পুরস্কৃত করেছিলেন। যে গির্জার সমাধি প্রাঙ্গণে নীল্ডের দেহ সমাহিত করা হয়, মহারাণীর আদেশে তা উত্তমরূপে সুসংস্কৃত করা হয় এবং নীল্ডের নামাঙ্কিত একটি স্মরণ চিহ্নও নির্ম্মিত করা হয় সেখানে। এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়ার কথা অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী তাঁর আত্মীয় বেলজিয়ামের অধীশ্বর লিওপোল্ডকে সে সংবাদ জানান, উত্তরে রাজা লিওপোল্ড মহারাণীকে যে পত্র লেখেন, ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিতে উল্লাস প্রদর্শনই তার মূল বক্তব্য। লিওপোল্ডের চিঠির সারাংশ ছিল এই ধরণের, "প্রিয় ভিক্টোরিয়া তোমার এই আকস্মিক সৌভাগ্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর, শ্রীযুক্ত 'জন নীল্ড' যে তোমাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী করে গিয়েছেন, এতে তুমি ও ইংলণ্ডের রাজপরিবার সমভাবেই উপকৃত হলে; বিশেষতঃ রাজ পরিবারের পক্ষে এই ধরণের মূল্যবান ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারী হওয়া যে শুধুই আনন্দের বিষয় তা নয়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও। এ ধরণের ঘটনা বোধ হয় এক মাত্র রাজভক্ত বৃটিশ জাতির ক্ষেত্রেই সম্ভবপর।" নীল্ডের অর্থ ঠিক কি ধরণের কাজে লাগানো হয়, উত্তরকালে তা নিয়ে বহু তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে নজির মেলে যে রাজা বা উত্তরাধিকারী পুত্রের রাণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হাইল্যাণ্ডের বিশাল 'বালমোরাল প্রাসাদ'টির জন্ম কথা বোধ হয় ওই কৃপণের ধনের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে।

মিনতি সোম

মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাইয়া বলিয়াছেন—

"তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ; দুই চারি কোথা পল্লবের ছায়
করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠ পিক।"

রবীন্দ্রনাথের উত্তুঙ্গ প্রতিভা হিমাচলের ন্যায় বিস্তৃত যুগ ব্যাপিয়া বাংলা সাহিত্যের বিরাট ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ছিল। ১৮৮০ হইতে ১৯৪১ খৃঃ পর্য্যন্ত এই ব্যাপক বিস্তৃত রবীন্দ্রযুগের সীমায় বহু কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করিয়া অপরিম্লান বৈশিষ্ট্য বিকশিত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই পর্ব্বের কবিরা বাংলা কাব্যজগতের ইতিহাসে ভারতী-গোষ্ঠী নামক অনুচ্ছেদে সম্মিলিত ভাবে স্থান পাইয়াছেন। তবুও সেই কবিজনতার ভিড় পার হইয়া যে তিনজন আত্মপ্রদর্শনমূলক মনোবৃত্তির কবির দুঃসাহসী তীব্র কলকণ্ঠ শোনা যায়, তাঁহারা হইলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

তখন রবীন্দ্র-কাব্যে ভরা কোটাল, তিনি প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করিয়া আছেন। বাংলা কাব্যজগতে তখনও রবীন্দ্র-প্রভাবপুষ্ট কবিদের জলসা চলিতেছে—কাব্যলক্ষ্মীর নূপুরনিক্কণ আর জলতরঙ্গের ধ্বনিতে তাঁহাদের মন উধাও হইয়া গিয়াছে স্বপ্নালোকের অসীমে। সেই শব্দময় ছন্দোময় জগতে যতীন্দ্রনাথ আসিলেন কণ্ঠে কঠিন ধাতুর আওয়াজ ও বলিষ্ঠ হাতে সূচীমুখ তীক্ষ্ণ লেখনী নিয়া। ব্রাউনিঙের মতো তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"Scare away this mad ideal." বাংলার শ্যামলভূমিতে বসিয়া তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন গোবি-সাহারার। মরুভূমির শুষ্কতা আর্দ্র মাটিতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল কবি যতীন্দ্রনাথের বুকে। জীবন যাঁহার কাছে সঙ্কীর্ণ বদ্ধ ডোবা, যাঁহার চোখের উপর ক্ষুধিত বর্ত্তমান করালছায়া ফেলিয়াছে তিনি কি করিয়া বলেন, "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" তিনি দুঃখের অগ্নিমন্ত্রে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া রূপ লাবণ্যে সমর্পিত প্রাণ ললিতচিত্ত কবিদের পংক্তি হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন—

"কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত,
সে ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত,
আমি সে ব্যথার চির-ব্যথিত।"

রবীন্দ্রযুগের কবি হইয়াও তিনি মননে ও স্বভাবধর্ম্মে বিরোধিতা নিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, আর এই ব্যতিক্রমের মধ্যেই তাঁহার পরিচয়ের বিশিষ্টতা নিহিত। এই স্বাতন্ত্র্য তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন ঋজু বক্তব্য ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে। আঙ্গিক সচেতন কবির হাতে যেন মৃদঙ্গ ধ্রুপদী বোল বাজিয়া উঠিয়াছে। ভারতী গোষ্ঠীর কবিদের হালকা চালের নৃত্যচপল ছন্দ তিনি দুই হাতে অপসারিত করিয়া সশব্দ পদক্ষেপে তাঁহাদের গতানুগতিক পথ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—

"যেপথ ভাঙে ও গড়ে নিত্য নব,
আজ সে পাওয়াটা পথে পথিক হব।"

যতীন্দ্রনাথ প্রেরণাবাদে বিশ্বাস করিতেন না, তাই আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হয় নাই। তাঁহার ভাবনার জন্ম রসানুভব চিত্তে হইলেও তাহাকে বুদ্ধির মন্থনদণ্ডে পরিশীলিত করিয়া লইয়াছেন। ইহার উপরই নির্ভর করিতেছে তাঁহার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। সজাগ মনের মাটির বুকের কাছাকাছি মানুষের মধ্যে সজোর পদক্ষেপ ছন্দের মধ্যেই অনুভব করা যায়। বক্তব্যকে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়া মাঝে মাঝে গতানুগতিক প্রচলিত রীতিকে ভাঙিতে হইয়াছে। তাঁহার ছন্দ প্রধানতঃ মাত্রাবৃত্ত এবং মাঝে মাঝে অর্দ্ধপংক্তি ব্যবহার করিয়া দ্রুত ছন্দের মধ্যে, ঝিমাইয়া পড়া মনকে যেন সজোরে চাবুক মারিয়া শ্রুতিকে সজাগ করিয়াছেন। যেমন:—

"সরাই-সরাই শেষ ক'রে, যবে খামারে দিইছি হাত,
কালকে হঠাৎ,—
বন্ধু দোহাই, ভুলো নাকো ভাই, হইনু অপ্রগলভ,—
ক্ষমা করো সখা—বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।"

এই চমক একেবারে অপ্রত্যাশিত, নূতন ধরণের অন্ত্যানুপ্রাসও শ্রুতিকে আকর্ষণ করে। মানুষের মতো শব্দের ক্ষেত্রেও তিনি শুচিতার শ্রেণীবিচার মানেন নাই, সংস্কৃত তৎসম শব্দ ও আটপৌরে চলিত শব্দের অসম মিলনে অভিজ্ঞচণ্ডাল মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। সামান্য বস্তুকে সহজ সত্যের প্রতীকরূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন অসামান্য কারয়া। মাঝে মাঝে ভক্তিসর্ব্বস্বতার আভাস দেখা দিলেও তির্য্যক কটাক্ষ, ছন্দের প্রাখর্য্য, শাণিত বক্রোক্তি, বলিষ্ঠ বিদ্রূপ, অপ্রত্যাশিত মিলের চমক সব কিছু মিলাইয়া তাঁহার আঙ্গিক রীতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়া ব্যক্তিত্বের ছাপ সুচিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।

তাঁহার কবিজীবনের প্রধান সৃষ্টি মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্; ত্রিযামা, নিশান্তিকা কাব্য। তিনি কর্ম্মজীবনে ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার, কাব্যজগতেও এই হাতুড়ি নিয়াই আসিয়াছিলেন। এই

রক্তা হাতুড়ির আঘাত পড়িয়াছে ভারতী-গোষ্ঠীর চন্দ্রানন্দ স্বামী আর মিষ্টিক ও শোষণকারীদের উপর। ভারতী-গোষ্ঠীর সৌন্দর্য্যবিলাসী আত্মমগ্ন কবিদের তিনি সরাসরি আক্রমণ করিয়াছেন—

"হাতে থাকে সঙ্গতি, কানে যদি ছন্দ—
না হয় হইলে কবি, কথাটা কি, মন্দ !"

রোমান্টিক কবিদের ভাববিমুগ্ধতাকে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে পারেন নাই।

"এ সবই রঙিন কথার বিম্ব মিথ্যা আশায় কাঁপা
গভীর নিঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা।"

মনে পড়িয়া যায় গ্যেটের উক্তি "In vain you strive, in vain you study earnestly।" "জীবন-ডোবার হৃদয়-ডুবি" কে এক ফুৎকারে তিনি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছেন—"মরণে কে হবে সাথী, প্রেম ও ধর্ম্ম জাগিয়ে পারেনা বারোটার বেশি রাতি।" তাঁহার দৈন্যভরা গৃহে শূন্যতার অভিশাপ জড়ানো, দিবাস্বপ্নের মতো প্রেম-মায়া তাঁহার কাছে মিথ্যা। যেখানে প্রতিনিয়ত দুঃখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সারা জীবনকে অঙ্গার করিয়া তুলিতেছে সেখানে তিনি কি ভাবে কল্পনার অলকালোকে বসিয়া কোমলকণ্ঠে প্রেমকূজনে মত্ত থাকেন! শুধু প্রেম নহে, প্রকৃতিও তাঁহার কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃতির রূপের মধ্যে মানুষের মৃত্যুবাণ খুঁজিয়া পাইয়া তিনি প্রকৃতিবিলাসের সুপ্রচলিত আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যপ্রেমিক সভাকবি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন—

"সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা
সত্যের শাঁস কালো বলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।"

মায়াবিনী প্রকৃতির আবরণ টানিয়া কবি দেখিয়াছেন, "যত টানি তার বাস, জীবনাঙ্গনে পুঞ্জিয়া ওঠে রঙা মিথ্যার রাশ।" রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিরা যখন রূপাবেশ স্নিগ্ধ মনে কোমল হাতে প্রকৃতির জন্য ঝুলনডোর বাঁধিয়াছেন তখন যতীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন ফাগুনের ফুলে ব্যথার স্পর্শে কি ভাবে আগুনের ফুলকি হইয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি যখন হর্ষের হিল্লোলে হাসিয়া বলিয়াছেন, "নর্ম্ম-সখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো" তখন তিনি দেখিয়াছেন প্রকৃতির বুকে বাঁচিবার জন্য জীবনের অন্ধ আকুতি

—"মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে নদী পথে কেঁদে যায়,
নিরুপায় জেনে প্রতি তট-তৃণে আঁকড়ি ধরিতে চায়।"

বরাঙ্গনা প্রকৃতি তাঁহার নিকট হইয়া উঠিয়াছে বারাঙ্গনা-"রাঙা সন্ধ্যায় বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা।"

"খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য,
ষড়ঋতু-ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হ'তে মাৎসর্য্য।"—

অভাবিতপূর্ব্ব এহেন প্রকৃতিদর্শন!

যতীন্দ্রনাথ মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যেও এই খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মানুষ ভালোবাসার অঙ্গীকার নিয়া বাঁধে নীড়, আর তিনি হানেন শর। তাই মানুষের ঘরে নবান্ন-উৎসব কোনদিন আসে না। নির্ব্বাক নির্বিকার ঈশ্বর তাঁহার কাছে অনিয়মের প্রভু আর এই ঈশ্বরের চক্রান্তেই মানুষের জীবন জীবিকার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে। ফাটা লাটুর মতো দূরে কণ্টকবনে তিনি ক্রীড়া ছিধায় মানুষকে পরিত্যাগ করেন, বুকে যন্ত্রণার ক্ষত সৃষ্টি করিয়া তিনি বাজান "পরের বুকের দুখের গান।" মানুষের চোখের জলের ঋতু আর ফুরায় না, এই দুখের কলসেই গোলা ভরিয়া ওঠে। ক্লান্ত জীবনের এ এক অভিনব বারমাস্যা। আর ঈশ্বর শুধুই হরণ করিয়া চলেন, শুষ্কজীবনে একবিন্দু বারিও বর্ষণ করিতে পারেন না। আধ্যাত্মিকতার বিলাসে মগ্ন হইয়া তিনি থাকিতে পারেন নাই

"আনন্দ নহ নহ ;
দিচ্ছ দুঃখ নিচ্ছ দুঃখ-দুঃখেরি ফেরি বহ!
যা প্রত্যক্ষ নিঠুর দুঃখ, তারে মায়া ভ্রম বলি,
টেনে বুনে তাঁরে আনন্দ বলে আপনারে কেন ছলি?"

মানুষের জীবনে গোবি-সাহারার যে রিক্ত হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে তাহা তিনি প্রশস্ত বক্ষে অনুভব করিয়া প্রতিস্পর্দ্ধী কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন ঈশ্বরকে—"চেরাপুঞ্জির থেকে একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে!" গরলপানকারী নীলকণ্ঠ শিবের মধ্যেই তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন সর্ব্বরিক্ত মানুষের তুলনা, তিনিই তাই কবির আরাধ্য। এই সব মানুষ যাহারা কিণাঙ্ক-কঠিন হাতে কাজ করে নগরে-প্রান্তরে তাহাদের চিরান্নহীন করিতে ঐশ্বরিক উৎপীড়নের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে একশ্রেণীর নিপীড়ক যাহাদের অত্যাচারে তাহারা তিল তিল করিয়া জীবনের রাজকর মৃত্যুর হাতে তুলিয়া দিয়া জন্মঋণ শোধ করে। এই আলাভলা জীবনচর্য্যার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কবি-আত্মবিলাসী মিষ্টিকদের তিক্তকণ্ঠেই বলিয়াছেন—

"অজানাটা অজানাই—
কেন ছোটাছুটি, শোন মোটামুটি, কোনখানে সে যে নাই।
সে কেবল মরীচিকা।
বাহিরে শ্রান্তি ভিতরে ভ্রান্তি, না থাকাই তার থাকা।"

কবির শ্রেষ্ঠত্ব তখনই স্বীকৃত হয় যখন তাঁহার ভাবনা আস্তিক্যবাদের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায়। কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁহার যাত্রা শুরুতে নেতি নেতি করিয়া পথ চলিলেও এক সময় তিনি নএর্থক দুঃখবাদের নৈরাজ্য হইতে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছেন। নাস্তিকের অভিমান ত্যাগ করিতে শিখাইয়া পথনির্দেশ করিয়াছে এই মানুষ আর তাহার দুঃখ। তিনি দুঃখবাদী নহেন, দুঃখীবাদী কবি। দুঃখসম্ভব দুঃখবিবর্দ্ধিত দুঃখপরিণত মানুষের যথার্থ ধর্ম্ম দুঃখদীক্ষার। কিন্তু তাহার সিদ্ধি সেখানেই যেখানে জীবন সংগ্রামে সে হার মানে নাই। দুঃখ সত্য, সত্যতম তাহার মৃত্যুঞ্জয় দুঃখ ভয়হীন সংগ্রাম; মহৎ ভয়ের সমুদ্যত বজ্রকে তাহারা কালাপাহাড়ী বজ্রমুষ্টি দিয়া প্রতিহত করিতেছে বারবার। দুঃখী মানুষ এই ভাবেই পৃথিবীকে করিয়া তুলিয়াছে অমৃতসম্ভব। যতীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে অশ্রুস্পর্শ করিয়া সন্ধি করিয়াছেন আর মুক্ত আত্মার বাণী শোনাইয়াছেন—

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ—
স্রষ্টা আছে বা নাই।"

এই আস্তিক্যবাদেই কবির ভাবনার মহত্ত্ব স্বীকৃত।

কবি যতীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রথম পর্ব্বের ইতিহাস ক্রমাম্বয়িক বিদ্রোহের। শোষণ আর মূঢ়তার আত্মবিস্মৃতি দর্শনে সরোষ গর্জ্জন

সেখানে প্রতিটি ছত্রে ছড়ানো। বামদেবের উপাসনা করিতে করিতে সহসা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, রুদ্রের পিঙ্গল জটাজাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে রসের বর্ষণধারা। If winter comes can spring be far behind ?—অসুন্দরের শবে সুন্দরের সাধনায় কবি এবার নিজেকে নিমগ্ন করিয়াছেন যিনি একদিন শীতের রিক্ত-কাঠিন্ত নিয়া বলিয়াছিলেন—"প্রেম বলে কিছু নাই—চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই", তিনিই বিগত-বসন্তের দিনে বিশীর্ণ অতীতের শূন্যতায় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছেন—

"সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতনার ঝাঁজ ?"

নিঃশেষী জীবনের হেমন্ত সন্ধ্যায় বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে তিনি সুন্দরকে পরম স্বীকৃতি দিয়াছেন

"বসন্তে উপেখিনু ফুল ফলে মিনতি,
বর্ষার মেঘে মেঘে আহ্বান,
হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন সুন্দরে করি সন্ধান !"

অতৃপ্তযৌবনের দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছেন রোম্যান্টিক ঐতিহ্যকে এবং সেই পথ ধরিয়াই তাঁহার ভাবনার পরমানিবৃত্তি ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের অনুগমন করিয়া জীবনের শেষ পর্বে। তখন তিনি নূতন করিয়া প্রেমে বিভোর হইয়াছেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। বড় মনোরম এই পথপরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ইতিহাসটুকু।

নচিকেতার মতো জাত প্রৌঢ় কবি মৃত্যুর নামে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জীবনকে ভালবাসিয়াছিল। জীবনের উপত্যকায় যখন মৃত্যুশিখরের ছায়া প্রলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে তখন মধুময় হইয়া উঠিয়াছে ধরণীর ধূলি। রোগশয্যায় শায়িত হইয়া জরাতুর চিত্তে মহামরণরূপী শিবের বক্ষলগ্ন জীবনরূপিণী উমাকে দর্শন করিয়াছেন আর বলিয়াছেন—

"আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যুমদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।"

জীবনের মর্ম্মভাষা শুনিতে পাইয়াছেন বলিয়াই বিরিক্ত মন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছে। ছিন্নবৃন্ত কেতকীর অপচিত সৌন্দর্য্যের জন্য মনে জাগিয়াছে অসীম বেদনা, "বুক ফুটে আছে কেয়ার গন্ধ হাতে ফুটে আছে কাঁটা"। মায়াকভস্কি বোস্টন শহর দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছেন "what a mighty strange !" আর যতীন্দ্রনাথ যখন দেখিয়াছেন—

"ঈশানের মেঘ বিষাণ বাজায়, পুবে মেঘে বারি ঝরে,
জনশ্মশানের পাষাণ সোপানে বকুল ঝরিয়া মরে"

তখন তাঁহার মন চলিয়া গিয়াছে "away away from men and town"। মানুষের নগ্ন লোভ মাঠের বুক হইতে লুণ্ঠন করিয়া যাহাদের হাটের পথে নিয়া আসিয়াছে তাহাদের জন্য কবির বেদনা অনুরণিত হইয়াছে "বুকের শোণিতে।" তিনি কান পাতিয়া শুনিয়াছেন বসন্তের গৈরিক সন্ধ্যায় জীবনের সমারোহের মধ্যে কচি কিশলয়ের কান্না পাণ্ডু পাতার দর্পণে আগামী শুষ্ক পরিণতির প্রতিবিম্ব দেখিয়া, এ কান্না কিশলয়ের নয়, এ কান্না কবির—"Is life at all worth living ;"

মরুভূমির কবি বাসনা-হরিণীর মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত হইয়া অপরূপার সন্ধানে ফিরিয়াছেন

"বকুল গন্ধে ভরাগো শূন্য বকুলতলীর ঘাটে।"

প্রিয়ার সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রতিফলন দেখিয়াছেন বিশ্বরূপের আর তিনি সেই সৌন্দর্য্যের তীর্থ বারিতে স্নান করিয়া খুঁজিয়াছেন যমুনা কূলের সেই নওলকিশোরের চিরায়ত মূর্ত্তি। তিনি চোখের জলে মালা গাঁথিয়া মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, "হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম !" নববিরহের আশায় সজল মেঘের আশ্রয় নিয়া তিনি নব মেঘদূত কাব্য রচনা করিয়াছেন—

"আজি মেঘদূত ফিরাও উজান পবনে,
অলকাক্লিষ্ট মিলনের ব্যথা রামগিরিগুহা ভবনে।"

জীবন যেদিন বসন্ত গুঞ্জিত ছিল সেদিন তিনি জীবনকে মনে করিয়াছেন "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।" আজ মৃত্যু অন্ধকারের মতো সত্য হইয়া উঠিয়াছে জীবনের হেমন্তহিম অপরাহ্নে। জীবনের মূল্য না দেওয়াতে যৌবন কবির ভালে দগ্ধচিহ্ন আঁকিয়া বৈরাগী বেশে রিক্ত হস্তে কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিয়াছিল, কবি তাহার পদচিহ্ন খুঁজিয়া পাইয়াছেন ক্ষতবিক্ষত যৌবনের রক্তবিন্দুর মধ্যে। সে আজ আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, কবি আত্মজ-আত্মজাদের মধ্যে অভ্যাগমন দেখিয়া তাহাকে শুভাশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন—

"যৌবন ওরে যৌবন
এলে যদি ফিরে, থাক্ মোরে ঘিরে
ভাঙা ঘরে রচি নন্দন।"

কবি যতীন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণতার স্পর্শ পাইয়াছে এই নন্দন সাজনেই। রুদ্র সন্ন্যাসী তপোভঙ্গের পর উমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিও জীবন-সায়াহ্নে আসিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন।

"বড় বিলম্বে এখন বুঝেছি
তোমারে ঠেলিয়া তোমারে খুঁজেছি।"

বাংলা কাব্য জগতের ইতিহাসে রবীন্দ্রযুগে কবি যতীন্দ্রনাথ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায় বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের খনিত প্রশস্ত রাজপথে বসিয়া সবাই যখন বেহালায় কোমল গান্ধার সাধিতেছে তখন তিনি চড়া সুরে অর্গান বাজাইয়াছেন। অবাস্তব জীবনাদর্শ সে কালীন রোমান্টিক কবিদের এক আবদ্ধ গণ্ডিতে নিয়া গিয়াছিল, আর যতীন্দ্রনাথ বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউসের মতো ব্যতিক্রম রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাব্য সৃষ্টির প্রথম পর্ব্বে তিনি অস্থির চিত্তে অশান্ত পদক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। শেষ পর্ব্বে তিনি যে সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহাই তাঁহাকে উত্তর জীবনে রোম্যান্টিক কবি করিয়া তুলিয়াছে। এ ভাবে রবীন্দ্রতীর্থেই তাঁহার যাত্রা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যুগে যুগে কবিরা যেমন 'অলক' ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছেন আর সাসকুইহান্নার তীরে, শিলাইদহে পদ্মাচরে বসিয়া আত্মসাধনা করিয়াছেন, কবি যতীন্দ্রনাথও তেমনি রোম্যান্টিকতার স্বপ্ন দেখিয়াছেন বকুলতলীর ঘাটের নির্জনে দাঁড়াইয়া।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

বিকেলে গেলাম মিষ্টার চাড্ডার বাড়ী। শাস্তাদি গেলেন না, বললেন, ওসব আমার ভালো লাগে না। সঞ্জয়দা গেলেন না শাস্তাদির জন্যে।

গিয়ে দেখলাম উচুঁতলার অনেকে এসেছেন, যোগলেকারও উপস্থিত। কমলেশ আর যোগলেকার দু'জনেই সুদক্ষ খেলোয়াড় ওরা।

খেলা সুরু হলো।

কমলেশ পরেছে সোনালী রং-এর সার্টিনের সালোয়ার পাঞ্জাবী। এঁকে বেঁকে লাফিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে সে ব্যাট্ হাতে ছুটোছুটি করে খেললো। হা-হা, হি-হি, করে হাসলো শিষ দিলো, তারপর সাময়িক বিরতি।

কমলেশের নাছোড়বন্দা অনুরোধে অগত্যা আমাকে ব্যাট্ হাতে নিয়ে যেতেই হলো খেলবার জন্য। যোগলেকারের সঙ্গে সুরু হলো আমার খেলা। মোটেই পারলাম না খেলতে। বাবার মৃত্যুর পর যে ব্যাট্ একেবারেই ছুঁইনি। ব্যাট্ ফেলে দিয়ে ফিরে এলাম নিজের জায়গায়।

মহা উল্লাসে কমলেশ ছুটে গিয়ে ব্যাট্টা তুলে নিলো হাতে। নিজের অক্ষমতার লজ্জায় মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে সহর্ষ হাততালির মাঝে খেলা শেষ হলো।

ডিনারের টেবিলে, যোগলেকার বসলো আমার পাশে।

চারিদিকে তখন কমলেশ আর যোগলেকারের খেলার সমালোচনা চলেছে। সকলে ওদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে। আমি নীরবে শুনছিলাম সব কিছু। নীচুগলায় যোগলেকার বললো আমাকে—

—এমন চুপচাপ কেন? মনে হচ্ছে আপনার মনটা ভালো নেই।

—কৈ না তো। আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম। বললাম ওকে—আমি যে খেলার বিষয়ে একজন বড় গোছের আনাড়ি তার পরিচয় তো পেয়ে গেছেন,—তাই এই প্রসঙ্গে যোগ দেবার মত, কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

—পৃথিবীতে খেলতে পারাটাই সব চেয়ে বড় গুণ নয় মিস মুখার্জি এবং সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞতাও,—অগৌরবের কারণ হতে পারে না। দরদভরা গলায় জবাব দিলো যোগরাজ যোগলেকার।

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই কিসের তাগিদে যেন ঘুমটা ভেঙে গেলো। প্রবল অস্থিরতা মনের ভেতর অনুভব করলাম। বদ্ধ ঘরে যেন হাঁফিয়ে উঠছি। ডাকছে—কারা সবাই যেন দল বেঁধে ডাক দিচ্ছে আমায়।

বাইরের আকাশ, বাতাস, বন জঙ্গল, ওরা সবাই ডাকছে আমায়। আর···সবার সুরে সুর মিলিয়ে আরো কে যেন ডাকে? তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে, শাড়ীটা পাল্টে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

না, অন্য কোনো পথ ডাকেনি আমায়। ডেকেছে ঐ পাওয়ার হাউসের পথটা। আলো আঁধারি এই নির্জ্জন পথে চলতে কৈ বিন্দুমাত্রও তো ভয় জাগেনি মনে। হন্ হন্ করে চলেছি আপন মনে। সেই চড়াই পথটার বাঁকে এসেই পা দুটো আমার থেমে গেলো। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে যোগলেকার। আমাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে, সে স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে, একখানি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আসুন।

একটা মধুর লজ্জার শিহরণ খেলে গেলো আমার সর্ব্বাঙ্গে! দুরু দুরু করে উঠলো বুকটা। যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছি হঠাৎ।

—কৈ আসুন! আপনাকে আবাহন করবার জন্যই যে এখানে অপেক্ষা করছি আমি! বললো যোগলেকার।

সঙ্কুচিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে! মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম—কেমন করে জানলেন যে আমি আজও আসবো?

—জানতাম! মনই জানিয়ে দেয় সব কথা। একটা গভীর দৃষ্টি আমার চোখের ওপর রেখে জবাব দিলো যোগলেকার।

কোন্ এক অনাস্বাদিত দুর্লভ আনন্দ ধারায় ভেসে গেলো আমার জীবনের সাতটি দিন। এই সাত দিনের ভেতর আমাদের আপনি সম্বোধন তুমিতে—আর মিস্ মুখার্জ্জি এবং মিষ্টার যোগলেকার, রমি, ও রাজায় রূপান্তরিত হয়েছে!

প্রতিটি দিন আমরা শুধু বনভূমিতেই যাইনি, মাঝে মাঝে নতুন প্রভাতের প্রথম আলোক ধারায় আমরা স্নান করেছি, যোগলেকারের বাগানে, ঘন গোলাপ ঝোপের আড়ালে বসে।

সেখানে কয়েকটি বৃহদাকারের পাথর ছিল এধারে ওধারে ছড়ানো। তার গায়ে জড়ানো ছিলো পুষ্পিত অর্কিড, আর রাশি রাশি লতানে গোলাপ। মাঝের পাথরটি ছিলো সব চেয়ে উঁচু আর মসৃণ।

গোলাপ বাগিচায় প্রথমে আমরা খানিকটা সময় ঘুরে বেড়াতাম, তখন যোগলেকার বিভিন্ন জাতের গোলাপদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতো। গাছগুলোকে সস্নেহে আদর করতো। আমি মুগ্ধ হতাম ওর গাছ ও ফুলের প্রতি অসাধারণ মমতা দেখে। তারপর আমরা বসতাম ঐ বড় পাথরটার ওপর। বলবার মত এত কথা যে থাকতে পারে, তার পরিচয় আগে পাইনি।

শুধু কথা নয়।

যোগলেকার শোনায় আমাকে উর্দু কবিতা, আমি শোনাই ওকে আমার প্রিয় বাংলা কবিতাগুলো। কোনো দিন ও বাজায় ভায়োলিন, আর আমি গাই গান!

ওর চাকর ছোটুলাল সেখানে রেখে যায় চা, কাজু বাদাম, বিস্কিট, অথবা স্যাণ্ডউইচ সেগুলোর সদ্ব্যবহার হয় ওর ফাঁকে ফাঁকে। দেখতে দেখতে, সাতটা, আটটা বেজে যায়, আমাদেরও শেষ করতে হয় দেওয়া নেওয়ার পালা। সময় যে এমন ঝড়ের বেগে ছুটে চলে, তা আগে বুঝিনি। যোগলেকার চলে যায় পাওয়ার হাউসে নিজের ডিউটিতে যোগ দেবার জন্ম, আর আমি চলি পেপার মিলের কলোনীর পথে।

সন্ধ্যেবেলা আমাদের এই অন্তরঙ্গতার সুযোগ, আমরা পেতাম না, কারণ সেই সময় আমাকে বেড়াতে বেরুতে হতো শাস্তাদির সঙ্গে। আর সন্ধ্যের পর আগের মতো সান্ধ্য আসর জমাতে হতো, বাড়ী বাড়ী। কোন কোন দিন যোগলেকারের বাড়ীতেও আড্ডা জমতো, তখন আমরা আবার সামাজিক ভদ্রতার মেকি খোলসগুলো পরে হতাম, মিস্ মুখার্জি আর মিষ্টার যোগলেকার। সব আসরে কমলেশের উপস্থিতিও কোন দিন বাদ পড়েনি।

দিন পনেরো পরেই এলো যোগলেকারের নাইট ডিউটির পালা।

আমাদের প্রভাত সঙ্গীতের মেয়াদ ফুরুলো—কিন্তু তখন যে এসেছে আমাদের অন্তরনদীতে প্রবল বন্যা, সে কি কোন কিছুর বাধা মানে?

বেলা তিনটের আগেই, আমি সেই ঝাঁঝালো রোদেই ছুটে চলেছি পাওয়ার হাউসের পথে।

বেরুবার সময়—হাঁ। হাঁ। করে উঠলেন শাস্তাদি—তোর মাথাটা কি বিগড়েছে নাকি? কোথায় চললি এই পাথুরে রোদ মাথায় করে?

—তুমি কিচ্ছু ভেবো না শাস্তাদি।—আমি শাস্তাদির হাতটা চেপে ধরে অনুনয় করে বললাম—তোমাদের এই চমৎকার দেশের সকাল সন্ধ্যে রাত্রি সব দেখছি। দেখিনি শুধু দুপুর বেলায় কেমন দেখতে লাগে এই সব ঝোপঝাড়গুলো। পাখীরা কেমন, কিচির মিচির করে গাছে গাছে। সবটাই না দেখলে কি আশ মেটে? তুমিই বল না।

—কি জানি বাপু। বুঝিনে তোর কথা। এই ছোট্ট জায়গায় রোজ রোজ কি যে এত দেখবার আছে, আমি তো ভেবেই পাই না! আচ্ছা যা। কিন্তু ছ'টার আগেই ফিরে আসবি। আজ আবার ক্লাবে আছে জোর তাসখেলা। বললেন শাস্তাদি।

সে তোমাকে বলতে হবে না। দেখোনা একটু ঘুর পাক দিয়েই ফিরে এলাম বোলে।

যোগলেকার অপেক্ষা করছিলো তার সেই সুর মহালে।

বাড়ীর পেছনের বারান্দা। তার সরু সরু পীলায়ের গা বেয়ে জড়াজড়ি করে উঠছে অসংখ্য গোলাপ লতা। ওপরে জালি ছাদের ওপর ছড়িয়ে পড়ে স্নিগ্ধ ছায়া রচনা করেছে ওরা।

সেখানে বসলে লতারা দুলে দুলে কাছে আসে। ফুলেরা গায়ে মাথায় দিয়ে যায় নরম নরম মিষ্টি ছোঁয়া। বাতাস ছড়ায় অপূর্ব সুরভি।

যোগলেকার রেফ্রিজেটর থেকে নিজে হাতে করে নিয়ে এলো দু'গ্লাস আনারসের জুস্। একটি আমার হাতে দিয়ে বললো—

—উঃ। মুখখানা যে তোমার পাকা কামরাঙা হয়ে উঠেছে। বড্ড কষ্ট হলো এই রোদ্দুরে আসতে—না?

—কৈ আমি তো কোনো কষ্টের স্বাদ পাচ্ছি না। মুখটা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।—আর রোদ জল, ঝড়, বজ্রনাদ; কোনো কিছুর বাধা কি এখন মানা যায়? জবাব দিলাম আমি।

—কিন্তু যখন তুমি চলে যাবে; তখন এই আসা যাওয়ার খেলা তো শেষ হয়ে যাবে রমি।

যোগলেকারের কণ্ঠে বাজলো বেদনার সুর।

—কে বললে আমি চলে যাবো? তুমি কি আমাকে তাড়াতে চাইছো?

সরবতের গ্লাস নামিয়ে রেখে, আমি চাইলাম ওর দিকে।

—তুমি যাবে না? সত্যি বলছো?

আমার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলো যোগলেকার।

—এর চেয়ে সত্যি, পৃথিবীতে এই মুহূর্তে আর কি আছে আমি জানি না রাজা। তবে তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার আছে কি না সে বিচার তুমি করতে পারো।

আমার বাড়ীর কথা, বাবা মা'র কথা, এমন কি সুব্রত'র কথাও আমি সব বলেছি ওকে।

সে ও কিছু গোপন করেনি আমার কাছে। ওর বাবা মারা যাবার পর, মায়ের আর্থিক দুরবস্থার কথা, কত কষ্টে মা ওকে মানুষ করে ছিলেন। মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছাড়াও, টিউশানী করেছেন, নিজের গহনা, দেশের জমিজমা সব বিক্রি করে ওকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করিয়েছেন, বিলেত পাঠিয়েছেন,—সেই সব কথা বলতে বলতে ওর গলার স্বর ভারি হয়ে উঠেছে, চোখে এসেছে জল।

বিলেত থেকে ফিরে এসে মাকে আর দেখতে পায়নি যোগলেকার। সেই থেকেই নিঃসঙ্গ জীবন তার। বাগানের গাছ ফুল, আর এই ভায়োলিন এত দিন এই ছিলো তার সঙ্গী, তার সান্ত্বনা।

আমার কথা শুনে, নত মস্তকে কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে বললো যোগলেকার—যোগ্যতার প্রশ্ন উঠলে যে, আগে আমার কথাই আসে রমি। তুমি কি পারবে সেই মহানগরীর বিলাসবহুল জীবন থেকে সরে এসে, এই বন-জঙ্গলে, এক অখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারের ঘর করতে! তোমাকে চাইবার মত কোনো যোগ্যতাই যে নেই আমার রমি। প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যের মত উপযুক্ত পয়সা তো

একেবারেই নেই। তাই মনে হয় হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। ভালো করে ভেবে চিন্তে তুমি যা স্থির করবে, আমি সানন্দে তাই মেনে নেব। ভবিষ্যতে যাতে তোমায় অনুতাপ না করতে হয়,—সেই জন্যই কথাগুলো বলছি তোমাকে!

আমি নীরবে ওর দিকে চেয়ে শুনছিলাম ওর কথাগুলো! চোখ ফেটে আসছিলো জল, অতি কষ্টে তাকে দমন করে, বললাম—এ সব কি তোমার মনের কথা রাজা? তুমি কি আমাকে এমনই হৃদয়হীন, লোভী, অপদার্থ মনে কর যে, যার পক্ষে প্রেম ভালোবাসা, একটা বিলাস মাত্র। তার জন্য কোনো রকমের ত্যাগ স্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সম্বন্ধে তোমার যে এই ধারণা, তা আগে জানতাম না··· কান্নায় আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেলো। আমি দু' হাতে মুখ ঢাকলাম।

আমার চোখের ওপর থেকে হাত দুটো নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললো যোগলেকার—আমায় ক্ষমা কর রমি! আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনি, শুধু নিজের মনের সঙ্কোচটুকু গোপন করতে চাইনি। আমি কি জানি না,—কত বড় মন তোমার। তোমার সততার স্বাক্ষর যে তোমার দুটি চোখে রমি। সব জেনেও, তোমাকে ওই কথাগুলো বলা, হয় তো আমার উচিত হয়নি।

—না, না, ভালোই করেছো বলে! ধরা গলায় জবাব দিলাম আমি। দু'জনার কাছে দু'জনের সব কিছু পরিষ্কার হওয়া ভালো···বলতে বলতে দর দর করে জল নেমে এলো আমার দু' চোখ দিয়ে। কান্না ভাঙা গলায় বললাম আমি—তুমি আজ কাঁদতে দাও আমায় বারণ কোরো না! মানুষ কি শুধু কাঁদে দুঃখের দিনে? বড় সুখের আঘাতে যে সে কেঁদেই শান্তি পায়।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো যোগলেকার। তারও দু' চোখে জল! কয়েক মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ মুছে বললাম ওকে—

—তুমি জান না! শুধু তোমাকেই ভালোবাসিনি আমি! তার সঙ্গে যে ভালোবেসে ফেলেছি তোমার এই পরিবেশকে। তোমার ঘর দোর, গাছ, ফুল,—তোমার চলার পথের ধূলোর কণাটি সুদ্ধ যে আমার কত প্রিয়, তা কি তুমি বুঝতে পারো না? তুমি কি অনুভব করো না যে, আমার এই কথাগুলো কত সত্য?

—জানি রমি। তোমার প্রতিটি কথার সততাকে আমি মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করি। আমার জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর যে কিছু নেই।

একটু থেমে আবার বললো যোগলেকার—জানো রমি। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম ষ্টেশনে, তখনই মনে হলো এ মুখখানি যেন আমার বড় চেনা। তারপর প্রথম যেদিন তুমি এলে এ বাড়ীতে আমি সেই দিনই বুঝেছিলাম, তুমি শুধু আমার বাড়ীতে আসোনি,—এসেছো আমার জীবনে। সেই সত্য উপলব্ধিই সারারাত আমাকে ভাবিয়েছে, ঘুমোতে দেয়নি। শেষ রাতে আমাকে টেনে এনেছে পথের ধারে। তাই সেদিন দাঁড়িয়েছিলাম তোমার আসার অপেক্ষায়।

আমার মুখে এলো না কোনো জবাব। এক গভীর সুখের আবেগে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো আমার ভাষা। শুধু নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলাম, ওর মুখের দিকে।

সুব্রত আসছে, চিঠি এসেছে তার। এখানে দিন সাতেক থেকে, তারপর কোচিন হয়ে জার্ম্মাণ রওনা হবে।

সেদিন দুপুরে খবরটা জানালাম যোগলেকারকে আরো জানালাম যে—ওর কথা আমি লিখেছিলাম মাকে। জবাবে মা লিখেছেন, যে—মনোমত পতি নির্ব্বাচন করার অধিকার তোমার বাবা তোমাকে দিয়ে গেছেন, আমারও আছে এতে পূর্ণ সমর্থন। তবে একটা কথা এই যে নির্ব্বাচনে ভুল যেন না হয়। আমার আশীর্ব্বাদ রইলো।

যোগরাজ একটু হেসে বললো—মাও যে সেই কথাই বলেছেন, যে কথা আমি কাল বলেছিলাম; কৈ মায়ের চিঠি পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছো না তো?

—তা কেন কাঁদবো? মা, যে ঐ চিঠিতেই আবার আদর করে তাঁর ভাবি জামাইকে নেমন্তন্ন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—তোর সঙ্গেই যদি সে আসে তো খুব ভালো হয়, তাকে যে আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। সে জন্য আমি বলতে চাইছি যে, শান্তাদিদের সঙ্গে আমাদের আর কোচিন গিয়ে কাজ নেই। তুমি আমি চলো কলকাতায় ফিরে যাই। বললাম আমি সেটা কি উচিৎ হবে? একটু চিন্তিত ভাবে বললো যোগলেকার।

তোমার দিদির একান্ত অনুরোধেই তো, ছুটি নিতে হলো আমাকে,—আর সঞ্জয়দার চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হলো, কারণ এখন ছুটি আমার পাওনা নয়। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি আমার কাজের ভার অপর ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে আমার এই এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়েছেন। উনি তো নিজে তোমার দিদির সঙ্গে কোচিনে যেতে পারছেন না, এদিকে দিদি তো যাবেন বলে জেদ ধরেছেন,—অতএব সঙ্গে লোক চাই। আর সেই জন্যেই আমার ছুটির ব্যবস্থা। কাজে কাজেই যেতে আমাকে হবেই, আর তুমি তো সঙ্গেই থাকছো। তবে, একটা উপায় আছে, কোচিন থেকে সুব্রতবাবু রওনা হবার পরেই, আমরা ওখানে আর সময় নষ্ট না করে, দিদিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে সোজা কলকাতায় পালাবো। এক মাস তো সময় হাতে আছে ভাবনা কি?

ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিকই। ইচ্ছে না থাকলেও শান্তাদি আর সুব্রতর সঙ্গে আমাদের যেতেই হবে কোচিনে। তা না হলে শান্তাদি আর সঞ্জয়দা মনে বড় দুঃখ পাবেন।

সঞ্জয়দার এখন ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে তাঁর পক্ষে ছুটি নেওয়া সম্ভব নয়, তাই তিনি ঠিক করেছেন যোগলেকারকে সঙ্গে দেবেন আমাদের। শান্তাদির ভীষণ ইচ্ছে, যে তিনি যাবেন, সুব্রতকে সি-অফ করতে কোচিনে! ঐ এক কাজেই দু' কাজ হবে। সি-অফ করা আর বেড়ানো। বেচারি সত্যিই কখনও কোথাও যেতে পায় না, সে জন্য সঞ্জয়দাও এ বিষয়ে ভীষণ মনোযোগী হয়েছেন, শান্তাদিকে তিনি পাঠাবেনই। সঙ্গে থাকবো আমি আর যোগলেকার।

—সুব্রত রওনা হবার পর, দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানগুলো দেখবারও প্ল্যান করে রেখেছেন শান্তাদি।

যাই হোক ঐ ভ্রমণ ব্যাপারটা কিছু সংক্ষেপ করে, যোগলেকার আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে, এই স্থির রইলো।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সুব্রত এলো। পেপার মিল কলোনীতে আবার চললো পার্টির ধূম। আমাদের বাড়ীতেও যখন তখন লেগে আছে মানুষের ভিড়। কমলেশ দু' বেলাই হাজিরা দিতে ভোলে না। তাস, ব্যাড্‌মিণ্টন, নাচ, গান, হৈ হুজুগে ওর জুড়ি মেলা ভার। সুব্রত এসব খুবই পছন্দ করে। সে বলে—কি চমৎকার মেয়েটি। ওকে ভারতীয় মেয়ে বলে মনেই হয় না। ওর চাল চলন সবই একেবারে খাঁটি বিলিতি মেয়েদের মত।

বিলেত যাবার আগেই সেখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সুব্রত।

সেদিন ছিলো মিষ্টার লালের বাড়ীতে পার্টি। পার্টির আসরে নাচবে কমলেশ কাপুর। আমরা সকলেই ছিলাম সেখানে। যোগলেকারকে ডাকলো কমলেশ ওর নাচের জুড়ি হবার জন্ম।

যোগলেকার ওর ডাকে সাড়া দিলো না দেখে, ও ছুটে গেলো সুব্রত'র কাছে। এবারে ওকে আর শূন্য হাতে ফিরতে হলো না। ওরা দু'জনে নাচের তালে ঘুরপাক্ খেতে লাগলো, সঙ্গে পিয়ানো বাজালেন মিসেস লাল।

নাচের পর খাওয়া সুরু হলো। প্রত্যেকে ডিসে করে নিজের অভিরুচিমত খাবার তুলে নিয়ে খেতে সুরু করলেন। কেউবা বসে খাচ্ছেন, কেউবা ঘুরে ঘুরে গল্প জমাচ্ছেন।

সুব্রত গল্প জমিয়েছে 'কমলেশের সঙ্গে, আমাদের পাশের টেবিলে। কানে আসছে ওদের কথাবার্তাগুলো।

—আপনিও আমাদের সঙ্গে কোচিনে চলুন না মিস্ কাপুর। সেখানে যে ক'দিন থাকবো সময়টা চমৎকার কাটবে, আপনার সঙ্গ পেলে। বলছে সুব্রত।

—হি! হিক্ হি! করে হেসে ঢলে পড়লো কমলেশ। বললো—কেন মিস মুখার্জ্জি তো থাকছেন। তাঁর সঙ্গ আপনার কাছে নিশ্চয়ই লোভনীয়।

—You are more interested than you. ওর কাঁধে হাতটা রেখে জবাব দিলো সুব্রত!

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো কমলেশ। তারপর সুব্রত'র হাতটা ধরে ওঁকে একটা হেঁচকা টান দিয়ে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাগানের দিকে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো কমলেশ।

কমলেশের বাচালতা আজ যেন আগের দিনগুলোকে হার মানিয়েছে। নানা ধরণের রসিকতা, টীকা-টিপ্পনি, বাক্যচ্ছটায় গরম হয়ে উঠেছে ঘরের আবহাওয়া। কাবেরী কৃষ্ণমূর্ত্তি কফি পরিবেশন করছেন।

—চমৎকার লাগে আমার এই কাবেরীদিকে। যেমন সরল পবিত্র স্বভাব, তেমনি সুরসিকা, কর্ম্মিৎকর্ম্মা, বিদুষী। আবার গানে, আর বীণা বাজনায় তেমনি দক্ষতা ওঁর। নানা সদ্‌গুণের জন্ম ইনি এখানকার সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্রী। সকলকার ভাবী,—আমাদের
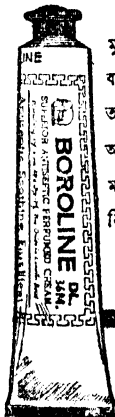
কাবেরীদি? সব বাড়ীতেই উৎসবে; অথবা বিপদে-আপদে, ইনিই প্রথমে ছুটে যান সাহায্য করবার জন্ত।

কফি পরিবেশনের পর কাবেরীদি নিজের কফি নিয়ে এসে বসলেন আমার পাশে। একটু হেসে আমার গালে একটা টোকা মেরে বললেন, কি রে। অমন চুপচাপ একা বসে কেন?

শাস্তাদি কোচিন যাত্রার গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত থাকায়, আসেননি। যোগলেকার তখন উঠে গেছে মিষ্টার লালের টেবিলে। সম্প্রদার চলেছে নাইট ডিউটি।

—আমি বললাম—কৈ চুপচাপ নয়তো। এই যে আপনার মিষ্টি হাতের কফি খাচ্ছি কাবেরীদি।

—বটে বটে। আমার মিষ্টি হাত? কৈ পিঁপড়ে ধরে না তো? আশে পাশে উপবিষ্টগণ হাসির ঝড় বইয়ে দিলেন কাবেরীদির কথায়। আমিও যোগ দিলাম তার সঙ্গে। হাসির ঝড় থামবার পর বললেন কাবেরীদি।

—তোরা তো ভাই কোচিন যাচ্ছিস। এর্ণাকুলামে আমার মাসীমার বাড়ী! অবশ্য মাসীমা মারা গেছেন অনেককাল আগে, এখন আছেন আমার মেসোমশাই মহেশ মেনন, আর তাঁর মেয়ে, মারুতি। তুই গিয়ে ভাব করিস মারুতির সঙ্গে, খুব ভালো লাগবে ওকে। ওকে খুব ছোট্ট রেখে আমার মাসীমা মারা গিয়েছিলেন, তাই ওর পিসিমা ওকে মানুষ করেছিলেন। ওর পিসিমা থাকেন কলকাতায়, মারুতি এতদিন কলকাতাতেই ছিলো, ওখানকার কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করে, এই বছর তিন চার হলো, এর্ণাকুলামে ওর বাপের কাছে চলে গেছে। কি চমৎকার মেয়ে যে, ঠিকানা দেব তুই আলাপ করলে বুঝবি, কাবেরীদি একটুও বাড়িয়ে বলেনি।

—খুব ভালো হলো, কাবেরীদি। ওদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমরা সব দেখতে পারবো, তা না হলে, আমরা তো নতুন, কোথায় কি দেখবার আছে জানতেই পারবো না।

কমলেশ এসে বসলো আমার পাশের চেয়ারে। চোখ নাচিয়ে বললো সে—আপনারা তো আমাকে বলেননি, তবে সুব্রতবাবু যখন এত করে বলছেন, তখন ভাবছি আমিও যাবার চেষ্টা করি, অবশ্য ছুটিটা আরো দিন কতক বাড়িয়ে নিতে হবে।

মুখে ওর ঝাঁঝালো এলকোহলের গন্ধ। কাবেরীদি ভ্রূ কুঁচকে তাঁর চেয়ারটা টেনে নিয়ে একটু দূরে সরে বসলেন।

আমি বললাম ভারি খুসি হবো আপনি আমাদের সঙ্গে গেলে। আমি জানতাম না যে আপনি ছুটি বাড়িয়ে নিতে পারবেন,—তা হলে অবশ্যই আপনাকে যাবার জন্ত অনুরোধ করতাম। যা হোক ক্রটি হয়েছে আমার, স্বীকার করছি।

হাসলো কমলেশ। বললো—আপনাদের সঙ্গে নয়, আমি আগেই চলে যাবো। কারণ কোচিনে মালাবার হোটেলে বোধ হয় বিনা খরচায় আমি আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করতে পারবো। ওখানকার কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার বন্ধু। আমি মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে কয়েকদিন থেকে আসি। জায়গাটা আমার ভারি ভালো লাগে।

তারপর আমার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো—এতটুকু করতে পারার গৌরবটুকুই আমার লাভ। নিশ্চয়ই এই সুযোগটুকু আমাকে দিতে আপনাদের আপত্তি হবে না।

জবাবের অপেক্ষা না করেই, যোগলেকারের দিকে চঞ্চল পায়ে এগিয়ে গেলো কমলেশ। ওর সোফার হাতলের ওপর বসে, একখানা হাত রাখলো ওর কাঁধের ওপর, তারপর দোল খেতে খেতে আরম্ভ করলো বলতে, নিজের যাবার কথা, আর মালাবার হোটেলের কথা।

[ ক্রমশঃ।

## প্রিয়তম ডাকে

কুমারী জ্যোৎস্না সিংহ রায়

*সে তো আমারই আমি তো তারি*
*দু'টি জীবনের একটি বারি*
*চির নূতনের স্বাক্ষর;*
*আমরা পরস্পর।*
*যবে দিই ডাক এস বলি তারে*
*তখনই আমায় শুধায়*
প্রেম প্রীতি গানে জীবনের টানে
কোথায় তুমি গো! কোথায়!
কাছে গেলে শুধু নীরবে তাকায়ে
নয়নের মণি ভ্রূকুটি বাঁকায়ে
দুরু দুরু বুক আমার কাঁপায়ে
বক্ষ লগ্নে প'ড়বে ঝাঁপায়ে
কোন কথা আর কোন বাণী
কহিবে না সে নীরব অভিমানী।
আমার পরেই তার
চির স্বাক্ষর ভালবাসা আনে
নীড়-বাণী-সংসার।

## শেষ অভিসার

শ্রীলীলা ঘোষ

আমি ঝড়ের রাতে অতল তিমিরে
প্রিয় যাব আমি তব অভিসারে
*মিলন মালা রেখ বন্ধু দিও মোর গলে।*
*যাব আমি তব অভিসারে।*
*মোরে যারা ফুলবেশে প্রণয় মাঝারে*
*ফেরিবে বন্ধু তোমারি দুয়ারে*
আমি কহিব তোমারে, সুদূর হইতে
এসেছি আজি তব চরণের তলে।
আজি বিশ্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়া
দুরন্ত বাতাসে এসেছি ভাসিয়া
হের আজি প্রিয় মুখপানে মোর
আমি তব অতীতের সেই প্রিয়া।
*আজি পেয়েছি তোমারে নিশীথ মাঝারে*
*এ যামিনী আমি ছাড়িব কেমনে*
মোর জীবনের আজি শেষ রজনী
আজি মোর শেষ অভিসার নিশা।
আমি যে তোমারি প্রিয়া।

# আণবিক যুগের ভবিষ্যৎ

বর্তমান সভ্যতা একদিনে হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। দিনে দিনে কায়িক শ্রম ও মানসিক উৎকর্ষের ফলে মানুষ আজ আধুনিক সভ্যতায় এসে পৌঁচেছে। আমি বর্তমান সভ্যতায় পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করবার চেষ্টা করছি।

অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে মানুষ একে একে প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, তাম্র প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ প্রভৃতি অনেকগুলি যুগ পেরিয়ে এসেছে। নিজের আত্মরক্ষা ও সুখসুবিধার জন্য মানুষ প্রত্যেক যুগেই কোন একটি দ্রব্যের অধিক ব্যবহার করেছে, ফলে সেই দ্রব্যের নাম অনুসারে সেই যুগের নামকরণ হয়েছে। এই সুত্রানুসারেই আমরা বর্তমান ও আগামী নিকটতম ভবিষ্যতকে আণবিক যুগ আখ্যা দিচ্ছি—কারণ নিকট ভবিষ্যতে মানুষ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আণবিক শক্তির সাহায্য নেবে।

অণু ও পরমাণুর অস্তিত্বের আবিষ্কার বহুদিন আগে হলেও অনেকের মতে আণবিক যুগের প্রকৃত সূচনা হয়েছে ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে। সেই দিন থেকেই মানুষের সামনে নেমে আসে নূতন একটি যুগ। বর্তমান জগতের সকল শিল্পোন্নত দেশগুলি আণবিক শক্তির সাহায্যে নিজের দেশকে অর্থে ও ক্ষমতায় শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। এমনি ভাবে একদিকে দেশগুলি যেমন আণবিক শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, অপরদিকে এমনি তারা স্বভাবতই নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে। এই প্রবন্ধে আমি সেই সকল সম্ভাব্য বিপদের কথাই আলোচনা করবো।

## আণবিক বিস্ফোরণ

যে সকল দেশ আজ আণবিক গবেষণায় উচ্চস্থান অধিকার করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই আণবিক অস্ত্রে শক্তি সম্পন্ন। এদের মধ্যে রাশিয়া, আমেরিকা, ফরাসী দেশ ও বৃটেনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজন বোধে আত্মরক্ষার জন্য কিম্বা নিজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তারা ঐ ভীষণ অস্ত্রের ব্যবহারে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করবে না। বর্তমানে তাই সারা পৃথিবীর মানুষ আণবিক যুদ্ধের ভয়ে ভীত। যদি এ যুদ্ধ কোন দিন ঘটে তাহলে পৃথিবীর দুই বিবদমান জাতির সঙ্গে ও অন্যান্য নিরপরাধ দেশগুলিও সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবে। তাই সাধারণ মানুষ আজ স্বভাবতই আণবিক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের চীৎকার উপেক্ষা করেই বিভিন্ন দেশের সামরিক বিভাগ ও আণবিক গবেষকগণ এটমিক টেষ্ট বম্ব বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গবেষণা কার্য চালাচ্ছে। ফলে সমুদ্র, মরুভূমি ও তুষারময় মেরু অঞ্চল বিপজ্জনক এলাকায় পরিণত হচ্ছে। ঐ সব স্থান ছাড়া ওর নিকটবর্তী স্থানগুলিও বিস্ফোরণজনিত ভস্মরাশির পতনে বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভস্মরাশি, বিস্ফোরণ মুহূর্ত থেকে কয়েক বৎসর যাবৎ আকাশমণ্ডল থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়তে থাকবে। ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সাধারণ তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে মানুষ ও প্রাণী জগতের ভয়ানক ক্ষতিসাধন করবে। পর পর অনেকগুলি বিস্ফোরণ ঘটবার পরও বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে পৃথিবী পৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা এখনও বিপদ মাত্রায় এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু এই ভাবে যদি কিলোটন থেকে সুরু করে ক্রমাগত নানা প্রকার শক্তিশালী মেগাটন বম্ পর্য্যন্ত বিস্ফোরণ ঘটান চলতে থাকে তবে

পৃথিবী পৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয়তার যে নিশ্চয়ই বিপদ মাত্রায় গিয়ে পৌঁছাবে তাতে সন্দেহ নেই।

## এটমিক্ রিএ্যাক্টার

এটমিক রিএ্যাক্টার এমন একটি যন্ত্র যাহার সাহায্যে পদার্থের অণুবিভাজন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও পরে তার থেকে শক্তি বের হয়ে আসে। এই অণুবিভাজনের ফলে যে শক্তি বের হয় তার দ্বারা যান চলাচল ও শিল্পকার্য চালান সম্ভব।

এর ব্যবহার দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী ৫০ বছরে আণবিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় এত বেশী শক্তি পাওয়া যাবে যা বর্তমানের সমস্ত প্রকারের শক্তির সমষ্টির দ্বিগুণ।

শিল্পকার্যে যত বেশী রিএ্যাক্টার এর ব্যবহার বাড়তে থাকবে ততই রিএ্যাক্টার হতে দুর্ঘটনাজনিত বিপদ বেড়েই যাবে। আমরা জানি যে ১৯৫৭ সালে ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার সেলাফিল্ড কাম্বারল্যাণ্ডে যে রিএ্যাক্টার দুর্ঘটনা ঘটে তাতে ঐ রিএ্যাক্টারের চতুর্দিকে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কণিকা ছড়িয়ে পড়ে ও এই ভাবে বিপজ্জনক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এ ছাড়া রিএ্যাক্টার হতে যে অল্প পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কণিকা বের হয় তা গাছপালা ও মাটিতে পড়ে এবং বায়ুতাড়িত হয়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এই তেজস্ক্রিয় কণিকা রিএ্যাক্টারে নিযুক্ত কর্মী ও নিকটবর্তী জনসাধারণের বিপদের কারণ হয়ে উঠে।

## খনিজ দ্রব্য

মানুষ যত বেশী আণবিক শক্তির ব্যবহার করবে ততই জ্বালানী হিসাবে ইউরোনিয়াম ও থোরিয়াম এর প্রয়োজন বাড়বে। খনিতে যত বেশী কর্মী কাজ করবে তাদের অনেকেই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব জনিত রোগে ভুগবে। কিছুদিন আগেও চেকোশ্লোভাকিয়ার যোয়াচিমষ্টারের ইউরোনিয়াম খনিতে কার্যরত শ্রমিকদের ফুসফুসের কর্কট রোগে ভুগতে দেখা যায়। তাছাড়া খনিজ পদার্থ থেকে আণবিক জ্বালানি বের করার পরও যে অব্যবহার্য খনিজ পদার্থ পড়ে থাকবে তার থেকেও যে তেজস্ক্রিয় কণিকা বেরুবে তা পৃথিবী পৃষ্ঠকে সংক্রামিত করবে।

ভারতে আণবিক সম্পদ সন্ধানের সুরুতেই দেখি যে কেরেলায় ও মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে সমুদ্র উপকূলে যে মোনাজাইট মাটি পাওয়া যায় তার উপর দৃষ্টি পড়েছে। ঐ অঞ্চলে কারখানা স্থাপন হয়েছে ও ট্রম্বেতে খনিজ পদার্থের সংশোধনের কাজ সুরু হয়েছে।

## সমুদ্রের তেজস্ক্রিয়তা

পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ স্থল এবং অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ সমুদ্র। এই বৃহৎ সমুদ্রের বুকে ৩,০০,০০০ মেগাকুরি তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম

হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি তাদের অব্যবহার্য তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি সরাসরি সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দিচ্ছে। ফলে সমুদ্রের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে। গত কয়েক বছর ধরে সমুদ্রের উপর আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে এবং ভবিষ্যতে আরো [illegible] সমুদ্রের তেজস্ক্রিয়তা আরো বেড়েই চলবে। প্রথমেই এর প্রতিক্রিয়া আসবে সমুদ্রের মাছ ও গাছপালার উপর। সমুদ্রের জীবজন্তুদের দেহে ঐ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ জমা হবে। যার অনিবার্য ফল স্বরূপ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

## শিল্পকার্যের বিপত্তি

আগামী দিনে আমরা অনুমান করচি যে পৃথিবীর নানা দেশে শিল্পকার্যে আণবিক শক্তির বিপুল ব্যবহার হবে। একমাত্র আমেরিকায় ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বৎসর গড়ে ১১,০০০,০০০ কিলোওয়াট উত্তাপ রিএ্যাক্টার থেকে উৎপন্ন হবে। কেবলমাত্র জলযান চালনায় মোট উৎপাদনের ২০ ভাগ ব্যবহার হবে। ফলে যে পরিমাণ অব্যবহার্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরুবে তাতে জল ও বাতাস বেশ বিষাক্ত হয়ে উঠবে। তেজস্ক্রিয় কণিকার দ্বারা সংক্রামিত জল শিল্পকার্যে নানা ক্ষতিসাধন করবে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ফটোগ্রাফিক শিল্প, ঔষধশিল্প, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি।

## কৃষিকার্য

আধুনিক কৃষি-বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে বীজ মাঠে রোপণ করার আগে যদি অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ফসফরাস (P 32) প্রয়োগ করা যায় তাহলে গাছের ফলন বেড়ে যাবে। অন্য দিকে মাঠে তেজস্ক্রিয় সার দিলেও গাছের ফলন বাড়ে বলে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন। যদিও এটা বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রয়েছে তবুও অনুমান করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে এর বহুল প্রচলন হবে ফলে একদিকে যেমন ফসল বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি অন্য দিকে মাটি ও বাতাসের মধ্যে বেশ কিছুটা তেজস্ক্রিয়তা বেড়ে উঠবে।

আবার কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক ঔষধে গাছের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক তত্ত্বের অন্বেষণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার বাড়ছে ও বাড়বে। উন্নত ধরণের কৃষিজাত গাছের সৃষ্টির জন্য সিজিয়াম কোবাল্ট, বেরিলিয়াম ও নিউট্রনের ব্যবহার বাড়বে।

কৃষিকার্যে নিযুক্ত জীবজন্তুর ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটবে। আমাদের মতই জীবজন্তুর জীবনও বিপদময় হয়ে উঠবে। যেহেতু গবাদি পশুর উপর আমরা নির্ভরশীল সেহেতু উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে দুধে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের প্রাদুর্ভাব আমাদের অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই ভাবে যতই তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার বাড়বে, ততই মানুষকে তেজস্ক্রিয় পরিবেশের মধ্যে বসবাস করতে হবে।

## চিকিৎসক ও হাসপাতাল

বর্তমানে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে হাসপাতালে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে। রুগীদের ব্যবহৃত আইসোটোপ তাদের মলমূত্রের সঙ্গে বেরুচ্ছে ও সেগুলো সমুদ্রে নিয়ে ফেলা হচ্ছে। আইসোটোপের ব্যবহারের ফলে রোগ নির্ণয়ে নিশ্চয়ই সুবিধা হচ্ছে ও ভবিষ্যতে আরো সুবিধা হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ও নার্সদের বিপদের পরিমাণও সমান ভাবেই বাড়ছে।

## পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

পর পর দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষ আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। ট্রম্বে আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে 'অপ্সরা,' 'যারলিনা,' 'কানাডা-ইণ্ডিয়া-রিএ্যাক্টার' নামক তিনটি রিএ্যাক্টার চালু হয়েছে। এখান থেকে উৎপন্ন আইসোটোপ সারা ভারতবর্ষে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বোম্বাইএর উত্তরে তারাপুরে ১৫০ মেগাওয়াট রিএ্যাক্টার ১৯৬৫ সালের মধ্যে চালু হবে। এ ছাড়া 'কানাডা-ডিউটেরিয়াম ইউরেনিয়াম রিএ্যাক্টার' (CANDU) চালু হবে।

ভারতবর্ষে গত দশ বৎসর অপেক্ষা আজ সংখ্যায় অনেক বেশী গবেষণাগারে আণবিক শক্তির প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। দিনে দিনে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভারতের দিকে দিকে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে।

## বিশ্বযুদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক

এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম সেগুলি নিশ্চয়ই মানুষের জীবনের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর সন্দেহ নেই। তার চেয়েও ভীষণ ভয়ের কথা যদি বিশ্বযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে যারা H-Bomb ও A-Bomb তৈরী করে রেখেছে তারা সেগুলি ব্যবহার করতে মোটেই পেছ পাও হবে না— ফলে দাঁড়াবে এই যে পৃথিবীর এক প্রান্তে যুদ্ধ হবে অন্য প্রান্তে নিরপেক্ষ নিরপরাধ শিশু ও মানুষের জীবন হানি ঘটবে। এর ভয়ে ভীত হয়ে ১৯৫৮ সালে জানুয়ারী মাসে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ লাইনাস পাউলিং ও ১২০৫ জন বৈজ্ঞানিক স্বাক্ষর দিয়ে বিশ্বসংস্থার হ্যামারশিল্ড এর কাছে যে আবেদন করেছিল তার কিছুটা উদ্ধৃতি করিলাম।

"We the scientists, whose names are signed below urge that an international agreement to stop the testing of nuclear bombs be made now.

Each nuclear bomb test spreads an added burden of radioactive elements over every part of the world. Each amount of radiation causes damage to the health of human beings all over the world and causes damage to the pool of human germ plasm such as to lead to an increase in the number of seriously defective children that will be born in future generation".

বর্তমানে আমাদের সুস্থ ভাবে বাঁচার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আগামী দিনে যারা আসছে তাদের জীবন গর্ভাবস্থার সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'বিষানো বায়ুর' থেকে যাতে আমরা বাঁচাতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। ঐ ছোট ছোট শিশুদের দিকে তাকিয়ে আমাদের আজ ঠিক করতে হবে, হয় আণবিক বিস্ফোরণ ও গবেষণা বন্ধ হউক আর না হয় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করা পর্যন্ত কোনো বোমা প্রস্তুত করা চলবে না। মানুষের ভবিষ্যত জীবন সুখ ও সমৃদ্ধময় হউক এই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

—শ্রীবলরাম মজুমদার

## মহাকাশে জীবন স্বাভাবিক ভাবেই চলে

"সোভিয়েত মহাকাশচারীরা এত দীর্ঘকাল মহাকাশে থাকিয়াও কি ভাবে খোশ-মেজাজে থাকিতে পারেন"—[illegible]টি আজকাল প্রায়শঃই শোনা যায়।

[আ]মাদের এই গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠে যে সকল অবস্থা বিরাজমান, [মহাকা]শ যানগুলির ক্যাবিনে তাহাই সৃষ্টি করা হয়। স্বল্পকালের [উড্ড]য়নের জন্য বিশেষ ধরণের সিলিণ্ডারে করিয়া অক্সিজেন সরবরাহের [ব্যব]স্থা লইয়া যাওয়া হয়। ঊর্দ্ধাকাশে রকেট-যোগে কুকুরদের [পরি]ক্রমা এবং মার্কিণ মহাকাশচারীদের স্বল্প-কালীন উড্ডয়নে তাহাই [কর]া হইয়াছে।

অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী উড্ডয়নে মহাকাশযানে অক্সিজেন সরবরাহের [ব্যব]স্থা সঙ্গে লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক নয়। সে-ক্ষেত্রে প্রয়োজন [পু]ন পুনঃ সৃজনক্ষম পদার্থসমূহের—যেগুলি কার্বনিক এসিড এবং [জ]লীয়বাষ্প আশোষিত করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহা হইতে [প্র]য়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন তৈরী করিতেও পারে। দ্বিতীয় [কৃ]ত্রিম উপগ্রহে লাইকার জন্য এবং কক্ষপথে ঘুরিবার জন্য প্রেরিত [ম]হাকাশযানগুলিতে এই পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়, আর ভোস্তোক [ম]হাকাশযানগুলিতে আরও উন্নত ধরণে তাহাই ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু সর্ব্বাধিক উন্নত পদ্ধতি হইল জৈব-ধরণের—যাহাতে [উ]দ্ভিদ কার্বনিক এসিড আশোষিত করিয়া অক্সিজেন তৈরী করিবে। [এ]কই গাছগাছড়াগুলিকে খাদ্যরূপেও ব্যবহার করা চলিবে। এই [প]দ্ধতি আমাদিগকে পৃথিবীতে সঞ্চরমান দ্রব্যাদির কাছাকাছিও [ল]ইয়া আসে। উড্ডয়ন যত সুদীর্ঘ হইবে ততই এই পদ্ধতি অধিকতর [ল]াভজনক এবং যুক্তিযুক্ত বলিয়াও বিবেচিত হইবে।

বছরে একজন মানুষ অক্সিজেন, খাদ্য ও পানীয় জল কমপক্ষে দুই [ট]ন পরিমাণ ব্যবহার করে। দীর্ঘতম উড্ডয়নগুলিতেও তাহা কমানো [বা]ঞ্ছোচিত হইবে না।

এখন যত সব পদ্ধতি বিবেচিত হইতেছে তন্মধ্যে জৈব ধরণের পুনঃসৃজনক্ষম পদ্ধতিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের জৈব-প্রক্রিয়ার উপজাত [দ্র]ব্যগুলিকে বিশেষ অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর সাহায্যে প্রথমে বিভক্ত করাইয়া মাটি বা যে-তরল পদার্থে গাছগাছড়াগুলি জন্মিবে সেগুলিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

এক-কোষবিশিষ্ট সামুদ্রিক গাছ ক্লোরেল্লা এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ ভাবেই ভাল। ইহাও লক্ষ্য ও আগ্রহের বিষয় যে, ইতিহাসের মতে পৃথিবীর আবহমণ্ডলেও জৈব-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অক্সিজেনের উৎপত্তি ঘটে। মহাদেশগুলির পৃষ্ঠের প্রবল গাছগাছড়ার আচ্ছাদন এবং জলজ গাছগাছড়াসমূহ হইতেই অক্সিজেন গঠিত হয়।

একটি চিত্তাকর্ষক প্রস্তাবনাও করা হইয়াছে: শুক্রগ্রহে ক্লোরেল্লা লইয়া যাইতে হইবে। ধারণা হইল যে শুক্রগ্রহে বড় বড় জলাশয় আছে, আর আছে উচ্চ তাপ, সেখানে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প এবং কার্ব্বনিক এসিড রহিয়াছে, কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম। হয়তো বা ক্লোরেল্লা সেখানে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়া বাঁচিতেও পারে। উহা শুক্রগ্রহের জলাশয়গুলিকে ছাইয়া ফেলিবে এবং এত পরিমাণ অক্সিজেন তৈরী করিবে যে তাহার ফলে পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রাণীগণের পক্ষে শুক্রগ্রহে বসবাস করা সম্ভব হইবে।

মহাকাশযানের ক্যাবিনে কিভাবে স্বাভাবিক তাপমান রক্ষা করা হয়? ইহা একটি জটিল সমস্যা। ভারশূন্যতার অবস্থায় মহাকাশচারীর দেহ অথবা কোনও যন্ত্রপাতি (যেমন একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব) যে তাপের স্তর সৃষ্টি করে, তাহা তাহাদের গায়ে একটি গরম কম্বলের মত চাপানো থাকে। পৃথিবীতে উষ্ণতর হাওয়া উপরে ভাসিয়া উঠে এবং অধিকতর ঠাণ্ডা স্তর উহার স্থান গ্রহণ করে। পৃথিবীতে এই যে বায়ু চলাচল সর্ব্বদা স্বাভাবিক, রীতিমত এবং আমাদের অজানিত ভাবেই ঘটিতেছে মহাকাশযানে ভেণ্টিলেটারের সাহায্যে তাহা গড়িয়া তুলিতে হয়।

অবতরণকালে ক্যাবিনের তাপমান নিয়ন্ত্রিত করা বিশেষ ভাবে দুরূহ কাজ। মার্কিণ মহাকাশ যানগুলিতে অবতরণ কালে বাতাসের তাপমাত্রা একাধিকবারই এত চড়িয়া যায় যে, মহাকাশচারীর জীবনই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সোভিয়েত মহাকাশযানগুলিতে তাপমান সর্ব্বদাই আরামের পরিধির মধ্যে থাকে আর তাহা মহাকাশচারীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

এখন তো দেখিতে পাইতেছেন যে, মহাকাশ উড্ডয়নে স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করিবার সমস্যাগুলিও সমধিক চিত্তাকর্ষক এবং দুরূহ।

—এ, গিযুবদ্জিয়ান,

## ভালোবাসার গোপন কথা

ডব্লিউ ব্লেক

যে হোক কাউকে ভালোবাসো তুমি! নয়?
নাই বা বললে। গোপনই সে কথা থাক্।
অকথিত প্রেম প্রেমিকেরই পরিচয়—
তুমি কি জানো না? মনের যমুনা তীরে
ভাষাহীন প্রেম বাঁশরীতে কথা কয়।
মদালস সাঁঝ বাতাসে ছড়ায় মধু
ধীর প্রশান্ত ললিত বাতাস বয়।
আমি নায়িকার স্বপ্ন প্রহর ঘিরে
কসুর করিনি কল্পনা জাল বোনা;
ফেনিল রক্ত! কী আমেজে ধীরে ধীরে
ব্যক্ত করেছি অব্যক্ত কল্পনা।

অথচ ভীষণ অবসাদ শুধু দিয়ে
বিবর্ণ ভয়ে হরিণী ত্রস্তা পায়
ধরা দিলো কোনো অচিন নায়কে গিয়ে
চকিত নয়না আমার হরিণী, হায়!

এবং আমার মৌন ব্যথার ধারে
পাতা ঝরানিয়া তুহিনা বাতাস শুধু
ক্লান্ত পাখীর নীড় খোঁজা হাহা কারে
দীর্ঘশ্বাসের ঊষর মরুভূ ধু ধু।।

অনুবাদ:—শ্রীমতী জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

রাজেন্দ্র যাদব

"কি জানি কেন এই জাহাজগুলো দেখে আমার সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা মাথায় আসে।" উনি অস্ফুট স্বরে বলেন। "কে জানে কোথায় কোথায় আসা যাওয়া করছে এরা।···এতে যারা যাচ্ছে কেমন আগে জানেই বা কে জানে···এমনিতেই নদীর ধারে যাবো ভারি একটা নেশার আছে আমার। ছোটবেলা থেকেই জল বয়ে যেতে দেখলেই অদ্ভুত মনে হয়। মনে আছে যখন ছোট ছিলাম আমাদের বাড়ির পেছনেই খুব চওড়া একটা নালা ছিল। আমার যখনই সুযোগ জুটে যেত দৌড়তাম সেদিকে। বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল দেখতাম। জলে মেঘের ছায়া পড়ত। আমার মনে হত সেই মেঘের এক ধারে বসে জলে সাঁতার দিতে দিতে আমিও চলে যাই সমুদ্রে···খুব দূরে···ওখানে কোন ধারে পড়া দিশা-তোলা জাহাজ যাচ্ছে···আমি দুহাত ভেঁপুর মত করে খুব জোরে জোরে সে জাহাজের লোকদের আওয়াজ দিচ্ছি···আমার গলার শিরা প্রকট হয়ে উঠেছে···কিন্তু জাহাজ চলেই গেল···শূন্য চোখে আমি সেই অসীমে হারিয়ে যাওয়া জাহাজটাকে দেখতে থাকি খালি আর তারপর ফুলে ফুলে কেঁদে উঠি।···"

আমি দেখি উনি হঠাৎ ভাবুক হয়ে ওঠেন আবার। কত তাড়াতাড়ি চুল ঝাপ্‌টানোর সঙ্গে সঙ্গে মুড বদলে ফেলেন উনি···আমি তো এত তাড়াতাড়ি নিজেকে বদলাতে পারি না। পেছনে দাঁড়ানো গাড়ির সারি, আইসক্রিম, মুড়ি, ছোলা আর চানাচুর গরম কিংবা চিনাবাদাম বিক্রি, পথ দিয়ে চলে যাওয়া বাস আর কৌতূহলী হয়ে আমাদের ঠিক পাশ দিয়ে দেখতে দেখতে চলে যাওয়া মানুষের দল আর সামনের নৌকা স্টিমার আর মাল জাহাজের ছায়া আমার চেতনায় এমন কিছু সুর তুলেছিল যে, হঠাৎ ঠিক মেঘের আর চিলের সঙ্গে সাঁতার দেওয়ার কথা আমি এই সময় ভাবতে পারছিলাম না। কিন্তু এ সব জিনিস বোধ হয় তখন ওঁর চিন্তাতেই আসছিল না। আজ ভাবি তো মনে হয় আমাকে বোধ হয় সে সব উনি শোনাচ্ছিলেনও না। উনি তো নিজের মানসিক পরিস্থিতির একটা প্রকাশ পথ চাচ্ছিলেন। আর কার্য্যকারণের যোগে সেখানে আমিই ছিলাম।

"এখন দেখুন, এপারে দেখুন।" কুকুরটার ঘাড়ে হাত রেখে উনি বলছিলেন, "জলে কিরকম ঢেউ দিয়েছে। বোধহয় জোয়ারের সময় হয়েছে। আচ্ছা, আপনিই বলুন আলোগুলো দেখে মনে হচ্ছে না যেন সোনালী সোনালী সাপ জলে লাফিয়ে লাফিয়ে পিছল পাড়ের ওপর উঠবার চেষ্টা করছে···নৌকোর ভেতর মশলা পেশা, রান্না করতে ব্যস্ত মানুষ···ঐ দেখুন আহা মাউথ অর্গানে কি সুন্দর সুর বাজাচ্ছে···'হামে তো শামে গম মে কাটনি হ্যায় জিন্দগী আপনি'···"

আর উনি আস্তে আস্তে মাউথ অর্গানের সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে আরম্ভ করেন। তারপর হঠাৎ আনন্দের এক লহরী তুলে শাড়িটাকে টেনে আনেন কোমরের পাশে। কাটা ব্লাউজের ফাঁকে পিঠ আর সুডৌল কাঁধ খুলে যায়। কোমরেরও বেশ খানিকটা অংশ দেখা দিতে থাকে। এ সম্বন্ধে বে-খেয়াল উনি বলেন, "ইস আমার তো মনে হচ্ছে লাফ দিয়ে উঠে এদিক থেকে ওদিক দৌড় লাগাই।" শান্ত হয়ে বসে থাকা কুকুরটার দুই কান ধরে আদর করে এমন ভাবে নেড়ে দেন যেন কোন বাচ্চার চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছেন।

"আজ কি জানি কেন আমার মনটা বড্ডই খুশী আছে। বড় 'মৌ' আছে। আচ্ছা একটা গান গাইব?"

"না তাই, পারিপার্শ্বিকের কথাও তো অল্প স্বল্প মনে রাখুন," আমি হঠাৎ চমকে গিয়ে বলি আর চোখের কোণ দিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে হেসে ফেলি। এত বড় হয়েও সব মেয়েই কোথাও না কোথাও একেবারে ছেলেমানুষ আছে যে এক্ষুনি আদুরে ভঙ্গিতে বলে উঠবে। উঁহু, আমি তো শোনাবই।

"না, শুধু একটা। তাই আপনি তো খুব তাড়াতাড়িই রেগে ওঠেন। আমার কথায় কিছু মনে রাখবেন না। আমি তো এমনিই। যা' মনে আসে বলে বসি। খুব আস্তে আস্তে গাইব। আপনিও হয়ত বলবেন, কি অসভ্য মেয়ে, কিন্তু আমি গাইবই।"

ওঁর স্বরে এমন এক আশ্চর্য্য আর অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তা ছিল যে আমি চমকে উঠি। যেন ওতে এমন এক ধাক্কা ছিল যা একেবারে সামলান আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আগে ওঁর সম্বন্ধে এমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে এ সব বড় পরস্পর বিরোধী বলে মনে হচ্ছিল।

আর উনি নিজের উঠিয়ে রাখা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে আস্তে আস্তে গাইতেও আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। মাউথ অর্গানের সঙ্গে এতক্ষণ উনি গুনগুন করছিলেন আর তা-ও খুব অস্ফুট ভাবে। স্বর এত আস্তে ছিল যে আমি মাথা পাশে সরিয়ে এনে সামনে দেখতে দেখতে শুনতে আরম্ভ করেছিলাম···'মজাজের' রচনা গাইছিলেন উনি···"এ গমে দিল কেয়া কঁরু, এ বহশতে দিল কেয়া কঁরু···"

একটু গলা ঝেড়ে অভ্যেস মতন উনি চুল ঝটকান আর একটা গুচ্ছ এসে লাগে আমার কানে···আর সেই প্রথম আমার সমস্ত শরীর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত শিরশির করে ওঠে। আমার যেন নতুন করে নিজের উপস্থিতি বোধ হয়। কানের ওপর হাত দিয়ে আমি সেই চাঞ্চল্য ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। কিন্তু এক আশ্চর্য্য মাদকতা, স্বপ্নময় মিষ্টি মিষ্টি গন্ধের কুয়াশা যেন গাঢ় হয়ে নিজের চার পাশে ছড়িয়ে পড়ছে মনে হয়। যেন বিস্মৃতির সাগরের ঢেউ ভেঙে ভেঙে আছড়ে পড়ছে আর সেই উচ্ছ্বসিত জলধারায় আমার শরীর-মন ভিজে উঠছে।

"এ গমে দিল কেয়া কঁরু?···
দিল মে ইক শোলা ভড়ক উঠা হ্যায় আখির কেয়া কঁরু?
মেরা প্যামানা ছলক উঠা হ্যায়, আখির কেয়া কঁরু?
জখম শিনে প মহক উঠা হ্যায়, আখির কেয়া কঁরু?
এ গমে দিল কেয়া কঁরু, এ বহশতে দিল কেয়া কঁরু?···

বিভোর হয়ে গাইছিলেন মিসেস তেজপাল। আর আমি যেন নিজের কাছ থেকে উঠে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলাম। যেন ওঁর থেকে, আশেপাশের কথাবার্ত্তা থেকে কোথাও দূরে···কোন অজানা দূর দেশে···মনে হচ্ছিল ডিসেম্বর বা মার্চ মাসের চাঁদের আলোয় কোন ছায়া ছায়া লনের মাথার তলায় হাত রেখে চিৎ

## নন্দার সৌন্দর্য্যের গোপনকথা...

# 'ত্বক সৌন্দর্য্যের জন্য লাক্স-ই আমার পছন্দ

কুমারী নন্দা
লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করেন।
লাক্স মাখুন ...
ফেনার পরশে চেহারায় নতুন
ত্বক সৌন্দর্য্যের যত্ন নিন, লাক্স মাখুন।

চিত্রতারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান

নন্দা, পদ্মদীপ চিত্রের 'আজ আউর কাল' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায়

রূপসী নন্দা বলেন—'লাক্স সাবানটি চমৎকার আর রঙগুলিও কি সুন্দর!'

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 121-X52 BG

হয়ে শুয়ে রহস্যভরা আকাশটাকে দেখছি আর আশেপাশে কেয়ারী করা বেল আর চামেলীর মধ্যে গোলাপ-ভ্রমরের মতন উচ্ছ্সিত হয়ে উঠেছি···যেমন কখনো কখনো অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত তাজমহলের লনে শুয়ে থাকতাম আর কোন উদাসী পথিকের মতন হাঁটুর ওপর মাথা দিয়ে তাজমহল নিঃশব্দে বসে বসে জ্যোৎস্নায় ভিজে কোন অতীতের সমুদ্রে হারিয়ে থাকত। এক মুহূর্ত্ত আমার মনে হয় যেন সত্যি সত্যিই সেই সময়ে ফিরে গেছি আর আধবোজা চোখে আকাশটাকে দেখে চলেছি আর তাজের সিঁড়ির ওপর হাতের ওপর থুতনি রেখে কোন উদাসী বসে বসে কে জানে কি ভাবছে, আর তারই ছায়া যেন আনাগোনা করছে আমার মনে মনে···ষ্টিমারে লম্বা ভোঁ আওয়াজে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসি। কোথায় চলে গিয়েছিলাম আমি এরই মধ্যে?

"জি ম্যায় আতা হ্যায় এ মুর্দ্দা চাঁদ তারে নোচ লুঁ,···
ইস কিনারে নোচ লুঁ, অর উস কিনারে নোচ লুঁ,
এক দো কা জিক্‌র কিয়া, সারে কা সারে নোচ লুঁ,
এ গমে-দিল কিয়া করুঁ, এ বহশেতে-দিল কিয়া করুঁ?···"

গান শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হয় মাঝখানে ওঁর গানের প্রবাহ যেন থেমে গেছে আর বিরক্ত হয়ে দাঁতে দাঁত ঘষছেন উনি, যেন সত্যিকার চাঁদ তারাকে কেড়ে নেবার প্রবল ইচ্ছে ওঁর ভেতরে তোলপাড় করছে। মনে হয় কোন স্বপ্নের যাদু-কাঠি যেন আস্তে নামতে শুরু করেছে···ওঁর এই মুড, ওঁর পুরনো ছবি আর এই অবসাদ···দুই-এর মধ্যে কোথাও যেন কোন সাম্য বা সংগতি নেই···আর এই চেতনা আমাকে আবার হুগলির ধারে ফিরিয়ে দেয়।···

উনি সামনে বসে অস্ফুটভাবে গাইতে থাকেন আর থেকে থেকে আবার নিজের দিকে ওঁর মখমলের মতন বাহু, রেশমী চুল আর কানের চাঁদ কিটির আবেশভরা চেহারা—সব কিছুই এক কুয়াশার ওপারে হারিয়ে যাওয়া মনে হতে থাকে আর আবার সচেতনতায় ফিরে এসে দেখি উনি নিজের হাতের পাতলা বেতটা দিয়ে উঠিয়ে রাখা হাতের পাতায় আস্তে আস্তে মারছেন। ওঁর এই ভঙ্গি, অল্প নড়া ঠোঁট, আর কুনুইএ বাঁধা সাদা পটি, আমাকে জোর করে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনে আর কসমেটিক্‌সের অল্প অল্প গন্ধ আবার ওপরে হাওয়ায় উছলিয়ে দিয়ে যেন ফুলের মতন হালকা করে দেয়। নিজের মাথার কাছে ওঁর মাথাটা সরে এলে যেন নেশা ধরছিল আর মন বলছিল—কেউ এ সময় আমাদের এমন ভাবে দেখলে কি বলবে। ওঁর সেই কণ্ঠস্বর উপস্থিতির জাদুতে আর উচ্ছ্সিত মনের প্রবাহে বিবশ হয়ে নিশ্চয়ই ভেসে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ছোট্ট একটা কাঁটা যেন তবু বারবার বিঁধছিল···আমি এখন কারুর বদলেই বসে আছি বুঝিবা। কে জানে সে কে? স্বপ্নের দেশে বিচরণ করতে করতে এও তো মনে হচ্ছিল যে, উনি নিজের মাথা আমার মাথার কাছে আনছেন কেন এত? পাশে বসা মানুষজন এই গান শুনে না ভেবে বসে যে কোন বাজারের মেয়েই সঙ্গে আছে বুঝি।

কিন্তু আমি এও জানতাম যে উনি যতই হালকা হোন, যতই বাধাবন্ধহীন স্বচ্ছন্দ ব্যবহারই করুন, গান গান, কিন্তু ওঁর সমস্ত কথাবার্ত্তায় এমন এক সংযত ভাব, এমন প্রশান্ত গাম্ভীর্য আছে যে সহসা ওঁর সম্বন্ধে এদিক সেদিক কেউ ভাবতে পারে না। আমার মনে আছে—সে সময় একবার কি যেন কেন আমার মনে হয়েছিল মিসেস তেজপালের খুব লম্বা চুল আছে আর উনি খুব যত্ন করে সুডৌল একটা খোঁপা করে রেখেছেন মাথায়। ইচ্ছা হয়েছিল কোথাও থেকে রজনীগন্ধার একটা অর্দ্ধচন্দ্রাকার মালা নিয়ে ওঁর চুলে লাগিয়ে দিই, আর কি জানি কি এক আবেগে আমার হাতটা ওঁর পিঠটা স্পর্শ করবার জন্যে ছটফট করে ওঠে। একবার বোধ হয় উঠেই গিয়েছিল। কিন্তু নিজেই আবার সজোরে মনের সে ইচ্ছেকে দমন করি। বীনুর কথা মনে মনেই ছবি হয়ে ফুটে উঠেছিল, হয় তো বা। সমস্ত রোমাণ্টিক ভাবনার মাঝে মাঝে আমার এই গর্ব্বও ছিল যে উনি আমাকে একেবারে একান্ত ক্ষণেই নিজেকে বিকাশের পথ করে নিয়েছেন; এত কাছে আসতে দিয়েছেন। আমি যেন আস্তে আস্তে অনুভব করতে চাইছিলাম যে, এরকম আপ-টু-ডেট, অভিজাত সৌন্দর্য্যময়ী নারী আমাকে এ-রকম গৌরব দিচ্ছেন আর আমি এ-রকম ভাবে ওঁর মুডের ভাগ নিচ্ছি।

গান শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই উনি বলেন: "কি দুঃখভরা গজল না? কি জানি কেন যখন আমার মন ভীষণ খুশি হয়ে ওঠে তখন এমনই খুব দুঃখের কিছু গাইতে ইচ্ছে করে। গাইতে গাইতে ইচ্ছে হয় এক-একটা অনেক বার করে গাই আর খুব কাঁদি। আচ্ছা, একটা কথা আপনি জানেন? দুঃখান্ত ছবি আমি দেখতে পারি না। যাই না আমি মোটেই। ক'দিন ধরেই মন খারাপ হয়ে থাকে।" পেছন দিকে মালভরা একটা ট্রাক এত জোরে আওয়াজ করতে করতে ঢুকে যায় যে ওঁর কথা ডুবে যায়···ওঁর যেন আমার কাছ থেকে কোন কথা শোনবার দরকারই ছিল না। কিন্তু আমি আর থাকতে পারছিলাম না। বার বার ওঁর কাঁধে হাতটা রাখবার ইচ্ছে দুর্নিবার হয়ে উঠছিল, আর থেকে থেকেই মনে হচ্ছিল ওঁর জীবনে কোথাও খুব বড় একটা কোন ট্র্যাজিডি আছে। কোন গরমিল আর সে গরমিলকে ওঁর উচ্ছ্সিত জীবনশক্তি কিছুতেই যেন স্বীকার করে নিতে পারছে না। আমি স্পষ্টই মনের গভীর থেকে একেবারে অন্তরের ডগা পর্য্যন্ত উঠে আসা একটা ঢেউ যেন অনুভব করছিলাম আর সেই ঢেউ শব্দের রূপ নিয়ে আমার মনে যেন গুঞ্জরণ করে উঠছিল। তখন কল্পনায় ওঁর কানের ওপর হাত রেখে মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর টেনে নিই আর বলি—তুমি বড় দুঃখী মিসেস তেজপাল। আমি জানি। গুলির ফুলের ছায়ায় তোমার এই কুহক কেই বা শোনে? সঙ্গে সঙ্গে এও জানতাম যে এই সহানুভূতি আর দয়া ওঁর আত্মসম্মান কখনো স্বীকার করে নেবে না। ইতস্তত করে তাই বলি: "একটা কথা জিজ্ঞেস করব মিসেস তেজপাল?"

"বলুন।" হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠেন উনি। নদীর ধারে বসে শুধু নিজেরা একলা বসা তরুণ-তরুণীর মধ্যে যদি কেউ এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, তো তার অর্থ কি হতে পারে, এই কথা সহসা যেন ওঁর খেয়াল হয়।

ওঁর আশঙ্কা বুঝে আমি হেসে বলি, "না, এমন কিছু বিশেষ কথা নয়। আমি তো এমনিই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম যে আপনার নাম কি?"

মুক্তির শ্বাস নিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠেন উনি—"এই? আরে, আমার নাম মিসেস তেজপালই তো। আর কি হতে পারে?"

"না, তাতো নয়। এ তো হয়েছে বিয়ের পর। আগেও

তো ছিল কিছু একটা। হঠাৎ আবার বলে ফেলি, "কয়েক বারই এ কথা মনে এসেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, বীচুকে জিজ্ঞেস করব। এখন আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি।"

উনি একই ভাবে হাসতে থাকেন আর আমার মনে হয় আলো থাকলে আমি ওঁর ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখতে পেতাম। উনি বলেন, "বড্ড ভালো লেগে গেছে নাকি আমাকে? বড় বেশী ইনটারেষ্টেড মনে হচ্ছে আমার সম্বন্ধে? ভালোবাসতে টাসতে আরম্ভ করেননি তো আবার? ভাই, আপনাদের পুরুষ মানুষদের কি কিছু ঠিক আছে?" সোজা ঘাড় ফিরিয়ে উনি আমার দিকে দেখছিলেন।

পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে যাই আমি। উনি হঠাৎ এমন কথা বলে বসবেন এ কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। মনে হয় উনি যেন আমাকে শিশুর মতন নিয়ে খেলাচ্ছেন। এও জানতাম যে উনি তামাসা করছেন, কিন্তু কি জানি কেন এ কথায় আমার সুরুচির অভাব বলে মনে হয়। নারীত্বের স্বাভাবিক সঙ্কোচ আর শালীনতা হতে পারে এ আমার শুধুই একটা সংস্কার, কিন্তু ওর এই কথায় আমার মনে হয় কেউ যেন হঠাৎ এক ঝটকায় সমস্ত মায়াজাল ছিঁড়ে আলাদা করে ছুঁড়ে ফেলে দিল আর আমি অনাবৃত অসহায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কণ্ঠস্বর সামলে বলি, "ভালো আপনি সত্যিই এতে আর নতুন কথা কি? কিন্তু নাম জিজ্ঞেস করার মধ্যে এসব মানে কোথায় আসে?"

আর সোজা হয়ে বসি আমি। উনি কিছু বলেন না। গভীর একটা নিঃশ্বাস নেন তারপর বলেন, "মিসেস তেজপাল নাম তো আর খারাপ নয়? শুধু নামেতেই কি? আগের না আমি কত কিছুই মিসেস তেজপাল হবার পর শেষ হয়ে গেছে। নামটাই বা আর থাকে কেন?"

মোট কথা···আমি বুঝতে পারি এই প্রশ্ন থেকে ওঁর নামের সঙ্গে সঙ্গে আগের জীবনের অনেক কথাই জানতে পারব।

"মোট কথা আগে কারুর মেয়ে ছিলাম, কারুর বোন। পরে শুধু স্ত্রীই হয়ে গেলাম। বিয়ের সময় শুধু লেফটানেন্টের বউ ছিলাম, এখন মেজরের, দু-তিন বছর পরে কর্ণেলের হয়ে যাব।"

"এ তো আপনি কথা এড়িয়ে যেতে বলছেন।"

"এড়িয়ে কোথায় যাচ্ছি? এ ত' পরিষ্কার করে বলছি যে পেছনের কিছুই সঙ্গে আনিনি আমি। নিজের লোক, নিজের সম্পর্ক নিজের নাম—সব পেছনে ফেলে এসেছি।" আমার অবিশ্বাসটুকু পড়ে নিয়েই যেন আবার বলেন, "আচ্ছা ধরে নিন আমার নাম—আমার নাম"—উনি সাহায্যের জন্যে এদিক ওদিক তাকান, "আমার নাম হুগলী ছিল, ফুটপাথ ছিল—কিংবা কিটি, তফাৎটা কি হবে এতে? এখন মিসেস তেজপাল হয়েছি, ব্যস।"

আর আমি হঠাৎ বুঝে গিয়েছিলাম। হয় এই লোকটি জেনে শুনে নিজের চার পাশে এক রহস্যের জাল বুনে রুখতে চাইছে, না হলে এড়িয়ে যেতে চাইছে আমাকে। সেই মুহূর্তে মনে হয় ওঁর প্রতি সবটুকু দরদ আমার শেষ হয়ে গেল। মনে পড়ে আর কিছু দরকারী কাগজপত্রও তো টাইপ করবার আছে, না হলে কাল মুস্কিল হয়ে যাবে। কিন্তু ওঠার কথা বলার ক্ষমতা হচ্ছিল না। জাহাজের ওপর বেড়ানো সাদা আর নীল উর্দী পরা অফিসা

আর খালাসীদের দেখতে থাকি তাই। জাহাজের মাথার ওপর রোমান অক্ষরে লেখা ছিল 'হেলেন'। বোধহয় কোন বৃটিশ জাহাজ। তাই তো এত কেতাদুরস্ত। নীচে জাহাজ থেকে জলের একটা মোটা ধারা ঝরঝর করে ঝরে পড়ছিল।

"বিশ্বাস হচ্ছে না?" হালকা হাসি ভরা স্বরে বলেন উনি।

"না, ঠিক আছে।"

"কলেজে সবচেয়ে ভালো মেয়ে ছিলাম। সব ব্যাপারে হাজির থাকতাম। সারাদিন হেসে খেলে ঘুরে বেড়াতাম। সেই জন্য ছেলেমেয়েরা আমার নাম কি দিয়েছিল জানেন?" উনি আবার নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে বলেন। ফিস ফিস করে বলেন,—আমার নাম—

*নিজের এত লম্বা নামে সঙ্গে সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়েন নিজেই। মেয়েরাও কম শয়তান হয় না। কি রকম লাগল নামটা?"*

"বেশ ভালোই তো।" *বিশেষ কিছু উৎসাহ না নিয়েই বলি।*

আমার ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর হয়ত উনি ধরতে পারেন কিন্তু হঠাৎ চুল দাপটিয়ে বলেন, "আচ্ছা একটা কথা বলব আপনাকে? জানেন আমি ভারতীয় নই।"

"তবে?" আমি সত্যি সত্যি নিজের জায়গা থেকে চমকে উঠি। এ তো একেবারে নতুন কথা। আমি ওঁর সমস্ত চেহারাটা আর একবার দেখবার চেষ্টা করি। অন্ধকারে ওঁর শরীর দেখতে পাই না।

"পনেরো বছর বয়সে আমি বর্মা ছেড়ে ছিলাম। তখন আমি রেঙ্গুনিয়ার কেমব্রিজে পড়তাম। বম্বিং-এর সময় আমরা এখানে চলে আসি।"

"ওঃ," নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস নিই আমি। ভেবেছিলাম কি জানি কোন দেশেরই হবে বা। জিজ্ঞেস করি "বর্মার কোথায়?"

"পেগু। পেগুর নাম শুনেছেন না? ওখানে আমার বাবা শ্রেষ্ঠ অফিসার ছিলেন। মা বর্মীজ ছিলেন, আর বাবা পাঞ্জাবী।" উনি আবার যেন হারিয়ে যান দূরে। "আমার মনে আছে গণ্ডগোলের সময় আসতে কি মুস্কিল হয়েছিল। আমরা রেঙ্গুনে এলাম। যে জাহাজে করে আমরা ছাগল ভেড়ার মতন গাদাগাদি করে এসেছিলাম সেটাতে জাপানীরা বোমা ফেলে দিয়েছিল। নৌকোয় যত লোক ধরে চলে এল। যতক্ষণ অন্য একটা জাহাজ না এল ততক্ষণ না জানি কত লোক ডুবে মরল। আমার মা সেই দৌড়াদৌড়িতে কোথায় ছিটকে গেল। আমারা কোন রকমে দিল্লী পৌঁছলাম।"

এখন মিসেস তেজপালের ওপর আবার নতুন করে দয়া হতে আরম্ভ করে আমার। দরদ ভরা সুরে তাই জিজ্ঞেস করি: "ক'জন ভাই বোন আপনারা?"

"আমি মেজ। এক ভাই আমার ওপরে আর এক পরে। ওখান থেকে এসে বাবা দেরাদুনে রেশ্নার হয়ে গেলেন। বড় ভাই মিলিটারি কলেজে তেজপালের সঙ্গে পড়ত। আমি দিল্লীতে হোষ্টেলে ছিলাম। ছুটিতে যেতাম। তখনই এক আধবার ভাইয়ের সঙ্গে ওঁকে দেখি।"

"এখন কোথায় আছেন ওঁরা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"জানি না। এ সব কথাও তো আট ন' বছরের হয়ে গেল।" এবার নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উনি বলেন, "এক্ষুণি বললাম আগের সম্পর্ক, শোক সব কিছুই—"

"তবুও মেজর তেজপাল যখন ক্যাম্পে ট্যাম্প চলে যান তখন কোথায় থাকেন?"

"কেন, কোয়ার্টার আছে না? ব্যাস, ওখানেই থাকা আর দিনরাত্তি রোমন্থন করা···গভীর ভাবে উনি বলেন, অতীতের সব শেষ। কোন একদিন টলষ্টয়ের উপন্যাস, শ'এর নাটক, চেখভের গল্প পড়বার শখ ছিল। কিটস্ আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে পারতাম আর বাঙলা কবিতা আবৃত্তি করতাম। ভারত নাট্যম নাচতাম, এখন তো সব শেষ। এখন তো···রক-এন-রোলে কাঁধে কাঁধ মেলাই আর জ্যাজ শুনি। ফিলম ফেয়ার আর ফিলম-ইণ্ডিয়া, আগাথা ক্রিষ্টি আর ষ্টেনলী গার্ডনারকে ঘাঁটি আর সারাদিন যা মনে আসে তাই ভাবি। 'মুহব্বতমে এ্যায়সে কদম ডগমগায়ে, জামানা ইয়ে সমঝা কি হাম পিকে আয়ে,' উনি হঠাৎ বড় হাল্কা হয়ে ওঠেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। "চলুন এবার উঠি। কটা বাজল?" আলোর দিকে কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে আঁতকে ওঠেন: "ওমা, আট। চলুন··· চলুন।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে চটিতে পা গলাতে গলাতে উনি একেবারে টলে পড়তে পড়তে আমার কাঁধ ধরে ফেলেন: "উঃ আমার তো সমস্ত পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে।" ওঁর কোমর পর্য্যন্ত আসা কুকুরটাও মস্ত বড় হাঁ করে হাই তোলে: "ক্যাঁ···া···া।" ওর সাদা দাঁত আর চোখে জাহাজের ছবি আঁকা হয়ে যায়।

আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ভয়ে ভয়ে ওঁর কাঁধ ছুঁয়ে সাহায্য করার ভাব করি আর এদিক ওদিক দেখি। মনে হয় সেই মুহূর্তে ওঁর কনুইও যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পা ঘষে ঘষে চলবার পর ঠিক হয়ে যায়। আমার কাঁধের ওপর ওঁর আঙুলের স্পর্শ তখনো শিউরে উঠছিল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ আমার হুগলির পাড়ের কথা মনে হতে থাকে। আর সে সব এক মধুর ছবি হয়ে আমার মনে গাঁথা হয়ে যায়। আশঙ্কাও ছিল মিসেস তেজপাল আমায় নিয়ে মজাই করছেন হয়ত। যে ভঙ্গিতে উনি ওঁর প্রতি মোহিত হয়ে যাবার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাতে উনি যে একরকম চঞ্চল স্বভাবের তাতে সন্দেহ মাত্রও ছিল না। আমার মনে হয় আমার ব্যবহারে নিশ্চয়ই এমন কোন ভাব উনি দেখেছিলেন যাতে 'কাঁসি' কথাটা ওঁর মনে হয়েছিল। না হলে চলতে চলতে সিঁড়িতে এ ধরণের কথা বলা তো স্বাভাবিক নয়। তবুও সে ছবিতে এমন কিছু ছিল যে শোবার সময় পর্য্যন্ত সে কথা মনে মনে আমি নাড়াচাড়া করতে থাকি।

ফেরবার সময় আমরা কেল্লার ধারের পথ দিয়ে ফিরছিলাম। উনি বলছিলেন: "আজ তো খুব গল্প জমালাম। আপনি নিশ্চয়ই খুব 'বোর' হয়েছেন। এ আমার বড় বদ অভ্যেস। কথা বলতে আরম্ভ করলাম তো বাস বকর-বকর বলেই চললাম। কেউ শুনুক বা না শুনুক মনেই থাকে না। মা খুব বকতেন যে, মেয়েদের বেশী কথা বলা ভালো নয়। কিন্তু শুনত কে? তা ছাড়া বাড়িতে আমার যা প্রতাপ ছিল। মা, বাবা, ভাই—সকলে ভয় করত। কি ভয়ানক কাণ্ড হত যদি আমি কিছু বলতাম আর তা কাজে না হত···একবারের কথা"···বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যান উনি—তারপর হঠাৎ মাথা নেড়ে বলেন: "না কিছু না।"

আমি এদিক ওদিক চাই। কেউ কোথাও নেই। "কেন, চুপ হয়ে গেলেন কেন?"

"না, কিছু নয়। এমনি বোকামির ব্যাপার আর কি।" কথা

ঘুরিয়ে বলেন উনি, "কিন্তু ওরা আমার বড় ক্ষতি করেছে। এখন আমার কোন ইচ্ছে যদি কাজে না হয় তো মনে হয় নিজেকে গুলি করি"—অন্যমনস্ক ভাবেই ফিতে-বাঁধা হাত দিয়ে অন্য হাতের কনুই স্পর্শ করেন।

"কিন্তু আপনার তো খুব ভালো সখ ছিল? ছেড়ে দিলেন কেন আপনি?" ওঁকে উৎসাহ দেবার জন্যে বলি আমি।

"ছেড়ে না দিয়ে কি ঐ নিয়ে পাগল হতাম?" উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলেন উনি, "আপনি দেখছেন না এখানে কোন সখটা থাকে মানুষের? লোকের ক্লাব, ক্যাবরে, রেশ আর ব্রিজ থেকে অবসর যদি হল তো সমস্ত দিন নিজেদের অফিসারের গল্প—অমুকের অমুকের সঙ্গে এক হাত হয়ে গেছে—অমুকের প্রমোশনে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। এটিকেট, ম্যানার্স আর কালচারের ওপর মন্তব্য কিংবা এর ট্রান্সফার ঐ ডিবিসানে হয়েছে ওর ওখানে। কিংবা সেই এর ওর বাড়ি ডিনার, রিটার্ণ-ভিজিটস আর চা-পার্টি, বার্থ-ডে পার্টির পর ঘুরে ফিরে সেই হাসি তামাসার কথা। একে অন্যের বিষয় নিয়ে কথা চালাচালি আর পোজিসানের রেষারেষি। দিনের বেলা সেই কড়কড়ে খাঁকি কাপড়ের ইউনিফরম, ভাঁজ করা হাত আর ঘাড়। প্রতিদিন সেই ফিতে আর ষ্টারগুলোর পালিশ আর সন্ধ্যেবেলায় কালো কালো স্যুট। 'আই'ম সিক অফ দেম। মাপা-জোপা চাল চলন, মাপা-জোপা হাসি, মাপা-জোপা মনোরঞ্জন। আপনি এক নাগাড়ে একে অন্যের বাড়ি চার বছর ধরে যান সেই একই প্রথম দিনের ফরম্যালিটি, সেই ভদ্র আদর আপ্যায়ন। মনেই হয় না যে মানুষে মেলামেশা করছে। কাঠের পুতুলের জীবন—যার প্রতিটি ভঙ্গি আগে থেকে তৈরী করা"—

"হ্যাঁ, এ কথা ঠিক।" সমর্থন করি আমি। আমি তো অন্য সব লোকেদের সঙ্গেও বেশ মেলামেশা করি তবুও এসব দেখতে দেখতে 'বোর' হয়ে যাই। আপনাদের তো সত্যি সময়ে অসহ্য লাগবেই।

"আর এখানকার মেয়েরা? উফ, একেবারে বেহদ্দ।" উৎসাহিত হয়ে বলেন উনি। "খাওয়াদাওয়া আর কাপড় জামা, বাস, এ ছাড়া আর কিছু কথাই বলতে পারবে না এরা! চব্বিশ ঘণ্টা খালি এই কথাই। প্রত্যেকের বাড়িতেই দৈনিক কাগজ আসে। কিন্তু সেটা খুলবে সেদিনই যেদিন সিনেমা যাবার দরকার হবে। এমনি ক্লাবে যাবে, পার্টি এ্যাটেণ্ড করবে, হাসবে, লোকেদের নিজের বাড়ি নেমন্তন্ন করবে খাওয়াবে, কিন্তু তবুও এত অর্থডক্স্ এরা যে কি বলব। খুব বেশী তো সাত আট কিংবা দশ এগারো ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছে। বাস। বেয়ারারা মেমসাহেব বলে ডাকে যদি তো খুব খুশী। বৌমুকে ছাড়া আমার তো একজনকেও কথা বলার যোগ্য বলে মনে হয় না। দূরে থেকে যখন দেখতাম মনে হত মিলিটারিতে কি স্বতন্ত্রতা—কি আদব-কায়দা—কিন্তু সে সব দূর থেকেই দেখতে।" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলে উনি খুব আস্তে করে হাসেন আবার, "প্রথম প্রথম আমি রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম যে যিনি অ্যানা কারেনিনা লিখেছেন তাঁর বুকে কত না জানি দরদ ভরা—কত রকম ভাব তাঁর মনে আসা যাওয়া করে।

এখন তো সে সব মনেও আসে না কিছু। অন্ত কোন জন্মের পুরনো কোন জীবনের কথা মনে হয় সব কিছু।"

"আর, এখানকার লোকেরাও তো আপনার ওপর খুশী নয় দেখি।" আমি আর একটু যোগান দেবার জন্যে বলি।

"আমি তো এ সব চিন্তাই করি না কখনো।" উদ্ধত স্বরে বলেন উনি: "নিজের সম্বন্ধে এ সব কথা আমিও শুনেছি অনেক। প্রথম প্রথম এসে এই নিয়েই তো আলোচনা শুনতাম নাগাড়ে। এখানকার মানুষ রেডিওও শুনতেও তো ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে, পাছে বাইরের কেউ সেই সব শুনে ফেলে। আমি পুরোদমে গলা ছেড়ে গান সুরু করায় ভয়ানক কথাবার্তা সুরু হল। কেউ বলে,—ম্যানার্স জানে না; কেউ বলে ভালো লোকজনের সঙ্গে মেশেনি কখনো; কারুর কারুর হিসেবে আমি কাপড় পরবার ভদ্র নিয়মটুকুও জানতাম না। সাড়ির ভাঁজ একদিকে যায়, তো আঁচল আর এক দিকে। কেউ বলে গ্রামোফোন, কেউ রেডিওগ্রাম। চলা-ফেরার কায়দা জানে না। স্লার্ট। ফিল্ম এ্যাকট্রেস। মেজর তেজপাল যেন কোন গানওয়ালীকে ঘরে এনেছেন। আর সব শেষে শুনলাম যে, আমি ব'লে কোন 'বারে' নাচ-গান করতাম আর সেখানেই মেজর তেজপালকে ফাঁস দিয়ে নিয়েছি। শুনে যে কি হাসি পেয়েছিল। এখন তো এসব শোনা অভ্যেস হয়ে গেছে। আমিও বলি দেখ। যত দেখতে পার। আমিও তত দেখাব। আমার আর কি হবে? এখন এমন হয়েছে যে কোনদিন যদি ওপরটা চুপচাপ থাকে তো মিসেস মক্কারার আর্দালি এসে জিজ্ঞেস করে,—"মিসেস তেজপালের শরীর তো ঠিক আছে, মেমসাহেব জিজ্ঞেস করছেন।"

"কিন্তু এসব ব্যাপার তো ঘটেই থাকে। কেউ ইচ্ছে করে তো নিজের যা পথ তা চালিয়েই যেতে পারে।" কোমল সান্ত্বনার ভঙ্গিতে আমি বলি।

"হ্যাঁ, চালিয়ে যেতে পারে বটে।" মুখ বেঁকিয়ে বলেন উনি, "আগে আমাদের এখানে একটি ছেলে আসত। আমার ভাইয়ের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ত। তারপর আমরা এক জায়গায় কাছাকাছি ছিলামও কিছুদিন। সে যে কি সুন্দর বেহালা বাজাত সে আর কি বলব। ইচ্ছে হত শুধুই বসে বসে ওর বেহালা শুনি। ও ফোর্টের ভেতরেই ব্যাচেলার্স কোয়ার্টার্সে থাকত আর প্রায়ই এখানে চলে আসত। রাতদিন সব সময় আমার মনে হত কোথাও অনেক দূরে বেহালা বাজাচ্ছে যেন ও। তার হাতের আর কাঁধের ওপর রাখা বেহালা, ভাবে বিভোর মুখ, কাঁপা আঙুলে টানা ছড়ি—সব কিছু প্রতিটি মুহূর্ত চোখের ওপর ভেসে উঠত। আমি খেতে বসতাম আর হঠাৎ মনে হত নীচে কোন ফ্ল্যাটে ও বেহালা বাজাচ্ছে। আমি চমকে থেমে যেতাম। ও জিজ্ঞেস করত কি হল? আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যেত এ কিসের আওয়াজ? ও বলত কিছু তো নয়। রান্নাঘরে জল সোঁ সোঁ করছে। নাহলে ওপরে জল তোলা মেশিনের শব্দ। স্তব্ধ হয়ে যেতাম আমি। কখনো ঘুমুতে ঘুমুতে চমকে জেগে উঠতাম···"

"তারপর?"

"তারপর কি? সেদিন যা যা শুনতে পেতাম তা কি আর ভুলতে পারতাম। তাই নিয়ে এঁর সঙ্গে ওর মন কষাকষি হয়ে গেল বেশ। শেষে ট্রান্সফার হয়ে গেল ওর।"

জানি না এ আমার মনের ভুল কিনা। কিন্তু আমার মনে হল ওঁর গলা বন্ধ হয়ে আসছে যেন। আমাদের ব্লক এবার শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার দিকটা তখনো অন্যদিকে পড়েছিল। উনি বললেন, "এখন আমি আপনার সঙ্গে চলছি কেউ যদি দেখে ফেলে তো শুনবেন কালই, কি কি সব কথা ওঠে। উঠুকগে, আমার কারুর সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা নেই।"

"মিসেস তেজপাল, আমি আপনার সম্বন্ধে এত কথা কিছুই জানতাম না।" গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আমি বলি। এতক্ষণে ওঁর সম্বন্ধে ভয় হয় আর সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ হয় হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়া বিরক্তির জন্যে।

হঠাৎ উনি খিলখিল করে হেসে ওঠেন: "আরে, আপনি তো একেবারে ভাবুক হয়ে উঠলেন। এতো রোজকার ঘটা একটা ঘটনা। আমি আজেবাজে কিছু কথা যদি বলে ফেলে থাকি তাহলে মনে কিছু করবেন না। আমি বড্ড কথা বলি। কিছু যদি মনে এসে যায় তো বাস, একা একাই বকবক করে চলি। কোন গান যদি সকালে একবার মনে পড়ে গেল তো হ'ল। সারাদিন সে গান গেয়ে গেয়ে একেবারে পচিয়ে ফেলব। তারপর কি জানি কেন রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছে বলেন: অবশ্য নিয়ম মতন আপনার কাছে ক্ষমা টমা চাওয়া দরকার আছে বলেও আমি মনে করি না। বীনু আপনার কাছে যা আমিও তাই।"

"না···না এমন কিছু কথা তো আপনি বলেন নি।" আমি তাড়াতাড়ি বলি।

এতক্ষণে আমরা সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠছিলাম। কথার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফিরিয়ে উনি আমার দিকে তাকান আর গভীর একটা ভাবাবেগ আর আত্মীয়তা যেন গঙ্গা-যমুনার মতন মেশামিশি হয়ে ফুটে ওঠে ওঁর মিষ্টি একটু গালে টোল ফেলা হাসির মধ্যে। কিটি ওঁকে টেনে টেনে ওপরে চলে যাবার পরও আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি···'কি স্মার্ট মেয়েটি···' কি জানি কেন সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। ওপরে সিঁড়ির বাঁকে ততক্ষণে হাত নাড়ছেন উনি—"টা-টা···"।

টা-টা! আজ রাস্তার ওপর এমনি পায়চারি করতে করতে এক একটা ছবি আমার সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল। তারপর থেকে কিটিকে বেড়াতে নিয়ে যেতে, আসতে-যেতে সিঁড়ি উঠতে যে বীনুর কাছ থেকে বিদায় নিতে উনি গভীর একটা বন্ধুত্বের ভঙ্গিতে হাত উঠিয়ে টা-টা করতেন ঠিক যেমন বাচ্চারা করে। আর গুড্ডীর সঙ্গে থাকবার সময় দেখা হলে টা-টা করার পরে ঠোঁটের ওপর একটা আঙুলও বুঝি উনি ছুঁইয়ে দিয়েছেন এক আধবার। কি জানি কোন অতলস্পর্শী গভীর ভাবে আমার সমস্ত মন ভরে উঠেছিল যে ওঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নাম না জানা এক খুশী আর করুণ সহানুভূতি পাশাপাশি দোলা দিয়ে উঠত। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওঁর কথা ভাবতাম আমি। উনি কখন কোথায়—খবর রাখতাম। এক একবার রণধীর রহস্য করে বলত "আজকাল আমাদের দাসীর সঙ্গে বড় বন্ধুত্ব হয়েছে 'ডেপুটি গভর্ণ'র···যা

সর্বনাশা খেলা কিন্তু। মেজর তেজপাল গুলী মেরে দেবেন। খেয়াল থাকে যেন।"

"তোমার মনে তো চব্বিশ ঘণ্টা কেবল এই চিন্তা" ঝাপটে উঠত বীমু। "অন্যের দিকে কেবল মাটি ছোঁড়া। নিজের কথা কিছু শুনি না?"

দাড়ি কামানো রেখে রণধীর বলত, "নিজের ভাই ইচ্ছে করে তো মানুষ খুন করে আসে। কিন্তু তোমার কাছে তো তাও গুণের কথা।" তারপর জোর করে মুখ গম্ভীর করে বলত, "দেখ ভাই, তোমাকে বোঝান আমার কাজ বলে মনে করি। তারপর তুমি জান। এমনিতেই একজন 'ডেপুটি গড'কে আমি কি দিয়ে বোঝাব?"

আমি জানি না সেদিন সত্যিই আমি সর্বনাশা খেলা খেলছিলাম কিনা, কিন্তু একথা সত্যি যে যখনি ওঁকে দেখতাম তেজপালের ছবি ভেসে উঠত চোখের সামনে। টাইপ করতে করতে চুলে ঝাঁকি দেওয়া মিসেস তেজপালের ছবি মনে পড়লেই মনে হত মেজর তেজপালের বড় বড় গোঁফও। একথা আমিও মনে মনে জানতাম যে এ এমনই এক দলের মানুষ যারা সহজেই মানুষকে গুলী মারতে পারে···আর তারপরে পিকনিকের ঘটনাটা হয়ে যাওয়াতে এ কথা তো আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। কোন কথা খুঁজে না পেয়ে তাই স্তব্ধ হয়ে রইলাম আমি। [ ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা :—নীলিমা মুখোপাধ্যায়

# মোর পাশে কিছুক্ষণ

এলা বসু

এখানে আকাশে মেঘে ঢল্ নামে বাদল বায়,
সুপারী বনেতে শূন্য বাতাস কি গান গায়!
এখানে ভরা স্তব্ধ দুপুরে সারাটি ক্ষণ,
ঝিম্ ঝিম্ সুরে বীণাটি বাজায় পাগল মন!
বৈশাখী মৃদু হাওয়ায় দোলানো ঝুমকা লতা,
দূর-দিগন্তে চুপি চুপি বলে মনের কথা।
এখানে ঘন নীল আকাশে আজ বাদল ছায়া,
সবুজ ঘাসের বুকেতে রচেছে স্বপ্ন মায়া।
তোমার চোখের ক্লান্ত তারায় নামিবে ঘুম,
কাজ রেখে দেখো এখানে দুপুর কি নিঝুম!

পাতার আড়ালে ঘুঘু ডেকে চলে, ক্লান্ত স্বর,
রজনীগন্ধার বনেতে উঠেছে অনেক ঝড়!
ডালিয়ার ডাল ভেঙ্গে নুইয়ে পড়া ঝোপের পাশে,
প্রজাপতিদের রঙিন্ পাখার আভাস ভাসে।
বকুল গন্ধে আবেশ মাখানো প্রহরগুলি
সেতারের তারে বুলানো অলস অংগুলি।
এখানে যে বেলা হেঁটে চলে যায় শ্রান্ত পায়
ঝুণ্ ঝুণ্ সুরে নূপুর বাজানো বাউল বায়।
তোমারো চোখে পাঠাবে তারা স্বপ্নদূত,—
কাজ ফেলে দেখো এখানে দুপুর কি অদ্ভুত!

এখানে দুপুর উদাস মধুর করুণ তানে,
খেয়ালিয়া কোন বাঁশীতে বেজেছে আমার প্রাণে।
আমার সকল চেতন ভরেছে,—সকল মন,
দূর-দিগন্তের স্বপ্ন ছোঁয়া একটি ক্ষণ!
মেঘ কালো চুল বাতাসে ওড়ানো আকাশ ছেড়ে
চকিত চরণে নাচিয়া ফিরিছে সোনার মেয়ে।
আঁচলে তাহার সিক্ত বকুল যুঁথীর মালা,
কাজল আঁখিতে নব-নীল মেঘ বরণডালা।
তোমারো নয়নে লিখিবে সে তার মনের কথা,
কাজ রেখে দেখো এখানে দুপুরে কি নীরবতা!

সব ফেলে এসো আজি অবেলায় একটি বার,
সোনার কাঠির পরশ ছোঁয়ানো বীণার তার
আপনি বাজিছে আকাশে, বাতাসে, মনের মাঝে,
তারি সেই সুর বিঘ্ন ঘটাবে তোমারো কাজে।
তুমি কি শুনেছ বেতস বনের মর্মর ধ্বনি,
গিয়েছে কি বেলা তোমারো এমন প্রহর গণি?
তোমারো কি চোখে ফেলেছে আভাস বাদল ছায়া
সবুজ-সুনীলে গাঁথা মণি হারে স্বপ্ন-মায়া?
হৃদয় তোমারো ভরিবে সুধায় সকল ক্ষণ,
কাজ ফেলে যদি বস মোর পাশে কিছুক্ষণ!

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ
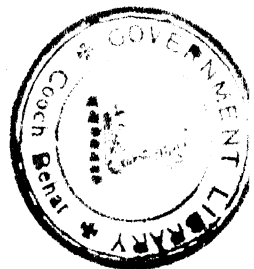
## অনতিক্রম্য

**জয়ন্তী সেন**

আমি ওদের তিন জনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনটি দুর্বোধ্য অতল অপার সমুদ্রের মধ্যে অনুভূতির ঝড়ের মাতামাতি চলেছে। বিস্ময়, হতাশা, তলিয়ে যাওয়ার করুণ হাহাকার ওদের চাউনীর স্বচ্ছ স্ফটিক আর্শিতে বার-বার ধরা পড়ছে। নিজের মনের যে দিকটা আমি দেখতে চাই না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওদের চোখে। প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করে থেকে আবার বললাম—"চাকরীতে ছাঁটাই হয় সব অফিসে। কারো হাত নেই তাতে।"

এই পাঁচ মিনিট একটা নিস্তব্ধ, অনড় কঠিন পাথরের মত ঘিরে ফেলেছিল আমাদের। সমস্ত নীরবতা টুকরো টুকরো নুড়ি পাথরের মত চুরমার করে ছড়িয়ে ফেলে আমি হাসলাম। ভূমিকম্পের দোলায় টলে উঠল ওরা, কিন্তু কেউ জবাব দিল না। মার হাতে জপের মালা ঘুরছে না আর। দুর্ভাগ্যের ঢেউ-এর দাপটে আছড়ে পড়ে তাঁর মন থেকে ভগবানের নাম পর্যন্ত মুছে গেছে। সামনে একজামিন বলে কিশোর মাদুরে ঝুঁকে মিটামটে লণ্ঠনের আলোয় বই পড়ছিল। এখন দুটো হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। বুঝেছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না এবারে একজামিন ওর দেওয়া হবে না। সকালের টিউশনি ছাড়াও আরও নানা কাজের খোঁজে ঘুরতে হবে। মনে হল জলে ভাসতে ভাসতে হাতের মুঠোর পাওয়া আশ্রয়টুকু যদি কেউ ছিনিয়ে নেয়, তবে মানুষের চোখে বোধ হয় এমন মোহভঙ্গের ছায়া ফুটে ওঠে। আর শান্তি? চোখে চোখ পড়তেই মাথা নীচু করে সিমেন্টের প্রকাণ্ড ফাটলটা একমনে লক্ষ্য করছিল সারাক্ষণ। নিজের কপালের মাঝখানেও বোধ করি অমনি ফাটলের অস্তিত্ব খুঁজে দেখছে শান্তি।

কথাটা বলা শেষ হলে বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। ঘর বলতে ছোট পায়রার খুপরি দুটো—আর সরু একফালি বারান্দা। কালিঝুলি-মাখা সঙ্কীর্ণ স্যাঁৎসেঁতে রান্নাঘরও আছে একটা। পঁচাশি টাকা মাইনের কেরাণীর পক্ষে এ বাড়ীও বিলাসিতা। তবু ভাঙাচোরা জীবনও বোধহয় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে—তাই দিন কাটছিল কোন রকমে। কিশোরের পড়ার খরচ দিতে হয় না। সকালে টিউশনী করে, সেখানেই খায়। দুপুরে কলেজ করে সমস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে ক্লান্ত শরীরে সন্ধ্যার পর ফেরে।

পঁচাশি টাকার মাপকাঠি বড় ছোট, বড় নগণ্য। দেখতে পাই পুষ্টির অভাবে আর পরিশ্রমের ধকলে শান্তির যৌবনে ভাঁটা পড়ছে এর মধ্যে। কিশোরের বুক পরীক্ষা করানো হয়েছে। ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছিল বলে ভয়ে সিঁটিয়ে উঠেছিলাম আমরা। দোষ না পেলেও সাবধান করে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। ঝাঁঝরা শরীরে অসুখ ঢুকতে পারে যে কোন মুহূর্তে। শেষ বয়সে হাঁপানিতে ভুগে ভুগে কঙ্কাল সার মার মুখের দিকে তাকানো যায় না। ওরা সবাই জানে দুর্ভাগ্য আপনা হতেই আসে। দোষ যখন কাউকে দেওয়া চলে না, তখন মানুষ নিজের কপালকেই দেওয়ালে ঠুকে সান্ত্বনা খোঁজে। শান্তি তাই দিনের কাজ মিটিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে আমার পাশে শুয়ে আক্ষেপ করে বলে, অভাগা কোন মেয়েমানুষের হাত থেকে পোড়া শোল মাছও প্রাণ পেয়ে পালিয়েছিল। ওর অপয়া সঙ্গদোষেই আমার এই অবস্থা। আমি কতবার বোঝাতে চেয়েছি সারাদিনের ক্লান্তির শেষে শুধু এই কয়েক ঘণ্টা কৈফিয়ত না দিয়ে, কোন দাবী না মেনে আমাদের বেঁচে ওঠার মুহূর্ত। এখন অপ্রিয় কথার জের টেনে কি লাভ! শান্তির চোখের নীচে গালের হাড় যেখানে অস্বাভাবিক ভাবে উঁচু হয়ে উঠেছে, সেখানে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়েছি। ভিজে-ভিজে, আঠা-আঠা চোখের জল হাতে লেগেছে।

শান্তি বলেছে, "তোমার এর চাইতে অফিসের ছোটসাহেবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলেই ভালো ছিল। চাকরীতে ছাঁটাই হওয়ার ভয় থাকত না, বরং এতদিনে প্রমোশন হয়ে মাইনে বাড়ত।"

"ইস্, তোমার পাশে সেই কালো ধুম্সী লতিকা রায়! কি যে বলো তার ঠিক নেই—।"

"আমার কিই বা থাকল!" শান্তির দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাপা একটুখানি শব্দ শোনা যায়। "দিন দিন যেন পেত্নীর মত হয়ে যাচ্ছি। আর্শীর সামনে যেন দাঁড়াতে লজ্জা করে;"

—কথাগুলো শান্তি মুখে বলে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে। আর হয় তো তার মনে সেই চার বছর আগেকার পুরোন দিনগুলি সোনালী তারার মত দপ দপ করে জ্বলে ওঠে। যখন আমি ওকে ভালবেসে ছিলাম। এখন অনেক হাতড়েও তার আভাস পাই না কোথাও। যেন সাদা দেওয়ালের অর্থহীন বন্ধনের মত ও আমাকে ঘিরে ফেলেছে। শুধু শান্তি একা নয়। মা, কিশোর, এমনকি আমার নিজের সত্তাও। যদি সব বাধা ভেঙে ফেলা যেত।

অফিসের ছোট সাহেব শ্রীমন্ত রায়ের মেয়ে লতিকার সঙ্গে বিয়ে হলে আজ সত্যিই জীবনকে অন্য পথে চালানো সম্ভব হত। অনেক

কিছুই আভাস দিয়েছিলেন রায়সাহেব। কলকাতায় একখানা নিজস্ব বাড়ী, চাকরীর উন্নতি, সব কিছু। বাড়ীতে ডেকে চা খাইয়ে ছিলেন একদিন। তখন নির্লজ্জ প্রসাধনে প্রাণপণে নিজেকে সাজিয়ে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী লতিকা রায় আমাকে পিয়ানোতে বিদেশী গৎ শুনিয়েছে, গল্প করেছে। কিন্তু না—নিজেকে বিক্রী করতে পারিনি সেদিন। আজকে যদি আবার সেই সুযোগ পেতাম, সুবিমল দত্তের মত তা কি ছিনিয়ে নিতাম দু হাতে! কে জানে, নিজেকে আমি আজকাল ভালো করে আর চিনতে পারি না। যাদের ভালোবাসা উচিত, তাদের প্রতি মন বিমুখ হয়ে ওঠে। তাদেরই এড়িয়ে যেতে চাই। অথচ শান্তির কি দোষ। ওর কপালের সামনে চুল উঠে চওড়া হয়ে গেছে সিঁথি। ঘামে ভেজা আঠা-আঠা চুলে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। সেখানে আঙুল চালিয়ে বলেছি—"ও কথা ভেবে মন খারাপ কোর না লক্ষীটি"!

কষ্টেরও শেষ আছে কোথাও। সেদিন কি আসবে না আমাদের জীবনে। অন্যদিন হলে শান্তি বুকের কাছে মুখ গুঁজে বলত, "নিশ্চয়ই আসবে।" ওর মন সরল, বিশ্বাস করতে বাধা ছিল না। কিন্তু আজ কি সে কথা বলতে পারবে শান্তি। আজকে ওর মন ভোলাবো কি বলে?

যে কথা যখন বলেছি এতদিন ওরা সকলেই বিশ্বাস করে এসেছে। মাকে ডেকে কখনও চিন্তিত হওয়ার ভাণ করেছি, "তোমার শরীর যেন ভালো থাকছে না আর।"

মা সন্ধ্যাবেলা জপের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে চোখের জল মোছেন।

আমি বলেছি—"অফিসে সুরেন হালদার বলছিল নতুন একটা বিলিতি ওষুধ বেরিয়েছে—একেবারে অব্যর্থ। দাঁড়াও আসছে মাসে গোড়ার দিকে খোঁজ করব। সত্যি বুড়ো বয়সে তোমাকে ভাল করে চিকিৎসা করাতেও পারলাম না।"

আমাকে ভুল বুঝে মার মুখ আনন্দে জ্বল জ্বল করে উঠেছে। চিকিৎসা না করতে পারার অক্ষমতা তাঁকে দুঃখ দেয় না আর। তবু যা হোক ছেলে এখনও মার কথা ভাবে। আজ না হোক, কাল হয় তো ওষুধের ব্যবস্থা সে করবে সেই আশাসেই বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পান বোধ হয়। কিন্তু আজকের পর ওরা যেন কতগুলো মাটির পুতুলের মত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এতক্ষণ কেউ একটা কথাও বলেনি।

কিশোরের গলা শুনতে পেলাম তারপর। হাতে ধরা মোটা বই বোধ হয় ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। শব্দ হল একটা। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ছেলেটা।

"গয়নার কথা কি বলছ বৌদি! ঐ এক গাছা বালা আর গিল্টি করা হারটুকুই ত সম্বল। আর তাতেও ক'ভাগ সোনা আছে তুমি মনে কর? বিয়ের আগে দাদার একবার টাইফয়েড হয়ে গেছে। মার ছিটে ফোঁটা সোনা ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে তখনই।"

গয়নার কথায় সাধারণত মার মনের প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ ধরা পড়ে।

শান্তি এ বাড়ীতে এসেছে শুধু শাঁখা সিঁদুর নিয়ে। কেরানী বাপ আরও তিনটি উঠতি বয়সী মেয়ের কথা ভেবে আমার নিজের পছন্দের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে শান্তিকে একেবারে খালি হাতে পার করেছেন। মা সে কথা ভুলতে পারেন না। আজ কিন্তু গয়নার প্রসঙ্গ ভুলে বললেন—"মরণ হোক আমার।" সুখে, দুঃখে জীবনে এক মাত্র কাম্য মৃত্যু, কিন্তু আমার মনে হয় আসন্ন মৃত্যুর কথা মনে করে জীবনকে সব চেয়ে বেশী আঁকড়ে ধরে আছেন মা নিজেই। তাই সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার এত প্রয়োজনীয়, এত মূল্যবান ওঁর চোখে। আমি যে জীবনের প্রত্যেকটি মোহকে রাস্তায় পড়ে থাকা নুড়ি পাথরের মত অনায়াসে পায়ে ঠেলে দিয়েছি, মা, কিশোর, শান্তি ত ছাড়তে পারছে না এক তিলও। ওরা বাঁচতে চায়। তাই নড়বড়ে, ফাঁপা এই জীর্ণ খুঁটিকে আশ্রয় করে এখনও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকতে পারে।

আরও কথা হচ্ছে বারান্দায়। কথার ঢেউ আছড়ে পড়ছে মনে। বালির তীরে কি দাগ ধরে? "আমি কাল থেকে তা হলে কলেজ ছেড়ে দিই মা। মিছিমিছি খরচ ত কম নয় সেখানে!"

"জানি না না বাবা। ভাবতেও পারিনে আর। এত দুঃখেও মরণ নেই আমার।"

"না ঠাকুরপো"—শান্তি ফিস ফিস করে বললেও স্পষ্ট শুনলাম আমি—"আমার শেষ উপায় আমি করব।"

কি তোমার শেষ উপায়—কি করতে পার তুমি! কিশোরের মুখ দিয়ে যেন আমিই আর্তনাদ করে উঠলাম। আর ক বছর বাদে মার মত মৃত্যু কামনা করবে কথায় কথায়। এই তোমার ভবিষ্যৎ। ভাবতে গিয়ে অসাড় বুকে যেন কান্নার ঢেউ উঠল একটা। বন্যার মত তোড়ে নয়, পাথরের খাঁজে হঠাৎ উছলে ওঠা ঝির ঝিরে জলের স্রোতের মত কান্না এল। আশ্চর্য্য এখনও কাঁদতে পারি আমি।

শান্তি জবাব দিল থেমে থেমে। সেই ওর এক জবাব। ভাঙনের মুখে প্রত্যেকবার ও এক কথাই বলে—"আমাদের বাড়ীওয়ালার দুবেলার রান্না করে দিলে ভাড়া অর্দ্ধেক ছেড়ে দেবেন উনি। হয় তো বিনা ভাড়াতেও থাকতে পারব আমরা।"

পারবে? কান্নায় যেন ভেঙে পড়ছি ক্রমশ। পারবে শান্তি। কি আছে তোমার শরীরে! কেবল মনের জোরে চলা ফেরা করছো এখনও, চালিয়ে নিতে পারছ কোন রকমে। কপালের ঘন চুল উঠে টাক হয়ে গেছে—চোখের নীচে কালি, গালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। কুয়াশার মত বিবর্ণ চামড়ার নীচে বোধ হয় প্রত্যেকটা হাড় আলাদা করে গোনা যায়।

"পারব—নিশ্চয় পারব ঠাকুরপো"—আমাকে শুনিয়ে বলল শান্তি মেয়ে মানুষ সব পারে। তাদের কখনো কিছু হয় না।"

আলোর পোকার মত একটা অসহ্য চিন্তা আমার মনের মধ্যে পাক খেতে শুরু করেছে তখন থেকে। সত্যি কথা ওদের বলিনি আমি। চাকরী আমি ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়ে এসেছি সুবিমল দত্তের মুখে। যে সুবিমল দত্ত শ্রীমন্ত রায়ের মেয়ে লতিকাকে বিয়ে করে এক লাফে সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে গেছে। যার চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আমার ফাইল তুলে ধরতে হয়। পঁচাশি টাকা মাইনের কেরাণী হয়েও সেই সুবিমল দত্তের পাঁচ শ' টাকা ঘুষ নেওয়া বরদাস্ত করতে পারিনি। ঘুষ নেওয়া নৈতিক অপরাধ, সে জন্যেই কি তাকে চোখ রাঙাতে সাহস পেলাম? কঠিন গলায় বলে উঠল সুবিমল দত্ত "আপনার এ স্পর্দ্ধার সমুচিত জবাব পাবেন সীতেশবাবু। আপনার সর্ব্বনাশ করতে হবে।"

"পারেন—সর্ব্বনাশ মানে চাকরীটা খেতে পারেন আপনি। আপনার মত মানুষের সঙ্গে কাজ করতেও ঘেন্না হয় আমার। চাকরী ছেড়ে দিলাম আজ থেকে।" ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেললাম। তারপর বোঝাতে চেষ্টা করছি—নিজেকেই তখন থেকে, যা করেছি মানুষ হিসেবে আমার তাই করা উচিত। কিন্তু বোঝাতে পারছি না কেন? নির্লজ্জ নগ্ন মনের দিকে চেয়ে অনুশোচনায় বুক ফেটে যাচ্ছে। ঘুষ নেওয়া অন্যায় বলে নয়—আমি ঘুষ নিতে পারছি না সেই অক্ষমতায় আসলে জ্বলে উঠেছিলাম। মানুষ হিসেবে আমি এক তিলও উঁচু নয়। ঈর্ষ্যায় অন্ধ হয়ে সেই সহজ সরল সত্যি কথাটা তখন ধরা পড়েনি আমার চোখে, অথচ এখনও উপায় আছে। যদি সুবিমল দত্তের পায়ে ধরে ক্ষমা চাই—ফিরিয়ে নিতে তার আপত্তি হবে না। বোধ হয়। বিদ্রূপ মেশানো তির্য্যক হাসি হেসে সে ক্ষমা করবে আমাকে।

কিন্তু ফিরে যাবো কেন? সেই নিঃশ্বাস বন্ধ করা বদ্ধ দেওয়ালের জগতে ফিরে গিয়ে আমার লাভ কি? শুনেছি জাহাজের কাজ পেলে অনেক দূরের দেশে চলে যাওয়া যায়। উত্তেজনার ঝড় থামিয়ে দিলে এখানকার পৃথিবীতে অদল বদল হবে না কোথাও। মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় হুমড়ি খেয়ে কিশোর তার বই খুলে বসবে, মা তাঁর অফুরন্ত জপের নাম বলে চলবেন। আর শান্তি? হয় ত শুতে এসে আজ চোখের জল ফেলবে আর সেই সঙ্গে হাসবে। এক সঙ্গে কাঁদতে আর হাসতে পারে ও। সেই আশ্বস্ত নিরুদ্বেগ মুখ কটির কথা মনে করে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি ক্রমশঃ। যে বাধাকে এড়িয়ে যাবো ভেবেছিলাম, সেই হিমালয়ের মত সুউচ্চ দুর্লঙ্ঘ্য সীমার শাসন মেনে নিতে মন চাইছে। পারব না, না ওদের বিশ্বাস ভাঙতে পারবো না আমি। দেওয়ালের পেরেকে ঝোলান ঘামে ভেজা খদ্দরের পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললাম—"না, চাকরী যায়নি আমার। যেতে পারত, তাই ও কথা বলেছিলাম।"

আবার ওদের চোখের দিকে তাকালাম। সেই ঝড়ে দোলা সমুদ্র যেন শান্ত হয়ে আসছে ক্রমশঃ। হারানো সেই ফাঁপা খুঁটিকে ফের হাতের মুঠোয় পেয়ে শক্ত করে ধরছে ওরা।

"তাই বল্। ভাবনায় সারা হয়ে উঠেছিলাম এতক্ষণ। আমার গোবিন্দর নাম জপ করাও হয়নি।"

মা একটু যেন হেসে উঠলেন। কিশোর কপালে ঝুলে পড়া চুল একটানে সরিয়ে অনুযোগের সুরে বলল—"মিছিমিছি এতখানি সময় নষ্ট হল দাদা। টেষ্টর মাত্র পনের দিন বাকি।"

শান্তি যখন ঘরে এল, তখন তার মুখেও প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস দেখে হঠাৎ ভালো লাগল। যেন সেই চার বছর আগেকার সেই লাজুক আধচেনা মেয়েটি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আজকে আটপৌরে শাড়ীখানা ছেড়ে ওর সেই নীলাম্বরী খানা পরে এসেছে। একটু যেন সুন্দর হতে চেষ্টা করেছে শান্তি। আমার পাশে বসে আস্তে আস্তে বলল—"কি ভয়ই না দেখিয়েছিলে তুমি। মাগো! সারা সন্ধ্যা যেন আর কাটছিলো না। আমার আবার।"—বলে হঠাৎ থেমে গেল শান্তি। অবাক হয়ে বললাম—"কি হল তোমার?"

শান্তির ফ্যাকাশে মুখখানা যেন লাল হয়ে উঠল। শাড়ীর আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে ঢোক গিলে বলল—"খবরটা ঠিকই। মানে—."

বুঝলাম দেওয়ালের তিনটি দিক ছিল। আজ নতুন করে আরও একটি দিকের শুরু হল। অনুভব করলাম মুক্তি আর নেই। বাধাকে দূর করতে না পেরে সাধারণ মানুষ তাকে মেনে নেয়। যে মানে না সে অসাধারণ। শান্তির কুয়াশা রঙের হাতের কব্জির কাছে মোটা মোটা নীল শিরগুলো যেখানে ফুলে উঠেছে সেখানে হাত রেখে বোধ হয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাধারণ মানুষের মতই আমি জীবনকে মেনে নিতে পারলাম আর একবার।

## চলন্তিকার পথে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আভা পাকড়াশী

পরদিন দুপুরে পৌঁছলাম কীর্ত্তি নগরে। একটা মাটির দোতলায় ঘর পেলাম। রক্ষা হল ওখানেই খেতে হবে। রাঁধা ভাত পাওয়া যাবে, আপত্তির আর কি আছে? নদীতে সবাই স্নান করছে দেখে আমাদেরও ইচ্ছে গেল স্নান করতে। বড় গরম লাগছিল। কোন রকমে কাকস্নান হল। গায়ের কাপড় গায়েই শুকাল। সঙ্গে একটা চিরুণী পর্য্যন্ত নেই, যে চুলটা আঁচড়াব। সব আছে সেই বিছানার মধ্যে। এবার ওরা আমার সেই বাড়তি শাড়ীটি লুঙ্গি করে পরে সবাই চান করল একে একে। রাস্তার পাথর এত গরম যে, নদীর ঘাট থেকে ঘরে আসতে প্রাণান্ত। এখানে একটি মস্ত বড় ব্রীজ নতুন তৈরী হয়েছে। এখনো তাতে গাড়ী চলছে না। সেই জন্ত পায়ে হেঁটে এই ব্রীজ পার হয়ে গিয়ে ওদিকে অন্ত বাসে উঠতে হয়। ব্রীজটুকু পার হতে পয়সা দিতে হয় টাক্স বাবদ। এখানে এক বাস থেকে অন্ত বাসে মাল তোলে পাহাড়ী মেয়ে কুলি। ওদের মেয়ে কুলিটি ছিল সুন্দরী। তাই নিয়ে একটু হাসা হাসি হল। যাক স্নানের পর এবার খাবার পালা।

ওরা গেল নীচে খেতে আমার খাবার এল ওপরে। মোটা চালের ভাত, ডাল আর একটা চাটনি। সঙ্গে আবার খানিকটা চিনি। চিনি কেন আবার? জবাব পেলাম ডালমাখা ভাত মুখে দিয়ে। ওঃ কি ঝাল। ঝাল কমাতে চাটনি মুখে দিলাম। আরও জ্বলে গেল মুখ। সেটা শুধু কাঁচালঙ্কা বাটা। এবার চিনির মর্ম্ম বুঝলাম। শুধু চিনিই খেলাম। তখন শুনলাম, আজকের রান্নায় না'ক ঝাল তেমন হয়নি। পাহাড়ীরা আরও ঝাল চায়। এসে গেল দীপ্তিশ দুই কুলিকে নিয়ে। গোমার পথ চলতে পা কেটে গিয়েছিল কাঁচে। তাই সময় মত পৌঁছতে পারেনি। টাকা কড়ি মিটিয়ে দেওয়া হল। বকশিস দিলাম। তবু দাঁড়িয়ে আছে বাসের জানলার কাছে। এবার বাস ছাড়বে সোজা নিয়ে যাবে হরিদ্বার। দেখি ছেলেরা গোমার দুহাত ধরে টানছে আর ওর দুচোখ দিয়ে জল পড়ে ছেঁড়া সার্টের বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমাদেরও চোখ শুকনো নেই। অনেকক্ষণ শক্ত হয়ে বসেছিলাম আর পারলাম না। গোমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলি, চললাম, ভগবান তোমার ভাল করবে। অনেক আরাম দিয়েছে এই বন্ধুর পথে। হাউ হাউ করে কাঁদে ও। শুধু শুনি অস্ফুটে বলছে, ভাইয়া ভাইয়া। ঐ ছেলেদের জন্তেই ওর মন পুড়ছে বেশী। ওদিকে চোন সিং ও ওদের চার বন্ধুকে ধরে ধরে কাঁদছে। ওদেরও চোখ শুকনো নেই। ও ত আবার ওদের রান্না করেও খাইয়েছে। আমিও ওকে বকশিস দিয়েছি। আমাদেরও কত কাজ করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে কত বড় দুটি আপনার জনকে ছেড়ে যাচ্ছি। অথচ আজকাল যারা সত্যিকার আত্মীয় তারাও এমন করে বিচ্ছেদ ব্যথা অনুভব করে না। তারা মনে করে গেল, না আপদ গেল। এখানে যে শহরের কৃত্রিমতা এখনো প্রবেশ করেনি, তাই এদের চোখের জল এখনো অকৃত্রিম। ভেজাল নেই তাতে।

পিপলকোটি থেকে হরিদ্বার একশো চুয়ান্ন মাইল পথ। পথে পড়ল নন্দ প্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ, গৌচর, রুদ্র প্রয়াগ, শ্রীনগর। এই শ্রীনগর থেকে কোটদ্বোয়ারা হয়েও ফেরা যায়। দীপ্তিশরা ঐ পথ হয়েই এসেছিল শুনলাম, ঐ পথের শোভা আরও সুন্দর। এই কর্ণ প্রয়াগে কর্ণের মন্দির আছে। এখানেই তিনি সূর্য্য উপাসনা করেছিলেন। আর বৃদ্ধ বয়সে রামচন্দ্র এসে দেবপ্রয়াগে বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন আর নন্দ প্রয়াগে আছে কণ্বমুনির আশ্রম। দুষ্মন্ত শকুন্তলার ঘটনা নাকি এখানেই ঘটেছিল। রাত্রি দশটা নাগাদ হরিদ্বার পৌঁছলাম।

সত্যি কথা বলতে কি এখন কিন্তু একটু আরামের জন্ত মন টানছে। মনে হচ্ছে এবার একটু ভাল ঘরে থাকব। কলের জলে বাথরুমে চান করব। আর ভাল বিছানায় শোব। শঙ্করটার আবার জ্বর এসেছে। ও পাবলিক স্কুলে থাকে। নিয়ম মত চলে। এত অনিয়ম ওর সইবে কেন? অতি দুঃখেই বলেছিল মা-মণি আমার ছেলেদের কিন্তু আমি বারণ করে দেব তারা যেন এই পথে কক্ষণো না আসে। বাসে আসতে সকলে বলছিল এখানে অনেক ভাল ভাল আশ্রম আর ধর্ম্মশালা আছে। বিশেষ করে ভোলা গিরি আশ্রম। আমি বললাম ওসব এখন মাথায় থাক। একটা ভাল হোটেল দেখ। ও এসব বিষয়ে খুব তৎপর। বাস থেকে নেমেই সুন্দর একটি হোটেল খুঁজে বার করল। একেবারে গঙ্গার ওপরে। নাম টেহরী হাউস। ঘরের ভাড়া ছটাকা রোজ। আমি বললাম তাই সই। তিন চার দিন তো থাকব মোটে। আমার ছিল থাকার চিন্তা আর ওদের চার বন্ধুর ছিল খাওয়ার চিন্তা। পথে হাঁটতে কতরকম খাবারের গল্পই যে করত। আহা কত দিন ভাল করে খায়নি ওরা। আমিও পথের ক্লান্তিতে ভেঙে-পড়া শরীরে আর জিনিষের অভাবে কিছুই করে খাওয়াতে পারিনি ওদের মনে সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। ছেলেরাও ভাল জিনিস খাবার জন্ত লালায়িত হয়ে আছে। এখানকার মিষ্টি, মালাই খুব বিখ্যাত। সেই রাত্রেই অনেক খাবার নিয়ে এলো ও। বেচারা শঙ্কর বিশেষ কিছুই খেতে পারল না। হোটেলের বারান্দায় বসে আছি চেয়ারে। কত দিন কত যুগ পরে যেন আবার ফিরে এসেছি সভ্য-জগতে। পরিচিত পরিবেশে। সামনেই নিয়ন-শোভিতা মা গঙ্গা। কোথায় তাঁর সেই স্বতোৎসারিত উজ্জ্বল রূপ? ও যেন, 'নগরের নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।' সকালে হর কি পৌড়ীতে স্নানে গেলাম। চমৎকার বাঁধা ঘাট। মাছেরা গায়ের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে ওদের সঙ্গে

খাদ্যখাদক সম্পর্ক নয় মানুষের। বরং ওরাই মানুষের কাছে খাবার পায়। তাই পায়ের কাছে ভিড় করে।

গঙ্গাদেবীর মন্দিরটি সুন্দর। চারদিকে পাহাড়-ঘেরা শহরটির একটি চমৎকারিত্ব আছে। মেয়েদের জন্য আলাদা ঘাট রয়েছে। স্নান শেষে একটি হোটেলে গিয়ে সবাই মিলে খেতে বসা হল। কত সব সুন্দর সুন্দর মিষ্টি থরে থরে সাজান। হোটেলে চমৎকার রান্নার সুগন্ধ বেরিয়েছে। এক টাকা করে থালা, নিরামিষ পঞ্চব্যঞ্জনসমেত, যত চাও তত ভাত। ও সেদিন যেন সবাই আমরা বুভুক্ষুর খাওয়া খেলাম। বেচারী হোটেলওয়ালার লোকসানই হয়েছিল মনে হয়। এখন আমরা সবাই কেমন ভদ্র বেশভূষায় চলাফেরা করছি। আমার পায়ে ভাল চটি, হাতে ব্যাগ, চোখে গগলস। ওদেরও সেই বাবাজী মার্কা দাড়ি অদৃশ্য। হাফপ্যান্ট হাফসার্টের বদলে ধুতি পাঞ্জাবী-পরা ফুলবাবু সেজেছে এক-একটি। আমার কর্ত্তা আর ছেলেও বেশ পরিবর্ত্তন করে ভদ্র হয়েছে। সত্যিই ভদ্র হয়েছি আমরা তখন। তাই মুখে শহুরে সভ্যতার মুখোস এঁটেছি। সেই স্বতোৎসারিত কথার স্রোতে কেমন যেন ভাটা পড়ে এসেছে। ওরা এখন কেনা-কাটা নিয়ে ব্যস্ত, বাড়ী এখন টানছে ওদের। আমরা গঙ্গার ধারে মাছকে খাবার খাওয়ালাম। গঙ্গায় প্রদীপ আর ফুলের নৌকা ভাসালাম। বুকে সেই প্রদীপটি নিয়ে ভাসতে ভাসতে কতদূর চলে গেল আমার সেই ফুলের নৌকাখানি। এমনি করেই মধুর দিনগুলি দূরে সরে যায় রেখে যায় প্রদীপের রশ্মির মত একটু আলোর রেশ। ফুলের সুবাসের মত একটুখানি স্মৃতির আভাস।

আজ শঙ্করের জ্বর ছেড়েছে। তাই ওকে রেখেই আমি, কালোবরণ, নব আর গোরা গেলাম চণ্ডীপাহাড়ে পুজো দিতে। আবার সেই মুসাফিরের পোষাক অঙ্গে উঠেছে সবার। হাতে লাঠি নিয়ে চলেছি। পথে কত যে নুড়ি কুড়োলাম আর ফেললাম তার ঠিক নেই। কত ছাঁদের, কত বর্ণের যে নুড়ি। যেগুলো কুড়োই মনে হয় তার চেয়ে যেগুলো পড়ে আছে সেগুলোই অনেক সুন্দর। যে যেটা পাচ্ছে সেটা অন্যকে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওই জিতে গেল, কত ভাল ওরটা! আবার সব ফেলে দিয়ে নতুন করে কুড়োই। ও-বলে তোমার যে সেই, "ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ রতন," সেই দশা হল দেখছি, চল মন্দিরে চল। খানিকটা নৌকায় এসে তারপর বেশ কিছুটা পাহাড়ের চড়াই ভেঙ্গে তবে আমরা পৌঁছলাম এই মা চণ্ডীকার মন্দির প্রাঙ্গণে। অনেককাল আগে ও একবার আমার শাশুড়ীকে নিয়ে হরিদ্বারে এসেছিল। সেই সময় এই চণ্ডীদেবীর মন্দিরেও এসেছিল। ওর কাছে তখনকার সেই ভয়াবহ বর্ণনা শুনে আমাদের গায় যেন কাঁটা দিয়ে উঠত। তখন পারাপারের কোন খেয়া ছিল না। ধারে কাছে কোন বসতিও ছিল না। একদিন দুপুর বেলা বেরিয়ে প্রায় দশ পনের মাইল পথ হেঁটে ও সন্ধ্যে নাগাদ এসেছিল এখানে। সেদিন এখানে ছিল একটা পাহাড়ীদের মেলা। ওর খাতায় লেখা সেই সন্ধ্যার চণ্ডী মন্দিরের বর্ণনার সঙ্গে এখন এই নিস্তব্ধ দুপুরের পরিবেশের যদিও অনেক তফাৎ। তবু সেই বর্ণনাটা একটু তুলে দিই।

"জঙ্গলাকীর্ণ বিরলবসতির মধ্যে অবস্থিত, পর্ব্বতের কন্দরে লুক্কায়িত, দেবী চণ্ডীকার একটি মন্দির। জঙ্গলীদের অবোধ্য গানের সহিত ঢক্কা নিনাদের শব্দ উঠিতেছে ড্রিম্, ড্রিম্। প্রায়ান্ধকার মধ্যে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া, ঐ লোমহর্ষণ দৃশ্যে শিহরিত হইয়া উঠিলাম। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ রুধির প্লাবিত ও অগণিত ছাগমুণ্ড দেবীর পদতলে স্তূপ রহিয়াছে। জঙ্গলীরা সেই রুধিরাক্ত প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি খাইয়া মাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছে। ওদিকে ভক্তেরা উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্যের তালে তালে রণোন্মত্ত অবস্থায় ক্রমাগত কি যেন পান করিতেছে ও অশ্রান্ত ভাবে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করিতেছে। একটি পাহাড়ী যুবতী কিন্তু হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে। রক্তাম্বর পরিহিত পুরোহিত একটি বালককে মন্ত্রপূত করিলেন, বলি দিবার মানসে। আমি এই পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া ভাবিলাম নিশ্চয়ই এই স্থানে অভয় কোন প্রতিজ্ঞাপালনের ব্রত উদযাপিত হইতেছে। মনে পড়িল সেই দেবতার গ্রাস কবিতার কয়টি লাইন—"শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা, শোননি কি জননীর অন্তরের কথা।" কিন্তু হায় কে শুনিবে? ইহারা আজ সকলেই অপ্রকৃতিস্থ, দেবতার সম্মুখে পণ রক্ষায় বদ্ধ পরিকর। সম্পূর্ণ একা আমি নিজেও বাধা প্রদান করিতে অক্ষম। সুতরাং সত্বর এই স্থান ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে স্থির করিয়া দেবী দর্শনের জন্য মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রস্তর চটানে উঠিলাম। এবং পদতলে রুধিরের স্পর্শে কণ্টকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সিন্দুর চর্চ্চিতা ভীষণা দেবী মূর্ত্তির উজ্জ্বল চক্ষু দুইটিতে দয়ার পরিবর্ত্তে যেন কেমন একটি হিংসার প্রকাশ দেখিয়া ভীতি বিহ্বল চিত্তে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। এই নারকীয় দৃশ্য আমার কিশোর মনে এমনই নাড়া দিয়াছিল যে, সে রাত্রে বাসায় ফিরিয়াই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম।"

গোরা তো ওখানেই পৌঁছেই আগে রক্তের দাগ খুঁজে এলো। দেবী মূর্ত্তি আমাদের কলকাতার মনসাতলার মনসামূর্ত্তির মত সিন্দুর চর্চ্চিতা। তবে চোখ দুটি সত্যিই বড় বেশী উজ্জ্বল। সত্যিই এই ভীষণা মূর্ত্তি মনে ভক্তির চেয়ে ভয়ের উদ্রেক করে বেশী। তবে স্থানটি বড় মনোরম। একটি সুন্দর ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে এসে আমাদের দিল তৃষ্ণার জল আর প্রসাদের বাতাসা। কেমন যেন মনে হল মায়ের ঐ ভয়াল রূপের আড়ালেও ফল্গুধারার মত বইছে এমনি একটি স্নিগ্ধ করুণার ধারা। মা নিজেই যেন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ভক্তকে এই কুমারী রূপে দিলেন দর্শন।

ওর ঐ বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করলাম এই জন্য যে, ওর স্বভাবটা ছোট থেকেই কি রকম অজানাকে জানার জন্য সমস্ত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তারই একটু নিদর্শন দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এমনি অজানার টানে ও যখন এগিয়ে যায় তখন সব দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে তারই মধ্যে ডুবে যায় ও। অথচ শুধু নিজে জেনে বা দেখে ওর সম্পূর্ণ তৃপ্তি মেলে না, আমাকেও দেখান চাই দেওয়া চাই ওর সেই আনন্দের ভাগ। তাই পথ চলতে আমাদের প্রতি যেটুকু ঔদাসীন্য ও দেখিয়েছে সেটা ওর ইচ্ছাকৃত নয়। ও ডুবে যায় নিজের আহরণী শক্তির মধ্যে। আমি ওর এই প্রকৃতিটাকে চিনি। তবে সাময়িক ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ঝগড়া করি বৈকি। সেটারও যে দরকার আছে তা ও নিজেও স্বীকার করে।

ফেরার সময় একটি কুকুর দম্পতি এলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। কুকুর-বউ এলো আমাদের নৌকায় আর বর-কুকুর প্রিয়াকে ফেলে

করতে করতে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে এলো নদী। এরাও বৌ-এর দুঃখ বোঝে। আর এমন প্রেমের টান সাঁতার কাটতে কাটতে বার বার চাইছে নৌকার দিকে। আর প্রিয়াও সকরুণ নেত্রে সারমেয় প্রিয়র দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কুঁই কুঁই করছে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে। প্রায় তীরের কাছাকাছি এসে প্রিয়তমের বিচ্ছেদ ব্যথা ও কষ্ট অসহ্য হওয়ায় প্রিয়াও এবার জলে ঝাঁপ দিল। তারপর দুজনে পাশাপাশি সাঁতার দিয়ে চললো তীরের দিকে। বহু জন্ম আগে হয়ত এরাই যে 'প্রতাপ-শৈবলিনী' ছিল না, তা কে বলতে পারে। চারি দিকের দৃশ্য আর আমাদের দেখা হল না। আমরা বিভোর হয়ে এই সারমেয় দম্পতির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণেই ব্যস্ত রইলাম।

বিকেলে গেলাম কংখলে। শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ। দেখলাম হিন্দুর সেই মহাপুণ্য তীর্থ সতীর দেহত্যাগের স্থান। কালভৈরবের মন্দির। এ ছাড়াও স্থানটির একটি নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে।

আবার ফিরে এসে আবার ট্রেণ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে বসে আছি আমরা। অন্তত দুটো টাঙ্গা চাই; আর চাই টাঙ্গায় মালগুলো তুলে দেবার জন্য দু' জন কুলি। ওদের আর আমাদের সব মিলে মালও হয়েছে প্রচুর। দু' জন টাঙ্গাওয়ালাকে বলে রাখা হয়েছিল তারা কুলি দেবে বলেছিল। কিন্তু টাঙ্গা এসে গেল তাদের কুলি এল না। ও তখন রাস্তা থেকে দুজন কুলি ডেকে মাল তুলতে বলল। সবে মাল তোলা স্বরু করেছে তারা, এমন সময় টাঙ্গাওয়ালার দুই কুলি সবেগে এসে উপস্থিত। তারা এদের এই মারে তো সেই মারে। ওদের হকের মাল ওরা কেন তুলছে। বিরোধটা সেখানেই। মস্ত ঝগড়া স্বরু হয়ে গেল। হোটেল প্রাঙ্গণকে নিমেষে রণাঙ্গন বানিয়ে তুলল ওরা। এদিকে আমাদের ট্রেণের সময় হয়ে গেছে। একি ফ্যাসাদ রে বাবা! ওর তাড়া আর বকুনির চোটে তারা চারজন আমাদের মাল ধরে টানাটানি জুড়ে দিল। যে যেটা পারছে ছিনিয়ে নিচ্ছে আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে টেহরী হাউসের দোতলার ওপর থেকেই টাঙ্গা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিচ্ছে। তার কিছু পড়ছে পথচারীর মাথায় কিছু টাঙ্গায়। যারা আঘাত পাচ্ছে তারাও তেড়ে ওপরে উঠছে। আর আমরা উৎকন্ঠিত চিত্তে ঐ ছুঁড়ে ফেলা জিনিষগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে বৃথাই হায় হায় করে বকাবকি করছি। ওদের কর্ণকুহরে তার কণা মাত্রও প্রবিষ্ট হচ্ছে না। বেগতিক দেখে ওরা চার বন্ধু আর ও তখন ভঙ্গুর জিনিষগুলি ওদের হাত থেকে উদ্ধার করবার কাজে লেগে গেল। এবার ওরা আর কাড়াকাড়ি করার মত হাতের কাছে কিছু না পেয়ে মারামারি করতে লেগে গেল। আর মুখে তো গালাগালির তুবড়ি ফুটছে। ওঃ সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। ভিড় জমে গেল ওদের ঘিরে। পয়সা দেবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! ওরা তখন নিজেদের ঝগড়া নিয়ে উন্মত্ত। অগত্যা আমাদের টাঙ্গা ষ্টেশন অভিমুখে রওনা দিল। টাঙ্গায় চলতে চলতে যতবা জিনিষপত্রগুলো আস্ত আছে কিনা ভেবেছি, সেই লড়াইয়ের দৃশ্য মনে করে হেসেছি তার চতুর্গুণ।

হরিদ্বারের ষ্টেশনটি বেশ বড়। চললাম হরিদ্বার ছেড়ে। আবার কখনও আসা হবে কিনা কে জানে। হরিদ্বারের গঙ্গার ধার, হরকি পৌড়ীর ঘাট ভারী মনোরম। ছেড়ে যাবার বেলা মনে পড়ছে সব কিছু। গঙ্গার ধারে মনে হয় যেন মেলা বসেছে। হরেক রকম চাটওয়ালা, কুলপিমালাইওয়ালা, কাপড়ওয়ালা সব নিজের পসরা সাজিয়ে বসেছে। জোর পাওয়ারের আলো জ্বলছে। কোথাও বা হ্যাজাক। সেই আলোর রোশনি পড়ছে গঙ্গার বুকে। তাকে করে তুলেছে রমণীয়া বরণীয়া। এই গঙ্গার ওপর আছে একটি ব্রীজ। ব্রীজের কাছেই আছে সুভাষ বসুর বীরত্বব্যঞ্জক একটি চমৎকার মূর্ত্তি। এই পাহাড়ের ইসারা ঘেরা হরিদ্বারে এসে সত্যিই যেন মনে হয় এবার হিমালয় আর দূরে নেই। সত্যিই যেন সেই পর্ব্বতরাজের চরণে এসে পড়েছি আমরা।

ডুন এক্সপ্রেস ছুটে চলেচে হু হু করে। ওরা চার বন্ধু আমাদের পাশের কম্পার্টমেণ্টেই আছে। মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাচ্ছে সবাই। মন ভার হয়ে উঠেছে ওদের। আসন্ন বিচ্ছেদের কথা মনে করে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে ওরা। কাল সকালে লক্ষ্ণৌ পৌছলেই হবে আমাদের একত্রে যাত্রার পরিসমাপ্তি। আমরা ওখান থেকে গাড়ী বদল করে যাব কাণপুর। ওরা দু'বন্ধু নব আর দীপ্তিশ দিন চারেক লক্ষ্ণৌতে ওদের এক মাসিমার বাড়ী থাকবে। আগে থাকতেই ওদের এক চিঠি লিখে মাংস রেঁধে রাখতে বলেছে ওরা। হরিদ্বারে নিরামিষ খেয়ে পুরোপুরি রসনার তৃপ্তি হয়নি ওদের। বাকি দুজন বিমল আর কালোবরণ এই গাড়ীতেই সোজা কলকাতা ফিরবে। হ্যাঁ ওদের সেই চার বন্ধুর খোঁজ করেছিল ওরা হরিদ্বারে গীতাভবনে, পায়নি ওদের। এবার কলকাতায় গিয়ে দেখা হবে সকলের। বলবে একে অপরকে নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী। আর সেই কথাও কাহিনীর মধ্যেই বেঁচে থাকবে আমাদের এই চলন্তিকার পথের স্মৃতি।

এসে গেলে লক্ষ্ণৌ। শরীর ঝলসান আগুন গরম লু-এর বাতাস বইছে। সেই বরফের শৈত্য স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। প্রায় একটা মাস কেটে গেছে কত বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে। বেরিয়েছিলাম খালি মনে, শুধু মাত্র কৌতূহল সম্বল করে, ফিরে এলাম হর্ষবিষাদে ভরা কিছু অতৃপ্ত পিপাসা আর কিছু তৃপ্তির পূর্ণতা নিয়ে, শেষ বারের মত আমরা একবার বল্লভদাসের রেষ্টুরেণ্টে এক সঙ্গে বসে সরবৎ খেলাম। আজ কিন্তু সেই উদ্দাম উচ্ছাস নেই কারো। নেই কথা বলার উৎসাহ, সবারই মুখ গম্ভীর ম্লান। ডুন এক্সপ্রেসের হুইসেল বাজতেই বিমল আর কালোবরণ ছল ছল চোখে বিদায় নিল। এবার আমাদেরও গাড়ীর সময় হল। ছেলেরাই যা একটু আধটু কথা বলছে। আমরা সবাই চুপ। দুই বন্ধু দীপ্তিশ আর নব আমাদের নমস্কার করে ভারী গলায় শুধু মাত্র বলল, চিঠি দেবেন। ওদের স্বভাব বিরুদ্ধ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল ওরা প্ল্যাটফর্মে, আমাদের ট্রেণ ওদের পেছনে ফেলে চলল এগিয়ে। দূরে মিলিয়ে গেল ওদের দুই বন্ধুর বিষাদ ভরা মুখচ্ছবি। চলছি আমরা। চলতে হবে সারা জীবন ধরেই চলব। জীবনের এই চলন্তিকার পথে পর্য্যায় ক্রমে আসবে কত সুখ, দুঃখ, মিলন, বিচ্ছেদ, বিরহ, আনন্দ তবেই না এই জীবনের পথ চলায় অভিজ্ঞতার ঝলিটি হবে সম্পূর্ণ। এই বলেই প্রবোধ দিলাম মনকে। ঐ উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ শেষ করেও আবারও সেখানে যাবার একটা তৃষ্ণা ও পে ছুটান বারে বারেই অনুভূত হচ্ছে অন্তরের অন্তর্দেশে। যদি তিনি সেই দেবাদিদেব, আবার সুযোগ করে দেন আবারও যাব তাঁর কাছে সেই তপোময় তুষার তীর্থে। এবার নিশ্চয়ই দেখে আসব তুঙ্গনাথ, ত্রিযুগীনারায়ণ, আর সেই অপরূপ শোভাময় স্বর্গোদ্যান।

সমাপ্ত

## আপনি, আপনার ছেলেমেয়ে ও অচেনা লোক

### শোভনা রায়

স্কুলের ছুটীর পর আপনার ছেলেমেয়ে ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরে না এলে আপনি নিশ্চয়ই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। চিন্তিত হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ হাজারো রকমের দুঃসংবাদের কথাই তো রোজ খবরের কাগজে পড়ছেন।

এ বিষয়ে আপনার কর্তব্য কী? আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, আপনার ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে দোকান-বাজারে অযথা ঘুরে ঘুরে যেন সময় নষ্ট না করে বা কোন অচেনা, অজানা লোকের সংগে আলাপ না জমায়। এ বিষয়ে তাদের সাবধান করে দিতে হবে।

ছেলেমেয়েদের নিষেধ করে দেবেন, কোন অচেনা লোকের সংগে যেন তারা কথাবার্তা না বলে বা তাদের কাছ থেকে কোন উপহার যেন না নেয়। কারণ কী জানেন? যত নিরীহই দেখতে হোক না কেন, কোন অপরিচিত কুকুরকে আপনি যদি আঘাত করেন, তাহলে হঠাৎ সে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এক ধরণের লোক আছে যাদের সম্বন্ধে এই যুক্তিটি বিশেষ ভাবে খাটে। অধিকাংশ লোকই ভদ্র এবং সজ্জন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা ভদ্রলোকের ভাণ করে। কথাবার্তার সময় তাদের আসল স্বরূপটি বেরিয়ে পড়ে। ছোট ছেলেমেয়েদের সরল মন। তারা মনে যা আসে মুখে তাই বলে। আপনার ছেলেমেয়ের কোন কথা যদি ভদ্ররূপী এই দুর্বৃত্তদের মনঃপূত না হয়, তাহলে এরা আপনার ছেলেমেয়ের সংগে দুর্ব্যবহার করতে পারে। ছোট ছেলেমেয়ে বলে বাছ-বিচার করার ক্ষমতা এদের থাকে না। সুতরাং এদের সংগে কথাবার্তা বলা বিপজ্জনক। এদের এড়িয়ে চলাই উচিত। এরাই ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে চকোলেট, মিষ্টি বা সিকি আধুলী গুঁজে দেয়। ভুলেও ভাববেন না যে, ওটা ওদের শিশু-প্রীতির নিদর্শন। এটাই ওদের ভদ্রতার ভাণ।

আপনি বলতে পারেন, কেউ কিছু দিতে এলে তা প্রত্যাখ্যান করা তো অভদ্রতা; কেউ কিছু বললে তার উত্তর না দেওয়া তো অসভ্যতা। দেখুন, এর পাত্র-অপাত্র আছে। পরিচিত কেউ যদি আপনার ছেলেমেয়েদের কিছু দেয়, তা নিতে কোন আপত্তি নেই। বড়রা যখন ছোট ছেলেমেয়েদের সংগে থাকবেন, তখন অচেনা কেউ ছেলেমেয়েদের কিছু দিলে তা নিতেও বাধা নেই। কিন্তু এই রকম অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থাতেই অচেনা লোকের কাছ থেকে কোনরকম উপহার নেওয়া ছোট ছেলেমেয়েদের উচিত নয়। আর কথার উত্তরের কথা বলছেন? ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে দেবেন যে অচেনা লোক কোন কথা তাদের বললে তারা যেন উত্তরে বলে যে, অচেনা লোকের সংগে কথা বলতে তাদের নিষেধ আছে।

আপনি ভাবছেন, আপনার ছেলেমেয়েরা 'রাস্তায় দুটো কথা কারও সংগে যদি বলে তাহলে মহাভারত এমন কী অশুদ্ধ হয়ে যাবে! আপনি জানেন না, ভদ্রবেশী দুরাত্মারা কী সাংঘাতিক ধরণের লোক! তারা মিষ্টি কথায় নানা প্রলোভন দেখিয়ে শিশুদের ভুলিয়ে নিয়ে যায় নিজেদের আস্তানায়। তারপর ভিক্ষা, চুরি, পকেটকাটা ইত্যাদি অপকর্মে অপহৃত শিশুদের নিযুক্ত করে। এমনি ধরণের ঘটনার কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। আরও একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইদানীং আমাদের দেশেও ছোট ছেলেমেয়ে আটক রেখে তাদের মা-বাপের কাছ থেকে মোটা টাকা দাবী করার ঘটনাও ঘটছে। সুতরাং সাবধান হওয়াই ভাল। ছেলেমেয়েদের বলে দেবেন যে, স্কুল থেকে সোজা যেন তারা বাড়ী চলে আসে। রাস্তায় অপরিচিত কারও সংগে বাক্যালাপ যেন না করে।

শিশুরা মায়ের মনের খবর রাখে না। কত সামান্য কারণেই যে মায়ের মন তাদের জন্য উতলাবোধ করে, তা বোঝবার শক্তি তাদের থাকে না। কিন্তু এ কথা যদি তাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, বড়রা যা কিছু করেন, তাদের ভালর জন্যই করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা বড়দের কথা শুনবে। এমন কি বড়দের অনুপস্থিতিতেও বড়দের কথা কিছুতেই অবহেলা করবে না।

## ত্রিপদী সংলাপ

### স্বাতী মুখোপাধ্যায়

।। দেহ ।।

আজও আমি শ্রান্ত তবু নিরুপায় জীবন সংগ্রামে
জঠর সমিধ বড় জীবনের অন্যান্য কারণে;
মন সত্যি মন নয়, বার্তাবহ অর্বাচীন শুধু—
এবং হৃদয় ব'লো ঘাম ঝরা অবয়ব মধু।

।। মন ।।

ভাখো-ভাখো কি আশ্চর্য আকাশের নীল:
পক্ষীরাজ তুরগের অনির্দেশ দুর্বার মিছিল
অনেক রাজত্ব আছে— রাজপুরী রাজন্য বিহীন,
এবং ষোড়শী কন্যা স্বপ্নে গোণে দিন।

।। প্রাণ ।।

নদীর তরংগ ওঠে লক্ষ্য তার তীরের আশ্লেষ
আমরা বহতা স্রোত খুঁজি অন্য দেশ।
'কি যে হলো' তারপর 'কি যে হবে'—আর;
না ভেবে এগিয়ে চলো—মিথ্যা অন্ধকার।।

## আলোর দর্পণে

### বাসবী দত্ত

চকমকি পাথর ঠুকে একটু আগুন জ্বালো, দেখি
আমার নিজের মুখ আলোর দর্পণে:
বিতৃষ্ণার ছড়াকাটা কিংবা এক প্রখর পুরুষ
দিনের ভেল্কি খুলে মজুরীর কানাকড়ি গোণে!

বুকের সীমায় সূর্য্য নত হ'লে
একটি আলোর সেতু বাঁধে পাহাড়-প্রান্তর-বন
বকিনীরা বক;
শ্মশানে সম্মতি দেয়
আলোর সেতুর পারে অন্য এক জীবন বিস্তৃত:
হেঁটে যায় একটি যুবক!
আমার নিজের মুখ আলোর দর্পণ খুলে দেখি:
প্রত্যাশার আলো-সেতু বুকের সীমায় মিলিবে কি?

# ভুল পথে

### অণিমা রায়

কনকনে শীতের মাঝে খরা রদ্দুরটা সুকান্তের বেশ ভালই লাগছে। পূর্বদিকের জানালাটা দিয়ে রদ্দুরটা এসে পড়েছে তার টেবিলটার উপর। টেবিলটি বেশ গোছান। টেবিলের মাঝখানে একটি চৌকা পুরু কাঁচ। কাঁচটির তলায় কতকগুলি সুন্দর রঙিন ছবি 'কোণাচে ভাবে সাজান রয়েছে। সুকান্ত নিবিষ্টমনে একখানি বই পড়ছিল, এমন সময় সুনন্দার আবির্ভাব। চশমার ফাঁক দিয়ে সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বইটি বন্ধ ক'রে বললো সুকান্ত, "কি ব্যাপার! পথ ভুলে না কোন কাজে? তোমার আসার কারণটা আমি বুঝতে পারছি না।"

সুনন্দা একটু ম্লান হাসি হেসে বললো, "খুব রাগ করছো দেখছি!"

সুকান্ত চশমাটা খুলতে খুলতে গম্ভীর গলায় বললো, "না ঠিক রাগ নয়, তবে বেশ আহত হয়েছি। যতবারই তোমায় ডেকেছি, তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছো আসবো বলে, কিন্তু আসোনি। তুমি আসবে বলে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। রাতের পর রাত চোখে ঘুম নেই, বসে বসে কবিতা লিখেছি অভিমান ক'রে। ভেবেছিলুম, যদি কোনদিন তুমি আসো, তাহ'লে দেখাব তোমায় আমার লেখা কবিতাগুলো—সেগুলোর মধ্যেই পাবে আমার মনের কথা। অর্থের দিক দিয়ে আমি খুব সামান্য মানুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই সুনন্দা, কিন্তু ভালোবাসার দিক দিয়ে কিছুটা মর্যাদা আমার আছে বলে দাবী করতে পারি। কতবার ডাক এসেছে আমার বাইরে যাবার। জানি গেলে আমার লাভ আছে, কিন্তু যাইনি, কেন তা তুমি জান না। তুমি বিশ্বাসও করবে না হয়ত যদি বলি তোমার জন্যে। তোমাকে ছেড়ে যেতে মন আমার চায়নি। এ হয়ত আমার মনের দুর্বলতা। আজ তুমি এলে ভালই হল—কবিতাগুলো দেখাবো তোমায়। এই দেখ বলে টেবিলে সাজান বইয়ের ফাঁক থেকে একখানি মোটা খাতা বার করে তুলে ধরলো সুনন্দার হাতের উপর।

সুনন্দা পাতা উল্টাতে উল্টাতে বড় বড় চোখ তুলে বলে উঠলো, "কত লিখেছ তুমি, পাতার পর পাতা কবিতার মালা গেঁথেছো দেখছি!"

সুকান্ত বললে, "বাঃ! তা হবে না কেন? যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল সেদিন থেকেই আবার শুরু করেছি আমার কবিতা লেখা।"

নিবিষ্টমনে পড়তে পড়তে সুনন্দা বলে উঠলে', "কি সুন্দর লেখো তুমি। কেন যে মাসিক পত্রিকায় বার করো না, বুঝি না। শেষের দিকের কবিতাগুলো বড় বেদনাদায়ক। 'চম্পাকলি' কবিতাটি আমার সব চেয়ে ভাল লাগলো।" কবিতাটির প্রতিটি লাইনে যেন সুকান্তের মান অভিমানের পালা উছলে উঠেছে। সুনন্দার চোখে মুখে তা ফুটে উঠলো।

সুকান্ত একটু ম্লান হাসির রেখা টেনে বললে, "কাগজে না দিয়ে ভুল করেছি না? কিন্তু জীবনের প্রতিটি পদেই তো ভুল করেছি সুনন্দা। একমাত্র তুমি পারতে তা সংশোধন করতে—কিন্তু তা হ'ল কৈ? ভাগ্য আমার অপ্রসন্ন, তাই তুমিও কেমন সরে যেতে চাইছ আমার সামনে থেকে—অস্তগামী চাঁদ যেমন করে ডুব মারে আকাশে। আজ হয়ত সেই জন্যেই তোমার আগমন।"

সুনন্দা কবিতার খাতা থেকে মুখ তুলে বললে, "আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল চারমাস আগে—অফিস থেকে বাড়ী ফেরবার পথে। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে চলেছিলুম দু'জনে মাঠের দিকে। ক্লান্ত সূর্য ঢলে পড়েছিল আকাশের শেষ প্রান্তে। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো। তুমি নরম ঘাসের উপর বসে পড়ে শুরু করেছিলে তোমার আবৃত্তি। আমি হয়েছিলুম শ্রোতা। সেদিনের স্মৃতি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।"

অলক্ষ্যে নিজের বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিয়ে বললে সুকান্ত, "সবই মনে আছে সুনন্দা। তোমার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপ থেকে সব কিছুই তুলে রেখেছি মনের গুপ্ত কোণে। মাঝে মাঝে যখন ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করি, তখন খুব অবাক লাগে আমার। হঠাৎ কেমন করে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল, আবার হঠাৎ কেমন বন্ধুত্বের মাঝে একটা লম্বা ফাটল দেখা দিল।

এই ভাঙ্গাগড়া খেলার মাঝে মানুষ এগিয়ে চলেছে। তুমিও চলেছ, আমিও চলেছি। সেদিন তুমি চলেছিলে বর্ষামুখর সন্ধ্যায়—দুর্যোগের দিনে। হঠাৎ আকাশ কালো ক'রে পৃথিবীর বুকে জাগিয়ে তুললো প্রচণ্ড ঝড়। ঠাণ্ডা কোড়ো হাওয়া থেকে থেকে কেমন শিহরণ জাগাচ্ছিল শরীরে। তুমি পরেছিলে একটি ফিকে হলুদ রংয়ের সাড়ী। আঁচলের প্রান্তভাগ দিয়ে মুড়ে ফেলেছিলে নিজের শরীরটাকে। দেখে মনে হয়েছিল তুমি খুব শীতার্ত ছিলে।

বিহ্বল নেত্রে বার বার তাকিয়ে ছিলে ট্রাম বাসগুলোর দিকে। কি অসম্ভব ভিড় ছিল সেগুলোতে। ভাবছিলে বোধহয় কেমন ক'রে বাড়ী ফিরবে। আমিও তোমার মত অপেক্ষা করছিলুম সেখানে। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল না, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু হ'ল। তোমাকে দেখে আমার কেমন করুণা হল, এগিয়ে গিয়ে বললুম, "ঠাণ্ডায় এ রকমভাবে দাঁড়িয়ে ভিজবেন না, বরং কোথাও গিয়ে অপেক্ষা করুন। বৃষ্টি ত' সবে সুরু হয়েছে, এখন বোধহয় থামবে না। সে এখন প্রবল প্রতাপে চালিয়ে যাবে তার দুর্জয় অভিযান।"

তুমি পাংশুমুখে বললে, "কোথায় আর দাঁড়াব বলুন? যেখানে একটু ছাউনি আছে সেখানেই লোকের ভিড়। কি মুস্কিলেই যে পড়লুম, এখন কি আর বাড়ী যেতে পারব?"

আমি সাহস দিয়ে বললুম, "চলুন বরং কোন রেষ্টুরেণ্টে অপেক্ষা করি। ভেজার হাত থেকে বাঁচবো, আর গরম চাটা মন্দ লাগবে না বাদলার দিনে।"

তুমি কি যেন ভেবে নিয়ে বললে, "চলুন, সত্যি এভাবে ভিজলে অসুখ অনিবার্য।"

দু'জনে পা চালিয়ে একটি ছোট রেষ্টুরেণ্টে উঠলাম। অন্যদিন সেখানে মোটেই ভিড় হয় না। সেদিন কিন্তু বৃষ্টির ভয়ে অনেকেই ভিড় জমিয়েছিল। বরাত ভাল একটা কামরা পেয়ে গেলাম। দু'জনে এসে বসলুম, কিন্তু কপালে চা আর ঠাণ্ডা সিঙ্গাড়া ছাড়া আর কিছুই জুটলো না, সব নাকি ফুরিয়ে গিয়েছিল। তা হ'ক বেশ কাটলো সেদিন। তারপর থেকে আমাদের মধ্যে প্রীতি ছাড়াও প্রেম এসে বাসা বাঁধলো নিবিড় ভাবে। দু'জনে প্রায়ই কাজের শেষে বেড়িয়ে আসতুম গঙ্গার ধারে, বা মাঠের দিকে।

সুনন্দা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, "সবই মনে আছে আমার কিন্তু আজ থেকে তোমাকে সব ভুলতে হবে—মুছে ফেলতে হবে মনের গুপ্ত-কোণ থেকে। সেই কথাই তো বলতে এসেছি।"

সুকান্ত বললে, "বুঝেছি আমি, তুমি বলতে চাও যে আমার কাছে আজ তোমার শেষ আসা এই তো। কিন্তু···

সুনন্দা হাতের একটি আঙুলের কোণ খুঁটতে খুঁটতে বললে "দেখ যে পথে আমরা চলেছি সেটি সম্পূর্ণ ভুল পথ। এ ভুল পথে তোমায় আমি যেতে দেব না। যাকে তুমি ঘরে এনেছ, সে আমারি মতন একজন নারী। তার উপর কর্ত্তব্য তোমার সব চেয়ে বেশি, কারণ সে সব কিছু ছেড়ে তোমার কাছে এসেছে। তার যতই দোষ থাক, তোমাকে তা ক্ষমা করতে হবে। তোমার অনেক গুণ আছে, গুণের অমর্য্যাদা করো না। নিজের চেষ্টায়, নিজের বুদ্ধিতে তুমি সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছো। আজ তুমি চাকরীতে কত উপরে উঠেছো সে কথা যখন ভাবি তখন আমার গর্ব হয়। বড় দেরীতে দেখা হ'ল—এইটাই আমাদের দুঃখ। এখন আর দুঃখ করে লাভ নেই। ঘরের লক্ষ্মীকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা কর, শান্তি পাবে। জীবনে অনিলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে কোন দাম নেই তোমার। তোমাকে উপদেশ দিতে আসিনি, আমি এসেছি আমার অপরাধের বোঝা লাঘব করতে।"

সুনন্দার কথাগুলো সুকান্তের সারা গায়ে যেন হুল ফোটাতে লাগলো। সুনন্দার চোখের উপর কটাক্ষ দৃষ্টি হেনে বললে, "কারুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করতে চাই না। তুমি হয় ত আমার জীবন থেকে সরে যেতে চেষ্টা করবে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে সব সময়ে তুমি জ্বল জ্বল করবে। অনিলাকে বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু সে আমার একটা দুঃস্বপ্ন—জীবনের অভিসম্পাত। তুমি ছাড়া আর কোনও নারী আমার মনে ঠাঁই পাবে না।"

সুনন্দা নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললো "অনেক বেলা হ'ল, চললুম। আমাকে ভুলে যাও।" সুকান্ত হতভম্বের মত চেয়ে রইল।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। সুনন্দা আর কোন খবর রাখেনি সুকান্তর। তবে প্রাকৃতিক নিয়মের মত একটি অপ্রতিরোধ গতিতে পুরাণো দিনের কথাগুলি বার-বার তার মনে পড়ে। একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলায় সে নিজেকে একটু বেশি একলা মনে ক'রল। নিঃসঙ্গতার হাত থেকে বাঁচবার জন্ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে হ'ল যে, সুকান্তর মনে আঘাত ক'রে সে চলে এসেছিল, সেটা তার উচিত হয়নি। মানুষের কাছে মানুষ গেলে কোন দোষ হয় না। তার উচিত একবার সুকান্তর খবর নেওয়া।

সুকান্তর বাড়ী এসে সুনন্দা দেখলো যে সুকান্তর ঘরের সামনের পর্দ্দাটা টানা রয়েছে। "ভিতরে আসতে পারি কি"? জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে এমন সময় ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে শোনা গেল—"আমাকে বলনি কেন যে তুমি বিবাহিত।" পরমুহূর্ত্তে শোনা গেল যে সুকান্ত বলছে, "তোমাকে ছাড়া আমি জীবনে আর কাউকে ভালবাসিনি। একমাত্র তোমাকেই আমি আমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সীমা।"

সুনন্দার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। সারা শরীর ঘেমে গিয়েছে; এ-কি শুনছে সে? আর দাঁড়াতে পারল না, একটু মুক্ত বাতাস চাই তার। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সন্ধ্যার আবছায়ায় মিলিয়ে গেল।

## চাঁদে অভিযান

### সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়

চরকা বুড়ি চরকা কাটে চাঁদের দেশে বসে
শুনেছিলেম মোর শৈশবকালে
আর পাশে রয়েছে বসে ছোট্ট খরগোস;
কিন্তু হায় হায় সবই যে হ'ল মিথ্যা
খসে পড়লো আজ পুরোনো মুখোস ॥
বড় বড় বিজ্ঞানী সব
গবেষণায় মগ্ন।
কেমন করে গিয়ে সেথায়
নিজেরে করবে ধন্ত ॥
অবশেষে ছুটলো সেথায়
রুশ দেশের চার ভাই।
জটিল তথ্য নামলো নিয়ে
একের পর এক তাই।
নেইকো সেথায় চরকা বুড়ি
বড় বড় সব গর্ত্ত।
নয়কো সাপের নয়কো ব্যাঙের
আগ্নেয়গিরি রয়েছে সব সুপ্ত ॥
বিজয়ী বীর বিজ্ঞানীরা
বলছে তারস্বরে।
ডরাবো না পিছাব না
জয় করবো তারে ॥
একদিন মোরা যাত্রা করবো সেই খানে;
যা ছিল অপার বিস্ময় রূপে
আমাদেরই মনে ॥
কিন্তু রইবে না কেউ উপরে,
নামতে হবে চাঁদের দেশের
পাতাল পুরে ॥
গড়বো সেথায় ঘর বাড়ি
করবো ক্ষেত খামার।
নূতন ভুবন রচিব মোরা
শান্তির পারাবার ॥
দ্বিতীয় পৃথিবী হবে সেথায়
জাঁকজমকে ভর্ত্তি।
বিজ্ঞান তবে বলবে হেসে
"এটি মোরই অমোঘ-কীর্ত্তি ॥"

এখন...
মধুর
নতুন
Rexona
গন্ধেভরা
নতুন
রেক্সোনা
এবার আপনার জন্য মধুর নতুন সুবাসভরা
রেক্সোনা সাবান। মধুর নতুন রেক্সোনার
সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক তেলের সাহায্য আপনার ত্বককে
দিনে দিনে আরও কোমল ও সুন্দর করে তুলবে।
ক্যাডলযুক্ত
নতুন রেক্সোনা
...ত্বকের যত্নে সেরা সহায়ক
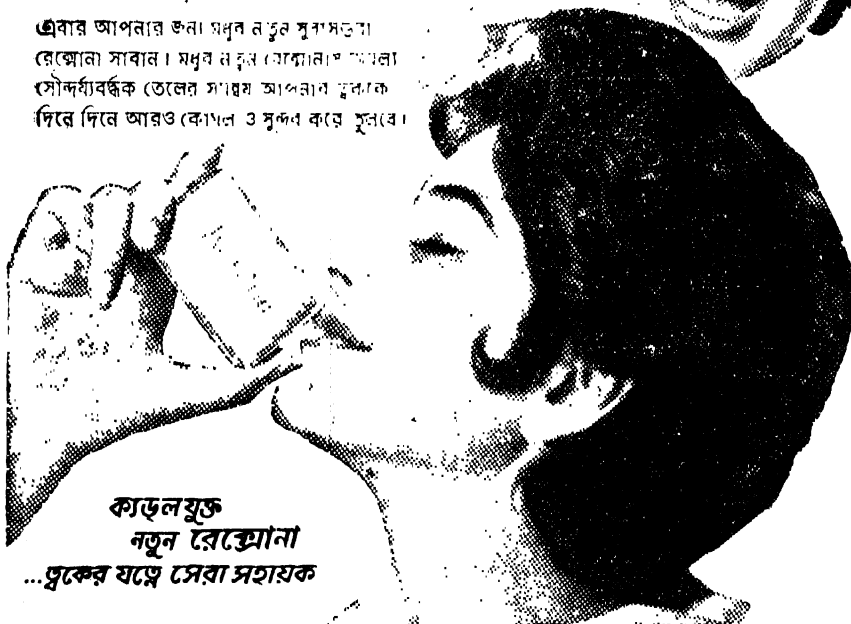
# সহযাত্রী

তারাপদ রাহা

আমাদের দু'জনের মধ্যে কে যে আগে ট্রেণে উঠেছিল তা আমি বলতে পারব না, এমন কি ও যে আমারই সঙ্গে এক কামরায় আছে তা-ই আমি অনেকক্ষণ জানতে পারি নি। বজবজের লাষ্ট ট্রেণ অর্থাৎ দশটা ছে-চল্লিশের গাড়িতে বালীগঞ্জ ফিরছিলাম। একটা সাহিত্যসভার আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম ওখানে, সঙ্গে আমার কয়েকজন বন্ধু এবং পরিচিতও ছিলেন। ওদের সকলকেই যে আমি খুব পছন্দ করতাম তা নয়, তবু গিয়েছিলাম এক সঙ্গেই, সেইটাই নাকি ভদ্রতা। কয়েক বছর আগেকার কথা, তখন ইণ্টারক্লাসের ব্যবস্থা ছিল। আমন্ত্রণকারীরা এসে ইণ্টারের টিকেট কেটেই নিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের। পাঁচটা কয়েক মিনিটের ট্রেণ, দস্তুরমত ভিড় ছিল। যাত্রীদের হৈ-চৈ, অপ্রিয়জনের অসম আলোচনা, সব-কিছু শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে কামনা করছিলাম তখন একটি নিরালা কক্ষ, নির্ঝঞ্ঝাট, নিঃসঙ্গ।

ফিরবার সময় তাই ঠিক মিলে গেল। সভাতে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে আমাকে তার বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল। আমার অন্যান্য সঙ্গীরা আগের গাড়িতেই রওয়ানা হয়ে গেলেন। বন্ধু আমাকে আপ্যায়ন করবার পর যথাসময়ে এই ট্রেণটায় উঠিয়ে দিয়ে গেলেম। এদিকের গাড়িতে সন্ধ্যার সময় দিব্বি ভিড় থাকে, বজবজ, নাঙ্গি, ব্রেসব্রীজ ইত্যাদিতে যারা কাজ করতে আসে তাদের বাড়ি ফিরবার ভিড়। সন্ধ্যার পর থেকেই ভিড় কমতে থাকে। শেষের গাড়ি ত দেখলাম এক রকম ফাঁকা। আমি যে কামরায় উঠলাম তাতে মোটে আর একটি লোক বসে ছিল, সে-ও নাঙ্গিতে নেমে গেল। ওঃ কি শান্তি, কি স্বস্তি! আসবার সময় নানা ঝামেলার মাঝে যে কামনা জেগে উঠেছিল মনে, তা যে ভগবান এমন করে পূরণ করবেন তা আর ভাবতে পারি নি।

লম্বা কামরার এদিক-ওদিক কোণা-কানাচ বেঞ্চের নীচে সর্বত্র তাকিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নাই। নিজের মনেই একবার হো-হো করে হেসে উঠলাম। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। বাড়িতে নিজের শয়নকক্ষে নিঝুম রাত্রেও এত স্বাধীনতা মেলে না। রাত্রির অন্ধকারের মাঝে গাড়ি ছুটে চলেছে, বাইরে থেকে দেখবার কেউ নেই, আমার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণী শুনবারও কেউ নেই, সুতরাং এখানে এখন আমি যা খুশি তাই করতে পারি, বলতে পারি। কল্পনায় যৌবন বন সারিকাকে সম্মুখে উপস্থাপিত করে তার দিকে প্রেমমদির দৃষ্টিতে চেয়ে মধুক্ষরা কথা উচ্চারণ করতে পারি, আবার পরম ভীতিস্থল 'বস'কে সামনে রেখে তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমে তাঁকে হেনস্থ করে ছাড়তে পারি, তবু চাকরি যাবার ভয় নেই। কতদিন আবৃত্তি করবার ইচ্ছা জাগে, বাড়ির ছেলেপিলেরা শুনে কি মনে করবে ভেবে করতে পারি না, এখানে গলা ছেড়ে—ইচ্ছা হয় রাবীন্দ্রিক ঢঙে, ইচ্ছা হয় শিশির ভাদুড়ীর ঢঙে আবৃত্তি করতে পারি। সিনেমায় শোনা যে গানটা কতদিন গাইতে ইচ্ছা করলেও বয়স হয়েছে বলে মুখে পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারি না, সে গানটা গলা ছেড়েই গাইতে পারি। রাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যক্তির অনুসরণে হঠযোগের শীর্ষাসন করতে পারি কি না তার একটা পরীক্ষা করে নিতে পারি। কোন্ ছেলেবেলায় ডিগবাজী খেতাম, এখন এ পরিণত স্থূলদেহ নিয়ে সেটা সম্ভব কি না তা-ও পরখ করে দেখতে পারি। উদয়শঙ্করের নাচ দেখে কতদিন নাচতে ইচ্ছা জেগেছে তা-ও একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি, উঁকি মেরেও দেখবার কেউ নেই, হাসবারও কেউ নেই। ইচ্ছা করলে লম্বা কামরার এধার থেকে ওধার তারপরে ওধার থেকে এধার বারবার আমি একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারি দৌড়াতে পারি। সব জানালাগুলি একে একে বন্ধ করতে পারি, আবার খুলতে পারি, কেউ এসে আমায় বাধা দেবে না, আসবার সময় আমি অতি কষ্টে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম, এখন আমি যে কোন জায়গায় যে কোন বেঞ্চে সটান শুয়ে পড়তে পারি। মার্বেল হাতে পেলে ছোটছেলেদের মত হাঁটু ভেঙ্গে বসে মার্বেল খেলতে পারি, কিছুতেই বাধা নেই। এই সব কল্পনার সঙ্গেই মনে মনে ভাবছিলাম মুক্তির আনন্দ বুঝি অনেকটা এই রকম।

এতটা স্বাধীনতার সুযোগ পেয়েও অবশ্য ওসবের কিছুই আমি করলাম না, তার বদলে যা আমি করলাম তা অতি সাধারণ। আমি হাত পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাতের খবরের কাগজখানি বেঞ্চে রেখে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর একবার দক্ষিণের একবার উত্তরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে গ্রীষ্মের রাত্রের নীরব সুন্দর রূপ দু'চোখ ভরে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কয়েক মিনিট পর এতেও আর আনন্দ না পেয়ে আমার সাবেক জায়গায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম, অতঃপর করবার মত আর কিছু মনে না পড়ায় খবরের কাগজটা খুলে বসলাম। ঠিক এই সময় আমার এতাবদদৃষ্ট সহযাত্রীর অস্তিত্ব অনুভব করলাম। সহযাত্রী বিনা দ্বিধায় কোনরকম ভূমিকা না করে আমার নাকের ডগায় এসে বসলেন।...সহযাত্রীকে আপনারাও চিনবেন: চারিটি পা, শুণ্ড ও পক্ষবিশিষ্ট রক্তখাকী যে জীবটিকে আমরা 'মশা' বলি ইনি হচ্ছেন তাই। নিতান্ত অভদ্রের মত না বলে-কয়ে আমার নাসিকার উপর উপবেশনের জন্য আমি তাকে কটূক্তি করে তাড়না করলাম। মশক মহাশয় আমার কটূক্তি ও তাড়না গায়ে না মেখে হালকা ডানায় ভর দিয়ে সুদীর্ঘ কামরাটা পরিক্রমণ করে প্রতি বাতায়নে টুঁ মেরে বহির্গমনোন্মুখিতার অভিনয় করেও বহির্গমন না করে—কক্ষকোণে উপবিষ্ট সাদৃশ বৃহৎ জীবের মত চিত্তাকর্ষক আর কিছু তখন কাছাকাছি নেই ভেবে আমার

ঘাড়ের উপর এসে বসলেন। আমি সেবারেও তাকে তাড়না করলাম। মশকপুঙ্গব ক্ষিপ্রগতিতে উড়ে গিয়ে সমস্ত কামরাটা আর একবার চক্কোর দিয়ে নিতান্ত দুর্বিনীতের মত আমার হাতের উলটো দিকে এসে বসলেন। আর নয়, ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। মনে মনে বললাম, দু'-দুবার আমি তোমায় মার্জনা করেছি, সতর্ক করে দিয়েছি, আবার এসেছ তুমি? এ কি ইয়ার্কি পেয়েছ? এবার তোমায় মৃত্যুদণ্ড দেব আমি, তারই জন্ত প্রস্তুত হও। মানবরচিত আইনও এই কথা বলে। অপরাধ তোমার বহু: প্রথমত: তুমি ভবঘুরে, দ্বিতীয়ত: তুমি জনসমাজের স্বাস্থ্যহানিকারী, তারপর তুমি বিনা টিকিটে ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়েছ, আর যে উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছ তাতেও মনুষ্য সমাজের অনুমোদন নেই। সুতরাং তুমি দণ্ডার্হ, আর এ দণ্ড হতে যাচ্ছে তোমার প্রাণদণ্ড। এবং সেই দণ্ডই তোমায় আমি দিতে যাচ্ছি। বলার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে তাকে মোক্ষম জোরে আঘাত করলাম। অতি সহজে ক্ষিপ্রগতিতে সে আমার সে আঘাত এড়িয়ে গেল। মশা ব্যঙ্গের হাসি হাসতে জানে কিনা জানি না, যদি জানে, এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে সে হাসি দেখবার ক্ষমতা যদি মানুষের থাকত, তা হলে হয়ত আমি দেখতে পেতাম, দাঁত বের করে আমার দিকে চেয়ে হি হি করে সে হাসছে। আমার সুপরিকল্পিত মোক্ষম আঘাত ব্যর্থ হওয়ায় আমি অপদস্থ অপমানিত বোধ করলাম। আমার আত্মাভিমান জাগ্রত হয়ে উঠল, ফলে হস্ত নয়, হস্তধৃত সংবাদপত্রের সাহায্যে তার ভবলীলার অবসান ঘটাবার জন্ত, তড়িদ্‌গতিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। উঁচুতে উঠে গেল সে, আমি বেঞ্চের উপর দাঁড়ালাম। নাগাল পেলাম না। আলোর চারিধারে সে হয়ত আমার দিকে দাঁত বের করে ঘুরতে লাগল। তাকে পাকড়াও করবার জন্ত আমিও বাধ্য হয়ে আলোর চারিদিকে ঘুরতে লাগলাম। কিছুতেই তার নাগাল পেলাম না। এর পর আমি আমার ক্রুদ্ধ মনোভাবকে বুঝিয়ে শান্ত করে এক নূতন কৌশল অবলম্বন করলাম। শ্বাপদকুল যে নীতি অনুসরণ করে তার বধ্য-জীবকে শিকার করতে সমর্থ হয়, আমি বিজ্ঞজনের মত সেই নীতির অনুসরণ করতে চেষ্টা করলাম। প্রথমে ওর কাছ থেকে সরে এসে যেন অন্ত কিছুতে মন দিয়েছি এরূপ ভান করলাম, তারপর ও যখন নির্ভয়ে নীচে নেমে এল, তখন চোরের মত চুপি চুপি এগিয়ে হঠাৎ বিদ্যুদ্‌গতিতে ওকে আঘাত করলাম। কিন্তু ও কি কৌশলে সরে পড়ল। কিছুতেই ওকে জখম বা কাহিল করতে পারলাম না। এবার যেন ও খোলাখুলি ভাবে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হ'ল। সত্যিকার 'বুলফাইট' কোনদিন দেখিনি, বইতে পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। পিঙ্গলচক্ষু ক্রুদ্ধ বৃষের আক্রমণ, ক্রীড়াকারী যেমন সহজ কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে তার চারিদিকে আবর্তন করতে থাকে, আমার সমস্ত ক্রুদ্ধ আস্ফালন নিষ্ফল করে দিয়ে ও তেমনি করে আমার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। সুস্বাদু রক্তমাংস বিশিষ্ট বিপুলকায় মূর্খ, অসহায় জীবকে দ্বন্দ্বে পরাভূত করে ক্ষুদ্রকায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী যে পরম কৌতুকানন্দ উপভোগ করে, ও হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সেই বিপুল আনন্দ উপভোগ করছিল।

আমি অকস্মাৎ ওর সত্তা, ওর মনোভাব উপলব্ধি করতে সমর্থ হ'লাম। ও আমার কাছে আর অতি ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ মাত্র রইল না,
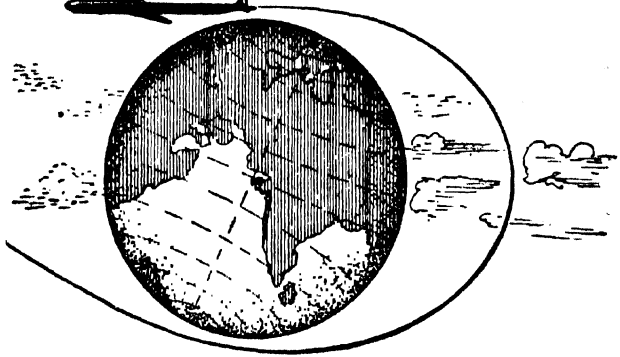
মানুষেরই মত বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব স্পন্দন একটি জীব হয়ে—এই ট্রেনের কামরায় একচ্ছত্র অধিকার এখন করে—তাই নিয়ে ও এখন আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং ওকে তুচ্ছ পতঙ্গমাত্র মনে করা, আমার আর কিছুতেই সঙ্গত নয়।

তুচ্ছ ত নয়ই বরং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখছি ও আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী, কৌশলী। জীবনে ইলেকশানে কোনদিন নামি নি, একটিমাত্র যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হ'লাম ও তাতে আমাকে অবলীলাক্রমে হারিয়ে দিচ্ছে, সুতরাং ছোট ওকে মনে করি কি করে? উদার মনোভাব নিয়ে বিচার করতে গিয়ে ওর উপর আমার শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা বিসর্জন দিয়ে ওকে আমি দয়া করব ঠিক করলাম। হ্যাঁ, তাই-ই করব, এবং তাই করাই উচিত। দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, উদারতা—এই হচ্ছে মানবমনের গৌরবময় বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বের জন্য মানুষ অন্য জীব থেকে বড়। সুতরাং সুযোগ থাকতে আমি ওর চেয়ে বড় হব না কেন? এই সব ভেবে-চিন্তে আমি ওকে ক্ষমা করলাম, সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে আমি ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারলাম। এতক্ষণ আমি ছিলাম পরাজিত, হাস্যাস্পদ, ঘৃণাস্পদ, দ্বিপদ জীব, এখন আমি মানুষের বিশিষ্ট নৈতিক গুণের পরিচয় দিতে পেরে মুহূর্তের মাঝে নিজেকে বড় মনে করতে পেরে ওকে বধ করবার উত্তম পরিহার করে সন্তুষ্ট চিত্তে খবরের কাগজ হাতে নিজের কোণে এসে বসলাম।

কাগজ খুলে পড়বার আয়োজন করতেই ও নির্বিবাদে এসে তার উপর বসল। হাসি পেল আমার: আরে মূর্খ, এ কি করলি তুই? আমি না হয় মানুষের মহৎগুণের চর্চা করতে নিজের মাঝে ক্ষমা করতে রাজী করিয়েছি কিন্তু তুই এতক্ষণ এত কৌশলে লড়ালড়ির পর তোর শত্রুর হাতে এসে ধরা দিলি? এ কি করতে আছে রে, বোকা? মানুষ ত সুযোগ পেলেই তার পূর্ব নীতি বিসর্জন দিতে কার্পণ্য করে না। এখন যদি আনন্দে করতালি দিবার মত করে আমার দুই হাতে ধৃত কাগজের দুটো দিক সজোরে একবার বন্ধ করি, তা'হলে তুই এর মাঝে 'স্যাণ্ডউইচ' হয়ে যাবি না? অবশ্য সে ভয় তোর এখন আর নেই। তোর উপর আমার কেমন এক মায়া পড়ে গেছে। তুই এখন আমার ভাই। মানুষের শাস্ত্র বলে—যত্র জীব তত্র শিব, তোর মাঝেও আমি শিবের অস্তিত্ব অনুভব করছি। আমার আত্মার আত্মীয় তুই। সোঽহং, তত্ত্বমসি। এ ছাড়া অন্য দিক দিয়েও তোর আর আমার মাঝে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি আমি। বিধাতা আমাদের একই রাত্রে একই ট্রেনের এক কামরায় সহযাত্রী করে দিয়েছেন, যে কারণেই হ'ক তুই আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিছু করতে না পেয়ে আমি যখন মনমরা হয়ে উঠেছিলাম, তখন তুই আমায় বহুক্ষণের জন্য দ্বন্দ্বক্রীড়ায় নিবিষ্ট রেখেছিস। এখন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছে—দেখছি তোর আর আমার মধ্যে আরও অনেক সামঞ্জস্য আছে: তুই আর আমি আমরা দুই-ই মরণশীল জীব। তুই এই ট্রেণে যাত্রা করেছিস, জানিস না কোথায় চলেছিস তুই। সত্যি কথা বলতে কি, ভাই, আমিও আমার জীবনের গন্তব্যস্থান জানি না। চেষ্টা করলেও জানতে পারি না। এই রাত্রির অন্ধকারের চেয়েও গভীর অন্ধকার থেকে এসে কিছুকাল তোরই মত আলোর পাশে ঘুর ঘুর করে আবার কেবল অন্ধকারে মিলিয়ে যাব।

ট্রেণ বালীগঞ্জ এসে গেল। আমি আমার সহযাত্রীকে কিছুমাত্র বিঘ্ন না করে খবরের কাগজটা গুটিয়ে নিয়ে ট্রেণ থেকে নেমে পড়লাম। এতক্ষণ একসঙ্গে ভ্রমণ করে আমার সহযাত্রীর উপর কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল, তাই ট্রেনের কামরাটির দিকে আর একবার সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলাম আমার সহযাত্রী আমাকে হারিয়ে কাতর হয়ে বৈদ্যুতিক আলোর চারিদিকে ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

# চীৎকারে লাভ নেই

ডব্লু, এচ, অডেন্

চেঁচিয়ে কি লাভ? জুটবে মধু চাই না আপত্তি।
গরম চা দাও, চাদর আনো, শরীরটাকে ঢাকি,
কিন্তু বলো, এর মানে কি? কি কর্‌তে যাচ্ছি?
রাগ করে তাই থাকলে বসে, পড়বে নিজেই ফাঁকি।
বহুদিনের আগের কথা বলেছিলেম মাকে,'
ছাড়ছি বাড়ী চিরতরে আরেকজনার খোঁজে।
তারপরে আর দেই নি সাড়া, কপ হয় নি ভাল;
আঘাত খেয়ে মূর্খ মানুষ, ঠেকলে শিখে বোঝে।
হেথায় আমি, হেথায় তুমি, শান্তি কি পাচ্ছি?
কিন্তু বলো, এর মানে কি? কি কর্‌তে যাচ্ছি!
বলবে তুমি এমনটা কি সব সময়েই ঘটে?
হয়ত ঘটে না সব সময়, তবুও ঘটে জেনো।
গাড়ী নিয়ে ভাগ্‌লে পরে, জীবন বোঝা বটে।
ওয়েলস্ গিয়ে কি লাভ হবে? ভাগ্যটাকে মেনো।
তুমিও জেনো আমার এ শিরদাঁড়ার আছে শেষ,
আমিও চিনি সেনাপতির বিশাল কঠিন মুখ।
নীরস মনের চারদিকে তার কাঁটাতারের বেড়া,
বলতে তবু পারি না তার গোপন ইচ্ছাটুকু।
হেথায় আমি, হেথায় তুমি, শান্তি কি পাচ্ছি?
কিন্তু বলো এর মানে কি? কি কর্‌তে যাচ্ছি?

শিরায় আমার ইচ্ছা নাচে, মাছের স্মৃতি ভাসে—
যখন আমি মেঝেয় শুয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদি,
বলবে বা কেউ "এমনধারা করতে এরও আগে।"
আমার ভারী দায় পড়েছে তোমায় বসে সাধি।"

একটা পাখী প্রায়ই এসে উড়তো নদীর চরে,
কিন্তু এখন আসে না আর, এর মানে কি জানো?
অনেক ভেবে বের করেছি, টের পেয়েছে সেও
এই জীবনে সবই ফাঁকি, মিথ্যা প্রেমের গানও।
হেথায় আমি, হেথায় তুমি, শান্তি কি পাচ্ছি?
কিন্তু বলো এর মানে কি? কি করতে যাচ্ছি?

অনুবাদ—ভাস্কর দাশগুপ্ত

# উদ্ভিদ্‌-অভিধান

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

উৎকরাদি—উৎকর, সংকল, শকর, শিম্বল, শিম্বলীমূল, অশ্মন, সুবর্ণ, খলাজিন, তিক, কিতব, অণক, ত্রৈবণ, পিচুক, অশ্বথ, কাশ, ক্ষুদ্র, ভস্ত্রা, শাল, জন্তা, অজির, চর্মণ, উৎক্রোশ, ক্ষান্ত, খদির, শূর্পণায়, শ্যাবনায়, নৈবাকব, তৃণ, বৃক্ষ, শাক, পলাশ, বিজিগীষা, অনেক, আতপ, ফল, সম্পর, অর্ক, গর্ত, অগ্নি, বৈরাণক, ইড়া, অরণ্য, নিশান্ত, পর্ণ, নীচায়ক, শঙ্কর, অবরোহিত, ক্ষার, বিশাল, বেত্র, অরীহণ, খণ্ড, বাতাগর, মন্ত্রণাহ, ইন্দ্রবৃক্ষ, নিতান্তবৃক্ষ, আর্দ্রবৃক্ষ—এইগুলি উৎকরাদি ( পাণিনি )।

উৎকুঞ্চিকা—কালজীরা।

উৎকূট—ছত্র, ছাতা।

উৎপল—[ হিং কমল, বোম্বাই কমবল, তাং অম্বল, তিব্বত—উৎপল ] কমল, পদ্ম দ্রং।

উৎপলশারিবা—শ্যামালতা।

উৎপলিনী—[ হিং ছোটি কোক্কি ] জলজপুষ্পবিং। পর্যায়—কৈরবিণী, কুমুদ্বতী, কুমুদিনী, চন্দ্রেষ্টা, কুবলয়িনী, ইন্দিবরিণী, নীলোৎপলিনী।

উৎপাদিকা—১ হিলমোচিকা, হিঞ্চা শাক। ২ পুতিকা, পুঁইশাক।

উত্তমা—দুগ্ধিকা বৃক্ষ, ক্ষীরাই।

উত্তমারণী—ইন্দীবরী, শতমূলী।

উত্তানক—উচ্চটা বৃক্ষ।

উত্তানপত্রক—লাল ভেরাণ্ডা।

উদর্ক—মদনকণ্টক বৃক্ষ।

উদুর্জাতি—রসুন গাছ দ্রং।

উদুম্বর—উড়ম্বর দ্রং।

উদুম্বরদলা, উদুম্বরপর্ণী—দন্তীবৃক্ষ।

উদুম্বল—উড়ম্বর দ্রং।

উদুজাতি—justicia dentata.

উদ্দাল—বহুবার, বৃক্ষ, কুদ্রক ধান্যবিশেষ।

উদ্দালক—বহুবারক বৃক্ষ।

উদ্বেগ—গুবাক, গুপারি।

উন্মত্ত—১ ধুস্তূর, ধুতরা, ২ মুচুকুন্দ বৃক্ষ।

উপকুঞ্চিকা—১ জীরা দ্রং, ২ তুঁত।

উপকুঞ্চি—এলাচ দ্রং।

উপচিত্রা—১ মূষিকপর্ণী, ইন্দুরকানি, ২ দন্তীবৃক্ষ।

উপমেত—শাল গাছ দ্রং।

উপবল্লিকা—অমৃতস্রবা লতা।

উপাস—বিষাক্ত বৃক্ষ বিং। ৫০।৬০ হাত দীর্ঘ। এই বৃক্ষের নির্যাস তীরে মাখাইয়া শত্রু বধ করে। যবদ্বীপে জাত।

উপহ্বপত্র—অশ্বত্থ বৃক্ষ।

উপবাক—যব দ্রং।

উপবাকী—ইন্দ্রযব দ্রং।

উপবিষা—আতবিষা দ্রং;

উপবট—পিয়াল, পিয়াশাল গাছ।

উপোদকী, উপোদিকা—পুঁই শাক দ্রং।

উপোতী—পুঁই শাক দ্রং।

উমা—১ হলুদ, ২ অতসী।

উপলভেদী—হাড়জুড়ী, plectranthus aromaticus. পর্যায়—শ্বেতা, পলভিৎ, শিলগর্ভজ, অশ্মভেদী শিলাভেদ, নগভিন্নক, ভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী, পাষাণভেদ।

উরণ, উরানাক্ষ, উরনাক্ষক—চাকুন্দাগাছ দ্রং।

উরুকাল—মাকাল দ্রং।

উরুকালক—মহাকাল লতা।

উরুবক—লাল ভেরেণ্ডা গাছ। ভেরেণ্ডা বৃক্ষ দ্রং।

উর্বারু—কাঁকুড় দ্রং।

উলকিপানা—salvinia verticillata.

উলট-কম্বল—ওলট-কম্বল ( ইং devil's cotton ), উলটাকম্বল abroma augusta. বন্ধুকাদিবর্গের ছোট তরু। শাখা সরু ও লোমশ। ফুল ঘোর রক্তবর্ণ, বর্ষাকালে ফোটে।

উলু, উলুখড়—[সং উলূকা, উলূক ] কাশ তৃণ। ধান্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু তৃণবিং। সবুজ পাতা, অল্প অল্প রোঁয়া আছে। কোথাও উলুঘাস বলে। Inparata arundinacea, I. cylindrica saccharun cylindricum.

উলুপ—উলুখড় দ্রং।

উশীর, উশীর—বেণা, খসখস, গন্ধবেণার মূল। বেণা দ্রং।

উশীরী—ছোট কেশে। পর্যায়—মিষি, শুঁড়া, অখাল, নীরজ, শর।

উষণ, উষণা—পিপুল মূল, শুঁট, চই।

উর্ধবুধ—রক্তচিতা দ্রং।

উষ্ট্রকাণ্ডী—পুষ্পবিং। পর্যায়—রক্তপুষ্পী, করভকাণ্ডিকা, রক্তা, লোহিতপুষ্পী, কর্ণপুষ্পী।

# দুই ধারা

সরিতা মজুমদার

সুনন্দাকে দেখে মাইলিং ওয়ার্ড থেকে বেরুবার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়লো সুব্রত। কালকের দেখা সেই ছেলেটি আজও ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও বেশ বোঝা যায় ছেলেটি কাঁদছে, ফোলা ফোলা চোখ দুটি মাঝে মাঝে হাতের উল্টো পিঠে মুছে নিচ্ছে।

পায়ে পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল সুব্রত। সস্নেহে ছেলেটির মাথায় হাত রেখে প্রশ্ন করলো, তুমি কেন কাঁদছ খোকন। মুখ ফিরিয়ে বিস্ময় ব্যাকুল দৃষ্টিতে সুব্রতর পানে তাকাল ছেলেটি, আশ্চর্য্য, ছেলেটির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সুব্রত, বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একখানি মুখের সাথে অদ্ভুত মিল ছেলেটির মুখের। মিল তার খোকনের সাথেও। সেই চোখ, সেই চুল, বয়সের পার্থক্য না থাকলে নিশ্চয় খোকন বলে ভুল হত। ছেলেটিও বিস্মিত দৃষ্টিতে তার অবাক হওয়া মুখের দিকে চেয়ে আছে। বিব্রত বোধ করলো সুব্রত। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে নিল ছেলেটির আপনার জন কেউ আছে কিনা, কাউকে না দেখে বললো, তুমি এখানে একা দাঁড়িয়ে কেন। কার অসুখ করেছে, তুমি কার সাথে এখানে এসেছ।

সহানুভূতির স্পর্শে ছেলেটির কান্না বেড়ে গেল। একটি কথারও জবাব দেওয়া তার হল না।

ওয়ার্ডের নার্স এসে দাঁড়াল ছেলেটির পাশে, বললো, আজ তোমার মায়ের সাথে দেখা করতে পারবে না খোকা। তাঁর শরীরটা বেশ দুর্বল আছে। আজ বাড়ী যাও।

কেঁদে কেঁদে বললো ছেলেটি, মাকে একটিবার দেখবো।

মায়ের সাথে আজ তোমার দেখা করা ঠিক নয় ভাই, তুমি কাছে গেলে তোমার মা অস্থির হয়ে ওঠেন, তাতে ওঁর ক্ষতি হতে পারে, সস্নেহে ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে নার্স বললো।

কাতর কণ্ঠে ছেলেটি বললো, আমি শুধু দূর থেকে মাকে দেখে চলে আসব। গায়ের জামা দিয়ে চোখ মুছে নিলো সে। মৃদুকণ্ঠে সুব্রতকে বললো নার্স আপনি কি এর কোন আত্মীয়? অন্যমনস্ক সুব্রতর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ।

তা'হলে আপনি ওকে নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। দূর থেকে ওকে দেখিয়ে নিয়ে আসবেন। ওর মা অত্যন্ত দুর্বল। কথা বলা একেবারেই মানা, আসুন। নার্সের ডাকে কিছু ভাববার অবকাশ পেল না সুব্রত, ছেলেটির হাত ধরে এগিয়ে গেল।

স্পেশাল ওয়ার্ডের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সুব্রত রোগিণীকে স্পষ্ট দেখতে পেলো, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের সম্ভাবনাটিই যেন রূপ ধরে বেডে ছড়িয়ে রয়েছে। একটি শুষ্ক রজনীগন্ধার ন্যায় যে নারী এই বেডে শায়িত, বার বছর বাদেও তাকে চিনতে সুব্রতের কোন কষ্ট হল না, ওই নারীর শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুব্রত মিত্রের চেনা। চিনতে কষ্ট না হলেও বুকের ভিতর কোথায় যেন একটা চাপা বেদনা তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল, বুকের ব্যথাটা এত আলোড়ন সৃষ্টি করলো যে সুব্রতর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠলো। নার্সের কথায় চমক ভাঙল, কাল সারারাত অবস্থা অত্যন্ত খারাপ গেছে। এখনও খুবই অসুস্থ, অপারেশন আরও দুদিন পিছিয়ে দিয়েছেন ডক্টর সেন।

অপারেশান। সুব্রত আর্তকণ্ঠে প্রায় চীৎকার করে উঠলো। ওর অপারেশান সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বুঝি। নার্সের প্রশ্নের উত্তরে হাঁ, না কিছু না বলে শুধু স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো ওই মুমূর্ষু শীর্ণা নারীর পানে।

বিস্মিত নার্স বললো, চলুন সময় হয়ে গেছে।

নার্সের আহ্বানে প্রায় নিথর দেহ টেনে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। ভুল গেল পরিবেশ, ভুলে গেল ছেলেটিকে। ওকে ছেড়ে দিয়ে একাই এগিয়ে গেল সুব্রত।

খোকনকে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যান, ও বড্ড কাঁদছে। নার্সের ডাকে চমকে ফিরে তাকাল সুব্রত ও তাই তো বড্ড ভুল হয়ে গেছে বলে হাত ধরে বাইরে এসে দাঁড়াল অলকার পুত্র অনিন্দ্যকে। যার জন্ম সংবাদে সুব্রত মিত্র হত্যা করতে চেয়েছিলো নবজাতককে ও তার মাকে। না, আজ আর কোন বিদ্বেষ জাগছে না ওর বিরুদ্ধে, উপরন্তু গভীর মমতায় মন ভরে উঠছে ওর অসহায় ব্যথিত মুখখানি দেখে। আরও মুখে যে তার খোকার ছাপ, খোকার পরে যদি তার আর একটি ছেলে হত সে নিশ্চয় এমনিই হতো।

গাড়ী করে যেতে যেতে ওকে প্রশ্ন করে সুব্রত জানতে পারলো, মা ভিন্ন অনিন্দ্যর আর কেউ নেই। বাড়ীতে সে আর মা থাকতো, আর থাকতো তাদের বুড়ি ঝি। বাবাকে সে দেখেনি, মায়ের কাছে জেনেছে তার বাবা এক বছর বয়সে মারা গেছেন। তার একটি বড় ভাই আছে মায়ের কাছে সে তাও শুনছে তবে তার দাদা হারিয়ে গেছে তাই মাকে বহুদিন কাঁদতে দেখেছে। মাকে সে কথা দিয়েছে সে বড় হয়ে দাদাকে খুঁজে বার করবেই।

শিশু মন শোকানলে দগ্ধ হয় না। ওদের মনের মেঘ কাটতে দেরী হয় না, তাইতো ওরা অত সুখী। অনিন্দ্যের অনর্গল বাক্যধারার ফাঁকে সুব্রত চলে গেল বার বছর পূর্ব্বের এক স্বপ্নে দেখা জগতে। অলকা যদি একটু মানিয়ে চলতো তাহলে তাদের জীবনে এ অধ্যায়ের সূচনা হত না। কিন্তু দোষ কি অলকার? অনিন্দ্যের কথায় ফিরে আসতে হল অতীতের বেদনাময় অধ্যায় ছেড়ে বর্ত্তমানে,

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, অনিন্দ্য শঙ্কিত কণ্ঠে বললো।

সত্যিই তো, ওকে কোথায় নিয়ে যাবে সুব্রত। তাই বললো, তুমি কোথায় যাবে বলো।

অনিন্দ্য বললো, আমি বড়মাসির বাসায় যাব, ওখানেই তো ছিলাম এ চার দিন।

সুব্রত চিন্তা করলো, কৈ অলকার তো কোন ভাই বোন ছিল না, বললো, বড়মাসি কে, ঠিকানা জান তাঁর।

পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে সুব্রতর হাতে দিলো অনিন্দ্য, তাতে একটা ঠিকানা লেখা। বড়মাসির পরিচয় যা দিলে তাতে সুব্রত বুঝতে পারলো অলকা যে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সে স্কুলের প্রধানা তিনি।

নির্দিষ্ট বাড়ীর সম্মুখে অনিন্দ্যকে পৌঁছে দিয়ে যাবার জন্ত পা বাড়াতেই অনিন্দ্য ডেকে বললো, শুনুন। আপনি আমায় কে হন, ঠিক বললেন না তো! আপনি কাল আবার মাকে দেখতে যাবেন?

এই নিষ্পাপ শিশুর প্রশ্নের সম্মুখে স্তব্ধ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুব্রত। কি পরিচয় দেবে সে তার। বলবে কি, আমি তোমার বাবা। আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। হারিয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের কাছ থেকে। না, এই নিষ্ঠুর প্রতারণা এই শিশুকে করা যায় না। তবে!

পুনরায় প্রশ্ন এলো, কৈ কিছু বলছেন না যে। আপনি কাল মাকে দেখতে যাবেন তো?

মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল সুব্রত। কথা বললে পাছে নিদারুণ মিথ্যা পরিচয় মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়, আচ্ছা আমি যাচ্ছি কেমন, কচি-কচি হাত দু'খানি তুলে সুব্রতকে নমস্কার জানিয়ে বললো অনিন্দ্য, এ ভদ্রতাটুকু নিশ্চয় ওর মায়ের কাছে শিক্ষা, গলি পথে মিলিয়ে গেল ওর ক্ষুদ্র দেহটি।

সারা রাত জেগে কাটিয়ে দিলো সুব্রত, সিগারেটের অর্দ্ধ দগ্ধ টুকরোতে ভরে উঠলো অ্যাস-ট্রে, ঘরের এদিক-ওদিকও ছড়িয়ে পড়লো কিছু, সুনন্দা বাড়ী নেই, থাকলে হয়ত মাথায় হাত বুলিয়ে কিংবা চুলে বিলি কেটে ওকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করতো, হয়ত এত সিগারেট খাবার জন্ত ওকে মৃদু তিরস্কার করতো, শেষ পর্য্যন্ত কৌটাটাই উঠিয়ে রাখতো, সুনন্দা কাছে নেই বলে আজ নিজেকে হাল্কা মনে হ'চ্ছে সুব্রতর। আলমারীর পাল্লা খুলে বার করে নিলো একখানা ফটো, টেবিলে ফটোখানা রেখে ফটোর পানে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল সে।

ফটোর সুব্রতর সাথে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না আজকের যৌবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে থাকা এই সুব্রত মিত্রের, ফটোর এই সুব্রতর কতই বা বয়েস তখন, সম্ভবতঃ তেইশ কি চব্বিশ, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নব-বধূবেশী অলকার বয়সই উনিশের বেশী নয়, ওরা তো পরস্পরকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল তবে কেন ছিন্ন হল সে মিলন গ্রন্থি, কার দোষে এমন হল, আজ বিচারের দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়ে সে বিচার করতে বসলো সুব্রত। কার দোষ বেশী ছিল সেদিন, অলকাকে সেদিন দোষী মনে করলেও সম্পূর্ণ দোষ কি সুব্রতর নয়, অলকাকে সে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল তবে কেন নারীরূপের নেশায় মত্ত হয়ে সে অলকাকে অপমান করেছিল। অপমান বই কি, নারীর ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করাই তো, তার অপমান করা।

অলকা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলো তাকে এ সর্ব্বনাশা নেশার হাত হতে ফিরিয়ে আনতো, না পেরে শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিলো, ঠৈক তখন তো সুব্রত একবারও ভাবে নি অলকার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা, এক বারও ভেবেছিল অলকারও কামনা বাসনা আছে, না ভাবেনি, আর ভাবে নি বলেই সেদিনের সেই চরম দুর্ঘটনা ঘটে ছিল তাদের জীবনে, অলকার কোলে তখন তিন বছরের খোকন, এই সময় অলকার বান্ধবী সুনন্দার রূপের আগুনে আকৃষ্ট হল সুব্রত।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল অলকা, আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই, সুব্রত পাগল হয়ে উঠেছিল সুনন্দাকে পাবার জন্ত। তার লজ্জা, সম্ভ্রম, প্রেম প্রীতি সবই আহুতি দিয়ে ছিলো সুনন্দার রূপের আগুনে, ভুলে গেল অলকাকে, ভুলে গেল তাদের খোকনকেও। *কিন্তু আজও সুব্রত অবাক হয়ে ভাবে তার এই নেশা, এই খেয়াল সব-কিছুর বাইরে আলাদা একটা জগৎ ছিল যেখানে শুধু থাকতো অলকা ও তার খোকন, সে-কথা সেদিন সে বুঝেও বুঝতে পারেনি, বুঝছিলো যেদিন ঘটে গেল সেই অঘটন।*

*সেদিন হঠাৎ চোখ জ্বালা করে উঠলো সুব্রতর।* অতীতের রোমন্থনে বর্ত্তমান ভুলে ছিল সে, ঘড়ি দেখলো, রাত দুটো, উঠে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল, চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে পাশের খাটের ঘুমন্ত খোকনকে একবার দেখে নিল, ফটোখানা বন্ধ করে আলমারীতে রেখে দিল। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলো, যাক মুছে যাক অতীত, অনেক জ্বলেছে আর জ্বলতে চায় না সুব্রত, কিন্তু মুছে যাক বললেই কি মোছা যায় জীবনের এই গভীরতম স্বাক্ষর, হাসপাতালের বেডে শায়িতা যে মুমূর্ষু নারী আজ তার হৃদয়ে আলোড়ন তুললো, তার প্রতি কি সুব্রতর আর কোন কর্ত্তব্য আছে! এখন সে কি করবে?

সেদিনও এ-কথাই ভেবেছিলো সে, এখন কি করবে, সুনন্দাকে তার চাই, প্রতি সন্ধ্যায় দু'জনে বেড়িয়ে রাত প্রায় দশটায় সে বাড়ী ফিরতো, নিজের টেবিলে ভাত-ঢাকা পেতো কখনও খেতো, কখনও খেতো না, অলকার সাথে দেখা হোত না, তার ঘরের দরজা বন্ধই থাকত। অলকা নিজেকে গুটিয়ে এক পার্শ্বে সরে দাঁড়িয়েছিলো। সুব্রত তাতে বরঞ্চ খুসিই হয়েছিল, সুনন্দাকে আরও একান্ত করে পাবার লোভে, তারপর সেই দিন এলো, কিছু টাকার দরকারে তাকে আসতে হল অলকার কাছে। অলকার কাছে পাশবুক ছিল, ঝিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো, অলকা এ সময় ছাদে থাকে।

সন্ধ্যার আবছা আঁধার, তার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল অলকা। এ সময় সে কোনদিন বাড়ী থাকে না, তাই বোধ হয় একটু চমকাল, কিন্তু সুব্রত কি তার চেয়েও বেশী চমকায়নি ওকে দেখে। শীর্ণ ক্লান্ত দেহ, রুক্ষচুল বাতাসে উড়ে উড়ে কপালে, গালে ছড়িয়ে পড়ছে, চুলে যেন বহুদিন চিরুণী তেল পড়েনি, চোখের কোলে কালি, চোখের জলের ধারাটি এখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি, বেদনার এই জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির পাশে তাকিয়ে সুব্রত ভুলে গেল তার বর্ত্তমান, ভুলে গেল সুনন্দা, তার ভুলে যাওয়া ব্যাকুল বাসনা উন্মুখ হয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইলো তার হারিয়ে ফেলা প্রিয়াকে। সেদিন সে যদি তা করতে পারতো তাহলে আজ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যেত দুটো প্রাণী, না সে তা করতে পারে নি, ওকে কিছু না বলে পালিয়ে এসেছিল ওর সম্মুখ থেকে, তাদের মাঝখানে ধীরে ধীরে যে একটা বিরাট সেতু গড়ে উঠেছিলো সেটা এর পূর্ব্বে উপলব্ধি করতে পারে নি সুব্রত। সে দেখলো সে সেতুটাই আজ তার পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, অলকা হয়ত সেদিন অনেক কিছু আশা করেছিল, সেই মুহূর্ত্তে সে হয়ত একটা ব্যগ্র কামনা নিয়ে প্রতীক্ষা করেছিল। মনে মনে কত সঙ্কল্প করেছিল সুব্রত সেদিন একা ঘরে বসে।

আজই অলকার সাথে সব মিটমাট করে নেবে সে, প্রয়োজন হয়তো এখানকার কাজ ছেড়ে অলকাকে ও খোকাকে নিয়ে চলে যাবে, এ পাপকে আর বাড়তে দেবে না সে, সেদিন রাতে বহুক্ষণ অলকার ঘরে তার বিছানায় খোকনের পাশে শুয়ে *অলকার প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত করেছিল, তথাপি লজ্জার আবরণ ভেদ করে ওকে ডেকে আনতে পারেনি। ঘুমিয়েও পড়েছিল এক সময়, আর ঘুম ভেঙ্গে ছিল খোকনের কান্নায়, সকাল হয়ে গেছে অলকা সম্ভবত বিছানায় শুতে আসেনি, খোকনকে কোলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে ঝি তাকে বলেছিল, মা কোথায়? সে বলেছিল, আমিও তোমাকে বলছিলাম একথা, খোকন কাঁদছে ওর মা কোথায়? তার পর ক্ষুদ্র গণ্ডির নির্দ্দিষ্ট সীমানা খুঁজে আসতে সুব্রতর দু'-মিনিট সময় লেগেছিল।* ঘরে এসেই পেয়েছিল দু'ছত্র লেখা একখানা কাগজ, লিখেছে অলকা।

"আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি, অসহায় অবস্থায় খোকনকে *নিয়ে যেতে সাহস পেলাম না, ওকে কষ্ট দিলে ভগবান তোমায়* ক্ষমা করবেন না।" ইতি—অলকা।

*সেই মুহূর্ত্তে নিজকে কেমন যেন বিপন্ন, দুঃস্থ মনে হয়েছিল তার। নিজের সকল দোষকেই মনে মনে অস্বীকার করে ফেলেছিল, অলকার পালিয়ে যাওয়া দোষটিই প্রধান হয়ে উঠেছিল তার কাছে।* অলকার মর্ম্মবেদনার গভীরতা মাপ করতে পারেনি সুব্রত, তাই তাকে দোষী করে স্বস্তি পেতে চেয়েছিলো, তার পর আরও কয়েক সপ্তাহ বাড়ী থেকে বার হয়নি সে, তার ধারণা ছিল নিশ্চয় অলকা কোন দিন চুপি চুপি ফিরে আসবে। তার সংসার, তার খোকা এদের ছেড়ে চলে যাওয়া কি এতই সহজ, কিন্তু না, অলকা আর কোন দিন ফিরল না তার ঘরে। অলকার পরিবর্ত্তে এলো সুনন্দা, নিজের হাতে তুলে নিলো খোকনের সাথে সুব্রতর ভারও। দুটি বছর সুনন্দা নীরবে তাদের সেবা করেছে। কোন দিন জানায়নি তার দাবী, বলেনি, তুমি আমায় নিয়ে একদিন খেলা করেছিলে কেন। না, সুনন্দা কোনদিন কোন অনুযোগ জানায়নি, দিনের কাজ সেরে রাতে খোকনকে নিয়ে তার বাড়ী ফিরে গেছে। প্রায় দু'বছর বাদে সুব্রত আদালতের সমন পেল অলকা তাকে ডাইভোর্স করতে চায়। সেদিন সত্যিই শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো সুব্রত। সেই মুহূর্ত্তে আত্মহত্যার সঙ্কল্পও মনে দৃঢ় হয়েছিলো। কিন্তু সুব্রত কিছুই করতে পারেনি। এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে কয়েকটা দিন কাটিয়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে সব কাজ শেষ করে এসেছিলো। আদালতে একবারও সে ওই দুঃসাহসিকার মুখ পানে চেয়ে দেখেনি, পাছে তার দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে যায়। সব হারানোর

সব জামাকাপড়ই রোজ বাড়ীতে সার্ফে কাচুন—শাড়ী, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবী, সার্ট, প্যাণ্ট, ফ্রক, তোয়ালে। দেখবেন, কি পরিষ্কার কি ধব্‌ধবে ফরসা হবে! সার্ফে কাপড় কাচার অতুলনীয় শক্তি আছে, তাই সহজেই ফরসা করে কাচা হয়। বাড়ীতে কাপড় সবচেয়ে ধব্‌ধবে ফরসা করে কাচায় সার্ফের জুড়ী নেই! আজই সার্ফ কিনুন!

# সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়!

SU. 24-X52 BG

লিভারের তৈরী

এক অসহনীয় অনুভূতিতে কয়েকটা দিন কয়েকটা রাত কাটিয়ে একদিন সুনন্দাকে বিয়েও করেছিলো সুব্রত। ক্রমে খবর শুনেছে অলকা বিয়ে করেছে, তার একটি ছেলে হয়েছে। সেদিন খোকনের পানে তাকিয়ে গলা টিপে মারতে ইচ্ছে হয়েছিলো অলকার নবজাত পুত্রকে।

অলকার সেই পুত্র অনিন্দ্য। খোকনের নাম অলকা দিয়েছিলো 'অনির্ব্বাণ' তার সাথে মিলিয়ে এই পুত্রের নাম অনিন্দ্য। পরদিন হাসপাতালে দেখা হল অনিন্দ্যর সাথে। তারই প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়েছিলো। আজও সুনন্দাকে দেখে ফিরে এদিকে আসছিল সুব্রত। সুনন্দা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ী যেতে পারবে এই সংবাদ সুনন্দা বেশ খুসির সাথেই তাকে ও খোকনকে বললো। বললো, আমি নেই বলে খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে খোকন।

অনুযোগের সুরে খোকন বললে, হচ্চে না আবার, জান মা, বাবা আমায় একটুও দেখেন না।

সুনন্দা হাসলো, বললো আর ভাবনা কি আমি তো আসছি। তোমার কি হয়েছে, মুখ অমন শুকনো কেন?

কিছু না, বলে সুব্রত উঠে দাঁড়াল। খোকনকে বললো, এসো আমার সাথে। দাঁড়িয়ে অনিন্দ্য বললো, আপনার জন্ত দাঁড়িয়ে আছি। এত দেরী হল, ওদিকে মা অস্থির হয়ে উঠেছেন।

দরজার দিকে বোধ হয় ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে ছিলো অলকা, ওকে দেখে বললো। অনিন্দ্যের মুখে শুনেই বুঝিছি, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। আমার কি সৌভাগ্য···বলতে বলতে দুটো চোখ স্থির হয়ে রইলো দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা খোকনের মুখের পানে, সুব্রত খোকনকে ইশারায় কাছে ডেকে আনলো, অলকাকে বললো, অলি, এই নাও তোমার খোকন, আমার কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছিলে আজ ফিরিয়ে দিলাম।

পনের বছরের খোকনের মুখখানা বুকে চেপে ধরে অস্ফুটে বললো অলকা, আমার খোকন, আমার হারিয়ে যাওয়া মাণিক, বিব্রত খোকন কিছু বুঝতে না পেরে অসহায় ভাবে পিতার পানে তাকাল। সুব্রত শান্ত গলায় বললো, তোমার মা, ওকে দুঃখ দিও না।

বোকার স্তায় পীড়িতা নারীর পানে তাকাল খোকন। তার চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়ছে জলের ধারা। ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটিয়ে তুললো, হাসি নয় কান্নারই আর এক রূপ যেন, বললো, ক্ষমা করতে পারিস্নি বুঝি। কিন্তু আমার যে শেষ সময় বাবা, তুই একবার মা বলে না ডাকলে, তো মরতে পারি না।

সুব্রত বললো, মিথ্যে ওকে বলছ অলি। ও কিছুই জানেনা।

জানে না! উত্তেজনায় উঠে বসতে যাচ্ছিলো অলকা। কিন্তু পারল না সুব্রত ওকে শুইয়ে দিলো। অলকা বললো আজ জানে না কিন্তু একদিন জানবে। সেদিন যেন তুই আমায় ক্ষমা করিস বাবা।

সুব্রত বেদনাভরা কণ্ঠে বললো, না ও কোনদিন জানবে না কিছু যদি কোনদিন জানে, জানবে সত্যি কথা। তার পিতার দোষে তার মায়ের এই লাঞ্ছনা। কিন্তু তুমি আর কথা বোল না তোমার শরীর খুব দুর্ব্বল। কথা বলা একেবারেই মানা।

সাশ্রু নয়নে অলকা বললো, আমার একটা ভিক্ষা আছে।

সুব্রত বাধা দিয়ে বললো, না, আর কোন কথা বলো না। যা বলার পরে বলবে। তোমার কথা বলা উচিত হচ্ছে না।

ম্লান হেসে অলকা বললো, পর আর আমার জীবনে আসবে না। কাল আমার অপারেশান, আমি জানি ওখান থেকে আমি আর ফিরে আসব না। আসতে আমি চাই না। বাঁচতে আমার সাধ নেই, তুমি জান না বার বছর আমি কি করে বেঁচেছি। কি দুর্বিষহ সে দিন কাটান, তোমাকে বোঝাতে পারব না। গভীর কান্নায় ভেঙ্গে পরলো সে।

চোখের জল মুছে ব্যস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল সুব্রত বললো, ছিঃ, ছিঃ কি হচ্ছে বল ত।

নার্স ছুটে এলো, বললো কি হচ্ছে অলকা দেবী। এই কি কান্নার সময়। সুব্রতকে বললো। আপনি চলে যান, আপনি থাকলে উনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

দুহাত যোড় করে সানুনয়ে নার্সকে বললো অলকা। আমায় একটু দয়া করুন ভাই, ওঁকে এখনই তাড়িয়ে দেবেন না। আমার অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু সব তো বলা সম্ভব নয় কয়েকটা কথা বলতে দিন। বলে হাঁফাতে লাগলো।

সুব্রত বললো, কাল আমি আগে আসবো কাল সব বোলো। আজ তুমি বড্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ অলি।

না, আজই আমি বলব। কাল আর তোমার সাথে আমার দেখা হবে না জানি। খাটের পার্শ্বে দাঁড়ান ক্রন্দনরত অনিন্দ্যকে কাছে ডেকে বললো, কাঁদছিস কেন। আমি সেরে উঠবো ভাবিস্ না। সুব্রতকে বললো, দাবী জানাবার অধিকার স্বেচ্ছায় হারিয়েছি, তাই শুধু ভিক্ষা চাইছি অনিন্দ্যকে তুমি দেখো। ওর একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না। খোকন চিরকাল তোমারই রইল, ওকে পেলাম না।

অনিন্দ্যকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সুব্রত বললো, তুমি কিছু ভেবো না অলি ও খোকার পাশেই বড় হবে। আমি থাকতে ওর কোন ভাবনা নেই, খোকন তুমি অনিন্দ্যকে নিয়ে একটু বাইরে ব'স আমি আসছি।

ওরা বাইরে যেতেই সুব্রত বললো, শোন অলি, মানুষের হৃদয়ের ভাষা কেউ বুঝতে পারে না কেউ দেখতে পারে না সেখানে কি লেখা থাকে। তাই আমরা মিথ্যে কষ্ট পাই। কয়েকটা কলমের আঁচড়ে আমরা আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করি। যত প্রকার আইন হউক না কেন মানুষের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করতে পারে তার সাধ্য কি। আজকাল দেখছি মিথ্যা অহমিকায় মানুষ তুচ্ছ করছে হৃদয়ের সম্বন্ধকে। ওরা ভুল করছে। যেমনি করেছি আমি, তুমি। সেই ভুলের মাশুল দিতে একটা সম্ভাবনাময় সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আরও কত যাবে। এরা কেউ শান্তি পাবে না অলি, কেউ শান্তি পাবে না। আমাদের মত···ওকি, অলি কি হয়েছে! নার্স,—অলকার কি হয়েছে অমন করছ কেন? সিস্টার!

রোগিণীকে অক্সিজেন দেওয়া হলো। ছেলেদের নিয়ে ওয়ার্ডের বাইরে বসে রইলো সুব্রত। রোগিণীকে নিয়ে যমে মানুষে লড়াই চলছে, এক ফাঁকে নার্সকে জিজ্ঞাসা করে এটাই জানতে পারলো সুব্রত। শেষ রাতে ডাক্তার বাবু বেরিয়ে এলেন, সুব্রতর সামনে এসে বললেন, মিঃ মিত্র আমি অত্যন্ত দুঃখিত ওঁকে রাখতে পারলাম না। উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় উঠে দাঁড়াল সুব্রত। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে, পাশের বেঞ্চিতে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে রয়েছে দুটো প্রাণী। অনির্ব্বাণ ও অনিন্দ্য, অলকার দুই সন্তান। চোখ মুছে ওদের পাশে এসে দাঁড়াল সুব্রত।

# কারমেন

প্রস্পের মেরিমে

[ পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর ]
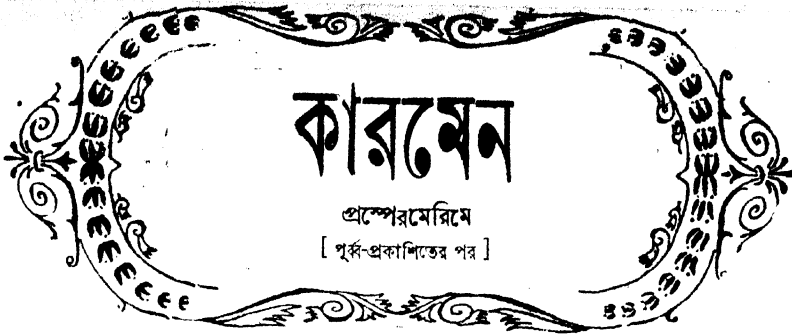
ডোমিনিকান কনভেণ্টে যেতেই ফাদারদের একজন আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানালেন। ইনি মুন্দার অবস্থান সম্পর্কিত গবেষণায় গভীর উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ধন্য ভগবান! প্রিয় বন্ধু, স্বাগত। আপনাকেও আমরা মৃত বলে ধরে রেখেছিলাম। এই আমাকে দেখছেন—আমি আপনার আত্মার শান্তির জন্য অনেকবার 'পাটের'২৪ ও 'আভে'২৫ স্তব পাঠ করেছি। অবশ্যি সেজন্য আমি দুঃখিত নই। তাহলে আপনি সত্যি সত্যি নিহত হননি। কিন্তু আমরা জানি আপনি ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন।

—কি করে? একটু বিস্মিতভাবে জবাব দিলাম।

—হ্যাঁ। আপনার সেই রিপিটার ঘড়িটার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। লাইব্রেরীতে কোরাসে যাওয়ার সময় হয়েছে কিনা জানতে চাইলে আপনি ঘড়িটা বাজাতেন। ওটা পাওয়া গেছে। আপনি ফেরৎ পাবেন।

একটু বিব্রতভাবে বাধা দিয়ে বললাম, তার মানে আমার যে ঘড়িটা খোয়া গিয়েছিল।

তিনি বলতে লাগলেন,—বদমাসটা এখন জেলে আছে। সবাই জানে যে লোকটা এমন সাংঘাতিক যে এক পেসেটার২৬ জন্য সে একটা মানুষকে গুলী করে মারতে পারে। আমাদের ভয় হয়েছিল আপনাকে সে খুন করেছে। আপনাকে নিয়ে করেজিদরের কাছে যাব ও আপনার চমৎকার ঘড়িটা যাতে ফেরৎ পান তার বন্দোবস্ত করব। তারপর আর দেশে ফিরে যেন বলবেন না স্পেনে ন্যায়বিচার নেই।

আমি বললাম, আপনাকে বলতে বাধা নেই—ঘড়িটা হারাতেও রাজী আছি কিন্তু কোর্টে সাক্ষী দিয়ে একটা গরীব হতভাগাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে পারব না। বিশেষ করে যেহেতু যেহেতু···

—ওঃ আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। লোকটা দাগী আসামী, ওকে ত আর দুবার ঝোলাতে পারবে না। কিন্তু ভুল বললাম। ফাঁসির দড়িও নয়। ঘড়ি-চোরটা একটা হিদালগো।২৭ আগামী কাল ওকে গ্যারট২৮ করে মারা হবে। ওর আর কোন অব্যাহতি নেই। বুঝতেই পাচ্ছেন একটা ডাকাতি কম বেশীতে ওর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। ভগবানকে ধন্যবাদ! ডাকাতটা শুধু ছিনিয়ে নিয়েই আপনাকে রেহাই দিয়েছে। ও অনেক খুন করেছে। প্রত্যেকটা খুনই আগের খুনের চেয়ে বীভৎস।

—কি নাম লোকটার?

—এদেশের লোক ওকে জোসে ন্যাভাড়ো বলে জানে। তবে ওর আর একটা বাস্ক্ নাম আছে। কিন্তু আমাদের দু'জনের কারুর পক্ষেই তা উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না। সত্যি, ও একটা দেখবার মত লোক বটে। আপনি এদেশের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে কৌতূহলী। বদমাসরা কি ভাবে এদেশে ইহলোক ত্যাগ করে তা জানার সুযোগ আপনার অবহেলা করা উচিত নয়। ও চ্যাপেলে আছে। ফাদার মার্তিনে আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবেন।

আমি যাতে 'এই মজার ফাঁসির ব্যবস্থাখানা'২৯ দেখি তার জন্য আমার ডোমিনিকান বন্ধুবর এমনভাবে জোর করতে লাগলেন যে, আমার পক্ষে আর অমত করা সম্ভব হলনা। বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সঙ্গে রইল এক প্যাকেট সিগার—যাতে আমার অনধিকার-প্রবেশের অপরাধ কিছুটা লঘু হয়।

জোসের সঙ্গে যখন দেখা হল তখন ও খাচ্ছিল। আমাকে দেখে নির্জীবভাবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল। ধন্যবাদ জানাল সিগারের জন্য। সিগারগুলো গুণে কয়েকটা বেছে নিল। ফিরিয়ে দিল বাকিগুলো। বলল, যে কয়টা ওর প্রয়োজন ও নিয়েছে। তার চেয়ে বেশী ওর দরকার হবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু টাকা খরচ করে কিংবা আমার বন্ধুদের সাহায্যে ওর অদৃষ্টের দুঃখ একটু লঘু করার চেষ্টা করব কিনা।

---

২৪। ঈশ্বরের প্রার্থনার প্রথম শব্দ 'পাটের' নোষ্টার বা আমাদের পিতা।

২৫। মা মেরী প্রার্থনার প্রথম শব্দ 'আভে' মারিয়া বা জয়মেরী।

২৬। স্পেনের তাম্রমুদ্রা

২৭। অভিজাত স্পেনীয়

২৮। শ্বাসরোধ করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান। একটি ছিদ্রযুক্ত কাঠের টুকরার মধ্যে ঢোকানো দড়ি গলায় জড়িয়ে দেওয়া হত। তারপর কাঠের টুকরাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অপরাধীর শ্বাসরোধ করে মারা হত। একমাত্র অভিজাত অপরাধীকেই এভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।

২৯। 'Petit pendement piencholi.' কথাটি মলিয়েরের Monsieur de pourceaugnac এর তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্য থেকে গৃহীত। কথাটি আসলে petit pendement bienjoli। নাটকে সুইস সৈনিকের মুখে কথাটি বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

—লাগুনা এনে বিয়োৎসাবেনা (আমার প্রাণের দরদী গো)! তুমি কি দেশ থেকে এসেছ? ও হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল। —মঁসিও, আমাদের ভাষা এমন আশ্চর্য সুন্দর যে ভিনদেশে এই ভাষা শুনলে আমাদের দেহে কাঁপন লাগে। নীচু গলায় বলল, আমার জন্য আমার দেশের কোন কনফেসারের যেন ব্যবস্থা হয়।

একটু নীরব থেকে জোসে আবার বলতে লাগল—ওকে আমাদের ভাষা বলতে শুনে আমি আবেগোদ্বেল হয়ে বললাম, এলিজান্দোয় আমার ঘর।

ও বলল, আমার এচালারে। (এচালার আমার ঘর থেকে চার ঘণ্টার পথ)। বেদেরা আমাকে সেভিলে নিয়ে আসে। কিছু টাকা জমিয়ে মার কাছে ফিরে যাব। তাই কারখানায় কাজ করছি। আমার মার ভরসা বলতে ত আমি আর কুড়িটা সাইডার গাছের একটা বাগান। হায় রে, আমার দেশের সাদা পাহাড়ের কাছে যদি ফিরে যেতে পারতাম। পচা কমলালেবুর সওদাগর এই পকেটমার-গুলো ভিনদেশী বলে আমাকে অপমান করেছে। সব মাগীগুলো আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। কারণ ওদের আমি বলেছিলাম যে ওদের দেশের সব ছুরিওয়ালা মরদরা মিলে আমাদের দেশের নীল টুপিপরা মাকিলাহাতে একটা যোয়ানকেও ভয় খাওয়াতে পারবে না। সাঙ্গাত, একজন দেশোয়ালীর জন্য তুমি কিছু করবে না?

মঁসিও, কারমেন মিথ্যা বলছিল, ও চিরকাল মিথ্যা কথা বলেছে। জানি না সারাজীবনে ও একটা সত্যিকথা বলেছে কিনা। কিন্তু ওর কথা আমি বিশ্বাস করলাম। ওর ক্ষমতা আমার চেয়ে বেশী। ও ভাঙ্গা বাস্‌ক্ বলেছিল তবু আমি ওকে ন্যাভার্ড়ী ভাবলাম। আমি তখন পাগল হয়ে গেছি। কোন কিছুই আর আমার নজরে পড়ল না। শুধু ভাবতে লাগলাম স্পেনীয়রা যে মুখে আমার দেশকে গাল দিয়েছে, কারমেনের মত আমিও সে মুখ ছিঁড়ে দেব। এক কথায়, আমার অবস্থা তখন মাতালের মত। আজেবাজে বকতে লাগলাম। নির্বোধের মত কাজ করতেও আর আমার দেরি হল না।

কারমেন বাস্‌ক্ ভাষায় বলতে লাগল,—দেশোয়ালী, আমি ধাক্কা দিলে তুমি যদি পড়ে যাও, তাহলে এই ক্যাস্টিলের রংরুট দুটো আমাকে রুখতে পারবে না।

ভগবান! ওপরওয়ালার আদেশ ও অন্য সব কিছু ভুলে গেলাম। কারমেনকে বললাম, দেশোয়ালী বন্ধু! তুমি চেষ্টা কর। আমাদের পাহাড়ের মা মেরী তোমার সহায় হোন।

এ সময়ে আমরা একটা সংকীর্ণ গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেভিলে এরকম সংকীর্ণ গলির অন্ত নেই। হঠাৎ কারমেন ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার বুকে একটা ঘুষি মারল। আমি ইচ্ছা করে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। এক লাফে আমাকে ডিঙ্গিয়ে কারমেন ছুটতে লাগল। আমরা শুধু একজোড়া ঠ্যাঙ দেখতে পেলাম। কথায় বলে বাস্‌ক্‌দের ঠ্যাঙ। ওর ঠ্যাঙের জুড়ি নেই, যেমন ক্ষিপ্রগতি, তেমনি সুডোল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু আমার বর্শাটা আড়াআড়ি ভাবে রাস্তায় ফেলে রাস্তাটা আটকে দিলাম। আমার লোক দুটো তৎক্ষণাৎ ওর পিছনে ছুটতে বাধা পেল। তারপর আমিও ছুটতে লাগলাম। আমার সঙ্গীরা আমার পিছনে ছুটতে লাগল। কিন্তু কার সাধ্যি ওকে ধরে? ওর ধরা পড়ার ভয়ও ছিল না। তরবারি, বর্শা ও ঘোড়সওয়ারের সাজ-সজ্জার বোঝা বয়ে আমাদের সাধ্য কি ওকে ধরি! আপনাকে কথাটা বলতে যা সময় লাগল, তার চেয়েও অনেক কম সময়ে বন্দিনী অদৃশ্য হয়ে গেল। তা'ছাড়া, মহল্লার যত জাঁহাবাজ মেয়েরা ওকে পালাতে সাহায্য করছিল। আমাদের টিটকারি দিয়ে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছিল। এভাবে কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি দৌড় ঝাঁপ করে জেলারের রসিদ ছাড়াই রক্ষীশিবিরে ফিরে যেতে হ'ল।

আমার লোক দুটো শাস্তি এড়াবার জন্য বলল,—কারমেন আমার সঙ্গে বাস্‌ক্ ভাষায় কথা বলেছে। সত্যি বলতে কি, কারমেনের একটা ছোট মেয়েলি ঘুষিতে আমার মত জোয়ানের চিৎপাত হয়ে পড়ে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক নয়। বরঞ্চ স্পষ্টই বলা যেতে পারে। রক্ষী-শিবির থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন আমার পদাবনতি ও এক মাসের কারাবাসের আদেশ হয়েছে। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর এই আমার প্রথম সাজা হল। কোয়ার্টার-মাষ্টারের পদের আশার শেষ।

দারুণ দুঃখে জেলের প্রথম ক'টা দিন কাটল। সৈনিক হয়ে আশা করেছিলাম অন্তত অফিসার হব। আমার জাতভাই লংগা, মিনা৩৫ এখন ক্যাপ্টেন জেনারেল। সাপা লংগাড়া৩৬ ও মিনার মত নিগ্রো৩৭ এবং মিনার মতই আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছিল। সে কর্ণেল হয়েছিল। ওর ভাইয়ের সঙ্গে আমি বিশবার টেনিস খেলেছি। ওটাও আমার মতই হতভাগা। নিজেকে বললাম, তুমি যে এতদিন বিনা সাজায় কাজ করেছ, সেই সময়টাই নষ্ট হল। তুমি এখন কর্তাদের বিষ-নজরে রইলে। আবার সুনজরে পড়তে হলে রংরুট হয়ে যখন এসেছিলে তখনকার চেয়ে দশগুণ বেশী খাটতে হবে। কিন্তু কেন আমাকে শাস্তি পেতে হল? এক বজ্জাত বেদেনীর জন্য—যে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করেছে আর এখন শহরের কোন কোণে ফরফর করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তবু ওর কথা না ভেবে পারছিলাম না। মঁসিও, আপনি কি বিশ্বাস করবেন? পালিয়ে যাওয়ার সময় কারমেনের বহুছিদ্রময় সিল্কের মোজা স্পষ্ট দেখেছিলাম। সব সময় তা আমার চোখে ভাসছিল। জেলের গরাদের ভিতর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। রাস্তায় যে সব মেয়েদের যাতায়াত করতে দেখতাম তাদের একটিও এই জাতশয়তান বেদেনীর মত নয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবলা ফুলের গন্ধ নিতাম—সেই ছুড়ে-মারা বাবলা ফুল। শুকনো বাবলা ফুল, কিন্তু তার মধুর গন্ধ তেমনি রয়েছে। সত্যিকারের জাদুকরী কেউ থাকেত—এই মেয়েটা তাই।

একদিন ঘরে এসে জেলার আমাকে একটি আলকালীর৩৮ রুটি দিলেন। বললেন, ছাখ, তোমার কাজিন্ তোমাকে কি পাঠিয়েছে। রুটিটা নিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেভিলে ত আমার কোন কাজিন্ নেই! হয়তো কোথায়ও কোন ভুল

---

৩৫। লংগা ও মিনা দুজনেই বিখ্যাত গরিলা নেতা।

৩৬। এ সাহার Le voyage en Navarre বইয়ে সাপা-লংগাড়া নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩৭। স্পেনীয় রাজনীতির ভাষায় লিবারেলদের নিগ্রো বলা হত।

৩৮। সেভিল থেকে ৬ মাইল দূরে আলকালা একটি গঞ্জ। এখানে উপাদেয় ছোট রুটি তৈরী হয়। মেরিমের পাদটীকা।

হয়ে থাকবে, রুটিটার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম। খুব সুস্বাদু এই আলাকালীর রুটি, লোভনীয় এর গন্ধ। ঠিক করলাম, ওটা খাব। ওটা কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, কিছুই জানতে চাইব না। রুটিটা কাটার সময় ছুরিটা একটা শক্ত কিছুতে ঠেকল। ভাল করে দেখলাম—ভিতরে একটা ইংলণ্ডে তৈরী রেতি রয়েছে। রুটি সেঁকার সময়ে ময়দার তালের মধ্যে কেউ ওটাকে ফেলে দিয়ে থাকবে। রুটির মধ্যে দু'টো সোনার পিয়াস্ত্র৩৯ ছিল। আর কোন সন্দেহ রইল না। কারমেনের উপহার। ওদের জাতের মানুষের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে দামী আর কিছু নেই। একদিন কয়েদ এড়াতে ওরা একটা গোটা শহরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আসলে মেয়েটা ধূর্ত। কেন না এই রুটিটা দিয়ে জেলারকে কলা দেখানো চলে। এই ছোট রেতি দিয়ে সবচেয়ে মোটা শিকও এক ঘণ্টার মধ্যে কেটে ফেলা যেতে পারে। আর পিয়াস্ত্র দুটো দিয়ে প্রথম যে পুরনো পোষাকের দোকান চোখে পড়বে, সেখানে আমার ইউনিফর্মের গ্রেটকোটের বদলে সাধারণ নাগরিকের পোষাক পাওয়া যেত। বুঝতেই পারছেন, যে লোক অসংখ্যবার পাহাড়ের চূড়া থেকে ঈগলের বাসা ভেঙে নিয়ে এসেছে, তার পক্ষে ত্রিশ ফুটেরও কম উঁচু জানালা থেকে নীচে নেমে আসা ত ছেলেখেলা। কিন্তু আমি পালাতে চাইনি। সৈনিকের মর্যাদাবোধ আমি তখনও একেবারে খুইয়ে বসিনি। সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে যাওয়া অপরাধ।

শুধু ওর এই স্মৃতিচিহ্নে আমি উদ্বেল হয়ে উঠলাম। বাইরে আমার কোন বন্ধু আছে যে আমাকে মনে রেখেছে,—কারাবাসের সময় একথা ভাবতে বড় ভাল লাগে। তবে পিয়াস্ত্র দুটো একটু বেখাপ্পা ঠেকছিল। ও দু'টো ফিরিয়ে দিতে পারলে স্বস্তি পেতাম। কিন্তু কোথায় পাব আমার পাওনাদারকে? ওকে খুঁজে পাওয়া সোজা কথা নয়।

এরপর আমার দুর্ভোগের শেষ হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু কপালে আরো লাঞ্ছনা ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে রক্ষী-বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর আমাকে সাধারণ সৈনিকের মত পাহারার কাজে লাগানো হল। এই অবস্থায় কোন সাহসী জোয়ানের মনের অবস্থা কি হয় কল্পনা করতে পারবেন না। এর চেয়ে গুলীর মুখে দাঁড়ানো ঢের ভাল। অন্তত তখন সারা প্ল্যাটুনের আগে মার্চ করে যাওয়া যায়। নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে হয়। সবাই তাকিয়ে দেখে।

কর্ণেলের বাড়ির দরজায় আমাকে পাহারায় রাখা হয়েছিল। কর্ণেলের কাঁচা বয়েস। পয়সাওয়ালা দিলদরিয়া লোক। সারাক্ষণ আমোদ ফুর্তিতে মেতে থাকত। ওর ওখানে সব ছোকরা অফিসাররা আসত। শুনেছে, বহু শহুরে নাগর এমন কি মেয়েমানুষ ও অভিনেত্রীরাও আসত। মনে হত সারা শহরটা যেন ওর ওখানে আমাকে দেখবার জন্যই ভেঙে পড়েছে।

একদিন কর্ণেলের গাড়ি এসে থামল। কোচ-বাক্সে তাঁর খাস আর্দালি। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল কে? জিতানিল্লা। এবারে ও একেবারে সঙ সেজে এসেছে। যেন সোনার জড়ি ও ফিতায় মোড়া একটি গয়নার বাক্স। পোষাকে চুমকি, নীল জুতায় চুমকি, সারাদেহ ফুল ও লেসে জড়ানো। হাতে বাস্ক্ খঞ্জনি। সঙ্গে আরো দুটো বেদেনী—একটা অল্পবয়সী, অন্যটা বুড়ী। ওদের দলের সরদারণী হিসাবে সব সময়েই একটা বুড়ী থাকে। তাছাড়া গীটার নিয়ে একটা বুড়োও ছিল। ওটাও বেদে। বুড়োটা গীটার বাজাবে—আর ওরা নাচবে। আপনি জানেন, অনেক সময় ফূর্তি করতে ভদ্রসমাজে বেদেদের আনা হয়। বেদেরা ওদের বিশেষ নাচ রোমালি নাচতে আসে। অন্য ব্যাপারেও আসে। কারমেন আমাকে চিনতে পারল। কেন জানি না, সেই মুহূর্তে আমি একশ' যোজন মাটির নীচে সেঁধিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

ও বলল, আগর লাগুনা (সুপ্রভাত, দেশোয়ালী)। অফিসার সাহেব রংরুটের মত পাহারা দিচ্ছ যে! আমি কোন জবাব দেওয়ার আগেই ও ভিতরে ঢুকে গেল। অতিথিরা সব প্রাঙ্গণে জমা হয়েছে। ভিড় সত্ত্বেও জাফরির মধ্য দিয়ে ভিতরে যা হচ্ছিল সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। কাস্তাইনেত ও খঞ্জনির বাজনা, উচ্চহাসি ও বাহবা সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। কারমেন যখন খঞ্জনি নিয়ে লাফিয়ে উঠছিল, ওর মাথাও চোখে পড়ছিল। অফিসাররা ওকে লক্ষ্য করে যে সব কথা বলছিল তা শুনে আমার মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। জবাবে ও কি বলেছিল জানি না। হয়তো ঠিক এই দিন থেকেই কারমেনকে মনে-প্রাণে ভালবেসেছিলাম। কারণ দু'তিনবার ইচ্ছে হয়েছিল ভিতরে গিয়ে যে রঙীলা অফিসাররা ওকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করছিল তাদের পেটে আমার তরবারি ঢুকিয়ে দিই। এক ঘণ্টা ধরে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হল। তারপর বেদেনীরা বেরিয়ে এল। গাড়ি করে ওরা চলে গেল। গাড়িতে ওঠার সময় কারমেন আবার ওর চোখের দৃষ্টি হানল (আপনি দেখেছেন কারমেনের সেই চোখ)। আমাকে বলল, খাস্তাভাজা খেতে হলে ট্রিয়ানায় লীল্লাপাস্তিয়ার দোকানে যেতে হয়। মেষ শিশুর মত লঘুপদে ও গাড়িতে লাফিয়ে উঠল। কোচম্যান ঘোড়াকে চাবুক লাগাতেই এই ফুর্তিবাজ দলটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন—ডিউটির পর ট্রিয়ানায় গেলাম। কিন্তু তার আগে দাড়ি কামালাম। ব্রাশ করলাম চুল। ঠিক যেমন প্যারেডের দিন করি। কারমেন লীল্লাপাস্তিয়ার ওখানে ছিল। বুড়ো বেদে লীল্লাপাস্তিয়ার ভাজাভাজির দোকান। লোকটা মুরের মত কাল। ওর দোকানে শহরের বহু লোক মাছভাজা খেতে আসত। আর বেশী করে আসত কারমেন ওখানে আস্তানা নেওয়ার পর থেকে।

আমাকে দেখামাত্র কারমেন বলল, লীল্লা, আজ আর আমি কিছু করব না। যা কিছু সব কাল হবে।৪০ চল গো দেশোয়ালী, বেড়িয়ে আসি। কারমেন মুখ পর্যন্ত ওড়না টেনে দিল। রাস্তায় চলে এলাম। তখনও জানি না কোথায় যাচ্ছি।

[ ক্রমশ:।

অনুবাদক—প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

---

৩৯। স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রা।

৪০। বেদেদের প্রবাদ—মানানা সেরা ওত্রোদিয়া। অর্থ—কালকে আবার দিন হবে।

# কলঙ্কিনী রাধা

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু মনে হয় যেন এই সেদিনকার কথা।

অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখে জেঠিমা বোধকরি বিস্ময়ের আতিশয্যেই কিছুক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর তাঁর দু'চোখে জল দেখা দিল। বললেন, এতদিনে বুঝি জেঠিকে মনে পড়ল! আমি ভেবেছিলাম, শেষ খবর না পাওয়া পর্যন্ত আর বোধ হয় এদিকে আসবি নে।

হেসে বললাম, তাহলেই দেখ, তোমার সব ভাবা ঠিক হয় না। শেষ খবরের অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছি। আর শুধু কি তাই, যাচ্ছিলাম কাশী গয়া বৃন্দাবন, কিন্তু সেসব পুণ্যতীর্থ ছেড়ে চলন্ত ট্রেণ থেকে নেমে তোমার কাছে চলে এলাম। এর পরেও আমায় বকবে?

দুই চোখে অপার স্নেহ বর্ষণ করে জেঠিমা বললেন, বকব কেন! পাগল ছেলে।

অপরাহ্ণবেলায় গ্রামের পথে বেরুলাম। প্রায় পনেরো বছর পরে আবার বাপপিতোমোর ভিটায় এসেছি। কিন্তু এই ক'বছরে এর দিকে দিকে যে পরিবর্তন দেখলাম, তাতে বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কত নতুন নতুন ইমারত, কল-কারখানা, দোকান পসার চারিদিকে!

একদা এই গ্রামে আমাদের বংশই ছিল সবচেয়ে বড় আর প্রতিপত্তিশালী। তখনকারদিনে এই বাড়ির কর্তাদের প্রতাপ ছিল দুর্দান্ত, প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। পালপার্বণে কলকাতা থেকে বড় বড় সাহেবসুবরাও জুড়ি হাঁকিয়ে এখানে এসে কর্তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে যেতেন।

সে দিন গিয়েছে। সেই বিরাট বংশের গৌরবরবি অস্তে গেছে। প্রায় সকলেই গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে। শুধু জেঠিমা শত প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে এখনো এখানে স্বামীর ভিটাকে পরম পবিত্র তীর্থ জ্ঞানে বাস করছেন।

আমাদের বারবাড়ি থেকে যে পথ সোজা গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত চলে গেছে, তারই উপর দিয়ে হাঁটছিলাম। এই পথ একদিন আমার পূর্বপুরুষদের পায়ে পায়ে মুখরিত হত। একদিন এই পথের উপর দিয়েই আমার পিতামহী নৌকা ক'রে আড় পার শ্রীরামপুর থেকে বধূবেশে এসে শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশ করেছিলেন। এই পথ ধরেই প্রতি বছর মা দুর্গা মুখুজ্যেদের বৃহৎ পরিবারের জয়ধ্বনির মধ্যে ঠাকুরদালানে উঠতেন, আবার একদিন এই পথের উপর দিয়েই তাঁকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

অতীতের সে-পথ আজও তেমনি প্রসারিত, কিন্তু অতীতদিনের সে কোলাহল আর প্রাণচাঞ্চল্য আজ নেই।

পথের ধারে একটি চালাঘর নজরে পড়তেই থমকে দাঁড়ালাম। ওই চালার মধ্যে নীচজাতের যে লোকটি থাকে তাকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি। যৌবনে 'হরি কাহার' নাকি ডাকাতি করত। সে জন্তে নয়, ঠাকুমার মুখে পুরাকালের অনেক গল্পের মধ্যে হরির চরিত্রের একটি দিক আমার কাছে একদিন এমনভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছিল যে, তারপর মাঝে মাঝেই সেই গল্পটি আমার মনে পড়ত আর যখনই এখানে আসতাম তখনই তার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে যাবার লোভ সম্বরণ করতে পারতাম না।

'হরি কাহার' ছিল যেমন বলবান, পুজোর সময় ছাগ বলি দিতে তেমনি সিদ্ধহস্ত। তার হাতের কোপ কখনো ব্যর্থ হয়নি। এক বছর মুখুজ্যেদের পুজোয় মহিষ বলিদানের আয়োজন হল। এক চাষার কাছ থেকে একটি মহিষের বাচ্চা কিনে আনা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'হরি কাহার' বেঁকে বসল। মহিষ বলি দিতে সে খাঁড়া তুলবে না।

কথাটা শুনে সকলে আশ্চর্য হল। সারদাচরণ পরিবারের কর্তা। তাঁর নামে গ্রামের ঘাটে বাঘে গরুতে এক সঙ্গে জল খায়। তিনি হাঁকলেন,—নিয়ে এসো হরিকে।

চারজন পাইক হরিকে ধ'রে আনলো।

সারদাচরণ বললেন,—তোর কাঁধের ওপর দুটো মাথা গজিয়েছে নাকি রে হরি। আমার হুকুম অমান্য করিস!

হরি সবিনয়ে জানালো, কর্তার হুকুম অমান্য করবে এত বড় বুকের পাটা তার নেই, আদেশ পেলে সে মানুষের কাঁধ থেকে মাথা

রোজকারের কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে!
SUNLIGHT SOAP
পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড়!
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন…

নামিয়ে নিতে পারে, কিন্তু মায়ের পুজোয় বলি দিতে হরি আর কোনোদিন খাঁড়া ছোঁবে না।

সারদাচরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর হরির সামনে এসে কঠিনকণ্ঠে বললেন,—আমার হুকুম তুই তামিল করবি কি না ?

আজ্ঞে, আমি অপারক, হুজুর, মাপ করবেন।

সকলে চমকে উঠল। সারদাচরণের মুখের ওপর এতবড় কথা এ তল্লাটে কেউ কোনদিন বলতে সাহস করেনি।

সারদাচরণ রাগ সামলাতে পারলেন না। পায়ের খড়ম তুলে নিয়ে সজোরে হরির কপাল লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। কপাল কেটে দরদর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল। ডাকাত কাহার এক নিমেষের জন্যে বোধ করি সোজা হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ নীচু করে স্থির হয়ে রইল।

সারদাচরণ বললেন, নিয়ে যাও একে আমার সামনে থেকে।

সেদিন সারদাচরণ জলস্পর্শ করলেন না। বলিদান স্থগিত রইল।

সেই হরি কাহার আজো বেঁচে আছে। আগড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে ডাকলাম,—হরিদা' আছো নাকি ?

প্রথম ভাল সাড়া পেলাম না। দু'তিনবার ডাকবার পর পাকাচুল থুত্থুড়ে বুড়ো হরি বেরিয়ে এলো। প্রথমটায় চিনতে পারেনি। কাছে এসে নিরীক্ষণ করে দেখে একগাল হেসে বললে, আরে দাদা নাকি! ইস, এ যে একেবারে কুঠির বাবু, চেনবার জো'টি নেই।

বললাম; তোমাকেও তো চেনবার জো নেই হরিদা। একদম বুড়ো হয়ে গেছো।

আর বুড়ো হবনা দাদা। বয়েসটা কি কম হল। চার কুড়ি এগারো।

বল কি। এত বোধ হয় হবে না।

এতই রে দাদা, এতই, যাকগে বয়েস। এখন বলতো তোমার খবর ? কবে এলে ?

এইতো আজই সকালে।

থাকবে তো কিছুদিন ?

থাকবো। আচ্ছা, হরিদা ?

কি দাদা।

সেই পান্সিখানা এখনো আছে ?

মাথা নেড়ে হরি জবাব দিলে,—আছে বৈকি ভাই, তবে আর থাকে না, ভেঙে পড়ছে।

চল দেখি, কী অবস্থা হয়েছে তার।

তার সঙ্গে দাওয়ার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে একখানি জীর্ণকায় পান্সি উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। দেখলাম, নৌকাটির অন্তিম দশাই বটে।

এই খেয়া-তরীটি হরি কাহার নিজের হাতে তৈরী করেছিল। নাম দিয়েছিল, কুটির পান্সি। তখনকার দিনে এই অঞ্চলের চাকরে বাবুরা এই ধরণের পান্সি ক'রে কলকাতায় গিয়ে আপিস করতেন। আমার ঠাকুর্দা নৌকা বাইতে ভালবাসতেন। হরির পান্সিখানিতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। ঠাকুর্দাকে হরি দেবতার মতো ভক্তি করত।

ঠাকুর্দা যখন এনট্রান্স পরীক্ষা দেন, তখনো এ অঞ্চলে রেলের প্রসার হয়নি। গ্রামের স্কুল থেকে টেষ্ট পরীক্ষা দিয়ে তিনি এই পান্সি করেই কলকাতায় ফাইনাল পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন। হরির মুখে গল্প শুনেছি, পরীক্ষার তৃতীয় দিনে নৌকা ছাড়বার পর মাঝপথে হঠাৎ প্রবল জোয়ার আসে, নৌকা আর কিছুতেই এগুতে চায় না। তখন ঠাকুর্দা হরিকে দাঁড় ধরতে বলে নিজে হাল ধরেন। তারপর ঝিঁকি দিয়ে নৌকা যখন বড়বাজারের ঘাটে গিয়ে লাগল তখন এগারোটা বেজে গেছে।

পরের ঘটনাটি পিতৃদেবের মুখে শোনা। বড়বাজারের ঘাট থেকে ঠাকুর্দা পায়ে হেঁটে সিনেট অভিমুখে চললেন। একে তিনি ছিলেন জ্ঞাতিদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র, তার ওপর তিনি যে লেখা-পড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠবেন—সে ইচ্ছেও তাঁদের কারুরই বিশেষ ছিল না। তাই পিতৃমাতৃহীন এই কিশোরকে বহু কষ্টের মধ্যেই বিদ্যা অর্জন করতে হয়েছিল।

ঘর্মাক্ত কলেবরে সেনেটহলের সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনি দেখলেন, দরজা বন্ধ। ব্যাকুল অন্তরে দরজায় ধাক্কা দিলেন। কয়েক মিনিট পরে এক রুক্ষ চেহারার লোক দরজা খুলে সামনে একজন পরীক্ষার্থীকে দেখে খেঁকিয়ে উঠলো,—এখন এগজামিন দিতে এসেছো, দু'ঘণ্টা পরে! ন্যাকামি পেয়েছো! দূর থেকে আসছো, বটে! বুঝি না কিছু! যাও, যাও, এতক্ষণ যেখানে ছিলে সেখানেই ফিরে যাও।

এই বলে গার্ড সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। দৈবক্রমে সেই সময় সেখান দিয়ে ভাইস চানসেলার উডরো সাহেব যাচ্ছিলেন। গার্ডের হুমকি শুনে তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে তিনি দরজা খুলতে বললেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে এক নম্রকান্তি কিশোর। তার কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে। মুখে চোখে দারুণ নিরাশা আর ব্যাকুলতা। বিস্ময়-ভরে সাহেব বললেন—বালক, তুমি পরীক্ষার্থী ?

ঠাকুর্দা মাথা নত করে বললেন, হ্যাঁ, সার।

এত দেরী করে এসেছো কেন ?

আমি আগড়পাড়া থেকে আসছি সার। আমায় নৌকায় ক'রে আসতে হয়। আজ মাঝপথে হঠাৎ জোয়ার এসে পড়ায় এত দেরী হয়ে গেল।

বিস্মিতকণ্ঠে উডরো বললেন,—আগড়পাড়া! সে তো অনেক দূর। রোজই কি এইভাবে আসো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রত্যহ।

সাহেব ঘড়ি দেখে বললেন, আর মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তুমি কি কিছু সুবিধা করতে পারবে ?

ব্যাকুল কণ্ঠে ঠাকুর্দা বললেন, আপনি যদি দয়া করে আমায় বসতে অনুমতি দেন, তাহলে আমার বিশ্বাস, আমি পাস করবার মত লিখতে পারবো।

সাহেব বললেন, আচ্ছা, এসো।

সেদিন ছিল অঙ্কের পরীক্ষা। সাহেব নিজে গিয়ে ঠাকুর্দাকে তাঁর সীটে বসিয়ে দিলেন এবং অবশিষ্ট সময়টুকু তাঁর উপর নজর রাখলেন।

ঘণ্টা বেজে গেল। গার্ডরা পরীক্ষার্থীদের খাতা সংগ্রহ করতে লাগল। উডরো ঠাকুর্দার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আরও মিনিট কয়েক সময় দেন, এইরকম ইচ্ছা তাঁর। কিন্তু তার আগেই

ঠাকুর্দা উঠে দাঁড়ালেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, পারলে কিছু?

মাথা হেলিয়ে ঠাকুর্দা বললেন, আপনার দয়ায় সবগুলোরই উত্তর লিখতে পেরেছি।

সাহেব বললেন, সব গুলোরই উত্তর লিখেছো? তারপর অস্ফুটে বললেন,—এবং আমার বোধ হচ্ছে তোমার সব উত্তরগুলোই নির্ভুল হয়েছে।

সাহেবের কথা মিথ্যা হয়নি।

হরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কিছুক্ষণ এধার-ওধার ঘুরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন গ্রামের বুকে সন্ধ্যা নেমেছে।

ঠাকুরদালানে পৌঁছে জেঠিমাকে ডাকতে যাবো—এমন সময় যে দৃশ্যটি চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল, তা দেখে কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। যা দেখলাম, তা এমন কিছু অসাধারণ নয়। দালানের এক পাশে যে অযত্ন-লালিত তুলসীমঞ্চটি আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, তার আঁচল গলায় জড়ানো, হাতে প্রদীপ। তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে এসেছে।

সন্ধ্যা-সন্ধির অস্পষ্ট আভায় তুলসীমূলে প্রণামরতা সেই অপরিচিতা মেয়েটিকে ঘিরে প্রকৃতি যেন তার অনির্বচনীয় ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। মুগ্ধনেত্রে নীরবে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি নম্রপদে ভিতরের দিকে অদৃশ্য হল। আমাকে সে দেখতে পায়নি। পেলে হয়ত লজ্জা পেতো।

দিন দুই পরে দুপুরবেলা ঘরে বসে কলকাতার এক বন্ধুকে পত্র লিখছিলাম। অনেককাল পরে গ্রামে এসে কেমন লাগছে—সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখলাম:

"চারিদিকের এই অলস মন্থরতার মধ্যে এক আশ্চর্য বিদ্যুৎ-চমকের আভাস দেখেছি। তার নাম রাধা। প্রথম দিন তাকে দেখলাম, তুলসীতলায় ম্লান প্রদীপের আলোয়। তারপর ঘরকন্নার কাজে, পুজোর ঘরে। প্রতিবারেই তার যে রূপ দেখলাম, প্রত্যহের প্রয়োজনে যাকে দেখা যায় তা নয়, সুদূর দিগন্তচ্ছটার পাশে তাকিয়ে যে অনির্বচনীয় দীপ্তির ক্ষণিক দেখা পাওয়া যায়, এ সেইরূপ, যেমন অদৃষ্টপূর্ব, তেমনি মাধুর্যময়।

বুঝতে পারছি, এতক্ষণে তুমি নিশ্চয় কৌতূহলে এবং হাজারো প্রশ্নে অধীর হয়ে উঠেছো।

রাধা আমার জেঠিমার নিকট-সম্পর্কের বোনঝি। ভিন্‌গাঁয়ের মেয়ে। নিঃসন্তান জেঠিমা তাকে মেয়ের মতোই ভালবাসেন আর বছরের বেশী সময় তাকে নিজের কাছে এনে রাখেন। তাঁর মুখে রাধার বিড়ম্বিত জীবনের করুণ কাহিনী শুনলাম। রাধার স্বামী বিয়ের কিছুদিন পরেই হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং তারপর খবর আসে যে, সে রেলে কাটা পড়েছে। তার নাকি মাথার গোলমাল ছিল।

রাধার সঙ্গে অবশ্য আমার আলাপ হয়েছে এবং আমার সেবাযত্নের ভারও তার উপর পড়েছে। কিন্তু আমাদের যেন মধ্যে দিগন্তবিস্তৃত ব্যবধান। তোমার কাছে গোপনে স্বীকার করছি, চেষ্টা করেও আমি তার অদ্ভুত একাকীত্ব আর অপরিসীম নিস্পৃহতার আবরণ এতটুকুও সরাতে পারিনি। দিনের অনেকখানি সময় সে ঠাকুরঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। যখন বাহিরে থাকে, তখনো মনে হয় যেন সে নিজের চারপাশে একটি পূজাগৃহ নির্মাণ করে রেখেছে, যার দরজা পর্যন্ত আমার গতি, তার ওপারে নয়।"

জেঠিমার উত্তেজিত আরক্তিম মুখের পানে তাকিয়ে হেসে বললাম, তা বেশ তো! তুমি যখন বলছ তখন মেনেই নিলাম যে তিনি একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। তা আমায় কি করতে হবে?

গ্রামের সীমানায় গঙ্গার ধারে সম্প্রতি এক সন্ন্যাসী এসে আড্ডা গেড়েছেন এবং দুচারদিনেই তাঁর প্রসার-প্রতিপত্তি জমিয়েছেন। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই তিন কালই তাঁর করতলগত, লোকের হাত আর কপাল দেখে তিনি নাকি আশ্চর্য ঠিক ঠিক অতীত কথা বলছেন আর ভবিষ্যৎ জানাচ্ছেন। জেঠিমা সেই সাধু সন্দর্শনে গিয়েছিলেন। সঙ্গে রাধাও ছিল। সাধু রাধার জীবনের অতীত ঘটনা ব্যক্ত করেছেন, এমনকি তার স্বামী যে দুর্ঘটনায় মারা পড়েছে, তা পর্যন্ত। বাড়ি ফিরে জেঠিমা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে তাঁর এই নাস্তিক দেবর-পুত্রটিকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, সংসারে সব কিছুই ভুয়ো নয় এবং এই সাধুটি সত্যিই একজন সিদ্ধ-পুরুষ।

বললাম, তোমার কথায় নিশ্চয় বুঝছি যে, তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ। কাল তাঁর ভোগের জন্যে গোটা পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিও।

জেঠিমা বললেন, গ্রামের সবাই যাচ্ছে তাঁর কাছে।

বললাম, যাবে বৈকি। সবাই তো আর আমার মতো পাষণ্ড নয়।

জেঠিমা বললেন, তুইও একবার যা না! দেখে শুনে আসাও হবে। আর সুবিধে হলে হাতটা একবার···

তাই বল। এই জন্যেই এত ভূমিকা। বেশ তো যাব। কি জিগেস করব বলতো?

সোৎসাহে জেঠিমা বললেন, চাকরি-বাকরি কি রকম হবে, আর শুভকাজটা, তারই বা দেরী কত···

আমার হাসি শুনে জেঠিমা রেগে গেলেন। বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি আজই বিকেলে গিয়ে তোমায় খবর এনে দেব।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে জেঠিমার কথা মনে পড়ে গেল। শুনেছিলাম, বড় মাঠটার শেষে গঙ্গার ধারে সন্ন্যাসী মহারাজ আস্তানা স্থাপন করেছেন। পায়ে পায়ে সেদিকে অগ্রসর হলাম।

কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম, একটা ভাঙা টিনের চালার উপর দরমার ছাউনি দিয়ে সাধুবাবা এরই মধ্যে একপ্রকার পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন। দরজার কাছে কয়েকজন মেয়ে পুরুষ নীরবে উৎসুক চোখে ভিতরের পানে দৃষ্টি মেলে বসে আছে। এগিয়ে গিয়ে তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, রীতিমত আশ্রম। ধূপ-ধুনো পুড়ছে, দু-তিনটে থালায় ফুল মালা, এক পাশে একটা কমণ্ডলু, মাটির পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বালা হয়েছে। আর তারই সামনে প্রকাণ্ড একটা বাঘছালের উপর সাধুজী আসীন। মাথায় প্রকাণ্ড জটা, মুখে চাপ দাড়ি, পরণে রক্তাম্বর। দুই চক্ষু অর্ধনিমীলিত। তপ্ত কাঞ্চনের মতো দেহের রঙ, তেমনি সুডৌল শরীরের গড়ন। চেহারা দেখে মনে সম্ভ্রম জাগে।

সন্ন্যাসীর সুমুখে এক ব্যক্তি মাটির উপর উপুড় হ'য়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, সাধুবাবা তার অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছেন, তা শোনবার পর লোকটির মন থেকে সংসার করবার বাসনা লুপ্ত হয়েছে। সে এখন তাঁর চেলা হতে চায়।

কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বসলেন। অদূরে একটি স্ত্রীলোক বোধ করি হাত দেখাবার জন্তে বসেছিল, বললে, ঠাকুর, আমার কি হবে?

সন্ন্যাসী নীরব। শিষ্যপদপ্রার্থী লোকটি কেঁদে উঠল, বাবা, আমায় কি দয়া করবেন না?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে জলদ-গম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসী বলে উঠলেন,—আজ আর আমি কাউকে কোন কথা বলব না। এখানে একজন ঘোর অবিশ্বাসী এবং নাস্তিক এসেছে। তার সামনে···

কে? কে সে?

চারিদিক থেকে রব উঠল,—কে সে বলুন! তাকে আমরা···

আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সন্ন্যাসী বললেন,—ওই!

মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

যারা কোলাহল করছিল তারা বোধ করি স্বপ্নেও আমার কথা ভাবতে পারেনি। তাই সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল, আর এ ওর মুখের পানে তাকাতে লাগল।

মিনিট খানেক নীরব থেকে মৃদু হেসে বললাম,—সন্ন্যাসী ঠাকুর কি নিশ্চয় করে জেনেছেন আমি নাস্তিক অবিশ্বাসী?

সন্ন্যাসী মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন, বললেন,—এ পৃথিবীতে আমার অজানা কিছু নেই। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েও আপনি আচারভ্রষ্ট পতিত।

বলেন কি! একবারে পতিত! তাহলে উদ্ধারের একটা পথ বাৎলে দিন প্রভু।

*মুখ ফেরানো অবস্থায় প্রভু অধিকতর গম্ভীরভাবে বললেন,—ব্যঙ্গের প্রয়োজন নেই। তোমার উদ্ধার কোনদিন হবে না। বিদ্যার অহঙ্কার আছে তো ষোল আনা, কিন্তু কতটুকুই বা জ্ঞান অর্জ্জন করেছো? কোন রকমে বোধ হয় বি-এ'টা পাশ করেছো, আর লিখেছো খানকতক মিথ্যা কাহিনী। তারই এত ঝাঁজ।*

*এই বলে সন্ন্যাসী একেবারে পিছন ফিরে বসলেন।* আমি উদ্বেল অন্তরে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন মনটা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

বাড়ি ফিরে অস্থির বোধ করতে লাগলাম। আজ রাত্রেই আর একবার মহাপুরুষটির সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেকথা অবশ্য জেঠিমার কাছে প্রকাশ করলাম না। আহারাদি সেরে রাত দশটার পর বাড়ি থেকে বেরুলাম।

নির্জন ঝিল্লিমুখরিত গ্রাম্য পথের উপর অনাবিল জ্যোৎস্নার প্রবাহ। দূরে কোন কুটীরের ভিতর থেকে রামায়ণ পাঠের একটানা সুর ভেসে আসছে। চরাচরব্যাপী মন্থর প্রশান্তি বিরাজ করছে।

সাধু মহারাজের আস্তানার কাছে গিয়ে দেখলাম, লোকজন সবাই চলে গিয়েছে। সাধুবাবা ঘরের এক কোণে বসে বোধ করি রাতের আহার সমাধা করছিলেন, এ হেন অসময়ে মানুষের সাড়া পেয়ে ঈষৎ চমকে বললেন,—কে?

নাম বললাম।

সন্ন্যাসী হাত মুখ ধুতে ধুতে বললেন, এখন কি প্রয়োজন?

মৃদু হেসে বললাম, নিরিবিলি দেখা করতে এলাম পুরণো বন্ধুর সঙ্গে।

তার মানে! সন্ন্যাসী সোজা হয়ে বসলেন।

মানে কি এখনো স্পষ্ট হয়নি, বীরুদা'?

ঘাড় নেড়ে সন্ন্যাসী বললেন,—আপনি ভুল করছেন। আমার নাম চিন্ময়ানন্দ স্বামী। আমি আপনার বন্ধু নই।

হেসে বললাম, না, আমি ভুল করিনি। চিন্ময়ানন্দ স্বামী আমার বন্ধু না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর ওই দাড়ি-গোঁফ আর জটার অন্তরালে যে বীরেশ্বর বসু লুকিয়ে আছেন, তিনি যে আমার অনেকদিনের পরিচিত। সত্যি বলছি, বীরুদা, এখনো যদি সোজা পথে না আসো, তাহলে তোমার জটার অরণ্য আক্রমণ করব, তা বলে দিচ্ছি। মিছিমিছি আমি এই রাত্রে আসিনি।

আমার কথা শুনে সন্ন্যাসী বললেন,—থাক, অত বিক্রমে কাজ নেই। কিন্তু সঙ্গে কেউ নেই তো?

না। আমি একা। কিন্তু এ কী ব্যাপার বল তো! তোমাকে যে হঠাৎ এভাবে দেখবো তা তো কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

বীরুদার সঙ্গে কলেজে এক ক্লাসে পড়েছি। বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বড়ো ছিল, তাই তাকে সবাই দাদা বলতাম। আর শুধু কি বয়সেই! সব বিষয়েই বীরুদা আমাদের চেয়ে বড় ছিল। প্রক্সি দিতে, কলেজ পালাতে, দৌড়ে বাজী জিততে, আপদে-বিপদে ছেলেদের সাহায্য করতে তার জুড়ি ছিল না। সকল ব্যাপারেই বীরুদা ছিল আমাদের পরম নির্ভর-স্থল, সকলের বিপত্তারণ বন্ধু। বি-এ পাশ করে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার কিছুদিন পরে অকস্মাৎ একদিন বীরুদা অদৃশ্য হয়ে যায়। সে ১৯২৮ সালের কথা। *তারপর তাকে দেখলাম সেদিন, প্রায় আটবছর বাদে।*

*বীরুদা প্রশ্ন করল,—তুই কি আমায় প্রথম দেখেই চিনতে পেরেছিলি?*

*বললাম, ঠিক প্রথম দেখেই না হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই পেরেছিলাম। এদের ফাঁকী দিতে পেরেছো বলে কি আমাকেও ফাঁকী দেওয়া সম্ভব?*

তা ঠিক। বলে বীরুদা অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

বললাম, কি ভাবচো?

না, ভাবিনি কিছু। হঠাৎ তোকে দেখবো আশা করিনি।

সে তো আমারও কথা। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন কেন, তাই বল। হঠাৎ একবারে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে!

মৃদু হেসে বীরুদা বললে, হঠাৎ নয়, অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে পরিবর্ত্তন চলছিল, আজ তারই বাহ্য প্রকাশ দেখছিস।

সবিস্ময়ে বললাম, তাহলে এ সত্যি? ভেক নয়?

মুখ টিপে হেসে বীরুদা বললে, কি মনে হয়?

তারপর মাথা নেড়ে বললে, ওসব কথা থাক। তোদের কথা বল। মিহির, ললিত, বিভু—এরা সব কে কোথায় আছে? কি করছে?

একে একে সকলকার খবর দিলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলে বীরুদা, কিন্তু আমার বারংবার প্রশ্ন সত্ত্বেও

নিজের কোন খবরই দিলে না। আহত কণ্ঠে বললাম, বুঝেছি, তোমার কোন কথা আমায় জানাতে চাও না। কিন্তু কেন চাও না? এতই পর হয়ে গেছি? এই ক'টা বছরের ব্যবধানে এতই দূরে চলে গেছি?

প্রত্যুত্তরে পুনরায় যখন মাত্র একটু হেসে বীরুদা নীরব হয়ে রইল, তখন বুঝলাম, ওদিকটা আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে, শত প্রশ্নেও উত্তর মিলবে না। কিছুক্ষণ পরে সেদিনকার মত তার কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

দিন দুই তিন পরে। জেঠিমা ঘরে এসে দাঁড়ালেন। লিখছিলাম, তাঁকে দেখে খাতা বন্ধ করে বললাম, কী হুকুম বল। হাটে যেতে হবে নাকি?

না। আজ তো হাটবার নয়।

জেঠিমা যেন কিছু অন্যমনস্ক। বললাম, কী ভাবছো জেঠিমা? মুখটা যেন ভার ভার!

জেঠিমা একটু থামলেন, একটু কাশলেন, তারপর বললেন, ভাবছিলাম, তোরা যা বলিস তা নিতান্ত মিথ্যে নয়। ওসব সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির শ্রেণীর ভাগই ঠক।

ঠিকমতো বুঝতে না পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে তিনি আবার বললেন, আর শুধু তাদের দোষ দিলেই বা চলবে কেন। নিজের ঘরও তো দেখছি বিগড়েছে।

কি বলছ জেঠিমা? কার কথা?

কার আবার। রাধার।

কি করেছে সে?

জেঠিমা বললেন, দুপুর নেই, সন্ধ্যে নেই, যখন তখন ওই সাধুর বাসায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। পাড়ায় তো আর কান পাতা যায়না।

খবরটি হজম ক'রে হেসে বললাম, জেঠিমা, তোমরা সবাই ভুল করেছো, ভুল ভেবেছো, রাধাকে তোমরা আজও চিনতে পারো নি। ধর্মেকর্মে ওর যেরকম নিষ্ঠা আর মতিগতি, তাতে ওর সম্বন্ধে ওকথা ভাবতেই পারা যায় না।

ঘাড় নেড়ে জেঠিমা বললেন, হয়ত তাই। কিন্তু যখন তখন হটহট ক'রে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। বললাম সেকথা। শুনে গোঁজ হয়ে রইল। বোধ হয় আমার কথা শুনবে না।

জেঠিমা একটু পরে নিজের কাজে চলে গেলেন, আমি বসে বসে রাধার কথা ভাবতে লাগলাম। পাড়ার লোকে যে ভুল ভেবেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ওর তপস্যাক্লিষ্ট ধর্মপিপাসু মন সাধুর কাছে হয়ত কোন নতুন প্রত্যাদেশের আশায় ছুটে যাচ্ছে, নিজেকে ও রোধ করতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে গুরুজনদের কথা অমান্য করা, তাও তো সঙ্গত কাজ নয়।

দেখলাম, সত্যিই জেঠিমার নিষেধ খাটল না। সময় পেলেই রাধা সাধুর আশ্রমে চলে যায় আর বহুক্ষণ অবধি সেখানে থাকে। আজকাল ওর আচরণ এমন কি বেশভূষার মধ্যেও সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম। ওর এই দুর্নিবার চিত্তব্যাকুলতা কোথায় গিয়ে কোন্ পথে শেষ হবে কে জানে।

বললাম, বীরুদা', তোমায় তাঁবু গুটোতে হবে।

অপরাধ?

তোমার জন্যে গাঁয়ের একটি মেয়ের নামে কলঙ্ক রটছে। এইমাত্র পাড়ার মাতব্বররা আমার কাছে এসে অনেক কথাই বলে গেলেন, যা পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছে আমার নেই।

আমার কথা শুনে বীরুদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর তার মুখের উপর একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ছায়া বিস্তার করল।

বললাম, আমার কথাটা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার মতো সামান্য নয়।

মাথা নেড়ে বীরুদা বললে, তা তো নয়ই। তোমার অস্বস্তির কারণ আমি বুঝতে পারছি বৈকি!

গ্রামের লোকেরা এই যে বলাবলি করছে, আশা করি, তোমার দিক থেকে তার কোন কারণ ঘটেনি?

আমার প্রশ্নের উত্তরে বীরুদা পুনরায় দুর্বোধ্য হাসি হেসে বললেন, কী উত্তর পেলে তুমি খুসী হও?
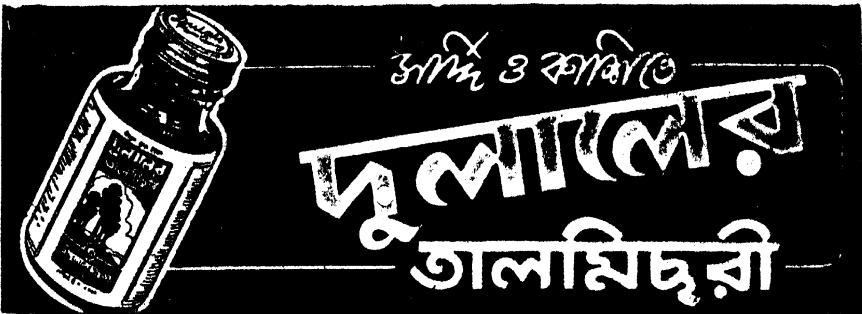
সত্য উত্তর পেলে।

চোখ বুজে বীরুদা বললে,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

কিন্তু এ তো আমার প্রশ্নের উত্তর হল না!

হাই তুলে বীরুদা বললে, হল না বুঝি? আচ্ছা কাল সকালে এসো, বলব।

বাড়ি ফিরে সারারাত ঘুম হল না। মনের মধ্যে কি জানি কেন এক প্রকার জ্বালা বোধ করতে লাগলাম। হাজারো রকমের প্রশ্ন আর তার হাজারো রকমের সম্ভব অসম্ভব উত্তর মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যে উত্তাপ আর উত্তেজনার সৃষ্টি করল তার মধ্যে বোধ করি কোন মানুষই সুস্থচিত্তে ঘুমোতে পারে না।

সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙলো তখন অনেকখানি বেলা। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যার কথা মনে পড়ল সে বীরুদা। তার সঙ্গে সকালেই দেখা করতে হবে।

মুখ ধুয়ে বাইরে এসে দেখলাম, গতকাল যাঁরা এসেছিলেন, আজ আবার তাঁদেরই পায়ের ধুলোয় বারদালান পবিত্র হয়েছে। ন্যায়রত্ন মশায় আমায় দেখে এগিয়ে এসে বললেন, এই যে বাবাজী, ঘুম ভেঙেছে। আমরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

বুঝলাম, আজও বোধ হয় আরও কিছু কথা শোনাবেন। মন তিক্ত হয়ে উঠল। বিনীতভাবে বললাম,—আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কী আদেশ বলুন।

ন্যায়রত্ন স্মৃতিভূষণের প্রতি তাকালেন। তিনি কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন, বলতে এসেছিলাম রাধার কথা। তার জন্যে গাঁয়ের মাথা হেঁট হল। এর তো একটা বিহিত করতে হয়।

বললাম, একেবারে বিহিতের দরকার পড়ল। এমন কি করেছে সে?

কি করেছে! ওই ভণ্ড সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওর চরিত্র নষ্ট হয়েছে!

বিরক্ত হয়ে বললাম, সকাল বেলাতেই এমন যা-তা কথা বলবেন না, ন্যায়রত্ন কাকা। কিসের জোরে এত বড় কথা বলছেন?

ন্যায়রত্ন বললেন, কিসের জোরে! তা'হলে বলি শোন। কাল রাত তখন ন'টা হবে। চারিদিক নিশুতি। সেই সময় রাধা ওই সন্নেসীটার ঘরে গিছল। আমরা, আমি আর স্মৃতিভূষণ সেই সময় ওই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। আমরা একঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু তবুও রাধা ফিরলো না। তখন আমরা চলে এলাম।

ন্যায়রত্ন মশায়ের কথার শেষ দিকটা কানে এলো না। দেউড়ির দিকে নজর পড়ল। দেখলাম, সিংদরজা পার হয়ে দু'জন লোক ভিতরে ঢুকছে। একজনকে চিনতে পারলাম, চিন্ময়ানন্দ স্বামীর সামনে উপুড় হয়ে পড়ে লোকটিকে কাঁদতে দেখেছিলাম, সে নাকি তাঁর শিষ্য হয়েছে।

দ্বিতীয়জনের সাজপোষাকে মনে হল তিনি পদস্থ ব্যক্তি। দূর থেকে আমায় দেখে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, এই বাড়িতে কি শ্রীমতী রাধাদেবী থাকেন?

সংশয়ান্বিত কণ্ঠে বললাম, কেন বলুন তো?

তাঁকে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে।

কি অধিকারে তাঁকে প্রশ্ন করতে আপনি আমাদের বাড়ি এলেন তা জানতে পারি কি?

মাথা নুইয়ে ভদ্রলোক বললেন, অবশ্য পারেন।

এই বলে পকেট থেকে একখানি পদক বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন, কলকাতা থেকে আসছি।

সভয়ে বললাম, রাধা কি করেছে?

মাথানেড়ে পুলিস-অফিসারটি বললেন, আপনি ভয় পাবেন না। তিনি কিছু করেননি। শুধু যে সন্ন্যাসীটি কয়েকদিন এখানে এসেছিল তার সম্বন্ধে ওঁকে কয়েকটা কথা জিগেস করব।

কিন্তু তার সম্বন্ধে ওকে জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

তার কারণ উনি অনেক সময়েই সেই লোকটির কাছে থাকতেন। কাল শেষ রাতে সেই সাধুটি যখন তার এই চেলাটির হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে সরে পড়েন, তখনো যে রাধা দেবী সেখানে ছিলেন।

রাধা! সেখানে ছিল? অসম্ভব।

বেশ তো! তাঁকে একবার ডাকুন না। তা'হলেই জানা যাবে।

রাধাকে ডেকে আনলাম। মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে ধীর শান্ত-পায়ে বাইরে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। পুলিস-অফিসার তার দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে মাথা নীচু করে সসম্ভ্রমে বললেন—আমায় মাপ করবেন। নিতান্ত কর্তব্যের দায়েই আপনাকে ডেকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম। প্রথমেই বলে রাখি, আপনি যে কাল প্রায় সারা রাত চিন্ময়ানন্দের ঘরে ছিলেন, তা আমার এই (চিন্ময়ানন্দের নতুন চেলাটিকে দেখিয়ে) ইনফরমার জানে। সুতরাং অস্বীকার করবেন না।

স্তব্ধবিস্ময়ে রাধার দিকে তাকালাম। বললাম, কাল রাত্রে তুমি সন্ন্যাসীর আশ্রমে ছিলে?

রাধা ঘাড় নাড়ল।

পুলিস অফিসার প্রশ্ন করলেন, কেন ছিলেন?

আমার কাজ ছিল।

সারা রাতই কাজ ছিল?

হাঁ।

হুঁ। শেষ রাতে সাধুজী হঠাৎ বেরিয়ে এসে আমার এই গুপ্তচরটিকে আক্রমণ করে তার হাত-পা বেঁধে রেখে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে যখন চম্পট দেন, তখনো আপনি ছিলেন?

ছিলাম।

যাবার সময় তিনি আপনাকে কি বলে গেলেন? কোথায় যাচ্ছেন? হরিদ্বার, না, কংখল?

জানিনে।

পুলিস কর্মচারী বুঝলেন, প্রশ্ন করে কোন ফল হবে না। বললেন, আর কিছু জানবার নেই। আপনি যেতে পারেন।

মন্থরপদে রাধা ভিতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়রত্ন আর স্মৃতিভূষণও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। বোধ করি এত বড় মুখরোচক খবরটি পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করবার জন্যে তাঁরা অধীর হয়ে পড়েছিলেন।

পুলিস-কর্মচারীটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তা পর্যন্ত এসে যথাসাধ্য আবেগ সম্বরণ করে নিস্পৃহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম,—যে সাধুটির পিছু নিয়েছিলেন, সে বোধ হয় কোন দাগী চোর বা ফেরারী আসামী হবে?

অন্যমনস্কভাবে পুলিস-অফিসর জবাব দিলেন,—না মশায়, তিনি অতি সামান্য লোক নন। আজ পাঁচ বছর ধ'রে চেষ্টা করছি। প্রত্যেক বারই হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও পিছলে যাচ্ছেন। মহাপুরুষ কি যে-সে লোক, পরলোক থেকে ফিরে এসেছেন। আচ্ছা, চলি, নমস্কার!

পুলিসের লোক দু'জন আগড়পাড়ার সীমানা ছাড়াবার আগেই সারা গ্রামের আকাশ-বাতাস আলোড়িত করে রাধার কলঙ্কের কথা ধ্বনিত হ'তে লাগল।

● মডেল এ-৭৩০

# হরেক রকমের ন্যাশনাল একো রেডিও —যেটি খুশি পছন্দ করুন!
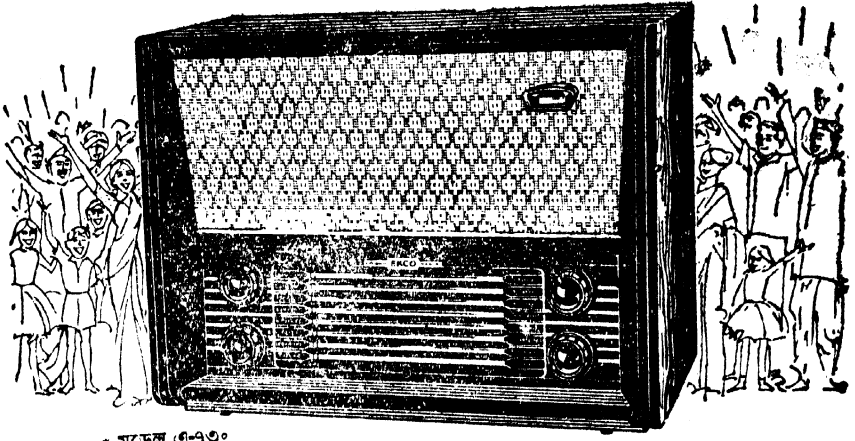
রকমারী মডেলের ন্যাশনাল-একো রেডিওর মধ্যে একটি-না-একটি আপনার পছন্দ হবে। ন্যাশনাল-একো রেডিওর জন্যে টাকা খরচ সার্থক···চমৎকার আওয়াজ···বছরের পর বছর শুনে আনন্দ পাবেন। সুন্দর সুন্দর ১০ রকম মডেল···দাম মাত্র ১২৫৲ টাকা থেকে উর্দ্ধে ৭২৫৲ টাকা পর্যন্ত।
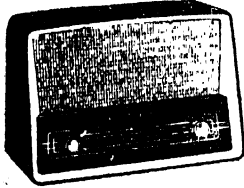
মডেল ইউ-৭৬৪ : ৫ ভাল্ভ, ৩ ব্যাণ্ড, এসি / ডিসি, ঢালাই ক্যাবিনেট। মডেল বি-৭৬৪ : ৪ ভাল্ভ, ৩ ব্যাণ্ড, ড্রাই ব্যাটারী সেট **দাম ২৬৫৲**
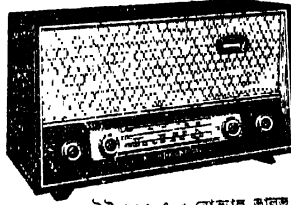
মডেল ইউ-৭৫৫ : ৬ নোভ্যাল ভাল্ভ, ৩ ব্যাণ্ড, এসি/ডিসি। মডেল বি-৭৫৫ : ৫ নোভ্যাল ভাল্ভ, ৩ ব্যাণ্ড, ড্রাই ব্যাটারী সেট, কাঠের ক্যাবিনেট **দাম ৩৫৫৲**
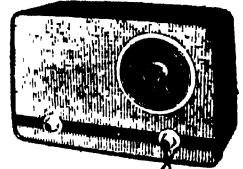
মডেল ইউ-৭৫৬ (জনতা) : ৩ ভাল্ভ, রেক্টিফায়ার সমেত, ২ ব্যাণ্ড- মিডিয়াম ও শর্ট ওয়েভ, এসি/ডিসি, ঢালাই ক্যাবিনেট **দাম ১২৫৲**

১২৫৲

● মডেল এ-৭৩০ : ৯ ভাল্ভের কার্যকরী ৬ নোভ্যাল ভাল্ভ, ৮ ব্যাণ্ড, এসি সেট। মডেল ইউ-৭৩০ : এসি/ডিসি, কাঠের ক্যাবিনেট **দাম ৫৭০৲**

মডেল এ-৭৪৪ : ৯ ভাল্ভের কার্যকরী ৬ নোভ্যাল ভাল্ভ ৪ ব্যাণ্ড, এসি। মডেল বি-৭৫১ : ৩ ট্রান্‌জিস্টার, ৪ ভাল্ভ, ৪ ব্যাণ্ড, ড্রাই ব্যাটারী, ঢালাই ক্যাবিনেট **দাম ৪০৫৲**
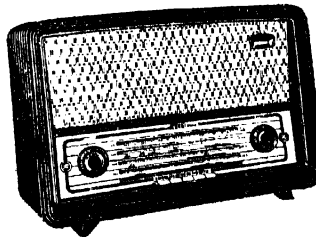
ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা — এগুলি মনসুনাইজড্‌

সব দামের মধ্যে এক্সাইজ ডিউটি ধরা আছে : বিক্রয় কর আলাদা

GRA

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়ান্সেজ লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • দিল্লী • পাটনা • বাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ

JWTGRA 3470

প্রশান্ত চৌধুরী

## ২২

সানাইপাড়া।

শুধু সানাই নয়, বিয়ের বরের শোভাযাত্রার যাবতীয় জিনিসই মিলবে এখানে। বরের গাড়িটাকে সাজাবার জন্যে কোন্ কাঠামো চাও তুমি? ময়ূর, প্রজাপতি, রাজহাঁস না ঘোড়া? দরদস্তুর করে পছন্দ করে নাও একটা, তারপর বায়নার টাকা দিয়ে অর্ডার দিয়ে যাও পাকা। সঙ্গে সঙ্গে দেখবে, সানাইপাড়ার বাচ্চা ছেলেরা আর বুড়িরা লেগে গেছে চ্যাঁচাড়ির কাঠামোতে সাদা কাগজের তাপ্পি লাগাতে।

পুরোনো লোহার দোকানদারদের অনেকেই হামেশাই আসেন এ-পাড়ায়। ছেলের বিয়ের শোভাযাত্রার জন্যে বায়নার টাকা কড়ি চুকিয়ে ফিরে যেতে না যেতেই সোরগোল পড়ে যায় সানাইপাড়ায়। কেউ অ্যাসিটিলিন্-গ্যাসের বাহারি গেটটাকে রঙ্‌টঙ লাগিয়ে ঝক্‌ঝকে করতে লেগে যায়, কেউ লেগে যায় আলো-জ্বলা মস্ত পিজবোর্ডের জাহাজটাতে রঙবেরঙের কাগজ সাঁটতে, কেউ বা কাগজের তৈরি ঝাঁপা ঘোড়াগুলোর খসে-যাওয়া ল্যাজের মেরামতীতে যায় লেগে। সবচেয়ে ফুর্তি বাচ্চা ছেলেগুলোর। কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী ঢাউস-ঢাউস ঝাঁপা মুণ্ডুগুলোর মধ্যে সর্বশরীর ঢুকিয়ে দিয়ে তারা গলা ফাটিয়ে বাঘ-ভাল্লুক ভূত-প্রেতের ডাক ডাকতে সুরু করে দেয়।

সানাইপাড়ার রঘুদাস সানাইওলার যে ছেলেটার ঠোঁট খরগোসের মতো দু-ফাঁক করা,—জীবনে তাই কোনোদিনই যার সানাইবাদক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই,—সেই ছেলেটার ভারি আনন্দ এই সময়। কাটা ঠোঁট নিয়েই এই সময় কাজ পায় সে একটা। চুরুট-খাওয়া লালমুখো সাহেবের ঢাউস ঝাঁপা মুণ্ডুর মধ্যে তার রোগা কালো দেহটার বারো আনা অংশ ঢুকিয়ে দিয়ে পরম আরামে একটা রিক্সার উপর বসে থাকতে পায় সে এই সময়। এতে ডবল লাভ তার। পয়লা নম্বরের লাভ,—পুরো এক টাকা মজুরি; দোসরা নম্বরের লাভ, আরামসে রিক্সায় চেপে বেড়ানো।—সেই সঙ্গে কাটা ঠোঁট আর কালো রঙ লুকিয়ে টকটকে লালমুখো সাহেব সাজার আনন্দ তো আছেই। —গ্রীষ্মকালে ঝাঁপা মুণ্ডুর মধ্যে ঢুকে গরমে কষ্ট হয় অবিশ্যি; কিন্তু তেমনি গ্রীষ্মকালে মজুরিটাও যে দেড়া হয়ে যায়।—তাছাড়া মুণ্ডুর মধ্যে লুকিয়ে ফক্‌ফক্ করে সত্যিকারের সিগারেট খেতে যা মজা না!

একসঙ্গে চার-চারটে বিয়ের প্রসেসন্ সাজাবার বায়না পেয়ে সানাইপাড়াটা সরগরম্ হয়েছিল সেদিন। অ্যাসিটিলিন্ গ্যাসের কার্বাইডের গন্ধে ভরপুর হয়েছিল জায়গাটা।—এমনি সময় চাঁপা গিয়ে হাজির হল সেখানে।

হাপোর আসেনি সঙ্গে।—সকাল থেকে জ্বর হয়েছে তার। দেশ থেকে শালা এসেছিল। চেহারাটা মস্ত হলেও বোকাসোকা সরল মানুষটা। নিজে আসতে পারল না বলে তাকেই সঙ্গে দিয়েছে চাঁপার।

চাঁপা সোহাগীকে বলেছিল,—সানাইপাড়ায় যাব মা।

সোহাগী ভেবেছিল, সানাইপাড়া বলতে ঐ বিয়ের প্রসেসনের কাণ্ডকারখানা দেখতে যেতে চাইছে বুঝি চাঁপা। এমন তো এর আগেও গেছে দু-একবার। তাই এক কথাতেই রাজি হয়ে গেছে। তার ওপর সঙ্গে যখন সুবল কামারের শালা যাচ্ছে, তখন আর আপত্তির কীই বা থাকতে পারে।

চাঁপা সব কথা বলেনি খুলে সোহাগীর কাছে। ইচ্ছে করেই বলেনি। এর আগেও যে সে একদিন খাঁদুর সঙ্গে গিয়ে পড়েছিল সানাইপাড়ার বস্তির মধ্যে, সেকথাও সে লুকিয়েছিল তার মায়ের কাছে। মায়ের কাছে সেই প্রথম কোনো কিছু গোপন করেছিল সে। আজ আবার দ্বিতীয়বার করল। কারণ, সে জানে, সব কথা খুলে বললে মা তাকে কিছুতেই আসতে দিত না এখানে। যেখানে বস্তি, যেখানে অন্ধকার, যেখানে ছাইগাদার চারপাশে মুরগী ঘোরে,—তেমন জায়গার ওপর সোহাগীর কেমন একটা উৎকট ঘৃণা। চাঁপাদের ইস্কুলে যাবার পথে একটা বস্তি পড়ে।—তার আঁকাবাঁকা সরু মেটে গলির ভেতর দিয়ে গেলে অনেকখানি পথ কমানো যায়।

যারও তো কত লোকেই। কিন্তু সেই শর্টকাট্ রাস্তা মাড়াবার উপায় নেই চাঁপার। •সোহাগীর দিব্যি দেওয়া আছে।

তাই সোহাগীকে সব কথা না জানিয়ে কতকটা প্রায় লুকিয়েই এসেছে চাঁপা এই সানাইপাড়ায়। এই লুকোছাপার জন্যে সারা পথ তার মনের মধ্যে অনেক ধুকপুকুনি হয়েছে, নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে গা শিরশির করেছে,—তবু এসেছে চাঁপা।

আহা, মানুষটার যে চোখ নেই; মানুষটার পা' দুটো যে হাঁটুর তলা থেকে কেটে বাদ দেওয়া!—সেই মানুষটা মরতে বসেছে যে! আর মরবার আগে সে যে খাঁদুকে দিয়ে ডেকেছে চাঁপাকে।

সানাইপাড়ায় পৌঁছেই সুবল কামারের শালার তো চক্ষুস্থির!

ফুল আর রঙীন কাগজ দিয়ে সাজানো চার-চারখানা মোটরগাড়ি, আলোর গেট, আলোর জাহাজ, হাতী-উট-ঘোড়া ইত্যাদির মস্ত মস্ত কাগজের পুতুল, হরেক রকমের সঙ্,—এইসব দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে।

চাঁপা বলল,—আপনি এইসব দেখুন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আমি চট্ করে একবার সানাইপাড়ার সানাই শুনেই ফিরে আসছি এখনি।

শুনে তো মহা খুশি লোকটি। বলল,—বেশ, বেশ, খুব ভাল। আমি এখানেই রইলুম। কী সোন্দর-সোন্দর সব ব্যাপার গো য়্যাঁ? ঐ ওখানে মুণ্ডুটা দেখেছ? বাব্বা! কী রাক্কুসে মুণ্ডু গো! আমার মত দশাসই লোক একটা গুড়িসুড়ি মেরে ঢুকে যেতে পারে ঐ মুণ্ডুটার মধ্যে।

চাঁপা বলল,—দেখুন আপনি, য়্যাঁ? আমি আসছি।

লোকটি বলল,—তাজ্জব কাণ্ড, কি বল?

চাঁপা ততক্ষণে ঢুকে গেছে সানাইপাড়ার বস্তির সরু গলির মধ্যে। ইট-বাঁধানো সরু গলি। ইট ক্ষয়ে গেছে কবে। খাঁজে খাঁজে জল আর কাদা। গলির দু-ধারে সার-সার খোলার চালার নিচু নিচু ঘর। পুকুরধারের গাছগুলো যেমন জলের দিকে হেলে যায়, এই গলির ঘরগুলোর বেশির ভাগই তেমনি হেলে আছে গলির দিকে। সেই নিচু-নিচু ঘুপসি ঘরগুলোর দোরের পাল্লায় হেলান দিয়ে ব'সে ব'সে সানাই প্র্যাক্টিশ করছে অনেকে। পাকা বাজিয়েদের সানাইয়ের সুরেলা আওয়াজ আর কাঁচা বাজিয়েদের বেসুরো আওয়াজে সমস্ত বস্তিটার কানে তালা লেগে যাওয়া উচিত। কিন্তু লেগেছে বলে বোধ হয় না মোটেই চাঁপার। কারণ, তাহলে ঐ আওয়াজের মধ্যেই মাটির দাওয়ায় ঠ্যাঙ ছড়িয়ে ব'সে ওরা গল্প করছে কেমন করে?

সমস্ত গলিটার এখানে-ওখানে কুটনোর খোসা, মাছের আঁশ আর উনুনের ছাই ছড়িয়ে আছে। কাদের ঘরের গোটা চারেক পাতিহাঁস পেটমোটা মানুষের মতো হেলে দুলে থপ্ থপ্ করে এদিক-ওদিক যাওয়া আসা করছে। হৃষ্ট-পুষ্ট একটা মাদী-শুয়োরের খানদশেক বাচ্চা তাদের ছোট্ট ছোট্ট বোঁচা ল্যাজ নেড়ে নেড়ে মাকে ঘিরে চলে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটা ছেলে ছেঁড়া ঘুড়িতে তাপ্পি মারতে ব্যস্ত। তিনটে রোগা নেড়িকুকুর ঘুম মারছে ছায়ায় শুয়ে।

সেই সব পেরিয়ে চাঁপা হাজির হল সেই ঘরের সামনে, যে-ঘরে খাঁদুদের বুড়ো ওস্তাদ অসুখে কাৎরাচ্ছে শুয়ে।

তখন অবশ্যি কাৎরাচ্ছিল না ওস্তাদ। ওদিকের মাটির দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল তখন সে। গায়ের ওপর থেকে সরে গেছে কাঁথাটা। হাঁটু থেকে কেটে বাদ-দেওয়া পা-দুটো বেরিয়ে রয়েছে বাইরে। জীর্ণ দেহের পাঁজরের হাড়গুলো ফুলেফুলে উঠছে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে।

চাঁপা দরজার কবাটে হাত দিয়ে দাঁড়াল চুপচাপ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেই অসহায় মানুষটাকে। মানুষটার জন্যে কী জানি কেন বড্ড মায়া হতে লাগল তার।

খাঁদু বলে, মানুষটা খারাপ, মানুষটা অসৎ, মানুষটা নেশাখোর, মানুষটা সারাজীবন বদমাইসি কোরে ভুগ্‌ছে আজ খারাপ অসুখে। সেই খারাপ অসুখের ফলেই ওর চোখ দুটো অমন ঘসা, ওর পা-দুটো অমন কাটা। খাঁদু বলে, অনেক পাপের শাস্তি পাচ্ছে মানুষটা। পাবে না? কম শয়তানী করেছে সারাটা জীবন? মা-মাসীদের কাছে সব শুনেছি আমি। নেহাৎ ভাল ভাল অনেক সুর জানা আছে ওস্তাদের, তাই;—তা না হলে না খেতে পেয়ে মরত। কিন্তু তবু, তবু, আজ এই পড়ন্ত বিকেলে সানাইপাড়ার নোঙরা বস্তির একটা ভাঙা অন্ধকার ঘরে রোগজীর্ণ সেই মানুষটাকে দেখে রাগ নয়, ঘেন্না নয়, মায়াই হতে লাগল চাঁপার।

ওস্তাদের সেই অন্ধকার ছোট্ট ভাঙা ঘরটার কিছু দূরেই আরেকটা ঘরের মধ্যে থেকে সানাইয়ের একটা করুণ সুর আসছিল ভেসে। সূর্য ডোববার পর আকাশের রঙটা যখন ম্লান হয়ে যায়, তখন সেই অন্ধকার-হয়ে-আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁপার মনের মধ্যে যে কান্না-কান্না একটা ভাব আসে,—সানাইটার সুরে ঠিক যেন সেই সুরের রেশ।

এগিয়ে গেল চাঁপা সেইদিকে।

ওস্তাদের ঘরের মতো ভাঙা নয়, নোঙরা নয়;—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটা। তবে তেমনি অন্ধকার আর তেমনি ছোট। দরজার নিচের চৌকাঠটা মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে। অর্থাৎ বর্ষার সময় রাস্তায় জল জমলে সে-জল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নয়। ঘরের মেঝেটা সম্ভবত রাস্তার চেয়েও নিচুতে। সেই নিচু মেঝের দরজার কবাটে ঠেস্‌ দিয়ে বসে একটি প্রৌঢ় সানাইওয়ালা আপন মনে সানাই বাজাচ্ছিল চক্ষু বুজে।

চাঁপা চুপটি করে দাঁড়াল।

চারিদিকে নোঙরা, এঁটোকাঁটার জঞ্জাল, মরচে-পড়া খালি টিন আর নোঙরা তুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে;—তারই মধ্যে সানাই বেজে চলেছে। যেন নরকের শ্যাওলা-ধরা ছোট্ট উঠানের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে স্বর্গের আকাশের একটুকরো ইসারা। চাঁপার মনে হল, ঐ সানাইওলা যেন এই মুহূর্তে সানাইপাড়ার এই নোংরা বস্তির ঐ ছোট্ট ঘরে বসে থেকেও ঐ ঘর থেকে অনেক বাইরে অনেক দূরে কোথায় চলে গেছে।

চাঁপাদের নিচের তলার কাগজের গুদোম থেকে যে সব ছবির বই জোগাড় করে নিয়ে আসে চাঁপা, সেই বইয়ের মধ্যে একটা ছবি চাঁপার খুব ভাল লাগে।—মরুভূমির ছবি। ধূ-ধূ মরুভূমি, সূর্যাস্ত হয়েছে,—আকাশের দাঁড়িটানা মেঘে মেঘে তার লাল রঙ, সেই মরুভূমির ওপর আকাশে মুখ তুলে পা মুড়ে বসে আছে একটা মস্ত উট।

চাঁপার মনে হল, এই মুহূর্তে ঐ প্রৌঢ় সানাইওলাও ঐ ছবির রাজ্যে চলে গেছে।

সানাইটা থেমে গেল হঠাৎ। দম নেবার জন্যে একটু থেমে চোখ খুলতেই সানাইওলা দেখতে পেয়েছে চাঁপাকে, আর দেখতে পেয়েই থেমে গেল একেবারে। মুখ থেকে সানাই নামিয়ে নিয়ে বলল,—কাকে খুঁজছ?

—না, কাউকে নয়।

—তবে?

—এমনি। সানাই শুনছি।

—সানাই শুনতে ভাল লাগে?

—খু-উ-ব।

—কেন?

—কি জানি।

—নাম কি?

—চাঁপা।

—চম্পা?

—উঁহু চম্পা নয়, চাঁপা; চাঁপাই আমার নাম।

—কাছেই থাক বুঝি?

—না। অনেক দূরে থাকি। সেই শনিঠাকুরের মন্দিরে পাড়ায়।

—এতদূর এসেছ সানাই শুনতে?

—না, একজনের সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ আপনার সানাই শুনে খুব ভাল লাগল, তাই।

—তাজ্জবের কোথা শোনালে। এ-সুর তো ভাল লাগে না আজকালকার লোকের। আজকাল সব ফিলিমের গানের সুর চায় বলে,—'পেয়ারে পেয়ারে সুরত কো' জানা আছে? 'লাল দুপাট্টা মলমল কি' জানা আছে? তা' আমার আশপাশের ঘরের লোকে তাই বাজায়। করবে কি? বাবুরা যা চাইবে, তাই তো বাজাতে হবে। আমার ছেলেটোও ঐ ফিলিমের গান ধরেছে। ভালই করেছে, রোজগার হচ্ছে তবু তার দু-পয়সা। আমি তো বসেই আছি, এক পয়সা ঘরে আনতে পারি না।

—আপনিও বাজান না কেন ঐ সুর?

—পারি না। গলায় আটকায়। ওস্তাদের কাছে না বেঁধেছি যে।

—কোন্ ওস্তাদ? ঐ ও-ঘরে যিনি থাকেন?

—হ্যাঁ। ঐ ঘরে।

—যার হাঁটুর তলা থেকে আর পা নেই? চোখের সাদায় কালো ফুটকি পর্যন্ত নেই যার?

—হ্যাঁ। ঐ আমার ওস্তাদ।

প্রৌঢ় সানাইওলা সেলামের ভঙ্গিতে ডান হাতটাকে কপালের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে নাচাতে লাগল।

চাঁপা বলল,—আমি যে ঐ ওস্তাদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি এখানে।

—ওস্তাদের সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—কোথায় থাক তুমি বললে?

—শনিমন্দিরের পাড়ায়।

—ঘোষের খাঁটালের পিছনের বস্তিতে ?

—না, সেখানে খাঁদু থাকে। আমি থাকি চওড়া রাস্তার ওপরে। দোতলা ঘর। তলায় ছেঁড়া কাগজের গুদোম। আমার বাবা হচ্ছেন শীতলা-মন্দিরের ঠাকুরমশাই।

—তাহলে ওস্তাদকে চিনলে কেমন করে ?

—চিনি না তো। একদিন মাত্র এসেছিলুম। ঐ যে খাঁদুর নাম করলুম, তার সঙ্গে এসেছিলুম একদিন। খাঁদুই টেনে এনেছিল।

—আজ একা এসেছ ?

—হ্যাঁ। কাল বিকেলে খাঁদু বলল, ওস্তাদ নাকি খুঁজছিল আমাকে। আচ্ছা, ওস্তাদ নাকি বাঁচবে না আর ?

—না। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিলুম। জবাব দিয়ে গেছে।

শুনে বুকের ভেতরটা যেন মুহূর্তের জন্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল চাঁপার। বলল,—মরে যাবেই বুঝি ? যাবেই যাবে ?

—হ্যাঁ। হয়ত আর দুদিন, কিংবা তিনদিন, কিংবা আজই হয়ত। তাই তো এখানে এই ঘরে বসে বসে ওস্তাদেরই শেখানো সুরে সানাইটাকে বাজিয়ে চলেছি। যাবার সময় সানাই শুনতে শুনতে চলে যাক ওস্তাদ। কি বল ? সেই ভাল না ?

চাঁপা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। ওর গলার কাছটায় আটকে এল কী যেন। বলল,—কিন্তু আমাকে যে ডেকেছিল ওস্তাদ। আমি যে দেখা করতে এসেছি।

—কেন ? কেন ডেকেছিল ?

—তা তো জানি না। এসে দেখলুম ঘুমোচ্ছে ওস্তাদ। তাই অপেক্ষা করছি।

ওধার থেকে জলের বালতি নিয়ে সানাইপাড়ার একটি বৌ আসছিল এদিকে। সানাইওলা বলল,—একটু উঁকি মেরে ছাখতো বুলকির মা, ওস্তাদ জেগেছে কি না ?

বুলকির মা উঁকি মেরে ছোট্ট একটা 'না' বলেই বেঁকে গেল বাঁ-দিকে।

চাঁপা বলল,—তাহলে ? আমায় যে বাড়ি ফিরতে হবে।

প্রৌঢ় সানাইওলা বলল,—আরেকটু দেখে যাও, ঘুমটা ভাঙে যদি একটু পরে। আফিম খাওয়ার টাইম তো।

—আফিম্ তো বিষ !

—কোন্ বিষটা খেতে বাকি আছে ওস্তাদের ? ঐ দোষটা না থাকলে ওস্তাদকে কে আর আমাদের এই সানাইপাড়ায় পড়ে থাকতে হয় ? কতবড় গুণী লোক ! আমাদের জন্ম হবারও অনেক আগে শ্যামবাজারের বায়োস্কোপের বাড়িতে তখন বায়োস্কোপের আগে কনসার্ট বাজাবার রেওয়াজ ছিল। সেইখানে কনসার্ট-পার্টির হেড্ বাজিয়ে ছিল ঐ ওস্তাদ। কোন্ বাজনাটা না বাজাতে জানত ওস্তাদ ! বেহালা দাও, চেলো দাও, পিকলু দাও, পাখোয়াজ দাও, অর্গ্যান দাও, কর্নেট দাও,—সবেতেই ওস্তাদ। আর, ক্ল্যারিওনেটে তো কথাই নেই একেবারে। ঐ নেশাতেই গেল সব। নেশা আর··

থামল সানাইওলা। তাকাল একবার চাঁপার দিকে।

চাঁপা বলল,—আর কি ?

সানাইওলা বলবে না বলবে না করেও বলল,—বদমাইসি।

চাঁপা এতদিনে বেশ বুঝতে পেরেছে 'বদমাইসি' কথাটার সঙ্গে খাঁদুদের বস্তির মতন রাত-জাগা বস্তির মানুষদের কোথায় যোগ আছে একটা। সেই যোগের আভাসটাও জানতে পেরেছে চাঁপা এতদিনে। বুঝতে পেরেছে আবছা। তাই চুপ করে গেল ঐখানেই। তারপর বলল,—খাঁদু বলেছিল ওস্তাদ নাকি বড়ঘরের ছেলে ?

—ওস্তাদ নিজেও তো আগে তাই জানত।

—জানত মানে ?

সেই বুলকির মা খালি-বালতি হাতে ঝুলিয়ে আবার বুঝি জল আনতে যাচ্ছিল রাস্তার কলে। যেতে যেতে ওস্তাদের ঘরে উঁকি মেরে চেঁচিয়ে বলে গেল,—এখনও ওঠেনি ওস্তাদ।

চাঁপা বলল,—ওস্তাদ তাহলে বড় ঘরের ছেলে নয় ?

সানাইওলা বলল,—সে অনেক কথা। বলতে অনেক সময় লেগে যাবে। ওস্তাদের খাতায় লেখা আছে সব। খুব লিখতে পারে ওস্তাদ। আমরা তো পড়তে পারি না। এই তো এক হপ্তা আগেও খাতায় কত কি লিখেছে ওস্তাদ। আমরা বলি, যা সব লিখছো, ছাপিয়ে দাও না ওস্তাদ ! ওস্তাদ বলে, খবরদার : আমার সঙ্গে আমার খাতা চিতেয় যাবে। চিতেয় যদি না দিয়েছিস খাতা, তো মরে ভূত হয়ে তোদের হাড়মাস চিবিয়ে খাব মনে রাখিস। আমরা বলি,—তবে লেখ কেন ওস্তাদ ? ওস্তাদ বলে,—ব্যামো।

—আচ্ছা, এখানে কতদিন আছে ওস্তাদ ?

—তা' হবে বছর আষ্টেক, কি তারও বেশি। মানে, পা-জুটো কাটা যাবার পরেই। তার আগে তো দর্জিপাড়ায় থাকত ওস্তাদ।

—পা কাটা গেল কেমন করে ?

—আমরা তো জানি গাড়ি চাপা প'ড়ে। ওস্তাদ কিন্তু বলে, —গাড়ির সাধ্যি কি আমাকে চাপা দেয় ? অভিশাপ, অভিশাপ, একটা টাটকা জ্যান্ত ছেলেমানুষ মেয়েছেলের অভিশাপ।—মাঝে মাঝে ওস্তাদ কী যে আবোল-তাবোল বলে বোঝবার উপায় থাকে না।

চাঁপা বলল,—তোমরা ঘর দিয়েছ বলেই তো থাকতে পেয়েছে মানুষটা। তা না হলে···

সানাইওলা বলল,—অমনি আছে নাকি ওস্তাদ ? আমাদের কত সুর শিখিয়েছে না ? আজই না হয় কদর নেই ওস্তাদের সুরের। আগে ঐ ওস্তাদের সুরে সানাই বাজিয়ে কম বাহবা পেয়েছি আমরা ? ওস্তাদের খাতায় কত গৎ আছে জান ? তা' কমসে কম হাজার খানেক হবে।

চাঁপা বলল,—এত বিদ্যে নিয়েও এমনি করে মরতে হচ্ছে মানুষটাকে ?

সানাইওলা বলল,—ভাগ্য। নৈলে বিষড়ের মল্লিকবাবুদের তিন-মহলা বাড়ির চাকর-দাসীদের কোলে চড়ে যার ছোটবেলাটা কাট্‌লো, আজ বুড়ো বয়েসে তাকে বেবুশ্যেপাড়ার পান্তাভাত খেয়ে পেটের খোল ভরাতে হবে কেন বলো ?

—কোথাকার মল্লিকবাড়ী বললে, সেই তাদেরই বাড়ির ছেলে বুঝি ওস্তাদ ?

—ওস্তাদের যখন ষোল বছর বয়েস, সেই তখনও পর্যন্ত তো তাই জানত ওস্তাদ। জানত যে, কর্তার যে ছোট ভাই কলেরায় মরে গেছে, তারই একমাত্র ছেলে ও'। তারপর কর্তা মরে যাবার পর জানতে পারল আসল কথা।

—কী ?

—বাড়ির দাসীর ছেলে ছিল ওস্তাদ। কর্তার ছোট ভাইটা বখা ছিল। তারই বদমাইসিতে দাসীর পেটে জন্ম হয়েছিল ওস্তাদের। সেই অবস্থায় তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দাসীকে। তারপর ছোট ভাই মরে যাবার পর সেই দাসীকে ডাকিয়ে এনে তার ছেলেকে মানুষ করেছিলেন বিধবা ছোট বৌ। ছোট বৌয়ের নিজের পেটে কোনো ছেলে আসেনি তো, তাই সোয়ামীর রক্তে জন্ম ব'লে ওস্তাদকে ঠিক্ নিজের ছেলের মতন করেই মানুষ করেছিলেন বাড়িতে রেখে। তবে, সেই দাসীকে কাশী না বৃন্দাবন কোথায় একেবারে বেপাত্তা করে দিয়েছিলেন। পাছে কোনোদিন তার মুখ দিয়ে জানাজানি হয়ে যায় কথাটা।

—জানাজানি হল কি করে ?

—বড়কর্তা মারা যাবার পর তাঁর শালা বলে দিল সব। ব্যস্—সেই থেকে ওস্তাদ একেবারে।···

সেই বুল্‌কির মা বালতি ভরে জল নিয়ে ফিরে আসতে আসতে চেঁচিয়ে উঠল এবার,—ওস্তাদ জেগে উঠেছে।

সানাইওলা বলল,—যাও এবার।

চাঁপা বলল,—একা যেতে ভয় করছে আমার।

সানাইওলা বলল,—চল, আমিও যাচ্ছি। [ ক্রমশঃ।

# সওদাগর রবীন্দ্রনাথ

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ব্যবসার ক্ষেত্রে পিতামহ দ্বারকানাথের অসাধারণ প্রতিপত্তি অক্লান্ত কর্ম্মী জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে সেই দিকে আকৃষ্ট করিল। তিনি প্রথমে পাট, পরে নীল ও অবশেষে "সরোজিনী" নামধেয় বাষ্প-চালিত ছোট যাত্রী-জাহাজের ব্যবসায় লাভ ও ক্ষতি গণনা করিতে করিতে প্রচুর ঋণভার সঞ্চয় করিলেন এবং সারাজীবন ধরিয়া তাহার পরিসমাপ্তি করিলেন। রবীন্দ্রনাথও জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে মনস্থ করিলেন। কমলার চরণাশ্রিত হেমনলিনীর আকর্ষণে বাংলার কলকণ্ঠ পাপিয়া "ভারতীর" কমলকুঞ্জ হইতে উড়িয়া আসিয়া পাটের ক্ষেতে বাসা বাঁধিবার আয়োজন করিল কিন্তু প্রতিকূল বায়ুতে সে আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল। "যাও লক্ষ্মী অলকায় যাও লক্ষ্মী অমরায়" বলিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তিনি আজ হয়ত সেই অভিমানেই নিজের বসতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবসায়ীরূপে পাইয়াও অভিনন্দিত করিলেন না। ইহা বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী-জাতির সৌভাগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। হয়ত সেখানে প্রশ্রয় পাইলে কবির অনধিকার-চর্চ্চার প্রসারই বৃদ্ধি হইত। উত্তরকালে কবির গুণে চঞ্চলা যেদিন কবিকে অভিনন্দিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেদিনও তিনি একা আসিতে সাহস করেন নাই। সরস্বতীর অঞ্চল ধরিয়াই দেখা দিয়াছিলেন। যাহা হোক, রবীন্দ্রনাথ বিফল মনোরথ হইয়া পাটের ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া 'আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরার ব্যবসা'-এ আবার একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করিলেন। বাণিজ্যের প্রতি কবির মোহ তখনও দুর্নিবার। তাঁহার এক সময়ের মনোভাব অনেকটা এইরূপ—

> কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
> কহ আমায় ধনী,
> তাহা হ'লে সেই বাণিজ্যের
> ক'রব মহাজনী।
>
> *　　*　　*　　*
>
> যাবই আমি যাবই, ওগো
> বাণিজ্যেতে যাবই।
> তোমায় যদি না পাই, তবু
> আর কারে তো পাবই। (ক্ষণিকা)

শুধু পাট নয়, কোমল আলু ও কঠিন ইষ্টক—দুইই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আকৃষ্ট করিতেছিল; কিন্তু আশা-বৈতরণী নদীর পারে যাইতে কোনও সাহায্য পাওয়া গেল না।

তাঁহার ব্যবসায় প্রবৃত্তি একেবারে নিবৃত্তি লাভ করে নাই। কিছুদিনের জন্য সুপ্ত থাকিয়া তাহা শিল্পানুরাগ ও স্বদেশ-প্রেমের মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠিল। বয়কট আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে চৈত্র-মেলার শিল্প বিভাগের আদর্শে হ্যারিসান রোডে ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বদেশী ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠার সময়ে ও বঙ্গভঙ্গ এবং বিলাতী বর্জ্জন যুগে শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী* প্রমুখ আত্মীয় বন্ধুবর্গ যখন বৌবাজারে "ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স" স্থাপন করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ দুটিতেই সানন্দে

* খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার স্বর্গত। প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীরণদেব চৌধুরী এঁর পুত্র।

যোগ দেন। কিন্তু এবারেও আশা মিটিল না। বঁধু আসিলেন না। আসিল 'পিতামহী ভাগ্যদেবীর প্রচুর পরিহাস'। ফলে যথেষ্ট অনটন, বহু বিপদ ও মনক্ষোভ রবীন্দ্রনাথকে বরণ করিয়া লইতে হইল। তাঁহার কুমায়ুন অঞ্চলের উদ্যান-জাত আপেল ও পেয়ার্স (ন্যাসপাতি) সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তাহারাও নাকি এক সময়ে পণ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এ কারবারে কবি কা'কে পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার খাতা-পত্র দেখার সুযোগ না থাকায় বলা কঠিন। অনেকে বলেন যে তাঁহার খরচা পোষায় নাই, আবার কেহ কেহ বলেন যে ফলের রস বৃথা যায় নাই, মধুযায় কিছু মধু সঞ্চিত হয়।

প্রখর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এই সকল বিফলতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মর্মান্তিকই হইল। তিনি আর একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। এবার কিন্তু প্রণালীর বদল হইল। সরস্বতীলব্ধ মূলধনে লক্ষ্মীর আগম-পন্থা প্রস্তুতের চেষ্টা চলিল। তাঁহার নিজ পুস্তক প্রকাশকে ব্যবসায়ে দাঁড় করাইলেন। পুস্তকের বহিরাবরণের পারিপাট্য সাধন ও সচিত্র সংস্করণ, প্রচ্ছদপটের সুব্যবস্থা, কাগজের গুণানুসারে মূল্যের তারতম্য বিধান, বিভিন্ন আকারে পুস্তক প্রকাশন, গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অল্পাধিক রদবদল ও কিছু কিছু যোগবিয়োগ দ্বারা সংস্করণের নবত্বসাধন, এমন কি গণিত বিজ্ঞানের সমবায় বিন্যাসের (Permutation and Combination) নিয়োজন প্রভৃতি নানা উপায়ে বাংলা গ্রন্থের প্রতি জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণের পথ প্রথম তিনিই উন্মুক্ত করিয়া ঐ ব্যবসাটিকে শিল্প-কলায় পরিণত করিলেন। নোবেল পুরস্কারের খ্যাতিও তাঁহার এই ব্যবসায়ের মূলধনকে সমধিক পরিপুষ্ট করিল। এক্ষেত্রে তাঁহার প্রচেষ্টা আশানুরূপ না হইলেও অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হইল। ভাষান্তরিতগ্রন্থ ও সর্বপ্রকার রচনার স্বত্বাধিকারের প্রতি সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি অর্থাগমের পথ প্রশস্ততর করিল। ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীকে পাইয়া চকের জোড়া ঘুঁটি ঘরে উঠিল। বঙ্গের বাণী বিত্তের বেণু ধরিয়া বিশ্বের ভারতী হইলেন। পৈতৃক ব্যবসা জমিদারীতে রবীন্দ্রনাথের যে কতটা নৈপুণ্য ও সাফল্য, তাহা অন্যত্র বলিয়াছি। "ধাবড়া কোল" কলিয়ারীর মালিক রবীন্দ্রনাথ জমিদারী হিসাবেই তাহাকে ব্যবহার করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর মধ্যে বাণিজ্যে সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি ব্যক্তি বিশেষের সাময়িক খ্যাতির পরিচায়ক, লোকের কথোপকথনে মাত্র ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে ইহাকে হেরেডিটারি অনার্স (Hereditary honours) দেওয়া হয়। কুলমর্য্যাদা চাপা দিয়া ব্যবসায় সাফল্যটা বংশানুক্রমিক পদবীর দ্বারা গৌরবান্বিত করা হয়। এমন কি ইংরাজ সরকারের কয়েদীর দারোগার পদগরিমাটাও পুরুষানুক্রমিক পরিচয়ে স্থান পাইয়াছে, তাই আমরা লিমজি, জেলার (Jailor) নামও পাইয়া থাকি। 'ভিন্ন রুচিহি লোকঃ'। গত শতাব্দীতে স্বনামধন্য মতিশীলও বোতল ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি কিন্তু মম্বাইয়ের দারুওয়ালা, উনওয়ালা, বটলীভাই বা গান্ধী প্রভৃতি ব্যবসায়িক প্রতিপত্তির ধ্বজা-স্বরূপ কোন বংশগত পদবী প্রাপ্ত হন নাই। তাই তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) খনির দ্রব্য মণির মূল্যে বিকাইলে লোকের মুখে মুখে "ন্যাকড়া হরিশ", "কয়লা উমেশ", "বালতি নন্দী"র ন্যায় 'কয়লা রবির' প্রসঙ্গও শুনা যাইত।
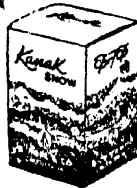
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

## ছয়

।। খ ।।

নাচ গানের আসর ভাঙ্গে অনেক রাতে।

আসর ঠিক ভাঙে না।

চুর হয়ে মদের নেশায় একে একে সব আসরের ঢালা ফরাসের 'পরে গড়িয়ে পড়ে।

উল্লাস থেমে যায়। কণ্ঠ সকলেরই নিস্তেজ হয়ে আসে।

হাত পা নাড়াবার শক্তি থাকে না, একে একে সকলে গড়িয়ে পড়ে এলোমেলো ভাবে বিস্তৃত ফরাসের সে যেখানে ছিল। কেবল গড়িয়ে পড়ে না একটি লোক।

মহেন্দ্র সাহা।

আশ্চর্য নেশা করার ক্ষমতা ঐ মহেন্দ্র সাহার।

আকণ্ঠ মদ্যপান করলেও সে কোনদিন বেএক্তিয়ার হয়ে পড়ে না। যত মদ্যপান করে তত যেন সে ধীর স্থির হয়ে যায়।

চুপ চাপ বসে থাকে। আর বসে বসে নেশারক্তিম আধা আধা দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায় আর মিটি মিটি হাসে।

সে রাত্রেও একে একে সকলেই যখন গড়িয়ে পড়লো ফরাসের উপর, শূন্য পাত্রটা পুনরায় ভরে নিয়ে মিটি মিটি হাসতে হাসতে পূর্ণপাত্র আবার ওষ্ঠের সামনে তুলে ধরে চুমুক দিল।

দীর্ঘ একটা চুমুক।—এক চুমুক দিয়ে গ্লাসটা সামনের রূপার থালার 'পরে নামিয়ে রাখতে গিয়ে নজরে পড়লো কস্তুরীবাঈকে। কস্তুরীবাঈও তখন গান শেষে তাকিয়ে ছিল এক দৃষ্টে মহেন্দ্র সাহার দিকে।

একটি মাত্র মানুষ যে তখনো জেগে বসেছিল।

সে তখনো নেশায় সম্বিৎ হারিয়ে ফরাসের 'পরে লুটিয়ে পড়েনি অন্যান্য সকলের মত।

মহেন্দ্র সাহা তাকিয়ে ছিল কস্তুরীবাঈয়ের সুর্মা-টানা কালো চোখের দিকে, টানা বঙ্কিম কালো ভ্রূযুগল। দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে ঝরা কুঙ্কুমের রক্ত টিপ। চিকন ওষ্ঠে প্রসাধনের রক্তরাগ।

চেয়ে থাকে চার জোড়া চোখ পরস্পর পরস্পরের দিকে। নিস্তব্ধ রাত্রি।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন চারিদিকে থম থম্ করছে।

মৃদু ক্লান্ত কণ্ঠে কস্তুরীবাঈ বলে, যদি অনুমতি হয়তো বিশ্রাম করি?

স্মিতকণ্ঠে বলে মহেন্দ্র সাহা, ঘুম আসছে বুঝি?

একটা ক্লান্তির হাই তোলে কস্তুরীবাঈ।

রাত তো বেশী হয়নি সুন্দরী।

কস্তুরী মৃদু হেসে বলে, রাত্রি তৃতীয় প্রহর—এবারে শয়ন না করলে কাল আবার মজুরা খাটতে যাবো কি করে। পাল্কী দ্বারে আনবার আদেশ হোক—

হাসে মহেন্দ্র সাহা। মজুরাতো কাল রাত্রে, আজ এত ত্বরা কেন?

কিন্তু বিশ্রামের ত দরকার!

এইখানেই শয়ন কর—বলতো ঐ ঝাড়ের বাতি নিভিয়ে দিই—

বিলোল কটাক্ষে হাসে কস্তুরীবাঈ, না—

না কেন! মজুরার জন্য তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, কাল সন্ধ্যায়ও এখানেই মজুরা দিও।

তাই কি হয় সাহা মশাই, কথা দেওয়া আছে—

দিলেই বা কথা।

আগাম অর্থ নেওয়া আছে—

আমি দেবো, ফিরিয়ে দিও। না হয় দ্বিগুণ ফিরিয়ে দিও।

তা হয় না।

হয় না বুঝি?

না। কস্তুরীবাঈ কখনো কথা দিয়ে কথার খেলাপ করে না।

কিন্তু আমি যদি না যেতে দিই তোমায়?

বলতে বলতে মহেন্দ্র সাহা সুরার বেলোয়ারী পাত্র তুলে তাতে একটি দীর্ঘ চুমুক দিল।

যেতে দেবেন না?

না।

মহেন্দ্র সাহা উঠে দাঁড়ায়! বোধ করি ঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়ায়।

শশব্যস্তে কস্তুরীবাঈ বলে ওঠে, চললেন কোথায়?

কিন্তু জবাব দিতে গিয়েও জবাব দেওয়া হয় না মহেন্দ্র সাহার। ভৃত্য বৃন্দাবন ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢোকে।

হুজুর—হাঁপাতে থাকে বৃন্দাবন।

অমন করে হাঁপাচ্ছিস কেন হারামজাদা, হয়েছে কি ?

রক্ত।

রক্ত ?

হ্যাঁ হুজুর, রক্ত !

কি বলচিস হতভাগা। রক্ত কি ?

শিগ গিরি চলুন হুজুর, রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে ? কোথায় ? কে ?

ঐ ঘরে হুজুর, যে ঘরে—সেই তিনি। ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল তুলে দিতে বলেছিলেন হুজুর, দিয়েছিলাম। একটু আগে খাবার নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা খুলে দেখি, মেঝেতে তিনি পড়ে আছেন আর রক্তে সারা ঘরের মেঝে থৈ থৈ করছে—।

হঠাৎ মেজাজ যেন তিরিক্ষি হয়ে ওঠে মহেন্দ্র সাহার।

ভৃত্য বৃন্দাবনের দিকে চেয়ে মুখ ভেংচে কর্কশকণ্ঠে বলে ওঠে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তো আমি কি করবো ?

হুজুর—চলেন একবার !

মিনতি জানায় ; যেন কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে বৃন্দাবন।

ধমক দিয়ে ওঠে মহেন্দ্র সাহা বৃন্দাবনকে। যা, যা—দেখগে, যদি মরে গিয়ে থাকে তো দ্বারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে পা ধরে টেনে গঙ্গায় গিয়ে ফেলে দিয়ে আয়। যত সব ঝুট ঝামেলা।

কস্তুরীবাঈ এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র সাহা ও বৃন্দাবনের কথাবার্তা শুনছিল। ব্যাপারটা সে কিছুটা আন্দাজ করলেও ঠিক বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আর সে যেন চুপ করে থাকতে পারে না। বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে শুধায়, কি হয়েছে ?

বৃন্দাবন কস্তুরীবাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝে, তা সেই জানে, তবে সেখানে যেন আশ্বাসের একটা আলো দেখতে পায়।

বলে, ক্ষীরোদা বোধ হয় এতক্ষণ মরেই গেছে বাঈজী সাহেবা।

ক্ষীরোদা ! ক্ষীরোদা কে ?

বিস্ময়ের প্রশ্ন করে কস্তুরীবাঈ।

বৃন্দাবন যেন কি জবাবে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে ওঠে মহেন্দ্র সাহা। বৃন্দাবন, এই হারামজাদা, গেলি এখান থেকে ?

বৃন্দাবন ঘুরে দাঁড়ায়, বোধ করি ঘর থেকে অতঃপর বের হয়ে যাবার জন্যই।

কিন্তু পশ্চাৎ থেকে ডাকে কস্তুরীবাঈ। দাঁড়াও, বৃন্দাবন—

বৃন্দাবন সে ডাকে আবার দাঁড়াল।

চল, আমি দেখে আসি—

আপনি যাবেন বাঈজী সাহেবা ?

হাঁ, চল।

তুমি আবার কোথায় যাবে কস্তুরী ? বাধা দেয় মহেন্দ্র সাহা।

কস্তুরী কিন্তু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, বৃন্দাবনকে বলে, চল।

তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি কস্তুরী ? একটা সামান্য দাসীর কি হয়েছে না হয়েছে—ও বৃন্দাবন আর দ্বারোয়ানই ব্যবস্থা করতে পারবে।

মৃদু হেসে মহেন্দ্র সাহার মুখের দিকে তাকিয়ে কস্তুরী বলে, হয়ত পারবে, তবু একবার দেখে আসি সাহা মশাই—

না, না—

কিন্তু কস্তুরীবাঈ আর কোন জবাব দেয় না। মহেন্দ্র সাহার দিকে ফিরেও তাকায় না, ঘর থেকে সোজা বের হয়ে যায় !

ঘরের মধ্যে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে মহেন্দ্র সাহা।

বৃন্দাবনের পিছনে পিছনে ঘরের মধ্যে ঢুকে সামনের মেঝেতে দৃষ্টি পড়তেই যেন হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে যায় কস্তুরীবাঈ।

মেঝেতে লাল রক্তের যেন একেবারে বন্যা বয়ে চলেছে এবং সেই রক্তবন্যার মধ্যে পড়ে এক নারী ছট্‌ফট্‌ করচে।

জ্ঞান বোধ হয় ফিরে এসেছে তখন ক্ষীরোদার, গোঙানীর মত একটা মৃদু যন্ত্রণার কাতোরক্তি করছিল থেকে থেকে।

হঠাৎ ঐ অত রক্ত দেখে কস্তুরীর মাথাটা বুঝি মুহূর্তের জন্য ঝিম ঝিম করে উঠেছিল। তার পরই সে সম্বিৎ পেয়ে সব কিছু ভুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সেই রক্তের মধ্যে পরিধেয় দামী শাড়ীটা নিয়ে বসে পড়ল ভূলুণ্ঠিতা ক্ষীরোদার শিয়রের সামনে। ধীরে ধীরে ক্ষীরোদার মাথাটা নিজের কোলের 'পরে তুলে নিল।

ক্ষীরোদা।

মৃদু মমতাভরা কণ্ঠে ডাকে কস্তুরী।

কে !

অতি কষ্টে যেন চোখ মেলে তাকাল ক্ষীরোদা।

নারী হয়ে কস্তুরীর ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হয়নি খুব। অত রক্ত আর ক্ষীরোদার অবস্থা দেখেই অনুমানে বুঝতে পেরেছিল কস্তুরী, অন্তঃসত্ত্বা ছিল ক্ষীরোদা, হঠাৎ পড়ে গিয়েই বা অন্য কারণেই হোক অতর্কিত আঘাতে গর্ভপাত হয়ে গিয়েছে। ঐ অত রক্তস্রাব তারই ইংগিত।

কস্তুরীবাইয়ের অনুমানটা মিথ্যা নয়। সত্যিই ক্ষীরোদা অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

ক্ষীরোদা !

উঁ !

আবার অতি কষ্টে যেন চোখ মেলে তাকাল ক্ষীরোদা কস্তুরীর মুখের দিকে। ক্ষণকাল ঝাপসা চোখে চেয়ে ওর মুখের দিকে শুধায়, তুমি কে ?

আমি কস্তুরী বাঈজী।

নষ্ট হয়ে গিয়েছে না ?

কি জবাব দেবে ক্ষীরোদার ঐ প্রশ্নের কস্তুরী।

তাই ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অন্য প্রসঙ্গ তোলে, বড় কি কষ্ট হচ্ছে ক্ষীরোদা ?

কষ্ট !

হাঁ।

না তো।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্র সাহা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল।

অত রক্ত আর ক্ষীরোদার ঐ অবস্থা দেখে তখন তার গলাটা শুকিয়ে উঠেছে, মাথাটা ঘুরতে শুরু করেচে।

কস্তুরী মহেন্দ্র সাহার দিকে তাকিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে দেখছেন কি সাহা মশাই—একজন কবিরাজ শীগ গির ডেকে নিয়ে আসুন—

মহেন্দ্র সাহা কোন মতে যেন টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মহেন্দ্র সাহা ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে কস্তুরী বলে, একটা শাড়ী বা ধুতি নিয়ে আসতে পার বৃন্দাবন!

এখুনি আনচি—

বৃন্দাবন পাশের ঘরে গিয়ে পোর্টম্যানটা ভর্তি যে সব দামী দামী শাড়ী ছিল মহেন্দ্র সাহার ক্ষীরোদাকে দেওয়া, তার থেকেই একটা শাড়ী বের করে নিয়ে এলো।

এই নিন—

বৃন্দাবন শাড়ীটা কস্তুরীর হাতে দিল।

কস্তুরী অনেক কষ্টে ক্ষীরোদার পরিধেয় রক্তমাখা শাড়ীটা বদলে আবার বৃন্দাবনকে ঘরে ডাকল।

ওকে একটু আমার সঙ্গে ধর বৃন্দাবন—চল ঐ পালঙ্কের 'পরে শুইয়ে দিই—

ধরা-ধরি করে দুজনে ক্ষীরোদাকে পালঙ্কের 'পরে শুইয়ে দিল।

যাও বৃন্দাবন, বালতি করে জল এনে রক্তটা ধুয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করে ফেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে মহেন্দ্র সাহা একজন কবিরাজকে সঙ্গে করে এসে ঢুকল।

কবিরাজ ক্ষীরোদার নাড়ী পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বললেন, গর্ভপাত—

মহেন্দ্র সাহা চকিতে তাকায় কবিরাজের মুখের দিকে।

নাড়ীর গতি অতীব ক্ষীণ—

উৎকণ্ঠিতা কস্তুরী কবিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায়, বাঁচবে তো কবিরাজ মশাই?

বলা দুঃসাধ্য। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে রোগিণী অতীব দুর্বলা হয়ে পড়েছেন—আমি ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, প্রহরে প্রহরে সেই ঔষধ খাইয়ে যান—

কবিরাজ ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ক্ষীরোদা আবার এখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

তিন দিন তিন রাত্রি এক ভাবে কস্তুরী ক্ষীরোদার শিয়রের ধারে বসে রইলো।

যাবার কথা সে যেন ভুলেই গিয়েছিল।

স্নান নেই, আহার নেই, ক্লান্তি নেই যেন কস্তুরীবাঈয়ের।

চতুর্থ দিন রাত্রে ক্ষীরোদা চোখ মেলে তাকাল। আমি কোথায়?

ক্ষীরোদার কপালে সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে কস্তুরী বলে, ঘরেই আছো তুমি!

কোথায়?

সাহা মশাইয়ের বাগান বাড়িতে!

ক্ষীরোদা ক্লান্তিতে আবার চক্ষু বোজে।

কিছু খাবে ক্ষীরোদা ?

একটু জল !

কস্তুরী জলপান করায় ক্ষীরোদাকে।

আরও খাবে ?

আর একটু।

তুমি কে ?

আমি বাঈজী কস্তুরী—

একটু পরে হঠাৎ ক্ষীরোদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

ছিঃ কাঁদে না।

চোখের জল মুছিয়ে দেয় ক্ষীরোদার সযত্নে নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে কস্তুরী বাঈ।

কেন, কেন তুমি আমাকে বাঁচালে ?

মরতে চাও ক্ষীরোদা ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—মরতে দিলে না কেন আমাকে ? কেন আমাকে বাঁচালে ?

কিন্তু তাতেই কি তুমি শান্তি পেতে ক্ষীরোদা ?

পেতাম। নিশ্চয়ই পেতাম !

বুঝতে পারচি ভাই, এ তোমার নিছক অভিমানের কথা। কিন্তু কার উপরে অভিমান তোমার বলতো। ঐ পশু মহেন্দ্র সাহার 'পরে।

না, না, ওর কাছে তো আমি স্বেচ্ছায়ই এসে ধরা দিয়েছিলাম।

স্বেচ্ছায় এসে দেহটাই তোমার ধরা দিয়েছিল ক্ষীরোদা, মনটাতো ধরা দেয়নি তোমার। তাছাড়া মরবেই বা কেন তুমি ?

মরবো না তো কি নিয়ে বেঁচে থাকবো ! আমার যে আর কিছু নেই—সর্বস্ব একজন কেড়ে নিয়েছে।

ওসব কথা এখন থাক। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

ক্ষীরোদার দু' চোখের কোণ বেয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

ছিঃ আবার কাঁদে ! কেঁদো না লক্ষীটি ! চুপ করো।

আরো দুইদিন পরে।

ক্ষীরোদা অনেকটা সুস্থ হয়েছে।

উঠে বসতে পারে।

সন্ধ্যার দিকে চুপচাপ শয্যার 'পরে বসে জানালা-পথে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে ছিল।

কস্তুরী এসে ঘরে ঢুকল, কিন্তু ক্ষীরোদা টেরও পায় না।

মৃদুকণ্ঠে ডাকে কস্তুরী, ক্ষীরোদা—

দিদি !

এবারে তাহলে চলি ক্ষীরোদা।

তুমি চলে যাবে ?

হ্যাঁ, আট দিন হয়ে গেল বাড়ি ঘর ছেড়ে পড়ে আছি এখানে।

না, না—তুমি যেও না—

হাত বাড়িয়ে ক্ষীরোদা কস্তুরীর ডান হাতটা চেপে ধরে।

না গেলে চলবে কেন ভাই ! সাহা মশাই এখানে আমাকে চিরদিন থাকতে দেবে কেন ?

নিশ্চয়ই দেবে—

পাগল !

তবে তুমি আমাকে নিয়ে চল।

নিয়ে যাব, কোথায় ?

তোমার সঙ্গে !

আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি ?

কেন তোমার বাড়িতে !

আমার বাড়ি ? বাড়ি আমার কোথায় ক্ষীরোদা। বাঈজী আমি, আজ এখানে কাল সেখানে—যখন যে ডাকে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে নেচে বেড়াই—

তুমি যেখানে যাবে সেখানে যাবো। তোমার দাসীর কাজ করে দেবো। আমাকে নিয়ে চল।

ছিঃ, তা কি হয় ?

কেন হবে না ! খুব হবে।

না। তা হয় না। তাছাড়া যে অপমানের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এ জায়গা ছেড়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইছো ক্ষীরোদা, সে জ্বালা তো তোমার আমার কাছে গেলেও নিভবে না। দুঃখ করো না—দুঃখ, বেদনা আর লজ্জা সইবার জন্যই তো আমাদের মেয়েদের জীবন।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে কস্তুরী ক্ষীরোদার।

কস্তুরীবাঈ চলে গেল। এবং কস্তুরী চলে যাবার পরদিনই সন্ধ্যায় মহেন্দ্র সাহা নয়দিন পরে এসে ক্ষীরোদার ঘরে ঢুকলো।

একটা কথা বলছিলাম ক্ষীরোদা।

কি !

এখানে আর তোমার থাকা চলবে না।

সাহা মশাই !

আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে ক্ষীরোদা।

হ্যাঁ ক্ষীরোদা,—কাল বা পরশু চলে যেতে হবে তোমাকে।

কিন্তু কোথায় যাবো আমি ?

কোথায় যাবে তার আমি কি জানি ? যেখানে মন চায় তোমার যাবে। তবে একেবারে শূন্য হাতে তোমাকে আমি যেতে বলছি না—বলতে বলতে একটা রুমালে বাঁধা কিছু টাকা জামার পকেট থেকে বের করে ক্ষীরোদার শয্যার 'পরে নামিয়ে রাখল মহেন্দ্র সাহা—এই টাকা দিচ্ছি, বুঝে খরচ করতে পারলে কটা মাস চলে যাবে তোমার—

না, না—ও টাকা আমি চাই না ! দয়া করুন—আমাকে দয়া করুন। এভাবে অসহায় আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

ভয় পাচ্ছো কেন ক্ষীরোদা, শরীরটা ভেঙ্গেছে—ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলে আবার মানুষ একজন ঠিক তোমার জুটে যাবে—

মহেন্দ্র সাহার শেষের কথাগুলো যেন এক একটা চাবুকের মতই ক্ষীরোদার সর্বাঙ্গে সপাং সপাং করে পড়লো।

একটি কথাও ওর মুখ দিয়ে আর বের হয় না।

বোবা দৃষ্টিতে মহেন্দ্র সাহার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কেবল।

তাহলে ঐ কথাই রইলো—বলে মহেন্দ্র সাহা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

[ ক্রমশঃ।

পল্লীগ্রাম

—আনন্দ মুখোপাধ্যায়

# শিশুমহল

—এন, রামকৃষ্ণ

—কে. সা
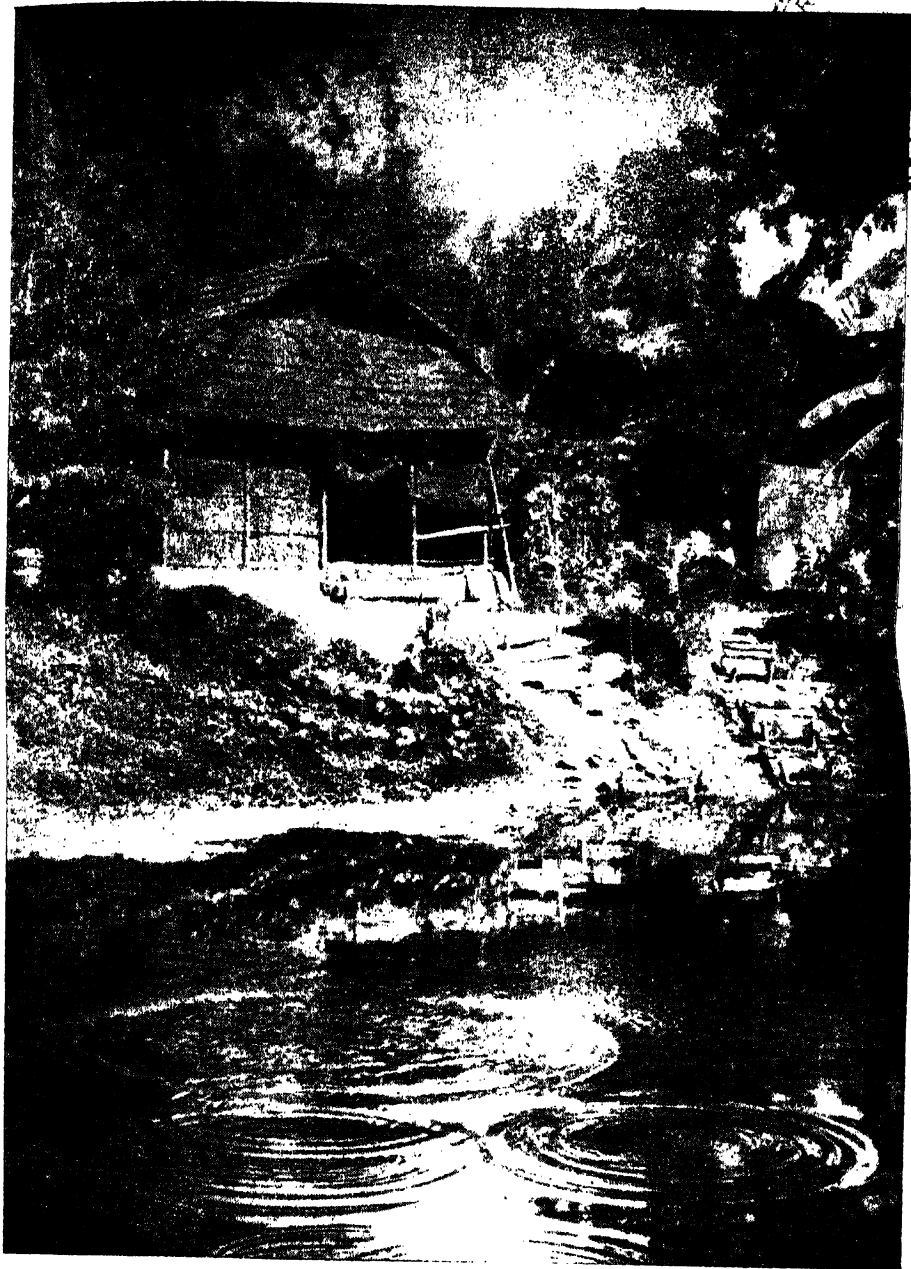
—রজতলাল মুখোপাধ্যায়

—রমেন বোস

—সমীরেন্দ্রনাথ সিং

—এন, রামকৃষ্ণ
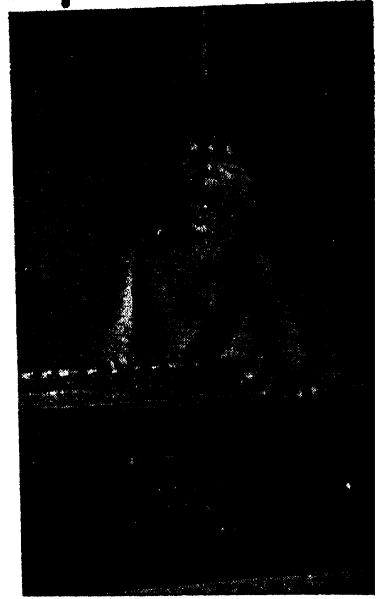
—সবিতা মিত্র

# শি শু ম হ ল

—পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়
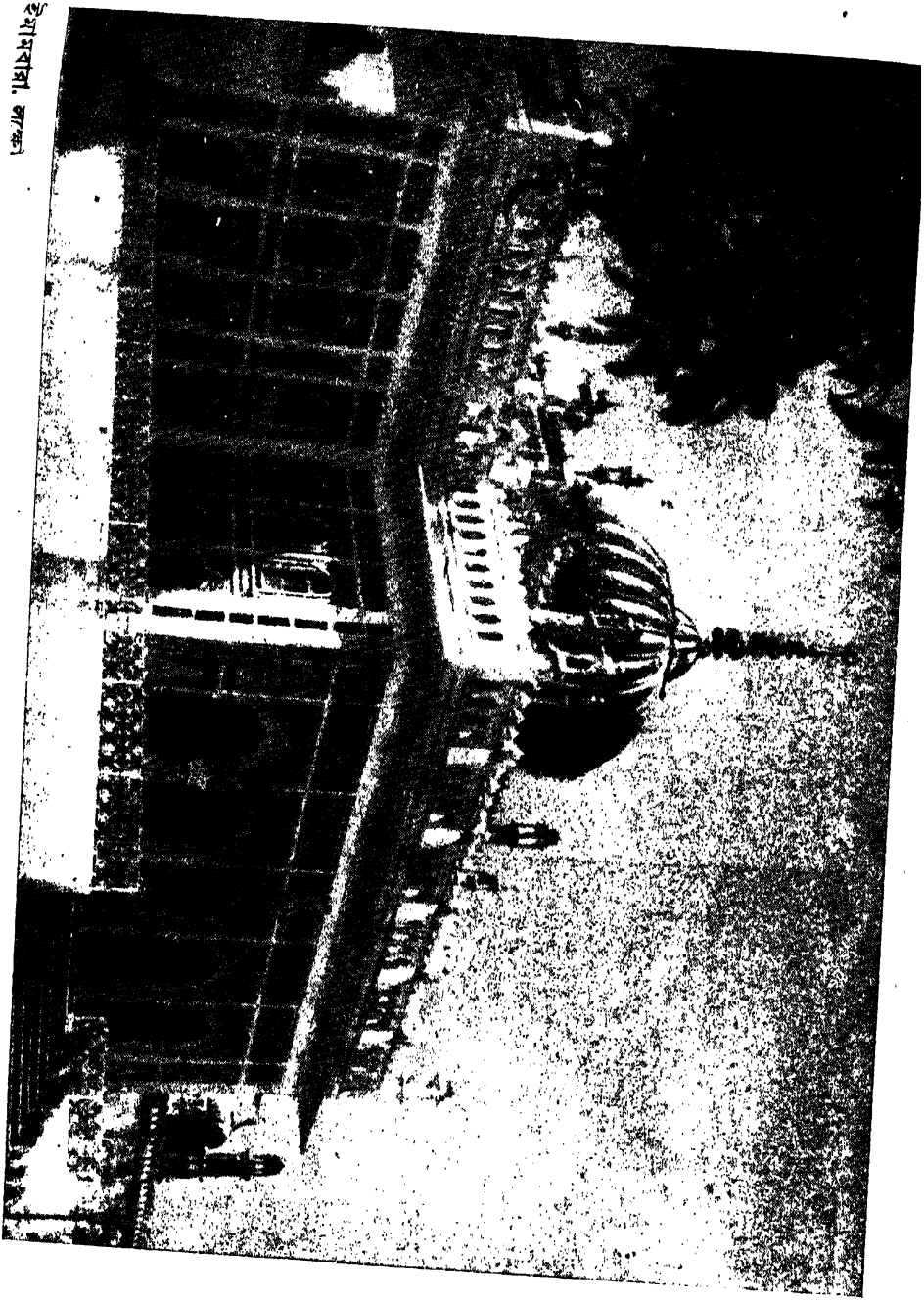
—হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

# এক যে ছিল রাজা

## জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। একদিন একটি মাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে নিজের রাজধানীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখলেন, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসে বসে ধান ভান্‌ছে। আর ভানা হয়ে গেলে তুষগুলি ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। নূতন ধানের মিষ্টি গন্ধে চারিদিক ভরপুর। রাজার এক অদ্ভুত খেয়াল হলো। তাঁর ইচ্ছে হলো ঐ তুষ তিনি খেয়ে দেখবেন। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে অনুচরটিকে বললেন, ঐ তুষ কিছু কুড়িয়ে আনতে। যার এমন সুন্দর গন্ধ তিনি আহার করে দেখবেন।

আদেশ শুনে অনু[illegible] স্তত হয়ে গেলো। নিজেকে সামলে নিয়ে বিনীত স্বরে বলল, মহারাজ। একি আপনার গ্রহণযোগ্য, এ তো গরু ছাগলে খায়।

রাজা বললেন, কোন প্রতিবাদ শুনতে চাই না, আদেশ দিয়েছি নিয়ে এসো।

দ্বিরুক্তি না করে অনুচর সোনার পাত্রে তুষ এনে মহারাজের সম্মুখে রাখলো।

গভীর তৃপ্তির সঙ্গে মহারাজ সেই তুষ খেলেন।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে—অনুচরকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, দেখো খবরদার। এ কথা প্রকাশ করো না। যদি ঘুণাক্ষরেও এ কথা প্রকাশ পায় তো তোমার মাথা কাটা যাবে।

কিন্তু অনুচরের রাত্রে ঘুম নেই—দিনে আহার নেই। গোপন কথাটা মনের মধ্যে কেবলি অশান্তি সৃষ্টি করছে। কথাটা বলে ফেলবার জন্য ছট্‌ ফট্‌ করছে, অথচ বলতে পারছে না। প্রকাশ হলেই মাথা কাটা যাবে।

কথাটাকে ভোলবার জন্যে খাওয়া দাওয়ায় মন দিতে যায়, খেতে পারে না। ঘুমুতে চেষ্টা করে, ঘুমুতে পারে না। গান গাইতে চেষ্টা করে, তাও পারে না। একি বিপদ!

কি করা যায়? তখন ভাবলো, আমি নিজের মনে মনে যদি ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলি, তাতে কি ক্ষতি?

ভাবতে ভাবতে একদিন যায়—দু'দিন যায় তিন দিন যায়। ও আর থাকতে পারে না। এদিকে শরীর দিনকের দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা নির্জন স্থান খুঁজতে—যেখানে বললে কেউ আর শুনতে পাবে না।

এমন নির্জন স্থান কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন সে একটা নৌকায় উঠে নিজেই হাল বেয়ে মাঝ নদীতে এলো। বলতে গিয়ে ভাবলো জেলেরা যদি শুনে ফেলে তা হ'লে তো আমার মাথা কাটা যাবে। আবার ফিরে এলো। এবার গেল কবর স্থানে।

বলতে গিয়ে ভাবলো, যদি কবর স্থানের লোকেরা শুনে ফেলে? বলা হলো না।

শেষ কালে, সে গভীর বনে চলে গেল। সেখানে খুঁজতে খুঁজতে এক প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে একটি ফুটো দেখতে পেলো। চারিদিক ভালো করে দেখে নিয়ে—ফুটোর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে চুপে চুপে বলে উঠলো—মহারাজ ধানের তুষ খেয়েছেন!

মহারাজ ধানের তুষ খেয়েছেন! বলে ফেলে মনটা হাল্কা হয়ে গেল। সে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে এলো।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। রাজপ্রাসাদের জয়ঢাক বহু ব্যবহারে পুরাতন হয়ে গেছে। মহারাজ আদেশ দিলেন, একটা নূতন জয়ঢাক তৈরী কর, এর আওয়াজ নষ্ট হয়ে গেছে।

ঢাক নির্মাতা গভীর বনে গিয়ে অনেক বেছে বেছে নিজের পছন্দ মতো, একটা প্রকাণ্ড গাছ কেটে তার গুঁড়িটা নিয়ে এলো। আর সেই কাঠ কেটে তৈরী করলো একটি চমৎকার সুন্দর কারুকার্য করা জয়ঢাক।

জয়ঢাক সম্পূর্ণ হলো, রাজপ্রাসাদে খবর গেলো।

রাজা-প্রজা সভাসদ পাড়া-প্রতিবেশী যে যেখানে ছিল, সকলেই এসে ঢাক দেখে প্রশংসা করলো। এক বাক্যে স্বীকার করলো, এমন সুন্দর ঢাক আর হয় না।

এবার জয়ঢাকে আঘাত দেওয়া হবে। মহারাজ স্বয়ং দেবেন। রাজ্য শুদ্ধ নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সভা লোকে লোকারণ্য, সকলে স্তব্ধ ভাবে প্রতীক্ষা করছে, প্রথম ধ্বনি শোনবার জন্য।

রাজা ঢাকে আঘাত দিলেন—গম্‌ গম করে ধ্বনি উঠলো, মহারাজ ধানের তুষ খেয়েছেন। মহারাজ ধানের তুষ খেয়েছেন! রাজ্য শুদ্ধ লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

জনসাধারণ রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো তিনি অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঢাক নির্মাতা তো কিছুই জানতো না। সে সেই গাছটিকেই কেটে নিয়ে এসেছিল যেটাতে অনুচরটি তার গোপন কথা বলেছিল।

# ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

## দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

### ছয়

ভোরের পাখী ডাকল বুঝি

বাঁকুড়া গিয়েছ কখনো? বাঁকুড়া থেকে দূরে বহু দূরে দেখতে পাবে দিগন্তে বিলীন এক ধোঁয়াটে পাহাড়। নাম শুশুনিয়া পাহাড়। এই পাহাড়ে পাওয়া গেছে একটি শিলালিপি, লেখা আছে,—

"পুষ্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণঃ পুত্রস্য

মহারাজঃ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ

চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেনাতি সৃষ্টঃ।"

কথাগুলোর সংস্কৃত পোষাক ছাড়িয়ে বাংলা পোষাক পরালে ওদের চেহারা হবে: পুষ্করণাধিপ সিংহবর্মার ছেলে চন্দ্রবর্মা এটি তৈরী করিয়েছেন। চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর দাস শ্রেষ্ঠ তিনি।

ঐ সূত্রটি থেকে তা হলে জানতে পারলাম, বাংলার এক রাজা চন্দ্রবর্মা! তাঁর বাবার নাম সিংহবর্মা। এই সিংহবর্মা রাঢ় অঞ্চলে মুরুণ্ডশাসকদের পরাজিত করে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্য খুব পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাঁর পর রাজা হন চন্দ্রবর্মা। চন্দ্রবর্মা যুবক। সবে রাজা হয়েছেন। ধারে পাশের রাজারা ভাবলেন এই সুযোগ। একে সমূলে বিনষ্ট করা যাক। দল বেঁধে সব চন্দ্রবর্মাকে আক্রমণ করলেন। চন্দ্রবর্মা তাঁদিকে পরাস্ত করলেন। তাঁর শক্তির পরিচয় দিলেন। তাঁর রাজ্য বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফরিদপুরে কোটালিয়া গ্রামে একটি দুর্গ ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল পুষ্করণে। সুশুনিয়া পাহাড় থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে পঁচিশ মাইল গেলে দেখতে পাবে পোখর্ণা গ্রাম; এই গ্রামেই পুষ্করণের অন্ধকার স্মৃতি।

*সিংহবর্মার রাজত্বকালে বাংলার একাংশে শ্রীগুপ্ত পত্তন করেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের। চীনা পর্যটক ইৎসিংএর মতে, বরেন্দ্রভূমে। সমুদ্রগুপ্ত পরে চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে সমস্ত বাংলা দেশে গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।*

চতুর্থ শতক থেকে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন। গুপ্ত আমলে বাংলা দেশে দীনার নামে সোনার টাকা আর রূপক নামে রূপার টাকা চলত। সাধারণ গৃহস্থরাও টাকা দিয়ে জমি কেনা বেচা করত। এই সময় বাণিজ্যের বেশ সমৃদ্ধি ঘটে। রাঙামাটির বণিক বুধগুপ্ত এ সময় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মালয়ে গিয়েছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অনেক নগর গড়ে উঠেছিল। নগরের লোকেরা লম্বা লম্বা নখ রেখে আঙুলের সৌন্দর্য চর্চা করতেন। আঙুলে রঙও লাগাতেন। শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীরাই ছিলেন সমাজে প্রভাবশালী। তখনকার বাঙালী সমাজই ছিল শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য নির্ভর। বাঙালী তখন ঘরকুনো ছিল না, সে যুগের এক ভারতীয় রাজা বাঙালীদের বলেছেন, "সমুদ্রাশ্রয়ান্।" মহাকবি কালিদাস বাঙালীদিগকে বলেছেন "নৌসাধনোদ্যতান্।" বাংলায় তখন নৌ-শিল্প বিখ্যাত ছিল। নৌকো জাহাজ তৈরীর অনেক পোতাশ্রয় ছিল। যাতায়াত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন ছিল নৌযান। এ যুগের বাংলা সম্বন্ধেই বুঝি কবি লিখেছেন,—

"সপ্তডিঙ্গার বঙ্গদেশ

সিন্ধু তরিয়া রচিল একদা দেশে দেশে নব উপনিবেশ।"

বাংলা ছিল নদীমাতৃক দেশ। নদীতে ছিল জলের স্বচ্ছল গতিবেগ। এই নদীই যেন ছিল বাঙালীর শিরা-উপশিরা। তার শিরা উপশিরায় ধ্বনিত হোত সমুদ্রের সুর। খৃষ্ট জন্মাবার অনেক আগে থেকে খৃষ্ট জন্মাবার অনেক পর আটশো বছর বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণ-যুগ। এরপর আর সে যুগ ফিরে আসে নি। এখন,—

"আমাদের সমুদ্র কোথায়?

টিম্ টিম্ করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।

সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা;—

—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।"

কড়ি ছিল এ সময় মুদ্রার নিম্নতম মান। সাধারণ কেনা কাটায় লোকে কড়ি ব্যবহার করত। জমি কেনা বেচার দলিল—পত্র রাখবার জন্যে একজন রাজ কর্মচারী ছিলেন, তাঁর নাম পুস্তপাল; জমি সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্রের দপ্তরের মালিক ছিলেন তিনি। জমির সীমা, স্বত্ব, জরিপ সমস্ত খবর তিনি লিখে রাখতেন।

গুপ্তরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। পঞ্চম শতাব্দীতে গোটা বাংলা দেশ ছিল গুপ্তরাজাদের অধীন। দলে দলে ব্রাহ্মণ বাংলার বুকে আসতে লাগলেন, ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মোত্তর ভোগ করতে লাগলেন। আর তার সঙ্গে তাঁদের কাজে হোম পূজা অধ্যয়ন করতে লাগলেন। রাজা, সামন্ত, বণিক ব্রাহ্মণদিকে ভূমি দান করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর সভ্যতার প্রধান অঙ্গ। এই ধর্মকে কেন্দ্র করে সমাজ ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে সাথে এগুলিও বাংলার বুকে আসতে লাগল। বাংলার রাজন্য সমাজে সে প্রতিষ্ঠা পেল বটে, জন সমাজে তাকে সহজে বরণ করে নিল না। *কাছে কাছে থাক কিছুদিন, দেখি তোমার হাবভাব, বুঝি তোমার মহিমা, তারপর আপনা আপনি দেখবে তুমি আমাদের দখল করে নিয়েছ। আমরা ধরা দিতেই তো আছি, তোমার ধরবার ক্ষমতা কেমন দেখাও।—জনগণের এই খোল সাফ কথা।* আর রাজন্য সমাজ রাজধর্মকে সহজেই বরণ করে নিল। বড়লোকের হাতী পোষা স্বভাব। আছে জমি, আছে ধন। অনেকই আছে। যা চাই তার চেয়েও বেশী। তার কিছু দিয়ে দিলাম ব্রাহ্মণকে। খান, ঘুমোন আর আমাদের উন্নতি কামনায় যাগযজ্ঞ করুন। পারমার্থিক মঙ্গল কামনা করুন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করুন। উপরওয়ালাদের এই ভাব। গুপ্ত যুগে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ক্রমশ বর্তমান হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত হচ্ছিল। তার রেশ বাংলাতেও এসে পৌঁছচ্ছিল। গুপ্ত যুগে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সভ্যতা চরম উন্নতি লাভ করেছিল। তারই প্রসার বাংলাদেশে হচ্ছিল। কিন্তু আগেই বলেছি, জনসাধারণ হঠাৎ তা বরণ করে নেয়নি।

গুপ্তরাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও, অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ছিল না। বরং অন্য ধর্মের প্রতি তাঁরা সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হিন্দু দেবদেবীর মন্দির গড়ে উঠেছে একদিকে, অন্যদিকে বৌদ্ধ বিহারও গড়ে উঠেছে। হিন্দুধর্মের প্রবল বন্যায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে চলে গেলেও, বাংলার বুকে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সমানে সমাজে কি তার চেয়ে বেশী বজায় ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন নামে এক চীনা পরিব্রাজক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্যে এসেছিলেন। তিনি পনের বছর ভারতে ছিলেন। বাংলা দেশ ঘুরে তিনি তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে স্বদেশে ফিরে যান। তিনি লিখে গেছেন, তাম্রলিপ্তি বন্দরেই বৌদ্ধদের বাইশটি সঙ্ঘারাম ছিল। তাম্রলিপ্তি ছিল এক প্রসিদ্ধ বন্দর। এখান থেকে বড় বড় জাহাজ সুবর্ণভূমি (দক্ষিণব্রহ্ম), কম্বোজ (কম্বোডিয়া), চম্পা (ইন্দোচীন), সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), যবদ্বীপ (জাভা), বালি

(বোর্ণিও) প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ যাতায়াত করত। দেশের জনসাধারণ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। রাজকর্মচারীদের অযথা হস্তক্ষেপে তাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাধীনতা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। করভারে তারা প্রপীড়িত হয়নি। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। চণ্ডালরা অস্পৃশ্যরূপে গণ্য হোত। তারা শহর বা গ্রামের বাইরে বাস করত।

হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশে জৈনধর্মও বজায় ছিল। জৈনধর্মের অবস্থাটা কেমন জান, দু'পাশে দু'টো শক্তিশালী বড় বড় রাজ্য মাঝখানে আর একটা কমজোরী ছোট রাজ্য। তবুও জৈনধর্ম অক্ষুণ্ণ ছিল। তাসের খেলায় আছে, একজন তাসগুলো হাতে করে আর একজনের সামনে মেলে ধরে বলে, যেটা ইচ্ছে টেনে নাও। তখনকার ধর্মীয় ব্যাপারটা ঠিক এমনি হয়েছিল। আর্য সভ্যতা যেন বাংলা দেশের জনসাধারণের সামনে মেলে ধরেছিল তিনটে তাস—একটা হিন্দুধর্মের, বৌদ্ধধর্মের একটা, আর একটা জৈনধর্মের: বলেছিল, টেনে নাও একটি। ঠিক তখন—তখন লোকের বৌদ্ধধর্মের দিকেই ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। সমতট গুপ্ত রাজাদের অধীন হোলে বৈন্য গুপ্ত তাদের সামন্তরূপে সারা পূর্ববাংলায় শাসন চালাতেন। পরে গুপ্তরাজাদের সদ্ব্যবহার করেন ও স্বাধীন হন। ষষ্ঠশতকের মাঝামাঝি সময়ে গোপচন্দ্র বর্ধমান থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত গড়ে তোলেন এক রাজ্য। রাজ্যের ছিল দুটো ভাগ—বর্ধমানভুক্তি ও নব্যবকাশিকা। গোপচন্দ্রের পর ধর্মাদিত্য ও নরেন্দ্রাদিত্য রাজা হন। এঁরা মোট পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। এঁদের পর আর দু'জন রাজার নাম জানা যায়—পৃথ্বীর ও সুধন্যাদিত্য।

সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে সমতটে একটি বৌদ্ধ রাজবংশের খবর পাওয়া যায়। ইতিহাসে এই বংশ খড়্গ বংশ নামে পরিচিত। খড়্গ বংশীয় রাজারা প্রথমে বঙ্গে রাজত্ব করতেন, পরে সমতটে রাজত্ব বিস্তার করেন। একটি প্রাচীন লিপি থেকে জানা গেছে, এই বংশের চারজন রাজার নাম। খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজরাজ। খড়্গদের অবসানে তাদের সমস্ত অধিমহারাজ একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন সমতটে। এই বংশের রাজা—শিবনাথ, শ্রীনাথ, ভবনাথ, ও লোকনাথ। লোকনাথকে পরাজিত করে জীবধারণ রাত রাজা হন। ও রাতবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। জীবধারণের পর শ্রীধারণ ও বলধারণ রাজত্ব করেন।

গুপ্ত বংশের শেষ দিকের রাজা মহাসেন গুপ্ত। তাঁর রাজ্য ছিল মগধ আর গৌড় নিয়ে। মহাসেন গুপ্তের এক সামন্ত ছিলেন শশাঙ্ক। মহাসেন গুপ্তের অধীনতা অস্বীকার করলেন শশাঙ্ক। গৌড়ে প্রতিষ্ঠা করলেন এক স্বাধীন রাজ্য। সপ্তম শতকের গোড়াতেই। সমতট বাদে গোটা বাংলা দেশে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়। চার ভাগে বাংলাদেশ তখন বিভক্ত ছিল—কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণ সুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত। আর এক ভাগ—সমতট। সমতট শশাঙ্কের অধীন ছিল না। তিনি উড়িষ্যার কঙ্গোদ অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর আগে কোনও বাঙ্গালী রাজা এত বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তাঁর আমলে বাঙ্গালী এক রাজার অধীনে প্রথম একতাবদ্ধ হ'তে চলল।

শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। কর্ণসুবর্ণ কোথায় ছিল জানো? মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের কাছে রাঙামাটি বলে যে জায়গাটি আছে সেইটিই ছিল কর্ণসুবর্ণ। অবশ্য আসল কর্ণসুবর্ণ আজ বেশীর ভাগ ভাগীরথীর গর্ভে নিমজ্জিত। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। শিবের ভক্ত ছিলেন তিনি। তাম্রলিপ্তি, দণ্ডভুক্তি ছাড়িয়ে উড়িষ্যার গঞ্জাম বা কঙ্গোদ অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে তিনি বাংলার সংস্কৃতি বিস্তারও করেন। শিবপূজা আর শিবমন্দির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর হাত দিয়ে। আজ শিব নেই বা শিবমন্দির নেই। এমন গ্রাম বাংলা দেশে খুব কমই আছে। অবশ্য শিবপূজার এত প্রসার শুধু শশাঙ্কের হাতে হয়নি। সমস্ত ধর্ম এই দেবতাকে মেনে নিয়েছে। এই দেবতার রূপ কল্পনায় নিজেদের অনেক কিছু মিশিয়ে দিয়েছে, শিবকে করে তুলেছেন মহান্। শশাঙ্ক নাকি বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। এমন কথাও শোনা যায়। কিন্তু এ কথা সত্য বলে মনে হয় না।

শশাঙ্ক এবার রাজ্যবিস্তারে পশ্চিমদিকে মন দিলেন। কাশী পর্যন্ত তিনি বিনা বাধায় এগিয়ে গেলেন। তারপরেই কনৌজ আর থানেশ্বর। কনৌজের রাজা গ্রহবর্মণ, থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন। গ্রহবর্মণ রাজ্যবর্ধনের ভগিনীপতি। রাজ্যবর্ধনের বোন রাজ্যশ্রীর স্বামী তিনি। শশাঙ্ক দেখলেন পাশাপাশি দু'রাজা আত্মীয়। একে ঘাঁটালে অন্যজন লাগবে। কাজেই শশাঙ্ক মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন। তারপর দু'জনে একযোগে কনৌজ আক্রমণ করলেন। গ্রহবর্মণ নিহত হলেন। রাজ্যশ্রী বন্দী হলেন। রাজ্যবর্ধন এ কথা শুনে সৈন্যদল নিয়ে কনৌজ চললেন। প্রথমেই দেবগুপ্তের সঙ্গে দেখা। দু'দলে যুদ্ধ হোল। দেবগুপ্ত নিহত হলেন। একজনকে কাহিল করে অন্যজনকে আক্রমণ করতে দ্বিগুণ উৎসাহে রাজ্যবর্ধন এগিয়ে চললেন। শশাঙ্কের কাছে রাজ্যবর্ধন কিন্তু নিহত হলেন। রাজ্যবর্ধনের ভাই হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হলেন। কনৌজের হোমরা চোমরারা গিয়ে হর্ষবর্ধনকে কনৌজের রাজা করে নিলেন। হর্ষবর্ধন কনৌজে তাঁর রাজধানী করলেন। হর্ষবর্ধন রাজ্যভার গ্রহণ করে অনেক কষ্টে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করলেন। হর্ষবর্ধন রাজত্ব করে চলেন। রাজ্যশ্রী মাঝে মাঝে মন্ত্রণা দেন। তাঁর স্বামীকে যে হত্যা করেছে, তাঁকে যে বন্দিনী করে রেখেছিল তার প্রতিশোধ চাই। হর্ষবর্ধন কিন্তু কোনও দিন শশাঙ্ককে হারাতে পারেননি। শশাঙ্ক প্রবল পরাক্রমে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করে চলেন। ৬৩৭ কি, ৬৩৬ খৃঃ এ তাঁর মৃত্যু হয়।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মানব আট মাস মাত্র রাজত্ব করেন। ইতিহাস তাঁকে অন্ধকার পশ্চাদপটে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। শশাঙ্ককে শায়েস্তা করবার জন্যে হর্ষবর্ধন কামরূপের (বর্তমান আসাম) রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন। শশাঙ্কের রাজত্বকালে কি হর্ষবর্ধন, কি ভাস্করবর্মণ বাংলার দিকে একটুও এগোতে পারেননি। কিন্তু এবার তারা এগিয়ে এলেন। ভাস্করবর্মণ কর্ণসুবর্ণতে গিয়ে চড়াও হলেন। হর্ষবর্ধন মগধ পর্যন্ত দখল করে নিলেন।

ভাস্করবর্মণকে গৌড়ে বেশীদিন রাজত্ব করতে হোল না। জয়নাগ নামে মহারাজাধিরাজ উপাধি বিশিষ্ট এক বাঙ্গালী দখল করলেন গৌড়। জয়নাগের বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি না।

সমতট এক পাশে অপ্রতিহত প্রভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে চলেছে। রাত বংশের পর এক চন্দ্রবংশ সমতটের স্বাধীন পতাকা বয়ে চলেছে, দেখতে পাই? চন্দ্রবংশের দু' জন রাজার নাম পাই গোবিন্দ চন্দ্র ও ললিত চন্দ্র।

ওদিকে জয়নাগকে তাড়িয়ে কনৌজের রাজা যশোবর্মা গৌড় দখল করেছেন। অষ্টম শতকের গোড়ার দিকেই তিনি গৌড় অধিকার করেছিলেন। তিনি এবার সমতটের দিকে তাকালেন। বেশ, এক পাশে নির্বিবাদে রাজত্ব করে চলেছে। রাজত্ব করা এতই সোজা? দাও ওকে এক ঠ্যালা। যশোবর্মা ললিতচন্দ্রকে পরাজিত করে সমতট দখল করলেন।

এ সময় নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হোল এই নালান্দা। দশ হাজার ছেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে কত ছাত্র আসতো এখানে শিক্ষালাভের জন্যে। শশাঙ্কের আর তার পরেও নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এক বাঙ্গালী পণ্ডিত। তাঁর নাম শীলভদ্র। সেই প্রাচীন কালেই বাঙ্গালী মনীষার অপূর্ব স্ফুরণ ঘটেছিল। তার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়।

যা হোক এবার এক বিচিত্র কাহিনী শোনাব। যশোবর্মা যখন গৌড়ের রাজা, কাশ্মীরের তখন ললিতাদিত্য। ললিতাদিত্য যশোবর্মাকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানালেন। যশোবর্মা বললেন যে, ললিতাদিত্যকে বিশ্বাস করেন না। কাশ্মীরে ছিল এক বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির। ললিতাদিত্য বিষ্ণুর পাদপদ্ম ছুঁয়ে যশোবর্মার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যশোবর্মা কাশ্মীরে গেলেন ও নিহত হলেন। গৌড়বাসী ক্ষুব্ধ হোল ললিতাদিত্যের বিশ্বাসঘাতকতায়। যে বিষ্ণুমূর্তি ছুঁয়ে ললিতাদিত্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে মূর্তি ভাঙ্গতে তারা সবাই জোট পাকিয়ে গেল কাশ্মীরে। কিন্তু তারা ভুল করে অন্য এক বিষ্ণুমূর্তি ভেঙ্গে ফেলল। তারা আর দেশে ফিরে আসতে পারল না। কাশ্মীর সেনার হাতে তারা প্রাণ দিল। স্বেচ্ছায় নয়, প্রাণপণ লড়াই করে। "রাজতরঙ্গিণীর" কবি কহ্লন গেয়েছেন—সেদিন গৌড়বাসিগণ যা সম্পাদন করেছিলেন বিধাতারও তা অসাধ্য ছিল। আরও গেয়েছেন তিনি, "দেবতাশূন্য রামস্বামীর মন্দির একদিকে, অন্য দিকে সারা পৃথিবী ভরে গৌড়বীরদের জয়গান বা যশোগান।" বাঙ্গালীর প্রভুভক্তি, বীরত্ব আর সাহস এই ঘটনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

দেশে আর কোনও রাজা থাকল না। থাকল না রাষ্ট্রের কোনও সামগ্রিক ঐক্য। দেশ বিদেশের রাজা রাজড়া এই সমৃদ্ধ ও বহুধা বিভক্ত দেশে শকুনির মতো চালাতে লাগলেন অভিযান, দেশে চলতে লাগল মাৎস্যন্যায়, ক্ষমতাশালীদের জুলুম চলল দুর্বলের উপর। মাৎস্যন্যায় সংস্কৃত কথা। ওর মানে মাছের নীতি। বড় বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খায়, এই হল সেই নীতি। সাধারণ প্রজাদের দুর্দশার অন্ত রইল না। দেশে অরাজকতা চলল। শান্তি শৃঙ্খলার লেশ মাত্র থাকলো না। জোর যার মুলুক তার। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল দেশের মানুষ। সমস্ত দেশবাসী আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

—"ভগবান আর কতদিন?" তারা সবাই এক জোট হয়ে এক সভায় গোপাল নামে একজনকে তাদের নেতা বলে মেনে নিল। দেশের রাজা হিসাবে বরণ করে নিল।

# বাইবেলের গোড়ার কথা

## দীপক সেনগুপ্ত

বাইবেল খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ। যেমন হিন্দুদের রামায়ণ-মহাভারত, মুসলমানদের কোরান।

'বাইবেল' কথাটি গ্রীক শব্দ—'বিবলিয়স' হতে এসেছে। ছেবট্টিটি ছোট ছোট পুস্তকের সমষ্টি। কিন্তু তাদের মধ্যে মনোরম সংযোগ রয়েছে তাই বাইবেলকে একটি মহান পুস্তক বলা হয়। রামায়ণের রচয়িতা যেমন বাল্মীকি মুনি—বাইবেলের তেমন বিশেষ কোন রচয়িতা নেই। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে কি ভাবে ওটা লেখা হোলো? বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময়ে ভগবানের ইন্দ্রিয়শক্তিতে চালিত হয়ে লিখেছেন আর সেই লেখাগুলির সমষ্টিই হচ্ছে পবিত্র বাইবেল। কথিত আছে বইটি সম্পূর্ণ হতে ষোল শত বছর লেগেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কি বিরাট ব্যাপার ওটা। বাইবেলে কি আছে? রচনার সম্পূর্ণ সময় ও রচয়িতার অসংখ্য সংখ্যা দেখে সকলেই ভাববে—নিশ্চয়ই কোনো বিরাট ব্যাপার রয়েছে। মোটামুটি ভাবে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়—বাইবেলের মধ্যে আমরা পাই প্রতিটি জিনিষের প্রারম্ভিক ইতি কথা। শুধু তাই নয় বর্ত্তমান সভ্যতার শেষ কি—তাও তাতে লেখা রয়েছে।

এগারো শতাধিক বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বাইবেলের বক্তব্য সহজ সরল। এর বাণী জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট মানবিক আবেদনের জন্য শাশ্বত ও পবিত্র। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন কর্ম্মক্লান্ত জীবনে খুঁজে ফেরে একটু শান্তি—একটু বিশ্বাস, একটু ভরসা। বাইবেলই হচ্ছে এক মাত্র আন্তর্জাতিক গ্রন্থ যার মধ্যে থেকে তারা এ সব কিছু সহজ সরল বিশ্বাসে পেতে পারে। তাই বাইবেলের প্রচার বিক্রয়ের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। তার মূল্য মানুষের কাছে চিরন্তন।

### বাইবেলের গল্প (সৃষ্টির এক সপ্তাহ)

ভগবানের প্রথম সৃষ্টি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, সেই স্বর্গ, মর্ত্ত্য সৃষ্টি হোলো। মর্ত্ত্যের কোনো নির্দিষ্ট আকার ছিল না। জল ও অন্ধকার সব কিছু ছেয়ে ছিল। জীব তো আলো ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই আলোর দরকার হোলো। ভগবানের একটি ইচ্ছায় মর্ত্ত্যে আলো দেখা দিল। তাই দিনে অর্থাৎ কাজের সময়ে আলো জেগে থাকল আর বিশ্রামের সময়ে অন্ধকার। পৃথিবীটাকে সূর্য্যের দিকে ঠিক মত ঘুরিয়ে এ ব্যবস্থা করে দিলেন। এটা করতে ভগবানের মাত্র একদিন লাগল। সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে ভগবান দেখলেন বাতাস আলোর চেয়েও কম দরকারী নয়। আর সেটাও তৈরী হোলো। সেই দিনেই তিনি স্থল পাহাড়, পর্ব্বত তৈরী করলেন।

সৃষ্টির তৃতীয় দিনে পৃথিবীতে গাছপালা, লতাগুল্ম জন্মালেন। চতুর্থ দিনে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র আলো বিকিরণ করতে আরম্ভ করল। এই ভাবে দিন, রাত্রি, ঋতু সমূহের সৃষ্টি হোলো।

সৃষ্টির পঞ্চম দিনে ভগবান পাখী, পোকামাকড়, সামুদ্রিক মৎস্য, ইত্যাদি তৈরী করলেন। বিভিন্ন চারপেয়ে জন্তু, যেমন ঘোড়া, গরু ভেড়া ইত্যাদি আর লতানো প্রাণী যেমন সাপ ইত্যাদির সৃষ্টি হোলো। সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে ভগবান এটা কোরলেন। এ সব তো তৈরী হোলো। আর এই সৃষ্টির পেছনে ভগবানের মনে একটি উদ্দেশ্য ছিল—সেটা কি? সেটা হচ্ছে তিনি চেয়েছিলেন এমন কিছু তৈরী করবেন যা তাঁর দেহের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি হয়। আর সে বস্তু জন্তুদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান, শক্তিমান, পবিত্র ও সৎ হবে। আর তাই মর্ত্ত্যের মাটি দিয়ে তিনি মানুষের দেহ তৈরী করলেন আর তাতে জীবন দান করলেন। প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম রাখলেন 'আদম।' তাকে অন্য সব জীবদের শাসনকর্ত্তা করে দিলেন। কিন্তু শাসন কার্য্যে ও

জীবনধারণে সাহায্যের জন্ত আর একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন দেখা দিল। সে একা একা কি ভাবে বাস করবে! তার চাই একজন সঙ্গী যে একাধারে সাহায্যকারী ও অন্তদিকে বন্ধু হতে পারে। আর সেই প্রয়োজনেই ভগবান 'ইভ'কে সৃষ্টি করলেন। আর সে হোলো আদমের স্ত্রী। এই মহান ও সুন্দর সৃষ্টি ঠিক ছয় দিনে সম্পন্ন হোলো। সপ্তম দিনে ভগবান বিশ্রাম নিলেন। দিনটিকে তিনি অন্তর হতে আশীর্বাদ দিলেন। তাই সেই দিন পবিত্র হয়ে রইলো। মানুষ সপ্তম দিনে বিশ্রামের মধ্যে দিয়ে সর্বশক্তিমান ভগবানকে স্মরণ করে। তাঁর মহিমামণ্ডিত অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টিকে শ্রদ্ধা জানায়।

## ম্যাজিক শেখাচ্ছি

### জাদুরত্নাকর—এ, সি, সরকার

হ্যাঁ, ম্যাজিকই শেখাচ্ছি তোমাদের—খুব মজাদার আর খুব চমকপ্রদ ম্যাজিক। এ ম্যাজিক দেখে শুধু যে তোমাদের ছোট ছোট বন্ধুরাই অবাক হবে তা নয়, কায়দামাফিক দেখাতে যদি পার তবে বয়স্ক দর্শকেরাও মুগ্ধ হবেন এই জাদুর কারসাজিতে।
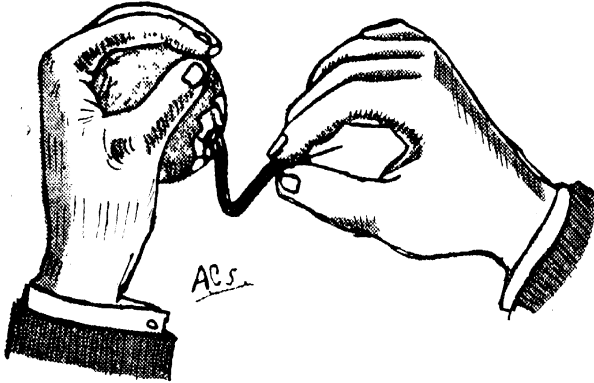
সেবার বাসে করে মালয়ের পেনাং সহর থেকে কুয়েলালামপুরে যাবার পথে মাঝ রাস্তার এক গেঁয়ো রেস্তোর্যাঁর মালিককে এই খেলা দেখিয়ে খুবই সুফল পেয়েছিলাম। রেস্তোর্যাঁর মালিক চীনে। তার দোকানে সেই ভরদুপুরে যে খাদ্য ছিল তা তার দেশোয়ালী ভাইদের পরম তৃপ্তির বস্তু হলেও আমার মত ভেতো বাঙালীর তা মোটেই খাদ্য নয়। অনেক অনুরোধ করেও যখন তার কাছ থেকে মাছভাজা-ভাত পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো তখনই লাগালাম আমার জাদুর তুক্। এই তুক্ এমন যুৎসই ভাবে লেগে গেল যে মালিক মশাইর তাক লাগালো তাতে, আর তাতেই হলো সে কাৎ। নিজের জন্তে রেখে দেওয়া মাছের অর্দ্ধেকটা কেটে ভেজে দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে। প্রেসার কুকারে দশ মিনিটে তৈরী করলো ভাত। গরম গরম ভাত, মাখন আর মাছভাজা এই দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে শেষ করলাম মধ্যাহ্ন ভোজন। দাম দিতে গেলাম। দাম নিতে সে নারাজ। অনেক পিড়াপিড়ি করলাম—তবুও দাম সে নিলে না। আমিও নাছোড়বান্দা। শেষকালে ঐ ম্যাজিকটার কৌশল শিখতে চাইল সে। এতে নাকি তার খাবারের দামের চেয়ে অনেক কিছু বেশী সে পেয়ে যাবে। তাই দিলাম শিখিয়ে।

কী এমন মহা বিস্ময়কর খেলা সেদিন আমি দেখিয়েছিলাম যার প্রভাবে হোটেলের মালিক সেদিন বশ মেনেছিল তা শোনার জন্তে খুব উৎসুক আর কৌতূহলী হয়ে উঠেছ তোমরা তাই না? বলছি শোন:

রেষ্টুরেন্টের টেবিলের উপরে সাজানো ছিল কতকগুলি কমলালেবু ও রামুতান (লিচুর মতন এক প্রকারের ফল, মালয় দেশে প্রচুর পাওয়া যায়)। সবার চোখের সামনে একটি কমলালেবু তুলে নিলাম আমি ডান হাতে, আর দিলাম মালিকের হাতে ভাল করে দেখে দেবার জন্তে যে, লেবুটা ঠিক আছে কি না। পরীক্ষা করে দেখে সে বললে 'বইয়া বাগুস' (মালাই ভাষায়-'খুব ভাল')। এইবার লেবুটাকে বাঁ হাতের চেটোতে রেখে একটু মন্ত্র পড়ে আমি লেবুটার বোঁটার দিকটায় একটু খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে টেনে বের করলাম একটা পাঁচ ছয় হাত লম্বা নাইলনের রঙিন ফিতে। এই কাণ্ডকারখানা দেখে তো খদ্দেরেরা সবাই অবাক। মালিক ভদ্রলোক এত বেশী অবাক হল যে তার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোন কথাই বেরুলো না। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো আর বেশ খাতির করে নিয়ে বসালো টেবিলের পেছনে রাখা তার খাস চেয়ারে; তারপরে যে কী হয়েছিল তা তো আগেই বলেছি।

এখন শোন খেলাটার মূল কৌশলের কথা: তোমরা যদি এ খেলা দেখাতে চাও তবে তোমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে আগে থেকে পাঁচ ছয় হাত লম্বা একটা পাতলা সিল্ক বা নাইলনের ফিতা নিয়ে। তার এক মাথা গলিয়ে দিতে হবে একটা বড় মতন ছুঁচের ফুটোতে। এই ছুঁচের চার দিকেই এমন পাকিয়ে কুণ্ডলী বানাতে হবে ফিতেটাকে? খেলা দেখানোর সময়ে কুণ্ডলী পাকানো ফিতেটাকে এমন ভাবে বাঁ হাতের তেলোতে লুকিয়ে রাখবে যাতে ছুঁচের সরু ধারালো মুখটা বাইরের দিকে থাকে। এই ছুঁচের উপরে কমলালেবুটাকে বসালে লেবুটাকে ফুটো করে ছুঁচটা বেশ কিছু দূর পর্য্যন্ত লেবুটার ভেতরে চলে যাবে। এর ফলে অল্প খোসা ছাড়ালেই ছুঁচের নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে। ছুঁচ ধরে টানলে সঙ্গে সঙ্গে ফিতেটাও আসতে থাকবে লেবুর ভেতর দিয়ে। ছুঁচটাকে এমন ভাবে ধরতে হবে যাতে ক'রে দর্শকদের নজরে না পড়ে। ছবি দেখলে সব কিছু তোমরা বুঝতে পারবে।
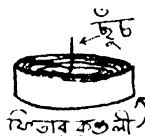
বেশ কিছুদিন ধরে ভাল ভাবে অভ্যাস করে তবেই এ খেলা দর্শকদের দেখাবে না হলে কিন্তু ধরা পড়ে যাবে।

## শ্রাবণে

### শ্রীবিকাশ ভানু

ঝির ঝির বৃষ্টি শ্রাবণের বর্ষণ,
গুরু গুরু শোনো ওই মেঘেদের গর্জন।
ঘ্যাং ঘ্যাং ব্যাঙেদের নীল গাল ফোলানো,
গাছেদের ভিজে মাথা ওই দেখো দোলানো।
দোয়েলের গুঞ্জন লটকান তলাতে,
হাঁসেদের প্যাঁক-প্যাঁক ওই দেখো জলাতে।
ফোটা-ফুলে ধোয়া মধু ওই দেখো করছে,
মৌমাছি ছুটে এসে গুঞ্জন করছে।
হুঁকো হাতে চাষী চলে ধান ক্ষেত নিড়োতে,
জোয়ালের গরু থাকে মাস কয় জিরোতে।
মাথা ভিজে পথিকের জল ঝরে পড়ছে,
কবিতার তরে কবি কল্পনা করছে।

## সৎ উপদেশ

### রণেশ মুখোপাধ্যায়

আরে এসো, ঢুকেই পড়ো, খাবে কি তাই বলো না!
পেটে খিদে মুখে কেন করছো মিছে ছলনা!
চপ কাটলেট? মুরগী কাবাব? কোর্মা-কারী লুচিতে,
যা খাবে তাই দেখবে সরেস—আটকাবে না রুচিতে।
বলছো কি-হে, রেস্তোরাঁতে খাওয়া মোটেই ভাল নয়?
মরার আগেও খাওয়া ভাল, খেয়েই যদি মরণ হয়!
অবাক্ করলে! দোকানেতে চপ কাটলেট্ খাওনি?
মামার বাড়ীর বড়াই মুখে, মামার বাড়ী যাওনি!
চিন্তা কি হে, ঢুকেই পড়ো, বসিগে ওই কোণাটায়,
দেখছো বুঝি দেহখানা? পাঁজরা গুলো গোনা যায়!
নেহাৎ কিনা, তোমার জন্যে মান রাখতে বসাটা,
মাংস খাবো? আরে রামঃ,—হজম হয় না মশাটা!
দাঁড়িয়ে তবু কাচু-মাচু? পকেটে নেই পয়সা?
নাই বা থাকলো, ধার করে খাও গব্য কিংবা ভয়সা॥

## জ্ঞান-বিজ্ঞানের টুকিটাকি

### মানস মুখোপাধ্যায়

**(১) করে দেখ—**

একটি কাঁচের গেলাসে জল দিয়ে কাণায় কাণায় ভর্তি কর। এইবার একটি পোষ্টকার্ড নিয়ে গেলাসটির মুখে চেপে বসিয়ে দাও। এখন এক হাতে পোষ্টকার্ডটি চেপে ধরে অন্য হাতে সাবধানে গেলাসটি উল্টে দাও। এবং ধীরে ধীরে পোষ্টকার্ড থেকে হাত সরিয়ে নাও। দেখবে জল পড়ে যাচ্ছে না। কেন এমন হয় জান? বাতাসের ঊর্ধ্বচাপ জল ও পোষ্টকার্ডের ভার ঠেকিয়ে রাখে।

**(২) জাহাজ জলে ভাসে কেন—**

লোহা জলের চেয়ে ভারি কিন্তু সেই লোহা দিয়ে যে জাহাজ নির্মাণ করা হয় তা জলে ডুবে যায় না, ভেসে থাকে। এর কারণ কি জান? এর কারণ, লোহা দিয়ে জাহাজের যে খোল তৈরী করা হয়, তার ভেতরটা ফাঁপা। এর ফলে জাহাজের ঐরূপ আকৃতি হওয়ায় তার নিমজ্জিত অংশ যথেষ্ট পরিমাণে জল অপসারিত করে, যাতে অপসারিত জলের ওজন জাহাজের চেয়ে বেশী। এ জন্য জাহাজ জলে ভেসে থাকে।

* * * *

**(৩) ডাঙ্গার শামুক—**

শামুক জলেরও আছে, ডাঙ্গারও আছে। ডাঙ্গার শামুক তোমরা বাগানে বা মাঠে দেখিয়া থাকিবে। আমি তোমাদের ডাঙ্গার শামুকের কথা বলিব। শামুকের দেহ একটি শক্ত খোলার ভিতর থাকে। ইচ্ছা করিলে ইহারা খোলার ভিতর হইতে শরীর বাহির ও গুটাইয়া লইতে পারে। ডাঙ্গার শামুক নরম গাছের শেওলা, লতা পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। শীতকালে ইহারা সমগ্র দেহটি খোলার মধ্যে গুটাইয়া এবং খোলার মুখটি লালার মত পদার্থ দ্বারা বন্ধ করিয়া নিঝুম অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ডাঙ্গার শামুক উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। ইহারা বসন্তকালে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটিয়া একেবারেই পূর্ণাঙ্গ শামুক বাহির হয়।

* * * *

**(৪) আগুনে পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা—**

হঠাৎ পরণের কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরিয়া গেলে কখনই ছুটোছুটি করিবে না। একটা কম্বল বা ঐ ধরণের জিনিসে জড়িয়ে নিয়ে সটান শুয়ে পড়িবে। দেখিবে, আগুন নিভে যাবে। পোড়া জায়গায় মেথিলেটেড স্পিরিটে ভিজিয়ে রাখিবে (আজকাল বার্ণল ইত্যাদি অনেক মলম বেরিয়েছে, সেগুলি হাতের কাছে থাকলে ব্যবহার করিবে)।

## ময়না

### কার্তিক ঘোষ

লাল টুকটুক ঠোঁট দু'টি বেশ—
নামটি যে তার ময়না,
খুকুর মতন নেইকো বাহার
নেইকো হাজার গয়না!
কথায় কথায় শিস দিয়ে যায়,
এদিক-ওদিক চায় সে,
সকাল-বিকেল হরেক রকম
টুকটুকে ফল খায় সে।
তেল কুচকুচ মাথার ওপর
ঝুঁটিনটি তার হোলদে,
যখন তখন ব'লবে কেবল—
'এই খুকু ভাই-দোল-দে।'

## রজনীকান্তের স্বদেশী গান

রজনীকান্তের দেশপ্রেমের গান এক সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। এক সময়ে পথে পথে গাওয়া হত তাঁর অতি প্রসিদ্ধ জাতীয় সংকল্প সঙ্গীত—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই ।।

গানটির সুর ছিল মূলতান, গড় খেমটা।

বঙ্গজননীর অপরূপ রূপশ্রী বঙ্গদেশের কবি রজনীকান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন জননীস্তোত্র গানে সুরটমল্লারে—

নমো নমো নমো জননী বঙ্গ ;
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী, অতুল, বিপুল গিরি অলঙ্ঘ্য।
বনে বনে ছুটে ফুল পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি তটিনী, মত্ত খর তরঙ্গ ।
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে
ফল-ভারনত শাখিবৃন্দে নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ ।।

সমগ্র ভারতকে উদ্দেশ ক'রে লেখা স্বদেশী গানগুলিতে কবি দেশজননীর শ্যামল শস্য-সম্পদভরা প্রসন্ন ও প্রশান্ত রূপটিরই বন্দনা করেছেন—

শ্যামল শস্যভরা, (চির) শান্তি বিরাজিত পুণ্যময়ী,
ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য সুশোভিত
যমুনা-সরস্বতী- গঙ্গা বিরাজিত।
ধূর্জটি-বাঞ্ছিত হিমাদ্রি-মণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত সরসিজ-রঞ্জিত ।।

ভৈরবীর উদাত্ত গম্ভীর ঐ গানের সুর। দুর্ভাগ্য আমাদের এসব গান আজ আর কেউ গাইতেও জানে না।

কেবল স্বদেশী গানেই নয়, হাসির গানগুলিতেও তাঁর স্বাদেশিকতা বিরাজমান। নকল সাহেবিয়ানার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ছিল—জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিপন্থী বলে তিনি তা মনে করতেন। তাঁর গভীর জাতীয় প্রেম এই সকল গানেই পরিস্ফুট—

যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি,
সদা জামা রাখি শরীরে,
(আর) 'স্যান্টপো' বলি শান্তিপুরকে
'হ্যারি' বলে ডাকি হরিরে ;
যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত,
কীটদষ্ট বাতুলতা বেদ-বেদান্ত
(মোদের) অস্থিমজ্জাগত সাহেবী দৃষ্টান্ত
দেখ না অমুক বাড়ুয্যে ।।

কবির সঙ্গে দেশের জনগণের ভাবধারার নিবিড় যোগ ছিল। তাঁর এক শ্রেণীর গানে সাধারণ দেশবাসীর প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশিত। এই সকল গানে জনগণের হৃদয়ের উষ্ণস্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে—

আমরা নেহাত গরীব, আমরা নেহাত ছোট,
তবু, আজি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠ !
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেগে,
কিনব না ঠুনক কাচ, যায় যে ভেঙে ;
থাকলে, গরীব হয়ে ভাইরে, গরীব চালে
তাতে হবে নাকো মান খাটো ।।

কৃষক-শ্রমিকদের তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর গানে আহ্বান জানিয়েছিলেন জাতীয় জীবনের মহাব্রতে।

স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের জন্য আবেদন তখন দূর পল্লী পর্যন্ত পৌঁচেছে। তাঁতীদের আহ্বান ক'রে একটি চলতি হিন্দী ভজনের সুরে তিনি রচনা করেছিলেন—

রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস,
ঘরের তাঁত যে কটা আছে রে, তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস,
তোদের সেই পুরানো তাঁতে,
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে ;
আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাব রে ।।

এক সময়ে ইংরেজ সরকারের দমননীতিতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ হয়েছিল। নির্ভীক রজনীকান্তের কণ্ঠে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

মা বলে ভাই ডাকলে মাকে ধরবে টিপে গলা,
তবে কি ভাই বাংলা হতে উঠবে রে 'মা' বলা ?
মারলে কি আর 'মা' ডাক, আমরা ছাড়তে পারি ?
হাজার মারো 'মা' বলা ভাই, কেমন ক'রে ছাড়ি ?

এ ছাড়া রজনীকান্তের হাসির গান ছিল, সেগুলিও বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে।

—জয়দেব রায়

# চর্য্যাগীতিকার কবি

## স্বপনকুমার বসু

"নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা।"

বাংলাভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকলেও 'চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়' যে বাংলাভাষায় রচিত সর্ব্ব পুরাতন গ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, এই দিক দিয়ে বিচার করলে চর্য্যাপদের কবিরাই বাংলাভাষার আদি কবি। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এই কবিদের সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না, বা জানলেও এত কম জানি যে তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও আমরা 'চর্য্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে'র কোন সন্ধান জানতাম না। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভির অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ইহা আবিষ্কৃত হয়, নেপালের রাজদরবারের প্রাচীন গ্রন্থাগারে, এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' হইতে 'হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' নামে তাহা প্রকাশিত হয়। মূল পুঁথিতে ৫০ বা ৫১টি পদ ছিল, কিন্তু তার মধ্যের সাড়ে তিনটি পদ পোকায় খেয়ে ফেলায় মোট ৪৬ইটি পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পদগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ দুর্ব্বোধ্য হলেও বাহ্য অর্থ বোঝা অসম্ভব নয়। পুঁথিটির জন্মকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নাই। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় ৯৫০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে ইহা রচিত। বাংলা দেশের পুঁথি কি করে নেপালে গেল, সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তার উত্তরে বলা যায় যে বাংলা দেশে তুর্কী আক্রমণের সময় পুঁথিটিকে নেপালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই পুস্তকে মোট ২২ জন কবির রচিত এক বা একাধিক পদ পাওয়া গেছে। নীচে কবিদের নাম ও রচিত পদ সংখ্যার উল্লেখ করলাম :

| পদকর্ত্তার নাম | লিখিত পদের সংখ্যা |
|---|---|
| কাহ্নু বা কাহ্নুপাদ বা কৃষ্ণপাদ | ১২ |
| ভুসুকু | ৬ |
| সরহ | ৪ |
| কুক্কুরীপাদ | ৩ |
| লুইপাদ | ২ |
| শান্তি | ২ |
| শবর | ২ |
| বিরুপ | ১ |
| গুণ্ডরী | ১ |
| চাটিল | ১ |
| কামলী | ১ |
| ডোম্বী | ১ |
| মহ্নীত্তা | ১ |
| বীণা | ১ |
| আজদেব | ১ |
| ঢেণ্ডন | ১ |
| তাড়ক | ১ |
| কঙ্কন | ১ |
| জয়নন্দী | ১ |
| ধামের | ১ |
| মীননাথ | ১ |

কৃষ্ণপাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ১২টি পদ পাওয়া গেলেও, কবিত্ব শক্তিতে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নন। ইহার অপেক্ষা শক্তিশালী কবির পরিচয় আমরা চর্য্যাপদে পাই। কৃষ্ণপাদের কবিতায় আদিরসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার একটি পদের উল্লেখ করা যায় :

"তিনি ভুবন মই বহিঅ হেলে।
হাউ সুতেলী মহাসুখ লীড়ে।"
হেলা করলাম তিন ভুবনে।
শুলাম সখী সুখলীলায়।

লুইপাদের মাত্র দুটি পদ পাওয়া গেলেও, চর্য্যাপদের কবিদের মধ্যে কবিত্ব শক্তিতে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি সম্ভবতঃ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার পদে একটি বিস্ময় সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন :

"ভাব ন হোই অভাব ন জাই।
আইস সংবোহে কে পতিআই।"
হয় না ভাব, যায় না অভাব,
এমন যে সংবোধ তা দেখে কে ?

পদকর্ত্তাদের মধ্যে কুক্কুরীপাদের পদ ভাবে ভাষায় সর্ব্বনিকৃষ্ট। ইনি সম্ভবত একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণী ছিলেন। অনেকে বলেন 'যে কুক্কুরীপাদের নামে প্রচলিত পদগুলি আসলে তাঁর এক শিষ্যার রচনা। কুক্কুরীপাদের একটি পদ লক্ষণীয় :

"আঙ্গন ঘরপন সুন তো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল আধরাতী।"
অঙ্গন ঘরের কোণে, বিআবতী।
মাঝরাতে কানেট নিল চোরে।

আর একজন পদকর্ত্তা শবরীপাদ ছিলেন একজন ব্যাধ। মৃগয়ার দ্বারা তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে। শবরীপাদের একটি পদ।

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গি পচ্ছি পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।"
শবরী কন্যা থাকে উঁচু পর্বতপরে
পরনে তার ময়ূরপুচ্ছ গলে শোভে গুঞ্জার মালা।

বীণপাদের একটি পদও খুব চমৎকার। যেমন :

"সূজ লাউ, সাওন লাগেলি তান্তী
অনহা দণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতী।"
"সূর্য্য হ'ল লাউ, শশী হ'ল তন্ত্রী,
চাকী হ'ল অবধূতি, অনাহত দাণ্ডী।"

আরও অনেক পদকর্ত্তার বহু পদ পাওয়া গেলেও তাঁদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। 'চর্য্যা'র ভাষা সঙ্কেতের ভাষা, তবু এই গ্রন্থ আমাদের বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রাচীনত্বের নিদর্শন কেবল এই হিসাবেই এই গ্রন্থ ও ইহার কবিরা অমরত্বের দাবী করতে পারেন। আর আমরাও সেই অচেনা অজানা কবিদের জানাই আমাদের অন্তরের ভক্তি।*

---

* গ্রন্থ সাহায্য (১) বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। (২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন।

# আমার কথা (৯০)

## শ্রীমতী নীতা সেন

১৯৪৪-৪৫ সালের কথা। পঞ্চদশী এক কিশোরীর সুরেলা কণ্ঠে "ওগো নয়নে আবীর" গানটি রেকর্ডায়িত হওয়া মাত্র বাঙ্গালী শ্রোতা বিমুগ্ধ হয়ে উঠলেন। ক্রমশ: জানা গেল, গানটির সুরদাতা পরলোকগত শ্রীসুধীরলাল চক্রবর্ত্তী আর গায়িকা শ্রীমতী নীতা সেন

নীতা সেন

(বর্দ্ধন)। জনপ্রিয়া হয়ে উঠলেন তিনি। বেশ কিছুকাল বহির্বঙ্গে থাকার পর সম্প্রতি আবার বাঙ্গালার সঙ্গীত রাজ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিতা করিতে সক্ষম হয়েছেন। একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সংগ্রহ করি তাঁর শিল্পিজীবনী :—

"২৭শে কার্ত্তিক ১৩৩৬ সালে ঢাকায় আমার জন্ম। মা শ্রীমতী আভা বর্দ্ধনের কণ্ঠ সম্পদ ছিল। পিতা স্বর্গত জগদীশচন্দ্র বর্দ্ধন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। শুনেছি আমার মাতামহ একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধক ছিলেন—সে সময় তিনি সাধনাই করেছিলেন—সঙ্গীত প্রচারের সুযোগ-সুবিধা না থাকায় ও কঠোর বিধিনিষেধ থাকায় তিনি শিক্ষাতেই আত্মতৃপ্ত ছিলেন। আর অল্প-বয়সে তিনি পরলোকগত হন।

ছেলেবয়সে মায়ের গান শুনেছি ও তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ভাবীকালের এক ইঙ্গিত রেখেছিলাম—এ-কথা আত্মীয়-স্বজনের মুখে শোনা। পিতার সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে শেষে হাওড়ায় আসি। তখন আট নয় বৎসর বয়স আমার—পরিচয় হল শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতবিশারদ ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর সুহৃৎ-শিষ্য পরলোকগত অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত। তিনিই হলেন আমার প্রথম সঙ্গীতগুরু। কেবল গান নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতাম—ফলে অল্পদিনেই উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে দক্ষতা দেখা দিল। গুরুর ইচ্ছায় ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে অলবেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে যোগদান করিয়া বিশিষ্ট স্থান পাওয়ায় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইতিমধ্যে Pioneer Record Companyর সঙ্গে যোগাযোগ হল। গুরুর অমত থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনদের ইচ্ছায় শ্রীরবি চ্যাটার্জ্জীর পরিচালনায় তের চোদ্দ বৎসর বয়সে আমার প্রথম দু'খানি ভজন গান রেকর্ড করা হয়। এর পর পিতার সঙ্গে বাইরে যেতে হয়। তবে গানের রেওয়াজ বরাবর রাখি। ১৯৪৪ সালে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করি। সেই সময় সুরের যাদুকর স্বর্গত শ্রীসুধীরলাল চক্রবর্ত্তীর সহিত পরিচিত হই। তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারই সুরসংযোগে 'ওগো নয়নে আবীর' গানটি আমায় দিয়া রেকর্ড করান। লঘুসঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে শ্রোতাদের মানসপটে আমার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট হল তখন। তাঁহার নিকট রাগ-প্রধান ও লঘুসঙ্গীত নিয়মিত শিখতে থাকি। গ্রামোফোন কোম্পানীতে শ্রীচক্রবর্ত্তীর সুর-সংযোজনায় আমার কয়েকটি রেকর্ড হয়। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে সেই সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করিতে থাকিলেও হাল্কা সঙ্গীত পরিবেশনের অনুরোধ আসিতে থাকে—প্রথমে উহার শিশুমহলে ও পরে সাধারণ বিভাগে।

আমার প্রথম নেপথ্য-সঙ্গীত 'বন্দীর পথে' ছায়াছবিতে। শ্রীসুনীলকুমার সেনের সহিত বিবাহের দুই বৎসর পরে স্বামীর কর্ম্মস্থল

বোম্বাই-এ যাইতে হয়। তথায় বোম্বাই বেতার কেন্দ্র ও রেডিও সিলোন-এ স্থায়ী শিল্পী হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হই। অনেকটি ছায়াছবিতেও (হিন্দী) নেপথ্য সঙ্গীত গাই। কিন্তু মনে হল যেন পূর্ণ স্বীকৃতি তথায় পাইনি—তজ্জন্য অন্তরের শূন্যতাকে অস্বীকার করিতে পারি নাই। তথায় থাকার সময় বেতার কেন্দ্র-এর পক্ষ হইতে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসাবে ভারতের প্রায় অধিকাংশ কেন্দ্র হইতে কণ্ঠসঙ্গীত প্রচারের সুযোগ পাই। সেখানে বিভিন্ন স্থানের গান শিখিবারও সুবিধা লই।

তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে মেগাফোন কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে "সেদিন বসন্ত বেলা" গানটি আমাকে বাঙ্গালী হৃদয়ে 'নব-পরিচিতি' করিয়া দেয়। ইহার পর নিজের সুরে গাওয়া গত বৎসরে 'অনেক কাঁটার পথ' ও 'মৌ-মৌ মহুয়ায়' গান দুইটি যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

একবার গীতিকার শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আমায় বলেছিলেন যে আমার সুরারোপের বিশেষ রূপ সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিবে। মেগাফোন কোম্পানীর কর্ণধার শ্রীকমল ঘোষ আমায় খুবই উৎসাহিত করেছেন এ বিষয়ে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা ছায়াছবিতে সুর দেওয়ার ও নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত করবার জন্য আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়। জানি না এই বিষয়ে আমি কতদূর সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিব।

বইপড়া ও কিছু কিছু লেখার অভ্যাস আমার বরাবরের। আই-এ পর্য্যন্ত পড়েছি—আরও পড়িবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু সঙ্গীতের মাঝে প্রকাশিত হবার বাসনায় উহা সম্ভব হয় নাই।

সুরের পিয়াসী

## পুরাতন গান

### ধ্রুপদ

সাঁই তো ন আবে আজ, অবিরাত মাঝ মাঝ,
সিংহিনী জগাবে সিংহ কানন পুকার।
চন্দন ঘসত ঘস, ঘসি গই নখ মেরা
বাসনা ন পুরত, মায়নকী নেহার।
ধিক ধিক জনম ঔর জগমে জীবন মেরা,
জবতক ন আবে নাথ পকড়ি বেণু বার বার।
জো নয়নকো অঞ্জন মেরী, বিন তাকো বহে বারি,
তানসেন অন্তর বাণী ধ্রুপদ পুকার।।

—তানসেন

### খ্যাল

আবন কহ গয়ে আগম ভইলবা উনকো
ভুজ করকত হৈ অঁখি মোরি বাঁই।
সগুন বিচারো রে মোরে পিয়া বেগ মিলনবা
হোয় সদারঙ্গীলে আলমগীর সাঁই ॥

—সদারঙ্গ

বি. বি. সি সিম্ফোনি অর্কেষ্ট্রার নব নির্বাচিত নেতা হিউগ ম্যাগারার। পল বার্কের (বর্ত্তমান নেতা) অবসর গ্রহণান্তে ইনি এই নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন ২০শে সেপ্টেম্বর। বিগত ছয় বৎসরকাল ধরে ম্যাগারার লণ্ডন সিম্ফোনি অর্কেষ্ট্রার নেতৃপদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

## সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

### রবীন্দ্র-দর্শন

রবীন্দ্র-দর্শন সম্বন্ধে নতুন ধরণের চিন্তাধারার পরিচয় মেলে আলোচ্য গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ কবি ও শিল্পী তাঁকে দার্শনিক হিসাবে বিচার করা সঙ্গত কিনা, গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক তা নিয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনায় কোথাও সে দ্বিধার আভাস মাত্র নেই, অতি সুসংহত প্রামাণ্য আলোচনার মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্র-জীবন দর্শনকে পাঠকের মননে সমুজ্জ্বল করেই উপস্থিত করেছেন। অতলান্ত প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কি শুধুই মনোমুগ্ধকর, না তার অন্তর্নিহিত এক বিশ্বজনীন মূল্য আছে, এটাই এই গ্রন্থ লেখকের মূল জিজ্ঞাসা। তাঁর রচনাও এই জিজ্ঞাসার ভিত্তিতেই রচিত, রবীন্দ্র-দর্শনের নানা দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে, এমন কি জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কবি স্বয়ং যে অভিমত পোষণ করতেন, তারও এক বিশদ বিবরণ বিধৃত করা হয়েছে। নানা ভাবে আলোকপাত করে গ্রন্থকার রবীন্দ্র-দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর রচনা আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল বলেই তাঁর বক্তব্যও হৃদয়গ্রাহী। প্রবন্ধ-সাহিত্যের আসরে আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। বইটির আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—সাহিত্য-সংসদ, ৩২এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

### যুক্তরাষ্ট্রের সংক্ষেপিত ইতিহাস

বর্তমান যুগের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্র, আলোচ্য গ্রন্থে এই রাষ্ট্রেরই একটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য পরিচয় বিধৃত করা হয়েছে। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আজ যুক্তরাষ্ট্রকে বর্তমান রূপ দিয়েছে, লেখক তাদেরই তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে। আমেরিকার আদি ইতিহাস পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত করেছেন লেখক, প্রাথমিক যুগে যে ক'জন মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়ান সেখানে বসতি স্থাপন করেন, তাঁদের মধ্যে অভাব ছিল সমাজ সচেতনতার ও রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানের, ফলে স্বতঃই সেদিনের আমেরিকা ছিল, নিতান্ত অখ্যাত ও অবজ্ঞাত এক উপনিবেশ মাত্র, কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হল অবস্থা, আমেরিকার অধিবাসিবৃন্দ বুঝতে শিখলেন আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন না করলে পৃথিবীর চোখে চিরদিনই তাঁরা রয়ে যাবেন উপেক্ষিত, ভুলে গেলেন যে নানা দেশ থেকে এসেছেন তাঁরা এই বন্য জনপদে, জাতিতে সমাজনীতিতে তাঁরা পৃথক বিচ্ছিন্ন, মনে রাখলেন যে তাঁদের সকলেরই নতুন পরিচয় এক ও অভিন্ন, তাঁরা আমেরিকান, জন্ম হল আমেরিকান গণতন্ত্রের। আমেরিকার এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে যথাযথ ভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক, তাঁর ভাষারীতি সহজ ও সাবলীল, পাঠক মনে আপন বক্তব্যকে স্বচ্ছন্দ গতিতেই পৌঁছে দেয়, তাঁর রচনাও তাই হয়ে উঠেছে একাধারে শিক্ষামূলক ও সুপাঠ্য। বইটির আঙ্গিক সাধারণ। মূল গ্রন্থটি বিদেশী ভাষায় লিখিত হলেও অনুবাদ কর্মটিকে সহজেই রসোত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন অনুবাদক। লেখক—ফ্রাঙ্কলিন এশার, অনুবাদক—সুবোধ রায়, প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

### ইলিনয়ে এব্রাহাম লিঙ্কন

জীবনচরিতমূলক এই সংক্ষিপ্ত নাটকখানি একটি অনুবাদ, বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদ শাখাটির উপর বর্তমানে অনেকেই ঝুঁকে পড়েছেন, ফলে সাহিত্যের এই উপেক্ষিত বিভাগটি আজ সত্যই হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ, আলোচ্য রচনাও তারই স্বাক্ষরবাহী। আমেরিকার সর্বোত্তম গণনায়ক এব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনের কয়েকটি পাতা নিয়েই গড়ে উঠেছে আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তিন অঙ্কের এই নাটকখানিতে বারোটি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, সংক্ষিপ্ত হলেও এর মাধ্যমে লিঙ্কনের ব্যক্তি জীবনের এক অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটির গতি কোথাও শ্লথ হয়ে পড়ে নি বলেই আগাগোড়া পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রাখে। অভিনয়-মোদীরা এই নাটকখানিকে সমাদর করবেন বলেই আমরা মনে করি। নাট্যকারের শৈলী সহজ ও সরল। গ্রন্থটির আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—রবার্ট এমেট সেরউড, অনুবাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

### মনভ্রমরা

আলোচ্য গ্রন্থখানি সুবোধ ঘোষের সাম্প্রতিক এক গল্প-সংগ্রহ। মোট ছটি গল্প রচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। রঙে-রসে-রূপে গল্পগুলি এতই মনোরম যে, পড়তে পড়তে এক অজ্ঞাত দেশে উড়ে যায় পাঠকের মন। ভাষার যাদুতে বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় লেখক যে আজও অনন্য তারই স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে বর্তমান গ্রন্থের ছত্রে-ছত্রে। লেখকের স্বপ্নালু মননের ছোঁয়ায় আশ্চর্য্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর চরিত্রগুলি, ব্যক্তিত্বে তারা সমুজ্জ্বল, কল্পনায় তারা অবারিত, কিন্তু সবের পিছনেই তাদের যে পরিচয়, তা মানুষের, সত্য শিব ও সুন্দরের উপাসনা করে যে মানুষ তাকেই যেন মূর্ত্ত করে তুলেছেন লেখক বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে। গল্পগুলির প্রায় সবক'টিই সুপাঠ্য হলেও এ

ওরই মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য, যেমন 'মনভ্রমরা' 'জমিকেতা' 'আত্মজা' 'রূপাঠাকরুণের ভিটা' ইত্যাদি। 'আত্মজা' গল্পটিই পরে বর্দ্ধিত হয়ে 'সুজাতা' নামে উপন্যাসে পরিণত হয়েছে। কোমল হৃদয়া এক কিশোরীর অন্তরের আকুতিকে বড় হৃদয়গ্রাহী রূপ দিয়েছেন লেখক এই রচনায়, পড়তে পড়তে সমবেদনায় মথিত হয়ে যায় পাঠকের অন্তর। ছোট গল্পের আসরে আলোচ্য গ্রন্থখানির দাবী যে বড় কম নয়, এ সত্য অনস্বীকার্য্য। আমরা গ্রন্থটি পাঠে অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করেছি। লেখকের শৈলী সম্বন্ধে নতুন করে কিছুই বলার নেই তা তাঁর চিরাচরিত রীতির ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দন, অপরাপর আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের। লেখক—সুবোধ ঘোষ, প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—তিন টাকা।

## ঝড়ের সংকেত

অরিন্দত কথাশিল্পীর আধুনিক এই উপন্যাস নানা কারণেই উল্লেখ্য। প্রেমের কল্যাণস্পর্শে অধঃপতিত মানবসত্তাও যে হয়ে উঠতে পারে মহিমময়, বলিষ্ঠ এক কাহিনীর মাধ্যমে লেখক তাই বলতে চেয়েছেন। এক অপরূপা শক্তিময়ীর আবির্ভাবে যুবক রাজেন্দ্র একদিন সভয়ে উপলব্ধি করল যে পুরাতন জীবনটা যেন ছিন্ন পত্রের মতই ঝরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। যত পাঁক যত কালিই মাখুক না কেন, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা যে তাতে ধ্বংস হয় না, অমৃতের সন্তান মানুষের যে মৃত্যু নেই, এ কথাটাকেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন লেখক। কাহিনীটির আদ্যোপান্ত জীবন্ত, লেখকের শৈলীর বলিষ্ঠতায় চমৎকৃত হতে হয়, ঝড়ের দুর্বার বেগ তাঁর কলমে, পড়তে পড়তে তলিয়ে যেতে হয় গভীর থেকে গভীরে। পোষবাধা গতানুগতিক জীবনের সব খুঁটিনাটিই তুচ্ছতায় ম্লান হয়ে যায়। পাঠকমন আলোড়িত হয়ে ওঠে, উদ্বেল হয়ে ওঠে, এক মহৎ আবেগে। সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ এই উপন্যাস সম্বন্ধে একটি কথাই শুধু বলার আছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ভাষারীতিকে উপেক্ষা না করলেই যেন ভাল করতেন লেখক, সাধুভাষার পরিবর্ত্তে চলতি ভাষা তিনি কেন ব্যবহার করেননি তা জানা নেই, কিন্তু করলে তাঁর এই রচনা যে অধিকতর সার্থকতা লাভ করতে পারত, একথা অনস্বীকার্য্য রূপেই সত্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রকাশক—শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## অঘটন আজো ঘটে ( নাটক )

আলোচ্য নাটকখানি ওই নামেরই উপন্যাসের নাট্যরূপ। সম্প্রতি এই নাটকটি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে ও হচ্ছে, এক অকুণ্ঠ জনসমাদর লাভেরও যোগ্যতা অর্জন করেছে। নাটকের বিষয়বস্তু সত্যই কৌতূহলকর, বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞানের যুগে অপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে মানুষ স্বভাবতঃই অবিশ্বাসী। বর্ত্তমান নাটকের বিষয়বস্তু আবার ওই দুটি আশ্রয় অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে, ভগবৎ প্রেম সত্য হলে যে মানুষ সত্যই এক অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পায় যার কাছে পার্থিব বা ঐহিক যে কোন সুখ সৌভাগ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ এটাই বর্ত্তমান নাটকটির মূল বক্তব্য। মূল পুস্তকের অন্তর্নিহিত ভক্তি ও বিশ্বাসের সুরটি আগাগোড়া বজায় রেখেই নাট্যরূপকার তাঁর আরব্ধ কর্ম্ম সমাধা করেছেন। এ ধরণের উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া বড় সহজসাধ্য কর্ম্ম নয়, কিন্তু এই দুরূহ কাজেও নাট্যরূপকার সফলতার সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। চমৎকার কৌশলে তিনি সংলাপ সাজিয়েছেন যা রচনার মর্ম্মমূলে পৌঁছে দেয় পাঠককে অতি সহজেই। 'অঘটন আজো ঘটে'র মত অবাস্তব কাহিনীকে সার্থক নাটকে রূপায়িত করার মত প্রায় দুঃসাধ্য কাজটিও অতি নিপুণ ভাবেই করেছেন তিনি। আলোচ্য পুস্তকের আঙ্গিক সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। কাহিনী—দিলীপকুমার রায়, নাট্যরূপ—ধনঞ্জয় বৈরাগী, প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, দাম—দু'টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

## লেনিন

বর্ত্তমান যুগের যুগপুরুষ বলা চলে যে স্বল্প সংখ্যক কয়েকজনকে, নিঃসন্দেহে লেনিনের নাম তাঁদেরই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গুরু এই অগ্রবরেণ্য মানুষটির, জীবন ও কর্ম্মধারার এক বিশদ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে বর্ত্তমান গ্রন্থে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে লেনিনের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা, তাঁর উল্লেখ্য কর্ম্মধারার বিস্তৃত পরিচয়। তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচয় ঘটে পাঠকের, যে চিন্তাধারার প্রভাবে বর্ত্তমান যুগের মানসিকতা গঠিত। লেনিনের যুগান্তকারী বৈপ্লবিক দৃষ্টি ভঙ্গীরও এক সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় এতে। বস্তুতঃ যুগ মানব এই মহান চিন্তানায়ক সম্বন্ধে বেশ একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে। মানুষের জন্য লেনিন যেটা সর্বোত্তম কল্যাণের পথ বলে ভেবেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর শিক্ষার যা সংক্ষিপ্তসার সেটা সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব এই বই পড়লে। বইটির ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। মূল রুশ থেকে অনুবাদ করেছেন ইলা মিত্র, তাঁর ভাষা সহজবোধ্য ও সাবলীল; প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২। দাম—এক টাকা ষাট নয়া পয়সা।

## ছোটদের বৌদ্ধ গল্প

আলোচ্য পুস্তকটি শিশুদের জন্য রচিত, বুদ্ধদেব সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর গল্পের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটবে এর মাধ্যমে, বৌদ্ধশিল্প ও সংস্কৃতি এককালে সমগ্র এশিয়াতে এক নব জাগরণ এনে ছিল, বৌদ্ধ সাহিত্যও ভারতের এক অমূল্য সম্পদ, শিশুদের উপযোগী প্রভূত রচনা তার অন্তর্গত হলেও ইতিপূর্ব্বে সেগুলিকে গ্রথিত করে প্রকাশ করার বিশেষ কোন উদ্যম দেখা যায়নি, এই সুন্দর সুপাঠ্য রচনাগুলিকে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত উদ্ধার করে বাংলার শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করার জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখিকা সত্যই ধন্যবাদার্হ। তাঁর শৈলী ও ভাষারীতি পরিচ্ছন্ন ও বিষয়োপযোগী, শিশুরা বইটিকে সমাদর দেখাবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—শ্রীসুলতা কর, প্রকাশক—শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## এক সমুদ্রে দুটি মন

আলোচ্য কাব্য পুস্তকখানির রচয়িতা নবীন কবি শান্তিভূষণ রায়। সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কবি জীবনকে যে ভাবে দেখেছেন, বুঝেছেন, তাঁর রচিত এই কবিতাগুলিতে সেই সত্যই স্বপ্রকাশ। অধিকাংশ আধুনিক কবিতার মত দুর্বোধ্য নয় এরা, বেশ একটা মিষ্টি আবেশ ঘনিয়ে আসে মনে পড়তে পড়তে। কবির ছন্দজ্ঞান সীমিত, চিন্তার প্রগাঢ়তাও লক্ষণীয়। ভোরের শিশির বিন্দুর মতই এক স্বচ্ছ সৌন্দর্য্যে ভরা আলোচ্য কবিতাগুলি, আবেগ ও মননশীলতা দুটোরই অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে এদের মাঝে। কবিতাগুলিকে রীতিমত সুপাঠ্য বলেই উল্লেখ করা যায়। প্রচ্ছদ শোভন অপরাপর আঙ্গিকও ভাল। লেখক—শ্রীশান্তিভূষণ রায়, প্রকাশক—আলফা-বিটা পাবলিকেশান্‌স্‌, পোষ্ট বক্স ২৫৫৯, কলিকাতা-১, দাম—দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

## নীল ঢেউ সাদা ফেনা

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে কুমারেশ ঘোষ সুপ্রতিষ্ঠিত, আলোচ্য উপন্যাসটি তাঁর অধুনাতম রচনা। এক আশাবাদী যুবকের নিরাশা জর্জর জীবন কাহিনীই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। দারিদ্র্যের কশাঘাতে কেমন করে মানুষ নেমে যায় লেখকের কুশল কলমে তারই এক নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে, আজকের যুগের জীবনযন্ত্রণাকে সার্থক ভাবেই রূপায়িত করেছেন তিনি, পাপ ও মিথ্যা যে কি ভাবে জীবনের মূল ভিত্তিকেই স্থানচ্যুত করে দেয় আলোচ্য গ্রন্থের পাতায় পাতায় রয়েছে তারই স্বাক্ষর। আবার এই হীন অধঃপতিত জীবনের মাঝেও যা অমৃতের সন্ধান এনে দেয় সেই প্রেমের বারতাও খুঁজে পাওয়া যায় এই রচনার মাঝে। সত্যকারের প্রেম যা মানুষকে উত্তীর্ণ করে নিরন্ধ্র অন্ধকারের ঘোর কালিমা থেকে ও অধঃপতিত মানবসত্তা যে তারই মুখাপেক্ষী এ কথাটাই লেখকের মূল প্রতিপাদ্য। উপন্যাসটি পাঠ শেষে সেই ইঙ্গিতটুকুই পাঠকের মননে ঢেউ তুলে দেয়। লেখকের শৈলী বলিষ্ঠ, ভাবারীতি সহজ ও সরল, বক্তব্যকে যা সোজাসুজি প্রকাশ করে। চিন্তাশীল পাঠক বর্ত্তমান গ্রন্থটিকে সমাদর করবেন বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—কুমারেশ ঘোষ, প্রকাশক—গ্রন্থগৃহ, ৮এ কলেজ ষ্ট্রীট-মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

## লালনিক

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুব বেশীদিন পদার্পণ করেন নি, কিন্তু নবাগত হলেও ইতিমধ্যেই তিনি যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাশীল হয়ে উঠতে বাধে না। বর্ত্তমান গ্রন্থের নায়ক প্রথম জীবনে এক যাত্রা পার্টির কর্ণধার, উত্তর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। জীবনে যে সব নরনারীর সংস্পর্শে এল নায়ক মধুময়, তাদেরই সুখ দুঃখ হাসিকান্নাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মূল বিষয়বস্তু। চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, সব কটি চরিত্রই যেন জীবন্ত, মনের দরজায় সজোরে ঘা দিয়েই যেন তারা নিজেদের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। বিশেষতঃ নারী চরিত্রগুলি তো বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য, শান্তময়ী, কুলমায়া, স্নেহপরায়ণা করুণা ও অভিমানিনী অথচ প্রেমময়ী চন্দ্রাণী লেখকের আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। চন্দ্রাণীর ফল্গুধারার মতই অন্তলীন প্রেম এ কাহিনীর প্রাণসত্তা গভীর দরদের সঙ্গে লেখক এই নারী চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যায় মন, তার জীবনের স্বচ্ছ পরিণতি ও লেখকের রসবোধেরই ইঙ্গিতবাহী। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

## হিমকান্তা কাঠমাণ্ডু

আলোচ্য গ্রন্থটি ভ্রমণ কাহিনী মূলক। বাংলা সাহিত্যে অবশ্য ভ্রমণ-কাহিনীর স্বল্পতা নেই, কিন্তু একাধারে চিত্তাকর্ষক অথচ প্রামাণ্য বলে অভিহিত করা যায় এমন কাহিনীর সংখ্যা বিরল, আলোচ্য পুস্তক সেই বিরল সংখ্যকদেরই অন্যতম। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে লেখক নেপালের পথ ঘাট, অরণ্য-পর্ব্বত, দেবস্থান, গ্রাম, সহর ইত্যাদি নিখুঁত বর্ণনা করেছেন সেই সঙ্গে সেখানকার অধিবাসীদের সামাজিক রীতি নীতি পালা পার্ব্বণ, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার এমন এক ছবি এঁকেছেন যা একাধারে তথ্যনিষ্ঠ ও বিস্ময়কর। নিজের দেখাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার শক্তি তাঁর আছে, তাই তাঁর রচনা রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে সহজ ভাবেই। কয়েকটি সুন্দর আলোকচিত্র এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। প্রচ্ছদ মনোরম, অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—প্রবোধ দে, প্রকাশক—অর্চনা পাবলিশার্স, ৮ বি, রমানাথ সাধু লেন,—কলিকাতা—৭। দাম—পাঁচ টাকা।

## ছন্দ যতি মিল

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে যাঁরা জনপ্রিয়তায় চিহ্নিত, বর্ত্তমান উপন্যাসের লেখক তাঁদেরই অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত সুষমাকে রেখায়িত করেছেন। বিদেশী পটভূমিতে বাঙ্গালী কয়েকটি তরুণ তরুণীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাদের ভাবধারা ও জীবন দর্শন সব কিছুকেই বিশ্লেষণ করেছেন তিনি গভীর বিচক্ষণতার সঙ্গে। চরিত্র সৃষ্টিতে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষতঃ মূল চরিত্র সরোজ নানা কারণেই বিশিষ্ট। মানুষের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জীবন জিজ্ঞাসাই যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে উক্ত চরিত্রের মধ্যে। অপরাপর চরিত্রও স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য, বস্তুতঃ যে গভীর দরদের সঙ্গে লেখক চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করেছেন তা সত্যই মর্ম্মস্পর্শী। মানুষের মনের গহনে লুকোনো কত ব্যথা কত আনন্দ তাঁর কুশল লেখনীর মুখে যেন ভাষা পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছে, সব কিছুকে অতিক্রম করে যে মনুষ্যত্ব আপন মহিমায় তারই জয়গান করেছেন তিনি আদ্যোপান্ত। আলোচ্য গ্রন্থের মূল বক্তব্যই সেই মহিমা, যা মানুষকে সব-কিছু গ্লানি, সব-কিছু আবিলতা থেকে মুক্ত করে উত্তীর্ণ করে জীবনকে মহাজীবনের রথে। লেখকের শৈলী স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শিল্প শোভন, ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের। লেখক—ধনঞ্জয় বৈরাগী, প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১২, দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## জাপানি জর্ণাল

আলোচ্য সংক্ষিপ্তাকার গ্রন্থটি বিদেশ ভ্রমণের একটুকরো স্মৃতি-চারণ। লেখক অল্প ক'দিনের জন্ত গিয়েছিলেন জাপানে কর্ম্মসূত্রে, সেই স্বল্পাবকাশেই জাপান তাঁকে মুগ্ধ করেছে, জাপানের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সবেরই সুমিত স্নিগ্ধ রূপটি গভীর ভাবে দাগ কেটেছে তাঁর মননে, তাঁর রচনায় সে কথা স্বীকৃত। লেখক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রায় দুই যুগ ধরে, বিশেষতঃ ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্ত, আলোচ্য গ্রন্থেরও মূল আবেদন সেখানেই নিহিত। মধুর অথচ বেগবান ভাষার স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় জাপানী দিনপঞ্জীর এই টুকরোগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক, পড়তে পড়তে আজকের জাপানের এক সংহত রূপ ধরা দেয় পাঠক-মানসে, বস্তুতঃ ভ্রমণকাহিনীমূলক রম্যরচনা বললেই বোধ হয় তাঁর এই রচনার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া যায়। একমাত্র অন্নদাশঙ্করের পথে প্রবাসের সঙ্গেই তুলনা করা যায় আলোচ্য রচনার, সেই রকম আকর্ষণীয়, সেই রকমই সুখপাঠ্য। বইটির আভ্যন্তরিক ঐশ্বর্য্যের মত, বাহ্য সৌন্দর্য্যও বড় কম নয়, অত্যন্ত শিরোত্তীর্ণ-এর আঙ্গিক, হাতে নিলেই রুচিশীল পাঠকের মন খুশী হয়ে উঠবে। লেখক—বুদ্ধদেব বসু, প্রকাশক—এম-সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, দাম—সাড়ে তিন টাকা।

## সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ-চিত্র ( প্রথম খণ্ড )

স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে বাংলায় আর এ ধরণের কোন উল্লেখ্য ও প্রামাণ্য রচনা সংকলন প্রকাশিত হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সেদিক দিয়ে সাহিত্যের এক বিশেষ পর্য্যায় তুলে ধরলেন পাঠকের সামনে। বাঙ্গালী পরিচালিত নানান সাময়িক পত্র থেকে সংগ্রহ করে 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি, আলোচ্য রচনা সেই উদ্যমেরই প্রথম ফল। বর্ত্তমান খণ্ডটি রচিত হয়েছে একদা বিখ্যাত সাময়িক-পত্র 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনা সংগ্রহ করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাঙ্গালীর সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ও রীতিনীতির এক প্রামাণ্য পরিচয় বিধৃত হয়েছে বর্ত্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে, আর সেজন্তই গবেষণামূলক সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠা থেকে লেখক বিশেষ করে এমন রচনাসমূহকেই নির্ব্বাচিত করেছেন যা তৎকালীন বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থাকেই 'বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তোলে, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই গ্রন্থকে স্বচ্ছন্দে বাংলার সমাজ জীবনের একাংশের ইতিহাস বলে ও অভিহিত করা চলে। এই মূল্যবান রচনা সংকলনটি প্রকাশ করার জন্ত সংকলয়িতা ও প্রকাশক উভয়েই আমাদের ধন্তবাদার্হ। আমরা এর সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। সম্পাদনা—বিনয় ঘোষ। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—বারো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## পঞ্চাশের পাঁচালী

আগের দিনে একটা কথা প্রচলিত ছিল 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ অর্থাৎ পঞ্চাশের উপর বয়স হলেই মায়া কাটাও, সংসারের তল্পিতল্পা গুটিয়ে চল বনবাসে; এ বিধান নাকি তখনকার বাঘা বাঘা পণ্ডিতরাই দিতেন, কিন্তু আজকের পণ্ডিতদের বিধান সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের, বর্ত্তমান যুগের মনস্তাত্ত্বিকের মতে পঞ্চাশের কোঠায় এলে তবেই মানুষে বিশেষতঃ মেয়েরা জীবনের প্রকৃত রসাস্বাদনের অধিকারিণী হয়ে থাকে। বিবাহিতা রমণী এই বয়সে এসে উপলব্ধি করে যে সংসার নামে জীবননাট্যের যে রঙ্গমঞ্চে এতদিন সে ছিল মুখ্যনায়িকা তার পট পরিবর্ত্তনের দিন এসেছে, প্রথমটা এই পরিবর্ত্তনকে শান্ত মনে মানতে না পারলেও কিছুদিনের মধ্যেই সে উপলব্ধি করে যে, এই পরিবর্ত্তন বহুবিধ বৈচিত্র্যবাহী। সন্তান ধারণের ক্ষমতা সাধারণতঃ এই বয়সেই লোপ পায় বলেই নারী বোধ হয় জীবনে সর্ব্বপ্রথম নিরঙ্কুশ দাম্পত্য জীবন যাপনের আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হয় পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়েই। স্ত্রী আবিষ্কার করে স্বামীকে যেন নতুন করেই, অবিমিশ্র নিঃশঙ্ক সম্ভোগের সুখ ভোগ করে প্রৌঢ় দম্পতী যেন ফিরে যায় তাদের অনেক দিনের ফেলে আসা সেই নব-প্রণয়ের সোনালী স্বপ্ন জড়ানো দিনগুলিতে। এই বয়সে মেয়েরা যেন আবার নতুন করে বেঁচে ওঠে দীর্ঘদিনের পথ চলার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রৌঢ়ত্বের অশঙ্ক কামনা জীবনকে ভোগ করবার, জীবনের পাত্রভরা মধু নিঃশেষে পান করবার। এই বয়সের মেয়েদের কর্ম্মোৎসাহও উল্লেখ্য, সংসারের চাপ অনেকটা লঘু হওয়ায়, ( কারণ সন্তানাদি এ সময়ে সচরাচর বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে) বাইরের কর্ম্মজগতের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে তারা স্বচ্ছন্দেই, এবং সংসারের পটভূমিতে তাদের স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় থাকে বলেই পঞ্চাশের প্রৌঢ়া খুঁজে নিতে চায় বাইরের জগতে তার নিজের স্থান। বহু বছরের সাংসারিক অভিজ্ঞতাই এইসব নারীর সব চেয়ে বড় মূলধন বা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, অবশ্য সাংসারিক অভিজ্ঞতা না বলে জাগতিক অভিজ্ঞতা বলাটাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। সরকারী মহলের মতে এই বয়সের মেয়েরাই বহির্জগতের কর্ম্মী হিসাবে সব চেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে যার জন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নারী কর্ম্মী খোঁজার সময় পঞ্চাশের কোঠায় পা দেওয়া মেয়েদের উপরই ঝোঁকটা দেন বেশী। গৃহেও এই সময় তাঁদের করবার অনেক কিছুই আছে যে কোন শিল্পকে সখ বা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে গৃহেই কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারেন তাঁরা সহজেই, আর একটা কথা, এই সময়ই তাঁদের জীবন যেমন এক দিকে সংকুচিত হয় তেমনি অপর দিকে প্রসারিত হয়ে যায়, কারণ সাধারণতঃ এই বয়সেই মেয়েরা সচরাচর দিদিমা বা ঠাকুরমা হওয়ার আনন্দ লাভ করেন, পুরোনো মুখের বদলে নতুন মুখ ঝলসে ওঠে তাঁদের চারিধারে, জীবনের পথে যাত্রা যেন নতুন করে সুরু হয়ে যায় আবার, নতুন মায়া নতুন বন্ধনে ভরে ওঠে মন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ছোঁয়ায়। সুতরাং প্রাক পঞ্চাশিকা ভীতা হবেন না, জীবন আপনার শেষ হয়ে যাচ্ছে না, শুধুমাত্র সমাপ্তি ঘটছে তার একটা অধ্যায়ের। হয়ত বা দীপ্ত যৌবনের ঘন মাধুর্য্যের পর প্রৌঢ়ত্বের ম্লানাভ সোনা রাঙা দিনগুলিতেই লুকিয়ে আছে আপনার জীবনের সর্ব্বোত্তম সম্পদ।

## কবি কর্ণপুর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১০৮। শিব-বিদ্যাধর-গন্ধর্ব-কিন্নরদের শ্রীমুখ থেকে,··· দুন্দুভি ঘোষের মত পঞ্চচামর-ছন্দে,··· যখন নিঃসৃত হয়ে দিগন্ত পুলকিত করে তুলল পুষ্প-স্তবক সদৃশ সেই স্তব ভারতীর সৌন্দর্য্য তখন আনন্দে যেন দিশা হারিয়ে ফেললেন ব্রজধামের গোপেরা। তাঁরা গুরুতর সমস্যায় পড়ে গেলেন।

"কী চমৎকার। কিন্তু এই চমৎকরণের কারণটি-কে?"—জিজ্ঞাসা করে উঠল তাঁদের মান-সম্বল মন।

তাঁরা পৌঁছে গেলেন ব্রজরাজ শ্রীনন্দের চরণে। প্রশ্রয় ভিক্ষা করে নিবেদন করলেন,—

"আমরা হকচকিয়ে গেছি, মহারাজ। আবার একটা পরিচ্ছন্ন আনন্দও নেচে উঠছে আমাদের ভিতরে। নানান্ দিকে আপনার বুদ্ধি খেলে, তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

ইন্দ্রযজ্ঞের ক্রম ভাঙলো, ইন্দ্রদেবের বন্ধুধন আদায় বন্ধ হয়ে গেল। তিনি পাঠালেন প্রসিদ্ধ সম্বর্ত্তক-গণের অসংখ্য মেঘ। প্রলয়ের মহাবৃষ্টি নিয়ে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন··· ব্রজনগর ধ্বংস করতে, ধারা প্লাবনে গলিয়ে ডোবাতে। সব দেখলুম। তারপরেই দেখলুম, সেই প্রচণ্ড বেগ ব্যর্থ করতে দাঁড়িয়ে উঠেছেন আপনার পুত্র। একটি বালক। অদ্ভুত লাগল যখন দেখলুম··· তাঁর দীর্ঘ অলক-দামে ঢেউ দোলানো কৌতুক, আর নিতান্তই লঘু ভাবে তিনি ঊর্দ্ধে তুলে ধরলেন বাম কর। তারপরে সাত সাতটা দিন তিনি লীলা ভরে করতলে ধরে রইলেন নগরাজকে। আর সেই নগরাজের শিরে চলল অশ্রান্ত বর্ষণ। যেন শিবের মাথায় পদ্মের মধু ঢালছেন ঐরাবত। সব দেখলুম। তারপরে দেখলুম··· সেই বালক··· নগরের জয় করে ছেড়েছেন ইন্দ্রকে।

১০৯। অতএব আমাদের জিজ্ঞাসা···ইনি কে? ইনি যে কে, তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের জ্ঞানের উপর যেন একটা মোহের সর জমে গেছে। বাঁধুলি ফুলের মত টুকটুকে,··· আর মধুর মত মিষ্টি ঠোঁট নিয়ে, আমাদের এই বন্ধু জীবনটি যেই জন্মালেন, অমনি দেখুন, উদয় হলেন পূতনা। তাঁর বিষ-মাখানো স্তনের রস টানতে টানতে ইনি তাঁকে পূত-নাম্নী করিয়ে ছাড়লেন। এতটুকুও দেরী হল না।

১১০। তারপরে বৃহৎ একখানা শকটকে ইনি টুকরো টুকরো করে ভাঙলেন,··· জোড়া অশোক পাতার চেয়েও কচি কচি একরত্তি পা ছুঁড়ে। তারপরে আবির্ভাব হলেন প্রলয়ঙ্কর মহাবাত্যা দৈত্য। ধুলো উড়িয়ে এলেন যেন খর খরে একখানা ঝাঁটা। সুরাসুর যাঁকে কোনদিন জয় করতে পারেন নি, যাঁর একটি চাহনিতেই লুপ্ত হয়ে যায় ধৃতি, সেই বিরাট দৈত্যের কণ্ঠটিকে ইনি তাঁর যমুনার শেওলার মত এক জোড়া নরম হাত দিয়ে জোরে জড়িয়ে ধরলেন,··· আর টুক করে প্রাণটি খসে গেল দৈত্যের।

তারপরে বিনা-রণে বিনা-পরিশ্রমে ইনি ঘটালেন অঘাসুর বকাসুরের মৃত্যু,··· যেন কটা বাছুর মরলো।

১১১। এঁর উপর আমাদের যেমন, আমাদের উপর এঁরও তেমনি··· নিখর ভালবাসা। এই প্রেমোল্লাস বেড়েই চলেছে অহরহ: গোড়া থেকেই যেন এটি সার্থক হয়ে অন্তস্তলেই ছিল। এ এক অনির্ব্বচনীয় উল্লাস, এ এক অনুপম উল্লাস। এ অনুভূতি আপনারও নিশ্চয় ঘটেছে। এ স্থলে তত্ত্বটি কি, মহারাজ, যদি দয়া করে বলেন।"

১১২। গোপেদের কথা শুনে বেশ একটু হাসির সঙ্গে কৌতুকের কুন্দ-মাধুর্য্য বিকশিত হল ব্রজেশ্বরের অধরে। তিনি বললেন,—

"গোপ শ্রেষ্ঠগণ, বহুদিন অতীত হয়েছে, আমি শুনেছিলাম একটি অনিন্দনীয় বাণী। তার তত্ত্ব আপনারা আশা করি অবহিত হয়ে শুনবেন। তখন কুমারের নামকরণ হবে। মুনি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ গর্গ··· যোগদান করেছিলেন উৎসবে। তিনি তমোহন্তা। আমাকে গুপ্ত-বোধ করে বলেছিলেন,—

'তোমার এই শিশুটির সৌভাগ্যের আস্বাদনীয়তার পার নেই। বিদ্যায় আমি পারমহংস্যের পারে পৌঁছে গেছি,··· এই অভিমান থাকা সত্ত্বেও এঁর রহস্য বোঝা ভার। ইনি নির্ব্বিকার; সত্যাদি চার যুগের বর্ণ-ভেদের কৃপায় চতুঃসংখ্যাবতী হয় এঁর অবিকারিতা। সত্যযুগে এঁর বর্ণ··· অক্ষয়-বল শুক্ল; ত্রেতায়··· জিতারুণ অরুণ; দ্বাপরে··· মেঘশ্যাম; কলিযুগে··· কৃষ্ণ ইদানীং তাই ইনি কৃষ্ণ। কদাচিৎ ইনি চিন্ময়ী ইচ্ছা-বশত: বসুদেব-সম্ভূত হয়েছিলেন, তাই কীর্ত্তনের সময় বাসুদেব—নামেও এঁকে অভিহিত করা হয়। আরো বলি শোন, ইনি নারায়ণসম··· মহিমায়। এই আধারটিতে আশ্রয় নেয় যাঁদের আত্যন্তিক প্রেম, অপরাধের বা কোন অপরিতোষের রেণুও তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। সর্ব্বত্র,··· সমস্ত নরনারীদের চতুর্ভিতেই বিরাজ করেন এই প্রেমাস্পদময় মঙ্গল;··· শত্রুদেরও লুপ্ত হয় পরাক্রমের ক্রমণিকা।'

১১৩। তাই বলছি, আপনারা শঙ্কা ভুলে যান। আমাদের কল্যাণের জন্য এঁর চেষ্টার অভাব কি দেখেছেন কোথাও? কেবল বক্তৃতা নয়, আপনাদের উচিৎ··· এই আধার থেকে প্রেম সঞ্চয়ন করা, এবং আমাদেরো উচিৎ··· এঁকে পুত্র স্বরূপেই অঙ্গীকার করে নেওয়া। মহিমা শ্রবণ করিয়ে এই পুত্র ভাবটিকে গ্রহণ করাতে চান না ইনি, যে হেতু ইনি স্ব-প্রভা-রক্ষী। অতএব এই কৃষ্ণে, অত মাল্যদান করবার প্রয়োজন নেই আপনাদের; অন্য কিছু ভেবে আত্মাকে কষ্ট দেবারও কোনো দরকার দেখি না। আমার কুমারের এখন এক মাত্র প্রয়োজন··· আপনাদের অনুকম্পা।"

ব্রজরাজের ভাষণ শুনে যে যাঁর ভাবে আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন গোপেরা। যেমন ছিলেন, তেমনিই অবহিত হয়ে রইলেন সবান্ধবে।

১১৪। সুস্থির হল বটে ব্রজবাসীদের মন, কিন্তু ততক্ষণে নিতান্ত আকুল হয়ে উঠেছিল সুরলোকের গো-জননী শ্রীমতী সুরভি দেবীর হৃদয়। নিজের সন্তানদের রক্ষা করতেই হবে পৃথিবীতে,··· এই উৎকণ্ঠা নিয়ে নিজলোক থেকে তিনি ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লাভ করেছিলেন ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মলোকবাসীদের অনুমোদন। বিশ্ব-সৌভাগ্য-পরিমল-সুরভিতা সুরভি দেবী তাই

যখন মনস্তুষ্টির আনন্দে সুরলোক থেকে নামছিলেন, তখন ব্রজধামের নিকটে আসতেই, হঠাৎ পথে তাঁর দেখা হয়ে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে। কী চেহারা হয়ে গেছে ইন্দ্রের! লজ্জার তীব্রতা যেন তার হাজার পাপড়ি দিয়ে ঢেকে ফেলেছিল ইন্দ্রের হাজার নয়ন; আর সেই হাজার নয়নের কোণ থেকে ঝর ঝর করে গড়িয়ে ঝরে পড়ছিল ···রোষরেণু। যেন তাঁকে একটি স্থূল আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নির্বেদ-লক্ষ্মী।

দৈববশতঃ ঠিক সেই সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতে একাকী পদচারণা করছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কোন সহচর ছিল না তাঁর সঙ্গে। পরিপুষ্ট-হৃদয়ে তিনি যেন হরণ করে নিচ্ছিলেন পর্ব্বতের বর্ষাবৃষ্টি-জনিত অঙ্গ-গ্লানি। এও তো হতে পারে ইন্দ্রের সৌভাগ্য লক্ষ্মীই তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন সেই স্থলে। স্থানটি নির্জ্জন, উদ্দেশ্য নিজের অপরাধের ক্ষমাকরণ, কার্য্য···স্ববিনয়ের বিজ্ঞাপন; অতএব সুনীতি অনুসরণ করেও গো-জননী সুরভিদেবীকে সঙ্গে নিয়ে, ইন্দ্রদেব উপস্থিত হয়ে গেলেন কৃষ্ণের সকাশে।

১১৫। গোমাতা সুরভিদেবী তখন দেবী সরস্বতীর মত সাদর বাণী-বিন্যাস করে ধীরে ধীরে বললেন, "হে দেব, ব্রজরাজ-রাজধানীর আপনি কস্তুরী—তিলক, অদ্বিতীয় আপনার কৃপা। আশা করি আমার এই বিশেষ ভাষণে আপনি মনঃসংযোগ করবেন। গো এবং গো-দোহনকারীদের হত্যা ব্যাপারে যদিও উদ্যোগী হয়েছিলেন ইন্দ্রদেব, তবুও অগম্য বুদ্ধির অতিবৃহৎ মহিমা প্রকট করে আপনি পরাস্ত করেছেন ইন্দ্রদেবের অতি-প্রচণ্ড অতিবর্ষণ এবং হে অখিলসৌভাগ্যবান ভগবান, আপনি রক্ষা করেছেন গো-কদম্ব। সেই আনন্দে অধীর হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে আহ্বান করে বলেন, 'সুরভিদেবী তুমি যাও। ইন্দ্রের হঠ-ক্রোধে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল মহাকবি-কীর্ত্তিত গো-সংহতি। দেবলোকে সুরদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল ভেদ। কিন্তু বিগত-স্পৃহ নন্দাত্মজ তাঁর অসীম করুণায় পালন করেছেন গো-রক্ষণ উৎসব। তাঁকে অধুনা তোমার গো-সাম্রাজ্যের ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করা সমীচীন। আমিও হংসে আরোহণ করে ব্রহ্মর্ষি, সুরর্ষি, সুর, কিন্নর, চারণ ও সিদ্ধদের সঙ্গে নিয়ে অনুসরণ করছি তোমার। আমিও দেখতে চাই, অনুভব করতে চাই সেই অভিষেকের মহানন্দ।"

"আর এই দেখুন, আমার সঙ্গে এসেছেন···পুরন্দর। লজ্জায় নত এঁর নয়ন, নিজের অ-ভব্যতায় অনুতপ্ত, নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন বারবার। এমন অপরাধ পূর্ব্বে কখনও করেন নি, তাই মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে এসেও আপনার সম্মুখে উপস্থিত হতে দ্বিধা করছেন, ভয়ে কাঁপছেন, অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। এখন আপনি অনুমতি করুন, আপনার চরণ প্রান্তে স্বয়ং ইনি স্বগত কিছু বলবেন।"

১১৬। ইন্দ্রের সহস্র নয়ন থেকে তখনও ধারাকারে ঝরে পড়ছিল নয়ন জল। দম্ভের সিংহাসন থেকে অবতরণ করে, সহসা তিনি যেন তাঁর মুকুটের মহামণীন্দ্রের কিরণ-সলিলে ধুইয়ে দিলেন কৃষ্ণের চরণমূল। এক গাছা বাঁশের খুঁটির মত পড়ে রইলেন চরণে। অনেকক্ষণ। তারপরে উঠে দাঁড়ালেন। সাদরে ও সভয়ে, করপুটে অঞ্জলি রচনা করে, অধোমুখে পায়ের নখের দিকে চেয়ে রইলেন,···যেন ঢেউ গুণছেন নখরের স্নিগ্ধ শান্ত কিরণের,···যেন দেখছেন অস্ত হচ্ছে তাঁর সহস্র বজ্রের তেজ। হৃদয়ে মায়া-নিয়ন্ত্রিত দম্ভের নিবিড় স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও সবিনয়ে তিনি বললেন —

"অখিল লোকনাথদের আপনি নাথ, আপনি ব্রজপুর-নাথের পুত্র, স্বতঃই স্বতন্ত্র। উৎসবের মধ্য দিয়ে পূজিত হয় আপনার মহা-মহত্ত্ব। এতই গহন আপনার তত্ত্ব। আমার মত লোকের পক্ষে ধারণাতীত আপনার মহিমা। নিজের মদের মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাঁরা অন্ধ হয়ে পড়েন, তাঁরা কেমন করে উপলব্ধি করবেন, আপনার মহিমার স্বভাবের বিকার-বশতঃ যাঁদের দৃষ্টি দোষ ঘটে, সেই সব পেচকদের চোখে কি সূর্য্যের আলো রোচে?

হে মহা করুণ, তেমনি হয়েছে আমার দশা। গর্ব্বমদে নষ্ট হয়ে গেছে আমার দৃষ্টি। সমুচিতই হয়েছে, যজ্ঞ খণ্ডন করে আমাকে এই চণ্ড দণ্ড-দান আপনার সমুচিতই হয়েছে। হতভাগ্য জন্মান্ধের কাছে সরল একগাছি লাঠিও তো পথ্য।

আমার বিরুদ্ধ বুদ্ধি আমাকে বলেছিল,···আপনি আমার অপকার করছেন। এই প্রণালীতে আপনি যে আমার উপকার করেই চলেছেন, তা বুঝতে দেয়নি ঐ বুদ্ধি। ও বুদ্ধির স্বভাবই খল।

বিরজা মুনিদেরও যখন নাড়া দিয়ে যায় রজোগুণ তখন আমরা··· যারা বিষয়-বিষ পান করে আমিষের লালসায় ফিরছি, তাদেরও যে নাড়া দেবেন রজঃ, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? পঞ্চম রিপু মদ-ই বা কেমন করে বাঁচবেন? যদি তা না হয়, তা হলে বলতে হয়···সবই আপনার দুর্দ্দমনীয় মায়ার খেলা।

হে দামোদর, আপনাকে নমস্কার। ত্রিজগত্তর নারাৎসার হয়েও,

গুণ ও নামের নিরুপম ধাম হয়েও, আজ আপনি ব্রজপুর—মঙ্গল মঙ্গলাবতার হয়ে রয়েছেন, দাম-বসুদাম সুদামের বন্ধু হয়ে রয়েছেন। হে দুর্জ্জেয়, হে বিজয়ী, আপনার জয় হোক। নমো নমঃ।

হে, দেব, দয়া করুন। আর যেন আমাকে কৃপা-বঞ্চিত হয়ে মোহগ্রস্ত হতে না হয়। সুঘট ঘটায় জানি, দুর্ঘটও ঘটায় দেখছি আপনার কটাক্ষ।

হে জন্মহীন, এক হলেও বহু আপনার অবতার। বিবুধ-গণের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে কৌতুক-বশতঃ একদা পুরাকালে আপনি অংশতঃ ইন্দ্র-কনিষ্ঠ উপেন্দ্র-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অধুনা স্বয়ং সুরভি দেবী কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হয়ে, আপনি হবেন আমার এই ইন্দ্র চূড়ার মহেন্দ্র নীলমণি।

আপনি গো-লাভ করেছেন। আপনি গো-বিচারক। গো আপনার শাশ্বত সত্তা। ধাতুর রূপ থেকেই অভিরাম গোবিন্দ-নাম যদিও নিত্য প্রাকসিদ্ধ, তবুও হে গোপেন্দ্রাত্মজ, হে শ্রীগোবর্দ্ধন ভূধরেন্দ্র ধর, হে ভগবান, অদ্যকার এই অভিষেক-উৎসবে আপনি গোবিন্দ-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করুন।"

১১৭। বাস্তব স্তবের কৃপায় যখন প্রক্ষিপ্ত হয়ে গেল ইন্দ্রদেবের দম্ভ-বিসর্জ্জন, তখন হঠাৎ দেখা গেল…গগন পুলকিত ও খচিত হয়ে উঠেছে অগণিত সুরসভার অক্ষয় আনন্দেও ভাস্বর উপস্থিতিতে। কমলাসন ব্রহ্মাকে পুরোভাগে নিয়ে স-পার্ব্বতী চন্দ্রশেখর এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন…সনাতন, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও কার্ত্তিকেয়। এসেছেন দিকপালগণ। এসেছেন নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি আহ্লাদপ্রিয় উত্তম মহর্ষিমণ্ডল, এসেছেন আর্য্য দীপ্তি অরুন্ধতী প্রভৃতি মুনি ভার্য্যারা। সকলেই এসেছেন সভা জমকিয়ে অভিষেক-মঙ্গল দেখবার বাসনায়। তাঁদের মধ্যে আরো দেখা গেল নারায়ণ-উরু-সম্ভবা অপ্সরা-প্রধানা মাননীয়া উর্ব্বশীকে। তিনিও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তুল্য-রূপ-গুণ-লাবণ্যময়ী অপ্সরা-রম্ভা।

ঠিক সেই সময়ে নগরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন নিজের রূপময় দেহের অবয়ব-সমষ্টি দিয়ে গড়ে ফেললেন রত্নশিলা-বিলসিত একটি সিংহাসন। পাশায়ুধ শ্রীবরুণ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সিংহাসনশীর্ষে ধারণ করলেন মণীন্দ্র-মুক্তার ঝালর-দোলানো আতপত্র।

সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হলেন মরুদ্গণ,… তাঁরা হাত কাঁপিয়ে বীজন করতে লাগলেন সুচারু চামর। পূর্ণমণ্ডল সুধাংশুও রূপান্তরিত হয়ে গেলেন সিংহাসনের মণি দর্পণে।

পাঞ্চজন্য শঙ্খ…তিনি কাম্বুরাহ রচনা করে আপনা হতেই বাজতে লাগলেন মুহুর্মুহুঃ। জ্যোতির্ময় সুদর্শন চক্র…অসংখ্য মণিদীপের আকার ধারণ করে স্বয়ং জ্বলতে লাগলেন চতুর্দ্দিকে।

বিভুর পদ্মটি হঠাৎ বিভুত্ব লাভ করে প্রকাশ পেলেন হংস শুভ্র নানান্ ছত্ররূপে। কৌমোদকী গদা সতেজে পরিণত হয়ে গেলেন অভিষেক—যজ্ঞোৎসবের মহনীয় মণি-যূপে।

সপ্ত সমুদ্র, পুণ্য নদ ও নদিগণ, এবং পুণ্য জলাধারগুলি দিব্যদেহ ধারণ করে উৎসব স্থলে উপস্থিত হয়ে গেলেন ; প্রত্যেকেরই হাতে নিজের নিজের অম্বুপূর্ণ মণিময় মঙ্গলকুম্ভ।

স্বয়ং পৃথিবীদেবী তনুমতী হয়ে কৃৎস্নাভিলাষ-দাতার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন ; সাতটি রতন-পাতার মোড়ক করে তিনি মণিপাত্রিকায় বহন করে নিয়ে এসেছেন শুচি সপ্ত মৃৎস্না।

হস্তে সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি, এলেন মূর্ত্তিমান মহৌষধিগণ ; বৈদূর্য্য-পাত্রে পঞ্চ কষায় গ্রহণ করে এলেন পুণ্য বনস্পতিগণ ; তাঁরা আসন গ্রহণ করলেন পুরোভাগে।

উদয় হলেন বনদেবীরা,···কারো হাতে ফলের ভার, কারো হাতে রসে ভরা ঘটির বাহার। উদয় হলেন গিরিদেবীরা,···তাঁদের হাতে নানান্ রঙের বিরাট বিরাট মণি।

এলেন শঙ্খ-প্রমুখ নব নিধি,, অষ্টসিদ্ধি ; এলেন চিন্তা মণীন্দ্রের দল, এলেন কামধেনু ও কল্পদ্রুমের সংহতি। মনোজ্ঞ রূপ ধারণ করে তাঁরা কৃতাঞ্জলি-করপুটে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন সম্মুখে।

স্বর্ণাম্বরের ভেট নিয়ে উপস্থিত হলেন সুমেরু-লক্ষ্মী, হারাবলীর উপহার নিয়ে হিমালয়শ্রী, মানসসরোবর থেকে হেমপদ্ম চয়ন করে স্বহস্তে তার মালা গেঁথে গন্ধমাদন পর্ব্বতশ্রী।

মলয়লক্ষ্মী নিয়ে এলেন গন্ধোত্তম চন্দন,···নিজে পিষতে বসে গেলেন শ্রীগোবর্দ্ধনের শিলায়। আর কৈলাস লক্ষ্মী নিয়ে এলেন এমন একটি রত্নমালা যা এর আগে কখনও চোখে দেখেন নি হরপার্ব্বতী।

মন্দাকিনীর সলিল থেকে যে বিকচ কমলগুলিকে স্বহস্তে চয়ন করে, এবং চন্দ্রকিরণে পুনর্ব্বার যেগুলিকে মুকুলীকৃত করে, রেখে দিয়েছিলেন সপ্তর্ষিবৃন্দ, রবি এখন সেই পদ্মের কুঁড়িগুলিকে নিয়ে এলেন···উৎফুল্ল করে।

ললিত-কাঞ্চনের একটি ধূপপাত্রী, স্থূল প্রবালের শৃঙ্খলে সেটি ঝুলছে, ঢাকনির সহস্র রন্ধ্রপথে বেরিয়ে আসছে জ্বলন্ত অগুরু-কাষ্ঠের সুরস গন্ধধূম,···স্বয়ং সেটিকে বয়ে নিয়ে এলেন বহ্নি।

জ্যোতির্ম্ময় পক্ষদ্বয় বিস্তার করে শ্রীগরুড় এলেন, সৃষ্টি করলেন কনকোত্তম-ভাস্বর চন্দ্রাতপ। ভুজঙ্গাপতিরা ফণা বিস্তার করে রচনা করলেন ধ্বজা ; ফণাগ্র রত্নে প্রকাশ পেল রত্নময়ী পতাকার বাহুল্য।

তারপরে কমনীয় দেহ ধারণ করে একে একে এলেন স্ত্রী-সূক্তের দল, পুরুষ-সূক্তের দল, অভিষেক-মন্ত্র-সঙ্ঘ ; মধুর উদাত্ত-মুখর স্বরে তাঁরা নিজেদেরই উচ্চারণ করে গেলেন নিজেরা ; সাধুবাদে মুখর হয়ে উঠলেন উপস্থিত মুনিগণ।

সুরভিদেবী নিয়ে এলেন পঞ্চগব্য। চতুরানন ব্রহ্মা···পঞ্চামৃত ঐরাবতও শুণ্ডে ভরে নিয়ে এলেন সুর-দীর্ঘিকার সলিল, বিপুল মণিকুম্ভগুলিকে পূর্ণ করে দিতে লাগলেন সাগ্রহে।

দেখতে দেখতে দেবতাদের তূর্য্য-সজ্ঞ নিনাদ করে উঠলেন দিব্যলোকে। নন্দনকাননের ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন দেবীরা। আর সঙ্গে সঙ্গে অসীম আনন্দে, হিল্লোলিত ছন্দে,···গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-সাধ্য-কিম্পুরুষদের কণ্ঠে ও চরণে খেলতে লেগে গেল নৃত্য ও গীত।

দলে দলে অপ্সরারা অভিনয় করতে লেগে গেলেন নানান রসের নাট্য। মুখ-প্রভৃতি পঞ্চ সুসন্ধি-বন্ধ প্রকাশ করবার সে কি তাঁদের অনবদ্য প্রণালী। কি ঘটা।

কৃষ্ণকে নয়ন ভরে দেখতে দেখতে কয়েকটি অপ্সরা তো আবার মূর্চ্ছাই গেলেন আনন্দে, আর যাঁরা নারায়ণের উরুসম্ভূতা তাঁরা ডুবে গেলেন ভক্তির অথৈ সায়রে।

[ ক্রমশঃ।

# রবীন্দ্রনাথের বেদনা

শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সে জুতির ছন্দে ছন্দে যা লিখেছ কবি,
কতদিন নিরালা বাতায়নে
বসিয়া পড়েছি চুপিচুপি।
গগনের রক্তরবি চলে গেল পাটে
মেয়েরা বসেছে ঘাটে ঘাটে ;
জীবনের যা ছিল সঞ্চয়
দিনান্তে গোধূলির আবির খেলায়,
সবটুকু রঙ, তার নিঃশেষে করে দিলে ক্ষয়।
সে কি অপচয় ?
সূর্য ডোবার সাথে পৃথিবীর অপর তীরে বুঝি,
মানুষ রয়েছে উন্মুখ তাহারই চরম অর্থ খুঁজি'।
সায়াহ্নের ধূসর লগনে
জীবনের সব পুঁজি, সব লেন দেন,
হিসাব মেলাতে বসি বারম্বার
চেতনার নির্ম্মম প্রহার,
অনেক ক্ষতের জ্বালা জ্বালায়েছে মনে।

হেনকালে, বুঝি বা অকালে,
দিবসের শেষ আলো মিলাল আঁধারে।
কালের প্রহরী করে করাঘাত
সময়ের সংকীর্ণ দুয়ারে ;
'জীবনে জীবন যোগ করা'
তোমার সে বেদনা কবি তোমারি লিপিতে স্বয়ম্বরা।

উৎসের বার্ত্তা নিয়ে তটিনী সাগর পানে ধায়,
প্রতিদিন ঘাটে বসে
মাটির কলস ভরে' কুলবধূ ঘরে ফিরে যায়।
তোমার আদর্শ সেথা যুগে যুগে আনন্দ-আহ্বানে,
বহে যায় কলস্বিনী বৈকুণ্ঠের অমৃত-সন্ধানে।

সে বাণীর ভগ্ন অংশ ভাগ
লিপিতে পেয়েছে পরিচয়
ইতিহাসে সুবর্ণ স্বাক্ষরে সযত্নে হউক সঞ্চয়।

## এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি

"মানব-জাতির কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে এশিয়ার তরুণেরা যেন চিরদিন এই ক্রীড়া উৎসব উদ্‌যাপন করেন" —দ্বাদশ দিবসব্যাপী এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের শেষ দিবসে সেনাজন ষ্টেডিয়ামে ...বেরং-এর বৈদ্যুতিক আলোকমালার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার নবম সুলতান হেমনকু বুয়নো চতুর্থ এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ এই গেমসের উদ্বোধন করেছিলেন। ১৭টি দেশের সেরা ক্রীড়াবিদরা এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগ দেন। বহু রেকর্ড হয়েছে—বহু পদকও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন, তা কি সফল হয়েছে?

খেলাধুলায় রাজনীতি প্রবেশ করা উচিত নয়; কিন্তু এবারকার চতুর্থ এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে যে রাজনীতির দ্বন্দ্ব চলে তা বিশ্বের সকল ক্রীড়ামোদীর বহুদিন স্মরণ থাকবে। তাইওয়ান ও ইসরাইলের যোগদান নিয়ে এক ঝড় বয়ে যায়। এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী জি ডি সোন্ধি এর নায়ক। তাঁকে কেন্দ্র করে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে তিক্ততার ভাব দেখা যায়। ইন্দোনেশিয়ানদের সোন্ধির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাইওয়ান ও ইসরাইল যোগ না দেওয়ায় এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের জন্য তিনি এক আন্দোলন সুরু করেছিলেন।

শ্রীসোন্ধিকে নিয়ে ভারত-বিরোধী যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল—তার পরিণতি ভারতীয় দূতাবাস আক্রান্ত হওয়া থেকে সুরু করে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা পর্যন্ত পৌঁছায়। ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার চেষ্টা হয়েছিল। তবে সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপে সে চেষ্টা কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নি। শেষ দিনে অবস্থা চরমে উঠে। ফুটবল ফাইন্যালের সময় ষ্টেডিয়ামে উপস্থিত এক লক্ষ দর্শক ভারতের বিরুদ্ধাচারণ করে। এমন কি বিজয়ী ভারতীয় দল বিজয়-উৎসবের সময় যখন জাতীয়-সঙ্গীত গাহিতেছিলেন —তখন ইন্দোনেশীয়রা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি করতে থাকে। তাঁদের বিদ্রূপাত্মক ধ্বনিতে ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত ডুবে যায়।

শ্রীসোন্ধি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পর্যবেক্ষক হিসাবে জাকার্তায় গিয়েছিলেন। তিনি কাউন্সিলের নিকট জাকার্তার খেলাধুলা সম্পর্কে এক রিপোর্ট দাখিল করবেন বলে জানিয়েছেন।

শ্রীসোন্ধি দিল্লীতে বলেছেন যে, "ইন্দোনেশিয়ায় আমি যা দেখেছি তা খেলাধুলার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সকল দেশের প্রতি সতর্কবাণী স্বরূপ। জাকার্তায় খেলাধুলায় শুধু রাজনীতিই অনুপ্রবেশ করে নাই—ব্যবসায়ীরাও হস্তক্ষেপ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ সুবান্দ্রিও বলেছেন যে এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী সুদৃঢ় করতে পারে—এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমি এশীয় বন্ধুদের সঙ্গে এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলাম। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান এমন বীজ বহন করে নিয়ে যাবে না—যা এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে। তিনি আরও বলেছেন ভারতের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী অক্ষুন্ন আছে এবং আমরা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে একটি স্বাধীন ও সক্রিয় নীতি অনুসরণ ব্যাপারে একমত পোষণ করি।

শেষ পর্যন্ত একটা মিটমাট হয়, নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব বানচাল হয়ে যায়। দোষ গুণ বিচার না করে খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতির দ্বন্দ্ব চলে তাহার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার—এটা উল্লেখ করলেই বোধ হয় সব কিছু বলা হবে। এবার জাপান সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে। ভারতের সাফল্যের কথা উল্লেখ করার মতন।

ভারত এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে ১৯৫৮ সাল অপেক্ষা এবার পদক ও পয়েন্টের বিষয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। পদম বাহাদুর মল "শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা" বলে বিবেচিত হয়েছেন। ভারত মোট ১০টি স্বর্ণপদক পেয়েছে। ১৩টি রৌপ্যপদক ও ১০টি ব্রোঞ্জ পদকও তাহারা লাভ করেছে। পদকের তালিকায় ভারত তৃতীয় স্থানে আছে। চার বছর পূর্বে টোকিও এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারত ৫টি স্বর্ণপদক পেয়েছিল এবং তালিকার সপ্তম স্থানে থাকে।

এ্যাথলেটিকসে ভারত আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। বিশেষ করে ৮০০ মিটার, সট পাট ও ডিসকাস নিক্ষেপে ভারতের ব্যর্থতা সকলকে ব্যথিত করেছে। ২০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠতেই পারেন নি। ৮০০ মিটার দৌড়ে দলজিৎ সিং প্রথম "ল্যাপে" স্বাভাবিক অপেক্ষা আস্তে দৌড়ান এবং শেষ "ল্যাপে" তৃতীয় স্থান অধিকারী অমৃত পাল জাপানী প্রতিযোগীকে আগাইয়া যাইতে দেয়। ডিসকাস নিক্ষেপে বলকারের সাফল্য সম্পর্কে সকলেই আশান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু নীতি বিরুদ্ধভাবে ডিসকাস ছোড়ায় তিনি প্রতিযোগিতা থেকে বাদ হয়ে যান। সটপাটে ইরাণী কাদের পেশী সঙ্কোচনের জন্য ভাল ভাবে বল ছুঁড়তে পারেননি। ৪০০ মিটার দৌড়ে যা আশা করা গিয়েছিল ভারতের "উড়ন্ত শিখ" মিলখা সিং সহজেই সাফল্য অর্জন করেন। ৪×৪০০ মিটার রিলেতে ভারতের জয়লাভের জন্য তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক। ১,৫০০ মিটার দৌড়ে মহীন্দর সিং ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে তারলোক সিং সাফল্য অর্জন করেন। ডেকাথলনে গুরুবচন সিং জয়ী হন। তবে তাইওয়ানের "লৌহমানব" ইয়ং-এর অনুপস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিযোগীর কিছুটা সুবিধা হয়।

ভারত কুস্তিতে ১২টি পদক পেয়ে সর্ব্বাধিক সাফল্য অর্জ্জন করে। গ্রিকো-রোমান কুস্তিতে দুইটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক এবং ফ্রিষ্টাইল কুস্তিতে একটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক পায়। হেভি ওয়েটে মারুতি মানে ও ফ্লাই ওয়েটে মালওরা শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরের নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। গ্রিকো রোমান ও ফ্রি ষ্টাইল কুস্তি প্রতিযোগিতার সকল বিভাগে প্রতিযোগী থাকলে ভারত আরও পদক লাভ করতো।

মুষ্টিযুদ্ধের লাইট ওয়েট বিভাগে ভারতের পদম বাহাদুর মল জাপানী প্রতিযোগীকে পরাজিত করে স্বর্ণ পদক পান। তিনি "শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা" বলে বিবেচিত হন।

হকিতে ভারত হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য যে চেষ্টা করেছিল তা সাফল্য লাভ করেনি। পাকিস্তান ২—০ গোলে ভারতকে পরাজিত করে বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

ফুটবলে সাফল্য প্রমাণ করিয়ে দিয়েছে যে আন্তর্জ্জাতিক ফুটবলে ভারত মোটেই পিছিয়ে নেই। ফুটবলের ফাইন্যালে ভারত ২—১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক পায়। ভারতের এই সাফল্য প্রথম নয়। ১৯৫৮ সালে প্রথম এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত স্বর্ণপদক পেয়েছিল। ফুটবলে স্বর্ণপদক লাভ ভারতের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। যে পরিস্থিতির মধ্যে তার জয় হয়েছে তাতে দলের প্রতিটি খেলোয়াড় অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। সহস্র সহস্র দর্শক যাঁরা ফুটবল ফাইন্যাল খেলাটি প্রত্যক্ষ করেছেন—তাঁদের এক বিরাট অংশ খেলাটি চলাকালীন ভারতীয় দলকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দিয়েছেন।

খেলার শেষে ভারতীয় ফুটবল দলের বিজয়োৎসব উপলক্ষে যখন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হচ্ছিল তখন ইন্দোনেশীয়রা সুসংগঠিত ভাবে বিদ্রূপ করে। পুরস্কার বিতরণ উৎসবের সময় বিজয়ী ভারতীয় খেলোয়াড়রা যখন পুরস্কার নিয়েছেন—তখন বিদ্রূপ ধ্বনি হয়েছে। কিন্তু পরাজিত দক্ষিণ কোরিয়া দলের খেলোয়াড়রা যখন পুরস্কার নিয়েছেন তখন সকলে উচ্চ চিৎকার করে তাদের অভিনন্দন করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার যে সকল কর্ম্মকর্ত্তা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের মধ্যেও কেহ ষ্টেডিয়ামে উপস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন নি।

এই সকল প্ররোচনা সত্ত্বেও ভারতীয় দলের মনোবল কোন সময়েই ভাঙ্গে নি। এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি দিনে ভারতীয় দল মার্চ্চ পাষ্টে যোগদান করেছেন। এখানেও ভারতীয় দলকে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

জাকার্ত্তায় ভারতীয় দলকে নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল—তাতে খেলোয়াড়রা যে সুস্থদেহে দেশে ফিরে এসেছেন—এটাই আনন্দের কথা।

পদক লাভে পাকিস্তানও এবার বেশী সাফল্য লাভ করে। তারা আটটি স্বর্ণ, দশটি রৌপ্য ও দশটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। টোকিওতে অনুষ্ঠিত গত এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে পাকিস্তান ছয়টি স্বর্ণপদক পেয়েছিল। এবার তারা চতুর্থ স্থান পেয়েছে। গত বারে তারা পঞ্চম স্থানে ছিল।

কর্মকর্তাসহ লীগবিজয়ী মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়গণ

## ভারতের পদক লাভের পূর্ণ তালিকা

এ্যাথলেটিকস্ :—পুরুষদের ডিসকাস নিক্ষেপ পর্দুমন সিং রৌপ্য পদক; ১০,০০০ মিটার দৌড়—তারলোক সিং স্বর্ণ পদক; ৫০০০ মিটার দৌড় তারলোক সিং ব্রোঞ্জ পদক; ৪০০ মিটার দৌড় মিলখা সিং স্বর্ণপদক ও মাখন সিং রৌপ্য পদক, ১৫০০মিটার দৌড় মহীন্দার সিং স্বর্ণপদক ও অমৃত পাল রৌপ্য পদক; সট পাট্ ডি আর ইরাণী রৌপ্য পদক ও যোগীন্দার সিং ব্রোঞ্জ পদক ৪×৪০০ মিটার রিলে—স্বর্ণ পদক; ৮০০ মিটার দৌড় দলজিৎ সিং রৌপ্য পদক ও অমৃত পাল ব্রোঞ্জ পদক; ডেকাথলন—গুরুবচন সিং স্বর্ণ পদক; মহিলাদের বর্শা নিক্ষেপ মিস ডেভেনপোর্ট ব্রোঞ্জ পদক।

### মুষ্টিযুদ্ধ

লাইট ওয়েট—পদম বাহাদুর মল্ল—স্বর্ণ পদক, লাইট মিডেল ওয়েট—বি ডি' সুজা ব্রোঞ্জ পদক; মিডল ওয়েট—সুরেন্দ্রনাথ সরকার—ব্রোঞ্জ পদক।

### গ্রিকো-রোমান কুস্তি

ফ্লাই ওয়েট—মালওয়া স্বর্ণপদক; ব্যাণ্টাম ওয়েট—নারায়ণ ঘূনে—ব্রোঞ্জ পদক; মিডল ওয়েট—সজ্জন সিং—রৌপ্য পদক; লাইট ওয়েট—উদয়চাঁদ রৌপ্য পদক; লাইট হেভি ওয়েট—মারুতি মানে রৌপ্য পদক; হেভি ওয়েট—গণপৎ আণ্ডালকার স্বর্ণ পদক।

### ফ্রি ষ্টাইল কুস্তি

ফ্লাই ওয়েট—মালওয়া ব্রোঞ্জ পদক; লাইট ওয়েট—উদয়চাঁদ রৌপ্য পদক; মিডল ওয়েট—সজ্জন সিং রৌপ্য পদক; লাইট হেভি ওয়েট—মারুতি মানে স্বর্ণ পদক; হেভি ওয়েট—গণপৎ আণ্ডেলকার রৌপ্য পদক; ওয়েল্টার ওয়েট—লক্ষ্মীকান্ত পাড়ে—ব্রোঞ্জ পদক।

ফুটবল

স্বর্ণ পদক।

হকি

রৌপ্য পদক।

স্মলবোর স্যুটিং

হরিচরণ সাউ—ব্রোঞ্জ পদক।

ভলিবল

রৌপ্য পদক।

বিভিন্ন দেশের পদকের খতিয়ান

| | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ |
|---|---|---|---|
| জাপান | ৭৩ | ৫৬ | ২৩ |
| ইন্দোনেশিয়া | ১১ | ১২ | ২৭ |
| ভারত | ১০ | ১৩ | ১০ |
| পাকিস্তান | ৮ | ১১ | ৯ |
| ফিলিপাইন | ৭ | ৭ | ২৩ |
| দক্ষিণ-কোরিয়া | ৪ | ৮ | ১০ |
| মালয় | ২ | ৪ | ১০ |
| থাইল্যাণ্ড | ২ | ৫ | ৪ |
| বর্ম্মা | ২ | ১ | ৫ |
| সিঙ্গাপুর | ১ | ০ | ২ |
| সিংহল | ০ | ২ | ৩ |
| হংকং | ০ | ২ | ০ |
| কম্বোডিয়া | ০ | ০ | ১ |
| দক্ষিণ ভিয়েৎনাম | ০ | ০ | ১ |
| আফগানিস্তান | ০ | ০ | ১ |

উত্তর বোর্ণিও ও সারাওয়াক কোন পদক পায় নাই।

## মোহনবাগানের দশম বার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ

ফুটবলে মোহনবাগান বহু ঐতিহ্যের অধিকারী। তাদের জনপ্রিয়তাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। এবার তারা গতবারের লীগ বিজয়ী চির-প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এই নিয়ে তারা দশ বার লীগ-বিজয়ী হয়েছে। এর আগে মহমেডান স্পোর্টিং নয় বার লীগ বিজয় করে রেকর্ড করেছিল।

মোহনবাগান ১৯৩৯, '১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬০, ও ১৯৬২ সালে লীগ বিজয়ী হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের পক্ষে সাতবার অর্থাৎ ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫২ ও ১৯৬১ সালে লীগে বিজয় লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে।

এ বছর প্রথম ডিভিসনে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল সমান পয়েণ্ট অর্জ্জন করে লীগের পালা শেষ করায় লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্দ্ধারণের জন্য আর একটি খেলার ব্যবস্থা হয়।

এর আগে তিন বার অর্থাৎ ১৯২৫ সাল, ১৯২৬ সাল ও ১৯৩৮ সালে দুটি দল সমান পয়েণ্ট লাভ করে লীগের পালা শেষ করেছিল। ১৯২৫ সালে গোলের গড়পড়তায় চ্যাম্পিয়নশিপ প্রশ্ন নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু এর পর নিয়মের পরিবর্ত্তন হওয়ায় ১৯২৬ সাল ও ১৯৩৮ সালে আর একটি অতিরিক্ত খেলার মাধ্যমে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রশ্নের মীমাংসা হয়।

দীর্ঘ ২২ দিন ধরে আলাপ-আলোচনার পর চ্যাম্পিয়নশিপ নির্দ্ধারক খেলাটি মন্ত্রী কালিপদ মুখার্জ্জীর স্মৃতি তহবিলের জন্য চ্যারিটি হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়।

এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী উভয়দলের খেলোয়াড়রা খেলতে পারেন নি। তবুও দুই প্রধানের মিলনে খেলার আকর্ষণ মোটেই কমে নি। মোহনবাগান এবার উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে যোগ্য দল হিসাবে জয়ী হয়েছে। দলগত শক্তির বিচারে ইষ্টবেঙ্গল শক্তিশালী থাকলেও তাদের খেলোয়াড়রা সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি।

মোহনবাগানের এই সাফল্যে দলের প্রতিটি খেলোয়াড় অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।

## নূতন ভাবে ভারতের টেষ্ট দল গঠনের প্রচেষ্টা

আগামী গ্রীষ্মকালে ভারতের এক তরুণ দলের ইংলণ্ড ভ্রমণের কথা আছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ টেষ্ট দল গঠনের উদ্দেশ্যই এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ভারতের দল গঠন সমস্যা দেখা দেওয়াতেই পাকিস্তানে ভ্রমণ পিছাইয়া দেওয়া হয়েছে। কারণ যে সময় পাকিস্তান ভ্রমণের প্রস্তাব হয়েছিল সেই সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের "ফাষ্ট" বোলাররা ভারতে শিক্ষাদানের জন্য আসবেন।

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ভারতীয় টেষ্ট দল গঠনের জন্য বিশেষ তোড়জোড় করছেন। যে সকল খেলোয়াড়রা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেষ্ট অথবা গত দু'বছরের মধ্যে কোন না কোন টেষ্ট খেলায়

যোগদান করেছেন, তাঁদের নিয়ে দল গঠনের এক পরিকল্পনা করেছেন। ইংলণ্ড ও পাকিস্তান ভ্রমণের জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়ের মধ্যে থেকে ভারতীয় টেষ্ট দল গঠন করার চেষ্টা হচ্ছে : (১) পতৌদির নবাব, (২) চান্দু বোড়ে, (৩) সেলিম দুরানী, (৪) বাপু নাদকার্ণি, (৫) রুসি সূর্ত্তি, (৬) এম এল, জয়সীমা, (৭) ভি, এল, মেহেরা, (৮) এফ, এম, ইঞ্জিনিয়ার, (৯) বি, কে, কুন্দরাম, (১০) ডি, এন, সারদেশাই, (১১) মিলখা সিং, (১২) আব্বাস আলি বেগ, (১৩) আর, বি, দেশাই, (১৪) ভি, বি, রঞ্জন, (১৫) ই, এফ, প্রসন্ন, (১৬) ভি, ভি, কুমার, (১৭) এস, জি, অধিকারী, (১৮) সূর্য্যবীর সিং, (১৯) ইন্দ্রজিৎ সিং, (২০) এ, ওয়েদকার, (২১) ভি, ভোঁসলে, (২২) বিশ্বনাথন, (২৩) ডি, এস মুখার্জ্জী।

নতুন ভাবে ভারতীয় টেষ্ট দল গঠনের চেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। এই সকল খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দল গঠন করলে ক্রিকেটে ভারতের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

## বিনিদ্র রাত্রি

(White Night)

বোরিস পেষ্টারন্যাক

অতীত দিনগুলি মনে পড়ে,
আর মনে পড়ে পিটার্সবার্গ সমুদ্রতটের সেই প্রাসাদ
স্টেপির কোন এক ছোট জমিদারের কন্যা,
তুমি এসেছিলে কুরকস্ থেকে ছাত্রী হয়ে।
ছিলে তুমি রূপসী, তরুণেরা ভালবেসেছিল তোমায়,
সেই ঘুমহীন রাতে আমরা দু'জনায়
বসেছিলেম তোমার ঘরের জানালায়
নীচের দিকে চেয়ে আকাশচুম্বী প্রাসাদ থেকে।
ভোরের স্পর্শে গ্যাসের প্রজাপতির মতো
রাস্তার আলোগুলি উঠেছিল কেঁপে কেঁপে।
তোমায় বলেছিলেম কত কথা মৃদু স্বরে
ঘুম-বিভোর দূর-দূরান্তের মতো।
পিটার্সবার্গ যেমন চ'লে গেছে তীরহীন
নেভা পার হ'য়ে বহু দূরে, তেমনি আমরা
স্তব্ধ হোলাম ভীত নির্জনতায়
কোন এক রহস্যে।
ঐ ওখানে বহু দূরে গভীর অরণ্যে
বসন্তের বিনিদ্র রাতে
সমস্ত অরণ্য মুখরিত হোল
বুলবুলির স্পন্দিত স্তব গানে।
উন্মাদ কম্পন ধ্বনি বেজেছিল দিকে দিকে
ছোট আর সামান্য পাখির গান
তুলেছিল আনন্দের উৎরোল
বোবা অরণ্যের গভীরে
ওখানে হামাগুড়ি দিয়ে রাত নামে
জড়িয়ে ধরে বেড়াগুলি খালি পা ভবঘুরের মতো
আর জানালা থেকে পিছনে ভেসে আসে
কলকণ্ঠের কাটা কাটা ধ্বনি।
প্রতিধ্বনি ভেসে আসা
বেড়া ঘেরা বাগানে
আপেল আর চেরীর শাখা ভরে গেছে
শুভ্র পুষ্পিত আহ্বানে।
আর প্রেতের মতো সাদা গাছেরা
রাস্তায় ভিড় ক'রে আসে
যেন জানায় বিদায় বাণী—
সেই বিনিদ্র রাত্রিকে—যে দেখেছে অনেক।

অনুবাদ—মিহির সাহা

## প্রচ্ছদপট

বন্দে আলী মিয়া

পাণ্ডুর আকাশ তলে একখানি মেঘ—অঙ্গে তার রাত্রির আভাস
নিঃশব্দে ভাসিয়া চলে আন্দোলিয়া লীলাকল পাখা
দূর, কোন বনস্পতি পানে। নীড়হারা নিঃসঙ্গ বলাকা
ধরিত্রীর মর্ম ত্যজি ধেয়ে চলে ঊর্দ্ধে যেথা অনন্ত নীলিমা।
সন্ধ্যার কঠিন কৃষ্ণ ঘন যবনিকা সম্মুখেতে পথ রোধে তার—
নির্বন্ধ বিহঙ্গ কাঁদে ভ্রষ্ট নীড় তরে—অভিমানে কাঁদে অনিবার।

অনন্ত নির্দেশ লেখা দিগন্ত সীমায়—মেঘে মেঘে বর্ণের বারতা
কল্পনা বিলাস তার—বনস্থালী মর্মরিয়া শিহরিয়া জাগে
পল্লবে কম্পন মৃদু—পাপড়ি বিথারে দল গাঢ় অনুরাগে
অন্তর ভরিয়া তাহে বাজে কলরব—প্রগলভতা অকারণ।
অম্বরে বিহঙ্গ ওড়ে—গৃহহীন ক্লান্তপক্ষ নিঃসঙ্গ বলাকা
দুইটি নয়নে তার অস্তপারের দূর স্বপ্ন ছায়া আঁকা।

বিস্মৃত দিনের কথা মোর চিত্ত মাঝে রচে আজ আবর্ত আকুল
হিংস্র শ্বাপদ সম গর্জিছে সরোষে। প্রতারক নিষ্ঠুর এমন
হইতে গো পারে সে-ই—ক্রীড়াচ্ছলে একদা যে লভেছিল মন
স্মরণে সে বান্ধবীরে বরি আমি আজ—তারে মোর হয় না বিভুল।
মর্মের প্রচ্ছদপটে যে আলেখ্য লভিলো সে রসের সম্ভার
কামনা বিহঙ্গ মোর অন্ধ নভতলে খুঁজে তায় কাঁদে বারম্বার।

ওষ্ঠের প্রচ্ছন্ন ভাষা কম্পন মৃদুল—নয়নের বিদ্যুৎ চাহনী
একদা আলস ক্ষণে দিয়েছিলো মোরে। সে হৃদয় আজো কী হায়
একটি পথিক লাগি সঞ্চয় রাখিছে তৃষ্ণা নিভৃত গুহায়!
দিনান্তে একটি শ্বাস ত্যজে কি সে উদ্দেশিয়া তাহার সরণী!
বলাকা হারায়ে পথ ধরিত্রীর বুকে অধোমুখে গুমরিয়া কাঁদে
বিঁধিল হৃদয় তার শায়ক হানিয়া মর্মহীন কঠিন নিষাদে।

# সমাধান

শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়

না, মালতী বুঝবে না, ও তেমন মেয়েই নয়। ওকে কেমন করে বোঝাবে অংশু? ক'দিন ধরে কত রকমেই না চেষ্টা করছে ওকে বোঝাতে। অবশেষে অংশু হতাশ হয়েই পড়েছে। শত হলেও মেয়ে তো? ওর মাথায় কি আর সহজে এ সব বৈজ্ঞানিক চিন্তা ঢোকাতে পারবে অংশু?

অংশু বলেছে: না না ঠাট্টা নয়, আজকাল এ সব চল হয়েছে, কত মেয়ে যে হাসপাতালে গিয়ে চটপট ব্যবস্থা করে আসছে, তার ঠিক নেই। খুব সহজ, বৈজ্ঞানিক সমাধান, তারপর আমাদের জীবনটা কেমন সুন্দর নিশ্চিন্তে—

হায়রে! কাকস্য পরিবেদনা? মালতী ফিক করে হেসে কোন না কোন কাজের ছুতোয় চলে যায়। অংশুর কথাগুলো যেন পাশের বাড়ীর কোন ভেসে আসা আলাপের টুকরো, কান দিলেও চলে, না দিলেও চলে, এমনিই মালতীর ভাবখানা।

রাত্রে নিরিবিলি সময় বুঝে আবার যখন কথাটা তুলেছে অংশু, মালতীর বড্ড ঘুম পাওয়ায় সে পাশ ফিরে শুয়েছে। যেন একটা হাল্কা গল্পের আধখানা শুনতে শুনতে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

এ মেয়েকে নিয়ে কি করে অংশু? কত দেশ বিদেশের খবর পড়ছে অংশু এ বিষয়ে। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে শিক্ষিত উন্নত রুচি সম্পন্ন দম্পতীর পক্ষে বেশি সন্তান যে লজ্জাকর, তা কি আর বলতে? একটি ছেলে হয়েছে ওদের, ওই যথেষ্ট! ওকেই ভাল করে মানুষ কর। জীবনটা বেশ ভদ্র ভাবে কাটুক, তা ছাড়া অভাবের সংসারও তো বটে, এই সামান্য কথাটা কেন কেন বোঝাতে পারবে না অংশু তার নিজের স্ত্রীকে? তার স্ত্রী, তার সহধর্মিণী, তার চিন্তায়, তার ভাবে, কি তাকে অংশু এতটুকু প্রভাবান্বিত করতে পারবে না? গল্পের বই নিয়ে এলে তো খপ করে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে আগে শেষ করা চাই। দশ মাইল দূরে সহরে গিয়ে সিনেমা দেখার বেলায় তো অংশুকে কত রকম ভাবে সাধাসাধি করা হয়। আর মালতীকে সুখী করার জন্যেই তো এই গ্রামের বাড়ীতে অংশু মায়ের অমতেও রেডিও এনেছে।

সামনের ছোট ছোট কৃষ্ণকলি আর দোপাটি ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে অংশু ভাবল, মালতীকে খুসী করবার জন্যেই তো অংশু নিজের হাতে ঐ ফুলগুলো লাগিয়েছে। মা কত বলেছেন: ওগুলোর পিছনে সময় নষ্ট না করে তরিতরকারী গাছগুলোর দিকে একটু নজর দে। কিন্তু মালতী যে বলেছিল কাদের যেন দাওয়ার পাশে লাল সাদা ফুল গাছের কথা? তাই তো অংশু তার এক বন্ধুর বাড়ী থেকে ঐ ফুল গাছের চারাগুলো এনে লাগিয়েছে।

মালতী লেখা পড়া জানে। হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করতে পারে। গ্রামের আর পাঁচটা বৌদের থেকে ও যে স্বতন্ত্র, তা এক নজরেই বোঝা যায়। অংশুরও মনে হয় যে মালতী তার সৌভাগ্য। গ্রামের একটা সামান্য প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার সে, মালতীর মত মেয়েকে সে পেয়েছে বরাত জোরে। মালতী তাকে ভালবাসে। মালতী বোঝে। তার মন আছে। বুদ্ধি আছে, তাই তো অংশু নিজেকে ধন্য মনে করে। স্ত্রীর সঙ্গে বসে ঘর-কন্নার কথা ছাড়াও বাইরের আর পাঁচটা কথা বলা যায়, এমন ভাগ্য গ্রামের মধ্যে ক'জনের আছে? অংশু তাই এত সুখী।

অংশুর সব কথাই যখন মালতী বোঝে, তখন এ কথাটাই বা কেন বুঝতে পারছে না? সন্তানের জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যে আধুনিক সভ্যতার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কেন এ সামান্য কথাটা বোঝাতে পারবে না অংশু তার নিজের স্ত্রীকে? সে নিজেই না সেদিন ইস্কুলের পণ্ডিত মশায়কে বলেছিল: খেতে দিতে পারেন না, বছর বছর একটি করে পোষ্য বৃদ্ধি করেন কেন? চোখ কান বুজে পড়ে থাকেন, ওদিকে দুনিয়া যে এত এগিয়ে যাচ্ছে তা দেখতে পান না? মাইনের টাকা কটা আগাম নেবার জন্যে এত ছুটোছুটি না করে, যান না স্ত্রীকে নিয়ে সদর হাসপাতালে, ব্যবস্থা করে আসুন গিয়ে।

শুনে পণ্ডিত মশায় কানে হাত দিয়েছিলেন। জিব কেটেছিলেন। পাশের অবিবাহিত অনিল মাষ্টার বলেছিল: আপনি মশায় বিয়ে করে ক্ষেপে গেছেন, মুখে আর কিছু আটকায় না। তারপর অংশু যে বক্তৃতাটা ঝেড়েছিল তার কথাগুলো মনে হলে এখনও ওর নিজের রক্তই গরম হয়ে ওঠে, সেন্টিমেণ্ট আর সায়েন্সের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব চলছে, তাতে সায়েন্সের জয় যে অবশ্যম্ভাবী এ কথা অংশু সেদিন ওদের বুঝিয়ে ছেড়েছিল। কে যেন আবার একটা টিপ্পনি কেটে বলেছিল: দেখা যাবে নিজের বেলায়। অংশু কোন জবাব না দিয়ে একটু মুচকি হেসে ভেবেছিল: মূর্খ, দেখিস তোরা যত খুশী, অংশু মাষ্টার সামনে এগিয়ে চলায় বিশ্বাস করে, কোনো মতে ট্রাডিশন আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকায় বিশ্বাস করে না।

কিন্তু আজ সেই অংশুর একি পরাজয়? মালতী কথাটা কানেই নিল না? আস্তে আস্তে অংশুর মালতীর উপর রাগ হতে লাগল। অংশুর আনুগত্যের প্রশ্রয়ে মালতী যেন বড্ড বেড়ে উঠেছে। অন্তত: অংশুর বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের উপরেও তো তার একটা শ্রদ্ধা থাকা উচিত?

মায়ের কাছে এ সব কথা বলা যায় না। অংশু যখন বড্ড বেশি পিছনে লাগে, তখন মালতী যে মায়ের কাছ ঘেঁসে ঘেঁসে থাকে তা অংশু বেশ লক্ষ্য করেছে। এত বড় একটা জীবন মরণ সমস্যার কথা নিয়ে অংশু মাথা ঘামাচ্ছে, আর মালতীর কাছে যেন এ এক লুকোচুরি খেলার মজা। ফিক্ করে হাসে, টুক্ করে চলে যায়, চুপ করে ঘুমিয়ে পড়ে। আর অংশু কিনা মনে মনে যতই গজর গজর করে মালতীর

সামনে আবার কেমন যেন নিরস্ত্র হয়ে পড়ে, মালতীর উপর রাগও করা যায় না। রাগ করা, মান অভিমান করা তারও যেন একচেটিয়া অধিকার মালতী নিজের হাতেই নিয়ে বসে আছে, আর অংশুর বেলায় যেন শুধু পরাজয়ের গৌরব।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এল। মাঠে মাঠে ঝাঁকড়া মাথা সোনালি ধানের গুচ্ছ হেলে দুলে পড়ছে। আলু কপির ক্ষেতে ক্ষেতে নতুন চারাদের খেলা। ঘরের দাওয়ায় ছড়ানো মিঠে রোদ্দুরের উষ্ণ আমেজ।

অংশু কিছুদিন ধরে গ্রামের ছেলেদের একটা ব্যায়ামের আখড়া নিয়ে মেতে উঠেছে। মালতীও যেন একটু আশ্বস্ত। এমনি সময় একদিন মালতীর দ্বিতীয় সন্তান সম্ভাবনার কথা শুনেই অংশুর চমক ভাঙল, ইস্, কি সর্বনাশ। একেবারে সব ভুলে বসে আছি? যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল অংশু, তাই তো। খোকনের এখনো দু'বছর পুরল না—এর মধ্যেই, অথচ অংশুই না মনে মনে ঠিক করেছিল আর নয়?

আশ্চর্য! মালতীর কিন্তু খুবই খুশী খুশী ভাব। তার দেহে মনে মুকুলিত হবার চাপা আনন্দ। ভয় নেই, ভাবনা নেই, অর্থ চিন্তা নেই, নাঃ। এ মেয়েকে নিয়ে পারা অসম্ভব। নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো অংশুর, বড় নিঃসঙ্গ একা মনে হলো।

অনেক ভেবে চিন্তে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতায় গেল অংশু, বলল: বেড়াতে যাচ্ছি, অনেক দিন বাইরে যাই না, মা ভাবলেন: ভাল, এইটুকু বয়েস থেকেই ছেলেটার ঘাড়ে সংসারের বোঝা চাপিয়েছি, যাক দু' দিন একটু বেড়িয়ে হাড়ে বাতাস লাগিয়ে আসুক। মালতী ভাবল: আমাকে ফেলে একলা যাওয়া হচ্ছে, দেখা যাবে ক'দিন টিকতে পারে,—কেন? কেন? যদি বেড়াতেই যাবে, তবে আমাকে নিয়ে যেতে কি দোষ ছিল? যাক কিছু বলব না, দেখি।

অংশুর চিঠির অর্থটা প্রথমে বুঝতে পারেনি মালতী, তার সব চিন্তা যেন কেমন গুলিয়ে গুলিয়ে যাচ্ছে। রাত্রে আবার নিরালায় বাতির সামনে বসে বার কয়েক পড়ল চিঠিখানা। পড়েই মালতী যেন নিশ্চল পাথর হয়ে গেল। কতক্ষণ এক ভাবে বসে ছিল কে জানে! সামনের বাতিটার তেল ফুরিয়ে গিয়ে জ্বলে জ্বলে কখন নিভে গেছে তার ঠিক নেই। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় জানালার কপাটগুলো জোরে শব্দ করে উঠল। মালতীর চমক ভাঙল।

একি করল অংশু? মালতীকে বোঝাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই সহরের হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা করেছে! বিশেষ কোন কষ্ট হয়নি তার—সামান্য ব্যাপার, এখন ভাল আছে। ক'দিন পরেই বাড়ী ফিরে আসবে।

পাশের ঘরে ঠাকুমার কাছে শোয় খোকন। হঠাৎ কেঁদে উঠল যেন। মালতী কান খাড়া করল, আবার ঠাকুমার আদরে ঘুমিয়ে পড়ল খোকন।

বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মালতী। চিরদিনের মত ঘুচে গেছে তার আর মা হবার সম্ভাবনা, তার একান্ত অজান্তে, না, না, এ তো চায়নি মালতী। অংশু এ কি করল! অংশু ফিরে আসছে, আবার ফিরে আসছে অংশু মালতীর কাছে, কিন্তু সে কোন অংশু? মালতীর দেহে যেন প্রাণ নেই, ছায়ার মত নেতিয়ে পড়ে রইল বিছানার উপর।

শীতের শেষে গাছে গাছে নতুন পল্লব দেখা দিয়েছে। বাতাসে আমের মুকুলের গন্ধ। গ্রামের পথে ঢুকেই অংশুর মন এক অভিনব আনন্দে ভরে গেল। একবার সহরের ইঁট পাথরের মধ্যে ঘুরে এলে তবেই না গ্রামের প্রকৃত রূপ চোখে পড়ে।

বাড়ী ফিরে এল অংশু। কিন্তু মালতী যেন কোথায় কোথায় ঘুরছে। পাড়ায় কাদের বাড়ীতে কি সব ব্রত পার্বণ নিয়ে মেতে উঠেছে। ভাল করে দেখাই হচ্ছে না তার সঙ্গে।

মা বললেন: মালতী বাপের বাড়ী যাবার জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়েছে। ছেলেমানুষ, অনেকদিন যায় নাই। যা কিছুদিনের জন্য রেখে আয়।

অংশু খানিক ভেবে চিন্তে বিজ্ঞের মত বলল: কিন্তু ক'দিন পরে যদি যেতেই হয় এখুনি তবে—

মা বাধা দিয়ে বললেন: না না, ওর শরীর খারাপের যে কথাটা ভেবেছিলাম, সেটা ঠিক না। ও এমনিতেই একটু শরীর খারাপ হয়েছিল। তা ভালই, ছেলেমানুষ, হাত পা খুলে খেলে ধুলে বেড়াক। দেরীতে দেরীতে হওয়াই ভাল। ঐ তো রোগা শরীর।

অংশুর যেন কোথায় একটা তাল কেটে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত বাইরের ঘরে বসে পড়াশুনা করল অংশু, কিন্তু আশ্চর্য! মালতী তো একবারও এল না? চঞ্চল স্বভাব মালতী তো কোনো দিনই অংশুকে এত নিবিষ্ট মনে পড়তে দেয়নি? তবে বোধ হয় মালতী ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দরজা ভেজান ছিল। অংশু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই সামনে অনেকটা ফুটফুটে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল। বিছানা পাতা হয়নি, গোটানোই রয়েছে। একি? মালতী কোথায়? এদিক ওদিক খুঁজল অংশু, মালতী পিছনের বারান্দায় দুই হাতে মুখ গুঁজে নিশ্চুপ বসে আছে। হাতে আলগা চুলের গোছা, আধ খোলা হয়ে পিঠের উপর লুটিয়ে পড়েছে। তা হলে মালতীর আজ চুল বাঁধা হয়নি? টিপ পরা হয়নি? পরনেও সেই সকালবেলাকার পাড় ওঠা ওঠা শাড়িটাই তো? সৌখীন মালতীর আজ একি হলো! ওকি সেই মালতী, না এই জ্যোৎস্নার আলোয় অংশু কোনো পাথরের মূর্তির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে?

আর অংশুরই বা কি হলো? সেই বা কেন মালতী বলে ডাকতে পারছে না? কেন পারছে না ঐ নিশ্চল মূর্তির দিকে দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে? এই তো ফিরে এসেছে অংশু কতদিন পরে। আর কত সহজ উপায়ে সব ভাবনা চিন্তার বৈজ্ঞানিক সমাধান করে এসেছে, আর তো কোনো ভাবনা চিন্তা, জড়তার দরকার নেই, দরকার নেই কষ্টকর সংযমের, এখন থেকে তাদের প্রেম হতে পারে মুক্ত, উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে পরস্পরকে পেতে পারে নিশ্চিন্ত হয়ে—সন্তান সম্ভাবনার অবাঞ্ছিত ভয় ভাবনা থেকে মুক্ত তারা।

কিন্তু একি হলো অংশুর! চাঁদের আলোয় তার নিজের ঐ লম্বা ছায়াটা দেখে ভয় পাচ্ছে কেন অংশু, কেন কেন পারছে না অংশু সহজ ভাবে মালতীর কাছে এগিয়ে যেতে, কেন? কিসের ব্যবধান আজ তাদের মধ্যে?

৫০

রাত থাকতে উঠে স্নান করলেন প্রভু। পার্ষদদের নিয়ে দেখতে গেলেন পাণ্ডুবিজয়।

হাতে ধরে শিশুকে যে হাঁটতে শেখানো হয়, তার নাম পাণ্ডু। জগন্নাথকে মন্দির থেকে রথের উপরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার নাম পাণ্ডুবিজয়।

বিগ্রহকে কী করে হাঁটায়?

মন্দির থেকে রথ পর্যন্ত তুলোর বালিশ পাতা হয়েছে। পাণ্ডাদের কেউ বিগ্রহের কাঁধ ধরেছে, কেউ কটি, কেউ পা, কেউ বা পট্টডুরি। এক বালিশ থেকে আরেক বালিশে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, বিগ্রহ যেন হেঁটে চলেছে। পায়ের চাপে বালিশ ফেটে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে, তুলো উড়ছে চারদিকে। এ কি, বিগ্রহকে কেউ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, না, জগন্নাথ নিজে হেঁটে চলেছেন। বিশ্বম্ভরকে চালায়, এমন সাধ্য কার? যিনি সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, তিনি নিজের ইচ্ছেতেই চলমান। 'বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার? আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার॥'

'মণিমা! মণিমা!' প্রভু উচ্চধ্বনি করে উঠলেন।

মণিমা অর্থ সর্বেশ্বর। জগন্নাথই সর্বাধিপতি। জগন্নাথই মহামহিম।

কিন্তু এ কে পথে ঝাড়ু দিচ্ছে? জল ছিটোচ্ছে ধুলোতে? নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখ। এই আমাদের রাজা প্রতাপরুদ্র।

রাজা হয়ে তুচ্ছ-সেবা করছে। তাহলে আর কথা কী! তাহলেই তো জগন্নাথের কৃপাভাজন হয়ে গেল।

আর যে জগন্নাথের কৃপাভাজন, সে তো প্রভুরও কৃপাভাজন।

মহাপ্রভু পাইল সুখ সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে॥

রথের সাজসজ্জা দেখ—হেমময় সুমেরু-আকার রথ। রথের মধ্যে শত শত শাদা চামর, শত শত উজ্জ্বল দর্পণ, আর রথের উপরে চাঁদোয়া, অগণন পতাকা। কত যে বাজনা বাজছে, ঘাগর থেকে ঘণ্টা, তার লেখাজোখা নেই। কত চিত্র, কত পট্টবস্ত্র, কত আবরণ-আস্তরণ। এক রথে জগন্নাথ, আর দুই রথে বলরাম আর সুভদ্রা।

অদর্শনের পনেরো দিন জগন্নাথ নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সঙ্গে ক্রীড়া করেছেন, এখন ভক্তদের খুশি করবার জন্যে রথে চড়ে বেরিয়েছেন বিহারে। রথযাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য তাই জগন্নাথের বৃন্দাবনবিহার।

জনসমুদ্রে তুফান উঠেছে, লক্ষকণ্ঠে উঠেছে জয়ধ্বনি। রথরজ্জু ধরে টানছে ভক্তরা। রথ কখনো দ্রুত চলছে, কখনো ধীরে, কখনো বা টানলেও চলছে না। সমস্ত চলাচল, সমস্ত গতাগতি জগন্নাথের ইচ্ছায়। 'ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে, টানিলে না চলে। ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে॥'

মহাপ্রভু নিজগণকে একত্র করে স্বহস্তে মালা-চন্দন পরিয়ে দিলেন। কীর্তনীয়াদের চার-সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান হল স্বরূপদামোদর, তার দোহার পাঁচজন,—দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘবপণ্ডিত আর গোবিন্দানন্দ। এ দলের প্রধান নর্তক অদ্বৈত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীবাস, পঞ্চ দোহার—গঙ্গাদাস, ছোট হরিদাস,

শ্রীমান, শুভানন্দ আর শ্রীরামপণ্ডিত। প্রধান নর্তক নিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান মুকুন্দ, পঞ্চ দোহার—বাসুদেব ঘোষ, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত আর বল্লভ সেন। প্রধান নর্তক বড় হরিদাস। চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান গোবিন্দ ঘোষ, আর পঞ্চ দোহার—বিষ্ণুদাস, মাধব, বাসুদেব দত্ত, অন্য রাঘব, অন্য হরিদাস। প্রধান নর্তক বক্রেশ্বর। প্রতি সম্প্রদায়ে দু'জন করে মৃদঙ্গ-বাদক।

এরা ছাড়া আরো তিন সম্প্রদায় প্রস্তুত। কুলীনগ্রামের, শ্রীখণ্ডের আর শান্তিপুরের। কুলীনগ্রামের দলের নর্তক-নেতা রামানন্দ আর সত্যরাজ, শ্রীখণ্ডের নরহরি আর রঘুনন্দন, আর শান্তিপুরের অচ্যুতানন্দ।

তাহলে মোট সম্প্রদায় সাত। তার মধ্যে চার সম্প্রদায় রথের আগে, দুই সম্প্রদায় দুই পাশে, আর এক সম্প্রদায় পিছনে চলল। 'সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।' মাদল বাজাচ্ছে চৌদ্দ, গান গাইছে বিয়াল্লিশ, আর নাচছে সাত। ওই সাত জায়গাতেই মহাপ্রভু ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন, বলতে লাগলেন হরি-হরি, বলতে লাগলেন—জয় জগন্নাথ। 'সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি। জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥' রথের কোথায় অগ্র, কোথায় অন্ত, দু জায়গাতেই ঘুরছেন। এ তো সামান্য কথা, একই সময়ে সাত জায়গায় বিলাস করছেন। প্রত্যেকে ভাবছে, আমার প্রতিই প্রভুর বিশেষ কৃপা, আছেন আমার দলে সংশ্লিষ্ট হয়ে, কিন্তু এ কে বুঝছে, আরেক দলেরও এই ভাবনা।

যার শুদ্ধ ভক্তি, সেই অন্তরঙ্গ ভক্তই এই লীলা দেখতে পারে।

দেখতে পেল প্রতাপরুদ্র।

কাশী মিশ্রকে বললে, 'মিশ্র, এ কী দেখলাম! প্রভু সাত জায়গায় একই সময়ে বিরাজ করছেন।'

'তোমার ভাগ্যের সীমা নেই।' বললে কাশী মিশ্র, 'তাই তুমি দেখতে পেলে ও মহিমা। প্রভু কৃপা করেছেন তোমাকে।'

'চৈতন্যের চুরি' সার্বভৌমও টের পেয়েছেন। রাজা যেই তাকে ইসারা করে বোঝালেন, সার্বভৌম সায় দিল।

কৃপা ছাড়া আর গতি কী! কৃপা ছাড়া ব্রহ্মাদি দেবতারাও ঈশ্বরের মহিমা জানতে পারে না। রাজার তুচ্ছ-সেবাই বুঝি সে কৃপাকে আকৃষ্ট করেছে। 'রাজার তুচ্ছ-সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন। সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন॥'

সাক্ষাতে দর্শন দেননি, কিন্তু পরোক্ষে দিলেন। 'সাক্ষাতে না দেখা দেন, পরোক্ষে এত দয়া। কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের মায়া॥'

কখনো এক মূর্তিতে নাচছেন, কখনো বা বহু মূর্তিতে, বহু স্থানে। রাসলীলায় যেমন করেছিলেন বৃন্দাবনে। দু'-দু' গোপীর মধ্যস্থলে গিয়ে দাঁড়ালেন দু' দিকের দুজনেরই কণ্ঠালিঙ্গন করে, প্রত্যেকে ভাবল, কৃষ্ণ শুধু আমার কাছেই আছেন, আমার হয়ে, এও সেই রকম। স্থাবর-জঙ্গম, সমস্ত কিছুকে প্রেমতরঙ্গে ভাসালেন। সাত সম্প্রদায়কে একত্র করে স্বয়ং কীর্তন আরম্ভ করলেন।

আর জগন্নাথকে দেখে স্তুতি করলেন জোড়হাতে।

দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাথ।
ঊর্ধ্বমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥

যিনি বেদজ্ঞদের পূজনীয়, যিনি গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি জগতের কল্যাণকর, সেই গোবিন্দকে—সেই কৃষ্ণকে নমস্কার।

দেবকীনন্দন দেবের জয় হোক। যদুবংশপ্রদীপ কৃষ্ণের জয় হোক। মেঘশ্যামল কোমলাঙ্গের জয় হোক। পৃথ্বিভারনাশী মুকুন্দের জয় হোক।

যিনি জনগণনিবাস, যিনি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অধিষ্ঠিত, দেবকী-গর্ভে জন্ম নিয়েছেন বলে যাঁর সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত, যাদব-প্রধানরা যাঁর সেবকরূপ সভাসৎ, বাহুবলে যিনি অধর্মকে বিতাড়িত করে স্থাবরজঙ্গমের দুঃখ হরণ করেন, সেই কৃষ্ণ তাঁর সুস্মিত শ্রীমুখে ব্রজবনিতাদের পরম প্রেম উদ্দীপিত করে সর্বোৎকর্ষে বিরাজমান।

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্যও নই, শূদ্রও নই, গৃহস্থ নই, ব্রহ্মচারীও নই, বানপ্রস্থও নই, সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু আমি নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্র গোপিকারমণ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস-দাসানুদাস।

হুঙ্কার করে প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন। ঘুরতে লাগলেন চক্রবৎ। মনে হ'ল জ্বলন্ত কাষ্ঠ যেন স্বর্ণবলয় রচনা করে চলেছে। পদতলে টলমল করছে পৃথিবী। প্রেমবিহ্বল প্রভুকে দেখবার জন্যে চারদিক থেকে লোক ভিড় করে আসছে। সে ভিড়

ঠেকাবার জন্যে পার্ষদেরা মণ্ডল করে দাঁড়াল। এক মণ্ডল যথেষ্ট নয়, তিন মণ্ডল করে দাঁড়াল। প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ প্রধান, দ্বিতীয়ে গোবিন্দ কাশীশ্বর, তৃতীয়ে পাত্রমিত্রসহ স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র। প্রভুর ভাবময় পবিত্র দেহ না জনতার পীড়নে আহত হয়।

পাত্র হরিচন্দনের কাঁধে হাত রেখে প্রতাপরুদ্র দেখছে প্রভুকে। হঠাৎ তাদের সামনে শ্রীবাস এসে দাঁড়াল। এমন প্রেমাবেশ, খেয়াল নেই কার দৃষ্টি সে অবরোধ করছে। হরিচন্দন তার গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললে, 'এক পাশে সরে যান দয়া করে।'

শ্রীবাস উদাসীন, পাত্রস্পর্শ অনুভবও করছেনা।

বারে বারে ঠেলতে লাগল হরিচন্দন।

ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীবাস হরিচন্দনকে চড় মেরে বসল।

হরিচন্দনও উত্তেজিত হয়ে কিছু রূঢ়বাক্য বলতে যাচ্ছিল, প্রতাপরুদ্র তাকে নিবৃত্ত করল। বললে, 'তুমি ভাগ্যবান, তাই এই স্পর্শ পেলে। আমি ভাগ্যহীন। আমি অকৃতার্থ।'

প্রভুর দেহে নব-নব সাত্ত্বিক বিকার অভিব্যক্ত হতে লাগল। যেন নব-নব কলেবর ধরলেন। রোমাঞ্চ, কম্প, স্বেদ, স্বরভেদ, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ আর প্রলয়—এই অষ্ট-সাত্ত্বিকের উদ্দীপনা। সমস্তই কৃষ্ণবিরহের বিপ্লব।

তাণ্ডবের শেষে প্রভু বললেন স্বরূপকে, 'স্বরূপ, গান গাও।'

প্রভুর মনোগত ভাব কী বুঝতে পেরেছে স্বরূপ। সে গান ধরল :

'সেই তো পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥

যে প্রাণবল্লভের বিরহে কামাগ্নিতে পুড়ে মরছিলাম এখন এখানে পেলাম সেই প্রাণবল্লভকে।

এ রাধিকার কথা। কুরুক্ষেত্রে যখন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হ'ল তখন শ্রীমতী ভাবল : এই, এই আমার সেই প্রাণনাথ, যার বিরহে বৃন্দাবনে দগ্ধ হচ্ছিলাম, এখন তাকে পেয়ে আমার দেহ-মন শীতল হল। মহাপ্রভুর রাধাভাব, তাই জগন্নাথের মুখের দিকে চেয়ে ভাবছেন এই আমার সেই মধুমত্তম যার জন্যে বৃন্দাবনে স্মরথরশরে বিদ্ধ হয়ে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করেছি, কৃষ্ণের একদিন দেখা পাব তারই আশায় দেহ রেখেছি এতদিন, কিন্তু আজ আমার কী সৌভাগ্য, সমস্ত সত্তা শীতলতায় স্নান করে উঠল।

এই আনন্দে রথের অগ্রে নৃত্যে মাতলেন গৌরহরি।' তাঁর নয়ন—হৃদয় শুধু জগন্নাথে নিমগ্ন।

গৌর যদি জগন্নাথের—শ্যামের নয়ন সম্মুখে না থাকেন, তা হলে রথ অচল হয়ে থাকে, আর যদি গৌর আবার আসে নয়নপথে তা হলেই রথ সচল হয়। মহাবলী গৌরের মাধুর্য-শক্তিতেই রথ নিয়ন্ত্রিত।

গৌর যদি আগে না যায়, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এই মত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥'

প্রভুর ভাবান্তর হ'ল। কুরুক্ষেত্রে নয়, বৃন্দাবনে যদি এ মিলন হ'ত।

তখন তিনি হাত তুলে সেই অনবদ্য শ্লোক পড়লেন : 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ' কোনো নায়িকা বলছে তার সখীকে : 'যিনি আমার কৌমার্য হরণ করেছেন, তিনিই এখন আমার পতি।' সেদিনের সেই চৈত্ররাত্রি আজও উপস্থিত। সেই মালতী ফুলের সুগন্ধ নিয়ে কদম্ববনে বইছে সেই মন্দানিল। সেই আমিও তেমনি আছি। তবুও সেই রেবা-তীরে বেতসী-তরুতলে যে প্রেমকৌশলকেলি করেছিলাম, তারই জন্যে আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত।

বার বার পড়ছেন। যেন রাধাভাবে বলচেন, সখি, সেই আমিও আছি, কৃষ্ণও আছে, আমাদের মিলনও হয়েছে, কিন্তু বৃন্দাবনে নিভৃত নিকুঞ্জে সেই যে আমাদের ক্রীড়া হত—তারই জন্যে আমার চিত্ত পিপাসিত।

সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন॥

যদিও তুমি এখানে আছ, এখানে লোকে লোকারণ্য, হাতি ঘোড়া রথধ্বনি। ওখানে নানা অস্ত্র-শস্ত্রের সমারোহ, এখানে তোমার রাজবেশ। এ আমার মনঃপূত নয়। আমার বৃন্দাবনই স্বর্গ। সেখানে লোকারণ্য না থাক, পুষ্পারণ্য আছে। হাতি-ঘোড়া না থাক, ভ্রমর-কোকিল আছে। অস্ত্র শস্ত্রের চেয়ে তোমার বেণু কত সুমধুর। আর রাজবেশ নিয়ে আমার কী হবে? কী হবে মণিমুক্তায়, রাজমুকুটে? বৃন্দাবনে কেমন তুমি সাজতে বনফুলে, ভালে ও কপোলে অলকা-তিলকা—সেই অনেক বেশি মনোহর ছিল। ঐশ্বর্য নয়, মাধুর্যেই আমার অধিক বাঞ্ছা। এখানে সে সুখের এক কণাও নেই। তুমি আমাকে

আবার বৃন্দাবনে নিয়ে চলো। ব্রজই আমার সদন, আর তুমিই ব্রজের জীবনস্বরূপ।

'অন্যের 'হৃদয়' মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥'

নৃত্য করতে করতে প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাছে এসে পড়েছেন, আর তখুনি তাঁর প্রেমবিবশ দেহ মাটিতে ঢলে পড়বার উপক্রম করল। সসম্ভ্রমে রাজা তাঁকে ধরে ফেললেন—যেন আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়েনা আহত হন।

রাজার স্পর্শে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হল। তখন ধিক্কার দিয়ে উঠলেন: 'ছি ছি, আমার বিষয়ীস্পর্শ হল। আমার সঙ্গীরা গেল কোথায়?'

দেহরক্ষী নিত্যানন্দ নিজেই প্রেমবিহ্বল। আর গোবিন্দ আর কাশীশ্বর সেই মুহূর্তে কোথায় না জানি সরে গিয়েছিল। নইলে প্রতাপরুদ্র ধরতে যাবে কেন?

প্রভুর ধিক্কারে রাজার ভয় হ'ল। তখন তাকে আশ্বাস দিল সার্বভৌম। বললে, 'আপনি ভাববেন না। আপনার উপর প্রভু প্রসন্নই আছেন। মনে হচ্ছে লোক সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে তাঁর এই তিরস্কার।'

তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিন্তু রোষাভাস কৈলা ভগবান॥

রথ তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে নিয়ে যাবেন সেই আগ্রহে রথের পিছনে গিয়ে প্রভু মাথা দিয়ে রথ ঠেলতে লাগলেন। আর তাতেই রথ হড় হড় করে চলতে লাগল। 'ঠেলিলে চলিল রথ হড় হড় করি। চৌদিকের লোক উঠে বলি হরি হরি॥'

গুণ্ডিচাবাড়ির পথে রথ এসে দাঁড়াল বলগণ্ডিতে। এইখানে জগন্নাথকে ভোগ নিবেদন করা হবে। এবার বিজাতীয় ভিড়। প্রভু তাঁর গণদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী বাগানে প্রবেশ করলেন আর ক্লান্ত হয়ে ঘরের দাওয়ায় পড়ে রইলেন। পরিশ্রমে ঘন ঘর্ম ঝরছে, সুগন্ধি শীতল বায়ু তাঁকে স্নিগ্ধ সেবা করতে লাগল। বহু বহু বৃক্ষতলে বিশ্রাম করতে বসল ভক্ত আর কীর্তনিয়ার দল।

সার্বভৌমের উপদেশে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ছেড়ে ছদ্মবেশ পরল, বৈষ্ণব সাজল। হাতজোড় করে সমস্ত ভক্তের নীরব আদেশ নিয়ে সাহস করে প্রভুর পায়ে গিয়ে পড়ল, 'নৃপতি নৈপুণ্যে' করতে লাগল পদসেবা। মাটিতে চোখ বুজে প্রেমাবেশে শুয়ে আছেন প্রভু, অনুভব করছেন কে তাঁর পা টিপছে। শুধু পা টিপছে না, রামলীলার শ্লোক পড়ে শোনাচ্ছে।

'বলো, বলো, আরো বলো।' অপার সন্তোষে প্রভু উচ্চে বললেন বার বার।

তারপর রাজা পড়ল সেই কথামৃতের শ্লোক। তোমার কথা তাপিতজনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের দ্বারা সংস্তুত, কলুষহারী, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলদায়ক, সর্বত্র সর্বকল্যাণহেতু, অমৃতনিস্যন্দী। তোমার কথা যাঁরা কীর্তন করেন, প্রচার করেন, তাঁরাই দানীশ্রেষ্ঠ।

যেই এই শ্লোক শোনা, অমনি প্রভু উঠে বসে রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দিলে। আলিঙ্গন ছাড়া আমার আর কিছুই দেবার নেই। তুমি নাও আমার আলিঙ্গন।' 'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। মোর কিছু দিতে নাহি দিমু আলিঙ্গন॥'

জানলেন না কে এ বৈষ্ণব। তবু 'ভূরিদা' বলে, বহুদাতা বলে, সংবর্ধনা করলেন। অনুসন্ধান বিনাই কৃপা করে বসলেন। 'অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল।'

'এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥'

বললেন, 'কে তুমি আমার এমন উপকার করলে? আচম্বিতে পান করালে কৃষ্ণামৃত?'

রাজা বললে, 'আমি তোমার দাসের অনুদাস। আমাকে তোমার ভৃত্যের ভৃত্য করো।'

'তবে এই তুমি আমার ঐশ্বর্য দেখ।' বললেন প্রভু, 'তবে কাউকেও তা বোলো না।'

কী দেখল রাজা তা রাজাই জানে।

তবু, কে এ দর্শনের অধিকারী, জানেন না প্রভু? জানেন, কিন্তু ভাব দেখান তিনি জানেন না। বৈষ্ণব বলে জানেন, রাজা বলে জানেন না। 'রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ। অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস॥'

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে রাজার। প্রভুকে প্রণাম করলেন প্রাণভরে। রাজার ভাগ্যকে ভক্তরা প্রশংসা করতে লাগল। জোড়হাতে ভক্তদের বন্দনা করে বিদায় নিল প্রতাপরুদ্র।

'বলগণ্ডি' ভোগের প্রসাদ, নি-সকড়ি প্রসাদ

পাঠিয়ে দিলেন। বাগানেই প্রভু ভক্তগণসহ মধ্যাহ্ন-ভোজন করলেন। 'এই মত জগন্নাথ করেন ভোজন।' শুধু নিজে খেলেন না, দীনহীন কাঙালদের ডেকে এনে খাওয়ালেন। আর বললেন, বলো হরিবোল। কাঙালেরা খাচ্ছে আর হরি-হরি বলছে।

কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি॥
'হরি হরি' বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়॥

বলগণ্ডি থেকে রথ আবার যাত্রা করবে, কিন্তু, কী আশ্চর্য, টানলেও রথের চলবার নাম নেই। শ্যাম বুঝি বলছেন—আমার গৌর কোথায়? রথ যাচ্ছে না দেখে রাজা পাত্র-মিত্র নিয়ে চলে এল, নিজে হাত দিল কাছিতে, তবু রথ নড়ে না। মহামল্লরা এসে দড়ি ধরল, তবু না। মত্তহস্তী এনে লাগাও। তবু যে-কে সে।

উদ্যানে বসে প্রভু শুনলেন রথের অচলত্বের কথা। নিজ-গণ নিয়ে প্রভু এলেন বেরিয়ে। দেখলেন মত্তহস্তী রথ টানছে, রথ তবু অনড়-অটল। অঙ্কুশের ঘায়ে হাতি আর্তনাদ করছে, প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করছে, তবু রথ পূর্ববৎ। চারদিকের লোক হাহাকার করছে, রথের কী হল!

প্রভু বললেন, 'হাতি সরিয়ে দাও।'

হাতির দল সরে গেল।

ভক্তদের বললেন, 'তোমরা কাছিতে হাত দাও, আমি পিছন থেকে ঠেলছি মাথা দিয়ে।'

রথ কি কারু চেষ্টায় চলে? রথ চলে জগন্নাথের ইচ্ছায়।

চলেছে, রথ সুরু করেছে চলতে!

'আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড়হড় করি রথ চলিল ধাইয়া॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিবা মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ—টানিতে না পায়॥'

সকলে জয়-জয় করে উঠল। জয় জগন্নাথ। জয় গৌরহরি।

পাণ্ডুবিজয় শেষ হল, রথ এসে পৌঁছুল গুণ্ডিচা-বাড়িতে। বলরাম সুভদ্রাকে নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। যার যেই সিংহাসনে বসলেন একে একে।

নর্তন-কীর্তন সুরু হল।

সন্ধ্যারতি দেখে প্রভু 'আইটোটায়' গেলেন বিশ্রাম করতে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এসেছে, এই প্রভুর জ্ঞান। আর রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা হচ্ছে—এই প্রভুর রসমগ্নতা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে করলেন জলকেলি। আর দেখ দুই গম্ভীর পণ্ডিত, সার্বভৌম আর রামানন্দ, তারাও বালচাঞ্চল্য করছে। গোপীনাথকে বলছে, 'এরা দুই প্রামাণিক সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত', এদের কি শোভা পায় চপলতা? নিষেধ করো।'

গোপীনাথ বললে, 'তোমার কৃপাসিন্ধুর একটি বিন্দু যদি উছলে ওঠে তা হলেই মেরু ও মন্দরের মত পর্বত ডুবে যেতে পারে। সার্বভৌম আর রামানন্দের মত দুটি ছোট পাহাড় ডুবে যাবে—তাতে আর বিস্ময় কী! সমস্ত অভিমান ভেসে গিয়েছে এদের। এরা এখন বালক ছাড়া আর কিছু নয়। যারা ভক্তিবিরুদ্ধ নীরস তর্ক করত তারা এখন কৃষ্ণলীলামৃত পান করছে।'

অদ্বৈতকে এনে জলের উপর শোয়ালেন প্রভু। অদ্বৈত অনন্তদেব হল। আর তার উপর প্রভু শুলেন। প্রকটিত করলেন শেষশায়ী নারায়ণের লীলা।

আইটোটার কাছাকাছি জগন্নাথবল্লভ পুনর্যাত্রা পর্যন্ত বাগানে কাটালেন নয় দিন। নিত্য জগন্নাথ-দর্শন। নিত্য নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান, নিত্য বনলীলা—চলতে লাগল নিত্য ভজনকীর্তন।

'দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র জলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার॥'

আমাদের নিজ দেহের স্মৃতি পর্যন্ত নেই, দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা আমরা কী ভাবব? আমরা যোগসিদ্ধ নই যে তোমার চরণচিন্তা করে উদ্ধার খুঁজব। আর কিসের থেকে উদ্ধার? সংসারকূপ থেকে? আমরা কি সংসারকূপে পড়েছি? আমরা পড়েছি বিরহসমুদ্রে। আর তিমি মাছকেও যে খায় সে তিমিঙ্গিল, কাম-তিমিঙ্গিল আমাদের গিলেছে। তোমার চরণচিন্তা করে ক্ষুদ্র সংসারকূপ পার হওয়া যায়, কিন্তু এই দুষ্পার বিরহসমুদ্র উত্তীর্ণ হব কী করে? চরণ নয়, তুমি এসে আমাদের হাত ধরো, আমাদের বুকে তুলে নাও, পার করে দাও এই দুঃখের পারাবার।

[ ক্রমশঃ।

## ডাকযোগে শিক্ষা-ব্যবস্থা

সাধারণতঃ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে তবেই শিক্ষালাভ করতে হয়। সেই শিক্ষার সফল সমাপ্তিতে সার্টিফিকেট মিলে, যা সর্বত্র স্বীকৃত। স্কুল কলেজে না যেয়েও শিক্ষালাভ সম্ভবপর, কিন্তু কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সুযোগ না পেলে সরকারী স্বীকৃতি তাতে মিলে না। সেই শিক্ষা বাস্তব ক্ষেত্র অর্থাৎ যেখানে কিছু করে খেতে হবে, সেখানে অনেক সময়ই অর্থহীন গণ্য হয়ে পড়ে। ডাকযোগে শিক্ষাদান ব্যবস্থা বা 'করেসপণ্ডেন্স কোর্স' এই দিক থেকে একটু পৃথক ধরণের—এর গুরুত্ব অমনি হয়ত উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

এ কথা ঠিক, ডাকযোগে শিক্ষা দেওয়ার ও গ্রহণের যে পদ্ধতি, আমাদের দেশে আজ এ অবধি তা পরীক্ষিত হয়নি। পরন্তু বলা চলে বিষয়টি ভারতবাসীর কাছে সম্পূর্ণ নতুন। কিন্তু বাইরে ইতোমধ্যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার (করেসপণ্ডেন্স কোর্স পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। বৃটেন, আমেরিকা রাশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, অষ্ট্রেলিয়া—এ সকল দেশে পদ্ধতিটি চালু রয়েছে বেশ কিছুকাল থেকেই। জানা যায়, বৃটেনের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মস্ত অংশ স্কুলের পড়া শেষ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য এই 'করেসপণ্ডেন্স কোর্স'টিকে অবলম্বন করেন। রাশিয়ায় ও যুক্তরাষ্ট্রেও ডাকযোগে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা বিশেষ কার্য্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এতকাল ভারত বিদেশী শাসনাধীনে ছিল, এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল যতই অবৈজ্ঞানিক, ততই কোণঠাসা। কিন্তু জাতীয় সরকারের আমলে তেমনটি চলতে থাকবে, সে হলে বিপদ্। শিক্ষার জন্য দেশের মানুষের ভেতর তাগিদ ক্রমেই বাড়ছে, যে কারণে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাখ্যা না বাড়ালে চলছে না। মাথা পিছু আয় এখনও সামান্য বলে অনেককে শিক্ষা-জগতের বাইরে থাকতে হচ্ছে। আবার কত কত যুবক কিছুটা শিক্ষা নিয়ে কাজে গেলো বটে, কিন্তু তাদের মন চায় আরও শিক্ষা গ্রহণ করতে, জীবনে ধাপে ধাপে উন্নতির জন্য তারাও ব্যাকুল।

সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা কোথায়,—এই প্রশ্নটি ভারতীয় মানুষের নিকট সেই থেকেই বড় হয়ে আছে। স্কুল-কলেজে স্থান সীমাবদ্ধ, ভর্তি হওয়ার সুযোগ সকলের ভাগ্যে জুটে না। কাজ করে পড়বার জন্যে নৈশ বিদ্যালয় বা কলেজের কিছু কিছু ব্যবস্থা এখানে-সেখানে হয়েছে বটে, কিন্তু তা-ও আদৌ পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া, আর্থিক কারণেও অসংখ্য নর-নারী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্কুল-কলেজে যেয়ে শিক্ষালাভে অসমর্থ। সেই অবস্থায় 'করেসপণ্ডেন্স কোর্স' চালু করার দাবীটি আপনি এসে যায়। বস্তুতঃ, ডাকযোগে শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রবর্তনে যেমন বৃটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকার সুযোগ মিলেছে, এদেশেও মিলবে বলে ধরে নেওয়া চলে।

পত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয় বছর খানেক আগে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ ডি. এস. কোঠারী ছিলেন এই কমিটিরও প্রধান। আলোচ্য সরকারী কমিটি যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন এবং বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন, সেই সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবতে হবে।

ডাঃ কোঠারীর নেতৃত্বে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি শিক্ষাগত উচ্চমান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে পত্রের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম চালু করার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। রিপোর্টে একথাও পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও নিতান্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হলে ডাকযোগে শিক্ষাদান সম্ভব। তবে আলোচ্য 'করেসপণ্ডেন্স কোর্স' একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হওয়া উচিত। কমিটির সুপারিশ অনুসারে একমাত্র দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়েই এই পদ্ধতি প্রবর্তন সঙ্গত হবে আর প্রথম দফায় এর শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে একমাত্র কলা ও বাণিজ্যিক বিষয়েই। পরে বিজ্ঞান বিষয়েও ডাকযোগে শিক্ষাদান চলতে পারে বলে বলা হয়েছে।

শিক্ষক ও ছাত্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা হয়, পত্র মারফৎ শিক্ষা-ব্যবস্থায় সে সুযোগ হতে পারে না, এ নিশ্চিত। তবুও যেখানে এইরূপ ব্যবস্থা না হলে ব্যাপক শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে না, সেই অবস্থায় ব্যবস্থাটিকে কিভাবে যতদূর সম্ভব সুষ্ঠু ও কল্যাণকর করা যায়, তাই দেখতে হবে। 'করেসপণ্ডেন্স কোর্সের' পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় চেয়ে আলাদা ধরণের না হলেও ঠিক চলবে না। বিশেষজ্ঞরা এবিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা নিবদ্ধ করবেন এবং তারপর পদ্ধতিটি চালু করবেন, এই আশা ও দাবী নিশ্চয়ই রাখতে পারা যায়।

ডাকযোগে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রবর্তনে কতকগুলো অসুবিধা যে না দেখা দিবে, তা নয়। বড় বড় সহরসমূহের সঙ্গে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। দূর পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে সেই ধরণের যোগাযোগ এখনও গড়ে উঠেনি। অথচ কোঠারী কমিটির রিপোর্ট অনুসারেই পত্রের মাধ্যমে পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের অংশবিশেষের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন চাই। মোটের ওপর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়, সে লক্ষ্যটি আগাগোড় থাকতে হবে। নিছক নতুন কিছু করবার জন্য কাজটি হলে, এর পিছনে মহত্তর দাবী না থাকলে জাতির কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত।

যে কথাটি বলতে চাওয়া হলো—পত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও শিক্ষাগত উচ্চমান কিছুতেই ক্ষুন্ন করা চলবে না। শুধু কলা বা বাণিজ্য বিষয়েই নয়, বিজ্ঞান বিষয়েও 'করেসপণ্ডেন্স কোর্স' ধীরে ধীরে খুলতে হবে। পরন্তু বিজ্ঞান, কারিগরী ও বৃত্তিকরী বিষয়ে কর্মরত উৎসাহী যুবকগণ যাতে উচ্চতর ভাবেও যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পায়, কর্তৃপক্ষের সে-দিকেই সমধিক নজর দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমী দেশগুলোতে এই সকল লক্ষ্য
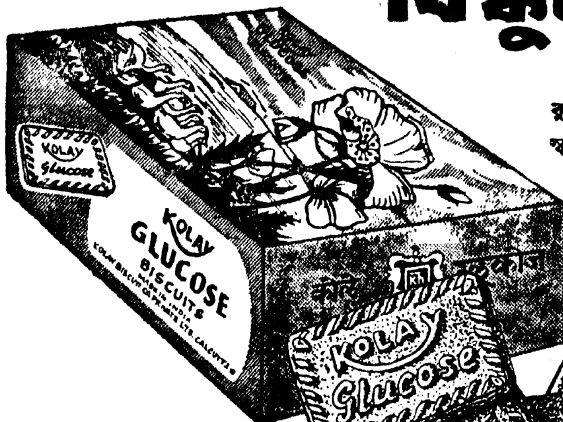
কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY
GLUCOSE
BISCUITS
KOLAY Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

থেকেই ডাক-যোগে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। একটি হিসাব অনুসারে বৃটেনের ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা প্রায় ৮০ জনই স্কুলের শিক্ষা শেষে কাজকর্মে লেগে যায়—কলকারখানা, নানারকম ব্যবসায়ে বা অন্য কোন কর্মসংস্থায়। পরে তারা উন্নততর যোগ্যতা অর্জনে ব্যস্ত হয়। 'করেসপণ্ডেন্স কোর্স' বা ডাকযোগে শিক্ষাদান ব্যবস্থা সে দেশে এই প্রয়োজন মেটাবার একটি বড় মাধ্যম।

এ দেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয় পত্রের মাধ্যমে শিক্ষা-ক্রম যখনই চালু করবেন, তার আগেই সকল দিকটা তাঁদের আরও ভালরকম পর্যালোচনা করতে হবে। পরিকল্পনায় কোথাও এতটুকু ত্রুটি থাকলে চলবে না। শুধু ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা দেওয়ার জন্যই যেন ব্যবস্থাটি প্রবর্তিত না হয়। বলা বাহুল্য, প্রকৃত শিক্ষা পেয়ে উচ্চশিক্ষাভিলাষী অথচ সুযোগলাভে বঞ্চিত যুবক-যুবতীরা কর্মজীবনে যেন এগিয়ে যাবার পথ করে নিতে পারে, 'করেসপণ্ডেন্স কোর্স' এর তা-ই থাকতে হবে আসল লক্ষ্য।

## চাষাবাদ ও আধুনিক সার

ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সার চাই, এ নতুন কথা নয়। কিন্তু এতকাল গোবরাদি থেকে দেশীয় প্রথায় যে সার তৈরী হয়ে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, চাষাবাদের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট নয়। নতুন রাসায়নিক সারের দাবী সেজন্যেই সর্বত্র এতটা ব্যাপক। লক্ষ্য করবার যে, জাতীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকটায় এড়ায়নি। বিদেশী আমলে সার কারখানা বলতে এখানে কিছুই ছিল না, এক্ষণে সে অভাব ক্রমে মেটাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় দেখা গেছে—এদেশের কৃষিজমি সমূহে ফসলের ফলন যে বেশি হয় না, তার একটি মুখ্য কারণ নাইট্রোজেনের বিশেষ অভাব। এই নাইট্রোজেন মূলক একটি সারই হলো এমোনিয়াম সালফেট—বিহারের সিন্ধ্রি কারখানায় সে-জাতীয় সার উৎপাদিত হচ্ছে কতক বছর ধরেই। সম্প্রতি কেরল ও মহীশূরেরও এই সার উৎপাদনের উদ্যম সুরু হয়েছে।

এমোনিয়াম সালফেট সারের দোষ-গুণ যা-ই থাকুক, এর উৎপাদন ইচ্ছামতো বাড়ানো চলছে না। এই সার তৈরী করতে গন্ধক বড় উপাদান, যার সরবরাহ পেতে বাইরের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এমোনিয়ম সালফেট ব্যবহার করে নাকি দেখা গেছে বরাবব এই সারের ব্যবহারের ফলে কৃষিজমিতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফসল ফলানোর যা খুব অনুকূল নয়। কেন্দ্রীয় সরকার তাই নতুন সার উৎপাদনের জন্য মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। এমোনিয়াম সালফেটের গুণসম্পন্ন সার উৎপাদনের দাবীও সেই সঙ্গে থাকে।

পাঞ্জাবের নাঙ্গলে সার উৎপাদন কেন্দ্রে ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট নামক একটি নতুম সার (নাইট্রোজেনমূলক) তৈরী হচ্ছে। নাইট্রোজেনমূলক সার আরও রয়েছে—এমোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট, ইউরিয়া, এমোনিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি। ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট সারটি এর মধ্যে সর্বাধুনিক এবং এমোনিয়াম সালফেটের গুণসম্পন্ন অথচ দামে নাকি অপেক্ষাকৃত সস্তা। উড়িষ্যার রাউর কেল্লাতেও নতুন ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জানা যায়, এই সারে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ অর্থাৎ এমোনিয়াম সালফেটের সমপরিমাণ নাইট্রোজেন আছে।

ভারতীয় কারখানায় উৎপাদিত ঐ নতুন সারটি চাষাবাদে ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেছে, সরকারী কৃষি-দপ্তর এই দাবী রাখছেন। বলা হয়েছে, যে জমিতে এসিডের পরিমাণ বেশি, সেখানে ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট নিতান্ত উপযোগী; আর এই সারে ক্যালসিয়াম কার্বনেট রয়েছে ৪০ শতাংশ। এর ব্যবহারে চাষের জমির প্রাকৃতিক গুণ (ভালো ফসল ফলানের জন্য যা বজায় থাকা চাই) বিনষ্ট হয় না। কোয়েম্বাটুরের ধান উৎপাদন কেন্দ্রে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে ফলন এতে বাড়ে বই কমে না।

নবতম ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট সারটি সূক্ষ্ম দানার আকারে থাকে। চাষাবাদকালে নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী এর ব্যবহার করতে হয়। থলে থেকে খোলা অবস্থায় এ বেশি সময় রেখে দিতে নেই। স্পষ্টই বলা হয়েছে, যে, এই সার যে-কোন নাইট্রোজেনমূলক সারের অনুরূপ, এর একটি বিশেষ গুণ—সব রকম শস্যের চাষাবাদেই সারটির ব্যবহার চলে, এমন কি, চা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও। উত্তর-প্রদেশে গম ও বার্লি-চাষের জন্যও ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হচ্ছে।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় দেশে বিভিন্ন ধরণের সার উৎপাদিত হয়ে চলেছে, এ আশার কথা। সেই সার দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলেও যাতে সরবরাহ হয়ে যায়, সেই দিকেও সরকারকে দৃষ্টি না দিলে চলবে না। কৃষকদের যেন সারের অভাবে চাষাবাদে পিছিয়ে পড়তে না হয়, চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে যথাস্থানে যথাযথ সার যেয়ে যাতে পৌছায়, এ সকলেরই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা চাই। এ জন্যে অধিক সংখ্যায় সমবায়-সমিতি গঠন করে সার বণ্টনের কাজ হলে ভালই হবার সম্ভাবনা।

একটি কথা প্রসঙ্গতঃ বলতে হবে—কোন্ বিশেষ সার কোন্ জমির ঠিক উপযোগী আর সেই সারের দরকার পড়বে কতটা পরিমাণ, কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ এ স্থির করবেন। শস্য আরো বড় হতে পারে কি ভাবে, চাষ কি করে আরো ভালো হতে পারে, এ সকলই নিবিড় পরীক্ষার বিষয়! যেটা স্বীকার্য,—ঠিকমত রাসায়নিক সার ব্যবহার করলেই ফলন বেড়ে যাচ্ছে। পর্য্যাপ্ত শ্রম ও যত্ন দিয়ে উৎপাদিত ফসলকে পোকা-মাকড় ও রোগের হাত থেকে বাঁচানোও কম দায়িত্বের কাজ নয়। পক্ষান্তরে জমির সার মরশুমের আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। এ সকল ব্যাপারে কৃষিজীবীরা যতটা সজাগ—সতর্ক থাকবেন, ততই মঙ্গল।

এইমাত্র বলতে চাওয়া হলো রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা হওয়া চাই। প্রয়োজনের মুহূর্তে কৃষকগণের হাতে সার পৌছে দেওয়ার সুবিধার্থ কতকগুলো রাজ্যে প্রাথমিক সমবায়-সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে। এইভাবে সার পেয়ে গেলে চাষাবাদের বিশেষ সহায়ক হতে পারে, এ বলার অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু ব্যবহার করবার আগেই নির্দিষ্ট জমিতে কি ফসল ফলানো হবে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী পরিমিত সার ছড়ানো সমীচীন। কোন অবস্থাতেই শ্রম ও অর্থের যেন অপচয় না হয়। কৃষিজীবীরা সে দিকে স্বতঃই নজর রাখবেন, এ ধরে লওয়া চলে।

## যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ—

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সাম্প্রতিককালে তাহাদের অধিকৃত রাজ্যসমূহের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু ইহাতে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিতেছে না—কোনও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ইহাতে সূচিত হইতেছে না। যে অর্থনৈতিক কাঠামো সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থানের অনিবার্য্য কারণ, তাহা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে; স্বল্প মূল্যে পণ্যোপকরণ আহরণের এবং সুবিধাজনক সর্ত্তে বিদেশে পুঁজি খাটাইবার প্রয়োজনীয়তা বিশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। আজ এই প্রয়োজন মিটিবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে অনুন্নত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক চেতনা—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, দ্বিবিধ শৃঙ্খল হইতে মুক্তির জন্য তাহাদের প্রবল আগ্রহ। যে সব রাষ্ট্র সম্প্রতি স্বাধীন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই আগ্রহ যেমন প্রবল, তেমনি যে সব তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র ইতিপূর্ব্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মৃগয়াক্ষেত্র ছিল, তাহাদের মধ্যেও এখন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য দারুণ ব্যগ্রতা। ইহা ছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনের বিশাল বাজার ধনতান্ত্রিক জগতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, হাত ছাড়া হইয়াছে পূর্ব্ব ইউরোপের অনুন্নত দেশগুলি।

## কমনওয়েলথ ও কমন মার্কেট—

ইউরোপীয় অভিন্ন বাজার ইউরোপিয়ান্ কমন মার্কেট সম্পর্কিত বিতর্কের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব-পরিস্থিতির এই বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যদি তাহাদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ না করে, তাহা হইলে শ্রম-শিল্পে অত্যুন্নত দেশগুলির পক্ষে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামো টিকাইয়া রাখা অসম্ভব। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান্ বলিয়াছেন—আজিকার এই সব ঘটনা যদি চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিত, তাহা হইলে ১৯১৪ সালের ও ১৯৩৯ সালের বিপর্য্যয় হইতে পৃথিবী হয়ত রক্ষা পাইত। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই দুইটি সালে বিশ্ব-যুদ্ধ বাধিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য; এই সব শক্তি যদি পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে সম্মিলিত ভাবে শোষণের জন্য পূর্ব্ব হইতে দলবদ্ধ হইতে পারিত, তাহা হইলে ঐ দুইটি বিরাট বিপর্য্যয় হয়ত সত্যই ঘটিত না। কিন্তু মিঃ ম্যাক্‌মিল্যানের সাম্রাজ্যবাদী অগ্রজরা মনে করিতেন যে, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতি পক্ষকে হটাইয়া স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ তখনও ছিল; এই জন্য মিলিত ভাবে শোষণের কোনও প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা বোধ করেন নাই! যাহা হউক, বর্ত্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মিলিত হইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল। এই ব্যাপারে তাঁহার উৎসাহী সমর্থক পশ্চিম জার্ম্মাণীর চ্যানসেলার ডাঃ আডেনয়ার। তাঁহাদের উদ্যোগে পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হইয়াছে ইউরোপীয় অভিন্ন বাজার। শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিম ইউরোপকে রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করাই নাকি তাঁহাদের উদ্দেশ্য; ইউরোপীয় অভিন্ন বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানরূপে প্রথমে বৃটেন উত্তর ইউরোপের কয়েকটি প্রতিবেশীকে লইয়া সাতটি রাষ্ট্রের উন্মুক্ত বাজার গঠনে প্রয়াসী হইয়াছিল; কিন্তু পরে, "গভীর চিন্তার পর" বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান ইউরোপীয় অভিন্ন বাজারে প্রবেশের জন্য আগ্রহী হইয়াছেন। গভীর চিন্তার এই বাস্তব স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহার চেতনা হইয়াছে যে, বৃটেনের সহযোগী যে কমন্‌ওয়েলথ, তাহার সহিত বৃটেনের অর্থনৈতিক লেন-দেন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে; কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাজ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে সচেষ্ট হওয়ায় বৃটেনের পক্ষে একাকী ইহাদিগকে অর্থনৈতিক তাঁবে রাখা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ অভিন্ন বাজারের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির সহিত বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট; বৃটেন যদি এই বাজার হইতে দূরে থাকে, তাহা হইলে ঐ সব রাজ্যে বৃটিশ পণ্য বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইবে। বৃটেনের অভিন্ন বাজারে প্রবেশের আগ্রহে শঙ্কিত হইয়াছে সমগ্র কমন্‌ওয়েলথ; ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে—১৯৩১ সালে বৃটেন তাহার সাম্রাজ্য শোষণের ব্যবস্থা পাকা করিবার জন্য তথাকথিত ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স বা সাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্যগুলির বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এই ব্যবস্থার মূল কথা:—সাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে পণ্যের আদান-প্রদানে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা উপভোগ করিবে। এই ব্যবস্থায় বৃটেন একদিকে সাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্যগুলি হইতে পণ্যোপকরণ আহরণের বিশেষ সুবিধা পাইল এবং অন্য দিকে ঐ সব রাজ্যে তৈয়ারী পণ্য বিক্রয়েও বিশেষ সুবিধা লাভ করিল। বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া কমনওয়েলথে রূপান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স পরিবর্ত্তিত হইয়া কমনওয়েলথ প্রেফারেন্স নামে পরিচিত হইয়াছে, এবং ঐ ব্যবস্থা এখনও বলবৎ আছে। কমনওয়েলথভুক্ত রাজ্যগুলির বহির্বাণিজ্য এই ব্যবস্থার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। বৃটেন যদি ইউরোপীয় অভিন্ন বাজারে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কমনওয়েলথ প্রেফারেন্সের অবসান নিশ্চিত, ঐ বাজারের নেতা ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর কমনওয়েলথ রাজ্যগুলিকে বিশেষ সুবিধা দিতে সম্মত হইবার কোনও যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান কমনওয়েলথী রাজ্যগুলির প্রতি যতই দরদ দেখান না কেন, তিনিও কমনওয়েলথ প্রেফারেন্স সম্পর্কে তত আগ্রহী নহেন। ইহার প্রথম কারণ—সাধারণ ভাবে

কমনওয়েলথভুক্ত রাজ্যগুলির সহিত বৃটেনের বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে; দ্বিতীয়তঃ এই সব রাজ্যের অনেকগুলিই এখন আর শ্রম শিল্পে উন্নত দেশে কাঁচা মাল যোগাইবার যন্ত্র মাত্র নহে, তৈয়ারী পণ্যের আগ্রহী খরিদ্দারও তাহারা নহে,—তাহারা নিজেরা শ্রম শিল্পে উন্নত হইতেছে এবং অনেক ব্যাপারে নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশে তৈয়ারী পণ্য রপ্তানীও করিতেছে। যতই দিন যাইবে, কমনওয়েলথভুক্ত রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র অর্থ নৈতিক সত্তা ততই এই ভাবে সংহত হইতে থাকিবে। বৃটেনের পক্ষে একাকী এই ধারা রোধ করা সম্ভব নহে; তবে, শ্রমশিল্পে উন্নত সমস্ত পাশ্চাত্য রাষ্ট্র যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহা হইলে এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নতিকামী দেশগুলির অগ্রগতি তাহারা, অন্ততঃ কতক পরিমাণে রোধ করিতে পারিবে; কারণ শ্রম শিল্পে উন্নত রাষ্ট্রগুলির সহিত উন্নতিকামী রাজ্য সমূহের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। পশ্চিম জার্মাণী, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গ—এই ছয়টি রাষ্ট্র লইয়া ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের উদ্ভব। অতঃপর, উত্তর ও মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই অর্থ নৈতিক জোটে প্রবেশপ্রার্থী হইয়াছে। বৃটেন ইহাতে যোগ দিবার পর আমেরিকাও বেশী দিন ইহা হইতে দূরে থাকিবে না। ইহার সহিত তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ আরম্ভ হইবে। বস্তুতঃ ইউরোপীয় অভিন্ন বাজার হইল ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতিষ্ঠান, যাহা হইতে কোনও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসম্পন্ন শক্তির বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়।

## মার্লবরো হাউসে—

গত ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে লণ্ডনের মার্লবরো হাউসে কমনওয়েলথ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে; এই সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় বৃটেনের কমনমার্কেটে প্রবেশের প্রসঙ্গ। যে হেতু বৃটেন এই অর্থ নৈতিক জোটে প্রবেশ করিলে কমনওয়েলথ প্রেফারেন্স ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে এবং কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্য বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইবে, সেই জন্ম মার্লবরো হাউসে সমবেত কমনওয়েলথী প্রধান মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই বৃটেনের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছেন। বৃটেনের বর্তমান রক্ষণশীল মন্ত্রিমণ্ডল যদি এই বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া কমন্ মার্কেটে যোগদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। প্রথমতঃ, বৃটিশ পুঁজিবাদী শ্রেণীর এক অংশ কমন মার্কেটে প্রবেশের বিরোধী; তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, ইহার ফলে বৃটিশ অর্থনীতির উপর জার্মাণীর একচেটিয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে। তাঁহাদের এই মনোভাব রক্ষণশীল দলেও প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং, ম্যাকমিল্যান গভর্ণমেণ্টের কমন মার্কেটে যোগদানের সিদ্ধান্তে রক্ষণশীল দলে ভাঙন ধরিবার সম্ভাবনা। এদিকে শ্রমিক দল কমন মার্কেটে প্রবেশের প্রবল বিরোধী। অতএব, দলত্যাগী রক্ষণশীল সদস্য ও শ্রমিক দলের মিলনে বৃটিশ রাজনীতিতে একটা বিপর্যয়কর কাণ্ড ঘটিতে পারে। আর বৃটেন যদি আভ্যন্তরীণ বাধা অতিক্রম করিয়া কমন মার্কেটে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে কমনওয়েলথী বন্ধন শিথিল হইবে এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া যাইবে।

## ভারত ও কমনওয়েলথ—

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথ হইতে বাহিরে যাইতে চাহিয়াছিল; ডোমিনিয়নে পরিণত হইয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবার নরমপন্থী প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ভারতের এই জাতীয় দাবীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বৃটেনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত থাকিবার এক ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়। নূতন ব্যবস্থায় কমনওয়েলথের "বৃটিশ" বিশেষণটি উঠিয়া যায় এবং স্থির হয় যে, বৃটিশ "ক্রাউন" কেবল প্রতীক হিসাবে কমনওয়েলথের পুরোধা বলিয়া গণ্য হইবেন, এই ক্রাউনের প্রতি আনুগত্যবিহীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রও কমনওয়েলথে থাকিতে পারিবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াও কমনওয়েলথে আছে। শ্রীনেহরুকে ইহার জন্ম বার বার বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "আইনের দিক হইতে অথবা সাংবিধানিক বিচারে আমাদের মধ্যে কোনও সম্পর্কই নাই—বৃটিশ ক্রাউনের প্রতি আনুগত্য তো দূরের কথা।...কমনওয়েলথে থাকিবার জন্ম অর্থ নৈতিক, সামরিক বা অন্য কোনও রকম বাধ্যবাধকতা আমাদের নাই।" বস্তুতঃ, ভারত কমনওয়েলথে থাকিয়াও বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির অনুবর্তী হয় নাই, তাহার সহিত একত্রে সামরিক জোটেও যোগ দেয় নাই। প্রথম দিকে বৃটেনের নিকট হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ

সংগ্রহের আবশ্যকতা ভারতের ছিল ; কিন্তু সে প্রয়োজনও এখন ফুরাইয়াছে। বিশেষতঃ, যে পাকিস্থান বৃটেনের সহিত একই সামরিক জোটে আবদ্ধ, তাহার দিক হইতে ভারত আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় বৃটিশ সমরোপকরণ নির্ভরযোগ্য নয়। বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী মিত্র পর্ত্তুগালকে গোয়া হইতে বিতাড়নের প্রয়োজনে বৃটিশ অস্ত্রের উপর নির্ভর করা চলে না। সংক্ষেপে, রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে বৃটেনের সহিত ভারত এখন বাস্তব সম্পর্কবিহীন। একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপারেই কমনওয়েলথের সদস্যরাষ্ট্র হিসাবে ভারত কতকগুলি সুবিধা লাভ করিত। সে সব সুবিধার অবসান হইলে ভারতের কমনওয়েলথে থাকিবার আর কোনও সঙ্গত কারণ নাই। শ্রীনেহরুই এক সময় বলিয়াছিলেন, "যেহেতু ইহা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক, সেই জন্যই বৃটেনের সহিত আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে। যদি কখনও এই সুবিধা চলিয়া যায়, তাহা হইলে এই সম্পর্কেরও শেষ হইবে।" সেই সম্পর্ক শেষ করিবার সময়ই এখন আসিয়াছে। ভারতকে এখন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত অথবা তাহাদের অর্থনৈতিক জোটের সহিত স্বতন্ত্রভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। ইউরোপীয় অভিন্ন বাজার নিশ্চয়ই শক্তিশালী পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান ; অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ইহা ধনতান্ত্রিক জগতের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে ( প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর ভাষায় আন্তর্জ্জাতিক কার্টেলে ) পরিণত হইবে। কিন্তু সে জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারতের অর্থনৈতিক লেন-দেনে অসুবিধা হইবার কথা নহে ; কারণ শ্রমশিল্পে পাশ্চাত্য জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী সোস্যালিষ্ট শিবিরের সহিত ভারতের সম্পর্ক মধুর। ভারত অসহায় ভাবে ইউরোপীয় অভিন্ন বাজারে বাণিজ্যপ্রার্থী হইবে না। দর কষাকষি করিয়া সঙ্গত সর্ত্ত আদায়ের ক্ষমতা তাহার পূর্ণ মাত্রায় থাকিবে।



## কিউবার বিপদ—

'অপরাধী' কিউবা—সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে কিউবা অপরাধী ; কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক শৃঙ্খল এবং পরোক্ষ রাজনৈতিক শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে সচেষ্ট হইয়াছে। তাহার বিশাল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবেশী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে অর্থনৈতিক শাস্তি দিয়া তাহাকে সায়েস্তা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে সায়েস্তা হয় নাই—আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সহিত সে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছে। এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ধূয়া উঠিয়াছে যে কিউবায় কম্যুনিষ্ট ঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছে, যাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এবং সমগ্র লাতিন আমেরিকার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই ধূয়া তুলিয়া এবং সেই সঙ্গে কিউবার প্রতিবেশী লাতিন আমেরিকান্ রাষ্ট্রগুলিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৯৬০ সালে কোষ্টা রিকার সান্ জোসে আমেরিকান্ রাষ্ট্র সংস্থার ( অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান্ ষ্টেট্সের ) যে সম্মেলন হয়, তাহাতে কিউবার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, তিনি পশ্চিম গোলার্দ্ধের নিরাপত্তা বিপন্ন করিতেছেন। এই সম্মেলন সম্পর্কে লণ্ডন 'ইকনমিষ্ট' মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'ওয়াশিংটনে এবং সান্ জোসে যখন চাপা হুমকী দেওয়া হইল যে, এই সম্মেলনে অবলম্বিত মনোভাবের উপরই মার্কিণ সাহায্যপ্রাপ্তি নির্ভর করিবে, একমাত্র তখনই প্রতিনিধিরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন।' এইভাবে এবং আরও অনেক গোপন ও প্রকাশ্য পদ্ধতিতে লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে কিউবার প্রতি বিরূপ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার পর, এই অঞ্চলের মার্কিণ তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির দ্বারা কিউবার বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ চালানোই ওয়াশিংটন কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। অন্য দিকে কিউবার প্রতিক্রিয়াপন্থী ও প্রতিবিপ্লবীদিগকে সযত্নে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পোষা হইতেছে। ইহারাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সাহায্যে ও অস্ত্র সাহায্যে ১৯৬১ সালের প্রথমে কিউবার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিল। মার্কিণ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ তখন কেনেডি সরকারকে বুঝাইয়াছিলেন যে, প্রবাসী কিউবানদের অভিযান আরম্ভ হইলেই জনসাধারণ অভিযাত্রী বাহিনীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইবে। অভ্যর্থনা তাহারা সত্যই জানাইয়াছিল—কিন্তু ফুলের মালা দিয়া নহে, রাইফেল ও সঙ্গীন দিয়া। সে অভ্যর্থনা এতই ব্যাপক এবং এতই উৎসাহপূর্ণ যে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই অভিযান ব্যর্থ হয়। এই পরোক্ষ মার্কিণ সামরিক অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা সদ্য প্রতিষ্ঠিত কেনেডি সরকারের পক্ষে লজ্জার কারণ হইয়াছিল। এবার হয়ত সেই জন্য ভাল করিয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া কিউবাকে শিক্ষা দিবার আয়োজন হইতেছে। এবারও

দেশত্যাগী কিউবানদিগকে কাস্ত্রো-শাসিত কিউবার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইবে, না কয়েকটি মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রকে লেলাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা এখনও স্পষ্ট নহে।

## বিপদের ইঙ্গিত—

গত ২৪শে আগষ্ট একখানি অজ্ঞাত পরিচয় জাহাজ অকস্মাৎ রাত্রির অন্ধকারে কিউবার রাজধানী হাভানায় গোলাবর্ষণ করে। মিয়ামিস্থিত দেশত্যাগী কিউবান্ ছাত্রদের সংস্থা হইতে বড়াই করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই গোলাবর্ষণ তাহারাই করিয়াছিল। ডাঃ কাস্ত্রো এই গোলাবর্ষণের জন্ম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেন; কিন্তু মার্কিণ কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, ইহার সহিত তাঁহাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই—এই ব্যাপারের কোনও খবরও তাঁহারা রাখিতেন না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বসিয়া একটি ছাত্র-সংস্থা জাহাজ যোগাড় করিল, গোলাগুলী সংগ্রহ করিল এবং গোলাবর্ষণ করিয়াও আসিল; কিন্তু মার্কিণ কর্তৃপক্ষ উহার কিছুই জানিলেন না! এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—১৯৫৯ সালের শেষের দিকে ফ্লোরিডার বিমানঘাঁটী হইতে কিউবার আখের ক্ষেতে যখন বার বার অগ্নিবর্ষী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তখনও ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষ বলিয়াছিলেন যে, বেসরকারী বিমান বাহিনীর কাজ বন্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরের বছর মার্চ্চ মাসে হাভানায় অস্ত্রশস্ত্র ভর্ত্তি জাহাজে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়, তাহার জন্ম ডাঃ কাস্ত্রো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেই দায়ী করিয়াছিলেন, যে দায়িত্ব স্বভাবতঃ তাঁহারা অস্বীকার করেন। যাহা হউক, ২৪শে আগষ্টের ঘটনার পর গত ১১ই সেপ্টেম্বর একখানি দস্যু জাহাজ কিউবার উত্তর উপকূলের নিকটে দুইখানি মালবাহী জাহাজকে আক্রমণ করিয়াছিল; ইহাদের একখানি কিউবান্ জাহাজ, অন্যখানি কিউবান্ পণ্য বহনের জন্ম ভাড়া-করা বৃটিশ জাহাজ। আক্রমণকারী জাহাজখানির পরিচয় জানা যায় নাই। তবে, এই ধরণের আক্রমণের প্ররোচনা ও উৎসাহ কোথা হইতে, তাহা অনুমান করা হয়ত দুঃসাধ্য নহে। ঠিক এই সময় প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কিউবা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে দেড় লক্ষ সৈন্য সজ্জিত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কিছু কাল যাবৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার চলিতেছিল যে, কিউবায় কম্যুনিষ্ট শিবিরের অস্ত্রশস্ত্র আসিতেছে, সেখানে কম্যুনিষ্ট ঘাঁটী বসিতে আর দেরী নাই। কিউবার আসন্ন বিপদের এই সব লক্ষণ দেখিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে যদি কিউবাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কা স্পষ্ট হইবে এবং সে যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হইবার নিশ্চয়তাও থাকিবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সুদৃঢ় ঘোষণা—"কিউবাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া কোনও শক্তিই যেন ইহা মনে না করে যে, তাহার উপযুক্ত

শান্তির বিধান হইবে না।" মার্কিণ কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ ধরণের হুমকীতে ভয় পান না—তাঁহারা যাহা ভাল বোঝেন, তাহা করিয়া যাইবেন। কিন্তু এই ধরণের হুমকীতে যে কাজ হয়, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল ১৯৫৬ সালে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইস্রাইল কর্তৃক মিশর আক্রান্ত হওয়ার সময়। তাহা ছাড়া, আমেরিকা যে এত দিন প্রত্যক্ষভাবে কিউবার গায়ে হাত দিতে সাহস করে নাই, তাহারও কারণ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ কিউবাকে রক্ষার জন্ম বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি লইবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে একবার সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমেরিকা হয়ত প্রত্যক্ষভাবে কিউবাকে আক্রমণ করিবে না। তবে, তাহার সক্রিয় সাহায্যে এবং পরোক্ষ প্ররোচনায় আবার কিউবার বিপদ হয়ত আসন্ন। সে বিপদ সমগ্র বিশ্বের পারমাণবিক বিপর্য্যয়ের বিপদে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

## সিঙ্গাপুরে গণভোট—

মালয়াসিয়া—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একটি নূতন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আয়োজন হইতেছে। সিঙ্গাপুর, মালয়, উত্তর বোর্ণিও, সারওয়াক ও ব্রুণি লইয়া গঠিত মালয়াসিয়া ফেডারেশন নামে এই যুক্তরাষ্ট্রটি পরিচিত হইবে। গত জুলাই মাসে মালয়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ টেঙ্কু আবদুল রহমান লণ্ডনে যাইয়া এই সম্পর্কে প্রাথমিক চুক্তি করিয়া আসিয়াছেন; আগামী বৎসর ৩১শে আগষ্ট এই যুক্তরাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হইবার কথা। মিঃ রহমান পূর্ব্বে সিঙ্গাপুরের সহিত মালয়ের মিলনের প্রবল বিরোধী ছিলেন। কারণ এই মিলনের ফলে সিঙ্গাপুরের তের লক্ষ চীনার দ্বারা মালয়ীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু মুরুব্বি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং মালয়ীদের স্বার্থরক্ষার ফরমূলাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মালয়ের সহিত সিঙ্গাপুর মিলিত হইবার পর সিঙ্গাপুরী ও মালয়ীদের অভিন্ন নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না; সিঙ্গাপুরের অধিবাসী সিঙ্গাপুরীই থাকবে, তাহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় পারষদে পনের জন সদস্য পাঠাইতে পারিবে মাত্র—লোক-সংখ্যার দিক হইতে তাহাদের পঁচিশ জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারা উচিত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তথা তাঁহাদের অনুগত মিঃ রহমানের মালয়াসিয়া ফেডারেশন সম্পর্কে উৎসাহী হইবার বিশেষ কারণ আছে। সিঙ্গাপুরের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী লি কুয়ান্ ইউর নেতৃত্বাধীন পিপলস্ এ্যাকশান পার্টিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এই দল ত্যাগ করিয়া যাঁহারা বরিসন্ সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী; সিঙ্গাপুরে তাঁহাদের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্দ্ধমান। আগামী ১৯৬৩ সালে সিঙ্গাপুরে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবার কথা এবং ঐ সময়টি সিঙ্গাপুরের সংবিধান সংশোধনের জন্তও নির্দ্ধারিত। এই নির্ব্বাচনে বরিসন্ সোস্যালিস্ট পার্টি জয়ী হইলে তাহাদের দাবী অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের ফলে সিঙ্গাপুরে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটির ভবিষ্যৎ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্তই উহার পূর্ব্বে মালয় ও সিঙ্গাপুরের মিলনের একটা ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। এদিকে উত্তর বোর্ণিও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান তৈল উৎপাদনকেন্দ্র। এই বোর্ণিওতে সম্প্রতি স্বাধীনতার দাবী উঠিয়াছে যাহা বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তরের পক্ষে দুশ্চিন্তার বিষয়। মিঃ টেঙ্কু আবদুল রহমান মালয়াসিয়া ফেডারেশন গঠন করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের এই সব মুস্কিল আসান করিবার ভার লইয়াছেন। সিঙ্গাপুরের প্রধান মন্ত্রী লি কুয়ান ইউও মালয়াসিয়ার টোপ গিলিয়াছেন; কারণ তাঁহার ধারণা (অন্ততঃ তিনি বলেন) যে, মালয়ের সহিত মিলিত না হইলে সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতা নিরাপদ হইতে পারে না।

## গণতান্ত্রিক অসাধুতা—

মালয়ের সহিত সংযুক্তির প্রশ্নে গত ১লা সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে গণভোট লওয়া হইয়াছে। এই গণভোটে যে গণতান্ত্রিক শঠতা হইয়াছিল, তাহার তুলনা মেলা শক্ত। প্রথমতঃ, ভোট দান বাধ্যতামূলক—ভোট না দিলে রাজনৈতিক অধিকার হরণের এমন কি অর্থদণ্ডেরও ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ গণভোটের জন্ম উপাপিত তিনটি বিকল্প প্রস্তাবের একটি সমর্থন করিতেই হইবে—দ্বিমত প্রকাশের অধিকার নাই; এই ব্যবস্থাটি একেবারে গণতন্ত্রের মূল নীতির বিরোধী। উথাপিত তিনটি প্রস্তাব এইরূপ—(১) মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রধান মন্ত্রী দুইটি রাজ্যের মিলন সম্পর্কে যে চুক্তি করিয়াছেন সেই চুক্তি অনুসারে মিলন; (২) বিনা সর্ত্তে সিঙ্গাপুরের ও মালয়ের মিলন (৩) উত্তর বোর্ণিও যে সর্ত্তে মালয়ের সহিত যুক্ত হইবে, সেই সর্ত্তে সিঙ্গাপুরের সহিত মালয়ের মিলন। কোনও ভোটদাতা যদি সাদা কাগজ ব্যালট বাক্সে দেন, অথবা তাঁহার ভোট অস্পষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বিনা সর্ত্তে মালয়ের সহিত সিঙ্গাপুরের মিলনের অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সমর্থনের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সিঙ্গাপরী চীনারা তাহা হইলে নাগরিকত্ব হারাইবে। তৃতীয় প্রস্তাবটি অস্পষ্ট, কারণ বোর্ণিও কোন সর্ত্তে মালয়াসিয়ায় যোগ দিবে, তাহা এখনও জানা নাই। অবশিষ্ট রহিল একমাত্র প্রথম প্রস্তাব; ইহার সমর্থন এড়াইবার উপায় নাই—যে কোন ভাবে ভোটপত্র দেওয়া হউক (সুস্পষ্টভাবে অন্ম একটি প্রস্তাবের সমর্থন ব্যতীত), উহা প্রথম প্রস্তাবের সমর্থন বলিয়া ধরা হইবে। এই ভাবে অনুষ্ঠিত গণভোটে জয়ী হইবার জন্ম প্রধান মন্ত্রী লি কুয়ান ইউ আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন। প্রথম প্রস্তাবের পক্ষে শতকরা পঁচাত্তরটি ভোট হইয়াছে, যাহার মধ্যে শতকরা পঁচিশ ভাগ সাদা কাগজের তথাকথিত ভোট। বরিসন্ সোস্যালিস্ট পার্টি মালয়ের সহিত সিঙ্গাপুরের মিলনের একান্ত বিরোধী। তাঁহারা সিঙ্গাপুরের শ্রমিক আন্দোলনে প্রভাবশালী, সাধারণ ভাবে জনপ্রিয়ও বটে। সুতরাং, গণতান্ত্রিক ভোটের নামে এই ধরণের অসাধু উপায় যদি অবলম্বিত না হইত, তাহা হইলে মালয় সিঙ্গাপুর মিলনের প্রচেষ্টা ফাঁসিয়া যাইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল বলা যাইতে পারে।

—"মিহির"

## ভাদ্র, ১৩৬৯ (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, '৬২)

### অন্তর্দেশীয়—

১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট): অমৃতসরে আকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং ও সন্ত ফতে সিং (বিরুদ্ধবাদী) সহ শতাধিক আকালী গ্রেপ্তার—উভয়পক্ষের সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য পাঞ্জাব সরকারের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার সীমান্ত বরাবর পাক্‌সৈন্য সমাবেশ।

২রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট): ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্ফীতিতে ডিব্রুগড় সহর (আসাম) প্লাবিত—লখিমপুর, শিবসাগর, দারাং, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায় বন্যার প্রকোপ।

৩রা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট): কলিকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন—উদ্বোধক: মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন (পশ্চিমবঙ্গ)।

গণ-সংযোগ কর্মসূচীর (প্রতি সোমবার) সূচনা দিবসেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক তিন শত লোকের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ।

৪ঠা ভাদ্র (২১শে আগষ্ট): প্রচণ্ড বর্ষণের ফলে উত্তরবঙ্গ ও আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত—হাজার হাজার নর-নারী বিপন্ন।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট): আসামে বন্যার্তদের উদ্ধারকার্যে সৈন্যবাহিনী তলব—যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার (আসাম) আবেদন।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট): মোহনবাগান দলের পুনরায় (দশম বার) লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ (ফুটবল) অর্জন—প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দল ২—০ গোলে পরাজিত।

৭ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট): বর্দ্ধমানে ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ—বাস কণ্ডাক্টারের সহিত ছাত্র-বিরোধের পরিণতি।

৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট): 'তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ও আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগৃহীত হইবে'—লোকসভায় পরিকল্পনা সচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দের আশা-প্রকাশ।

৯ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট): 'প্রতি বৎসর মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-দিবস (২রা অক্টোবর) হইতে জাতীয় সংহতি সপ্তাহ পালন—জাতীয় সংহতি সংক্রান্ত আঞ্চলিক পরিষদ কমিটির সিদ্ধান্ত।

১০ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট): বিধ্বংসী বন্যায় দেশের বিভিন্ন অংশে এ-যাবৎ ১০ জনের প্রাণহানি—হাজার হাজার গৃহ বিধ্বস্ত ও দুই সহস্র গবাদি পশুর মৃত্যু—পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআলগেসানের বিবৃতি।

১১ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট): ভারত ইউনিয়নের ষোড়শ রাজ্যরূপে নাগাভূমি গঠনের উদ্যোগ—লোকসভায় সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত।

১২ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট) লোকসভায় নাগাভূমি রাজ্য বিল পাশ।

১৩ই ভাদ্র (৩০শে আগষ্ট): 'প্রয়োজন হইলে গুলী চালাইয়া হইলেও সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে'—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃঢ় অভিমত—ত্রিপুরা অঞ্চলে পুনঃ পুনঃ পাক্ হানার প্রতিক্রিয়া।

১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ীর পদত্যাগ।

লোকসভায় হটগোল সৃষ্টি ও স্পীকারের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগে সোস্যালিষ্ট সদস্য শ্রীরামসেবক যাদব এক সপ্তাহ সাসপেণ্ড।

১৫ই ভাদ্র (১লা সেপ্টেম্বর): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে রবীন্দ্র অধ্যাপকপদ (কবিগুরুর নামে) সৃষ্টি।

১৬ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর): বিহার কংগ্রেস কমিটি বাতিল করার সুপারিশ গৃহীত—প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র দলাদলি ও ভুয়া সদস্য সংগ্রহের অভিযোগ।

১৭ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর): গত চার মাসে লাডাক এলাকায় চীনাদের ৩০টি নূতন ঘাঁটি স্থাপন—ভারতীয় ঘাঁটিতে রসদ সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি—লোকসভায় তথ্য প্রকাশ।

১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর): শিয়ালদহ এলাকায় (কলিকাতা) উত্তেজিত জনতা ও পুলিশের মধ্যে দীর্ঘ খণ্ডযুদ্ধ—পুলিসের উপর্যুপরি লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ—১৩টি ট্রাম ভস্মীভূত: ৮০ জন আহত: প্রায় দুই শত ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং জম্মুতে কাশ্মীর লইয়া নূতন রাজ্য গঠনের দাবী—পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকাইরণের প্রস্তাব।

ত্রিপুরা-মণিপুর প্রভৃতি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদ গঠন সংক্রান্ত বিল লোকসভায় গৃহীত।

১৯শে ভাদ্র (৫ই সেপ্টেম্বর): কলিকাতায় সকল স্কুল ও কলেজে ছাত্রদের ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা—ছাত্রদলনে পুলিসের যথেচ্ছ কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠিচালনার প্রতিবাদ।

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর): বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আবেদন—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য কমিটি গঠন করুন।

২১শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর): দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্বর্দ্ধিত।

লোকসভায় বার্তাজীবী সাংবাদিক (সংশোধন) বিল পেশ।

২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর): কাঁকিনাড়া ষ্টেশনে (রেল) প্রকাশ্য দিবালোকে সশস্ত্র ডাকাতি—২৫ হাজার লুণ্ঠন করিয়া দুর্বৃত্তদল উধাও।

২৩শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): পাটনায় শ্রীমতী রাজবংশী দেবীর (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের পত্নী) ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ ও পরিবহন মন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ গ্রহণ।

উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে একীভূত করার প্রস্তাব (পাঞ্জাব মুখ্যমন্ত্রী আনীত) কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ কর্তৃক অগ্রাহ্য।

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): ১৯৬১ সালের চূড়ান্ত আদম-শুমারীর হিসাবে ভারতের জনসংখ্যা ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষ।

প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিযুক্ত।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): পেট্রাপোলে (বনগাঁর সন্নিহিত) ভারতীয় শুল্ক কর্ম্মচারীদল কর্তৃক চলন্ত মোটর হইতে ২০ লক্ষ টাকার বে-আইনী সোনা আটক—গাড়ীর মার্কিণ মালিক গ্রেপ্তার।

২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): নেফার কামেং সীমান্ত বিভাগে চীনা ফৌজের অনুপ্রবেশ—আসাম রাইফেলদের একটি ক্ষুদ্র দল পরিবেষ্টিত।

২৭শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): ম্যাকমোহন লাইন বরাবর সমরাস্ত্রসজ্জিত বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের সমাবেশ—নেফা অঞ্চলে অনুপ্রবেশের কথা সরকারীভাবে স্বীকৃত।

২৮শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): দশ বৎসরে ১০ হাজার বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানীকে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে বহিষ্কার—দিল্লীর সরকারী ইস্তাহারে তথ্য-প্রকাশ।

২৯শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর): বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা করার দাবী—দিল্লীতে রাষ্ট্রপতির (ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ) সহিত কাছাড় প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ।

৩০শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর): নেফা সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে দেশ রক্ষা দপ্তরের উর্দ্ধতন পর্য্যায়ে পর্য্যালোচনা—লেঃ জেনারেল সেন (ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের জি-ও-সি) কর্তৃক সীমান্ত পরিস্থিতির বিবরণ-দান।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ (কলিকাতা) পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—জাতীয় সংহতি, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত।

৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর): দৈখাতায় (জলপাইগুড়ি সীমান্ত) অঞ্চলে ভারতীয় এলাকায় পূর্ব্ব-পাকিস্তান রাইফেলবাহিনীর গুলীবর্ষণ।

## বহির্দেশীয়—

১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট): 'মস্কো-এ মহাকাশচারী নিকোলায়েভ ও পোপোভিচের বিপুল সম্বর্দ্ধনা—প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ কর্তৃক অভিনন্দন জ্ঞাপন।

চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম ইরিয়ানে ইন্দোনেশীয় ও ওলন্দাজ বাহিনীর যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা।

২রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট): আটকাবস্থা হইতে প্রাক্তন পাক্-প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর করাচীতে মুক্তিলাভ।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট): প্যারিসের নিকট প্রেসিডেণ্ট দ্য-গলের প্রাণনাশের চেষ্টা।

৭ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট): বার্লিন সম্বন্ধে চতুঃশক্তি বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য পুনরায় আহ্বান—রাশিয়ার নিকট পশ্চিমী শক্তি-গোষ্ঠীর লিপি।

জাকার্ত্তায় সমারোহ-সহকারে চতুর্থ এশিয়ান "গেমস্"-এর উদ্বোধন—ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণ কর্তৃক ক্রীড়ারম্ভ ঘোষিত।

৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট): হাভানার উপকূলে সশস্ত্র জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ—আমেরিকার বিরুদ্ধে কিউবার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ কাষ্ট্রোর অভিযোগ।

৯ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট): মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক কিউবার আকাশ ও সমুদ্রসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার।

১১ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট): রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সহিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের বৈঠক—রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিষয়ক সমস্যাবলী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা।

১২ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট): ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাস মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার দাবী—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে (সপ্তদশ জাতি) রুশ প্রতিনিধির প্রস্তাব।

১৩ই ভাদ্র (৩০শে আগষ্ট): ১লা জানুয়ারী (১৯৬৩) হইতে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধে সোভিয়েট প্রস্তাবে আমেরিকার সম্মতি—কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ চুক্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তাব।

১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট): ভারতের সহিত নূতন বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে ইন্দোনেশিয়ার আপত্তি—এশিয়ান গেমসে শ্রীসোন্ধির (ভারতীয়) ইস্রায়েল ও চিয়াং চীন প্রীতির প্রতিক্রিয়া।

বৃটিশ নাগপাশ হইতে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর স্বাধীনতা অর্জ্জন।

১৫ই ভাদ্র (১লা সেপ্টেম্বর): পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ভয়াবহ বন্যায় শতাধিক লোকের প্রাণহানি—পাবনা ও রাজসাহীতে হাজার-হাজার গৃহ ভূমিসাৎ—দুই শত কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট।

পঃ ইরাণে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ২০ হাজার নর-নারী হতাহত—৮ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড।

১৭ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর): জাকার্ত্তায় ভারতীয় দূতাবাসের উপর আক্রমণ—শ্রীসোন্ধির বিরুদ্ধে ২০ হাজার ইন্দোনেশীয় নর-নারীর বিক্ষোভ—গোপনে সোন্ধির জাকার্ত্তা ত্যাগ।

১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর): চতুর্থ এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার (জাকার্ত্তা) ফাইন্যালে দক্ষিণ-কোরিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ২—১ গোলে সাফল্য ও স্বর্ণপদক লাভ।

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর): কঙ্গো হইতে তিন মাস মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী অপসারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের দাবী।

২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর): ২০শে সেপ্টেম্বর আলজিরিয়ায় নির্ব্বাচন সম্পর্কে ঘোষণা—আলজিরিয়ায় পুনরায় স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম আরম্ভ।

২৩শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): চীনের আকাশে আমেরিকার প্রস্তুত ইউ-২ বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত।

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): লণ্ডনে ১০ দিবসব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ—বৃটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানের বিরুদ্ধে শ্রীনেহরুসহ নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধিতা।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): কিউবার উপর আক্রমণে আণবিক বিশ্বযুদ্ধ বাধিতে পারে'—আমেরিকার প্রতি রুশিয়ার হুঁসিয়ারী।

২৯শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর): ভারতীয় পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের রুশিয়া সফর সুরু—দলের নেতা: লোকসভার স্পীকার শ্রীহুকুম সিং।

৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর): পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ১ জন নিহত ও আড়াই শতাধিক আহত—ঢাকা ও যশোহরে পুলিশের গুলীবর্ষণ—কয়েক স্থানে সৈন্যবাহিনী তলব—শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে ছাত্রদের হরতাল।

## শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই, এ, এস

[ পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী ও কমিশনার ]

১৯০৫ সাল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরম্ভ কাল—ভারতের নব যুগের সূচনা। এই বছরই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং পরবর্তী জীবনে বিশিষ্ট সরকারী অফিসার ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন কমিশনার শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। যুগের প্রভাব এঁর জীবনের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। তাই দেখা গেল শিক্ষাবিভাগ থেকে পরবর্তী জীবনে ইনি দেশের ও জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্যে সরকারী কার্যে যোগ দেন। আজও তিনি আর্ত দরিদ্র মানবতার কার্যে নিরলসভাবে কর্ম করে চলেছেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ নরনারী নিঃসহায় উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। শম্ভুনাথ তাদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিলেন পুনর্বাসন কমিশনারের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করে। সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ এই পদস্থ সরকারী কর্মচারী পশ্চিমবঙ্গের অলঙ্কার স্বরূপ। 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' এই মহাবাক্যই তিনি জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছেন। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতরে যতখানি সম্ভব ইনি উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। পুনর্বাসন বিভাগের দুর্নীতির এঁর কার্যকালে অবলুপ্তি ঘটতে চলেছে।

শম্ভুনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই পরিবারটি শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে আছে। তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ সকলেই কৃতবিদ্য। পিতা ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট সরকারী অফিসার। প্রেসিডেন্সী স্মল কজেস কোর্টের বিচারপতি হিসেবে তিনি প্রচুর খ্যাতি ও যশ অর্জন করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্।

ইংরেজী ১৯০৫ সালের ৩রা অক্টোবর শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলায় নেত্রকোণায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের আদি নিবাস পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায়। সরকারী কর্মব্যপদেশে এঁর পিতা তখন নেত্রকোণায় ছিলেন। বাল্যকালে পিতার সঙ্গে শম্ভুনাথকে বহু জেলায় পরিভ্রমণ করতে হয়েছে।
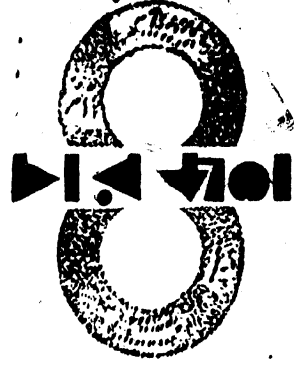
১৯২২ সালে ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউট থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং পনের টাকা বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন। এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেন। ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজেই ইতিহাসে অনার্স গ্রহণ করে বি, এ পড়েন। ১৯২৬ সালে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পেয়ে বঙ্কিম স্বর্ণপদক ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তারপর ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী লাভ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং ১৯৩০ সালে প্রথম শ্রেণীতে ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইতিহাসের লেকচারার ছিলেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকও ছিলেন। হয়তো অবশিষ্ট জীবন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষাব্রতী হিসেবেই অতিবাহিত করতেন, যদি না দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের জনগণের সেবার আহ্বান না পেতেন। সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল তাঁর দেশের ও জনগণের সেবা। সরকারী চাকরী গ্রহণ করলেই জনসাধারণ ও দেশের সেবা করতে পারবেন এই মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৪১ সালে আই, এ, এস অফিসার হিসেবে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। তারপর এস, ডি, ও, এডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে স্বরাষ্ট্র বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী হয়ে কলকাতায় আসেন এবং তার পর ১৯৫৭ সালে রাজ্যের পুনর্বাসন দপ্তরের অতিরিক্ত সেক্রেটারীর পদে যোগদান করেন। সরকার এঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে এঁকে ১৯৫৯ সালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও সাহায্য বিভাগের কমিশনার ও সেক্রেটারী পদ প্রদান করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নিরলসভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন।

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ও আলিপুরের প্রখ্যাত এডভোকেট, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরহঙ্কারী ও সদালাপী। শিক্ষা জীবন থেকে ইনি খেলা-ধূলোয় অংশ গ্রহণ করতেন এবং অদ্যাবধি খেলা-ধূলোয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবসর সময়ে ইতিহাস, সাহিত্য, প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ করে থাকেন।

পরিশেষে জিজ্ঞেস করলে বললেন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কার্যই আমার এখন একমাত্র ভাল লাগে। এই কাজের ভেতর দিয়েই আমি দেশ ও জনসাধারণকে সেবা করতে সক্ষম হব।

## ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

[ বাংলার বিশিষ্ট অপরাধ-বিজ্ঞানী ]

বহু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই মানুষটি—একাধারে তিনি সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও সমাজসেবী। দক্ষ পুলিশ অফিসার রূপেও শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের খ্যাতি কারো অজানা নয়। অপরাধ মনো-বিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রীতে তিনি যখন ভূষিত হলেন, বহুদূর অবধি সুনাম তাঁর ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র জীবন থেকেই ডঃ ঘোষালের মাঝে একটি বিজ্ঞানী-মন সজাগ দেখতে পাওয়া যায়।

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

এম-এস্-সি পাশ করার পর তিনি ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর অধীনে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। এরই মাঝে কর্মজীবনে পুলিশ-বিভাগে তিনি যে এসে পড়েন, তা ঘটনাচক্রেই বলতে হবে। কিন্তু একবার যখন আসা হয়ে গেল, প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা চাই-ই। সংকল্পে অবিচল থেকে তিনি ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে পাশাপাশি চলে তাঁর নিবিড় গবেষণা। তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ এই গবেষণারই সফল পরিণতি।

কলকাতার একজন বেশ জনপ্রিয় পুলিশ অফিসার—ডেপুটি কমিশনার ছিলেন ডঃ ঘোষাল (আই-পি-এস্), এ অত্যুক্তি নয়। বহু প্রয়োজনের মুহূর্তে মহানগরীর অধিবাসীরা তাঁকে পাশে পেয়েছে, বিপদ অতিক্রমে নিশ্চিত সহায়তা এই মানুষটি এগিয়ে দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালের নারকীয় দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলকাতায় ডঃ ঘোষালের সাহসী ভূমিকা অনেকেরই স্মরণে আছে। নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সহরবাসীদের রক্ষাকল্পে সেদিনে তিনি কী তৎপরতাই না দেখিয়েছেন।

পুলিশ বিভাগকে সমধিক সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলবার ব্যাপারেও ডঃ ঘোষালের অবদান রয়েছে অনেকখানি। মহানগরীতে তিনি যখন এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, সে-সময় ভেজাল বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভেজাল নির্দ্ধারণের জন্যে তিনি একাধিক যন্ত্র উদ্ভাবন ও সংগ্রহ করেন। ভারত সরকারের কমার্শিয়াল ক্রাইম মিউজিয়াম ও জেনারেল ক্রাইম মিউজিয়াম তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধরণের মিউজিয়াম ভারতে এখন অবধি আর নেই। পুলিশ অফিসাররূপে বৈশিষ্ট্য ও কর্মদক্ষতা প্রমাণিত করে তিনি তিনটি পদক (ভারতীয় পুলিশ পদক সহ) পেয়েছেন, এ সামান্য নহে।

কলকাতা পুলিশ বিভাগের সঙ্গে ডঃ ঘোষালের নাম নানাভাবে জড়িত হয়ে আছে। স্থানীয় পুলিশ এসোসিয়েশনের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা—সদস্য ও সহ সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ক্লাব লাইব্রেরী এবং পুলিশ জার্ণাল—দুই-ই গড়ে ওঠে তাঁর প্রচেষ্টায়। কলকাতা পুলিশের এই প্রথম জার্ণাল আর পুলিশ এসোসিয়েশন বুলেটিনের সম্পাদকও ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে তিনি এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হন। এ সকল কাজের দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে চলে তাঁর সাহিত্য সাধনা, এ নিশ্চয়ই একটা বৈশিষ্ট্য।

শ্রীঘোষাল যেখানটায় বিশেষ গৌরব করতে পারেন—এখন অবধি ভারতে 'ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি' বা অপরাধ মনোবিজ্ঞানের একমাত্র ডক্টরেট তিনিই। এই স্বতন্ত্র ক্ষেত্রটিতে তাঁর অনন্যসাধারণ গবেষণা বহির্ভারতেও শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদেশে ক্রাইম মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই অগ্রণী বলা যায়। অপরাধ বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষার জন্য তাঁর আবিষ্কৃত ও নির্মিত কয়েকটি যন্ত্রও রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (মনোবিজ্ঞান শ্রেণী), মাউণ্ট আবু কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ, ডেফ এণ্ড ডাম স্কুল (শিক্ষক শিক্ষণ শ্রেণী) প্রভৃতি শিক্ষায়তনে তিনি অধ্যাপনার কাজও করেছেন। অপরাধ বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ও বাংলার বাইরেও তাঁকে বক্তৃতা করতে দেখা গেছে এবং সর্ব্বত্রই প্রশংসা জুটেছে তাঁর। সাহিত্য ক্ষেত্রেও ডঃ ঘোষাল নিজস্ব একটি স্থান করে নিতে পেরেছেন। তাঁর রচিত গবেষণামূলক গ্রন্থ হিন্দু প্রাণী বিজ্ঞান, বাংলা ও কলিকাতা পুলিশের ইতিহাস, তিন খণ্ডে সম্পন্ন বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত কাহিনী এবং আট খণ্ড বিশিষ্ট অপরাধ বিজ্ঞান—এই সকলই বাংলা ভাষার গ্রন্থরাজির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। তাঁর লিখিত বহু গ্রন্থের অপরাধী ও অপরাধিনীর জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন টেকনিকে আরও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি যশস্বী হয়েছেন। 'বসুমতী'র নিয়মিত লেখক গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম।

সমাজসেবী হিসাবেও এই বলিষ্ঠ মানুষটির বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ ছিল বা রয়েছে। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের তিনি অন্যতম। কয়েকটি বিদ্যালয় বা শিক্ষা-সংস্থার পরিচালনা কমিটির সভাপতি পদে তিনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন। গোঁড়া থেকেই নিজ জন্মভূমির উন্নতিকল্পে তাঁর প্রাণে নিতান্ত তাগিদ দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে সমবায় কৃষি প্রসারে তিনি এক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছেন।

ডঃ ঘোষাল মাদরালের (চব্বিশ পরগণা) রাজা রামশঙ্কর ঘোষাল প্রতিষ্ঠিত জমিদার বংশের রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষালের পৌত্র। কমলাপতি ঘোষাল ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাসতুত ভাই। ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের ছাত্রাবস্থা থেকে বহুকাল তিনি কেন্দ্রীয় এ্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটি এবং কেন্দ্রীয় সয়োজনলিনী এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সভার সদস্য ছিলেন। ৺কবিরাজ গণনাথ সেন প্রতিষ্ঠিত কবিরাজী হাসপাতাল এবং সিটি ডেণ্টাল কলেজেরও তিনি কার্য্যকরী সভার সদস্য ছিলেন বহু গ্রামে তিনি মহিলা সভা ও ম্যালেরিয়া নিবারণী সোসাইটি স্থাপন করেন।

ভাই ডঃ হিরণ্ময় ঘোষালও একজন কৃতি পুরুষ। তিনি এখন পোলাণ্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় ব্রতী আছেন।

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালকে কতকগুলো দিক থেকেই একটি দৃষ্টান্ত বলা যায়। তাঁর ভেতরকার কর্ম্মী মানুষটি আজও বুঝি বেশ বলিষ্ঠই রয়েছে। অবসর জীবনে তিনি যা করতে চান, সেটি তাঁর নিজেরই ভাষায়—এখুনি আমার গ্রামে আমি ফিরে যাবো। সেখানে অনেক কাজ অসমাপ্ত ফেলে এসেছি—যা আমায় শেষ করতে হবে। পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন কাজেই আমি আত্মনিয়োগ করবো।

## শ্রীমতী শান্তি দাস

[ স্বাধীনতা সংগ্রামে দুঃসাহসী বিপ্লবিনী ]

স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা নিয়ে শুধু পুরুষরাই অগ্নিস্নান করেননি, বাঙলার নারীরাও সেদিন পুরুষের সঙ্গে রক্ত পিছলপথের সহযাত্রিনী হয়েছিলেন। সেবাকোমল নমনীয় হাতেই সেদিন গর্জ্জে উঠেছিল কালাগ্নিবর্ষী পিস্তল-রিভলবার। দিনটি ছিল
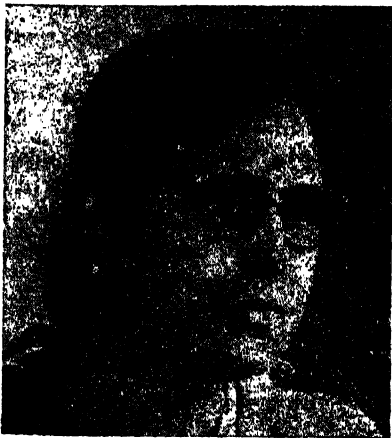
শ্রীমতী শান্তি দাস

১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। কুখ্যাত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সের বুক লক্ষ্য ক'রে যে দু'টি বাঙ্গালী তরুণীর হাতের পিস্তল অকুতোভয়ে গর্জ্জন করে উঠেছিল তারা হলেন শান্তি দাস (ঘোষ) ও সুনীতি চৌধুরী। ষ্টিভেন্স তার হাতের পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন এই দুটি বাঙ্গালী বহ্নিকন্যার আগ্নেয়াস্ত্রের অব্যর্থ গুলীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে। তরুণ সমাজে যেমন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী তরুণী সমাজে তেমনি শান্তি-সুনীতি প্রত্যক্ষ বিপ্লবের পথিকৃৎ।

দেশের জন্যে নিঃশেষে আত্মদানের প্রেরণা শ্রীমতী শান্তি পেয়েছিলেন তাঁর পূর্ব্বপুরুষের কাছ থেকেই। তাঁর মাতৃদেবী স্বামী বিবেকানন্দের ভাগিনেয়ী আর তাঁর পিতৃদেব স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের দর্শন শাস্ত্রের আদর্শনিষ্ঠ অধ্যাপক।

শ্রীমতী শান্তি দাসের জন্ম এই কোলকাতায় ১৯১৬ সালে। পিতৃপুরুষের বাসভূমি যশোহর জেলার বাবুটিয়া গ্রামে। স্কুলের ছাত্রী জীবনেই মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে তিনি কুমিল্লা জেলা ছাত্রছাত্রী ইউনিয়নের সম্পাদিকা পদে নির্ব্বাচিতা হন। বাল্যে স্বদেশ-প্রেমের বীজ কি ভাবে অন্তরে অঙ্কুরিত হয়েছিল, সে কথা বলতে গিয়ে শ্রীমতী শান্তি এক জায়গায় লিখেছেন, "ঋষি বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণী বহন করে নিয়ে এলো নতুনতর ইঙ্গিত; গীতা হল সঙ্গী, গীতাকে শুধু কর্ম্মানুষ্ঠান আর দেবপূজায় আবৃত্তি করার মন্ত্র বলে নিই নি আমরা, গীতা ছিলো আমাদের অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষার মন্ত্র।"

দেশের মুক্তিই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছুতে যে কোন পন্থাই তাঁর পক্ষে গ্রহণযোগ্য, ফলে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতেও তাঁর দেরী হলো না। ১৯৩০ সালের গণ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। পুলিসের নির্য্যাতন হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিচলিত আত্মোৎসর্গে তিনি কুমিল্লার জনগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলেন চিরকালের জন্য। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুরু হল শান্তি ঘোষের রাজ-নৈতিক জীবনের আর এক অধ্যায়।

কুমিল্লা সহরে জেলা-শাসকের সরকারী নিবাস; শান্ত্রী সেপাই ঘেরা সরকারী বাঙলো; শাদা পোষাকে পুলিসও ঘুরছে এদিক ওদিক। তখন সকাল প্রায় দশটা, শান্তি, সুনীতি এগিয়ে যায় সাহেবের বাঙলোর দিকে। বাইরের বিস্তীর্ণ হলঘরে গিয়ে বসে তারা। সাহেবের কাছে সাক্ষাতের জন্য তারা ইণ্টারভিউ কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সাক্ষাৎকারের আবেদন সাহেব মঞ্জুর করেন। মহকুমা-হাকিমকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টিভেন্স সাহেব হলে এসে ঢুকলেন; মেয়ে দুটি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিবাদন জানালেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন তাদের—'কি চাই তোমাদের?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো মেয়ে দুটির হাতের দুটি পিস্তল থেকে, 'গুড়ুম!' 'গুড়ুম'! সারা হলঘর ভরে গেল ধোঁয়ায়। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে কোনরকমে পাশের ঘরে চলে এলেন ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তাঁর প্রাণহীন দেহ। দেহরক্ষী দল এসে তাঁদের গ্রেপ্তার করলো, নিয়ে যাওয়া হল কুমিল্লা জেলে, সেখান থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। তখন শান্তি ঘোষের বয়স মাত্র পনের। এই বয়সের কথা বিবেচনা করেই বোধহয় তাঁর প্রাণদণ্ড হয় নি; বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বছর সাতেক কারাবাসের পর গান্ধীজীর হস্তক্ষেপের ফলে শ্রীমতী শান্তির সে দণ্ডও

একদিন মকুব হয়ে গেল, তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি বিপ্লবী রাজবন্দী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। পরবর্ত্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর মানব কল্যাণ ব্রতে সঞ্জীবিত হলেন শ্রীমতী শান্তি দাস এবং সেই থেকেই তিনি একজন নিষ্ঠাবতী কংগ্রেস কর্ম্মী। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মহিলা বিভাগের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত শ্রীমতী দাসের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রধানত: উদ্বাস্তু, শিক্ষা ও সমাজ সেবার এলাকাতেই। তিনি কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী, রাজ্য বয়স্ক শিক্ষাসমিতির বিশিষ্ট সদস্যা এবং রাজ্য সমাজ কল্যাণ পর্ষতের উপদেষ্টা। এতদিন পর্য্যন্ত শ্রীমতী দাস পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্যা ছিলেন; কিন্তু গত সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি চাকদহ কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যা নির্ব্বাচিতা হয়েছেন।

পরাধীন ভারতের মুক্তিযুদ্ধে অবলা নারী সমাজের পুরোধা বিপ্লবিনী-রূপে ইতিহাস তাঁকে বরণ করে নিয়েছে। আর আজ স্বাধীন ভারতের সেবাব্রতের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের নিকট ভিন্নরূপে তাদের হৃদয় সিংহাসনে অক্ষয় স্থান অধিকার করে নিয়েছেন।

## শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ প্রখ্যাত নাগরিক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ]

বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানের সাধনায় যাঁদের জীবন উৎসর্গীত সাধারণের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি তাঁদের জন্যে চিরনির্দিষ্ট। মহানগরীর অন্যতম প্রখ্যাত নাগরিক শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই তালিকায় অন্যতম বিশিষ্ট নাম। জনসেবায়, সাহিত্যচর্চায় এবং সমাজ উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় এঁর আগ্রহ এবং আন্তরিকতার অভাব নেই।

শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদের এক প্রাচীন জমিদারবংশে এঁর জন্ম। প্রাচীনতা এবং ঐতিহ্য দু'দিক দিয়েই এই পরিবার বৈশিষ্ট্যবান এবং স্মরণীয়। কলকাতার ছোট আদালতের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন এঁর পিতামহ। অবসর গ্রহণান্তে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কুঞ্জলাল ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারতে আইনসভা সম্প্রসারণের "রেজলিউশান মুভ" করার গৌরব কুঞ্জলালের। দেশসেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগত এবং সমাজগত উভয়দিকেই কুঞ্জলাল অর্জন করেছিলেন বিপুল প্রসিদ্ধি এবং জনপ্রিয়তা। পিতৃদেব স্বর্গীয় কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র আটাশ বছর বয়েসে জীবনের স্ফুরণ মুহূর্তেই ভববন্ধন ছিন্ন করেন। অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ার জন্যে বটকৃষ্ণ মাতুলালয়ে পালিত হন। কলকাতা হাইকোর্টের আদিযুগের য়্যাটর্নিদের অন্যতম জনাইয়ের সুবিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন মাতামহ।

কলকাতার সুপ্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে বটকৃষ্ণ পাঠ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সেণ্টপলস ক্যাথিড্রাল মিশনস কলেজ, গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট ( অধুনা গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স ) আশুতোষ কলেজ, ইউনিভার্সিটি ল কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেও ইনি শিক্ষালাভ করেন।

বাল্যকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে বন্যাত্রাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্যাদিতে সহযোগিতা করেছেন। ১৯২৯ ও ১৯৩১ সালে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বঙ্গীয় সরকার প্রদত্ত স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ইনষ্টিটিউট ছাত্রমণ্ডলীর ইনি নেতা ছিলেন, পরে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসান এক বিশেষ প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। আশুতোষ কলেজে অধ্যয়নকালে পরলোকগত অধ্যাপক লে: অজিত ঘোষের সঙ্গে য়্যাম্বুলেন্স ডিভিসানের প্রতিষ্ঠা করেন। সেণ্ট জনস য়্যাম্বুলেন্স কেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর জন্যে এঁকে ভারতের প্রাক্তন বড়লাট স্বর্গত লর্ড ওয়াভেল এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দুবার প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ইনি সেণ্ট জনস য়্যাম্বুলেন্সের টালিগঞ্জ শাখার সভাপতি। ১৯৪৩এর দুর্ভিক্ষে এঁর জনহিতকর কর্মাদির জন্যে তদানীন্তন বঙ্গের গভর্ণর মি: কেসি এঁকে মেডিলিয়ান প্রদান করেন। ১৯৪৫ সালে ইনি 'রায়সাহেব' খেতাব লাভ করেন। জেনেভার আন্তর্জাতিক টুরিষ্ট কমিশনের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ বিদ্যমান। ১৯৪৯সালে ইনি নোটারি পাবলিক হন। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার এঁকে নোটারি পাবলিক রূপে পুনর্নিয়োগ করেন।

যে সকল প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে ইনি বিশেষরূপে জড়িত আছেন ( কোথাও কোথাও আজীবন সদস্যরূপেও যুক্ত ) তাদের মধ্যে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, মহাবোধি সোসাইটি, ভারতীয় রেডক্রস ও সেণ্ট জন, লণ্ডনের রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটি, নয়াদিল্লীর সারা ভারতের বার য়্যাসোসিয়েশান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নদীয়ার অন্তর্গত বীরনগর উলা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দ্বাদশ মন্দিরস্থ ভক্তিবিনোদ গোষ্ঠীর ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের ইনি সচিবের আসনে অধিষ্ঠিত এবং দ্বাদশমন্দিরস্থ প্রতিষ্ঠান বহুকাল যাবৎ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করছেন।

ইনি বিদ্যানুরাগী গুণগ্রাহী একথা পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে। নিজ ব্যয়ে তিনি একটি বিশিষ্ট পাঠাগার পরিচালনা করছেন যার পাঠকদের মধ্যে বহু সুধী গবেষকদের নামোল্লেখ করা যায়।

# বার্ধক্যে বারাণসী

**নীলকণ্ঠ**

## ছাব্বিশ

পরমাশ্চর্য সেই পদ্মগন্ধ আসছে কোথা থেকে? অনেক দূরের কোনও দুরন্ত দুর্গম বন থেকে? নাকি কারুর গভীর আনন্দে উজ্জ্বল, সীমার অঙ্গে সীমাহীন বেদনায় উচ্ছল কোনও মন থেকে, আজ বহুক্ষণ থেকে কেন আসছে তাঁর সুবাস,—দূষিত মল যাঁর করুণায় হয় পূজার পরিমল! পদ্মের দেহ থেকে নয়; সেই দেহপদ্ম থেকে আসছে এই দুঃখ দূর করা দুরন্ত গন্ধ, নিঃসন্দেহ! কিন্তু সে কি করে সম্ভব? মরলোকের আকাশ কেন ছেয়ে যাবে অমরলোকের আলোয়? অন্তর ইন্দ্রিয়ে লাগবে কেমন করে ইন্দ্রিয়াতীত অনন্তের কাননে ফোটা পারিজাত! পুষ্পের পুণ্য, পূর্ণ স্পর্শ? অন্তহীন দুঃখের অমারাত্রি রাঙবে কেন অকস্মাৎ অনন্তের আনন্দ-পূর্ণিমায়! রোগীর কালো মুখ ছড়িয়ে যায় আরোগ্যের আলো। ম্লান বিষণ্ণ মুমূর্ষু অবসন্ন হতাশ হতভাগ্য প্রকোষ্ঠে মুহূর্তে উৎসারিত হয়ে ওঠে জীবন নির্ঝরিণী প্রচণ্ড আবেগে! মৃত্যুর কিংকিণী দূরক্রান্ত হয়ে আসে অচিরে। পাপ পরিক্রান্ত হয় পুণ্যের মার্জনায়। দুঃখের মৌন আনন্দমুখর হয় সেই। আর শয্যার ওপর উঠে বসে হীরালাল ভোগীলাল ত্রিবেদীর বালিকা কন্যা। অন্তের পদধ্বনি মিলিয়ে যায় দূরে। কাছে আসে অনন্তের পদধ্বনি। মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চ লাগে সেই! ওই মহামানব আসে। সুবাসে ভরে যায় বাতাস। আলোয় আকাশ ভরে।

বিছানায় উঠে বসে বালিকা। উঠে বসে নির্দ্বিধায় নিষ্কম্প্র কণ্ঠে বলে: বাবা, গুরুজী এসেছিলেন আজ! এইমাত্র আমার মাথার কাছে এসে, হেসে, ভালোবেসে বলে গেলেন: বাপ থাকতে আবার মেয়ের ভয় কি রে!

মৃত্যুর মহাসমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসে জীবনের মৃত্যুহীন সংগীত!

আসতে হবে তাকে; হাসতে হবে; ভালোবাসতেই হবে যে তাঁকে। এই পৃথিবীর পথে পথে কাঁকর ছড়ানো হোক যত,—তারই ওপর যে তাঁর বার বার অপার করুণার ঝরণা ঝরানো!

হীরালাল ভোগীলাল ত্রিবেদীর বালিকা কন্যার মৃত্যুশয্যার পাশে এসে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন; হেসে, ভালোবেসে বলেছিলেন, দেহত্যাগ করে যাবার দু'বছর পর, 'ভয় নেই,' তিনিই কাশীর বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস। কাশীর আবালবৃদ্ধবনিতা যাঁকে আদর করে ডাকে, গন্ধবাবা। দেহত্যাগ করে যাবার পরেও আজ যিনি শিষ্যের অকালে দেহত্যাগ রোধ করতে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই মুহূর্তকে অশেষ মুহূর্তে উত্তরিত করতে। ভগবানের দূতকে দেখে আজ ফিরে গেছে তাই মৃত্যুদূত! কথা রেখেছেন তিনি; শংখের মুখে যাঁর অসংখ্যবার ঘোষণা: সম্ভবামি যুগে-যুগে। শুধু রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত আহত ধর্মের আরোগ্যে নয়, ভক্তের বোঝা বইতে ভগবানের দূতেরা আসেন বার-বার শয়তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে শরণাগতকে।

নরদেহে অমরদেহের অধীশ্বর গন্ধবাবা, যতদিন জীবিত ছিলেন সেই চিরজীবিত বার-বার বলেছেন: সেই হচ্ছে গুরু যাঁর শক্তি আছে শিষ্যের গুরুভার বইবার। নিশ্চয় তাই। গুরুর চেয়ে সম্পদ বা বিপদ কখনও নয় গুরুতর! চোখের সামনে যিনি নেই, চোখের সামনে যাঁর শিষ্য জেগে আছে সর্বক্ষণ তাঁর অকালমৃত্যুকে যদি রোধ না করতে পারেন তিনি, মৃত্যুদূতের পথ অবরোধ না করে দাঁড়াতে পারেন, তবে তিনি কেন হবেন, ভগবানের দূত!

যাঁর দু'পায় নেই জীবন-মৃত্যুর পারে পৌঁছবার উপায়, তাঁর আনন্দ তবে বিশুদ্ধ হবে কেন?

সীমার গণ্ডিতে অসীমের আহ্বান কোনও কোনও ভাগ্যবানের কানে আসে অতি অল্প বয়সে। প্রাণে বাজে বিজয়াহীন পূজার আরতির আলো, এসে পড়ে জীবনের আকাশে ভোরের আলো ভালো করে জাগতে না জাগতে। লোকে অবাক হয়; ভাবে এ-বুঝি অলৌকিক কিছু। 'ক' বলতে প্রহ্লাদ যে কৃষ্ণ বলে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই; অবিশ্বাসেরও না। ধ্রুবকে নিয়ে জলবিহারে বেরিয়েছেন নারায়ণ। মনুষ্য অস্থির পাহাড়ে ঠেকেছে সেই তরণী। বিস্ময়াবিষ্ট বালক প্রশ্ন করেছে নারায়ণকে: এ কার হাড়? শংখ-চক্রগদাপদ্মপাণি উত্তর দিয়েছেন: তোমার! ধ্রুব আবার প্রশ্ন করেছে: আমার?—হ্যাঁ তোমার! তোমার জন্ম-জন্মান্তরের হাড় জমে জমে হয়েছে এই পাহাড়! বহু জন্মের সাধনায় বাকী ছিলো যেটুকু, সেটুকু শেষ করতে এসেছ এবার! তাই জন্মেই তুমি চেয়েছ আমাকে!

শুধু ভগবানকে নয়। জন্মেই কেউ লেখে, কেউ গান গায়, কেউ ছবি আঁকে, কেউ সন্ন্যাসী হতে চায়, যে, এর কারণ আর কিছুই নয়, কেবল জন্মজন্মান্তরের সংস্কার ছাড়া। তুমি যা করতে এসেছ, পাঁক তুলতে, অথবা পদ্ম ফোটাতে, কিংবা পদ্মনাভের দেখা পেতে, তোমার উপায় নেই, কেবল তাই না করে।

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসর বাল্যকালের নাম ছিলো ভোলানাথ। বারো বছর বয়সে, এক দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে অঘটন ঘটন যাঁর কৃপায় তাঁর দু'পায় জীবন মৃত্যুর বন্ধন মোচনের উপায় জানবার আহ্বান আসে জীবনে। সেই আহ্বান, যা যার কানে গেছে, সব বাসনা তার সোনা হয়ে গেছে, ঘর যার কাছে মনে হয়েছে কারাগার, পথ

যাকে করেছে পাগল, সব পথের শেষ যে 'এক' দাঁড়িয়ে আছে গানের ওপারে ; জ্ঞানের ওপারে, তারই জন্তে তুচ্ছ করে আরাম আর নিরাপদ আশ্রয়ের বিলাস বেরিয়ে গেছে সে জন্ম-মৃত্যুর নাগপাশ থেকে চিরকালের মতো ! সেই আহ্বান জীবনের প্রভাত বেলায় ডাক দিলো শিশু ভোলানাথকে।

বারো বছরের বালক। কুকুর কামড়ানোর দুরারোগ্য যন্ত্রণায় নদীগর্ভে আত্মবিসর্জনে উদ্যত। সেই একই সময়ে এক সন্ন্যাসীও জলে নেমেছেন উদাত্তকণ্ঠে জীবনের স্তোত্র উচ্চারণ করতে। মরতে প্রতিজ্ঞ বালক ; তাকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর তপস্বী। কি হয়েছে তোমার ? বালককে প্রশ্ন করেন চিরবালক সন্ন্যাসী। শিশু ভোলানাথের ওপর ভোলানাথ চিরশিশুর করুণা জেগে ওঠে। চোখের জলে নদীর জলে একাকার হয়ে যাওয়া নিশীথ রাত্রে নির্জন নদীকূলে বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত বাষ্পরুদ্ধ আবেগোচ্ছল কণ্ঠ উত্তর দেয় : বড় যন্ত্রণা ! কোথায় যন্ত্রণা ? বলতে বলতে সন্ন্যাসী করস্পর্শ করেন ক্ষতস্থানে। বেদনা দূর হয় ; যন্ত্রণার হয় উপশম। উধাও হয় সাধু। ক্ষতস্থান থেকে অক্ষত অবস্থানে প্রত্যাবৃত বালক ভাবে, একি অলীক, না, অলৌকিক ? স্বপ্ন, না, মায়া ? ইন্দ্রজাল, না, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি !

ভোলানাথের পক্ষে ভোলা অসম্ভব হয় আরোগ্যের উৎস সন্ন্যাসী চিরভোলানাথকে।

আবার পরের দিন সেই নির্জন নদীতীরে। এদিন আরও বিস্ময়ের বাকী ছিলো। সন্ন্যাসীকে নদীর জল তুলে নিতে হয় না। প্রসারিত হস্তে নদী আপনি এসে ওঠে ; আপনি নেমে যায়। ভোলানাথ কেঁদে তাঁর দু'পায় পড়ে। কুকুর কামড়ানোর যন্ত্রণা থেকে নয় ; জীব-যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় জানতে চায় এক শিশু আরেক শিশুর দু'পায় পড়ে। সাধু কাছে এসে, হেসে, ভালোবেসে বলেন : সময় হলেই সব দুঃসময় দূর হবে। এখন কানে তোমার যে বীজ দিচ্ছি তাকে প্রাণের বীণায় বাজাও রোজ।

সেই বীজ থেকে সেই বীর্য থেকে যে বীরের আবির্ভাব উত্তরকালে বারাণসীতে আবালবৃদ্ধর নত্য আদর করে তাঁরই নাম দিয়েছিলো গন্ধবাবা।

বর্দ্ধমানের রাজপথে একদিন সেই কিশোর ভোলানাথের কানে এলো জীবনের রাজপথে বেরিয়ে পড়ার ব্যাকুল আহ্বান। এক অলৌকিক কীর্তির চেয়ে মহৎ এক মানুষের কথা শুনে ভোলানাথ ঢাকায় যাবার জন্তে মায়ের অনুমতি নিতে স্বগ্রাম বণ্ডুলে এলেন। বণ্ডুলের সবাই কিশোরের বাউণ্ডুলে জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। *কেবল ভোলানাথের মা বললেন : যে যাবেই তাকে যেতে দাও। বাইশ বছর ওর আয়ু। যদি কোনও পরমশক্তির কৃপায় ওর পরমায়ু বাড়ে, চরমের কোনও সন্ধান ও পায়, তবে বাধা দেবার নিমিত্ত হই কেন ?*

*ভোলানাথের মায়ের নাম রাজরাজেশ্বরী ; জগতের যিনি মা, তিনিও রাজরাজেশ্বরী। এই মা আর সেই মা-র তফাৎ কি !*

রমনার বনে ভোলানাথের জীবনে দ্বিতীয় রমণীয় ঘটনা ! ভোলানাথ সংগ চায় নিঃসংগ এক মহাপুরুষের। অনেক কাঁদাকাটা, অনেক পায় ধরে শেষ পর্যন্ত উপায় হয় ভোলানাথের। সন্ন্যাসী তাকে সংগে নিতে রাজি হয়। যোগীর হাত ধরে ভোলানাথ চোখ বাঁধা অবস্থায় যেখানে গিয়ে ওঠে, সে স্থানের নাম, বিন্ধ্যাচল। সেখান থেকে তিব্বতের মালভূমিতে উপস্থিত হলেন তাঁরা। বিরল শক্তিধর পুরুষের অবিরল ধারায় অভিষিক্ত সেই দুর্লভপুরীকে ভোলানাথ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস হবার পর, জ্ঞানগঞ্জ নামে অভিহিত করতেন [ ভারতের সাধক : তৃতীয় খণ্ড ]।

যাঁর কৃপায় বালকের দু'পায় পর্বত লংঘনের প্রেরণা জাগে তাঁর নাম নীমানন্দ।

নীমানন্দ নিয়ে যান ভোলানাথকে আরও উচ্চে অবস্থিত গুরু স্বামী মহাতপার কাছে। আট বৎসর দুশ্চর মহাতপস্যায় উত্তীর্ণ ভোলানাথের নূতন নাম হয় বিশুদ্ধানন্দ। সাধনার শেষে অশেষ ক্ষমতার অধিকারী বিশুদ্ধানন্দের ওপর আদেশ হয় ঘরে ফিরে গিয়ে ঘরণী নিয়ে চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবার।

ঘরে ফেরবার তাঁর বাধা কোথায়, ঘোরে পড়বার বিপদ যার কেটে গেছে চিরকালের মতো।

সংসার করবার সময় চিকিৎসা বিভার চেয়ে অবিদ্যা মুক্তির ঐশ্বর্যই বিশুদ্ধানন্দের কাছে টেনে আনতো সকলকে। সেই সময় স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্তে স্ত্রীর কাছে পাঁচটি গিনি লুকিয়ে রেখে আসেন। এবং এসে বিশুদ্ধানন্দকে বলেন : আপনার বিভূতির কথা শুনে এসেছি। বিশুদ্ধ আনন্দে উদ্ভাসিত আনন বলে ওঠে : আমার বিভূতি কি স্ত্রীর কাছে রেখে আসা পাঁচ গিনির চেয়েও কম মনে কর তুমি, যে, আমাকে পরীক্ষা করতে আস ?

লৌকিক শক্তির মূল্য যত হোক অলৌকিক শক্তি যে অমূল্য, রমেশচন্দ্র তা বুঝলেন।

লৌকিক জগতে বিশুদ্ধানন্দ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস দিতে; সীমাকে দিতে অসীমের নিঃশ্বাস। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বিশুদ্ধানন্দ বলেছিলেন চর্মচক্ষে দেখা যায় না এমন অসংখ্য দ্বার মনুষ্যদেহে বর্তমান রয়েছে, মর্মচক্ষেই যার উদ্ঘাটন সম্ভব কেবল। নিজের মুখ দিয়ে ঘিয়ে ভেজানো কাপড় ঢুকিয়ে নাভিদেশ দিয়ে তা বার করে দেখালে ডাক্তার সরকার বলেছিলেন: দেহবিজ্ঞান যে কত অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী আজ এই অভয়ংকরী শক্তির প্রকাশে তার তত্ত্ব অবগত হলাম।

দর্শন যাকে দর্শন করেনি, মন্দিরে দর্শনী দিয়ে যার দেখা পাওয়া যায়নি কোনও কালে, নিজে দেখা দিলে তবেই দেখানো যায় এই দেহতে দেহাতীতের শক্তি!

সাধুর বেশে এক অসাধু এসেছে সেবার বিশুদ্ধানন্দের কাছে। সাধুর সম্বল এক শিবলিংগ। তার দিকে কেউ তাকাতে পারে না বেশীক্ষণ। বিশুদ্ধানন্দ দৃষ্টি দিলেন তার ওপর। সেটি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেংগে গেলো তৎক্ষণাৎ। কেঁদে উঠলো অসাধু। সাধুকে পরীক্ষা করতে আসার অনুশোচনায় নয়। শিবলিংগটি অক্ষের। ভাংগা শিবলিংগ এখন জোড়া লাগায় কে? কান্নায় বিগলিত বিশুদ্ধানন্দের চোখজোড়া কৃপা নামে। নিজের হাতে তাকে জুড়ে দেন তেমনই অনায়াসে, এ বিশ্বকে অনন্তকাল ধরে প্রলয় পয়োধিজলে ভাসাবার পর যেমন করে আবার জোড়েন সব ভাংগাগড়ার মূলে যিনি তাঁরই মতো দৃষ্টিপাত মাত্র সৃষ্টি করেন আবার নূতন শিবলিংগ। অক্ষত, অনাহত; অভংগ।

দর্শনের দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যাতা স্বর্গত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে বিশুদ্ধানন্দ বলেছিলেন: তুমি কেন মিথ্যে করে বলছ, তোমার কিছু হলো না? অর্থ হোলো, নাম হোলো, আর অহংকার, তা তো হোলো সব চেয়ে বেশী। আর তো তুমি কিছু চাওনি। কাশীতে হনুমান ঘাটে বাস করেন তখন বিশুদ্ধানন্দ। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার এক বালিকা কাশীতে চিঠি লিখে জানায় সেখানে বিশুদ্ধানন্দ তাকে দেখা দিয়ে বলেছেন যে তাঁর নাম ভোলানাথ, উপস্থিত প্রকাশ বিশুদ্ধানন্দ নামে; কাশীতে বর্তমান অবস্থান [ ভারতের সাধক; তৃতীয় ভাগ ]।

ধর্মকে রক্ষা করবার জন্তেই তাঁর আবির্ভাব এ কথা কে বলে? অধর্মের মুক্তি প্রার্থনায়ও করুণার মুক্তধারা নামে অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখর, অসীমকালের মহাগহ্বর থেকে। অহল্যার শাপবিমোচনের জন্তেই তো শ্রীরামচন্দ্রের অশ্রুমোচন। জগাই মাধাই উদ্ধার যদি না হলো তো চৈতন্ত সার্থক হবে কি করে। হিংসার পূজারী যদি অহিংসার পূজায় লোক থকে উত্তীর্ণ না হোলো অশোকে তো বুদ্ধের প্রবুদ্ধের আর প্রয়োজন কি। বিশুদ্ধানন্দের কাছে অশুদ্ধ আনন্দের রসিকেরা এসে যদি তার সন্ধান না পেলো, স্পর্শ না পেলো রমণের চেয়ে সীমাহীন রোমাঞ্চের আকর পরম রমণীয়র, তা হলে ভগবানেরা দূতেরা কেন বলবেন বারবার: ক্ষমা কর; ভালোবাসো।

জগত জুড়ে যত জমা কর পাপ, জগদীশ্বরের দূতেরা তত ক্ষমা কর সেই প্রতাপ।

বিশুদ্ধানন্দের দীক্ষিত এক শিষ্য এক সময়ে দুশ্চরিত্রা এক রমণীর পাল্লায় পড়েছিলো। বিবাহের পরেও তাকে কমলি ছাড়তে নারাজ। ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলে সে একদিন যাচ্ছে কমলির কাছে। ধড়মড় করে উঠেছে স্ত্রী; কেঁদে বলেছে; আবার তুমি তার কাছে যাচ্ছো!

কেমন করে জানলে তার কাছে যাচ্ছি? নির্লজ্জ প্রশ্ন করে তবুও স্বামী।

বাবা বিশুদ্ধানন্দ যে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললেন, তুই ঘুমিয়ে এখনও? ওদিকে তোর সব চেয়ে বড় সম্পদ যে চুরি হতে চললো।

বিশুদ্ধানন্দ যত দূরেই থাকুন বিপদে যিনি শিষ্যের সমীপবর্তী নন, গুরুতর বিপদে নন মুক্তির দূত, তিনি কি করে হবেন কারুর গুরু।

বিশুদ্ধানন্দের কাছে এসেছেন আনন্দময়ী মা। ফুল থেকে বিশুদ্ধানন্দ তখন তৈরী করছেন স্ফটিকের দানা। শিষ্যের বিস্ময়ে হতবাক। আনন্দময়ী মা হাসছেন। বলছেন: বাবা এসব কি দেখাও? যা নিয়ে মণিরে মণি বলে মানে না মুনিরা। তাই দাও এদের। বিশুদ্ধানন্দ উত্তর দেন: নেয় কে?

নেয় কে? দেয় কে? এর উত্তর কে দেবে? সমুদ্রের কল্লোলে এই প্রশ্নের উত্তরেই তো হিমালয় চির নিরুত্তর। কাশীতে বিশুদ্ধ আনন্দের সেই ধারা মরুর তলা দিয়ে ফল্গুর মতো, মরার বুকে অমরার মতো আজও অব্যাহত। দেবার জন্তে তিনি উন্মুখ। তাঁর দিকে মুখ তোলে কে? তাঁকে চায় কে, যাঁকে চেয়ে রাজকুমার বেরিয়েছে ঘর ছেড়ে। স্ত্রৈণ ত্যাগ করেছে রূপসী নারীকে, বেলা যায় শুনে বেরিয়ে গেছে ধনীর দুলাল।

সেই কাশীর কোল আলো করে এখনও রয়েছেন আনন্দময়ী মা। শুধু কাশীর নন; জগতের সব জায়গা জুড়ে রয়েছেন, অবিশ্বাসের অমানিশীথেও জেগে আছেন যিনি তিনি আনন্দময়ী মা নন; আনন্দ-পূর্ণিমা। [ক্রমশঃ।

ধারাবাহিক আত্ম-জীবনী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**পরিমল গোস্বামী**

১৫

'বেপরোয়া' নামক অসাময়িক পত্রিকাটি প্রকাশ হয় ১৩২৩ সালে। আমার সঙ্গে বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় ঘটে ১৩২৫ সালে। এই সময় বনফুল-এর বন্ধু এবং গুরু ছিলেন তিনি। আমারও বনফুলের বন্ধুরূপেই বনবিহারীবাবুর সংস্পর্শে আসা সম্ভব হয়েছিল, নইলে যোগাযোগ ঘটবার কোনো সূত্রই ছিল না।

এই সময়ে বেপরোয়ার ব্যঙ্গ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এই জাতীয় ব্যঙ্গ তখন প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটা প্রচণ্ড শক্তির আক্রমণে ঘুণ ধরা সমাজের কাঠামোটাই ভেঙে পড়ে বুঝি। একটা বিশেষ সময়ে প্রাচীন সংস্কারের নব্য ব্যাখ্যা দিতে যেমন রক্ষণশীলদের মুখপাত্ররূপে কয়েকজন ব্যক্তির উৎসাহ জেগেছিল, এই কালাপাহাড়ের দলও ঠিক সময়ে আবির্ভূত হয়ে যুক্তিবাদীদের মুখপাত্রের ভূমিকা নিয়েছিলেন। গোঁড়ামির নব্য ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ নস্যাৎ হবার উপক্রম হয়েছিলেন—অবশ্য তাঁদের মতে। রবীন্দ্রনাথ বিপক্ষের আক্রমণে কোনো দিনই বিচলিত হননি, এবং তার 'নিউস্যান্স' মূল্য ভিন্ন অন্য কোনো মূল্য আছে ব'লে স্বীকার করেননি। বিরক্ত হয়েছেন মূর্খতার চেহারা দেখে। মাঝে মাঝে প্রসন্নচিত্তে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু গোঁড়ামি ঘোচেনা তাতে।

গোঁড়ামির পিছনে এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব আছে। সমাজের জন্য সব যুগেই নতুন নতুন ব্যবস্থা বা বিধিবিধান রচিত হয়েছে। এ বিধান মানুষের তৈরি, এতএব পরিবর্তন-যোগ্য। একই বিধান সব কালের উপযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু ভীরু মন এটা বিশ্বাস করতে চায় না। যে বিধি আর চলতে পারে না, যাকে জোর ক'রে ধ'রে রাখতে চাইলে নিজেদেরই ক্ষতি, তাকেই জোর ক'রে ধরে রাখার চেষ্টা। কালের বদল তাদের চোখে পড়ে না। চোখের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখলেও তা বিশ্বাস করতে চায় না।

সেই "যেতে নাহি দিব" কবিতার তত্ত্বকথাটি মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ যতই প্রাণপণে প্রিয়বস্তুকে আঁকড়ে ধ'রে 'যেতে নাহি দিব' ব'লে চেঁচাতে থাক, ধ'রে রাখা যায় না, 'তবু হায় যেতে দিতে হয়।'

ছোট ছোট মেয়েকে ধ'রে সমাজের নামে অপাত্রে বলি দেবার প্রথা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব'লেই গোঁড়া মানুষের মনে আগের যুগে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি একটু দূরে প্রসারিত, তাঁরা এর নিষ্ঠুরতায় বিচলিত হয়েছেন। যাঁরা নিয়মের চেয়ে মানুষকে বড় ব'লে মানেন এমন মানুষের আবির্ভাব বাংলা দেশের পক্ষে অপ্রত্যাশিত ছিল না। পূর্ব থেকেই সমাজ সংস্কারক একে একে আবির্ভূত হচ্ছিলেন সমাজের নানা প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এঁদের মধ্যে ব্যঙ্গের আঘাত হানতে যাঁরা কলম হাতে নিয়েছিলেন বনবিহারীবাবু তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। তাঁর সমাজ বোধ কোনো শখের জিনিস নয়, কোনো সাইড-বিজনেস নয়, তাঁর আক্রমণ সর্বাত্মক এবং তিনি এই কাজেই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এ কথার পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর সব লেখার মধ্যে। সে লেখাগুলি এক সঙ্গে ছাপা হওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু বোধ হয় সময় আসেনি। বিভিন্ন কাগজে ছড়িয়ে আছে। তার তালিকাও তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর লেখা আমি চার বছর আগে অনেকগুলো নিজে ছেপেছি ও বিভিন্ন কাগজে পাঠিয়েছি। অনেক লেখা এখনও ধরা আছে।

একটা লেখা ছাপবার সময় আমি জানিয়েছিলাম আপনার অনেকগুলো কথা কেটে দিচ্ছি। আমাদের 'টাবু' আছে অনেক বিষয়ে। তার উত্তরে যে চিঠি লিখেছিলেন (৭-১১-৫১) তার একটি কথা হচ্ছে এই—'টাবু' আমার লেখায় থাকেই। 'টাবু' আমার মাথার মধ্যে টগবগ ক'রে ফুটচে। সময়ে/অসময়ে বেরিয়ে পড়েই। সেগুলো কেটে দেবার অধিকার তোমায় দিলুম। আমি নিজেই চিঠি লিখে··কেটে দিতে বলব ভেবেছিলুম।"···

মাথার মধ্যে এই যে সমস্ত 'নিষিদ্ধ' টগবগ ক'রে ফুটছে এই হ'ল বনবিহারীবাবুর আসল পরিচয়। তিনি শৌখিন সংস্কারক কদাপি নন, বিদ্রোহ তাঁর রক্তে।

১৩২৩ সালে এর প্রাথমিক পর্যায় দেখা যাবে তাঁর নানা রচনায়। একখানা মাত্র 'বেপরোয়া' সংখ্যাতে তাঁরই রচনাতে বোঝাই। বারো আনা তাঁর রচনা।

বনবিহারীবাবুর 'কলির কের' কাহিনীতে দেখা যায়—মেয়ের বয়স বারো—সর্বনাশ হ'ল, ধর্মে আর কত সহ্য হয়, অতএব খোঁজ খোঁজ পাত্র খোঁজ। নানা স্থানে নানা জাতীয় পাত্র খুঁজেও পণের দাবীতে প্রত্যেকটিকে ছাড়তে হল।

চড়াদরের বার্তা শুনে কর্তা অকস্মাৎ
"ধর্ম গেল!" ব'লে মাথায় করলেন করাঘাত।
পড়লেন শুয়ে দাওয়ার উপর, দিলেন হাল ছেড়ে।—
এমন সময় নীলু ঘটক এলেন টিকি নেড়ে,
আনলেন সাথে সাত গাঁ খুঁজে সস্তা দরে বর,
চেলির জোড়ে অঙ্গ ঢাকা, অনঙ্গ সুন্দর।···
নাকের স্থানে গর্ত—কারণ বলতে দোষ কি আর?
বরের ছিল কুষ্ঠ। তা রোগ নেই বা বল কার?"

গিন্নির এ বর পছন্দ নয়।

"নাক নিয়ে কি ধুয়ে খাবে?" কর্তা বল্লেন চোটে
শালগ্রাম যে দেবতা তার ত নাক নেইক মোটে!"

বিয়ে হয়ে গেল। বরের হাতও নুলো। কনে বরের আলিঙ্গন-পাশ-মুক্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো, কিন্তু

কাণ্ড দেখে স্তব্ধ সবাই। এলেন পিসি মাসি,
বল্লেন ডেকে, কল্লি এ কি ওলো সর্বনাশী?
পতিই হলেন দেবতা, নারীর পরম তীর্থ পতি
পতির পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, পতিই নারীর গতি।···
পতি পরম গুরু এমন চিকনিতেও লেখে,
পতিভক্তি শিথিল না-ক আজও এ সব দেখে?···

সবাই মেয়েটাকে বক্তৃতার চোটে পতিভক্তি শেখাতে লাগল। "পতি পরম গুরু এমন চিকনিতেও লেখে"—এত বড় একটি উজ্জ্বল নজির চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো সত্ত্বেও মেয়েটি স্বামীর বাড়িতে না গিয়ে যমের বাড়িতে যাওয়াই পছন্দ করল।

কাহিনীটির দৈর্ঘ্য প্রায় আট পৃষ্ঠা। নিচে ফুট নোটে লেখা আছে—'কিছুকাল পূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশ যে, বাঁকুড়া জেলার দুইটি হিন্দু বালিকা আত্মহত্যা করিয়াছিল। কারণ আর কিছুই নহে, কুষ্ঠরোগীর সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল এই মাত্র।"

এই হ'ল কবিতার প্রেরণা। সমাজের এই জাতীয় সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে বনবিহারী বাবুর মতো সমস্ত জীবন এমন সনিষ্ঠ কলম ধরার দৃষ্টান্ত বাঙালীর মধ্যে আর নেই।

আমি শুধু তাঁর পরবর্তী কালের আরও কঠিন আক্রমণমূলক লেখার প্রাথমিক পর্যায়গুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। বয়সএ সময় তাঁর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে।

সর্বজাতীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর বিদ্রোহ।

রবীন্দ্র বিরোধীদের বক্তব্য নিয়ে ব্যঙ্গ করেও বনবিহারীবাবু অনেক লিখেছেন এবং ছবি এঁকেছেন। তাঁর 'বঙ্গভাষা' নামক ব্যঙ্গ রচনাটিতে একই সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ বিশ্লেষণ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আপাত ব্যঙ্গ বর্ষণ। এর অর্থ আর কিছুই নয়, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ব্যঙ্গ করতেন এ ব্যঙ্গ তাঁদেরই বিরুদ্ধে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়।

দু একটি স্থান উদ্ধৃত করি—

**পদ্য লিখিবার উদ্দেশ্য**

"১। আত্মতুষ্টি। লেখা শেষ করিতে পারিলেই আত্মতুষ্টি হয়। পদ্য শেষ করিতে পারা বড় সুখসাধ্য নহে। পদ্যের মধ্যে ছন্দঃ বলিয়া একটি পদার্থ আছে। ইহা লেখকের পরম বৈরী। ছন্দঃ শব্দের অর্থ সমাক্ষরত্ব। অর্থাৎ পূর্ব চরণে যদি চৌদ্দটি অক্ষর থাকে ত পরের চরণে গুনিয়া গুনিয়া ঠিক চৌদ্দটি অক্ষর বসাইতে হইবে। কম বেশী হইলে চলিবে না···পদ্য ব্যবসায়ী মাত্রেই জানেন অক্ষরগুলাকে লইয়া অনেক সময় বড় বিব্রত হইতে হয়, করতলগত সর্ষপতৈলের ন্যায় যতই তাহাদিগকে মুঠার মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা যায় ততই তাহারা আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়ে। পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি বাঁধনের মধ্যে আটকাইয়া রাখা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ·ইহার দৃষ্টান্ত—

"ত্যজ রণসাজ শীঘ্র, দেখাই(ও) না আর
বিভীষিকা তরুণীর হৃদয় তাপিতে।"—হেমচন্দ্র

"অনেক নামজাদা কবির পদ্যে ছন্দপতন দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইঁহারা দমিবার পাত্র নহেন। যেখানে ছন্দোরক্ষা করিতে না পারেন সেখানে মাত্রা ছন্দঃ নাম দিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টা করেন। যথা—

"জনগণপথ তব জয়রথ চক্রমুখর আজি
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।"—রবীন্দ্রনাথ

"এ স্থলে পূর্ব চরণে ১৯টি অক্ষর, আর দ্বিতীয় চরণে ১৭টি অক্ষর। কাজেই ইহা মাত্রাছন্দ। মত্তমহিষের ন্যায় দুর্নিবার এই ছন্দকে আয়ত্ত করিয়া পদ্য শেষ করিতে পারিলে আত্মতুষ্টি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?"···

অথবা—

পদ্যে দোষ—

"১। অপ্রাচীনত্ব

"তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙীন আঙিয়া?

বিহানবেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কি খেলাছলে
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।"

" 'রাঙিয়া', 'ভাঙিয়া' প্রভৃতি বানান অপ্রাচীন, সুতরাং বর্জনীয়।"

"২। ছন্দে অপ্রাচীনত্ব। যথা—

"হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
শুধু থাক
'এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

"এ আবার কিরূপ পদ্য! ইহার কোন চরণ বা আধ ইঞ্চি, কোনটি বা দেড় গজ। পর পর জোড়াতাড়া দিয়া সাজান। ইহাকে চতুষ্পদী কি ষট্পদী বলিব ঠিক করা দুঃসাধ্য। এমন পদযোজনা হেমচন্দ্রেও দেখি নাই, নবীনচন্দ্রেও দেখি নাই, ভাবতচন্দ্রেও দেখি নাই। অতএব ইহা অপাঠ্য।"

এরপর অনেকগুলি প্রসঙ্গের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উদ্ধৃতি সহযোগে মন্তব্য করা হয়েছে যে এসব কবিতা নাকিস্মুরে কাঁদুনি, বড়ই একঘেয়ে, যথা···

"ঝড়ের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের থলিঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আনরে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত আয় রে আমার কাঁচা।"

আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি
আমরা দুখের বক্রমুখের চক্র দেখি ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে
ভিন্ন করব নীলাকাশ।"

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর!
আমার দেবতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর?
কিসেরি বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম গান।
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

"নিমেষ তরে ইচ্ছা কার বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্য সম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে আম্রবনছায়ে
লুপ্ত হয়ে, লুপ্ত হয়ে, গুপ্ত গৃহবাসে।"

"ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কি কল্লোল
দে দোল দোল!
পশ্চাৎ হতে হা হা করে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি
এ যেন লক্ষ যক্ষ শিশুর অট্টরোল!
আকাশে বাতাসে পাগলে মাতালে
হট্টগোল
দে দোল দোল!"

"রবীন্দ্রনাথের এই এক-ঘেয়ে নাকি সুরে কাঁদুনি শুনিতে শুনিতে আকণ্ঠ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল।

"বিতৃষ্ণা হইবারই কথা। কারণ আর কিছুই নহে, আমরা রৌদ্ররস প্রধান জাতি। আমাদের রঙ্গমঞ্চই বল, আর সঙ্গীত সভাতেই বল, রৌদ্ররসের ছড়াছড়ি। আমরা পাঁচশত লোক একযোগে জলদমন্দ্রে গর্জন না করিলে পাঁচ মণ মোট উঠাইতে পারি না, দুই হাজার লোকের নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করিতে পারি না। যে যাহা করে করুক, আমরা করিব না।"

এর পর পদ্যের নানা গুণ ও অগুণ বোঝানো হয়েছে। যে পদ্যে কঠিন শব্দ থাকে তা অভিধান দেখলেই সরল হয়। কিন্তু আসল দুর্বোধ্যতা হচ্ছে ভাবের। এর উদাহরণে বনবিহারী বাবু নিম্নলিখিত দুর্বোধ্য কবিতাংশটি উদ্ধৃত করেছেন—

"আমি উন্মনা হে
হে সুদূর আমি উদাসী!
রৌদ্রমাখান অলস বেলায়,
তরু মর্মরে ছায়ার খেলায়
কি মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি!

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি বাজাও মোহন বাঁশরী
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাসরি।"

"লোকে স্ত্রী-পুত্রের জন্য, স্বজন বন্ধুর জন্য, বিরহিনী প্রণয়িনীর জন্য উন্মনা হয়, উদাসী হয়, এই ত এতকাল জানা ছিল। এখানে দেখিতেছি এক ব্যক্তি সুদূরের জন্য উদাসী হইয়াছেন। আমরা সুদূরে থাকিলেই উন্মনা হই, ইনি ঘরে থাকিয়া সুদূরের জন্য উন্মনা! ইঁহার মানসিক অবস্থা আমাদের বোধশক্তির অতীত। আরও, তরু মর্মরে ছায়ার খেলায় সুদূরের মূরতি কি রূপে ফুটিয়া উঠে বলা শক্ত। তারপর, সুদূর আবার বাঁশী বাজাইবে কি? সুদূর কি একটা মানুষ? ও-ছাই কিছু বুঝিলাম না।"

এর পর অশ্লীলতা প্রসঙ্গ।

"অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা হইতে পারে না। উহা সহৃদয় হৃদয়-বেদ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'চন্দ্রশেখর' অশ্লীল নহে, কিন্তু 'চোখের বালি' বা 'চরিত্রহীন' অতিশয় অশ্লীল। 'বিদ্যাসুন্দর' অশ্লীল নহে। হইলে তাহার মুদ্রণ, সংমুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণ এতদিনে বন্ধ হইয়া যাইত, এবং অভিনয়ের সাহায্যে ঘরে ঘরে তাহার রসস্বরূপের উপাসনা হইত না। কারণ আর যাহাই হউক অশ্লীলতা আমরা কিছুতেই মার্জনা করিতে পারি না। 'মহাভারত' অশ্লীল, এমন কথা কখনও শুনি নাই। বরং ইহা দেখিতে পাই যে নবেল নাটকাদির সংক্রামক বিষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিধবা ও ব্রহ্মচারীর চিত্তকে মহাভারতের শৃঙ্গার রসে জর্জরিত রাখার বিধি আছে। কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা' ভয়ানক অশ্লীল। বিশেষতঃ তাহার মধ্যে—

"—মিথ্যা সরম সঙ্কোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মত
পদতলে।"

"এই অংশ একেবারে মারাত্মক।"

এই হ'ল উক্ত রচনাটির আংশিক নমুনা। সবটা না পড়লে পুরো মজাটা উপভোগ করা যাবে না। যাই হোক, আরম্ভের দিকটা দেখানো হ'ল, কলম পাকা হ'লে তা কি ভীষণ হতে পারে—পরে দেখাচ্ছি।

বনবিহারীবাবু ছিলেন ডাক্তার। মেডিক্যাল কলেজের রেজিষ্ট্রার ছিলেন যখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তার প্রখর (যোদ্ধমূর্তি) আমি দেখেছি এবং দেখে মুগ্ধ চমৎকৃত হয়েছি। এমন প্রবল ব্যক্তিত্ব সহজে দেখা যায় না। এঁর মতো সর্ববিষয়ে প্রায় সমবিদ্বানও দুর্লভ।

যে ব্যঙ্গ রচনাগুলো উদ্ধৃত করেছি, এর সঙ্গে তাঁর আঁকা ব্যঙ্গ চিত্রগুলো দিতে পারলে প্রাথমিক পরিচয় অনেকটা পূর্ণাঙ্গ হত। কারণ তাঁর ব্যঙ্গচিত্রগুলিও তাঁর ভাষার মতোই জোরালো এবং ধারালো। তিনি এ সময়ে ছিলেন প্রাণধর্মে উচ্ছল। নিজের বৈষয়িক সুবিধা বা খাতির পাবার জন্য তাঁর মনে কোনো রকম দুর্বলতা ছিল না। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি সন্ন্যাসী। মেকি তাঁর মধ্যে কিছু ছিল না, মেকি তিনি সহ্য করতে পারতেন না—এই মূর্তিই আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি এই সময়। দুর্লভ পুরুষোচিত সৌন্দর্য ছিল তাঁর চেহারায় বাক্যে ব্যবহারে। যদিও ব্যঙ্গপ্রেরিত হলে তখন কাউকে খাতির করতেন না এবং প্রয়োজনাতিরিক্তি নিষ্ঠুর হয়ে পড়তেন। সে সব কথা স্মৃতিচিত্রণে আমি লিখেছি। বেপরোয়ার দলটি জুটেছিল ভাল, যদিও বিজয়চন্দ্র মজুমদার এঁদের সঙ্গে ভাবগত মিলের একটা সাধারণ সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র বনবিহারীবাবুই ছিলেন ষোল আনা বেপরোয়া। [ ক্রমশঃ।

## মেয়ে বড় হলে

মেয়ে বড় হলে মায়েদের মনে আনন্দ ও শঙ্কা দুইই স্বাভাবিক ভাবে জেগে ওঠে চিরকালই, তবে আজকের মায়ের ভাগ্যে শঙ্কার ভাবটাই প্রবলতর, কারণ, প্রথমতঃ আগের দিনের মত মেয়ে বড় হতে না হতে বিয়ে দিয়ে দেওয়াটা নানা কারণেই আজকের যুগে সম্ভব হচ্ছে না এবং প্রধানতঃ সামাজিক কাঠামোটার আমূল পরিবর্ত্তনের ফলেই বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েদের ঘরের কোণে নিজেদের সতর্ক জাগ্রত দৃষ্টির তলায় সর্ব্বদা রেখে দেওয়াটাও সম্ভবপর হচ্ছে না। মেয়ে বড় হলেই তাই প্রত্যেক মায়ের প্রধান চিন্তা কি করে তাকে মন্দ লোকের সংস্পর্শ থেকে বাঁচানো যায়। শিশুকে বিপদ আপদ থেকে বাঁচাবার জন্ম যে ভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়, ঘরে ঘরে বয়স্কা তরুণীদের মা'রাও প্রায় সেই ভাবেই তাদের সতর্ক করে দেন নানাবিধ উপদেশ বাণীর সাহায্যে। যার মূল উদ্দেশ্য পুরুষ জাতির অপকারিতা সম্বন্ধে তাদের অবহিত করে তোলা। এই সব উপদেশাদির সারাংশ হল এই যে পুরুষ জাতিকে কোন সময়ই বিশ্বাস করা চলে না, অতএব তাদের কাছ থেকে সহস্র না হোক শত হস্ত দূরে থাকাটাই বুদ্ধির পরিচায়ক। তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে অভিভাবিকারা যা উপলব্ধি করেছেন তা যে একেবারে মিথ্যা তা নয় বটে, কিন্তু তাতেও এই সমস্যার সম্যক সমাধান সম্ভব নয়। তরুণীর ভাবপ্রবণ নবজাগ্রত মনে এ ধরণের উপদেশ স্বতঃই নানা আলোড়নের সৃষ্টি করে যার ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, উজ্জ্বল আশাবাদের বদলে ঘোর নৈরাশ্যবাদে ছেয়ে যেতে পারে তার সমস্ত হৃদয় যার পরিণতি কখনও কল্যাণপ্রদ নয়। এ যেন ফুলকে দল মেলবার স্বাভাবিক অবকাশটুকু না দিয়েই তাকে ঝরিয়ে দেওয়া। তা ছাড়া এক্ষেত্রে উপকারিতাই বা কতটুকু? মেয়েরা না হয় শিখলো সংসারে ভালর চেয়ে মন্দ লোকের সংখ্যাই বেশী, কিন্তু সেই মন্দকে ভালর ভেতর থেকে চিনবে কি করে তারা? মানুষের আসল চেহারাটা চিনতে পারা কি এতই সহজ? অতএব এ সমস্যার সমাধান কল্পে মেয়েদের শুধু সাবধান হলেই চলবে না হতে হবে কৌশলী, হতে হবে শক্তিমতী। নিরালা জায়গায় কার্য্যোপলক্ষে যেতে হলে সঙ্গে আত্মরক্ষা মূলক কোন অস্ত্র নেওয়াই বিধেয়। অভাবিত ভাবে আক্রান্তা হলে লজ্জার মোহ ত্যাগ করে চিৎকার করে লোক ডাকা উচিত, কারণ সব রকম দুর্ব্বৃত্তেরই লোকভীতিটা সাধারণতঃ প্রবল। হুইসিল জাতীয় কোন বাঁশী সঙ্গে রাখলে ছুটে পালাবার সময়েও তার দ্বারা পাঁচ জনকে জড় করা যায়। মোট কথা এই ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে সক্ষম হলে বয়ঃপ্রাপ্তা তরুণীদের বিপদ আপদে পড়ার সম্ভাবনা যে অনেকটাই কম থাকে এ কথা অনস্বীকার্য্য, কাজেই প্রতিটি মায়েরই উচিৎ মেয়েকে জীবনের এই অরুচিকর অথচ কঠিন সত্য সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কি করে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা করতে হয় সে সম্বন্ধে অবহিত করে তোলা। বুদ্ধি ও নিষ্ঠা থাকলে বিপরীত পারিপার্শ্বিকতাকে জয় করে চলা কোন মেয়ের পক্ষেই দুঃসাধ্য নয়।
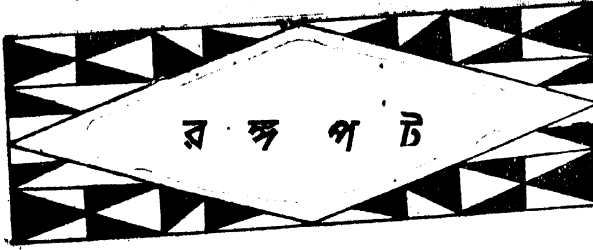
# ছায়াছবির উপসর্গ

শ্রীতারক ঘোষ

ভদ্রলোক বললেন আরে মশাই যতই বলুন যুদ্ধের পর অনেক কিছু হলোও যেমন, গেলও তেমন, এই শুনুন না সারা বাংলা দেশ ত গেলই, সঙ্গে সঙ্গে ছবির বাজারও খতম : আমি বললাম কেন ? বললেন কেন নয়, তাই বলুন কারণ অর্দ্ধেকের বেশী টাকা ত সেখান থেকেই উঠত মশাই। সে-ত গেলই, তারপর ঐ যে আপনাদের যুদ্ধোত্তর ভাষা *Black-out, Black Market, Black* **Money** এগুলো চালু হবে পড়লো সর্ব্বত্র, সব দিকই অন্ধকার, জানি না মহাভারতের যুদ্ধও ত হয়ে ছিলো, বলি এ রকম Black-এর আমদানি হয়েছিলো বলে ত' মনে হয় না।

হাসি পেল, ভাবলাম চায়ের টেবিলে বসে সময় কাটানর মস্ত খোরাক নয় ; উঠে পড়লাম, কিন্তু মনে ঐ একটা কথা তোলপাড় করতে লাগল—Black market-এর Black-money যখন উপসর্গ হয়ে ঘাড়ে চেপে বসে, তখন ঘাড় থেকে নামাবার চেষ্টা কিম্বা আরো কিছু অন্ধকারে সঞ্চয় করবার পাগলামিতে নেমে পড়ে ছবি করতে।

এত সহজে লাখ টাকায় চার লাখ কেউই দিতে পারে না ? বিড়ি-পাতার ব্যাপারী নেমে পড়লো ঠিক হোল director, নাটক কেনা হোল, নায়ক-নায়িকা সমেত মহরত হোল, হৈ-হৈ ব্যাপার Producer স্বপ্ন দেখছে, কত ফুল কতরং তারই মাঝে তিনি বসে আছেন !

আপনারা হয়ত বলবেন বাজে কথা কিন্তু আমি জানি এমন হয় হচ্ছে, প্রতিদিন, চোখ তুলে দেখলেই দেখতে পাবেন।

Producer নতুন, টাকা আছে নেমে পড়েছেন, নির্ব্বাচিত নায়ক নিজে তাকে নিয়ে নায়িকা ঠিক করেছেন, অন্য artist ঠিক করে contract করিয়েছেন ; গল্প গোড়া থেকে ঠিকই আছে, সুন্দর plot সাধারণের ভালই লাগবে। সব ঠিক, Director এলেন, Distributor পর্য্যন্ত মোটামুটি ঠিক, যদিও লেখাপড়া হয়নি তবে গল্প পড়ে ভালই লেগেছে—কিছুটা এগিয়ে এলে তাঁরা হাত দেবেন। Floor ঠিক, দিন সময়মত কাজ সুরু হবে। হঠাৎ নায়ক জানতে পারলো ; বইয়ের নায়ক নাকি change হয়েছে অথচ তাঁর সঙ্গে contract, নায়ক তিনি। নায়িকাও জানতে পারলেন বললেন, নায়ক যদি change করা হয় আমি কাজ করবো না, কারণ তার কথামত আপনাদের টাকায় রাজী হয়েছি সুতরাং—আপনাদের advance নিয়ে যান ফিরিয়ে, ঐ সঙ্গে আমার contract-টা ফেরত দিন দয়া করে।

হলোও তাই, নায়িকা রেহাই পেলেন, নায়ক কিন্তু তাদের রেহাই দিলেন না, কাজ অন্য দিকের কিছু-কিছু এগিয়েছে, প্রায় ১৫০০০৲ টাকার মত ব্যয় হয়েছে Producer-এর অথচ যাদের কথায় নায়ক পাল্টান হয়েছে তাঁরা মজা দেখছেন দূর থেকে। নব-নির্ব্বাচিত নায়কও সেটে কাজ করতে পারছেন না। সব মিলিয়ে খিচুড়ী হয়ে গেল।

এই হচ্ছে বর্ত্তমান ছায়াছবির একটি কালো ছায়া, যার কবলে বহু producerই পড়ছেন এবং হতাশ হয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। এর জন্য দায়ী কে ? দায়ী হঠাৎ তাঁরাও ধনী হবার মোহে যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন, গুটিকতক অসৎ লোকের পাল্লায় তাঁরাই Experiment-এর মোহ ধরিয়ে দেন।

বাংলা ছবির মান যেমন উন্নত হচ্ছে একদিক থেকে ! কিন্তু Experiment করতে করতে সঙ্কোচনও হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য খুব ভাল নাটক বাজে ভাবে produce করার জন্য লজ্জা পাচ্ছি কারণ

আর, ডি, বনসাল প্রযোজিত নির্মীয়মাণ "সাত পাকে বাঁধা"র নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী সুচিত্রা সেন

সেগুলি বাজে হাতে আসার কারণ; অন্যদিকে মসলাদার রঙিন ঠোঙায় খারাপ বাজে নাটকও পরিবেশিত হচ্ছে, Commercial Success বললেও ভুল হবে না। এই যে দু'টি দিক, এর মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সুচিন্তিত ভাবে পরিবেশন করাই মুন্সিয়ানা অবশ্য আদর্শ একেবারে ভুলে গেলে অপরাধ নিশ্চয়ই হবে।

সহজ নাটক সহজ ভাবে তোলার দিকে যেমন কোন ঝুঁকি নেই তেমন সাধারণ মন পাওয়াও বোধ হয় সহজ হয়। তবু বিপদ এড়িয়ে যাওয়া শক্ত, কারণ সেখানে Box নামক বস্তুটিকে বাদ দিয়ে Director চিন্তা করলে ছবিই হয়ত হবে না তাই তৈরী গল্প তাঁর কাছে নিয়ে যেতে তিনি নিজের দিকে সব চাইতে বেশী করে ভাবতে গিয়ে plot হয়ত চলে গেল অন্য দিকে, মূল নাট্যকার চেয়ে রইলেন অবাক হয়ে। এ-ছাড়া আরও অনেক আবদার কাটিয়ে একখানি ছবি টেনে তুলতে হয়। তারপর ছবি এল বাজারে, হয়ত পয়সা পেল, নয় এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ।

সেদিক থেকে Experiment-এর ব্যাপার বিশেষ ভাবে দু'একজন পরিচালকের মধ্যেই থাকা উচিৎ। অর্থাৎ overseas right আছে যাঁদের, তাঁদের কথাই প্রধানত বলছি, কারণ একাধিক বার তা আমরা দেখেছি, পরীক্ষামূলক ভাবে আরম্ভ করে কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ করেছেন। —কোন দিক থেকেই অর্থাৎ ঘটনামূলক অথবা আদর্শমূলক কিম্বা মনস্তত্ত্বমূলক যাই বলুন না কেন। পথের-পাঁচালী, অপুর সংসার, দেবী এদের কাউকেই এত সহজে ভুলব না নিশ্চয়ই। তেমনই অন্য দিকে ক্ষুধিত পাষাণ আমাদের মনে চিরদিনের মত দাগ কেটে বসে গেছে। সেদিক থেকে অহঙ্কার তো করবোই, নূতনদের জয় সেখানে কম নয়। Experiment সার্থক হয়েছে। কেন? এ-কথায় একটিমাত্র জবাব নিষ্ঠা সমষ্টিগত ভাবে সেখানে কাজ করেছে।

নিষ্ঠা, সাধনা ঐকান্তিকতা শিল্পীর দিক থেকে যেমন প্রয়োজন, তেমন কোন দিক থেকে ফাঁক থাকলে কীট সেখানে প্রবেশ করতে দেরী হয় না।

এই চিন্তাধারাকে আন্দোলনমুখী করে তুলতে হবে; আমরা যাঁরা শিল্পী, তাঁরা জীবন দিয়ে জীবন-সংগ্রামে নেমেছে, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বে, ভবিষ্যৎকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে, জাতিকে তুলে ধরতে, রাষ্ট্রকে জগৎ-সভায় সম্মানিত করতে আমাদের বিরাট কর্তব্য আছে।

এগিয়ে চলতে বাধা ত' আছেই
জয় করতে তাই আনন্দ পাই।

## অভিসারিকা

আপন মনের অজান্তেই জীবনে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে যায়—যা খুব অল্প সময়কে কেন্দ্র করে ঘটলেও জীবনের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে অমরতা পায়। কারণ, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি জীবনের সামগ্রিক রূপ বদলে দেয় জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়, স্রোত অন্য দিকে নিয়ে যায়, সর্বোপরি এক অভিনব জীবনবোধ আনে। "অভিসারিকা" ছবিটির মধ্যে দিয়ে পূর্বোক্ত উক্তিগুলির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটি গড়ে উঠেছে।

নায়ক শ্রেফ বন্ধুর সঙ্গে বাজী ধরেই অনিমন্ত্রিত হয়েও এক ধনী গৃহে অভ্যাগত সেজে ঢুকে পড়েছিল, ধরা সে পড়ে গিয়েও চরম

লাঞ্ছনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেল বাড়ীর আলো নিভে যাওয়ায়। এই বিবাহ নায়িকার অনিচ্ছায় হতে চলেছিল। কথা ছিল তার প্রেমাস্পদ প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিবাহসন্ধ্যায় নায়িকাকে নিয়ে গিয়ে তারা মিলিত হবে। এদিকে লাঞ্ছনার ভয়ে ভীত আত্মগোপনকারী নায়ককেই সে ভেবে নিলে তার প্রেমাস্পদ প্রেরিত প্রতিনিধি বলেই। তারপর সেই হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় নায়কের সঙ্গেই সে করলে গৃহত্যাগ। তারপর নানা কৌতূহলোদ্দীপক, বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে কাহিনীর মধুময় পরিসমাপ্তি।

ছবিটিকে সর্বতোভাবে উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক করে তুলেছেন পরিচালক। নানা রসের তিনি সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ছবিটির সকল দিক অতি নিখুঁত পরিচর্যার স্বাক্ষর বহন করছে। ছবিটিকে বহুবিধ ঘটনার মধ্যেও পরিচ্ছন্ন ভাবে উপস্থাপন করার সাধুবাদ পরিচালকের অবশ্যই প্রাপ্য। সারা ছবিতে তিনি যে বিশেষ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় এবং উল্লেখযোগ্য। এই সংযমবোধই ছবিটিকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলেছে।

সঙ্গীত পরিচালনা ও চিত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায় ও দীনেন গুপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নায়িকার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী সুঅভিনয় করেছেন। নায়কের চরিত্রটির রূপ দিয়েছেন নির্মলকুমার। পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, হরিমোহন বসু, ডি জি, প্রীতি মজুমদার, মণি শ্রীমানি, ভারতী দেবী, তপতী ঘোষ, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ আপন আপন চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণ করেছেন। "অভিসারিকা" পরিচালক কমল মজুমদারকে দর্শক-সমাজের বিপুল প্রশংসা ও সাধুবাদে—বিভূষিত করবে।

তারু মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত পরিচালিত "সৎভাই" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় বোম্বাইয়ের শিল্পী নাসিম বানু

## শেষচিহ্ন

অভিনয়নৈপুণ্য যে ছবির এক বিরাট সম্পদ সে বিষয়ে যেমনই কোন সংশয় নেই তেমনই সেই দিকটিই ছবির একমাত্র অঙ্গ নয় এ বিষয়েও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সমালোচনধর্ম যে কোন জিনিষকে সকল দিক থেকে বিচার করে তার প্রতি সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে ( অবশ্য একটিমাত্র গুণ থাকলেও সেটি প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হবার নয় )।

যুগ ও কাল যথানিয়মে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর রঙ বদলাচ্ছে তার অগ্রগমনের প্রতিটি চক্রাবর্তন পরিবর্তনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, মানুষের ভাবধারাও ভিন্ন রূপ নিচ্ছে, বিশ বছর আগে মানুষ যাতে তৃপ্তি পেত সেই উপকরণ দিয়ে আজকের মানুষকে তৃপ্তি দেওয়া যায় না, সুতরাং এই কথাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কোন প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করলে ব্যর্থতা বরণ করতে হয় না।

"শেষচিহ্ন" ছবিটিকে কেন্দ্র করেই এই কথাগুলির অবতারণা। একটি দুর্বল ও অসার গল্প এই ছবির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। সেই গতানুগতিকতার ধারা থেকে বাঙলা ছবি কি মুক্তি পাবে না? আজকের দিনে পরিচালকের মস্তিষ্কে এই অসার কাহিনীগুলির চিত্রায়ণ কল্পনা আসে কি করে ভেবে পাই না। গল্প আড়ম্বরহীন হোক ক্ষতি নেই কিন্তু যেন বলিষ্ঠ হয়। নারীকে বহুমূল্য অলঙ্কার পরলেই যে তার সৌন্দর্য বিকশিত হয়, তা নয়। নিরাভরণ অবস্থায় তার সৌন্দর্য যে আরও প্রস্ফুটিত হয় আরও স্নিগ্ধ হয়, আরও উজ্জ্বল হয়, এ কথা তো ধ্রুব সত্য। তাই গল্প মাত্রেই যে জাঁকজমকপূর্ণ কিছু হবে তা আমরা বলি না। কিন্তু তার বলিষ্ঠতা, তার স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য না পেলেই অভিযোগ উঠবে।

ছবির পরিচালক বিভূতি চক্রবর্তীর এটি প্রথম ছবি বলে কোন কোন সমালোচক ভুল করেছেন, এটি তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি নয়, পূর্বেও তিনি পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন। বিভূতি চক্রবর্তী খ্যাতনামা আলোকচিত্রী। এই ছবিটি তাঁর শেষোক্ত গুণটির স্বাক্ষর পুরোপুরি বহন করছে। আলোকচিত্রের কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর। সেদিক দিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদভাজন।

পুর্বানুবৃত্তি করে বলছি। এই ছবির অভিনয়ের দিক অত্যন্ত জোরালো। অভিনয় দক্ষতা এই ব্যর্থ ছবিটির মধ্যে একমাত্র স্বীকার্য। শিল্পীদের প্রাণঢালা অভিনয় বিশেষ ভাবে উপভোগ্য। রূপায়ণে আছেন কমল মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, স্বর্গত তুলসী চক্রবর্তী, সন্ধ্যা রায়, লিলি চক্রবর্তী ও রেণুকা রায় প্রভৃতি।

# চলচ্চিত্র সম্পর্কে সুলতা চৌধুরী

দুঃখের ঝঞ্ঝা তীব্রবেগে যার জীবন-যৌবনে এসে আঘাত করেছে, বিষাদের ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে যার ভ্রমর কালো দুই চোখ, ফুলে ফুলে ভরা বেণীর বাঁধন গেছে খুলে, তবুও তা উপেক্ষা করে সত্যের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করে আপন লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে যে মেয়েটি আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, আজ সেই মেয়েটিই

সুলতা চৌধুরী

হচ্ছে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সার্থক নায়িকা। নাম—সুলতা চৌধুরী। কি দেহের গঠনে, কি অঙ্গের সুষমায় সব দিক থেকেই সার্থক, সুন্দর। 'হিরোইন' করার আগে বিশিষ্ট পরিচালকদের যে কয়টি নাম এক ঝলকে মনে পড়ে, শ্রীমতী চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতমা।

প্রখ্যাত বিদেশী নাট্য-সমালোচক CORCE বলে গেছেন, 'Art is intuition.' সুলতার ক্ষেত্রে এ কথা সর্বতোভাবে সত্য। তাই মাত্র দুটি চিত্র 'শেষ পর্যন্ত' ও 'দুই ভাই'য়ে প্রথমেই নায়িকা হবার সুযোগ পেলেন এবং আশাতিরিক্তভাবে সফলও হলেন। তাই তাঁর কাছে একদিন গেলাম চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে।

আমার প্রথম প্রশ্ন, লক্ষ্য করে থাকবেন বোধ হয়, কোন একটি নামকরা ষ্টুডিও আজ কয়েক মাস যাবৎ অচল অবস্থায় রয়েছে, যার ফলে তার সকল কর্মীর জীবনে এসেছে বেকারত্ব। কিন্তু এতে কি চলচ্চিত্র জগতের অথবা আপনাদের কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না? যদি হয়ে থাকে তবে তার জন্যে আপনারা কি করেছেন?

দেখুন, শ্রীমতী চৌধুরী বললেন, আমরা নতুন এ লাইনে এসেছি, আর একার দ্বারা কোন কিছু তো সম্ভব নয়, যদি সকলেই এদিকের প্রতি মনঃসংযোগ না করেন। তবে এইসব কর্মীদের প্রতি আমার সহানুভূতি সব সময়ই আছে এবং নিজের দ্বারা যেটুকু করা সম্ভব তা আমি করে থাকি।

অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্প যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে থাকে কয়েকজন মালিক সম্প্রদায়ের কারচুপিতে, তখন কি করবেন?

—যে কটা পয়সা জমাতে পেরেছি বসে বসে তারই সদ্ব্যবহার করব। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পেলাম। পরে বললেন, এইসব ভেবেই প্রাইভেটে পড়াশুনা করছি।

আপনি কি আপনার নিজের অভিনীত কোন বই দেখেন? দেখে থাকলে আপনার মনের উপর তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি?

অসম্ভব রকম দেখি—বললেন সুলতা। একবার নয়, আমার প্রথম বই 'শেষ পর্যন্ত' আমি দেখেছি আট বার থেকে দশ বার এবং বেশীর ভাগ সময়েই দেখেছি দর্শকদের সঙ্গে। এক রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে আমার সমস্ত দেহ মন তখন ভরে থাকে। তবে হ্যাঁ, সুধীরদার অত ধমকানি খেয়েও যে দু'একটা ভুল কিছুতেই সংশোধন করতে পারিনি সে ভুলটা ছবি দেখার সময় ভীষণভাবে চোখে পড়েছে এবং আমার পরের বইয়ে আমি তা সংশোধন করেছি।

ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আপনার সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্তন এসেছে কি?

পরিবর্তন যা আসবার তা ছবিতে আত্মপ্রকাশের আগেই এসেছে।

'কি রকম!' বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি।

উত্তরে শ্রীমতী চৌধুরী যা বললেন, তা আপনাদের আমি জানাচ্ছি একটু পরেই।

চলচ্চিত্র ছাড়া মঞ্চে কি আপনি কখনও অভিনয় করেছেন?

তা হয়তো করি নি, তবে লিটল থিয়েটার গ্রুপের হয়ে ওথেলো, ছায়ানট, অঙ্গার মিনার্ভায় প্রদর্শন করেছি বহুবার। আর চলচ্চিত্রে আমার প্রথম অবতরণই তো নৃত্যের জন্যই। পরিচালক হীরেন বসু আমার নৃত্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর 'নারদের সংসার' চিত্রে একটি রোল দেন। তবেই তো আজ আপনারা আসছেন। বলে হেসে উঠলেন সুলতা।

অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে আড়ালে আবডালে কয়েকটা কথা শোনা যায়।

···কি রকম? আমার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন শ্রীমতী চৌধুরী।

তাঁরা নাকি বড় unsocial হয়ে থাকেন অর্থাৎ সাধারণ

বিশ্বজিত—ছায়াছবির বাইরে

মানুষের সঙ্গে তাঁরা কোন রকম যোগাযোগ না কি রাখেন না।
absolutely wrong বললেন স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী এই নায়িকা সুলতা চৌধুরী। Man is a social creature কথাটা যদি সত্য হয় তা হলে আমরা সেই societyর বাইরে এ কি করে হয়। আমরা inhumanও নই আর superman-ও কিছু নই। আর পাঁচজনে যেমন পাঁচটা কাজ করে জীবিকা অর্জন করে থাকে, অভিনয় করাটাও আমাদের সেই প্রকার।

এইবার আমি সুলতা দেবীর ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলব। আচ্ছা, প্রথমেই আমি যদি বলি, সুলতা চৌধুরী এখনও Miss তা হলে অনেকেই হয়তো আমার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দেবেন। ঠিক কথা, কিন্তু আমি ঐ যুক্তি-তর্কের ভিতরে না গিয়ে মানব অন্তরে সুপ্ত যে নিভৃত কোণটি দিনে দিনে প্রকৃতির দেওয়া জলে ও হাওয়ায় পল্লবিত হয়ে ওঠে, অপরূপ সুষমায় সারা অঙ্গ ভরিয়ে দিয়ে যে একদিন উন্মুখ হয়ে ওঠে আর একটি মন পাবার প্রত্যাশায়, সে কখনও কামবিদ্ধ লম্পটের প্রসারিত দুই হস্তের মধ্যে ধরা দেয় না। সুলতার জীবনে তাই-ই ঘটেছিল। যদিও তার গোলাপ পাপড়ির মত দুই ওষ্ঠাধরে ধ্বনিত হয়েছিল "যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।" যদিও সুবাসিত চন্দনের ফোঁটায় তাঁর দুই কপোল আঁকা হয়ে গিয়েছিল, তবুও যে ফুলশয্যাকে কেন্দ্র করে লেখক তাঁর লেখনী ধারণ করেছেন, কবি রচনা করেছেন তাঁর কাব্য, সে ফুলশয্যা তাঁর জীবনে আসেনি। সেই চরম মুহূর্তের আগেই কে যেন তার কানে কানে এসে বলে গেল, "তুমি যার সঙ্গে আজ মধু যামিনী যাপন করতে চলেছ, তার আর একটি স্ত্রী আছে, তার চারিটি পুত্র সন্তান আছে। এই তার সন্তান।" আর কথাটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি চলে গেলেন। মাথায় যেন বজ্রাঘাত ভেঙ্গে পড়ল সুলতার। সমস্ত বিষয়টা তাঁর চোখের সামনে যেন অন্ধকারে ঢেকে গেল। তিনি সুযোগ খুঁজতে লাগলেন সেই জঘন্য জায়গা থেকে কি করে পালিয়ে যাওয়া যায়। সুযোগও এসে গেল। তিনি ঘর ছেড়ে নেমে পড়লেন পথে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়ীটায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। চারিদিকে লোক পাঠান হল কিন্তু সুলতার খোঁজ পাওয়া গেল না। ফুলশয্যার রাত্রি অন্ধকারের গহ্বরে ঢাকা পড়ে রইল। সুলতা দেবী তখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের তলায় পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছেন। এবার আপনারা বিচার করুন। কিন্তু যাঁর সম্বন্ধে আমি এত কথা লিখলাম তিনি কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নির্বিকার। সুলতা দেবীর বয়স এখন বাইশ। তাঁর দেহে আছে এখন সতেজ যৌবন, চোখে মুখে আছে মনোমুগ্ধকর হাসি আর মনে আছে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার দৃঢ় সঙ্কল্প। কামনা করি তাঁর সঙ্কল্প সফল হোক।

—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

# সংবাদ-বিচিত্রা

বাঙলার গৌরব বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর সসম্প্রদায়ে সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে বোম্বাই থেকে যাত্রা করেছেন। উদয়শঙ্করের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী এবং তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যতমা উজ্জ্বল রত্ন শ্রীমতী অমলাশঙ্কর এবং বিশিষ্ট মার্গ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী লক্ষ্মীশঙ্করও যাত্রা করেছেন। তাঁর আট সপ্তাহব্যাপী সফরে এই ভুবনবিখ্যাত শিল্পী যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার প্রধান স্থান সমূহে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে "নিশীথে"র নায়িকার রূপসজ্জায় নন্দিতা বসু

ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করবেন। এবারে তাঁর য়্যামেরিকা সফরে তাঁর সম্প্রদায়ের-সদস্য সংখ্যা ছাব্বিশ, তাঁর বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাইতে কিন্নর সঙ্গীতগোষ্ঠী এবং ভারত সঙ্গীত সভার উদ্যোগে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সাড়ম্বরে। উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র যে, উদয়শঙ্করের সুযোগ্যতম অনুজ দিকপাল শিল্পী রবিশঙ্কর "কিন্নর"এর প্রতিষ্ঠাতা।

স্বাধীনতাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক প্রবর্তিত গুণী সম্বর্ধনা-সপ্তাহে এ বছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যশস্বী যে সাতজন গুণীকে প্রদেশ কংগ্রেস সম্বর্ধনা দিলেন বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল তাঁদের অন্যতম। গুণী সম্বর্ধনা সপ্তাহের উপসংহার দিবসে পার্কসার্কাস প্যাণ্ডেলে তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীবিকাশ রায়। সভায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ভাষণ দান করেন।

নিউইয়র্কের ইউনাইটেড প্রোডাকসান্স এবং বোম্বাইয়ের হানার ফিল্মসের যুগ্ম পরিকল্পনায় একটি ভারত-মার্কিণ যৌথ চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রচেষ্টাটিকে কার্যকরী করার চেষ্টায় ইউনাইটেড প্রোডাকসান্সের সহকারী সভানেত্রী কুমারী তাও প্রোচোন এবং হানার ফিল্মসের মিঃ সি, টি, বাপাতিস্তা মিলিত হস্তক্ষেপ করেছেন। ছবিটি উভয় ভাষাতেই (অর্থাৎ ইংরাজী ও হিন্দী) গৃহীত হবে এবং আগামী নভেম্বরের শেষ ভাগে এর কাজ শুরু করার সম্ভাবনা বিদ্যমান। "টু ওয়ার্ল্ডস, টু লাভস" শীর্ষক এই আলোচ্য ছবিটির চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে ভারতেই হবে বলে স্থির হয়েছে। ছবিটিতে একজন প্রখ্যাত মার্কিণ অভিনেতা আত্মপ্রকাশ করবেন এবং অন্যান্য ভূমিকাগুলির রূপ দেবেন ভারতীয় শিল্পীরাই। ভারতের পেশাদারী শিল্পীদেরই নির্বাচন করা হবে। তবে সুবিখ্যাত কোন শিল্পীকে অভিনয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে না।

টেমস নদীর দক্ষিণ তীরে ২,৩০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে বৃটেনের যে জাতীয় নাট্যশালাটি নির্মিত হবে, তার পরিচালক পদে নিযুক্ত হয়েছেন পৃথিবীখ্যাত অভিনেতা প্রযোজক পরিচালক ছাপ্পান্ন বছর বয়স্ক স্যার লরেন্স অলিভার। স্যার লরেন্স চিচেষ্টার্স ফেষ্টিভ্যাল থিয়েটারের পরিচালকের আসন অলঙ্কৃত করে আছেন। ১১৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই আসনে সমাসীন থাকবেন বলে শোনা যাচ্ছে, ততদিনে পরিকল্পিত জাতীয় নাট্যশালার নির্মাণ কার্য শেষ হবে বলে আশা করা যায়। চিত্র ও মঞ্চ উভয় জগতেই স্যার লরেন্সের অবদান অবিস্মরণীয় এবং তাঁর প্রতিভা আজ জগৎ বিস্তৃত। বৃটেনের জাতীয় রঙ্গালয়ে তাঁর মত প্রতিভাধরের পরিচালকপদে নিয়োগ সংবাদ নাট্যরসিক সমাজকে যথেষ্ট আনন্দ দেবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

দক্ষিণ স্পেনে "দ্য ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার" নামে যে ছবিখানি গড়ে উঠছে সংবাদ পাওয়া গেল, তাতে সম্রাট ওরেলিয়াসের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন বিদগ্ধ অভিনেতা স্যার অ্যালেক গিনেস।

মেরিলিন মোনরোর আকস্মিক এবং অকাল মৃত্যু রসিক সমাজকে

সন্ধ্যা রায়—ছায়াছবির বাইরে

যে কি পরিমাণ স্তম্ভিত ও শোকবিহ্বল করে তুলেছে তা সকলেরই সুবিদিত। তাঁর অনবদ্য অভিনয় প্রতিভা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। দর্শক হৃদয়ে যে বিরাট আসন তাঁর অধিকারগত, মৃত্যু কখনই তাঁকে সে আসন থেকে চ্যুত করতে পারবে না। এই আশ্চর্য শিল্পীর করুণ জীবনের একটা দিক ছিল যতখানি আলোকোজ্জ্বল আর একটা দিক ছিল ততখানি ঘনান্ধকার। এবং এই অন্ধকার এত প্রকট যে জগদ্ব্যাপী জনপ্রিয়তা ও আকাশচুম্বী খ্যাতি কোনটাই তাকে দূর করতে সক্ষম হয়নি। তাঁর হাসি কান্নার সমন্বয়ে রূপায়িত জীবনকাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ প্রচেষ্টা চলছে বলে শোনা যাচ্ছে কিন্তু চিত্রটি নামভূমিকায় অভিনয় করবে কে? তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেছে যে তিনি রেখে গেছেন এক শ' আটাত্তোর হাজার পাউণ্ড (প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা)। এই বিরাট অঙ্কের টাকার ভবিষ্যতও তিনিই নির্দিষ্ট করে গেছেন। তাঁর মানসিক রোগগ্রস্তা জননীর জন্য তিনি পাঁচ লাখ টাকার একটি ট্রাষ্ট করে দিয়ে গেছেন। সেই হতভাগিনী তাঁর কন্যার সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গও জানেন না যে, "মেরিলিন মোনরো" নামটি সারা জগতকে তোলপাড় করেছে। গর্ভধারিণী হয়েও সে নামটি তাঁর কানে কোনদিনই যায়নি। মেরিলিনের রেখে যাওয়া অর্থ সম্পদের অর্ধাংশের অধীশ্বর হলেন তাঁর অভিনয় গুরু লি ষ্ট্রাসবার্গ, তা ছাড়াও মেরিলিনের বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি অলঙ্কারাদি এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদিরও অধিকারী এখন তিনিই। মনস্তত্ত্বমূলক গবেষণার উন্নতিকল্পে মেরিলিনের রেখে যাওয়া এক বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয়িত হবে। আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যেও অনেকেই মেরিলিনের টাকার অংশবিশেষের উত্তরাধিকারী হয়েছেন।

ইংল্যাণ্ডের একটি প্রাচীনতম রঙ্গালয় আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। এক্সেটারের থিয়েটার রয়্যাল ক্রমশই যে ভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তার ফলে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করছেন না। তাই রঙ্গালয়টির দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে অল্পকালের মধ্যেই, এ সিদ্ধান্ত নাট্যজগতের পক্ষে এক নিদারুণ বেদনাদায়ক সংবাদ এ বলাই বাহুল্য মাত্র। ইংল্যাণ্ডের নাট্যানুশীলনে এর অবদানও কম নয়। বহু যুগান্তকারী নাটক এখানেই অভিনীত হয়েছে, বহু দিকপাল অভিনেতা এখানেই পাদপ্রদীপের সামনে প্রথম দাঁড়ান, বহু দক্ষ নাট্যকারের প্রতিভার বিকাশ এখান থেকেই। এ সব আজ ইতিহাসের মধ্যেই শুধু বেঁচে রইল।

হলিউডের কৌতুকাভিনেতা জ্যাক লেম্মান (৩৭) গত ১৭ই আগষ্ট প্যারিসে য়্যামেরিকার টেলিভিসানশিল্পী ফেলিসিয়া ফারের (৩০) সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বলে জানা গেল। এ বিবাহ উভয়েরই দ্বিতীয় বিবাহ।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

কথাশিল্পী সমরেশ বসুর "দুই নারী" কাহিনীটি চলচ্চিত্রের রূপ নিচ্ছে জীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কালী সরকার, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কাজল গুপ্ত, গীতা দে প্রভৃতি। বিখ্যাত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় সুরকার। * * * শৈলেশ দে রচিত কাহিনী অবলম্বনে "দুই বাড়ীর" চিত্ররূপ গড়ে উঠছে। পরিচালনা করছেন অসীম পাল। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মণ, গীতা দে, রেণুকা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুরযোজনা করছেন কালীপদ সেন। * * * পরলোকগত সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়ের কাহিনী অবলম্বনে নবাগত পরিচালক

নির্মীয়মান ছায়াছবি "কাঁচাপাকা"র মহরতানুষ্ঠানে মলয়া সরকার, তপতী ঘোষ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।

ঊষা কলে আরামে
সেলাই করুন
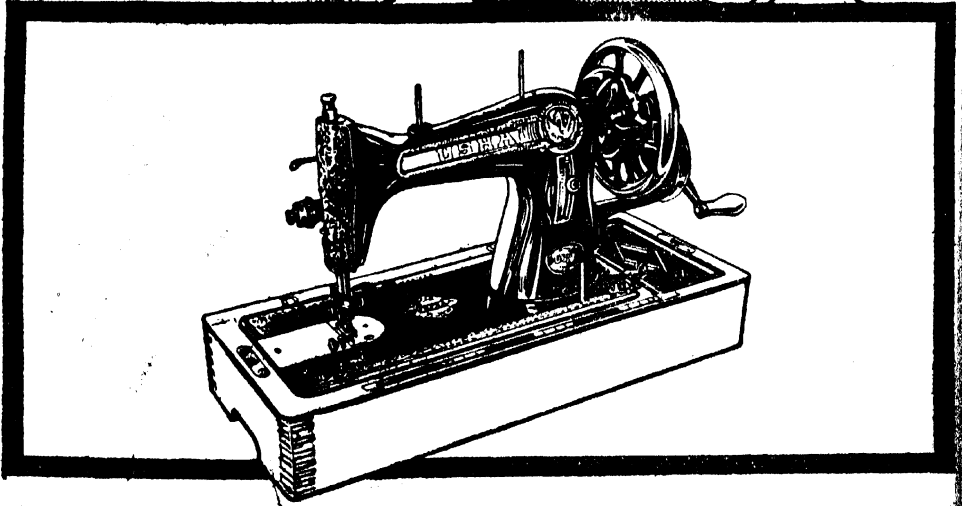
শচীন অধিকারী "দুটি ফুল একটি পাতা" ছবিটি রূপ দিচ্ছেন। রূপায়ণে আছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, সুনীতা দেবী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন বালসারা। চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্বও স্বর্গত রায়ের প্রাপ্য। * * * সলিল দত্তের পরিচালনায় "সূর্য শিখা" ছবিটি চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। সুর দিচ্ছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন স্বর্গীয় ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার, অশোক মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, সুপ্রিয়া চৌধুরী প্রভৃতি। * * * "ক্যাম্প নম্বর ৫৪" ছবিটি বর্তমানে প্রস্তুতির পথে। এর চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক যুগল। সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অমর মল্লিক, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় অমূল্য সান্যাল, রসরাজ চক্রবর্তী, প্রীতি মজুমদার, অমর বিশ্বাস, অরূপ চৌধুরী, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, সুলতা চৌধুরী, লিলি চক্রবর্তী রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী, শিখা বাগ, রাজলক্ষ্মী দেবী, আশা দেবী প্রভৃতি।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

# সৌখীন সমাচার

নাট্যকার কিরণ মৈত্রের "চোরাবালি" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন বর্ধমান নাট্য মন্দিরের সদস্যরা। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন

শীলা পাল—ছায়াছবির বাইরে

মুক্তিরঞ্জন চক্রবর্তী, দিলীপ কোঙার, মদন রায় শিশেন নাগ ও সাধনা মৈত্র প্রভৃতি। * * * সুনীল ভঞ্জের "জল ভরা মেঘ" নাটকটি মধুচক্র নাট্যসংস্থা অভিনয় করলেন। বিদ্যুৎ চন্দ্রের পরিচালনায় এতে অভিনয় করেন স্বপন রায়, রঘু দত্ত, অনিল ভট্টাচার্য, সব্যসাচী চৌধুরী, প্রভা দেবী, চন্দ্রা দেবী, বাণী চৌধুরী, মঞ্জু মিত্র প্রভৃতি। * * * কলিকাতা কর্পোরেশান ডিষ্ট্রিক্ট ওয়ান প্রমোদ বিভাগের সদস্যবৃন্দ মঞ্চস্থ করলেন জয়দেব বসুর "ঝরাফুল" নাটকটি। অভিনয়াংশে ছিলেন অনিল পাল, ভূপেন আশ, মাণিক মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি দাস, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, শিখা ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার নিজেই। * * * সলিল সেনের বিখ্যাত নাটক "মৌচোর" অভিনয় করলেন মঞ্জুশ্রী নাট্য সম্প্রদায়। চরিত্রগুলির রূপদান করেন প্রবোধ ঘোষ, অনিল মুখোপাধ্যায়, সুভাষ অধিকারী, দিলীপ চন্দ, শ্যামল সেন, বাসুদেব সাহা, শেফালি কুণ্ডু, সন্ধ্যা গুপ্ত, ছায়া পাল ইত্যাদি * * * নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাবলিক গৃহে অরুণ মৈত্রের "জোয়ার ভাঁটা" অভিনীত হল। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাট্যকার স্বয়ং, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়, প্রণব ঘোষ, শ্যামল সান্যাল, মায়া নন্দী, কাকলী বসু ও প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি।

"Professional comedians know better than anybody that laughter can be successfully wooed almost by accident rather than by design." —Earl Wilson.

## এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে সিংহবাহিনী দেবীদুর্গার ভিন্ন ভিন্ন দুইখানি আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। মূর্তি দুইটি কাঞ্চীভরম্ ও সুচীন্দ্রম নামক দক্ষিণ-ভারতের পৃথক দুই মন্দিরে অবস্থিত। আলোকচিত্র শ্রীএন, রামকৃষ্ণ কর্তৃক গৃহীত।

শব্দযন্ত্রী দেবেশ ঘোষ ও চিত্রনায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

সিনে ক্রাফট এর প্রথম ছবি "পাহাড়ের কান্না"র একটি দৃশ্যে মঞ্জুলা সরকার

চিত্ত বসু পরিচালিত "শুভদৃষ্টি"র একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

"বন্ধ কোর না পাখা" চিত্রের নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমার

"In London, theatre-goers expect to laugh; in Paris, they wait grimly for proof that they should." —*Robert Dhery.*

## —আলোকচিত্র—

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যায় রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি সর্বশ্রী হেমেন মিত্র, শান্তিময় সান্ন্যাল, চিত্ত নন্দী, জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোনা চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত।

## কালো বাজারের মাছ

"মাছকে মুনাফা নিরোধ আইনের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুমতি চাহিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্তও সে অনুমতি পাওয়া যায় নাই। পুনরায় অনুমতি চাহিয়া আর এক পত্র দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি অনুমতি দেনও, তাহা হইলেই যে আমরা নিয়ন্ত্রিত দরে মাছ পাইব, সে সম্বন্ধে আমাদের ভরসা করিবার কিছুই নাই। হয়ত বাজার হইতে মাছ একেবারেই উধাও হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি সমবায়ের মাধ্যমে কলিকাতার বাজারে মাছ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। মহালয়ার দিন কলিকাতার বাজারগুলিতে পরীক্ষামূলক-ভাবে মাছ বিক্রয়ের জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। রাজ্য সরকার আশা করেন, উহার পর দিন হইতে যথারীতি মাছ বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। এদিকে মাছের দর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আবার 'ভদ্রলোকের চুক্তি'র কথা নাকি উঠিয়াছে। আড়তদার এবং মৎস্যব্যবসায়ীরা কয়েকজন বামপন্থী নেতার নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। উহাতে অন্যান্য দাবীর সঙ্গে 'ভদ্রলোকের চুক্তি'র কথাও নাকি আছে। উক্ত স্মারকলিপির একটি অনুলিপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকটেও প্রেরণ করা হইয়াছে; ভদ্রলোকের চুক্তির পরিণাম আমরা দেখিয়াছি। বামপন্থী নেতারা ভদ্রলোকের চুক্তি সমর্থন করিবেন কিনা তাহা জানা যায় না। কিন্তু মাছের দাম সত্যই কমিবে, এ সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। তবে পাঁয়তাড়া কষিতে কষিতে শীতকাল আসিয়া পড়িবে এবং তখন মাছের দাম স্বাভাবিক নিয়মেই কিছু কমিবে? তখন উহাকেই সরকারের সাফল্য বলিয়া অনায়াসে ঘোষণা করা চলিবে।"

—দৈনিক বসুমতী।

## ডাক বিভাগের কথা

"চিঠি বিলির ব্যাপারে ডাক-বিভাগের কর্মক্ষমতা কী পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, সম্প্রতি তাহার আর একটি নমুনা মিলিয়াছে। অবশ্য ডাক-বিভাগের এই গাফিলতির মাশুল হিসাবে বারুইপুর এলাকার এক যুবক একটি ইণ্টারভিউতে হাজির হইতে পারেন নাই। ইণ্টারভিউয়ের চার দিন আগে চিঠি ডাকে ছাড়া হইলেও ইণ্টারভিউয়ের পাঁচ দিন পরে উহা নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছায়। কলিকাতা হইতে দশ মাইল দূরে যেখানে এক দিন পরেই চিঠি পাওয়ার কথা, সেখানে চিঠি বিলি হইতে নয় দিন কী করিয়া গেল, তাহা বুঝিয়া উঠা মুশকিল। এই ধরনের ঘটনা অবশ্য এই-ই প্রথম নয়। কিছুকাল আগেও শিবপুরের এক যুবক ওই একই কারণে ইণ্টারভিউতে হাজির হইতে পারেন নাই। খাস কলিকাতাতে যেখানে এক দিনের মধ্যে চিঠি বিলি হওয়া উচিত, সেখানে চিঠি বিলি হইতে তিন দিন কী করিয়া লাগে, একমাত্র ডাক-বিভাগের পক্ষেই তাহা বলা সম্ভব। আশা করি জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া চিঠিপত্র বিলির ব্যাপারে বিলম্বের কারণগুলি দূর করিতে কর্তৃপক্ষ তৎপর হইবেন; চিঠি বিলির ক্ষেত্রে এই ধরনের বিলম্ব যখন স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হইতে চলিয়াছে তখন ইণ্টারভিউয়ের চিঠিগুলি কিছুদিন আগে ছাড়িলে এই ধরনের ঘটনা এড়ানো সম্ভব হইবে।"

—আনন্দবাজার।

## শনির দশা

"পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড বাতিলের আদেশের মেয়াদ আরও ছয় মাসের জন্য বাড়ানো হইয়াছে। শিক্ষাবোর্ডের শনির দশা আর কিছুতেই ঘুচিতেছে না। বহু বিঘোষিত নূতন পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বিল বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে আনয়ন করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ইহা বহু আগেই করা উচিত ছিল। শিক্ষাবোর্ডের মতন একটা প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর সরকারী আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হইবে, শিক্ষাবিদদের কিংবা শিক্ষকদের সঙ্গে ইহার কোনো সংস্পর্শ থাকিবে না, এই গণতান্ত্রিক যুগে এইরূপ ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে জানি না, বাতিল শিক্ষাবোর্ডই দিব্য পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর মাতব্বরী চালাইয়া যাইতেছে। যত শীঘ্র শিক্ষাবোর্ড এই সরকারী আমলাদের রাহুর গ্রাস হইতে বাহির হইয়া আসে, ততই মঙ্গল। আমরা আশা করি বিধানসভার আগামী অধিবেশনে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলকে অগ্রাধিকার দিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইহাকে আইনে পরিণত করার চেষ্টা হইবে। এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত শিক্ষাবোর্ড পুনরায় নিজের মর্যাদায় ফিরিয়া যাইবে।"

—যুগান্তর।

## বস্ত্র হরণের নির্লজ্জতা

"গত কয়েক বছর কাপড়ের দর ও সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ মিল-মালিকদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও ন্যায্য দরে কাপড় ক্রয় করার আশা এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে সুদূরপরাহত"—এই মন্তব্য একটি সরকার সমর্থক সংবাদপত্রের রিপোর্টেই প্রকাশিত হইয়াছে। খুচরা ব্যবসায়ীরা বলিতেছেন—মিল মাল দিতেছে না, পাইকারী হাটেই সব শেষ হইয়া যাইতেছে, দর দাম উপরেই স্থিরীকৃত হইয়া আসিতেছে আমরা কি করি বলুন। বস্ত্রের দর বৃদ্ধির এই রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা সাধারণ ক্রেতা কোথায় পাইবেন? সরকার যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহা হইলে বাজার দর কমায় কাহার সাধ্য! সরকার দর হ্রাসের কোন ব্যবস্থাই করিতেছেন না—ইহাই আমাদের অভিযোগ। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন—মোটা ও মাঝারি সূতায় তৈরী বস্ত্রের মূল্য শতকরা আট ভাগ হ্রাস করা হইবে। এই সিদ্ধান্তের সুযোগ দরিদ্র ক্রেতা সাধারণ কোন দিনই পান নাই অথচ বিলিবণ্টনকারী ব্যবসায়িগণের

কমিশন শতকরা ১৫ ভাগ হইতে বাড়াইয়া ১৮ ভাগ করার সিদ্ধান্তগুলি ঠিক মতই চালু হইয়া গিয়াছে। আসল কথা হইল—সরকার মিল মালিক ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার নীতি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। এই কারণেই কাপড়ের দর হ্রাস পাইতেছে না। মিল মালিক ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফার লালসা কঠোরভাবে সংযত করিতে না পারিলে বা না করিলে কাপড়ের দাম কমিবে না, কংগ্রেস সরকারের নীতি তাহা নহে। সুতরাং সরকারী কর্ত্তাদের আশ্বাস দানের কোন মূল্যই নাই।"

—স্বাধীনতা।

## বামপন্থী কৌশল ?

"লক্ষ্য করিবার বিষয় কোন সমস্যা সমাধানের আগ্রহই প্রস্তাবের কোথাও নাই—সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্যই আওয়াজ তোলা হইয়াছে, আন্দোলনের ইহাই একমাত্র প্রেরণা, একথা কমিউনিষ্টগণ আর সকলের মতো ভালই জানেন যে, যত অসত্য, যত আজগুবী, যত ভ্রান্ত এবং যত জনক্ষতিকর ও স্বার্থহানিকর কথাই হউক—দেশের এক শ্রেণীর লোক সরকারের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে খুসীই হয়। বহুকাল বিদেশী সরকারের কঠোর শাসন ও শোষণের ফলে—দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে—জনগণের মানসিকতায় একটা বিরুদ্ধভাব জাগে,—দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশতঃ তাহা অনেকটা স্বভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। দেশ যে স্বাধীন—স্বাধীন দেশের সরকার যে স্বাধীন নাগরিকগণের অবাধ নির্বাচনের দ্বারা গঠিত সরকার; একান্ত নিজস্ব সরকার, পুরাতন অভ্যাসবশতঃ এই সত্যও ভুল হইয়া যায়—দেশের পুলিস ও সরকার সম্পর্কে সেই বিদেশী শাসনাধীন পরাধীন যুগের মতিগতিই থাকিয়া যায়। অবশ্য যাহা সত্য, তাহা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইত, মিথ্যা বিরূপতা দূর হইতে পারিত; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা-লিপ্সু সরকার বিরোধী দলের অবাধ মিথ্যা প্রচার ও—অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টির দূষিত কর্মনীতির দরুণ, তাহা নিয়তই বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কলিকাতায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নাগরিক সম্বর্দ্ধনায় পশ্চিমবঙ্গ লৌহব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে সমিতির সভাপতি শ্রীঈশানীতোষ ঘটক মাল্যভূষিত করিতেছেন।

যত অবাঞ্ছিত এবং দেশের ক্ষতিকর—প্রকৃত জনস্বার্থ বিরোধীই হউক—অনুরূপ সরকার বিরোধী আন্দোলন—ভারতের ন্যায় গণতান্ত্রিক দেশে খাড়া করা অসম্ভব নহে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার সচেষ্ট রহিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সেজন্য উদ্বিগ্ন ও তৎপর রহিয়াছেন।"

—জনসেবক।

## টেলিফোন বিভ্রাট

"বর্দ্ধমান সহরে আরও ৫০টি টেলিফোন সংযোগ দেবার কথা হয়েছিল। আবেদনকারীরা সেইমত ৩৪০৲ টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসে জমা দেন। সেটা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা। তখন আবেদনকারীদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে ৬ মাসের মধ্যেই সংযোগ দেওয়া হবে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত টেলিফোন সংযোগ দেওয়া হয় নাই। কবে বা কতদিন নাগাদ দিতে পারবেন তাও এঁরা বলতে পারছেন না। এ দিকে লাইন বসাবার কাজ অনেক দিন আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, পূজার পর সম্ভবতঃ সংযোগ দেওয়া হবে। তাও তিনি সঠিকভাবে বলতে পারেন না। ফেব্রুয়ারী মাসে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো সেই মত কেন যে কাজ হল না, তাহাই কর্ত্তাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। লাইন টানা হয়েছে, বোর্ডও এসেছে। এখন সাজ সরঞ্জাম যোগান পেলেই সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু সেই সনাতন লাল ফিতার গ্রন্থি মোচন কে করবে? বিভাগের নাম যোগাযোগ বিভাগ হইলেও আসল ইহা গোলোযোগের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। টাকা জমা দিয়া আট মাস পরেও যখন সংযোগ পাওয়া যায় নাই তখন আরও আঠারো মাস অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি উপায় আছে।"

—বর্দ্ধমান বাণী

## মূল্য বৃদ্ধির চাপ

"সাধারণ লোকের আয় বাড়ে নাই, বাড়িয়াছে শুধু ব্যয়। একথা সরকার স্বীকার করেন কিনা জানি না। উৎপাদন বাড়িতেছে অথচ তাহা সত্ত্বেও যে দাম কমে না তাহা আমরা বহু পূর্ব্ব হইতেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। সুতরাং উৎপাদন বাড়ানোই আজ এক মাত্র সমস্যা নয়। তাহা ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনানুসারে যে উৎপাদন বাড়িতেছে তাহারও ফল ভাগ করিতে পাইবে কোন অধস্তন পুরুষ তাহা কেহ জানে না। জিনিষপত্র কনট্রোল করিয়া দোকানে দোকানে মূল্য তালিকা টাঙ্গাইয়া দিয়া যে দ্রব্য মূল্যের চাপ কমানো যাইবে তাহা আমরা মনে করি না, কারণ কনট্রোলের যুগের কথা আমাদের এখনও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। কি দুর্ভোগই ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা সকলেরই অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ধারণা আছে। কাজেই আমরা সরকারকে এ সময়ে বারবার সতর্ক করিতে চাই যে যদি তাঁরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে কালোবাজারীদিগকে শায়েস্তা করিতে না পারেন তবে কোন মতেই দ্রব্য মূল্যের চাপ কমাইতে পারিবেন না। দেশের বর্ত্তমান যে অবস্থা তাহাতে আর দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি হইবে। যাহার ফল বিষময় হইবে বলিয়া যথেষ্ট আশঙ্কা করা যাইতে পারে।"

—সেবা ( সিউড়ি )।

## পাকিস্তান ধৃষ্টতা

"ত্রিপুরা সীমান্তে হানা দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানী ধৃষ্টতা এমন চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, উহা এখন অপরাধের পর্য্যায় হইতে অপমানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পাকিস্তানী দুর্বৃত্তগণ এখন প্রকাশ্য দিনের বেলায়ই অনায়াসে ভারতীয় এলাকা হইতে ভারতীয় নাগরিককে ধরিয়া নিতে সাহস করে। সংবাদে প্রকাশ, গত ৮ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানী দুর্বৃত্তগণ আখাউড়া বর্ডারে ভারতীয় অঞ্চল হইতে তিনজন শ্রমিককে ধরিয়া নিয়া যায় এবং বেদম প্রহার করে। তাহারা জনৈক শ্রমিকের কণ্ঠ হইতে একটি সোনার হারও ছিনাইয়া নেয়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, দুর্বৃত্তগণ ভারতীয় তিনজন শ্রমিককে ধরিয়া নিয়া পাকিস্তানের সৈন্য ও অফিসারদের চোখের উপরই প্রহার করিয়াছে। এই বে-আইনী ও মারাত্মক আন্তর্জাতিক অপরাধ করা সত্ত্বেও আখাউড়া চেক্ পোষ্টের পাক সৈন্যদল অথবা অফিসারগণ, থাক তাহাদের গ্রেপ্তার করা—ভারতীয় শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য টুঁ-শব্দটিও নাকি করে নাই। ইহার অর্থ এই যে, পাক-বাহিনী ও অফিসারবৃন্দের উস্কানীতেই এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই নীরবতার আর কোন অর্থই যে করা যায় না। আমরা এই পাকিস্তানী 'হরকতের' তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি এবং এতদ্ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ত্রিপুরার জনগণ পাকিস্তানী দুর্বৃত্তপনায় অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিপুরাকে পাকিস্তানী অত্যাচার হইতে যে কোন উপায়ে রক্ষা করার জন্য আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।"

—গণরাজ ( আগরতলা )।

## এশিয়ান গেমস্

"চতুর্থ এশিয়ান গেমস্ জাকার্তায় সমাপ্ত হইয়াছে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে জাপান সর্বাপেক্ষা যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ভারতবর্ষও কয়েকটি ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ইন্দোনেশীয় সরকার ও অধিবাসীগণ কর্তৃক ভারতীয় প্রতিনিধিগণ, ভারত রাষ্ট্রের পতাকা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। তাইওয়ান ও ইস্রাইলের যোগদানের বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া ইন্দোনেশীয় সরকারের জঘন্য রাজনীতি অত্যন্ত মর্মপীড়াদায়ক। এই অপমান এই লাঞ্ছনা আমাদের জয়গৌরবকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। অবশ্য আশার কথা এই যে, ইন্দোনেশীয় সরকার তাঁহাদের কার্য্যাবলী এবং জাকার্তার ভারতীয় দূতাবাসের উপর হামলার উপর দুঃখ প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোনদিনই তাহার বন্ধু রাষ্ট্রের জন্য অপন কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। চীন, পাকিস্থান, নেপাল সকল রাষ্ট্রের কাছে ভারতবর্ষ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আগাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রতিদানে ভারতবর্ষ সকলের কাছে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার লাভ করিয়াছে। ইন্দোনেশীয়ার পক্ষে এই সেদিন পর্য্যন্ত পশ্চিম ইরিয়ানের বিদেশী শাসন-মুক্তির জন্য ভারতবর্ষ সমর্থন জানাইয়াছিল, কিন্তু ইন্দোনেশীয়ার কাছে এইরূপ অপমানজনক ব্যবহার সত্যিই নিন্দার্হ। জাকার্তায় ভারতীয় দলের সাফল্য আনন্দের কারণ হইলেও উহার মধ্যে অপমানের শ্লেষ আমাদের অন্তরকে পীড়িত করিতেছে।"

—ভাগীরথী ( কালনা )।

## জনসংযোগে মুখ্যমন্ত্রী

"প্রথম বিবেচ্য হ'ল মুখ্যমন্ত্রী এ কার্যে প্রবৃত্ত হলেন কেন? জনগণের অভাব অভিযোগ, দুঃখ ও নালিশ যাঁরা ক্ষমতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত তাঁদের কাছে পৌঁছায় না কেন? যদি পৌঁছাবার কোন উপায় না থাকে, তা হলে এমন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা দরকার যাতে সেগুলি তাঁদের কর্ণ কুহরে দ্রুত পৌঁছিতে পারে। কিন্তু কলিকাতা সহরে বসে জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেই কি সারা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হবে? গ্রামবাসীরা কি তাদের অভিযোগগুলি সহরে এসে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করবে? দ্বিতীয় বিবেচ্য হল শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব হবে কি? যদি সম্ভব হয় তবেই চিন্তা করতে হবে আমলাতন্ত্রের জায়গায় প্রশাসনিক বিভাগগুলি কি উপায়ে চলবে। এ দুটো বিষয়কে সামনে রেখে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমাদের নিবেদন যে তিনি আমাদের সেই সমাধানের পথ বাংলে দিন এবং তা যদি তিনি পারেন তা হলেই তিনি একটা স্থায়ী মঙ্গলের পথ বাংলে দিয়েছেন বলে স্বীকার করতেই হবে।"

—জনমত ( ঘাটাল )।

## অস্থায়ী বাসরুট চাই

"খবর পাওয়া গেল, যাহাতে বাসরুটগুলিতে অস্থায়ীভাবে বাস চালাইবার অনুমতি না দেওয়া হয় সেজন্য বাস মালিকগণ সদর হইতে পরিবহন মন্ত্রী পর্য্যন্ত ডেপুটেশন লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, বাসে যে পরিমাণ ভিড় দেখা যায় তাহাতে যতদিন স্থায়ী বাসরুটের অনুমতি না দেওয়া হয় ততদিন অস্থায়ী বাসের অনুমতি দেওয়াই ভাল, পরে ঐ সকল অস্থায়ী বাসগুলিকে স্থায়ী বাস রূপে চালাইবার অনুমতি দিলেই হইবে। কারণ অস্থায়ী বাস চালাইতে অনেককেই নূতন বাস কিনিয়া রাস্তায় নামাইতে হয়। তাঁহাদের সেই আর্থিক দিকটার কথাও বিবেচনা করা উচিত।"

—আসানসোল হিতৈষী।

## শিশু সমাজ কল্যাণ সমিতি

"আমাদের একটি প্রশ্ন,—কলিকাতাতেই এইরূপ সমিতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ রাখিলেই কি সমগ্র রাজ্য উপকৃত হইবে? পুষ্টির অভাবে রাজ্যের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ শিশু নানা রোগের আক্রমণে কষ্ট পাইতেছে। তাহাদের দিকে চাহিবার কি প্রয়োজন নাই। অবৈতনিক সম্পাদক ডাঃ বি, এন্, রায় কান্দী মিউনিসিপ্যাল এলাকার অধিবাসী। কান্দীতে জনদরদী চিকিৎসকেরও অভাব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ডাঃ রায় কি তাঁহাদিগকে লইয়া সর্বপ্রথমে অন্তত: কান্দীতে ঐরূপ একটি শিশু সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না? ডাঃ রায়ের উদার জনহিতৈষণা আমাদের অবিদিত নহে। আর সেইজন্যই আমরা তাঁহাকে মফঃস্বলের বহুসংখ্যক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মুখ চাহিয়া ঐরূপ চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষত: মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়দ্বয়কে রাজ্যের সর্বত্র অনুরূপ চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা জন্য মুক্ত হস্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের আবেদন কি অরণ্যে রোদনেই পরিণত হইবে?"

—কান্দী বান্ধব।

## চীনা ধোলাই ঘর

"কিছুদিন হইতে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বহু চীনা ধোলাই ঘর যত্র-তত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল দোকানগুলিতে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। অভিযোগ আছে যে এই সকল ধোলাই ঘর বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র, ইহাদের পশ্চাতে একটি সুনিয়ন্ত্রিত গুপ্তচর দল কাজ করিতেছে। কলিকাতা শহরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ বসবাস করিতেছে এবং স্বাধীন গতিবিধির উপর কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই ; কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে চীনা গুপ্তচর বৃত্তি রোধ করা দরকার। সে জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত ভাবেই কাম্য। দেশের স্বাধীনতা এবং সার্ব্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে দেশের সাধারণ মানুষ আনন্দিত হইবে। কারণ স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব দেশের প্রতিটি মানুষের উপরই ন্যস্ত।"

—সমাজ-সেবা ( কলিকাতা )।

## মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি

"মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রীর আসন গ্রহণ করার পর হইতে তিনি যে সকল বাণী দিতেছেন এবং যেভাবে কাজ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন তাহাতে পশ্চিম বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। সুদীর্ঘ কালের দেশকর্ম্মী সরল জীবনযাপনকারী সাধারণের মানুষ শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় যদি প্রতিশ্রুতি মত কার্য্য করেন তাহা হইলে স্বাধীন পশ্চিম বাংলায় নূতন উদ্যমে যাত্রা সুরু করিবে। দল বড় নয় দেশ বড় এই কথা স্মরণ রাখিয়া দৃঢ় হস্তে রাষ্ট্র পরিচালনা করিলে দেশের কল্যাণ হইবে এবং তাঁহার মন্ত্রীত্ব সার্থক হইবে। আমরা সেই আশাই করিব।"

—বীরভূম-বাণী।

## মৎস্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ

"ভদ্রলোকেরাই ভদ্রলোকের চুক্তি করেন। মাছের দর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হইলে পশ্চিম বাংলা সরকার নাকি পুনরায় ব্যাপারীদের সঙ্গে ভদ্রলোকের চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন। বলা বাহুল্য, সেই সমঝোতাও যথারীতি রসাতলে যাইবে। উহার পর মাছের বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু হইলে একেবারে সোনায় সোহাগা সংযোগ ঘটিবে। মৎস্যভোজী বাঙালীরা তখন চোরাবাজারে আঁষ-কাঁটা কিনিয়া পিত্তরক্ষা করিবে।"

—লোকসেবক।

## বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

"বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির অধিবেশন সদস্য প্রভুদের সুবিধার জন্য কলিকাতায় হইয়াছে। ইহা যেন কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার ব্যবস্থা! আমাদের উপাচার্য রবীন্দ্রপ্রেমী শ্রীগুহ নিতান্ত নরম লোক। এইরূপ নজির সৃষ্টি হইলে কোন দিন হয়তো দেখা যাইবে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্লাস সাময়িক ভাবে কলিকাতায় বসিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ইহা সম্মানজনক বলিয়া আমরা মনে করি না।"

দামোদর ( বর্দ্ধমান )।

## শোক-সংবাদ

### যতীন্দ্রনাথ ( কানু ) রায়

বাঙলার ক্রীড়াজগতের অন্যতম উজ্জল রত্ন সুদক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় যতীন্দ্রনাথ রায় ওরফে কানু রায় গত ২৮এ ভাদ্র ৭২ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৯১১ সালের মোহনবাগানের আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী দলে ইনি ছিলেন অন্যতম। ক্রীড়া জগতে বাল্যকাল থেকেই এঁর যোগাযোগ। ১৯০১ সালে কুচবিহারের মহারাজা স্বর্গত নৃপেন্দ্রনারায়ণের প্রচেষ্টায় ইনি মোহনবাগানে যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯১৭ সালে ইনি পুলিশ বিভাগে কর্মগ্রহণ করেন ও ১৯৪৭ সালে ইনি এস, পি হন।

### ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বরাহনগরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা এবং বরানগর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৭ই ভাদ্র বোমার আঘাতে আহত হয়ে গত ১১ই ভাদ্র ৬৩ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। অল্প বয়েসেই ইনি বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং স্বর্গত দেশনায়ক

ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ইনি বরানগর পৌরসভার পরিচালনা করেন। ইনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
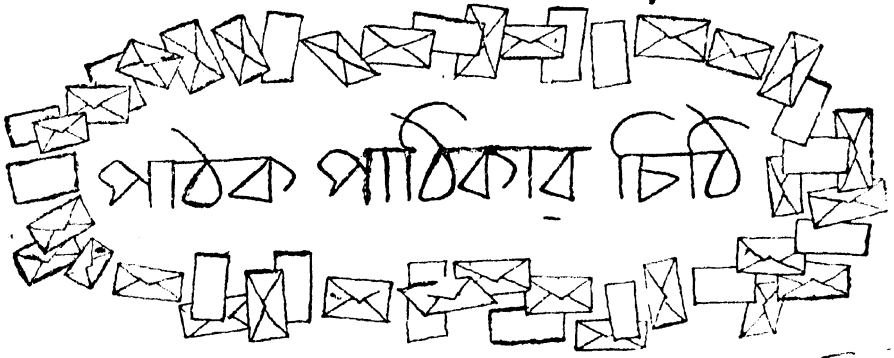
## পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন, বাঙলা দেশ থেকে বহু দূরে বাস করলেও মনেই হয় না যে বাঙলার বাইরে আছি। কারণ, 'মাসিক বসুমতী'র মধ্যে দিয়েই যেন গোটা বাঙলা দেশকে দেখতে পাই। যদিও 'বসুমতী'র মধ্যে সারা পৃথিবীই লেখায় ও রেখায় সমুপস্থিত তবু তার মধ্যে দিয়েও আপনার বলিষ্ঠ সম্পাদনায় বাঙলা দেশ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রবাস বাসের শূন্যতা মুছে যায়। 'মাসিক বসুমতী' যে কবে থেকে আমি পড়ছি, তা আমার নিজেরই মনে নাই তবে লক্ষ্য করেছি একটি বিশেষ সময়ে 'মাসিক বসুমতী'র একটা ব্যাপক ও বিরাট রূপান্তর ঘটেছে। সেই রূপান্তর 'মাসিক বসুমতী'কে সর্বৈব চমৎকারিত্বের উচ্চতম শিখরে উপনীত করেছে। সেই রূপান্তরণই 'মাসিক বসুমতী'কে নতুন ইতিহাসের সম্মুখীন করেছে। বলা বাহুল্য এই ঐতিহাসিক রূপান্তর কর্মের প্রধান নায়ক আপনি। 'মাসিক বসুমতী' শুধু যে পাঠকচিত্তকে ভাবিয়ে তোলার জন্যে আত্মপ্রকাশ করছে তা নয়—দেশের সাহিত্য সম্পদকেও নানাভাবে ভরিয়ে তোলার জন্যেই তার গৌরবময় আত্মপ্রকাশ। পাঠকচিত্তকে এবং সর্বোপরি দেশের সাহিত্যভাণ্ডারকে নানাভাবে ভরিয়ে তোলার গৌরব আপনার অবশ্য প্রাপ্য। 'মাসিক বসুমতী'র প্রতিটি বিভাগ আপনার বলিষ্ঠ ও যুগোপযোগী চিন্তাধারার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। 'মাসিক বসুমতী'র নীতি আমার মতে আজকের দিনে রুচিবান এবং আলোকপ্রাপ্ত সমাজের প্রতিটি মানুষের সমর্থন পাবে। বিভিন্ন ধরণের বিভাগ সৃষ্টি করে বিভিন্ন সমাজের পাঠকচিত্তকে আপনি যে ভাবে খোরাক জুগিয়ে চলেছেন তা যেমনি সাধুবাদার্হ তেমনই অভিনব। ভবিষ্যতে' যেদিন আজকের দিনের সাংবাদিকতার ইতিহাস লেখা হবে এ কথা বলাই বাহুল্য সেদিন সেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষরে আপনার গৌরবময় নাম লেখা থাকবে। ইতি—কণিকা, চিত্রিতা ও অশোক রায়চৌধুরী, নয়াদিল্লী।

মহাশয়, 'মাসিক বসুমতী'র বর্তমান বৎসরের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাল মহাশয়ের রচিত "যুগাবতার" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি, কিন্তু ঐ প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সমাজ উন্নয়নের কৃতিত্ব হিসাবে বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ; সম্বর দৈত্য নিহত হইলে তৎপত্নী মায়া দেবীর সহিত নিজ পুত্র প্রদ্যুম্নের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত "চক্রধারী" নাটকের বিষয়বস্তু হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ঐ নাটকে নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণের সদ্য প্রসূত পুত্র প্রদ্যুম্নের জন্ম মাত্রই সম্বর অসুর মায়াবলে দেবকীর সূতিকাগৃহ হইতে তাহাকে হরণ করিয়া সাগর জলে নিক্ষেপ করেন, এবং নিয়তির চক্রান্তে সেই শিশুপুত্র সম্বরের পত্নীর নিকট নীত হয়। সম্বরের পত্নীর সদ্যোজাত কন্যাও মায়াবলে অপহৃতা হয়। সম্বর পত্নী শ্রীকৃষ্ণের শিশুপুত্রকেই নিজ পুত্র মনে করিয়া দীর্ঘ দ্বাবিংশ বৎসর পুত্র স্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন। এদিকে তাহার নিজ কন্যাও অন্যত্র পালিত হইয়া দ্বাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করেন। নিয়তির চক্রান্তেই একদিন গঙ্গাতীরে দু'জনের সাক্ষাৎ হয় এবং সম্বর অসুরের জীবিত কালেই তাহাদের পরিণয় অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রদ্যুম্ন সম্বর অসুরকে বধ করেন। নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত নাটকের বিষয়বস্তুও তিনি পুরাণ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহার পুস্তিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে বর্তমান প্রবন্ধে শশিভূষণ বাবুর উল্লিখিত ঘটনাটি মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত নাটকের বিষয়বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন্ ঘটনাটি পুরাণে প্রকৃত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আপনার 'মাসিক বসুমতী'র মাধ্যমে প্রকাশিত হইলে আমার নিজের এবং অন্যান্য জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকার সমস্যার নিরসন হইতে পারে। ইতি—শ্রীমতী নীলিমা গুহরায় গ্রাহক নং ৬৬৩২৭। বহরমপুর।

মহাশয়, আমি আপনাদের 'মাসিক বসুমতী'র সাধারণ একজন পাঠিকা। পত্রিকা সম্বন্ধে একটি বক্তব্য আপনার বিবেচনার জন্য জানাতে চাই। দেখুন, 'মাসিক বসুমতী'র সুপ্রচার এবং জনপ্রিয়তার মূলে তার যে নিজস্বতা বা বৈশিষ্ট্য আছে তা' একাধারে উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-জীবনী ছাড়াও আছে মহামূল্য অনুবাদ-সাহিত্য—যা আজকাল খুব কম পত্র-পত্রিকাতেই আমরা পেয়ে থাকি। আমার,—অবশ্য একজন অনুরক্ত পাঠিকা হিসেবেই ধারণা—অনুবাদ-সাহিত্য সমসাময়িক ভিন্ন ভিন্ন দেশের তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। এ হিসাবেও অনুবাদ অনেক পাঠক-পাঠিকারাই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পড়ে থাকেন—এ কথা অস্বীকার্য্য নয়। ইদানীং 'মাসিক বসুমতী'তে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ তত ভাল চোখে পড়ে না যা আগে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যেত। বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ প্রকাশনায়—বিশেষতঃ অস্কার বা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিদেশী রচনা প্রকাশনায় আমি এই প্রসঙ্গে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট করছি। গত মাসের প্রতিটি প্রবন্ধই প্রথম শ্রেণীর—খুব ভাল লেগেছে, প্রকাশনার জন্য ধন্যবাদ। ইতি—কৃষ্ণা সাহা C/O এস. সাহা, বারাসাত ২৪ পরগণা।

মহাশয়, 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকরূপে আপনার লিখিত যে 'কথামৃত' প্রকাশিত হইতেছে তাহা পড়িয়া আমি বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি। সম্ভব হইলে ঐ পুস্তকের—একখানা কিনিতে ইচ্ছা করি। দয়া করিয়া যদি উহার দাম কত এবং কোথায় পাওয়া যায় যদি তাহা জানান তবে বাধিত হইব। আমার বাসা রাসবিহারী এ্যাভেনিউর নিকটে। ইহার কাছে কোন লাইব্রেরীতে কি পাইতে পারি? আমি প্রায় ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ, কাজেই এত কথা লিখিয়া ত্যক্ত করিলাম, ক্ষমা করিবেন। নিবেদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১, জনক রোড, কলিকাতা—২৯।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত অবধায়ক ক্যাপ্টেন এস, কে দত্ত, মিলিটারী হাসপাতাল, ডাক—আলওয়ার, জেলা—রাজস্থান * * * প্রেসিডেণ্ট ভুধপাতিলগাঁ, পঞ্চায়েত, ডাক ও গ্রাম—ভুধপাতিল, জেলা—কাছাড়, আসাম * * * শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত, অবধারক ক্যাপ্টেন্ এস, কে, দত্ত, মিলিটারি হাসপাতাল ডাকঘর আলওয়ার, জেলা—রাজস্থান * * * প্রেসিডেণ্ট, ভুধপাতিল গাঁ পঞ্চায়েৎ, ডাকঘর ও জেলা—ভুধপাতিল জেলা—কাছাড়, আসাম * * * শ্রীমতী রূপমঞ্জরী দেবী ডাকঘর মদনপুর-রামপুর, জেলা—কালাহণ্ডি, উড়িষ্যা * * * ডাক্তার এন, এন খান্, মিরজাপুর সিটি, ইউ পি * * শ্রীমতী দীপ্তি মৈত্র অবধারক মিষ্টার এন্ মৈত্র, Executive Engineer, রোড নম্বর ৬-ডি গর্দানিবাগ, পাটনা-১ * * * * * * The District Librarian, District Library, Gouhati, Assam * * * শ্রীমুক্তিপদ মুখোপাধ্যায়, গ্রাম কেন্দুয়া, ডাকঘর শিউড়ি, জেলা—বীরভূম * * * Mrs. H. K. Bose—C/o Mr. H. K. Bose. New standard Coal Co. Jharia.

Remitting herewith Rs 15/—being the annual subscription of Monthly Basumati—Sm. Sulekha Mittra, Jamshedpur.

A/c. Monthly Basumati for one year. please send copies from Chaitra.—Dr. K. Majumder A. M. O.—Nowgong, Assam.

বৈশাখ মাস হইতে এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য পাঠাইলাম।—অপর্ণা ত্রিবেদী চার্চ্চ গেট, বোম্বাই।

Herewith I am sending my annual subscription for Masik Basumati.—Dr. B. N. Majumder. Ahmedabad.

Subscription for one year from Baisakh 1369 B. S.—Girls' High School, Kailasahar, Tripura.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭'৫০ পাঠাইলাম—আরতি গাঙ্গুলী, নিউ দিল্লী।

Remitted Rs 15/- for Masik Basumati being subscription for the period from Baisakh to Chaitra 1369 B. S.—Tamluk District Library Midnapore.

I send herewith my yearly subscription of Rupees fifteen only for the year 1369 B. S.—Pradip Basu, Calcutta.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলাম।—Mrs. Archana Dutta, Nefa.

Please accept my yearly subscription for Monthly Basumati.—Sm. Santi Lata Ghose, Ranchi.

বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম।—Daulatpur Rural Library W. Dinajpur.

বৈশাখ হইতে আশ্বিন ১৩৬৯ পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ৭'৫০ পাঠালাম—Addl Distt. Library, Asansol, Burdwan.

Herewith Rs 15/- being the annual subscription for the current year from Baisakh 1369 B. S

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম —Geeta Das-gupta, Bena ( M. P. ).

I am sending herewith Rs 15/- as my annual subscription for Monthly Basumati—Sm. Mukul Rani Das—Berhampur ( W. B. ).

মাসিক বসুমতীর ১৫৲ টাকা চাঁদা পাঠাইলাম—শ্রীমতী জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য্য, কানপুর।

Sending herewith Rs 15/- being subscription for Monthly Basumati for the year 1962-63.—Sri Bipul kumar Sarker, Jalpaiguri.

Sending Rs 15/- one year's subscription for Monthly Basumati—Bengal Chemical Club, Bombay.

এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—উমা রায়, জয়পুর ( রাজস্থান )।

Sending herewith Rs 15/- being the annual subscription of Monthly Basumati for the year 1369 B. S.—Ira Majumder, Tamluk, Midnapore.

I am remitting Rs 15/- as annual subscription of monthly Basumati from Asarh to Joistha ( 1369-70 B. S. )—R. P Chatterjee.—Ratlam ( M. P. ).

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

বঙ্গলক্ষ্মী

( তৈলচিত্র )

—বধূরাণী শুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত

৪১শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬৯ ]  ।। স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ।।  [ ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

# কথামৃত

কোয়ালপাড়ার ভক্তগণের আহ্বানে গৌরীমা সেইস্থানে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের অনুপম জীবনকথা শুনাইয়া আসিলেন। জয়রামবাটীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতেও অনেক নরনারী তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিতেন। চারিদিকে এক নবভাবের উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিল। অবস্থা দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, "গৌরী যে ঠাকুরের কথায় এদেশ ভাসিয়ে দিলে!"

জয়রামবাটী হইতে শ্রীশ্রীমাকে লইয়া গৌরীমার কলিকাতায় ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং তিনি এই সময় গৌরীমাকে দুইখানি পত্র লিখেন। স্বামিজীর ব্যাকুলতাপূর্ণ দ্বিতীয় পত্রখানি পাইয়া গৌরীমা শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিয়া আহারাদি এবং বিশ্রাম করা হইল। সেখান হইতে বিষ্ণুপুর উপস্থিত হইলে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া যৎপরোনাস্তি বিনয়সহকারে বলিলেন, "মা, তোমার অপেক্ষায় আমি কতকাল ব'সে আছি। একবার গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তোমার পায়ের ধূলো দিতে হবে।" কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই অন্যপ্রকার ব্যবস্থা থাকায় তখন ব্রাহ্মণের গৃহে যাওয়া সম্ভবপর হইল না। বিষ্ণুপুরে অন্য এক পরিচিত ভক্তের বাড়ীতে গিয়া তাঁহারা উঠিলেন। সেখানে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকলে রেল-ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পুনরায় আসিয়া তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। জনৈক সন্তান ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "এখন আর কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না, সময়ে কুলোবে না।" ব্রাহ্মণের গৃহে গেলে পরবর্ত্তী রেলগাড়ী ধরা যাইবে না, অনেকেরই এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায় ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনের দিকেই চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বিফলমনোরথ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে করুণাময়ী মাতাঠাকুরাণীর প্রাণ ব্যথিত হইল; অথচ এতগুলি লোক যাইয়া রেলগাড়ী ধরিতে না পারিলে অনেক রকম অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি কোন কথা বলিলেন না।

ব্রাহ্মণ এইবার অভিমানে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় শেপো না, ওদের বল।" তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া গৌরীমা বলিলেন, "মা, তোমার যদি যাবার ইচ্ছে থাকে, তবে তা' বল। ব্রাহ্মণের বাড়ী হয়েই যাওয়া

হোক—ভক্তের চোখের জল পড়ছে।" শ্রীশ্রীমায়ের ইঙ্গিত পাইয়া গৌরীমা গাড়োয়ানকে আদেশ করিলেন, "গাড়ী ফেরাও।" পূর্ব্বোক্ত সন্তান পুনরায় সতর্ক করিয়া দিলেন, "কাজটা কিন্তু ভাল হলো না, গৌরীমা, শেষে গাড়ী ফেল হবে।" গৌরীমা গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "গাড়ী কিছুতেই ফেল হবে না। তুমি দেখে নিও।"

ভক্ত ব্রাহ্মণের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। তাঁহার পূজিতা 'মৃন্ময়ী' দেবীর দর্শনে সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে কতকগুলি ফল আনিয়া শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করিলেন। তিনিও পরম আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন, এবং এই সৌভাগ্যের জন্য গৌরীমার নিকট বারংবার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই স্থান হইতে ফিরিবার সময় শ্রীশ্রীমা কহিলেন, "গৌরমণি, এই দেবীকে দর্শন করতে ঠাকুর আমায় বলেছিলেন। কিন্তু কত বছর কেটে গেল দর্শন করা হয়নি। এবার মা, তোমার জন্যে সেটি হলো।"

*ইহারই কয়েকদিনমাত্র পূর্ব্বে জয়রামবাটীতে ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "কামারপুকুরে একদিন রঘুবীরের ভোগ হ'য়ে গেলে ঠাকুরকে ডাকতে গিয়ে দেখি, তিনি ঘুমুচ্ছেন। ভাবলুম, ঘুম ভাঙ্গাবো না; আবার মনে হলো, কিন্তু খেতে যে দেরী হয়ে যাবে। পরক্ষণেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি জেগে উঠে বললেন, 'দেখ গা, এক দূরদেশে গিছলুম। সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। তা'রা পরে আসবে। কিন্তু আমার দেখা পাবে না, তোমায় তা'রা দেখতে আসবে'।"*

"সেই দিনই ঠাকুর বলেছিলেন, 'বিষ্টুপুরের মৃন্ময়ীদেবীকে দর্শন করো, আমি দেখছি, ভারী জাগ্রত'।"

মৃন্ময়ীদেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ষ্টেশনে যাইয়া শুনিলেন, গৌরীমার কথাই সত্য, গাড়ী তখনও আসে নাই। শ্রীশ্রীমা এবং ভক্তগণ ইহাতে খুবই আনন্দিত হইলেন।

শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে পাইয়া দীনদুঃখী কুলীমজুর অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গৌরীমা তাহাদিগকে বলিলেন, "জানকীমায়ীকে প্রণাম কর।" শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া সেই সরলপ্রাণ ভক্তগণ কেহ কেহ ভাবাবেগে কাঁদিতে লাগিল। করুণাময়ী তাহাদিগকে নাম-দানে কৃতার্থ করিলেন। নিকটেই ছিল একটা ফুলের গাছ, গৌরীমা কতকগুলি ফুল আনিয়া তাহাদিগের হাতে দিয়া তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে বলিলেন। তাহারা ভক্তিভরে তাহাই করিল। শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, "জানকীমায়ীকী জয়!"

ইহার কিছুকাল পর, ১৩১৮ সালে আশ্রম কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে শ্রীশ্রীমা এবং গৌরীমা উভয়েই খুব আনন্দিত হইলেন। গৌরীমা প্রায়ই উদ্বোধন-ভবনে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতেন এবং আশ্রমের গাড়ীতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইতেন। ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া গিয়া তাঁহাকে এবং উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে তাহা ভোজন করাইয়া গৌরীমা অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করিতেন।

আশ্রমবাসিনীগণও মধ্যে মধ্যে গৌরীমার সহিত শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহাদিগের কণ্ঠে স্তোত্র এবং সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীমা প্রীত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগের অনেককে তাঁহার পূতচরিতা সন্ন্যাসিনী কন্যার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উন্নত জীবন যাপন করিতে এবং ত্যাগ ও সেবার পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দান করিতেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আশ্রমবাসিনীদিগের অনেকে পরহিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতেছেন।

গৌরীমার নিকট যাঁহারা ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে অথবা দীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্য লইয়া আসিতেন, তিনি তাঁহাদের অনেককে মাতাঠাকুরাণীর নিকট লইয়া যাইতেন।

জনৈকা ভক্তিমতী মহিলা নিজের দীক্ষার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"আমার দীক্ষার পূর্ব্বে আমি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বরী মাতৃদেবী ঠাকুরাণীকে কখনও দেখি নাই বা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত কিছুই জানি নাই। * * একদিন বাগবাজারে যাইবার দিন স্থির হইল। * * আমি কাঁদিতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীগৌরীমা বলিলেন, 'কাঁদছিস কেন?' আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'যেন দয়া করেন।' শ্রীশ্রীগৌরীমা বলিলেন, *'তুই কি চাস?' আমি বলিলাম, 'জানি না, যা ভাল হয় তাহা আপনি করিবেন।' * * মাতৃদেবীকে গৌরীমা কি বলিলেন, জানি না—এইটিমাত্র শুনিলাম, শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বরী মা বলিতেছেন, 'তোমার ঐ কাজ, সেদিন—র স্ত্রীকে আনলে আজ আবার একে এনেছ।'* তাহাতে শ্রীশ্রীগৌরীমা একটু জোরে বলিলেন, 'এসেছ কি করতে, জীবের জন্য তো এসেছ।' শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বরী মাতৃদেবী ঠাকুরাণী একটু চুপ ক'রে রইলেন। পরে কি কথা হইল জানি না। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী বলিলেন, 'তবে এস, এখন সময় ভাল আছে'।"

"* * মা আমায় দীক্ষা দিলেন এবং কি ঠাকুর দিবেন, তাহাও গৌরীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। আমার সদগুরু লাভ, তাহাও শ্রীশ্রীগৌরীমার কৃপায়। তিনি যাহা করিলেন, তাহাই হইল। আমার দীক্ষা হইয়া গেলে শ্রীশ্রীগৌরীমা বলিলেন, পূজার ফুল হইতে ফুল লইয়া শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বরী মার শ্রীপাদপদ্মে দিতে। আমি তাহাই করিলাম। পরে বলিলেন, 'একটি টাকা দিয়া প্রণাম কর।' তাহাই করিলাম।"

শ্রীশ্রীমা আশ্রমকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং অনেকবার আশ্রমে পদার্পণ করিয়া "আশ্রমের ভবিষ্যৎ জয়যুক্ত হবে" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আশ্রম গোয়াবাগানে থাকাকালে তিনি তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি আশ্রমে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি আশ্রমে সেই প্রতিকৃতির নিয়মিত পূজার্চ্চনা হইতেছে। তিনি অনেককে বলিয়াছেন, "গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্য্যন্ত যে উস্‌কে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।"

শ্রীশ্রীমা যেদিন আশ্রমে পদার্পণ করিতেন, সেদিন আশ্রম অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। আনন্দময়ীর আগমনে আশ্রমবাসিনীগণের হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠিত। তাঁহারা স্তব-সঙ্গীতাদি দ্বারা তাঁহাকে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিতেন এবং তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ ও অপার স্নেহাশীষ লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। গৌরীমা স্বয়ং ভোগ রন্ধন করিয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গোলাপ-মা, যোগেন-মা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ-প্রমুখ সন্তানগণও অনেকবার আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় ও শিবরাম চট্টোপাধ্যায় এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি দেবীও আশ্রমে বহুবার আগমন করিয়াছেন। —গৌরীমা গ্রন্থ হইতে

## কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপত্র

[ নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম ও বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বহু বছরের নিরলস সাধনার ফল বাংলা ভাষায় এনসাইক্লোপিডিয়া বা "বঙ্গীয় মহাকোষ"—একাধারে কোষগ্রন্থ ও শব্দাভিধান। এই বিরাট গ্রন্থের মাত্র দুই খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ডের কয়েক ফর্মা ( প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠা ) ব্যতীত আর প্রকাশ হয়নি, তাঁর মৃত্যুতে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। দুই খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় জ্ঞানী গুণী ও বিদ্বদসমাজের মধ্যে সাফল্য, সার্থকতার সম্বন্ধে প্রচুর উচ্চাশার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ আধুনিকতম ঐতিহাসিক তথ্যাদি অবলম্বনে এশিয়া ও ভারতের সর্ব বিষয়ের আলোচনার পরিকল্পনা ছিল। সেই কোষগ্রন্থ প্রকাশের শুভ সূচনায় স্বর্গত বিদ্যাভূষণের প্রতি কবিগুরুর আশীর্বাণী। ]

বঙ্গসাহিত্যের যে পরিমাণ উৎকর্ষ ও বিস্তার হইলে বঙ্গীয় মহাকোষ প্রকাশের সংকল্প মনে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে তাহা আমাদের গৌরবের বিষয়। এই মহাকোষ সম্পূর্ণ হইলে বাংলা দেশের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে কল্পনা করিয়া উৎসাহ বোধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নেতৃত্বে এই মহদনুষ্ঠান সিদ্ধিলাভ করিবে আশা করিয়া একান্তমনে ইহার সম্পূর্ণতা কামনা ও সম্পাদকের প্রতি বঙ্গদেশের পক্ষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পৌষ সংক্রান্তি ১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

# উনবিংশ শতাব্দীর

# নব মহাভারতের নারী

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রি-তর্কতীর্থ

জাতীয়তা ও ধর্মীয় চিন্তাধারায় যখন বিভেদ আদর্শবাদী অথবা অপঠিত আত্মশক্তির পুনরুদ্বোধনকল্পে যুগকবি নবীনচন্দ্রের অন্তরলোকে ভারত-আত্মার নিত্যকালের চেতনার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কবি-ঋষির ভাষায় তাহা নিম্নরূপ, "আমার হৃদয়-আকাশে পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় পূর্ণ চন্দ্রের মত ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ। "বুদ্ধিদেব অন্তর বিচ্ছেদ ও অন্তর বিয়োগে ধর্মের ও ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার নাম মহাভারত। মহাভারত ভারত কালের ইতিহাস নহে—মহাভারত—মহাভারত সাম্রাজ্য।"

স্বাধীনতা লাভের পর আমরা যে অখণ্ড রাষ্ট্র ও সমাজের পরিকল্পনা করিতেছি প্রায় শতাব্দী পূর্বে মহাকবি নবীনচন্দ্র, পরম পুরুষ সর্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণের মহা আদর্শ অনুসরণে রচিত উনবিংশ শতাব্দীর নব মহাভারত; রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে তাহারা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন :—

এক জাতি মানব সকল
একবেদ মহাবিশ্ব অনন্ত অসীম
একই ব্রাহ্মণ তার মানব হৃদয়
একমাত্র মহাযজ্ঞ স্বধর্ম্ম সাধন
যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ!

প্রতিটি মানবই ভগবানের বিগ্রহ বিশেষ ;—

(নরবপু তাঁহার স্বরূপ, চরিতামৃত)—প্রতি মানবের হৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান,—

এক ভগবান সর্বদেহে অধিষ্ঠান
সর্বময় এক অদ্বিতীয়
কেবা তুমি' কেবা আমি, কেবা শত্রু মিত্র কেবা
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়।

ভেদবুদ্ধির একান্ত বিলুপ্তি না ঘটিলে আপন অন্তরাত্মাকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করিবার শিক্ষা লাভ না ঘটিলে এই অনুভূতির জাগরণ সম্ভব নহে। ভারতীয় কৃষ্টি ও সমাজ জীবনের মূলে রহিয়াছে এই অখণ্ড দৃষ্টি—, দীর্ঘ অভ্যাস ও সাধন বলে মানুষে মানুষে সহজ প্রেম সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে এই অখণ্ড মানব সমাজ গড়িয়া উঠিবে না,—ফলে অখণ্ড রাষ্ট্র চেতনার বিকাশও সম্ভব নহে।

ভারতীয় সমাজ-জীবনে নারী—শক্তিরূপে বিশেষ ভাবে মাতৃরূপে, পূজিতা। শক্তিরূপিণী তথা মাতৃরূপিণী নারীতেই প্রেম ধর্মের সহজ বিকাশ। সহজাত এই প্রেম ধর্মের যথার্থ পরিণতি ঘটিলেই উহা বিশ্ব মাতৃত্বে রূপান্তর লাভ করে। মহাকাব্যের নায়িকা সুভদ্রার জীবনেই বিশ্ব মাতৃত্বের চরম ও পরম বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। কবির মানসকন্যা সুলোচনা শৈলজা ও কারুর জীবনেও এই 'প্রেমধর্ম ঋজু কুটিল পথে, নানা আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়া মহা প্রেম সিন্ধুতে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। প্রেমধর্মের মহনীয়তা ও সর্বজনীনতায় নারী কবির কাব্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভারতীয় সমাজ তথা ধর্ম-জীবনে নারীর স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

ভারতীয় সমাজে নারীর আসন বিশেষ করিয়া জননী ও জন্মভূমির স্থান সম্বন্ধে, লঙ্কা বিজয়ের পর বিভীষণ কর্তৃক রাজসিংহাসন উপবেশন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্র বলিতেছেন,

ইহ স্বর্ণময়ী লঙ্কা ময়ে মহ্যং ন রোচতে
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'

জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও উচ্চতর, সমাজে নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে ভারতীয় শাস্ত্র বলেন—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।'

সমাজে নারীর যথার্থ মূল্যবোধ উপরই নির্ভর করে সমাজের কল্যাণ। জ্ঞান-স্বরূপিণী নারী কর্তৃকই বিশ্বের মানব সমাজ নিয়ত তাহার জাতি গোত্রনির্বিশেষে রহিয়াছে মাতৃ হৃদয়ের অমৃতের পান ও পুণ্য পীযূষধারায় অবগাহন। সর্ব কালে প্রেমস্বরূপিণী শক্তিময়ী নারীই অনাদিকাল হইতে যোগাইয়া আসিতেছে অমিত বল। কর্মক্লান্ত বেদনাবিক্ষুব্ধ হতাশ জীবনে মায়ের অভয় বাণী—(মহাভারতে বিদুলা-সঞ্জয় কাহিনী স্মরণীয়) সঞ্জীবনী সুধা-স্বরূপ। মানব জীবনের প্রতি স্তরেই রহিয়াছে আনন্দরূপিণী নারীর মঙ্গল করস্পর্শ, নারীর আহ্বান, নবীনচন্দ্রের ভাষায় :—

রোগে শান্তি দুঃখে দয়া শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া
দিদি, এই ধরাতলে রমণীর বুক
এতাধিক রমণীর কিবা আছে সুখ।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকর্মে জাতি ও সমাজ গঠনই ছিল মুখ্য। কেবল আনন্দ পরিবেশনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি ছিল গৌণ। সাহিত্য; সমাজ তথা ধর্ম্ম'জীবনের নিছক প্রতিকৃতি না হইলেও, যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে সুস্থ সমাজ ও ধর্ম-জীবনের প্রভাব। গোলাপ শূন্যে গন্ধ বিলায় সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণের রসদ যোগায় গোড়ার মাটী। নবীনচন্দ্রের সমগ্র কাব্য সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে, রস দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সবল নব সমাজ ও ধর্মজীবন গঠনের অকুণ্ঠ প্রয়াস। প্রথম জীবনে নবীনচন্দ্র রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকেই সমাজ ও ধর্মজীবনের সর্ব-অনর্থপাতের মূল বলিয়া মনে করিতেন। এই রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই আমাদের সমাজ ও ধর্মজীবনে যথার্থ শ্রেয়োলাভে মহান অন্তরায় স্বরূপ, সত্যশিব সুন্দরের যথার্থ অনুভবে সুকুমার বৃত্তির যে-বিকাশরূপের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে দাস-জীবনে তাহা সম্ভব নহে বলিয়াই কবি মনে করিতেন। তাই কবিজীবনে প্রথম কাম্য ছিল—

পরাধীন স্বর্গ বাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরক বাস।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গেই সঙ্গেই জাতি আপন আদর্শে ফিরিয়া আসে না। সর্বপ্রকার মালিন্যমুক্ত সমাজই জাতিকে এই সত্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। তাই কবি পরিণতবয়সে, উনবিংশ শতাব্দীর নব মহাভারতরূপ-কাব্যত্রয়ে, আদর্শ মানব সমাজ গঠনের বিশেষ প্রয়াস পাইছেন।

নর ও নারী পরস্পর একে অন্যের পরিপূরক হইলেও ভারতীয় সমাজ ধর্মের মহিমময় আদর্শে নারীকে উচ্চতরা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ;—

'সহস্রন্তু পিতৄন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে'

মাতৃত্বের অনন্ত মহিমায় মাতা সহস্র পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এখানে নারীর পাতিব্রত্য ও আত্মধর্ম্ম অপেক্ষা মাতৃ ধর্ম্মকে বিশেষ উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই মাতৃত্ব বিশ্বমাতৃত্বেরই প্রতীক, কবির ভাষায় :—

আপন পুত্রের মাতা আপন মাতার পুত্র
যে হয় কি মহত্ত্ব তাহার
পরের মাতার পুত্র পরের পুত্রের মাতা
যে হয় সে পুণ্য পারাবার।

স্রষ্টার সৃষ্টি মহিমাও এখানে সার্থক—

যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ
সৃজি সেইরূপ বিধি রোগ দুঃখ শোক
সৃজিলা অনন্ত প্রেমপূর্ণ নারীবুক।

নবীনচন্দ্র এখানে তাহার নব-মহাভারতে সুভদ্রার চরিত্র চিত্রণে ভারতীয় সমাজ তথা ধর্ম্মজীবনের যথার্থ আদর্শরূপ প্রকটিত করিয়াছেন। পাতিব্রত্য ধর্ম্মময়ী সুভদ্রার আদর্শ মাতৃত্বের সহিত সমাজকল্যাণব্রতা সেবারূপিণীর যে অপরূপ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে কেন বিশ্ব-সাহিত্যে অতুলনীয়। যুগান্ত স্থায়ী এই আদর্শ নিত্যকাল অপরিম্লান রহিবে।

## প্রেমের জন্য

### গোপাল ভৌমিক

মানুষের অরণ্যে বাঘ কয়ে কয়ে
বাঘটা যখন ক্লান্ত হয়ে ওঠে
( আর সে ক্লান্তি অবশ্যম্ভাবী )
সে তখন ফিরে যেতে চায় খাঁটি অরণ্যে ;
আর অমনই ভালবাসার দোহাই দিয়ে
তুমি না, না, করে ওঠ।
আর আশ্চর্য, অভ্যাসের দাসত্ব মেনে নিয়ে
সেও গা এলিয়ে দেয় নিশ্চিন্ত আরামে
সেই চিরাচরিত একঘেয়েমির
নৈরাশ্য-পঙ্কিল আবর্তে।

তুমি তাকে ভালবাসো,
হয়তো তার প্রতিদানও তুমি পাও ;
নইলে তাকে ধরে রাখার এত আগ্রহ তোমার হত না।
তবে মোহে তোমার চোখ অন্ধ বলে
ওর দুর্দশা তোমার চোখে পড়ে না ;
ওর শিশুর মত অসহায় অবস্থাটাকে
তুমি মনে কর আত্মনিবেদনের ভাষা।
আর অব্যক্ত যন্ত্রণায় ও গুমরে গুমরে কাঁদে।

মনে অতৃপ্তির চিতা জ্বালিয়ে
ও আর কতদিন থাকবে বল।
একদিন প্রেমের নিষেধ
না মেনে ও চলে যাবে দূর অরণ্যে ;
আর সেদিন তোমার মনের বাঘটা
সেও ছুটবে ওর পিছনে।
সেদিন ও যেমন খুঁজে পাবে খাঁটি অরণ্য
তুমিও তেমনই খুঁজে পাবে প্রেম।

## এশিয়া

### কান্তা দাশ

সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্তে
কে যেন, পাগল করা এক সার্থকতায়
ভোরের হাওয়ায় আশ্চর্য্য শঙ্খ শ্বেত পাপড়ি মেলে,
আসে বারে বারে
কনকচাঁপার সেই রঙিন দিন,

জন্মক্ষণের সেই কান্নার স্বর
মধ্যাহ্নের স্তব্ধতার করুণ ছায়ায়
অস্পষ্ট স্বপ্নের আবেগের মুখ চিনে চিনে
তুলছে, আজ কত, নতুন কলরব।
সোনালী ধানের শিষের, শির শির হাওয়ায়
যুঝে যুঝে
কে যেন জাগায়,—
মরা দুর্বার জীবনের শিকড়ে
সবুজের আর এক ইতিহাস।
জানি
মুখ লুকানো আরো অনেক সকাল
রক্তে রক্তে উচ্চকিত পিতল কুকারে
উদ্ধত উপনিবেশের গর্ব্বের চূড়া ভেঙ্গে,
আজ করে আকাশের নীলে
মেঘে মেঘে কত কথার জানাজানি।
তাই
উদ্ধত আষাঢ় দিন
ভাটিয়ালির সুর ছড়ানো এক বিস্ময়ের আনন্দ উল্লাসে
দিকে দিকে
জাগায় আজ, জীবনের সবুজ প্রত্যয়।
জানি
ঘুম ভাঙ্গা প্রত্যেক অবাক শিশুকে
হত্যা আর দূষিত ক্ষুধার এই দিনে
শ্বেত-সাম্য-শান্তির জ্বলন্ত শপথে
আজো পথ দেখায় নতুন জীবনের,
আমার এশিয়া, আমার অহংকার
গর্বী আজ মাগো আকাশে আকাশে।

# হাতদেখা

শ্রীঅসিত মৈত্র

ভারতের প্রাচীন সভ্যতার দান অনেক কিছুর মধ্যেই যে সাচ্চা হীরা-মাণিক লুকিয়ে থাকতে পারে তা' আমরা ইংরাজী শিক্ষিতের দল অনেক সময় মানতে চাই না। কিন্তু যখন দেখি, আমাদের উৎসাহদাতা গুরুস্থানীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দলই আমাদের অবহেলিত, অবজ্ঞাত জিনিষগুলি নিয়ে "ইউরেকা," "ইউরেকা," বলে আনন্দ ধ্বনি করছেন, তখন আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না এবং আমরাও তড়িঘড়ি তাঁদের মতাবলম্বী হই। এইরকমই অবহেলিত বিদ্যা ছিল প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য, যাদুবিদ্যা, যোগশাস্ত্র ও চিত্রশিল্প।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ইংরাজী শিক্ষিতের দল ভারতীয় নৃত্যকে অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। তাঁরা নাচ বলতে ইংরাজী বল, ডান্স, ফক্সট্রট, ব্যালে প্রভৃতি নৃত্যকেই নাচ বলে মানতেন এবং জানতেন। এরপর হল উদয়শঙ্কর, রামগোপাল প্রভৃতির আবির্ভাব—রাতারাতি দৃশ্যপট বদলে গেল। উদয়শঙ্কর, রামগোপাল প্রভৃতির তথা ভারতীয় নৃত্যের প্রশংসায় জগদ্বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী অ্যানা প্যাবলোভা, ইসাডোরা ডানকান্ প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সব নৃত্যরসজ্ঞ পণ্ডিতেরা পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। আর আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের সুরে পোঁ ধরা সুরু করলাম। বলতে লাগলাম, সত্যিই ভারতীয় নৃত্য অপূর্ব! সঙ্গে সঙ্গে তরুণ-তরুণীরা দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যশিক্ষা করতে। নৃত্যের তালে তালে উদ্বেল হয়ে উঠল আসমুদ্র—হিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষ! সেই ধারা আজও চলেছে।

তারপর ধরুন ভারতীয় যাদুবিদ্যা—ভারতীয় যাদুবিদ্যা শুনলে আমরা নাসিকা অবজ্ঞায় কুঞ্চিত করতাম। ভারতীয় যাদুকর বললে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত কতকগুলি লক্ষ্মীছাড়া, ছন্নছাড়া, অশিক্ষিত, জোচ্চরের দল। আমরা বলতাম, ভারতীয় রোপ্ ট্রিক্-ট্রিক্ বাজে গাঁজা, ওসব খালি কাহিনীতেই পড়া যায়, চোখে তো কাউকে দেখা যায় না ভারতীয় রোপ ট্রিক জানে। হ্যাঁ, যাদুকর আছে বটে ইউরোপে। হ্যারিহুডিনী—হার মান দি গ্রেট, উইলিয়াম ব্ল্যাকষ্টোন্ হাওয়ার্ড থ্রাসটন, উইল গলষ্টোন্, নেলসন ডাউন্ এঁদের জুড়ি কোথায় জগতে। এঁদের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় যাদুকর?

আজ এর যোগ্য জবাব দিচ্ছেন পি, সি সরকার, দেবকুমার ঘোষাল প্রভৃতি যাদুকররা। এঁরা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, এঁরা পাশ্চাত্যের বড় বড় যাদুকরের সমকক্ষ তো বটেই, এমন কি অনেকাংশেই বড়। আর, ভারতীয় যাদুবিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্যের যাদুবিদ্যার তুলনাই হতে পারে না। এঁদের প্রশংসায় পাশ্চাত্যের বড় বড় যাদুকর পঞ্চমুখ। তাঁদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে এঁদের সম্মানিত করছেন তাঁরা এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের যাদুবিদ্যা এবং যাদুকরদের প্রশংসার ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যাচ্ছে। আজ আমরা ভারতীয় যাদুবিদ্যা এবং যাদুকরদের প্রশংসায় মুখর। সত্যিই, বিদেশে পি, সি, সরকারের সম্মানে আমরা গর্ব অনুভব করি না কি?

এইরকমই আরেকটি বিদ্যা ছিল ভারতীয় যোগশাস্ত্র। প্রথমে এই বিদ্যাটির ওপর আমাদের ঘৃণা এবং অবজ্ঞার সীমা-পরিসীমা ছিল না। আর যে কয়জন এই বিদ্যাটির চর্চা করতেন তাঁদের—আমরা নিম্নস্তরের জীব বলে এবং ভণ্ড ও প্রতারক বলে ভাবতাম। কিন্তু এখন হাওয়া উল্টো দিকে বইছে। পাশ্চাত্য দেশে যোগবিদ্যা নিয়ে তোলপাড় পড়ে গেছে? তাঁরা বলছেন, এ বিদ্যা ভারতীয় সভ্যতার এক অপূর্ব দান, একে হারালে আমাদের সভ্যতাই অনেকখানি পিছিয়ে যাবে। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সব পণ্ডিতেরা এর জয়গানে উন্মত্ত হয়ে ভল্যুমের পর ভল্যুম বই লিখছেন। সে দেশে নানা জায়গায় এই বিদ্যা শিখবার স্কুল, কলেজ স্থাপিত হয়েছে। বিখ্যাত মনীষী আলডুস হাক্সলি, ইসারউড্, সমারসেট মম্ প্রভৃতি যোগাভ্যাস করছেন। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত অ্যাডলার যুঙ, যোগের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে, আমরা বলতে সুরু করেছি, না, এমন জিনিষ আর হয় না।

হ্যাভেল, হাণ্টার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রশংসার পূর্বে এবং রবি বর্মা, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় প্রভৃতির আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধেও আমাদের অনুকূল মনোভাব ছিল না। আজ ভারতীয় চিত্রবিদ্যার খ্যাতি দেশে-বিদেশে পরিব্যাপ্ত। জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পি পিকাসো মাতিসের মত শিল্পীও ভারতীয় বিশিষ্ট অঙ্কন পদ্ধতির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। আজ আমাদের মনোভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছে—ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমরা প্রচুর গর্বই অনুভব করি।

উপরিলিখিত বিদ্যাগুলির মতই পামিষ্ট্রি বা হাত দেখা এক প্রচুর অবহেলিত বিদ্যা। তফাৎ এই যে, উপরিলিখিত বিদ্যাগুলি আজ গৌরবের আসনে সমাসীন, হাতদেখা বিদ্যা তার পূর্ব গৌরবে আজও ফিরে আসেনি আমাদের দেশে। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশে ইতিমধ্যেই ভারতের অবহেলিত বিদ্যাটি নিয়ে তোলপাড় পড়ে গেছে। ওদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই কয়েক জন বিখ্যাত মনীষী এই বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হন এবং তাঁরা জীবনব্যাপী আপ্রাণ সাধনার দ্বারা এই বিদ্যার সত্যতা প্রমাণ করেন। বিখ্যাত মনীষী ডি আর পাঁতি, দেবারল, কিরো, বেনহাম, জুলিয়াস স্পায়ার, মিসেস্ সেন্টহিল, মিসেস রবিনসন, কাউন্টেসেস জারমান, নোয়েল জ্যাকোঁ, শার্লট উলফ,, অঁরি মাঞ্জিন প্রভৃতির উদগ্র সাধনায় এবং অতুলনীয় কীর্তি প্রভায় আজ হাতদেখা বিদ্যা ওদের দেশে উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান বলে পরিগণিত।

এদেশে অনেকেই বোধ হয় জগদ্বিখ্যাত হস্তরেখাবিদ কিরোর অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথা জানেন। সম্প্রতি বিলাতে মিস ভেরা কম্পটন লণ্ডন বি, বি, সি, টেলিভিসনে পাশ্চাত্য দেশের সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ করে হাত দেখে দিয়ে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্বনামধন্য বারট্রাণ্ড রাসেল, সমারসেট মম্, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ, বিখ্যাত অভিনেত্রী এস্থার উইলিয়ামস্ প্রভৃতি হাজার হাজার বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাত দেখে দিয়ে তাঁদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সঠিক বলে দিয়ে একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। বারট্রাণ্ড রাসেলের মত অবিশ্বাসী, নাস্তিক লোকও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, নিশ্চয়ই এই বিদ্যায় প্রচুর সত্য নিহিত আছে, তা' না হলে এইরকম সব সব সঠিক বলে কি করে।

* * *

বিশ্বের সমস্ত দেশের মনীষীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে,

ভারতবর্ষই এই বিদ্যার আদি জন্মভূমি। যদিও আমাদের দেশে হাতদেখা বিদ্যার উৎপত্তির সঠিক সাল-তারিখ পাওয়া যায় না তবু মহর্ষি পরাশরের সময় থেকেই (খৃঃ পূঃ ২৫০০—১৩০০) হাতদেখা বিদ্যার সূচনা দেখা যায়। মহাভারত সভাপর্ব, কর্ণপর্ব, অশ্বমেধপর্বে, হাতদেখা বা সামুদ্রিক গণনার উল্লেখ আছে। হাতদেখা (যা' জ্যোতিষবিদ্যার একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবেই ধরা হয়) এবং জ্যোতিষবিদ্যা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট অঙ্গস্বরূপ ধরা হোত এবং এর প্রমাণও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এমন কি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিমূল যে বেদ তাতে জ্যোতিষকে তার চক্ষু হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রাচীনকালে এই জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাব প্রতিপত্তি কম ছিল না সমাজের সর্বস্তরে; তখনকার কালে এমনকি, ভারতের বিখ্যাত রাজন্যবর্গও জ্যোতিষীর পরামর্শ ছাড়া রাজকার্যে একপদও অগ্রসর হতেন না। এর কিছুটা প্রমাণ কালিদাসের—'অভিজ্ঞান শকুন্তলমের' মধ্যেই পাই। যেমন, যখন সগর্ভা শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের সভাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে নিজেকে রাজার পরিণীতা পত্নী বলে পরিচিতা করছেন অথচ রাজা নিজে তাঁকে পরিণীতা বলে চিনতে পারছেন না, তখন মহাকবি কালিদাস পুরোহিতের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, "তং সাধুভিঃ উদিষ্টঃ—প্রথমমেব চক্রবর্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। স চেন্মুনিদৌহিত্রঃ স্তলক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি বিপর্যয়ে ত্বস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং স্থিরমেব।" আরেক জায়গায় পাই, দুষ্মন্ত সর্বদমনের হাত দেখে বলছেন, "কথং চক্রবর্তিলক্ষণমপ্যনেন ধার্যতে··· জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ ইত্যাদি।"

এর কিছু সময় পরেই এই হাতদেখা বিদ্যা প্রাচীন গ্রীস, চীন, তিব্বত, পারস্য, মিসর, ইতালী প্রভৃতি দেশে প্রসার লাভ করে।

পণ্ডিত হিস্পানাস বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটকে হাত দেখা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ উপহার দেন। তাতে স্বর্ণাক্ষরে এই ক'টি কথা লেখা ছিল, "A study worthy the attention of an elevated and inquiring mind." বাস্তবিক এই বিজ্ঞানটি অজ্ঞ ও নিরক্ষর শ্রেণীর হাতে ফেলে না রেখে, যদি মনস্বী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এর গবেষণার ভার নেন, তা'হলে এর দ্বারা পৃথিবীর যে কত উপকার সাধিত হতে পারে, তা' বলে শেষ করা যায় না।

প্রাচীনকালের বিখ্যাত সব গ্রীক পণ্ডিত যেমন অ্যানাক্সাগোরাস, পিথাগোরাস, প্লেটো, অ্যারিষ্টোটল, প্লিনি, প্যারাসেলসাস, কারডামিস, অ্যালবারটাস, ম্যাগনাস প্রভৃতি এবং রোম সম্রাট অগাষ্টাস, জুলিয়াস সিজার প্রভৃতি এই বিদ্যা গভীর ভাবে চর্চা করতেন।

এখন আমাদের বিচার করতে হবে হাতদেখার আবিষ্কর্তা প্রাচীনকালের এই যে-সব হিন্দু পণ্ডিত এবং গ্রীক পণ্ডিত এই বিদ্যা বিশ্বাস করতেন এবং চর্চা করতেন এঁদের মানসিক সম্পদ কিরূপ ছিল।

প্রথমে হিন্দু-পণ্ডিতদের কথাই বলি। যে সময়কার কথা লেখা হচ্ছে, সে-সময়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল না, তখনকার লোকেরা যে মানসিক সম্পদে এখনকার লোকদের চেয়ে হীন ছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তার উল্টো সাক্ষ্য আছে। তখনকার লেখা যে সকল উপনিষদ, দর্শনাদি পাওয়া যায়, তা' আজকালকার যে কোন মনীষীর পক্ষেও অত্যুচ্চ গৌরবের বিষয়। এবং বহির্বিশ্বে ভারতীয় সভ্যতার যে বিরাট খ্যাতি তা'ও প্রধানতঃ এই সুপ্রাচীন যুগে রচিত এই সব মহান গ্রন্থাবলীর জন্যেই। বিখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত সোপেনহাওয়ার এই প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতদের সৃষ্টি অমূল্য গ্রন্থরাজী বিষয়ে এক জায়গায় লিখেছেন যে, মানুষ মানসিক সম্পদের যে কত উচ্চস্তরে উঠলে এইরূপ ভাবগর্ভ গ্রন্থরাজী রচনা করতে পারে তা' আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এই সময়েই (৪৭৫ খৃঃ অঃ) ভারতের জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, গ্যালিলিওর সহস্র বৎসর পূর্বে সৌরকেন্দ্রিক মত প্রচার করেছিলেন। তিনিই প্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ ঘুরছে। পূর্বে ধারণা ছিল পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলি ঘুরে বেড়ায়। তখনকার হিন্দু পণ্ডিতদের অভূতপূর্ব মানসিক সম্পদ ও বুদ্ধিবৃত্তির চরম পরিচায়ক আর একটি আবিষ্কার সম্বন্ধে বিখ্যাত হস্তরেখাবিদ্ কিরো You and your hand নামক তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকের এক জায়গায় লিখেছেন যে, "People who in their ignorance disdain the wisdom of ancient races, forget that the great past of India contained secrets of life and Philosophy that following civilizations could not controvert, but were forced to accept.

For instance it has been demonstrated that the ancient Hindus understood the "precession of the Equinox," and made the calculation that it took place once in every 25,850 years. The observation and mathematical precession necessary to establish such a theory has been the wonder and admiration of modern astronomers. They with their modern knowledge and up-to-date instruments are still quarrelling among themselves at to whether the "precession," the most important feature in astronomy, takes place every 25,850 or 24,500 years. The majority believe that the Hindus made no mistakes, but how they arrived at such a calculation is as great a mystery as the origin of life itself.

It is to the same wonderful people that we are a great deal of the knowledge we posses on the study of the hand."

এইসব ধীশক্তিমান ও মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিতেরাও হাতদেখা বিশ্বাস করতেন এবং তাঁরাই এই বিদ্যার আবিষ্কর্তা।

যাঁরাই ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস পড়েছেন তাঁরাই জানেন, বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার কাছে কিরূপ ঋণী। পণ্ডিতেরা বলেন, বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার পুত্রস্বরূপ। প্রাচীন গ্রীক-রোমান পণ্ডিতদের মত সুউচ্চ মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত বর্তমানেও একান্ত বিরল। বারট্রাণ্ড রাসেল তো এক জায়গায় স্পষ্টই বলেছেন, "প্রাচীন রোমান-

...ীন পণ্ডিতদের মনীষার কাছে বর্তমান পণ্ডিতদের মনীষা তাকাতেই পারে না।

আমাদের ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এইসব মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিতেরা হাতদেখা প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং চর্চা করতেন। তাঁরা নির্বোধ ছিলেন না, হাতদেখায় কিছু না থাকলে নিশ্চয়ই তাঁরা বিশ্বাস করতেন না।

• • • •

সুতরাং আশা করা যায়, বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে যখন হাতদেখার স্বপক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, অচিরে ভারতবর্ষেও এই বিদ্যার ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন হবে। ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এই বিদ্যার চর্চার দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকেছেন। আজকাল প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ ও মনীষী শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের মত যুক্তিবাদী লোকও জ্যোতিষ বিদ্যার সপক্ষে—'ইলাস্ট্রেটেড্ উইক্‌লি'তে প্রবন্ধ লিখছেন এ বাস্তবিকই আশা ও আনন্দের কথা!

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে, পাশ্চাত্য মনীষীরা যতক্ষণ না আমাদের কোনো বিদ্যা বা প্রতিভা সম্বন্ধে প্রশংসা না করেন বা স্বীকৃতি না দেন আমরা সে সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করি না। এ দুর্ভাগ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভা, রামানুজম এবং সত্যজিৎ রায়ও নিষ্কৃতি পাননি।

• • • •

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আমি গত বিশ বৎসর যাবৎ এই হাতদেখা বিদ্যার চর্চা করছি এবং এতে যে প্রচুর সত্য নিহিত আছে তা নিজে বুঝতে এবং অপরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী চমকপ্রদভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে; অবশ্য এতে আমার কৃতিত্বের প্রকাশ হয় না, এ বিদ্যায় যে প্রচুর সত্য নিহিত আছে তারই জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

পাঠক-পাঠিকাদের যদি এ প্রবন্ধ ভাল লাগে, বারান্তরে এ বিদ্যা তাঁদেরকে কিছুটা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করব।

# নিপাতনীয় দ্বি-ছন্দিকা

### হীরালাল দাশগুপ্ত

বার্নিশ করো মর্মর নীপ্ত অরণ্য,
সাফ্ কোরে দাও আগাছায় ভরা আকাশ,
জীবনের পিঠে লাগাও সময়— জিন্!
ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার অনন্ত,
মুক্ত যেখানে গুমোট মেঘের বাতাস;
গভীর নীলের তলায় তলায় সূর্য্য অন্তরীণ!
প্রেমের কবর প্রিয়ার গোপন বুকে,
জ্যামিতি জানে না হৃদয়ের পরিমিতি,
ফুলের কুঁড়িতে পাখীর পাখায় স্বপ্ন!
পৃথিবীর ভাষা অগ্নি-সিক্ত-গলিত লাভার মুখে,
তামসী-পত্রে হঠাৎ-উর্বশী-ইতি;
রাতের কবিতা দিবসে হারায় ছন্দ!
চুম্বন-ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনতে পাও?
কবর-শীতল ধারালো ঠোঁটের আগুন;
এই পারে প্রেম ওপারে প্রিয়ার বাড়ী!
শেষের দৃশ্যে যবনিকাপাত দেখতে চাও?
লৌহকপাট অন্তরালে বিলম্বিত বিড়ম্বিত ফাগুন!
তবু বিহঙ্গ সন্ধ্যার মেঘে সুদূর গগনচারী!
দক্ষিণে, বামে বামাচারী ক্ষত চিত্ত,
পচা রক্তের গন্ধ নদীর জলে,
বাঁকা দিগন্তে আঁকা কলঙ্ক রেখা!

যদিও হৃদয় রিক্ত-সময় বিত্ত,
তবু দুই চোখে উড়ন্ত তারা জ্বলে;
দেয়ালে দেয়ালে গোপন হাতের প্রেমের কবিতা লেখা!
আকাশ-পাথরে সকালের ছবি আঁকা,
ঘাসে ও শিশিরে রাত্রির শব ঢাকা!
দুই কাঁধে দুই অন্ধকারের বোঝা,
নিজের মধ্যে নিজেরেই শুধু খোঁজা!

### মালবগ্গো (১৮)

১-২। জরাপাণ্ডু সম জীর্ণ তুমি যে যমকিঙ্কর কাছে,
শিয়রে তোমার মৃত্যু দাঁড়ায়ে সম্বল কিবা আছে।
হও উদ্যোগী, হও পণ্ডিত, পাপমল করি নাশ,
তৃষ্ণাবিহীন আর্যভূমির আশ্রয়ে কর বাস॥

৩-৪। পরিণত তব পরমায়ু আজ যাত্রা যমের ঠাঁই,
নাহিক পাথেয়, পথমাঝে তব আশ্রয় কোনো নাই।
হও পণ্ডিত, হও উদ্যোগী, বাঁধি নিজ আশ্রয়,
তৃষ্ণাপাপমল পরিহর দূরে জন্মজরার ভয়।

৫। নির্মল করে রজতে যেমন সহজে রজতকার,
মেধাবী সেরূপ অন্তরমল নাশ করে আপনার।

৬। লৌহে ধ্বংসে লৌহের মল, জনমি লৌহ মাঝে,
দুর্গতি লভে অধর্মচারী আপনার কৃত কাজে।

৭, ৮, ৯।

১০-১১। কাকের সমান ধূর্ত যে জন, নির্লাজ অহিতকারী,
বঞ্চক, পাপী, প্রগলভ যেবা সহজ জীবন তারই।
হ্রীমান্ যেজন, অপ্রগলভ, পবিত্র জ্ঞানী হয়,
জীবিকা তাঁহার নির্বাহ করা সুকঠিন অতিশয়।

১২-১৪। মিথ্যাভাষণ করে যেইজন অথবা জীবন নাশ,
পরের দ্রব্য অপহরি, যায় পর রমণীর পাশ।
সুরাপানে যেবা আসক্ত থাকে,—এই জগতেরই পরে,
আপনার হাতে সর্বনাশের মূল সে খনন করে।
হে মানব, জানি লোভ আদি পাপে ফল সদা রহে লগ্ন,
সুদীর্ঘকাল দুঃখে তোমায় নাহি রাখে যেন মগ্ন।

১৫-১৬। লোকে দান করে প্রসন্নতায় অথবা শ্রদ্ধাবশে,
সেই পরদান পানাহারে যার অতৃপ্তি মনে পশে,
দিবস-রজনী না হয় তাহার সমাহিত কভু মন,
এ চিত্ত ক্ষোভ অপগত যাঁর তিনি সমাহিত হন॥

১৭। অনুরাগসম নাহিকো অগ্নি বিদ্বেষসম ক্ষত,
জালে মোহজাল, নদী কোথা ভবে, তৃষ্ণানদীর মতো।

১৮। নিজ দোষ কভু যার নাকো দেখা পরদোষ চোখে পড়ে,
তুষের মতন পরদোষ লোকে উড়াইয়া দেয় ঝড়ে।
শঠ ব্যাধ যথা করে সে গোপন ব্যর্থশর ক্ষেপে,
সেই মতো লোকে আপনার ত্রুটি সহজেই ফেলে চেপে।

১৯। পরদোষ খুঁজি নিত্য যে-জন পরনিন্দায় রত,
তৃষা বাড়ে তার,—নির্বাণ হতে দূরে যায় অবিরত।

২০-২১। আকারবিহীন আকাশ যেমন সেরূপ শ্রমণগণ,
বুদ্ধশাসন বাহিরে মিথ্যা—শূন্যের মতো হন॥
সংসার-জালে আবদ্ধ জীব সদা প্রপঞ্চরত,
প্রপঞ্চহারা বন্ধনহীন—অবিচল তথাগত॥

### ধম্মট্‌ঠবগ্গো (১৯)

১-২। নহে ধার্মিক বিচারের কালে পক্ষপাতি যে হয়।
বিচারে যে জন ভাল ও মন্দ তারে পণ্ডিত কয়॥
যে জন সাম্যনীতি অনুসরি নিরপেক্ষিত চিতে,
সুবিচার করে, সেই সে মেধাবী, ধার্মিক পৃথিবীতে।

৩। পণ্ডিত কেহ না হয় জগতে বহু ভাষণের ফলে,
শত্রুশঙ্কাশূন্য মানবে সবে পণ্ডিত বলে

৪। বহু ভাষণেতে কেহ নাহি হয় ধর্মেতে তৎপর,
যে পালে, যে শোনে, যে দেখে ধর্মে সেই সে ধর্মধর।

৫-৬। স্থবির না হয় পক্ককেশেতে, বৃদ্ধই তারে বলে,—
সত্য ধর্ম, অহিংসা আদি পালিয়া যে জন চলে—
সংযম, দম আছে যাঁর মনে, কলঙ্কহীন যিনি,
স্থবির নামেতে সকলের মাঝে পরিচিত হন তিনি।

৭-৮। ঈর্ষায় ভরা মৎসর শঠ, বাক্যে কিম্বা কায়,—
সাধুতাশূন্য,—সুন্দর রূপ কভু নাহি তারা পায়।
ঈর্ষা, শঠতা দোষ হতে যাঁরা সতত রহেন মুক্ত,
কলঙ্কহীন, পণ্ডিত তিনি সাধু নামে হন উক্ত।

৯-১০। মিথ্যাবাদী ও লুব্ধ যে জন দুষ্ট ইচ্ছা মনে,
না হয় শ্রমণ ব্রতহীনজন মস্তক মুণ্ডনে।
ক্ষুদ্র বৃহৎ পাপে অবদমি যেই জন হন মুক্ত,—
প্রশমিত পাপ ;—শ্রমণ নামের সেই শুধু উপযুক্ত।

১১-১২। ভিক্ষা করিলে না হয় ভিক্ষু, বৃথা ঘোরে পরদ্বারে,
ধর্ম-বিরোধী আচরণ যার, ভিক্ষু না বলি তারে।
পুণ্যপাপের প্রবাহে যে জন ব্রহ্মচর্যমানি,
জ্ঞানে বিচরণ করেন সতত তাঁরেই ভিক্ষু জানি।

১৩-১৪। মৌন থাকিলে নাহি হয় মুনি, মূঢ় জ্ঞানহীনজন,
তৌলে বিচারি পণ্ডিত, যেবা পাপে করে বর্জন,—
উভয় লোকেতে যে করে মনন—অন্তরে বাহিরেতে,
তিনিই যোগ্য জগৎ মাঝারে মুনির আখ্যা পেতে।

১৫। হিংসিয়া যেবা প্রাণিগণে ফিরে আর্য সে কভু নয়,
মৈত্রী যাঁহার সকল জীবেতে আর্য তাঁহারে কয়।

১৬-১৭। শীল ব্রত আদি অষ্ট সমাধি নির্জনে যদি লভ,
অনাগামিসুখ অনুভব যদি হয় অন্তরে তব,
হে ভিক্ষুগণ জেনে রেখ মনে তৃষ্ণা না হলে ক্ষয়,
ব্রতের পালনে নির্জনবাসে নির্বাণ নাহি হয়।

### মগ্গবগ্গো (২০)

১-৪। সত্যে চতুর্সত্য শ্রেষ্ঠ, মার্গে অষ্ট পথ,
ধর্মে শ্রেষ্ঠ বিরাগ, দ্বিপদে শ্রেষ্ঠই তথাগত।
এই তব পথ, একটিমাত্র বিশুদ্ধ দর্শনে,
এই পথে চলি জয়ী হও তুমি মারের ভীষণ রণে।
এই পথে তব দুঃখ অন্ত ; দ্বেষাদি শূলেরে জানি,
তথাগত আসি এ মহাপথের সন্ধান দিলা আনি।
উদ্যোগী হও, এ-পথে সতত অমিতাভ আলো জ্বলে,
সাধুজনগতি, মারের বাঁধন খসি পড়ে অবহেলে

৫-৭। অন্তরে সদা অনিত্য জানি সকল সংস্কার,
লিপ্ততাহীন জীবন যাঁহার, বিশুদ্ধ পথ তাঁর।
অন্তরে সদা দুখময় জানি সকল সংস্কার,
লিপ্ততাহীন জীবন যাঁহার, বিশুদ্ধ পথ তাঁর।
অন্তরে সদা অনাত্ম জানি সকল সংস্কার,
লিপ্ততাহীন জীবন যাঁহার, বিশুদ্ধ পথ তাঁর॥

৮। তরুণ, সবল হয়েও যে থাকে আলস্যপরায়ণ,
প্রচেষ্টাকালে চেষ্টা-বিরত বসি থাকে যেই জন,
চিন্তা অথবা সাধনার মাঝে অবসাদ আসে যার,
অলস সে জন, প্রজ্ঞামার্গে নাহি তার অধিকার॥

৯। সংযত করি বাক্য ও মনে কায়িক পাপেরে ছাড়ি,
আর্য মার্গে সন্ধান লভে এই ত্রিকর্মকারী॥

১০। যোগ হতে হয় জ্ঞানের জন্ম, যোগের অভাবে ক্ষয়,
ওঠা ও নামার এই দুই পথ ; যোগে জ্ঞান লাভ হয়॥

১১-১২। শুধু তরু নয় নাশো অরণ্য, অরণ্যে মহাভয়,
লতা পাতা শাখা ছেদিয়া সকলি অরণ্য কর ক্ষয়॥
যতদিন নাহি আসক্তি যায় নরের রমণী প্রতি,—
অণুটুকু যদি বাকি থাকে তার ততদিন নাহি গতি।—
নিশিদিনমান রমণীর লাগি উৎসুক হয়ে উঠে,
গরুর পিছনে বাছুরের মতো কেবলি বেড়াবে ছুটে॥

১৩। আসক্তি তব শরত কুমুদ, করি তা উচ্ছেদিত ;
চিত্তে জাগাও নির্বাণ-কথা সুগত নির্দেশিত॥

১৪। হেথায় কাটাব হেমন্ত-শীত, হোথায় বর্ষা-গ্রীষ্মে,—
এ হেন চিন্তা অজ্ঞ জনের ; বিপদ না দেখে বিশ্বে।

১৫। সুষুপ্ত গ্রাম সহসা যেমন বন্যাপ্লাবনে ভাসে,
বিষয়ীজনের পুত্র ও পশু মৃত্যু তেমনি গ্রাসে॥

১৬-১৭। পিতা ও পুত্র, মিত্র, বন্ধু আছে যারা সংসারে,
মৃত্যু হইতে তোমারে কেহই ত্রাণ না করিতে পারে।
মৃত্যু গ্রাসিত নাহি পায় খুঁজি কুটুম্ব মাঝে ত্রাণ,—
এই জানি মনে নির্বাণ-পথ অনুসারে শীলবান্॥

### পাকিণ্ণকবগ্গো (২১)

১। ত্যজিলে অল্প সুখ যদি হয় বিপুল সুখের ভাগী,—
ধীরগণ ত্যজে সামান্য সুখ মহৎ সুখের লাগি।

২। অজ্ঞজনেরে দুঃখ হানিয়া নিজ সুখ যেবা চায়,
বৈরীর মাঝে বসবাস তার মুক্তি কভু না পায়।

৩—৪। উচিত কর্ম ছাড়িয়া যেমন অকাজেতে খোঁজে সিদ্ধি,
উদ্ধত সেই প্রমাদীজনের অস্রাব পায় বৃদ্ধি।
কায়গত স্মৃতি নিত্য যাঁহার সুসমারব্ধ থাকে,
অকাজে আপন আত্মনিয়োগ করিতে না হয় তাঁকে।
সমুচিত কাজ সাধিতে যেমন তৎপর সদা হয়,
স্মৃতিমান সেই বিজ্ঞজনের অস্রাব পায় লয়॥

৫—৬। তৃষ্ণা ও মানে হনন করিয়া দ্বিমতে বিনাশ করি,
নিন্দা ও দ্বেষ ত্যজি ব্রাহ্মণ পাপে যান পরিহরি।
তৃষ্ণা ও মানে হনন করিয়া পঞ্চব্যাঘ্রে নাশি,
ব্রাহ্মণ হন দুঃখমুক্ত পরিহরি পাপ রাশি॥

৭—১২। দিবসরজনী নিত্য যাঁহারা বুদ্ধচিন্তাগত,
প্রবুদ্ধ তাঁরা বুদ্ধশিষ্য সদা রন জাগ্রত।
দিবসরজনী নিত্য যাঁহারা ধর্মচিন্তাগত,
প্রবুদ্ধ তাঁরা বুদ্ধশিষ্য সদা রন জাগ্রত।
দিবসরজনী নিত্য যাঁহারা সঙ্ঘচিন্তাগত,
প্রবুদ্ধ তাঁরা বুদ্ধশিষ্য সদা রন জাগ্রত।
দিবসরজনী নিত্য যাঁহারা কায়িক চিন্তাগত,
প্রবুদ্ধ তাঁরা বুদ্ধশিষ্য সদা রন জাগ্রত।
দিবসরজনী নিত্য যাঁহারা অহিংসভাবগত,
প্রবুদ্ধ তাঁরা বুদ্ধশিষ্য সদা রন জাগ্রত।
দিবসরজনী নিত্য যাঁহারা ধ্যানানুশীলনে রত,
প্রবুদ্ধ তাঁরা বুদ্ধশিষ্য সদা রন জাগ্রত॥

১৩। সংসার ত্যাগে দুঃখ সতত, গৃহে থাকিলেও তাই,
সঙ্গ না পেলে দরদী লোকের দুখের অন্ত নাই।
বারে বারে ভবে জনমগ্রহণ সে অতি দুঃখময়,
জগতভ্রমণ কর অবসান, দুঃখেরে কর জয়।

১৪। যাঁহারা সুযশা, বৈভবশালী, সুশীল শ্রদ্ধাবান্
যেথায় গমন সেথায় তাঁহারা সকলেরি পূজা পান।

১৫। একাসন যাঁর, একক শয্যা, একাচারী, ধ্যানব্রতী,
নির্জনে করি আত্মদমন আনন্দ পান অতি।

### নিরযবগ্গো (২২)

১। কুকাজ করিয়া যে বলে করিনি, আর যে মিথ্যা বলে,
নরকেতে যায় উভয়ে তাহারা, পরলোকেতেও জ্বলে।

২। আছে বহু পাপী সংযমহীন কাষায় বসনধারী,
পাপের করমে জনমে নরকে সেই সব পাপকারী,

৩। রাষ্ট্র অন্ন করি যে ভোজন, সংযম নাহি ধরে,
শ্রেয় তার চেয়ে তপ্তলৌহ ভক্ষণ যেবা করে।

৪-৫। পরদারসেবী প্রমত্ত যারা চারি গতি পায় তারা,
অপুণ্যলাভ, শয্যা তাদের সতত শান্তিহারা,
নিন্দা লভিয়া সকল লোকের নরকে চলিয়া যায়,
পরদারসেবী লভে অপুণ্য আর পাপগতি পায়।
শঙ্কিত নর, ভীতা রমণীর সঙ্গমে সুখ নাস্তি,
অল্প সে রতি, নরপতি তারে হানে সুকঠিন শাস্তি।

৬-৮। অযতনে কুশ তুলিলে যেমন কর কর্তন করে,
মন্দপালিত শ্রমণ তেমনি নরকের পথ ধরে।
দ্বিধা ও শঙ্কা ব্রহ্মচর্যে, কষ্টেতে ব্রত পালে,
শিথিলকর্মী নাহি লভে কভু শুভফল কোনো কালে।

অতি বিক্রমে করণীয় কাজ সাধ দৃঢ়তার সাথে,
শ্রমণের কাজে শিথিলতা এলে রজঃ শুধু বাড়ে তাতে ॥

৯। না করাই ভাল দুষ্টকর্ম পশ্চাৎতাপ আনে,
সুকর্ম করা শ্রেয় বলি তাই অনুতাপ নাহি জানে ॥

১০। সীমন্ত দেশে নগর যেমন ভিতর বহির্ভাগে,—
রক্ষিত সদা, সেইরূপ তুমি আপনা রক্ষ আগে।
ক্ষণ-সম্পদ না করিও হেলা, অবথা না কর নষ্ট,
ক্ষণহীন হলে নরকে গমন, অনুশোচনায় কষ্ট ॥

১১-১২। অলজ্জ কাজে লজ্জা যাদের, লজ্জাতে লাজহারা,
মিথ্যাদৃষ্টি আশ্রয় করি দুর্গতি লভে তারা।
অভয়ে যাহারা ভীত হয় মনে ভয়ে থাকে ভয়হারা,
মিথ্যাদৃষ্টি আশ্রয় করি দুর্গতি লভে তারা।

১৩-১৪। নির্দোষ কাজে দোষ দেখে যারা, দোষে দোষ নাহি ধরে,
মিথ্যাদৃষ্টি আশ্রয়ি তারা দুর্গতি লাভ করে।
দোষের কর্মে জানি দোষময়, নির্দোষে দোষহারা,
সত্যদৃষ্টি আশ্রয় করি সুগতি লভেন তাঁরা ॥

## নাগবগ্গো (২৩)

১-৩। হস্তী যেমন সংগ্রামে সহে ধনুর্নিঃসৃত বাণে,
সেই মতো সহি কটুভাষ যবে দুর্জনে মোরে হানে।
শিক্ষিত গজ জনতার মাঝে সহজে যায় যে চলে,
নৃপতি চড়েন হস্তিপৃষ্ঠে শিক্ষিত গজ বলে।
কটুকথা পারে যেজন সহিতে মনুষ্যদেহধারী,
শ্রেষ্ঠ সে জন, মৈত্র্য-চিত্ত, আত্মদমনকারী ॥
সিন্ধুদেশের হস্তী, অশ্ব অথবা অশ্বতর—
দমন কঠিন,—আত্মদমন তা হতে কঠিনতর ॥

৪। নির্বাণে কভু যাওয়া নাহি যায় বসি যানবাহনেতে,
ইন্দ্রিয়জয়ী লভে নির্বাণ, সংযম প্রভাবেতে ॥

৫। ধনপাল নাগে আনিল নগরে বন হতে যবে ধরি,
না করে হস্তী খাদ্যগ্রহণ অরণ্য কথা স্মরি ॥

৬। পরিমাণহীন ভোজন যাহার আলস্যে রত রয়,
গৃহে পোষা মোটা শূকরের মতো নিদ্রালু অতিশয়,—
শয়নে সতত গড়াগড়ি দিয়া এপাশ ওপাশ করে,
মন্দমতি সে বার বার আসি গর্ভে জনম ধরে ॥

৭। নানাদিকে মোর ভ্রমিল চিত্ত মত্তহস্তী প্রায়,
মাহুতের মতো আজি দৃঢ় করে দমন করিব তায় ॥

৮। অপ্রমাদেতে রত হয়ে সদা রক্ষিও নিজ চিত,
হস্তীর মতো পঙ্ক ত্যজিয়া হও তুমি উত্থিত ॥

৯-১১। সদাচারী ধীর পণ্ডিত যদি মিত্র তোমার হয়,
তারি সাথে থাক হৃষ্টচিত্তে বিঘ্ন করিয়া জয় ॥
নিপীড়িত গজ চলিয়া যায় যথা কুঞ্জর যূথে ছাড়ি,—
পরাজিত নৃপ পশে অরণ্যে রাজত্ব পরিহারি,
সেই মতো একা বিচরণ কর, একাকী থাকাই শ্রেয়,—
ধীর পণ্ডিত সদাচারী সখা নাহি মেলে যদি কেহ ॥
মূঢ়জন সাথে না কর বসতি, কলুষ কামনা ছাড়,
গজরাজ সম সঙ্গীবিহীন একা সদা সঞ্চার ॥

১২-১৪। প্রয়োজনকালে বন্ধু সুখের, তুষ্টিতে সুখ হয়,
সর্বদুঃখ বিনাশেতে সুখ, পুণ্য সে সুখময় ॥
জননীর সেবা অতি সে সুখের, পিতৃসেবায় তাই,
ব্রাহ্মণ আর শ্রমণ সেবায় অনন্ত সুখ পাই ॥
শীল-আচরণ অতি সে সুখের, চিরদিন যেবা পালে,
শ্রদ্ধায় যাঁর প্রতিষ্ঠা সদা সুখ-দীপ সেই জ্বালে ॥
সুখ ভোগ করে সদা সেইজন যে লভে প্রজ্ঞাধর্ম,
সুখ-অধিকারী—চলে যেইজন বর্জিয়া পাপকর্ম ॥

## তণ্হাবগ্গো (২৪)

১-৪। প্রমাদীর তৃষ্ণা মালুবা লতা সে বেড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে,
ফল লোভী মূঢ়, কপি সম নর, জনমে জনমে ভ্রমে।
বিষময়ী এই বর্ষণ শীল তৃষ্ণা যাহারে ধরে,
বর্ষা কালের বেণাঘাস সম শোকেতে সে জন ভরে।
বর্ষণশীল, দুরতিক্রম্য তৃষ্ণা যে করে জয়,
পদ্মপতিত জলকণা সম শোক পায় তার লয়।
সমাগত সবে শুন বলি তাই তব মঙ্গল তরে,—
উশীমূলকামী বেণাবন যথা সমূলে খনন করে,
সেই মতো সবে উৎখাত কর তৃষ্ণামূল রাশি রাশি,—
স্রোতের মুখেতে নলের মতন মার নাহি ফেলে গ্রাসি ॥

৫-১০। ছিন্ন বৃক্ষ অঙ্কুরে পুনঃ অখণ্ড মূল যায়,—
সমূলে তৃষ্ণা না করিলে নাশ, জনমে বারংবার।
প্রিয়বস্তুর সন্ধানে যার ভ্রান্তদৃষ্টি ফেরে,
ভাসাইয়া লয় ছত্রিশধারা তৃষ্ণা সে মানবেরে।
যথাতথাগামী তৃষ্ণা প্রবাহ, লতা সম উদ্ভিন্ন,
প্রজ্ঞাঅস্ত্র হানি সে লতার মূলদেশ কর ছিন্ন।
সুখে আনন্দ, প্রিয়ের মিলনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস,—
সেই সুখকামী, সুখ-আশ্রয়ী, জন্মজরার দাস।
ব্যাধ-শঙ্কিত শশকের মতো তৃষা বিতাড়িত যারা,
আবদ্ধ থাকি, বার বার ভবে মহা দুখ, পায় তারা।
তৃষ্ণাতাড়িত মানব সতত শশকের মতো ভীত,
মুক্তি লক্ষ্যি ভিক্ষু সে করে তৃষ্ণারে বিদূরিত ॥

১১। মহাবন হতে মুক্তি লভিয়া পুনঃ যে প্রবেশে বনে,—
বিমুক্ত তবু বন্ধন খোঁজে—দেখ সেই মূঢ়জনে ॥

১২-১৪। লৌহ, কাষ্ঠ, অথবা শনের রজ্জুর বন্ধনে,
দৃঢ় বন্ধন না বলে তাহারে ধীর পণ্ডিতজনে।
আসক্তি যার মণি-মাণিক্য, পত্নী পুত্র প্রতি,—
এই সে বাঁধনে ধীর জন ভণে দৃঢ়বন্ধন অতি।
এ দৃঢ় বাঁধনে ছেদন করিয়া আসক্তিহীন জন,
কামসুখ ছাড়ি, প্রব্রজ্যা গ্রহি, সংসার ত্যাগী হন ॥

১৪। তৃষ্ণাসক্ত তৃষা-প্রবাহের আবর্তে ভাসি যায়,
আপনার জালে আপনি বদ্ধ ঊর্ণনাভের প্রায়।
আসক্তিহীন ধীর জন সদা এ জাল করিয়া ছিন্ন,
দুঃখ বিনাশি দূরে যান চলি, সংসার হতে ভিন্ন ॥

১৫। সমুখে পিছনে মধ্যে যা আছে ত্যজি তাহা সমুদয়,
পর-পারে যাও, দূরে পরিহরি জন্মজরার ভয় ॥

১৬-১৭। মথিত যে জন কামচিন্তায় জলে কামনার বিষে,
সর্বনাশিনী ভোগের তৃষ্ণা, মিটিবে তাহার কিসে ?
যে জন সতত কুচিন্তাহীন, ধ্যানরত স্মৃতিযুক্ত,
বিনাশি তৃষ্ণা সহজে সে হয় মায়ের প্রভাব মুক্ত।

১৮-১৯। শঙ্কা, তৃষ্ণা, পাপহীন যাঁরা নিষ্ঠার অধিকারী,
সংসারশূল ভগ্ন তাঁহার—অন্তিম দেহধারী।
নিরুক্তপদকৌশলী যিনি, আসক্তি তৃষাহারা,
পূর্ব ও পর জ্ঞানেতে পূর্ণ, শাস্ত্রনিপুণ যাঁরা—
জন্ম-জরার বশ নহে যাঁরা অন্তিম দেহধারী,
মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাপুরুষের নামে তাঁরা অধিকারী।

২০। সর্বধর্মে লিপ্ততাহীন আমি যে সর্বজয়ী,
সর্ব জানিয়া, সর্ব ত্যাগিয়া তৃষ্ণামুক্ত হই।
নিজ বলে আমি লভিয়াছি জ্ঞান, সাধিয়া সুদৃঢ় চেষ্টা,
বল কোন জনে মানিব কী লাগি আচার্য-উপদেষ্টা ?

২১। সর্ব দানের পরাভব ঘটে সতত ধর্ম দানে,
ধর্মের রস, সর্বরসের পরাভব সদা আনে।
রতির মধ্যে ধর্ম-রতির বিজয় সুনিশ্চয়,
নিদারুণ দুখ জয় করা যায় তৃষ্ণার হলে ক্ষয়।

২২। অজ্ঞ যে জন না চাহে মুক্তি, ভোগ তার নাশ আনে,
নির্বোধ যারা ভোগতৃষ্ণায় আপনারে সদা হানে।

২৩-২৪। ক্ষেত্রের ক্ষতি তৃণে হয় আর মানুষের অনুরাগে,
অনুরাগহীনে যাহা দিবে দান সেই দান কাজে লাগে।
*ক্ষেত্রের ক্ষতি তৃণে হয় আর মানুষের বিদ্বেষে,*
*বিদ্বেষহীনে দান দিলে তার সুফল ফলিবে শেষে।*
*ক্ষেত্রের ক্ষতি তৃণে হয় সদা, মোহে মানুষের হানি,*
*মোহহীন জনে যাহা দিবে দাম সেই মহাদান মানি।*
*ক্ষেত্রের ক্ষতি তৃণে হয় সদা নরের আসক্তিতে,*
*আসক্তিহীনে যাহা দিবে দান শ্রেষ্ঠ তা পৃথিবীতে।*

## ভিক্খুবগ্‌গো (২৫)

১-২। চক্ষু শ্রবণ ঘ্রাণ সংযম উত্তম তারে বলি,
উত্তম যদি রসনা ও বাকে সংযত করে চলি,
উত্তম অতি সংযম যার সকল বিষয় যুক্ত,
সর্ব বিষয়ে সংযত যিনি, সর্ব দুঃখ মুক্ত।

৩। হস্ত যে জন সংযত রাখে, পদে সংযম যাঁর,
ভাষণ যাঁহার সংযত সদা শ্রেষ্ঠ আসন তাঁর।
একাচারী সেই ধ্যানপরায়ণ হৃষ্টচিত্ত যাঁরা,
জগতের মাঝে ভিক্ষু নামেতে অভিহিত হন তাঁরা।

৪। মন্ত্রভাণী যে সুস্থির সদা সংযত বাক্ যাঁর,
বর্ণিতে পারে অর্থ, ধর্ম মধুর ভাষণ তাঁর।

৫। ধর্মে চিন্তি, ধর্মানুসারী, ধর্মানন্দেপ্লুত,
ধর্ম-সাধক, সদ্ধর্মেতে নাহি হন বিচ্যুত।

৬-৭। আপনার লাভে অবহেলা যার পরবস্তুতে লোভ,
সমাধি না পায় চিত্তে তাহার জাগি রহে বিক্ষোভ।
আপনার লাভে না করে যে হেলা পবিত্রজীবী ভবে,
নিরলস সেই ভিক্ষু সতত দেব-সম্মান লভে।

৮। মমতা নাহিকো নামরূপে যাঁর বিনাশে না জাগে শোক,
অহংশূন্য প্রকৃত ভিক্ষু বলে তাঁরে সব লোক।

৯। বুদ্ধ-শাসনে প্রসন্ন যিনি মিত্র ভাবনা যাঁর,
লভেন সেজন নির্বাণসুখ বিনাশি সংস্কার।

১০-১৭। দেহ-নৌকারে সিক্ত করিয়া লঘু কর তার গতি,
রাগদ্বেষ আদি ছিন্ন করিলে নির্বাণে হবে মতি।
পঞ্চ বিনয়ে ছিঁড়িয়া, ছাড়িয়া, ভাবিয়া যে জন চলে,
পঞ্চ বাঁধন অতীত জনেরে 'ওঘত্তীর্ণ' বলে।
প্রমাদের বশে আসিও না কভু ধ্যানেতে থাকিও মগ্ন,—
চিত্তে তোমার বাসনা-বহ্নি কভু না হইবে লগ্ন।
গ্রাসিও না কভু তপ্ত লৌহ—রাগদ্বেষ আদি পাপ,
সন্তাপে-জ্বলি 'হায় দুখ,' বলি না করিও অনুতাপ।
প্রজ্ঞাহীনের নাহি কোনো বোধ নাহি কো মনন ধ্যানে,
ধ্যানী ও প্রাজ্ঞ প্রশান্তচিত্তে রত হন নির্বাণে।
শূন্য আগারে প্রবেশি ভিক্ষু শান্ত চিত্ত হন,
প্রীত অন্তরে দেখেন সকল ধর্ম-বিদর্শন।
ইন্দ্রিয়জয়ী তুষ্ট চিত্তে শীলতা পালন করে,
ইহাই প্রথম করণীয় কাজ প্রজ্ঞাবানের তরে।

১৮। লতিকা যেমন বর্জন করে বিশুষ্ক যুঁই ফুল,
বর্জন করে রাগবিদ্বেষ তেমনি ভিক্ষুকুল।

১৯।

২০। আপনারে কর আপনি প্রশ্ন, আপনা পরখ কর,
আত্মগুপ্ত, স্মৃতিমান হয়ে মহাসুখে কাল হর।

২১। আপনিই তুমি আপনার প্রভু আপনারই আশ্রয়,
বণিকের ঘোড়া দমনের মতো আপনারে কর জয়।

২২।

২৩। *ভিক্ষু যে জন তরুণ বয়সে বুদ্ধ শাসনে আসে,*
*মেঘবিমুক্ত চন্দ্রের মতো ধরণীরে উদ্ভাসে।*

## ব্রাহ্মণবগ্‌গো (২৬)

১। ব্রাহ্মণ; তুমি পার হও স্রোত কামনারে কর জয়,
ব্রাহ্মণ, তব অজ্ঞাত নহে সংসারে যত ক্ষয়।।

২। ব্রাহ্মণ যবে দ্বিবিধ কর্মে পারদর্শিতা লভে,
বন্ধনরাশি জ্ঞাত সারে তার তখনি ছিন্ন হবে।।

৩-৪।

৫। আদিত্য যথা প্রজ্বল দিনে, নিশিতে চন্দ্র ভাতে,
নৃপ শোভা পায় বর্ম পরিয়া অস্ত্র শস্ত্র হাতে।—
ধ্যানে ব্রাহ্মণ আলোকিত হন, তথাগত মহামতি,
আপনার বলে দিবস রজনী প্রদীপ্ত তাঁর জ্যোতি।।

৬।

৭-৮।

৯। কায় মনবাক তিনে সংযত দুষ্কৃতিহীন যিনি,—
সুকর্মে রত, ব্রাহ্মণ বলি পরিচিত হন তিনি।।

১০।

১১। জটা ও গোত্র কিংবা জাতিতে ব্রাহ্মণ নাহি হয়
প্রতিষ্ঠা যাঁর সত্য ধর্মে, তাঁরে ব্রাহ্মণ কয়।।

১২। কী লাভ পরিয়া মৃগের চর্ম, কী লাভ ধরিয়া জটা।
ভরা আছে বিষ অন্তরে তব, বৃথা বাহিরের ঘটা ॥

১৩।

১৪। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম যাহার, মাতা যার ব্রাহ্মণী,—
পাপ যার মনে কভু সেই জনে ব্রাহ্মণ নাহি গণি।
আসক্তিহীন কলুষ শূন্য যে জন সতত থাকে,
অবিদ্যারাশি বিদূরিত যাঁর ব্রাহ্মণ বলি তাঁকে ॥

১৫। ছিন্ন যাঁহার বন্ধন রাশি শঙ্কাশূন্য চিত
আসক্তিহীন, ব্রাহ্মণ নামে তিনি হন পরিচিত।

১৬। তৃষ্ণা বর্জি, পরিতাপ, ক্রোধ, মিথ্যা দৃষ্টি ছাড়ি,
অবিদ্যাভেদি যে জানে সত্য ব্রাহ্মণ নাম তাঁর-ই ॥

১৭। সহিষ্ণু যিনি, বধ-আক্রোশ-বন্ধন আদি সহি,
ক্ষমাগুণধারী, ক্ষমার আধার, ব্রাহ্মণ তাঁরে কহি।

১৮।

১৯। সূচের মুখেতে সরিষা যেমন পদ্মপাতাতে বারি,
কামনায় যিনি লিপ্ত না হন ব্রাহ্মণ নাম তাঁরই।

২০। দুঃখ, ক্ষয়ের হেতু যেই জন ইহজনমেই জানে,
সেই বিমুক্ত ভারহীনে সবে ব্রাহ্মণ বলি মানে।

২১-৩১।

৪০। বৃষভ তুল্য প্রবর যে জন মহর্ষি, মারজিৎ,
নিষ্পাপ, ধীর বুদ্ধ তিনি যে ব্রাহ্মণ নিশ্চিৎ।

৪১। দিব্য চোখেতে দেখে যেই জন, স্মৃতি যার উজ্জ্বল,
স্বর্গ-নরক দর্শিয়া নাশে পূর্বজন্মফল,
অভিজ্ঞ যিনি, ধর্মে সতত সম্যক্ রূপে জানি,
পূর্ণতা লভে ব্রহ্মচর্যে, তারে ব্রাহ্মণ মানি।

অনুবাদক—রামপ্রসাদ সেন

# আবিষ্কার

( তোগোহিকো কাগাওয়া )

নূতন কিছু আবিষ্কারের ভাগ্য আমার নেই,
যেমন বিরাট বিমান—
রূপালী দুই পাখায় করে ভর,
উড়ে বেড়ায় দিল্‌দরিয়া শূন্যেই!
কারণ আমি স্বয়ং নির্ভর।

কিন্তু হঠাৎ ভোরবেলাতে—
আজব রকম চিন্তা পেলাম ;
আমার মগজেতে।
দেখতে পেলাম আমার চোখের 'পর,
পোষাকখানা উঠলো হয়ে আচম্‌কা সুন্দর—
আকাশ হতে পড়লো ঝরে আলোরই নির্ঝর।

চিন্তাটা যে এই ;
বিরাট গোপন কল্পনা এক,
লুকিয়ে আছে আমার বাহুতেই।
আর আমার হাতদুটি খুব বড়
এমন চিন্তার জন্যেই।

বিধাতা খুব রসিক
যিনি আমার হাতেই করেন বাস
তথাপি অদৃশ্য।
উদ্‌ঘাটিত তার কাছে এই
গুপ্ত রহস্য।

কারণ তিনি, আমার হাতের দ্বারা
করেন একাই এই দুনিয়ার
সমস্ত কাজ সারা।

অনুবাদ—ভাস্কর দাশগুপ্ত

# দেখা

করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটুখানি আকাশ দেখি বন্ধ ঘরে ব'সে
একটি অশথ দাঁড়িয়ে যে ঐ ডাল পালা তার মেলে
একটি কুটীর ও-গাছতলায় রঙ গেছে তার খ'সে
বহুকালের, আহ্বান কি জানায় হৃদয় ঢেলে?

অতটুকু দেখা আকাশ বিরাট গগনের
সাথে যে যোগ বন্ধ ঘরে দেখা নাহি যায়,
কুটীর দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে মূর্ত লগনের
ছোট্ট ছেলে কী রূপ দেখে আনন্দগান গায়।

আশে পাশের সকল দৃশ্য মিলিয়ে গেল বুঝি
শুধু জাগে আকাশ, তরু, কুটীর, বালক হেরি
অবসর যে ভরল কিসে ভেবে না পাই খুঁজি
মনানন্দ উদ্ভাসিত আমার সকল ঘেরি

বিশ্বরূপের একটু দেখা একটু অনুভব
ক্ষণে ক্ষণে জীবন-দ্বারে যখন দাঁড়ায় আসি'
বেদনাভরা হৃদয় মাঝে যত ব্যথা সব
ভুলিয়ে দিয়ে আলোই শুধু চক্ষে ওঠে ভাসি' ॥

## ॥ সাহিত্যাচার্য ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাবলী ॥

( ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত )

S. Chatterji
D. A. G's Office, Rangoon.
[ জানুয়ারি ১৯১৩ ]

*ফণীবাবু,—আপনাদের সম্বাদ কি? সদাসর্ব্বদা চিঠি দিতে ভুলবেন না। আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি করব। উপীন কোথায়? ভবানীপুরে কবে আসবে? আমাকে 'চন্দ্রনাথ' কবে পাঠাবে? আমাকে আপনি যা করতে হবে বলবেন। না বললে আমার দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ হবে না। এসে পর্য্যন্ত আমি আমাশা ও জ্বরে ভুগচি না হ'লে এতদিনে হয়ত কিছু লিখতাম। যা হোক একটা চিঠি দেবেন। সৌরীনকে আমার কথা মনে করিয়ে দিবেন। শরৎ*

রেঙ্গুন, [ মাঘ ] ১৯১৩

প্রিয় ফণীন্দ্রবাবু,—'রামের সুমতি' গল্পটার শেষ পাঠালাম, এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে, বোধ করি একবারে প্রকাশ হ'তে পারবে না, কিন্তু হ'লে ভাল হয়। একটু ছোট টাইপে ছাপালে এবং দুই-একখানা পাতা বেশী দিলে হ'তে পারে। ছোট গল্প, খণ্ডশঃ প্রকাশ করায় তেমন সুবিধা হয় না, বিশেষ আপনার কাগজের এখন একটু পসার হওয়া উচিত। যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে, তবে আশা করি দু-এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতি মাসেই গল্প ( ছোট করে ১০।১২ পাতার মধ্যে ) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই, কেন না, আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।...

আগামী বারে গল্প যাতে ছোট হয় সেদিকে চোখ রাখব। আর এক কথা আপনি সমাজপতির সহিত সদ্ভাব রাখবেন। তাঁর কাগজে যদি আপনার কাগজের একটু-আধটু আলোচনা থাকতে পায় সুবিধা হয়। এবারের সাহিত্যে আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তা হলেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলায় অনেক লেখে সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেচেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েছেন। যদি উপীনকে চিঠি লেখেন এই অনুরোধটা জানাবেন যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ হয়। আবশ্যক হ'লে গল্প আমি ঢের লিখতে পারি—আপনার কাগজ ত একফোঁটা, ওরকম ৩।৪ গুণ কাগজও একলা ভরে দিতে পারি। তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধে আছে। গল্প ছাড়া সমস্ত রকম subject নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে লিখবেন। যে কোন subject—তাতেই আমি স্বীকার আছি। *'রামের সুমতি' ক'বারে ছাপাবেন, কিম্বা একেবারে ছাপাবেন আমাকে লিখে জানাবেন। তা হ'লে চৈত্রের জন্য আর লিখবার আবশ্যক হবে না।*

*চরিত্রহীন প্রায় সমাধার দিকে পৌঁছেচে। তবে সকালবেলা ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারিনে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে পড়ি।...*

আর একটা কথা—আপনি যমুনা ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়। এই ধরুন চৈত্রের জন্য যে সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে—একটু নির্ব্বাচন করে দিতেও পারি। পৌষের যমুনা বড় ভাল হয়নি। শেষের গল্পটা সুবিধের নয়। অবশ্য এতে খরচ আপনার পড়বে ( ডাকটিকিট ) কিন্তু কাগজ ভাল হয়ে দাঁড়াবে। আমার এদিক থেকে ফেরৎ পাঠাবার খরচ আমি দেব, কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডাকে পাঠালে আমি একটু দেখে দিই এমনি ইচ্ছে করে। আগেই বলেছি আমি শুধু গল্পই লিখিনে। সব রকমই পারি শুধু পদ্য পারিনে। আচ্ছা আপনি সৌরীনবাবুকে দিয়ে, কিম্বা উপীন, সুরেন, গিরীনকে দিয়ে নিরুপমা দেবীর রচনা—কবিতা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন না কেন? তাঁর বড় ভাই বিভূতিকে বোধ করি আপনিও চেনেন। তাঁকে লিখলে নিরুপমার রচনা ( রচনা না হয় কবিতা ) বোধ করি পেতেও পারেন। অনেকের চেয়ে তাঁর কবিতা এবং রচনা ভাল।

আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় ক'রব। কথা দিয়েছি সেই মত কাজও ক'রব। সাহিত্যের মধ্যে যতটা নীচতাই প্রবেশ করুক না, এদিকে এখনও এসে পৌঁছায়নি। তা ছাড়া এ আমার পেশা নয়; আমি পেশাদার লিখিয়ে নই এবং কোন দিন হতেও চাই না।

আমি একটু কাছে থাকিতে পারিলে আপনার সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু এদেশ আমি বোধ করি কোন মতেই ছাড়তে পারব না। আমি বেশ আছি, অনর্থক মুস্কিলের মধ্যে যেতে চাই না এবং যাবও না। আমার কথা এই পর্য্যন্ত—

আগামী বৎসর থেকে আপনি কাগজখানা যদি একটু বড় করতে পারেন, কিছু মূল্য বৃদ্ধি করে, সে চেষ্টা করবেন। প্রতি সংখ্যায় পড়বার উপযুক্ত জিনিষ থাকবে এ কথা প্রকাশ করে জানাবেন। সেই জন্যেই বলি গল্পগুলো এক সংখ্যাতেই প্রকাশ করা ভাল—একটু ক্ষতি স্বীকার করেও তাতে অনেকটা advertisement-এর মত হবে।

উপেন আমাকে অনেকবার লিখলে যে 'চন্দ্রনাথ' পাঠাচ্চে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্চে না তাই। তবে আপনি যদি 'চন্দ্রনাথটা' ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন ক'রে লিখে দেব। ভবানীপুরে সৌরীনের মুখে জিনিষটা যে কি শুনে নিয়েছি। আমার কতক মনেও পড়েচে—সুতরাং নূতন করে লিখে দেওয়া বোধ করি শক্ত হবে না। আপনি যদি এই রকম নূতন লেখা চান আমাকে জানাবেন।···আঃ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেঙ্গুন, ১২।২।১৩

প্রিয় ফণীবাবু,—এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। ১ম কথা—'বঙ্গবাসী'র ক্রোড়পত্র প্রভৃতি করে অর্থশূন্য বাজে খরচ ভাল হয় নাই। আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাগজের মধ্যে যদি ভাল জিনিষ থাকে দুদিনে হোক দশ দিনে হোক সে কথা আপনি প্রচার হয়ে যাবে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আপনার কোন ভয় নেই। ক্যানভাস করে গ্রাহক যোগাড় করা, ক্রোড়পত্র দিয়ে টাকা নষ্ট করার চেয়ে ঢের ভাল।

২য় কথা—'রামের সুমতি' ছোট টাইপে ছাপিয়ে একেবারে বার করতে পারলেই বড় ভাল হোতো—কেন না, এ রকম ছোট ধরণের গল্প "ক্রমশঃ" বড় সুবিধে হয় না। যা হোক যখন হয়নি তার জন্যে আলোচনা বৃথা। আমি দু-একদিনের মধ্যে আর একটা গল্প পাঠাব (আপনার জবাব পেলে পাঠাব), এ গল্পটা আমার বিবেচনায় 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভাল। তবে দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় ঐ রকম বড় হয়ে পড়চে। এত চেষ্টা করেও ছোট করা গেল না। ভবিষ্যতে চেষ্টা করে দেখি কি হয়।

৩য় কথা—'চন্দ্রনাথ' নিয়ে কি একটা বোধ করি হাঙ্গামা আছে। তাই বলি ওতে আর কাজ নেই। 'চরিত্রহীন' বার করা যাবে। অবশ্য সেজন্য কাগজ কিছু বড় করা চাই—কিন্তু মূল্য কত এবং কবে থেকে বাড়াবেন এটা লিখবেন। দাম না বাড়ালে কিছুতেই কাগজ বড় করে গচ্ছা দেওয়া উচিত নয়।

৪র্থ কথা—সমাজপতির সঙ্গে অসদ্ভাব করবেন না এইটাই বলেচি, তাকে খোসামোদ করতে বলিনি। ফণীবাবু আপনার দোকানের মাল যদি খাঁটি হয়, একদিন পরে হোক পাঁচ দিন পরে হোক খদ্দের জুটবে। মাল ভাল না হলে হাজার চেষ্টাতেও দোকান চলবে না—দু'চার দিনে হোক মাসে হোক ফেল হ'তে হবে।

আমার ছেলেবেলার ছাইপাঁশ ছাপিয়ে আমাকে যে কত লজ্জা দেওয়া হচ্চে এবং আমার প্রতি কত অন্যায় করা হচ্চে তা আমি লিখে জানাতে পারিনে। সমাজপতি সমজদার লোক হয়ে কেমন করে যে ঐ ছাই ছাপালেন আশ্চর্য্য!

৫ম কথা—সৌরীনবাবুর সঙ্গে আপনার আজকাল মিল কেমন? তিনি আমার দিদির লেখা সমালোচনাটা দেখেছেন কি? বোধ হয় খুব রাগ করেচেন না? কিন্তু আমার দোষ কি? যিনি লিখেচেন তিনিই দায়ী। তা ছাড়া এসব লেখা ছোট টাইপে ছেপেচেন ত?

৬ষ্ঠ কথা—আমার নূতন গল্পটা (যেটা দু' একদিনের মধ্যেই পাঠাব) কোন্ মাসে ছাপাবেন? চৈত্রে 'রামের সুমতি' শেষ হবে, সুতরাং সে মাসে আর কাজ নেই, বৈশাখে দেবেন। কিন্তু যাতেই দিন, ছোট টাইপে ছাপালে কম জায়গা লাগবে, অথচ গ্রাহক অনেকটা জিনিষ পড়তে পাবে।

৭ম কথা—বৈশাখ থেকে কাগজখানি যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ছবির পেছনে মেলাই কতগুলো টাকা নষ্ট না করে, ঐ টাকা যাতে অন্য কোন রকমে কাগজের পেছনে লাগান যায় তাই ভাল। অবশ্য আমি জানি না, গ্রাহক ছবি চায় কি না, যদি ঐ ফ্যাসান হয় তাহলে নিশ্চয় দিতে হবে। আপনি আমাকে প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি selection-এর মধ্যে একটু স্থান দিলে এই ভাল হয় যে, আমিও দেখে-শুনে দিতে পারি। খাতিরে পড়ে ছাই মাটি দেওয়া কিম্বা 'নাম' দেখে ছাই মাটি দেওয়া দুই মন্দ।

৮ম কথা—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী যদি তাঁর লেখা দয়া করে আপনাকে দেন, সে ত নিশ্চয়ই ভাল, তাঁর কবিতা লেখবার ক্ষমতাও খুব বেশী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর লেখা বোধ করি পাওয়া দুঃসাধ্য। তিনি ভারতীতে লেখেন আপনার এতে লিখবেন কি না বলা যায় না। লিখলেও হয়ত অশ্রদ্ধা করে যা-তা লিখবেন। এঁরা সব বড় লেখিকা, এঁদের হয়ত যমুনার মত ছোট কাগজে লিখতে প্রবৃত্তি হবে না। তবে একটু চেষ্টা করে দেখবেন। পাওয়া যায় ভালই না যায় সেও ভাল।

আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো।

বড় গল্প—অনুপমা।

সমস্তই এক নামে হলে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।

আমার এখানে একজন বন্ধু আছেন তাঁর নাম প্রফুল্ল লাহিড়ী B.A. তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক। প্রবন্ধ লেখেন খুব ভাল, অবশ্য নাম নাই, কেন না কোন মাসিক পত্রের লেখক নন। আমি এঁকে অনুরোধ করেছি—আমাদের যমুনার জন্য লিখতে। লেখা পেলে আমি পাঠিয়ে দেব।

অসুবিধা এই, যমুনা আকারে ছোট। বেশী প্রয়াস এতে চলে না। দামও কম। হঠাৎ দাম বাড়াবার চেষ্টা কি রকম সফল হবে বলা যায় না। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, কিছুদিন পরে, অর্থাৎ আশ্বিন মাস থেকে (গ্রাহকের মত নিয়ে এবং প্রমাণ করে যে তাঁহারা বেশী দাম দিলেও ঠকবেন না—) মূল্য এবং আকারে আরও বড় করলে কি হয় না? আপনি নিজে একটু ঢিলা লোক, কিন্তু সে রকম হলে চলবে না। রীতিমত কাজ করা চাই। আপনি যখন আর অন্য কিছু করবেন না মতলব করেচেন, তখন এই জিনিষটাকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখবার চেষ্টা করবেন। এবং যাকে 'বিষয়বুদ্ধি' বলে, তাও অবহেলা করবেন না। আপনি আমাকে পুরুষ লেখকদের সমালোচনা লিখতে বলেছেন কিন্তু আমার বাঙ্গলা বই নাই। মাসিক পত্রও একটাও লই না—আমি কোথায় কি পাব যে সমালোচনা লিখব। লিখলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিশ্চয় এবং একটা বাদানুবাদ হবার উপক্রম হয়। আমি এটা জানি যদি তাই হয়,

তাহলেও চিন্তার কথা কিছু নাই—আমার সমালোচনায় ভুল থাকে আর তা যদি প্রমাণ করতে পারেন (পারা শক্ত যদিও) সেও ভাল কথা।

এইখানে আমার আর একটা বলবার জিনিষ আছে। আমার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হচ্চে। সমস্ত সকালটা কোন দিন বা আপনার জন্য কোন দিন বা চরিত্রহীনের জন্য নষ্ট হচ্চে। রাত্রিটা অবশ্য পড়তে পাই, কিন্তু নোট করা প্রভৃতি হয়ে উঠচে না। আর একটা কথা আমি কয়েক দিন ধরে ভাবছি—এক একবার ইচ্ছা করে, H. Spencer-এর সমস্ত Synthetic Philo: একটা বাঙ্গলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher যাঁরা Spencer-এর শত্রু মিত্র তাঁহাদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়—কি করি বলুন ত? যদি আপনার কাগজে স্থান না হয় (হওয়া সম্ভব নয়) অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করে এ রকম জোগাড় করে দিতে পারেন কি?

আপনি আমাকে সর্ব্বদা চিঠি লিখবেন। না লিখলে আমারও যেন আর তেমন চাড় থাকে না। এটাও একটা কাজ বলে মনে করবেন। লেখা Registery করেই পাঠাব। খরচ আপনি দেবেন কেন? আমার অত দৈন্য দশা নয় যে এর জন্যে খরচ নিতে হবে। এসব কথা আর লিখবেন না।

আশীর্ব্বাদ করি আপনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—সেই আমার পারিতোষিক হবে।

চন্দ্রনাথ আর চাইবেন না। যদি দরকার হয় আমি আবার লিখে দেব। সে লেখা ভাল বই মন্দ হবে না।

আমার তিন রকমের নাম গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? বোধ করি এতে সুবিধে হবে। এক নামে বেশী লেখা ভাল নয়, না?

উপেন কি বলে? সে ত চিঠিপত্র লেখবার লোক নয়। সে থাকলে ঢের সুবিধে ছিল—না থাকে বোধ করি বেশ অসুবিধে হচ্চে। সে লোকটার আপনার প্রতি ভারী স্নেহ ছিল—যদি তার নিকট থেকে কাজ আদায় করতে পারেন সে চেষ্টা ছাড়বেন না।

যাই হোক আর যেমনই হোক ব্যস্তও হবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না।... আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।

আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home, সত্যি না? একটু শীঘ্র জবাব দেবেন। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি শরৎচন্দ্র চট্টো।

[ চৈত্র ১৩১৯ ]

প্রিয় ফণীবাবু,—আপনার প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠাইয়াছি। প্রবন্ধ দুটি মন্দ নয় দেওয়া চলে, 'চক্ষু' সম্বন্ধে প্রবন্ধটা বেশ।

চন্দ্রনাথ লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির এক শেষ। তাহারা চন্দ্রনাথ দিবে না, এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে, নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবে। আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমার পুরাণ লেখা যেমন আছে তেমনিই প্রকাশ হয়। অনেক ভুল-ভ্রান্তি আছে সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে অন্যথা নিশ্চয় নয়। এক কাশীনাথ লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি—আবার যে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই আমার ইচ্ছা নয়। তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলেচ্ছাই করিয়াছেন কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্ধ থাক। চরিত্রহীন জ্যৈষ্ঠ থেকে সুরু করুন। আর যদি চন্দ্রনাথ বৈশাখে সুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকীটা পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি করিতেই হইবে। বৈশাখে কতটুকু বাহির হইয়াছে দেখিতে পাইলে আমি বাকীটা হাতে না পাইলেও খানিকটা খানিকটা করিয়া লিখিয়া দিব। যদি বৈশাখে ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলে চরিত্রহীন ছাপা হইবে।

আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ কেহ সম্মানের লোভ কেহ বা দুইই কেহ বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

আপনি দয়া করিয়া এই ঠিকানায় ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ যমুনা পাঠান B. Promathanath Bhattacharji. 19, Jugal Kisore Das Lane, Calcutta.

নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভাল। এবং বাজারে নাম আছে। অনেক সময়ে এবং বেশী ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল বলেই আমার মনে হয়। এর মধ্যে মানসীর শ্রীযুক্ত ফকিরবাবুর সহিত যদি দেখা হয় বলিবেন তাঁর পত্র পাইয়াছি এবং শীঘ্র উত্তর দিব। আমারও জ্বর এইজন্য পত্র দিতে পারিতেছি না—শীঘ্র দিব।

আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কতদিন শ্রাদ্ধ "সাহিত্য" কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথের' অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয় উপীন বেচারার বোধ হয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে এইজন্যই কোন মতে সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি, আরও ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছে নাকি? যদি থাকে ত হলেই সারা হব দেখচি। আরও একটা আপনাকে বলি। সেদিন গিরীনের পত্র পাই—তাঁহাদের সহিত উপীনের 'চন্দ্রনাথ' লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাটাতে এবং কাশীনাথের সাহিত্যে প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা চন্দ্রনাথ দিতে সম্মত নন। তাঁরা আমার লেখাকে বড় ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালারা ওটা হাতে পায় এইজন্য সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মৎলব করিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে আমাকে চিঠি লিখিয়া কিম্বা তার দিয়া জানান 'yes' or 'no' আমি তার পরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব। এই বলিয়া অনুরোধ করিব যে আর উপায় নাই দিতেই হইবে। যদি ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কেন না চরিত্রহীন ছাপা হইতে পারিবে।

আমাকে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাবেন। অন্যান্য আপনিই দেখিয়া দিবেন। যা তা গল্প ছাপা নয় অন্তত: হাত থাকিতে ছাপা না। হয় এই আমার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতেছি (কাজের মধ্যেই) সেইজন্য সব কথা তলাইয়া ভাবিতে পারিতেছি না, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই জানিবেন।

জ্যৈষ্ঠের জন্য যাহা পাঠাইব তাহা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইব। শুধু 'চন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ওটা কেমন গল্প কি রকম লেখার প্রণালী না জেনে প্রকাশ করা উচিত নয় বলে ভয় হচ্চে। যা হোক অতি শীঘ্র এ বিষয়ে সংবাদ পাবার আশায় রইলাম।

ভাল নই—জ্বরোভাব কাল রাত্র থেকেই হয়ে আছে। না বাড়লেই ভাল। আপনার দেহ কেমন? জ্বর সারল? ইতি আপনাদের স্নেহের শরৎ।

# বিধানচন্দ্র রায়ের মহাপ্রয়াণে

## শ্রীবিনয়ভূষণ মিত্র

জন্ম লগন উৎসবে আজ বাজে বোধনের বাঁশী
বিসর্জনের করুণ কান্না সহসা উঠিল ভাসি।
অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা দিবাকর ম্রিয়মাণ,
নাই-নাই-নাই বিধানচন্দ্র হয়েছে মহাপ্রয়াণ,
ঘোর অমানিশা নামে বাঙলায় ভারত অন্ধকার,
"ভারত রত্ন" কোথা ডুবে গেলে দিকে দিকে হাহাকার
দামোদর নদ সোনার ফসলে তীরে তীরে ভ'রে ওঠে,
ময়ূরাক্ষীর নির্মল জলে সোনার কমল ফোটে।
বিজলী ছটায় গ্রাম জনপদ পথে প্রান্তরে আলো,
জীবনে সাধনা ছিল সুমহান, দেশেরে বাসিলে ভালো,
দুহিতা তোমার "কল্যাণী" যেন নব যৌবন ভারে
কথ দুহিতা হরিণঘাটায় শত সম্পদে বাড়ে।

দুর্গাপুরের লৌহনগরী তোমার হাতের গড়া,
কর্ম জীবনে ছিলে হে অজেয় "দুর্জ্ঞেয়" দিল ধরা।
দেশের মাটিতে দিকে দিকে তব হাতের আলিম্পনা।
আরো আছে কত গোপনে নিরালা জানে তাহা কয় জনা!
ভাসায়ে দেশেরে অশ্রুসায়রে কোথা গেছ তুমি চলি,
মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মা তোমার লহ লহ অঞ্জলি।

জলধির সম গভীর হৃদয় জ্ঞানের রত্নাকর,
চির নির্ভীক ত্যাগে গরীয়ান, দীপ্তিতে ভাস্বর।
আপনার তরে, ছিল অবারিত তোমার গৃহের দ্বার,
অগণিত কত প্রার্থী আতুর সুযোগ পেয়েছে তার।
নিরাময়ে তুমি ছিলে যাদুকর মানুষের কল্যাণে,
কত মুমূর্ষু জীবন ল'ভেছে তব অমৃত পানে।

ভারতের তুমি ছিলে ভগীরথ তোমার শংখ রবে,
প্লাবন জেগেছে গঙ্গার বুকে তীরেতে বনোৎসবে।
"দেশমাতৃকা" দিয়েছিল ডাক স্বাধীনতা সংগ্রামে,
বীর সৈনিক চলেছো সমুখে হৃদয় রক্তদানে।
পরাজয় কভু মাননি কো তুমি শত সে নির্যাতনে,
দেশবন্ধুর সহচররূপে প্রতিটি আন্দোলনে—
ঝাঁপ দিয়েছিলে গুরুদায়িত্ব আপনার শিরে বহি,
নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান করি কত না ঝঞ্ঝা সহি।
ভাসায়ে দেশেরে অশ্রুসায়রে কোথা গেছ তুমি চলি,
মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মা তোমার লহ লহ অঞ্জলি।

কলিকাতা এই মহানগরীর গ্লানিরাশি শুধু কালো—
কোটি নরনারী নবদিগন্তে দেখেছিল সবে আলো
শিশুদের মুখে হাসি উচ্ছ্বাস কিশোরের বুকে আশা,
যুবার কণ্ঠে জয়গানে যেন আ মরি বাংলা ভাষা!
কৃষি ও শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মের সুরে সুরে,
যেন বসন্তে প্রাণের চিহ্ন আকাশ মেদিনী জুড়ে।
বিপর্যয়ের বৈশাখী মেয়ে বাংলার হাল ধরি—
তীরে বারবার ভিড়াইলে তরী প্রাণ তব পণ করি,
সহসা অশনি প্রপাতে যেন রে ভারত মুহ্যমান,
বিধানচন্দ্র নাই ওরে নাই, সব ফিরে অবসান!
বুকে বুকে মহাশোকের বন্যা, নয়নে অশ্রুরাশি
কণ্ঠে কণ্ঠে ক্রন্দনরোল ওঠে যেন উচ্ছ্বাসি।
দীঘা সৈকতে "ভারত সাগর" ক্রন্দন ভারাতুর—
"ভারত রত্নে" শত তরঙ্গে খোঁজে কোথা কতদূর!
ধুধুলিয়া ওই যক্ষ্মা-নিলয়ে ক্ষয়-ক্ষতি ব্যথা ছাপি,
অমঙ্গলের শঙ্কায় যেন ভিত্তি উঠিছে কাঁপি।
দিকে দিকে কত বন অরণ্য সবুজ বলয় নিয়া,
অশুভ চিহ্নে কাঁপিতেছে যেন উঠিছে মর্মরিয়া।
যেথা থাক তুমি দাও সাড়া দাও জ্যোছনায় উজ্জ্বলি,
মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মা তোমার লহ লহ অঞ্জলি।
করুণায় ছিল বিগলিত প্রাণ নিষ্ঠায় অবিচল,
বজ্রের সাথে বারিধারা যেন গোমুখীর হিমাচল।
সকল দ্বন্দ্ব মিলন সূত্রে তোমাতে পেয়েছে ঠাঁই,
বুঝিয়াছে হায় দেশের মানুষ যবে তুমি আজ নাই।
তুমি যে ধীমান মানব প্রেমিক, আর্তের দরদিয়া —
দুখের আগুনে আপনি দহিয়া উদিলে দীপ্তি নিয়া।
পঞ্চরথীর তুমি শেষ রথী সাধিয়া আপন কাজ,
অমরাপুরীতে মহা নিদ্রায় বিশ্রাম নিলে আজ।
মর্ত্যে আমরা আর্তের দল দিশেহারা হয়ে কাঁদি,
শূন্য আসনে কেহ নাই, নাই, কেমনে পরাণ বাঁধি
নামহীন ছিনু ধূলার মানুষ তোমা হতে বহু দূর,
অনন্তে মিশে অন্তরে দিলে মহামিলনের সুর।
সুরে ভেসে আসে বিধির বিধান সকলি যে নশ্বর,
অনিত্য মাঝে নিত্য শুধুই "মহাপ্রাণ" ধরা পর।
মেনে তবু হায় মানে না পরাণ কোথা গেছ তুমি চলি,
মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মা তোমার লহ লহ অঞ্জলি।

# জঁা-পল সার্ত্র

সুনীলকুমার নাগ

দার্শনিক চিন্তার জন্য আজ অবধি পৃথিবীতে মানুষ যতো সময় এবং শক্তি ব্যয় করেছে, খুব সম্ভব জ্ঞান-বিজ্ঞানের আর কোন বিভাগ সম্পর্কেই ততোটা করে নি। যে বিজ্ঞানের আজ এতো জয় জয়কার চারদিকে, বলতে গেলে তার বয়স মাত্র কয়েক শ' বছর। কিন্তু মানুষের দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিলো কয়েক হাজার বছর আগে। ভারতবর্ষ, চীন, মিশর; তারপর গ্রীস এবং গ্রীস থেকে ক্রমে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে দার্শনিক চিন্তার প্রসার ঘটেছে। যদিও বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধরণের দার্শনিক মতের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে এর মূল প্রকৃতিটা প্রায় সর্বত্রই এক। সে হ'লো বিশ্বচরাচরের চরম এবং পরম সত্য কথাটা বলে দেওয়ার জন্য একটা তীব্র প্রবণতা। দার্শনিক লক্ষণযুক্ত ভাব ধারণার এইটেই হ'লো গোড়ার কথা। বলাই বাহুল্য, এই চরম এবং পরম সত্য সম্পর্কে কদাচিৎ দু'জন প্রথম সারির দর্শনবেত্তাকে একমত হতে দেখা গেছে। ফলে, সভ্যতা ক্রমবিকাশের সাথে সাথে শিক্ষার যতো প্রসার হয়েছে, দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ মানুষের সংখ্যা যতো বেড়েছে, দার্শনিক মতের সংখ্যাও প্রায় সেই হারেই বেড়েছে। ভাববাদী এবং বস্তুবাদী— সমস্ত দার্শনিক চিন্তাকে এই দু'টোর কোনো একটা দলভুক্ত করে ফেলার যে সহজ পদ্ধতি এক শ' বছর আগেও চালু ছিলো, মনে হয় আজকের দিনে তা আর কার্যকরী নয়। তার কারণ একদিকে, পুরনো ধরনের দার্শনিকের মতের বিভিন্ন মৌলিক শাখা প্রশাখাগুলির বিভ্রান্তিকর জটিলতা এবং আর একদিকে মূলতঃ বিজ্ঞানাশ্রয়ী দর্শন চিন্তার প্রসার। তারপরে আর এক সমস্যা, এবং হয়তো সব চেয়ে বড় সমস্যা হ'লো 'ঈশ্বর'। 'ভগবান' আছেন কি নেই এ প্রশ্নটা বহু পুরনো হ'লেও এর কোনো সর্ববাদীসম্মত সমাধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

এ রকম বহু দার্শনিক আছেন যাঁদের কোনো মতেই বস্তুবাদী বলা যায় না অথচ শেষ পর্যন্ত ভগবান অস্বীকার করেছেন। আবার এ রকম দার্শনিকও আছেন যাঁরা বস্তুবাদী, কিন্তু ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বলাই বাহুল্য 'ভগবান' বলতেও সব দার্শনিক একটা নির্দিষ্ট কিছু কখনো স্বীকার করেন না। ভগবানের 'গুণ' সম্বন্ধেও মতের বিভিন্নতা কম বিভ্রান্তিকর নয়। যা'ই হ'ক, এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার স্থান এ নয়। আমরা বর্তমানে একটি মাত্র দার্শনিক মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো—সে হ'লো অস্তিত্ববাদ (Existentialisn); ফরাসী সাহিত্যিক জঁা-পল সার্ত্রকে বুঝতে হ'লে তাঁর দার্শনিক মত অর্থাৎ 'অস্তিত্ববাদ'-এর আলোচনা করতেই হবে। অনেকের কাছে ত' সার্ত্র শুধুই একজন দার্শনিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক বা সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তাঁর সৃষ্টিকে এঁরা মনে করেন তাঁর দার্শনিক মতেরই পরিপূরক মাত্র। কিন্তু এটা বোধ হয় ঠিক নয়। আসলে সার্ত্র যেমন একজন পুরাদস্তুর দার্শনিক তেমনি একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক। যে কোনো প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য স্রষ্টার রচনাতেই একটা জোরালো 'ভাবধারা' দেখা যায় এবং তাকে নিশ্চয়ই একটা দার্শনিক মত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সেক্সপীয়ার, গ্যয়টে, হুগো, ডষ্টয়েভস্কি এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনা মন্থন করে দেশ-বিদেশে একাধিক দর্শনের বই রচিত হয়েছে। এবং সে জন্য ওঁদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য নিশ্চয়ই বেড়েছে, কমেনি। তাই আমাদের মনে হয় একটা জোরালো দার্শনিক মত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে বলে সাহিত্যিক সার্ত্রের নাটক, গল্প ও উপন্যাসের মূল্যও বেড়েছে, কমেনি। দার্শনিক সার্ত্রের কথা হয়তো আগামী পঞ্চাশ বছর পরে মানুষের মনে না-ও থাকতে পারে—যদিও একাধিক পুরাদস্তুর দর্শনের বই উনি লিখেছেন; কিন্তু সাহিত্যিক সার্ত্র ইতোমধ্যেই বিশ্বসাহিত্যে নিজসত্তায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন বলা যায়—যে অল্প কয়েক বছর উনি সাহিত্যচর্চায় ব্যাপৃত আছেন, তার মধ্যেই এতোটা প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই ওঁর সাহিত্য-প্রতিভারই পরিচায়ক।

জাঁ-পল সার্ত্রে জন্মগ্রহণ করেন প্যারিসে (২১।৬।১৯০৫)। প্যারিসেই কাটে ওঁর ছেলেবেলা। একেবারে বাল্য বয়স থেকে কিছুটা ভাবুক প্রকৃতির সার্ত্রে প্যারিসের জীবন-যাত্রা থেকেই যেন পৃথিবীতে মানুষের জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। সব-কিছু বুঝবার জন্যই একটা উদগ্র বাসনা ওঁর মাষ্টার মশায়রা একেবারে ছেলেবেলাতেই লক্ষ্য করতেন—বলাই বাহুল্য, তার বেশির ভাগই তখন উনি বুঝতে পারতেন না এবং কে জানে আজকের মহাবিজ্ঞ সাতান্ন বছরের দার্শনিক সার্ত্রেও হয়তো বলবেন—যা বুঝেছি, তার মধ্যেও অনেক ভুল রয়ে গেছে, অর্থাৎ কিনা ঠিক ঠিক বুঝা হয়নি।

১৯৩০ সালে অর্থাৎ ঠিক পঁচিশ বছর বয়সে সার্ত্রে তাঁর কলেজের বাঁধাধরা পড়াশুনো শেষ করলেন। দর্শনশাস্ত্রে ওর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে অধ্যাপকেরা সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। সার্ত্রে নিজেই পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নিলেন। ওঁর মনে হ'লো মানুষ তৈরী করতে হলে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করা উচিত—তাই স্কুলের শিক্ষক হয়ে গেলেন তিনি।

চার বছরে পর পর তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করলেন সার্ত্রে। কিন্তু কোথাও আশার তেমন কিছু দেখতে পেলেন না—না প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে, না পড়ুয়াদের মধ্যে, তার ওপর রয়েছে নিজের ভেতরের অস্থিরতা—সব কিছু জেনে ফেলবার বুঝে ফেলবার জন্য একটা তীব্র আগ্রহ। চার বছর এইভাবে কাটবার পরে সার্ত্রে স্কুল মাষ্টারী ছেড়ে দিলেন। ইচ্ছে হ'লো একটু বিদেশ দেখবার। তাই বেরিয়ে পড়লেন। এক এক মিশর, গ্রীস, ইটালী ঘুরবার পরে জার্মাণী এসে পৌছুলেন সার্ত্রে। সে সময়কার জার্মাণীতে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে এডমণ্ড হাসেরল এবং মার্টিন হাইডেগ্‌গারের প্রচুর নাম ডাক ছিল। সার্ত্রে কয়েকদিনের মধ্যেই পরিচিত হ'লেন ওঁদের সঙ্গে। ওঁদের জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা মুগ্ধ করলো সার্ত্রেকে। মনে হলো এঁদের কাছে থাকতে পারলে; এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করবার একটা সুযোগ পেলে নিজের অগোছালো দার্শনিক চিন্তা সঠিক পথ ধরে এগোতে পারবে। এই কথা মনে হতেই সার্ত্রে কিছুদিনের জন্য রয়ে গেলেন জর্মণীতে। অধ্যাপক হাসেরল এবং হাইডেগ্‌গার খুসী হলেন একজন জ্ঞানলিপ্সু যুবককে পেয়ে। দর্শনশাস্ত্রের নানা জানা-অজানা দিক সম্বন্ধে ওঁরা সার্ত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সোরেন কির্কেগার্ড-এর চিন্তাধারা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিলো। সার্ত্রে একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করলেন কির্কেগার্ডের দার্শনিক মতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। এবং সেইদিন থেকেই পড়তে আরম্ভ করলেন কির্কেগার্ডের বিভিন্ন দর্শনের বই।

১৯৩৫ সালে সার্ত্রে যখন প্যারিস ফিরে এলেন, অনেকের মতে সেই সময় উনি ওঁর নিজস্ব দার্শনিক মতবাদের মূল চিন্তাগুলি ঠিক করে ফেলেছেন। তা' হ'লে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে কির্কেগার্ডের চিন্তার প্রভাবে বা তাঁর দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এবং ব্যক্তিগতভাবে হাইডেগ্‌গারের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সার্ত্রে তাঁর দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছেন। সার্ত্রেকে যেমন অস্তিত্ববাদী বলা হয়। কির্কেগার্ডকেও ঠিক তেমনি অস্তিত্ববাদী বলা হয়। কাজেই বলতে হয় অস্তিত্ববাদী হিসেবে সার্ত্রে কির্কেগার্ডের উত্তরসূরী। যদিও বিংশ শতাব্দীতে, ঠিক আজকের দিনে 'অস্তিত্ববাদ' বলতে যে বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে বোঝায় তার বেশির ভাগই হাইডেগ্‌গার ও সার্ত্রের চিন্তা-প্রসূত। কির্কেগার্ড বলতেন—মানুষ যতোই ভগবানের সন্নিকটবর্তী হচ্ছে বলে মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে ততোই একটা মহাশূন্যতার আওতায় এসে পড়ে। অর্থাৎ ভগবান লাভের জন্য যে চেষ্টা তা' বরাবরই একটা চেষ্টা মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। এই চেষ্টা যতোই চালিয়ে যাও, দেখবে শেষ নেই, আরো চেষ্টা করো, দেখবে তবু আরো অনেক দূরে লক্ষ্যবস্তু। কাজেই এঁ চেষ্টার কোনোদিনই শেষ হতে পারে না—অর্থাৎ ভগবান লাভ হ'তে পারে না। কির্কেগার্ডের এই ধারণাটিকে কেন্দ্র করেই সার্ত্রে ক্রমশ তাঁর নিজস্ব 'অস্তিত্ববাদ' গড়ে তুলতে সুরু করলেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করছি।

প্যারিসে ফিরে এসে সার্ত্রে আবার একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করলেন। পরিচিতরা এবার একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখতে পেলেন ওঁর মধ্যে। সে হ'লো কথাবার্তা এবং সাধারণ চালচলনে একটা স্থিরতা। প্রথমবার শিক্ষকতার সময়ে প্রকৃতির অস্থিরতাই ছিলো যার মধ্যে সর্বপ্রধান বস্তু এখন তারই মধ্যে এতোটা স্থিরতা দেখে তাই অনেকেই বিস্মিত হ'লেন। অবশ্য যুবক সার্ত্রেকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁরা আগের অস্থিরতারও কারণ বুঝতেন, এবারের স্থিরতারও কারণ বুঝতে পারলেন। সৃষ্টির চরম এবং পরম সত্যকে জানবার জন্য সার্ত্রে এতোদিনে পর্যালোচনা চালিয়ে যাবার মতো একটা দার্শনিক মূল সূত্র পেয়েছেন এবং এবার অবিশ্রান্ত তাঁর নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলতে লাগলেন।

প্যারিসে ফিরে সার্ত্রে বাসা বাঁধলেন ছোটো একটা হোটেলের খুব ছোট্ট একখানা কামরায়। শিক্ষকতার অবসরে ওঁর কাজ রইলো দুটি—হয় পড়াশুনো এবং লেখার কাজে ব্যস্ত থাকা আর না হয় বিভিন্ন রেঁস্তোরায় ঘুরে বেড়ানো। একাদিক্রমে অন্তত দু' বছর সার্ত্রে বিভিন্ন রেঁস্তোরায় এতো ঘুরলেন যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রেঁস্তোরা-মালিকদের সঙ্গে ওঁর রীতিমতো হৃদ্যতা জমে উঠলো। এই হৃদ্যতা জমে উঠবার অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো, এবং নিঃসন্দেহে সেইটেই প্রধান কারণ। সার্ত্রের যাতায়াতের ফলে ঐ সমস্ত রেঁস্তোরাতেও প্রত্যহ নতুন নতুন ভদ্র এবং শিক্ষিত খরিদ্দারের ভিড় বাড়তে লাগলো।

ব্যাপারটা খুবই অভিনব। সার্ত্রে যে রেঁস্তোরায় রেঁস্তোরায় ঘুরে বেড়াতেন তার পেছনে ওঁর একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো। সে হ'লো সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ 'অস্তিত্ববাদ' সম্পর্কে একটা যুক্তিযুক্ত এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো। দু'টো বছর এইভাবে চলবার পর দেখা গেলো অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী সার্ত্রের অনুগামী সংখ্যা কয়েক শ'-এ পৌছে গেছে। যারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং বেশিরভাগই বয়সে তরুণ।

এই সময়ের মধ্যে সার্ত্রে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও রচনা করলেন "আবেগ ও কল্পনা" সম্বন্ধে। পণ্ডিত মহলে রচনাটির প্রচুর সুখ্যাতি হ'লো কিন্তু সাধারণ পাঠকমহলে তার কোনো পড়ুয়া পাওয়া গেলো না। কাজেই লেখক হিসেবে প্রকাশক মহলেও কোনো স্বীকৃতিলাভ ঘটলো না। এর পরের বছর সার্ত্রে একটি সাহিত্য পত্রিকায় পর পর কয়েকটি সাহিত্য-সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখলেন—ফকনার, হেমিংওয়ে, ডস্ প্যাসস এবং স্টাইনবেক সম্বন্ধে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

রচনাগুলি সাধারণ পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। ফকনার সম্বন্ধে সার্ত্রের প্রবন্ধটি তো রীতিমতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করলো। এরপর ক্রমশঃ সার্ত্রের লেখার চাহিদা বাড়তে আরম্ভ করলো—যেমন পাঠকমহলে তেমনি প্রকাশকদের মধ্যে। কিছুদিনের চেষ্টায় সার্ত্র একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। বন্ধু-বান্ধব এবং অনুগামীরা অনেকেই সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখেছেন। একটা কাহিনীর মাধ্যমে সার্ত্র যে তাঁর 'অস্তিত্ববাদ' প্রচার করেছেন সে লেখায় একথা কারো কাছেই গোপন করলেন না উনি। এতদিন প্রকাশকেরা যদি প্রত্যাখ্যান করেন এই কথা মনে হতেই কিছুটা ইতস্ততঃ করছিলেন সার্ত্র—রচনাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে একটু-আধটু চেষ্টা করতেন আর প্রায় সময়ই পাণ্ডুলিপিটি সংশোধন করতেন। এবার ওঁর লেখার জন্য পাঠকমহলের তাগিদে প্রকাশকেরা এতোটা আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন যে এই রচনাটি প্রকাশের অগ্রাধিকারের জন্য কয়েকটি প্রকাশকের মধ্যে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল। পরে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় তাই সার্ত্র প্রত্যেককেই স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, রচনাটিতে 'অস্তিত্ববাদ' প্রচার করা হয়েছে। অর্থাৎ কি না রচনাটি যদিও একখানি উপন্যাস কিন্তু তারই মধ্যে দর্শনচর্চা করা হয়েছে এবং দর্শনের দিকটাই আসল। এ কথার পরেও প্রকাশকেরা কেউ পিছিয়ে গেলেন না। অতঃপর সার্ত্র চুক্তিবদ্ধ হলেন এক প্রকাশকের সঙ্গে—প্রকাশিত হ'লো সার্ত্রের প্রথম উপন্যাস—'নসিয়া' ( দি ডায়রী অব আন্তোইন রোকেন্টিন )। এটা ১৯৩৮ সালের কথা। সার্ত্রের বয়স তখন ঠিক তেত্রিশ।

উপন্যাস হিসেবে "নসিয়া"র বিক্রি যদিও খুব বেশি হ'লো না, কিন্তু লেখক হিসেবে সার্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লেন কারণ শুধু ফরাসী দেশেই নয়, ইংলণ্ড, জর্মণী, ইতালী এবং আমেরিকার বিদগ্ধ মহলেও উপন্যাসখানির মূল বক্তব্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা হ'লো। এই উপন্যাসের ভেতর অস্তিত্ববাদের একটি প্রধান চিন্তা সাধারণের সামনে তুলে ধরা হলো। কথাটা হ'লো পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা মানুষের জীবনধারণের যৌক্তিকতার সমর্থন বলে মনে করা যেতে পারে **( Nothing, absolutely nothing justifies man's existence in earth. )**। অর্থাৎ কিনা আমরা মানুষেরা যেন কিছুটা অন্যায় ভাবে কিম্বা অন্ধ ভাবে বলতে গেলে—একান্ত অসহায়ভাবে এখানে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এবং কালাতিপাত করছি। অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কথারই সম্পূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করা যায় না—সেজন্য গোটা অস্তিত্ববাদ বুঝবার চেষ্টা করা দরকার।

যাই হ'ক, 'নসিয়া'র আত্মপ্রকাশের সময় ইউরোপের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদধ্বনি তখন ইউরোপের সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। হিটলার ১৯৩৩ সালে জর্মণীতে ক্ষমতা দখল করেই বিদ্যুৎগতিতে স্বদেশকে অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত করে তুলবার জন্যে অবিশ্রান্ত সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চলছিলেন। প্রত্যহ হাজার হাজার ইহুদি প্রাণ নিয়ে জর্মণীর বাইরে পালাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। মেমেল, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া একটির পর একটি পররাজ্য হিটলার গ্রাস করে চলেছেন। কখন কোথায় কি ভাবে নাৎসীদের আক্রমণ আরম্ভ হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই একটি আলোচনা প্রাধান্য লাভ করলো। ওদিকে ইতালীতে হিটলারের আগে থেকেই মুসোলিনী ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন। মুসোলিনীর আবিসিনিয়া বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে, আলবেনিয়ার ওপর আক্রমণ আসন্ন হয়ে উঠেছে। স্পেনে প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে ফ্রাঙ্কো তাঁর একনায়কত্ব সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন। নাৎসী ও ফ্যাসিষ্টদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সর্বজনজ্ঞাত, ইংলণ্ড সামরিক শক্তিতে দুর্বল তো বটেই, নেতৃত্বের অভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইংলণ্ড দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে? সে সময়ে রাশিয়া ছিলো পুরোপুরিই লোহার জালে ঘেরা, কি তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর কি তার প্রকৃত শক্তি সবই অনুমান। আর খাস ফ্রান্সে বলতে গেলে সে সময়ে মাসে দু'টো করে মন্ত্রিসভার পতন হচ্ছিলো। নিত্য নূতন নেতা আর নিত্য নূতন প্রধানমন্ত্রী—ফলে সে দেশের সমাজ জীবনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এইরকম একটা সময়ে, অর্থাৎ সংকটের মুহূর্তে বা যুগ সন্ধিক্ষণে সার্ত্র ফ্রান্সের সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁর 'অস্তিত্ববাদ' নিয়ে। ক্রমে দেখা গেলো অস্তিত্ববাদ একদিকে যেমন ধনতন্ত্রবাদ-ঘেঁসা ভাববাদের বিরোধিতা করছে, ভগবানকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তেমনি আর একদিকে মার্কসবাদেরও বিরোধিতা করছে। কাজেই দারুণ হতাশায় নিমজ্জমান ফরাসীদেশের শিক্ষিত সমাজ আগ্রহভরে শুনতে আরম্ভ করলো সার্ত্রের কথা!

পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে সার্ত্র তাঁর প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশ করলেন—দি ওয়াল।

এদিকে শান্তিকামীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেলো। সুরু হলো একটা অভূতপূর্ব নাটকীয়তার সঙ্গে। জার্মাণীর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার কোনো বোঝাপড়া হতে পারে এটা অতিদূরদর্শী রাজনীতিবিদেরাও কেউ ভাবেন নি। কিন্তু ঠিক তাই হলো। হিটলার ষ্টালিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন। পোলাণ্ডের অর্ধেক আন্দাজ নিলে। জার্মাণী, বাকীটা রাশিয়া। পোলাণ্ড আক্রমণ করবার পরেই পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। কয়েকটা দিনের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নতুন পথে মোড় ফিরলো।

নাৎসী ফ্যাসিষ্ট বিরোধী কোনো দেশই এ সময়ে মহাযুদ্ধজাতীয় একটা বৃহৎ ব্যাপারের জন্য তৈরী ছিলো না। ফ্রান্স তো নয়ই। যাই হ'ক যুদ্ধ যখন সুরু হয়েই গেলো লক্ষ লক্ষ যুবক স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে যোগ দিলো। সার্ত্রও যোগ দিলেন, উনি বেছে নিলেন গোলন্দাজ বাহিনী। নাৎসী বর্বরদের তাড়নায় এইভাবে একজন উদীয়মান সাহিত্যিক এবং দার্শনিককে লেখাপড়া ছেড়ে, কলম বন্ধ করে কামানের গোলার তদারকীর কাজে লেগে পড়তে হ'লো।

বলাই বাহুল্য, সৈনিকের কাজও সার্ত্র বিশেষ যোগ্যতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছিলেন। অস্তিত্ববাদের একটি প্রধান লক্ষ্য হ'লো মানুষের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা এবং তা রক্ষা করা। নাৎসীদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সার্ত্র দেখেছেন ফ্রান্স বা জার্মাণীতে সাধারণ মানুষ অনেক রকমের স্বাধীনতা ভোগ করে। অস্তিত্ববাদী হিসেবে সেটুকু স্বাধীনতায় সার্ত্রর মোটেই খুসী হবার কথা নয়। স্বাধীনতা আরো প্রয়োজন, আরো, আরো। চালু সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়ও মানুষকে উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে এই বিশ্বাসই সার্ত্রর ছিলো। কারণ এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের যে সংগ্রাম তা সরকারের বিরুদ্ধে

ততোটা নয়, যতোটা ব্যক্তি মানুষের অশিক্ষা এবং ভুল শিক্ষার বিরুদ্ধে। অস্তিত্ববাদীদের আন্দোলনটা মূলত একটা দার্শনিক আন্দোলন—যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এ ধরণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা নয়। নাৎসীদের আবির্ভাবের পর কি ফ্রান্সে কি জার্মাণীতে এ ধরণের আন্দোলন ও পুলিশী হামলার বাহিরে থাকতে পারে না। এবং বাস্তবিক পক্ষে নাৎসীরা জার্মাণীতে ক্ষমতা দখল করবার পর যতো ভাবে সম্ভব মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছিলো। তাই ফ্রান্স, যখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো তখন সার্ত্র মনে করলেন বিপদটা দু'রকমের—প্রথমতঃ জাতীয় বিপদ আর দ্বিতীয়তঃ মানবিক বিপদ।

যে কোনো সাধারণ মানুষের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সার্ত্রের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার এইখানেই হলো বিশেষত্ব। উনি যুদ্ধে যোগ দিলেন স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে। দু'মুখী যুদ্ধ উনি চালাতে লাগলেন, প্রথমত জাতির স্বার্থে যুদ্ধ আর দ্বিতীয়ত সমগ্রভাবে মানব-সমাজের জন্য যুদ্ধ।

মাত্র তিন সপ্তাহ প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পর ফ্রান্স যখন জার্মাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করলো, তখন লক্ষ লক্ষ ফরাসী তরুণ সৈনিককে জার্মাণরা বন্দী করলো।

সার্ত্রও বন্দী হলেন জার্মাণদের হাতে। উনি ধরা পড়লেন ম্যাজিনো লাইন অঞ্চলে।

প্রায় ন'মাস সার্ত্র জার্মাণদের যুদ্ধ বন্দী শিবিরে ছিলেন। কথায় বলে, যার প্রকৃতই এমন কোনো কথা আছে যা অপরকে না শোনালেই নয়, সে কথা সে ব্যক্তি অপরকে শোনাবেই—পারিপার্শ্বিক যতই প্রতিকূল হ'ক না কেন। কথাটা যে কতো সত্য সার্ত্রের বন্দী-জীবনই তার প্রমাণ। বন্দী করবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্ত সৈনিকের মতো সার্ত্রকেও জার্মাণরা নিরস্ত্র করলো। কিন্তু হাত আর কতোক্ষণ খালি রাখা যায়? হয় রাইফেল আর না হয় কলম—একটা কিছু তো চাই। বন্দী অবস্থায়ই কলম ধরলেন সার্ত্র।

এবার নাটক লেখা আরম্ভ করলেন। সার্ত্র যে যুদ্ধ-বন্দী শিবিরে আটক ছিলেন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত জার্মাণ অফিসারটি ছিলেন বয়সে প্রৌঢ় এবং কিছুটা ভদ্রপ্রকৃতির। সার্ত্র বোঝালেন অফিসারটিকে—এই যে হাজার হাজার তরুণ-বয়স্ক যুদ্ধ-বন্দী দিনের পর দিন মনমরা হয়ে কাটাচ্ছে এ জন্য কি জার্মাণ সরকারের করবার কিছু নেই।

—এ জন্য সরকারের কিছু করবার থাকলেও বর্তমানের জরুরী অবস্থায় কিছুই করা সম্ভব নয়। জার্মাণ অফিসারটি জানালেন।

অতঃপর সার্ত্র প্রস্তাব করলেন যে উনি নাটক লিখে বন্দীদের নিয়ে অভিনয় করবেন যুদ্ধ-বন্দী শিবিরে। এতে সকলেরই মন ভালো থাকবে। জার্মাণ অফিসারটি অনুমোদন করলেন সার্ত্রের প্রস্তাব। তারপর থেকে সার্ত্র নাটক লিখে নিয়মিত অভিনয়ের বন্দোবস্ত করলেন শিবিরে। কয়েকদিন পরে দেখা গেলো যুদ্ধ-বন্দীরা তো নাটক দেখছেই, জার্মাণ সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক এবং অফিসাররাও প্রচুর সংখ্যায় এই সমস্ত নাটকের অভিনয়ে যোগদান করতে আরম্ভ করেছেন। এইভাবেই চললো কয়েকটা মাস। ইতোমধ্যে বহু ফরাসী যুদ্ধ-বন্দীকে আন্তর্জাতিক আইন অগ্রাহ্য করে জবরদস্তী করে জার্মাণরা যুদ্ধের কাজে (জার্মাণদের পক্ষে, মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে) লাগাতে লাগলেন। সার্ত্র পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে কোনো অবস্থাতেই এ কাজটি তাঁর দ্বারা হবে না—তার জন্য জার্মাণ সরকার যতই রুষ্ট হন না কেন।

যুদ্ধবন্দী শিবিরের ভারপ্রাপ্ত জার্মাণ অফিসারটি সার্ত্র সম্পর্কে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিলেন যে—এ যুবকটি নেহাৎ খেয়ালী প্রকৃতির, গান-বাজনা আর নাটক নিয়ে মেতে থাকে সারাক্ষণ, এর দ্বারা আমাদের পক্ষের কোনো যুদ্ধের কাজ করাবার চেষ্টা বৃথা। অকারণে আমরা একটা লোকের খোরাক জুগিয়ে চলেছি।

এর পর জার্মাণ সরকার মুক্তি দিলেন সার্ত্রকে। সার্ত্র চলে এলেন প্যারিস এবং সরাসরি মুক্তি-যোদ্ধাদের দলে যোগ দিলেন। বিগত বছর দেড়েক ধরে ব্যবহারিক জীবনের যে অভিজ্ঞতা ওঁর হ'য়েছিলো তাতে বুঝতে পেরেছিলেন যে একটা কাজ করবার সময় অন্য আর সমস্ত কাজ ধামাচাপা দিয়ে রাখা চলে না। যা কিছু করণীয় তা' সমস্তই একসঙ্গে করে যাওয়া দরকার। এবার তাই এক হাতে নিলেন রাইফেল আর এক হাতে কলম। এইভাবেই প্রায় চারটে বছর কাটলো ওঁর। প্রতি মুহূর্তে নিজের জীবন বিপন্ন করে সার্ত্র একদিকে যেমন দেশপ্রেমিক মুক্তি-যোদ্ধাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন, ফ্রান্সকে জার্মাণ নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য, আর একদিকে তেমনি সার্ত্র লেখা আরম্ভ করলেন—নাটক, উপন্যাস, গল্প এবং প্রবন্ধ তো লিখতে লাগলেনই সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব "অস্তিত্ববাদ"ও লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জন যাঁর দর্শনের গোড়ার কথা, যুদ্ধকালীন জার্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেই সার্ত্রের জীবন কাটতে লাগলো প্রতি মুহূর্তে একটা চরম বিভীষিকার মধ্যে। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, উৎপীড়ন—জীবন নিয়ে ছিনিমিনি করা—এই হ'লো সে সময়কার ফ্রান্সের প্রতিদিনের জীবন। পরবর্তীকালে "দি রিপাবলিক অব সাইলেন্স" প্রবন্ধে সার্ত্র লিখলেন—জার্মাণদের অধীনে নিপীড়িত অবস্থায় আমরা যতটা স্বাধীন ছিলাম সে রকম আর কখনো থাকিনি। সমস্ত রকমের নাগরিক এবং মানবিক অধিকার আমরা হারিয়েছিলাম, এমন কি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার অধিকারটুকু পর্যন্ত। প্রত্যহ আমরা অপমানিত হচ্ছিলাম তুচ্ছ সমস্ত কারণে এবং এ সমস্তই বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা হজম করতে বাধ্য হচ্ছিলাম। এক এক সময় এক এক রকমের অছিলায় আমাদের গ্রেপ্তার করা হ'তো—শ্রমিক, শিক্ষক, ইহুদী, রাজনৈতিক কর্মী, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কেউই বাদ পড়তো না। বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের হাজারে হাজারে গ্রেপ্তার করে কন্সানট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হ'তো, কখনো বা সরাসরি জাহান্নামে পাঠানো হ'তো। কি খবরের কাগজে, কি রেডিওতে, কি সিনেমা-থিয়েটারে সর্বত্রই অত্যাচারী জার্মাণরা যা চাইতো তাই করা হ'তো। কিন্তু, এ সমস্ত সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস যে আমরা ফরাসীরা স্বাধীন ছিলাম। নাৎসীদের বিষ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিলো। কাজেই এই সময় প্রতিটি সুস্থ, স্বাভাবিক চিন্তাই প্রকৃতপক্ষে এক-একটা বিজয়ের সূচনা করতো। নাৎসী কর্তৃত্বাধীনে সর্বশক্তিমান পুলিশ কঠোর হস্তে আমাদের নীরব করে রেখেছিলো, তাই আমাদের প্রত্যেকের মুখের প্রতিটি কথার মূল্য লক্ষ গুণ বেড়ে গেলো।··· যেহেতু প্রতি মুহূর্তে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতো গেষ্টাপো বা তাদের বেতনভোগী অনুচরেরা, সেই কারণেই পরস্পরের প্রতি আমাদের প্রতিটি ইশারা পবিত্র প্রতিশ্রুতি হয়ে

উঠতে লাগলো।……এই বর্বরোচিত এবং হৃদয়হীন পরিবেশেই, কী আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত আমরা বাঁচতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। এজন্য আমাদের কোনো লজ্জা নেই বা মিথ্যে কারণ খুঁজতে চাই না। আমরা, হ্যাঁ, আমরা সভ্য পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষেরাই এই বিশৃঙ্খল এবং অসম্ভব অবস্থার মধ্যে বাঁচতে লাগলাম।··ওঃ মানুষের সহ্যশক্তি কী ভীষণ! এর মধ্যেও বাঁচতে হয়, না বাঁচলেই নয়।

এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যে সার্ত্র শুধু যে বেঁচে রইলেন তাই নয়, অত্যন্ত সক্রিয়ভাবেই বেঁচে রইলেন। অর্থাৎ কিনা এক হাতে রাইফেল আর এক হাতে কলম সমানভাবে চালাতে লাগলেন। একদিকে যেমন উনি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হ'লেন—সাহিত্যিক এবং দার্শনিক হিসেবেও সর্বসাধারণের কাছে উনি একজন প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেন। বাস্তবিক পক্ষে, ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হ'লো এবং ফ্রান্স নাৎসী কবলমুক্ত হ'লো, তখন রাতারাতি সার্ত্রর নাম গোটা সভ্যজগতে ছড়িয়ে পড়লো ফ্রান্সের বিদগ্ধ সমাজের শিরোমণি হিসেবে। এ সময়ে সার্ত্রর বয়স মাত্র বছর চল্লিশ। ফ্রান্সের মতো একটা দেশে, এতো অল্পবয়সে লেখক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে সার্ত্রর এই যে বিরাট খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা, অনেকের মতে তার প্রধান কারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ওঁর দুঃসাহসিক কাজকর্ম। সাহিত্যচর্চা অনেকেই করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বদেশের মুক্তির জন্য সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে খুব কম সংখ্যক লেখককেই দেখা যায়—তা যে কোনো দেশের কথাই ধরা যাক না কেন। যে সমস্ত পরাধীন বা নিপীড়িত দেশের সাহিত্যিকদের দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে, তাঁদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখার মধ্যেই তাঁদের রাজনীতি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু সার্ত্র একদিকে যেমন তাঁর লেখনী ব্যবহার করেছেন নাৎসী শত্রুদের বিরুদ্ধে, তেমনি বারুদের সাহায্যও নিয়েছেন শত্রুর কবল থেকে পিতৃভূমি উদ্ধার করবার জন্য। এবং এ দু'রকম কাজের জন্যই প্রতি মুহূর্তে তাঁকে জীবন বিপন্ন করে চলতে হয়েছে প্রায় চারটে বছর।

এই সময়ে অর্থাৎ ফ্রান্স যখন নাৎসীদের কবলে প্রতিদিন নিষ্পিষ্ট হচ্ছিলো, তখন প্যারিসে বসেই সার্ত্র দু'খানা নাটক রচনা করলেন। 'দি ফ্লাইজ' এবং 'নো একজিট।' সাহিত্য হিসেবে নিঃসন্দেহে 'নো একজিট' শ্রেষ্ঠতর রচনা, তা' ছাড়া অস্তিত্ববাদের ব্যাখ্যানেও এর মূল্য অধিকতর—কিন্তু পদদলিত দেশবাসীকে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস হিসেবে 'দি ফ্লাইজ' নাটকের তুলনা নেই। জার্মাণ সেন্সর বিভাগের ধুরন্ধরদের নজর এড়িয়ে সার্ত্র যে নাটকখানা কি ভাবে ছাপালেন এবং মঞ্চস্থ করলেন তা অনেকেরই বিস্ময় উদ্রেগ করেছে। অনেকের ধারণা যে ক্লাসিকাল বিষয়বস্তু বলেই নাৎসী-সেন্সর বিভাগ, 'দি ফ্লাইজ'এর মূল বক্তব্যটিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি। হয়তো তাই-ই। 'দি ফ্লাইজ' নাটকের বিষয়বস্তু ওরেসটেস-উপাখ্যান। হোমর, হেসিয়ড, এসকাইলাস ও ও ইউরিপিদেস প্রভৃতির বিভিন্ন রচনা থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে সার্ত্র 'দি ফ্লাইজ' রচনা করলেন।

ওরেসটেস-উপাখ্যানে দেখা যায় গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি রাজা আগেমেমনন ট্রয় জয় করে স্বরাজ্যে ফিরে এসেছেন। ফিরে আসবার পরে দেখতে পেলেন তাঁর স্ত্রী ক্লাইতেমনেস্ত্রা রাজ্য-রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ইগিসথাসের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছেন। ইগিসথাস এবং ক্লাইতেমনেস্ত্রা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো আগেমেমননকে! আগেমেমননের একমাত্র পুত্র ওরেসটেসকে হত্যা করবার চেষ্টাও ওরা করলো, কারণ তা হলে আগেমেমননের নাম চিরতরে মুছে ফেলা যায়। কিন্তু তা ওরা পারলো না। বোন ইলেকট্রার সাহায্যে তরুণ ওরেসটেস পিসির বাড়ী পালিয়ে বাঁচলো। এদিকে ইগিসথাস ওরেসটেসের পিতৃ-রাজ্যে যা খুশী তাই করতে লাগলো। ওরেসটেসের মা প্রকাশ্যে ইগিসথাসের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'লো। ওদিকে ওরেসটেস পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হ'তে লাগলো। এবং দীর্ঘ সাত বৎসর পরে পিসতুতো ভাই পাইলেডসকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃরাজ্যে আত্মগোপন করে এসে শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী ইগিসথাসকে হত্যা করে পিতৃহত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিলো।

সার্ত্রর রচনা-চাতুর্যের গুণে দেখা গেছে সে সময়কার ফ্রান্সে 'দি ফ্লাইজ' নাটকের পাঠক বা দর্শক অজ্ঞাত ভাবেই ইগিসথাসের সঙ্গে অত্যাচারী এবং পররাজ্য দখলকারী নাৎসীদের তুলনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। প্রতিক্রিয়াটা সহজেই অনুমেয়।

'নো একজিট' নাটিকার পটভূমি নরক। নরকের একটি নোংরা এবং শস্তাদামের হোটেল। এখানে দেখা যায় তিনটি লোক—দু'টি পুরুষ এবং একটি নারী, এরা কেউ কাউকে চায় না, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না অথচ ঘটনাচক্রে নরকের একটি জায়গায় এসে পড়েছে। এখান থেকে কারো বেরিয়ে যাবারও কোনো উপায় নেই। এই নাটিকাটিতে শেষ পর্যন্ত সার্ত্র বলেছেন যে যাকে চাই না বা যা চাই না, সেইটেই মানুষের পক্ষে নরকতুল্য হয়ে পড়ে।

অস্তিত্ববাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ত্র তাঁর "বিইং এণ্ড নন-বিইং" এবং 'একজিসটেনসিয়ালিজম' বই দু'খানিতে যা বলেছেন তা একটু আলোচনা করা দরকার। সার্ত্র বলছেন যে দু'-রকমের অস্তিত্ববাদী আছেন। এক হলো যাঁরা খৃষ্টান ধর্ম মানেন অথচ অস্তিত্ববাদী—যেমন জ্যাসপারস, গ্যাব্রিয়েল মার্সেল প্রভৃতি। আর দ্বিতীয় ধরণের অস্তিত্ববাদীরা হলেন নাস্তিক—যেমন হাইডেগগার এবং সার্ত্র নিজে।

সার্ত্রর অস্তিত্ববাদ অনুসারে ভগবান নেই, থাকতে পারে না, পৃথিবীতে সাধারণত মানুষ যতো জিনিষের সত্যতায় কম বেশি বিশ্বাসী—ধূলিকণা থেকে সুরু করে ভগবান পর্যন্ত—এ সমস্তেরই গোড়ার কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে, মানুষের পক্ষে, কোনো বস্তুর অস্তিত্বই সত্য নয় যে সম্পর্কে সে যথাযথ ধারণা করতে না পারে। অর্থাৎ যে কোনো বস্তুর অস্তিত্বের যাথার্থ্য মানুষের ধারণার ওপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল কোনো জিনিষ আর যাই হ'ক ভগবান বলতে কবি-মানসে যে সর্বশক্তিমান সত্বার কথা উদয় হয়—তা' হ'তে পারে না। কাজেই ভগবানের ধারণার কোনো বাস্তব সত্যতা নেই।

হাইডেগগারের অনুসরণে সার্ত্র বলেন যে, একটিমাত্র জিনিষের বেলায় দেখা যায় **Existence precedes essence** সে হ'লো মানুষ, কিম্বা বলতে হয়—মানব অস্তিত্ব। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে না পারলেও মানুষ বাঁচতে পারে, তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে।

মানুষ মাত্রেরই অবচেতন মনের একটা নিজস্ব কর্মপদ্ধতি বা প্রকৃতি থাকে। এই প্রকৃতিই ক্রমশঃ উদঘাটিত হ'তে থাকে

মানুষের জীবনে। সজ্ঞান ভাবে মানুষ কি ইচ্ছা (will) করলো সেটা বড়ো কথা নয়—কারণ কি সে ইচ্ছা করেছে বা করবে তা-ও ঐ প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই বলতে হয় মানুষ নিজেই সর্বতোভাবে তার সব-কিছুর জন্ম দায়ী।

মানুষকে তার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়া অস্তিত্ববাদী হিসেবে সার্ত্র তাঁর প্রথম কর্তব্য মনে করেন। মানুষ শুধু যে তার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্পর্কে দায়ী তা নয়—প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষ সমগ্র মানবজাতির দায়িত্ব বহন করে। সার্ত্র বলেন যে, কোনো কিছুই কারো পক্ষে প্রকৃত ভালো হতে পারে না, যদি তা সমগ্র ভাবে মানুষের পক্ষে ভালো না হয়। এই দায়িত্ব বোধ যার আছে জীবনটা তার পক্ষে একটা রীতিমতো যাতনা (Anguish) ভগবান নেই বলেই জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মানুষের নিজের। অন্তরে বাইরে এমন কোনো উচ্চতর সত্তা বা মানদণ্ড মানুষের নেই যার সঙ্গে তুলনা করে বা যার কষ্টিপাথরে যাচাই করে মানুষ কাজের ভালো মন্দ বিচার করতে পারে। এই জন্মই সার্ত্র বলেন যে পৃথিবীতে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই স্বাধীনতা মানুষের পক্ষে একটা যন্ত্রণা বা শাস্তি বিশেষ (Man is condemned to be free)। কারণ, কোনো ব্যক্তি-মানুষই স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে আসেনি—তাকে আনা হয়েছে এবং এনে বিরাট একটা দায়িত্বের ভার তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা নিদারুণ নিঃসহায় অবস্থা (Fornlorness). কোনটা পাওয়া জীবনে সম্ভব আর কোনটা সম্ভব নয় তা সঠিকভাবে বুঝে উঠতে না পারার জন্মই মানুষের জীবনে দেখা দেয় নৈরাশ্য (despair)। বাইরের পৃথিবীর কোনো কিছুই মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃকপাত করে চলে না। অথচ সর্বদাই মানুষ বাইরের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করবার বৃথা চেষ্টা করে হয়রাণ হচ্ছে। "বাইরের পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে জয় করো"—সভ্য মানুষকে ডেকার্ট এই যে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন তা সার্ত্র ও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

সার্ত্র ঘোরতর ভাবে মার্কসবাদ এবং অন্ত সকল রকমের বস্তুবাদের বিরোধী। কারণ, বস্তুবাদ মানুষকেও বিশ্বের অসংখ্য বস্তুর মধ্যে একটি বলে গণ্য করে। একটা চেয়ার বা টেবিল বা একখণ্ড পাথরের সঙ্গে সামিল করে মানুষের বিচার করা হবে—এটা সার্ত্র সমর্থন করেন না। সার্ত্র মনে করেন যে মানুষকে বিচার করবার এবং বুঝবার একমাত্র উপায়ই হলো বস্তুবাদের ঠিক বিপরীত পদ্ধতি। অর্থাৎ Subjective পদ্ধতি। সার্ত্র মনে করেন যে কোনো মানুষই কখনো একেবারে ফুরিয়ে যায় না। কোনো অবস্থাতেই বলা যায় না যে মানুষ তার চরম উন্নতি করে ফেলেছে। কারণ সর্বদাই সে একটা দারুণ পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছে এবং কার্যতঃ সে নিজেরও প্রচুর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

পেশাদার দার্শনিকেরা অস্তিত্ববাদকে একটা পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক মত বলে গণ্য করেন না, তাই তাঁরা এর সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন ভাব দেখান। তাঁরা বলেন 'অস্তিত্ববাদ' কেবল একটা Attitude মাত্র, Philosophical System নয়। অস্তিত্ববাদের বিরূপ সমালোচনা সব চাইতে বেশি করে থাকেন খৃষ্টান ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বা গোঁড়া খৃষ্টান সাধারণ লেখকেরা। বিশেষ করে এই শ্রেণীর বিরুদ্ধ সমালোচনাকারীদের প্রতি নজর রেখেই সার্ত্র বলেন যে, তাঁর অস্তিত্ববাদ যদিও সকল রকমের নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক মতের একটা সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাই বলে "ভগবান নেই" শুধু এই কথাটা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য নয় বা এই কথাটা বলবার পরেই তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে যায় না। কাজেই মানবজাতিকে ঈশ্বর-মুক্ত করে একটা নিদারুণ হতাশার মধ্যে টেনে আনবার অভিযোগ ভিত্তিহীন। সার্ত্র বলেন যে, ভগবান নেই তা ঠিক, কিন্তু যদি থাকতেনও তা' হ'লেও পৃথিবীতে মানুষের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হ'তো না। ভগবানের সমস্যাটা প্রধান নয়, মানুষের সমস্যাটাই প্রধান—অস্তিত্ববাদ এই সমস্যার সমাধানের জন্মই চেষ্টিত। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মানুষ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ স্বাধীন—ভালো বা মন্দ সব কিছু করবারই তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তা ছাড়া রয়েছে বিরাট দায়িত্ব, নিজের সম্পর্কে তথা সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে—এই দায়িত্ব বহন করে সঠিক পথে চলতে পারা দারুণ সমস্যা মানুষের পক্ষে। তাই সার্ত্র বলেন Man is condemned to be free. প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় ভুল কম হয়, তা ছাড়া শক্তি বাড়ে, শক্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে আত্মবিশ্বাস, তাই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে সজাগ করে দিয়ে অস্তিত্ববাদ সত্যের সেবা ত করেই তা' ছাড়া সার্ত্র মনে করেন যে এর ফলে মানুষের মনে একটা নতুন আশার সঞ্চারও হয়। কাজেই "অস্তিত্ববাদ" একটি মানবতন্ত্রী এবং আশাবাদী দার্শনিক মত।

সার্ত্রর একখানি এপিক উপন্যাস লেখবার পরিকল্পনা আছে। উনি এ উপন্যাসের নামকরণ করেছেন "দি ওয়েস অব ফ্রিডম"। এই বিরাট উপন্যাসের প্রথম দু'টি খণ্ড "দি এজ অব রিসন" এবং "দি রিপ্রীভ" যুদ্ধ থেমে যাবার কিছু পরেই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে বইখানা ইংরেজীতে অনূদিতও হয়েছে। এই উপন্যাসমালায় সার্ত্র তাঁর 'অস্তিত্ববাদ' আরও পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যা করবেন—এই রকম একটা ধারণা সাহিত্য ও দর্শন রসিক মহলে প্রচলিত হয়েছিল কিন্তু পনেরোটা বছর কেটে গেলো তবু আজ পর্যন্ত সার্ত্র তাঁর "দি ওয়েস অব ফ্রিডম"-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করলেন না। তাই অনেকেই আজ একথা প্রকাশ্যেই বলতে সুরু করেছেন যে—এই তৃতীয় খণ্ড আর বেরুবে না, অর্থাৎ কিনা সার্ত্র তাঁর বিরাট উপন্যাসখানা আর শেষ করবেন না। কারণ তিনি নিজেই বর্তমানে আর অস্তিত্ববাদ-এ বিশ্বাস করেন না। একথা যে তাঁরা বলেন তার প্রধান কারণ হ'লো গত বছর-দশেক ধরে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। ১৯৫২ সালে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত শান্তি কংগ্রেসে যোগদান করে সার্ত্র পশ্চিমী দুনিয়ার যুদ্ধবাজদের তীব্র ভাবে সমালোচনা করে একটি জোরালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে এর পর থেকেই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমতে আরম্ভ করেছে এবং বিদগ্ধ সমাজের একটা শ্রেণী নানাভাবে সার্ত্রর চিন্তাধারার মূল্য কমিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এমন কি সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবেও তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করতে রাজী নন দেখা যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই খুব দুর্ভাগ্যের কথা।

আমেরিকাতেই সার্ত্র-বিরোধীদের উত্তেজনাই সবচাইতে বেশি। তার একটা কারণও আছে। সার্ত্র তাঁর একটি নাটকে আমেরিকার সমাজ-জীবনের পঙ্কিলতার একটি দিক অত্যন্ত প্রকটভাবে তুলে ধরেছেন—এইটেই হ'লো কারণ। ১৯৪৯ সালে সার্ত্রর তিনখানি

নাটক বেরুলো—'ডার্টি হ্যাণ্ডস,' 'দি রেসপেকটেবল প্রসটিটিউট' এবং 'দি ভিকটরস'। 'দি রেসপেকটেবল প্রসটিটিউট' নাটকের পটভূমি খাস আমেরিকা। এ নাটকে দেখা যায় বিরাট ধনী এক আমেরিকান যুবক একটি নিগ্রোকে হত্যা করেছে এবং তারপর আইনের চোখে ধূলো দেবার জন্ম একজন বারবনিতাকে বলছে যে, তুমি প্রকাশ্যে বলবে যে তুমিই ঐ নিগ্রোটাকে হত্যা করেছ, কারণ সে তোমাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা কি পরিমাণ নগ্ন এবং সত্য। আইনের দেশ আমেরিকাতে এক শ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ অশ্বেতকায়রা যে আইনের আওতা থেকে কার্যত বঞ্চিত এ কথা সর্বজনবিদিত—সার্ত্রে এই সত্য কথাটাই মাত্র তাঁর পাঠক এবং দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন।

বলাই বাহুল্য, যা উচিত, ভালো বা করণীয় বলে মনে করেন সার্ত্রে তা বরাবরই করে এসেছেন এবং এখনো করছেন। দারুণ বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও সার্ত্রে ১৯৬২ সালের মস্কোতে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনেও গিয়েছিলেন।

সার্ত্রে অবিবাহিত, বয়স এখনও ষাটের নীচে এবং স্বাস্থ্যবান। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর দার্শনিক মতের কি হবে তা এখনই বলা যায় না। তবে তাঁর সাহিত্য ইতোমধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উঠে গেছে, একথা সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যায়।

## প্রণয়-প্রশ্ন

*( Shelley রচিত* **Love's Philosophy** *কবিতা হইতে )*

### সবিতা রায়চৌধুরী

ঝরণা চলে
নদীর জলে
নদী সাগর বুকে
ঝাঁপায়ে পড়ি মিলনে হয় সারা
শূন্য ঘিরে
সমীর ফিরে,
শিহরি উঠি সুখে,
কাঁপন মাঝে পবন হল হারা।
জগত শুধু
মিলনে মধু
কেহ তো নহে একা,
প্রেমের জালে পড়েছে ধরা সবে,
জীবন-স্বামী
তোমার আমি
পাবো না কেন দেখা,
ও বুকে কেন মিশিব না গো তবে ?
শিখর গুলি
বদন তুলি
আকাশে চুমে হাসি,
লহরগুলি বাহুতে বাহু বাঁধে,
তরুর কোলে
কুসুম দোলে
মিলনে ঘেঁসাঘেঁসি
তাদেরও বিধি বেঁধেছে প্রেমফাঁদে।
রবির করে
সোহাগ ভরে
বাঁধিল ধরাভূমি।
চাঁদের হাসি সাগর চুমে ওই।
হে প্রিয়তম,
অধর মম,
না যদি চুম তুমি।
এত চুমার অর্থ তবে কই ?

## অশ্রু-অর্ঘ্য

### শ্রীবীথিকা পাল

১৩৪৮ সাল,
প্রকৃতি ঢাকিল মুখ আকুল কান্নায়,
সাগরের ঢেউ ওঠে উথাল পাথাল,
"আকাশের নীল চোখ ভরে গেল জলে"
বাতাস কাঁদিল ফিরে অসহ্য ব্যথায়,
আমাদের প্রাণে ওঠে ব্যর্থ হাহাকার,
ঝড়! ঝড় এলো এ ভুবন করে অন্ধকার।
বিধাতার নির্ব্বাচিত যে কুসুমখানি—
ফুটে উঠেছিলো আমাদের এই পৃথিবীতে
তাহারে ছিনায়ে নিয়ে গেল।
অন্ধ ঝড়, সে কি কিছু দেখতে পায় ?
এ মহাপুষ্পের প্রতিটি পাপড়ীতে ছিল ;
কী বিচিত্র রঙের বাহার !
রেণুতে রেণুতে ছিল কী আশ্চর্য্য ক্ষমতা !
মৌমাছি ভ্রমর সব বাঁধা তারি কাছে,
সে মহাপুষ্পের প্রতি কোষ হতে
অপূর্ব্ব সুরের যে কী আনন্দ ধারা
উৎসারিত হ'ত রাত্রিদিন,
উন্মত্ত, অধীর ঝড় কিছু বুঝিল না :—
কী যে নিলে, কতখানি নিলে যে মোদের !
২২শে শ্রাবণ সে ঝড়ের তিথি আবার এসেছে ফিরে,
আবার আকাশ ছেয়েছে সজল ব্যথায়
আবার সবুজ বনানী উঠেছে কাঁদিয়া
ধরণী এসেছে অশ্রু-অর্ঘ্য নিয়া
সাগরের ব্যথা মিশেছে শ্রাবণ ধারায়,
তবু! তবু প্রাণ ভরে আছে সে মহাপুষ্পের সৌরভে।
তারি ছবি চোখে চোখে আঁকা,
তারি রেণু ফুলে ফুলে মাখা,
২৫শে বৈশাখের শুভ শত গানে—
নিখিল উঠেছে ভরে
২২শে শ্রাবণ তাই—
ফিরে গেল হার মেনে ॥

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

(২২)

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শৈশব—না আছে বাড়ী-ঘর, না মানুষ-জন। সামান্য কয়েকটি ছাত্র নিয়ে গাছতলায় বসে বিদ্যা দেওয়া-নেওয়া, পর্ণ কুটীরে বাস ও সামান্য আহারে ক্ষুন্নিবৃত্তি। এত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও গুটিকতক মানুষ গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে, প্রদীপে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন এই দারিদ্র্য অনলে। পতঙ্গের ন্যায় না পুড়ে তাঁরা আরও ভাস্বর হয়ে উঠতেন স্পর্শমণির স্পর্শে! গুরুপল্লীর দু'চারখানা কাঁচা মাটির বাড়ীতে থাকেন সেইরূপ কয়েকজন শিক্ষক ও কর্ম্মী। বেতন যৎসামান্য—উদরের খোরাকের ঘাটতি মানসিক খোরাকেই বোধ হয় পূর্ণ হয়ে যেত। উদার অবারিত মাঠের মধ্যে আর কোন পল্লীর চিহ্নও ছিল না।

গুরুপল্লীর একটি বাড়ীতে হঠাৎ একদিন ওঠে কচি গলার মিষ্টি সুরের গান। কে গায় এমন সুন্দর বাঁশীর মত কণ্ঠে? আশেপাশের সকলে এসে দেখেন গ্রন্থাগারের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের পরিবার এলো এত দিন পর,—তাঁরই পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যার ঐ সুললিত কণ্ঠ-কাকলি।

সত্যচরণ বাবু গ্রন্থাগারের কর্ম্মী, এখানে আসেন তাঁর ২৩।২৪ বৎসর বয়সে। বাড়ী পান না—কাজেই পরিবার-পরিজন সবই দেশে। নিজে অতি কষ্টে ছোট একখানা ঘরে থাকেন ও আহার করেন সমবায় রন্ধনশালায় প্রায় ৮।১০ বৎসর ধরে।—এমন সময় ভাগ্যক্রমে গুরুপল্লীতে একখানা বাড়ী পেয়ে সকলকে আনিয়ে নিলেন।

সহধর্ম্মিণী অনিলা দেবী তিনটি শিশুকন্যাসহ এলেন শান্তিনিকেতন। পল্লীগ্রামবাসিনী প্রথমটা এখানে এসে বিষম সঙ্কুচিতা হয়ে উঠলেও, পরে গুরুপল্লীর গুরুপত্নীদের সদয় ব্যবহারে অল্প দিনেই সকলের সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে গেলেন।

ছোট ফুটফুটে বছর পাঁচেকের বড় মেয়েটি স্বভাব-দত্ত ক্ষমতায় নাচে, গায়, আশেপাশের সকলকে মুগ্ধ করে। ক্রমে কথাটা গুরুদেবের কাণেও গিয়ে পৌঁছায়,—গুরুদেব তাকে ডেকে পাঠান। তার গান শুনে খুসী হয়ে বলেন,—খুকু, তোমার নাম কী? খুকী বলে,—অনিমা—ডাক নাম মোহর। গুরুদেব বলেন,—না, তোমার নাম অনিমা নয়,—'কণিকা'। আমি তোমার নাম দিলাম 'কণিকা'। তুমি রোজ আসবে, আমি তোমায় গান শেখাব। হাত ভরে দিলেন লজেন্স-বিস্কুট। তার মাকে বলেন,—মেয়ে এত রোগা কেন? ওর শরীর ভাল করতে হবে,—আমি দেব ওষুধ।

অনিলা দেবী প্রায়ই মেয়েকে নিয়ে যান গুরুদেবের নিকট। দু'এক দিন না গেলে তিনি গাড়ী পাঠিয়ে দেন,—তাঁর ভালবাসার পরিচয়ে অনিলা দেবী মুগ্ধ।

গুরুদেব যেমন গান শেখান—তেমনি শিশি শিশি ওষুধ খাওয়ান,—মোহর মোটা আর হয় না। গুরুদেব বলেন,—নাচ ছাড়—শুধু গান গাও; দুটো একসঙ্গে হবে না। অনিলা দেবীকে উপদেশ-নির্দেশ দেন, তাঁর মেয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

এক দিন অনিলা দেবী সকন্যা গিয়েছেন উত্তরায়ণে,—গুরুদেব তাঁদের বসিয়ে বলেন,—মোহরের শরীর ভাল হচ্ছে না,—কণিকা নাম দিয়েছি বলে কি সে চিরকালই ছোট্ট একটি কণা হয়ে থাকবে? বৌমারা যাবেন কিছু দিনের জন্য পুরীতে,—পাঠাবে তোমার মেয়েকে তাদের সঙ্গে? কিছু দিন সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে এলে হয়ত ওর শরীর ভাল হবে। অনিলা দেবী কৃতজ্ঞ-চিত্তে বলেন,—বেশ ত! তৎক্ষণাৎ প্রতিমা দেবীকে ডেকে গুরুদেব বলেন,—বৌমা, তোমাদের সঙ্গে মোহরকেও পুরী নিয়ে যাও। বেশ হবে,—'পুপের' সঙ্গে খেলা করবে।

মোহর গেল পুরীতে। মোহরের মাকে গুরুদেব যেন ছোট মেয়েটির মত নানা ভাবে আশ্বাস দিতে থাকেন। বলেন—তোমার মন কেমন করছে না ত? দেখো তোমার মেয়ে তোমার জন্য কত ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। সে কী সুন্দর সমুদ্রের ঝিনুক! তুমিও ত ছেলে মানুষ, ঝিনুক তোমার খুব ভাল লাগবে। আর মোহরের শরীরও নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে।

অনিলা দেবীর কন্যাটি থাকে বেশীর ভাগ সময়ই গুরুদেবের নিকট উত্তরায়ণে, মাঝে মাঝে তিনি যান মেয়েকে দেখতে,—তখন গুরুদেবের কত আদর-যত্ন। প্রতিমা দেবীকে বলেন,—মেয়েকেই কেবল খাওয়াবে? মেয়ের মাকেও কিছু খাওয়াও।

আশ্রমের নাচ-গানের দলে মোহরের স্থান ছিল অপরিহার্য্য, কত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে সে গুরুদেবের সঙ্গে। অনিলা দেবী নিশ্চিন্ত মনে কন্যাকে সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে। গুরুদেব তাকে যেমন ভালবাসতেন তেমনি রাগাতেও ছাড়তেন না; বলতেন,—তুই ঝগড়াটি কি-না, তাই তোকে দিয়েছি 'দহলানী'র 'পার্ট।' এরপর দেব মেছুনীর পার্ট। মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, হাঁটুর ওপরে কাপড় পরে মাছের চুপ ড়ি কাঁধে নিয়ে, পারবি ত সে পার্ট করতে?

অসুখের সময় গুরুদেব রোজ সন্ধ্যায় মোহরকে ডেকে পাঠাতেন; তার মিষ্টি গলার গান শুনতে শুনতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন।

গুরুদেবের মৃত্যুতে মোহরের শোকাবেগ প্রশমিত করা অনিলা দেবীর হয়েছিল অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার!

অনিলা দেবী বলেন,—কত করুণা গুরুদেবের! তাঁরই দয়ায়, তাঁরই শিক্ষায় মেয়ে আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জগতে আপনার স্থান করে নিতে পেরেছে। আজ আমার যা কিছু সবই তাঁর কৃপায়!

## (২৩)

দাক্ষিণাত্য-কন্যা সাবিত্রী কৃষ্ণান্ (গোবিন্দ) শান্তিনিকেতনের প্রাচীন বাসিন্দা। বর্তমানে বাস করেন 'মালঞ্চে'র ভিতরে এক পর্ণ কুটীরে; বয়স প্রায় পঞ্চাশ।

তিন চার বৎসর পূর্বে তাঁকে দেখে চমক লাগে। বর্ষীয়সী মহিলা, একাকিনী বাস করেন একটি কুটীরে, শেষ রাত্রে রোজ শোনা যায় তাঁর কণ্ঠ-সাধনের আওয়াজ! পরে দেখি, ঐ বয়সে তিনি ভর্তি হয়েছেন এখানকার কলা-ভবনের দুই বৎসরের কার্যক্রমযুক্ত হস্ত-শিল্প-শিক্ষণ শাখায়। ঐ বয়সে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে সূক্ষ্ম সূচি-শিল্প শিক্ষায় নিবিষ্টচিত্ত দেখে আশ্চর্য্য হই। পরে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। তাঁর মাতৃভাষা তেলেগু হলেও, এখন চমৎকার বাংলা বলেন। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, কেনারিস্, তামিল ও তেলেগুতে কথোপকথনে তাঁর সমান দক্ষতা।

তাঁর নিকট গুরুদেবের বিষয় কিছু জানতে চাওয়ায় বলেন, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর ১৪।১৫ বৎসর বয়সে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। শিশুকাল থেকেই বিশেষ কোনো শিক্ষা না পেলেও, স্বভাব-দত্ত কণ্ঠে, খোলা গলায় গান গাইতেন,—ত্যাগরাজ, মীরা, মারাঠী সাধু সন্ত প্রভৃতির ভজন-কীর্ত্তন। কর্ণাটিক সুরই তাঁর কণ্ঠে সমধিক সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে। কণ্ঠস্বর মধুর, উচ্চ, গীটকারী-বহুল হওয়ায় সকলেই তাঁর গানে আকৃষ্ট হতেন। তিনি ছিলেন মাদ্রাজের নিকট অ্যাডেয়ারে, অ্যানি বেসান্ট প্রতিষ্ঠিত থিয়জফিকেল সোসাইটির 'গিণ্ডি হাই-স্কুলের' অবৈতনিক ছাত্রী।

গুরুদেব ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী বেসান্টের আমন্ত্রণে অ্যাডেয়ারে গিয়ে সাবিত্রী দেবীর মুখের প্রথম গান শোনেন, দক্ষিণী সুরে মীনাক্ষী দেবীর একটি ভজন। শুনেই তিনি তাঁকে অনেক প্রশ্নের পর শান্তিনিকেতনে এসে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। প্রথমে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বালিকা সাবিত্রী নিজের দেশ, মা, বোন, স্বদেশের বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে বাংলাদেশে অপরিচিত পরিবেশে আসতে অসম্মত হলেও, গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে অবশেষে স্বেচ্ছায় এখানে আসেন কিশোর বয়সে।

গুরুদেব স্বয়ং তাঁর সমস্ত ভার গ্রহণ করে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। বাংলা, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে, অল্পদিনের মধ্যেই সাবিত্রী দেবী এখানে মনের আনন্দে বাস করতে থাকেন। গুরুদেব তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন, যখন-তখন ডেকে পাঠাতেন ও চুল টেনে, পিঠ চাপড়ে, গান গাইতে বলতেন।

দিনু বাবুকে ভার দিলেন সাবিত্রীকে যত্ন নিয়ে গান শেখাবার। সাবিত্রী দেবী বলেন,—দিনু বাবুকে প্রথম দেখে তিনি অত্যন্ত ভীতা হয়ে পড়েন। দিনেন্দ্রনাথ লম্বা-চওড়া বিরাট পুরুষ,—আর তাঁর চোখ দুটি এত বড় ও অসাধারণ যে, সেদিকে তাকাবামাত্র বালিকা সাবিত্রীর বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ত। কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর সদয় ব্যবহারে ভয় দূর হয়ে গেল। গুরুদেব দিনেন্দ্রনাথকে বললেন,—সাবিত্রীকে প্রথমে পূরবীরাগের গান শেখা,—ওর কণ্ঠে তা ফুটবে ভাল। তাই তিনি প্রথমেই দিনুবাবুর নিকট শিখলেন,—

অশ্রু-নদীর সুদূর পারে

ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে···

আজও সাবিত্রী দেবীর কণ্ঠে ঐ গানখানি অপূর্ব্ব হয়ে মূর্ত্ত হয়। তারপর গুরুদেবের কঠিন রাগ-রাগিনী ঘেঁসা গানগুলি তিনি অনায়াসে শিখতে থাকেন। আশ্রমের উৎসবে, যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে, কিংবা কলকাতার নিউ এম্পায়ারে, একক গানের মধ্যে সাবিত্রীর তখন ছিল অগ্রাধিকার। বিবাহযোগ্য বয়স হবার পর, তিনি তাঁর মাতৃভূমি বাঙ্গালোরে চলে আসেন। সে সময়কার লেখা দিনুবাবুর একটি চিঠিতে দেখি,—তিনি লিখেছেন—সাবিত্রী, তুমি আমাদের আশ্রম ত্যাগ করার পর, আর তোমার মত 'নীলাঞ্জন ছায়া' গাওয়ার উপযুক্ত গায়িকা পাই না।

সাবিত্রী দেবী তাঁর গাওয়া দক্ষিণী সুরের প্রথম গানে গুরুদেবের বাক্য সংযোজনের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিলেন,—

দুপুরের ছুটি, বেলা এগারোটা। এবার আহারাদি সমাধা করে একটু বিশ্রামান্তে আবার ক্লাশ। সাবিত্রী দেবী কলা-ভবন থেকে ছাত্রী-আবাসে এসে কেবল বই খাতার বোঝা নামিয়েছেন, এমন সময় তত্ত্বাবধায়িকা হেমবালা দি বলেন,—সাবিত্রী, তোমার জন্য গুরুদেব লোক পাঠিয়েছেন, তুমি এখনি যাও তাঁর কাছে বনমালীর সঙ্গে।

সাবিত্রীর তখন পেটে ক্ষুধার অনল, বলেন—খাওয়ার পরে যাই। হেমবালা দি বোঝান,—তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া থাকবে, লক্ষ্মী মেয়ে, গুরুদেব ডাকছেন আগে দেখা করে এসো।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় সাবিত্রী পরিচারক বনমালীর সঙ্গে উত্তরায়ণে এলেন। গুরুদেব একাকী একটা ঘরে বসে পা দোলাচ্ছেন, সাবিত্রীকে দেখেই বলেন, বস সাবিত্রী, একটা গান কর। এই দুপুরবেলা অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় গান? সাবিত্রী অবাক! গুরুদেব একটু ধমকের সুরে বললেন,—শীগ্ গীর আরম্ভ কর সেই গান, যেটা অ্যাডেয়ারে আমাকে প্রথম শুনিয়েছিলে। থতমত খেয়ে সাবিত্রী আরম্ভ করেন মীনাক্ষী দেবীর ভজন। গুরুদেব বলেন, আর একটু ধীর গতিতে। খুব ধীর গতিতে আবার গাওয়ার পর তিনি বলেন, একটু কাগজ দাও। সাবিত্রীর নিকট কিছুই নেই; গুরুদেব ধমকে বলেন, কিছু নেই? ঐ সামনের ময়লা কাগজের ঝুড়ি থেকে আন শীগ্ গীর। সেখানে ফেলে-দেওয়া কাগজ ঘেঁটে একটি বড় খাম পেয়ে সাবিত্রী তাই এনে দিলেন। গুরুদেব তার উল্টো পিঠে লিখলেন,—

বাসন্তী! হে ভুবন-মোহিনী,
দিক প্রান্তে বন বনান্তে
শ্যাম প্রান্তরে আম্র ছায়ে,
সরোবর তীরে নদী নীরে,
নীল আকাশে মলয় বাতাসে,
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী!
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী!
বাসন্তী!

বললেন,—এই কথা—তোমার মীনাক্ষীর

মীনাক্ষী মে মুদম দেহি

মে চ কাঙ্গী রাজ মাতঙ্গী···প্রভৃতি কথাগুলির বদলে আমার কথাগুলি দিয়ে গাও।

সাবিত্রীর তখন পেটে অগ্নি-কাণ্ড—গলা দিয়ে গানের 'গ'ও আসছে না, সে কথা সে গুরুদেবকে বলেই ফেলল।

গুরুদেব বললেন, সে হবে। তোমার জন্ত রসম, দই-বড়া, সব বৌমা করে রেখেছেন—কত খাবে, পরে খেও, এখন গানটাত শেষ কর!

বালিকা অনেক কষ্টে বাংলা কথায় দক্ষিণী সুর দিয়ে গাইলো—বাসন্তী হে ভুবন-মোহিনী!

গুরুদেব তৎক্ষণাৎ ডাকালেন দিনুবাবুকে; দ্বিপ্রহরে নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়ায় বিরক্ত মুখে, বিশাল চেহারাখানা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে। গুরুদেব সাবিত্রীকে দিয়ে আবার সে গানখানা গাওয়ালেন। দিনুবাবুর বিরক্ত-কুঞ্চিত মুখ ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে করুণ। গানের শেষে তিনি অশ্রুসজল চক্ষে বলেন,—রবিদা, কোথা থেকে তুমি এ রকম কথাগুলি পাও?

গুরুদেব একটু হেসে পা নাচাতে নাচাতে বলেন—এবারে কলকাতার নিউ এম্পায়ারে বসন্তের 'নবীন' উৎসবের প্রথম গান হবে এটি, আর গাইবে সাবিত্রী। পরে এই গানটি স্থান পেয়েছে তাঁর 'নবীন' নামক বইটির প্রথম পাতায় ও তারপর গীত-বিতানে।

সাবিত্রী দেবী তখন একটি মীরার ভজন ও একটি মারাঠী ভজনও খুব গাইতেন; সেই দুটি গানের সুর সামান্য অদল-বদল করে গুরুদেব রচনা করেন,—তুমি কিছু দিয়ে যাও, এবং শুভ্র প্রভাতে প্রভৃতি গান।

বাজে করুণ সুরে,—বেদনা কি ভাষায় রে,—নীলাঞ্জন ছায়া,—বাসন্তী হে ভুবন-মোহিনী,—কখন দিলে পরায়ে,—প্রভৃতি ৭।৮টি গানে গুরুদেব সাবিত্রী দেবীর গাওয়া দক্ষিণী সুরে বাংলা শব্দ সংযোজন করে, নূতন রূপে প্রকাশ করে তাঁর বিশাল সঙ্গীত-রাজ্যে আনেন এক চমকপ্রদ অভিনবত্ব!

সাবিত্রী দেবী ছাত্রী অবস্থায় একবার অটোগ্রাফের খাতা গুরুদেবকে এগিয়ে দিয়ে আব্দার জানান কিছু লিখে দিতে। গুরুদেব স খাতায় লেখেন,—

তব কণ্ঠে ভাষা যদি পায় মোর গান

আমার সে দান, কিংবা তোমারই সে দান?

সাবিত্রী দেবী এর অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে বলেন,—গুরুদেব, কী লিখলেন? আমি যে বুঝতে পারছি না! গুরুদেব কপট কোপের সুরে বলেন,—যাঃ—পালা এখান থেকে। পাশে ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই,—তিনি হেসে ওঠেন হা হা করে।

সাবিত্রী দেবী অল্প বয়সে ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত, উচ্ছল, তাই দুরন্ত। কবিত্বপূর্ণ আম্রকুঞ্জে কচি আমের আশায় বীণাবাদিনী বাণীর রূপ ছেড়ে তিনি ধরতেন শাখা-মৃগের রূপ! গাছের মগ-ডালে উঠে কচি আম পেড়ে আনতে তাঁর জুড়ি সমস্ত মেয়ে-বোর্ডিং খুঁজে পাওয়া যেত না। আবার অসুস্থ হলে তাঁকে শয্যা-বন্দিনী করে রাখা ও রোগীর পথ্য খাওয়ানো ছিল তত্ত্বাবধায়িকার সাধ্যের অতীত। কাজেই তাঁর নামে নানা রিপোর্ট প্রায়ই গুরুদেবের কর্ণগোচর হত।

একদিন দুপুর বেলা অসময়ে উত্তরায়ণ থেকে গুরুদেবের ডাক এলো। সাবিত্রী দেবী ভাবলেন, কী জানি কি আবার 'রিপোর্ট' গেল গুরুদেবের কাছে। গুরুদেবের মধ্যাহ্ন-আহার সমাপ্ত, খাবার ঘরেই তিনি বসে আছেন—ভৃত্য বনমালী তখনও টেবিলের নিকট দণ্ডায়মান। গুরুদেব সাবিত্রীকে দেখেই বলে উঠলেন,—'সাবিত্রী, তুমি কী শিখলে এখানে?' ঘাবড়ে গিয়ে সাবিত্রী মাথা চুলকাতে আরম্ভ করলেন।

গুরুদেব—এত দিন রইলে এখানে,—শিখলে কী? ঐ টেবিলের উপর প্লেটে যা আছে তা খাও।

সাবিত্রী দেখেন চপ জাতীয় একটি খাদ্য। আমিষ খাদ্যে তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা। আরও ঘাবড়ে বলেন,—না গুরুদেব, ও আমি খেতে পারব না, ওর ভিতরে না জানি কি আছে। গুরুদেব কপট গাম্ভীর্যে বলেন,—আছে তোমার মুণ্ডু। ওটা মাছের চপ, এতদিন বাংলা দেশে আছ, আর মাছ খেতে শিখলে না? তবে তুমি শিখলে কী?

সাবিত্রী দেবীর তখন প্রায় কান্না এসে গেছে, বনমালী টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে; এবার গুরুদেব গাম্ভীর্য ত্যাগ করে হেসে বলেন,—ওরে বনমালী,—যা বৌমার কাছ থেকে সন্দেশ, রসগোল্লা, মিষ্টি মিঠাই যা পাস সাবিত্রীর জন্য নিয়ে আয়।

তারপর কষ্টের পর হাসি,—মিষ্টি মুখ,—গুরুদেবকে গান শোনানো, তবে ছুটি।

এ ভাবে যখন তখন তিনি সাবিত্রী দেবীকে ডেকে পাঠাতেন ও তাঁর গান শুনতেন। অল্প বয়সে গুরুদেবের অনেক কথাই বুঝতে না পারলেও সাবিত্রী দেবী এখন সবই বোঝেন, মনে প্রাণে। গুরুদেব যে তাঁকে কত গভীর স্নেহ করতেন তা মনে করে এখন মুহুর্মুহু আঁখি অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। এখানকার মায়া কাটাতে না পেরে তাই আজও, জীবনের অপর প্রান্তে এসে শান্তিনিকেতনের মাটি আঁকড়ে ধরে আছেন, আপন মাটির মত।

## ( ২৪ )

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের আবাল্য বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা জ্যোৎস্নালতা দেবী বর্ত্তমানে শান্তিনিকেতন-বাসিনী। তিনি বর্ষীয়সী, পূর্ব্ব পল্লীতে একমাত্র কন্যা ও অবসর প্রাপ্ত জামাতার সহিত বাস করছেন পরম শান্তিতে। অমায়িক, বিনয়ী, সদালাপী, ৬৬ বৎসর বয়স্কা জ্যোৎস্না দেবীর মধুর ব্যবহার মনোমুগ্ধকর!

তাঁর নিকট গুরুদেবের কথা কিছু শুনতে চাওয়ায় বললেন, তিনি তাঁর শিশুকালে গুরুদেবের কোলে পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছেন। সন্তোষ মজুমদার মহাশয় তাঁর দাদা; গুরুদেবকে তাঁরা ডাকতেন কাকা মশাই বলে, এবং শান্তিনিকেতনে এলে থাকতেন দেহলি কিংবা তার পাশের নূতন বাড়ীতে। আবার গুরুদেবও অনেক সময় তাঁর বাবার কর্মস্থানে তাঁদের বাড়ীতে এসে দীর্ঘ দিন থাকতেন নিজের বাড়ীর মতই।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে পিতামাতার মত কাকা মশাইকেও তাঁরা অতি আপনার বলে মনে করতেন। জ্যোৎস্না দেবী বলেন, তাঁকে এত কাছে পেয়েছিলাম বলেই বোধ হয় তাঁর সম্বন্ধে আলাদা করে বিশেষ কিছু বলা শক্ত। তিনি যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে এক হয়ে গিয়েছিলেন।

গুরুদেব সম্বন্ধে তাঁর প্রথম স্মৃতি,—কলকাতায় জ্যোৎস্না দেবীর পিতামহ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। গুরুদেব কলকাতায় এলেই, তাঁকে দেখতে আসতেন। অসুস্থ ঠাকুর্দ্দা তিনি এলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন ও গান শোনাতে অনুরোধ করতেন। ৪।৫ বৎসর বয়স্কা জ্যোৎস্না দেবীকে কোলে বসিয়ে তিনি গান গেয়ে যেতেন একটার পর একটা। তাঁর মিষ্টিগানে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শিশু জ্যোৎস্না নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকতেন তাঁর ক্রোড়ে।

তারপর আর একটু বড় বয়সের একটি স্মৃতি,—তাঁদের কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁর বাবা সহরের বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। নিমন্ত্রিত অনেকের মধ্যে জ্যোৎস্না দেবীর স্মরণে আছেন—অক্ষয় বড়াল, ডি, এল, রায়, রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত দীর্ঘকায়, উচ্চতায় সাধারণের চেয়ে বেশ খানিকটা বড়। বোধহয় সে বাড়ীর দরজাগুলি একটু নীচুই ছিল, সাধারণ মানুষের তাতে কোন অসুবিধা না হলেও, সবদিক দিয়ে অসাধারণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাড়ীতে ঢুকতে গিয়েই খেলেন মাথায় এক ঠোক্কর। ভিতরে গিয়ে জ্যোৎস্না দেবীর জননীকে বললেন,—বৌঠান, বাড়ী ঢুকবার মুখেই ত বেশ একটি ঘা খাইয়ে দিলেন,—এখন আবার না-জানি কী খাওয়াবেন! বলে খুব হাসতে লাগলেন। জ্যোৎস্না দেবীর শিশুকালে তাঁর দৈহিক উচ্চতা দেখে খুব আশ্চর্য্য লাগত ও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে মনে হত, যেন আকাশের দিকে চেয়ে কথা বলছেন।

তারপর তাঁর বাবা যখন গিরিডিতে হাকিম ছিলেন, তখন গুরুদেব ও তাঁর পরিবারের অনেকেই তাঁদের বাড়ী গিয়ে অনেক সময় থাকতেন।

মজুমদার মহাশয় গিরিডিতে স্যার নীলরতন সরকারের প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করে সেখানে থাকতেন এবং গুরুদেব এলে রোজ সন্ধ্যায় সে-বাড়ীর বিশাল বারান্দায় বসে 'দারোগা-কাহিনী' নামে একটি বই পড়ে শোনাতেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের পাঠ শুনতে ক্রমশঃ সেখানে এত ভীড় জমে যেত যে, শেষকালে বারান্দায় আর স্থান সঙ্কুলান হয়ে উঠত না। সবসময়েই তিনি জ্যোৎস্না দেবী ও তাঁর ভাই-বোনদের এত আদর করতেন যে, কাকা মশাইয়ের দরদীমনের স্নেহ-ভালবাসার কথা স্মরণ করে আজও তাঁর চোখ অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে।

পিতার মৃত্যুর পর বাংলা ১৩১৫ সালে তাঁরা কলকাতায় এলে, গুরুদেব প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের বাড়ী এসে, নীরব সান্ত্বনায় তাঁদের সকলকে অভিষিক্ত করতেন। ১৩১৬ সালে গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের ও জ্যোৎস্নাদেবীর মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বিবাহ হয়। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ এবং জ্যোৎস্নাদেবী ছিলেন এক বয়সী; তাঁদের মামাবাড়ী মুঙ্গেরে গিয়েই বিধির বিধানে শমীন্দ্রনাথের ঘটে অকাল মৃত্যু।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের একটি মনোরম অথচ বেদনা-বিধুর চিত্র জ্যোৎস্নাদেবীর নিকট পাই। যোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে রথীবাবুর খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে প্রতিমাদেবীর সহিত বিবাহ হয়। জ্যোৎস্নাদেবী সে বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বড় ভগ্নী সৌদামিনী দেবী বিবাহের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজে মহা ব্যস্ত। চরকীর মত চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও মাঝে মাঝে রথীবাবুর মার কথা মনে করে আঁচলে চোখ মুছছেন। অন্য ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন,—সব সব,—সে আজ কোথায়? যাঁর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করে আদরের রথী যাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজে,—তিনিই রইলেন আজ অনুপস্থিত!

চতুর্দ্দিকে অগণিত নিমন্ত্রিতা। তাঁদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথের মা ৺মৃণালিনী দেবীর আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে গুঞ্জন ওঠে। সে সভার সমগ্র মহিলাকুলের মধ্যে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী; তাঁকেই সকলে ধরলেন,—রথীবাবুর মা কেমন ছিলেন তার বর্ণনা দিতে। স্বর্ণকুমারী দেবীর কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর চেহারারই মত,—অতি মধুর! তিনি তাঁর সেই বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে থাকেন ৺মৃণালিনীদেবীর কথা। বলেন,—তিনি ছিলেন আমাদের বাড়ীর জ্যোতির্ম্ময়ী বৌ! স্বভাব তাঁর এতই সুন্দর ছিল যে, চেহারার কোন ত্রুটি আমাদের চোখেই পড়ত না। গায়ের রং হয়ত একটু ময়লা ছিল, কিন্তু তা ঢেকে প্রকাশ পেত তাঁর অন্তরের সৌন্দর্য্য! বাহিরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভিতরের সৌন্দর্য্যে তিনি ছিলেন অনেক বেশী ঐশ্বর্য্য-শালিনী, মহিম-ময়ী!

জ্যোৎস্নাদেবীর বিবাহ হয় শ্রীরামপুর-নিবাসী ৺সত্যেন্দুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি আজীবন শ্রীরামপুরেই শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। বিবাহের পরও জ্যোৎস্না দেবী অনেক সময় শান্তিনিকেতনে আসতেন; তিনি ছিলেন রন্ধনে সুপটু। একদিন হঠাৎ গুরুদেব তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি উত্তরায়ণে গিয়ে শোনেন, গুরুদেবের নিকট এক ভদ্রমহিলা লিখে পাঠিয়েছেন যে, ১১ রকম মোচার তরকারী রাঁধা যায়। গুরুদেব জ্যোৎস্না দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন,—তুই ত খুব রাঁধতে শিখেছিস শুনি,—পারিস এগারো রকম মোচার তরকারী রাঁধতে? জ্যোৎস্না দেবী বলেন,—কাকা মশাই, এগারো রকম কেন, আমি পনেরো রকম মোচার তরকারী রাঁধতে পারি।

গুরুদেব—সত্যি? তবে খাওয়া আমাকে কাল থেকেই,—দেখি তুই কেমন রান্নায় হাত পাকিয়েছিস!

জ্যোৎস্না—আচ্ছা খাওয়াব, কিন্তু মোচা যোগাড় করি আগে। আমাদের গাছে মাত্র তিনটি মোচা হয়েছে দেখেছি।

তারপর প্রতিমা বৌঠানের নিকট গিয়ে সব বলে, বললেন,—মোচা দিতে হবে। প্রতিমা দেবী নিজেদের বাগান অনুসন্ধান করে আরও কিছু মোচা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। তখন জ্যোৎস্না দেবী প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার মোচার তরকারী রেঁধে পাঠাতে লাগলেন। তার ভিতরে বিবিধপ্রকার ঘণ্ট, ডালনা, চপ, কাটলেট, কোপ্তা, পাতুরী, আমিষ, নিরামিষ রান্নার শিল্প-চাতুরীর কিছুই বাদ যায়নি। ১৩ রকম খাওয়ার পর গুরুদেব খুসী হয়ে বলেন,—তোকে সার্টিফিকেট দেব। তারপরই তাঁর অন্যত্র যাওয়ায়, পনেরো রকম আর খাওয়ানো হয়ে ওঠে নি।

রান্নার কাহিনী ওঠায় জ্যোৎস্না দেবীর আর একটি পুরাতন ঘটনা মনে পড়ে। বাবা মারা যাওয়ার পর মার সঙ্গে তাঁরা আছেন দেহলি-সংলগ্ন নূতন বাড়ীতে। মা হঠাৎ ছেলেমেয়েদের বলেন,—আমি কয়েকদিনের জন্য কাশী যাব, তোমরা মিলে মিশে সংসার চালাও। সন্তোষবাবু তখন সদ্য-বিবাহিত, মা সকলকেই সুশৃঙ্খলায় কর্ম্মবিভাগ করে অকস্মাৎ গেলেন কাশী।

[ক্রমশঃ

# কারমেন

প্রস্পের মেরিমে

[ পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর ]
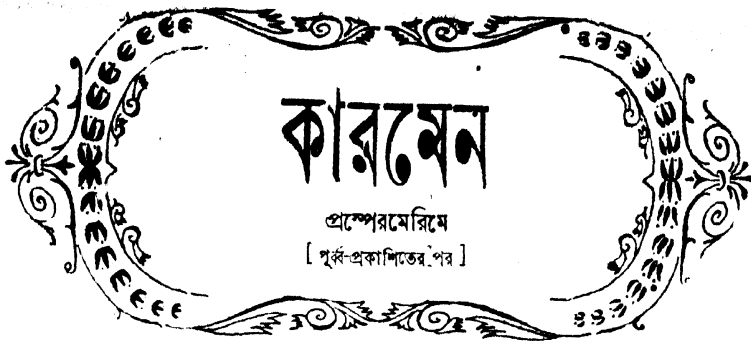
আমি বললাম, মাদমোয়াজেল, জেলে আমাকে যে উপহার পাঠিয়েছিলে তার জন্য তোমার ধন্যবাদ পাওনা আছে। তোমার দেওয়া রুটি আমি খেয়েছি। রেতিটা আমার বর্শা ধার দেওয়ার কাজে লাগছে। ওটা তোমার স্মৃতি হিসাবে আমার কাছে রেখেছি। কিন্তু এই রইল তোমার পিয়াস্ত্র। কি কাণ্ড! হাসিতে ফেটে পড়ল কারমেন। পিয়াস্ত্রটা রেখে দিয়েছ? যাক্, ভালই হল। আজ আমার ট্যাঁক খালি। কিন্তু কুছ্ পরোয়া নেই। যে কুকুর রাস্তায় ঘোরে সে ভুখা মরে না।৪১ চল। আজ সব খেয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাক্। আর আজ খাওয়াবে তুমি।

আমরা সেভিলের পথে চললাম! ক্য ছ সেরপঁয় ঢোকার সময় কারমেন ডজনখানেক কমলালেবু কিনে আমার রুমালে ঢেলে দিল। আর একটু এগিয়ে কিনল রুটি, সসেজ ও একবোতল মাঞ্জানিলা।৪২ শেষে ঢুকল এক মিঠাইর দোকানে। আমার দেওয়া সোনার পিয়াস্ত্র, ওর পকেটের আরেকটা পিয়াস্ত্র ও আরো কিছু রূপার মুদ্রা কাউন্টারে ছুড়ে দিল। আমার পকেটে আরো যা ছিল সব দিতে বলল। আমার পকেটে পিয়েসেত৪৩ ও কয়েকটা কুয়ার্তো৪৪ মাত্র ছিল। সেগুলো দিলাম। বেশী কিছু ছিল না বলে ভীষণ লজ্জিত হলাম। মনে হল ও সারা দোকানটা কিনে নিয়ে যাবে। দোকানে সব চেয়ে পছন্দসই ও দামী যা কিছু—ইয়েমা৪৫, তুর৪৬, ফলের মিঠাই,—ঐ টাকায় যা পাওয়া গেল, সব কিনে নিল। সব কিছু কাগজের থলিতে পুরে আমাকে নিতে হল। আপনি হয়তো ক্য ছ কঁদিলে জো চেনন। ঐ রাস্তায় রাজা ডন পেড্রো জাষ্টিসের৪৭ আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি আছে। ওতেই আমার হুশ হওয়া উচিত ছিল। এই রাস্তায় একটা পুরাণো বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়ালাম। কারমেন বাড়ির ভিতরের গলিতে ঢুকে একতলার দরজায় ঘা দিল। ইবলিশের খাস বাঁদী এক বেদেনী দরজা খুলে দিতে এল। কারমেন রোমাণিতে তাকে কি বলল। বুড়ীটা প্রথমদিকে একটু গাঁইগুঁই করছিল। ওর মুখ বন্ধ করার জন্য কারমেন ওকে দুটো কমলালেবু ও একমুঠো মিঠাই দিল। একটু মদও চাখতে দিল। নিজের কোটটা চাপিয়ে দিল ওর কাঁধে। তারপর ওকে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজার কাঠের হুড়কা লাগিয়ে দিল। এবার নির্জন ঘরে শুধু আমরা দুজন। কারমেন পাগলের মত নাচতে সুরু করল। গান গাইতে লাগল, তুমি আমার রম৪৮ আর আমি তোমার রমী৪৯। আমি কেনাকাটা জিনিষপত্র বোঝাই

---

৪১। বেদেদের প্রবাদ—সুকেল সো পিরেলা, কোকাল টেরেলা। অর্থ—যে কুকুর হেঁটে বেড়ায়, তার হাড় জোটে।

৪২। এক জাতীয় সাদা নরম মদ।

৪৩ ও ৪৪। স্পেনীয় তাম্রমুদ্রা।

৪৫। চিনি মাখা ডিমের কুসুম।

৪৬। বাদাম-বরফি।

৪৭। নিষ্ঠুর নামে পরিচিত রাজা ডন পেড্রোকে তাঁর রাণী 'ক্যাথলিক' ইজাবেলা জাষ্টিসিয়ার ছাড়া অন্য কোন নামে কখনও ডাকতেন না। খলিফা হারুণ-অল-রসিদের মত রাজা ডন পেড্রো রাত্রিতে সেভিলের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন। কোন এক রাত্রিতে একটি নির্জন রাস্তায় সেরেভানে মত্ত একটি লোকের সঙ্গে রাজার বিবাদের ফলে দ্বন্দযুদ্ধ হয়। রাজা প্রেমিকপ্রবরকে হত্যা করেন। তরবারির ঝঞ্ঝনা শুনে এক বৃদ্ধা জানালা দিয়ে মুখ বার করেন। তার হাতের ছোট আলোয় (কঁদিলজো) রাস্তাটি আলোকিত হয়। রাজা খুব চতুর ও শক্তিমান হলেও তাঁর দেহের গঠনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। হাঁটার সময় তাঁর হাঁটু থেকে জোরে কটকট শব্দ হত। কটকট শব্দ শুনে বৃদ্ধার রাজাকে চিনতে একটুও বেগ পেতে হয়নি। পরদিন মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট রাজার কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন।

—মহারাজ, অমুক রাস্তায় দ্বন্দযুদ্ধ হয়েছে। একজন মারা গেছে।

—আপনি হত্যাকারীকে চিনতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ, মহারাজ।

—তাহলে তাকে এখনও শাস্তি দেওয়া হয়নি কেন?

—মহারাজ, আমি আপনার আদেশের অপেক্ষা করছি।

—আইন যা বলে আপনি তাই করুন।

রাজা ইতিপূর্বে দ্বন্দযোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান করে তাদের কর্তিত মস্তক দ্বন্দযুদ্ধের স্থানে স্থাপন করার জন্য এক আইন পাশ করেছিলেন। মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট খুব তেজস্বী পুরুষের মত এই ব্যাপারের মীমাংসা করলেন। তিনি রাজার একটি প্রস্তর-মূর্তি থেকে মাথাটা কেটে এনে দ্বন্দযুদ্ধের স্থানে স্থাপন করলেন। রাজা ও সেভিলবাসীরা কাজটি প্রশংসনীয় বলে মনে করেছিলেন। এই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী বৃদ্ধার হাতের আলো থেকে রাস্তার নাম হল কঁদিলেজো। ক্য ছ কঁদিলেজো ও ডন পেড্রো সম্পর্কে এই হল জনশ্রুতি।

৪৮। স্বামী। ৪৯ স্ত্রী।

হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না ওগুলো কোথায় রাখব। কারমেন সব কিছু মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার কাঁধে লাফিয়ে উঠল। বলতে লাগল, আমি তোমার ধার শুধছি। এই কালদের৫০ নিয়ম।—ম'সিও, সেদিনটা, সেদিনটা,—যখন সেদিনের কথা ভাবি, কালকের কথা ভুলে যাই।

দস্যু একটু নীরব থেকে সিগার ধরিয়ে আবার বলতে লাগল।—পানাহারে ও অন্য সব কিছুতে সারাদিন কাটালাম। কারমেন ছ'বছরের শিশুর মত মিঠাই মুখে পুরছিল আর হাত দুটো বুড়ীর জলের কুঁজোয় ডুবিয়ে বলছিল, বুড়ীর জন্য সরবত বানিয়ে দিচ্ছি। ইয়েমাগুলো দেয়ালে ছুঁড়ে চেপ্টে লাগিয়ে দিয়ে বলল, ওতে মাছির হাত থেকে রেহাই পাব। কোন পাগলামি, কোন ছলাকলা কিছুই ও বাকি রাখল না। ওকে বললাম ওর নাচ দেখতে চাই। কিন্তু কাস্তাইনেত কোথায়? তৎক্ষণাৎ বুড়ীর একমাত্র প্লেটটি টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলল কারমেন। চীনামাটির ভাঙা টুকরোর বাজনার সঙ্গে সুরু হল রোমালি নাচ। শুনে মনে হল যেন সত্যিকারের মেহগণি বা হাতীর দাঁতের কাস্তাইনেত বাজছে। আমি হলপ করে বলতে পারি এই মেয়েটার সঙ্গ কখনও একঘেয়ে লাগবে না। সন্ধ্যা হয়ে এল। শুনতে পেলাম ড্রাম বাজছে। ওটা শিবিরে ফিরে যাওয়ার ডাক। আমি বললাম, নাম ডাকার সময় হল। ব্যারাকে ফিরতে হবে।

—ব্যারাকে চল্, ঘৃণাভরে প্রতিধ্বনি করল কারমেন।

—তুমি একটা আস্ত নিগার। ডাণ্ডায় ঠাণ্ডা। আকৃতি ও প্রকৃতি দুইয়েতেই তুমি চড়াই পাখী। ভাগো। মুরগীর কলজে তোমার।

থেকে গেলাম। অদৃষ্টের হাজতবাস মেনে নিলাম আগে থেকেই।

সকালবেলা কারমেনই প্রথম বিদায় নেওয়ার কথা বলল।—শোন জোসেইতো, তোমার ধার শোধ হল ত। তুমি পরদেশী। বেদেদের আইনমত তোমার কাছে আর আমার কোন ঋণ নেই। কিন্তু তুমি মন্দ লোক নও। তোমাকে আমার মনে ধরেছে। শোধবোধ—কেমন? বিদায়।

আবার কবে দেখা হবে জানতে চাইলাম। কারমেন হাসিমুখে বলল,—তোমার ক্যাবলামি যখন একটু কমবে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, বন্ধু, বুঝতে পারছ ত? তোমাকে হয়তো একটু ভালবেসে থাকব। কিন্তু তা ধোপে টিকবেনা। কুকুর আর নেকড়ের ঘরকন্না বেশীদিন টেকেনা। তুমি মিশরীয় আইনকানুন৫১ মেনে চললে হয়তো আমি তোমার রমী হতাম। কিন্তু সেত পাগলামি। তা হতে পারে না। যাক্, বাছাধন মনে রেখ—এবার খুব সস্তায় রেহাই পেলে। শয়তানের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। হ্যাঁ, শয়তান। সে যে সব সময় দেখতে কাল হবে তার কোন মানে নেই। মনে রেখ সে তোমার ঘাড় মটকায়নি। পশমী পোষাকে মোড়া থাকলে কি হবে? আমি মেষ নই। ফিরে গিয়ে মা মেরীর সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিও। ওটা মা মেরীর সত্যিকারের প্যাওনা হয়েছে। আচ্ছা, এবার বিদায়। কারমেনচিতার কথা আর মনে এনোনা। নয়তো সে তোমাকে কাঠের ঠ্যাঙওয়ালা বিধবার৫২ সঙ্গে বিয়ে দেবে।

এই ভাবে কথা বলতে বলতে ও দরজার হুড়কা খুলে দিল। রাস্তায় বেরিয়েই ওড়নায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরল।

কারমেন সত্য বলেছিল। ওর কথা আর মনে ঠাঁই না দিলে ভাল করতাম। কিন্তু দ্য ক্ত কঁদিলেজোর সেদিনের পর অন্য কিছুই আর ভাবতে পারছিলাম না। যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—এই আশায় প্রতিদিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। বুড়ীটা ও ভাজার দোকানীর কাছে ওর খবর নিতাম। দুজনেই জবাব দিত ও লালোরোর গেছে। ওরা পর্তুগালকে ঐ নামে ডাকে। সম্ভবত: কারমেনের নির্দেশমতই ঐ কথা বলত। কিন্তু আমার বুঝতে দেরি হয়নি যে, ওরা মিথ্যা কথা বলছে। দ্য ক্ত কাঁদিলেজোর সেদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পরে শহরের একটা গেটে পাহারায় ছিলাম। গেট থেকে একটু দূরে প্রাচীরের গায়ে একটা ভাঙা ছিল। দিনের বেলা সেখানে কাজ হত। রাত্রিতে চোরাই চালানকারীদের ঠেকাবার জন্য পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। দিনের বেলা লীল্লা পাস্তিয়াকে দেখলাম। রমী বাহিনীর চারদিকে ঘুর ঘুর করছে। কথাবার্তা বলছে আমার কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে। প্রত্যেকেই ওকে চিনত। ওর ভাজাভুজিকে চিনত আরো ভাল করে। লীল্লা আমার কাছে এগিয়ে এসে আমি কারমেনের খবর পেয়েছি কিনা জিজ্ঞেস করল।

—না, আমি উত্তর দিলাম।

—তা'হলে এবার খবর পাবে।

লীল্লা মিথ্যা বলেনি। রাত্রিতে ভাঙা জায়গাটায় আমি পাহারায় ছিলাম। কার্পোরাল চলে যেতেই একটি মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার প্রাণ বলল, ও কারমেন। তবু আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, তফাৎ যাও।

—বজ্জাতি করোনা, আমাকে দেখা দিয়ে কারমেন বলল।

—কী? কারমেন তুমি?

—হ্যাঁগো দেশোয়ালী। একটা কথা আছে। এক দুয়োরো৫৩ রোজকার করবে? থলি নিয়ে কিছু লোক এদিকে আসবে, তাদের যেতে দিও।

আমি উত্তর দিলাম—না। আমি তাদের যেতে দেব না। ওপর-ওয়ালার হুকুম আছে।

—হুকুম। হুকুম। দ্য ক্ত কাঁদিলেজোয় তোমার হুকুম কোথায় ছিল? শুধু স্মৃতিমাত্রেই উদভ্রান্ত হয়ে জবাব দিলাম—হুকুম ভুলে যাওয়ার বিপদের যোগ্যমূল্যও পেয়েছিলাম। চোরাইচালানকারীর টাকা আমি চাইনা।

—বেশত! টাকা চাওনা? বুড়ী দরোতের ওখানে আবার ডিনারে যেতে চাওত?

---

৫০। বেদেরা নিজেদের কাল বলে। বেদেদের ভাষায়ও কাল মানে কৃষ্ণকায়।

৫১। বেদেদের আইনকানুন। অধিকাংশ বেদের ধারণা—তাদের আদি বাসস্থান মিশর।

৫২। ফাঁসি কাঠ হচ্ছে সর্বশেষে যে ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছে তার বিধবা—মেরিমের পাদটীকা।

৫৩। স্পেনীয় রৌপ্যমুদ্রা।

—না, তাও চাইনা । এই কয়টি কথা বলতে আমার প্রায় দমবন্ধ হয়ে এল ।

বেশ বড্ড গোলমেলে হয়েছে, না ? আমি জানি কোথায় আমাকে যেতে হবে । তোমার অফিসারকে আমি দরোতের ওখানে যাওয়ার বন্দোবস্ত করব । দেখেত মনে হয় ছোকরা লোক ভাল । যে যোয়ানকে সে পাহারায় বসাবে সে শুধু যা দরকার তাই দেখবে । যাচ্ছি তাহলে, চড়ুইমশাই । ওদের হুকুমে যেদিন তুমি ফাঁসিতে লটকাবে সেদিন আমি প্রাণ ভরে হাসব ।

আমি দুর্বল । ওকে আবার ডাকলাম । কথা দিলাম দরকার-মত বেদেদের যেতে দেব । শুধু একমাত্র যে পুরস্কার আমি কামনা করি তা আমাকে দিতে হবে । কারমেন তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করল—পরদিন আমার কথা রাখবে । তারপর ছুটে গেল একটু দূরে অপেক্ষমান সাঙ্গাতদের খবর দিতে । ওরা সবশুদ্ধ পাঁচজন । তার মধ্যে একজন লীল্লা পাস্তিবা । সবাই ইংলণ্ডে তৈরী মালপত্রে বোঝাই । কারমেন নজর রাখছিল । রাউণ্ডের প্রহরীদের দেখলে কাস্তাইনেত্ত বাজিয়ে ওদের সতর্ক করে দেবে । কিন্তু প্রয়োজন হল না । ঠকের দল মুহূর্তের মধ্যে কাজ সারল ।

পরদিন ক্যা ত্ত কঁদিলেজোয় গেলাম । কারমেন অপেক্ষা করছিল । বিশ্রী মেজাজ নিয়ে কাছে এল । যারা মানুষকে পায়ে ধরে সাধায় তাদের আমি দেখতে পারি না । প্রতিদানের কথা না ভেবেই প্রথমবার তুমি আমার মহা উপকার করেছিলে । গতকাল তুমি আমার সঙ্গে দরকষাকষি করেছ । জানি না আজ আমি কেন এসেছি কিন্তু তোমাকে আর আমি ভালবাসি না । চলে যাও তুমি । তোমার ঝামেলার জন্য এই দুয়োরোটা নিয়ে যাও ।

ওর কপাল ভাল, দুয়োরোটা ওর মাথায় ছুঁড়ে মারিনি । প্রচণ্ড চেষ্টা করে নিজেকে সামলাতে হয়েছিল—পাছে ওর গায়ে হাত দিই । প্রায় এক ঘণ্টা কথা কাটাকাটির পর আমি ভীষণ রেগে বেরিয়ে গেলাম । কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত শহরে এলোমেলো ঘুরে বেড়ালাম । শেষে একটা গীর্জার অন্ধকারতম কোণে বসে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলাম ।

হঠাৎ কার গলা কানে এল : ড্রাগুনের চোখের জল । এদিয়ে আমি প্রেমের আড়ক বানাব । চোখ তুলে দেখলাম, কারমেন । ও আমাকে বলল, আচ্ছা দেশোয়ালী, তুমি কি এখনও আমাকে চাও ? যাই বলি না কেন নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালবাসি । তুমি চলে আসার পর আমার কি হল, জানি না । বেশ, এবার আমি তোমায় ডাকতে এসেছি । ক্যা ত্ত কঁদিলেজোয় যাবে ত ?

আবার আমাদের মধ্যে সব মিটমাট হয়ে গেল । কিন্তু কারমেনের মেজাজ আমাদের দেশের আবহাওয়ার মত । আমাদের পাহাড়ে সূর্যের আলো যখন ঝলমল করছে, তখন বুঝতে হবে ঝড়ের আর দেরি নেই । কারমেন কথা দিয়েছিল, আর একবার দরোতের ওখানে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে । কিন্তু ও আসেনি । দরোতে আমাকে অবলীলাক্রমে বলল, মিশরীয় ব্যাপারে কারমেন লালোরোয় গেছে । পুরনো অভিজ্ঞতার ফলে কোথায় কারমেনের খোঁজ করতে লাগলাম । দিনে বিশবার ক্যা ত্ত কঁদিলেজোয় ঘোরাঘুরি করতাম । একদিন সন্ধ্যায় দরোতের ওখানে ছিলাম, দরোতেকে মাঝে মাঝে গ্লাস কয়েক 'এ্যানিজেত[৫৪] খাইয়ে প্রায় বশ করে এনেছিলাম । এমন সময় কারমেন ঘরে ঢুকল । পিছনে আমাদের রেজিমেন্টের এক ছোকরা লেফটেনাণ্ট ।

কারমেন বাস্কভাষায় আমাকে বলল—এখনি এখান থেকে চলে যাও । আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম । রাগে আমার রক্ত টগবগ করতে লাগল । লেফটেনাণ্ট আমাকে বলল—তুই এখানে কি করছিস ? ভাগো হিঁয়াসে ।

আমি নড়তে পারলাম না । দেহ যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেল । মাথা থেকে টুপি পর্যন্ত খুলিনি দেখে অফিসারটি রেগে আমার কলার ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল । ওকে আমি কি বলেছিলাম জানিনা । অফিসারটি তরবারি বার করল । আমিও খাপ থেকে তরবারি খুলে ফেললাম । বুড়ীটা আমার হাত ধরে ফেলল । অফিসারটি তরবারি দিয়ে আঘাত করল আমার কপালে । তার চিহ্ন এখনও আমার কপালে রয়েছে । আমি হটে গিয়ে কনুইর গুতো দিয়ে বুড়ীকে মাটিতে ফেলে দিলাম । তারপর লেফটেনাণ্ট যখন আমাকে তাড়া করছিল তখন আমি তরবারিটা বাড়িয়ে দিলাম । সে আমোর তরবারিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল । কারমেন আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ওদের ভাষায় দরোতেকে পালাতে বলল । আমি ওখান থেকে পালিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলাম—জানিনা কোথায় । মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে অনুসরণ করছে । যখন সম্বিত ফিরে এল, দেখলাম কারমেন আমার সঙ্গ ছাড়েনি ।

কারমেন বলল—হাঁদারাম । ক্যাবলামি ছাড়া আর কিছু শেখনি । বলিনি আমি তোমার জন্য দুর্ভাগ্য নিয়ে আসব ? কিন্তু কিছু ভেবোনা । তোমার যখন বেদে সাঙ্গাতনী জুটেছে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে । আগে এই রুমালটা মাথায় জড়িয়ে তোমার বেল্টটা আমায় খুলে দাও । এই গলিতে আমার জন্য একটু দাঁড়াও । আমি এক্ষুণি ঘুরে আসছি, বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল । একটু পরেই একটা ডোরাকাটা ওভারকোট নিয়ে এল । জানিনা ওটা ও কোথা থেকে জোটাল । কারমেন আমার ইউনিফর্ম খুলে নিয়ে সার্টের ওপর ওভারকোটটা চাপিয়ে দিল । রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল কপালের ক্ষত । মাথায় রুমাল জড়ানো অবস্থায় আমাকে দেখাচ্ছিল—ভ্যালেন্সের যে সব চাষীরা সেভিলে সুফাস রস বেচতে আসে ঠিক তাদের মত । একটা ছোটগলির শেষপ্রান্তে প্রায় দরোতের বাসার মত একটা বাসায় কারমেন আমাকে নিয়ে এল । সেখানে কারমেন ও আর একটা বেদেনী আমার ক্ষত ধুয়ে যে-কোন সার্জেন-মেজরের চেয়ে নিপুণহাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল । আর দিল পানীয় । জানিনা কি ধরণের পানীয় ওটা । শেষে একটা গদির ওপর আমাকে শুইয়ে দিল । আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ।

সম্ভবতঃ পানীয়ের সঙ্গে ওরা ওদের বিশেষ ধরণের ঘুমের ওষুধ ( যার মর্ম শুধু ওদেরই জানা আছে ) মিশিয়ে দিয়েছিল । কারণ পরদিন অনেক বেলায় আমার ঘুম ভাঙল । আমার গায়ে তখনও জ্বর, মাথায় সাংঘাতিক ব্যথা । গত সন্ধ্যায় যে ভয়ানক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, সে সব কথা মনে হ'তে বেশ কিছু সময় লাগল । আমার ক্ষত বেঁধে দিয়ে কারমেন ও তার সঙ্গিনী উবু হয়ে আমার

৫৪ । মৌরীমশলায় তৈরী একজাতীয় পানীয় ।

বিছানার পাশে বসেছিল। ওরা সিপকালিতে[৫৫] কি বলাবলি করল। দুজনেই আশ্বাস দিল—আমি দু'দিনেই সেরে উঠব। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেভিল ছেড়ে যেতে হবে। কেন না, ধরা পড়লে আমাকে গুলি করে মারা হবে। কিছুতেই রেহাই নেই।

কারমেন আমাকে বলল—যাদুমণি, তোমাকে একটা কিছু করে খেতে হবে ত? এখন ত সরকার তোমার জন্য ভাত আর শুটকি মাছ যোগাবেন না। এবার তোমাকে অন্য কোন আয়ের পথ দেখতে হবে। চালাকের মত চুরি করার বুদ্ধিটুকুও তোমার নেই। কিন্তু তুমি চটপটে ও শক্তিমান। বুকের পাটা থাকেত পাহাড়ে গিয়ে চোরাই চালানকারী হয়ে যাও। বলিনি,—তোমাকে আমি ফাঁসির দড়িতে ঝোলাব। গুলি খেয়ে মরার চেয়ে তা' ঢের ভাল। তা'ছাড়া, ঠিকভাবে চলতে পারলে রাজার হালে থাকবে। অন্তত যতদিন সৈনিক বা উপকূলরক্ষীদের হাতে না পড়।

কী লোভনীয় করেই না শয়তানী আমার নয়াজীবনের পথ বাতলে দিল। সত্যি কথা বলতে কি, এই একমাত্র পথই আমার জন্য খোলা ছিল। কারণ আমার মাথার ওপর তখন খড়গ ঝুলছে। সত্যি বলব ম'সিও? আমাকে রাজী করাতে ওর বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। ভেবেছিলাম ঝঞ্চাক্ষুব্ধ বিদ্রোহীর জীবন মেনে নিলে কারমেনকে আরো নিবিড়ভাবে পাব। নিজেকে আশ্বাস দিলাম—এখন থেকে কারমেনের ভালবাসা পাব। আন্দালুশিয়ার কয়েকজন চোরাই চালানকারীর কথা অনেক শুনেছিলাম। তারা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সারা আন্দালুশিয়া ঘুরে বেড়ায়। তাদের হাতে বন্দুক—ঘোড়ার পিছনদিকে তাদের প্রণয়িণী। আমার মধুর বেদেনীকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে পাহাড়-উপত্যকা পেরিয়ে যাচ্ছি, ইতি মধ্যেই এই ছবি আমার চোখে ভাসতে লাগল। কারমেনকে তা বললাম। সে হাসিতে চৌচির হয়ে গেল। আমাকে বলল, রাত্তিরে তাঁবুতে রাত কাটানোর চেয়ে মধুর আর কিছু নেই। ছোট তাঁবু—তিনদিক কাপড় দিয়ে বৃত্তাকার করে ঘেরা—ওপরে একটা কম্বল চাপানো। প্রত্যেক রম তার রমীকে নিয়ে এই তাঁবুতে রাত কাটায়। আমি ওকে বললাম, যদি কখনও পাহাড়েই যেতে হয়, তোমার ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিন্ত হতে হবে। সেখানে ভাগীদার কোন লেফটেনান্টের থাকা চলবে না।

কারমেন উত্তর দিল—হিংসুটে কোথাকার। জ্বলে পুড়ে মরছে। আচ্ছা বোকা ত! তোমাকে ভালবাসি, তাকি দেখতে পাও না? কখনও তোমার কাছে একটা পয়সা চেয়েছি?

যখন ও এভাবে কথা বলত, ইচ্ছা হত ওকে গলা টিপে মেরে ফেলি। সংক্ষেপে বলছি। কারমেন আমাকে সাধারণ নাগরিকের পোষাক যোগাড় করে দিল। সেই পোষাকে সকলের অজ্ঞাতে সেভিল ত্যাগ করলাম। পাস্তিয়ার চিঠি নিয়ে জেরেজে এক এ্যানিজেতের ব্যবসায়ীর কাছে গেলাম। তার ওখানে চোরাই-চালানকারীর জমায়েত হত। এই লোকগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তাদের সর্দার দাঁকাইর আমাকে দলে ভর্তি করে নিল। গঁছ্যায় রওনা হলাম। সেখানে কারমেন আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল। আবার কারমেনকে কাছে পেলাম। অভিযানের সময় কারমেন গুপ্তচর হিসাবে কাজ করত। গুপ্তচর হিসাবে ওর জুড়ি মেলা ভার। জিব্রালটার থেকে ঘুরে এল। ইংলণ্ড থেকে যে মাল আসবার কথা ছিল, ও ইতিমধ্যেই এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তা নামাবার বন্দোবস্ত করে ফেলল। এই মালের জন্য আমরা এস্তেপোনার কাছাকাছি গেলাম। মালের কিছুটা পাহাড়ে লুকিয়ে রাখলাম। বাকি মাল নিয়ে আমরা রঁদায় ফিরে এলাম। আমাদের আগেই কারমেন সেখানে হাজির হয়েছিল। শহরে ঢোকার সময়টাও কারমেনই বলে দিল। এই প্রথম অভিযান ও পরপর আরো কয়েকটি সফল হয়েছিল। সৈনিকের চেয়েও চোরাই-চালানকারীর জীবন ভাল লাগল। কারমেনকে নানা উপহার দিলাম। টাকা ও প্রেমিকা—দুইই আমার মিলল। প্রায় কোন অনুশোচনাই আমার ছিলনা বলা চলে। বেদেদের প্রবাদ আছে—আমামের চুলকুনি চুলকুনিই নয়।[৫৬] যেখানে যেতাম, বেশ সমাদর পেতাম। সঙ্গীরা আমার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করত। বেশ খাতির করত বলা চলে। তার কারণ আমি একজন মানুষ খুন করেছি। অবশ্য ওদের মধ্যে এমন কেউ ছিলনা যে বুক ফুলিয়ে ওই ধরণের কীর্তির কথা বলতে পারতনা। কিন্তু আমার নূতন জীবনে আমাকে যা সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল, তা'হচ্ছে এই: কারমেনের দেখা প্রায়ই পেতাম। ও আমাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রীতির চোখে দেখত। কিন্তু সঙ্গীদের সামনে ও আমার প্রণয়িনী—একথা প্রকাশ করতনা। এমনকি এ বিষয়ে আমিও কিছু বলবনা—আমাকে নানাভাবে শপথ করিয়ে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল। এই জীবনটির কাছে আমি এমনি দুর্বল ছিলাম যে, ওর সব খামখেয়াল মেনে নিতাম। তা'ছাড়া, এই প্রথম ও গেরস্তঘরের বউয়ের মত সংযত আচরণ করছিল। আমিও সাদামনে ভেবেছিলাম, ওর আগেকার চালচলন সত্যিই শুধরেছে।

আট দশ জন লোক নিয়ে আমাদের দল। একমাত্র জরুরী প্রয়োজনেই আমরা একত্র হতাম। অন্য সময় দুজন দুজন কিংবা তিনজন তিনজন করে আমরা শহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে থাকতাম। প্রত্যেকেই একটা-না-একটা কাজ করত। কেউ ঝালাইকর, কেউ ঘোড়ার দালাল, কেউ বা ছিট-কাপড়ের ফেরিওয়ালা। সেভিলের কুকীর্তির জন্য আমি কদাচিৎ কোন শহরে বের হতাম। একদিন, একদিন রাত্তিরে বলা যেতে পারে,—ভেজেরের পাদদেশে আমাদের জমায়েত হয়েছিল। সবাইর আগে আমি ও দাঁকাইর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেখলাম, দাঁকাইর খোশমেজাজে রয়েছে। সে বলল, আমরা আরো একজন সঙ্গীকে ফিরে পাব। কারমেন তার সেরা খেল দেখিয়েছে। ওর রম তারিফার জেলে ছিল। কারমেন এইমাত্র তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। বেদেদের ভাষা আমি কেবল বুঝতে শুরু করেছিলাম। আমার সব সঙ্গীরাই এই ভাষা বলত। রম শব্দটা আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল।

সর্দারকে বললাম, কী বললে? কারমেনের স্বামী? ওর তাহলে বিয়ে হয়েছে? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। ও বিয়ে করেছে ওরই মত ধূর্ত কানা গার্সিয়াকে। বেচারার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। জেলের ডাক্তারকে পটিয়ে কারমেন ওর রমকে ছাড়িয়ে এনেছে। সত্যি, এই ছুঁড়ীটার দাম ওর ওজনের সোনার সমান। দু'বছর ধরে

৫৫। বেদেদের ভাষার নাম রোমানি বা সিপকালি।

৫৬। বেদে প্রবাদ—সারাপিয়া সং পেসকিতাল, নে পুন্নাভা।

—মেরিমের পাদটীকা।

কারমেন ওকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করছিল কিন্তু অফিসার বদলি না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। নূতন অফিসার হাতে ওর কথায় কান দেয়, তার ব্যবস্থা করতে ওর বেশি দেরি হয়নি।

বুঝতেই পারছেন, এই খবরে আমার কি আনন্দ হল। কানা গার্সিয়ার দেখা পেতেও দেরি হলনা। এতবড় হিংস্র পশু বেদেদের মধ্যেও আর হয়নি। গায়ের রঙ কাল। তার চেয়েও কাল ওর ভিতরটা। সারা জীবনে আমি এমন নচ্ছার বদমাস দেখিনি। কারমেন ওর সঙ্গে এল। ও যখন গার্সিয়াকে রম বলে ডাকত, তখন ও যে চোখে আমার দিকে তাকাত, আর পিছন থেকে গার্সিয়াকে যেভাবে ভেংচি কাটত, তা দেখবার মত ছিল। আমার ভীষণ রাগ হল। রাত্রিতে ওর সঙ্গে কথা বললাম না। সকালবেলা ঝোলাঝুলি বেঁধে রওনা হতেই দেখি পিছনে ডজনখানেক ঘোড়সওয়ার আমাদের তাড়া করেছে। দলের যে সব আন্দালুশীয় বাহাদুররা খুনখারাপি ছাড়া কথাই বলত না, তাদের মুখ এখন শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। তারা চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে পালাতে লাগল।

শুধু দঁকাইর, গার্সিয়া, রম দাদো নামে এদজার এক সাহসী যোয়ান ও কারমেন মাথা ঠিক রাখল। অন্য সবাই ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে খাদে লাফিয়ে পড়ল। ঘোড় সওয়াররা সেখানে যেতে পারবেনা। আমাদেরও ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিতে হল। চটপট মালপত্রের মধ্যে শুধু দামী জিনিষগুলো বেছে নিলাম। সেগুলো ঘাড়ে ফেলে পাহাড়ের সবচেয়ে খাড়া ঢাল বেয়ে পালাতে লাগলাম। থলিগুলো আগে ঢাল দিয়ে গড়িয়ে দিয়ে আমরা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে পিছনে নামতে লাগলাম। সারা সময়টা শত্রুরা গুলিছুড়ছিল। এই প্রথম কান ঘেঁষে সনসন করে গুলি যেতে শুনলাম। কিন্তু তাতে এমন কিছু মনে হয়নি। কোন মেয়ের চোখের সামনে মৃত্যুকে তুচ্ছ করায় বাহাদুরিই বা আছে! আমরা সবাই পালাতে পারলাম, কিন্তু শুধু হতভাগা রম দাদো পড়ে রইল। ওর মূত্রাশয়ে গুলি লাগল। আমি থলি ফেলে দিয়ে ওকে তুলে নিতে চেষ্টা করলাম। গার্সিয়া চেঁচিয়ে উঠল, গাধা কোথাকার! এই মড়াটা দিয়ে আমাদের কি হবে? ওকে শেষ করে দে। ওর মোজাটা খুলে নিতে ভুলিসনি। ওকে ফেলে দে, কারমেন চীৎকার করল।

ক্লান্ত হয়ে মুহূর্তের জন্য ওকে একটা পাহাড়ের আড়ালে নামিয়েছিলাম। গার্সিয়া এগিয়ে এসে ওর মাথায় বন্দুকটা খালি করে দিল। এখন যে ওকে চিনতে পারবে তার বুদ্ধি আছে বলতে হবে,—এক ডজন গুলিতে ছিন্নভিন্ন রম দাদোর মুখের দিকে তাকিয়ে গার্সিয়া বলল।

দেখুন, কী আনন্দের জীবন বেছে নিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে একটা ঝোপে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সঙ্গে একদানা খাবার নেই। আরো সর্বনাশ হয়েছিল, ঘোড়াগুলো হারিয়ে। অথচ পিশাচ গার্সিয়া কী করছিল শুনবেন? পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বার করে আগুনের আলোয় দঁকাইরের সঙ্গে সে তাস খেলতে লাগল। আমি চিত হয়ে শুয়ে তারার দিকে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম রম দাদোর কথা। ভাবছিলাম ঢের ভালছিল যদি রম দাদোর জায়গায় আমি শুয়ে থাকতাম। কারমেন আমার পাশে জড়সড় হয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে কাস্তানিয়েত বাজিয়ে গুনগুন করছিল। হঠাৎ ও আমার ওপর ঝুঁকে পড়ল—যেন আমার কানে কানে কিছু বলবে। চুমু খেল আমাকে দু'তিনবার। আমার বাধা সত্ত্বেও। আমি বললাম, তুমি শয়তান।

হ্যাঁ, তাই, কারমেন উত্তর দিল।

কয়েকঘণ্টা বিশ্রামের পর ও গঁছ্যায় চলে গেল। পরদিন সকালবেলা একটি রাখাল ছেলে আমাদের জন্য রুটি নিয়ে এল। দিনের বেলাটা আমরা সেখানেই কাটিয়ে দিলাম। রাত্রিতে গঁছ্যার দিকে এগোলাম। আশা ছিল কারমেনের কাছ থেকে খবর আসবে। কিন্তু কোন খবর এল না। দিনের বেলা দেখলাম একটি খচ্চরচালক একজন সুসজ্জিতা মহিলাকে নিয়ে আসছে। মহিলার হাতে রঙিন ছাতা। সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে, সম্ভবতঃ পরিচারিকা। গার্সিয়া বলল, ছাখ, সেন্টনিকোলাস দু'টো মেয়ে ও দু'টো খচ্চর পাঠিয়েছেন। চারটে খচ্চর হলে আরো ভাল হত। যা হোক, এতেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

গার্সিয়া বন্দুক নিয়ে রাস্তার দিকে নেমে গেল। দঁকাইর ও আমি একটু দূরে থেকে ঝোপের আড়াল দিয়ে ওর পিছন পিছন যেতে লাগলাম। যখন ওদের বন্দুকের গুলীর আওতার মধ্যে পেলাম, আমরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খচ্চর চালককে হাঁক ছেড়ে থামতে বললাম। মহিলাটি কিন্তু আমাদের দেখে ভয় পাওয়া ত দূরের কথা (আমাদের সাজগোজ দেখে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল), হেসে লুটিয়ে পড়ল। লিল্লিপেন্দি, গাধার দল আমাকে ভদ্রলোকের মেয়ে ঠাউরেছে। কারমেন। কিন্তু ছদ্মবেশ এমনি নিখুঁত যে অন্য ভাষায় কথা বললে আমি ওকে চিনতে পারতাম না। কারমেন ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে দঁকাইর ও গার্সিয়ার সঙ্গে ফিসফিস করে কি বলাবলি করল। আমাকে বলল—চড়ুই, তুমি ফাঁসিতে লটকাবার আগে আবার দেখা হবে। মিশরের ব্যাপারে আমি জিব্রালটার যাচ্ছি। কিছুদিনের মধ্যেই আমার খবর পাবে। কয়েকদিন থাকবার মত একটু ডেরা দেখিয়ে দিয়ে কারমেন চলে গেল। এই মেয়েটা আমাদের দলের ভাগ্যবিধাতা। অল্পদিনের মধ্যে কিছু টাকাও পাঠাল কারমেন। আর পাঠাল খবর, যার দাম টাকার চেয়ে বেশী। দুজন ইংরেজ মিলর্ড অমুক রাস্তা দিয়ে জিব্রালটার থেকে গ্রেনাডা যাচ্ছে। বুঝ সাধু যে জান সন্ধান। ওদের সঙ্গে ছিল ঝকঝকে গিনি। গার্সিয়া ওদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমি ও দঁকাইর আপত্তি করলাম। আমরা শুধু ওদের টাকা, ঘড়ি ও সার্ট কেড়ে নিলাম। সার্টগুলোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমাদের।

মঁসিও, কিছু না ভেবে চিন্তে মানুষ ডাকাত হয়ে যায়। কোন সুন্দরীকে দেখে হয়তো মাথা ঘুরে গেল, খুন-খারাপি হল ওকে নিয়ে, হানা দিল দুর্ভাগ্য। পাহাড়ে চোরাই-চালানকারীদের সঙ্গে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। কিছু তলিয়ে দেখার আগেই সে ডাকাত হয়ে গেল। মিলর্ডদের ঘটনার পর জিব্রালটারের কাছাকাছি থাকা আর নিরাপদ মনে হল না। আমরা রঁদার পর্বতমালায় লুকিয়ে রইলাম। আপনি আমাকে জোসেমারিয়ার কথা বলেছিলেন। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অভিযানের সময় জোসেমারিয়া ওর প্রণয়িনীকে সঙ্গে নিত। বেশ সুন্দরী, নম্র ও বুদ্ধিমতী মেয়েটি। চমৎকার আচার-ব্যবহার

একটিও অসঙ্গত কথা ওর মুখ দিয়ে বেরোত না। আর কী ভক্তি! প্রতিদানে জোসেমারিয়া ওকে ভীষণ দুঃখ দিত। সারাক্ষণ অন্য মেয়ের পিছনে ঘুরে বেড়াত। যন্ত্রণা দিত ওকে। মাঝে মাঝে আবার ঈর্ষাপীড়িত নাগরের ভূমিকাও নিত। একবার সে মেয়েটিকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল। তাতে কিন্তু মেয়েটির ভালবাসা আরো বেড়ে গিয়েছিল। এমনি ধাতুতে মেয়েরা গড়া, বিশেষ করে আন্দালুশিয়ার মেয়েরা। মেয়েটি ওর বাহুর কাটা দাগটা গর্বভরে দেখাত, যেন দুনিয়ায় এর চেয়ে সুন্দর জিনিষ আর কিছু নেই। তার ওপর জোসেমারিয়া সঙ্গী হিসাবে ছিল অত্যন্ত কদর্য। একবার একটা অভিযানে একসঙ্গে গিয়েছিলাম। সে এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল যে, সব লাভের ভাগী হল সে, আর মার জুটল আমাদের অদৃষ্টে। কিন্তু যা বলছিলাম। কারমেনের কোন খবর পাচ্ছিলাম না। দঁকাইর বলল, আমাদের মধ্যে কাউকে ওর খবরের জন্য জিব্রালটার যেতে হবে। কারমেন এতদিনে কিছু একটা ব্যবস্থা করেছে নিশ্চয়। আমি যেতে রাজী। কিন্তু সেখানে আমাকে সবাই চেনে।

কানাটা বলল, আমাকেও সবাই চেনে। গলদাচিংড়ী গুলোকে[৫৭] নিয়ে ত কম কীর্তি করিনি। তাছাড়া, একচোখ নিয়ে আমার পক্ষে ছদ্মবেশ নেওয়াও মুশকিল।

তবে আমাকেই যেতে হয়, কারমেনকে আবার দেখতে পাওয়ার কল্পনায় আবিষ্ট হয়ে বললাম—আচ্ছা, তাহলে কি করতে হবে?

ওরা বলল, জাহাজে অথবা সেণ্ট রক হয়ে,—যে ভাবে তুমি ভাল মনে কর,—যেতে পার। জিব্রালটার বন্দরে চকোলেট-ব্যবসায়ী লা রোল্লোনা কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করবে। ওকে খুঁজে পেলে ওখানে ক হচ্ছে জানতে পারবে।

স্থির হল—আমরা তিনজনই গঁদার পর্ব্বতমালার দিকে রওনা হব। সেখানে আমার সঙ্গী দু'জন থাকবে। আমি ফলের ফেরিওয়ালা সেজে জিব্রালটার যাব। রঁদায় আমাদের দলের একটা লোক আমাকে পাসপোর্ট যোগাড় করে দিল। গচ্ঁায় একটা গাধা জুটিয়ে দিল। গাধার পিঠে কমলা লেবু ও তরমুজ চাপিয়ে রওনা হলাম। জিব্রালটার পৌঁছে দেখলাম লা রোল্লোনাকে সবাই চেনে। কিন্তু হয় সে মারা গেছে, নয় তো শয়তানের খপ্পরে পড়েছে। সে নিখোঁজ হওয়াতেই কারমেনের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। গাধাটাকে একটা আস্তাবলে রেখে কমলালেবুর ফেরিওবালা সেজে শহরে বেরোলাম। আমার আসল উদ্দেশ্য—যদি কোন চেনামুখ চোখে পড়ে যায়। নানাদেশের সব ভবঘুরে জিব্রালটারে জড় হয়েছে। জায়গাটাকে হট্টমালার দেশ বলা যায়। কারণ কোন রাস্তায় দশপা এগোলে অন্তত: দশটা ভাষা কানে আসবে। অনেক বেদের দেখা পেলাম, কিন্তু ওদের বিশ্বাস করতে ভরসা হলনা। ওরা আমাকে বাজিয়ে দেখতে চাইল, আমিও ওদের বাজিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। এভাবে দুদিন হাঁটাহাঁটি করেও রোল্লোনা বা কারমেনের কোন হদিশ পেলাম না। ঠিক করলাম, কিছু কেনাকাটা করে আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাব। সূর্য্যাস্তের পর একদিন রাস্তায় ঘুরছিলাম। একটা জানালা থেকে মেয়েলি গলার ডাক শুনলাম—ও লেবুওয়ালা। মাথা তুলে দেখলাম—কারমেন। একটা ঝোলানো বারান্দায় লালপোষাকপরা এক ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসারের কাঁধে সোনার ব্যাজ, কোঁকড়া চুল—চেহারায় মনে হয় একজন শাঁসালো ইংরেজ মিলর্ড। কারমেনের বেশবাস অপূর্ব সুন্দর। কাঁধে শাল, মাথায় সোনার চিরুনি; সারা দেহ সিল্কে জড়ানো। তবু তেমনি ধূর্ত শয়তানের প্রতিমূর্তি। কারমেন হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। ইংরেজটি আমাকে ভাঙা স্পেনিইশে ওপরে যেতে বলল। মাদাম লেবু চাচ্ছে। [ক্রমশঃ।

৫৭। লালরঙা ইউনিফর্মের জন্য ইংরেজরা স্পেনে এই নামে পরিচিত। মেরিমের পাদটীকা।

অনুবাদক—প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

# একটি কি দুটি পাখি

## সরিৎ শর্মা

একটি কি দুটি পাখি বনের ভিতর
আসে যায়, কেউ তার রাখে না খবর—

একটি কি দুটি পাখি গাছের কোটর
খুঁজে খুঁজে ডাকে আর স্বপ্নের দোসর—

শাখা নড়ে, পাতা ঝরে, ফুল ঝরে আর
বনে বনে রঙ লাগে বসন্ত-বাহার—

আকাশের নীল আর বাতাসের সুর,
নদীতে হীরার জল, ঘাসের রোদ্দুর—

ডানা ঝাড়ে, গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত ফল আঁকা
চঞ্চুতে চঞ্চুতে ঘষে, দুলে ওঠে শাখা—

একটি কি দুটি পাখি মনের ভিতর
আসে যায়, কেউ তার রাখে না খবর।

# কান্নার ঘোমটায়

## অর্ণব মজুমদার

পলাশের রং থেকে সূর্যের কান্না
বুড়ো দাদু কোনদিন দেখতেই চাননা।
রূপশালী রোদ নয়, নয় কোনো বর্ণ
দাদু চায় মনে মনে একতাল স্বর্ণ।
কিন্তু কি আপশোষ! সূর্যের ক্রন্দন—
দাদুকেই পাকে পাকে করে রাখে বন্ধন।

বিকালের ধানী রোদে ফুল ফোটে চিন্তা,
যাতনার কাচপোকা নাচে ধিন ধিন্‌তা,
ধূপছায়া সাড়ী নেই, নেই ফুল পদ্ম
হৃদয়ের ঘোমটায় তনমন ছদ্ম।

তথাপি তো নীলপরী জাল বোনে নিত্য
জাল বোনে স্বপ্নেরা দোলে মন চিত্ত।

# বেদের মর্ম

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীর অন্যতম। এর আবির্ভাবকাল বিভিন্ন পণ্ডিত খৃঃ পূঃ ১৫০০ থেকে সুরু করে খৃঃ পূঃ ৬০০০ সালের মধ্যে ফেলেছেন। বেদকেই গণ্য করা হয় হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের মূল; বেদ যে মানে না, সে হিন্দু নয়। বেদ চারিখানি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বহু সূক্ত বা মন্ত্রের সমষ্টি এক একটি বেদ, রচনা সংস্কৃতের প্রাচীনতম রূপে, যাকে বলা হয় বৈদিক সংস্কৃত। খুবই উচ্চশ্রেণীর কাব্য এ সমস্ত সূক্ত, মানুষের সৃষ্টি বলেই গণ্য নয়; ঋষিদের নির্মল চিত্তে প্রতিভাত দৈববাণী—এটাই পরম্পরাগত বিশ্বাস।

এই যে বেদ, এর মর্মগত কথা কি? কি এর বাণী? কোন্ গূঢ় সত্য প্রকাশের জন্যে এর এত মর্যাদা? বেদে আমরা তৎকালীন মানুষের কি পরিচয় পাই? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন না। যে গ্রন্থকে অপৌরুষেয় বলে, সর্বাগ্রে মান্য বলে ঘোষণা করেন, সে গ্রন্থে ধনজন, শত্রুনাশ, অশ্ব ইত্যাদির প্রার্থনা এবং সেজন্যে দেবতাদের স্তবস্তুতি ছাড়া কিছুই খুঁজে পান না। প্রকৃতিপূজক অর্ধসভ্য এক শ্রেণীর মানুষই হয়ে দাঁড়ায় বৈদিক ঋষিসম্প্রদায়।

কিন্তু এই অসামঞ্জস্য শুধু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে পাঠ নেওয়া আধুনিক হিন্দুর মধ্যেই দেখা যায় না। বহু পূর্বে এর সৃষ্টি। গীতার এক স্থানে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্তদের 'বেদবাদরতাঃ' বলে নিন্দা করা হয়েছে—২।৪২ (বেদের বিভিন্ন সূক্ত বা মন্ত্রের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কৃত যজ্ঞাদিতে প্রয়োগ পদ্ধতির কথা 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে রয়েছে, এই কর্মকাণ্ডের মর্মব্যাখ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত জৈমিনির পূর্বমীমাংসা দর্শন।) আবার গীতারই স্থানান্তরে রয়েছে "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।" ১৫।১৫। বেদ যে দুর্জ্ঞেয় জ্ঞানের আকর, এ কথায় তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

বেদার্থ সম্পর্কে এই দ্বৈতের কথা আধুনিক কালে একাধিক পণ্ডিতের মনে জেগেছে, কিন্তু এর চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নি।

গত দুই শ বছরের মধ্যে বেদ সম্পর্কে প্রচুর মৌলিক গবেষণা হয়েছে। এ ব্যাপারে বেশির ভাগ কৃতিত্ব ইউরোপীয় পণ্ডিতদের (Griffith, Maxmuller, Whitney, Macdonell, Geldner, Bloomfield প্রভৃতি)। তাঁদেরকে অবশ্য এগোতে হয়েছে অদ্বিতীয় ভাষ্যকার সায়ণাচার্যকেই (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী) ভিত্তি করে। সায়ণাচার্য পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের অনুসরণে এবং বহু সহযোগীর সাহায্যে যে বিরাট ভাষ্য তৈরী করেছেন, তা মূলতঃ ক্রিয়াকাণ্ডগত (ritualistic)। যজ্ঞে প্রয়োজনের দিক থেকে তিনি সমস্ত মন্ত্রকে বুঝার চেষ্টা করেছেন। স্থানে স্থানে অবশ্য স্পষ্ট অর্থ নির্দেশে দ্বিধার কথা তিনি গোপন রাখেন নি। মন্ত্রের শক্তি সম্পর্কে সায়ণ সচেতন, মন্ত্রের আবৃত্তি ও প্রয়োগ যে ধর্মাচরণ—এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্বাভাবিক ভাবেই শ্রদ্ধা বিশ্বাসের ব্যাপারটি বাদ দিয়েছেন, এবং তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, তুলনামূলক পুরাণ-ইতিহাস—এ সমস্ত অর্বাচীন দুর্বলভিত্তি বিদ্যার সাহায্যে তাঁরা বেদের যে অর্থ করেছেন, তাতে বৈদিক যুগকে দেখতে হয় সভ্যতার অরুণোদয়ের যুগ হিসাবে, যখন মানুষের অপরিণত বোধ-বুদ্ধি সূর্য, চন্দ্র, জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করেছে এবং নিতান্তই বাহ্যসম্পদের আকাঙ্ক্ষায় এই সমস্ত কল্পিত দেবতার স্তবস্তুতি করেছে। প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে হীন ধারণা যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিচারকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে, তা বলাই বাহুল্য। ঐতিহাসিকেরা তাই আজ এশিয়ার ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজন বোধ করছেন। তাছাড়া তুলনামূলক ইতিহাস, পুরাণ, ভাষা শাস্ত্রের অনেক মৌলিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটছে। দ্রাবিড় ও আর্যদের সম্পর্ক, আর্যসভ্যতার সঠিক অবস্থা, বেদের কাল, ভারতীয় আর্যদের আদিভূমি ইত্যাদি অনেক জরুরী ও প্রাসঙ্গিক ব্যাপারে অবিসংবাদিতভাবে কোন মত এখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

যাহোক্, বেদার্থ সম্পর্কে দ্বৈতের কথা হচ্ছিল। লোকমান্য তিলক তাঁর 'Arctic Home in the Vedas' গ্রন্থে সাধারণভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যান মেনে নিলেও, বৈদিক উষা ও গাভীর প্রতীকের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন এবং জ্যোতিষের সাহায্যে আর্যদের আদিভূমি সম্পর্কে নতুন কথা বলেন। পণ্ডিত টি, পরমশিব আয়ার সমগ্র ঋগ্বেদকেই ভূতত্ত্ববিষয়ক ঘটনাবলীর প্রতীক হিসাবে দেখে পৃথিবীর সৃষ্টি ও জীবের অভিব্যক্তি বিষয়ে অসম্ভব রকমের নতুন কথা বলেছেন। আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ দেখবার চেষ্টা করেছেন যে, বৈদিক স্তোত্রগুলোতে সুগভীর নীতি ও ধর্মবোধ এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে। বস্তুতঃ বেদ সম্পর্কে তাঁর এই আবিষ্কৃতির উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী বেদের স্থূল অর্থকে মেনে নিতে পারেননি। বৈদিক সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, সাগর, এ-সকলের মধ্যে ও অন্তরালে একটা প্রাণবান গতি, একটা শক্তির উপস্থিতি তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর 'A New Approach to the Vedas' গ্রন্থ থেকেই সুখ্যাত আলো পেয়ে Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. M. Fowler ঋগ্বেদের

কতকাংশের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যান ও অনুবাদের চেষ্টা করেছেন (কুমারস্বামীর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত Art & Thought' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত চেষ্টা মূল্যহীন না হলেও, বেদের আনুপূর্বিক সুসঙ্গত মর্মব্যাখ্যা এর কোনটিও নয়। বেদের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে যে চাবিকাঠির দরকার, তার সন্ধান এঁদের কারও মেলেনি। সে সন্ধান মিলেছে কবি ঋষি শ্রীঅরবিন্দের। বেদ যেমন স্বপ্রকাশিত আন্তর কর্ণে শ্রুত বাণী, তার রহস্যের সন্ধানও এসেছে তেমনি আন্তর অনুভূতিতে। বিশিষ্ট অধ্যাত্ম উপলব্ধির প্রতীক হিসাবে এমন সব চিত্রকল্প তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, যাদের প্রতিরূপ দেখা গেছে বেদের মধ্যে। এভাবেই বেদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে। একদিকে যেমন বেদের আলোকে নিজের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন, আর একদিকে তেমনি বেদের মর্মে সহজেই অনুপ্রবেশ লাভ করেছেন। শুধু সেই নয়, বেদরহস্যের প্রকাশের ফলে বিভিন্ন উপনিষদের বহু দুর্বোধ্য অংশের অর্থ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, এবং পুরাণোক্ত অনেক কাহিনী, রূপক ও প্রতীকের তাৎপর্য প্রকট হয়েছে। বেদ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধি ও গবেষণার ফল হল Arya কাগজে (১৯১৪-'২১) প্রকাশিত প্রবন্ধমালা Secret of the Vedas, এবং Hymn to the Mystic Fire নামক গ্রন্থ।

প্রথমোক্ত নিবন্ধে সায়ণ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যান-রীতির আলোচনা করে ও সকলের অসম্পূর্ণতা দেখিয়েছেন এবং নিজের অনুসৃত পদ্ধতির কথা সবিস্তারে বলেছেন। প্রাচীন সংস্কৃতে একই শব্দের বহু বিচিত্র অর্থের কথা জানা যায় যাস্কের নিরুক্ত থেকে। 'ধন' 'বাজ' 'পোষ' প্রভৃতি শব্দ বাহ্য সম্পদ, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি অর্থে যেমন গ্রহণ করা যায়, আবার আন্তর সম্পদ ও সমৃদ্ধি হিসাবেও নেওয়া যায়। সায়ণ অনেক শব্দের সহজ অর্থ গ্রহণ না করে দূরবর্তী কোন অর্থ গ্রহণ করেছেন। 'ঋতম' শব্দটি বেদে অজস্রবার ব্যবহৃত হয়েছে। সায়ণ এটির সরল অর্থ—সত্য—কোন কোন জায়গায় গ্রহণ করলেও, অধিকাংশ স্থলে এর অর্থ করেছেন 'যজ্ঞ', এবং স্থানে স্থানে 'জল'। 'রায়ে' শব্দটি একাধিক উপনিষদে ঋগ্বেদের উদ্ধৃতি হিসাবে অধ্যাত্ম উপলব্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন 'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।' ঈশ ১৮। মূল বেদে সে অর্থে গৃহীত না হয়ে বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্থে গ্রহণ করার কারণ কি থাকতে পারে? এভাবে শব্দাবলীর আন্তর অর্থ গ্রহণ করে এগিয়ে চললে বেদ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি অবলম্বন ছাড়া উপায় থাকে না। তার পরে বেদের যজ্ঞকে শ্রীঅরবিন্দ বরাবর তার আন্তর অর্থে—'কর্মচিন্তার ঈশ্বরে নিবেদন' হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বহু সূক্তে তিনি দেখিয়েছেন, এরূপ অর্থের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। গীতায়ও 'যজ্ঞ' আন্তর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যজ্ঞের ব্যাপারে পুরোহিতের উল্লেখ আছে; দেবতা-বিশেষকে পুরোহিত (ministrant) বলে গণ্য করা যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ ইন্দ্র বরুণ মিত্র উষা সাবিত্রী সরমা প্রভৃতি দেবদেবীর শক্তি ক্রিয়া মানুষের অধ্যাত্ম সাধনায় এদের স্থান ও দান সম্পর্কে উপযুক্ত প্রমাণসহ গভীর আলোচনা করেছেন এবং বেদের বহু উপাখ্যান ও রূপকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলীতে স্পষ্টভাবেই বাহ্য যজ্ঞের কথা ও তার অনুষ্ঠান-পদ্ধতির খুঁটিনাটির বর্ণনা আছে। ব্রাহ্মণ সংহিতার অনেক পরবর্তীকালের রচনা যখন সংহিতার গূঢ় অর্থ অনেকখানিই হারিয়ে গিয়ে থাকবে। কারণ, কোন ক্রিয়াকাণ্ডই উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-বর্ণিত বিধিবদ্ধতা লাভ করতে পারে না। অথর্ব বেদে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের অনুপস্থিতি ঐ বেদের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। যা হোক, যদি বাহ্যক্রিয়াকর্ম ও যজ্ঞকে বেদভিত্তিক বলে স্বীকার করেও নেওয়া যায়, তবু ও শুধোই বেদের একমাত্র অর্থ—এমন মনে করার কারণ নেই। এমন হওয়াই সম্ভব যে, যোগ্য অধিকারীর নিকট বেদের অর্থ ছিল আন্তর—অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রকাশ ও অধ্যাত্ম সিদ্ধির সহায় এবং সাধারণের নিমিত্ত ছিল বাইরের অর্থ অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম। পাশাপাশি দুটি অর্থ সহজেই করা চলে। অধিকার-ভেদ ও দ্ব্যর্থক রচনা আমাদের দেশে চিরকাল চলে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদগুলি দ্ব্যর্থক বা সন্ধ্যা ভাষার অন্যতম নিদর্শন।

যদিও শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুসৃত ভাষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক পুরাণেতিহাস—সবগুলির দুর্বলতার কথা তুলে ধরে ওগুলোর সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তা দেখিয়েছেন এবং বিকল্প মতের দিক নির্দেশ করেছেন, তবু একথা বলা চলে না যে, পাশ্চাত্য বিচারগুলো তাঁর দ্বারা খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর নির্দিষ্ট সূত্র অবলম্বন করে বহু বিষয়ে সতর্ক থেকে নিরপেক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল অতন্দ্র গবেষণা চালিয়ে গেলে ও সমস্ত ব্যাপারের একটা মীমাংসা হতে পারে এবং তার ফলে, হিন্দুধর্ম ভারতীয় সভ্যতা, সমাজ, আর্য ও দ্রাবিড় ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কে যুগান্তকারী তথ্য ও সত্যের আবিষ্কার সম্ভব হতে পারে। তবু এ পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ যা করেছেন—আলোচনা অনুবাদ ও ভাষ্যে, তাতে সায়ণাচার্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মত অস্বীকার না করেও একথা মানতে বাধা থাকে না যে, বেদের মন্ত্রগুলো গূঢ়তর তাৎপর্যমণ্ডিত অধ্যাত্ম উপলব্ধিসমৃদ্ধ। চিরকাল বেদ মৌখিক যে মর্যাদা পেয়ে এসেছে, এতদিনে তার উপযুক্ত হেতু নির্দিষ্ট হল।

যদিও ব্যাখ্যানের মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব, তবু ঋকের সরাসরি অনুবাদের মধ্যেই যে বিভিন্নতা প্রকাশ পাচ্ছে, তা পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না:—

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের প্রথম তিনটি শ্লোক নেওয়া যাক্—

ইন্দ্রঃ

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥১
উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।
গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥২
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং।
মা নো অতি খ্য আ গহি ॥৩

সায়ণভাষ্যানুসারে এর অনুবাদ দাঁড়ায়:—

1. The doer of (works that have) a good shape, Indra, we call daily for protection as (one calls) for the cow-milker a good milch-cow.

2. Come to our (three) libations, drink

of the Soma, **O Soma-drinker, the intoxication** of thee, the **wealthy one, is indeed cow-giving.**

3. Then (standing) among the intelligent people who are nearest to thee, may we know thee. Do not (go) beyond us (and) manifest (thyself to others, but) come to us.

শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ :—

1. The fashioner of perfect forms, like a good yielder for the milker of the Herds, we call for increase from day to day.

2. Come to our Soma-offerings. O Soma-drinker, drink of the Soma-wine; the intoxication of thy rapture gives indeed the Light.

3. Then may we know somewhat of thy utter. ost right thinkings. Show not beyond us, come.

আর একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে পার্থক্য দেখান যেতে পারে :— —ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল, ৬১ সূক্ত

**উষা**

উষো বাজেন বাজিনি প্রচেতাঃ স্তোমং জুষস্ব গৃণতো মঘোনি।
পুরাণী দেবি যুবতিঃ পুরংধিরনু ব্রতং চরসি বিশ্ববারে। ১
উষো দেব্যমর্ত্যা বি ভাহি চন্দ্ররথা সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
আ ত্বা বহন্তু সুয়মাসো অশ্বা হিরণ্যবর্ণাং পৃথুপাজসো যে। ২

Wilson কৃত অনুবাদ :—

1. Affluent Ushas, giver of sustenance, possessed of intelligence, be propitiated by the praise of him who lends thee, (and **worships**) with (sacrificial) food: divine Ushas, **adored** by all, who (though) ancient art **(still)** young, the object of manifold **worship, thou** art present at the recurring (morning) rite.

2. Ushas, who art divine and immortal, mounted in a golden chariot do thou **shine** radiant, causing to be heard the sounds **of** truth; may thy vigorous and well-trained horses bring thee, who art golden-haired, (hither).

শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ :—

1. Dawn, richly stored with **substance**, conscious cleave to the affirmation of him **who** expresses thee, O thou of the plentitudes. Goddess, ancient, yet ever young thou **movest** many-thoughted following the **law of thy** activities, O bearer of every boon.

2. Dawn divine shine out immortal **in thy** car of happy light sending forth the pleasant voices of the Truth. May steeds well-guided bear thee here who are golden-brilliant **of hue** and wide their might.

# শৃণ্বন্তু

## গিরিজা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁচতে হয় বাঁচো, ভেক ধরো
তারো আগে নাও জীবন তারণী সংস্কার তাড়ানি পণ,
দ্বিধা! প্রাত্যহিক মৃত্যুর আগুনে পুড়িয়ে
হও নির্গুণ; অভিজ্ঞতার কমণ্ডলু হ'তে
পুঞ্জিত যত ক্লেদ যত গ্লানি নিঃশেষে পান ক'রে
হও গরলপায়ী বিষধর।

শৃণ্বন্তু অমৃতস্য পুত্রাঃ
কে বলে সকলই মায়া—
হলাহল জর্জরিত পৃথিবীতে
বাঁচতে হয় বাঁচো, ভেক ধরো,
হেলায় পুচ্ছ তুলে এগিয়ে চলো
পায়ে পায়ে মাঠ পেরিয়ে যাওয়ার মতন
অনায়াস ক'রে নাও জীবনটাকে
ভেক ধরো, ভেক শুধু ভেক
আধুনিক সভ্যতার যুগধর্ম
ভেক বই টেকসই অবলম্বনই বা কই

সহস্রধার প্রবঞ্চনার হাত থেকে পরিত্রাণের
বা সসম্ভ্রম মস্তক রক্ষার।

মারী বেকারী ও ছাঁটাই এ
নীতির আস্ফালনে বা কৌলিন্য সওদায়
সর্বসিদ্ধি মনস্কাম্ভ অব্যর্থ কবচ
ভেক শুধু ভেক,
সংসার-দরিয়ায় নির্ভীক পারানি এবে
একমেবাদ্বিতীয়ম্—
অগত্যা বাঁচতে হয় বাঁচো, ভেক ধরো।

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'Love is the happiness of the world....Love is a coming together.... In love, all things unite in a oneness of joy and praise, (D. H. Lawranc)—এটাই হ'ল ইংরাজী সাহিত্যে প্রেমের প্রকৃত সংজ্ঞা।

যে অর্থ চায়, মান চায়, চায় নারীসঙ্গ—তার সবগুলো পেলেও কোন জায়গায় যেন অতৃপ্তির সুর থাকে, সেই না পাওয়ার হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে :

'যদি প্রেম না দিলে প্রাণে—
ভোরের আকাশ কেন ভরিয়ে দিলে গানে-গানে !'

তাই Shelly দুঃখ করে বলেছেন—

'One word is too often profanted,
For me to profane it ;'

আজকের যুগের সাহিত্যে তাই প্রেম চিন্তা প্রাধান্য লাভ করেছে।

মজ্জাগত ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা থেকে ক্রম-বিকশিত প্রেমই সাহিত্যে মাত্রা, স্থান এবং কালভেদে মাতৃ-প্রেম, পিতৃ-প্রেম, ভ্রাতৃ-প্রেম, স্বদেশ-প্রেম এবং পত্নী-প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। গোর্কীর 'মা', ইবসেনের 'ঘোষ্ট', শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' ইত্যাদি অনবদ্য মাতৃ-প্রেমের কাহিনী।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে ভ্রাতৃ-প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন দেয় Irving-stone-এর 'Lust for life'. Earnest Hemingway রচিত 'A farewell to Arms' অভূতপূর্ব দাম্পত্য-প্রেমের উপন্যাস। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের, এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসে স্বদেশ-প্রেমের অত্যুচ্চ ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। যুগে যুগে নারী প্রার্থনা করে এসেছে স্বামীর মধ্য দিয়ে সে পাবে প্রেমিককে। তাই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের আকর্ষণ কাটিয়ে প্রতাপের সন্ধানে অজানা পথে পাড়ি জমিয়েছে শৈবালিনী। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' উপন্যাসে চারু নিজস্বামীর ভালবাসা না পেয়ে চেয়েছে পর-পুরুষের ভালবাসা; শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে ঐ একই কারণে উপেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্টা হয়েছিল কিরণময়ী। 'শেষের কবিতা'য় প্রেমের সৌন্দর্যে লাবণ্যের নারী-প্রকৃতি হৃদয়াবেগ পরিতৃপ্তির জন্য জেগে উঠেছে !

সাহিত্যে প্রেমের প্রকৃত সত্য বোঝান হয়েছে। প্রেমকে আদায় করে নিতে হবে—Whitman এক জায়গায় লিখেছেন,—'The high-road of love is no open road. It is a narrow, tight way, where the soul walks.....' সেই কারণেই বৈষ্ণব-পদাবলীর কবিগণ প্রেমকে বলেছেন আদিরস।

আদিম যুগের দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়ক্ষুধাকে মেনে নিয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'সেই দুর্দান্ত প্রকৃতির তাড়নাকেই সৌখীন কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে দাঁড় করালেই উপন্যাসের নিখুঁত ভালবাসা তৈরী হয়।'

সমালোচক—পাঠক মাত্রেই জানেন, রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ত্যাগের মাধ্যমে! মহাকবি দান্তে তাঁর মানস-সুন্দরী বিয়াত্রিচেকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন অমর কাব্য—'ডিভাইনা কামেডিয়া'; সেক্সপীয়রের 'Othello' নাটকে ওথেলো ডেসডিমোনাকে সন্দেহ করে, খুন করতে যায় তাকে—কিন্তু প্রেমিককে হারাবার ভয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে ডেসডিমোনা বলে —'Don't kill me to-day, kill me to-morrow ; আজ শুধু তোমার প্রেম-পরশে আমার মন ভরিয়ে তোল'। সাহিত্যে প্রেম পূজ্য—তা' মানব-জীবনে ভোগ্য ! অথচ মানুষ বোঝে না যে, প্রেম হৃদয়েরই কথা—

'নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে
চিরকাল চোখে চোখে
নূতন নূতনালোকে
পাঠ ক'রো রাত্রিদিন ধরে।
বুঝা যায় আধ প্রেম, আধখানা মন—
সমস্ত কে বুঝেছে কখন।'

তাই প্রেমের মোহেই রবীন্দ্রনাথ যৌবনগান গাইলেন 'ঝুলন' কবিতায়—'তপ্তপ্রেমতৃষ্ণা'ই কবিতাটির মূলসুর :—

দে দোল্ দোল্
দে দোল্ দোল্
এ মহাসাগরে তুফান তোল্
বধূরে আমার পেয়েছি আবার,
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয় রোল
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল।'

—একেই কি Shelly বলেছেন 'Grand passion'—অর্থাৎ জীবনের দিব্য উন্মাদনা ? এই প্রেমই কী নিয়ে আসে শিলভারীর বিচিত্র সৌরভ ?

বয়ঃসন্ধির কাল থেকে পুরুষ স্বতঃই অদম্য বেগে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সময় তার প্রেম প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়জ এবং নারীর

দেহ-সৌন্দর্যই তাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করে। কিন্তু নারীর প্রেম তখন ভাবপ্রবণ, পুরুষের প্রতি তার প্রেম তখন মন, প্রাণ—সমস্ত চেতনা দিয়ে।

প্রেমের উপলব্ধিতে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই, শুধু ব্যঞ্জনা পদ্ধতি বিভিন্ন। লেখক যা প্রকাশ করতে চান, তার প্রকৃত রূপ না বদলে, বদলেছে রূপক। প্রেমের পৌরাণিক চেতনার মধ্যে যেভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, প্রেমের আধুনিক চেতনায় দেহ-সর্বস্বতার আধিক্যে সেই প্রাণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে আজ। সাহিত্য আজ তাই উদ্দেশ্যবিমুখ।

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী উপন্যাসে প্রৌঢ় নর-নারীর প্রেম-উন্মাদনাকে বিকৃতভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। অত্যাধুনিক মার্কিণ সাহিত্য আর এক ধাপ এগিয়ে প্রেমের বিচিত্র সংজ্ঞা উদঘাটনে সচেষ্ট, সে প্রেম মনের চেয়ে দেহের কাছে বেশী ঋণী।

ইংরাজ' উপন্যাসিক জেমস্ জয়েস, ডি, এইচ লরেন্স, মার্কিণ সাহিত্যিক নরমান, ফরাসী উপন্যাসিক জুলে রোঁমা প্রভৃতিরা উগ্র দেহকেন্দ্রিক প্রেমকে সাহিত্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। জুলে রোঁমা তাঁর 'Body's Rapture' গ্রন্থে যৌনমিলনের সুদীর্ঘ চিত্র অঙ্কন করে প্রমাণ করেছেন যে, দেহের উল্লাস মানবমনের সর্বশ্রেষ্ঠ উল্লাস—প্রেমের কথা পরে।

সাহিত্যে প্রেম প্রাধান্য লাভ করে কখনও দ্রুত কখনও ধীরে ধীরে—তবে নায়ক-নায়িকার প্রেম একদিন যে চরিতার্থতা লাভ করবেই বিশ্বসাহিত্যের রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে: 'There must be two in one, always two in one—the sweet love of communion and the fierce, proud love of sensual fulfilment, both together in one love.'

# হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ এক দশক পরে যদি কিউরিয়ামের এপলো মন্দিরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে গ্রীক কন্যা ভানিয়ার সংগে আবার দেখা না হতো তাহলে আমার এই পথচলার কাহিনী লেখার তাগিদ হয়ত কোন দিনই বোধ করতাম না।

অনেকদিন আগে এক সন্ধ্যা: শীতের সন্ধ্যায় মহাবলীপুরম অর্জুন-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পাণ্ডববীরের তপশ্চর্যার মূর্তি দেখছিলাম। একদল বিদেশীকে কিছু আগেই দেখেছিলাম আলোকস্তম্ভের পাশে। একটু উদাস মনে ঘুরছিলাম। আমার সঙ্গীরা তখন কিংবদন্তী জড়ানো "ননীর ঢেলা"র গল্প শুনছিল এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের কাছ থেকে। কিছুক্ষণ পরে মনে হল আমার পিছনে অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অন্যমনস্ক ভাবেই ঘুরে দাঁড়ালাম। যাকে দেখলাম, তাকে এখানে এইভাবে এই বেশে দেখব—একথা কোনদিনই মনে হয়নি। দুঃখসহা জীবনের ছাপ সে মুখে আছে—কিন্তু তার সাথে মিশে আছে এক অদ্ভুত প্রশান্তি—যা এথেন্সের নাটমন্দিরে সেদিনের সে লাস্যময়ীর মুখে দেখেছিলাম না। মোটা খাদির পোষাকে ভানিয়াকে একটু যেন রুক্ষই মনে হচ্ছিল। পায়ে দেখলাম এদেশী চপ্পল, মোজা নেই। ভানিয়াই প্রথম কথা বলল। তার কথা শুনে মনে হল সে যেন স্থির নিশ্চয়ই ছিল যে, ভারতবর্ষের কোন-না-কোন প্রান্তে একদিন আমার সংগে তার আবার দেখা হবে। সেদিনের লাস্যময়ী গ্রীক নর্তকী আজ কি করে দক্ষিণ-ভারতের এই সমুদ্রপ্রান্তে এসে পৌঁছুল, সে কাহিনী যদি বলার সময় ও সুযোগ হয়, তা অন্য সময়ে বলব। আপাতত: যেটুকু আমার কাছে জরুরী জানার ছিল তা হল এখন সে তিরুকালী কুষ্ঠসের কুষ্ঠ-হাসপাতালে সেবাব্রতিনী। কোথা থেকে কোথায় সে এসেছে, আর কিসের থেকে কি সে হয়েছে তা ভাবতে আশ্চর্য লাগলেও ঘটনাটা যখন চাক্ষুষ সত্যি—তখন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাকেও বিব্রত করলাম না, নিজেও ব্যস্ত হলাম না। ভানিয়া বলল—ওদের হাসপাতালের গাড়ী আছে বড় ষ্টেশন ওয়াগণ, আমি স্বচ্ছন্দে তাতে যেতে পারি। এই হাসপাতাল এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কুষ্ঠ-হাসপাতাল। আমার দেশেরই এক প্রান্তে মহাবলীপুরম জিলার মধ্যেই প্রায় আড়াই মাইল জমি নিয়ে এক বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে এই হাসপাতাল গড়ে উঠেছে—অতীতে মিশনারীরা এর গোড়া পত্তন করেছিল, এখন স্বদেশী সরকার এর পরিচালনভার হাতে নিয়েছেন। হাসপাতাল দেখার লোভ থাক বা নাই থাক, অনেকদিন পরে ভানিয়ার সঙ্গ লাভের লোভ মনে প্রবল বলেই অনুভব করলাম। তাই তার সঙ্গ নিলাম। মহাবলীপুরম মন্দির ও সমুদ্রপ্রান্ত থেকে ভানিয়াদের হাসপাতালের আস্তানা প্রায় ৩০ মাইল দূরে। ওর পাশে বসেই চলছিলাম কিন্তু মন ভেসে বেড়াচ্ছিল দেশ দেশান্তরের নানা জায়গায়—ভানিয়ার সঙ্গে যেখানে যেখানে ঘুরেছিলাম, সেই দৃশ্যগুলো স্মৃতির পটে জেগে উঠছিল।

ভানিয়াই বলছিল—দেখো, মানুষ বোধ হয় মনে প্রাণে আজও যাযাবর। কোথাও স্থিত হয়ে বসা বা কোথাও থেমে থাকা তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। একদিন মানুষ জঙ্গলে ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে তারা পাহাড় নদীর ধারে আস্তানা নিল—তারপর গড়ে তুলল শহর, নগর, গ্রাম। জমি থেকে নিজের খোরাক জোটানোতে সন্তুষ্ট না থেকে গড়ে তুলল কলকারখানা, নিজের হাতে প্রকৃতির সৃষ্টি-প্রেরণাকে সে রূপ দিতে চাইল। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অবাধ গতি পেতে চাইল, পেলও। আজ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সে ছুটে চলেছে। নিজেদের গোষ্ঠী থেকে গড়ল সমাজ সেই সমাজের মধ্যেই হল কত ভাঙ্গন, কত নব নব সৃষ্টি; আজ সে স্বপ্ন দেখছে শাসন-শোষণহীন মুক্ত মনের এক স্বর্গ এই মর্ত্যেই গড়ে তুলবার। সেই স্বপ্ন সফলও করছে। তবু তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। থামবার ইচ্ছা নেই—কারণ, থেমে যাওয়া মানেই ত মরে যাওয়া—চলছি চলছি—তাই ত আমরা এই জগতের অধিবাসী।

আমি দু'চোখ খুলে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে—কান দুটোও দৃশ্যত: ওর কথাই শুনছিল। কিন্তু বাস্তবে আমি ওকে দেখছিলাম

না, ওর কথাও শুনছিলাম না। আমার মনের চোখে তখন আমি দেখছিলাম ওকে লিদিৎসের গোলাপবাগে। ওর সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার সেদিনেই। জুলাই মাস—ওদেশে তখন বসন্তকাল। আমি লিদিৎসের মিউজিয়ামে বসে শ্রীমতী পেথনার কাছ থেকে শুনছিলাম—কিভাবে একটি নিরীহ গ্রামের শিশু, বৃদ্ধ যুবা—প্রতিটি মানুষকে, প্রত্যেকটি জীবজন্তুকে, প্রতিটি গৃহকে এক রাত্রে জার্মাণ নাজী দস্যুরা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল—কিভাবে তরুণী আর নারীদের তারা জার্মাণ সন্তানের জননী হতে বাধ্য করেছিল, কচি শিশুদের খাস জার্মাণীতে নিয়ে গিয়ে নর্ডিক জাতীয় আভিজাত্যে গড়ে তুলে ভবিষ্যতের বিষবৃক্ষের বীজ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। আর আজ মুক্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ায় কিভাবে সেই ভস্মীভূত কালো মাটিতে আন্তর্জাতিক গোলাপবাগ গড়ে উঠেছে—সারা পৃথিবীর মানুষের স্নেহের দানে। সেদিনের সেই নির্মম পাশবিকতায় লুন্ঠিত মানবতার গভীর ব্যথা আজ রক্তগোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে—এই সব কথা শুনছিলাম তন্ময় হয়ে। ভানিয়া তখন ঘুরছিল ঐ গোলাপবাগেই। ওর জীবনেও অনেক ব্যথা—জানিনা সে ব্যথা কোনদিন গোলাপ হয়ে ফুটে উঠবে কি না। আর যদি নাই ওঠে, তাতে আমার অক্ষমতার ঋণ যে কতটা দায়ী তার হিসাব করার হিম্মৎ আমার নেই, হয়ত ওর মনের কোন অবরুদ্ধ কোণে আমার অপরিশোধ্য ঋণের খতিয়ান লেখাই রয়েছে! ও ঘুরছিল গোলাপবাগে। সতেজ গন্ধরাজ ফুলের সংগে ওকে আমি অনেকবার তুলনা করেছি। ওদেশে গন্ধরাজ ফুল দেখতাম না—তাই ঠিক বোঝাতে পারতাম না কি ধরণের ফুলের সংগে ওর তুলনা করতাম। এদেশে এসেছে—এবার ওকে গন্ধরাজ ফুল দেখাতে পারব। কিন্তু সেদিনের সে মন কি ওর আছে? সেবাব্রতিনী-জীবনের নিঃস্বার্থ রুক্ষতার মধ্যে ওর সেই মন কি আজও বেঁচে আছে? জানতে লোভ যে হচ্ছিলনা তা নয়—কিন্তু ওর পোষাকের শ্বেতশুভ্রতা যেন একটা অলক্ষ্য ব্যবধান গড়ে তুলেছিল, সেই নির্বাক ব্যবধানই হয়ে উঠেছিল আমার অন্তরায়।

*মিউজিয়ামে বসেই দূর থেকে ওকে দেখেছিলাম। আমার ভিনদেশী পোষাক আর চেহারা যে ওরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা বুঝছিলাম ওর বার বার ফিরে ফিরে তাকানোতে। আমিও গোলাপবাগে এলাম। পেথনার কাছেই শুনলাম—ভানিয়া ওখানে এসেছে কয়েকদিন আগে। এক দেশত্যাগী গ্রীক পরিবারের সংগে ও এসেছিল।* তারপর তারা চলে গেলেও ও রয়ে গেছে। এক সন্তানহারা চেক-রমণী তাকে পালিতা কন্যা হিসাবে রেখে দিয়েছেন। ওর চেহারার মধ্যে এমন একটা করুণ শান্ত সৌন্দর্য্য আছে—যা কোন দরদী মনকে আকৃষ্ট করবেই। ওর জীবনের যে করুণকাহিনী তাও যে-কোন মাকেই বিচলিত করবে—আর সে মা যদি সন্তানহারা হয় তাহলে ত কথাই নেই। আমি যখন ভানিয়ার কাছাকাছি এলাম ও তখন দাঁড়িয়েছিল একটা সাদা গোলাপের ঝাড়ের কাছে। সাদা গোলাপ এর সৌন্দর্য্যে যেমন আছে অস্বাভাবিক কমনীয়তা, তেমনি আছে এক বিচিত্র বৈরাগ্যের ছাপ। গন্ধরাজের সতেজতা তাতে নেই—কিন্তু তরুণসন্ন্যাসীর কঠোর আর কমনীয় সৌন্দর্য্যের আকর্ষণীয় সংমিশ্রণ তাতে ফুটে ওঠে। ভানিয়াকে সাদা গোলাপের ঝাড়ের পাশে প্রথম দর্শনেই আমার এমনি সাদৃশ্যের কথাগুলো মনে এসেছিল। সেদিনকার সেই প্রথম আলাপ উত্তরকালে আরও গভীরতর বোঝাবুঝির পালার সুরু। লিদিৎসের থেকে পরদিন আমরা গিয়েছিলাম কার্লভিভ্যারীর চলচ্চিত্র উৎসবে। ভানিয়া নিজেই উদ্যোগী হয়ে আমাদের সহযাত্রিণী হয়েছিল। ও গ্রীক মেয়ে হয়েও ইংরেজী জানত ভালই। নিকোলিয়ার এক ইংরেজ পরিবারে ও অনেকদিন ছিল।

সেই থেকেই ইংরেজী ভাষা ওর বেশ কিছুটা রপ্ত ছিল। আমার দোভাষী সহযাত্রী প্রধানতঃ এই কারণেই ওকে সংগে নিতে রাজী হয়েছিল। আমি ভানিয়ার সাথে কথায় ব্যস্ত থাকলে সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম পাবে—এটাই ছিল বড় একটি কারণ। কার্লভিভ্যারীর পাড়ে উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে এই ঐতিহাসিক নগরীতে আমরা ৪।৫ দিন কাটালাম। ভানিয়া এর মধ্যে প্রায় প্রতিদিনের সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিল আমার। কার্লভিভ্যারীর উষ্ণ প্রস্রবণগুলির খনিজ জলের উৎস কোথায়—তাই নিয়ে কথা বলতে বলতে একদিন ও একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। ও বলেছিল আমার নিজের মনের ভাবভাবনাগুলোর উৎস কোথায় তাই আমি অনেক সময়ই বুঝি না—এই পাহাড়ী ঝরণার উৎসব খুঁজে আমি কেন মরব? নানা ব্যথা-বেদনায় উদ্গত অশ্রুর উৎসব আমি কোনদিন খুঁজিনি—যুগযুগান্তের প্রকৃতির প্রস্তরীভূত বেদনার কোন আঘাতে এই অশ্রু অনিবার উদ্গত হয়ে চলেছে আমি তা খুঁজতে বসব কেন? কথাগুলো ও বলেছিল আমার জন্যে আয়োজিত এক বিদায়-সভায় বসে। বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার জন্য আমাদের চেক-বন্ধুরা অসংখ্য ফুলের তোড়ায় আমার দুহাত ভরে দিয়েছিল। (এরা ফুলের মালা দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানায় না)। আমি ফুলের বোঝার ভার ওর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলাম—আমার এই ফুলগুলো তুমি ধরো। কেমন এক ব্যথাহত চোখদুটো তুলে ও বলেছিল—তুমি এই ফুলগুলো আমার কাছে দিলে, তবু প্রাণভরে একবার বলতে পারলে না যে, এই ফুলগুলো তুমি নাও। ভুল আমারই হয়েছিল, তাই ব্যথা দিয়ে সেই ভুলকে আর বাড়াবার চেষ্টা আমি করিনি। *এই কথাটা ও বোধহয় চিরদিনই মনে রেখেছে। আজ কথায় কথায় সেই কথা উঠতে আমি বললাম—আঘাত ত তুমিও আমাকে দিয়েছ। সোফিয়ার ঘটনা ওকে মনে করিয়ে দিতে চাইলাম।*

*গাছ থেকে তুলে একটা লাল গোলাপ আমাকে দিয়ে পরক্ষণে কি মনে করে সেটা টেনে নিতে গিয়ে কাঁটায় হাতটা আমার* বেশ খানিকটা ছড়ে যায়। আমি যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠায়—ও করুণ দুটো চোখ তুলে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসেছিল। আমার হাতটা তুলে নিয়ে ও ওর কপালে চেপে ধরেছিল। আমারই রক্তের ছাপে ও রক্ততিলক পরেছিল সেদিন। আচমকা এই কাজ ও করাতে আমার ব্যথাটা আমি কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই আজ যখন সেই ঘটনার কথা ওকে মনে করিয়ে দিতে গেলাম, ও শুধু বলল—তোমার ব্যথা সেদিন তিলক হয়ে আমার কপালে উঠেছিল—বাইরে তার দাগ আছে কি নেই, তা নিয়ে আমি কোনদিন মাথা ঘামাইনি—কিন্তু আমার মনের ললাটে তার সব ব্যথাকে রঙীণ করে দিয়ে—গোলাপী চন্দন হয়ে এঁকে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল—তা হলে তোমার সারা অঙ্গ এই শ্বেত বৈধব্যের রুক্ষ ব্যবধান দিয়ে ঢেকে রেখেছ কেন?

দূরদৃষ্টি

—সুধাংশু মণ্ডল

কুতুব-দর্শন

—তপনকান্তি দাস

শাস্তি

—চিত্ত নন্দী

আলোকচিত্র

জোনহা প্রপাত ( রাঁচী )

—চঞ্চল মিত্র

মজদুর ভাই —শ্রীমুকুল সাহা

চারণক্ষেত্র

—নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়
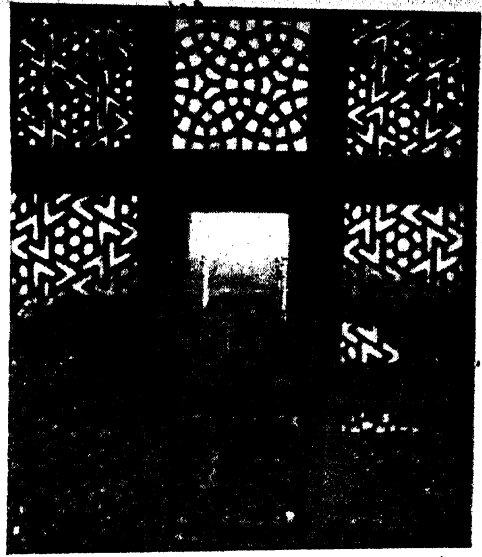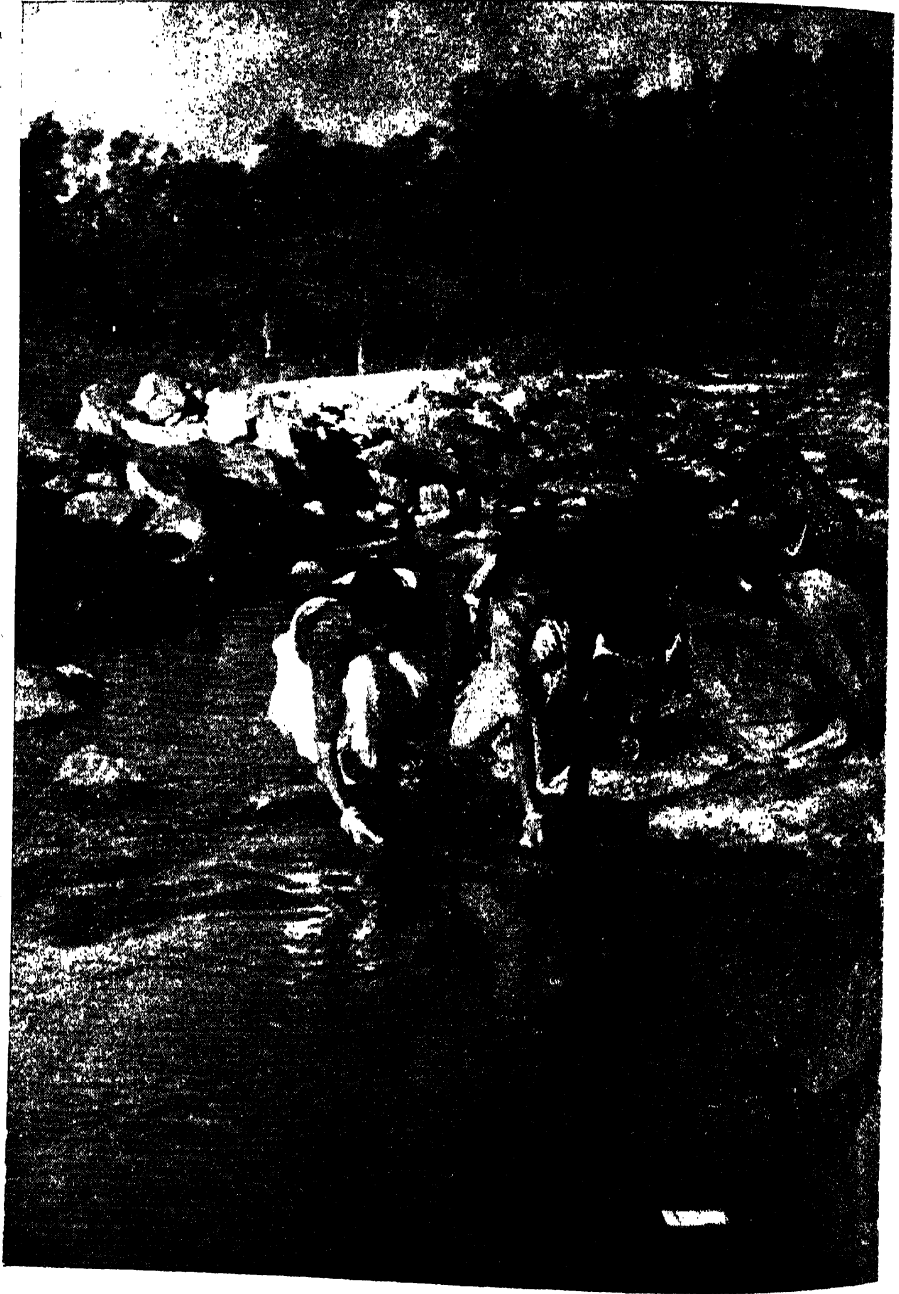
# অভিশপ্ত কাম-মিথুন

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

আদিকর্তা সুরেশ্বরের পাদপদ্ম স্মরণ করে সবেমাত্র প্রাসাদ হতে নিষ্ক্রান্ত হবার উদ্যোগে উদ্যোগী হয়েছেন [সুর]াচার্য্য বৃহস্পতি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দশকুন্দধবল অশ্ববাহিত সেই [স্ব]র্ণকেতনশালী ত্রিবক্র রথ এসে থামে তাঁর সুবিশাল প্রাসাদ দ্বারে।

সুরাচার্য্যের আলয় আজ ধন্য হতে চলেছে সেই অত্রিপুত্র দ্বিজরাজের শুভাগমনে। যিনি মুক্তাফলময়ী সুরনায়িকার প্রসাদে সমুজ্জ্বল রূপ ও [ত্রি]দশ-ব্রহ্মাণ্ডের বক্ষে একনায়কত্ব লাভের বরশ্রুতি গ্রহণ করে দেবকুলের গৌরব প্রবর্দ্ধিত করেছেন বহু গুণে। যাত্রা স্থগিত রেখে শশব্যস্তে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন সুরমন্ত্রী বৃহস্পতি।

পূজনীয় সুরগুরুর পদধূলি গ্রহণ করে সবিনয়ে নিবেদন করেন অমিততেজ, হিমাংশুমালী—"গুরুদেব, বিরামহীন রথচালনায় ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের প্রার্থনা নিয়ে এসেছি আমি আপনার পাদপদ্মে। অনুগ্রহ করে আজকের মত আপনার সান্নিধ্য দান করে আমার পরম সৌভাগ্য সূচিত করুন।"

অত্রিপুত্রকে আলিঙ্গন দান করে সস্মিতবদনে বলে ওঠেন প্রীতমনা সুরাচার্য্য—"আমি জানতাম দ্বিজরাজ, তুমি আসবে। বাসবের আমন্ত্রণ রক্ষার উদ্দেশে আজ নিশাযোগে প্রাসাদে অনুপস্থিত থাকতে হবে আমায়। তাই, মুহূর্ত্ত আগে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলাম এই ভেবে যে, আমার পৌরুষত্বের একমাত্র সুমন্ত্রণা যিনি, তাঁকে এই পুরুষহীন পুরোত্তমে অরক্ষিতা রেখে কেমন করে বাসবের মনোভিলাষ পূর্ণ করব আমি? নিখিলবিঘ্ননাশন সর্ব্বলোকপতি আমায় সে দুশ্চিন্তা হতে মুক্তিদান করেছেন, তোমাকে প্রেরণ করে। তুমি আমার আলয় রক্ষা করে আমায় ধন্য কর।"

বিশ্রামের পরিবর্ত্তে এ সুকঠোর দায়িত্বেও কিন্তু হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে সোমদেবের সমগ্র মুখমণ্ডল। প্রযত্নে আলয় রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করে সুরাচার্য্যের চিন্তারাশি দূরীভূত করেন তিনি তখনই।

ধীরে ধীরে রক্তিম আলোকধারায় সুস্নাত হয়ে ওঠে পশ্চিম দিগন্তের বক্ষ। ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে চলে যান দিনতীর্থ দিবাকর।

অভ্যাগত অতিথির যথাবিধি সৎকারের আয়োজন সম্পাদিত করে দূরতম দূরত্বে আঁধারজয়ী অলকাপুরীর উদ্দেশে যাত্রা করেন সুরাচার্য্য বৃহস্পতি।

ধীরে ধীরে অগ্রবর্তিনী হয়ে আপন তমসাজালে সমগ্র প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে মায়াময়ী নিশীথিনী। সর্ব্বকামদ সেই বসন্তরজনীর প্রগাঢ়তম তমসা, অজিতাত্মা জীবের মনে সেই সঙ্গে জাগিয়ে তোলে সঙ্গম সুখলাভের অনিবার্য্য বাসনা। সংযতাত্মা যতিরা সাবধান হন সেই প্রচেষ্টায়, সাধারণে ক্ষত-বিক্ষত হতে সুরু হয় কামবাণে।

সুরগুরুর দিব্যপ্রাসাদের সর্ব্বমহলে ভ্রমণ করতে থাকেন কন্দর্প-শরাহত অত্রিপুত্র সোমদেব। বারে বারে একটি কামনাই সমুদিত হয়ে ওঠে হৃদয়পটে, সে কামনা রোহিণীর অনুপম অঙ্গহিল্লোল পান করার এক দুঃসহতম পিপাসা।

অকস্মাৎ এক কক্ষমধ্য হতে বিচ্ছুরিত হয়ে আসে কাঞ্চীগুণের মনোহর শিঞ্জিত বলয়রাজির ধ্বনি। তা শুনে চমকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন চঞ্চলমনা সিতাংশু। নারীদেহের সৌগন্ধে মাতাল হয়ে ওঠে নিশাকরের হৃদয়াভিলাষ।

যে পরম দর্শনের অভিলাষে দেববৈরী ছলনার আগমনী বয়ে নিয়ে এসেছেন দ্বিজরাজ, বুঝি তার চরম ক্ষণ এসেছে এবার।

বাতায়নপথে তৃষ্ণাভিভূত দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিত করে সঙ্গে সঙ্গে শিহরিত হয়ে ওঠেন অত্রিপুত্র সোমদেব। নিশীথিনীর অনিবার্য্য কামনা তীব্রতর হয়ে ওঠে তাঁর চঞ্চল মনে।

কামকলার মত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী এক সীমন্তিনী বেশ পরিবর্ত্তন করতে ব্যস্ত তখন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই পীনোন্নত পয়োধরা কামিনীর অনাবৃত বরতনুর সঙ্কোচময় রূপরাশি দর্শন করে শিহরিত হয়ে ওঠেন সোমদেব।

নিঃশব্দে সেখান হতে স্থানান্তরে সরে যান কামার্ত্ত সিতাংশু। কিন্তু স্থির হতে পারেন না কিছুতেই। বারে বারে সেই নবযৌবনযুক্তা গৌরাঙ্গীর কক্ষদ্বারেই এসে উপস্থিত হন।

কর্পূর পরাগপূর্ণ চন্দনপাত্র শিয়রে রেখে পুষ্পময়ী শয্যার উপরে অলসলুলিত দেহভার অর্পিত করে নিবিড় নিদ্রায় অভিভূতা হয়েছেন তখন রূপবতী। সেই নারীবদন চুম্বনের অরোধ্য তৃষ্ণায় পুনরায় বিচলিত হয়ে ওঠেন সোমদেব। অনাবৃত উত্তুঙ্গাগ্র সুবর্ত্তুল পয়োধরের নির্ব্বাক আহ্বান অস্বীকার করতে পারেন না সোমদেব। যৌনবাসনার বেত্রাঘাতে অকৃত বন্ধন বড়বের মত মহাবেগে ছুটতে থাকে সোমদেবের মন।

রূপপূজারী এসেছিলেন শুধু দর্শনের অভিলাষে। অনুতপ্ত মরণকে বরণ করে দেখতে এসেছিলেন তিনি, সেই ত্রিলোকখ্যাত অমৃতময় রূপরাশি সত্যই অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে কি না বার্দ্ধক্যপীড়িত সুরগুরুর কামহীন দৃষ্টির অন্তরালে।

বুঝতে পারেন তিনি, ইনিই স্বয়ং দেবগুরুর ধর্ম্মপত্নী, তারা।

ত্রিলোকের সহস্র নারীরূপের খ্যাতিও পরিম্লান হয়ে আছে যে পীনোন্নতা রম্যাঙ্গপার অন্তহীন রূপরাশির বিস্ময়তায়।

কিন্তু এই পরিচয়েও নিবৃত্ত হতে পারেন না সোমদেব। নারীস্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তিনি ততক্ষণে। রূপের আগুনেই আগে দগ্ধ হয় কামভৃঙ্গ, অজ্ঞাত মুহূর্তের আকুলতায় আকুল হয়ে ওঠে পিপাসার্ত জীবনের প্রতিকূল।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে মৃদু মৃদু করাঘাত করেন তিনি নিদ্রাভিভূতা সীমন্তিনীর কক্ষদ্বারে। অর্গলহীন সে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় সহসা সে আঘাতে।

দ্বিধা আসে, পুনরায় দ্বন্দ্ব হয় মনে মনে। কিন্তু বৃথাই। শরীরের সাথে সাথেই জন্ম নিয়েছে যে আদি অন্তহীন কাম, সুযোগে সে নির্মম হয়ে ওঠে।

কামহতজ্ঞান উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত দ্বিজরাজের পরাজিত সুসন্তোষ নীরব হয়ে যায় অবশেষে। সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায় একটি নিমেষে।

অবরুদ্ধ নিশ্বাসের বোঝা বুকে নিয়ে একাকিনী সীমন্তিনীর সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষে প্রবেশ করেন সোমদেব।

সামান্য এক আলোকবর্তিকা বুঝি তখনও নির্মম নিষেধের মতই পথরোধ করে দাঁড়াবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে চলেছিল তখনও। ফুৎকারে তাকে নিভিয়ে দিয়ে পুনরায় পুষ্পময়ী শয্যার দিকে এগিয়ে চলেন সোমদেব।

পার্শ্বশায়িত পুরুষের মুহুর্মুহু চুম্বনস্পর্শে জাগরিতা হয়ে ওঠেন রূপাতিশালিনী তারা। তখনও নিদ্রার জড়িমা কাটে না তাঁর। অর্দ্ধনিদ্রা ও অর্দ্ধ-জাগরণের সীমানায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারেন না তিনি, পার্শ্বশায়িত এ পুরুষ তাঁর স্বামী, না অন্য কেউ।

কিন্তু জড়িমার মুক্তি আসতে দেরি হয় না। আপন অনুভবের বিনিময়ে সব-কিছু উপলব্ধি করতে পারেন তিনি তখনই। শরীরের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরপুরুষের করস্পর্শ সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করতে পারেন তারা।

বুঝতে পারেন তিনি, দূরের নিশাকর ছুটে এসেছে পাশে। কিন্তু বাধা দেন না তবুও। এগিয়ে আসেন তিনিও।

বাধাহীন অভিসারের নেশায় আরো নেশাগ্রস্ত হয়ে ওঠেন সোমদেব। রক্তাস্বাদলোভী শ্বাপদের মতই উন্মত্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

অতৃপ্ত যৌনপিপাসা উদ্দামতর হয়ে ওঠে কামসন্তপ্তা উদ্ধত যৌবনবতীর। প্রায়বৃদ্ধ বৃহস্পতির কাছ হতেও যা তিনি পাননি কোন দিন, যা পাবার আশাও নেই আর, সেই পাওয়াই আজ আত্ম-নিবেদনের প্রার্থনা নিয়ে স্বেচ্ছায় লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পদপ্রান্তে। আর, এ পাওয়াকে নিরাশায় না ফিরিয়ে দেবার অভিলাষেই যেন হৃদয়ের মৃদঙ্গপর্ণব উদ্ঘোষিত হয়ে ওঠে বার বার।

নৈশাকাশের বক্ষকে প্রদীপ্ত করে উদিত হ'ত যখন সন্ধ্যারাণীর নিশাকর, তখন তাকে বারে বারে আহ্বান করেছে কামাতৃপ্তা কামিনীর হৃদয়ের আকুলতা। আজ সার্থক হয়েছে সেই আহ্বানের প্রতিশ্রুতি।

প্রতি আলিঙ্গনে, প্রতি চুম্বনে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন বৃহস্পতির পৌরুষত্বের মন্ত্রণা, উন্মত্ততর করে তোলেন সোমদেবকেও। স্মরবিমোহিত হয়ে এইভাবেই চিরন্তন ইন্দ্রিয়সুখে চরমভাবে অচেতন হয়ে যায় সেই কামুক-মিথুন।

কিন্তু তবুও পরিতৃপ্ত হতে পারেন না দু'জনেই। এ মিলনের এখানেই যবনিকা আহ্বান করতে চান না তাঁরা কেউই।

আসন্ন তারাহারা ভবিষ্যৎকে স্বীকার করতে পারেন না তারাপতি!

কান্তিমান যুবার সঙ্গলাভে সব সংযমের পরাকাষ্ঠা বিচূর্ণ হয়ে যায় উদ্ধত যৌবনবতীর। যৌবনকে নবরূপে উপভোগ করার মোহস্পর্শে জাগরিত হয়ে ওঠে তাঁর প্রতীক্ষারত সুপ্তবিদ্রোহ। সীমন্তসরণির সকল বাধাবিধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রচণ্ড সঙ্কল্প স্থির হয়ে ওঠে রূপাভিরামার অসিতনয়নশ্রী।

প্রাসাদদ্বারে অপেক্ষারত ত্রিবক্র রথে গিয়ে ওঠেন কম্পিতকায়া বৃহস্পত্নী।

দশকুন্দধবল অশ্ববাহিত ত্রিবক্র রথ এবার ছুটতে থাকে মহাবেগে। তারপর ছোট একটি বিন্দুর মত ধীরে ধীরে বিলীয়মান হয়ে যায় মহাকাশে।

দূরান্তরের নভঃপটে বিদায়ের প্রণতি জানিয়ে অস্তেয় অবসান ঘোষিত করে চলে যায় পৌর্ণমাসীর রজনী।

প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে বিস্মিত হন সুরাচার্য্য বৃহস্পতি।

চারিদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিদান করেও সোমদেবের দর্শন পান না তিনি। কিন্তু তাও কি হয়? তাঁর অনুজ্ঞা না নিয়েই কি বিদায়ী হবে দ্বিজরাজ!

চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে এবার প্রেমময়ী তারার কক্ষে প্রবেশ করেন সুরাচার্য্য। কিন্তু চমকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন সহসা। বিস্ময়ের বজ্রপাত হয় যেন অকস্মাৎ। স্তব্ধ হয়ে যায় তাঁর সকল চিন্তাস্রোত।

তারার শূন্য শয্যায় পড়ে আছে সোমদেবের উত্তরীয়! কিন্তু এ অসম্ভবও কি সম্ভাব্যের ভূমিকা নিয়ে দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়াবার দুঃসাহস পায়।

স্খলিতচরণে প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অলিন্দে অলিন্দে প্রেমময়ী তারার অন্বেষণে ছুটোছুটি করেন সুরাচার্য্য। কিন্তু তাঁর সন্ধান মেলে না তবু।

প্রাসাদাভ্যন্তর হতে এবার প্রাসাদদ্বারে এসে দাঁড়ান মতিস্থৈর্য্য-হারা সুরাচার্য্য বৃহস্পতি। দাবদগ্ধ মহীরুহের মতই যেন প্রাণহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।

সহসা নিজ পদপ্রান্তে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তাঁর। তখনই শম্পাস্পৃষ্টের মত পিছিয়ে যান তিনি কয়েকপদ। দেখতে পান, সেখানে পড়ে আছে এক বহু রত্নবিচিত্রিত প্রালম্বিকা।

বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের মতই যেন আর্ত্তস্বর উৎসারিত করে মনোবেদনার স্পর্শানুভূতির ঘোষণা করতে চায় মন।

বুঝতে পারেন তিনি। চলে যাওয়ার পরম মুহূর্তে ফেলে যাওয়া এ চরম বিদায় চিহ্নটিকে চিনতে একটুও ভুল হয় না সুরাচার্য্যের। তাঁর প্রাণ-ওজবলের সকল দর্পে দংশন করে যেন গরলে গরলিত করে দিয়েছে এক কৃষ্ণবর্ণ কালভুজঙ্গী।

সোমদেবের অন্তর্ধানের রহস্যাবরণ অল্পে অল্পে উন্মোচিত হয়ে যায়। স্থির সন্দেহে দুলে ওঠেন সুরাচার্য্য বৃহস্পতি।

তবু যেন সে বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে চায় না মন। ভেবে পান না তিনি, কেমন করে বিশ্বাসরূপ সেই উন্নতশীর্ষ মহাবৃক্ষে কুঠারাঘাত করতে পারে সোমদেব! তারা যে তার কাছে মাতৃসমা!

## কেশ পরিচর্য্যায় ভারতীয় নারী

সুরভিত কৃষ্ণকোমল কেশপাশে নানা ছাঁদে যখন রচিত হয় সুঠাম কবরী তখন নারীর মুখশ্রী মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে নয়নকে। তাই প্রতি অন্তঃপুরে অনন্য নিষ্ঠায় চলে নারীর কেশ-পরিচর্য্যা। আর এই কেশ-পরিচর্য্যার অপরিহার্য্য অঙ্গ শতাব্দীর পরিচিত লক্ষ্মীবিলাস।

# লক্ষ্মীবিলাস

শতাব্দীর সুপরিচিত গুণসম্পন্ন তৈল

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা

কিন্তু তত্ত্বদর্শী ধৃতিমান সুরাচার্য্য তিনি, স্বয়ং বৃহস্পতি। কারো প্রতি কারো অন্যায় সন্দেহের অপরাধ মার্জ্জনা করেন নি তিনি কখনো। নিজেকেও সে অপরাধে অপরাধী করবেন না এবার। প্রকৃতভাবে সকল রহস্যের যবনিকা টানতে হবে অবশ্যই।

কিন্তু কার কাছে আপন জিজ্ঞাসা প্রকাশিত করবেন তিনি? কে উন্মুক্ত করবে সেই রহস্যদ্বার?

প্রাসাদ সংলগ্ন নির্জ্জন উদ্যানের শ্বেতমর্ম্মরের বেদকার উপরে গিয়ে বসেন শ্রান্তক্লান্ত তারাহারা বৃহস্পতি। তারপর ধীরে ধীরে এক সময় মহাযোগে সুসমাহিত হয়ে যান তিনি দিকহারা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তুষার পড়ে। দেবতাত্মা হিমালয়ের শিখরে শিখরে তুষার পড়ে। সে তুষারে আবরিত হয়ে যান অভ্রভেদী শৈলসম্রাট।

সুরাচার্য্যের নির্ম্মল চিত্ত আবরিত হয়ে যায় ব্যথার দুরন্ত তুষারে।

সুরাচার্য্যের বেদনা আর একজনও উপলব্ধি করতে পারেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই। তিনি সুরাচার্য্য বৃহস্পতিরই জনক,—ব্রহ্মবিদ্বর মহাপ্রজাপতির অন্যতম মানসপুত্র, মহর্ষি অঙ্গিরা।

মহাযোগী বৃহস্পতির অন্তর্বিলাপের সুরস্পর্শে রীন্ রীন্ করে বেজে ওঠে তাঁরও হৃদয়তন্ত্রী। চিরশান্ত স্বরাশ্রম হতে তাই চঞ্চল হয়ে ছুটে এসেছেন অচঞ্চল যোগবান্। পুত্রের কুসুমোদ্যানে এসে হাজির হন্ কুসুমহৃদয় ভগবান্ অঙ্গিরা।

যোগবান মহা-ঋষির আবির্ভাবে মহাযোগের অবসান হয় যোগাবলম্বী সুরাচার্য্যের। অশ্রুসিক্ত দুই আঁখিপল্লব উন্মীলিত করেই সম্মুখে দেখতে পান তিনি সেই মহাতাপস জনকের চিরাভয়জ্যোতিপূর্ণ প্রশান্ত আননের সমবেদনাময় রূপ।

ইতিমধ্যেই যোগশক্তিবলে বুঝতে পেরেছেন সুরগুরু, তাঁর সন্দেহ অমূলক নয়। তাঁর বিশ্বাসই ভ্রান্তিহীন প্রতারণায় প্রতারিত হয়েছে চরমভাবে। কিন্তু তবু, তবু সেই বিশ্বাসের এত বড় নারকীয় নির্য্যাতন অসহ্য হয়ে ওঠে জিতাত্মা সুরাচার্য্যের জীবনোদাসী হৃদয়েরও ঔদাস্যে।

ঋষিশ্রেষ্ঠ জনকের পদপ্রান্তে অরোধ্য ক্রন্দনাবেগে লুটিয়ে পড়েন মতিস্থৈর্য্যহারা সুরাচার্য্য বৃহস্পতি?

—"এ কি হলো পিতা? এ অভিশাপে অভিশপ্ত হলাম আমি কোন্ অপরাধে? সমগ্র সুরলোকের সম্মুখে কেমন করে প্রতারণার কালিমায় কলুষিত এ মুখমণ্ডল নিয়ে দাঁড়াবে আপনার তনয়?"

স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সহৃদয় পিতার স্নেহাসিক্ত বদনমণ্ডল। হাসি দিয়ে পুত্রের ব্যথা সংক্রামিত আপন হৃদয়ের জ্বালা শীতল করার প্রচেষ্টায় যত্নবান হয়ে ওঠেন তিনি।

পুত্রের শিরে আপন অক্ষসূত্রসমন্বিত কমলবাহুর পুতস্পর্শ দান করে সুস্নিগ্ধস্বরে বলে ওঠেন মহর্ষি অঙ্গিরা—"এ তোমার অভিশাপ নয় পুত্র। এ তোমার আশীর্ব্বাদ। অপরকে প্রতারণার মোহজালে জড়িত করে আপাতসুন্দর এক কালাভিশপ্ত শোষকের নিকৃষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করার চেয়ে প্রতারিত হওয়া অনেক শ্রেয়ঃ। তুমি গর্ব্ব করো, তুমি প্রতারিতই হয়েছো শুধু।"

—"কিন্তু নিজেকে যে সেই প্রতিশাপের বাণী শোনাতে আমি ব্যর্থ হয়েছি পিতা।"

—"শান্ত হও সংযতাত্মা দেবগুরু, পৌরুষহীন বিলাপ বর্জ্জন কর। সর্ব্বজীবের ভাগ্যরচনাকারী বিধাতার মানসপুত্র আমি জানি, সোমদেবের নিয়তিই প্ররোচিত করেছে তাকে এই দুষ্কার্য্যে। ধৈর্য্যাবলম্বন কর, ধীমান বৃহস্পতি। তোমার এ অকাল বিরহ স্থায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই এক চরম বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে অত্রিপুত্রকে। অচিরেই আপন ভ্রান্তির ছলনা হতে মুক্তিলাভের তৃষ্ণায় ব্যাকুলা হয়ে ফিরবেই সে আকাঙ্ক্ষিতা। আমার আশীর্ব্বাদমুক্তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে পারে না কখনও।"

কিন্তু তবু হৃদয়ের সেই অরোধ্য প্রায় ক্রন্দনাবেগকে রোধ করতে পারেন না সুরগুরু বৃহস্পতি। নয়নাশ্রুর আবরণে আবরিত হয় যায় তাঁর দৃষ্টির ঔৎসুক্য। শুধু তো সোমদেবই নয়, সেই প্রেমময়ীও যে প্রতারিত করেছে তাঁকে নিষ্ঠুর অনমুকম্পায়।

সুরাচার্য্যের আচ্ছন্নপ্রায় দৃষ্টির সুযোগে অন্তর্হিত হয়ে যান মহাতপা অঙ্গিরা। যাবার আগে আপন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে যান তিনি পুত্রের হৃদয়-কেন্দ্রে।

তারাবিরহানলে দগ্ধীভূতপ্রায় অনঙ্গতপ্ত সুরাচার্য্য সর্ব্বহারা ভিক্ষুকের মত এসে দাঁড়ান হিমাংশুমালীর হৈমসিংহাসনের সম্মুখে। স্বপ্নলোকের স্বপ্ন দিয়ে গঠিত চন্দ্রলোকাধিশ্বরের সেই দিবিষ্ঠ জ্যোতির্লোকপূর্ণ রাজসভা যেন মুহূর্ত্তের অসীম বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সহসা।

সুরাচার্য্যের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না দ্বিজরাজ। উপহাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন তিনি তাঁর দিকে।

কাতরস্বরে নিজ ভার্য্যাকে ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা করেন সুরাচার্য্য বৃহস্পতি। উচ্চ অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন মদোন্মত্ত দ্বিজরাজ। যেন কোন মূর্খের মূঢ়ত্বে ধিক্কারের লৌহাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন কোন মহাজ্ঞানলাভী মহানুভব।

এবার যেন আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন সুরাচার্য্য, কোথায় তাঁর ভুল। নিজের মূঢ়ত্বে নিজেই তাই অবনমিত হয়ে যেতে চান অসহ্য কুণ্ঠায়।

হ্যাঁ, এই মূঢ়ত্বই আজ একমাত্র সত্য। আজ বুঝতে পেরেছেন সুরাচার্য্য, তাঁর এ বিরহ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, যৌবনচটুল কোন প্রবঞ্চকেরই অভিসন্ধির ফল। বুঝেছেন সুরাচার্য্য, সেদিন তাঁর কাছে বিশ্রাম প্রার্থী হয়ে যাননি সোমদেব। গিয়েছিলেন রূপাতিশালিনীর রূপসুধা পানাভিলাষের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মিথ্যার আবরণে আবরিত হয়ে। কোবিদকুলশ্রেষ্ঠ সুরাচার্য্য বৃহস্পতি হয়েও সেদিন মূর্খের মতই সরল বিশ্বাসে তাঁর হাতে প্রাসাদ রক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে স্থানান্তরে সরে গিয়েছিলেন তিনি। আর সেই সুযোগের চরমতম ব্যবহার করে, তাঁর সকল বিশ্বাসকে দুঃসহ আঘাতে আহত করে, উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন অত্রিপুত্র দ্বিজরাজ। মূঢ়ত্বের শেষ প্রতিফল!

লজ্জায়, ঘৃণায়, ধিক্কারে শরাহত কুরঙ্গের মত সোমদেবের ঐশ্বর্য্যসভা ত্যাগ করে ছুটে চলে যান সুরাচার্য্য বৃহস্পতি। অত্রিপুত্রের অট্টহাসি যেন তখনও করাল অগ্নিবাণের মতই তাঁর পিছু পিছু ধাবিত হয়ে চলে।

না, অসহায় শিশুর মত ক্রন্দনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপন হৃদয় জ্বালার অভিবেদনা প্রকাশিত করতে চাননি সুরাচার্য্য, অভিশাপের

দাবানলেও প্রতিহিংসার মনোলাষ ব্যক্ত করে নয়—আপন পৌরুষত্বের বিনিময়ে অবলিপ্ত এক পুরুষের শির মাটির সাথে মিশিয়ে দেবার সঙ্কল্পে অটল হয়ে ওঠেন তিনি। আর তার জন্ত সুরশক্তির কাছেই প্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়ান সুরগুরু।

শঙ্খেন্দুকুন্দধবল বৃষভবরে আরোহিত হয়ে সোমপ্রাসাদে আসেন শূলপাণি বৃষধ্বজ। কুলিশকণ্ঠে আদেশ করেন তিনি সোমদেবকে—'ফিরিয়ে দাও বাকপতির জায়া। নতজানু হও কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায়।'

এবারেও উচ্চহাস্থে ফেটে পড়ে প্রত্যাখ্যানের প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত করে দেন অত্রিপুত্র দ্বিজরাজ।

ভীষণ বদন ধূর্জ্জটির প্রদীপ্ত জ্বালাবলিময় নয়নবহ্নি জগৎসংহারক মূর্ত্তিতে জ্বলে ওঠে সে প্রত্যাখ্যানে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে সে বহ্নিশিখা মিশে যায় জ্যোতিরাত্মা সোমদেবেরই দেহজ্যোতির সাথে সাথে। ক্রোধময় শশিশেখরের অসীম ক্রোধজ্বালা নিঃসীম হয়ে যায় শশাঙ্কের অহঙ্কারজড়িত হিমতাপের পরশ পেয়ে।

এবার আসেন সত্ত্বগুণাশ্রয়ী জগদীশ পীতাম্বর। আসেন পদ্মজন্মা চতুরানন। আসেন সাধ্যবর্গ, আসেন মরুদ্বর্গ, আসেন অমিতশক্তিধর সকল লোকপাল। প্রদীপ্তকণ্ঠে একই দাবী বিঘোষিত করেন সবাই —"নিজের মঙ্গল চাও যদি, তবে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকৃতি দান কর আমাদের অনুশাসনে।"

কিন্তু সঙ্কল্পের প্রতিজ্ঞায় অটল তখন সোমদেব। সবাকেই প্রত্যাখ্যানের অবমাননায় অবমানিত করার দুরন্ত আগ্রহে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন তখন তমোগুণাচ্ছন্ন অত্রিপুত্র দ্বিজরাজ। পুনরায় উচ্চ অট্টহাস্থের স্রোতে ভাসিয়ে দেন তিনি সেই সুরপুরুষদের ন্যায়াশ্রয়ী অনুশাসনের দাবী। কঠোরতম প্রতিজ্ঞা তাঁর, জীবনের রাজপথে আকস্মিক কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক্য যখন একবার এসেছে তাঁর অধিকারে, তখন তাকে আপনারই একান্ত সম্পদ বলে স্বীকার করে চলবেন তিনি জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্তও।

—"কিন্তু সেই শেষ মুহূর্ত্তেরও পরের কথা কি ভেবে দেখেছেন বরৌষধিপতি দ্বিজরাজ?"

উচ্চ অট্টহাস্থের অগ্ন্যুৎপাত হয় যেন পুনরায় জীবন্ত আগ্নেয়গিরির বুকে। কোপপীড়িত দৃষ্টির ইঙ্গিতে সুরপুরুষ পরিবেশিত সুরাচার্য্যকে নির্দ্দেশ করে শ্লেষাক্ত স্বরে বলে ওঠেন অত্রিপুত্র—"না, সে কথার অনুচিন্তা একদিন নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ঐ সুরাচার্য্যেরই সুরদ্রোহী ভ্রান্ত সত্যের নির্লজ্জ ইচ্ছায়। আর, সেই ইচ্ছায় জাত হয়ে শাস্ত্রহীন শাস্ত্র রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন ওঁরই শিষ্য চার্ব্বাক। আমি ওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিনি, তবু ওঁরই প্রদর্শিত পথ ধরে অগ্রসর হয়ে ওঁকেই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছি যে, পরকালের মৃত্যুভয়ে ইহকালের ভোগলালসাকে অবহেলা করিনি আমিও। এবং সে বিবেক-বিহ্বলতাও নেই আমার তিলেকও। তারাকে আমি প্রত্যর্পিত। করব না, এই আমার স্থির ঘোষণা।"

ফিরে যান সমগ্র দেবলোক আবার সেই দেবলোকে। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের গ্লানি সহ্য করতে পারেন নি তাঁরা কেউই। আসন্ন যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হবার নির্দ্দেশ দিয়ে যান তাঁরা তখনই।

সুরপুরুষদের সে সদম্ভ ঘোষণায় পুনরায় উচ্চ অট্টহাস্থে ফেটে পড়েন মদান্ধ দ্বিজরাজ। আসুরিক দর্পমায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেন দেবকুলের দ্বিজরাজ।

ব্যভিচারের মন্ত্রে উৎসর্গীকৃত যৌবনযজ্ঞের অনলগ্রাসে বৃথাই দগ্ধ হয়েছে কামরূপ ঘৃতরাশি, শান্তির পূতস্পর্শলাভে তবু ধন্তা হতে পারেননি উদ্‌ভ্রান্তচিত্তা কোবিদা। কি যেন এক হারিয়ে যাওয়ার দুঃসহ বেদনার ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তাঁর সকল মনপ্রাণ।

সুচারুনেত্রা কামানুবন্ধিনী তাই তাঁর সকল চারুতা হারিয়ে অভিশপ্তা প্রেতিনীর মত হতরূপা হয়ে যান অন্তরে অন্তরে। পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা উৎফুল্লা মল্লিকাদামের মত সেই সুকুমার অঙ্গ—সৌষ্ঠবেও ভাঙ্গন ধরে।

তবু কিছুতেই নিজেকে প্রকৃতিস্থা করতে পারেন না বিস্রংসিনী, বিশ্বাস করতে পারেন না নিজেকেও। অতর্কিত এক অবিশ্বাসের পাবক এসে দগ্ধ করে বিশ্বাসের বাস্তব অসংশয়।

সুরাচার্য্যকে প্রতারিত করার দুরভিসন্ধি ছিল না তাঁর শুধু ক্ষুধার্ত্ত যৌবন-শার্দ্দূলের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্তই জীবনের সকল সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য নিবেদিত করে ব্যভিচারকে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার পরিণতি যে এইভাবে এই ভয়াবহ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, তা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ অগোচরে। আজ বুঝেছেন, বুঝতে পেরেছেন তন্বঙ্গী বরবর্ণিনী, বস্ত্রাঞ্চলে পাবক বন্ধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সেই মৃত্যুর জন্তও প্রস্তুতি নিতে হয় সাথে সাথে।

রত্নস্তম্ভ শোভিত সোমনিকেতনের সুবর্ণপালঙ্কে শায়িতা আপন কলঙ্কে কলঙ্কিনী স্ববঞ্চকী অর্ব্বতি ব্যাকুলা হয়ে ওঠেন এবার। প্রায়শ্চিত্তের সুকঠিন শিলাতলে ললাটশিরা সম্ভেদ করে, সেই শোণিতে অঞ্জলি পূর্ণ করে, ভ্রান্তির পাদপদ্মে তা নিবেদিত করার ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী হয়ে ওঠেন অঙ্গারময়ী অঙ্গনা।

সুরাচার্য্যের আলয়ে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করা বৃথা, নারীত্বের সাগ্রহ প্রতীক্ষার বিনিময়ে হারিয়ে যাওয়া সেই অতীতকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও বৃথা, কিন্তু প্রচেষ্টা পরাজিত হতে চায় না কিছুতেই। তাই, আপন সুরোমণ্ড পিঙ্গলাক্ষ উৎকট রূপে প্রদর্শিত করে সোমদেবের ঘৃণা ও বিরক্তিকেই বরণ করে তাকে মুক্তির পাথেয়রূপে স্বীকার করতে চেয়েছেন অস্থিরমনা মুক্তি অভিলাষিণী। এইভাবেই তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, দক্ষের সপ্তবিংশতি ললনার অন্ততমা নন তিনি, তিনি শুধু ছলপ্রণয়বিলাসিনী এবং ক্ষণিকের তৃষ্ণাচারিণী এক কুহেলিকা?

কিন্তু আশ্চর্য্য কামোন্মত্ত সে পুরুষ; প্রেমিকের মূর্ত্তি অপসারিত হয়ে যায় ধীরে ধীরে, দেখা দেয় এক ক্রূরাত্মা কামুক। নারীমনের কোন সম্মাননা নেই তাঁর কাছে, দেহের সম্ভোগই একমাত্র পরমাশা। আসক্তির জন্ত ত্যাগের ধর্ম্মকে অস্বীকার করে সে পুরুষ, ভোগের জন্ত আপন বিবেকের মৃত্যুও তাঁর কাছে একান্ত বরণীয়।

এতদিনের সবল স্বীকৃতির পাশাপাশি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বল বাধা তাই নারী-ধর্ষকের গর্ব্বিত বিদ্রূপের কাছে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। আবর্ত্তাভিহত তরী যেন অথৈ জলে নিমজ্জিত হওয়ার প্রাক্‌মুহূর্ত্তে উপনীত হয়েছে।

আর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে না কোন, আঘাতের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ বুকে নিয়ে বিষাদ-সলিলে সমাধিস্থ হয়ে যায় সেই অসমাপ্ত সঙ্গীভূতা অপহৃতচিত্তা কাম-তাপসিকার লালস-তপস্যা, মুক্তির আশায় ব্যাকুলাভিভূতা হয়ে ওঠেন অন্তঃসত্ত্বা রীতিদ্রোহিণী। যেন বিদিশভীতা

কোন কুরঙ্গবধূ সূর্য্যকরবঞ্চিত কাননভূমির সকল লতাজাল ছিন্ন করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলে ব্যর্থ প্রয়াসটুকুকে সঞ্চয় করে।

অবশেষে সর্বধ্বংসী ভাবী মরণ-যজ্ঞশালায় উপনীত হতে চলে সপ্তলোক। তারই সম্প্রস্তুতি চলে দেব ও দানবের অন্তরে অন্তরে।

আশু মহারণক্ষেত্র মুখরিত হয়ে ওঠে সুরাচার্য্যের পক্ষাবলম্বী দেবানীকিনীর উন্মত্ত কোলাহলে। অত্রিপুত্রের সাহায্যার্থে আসেন ত্রিলক্ষরথারোহী মহাবল • সব অসুর-সেনাপতি। তাঁদের ব্যাক্রোশধ্বনি যেন সীমাহীন স্পর্দ্ধায় চিরবৈরী দেবকুলের সকল পরাক্রমকে বিপ্লাবিত করে তোলে। সুরগুরুর বিরুদ্ধে কুটিলতার যুদ্ধ আহুত করে উপস্থিত হন স্বয়ং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য।

একদিকে ধ্বনিত হয় দেবতূর্য্য, অন্যদিকে নিনাদিত হতে থাকে দৈত্যভেরী!

দুই পরাক্রান্ত যোদ্ধৃকুল ক্রোধসংরক্তনেত্রে দাঁড়ান এবার মুখোমুখি। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার আগে কোলাহলহারা প্রকৃতির মত স্বাভাবিক শান্তি ও নিস্পন্দতায় ক্ষণমুহূর্তে স্তব্ধ হয় রণভূমি।

কিন্তু সহসা চমকিত হয়ে ওঠেন সকল দেবাসুর। সেই ক্ষণমুহূর্ত্তের স্বাভাবিকতাকে বিস্ময়ের আঘাতে আহত করে রণক্ষেত্র পার্শ্বস্থ অদূর বনস্থলীর প্রান্ত হতে ভেসে আসে এক সুমধুর মঞ্জীর নিক্বণ!

রণক্ষেত্রে মঞ্জীর নিক্বণ শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, ভয়প্রদও। তাই, এক শব্দবেদিতা আসুরি মায়া বলে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হন সুরদল। দেবতার মোহজাল বলে তাকে অবিশ্বাস করে হেসে ওঠে দৈত্য-অনীকিনী।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও এ সত্য। সবার শ্রবণেন্দ্রিয়ই অসত্যের বিশ্বাসে দ্বিধান্বিত হয়ে গেলেও সুরাচার্য্যের কর্ণকুহরে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না কিছুতেই। কোন উপেক্ষার দ্বিধা নিশ্চিন্ত করতে পারে না তাঁর অশান্ত হৃদয়ের সম্ভাবনাপ্রাপ্ত উল্লাসকে। বুঝতে পেরেছেন সুরাচার্য্য। এ শিঞ্জন কোন ভ্রমাত্মিকা মায়া নয়, এ শিঞ্জন দয়িতকে কাছে পাওয়ার জন্য দয়িতার আকুলাহ্বান। এই শিঞ্জন যে একদিন তাঁরই হৃদয়ের আনন্দনৃত্যের অনুসঙ্গিনী হয়ে নেচেছিল দেহসমর্পণের নিবেদনে আত্মহারা হয়ে।

রণক্ষেত্রপার্শ্বস্থ পাদপমণ্ডপের দিকে উদ্‌ভ্রান্তপদে ছুটে চলেন সুরাচার্য্য বৃহস্পতি।

কিন্তু সে পর্য্যন্ত পৌঁছাতে হয় না তাঁকে। তার পূর্ব্বেই বিস্মিত সুরাসুরের বিহ্বলদৃষ্টির সম্মুখেই পাদপমণ্ডপের অন্তরাল হতে আবির্ভূতা হয়ে সুপুষ্পভরণোজ্জ্বলা কুন্দলতার মত এক যোষিদ্বরার চঞ্চল মূর্ত্তি এগিয়ে আসে তাঁর দিকে।

সুরাচার্য্যের অনুমানই সত্য হয় অবশেষে। নারীমূর্ত্তি, সোমদেবের প্রত্যাখ্যাতা তাঁরই জায়া, তারা।

না, বিস্মিত হন্ নি সুরাচার্য্য। এ তিনি জানতেন। জানতেন, মহাতপা অঙ্গিরার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হতে পারে না। জানতেন, আসন্ন সর্ব্বধ্বংসী সুরাসুর সংগ্রামকে রোধ করবার উদ্দেশে, সোমদেবের সকল রূঢ় প্রলোভনের দম্ভকে প্রতারণার আঘাতে বিচূর্ণ করে, পুনরায় ফিরে আসবেই সে তাঁর তারাশূন্য বুকে। মুক্তি পাবে সেই মুক্তি অভিলাষিণী, মুক্তি দেবে অগণিত সুরাসুরকে।

দু'-বাহু প্রসারিত করে তাঁকে সাগ্রহ আহ্বানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন সুরাচার্য্য বৃহস্পতি। ক্ষণপ্রণয়ের অভিশপ্ত জীবনকে বর্জ্জন করে স্বামীর আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে সমাজ ও সংস্কারের শাসনকে ধন্য করেন রূপান্তরিতা অন্তর্বত্নী। মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র একবার শিহরিত হয়ে ওঠেন সুরাচার্য্য নতুন স্পর্শের অনুভবে।

ধন্য ধন্য করে ওঠে দেব-সমাজের অগণিত কণ্ঠের স্বীকৃতি।

এ অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে কিন্তু ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বরৌষধিপতি দ্বিজরাজ। সপ্তলোকের প্রাণকেন্দ্র তিনি, আর তাঁকেই প্রতারিত করবে ঐ নারী। যার জন্য দেবতা হয়েও প্রবলতম দেবশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আসুরিক বলের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে তাঁকে, তাঁরই কাছ থেকে পেতে হবে প্রবঞ্চনার প্রথম আঘাত।

কোপামর্ষবিবৃত্ত লোচনে প্রবঞ্চকী রহস্যময়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ান মহাশূর অত্রিপুত্র। সেই খরনেত্রের অপ্রসন্ন দৃষ্টির জ্বালায় রূপাতিশালিনীর সকল আশাকে ভস্মীভূত করে দেবার উল্লাসে উল্লসিত হয়ে ওঠেন তিনি।

—"কে তোমাকে এই রণক্ষেত্রে আসবার অনুমতি দিয়েছে? কার মন্ত্রণায় প্ররোচিতা হয়ে আপন দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নিতে উদ্যতা হয়েছ তুমি দুঃসাহসিকা?" গর্ব্বিতস্বরে প্রশ্ন করেন সোমদেব, কিন্তু অধোবদনা সেই কৌতুকিনীর প্রতিবাদমুখরা নিরাতঙ্কা মূর্ত্তি দর্শনে চমকিত হয়ে ওঠেন।

তপ্তসুবর্ণের মত মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল করে বলে ওঠেন ক্রোধাননা বরবর্ণিনী—"কারো প্ররোচনা আমাকে এখানে আনেনি দ্বিজরাজ। কারো আদেশের অপেক্ষা আমি করিনি। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।"

বিস্ময়ের মেঘযোনি আচ্ছন্ন করে অত্রিপুত্রের খরনেত্রের গর্ব্বকে। তবু চরম দম্ভের সাথে চিৎকার করে ওঠেন অত্রিপুত্র দ্বিজরাজ—"কিন্তু সে স্বেচ্ছাচারের অধিকার কোথা হতে পেয়েছ তুমি কপট প্রণয়বিলাসিনী?

লজ্জামুক্ত হাসির সাথে সকল কুণ্ঠার জড়তাকে বিতাড়িত করে তেমনি তীব্র উপহাস বর্ষণ করে রূপাতিশালিনী—"যেদিন এই কপট প্রণয়ের বিশ্বাসে সোমদেবের কাছে নিজেকে সমর্পিতা করেছিলাম, সেদিনই স্বেচ্ছায় জন্ম নিয়েছিল এই স্বেচ্ছাচার।"

পাষাণের সাময়িক ভাষা হয়ত এখানেই স্তব্ধ হয়ে যেত। ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতীর জলোচ্ছ্বাসও হয়ত এখানেই রুদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় জাত জীবনের সকল বিফলতাকে বিপর্য্যস্ত করবার দম্ভ নিয়ে রূপাতিশালিনীকে চরম ও শেষ আঘাত দেন মদান্ধ বরৌষধিপতি। তাঁর সে তীব্র চিৎকার ধ্বনি সমগ্র রণক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে।

—"জানো, তোমার গর্ভে এখনও ভ্রূণাকারে সুষুপ্ত রয়েছে আমারই সন্তান? জানো, সেই অধিকারে তুমি আমারই অধিকৃতা? স্বেচ্ছায় স্বামীর কাছে ফিরে যেতে উদ্যতা হয়েছ, কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ যে, তোমার ঐ জারজ সন্তানকে স্বীকার করে নিতে পারেন না তোমার স্বামী, স্বীকার করে নিতে পারেন না তোমাকেও?"

প্রতিবাদিনী রূপাতিশালিনীর সকল ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রবৃত্তির আশার সত্যাকার বাস্তবের যে ধ্বনি বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি এতদিন, তা যেন প্রচণ্ড আক্রোশে বিক্ষুব্ধ করে তোলে হৃদয়ের দশ দিক। এবার বেশ দেখতে পেয়েছেন মুক্তি-অভিলাষিণী রূপময়ী,

তাঁর আকাঙ্ক্ষিতা চিরবন্ধনহীনা মুক্তি মৃগেন্দ্রত্রস্তা কুরঙ্গীর মত সমাজ ও সংস্কারের দণ্ডাতঙ্কে আতঙ্কিতা হয়ে সরে গেছে বহু দূরে।

বাষ্পব্যাকুল নেত্রে সুরাচার্য্যের দিকে তাকান মায়াবিনী ভ্রমাচারিণী।

ব্যাকুল এ দৃষ্টির অর্থ উপলব্ধি করে বলে ওঠেন সুরাচার্য্য বৃহস্পতি—"হ্যাঁ, আমি আমার প্রিয়তমাকে মার্জ্জনা করেছি অত্রিপুত্র, সেই সঙ্গে মার্জ্জনা করেছি তোমাকেও।"

—"মার্জ্জনা!" চরমব্যাক্রোশভরে উচ্চ অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন অত্রিপুত্র দ্বিজরাজ।—"বহির্বিহারিণী দুশ্চরিত্রা অমেধ্যাকে মার্জ্জনা করার স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধিত হয়েছে যে পুরুষ, তার সেই কৃপালাভে নিজেকে ধন্য মনে করে না বরৌষধিপতি দ্বিজরাজ।"

অপমানে রক্তিম হয়ে ওঠে সুরাচার্য্যের সমগ্র মুখমণ্ডল। বাক্-শক্তিহারা পাষাণের মত প্রতিবাদের সকল ভাষা হারিয়ে এবং রুদ্ধ আক্রোশের বেদনায় বিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুরগুরু বৃহস্পতি।

সুরাচার্য্যের এ বিহ্বলতাকে বিফল হতে দেন না অত্রিপুত্র। তিনি তাঁর বুক হতেই সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন লজ্জা-প্রণয়নম্রাঙ্গী তারাকে। অসহায়া বরবর্ণিনীর আর্ত্তচিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে উন্মুক্ত মহাপ্রান্তরে।

সতর্ক হন্ সুরাচার্য্য, প্রস্তুত হন দ্বিজরাজের উদ্ধত পাপাভিলাষের বিরুদ্ধে নিজের নিঃশেষপ্রায় শক্তিকে ধারণ করে রাখতে। সোমদেবের দুঃসাহসের পথরোধ করে দাঁড়ান তিনি।

করাল অন্তকজিহ্বার মত শোভিত হয়ে ওঠে বিজিগীষায় উত্তেজিত অত্রিপুত্রের মহোজ্জ্বল খড়্গ। কিন্তু উত্তোলিত হয়েই কোন্ এক আকস্মিক বিস্ময়ের আকুলতায় অর্দ্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায় তাঁর সকল ক্রোধস্রোত। অজ্ঞাত এবং অদৃশ্য এক মায়াবলে বিহ্বল হয়ে পড়েন অত্রিপুত্র দ্বিজরাজ।

সহসা মহান্ধতমসে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সকল সুরাসুরের দৃষ্টি। ঘোর অন্ধকার ও ভীষণ নিস্তব্ধতার সর্ব্বগ্রাসী মুখবিবরে গ্রাসিত হয়ে যায় আকাশমণ্ডল।

যুদ্ধের উন্মাদনা স্তব্ধ হয়ে যায় এক মুহূর্ত্তে। চরমতম বিস্ময়ের মাদকতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে যুদ্ধদুর্ম্মদ দেব ও দানবানীকিনীর সমরাভিলাষ।

—"এ কি হ'ল? প্রলয়মেঘে আচ্ছন্ন হ'ল কেন নির্ম্মল অম্বর।"

—"কে নিভালো দিবাকরের আলো?"

—"সপ্তলোকের চিরস্থায়ী কোলাহল মুহূর্ত্তে স্তব্ধ করে দিলে, কে তুমি মহাশক্তিধর?"

বিস্মিতচিত্ত সুরাসুরের চিৎকারধ্বনি সকরুণ জিজ্ঞাসার আবেদনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে!

এবার কম্পিত হয়ে ওঠে মহাশূন্যের বায়ুতরঙ্গ, আর সেই তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে আসে এক মেঘগম্ভীরনিস্বনা আকাশবাণী—

"সন্দেহভারে ভারাক্রান্ত ক্রেতার সম্মুখে বিচারের তুলাদণ্ডে পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্মতম পরিমাণ বুঝিয়ে দিতে এসেছি আমি নিপুণ বণিক। সর্বভূতের চিরাদৃশ্য যোগাত্মা আমি সর্বদ্রষ্টা বিরাট পুরুষ।"

অন্ধকার ঘোরতর হয়ে ওঠে, নিস্তব্ধতা গাঢ়তর হয়ে যায় আরও।

ভয়াকীর্ণ মহাপ্রান্তরের অগণিত উজ্জ্বল মুহূর্ত্ত যেন চরম আঘাতের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে এক ভাবে।

সেই দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধতমসের মাঝে দাঁড়িয়েও এক সুসহ সুখস্পর্শ লাভে ধন্য হয় দেবানীকিনীর হৃদয়াভিলাষ। পরম সন্দিহান পাপ-ক্রেতার দণ্ডলাভের সুবার্ত্তায় উল্লসিত হয়ে ওঠেন সম্ভোগ্রিক্ত সুরদল।

সম্ভাসাধিত কণ্ঠে এবার চিৎকার করে ওঠেন উৎপথাশ্রয়ী দ্বিজরাজ —"কিন্তু প্রভু, এ অপরাধ তো শুধু আমারই নয়। চিত্তবিকারিণী ঐ নারীও তো তাঁর স্বেচ্ছার বশবর্ত্তিনী হয়ে আমাকে বরণ করে পাপাবর্ত্তের পথে এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন।"

—"কিন্তু আজ?" যেন বজ্রদম্ভে প্রকাশিত হয়ে ওঠে এক কালজয়ী মহাজিজ্ঞাসা,—"কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় আত্মপীড়িতা হয়েছে যে নারী, পুনরায় তাকে কামাসক্তিরূপা পঙ্কিলার্ণবের অবসাদে মণ্ডিতা করার অধিকার পেয়েছ তুমি কেমন করে? নিরপরাধ অঙ্গিরাপুত্রের প্রতি তোমার ঐ দেবমিত্র অসি উত্তোলিত হয়েছে কোন স্পর্ধায়? আমারই ত্রয়ীরূপের অবমাননা করেছ তুমি কোন বলে বলীয়ান্ হয়ে? ক সেই প্রাজ্ঞবিগর্হিত দুরাত্মা, যার কামাভিলাষে ছলিত হয়ে চিরবিদ্বেষী রাসুরের সর্ব্বধ্বংসী সে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠছে পুনরায়?"

সাময়িক স্তব্ধ হয় মহাবাণী, নেমে আসে সাময়িক নিস্তব্ধতা।

অবাধিত সেই ক্ষণিক নীরবতার সুযোগে ভয়াবহ মহাশূন্যের দিকে াকিয়ে আকুলস্বরে চিৎকার করে ওঠেন মৃত্যুদ্বারস্থ ভীতাত্মা দ্বিজরাজ -"প্রভু, আমি ক্ষমা চাই, আমি ক্ষমা চাই।"

প্রত্যুত্তর আসে না, আসে শুধু নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতই নির্ম্মম ক প্রতিধ্বনি। বলে, ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই।

পুনরায় গগনবক্ষ স্পন্দিত করে প্রণাদিত হয়ে ওঠে সেই নাদিনিধনা বেদময়ী দিব্যবাণী—

"কৃতপাপের শাস্তি পেতে হয় সকল জীবকেই। আর, সেই পের শাস্তি হয় অনিবার্য্য মহামৃত্যু।

কেশবের শোণিতে, ব্রহ্মার দীপ্তপ্রভায় এবং দেবদেব কপর্দ্দীর পাতে সমুৎপন্ন বহ্নিপ্রতিম ধরণীসন্তানের হাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে তুমি, াচারী সোমদেব। বিশ্বযোনির শক্তিলাভে মহাশক্তিশালী সেই নবের মহাজ্ঞান অস্বীকার করবে তোমার দেবত্ব, ধূলায় তারা মিশিয়ে র দেবত্বগর্ব্বে গর্ব্বোন্নত তোমার ঐ পাপশির। আর, সেই দিনই ব তোমার পাপশুদ্ধি।"

শিহরিত হয়ে ওঠেন অত্রিপুত্র দ্বিজরাজ। ভীষণ মহামৃত্যুর ভ পদধ্বনি শুনতে পান তিনি যেন এবার। সব হারানোর লব্ধি আসে সঙ্গোপনে।

উত্তাল জলকল্লোলের মতই মিথ্যা হতে চলেছে সপ্তলোকাধিশ্বরের ল অভিসারের দম্ভ।

অনিবার্য্য ক্রন্দনাবেগে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন সোমদেব।

—"প্রভু, তোমার এ আদেশ প্রত্যাহার কর। আমায় ক্ষমা , হে মহাস্রষ্টা অসীম নিরাকার, আমায় তুমি ক্ষমা কর।"

কিন্তু হায়! স্বয়ং কালাগ্নিই আজ অভিশাপে রূপান্বিত হয়ে লাবিষ্টস্বরূপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। কোন ভাস্কর সমুদ্ভূত জলধর আশীর্ব্বাদের মৃদুতা নিয়ে সপ্তসূর্য্যাত্মক সে অগ্নিকে শান্ত করার দুঃসাহসে প্রাদুর্ভূত হয় না আর।

বিপদাপন্ন সোমদেবের অলক্ষ্যেই সন্ত্রস্ত শ্বাপদের মত রণভূমি পরিত্যাগ করে চলে যায় অসুরানীকিনী। উল্লসিত হয়ে উড়তে থাকে সুরবাহিনীর বিজয়-পতাকা।

না, এখানেই যবনিকা পড়ে না। নাটকের শেষ দৃশ্য আসে না এখানেই। অদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ পরিচালকের শেষ কৃতিত্বের অবসান হয় সেই পীনোন্নী পীবরীকেই নিয়ে।

চিরলব্ধবরা সেই কাম-তাপসিকা নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করেছিলেন সেদিন অভিশপ্ত সোমদেবের দিকে তাকিয়ে। ভাগ্যবতী বলে মনে করেছিলেন সেদিন সুরাচার্য্যের প্রাসাদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করে। ভেবেছিলেন, তিনি বুঝি সকল অভিশাপের দুর্ব্বার বন্ধন হতে মোচিতা হয়েছেন চিরতরে। ছলনিপুণ বিভাবসুকে যেন স্পর্শ করেনি তমোরাশি।

ক্ষমা পেয়েছেন! অভূতপূর্ব্ব এক পুলকাবেগের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেয় উল্লসিতা। কাম-তাপসিকার হৃদয়-স্বীকৃতি। হ্যাঁ, তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করেছেন সেই অবিনশ্বর বিরাট পুরুষ। তাঁর ব্যভিচারকে যৌবনের ধর্ম্ম বলে উপেক্ষা করেছেন সেই অপ্রমেয় সর্ব্বশক্তিমান! দুঃসহ অভিশাপের পরিবর্ত্তে মার্জ্জনার আশীর্ব্বাদে ধন্য করেছেন তিনি এক ভ্রান্তপথা সুরাঙ্গনার জীবন স্বপ্ন।

স্বস্তির প্রশ্বাস নেন রূপবতী। মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি, মুক্তি পেয়েছেন এতদিনে।

কিন্তু ভুল, সব ভুল!

মাতৃত্বের সুকাঠিন্যের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আজ সব শেষেরও সেই শেষ বোঝাটুকু বুঝতে পারেন প্রমত্তা যৌবনময়ী—কবরী হতে বিগলিত প্রফুল্ল পারিজাতের মধুপানে লোলুপ যে মধুকরকে হৃদয়ের সকল অভিসারের অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি সেদিন, সে সত্যই মিলনদূত ছিল না। সে ছিল চির-বিরহেরই এক জাগ্রত অভিশাপ।

আর, সেই অভিশাপের মধ্য দিয়েই সুরভূমির মৃত্তিকা স্পর্শ করেছে তাঁরই গর্ভজাত শিশু বুধ।

হায়, এ কি হ'ল!

অনুশোচনার অন্ধতমসে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায় নারীত্বহারা এক মাতৃত্বের দায়িত্ব। আত্মগ্লানির আলোড়নে ভীষণভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে বিবেকাহতা এক গ্রহমাতার বিবেকসাগর।

আর, সে আলোড়ন স্তব্ধ হয় না কোন দিন। সে অন্তহীন।

বিভ্রান্তিবাহিকা বাসন্তিকা তার সকল মায়া সমীরণের সাথে সাথেই ফিরে গেছে বহুদিন, ঝরে গেছে বসন্তকুঞ্জের মধুগর্ভা কুসুমিকা। মোহনমন্ত্রে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে না আর কোন পুষ্পকোরক, বিরহানলের উষ্ণতার জ্বালায় পরিপূরিত হয়ে গেছে নিখিল বাতাস।

তবু পূর্ণিমা আসে। চন্দ্রের আলোকে তবু উদ্ভাসিতা হয়ে ওঠে ধরণী। অভিশাপাগ্নির শত জ্বালা বুকে নিয়ে দিগন্তের দূরান্তরে হাসির হিমকণা ছড়িয়ে দিতে আসেন অত্রিপুত্র দ্বিজরাজ—সুধাকর চন্দ্রলেখা।

সেই পূর্ণশশীর দিকে অসীম ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে ধূলিরাগে ধূসরিতা এক কনকময়ী প্রতিমা। তারপরই তার কোপকঠোর কণ্ঠস্বর হতে যেন দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাসের মতই অকস্মাৎ নিনাদিত হয়ে ওঠে এক ধিক্কারবাণী—

"নির্লজ্জ নিশাকর, তুমি দূর হও, দূর হও।"

# হোমিওপ্যাথ

**কালপুরুষ**

মিউনিসিপ্যাল সীমানার শেষ প্রান্তে উদ্ধত প্রহরীর মত দোতলা যে বাড়ীখানা দাঁড়িয়ে, তে-মাথা রাস্তার বাঁ পাশে, সেই বাড়ীটাই ডাক্তার ভজহরি সরকারের। ভজহরি ডাক্তারের একটা সাইনবোর্ডও আছে। কাঠের ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডে ইটালিক অক্ষরে লেখা—ডাঃ ভজহরি সরকার, দ্বিতীয় লাইনে 'এম-বি'-এর পরেই ব্র্যাকেটে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে 'হোমিও'। শুধু তাই নয়—একটা রেজিস্ট্রেশন নম্বরও আছে সর্বশেষ লাইনে।

ডাক্তার ভজহরির নির্দিষ্ট কোন পেশা ছিল না তার বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় রোগী-অরোগী নানা ধরণের, নানা বয়সের লোক এসে আড্ডা জমাত। কিন্তু কোনদিন সে যে প্র্যাক্টিস করত, তার নিদর্শন ঘরের মধ্যেই আছে। ডিসপেনসিং টেবিল, সাজ-সরঞ্জাম—এসব তো ছিলই, তার নিজের ব্যবহারের জন্য একটা সোলার টুপি এবং 'স্টেথো'ও একটা ঝুলতে দেখেছি, কাঠের ব্র্যাকেটে ঐ ডিসপেনসিং রুমেই। আর ছিল বিভিন্ন বিষয়ে প্রামাণ্য সব বই—ডাঃ ক্লাস, ডাঃ ফ্যারিংটন, ডাঃ প্রতাপ মজুমদার—সব পাশাপাশি।

লোকে বলে, এককালে নাকি ভজহরির প্র্যাকটিস ছিল খুব জমকালো। রাঢ়ের রুক্ষ মাটির দেশে থেকে থেকে প্রচুর পয়সা হাতে পেয়ে তার মেজাজের উত্তাপও নাকি ঐ সঙ্গে বাড়তে থাকে। তাতেই দুই একটি করে খসতে থাকে তার মক্কেল। আরও কারণ তখন শহরে ডাক্তারের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। তবু ওর মধ্যেই সৌভাগ্যক্রমে যে দু'-একটি শক্ত শক্ত কেস বাঁচিয়ে তুলেছে তারা আজও তার নাম ডাক্তার হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

এক মুসলমান-বাড়ীতে একটা মেয়ের কলেরা হয়। মেয়ের মা তো কেঁদে এসে পড়ল ভজহরির পায়ের উপর। বেরোল ভজহরি। আশ্চর্য্যের কথা, ভজহরির ওষুধেই নাকি সে-যাত্রা মেয়েটা বেঁচে যায়। এই মেয়েটার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ভজহরি তাকে একটু অসাধারণ প্রণালীতে চিকিৎসা করেছিল। তাতে সুফল পেয়েই সে এই কেসটির রেকর্ড রেখেছে তার একখানা খাতায়।

একটা জটিল নিউমোনিয়া কেস-ও নাকি তার হাতে ভাল হয়ে যায়। এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারেও তাকে আশা দিতে পারেনি। আর সেই কেস ভজহরির হাতে ভাল হয়ে গেল। কেউ কেউ তাই বলত—ভজহরি ম্যাজিক জানে।

তা ম্যাজিক ভজহরি জানত সে-কথা মিথ্যে নয়। এককালে "সরকার এণ্ড কোং" নাম দিয়ে সে একটা ম্যাজিকের দল তৈরি করে উত্তর বাংলারনানা জায়গায় তার ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু কি করে যে ম্যাজিকের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তার ইতিহাস এক ভজহরি ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। তবে কতকগুলো বাক্স, টেবিল প্রভৃতি ঐ কোম্পানীর নাম বিবর্ণ অক্ষরে ধারণ করে আজও বিশ্রাম করছে ভজহরির দোতলার একখানা ঘরে। পাড়ার লোকে বলত—ভজহরি ম্যাজিক কোম্পানীর টাকা মেরে সরে পড়েছে। দলের মধ্যে উনিই লেখাপড়া-জানা লোক ছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, ভজহরি কিছুদিন নিরুদ্দেশ হয়েও ছিল।

এই নিরুদ্দেশের পর সে যখন দেশে ফিরে এল তখনই সে প্রচার করল, হোমিওপ্যাথী পড়ছিল সে এতদিন। ডিপ্লোমাও একখানা দেখেছিল সবাই; কিন্তু সেখানা কাউকে হাতে ধরে দেখতে দেয়নি। কেউ কেউ সন্দেহও করেছিল তাই—হয়ত বা ম্যাজিকই দেখাচ্ছে ভজহরি। কিন্তু পর-পর যখন দু' তিনটি শক্ত শক্ত কেস তার হাতে বেঁচে গেল, তখন লোকে বিশ্বাস করল—না ডাক্তারী সে শিখেছে বটে। তারপর লোকে আর কোনদিন তার ডিপ্লোমা দেখতে চায়নি।

ইদানীং নির্দ্দিষ্ট কোন পেশা না থাকার দরুণই তার সময় সময় এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াত যে দু' বেলা অন্ন জুটত না। পৈতৃক বাড়ীখানা না থাকলে তাকে হয়ত গাছতলাই সার করতে হত, দুই বয়স্থা মেয়ে নিয়ে।

ভজহরির স্ত্রী সুরমার আবার সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পাশের বাড়ীর মালাকারদের বৌয়ের সঙ্গে সেদিন বিকেলে কথায় কথায় সুরমা বলছিল—ভাল লাগে না দিদি আর সংসার। তার কথায় অসীম ক্লান্তি আর অবসন্নতার আভাস। সেটা মালাকারদের বৌয়ের কান এড়ায়নি। সে শুধাল—কেন দিদি? একটু চুপ করে থেকে আবার বলল—তোমার শরীরটা মনে হচ্ছে একটু নরম হয়েছে আবার কিছু হবে-টবে নাকি? বলে কটাক্ষে একটু ইঙ্গিত করল।

সুরমার বিরক্তি ততক্ষণে চরমে উঠেছে। বলল সে—আর বলো কেন দিদি? এই তো চার মাস চলছে।

এবার ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল মালাকার-বৌ। খানিক কি ভেবে নিয়ে বলল—কিন্তু এতো তোমাকে ভোগাবে মনে হচ্ছে। ডাক্তার দেখাও দিদি।

অর্দ্ধশুষ্ক পাতার মত মুখে ম্লান হাসি টেনে এনে বলল সুরমা—আর দিদি ডাক্তার। আমি যদি এখনই যেতে পারি তো ভাল। একদণ্ড বাঁচতে ইচ্ছে নেই দিদি,—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। সত্যি-সত্যিই ওর গায়ে হাত দিল সুরমা। কথাগুলো বলে যেন

হাঁপাতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগল—হাসালে দিদি তুমি। দু'বেলা যার অন্ন জোটে না, তার আবার ডাক্তার দেখানো! ওই নিজেই যা দেখছে—আরও কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বড় মেয়ে হঠাৎ ঘরের সামনে থেকে ফিরে যাচ্ছে দেখে নিজেই ডাকল—মালা আয়। লজ্জা কি রে। তোর মাসীমা-ই তো। মালা ততক্ষণে এ ঘরের ত্রি-সীমানায় নেই। আর একবার চেঁচিয়ে ডাকতেই মালার সাড়া পাওয়া গেল। পাশের ঘরে সে তখন ব্যর্থ চেষ্টা করছে খাটো ছেঁড়া শাড়ীখানাকে কি ভাবে পরলে অন্তত দেহের ঊর্ধ্বাংশকে বয়সের ধর্ম্মের অসম্ভ্রম সহ্য করতে না হয়। অনেকক্ষণ পর সে যখন ঘরে এসে দাঁড়াল, তখন তার ডান হাতে শাড়ীর আঁচলের একটা খুঁট টেনে ধরা রয়েছে, বুকের সঙ্গে চেপে বসে আছে শাড়ীর পাড়। নগ্ন গাত্রে ঐটুকুই সম্বল।

মালা এসেই শুধাল—মা, তুমি কি খাবে এ বেলা? মেয়ের চালাকি মা ধরতে পেরেছে। মা-ও তাই বলল—আমাকে দুটো মুড়ি দিলেই চলবে, মা। মা জানে, হয়ত আজ উনুনই জ্বলবে না। বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই ঐ মুড়ির ব্যবস্থা। তাই বলে দিলেন অমন করে।

মালা চলে গেল। ওর গমনপথের দিকে লক্ষ্য করেই সুরমা বলল—দেখলে তো দিদি, অতবড় মেয়ে—সতের আঠারো তো হল—একটা পরণের শাড়ী নেই আস্ত। পড়ত স্কুলে, তা-ও আর খরচ চালাতে পারছি না বলে স্কুল ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। এখন বাড়ীতেই বসে আছে। কি করব? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল সুরমার। সে দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভেসে এল অনেক ঘুরে, বিস্মৃতপ্রায় অতীতের মধুময় ইতিহাস, যা মালাকারদের বৌয়ের জানার কথা নয়।

সেদিন সকালবেলায় একটা রোগী এল—পেটের গোলমালে ভুগছে অনেক দিন। তাকে ওষুধ দিল ভজহরি ডাক্তার। যথারীতি তাকে খাওয়ার বিধি- নিষেধগুলোও বাতলে দিল।

দু'তিন দিন পরে আবার যখন রোগীটি এল, বিমর্ষমুখে বলল—ডাক্তারবাবু, কিছু উপকার তো বুঝছি নে, তবে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ভজহরি—তবে, তবে কি, বলো।

তবে ব্যথাটা আগে রাত্রিতে বেশি হত, এখন আর ততটা হয় না।

হবে, হবে; ক্রমে ক্রমে কমবে। আচ্ছা—আর একটা ওষুধ দেব। বলে ডাক্তার ভিতরে ঢুকে গেল একটা ঘরে। বিবর্ণ কাঠের বাক্সে গোটা দশ-পনের ধুলোপড়া শিশি এদিক-ওদিক সরিয়ে নড়িয়ে, সশব্দে রেখে দিয়ে প্রায় মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে বলল—নাঃ ও ওষুধটা তো আমার কাছে নেই। তবে ওটা যদি আনিয়ে দিতে পারো, তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম। রাত্রিতে যখন একটু কমেছে বলছ—

আমি আর কোথা থেকে আনাব, আপনিই না হয় আনিয়ে দিন না; যা খরচ লাগে আমি দেব।

ভজহরি ঠিক এই কথাটিরই অপেক্ষা করছিল। ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন আজ।

তা হলে—একটা কি হিসাব করে নিল ভজহরি মনে মনে—তা হলে গোটা পাঁচেক টাকা দাও। যদি কিছু বাঁচে, পরে ফেরৎ নিও। রোগী তখনও জানত না এ 'ফেরৎ নিও' কথার অর্থ উকিল-মোক্তারের 'ফেরৎ নিও'র সমান। উকিল-মোক্তারের হাতে টাকা বেশি দিয়ে কেউ কখনও ফেরৎ পেয়েছে বলে জানা নেই। হিসাব মিলিয়ে দিতে তাদের দু'মিনিটের বেশি লাগে না। অন্ধকার গলি-পথের অজস্র মানুষের তথ্য তথ্যের হিসাব পাবে তখন তাদের মুখে।

রোগী বিনা দ্বিধায় পাঁচ টাকার একখানা নোট এগিয়ে দিল। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইল, নড়বার কোন লক্ষণ দেখাল না।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন? পাঁচ-সাতদিন পরে এসে বরং একবার খোঁজ নিও। কলকাতা থেকে ডাকে আনাতে হবে কিনা ওষুধটা।

আমতা-আমতা করে শুধাল রোগী—ডাক্তার বাবু, হোমিওপ্যাথি ওষুধের দাম এত হয়!

রেগে উঠল ভজহরি এবার। বলল—তুমি জানো সব? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আচ্ছা, টাকা তুমি নিয়ে যাও দরকার নেই আমার। মুখে বললেও টাকা ফেরৎ দেওয়ার কোন লক্ষণই সে দেখাল না।

রোগী অপ্রস্তুত। বলল—না না, আমি তা বলছিনে। সত্যিই আমি জানতাম না। আচ্ছা, ক্ষমা করুন, আসি। নমস্কার।

রোগী পিছন ফিরতেই ভজহরি একবার বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল সত্যিই সে গেল কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর সে চলে গেল বাড়ীর মধ্যে, ডাকল বড় মেয়েকে—মালা!

সস্তা দামের মোটা চালের কাঁকর বেছে রাখছিল মালা। বাবার ডাক শুনে কাপড়টা একটু টেনে টুনে উঠে দাঁড়াতেই ভজহরি নোটখানা বাড়িয়ে দিল মালার দিকে—ধর।

চক-চক করে উঠল মালার চোখ। পাঁচ টাকা। একসঙ্গে পাঁচটা টাকা অনেকদিন দেখেনি সে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত সে দেখছে সংসারের অবস্থা এইরকমই। রাত্রিতে তো অনেকদিনই শুধু মুড়ি—কোন কোনদিন সকলের ভাগ্যে তাও জোটে না। মায়ের দিকে আর তাকানো যায় না। একটা ছেঁড়া চটে শুয়ে রাত্রি কাটায়, গায়ে একখানা সূতী চাদরও নেই। বয়স হয়েছে তার, সে বোঝে মায়ের এই শরীরে একজনের ভার বহাই কঠিন, অথচ সেই শরীরে দুই জনকে বইতে হয়। কত যে হিসেব করে তাকে চলতে হয়—মা কি তা বোঝে না! ইচ্ছা থাকলেও তাই আর্থিক কারণেই স্কুল ছাড়তে হয়েছে তাকে। বাবা কি বুঝেও বোঝে না! তার সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে মায়ের উপর। রাগের মাথায় বলেও ফেলে এক-একদিন—গণ্ডা গণ্ডা তো পেটে ধরছ, খাওয়াবে কি শুনি? মা কোন উত্তর দেয় না।

মালা দেখে—তাদের বৈঠকখানা ঘরে ইদানীং নানা ধরণের লোকজন আসে। তাদের কথাবার্তা চলে নিম্নস্বরে। রাত্রির গভীর নিশীথে তারা আসে, কি সব কথাবার্তা হয়, আবার রাতের অতিথি রাতের অন্ধকারেই মিশে যায়।

একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করল মেয়ে—ওরা কারা বাবা? এত রাত্রে কি করতে আসে?

ওরা! ওরা হচ্ছে স্মাগলারের দল। ঘোড়ার পিঠে করে রাত্রির অন্ধকারে ধান-চাল নিয়ে আসা-যাওয়া করে। সোজা কথায় ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার। ওদের এবার আমি শায়েস্তা করছি।—কণ্ঠস্বর শেষের দিকে তার কঠোর হয়ে এল।

অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠল মালা।—না বাবা অমন কাজ করতে যেও না। পারো তো পুলিশে খবর দাও। জানো না তো

ওদের দল আছে। বাধা পেলে অনেক সময় তারা কোন রকম কাজ করতেই দ্বিধা করবে না।।

দূর পাগলি! আমি কি একা করব নাকি? এ-পাড়ার সবাই মিলে আমরা করব।

তা-ও ভালো। তবে পুলিশে একবার জানিয়ে রেখ।

তা তো নিশ্চয়।

পাড়ার দু-চারজনকে নিয়ে তৈরি হল একটা দল। থানা থেকে এজন্যে যথারীতি অনুমতিও নেওয়া হল। ভজহরি হল এ দলের ক্যাপ্টেন।

সেদিন রাত্রিতে এক গাড়ী বোঝাই ধান ধরা পড়ল। ভজহরি নিজেই সেদিন উপস্থিত ছিল। গাড়োয়ান কেঁদে পড়ল। হুজুর আমি কিছু জানি না। আমাকে মালিক এই রাস্তা বলে দিয়েছে। আমি শুধু—মানে গাড়ীখানাই আমার—গাড়ীর ভাড়া বয়েই চলে আমাদের হুজুর।

হাফ-প্যাণ্ট পরা, ডাক্তারের টুপি মাথায় ভজহরির মেজাজ তখন মিলিটারী। চড়া গলায় বলল—কোথায় তোর মালিক? মালিক না হলে, চল ব্যাটা, তোকেই থানায় দিয়ে আসি।

মালিক হুজুর কাল আসবে।

কাল আসবে!—মুখ ভেঙচিয়ে উঠল ভজহরি ক্যাপ্টেন। বেশ, চল তোকেই তবে আপাতত চালান দিই। আর ধান সব সরকারে বাজেয়াপ্ত করে দিই। আয়।

গাড়োয়ান মুখ কাচু-মাচু করতে করতে চলল ভজহরির পিছু-পিছু। দু'জনে উঠল এসে ভজহরির বৈঠকখানায়। কিছুক্ষণ কি কথাবার্তা হল, তারপর গাড়োয়ান বেরিয়ে এল আগে আগে, পিছনে ভজহরি বলতে বলতে যাচ্ছে—তোকে ধরে আর কি হবে? তুই তো আর মালিক নোস। যা, এবারকার মত ছেড়ে দিলাম, আর কোনদিন এ রাস্তায় আসবিনে যা:!—

পরের দিন সকাল-বেলায় মালার হাতে পঁচিশটা টাকা দিতেই মালা শুধাল—কোথায় পেলে এ টাকা?

বিরক্ত হল ভজহরি। বলল—তাতে তোর দরকার কি?

মালা একটু অসন্তুষ্ট হল। তবু বলল—বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু তোমার, বাবা।

কোন উত্তর দিল না ভজহরি।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরে পূর্ব্বোক্ত রোগীটি এসেছিল তার ওষুধ সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। ভজহরি এবার ওষুধ পাল্টে দিল তাকে। রোগী ছিল বাইরে বসে। সে ঘরের মধ্যে গিয়ে খুটখাট নানারকম শব্দ করে মিনিট পাঁচ-সাত পরে বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে ওষুধ দিল।

দু' তিন দিন পরে রোগী নিজেই এই খবরটা বলবার জন্যেই এল ডাক্তারের কাছে যে, এবার ওষুধে একটু ভাল ফল দেখা দিয়েছে। ভজহরি বলল—হবে না, এ-যে একেবারে খাঁটি ওষুধ, হতেই হবে। মনে মনে জানে ভজহরি এতে তার এক পয়সাও খরচ হয়নি। কিন্তু, বলল ভজহরি, এবার একটা ইনজেকসন নিতে পারলে ভাল হত। ভজহরি যখন ডিপ্লোমা নিয়েছে, তখন হোমিওপ্যাথিতে ইনজেকসন বেরোয়নি! কিন্তু ইতিমধ্যে নানা পত্র-পত্রিকা থেকে জেনেছে যে, ইনজেকসন হোমিওপ্যাথিতেও চলে।

রোগীটি রাজী হয়ে গেল। টাকার অঙ্ক শুনে একটু কি যেন ভাবল। শেষে দশ টাকার একখানা নোটই বাড়িয়ে দিল। চিকিৎসার যখন ফল পাওয়া গেছে, তখন পুরো কোর্সের চিকিৎসা করানোই ভালো।

সেইদিনই ইনজেকসন হয়ে গেল একটা। আরো পাঁচটা নিতে হবে।

ইনজেকসনের পরে রোগীর কি খেয়াল হল, ইনজেকসনের এম্পুলটা দেখতে চাইল।

এক মুহূর্ত্ত কি ভাবল ভজহরি। তারপর বলল—সে তো ফেলে দিয়েছি। তা ছাড়া, ও দিয়ে তোমার কি দরকার?

আমি শুধু দেখতাম।

আচ্ছা, কাল দেখাব। কালকেও তো আসতে হবে। কিন্তু কাল সকালে আমি একটা 'কলে' যাব; সন্ধ্যেবেলা এস ইনজেকসন নিতে, বুঝলে? তারপর কি মনে করে হঠাৎ বলে বসল ভজহরি—দাঁড়াও একটু। আমি আসছি। বলেই ভিতর-বাড়ীতে চলে গেল। মিনিট দু'তিনের মধ্যেই আবার এসে বসল বৈঠকখানায়। বলল—ইনজেকসনের পরে এক কাপ হরলিক্স খেতে পারলে ভাল হয়। হরলিক্স আছে? নেই? আচ্ছা, আজ তো আমার এখান থেকেই খেয়ে যাও। এই যে, এসে গেছে। দে, আমার হাতে দে। বলে মালার হাত থেকে কাপটা নিয়ে রোগীর হাতে দিল। কাপটা হাতে নিয়ে রোগী দেখতে লাগল—মালার তপস্বিনীর মূর্ত্তি। দারিদ্র্যের কশাঘাতে রূপজ্যোতি হীন হলেও প্রকৃতির যাদুস্পর্শ সারা শরীরে জাগিয়েছে তার মোহিনী মায়া। কি যেন ভাবছিল সে মালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ভজহরি তা দেখেও দেখল না! শেষে মালা-ই বলল—কৈ, কাপটা দিন।

ও: হ্যাঁ—এই যে নিন। বলে কাপটা দিতে গিয়ে মালার হাতের সঙ্গে তার আঙুলে ছোঁয়া লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তের মধ্যে জেগে উঠল অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য। অনেক কষ্টে চাঞ্চল্য দমন করে চলে গেল সে সেদিনের মত।

পরদিন সকালবেলায় আবার এল রোগীটি,—ডাক্তার থাকবে না একথা জেনেও। বস্তুত সে ডাক্তারের কাছে আসেনি। এসে দরজার কড়া নাড়তে মালা-ই দরজা খুলে দিল। বলল—বাবা তো নেই। একটা 'কল'-এ গিয়েছেন।

কতক্ষণে ফিরবেন?

তা তো বলে যান নি। তবে দেরী হবে না বলেই মনে হয়, কারণ জল-টল খেয়ে বেরোননি। না হয়, বসুন একটু।

আচ্ছা আপনি যান, আমি বসছি খানিকক্ষণ।

মালা চলে গেল ভিতর-বাড়ীতে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল মুখে চোখে দুর্য্যোগের ইঙ্গিত বহন ক'রে। আপনি—আপনি—না না, কিন্তু—কি করি? তার স্বর তখন কাঁপছে কি এক আশঙ্কায়। সারা দেহে একটা অসহায় অস্থিরতা।

কি হল বলুন না?

মা যেন কেমন করছে। আপনি—আপনি যদি দয়া করে শৈলেশ ডাক্তারকে একবার ডেকে দিতেন!

তা দিচ্ছি—বাড়ীটা কোথায় তার বলুন তো?

বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল মালা—একটু শীগগির যান দয়া করে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে এল রোগীটি শৈলেশ ডাক্তারকে নিয়ে! ডাক্তার দেখে চলে গেলে মালা ডাক্তারের পিছন পিছন আবার এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। দেখে, তখনও সেই রোগীটি বসে আছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, বলল—আপনি এখনও বসে, আছেন!

রোগীটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল—ডাক্তার কি বলে গেল আপনার মাকে দেখে?

করুণ হেসে বলল মালা—তা ভালই বলল। ভয়ের কারণ নেই। ইনজেক্সন হল একটা। আর—আর বলল এখন কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দরকার।

কৌতূহল হল রোগীর। তাই সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মালাকে আটকে রাখতে চাইছিল। শুধাল—কি কি তবু বলল ডাক্তার।

সংক্ষিপ্ত আকারে ইতিহাসটা বলে গেল মালা। শেষে যোগ করল—মা'র আবার সন্তান হবে কি না, শরীরটা তাই একটু খারাপ হয়েছে।—বলেই মালা আর দাঁড়ায় না।

রোগী চলে গেল। সন্ধ্যেবেলা এল ইনজেক্সন নিতে।

আজও ডাক্তার এক কাপ হরলিক্স মালার হাত দিয়ে আনিয়ে রোগীকে খেতে দিল; রোগী উঠতে চাইলে ডাক্তারই তাকে বসতে বলল। বলল, তুমি আমার যে উপকার করেছ আজ সকালে! তুমি না থাকলে হয়ত মালার মাকে ফিরে পাওয়াই যেত না।

আমি আর কি করেছি? সবিনয়ে বলল রোগীটি?

কি করেছ—ঐ সময় একটা ডাক্তার না পাওয়া গেলে ওরা ছেলেমানুষ শুধু চীৎকার করেই কাটাত। ইনজেক্শন না হলে কি বাঁচত মনে কর? কখনই না।

ইনজেক্সনের জোরে কি রোগীর কপাল-জোরে, যাতেই কেন হোক না, রোগটা তার সেরে গেল।

কিছুদিন পরে রোগী একদিন নিয়ে এল গোটা দুয়েক হরলিক্সের শিশি, কমলালেবু ডজন খানেক, ন্যাসপাতি গোটা ছয়েক।

ভজহরি তখন বাড়ী ছিল না। মালা দরজা খুলতেই অবাক হয়ে গেল—ওমা, আপনি! এত সব কি এনেছেন—কেন এনেছেন?

তাতে আর কি হয়েছে! তারপর একটু অন্যমনস্ক ভাবেই যেন বলল—ডাক্তারবাবু আমার যা উপকার করেছেন!'

আসুন—মালা অভ্যর্থনা করল তাকে—একেবারে বাড়ীর মধ্যেই নিয়ে এল।

এই প্রথম বাড়ীর মধ্যে ঢুকল মনীশ। ওগুলো রান্নাঘরের সামনে নামিয়ে দিতেই আর একবার মালা বলল—এ কিন্তু আপনার ভারী অন্যায় হল।

আচ্ছা, আমি উঠি।

বসুন না, বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

না থাক—আজ আর তার সময় হবে না। আর একদিন এসে না হয় দেখা করব।

মনীশের মারফৎ ডাক্তারের আরও কতকগুলো রোগী জোগাড়

হয়ে গেল। এই ভাবে মনীশ এ বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ডাক্তার মনীশকে এরপর দেখলেই বলত—যাও, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বস। মনীশও চলে যেত ভিতর-বাড়ীতে, বসত গিয়ে মালার কাছে।

শীতের সকাল। একটা ফ্লানেলের পুরানো ব্লাউজ গায়ে দিয়ে মালা উনুন ধরাবার জোগাড় করছিল, দরজায় ছায়া পড়তেই দেখে মনীশ! ব্লাউজটার বোতামের ঘরগুলো এমন ভাবে ছিঁড়ে গেছে যে, ভাল ভাবে বোতাম ধরে না; একটু বেসামাল হলেই বোতাম খুলে গিয়ে তুঙ্গ দুই বক্ষের একাংশ নজরে পড়ে যায়। তারই উপরে কোন রকমে কাপড় জড়িয়ে থাকে মালা। সন্ধ্যের অন্ধকারে বেরোয় জল আনতে বড় বড় ঘড়া কাঁখে নিয়ে। রাত ন'টা-দশটাতেও গিয়েছে। ছোট বোনটাকে দিয়ে জল আনায় দিনের বেলা। টিউব-ওয়েলটা কাছেই।

মনীশকে দেখেই কাপড়-চোপড় সামলে নিয়ে বলল—বসুন। রান্নাঘরের দরজাতেই বসে পড়ল মনীশ।

কালি-ঝুলি-মাখা হাত, মুখখানা লাল, এলোমেলো খোঁপা—তাই দেখে মনীশ বলল, বেশ হয়েছে আপনার চেহারাখানা। দেখুন গিয়ে আয়না দিয়ে।

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে মালা বলল—আমার চেহারাই তো এমনি, তাড়কা-রাক্ষসীর মত। ভাল আর দেখাবে কোথা থেকে?

ওঃ, আপনি খুব রেগেছেন দেখছি। আচ্ছা, তাহলে আজকের মত আমি চলি, কেমন?

বা রে, বসুন, চা তৈরি করছি, খেয়ে যান। সকালবেলা বাসি-মুখে অতিথি ফিরাতে নেই।

ওরে বাবা—এ যে একেবারে পাকা গিন্নীর মত কথা! গৃহ না হতেই গৃহিণী হয়ে বসে আছেন। আপনি যে ঘরে যাবেন সে ঘর তো স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে।

যান—সারা মুখখানায় লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল মালার।

এমনি করে কেটে গেল মাস ছয়েক। সন্তান হতে গিয়ে মারা গিয়েছে মালার মা। সেই সময় থেকেই মনীশ আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে এ সংসারে। মালা এখন তাকে বলে মনীশদা, সম্বোধনটাও নেমে এসেছে তুমি'তে। অর্থাৎ মালা-মনীশের সম্পর্কটা লোকের চোখে এমন আপত্তিকর পর্য্যায়ে নেমে এসেছে যে, লোকে এ নিয়ে যার যা মুখে আসছে, সে তাই বলছে। ভজহরির এসব দিকে যেন খেয়াল নেই। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে আর ডাক্তারী করে না। কিন্তু পড়াশুনা করে ডাক্তারী বই আজও।

মনীশ এখন এ সংসারের একজন হয়ে পড়েছে। মালার টুকিটাকি জিনিস আনতে ঐ মনীশ, এমন কি না বললেও মাঝে মাঝে বাজারটাও করে দিয়ে যেত। দু'বেলাই সে আসে, খোঁজ-খবর নেয়।

সেবার পূজার সময় হঠাৎ এক অপরিচিতা প্রৌঢ়া নারীর আবির্ভাব হল এ-পাড়ার শিবমন্দিরে। শোনা গেল—ভৈরবী। এই মন্দিরের নাকি সেবাইত পুরুতদের মেয়ে। তাই নয় শুধু, এ মন্দিরের সব সম্পত্তি নাকি তারই। পাড়ার লোকে শুনে মুখ টিপে হাসল একটু।

ভজহরির সঙ্গে দেখা হতেই ভজহরি তাকে নিয়ে এল নিজের ঘরে। তার আশ্রয়স্থল নির্দিষ্ট হল ভজহরির বৈঠকখানা ঘরেই।

মনীশ এসে দেখল। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে তার বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় দেখল। তারপর গম্ভীরস্বরে আপন মনেই একটা "হুঁ" বলে চলে গেল বাড়ীর ভিতর। মালাকে গিয়ে শুধাল—ও কে? এখানে কেন?

মালা বলল—বাবা যখন ম্যাজিক-পার্টিতে ছিলেন তখন নাকি উনি ছিলেন সেই পার্টিতে। কিন্তু সেই পার্টিরই আর একজনের নজর ছিল ওর উপর। সে একদিন ওকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। তারপর আর ওদের দুজনের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। শুনি, এখন নাকি উনি থাকেন কাশীতে।—বলে মুখ টিপে একটু হাসল।

হুঁ, বুঝলাম? কিন্তু ডাক্তারবাবু ওকে কেন ঘরে এনে তুললেন? লোকে কি বলে জানো? গলাটা একটু খাটো করে বললে—ও নাকি বেশ্যা।

চমকে উঠল মালা। মনীশের দৃষ্টি এড়ায়নি তা। মনীশ বলে চলল—বলবেই বা না কেন? ভৈরবীর কি এমন বেশ-ভূষা থাকে? থাকে এমন শাড়ী আর গহনার বাহার?

মালা নিরুত্তর। কি যেন ভাবছে সে। মনে হয়, মনীশের একটা কথাও কানে যাচ্ছে না তার।

মনীশের কথা মিথ্যা নয়। ভাগীরথীতে স্নান করতে গিয়ে মালা নিজের কানেও শুনেছে, সবাই বলাবলি করছে—ভজহরিটা গোল্লায় গেল। বুড়ো বয়সে কোথাকার কোন এক মাগীকে নিয়ে এসে আর তার আদর-যত্নই বা কি? যেন ওর গুরুদেব আবার বলে, ভৈরবী! কেউ কেউ আবার বলেছে—মিলেছে ভাল। ওদিকে মেয়েটা আবার জাল ফেলেছে মনীশকে ধরবার জন্যে। ঘরে বাইরে সমান।

মালার কানে যেন গরম সীসা ঢেলে দিয়েছে ওদের কথাগুলো। সে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করেনি। বাড়ী এসে রান্নাঘরে ঘড়াটা সশব্দে নামিয়ে রেখে বারান্দায় এসেই দেখল—ওধার থেকে মনীশ ঢুকছে। তাড়াতাড়ি গামছাটা বুকের উপর ফেলে দিল। মনীশও ততক্ষণে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে সেটা লক্ষ্য করে বলল মালা—যেও না মনীশদা, আমি এই কাপড়টা ছেড়েই আসছি।

কাপড় ছেড়ে বারান্দার রোদে দাঁড়িয়ে এলোচুল ঝাড়তে ঝাড়তেই মালা ডাকল মনীশকে।

মনীশ এসে দেখল, মালা সশব্দে ঘন ঘন চুলের উপর আছড়াচ্ছে ভিজে গামছা। এক ফোঁটা জলও আর নেই—তবু তার চুল-ঝাড়া শেষ হয় না। মনীশ হেসে ফেলল। মালার একেই মন-মেজাজ ভাল ছিল না, স্নানের ঘাটে শোনা কথাগুলো তোলপাড় করছিল তার মনে, মনীশের হাসিতে আরও বিগড়ে গেল সে। বলল—তুমি হাসছ মনীশদা, আমার রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি চুল-ঝাড়ার নমুনাতেই। কিন্তু কেন, জানতে পারি কি?

বাবা নাকি এক বেশ্যাকে ঘরে এনে তুলেছে। লোকে বলাবলি করছে। আরও কি শুনেছে সেটুকু আর বলল না। কিন্তু মনের জ্বালা তার তেমনই জ্বলছে তখনও।

একটু নিকটে সরে এল মালার দিকে মনীশ। তারপর বলল—আমি গোড়াতেই সন্দেহ করেছিলাম, মালা। বলেছিও তোমাকে।

উত্তরে, মালা তাকিয়ে রইল মনীশের মুখের দিকে—কেমন এক নির্বোধ দৃষ্টিতে। তারপর ধীরে ধীরে বলল—তাই যদি হয়, তুমি এর ব্যবস্থা করো, মনীশদা। এখান থেকে ওকে সরাবার ব্যবস্থা করতেই হবে তোমাকে। যত শীগগির হয়, ততই ভালো। মনীশদা,, মনীশদা,—এ না হলে আমাদেরও আর এখানে থাকা চলবে না। আমাকে আর তোমাকে নিয়েও তো কম দুর্নাম রটেনি! এর একটা বিহিত তুমি করো মনীশদা—আকুতি ঝরে পড়ল মালার কণ্ঠে। সহসা মনীশের দুটো হাত চেপে ধরল। মনীশ চমকে উঠেই হাত দুটো ধীরে ধীরে সরিয়ে দিল।

হঠাং ভজহরি এসে পড়ল সেখানে। সে আসছিল বাড়ীর মধ্যে একখানা বইয়ের জন্য। ভৈরবীর কি এক অসুখের বিষয়ে কনসাল্ট করবার জন্যে একখানা বইয়ের প্রয়োজন ছিল তার। কিন্তু মালার কথাগুলো তার কানে যেতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিশ্চল প্রস্তর-মূর্তির মত শুনল মালার বক্তব্য। মনীশের উত্তর দিতে দেরী হচ্ছিল দেখে সে আত্মপ্রকাশ করল, কিন্তু কিছুই বলল না। ওদের সামনে দিয়েই ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকল একখানা ঘরে। কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বই না নিয়েই আবার ধীরে ধীরে ওদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে এল বৈঠকখানা ঘরে।

পরের দিন ভোরবেলা বৈঠকখানার বারান্দা ঝাঁট দিতে এসে মালা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে ঘরের দরজা হাঁ করে খোলা। আরও বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করছিল ঘরের মধ্যে। গিয়ে দেখে, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া, বিছানার চাদর প্রভৃতি। বালিশটা যেন ভিজে ভিজে মনে হল। সেটা উলটে দেখেই তার চক্ষুস্থির! একটা ছোট পুঁটলীতে ভৈরবীর সব ক'খানা গহনা বাঁধা। এত গহনা ছিল ভৈরবীর! কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে সে ছুটল বাবার ঘরে। বাবা—বাবা, ত্রস্তে ডাক দিল। দরজায় একটু চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘর শূন্য—কেউ নেই! তবে কি বাবা-ও ঐ সঙ্গে—তার কান্না এসে গেল। কিছুই আর বুঝতে বাকী রইল না তার।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল সে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতেই টেবিলের উপর পাথর চাপা দেওয়া একটা কাগজ চোখে পড়ল। চিঠি। বাবার হাতের লেখা। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল সে।—

'মা মালা—আমার জন্যে ভেব না। মনীশের হাতেই তোমাকে দিয়ে গেলাম। আশীর্বাদ করি—সুখী হও।'

'ভৈরবী আজ থেকে একেবারে খাঁটি ভৈরবী হল। ওর গহনাগুলো তুমি ব্যবহার ক'র। এ জীবনে ওর প্রয়োজন এতদিনে মিটেছে ওর কাছে। কেন তা জানতে চেও না—জানতে পাবে না।

ইতি—

আশীর্বাদক—বাবা।

সকালে ঘটনাটা রাষ্ট্র হয়ে গেলে পাড়ার লোকে বলাবলি করতে লাগল—ম্যাজিক ভোলেনি ভজহরি ডাক্তার।

# কোন পরিমল পবনে

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৩৫ সালের নববর্ষের দিন হান্স আণ্ডেরসেন তাঁর এক বান্ধবীর কাছে এক চিঠি লিখেছিলেন। তিনি যে কতিপয় রূপকথা রচনার জন্য সংকল্প করেছেন, এই চিঠিতেই তা তিনি বান্ধবীটিকে জানিয়েছিলেন। ঠাট্টার ভঙ্গিতে সেই সঙ্গে আরেকটি মন্তব্য ছিলো। 'বুঝতেই তো পারছো, এই কয়েকটা রূপকথা দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জিতে নেবার তালে আছি।' এই চিঠির কিছুদিন পরেই আরেকটি চিঠি এলো: ততদিনে 'রূপকথার প্রথম বই' নামে ছোট্ট একটি সচিত্র পুস্তিকা বেরিয়েছে, যার ভিতর ছোট্ট তিনটি রূপকথা ছাপা হয়েছিলো। দ্বিতীয় চিঠিতে এই পুস্তিকাটি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি মন্তব্য দেখা গেলো; লোকে বলাবলি করছে, এটাই নাকি আমার অমর কীর্তি।'

তখন বয়েস কত আণ্ডেরসেনের? মাত্র তিরিশ। এই কথাগুলো ওই যুবা বয়েসেই লিখেছিলেন ব'লে অনেকটা যেন প্রবক্তাদের ভাবী-কথনের মতো শোনায়। নিরবধি কাল কিন্তু এই কথাগুলিকে ভুলে যায়নি: সব দ্বিধা, সন্দেহ ও সংশয়কে ভঞ্জন ক'রে মহাকাল তাকে সত্যিই অবিনশ্বর মহিমা দিয়ে গেলো। প্রথম সংস্করণ যে-দিন বেরোয় তার পর থেকে কতবার যে তাদের পুনর্মুদ্রণ হয়েছে তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই: শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীর এমন কোনো প্রধান ভাষা নেই, যে ভাষায় তাঁর রূপকথা অনূদিত হয়নি। অজস্রবার এই গল্পগুলির ভাষান্তরণ হয়েছে, অজস্রবার হয়েছে পুনর্কথন এমন কি ১৮৫০ সালে—যখন বাংলা গদ্য সদ্যোজাত এবং আণ্ডেরসেনের বয়েসমাত্র পঁয়তাল্লিশ তখন—বাংলা ভাষায় প্রথম যে শিশুসেব্য গল্পসংকলন বেরোয়, তার নির্ভর ছিলো আণ্ডেরসেনেরই কতগুলো গল্পের অনুবাদ। নিছকই বিনোদন ও মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য ছিলো সেই বইয়ের; আর এটাই ছোটদের জন্য উদ্দিষ্ট প্রথম বাংলা পুস্তক যেখানে গ্রন্থকার বা অনুবাদকের লক্ষ্য নীতিসুধা কিংবা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাতে নিবদ্ধ ছিলো না।

'রূপকথার প্রথম বই'তে যে-গল্পগুলি ছিলো তার মূল ভিত্তি ছিলো প্রচলন নির্ভর লোককথা; কিন্তু ঠিক একই গল্প তিনি কোনোবারই বললেন না—পুরোনো ছেলেভুলোনো গল্পগুলিকে আশ্রয় ক'রে তিনি নতুন গল্প লিখলেন; যে-ভাবে এই গল্পগুলি তাঁর হাতে বিকশিত ও বিবর্তিত হ'লো, তাতে এক কথায় বলা যায় তিনি যেন গল্পগুলির পুনর্জন্ম ঘটিয়ে দিলেন। পুরোনো রূপকথাকে আশ্রয় ক'রে আর যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—অর্থাৎ গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়, শার্ল পেরোৎ, আলেক্সি টলস্টয়, লালবিহারী দে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং আরো অনেকে—তাঁদের সঙ্গে এইখানেই ছিলো তাঁর মূল তফাৎ।

১৮৪৩ সালেই লোককথার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন—রূপান্তরিত রূপকথায় আর তৃপ্তি পেলেন না ব'লেই আত্মনিয়োগ করলেন মৌলিক রূপকথা রচনায়—যা হ'লো তাঁর আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের উপায়। 'এখন আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ওই রূপকথাগুলি বলি—হঠাৎ কী ক'রে যেন প্রাচীন মানুষের ভাবনা ও অভিলাষ আমার বুকের ভিতর ঘুরে বেড়ায়, চাপা গলায় বুকের ভিতর কথা বলে বড়োদের অভিজ্ঞতা আর বিচিন্তা, আর তার পরেই ছোটদের জন্য নতুন একটি গল্পের সূচনা হ'য়ে যায়। গল্পগুলি ছোটদের জন্য উদ্দিষ্ট হ'ল হবে কি, সব সময়েই এই কথাটি আমি মনে রাখি যে, মা-বাবাও মাঝে-মাঝে গল্পগুলি শুনতে চাইতে পারেন, তাঁদের জন্যও কথঞ্চিৎ চিন্তার খোরাক আমাকে দিতে হয় বৈকি! উপাদানের কি কোনো অভাব আছে আমার? স্তূপ হ'য়ে আছে উপাদান—সাহিত্যের জন্য যে কোনো বিভাগেই এত সব সূত্র ও উপাদান কোনো কাজেই লাগে না—অথচ লিখে লিখে ক্লান্ত হ'য়ে গেলেও এরা কখনো ফুরোয় না: মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় যেন প্রতিটি বিজ্ঞপ্তি কি সংকেতচিহ্ন, প্রতিটি ছোট্ট ঝলমলে ফুল আমাকে ডেকে বলে "আমার দিকে তাকাও হান্স, অন্তত একটুক্ষণের জন্য আমাকে তাকিয়ে দ্যাখো, তাহ'লেই আমার কথা ঠিক তোমার বুকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।" আর তার পরেই, যদি একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখি, অমনি আমার কাছে আস্ত একখানা গল্প এসে যায়।'

সত্যি কিন্তু তা-ই হ'তো। রূপকথার প্রেরণা ও উদ্দীপনা কত জায়গা থেকে যে আসতে পারে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই: ছেলেবেলার স্মৃতি, দেশবিদেশে ভ্রমণ করার সময়কার অভিজ্ঞতা, কিংবা পথে-ঘাটে প্রতিনিয়তই যে-সব ছোটো-খাটো ঘটনা ঘ'টে যাচ্ছে—তারা যেন সবাই তাঁকে বিস্ময়কর এক কল্পলোকের সন্ধান দিয়ে যেতো। রূপকথার এই সব 'বীজ' তাঁর সব লেখাতেই এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। বছরের পর বছর হয়তো চ'লে গেলো, প'ড়ে রইলো ওই বীজ তাঁর মনের মধ্যে অন্ধকারে; অপেক্ষা ক'রে ক'রে ক্লান্তি এসে গেলো, তবু কোনো অঙ্কুরেরই হয়তো দেখা নেই। 'তারা প'ড়ে থাকে আমার চিন্তায় অবহেলিত কোনো বীজের মতো; এই জন্যেই অবহেলিত যে কোনো যত্ন পায় না তারা, শুধু প'ড়েই থাকে, আর প'ড়ে থেকে দিনরাত্রি কেবল অপেক্ষা করে, কবে স্রোত ব'য়ে যাবে তাদের উপর দিয়ে, কবে তারা পাবে ঝলমলে রৌদ্রের একটি রশ্মি, কবে পাবে ব্যথা বেদনা ও তিক্ততার পেয়ালা থেকে উপচে ঝ'রে পড়া এককোঁটা অনুভূতি; যেদিন তারা ওই সব পেয়ে যায়, সেদিনই লাফিয়ে উঠে বীজ ফাটিয়ে বের ক'রে দেয় অঙ্কুর, খোসা কেটে বেরিয়ে আসে শ্যামল উদ্গমে।'

আণ্ডেরসেনের রূপকথাগুলির সঙ্গে প্রচলনভিত্তির লোককথার ব্যবধান আরো একটি দিক থেকে স্মরণীয়: প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর রচনাগুলি এমনি ঝলমলে যে পূর্বসূরীদের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না। প্রকৃতির সৌন্দর্যে সাড়া দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো তাঁর; কোন্ গোপনে লুকিয়ে আছে সুন্দরের আভা, তাকে উন্মোচিত ক'রে দেবার অসাধারণ দৃষ্টি ছিলো তাঁর। আর কৌতুকে আমোদে বিনোদে যে ভাবে তাঁর রচনা সব সময়েই ঝর্ণার মতো বেজে উঠছে, তারও তুলনা পূর্ব আমলের কোনো রূপকথায় পাওয়া যাবে না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একেকটা সূক্ষ্ম, ধারালো ও মর্মভেদী ছোটো-ছোটো মন্তব্য তাঁর রঙ্গ ব্যঙ্গের যে প্রবণতাকে উদ্ঘাটিত ক'রে দেয়, তা যেমন ঝলমলে রশ্মির মতো তাঁর রচনাবলীকে আলো ক'রে রেখেছে, তেমনি রয়েছে অন্তহীন এক বিষাদের বোধ; ব্যর্থতা; হতাশা আর অবসাদে ঠিক তেমনিভাবেই তাঁর রূপকথাগুলি যেন কোনো এক অন্তহীন গোধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। সামনে ধাপে-ধাপে অনেক সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে, এই দেখে 'দেশলাইয়ের বাক্স' নামক গল্পে সৈনিকের দঙ্গল বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থান করেছিলো। 'বড়ো ক্লাযুস আর ছোটো ক্লাযুস' গল্পে এক যে ছিলো লোক যে গির্জের পুরুতদের দুইচক্ষে দেখতে পারতো না; আস্ত গল্পই যে কখনো-কখনো রঙ্গব্যঙ্গ ও ঠাট্টায় মুক্তোর মতো ঝলমল ক'রে ওঠে, তার প্রমাণ হ'লো "রাজার নতুন পোশাক" কি 'লাট্টু আর বল' কিংবা 'সত্যের মতো সত্য একখানা' নামক গল্পগুলি; আবার বিষণ্ণতায় ভরপুর গল্প রয়েছে 'জলকন্যাদের ছোটো বোন' নিষ্ঠুর গল্প হ'লো "লাল জুতো" কিংবা 'রুটি যে-মেয়ে মাড়িয়েছিলো'—ক্ষমাহীন গল্প, অপরাধ ও শাস্তিদ্বারা আদ্যোপান্ত টান-টান; করুণ অথচ স্বপ্নে-পাওয়া গল্প সেই ছোট্ট মেয়েটির উপাখ্যান যে দেশলাই বিক্রি করতো; বিভীষিকা ও রোমাঞ্চে আচ্ছন্ন গল্প হলো 'ছায়া,' যেখানে কালক্রমে নিজেরই ছায়ার দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তিটির নিধন ঘটেছিলো।

রূপকথাই হ'লো শিল্পের সেই প্রকরণ যা হান্স আণ্ডেরসেনের সুবেদী অস্মিতা ও থরো থরো ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত করে দিয়ে যায়। কোন্খানে মানুষের দুর্বলতা লুকিয়ে আছে, কোন্খানে সে সম্পূর্ণ অসহায় ও অক্ষম—রূপকথাকে উপায় হিসেবে ব্যবহার ক'রে এই সবই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন; আবার রূপকথায় ছদ্মবেশে তিনি বাণী পাঠিয়েছেন বিশ্বজগৎ ও মানবাত্মার উদ্দেশ্যে—রক্তের দাগ লেগে আছে ব'লেই সেই সব বাণী তাদের সরলতা ও মহত্ত্ব দ্বারা আমাদের অন্তহীন ভাবে আকৃষ্ট করে। বলা হ'য়ে থাকে তাঁর প্রতিটি রূপকথার ভেতরেই আর্তনাদ ক'রে উঠেছে তাঁর স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা; প্রতিটি রূপকথার ভিতরেই যে তাপ স্পন্দন আর রক্তপাতের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, তা আসলে তাঁরই। এই সবের মধ্য দিয়ে স্তম্ভিতের মতো যিনি ত্রিকাল ও ত্রিভুবনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তিনি আর-কেউ নন, একজন আদ্যোপান্ত কবি—আর সেইজন্যই এই সব গল্প মৃত্যুহীন।

এই কথাগুলির মধ্য থেকে নিশ্চয়ই এই তথ্যটি প্রতিভাত হয়েছে যে আণ্ডেরসেনের জীবনকথা ও তাঁর রচনাবলীর ভিতর এক নিবিড় আত্মীয়তা রয়েছে—যেন তাঁর জীবন আর রূপকথা পরস্পরের সম্পূরক, পরিপূরক ও সেতুবন্ধক। আত্মজীবনের কাহিনীকে তিনি সত্যিই রূপকথার মতো মনে করতেন: এক ছিলো গরীব ছেলে, কালক্রমে সেই কি না হ'লো একজন সুবিখ্যাত কবি, বিশ্বসাহিত্যের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রশংসায় আজ পৃথিবী বাঙ্ময়; অর্থাৎ এটাই হ'লো সেই কুরূপ হংসশাবকের কাহিনী কালক্রমে যে রাজার মতো সুন্দর ও মহিমান্বিত এক মরালে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

জন্ম হয়েছিলো দিনেমার দেশের ওডেন্সেয়—১৮০৫ সালের এপ্রিল মাসের দুই তারিখে। গরীব ঘরের ছেলে—অতিশয় গরীব। বাবা ছিলেন মুচি, জুতো সেলাই করতেন—কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলেন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ও আপাদমস্তক রোম্যান্টিক।

যেন জন্মসূত্রেই এই দুই প্রবণতা ছেলের ভিতর বর্তালো; মা ছিলেন দশাসই এক স্ত্রীলোক, কাপড় কাচতেন লোকজনদের; ছোট্ট পরিবারটির গায়ে যাতে কোনো আঁচ না লাগে, আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি সেইজন্য। যখনি স্মৃতির রঙিন চশমার ভিতর দিয়ে ছেলেবেলার এই দিনগুলির দিকে তাকিয়েছেন আণ্ডেরসেন, তখনি যেন লাবণ্যের ঝর্ণায় স্নান করে মধুর এক সৌন্দর্যে সেই গরীব ছেলেবেলা ভ'রে যায়। তাঁর ছেলেবেলার স্বপ্নে পাওয়া অভিলাষের মূল কেন্দ্রই যেন সেই ছোট্ট ঘরগুলি। এখানেই তিনি খেলা করেছিলেন তাঁর 'পৌত্তলিক নাট্যশালা' নিয়ে—বাবাই নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছিলেন পুতুলগুলি। হান্স আণ্ডেরসেনও নিজেই পুতুলদের জন্য পোশাক-আশাক বানিয়ে নিতেন, আর থিয়েটারে ছাপ্তবিল দেখে-দেখে মোটামুটি যে ধারণা হ'তো তার উপর নির্ভর ক'রে নিজেই তিনি পুতুলদের জন্য নাটক লিখতেন। কেবল কচিৎ কোনো উপলক্ষে সত্যিকার থিয়েটারে যাবার সুযোগ মিলতো তাঁর, সেখানে কল্পনার এক বিশাল জগৎ নিজেকে তাঁর কাছে উন্মোচিত ক'রে দিতো: একেবারে এক অলীক জগৎ, যেখানে এই দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের হাত থেকে মুক্তি পেলে।

ছেলেবেলাতেই কেমন যেন অদ্ভুত ছিলেন তিনি—ছিলেন অন্য সব বালকদের থেকে আদ্যোপান্ত আলাদা—কিছুতেই অন্য কারো সঙ্গে তাঁর খাপ খেতো না। ঠিক সেই কুরূপ হংস শাবকের মতো 'মস্ত আর অদ্ভুত' ছিলেন তিনি, ছিলেন অলবড্ডে আর কিমাকার, আর সেই জন্যেই ছিলেন সকলের লাঞ্ছনা নির্যাতন ও উপহাসের পাত্র। কোনো-কোনো বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অভিরুচি থাকলে কী হবে, সামান্য কিছু লেখাপড়া শেখবার সৌভাগ্যই তাঁর হয়েছিলো, অধ্যয়ন লাভের সুযোগ মিলেছিলো—নামে মাত্রই।

ছেলেবেলার সেই স্বপ্নের মতো দিনগুলির উপর বাজপাখির ঘূর্ণমান ছায়ার মতো অন্ধকার হানলো নেপোলিয়নের যুদ্ধ বিগ্রহ। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসলো তাঁর বাবামশাইকে, তৎক্ষণাৎ গিয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে নাম লেখালেন। টাকাকড়ির কিছু সুরাহা হবে, হয়তো এই ভেবেই কাজটা করেছিলেন। গ্রামের লোকজনদের জামা কাপড় কেচেই আণ্ডেরসেনের মাকে দিন চালাতে হ'তো; এবং যখন কয়েক বছর বাদে বাবামশাই বাড়ি ফিরলেন তখন দেখা গেলো তাঁর স্বাস্থ্য এমন ভীষণ ভাবে ভেঙে পড়েছে যে, কিছুতেই সারতে চাচ্ছে না; সত্যিই সারলো না—কিছুকাল পরেই এক ঠাণ্ডা তুষার-পড়া রাতে তাঁর মৃত্যু হ'লো। হান্স আণ্ডেরসেনের মা আবার বিয়ে করলেন, আর কোন অদৃশ্য হাত—হয়তো সে নিয়তি—যেন ঘাড়ে ধ'রে হান্স আণ্ডেরসেনকে একেবারে নিজের ভিতর ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো। আরো একা হ'য়ে পড়লেন তিনি আরো নিঃসঙ্গ, শুধু নিজের তীব্র হৃদয়টি ছাড়া আর-কোনো সঙ্গীই তাঁর রইলো না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা তিনি ব'সে থাকতেন ওডেন্সের নদীর ধারে ; জলের কলের চাকার উপর দিয়ে চ'লে যেতো ঘূর্ণিভরা ছলোছলো ফেনিল জল, আর তার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কোন সময়ে মিলিয়ে যেতো ওডেন্সের চেনা পথ-ঘাট, তার বদলে চোখের সামনে ভেসে উঠতো আশ্চর্য সব প্রান্তর আর দেশ আর স্বপ্নের মতো কত রাজবাড়ি—তাঁরই কল্পনার সৃষ্টি, সম্পূর্ণভাবে তাঁরই কল্পনা দ্বারা যাদের সর্বস্বত্ব কঠিন ভাবে সংরক্ষিত। কোনো-কোনোদিন আবার ঠাকুমার সঙ্গে হাসপাতালে যেতেন তিনি, যেখানে এই গরীব বর্ষীয়সীটি চরকায় বসতেন ; অন্য অনেক বর্ষীয়সী সেখানে কাজ করতেন, তাঁরা যে-সব গল্পগুজব করতেন ব'সে ব'সে তিনি একমনে সে-সব শুনতেন ; আবার কখনো-কখনো তাঁদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য নিজেই বানিয়ে বানিয়ে আজগুবি ও অদ্ভুত সব গল্প ব'লে দিতেন।

শেষে একদিন স্বপ্নের মতো শৈশব চ'লে গেলো। কী করবেন, তাই ঠিক করবার সময় হ'লো এবার। মা ভেবেছিলেন, ছেলে বুঝি কোনো শিল্পবিদ্যা শিখে-টিখে কাজকারবারে মন দেবে···অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরাও সেই পরামর্শ ও উপদেশ দিলে। তৎকালে যখন সামাজিক ব্যবধান ছিল অতিশয় কঠোর ও অনমনীয়, সেই সময়ে—এর চেয়ে উচ্চতর কোনো-কিছুর কল্পনা করা সুবুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব ছিলো ; যে-ছেলেটি সমাজের একেবারে নিম্নতম শ্রেণীতে জন্ম নিয়েছে তার পক্ষে অন্য সব কিছুই ঠিক বন্যহংসের পশ্চাদ্ধাবনের মতো হবে।

কিন্তু বালকের দুর্ধর কল্পনা তাঁকে অসীম শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। স্পষ্ট গলায় সোজাসুজি তিনি সকলকে ব'লে দিলেন যে তিনি বিখ্যাত হবেনই, হ'তেই হবে তাঁকে, আর তার জন্য হয়তো এখন তাঁকে ভীষণ সব দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে, তবু এটা তিনি নিশ্চিত জানেন ভবিষ্যতে কোনো-না-কোনো দিন খ্যাতি এবং যশ সোনার থালায় ক'রে মালা-চন্দন নিয়ে এসে হাজির হবে। তাঁর উচ্চাকাঙ্খার মূল লক্ষ্য ছিলো নাট্যশালা! শৈশবের সেই 'পৌত্তলিক নাট্যশালার' কথা তাঁর মনে জ্বলজ্বল করছিলো ; ওডেন্সের নাট্যগৃহে যে সব নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন সব তখনো তাঁর চোখে ভাসছে ; উপরন্তু লোকে বলতো, 'হান্সের গলা এত ভালো যে কারো সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না।' নদীর ধারে মস্ত একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে তিনি গান করতেন লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ; কাছেই ছিলো একটি প্রমোদবীথিকা ; একদিন সেখানে মস্ত এক পার্টি হচ্ছিলো ; সেই আসরে 'রাজকীয় নাট্যশালা'র কতিপয় অভিনেতা যোগদান করেছিলেন। আণ্ডেরসেন চাচ্ছিলেন তাঁর গলা শুনে এই অভিনেতারা যেন আকৃষ্ট হন—কেন না যে-খ্যাতির জন্য তিনি ব্যগ্র ও ব্যাকুল হ'য়ে আছেন, তা কেবল 'রাজকীয় নাট্যশালাই' তাঁকে উপহার দিতে পারে ব'লে তাঁর ধারণা।

এই উদ্দেশ্যেই ১৮১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক অপরাহ্ণে চোদ্দ বছরের আণ্ডেরসেন মা আর ঠাকুমাকে বিদায় জানিয়ে রাজধানী কোপেনহাগেনের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লো। সেই বিশাল অপরিচিত শহরে দুঃখ কষ্টের কোনো সীমা থাকলো না—কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সব তিনি সহ্য করেছিলেন ব'লেই সেই দুর্ধর একাগ্রতার সাহায্যে শিক্ষার্থী হিসেবে নাট্যশালায় গৃহীত হলেন ; তখনও যেমন, পরেও আজীবন এক অন্ধ ও অপূর্ব ভালোবাসার সূত্রে তিনি এই নাট্যশালার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। স্বপ্নে-জাগরণে-ঘুমঘোরে সব সময়েই এই নাট্যশালা যেন চিরকাল তাঁকে অধিকার ক'রে ছিলো।

কিন্তু অভিনেতা তিনি হ'তে পারলেন না। সেই দিকে তাঁর প্রবণতা নেই—এই মর্মান্তিক তথ্য তাঁকে একদিন জানানো হ'লো : কয়েক বছর নাট্যশালায় কাটাবার পর একদিন তাঁকে নির্মমভাবে বরখাস্ত ক'রে দেয়া হ'লো।

ঘটনাপ্রবাহ সচরাচর যে-ভাবে ও যে-পথে এগোয়, তাতে হয়তো যে-কেউ ভাবতে পারেন এর পরেই বুঝি হান্স আণ্ডেরসেন একান্ত অসহায়ভাবে নিয়তিকে মেনে নিলেন, যে-নিয়তি তাঁকে সমাজের একেবারে নীচের তলায় প্রেরণ না-ক'রে ছাড়বে না। শিক্ষা-দীক্ষা বলতে কিছুই নেই, নেই কোনো কারিগরি বিদ্যার অভিজ্ঞতা ; অর্থাৎ কোনো ভাবে যে অর্থোপার্জন ক'রে জীবিকানির্বাহ করবেন তার কোনো চোরাগলি পর্যন্ত তাঁর সামনে খোলা ছিলো না। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই যে তাঁকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু অপরিসীম আস্থা ছিলো তাঁর বিশ্ববিধানে ; অলস্ত বিশ্বাস ছিলো তাঁর, যা তাঁকে বলতো একদিন না একদিন ভগবান স্বয়ং করুণাপরবশ হ'য়ে এগিয়ে আসবেন তাঁর সাহায্যের জন্য এবং পরিশেষে তিনি যে জিতেই যাবেন এ বিষয়ে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিলো তাঁর। এই আশ্চর্য আত্মবিশ্বাসই নিশ্চয়ই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো ; এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই তাঁর পরিচয়ের গণ্ডি প্রসারিত হ'লো তৎকালের খ্যাতনামাদের ভিতর—এই তীব্র আস্থা না থাকলে যা কিছুতেই সম্ভব হ'তো না।

রাজকীয় নাট্যশালার পরিচালকদের অন্যতম ইয়োনাস কোলিন যে আণ্ডেরসেনের সরলতা, বিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এই তথ্যটি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর সর্বাধিক দূরবিসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সব চেয়ে আগে যে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা দরকার এবং অনুশীলন ব্যতীত যে তাঁর কোনো উন্নতিই হবে না—এটা কোলিনই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যাতে একটি লাতিন বিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারেন, নিজে থেকে তার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন কোলিন। বিধিবদ্ধ ভাবে কোনো কিছুর চর্চা করা আণ্ডেরসেনের স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো। নিয়মিত ভাবে কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করা যেমন তাঁর ধাতে ছিলো না, তেমনিভাবে নীচু ক্লাসের বালখিল্যদের সঙ্গে পাঠাভ্যাস করাটাও খুব একটা সুখের অনুভূতি ছিলো না। এবারও তাঁর সহপাঠীদের চোখে 'মস্ত অদ্ভুত' ব'লে প্রতিভাত হলেন আণ্ডেরসেন। সহপাঠীদের আর লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও নিগ্রহের সীমা থাকলো না। তবু অজস্র দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনার পর ১৮২৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলেন। এতকাল—এই দুর্দশাভরা দিনগুলিতে—যা তিনি সংগোপনে অভ্যাস করতেন, এবার প্রত্যক্ষভাবেই সেই সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করবার অধিকার পেলেন।

গীতিকবি হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আণ্ডেরসেন—অবশ্য রঙ্গব্যঙ্গ ও আমোদপ্রমোদের দিকেও একটা প্রবল ঝোঁক

ছিলো। 'মুমূর্ষু' নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন তিনি ছাত্রজীবনে—আকস্মিক ভাবে কবিতাটির শিরোনামায় ভাষান্তর হয় 'ম্রিয়মাণ শিশু'; কবিতাটি কোনো অজ্ঞাত লেখকের রচনা হিসেবে একটি পত্রিকায় বেরিয়েছিলো—সেটা হ'লো ১৮২৭ সালের কথা—এবং এই কবিতাটির সাহায্যেই তিনি কথঞ্চিৎ যশ অর্জন করেছিলেন। 'হোলমেন্স খাল থেকে আমাগের পর্যন্ত পদচারণা' নামে যখন হাসির উপাখ্যানটি বেরোলো, তখন তিনি যেন রাতারাতি নামজাদা লেখক হ'য়ে উঠলেন।

১৮৩০ সালে একাধিকবার ফুনেন-এ প্রমোদভ্রমণে গিয়েছিলেন আণ্ডেরসেন। ওই রকম একটি প্রমোদভ্রমণে গিয়েই তিনি রিবোর্গ ভয়গট নামক ধনীবণিকের এক কন্যার প্রেমে প'ড়ে যান, কিন্তু মেয়েটি তার আগেই আরেকজনকে বাগদান ক'রে ফেলেছিলো। এই অসুখী প্রণয় ব্যাপারের ফলাফল হ'লো কতগুলি প্রেমের কবিতার একটি সংকলন, মাধুর্য ও লাবণ্যের গুণে যা দিনেমার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন না আণ্ডেরসেন—ওই প্রেমের কবিতাগুলির তপ্ত, বিষণ্ণ, হতাশ নিঃসরণ পর্যন্ত কিছুতেই তাঁর শূন্যতাকে দূর করতে পারলো না। যাতে এই প্রেমের স্মৃতি মন থেকে মুছে যায়, এই জন্য ১৮৩১ সালে তিনি প্রথমবার বিদেশভ্রমণে বেরোলেন—গেলেন উত্তর জার্মানীতে—তাঁর প্রথম ভ্রমণবৃত্তান্তের বইটিতে এই পর্যটনের বিবরণ পাওয়া যাবে! ভ্রমণবৃত্তান্তের এই প্রথম বইটিতেই তার সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যা তাঁর পরবর্তী সব রচনাবলীরই প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুর্লভ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি, এই অসাধারণ ক্ষমতাই তাঁকে ভ্রমণবৃত্তান্তের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলো।

এর পরে যেন স্রোতে ভেসে গেলো ভেলা—আর তিনি প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করলেন না—জল তাঁকে যেদিকে নিয়ে যায়, সেদিকেই গেলেন আজীবন। যে-পথে তিনি রওনা হলেন আর কোনোদিনও সেই পথ থেকে বিচ্যুত হলেন না। পথই বলা ভালো, কেন না এর পর থেকে ক্লান্তিহীনভাবে তিনি কেবল দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন—অন্তহীন ও অবিশ্রান্ত এক ভ্রমণের নেশা তাঁকে পেয়ে বসলো। ১৮৩৩—৩৪-এ গিয়েছিলেন ইতালিতে, যা তাঁর জীবনে এক নতুন যুগের সূচনা ক'রে দিলো; এই পর্যটনের ফলই হ'লো তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'The Improvisatore'; ইংরেজি ও আলেমান ভাষায় অনূদিত হ'য়ে এই বইটি তাঁকে ইয়োরোপের খ্যাতনামাদের অন্যতম ক'রে দিলো। বইটি বেরিয়েছিলো ১৮৩৫ সালে, আর সেই বছরই বেরিয়েছিলো তাঁর প্রথম রূপকথাগুলি, কিন্তু হান্স আণ্ডেরসেন তাঁর এই শিশুসেব্য পুস্তিকাটিকে নিছকই এলেবেলে ব'লে ভেবেছিলেন। উপন্যাসই তাঁর শ্রীক্ষেত্র—এই তিনি তখন মনে করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি আরো কতগুলি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, কিন্তু সেই বইগুলি ইতিমধ্যেই ধূসর ও বিস্মৃত হ'য়ে গেছে; এটা যে হ'লো তা কিন্তু তাঁর ওই ঝলমলে রূপকথাগুলির জন্য, না-হ'লে ওই বইগুলির ভিতর প্রাণশক্তি ও স্বাস্থ্যের সুষমা উপচে পড়ছে, উপরন্তু আছে কিছু কিছু আত্মস্মৃতি ও তাঁর পর্যটনে উজ্জীবন্ত কতিপয় দৃশ্য।

নাট্যশালা তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছিলো; কোনোদিনও

তিনি নাট্যরচনার অভিলাষ ত্যাগ করেন নি। বৈদেশিক গ্রন্থকারদের নাট্যরচনার দিনেমার সংস্করণ রচনা করেছিলেন তিনি, কয়েকটি আবার রাজকীয় নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্ত গৃহীতও হয়েছিলো। লিখেছিলেন কতগুলি তুচ্ছ অতিনাটক, আর কতগুলি নাটকে তিনি তাঁর কল্পলোকের আভাস দিয়েছিলেন ব'লে এককালে তা জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলো। জনপ্রিয়তার পিছনে আরেকটি কারণ ছিলো সংলাপ—ছিপছিপে সব কথোপকথন থাকতো সেই সব ঘটনানির্ভর নাটকে, থাকতো কৌতুক আমোদ আর ঠাট্টা, প্রত্যেকটি সংলাপ হ'তো ছুরির মতো চাঁচাছোলা।

কিন্তু এত সব সাহিত্যিক উদ্যম সত্ত্বেও রূপকথাই তাঁর রচনাবলীকে দীর্ঘ আয়ু দিয়েছিলো। প্রত্যেক বছরে ছোট একটি রূপকথার বই বেরোতো—থাকতো কয়েকটি ছোটো-খাটো পরীর গল্প—প্রত্যেকটি গল্পই হ'তো কবিতাবোধে আক্রান্ত ও দ্যুতিময়—একেকটি স্মরণীয় ও তীব্র কীর্তি—; আর ওই রূপকথাগুলিই কালক্রমে তাঁকে বিশ্বজনের অন্তরঙ্গ ক'রে তুললো। তখন থেকেই *এই রূপকথাগুলির অনুরাগীরা হান্স আণ্ডেরসেনের উদ্দেশে অকৃত্রিম বিনতি জানিয়েছেন—এমন কি ব্রাউনিং দম্পতির প্রণয় পত্রাবলীর সংরক্ত ও দপদপে স্পন্দনের ভিতরেও হান্স আণ্ডেরসেনের স্তব গান শোনা যায়। পরস্পর বিরোধী সব সাহিত্যিকগণ তাঁর প্রতি উন্মুখ হয়েছিলেন: চার্লস ডিকেন্স, লংফেলো, এলিজাবেথ, ব্যারেট ব্রাউনিং, ওয়াল্ট হুইটম্যান, অস্কার ওয়াইল্ড, হিলেয়ার বেলক, গিলবার্ট কীথ চেস্টার্টন, লিয়ো টলস্টয়, হেনরি জেমস, ডব্লিউ এচ অডেন—বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মেজাজের এইসব কীর্তিমানগণ এই রূপকথাগুলির মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন বয়স্কজনদের পক্ষেও পরম উপভোগ্য বহু উপাদান।* 'উত্তরদেশের সত্যিকার জাদুকর' যদি কাউকে বলতে হয়, তো ওয়াল্টার স্কটকে না ব'লে হান্স ক্রিস্টিয়ান আণ্ডেরসেনকেই বলা উচিত—এই কথা বলেছিলেন বিখ্যাত সমালোচক ই. ভি. লুকাস: 'কারণ স্কট যেখানে নরনারীদের যেমন দেখতেন, তেমনি আঁকতেন, সেখানে আণ্ডেরসেন তাঁর সোনার কাঠির সাহায্যে অনেক অমানুষ, নির্জীব ও নিশ্চেতন বস্তুকেও—আসবাবপত্র, পুতুল, ফুল, হাঁসমুর্গি—মানবতার অনুভূতিতে জীবন্ত ক'রে তুলতেন।'

মনে রাখতে হবে যে আণ্ডেরসেনের এই রূপকথাগুলি নিছকই ঘটনানির্ভর কোনো কিংবদন্তী নয়। এটা ভুললে চলবে না যে, এই গল্পগুলির মধ্য দিয়েই নিজের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন; কথা বলেছেন যুগপৎ বয়স্কজন ও ছোটোদের কাছে, এবং কোনো কোনো সময় ছোটোদের চেয়েও বয়স্করাই এর সম্পূর্ণ রসটা উপভোগ করতে পারবেন বেশি। আর বাগ্‌ভঙ্গিমার মধ্য দিয়েও তিনি যেন বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তৎকালীন দিনেমার সাহিত্যে, কৌতুক আর আমোদে আদ্যোপান্ত ভরপুর তাঁর রচনা—মাঝে মাঝে মনে হয় এটাই বুঝি তাঁর প্রতিভার গোপন চাবি; উপরন্তু এই গল্পগুলির স্বাদ পুরোপুরি পেতে হ'লে জানতে হবে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা ও অনুভাবনাকে, জানতে হবে তাঁর জীবন কথা, জানতে হবে প্রতিটি গল্পের, আত্মজৈবনিক নির্ভর, কারণ প্রতিটি গল্পেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ আর ছাপ ভাঁজে-ভাঁজে মিশে রয়েছে। অথচ এত তীব্র ভাবে ব্যক্তিগত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গল্পগুলি হ'লো বিশ্বসাহিত্যের সত্যিকার সম্পদ সেখানে তিনি বাণী পাঠিয়েছেন মানবাত্মার উদ্দেশে, সেখানে তিনি কথা বলেছেন ত্রিকাল ও ত্রিভুবনের সঙ্গে। জোনাথন সুইফট্ চার্লস ডিকেন্স, লিউয়িস ক্যারল, অস্কার ওয়াইল্ড কি এডোয়ার্ড লিয়ারকে কেবলমাত্র বালমেধ্য ব'লে ভাবলে যেমন আমরা মারাত্মক ভুল করবো, ঠিক তেমনি ভুল করবো যদি আণ্ডেরসেনকে কেবলমাত্র শিশুপাঠ্য ব'লে ভাবি। বিশুদ্ধ কবিতা যাকে বলে আণ্ডেরসেন একদিক থেকে ছিলেন তারই স্রষ্টা: এই কবিতা আবেদনে এমনি সার্বিক ও বিশ্বজনীন যে তার কোনো কোনো প্রবন্ধ এখনো যেমন ভাবে ওডেন্সের কোনো শিশুকে দুঃখ ও বেদনায় কাঁদিয়ে তোলে, ঠিক তেমনি ভাবে তাঁর আবেদন পৌঁছোয় কোনো ইংরেজ, জর্মান, য়িহুদি কি ভারতীয় ছেলের কাছে।

হিলেয়ার বেলক একবার আণ্ডেরসেন সম্বন্ধে বলেছিলেন: 'এটা আমি বাজি ধ'রে বলতে পারি যে, যদি আমাদের এই বর্ণমালা আর মাত্র পাঁচশো বছর বেঁচে থাকে, এই দুজন ছাড়া সাহিত্যিক কিন্তু ততদিনই সমান ভাবে বেঁচে থাকবেন। আণ্ডেরসেনের প্রতিভার ভিতর তিনি তিনটি স্তর খুঁজে পেয়েছিলেন: 'প্রথমত, তিনি যা ভাবতেন তাই তিনি সব সময় বলতেন; দ্বিতীয়ত, সেই ভাবনাকে যত ভাবে প্রকাশ করা যায় তার প্রত্যেকটি উপায় তিনি জানতেন; এবং তৃতীয়ত কেবল এতটুকুই তিনি বলতেন যতটুকু তাঁর বলবার থাকতো।'

আণ্ডেরসেন নিজেও একবার আত্মবিশ্লেষণ ক'রে নিজের প্রতিভার সংকেত দিয়েছিলেন: 'রূপকথার মতো কবিতার আর কোনো প্রকরণই এমন তুমুলভাবে অসীমের সন্ধানী নয়। সীমাহীন তার ক্ষেত্র, দিগন্ত পেরিয়েও অবারিত ও দূরগামী। প্রাচীন কালের রক্ত জল করা বিভীষিকার কাহিনী থেকে শুরু ক'রে শিশু সচিত্র পুস্তকের নীতিসুধা পর্যন্ত তার অবারিত দ্বার; লোকে যাকে কবিতা বলে আর কোনো কবি যাকে কবিতা বলেন এই দুটোই রূপকথার ভিতর ভাঁজে-ভাঁজে মিশে থাকে! কবিতা বলতে আমি তো কেবল রূপকথাই বুঝি—বিশুদ্ধ, সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কবিতা; যিনি রূপকথায় হাত পাকাতে পারেন তিনি বিষণ্ণতা, অবসাদ, বিয়োগব্যথা, প্রহসন, গ্রাম্য সরলতা, তীব্র কৌতুক ও নিছক আমোদকে ওই রূপকথার ভিতরেই অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে ভ'রে রাখতে পারেন; তাঁর সেবা করার জন্য ভৃত্যের মতো সারি-সারি হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে গীতলতার আবেদন, শিশুসরল উপাখ্যান, এবং প্রকৃতির নিজের ভাষা!···উপকথা কিংবা কিংবদন্তীতে দেখা যায় পরিণামে সব সময়েই সরল সাইমন জিতে যাচ্ছে···কাজেই এর ভিতর দিয়ে কবিতার সেই অপাপবিদ্ধ শিশুত্ব—যা কারো চোখেই পড়ে না, এবং অন্যান্য সহকর্মিগণ যাকে নিয়তই অবাঞ্ছিত বিদ্রূপ করেন···তা একেবারে শেষ ও চরম সীমান্তে, অর্থাৎ পরাকাষ্ঠায়, পৌঁছে যায়।'

এই রূপকথাগুলির মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব একটি জগতের উপর থেকে পর্দা তুলে দিয়েছিলেন আণ্ডেরসেন; যে জগতে আমরা প্রতিদিন বেঁচে থাকছি, তার চেয়ে এই বিশ্বভুবন যে কতখানি আলাদা—অথচ সেই সঙ্গেই আবার অস্বস্তিকর ভাবে যে ঠিক তারই মতো—কবির সেই জগতের ভিতর আণ্ডেরসেন যা-কিছু দেখেছেন সবই

ভ'রে রেখেছেন—এই পৃথিবীতেই আছে টিনেমাটি দিয়ে বানানো মেষপালিকা, আছে টিনের সেপাই, মেঠো ইঁদুর আর ঝলমলে ফুল ; আর তারাই তাদের যুক্তিতর্ক কথাবার্তা কর্ম কারণের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলছে এই জীবন ও তারই কর্ম-সংঘাতের অবিচল ও উদ্দীপিত বাকপ্রতিমা।' বিখ্যাত সমালোচক ও প্রবন্ধকার রবার্ট লিণ্ড এই কথাগুলির সঙ্গে আরো যা বলেছিলেন, তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'লোকের দেরাজে কি টেবিলে যে-সব এলোমেলো জিনিস প'ড়ে থাকে, তাদের দিয়েই তিনি অবলীলাক্রমে ঘটাতেন মহাকাব্যের নায়কের রোমাঞ্চকর ও রুদ্ধশ্বাস অভিযান ; কোনো সাঁড়াশি কিংবা দরজার হাতলে কি কড়ায় আমরা সাধারণ নরনারী যে-সব সম্ভাবনা দেখে থাকি, তার চেয়েও মহত্তর সম্ভাবনার বোধ তাঁর ছিল। সহস্র প্রকল্পের জনক তিনি—কত যে তাঁর কল্পনা ও খেয়ালখুশি তার কোনো সীমা নেই। পুরুষ পরীদের কল্পনা করেছিলেন, যারা এতই একরত্তি সে যে ইঁদুরের ঠ্যাংয়ের চেয়ে বড়ো নয় ; তাঁর ইঁদুরেরা বেড়াতে বেরোয় ঠিক যেমন বেরোয় তীর্থযাত্রীরা ; আর সেই একরত্তি আঙলিনা 'যার দোলনা ছিলো বাদামের খোলা, আর ভায়োলেটের পাপড়ি ছিলো যার বিছানা, আর গোলাপের পাপড়ি যার গা-ঢাকা চাদর'।' সব ছোট, একরত্তি, অথচ অফুরন্ত বিনোদের আকর।

বিশ্বমানুষের অন্তরঙ্গ তিনি, জগতের সকল লোকেরই পরম ঐতিহ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত দিনেমার। এই কথাটা ছিলেয়ার বেলক সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে ব'লে গেছেন : 'তিনি ছিলেন উত্তরদেশের লোক ; তাঁর গল্প পড়তে গেলেই দেখবেন তিনি যদি খোলা হাওয়ায় গল্পের উপস্থাপনা ক'রে থাকেন, তাহ'লে সেই হাওয়া সব সময়েই সতেজ ও সপ্রাণ এবং কখন কখন তুষারাক্রান্ত ও তুহিন ; যদি তিনি কখন ঘরের মধ্যে গল্পের যবনিকা তোলেন তো লক্ষ্য ক'রে দেখবেন ঘরটা বেশ উষ্ণ ও আরামপ্রদ এবং প্রায় ক্ষেত্রেই প্রাচীন। উত্তরদেশের লোকেদের কোনো-কোনো বিষয়ে কোনো অনুরাগ বা অভিরুচি নেই ; এই অভাবের ফল কোন ক্ষেত্রে ভালো, কোন ক্ষেত্রে বা খারাপ হয়েছে ; আণ্ডেরসেনের মধ্যেও এই দোষ-গুণ আদ্যোপান্ত বর্তমান। কখনো বীরত্বের যশোগাথা গাননি তিনি—যে-অর্থে সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব ও হাম্বড়া ভাব দেখায় ; প্রতিবিধিৎসা নেই তাঁর রচনায়, নেই প্রতিশোধের তীব্র স্পৃহা ; জীবনের চঞ্চল স্পন্দন ককখনো তীব্রও তীক্ষ্ণভাবে দেখি না তার মধ্যে কিন্তু আবার কখনো তাঁকে ঈর্ষিত, লোভী কিংবা পরশ্রীকাতর হ'তেও দেখি না। যাঁরা তাঁকে পড়বেন, তাঁদের ভিতর যাঁরাই উত্তরের ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত তাঁরাই নির্ঘাৎ ডেনমার্কের প্রেমে প'ড়ে যাবেন।' অরোরা বেরিয়ালিসের মতো দ্যুতিময় ও বিচ্ছুরণভরা আভা ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনায়—ঠিক তাঁরই মতো আকর্ষণকারী ও সুন্দর।

বলা হয় যে 'বিশ্রী হাঁসেরছানার' গল্প তাঁর নিজেরই জীবনকথা। এই কথাতেও সত্যের ঠিক ততটুকুই আভাস থাকে যদি বলি যে 'দেবদারু' গল্পের ভিতর রূপান্তর ও পরিবর্তনের জন্য যে স্থির ও অবিচল পিপাসা দেখা যায় তা গভীরভাবে স্বয়ং আণ্ডেরসেনেরও সত্তার ভিতরে দাগ কেটে বসেছিলো। কখনো বিয়ে করেননি। আরেকবার এমন হয়েছিলো যে ইয়োনাস জেলিসের কন্যা লুইজির প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। তীব্র ও সংরক্তভাবে প্রেমে পড়েছিলেন সুইডেনের মস্ত গায়িকা জেনি লিণ্ডের, কোপেনহাগেন আর বের্লিনে যাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো। কিন্তু তবু কিছুতেই নিজে তিনি ঘর বাঁধতে পারেননি। সেইজন্যই তাঁর বন্ধুবান্ধবদের গৃহই এক অর্থে তাঁর নিজের বাড়ি হ'য়ে উঠেছিলো এবং তাদের ভিতর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হ'লো কোলিন পরিবারের বাসগৃহ। দুঃখের দিনে যেমন, আনন্দের দিনেও তেমনি প্রথমেই তাঁর কোলিনদের বাড়ির কথা মনে হ'তো ; আর কোলিনরাও তাঁকে নিকট আত্মীয় ও পরম প্রিয়জন ব'লে মনে করতেন। কিন্তু সব সত্ত্বেও তথ্য অবিচল থাকে যে কোনো কালেই তাঁর ঘর বাঁধার স্বপ্ন সফল হয়নি। যতবারই ভালোবেসেছেন, ততবারই ফেরে নিয়ে হয়েছে ব্যর্থতা, আর অবসাদ। নিঃসঙ্গ ছিলেন আজীবন—এমন একজনও ছিলো না যার কাছে তিনি অসংকোচে ও অনায়াসে নিজেকে উন্মোচিত ও উদ্ঘাটিত করতে পারেন। ফলে অক্লান্তভাবে দেশে-বিদেশে ঘুরে না-বেড়িয়ে তাঁর কোনো উপায় ছিলো না—স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র তিনি লোকজনের সঙ্গে সংযোগ করতে চাইতেন, যাতে নিজের এই তীব্র ও প্রবল নিঃসঙ্গতাকে ভুলে থাকতে পারেন। ওডেন্সে একটি জাদুঘর আছে, যার নাম 'হান্স আণ্ডেরসেনের মিউজিয়াম'। সেখানে সযত্নে তাঁর পথচলার উপকরণগুলি সাজিয়ে রাখা আছে—তাঁর ব্যাগ আর স্যুটকেস, বেড়াবার ছড়ি আর ছাতা, তাঁর টুপি আর জুতো—সব একজায়গায় জড়ো ক'রে রাখা। এটা যেন কোনো তীব্র প্রতীক। পথিক ব্রত গ্রহণ না-করে যে তাঁর কোনো উপায় ছিলো না, এই সযত্ন রক্ষিত জিনিষপত্রগুলি যেন তাই বোঝাতে চাচ্ছে। নিঃসঙ্গতার জ্বালা তাঁকে কী পরিমাণ সহ্য করতে হয়েছিলো তার ঝাপসা একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় লিয়ো টলস্টয়ের একটি ছোট্ট মন্তব্যে। ম্যাক্সিম গর্কির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কথাপ্রসঙ্গে টলস্টয় হান্স আণ্ডেরসেনের রূপকথার মূল চাবিকাঠিটির সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আণ্ডেরসেনের রূপকথা প'ড়ে এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পাই, যিনি জীবনের সব ব্যর্থতা, বিয়োগ, ও হতাশা সহ্য ক'রে অবশেষে ছোটোদের কাছে এসে নিজের নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা যে কী বিপুল ও কী নিদারুণ ছিলো, তার প্রমাণই এটা। কেননা ছোটোরা কখন—ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের বালাই রাখে না ব'লে—কাউকে ক্ষমা করে না, যদি কাউকে অপছন্দ কিংবা ত্যাগ ক'রে তো সে একেবারে চিরকালের মতো। এ-কথা আণ্ডেরসেন জানতেন, তবু যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ছোটোদের কাছে যেতে হয়েছিলো তার কারণেই হ'লো ভীষণ এক ব্যর্থতাবোধ ও নিঃসঙ্গতা।' যেন একাকিত্বের চূড়োয় বসেছিলেন, যার দু-পাশে হিংস্রভাবে হাঁ ক'রে ছিলো পাতালস্পর্শী গহ্বর। নিজেকে বাঁচাবার জন্যই অন্তহীন পথকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন, যে-পথের মধ্যে একাকিত্বকে ভুলে থাকার জন্য তাঁকে এই রূপকথাগুলি রচনা করতে হয়েছিলো।

যখন তাঁর বয়স ত্রিশ, তখন থেকেই আণ্ডেরসেন দিনেমার কেল্লা ও গোলাবাড়ির এক নিয়মিত ও চিরস্বাগত অতিথি। ওই সব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েই তিনি একের পর এক গল্প শোনাতেন—যেন তিনি এক অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন ; আর শ্রোতারা ভালো লাগার বোধে আর বিনোদে তাঁকে অন্তরঙ্গ অভ্যাগত ক'রে নিতো। আণ্ডেরসেন নিজেও সুন্দর পরিপার্শ্ব থেকে আনন্দের উপহার পেতেন, পেতেন তাঁর রচনাবলীর উপাদান ও প্রেরণা। এই ভাবেই

জিজ্ঞাসা ঘুরে ঘুরে কাটাতেন একজনের বাড়ি থেকে আরেকজনের বাড়ি—তার পরেই আবার বিদেশের জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠতো রক্ত আর স্পন্দন, তিনি যেন দূরের কোনো ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেতেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যতদিন বিদেশে কাটিয়েছেন, তা একত্র করলে ন' বছর; তার পরমায়ুর একটি দীর্ঘ ও সক্রিয় অংশই তিনি কাটিয়েছেন ডেনমার্কের বাইরে। এই সব বিদেশ ভ্রমণই তাঁকে তৎকালের বিখ্যাতদের সম্পর্কে ও সংস্রবে এনেছিল।

মাঝে-মাঝে জর্মাণি যেতেন; সেখানে রাজসভায় তাঁর প্রবল সমাদর হ'তো বিশেষ ক'রে হ্বাইমারে। ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন দু'বার—১৮৪৭ সালে আর ১৮৫৭ সালে; সেখানে চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিলো। ইয়োরোপের সব দেশেই গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু বিদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো তাঁর ইতালিকে। রোমের রাস্তায় রাস্তায় একা ঘুরে বেড়াতেন তিনি—এত স্বাচ্ছন্দ্যে এবং অনায়াসে যে মনে হ'তো বুঝি স্বদেশেই আছেন; নীল ভূমধ্যসাগর আর ঝলমলে রোদ তাঁকে মুগ্ধের মতো আটকে রাখতে চাইতো। সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর অনেক বন্ধু ছিলেন; ছোট্ট ওই ভূস্বর্গের রাজার মতো সৌন্দর্য তাঁর মনে এতটাই রেখাপাত করেছিলো যে পরে তিনি 'তুহিনকুমারী' নামক রূপকথায় তাকেই ধ'রে রাখতে চেয়েছিলেন। ১৮৪০—৪১ সালে গ্রীসদেশ আর তুর্কিস্থানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন, ঝলমলে অন্তরঙ্গ ও উপভোগ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'কবির বাজার' নামক গ্রন্থে তারই বিবরণ পাওয়া যায়। স্পেন, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, সুইডেন, নরোয়ে—প্রত্যেক দেশেই তিনি গিয়েছিলেন—কোথাও বা একাধিকবার। 'পথ চলার অন্য নামই হ'লো বেঁচে থাকা'—প্রায়ই বলতেন তিনি এই কথা, এবং ব'লে বেশ সুখী হতেন। কোন্ জায়গা তাঁর মনে কী ছাপ ফেললো টুকরো-টুকরো কথায় তা লিখে রাখতেন নোটবইয়ে, কখনো স্কেচ এঁকে ভূদৃশ্য কিংবা ঘরবাড়িকে ধ'রে রাখতে চাইতেন—সব সময়েই লক্ষ্য থাকতো সব স্মৃতি যেন থেকে যায় মনের মধ্যে, যাতে কোনো দিন কোনো লেখা তাঁকে পুনর্জীবন দিতে পারে।

শীতকালে যখন কোপেনহাগেনে ফিরে আসতেন তখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করতেন, যাতে যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকে। অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন জীবনে, তাঁর গল্পের মতোই তা সতেজ, মনোরম ও উপভোগ্য; এবং ওই সব চিঠির মধ্যেই তাঁর জীবনের সকল তথ্য পাওয়া যায়।

মানুষটি বড্ড বেশি স্পর্শভীরু ছিলেন। কোনো অপ্রিয় সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। দিনেমার সমালোচকদের অনেকেই তাঁর উপন্যাস ও নাট্যরচনার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করতেন এবং সে-সব মন্তব্য যথেষ্টই ন্যায্য ও যুক্তিসংগত হ'তো। কিন্তু তবু তিনি বিশ্রী এক তিক্ততার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তার রূপকথাগুলিই যে অতুল কীর্তি এবং তার সাহায্যেই যে তিনি তাঁর সমকালীনদের জয় ক'রে নিয়েছেন, এটা বুঝতে তাঁর অনেকদিন লেগেছিলো। অথচ যখনি কেউ তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতো, কি স্বীকার করতো, তখনি তা গভীরভাবে তাঁর মর্মস্পর্শ করতো এবং তিনি উষ্ণভাবে তাঁর প্রতি ধাবমান হতেন। এত স্পর্শাতুর ছিলেন যে স্বদেশের প্রতি ভীষণ অভিমান ক'রে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর রচনাবলীর প্রকৃত সমঝদার হচ্ছে বিদেশীয়রা; তারাই তাঁকে বুঝতে পারে, তারাই তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয় ও প্রকৃত সমাদর করে, এবং তারা কেবল এটাই দেখে যে কী তিনি দিতে চাচ্ছেন—কোথাও কোন গলদ থেকে গেলো খুঁতখুঁতে ও নির্বিবেক স্বদেশীয়দের মতো তা তারা খুঁটিয়ে দেখে না!

আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। স্বদেশে তিনি প্রচুর সম্মান ও সমাদর পেয়েছিলেন। রাজবাড়ির প্রীতি এবং সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি, অসংখ্য উপাধি ও পুরস্কার পেয়েছিলেন, অজস্র প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলো, আর আস্তে-আস্তে যত দিন কাটলো ততই এই ক্ষুদ্রকায় স্বদেশের জন্য করুণা, অনুকম্পা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সমবেদনার গভীর অনুভূতিতে তিনি ভ'রে গেলেন—এই অনুভূতি চরমে পৌঁছোলো তখন যখন ১৮৬৪ সালে ডেনমার্ক জর্মাণির কাছে যুদ্ধে হেরে গেলো। স্বদেশের দুর্দশার মধ্যে তিনি তাঁকে শুনিয়েছিলেন আশার বাণী; গভীর স্বদেশ-প্রেমে তখন তাঁর রচনাবলী স্পন্দিত ও উদ্মথিত হ'তো: এমন কি এখন যে জাতীয়সংগীত ডেনমার্কে নিয়তই গীত হ'য়ে থাকে তাও তিনিই রচনা ক'রে দিয়েছিলেন। ১৮৬৭ সালে তাঁকে সংবর্ধনা জানালো গোটা দেশ: 'নগরীর স্বাধীন আত্মা' এই উপাধি পেলেন তিনি তখন। সারা ওডেন্স দীপমালায় ঝলমল ক'রে উঠলো, তাঁর সংবর্ধনায় রাস্তায় বেরোলো মস্ত এক মশাল শোভাযাত্রা, আর তখন, তখন তিনি বুঝলেন দূরের ঘণ্টা আর ভগবানের করুণা কী আশ্চর্যভাবে তাঁকে এই মহিমায় মুখোমুখি ক'রে দিয়ে গেলো;

কোন অসীম থেকে কোন পরিমল এসেছিলো পবনে তা তিনি অনুভব করলেন রক্তে-মাংসে। বুঝতে পারলেন যে সত্যিই তাঁর নিজের জীবনই হ'লো সবচেয়ে সুন্দর ও বিস্ময়কর রূপকথা; মহান্, মূল্যবান ও সুখী, পূর্ণতার প্রত্যাশী ও অভিলাষী এই প্রবল বোধ তাঁকে এতটাই বিচলিত করে ফেলেছিলো যে এই সংবর্ধনার উত্তরে প্রথমটায় তিনি কোনো কথাই বলতে পারেননি।

জীবনের শেষ বছরগুলি কেবল অসুখে কেটেছিলো তাঁর। স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছিলো; কোথাও যেতে হ'লে ভীষণ কষ্ট হ'তো। কোপেনহাগেনে তখন তাঁর নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন মিলথিয়োর নামক একজন মস্ত ব্যবসায়ী, পরম সমাদরের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আণ্ডেরসেনের যত্ন নিতেন; এবং মেলথিয়োরদের বাড়িতেই ১৮৭৫ সালের অগাষ্ট মাসের চার তারিখে তিনি মারা গিয়েছিলেন।

অনেক লেখকই তাঁদের জীবৎকালে আণ্ডেরসেনের মতোই শ্রদ্ধা প্রীতি ও সম্মান লাভ করেছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর ও মমতাহীন মহাকাল তাদের কিছুতেই যুগোত্তীর্ণ হ'তে দেয়নি। কিন্তু আণ্ডেরসেনের রূপকথাগুলি চিরঞ্জীব—চিরকালের মানবতার কাছে তা এক অমূল্য উপহার। প্রথমত এবং প্রধানত ছোটদের জন্যই এই রূপকথাগুলি তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর আশা ছিল মা-বাবাও নিশ্চয়ই ছোটোদের সঙ্গে সঙ্গে এই গল্পগুলি শুনবেন—এবং তাঁর কোনো কোনো রচনা তো ছোটদের চেয়ে বয়স্কদেরই বেশি উপযোগী, কেন না কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ও পরিণতরাই তাদের গভীরতা অনুভব করতে পারবেন। মৃত্যুর পর কিঞ্চিদধিক আশি বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, তবু হান্স ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরসেনের নাম বিশ্বসাহিত্যের প্রধান পুরুষদের নামের পাশেই ভাস্বর ও জ্যোতিষ্মান হ'য়ে আছে; এবং এখনও তাঁর গল্পগুলি তেমনি সতেজ প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী হ'য়েই আছে কেননা তাদের মূল অবলম্বন ছিলো মানবতারই যুগাতিক্রমী অনুভূতি ও সংরাগ, আর এইভাবেই স্থান-কালের সীমাকে অতিক্রম ক'রে সর্বলোকের ঐশ্বর্য হ'য়ে আছে। এখনও এই গল্পগুলির ভিতর শোনা যায় দূরাগত ঘণ্টার ধ্বনি, যা ঘর থেকে বের ক'রে এনে পথে ছেড়ে দেয়, যে-পথে চিরকাল ধ'রে অসীম পবনে কোন পরিমল আসে কেউ জানে না, যে-পথে চিরকাল ধ'রে কোন দূরবর্তী নক্ষত্র আলো ছিটিয়ে দেয় কেউ জানে না; শুধু জানে যে পথ গেছে দূরের দিকে ঘুরে-ঘুরে, কাঁটাঝোপ জঙ্গল বন গিরিশীর্ষ ছাড়িয়ে অসীম এক নীল সমুদ্রের তীরে, যে সমুদ্রের তরঙ্গলীলায় নৃত্যপর অনেক অশরীরী দিব্যাত্মা, এবং যে সমুদ্রের ওপার থেকে কেবলই ভেসে আসে অবিরাম এক গম্ভীর স্তবগান।

# যৌবন সমাগমে

ডাক্তারী মতে ষোলো থেকে ছাব্বিশ বছর সময়টাই মানুষের শারীরিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতম কাল। প্রথম যৌবনের এই দিনগুলিতেই নাকি ছেলেমেয়েদের মানসিক ও দৈহিক কার্য্যকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতা লাভ করে, ও এই সময়ই যে কোন দুরূহ কর্ম্ম ও তাদের কাছে সহজসাধ্য হয়েই দেখা দেয়। মেয়ে হলে এসময়ে তার দেহ এক অভূতপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে, শরীরের বাঁক প্রতিটি কোণ ভরে ওঠে প্রয়োজনীয় উপচারে, বসন্তের সমাগমে ধরণী হয়ে ওঠে যেমন সুন্দরতর, প্রথম যৌবনের জোয়ারে নারীদেহও হয়ে ওঠে তেমনি লাবণ্যময়, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। এই লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য পরবর্ত্তী জীবনে পেতে হলে বহু আয়াস স্বীকার করতে হয়, কিন্তু প্রথম যৌবনে তা আসে আপনা হতেই বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে। মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতাও এই সময়েই সবচেয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং সন্তান লাভের শ্রেষ্ঠতম সময়ও এটাই। দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্যের এই বসন্ত দিনে নবযুবক বা নবযৌবনার প্রধানতম সমস্যা নিজের আভ্যন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বসিত আবেগ কে ঠিক মত কাজে লাগানো। অত্যন্ত সাবধান না হলে হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে ভুলপথে পা দেওয়ার সম্ভাবনাও বড় কম নয়। তরুণতরুণীর সামনে এ সময়ে যে সব সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে প্রধানতম হল যৌন সমস্যা। যৌনাবেদন বা যৌনক্ষুধা নবযৌবনের পক্ষে অপরিহার্য্য আর সেটা তার পথ খুঁজে নিতে চায়ই। সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়ায় স্বাভাবিক নিবৃত্তির পথ থাকে রুদ্ধ, তাই দেহের গণ্ডীর মাঝে অবরুদ্ধ কামনা যখন মাথা খুঁড়ে মরে তাকে পরিতৃপ্ত করতে পাবার সুযোগ বা সুবিধা না থাকলে অনেক যুবক যুবতীকেই এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এই ক্ষুধা এসময়ে এতই প্রবল হতে পারে যে স্বাভাবিক পথে নিবৃত্তি না ঘটলে এর থেকে বহু বিপর্যয় ঘটা সম্ভব। আবার এই যৌনাবেগকেই সংযমের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধতে পারলে এর প্রভাবে তরুণতরুণীর মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষ বিকাশ লাভ করে। মনস্তাত্ত্বিকের মতে যৌন অনুভূতি জাগ্রত না হলে মানুষের মনে দয়া ক্ষমা করুণা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলির দ্বারও থাকে রুদ্ধ, যে জন্য শিশু বা বালকবালিকারা স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। মানসিক শক্তি সম্পন্ন যে কোন তরুণতরুণী তাই এসময়ে স্বভাবের নিজস্ব গুণগুলিকে পরিণতির পথে নিয়ে যেতে পারে, শিক্ষা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কষ্টিপাথরে নিজেদের যাচাই করে নিয়ে। যৌবনের প্রধানতম বিকৃত হল সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি। যৌনাবেগ স্বাভাবিক পথে চালিত হতে না পারলে প্রায়শঃই যে সব বাঁকা পথে চলতে চায় উপোরোক্ত বিকৃতি তারই অন্যতম, এই অনিষ্টকর অভ্যাস সম্বন্ধে সমস্ত তরুণতরুণীর সম্যক অবহিতি দরকার, কারণ এই অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হলে জীবনের শ্রেষ্ঠতম অনুভূতি প্রেম ও স্বাভাবিক যৌনসঙ্গমের আনন্দ হতে চিরতরে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে; প্রয়োজন হলে এই কদভ্যাস পরিহার কল্পে সুচিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়াই বিধেয়। প্রত্যেক তরুণ তরুণীরই উচিৎ জীবনের এই পর্য্যায়ের সুরুতেই বিচক্ষণতার সঙ্গে আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্র, নিজের শিক্ষা সংস্কৃতি ও স্বভাবের অনুকূল পরিবেশ খুঁজে নেওয়া, তারপর আসে তার সাথী নির্ব্বাচনের প্রশ্ন, এক্ষেত্রেও যদি সে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে খুঁজে বার করতে পারে তার মনের মানুষটিকে তাহলে জীবনের চলার পথ আপনা হতেই হয়ে উঠবে সহজ ও সুন্দর, নবীন জীবনের রথ নবযৌবনের সিংহ দ্বার পেরিয়ে নির্ব্বিঘ্নে চলবে সার্থকতা, সাফল্য ও পরিণতির পথে। যৌবন সমাগমের বসন্তদিনে আত্মহারা না হয়ে আত্মস্থ হতে পারাটাই তাই অধিকতর কাম্য।

# পৃথিবীর অতীত রূপ ও খনিজ সম্পদ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

মানুষ সৃষ্টির, বহু কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। আদিম যুগের মানুষের ন্যায় বর্তমান যুগের মানুষ শুধু আকাশ, পাহাড় পর্বত ও সমুদ্র দর্শন করেই অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ নয়নে সে আর সন্তুষ্ট নয়। আজিকার মানুষ পৃথিবীকে জানতে চায় ও চিনতে চায়। চিনতে চায় সে—সঠিক ভাবে অতীত ও বর্তমানের পৃথিবীকে। তাঁর সেই কৌতূহলী সন্ধানই জন্ম দিয়েছে ভূ-বিজ্ঞানকে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু কিছুই সৃষ্টি করে না। সৃষ্টির সংঘটিত, তথ্য ও সত্যগুলির কেবল মাত্র পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্ঘাটনই বৈজ্ঞানিকের কাজ। বিভিন্ন এসিড, বিভিন্ন গ্যাস ও বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তারই রহস্য। স্রষ্টা সমগ্র বিশ্বে কেবল মাত্র একজনই। ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিটি পাথরের স্তর বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান দ্বারা এক একটি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পরিণত হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদরা এই লব্ধ জ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর অতীত ইতিহাসকে সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করেছে। পৃথিবীর সেই আদি ইতিহাসের পাতায় একবার অনুসন্ধান করে দেখা যাক পৃথিবীর অতীত রূপ কিরূপ ছিল। নিশ্চয়ই সেই কোটি কোটি বৎসর পূর্বের পৃথিবী আজিকার পৃথিবী হতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল।

পঞ্চ মহাদেশ পঞ্চ মহাসাগর বেষ্টিত এই পৃথিবী অন্য রূপে বিরাজমান ছিল। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম্ ও রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয়প্রাপ্তির বয়স ও বিভিন্ন পাললিক শিলার মধ্যে বিভিন্ন পলি নির্দিষ্ট চিহ্ন ও পলির স্থায়িত্বকাল আমাদের পাথরের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেছে। ১ গ্রাম ইউরেনিয়াম ৭৬০ কোটি বছরে সম্পূর্ণ রূপে সীসায় পরিণত হয়। ১ গ্রাম থোরিয়াম ১ গ্রাম সীসায় পরিণত হতে লাগে ২১১,০০০ লক্ষ বছর। কোন মৃত জীবের দেহে যে অঙ্গারাম্ল গ্যাস সৃষ্টি করে এবং সেই কার্বন সঞ্চিত হয়ে সেই মৃত দেহের নানা প্রকার রূপান্তর ঘটায় সেই সময়ও নির্ণীত হয়েছে। প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদের জীবাশ্মও ভূতাত্ত্বিকের প্রধান সহায়ক। ভূতাত্ত্বিকের মতে কোটি কোটি বৎসর পূর্বে (ঠিক কত কোটি বৎসর, তাহা আজও সঠিক ভাবে নির্ণীত হয় নাই) দক্ষিণ ভারতের গণ্ডরাজ্যের নামানুযায়ী গণ্ডোয়ানা মহাদেশটির আয়তন ছিল অতি বৃহৎ। বর্তমান দক্ষিণ ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও কুমেরু মহাদেশ সমেত গণ্ডোয়ানা মহাদেশ সৃষ্ট হয়েছিল। মাদাগাস্কার আজ দক্ষিণ ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া হতে বহু দূরে অবস্থিত, তথাপি উহারা সেই সুদূর অতীতে এক অবিচ্ছিন্ন মহাদেশ সৃষ্টি করেছিল। ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরদ্বয় তখন ক্ষুদ্র কলেবরে বিরাজমান ছিল। ভূতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর শেষ যামের অর্থাৎ বিগত ৫০ কোটি বছরের যে ইতিহাস রচনা করেছেন, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত (১) প্রাচীন জীবের যুগ (প্যালিওজোয়িক, প্রায় ৫০ কোটি বছর পূর্বেকার) (২) মধ্যবর্তী জীবের যুগ (মেসোজোয়িক, ১৮ কোটি বছর পূর্বেকার) (৩) আধুনিক জীবের যুগ (কেনোজোয়িক, ৬—৮ কোটি বছর পূর্বেকার)। গণ্ডোয়ানা মহাদেশ কবে স্থাপিত হয়েছিল, কি ভাবে স্থাপিত হয়েছিল এবং কেন স্থাপিত হয়েছিল, সে সব প্রশ্নের জবাব আজও অজ্ঞাত। তবে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ দক্ষিণ গোলার্ধের অধিকাংশ স্থানব্যাপী দীর্ঘদিন স্থিতিলাভ করেছিল; এটুকু বলা চলে—নানাপ্রকার তথ্যের সাহায্যে।

গণ্ডোয়ানা মহাদেশ গঠনকারী দেশগুলির সংযুক্তির কারণ সম্বন্ধে কতগুলি যুক্তি দেখানো হয়েছে। মিষ্টার ওয়েগনারই এই মতের প্রধান সমর্থক। পূর্বোক্ত স্থানগুলির পাথরের মধ্যে, কয়লার মধ্যে ও উদ্ভিদ জীবাশ্মের মধ্যে ভূতাত্ত্বিকেরা অনেক সাদৃশ্য পেয়েছেন। যেমন প্রাচীন যুগের পাথরের চিহ্নগত মিল পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকার পর্বতের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার পর্বতের সাদৃশ্য আছে। দক্ষিণ ভারতের গণ্ডোয়ানা কয়লার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেণ্টিনার কয়লার সঙ্গে বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। একই প্রকার লাল পাললিক শিলা দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রেজিলের কয়লাস্তরে পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে মাদাগাস্কার ও মাদাগাস্কারের সঙ্গে আফ্রিকার স্থলসংযোগের কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। নব্যজীবীয় যুগের প্রথম যামে (ক্রিটেসাস যুগে) নর্মদা ও তাপ্তি নদীর উপত্যকায় সমুদ্র এসে ঢুকেছিল এবং ঐ সমুদ্রের সঙ্গে আরব সাগর ও ইউরোপের তখনকার সমুদ্রের যোগাযোগ ছিল ; কারণ তার সাক্ষ্য—তৎকালীন জীবাশ্ম। যে জীবাশ্ম ভারত ও ইউরোপে পাওয়া গেছে। কিন্তু একই সময়ে (ক্রিটেসাস যুগে) ত্রিচিনপল্লী ও আসামের খাসি পাহাড় অঞ্চলে আরেকটা সমুদ্রের অংশ এসে ঢুকেছিল। তাই উক্ত উভয় অঞ্চলের তৎকালীন জীবাশ্মের সাদৃশ্য আছে।

সুতরাং দেখা যায়, প্রায় সমগ্র দক্ষিণ গোলার্দ্ধব্যাপী এক বিরাট গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল ; দক্ষিণ ভারত হতে অষ্ট্রেলিয়া সমেত কুমেরু পর্যন্ত। তৎকালীন মানচিত্র এখন কল্পনা করা যাক। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল, মাদাগাস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং দক্ষিণ আমেরিকা কুমেরু অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমান ত্রিচিনপল্লী, সিংহল, আসামের বৃহদাংশ, সমগ্র ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও মালয় বঙ্গোপসাগরের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র উপসাগর কিংবা সাগর দ্বারা আবৃত ছিল। খনিজ তৈল, পেট্রোল প্রাপ্তির কারণ—তৈলাক্ত জলজ জীবের দেহাবশেষ ; অর্থাৎ যেখানেই প্রচুর পেট্রোল পাওয়া যায় সেই স্থানই সুদূর অতীতে বহু তৈলাক্ত জলজ-জীবের আবাসস্থল ছিল। তৈলাক্ত জলজ জীব বলতে বুঝা যায়, তিমি, শুশুক, কুমীর, হাঙ্গর, শীলমাছ ইত্যাদি। ত্রিচিনপল্লীর উত্তর হতে তাপ্তি নদী পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বাংলা প্রদেশ পর্যন্ত গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। সমগ্র সুন্দরবন ও দক্ষিণ বাংলা হয়তো তখনও সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল। ত্রিচিনপল্লী

ও ইহার দক্ষিণাংশ ও সিংহল তখনও সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। আসামের ডিগবয়, নুনামাটি, গৌহাটি, শ্রীহট্ট, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ও মালয় সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। উপরোক্ত স্থানগুলিতে প্রচুর পেট্রোল প্রাপ্তির কারণও ঐ একই।

গণ্ডোয়ানা মহাদেশের বিচ্ছিন্নতা বা বিমুক্তির কারণ বর্ণনায় আসা যাক। গণ্ডোয়ানা যুগের প্রারম্ভ বা স্থায়িত্বকাল বর্ণনা করা সুকঠিন; তবে এই যুগের সমাপ্তিকাল পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় অতি আধুনিক। বৈজ্ঞানিকের অনুমান অনুযায়ী নব্যজীবীয় যুগের ইয়োসিন যুগে কিংবা ক্রিটেমাস যুগের শেষ যামে গণ্ডোয়ানা মহাদেশগুলি এক হতে অপরে বিচ্ছিন্ন হয়। কার্বন-ডায়অক্সাইড যুগের শেষ পর্বে বৃক্ষরাজি ও প্রস্তর কর্তৃক উক্ত গ্যাস প্রচুর সংগৃহীত হওয়ায় উক্ত গ্যাসের প্রাচুর্য পৃথিবীতে হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ, গ্রহের তাপমাত্রাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং নিম্নতাপে উক্ত গ্যাস বহুলাংশে দ্রবীভূত হয়ে জল ও মাটির সঙ্গে মিশ্রিত হয়। দ্রবীভূত কার্বন-ডায়অক্সাইড পৃথিবীতে জলের পরিমাণেরও বহুলাংশে বৃদ্ধি ঘটায়। আমাদের এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে কার্বন-ডায়অক্সাইড গ্যাস যুগে অক্সিজেন ছিল অত্যল্প পরিমাণে। বৃক্ষ দ্বারা ও ম্যাগনেসিয়াম্ ধাতু ও ম্যাগনেসিয়াম্ অক্সাইড দ্বারা ও অন্যান্য ধাতুর অক্সাইড দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল অক্সিজেন। নাইট্রোজেন আজিকার মত ছিল না। ভারী অক্সাইডস্ অব নাইট্রোজেন কিছু ছিল (N204) কার্বন ডায়-অক্সাইড যুগের সমাপ্তি পর্বে সেই হিমশীতল জল ভারতের দক্ষিণ দিক হতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে কুমেরু অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। সেই হিমশীতল জল দক্ষিণ গোলার্ধের নিম্নস্থান সমূহকে প্লাবিত করে এবং তৎকালীন ক্ষুদ্র ভারত মহাসাগরকে বর্তমান রূপদানে সমর্থ হয়। সেই হিমশীতল জল কুমেরু অঞ্চলে স্থিতি লাভ করে এবং কুমেরু অঞ্চলের হিমশীতল জলের কলেবরও বৃদ্ধি করে। এইভাবে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে মাদাগাস্কার হ'তে ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া হ'তে মাদাগাস্কার, মাদাগাস্কার হ'তে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা হ'তে দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা হ'তে কুমেরু অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়। এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে পৃথিবী সৃষ্টির আদি হতেই হিমরেখা সৃষ্ট হয় নাই। আমরা জানি যে হিমরেখা উপগোলাকার; অর্থাৎ মেরু অঞ্চলের সঙ্গে বিষুবরেখা অঞ্চলের পঁচিশ হাজার ফুট উচ্চতার পার্থক্য। তুহীনশীতল এমোনিয়াযুগই (বর্তমান শনি ও বৃহস্পতি) আমাদের এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হিমযুগ বা তুষার যুগ সৃষ্টি করে। এমোনিয়া যুগের প্রারম্ভে হিমরেখা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় সমান ছিল; হয়তো সামান্য ৩০।৪০ ফুট উচ্চতার পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়। হাইড্রো-কার্বনযুগের শেষ পর্বে পৃথিবীর মৃত্তিকার স্তর ঘন ও পুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির স্তরে সঙ্কোচন আরম্ভ হয়। মৃত্তিকার অন্তরাঙ্গে অত্যধিক চাপের ফলে পাহাড় পর্বতাদি সৃষ্ট হয় এবং সেটাই পাহাড় পর্বতাদির আদি যুগ। হাইড্রো-কার্বন যুগে পৃথিবী কতগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বদ্ধ জলাশয়ে সীমাবদ্ধ ছিল; সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সাগর, মহাসাগর, পাহাড় ও পর্বতাদি তখনও পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে নাই। কার্বণিফেরাস্ যুগে (হাইড্রো-কার্বনযুগের সমাপ্তিপর্বও এমোনিয়াযুগের প্রারম্ভে) পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে হিমবাহ বা তুষারযুগের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে তুষারযুগে সেই হিমবাহ যে পৃথিবীর হিমরেখার নিম্নস্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল তার কারণও ঐ একই; অর্থাৎ তখনও মৃত্তিকাস্তরে পাহাড় পর্বতাদি বা হিমরেখার সৃষ্টি হয় নাই। মৃত্তিকাস্তরে পাহাড় পর্বতাদির সুষ্ঠু প্রস্তুতি ও হিমবাহের সৃষ্টি হয় কার্বণিফেরাসের পরবর্তী যুগে অর্থাৎ এমোনিয়া যুগ হতে।

সাহারা মরুভূমি অঞ্চলে ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী স্থান সমূহে পর্যাপ্ত পেট্রোল প্রাপ্তির একমাত্র কারণ ঐ একই। সুদূর অতীতে উক্ত অঞ্চলগুলি কোন সাগর কিংবা মহাসাগরে নিমজ্জিত ছিল। নর্মদা ও তাপ্তির উপত্যকার জলাশয়ের সঙ্গে ইউরোপের সমুদ্রের যে যোগাযোগ ছিল, তাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র সাহারা মরুভূমি অঞ্চল, মরোক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, মিশর, সুদান ও আবিসিনিয়া একই সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল; অর্থাৎ নর্মদা ও তাপ্তি হতে সুরু করে পশ্চিম দিকে আরব সাগর, ভূমধ্য সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এক বিরাট জলরাশির অস্তিত্ব ছিল। শুধু তাহাই নহে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের সামান্য পশ্চিমাংশ পূর্বোক্ত জলরাশির অন্তর্গত ছিল। সম্প্রতি কাম্বে উপসাগরের সন্নিহিত স্থানে প্রচুর পেট্রোল প্রাপ্তির ইহাই একমাত্র কারণ। কাস্পিয়ান সাগরের রূপ সুদূর অতীতে ছিল—সম্পূর্ণ অন্যরূপ। কাস্পিয়ান সাগর একদিন সত্যিকারের সাগরই ছিল, যদিও আজ অতি ক্ষুদ্র কলেবরে বিদ্যমান। সমগ্র ইরাক, ইরাণের উত্তরাংশ, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, পশ্চিমদিকে কৃষ্ণ সাগর ও পূর্বদিকে আরল সাগর ও বলখাস হ্রদ পর্যন্ত উহার সীমানা বিস্তৃত ছিল। তজ্জন্যই উক্ত অঞ্চলের বাকু, বাটুম, ইরাকের মাসুল অঞ্চল, ইরাণের উত্তরাংশ, এমন কি রুমানিয়ায় প্রচুর পেট্রোল প্রাপ্তির কারণ। শুধু তাহাই নহে, কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিহিত স্থানসমূহে মরুভূমিসম শুষ্ক আবহাওয়ার কারণও ঐ একই। সমুদ্র হতে উত্থিত স্থানসমূহে দীর্ঘদিন ব্যাপী মরুভূমি কি মরুভূমিসম শুষ্ক আবহাওয়া বিদ্যমান থাকে। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু হতে সিরিয়া, ইরাক ও উত্তর ইরাণ বঞ্চিত হলে উক্ত দেশত্রয়ের আবহাওয়া আরও শুষ্ক ও মরুভূমিসম হোত এবং পেস্তা, আখরোট, বাদাম উৎপাদনেও বহুলাংশে বঞ্চিত হোত।

সমগ্র আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে প্রচুর পেট্রোল প্রাপ্তির কারণও ঐ একই। হয়তো সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো একদিন সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিল কিংবা এমনও হ'তে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোল প্রাপ্তির স্থান, ক্যালিফোর্ণিয়া সমেত সমগ্র মেক্সিকো প্রদেশ একদিন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। তবে সেটা মধ্যজীবীয় যুগের ইতিহাস (মেসোজোয়িক যুগের)। পৃথিবীর ৭০ ভাগ পেট্রোল তৈল ক্যালিফোর্ণিয়া ও আপালেশিয়ান অঞ্চলে পাওয়া যায়। সমুদ্র হতে সাহারা মরুভূমির উত্থানের ন্যায় উহার ইতিহাস আধুনিক যুগের নয়; মধ্যজীবীয় যুগের। যে সব দেশ সমুদ্রের দিকে ক্রমশঃ সরু হতে হতে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যায়, সেই সব ভূমিখণ্ড অতীতে সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল, যেমন ক্যালিফোর্ণিয়া, মেক্সিকো, মালয় প্রভৃতি।

লৌহ ও ইস্পাতের ইতিহাস কিন্তু অন্যরূপ। লৌহ ও ইস্পাত সম্পদ অধিকাংশ সঞ্চিত রয়েছে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে, যেমন সুইডেন, সাইবেরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, জাপান, কানাডা, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স ও

জার্মাণী। পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চলের লৌহ সম্পদের সঠিক ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের পর্যাপ্ত লৌহ ও ইস্পাত সম্পদ পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি উৎপাদনে প্রধান সহায়ক। উহার অন্য আরেকটি কারণ, পৃথিবীর মধ্যভাগ অর্থাৎ বিষুবরেখা অঞ্চলের ন্যায় উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মাটির স্তর সমভাবে পুরু নহে; অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকট মাটির স্তর যদি ৪০০০ হাজার মাইল পুরু হয়, মেরুপ্রদেশদ্বয়ে ও তৎসন্নিহিত স্থানে মাটির স্তরের ঘনত্ব তদপেক্ষা কম হবে।

লৌহ সম্পদে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম। আমেরিকা ও সুইডেনের লৌহশিলা উৎকৃষ্ট। লৌহের পক্ষে ক্ষতিকর ফসফরাস্ ও গন্ধকের অংশ ঐ সব লোহায় নেই। রাশিয়ার ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলে ম্যাগনেটাইট নামক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ পাওয়া যায়। অঙ্গার ও মাঙ্গানীজের সাহায্যে লৌহকে ইস্পাতে পরিণত করা হয়। জার্মাণীর লৌহ সম্পদ খুব বেশী উন্নত স্তরের নহে। মস্কোর দক্ষিণে টুলা অঞ্চলে প্রচুর লৌহ সম্পদ আছে। লৌহ ও ইস্পাত সম্পদ পৃথিবীর মৃত্তিকান্তরে এক আদি ও প্রধান ইতিহাস রচনা করেছে। হাইড্রো কার্বনযুগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (এমোনিয়াযুগে) যুগদ্বয়ে পৃথিবীর তড়িৎ-চুম্বকীয় যুগের ইতিহাস রচিত হয়েছে উক্ত ধাতুদ্বয় ও লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ধাতু দ্বারা। সেই তড়িৎ-চুম্বক যুগ সৃষ্টিতে পূর্বোক্ত ধাতু সমূহের কাহারও অবদান কম নহে। পৃথিবীর সেই আদি তড়িৎ-চুম্বকীয় যুগে যখন লৌহ, ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট সমন্বয়ে পৃথিবীর মৃত্তিকান্তরে প্রথম খোল (clutrosphere) রচিত হয়েছিল, তখনও উক্ত ধাতুসমূহ তরল ও ভারী তরল পদার্থে নিহিত ছিল; অর্থাৎ কাঠিন্য লাভে অসমর্থ ছিল—উত্তাপ বশতঃ। সে যুগ ছিল হাইড্রো কার্বনেরও বহু পূর্ববর্তী যুগ। হাইড্রো কার্বনের ঠিক পরবর্তী যুগে এমোনিয়া গ্যাস যুগে স্বল্প চুম্বকীয় ধাতুসমূহ (যেমন প্লাটিনাম, পালাডিয়াম, শক্ত অক্সিজেন ও লৌহের লবণজাত দ্রব্য এমোনিয়া যুগের অতি শীতল আবহাওয়া অর্থাৎ প্রায়—১২০° সেণ্টিগ্রেড হতে—২৩৫° সেণ্টিগ্রেড তাপে অত্যধিক চুম্বকীয় শক্তির অধিকারী হয়। অন্যদিকে ঐ এমোনিয়া গ্যাস যুগের কোন ভাগে ফ্লুরিন গ্যাস, লিথিয়াম, পটাসিয়াম্ ও সোডিয়াম্ ধাতুসমূহের সংযোগে পৃথিবীর মাটিতে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করে—শীতল আবহাওয়ায় কিন্তু অত্যধিক শীতল নয়। (শূন্য ডিগ্রি হতে মাত্র কয়েক ডিগ্রি নিম্ন তাপে)। পৃথিবীতে আজ তড়িৎ উৎপাদন এত সহজসাধ্য হওয়ার উহাই একমাত্র কারণ।

এমোনিয়া যুগ হতেই পৃথিবীর মাটি তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তিতে পরিণত হয়; যদিও চৌম্বক যুগের আদি ইতিহাস অতি প্রাচীন। বৃহস্পতি ও শনি গ্রহদ্বয়ে বর্তমানে তুহীন শীতল এমোনিয়া যুগ, অর্থাৎ তড়িৎ-চুম্বকীয় যুগ। মৃতপ্রায় মঙ্গলগ্রহে তড়িৎ উৎপাদন সম্ভব হলেও আজ সেখানে তড়িৎশক্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

কয়লার উৎপাদন একমাত্র অতীতের বৃহৎ অরণ্যানীর সাক্ষ্য। বৃহৎ মহীরুহ যে পৃথিবীর নানাস্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান ছিল, তারই সাক্ষ্য দেয় বর্তমান কয়লার অস্তিত্ব। হাইড্রো কার্বন যুগের অধিকাংশ বৃক্ষ, যেমন পাইন ফার্ণ প্রভৃতির জীবাশ্ম কয়লাতে অধিক পাওয়া যায়। উহাদের আকৃতি তখন আজিকার তুলনায় অতি বৃহৎ ছিল। হাইড্রো কার্বন যুগের শেষ পর্বে (কার্বনিফেরাস যুগ কিংবা উহার নিকটবর্তী যুগ) এবং এমোনিয়া যুগের প্রারম্ভে ঐ সব মহীরুহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাটির নীচে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। উক্ত বৃক্ষাদির বহুলাংশ পৃথিবীর সঙ্কোচন জনিত অত্যধিক চাপে লাভা প্রবাহের সাহায্যে অত্যল্পকালের মধ্যেই তরল কয়লা বা তরল এমোনিয়ায় (Ammoniacal liquor) পরিণত হয়, সেই তরল এমোনিয়াই পৃথিবীতে এমোনিয়া গ্যাস যুগের সৃষ্টি করে।

এমোনিয়া গ্যাস যুগ হতে কার্বন ডায়-অক্সাইড যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্কোচনের ফলে মাঝে মাঝে পৃথিবীর অন্তরাঙ্গের উত্তপ্ত গ্যাস ও ধাতুসমূহ লাভা প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল। ঐরূপ একটি লাভা প্রবাহের সাক্ষ্য বিহারের রাজমহল পাহাড়। ঐ একই যুগে অনুরূপ লাভার অস্তিত্ব দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়। অনুরূপ একটি লাভা প্রবাহ আজও বঙ্গোপসাগরে বিদ্যমান, যাহা "বরিশালের কামান" নামে খ্যাত (Barisal Gun); অর্থাৎ উহা একটি বঙ্গোপসাগরে কর্মব্যস্ত আগ্নেয়গিরি। স্থলে অবস্থিত হোলে উহার শব্দ দশগুণ বর্দ্ধিত হ'ত। পৃথিবীর স্তর ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তরাঙ্গে মাঝে মাঝে যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাহাই লাভা উদ্গীরণ বা আগ্নেয়গিরি নামে খ্যাত। পৃথিবীতে পাহাড় পর্বতাদি, সাগর ও মহাসাগরের সৃষ্টি পর আরম্ভ হয় হাইড্রো কার্বন যুগের সমাপ্তি পর্ব হতে বা এমোনিয়া যুগের প্রথম ভাগ হতে (কার্বনিফেরাস যুগের পরবর্তী যুগ)। সব পাহাড় পর্বতই লাভা প্রবাহে সৃষ্ট হয় নাই, কতগুলি ক্ষেত্রেই লাভা প্রবাহের ...ড়াশীলতা দেখা যায়। তবে এটা সত্য যে আভ্যন্তরীণ চাপেই ...াহাড় পর্বতের সৃষ্টি। নদীর স্রোতের ন্যায় মৃত্তিকার অন্তরাঙ্গে ... চাপে ও তাপে বহুদূরব্যাপী সেই স্রোত প্রবাহিত হয়, যেমন ...মিকম্পের দিগন্তব্যাপী বিস্তৃতি।

পৃথিবীর খনিজ সম্পদ:—ভারতবর্ষের আসানসোল, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, গিরিডি অঞ্চলে প্রচুর কয়লাখনি আছে। ভারতের দাক্ষিণাত্যেও যথেষ্ট কয়লার খনি আছে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে কয়লার খনি আছে। রাশিয়ার মস্কোর দক্ষিণে টুলা অঞ্চলে ও ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কয়লা উৎপাদনে প্রথম। তাম্র সীসা, দস্তা, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মাঙ্গানীজ প্রাপ্তির স্থানগুলি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কোন বিশেষ নিয়মে বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শুধু কয়লা উৎপাদনেই প্রথম নয়, পেট্রোল, লৌহ, সীসা ও দস্তা উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম; রৌপ্য ও তাম্র উৎপাদনে দ্বিতীয়, স্বর্ণ উৎপাদনে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র মাঙ্গানীজ উৎপাদনে প্রথম, ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। পূর্বে ভারতই প্রথম স্থানের অধিকারী ছিল। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র স্বর্ণ ও পেট্রোলিয়াম উৎপাদনে দ্বিতীয়, লৌহে তৃতীয় ও কয়লা উৎপাদনে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। গন্ধক প্রাপ্তির প্রধান স্থান জার্মাণী ও ফ্রান্স। ইউরোপে তাম্র প্রাপ্তির প্রধান স্থান রাশিয়া, সুইডেন ও স্পেন। তাম্র উৎপাদনে দক্ষিণ-আমেরিকার চিলি শীর্ষস্থানের অধিকারী। এলুমিনিয়াম প্রাপ্তির প্রধান স্থান জার্মাণী, ফ্রান্স ও রাশিয়া। বক্সাইট হতেই ক্রাইয়োলাইট ধাতুর সাহায্যে এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। বক্সাইট উৎপাদনে জামাইকা, বৃটিশ ও ডাচ গিয়ানা

এবং ফ্রান্স প্রধান। হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায়ও প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়।

যন্ত্র-শিল্পের অগ্রগতি ও সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারাই এলুমিনিয়াম শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রভূত বক্সাইটের অবর্তমানেও বৃটিশ ও ডাচ গিয়ানা হতে বক্সাইট আমদানী করে উন্নত এলুমিনিয়াম শিল্প গড়ে তুলেছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরের প্রয়োজনীয় ৩০ হাজার টন এলুমিনিয়াম উৎপাদন অসাধ্য নয়; যদি আমরা আমাদের দেশের কোটি কোটি টন অব্যবহৃত বক্সাইটের সদ্ব্যবহার করতে পারি—সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক প্রথার সাহায্যে। আমাদের দেশে বর্তমানে ১৫ হাজার টন বক্সাইট পাওয়া গেছে এবং বৎসরে মাত্র ৩০।৪০ টন এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে ও ছোট নাগপুরে প্রচুর বক্সাইট আছে। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান অনুযায়ী ভারতের মাটিতে কোটি কোটি টন উচ্চশ্রেণীর বক্সাইট আছে। অনুরূপ ভাবে কাম্বে উপসাগরের তীরবর্তী স্থানসমূহে, রাজস্থানের সম্বর, ও পুষ্কর হ্রদের সন্নিহিত স্থানসমূহে এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সুষ্ঠু ও সুচারু রূপ খনন দ্বারা পেট্রোল প্রাপ্তির আশা করা যায়।

লৌহ উৎপাদক দেশের যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতির উপরি উক্ত শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। ভারত আজ উন্নত দেশসমূহের সাহায্যে এই অগ্রগতির পথে। লৌহশিল্পে ভারতের সুবিধা এই যে, যেখানে বৃটিশ ও জার্মাণীতে লৌহ শিলা হতে মাত্র ৩০ ভাগ ভাল লৌহ পাওয়া যায়, সেখানে ভারতের হেমাটাইট লৌহশিলা হতে শতকরা ৬৫ ভাগ ভাল লৌহ পাওয়া যায়। অভ্র উৎপাদনে ভারত শীর্ষস্থানীয়। রৌপ্য উৎপাদনে আমেরিকার মেক্সিকো শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। মেক্সিকোতে প্রচুর পেট্রোলও পাওয়া যায়। কানাডার পুর্বাঞ্চলে পৃথিবীর ৯৫ ভাগ এসবেষ্টস্ পাওয়া যায়। মালয় দেশ টিন উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয়। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার নানা স্থানেই টিন পাওয়া যায়।

লবণ হ্রদ ও লবণ:—রাজস্থানের সম্বর, পুষ্কর প্রভৃতি হ্রদের জল হতে লবণ পাওয়া যায়। পূর্ব-পাঞ্জাবের মণ্ডিরাজ্যে খনিজ লবণ আছে। কাম্পিয়ান হ্রদ একটি বৃহৎ লবণ হ্রদ। যুক্তরাষ্ট্রের রকি পার্বত্য অঞ্চলে কয়েকটি লবণ হ্রদের সমাবেশ দেখা যায়। মধ্য-এসিয়ার কাম্পিয়ান, আরল, বলখাস, ইরাণের উরুমিয়া, আর্মেনিয়ার ভান হ্রদ এবং ইস্রাইলের মরুসাগর এসিয়ার উল্লেখযোগ্য লবণ হ্রদ। এই সব লবণ হ্রদের অস্তিত্বের কারণ কি? পৃথিবীর অধিকাংশ লবণ হ্রদ প্রাচীন যুগে এক-একটি সমুদ্র কিংবা বৃহৎ জলাশয়ের অংশ বিশেষ ছিল। বিরাট কালের ব্যবধানে সেইসব সমুদ্রের দেহ ভরাট হতে হতে অতি ক্ষীণ কলেবরে তাদের সাক্ষ্য রেখে গেছে—অতি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হ্রদ রূপে। মধ্য-এশিয়া, ইরাণ, ইস্রাইল ও আর্মেনিয়ার হ্রদসমূহ সুদূর অতীতে কাম্পিয়ান সাগরের দেহেই লীন ছিল। কাম্পিয়ান হ্রদ তখন সত্যিকারের সাগরই ছিল। রাজস্থানের সম্বর, পুষ্কর প্রভৃতি হ্রদগুলিও সুদূর অতীতে অর্থাৎ যখন আটলাণ্টিক মহা সাগর, ভূমধ্য সাগর ও আরব সাগর একই জলাশয়ের অন্তর্গত ছিল, সেই সময়ের ঐতিহাসিক সাক্ষ্যরূপে উক্ত হ্রদদ্বয় আজও ক্ষীণ কলেবরে বিরাজমান। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র পশ্চিম পাকিস্থান ও ভারতের সামান্য পশ্চিমাংশ ঐ জলাশয়ের অন্তর্গত ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপিরিয়র, অণ্টারিও, মিসিগান প্রভৃতি পাঁচটি সুপেয় জলের হ্রদ পৃথিবী বিখ্যাত। আশা করা যায়, উহারাও একদিন কোন সাগরের অংশরূপে বিরাজমান ছিল এবং তখন উহারা লবণাক্ত ছিল। সেণ্ট লরেন্স নদী দ্বারা পাঁচটি হ্রদ বিধৌত হওয়ায় এবং শীতকালে হিমবাহদ্বারা বিধৌত হওয়ায় উপরোক্ত পাঁচটি হ্রদের লবণাক্ত অংশ সুপেয় জলে পরিণত হয়েছে। অতীতের বহু লবণ হ্রদের সুপেয় হ্রদে পরিণতি লাভের কারণ ঐ একই, অর্থাৎ বাহিরের হিমবাহ কিংবা নদী দ্বারা উহারা উত্যক্ত না হলে আজও লবণ হ্রদ রূপে পরিগণিত হোত।

সময় সময় দুই পর্বত কিংবা পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বৃষ্টিপাত কিংবা প্রস্রবণ দ্বারাও হ্রদের সৃষ্টি হয়। উহাদের ইতিহাস অন্যরূপ। যুক্তরাষ্ট্রের রকি পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি লবণ হ্রদের ইতিহাসও হয় তো এই সাক্ষ্যই দেয় যে সমগ্র রকি পার্বত্য অঞ্চল, কালিফোর্নিয়া ও মেক্সিকো একদিন সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল। এ প্রশ্নের মীমাংসা আজও বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাত। বিশ্বস্রষ্টা কোন দেশকেই খনিজ সম্পদ কিংবা শস্য সম্পদ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেনি। যে দেশ নদী কিংবা জলাশয় হতে বঞ্চিত সেখানে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য; যে দেশ খনিজ সম্পদ হতে বঞ্চিত সেখানে নদীবহুলতা ও ভূমির উর্বরতা দ্বারা শস্যের প্রাচুর্য। উভয় সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়েও কোন কোন দেশ বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। স্রষ্টা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট নন। সুবৈজ্ঞানিকের কর্তব্য বিধাতার দানকে সুষ্ঠু সুন্দর ও সুচারু রূপে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রয়োগ দ্বারা মানব কল্যাণকর কার্যে প্রয়োগ করা। কোটি কোটি বৎসরের সৃষ্ট এই সুন্দর পৃথিবীকে হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ধ্বংস আনয়ন কোন বৈজ্ঞানিকেরই উচিত নয়। সে মানবজাতির চির শত্রু।

LIFEBUOY
SOAP

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

**বাপ্পি দেবী**

আমাদের রওনা হবার আগের দিন এলো কমলেশের টেলিগ্রাম সুব্রতর নামে—সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আপনারা কোচিনে মালাবার হোটেলে আসুন।

সুব্রত বলল, মেয়েটি একটি জুয়েল। আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন সঞ্জয়দা ষ্টেশনে। ট্রেন ছাড়বার আর দেরী নেই।

শাস্তাদির ভ্রমণের নেশার উজ্জ্বল বাতিটা যেন হঠাৎ নিবু নিবু হয়ে গেছে। ম্লানমুখে বললেন তিনি সঞ্জয়দাকে—আমার যে আর যেতে ইচ্ছে করছে না গো! যাওয়াটা ক্যানসেল করলে কেমন হয়? তুমি যে নিজে কিছুই করতে পারো না, ঐ ঝি-চাকরের ভরসায় তোমাকে রেখে যেতে যে আমার কিছুতেই মন সরছে না।

হো, হো, করে হেসে উঠলেন সঞ্জয়দা।

—তুমি যে আমার সঙ্গে সেই শান্তিপুরের নৌকতা সুরু করলে গো। শুনেছি ওখানকার কোন গেরস্ত অতিথিকে নৌকোয় তুলে দিয়ে বলেছিলো, আজ থেকে গেলে হোত না? আমরা হেসে উঠলাম সঞ্জয়দার কথায়।

—আহা। কি তোরা বাজে কথায় হাসিস যে,—ভালো লাগে না। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন শাস্তাদি। তারপর কান্নাভরা গলায় বললেন—কখনো তোমাকে রেখে কোথাও যাইনি তো, তাই বড্ড অস্থির হচ্ছে মনটা।

ট্রেনের যাত্রা ঘণ্টি বাজলো।

সঞ্জয়দা কামরা থেকে নেমে যাবার সময় শাস্তাদির একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে দরদভরা কণ্ঠে বললেন—তুমি কিছু ভেবো না শান্তু। অসুবিধে সহ্য করবার পাত্তোর আমি নই। তেমন কিছু হলে, জোর তাগাদা দিয়ে তোমাকে আনিয়ে নেব।

গাড়ী ধীরে ধীরে চলতে সুরু করলো। শাস্তাদি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জলভরা চোখ দুটি মেলে চেয়ে রইলেন সঞ্জয়দার দিকে।

সঞ্জয়দা হাসিমুখে, হাত নেড়ে বিদায় জানাতে লাগলেন আমাদের।

পরদিন দুপুর একটায় মাদ্রাজ থেকে আমরা কোচিনের ট্রেন ধরলাম। এদিকের পথের দৃশ্য ভারি গুরুগম্ভীর, এবড়ো-খেবড়ো, লাল, কাল, শাদা, ন্যাড়া পাহাড়গুলো সারিবদ্ধ ভাবে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় খাদগুলো যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। কোথাও আবার মালাবার টিকের ঘন জঙ্গল।

ট্রেনে মোটে গল্প জমলো না। সকলকারই কেমন বিমর্ষ ভাব।

শাস্তাদি উল কাঁটা নিয়ে বুনতে বসলেন, সঞ্জয়দার জন্য নতুন আরম্ভ করা জারকিনটা।

পরদিন বেলা একটা নাগাদ আমরা পৌঁছোলাম কোচিনে।

ষ্টেশনে এসেছিলো কমলেশ, ওর সঙ্গেই আমরা গেলাম, উইলিংডন্ আইল্যাণ্ডে, মালাবার হোটেলে।

কি অপূর্ব্ব জায়গাটা! দ্বীপের চারপাশে আরব সাগরের ধূ-ধূ করা নীলজল। এ জলে উত্তাল তরঙ্গমালা নেই, এর নাম ব্যাক্ ওয়াটার্স?

আরব সাগর থেকে বিরাট চওড়া নদীর মত এই জলরাশি, কেরালার ভেতর দিয়ে চলে গেছে মাইলের পর মাইল। এই জলের ভেতর, ছড়ানো ছিটোনো অনেকগুলো ছোট বড় দ্বীপ আছে। আইল্যাণ্ডের জলের ধারে পাথরের বাঁধ দেওয়া, আর সেই পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে অশান্ত জলোচ্ছ্বাস। আশে পাশের দ্বীপের ঘন নারকোল বীথির ঝাঁকড়া মাথাগুলো নীল আকাশের গায়ে, উদ্দাম সাগর বাতাসের দোলা লেগে, মাতামাতি করছে।

ওদের সাঁ, সাঁ, সাঁ,—সর, সর, সর, অবোধ্য ভাষার কলগুঞ্জন ভেসে আসছে বাতাসে।

দু'খানি ঘর পাশাপাশি। একটি বসবার ও একটি শোবার ঘর।

স্থির করা হলো, বসবার ঘরে সুব্রত আর ছোেট লোকার শোবে রাত্রে, আর দিনের বেলায় ওটা ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আর অপর ঘরটি রইলো আমাদের জন্য। কমলেশের সেই বিশেষ বন্ধুটির সঙ্গে কিন্তু দেখা হলো না আমাদের। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে নাকি বোম্বাই চলে গেছেন বিশেষ প্রয়োজনে।

বিকেলে আমরা ঐ হোটেলের একটি প্রাইভেট ট্যাক্সি নিলাম, বেড়াবার জন্য।

প্রথমে আইল্যাণ্ডের চার পাশে ঘোরবার পর ব্রিজ পেরিয়ে আমরা গেলাম এর্ণাকুলামে। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ওখানকার প্রধান প্রধান কয়েকটি রাস্তার নাম আমাদের বললো কমলেশ।

—এইটি হলো ব্যানার্জ্জি রোড, এটি গান্ধি রোড, এর নাম সেভেনটি ফিট রোড,—দরবার হল রোড। সম্মুখস্ রোডটি ঠিক সমুদ্রের ধারেই।

এর দৃশ্য অনেকটা বোম্বের ম্যারিণবীচ-এর মত। চমৎকার চওড়া পিচের রাস্তার একধারে বড় বড় অট্টালিকা।

কোর্ট কাছারি, সরকারী মন্ত্রণালয়, নামকরা কলেজ, স্কুল, হোটেল, ইত্যাদি। অপর দিকে ব্যাক্ ওয়াটার্স-এর নীল জলকল্লোল। কমলেশের নির্দ্দেশ মত আমাদের গাড়ী থামলো ব্রডওয়েতে।

ঐ জায়গাটাকে আমাদের কলকাতার নিউ মার্কেট বলা যায়। বেশ বড় বড় সুসজ্জিত দোকানগুলো। শাড়ী-ব্লাউস্, সিল্ক সুতি, ছিট কাপড়ের দোকান থেকে আরম্ভ করে কাঁচের বাসন, মণিহারী দ্রব্য, কাঁসা পেতলের বাসন, ফল, কফি, বিস্কুট, সোনারুপার গহনা, সব কিছু এখানে পাওয়া যায়।

এখানকার হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসছে দামি কফির গন্ধ।

সবচেয়ে চমৎকার লাগলো আমার, এখানকার পুরোণো আমলের ঘর বাড়ীগুলো। একতলা বা দোতলা সব বাড়ীরই ছাদগুলো লাল কালো খাবড়া দিয়ে তৈরী,—ঠিক বিলিতি কটেজের মত। কোনটি চৌকো আকারের, কোনটি লম্বাটে। ছাদের চারকোণ গোপুরমের ঢংএ, একটু বাঁকানো মত। প্রশস্ত, লম্বা কাঠের বারান্দা, মেহগনি কাঠের পালিশ করা দরোজা, জানলা, কাঁচের শার্সি, ফুলের বাগান, বেঁটে বেঁটে নারকোল গাছের মাথায় সোনালী রং নারকোলের কাঁদি, চকচকে নারকোল পাতার সবুজ বাহারে ঝালর, সব মিলিয়ে জায়গাটাকে, বিলেতের কোনো সুদৃশ্য রমণীয় ভিলেজ বলে মনে হচ্ছিলো। আধুনিক ডিজাইনের বাড়ীও এখন অনেক হয়েছে। ব্রডওয়েতে নেমে আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম দোকানগুলো।

কমলেশ বলল—ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, মাইসোর সিল্ক, সিফন্, কাঞ্জিভরম শাড়ী এখানে অর্দ্ধেক দামে পাবেন, ক'খানা নেবেন বলুন।

—না, শাড়ী আজ নয়, বললাম আমি, বরং আসুন এখানকার ঐ চমৎকার কাঠের খেলনা আর হাতির দাঁতের কিছু জিনিষ কেনা যাক।

—না, না। ওসব জিনিস কিনতে হলে কোর্ট জেটিনের দোকানে আরো ভালো পাবেন। চলুন এবারে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে। কাল ও।

একটা হোটেলে গিয়ে আমরা, কফি আর মশলা ধোসা খেয়ে নিয়ে আবার গাড়ীতে ফিরে এলাম।

এবার আমরা নামলাম বোট জেটিতে। পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা অন্তরই এখান থেকে ফেরি ষ্টীমার ছাড়ছে। ব্যাক ওয়াটারের বুকে চলেছে অসংখ্য বোট, জেলেডিঙ্গি। এখানে জলযানই বেশী প্রয়োজনীয়। কারণ মোটরের সংখ্যা কম, আর ভাড়া খুব বেশী। বাসে বা মোটরে যাতায়াতের সময় ও বেশী লাগে, পথের দূরত্বের জন্য। সেজন্য জলযানেই সাধারণ মানুষ যাতায়াত করে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে।

উইলিংডন আইল্যাণ্ড ছাড়া অন্য দ্বীপের কোনো ব্রীজ নেই, সেজন্য সে সব জায়গায় যাবার উপায় হচ্ছে একমাত্র এই সব ফেরী ষ্টীমার, বোট আর ডিঙি। সেজন্য এই বোট জেটিতে ভীড় সব সময় লেগে আছে।
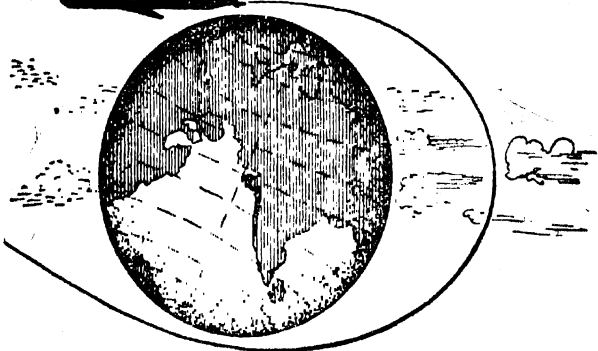
বোট জেটির পাশেই সুভাষ পার্ক। নেতাজীর নামে, এই পার্কটির নামকরণ হয়েছে। চমৎকার পরিচ্ছন্ন বিরাট আকারের পার্কটা সমুদ্রের ধারেই। চারিদিকে নানা রংএর ফুলের শোভা, কোথাও বা অর্কিড ঘেরা গাছ ঘর, কোথাও ফোয়ারার জলে ফুটেছে লাল শাদা পদ্ম।

চওড়া চওড়া, সিমেণ্টের আর কাঠের বেঞ্চি সাজানো, এখানে ওখানে।

অনেক মেয়ে-পুরুষ আর ছোট ছেলেমেয়ের ভীড় এখানে। ফেরিওয়ালা বিক্রি করছে, চানাচুর, কাজুবাদাম।

আমরা ব্যাক্ওয়াটারের ধারে চওড়া বাঁধের ওপর গিয়ে বসলাম।

বন্ধন-যন্ত্রণায় কাতর আরবসাগর নন্দিনী কল কল ছলাৎ ছলাৎ রবে মাথা কুটছে পাষাণ বাঁধের ওপর। চূর্ণ জলকণা মাঝে মাঝে এসে লাগছে আমাদের গায়ে।

এখানকার বেশীর ভাগই লোকেদের দেখলাম খালি পা। শুনলাম এখানে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, আর রাস্তায় প্রচুর বালির জন্যই নাকি সাধারণ লোকেরা জুতো ব্যবহার করেন না।

পুরুষরা সাধারণতঃ লুঙ্গির মত করে ধুতি পরেন,—আবার নিচে থেকে অর্দ্ধেকটা ধুতির অংশ পাট করে উল্টে কোমরে গুঁজে রাখেন কাজের সময়।

গায়ে শার্ট বা ফতুয়ার ওপর চাদর সরু করে ভাঁজ করা কাঁধের দু'পাশে ঝুলতে থাকে। এইটাই এদের দিশি সাজ। অনেকের পরণে অবশ্য দামি স্যুট, বা পায়জামা শার্ট, পাঞ্জাবিও দেখলাম। মেয়েদের পরণে লুঙ্গি, বা পা পর্যন্ত ঝুল ঘাগরা, ওপরে জ্যাকেট আর চাদর।

গ্রাম্য-মেয়েদের গায়ে চাদরের বালাই নেই! তবে আজকালকার শিক্ষিতা আধুনিকারা ঐ দিশি পরিচ্ছদ ছেড়ে শাড়ী ব্লাউস পরছেন আমাদের মত করে।

এ দেশের মেয়েদের মাথার চুল অপূর্ব্ব। চকচকে কালো ঘন লম্বা চুলের রাশ—ওঁরা ঘাড়ের কাছে শক্ত করে লম্বা ঝোলানো আকারে খোঁপা বাঁধেন। ঐ রকম খোঁপাকে বাংলায় কাগ খোঁপা বলে। ঐ খোঁপায় দেন ফুলের স্তবক। ভারি চমৎকার লাগে দেখতে। অনেকের মাথায় লম্বা বেণীতে ফুল জড়ানো দেখলাম।

পার্কের হেডমালী আর তাঁর স্ত্রী কায়রণ এলেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। ভিন্ন প্রদেশের কেউ পার্কে এলেই তাদের সঙ্গে ওঁরা নিজেরাই এগিয়ে এসে আলাপ জমান। ওঁদের দু'জনার পরণেই দিশি সাজ। কায়রণের চকচকে কাগ খোঁপায় গোঁজা হলুদ রংএর পুষ্পস্তবক।

এদেশের মুটে-মজুর, ধোপা, নাপিত, দোকানদার, সকলেই অল্প বিস্তর ইংরাজি জানে। ইংরাজির মাধ্যমেই এঁরা বিভিন্ন প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালান। রাঘবন আর কায়রণ,—বেশ ভালো ইংরাজি কথা বলেন।

এই ইংরাজি ভাষার চলন এদেশে এত বেশী কি করে হলো, সেই প্রসঙ্গের জবাবে বললেন রাঘবন—এদেশে ইহুদিরা এসেছিল দু'হাজার বছর আগে। সেই সময় থেকেই এদেশে চলতি হয়েছিলো, ইংরাজি ভাষা, আর ক্রমে ক্রমে খৃষ্ট ধর্ম্ম।

কোচিনে ম্যাটেচারিয়ায় এখনও ওদের বংশধরেরা বাস করে। ওঁরা নিজেদের বলে থাকেন ইহুদি।

এতকাল এদেশে বাস করেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে ওরা।

এখান থেকে চা, কফি, নারকোল, দারুচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, সমুদ্রের মাছ প্রভৃতি জিনিষ ওরা বিদেশে চালান দিয়ে প্রচুর পয়সা উপার্জ্জন করে।

ওরাই এখানকার সবচেয়ে পুরোনো বিদেশী বাসিন্দা। ভাস্কো ডা গামা, তো এই সেদিন এসেছে।

আমি বললাম—এখানে বাঙালীর নামেও তো রাস্তা আছে দেখছি, ব্যানার্জ্জি রোড। ভারি আশ্চর্য্য লাগছে দেখে।

—হ্যাঁ! তা হবে না কেন? বাঙালীর প্রতিভা তো সর্ব্বত্রই স্বীকৃত। ওঁর নাম ছিলো এ্যালবিয়ন ব্যানার্জ্জি। উনি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। রাজা প্রজা সকলেই এঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, কারণ ওঁর দ্বারা রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিলো। তাঁর নামেই এই ব্যানার্জ্জি রোড।

জবাব দিলেন কায়রণ মিষ্টি হাসির সঙ্গে। ভারি চমৎকার, হাসিখুসি মেয়েটি। কথায় কথায় সাদা ঝক্‌ঝকে মুক্তোর মত দাঁত বার করা হাসিটিও ওর ভারি সুন্দর।

এ দেশটা আমাদের কেমন লাগছে বা এখানকার সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্বন্ধে টুক্‌রো কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো।

রাঘবন দম্পতি বিনীত অনুরোধ জানালেন, এই পার্কের পাশেই ওঁদের ছোট্ট কুটীর, যদি আমরা গিয়ে একটু কফি খেয়ে যাই, তবে ওঁরা বিশেষ আনন্দিত হবেন। ওঁদের ভদ্র ব্যবহারে বড়ই খুসি হয়েছিলাম আমরা।

আজ কিন্তু ওদের বাড়ী যাওয়া হলো না, আরেকদিন অবশ্যই আসবো কথা দিয়ে, আমরা ফিরে এলাম গাড়ীতে।

কায়রণ ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো একরাশ গোলাপ আর ডালিয়া ফুল। আমাদের প্রত্যেকের হাতে ফুলের গুচ্ছ দিয়ে বারংবার বললো,—ওদের যেন ভুলে না যাই।

গাড়ীতে যেতে যেতে আমি বললাম শান্তাদিকে—এই দরবার হল রোডে তো কাবেরীদির মেসোমশাই মহেশ মেননের বাড়ী, একবার ঘুরে গেলে হয় না? কাবেরীদি অনেক করে বলেছিলেন, ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে।

সুব্রত বললো—না, না, ওসব ঝামেলা এখন থাক। বড্ড টায়ার্ড ফিল করছি। তোমরা তো এখন ক'দিন থাকছো পরে দেখা কোরো।

হোটেলে ফিরে, ডিনারের পর আমরা সমুদ্রের ধারে লনে, চেয়ারে বসলাম। এখানে ওখানে চেয়ার টেবিল সাজানো।

ডাইনিং রুমে খুব ভিড় দেখলাম।

বিদেশী জাহাজ নোঙর করেছে এখানকার বন্দরে। দু-তিনদিন থাকবে। জাহাজে এসেছে, অনেক সৈন্যবিভাগের লোক, ব্যবসায়ী, আর ছাত্র।

খাবার সময় এদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ছিলো, কমলেশ আর সুব্রত। লনে ওদের সঙ্গেই ওরা বসেছে, আমাদের চেয়ে একটু দূরে।

আমি, শান্তাদি আর যোগলক্ষ্মী আমরা বসেছিলাম সমুদ্রের ধার ঘেঁসে। ব্যাক্ওয়াটারের তীর কালো টলটলে জলে, ঝিল ঝিল্ করছে, দীপের আলো। রাত ছটা। দূরে দূরে,—কোনো

নোনো দ্বীপের নারকোল কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে ঝিক্ মিক্ করছে আলো, বোলগ্যাটিন্ দ্বীপের আলোগুলোই বেশী নজরে পড়ে।

সোঁ, সোঁ করে ভেসে আসা সমুদ্র বাতাসে শির শির—ঝির, ঝির—নারকোল বীথির আবহ সঙ্গীত।

দূরে দেখা যাচ্ছে—আরব সাগরের উত্তাল তরঙ্গের শাদা ফেনা, তুলোর বস্তার মত গড়িয়ে চলেছে, ফোর্ট কোচিনের বালুকাবেলায়। কালো কালো ঢেউ এর মাথায় চক্ চক্ করে জ্বলে উঠছে ফস্‌ফরাস্। ঝপাং, ঝপাং, ঢেউ ভাঙার গুরু গর্জন ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মৌন নিশীথিনীর বুকে। মাথার ওপরে উদার আকাশ, তারার দীপালি,—নীচে ছল ছল, কল কল, আরব সাগরের অশান্ত কলরোদন।

সৌন্দর্য্যের অতল গভীরে ডুব দিয়েছিলাম আমি আর যোগলেকার।

লনে ছড়ানো ছিল,—মিওনলাইটের—মৃদু নীলাভ আলো। সেই নিভৃত আলোতেই,—শান্তাদি বুনছিলেন,—সন্তর্পণে জারকিন।

ওদিকে চলেছে,—হা, হা—হি, হি, হাসি, সরস গল্প, আর ড্রিঙ্ক।

কমলেশ ছুটে এসে যোগলেকারের হাত ধরে টান দিয়ে বললো—কি ইন্টারেষ্টিং গল্প জমেছে ওদিকে,—এখানে একঘরে হয়ে থাকা চলবে না। চলুন, চলুন। আপনারাও আসুন মিস মুখার্জ্জি।

শান্তাদি বললো—আমাকে মাপ করো ভাই। তোমাদের ঐ সব গল্প আমি বুঝিও না,—আর জারকিনটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিয়ে যাবো ইচ্ছে আছে,—তাই··কিছু মনে কোরো না।

আমিও যেতে চাইলাম না। বললাম বড্ড মাথা ধরেছে।

আমাদের প্রতি আর বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে কমলেশ যোগলেকারকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলো নিজের দলে।

শান্তাদি বললেন—আমাদের ভারি ভুল হয়েছে যে এখানে এসে ওঠা। ঐ বাঘিনী মেয়েটা একসঙ্গে সব ক'টা পুরুষের মাথা চিবিয়ে খেতে চাইছে দেখছি।

কয়েক মিনিট পরে একটা প্রচণ্ড হাসির শব্দে সেই দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম।

কমলেশ একরাশ মদ এগিয়ে ধরেছে যোগলেকারের দিকে,—আর সে, প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে হাত আর মাথা নেড়ে। ওর এই অবস্থার জন্যই উঠছে হাসির তরঙ্গ।

আমার বুকে লাগলো যেন ঐ আরব সাগরের ঢেউ এর দোলা। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ঐ নাগপাশ থেকে মুক্ত করে আনি ওকে।··· কিন্তু···যেতে পারলাম না। রুদ্ধনিঃশ্বাসে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

এক ঝটকায় কমলেশকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো যোগলেকার। তারপর বললো—**I am very exhausted, so I want to sleep.** দ্রুতপদে, হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলো ও। ওর যাত্রাপথে, আবার একটা উদ্দাম হাসির ঢেউ আছড়ে পড়লো।

পরদিন সকালে ব্রেকফাষ্টের পর কমলেশ বললো,—চলুন, আজ ফোর্ট কোচিনটা দেখাবো আপনাদের।

সুব্রত বললো,—এখন তো আমি যেতে পারছি না,—কারণ কাল জাহাজ ছাড়বে, আমার সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র যাবে, তাদের সঙ্গে এখন আমায় যোগাযোগ করবার জন্য একবার বেরুতে হবে যে।

অগত্যা ওকে বাদ দিয়ে আমরা চারজন মোটরে রওনা হলাম।

আইল্যাণ্ডের অপর প্রান্তের ব্রীজটি পেরিয়ে আমরা কোচিন সহরে প্রবেশ করলাম।

ইংরেজ আমলে সহরটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো,—ম্যাটেনচারিয়া ও ফোর্ট কোচিন।

ম্যাটেনচারিয়া অংশটি যেমন ঘিঞ্জি তেমনি নোংরা।

এদিকটায় বাস করেন বেশীর ভাগ দেশী লোকেরা, অবশ্য ইহুদিরাও খানিকটা জায়গা জুড়ে বাস করছেন বহুকাল ধরে। সাদা চামড়ার বড় বড় অফিসাররা বাস করতো ফোর্ট কোচিনে।

ম্যাটেনচারিয়ার পথে নজরে পড়লো সেই দু'হাজার বছরের বাসিন্দা সাদা ইহুদিদের।

ময়লা ঢোলা প্যান্ট, আর শার্ট পরণে ওদের, খালি পা। রোদে-পোড়া তামাটে, গায়ের রং। কারুর কারুর পায়ে গোদও দেখলাম। এদেশের বিষাক্ত মশার কামড়ে নাকি গোদ হয়।

ফোর্ট কোচিনের প্রশস্ত চওড়া, পরিচ্ছন্ন পিচের রাস্তাগুলোর দুধারে দীর্ঘাকার পাইন গাছের বর্ডার দেওয়া।

কি চমৎকার বিলিতি কটেজের ফ্যাসানে তৈরী বাড়ীগুলো। কোনো কোনো বাড়ীর গড়ন দুর্গের মতো, সাদা লাল পাথরের তৈরী দেয়াল। প্রত্যেক বাড়ীতেই বড় বড় গেট, সুসজ্জিত বাগান আছে। কোনো কোনো বাড়ীতে, কৃত্রিম লেক ঝরণা, সুইমিং পোল রয়েছে। ফোর্ট কোচিনের পথে যেতে যেতে মনে হচ্ছিলো যেন আমরা বিলেতের কোনো বনেদি পাড়ায় এসে পড়েছি।

পররাজ্যে বসে সাগর পাড়ের বণিক আর জলদস্যুরা যে কি পরিমাণ স্বর্গসুখ উপভোগ করে গেছে, তার জলন্ত নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে এই ফোর্ট কোচিনে।

কুখ্যাত ভাস্কো-ডি-গামার সমাধি, ও গীর্জ্জার সামনে দাঁড়ালো আমাদের গাড়ী।

গাড়ীতে বসেই আমরা দেখলাম, তারপর সমুদ্রের ধারে ধারে বড় বড় ব্যবসায়ীদের অফিস সীমানা ছাড়িয়ে এলাম কোচিন ক্লাবের সামনে।

কমলেশ বললো,—কাছেই আছে বেশ বড় দোকান।' এখানে হাতির দাঁতের জিনিষ আর এখানকার বিখ্যাত কাঠের তৈরী শিল্পদ্রব্য দেখতে পারেন।

যোগ,লেকার বললে,—আগে সমুদ্রটা দেখে ফেরার পথে দোকানে গেলেই হবে।

—না, না,—সমুদ্র ধারে বেড়াবার পর কি আর এখানে নামার মত অবস্থা থাকবে? সব ভিজে যাবে যে। জবাব দিলে কমলেশ।

দোকানের সামনে গাড়ী আগে থামানো হলো। আমরা গাড়ী থেকে নেমে গেলাম দোকানে।

চকচকে কালো পালিশ করা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত, কাঠের তৈরী নানারকমের জীব জন্তুর মূর্ত্তি, পেট মোটা মাথা ন্যাড়া চীনের বৌদ্ধ মূর্ত্তি, নারকোল গাছ, আর মালয়ী মানুষের নারকোল গাছে ওঠার অপূর্ব্ব জীবন্ত মূর্ত্তি, নৌকো, জাহাজ ইত্যাদি কত রকমারী জিনিষ রয়েছে, তা একদিনে দেখে শেষ করা যাবে না। চন্দন কাঠের আর হাতীর দাঁতের তৈরীও ঐরকম সুন্দর সুন্দর জিনিষ রয়েছে।

ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম আমরা। দর দামও করা হলো।

হঠাৎ আমার নজরে পড়লো হাতির দাঁতের তৈরী একটি অপূর্ব্ব সুন্দর কৃষ্ণ মূর্ত্তি।

মূর্ত্তিটি আমি হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম। কি চমৎকার মুখখানি, কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। বাঁশি হাতে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটিও তেমনি মনোরম। এমন চমৎকার মূর্ত্তি আমি জীবনে আর দেখিনি। দাম দেড়শো টাকা। আমার সঙ্গেই টাকা ছিলো, স্থির করলাম শাড়ী বা অন্য কিছু আর নেব না, এইটি নিয়ে যাবো মার জন্য। অনেক দর কষাকষি করে শেষে, একশো পঁচিশে দাম ঠিক করলো যোগ,লেকার।

ওদিকে এসেছে দুজন বিদেশী সৈনিক, ওরা কিনলো হাতির দাঁতের ময়ুরপঙ্খী আর তাজমহল। দুটোর দাম—তিন হাজার টাকা।

কমলেশ ঐখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলো জিনিষগুলো।

সৈনিকরা জিনিষগুলো প্যাক্ করে রাখতে বলে, চেক্ লিখে দিলো তারপর কমলেশের দিকে চেয়ে ভুরু নাচিয়ে, শিষ দিতে দিতে বেরিয়ে গেলো। এবারে কমলেশ এলো আমাদের কাছে।

কৃষ্ণমূর্ত্তিটি ওকে দেখিয়ে আমি বললাম,—এটা আমি নিচ্ছি একশো পঁচিশে।

—দেখি দেখি, বা:—কি চমৎকার জিনিষটি। বলতে বলতে মূর্ত্তিটা আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিলো কমলেশ।

ও! হাউ লাভলী! আমারও যে একটা চাই। বললো কমলেশ দোকানীকে। দোকানী বললো ও জিনিষ আর তো নেই, ঐ একটাই আছে। দু' চারদিন পরে আবার আসবে। তবে চন্দন-কাঠের ঐ মূর্ত্তি আছে: দেখুন না।

—না, না, চন্দন কাঠের নয়,—অধৈর্য্যভাবে বললো কমলেশ—এইটাই, এইটাই আমার চাই। বলতে বলতে দুহাতে মূর্ত্তিটিকে বুকে চেপে ধরলো ও।

যোগলেকার আমার দিকে চেয়ে বললো—আপনি তবে চন্দন কাঠেরটি নিন, কিম্বা অন্য কোনো মূর্ত্তি?

বলতে বলতে, মেরী মাতার কোলে যীশুখৃষ্টের শিশুমূর্ত্তিটি হাতে করে তুলে নিয়ে বললো সে—এটাও তো চমৎকার! এইটিই না হয় নিন আপনি।

কমলেশের প্রতি সহসা যোগলেকারের এই অহেতুক পক্ষপাতিত্ব আমার মাথায় যেন আগুন জ্বালিয়ে দিলো। আমি কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক চোখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

বোঝবার চেষ্টা করলাম,—ওর এই অকস্মাৎ ভাবান্তরের কারণটিকে। যোগলেকার তখন বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখছিলো মেরী মাতাকে, তাই তার নজর পড়লো না আমার দিকে।

—আমি বললাম—থাক্ আমি পরেই নেব। মেরী মাতার মূর্ত্তি আমার পছন্দ নয়। একটা বক্র উল্লাস যেন ঝিলিক মেরে জ্বলে উঠলো কমলেশের দুচোখে আর ঠোঁটের চাপা হাসিতে।

বললো সে—অনেক ধন্যবাদ। আমি তো কাল পরশু নাগাদ চলে যাবো, আর আপনারা তো এখন ক'দিন—থাকবেন, অনায়াসে এরকম মূর্ত্তি আরেকটি যোগাড় করে নিতে পারবেন।

কোচিনে অনেক দোকান আছে, সেখানে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। তারপর নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দাম দিতে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো সে—ঐ যা:! টাকা তো বেশী নেই সঙ্গে, মিষ্টার যোগ,লেকার আপনি নিশ্চয়ই এ টাকাটা এখন আমায় ধার দিতে পারেন,—আমি মাদ্রাজে গিয়ে আপনাকে টি, এম, ও, তে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

—ঠিক আছে, এর জন্য ব্যস্ত হবেন না। বলে—যোগ,লেকার নিজের পকেট থেকে দাম চুকিয়ে দিলো।

আমি আরেকবার চেয়ে দেখলাম ওর মুখের দিকে। আমার চোখের সঙ্গে মিলিত হলো ওর চোখের দৃষ্টি। মনে হল আগেকার মত অনুরাগসিক্ত নয় ওর আজকের চোখ দুটো, বরং তার পরিবর্ত্তে সুস্পষ্ট বিরাগের ভাবটাই যেন আমার বড্ড বেশী করে চোখে পড়লো।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল যোগ,লেকার।

শান্তাদি অতশত বোঝেন না। তিনি একটি চন্দনকাঠের সিগারেট কেস কিনছিলেন সঞ্জয়দার জন্য, আমার দিকে চেয়ে সেটি নামিয়ে রেখে বললেন—থাক্। আমিও আজ তা হলে কিছু নেব না। পরে একসঙ্গে দুজনে কিনবো।

আমি কেসটা হাতে তুলে নিয়ে বললাম—তুমি পরে অন্য কিছু নিও শান্তাদি। আমি এটা আজ নিলাম সঞ্জয়দার জন্যে।

—আরে না, না! বাধা দিয়ে বললেন তিনি, পঁচিশ টাকা তুই শুধু শুধু খরচ করবি কেন?

—খরচ করার এই আনন্দটুকু থেকে তুমিও আমায় বঞ্চিত করো না শান্তাদি? কথাগুলো বলতে গিয়ে, নিজের গলার স্বরে নিজেই চমকে উঠলাম।

দাম মিটিয়ে, জিনিষটি নিয়ে, আমি আর শান্তাদি দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে এসে বসলাম।

কমলেশ আর যোগ,লেকার এলো একটু পরে, মূর্ত্তিটি প্যাক্ করিয়ে নিয়ে।

এর পরে গাড়ী চললো আরব সাগরের ধারে।

সমুদ্রের ঠিক ধারে গাড়ী যায় না। একটু দূরে গাড়ী রেখে, সরু উঁচু নিচু হাঁটা পথ ধরে আমরা চলতে সুরু করলাম। সমুদ্রের উঁচু পাড়ে, অসংখ্য বাবলা কাঁটা গাছ। ঝাউ আর মনসা গাছে ভর্ত্তি আর আছে গেছুপে ফুলে ভরা রাশি রাশি নরম তারা ঝোপ। ক্রমশঃ

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ওষধিপতি—কর্পূর, সোমলতা।

ওষ্ঠপুষ্প—বন্ধুক ফুল।

ওষ্ঠী, ওষ্ঠোপমফলা—বিম্বফল, তেলাকুচা।

ওঁরাচাঁপা—বৃক্ষ বি° aphenocarpus grandiflorus.

ককজঙ্ঘা—[ স° কাকজঙ্ঘা, পারাবতপদী, লোমশা, হি° কাকজঙ্ঘা, মসী, কাউয়াঠুটী, কাউয়াঠেণ্ঠা, কো° কাউয়াঠোকা, ম° কাঙ্গা-চেঝড়ে, গু° অষেডী, ক° জীরীচিলেচ, তে° লালমুচ্চীনিকে ] কাকজঙ্ঘা, কাকশসা leca tiomta, l. aequata. বঙ্গ ক্ষুপবি°। কাকের জঙ্ঘার ন্যায় শাখা বলিয়া এই নাম। জলাভূমিতে জন্মে।

ককুভ—অর্জুন দ্র°।

ককোর, কোদ—[ হি° কায়েল, প° কমল বা করম্। ম° কদম, তা° নীরকদম্ব বা বোটকদিমি, তে° বটকরমী ] বড় গাছ বি° nanclea parerifolia.

ককুথটপত্র—corchorus olitorius. পর্যায়—পট্ট, বাজশন, শানি, চিম।

কক্ষরুহা—নাগরমুথা দ্র°।

কক্ষোথা—ভদ্রমুস্তা, নাগরমুথা।

কক্ষ্যা—বহতী।

কঙ্করোল—নিক্কোচক বৃক্ষ momordica mixta, কাঁকরোল দ্র°।

কঙ্কটেরি—হরিদ্রা, হলুদ।

কঙ্কশত্রু—পৃশ্নিপর্ণী, চাকুন্দে।

কঙ্কেল্লি—অশোক বৃক্ষ।

কঙ্কুল—বকুল।

কঙ্কানটি—amaranthus atropurpurens.

কঙ্গিয়া—roscocea pentandra, congea p.

কঙ্গু, কঙ্গুনী, কাঙ্গিনী—[ স° কঙ্গু, শূকধান্য, হি° কঙ্গনী, ম°—কাংগ, ক° নবনে, তে° কোরলু, কো° কাউন, ফা° গল ] কাউন, কাঙনীদানা, setaria italica, panicium italicum, তৃণধান্যবিশেষ। কোচবিহারে ও বোম্বাই প্রদেশে প্রচুর জন্মায়। পর্যায়—প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গ।

কঙ্গুড়িয়া—তৃণধান্যবিশেষ। পর্যায়—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, বহ্নি, রুচি, চিনক, জ্যোতিকা, পাবাবাতপদী, পণ্যালতা, পীততণ্ডুলা, সুকুমারী, কুকুন্দনী।

কচকচিয়া—papyrus legelifornica.

কচনার—banhinia puspurea.

কচবিপুফলা—শমীবৃক্ষ।

কচিবি—কচু-জাতীয়, arum tornicatum.

কচ্বী, কচু—[ স° কচ্বী, উ° সারু ] কচু, কন্দবিশেষ, colocasia antiquorum. কচুর প্রকার ভেদ—(১) বনকচু, ঘেটকচু, ঘণ্টাকর্ণ কচু, tvphonium trilobatum, (২) সার কচু—[ উ° তেলিয়া সারু ] c. nymphacifolia, (৩) কাঁটা কচু, (৪) মান কচু, (৫) গুঁড়ি কচু।

কচুরীপানা—পানা দ্র°।

কচ্ছু, কচ্ছক—তুন্নবৃক্ষ, তুঁদ গাছ।

কচ্ছরুহা—দূর্বা।

কচ্ছুরা—শূকশিম্বি, দুরালভা, শঠি, যবাস, প্রাচিনী, ক্ষীরুই বৃক্ষ।

কচ্ছুমতী—শূকশিম্বী, আলকুশী।

কচ্ছোর—শটী।

কচ্বী—কচু।

কঞ্জ—কমল, পদ্ম।

কঞ্চট—জলজ শাক বি°। কাঁচড়া। পর্যায়—জলজ, লাঙ্গলী, শারদী, তোয়পিপ্পলী, শকুলাদনী, জলতণ্ডুলীয়।

কঞ্চড়—কাঁচড়া-বি°।

কঞ্চুকী—১ যব, ছোলা, জোঙ্ক বৃক্ষ, ২ ক্ষীরীশ বৃক্ষ।

কঞ্জ—পদ্ম।

কঞ্জর—আকন্দ গাছ।

কঞ্জলতা—pergularia odoratissima.

কণ্ঠিকা—ব্রাহ্মণযষ্টি বৃক্ষ, বামুনহাটি গাছ।

কটকী—[ স° কটুকা ] কন্দ-বি° gentiana kunoa.

কটঙ্কট—চিতাবৃক্ষ।

কটঙ্কটেরী—১ হরিদ্রা, ২ দারুহরিদ্রা।

কটফল—[ স° কটফল, হি° কায়ফল, ম° কুসুভ্যাচীশাল, কর্ঠ। গু° কায়ফল, তে° পাপরবুডম, ফা° উদুলবর্ক, অ° দার্শীশবান ] কায়ফল, myrca nagi, m. sapida. পর্যায়—শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, কুম্ভী, কৈটর্য, সোমবল্ক, সোমবৃক্ষ, রোহিণী, কৃষ্ণগর্ভ, প্রচেতসী, ভদ্রাবতী মহাকুম্ভী, রামসেনক, উগ্রগন্ধ, ভদ্রা, রঞ্জনক, কাফল, পঙ্কবকুমুদী।

কটফলা—গাম্ভারী, বৃহতী, কাকমাচী, বার্তাকী, মৃগের্বারু দেবদালী।

কটুবেল—কথবেল দ্র°, teronia elephantum.

কাটকরঞ্জা—করঞ্জা দ্র ।

কটভী—১ জ্যোতিষ্মতী লতা, নবকটকী, ২ অপরাজিতা, ৩ ক্ষাটা শিরীষ ।

কটম্ভর—১ শোনা বৃক্ষ, ২ কটভীবৃক্ষ ।

কটম্ভরা—গন্ধভাদুলে, পুনর্ণবা ।

কটুশর্করা—গাজ্রেষ্ঠী লতা, নাটাকরঞ্জা ।

কটামন—বেণামূল ।

কটিরা, কটিলা—[ হিং কতীরা ] গাছের আঠা বিং ।

কটিল্লক—করলা ।

কটু—১ চাপা, ২ পটোল, ৩ কটীলতা, ৪ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ, ৫ রাইসর্ষপ ।

কটুক—১ পটোল, ২ সুগন্ধি তৃণ ৩ কুটজ বৃক্ষ, ৪ আকন্দ বৃক্ষ, ৫ রাজসর্ষপ, ৬ মাটী ।

কটুকন্দ—১ সজিনা গাছ, ২ আদা, ৩ লশুন ।

কটুকফল—কাঙ্কোল ।

কটুকরঞ্জ—নাটা করঞ্জ ।

কটুকা—১ কটকী দ্রং, ২, কুলিকা বৃক্ষ, ৩ রাই সরিষা, ৪ তিক্ত লাউ । পর্যায়—জননী, তিক্তা, রোহিণী, তিক্ত-রোহিণী, চক্রাঙ্গী, মৎস্যপিত্তা, বকুলা, শকুলাদনী, সাদনী, শতপর্বা, বিজাঙ্গী, মলভেদিনী, অশোকরোহিণী, কৃষ্ণা, কৃষ্ণভেদী, মহৌষধীকটা, অঞ্জনী, কাণ্ডরুহা, কটু, কেদারকটুকা, অরিষ্টা, পানম্বী, কটম্বরা, কটুম্ভরা, অশোকা ।

কটুকালাবু—তিক্ত লাউ ।

কটুগ্রন্থি—১ পিপ্পলী মূল, ২ শুণ্ঠি ।

কটুচ্ছদ—টগর বৃক্ষ ।

কটুতিক্তক—শোণ গাছ, চিরতা ।

কটুতুম্বী—লতা বি, তিক্ত ঝিঙা ।

কটুতম্বী—তিক্ত অলাবু । পর্যায়—ইক্ষ্বাকু, কটুকালাবু, নৃপাত্মজা, কটুতিক্তিকা, কটুফলা, তুম্বিনী, কটুতুম্বিনী, বৃহৎফলা, রাজপুত্রী, তিক্তবিজা, তুম্বিকা ।

কটুদলা—কাঁকুড় ।

কটুনিষ্পাব—নদীতীরে উৎপন্ন নিষ্পাব ধান্যবিং ।

কটুপত্র—পর্পট, ক্ষেতপাপড়া ।

কটুপত্রিকা—কণ্টকারী বৃক্ষ ।

কটুফল—পটোল ।

কটুফলা—শ্রীবল্লীবৃক্ষ ।

কটুভঙ্গ—শুণ্ঠী ।

কটুভদ্র—শুণ্ঠী, আদা ।

কটুমঞ্জরিকা—অপামার্গ, অপাং ।

কটুম্ভরা—কটকী, গন্ধভাদুলে ।

কটুরোহিনী—কটকী ।

কটুবর্গ—পিপুল, চই, চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপ্পলী, করেণুকা, এলা, যবানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম্বফল, হিঙ্গ, বামনহাটি, মধুরস, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ, কটকী, সুরসা, শ্বেতসুরসা, ফণিজ্জক, অর্জক প্রভৃতি তুলসী সকল, গন্ধতৃণ, সুগন্ধক, সুমুখ, কালমাল, কাসমর্দ, বর্বক, খরপুষ্প, কটফল, নিসিন্দা, কুলাহক, ইন্দুরকানি, পুরাতন আমলকী, কাকমাছী, বিষমুষ্টি, সজিনা, মধুশিগ্রু নামক অজবিধ সজিনা, মূলা, লশুন, মৌরি, বৃহ, দেবদারু, বলগুঞ্জফল, গুগ্গুল, মুথা, লাঙ্গলিকী, শুকনাসা, পীলু প্রভৃতি দ্রব্য ।

কটুবার্ত্তাকী—শ্বেতকণ্টকারী ।

কটুবীজ—পিপ্পলী দ্রং ।

কটুরোহিনী—কটকী দ্রং ।

কটুশৃঙ্গাল—গৌরসুবর্ণ শাকবিং ।

কটুস্নেহ—সর্ষপ, শ্বেতসর্ষপ, রাই সরিষা ।

কটূৎকট—আদা ।

কটূৎকটক—শুঁঠ ।

কটল—শোনাগাছ ।

কঠিঞ্জর—তুলসীবৃক্ষ । পর্যায়—পর্ণাস, কুঠেরক, উদামিকা, জাম্বুক, পর্ণিকা, পত্তুর, জীবক সুবর্চলা, কুঞ্জক, কণ্ডলিকা, কুর্ণিকা, তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী, দেবদুন্দুভি । শব্দং ।

কঠিল্ল—কারবেল্ল, করেলা ।

কঠিল্লক—করেলা, পুনর্ণবা, তুলসী ।

কড়মা—[ সং কলম ] ধান্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু ঘাস । দূর্বাঘাসের মত, লতাইয়া যায় কিন্তু মোটা ।

কড়ম্ব—কদম্ব দ্রং ।

কড়ম্বী—কলমী শাক ।

কড়কি—rottbœlla perforata.

কড়িলা—alysicarpus vaginalis.

কণজীর—শ্বেতজীরক ।

কণজীরক—ক্ষুদ্র জীরা ।

কণা—জীরা, শ্বেতজীরা, পিপুল ।

কণিকা—অগ্নিমন্দ, গণিকারিকা বৃক্ষ ।

কণীচি—গুঞ্জা, কুঁচ ।

কণের, কণেরু—কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালুগাছ ।

কণ্টকদ্রুম—শাল্মলি বৃক্ষ, বাবলা ।

কণ্টক পঞ্চমূল—করমচা, গোক্ষুর, ঝাঁটি, শতমূলী, কেলেকড়া ।

কণ্টকপ্রাবৃতা—ঘৃতকুমারী ।

কণ্টকফল—কাঁঠাল গাছ, গোক্ষুর বৃক্ষ ।

কণ্টকবৃন্তাকী—বার্তাকু, বেগুণ ।

কণ্টকশ্রেণী—কণ্টকারী ।

কণ্টকাঢ্য—কুব্জক বৃক্ষ ।

কণ্টকার—শিমূল গাছ, বঁইচ গাছ ।

কণ্টিকারী—[ সং ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, হিং কটেরী, তেং কুদা, তাং কান্দন-কাট্টেরি ] ।

কৎ—খদির ।

কত—নির্মলী বৃক্ষ ।

কতক—[ তাং তেত্তমরম, তেং-একোস্তে, ওং কত্তোক, তৈং কতকস্থ, দাক্ষিণাত্যে—চিলবিজ, সিংহলে ইঙ্গিবি ] ১ নির্মলী বৃক্ষ, strychnos potatorum. এই বৃক্ষ ৩০—৬০ ফুট উচ্চ হয় । পর্যায়—অম্বুপ্রসাদ, কত, তিক্তফল, রুচ্য, ছেদনীয়, গুচ্ছফল, তিক্তমরিচ । সুশ্রুং মনুং । ২ কুচিলা । [ ক্রমশঃ ।

শাশ্বতী রায়। এক সময় কোলকাতা য়ুনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীদের মুখে শুধু এই নাম ঘুরে বেড়াত। অধ্যাপক মহলেও এর নাম বেশ একটি সাড়া এনেছিল। এর একমাত্র কারণ—শাশ্বতীর রূপ। এত রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। সে ছিল যেন একটি জলন্ত অগ্নিশিখা। তাই তার আশে পাশে দেখা যেত অসংখ্য কীট পতংগ। অগ্নিশিখার সংস্পর্শে এসে ওরাই আপনা আপনি জলে পুড়ে মরেছে। একথা শাশ্বতী নিজে না জানলেও অনুমান করতে পারতো। শাশ্বতী রায়ের সব কিছুই ভাল। পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন—সবেরই মধ্যে তার বেশ একটা শালীনতার ভাব। সব সময়ই তার হাসি মুখ। এই সুন্দর হাসিমুখের ছিল জয় সর্বত্র।

শাশ্বতী রায় সম্পর্কে সকলেরই কৌতূহল। এত রূপ সে পেল কি করে! শাড়ীর আবরণে সে তার যৌবনকে ধরে রাখতে পারতো না। সব কিছু যেন উপচে পড়ছে।

সে সময় সব কিছুতেই শাশ্বতী রায়। য়ুনিভার্সিটিতে তারই মরশুম। শুধু ছেলেরা নয় মেয়েরাও তার সংস্পর্শে আসতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতো। কিন্তু আশ্চর্য এই মেয়ে! এই সবের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সে চলতো। সব কিছুতেই। তার কেমন যেন একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ।

তারপর হঠাৎ একদিন শাশ্বতীর কালেরও শেষ হলো। য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষার পর আর তাকে দেখা গেল না। কোথায় সে গেল আর কি করলো—তা কেউ জানলো না। শুধু সকলের মনে তার নামটা রয়ে গেল। আজও তার যারা সমসাময়িক ছিল—তারাও তার নাম ভোলেনি। কথা প্রসংগে শাশ্বতীর রূপ, আচরণ, চলাফেরার কথা উল্লেখ করে থাকে। এখন সে তাদের কাছে ইতিহাস ও ইতিহাসের নায়িকা। সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের সংগে যেমন ইতিহাসেরও পরিবর্তন হয়—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি।

এরপর দীর্ঘ আঠারো বছর কেটে গেছে। শাশ্বতী রায়কে দেখা গেল দিল্লীতে। সে এখন বিবাহিত। তার গতি সর্বত্র। কনট প্লেস থেকে উইলিংডন এয়ার পোর্ট, আবার নিজামুদ্দিন থেকে ফিরোজশাহ কোটলা। স্বামী দিল্লীর সরকারী চাকুরে। কর্মস্থল সেক্রেটারিয়েট। এখানেও শাশ্বতী মক্ষীরাণী। সমাজের উঁচু নীচু সকল স্তরেই তার অবাধ গতি। কিন্তু শাশ্বতীর মধ্যে সেই পুরাতন শাশ্বতীকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন সে দিল্লীর আবহাওয়ার সংগে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। প্রগতিবাদী হতে গেলে যে সব গুণের প্রয়োজন—শাশ্বতী একে একে তা সব নিজে করায়ত্ব করে নিয়েছে। রেস খেলা থেকে আরম্ভ করে বারে বসে পুরুষদের সংগে পাল্লা দিয়ে হুইস্কি, জীন, রাম পেগের পর পেগ শেষ করতে শিখেছে।

এ-সব বিষয়ে শাশ্বতীর হাতেখড়ি হয়েছিল মিসেস ক্রাউজের কাছে। তা ছাড়া অভিজাত সম্প্রদায়ের সংগে মেলা-মেশা করতে গেলে এ-সবের প্রয়োজন আছে। সেখানে নাক সিঁটকাবার কোনো সুযোগই নেই।

এরপর শাশ্বতী ও তার স্বামী এলো কোলকাতায়। দীর্ঘদিন পরে কোলকাতার আবহাওয়া কেমন যেন তাদের মনে হয়। শাশ্বতীর স্বামী সরকারী চাকুরে—তাই বদলী হবার সম্ভাবনা বেশী। আজ এ শহর, কাল ও শহর তাকে ঘুরতেই হবে। তাই পাকা রেল যাত্রীর মতন তার মনের অবস্থা। যেখানেই যাক সেখানেই সে নিজের মধ্যে নিজেকে রেখে দেওয়ার কৌশলটা জানতো। সে কারণে শাশ্বতীর চেয়ে তার স্বামীর দিল্লী কোলকাতা করতে তেমন কোনো কষ্ট হয়নি—যত কষ্ট হয়েছে শাশ্বতীর।

যাই হোক দক্ষিণ-কোলকাতার একটি ম্যানসনে ওদের ভ্রাম্যমাণ

সংসারের পত্তন হোল। এ ম্যানসনটিতে বাঙালী অপেক্ষা পাঞ্জাবী, গুজরাটির সংখ্যা বেশী। তা হোক শাশ্বতী এদেরই সংগে এতদিন কাটিয়ে এসেছে—এখন আর এদের ছাড়াই সে থাকতে পারে না। আর কোলকাতায় রেসও আছে, বারও আছে। শুধু শাশ্বতীর মনটা যা একটু খুঁত খুঁত করে। বাংলা দেশে বাঙালী মেয়ের গতিবিধি খুব স্বাধীন নয়।

যাই হোক টাই নাড়া হয়ে শাশ্বতীর মনটা বেশ কয়েক দিন মুষড়ে পড়ে। বয়সের জন্ত হোক আর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার জন্তই হোক ওদের দাম্পত্যজীবনে বেশ ফাটল ধরেছে। আজকাল প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীতে খুঁটিনাটি কলহ হতে দেখা যায়। স্বামী কলহের পর নিজের কাজে গিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকে, কিন্তু স্ত্রী বেচারার পৃথিবী তো তার ঐ ছোট্ট ফ্ল্যাটটি। ঐ ফ্ল্যাটের সীমানার মধ্যে নিজের দুঃখকে আঁকড়ে বসে থাকতে হয়।

এমন মনের ভাব শাশ্বতীর বেশী দিন থাকেনি। থাকতে থাকতে মানুষের সংগে আলাপ হয়, তারপর সেই থেকে মনের মতন সংগীও জুটে যায়। এই ম্যানসনের সকলের সংগে শাশ্বতীর চেনা-জানা হলেও—মিসেস মেটার সংগে ঘনিষ্ঠতা তার একটু বেশীই হয়েছিল। মিসেস মেটার নিজস্ব একটি গাড়ী আছে—সেই গাড়ী করে দুই সখীতে মিলে কোলকাতা ও তার আশে-পাশে সারাদিন ধরে চষে বেড়ায়। তা ছাড়া দু'জনেরই স্বভাবের বেশ একটা মিল আছে। শাশ্বতীর জুয়াড়ী মন। টাকার নেশায় সে প্রায় সময়েই বুঁদ হয়ে থাকে। স্বামী অফিসে চলে গেলে প্রতিবেশীদের সংগে বসে রামি বা ফ্ল্যাশ-এর আসর জমে ওঠে। সংসারের দিকে মন বসাবার ফুরসৎ কোথায়?

শাশ্বতীর স্বামী জয়ন্ত যা রোজগার করে তাতে দুটি প্রাণীর সংসার বেশ ভালভাবেই চলে যেতে পারে, কিন্তু এখন যা অনটন দেখা যায়—তার জন্ত সম্পূর্ণ দায়ী এই শাশ্বতী।

জয়ন্ত এত দিন শাশ্বতীকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে—তাই এখন আর তাকে শাসন করা তার পক্ষে বেশ কঠিন। এই সব নানা কারণে চারিদিকে অশান্তি।

সেদিন সকাল বেলা জয়ন্ত যখন অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন মিসেস মেটা এসে শাশ্বতীকে বললে: তোমার টেলিফোন এসেছে।

শাশ্বতী মিসেস্ মেটার ঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরে বললে: হ্যালো—আমি শাশ্বতী। কে আপনি?

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এলো: আমি মণি।

—কি খবর মণি? ভাল টিপস্ আছে নাকি?

—না। আমি ভাবছিলাম আপনার সংগে একবার দেখা করবো।

—কেন? কি ব্যাপার?

—আচ্ছা আমি আসছি। আপনি আছেন তো?

—হ্যাঁ আছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো?

—আপনার সংগে দেখা করে সব বলছি। বলে মণি টেলিফোনটা রেখে দিল। শাশ্বতী বুঝতে পারে না মণির আবার কি জরুরী কাজ থাকতে পারে তার সংগে। মনটা একটু চঞ্চল হয়ে যায় শাশ্বতীর।

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে সে বসার ঘরটি পরিষ্কার করতে শুরু করে। এরই মধ্যে মণি এসে হাজির।

মণি শাশ্বতীর সামনা সামনি এসে বললে: গত শনিবারের দরুণ আপনার কাছ থেকে ত্রিশ টাকা পাব। ঐ টাকাটা দয়া করে এখন দিন।

শাশ্বতীর হাতে নিজস্ব বলে কোনো টাকা নেই। সংসার খরচের জন্ত জয়ন্ত যা টাকা দেয়—সে টাকাও মাসকাবারের শেষে কম পড়েছে। কাজেই সে বললে: মাসকাবারের শেষে এখন তো আমার কাছে টাকা নেই।

মণি বললে: তা বললে কি করে কি হবে? আপনি তো বলেছিলেন সোমবারেই দিয়ে দেবেন। আজ শুক্রবার। তা ছাড়া আপনিই বলেছিলেন ত্রিশ টাকা লাগাতে।

শাশ্বতী বললে: এই ত্রিশটা টাকার জন্ত কি আমাকে জ্বালাতন দিতে হবে?

মণি রেসের প্রাইভেট বুকি। তার কাছে ভদ্রতা বলে কিছু নেই। অন্য কেউ হলে মণি তার পকেটে হাত দিয়েই টাকা বের করে নিত। কিন্তু শাশ্বতী বলেই তার যা একটু সমীহ ভাব। মণি বললে: আজ ছ'টার মধ্যে আমার টাকা চাই। আর ঐ টাকা না পেলে আমি জয়ন্ত বাবুর কাছ থেকে টাকা চাইবো।

শাশ্বতী জয়ন্তর কাছ থেকে টাকা চাইবে শুনে বেশ ঘাবড়িয়ে যায়। সে বললে: এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? টাকা আমি তোমার পরের সপ্তাহে দিয়ে দেবো। আমার কাছে এখন সত্যি কোনো টাকা নেই।

মণি বিশ্বাসই করে না টাকা নেই। ঘর-সংসার করে—স্বামী কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার আর তার ঘরে টাকা নেই। এ হতেই পারে না।

মণি বললে: বেশ তো টাকা আপনার নেই, তা আপনি মিসেস মেটার কাছ থেকে ত্রিশটা টাকা চেয়ে দিন।

শাশ্বতী মিসেস মেটার কাছ থেকে বহু টাকা ধারে। সে কারণে সে বললে, না মিসেস মেটা আমাকে ধার দেয় না।

মণি এবার একটু চড়া সুরেই বললে: আমি ও-সব কথা জানি না—আজ সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে আপনি যদি আমাকে টাকা দিয়ে না আসেন, তাহলে আমি জয়ন্ত বাবুকে টাকার জন্যে বলবো।

মণি শাশ্বতীর কোনো কথাই আর শুনলো না। সে যেমন দ্রুত পদে এসেছিল—ঠিক তেমনি দ্রুতপদে চলে গেল।

শাশ্বতী কাঠ হয়ে যায় মণির শাসানির কথা শুনে।

জয়ন্তর কাছে টাকা চাইলে আবার শাশ্বতীকে অপমানিত হতে হবে। হাতের লোহাটা পর্যন্ত শাশ্বতী বিক্রী করে দিয়েছিল। জয়ন্তর এটা নজরে পড়ে। জয়ন্ত তাই শাশ্বতীকে ডেকে বলেছিল: সধবা স্ত্রীলোক হাতের লোহাটা খোচালে কি করে?

শাশ্বতী তার উত্তরে বলেছিল: বাথরুমে খুলে রেখেছিলাম—তারপর যখন খেয়াল হলো—তখন গিয়ে দেখি লোহাটা নেই। তোমাকে আমি ভয়ে কিছু বলিনি।

জয়ন্ত শাশ্বতীকে খুব ভাল করেই জানে। সে শাশ্বতীর কথা বিশ্বাসই করেনি। বুঝতে পেরেছিল রেস খেলার টাকা কম পড়ায় শাশ্বতী ওটাকে বিক্রী করে দিয়েছে। জয়ন্ত শাশ্বতীকে খুব চড়া সুরে বলেছিল: এ বারের মতন তোমাকে ক্ষমা করলাম শাশ্বতী। ভবিষ্যতে যদি তুমি আর রেস খেলবে তা হলে সংসারের পাট আমি তুলে দেব

দিনের পর দিন তোমার শুধু অধোগতি হ'চ্ছে। ছিঃ ছিঃ শাশ্বতী তুমি শেষে হাতের লোহাটা বিক্রী করে দিলে! কতই বা শুতে সোনা ছিল? তিন আনা কি চার আনা ওজনের।" এই সামান্য ক'টি টাকার জন্য তুমি তোমার সধবার চিহ্নটিকে ঘোচাতে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করলে না।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বহুদিন মন কষাকষির ভাব ছিল। শেষে একদিন জয়ন্তর কাছে ঠাকুরের ছবি ছুঁয়ে শাশ্বতী প্রতিজ্ঞা করেছিল, রেস সে আর খেলবে না।

এর পর থেকে বহুদিন শাশ্বতী সত্যি রেস খেলেনি। কিন্তু মানুষ তো নেশার দাস। শাশ্বতী তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেনি। সে অবশ্য মাঠে আর যেতো না—তবে এই মণিকে দিয়ে বাড়ীতে বসেই এখন রেস খেলে থাকে। এ কথা জয়ন্ত অবশ্য জানে না।

বড় ভাবনায় পড়ে গেছে শাশ্বতী। শুধু তার চিন্তা কি করে—মণিকে ত্রিশটা টাকা শোধ করে দেওয়া যায়। সামান্য ত্রিশটা টাকার জন্য তাকে আবার অপমান সহ্য করতে হবে। তা ছাড়া এ ব্যাপার নিয়ে জয়ন্তর সামনা সামনি হতেই পারবে না শাশ্বতী। সংসার খরচ বাবদ তার কাছে মাত্র পনেরো টাকা আছে। এখন মাসকাবার হতে তিনদিন বাকি। এই তিনটে দিন কোনরকমে কাটাতে পারলে শাশ্বতীর এত ভাবনা হোত না।

আলমারি, ড্রয়ার, বিছানার তলা হাটকে শাশ্বতী মাত্র চার টাকা বার নয়া পয়সা সংগ্রহ করতে পেরেছে। কী যে করবে সে ভেবেই পায় না। এখন বেলা এগারটা বাকি সাত ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যে কোরেই হোক ত্রিশটা টাকা শাশ্বতীকে জোগাড় করতে হবে। বিকেল ছটার মধ্যে মণিকে টাকা না দিতে পারলে তার আর কোনো স্বস্তি নেই। ভাবনা শুধু ভাবনা। এত ভাবনা সে আর ভাবতে পারে না। শাশ্বতীর মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। কান্না এসে পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ করে বসে থাকে শাশ্বতী। টেবিলের ওপর চার টাকা বার নয়া পয়সা পড়ে আছে। কোথা থেকে সে এখন টাকা জোগাড় করে। আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে হঠাৎ গিয়ে টাকা ধার করা তো শোভা পায় না। তা ছাড়া এই ধারের কথাটা আবার আত্মীয়দের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে। ভীষণ দুর্ভাবনায় পড়ে যায় শাশ্বতী। প্রয়োজনে সে মিসেস মেটার কাছে অনেক টাকা নিয়েছে। এখন গত হপ্তায় সে যে টাকা মিসেস মেটার কাছ থেকে নিয়েছে—তার শোধ হয়নি। ধার থাকা সত্ত্বেও ধার চাওয়ার মুখ কোথায়?

শাশ্বতী বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে শাড়ীটা পাল্টে নিল। তারপর প্রসাধন সামগ্রীর বেশ পরিপাটি করে ব্যবহার কোরলো। আয়নার সামনে দাড়িয়ে কান ঢেকে এ কালের মেয়েদের মতন চুলও বাঁধলো। তারপর চমকে দাঁড়িয়ে আবার কী যেন সে ভাবতে থাকে।

একবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। কোথায় যাবে আর কি বলবে—তা এখনও সে স্থির করতে পারেনি। শুধু অস্থির মন নিয়ে সে পথ চলতে সুরু করে।

জনবহুল পথে আধুনিক যানবাহনের অর্কেস্ট্রা। সকলেরই মধ্যে একটা ব্যস্ততার ভাব। শাশ্বতী তার হাত ব্যাগটি পরীক্ষা করে দেখলো—তাতে ঐ চার টাকা বার নয়া পয়সা সে নিয়েছে কি না। হ্যাঁ সে নিয়েছে। বাস ষ্টপের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কি ভেবে একটা দু নম্বর বাসে চড়ে বসলো। বাসটি এসপ্ল্যানেডের দিকে চলেছে। শাশ্বতী তখনও মনস্থির করতে পারেনি। বাস এসে থামলো এসপ্ল্যানেডে। শাশ্বতী নেমে পড়লো। চারিদিকে মানুষের ভিড়। রাস্তা পার হয়ে শাশ্বতী গিয়ে দাঁড়াল অপর দিকের ফুটপাথে। পথচারীদের দৃষ্টি। ত্রস্ত পথিকের ধাক্কা বাঁচিয়ে সে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এমনি ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর হঠাৎ শাশ্বতী তার হাতব্যাগটি খুলে কি যেন খুঁজতে থাকে। পাশে এক ভদ্রলোক বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন—এই ব্যাপারটি তাঁর নজর এড়িয়ে যায় না। ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শাশ্বতীর আর একটু কাছে গিয়ে জিগ্যেস করে আপনি কি কোনো অসুবিধায় পড়েছেন?

শাশ্বতী চুপ করে থাকে—কি যে উত্তর দেবে তা সে ভেবে উঠতে পারে না। ভদ্রলোক তবু আবার বললেন: আমার মনে হয়, আপনি বোধ হয় আপনার টাকা পয়সা আনতে ভুলে গেছেন।

নিজের অজান্তে শাশ্বতী ঘাড় নেড়ে জানায়: হ্যাঁ।

ভদ্রলোক জিগ্যেস করেন: কত টাকা আপনার প্রয়োজন?

শাশ্বতী এবার মুখ ফুটে বললে: আমাকে যদি একটা টাকা দেন—তা হলে আমি যেখানে যাবার সেখান থেকে গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় যা টাকার দরকার—তা নিয়ে নিতে পারবো।

ভদ্রলোক একটি টাকা বার করে শাশ্বতীকে দিলেন।

শাশ্বতী বললে: এ টাকাটা আপনাকে ফেরৎ দেব কি করে?

সামনে একটি বাস এসে থামলো। ভদ্রলোক তাতে ওঠার সময়—বললেন: আর একদিন যখন দেখা হবে—তখন ফেরৎ দিয়ে—দেবেন।

শাশ্বতী কিছু বলার আগেই বাসটি ছেড়ে দিল।

বাস ষ্ট্যাণ্ডে দাড়িয়ে থাকে শাশ্বতী। এবার একজন ভদ্রমহিলার পাশে গিয়ে সে দাঁড়ায়। তার মুখে চোখে কেমন যেন উদ্বিগ্ন ভাব। ভদ্রমহিলার দিকে সে দু'একবার তাকাতে—ভদ্রমহিলা নিজেই জিগ্যেস করলেন: কিছু বলবেন নাকি?

শাশ্বতী বললে: একটু মুস্কিলে পড়ে গেছি। তার মধ্যে কেমন যেন সংকোচের ভাব।

ভদ্রমহিলা খুব মিষ্টি করে জিগ্যেস করলেন: কি হয়েছে বলুন না।

শাশ্বতী তখন বললে: একটা ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফেরার কথা। টাকাটা যেন কোথায় পড়ে গেছে—অথচ ওষুধটা না নিয়ে গেলেই নয়। কি যে করি তাই ভাবছি।

শাশ্বতীর বলার ধরণ দেখে ভদ্রমহিলাও অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি বললেন, পাঁচটা টাকা দিলে হবে?

শাশ্বতী বললে: তা হয়ে যাবে। তবে আপনাকে ফেরৎ দেব কি করে? ভদ্রমহিলা পাঁচটা টাকা আর তাঁর ঠিকানা লেখা একটি কার্ড দিয়ে বললেন: যবে হোক ফেরৎ দেবেন।

—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভদ্রমহিলা বাসে খুব ভীড় দেখে ট্রাম ষ্টপেজের দিকে চলে গেলেন আর শাশ্বতী ঐ পাঁচ টাকার নোটটি ভাঁজ করে তার ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল।

শাশ্বতী মনে মনে ঠিক করলো—এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না। একটি ডালহাউসীগামী বাসে চড়ে সে বসলো। জি, পি, ওর কাছে

এসে বাস থামতে শাশ্বতী নেমে পড়লো। তারপর ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল ডালহাউসী স্কোয়ারের মধ্যে ট্রাম ষ্টেপেজের কাছে। আশে পাশে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে। শাশ্বতী লক্ষ্য করে যাত্রীদের ওঠা নামা। এমনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শাশ্বতী একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হোল। শাশ্বতী ইংরিজীতে তার কাছে নিজের বিপদের কথা জানাল। ভদ্রলোক কেমন যেন নিজেকে বিব্রতবোধ করলেন তারপর নিজের পার্স থেকে একটি দু' টাকার নোট বার করে দিলেন। শাশ্বতী ধন্তবাদ জানিয়ে বললে: এই টাকাটা আপনাকে কি করে ফেরৎ দেব?

ভদ্রলোক বললেন: আমাকে আর ফেরৎ দিতে হবে না। আপনি বরং কোনো গরীব লোককে দিয়ে দেবেন।

—ধন্তবাদ আপনাকে। শাশ্বতীর কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতার আভাস পাওয়া যায়। আবার আর একজন ভদ্রমহিলাকে শাশ্বতী বললে: দেখুন, আমি একটু বিপদে পড়েছি—যদি দয়া করে আমাকে একটি টাকা দেন—তাহলে আমি আমার বোনের বাড়ীতে যেতে পারি। আমার বোনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওষুধ কিনে বাড়ী ফিরবো। ছেলেটার খুব অসুখ।

ভদ্রমহিলা একটু বেশ বিরক্ত-বোধ করেন। তিনি তাঁর পার্স থেকে আট আনা পয়সা বার করে দিয়ে বললেন: এর বেশী আপনাকে কিছু দেওয়ার মতন আমার সামর্থ্য নেই। কিছু মনে করবেন না।

শাশ্বতীর মুখে আর একটি কথাও বার হয় না। নিজেকে বড় ছোট মনে হয় শাশ্বতীর। এমনি ভাবে ধাপে ধাপে নীচে নামা তার পক্ষে কি করে সম্ভব হোল? শাশ্বতী ট্রাম ষ্টপেজ থেকে আবার হাঁটতে সুরু করলো। এখানে দাঁড়ান উচিত হবে না। এখুনি যদি জয়ন্ত কিম্বা জয়ন্তর কোনো লোক দেখতে পায়—তাহলে আর শাশ্বতী মুখ দেখাতে পারবে না। মনের মধ্যে অসম্ভব জ্বালা। অপমানের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্ত নিজেকে সে এত ছোট করে ফেলেছে।

শাশ্বতী হাঁটতে হাঁটতে হাইকোর্টের পাশ দিয়ে সুইমিং ক্লাবের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। এখন তার সারা মুখে বিষণ্ণতার ছায়া।

শাশ্বতীর এখন আর তেমন কোনো সংকোচের ভাব নেই। একটু বুঝলেই সে বাঙালী-অবাঙালী, মেয়ে-পুরুষ নির্বিচারে সাহায্য চায়। কেউ তাকে সাহায্য করে আবার কেউ বা তাকে বিমুখ করে। ত্রিশটা টাকা তার চাই। এই ত্রিশটা টাকার জন্ত শাশ্বতী আজ পথে বেরিয়েছে। মনে মনে সে স্থির করে মণির সংগে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। টাকার নেশায় তার এই অধঃপতন হয়েছে। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। হঠাৎ শাশ্বতী লক্ষ্য করে, ওদিকের ফুটপাথ থেকে কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। অনেকটা জয়ন্তর মতন। শাশ্বতী ইডেন গার্ডেনের দিকে চলতে সুরু করে। বোধ হয় জয়ন্ত। শাশ্বতীর পিছনের দিকে তাকাবার আর সাহস নেই। শুধু দূর থেকে লক্ষ্য করে, লোকটি তার পিছু নিয়েছে বোধ হয়। শাশ্বতী

জোরে জোরে পা ফেলে ইডেন গার্ডেনের ভিতর চলে যায়। সারা দিনের ঘোরা-ফেরায় ক্লান্তিবোধ করে সে। একটি বেঞ্চির ওপর বসে বিশ্রাম করতে থাকে।

শাশ্বতীর মনে কেমন যেন একটা ভয় হয়। জয়ন্ত আজকে তাকে দেখেছে! আবার মনে হয়—না না, জয়ন্ত নয়। কিন্তু দূর থেকে একেবারে জয়ন্তর মতন দেখতে। না, আর ভাবতে পারে না শাশ্বতী। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ওর মনটা আরো বেশী খারাপ হয়ে যায়। এখন বেলা পাঁচটা। আর এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে ত্রিশ টাকা নিয়ে মণির সংগে দেখা করতে হবে। এ একটা বিশ্রী ব্যাপার।

হঠাৎ শাশ্বতী লক্ষ্য করে সেই লোকটি এগিয়ে আসছে। জয়ন্ত আসছে। শাশ্বতী স্থির করেছে, এখান থেকে আর উঠবে না। আসুক জয়ন্ত। সে পরিষ্কার বলবে: আমি সব কিছুতে হাঁপিয়ে উঠেছি। তাই একটু ফাঁকায় এসে বসে আছি। গঙ্গার ধারে বেড়াতে আমার ভালই লাগে। লোকটা যখন খুব কাছাকাছি এসেছে—তখন শাশ্বতী একবার মুখ তুলে তাকাল।

না, জয়ন্ত নয়। দূর থেকে মনে হয়েছিল জয়ন্ত। কাছে আসতে শাশ্বতী দেখে জয়ন্তর সংগে লোকটার কোনো মিল নেই। না চেহারা—না পোবাক-পরিচ্ছদ।

লোকটা শাশ্বতীকে দেখতে দেখতে চলে গেল।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো শাশ্বতী। সত্যি যদি জয়ন্ত হোত—তা হলে বিশ্রী একটা ব্যাপার হোত।

একটি ছেলে শাশ্বতীর সামনে এসে বলে: কোকোকোলা, অরেঞ্জ, পাইনাপেল।

শাশ্বতী জিগ্যেস করে: ঠাণ্ডা হবে?

—হাঁ মেমসাহেব।

—একটা পাইনাপেল দাও।

শাশ্বতী পাইনাপেল জুস্ পান করে বেশ তৃপ্তি পেল। শরীরটা সত্যিই খুব ঠাণ্ডা হোল মনে হয়। ব্যাগে কত টাকা হয়েছে—তা দেখবার সাহস হয় না শাশ্বতীর। চার আনা পয়সা ছেলেটার হাতে দিয়ে সে উঠে পড়লো। আবার তার চলা সুরু হোল।

অফিসের পর মানুষের যাতায়াত আরো বেড়ে গেছে। সারাদিন পর যে যার গন্তব্যস্থলে চলেছে। শাশ্বতী সেই জনস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। উটরাম ঘাটের কাছে যখন সে পৌঁচেছে—তখন একজন কে যেন তার পিছন থেকে ডাকলো: শুনছেন··শুনছেন।

শাশ্বতী চমকে দাঁড়াল, পিছনের দিকে তাকাতে দেখলো—সেই লোকটি এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললে: আপনার সংগে একটু কথা আছে।

শাশ্বতী বিস্মিত হয়ে বললে: আমার সংগে? আমার সংগে আপনার কি কথা থাকতে পারে?

—আছে। আমি আপনাকে বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি। আপনি কোনো কথা না বলে রাস্তার এ পাশে আসুন। এখানে বেশী কথা বললে রাস্তায় লোক জমে যাবে।

শাশ্বতী ভয় পায়, কিন্তু মুখে এমন দেখায় যেন সে ঐ সব কিছুই পরোয়া করে না। লোকটির সংগে রাস্তার ওপাশে গিয়ে সে বললে: বলুন এবার কি কথা আছে?

কি যে বলবে লোকটি তা বলতে পারে না। শুধু সে বললে: আপনি বাড়ী যাবেন।

শাশ্বতী বললে: হ্যাঁ।

—চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই। আমার গাড়ী আছে।

শাশ্বতী কিছু উত্তর দিতে পারে না।

লোকটি এবার বললে: আমি লক্ষ্য করেছি আপনি বিপদে পড়েছেন। তাই আমি আপনাকে আমার গাড়ী করে পৌঁছে দিতে চাই। আপনার কোনো ভয় নেই।

কি যেন ভেবে শাশ্বতী বললে: আচ্ছা চলুন।

একটু দূরেই লোকটার গাড়ী ছিল। ওরা দুজনে গিয়ে উঠে বসলো গাড়ীতে। লোকটি জিগ্যেস করলো, আপনি থাকেন কোথায়?

—বালিগঞ্জে।

গাড়ী মন্থর গতিতে গঙ্গার ধার দিয়ে চললো।

—আপনাকে আর কোনো বিষয়ে আমি সাহায্য করতে পারি?

—ধন্যবাদ। আপনি আমাকে বাড়ীতে শুধু পৌঁছে দিন, তা হলেই হবে।

লোকটি যেন এইটুকু সাহায্য করে খুশী নয়। আরো কিছু যদি করতে হয়—তার জন্য প্রস্তুত।

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। শাশ্বতীর বুকের ভেতরটা এক রকম প্রায় শুকিয়ে আসছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে তাকে ত্রিশটা টাকা মণির কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এই টাকা দিতে না পারলে সত্যি খুব কেলেংকারী হবে।

লোকটি শাশ্বতীকে এমনি অন্যমনস্ক দেখে বললে: আপনার বুঝি ভয় হচ্ছে?

—না। ভয় হবে কেন? আপনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আপনার সংগে গাড়ী করে যাচ্ছি—তাতে আবার ভয় কিসের।

ভদ্রলোক এবার গাড়ী নিয়ে খিদিরপুর ব্রীজ ছাড়িয়ে আলিপুরের একটি নির্জন রাস্তায় এসে গাড়ী থামালেন।

ভদ্রলোক এবার একটু অনুনয়ের সুরে বললেন: আসুন না আমার বাড়ীতে। একটু বসে তারপর যাবেন।

শাশ্বতী বললেন: দেখুন আমাকে ছ'টার মধ্যেই বাড়ী ফিরতে হবে। ভীষণ জরুরী কাজ আছে।

—আমি আপনাকে পাঁচ মিনিটে পৌঁছে দেব।

—আজ নয়। আর একদিন আসবো।

—না না আজই আসুন। বিশ্বাস করুন আপনাকে দেখেই আমার ভাল লেগেছে। প্লীজ—আসুন আমার সংগে।

শাশ্বতীকে যে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে—তা কোনো দিন ভাবতেই পারিনি। লোকটির প্রস্তাবে সে শুধু বিস্মিত হয়নি—আহত হয়েছে। তবু শাশ্বতী মনোবল হারায়নি। অন্ধকারে একটি অপরিচিত পুরুষের কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ সে খুঁজে বেড়ায়। মনে মনে ভীষণ সে রাগ করে। শক্তি দিয়ে পরাস্ত করার ক্ষমতা তার নেই।

লোকটি সাপের মতন শাশ্বতীকে জড়িয়ে ধরে। তারপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা করে। অনুনয়, বিনয়ে যখন কোনো কাজ হোল না—তখন লোকটি জোর করে শাশ্বতীকে উপভোগ করার চেষ্টা করে।

শাশ্বতীর সারা শরীরটা রী-রী করে ওঠে। রাগে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। পুরুষের এই আচরণ—যে কোনো মেয়ের কাছে ঘৃণার ব্যাপার। শাশ্বতী গর্জন করে ওঠে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য সে তার সকল শক্তি প্রয়োগ করে। তারপর সে যখন নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, তখন গাড়ী ষ্টার্ট করার লোহার হ্যাণ্ডেলটি দিয়ে সজোরে লোকটির মাথায় আঘাত করে। অন্ধকার নির্জন পথে একটি আর্তনাদ শোনা যায়। শাশ্বতী গাড়ীর দরজা খুলে নেমে পড়ে। লোকটি বোধ হয় অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।

শাশ্বতী যে এমনভাবে লোকটিকে আঘাত করতে পারবে—তা সে নিজেই জানতো না। শাশ্বতী হাঁপাতে থাকে। নিজে একটু ভাল করে লক্ষ্য করলো। হ্যাঁ সত্যি লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তারপর তার মনে হলো—মাথায় আঘাত পেয়েছে—লোকটি মরে যায়নি তো? শাশ্বতী পরীক্ষা করে দেখে লোকটি এখনও জীবিত আছে। মাথা গুঁজে সে ষ্টিয়ারিং-এর ওপর পড়ে আছে আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। লোকটির জামার বুক পকেটে অনেকগুলি দশ টাকার নোট। শাশ্বতী ঐ টাকা থেকে তুটো দশ টাকার নোট বার করে নেয়। তারপর ত্রস্ত পদে সে এগিয়ে যায় বড় রাস্তার দিকে। এদিকের পথঘাট তার বেশী জানা নেই। তবু আন্দাজ করে চলতে সুরু করে। চলতে চলতে সে নিউ আলিপুরের কাছে চলে আসে।

সামনে দিয়ে একটি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। শাশ্বতী ট্যাক্সিটি থামিয়ে তাতে উঠে বসলো—তারপর সে বললে, টালিগঞ্জ। ট্যাক্সি যখন টালিগঞ্জের ট্রাম ডিপোর কাছে এসেছে—তখন শাশ্বতী বললে: রোখ দেও।

ট্যাক্সি থেমে গেল। মিটারে যা উঠেছিল তা দিয়ে শাশ্বতী সামনের একটি গলিতে ঢোকার ভাণ করলো। তারপর যখন সে দেখলো ট্যাক্সিটি তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে—তখন সে ট্রামে উঠে বসলো।

এবার একটু হাঁপ ছাড়তে পারলো শাশ্বতী। সাদার্ণ এভিন্যুর মোড়ে এসে সে নেমে পড়লো।

ওখান থেকে একটি রিক্সায় করে গিয়ে শাশ্বতী হাজির হোল মণির অফিসে। এমনি ভাবে যে শাশ্বতী আসবে তা মণি ভাবতে পারেনি। ওকে দেখে মণি বেশ অবাক হয়ে যায়।

শাশ্বতী মণির সামনে টেবিলের ওপর ব্যাগ থেকে সব টাকা পয়সা বার করে দিয়ে বললে: দেখো কত আছে। তোমার ত্রিশটা টাকা গুণে নাও।

মণির মুখে আর কোনো কথা আসে না। শাশ্বতীর এমন মেজাজ দেখে সে-ও বেশ ভয় পায়।

যাই হোক ত্রিশ টাকা নিয়ে মণি বললে: আপনি আমাকে যে পঁচিশ টাকা বেশী দিয়েছেন।

শাশ্বতী ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে: বেশী দিইনি। ওগুলো আমাকে দাও। পঁচিশটি টাকা ব্যাগের মধ্যে রেখে শাশ্বতী মণির অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো।

শাশ্বতী যখন বাড়ী ফিরলো তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। সিঁড়ির মুখে ওর সংগে দেখা হয়ে গেল মিসেস মেটার।

একটু মৃদু হেসে মিসেস মেটা বললে: কোথায় গিয়েছিলে তুমি? জয়ন্ত বাবু তোমাকে তিন তিনবার ফোন করে খুঁজেছে।

শাশ্বতী জিগ্যেস করে: কি ব্যাপার?

মিসেস মেটা বললে: আমি বলেছি তুমি তোমার বোনের বাড়ী গেছ।

—তাতে কি বললে?

—বলল—আজই সন্ধ্যেবেলায় তিনি কোলকাতার বাহিরে যাচ্ছেন। ফিরতে তুদিন দেরী হবে।

শাশ্বতীর মুখে স্বস্তির হাসি। সে বললে: চলো তোমার ঘরে, একটা টেলিফোন করবো।

ওরা তুজনে ওপরের ঘরে এলো। শাশ্বতী মণিকে টেলিফোন করে বললে: কাল ব্ল্যাক বয় ও টনি লককে পাঁচ টাকা, পাঁচ টাকা করে ব্যাক করবে। ষ্টেট উইন।

* * * *

শাশ্বতী নিজের ঘরে এসে বিছানার ওপর তার দেহটা এলিয়ে দেয়। মাথার ওপর খুব জোরে পাখা ঘুরছে। মিসেস মেটা তার ঘরে এসে জিগ্যেস করলো: কি ব্যাপার বল তো? সারাদিন কোথায় গেছলে? শাশ্বতী মিসেস মেটাকে জড়িয়ে ধরে বললে: প্লীজ—আজ আর অন্য কোনো কথা নয়। এসো আজ ভাল করে নেশা করা যাক। আজকের রাত্রিটা আমরা তুজনে মিলে উপভোগ করবো।

মিসেস মেটা একটু হেসে বললে: সত্যি—তোমাকে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। কিন্তু তবু তুমি ভারী মিষ্টি মেয়ে।

## শ্রীদুর্গা

### জ্যোতির্ম্ময়ী মুখোপাধ্যায়

এস মা তুর্গা, এস মা তুর্গা, এস, তুর্গতিনাশিনী।
এস মা চণ্ডিকে এস মা অম্বিকে এস কৈলাসবাসিনী॥
ফুলে ফুলে মিলি গাঁথিয়াছে মালা।
শ্যামলা ধরণী সাজায়েছে ডালা॥
ভরা নদী বহে কুলু কুলু তানে।
পাখিরা মেতেছে সুমধুর গানে॥
কত লোকে মাগো কত আয়োজনে।
করে তব পূজা রাতুল চরণে॥

আমি অতি দীন কি দিব চরণে।
বারিধারা বহে মোর তু' নয়নে॥
কি ফুলে তোমার করিব গো পূজা।
কি নামে ডাকিব বল দশভুজা॥
ওগো মহামায়া এস গো শরণে।
ভক্তি ভক্তি মাগি ও রাঙা চরণে॥

## পল্লী-বাংলার দুর্গোৎসব

তরুরাণী রায়

বাঙালীর সব চাইতে বড় আনন্দোৎসব দুর্গাপূজা। এই সুমধুর সর্ব্বজনীন পূজার অনুষ্ঠান এতদ্দেশের চিত্তাকর্ষক জলবায়ুর মতই বৈশিষ্ট্যতায় অনন্যসাধারণ। এমন সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বজন মনোমুগ্ধকর জাতীয় উৎসব অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। কিন্তু বরষার ঘনঘটার অবসানে নির্ম্মল মেঘমুক্ত আকাশ যখন জলভরা নদীর বুকে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, এবং পশ্চিম দিগন্তের সিঁদুর লেপা স্বচ্ছ মেঘমালার কাছ থেকে ছোট ছোট নৌকাগুলি পালের তালে তালে তক তক করিতে করিতে পদ্ম সুরভিত অতল বিলের বিপুল বক্ষ চিরিয়া হেলিয়া দুলিয়া আপন মনে ভাসিয়া চলে, আর সুদূর পল্লীর সন্ধ্যা আরতির কাঁসরঘণ্টার মনমাতান ধ্বনি যখন জলের উপর দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া অধিকতর করুণ রাগিণী বহিয়া আনে, তখন বাঙালীর প্রাণে যে কি এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগায়, অনাগত আনন্দের সূচনা করে, তাহা পল্লী-বাংলার অধিবাসী মাত্রেই সম্যক উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন।

প্রভাতে কি এক অহেতুকী আশা ও আনন্দে মন যেন অজ্ঞাতেই নৃত্য সুরু করে দেয় শেফালী ফুলের অপূর্ব্ব গন্ধের সুধাময়ী আহ্বানে। কি যেন আসিতেছে, কি এক আনন্দের আশায় মন যেন বিগত দিনের দুঃখরাশিকে পেছনে ঠেলিয়া নূতন স্বপ্নের নব আয়োজনের জন্য ব্যস্ততা অনুভব করিতে থাকে। প্রতিটি প্রভাত যেন নিত্য-নূতন আশার বাণী বহন করিয়া আনে। পূজা আসিতেছে। বর্ষাস্নাতা শারদীয়া প্রকৃতি যেন তার আগমনী-গানে মুখরিত হইয়া উঠে।

এমনই সুন্দর আবেষ্টনীর মধ্যে বাংলার দুর্গোৎসবের শুভ তিথিগুলি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সাধারণ মন ততই আনন্দে ভরপুর হইতে আরম্ভ করে। হিন্দু-সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের মিলিত উৎসব এই দুর্গাপূজা; এ পূজা একার নয়, একা একা এ পূজা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কারণ এর ক্রিয়াকাণ্ডগুলিই ঋষিগণ সকলের করিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন। পূজার প্রধান উপাদান নবপত্রিকা সংগ্রহ ব্যাপারে, মালী তার অংশ নিবে। পূজার আগে থেকেই সে মনে মনে ভাবে পূজায় তার আহ্বান আসিবে। সে কি নগণ্য আনন্দ? পুরোহিত যেমন পূজার সুবৃহৎ অংশ অধিকার করে নিজ কর্ত্তব্য ভার মহিমায় আনন্দিত; মালী নব-পত্রিকার সামগ্রী আহরণ ও পূজা মণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বে পরিষ্কার করার কাজেও তার চেয়ে কম আনন্দ পায় না। সেই পূজা-বাড়ীতে মায়ের আরাধনার উদ্যোগপর্ব্বে অন্যান্যদের সঙ্গে তাহারও একটা একত্ব ভাব জড়িত আছে। তেমনি নাপিতের দর্পণ না হলে মায়ের স্নানের কাজ চলে না। কুম্ভকারেরা ত' এই উপলক্ষে প্রতিমা গড়িয়া দু'পয়সা রোজগার করিবার ফিকিরেই থাকে।

কোন কোন বাড়ীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি জন্মাষ্টমী দিনেই প্রতিমার কাঠামো খিল দেওয়া হয়। কাঠমিস্ত্রী আসিয়া ঘটা করিয়া কাঠামো খিল দিয়ে যায়। এমনি কর্ম্মকার খড়্গ তৈয়ার করিয়া দেয়, পূজার অঙ্গ শত্রু বলির জন্য। এ ভাবে এরা সকলেই পূজার কাজের অংশ লয়। পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে পূজায় উৎসর্গীকৃত দ্রব্য সামগ্রীর অংশও এদের প্রাপ্য হয়। কারণ, সমাজপতিরা পুরোহিতদের সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা প্রাচীনকাল হইতেই করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে পাড়ার লোকদের আনন্দের সীমা থাকে না। প্রায় জন্মাষ্টমী দিন থেকেই ছেলেরা গ্রামের সকল পূজা বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে আরম্ভ করে কোন বাড়ীর প্রতিমা নির্ম্মাণ কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে। ক্রমে যতই প্রতিমা নির্ম্মাণ শেষ হইয়া আসিতে থাকে অর্থাৎ চন্দ্রমার মত মায়ের রূপ যতই আকার ধরিয়া মাটির কাঠামোতে স্পষ্ট হইয়া উঠে, ততই তাদের মন উৎসাহে উদ্বেলিত হইয়া পড়ে। কুম্ভকারদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রতিবেশী ছেলেরা প্রতিমার রূপবিন্যাসে সহায়তা করে। কি আনন্দ! দৈনন্দিন কাজে অবসর পাওয়া মাত্র বালবৃদ্ধ যুবা নির্ব্বিশেষে সকলে পূজাবাড়ী যাইয়া এই সময়টুকু আনন্দে কাটায়। রোজ একবার পূজাবাড়ী না গেলে কাহারও শান্তি লাগে না। দুর্ব্বহ জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যেও যে শান্তির ও আনন্দের অবসরটুকু সেখানে কাটান গেল, তাহা যদি একদিন বাদ পড়িয়া যায় তবে যেন শত কাজ করা সত্ত্বেও সেই দিনটা বৃথাই গেল বলিয়া মনে হয়। এমনি করে পূজার আনন্দ ঠিক পূজার বহু আগে থেকেই গ্রামে গ্রামে হিন্দুসমাজের প্রতিটি স্তরের লোকের মনে সাড়া জাগায়।

পূজার উপাদান সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে ইহা একটি সর্ব্বাত্মক উৎসব। ভগ্ন কুটীরের উই মৃত্তিকা থেকে প্রবাল পাথর এমন কি সপ্ত সাগরের জল পর্য্যন্ত মায়ের স্নানের উপকরণ। এ যে মহা পূজা। তাই জগতের সকল ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য সকলেরই প্রয়োজন ইহার সমাধানে। কার সাধ্য একা জগন্মাতার পূজা সারে। এ যে আপনা থেকেই সর্ব্বজনীন।

পূজার দিনের কথা কি বলিব। এমন অভূতপূর্ব্ব আনন্দ আর কোনও ব্যাপারে হওয়া সম্ভব নয়। বড় বড় মেলা, বড় বড় প্রদর্শনী, বড় বড় বিজয়-উৎসব কতই ত হয়। কিন্তু তাতে মুষ্টিমেয় লোকের (সেও সমাজের সর্ব্বস্তরের নয়) প্রাণে সাময়িক উচ্ছ্বাস আনে মাত্র। পূজার আনন্দ যেমন সর্ব্বজনীন তেমনি ইহা অনন্যসাধারণ। নিজ বৈশিষ্ট্যে ইহা সর্ব্বোত্তম, পার্থিব আনন্দে অতুলনীয়। তাই ইহা স্বর্গীয়, মহান ও চিরন্তন। বিল্ববষ্ঠী দিন থেকেই পূজা আরম্ভ হয়ে যায়। অমানিশার অন্ধকার ভেদ করিয়া শুক্লপক্ষের চাঁদের মত আপামর সন্তানদের বেদনাক্লিষ্ট বিকল হৃদয়কে নূতন আশায় উদ্ভাসিত করিয়া মহিষাসুরমর্দ্দিনী, দুর্গতিহারিণী, পতিতপাবনী মায়ের আবির্ভাব হয় মৃন্ময়ী প্রতিমাতে। অমনি বিশ্ব প্রকম্পিত করিয়া বাজিয়া উঠে কাঁসর ঘণ্টা ও জয়ঢাক। ললনার উলুধ্বনি ও মঙ্গল শঙ্খ নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ কণ্ঠের মাতৃস্তব চণ্ডীপাঠ দ্বারা মায়ের আবাহন উৎসব আরম্ভ হয়।

তিন দিন মায়ের আরাধনা, কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণ, আরত্রিক প্রভৃতি কাজে বিন্দুমাত্র বিরাম বিহীন উৎসবাতুর বঙ্গবাসীর কি এক পরম মহোৎসব, সে না দেখিলে পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সে তিনটি দিনের আশায় বাঙালী প্রবাসে থাকিয়া দিন গণে, প্রায় সমগ্র পৃথিবীর বিরাট ব্যবসায়ীমহল পণ্যসম্ভার যোগায় বাংলার শহরে-বন্দরে হাটে-বাজারে, সে তিনটি দিনের আনন্দের চিন্তায় মাসাবধিকাল ধরিয়া হিন্দু হৃদয়ে এক পরম ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই দিন কয়টি যখন মায়ের দশদিক বিকাশিনী রূপকে বুকে করিয়া সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বাঙ্গালীর মনের আনন্দ কূল ছাপাইয়া প্লাবন বহাইয়া দেয়। এই কয়টি দিন ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই গতানুগতিক কাজ থেকে সাধ্যানুযায়ী মুক্তি নেয়। এ যেন এক সর্ব্বজনীন স্বতঃপ্রবৃত্ত ছুটি। সকলেরই এক মাত্র কাজ হইল জগদম্বার ঐশ্বর্য্যময়ী আবির্ভাবকে সর্ব্বতোভাবে অভিনন্দন আর চির আকাঙ্ক্ষিত মাতৃযজ্ঞের মহা অনুষ্ঠানে যোগদান। ঋষি প্রবর্ত্তিত মহামন্ত্রগুলি সুপণ্ডিত পুরোহিতের মুখে উচ্চারিত হইয়া প্রতিটি প্রাণে প্রাণে ত্বরিৎ পরশের মত সকলের মন থেকে যেন বিগত বর্ষের কলুষ অপনোদন করিয়া লয়, হৃদয় পবিত্র করিয়া দেয়, আর সকলের আমিত্ব বোধটাকে গলাইয়া দিয়া আত্মসত্তাকে মাতৃচরণে অর্ঘ্য দিতে প্রলুব্ধ করে।

গ্রাম গ্রামান্তর হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পূজার আনন্দে যোগ দেবার জন্য পাড়াময় গ্রামময় ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রতিমা দর্শন করে ও প্রসাদ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় আরতি ও রাত্রিতে মায়ের কীর্ত্তন, রামায়ণ গান ও পৌরাণিক নাটক অভিনয় দেখিতে দেখিতে পূজা বাড়ীতেই দিন রাত্রি কাটাইয়া দেয়।

এমনি আনন্দে এমনি মহাপূজায় যখন হিন্দু জাতি একান্ত আত্মভোলা, পূজার তিনটি মাত্র দিন কেমন করিয়া যে কাটিয়া যায় কেহ যেন টেরও পায় না। নবমীর সন্ধ্যায় বঙ্গবাসী আকুল হইয়া উঠে পূজার অবসান আশঙ্কায়। পরদিন বিজয়া দশমী যখন সকল আনন্দকে ম্লান করিয়া দিয়া নিজ বেদনাভরা প্রকৃতি

লইয়া উপস্থিত হয় তখন সকলেই যেন প্রমাদ গণে। এবারের মত পূজা শেষ হইল, আবার বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আর এমন দিন আসিবে না, এই চিন্তায় বাঙ্গালী এমনি ব্যাকুল হইয়া পড়ে যে তাহার চোখে আকাশ তখন কাঁদ কাঁদ হইয়া যায়, গাছপালা পশুপক্ষী দিক বিদিক সহ গোটা প্রকৃতিটাই যেন বিমর্ষ মলিন হইয়া পরে। শরতের আগমনে যে প্রকৃতি সকলের মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের বান আনিয়া দিয়াছিল সেই প্রকৃতি যেন দশমীর প্রভাতে বিষন্ন মুখে ব্যঙ্গ করিতে থাকে। পূজাবাড়ীর লোক-গুলাও একরূপ মনমরা হইয়া যায়। একটা বিষাদের কালো ছায়া সারা বাড়ী ছড়াইয়া পরে। সবই ঠিক আছে কিন্তু কাহারও সেই উৎসাহ নাই। স্বয়ং মৃন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিও যেন সন্তানদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া আকুল হইয়া পড়েন। পাড়ার ছেলেরা বার বার মায়ের পায়ে প্রণতি জানায়। মনে প্রাণে পুনঃপুনঃ মিনতি করিয়া বলে, "মা, আবার এস কিন্তু"। বিজয়া দশমী দিনে বিসর্জ্জনোন্মুখ মাতৃমূর্ত্তির পানে না চাহিলে এবং নিজ প্রাণে দরদ দিয়ে বুঝিবার চেষ্টা না করিলে তাহাদের সেই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাকুলতা ভাষায় বুঝান অসম্ভব। মেয়েরা দলে দলে মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে, সকল কাজ ফেলিয়া মায়ের পায়ের সিঁদুর সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গ্রামসুদ্ধ লোক বিজয়া দশমী দেখিবার জন্য নৌকা করিয়া নদীতে জড় হয়। বড় বড় নৌকা সাজাইয়া এবং উহাতে প্রতিমা উঠাইয়া লইয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে পূজাবাড়ীর লোকেরা নদীর বুকে বিসর্জ্জন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলে সমবেত জনমণ্ডলী "দুর্গা মা কী জয়" বলিয়া আকাশ কাঁপাইয়া তোলে। মাসাধিক কাল ধরিয়া যে মাটির প্রতিমাকে কেন্দ্র করিয়া দেশে এমন আনন্দের বান আসিয়াছিল তাহার বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সেখানে আবার সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া মায়ের আরতি করে, কীর্ত্তন গায়। কাহারও ইচ্ছা করে না প্রতিমার বিসর্জ্জন হউক। ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামের প্রতিমার নৌকা বাদ্যের তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া নদীর তীরের ডুবু ডুবু কালীগাছকে দক্ষিণে রাখিয়া সারি দিয়া নোঙর গাড়ে। প্রায়ই বিজয়া দশমী দিনে নদীতে ঝড় উঠে বলিয়া মিস্ত্রেরা তাড়াতাড়ি বিসর্জ্জন সারিতে চায়। কিন্তু কাহার ও প্রাণ এই মাটির মূর্ত্তিকে ছাড়িয়া যাইতে চায় না। সকলেরই ভাবনা মাকে বিসর্জ্জন দিয়া কি লইয়া বাড়ী ফিরিবে। সেই আনন্দের পুরীতে ফিরিয়া গিয়া কি দেখিবে এই ভাবিয়া সকলেই আকুল হইয়া উঠে। অধিক রাত্রিতে কাঁসর ঘণ্টার শ্রুতিমধুর ধ্বনির মধ্যে একের পর এক প্রতিমার বিসর্জ্জন হইতে থাকে। আর বিরাট জনতা প্রতিটি মূর্ত্তি নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আকুল হইয়া মা মা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। কাঁসর ঘণ্টার রবে প্রাণের আবেগকে চাপা দেওয়া যায় না। সর্ব্বহারার দল একে অন্যের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দেখে, সকলেরই এক অবস্থা। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, মানী, নিপীড়িত, পূজ্য, অস্পৃশ্য সকলেরই মা গিয়াছেন। সকলেই অসহায়। এই বিপদের বেদনায় একে অপরের বুকে আছাড় খাইয়া পড়ে, ভাই ভাই বলিয়া কোল দেয়; ভেদাভেদ ভুলিয়া যায়। বিজয়ার সম্ভাষণে বাঙ্গালী মত্ত হইয়া উঠে। মায়ের এই পরম আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া লয়, সকলে মিলিয়া সমবেত কণ্ঠে গান করিতে করিতে বাড়ী ফিরে :—

আমি ডাকি মা মা, মায়ত কানে শুনে না।
ছেড়ে যেতে পরাণ বিদরে গো অভয়া।
সপ্তমী অষ্টমী তিথি নবমীতে হল স্থিতি।
আজ হল বিজয়া দশমী গো অভয়া।
মাকে ভাসায়ে জলে কি নিয়ে থাকিব ঘরে।
ছেড়ে যেতে পরাণ বিদরে গো অভয়া। ইত্যাদি।

# প্রিয় লেখক

## শিবানী ঘোষ

ফিলজফির ক্লাস শেষ হতেই শ্যামলী ছুটতে ছুটতে আসে লাইব্রেরী-ঘরে। এসেই লাইব্রেরিয়ানকে বলে—কই আমার বইটা?

লাইব্রেরিয়ান মুখ তুলে বলেন—কি বই?

—'সোনালী দুপুর'।

লাইব্রেরীয়ান একটা হাই তুলে বলেন—ও বইটা এখুনি যে একজন নিয়ে গেল।

—তার মানে!—শ্যামলী রুখে বলল—ওসব আমি শুনতে চাই না, ও বইটা আমার চাই-ই।

লাইব্রেরিয়ান বলেন—এই ত্যাখো মুস্কিল। বলছি বইটা এখুনি একজনকে দিয়ে দিলাম।

শ্যামলী বলে—দিলেন কিসের জন্যে? আমি তো সকাল বেলা এসেই আপনাকে জানিয়ে স্লিপ দিয়ে গেলাম।

লাইব্রেরিয়ান বলেন—তা গেলে জানি, কিন্তু সে-কথা আমার যে একেবারেই খেয়াল ছিল না। তুমি এই এখন আসাতে মনে পড়লো।

শ্যামলী বেণী দুলিয়ে রাগত ভাবে বলে—হুঁ: এইজন্যেই আপনার ওপর রাগ হয়।

লাইব্রেরিয়ান বলেন—আহা আরও তো বই রয়েছে। নাও না একটা বেছে।

—থাক্ দরকার নেই। নবেন্দু সেনের বইটাই যখন পাওয়া গেল না তখন আর আমার কিছু চাই না।—বলে শ্যামলী শূন্য দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখে সামনের বই ভর্তি আলমারীটার পানে।

এমন সময় পেছন দিক থেকে মৃদু কণ্ঠে কে যেন বলল—আপনি বুঝি খুব নবেন্দু সেনের বই পড়েন?

শ্যামলী পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল বনানী। মেয়েটি নতুন ভর্তি হয়েছে। তার সাথে এখনও ঠিক পরিচয় হয়নি। আর তারই হাতে রয়েছে নবেন্দু সেনের 'সোনালী দুপুর' বইটা।

লাইব্রেরিয়ান বললেন—এই তো এ নিয়েছে বইটা। এবার এর সাথে বলাবলি করে নাও।

বনানী বলে—আপনি নেবেন বইটা?

শ্যামলী বলে—থাক্ আপনার পড়া হয়ে গেলে নেবো।

বনানী বলে—এ আমার পড়া বই। আমি একজনকে দেখাবো বলে নিয়েছিলাম। তা আপনি স্বচ্ছন্দে এটা নিয়ে যেতে পারেন।

এই ভাবেই হল তাদের প্রথম আলাপ। শ্যামলী সেদিন হাত

বাড়িয়ে বইটা নিয়েছিল বনানীর হাত থেকে এবং তা থেকেই ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলো পরস্পরের। এই ঘনিষ্ঠতা দুদিনেই এত বেড়ে গেল যে তাদের 'আপনি' সম্বোধনকে তখুনি নেমে আসতে হল 'তুই' সম্বোধনে।

শ্যামলী একদিন বললে—ভাখ, বনানী তোকে আমি রোজ একটা কথা জিজ্ঞেস করবো মনে করি।

—কি বল্ না?

শ্যামলী একবার তার মাথার পানে তাকিয়ে বলে—তোর সিঁথির রেখা দেখলে মনে হয় ওতে যেন অল্প একটু সিঁদূরের দাগ রয়েছে। তা সত্যি করে বলতো তোর ঐ দাগের পরিচয় কি সত্যি?

বনানী হেসে বলে—ওঃ তোর দৃষ্টি এড়াবার এতটুকু জো নেই। আমি রোজ কলেজে আসবার আগে ঐ দাগটা মুছে আসি। কারণ ঐ দাগ মাথায় নিয়ে কলেজ আসতে আমার ভারী লজ্জা করে। তা তোর কাছে কি আর রেহাই পাবার উপায় আছে।

শ্যামলী বলে—তুই কি মেয়ে রে বনানী! বিয়ে যখন হয়েছে তখন মাথায় সিঁদূর দিয়ে কলেজ আসতে লজ্জাটা কোথায়? তা হ্যাঁরে তাঁর নামটা কি?

বনানী বললে—সে নামটা শুনলে তুই খুব অবাক হবি।

—মানে?

বনানী একবার তার মুখের পানে তাকিয়ে বলে—মানে সে হল তোর প্রিয় লেখক নবেন্দু সেন।

এই কথা শুনে চমকে উঠে শ্যামলী বলে—হ্যাঁ বলিস কি রে বনানী এই খবরটা এতদিন বলিস নি! তা খবরটা এখুনি তো আমাকে ক্লাস রটাতে হচ্ছে।

বনানী বলে—দোহাই তোর শ্যামলী, এ খবর ক্লাসে রটিয়ে আমাকে আর অপদস্থ করিস না।

শ্যামলী বলে—আচ্ছা তা নয় হল, কিন্তু তোর স্বামীর সাথে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। তা কবে দিবি বল্?

বনানী বললে—ওঁর সাথে পরিচয় করতে গেলে তোকে যেতে হবে মধুপুর। ও অবশ্য কলকাতায় প্রায়ই আসে। তবে আমাদের 'সামার ভেকেসান'-এর আগে আর আসবে না। কাজেই এক কাজ কর না, তুই গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার সংগেই চল্ না মধুপুর। আমি ঐ দুটো মাস ওখানে গিয়েই থাকবো।

শ্যামলী বললে—তোর শ্বশুরবাড়ী বুঝি মধুপুরে?

—হ্যাঁ।

—ওখানে কে কে থাকেন?

—থাকেন আমার শাশুড়ী আর স্বামী।

—তোর ছেলেপুলে নেই?

—না।

—বেশ তবে ঐ কথাই রইলো। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি মধুপুরে যাব তোদের বাড়ী। তবে একটা কথা, আমি তোর সাথে যাব না। তুই আগে চলে যাবি। মানে ওখানে গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে রাখবি। তারপর আমি যাব। অবশ্য যাবার আগে তোকে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবো।

—আচ্ছা।

সেদিন এই ভাবেই সমাপ্ত হল শ্যামলী ও বনানীর কথাবার্তা।

এর পর শীঘ্রই এসে গেল গ্রীষ্মের অবকাশ। বনানী ছুটির প্রথম দিনেই রওনা হয়ে গেল মধুপুরের পথে। শ্যামলীও তার দিন পাঁচেক পরেই একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিল আগামীকালই সে রওনা হচ্ছে।

তুফান এক্সপ্রেস, যেটা হাওড়া থেকে বেলা এগারটার সময় ছাড়ে, তাতেই যাবার ঠিক ঠাক করে ফেলল শ্যামলী। নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে গিয়ে সে তার হোল্ডল বিছিয়ে দখল করে বসে রইলো সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের একটা বেঞ্চ। যে কোন কারণেই হোক ঐদিন একটু ভিড় ছিল গাড়ীতে। থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টগুলো অনেক আগেই ভর্ত্তি হয়ে গেছে। সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টগুলোতেও আর বসবার জায়গা ছিল না। তখনও গাড়ী ছাড়তে মিনিট দশেক দেরী। একটা বেঞ্চে শ্যামলীকে একা দেখে অনেকেই সেখানে এসে দাঁড়াচ্ছেন একটু জায়গা পাওয়ার আশায়। তবে যুবতী নারী দেখে সমীহ বোধ করেন প্রত্যেকেই। কাজেই কোন কথা না বলে তাঁরা নেমে চলে যান অন্য কম্পার্টমেণ্টের উদ্দেশ্যে। শ্যামলী একটা বই-এর মধ্যে মুখ গুঁজে আড়চোখে ঘন ঘন চেয়ে দেখে তার হাত-ঘড়িটা। তার কেবলই মনে হচ্ছে গাড়ীটা ছাড়লে যেন সে বাঁচে। না হলে এখুনি কে এসে এই বেঞ্চটা দখল করে ব্যাঘাত ঘটাবে তার স্বাচ্ছন্দ্যের।

ঠিক হলও তাই। গাড়ী ছাড়ার মিনিট দুয়েক আগে এক যুবা পুরুষ এসে বললেন—আপনার পা দুটো একটু গুটিয়ে বসলে আমি এখানটায় বসতে পারি।

শ্যামলী একবার বললে—অন্য কোথাও আর জায়গা নেই?

ভদ্রলোক বললেন—থাকলে নিশ্চয়ই আপনার কাছে এসে এ কথা বলতাম না।

শ্যামলী বিরক্তির সাথে পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে বলে—আমাকে যে অনেকটা পথ যেতে হবে।

ভদ্রলোক সে-জায়গাটায় বসবার আয়োজন করতে করতে বললেন কদ্দূর যাবেন?

—মধুপুর।

—মাত্র মধুপুর!—ভদ্রলোক তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন—তার জন্যে দিনের বেলায় এই হোল্ডল বিছিয়ে চলেছেন! আমি তো মনে করেছিলাম লক্ষ্ণৌ দিল্লী যাচ্ছেন। মধুপুরে এ গাড়ী তো বিকেলেই পৌঁছে যাবে। আর আমিও তো ওখানেই যাচ্ছি।

ভদ্রলোকের কথাগুলো খানিকটা শ্লেষের মত শোনায় শ্যামলীর কানে। বিশেষ করে উনিও মধুপুর যাবেন শুনে তার অত্যন্ত বিরক্ত লাগে। এই পাঁচ ঘণ্টা এই ভাবে পা গুটিয়ে বসে থাকাটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর হবে। তবে তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে মন দিয়ে পড়তে শুরু করে দেয় তার হাতের বইটা। গাড়ী তখন চলতে শুরু করে দিয়েছে। ভদ্রলোক একবার তার পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন—মধুপুরে আপনি থাকেন কোথায়?

তাঁর কথার কোন জবাব দেবে নাই স্থির করেছিল শ্যামলী। কিন্তু তার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল—ওখানে আমি থাকি না, বেড়াতে যাচ্ছি।

—কাদের বাড়ী?

তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্যামলীর বলতে ইচ্ছে করছিল 'যমের বাড়ী',

তবে মনের সে ভাব প্রকাশ করে সে একটু গর্ব ভরেই বলে—সাহিত্যিক নবেন্দু সেনের বাড়ী।

—নবেন্দু সেনের বাড়ী যাচ্ছেন! ওঁর সাথে আপনার পরিচয় আছে নাকি?

—না তাঁর সাথে আমার পরিচয় নেই। তবে তাঁর স্ত্রী আমার সহপাঠিনী সেই সম্পর্কেই আমার যাওয়া।

—ও। তা আপনার হাতের বইটা নবেন্দু সেনের বলেই যেন মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—ওঁর লেখা বুঝি আপনি খুব পড়েন?

শ্যামলী মৃদু হেসে বলে—হ্যাঁ, ইনিই আমার প্রিয় লেখক। এঁর লেখা পড়তে শুরু করলে আমি আর ছাড়তে পারি না।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন—একেবারে থার্ড ক্লাস রাইটার।

শ্যামলী অন্তরে আহত হয়ে বলে—কেন?

—কেন আর, তার লেখার মধ্যে আছে কি; কতকগুলো গেঁয়ো জংলী মানুষকে নিয়ে কি আর সাহিত্য হয়? ওর লেখার মধ্যে না আছে কোন অভিজাত বংশের নরনারী, না আছে কোন রস কষের বালাই।

শ্যামলী বলে—এ আপনার ভুল ধারণা। গেঁয়ো জংলী মানুষ নিয়ে যে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় তা বহু লেখক প্রমাণ করেছেন এবং এখনও করছেন।

ভদ্রলোক বলেন—তা বলে নবেন্দু সেনের লেখার দাম আমি কাণাকড়িও দিই না।

শ্যামলী বলে—আপনি না দিলেও সাহিত্যের সমঝদারেরা দিয়ে থাকেন।

ভদ্রলোক বলেন—সাহিত্যের সমালোচকদের কথা আর বলবেন না। তারা যে যা লেখে তাতেই হাততালি দেয়। কারও মুখ ফুটে দুটো কথা বলবার সাহসও নেই, জ্ঞানও নেই। আমি যদি একবার কলম ধরতাম তবে এক হাত দেখে নিতাম ঐ নবেন্দু সেনকে।

শ্যামলী একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে—আপনার কথা শুনে ছেলেবেলাকার সেই গল্পটার কথা মনে পড়ে গেল,—যে একটা ব্যাঙ একটা হাতীর মত হবার চেষ্টা করতে গিয়ে ফেটে মরে গিয়েছিল। তা আপনিও যদি কোন দিন নবেন্দু সেনের সমালোচনা করতে কলম ধরেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারও সেই ব্যাঙের অবস্থাই হবে।

ভদ্রলোক তার শ্লেষটা গায়ে না মেখে বলেন—আপনি দেখছি নবেন্দু সেনের অন্ধ-অনুরাগী। আচ্ছা আপনি তো তাঁর বাড়ীতেই যাচ্ছেন। তা তাঁর সাথে দেখা হলেই ফুলের মালা তাঁর গলায় নিশ্চয়ই পরিয়ে দেবেন?

ভদ্রলোকের কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শ্যামলী বলে—দেখুন ভদ্রতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না।

ভদ্রলোক বলেন—আহা আপনি চটেন কেন। নবেন্দু সেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাই একবার তার সৌভাগ্যের কথাটা আগে থেকেই জেনে নিচ্ছিলাম।

একজন অজানা অচেনা ট্রেণযাত্রীর সাথে বেশী কথাবার্তা না বলাই ভাল মনে করে শ্যামলী মন দেয় তার বই-এর মধ্যে। গাড়ী ছুটে চলল আপন গতিতে।

মধুপুর আসার একটা ষ্টেশন আগে ভদ্রলোকটি পুনরায় বলে উঠলেন—আপনার হোল্ডলটা গুটিয়ে ফেলুন। এর পরের ষ্টেশনেই তো নামতে হবে।

শ্যামলী তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে বসে থাকে চুপ করে। পরে মধুপুর ষ্টেশনে গাড়ী ঢোকবার সময় সে তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করে তার হোল্ডলটা। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে বলেন—কিছু সাহায্য করতে হবে?

—থাক ধন্যবাদ!—বলে শ্যামলী নিজেই বেঁধে নিল হোল্ডলটা। পরে ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই সে হাঁক দিল—কুলি!

কুলি এসে নামিয়ে নিয়ে গেল তার সুটকেশ আর বেডিংটা। শ্যামলী গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে দিল কুলির পিছু-পিছু।

রিক্সা-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে এসে শ্যামলী ভাড়া করতে যাবে একটা রিক্সা, এমন সময় ঐ ভদ্রলোক পুনরায় তার কাছে এসে বলেন—একি আপনি রিক্সা করছেন কেন? আমার মোটর রয়েছে, চলুন না আপনাকে পৌঁছে দিই।

—থাক ধন্যবাদ!—বলে একটা রিক্সা ভাড়া করে শ্যামলী তার চালককে জানিয়ে দিল পথের নির্দেশটুকু।

শ্যামলীর রিক্সা চলে গেলে ভদ্রলোক মৃদু হেসে তাঁর মোটরে উঠে ড্রাইভারকে বলেন—ওরে যাবার সময় একটু বাজারটা ঘুরে যাস, কিছু মাছ আর মিষ্টি কিনে নিয়ে যেতে হবে।

বনানী তার বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলীর আগমন প্রতীক্ষায়। এমন সময় তাকে রিক্সাতে আসতে দেখে সে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বলে—এ কি তুই রিক্সাতে এলি কেন? আমি যে তোর জন্যে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বনানীর শাশুড়ী। তিনি বললেন—এই জন্যেই বৌমা আমি তোমাকে ষ্টেশনে যেতে বলেছিলাম। ড্রাইভার নিশ্চয়ই ওকে চিনতে পারেনি।

শ্যামলী বলে—তার জন্যে কি আছে, আমি তো এসে পৌঁছেছি।

বনানী বলে—আয়—আয় ভেতরে আয়।

শ্যামলী বলে—ওঃ জানিস বনানী, গাড়ীতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দারুণ ঝগড়া।

—কেন?

—কেন আর, তাঁর মতে তোর স্বামী একজন থার্ড ক্লাস রাইটার। ব্যস এই লেগে গেল আমার সংগে। তা হ্যাঁ-রে তিনি কোথায়?

বনানী বলে—ও তো আবার পরশু দিন কলকাতা গেছে। আজকেই অবশ্য ফেরবার কথা। সম্ভবত রাতের ট্রেণে আসবে।

এমন সময় মোটরের হর্ণ বাজতেই বনানীর শাশুড়ী বলে ওঠেন—ঐ যে ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে ফিরে এল।

বনানী ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে বলে—না খালি গাড়ী নয়। ওকেও তো নামতে দেখছি। তা হলে ও তুফানেই এল।

শ্যামলী সেদিকে তাকিয়ে দেখে তার ষ্টেশনে দেখা সেই গাড়ীটা। আর গাড়ী থেকে তখুনি নেমে দাঁড়ালেন তার সেই ট্রেণ-সহযাত্রী ভদ্রলোকটি।

বনানী তখুনি সেখানে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়—ওগো এই

আমার বন্ধু শ্যামলী, মানে তোমার লেখার একজন গুণগ্রাহী পাঠিকা। আর শ্যামলী, ইনিই তোর প্রিয় লেখক।

শ্যামলী একটু দ্বিধা ভরে নমস্কার জানায়। আর নবেন্দু সেনও প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলেন—আমাদের পরিচয় অনেক আগেই হয়ে গেছে।

বনানী বলে—তার মানে!

নবেন্দু সেন বলেন—তার মানে হাওড়া থেকে এই মধুপুর পর্যন্ত এসেছি ওঁর সাথে ঝগড়া করতে করতে। বলেই শ্যামলীর মুখের পানে তাকিয়ে বলেন—কি হল আপনি এত চুপ করে গেলেন কেন?

শ্যামলী কৃত্রিম ক্রোধে বলে—যিনি নিজের পরিচয় গোপন রেখে নিজেকে গালাগালি দেন, তাঁর সাথে কথা বলতে আমি লজ্জা বোধ করি।

সেই শুনে হো-হো করে হেসে ওঠেন নবেন্দু সেন। বনানী তার স্বামীর হাত থেকে মাছ এবং সন্দেশের বাক্সটা নিয়ে বলে—থাক তোমাদের ঝগড়ার ফয়সালা পরে হবে, এখন ঘরে এসো সব। বলে বনানী সকলকে নিয়ে ঢুকে পড়ে বাড়ীর মধ্যে।

## বৈজয়ন্তী

### সাবিত্রী সেনগুপ্তা

সিনেমার অভিনেত্রী নহেন—বৈজয়ন্তী ছিলেন এক মহীয়সী বিদুষী নারী। কালের আবর্তে তাঁর নাম আজ বিস্মৃতির স্রোতে ভেসে গেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা।

ফরিদপুর জেলার ধলুকা গ্রামে সুপণ্ডিত মথুর ভট্টের বংশে বৈজয়ন্তী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল অত্যন্ত অনুরাগ। তাঁর মুখে যখন ভাল করে কথা ফোটেনি তখন থেকেই তিনি তাঁর পিতার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের অনুকরণে হাতে পুঁথি নিয়ে পাঠাভ্যাসের ভাণ করতেন। বৈজয়ন্তীর পিতা কন্যার এই পাঠানুরাগ দেখে তাঁকে লেখাপড়া শেখাবেন বলে মনস্থ করেন এবং যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতে থাকেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বর্ণজ্ঞান এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন।

বৈজয়ন্তী প্রথমে কাব্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করেন। কাব্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা শেষ হলে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষায় মনোযোগ দেন। তাঁর পিতা যখন ছাত্রদিগকে দর্শনশাস্ত্র পড়াতেন তখন বৈজয়ন্তী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তা শুনতেন। পিতা ও ছাত্রদের ভিতর যে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে তর্ক হত তা থেকে অনেক কিছু শিখতেন।

এদিকে বৈজয়ন্তীর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখনকার দিনে বৈজয়ন্তীর মত বিদুষী মহিলা খুব কমই ছিল।

দার্শনিক পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ বৈজয়ন্তীর শিক্ষাদীক্ষার পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি কোটালিপাড়ার দুর্গাদাস তর্কবাগীশের পুত্র। দুর্গাদাস তর্কবাগীশ বৈজয়ন্তীর পিতা অপেক্ষা বংশ মর্যাদায় বড় ছিলেন। কাজেই কৃষ্ণনাথ যখন বৈজয়ন্তীকে বিবাহ করতে উদ্যত হলেন—দুর্গাদাস তাতে সম্মতি দিতে পারলেন না। কৃষ্ণনাথ গোপনে বৈজয়ন্তীকে বিবাহ করলেন।

যেহেতু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয়নি—সেহেতু যতদিন শ্বশুর জীবিত ছিলেন ততদিন বৈজয়ন্তী স্বামীর ঘর করতে পারেননি। কৃষ্ণনাথ মাঝে মাঝে বৈজয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতেন।

এর কিছুদিন পরেই কৃষ্ণনাথ পুনরায় অন্য এক নারীর প্রতি আসক্ত হলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর বৈজয়ন্তী যখন স্বামীগৃহে যাবার জন্য ব্যাকুল হলেন তখন হীন বংশের অভিযোগ দিয়ে কৃষ্ণনাথ তাঁকে ত্যাগ করলেন। স্বামী সুখে বঞ্চিতা হয়ে বৈজয়ন্তী পিতৃগৃহেই বাস করতে লাগলেন। অধ্যয়নে নিমগ্না হয়ে বৈজয়ন্তী সকল দুঃখ ভুলে থাকতেন। বিবাহের পূর্বে যে শিক্ষা অসমাপ্ত ছিল তিনি এই সময়ে তা পরিপূর্ণভাবে লাভ করলেন।

এইভাবে অনেকদিন কেটে গেল। বৈজয়ন্তী একদিন নিজের মনের দুঃখ কবিতার ছন্দে গেঁথে স্বামীকে একখানি পত্র লিখলেন। কৃষ্ণনাথ ছন্দোময় পত্রখানি পড়ে দুঃখিত হলেন এবং স্ত্রীর কবিত্ব শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, সামান্য বংশমর্যাদার জন্য নিজের স্ত্রীর প্রতি কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করে আসছেন। কৃষ্ণনাথ ভয়ানক অনুতপ্ত হলেন। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে স্ত্রীকে নিয়ে আসবার জন্য যাত্রা করলেন।

স্বামীর গৃহে এসে বৈজয়ন্তী কেবল সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না। লেখাপড়ার চর্চাও করতেন। সংসারের সমস্ত কাজ সেরে তিনি স্বামীর নিকট দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করতেন।

তাঁর স্বামী কৃষ্ণনাথ একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। অনেক ছাত্র তাঁর নিকট দর্শন শাস্ত্র পড়ছিলেন। গ্রন্থের একস্থানে 'অত্র তু নোক্তং তত্রাপি নোক্তম্' এইরূপ লিখিত ছিল। পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ঠিকমত অর্থ করতে পারছিলেন না। তাই ঠিকমত অর্থ বের করবার জন্য চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে বৈজয়ন্তী রান্না ঘরে বসে আছেন ও ভাবছেন আজ পড়া শেষ হতে এত দেরী হচ্ছে কেন, এমন সময় একটি ছাত্র কি একটা কাজে রান্নাঘরে প্রবেশ করল। বৈজয়ন্তী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ তোমাদের এত দেরী কেন? এত বেলা পর্যন্ত কি পড়ছ?

ছাত্রটি বলল—'অত্র তু নোক্তং তত্রাপি নোক্তম্'—এই লাইনটির মানে কিছুতেই হচ্ছে না, তাই এত দেরী হচ্ছে—।

বৈজয়ন্তী বললেন—কর্তাকে স্নানাহার করে বুদ্ধি স্থির করতে বল, পরে আপনিই ঠিক অর্থ মনে এসে যাবে।

কৃষ্ণনাথ ছাত্রের মুখে তাঁর গৃহিণীর কথা শুনে পুঁথি বন্ধ করে ছাত্রদের নিয়ে স্নান করতে গেলেন। বৈজয়ন্তী ছাত্রের মুখে উক্ত লাইনটি শুনে আগেই যথার্থ অর্থ স্থির করে ফেলেছিলেন। তারপর কৃষ্ণনাথ যখন ছাত্রদের নিয়ে স্নান করতে গেলেন সেই অবসরে পুস্তকটি খুলে ঐ কথাটির পদচ্ছেদ করে 'অত্র তুন উক্তং তত্র অপিন উক্তম্' এইরূপ লিখে রাখলেন।

স্নান সেরে আহারাদি সমাপন করে কৃষ্ণনাথ বিশ্রামের জন্য শয়ন করলেন। বৈকালে আবার অধ্যয়নের আসর বসল। কৃষ্ণনাথ পুঁথি খুলেই অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন সেই দুর্বোধ্য কথাটি পদচ্ছেদ দ্বারা কে যেন সহজবোধ্য করে রেখেছে। তিনি এ ব্যাপারে খুব খুশী হলেন এবং একাজ যে করেছে তাকে পুরস্কৃত করবার জন্য অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ছাত্ররা কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে পারল না। তখন তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর স্ত্রীরই এই কাজ।

বৈজয়ন্তী দেবী অনেক সংস্কৃত কবিতা ও শ্লোক রচনা করেছিলেন। সে সমস্ত শ্লোক বা কবিতার কোন চিহ্ন এখন আর নেই। তখনকার দিনে সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের নাম প্রচার করা রীতিবিরুদ্ধ ছিল। সেজন্যই তাঁর রচিত কবিতার ভিতর তাঁর নাম দেখতে পাওয়া যায়, না। কৃষ্ণনাথ 'আনন্দ লতিকা চম্পু' নামক যে পুস্তক রচনা করেন, তাঁর স্ত্রী সেই পুস্তকের সহকারিণী ছিলেন। সেই পুস্তকের ভূমিকায় তাঁর উল্লেখ ছিল।

বৈজয়ন্তী দেবী কেবল যে রচনা বিষয়ে নিপুণা ছিলেন তা নয়, তিনি অতি ক্ষিপ্রহস্তা ছিলেন। 'আনন্দ লতিকা' রচনা কালে একদিন কৃষ্ণনাথ সন্ধ্যা থেকে শেষ রাত্রি পর্যন্ত বসে নায়িকার রূপ বর্ণনা করছিলেন। তবু তা শেষ হয়নি। তা দেখে বৈজয়ন্তী হাস্যমুখে স্বামীকে বললেন—এত দীর্ঘকাল ধরে একটা স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা করছ?

কৃষ্ণনাথ বললেন—স্ত্রীলোকের চরিত্রের মতই তার রূপ বর্ণনাও বড় কঠিন ব্যাপার।

বৈজয়ন্তী বললেন—দাও, আমিই তোমার এ দুঃসাধ্য কাজ সমাধান ক'রে দিচ্ছি।

সত্যি, অল্প সময়ের মধ্যেই বৈজয়ন্তী আনন্দ লতিকার রূপ বর্ণনা করে দিলেন। কৃষ্ণনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।

বৈজয়ন্তী দেবী বাংলার বিদুষীদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাশালিনী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ বিদুষী মহিলা বর্তমান যুগেও কম দেখা যায়।

## রত্নাবলী

### উমা মজুমদার

অনেকদিন পরে কলকাতায় এসেছি। চৌরঙ্গীর রাস্তাটা পার হয়ে ময়দানের দিকে পার্ক করে রাখা গাড়ীগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সামনের নিওনসাইনে লেখা বিজ্ঞাপনগুলো পড়ছি। নানা আকারের নানা ধরণের লেখাগুলো নিবছে আর জ্বলছে। হঠাৎ পেছন দিকে একটা কালো রংয়ের ল্যাণ্ডমাষ্টার এসে থামল। চমকে উঠে সরে দাঁড়াতে গিয়ে অবাক হয়ে রইলাম,—গাড়ী থেকে যে মেয়েটিকে নামতে সাহায্য করছেন একজন ভদ্রলোক, সে যে আমার এককালের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু নীলা। বিস্ময়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল একটি মুহূর্ত;—পর মুহূর্তেই ওদের দৃষ্টি আমার উপরে এসে পড়লো। ঈষৎ বিস্ময়ের অব্যয় উচ্চারণ করে দুপক্ষই এগিয়ে গিয়ে হাত ধরেছি দু'জনার। একসঙ্গেই দু'জনে প্রশ্ন করেছি—'তুমি'! পরমুহূর্তেই হেসে উঠেছি।

ভদ্রলোক একটু সরে গিয়ে সিগরেট ধরাচ্ছিলেন লাইটারের আগুনে। সেদিকে মাথা হেলিয়ে চোখেই প্রশ্ন করলুম—'কে'?

নীলা হেসে উঠল, ডাকলো—'দাদা, এদিকে এসো। নতুন করে তোমাদের পরিচয় করে দিই। ছেলেবেলায় অঙ্ক ঠিক করতে না পারলে তো আমার সাথে সাথে ওর পিঠেও কম তাল পড়ে নি; আর আজ কেউ কাউকে চিনতেও পারছো না।—কৃষ্ণা, সুমন্তদাকে ভুলে গেলি?'

অপরিচয়ের আঁধার কেটে গিয়ে এক মুহূর্তে স্মৃতির মণিকোঠা খুলে গেল। ছেলেবেলার সেই দিনগুলো গানের মতো কথা কয়ে উঠলো কানে কানে। গ্রীষ্মের ছুটীর অবকাশে দুপুরবেলা পেছনের পুকুরের উপর সমান্তরাল হয়ে বেড়ে উঠা গুলঞ্চ ফুলের গাছের উপর বসে জলে পা ডুবিয়ে নুন সহযোগে তেঁতুল খাবার সেই দৃশ্যটা নতুন করে মনে পড়লো। আমাদের আক্রমণ থেকে ভাঁড়ার বাঁচাবার জন্যে মাসীমার কড়া হুকুম ছিল সুমন্তদার উপর—আমাদের পড়াতে হবে। তিতাশের কোলের সেই ছোট্ট শহরের গ্রীষ্মতপ্ত দুটী বালিকা খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে চোখ ছল ছল করে বসে আছে। আর গম্ভীর ভাবে একটা বই হাতে নিয়ে অদূরে শুক্লমশাই ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। দৃশ্যটা মানসচক্ষে স্মরণ করেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে সুমন্তদাকে একটা প্রণাম করলাম। সুমন্তদা হেসে জিজ্ঞেস করলেন—'হাসলি কেন রে?'

—'আমাদের অঙ্ক করার সে দৃশ্য মনে পড়ছে।'

তিনজনের সম্মিলিত হাসির শব্দ উঠলো। হাতের সিগারেট মুখে তুলতে তুলতে সুমন্তদা বললে—'চল, চা খেতে খেতে তোর খবর নেওয়া যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে নীলা দুষ্টু হাসির সঙ্গে বললে—'হ্যাঁ, সেই ভাল। খবর দেওয়াও যাবে। কি বল দাদা?'

সুমন্তদা একটু হাসলো অন্যমনস্ক ভাবে।

নীলা খবর জানালে—'জানিস আজ দাদার ভাবী বৌ দেখতে এসেছি। এইখানেই দেখা হবে। ভারী মজা লাগছে না?'

আমি অবাক হয়ে গেলাম—'সেকি, সুমন্তদার বিয়ে হয় নি! সাত আট বছর আগেই তো বিয়ের কথা শুনেছিলাম। সে বিয়ে কি হয় নি?'

নীলা চাপা গলায় বললে—'না, সে বিয়ে হয়নি।'

ওর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর প্রশ্ন করলাম না। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো। এমন উপযুক্ত ছেলে এত বয়স অবধি বিয়ে হলো না? আর যদি নাই হয়ে থাকে তাতেই বা কি? এত লুকোচুরি কেন? আড়চোখে দেখে নিলাম সুমন্তদার মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। নীলাও চুপ করে হাঁটছে। আমিও চুপ করেই রইলাম। সুমন্তদা এগিয়ে গিয়ে 'নীরা'তে ঢুকলেন পিছু পিছু আমরাও ঢুকে পড়েছি। এক পাশে একটা টেবিলে বসে নীলা হেসে বললে—'ভাল করে খাওয়াও দাদা। আমার উপরেই কিন্তু মেয়ে পছন্দের ভার দিয়েছেন পিসীমা। এক কথায় নাকচ করে দিতে পারি তা জানো?'

—'তা আর জানিনে, তুমি সব পারো বিচ্ছু মেয়ে। কি খাবি বল?'

—'সে আমি জানি না। শুধু জানি, ভাল খাওয়াতে হবে।'

সুমন্তদা হেসে রকমারি অর্ডার দিলে। আমায় জিজ্ঞেস করলো—'তোর পছন্দ কিছু বলবি না?'

হেসেই মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম। নীলাকে বললাম—'তা হলে তুই-ই বরকর্তা।'

—'হ্যাঁ, তাই। কলেজের কতো সুন্দর মেয়ের কতো ছবি পাঠিয়েছি তা দাদার পছন্দই হয় না। সেই যে সাত বছর আগে চাকরীর নাম করে দিল্লীতে বসে আছে আর আসার নামটি নেই। পিসেমশাই তো এ দুঃখ নিয়েই গেলেন। পিসীমাও কাশী যেয়ে

বসেছিলেন। একদিন বাদে পিসীমাকে শুদ্ধ সঙ্গে করে নিয়ে হাজির। বলে কি না এবার বিয়ে করবে। পিসীমাকে তো জানিস,—বলে দিলেন, যাকে খুশী বিয়ে কর। তবু তুই সংসারী হ।' এখানে একেও তিনমাস কাটিয়ে দিলে, বিয়ের নামগন্ধও নেই। চেপে ধরতে বললে, মেয়ের মত পাচ্ছে না। আজ শেষ বোঝাপড়া। তাই আমিও এসেছি শ্রীমতীকে একবার দেখে যাব। আমার দাদাকেও যার পছন্দ হয় না, সে কেমন মেয়ে।

অবাক বিস্ময়ে সুমন্তদার দিকে তাকিয়ে দেখি মৃদু হাসছেন। একটু যেন চিন্তিত। এ-যে গল্প হয়ে দাঁড়াল। এক মুহূর্তে মনটা কৌতূহলে ভরে গেল—এ গল্পের শেষ দেখতে হবে। আমি কিছু বলার আগেই টেবিলে খাদ্য সম্ভার এসে হাজির। হঠাৎ দরজার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম রত্নাবলী ভেতরে ঢুকছে। আমি বিস্ময়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এলো—'রত্না।' চেয়ার নাড়ার সঙ্গে আর আমার ডাকে রত্না এদিকে চাইলো। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে চোখ সরিয়ে নিলে সুমন্তদা আর নীলার দিকেও একটু দেখলে। আস্তে অন্য একটা টেবিলের পাশে বসলো। আমি বোকার মতো তাকিয়ে আছি, রত্না আমাকে চিনলে না।

ওদের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, ওরাও রত্নার দিকেই তাকিয়ে আছে। সুমন্তদার প্রসন্ন গম্ভীর দৃষ্টি আর নীলার ভ্রূ কুঞ্চিত। হলের আরও অনেকেই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যি চেয়ে দেখবার মতো চেহারাও। এত রূপ সর্বদা চোখে পড়ে না। কিন্তু খুবই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম কড়া বিলিতি মেক্-আপে রত্না নিজেকে সাজিয়েছে। আমি যে রত্নাকে জানতাম তাকে যেন খুঁজে পাচ্ছি না।

সুমন্তদাই প্রথম কথা বললে—'বোস কৃষ্ণা। তুই কি ওকে চিনিস?'

আমার যেন তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। মাথা নেড়েই জবাব দিলাম, বললাম—'কিন্তু ও তো আমাকে চিনতে পারেনি?'

নীলা একটু ব্যঙ্গ করেই বলে উঠলো—ও যে আজকাল নামকরা লেখিকা। বাড়ীতে সর্বদা ভীড়, তোমাকে কি এখন চিনতে পারে?'

সুমন্তদা অবাক হয়ে নীলার দিকে তাকালে—'তুইও ওকে চিনিস?'

—'এক পাড়াতেই থাকি, চিনবো না কেন?' নীলার নীরস উত্তর।

'কিন্তু কৃষ্ণা তুই কি করে ওকে জানলি?'

দূরের টেবিলে তাকিয়ে দেখি, রত্না মুখ নীচু করে বসেছে। এখান থেকে তার মুখের একটা পাশ আর কাঁপানো চুলের রাশ দেখা যাচ্ছে। হাত নেড়ে বয়কে কি যেন বললে। এদিকে তাকিয়ে দেখি, ওরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

—'নীলা তুই তো জানিস, আমি কুমিল্লাতে পড়তে গিয়েছিলাম। ওর সাথে আমার দেখা সেখানেই। কি রূপ, প্রথমেই ওর সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছি। পরে দেখেছি ওর মনটা আরও সুন্দর। আরও ছিল, নম্র শান্ত আর আশ্চর্য কোমল ছিল তার মন। আমি তো চিরকালই দুরন্ত ছিলাম—তাই বোধ হয় রত্না আমাকে এত আকর্ষণ করেছিল। সেই ছোট বয়সেই, অর্থাৎ ওর তখন চোদ্দ পনেরো বছর বয়স, ওর বিয়ের চেষ্টা করছিলেন ওর বাবা। আর নানা রকমের পাত্রপক্ষের কাছে ওকে দেখানো চলছিল। আমি তো ওকে রাগ করে কত বলেছি—কেন সবার কাছেই অমন সং হয়ে বসবি?'

ও হেসে বলতো—'তাতে কি হয়েছে। ওরা দেখে নেবে না?'

রত্নার হাসিটা তখন যেন আর ভালো লাগতো না। রেগে গালি দিয়েছি—'হ্যাংলা, নির্লজ্জ।' রত্না কিন্তু হেসেই আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, কানে কানে বলেছে—'বিয়ে যখন করতেই হবে তখন এ-সব তো মেনে নিতেই হবে ভাই'। উত্তরে আমি তাকে বিয়ে না করেও কতো বড়ো হওয়া যায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ স্বরূপিণীদের নাম মুখস্থ বলতে বসে যেতাম। রত্না হাসতো আর চুপি চুপি বলতো—'কিন্তু ভাই, আমার যে ভারী ইচ্ছে করে একটি সুন্দর সংসার গড়ে তোলার।' আমি শেষে আর ওকে এ নিয়ে কিছু বলতাম না। রত্নার রূপ থাকলেও ওর বাবার বিশেষ টাকা ছিল না, তাই শেষ অবধি বিয়েটা পিছিয়েই যেতে লাগলো। তারপর ওর ওই রূপের জন্যেই এক জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো। ততদিনে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে সবাই ছড়িয়ে পড়েছি। অনেকদিন বাদে হঠাৎ আমাদের বন্ধু জয়ার সাথে দেখা। জয়া ছিল আমাদের সহপাঠিনী তাছাড়া রত্নাদের প্রতিবেশী। তাই সে রত্নার খবর আমার চেয়েও বেশী জানে। তার কাছেই রত্নার জীবনের করুণতম অধ্যায়টি জেনেছি।"

চুপ করে চেয়ে দেখলাম রত্নার দিকে। ও আপনমনে কফির-পেয়ালায় চামচ নাড়াচ্ছে। এদিকে তাকালাম সুমন্তদা আর নীলা আমার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে। 'শেষ করো।'

এর পরের কথা বড়ই আশ্চর্য। ওর বিয়ে ঠিক হতে হঠাৎ ওর মা মারা গেলেন। এরপরেই লাগলো সেই বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশ ভাগের আগুন। দুটি মেয়ের হাত ধরে সদ্য স্ত্রীহারা বৃদ্ধ কলকাতায় এসে আশ্রয় নিলেন দূর আত্মীয়া এক বোনের বাড়ীতে। পাত্র পক্ষকে সব জানিয়ে অশৌচান্তে বিয়েটা চুকিয়ে দিতে অনুরোধ জানালেন। পাত্রপক্ষ রাজী হয়ে গেলেন।

বিয়ের দিন এগিয়ে এল। খবর পেয়ে জয়া এসে জড়িয়ে ধরলে রত্নাকে। রত্নার বাবার কোন উৎসবের আয়োজনের ক্ষমতা ছিল না। নিরানন্দ বিবাহ বাসরে এসে বরযাত্রীরা মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। পাত্রপক্ষের কর্তা হয়ে এসেছিলেন পাত্রের এক মামা। তিনি তার হীরের টুকরো ভাগনের এমন হাঘরে বিয়ে দেখে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। বর নিয়ে যাবার জন্যে রত্নার বাবা অনুমতি চাইতে এলে তিনি রুক্ষকণ্ঠে বললেন—'তাতো নেবেনই। ছেলের বিয়ে দিতেই যখন এনেছি। রায়টে তো সর্বস্ব খুইয়ে এসেছেন বললেন—আর দেখছিও তাই—কিন্তু পাত্রীটি ঠিক আছে তো? না সেদিকেও গোলমাল আছে?'

মামার এই রূঢ় সম্ভাষণে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ রত্নার বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেই গোলমালটা বেধে গেল। ভিতরে বাইরে গুঞ্জন তুলতে লাগলো। বর নিজে উঠে এল কারণ জানার জন্যে। হঠাৎ সব লোকের ভীড় কাটিয়ে ছোট বোনের হাত ধরে রত্না বেরিয়ে এসে বাবার মাথা কোলে তুলে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললে—'দয়া করে আপনারা চলে যান। এ বিয়ে হবে না।'

রত্নার মুখে একথা শুনে আর একদফা গুঞ্জন উঠলো। ছোট বোনটি কেঁদে ফেললে। বাড়ীর কর্তা এসে রত্নাকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রত্নার সেই উত্তর। শেষ পর্যন্ত বর নিজে এসে মামার জন্যে ক্ষমা চাইলে। কিন্তু রত্না মাথা থেকে মুকুট টেনে খুলে চেঁচিয়ে উঠলো—'আপনারা আমার বাবাকে আর

আমাকে চরম অপমান করেছেন। দয়া করে চলে যান। আমি বিয়ে করবো না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

—'তারপর'? নীলা প্রশ্ন করলে।

—'তারপর আর কি? বিয়ে ভেঙ্গে গেল। সবাই রত্নাকে বকতে লাগলেন। আর রত্না বাবা আর ছোট বোনটিকে নিয়ে সারারাত পাথরের মতো বসে রইলো। পরদিন সকালে প্রথমেই জয়াকে বিদায় দিলে। বললে তুই চলে যা। জয়া জানতে চাইলো এবার তুই কি করবি? একটু মলিন হেসে রত্না উত্তর করলে—এবার থেকে তো নতুন ধারায় জীবনকে জানতে হবে। দেখি কি করি। তবে এখানে আর নয়।'

আমার কথা শেষ হতেই নীলা বললে—'আমাদের পাড়াতে বোধহয় তারপরেই ওরা উঠে এসেছে। আমাদের গলির উল্টো দিকের বাড়ীটার দোতলার ফ্ল্যাটটি নিয়েছে। নতুন মুখ, তাতে এত সুন্দর, তাই সবার চোখ পড়েছিল ওদের উপর। বুড়ো বাবাতো বছর খানেক পরে মারা গেলেন। তখন আমার ভাই ওবাড়ীতে গিয়েছে। আরও কয়েকজন পাড়ার ছেলের সাহায্যে ওরা বাবার শেষ কাজ করলে। তখনই ওদের কথা জানতে পেরেছি। ও নাকি গল্প লেখে আর ছোট বোনটি একটি স্কুলে কাজ করে। কত লোক যায় আসে ওদের বাড়ীতে! কত হাসি, কত আলো আর কতো সাজ। স্বাভাবিক ভাবেই এরকম বয়সের দুটি মেয়েকে এভাবে জীবন কাটাতে দেখলে শ্রদ্ধা আসে না। তবে মাঝে মাঝে রাতে ঘুম না এলে ছাদে যখন যাই—তখন দেখা যায় টেবিল ল্যাম্পের সীমায়িত আলোকে জানালার পাশে টেবিলে ঝুঁকে একটি মেয়ে কি যেন করছে। আবার কখনও বা সেই আলোটিও থাকে না। রাস্তার দূরের আলো ওদের জানালার উপর এসে পড়ে, আর অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্ত্তির মতোই একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে।'

একটু থেমে রত্নাকে ভালো করে দেখে নিল নীলা, তারপরে যোগ করলে—'হয়তো গল্পের প্লট খুঁজে বেড়ায়।'

সুমন্তদার দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনিও তাকিয়ে আছেন রত্নার দিকে। আমি মুখ ফেরাতেই দেখলাম, রত্না অপেক্ষমান বয়ের হাতে বিল চুকিয়ে দিল। চলে যাবার জন্তে তৈরী। হঠাৎ চমক ভেঙ্গে সুমন্তদা উঠে দ্রুত রত্নার কাছে এগিয়ে গেলেন। আমি আর নীলা দৃষ্টি বিনিময় করলাম সমান বিস্ময়ে। আবার চাইলাম ওদের দিকে। রত্না কি যেন বলছে। আর সুমন্তদা হাত বাড়িয়ে আমাদের দেখিয়ে তার জবাব দিল। একটু ইতস্তত করে রত্না এসে আমাদের পাশে বসলো। সুমন্তদাও এলেন। আমাদের মুখের উপর রত্নার চোখ সরে সরে গেল। সুমন্তদা নিজ হাতে এক পেয়ালা কফি ঢেলে রত্নাকে দিল আর হেসে বললে—

'—কৃষ্ণা, তুমি আর নীলা যে গল্পের প্রথম আর দ্বিতীয় অধ্যায় বলে গেলে, তার তৃতীয় আর শেষ অধ্যায়টি আমিই যোগ করবো। কিন্তু তার আগে'—সুমন্তদার গলা ভারী হয়ে এলো—'তার আগে, রত্না তোমার মতটা জানতে চাই।'

নীলা আর আমি আবার দ্বিগুণ বিস্ময়ে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। রত্নার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর জবাব শোনার অপেক্ষা করছিলাম সবাই। আমাদের সম্মিলিত দৃষ্টি নিজের মুখে অনুভব করে একটু লাল হয়ে উঠলো রত্না। চোখ তুলে খুব নরম দৃষ্টি দিয়ে তাকাল আমার দিকে, তারপরে তার দৃষ্টি সরে এল নীলার উপর। সেখান থেকে যেন পিছলে ওর কালো তারা এসে থাম্‌লো সুমন্তদার চোখে। সুমন্তদার মুখ আগ্রহে আর আশঙ্কায় সাদা হয়ে গেছে।

খুব আস্তে, মিষ্টি নরম গলায় সুমন্তদাকে বললে, "—কফি না, চা খাব। অনেক দিন কফি খাচ্ছি, আজ থেকে আর নয়।"

সুমন্তদার মুখটা দপ করে জ্বলে উঠলো। ভেতরের দুর্দ্দম আবেগে ওর ঠোঁট কাঁপছিল। কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল। বয়কে ডেকে চা আনার নির্দ্দেশ দিয়ে, রুমাল দিয়ে মুখটা ভাল করে মুছে নিল। একটুখানি চুপ করে থেকে হঠাৎ আমায় বললে—'কৃষ্ণা, তোর গল্পের সেদিনের ভাঙ্গা আসরের সেই বর আমিই।'

আমি সবটা ভাল বোঝার আগেই আবার সুমন্তদা কথা বললে—'নীলা, এই তোদের বৌদি, যাকে দেখবি বলে এসেছিস।'

আমি আর নীলা চরম বিস্ময়ে তৃতীয়বার দৃষ্টি বিনিময় করলাম নীরবে।

## নিবিড় চাষাবাদ

একটি কথা বলবার প্রয়োজন পড়ে না—বাংলা তথা ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, ধান এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু এদেশে এখনও প্রায় পুরানো পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়ে চলেছে, এমন কি ধানচাষও, একথাটি বলতেই হবে। অথচ ব্যাপক খাদ্য-সমস্যা মিটাতে হলে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটালেই নয়। আর এর জন্য যেমন চাই চাষের আধুনিক যান্ত্রিকীকরণ, তেমনি গ্রহণ করা চাই নিবিড় চাষাবাদ পরিকল্পনা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সরকার অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। সরকারী উদ্যোগীপনায় স্থানে স্থানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থাও হয়ে চলেছে—কয়েকটি রাসায়নিক সার কারখানাও স্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে, উন্নততর কৃষি উৎপাদনের জন্য যা অত্যাবশ্যক। নিবিড় চাষাবাদের প্রশ্নটি এই প্রসঙ্গে আপনি এসে যায়। সরকারী মনোযোগ এই বিশেষ দিকটিতেও কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছে, এ আশার কথা।

দুইটি পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়ে গেলো—তৃতীয় যোজনার কাজও চলেছে, কিন্তু ধান-চালের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত দাবী রাখা সত্ত্বেও স্বয়ংসম্পন্ন হতে পারল না। বাইরে থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়ার জন্য ভারতকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে এখনও। এ অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য শুধু ব্যাপক চাষ নয়, নিবিড় চাষাবাদের ব্যবস্থা করা ভিন্ন উপায় নেই।

নিবিড় চাষাবাদ বলতে সাধারণ অর্থে কি বোঝায়? সীমাবদ্ধ জমি থেকে সর্বোচ্চ পরিমিত উৎপাদন ব্যবস্থাই নিবিড় চাষ। জাপানে এই জাতীয় চাষাবাদ ব্যাপক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। জাপানী প্রথায় চাষের দ্বারা কৃষি-উৎপাদন যে অনেক বেশি হয়ে থাকে, তা এই দেশেও কিছুটা পরীক্ষিত হয়েছে। এখন যে-টি বড় প্রশ্ন—পরীক্ষিত জিনিষটিকে সর্বত্র জনপ্রিয় করে তোলা অর্থাৎ নিবিড় চাষের ব্যাপক প্রচলনের ব্যবস্থা করা।

ভারতে বিশেষভাবে এই খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার তুলনায় জমি খুবই সামান্য। এখানে ব্যাপক চাষাবাদের ব্যবস্থা হলেই মানুষের জরুরী খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন দাবী করা চলে না। পরন্তু গভীরভাবে ভেবেচিন্তে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নিবিড় চাষের প্রকল্পাদি গৃহীত হলে এবং সেই সব প্রকল্পের যথোচিত রূপায়ণ হয়ে চললে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হবে। মোট কথা খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দাবী রাখলে সরকার ও জাতীয় নেতাদের এবং সেই সঙ্গে দেশের কৃষিজীবী জনতার এই দিকে সমধিক তৎপরতা না দেখালে নয়।

আশার কথাই বলতে হবে—জাপ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এদেশে নিবিড় চাষাবাদের কয়েকটি প্রকল্পের রূপদানের ব্যবস্থা চলেছে। জাপ-ভারত কারিগরী সাহায্য কর্মসূচী অনুসারে নদীয়া জেলার (পশ্চিমবঙ্গ) রাণাঘাটে একটি জাপানী কৃষকদল নিবিড় ধান চাষের এক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করছেন। উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে জাপ পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বল্প পরিমিত জমি থেকেই বহুল পরিমাণ উৎপাদনের এই প্রয়াস লক্ষ্য করবার মতো। রাণাঘাটের নির্ধারিত প্রদর্শন খামারে প্রথমাবস্থায় পরীক্ষামূলক নিবিড় চাষের কাজ চলবে তিন বছর এবং এর জন্যে ব্যয় হবে প্রতি বছরে প্রায় ২০ হাজার টাকা। জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকার

একে একটি আদর্শ খামার হিসাবে দাঁড় করাতে চাইছেন এবং রাজ্যের কৃষিজীবীদের একটি শিক্ষণকেন্দ্র হিসাবেও এইটিকে ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে নিবিড় ধান চাষের যে-পরিকল্পনাটি রূপদানের চেষ্টা চলছে, তা সফল হলে দেশের নতুন নতুন অঞ্চলে একাধিক নতুন পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাবে, এইটুকু সহজেই আশা করা যায়। উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুরে অবশ্য নিবিড় চাষের একটি প্রকল্প প্রথমেই পরীক্ষিত হয়েছে এবং সেখানেও কাজের সহায়ক হিসাবে ছিলেন জাপানী কৃষি-বিশেষজ্ঞ ও কর্মিদল। ভারতের মাটিতে ভারতীয় পরিবেশের নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে ধান্যোৎপাদন কতটা বাড়ানো চলে, সে সম্পর্কে নিয়মিত গবেষণার বিষয়ও সরকারী পর্যায়ে চিন্তা করা হচ্ছে।

পরীক্ষাধীন সাহারাণপুর খামারটিতে ধান্য ও গম উৎপাদনের যে হিসাব পাওয়া গেছে, তা নিশ্চয়ই যথেষ্ট আশাপ্রদ। পূর্বে বলতে গেলে ঐ স্থানটি ধান চাষের উপযোগী বলেই গণ্য ছিল না। তবু নিবিড় চাষাবাদ পরিকল্পনার পরীক্ষা করতে যেয়ে, সেখানেও গমের পাশাপাশি ধান্যোৎপাদন করা হয়। দেখা গেছে, আগে যেখানে ধান ও গম উৎপাদন হতো ১৫ মণ ও ২৪ মণ মাত্র, সে স্থলে একই জায়গা থেকে প্রথম দফায় (এপ্রিল হইতে জুন) উৎপাদিত হয়েছে ৫১ মণ ৩৫ সের ধান এবং দ্বিতীয় দফায় (জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর) ২৪ মণ গম বাদ দিয়েই ৭১ মণ ধান। এর অর্থ বছরে এক জমিতেই ফসলের উৎপাদন বেড়েছে আশাতীত।

নিবিড় চাষাবাদের সুফল সম্পর্কে এর পর বোধ হয় বেশি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না; অন্ততঃ এই দাবীটি রাখা চলে এই জাতীয় পরিকল্পনা যত অধিক সংখ্যায় চালু হবে, খাদ্য-সমস্যার জটিলতা তত দ্রুত হ্রাস পেয়ে চলবেই। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারণ অনুসারে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বিহার, উড়িষ্যা ও গুজরাটেও একটি করে পরীক্ষামূলক প্রদর্শন খামার স্থাপিত হবে। ভারত ও জাপানের মধ্যে বর্তমান (১৯৬২) সালেই যে সহযোগিতা চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে, সেই চুক্তির তাৎপর্য্য অনুযায়ী জাপ কৃষি বিশেষজ্ঞগণ প্রতি ক্ষেত্রেই নিবিড় চাষের প্রকল্পসমূহের রূপায়ণে সহায়তা দিয়ে যাবেন। এদেশে নিবিড় চাষাবাদে সম্প্রসারিত করতে হলে সব কয়টি রাজ্যের কৃষি দপ্তরকেই এগিয়ে আসতে হবে, এটা বলা বাহুল্য

দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্তে সরকারী উত্তম বিগত একটি দশক ধরেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। জমি থেকে খুব বেশি পরিমাণ ফসল যাতে পাওয়া যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির উপরও সমধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। রাসায়নিক সার ও ভালো বীজ সরবরাহের জন্তেও উত্তমের অভাব আছে, সেটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকার কৃষির উন্নয়নে ব্যয় নির্দ্ধারিত করেছেন ১২৮০ কোটিরও বেশি টাকা। এর মাঝে নিবিড় চাষাবাদের সুচিন্তিত প্রকল্প অনুযায়ী নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ হয়ে চললে খাত্তবিষয়ে দেশের আশানুরূপ অগ্রগতি না হয়ে পারে না।

ইত্যবসরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মহল একটি দাবী রেখেছেন—এই রাজ্যে স্বল্প জমিতে পরীক্ষামূলক সামগ্রিক নিবিড় চাষ-ব্যবস্থার (‘প্যাকেজ প্রোগ্রাম”) প্রবর্ত্তনের পর থেকেই এর কাজ ভালভাবেই চলছে। এ নিঃসংশয়ে একটি আশার কথা, প্রেরণার কথা। দেশের কৃষিজীবী জনতার মধ্যে পরিকল্পনাটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলতে হবে আর এর জন্তে স্বভাবতঃই চাই ব্যাপক প্রচারকার্য্য। জানা গেছে এই প্রচারকার্য্যের সুবিধার্থ রাজ্য কর্ত্তৃপক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের একটি প্রেস করবার সুযোগ পেয়েছেন। নিবিড় চাষাবাদকে ব্যাপক ও দৃঢ়ভিত্তিক করে তোলবার জন্তে যা যা করার প্রয়োজন, সেখানটায় সরকারী প্রযত্নের যেন অভাব না ঘটে।

## মূল্য বৃদ্ধি সমস্যা

অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি একটি জাতীয় সমস্যাই বলতে হবে। অথচ এই সমস্যাটির সমাধানের কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন উপায় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে এর ভেতর না হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির ঝোঁক প্রতি ক্ষেত্রে থেকে যাচ্ছে—এ একটি জটিলতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধের সময় থেকেই নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যেতে দেখা যায়। কয়েকটি পণ্যের বেলায় ন্যায্য মূল্যের দোকান করে বা অন্তভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু পুরো সফলকাম হওয়া যায়নি। শুধু ভারত নয় আজকের দিনে প্রায় প্রতিটি দেশেই মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা কোন না কোন আকারে রয়েছে। মহার্ঘ্য ভাতা যতই বাড়ানো যাক্ না কেন, মূল্য-বৃদ্ধির গতির সঙ্গে তা পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না।

চাল-ডাল-মাছ-তরিতরকারী, বস্ত্র, ঔষধপত্র ও প্রসাধন সামগ্রী—এক কথায় বাজারের যে-কোন জিনিসেই হাত দেওয়া যাক্, দিন দিন মূল্য বেড়ে চলেছে। যুদ্ধ পূর্ব্ব যুগের দামের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর কাল বিশেষ করে আজকের পণ্যাদির দাম আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে, এ সকলেরই জানা। প্রকৃত পক্ষে সীমাবদ্ধ আয়বিশিষ্ট লোকরা সর্ব্বত্র আজ মূল্য বৃদ্ধির চাপে অতিষ্ঠ—প্রাণ রাখতে তাদের প্রাণান্তকর অবস্থা।

মাত্রাতিরিক্ত পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য পাইকারী ব্যবসায়ী মহলের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি বলা চলে। মূল্যবৃদ্ধির জরুরী প্রশ্নটি নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন অনেক ভেবেছেন—ভেবেচিন্তে তাঁরা যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে মূল্যবৃদ্ধি নিরোধের একটি প্রধান উপায়—পাইকারী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ। ব্যবসায়ের ঊর্দ্ধতন পর্য্যায়ে পণ্যাদির মূল্য যথোচিত নির্দ্ধারিত হলে, নিম্ন পর্য্যায়ে অর্থাৎ খুচরা ব্যবসায়ীদের হাতে এসে ততটা মূল্য বাড়তে পারে না।

মুনাফা শিকারের আত্যন্তিক লোভ থেকে মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো হলে তা নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধ। মূল্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কোনক্রমেই সঙ্গত বিবেচিত হতে পারে না। ন্যায্য কারণ থেকে যেখানে মূল্য বৃদ্ধি হবে, সেখানে সেই কারণটি দূর করার জন্তে দৃঢ় প্রচেষ্টা চাই। পরিবহনের অভাবের দরুণ মূল্য বৃদ্ধি হতে যদি দেখা গেলো (যা অনেক সময় বলা হয়ে থাকে), সেই অভাবের অবসান ঘটানোই হবে শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের মুখ্য কাজ।

মূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গ আলোচনা-পর্য্যালোচনাকালে পরিকল্পনা কমিশনের কয়েকটি সুপারিশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা চাই। অত্যাবশ্যক পণ্যাদির মূল্য বৃদ্ধি নিরোধের জন্তে তাঁরা ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা, ক্রেতা সমবায় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, খুচরা ব্যবসায়ীদের মূল্য তালিকা রাখতে বাধ্য করা—এ কয়েকটি জিনিসের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। পরিকল্পনা কমিশন তথা সরকারকে সম্প্রতিকালে মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা ব্যাপারে সমধিক ব্যাকুল লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বৈঠকের পর বৈঠক করে চলেছেন এবং প্রতিকারের উপায় খুঁজে পেতে তৎপরতা দেখাচ্ছেন।

কৃষি-পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক ওঠানামা করার পরিণতির দিকেও সরকারের নজর রয়েছে। এই ক্ষেত্রটিতে মূল্যের স্থিতিসাধনের ওপরই তাঁরা জোর দিতে চাইছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ঘোষিত নীতিই হচ্ছে—কৃষি পণ্যের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দর বেঁধে দেওয়া। মোটের ওপর, সরকারকে সর্ব্বক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখতে হলে মূল্য বৃদ্ধির সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করতেই হবে আর তা হতে হবে সঠিক রাস্তায়, উল্টো দিক থেকে নয়।

এমন বহুবার দেখা গেছে—সরকার কোন একটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি নিরোধে কোন সুচিন্তিত ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হয়েছেন, অমনি সে জিনিস বাজার থেকে হয় উধাও হয়ে গেল, কিংবা যদি তা সংগ্রহ করা গেল, দাম তার আরও আগুন। উৎপাদক ও ভোক্তা এই দুই-এর মাঝখানে যে চতুর ব্যবসায়ীমহল রয়েছেন, দর কমানো-বাড়ানো যেন তাদের খুশীর ওপরই নির্ভর করছে, অবস্থা-ব্যবস্থায় তা-ই মনে হয়। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির গতিরোধ করতে চাইলে সরকারকে এই প্রশ্নটির প্রতি বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, অন্যথা অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও তাঁদের প্রায় সকল ব্যবস্থা, সকল প্রকল্পই ব্যর্থ হওয়ার বহুল সম্ভাবনা।

সম্প্রতি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির মূল্য বিষয়ক সাব্-কমিটিতে পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ অবশ্য বলেছেন যে, খাত্তশস্যের এতটা দর বৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা আছে বলে পরিকল্পনা কমিশান মনে করেন না। মূল্য বৃদ্ধির ঊর্দ্ধগতি রোধ করার জন্য কমিশান কর্ত্তৃক নতুন করে জরুরী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে শ্রীনন্দ এই দাবীও রেখেছেন—পণ্যের উৎপাদক ও ব্যবহারকারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদের মুনাফা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সমধিক জোর দিতে হবে কৃষি ও শিল্প-পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর। এই সকল প্রস্তাব যথাযথ কার্য্যকরী হলে খুবই ভাল। কিন্তু তবুও অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটানোর জন্তে যাদের সত্যি অপরাধী দেখা যাবে, তাদের চরম দণ্ড প্রদানের জন্তেও সরকারকে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ না করলে চলবে না, এটা ঠিক।

প্রশান্ত চৌধুরী

সানাইওলার পিছু পিছু হেঁটে চাপা ফিরে এল সেই ঘরের সামনে, যে-ঘরে অন্ধ এবং খঞ্জ এক সুরকারের আয়ুর পিদিমের সল্‌তে পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে।

অন্ধকার ঘর। মাটির দেয়াল। খোলার চালা। ঘরের এক কোণে ইঁদুরের গর্তের মুখে একরাশ ইঁদুরে-কাটা কুচিকুচি কাগজ। দেয়ালে একটা টিকটিকি পাথরের মত স্থির হয়ে বসে রয়েছে চুপচাপ; আর, একটা আরশুলা বার বার উড়ে উড়ে তার কাছাকাছি গিয়ে বসেই উড়ে যাচ্ছে আবার।

ওস্তাদের ঘুম ভেঙে গেছে। চিৎ হয়ে শুয়ে একদৃষ্টে দেখছিল ওস্তাদ দেয়ালের ঐ নিস্পন্দ টিকটিকি আর অস্থির আরশুলাটার দিকে। সানাইওলা হাল্‌কা পায়ে ঘরে ঢুকে আবছা গলায় ডাক দিল,—ওস্তাদ।

ওস্তাদ দেয়াল থেকে চোখ না ফিরিয়ে হাত তুলে চুপ করতে ইসারা করল শুধু।

বসে পড়ল সানাইওলা ওস্তাদের বিছানার ধারে মেঝের ওপরেই। তারপর হাতের ইসারায় চাপাকেও ডেকে এনে বসাল পাশে।

কথা নেই কারুর মুখে।

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শুধু একটা আরশুলার ছটফটানির শব্দ। আর, আয়ুক্ষীণ একটা মানুষের ঘন ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ।

চাপার মনে হল, সে যেন পৃথিবীর বাইরে এমন এক জায়গায় চলে এসেছে, যেখানে কেউ নেই। তার মনে হল, সারা দুনিয়ায় এই ঘরটুকু ছাড়া কোথাও কিছু নেই আর। একটা অসীম নিস্তব্ধতার মহাসমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মত ভাসছে এই অন্ধকার ছোট্ট মাটির ঘরটা; আর তার মধ্যে আছে মাত্র তিনটি মানুষ, একটি সরীসৃপ আর একটি পতঙ্গ। আর কেউ নেই কোথাও।

সরীসৃপটা নিশ্চল নিস্পন্দ। পতঙ্গটা অস্থির চঞ্চল।

টিকটিকিটা নির্বিকার। আরশুলাটা বার বার উড়ে উড়ে টিকটিকিটার মুখের কাছাকাছি বসেই উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে আবার।

মৃত্যু স্থির, নিশ্চল, নিস্পন্দ, নির্বিকার। জীবন অস্থির, চঞ্চল।

আরশুলাটা ক্রমেই আরো কাছাকাছি গিয়ে পড়ছে। টিকটিকির সামনে দিকের একটা পা শুধু এতক্ষণে নড়েছে একটু।

উড়ল আরশুলাটা। উড়ল অনেক দূরে। বসল তাকের ওপর। বসল আলনায় ঝোলানো ওস্তাদের ময়লা শার্টের কলারে। বসল ওস্তাদের থুথু ফেলবার মাটির হাঁড়ির কাণায়। বসল ইঁদুরের গর্তের কুচো কাগজের ওপর। টিকটিকি স্থির অচঞ্চল।

জীবন ছটফট্ করছে, জীবন পালাচ্ছে, জীবন পালিয়ে বেড়াচ্ছে মৃত্যুর কাছ থেকে, জীবন চোর-চোর খেলছে মৃত্যুর সঙ্গে, কত তার অঙ্গভঙ্গি, কত তার খেলা, কতরকম তার চেষ্টা।—মৃত্যু নিশ্চিন্ত, মৃত্যু নিশ্চিন্ত, মৃত্যু নির্বিকার।

আরশুলাটা লুকিয়ে গেল ইঁদুরে-কাটা কুচো কাগজের তলায়। আর তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।—টিকটিকি নির্বিকার; এক চুলও নড়েনি, ঘাড় ফেরায়নি একটুও।

চাপার বুক থেকে নিশ্বাস উঠল একটা এতক্ষণে।—যাক্, বেঁচে গেল আরশুলাটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে ইঁদুরে-কাটা কুচো কাগজের তলা থেকে উঠে আরশুলাটা উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশ্চল নিশ্চিন্ত টিকটিকিটার মুখের গোড়ায়।

মৃত্যু চকিতে গলা বাড়াল একটু।

একটু ধড়ফড়ানি, একটু ছটফটানি,—তারপর আবার সব স্থির।

—বাঃ!

শব্দটা শুনে শিউরে উঠল চাপা। কে বলল কথাটা!—ওস্তাদ কী? সানাইওলা কী? চাপা নিজেই কী?

ওস্তাদ দেয়াল থেকে চোখ সরিয়ে নিল এতক্ষণে। শূন্যে শীর্ণ আঙুল নেড়ে কোন্ অদৃশ্য তারে ঝঙ্কার দিতে দিতে ক্ষীণ অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,—মেজরাফ, মেজরাফটা পরিয়ে দাও আঙুলে।

সানাইওলা হাত বাড়িয়ে ওস্তাদের আন্দোলিত শীর্ণ হাতটাকে ধরে ফেলে বলল,—ওস্তাদ, আমি, আমি।

যেন কোন্ স্বপ্নের ঘোর ভেঙে উঠে স্থির হয়ে তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে,

সানাইওলার দিকে। সানাইওলাকে ডিঙিয়ে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল চাঁপার মুখের ওপর। ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওস্তাদের। যেন মনে পড়ছে কিছু। যেন খুঁজে পাচ্ছে কিছু।

চাঁপা তাড়াতাড়ি গলা বাড়িয়ে বলল,—আমি ওস্তাদ, আমি। আমি চাঁপা। সেই যে অনেক দিন আগে বনবালার সঙ্গে এসেছিলুম। চিনতে পারছ না? কাল বিকেলে বনবালা বলল, আমাকে নাকি ডেকেছে তুমি। তাই এসেছি। মা তো একলা বেরোতে দেয় না আমায়, তাই লুকিয়ে এসেছি তোমার কাছে। তুমি কেমন আছ ওস্তাদ?

শীর্ণ হাতের ঠেলা দিয়ে ওস্তাদ সরে বসতে বলল সানাইওলাকে। ঘাড় তুলে তাকাল চাঁপার দিকে। স্তিমিত চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল এতক্ষণে। হাতের ইঙ্গিতে কাছে ডাকল চাঁপাকে।

এগিয়ে বসল চাঁপা।

ওস্তাদ মনে মনে অনেক কিছুর ভেতর থেকে বিশেষ কিছুকে যেন হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজতে খুঁজতে বলল,—চাঁপা, চাঁপা, চাঁপা।—কণ্ঠার হাড়দুটো দুদিক থেকে যেখানে এসে একটা গর্তের কাছে মিলেছে, সেইখানে যার তিল আছে একটা, সেই মেয়ে তো তুই?

—হ্যাঁ ওস্তাদ। কিন্তু ডেকেছ কেন গো আমাকে?

—দেখব বলে। শুধু দেখব বলে।

বলতে বলতে ওস্তাদ তার কাঁপা-কাঁপা হাতদুটো দিয়ে চাঁপার মাথাটাকে ধরে টেনে আনে নিজের দিকে।

খালুর কথাগুলো অমনি মনে পড়ে যায় চাঁপার। মনে পড়ে যায় মানুষটা দুশ্চরিত্র, মাতাল, খারাপ অসুখে ভুগছে। তবু কিন্তু নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মানুষটাকে আঘাত দিতে কেমন যেন মায়া হয় চাঁপার।

ওস্তাদ বলে,—তোকে আর গান শেখানো হল না আমার রে।

চাঁপা বলে,—কেন?

ম্লান হাসে ওস্তাদ। দেয়ালের দিকে আঙুল তুলে বলে,—দেখলি না?

দেয়ালের দিকে তাকায় চাঁপা। টিকটিকির মুখের বাইরে মৃত আরশুলার মাথাটুকু বেরিয়ে রয়েছে শুধু।

সহসা বাইরে একটা প্রচণ্ড কোলাহলের শব্দ উঠল,—আগুন! আগুন! আগুন!

সানাইপাড়ার বস্তির মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বুলকির মা দরজার বাইরে থেকে চিৎকার করে জানাল,—বরের গাড়িতে আগুন ধরে গেছে গো!

শুনেই চমকে উঠল চাঁপা!

হাপোরের শালা সেই নতুন মানুষটাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে যে চাঁপা!

চাঁপা ছুটল তাড়াতাড়ি।

সানাইপাড়ার বস্তির অলিগলি পেরিয়ে দাঁড়াল গিয়ে মোড়ের মাথায়।

অসম্ভব ভিড়! কেমনভাবে আগুন লেগে গিয়ে সাদা কাগজে-রাজহাঁস দিয়ে ঢাকা একটা বরের গাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে রাস্তার মাঝখানে।

বালতি, মগ, ঘটি,—যে যাতে করে পারছে জল ছিটিয়ে চলেছে। আগুন কিন্তু বাগ মানছে না মোটেই।

সুবল কামারের শালাকে ভিড়ের ভেতর থোক খুঁজে পেয়ে চাঁপা তার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বিরাট একটা রাজহাঁসের পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া।

যে বিরাট সুন্দর ধপধপে সাদা রাজহাঁসটাকে কিছুক্ষণ আগেও ডানা ছড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গেছে চাঁপা রাজপথের মাঝখানে, এতজনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখের সামনে তাকে এমন ভাবে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখে কেমন যেন কান্না পেতে লাগল চাঁপার।

একটু একটু করে রাজহাঁসটার প্রসারিত ডানাদুটো, বঙ্কিম গ্রীবা, উজ্জ্বল দুটো চোখ পুড়ে গিয়ে তারের জালের পাঁজরগুলো যখন অবশিষ্ট রইল শুধু,—তখন কোথা থেকে যেন শব্দ উঠল একটা,—যাঃ!

এতক্ষণ ওস্তাদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল চাঁপা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার কথা। সুবল কামারের শালাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ছুটে গেল চাঁপা সানাইপাড়ার বস্তির মধ্যে।

ফাঁকা বস্তি। বস্তির ছেলেবুড়ো মেয়ে-পুরুষ সবাই তখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে। চাঁপা ছুটে গেল ওস্তাদের ঘরের দিকে।

বাইরের রাস্তায় তখনো চলেছে হাজার লোকের কলরব। চাঁপা ওস্তাদের ঘরের কাছাকাছি পৌঁছতেই শুনতে পেল, সেই কলরবকে ছাপিয়ে একটিমাত্র সানাই থেকে একটি করুণ সুর বেজে চলেছে।

ওস্তাদের ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল চাঁপা।

ওস্তাদের দেহ স্থির নিস্পন্দ। চেয়ে আছে পিছনের দেয়ালের জানালার দিকে। জানালার পাল্লাটা খোলা। একটা ডুমুর গাছের ডালে বুড়ো কাক ঝিমোচ্ছে বসে বসে। পাশের খোলার চালায় ঝটাপটি করছে একদল চড়ুই পাখি। আর, সানাইওলা এক মনে একলা বসে বাজিয়ে চলেছে তার সানাই।

আরো কিছুক্ষণ সানাই বাজিয়ে থামল সানাইওলা। চাঁপার দিকে তাকিয়ে বলল,—চলে গেল ওস্তাদ।

চাঁপা আবার একবার তাকাল ওস্তাদের নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে। ইতিমধ্যে কে তার কাটা পা-দুটোর ওপর চাদরটাকে চাপা দিয়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই সানাইওলাই। তাছাড়া আর কেই বা ছিল তখন ঘরে। জানালার পাল্লাটাও ঐ সানাইওলাই খুলে দিয়েছিল নিশ্চয়ই।

ঐ জানালা দিয়েই উড়ে গেছে ওস্তাদের প্রাণটা। ডুমুরগাছের ডালে গিয়ে বুড়ো কাকটার মতো ঝিমিয়েছে কিছুক্ষণ, হাঁপিয়েছে কিছুক্ষণ। তারপর ঐ চড়ুই পাখিদের মতো কিছুক্ষণ কিচিরমিচির করে উড়ে গেছে সেইখানে, যেখানে নিঃসঙ্গ একেকটা চিল একেক দিন হাজির হয় গিয়ে।

সানাইওলা বলল,—ওস্তাদ বলে রেখেছিল যে, প্রাণটা তার যতক্ষণ না গাঙ পেরিয়ে যায়, ততক্ষণ যেন সানাই বাজাই আমি। তা' এতক্ষণে ওস্তাদের প্রাণ গাঙ পেরিয়ে গেছে,—কি বল?

কোন কথা না বলে চাঁপা আবার তাকাল ওস্তাদের দেহটার দিকে। হাতের কাছে দুখানা খেরো-বাঁধানো খাতা রাখা!

সানাইওলা খাতা দুটোকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে চাঁপার হাতের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল,—তোমাকে দিতে বলে গেছে। হাজারেরও ওপর গানের সুর আছে ওতে।

চাপা কেমন বিহ্বলের মত হাতে নিল খাতাটা, তারপর হঠাৎ খোলা জানালার ভিতর দিয়ে আকাশে সন্ধ্যার রঙ্ দেখে ত্রস্তকণ্ঠে বলল,—আমি যাই। মা আবার ভাবছে।

২৩

সোহাগী ভাবছিল। ভাবছিল চাঁপার কথা, নিজের কথা। ভাবছিল চাঁপার ভবিষ্যৎ আর নিজের অতীতের কথা।

সুবল কামারের শালার সঙ্গে চাঁপা গেছে সানাইপাড়ার মোড়ে বিয়ের প্রসেসনের গাড়ি, আলো আর সঙ্ দেখতে। সোহাগীর ছোট-বেলায় গাড়ির চেয়ে বেশি চল ছিল চতুর্দোলার। তিরিশটা বেহারার কাঁধে চেপে চতুর্দোলায় চেপে বর যেত তখন কনে আনতে। ফিরতও ঐ চতুর্দোলায় চেপে। সিংহাসনে বসে থাকত আঠারো বছরের কচি বর, আর পাশে ব'সে কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলাত এগারো বছরের বাচ্চা কনে। পায়ের তলায় দু-দিকে দু'জন সখী পা মুড়ে ব'সে চামর দুলিয়ে বাতাস করত বর-কনেকে।

খুব বড়লোকদের বরের চতুর্দোলায় থাকত ফর্সা-ফর্সা ইহুদী সখী। লোকে বর-কনে দেখবে, না ইহুদী সখীদের সুন্দর মুখ দেখবে।

সঙ্গে কত আলো যেত বাজনদারের দল যেত রাস্তার দু-পাশের লোকেদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে। কিন্তু ছোটদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণের ছিল ব্যাগপাইপ্‌ওয়ালারা। সোহাগীর বেশ মনে পড়ে তাদের কথা। তাদের পোশাক, তাদের গাল ফুলিয়ে বাজাবার ভঙ্গি, তাদের হাঁটার কায়দা,—সে সব কী বিস্ময়েরই যে ছিল! আর তাদের ঐ ব্যাগপাইপ্? মনে হত, একটা বিচিত্র থলের মধ্যে অনেকগুলো লম্বা-লম্বা বাঁশি পুরে রেখে তার মধ্যে থেকে একটাকেই বাজাচ্ছে শুধু ওরা। অতগুলো বাঁশি থাকতে একটাকেই বা বাজায় কেন ওরা,—এ-প্রশ্ন কতবার যে সোহাগীর কচি মনকে ভাবিয়ে তুলেছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই।

একবার অমনি এক বরের চতুর্দোলায় বর-কনের পায়ের কাছে ব'সে চামর দোলাবার কাজ পেয়েছিল সোহাগী। হয়েছিল ওর সেই সৌভাগ্য!—তখন কত বয়েস ওর? বারো? তেরো?

ওর মা কুসুমের যৌবন তখনো যায়নি। বাগবাজারের ধারে নন্দ শুঁড়ির দিশী মদের দোকানের তখন জমজমাট অবস্থা। কুসুমের দোতলা ঘরের মজলিসে তখন স্ফূর্তির বান ডাকে। সোহাগী থাকে তখনও একতলার ঘরে বুড়ি ভবসুন্দরীর হেপাজতে।

সেদিন কুসুম ছিল না ঘরে। নন্দ শুঁড়িদের বাগানপার্টিতে গেছল দমদমায়। দু-রাত্তির পরে ফেরবার কথা। বিকেল বেলা ভবসুন্দরী হ্যারিকেনের কাঁচ থেকে ভুষো-কালির ছোপ মুছছিল আর সোহাগী এক পাশে ব'সে নিজে নিজে বিনুনি বাঁধছিল চুলে, এমন সময় সানাইপাড়ার বুড়ো মাণিক এসে খপ করে সোহাগীর হাতটা ধরে বলল,—নিয়ে চললুম গো ভবদিদি।

চমকে উঠল সোহাগী। ভয় পেল।

ভবদিদির মুখে কিন্তু কোনো ভাব-ভঙ্গি নেই। যেন এমনটা যে হবে, সবই জানা ছিল তার। তেমনি ধীরে-সুস্থে হ্যারিকেনের কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে শুধু বলল,—টাকা দিবি না আগাম?

মাণিক বলল,—কথার নড়চড় নেই মাণিকের। পুরোপুরিই এনেছি সঙ্গে। দু-টাকা নগদ। ধরো।

ভবদিদি বলল,—আমায় দিতে হবে না,—ঐ দিয়ে মেয়েটার জন্তে কাঁচকড়ার একটা বড় ডল্ পুতুল কিনে দিস্ ভাই। আর, বাঁচে যদি কিছু, তো আমার জন্তে মোতিহারীর দোক্তাপাতা কিনে দিস্।

সোহাগী কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল,—কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?

ভবদিদি একহাত জিভ কেটে বলল,—আ পোড়া কপাল! সকাল থেকে সর-ময়দা দিয়ে তোর মুখ পোস্কার করে দিলুম, মাথাঘষা দিয়ে চুল সাফ করে দিলুম, অথচ আসল কথাটাই বলা হয়নি বুঝি তোকে? বরের চতুর্দোলায় সখী সাজাতে নিয়ে যাচ্ছে তোকে।

—চতুর্দোলায়!

—হ্যাঁরে। ঝকমকে পোশাক পরাবে, মাথায় ওড়না দেবে, গায়ে কত গিল্টির গয়না পরিয়ে দেবে।

—চামর দেবে হাতে?

—দেবে বৈকি। তারপর আবার মস্ত একটা কাঁচকড়ার পুতুল পেয়ে যাবি।

—কখন আবার ফিরে আসব ভবদিদি?

—রাত্তিরের মধ্যেই।

মাণিক বুড়োই বলল এবার কথাটা। বলল,—কত লুচি-মণ্ডা খাবি। আয়।

মাণিকবুড়ো হাত ধরে নিয়ে চলল সোহাগীকে। আর সোহাগীর মনে হল, রাক্ষসী একটা ডাইনি রাণীর হাত থেকে উদ্ধার করে কোন্ রাজপুত্তুর যেন তাকে পরীরাজের পিঠে চাপিয়ে সাতসমুদ্দুর পারের পরীর রাজ্যে নিয়ে চলেছে!

একটা স্বপ্ন একটা বিহ্বলতার মধ্যে কেটে গেল ঘণ্টা দেড়েক সময়। তার মধ্যে কুসুম দাসীর চুরি-করা মেয়ে সোহাগী সেজেগুজে পরীর মতন সুন্দরী হয়ে বসল গিয়ে চতুর্দোলায়, একটি তরুণ বরের পায়ের কাছে। আরেকটি মেয়ে ছিল ওধারে। বয়েসে বছর ছয়েকের বড় সোহাগীর চেয়ে দুজনে চামর দোলাতে লাগল। চলতে লাগল চতুর্দোলা।

কত আলো জ্বলল! কত বাজনা বাজল! কত বাজি পুড়ল!

সোহাগীর মনে হতে লাগল, পরীর রাজ্যে যে-বাগানে হীরের গাছে মোতির ফুল ফোটে, সেই বাগানের পথ দিয়ে চলেছে চতুর্দোলাটা!

কাঁটাপুকুরের দত্তবাড়ির দেউড়িতে এসে থেমে গেল চতুর্দোলা। বেহারার কাঁধ ছেড়ে মাটিতে এসে ঠেকল চতুর্দোলা। হৈ-হৈ করে সবাই এসে বরকে নামিয়ে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে।

সখীদের দিকে আর দৃষ্টি নেই কারুর। বুড়ো মাণিক এসে চতুর্দোলা থেকে দুই সখীকে নামিয়ে নিয়ে বসিয়ে দিল দত্তবাড়ির আস্তাবলের অন্ধকার ছাতের ওপর। বলল,—বসে থাক্ এখানে চুপটি করে। আমি ছাড়া কারুর সঙ্গে যাসনি কোথাও। খাবার ব্যবস্থা হলেই আমি ডেকে নিয়ে যাব তোদের।

বসে রইল ওরা। সোহাগীর মন খারাপ হয়ে গেল খুব। কান্না পেতে লাগল।

অন্য সখীটা একসময় বলল,—নাম কি রে?

—সোহাগী।

—আমার নাম জিগেস করলি না যে বড়? বড় ঠ্যাকার দেখছি যে লো তোর। আমার নাম ঠুনকি।

—ও।

মেয়েটা ঝকমকে পোশাকের কোন্ লুকোনো জায়গা থেকে চারটে বিড়ি আর একটা দেশলাই বের করে বলল,—আমি বাবা সঙ্গে এনেছি সব। নে, খা।

সোহাগী বলল—খাই না তো।

—আ মর মুয়ে আগুন,—খাস না কি লো?

মেয়েটা ফস্ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল মজাসে। হাঁটুর ওপর পোশাক তুলে ছাতের ওপর ঠ্যাঙ ছড়িয়ে ব'সে বিড়ি টানতে টানতে বলল,—এই পেরথম্ বুঝি?

—হ্যাঁ।

—আমার এই এগারো বার। নাড়ি-নক্ষত্তর জানা হয়ে গেছে আমার সব। এত তো ঘটা, এত তো রোশনাই, এত তো সাজসজ্জে! কী খেতে দেবে জানিস আমাদের?

—কী?

—একগণ্ডা লুচি আর একগণ্ডা দরবেশ।

—আর কিচ্ছু না?

—কিচ্ছুনা। তবে, আমার বাবা ভাবনা নেই।

—কেন?

—পোলুয়া কালিয়া সব আসবে আমার।

—কোথা থেকে?

—দেখতে পাবি।

বলে বাঁ-হাতের নখ দিয়ে উরুৎ চুলকোতে চুলকোতে ঠুনকি কসে টান দিল বিড়িতে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আস্তাবলের কাঁধের সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে একটা মানুষ উঠে এল ছাতে। চাপা গলায় বলল,—ঠুনকি কই রে?

ঠুনকি বলল,—এই যে। চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? এনেছ?

লোকটা বলল,—হ্যাঁ। আস্তাবলের পিছন দিকে চৌবাচ্চার পারে রেখে এসেছি। সহিস ব্যাটা দেখে ফেলেছে কিন্তু। সিদ্ধিতে চুর হয়ে আছে ব্যাটা। নড়তে চাইছে না। বলছে সখীকে নিজে হাতে খাওয়াবে।

—চলো, দেখি।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ঠুনকি। সোহাগীর দিকে ফিরে বলল,—কি রে কচি খুকী, যাবি নাকি?

—না। মাণিকবাবু বারণ করেছেন যে।

—ওরে আমার মাণিক রে!

বলতে বলতে হাতমুখ ঘুরিয়ে নেমে গেল ঠুনকি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। লোকটাও নেমে গেল পিছু পিছু। সোহাগী একলা বসে রইল সেই অন্ধকার আস্তাবলের ছাতে।

কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর সোহাগী দাঁড়াল গিয়ে পাঁচিলের ধারে। আস্তাবলের ধার দিয়েই একটা রাস্তা চলে গেছে। কত রকমের দোকান রাস্তার ধারে। বিয়েবাড়ির সঙ্গে কোথাও কোনো যোগ নেই তাদের। সবাই যে-যার রুজি-রোজগারের চেষ্টায় ব্যস্ত।

বিড়ির দোকানের লোকটা ঘাড় গুঁজে বিড়ি বাঁধছে একমনে। স্যাকরার দোকানের বুড়ো মিস্ত্রি ঠুকঠুক করে কী ঠুকে চলেছে কাঁপা হাতে। কিন্তু তারপর?

চোখের সামনে ও কী দেখছে সোহাগী?

দেখছে পর পর চার-পাঁচটা ময়রা দোকান। আর, দেখেই চিনতে পেরেছে সোহাগী। এই তো সেই! এই তো সেই কাঁটাপুকুরের ময়রাপাড়া! ভবদিদি যে কাঁটাপুকুরের এই ময়রাপাড়ার একটি লক্ষ্মী বৌয়ের গল্পই শুনিয়েছিল তাকে একদিন!

মনটার মধ্যে হু-হু করতে লাগল সোহাগীর। কান্নায় ঝাপসা হয়ে গেল তার চোখ। মনে হল কাঁপতে-কাঁপতে এক্ষুণি ও পড়ে যাবে ছাতের ওপর।

আকাশের তারার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে সোহাগী কেঁদে কেঁদে বলল,—কেন? কেন? এ কেন হল? এ তোমরা কেন করলে?

সোহাগী তাকাল নিচের দোকান ঘরগুলোর দিকে। ঐখানেই আছে ওর বাবা। নিশ্চয়ই আছে। একরাশ সন্দেশের মধ্যে ব'সে সে জানতেও পারছে না যে, তারই মেয়ে দত্তবাড়ির আস্তাবলের অন্ধকার ছাতে দাঁড়িয়ে কেঁদে চলেছে ফুঁপিয়ে।

ওড়নায় চোখ মুছে সোহাগী তাকাল ওপর দিকে। ময়রাবাড়ির টানা-বারান্দায় কত বৌ-ঝিদের ভিড়। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের বিয়েবাড়ির জৌলুষ দেখছে সবাই। দত্তবাড়ির দেউড়ির আলো গিয়ে পড়েছে তাদের মুখে।

ওদের মধ্যে কি আছে সেই লক্ষ্মী-বৌ? আছে কি সোহাগীর আসল মা? নিশ্চয়ই আছে।

চোখ মুছে সোহাগী তাকাল বড় বড় চোখে।

কে সে? কোন্‌টি সে? কে সেই হাসপাতালের লক্ষ্মী-বৌ? কে সে,—কুসুমবুড়ির মরা মেয়েটাকে বুকে নিয়ে যে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল বারো বছর আগে? কোন্‌টি? কোন্‌টি?

সে কি ঐ?—ঐ পরণে যার রাঙাপাড় শাড়ি? কালো-কালো রঙের মধ্যে মিষ্টি সুন্দর মুখখানি যার, ঐ কি সেই? ঐ যার নাকে নথ, গলায় বিছে হার, কপালে চওড়া সিঁদুরের টিপ, ?

সোহাগীর বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। মনে হল বুকটা ফেটে চুরমার হয়ে গিয়ে এক্ষুণি মরে যাবে সোহাগী।

সোহাগী ফিসফিস্‌ করে উচ্চারণ করল একবার,—মা।

তারপর আবার; আবার: আবার। দশ, কুড়ি, একশোবার উচ্চারণ করল ঐ শব্দটা।—মা, মা, মা, মা-মা। মনে হল, চিৎকার করে ডাক দিয়ে বলে,—মাগো, এই যে, এই যে আমি. চিনতে পারছ না আমাকে? আমি সোহাগী, তোমার মেয়ে। হাসপাতালে তোমার মেয়ে মরেনি মাগো। আমি সেই মেয়ে। সেই মেয়ে কত বড় হয়েছি ভাখো। মাগো, ডেকে নাও আমাকে, চিনে নাও আমাকে, তুলে নাও আমাকে।

সোহাগী আবার কাঁদল। দত্তবাড়ির আস্তাবলের অন্ধকার ছাতে একলা দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল এবার। তারপর চোখ মুছে তাকাল যখন আবার,—ময়রাবাড়ির বারান্দা থেকে বাড়ির অন্দরের দিকে ফিরে গেছে ততক্ষণে বৌ-ঝিদের দল।

শূন্য বারান্দা। কেউ নেই। শুধু বারান্দার তীরে ঝোলানো একটা খাঁচার মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে একটা রাতকানা টিয়াপাখি।

সোহাগীর বড্ড একলা মনে হতে লাগল নিজেকে, ছুটে গেল পাঁচিলের ওধারে। ঘাড় ঝুঁকিয়ে তাকাল আস্তাবলের পিছনের দিকে,—যদি দেখা যায় কাউকে। অন্তত টুন্‌কি নামের সেই বদ্র মেয়েটাকেও দেখা যায় যদি।

দেখতে পেল। দেখতে পেল সোহাগী। টুন্‌কিকে নয়। নিচের আস্তাবলের চৌবাচ্চার পাড়ে তার ছাড়া পোশাকটাকে দেখতে পেল শুধু সোহাগী। সেইসঙ্গে এক লহমায় বিদ্যুৎচমকের মতো নতুন কোরে আরো একবার দেখতে পেল নিজের ভবিষ্যৎটাকে।

দেখে কেঁদে উঠল আবার ফুঁপিয়ে।

আর ঠিক এমনি সময় কে একজন চুপিসাড়ে কখন ছাতে উঠে ওর মাথায় হাত রেখে খুব স্নেহের সঙ্গে বলল,—কাঁদছিস্‌ কেন! কী হয়েছে?

[ ক্রমশঃ

# মনট্রিল

## মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আততায়ী অন্ধকারে জ্বলে ওঠে পথের আলোক,
নিবে যায় সোনালী বিকেল।
অন্তিম উপান্তে এসে শিয়াল-হরিণ আর বনের সেবল
পালটায় ভেল।
রোম নিয়ে চলে বেচা কেনা,
পর্কুপাইন সোনার ভাগে ফাঁকি তো দেবে না।
বরফ গলেছে।—এই বেলা
জল স্রোতে ভাসাও যত কাষ্ঠ খণ্ড সজ্জিত করে':
ভেসে যাক শৃঙ্খলিত ভেলা।
ভ্যাঙ্কুভার বন্দর থেকে খনিজ অঞ্চলে
সিটি দিয়ে কতবার কত গাড়ি চলে।
কনট সুড়ঙ্গ থেকে মুক্তি যদি পায় কোন ট্রেণ,
হ্যালিফাক্সে তন্দ্রা নেই। ওঠে নামে অবারিত ক্রেন।
আর,
কোষ্টরেঞ্জ স্মরণে আনে বার্চ-ওক-সীডারের
অরণ্যবাহার।

ও ঘরে ময়দার স্তূপ, মালিনী বানায় কেক।
ঠোঁটে তার সোনালী আঁচিল!
দু' চোখের তারা দুটো নীল।
এদিকে পাইন বন, সি-বি-সির গান
আর ঝলমলে ঝিল।
জ্যোৎস্নায় জেগেছে যেন শহর মনট্রিল।

# অশ্রু, অলস অশ্রু

( Tears, Idle Tears by Lord Tennyson )

অশ্রু, অলস অশ্রু, তাদের অর্থ আমি জানি না,
কোন স্বর্গীয় হতাশার গভীরতা হ'তে আমার এ অশ্রু
উৎসারিত হয় হৃদয়ে, জমা হয় চোখের পাতায়,
শরতের সোনালী মাঠের দিকে তাকিয়ে,
যে দিন চলে গেছে তাদের কথা স্মরণ ক'রে।

সেই পালের প্রথম উজ্জ্বল আলোকের মতই সজীব
যা দিগন্তরেখার পার হ'তে নিয়ে আসে আমাদের বন্ধুকে,
তারই মত দুঃখময়, যার শেষ বিন্দুটি ম্লান হয়ে
ডুবে যায় আমাদের ভালবাসার ধনকে নিয়ে সুদূরে।
তেমনি দুঃখময়, তেমনি সজীব সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি।

আঃ, সেই রকম দুঃখময় ও অস্পষ্ট যেমন গ্রীষ্মের ঝাপসা সকালে
আধজাগা পাখীর প্রথম সঙ্গীতের ধ্বনি
মুমূর্ষের কাছে, যখন তার ক্লান্ত চোখে
জানালাকে মনে হয় একটি চৌকো আলোক রেখা মাত্র,
তেমনি দুঃখময়, তেমনি অস্পষ্ট সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি।

মৃত্যুর পর মনে-পড়ে-যাওয়া চুম্বনের মতই প্রিয়,
এবং সেই চুম্বনের মতই মধুর, যা আশাহীন কল্পনা
সৃষ্টি করে অপরের জন্য রক্ষিত ওষ্ঠে; প্রেমের মতই গভীর,
প্রথম প্রেমের মতই গভীর এবং অনুতাপের বেদনায় উন্মাদ।
ও জীবনমৃত্যু, সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি।

অনুবাদিকা:—অপরাজিতা গোহ

...ব্যাপারটা হচ্ছে কি? ... উঠে বলল রণধীর। তারপর তেজপালের দিকে চেয়ে বলল, "এই লেডিসদের বেরোতে হলেই ব্যস..."

বীনু মিসেস তেজপালকে ডাকতে গিয়ে সেখানেই যে রয়ে গেল। 'পিকআপ' এসে গিয়েছিল। আর আর্দালি সমস্ত জিনিসপত্র তার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। দুবার হর্ণও দেওয়া হল। রণধীর, তেজপাল আর রুদ্র নিচে দাঁড়িয়েছিল। মিসেস তেজপাল আর ওঁর মেয়ে গুড্ডী আগেই পিকআপে গিয়ে বসে পড়েছিলেন। গুড্ডী পিকআপের রেলিং থেকে ঝুঁকে পড়ে সামনের ফ্ল্যাটের শেখরের সঙ্গে কথা বলছিল। পেছন থেকে মিসেস রুদ্র ওকে ধরেছিলেন। ওপরে যেতে যেতে আমি দেখলাম তেজপাল একটা খালি সিগারেটের টিনে ঠোক্কর দিতে দিতে কিছু বলছেন।

"বীনু!" ডাকতে ডাকতে আমি তেজপালদের ফ্ল্যাটে পা দিই। বেয়ারা পিকআপে জিনিসপত্র রাখতে আসা-যাওয়া করছিল। এইজন্যে দরজা খোলা ছিল।

"মিসেস তেজপাল, আপনিও তৈরী হতে"...কথা বলতে বলতে আমি ড্রইংরুমের ভেতর দিয়ে লাগান ঘরটাতে এসে পড়েছিলাম।

আমার কথা মাঝপথেই থেমে গিয়েছিল।

"ভেতরে তো আয়।" খিলখিলিয়ে হাসির মধ্যে বলে বীনু। আর পর্দাটা ঠেলে সরাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে এক মুহূর্ত শুব্ধ হয়ে যাই আমি। আর পরমুহূর্তেই হেসে উঠি গলা ছেড়ে।

বীনু খাটে বসে হাসিতে ভেঙ্গে পড়ছিল আর ড্রেসিং টেবিলের সামনে প্যান্ট আর ব্লাউজ পরে আয়নার কাছে ঝুঁকে লিপষ্টিক লাগাচ্ছিলেন মিসেস তেজপাল। "হ্যালো!" একান্ত নির্বিকার ভঙ্গিতে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখতে দেখতে উনি বলেন।

"এ কি তামাসা হচ্ছে? নিচে ওরা সকলে চেঁচামিচি জুড়ে দিয়েছে আর"...সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে কৃত্রিম রাগে বলি আমি। এই পোষাকেও যে ওঁকে কি মোহনীয় দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন এ বেশ ছাড়া অন্য কোন বেশে ওঁকে আর কোন দিন দেখিইনি।

"যাচ্ছি ভাই, দয়া করে এখন আমার মাথাটি খেও না।" গভীর মনোযোগ দিয়ে আয়নার সামনে ঝুঁকে পড়ে উনি কপালে কুমকুম লাগাচ্ছিলেন।

"হর্ণ তো এতক্ষণ নিচে থেকে বাজছিলই। এবার ওপরেও বুঝি এসে পড়ল।" কথা বলতে বলতে মিলিটারি অফিসারের টুপি পড়ে নেন। কপালে কুমকুমের সঙ্গে যে তা কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। পেছন দিকে চুল ছড়িয়ে পড়েছিল অনেকখানি।

"কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা কি? অকারণে খা...টার মুড খারাপ করবেন?" নতুন পোষাক ওঁর চেহারায় নতুন একটা উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তবু জিজ্ঞেস করলাম, "এমনি করেই যাবেন নাকি?"

"কেন? ভালো দেখাচ্ছে না নাকি?" উনি সোজাসুজি আমার দিকে দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন। "আমার স্ল্যাক্স পছন্দ হচ্ছে না?"

"একেবারে 'ওয়াকাইদে'র মতন দেখাচ্ছে।"

"ইস্।" কৃত্রিম নিরাশ ভঙ্গিতে উনি বলেন। খালি ওয়াকাইদের মতন দেখাচ্ছে? অন্তত এও তো বলতে পারতেন যে অড্রি হেপবার্ণের মতন দেখাচ্ছে।"

"অড্রি হেপবার্ণ?" খুনসুটির ভঙ্গিতে বলি আমি। "মানুষের নিজের সম্বন্ধে যে কত ভ্রমই থাকে। বেচারা হলিউড বাসিন্দাদের

# কুলটা

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

রাজেন্দ্র যাদব

জানা ছিল না! নাহলে ভবানী জাংসনে মিছিমিছি আতা গার্ডনারকে আর কেন বিরক্ত করত? কিন্তু সত্যি সত্যিই বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।" কিন্তু নিচে থেকে আবার হর্ণের শব্দ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলি, "আচ্ছা বাবা, যেমন ইচ্ছে চলুন। এখন বেরোন তো দয়া করে।"

"থ্যাংকু।" শেষের কথাগুলো যেন শুনতেই পান না উনি।

বীনু বলে, "আসল কথা, কাল ও মেজর তেজপালের সঙ্গে ময়দান থেকে ফিরছিল। রাস্তা দিয়ে কয়েকজন ইউরোপিয়ান মহিলা জিন আর ফ্লাইং পট পরে গলফ্ খেলতে যাচ্ছিলেন কোর্টে-এ। ওদের দেখে মেজর তেজপাল বলেছিলেন, "দেখ, কি নির্লজ্জ এদের মনে হয়। মাঝখানে কোমরটা যদি না শক্ত করে বাঁধা থাকত আর চলনে মেয়েদের মতন ঢং না থাকত তাহলে পেছন থেকে ছেলে আর মেয়ে আলাদা করে চেনা মুশকিল হত।" ও বলেছিল, "এতে নির্লজ্জতার কি আছে? এ তো যার যার নিজের পোষাক। এমন খোলামেলা থাকে তাই তো এত স্বাস্থ্য। আর ব্যাস্ সেই থেকে শুরু হয়ে গেল আমিও একবার জিন পরে দেখব। তা যখন হল না তো প্যান্টই সই।"

"ঠাট্টা নয়; আপনি যা পরেন তাতেই সুন্দর দেখায়।" কুমকুম আর ঠোঁটের লালের সঙ্গে মাথার টুপি সত্যিই এমন দেখাচ্ছিল যে বীনু না থাকলে হয়ত পরিণাম সব ভুলে ওঁর থুতনিটি নিজের দিকে ফিরিয়ে আমি নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম,—তখন ঐ চোখের পাতা কেমন করে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকত—কল্পনাতেও সমস্ত মন অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে ভরে ওঠে।

রুজ, লিপষ্টিক, পাউডার মাখা মেয়েদের কোনদিনই ভালো চোখে দেখতাম না। কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা ভাবতে মন চাইতই না।

"আচ্ছা, মিসেস তেজপাল এবার চলুন। নাহলে এরা সত্যি সত্যিই এবার রাগ করবে।"

উনি আবার কাপড় বদলাতে চলে গিয়েছিলেন। ওঁকে গুড্ডীর সঙ্গে দেখে যে কথা আমার পরে মনে হয়েছিল যে উনি একটি বড় গুড্ডী সে কথা এখনই যেন শব্দহীন ভাষায় ছবি হয়ে উঠেছিল।

"কি হল?" মেজর তেজপাল যাতে জোরে বকে না ওঠেন সেজন্যে চাপাস্বরে চীৎকার করে বলে রণধীর।

"আসছে। আলমারীর চাবি কোথায় রেখে দিয়েছিল পাওয়া যাচ্ছিল না।" আমার ভয় ছিল যে ওদের নিচে আসতে দেখেই মেজর তেজপাল না চেঁচামিচি শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখি সমস্ত সিঁড়িটাকে চটির শব্দে ভরিয়ে দিয়ে হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে নামছে ওরা দুজন। সিঁড়ির কাঁচ দেওয়া জানলা দিয়ে দেখি মিসেস তেজপাল নানা রংএর ছুচিনটে ফানুস নিয়ে আসছেন। পরণে আসমানী নাইলনের সাড়ি আর ব্লাউজ। ও জিনিস পরার অর্থ কি একথা

আমার আজও বোধগম্য হয় না। 'সার্টিনের পেটিকোট' আর ব্রেসিয়ার সাড়ির অনেক ভাঁজ আর থাক সত্ত্বেও যেমনকার তেমনিই দেখা যাচ্ছিল। মিসেস তেজপালের সে বেশ দেখে' চমকে উঠি সবাই আর চোখ যেন সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে নিই সকলেই। কেউ কিছুই বলে না। আড়চোখে চেয়ে দেখি মেজর তেজপাল যেন কিছু বলতে বলতে থেমে যান। ওঁর কান লাল হয় যেন একবারের জন্ত, আর দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেন মুহূর্ত্তের জন্তে। তারপর শান্তস্বরে বলেন, "কিটির কথা বলে দিয়েছ বেয়ারাকে ?"

"হ্যাঁ।" মিসেস তেজপাল বলেন আর গুড্ডীর কাছে এসে ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুটো ফানুস ওর হাতে তুলে দিতেই উছলে ওঠে ও। পিকআপের পেছন দিক ধরে ব্যস্ত ভাবে ওপরে ওঠার সময় ওঁর আচল হাঁটু পর্য্যন্ত খুলে যায়। সকলে ওঁর দিকে প্রশংসা-মুগ্ধ সংগে সংগে ঘৃণাভরা চোরা দৃষ্টিতে দেখছে, এ বিষয়ে যেন একেবারে উদাসীন ছিলেন উনি। অন্ত কোন সময় হলে আমিও হয়ত ওঁর দিকে সেই দৃষ্টিতেই চাইতাম কিন্তু এখন কেন যেন ওঁর এই চেহারায় আমার লজ্জা হচ্ছিল। সিটে বসেই উনি চুলে একবার ঝাপটা দেন আর গুড্ডীকে দুহাতে কাছে টেনে বলেন, "আন্টি'র কোলে বসবে না বুঝি ? আমি যে ফানুস দিলাম ?"

সবাই বসার পর ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে দেয়। বেয়ারা সামনে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে। গাড়ি গেট থেকে বেরিয়ে হাওড়ার দিকে দৌড়তে থাকে। আমরা সামনা-সামনি বসেছিলাম। মেয়েরা সকলে একদিকের সিটে বসেছিলেন। ওঁর কানের অসামান্ত শেডের মস্ত বড় পাথরটা মুগ্ধচোখে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিস ফিস করে কি জানি কি কথা বলছিল গুড্ডী। আর ওর হাতের ফানুস দুটো সুন্দর একটা রং তুলে এদিক ওদিক উড়ছিল। সৌন্দর্য্যের প্রতি শিশুরাও বোধ হয় সমান ভাবেই আকৃষ্ট হয়। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগছিল যে, তেজপাল দেরির জন্তে একটা কথাও বললেন না। যে ভঙ্গিতে উনি সিগারেটের খালি টিনটাতে ঠোকর মারছিলেন তাতে তো মনে হচ্ছিল ওঁকে দেখামাত্র উনি বিকট ভাবে চীৎকার করে উঠবেন। এতক্ষণ পর হাঁটুর কাছে শাড়ির কুঁচিগুলো ঠিক করে নিচ্ছিলেন মিসেস তেজপাল। রণধীর ঘন খয়েরী-রঙের কর্ডের প্যান্ট আর খোলা গলা সাদা সার্ট পরেছিল আর কলারটা বারবার উড়ে ওর কানের পাতায় পড়ছিল। গাড়ি খুব জোরে চলছিল আর মিসেস তেজপাল বারবার কানের ওপর হাত তুলে নিজের চুল ঠিক করে নিচ্ছিলেন। বুকের ওপর থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত আড় করে হাত রেখে সিলেটি ব্যাঙ্গালোর সাড়িটা চেপে রেখেছিলেন মিসেস রুদ্র। বীনু সালওয়ারের সঙ্গের ওড়না মাথায় দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিল। তখন তো কিছু বোঝা যায়নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল মিসেস তেজপালের প্রতি একটা উপেক্ষার ভঙ্গি দেখাতে দুটি মহিলা যেন মনে মনে একটা নিঃশব্দ বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন।

"মেজর আয়ারকে বলা হয়নি ?" পকেট থেকে এলাচ বার করে হাতের ওপর রেখে রুদ্র সকলকে অফার করেন। প্রথমে মহিলাদের তারপরে পুরুষ। মিসেস তেজপাল না নিয়ে 'থ্যাঙ্কস্' বলেন। উনি ব্যাগ থেকে টফি বার করে সকলকে দেন। আর বাইরে এত ব্যস্ততার সঙ্গে দেখতে থাকেন, যেন খুব জরুরি কি কাজ আছে।

"বলেছিলাম, কিন্তু আজ ওঁর ডান্স-টিচারকে ডেকেছেন উনি বাড়িতে।" বলল রণধীর।

"হোয়াট ? ডান্স-টিচার ?" দাঁত দিয়ে এলাচের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে মেজর তেজপাল কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন: "সেইজন্তেই ওদের ফ্ল্যাট থেকে আজকাল এত তবলা-টবলায় আওয়াজ শোনা যায়।"

"তবলা না। মৃদঙ্গ।" মজার একটা চেহারা করে রুদ্র বলে। "তোমরা জান না, আজকাল মেম আর সাহেব দুজনেরই ডান্স শেখার বড় সখ হয়েছে। যখনই দেখ নাচছে।"

"হুঁ, এই সাউথ ইণ্ডিয়ানদেরও দেখি মাথা খারাপ হচ্ছে।" মাথা ঝাঁকিয়ে তেজপাল বলে, "প্যারেড করা ছেড়ে এখন উদয়শঙ্কর হবার ধুম।"

"উদয়শঙ্কর হবার কি আছে ? এ যে যার নিজের নিজের 'হবি'। গুড্ডীর কানে 'কু' করা ছেড়ে হঠাৎ বলে ওঠেন মিসেস তেজপাল। যদি ইংরিজি ডান্স প্র্যাক্‌টিশ করা খারাপ না হয় তাহলে নিজেদের নাচ প্র্যাক্‌টিশ করা খারাপ হবে কেন ? এ তো নিজের নিজের হবি।"

"আই সেড, ড্যাম হবি।" হাত ঝাঁকিয়ে ওঠেন তেজপাল: "মেয়েদের মতন হাত-পা মটকানো খুব ভালো হবি। আরে, যদি আর কোন কাজ না থাকে তো টেবিল টেনিস খেল। সত্যি কথা, এদের খাওয়া, থাকা কোনদিন আমার বোধগম্য হল না। হাউ দিজ পিপল্ লিভ। সেদিন আমাকে লাঞ্চে ডাকল, রসম্ ··ভাত—কে জানে কি কি এনে জড়ো করল। আমার তো সমস্ত খিদে দেখতে দেখতে চম্পট দিল। আই সেড, ভাই তুমি আমাকে এগ. পোচ আর দু স্লাইস রুটি আনিয়ে দাও। এ সমস্ত আমার চলবে না। ও তো বসে বসে খুব আরাম করে খেয়ে চলল। ওকে যা ইচ্ছে দিয়ে দাও তোমরা—সব খেয়ে শেষ করবে।"

"বেশ তো ধরে নেওয়াই গেল যে ভাল লাগেনি। কিন্তু হোষ্টের সামনে সেকথা কি বলা যায় ?" যেন বিরক্ত হয়ে বলেন মিসেস তেজপাল। "বেচারারা এত কষ্ট করে তৈরী করেছিল।"

এমনিতেই আমার মন বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন ওঁর এই পক্ষ নেওয়া আর হাত নেড়ে নেড়ে জোর দিয়ে কথা বলার ভঙ্গি আমার বড় বেশী কৃত্রিম বলে মনে হল। আমার কখনো কখনো নিজেরই আশ্চর্য্য লাগত যে কি করে এই স্ত্রীলোকের প্রতি সমস্ত মনটা অদ্ভুত এক মমতায় ভরে গিয়েছিল আর কি সে সম্মোহন ছিল যে সেদিনের সেই সন্ধ্যার পরে জ্ঞানে অজ্ঞানে প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমি ওঁর কথাই কল্পনা করতে শুরু করেছিলাম।

বোধহয় সেদিনের ছাপ মনের গহনে এমন গভীরভাবে পড়ে গিয়েছিল যে মনে হত গোলাপী কোন শীতের দুপুরে মিসেস তেজপালের সঙ্গে লেকের কোন একান্ত বেঞ্চের ওপর বসে আছি আর সামনে সাদা জামা আর জাঙিয়া পরে যারা নৌকো বাওয়া শিখছে তারা সরু সরু নৌকো করে তীরের দিকে হারিয়ে যাচ্ছে। রুদ্দুরে চিকচিক করে ওঠা জলে মিসেস তেজপালের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। এই জন্তে উনি ভুরুতে হাত দিয়ে আড় করে নিয়েছেন আর আমরা দুজনে চুপচাপ বসে আছি। কখনো মনে হত পাহাড়ের ধারে তৈরী বারান্দায় বন্ধ কাঁচের পারে বসে বসে চা খাচ্ছি আর ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গেছে আর জানালার কাঁচগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে কুয়াশা বিন্দু বিন্দু ধারায় জমে গেছে—কি আশ্চর্য্য অবাস্তব ব্যাপার। এই

ধরনের আরও কত ছবি না জানি ছিল, যা সে সব দিনে, সব সময় আসা যাওয়া করত। আমি জানতাম, সে সব ছবি সত্যি নয় কিন্তু সে সব স্বপ্নকে আমি নিজের মনে রাঙিয়ে এমন সত্যি করে নিয়েছিলাম যে মনে হত এ যেন অতীতেরই সত্যি সব ঘটনার আবার করে ছবি দেখা। কি জানি সে কতই প্রশ্ন ছিল, ওঁকে মনে মনে যা দিন রাত জিজ্ঞেস করতাম, নিজের কল্পনাতেই তার উত্তর খুঁজতাম, আর প্রতিক্রিয়ায় বিভোর হয়ে থাকতাম।

মিসেস রুদ্রের ঘৃণা মেশান বাঁকা চোখ যা দিয়ে উনি বুঝি মিসেস তেজপালের প্রতি পুরুষদের মনোভাবের ওজন করছিলেন দেখতে দেখতে নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম যে, সত্যিই কি এ সব কথা আমি ওঁকে নিয়েই ভেবেছিলাম? ওঁর সমস্ত শাড়ির আঁচলাটা বাঁ-হাতের ওপর পড়েছিল। কোন মজার কথা বলার জন্যে রুদ্রের প্রজাপতি গোঁফ বার বার নড়ে চড়ে উঠছিল। ও বলে: "আরে, মিসেস তেজপাল, আপনার আর কি বলুন? আপনি তো ভারতীয়ই নন। আপনার ভারত-নাট্যমের সঙ্গে আর কি কথাবার্ত্তা। আপনি চান তো বরং মণিপুরীর কিছু প্রশংসা ট্রশংসা করতে পারেন। আর এখন তো সবচেয়ে বড় কথা এই হল যে, আমরা জেনেশুনেই গ্রামোফোন সংগে আনিনি।"

সবাই মিলে আবার হেসে ওঠে। ওঁর গালের টোল দুটি আরও গভীর হয়ে ওঠে আর গুড্ডীর কচি কচি হাত দুটো নিজের হাতে তুলে তালি বাজাতে বাজাতে উনি বলেন, "আপনারা যাই বলুন, আমার গুড্ডী যদি বলে তবেই গাইব। না গুড্ডী? দেখ গুড্ডী, ওই যে পুল....."

হুগলীর দুদিকে পা রেখে সামনে পুল দাঁড়িয়েছিল। গুড্ডীকে খেলাবার ছলে উনি যে ইচ্ছে করে নিজের কাপড় জামা বেসামাল করে তুলছিলেন, একথা সবাই বুঝতে পারছিল। যখনই উনি বাইরের দিকে ঘুরে গুড্ডীকে কোন জিনিস দেখাচ্ছিলেন তখনই মাঝখানের গভীর খাঁজের দুপাশ ভেঙে কচি কলার নতুন পাতার মতন চওড়া পিঠ কি এক অদ্ভুত আকর্ষণে যুড়ে গিয়ে আমাদের সামনে এসে পড়ছিল। আর এই সময় 'মেজর তেজপাল দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ কাটতে কাটতে বাইরের দিকে দেখতে আরম্ভ করছিলেন। বড় অস্বস্তি বোধ করছিলাম সকলে···হঠাৎ খুব আস্তে আস্তে গুড্ডীকে গান শোনাতে সুরু করেন উনি।

ওঁর এই নির্লজ্জতা মেয়েরা কি ভাবে নিচ্ছিল, একটু পরেই বীনুর কাছে তা শুনলাম।

মেয়েরা এক কথায় ব্রিজের বিরুদ্ধে মত দেওয়ায় বিরক্ত রুদ্র আর তেজপাল দাবা খেলতে বসেন। আজ পিকনিকের বিশেষ কার্য্যক্রম ছিল যে রণধীর ছোট বন্দুকে মেয়েদের নিশানা শেখাবে। সবাই জানত যদি এরা কোনরকমে ব্রিজের নেশায় বসে পড়ে তো সন্ধ্যে পর্য্যন্ত না খাবার নাম করবে, না নিশানা শেখায়। বীনু রণধীরের সঙ্গে আগেই কড়ার করে নিয়েছিল।, তাই রণধীরও আর বিশেষ উৎসাহ দেখায় না। একপাশে ইঁটের উনুন পেতে নিয়ে গোমেজ উনুন আর স্টোভ একসঙ্গে ধরিয়ে নিজের জিনিসপত্র ছড়িয়ে বসে গিয়েছিল। তেজপাল পা ছড়িয়ে আধ শোওয়া হয়ে দুহাতে ফ্লাস্ক নিয়ে ঢকঢক করে জল খাচ্ছিলেন। আর রুদ্র খুশী ওপচান হাতে গোঁফের ওপর লেগে থাকা হাসি লুকোচ্ছিলেন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল দাবার চাল কার দানে যাচ্ছিল।

এর পরই এই ঘটনা ঘটস যে সমস্ত পিকনিকটারই অন্য রূপ হয়ে দাঁড়াল।

আমরা সবাই ওখান থেকে সরে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছিলাম যার সামনে একটা ভাঙ্গাচোড়া বাউণ্ডারির একটা শক্ত মতন দরজা ছিল। মাঝখানে ঘাস বিছান ছোট মতন একটা মাঠ ছিল। যেটা খানিকটা গিয়ে এক দিকটা ঢালু মতন হয়ে গিয়েছিল। নিচে ঢালু শেষ হয়ে একটা জলা ছিল যার মাঝে মাঝে ছোট ছোট লতায়, পদ্ম ফুটেছিল। জলার আর একদিকে দু একজন বৌ আর শিশু কোমর পর্য্যন্ত জলে ডুবে জাল দিয়ে মাছ ধরছিল। ছোট ছোট পাত্র বা ঘড়া জলে ভাসিয়ে দিয়ে মাছ ধরে ধরে তার মধ্যে রাখছিল। গুড্ডী ফুল নেবার জন্যে বায়না ধরায় মিসেস তেজপাল ওর হাত ধরে দৌড় করিয়ে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। দুজনের হাতে রং বেরঙের ফানুস ছিল। আর দুজনে জলার পারে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে মাছ ধরা দেখছিলেন। গুড্ডী মাঝে মাঝে কিছু জিজ্ঞেস করছিল আর উনি উত্তর দিচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন গুড্ডীরই 'এনলার্জড ফোটো' দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

নিশানার ক্লাপ সুরু করার জন্যে রণধীর কিটব্যাগ থেকে টারগেট, গুলির ডিবে আর ফিতে বার করে নিয়েছিল। সবচেয়ে প্রথমে ওর ওঁদের বন্দুকের ভাগ আর যন্ত্রপাতী বোঝাবার ছিল। চিনেবাদাম খেতে খেতে মিসেস রুদ্র আর বীনু এদিক ওদিক উৎসুক বিদ্যার্থীর মত

এসে বসে পড়েছিল। মিসেস তেজপালকে ডাকার ছিল নাহলে ওঁকে আবার দুবার করে বোঝাতে হবে।' বীনু দুহাত জড় করে মুখের কাছে ধরে পুরো দমে ডাকে, "মিসেস তেজপাল! গুড্ডী-ই-ই-ই।" ওর গলার শিরা ফুলে ফুলে ওঠে। দম নিতে নিতে বলে, "ওঁর তো গুড্ডীর সঙ্গে এমন জমে গেছে যেন কতকালের বন্ধুত্ব। কে জানে ওরা কি কথাবার্তা বলে।"

"গুড্ডীও তো ওঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারে।" বড় বড় দাঁতগুলো ঢাকবার কোনরকম চেষ্টা না করেই হেসে হেসে বলেন মিসেস রুদ্র। "নিজে খানিকক্ষণ পরে পরেই বলবে মাম্মী আণ্টির বাড়ি চল। যেই আমি বলব ওখানে মেজর তেজপাল আছেন, বাস্ ওমনি একেবারে চুপ। ওঁর সঙ্গে আর কিটির সঙ্গে শুধু এখনও ওর বন্ধুত্ব হল না।"

"ভয় পাবার কথাই।" বীনু রণধীরের দিকে অর্থপূর্ণ এক চোখে চেয়ে মুচকিয়ে হাসে। ও টারগেটে ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সামনের পুকুরের দিকে চেয়েছিল।

গুড্ডীকে ছুটিয়ে নিয়ে মিসেস তেজপাল দৌড়িয়ে আসছিলেন দেখা গেল। রণধীর মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে থাকে। তারপর যেন একেবারে স্বচ্ছন্দভাবে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, "যাই বল, মহিলার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন ছাঁচে ঢালা।" সামনের দিকে দৌড়ে আসার ফলে ওঁর সাড়ির আঁচল শরীরে জড়িয়ে পেছনের দিকে উড়তে আরম্ভ করেছিল আর এক বিচিত্র অতীন্দ্রিয় স্পর্শ যেন সমস্ত শরীরটায় ছড়িয়ে পড়ছিল। পিছন দিকে ওড়া সাড়ির মধ্যে দিয়ে দু'পা, কোমর, বুক—সব কিছুর গঠন উপছে পড়া রোদে এমন ভাবে দেখা যাচ্ছিল, যেন খোলা গোলাপ ফুলের পাঁপড়িতে কুয়াশা ঘেরা নীল নীল জলে দোলা লাগছিল। সকলের মনে একই কথা বুঝি প্রতিধ্বনি তুলছিল কিন্তু রণধীর যেন সে ভাষাকে শব্দময় করে তুলল: "রম্ভা বুঝি নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

পর মুহূর্তে বীনুর থমথমে মুখের দিকে মিসেস রুদ্রের চোখ পড়ে। উনি বলেন, "এদিকে একবার তাকান মেজর ধীর, বীনুও তো কিছু খারাপ দেখতে নয়। এ তো শুধু নির্লজ্জতাই। এতে কাপড় জামা পরবার অর্থটাই যে কি"···

এতক্ষণে বোধ হয় রণধীরের খেয়াল হয় যে মিসেস রুদ্র আর বীনুর সামনে এমন কথা বলে ফেলা হয়েছে যা শুধু অশোভন নয়, অশিষ্টও বটে। নিজের হঠকারিতা সামলে আদরের ভঙ্গিতে বীনুর কাঁধে হাত রেখে তাই বলে: "আমার বীনু লক্ষে এক।"

"হাত সরাও," এক সঙ্গে লজ্জা আর অপমানে ওর হাত ঝাঁকিয়ে ফেলে দেয় বীনু। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠেস দিয়ে বলে: "ঘরের মুর্গী তো শিকের তোলা। এদিক-ওদিক না চাইলে আর পুরুষমানুষ কি?" চোখ ছল ছল করে আসে ওর।

হাল্কা ভাবে বীনুকে ধমক দিই আমি: "এ কি বোকামি হচ্ছে বীনু? ঠাট্টা ইয়ার্কি বোঝ না নাকি?" কিন্তু ওর কথা যেন আমার সমস্ত সত্তাকে স্পর্শ করে। ওর কথায় মিসেস রুদ্রের মত না কোন হিংসের রেশ ছিল, না কোন আক্ষেপ। আত্মহীনতার এমন এক মর্মস্পর্শী প্রকাশ সেখানে ছিল যে আমার সমস্ত মনটা যেন চিরে চিরে যেতে থাকে। মিসেস তেজপালের এই আহ্লাদী স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি এই দুই মহিলার অন্তর পর্য্যন্ত যে কি ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, সে কথা মনে করে অদ্ভুত এক করুণায় সমস্ত মনটা ভরে ওঠে আমার। জানি না এ আমার মনের পক্ষপাতিত্ব ছিল, না দুর্ব্বলতা। কিন্তু ওর ওপর আমার তবুও ঠিক রাগ যেন হচ্ছিল না, আর সঙ্গে সঙ্গে রণধীরের এই অসাবধান ভাবও ভালো লাগছিল না বিশেষ।

কখনো উনি দৌড়নোতে আগু হয়ে যাচ্ছিলেন আবার জোর কমিয়ে গুড্ডীকে সমান সমান এগিয়ে আসতে দিচ্ছিলেন। গুড্ডীর পা টলমল করে উঠছিল। আঙুল ধরে ও প্রায় টলতে টলতে দৌড়ে আসছিল। কি জানি কেন আমার হঠাৎ মনে হয়—কিটির সঙ্গে মিসেস তেজপালের দৌড়নো আর গুড্ডীর দৌড়নো যেন এক অদৃশ্যসূত্রে এক করে গাঁথা। এমনি দেখতে সে দৃশ্য একেবারে উল্টো ছিল। কিটি ওকে এমন ভাবে টেনে নিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলতে থাকত, যেন উনি শুধু ওর ইচ্ছেতেই চলেছেন আর এখানে উনি গুড্ডীর সঙ্গে শিশু হয়ে ওর সঙ্গেই চলে আসছিলেন। সেই সময় আমি ভাবতেও পারিনি, যে এ ছবি আমার মনের পটে এমনভাবে আঁকা হয়ে যাবে। আর মিসেস তেজপালের নামের সঙ্গে সঙ্গে সে ছবি এমনভাবে ভেসে উঠবে আর ওর চরিত্রের এক নতুন অর্থের ইঙ্গিত করবে।

"মাম্মী, আণ্টি আমাকে দৌড় করিয়েছে।" গুড্ডী মায়ের কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। "এই দেখ ফুল দিয়েছেন।" ওর এক হাতে দু' তিনটে ফুল ছিল। জানা যায় যে সেই ছেলেদের কাছে থেকে ফানুসের বদলে এই ফুলের বিকিকিনি গুড্ডীই করেছিল। হাঁপাচ্ছিল তখনও ও। "আমরা তো তোমাদের জন্যে পদ্মফুল তোলাচ্ছিলাম। ডাকলে কেন আমাদের?" হাঁপাতে হাঁপাতে মিসেস তেজপাল যেন আকাশ থেকে নেমে আর পরীর মতন এক হাত দিয়ে চুল সামলাতে সামলাতে সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চোখ বড় করে সেদিকে দেখি আর ভাবি,—সত্যি, এর ওপর কেউ কোন দিন রাগ করে থাকতে পারে?

"আসুন, প্রথমে এই কাজটাই শেষ করে ফেলি। আবার তো এক্ষুণি ওরা খেতে ডাকবে।" রণধীরের কথা বোধহয় এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অপরাধীর মতন চোখ নিচু করে রুমাল দিয়ে বন্দুকের বাট পরিষ্কার করছিল ও।

নিজের চারদিকে আমাদের বসিয়ে অতক্ষণ ধরে বন্দুকের ভাগ, বন্দুক চালাবার কায়দা সব শেখাবার সময় নিশ্চয়ই চোখ তুলে এক আধবার দেখে ছিল। ফিতে দিয়ে দূরত্ব মেপে নিশানা পোঁতা হল। ভুল করে আসতে যেতে কেউ সামনে এসে না পড়ে এ জন্যে দরজার দিকে কারুকে পাঠাবার দরকার পড়ল। "আমি যাব। এস গুড্ডী আমরা যাই।" মিসেস তেজপাল বলার সঙ্গে সঙ্গে গুড্ডী আবার গিয়ে ওর গায়ে লেগে দাঁড়ায়। "মাম্মীকে টা-টা বল।" আবার ওর বিদায় দেওয়া চেহারাটা সকলের চোখে ভেসে ওঠে।

"মাম্মী টা-টা।" গুড্ডী বলে আর আবার দুজনে হুড়মুড় করে সামনে দৌড়ে যায়।

"মিসেস তেজপাল, এত দৌড়দৌড়ি করাবেন না ভাই, পরে আবার কান্না লাগাবে।" অনুনয়ভরা গলায় পেছন থেকে বলেন মিসেস রুদ্র। আর যখন একেবারে লম্বা হয়ে সাষ্টাঙ্গ হবার ভঙ্গিতে শুয়ে কুনুই মাটিতে আর বাট কাঁধে রেখে রণধীর যখন নিশানা নেওয়া শেখাতে আরম্ভ করে বলে "রেডি"—তখনই দরজার ওপার থেকে মিষ্টি এক সুরের লহরী ভেসে আসে—"মেরা জম ডোলে, মেরা মন ডোলে, মেরে দিল কা গয়া করার, ইয়ে কোন

রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত

বাজারে বাঁওরিয়া...'' পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসি আমরা। ''সত্যি একেবারে পাগল।'' মনে মনেই হেসে ভাবি আমি, তার সঙ্গে আবার চোখে ভেসে ওঠে 'গুলির ফুল'। কেউ যেন ভেতর থেকে কথাটি শুধরে দেয় তখুনি,—পাগল নয়, শক্তিময়ী।

মেয়েদের পক্ষে বন্দুক হাতে নিয়ে নিশানা ঠিক করাটাই যথেষ্ট রোমাঞ্চকর ব্যাপার ছিল। প্রত্যেকের তিনটে করে গুলি চালাবার কথা ছিল। মিসেস রুদ্র আর বীনুর ছুটো গুলির ছুটো অনেক কষ্টে বাইরের গোল দাগের কোণায় লেগেছিল। কিন্তু ছ'জনে এমন উল্লসিত উত্তেজনায় কাঁপছিল, যেন কোন বড় রকমের দৌড়ে জয় হয়েছে। মিসেস তেজপালের সময় আসায় ওঁকে জোরে ডাকা হল। উনি একেবারে শান্ত নিস্পৃহভাবে টফির কাগজ ছাড়াতে ছাড়াতে এসে নিঃসঙ্কোচে শুয়ে পড়েন। গুড্ডীকে ওখানেই ছেড়ে এসেছিলেন। এবার মিসেস রুদ্রের সঙ্গে ''আমিও যাচ্ছি'' বলে বীনুও চলে গেল। রণধীর ওঁর কুনুইটা মাটিতে ঠেকিয়ে দেয়, ওঁর হাতে বন্দুক দেয় আর নিশানা ঠিক করবার জন্যে ওঁর মাথায় মাথা ঠেকিয়ে খুব সাবধান চেষ্টায় সবটুকু স্পর্শ বাঁচিয়ে ওঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে। বন্দুকও ওঁর হাতের ওপর থেকে নিজেই ধরে রেখেছিল।

''দেখুন মিসেস তেজপাল, কাঁপবেন না। আপনি বড্ড 'এক্সাইটেড' হয়ে পড়ছেন।'' একটা চোখ 'টারগেটের' ওপর রেখে রণধীর বলে।

কিন্তু নিজেরই ওর হাত সরে আসছিল। কানের লতি লাল হয়ে উঠছিল। কিন্তু তবু আশ্চর্য্যভাবে সংযত দেখাচ্ছিল ওকে। এ দৃশ্য মনের পক্ষে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর হয়ে উঠছিল।

আমার ভেতর কোথাও যেন একটা ইচ্ছে উঁকি দিয়ে ওঠে—হায়, আমিও যদি ওঁকে ওরকম বন্দুক চালানো শেখাতে পেতাম। আশ্চর্য্য যে যদিও আমি তখন সেখান থেকে অনেকটা পেছনে ছিলাম আর রণধীরের থুতনি ওঁর মাথার ওপর রাখা মতন দেখাচ্ছিল কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার থুতনিই ওঁর মাথার ওপর রাখা আছে আর ওঁর চুলের ভাসা ভাসা গন্ধ আমার মাথার মধ্যে যেন গেঁথে যাচ্ছে আর ওঁর নাইলনের সাড়ির সজীব স্পর্শ যেন আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে। ওঁর শরীরের গন্ধের মায়া যেন আমার চারদিকে ঢেউ তুলে দিয়েছে। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেই অনুপম অনুভূতির স্বাদ নিতে থাকি শুধু।

''মিসেস তেজপাল আপনি শুধু শুধু দেরী করছেন।'' হঠাৎ রণধীরের গোঁ গোঁ স্বর আমার কানে আসে। দেখি রণধীর মাথা ঘুরিয়ে যেখানে গাছের আড়ালে উঁচু জায়গাটায় মেজর তেজপাল আর রুদ্র দাবা খেলছিলেন সেখানে নজর দেয়।

''কি করে ধরব বলুন না।'' নাক দিয়ে আওয়াজ করে বলেন মিসেস তেজপাল।

আর যেই ওঁর আঙুলে নিজের আঙুল রেখে রণধীর ঘোড়া টেপে ওমনি ''উঃ!'' করে উনি বন্দুক ছেড়ে ছু হাত দিয়ে কান চেপে ধরেন।

গুড়ুম করে আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে একটা তের চোদ্দ বছরের ছেলে সামনে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে।

''সর্বনাশ!'' সকলের মুখ খোলা থেকে যায়। এখুনি এক মুহূর্ত্তে মানুষ খুন হয়ে যেত, সে কথা যেন বিদ্যুতের চমকের মতন সকলের একসঙ্গে মনে হয়।

রণধীর একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক একদিকে ছুড়ে ফেলে।

''এ কি মিসেস তেজপাল? এক্ষুণি খুন হয়ে যেত না। আপনার সব সময়ই ছেলেমানুষী...সব পিকনিক করা হয়ে যেত!'' দাঁত পিষে ঝাঁঝিয়ে উঠে ও, আগে ঝাপিয়ে পড়ে আর সমস্ত রাগ তোলে সেই ছেলেটার উপর। এলোপাতাড়ি তিনচার থাপ্পড় মারে আর বলে: ''এখানে কেন এসেছিস? সাড়া দিস নি কেন? তোকে এখানে কে পাঠাল?''

ছেলেটো নিজেই ভয় পেয়ে জড়ের মতন হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলে যে, ''মেমসাবরা বললেন যে সাহেবদের খেতে পাঠিয়ে দে।''

''কোথায় মেমসাবরা? হারামজাদা নিজে তো মরতোই আমাদেরও বিপদে ফেলে যেত।'' ওর কুনুই ধরে হ্যাঁচকা টানে রণধীর ওকে দরজার ওপারে টেনে নিয়ে যায়। ঘুরে আমাকে বলে যায়: ''বন্দুক আর কার্টিজ নিয়ে এস।''

এখুনি যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটত। সে কথা কল্পনাতেই ভয়ঙ্কর এক রূপ নিয়ে চোখে ভেসে ওঠে। মিসেস তেজপাল প্রথমে চোখ বড় করে বোকার মতন রণধীরের দিকে চেয়ে থাকেন, তারপর হাঁটুর ওপর মাথা ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন। সেই সময় ওর ওপর আমার বিন্দুমাত্র মায়া ছিল না। ওঁর সামান্য খেলার খেয়ালে একটা প্রাণ চলে যেতে পারত। কিন্তু সে ছেলেটারই বা মরতে এক্ষুনি এখানে এসে পড়বার কি দরকার ছিল। আর বীনুরাই বা ওকে ওখানে আটকালো না কেন? আমি সন্ত্রস্তভাবে এমন করে বন্দুক-টন্দুকগুলো তুলে নিই যেন সমস্ত সম্ভাবিত ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাঁচাবার ভার একমাত্র আমারই উপর ন্যস্ত। আর কোনভাবে মূলে অপরাধী যেন আমিই। ভয় লাগছিল বন্দুক এদিক ওদিক না হয়ে যায়। মানুষে পরস্পরকে মারতে কি হাতিয়ার তৈরী করেছে নিজের। সীসের এক টুকরো গুলি আর সামনের আর পেছনের ছুটো দিক সমস্ত ইতিহাস এক মুহূর্ত্তে শেষ? কত সহজে পলক ফেলতে না ফেলতে মানুষ অন্যের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেয়। কখনো ভাবে না সব জীবনের সঙ্গে তার নিজের জীবনের মতন ইতিহাস, ভাবনা সম্পর্ক আর সম্বন্ধ থাকে। সমস্ত জিনিস পত্তর তুলে আমি বলি, ''যাকগে যা হবার তা হয়েছে, মিসেস তেজপাল...''

উনি কিছু বলেন না। ওঁর চুল হাতের ওপর ছড়িয়ে থাকে। মাথাটা দু'একবার কাঁপে।

''যাকগে এখন, কিন্তু আপনার এমন করা উচিৎ হয়নি।'' আমি ওর একেবারে কাছে এসে দাঁড়াই। ঝুঁকে কুনুই ধরে ওঠাতে বেশ সংকোচের সঙ্গে বসি।

উনি কান্না ভেজা ভাঙ্গা গলায় বলেন, ''আপনি যান।'' আর মুখ তুলে এমন করুণ দৃষ্টিতে তাকান, যে ওঁকে সামলান ছেড়ে এমন ভাবে আমি চলে আসি যেন আমিই কারুকে মেরে চলে আসছি। রোদ পড়ে আসছিল। এই সময় ওঁর ওপর আমার আগের মতন কিছু মর্ম্মার্পিতা ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ষড়যন্ত্র যেন বীনু আর মিসেস রুদ্রের চেষ্টা করে তৈরী। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা:—নীলিমা মুখোপাধ্যায়

# আনন্দ-বৃন্দাবন

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

**অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর**

লতিকার কুসুম-সুরাজির মত [illegible] সুরভিদেবীর হৃদয়, তখন সাগ্রহে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললেন,—

"সময়টি অতি সরস, অনবদ্য, অবসরও রয়েছে প্রচুর। আর বিলম্ব করা উচিত নয়, সুরভি। গণেশ-জনক মহেশ্বরের অনুমতি নিয়ে আরম্ভ করে দাও অভিষেক। কৃষ্ণের কাছে আমার পৌঁছবার পূর্ব্বেই দেখো যেন···অরুন্ধতী দেবী, যিনি সাগ্রহে সাধন করেন আমার সমস্ত প্রিয় কাজ,···অনসূয়া দেবী, যিনি নিঃশেষে অসূয়াহীন, ···লোপামুদ্রা, যাঁর মধ্যে লোপা পেয়ে গেছে রজোগুণ এবং তমোগুণ, ···ভগবতী পার্ব্বতী, যিনি সর্ব্ব-সম্মাননীয়া এবং হর্ষদান-চতুরা,··· দেবমাতা গায়ত্রী দেবী, প্রাচুর্য্যে সৃষ্টি করেন যিনি গীত,··দেবমাতা অদিতি দেবী, যিনি অখণ্ডনীয়া,···এই আমার বাণীদেবী,··আর ওই আহার্য্য-গুণসম্পন্না স্বাহাদেবী,···এঁরা সকলেই যেন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে যান।"

ব্রহ্মার নির্দ্দেশ-অনুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেলে, ভগবান স্বয়ম্ভুও দেবীদের স্বয়ং করলেন অনুসরণ।

অনুসরণ করে, পদ্মাসন ব্রহ্মা সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। তারপর পাদ্য, পয়ঃ ও আচমনীয়কের অর্ঘ্য রচনা করে এবং বক্ষে সু-সীমায় মধুপর্ক সমর্পণ করে, বাণী বিন্যাসের মহিমায় সম্পন্ন করলেন অব্জাক্ষের মনোজ্ঞ অর্চনা।

ব্রহ্মার আদেশে ও নিয়োগে ততঃপর শ্রীমতী সুরভি দেবী অন্যদেবীদের সাহচর্য্যে,···সুগন্ধি পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য ও নিজের স্তন-দুগ্ধের ধারা দিয়ে,···শ্রদ্ধা-সহকারে অভিষিক্ত করলেন শ্রীগিরিধারীকে।

১১৯। অভিষেক দেখতে দেখতে পুলক-লাগা মন তর্কপীঠ হয়ে দাঁড়াল। সকলের,—

···"একি আমরা স্নান দেখছি শ্রীমুরারির লাবণ্যবিপুল অঙ্গের? না তরল জ্যোৎস্নাধারায় স্নান দেখছি নবনীরদের?

···আহা, শুভ্রতা যেন নাইয়ে দিয়ে আরো নিবিড় করে তুলছে নীলিকাকে!

···শুদ্ধ স্ফটিকের জল দিয়ে কি পরিষ্কার করে ধোয়া হচ্ছে ইন্দ্রনীল অঙ্কুরকে? না মুক্তার ঝারা দিয়ে স্নান করানো হচ্ছে তরুণ তমালকে? না এ চলেছে উজ্জ্বল কর্পূররেণুর ধূলোটখেলা শ্যাম-সরোজের সঙ্গে?"

তারপরে মঙ্গল গান করতে করতে এগিয়ে এলেন গায়ত্রীদেবী, ভগবতী পার্ব্বতী, দেবমাতা অদিতি, এবং পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা দেবী অরুন্ধতী। মহাসুরভিচূর্ণ দিয়ে তাঁরা যখন গাত্রমার্জ্জন করে দিলেন কৃষ্ণের, তখন যেন মায়ের আহ্লাদি হাসিখানি ফুটে উঠল তাঁদের সকলেরি চোখে মুখে হাতে।

তারপরে এগিয়ে এলেন সনকেরা, এগিয়ে এলেন সপ্তর্ষিমণ্ডল। তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। মন্ত্রপরিপূত মহাভিষেক-দ্রব্যের সংস্পর্শে স্বর্গঙ্গার শুভজল উজ্জ্বল করে নিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই এক এক এক করে অভিষিক্ত করলেন গিরিধারীকে।

ব্রহ্মার আদেশ লাভ করে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সপ্তসিন্ধুর পবিত্র গাত্র। বেগে ঝরে পড়তে লাগল তাঁদের নয়নজল। সনকাদি মুনিদের হাত দিয়ে তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন নিজের নিজের সিন্ধুজল, অভিষিক্ত করলেন কৃষ্ণকে।

তদন্তে, পুনর্ব্বার পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণ নিয়ে এলেন অতিরঞ্জিত সুবাসিত গন্ধতৈল; কৃষ্ণাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েই সহস্রধারার কর্পূরবাসিত সুশীতল ধারাজলে আবার তখনি দিলেন ধুইয়ে; শঙ্খজল ঢেলে সমাপ্ত করলেন অভিষেক।

১২০। ঠিক তার পরেই তথায় আবির্ভূত হলেন সুকুমারী কুমারিকার দল। তাঁরা সকলেই চিন্তামণি, কল্পতরু ও কামধেনুর প্রভাব-লক্ষ্মী-প্রসূতা। শুভ্রকোমল ও সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তাঁরা কৃষ্ণাঙ্গ থেকে পরিপাটি ভাবে অপসারিত করে দিলেন অভিষেক-সলিল।

কেউ কৃষ্ণের কেশকলাপ থেকে, তারপরে তাঁর মুখপদ্ম থেকে, তারপরে বক্ষঃদেশ থেকে মুছে ফেললেন জল; কেউ বাহুযুগ থেকে, কেউ চরণ থেকে, কেউ পৃষ্ঠদেশ থেকে মুছতে লাগলেন জল; কেউ একখানি শুষ্ক বসনখণ্ড দিয়ে জড়িয়ে দিলেন কৃষ্ণের শ্রোণিতট; কেউ বা সিক্ত বসন বিসর্জ্জন করে ভিন্ন বস্ত্রে অপসারিত করলেন জল।

১২১। চুল থেকে পা পর্য্যন্ত এইভাবে দুতিন বার জল মোছা হয়ে গেলে কুমারিকা চতুরিকার দল সাজাতে বসলেন কৃষ্ণকে। পূর্ব্বেই এনে রেখেছিলেন অনুলেপন বসন আভরণ, তাই প্রথমেই সেগুলি দিয়ে কৃষ্ণকে সাজিয়ে, শৈলাধিরাজতনয়ার উপদেশ মত এবার তাঁরা প্রসাধিত করলেন কৃষ্ণের কেশকলাপ, নিপুণ আঙুলে বেঁধে দিলেন চূড়া।

কিন্তু এই সমস্তই কেমন যেন উপদ্রব বলে মনে হতে লাগল কৃষ্ণের। গো, গোপ ও গোপবনিতাদি ব্রজবাসীদের সঙ্গে রসপ্রসঙ্গে যার চলে স্বাভাবিক ব্রজবিলাস, তাঁর আজ কেবলি মনে হতে লাগল, বৃথাই বয়ে যাচ্ছে সময় যেন হানি ঘটছে প্রতিটি মুহূর্ত্তের। কিন্তু এঁদের এই এত উপরোধ কি অবহেলা করা সম্ভব? কখনই নয়। অতএব কিছুকাল উপদ্রব সহ্য করবার জন্যে তৈরী হতেই হল কৃষ্ণকে।

১২২। যদিও উদ্বেগের তরঙ্গ খেলে চলেছে তাঁর অন্তরে, তবুও ব্রহ্মাদি দেবগণের অনুরোধে পড়ে, তিনি কোথাও কারোর মধ্যে এতটুকুও ঘটতে দিলেন না রঙ্গ-হানি। প্রত্যুত, ভক্তের ভক্তি যা কিছু ঘটালো, তারি তিনি করলেন অনুমোদন। আর সেই অনুমোদন-মূলে যেমন বাড়তে লাগল তাঁর সম্মান, তেমনি বাড়তে লাগল তাঁর গাম্ভীর্য্য।

১২৩। স্নান প্রসাধন অলঙ্করণ সমস্তই কৃষ্ণাঙ্গে সার্থক হয়েছে দেখে পুলকিত হলেন ব্রহ্মাদি সর্ব্বদেবতা। কল্পতরু-প্রসূত গম্ভারী কাঠের ভদ্রাসনে সাদরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে বসালেন, কুমারিকাদের দিয়ে ধুইয়ে নিলেন চরণ।

তারপরে ভাবতে বসলেন ব্রহ্মা।···কেমন করে এঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পূজন করা যায়, অপচয়হীন অপরিচ্ছেদ্য-রস সম্পূজন করা যায়,··· কোন রসতম মন্ত্রকে আবাহন করা যায়,···ভাবতে বসলেন ব্রহ্মা। সত্যিই তো, মন্ত্রহীন পূজা তো অসম্ভব!

নিকটেই ছিলেন চন্দ্রশেখর। নিম্নকণ্ঠে তিনি বললেন,—

"বলি ওহে চতুরানন, চতুরেরা কখন আবার চিন্তা করেন? এই কুমারটিই···অর্চনা করবেন।"

১২৪। ধূর্জটির মুখ থেকে কথাটি বেরোতে না বেরোতেই ইন্দ্রদেব সহস্র-নয়নে দেখতে পেলেন,···উৎসবের মহোদয়ের মত সম্মুখেই আবির্ভূত হয়েছেন গোবিন্দ-পূজার উপযুক্ত এবং গোবিন্দ-নামাঙ্কিত মূর্তিমান অষ্টাদশাক্ষর এক মহামন্ত্র।

১২৫। কী অদ্ভুত-তেজস্বী আবির্ভাব! মহোল্লাসে ব্রহ্মা বলে উঠলেন, "কি আনন্দ কি আনন্দ! আমি অনুভব করেছি এই মহামন্ত্রকে, যাঁর আবির্ভাব ধারাবর্ষণ করছে রসের! এঁর ঋষি··· নরসমাজের দোষ-হর্তা নারদ, এঁর ছন্দ গায়ত্রী; উভয়েই আমার আপনজন। কি আনন্দ কি আনন্দ! এই মহামন্ত্র দিয়েই আমি আরাধনা করবো কৃষ্ণদেবকে।"

এই বলতে বলতে পূজার উপকরণাদি গ্রহণ করে ব্রহ্মা উপস্থিত হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের সমীপে। মহামন্ত্রকান্তিতে তিনি আজ দ্বিগুণিত-শুভাম্বর। তাঁকে অনুসরণ করলেন, নারদ, যাঁর কৃপায় ভক্তিবাসনা ছাড়া অন্য সমস্ত বাসনা নির্মূল হয়ে যায়; সনকাদি মানসপুত্রেরা, যাঁদের বাসনা তাঁরই সমতুল; ধ্রুব, যিনি অচঞ্চল ভক্তিরসে; প্রহ্লাদ, যিনি পরমাহ্লাদ বিতরণ করেন জনমানসে; উপরিচর বসু, সাত্বত মতবাদ যাঁর শ্রেষ্ঠ ধন; এবং অন্যান্য পরম ভাগবতগণ।

১২৬। তারপরে যখন পদ-প্রক্ষালন করে ভগবৎ-পূজার্থ পদ্মাসনে উপবেশন করলেন ব্রহ্মা; তখন তাঁর চতুর্মুখের চতুর্দিগন্তদৃষ্টি কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে কেবল আট নয়নের আনন্দ দিয়ে তাঁকে দেখতেই লাগল;···দেখতেই লাগল;···এবং সেই বিহ্বলতার অবকাশে, ক্ষীরসমুদ্র অর্ঘ্য নিয়ে এলেন অমূল্য একটি সুদীর্ঘপুচ্ছ শঙ্খ, এবং সুমেরুশ্রী নিয়ে এলেন স্বর্ণঘটিত একটি ত্রিপাদিকা। কিন্তু এ দুটির বিপুল সৌন্দর্য্যও টলাতে পারল না ব্রহ্মার বিহ্বল ভাবটিকে।

১২৭। কৈলাসলক্ষ্মী নিয়ে এলেন অতিসুন্দর মঙ্গলঘটি;

হিমালয়লক্ষ্মী···কয়েকটি চোখ-ফেরান যায় না এমন পুষ্পপাত্র;

বনদেবতারা—সদ্যচয়ন-করা গন্ধপুষ্প, অক্ষত, কুশাগ্র, তিল, সিদ্ধার্থ ইত্যাদি অর্ঘদ্রব্য···শ্যামাক, দূর্ব্বা, অপরাজিতা পদ্ম ইত্যাদি পাদ্যদ্রব্য···এবং জাতিফল, কক্কোল, লবঙ্গ ইত্যাদি আচমনীয়দ্রব্য;

ধরণীদেবী···পরমেষ্ঠ-গন্ধ গন্ধদ্রব্য;

নন্দনবনদেবী···মন্দারকুসুম;

কল্পতরু···তরুণ আভরণ, উত্তম পীতাম্বর; অগ্নায়ী···গুগ্‌গুল-অগুরু-চন্দনের ধূপ, কর্পূরসারের সলতে-পরানো সুরভি-ঘৃতের প্রদীপ;

কামধেনু···নানাবিধ গব্য;

দেবমাতা অদিতি···মাত্রারহিত পুষ্টিকারক পিষ্টকাদি ভোজ্যদ্রব্য;

এবং যথাক্রমে অনুরঞ্জিতচিত্তে ইন্দ্রাণী শচীদেবীও নিয়ে এলেন মুখের জড়তা-নাশক চিকণ-করে-কাটা সুপুরী-দিয়ে-সাজা কয়েক খিলি হৈমবরণ তাম্বুল।

১২৮। দেবদেবীরা সকলে মিলে এত সম্ভার নিয়ে এলেন বটে, কিন্তু এততেও কিছুতেই কাটল না বিচক্ষণ ব্রহ্মার আনন্দ-চকিত প্রজ্ঞার বিহ্বলতা। কী যে তাঁকে করতে হবে নিজেই তিনি যেন তা জানেন না। তাঁর এই মুগ্ধভাব দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন মন্ত্রর্ষি নারদ,··· এগিয়ে এলেন,···তাঁকে দর্শিয়ে দিলেন পূজার ক্রম। তারপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে, অর্ঘ্যাদিক্রমে যেই ব্রহ্মা আরম্ভ করে দিয়েছেন শ্রীভগবানের পূজার্চ্চনা, অমনি যেন···ধ্বনি-বিনিময় করতে লেগে গেল দেব-দুন্দুভি-সজ্জ,···জন্মান্তরলাভ করল অপ্সরাদের লাস্য,···নবযৌবন পেয়ে গেল গন্ধর্ব্বদের গান,···জরা ছেড়ে তরুণ হয়ে উঠল চারণদের স্তব,···হর্ষেরও যেন সমুৎপন্ন হল হর্ষ। এবং সেই সময়টিও যেন সময়ান্তরের মত হয়ে গিয়ে, সকলের চিত্তকেও চিত্তান্তরে রূপায়িত করে দিল।

১২৯। দেবসেনাপতি মহাতেজস্বী কার্ত্তিকের এগিয়ে এলেন। তাঁর বিশাল বক্ষে বলিষ্ঠতার সৌন্দর্য্য। প্রীতিরসে আপ্লুত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাথার উপর তিনি স্বয়ং ধারণ করলেন আতপত্র। তারপরে যখন মন্ত্রগান গাইতে গাইতে অভিষেক-সভায় পদধারণ করলেন মহর্ষিগণ, তখন রূঢ় পরমানন্দে পরমেষ্ঠীও রঞ্জিতমনে আসন পরিত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে শ্রীকৃষ্ণের শিরোভাগে বন্ধন করে দিলেন রত্নোদ্ভাসিত অপূর্ব্ব মুকুট এবং ভালে বিলেখন করে দিলেন অতিসুখের একটি তিলক। তারপরে ঘোষণা করলেন,—"আজ থেকে তুমি সকল-দেব দেবেন্দ্র গোবিন্দ-নামে খ্যাত হও।"

১৩০। ব্রহ্মবাণীর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষিরা হর্ষযোগে এবং সনন্দেরা নাদযোগে স্তব করে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণের। জয়ধ্বনি তুলে গাইলেন,—

"হে গোবিন্দ তোমায় নমস্কার।
নিখিল ভুবনের তুমি আনন্দ-কন্দ
তোমায় নমস্কার।
দেববৃন্দের রত্ন তুমি
আভীরিণীদের প্রিয় তুমি
শ্রীমৎবৃন্দাবনের মদন তুমি
তোমায় নমস্কার।
চিদানন্দের অধিক মধু
পদারবিন্দের মহমধু
হে গোবিন্দ বিশ্বকন্দ
তোমায় নমস্কার।"

বিথার সন্তোষে রূঢ় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন নারদ। তিনি আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলেন না। গন্ধর্ব্ব তুম্বুরুকে সঙ্গে নিয়ে নারদ বীণায় বাজাতে আরম্ভ করে দিলেন গোবর্দ্ধন-ধারণ ক্রীড়াকীর্ত্তন।

কীর্ত্তন শেষ হতেই দেবপশুপতি···মানসগঙ্গায় স্নান করে বিধৌত করে ফেললেন নিজের ভস্মাঙ্গরাগ, এবং মালা, কপাল ও সর্পাভরণ খুলে রেখে, মৌলীন্দু কান্তি-কমনীয় মণীন্দ্র দীপাবলির উৎসব দিয়ে আরতি করলেন—শ্রীগোবিন্দের।

১৩১। যখন সমাপ্ত হয়ে গেল পূজাঙ্গভূত আরাত্রিক, মহর্ষিগণ তখন গীতমন্ত্রের বিনিয়োগে পুনঃপূত করলেন মহী, গন্ধ, শিলা ও ধান্যাদি। এক এক করে তারপর প্রত্যেকেই সেগুলিকে ছোঁয়ালেন কৃষ্ণশিরে, এবং ছুঁইয়ে পুনর্ব্বার রেখে দিলেন কাঞ্চনপাত্রে। অভিষেক-মহোৎসবের এই অঙ্গটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে তাঁরা মিলিতকণ্ঠে পূর্ব্ববৎ মন্ত্রান্তর পাঠ করে সম্পূর্ণ করলেন মহারতি।

১৩২। আচারের ব্যতিক্রম না করে এবার এগিয়ে এলেন গায়ত্রী, গৌরী, অরুন্ধতী প্রভৃতি, দেব-মাতৃগণ এমন কি দেবপত্নীরাও প্রত্যেকেই বামপ্রকোষ্ঠের উপর দক্ষিণ প্রকোষ্ঠটিকে তির্য্যগ্‌ভাবে

# আরও দুধ !

# মানে আরও বনস্পতি !

খাদ্যের উপকরণগুলি যাতে সুসম পরিমাণে পাওয়া যায় তার জন্যে পুষ্টিবিশারদেরা প্রতিদিন কমপক্ষে ২৮০ গ্রাম দুধ খাবার পরামর্শ দেন। কারণ দুধ একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য। দুধে একাধারে প্রোটিন, খনিজ, ভিটামিন ও স্নেহপদার্থ আছে। নিরামিষাশীদের পক্ষে তো দুধই প্রয়োজনীয় প্রাণীজ প্রোটিন পাবার একমাত্র উপায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিদিন দুগ্ধজাত খাবার মোট ১৪০ গ্রাম মাত্র পাওয়া সম্ভব — এমন কি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষেও তা ১৪৫ গ্রামের ওপরে যাবে না।

পরিবহণ ব্যবস্থার আরো উন্নতি এবং পূর্বাপেক্ষা উন্নতধরনের ডেয়ারী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ আরো বেশী পরিমাণে দুধ পাবেন। এতে শুধু ক্রেতারা

নেন, ডেয়ারী মালিকও লাভবান হবেন। কেননা, দুগ্ধজাত জিনিসের চেয়ে দুধ বিক্রি করে ডেয়ারী মালিকরা বেশী দাম পান। দুধের যত বেশী কাটতি হবে, ঘিয়ের পরিমাণও ততই কমে যাবে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও বনস্পতিই ধীরে ধীরে ঘি-জাতীয় স্নেহপদার্থের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাবে। ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের মত যেসব দেশে প্রচুর মাখন তৈরী হয় এবং ডেয়ারী শিল্প খুবই উন্নতস্তরের সেসব দেশেও বনস্পতির মতই আধাজমাট উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ বেশীর ভাগ ব্যবহার করা হয়। পুষ্টির দিক থেকে ভিটামিনযুক্ত বনস্পতি খাঁটি দুগ্ধজাত স্নেহের সমকক্ষ। তাছাড়া সহজলভ্য উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরী বলেই বনস্পতিতে খরচ কম পড়ে।

**বনস্পতি-তুল্য**
**স্নেহপদার্থের**
**ব্যবহার**
**পৃথিবীর সর্বত্র !**

বিস্তারিত জানতে হলে লিখুন :

**দি বনস্পতি**
**ম্যানুফ্যাকচারার্স**
**অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া**
ইণ্ডিয়া হাউস, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই

IWT-VMA 3004A

বিন্যস্ত করে,···দুটি করতলে পাপড়ির মত দুটি মঙ্গলদীপ,···এক এক করে আরতি করলেন শ্রীগোবিন্দের।

১৩৩। সাঙ্গ হয়ে গেল মহোৎসব। ভগবান আত্মযোনি তখন বিশ্বকসেন, গরুড়াদি পরম ভাগবতগণের মধ্যে বিভাগ করে দিলেন ভাগবন্নৈবেদ্য; এবং শঙ্খাদি নিধিবর্গ, কল্পতরু, চিন্তামণি ও কামধেনুকে উদ্দেশ করে আদেশ দিলেন,—

"শ্রীভগবানের মহোৎসব সম্প্রতি প্রমাণসিদ্ধ হয়ে গেছে। সভায় উপস্থিত রয়েছেন দেব, উপদেব, মুনিগণ এবং তাঁদের অঙ্গনারা। উপস্থিত রয়েছেন নাগেশ্বরগণ, গিরিকানন-দেবীরা এবং অপ্সরাগণ। উপস্থিত সকলকেই আশা করি আপনারা ভূষিত করবেন অত্যুত্তম বসনে ও ভূষণে।"

১৩৪। ব্রহ্মার আদেশ লাভ করে নিধিগণ, কল্পতরু ও কামধেনু প্রদান করলেন আশাতীত ফল; এবং পরম সৌভাগ্যবশতঃ যাঁরা শ্রীগোবিন্দাভিষেক উৎসব দর্শনের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই লাভ করলেন তিলক-তাম্বুল-বসন-ভূষণের সম্মানিত অর্চনা।

১৩৫। অনন্ত-গূঢ় তত্ত্ব এই মহোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে গেলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন কৃত্য-কোবিদ ব্রহ্মাদি দেবগণ। কাঞ্চন বৃক্ষে যেমন করে অরুণবরণ ফুল ধরে তেমনি করুণায় ভরে উঠল তাঁদের মন। এবং তার পরেই তাঁরা·····অন্তর্হিত হয়ে গেলেন·····সত্ত। কেবল সুরভীতিহারির সম্মুখে ক্ষণকাল রয়ে গেলেন ইন্দ্র এবং সুরভি।

১৩৬। শ্রীকৃষ্ণের এই বৈভব, তাঁর এই ঐশ্বর্য্য, বলতে গেলে এমন কিছুই আশ্চর্য্যের নয়, এমন কিছু অতিরসেরও নয়। কারণ,— দেবতাদের মধ্যে দেখা যায় কেউ কেউ তাঁর অংশ, কেউ তাঁর অংশাংশ, কেউ বা তাঁর কলা, কেউ বা তাঁর বিভূতি। ঐ দেবতারা যে তাঁকে আদর করবেন, আপ্যায়ন করবেন, তাতে অবকাশ কোথায় বৈচিত্র্যের!

১৩৭। ব্রহ্মাদি দেবগণের অন্তর্ধানের পরেই কৃষ্ণ দেখতে পেলেন, ইন্দ্রদেব তাঁর অনল্প মনীষা নিয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেখে তাঁরও মধ্যে উদিত হল অনল্প অনুগ্রহ, আর সঙ্গে সঙ্গে খেলে গেল কৌতুকরসের একটি ছোট্ট ঢেউ। হাসতে হাসতে তাই বললেন,—

"হে শতক্রতু, বলুন শান্ত হয়েছে কি আপনার ক্রোধ? আশা করি গোপন করবেন না মর্ম্মকথা। আমার উদ্রিক্ত দ্রোহ নয়, কেবল উত্তেজিত আনন্দ-কৌতুক খর্ব্ব করতে চেয়েছিল আপনার গর্ব্বকে। স্বজনের দম্ভ সহ্য করতে পারে না আমার বলবান উৎসাহ। তাই আপনজন যখন প্রমত্ত হয়ে ওঠেন, তখন কি উচিত নয়·····আমার কাছেই তাঁর দণ্ডগ্রহণ?

১৩৮। অনুগ্রহ করেই আমি আপনার যজ্ঞভঙ্গ করেছি,·····এই ভেবে, কিন্তু হে পরন্তপ এরপর আশা করি আমার উপর অসূয়া পোষণ করবেন না। আপনি সুখে যান, নিজের ঐন্দ্রপদ সুখে ভোগ করুন, ঐ বিশাল অনন্ত সম্পদকে আশ্রয় করে অতি প্রমত্ত না হওয়াই সমীচীন।" শ্রীভগবানের অনুকম্পায় ও সরস কৃপাশাসনের প্রশ্রয়ে, আনন্দিত বোধ করলেন পাকশাসন ইন্দ্রদেব। তিনি প্রণাম করলেন এবং প্রণাম-শেষে শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন ইন্দ্রপুরীর অভিমুখে।

তারপরে শ্রীকৃষ্ণ বিদায় দিলেন গো-মাতা সুরভি দেবীকে। তিনি তাঁর পায়েয় করে নিয়ে গেলেন শ্রীভগবানের অতিবিমল প্রণয়-পরিমল।

শ্রীকৃষ্ণ এবার অঙ্গে পরলেন তাঁর পূর্ব্ব বেশ,·····একান্ত কান্ত লাবণ্যময়। হঠাৎ কোথা থেকে যেন তিনি এই মুহূর্ত্তেই এলেন,···এই ভাব নিয়ে আবিষ্ট হয়ে গেলেন ব্রজে।

ইতি গোবর্দ্ধন ধারণো নাম
পঞ্চদশঃ স্তবকঃ। [ক্রমশঃ।

# কেন জন্ম লভিলাম

## কে. এম. শমশের আলী

পরিশ্রান্ত পথিকের ক্লান্তি ঘন প্রদোষ-সন্ধ্যায়
অনন্ত জিজ্ঞাসা মনে মুহুর্মুহুঃ হয় বিক্ষোভিতঃ
কেন জন্ম লভিলাম ধরণীর স্নেহ-ক্রোড়চ্ছায়,
আদিগন্ত বর্ণালীর রংগে রাগে যদি উচ্চকিত
করিতে নারিনু কভু। তাপিত জনের ব্যথাভার
নিরাবণে পৌরুষের দক্ষতায় যদি বাহু মম
না বাড়ানু অসংকোচে,—স্বার্থান্বেষী অন্ধ কামনার
দাসবৃত্তি-মন্ত্রে আয়ু করিলাম হীন অপচয়।

জ্ঞানের মশাল হস্তে নকীবের বেলালী আহ্বানে
অগ্রপাছু যদি কভু না হইনু কাফেলা-দিশারী,
মূঢ় ম্লান ক্লিষ্ট আস্যে যদি কভু ফুটাইতে হাসি
নারিনু জীবন-ভোর অকাতরে সর্ব্বগ্লানি নাশি';—
বৃথা জন্ম পরিগ্রহ তবে মোর নিখিল উদ্যানে:
ন্যায়-তুলাদণ্ডে হবে কোন পুঁজি কী গুণ বিচারি!

# একটি বিকেল

## অনাথ চট্টোপাধ্যায়

বনের পাখিই থাক, আমি যেন শুধু সুরে শুনি
জৈবিক যা-কিছু ক্ষুধা ভেসে যাক আজ একেবারে।
এখন আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলক
তোমার কম্পনটুকু ধরা পড়ে বৃষ্টির সেতারে।
এ প্রান্তরে সাহারার কিছুকাল ছায়া পড়েছিল
সব ঘাস জ্বলে গিয়ে নগ্ন মাঠ কেঁদেছে কেবলি।

আগেতো ছিলনা জানা ছোট এক বৃষ্টির ধারায়
বুকচুড়ায় সাথে শোনা যাবে মাটির কাকলি।
আমারো চাতক-মন দীর্ঘ এক প্রতীক্ষার পর
অকস্মাৎ শান্ত হোল স্তব কণ্ঠে পুরবীর সুরে।
চাই না তোমাকে ছুঁতে অশরীরি কবিতা আমার
জানি তুমি আছ কাছে, এই চাই থাক মন জুড়ে।
টুপটাপ বৃষ্টি ঝরে ছোঁয়া পায় সোনাঝুরি ডাল,
বাতাসে শালের বন, এই মন হয়েছে মাতাল।

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

ছত্রপতি শিবাজী!

যাঁর নাম শুনলে প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয় আজও গৌরবের আনন্দে নেচে ওঠে,—মহারাষ্ট্র-নায়ক সেই ছত্রপতি শিবাজীর কথা তোমরা 'ইতিহাসের বইয়ে' পড়েছ। সামান্য অবস্থা থেকে বড় হ'য়ে তিনি যে এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,—সে কথাও তোমরা জান। কিন্তু তাঁর রাজ্যপ্রতিষ্ঠার মূলে বড়-ছোট এমন অনেক ঘটনা আছে,—যা' তোমাদের হয়ত জানা নেই। আমি তারই মধ্যে একটি তোমাদের এখানে বলছি।

রাজ্য স্থাপন করতে হলে যেরূপ শক্তি, সাহস এবং প্রখর বুদ্ধির দরকার,—তা' শিবাজীর ছিল। কিন্তু অর্থের সঙ্গতি সেরূপ ছিল না। অথচ বিপুল অর্থ না হলে রাজ্য-গঠনের আশা আকাশে দুর্গ নির্মাণের মতই অলীক হয়ে যায়।

শিবাজী তাই গভীর ভাবেই ভাবতে লাগলেন অর্থ সংগ্রহের উপায়। প্রভূত ধন-সম্পদ থাকতেও কেউ যে তাঁকে দিয়ে সাহায্য করবে, এ বিশ্বাস তাঁর একেবারেই ছিল না। অথচ একটি স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের কল্পনা তাঁকে অধীর করে তুলেছিল।

কাজেই আর অন্য উপায় না দেখে অর্থ সংগ্রহের জন্য এক অনভিপ্রেত পথেই অগ্রসর হলেন তিনি। তাঁর অনুচরেরা প্রত্যেকেই ছিল দুর্দ্ধর্ষ সাহসী এবং শক্তিমান। তিনি তাদের নিয়ে দল গঠন করে—গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে লুটপাট ক'রে বেড়াতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে 'শিবা-ডাকাত' বলে তাঁর নামও রটে গেল চারিধারে।

—রাজশক্তি তাঁর পেছনে ধাওয়া করেও কিছু করতে পারতো না। তিনি যেন কোন যাদুবলে দলবল সমেত মুহূর্ত্তে উধাও হ'য়ে যেতেন—এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। তবে অনুচরদের প্রতি তাঁর কয়েকটি কঠোর আদেশ ছিল। শিশু, নারী, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধের ওপর কোনরূপ পীড়ন করা শিবাজীর আদেশে ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নারীদের তো তিনি মায়ের মতই সম্মান করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, নিতান্ত বাধ্য করে না তুললে—কাউকে হত্যা করারও ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। দরিদ্র গৃহস্থের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট।

লুণ্ঠনের পরদিন—দিনের আলোকে শিবাজী ছদ্মবেশে ঘুরে ফিরে লুণ্ঠিত গ্রামের অবস্থা লক্ষ্য করতেন। একদিন এমনি একখানি গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে শিবাজী সহসা দেখলেন,—এক বৃদ্ধা তার গৃহের দ্বারে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন চোখের জল মুছছে।

উদ্বিগ্ন হ'য়ে শিবাজী দ্রুতপদে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধার দিকে। সহানুভূতির স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন তাকে,—"মা, তুমি কাঁদছো কেন? কি হ'য়েছে?"

ক্ষীণদৃষ্টি প্রসারিত করে শিবাজীর দিকে তাকালো বৃদ্ধা। বললে অশ্রুরুদ্ধস্বরে—"আর দেখছো কি বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। কাল রাত্রে 'শিবা-ডাকাতের' দল এসে আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে।"—বলতে বলতে দুঃখের আবেগে তার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হয়ে এলো। কোনরূপে গলাটাকে পরিষ্কার করে সে আবার বললে,—"আর তাতেই কি নিস্তার আছে বাবা। আমার তিন তিন জোয়ান ছেলেকে এমন মার-ধর করে গেছে যে—আজ তারা কেউ আর গা তুলতেই পারেনি।"
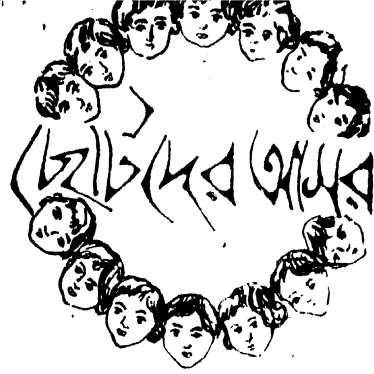
"তোমার বাড়ীতে আর কে-কে আছে মা?" শিবাজীর স্বরে সমবেদনার সুর বেজে উঠলো।

চোখের জল মুছতে মুছতে বৃদ্ধা বললে—"ঐ ছেলে তিনটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই বাবা। ওরাই গতর খাটিয়ে রোজগার করে আনে।···ওরাই আমার সব।"

শিবাজী নীরবে কি যেন একটু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন,—"তোমার বাড়ীর মধ্যে আমি একবার যেতে পারি মা?"

"এস, এস বাবা, এস!"—যেন দুঃসময়ের এক বন্ধু পেয়েছে,—এইভাবেই বিপন্না বৃদ্ধা বলে উঠলো,—"তুমি তো আমার ছেলের মতোই। এস না, দেখবে, আমার ছেলেদের কি দুর্দ্দশা করে গেছে শিবা-ডাকাতের লোক!"

বৃদ্ধার পিছু পিছু বাড়ীর মধ্যে ঢুকে শিবাজী দেখলেন,—বৃদ্ধার তিনটি ছেলেই স্বাস্থ্যবান পরম সুন্দর যুবক। কিন্তু সাংঘাতিক ভাবেই আহত হয়েছে তারা।···লুণ্ঠনের সময় তাঁর লোকদের বাধা দিতে গিয়েই ছেলে তিনটির যে এই অবস্থা হয়েছে,—বলা বাহুল্য একথা বুঝতে বাকী থাকলো না শিবাজীর।···তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিলেন,—"মা, তুমি ভেবো না, তোমার ছেলেরা শীগ্‌গির সুস্থ হয়ে উঠবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করছি।"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন তিনি বৃদ্ধার বাড়ী থেকে। আশ্চর্য্য হ'য়ে বৃদ্ধা ভাবতে লাগলো,—"কে এ? কোত্থেকে এসে পড়লো আমার এ দুঃসময়ে বন্ধুর মত?"

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার অবকাশ পেলো না সে। অবিলম্বেই শিবাজী একজন চিকিৎসক এবং অন্য একটি লোক সঙ্গে সেখানে ফিরে এলেন। তাঁর আদেশমত চিকিৎসক বুড়ীর ছেলেদের আহত স্থান পরীক্ষা করে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করলেন।

বৃদ্ধার হাতে কতকগুলি মুদ্রা দিয়ে শিবাজী বললেন,—"মা, এই অর্থ দিয়ে তুমি এখন তোমার সংসারব্যয় নির্ব্বাহ কর।" তারপর চিকিৎসককে দেখিয়ে বললেন,—"ইনি অতি বিচক্ষণ কবিরাজ, মাঝে মাঝে এসে ইনি তোমার ছেলেদের দেখে যাবেন। আর এই যে লোকটি দেখছো"—অন্য লোকটিকে নির্দ্দেশ করে বললেন—"এও মধ্যে-মধ্যে এসে তোমার দরকার মত হাটবাজার করে দিয়ে যাবে। তা ছাড়া যতদিন তোমার ছেলেরা সুস্থ হ'য়ে না উঠবে—ততদিন আমি তোমার সংসারের ভার নিলুম;—সে জন্যে তুমি ভেবো না।"

শ্রদ্ধায় এবং কৃতজ্ঞতায় বুড়ীর কোটরগত দুই চক্ষু জলে ভ'রে উঠলো।—কে ইনি? ইনি কি ছদ্মবেশী কোন দেবতা?—অথবা বিপদবারণ ভগবান এসেছেন—এঁর রূপে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে?—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বৃদ্ধা বললো,—"বাবা, তুমি যে কে,—তা' তো জানি না। কিন্তু তুমি যদি আমাদের রাজা হ'তে!"

"তাই আশীর্ব্বাদ কর মা!"—ঈষৎ হেসে শিবাজী মাথা নত করলেন,—"তাহলে 'শিবা-ডাকাতের' অত্যাচার বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

"তুমি রাজা হবে, বাবা!"—সমগ্র অন্তরের ঐকান্তিক কামনা যেন ফুটে উঠলো বুড়ীর কণ্ঠে!

* * * *

প্রায় দু'বছর পরে। বৃদ্ধার গৃহ-দ্বারে এসে দাঁড়ালো একখানি সুসজ্জিত শিবিকা। শিবিকা থেকে নামলেন শিবাজী;—অঙ্গে তাঁর রাজোচিত বীরবেশ,—কটিতটে লম্বিত স্বর্ণমুঠ দীর্ঘ তরবারি,—মাথায় বহুমূল্য উষ্ণীষ।

দ্বারে করাঘাত করে শিবাজী ডাকলেন—"মা!" ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বৃদ্ধা।

"ভালো আছ মা?"—পরম আত্মীয়ের মতই প্রশ্ন করলেন শিবাজী,—"তোমার ছেলেরা কোথায়? তারা বেশ কাজকর্ম্ম ক'রছে তো?"

বুড়ী প্রথমে শিবাজীকে চিনতে পারলো না। কিন্তু তাঁর কথার ভাবে কিসের যেন একটু ইঙ্গিত পেয়ে ক্ষীণদৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত ক'রে শিবাজীর মুখের দিকে তাকালো সে।··পর মুহূর্তেই সে চমকে উঠলো—"বাবা তুমি?"

"হ্যাঁ মা, আমি! তোমার আশীর্ব্বাদ সফল হয়েছে মা। আমি রাজা হয়েছি।"

"রাজা হয়েছ!" পুলকে অধীর হয়ে উঠলো বৃদ্ধা—"রাজা হয়েছ তুমি? হাঁ-হাঁ হবেই যে! রাজাই যে তোমার হওয়া উচিত বাবা!"—তার কণ্ঠস্বর আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো,—"এ আমার আশীর্ব্বাদ নয় বাবা, ভগবানের বিচার। নইলে আমাদের মত লোকের মুখের দিকে চাইবে কে?"

শিবাজী সে সব কথা বাদ দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন,—"কই, তোমার ছেলেদের কথা যে বললে না, মা?··আমি যে তোমার তিনটি ছেলেকেই ভিক্ষে চাইতে এসেছি, তোমার কাছে। তাদের আমি আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করবো।"

"সে তো আমার মহাভাগ্যের কথা বাবা!" কৃতজ্ঞ-অন্তরে বুড়ী জবাব দিলে,—"কিন্তু ভিক্ষে বলছো কেন? তোমার আদেশই যে যথেষ্ট। তবে আজ তো তারা এখনও কাজ থেকে ঘরে ফেরেনি বাবা! এর পর তুমি যে মুহূর্তে ডেকে পাঠাবে,—সেই মুহূর্তেই তারা তোমার হুজুরে গিয়ে হাজির হবে।"

"হুজুর আমি নই মা,—আমিও তোমার এক ছেলে!"

"আমার রাজা ছেলে! আমার রাজা ছেলে!" বৃদ্ধা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। কিন্তু হঠাৎ কি জানি কেন, কেমন একটা শঙ্কার ভাব ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে—"তা বাবা শিবা-ডাকাত আর আমাদের ওপর কোন অত্যাচার করবে না তো?"

—"আমিই যে শিবা-ডাকাত মা!"

"অ্যাঁ-অ্যাঁ"—মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠলো বুড়ীর শীর্ণ মুখ; শঙ্কায় আকুল হয়ে উঠলো তার কোটরগত চোখের দৃষ্টি,—"তু—তুমি-তুমিই শিবা ডাকাত!"—হঠাৎ যেন কোন বিভীষিকা দেখে থর থর করে কাঁপতে লাগলো সে।··কিন্তু তবু যেন কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না তার। এত বড় মহান অন্তর যার, সে কি কখনও ডাকাত হতে পারে?

শিবাজী তার শঙ্কা এবং সংশয় দুইই বুঝতে পেরে প্রশান্ত হাস্যে বললেন,—"তা' ভয় কি মা? শিবাজী রাজা হবার পর শিবা-ডাকাতের যে মৃত্যু হ'য়েছে। আর কি সে জগতে আছে?"

"তাই হোক—তাই হোক।" বিহ্বলকণ্ঠে বুড়ী বলে উঠলো,—শিবা-ডাকাত যাক; শতায়ু হয়ে বেঁচে থাক—আমাদের শিবাজী, আমার রাজা ছেলে শিবাজী!···

# একটি কিশোর

## প্রদীপকুমার চক্রবর্ত্তী

১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর।

ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে দিনটি। কারণ এই দিনটিতে মেদিনীপুর জেলার মৌবানি গ্রামে যে শিশুটির জন্ম হয়েছিলো তার অপূর্ব দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ আত্মবলিদান আমাদের মনে শুধু বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না,—প্রথম শহীদ হিসেবে শ্রদ্ধা জানাতেও বাধ্য করায়।

দেশ তখন পরাধীন। আমরা তখন ব্রিটিশের কড়া শাসনের শৃংখলে শৃংখলিত। স্বাধীন চিন্তা তখন নিষিদ্ধ। কিন্তু নিষিদ্ধ হলেও বন্ধ থাকেনি আমাদের সংগ্রাম। বেওনেট-গুলি আর মৃত্যুর ভ[য়] দেখিয়ে সরকার বন্ধ করতে পারেনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপ্লবের যে বহ্নি সেদিন প্রজ্বলিত হয়েছিলো—মানুষের মনে আর প্রা[ণে] তারই লেলিহান শিখা গ্রাম থেকে গ্রামে, এক দেশ থেকে অন্য দে[শে] ছড়িয়ে পড়তেও বেশি সময় নেয় নি। সরকার তাই ভীত ও সন্ত্র[স্ত] হয়ে লাঠনা, নির্যাতন আর মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বানচাল ক[রে] দিতে চেয়েছিলো মানুষের ন্যায্য দাবীকে। দিকে দিকে সেদিন ত[াই] নেমে এসেছিলো মৃত্যুর যবনিকা।

ঠিক এমনি দিনে পিতৃ-মাতৃহীন এক তরুণ কিশোর নির্ভয়ে এগি[য়ে] এসেছিলো, ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে পরাধীন শৃংখলে শৃংখলিত ভারত মায়ের ললাটে রক্তের তিলক পরাতে। আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষায় সে নষ্ট করেনি সময়,—বীরের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর মুখোমুখি। পিছনে ফিরে তাকাবার মতো স্বভাব তার ছিলো না। সংগ্রামকে সার্থক করে তোলার জন্য সে জাগিয়ে তুলেছিল তারই মতো শত শত তরুণ কিশোরকে। আঠারো বছর বয়সের তরুণ কিশোর ক্ষুদিরামের স্মৃতি তাই আজ আমাদের মনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ক্ষুদিরামের নাম স্মরণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অপূর্ব ছবি। মজঃফরপুর জেলার বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এক তরুণ কিশোরকে বলতে শুনি, 'এখানে সকলের সামনে আমার কিছু বলার আছে।'

বিচারক তখনই বাধা দিয়ে বলেন, 'এখন আর তার সময় নেই।'

সময় না থাকলেও, তাকে বলার সুযোগ না দিলেও কিশোর বলে যায়, আমাকে যদি অনুমতি দেন তা হলে যাবার আগে আমি আমার দেশের তরুণদের জানিয়ে যেতে চাই যে কি করে বোমা তৈরী করতে হয়।'

এরকম নির্ভীকতার পরিচয় কিশোর ক্ষুদিরাম প্রত্যেক কাজেই দিয়েছে। তাইতো পার্টির লোকেরা শয়তান কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্ম ক্ষুদিরামকেই নির্বাচন করেছিলো। ক্ষুদিরামও হাসতে হাসতে মাথায় তুলে নিয়েছিলো এই ঝুঁকি। ছদ্মবেশী দুর্গাপ্রসাদ সেজে সে তখনই রওনা হয়েছিলো মুজফরপুরে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে ক্ষুদিরামের হাতের বোমায় আমরা কিংসফোর্ডকে চিরদিনের মতো এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারিনি,—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাতে নিহত হয়েছিলো, মিসেস কেনেডী ও মিস কেনেডী নামে দু'জন মহিলা।

এই ঘটনার পরদিন ( ১লা মে ১৯০৮ ) ক্ষুদিরাম যখন ওয়াইনি ষ্টেশনের কাছে এক মুদির দোকানে তৃষ্ণা মিটাবার জন্মে জল খেতে ঢুকেছিলো তখন পুলিশ তাকে করেছিল বন্দী। সে সময় ক্ষুদিরামের হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না,—থাকলে সে কখনই এ ভাবে ধরা দিত না।

কিংসফোর্ড হত্যা মামলায় তরুণ কিশোরের ফাঁসির হুকুম হলো। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে যখন শুনলো তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ, তখন সে কাঁদেনি, তাই তার চোখে ছিল না এক ফোঁটা জল। হাসতে হাসতে তখনই সে বিচারককে বলল,—আমাকে যদি অনুমতি দেন তাহলে যাবার আগে আমি আমার দেশের তরুণ কিশোরদের জানিয়ে যেতে চাই যে, কি করে বোমা তৈরী করতে হয়।

১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট।

এদিনটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এদিনে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

অন্যান্য দিনের চেয়ে ক্ষুদিরাম সেদিন একটু আগেই ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে দেহকে শুদ্ধ করে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো কারাগার কক্ষের দরজায় আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। সময় মতো মৃত্যুদূত সামনে এসে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। কারা প্রহরীরা তরুণ কিশোরের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেললো আর হাত দুটো পেছনে করে শৃংখলিত করে নিয়ে চললো—বধ্যভূমির দিকে। ধীর পদক্ষেপে কিশোর এগিয়ে চললো। গতি মন্থর হলেও তাতে ভীরুতার ছাপ ছিলো না।

জল্লাদ এলো ফাঁসির দড়ি নিয়ে। ক্ষুদিরাম স্বহস্তে সেই দড়ি নিজের গলায় পরিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলো, 'হ্যাঁ, ভাই! তোমরা ফাঁসির দড়িতে মোম মাখাতে কেন?'

মৃত্যুপথ যাত্রী কিশোরের মুখে এই প্রশ্ন শুনে উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিশোরের এই প্রশ্নে সেদিন তাদের প্রাণ কেঁদেছিলো কি না তা ইতিহাসে লেখা নেই। ইতিহাসে শুধু লেখা আছে—ধীরে ধীরে কিশোর এগিয়ে এসে নির্ভয়ে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালো। কিশোরের মুখে থেকে তখনও হাসির রেখা মিলিয়ে যায়নি। শেষ বারের মতো কিশোর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো,—বন্দেমাতরম্! তারপর?

তারপরের ইতিহাস আরো করুণ। মুহূর্তে নিভে গেল আঠারো বছর বয়সের এক তরুণ কিশোরের উজ্জ্বল জীবন প্রদীপ! শুধু ভারতবর্ষ নয়,—পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশও কোনোদিন ভুলতে পারবে না এই তরুণ কিশোরকে। প্রথম শহীদ হিসেবে ক্ষুদিরামের স্মৃতি বিশ্বজনের মনে ক্রমশঃ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

## একটা নীলামের খবর বলছি

### যতীন্দ্রনাথ পাল

তাজ্জব ব্যাপার। কিন্তু গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। কাহিনীটা এই।

কেনিয়ার একজন ভদ্রলোক একখানা পুরণো বই কিনেছিলেন। বাঙ্গালোরের একটা পুরণো বই-এর দোকান থেকে তিনি এই বইটা কেনেন মাত্র এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা দিয়ে। বইটি হোল ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাস লুই ক্যারলের 'এলিস-ইন-ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে'র প্রথম সংস্করণের একটি কপি। এটি ছাপা হয় ইংরেজী ১৮৬২ সালে।

একশ বছর আগে ছাপা এই বইটার চেহারা অতি বিশ্রী। কোথায় ধুলোর মধ্যে পড়ে ছিল কতদিন ধরে, কে জানে। কিন্তু বইটা যে দুষ্প্রাপ্য তাতে সন্দেহ কি!

ভদ্রলোকটি জানতেন যে, যে-কোনও বিখ্যাত বইয়ের প্রথম সংস্করণের একটা কপির দাম অনেক। এ ধরণের একটা কপি মোটা টাকায় কিনে নেন কোন কোন শৌখিন লোক। সেরকম কোন খরিদ্দার মিলে যেতেও তো পারে এ বইটার। তা হলে তিনি টাকাও পেয়ে যাবেন প্রচুর।

এর পর তিনি পাঠিয়ে দেন বইটা বিলাতে, একটা নীলামের দোকানে, সেখানে বিক্রির জন্য।

বইখানা বিক্রি হোয়ে গেল সেখানে। বহু মূল্য দিয়ে এটি কিনে নেন যুক্তরাষ্ট্রের এক পুস্তক-ব্যবসায়ী কোম্পানী।

এই নীলাম হয় ১৯৬১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর।

কলকাতার সংবাদপত্রে এই নীলামের খবর বের হয় পরদিন, অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর।

তাজ্জব খবর। এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সায় কেনা বইটি আটশো আশি পাউণ্ডে অর্থাৎ প্রায় তের হাজার দুশো টাকায় বিক্রি হোয়ে গেছে।

## একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র

### শ্রীমতী ফুল্লরা রায়

এ যুগের একজন মস্ত বড়ো পণ্ডিত লোক ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। পৃথিবীর প্রায় সকল বিদ্যাই অল্পবিস্তর তাঁর জানা ছিল। ছাত্রাবস্থা হতেই এমন অসাধারণ মেধা, এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এমন প্রতিভার দীপ্তি আর কারও ছিল না।

ব্রজেন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান্ শিক্ষাব্রতী খুব অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র-জীবনের একটি গল্প শোন—

প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক হেষ্টিংস সাহেব যত সব দুরূহ অপ্রচলিত গ্রন্থ হাতে করে ক্লাসে পড়াতে আসতেন। ছাত্ররা তাঁর উল্লিখিত অনেক বইয়ের নাম পর্যন্ত জানত না। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ সুবিধা পেলেই অধ্যাপকদের নিকট হতে সেই সব দুরূহ বইগুলি নিয় আগ্রহ-সহকারে পড়তেন।

সেদিনও এমনই একটি কঠিন বই অধ্যাপকের হাতে দেখে ব্রজেন্দ্রনাথের বইখানি পড়বার বিশেষ আগ্রহ হ'ল। তিনি এসে অধ্যাপককে বললেন—"স্যার, বইটা আমাকে একদিনের জন্ম দিন, কালই ফেরত দেবো।"

অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে বললেন—"আরে, এ গল্পের বই নয়! এ পড়ে তুমি বিন্দুবিসর্গও বুঝবে না। এত কঠিন বই যে আমি নিজেও বিশেষ কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ কিন্তু কিছুতেই ছাড়লেন না। অধ্যাপকের হাত হতে বইটি নিয়ে বাড়ী গেলেন। পরের দিনই বইখানি আবার হেষ্টিংস সাহেবের কাছে ফেরত দিলেন।

সাহেব হেসে বললেন—"কি, এরই মধ্যে দেখা হয়ে গেল? আমি তো আগেই বলেছিলাম, এ বই পড়া তোমার সাধ্যেরও অতীত।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন—"আজ্ঞে না, আমি এর প্রত্যেকটি পাতা ভালো করেই পড়েছি, তা ছাড়া এর কিছু কিছু অংশে ভুল রয়ে গেছে।"

অধ্যাপক চোখ বড় বড় করে বললেন—"সে কি! তুমি কি বলছ?" কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের কথা সত্য সত্যই সঙ্গত বলে জানা গেল। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন, সেই দুরূহ বইটির কোন কোন অংশ ভ্রমাত্মক।

ব্রজেন্দ্রনাথ একদিনের মধ্যেই সেই দুর্বোধ্য বইখানি যে তন্ন তন্ন করে পড়েছেন, তা অধ্যাপক বেশ বুঝলেন এবং একজন বাঙালী ছাত্রের অসাধারণ মেধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

## রাক্ষসের কবলে

**শ্রীরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়**

আজ থেকে অনেক বছর আগেকার কথা।

মায়াপুর বলে একটা রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যে একজন রাজা ছিল। রাজার নাম কাঞ্চনকুমার।

মায়াপুর রাজ্যটা খুব বড় নয়। ছোট রাজ্য। রাজা তাঁর প্রজাদের নিজের ছেলের মতন ভালোবাসতেন। প্রজারা খুব সুখে শান্তিতে বাস করত। তাদের রাজ্যে ছিল না কোন দুঃখ কষ্ট।

মায়াপুর রাজ্যের শেষ ভাগে ছিল পাহাড় আর জঙ্গল। সেই পাহাড়ের গুহায় বাস করত একটা রাক্ষস। রাক্ষসটা ছিল খুব বদমাস।

রাক্ষসটার চেহারা ছিল খুব ভয়ঙ্কর। বাঁ হাতটা নেই। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বিরাট মাথা। নাকটা ছিল ঠিক মনুমেন্টের মত। হাতে আর পায়ে বড় বড় নোখ। তার শরীরটা ছিল বিশাল।

রাক্ষসটা পাহাড়ের গুহায় থাকত। কিন্তু রাজ্যে কোন দিন ঢুকত না। আর লোকেরাও কোনদিন সেই পাহাড়ের কাছে যেত না।

হঠাৎ একদিন সেই রাক্ষসটা গভীর রাতে রাজ্যের ভিতর ঢুকল। তখন রাজ্যের সব লোক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তারা জানতেও পারল না যে রাক্ষসটা তাদের গ্রামে ঢুকে পড়েছে।

রাক্ষস এদিকে গ্রামে ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরছে আর শীকারের চেষ্টা করছে।

সেই রাজ্যের প্রায় শেষ দিকে থাকত একজন কাঠুরে।

শিশু-সমাবেশ আলোকচিত্র—মোনা চৌধুরী

কাঠুরের ছিল এক ছেলে আর এক মেয়ে। কাঠুরের বউ অনেক দিন আগেই মারা গেছল।

কাঠরে কাঠ কেটে দিন চালাত।

এদিকে হয়েছে কি রাক্ষসটা কাঠুরের আনাচে-কানাচে ঘুরছে। তখন।

ঘরের ভেতর কাঠুরে আর তার ছেলে মেয়ে ঘুমুচ্ছিল। কাঠুরের মেয়েটা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে তার বড় পায়খানা পাচ্ছিল। সে তার বাবাকে ঘুম থেকে তুলেছে। কাঠুরে উঠে মেয়েকে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসেছে। যেই বাইরে এসেছে অমনি রাক্ষসটা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল।

কাঠুরে তো রাক্ষসের পিছনে পিছনে অনেক দূর অবধি গেল। কিন্তু মেয়েকে রাক্ষসের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারল না। কাঠুরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

সকাল বেলায় কাঠুরের ছেলে ঘুম থেকে উঠে তার দিদিকে দেখতে না পেয়ে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল—"বাবা, দিদি কোথায়?" তখন তার বাবা বললে, তার দিদিকে রাক্ষসে ধরে নিয়ে গেছে। তখন সে খুব কান্নাকাটি করল তার দিদির জন্য। আর সে প্রতিজ্ঞা করল যেমন করে হোক রাক্ষসের কবল থেকে উদ্ধার করবে।

একদিন সে তার দিদির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। আর চলতে লাগল সেই পাহাড়ের দিকে, অনেক পথ চলে সে পড়ল পাহাড়ের গুহার কাছে। তারপর খুঁজতে লাগল তার দিদিকে। অবশেষে সে তার দিদিকে দেখতে পেল, একটা গুহায় বসে আছে আর কাঁদছে।

দিদি তো ভাইকে দেখে অবাক।

ভাই বলল। দিদি চল তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাই নইলে সেই রাক্ষসটা এসে পড়বে আর আমাদের দু'জনকে খেয়ে ফেলবে।

তারপর তারা দু'জন সেই পাহাড় থেকে নামতে লাগল। এদিকে হয়েছে কি সেই রাক্ষসটা তখন জঙ্গল থেকে ফিরছিল। সে তাদের দু'জনকে পালাতে দেখে ছুটে আসতে লাগল ধরবার জন্যে, রাক্ষসটা ছুটে আসতে আসতে একটা বড় পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল।

আর এদিকে ভাই আর বোনেতে মিলে কোন রকমে পালিয়ে এল তাদের গ্রামে।

তারপর একদিন রাজ্যের সব লোক মিলে মেরে ফেললো রাক্ষসটাকে।

তোমরা কি এই ভাইটির মত সাহসী হতে চাও?

## ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

### সাত

#### সূর্য্যোদয়

"মাৎস্যন্যায়মপোহিতুম্ প্রকৃতিভির্লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন যশোরাশির্দিশামালয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনীজ্যোৎস্নাতিভার শ্রিয়া।"

সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্বাক্ষর বহন করেছে এক শিলালিপি। তার বুকে ক্ষোদিত আছে এই কথাগুলি।

মাৎস্যন্যায় যে দেশে চলে, করতে তাহা দূর
রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করলেন শ্রীগোপাল।
যশোভার যে ছড়িয়ে পড়ে, ছাড়িয়ে গৌরপুর,
পূর্ণিমা রাত হার মেনে যায় (হায়) রে চাঁদের কপাল।

গোপাল বাংলা দেশের রাজা হলেন। কালের হিসাবে, অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সেটা। তাঁর সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরে এল শান্তি, স্থাপিত হোল শৃঙ্খলা। শশাঙ্কের আমলে মনে হয়েছিল ভোরের পাখী ডাকল বুঝি। বাঙ্গালী জাতি জাগল বুঝি। কিন্তু সে বুঝি কাকজ্যোৎস্না। ভোরের ভাণ। পাখীরা বুঝেছিল, ভোর হোল। উঠেছিল ডেকে, ঝেড়েছিল পাখা। পাখা ঝাড়া বৃথা। পাখী ডাকা ভুল। আবার গুটোতে হোল পাখা। বন্ধ করতে হোল ঠোঁট। সকাল হোতে বুঝি দেরী আছে। তারপর গোপাল সিংহাসনে বসলেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠা হোল। চারশো বছর রাজত্ব করে গেছেন তাঁরা। সেই চারশো বছর বাঙ্গালীর জীবন-প্রভাত। তাই গোপাল সিংহাসনে বসলে পর মনে হোল, হোল বুঝি সূর্য্যোদয়। হ্যাঁ, সূর্য্যোদয়ই বটে। রাতের অন্ধকারে বেরোয় ভূত-প্রেত-দত্যি-দানা, মানুষের মনে ভয় জাগে; দস্যুতস্করের চলে রাতভোর অভিযান। জগৎ জুড়ে চলে কুকাজ। আর যেই ভোর হোল, উঠল সূর্য্য, জগৎ ভরে গেল আলোয়, কালো ঢাকল মুখ, দস্যু তস্কর মুখ ঢাকে, কুকাজ আর পায় না গোপন আশ্রয়, তাই তার লয় হয়। চারিদিকে শোনা যায় জাগার গান।

গোপালের রাজ্যলাভে রাজার নহবৎ খানায় বেজে উঠল জাগার গান। গোপাল তাঁর নিপুণ নেতৃত্বে দেশে আনলেন সমৃদ্ধি, লোকের মনে জাগালেন স্বদেশ চেতনা। আমাদের এই দেশ—মাতৃভূমি, জন্মভূমি; দেশকে সাজাবো মনের মতো, করবো সমৃদ্ধ। আমাদের রাজা সিংহাসনে—তাঁকে আমরা বসিয়েছি, বসিয়ে রাখব—জান কবুল, আর মান কবুল; রাজাও সিংহাসনে বসে থাকবার জন্যে উপযুক্ত কাজ করে যাবেন। রাজা রাজ্যের অলঙ্কার। দেশের আবরণ রাজা। রাজা যদি প্রজাদিগকে ভালবাসেন আর প্রজারা যদি রাজাকে ভালোবাসে—তাহ'লে রাজ্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বাংলা দেশেরও উন্নতি হতে লাগল।

গোপালের পর রাজা হলেন তাঁর ছেলে ধর্মপাল। দেশে খাওয়া পরার অভাব নেই। লোকে শান্তি শৃঙ্খলায় বাস করছে। কলার পাতায় গরম ভাত জুটছে, ভাতে গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল আর নালতে শাক ভাজা, তার সাথে হাসিমুখে স্ত্রী পরিবেশন করছেন আর পুণ্যবান লোক খাচ্ছেন। বাঙ্গালী খেতে ভালোবাসে। আগেকার কবিরা সেই খাওয়ার বর্ণনা করতে আরও ভালোবাসতেন। তাই সে যুগের লোক কি ভাবে খাচ্ছে তার ছবিটিও কবি এঁকে রেখেছেন শব্দে ও ছন্দে—

ওগগরা ভত্তা রম্ভঅপত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সযুত্তা।
মৌইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা পুনবন্তা।

হরিণ আর ছাগলের মাংস যে পাতে পড়ত না, তাও নয়। ভোজবাড়িতে এখানকার মতই সুপ্রচুর সরঞ্জাম হোত। কর্পূর মেশানো জল দেওয়া হোত, ভোজের শেষে দেওয়া হোত নানা মসলা

রূপা পানের খিলি। দই, পায়েস, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানারকম খাবার বাঙ্গালীর প্রিয় ছিল। বেগুন, কুমড়ো, লাউ, ঝিঙে, কচু, নানারকমের শাক ছিল তরকারী। কলা, আম, কাঁঠাল, নারকেল, আখ, তেঁতুল প্রভৃতি ফলও বাঙ্গালী প্রাচীন কাল থেকে খেয়ে আসছে। শীকার, কুস্তি, সাঁতার-কাটা, বাগান তৈরী, পাশা খেলা, দাবা খেলা, কড়ি খেলা, ভেড়া ও মুরগীর লড়াই—এসবে বাঙ্গালী মেতে থাকত। সামাজিক ও ধার্মিক উৎসব অনুষ্ঠানে নাচগান হোত, যাত্রার আসর বসত। বিয়ে বাড়ীতে বাজনা বাজানো হোত। বাজনার মধ্যে ছিল কাঁসর, ঘণ্টা, ঢাক, বীণা, বাঁশী, করতাল, মৃদঙ্গ, মুরজ, খঞ্জনী ইত্যাদি। লাউ-এর খোলে তার লাগিয়ে একরকম বাদ্যযন্ত্র তৈরী হোত। যাতায়াতের জন্য ছিল ঘোড়া, হাতী, পাল্কী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি। ইট কাঠে তৈরী হোত রাজপ্রাসাদ আর বড়লোকের বাড়ী। সাধারণ লোকের ঘর তৈরী হোত বাঁশের বেড়া, বাঁশের খুঁটি, খড়ের চাল দিয়ে, মাটির দেওয়ালও ছিল। বড়লোকেরা সোনা রূপার থালা বাসন ব্যবহার করত। গরীব লোকেরা ব্যবহার করত মাটির থালা বাসন। আর সাধারণ লোকেরা কাঁসার। পুরুষরা পরতো ধুতি, গায়ে জড়াতো একটা উত্তরীয়, মেয়েরা পরতো শাড়ী, গায়ে জড়াতো ওড়না। ছোটছেলেরা পরতো হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ধুতি, নয় আঁট পাজামা, কোমরে জড়াতো ছোট এক কাপড়। তাকে বলত ধটি। পুরুষেরা লম্বা বাবরী চুল রাখতো, কাঁধের উপর ঝুলতো। মেয়েদের লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর খোঁপা বাঁধা থাকত। বাঁশের লাঠি আর ছাতার ব্যবহার হোত। সৈন্যরা, দারোয়ানরা ফিতাবিহীন চামড়ার জুতা পরতো আর বড় লোকেরা কাঠের পাদুকা। বিদেশে যে সব বাঙ্গালী ছাত্র পড়তে যেত তারা ময়ুরপঙ্খী জুতা পরতো। রাজসভায় নটী বা নর্তকী থাকত। তাদের পা পর্য্যন্ত আঁটসাট পাজামা পরতো। গায়ে জড়াত ওড়না। চন্দনের গুঁড়া, চন্দন, মৃগনাভি, জাফরান, কর্পূর প্রভৃতি ছিল প্রসাধন দ্রব্য। কপালে কাজলের টিপ, চোখে কাজল, ঠোঁটে লাক্ষারস, গলায় ফুলের মালা, মাথার খোঁপায় ফুল—এভাবে মেয়েরা সাজত। গাঁয়ের মেয়েরা হাতে পরতো সাদা শঙ্খের বালা ও তাগা আর কানে পরতো তালপাতার দুল কি কচি রীঠা ফলের দুল।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা দেশ কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। পাটের ও সুতোর সূক্ষ্ম কত রকম কাপড় যে ছিল তার ঠিকানা নাই। ক্ষৌম, কৌষেয়, দুকূল, পত্রোর্ণ, মেঘউদুম্বর, গঙ্গাসাগর, গঙ্গোর, দ্বারবাসিনী, লক্ষ্মীবিলাস, সিলহটী প্রভৃতি ছিল কাপড়ের নানান্ নাম। এসব কাপড় রাজরাণী আর বড়লোকের গৃহিণীরাই পরতেন। সাধারণ লোকের সাধারণ কাপড় ছিল। সাধারণ ঘরের মেয়েরা দাওয়ায় বসে নিজেদের কাপড়ের সুতো কাটতেন, তারপর তাঁতীকে দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিতেন। মেয়েরাও নাচগান লেখাপড়া শিখতেন।

প্রজা সাধারণের কথা বলতে গিয়ে তাদের ঘরের কোণে অনেক উঁকি-ঝুঁকি দেওয়া গেল, আর নয়। আবার ধর্মপালের কথায় যাওয়া যাক্। বালতিতে জল ভরে গেলে জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেশ ভরে গেছে, দেশের ইচ্ছে এবার বিস্তৃত হবার। দেশের — বাড়াবার আর কোনও দরকার নেই। তাকাও বাইরের দিকে। ধর্মপাল বাইরের দিকেই তাকালেন। বিশাল ভারতের বিস্তৃতভূমি পড়ে আছে,—এগোও, জয় কর, বঙ্গলক্ষ্মীর পদতলে এনে ফেল। ধর্মপালের মনে বুঝি একথাগুলিই খেলে গেল। সেকালে কনৌজ জয় করা ছিল প্রত্যেক রাজার লক্ষ্য। ধর্মপালও প্রথমেই চললেন কনৌজের দিকে। সঙ্গে তাঁর দলের পর দল বাঙালী সৈন্য। কনৌজে তখন রাজত্ব করছেন ইন্দ্রায়ুধ। সহজেই তাঁকে পরাজিত করলেন ধর্মপাল। ইন্দ্রায়ুধের ভাই চক্রায়ুধ ধর্মপালের বশ্যতা স্বীকার করলেন। ধর্মপাল চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসালেন। চক্রায়ুধ ধর্মপালের আশ্রিত রাজা হয়ে থাকলেন। এরপর ধর্মপাল রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে লাগলেন। ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কীর তাঁর অধীন হোল। এমন কি, দু' একজন রাজাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন। ধর্মপাল এবার কনৌজে এক মহাসভা আহ্বান করলেন। এই সভায় ভোজ, মৎস্য, কুরু, অবন্তী, যবন, যদু প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা উপস্থিত থেকে পালরাজাকে সম্রাট বলে স্বীকার করে নিলেন। এমনিভাবে ধর্মপাল সারা উত্তর ভারতে এক বিশাল বঙ্গ সাম্রাজ্য গড়লেন। সভাকবি ধর্মপালের নামে যশোগান গাইলেন, "উত্তরাপথ স্বামী" বলে।

যত বড় পদ, তত বেশী বিপদ। যত বড় গাছ, তত বেশী ঝড়ের ঝাপট। ধর্মপাল বিশাল সাম্রাজ্য তো গড়ে তুললেন, ভারতের অন্যান্য রাজারা দেখছিলেন। এবার একে একে এগিয়ে এলেন। প্রথমেই আক্রমণ করলেন পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহারবংশীয় বৎসরাজ। ধর্মপাল পরাজিত হলেন, এমন কি প্রাণ মানে টান পড়ল। কি হয়, কি হয়,—একটা বিপদাশঙ্কা দেখা দিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্য থেকে ঝড়ের মত রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব দু' দলের মাঝে দেখা দিলেন সসৈন্যে। বৎসরাজ রাজপুতানার মরুভূমিতে পালালেন। ধর্মপালের কিন্তু কিছু হোল না—ধ্রুব যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন, উত্তরাপথে ধ্রুবত্ব লাভ করলেন না।

বেশ কিছুদিন কেটে যায়। বৎসরাজ ওদিকে মারা গেছেন। তাঁর ছেলে দ্বিতীয় নাগভট্ট রাজা হয়েছেন। ধর্মপালকে নিশ্চিন্তে রাজ্য করতে দেখে ভাবলেন, বা: বেশ তো পরমানন্দে বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করছেন। কনৌজের দিকে তিনি বিরাট সৈন্যদল নিয়ে চললেন। চক্রায়ুধ ধর্মপালকে খবর পাঠালেন। ধর্মপাল তাড়াতাড়ি সৈন্য নিয়ে কনৌজে গেলেন। দ্বিতীয় নাগভট্ট তুমুল বিক্রমে আক্রমণ করলেন। ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ পাল্টা জবাব দিলেন। এবারেও ধর্মপালের পরাজয় হয়-হয়, এমন সময় শোনা গেল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ আসছেন তাঁহার দলবল নিয়ে। ধর্মপাল আগে ভাগে দূত পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে ফেললেন। গোবিন্দ নাগভট্টকে গিয়ে আক্রমণ করলেন। নাগভট্ট চরমভাবে পরাজিত হলেন। গুড় গুড় করে দেশে ফিরে যেতে পথ পেলেন না তিনি। রাষ্ট্রকূটরাজও তাঁর দেশে ফিরে গেলেন। ধর্মপালের বিরুদ্ধে আর কোন আক্রমণ হয়নি। তিনি নিরাপদে রাজত্ব করে চললেন। বত্রিশ বছর রাজত্ব করে ধর্মপাল পরলোকগমন করেন।

ধর্মপাল সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহ করেই কাটাননি। পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। ধর্মপালও বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। ধর্মশিক্ষার জন্যে তিনি পঞ্চাশটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মগধে তিনি একটি বৌদ্ধবিহার

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গঙ্গাতীরে এক পাহাড়ের মাথায়, বিক্রমশিলায় (বর্তমানে বিহারের ভাগলপুর জেলায় পাথরঘাটে)। মাঝখানে ছিল একটি বিরাট মন্দির, তার চারিধারে একশ' সাতটি ছোট ছোট মন্দির ছিল। একশ' পনের জন শিক্ষক এখানে নানা বিষয়ে অধ্যাপনা, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করতেন। এ হোল সেই অতীতের বিখ্যাত বিক্রমশীল বিহার। এ ছাড়া তিনি আর একটি বিখ্যাত বিহার তৈরী করিয়েছিলেন। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার। রাজশাহী জেলার জামালগঞ্জ থেকে তিন মাইল দূরে পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। এত বড় বিহার ভারতে আর কোথাও ছিল না। সোমপুর ও ওদন্তপুরে তিনি আর দুটি বিহার তৈরী করিয়েছিলেন।

ধর্মপালের মন্ত্রী ছিলেন এক ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম গর্গ। সেনাপতি ছিলেন তার ছোট ভাই বাক্‌পাল। ধর্মপালের বিয়ে হয়েছিল রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের মেয়ে রন্নাদেবীর সঙ্গে। গোপালের বাবার নাম ছিল দয়িতবিষ্ণু, ঠাকুরদার নাম বপ্যট। তাঁর মহিষীর নাম ছিল দেদ্দদেবী। ধর্মপালের মা। গোপাল গত হলেন। ধর্মপাল এলেন। এবার বাংলার সিংহাসনে এলেন দেবপাল। ধর্মপালের ছেলে। উপযুক্ত উত্তরাধিকারী পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, আগেই বলেছি। তাঁরা কিন্তু পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা করে গেছেন। তাঁদের মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। ধর্মপালের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গর্গের কথা বলেছি। দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন গর্গের ছেলে দর্ভপাণি ও দর্ভপাণির ছেলে কেদারমিশ্র দুজনেই, তাছাড়া প্রত্যেক পাল রাজাই কোনও না কোনও ব্রাহ্মণকে কিছু না কিছু দান করেছেন, কাকেও ভূমি, কাকেও অর্থ, কাকেও বস্ত্র। ধর্মপাল এক নারায়ণ মন্দির তৈরীর জন্যে নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। দেবপাল রাজা হয়ে পিতৃদত্ত সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করতে চাইলেন। এবিষয়ে তাঁর সহায় হলেন তাঁর বাবার সেনাপতি বাকপালের ছেলে জয়পাল। এক কথায়, তাঁর সেনাপতি হলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই জয়পাল। মন্ত্রীর মন্ত্রণায় আর সেনাপতির অস্ত্র ঝনঝনায় তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের পরিকল্পনায় সার্থক হোল। প্রথমে তাঁর সেনাবাহিনী উত্তরদিকে চলল। উত্তরে কম্বোজ দেশ। আজকের তিব্বত। কম্বোজ জয় করলেন তিনি। উত্তরে কম্বোজ থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা হোল। পূর্বদিকে কামরূপ। পর্বত সঙ্কুল বনাকীর্ণ দুর্গম রাজ্য। আজকের আসাম। প্রকৃতির দুরতিক্রম্য বাধা সত্বেও তাঁর সেনাদল সে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করল তাঁর নাম। দক্ষিণে উৎকল দেশ, আজকের উড়িষ্যা। চলল সৈন্যদল। অবলীলাক্রমে জয় করল সে দেশ। এবার পশ্চিমে তাকালেন দেবপাল। পশ্চিমে আছে হূণরা। দুর্দান্ত ওরা। উত্তর পশ্চিম ভারতে তাদের আস্ফালন সহ্য করছিল ভারতের লোকরা নিরুপায় হয়ে। দেবপাল তাদিকে সায়েস্তা করলেন গিয়ে। রাজ্য ছেড়ে তারা যে যেদিকে পারল পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। দেবপালের ক্ষমতা সমস্ত উত্তর ভারতে প্রকীর্তিত হতে থাকল। তাঁর বাবা ছিলেন "উত্তরাপথ স্বামী", তিনি হলেন "সকলোত্তরপথ স্বামী।"

ক্রমশঃ।

## এই শরতের সকালে

**নির্মলেন্দু গৌতম**

হাসছে আকাশ, আসছে আলো,
ভাসছে ছেঁড়া মেঘের ভেলা।
ফুলবনে আজ দেখ্‌না চেয়ে
নানা রঙের ফুলের মেলা।
সবুজ ঘাসে রোদ্দুরেতে
শিশির কণা ঝলসে ওঠে।
পদ্মদীঘির অথই জলে
আজকে সোনার আলোক লোটে।
পা ডোবা এই নদীর জলে
মেঘের ছায়া কাঁপ্‌ছে দেখ;
সবুজ কাশের বনে বনে
ফুলের এল বন্যা, একি!
শিউলি তলা সাদায় সাদা,
মৌমাছিরা জমছে এসে!
ইচ্ছে করে এই সকালে
যাই ছুটে যাই নিরুদ্দেশে।

## তিনটে ছড়া

**কার্তিক ঘোষ**

খোকন আমার নয়কো তেমন দস্যি,
সর্দি হ'লেও নেয় না সে ভাই নস্যি।
ইংরেজীটা সবটা পড়ে নিত্য,
চায় না যেতে কোথাও কোনো তীর্থ।
আমার খুকুর নেইকো তেমন বায়না,
রঙিন ফিতে, রঙিন পুতুল চায় না।
চায় সে কেবল কলম খাতা নামতা—
পুজোর সময় চায় না যেতে আমতা।
আমার পুষির নেই ঝামেলা সত্যি,
সকল সময় দুধ খেয়ে পেট ভর্তি।
মিঁ-আঁও-মিঁ-আঁও নেইকো পুষির কান্না,
তুলোর বিড়াল—নাম তবু তার 'আন্না'!

## নার্স

**দীপক সেনগুপ্ত**

(জীবনানন্দ দাশের 'কমলালেবু' কবিতার ছায়া অবলম্বনে)

পৃথিবীর সব ফুলে পূর্ণ ছিল আমার ডালি
পুজার লগ্নের আগেই চলে যেতে হোল—
এ বেদনা কি আমায় টেনে আনবে না?
আবার যেন জন্মাই
কোন এক ঝড় জলের রাতে,
অসহায় ছোঁয়াচে রোগীর পাশে
নার্সের বেশে॥

# সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

## গিরিশ রচনাবলী ( প্রথম খণ্ড )

কেবলমাত্র নাট্যকলার ক্ষেত্রেই নয় নটগুরু গিরিশচন্দ্র বাঙলার সাহিত্য জগতের ইতিহাসেও এক বিরাট অধ্যায় জুড়ে আছেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভা কেবল নাট্যলোক সমৃদ্ধ করে থেমে যায়নি সাহিত্য জগতের নব রূপায়ণেও তার স্বাক্ষর অম্লান। শত শতাব্দীর স্বনামধন্য সাহিত্যস্রষ্টাদের জন্য গিরিশচন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে রচনাবলী তাঁর নামকে এক বিশেষ মূল্যে বিভূষিত করেছে এবং মহাকালের গ্রাসধর্মিতাকে অতিক্রম করে অমরত্ব দিয়েছে তাদেরই কতকগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা সংকলিত হয়ে এই গ্রন্থটি রূপ নিয়েছে। রচনাগুলি নটগুরুর দেশকালবন্দিত লেখনীর অত্যাশ্চর্য শক্তির এক পরমাশ্চর্য নিদর্শন। একদা এরা বাঙলাসাহিত্যে যে আলোড়ন এনেছিল, বাঙলার রঙ্গজগতের যে বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, অনেকানেক গুণীজনের বিরাট প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ নিয়েছিল তাদেরই পুনঃপ্রকাশে পাঠক সমাজ যে বিপুল আনন্দ রসের আস্বাদ করবেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এই রচনাগুলির প্রভাব আমাদের জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য। তাই এদের পুনঃ প্রকাশ প্রচেষ্টাকে পাঠকসমাজ সাদরে বরণ করবেন এ বিশ্বাস আমরা রাখি। গ্রন্থটি সম্পাদন করেছেন কবি ও গীতিকার রমেন চৌধুরী। সম্পাদনকার্যে তিনি যে অসামান্য শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য। তাঁর কর্মে এক অসামান্য আন্তরিকতা শ্রদ্ধা ও শ্রমস্বীকারের পরিচয় মেলে। এই কর্মে তিনি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন এ আমরা সানন্দে ঘোষণা করি। আমরা পরবর্তী খণ্ডগুলির প্রকাশ প্রতীক্ষায় রইলুম। গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী বাঙলার জাতীয় জীবনের সম্পদবিশেষ। পাঠকসমাজে এদের প্রসার যত বেশী হয় ততই মঙ্গল। আমরা সম্পাদককে এই মহৎ প্রচেষ্টার হস্তক্ষেপ করার জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রকাশক—প্রগতি সাহিত্য সংসদ, ১৪ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭ ।। দাম—দশ টাকা মাত্র।

## সাহিত্য ও সাধনা ( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড )

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচ্য সংকলন গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়েছে। " বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের নানাবিধ রচনা একত্র সংগৃহীত হয়েছে যার মূল্য বড় কম নয়। বিপিনচন্দ্রকে তাঁর দেশবাসী প্রধানতঃ রাজনীতিবিদ ও সুবক্তা হিসাবেই স্মরণ করে থাকে, কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রেও যে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে আলোচ্য সংকলন গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে সে বিষয়ে ও অবহিত হতে পারবেন পাঠক। সংগৃহীত রচনাগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন, লেখকের মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিধৃত রয়েছে এদের মাঝে, চিন্তাশীল বোদ্ধা পাঠকমাত্রই এগুলি পাঠে প্রভূত পরিমাণেই উপকৃত হবেন, তৎকালীন সমাজের চিন্তাধারারও একটা বিশদ পরিচয় লাভে সমর্থ হবেন। এজন্যই এই রচনাগুলির একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যও আছে, আমরা আলোচ্য গ্রন্থ দুটি পাঠে আনন্দ লাভ করেছি ও এদের সাফল্য কামনা করি। বই দু'টির আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—বিপিনচন্দ্র পাল। প্রকাশক—নারায়ণ পাল, যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ৪১।এ বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা—৬, দাম—প্রথম খণ্ড, তিন টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড, তিন টাকা।

## মানুষের মত মানুষ

সোভিয়েত ইউনিয়নের এক বীর যোদ্ধার জীবন কাহিনী বিধৃত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক বরিস পলেভয় সোভিয়েতের এক স্বনামধন্য সাহিত্যকার, অসীম দক্ষতার সঙ্গে তিনি বৈমানিক আলেক্সেই মারেসিয়েভের কার্য্যকলাপের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন; জঙ্গী বৈমানিক মারেসিয়েভের বিমানকে জখম করে নামায় শত্রুপক্ষ ১৯৪১ সালে, দারুণ শীতে আহত অবস্থায় কাতর বৈমানিক প্রায় এগারো দিন ধরে হামাগুড়ি দিয়ে পথ অতিক্রম করে শত্রু এলাকার মধ্যে দিয়ে। শুধু মাত্র অদম্য মনোবলই তাকে চালনা করে এ সময়ে, ও হাসপাতালে পায়ের পাতা দুটি কেটে ফেলতে বাধ্য হওয়া সত্বেও এই নির্ভীক যোদ্ধার প্রাণশক্তি হ্রাস পায় না অণুমাত্রও, আপ্রাণ শক্তিতে নিজের পঙ্গুতাকে অতিক্রম করে আবার বিমান চালনার শক্তি ফিরে পায় সে, বাহিনীতে ফিরে এসে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাতে সক্রিয় ভাবেই যুক্ত থাকে। এক অদম্য প্রাণসত্তারই অপরূপ বিকাশ এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য, লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীতে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয় পাঠকমনে। অনুবাদকার এই বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ নিঃসন্দেহে সফলকাম হয়েছেন। বইটির আঙ্গিক উচ্চমানের। লেখক—বরিস পলেভয়, অনুবাদক—সমর সেন, প্রকাশক—বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, ২১ জুবভস্কি বুলভার; মস্কো সোভিয়েত ইউনিয়ন। পরিবেশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

## সূর্যগ্রহণ

আলোচ্য বইটি একটি বিদেশী ভাষায় রচিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে রুশ ভাষায় লিখিত রচনা বলীর যে ভাবান্তকরণ হয়ে চলেছে, এই ছোট বইটি তারই অন্যতম ফসল। সূর্য গ্রহণ এক অতি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের

অন্তর্গত ঘটনা হলেও আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে নানা অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, আলোচ্য গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন আলোচনা করা হয়েছে। সূর্যগ্রহণ কেন হয় এবং কি ভাবে হয় এ কথা সবিস্তারে বোঝানো হয়েছে, সেই সঙ্গে সৌরমণ্ডলের এক সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে যাতে পাঠকের কাছে সমস্ত বিষয়টা, প্রাঞ্জল হয়ে ধরা দেয়। অনুবাদকের ভাষারীতি অত্যন্ত সহজ বলে অল্পশিক্ষিত পাঠক ও স্বচ্ছন্দেই রচনার মর্মে প্রবেশ করতে পারেন। বইটির আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—অধ্যাপক, ভ. ভ. তিরের,—ওগানিয়েজফ., অনুবাদক—বিনয় মজুমদার, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রা: লি:, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—এক টাকা পঁচিশ ন: প:।

## আকাশ ও পৃথিবী

অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরা মহাকাশের রহস্য চিরদিনই মানুষের মনে এক অপরিসীম বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে এসেছে, কিন্তু আজকের মানুষ আর শুধু উৎসুকই নয়, মহাকাশের রহস্যভেদে সে অগ্রসরও। সুদীর্ঘ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে মানুষ এক্ষেত্রে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে ও করতে চলেছে তারই এক প্রামাণ্য পরিচয় বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। বর্তমান রচনা এই উদ্দেশে রচিত গ্রন্থমালার প্রথম স্তবক, এতে প্রধানত: আকাশ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বস্তুনিষ্ঠ ও আন্তরিক, প্রভূত শ্রমের সঙ্গে তিনি রচনার মাল-মশলা সংগ্রহ করেছেন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেগুলির সদ্ব্যবহার করেছেন, সন্ধানী পাঠক মাত্রই যে বইটি পড়ে তৃপ্ত হবেন, এ-কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায়। বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধে ও অনুযোগের কিছু নেই। লেখক—মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কো: প্রা:, লি:, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭, দাম—দশ টাকা।

## সামূহিক বিকাশ

স্বাধীন ভারতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি বিশেষ ভূমিকার অধিকারী, এই পরিকল্পনা সমূহের যিনি কর্ণধার স্বভাবত:ই তাঁর চিন্তাধারারও একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, আলোচ্য গ্রন্থে তারই পরিচয় বিধৃত করা হয়েছে। কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করে লেখক তাঁর চিন্তাধারার একটি সংহত রূপ দিয়েছেন, প্রবন্ধগুলি মূলত: ইংরাজী ভাষায় রচিত, আলোচ্য গ্রন্থখানি তারই বঙ্গানুবাদ। সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টার ব্যবহারিক রূপ সমগ্র ভাবেই বিদেশের ছাঁচে ঢালাই হলেও গ্রন্থকারের মতে তাই পর্য্যাপ্ত নয়, এই পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে হলে দেশের সংস্কৃতিকে যে সর্ব্বতোভাবেই অনুসরণ করা উচিত এ বিষয়ে গ্রন্থকার সম্যকরূপেই অবহিত। তাঁর মতে নবভারত রচনায় সাম্যবাদ অপেক্ষা সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী, সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের দিকে চোখ খোলা রেখেই যে কেবল এই সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব, দৃঢ়তার সঙ্গে এই মতই প্রকাশ করেছেন তিনি। সমাজের সত্যকার কল্যাণের পথ কি ভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছেন তিনি। অনুবাদকার বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই তাঁর আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদন করেছেন, যার মূল গ্রন্থের ভাব যথাযথরূপেই পাঠক-মননে দাগ কেটে দেয়। আলোচ্য গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য বললেও তাই অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি। বইটির ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—এস, কে, দে। অনুবাদক—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ধ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কো: (১৯৩৩) প্রা: লি:, কলিকাতা-১। দাম নয় টাকা।

## কাল, তুমি আলেয়া

শক্তিশালী এবং বৈশিষ্ট্যবান এক লেখনীর মূলধন করে বাঙলার সাহিত্য জগতে যাঁদের শুভ আবির্ভাব ঘটেছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই তালিকায় এক উল্লেখযোগ্য নাম। ছোট গল্প ও উপন্যাসের জগতে ইনি এক অভিনব ভাবধারার আঙ্গিয়কের পরিচয় দিয়ে পাঠক সমাজে এক গৌরবময় আসন অধিকার করেছেন। "কাল তুমি আলেয়া"র আখ্যানবস্তুর সঙ্গে আমাদের পাঠক-পাঠিকার অপরিচয় নেই, কারণ দীর্ঘদিন ধরে এর কাহিনীর সঙ্গে মাসিক বসুমতীই তাঁদের মিতালি ঘটিয়েছে। কাল, তুমি আলেয়া সমকালীন মানুষের একটি নিঁখুৎ জীবনদর্পণ বললে অত্যুক্তি হয় না। যে বিচিত্র ধারায় মানুষের চিন্তা ভাবজীবন প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার উৎসমুখ এবং গন্তব্য জীবনরসপিপাসু সার্থকনামা কথাশিল্পীর কাছে অনুদ্ঘাটিত নয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি সন্ধানী। গতানুগতিকতা তাঁকে কখনও আকৃষ্ট করতে পারে নি। অভিনবত্বের উদ্দেশ্যাভিসারের দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে চিরদিনই হাতছানি দিয়েছে। লেখকের লেখনী তাঁর পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনীবিন্যাস, ভাবধারার সম্যক রূপায়ণে তিনি প্রভূত দক্ষতা দেখিয়েছেন। ধীরাপদ ও সোনাবৌদি আধুনিক যুগের সাহিত্যজগতে এক দুর্লভ চরিত্রসৃষ্টি। বিভিন্ন ধারায় কাহিনীকে প্রবাহিত করে একটি লক্ষ্যে তাকে মিলিয়ে দিয়ে লেখক যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির মধ্যে বিবিধ সমন্বয় তার মূলসূত্রকে বিন্দুমাত্র ভিন্নমুখী করে নি, অধিকন্তু তার সুষমাবৃদ্ধি করেছে। তাঁর তীব্র জীবনবোধ, বলিষ্ঠ বক্তব্য এবং অনবদ্য প্রকাশ ভঙ্গীমা সুর মিলিয়ে গ্রন্থটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। আমরা লেখককে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম বারো টাকা পঞ্চাশ ন: প: মাত্র।

## চৌরঙ্গী

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিমধ্যেই, তাঁর এই অধুনাতম রচনা সেই স্বীকৃতিকে দৃঢ়মূল করার দাবী নিয়েই উপস্থিত হয়েছে। কলিকাতা নগরী প্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ প্রাণকেন্দ্র, এই শহর কলকাতারই বুকের এক বিরাট পান্থশালাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বর্ত্তমান গ্রন্থের কাহিনী, সেই পৃথিবী যদি পান্থশালা হয় তবে এ গ্রন্থের রূপায়ণে সেই পান্থশালারই সামগ্রিক রূপটি ধরা দিয়েছে। পান্থশালার কক্ষে কক্ষে চলে কত বিচিত্র মানুষের পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্ত্তে, তাদেরই সুখ দু:খ হাসি কান্নার সার্থক ছবি এঁকেছেন লেখক অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে। জীবনধর্মী শিল্পী তাঁর মনের সমস্ত দরদ দিয়ে মানুষকে দেখেছেন, ভালবেসেছেন, আর তারই স্বাক্ষরে ভাস্বর হয়ে উঠেছে তাঁর রচনা। চরিত্রগুলি এতই জীবন্ত যে, পাঠক মনে তাঁদের জন্য জেগে ওঠে এক অভূতপূর্ব্ব সমবেদনা, পাঠশেষে সমস্ত হৃদয় অনুরণিত হয়ে থাকে এক বিচিত্র অনুভূতিতে, মনে হয় সত্যকার জীবন্ত মানুষের এক মিছিল চলে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

মনে হয় যেন কোন এক মায়াপুরীর বন্ধ দ্বার খুলে গিয়েছে হঠাৎ। এই একাগ্রতা বজায় থাকে পাঠকের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আর এটাই বর্ত্তমান রচনার সবচেয়ে বড় প্রসাদ গুণ। লেখকের আন্তরিকতা ও শিল্পবোধ এ দুটোরই পর্য্যাপ্ত পরিচয়ে আলোচ্য উপন্যাসের প্রতিটি ছত্র সমুজ্জ্বল ও সার্থক। সাম্প্রতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক চিহ্নিত স্থানের অধিকারী। প্রচ্ছদ অতি মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—শংকর, প্রকাশক—বাক্‌-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—দশ টাকা।

## শাহজাদা

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে লেখক অজানা নন, তাঁর অধুনাতম এই উপন্যাস নানা কারণেই উল্লেখ্য। ঐতিহাসিক পটভূমিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে বর্ত্তমান গ্রন্থের কাহিনী, বিখ্যাত মোগল সম্রাট আলমগীর বা আওরংজেব এর মুখ্য চরিত্র। হিন্দুবিদ্বেষী কূট রাজনৈতিক আওরংজেবকে এক নতুন ভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন লেখক এই গ্রন্থে, সে ভূমিকা বিশ্বস্ত প্রেমিকের। বাদশা আলমগীর যখন মাত্র শাহজাদা আওরংজেব, সেই সময়কার কয়েকটি রঙীন মধুর দিনের ইতিহাস বিধৃত করেছেন লেখক। লেখকের আন্তরিকতায় কল্পিত কাহিনীতে জীবনের স্পর্শ লেগেছে, চরিত্রাঙ্কনের নিপুণতায়, চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। নায়িকা হীরাবাইকে লেখক দেখিয়েছেন চিরন্তনী এক নারী রূপে, প্রেমের মহিমা ও গরিমা যেন পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে এই চরিত্রটির মাধ্যমে। অনবদ্য এই উপন্যাসের ভাষারীতি সম্বন্ধেই যা দু' একটি কথা বলার থেকে যায়। বিষয়বস্তুর সমতা রক্ষার্থে লেখকের বাচনভঙ্গী আর একটু সমৃদ্ধ হলেই ভাল হত, ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সম্পন্ন পাত্রপাত্রীর গুরুত্ব তাতে আর একটু বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বারীন্দ্রনাথ দাশ। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—নয় টাকা।

## বায়ুমণ্ডল

আলোচ্য পুস্তকটি বিদেশী ভাষার অনুবাদ। পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ বা বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সুসংহত আলোচনা করা হয়েছে এতে। বায়ু, জীবনের পক্ষে এক অপরিহার্য্য সম্পদ, হাওয়া না থাকলে জীবন ও অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য, এই অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক। পৃথিবীর বায়বীয় পরিমণ্ডল, তার কার্য্যকারিতা, তার প্রকৃতি এ সবেরই এক প্রামাণ্য পরিচয় বিধৃত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু জন বইটি হাতে পেয়ে খুশী হবেন বলেই মনে হয়। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—এম· ইলিন, অনুবাদ—প্রতিভা গাঙ্গুলী, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দুই টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

## উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে

সাম্যবাদের গুরু কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কয়েকটি রচনা ও মতবাদ বিধৃত হয়েছে বর্ত্তমান গ্রন্থে। উপনিবেশিকতার পেছনে যে দমননীতি ও পুঁজিবাদী আদর্শ উপস্থিত রয়েছে তাকেই কঠোরভাবে আক্রমণ করা হয়েছে ও বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। উপনিবেশিকতা যে শোষণেরই রূপান্তর মাত্র এই কথাটাই আলোচ্য সংকলন গ্রন্থের প্রবন্ধকারদের মূল বক্তব্য, উপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের মূল চেহারাও এখানে উদ্‌ঘাটিত। ভারতে বৃটিশ শাসনের কালে তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন ও বিক্ষোভ সুরু হয়, পৃথিবীখ্যাত সাম্যবাদী কার্ল মার্কসের দৃষ্টি তার প্রতি আবদ্ধ হয়েছিল এবং সে সময়ে এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি New-York Daily Tribune নামক সংবাদপত্রে লেখেন, সেই রচনাগুলির কয়েকটিও আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কয়েকটি প্রবন্ধ আছে চীনের উপর। বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তম সমস্যা নিয়েই আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধকারদ্বয় আলোচনা করেছেন ও বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর একমাত্র বাঁচবার পথ বলেই সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আলোচ্য গ্রন্থটিকে যুগোপযোগী বলে অভিহিত করা চলে স্বচ্ছন্দেই। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চমানের। লেখকদ্বয়—কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। প্রকাশনা—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল প্রকাশক—বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়। ২১ জুবভস্কি বুলভার, মস্কো সোভিয়েত ইউনিয়ন, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

## অনুভব

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি সংক্ষিপ্ত কাব্য প্রয়াস। পঁচিশটি ছোট ছোট কবিতা একত্রে গ্রথিত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক পুরাতন শৈলীর অনুসারী, কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকটি রচনা একটা সহজ মাধুর্য্যে মণ্ডিত হয়েই পাঠকমনকে স্পর্শ করে। সরল এক চিন্তাধারায় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় কয়েকটি কবিতার মধ্যে, আর সেটাই তাদের আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কবি যে খানিকটা সমাজ সচেতন সেটাও প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি রচনার মাঝে। আশা করি তাঁর এই কাব্য প্রচেষ্টা পাঠকের সমাদর লাভে বঞ্চিত হবে না। ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীরাধানাথ সিংহ। প্রকাশক—পুস্তক, ৮/১ বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিঃ—১২, দাম—দুই টাকা।

**Men best show their character in trifles, where they are not on their guard—it is in insignificant matters and in the simplest habit that we often see the boundless egotism which pays no regard to the feeling of others and denies nothing to itself.**

***—Schopenhaur.***

তিন বন্ধু

—মোহিতময় দে

মধুসঞ্চয়

—চিত্ত মণ্ডল
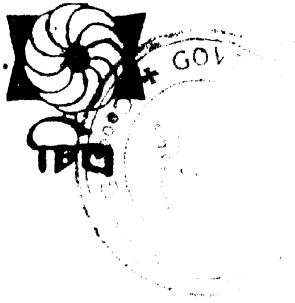
[ মনে রাখবেন যে, ছবি গ্লসি কাগজে ছাপা (print) হলে ছাপার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধে হয়। ]

সাদা গোলাপ

—কুলদাচরণ সরকার

বিশ্রাম

—নীহাররঞ্জন ঘোষ

শিকারী —আশুতোষ সিনহা

অন্তহীন পথ

—শ্রীমতী কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

[ ছবি পাঠানোর সময় ছবির পিছনে নাম, ঠিকানা, ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না। ]

দিল-ওয়ারা ( আবু ) —নারায়ণ সাহা

লক্ষ্মী-জনার্দন ( ভুবনেশ্বর ) —হিরক সাহ
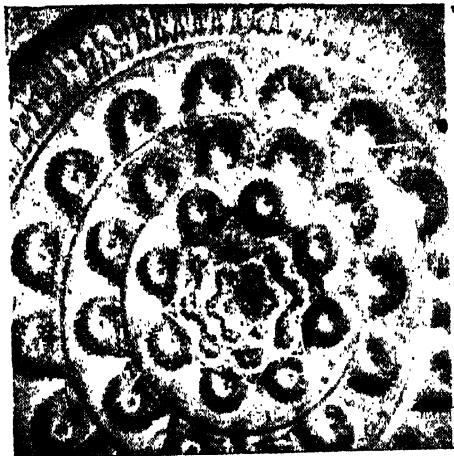
কোণারকের শিল্প —চিত্ত নন্দী
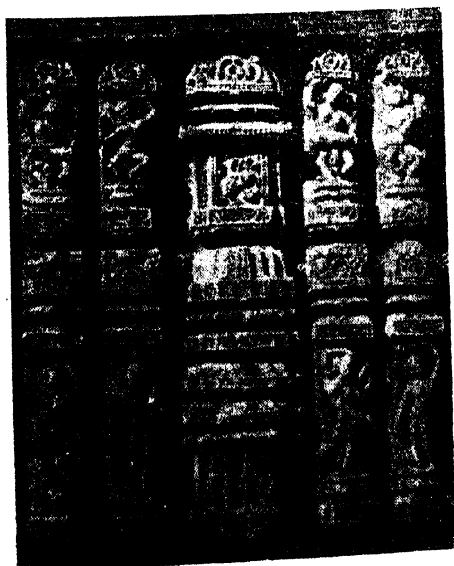
আসল না নকল ? —শান্তিময় সান্যাল

মাঙ্গলিকী —অজিত চট্টোপাধ্যায়

গৃহস্থালী —রথীন রায়

তেপান্তর —অশোক দাশগুপ্ত

জুতা-ব্রুশ —দীপক ঘোষ

# কোথায় বেড়াতে যাবেন ?

সমর চট্টোপাধ্যায়

খোসবাগে নবাব আলীবর্দী খাঁর সমাধি

## মুর্শিদাবাদ

যাঁরা বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের অমর কাহিনী শুনতে ভালবাসেন, প্রাচীন যুগের স্থাপত্যশিল্পের চমৎকার নিদর্শন দেখার জন্যে যাঁরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের বলব এবার একবার মুর্শিদাবাদ ঘুরে আসুন। বহু স্মৃতি বিজড়িত মুর্শিদাবাদের মাটি আজও যেন কথা বলে; নবাব বাড়ীর সিংহদ্বারের চূড়ায় সানাইয়ের শেষ রাগিণীতে আজও যেন ভেসে আসে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের অব্যক্ত কাহিনী; যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মাটির বুকে, খোদিত হয়ে আছে প্রাসাদে, মসজিদে, দুর্গে আর শত শত স্মৃতি-স্তম্ভের বুকে।

বেশীদূর নয়, কোলকাতা থেকে মাত্র ১২২ মাইল দূরে এই মুর্শিদাবাদ সহর। কোলকাতা থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চড়লে ৭ ঘণ্টার মধ্যেই মুর্শিদাবাদ পৌঁছে যাওয়া যাবে। এখানে থাকাই যা অসুবিধে; তেমন ভাল হোটেল নেই যে বলব ঐ হোটেলে গিয়ে উঠুন; তবু যা দু'একটা আছে মন্দের ভাল। সবচেয়ে ভাল হয় মুর্শিদাবাদ আসার পথে বহরমপুরে যদি নামেন। বহরমপুরে থাকার ভাল হোটেলও আছে; জেলার হেড কোয়ার্টার; কাজেই আশা করতে পারা যায়, সরকারের কর্মচারীদের কাছ থেকে মুর্শিদাবাদ ও তার আশে পাশের প্রাচীন কীর্তিগুলি দেখার গাইড হিসেবে কিছু সুযোগ সুবিধে পাওয়া যেতে পারে। বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদ মাত্র ৬ মাইল।

ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত এই মুর্শিদাবাদ সহরটি প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ এক সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল। মুর্শিদাবাদ সহরের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদ আছে। টিফেনথালারের মতে এই সহরটি আকবরের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই যুক্তির কিছুটা সমর্থন মেলে; কেন না মুর্শিদাবাদের পুবদিকে আককরপুর নামে একটি জায়গা এখনও আছে। কিন্তু ইতিহাসের যে সব প্রাচীন তথ্য আছে তার মধ্যে এই জায়গাটির নাম কোথাও উল্লেখ নেই। ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ আছে মাখসুসাবাদ অথবা মাখসুদাবাদ। রিয়াজসালাতিন বলেছেন মাখসুসখান নামে একজন বণিক ঐখানে একটি সরাই নির্মাণ করেন; তিনি সংপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁর ভাই সৈয়দখান তখন আকবরের আমলে (১৫৮৭-৯৫ খৃঃ) বাংলার গভর্ণর ছিলেন। মাখসুসখানের নামেই সম্ভবতঃ ঐ জায়গাটির তখন নামকরণ করা হয়। আবার একথাও উল্লেখ আছে একজন যবন মোরাসুদাবাদ সহরের পত্তন করেন।

রেনও বলেছেন, এই সহরের প্রাচীন নাম ছিল কোলারিয়া; এই কোলারিয়াতেই মুর্শিদকুলি খাঁর বাসভবন ছিল। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে আফগান হানাদাররা এই সহরটি দখল করে নেয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বাংলার তদানীন্তন দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে তাঁর দেওয়ানী এই সহরে নিয়ে আসেন এবং তিন বছর তাঁর নামানুসারে এই জায়গার নামকরণ করা হয় মুর্শিদাবাদ। তারপর থেকেই নবাবরা আধুনিক ধাঁচধরণের বড় বড় বাড়ী, উদ্যান, সরোবর তৈরী করে এই রাজধানীটিকে মনোরম ভাবে সাজিয়ে তুলে নিজেদের সৌখীনতার পরাকাষ্ঠা দেখান। নবাবদের শাসনকালে মুর্শিদাবাদ সহর একবারও যুদ্ধের কবলে পড়েনি। মীর হাবিবের নেতৃত্বে মারাঠাগণ একবার মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে; কিন্তু তারা সহরে ঢুকতে পারেনি; সহরতলীতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে তারা লুঠতরাজ করেছিল, এমন কি জগৎ শেঠের প্রাসাদ থেকেও অমূল্য ধনসম্ভার লুঠ করে তারা নিয়ে যায়।

মারাঠারা ইচ্ছে করলে তখন মুর্শিদাবাদ সহরে হানা দিতে পারতো কেন না তখন সহরটি সুরক্ষিত ছিল না; মারাঠাদের আক্রমণের ভয়ে তখন অনেক অধিবাসীই মুর্শিদাবাদ ছেড়ে নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল। পলাশী যুদ্ধের পরও কয়েক বছর মুর্শিদাবাদ শাসন পরিচালনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংসই বড় রকমের পরিবর্তন আনলেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় নিয়ে এলেন। একে একে সবই গেল, শেষ পর্যন্ত মীরজাফরের বংশধর নবাব নাজিমের বাসভবন ছাড়া আর কিছু শাসন ব্যবস্থা রইল না। তাকে বছরে ষোল লক্ষ টাকা পেনসেন দেওয়া হ'তো। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শেষ নবাব নাজিম সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁর পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত করলেন, কিন্তু তাঁর পেনসেন কমিয়ে দেওয়া হল এবং শাসন পরিচালনায় তাঁর কোন ক্ষমতাও রইল না। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সেদিনকার শেষ স্বাধীন নবাবের বংশধর যাঁরা রইলেন তাঁদের শুধু এইটুকুই পরিচয় রইল

'মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর।' বর্তমান নবাব বাহাদুরের বাৎসরিক পেনসেনের পরিমাণ হ'ল তেইশ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মাসে ১৯১৬৬ টাকা। নবাব বাহাদুর ছাড়াও, নবাব নাজিমের পুত্র এবং অন্যান্য নবাব পরিবারের ছাব্বিশ জনকে এখনও পেনসেন দেওয়া হয়ে থাকে।

এইবার আসুন এই শহরের প্রাচীন কীর্তিগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনা দেবারও চেষ্টা করবো। প্রথমেই চলুন নবাব বাহাদুরের প্রাসাদে। বর্তমান নবাব হলেন ওয়ারিস আলি মীর্জা আমিরুল ওমরাহ; তাঁর ছোট ভাই কাযেজআলি মীর্জা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান উপমন্ত্রী। প্রাসাদটির নাম হাজার-দুয়ারী অর্থাৎ এক হাজারটি দরজা এই প্রাসাদে আছে। প্রধান সিংহদ্বার দিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। এই সিংহদ্বারের নাম হল ত্রিপোলিয়া তোরণ। এই তোরণের দ্বিতলের কক্ষে বসে ওস্তাদ সুরশিল্পীরা সানাইয়ে যে মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করতেন প্রহরে প্রহরে, বহু দূর-দূরান্তের মানুষকেও তা পাগল করে তুলতো; আজও তার কিছু রেশ পড়ে আছে; দু'টি বাঁশী দু'টি ড্রাম নিয়ে ভাঙ্গা হাটে আজও ঝঙ্কৃত হয় নবাব পরিবারের শেষ রাগিণী।

প্রাসাদের এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের সঙ্গে আগেকার দিনের তুলনা করে কোন লাভ নেই। শুধু জানবার চেষ্টা করুন সেদিনকার নবাবদের বিলাস চরিতার্থতার জন্যে কি অপূর্ব সুরুচির তাঁরা পরিচয় রেখে গেছেন। ভাগীরথীর পূব তীরে এই বিশাল প্রাসাদটি ইতালীয় স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে বলে কোন কোন মহল থেকে দাবী করা হয়। প্রাসাদটির নক্সা প্রস্তুত করেছিলেন স্যার ডোগল্ড ম্যাকলিয়ডের পিতা জেনারেল ডানকান ম্যাকলিয়ড। ১৮২৯ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং ম্যাকলিয়ডের তত্ত্বাবধানে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। প্রাসাদটি তৈরী করতে মোট খরচ পড়ে ত্রিশ লক্ষ টাকা ও তখনকার দিনে রাজমিস্ত্রীর মজুরী ছিল দৈনিক দু' আনা। তিন তলা এই প্রাসাদটির উচ্চতা হবে ১২০ ফুট, দৈর্ঘ ৪২৫ ফুট ও প্রস্থ ২০০ ফুট। চলুন ঐ দিকে প্রাসাদে যাবার সিঁড়ি; ৩৫টি সিঁড়ি বেয়ে হাজার দুয়ারীর বারাণ্ডায় উঠে এসে দাঁড়ান, সামনে ভাগীরথী আর আশেপাশের মনোরম পরিবেশ বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখুন। সিঁড়ির দু'পাশে রয়েছে দুটি ঐতিহাসিক কামান। যে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছেন এর তলায় ঘর আছে কয়েকটি; নবাবদের তোষাখানা; অর্থাৎ সাজ-সরঞ্জাম, গোলা বারুদের গুদাম, অফিস আর প্রাচীন নথিপত্র এখানে রাখা হতো। এর উপর তলায় অর্থাৎ দ্বিতলে দরবার হল, খানাপিনার হল, ড্রয়িং রুম, বসবার ঘর ও বিলিয়ার্ড খেলার ঘর। একে একে এগুলি দেখুন তারপর তিন তলায় উঠে আর সব দেখবেন। দরবার হল বা সভাকক্ষটি এখনও ঝকঝক চকচক করছে।

ওপরের গম্বুজটি দেখবার মতো। ঐ সভাকক্ষে ঐ মর্মর সিংহাসনটি মুর্শিদকুলি খাঁর। এই ঘরে মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র সরফরাজের রৌপ্য সিংহাসন ও সিরাজউদ্দৌলার রজত সিংহাসনও ছিল। বেদীর ওপর ঐ চন্দ্রাতপটি কিংখাবের। দরবার হলটি এমন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে মেঝেতে যদি একটি আলপিনও পড়ে তার আওয়াজ উপরতলায় গিয়ে পৌঁছবে। উপরের অলিন্দের চারদিকে চারটি ঝরোকা বিশিষ্ট কক্ষ আছে। এই ঝরোকা দিয়ে বেগম ও শাহাজাদিগণ সভার কাজ পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সভার প্রতিটি কথা তাঁরা শুনতে পেতেন। সভাকক্ষে যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁরা কেউ উপর দিকে তাকিয়েও বেগমদের দেখতে পেতেন না।

এইবার একে একে প্রসাধন ঘর, নাচঘর ও ভোজনকক্ষগুলো দেখুন। ঘরগুলি যেমন বড় তেমনি বাহার। ঘরগুলির প্রত্যেকটি ১৯০ ফুট দীর্ঘ, ২৭ ফুট প্রস্থ। এটি হ'ল নবাবদের ভোজনকক্ষ;—দেওয়ালের গায়ে গোটা বারো থালার মতো ওগুলো কি জানেন? নবাবদের খাবার দাবারে বিষ মেশানো আছে কিনা-তা এই থালায় পরীক্ষা করে নেওয়া হতো। একটা কথা এখানে জানিয়ে রাখি;—প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষে মূল্যবান সুদৃশ্য যে সব আসবাবপত্র দেখছেন তার অধিকাংশই মেহগিনী ও সেগুন কাঠের তৈরী। ইতালীয় মার্বেল টেবিল, বেলজিয়াম কাঁচের আয়না,—ফ্রান্স ও জার্মানীর দামী—চিনামাটির সৌখীন দ্রব্যসম্ভার নিশ্চয়ই আপনার চোখ এড়িয়ে যাবে না। দেওয়ালে দেওয়ালে ঝলানো চিত্রসম্ভার দেখেও নিশ্চয়ই আপনি মুগ্ধ হবেন। এটি হল ড্রয়িং রুম বা বৈঠকখানার ঘর। মেঝেতে পাতা রয়েছে যে সুন্দর মসৃণ গালিচাটি তা আনা হয়েছে পারস্য থেকে, এর কারুকার্য দেখবার মতো। ৫০ ফুট দীর্ঘ আর ৩০ ফুট চওড়া এতো বড় গালিচাটিতে কোথাও জোড় নেই; শুনেছি এই গালিচাটির দাম নাকি এক লক্ষ টাকা। দেওয়ালের ছবিগুলির পরিচয় পরে দেবো।

কক্ষে কক্ষে যে ঝাড় লণ্ঠনের বাহার দেখছেন মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের বাড়ীতে বাড়ীতে শতবর্ষ বা তার পূর্বেও এগুলি শোভা পেতো। করিডোরের মাদুরগুলি মেদিনীপুর থেকে আনা হয়েছে। পাশেই এই যে ছোট ঘরটি এটি হ'ল মন্ত্রকক্ষ। দেওয়ালে টাঙ্গানো আয়নাখানারও একটু বৈচিত্র্য আছে—সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের ছায়া ওতে দেখা যাবে না। একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে কোণাকুণি দাঁড়িয়ে নিজের ছবি ওতে দেখা যাবে। আর একটি রহস্যময় ঘর হল চীনাকক্ষ। এই কক্ষে সাজানো আছে সৌখীন চীনামাটির অজস্র বাসন পত্র। বাসনগুলির গায়ে সোনার ও রূপোর জলে আঁকা বিচিত্র নক্সাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার মতো। বারাণ্ডা দিয়ে যেতে যেতে কাঁচের আধারে রাখা চন্দনকাঠ, মার্বেল পাথর ও শঙ্খের তৈরী জীবজন্তুগুলোর নিখুঁত কারুকার্য আপনার অনুসন্ধিৎসু চোখ নিশ্চয়ই এড়িয়ে যাবে না।

প্রাসাদের একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হল—বহু মূল্য গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারটি ঘুরে ঘুরে দেখার সময় নবাবদের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতে হয়। বর্তমানে ভাল ভাবে সংরক্ষিত না হলেও অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারে আছে।

ফার্সি ও আরবী মূল্যবান গ্রন্থরাজী ছাড়াও বৈদেশিক লেখকদের লেখা ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্যসম্পর্কিত বইও এখানে আছে। স্বর্গত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বহুদিন এই গ্রন্থাগারে এসে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। মুর্শিদকুলি খাঁর স্বহস্তে লেখা কোরাণও এখানে আছে। হাজার দুয়ারীর ভূতলে এই গ্রন্থাগার কক্ষ ও চীনা কক্ষটি ছাড়াও নাচের ঘর ও শয়নকক্ষ কৌতূহল হ'লে দেখে যেতে পারেন। উপরের বারণ্ডার ঝরোকা দিয়ে দরবার হলটি

একবার দেখে নিন ; যে বিরাট সুদৃশ্য ঝাড়লণ্ঠনটি ঝুলতে দেখছেন ওটিতে ১০১টি শাখা আছে। এইবার নবাববাড়ীর যাদুঘরটি একবার দেখে নেওয়া যাক্। *এখানে রয়েছে যে ১২-১৬ ফুট কুমীরের কঙ্কালটি সেটি নাকি এই ভাগীরথী থেকেই শীকার করা হয়েছে। কচ্ছপের কঙ্কাল, বংশগণ্ড, গৌড় থেকে আনা কারুকার্যময় কষ্টিপাথরের চৌকাঠ। বিদেশের বাইসন্ নামে এক জন্তুর খোলসও এখানে আছে।

হাজার দুয়ারী ত্যাগ করার পূর্বে নীচের তলায় অস্ত্রাগারটি একবার দেখে যাওয়া যাক। নীচে যাবার আগে নবাব প্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে যে সব মূল্যবান ছবি রয়েছে সেগুলির একটু পরিচয় জেনে রাখা ভাল। যাঁরা অবশ্য শিল্পী তাঁরা প্রাণভরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলি দেখবেন। র‍্যাফেল ও মার্শালের আঁকা বৃন্দাবনের তৈলচিত্র ছাড়াও ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা চিত্রও এখানে আছে। বিশ্ববিখ্যাত রাপের আঁকা হুমায়ুন জাঁহার ও নবাবজাদাদের খানকয়েক ছবি মনে হয় যেন এখনও সজীব। মুর্শিদাবাদের প্রথম নবাব নাজিম মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সুরু করে শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুন জাঁহা পর্যন্ত ষোল জন স্বাধীন ও আধাস্বাধীন নবাবের পূর্ণাবয়ব চিত্র এখানে আছে। কোন বেগমের ছবি এখানে নেই, শুধু গোয়ালিনী বেগম ছাড়া। গোয়ালিনী বেগম সিহারী ; প্রতিদিন নবাবদের জন্যে টাটকা দুধ নিয়ে একেবারে অন্তঃপুরে চলে যেতেন। গোয়ালিনী হলেও তাঁর স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর, রূপের লাবণ্য ছিল অপরূপ। দুধ দিতে এসে একদিন হুমায়ুন জাঁহার নজরে পড়লেন তিনি ; হুমায়ুন মুগ্ধ হলেন তাঁর রূপে ; গয়লানী হলেন নবাবের বেগম। এই বেগমের একখানি ছবি প্রাসাদে আছে। মহীশূরের রাজা টিপুসুলতানের ছবিটিও দেখার মতো।

এবার চলুন নীচে গিয়ে অস্ত্রাগারটি দেখে আসি। এই অস্ত্রাগারে সিরাজউদ্দৌলার ব্যবহৃত অসি, বর্ম, নাদিরশাহের শিরস্ত্রাণ বর্মও এখনও আছে। ছোট-বড় নানা আকারের কামান ছাড়াও নবাবদের ব্যবহৃত ছুরিকা, দোনলা থেকে সুরু করে সাতনলা বন্দুকও এখানে রয়েছে। এখনও এগুলিতে তেল মাখানো হয় ; মরচে যাতে না ধরে তার জন্যে মাঝে মাঝে পরিষ্কারও করা হয়। এগুলি সবই নবাব পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি। ঐ যে দেখছেন চার ফুট দীর্ঘ তরবারিটি ওটি সিরাজ নিজে ব্যবহার করতেন। দিল্লী থেকে আনা অষ্টধাতুর চারটি কামানও এখানে আছে। এ ছাড়া আরও বহু যুদ্ধাস্ত্র এখানে আছে। যেগুলি মুঙ্গের, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে তৈরী হয়েছিল। ঐ যে কাঁচের আধারে ছুরিকাখানি দেখছেন ঐটি দিয়েই মহম্মদ বেগ সিরাজউদ্দৌল্লাকে হত্যা করেছিল। ঐ যে ভগ্নপ্রায় কামানটি দেখছেন ঐটি একসময় অকস্মাৎ বিস্ফারিত হয়ে সেনানায়ক মীরমদনের মৃত্যু ঘটিয়েছিল।

যে সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে এই হাজারদুয়ারী রয়েছে, সেটি নিজামৎ কিলা নামে পরিচিত। শুধু হাজারদুয়ারী দর্শন করলেই সব দেখা হ'লো না। এই নবাব প্রাসাদটি ছাড়াও নিজামৎ কিলার আর সব দর্শনীয় বস্তু হচ্ছে ইমামবাড়া, মেডিনা, ঘড়িস্তম্ভ, তিনটি মসজিদ ও আরও কয়েকটি বাড়ী। আগে চলুন ইমামবাড়াটি দেখে আসি। নবাবপ্রাসাদের উত্তর দিকে ১৮৪৭ সালে এই ইমামবাড়াটি নির্মাণ করা হয়। বাংলা দেশের মধ্যে এইটেই সবচেয়ে বড় ইমামবাড়া। এর সামনের অংশটি ৬৮০ ফুট এবং তিনটি ব্লকে বিভক্ত। সিরাজউদ্দৌল্লা যে ইমামবাড়াটি তৈরী করেছিলেন সেটি ১৮৪০ সালে আগুন লেগে পুড়ে যায় ; তার এক দশমাংশ কোনরকমে রক্ষা পায় ; সেইটেই আবার নতুন করে তৈরী করা হয়েছে।* সিরাজ যে ইমামবাড়াটি তৈরী করেছিলেন তার তুলনা নেই, সারা হিন্দুস্থানেও তার জুড়ি পাওয়া যায় না বলে রিয়াজু সালাতিন বর্ণনা করেছিলেন। ইমামবাড়ার পাশেই ঐ বিরাট তোপটি 'বাচ্চাওয়ালি' তোপ নামে খ্যাত। দ্বাদশ অথবা চতুর্দশ শতকে এই তোপটি নির্মিত হয়েছে। কথিত আছে যখন এই কামান থেকে তোপধ্বনি হতো তার প্রচণ্ড আওয়াজে কয়েক মাইলের মধ্যে বসবাসকারী গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সন্তান অকালে ভূমিষ্ঠ হয়ে যেতো।

নবাব প্রাসাদের পূব দিকে প্রায় দেড় মাইল দূরে ইচ্ছে করলে তোপখানা দেখে আসতে পারেন। সহরে ঢোকবার পূবদিক থেকেই এইটে প্রবেশ পথ, সেইজন্যেই নবাবদের সেনাবাহিনীর একটি শিবির এখানে ছিল। এই শিবিরের আর একটু পূবে গোবরা নালা বা খাটরা বিল। সাড়ে ১৭ ফুট দীর্ঘ একটি কামানও এখানে আছে। সাজাহানের রাজত্বকালে এই কামানটি তৈরী হয়েছিল, এর ওজন হবে ২১২ মণ ; ঐ কামান থেকে একটি তোপধ্বনিতে ২৮ সের বারুদ লাগতো। এখান থেকে আরও কিছুটা উত্তর পশ্চিমে গেলে খাটরা মসজিদ ; মুর্শিদকুলি খাঁ এই মসজিদটি নির্মাণ করান এবং এইখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মস্ত বড় দেখবার মতো মসজিদ ছিল এটি। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এই মসজিদটির কিয়দংশ ধ্বংস হয়ে যায়। গম্বুজগুলির মধ্যে মাত্র দুটিকে সংস্কার করা হয়েছে, বাকীগুলি এখনও ভাঙ্গা অবস্থাতেই রয়েছে।
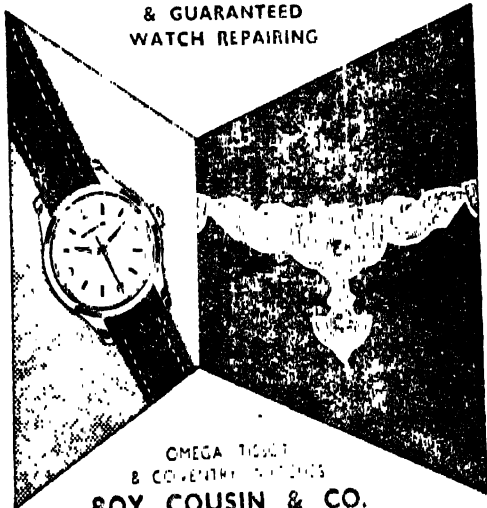
এবার চলুন বিখ্যাত মতিঝিল দেখে আসি। নবাব প্রাসাদের দক্ষিণপূব দিকে প্রায় দেড় মাইল দূরে এই মতিঝিল। এই ঝিলের স্বচ্ছ নীল জলে যেন মুক্তা ঝরে। ঘোড়ার ক্ষুরের আকারের দীর্ঘকায় এই ঝিলটির উৎসস্থল কোথায় তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। ভাগীরথীর এটি একটি খাল ছিল বলে রেণেল তাঁর অভিমত দিয়েছেন। এই মতিঝিলের আঁকে-বাঁকে সঙ্গীদালান নামে একটি প্রাসাদ, একটি মসজিদ ও আরও কয়েকটি বাড়ী ছিল। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে কালো পাথর এনে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। নওয়াজিস খাঁয়ের মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণী ঘষেটি বেগম এই প্রাসাদে বাস করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিরাজউদ্দৌলা ঘষেটি বেগমকে এখান থেকে বিতাড়িত করে প্রাসাদ অধিকার করেন এবং ধনদৌলত দখল করে নেন। ১৭৬৩ সালে ইংরাজ সেনাদের সঙ্গে মীর কাশিমের সেনাদের এখানে একটি যুদ্ধও হয়েছিল। এই মতিঝিল প্রাসাদেই লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৬ সালের মে মাসে প্রথম ইংরাজী পুণ্যোৎসব করেন। মতিঝিলের সবই এখন ধ্বংসের মুখে। সঙ্গীদালানের ভিতটা এখনও জেগে আছে। কত যে ফল ও ফুলের গাছ ছিল এখানে তা সবই গেছে। মতিঝিলের সৌন্দর্য এক সময় দেখবার মত ছিল, ভূ-কৈলাস বা বিশ্বের স্বর্গ বলেও এই জায়গাটিকে অভিহিত করা হত। মতিঝিলের পূবদিকেই মুবারক মঞ্জিল—নবাব বাহাদুরের চিত্তাকর্ষক বাহারী বাগান। এক সময় এখানে নিজামৎ আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালত ছিল। নবাব হুমায়ুন ঝা ১৮৩১ সালে বাড়ীটি কিনে নেন। তিনিই এখানে মনোরম উদ্যানটি করেন এবং যে বাঙলোটি তৈরী করে যান তার নাম দেওয়া হয় লাল বাঙলো। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে নবাব নাজিমের মসনদটি ছিল; সেই মসনদটি এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আছে।

কাছাকাছির মধ্যে ইচ্ছে করলে বংশবাড়ী বিলের ধারে আফজলবাগ, আমবাগান যদি দেখতে চান তো চুনাখালি আর বড় বড় দেবদারু ও মেহগিনী গাছের সারির সৌন্দর্য দেখতে চান তো নিশাতবাগ ঘুরে আসতে পারেন।

এবার চলুন নবাব প্রাসাদের দিকে আবার ফিরে যাই। প্রাসাদের উত্তরে মাইলখানেক দূরে জাফরগঞ্জে যেখানে সিরাজকে হত্যা করা হয়েছিল সে জায়গাটি একবার দেখা দরকার। নিজামৎ সমাধির ঠিক বিপরীত দিকে দেউড়িতে মীরজাফরের প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদের হলটি ইমামবাড়ার এবং মীরজাফরের বাসভবনটি পরে মহলসরাইএ রূপান্তরিত করা হয়। পলাশী যুদ্ধের আগে এইখানেই মীরজাফরের সঙ্গে ওয়াটসের গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওয়াটস্ তখন পর্দানশীন স্ত্রীলোক সেজে পাল্কী চড়ে ছদ্মবেশে এই প্রাসাদে এসেছিলেন। এই দেউড়ীতেই মীরজাফরের পুত্র মীরণের চক্রান্তে সিরাজকে পরে হত্যা করা হয়। সিরাজ তিনদিন অভুক্ত একটি নিমগাছে হেলান দিয়ে কোরাণ পাঠ করছিলেন; এমন সময় মহম্মদ একটি ধারালো ছোরা নিয়ে অতর্কিতে সিরাজকে আক্রমণ করে। সিরাজের গা থেকে রক্ত ফিন্‌কী দিয়ে বেরিয়ে গাছটিকেও রক্তাক্ত করে দেয়। সে রক্তের বিন্দু বহুদিন গাছটিতে ছিল। গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে, গাছের গুঁড়িটি এখনও আছে এবং এই গাছের পাশে আরও দু'একটি গাছ সাক্ষী স্বরূপ এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

যে মহলে সিরাজকে এই ভাবে নৃশংস হত্যা করা হল সেটি 'নিমকহারাম' মহল নামে পরিচিত। কথিত আছে সিরাজ সাংঘাতিক আহত হয়েও ঐ মহলেরই একটি ঘরে ছুটে চলে গিয়েছিলেন এবং সেই ঘরেই নাকি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সে ঘরটির কোন চিহ্ন অবশ্য এখন আর নেই। যেদিন সিরাজকে হত্যা করা হয় তার ঠিক তিন বছর পরেই মীরণ বজ্রাঘাতে মারা যান। সিরাজ নিহত হবার পর জাফর আলি খাঁ সিংহাসনে বসেছিলেন বটে, কিন্তু বেশীদিন ভোগ করতে পারেন নি। মীরজাফর যে প্রাসাদে বাস করতেন সেটি বহুদিন আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, এখন ঐ একটিমাত্র স্তম্ভ রয়েছে বোধ হয় বিশ্বাসঘাতকতার শেষ স্মৃতি। মীরজাফর কুষ্ঠ রোগে মারা গিয়েছিলেন বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করে গিয়েছেন।

জাফরগঞ্জের বিপরীত দিকে আর একটু এগুলেই প্রমোদ উদ্যান হীরাঝিল পাওয়া যাবে। এখানে সিরাজ যে প্রাসাদটি নির্মাণ করেন তার অনেক মাল-মশলা গৌড় থেকে আনা হয়েছিল। নদীগর্ভে সে সব চলে গিয়েছে। জাফর গঞ্জ থেকে আর একটু উত্তরে গেলে নসীপুরের রাজবাড়ী; নসীপুরের মহারাজা রঞ্জিৎ সিং এই প্রাসাদে বাস করতেন।

সংরক্ষণের অভাবে মুর্শিদাবাদের সৌন্দর্য ও প্রাচীন অসংখ্য কীর্তিকলাপ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ফলে যাঁরা এখানে বেড়াতে আসেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা বিভ্রান্ত হন।

চলুন ভাগীরথীর ওপারে খোসবাগ দেখে মুর্শিদাবাদ দর্শন আপাততঃ শেষ করি।

খোসবাগের বিস্তীর্ণ বাগিচার মধ্যে যে সমাধিস্থল, সেখানে শায়িত আছেন আলিবর্দী খাঁ। তাঁর দৌহিত্র সিরাজের রক্তাক্ত দেহও এখানে সমাধিস্থ করা হয়। এই দুই বীরের সমাধিস্থল দেখার জন্যে এখনও দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শকের সমাগম হয়। স্মৃতি-সৌধের দিকে যাবার রাস্তাটি কাঁচা মাটির; বর্ষাকালে এ পথ দিয়ে হাঁটাই দুষ্কর। এখনও এই সমাধির উপর বনফুলের মালা পড়ে এবং খোসবাগের বিস্তীর্ণ আম্রকুঞ্জের তলায় বসে পথিকরা শান্তির সন্ধান পায়। সিরাজের পদতলে লুৎফার সমাধি আগন্তুকদের মনে প্রেম, প্রীতি ও করুণার উদ্রেগ করে।

মুর্শিদাবাদের আশেপাশে আরও কিছু দেখার আছে। সময় থাকলে তা দেখে আসতে পারেন। বিশেষ করে বহরমপুর, সাগরদীঘি, কাশিমবাজার, খাগড়াবাজার, রাঙ্গামাটি সবই দেখবার।

[ পরের বার বিষ্ণুপুর চলুন ]।

**Leisure is gone, gone where the spinning wheels are gone, and the peddlers who bought bargains to the door on sunny afternoons.**

***—George Eliot.***

সুনীলিমা ঘোষ

হাসপাতাল। যেমন বিরাট তেমনি সুন্দর। ফুল দিয়ে সাজানো, সবুজ মোজেক দিয়ে বাঁধানো। বাইরেটা দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে গেল, ভেতর দেখে হলো বিস্মিত। এ বিস্ময় হাসপাতালের নার্স। মনে হয় ও যদি না থাকত হাসপাতালের সৌন্দর্য্য যেন এমন করে প্রস্ফুটিত হ'ত না। সবুজ মোজেকের ওপর সাদা জুতো, সাদা সাড়ি, সাদা এ্যাপ্রন পরে ওর চমৎকার মুখখানি নিয়ে ও যখন ঘুরে বেড়াত, মনে হতো হাসপাতালের কল্যাণী মূর্ত্তিমতী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকে অবাক হতো এত সৌন্দর্য্য নিয়ে ও কেন নার্স হলো। ওর আশ্চর্য্য করুণ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রুগীরা নিজেদের দুঃখ ভুলে ভাবতো, ঐ দুটি চোখের করুণতা ওরা যদি মুছে নিতে পারতো। ও কাছে এলে রুগীরা কষ্টকর হলেও হাসতো, তৃপ্তির হাসি। যদিও সে সেবা করতে পারতো না ভালভাবে, তবু ওর এতটুকু উপস্থিতি, স্পর্শ সেই যে মহামূল্যবান।

১৩ নং বেডের রুগিণী যন্ত্রণায় অস্ফুট 'উঃ' করে পাশ ফিরতেই নার্স অনিতা ছুটে গিয়ে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে প্রশ্ন করে—'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

রুগিণী ঠোঁটে দাঁত চেপে বললে, 'খু-উ-ব'।

রাত তখন ১১টা। রুগিণীর যন্ত্রণা বেড়েই চলে। অনিতা অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়ায়, বার বার ওর কাছে বসে, প্রশ্ন করে, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব?' ওর যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে ভাবতে থাকে, এখন ও একা একা কী করবে? আজ-ই যে লেডি ডাক্তার সাত দিনের ছুটিতে বাইরে গেলেন। সমস্ত শরীর ওর অবশ হয়ে আসে, হাত পা কাঁপতে থাকে, শেষে কি সে একটি প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হবে? আর ভাবতে পারে না ও, চঞ্চল পায়ে গিয়ে ফোন ওঠায়—

হ্যালো··

ঘুম জড়িত উত্তর আসে, হ্যালো··

আমি হাসপাতাল থেকে বলছি, ১৩ নং বেডের অবস্থা খুব খারাপ। আপনার একবার আসা বিশেষ দরকার।

মাত্র পনেরো মিনিট পরে ডাঃ বোস হাসপাতালের এ্যাসিস্টেন্ট সার্জন ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন—'কেমন আছে, রুগী?'

ভীরু কম্পিত কণ্ঠে শুনলেন, 'ভালো নয়।'

পরীক্ষা সমাপনান্তে ডাঃ বোস প্রশ্ন করলেন, 'ইনি কী আপনার আত্মীয়া?'

আবার ভীরু গলায় উত্তর শুনলেন—'না।'

বিস্মিত স্বরে বললেন, 'নয়? হাতে স্টেথিস্কোপ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'স্বাভাবিক অবস্থা' চিন্তার কিছু নেই।'

চারদিন পর। রাত নটায় আবার নার্স চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়ায়—হায়! লেডি ডাক্তারের সাথে সেও কেন ছুটি নেয়নি, তিনি যে তাকে অসম্ভব স্নেহ করেন। ওর প্রতিটি কাজে সাহায্য করেন আশাতীত ভাবে। তাঁর অনুপস্থিতির অভাব সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে—এমন নিঃসঙ্গ অসহায় সে কোনদিন নিজেকে ভাবেনি। ডাঃ বোসকে একবার ডাকতেই হবে, তাঁর সাহায্য ছাড়া কিছু করা অসম্ভব—কিন্তু ওঁকে দেখলেই যে ওর বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে। তাঁর সেদিনের বিরক্তির ভ্রূ কুঞ্চন স্মৃতি তাকে আরো অসহায় করে তোলে। ফোন তুলে সে দাঁড়িয়ে থাকে বহুক্ষণ, সাহস তার পরিমিত কিন্তু একটি অসহনীয় কষ্টের কাছে সে নিজের দুর্বলতাকে হার মানাতে বাধ্য হয় শেষ পর্য্যন্ত—আবার টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে ওঠে, 'একটি পেসেন্টের অবস্থা ভীষণ খারাপ, হয়ত বাঁচবে না, তাড়াতাড়ি আসা বিশেষ প্রয়োজন।'

আধ ঘণ্টা পর রুগিণীকে পরীক্ষা শেষ করে ডাঃ বোস বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে বলেন, 'কিছুই তো জানেন না দেখছি, কী করে যে—'

তাঁর অসমাপ্ত কথা মুখেই রয়ে গেল, ঘুরতে গিয়ে তাঁর চোখ নার্সের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হলো, জলেভরা ছলছল চোখে তার সমস্ত সহানুভূতি নিয়ে করুণার কাব্যমূর্ত্তি নার্সের বাস্তব রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুহূর্ত্তমাত্র, তারপরই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি—সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে তৃপ্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন—'মিস রায়, হাসপাতালের সাফল্য ওর যন্ত্রপাতি বা ডাক্তার-ওষুধে নয়—'

অনিতা মুখ তুলে তাকালো।

'সে সাফল্য আপনি। আপনার চোখে রুগীরা ওদের সহানুভূতির স্পর্শে নিজেদের রোগ ভুলে যায়। সাধ্য কী কতগুলো তেঁতো ওষুধে এ যন্ত্রণা সারায়।'

অনিতা মুখ নিচু করে বললো, 'কিন্তু রুগীর সেবা এ আমার ভালো লাগে না।'

ডাঃ বোস চমকে উঠলেন, 'ভালো লাগে না?'

'না।'

'তবে আপনি এ লাইনে এলেন কেন মিস্ রায়?' তারপর নিজেই উত্তরের সুরে বলেন 'অবশ্য আপনার জন্য এ লাইন নয়, এমন কষ্টকর আর যে যাই বলুক না কেন এমন নোংরা কাজে আপনাকে সত্যি মানায় না মিস রায়।'

আনত মুখ ঈষৎ উঁচু করে অনিতা বললে, 'আমি ইচ্ছে করে আসিনি আসতে বাধ্য হয়েছি, আরো কিছু লেখাপড়া জানলেও আসতাম না। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হলে এ ছাড়া ভদ্র উপায় আর দেখলাম না।' মুখ আনত করে সে একটু থেমে বললে, 'আমি মিস নই, মিসেস রায়।'

'মিসেস' অস্ফুট উচ্চারণ করলেন তিনি—রুগিণী কাতরোক্তি করে উঠলো—ডাক্তারকে দ্বিতীয় প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে তড়িদ্‌বেগে প্রস্থান করলো অনিতা।

অতন্দ্র ডাঃ বোসের একাগ্র অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করে তাঁর কানের কাছে চারটি লাইন মৃদু গুঞ্জন তুলে ফিরতে লাগলো সারারাত—

She was good as she was fair,
None, none on earth above her;
As pure in thought as angels are;
To know her was to love her.

অপারেসন থিয়েটারে সব কিছু গুছিয়ে দিচ্ছিলো অনিতা। ডাঃ বোস্ তদ্বির করছিলেন। যন্ত্রপাতির টুং টাং, হাইহিলের খুটখাট, ঘড়ির একটানা টিক্ টিক্ ঘরের স্তব্ধতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ডাঃ বোস আবশ্যক অনাবশ্যক ভাবে এটা ওটা নাড়লেন, ঘড়ি দেখলেন, তারপর গ্লাবস্ পরতে পরতে বললেন—'কিছু মনে করবেন না মিস'—নিজের ভুল শুধরে টেনে উচ্চারণ করলেন, 'মি-সে-স্ রায়,' আপনি কেন স্বামীর মঙ্গল চিহ্ন ধারণ করেন না, আপনি বাঙালী তো বটেন তাছাড়া অত্যাধুনিকাও তো নন।

অনিতার ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল, বললে—'তাঁর সব মঙ্গল নিয়ে তিনি চলে গেছেন। আমি বিধবা।'

অনিতার কাজ শেষ হয়েছিলো, বেরিয়ে গেল সে।

ডাঃ বোস অর্দ্ধেক ঢোকানো গ্লাবস্ হাতে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনাস্বাদিত আনন্দে দেহ-মন ভরে উঠলো তাঁর। পরের দুঃখে এ আনন্দ অশোভনীয়, অত্যন্ত লজ্জাকর। তিনি জানেন, বোঝেন, কিন্তু হারিয়ে পাবার উপলব্ধিকে তিনি কিছুতেই দমন করতে পারলেন না। কোথায় যেন পড়েছেন—

For this relief much thanks:

অসহনীয় তীব্র আনন্দের শিহরণ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপরূপ লাবণ্য পরশে অবশ করে আনলো তাঁকে। একবার ভাবলেন লিখে দেন, আজ অপারেসন হবে না, কাল হবে, কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। যথারীতি অপারেসন হলো—শুধু যাবার আগে পরদিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত রেখে তিনি বাড়ি গেলেন।

পরদিন দিনান্তে ডিউটি শেষে পোষাক বদলাচ্ছিলো অনিতা, ডাক্তার বোসের খাস চাকর এসে দাঁড়ালো একটি চিঠি নিয়ে। চিঠি দিয়ে বললে, 'জবাব আপকা যাসা খুসি, অভি ভী দে সেকতি ঔর বাদ মেভী।'

অনিতার মনে হলো এ চিঠি একেবারে অভাবিত অপ্রত্যাশিত নয় তার কাছে, সে যেন জানতো এমনি ভাবে একদিন প্রশ্ন আসবে তার উত্তরের প্রত্যাশা নিয়ে। তার আর পোষাক বদলানো হলো না। অপলক চোখে সে তাকিয়ে রইলো বন্ধ খামটার দিকে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো ডাঃ বোসের দৃঢ়তাব্যঞ্জক সুন্দর দীর্ঘায়তত‌নু—সৌন্দর্য্য ও আভিজাত্য যে দেহকে পুরুষত্ব ও সুষমায় অপরূপ করে তুলেছে। তাঁর কাছে গেলে ওর বুকে যে কাঁপন জাগে, সে কী শুধু ভয়?

প্রশ্ন এসেছে উত্তর দিতে বাধা নেই, কিন্তু এ সত্য প্রকাশ করবার ভাষাও যে নেই ওর। উত্তর ও দিতে চায়, আনন্দকে অনুভব করবার অনুভূতি আছে, কিন্তু তাকে রূপ দিতে ও অপারগ। অন্তরের অসহনীয় দুঃখ ওকে চঞ্চল অস্থির করে তুললো। নিজেরই অজান্তে সযত্নে তুলে রাখা একটি খাতা টেনে বার করলো—তারপর তার ভেতর ডুবে গেল সে—

—লোকে বলে আমি অপরূপ রূপসী, হয়তো তাই, আমি নিজে কিন্তু বুঝি না। আমার মনে হয় সুখই সৌন্দর্য্য, সে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য থেকে আমি বঞ্চিত। যার এত অশান্তি, সে কী সুখী হতে পারে? আমার মনে হয়, আমার চার পাশে যারা রয়েছে তারা কত সুখী, আবার মনে হয়, এ পৃথিবীতে কেউ সুখী নয়, আমারই মত, সুখের আবরণ টেনে সবাইকে নিশ্চিন্ত করছে তারাও; তবু ওরাই তো নিয়ম, আমিও কেন ওদের মত হতে পারলাম না ভাবতে চেষ্টা করি, ভাবতে পারি না। আমি অনুভূতি শূন্য মনে জাগতিক নিয়মেই আমি আমার মত কারোর তুলনার যোগ্য নই। শুধু নিখুঁত রং, নাক, মুখ, চোখ থাকলেই কী রূপসী হওয়া যায়, না সুখী হওয়া যায়? যে এতগুলো লোকের দুঃখের কারণ সে নিজে সুখী হবে কী দিয়ে? আমার নিজের কী দুঃখ জানি না, বুঝি না। ওদের সবাইকে দুঃখ দিয়ে, ওদের সবার দুঃখের কারণ হয়ে আমি সুখী হতে পারি নাই, নইলে আমি এমন ভাবে অসুখী হতাম না। আমি দুঃখের তরঙ্গে ভেসে চলেছি কিন্তু সে দুঃখ আমার নয়, তাদের সৃষ্টি দুঃখে, ওদের মনবেদনা, ওদের সমবেদনার তরঙ্গে আমি দুলে দুলে ভেসে চলেছি।

আমি মানুষ, মানুষেরই মত থাকতে চেয়েছিলাম—অতি সাধারণ মানুষের মত, কিন্তু মানুষের আকৃতি হলেই তো হয় না, নাক, মুখ, চোখ আর চমৎকারিত্ব থাকলেও হয় না, নইলে মানুষের মত হতে পারলাম কই? মানুষ একটা কিছু নিয়ে বাঁচতে চায়, তার আর কিছু না থাক অনেকে শুনি রূপের গর্ব্ব নিয়ে, রূপের মোহ নিয়ে, রূপের আকর্ষণ ছড়িয়ে কত সুখী হয়। আহা! আমি যদি তা পারতাম। আমি যদি রূপের গর্ব্ব নিয়ে বিভোর হতে পারতাম। আহা! আমি যদি বিচ্ছিরি হতাম দেখতে। তবে তো লোকে রাতদিন অত আহা উহু করতে পারতো না, এত রূপ নিয়েও কী দুঃখের কপাল! ফিসফিসিয়ে বলতো জা, অতি বড় রূপসী না পায় বর! ওরা বোঝে না ঈশ্বর নাক মুখ, চোখ দিয়েছেন, তাতে আমার কৃতিত্বও যেমন নেই, তার জন্য দোষীও নই আমি। আমি কারো কৃপার পাত্রী হতে চাইনি, তবু সবাই আমার কৃপার চোখে দেখে। কতবার ইচ্ছে হয় বলি—তোমরা দয়া করো না, কৃপা করো না. শুধু মানুষের মত বাঁচতে দাও। যা ঘটেছে সেটা বিচিত্র নয়, অভূতপূর্ব্ব নয়, নিতান্তই সামান্য ঘটনা। কালের চক্রে এমন কত ঘটনা ঘটে আবার ঘুরে

যায়, তাকে সে সামান্য ঘটনাকে অসমান্য করে দেখে তোমরা আমায় মানুষের মত বাঁচতে দিলে না—সে ছোট্ট ঘটনা হয়ে রইলো, চিরন্তন, চিরসত্য।

ছোট্ট সাধারণ ঘটনা তেমন ঘটনা কত ঘটছে কে তার খবর রাখে? আমরা গরমে সেবার মুসৌরি বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার বয়স চৌদ্দ! আমি দাদা, বৌদি, ও ছোট্ট ভাইপো মিণ্টু। খুব আনন্দে ছিলাম, হোটেলে থাকতাম, রোজ বিকেলে বেড়াতে যেতাম, কোনদিন লাইব্রেরী, কোনদিন ক্যামেলস্ ব্যাক, কোনদিন কেম্পটি ফলস। আর রোজ সকালে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে যেতাম কাছাকাছি কোন যায়গায়। সেদিন লাল টিব্বায় গিয়েছিলাম বিশ্রাম করে! ঐ যে যেখানে জলের রিজারভার রয়েছে তার এক পাশে মস্ত বাগান আছে। চারদিকে পাইন গাছ বহু দূরের সারি সারি পাহাড় হাল্কা কুয়াসার মাঝে অপরূপ লাগছিলো। দাদা বৌদির ফটো তুলছিলেন। আমি আর মিণ্টু অবাক হয়ে দেখছিলাম, কত লোক যাচ্ছে, আসছে, কত সাহেব কত মেম। তারা কেউ কেউ আমাদের গাল টিপে আদর করছিলো, কেউ বা হেসে চলে যাচ্ছিলো। হঠাৎ একটা লোমস ছোট্ট কুকুর তীরের বেগে আমার কাছে ছুটে এলো, আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। দাদা বৌদি ছুটে এলেন যাঁদের কুকুর তাঁরাও এলেন। কুকুর কিন্তু কিছুই করলো না, ছুঁড়ে দেওয়া বলটি মুখে নিয়ে মনিবের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। পেছনে এগিয়ে এলো অনেক লোকের দল। তাঁদেরই মাঝে এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে বৌদির হাত ধরলেন—তিনি বৌদির ছেলেবেলার বন্ধু, সহপাঠী। ঘটনাচক্রে ওঁদের পেয়ে সবাই খুসি হলো। পরদিন ওঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ হলো আমাদের।

বৌদির বন্ধুর আত্মীয় খুব বড়লোক—কি চমৎকার বাড়ি। কালকের সেই লোমস কুকুরটা শেকল বাঁধা, লাফালাফি করছিলো, খুলে দিতেই সবার কাছে এক এক একবার শুঁকে শুঁকে চলে গেল। আমার কাছে যখন এলো আমি কাঠ হয়ে রইলাম। বৌদি তার বান্ধবীকে নিয়ে গল্প করতে লাগলো, দাদারও বন্ধু জুটলো, ছোট্ট মিণ্টু ও তার সমবয়সীর সাথে খেলনা নিয়ে মেতে গেল। আমিই শুধু নিঃসঙ্গ হয়ে বাগানের ফুল আর শিকারের ছবি দেখে সময় কাটালাম। যাঁর বাড়ি সেই ভদ্রমহিলা আমায় দু' একবার আদর করলেন, বার বার সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন।

পরদিন আমরা এক সঙ্গে পিক্‌নিক্ করলাম। তারপর দিন আবার গেলাম ওঁদের বাড়ি। আমার কিন্তু যেতে একটুও ভালো লাগেনি। প্রতিবাদও করলাম বৌদির কাছে—'তোমরা সব যে যার বন্ধু নিয়ে বসে থাক, আমার একা একা ভালো লাগে না, আমি যাবো না।'

বৌদি থুতনি টিপে বললেন, 'ওরে মিলবে মিলবে, তোর বন্ধুর বন্দোবস্ত করতেই যাচ্ছি, চল্ বন্ধু পাবি, চিরদিনের বন্ধু।'

বুঝলাম না, কারণ ঐ ভদ্রমহিলার একটি মাত্র ছেলে, মেয়ে নেই শুনেছিলাম। তবু ভাবলাম হয়তো মেয়ে আছে। আজ এসেছে। গিয়ে কিন্তু কোন মেয়েকে দেখলাম না, তেমনি একাই রইলাম আজো। ঐ ভদ্রমহিলা, বৌদি, তার বান্ধবী, দাদা, বুড়ো ভদ্রলোক সবাই কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একাই ঘুরছিলাম। পাশের একটি ঘরে এ বাড়ির ছেলে, সেই প্রথম দিনের কুকুরের মনিব একটি ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছে। পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকালো সে, তাকিয়ে হাসলো। তার সৌন্দর্য্য আর সাজ, বাড়ির মতই নিখুঁত।

ও হেসে বললো, 'তোমার বুঝি সাথী নেই কেউ? এসো তোমায় ছবি দেখাই।' আবার হাসলো ও।

জানিনে কেন ওর ওপর রাগ ছিল আমার, হয়তো কুকুরের মনিব বলে। আমি কিছু না বলে ফিরলাম, ও উঠে এসে আমার হাত ধরলো আর ঠিক সেই মুহূর্তে বৌদিরা ঢুকলেন অন্য দরজা দিয়ে। সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো, ও পালালো, আমি বিব্রত হলাম, রাগ বাড়লো ওর ওপর।

বৌদি হেসে বললেন, 'যাক্! বন্ধুর অভাব ঘুচলো তোর। বলেছিলাম না, বন্ধু পাবি আজ, চিরদিনের বন্ধু। নে এবার বন্ধুর মা-বাবাকে প্রণাম কর।'

দাদাকে ভালবাসতাম, বৌদিকে তার চেয়ে এমন কি মা'র চাইতে বেশী ভালবাসতাম। প্রণাম করলাম না বুঝেই বৌদির বাধ্য হয়ে। ওঁরা আদর করলেন প্রথম দিনের থেকেও বেশী, চুমোও খেলেন। আমার বয়সটা তখন এমন, রসিকতাগুলো রসিকতা বলে বুঝতে পারি, লজ্জাও পাই স্বাভাবিক নিয়মে, তার তাৎপর্য্য বুঝবার বয়স তখনো হয়নি। বয়ঃসন্ধির লজ্জাটা শুধু এসেছে। আর কিছু নয়। সবাইকে, অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখলাম।

বাড়ি ফিরে বৌদি বললেন, 'আমার মতো ভাগ্য কারো নেই। নইলে ছোট্ট একটি ঘটনার সূত্র ধরে এমন ছেলে ঘরে আসে।' শুনলাম আমার বিয়ে ঐ ছেলেটির সাথে। আরো শুনলাম খুব বড়লোক ওরা, একটিমাত্র ছেলে—রূপে, গুণে, বিদ্যায় অতুলনীয়। মাত্র বিশ বছর

বয়সেই বেশ বড় পোষ্টে কাজ করছে বম্বেতে। ছুটিতে মার কাছে এসেছে। ওরা থাকে দেরাদুন—গরমের কয়েক মাস থাকে মৌরি। ছেলের ছুটি আর সাত দিন মাত্র আছে, তার মধ্যে বিয়ে করে ফিরে যাবে বম্বে। দাবী দাওয়া কিছুই নেই তবু বৌদি সময় চেয়েছিলেন, ওঁরা বললেন, শুভস্য শীঘ্রম্. দাদারও তাই মত।

পরদিন আমরা দুদলই দেরাদুন গেলাম। মা এলেন না, কাছাকাছি দু' একজন আত্মীয়স্বজন এলেন টেলী পেয়ে। ওদের বাড়িতেই অনেক লোক এলো।

আমার বব, চুল কষে বেঁধে আর ফ্রকের বদলে বেনারসী পরে বিয়ে হলো। ফ্রকের বদলে অত ভাল ভাল সাড়ি পেয়ে আর গা ভর্তি গহনা পরে ভালোই লাগছিলো। কিন্তু যার জন্য এত সব পেলাম তার ওপর রাগ গেল না। দোতলার একটা ঘরে একা বসেছিলাম। ও চুপি চুপি এলো, এসেই টেনে নিল আমাকে। আমার সাড়ি, চন্দন, স্নো, পাউডার সব এলোমেলো হয়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এই' বলে ও পালালো। বিয়ে বাড়ির গণ্ডোগোলে কেউ আমার চিৎকার শোনেনি। বার বার আমি দেখলাম আমার সাজ কতখানি নষ্ট হলো। রাগের মাত্রা আমার বাড়লো। মনে হলো জব্দ করবার জন্যই ও আমার সাথে এমন করে।

পরদিন সকালে আবার এক ফাঁকে এলো। খাঁকি পোষাক, টুপি, হাঁটু পর্য্যন্ত জুতো পরনে, বন্দুক হাতে। বন্দুকটা একপাশে রেখে বললে, 'আমায় তুমি ভালোবাস না?'

'না'।

আমি শিকার করতে জঙ্গলে যাচ্ছি, যদি বাঘে খেয়ে ফেলে আর না আসি আমার জন্য কাঁদবে না? ভয় পেলাম মনে মনে তবু উত্তর দিলাম না, আশা পেয়ে বললে—'আমি কাল বম্বে যাবো, সেখানে কত জিনিষ দেখবার আছে, তোমায় সব দেখাবো, যাবে তুমি আমার সাথে?'

আমি বললাম—'না, তোমার সাথে যাবো না?'

'কেন? আমার তোমার জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমার আমার জন্য হবে না?'

উত্তর ওর শোনা হলো না, হুড়মুড় করে অনেক বন্ধুবান্ধব ঘরে ঢুকে হেসে উঠলো। ও চলে গেল।

বিকেলে ফিরলো, সঙ্গে মস্ত একটা বারশিঙ্গা হরিণ। আমি অবাক্ বিস্ময়ে হরিণটার সৌন্দর্য্য দেখলাম। সবাই কিন্তু একবাক্যে বললো পাঁচ দিন বিয়ে হয়নি হরিণ মারা অন্যায় হয়েছে, লোকে বলে তাতে হরিণীর অভিশাপ লাগে।

রাত্রে বললে—'হরিণটা তোমার জন্য মারলাম। হরিণীটাকে পেলাম না, পেলেও অবশ্য মারতাম না। আচ্ছা, ওটার চামড়া দিয়ে জুতো বানাবে, না চমৎকার একটা আসন করে দেবো? কী চাও তুমি বলো তো? শিং সুদ্ধো মাথাটা বাঁধিয়ে রেখে দেবো তোমার ঘরে।'

সেদিনও আমি কোন উত্তর দেই নাই। বলতে চাইলাম, আজ সারাদিন তোমার জন্য বড় কষ্ট হয়েছে, আমি তোমার সাথে বম্বে যাবো। বলতে পারিনি।

পরদিন ও যাবে। ঠিক হলো দশ পনেরো দিন পর ও ছুটি নিয়ে আবার আসবে। চট করে ছুটি বাড়ালে চাকুরী নাও থাকতে পারে। আমায় বললে, 'ষ্টেশনে যাবে?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

ও বললে, 'আমি মাকে বলিগে।'

ষ্টেশনে বৌদিরা ও এবাড়ির অনেকেই গেলেন। আমি আর ও এক সঙ্গে গেলাম। চুপচাপই ছিলাম। মাঝরাস্তায় এসে ও হঠাৎ আমার মুখ দুহাতে টেনে নিজের মুখের কাছে নিয়ে গেল।

আমি লজ্জায় ওকে ঠেলে বললাম—ছিঃ, ছিঃ কী অসভ্য ও মুখ ভার করে সরে গেল। ষ্টেশনে এলাম। ও চলে গেল।

বৌদি আমায় নিয়ে যেতে চাইলেন। ওঁদের মেয়ে নেই, নতুন মেয়ে পেয়েছেন, ছেলে দূরে, ছাড়লেন না আমায়। আমি মার কাছে যত আদর পাইনি, তার থেকে বেশী আদর স্নেহ পেলাম। অত বড় হয়ে কোলে চড়বার বয়স পার হয়েও কত সময় ওদের কোলে বসেছি। আমার জন্মের চার মাস আগে বাবা মারা গেছেন, বাবা ডাকিনি কোনদিন, জানতাম না বাবা কি জিনিষ। তবু মনে হতো আমার বাবা থাকলেও এত ভালবাসতেন না, এত আদরও পেতাম না। ওদের এত আদর সত্ত্বেও বাড়ি ফিরে এসে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো—এখন আর অত উৎকণ্ঠায় থাকতে হয় না, কখন সবার কাছে লজ্জা দেবে। তবু মনে হলো সেও মন্দ লাগতো না। মনে মনে ভাবলাম, একটা চিঠি লিখবো—'তোমার জন্য আমার কষ্ট হয়, আমি বম্বে যাবো, আমি ভীষণ দুষ্ট, তোমার সাথে মিছিমিছি ঝগড়া করেছি এবার থেকে আর কখনো করবো না—তুমিও সবার কাছে, আমায় লজ্জা দিও না।' ভাবলাম ও চিঠি দিলেই লিখবো।

তৃতীয় দিন টেলি এলো, চিঠি নয়। পৌছান খবর টেলিতেই আসবার কথা। কিন্তু বাবা টেলি খুলে 'উঃ বলে বসে পড়লেন। বিয়ে বাড়ির আনন্দোৎসব তখনো শেষ হয়নি সবাই ছুটে আসলো। টেলি পড়ে চিন্তিত হলো সবাই, ওরই মাঝে কেউ কেউ মন্তব্যও করলো মুখ টিপে, ও সব কিছু নয়, বৌ নেবার মতলব। নইলে দশদিন বিয়ে হয়নি এর ভেতরই লেখে seriously ill, come immediately with Anita.

বাবাও মনকে প্রবোধ দিতে দিতে প্লেনে রওনা হয়ে গেলেন। আবার টেলি এলো। মা অস্থির হয়ে কাঁদছিলেন। আমারও কষ্ট হচ্ছিলো। আহা! ওর সাথে কত ঝগড়া করেছি।

বম্বে পৌছলাম। ষ্টেশনে লোক ছিল, শুনলাম ভালোই আছে, বাড়ি নিয়ে গেল—কিন্তু বাড়ি যেতেই বাবা পাগলের মত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন, 'মা তোর একি সর্ব্বনাশ করলাম আমি।'

মা চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ওঁদের কান্না দেখে আমিও কাঁদলাম, না বুঝেই কাঁদলাম, অনেক কাঁদলাম।

শুনলাম আমি বিধবা হয়েছি। বাবা ছিলেন না তাই বিধবা কী জানতাম। ফ্রক ছেড়ে বেনারসি ছেড়ে আবার সাদা থান পরলাম। চুল তেমনি ববই রইলো। বাবা আমাকে দেখলে কাঁদতেন, মা আমি আবার তোর বিয়ে দেবো। চিৎকার করে উঠতেন, কেন আমার মাকে তোমরা সাদা কাপড় পরিয়েছো, খোলা খোলাও। আমি কখনো ভয় পেতাম কখনো ওঁর কান্না দেখে কাঁদতাম। ওর কথা মনে হয়ে মন খারাপ হতো।—কত ভাল ছিলো ও, তবু ওর সাথে কত ঝগড়া করেছি। একটা অরগ্যান ছিল শুনেছিলাম। ও বাজাতে ভাল বাসতো, একদিন কখন গিয়ে

মনস্ক ভাবে ওর ডালা খুলে আঙুল টিপলাম। সবাই ছুটে লো। বাবা বুকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে—কাঁদতে লাগলেন। আমিও দলাম। মাকে দেখতাম না। আমার কাছে আসতেন না। ড়বার শক্তিও তাঁর ছিল না, রাতদিন অজ্ঞান হয়ে থাকতেন। মামারও কেন জানি না, কারো কাছে যেতে ভয় হতো, লজ্জাও, তো। একা ঘরে চুপচাপ থাকতেই ভালো লাগতো।

দাদা বৌদি এলেন চার পাঁচ দিন পর। বৌদি বুকে তুলে নয়ে কাঁদলেন, এবার কেঁদে আমারো খুব ভালো লাগলো। বৌদি বাবার কাছে আমার মার চিঠি দেখালেন—মা মেয়ের বিয়ে দেখেন নি। জামাই দেখেন নি এবার মেয়েকে বুকে পেতে চান। বাবা আমার ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন—'আমার বাবা চলে গেছে, আমার মাকে ছেড়ে থাকবো কী করে?'

বৌদি বললেন, 'থাক্ মেসোমশাই ও আপনাদের কাছেই থাক্।'

দুদিন পর বাবা নিজেই ডেকে বললেন, 'মা, আমি বড় স্বার্থপর। আমার নিজেরটাই ভাবছি, আমার মায়ের টা ভাবছি না, ওর মার কথাও ভাবছি না। তোমরা ওকে নিয়ে যাও কিন্তু দেরী করো না, আবার দিয়ে যেও।'

অনেক কষ্টে বিদায় দিলেন ওঁরা, বার বার—বলে দিলেন, 'তাড়াতাড়ি পাঠিও।'

মার কাছে এলাম। বাবা ছিলেন মা, সন্তান মা ভালবাসতেন নিশ্চয় কিন্তু এমন রাগী আর গম্ভীর ছিলেন যে কোনদিন কোন আব্দার করবার সাহস পাইনি, কোন হাল্কা আলোপও করিনি কখনো। অন্যের থেকে আর পাঁচ জন মা'র থেকে একেবারে ভিন্ন ছিলেন মা—শাসন করতেন কিন্তু সোহাগ কখনো মুখ ফুটে করতেন না। তাই মার কাছে এলাম ভয়ে ভয়ে, মনে মনে ভাবছিলাম, মা আমাকেই দোষী করে শাস্তি দেবেন। নইলে মা যদি কাঁদেন তবে আমি কী করবো? মা কিন্তু কিছুই করলেন না, কাঁদলেন না, বকলেন না, আদরও করলেন না। মনে মনে বাঁচলাম কিন্তু সহজ হতে পারলাম না। মনে হলো মা কাঁদলে বা বকলে ভালো লাগতো। আমি নিজেরই কাছে নিজে দোষী হয়ে রইলাম। বিকেলে দুগাছা চুড়ি, একটা সরু হার, দুটো রিং, একটা রঙিন সাড়ি দিয়ে বললেন, 'এগুলো পরে থাক খুলবে না।' পরলাম।

পাড়ার লোকে সহানুভূতি জানাতে এসে ফিরে গেল দেখা করতে দিলেন না মা। আমি বাঁচলাম।

খুড়তুতো দাদা নিজের কাজে রাতদিন বাইরে থাকতো, মা থাকতেন মার কাজে, কথাও বলতেন না। আমি হাঁপিয়ে উঠলাম রাতদিন একা একা থেকে। বড় ইচ্ছে হলো একটা চিঠি লিখি। সাহস হলো না, ঠিকানাও জানতাম না। পর পর ক'খানা চিঠি এলো মা পড়ে পড়ে ছিঁড়ে ফেললেন, বুঝলাম ওঁদের চিঠি। ছ'টি মাস কোনরকমে কাটালাম। একদিন রাত্রে চুপি চুপি উঠে একটা খাতা নিয়ে যে কথা আমার মনে গুমরে গুমরে মরছে, যে কথাকে কারোকে শোনাতে পারলে মনে হতো হাল্কা হয়ে যাবো, তাকে লিখতে বসলাম। লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, চমকে দেখলাম মা পেছনে দাঁড়িয়ে। খাতাটা নিয়ে তিনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লেন, বললেন, 'শোবে এসো, এসব কথা তোমার ভুলতে হবে, সম্পূর্ণ ভুলতে হবে।'

ভয়ে আর লজ্জায় মুখ নীচু করে গিয়ে শুলাম, ঘুম এলো না।

এরপর আমার বড়দি এলেন, কদিন থেকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। বৌদি বহুবার নিতে চেয়েছেন মা দেন নি, জানি না কেন। গিয়েই বৌদিকে লিখলাম, 'আমায় নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে যাবো।' একদিন দিদি আলতা পরতে গিয়ে বললেন, 'আয় তোকে ও পরিয়ে দি।'

উত্তর দিলাম, 'ছিঃ, আমার যে পরতে নেই।'

দিদির চোখ জলে ভরে উঠলো। পরদিন আমি নিজে আলতা বার করে ওঁকে পরালাম, ওঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো, পরানো শেষ হলে বললাম, 'আমায় পরিয়ে দেবে না?'

দিদির জলভরা চোখ আনন্দে এমন অপরূপ হয় উঠলো যে বহুদিন পর আমি সত্যিকারের আনন্দ পেলাম।

দাদা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। বৌদি অনেক বই এনে দিলেন। ছেলেমেয়ের ভার ইচ্ছে করেই আমার ওপর ছেড়ে দিলেন। একাকিত্ব কিছুটা ঘুচলো, কিন্তু রাতের পর রাত গেল, ঘুমুতে পারি না। একদিন তন্দ্রার ঘোরের মনে হলো এক সন্ন্যাসী একটা কথা বলে গেলেন এটা ভ্রম, শান্তি পাবে—কদিন করলাম ঘুম হলো কিন্তু ভাবনা কমলো না। ওদের বড় দেখতে ইচ্ছে করতো। আমি এখন বড় হয়েছি, বুদ্ধি হয়েছে, চিন্তা শক্তি বেড়েছে, আমার মনে হতো ওঁদের কাছে থাকতে ওঁদের দুঃখ ভোলাতে পারলে আমি হয়ত শান্তি পাব। মনে হতো আমিই ওঁদের দুঃখের কারণ, মনে হয় ওঁরা এখনো ঠিক তেমনি করছেন, আমি গেলেই ওঁরা শান্তি পাবেন, আমারও ভাল লাগবে। কিন্তু, কেউ সে কথা বললে না। আমার এক দিদি ও জামাইবাবু আমার বিয়ের পর বদলী হয়ে দেরাদুনে রয়েছেন, তাঁরা এলো, গেল, কেউ ওঁদের নামোচ্চারণও করলো না। আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারি নাই লজ্জায়।

একদিন দাদার কাছে গেলাম, বললাম, 'আমি পড়বো'—দাদা পরদিনই স্কুলে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

আবার বড়দি এলেন। খাবার টেবিলে বসে ডাকলেন, 'আমার সাথে খাবি আয়।'

বললাম, 'আমার যে এসব খেতে নেই দিদি, খেতে ইচ্ছেও করে না।' বৌদি মার ভয়ে এতদিন কিছু বলেন নাই, দুদিন পর আবার ডাকলো দুজনেই, অনেক বোঝালো—আমি মাছ খেলাম। কিন্তু মুখে দিয়েই ওঁদের কথা মনে হলো, বাইরে যেমন ওঁদের কথা একটিও উচ্চারণ করতাম না তেমনি ওঁদেরই চিন্তার ভাবের
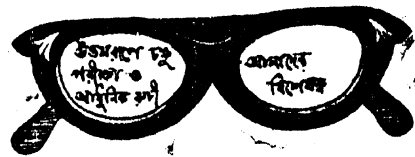
তারপর রাতদিন আমি আমাকে নিয়ে বেড়াতাম। বৈধব্যের সমস্ত লক্ষণ আমার শরীর থেকে মুছে গেল।

বিয়ের সব চিহ্ন ছেড়েছিলাম শুধু পদবীটা ছাড়ি নাই, অনিতা রায়ই রইলাম। কেউ সন্দেহ করেনি—কেউ প্রশ্ন করেনি, শুধু আমার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। সাধারণ ভাবে পাশ করলাম আমি।

কিছুদিন বাড়ি থেকে আবার হাঁপিয়ে উঠলাম। বৌদিকে বললাম 'নার্সিং ট্রেনিং নেব আমি।' ওঁরা কোনদিন কিছুতেই বাধা দেননি এবারও দিলেন না, তবু বললেন, 'পড়তে চাও পড় না চাকুরী করবার দরকার কী?' হেসে বললাম, 'চাকরী করলে তোমার ভালো লাগবে না? আমার টাকায় যখন অনেক জিনিষ এনে দেব তোমায়?' হাসতাম খুব কম। হাসি দেখে বৌদি ভাবলেন, যে কোন পথ দিয়েই হোক্ আমার জীবনে খুশি প্রবেশ করলেই হলো। ট্রেনিং শেষ করে নার্স হলাম। চাকরী নিয়ে যখন চলে আসি আমার স্বল্পভাষী গম্ভীর দাদা ডেকে খাটের পাশে বসিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'অনি! যাচ্ছ যাও, যেমন ভাবে তুমি আনন্দ পাও তাতে আপত্তি নেই আমার। যা হয়েছে তার ওপর কারো হাত নেই, যদি কাউকে ভাল লাগে, সে যেমন হোক্, যেই হোক্, আমাকে জানাতে দ্বিধা করো না। কোন বাধা আমি মানবো না আমি আবার তোমার বিয়ে দেব।'

ওরা কিন্তু কেউ বোঝেনি, একটা সাধারণ ঘটনাকে তার প্রবাহে চলতে না দিয়ে, তাকে বাধা দিয়ে আমার বুকে আলোড়নের যে তরঙ্গ তুলেছে, সে তরঙ্গ নীরবে আমাকে শুধু ভেঙেই চলেছে। এ ভাঙনের শেষ নেই। ভোলাতে গিয়ে ভুলতে দেয়নি। যা আলোচনায় ব্যবহারে সাধারণ হয়ে যেত, অব্যবহারে অসাধারণ হয়ে আমার জীবনে ভিত পাকা হয়ে গেছে। নইলে একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে কী ভালবাসার সম্পূর্ণ অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারে? ভালো লাগা আর ভালবাসা কি এক? সেই ভালবাসাকে নিয়ে চিরজীবন কাটানো যায়? কয়েক ঘণ্টার আলাপ কি চিরস্থায়ী থাকতে পারে? কালের প্রবাহে মানুষ সব ভোলে, আমিও ভুলতাম কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি। ভোলাতে গিয়ে আরো মনে করিয়ে দিয়েছে। ওর চেহারা আমার মনে, কোন ফটোও নেই—তবু ওর উপস্থিতি চিরন্তন।

লোকজন আমার ভাল লাগে না, একমাত্র বৌদির কাছে যেতে ইচ্ছে করে তবু যাই না, মুখে না বললেও জানি কি অসহ্য ব্যথায় তাঁর বুক ভরে থাকে।

খাতার লেখা এখানেই শেষ। কিন্তু কথার কি শেষ আছে, নিজের অজান্তে অনিতা লিখে চললো—

কবে সে যে এসেছিলো আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলি বেলার পথে জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা!
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।
তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে, অশ্রু সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মন্ত্রে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন।

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান।
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে সেই তব দান।
সে মূর্ত্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

উত্তর যায়নি তবু আবার চিঠি এলো—সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত আমি, কোন রকম গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দেয় না। আমার বাড়ির লোক। অতীত আমার কাছে মূল্যহীন। ছোট একটি সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে আমার ভবিষ্যতের অমূল্য প্রাপ্তি-যোগ। ভবিষ্যতই একদিন এগিয়ে আসবে বর্ত্তমানকে স্বর্ণময় করে—তার প্রতীক্ষায় রইলাম।

অনিতা রেজিগনেশন পাঠাবে স্থির করেছে। এ্যাকসেপ্ট করলে ভাল না হলেও ওকে ক'দিনের জন্য বাইরে যেতেই হবে বৌদির আশ্রয়ে। সে জন্যই আজ থেকে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছে। আর কয়েক ঘণ্টা পর ওকে রওনা হতে হবে—খোলা সুটকেস আর জামাকাপড় নিয়ে চুপ করে বসেছিলো সে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে, কারো বলার অপেক্ষা না রেখেই চেয়ার টেনে বসলেন ডাক্তার বোস, চোখ তুলে চমকে উঠলো অনিতা। ওর গাড়ির বা জুতোর কোন আওয়াজই সে পায়নি। বসেই প্রশ্ন করলেন—'শুনলাম, আপনি নাকি রেজিগনেসন দিচ্ছেন?'

অনিতা আনত মুখে চুপ করে রইলো।

ডাঃ বোস আবার প্রশ্ন করলেন—'কেন? আমি আপনাকে সসম্মানে আমার হৃ,'—থেমে বললেন 'আমার গৃহে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। যাকে আমার অন্তরে দেবীর আসনে বসিয়েছি'—অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে চেয়ার ধরে দাঁড়ালেন তিনি—তাঁর ব্যথা ভরা কণ্ঠ অপরূপ লয়ে ফিসফিসিয়ে উঠলো—'তাকে আমি অসম্মান কোন রকমেই করতে পারি না, এটুকু তুমি বিশ্বাস করো।'

সে সুরে অনিতার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো, জলভরা চোখ তুলে সে চিৎকার করে বলতে চাইলো, আমাকে দেবী করে মহীয়সী বানিয়ো না, আমি বৈধব্যের মহীয়সী মূর্ত্তি নিয়ে থাকতে চাইনি আমি দয়াময়ী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল হতে চাইনি, আমি শুধু চেয়েছি সাধারণ অশুদ্ধি মানুষের মত কোন তরঙ্গের আলোড়ন না তুলে ঐ জলেরই মাঝে মিলিয়ে যেতে। হয়তো আমি তোমাকে সুখী করতে পারতাম, হয়ত আমি নিজেও সুখী হতাম। সাতটি দিনের একটি ছোট ঘটনা আমি ভুলে যেতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু ছোট একটি কিশোরীর দুটি কচি হাতের একটি ছলছলে ঢলঢলে এগিয়ে আসা ও অসভ্য বলে ঠেলে দেওয়া মুখের স্মৃতিকে এ ভরা যৌবনেও উপেক্ষা করবার শক্তি পাচ্ছি কই? এরই নাম কি ভালবাসা? সাড়ি গহনা আচ্ছাদিত অঙ্গকেও কী এরই অভাবে বৈরাগ্য বলে? নিরাভরণ দেহ, সজ্জাহীন অঙ্গ এরই নাম কী বৈধব্য, না সুসজ্জিত দেহের অন্তরালে একটি উত্তর না পাওয়া প্রশ্নকে বৈধব্য বলে, এতদিনের অহোরাত্রির চিন্তায়ও যে উত্তর আমি পাইনি।

তার কম্পিত ঠোঁট নীরবেই কাঁপতে লাগলো—একটি কথাও সে উচ্চারণ করতে পারলো না। জলভরা চোখ তুলে সে দেখলো ডাঃ বোস যেমন করে এসেছিলেন তেমনি করে চলে গেলেন।
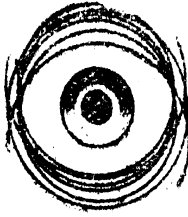
শ্রীঅসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়

( W. S. Schaill, রিডিং লেবরেটরীর সভাপতির রচনা অবলম্বনে )

এই যুগ ব্যস্ততার যুগ, বসিয়া থাকিবার অবকাশ কাহারও নাই। অথচ পৃথিবীর অবস্থা এমনই যে, একদিকে জানিবার বহু বস্তু সঞ্চিত হইতেছে, অপর দিকে উদরান্ন সংস্থানের জন্যে ব্যস্ততাও বাড়িয়াছে দ্বিগুণ। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পঠন রীতিকে যদি দ্রুততর করিতে পারি তবে স্বল্পকালের মধ্যেই জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার অবকাশ হইবে প্রচুর। আমেরিকায় একাধিক Reading Laboratory আছে, এমন কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আছে কিনা আমার জানা নাই। এই Reading Laboratory'র একজন ছাত্র অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে 'এ টেল অব টু সিটিজ' পুস্তকটি শেষ করিয়াছিল, একটু মনোযোগী হইলে আমরাও অনুরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারিব।

পঠন রীতিকে যদি দুই ভাগে ভাগ করিয়া লই তবে আলোচনার সুবিধা হয়, একটি মনের ভাগ অপরটি চোখের, বস্তুত পক্ষে মন এবং চোখ মাত্র এই দুইটি পঠন কার্যের কর্মী। যাহা চোখে দৃষ্ট হয় মন তাহা গ্রহণ করিয়া মনের মত করিয়া লয়, আপাতদৃষ্টিতে যদিও চোখের কাজ সর্বাগ্রে তবুও সমস্ত ইচ্ছা যেহেতু মনেই সঞ্চারিত হয় সর্বপ্রথম, সেই হেতু মনের কথাই সর্বপ্রথম আলোচ্য।

দ্রুত পঠনের জন্য মনকে অগ্রণী করিতে সাতটি নিয়ম পালনীয়। তৎপূর্বে ইহা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে পঠন কার্য, মন এবং চোখ পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, এই জন্য যে সাতটি মনের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিব তাহারা সম্পূর্ণ চোখকে বাদ দিয়া নহে। চোখের আলোচনা কালেও মন সম্পূর্ণ আলোচনার বহির্ভূত হইবে না।

১। পূর্ব পঠন—যখনই কোন বিষয় পাঠ করিতে হইবে তখনই পাঠ্যবস্তুর সম্পূর্ণ নিরীক্ষার প্রয়োজন। দেখিতে হইবে পাঠ্য বস্তুটি কি? পুস্তক অথবা কোন চিঠিপত্র অথবা পত্রিকা। ইহার প্রচ্ছদ-পটে অথবা ভিতরে কোন ছবি আছে কিনা, ছবি সম্পর্কে মন্তব্য কি? লেখকের নাম, ইত্যাদি এইগুলি প্রথমে পড়িয়া লইলে ইহারা পরে আর সময় চুরি করিতে পারিবে না।

২। পঠনের উদ্দেশ্য—পঠনের উদ্দেশ্য চারিটি, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্য আছে সত্য, তথাপি বই পড়িবার এই চারিটি রীতির যে কোন একটিকে মানুষকে মানিয়া লইতে হইবে।

(ক) শুধু জানার প্রয়োজনে, (খ) জ্ঞাত বস্তুর মূল্যায়নে, (গ) স্বজ্ঞান সমৃদ্ধির জন্য, (ঘ) আনন্দের জন্য, এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যদি পাঠক পঠনের উদ্দেশ্য কি বোঝে তবে উক্ত চারি প্রকারের কোন কোন প্রকারে পঠন কার্য দ্রুততর হইবে সন্দেহ নাই, উদাহরণ স্বরূপ যে শুধুমাত্র আনন্দ লাভ করিতে চায় তাহাকে প্রত্যেকটি শব্দের পারম্পর্য অথবা অর্থবোধ অবগত হওয়ার প্রয়োজন নাই, কাজেই পাঠ দ্রুততর হইতে বাধ্য।

৩। দ্রুততার উন্নতি ও অবনতি—এই অনুচ্ছেদটি উপরের অনুচ্ছেদের পরিপূরক বলা যাইতে পারে, কারণ যে চারি প্রকার উদ্দেশ্যের কথা ২নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে প্রত্যেকটির স্বগুণ অনুসারে পঠন কার্য কখনও ধীর কখনও দ্রুত হইবে। যেমন জনশূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়া গাড়ী চালাইতে চালক যে গতি ব্যবহার করে নগরের জনারণ্যে সে গতি অব্যাহত থাকে না, জনের দ্বারাই পদে পদে বাধা পাইতে হয় তেমনই স্বজ্ঞান সমৃদ্ধির জন্য পঠনের উদ্দেশ্যে যে পাঠ তাহার দ্রুতগতি প্রতিটি শব্দ জনতায় বাধা পায়।

৪। পঠনের সময় বিরতির চিহ্নগুলিকে মূল্য দিতে নাই। অভ্যাস করিতে হইবে, ইহাতে যেন অর্থবোধের অসুবিধা না হয়।

৫। মনোনিবেশ—ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ম, এমনও অনেক ক্ষেত্রে হয় যে চক্ষু তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে অথচ মন তাহার স্বল্প অংশও গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, ইহা মনোনিবেশের অভাবের লক্ষণ।

৬। উপর দিয়ে যাও—এই অংশটি একটু অভ্যাস সাপেক্ষ, যদিও ইহা বর্ণনার দ্বারা বোঝান সম্ভব নয় তথাপি অনেকেরই বিশেষত পাঠিকাদের এ অভ্যাস আছে, পাঠ করিতে করিতে প্রয়োজনীয় অংশ না ছাড়িয়াও অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাছিয়া বাদ দেওয়া, অবশ্য এ ব্যাপারে পঠনের যে চারি প্রকার উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছি তাহার মানদণ্ডেই কোনটি প্রয়োজন কোনটি অপ্রয়োজন ধরা পড়িবে, উদাহরণ স্বরূপ শুধু মাত্র আনন্দলাভ যাহার উদ্দেশ্য, রুচি ভেদে তাহার নিকট প্রকৃতি নিখুঁত বর্ণনা অথবা আপাত একঘেয়ে সংলাপ নাও ভাল লাগিতে পারে।

৭। উচ্চারণ দ্রুততা—স্পষ্ট এবং সুন্দর উচ্চারণ পাঠের গতি দ্রুত করিয়া তোলে, অনেক সময় শব্দের প্রথম একটি দু'টি অক্ষর দেখিলেই সমস্ত শব্দটি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে; ইহাতে দ্রুত পাঠের সুবিধা হয়।

এই বার চোখের কথা। চোখই পাঠক ও পাঠ্য বস্তুর মধ্যে দৌত্যের কার্য করে। পাঠ্য বিষয় হইতে চোখের মাধ্যমে শব্দ আসিয়া মনের কোঠায় পৌছায় এবং অর্থবোধে সাহায্য করে। চোখের

দৌড়ের কার্যকে দ্রুততর করিয়া তুলিতে মাত্র পনের মিনিট দিনে ব্যয় করিলে কয়েক দিনের মধ্যেই সুফল অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে হয়তো একটু অস্বস্তি বোধ হইতে পারে, কিছুদিন চেষ্টা করিলে অভ্যাসে পরিণত হইবে। আর Habit is the second nature আমরা জানি।

(১) সূঁচের গতি—চোখের দৃষ্টি যেন পুরোপুরি শব্দের উপর না পড়ে। ছটি পংক্তির মাঝামাঝি চিত্রের অনুরূপ চালাইলে পাঠের কাজ যেমন দ্রুততর হয় তেমনি অপ্রয়োজনীয় অংশে চোখ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে প্রতি (ক) শব্দের আরম্ভের অনেক পরে প্রতি (খ) প্রান্ত শব্দের শেষে অনেক শেষ হইয়া গিয়াছে। দুই পংক্তি মাঝামাঝি চোখ থাকিবার জন্য একই সঙ্গে যেমন এক পংক্তি পাঠ হইতেছে, নীচের পংক্তির খানিকটা আভাস ধরা পড়িতেছে।

(২) মাঝ পথ ধর—কোন বই অথবা কোন পত্রিকা পড়িতে গেলে তাহার একটি কল্পিত মধ্যরেখা ঠিক করিয়া লইয়া—সেই স্থানেই চোখের কেন্দ্র বিন্দু স্থির করিতে হয়। তাহার পর ঘড়ির দোলকের মত একবার দক্ষিণে এবং একবার বামে ২ অনুচ্ছেদের আকারে দৃষ্টির গতি ফিরাইতে হয়। যেমন—

(৩) অবসাম চাই। অস্বস্তিতে কোন কাজেই মন বসে না—তাই বহুক্ষণ স্বস্তিতে থাকিতে হইলে সোজা হইয়া বসা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া সোজা মেরুদণ্ড একাগ্রতার অনুপন্থী, আর একাগ্রতা সকলকাজে সুফলদায়ক।

অদূরাগত শব্দকে বুঝিয়া লইবার অভ্যাস যেদিন সুন্দর রূপে আয়ত্ত হইবে সেইদিন পঠন কার্য রীতিমত দ্রুততার সহিত চলিতে বাধ্য, কারণ প্রতিটি শব্দের উপর মনঃসংযোগ না করিয়া যদি পঠিত শব্দের সূত্র ধরিয়া অনাগত শব্দের আগমনের ইঙ্গিত বোঝা যায়, তবে স্বাভাবিক ভাবেই দ্রুততর হইবে সন্দেহ নাই।

## উদাসীন

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মজুমদার

শ্রাবণের আকাশ ঘিরেছে আজি
ক্লান্ত মেঘেরই ছায়,
উন্মনা মনে বাতায়ন পাশে—
বসে আছি আমি তায়।
মেলিছু উদাস দৃষ্টি চারিদিকে
যতদূর পানে যায়,
বাধাপ্রাপ্ত হ'ল মোর সে চাওয়া
নীল পাহাড়ের চূড়ায়।
হেরি যে অপরূপ দৃশ্য সেথায়
দাঁড়ায়ে কে এক নারী,
মেঘমল্লারের সুমধুর ধ্বনি
কণ্ঠে যে ঝরিছে তারি।
তাই বুঝি আজি শ্রাবণের ধারা
নামিল মাটির পরে,
শেষ নাহি যায় ঝরে অবিরাম
রহে যেন চিরতরে।
পৃথিবীটা যদি সঙ্গীতের সুরে
রহিত এমন ভরে,
ধন্য হ'ত সুরের পিয়াসী যারা
সেই সুধা পান করে

## মঠের ঘণ্টা

স্যাঁ জন প্যার্স

জনতার ভেতরে রয়েছে
বৃদ্ধ ক্রুশো
রিক্ত-হাতে।···
যখন মঠের চূড়া থেকে
ঘণ্টার কান্নার আওয়াজ
জল প্রবাহের মত
ছড়িয়ে পড়ছিল সহরের পরে
মনে হয়
তখন কাঁদছিলে তুমি।···
চন্দ্রাতলে সমুদ্রের উর্মীমালা···
সুদূর নদী-তটের শন্ শন্ আওয়াজ
আর যে বিচিত্র উদাত্ত সংগীত
রাত্রির বদ্ধ পক্ষ পুটে জন্ম নেয়
সেই সংগীত যেন
শংখ-ধ্বনি-তরংগের শৃংখল-বৃত্তের মত···
যেন সমুদ্র-গর্ভের
উদাত্ত কলরোল।···
হে নির্মোক
এসব ভেবে কাঁদছিলে তুমি।

—অনুবাদ : সুধীরকান্ত গুপ্ত

নীলকণ্ঠ

## প্রাক্কাল

**উ**ত্তর ভারতে একদিন আর্যরা এসেছিলেন দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে, জয়বাজের ভেরীধ্বনিতে কাশীর আকাশের কেঁপেছিলো বুক। প্রথম যুগের সেই আর্য বসবাসীরা অনার্য আদিবাসীদের বলেছিলেন 'রাক্ষস'। দ্রাবিড়দের সংগে আর্যদের যুদ্ধ এবং সন্ধির ইতিহাসই কাশীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত। দ্রাবিড়ীরা ভারতবর্ষে এসেছিলো উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে। আর্যদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব এবং দলের অভাব ছিলো না। দুটি প্রধান দলের নেতৃত্ব ছিলো ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ; এবং ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের হাতে। বশিষ্ঠ ছিলেন রক্ষণশীল নীতির রক্ষণাবেক্ষক। বিশ্বামিত্র ছিলেন অনার্যগোষ্ঠির নেতা ও উপদেষ্টা। এই অনার্যরা তাঁর নেতৃত্বে আর্যদের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণে হয়েছিলো বদ্ধপরিকর। আর্যরা নিজেরা অগণিত অজগোষ্ঠীর অক্ষৌহিণীর দ্বারা প্রতিমুহূর্তে বিধ্বস্ত হবার, ছিন্ন ও ভিন্ন হবার, ছিন্নভিন্ন হবার আতংকের মধ্যে বাস করতেন। সংখ্যায় তাঁরা সেই অসংখ্যের তুলনায় ছিলেন অতি সামান্য। পাতার তুলনায় বৃক্ষের মতো; সাপের তুলনায় সাপের মাথার মণির মতো; বিদ্যার তুলনায় বইয়ের মতো আর্যরা পরিবেষ্টিত ছিলেন। সুবিপুল সমুদ্র-স্রোতের দ্বারা একমুঠো দ্বীপের মতো। অসীম অন্ধকারের আচ্ছন্নতার মধ্যে দীপের মতো; কুসংস্কার, কুরুচি, কুরীতি, হত্যা, হানাহানি, অজ্ঞান অনার্যলোকে তাঁরা এনেছিলেন সভ্যতার, সুরুচির, সংস্কৃতির, শুভবুদ্ধির আলোকবর্তিকা।

বিশ্বামিত্র কিন্তু আর্যদের অতিরক্ষণশীলতার বিপদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যদিও সেই প্রথম দিনে, আর্যরা নিজেদের ধর্মের মধ্যে আত্মরক্ষাকারী কচ্ছপের মতো অনার্যদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলো: "For a long time however, pride of race kept most of the Aryans aloof from their dark-skinned neighbours, and Brahmaarta, 'that land created by the Gods, which lies between the two divine rivers Saraswati and Drishadati, or the part of the Punjub which they first occupied, was held to be the only soil fit for the faithful people."
[ Benares, the sacred city : E. B. HAVELL. ]

তবুও শেষ পর্যন্ত আর্যরা গা বাঁচিয়ে চলতে পারলেন না। মেনে নিতেই হলো তাঁদের তথাকথিত 'Turanian'-দের সংস্পর্শ। আর্য শিক্ষার স্রোতে এসে মিশলো আদিম স্থানীয় বিশ্বাসের উদ্দাম প্রাণবন্যা; তার পূর্ণ বিশুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের সংগে সংগম ঘটলো আর্যমনীষার। এর ফলে জন্ম নিলো বর্ণাশ্রম ধর্ম। মনু যদিও, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র,—এই চার বর্ণের কথাই মাত্র বললেন, কিন্তু ইতিহাস বলছে, ব্রাহ্মণেরা নানা প্রদেশে, নানা সম্প্রদায়ে নানা রীতিতে এতদূর আলাদা হয়ে গেলেন যে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, আরেক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংগে পানাহারে, পুত্রকন্যার বিবাহ-বিনিময়ে পর্যন্ত অপ্রস্তুত হলেন।

হ্যাভেল সাহেব বলছেন, বর্ণাশ্রম যদিও বহু কুসংস্কারকে কোল দিয়েছে তবুও আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধ রাখবার প্রয়াসে বর্ণাশ্রমের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর্য সভ্যতাকে ভারতীয় পরিবেশ এমন ভাবে আত্মসাৎ করেছে যে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ আজ আর কোথাও চোখে পড়ার নয়, তবুও একথা ঠিক যে এই আর্য সংস্কৃতি ও দর্শনই হিন্দুসমাজকে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত অদৃশ্য সূত্রে বহু বৈচিত্র্যের মাণিক দিয়ে গাঁথা একখানা মালার মতো ধরে রেখেছে। সেই ভুবনমনোমোহিনী মালার নাম ভারতবর্ষ আর তার বুকের মধ্যমণি তাঁর আত্মার আলোয় অবিরাম বিচ্ছুরিত, যে, তারই নাম কাশী। এই কাশীতেই কেবল ভারতবর্ষের স্মরণাতীত জন্ম-জন্মান্তরের লীলা প্রত্যক্ষ করবার।

অনন্তকাল ধরে অসীম আনন্দের সেই লীলাই আনন্দময়ী মায়ের ইহলীলা!

ওপরে যে ইতিহাস বিধৃত করেছি তা ভারতবর্ষের দেহের ইতিবৃত্ত। তার আত্মার ইতিহাস আজও লেখা হয়ে চলেছে কেবল কাশীতেই। যার সুরু নেই, আর যা অশেষ তা নিয়ে কাব্য হয়; কিন্তু ইতিহাস হয় না। কাশীর তাই কোনও ইতিহাস নেই; আত্মার নেই যেমন কোনও বয়স।

এই কাশীতেই একদিন, ভারতবর্ষের চির নূতন 'পুরাণ' বলছে, রাজা ত্রিশংকু সশরীরে স্বর্গে যাবার উদ্ধত, উন্নত বাসনায় যজ্ঞ সুরু করলেন। সেই যজ্ঞের, অভাবিত, অভূতপূর্ব সেই যজ্ঞের যোগ্য পুরোহিত ধার্য করলেন ক্ষত্রিয়বীর্য আর ব্রহ্মশৌর্যের অধিকারী বিশ্বামিত্রকে। দেবলোকে ইন্দ্রের নিশীথরাত্রের নিদ্রা দুঃস্বপ্নে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকলো। স্বর্গলোকের পথে উত্থিত ত্রিশংকুকে নিরস্ত করবার জন্যে ইন্দ্র প্রশ্ন করলেন: কি তোমার এমন পুণ্যকর্ম, যার জোরে এমন অভিলাষ তোমাকে সাজে? ত্রিশংকু নিজেই নিজের গুণব্যাখ্যা করতে বসলেন। আর খসতে থাকলো তাঁর পুণ্যকর্মের পাখা। নামতে থাকলেন আবার নীচের দিকে। বিশ্বামিত্র তাই দেখে বললেন: তিষ্ঠ! স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে ত্রিশংকু দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের থামলো না প্রয়াস। নবস্বর্গ রচনা করে দিলেন মধ্যপথে; নব নব গ্রহ উপগ্রহ তারকায় দীপ্যমান সেই দ্বিতীয় স্বর্গে দীপ্তিমান হলেন ত্রিশংকু, অদ্বিতীয় বিশ্বামিত্র বরে।

ইতিহাসের অমোঘ পুনরাবৃত্তি আজ চোখের ওপরেই প্রমাণ রয়েছে যে, পুরাণ আজও পুরানো নয়। আজও স্বর্গ-মর্ত্য, বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মাঝখানে ত্রিশংকুর মতো ঝুলছে মানুষ। দ্বিতীয় আরেক দ্বিতীয় স্বর্গের সন্ধান দেবে তাকে এমন বিশ্ব-মিত্র কই!

ঋষি বলেছেন বিশ্বামিত্র, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ত্রিবিদ্যা করায়ত্ত করেছিলেন এই কাশীতেই।

ইতিহাস বলছে, বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠ দুই বিবদমান দলের নেতা। পুরাণ বলছে, বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠ,—মানুষের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের, বিবদমান দুই সত্তার আভাস। বেদকে রক্ষা করবার জন্যে ভারতের জন্য এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, বিনা অনুমতিতে যে বেদ-মন্ত্রের আবৃত্তি শ্রবণ করবে, নরকবাস হবে তার নির্মম নিয়তি। এবং গৌতম যিনি আরেকজন বিখ্যাত সংহিতাকার, তিনিও বলেছেন, কোনও শূদ্র ইচ্ছা করে বেদমন্ত্র শুনলে, তার কানে গরম সীসে ঢেলে দিতে হবে; বেদ আবৃত্তি করলে কেটে ফেলতে হবে তার জিব। এই ভারতবর্ষই আবার বিশ্বামিত্রকে স্বীকার করেছে, ব্রাহ্মণ বলে। দুশ্চর তপস্যার জন্যে নয়; অবদমিত বীর্যের জন্যেও নয়; হিংসার হিংস্রতা থেকে মুক্ত হতে পারার কারণে। বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠকে নষ্ট করবার জন্যে জ্বালা সত্যাগ্নিতে আহুতি দেবার জন্যে বশিষ্ঠকেই আহ্বান করলেন, এবং বশিষ্ঠ নির্ভয়, নিষ্কম্প কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন আপন মৃত্যুমন্ত্র,—তখন, কেবল বিশ্বামিত্র, সেই জীবনের জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে দীপ্ত দিব্য আননে 'মৃত্যু'র মহিমান্বিত মৃত্যু লক্ষ্য করতেই, পা জড়িয়ে ধরলেন বশিষ্ঠের! আর? আর তখনই কেবল, পৌঁছতে পারলেন তাঁর লক্ষ্যে। ক্ষত্রিয়জন্মের পর আবার দ্বিতীয় অদ্বিতীয় জন্ম হলো তাঁর। মহাভূজ হলেন, মহৎ দ্বিজ!

ভারতবর্ষ, দ্বিজকে দিয়ে দ্বিজোত্তম অব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়েছে বারবার!

এই কাশীতেই বারবার এসেছেন, হেসেছেন, ভালবেসেছেন ভগবানের দূত, বোধিসত্ত্ব থেকে যিনি হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এই কাশীতেই তিনি এসেছেন কতবার, ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে। এই কাশীর পথ দিয়ে গিয়েছিলেন চিরকুমার ভীষ্ম। কাশীরাজ দিবোদাসের তিন কন্যা, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকাকে তুলে আনেন স্বয়ংবর সভা থেকে। অম্বিকা ও অম্বালিকার সংগে বিবাহ দেন নিজের দুই ভাইয়ের। হরিশ্চন্দ্র এই কাশীতেই মানবজীবনের মহত্তম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই কাশীতেই কবি তুলসীদাস রমণীপ্রেম থেকে রমণীয়ের প্রেমে উত্তীর্ণ হন। এখানে কবীর আবির্ভূত হন, জগৎ-কবির যিনি শ্রেষ্ঠ বন্দনাকার।

কবি বলেছেন, কাশীতে কেউ অভুক্ত না থাকার প্রতিশ্রুতি, কালে তার সীমা অতিক্রম করবে। এখানে মানুষের মনের ক্ষুধাও মিটবে। মানুষের মন চেয়েছে, জগৎ পারাবারের তীরে সকল দেশের, সকল জাতের শিশুরা খেলবে, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-নির্ধনের দ্বেষ-বিদ্বেষ ভুলবে। আত্মার সংগে আত্মার আত্মীয়তা হবে এই কাশীতেই। এই কাশীতেই মহর্ষি ব্যাস, যাঁর মৃত্যুহীন নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নূতন কাশীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। গায়ের রং কালো বলে, কৃষ্ণ; আর দ্বীপে আবির্ভূত বলে দ্বৈপায়ন। বেদকে চারভাগে ভাগ করেন বলে, এঁর নাম বেদব্যাস। ইনিই মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। মৈত্রীর সাধনা এঁর অন্নপূর্ণা ব্যর্থ করে দেন, শিবমহিমা ক্ষুণ্ণ হবার আশংকায়। কিন্তু কবি বলছেন, ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ হবার নয়। এই বারাণসীতেই সমস্ত মানুষকে মিলতেই হবে একদিন, জয় করতে হবে মৃত্যুকে। কাশীতেই জন্ম নেবে সেই চিরনূতন কাশী।

মানুষের আত্মা যে অবিনাশী, ভারতবর্ষের এই বার্তাই হচ্ছে,— বারাণসী।

এই কাশীতেই আজকে আসন পেতেছেন অনাদিকালের আনন্দ, আনন্দময়ী মা রূপে। জ্ঞানের ওপারে যিনি দাঁড়িয়ে তাঁরই জন্যে গানের সুরের আসন পেতেছেন তিনি কাশীতে। যিনি কীর্তির অতীত তাঁর সংকীর্তনের বসিয়েছেন আসর; যাঁর নাম নেই তাঁকেই প্রণাম জানাবার জন্যে তুলে নিয়েছেন জীবনের শংখ। সেই শংখ, অসংখ্যবার যাঁর মুখে উচ্চারিত এই মৃত্যুহীন বাণী: নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

আনন্দময়ী মায়ের মুখের হাসিতে সেই বাঁশী বাজে, যে বাঁশীতে অসুর হয়ে যায় সুর; যে সুর দিয়ে শুরু তাঁর যাঁর সারাও নেই, শুরুও নেই। তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি সেই অপ্রত্যক্ষের আলো, যে আলোই কেবল পৃথিবীকে তমসা থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অসৎ থেকে সতে। এই শেষ, অশেষ আলোই ভারতবর্ষকে আরেকবার পথ দেখাতে এসেছে, যা ছাড়া, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। বিদ্যা নয়, বিভূতি নয়। নয় বিচার; বিশ্বাস। স্মরণের অতীত এক কাল থেকে এই মুহূর্তের সকাল পর্যন্ত সে বিশ্বাসই সকলের শেষ আশ্বাস। তিনি আছেন। মৃত্যু, দুঃখ, বিরহ বিচ্ছেদ, হাহাকার, হতাশা, গ্লানি, অর্থ, অনর্থ, খ্যাতি, অখ্যাতি, প্রতিপত্তি, দৈন্য, সব কিছুর মধ্যে, সব কিছু পার হয়ে আছে এক অপার বিস্ময়। সে বিস্ময় অনন্ত নীলে, অব্যাহত অনিলে। এই বিশ্বের সমস্ত নিঃশেষ পান করবার পর সে বিস্ময় আনন্দময় রূপ নিয়েছে, অপরূপ আনন্দময়ী মা হয়ে আছেন আজও।—সে-ও এই কাশীতেই।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবদ্দশায় তিনজন মুক্ত পুরুষ আছেন ভারতবর্ষে, বলেছিলেন। আনন্দময়ী তাঁর একজন,—বলেছিলেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তিকামী নন শুধু, সমস্ত মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্তিকামী নবীন ঋষি শ্রীঅরবিন্দ।

ওই আকাশভরা আলোর মতো বাতাসঝরা পুরভিক্ষরা ফুলের মতো ফুটে উঠেছেন আনন্দময়ী মা। নিরুপম এই মহিমা দলের পর দল মেলা শতদলের সংগেই বুঝি তুলনীয় কেবল। এখনও সেই দল মেলার শেষ হয়নি। ফুলের হাসি, আলোর খুসি তাঁর মুখে এমন ঝলমল করে যে মনে না হয়ে পারে না যে, যিনি জ্ঞানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি এসে আসন পেতেছেন, গানের সুরের আসন পেতেছেন, যেখানে মা আনন্দময়ী। এই ভুবনে, সেই সিন্ধুতে, ওই গগনে, পাহাড়ে, অরণ্যে, পথে, প্রান্তে যে মধু ক্ষরিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, একথা মা-কে দেখলে, শাস্ত্রপ্রমাণের প্রয়োজন হয় না। গৃহস্থের পরিভাষা অতি সামান্য। অতি সাধারণ ঘরের, অতি নগণ্য শিক্ষার অধিকারী এই মানবতনুর অণুতে অণুতে আনন্দের বাঁশি বেজেছে সেই কোন্ সকালে কেউ তা জানে না। মায়ের নাম তখন নির্মলা। ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্তে কান্না নয়, হাসিতে উজ্জ্বল দুটি চোখ চেয়ে দেখছে নির্মলার, বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমগাছ। জন্মের পর ... দিনের দিন যে নন্দন চক্রবর্তী তাঁকে দেখতে এসেছিলেন তাঁকেও

মায়ের তা মনে আছে। শিবমন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে রেখে গেছে নির্মলাকে। মন্দির দেখা শেষ হলে ডাক দিয়েছে নির্মলাকে, বাড়ি চল। নির্মলার কানে যায় না সেকথা। যাবে কি করে? প্রাণে বাজছে তার তখনও, পাথরের মূর্তির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা শিবের নৃত্যের গুঞ্জন। যে নৃত্যের তালে তালে বাজে মহাকালের মন্দিরা, যার তালে তালে সকাল সন্ধ্যা হয়, ফুল ফোটে, পাখি ছোটে, ঝরণা জাগে, দোলা লাগে পাতায় পাতায়। আনন্দের বেদনায় রাঙে গোধূলির আকাশ।

বালিকা নির্মলা বলছে তার মা-কে: পুজোয় আম দেবে না? মা উত্তর করেন: আম কোথায় পাব? কোথায় পাব? মুহূর্তের মধ্যে নির্মলা এনে দেয় পাকা আম, বাড়ির গাছেরই সব চেয়ে উঁচু ডালে পেকে আছে, মায়ের পূজায় লাগবে বলেই যেন! কোথায় পাব, বোলো না; বল কোথায় পাব না। সর্বত্র পাব, মায়ের পূজার উপকরণ। মলে আছেন যিনি, যিনি আছেন পরিমলে, সুধায় যাঁর অবস্থান, বসুধায় সমস্ত বিশ্বে যিনি মিশে আছেন। অনলে আছেন যিনি, অনিলেও আছেন, কাঁটায় এবং ফুলে, জোয়ারে এবং ভাঁটায়, সুখে-দুঃখে, শংকায়-আনন্দে, মৃতে-অমৃতে যাঁর সমান আসক্তি আবার একই রকম নিরাসক্তি, তাঁর পূজায় তাঁরই দু'পায় আছে, সব পাবার উপায়। তাই বলো, কি চাই তোমার! কি করে পাবে, তার ভাবনা নয় তোমার। কারণ পূজাও যে তোমার নয়;—মা'র।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা আনমনা এই বালিকা কার কথা সেদিন ভাবত কে জানে। মা দিয়েছেন নির্মলার হাতে পাথরের বাটি তুলে। দিয়ে বলেছেন, দেখিস আবার পারলে ভেঙে নিয়ে আসিস। নির্মলার হাত থেকে পড়ে বাটিটা ভেঙে গেল সত্যি সত্যি। সেই ভাংগা বাটির প্রত্যেকটি টুকরো এনে বালিকা তুলে দেয় তার মায়ের হাতে: তুমি বলেছিলে সব নিয়ে আসতে। এই নাও সব—

ভাংগাকে জোড়া লাগাবার খেলা খেলতে এসেছেন যিনি, জোড়াকে ভাংগার কাজই তো তাঁর প্রথম লীলা। নির্মলার মা বলতেন, নির্মলা সোজা; বুদ্ধিসুদ্ধি নেই মোটে। কলসী কাঁখে বংকিম ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মা বলতেন: এই তো আমি বাঁকা! বাঁকাকে সোজা, সোজাকে বাঁকানো,—এরই জন্যে তো মায়ের আসা, হাসা, মায়ের অফুরন্ত ভালবাসা মানুষের জন্যে।

বালিকার বয়স যখন বারো তখন লৌকিক বিবাহের ডাক এলো নির্মলার জীবনে। স্বামীর নাম ভোলানাথ। ভোলানাথের বড় দাদা রেবতীমোহন চক্রবর্তীর ওখানে প্রচণ্ড সাংসারিক শৃংখলার মধ্যে দিয়ে নির্মলা নিজেকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধলো। গৃহের সবাই অত্যন্ত খুসি। ঘড়ির কাঁটার চেয়েও নিয়মিতরূপে রাত্রিদিনের কাজকর্মের পালা সাংগ করেন নববধূ। কিন্তু যে এসেছে সংসারের সংত্যাগ করে, সারকে তুলে ধরতে সকলের চোখের ওপর, এ খোলস তার কতদিন টিকবে। নির্মলার মধ্যে জেগে ওঠে সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা আনমনা চিরবালিকা। রান্না পুড়ে দুর্গন্ধে ভরে যায় ঘর, হুঁস হয় না বউয়ের। বড়জা ছুটে আসেন। তিরস্কার করেন, 'বৌ বড় ঘুমোয়'।

ঘুমোয় না নির্মলা। মানুষের ঘুম ভাঙাতে যে আসছে তার মধ্যে তারই সাড়া পেয়ে সব কাজ ভুল হয়ে যায় তার। স্বামী ভোলানাথ আসেন মাঝে মাঝে দাদার বাড়িতে। সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়; স্ত্রীর সংগ চেয়ে কাছে, তবু দুস্তর ব্যবধান জানো। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, তুমি এমন একজন লোককে বিবাহ করেছ, যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো নয়। নির্মলা সামান্য লেখাপড়া জানা বাঙালী বউ। নিশ্চয়ই স্বামীকে তা বলেননি। কিন্তু দুটি নির্মলার সেই নিরুপম নির্মল মুখে স্বামী ভোলানাথ কি সে বার্তা পড়তে পারেননি, যে জয়বার্তা ঘোষণা করতে এসেছে ভারতীয় নারীরা বারবার: যা আমায় অমৃত দেবে না, তা নিয়ে আমি কি করব?

অন্ধ যে, যে দেখতে পায় না। লঘুপক্ষ সাদা মেঘের ভেলায় আশ্বিনের আশ্চর্য সমারোহ আকাশে, শিউলির সুবাসে, ঢাকের বাদ্যিতে, তারও প্রাণের দ্বারে কি এসে দাঁড়ান না সিংহবাহিনী, অসুরনাশিনী, দশভুজা দুর্গা! চিনতে কি ভুল হয় অন্ধেরও?

আনন্দময়ী মায়ের দু'চোখের করুণা ঘন দৃষ্টিতে আর তাঁর পরমাশ্চর্য পবিত্র হাসিতে জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর নীরব উচ্চারিত। পথে চলার ক্লান্তি, পিছিয়ে পড়ার লজ্জা, বাসনার গিল্টি করা সোনায় মুখ বেরিয়ে পড়ার ব্যর্থতা, আত্মগ্লানির পীড়ন, দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ বেদনা সব মুছে যায় ওই চোখের দিকে তাকালে। দর্শনের পাতায় নেই তার উত্তর, মায়ের চোখের পাতায় উজ্জ্বল সে উত্তরণের ইংগিত। তৃষ্ণায় মুমূর্ষু যে ব্যক্তি, তার কাছে 'এইচ-টু-ও' এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেয়ে একটু নির্মল, শীতল, টলটলে জলের দেখা পাওয়ার সে ভাগ্যের উদয়, ভ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ভারতের মরীচিকায় আনন্দময়ী মায়ের দর্শন সেই 'সম্ভবামি যুগে যুগে'; এই অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এবারেও তিনি এসেছেন ধর্মসংস্থাপনের প্রতীক্ষায় অশ্বে আরূঢ় হয়ে; এবারেও এসেছেন ঠিক তখনই যখন ভারতবর্ষের বুক ভরে গেছে গ্লানিতে, এবারেও এসেছেন তিনি অধর্মের উদ্যত উদ্ধত বজ্রমুষ্টির ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে ধর্মের বিশ্বাসের, মৃত্যুহীন বাণীর বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে। ভারতবর্ষের সে নৈতিক পতাকা রাজনৈতিক পরাধীনতায়ও কোনওদিন নমিত হবার নয়: নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কিন্তু এবারে তিনি মার মূর্তি-তে নয়; মা'র মূর্তিতে মূর্ত হয়েছেন; ক্ষমার মূর্তিতে বিমূর্ত!

এবারে এসে, হেসে, ভালোবেসে হারিয়ে দেবেন তিনি অবিশ্বাস আর সংশয়ের অসুরকে। আণবিক আঘাতকে মানবিক অস্ত্রেতে প্রত্যাঘাত করতে এসেছেন যিনি, তিনি এবার সিংহবাহিনী দশভুজা নন। পায়ে হেঁটে এসেছেন তিনি। দু'পায়ে শত দুঃখ দলতে নয়; শত দুঃখের

দলকে সতত আনন্দের শতদল করতে। দুঃখময়ী ধরায় এসেছেন তাই এবারে আনন্দময়ী অধরা।

যারা বিষাক্ত করছে বাতাস, অন্ধকার করছে তোমার আকাশ, তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ,—কবির এই প্রশ্ন ; আনন্দময়ী মা হচ্ছেন এই প্রশ্নের মধ্যেই উচ্চারিত, জগৎকবির অশেষ উত্তর। এই প্রশ্ন জগৎ আবার করবে ; আর বারবার আসবেন জগদীশ্বরের দূতেরা। তাঁরা বলবেন, ক্ষমা কর ; ভালোবাসো। অসংখ্য পাপের, দুঃসহ তাপের দুর্বহ জ্বালা জুড়োতে ক্ষমার প্রতিমূর্তি আনন্দময়ী মা'র দু' চোখের করুণাধারায়, হাসির মুক্তধারায় সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি।

মায়ের কাছে কোনও প্রশ্ন করলেই তিনি হাসেন। কখনও বলেন উপস্থিত কোনও মহামহোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে : বাবা, আমাকে তো তুমি কিছু শেখাওনি। উত্তর দিতে ভুল হলে ঠিক করে দিও। তারপর দুরূহ জটিল দুর্গম দর্শনের পাতায় যার জবাব নেই, সেই জ্যোতির্ময় উত্তর আপনি এসে দাঁড়ায় মায়ের অপরূপ দুটি চোখের পাতায়। প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসু : সবই যদি কর্মফল তবে বর প্রার্থনা কেন? মা উত্তর করেন : বর প্রার্থনাও তোমার কর্মফল যে! যত চাইবে তত বাঁধা পড়বে কর্মফলের অনন্ত বন্ধনে। তত বাধা পড়বে তোমার পথ কেটে বেরুনোর পথে ; যত ফুরোবে পাথেয়, পথও ফুরোবে তত।

দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে আছে ততক্ষণ লজ্জা ; ততক্ষণ দেখা নেই 'লজ্জাহর'-র। যেই দু' হাত তুলে দিয়েছে ওপরে, শরণ নিয়েছে ভক্তের, স্মরণ করেছে তাঁকে, সেই দেখা দিয়েছেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পাণি। সেই ক্লান্ত হয়েছে, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে উদ্যত, উদ্যত দু' হাত দুঃশাসনের ক্লান্ত হয়েছে ; ক্ষান্ত হয়েছে বস্ত্রবিমোচনে।

আনন্দময়ী জোর করেন না বলেই তাঁর এত জোর। বিপদের আভাস দেন ইংগিতে ; বুঝে নিতে হয়। আগুন, আগুন!—বলে উঠতেই মা একদিন, শিষ্যা বাড়ি দৌড়েছে। সিগারেটের আগুন থেকে ঘরে জ্বলছে দাউদাউ করে মৃত্যুর শিখা, ঘুমন্ত স্বামীর ঘরে। দরজা ভেঙে স্বামীকে আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন যিনি, সেই মা'র আশীর্বাদকে মারবে কে!

মৃত্যুর আভাসও দেন, বিচ্ছেদের পূর্বাভাস অমনই সংকেতে। পুরীতে সশিষ্য গল্প করতে করতেই অসংলগ্ন ভাবে মা বললেন : 'বিপদ আসছে। তোমরা কি করবে তাই বলো।' আর একটি কথাও নয়। মায়ের ভক্ত একজনের বড় ছেলে, তার নাম সন্তোষ, কয়েক দিনের মধ্যেই, কূপের মধ্যে তার মৃত দেহ পাওয়া গেল একদিন। ছেলেটির মৃগীরোগ ছিলো। [ আনন্দময়ী মা ; শ্রীবিভূপদ কীর্তি ]

জোরও করেন তিনি কখনও কখনও।

আনন্দময়ী মায়ের লৌকিক স্বামী ভোলানাথের দীক্ষা হয়েছে কি না, প্রশ্ন করতে, মা বললেন, না। পাঁচ মাস পরে, আগামী সনেরই অঘ্রাণ হবে ; অমুক বার, অমুক তিথি, অমুক নক্ষত্র। নক্ষত্রটা বোঝা গেল না ঠিক, একজন জানালেন। মা বললেন, পুকুরে জানকীবাবু মাছ ধরছে, সে বুঝবে। জানকীবাবু বুঝলেন। স্বামী ভোলানাথ সব শুনে মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন, ওই সময়ে ওই ক্ষণে কিছুতেই দীক্ষা নয়।

১৫ই অগ্রহায়ণ আসে এক সময়ে। স্বামী ভোলানাথ ভোর না [illegible] । জল খাবার পর্যন্ত না খেয়ে। দীক্ষার লগ্ন এগিয়ে আসে দ্রুত পায়ে। আনন্দময়ী মা ডেকে পাঠান স্বামীকে। ভোলানাথ আসতে অস্বীকার করেন। তারপর কি হয় কোথায় কে জানে, বাড়ির পথ ধরেন হঠাৎ ভোলানাথ। তখনও মনে মনে সংকল্প, বাড়ি যাবেন বটে, তবে দীক্ষা নেবেন না। এসে দেখেন বাড়িতে, মায়ের মুখে উৎসারিত হচ্ছে স্তোত্রের নির্ঝরিণী। ভোলানাথকে হাতে একখানা কাপড় দিয়ে বললেন স্নান করে আসতে। মন্ত্রের বন্যায় মুখে সম্মুখে খড় কুঠোর মতো ভেসে গেলো ভোলানাথের দীক্ষা না নেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা [ শোন বলি মায়ের কথা : শৈলেশ ব্রহ্মচারী ]।

কখনও জোর কখনও করজোড়। মায়ের ভাষা বোঝার আশা দিয়েছে জলাঞ্জলি,—বলে তাই মাতৃভক্ত। কোনও কথা না বলেই তিনি বলে যান সব। তাঁর কথা যে রাখতেই হবে। সব কথা হতে পারে শব-কথা। তোমার আমার কথা করতে পারে অস্বীকার! কিন্তু 'মা'-র কথা,—সেই যে সব কথা, শব-কথা নয় কিছুতেই।

অন্তহীন অন্ধকারের ওপারে যে অনন্ত জ্যোতির্ময় সত্তা নিত্য বিরাজমান, সব ভগবানের দূতেরাই তাঁরই এক টুকরো আলো ছিটকে এসে পড়েছেন বারবার এই মাটির ঢেলার ওপর পৃথিবী যার প্রিয় নাম। এঁরা সবাই নিয়ে এসেছেন সেই পতাকা, যা বহন করবার শক্তির উৎস হচ্ছে নিরাসক্তি। আনন্দময়ী মা-ও সেই আলোরই দেহমূর্তি,—নিঃসন্দেহ। তাঁর জীবনে পরমাশ্চর্যের যে প্রকাশ তা তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয় ; এও তাঁরই ইচ্ছায় যিনিই কেবল ফুল ফুটাতে পারেন ; সবাই পারে কেবল আঘাত করতে বোঁটাতে। যে মণিহার মায়ের গলায়, অনন্ত আনন্দের নীলমণি হার সে, কেবল আনন্দময়ী মায়েতেই সাজে ; আর কেউ পরতে গেলে তা যে গুরুভার বাজে,—এও তাঁর ইচ্ছায় যাঁর ইচ্ছায় সেপাই হয় দিগ্বিজয়ী সম্রাট ; গণ্ডগ্রামের প্রায় অশিক্ষিত বধূ হন নিত্যবোধের নিরন্তর ভোক্তা।

চেষ্টায় হয় না। আনন্দময়ী মা চেষ্টা করে কিছু পাননি। তাঁর মধ্যে আনন্দের একটি শতদল সতত পাপড়ি মেলছে। তাঁর দেহকে আশ্রয় করে দেহাতীতের যে অলৌকিক প্রকাশ, তা সাধনার সাধ্য নয়। তিনি নিজেও জানেন না, কেন হয়, কখন হয়, কেমন করে হয়। যদি জানতে পারত মানুষ, তাহলে সব লীলার হতো অবসান ; সব খেলার শেষ ; সব সৃষ্টির কৌতুক নিঃশেষ। মা নিজেও বলেছেন সেকথা বার বার :

"রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি অবতারদের খেলাগুলিকে লীলা বলিয়া গিয়াছে। লীলা কি, না যাহা লয় হয়, তিনি যাকে লন। তিনিই তাহাতে মিশাইয়া লন। তিনি স্বয়ং বহু। তিনিই নিজেকে নিয়ে নিজে খেলেন। তাই লীলা ; প্রকৃতিই লীলা করেন। প্রকৃতি পুরুষে লয় হইয়া যায়। এই যে প্রকৃতি, ইহা সবই সমান ভাবে গ্রহণ করেন। যেমন নদী, ময়লা ও চন্দন সবই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, বাতাস, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ সবই বহন করিয়া নিয়া যাইতেছে, সূর্য সর্বত্রই সমান আলো দিতেছেন। এই সবই প্রকৃতির খেলা। নদী যতক্ষণ সমুদ্রে না মিলে ততক্ষণই তার নাম নদী, যেই গিয়া সমুদ্রে পড়িল, অমনি তার নাম হইল সমুদ্র। আসলে সবই—এক মহানের খেলা [ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী : ৫ম ভাগ : ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া ]।

সেই মহানের খেলার নাম কখনও রাম, কখনও কৃষ্ণ, কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ। এই মুহূর্তে কাশীকে কেন্দ্র করে সেই মহানের খেলার নাম,—এবারে, আনন্দময়ী মা। তাঁকে প্রণাম। [ ক্রমশঃ।

## শ্রীঅজিতেন্দু চক্রবর্ত্তী

[ ভারতীয় নৌবাহিনীর রিয়ার এ্যাডমিরাল ]

চব্বিশ পরগণার নিমতা গাঁয়ের চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর সন্তান অজিতেন্দু চক্রবর্ত্তীর রোমাঞ্চকর জীবন বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়বস্তু। বাংলার বাইরে যে কয়জন বাঙ্গালী তরুণ প্রতি পদে পদে জীবনে 'বীরত্বের পরিচয় দিয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন, অজিতেন্দু তাঁদের একজন। পিতামহ প্রসন্নকুমার, প্রপিতামহ রাজেন্দ্রনাথ সকলেই বাংলার বাইরে জীবন কাটিয়েছেন; তাঁদের বাসস্থান ও কর্ম্মকেন্দ্র ছিল আজমীঢ়।

অজিতেন্দুরা সাত ভাই ও তিন বোন। ভাইয়েদের মধ্যে তিনজনই বেছে নিয়েছিলেন সাগর-জীবন এবং তিনজনেরই জীবন-কাহিনী এককথায় রোমাঞ্চকর।

বড় ভাই যুদ্ধের সময় নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, এখন কোলকাতা বন্দরে দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত। ছোট ভাই কোয়েম্বাটুরে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমান বন্দরের একজন কমাণ্ডার। আর এক ভাইও ভারতীয় বিমান বাহিনীতে কাজ করতেন, গত মহাযুদ্ধে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

রিয়ার এ্যাডমিরাল অজিতেন্দুর বাল্যজীবন আজমীঢ়ে কাটে। ১৯২৯ সালে আজমীঢ় স্কুলের পড়া শেষ করেই নৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য আসেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো। দু' বছর পরে তিনি শিক্ষানবিশীর প্রথম পর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ করেন এবং এই অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্বের জন্য তিনি ভাইসরয় ও ক্যাপ্টেন সুপারিন্টেণ্ডেন্টের গোল্ড মেডেল লাভ করেন। সবদিক দিয়েই তিনি শ্রেষ্ঠ নাবিক বলে তখন বিবেচিত হন।

শ্রীঅজিতেন্দু চক্রবর্ত্তী

ঐ বছরই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তাঁকে 'রয়াল এ্যাডমিরাল মেরিন'এ মনোনীত করা হয় এবং উচ্চশিক্ষার্থে তিনি বিলাত রওনা হন। দু' বছর পরে সেখানকার শিক্ষা শেষ করার পর ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে 'রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিনে'র একজন সাব-লেফ্‌টেনেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এর পরই রয়াল মেরিনের নাম পরিবর্ত্তন করে 'রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি' নামকরণ করা হয় এবং অজিতেন্দু নিজের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে সর্ব্বত্র 'নেভির চক্রবর্ত্তী' বলে বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

জাহাজে জাহাজে তিন বছর কাটানোর পর ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অজিতেন্দুর প্রথম পদোন্নতি হয়। তিনি লেফ্‌টেনাণ্ট হলেন। তারপর ১৯৪৪ সালে লেফ্‌টেনেন্ট কমাণ্ডার, ১৯৪৫ সালে কমাণ্ডার, ১৯৪৭ সালে ক্যাপ্টেন, ১৯৪৮ সালে কমাণ্ডার ইন-চার্জ্জ ও ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে রিয়ার এ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হন।

নৌজীবনে এত দ্রুত উন্নতিতে সকলে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান। শিক্ষায়, যোগ্যতায়, অভিজ্ঞতায় তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি যে কোন উচ্চপদেরই যোগ্য ব্যক্তি। ১৯৩৭ সাল থেকে কয়েকবার তিনি বিলেত গিয়েছেন এবং প্রতিবারই বিশেষ যোগ্যতা অর্জ্জন করে দেশে ফিরেছেন। তিনিই একমাত্র প্রথম ভারতীয়, ১৯৩৯ সালে যিনি নৌ গোলন্দাজ হিসেবে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজদের হাত থেকে বিশেষ শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

যুদ্ধের সময়ও তিনি কমাণ্ডিং অফিসার হিসেবে একটি যুদ্ধের জাহাজে ফরাসী উপকূল কাটিয়েছেন। ১৯৪১ সালে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন তাঁর ওপর বোম্বাইয়ের ভারতীয় নৌবাহিনীর 'গানারী স্কুল' পরিচালনের দায়িত্ব পড়লো। পরের বছর তিনি পূর্ণ কমাণ্ডিং অফিসারের পদে উন্নীত হলেন। তখন ব্রহ্মের উপকূল জাহাজবিধ্বংসী 'মাইন'এ ভর্ত্তি। সেই সময় এ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তীকে ব্রহ্মের উপকূলেই প্রেরণ করা হল। এইচ্ এম আই এস। 'রাজপুতানার' কমাণ্ডিং অফিসার ও মাইন সুপার ফ্লোটিলার দ্বিতীয় কমাণ্ডিং অফিসার হিসাবে সেখানে গেলেন। পর্য্যবেক্ষকরা স্বীকার করেছিলেন—মিত্রপক্ষরা অনায়াসে রেঙ্গুনসহ ব্রহ্ম পুনরুদ্ধার করতে যে পেরেছিল তার অনেকখানি কৃতিত্ব 'ফ্লোটিলা' ও তার অন্যতম পরিচালক চক্রবর্ত্তী।

যুদ্ধশেষে এ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তীই নৌবহরের পক্ষ থেকে লণ্ডন ও এডিনবরায় বিজয়োৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পরও তাঁর জীবনকাহিনী সমগৌরবজ্জ্বল। ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে উত্তর প্রদেশের চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীএস এন চক্রবর্ত্তীর মেয়ে শ্রীমতী রেখার সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

তখন তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল করাচী। 'হিমালয়' ও 'চমুক' নামক দু'খানা রণপোতের তিনি ছিলেন কমাণ্ডিং অফিসার।

১৯৪৭ সালে জুন মাসে তিনি দিল্লীতে এলেন; এখানে ক্যাপ্টেন চক্রবর্ত্তীর পদ হল নৌবাহিনীর সদর দপ্তরের চীফ অব এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর। পরের বছর কমোডর নট যখন ছুটিতে, তখন চক্রবর্ত্তীই হেড কোয়াটার্সের চীফ অফ ষ্টাফ। ১৯৫০ সালে তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত বন্দরনায়েক তাঁকে 'আই-এন-স মহীশূরের' ডেকে এসে অভিনন্দন জানিয়ে যান।

ভারতীয় নৌবহর সম্পর্কিত যে কোন বিষয় তাঁর নখদর্পণে ছিল। ১৯৬০ সালের এপ্রিলে তিনি যখন সব কনভেন্সান ভেঙ্গে মেয়াদের বেশী দু' মাস রিয়ার এ্যাডমিরালের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন তখন কেউ বিস্মিত হননি।

১৯৬০ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাশানাল ডিফেন্স কলেজের ডেপুটি কমাণ্ডাণ্ট ও সিনিয়র ডাইরেক্টিং ষ্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হল। ১৯৬১ সালের এপ্রিলে সে-পদের প্রথম পর্য্যায় শেষ হয় এবং গত এপ্রিলে দ্বিতীয় পর্য্যায়ও শেষ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যায়ে তাঁর ন্যায্য দাবী উপেক্ষিত হয়েছে।

কোর্ট মার্শালের বিচারপতি এ্যাডমিরাল অজিতেন্দু ন্যায় বিচারের জন্য একসময় খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন কিন্তু স্বাধীন ভারতে তাঁর কর্ম্মজীবনে সে ন্যায় বিচার করার ভার যাঁদের উপর, সম্ভবতঃ বাঙ্গালী বলে সে সম্মান আজ উপেক্ষিত। তবুও বাঙ্গালীর সন্তান অজিতেন্দুর খ্যাতি আজ সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে।

## শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার

[ সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ উপাসিকা ]

সনাতন বঙ্গ তথা ভারতের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অন্যতম ধারিকা ও বাহিকা লোকান্তরিতা শ্রদ্ধেয়া সরলাবালা সরকারের সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবী যে পরিপূর্ণভাবে মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন—তাহা উক্ত মহিলাকে দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় সাংবাদিক স্বর্গত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন তাঁহার মাতার মাতুল। নির্ঝরিণী দেবীর পিতা ছিলেন রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের (এম, সি, সরকার) জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺শরৎচন্দ্র সরকার মহাশয়। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় স্বর্গতা সরলাবালা 'সরকার লিখিবার প্রয়াস পান।

শিশুকাল হইতে নির্ঝরিণী দেবী মাতার নিকট "মানুষ" হইতে থাকেন এবং অল্পবয়সে পিতৃহীনা হওয়ায় মাতার যথেষ্ট প্রভাব তাঁহার উপর প্রতিফলিত হয়। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ভারতবর্ষের অন্যতম একনিষ্ঠ সংবাদপত্রসেবী এবং সাংবাদিকজগতের অন্যতম দিকপাল পরলোকগত প্রফুল্লকুমার সরকারের সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। প্রফুল্লকুমার কেবলমাত্র নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন না—বিদেশী শাসনে পিষ্ট পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবী স্বামীর অনুগমন করেন। ফলে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করার জন্য

শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার

দুইবার তিনি কারাবরণ করেন—একবার ১৯৩০ সালে আর একবার ১৯৩২ সালে। আজ পর্য্যন্ত মনে-প্রাণে তিনি স্বদেশীয়ানার পরিচয়ই দিয়া থাকেন।

জীবনের প্রথম ভাগেই শ্রীমতী সরকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত কবিতা ও প্রবন্ধ পড়িয়া অভিভূতা হন। ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত পত্রালাপ করিতে থাকেন। ১৩১৫ সালের ২৩শে বৈশাখ কবিগুরু শ্রীমতী সরকারকে প্রথম পত্র দেন। তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চব্বিশটি পত্র কিছুকাল পূর্ব্বে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমতী সরকারের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র শ্রীঅশোককুমার সরকার বর্ত্তমানে "আনন্দবাজার পত্রিকা" লিমিটেডের প্রধান পরিচালক এবং দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকার সম্পাদক পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন, ও দেশের সাংবাদিক সম্প্রদায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। তাঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী দেবী ও শ্রীমতী শিবানী দেবী।

সাংসারিক গৃহকর্ম্ম হইতে দূরে থাকিলেও এই ধর্ম্মগতপ্রাণা প্রবীণা মহিলা এখনও প্রচুর পড়াশুনা করিয়া থাকেন। পঠিত পুস্তকসমূহের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ, দৈনিক সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকাসমূহ ও সমকালীন বিশিষ্ট গ্রন্থনিচয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## ডঃ জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত

[ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ]

প্রতিভাধর বাঙ্গালীর অভাব নেই, শুধু ভারত কেন সারা বিশ্বের কোন না কোন স্থানে ছড়িয়ে আছেন এই সব ালী, যাঁরা নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান আর কর্মপ্রতিভার দ্বারা দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতিভা াশের পূর্ণ সুযোগ মানুষের এখনও আসেনি।

ডঃ জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত এমনই একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি যাঁর ানিক গবেষণার পূর্ণ সুযোগ যদি এদেশে থাকতো তাহলে ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে একদিন না একদিন ভারতের মুখ উজ্জ্বল হ'তো।

১৯০০ সালের ১২ই ডিসেম্বর ঢাকার বিক্রমপুরে ডঃ সেনগুপ্তের ্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনায় তাঁর খুব ঝোঁক ছিল এবং ল ছাত্র হিসেবে অল্প বয়সেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ১৯২১ সালে ালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি, এস-সি পরীক্ষায় এবং ১২৩ সালে এম, এস-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১২৩ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ান এবং বৃত্তি লাভ করেন। ঐ বছরেই উচ্চ শিক্ষার্থে ও আরও বেষণা চালাবার জন্যে তিনি জার্মাণী যাত্রা করেন। দুই বৎসর ধ্যয়ন ও গবেষণার পর ১৯২৮ সালে জার্মাণীর হেডেলবার্গ শ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টর অফ ফিল নাট' উপাধি লাভ করেন। ্ভিদ, প্রাণিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক তত্ত্বের বিভিন্ন দিকের উপর তিনি ীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন এবং তাঁর রচিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থে সেই সব গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করেছেন।

জার্মাণী থেকে ফিরে এসে ১৯২৯ সালের ২রা জুলাই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের বোটানীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি ঐ কলেজেরই বোটানীর হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সাল থেকে '৫৯ সাল পর্য্যন্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের লেকচারার হিসাবে তিনি কাজ করেন। ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত ঐ পদেই আসীন ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তাঁকে বোটানিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার চীফ বোটানিষ্ট বা ডাইরেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদেই আসীন ছিলেন। ১৯৬০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে পি. জে. ব্রুল স্মারক পদক দিয়া সম্মানিত করেন। ১৯৬২ সালের মে মাসে তিনি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন।

১৯৫১-৫৪ পর্যন্ত তিনি বোটানিক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বোটানী শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ফিজিওলজির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটি, বোটানিক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গল; ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন, এশিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রিকালচারাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন, জার্মাণ বোটানিক্যাল সোসাইটি, ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স অফ ইণ্ডিয়ার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ষ্টেট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কমিটি, ষ্টেট বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ, ভারতীয় যাদুঘর, টি বোর্ডের টি রিসার্চ কমিটি, লক্ষ্ণৌর ন্যাশানাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি কলেজের গভর্নিং বডি প্রেসিডেন্সী কলেজের গভর্নিং বডি, বাসন্তী দেবী কলেজের গভর্নিং বডি, পশ্চিমবঙ্গের ষ্টেট বুরো অফ এগ্রিকালচার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স, খড়্গপুরের ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজির এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, বায়োলজিকাল রিসার্চ কমিটি, বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের

ডঃ জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত

লোকাল কমিটি, জগদীশ বসু ন্যাশানাল সায়েন্স ট্যালেণ্ট সার্চের উপদেষ্টা পর্ষৎ প্রভৃতি বহু সংস্থার সঙ্গে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থেকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। ১৯৫৪ সালে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাতে যোগদানের জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু কাজের চাপের জন্যে তিনি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি।

ডঃ সেনগুপ্তের হাতে যখনই যে দায়িত্ব এসেছে তিনি তা নিজ কর্মদক্ষতার গুণে সুষ্ঠু ভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন! জীবনের ক্ষেত্রে অনেক মর্য্যাদাসম্পন্ন পদ তিনি অলঙ্কৃত করেছেন, অনেক সম্মান তিনি কুড়িয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় তিনি সন্তুষ্ট নন। অপেক্ষা করছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আশায়। প্লাণ্ট ফিজিওলজিই তাঁর ছিল গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু, মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন তিনি উদ্ভিদকে। এই উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে তিনি আরও গবেষণা চালাতে চান এবং জীবনে যদি সে সুযোগ আবার পান তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান ঐপথেই তাঁর আসবে।

## শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়

[ বর্ষীয়ান সাহিত্যপ্রেমী ও সমাজসেবী ].

কলকাতার বাইরে যে সকল কর্ম্মী জনহিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সহরে ১৮৮২ সালের ৫ই জানুয়ারী শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়ের জন্ম হয়। পিতামাতার তিনি একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা স্বর্গত উমাচরণ রায় সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যশস্বী ছিলেন। শ্রীরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি পরীক্ষায় পর পর উত্তীর্ণ হয়ে পিতার অভিপ্রায়ক্রমে আইন অধ্যয়ন করেন। ১৯০৪ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০৫ সালের প্রথম ভাগে কোচবিহার ষ্টেট কাউন্সিলে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং পরে তিনি বহরমপুরে এসে ওকালতীতে ব্রতী হন। অল্প দিনের মধ্যেই এই পেশায় তাঁর খ্যাতি লাভ হয়। বহরমপুর উকিল-বারে তিনি প্রবেশের পর প্রথমে সহ-সম্পাদক, পরে সম্পাদক এবং শেষে ১৯৪৫ সালে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং উকিল সভায় প্রতি বাৎসরিক অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হয়ে আঠার বৎসর ধরে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

কিন্তু ওকালতীর খ্যাতির মধ্যেই শ্রীরায়ের জীবন সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বিশেষ ভাবে সাহিত্যামোদী। ১৯০৬ সালে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালনা বিভাগের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়ে কার্য্যক্ষেত্রে কবিগুরুর সান্নিধ্যলাভ করেন। এর পর তিনি নির্ব্বাচিত হন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বহরমপুর শাখার সহ-সম্পাদক। বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত "পূর্ণিমা সম্মেলনে" পরলোকগত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর তিনি দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। অল্পকাল পূর্ব্বে রাজ্য সরকারের অনুরোধক্রমে নূতন চারটি হিন্দু আইনের আক্ষরিক অনুবাদ "নবহিন্দু সংহিতা" আখ্যায় প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সালে বহরমপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শ্রীরায় সমবায় আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথম দশ বছর সহ-সম্পাদক পরে বার বছর সম্পাদক এবং তারপর পনের বছর তিনি ঐ ব্যাঙ্কের প্রতি বাৎসরিক নির্ব্বাচনে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হয়ে কার্য্য করেছিলেন। শেষে ঐ ব্যাঙ্ক জেলার অন্য ব্যাঙ্কগুলির সহিত সংযুক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক গঠিত হলে ১৯৬১ সালে তিনি প্রথম নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান হন, ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় নির্ব্বাচনেও ঐ পদ অধিকার করেন। তিনি ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত কলকাতার বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্ব্বাচিত ডিরেক্টর ছিলেন। বহরমপুরে সমবায় ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হলে তিনি ঐ দুই ব্যাঙ্কের কয়েক বছর ডিরেক্টর নিযুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট সমবায় কর্ম্মী হিসেবে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সরকারী সমবায় বিভাগ থেকে সার্টিফিকেট, মানপত্র এবং সমবায় সম্মেলন থেকে স্বর্ণপদক অর্জ্জন করেছিলেন।

১৯৩৮ সালে শ্রীরায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হয়ে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত ঐ পদে [illegible] করেন। সেই সময় পৌর এলাকার নক্সা প্রস্তুত এবং সেই সঙ্গে বহু বেদখলি ভূমি উদ্ধার করা এবং সারা পৌর এলাকার পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের নক্সা রচিত হয় এবং কিছু কাজও আরম্ভ হয়। পৌর প্রতিষ্ঠানের নিজগৃহ নির্ম্মাণ তাঁরই কল্পনা এবং ভিত্তিস্থাপন ও নির্ম্মাণ আরম্ভ তাঁরই কীর্ত্তি। ১৯৩৯ সালে শ্রীরায় খুলনায় সারা বাংলা মিউনিসিপ্যাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪০ সালে তিনি ঐ সম্মেলন বহরমপুরে আহ্বান করে তার অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে অভিভাষণ দেন। তিনি কিছুদিন সারা বাংলা মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীরায়ের মনে রাজনীতির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অধ্যাপনায়। তিনি আচার্য্য শীলের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে বি, এ ( পাশ ও অনার্স ) এবং এম, এ ক্লাসে আচার্য শীলের অধ্যাপনা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। সব দিক দিয়েই আচার্য্য শীল ছিলেন তাঁর গুরু। ১৯০৫ সালে বহরমপুরে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভেই তিনি বহরমপুরে "আদর্শ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৩১ সালে চরমপন্থী দলের উদ্যোগে বহরমপুরে এক বিরাট জনসভায় তিনি নির্ভয়ে ও সগৌরবে পূর্ণ স্বরাজ শপথবাক্য পাঠ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি আর কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নেই।

১৯১৯ এবং ১৯২০ সালে শ্রীরায় মুর্শিদাবাদ জেলার বিরাট বাজেটিয়া কৃষি শিল্প প্রদর্শনীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়ে কৃতিত্বের সহিত প্রদর্শনী পরিচালনা করেন এবং পল্লীগ্রামে আবাস নির্ম্মাণ করে এখনও মধ্যে মধ্যে তিনি কৃষি শিল্পের উন্নতির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। ১৯৩৯ সালে বহরমপুর "মণীন্দ্র মিলস" ( কাপড় কল ) স্থাপিত হবার সময় থেকে তিনি প্রতি ত্রৈবার্ষিক নির্ব্বাচনে ঐ কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হয়ে আসছেন।

শ্রীরায় শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে বরাবর সংযুক্ত আছেন। ওকালতীর প্রথম দিকে তিনি বহরমপুরে খাগড়া জেনানা শিক্ষা কমিটির সরকার নিযুক্ত সম্পাদক হন। পরে শতবর্ষজীবী বহরমপুর বালিকা মহাকালী পাঠশালা তাঁর পরিচালনায় সামান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সহরের এক বিশিষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়ের পথে উন্নীত হয়। তিনি বহরমপুর গার্লস কলেজের স্থাপনায় যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন এবং প্রথম থেকে ঐ মহাবিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর সক্রিয় সদস্য নিয়োজিত আছেন। ত্রিশ বছর পূর্ব্বে বহরমপুরে মূক-বধির বিদ্যালয় তাঁর প্রযত্নে স্থাপিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং স্থাপনা থেকে তিনি এ যাবৎ ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরাট উন্নতি সাধন করেছেন। মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি স্থাপিত হওয়ার পর তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সমিতির সরকার নিয়োজিত সদস্য এবং সহ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৪১ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরাট আন্দোলন সময়ে শ্রীরায় মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিবাদ সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে ভাষণ দিয়াছিলেন। ১৯৫১ সালে 'গিরিজাশঙ্কর' সঙ্গীত সম্মেলনে এবং ১৯৫৩ সালে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত 'সারা বাংলা সঙ্গীত' সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

## ছয়

॥ গ ॥

শেষ এবং চরম কথাটা জানিয়ে দিয়ে যেন মহেন্দ্র সাহা ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং ক্রমশ এক সময় দরজার বাইরে অন্ধকার ঝরা পথে মহেন্দ্র সাহার পায়ের ভারী জুতোর শব্দটা মিলিয়েও গেল।

ক্ষীরোদা যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইলো। তার সমস্ত বোধ শক্তি যেন তখন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। সমস্ত চেতনা কোন এক অতল অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে। কোন রকম অনুভূতিই আর নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছে।

গত কয় মাসেই মহেন্দ্র সাহাকে চিনেছিল ক্ষীরোদা।

একটি মাত্র দৃষ্টিতেই মহেন্দ্র সাহা চিরদিন সমস্ত স্ত্রী জাতটাকে দেখে এসেছে। একটিমাত্র প্রয়োজনই ছিল মহেন্দ্র সাহার কাছে স্ত্রী জাতির, এবং সে প্রয়োজনটা যেমন স্পষ্ট তেমনি স্থূল। এবং সে প্রয়োজনটা হচ্ছে স্ত্রীলোকের স্থূল দেহটা। রক্ত মাংসের স্থূল দেহটা, তাই সে নিত্য নতুন স্ত্রীলোকের সন্ধানে ফিরত।

সে জন্য সে খরচ করতেও অবিশ্যি যেমন দ্বিধা করতো না তেমনি প্রয়োজনটা মিটে গেলে অর্থাৎ সেই নারীকে কিছুদিন ভোগ করার পরই তাকে ত্যাগ করতেও কোন রকম সংকোচ ছিল না তার।

ক্ষীরোদার আগে আরো অনেক নারীই মহেন্দ্র সাহার জীবনে এসেছে এবং কাউকেই সে দুই থেকে ছয় মাসের বেশী আঁকড়ে থাকে নি।

সে রাত্রের ঐ ব্যাপারটা না ঘটলেও ক্ষীরোদাকে যেতেই হতো এবং সেই কথাটাই কিছুদিন ধরে চিন্তা করছি মহেন্দ্র সাহা।

আকস্মিক একটা দুর্ঘটনায় কেবল সেটা কিছুদিন পিছিয়ে গিয়েছিল মাত্র।

তাই ক্ষীরোদার কাছে ব্যাপারটা যতই আকস্মিক হোক মহেন্দ্র সাহার দিক থেকে কোন আকস্মিকতাই ছিল না।

কথাটা জানিয়ে দিতেও তাই মহেন্দ্র সাহার কোন রকম দ্বিধা বা সংকোচ হয় নি। কিন্তু ক্ষীরোদা সত্যিই যেন একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল মহেন্দ্র সাহার স্পষ্ট কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে।

ব্যাপারটা যেন তার কল্পনারও অতীত ছিল। কারণ একদিন মহেন্দ্র সাহা তাকে চেয়েও পায়নি। প্রচুর অর্থ ও ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখিয়ে ও ক্ষীরোদার মত সামান্য এক মেয়ের মনকে টলাতে পারে নি।

সার ফলে মহেন্দ্র সাহার জিদটা যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছিল।

ক্ষীরোদা দিনের পর দিন যত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মহেন্দ্র সাহা যেন ততই ক্ষীরোদাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

কোথায় ধনী ব্যবসায়ী মহেন্দ্র সাহা আর কোথায় অতি সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরনাথ মিশ্র।

মহেন্দ্র সাহা ভেবে পায়নি প্রৌঢ় হরনাথের মধ্যে এমন কি পেয়েছিল ক্ষীরোদা যাতে করে সে কখনো ফিরেও তাকায় নি মহেন্দ্র সাহার দিকে।

কিন্তু মহেন্দ্র সাহা জানতেও পারে নি, বুঝতেও পারেনি, হরনাথের কাছে বাঁধা পড়েছিল ক্ষীরোদা নেহাৎ মনেরই দিক থেকে।

মহেন্দ্র সাহার কাছে পুরুষের একটা দিকই বরাবর স্পষ্ট ছিল তার টাকাকড়ি ও ঐশ্বর্য। কিন্তু পুরুষের ঐশ্বর্য বাদ দিয়েও যে আর একটা দিক থাকতে পারে তার নারীর কাছে, সেটা জানত না বলেই মহেন্দ্র সাহা বুঝতে পারেনি ক্ষীরোদার মনের কোথায় বাঁধন পড়েছিল, দরিদ্র হরনাথ কোথায় ক্ষীরোদাকে আকর্ষণ করেছিল।

মহেন্দ্র সাহা জানত না যে নারীর মনের মধ্যে ভালবাসা বলে একটা বস্তু আছে এবং সেই ভালবাসাই তাকে হরনাথের গৃহে বেঁধে রেখেছিল।

আর ক্ষীরোদা যে একদিন স্বেচ্ছায় তার কাছে ছুটে এসেছিল দিক-বিদিক হারিয়ে, সে-ও ঐ ভালবাসার ভিতটা অকস্মাৎ গুঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে।

অথচ মহেন্দ্র সাহা সে রাত্রে তার গৃহে ক্ষীরোদাকে দেখে ভেবেছিল, বুঝি এতকাল পরে ক্ষীরোদার ভুল ভেঙ্গেছে। আর তাইতেই হরনাথকে ত্যাগ করে ক্ষীরোদা তার এখানে চলে এসেছে। মনে মনে হেসেছিলও মহেন্দ্র সাহা। হেসেছিল সে দুটি কারণে।

প্রথমত সে ভেবেছিল এতকাল পরে ক্ষীরোদার ভুল ভেঙ্গেছে, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা সে বুঝতে পেরেছে।

দ্বিতীয়ত যে ক্ষীরোদা এতকাল তাকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে, শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষীরোদাকেই স্বেচ্ছায় যেচে তার কাছে এসে ধরা দিতে হলো। ক্ষীরোদাকে মহেন্দ্র সাহা এতদিন পরে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে এই আনন্দেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। সে বুঝতে পারেনি ক্ষীরোদা তার মুঠোর মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে নিছক একটা দুরন্ত অভিমানের তাড়নাতেই।
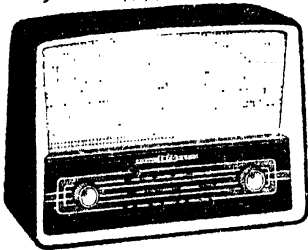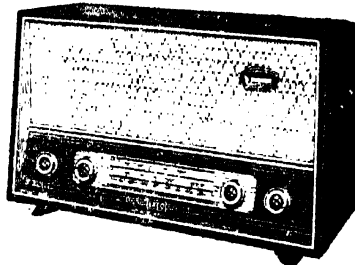
**মডেল বি-৭৬৪ঃ** ৬ ভাল্ব, ৩ ব্যাণ্ড, প্ল্যাষ্টিক ক্যাবিনেট, ড্রাই ব্যাটারীতে চলে

**দাম ২৬৫৲ টাকা**
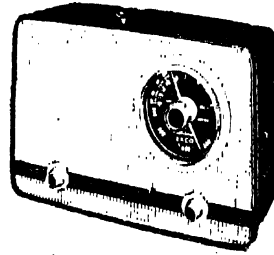
**মডেল ইউ-৭৫৬ঃ**
৩ নোভাল ভাল্ব, ২ ব্যাণ্ড, অল্প খরচে বড় সেটের কাজ দেয়। মেহগ্নি প্ল্যাষ্টিক ক্যাবিনেট

**দাম ১২৫৲ টাকা**
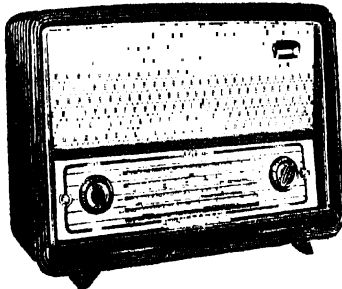
**মডেল এ-৭৪৪ ঃ** ৪ ব্যাণ্ড, ৬ নোভাল ভাল্ব যাতে ৮ ভাল্বের কাজ হয়। ছাঁচে তৈরী ক্যাবিনেট **দাম ৪০৫৲ টাকা**
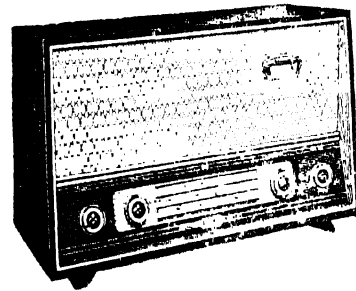
**মডেল বি-৭৫৫ ঃ** ৫ নোভাল ভাল্ব, ৩ ব্যাণ্ড, ভিনীয়র ক্যাবিনেট, ড্রাই ব্যাটারী সেট

**দাম ৩৫৫৲ টাকা**
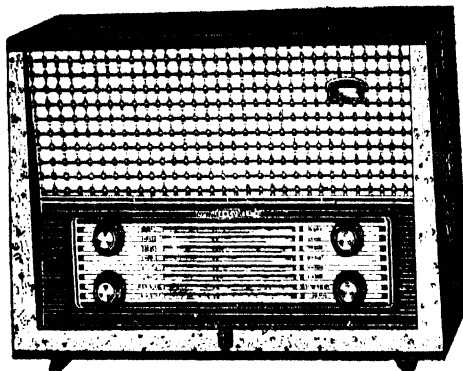
**মডেল এ-৭৬৭ ঃ** ৭ ভাল্ব, ৮ ব্যাণ্ড, সুদৃশ্য বড় ক্যাবিনেট **দাম ৭২৫৲ টাকা**

সব দাম উৎপাদন শুল্কসমেত; অন্যান্য কর আলাদা

# GRA

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড

কলিকাতা • বোম্বাই
মাদ্রাজ • দিল্লী • পাটনা
বাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ

**ন্যাশনাল একো**

JWT/GRA 4226A

সত্যিই ক্ষীরোদা দুরন্ত একটা অভিমানের বশেই গঙ্গার জল থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে হাঁটতে হাঁটতে অনির্দিষ্ট ভাবেই মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়ির জলসা ঘরে এসে ঢুকে পড়েছিল। ভাল মন্দ বিবেচনাটুকুরও কোন ক্ষমতা বুঝি ঐ মুহূর্তে ছিল না তার। তাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সহসা সামনে মহেন্দ্র সাহাকে দেখে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিল এবং মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরও যে সে মহেন্দ্র সাহার গৃহ থেকে অন্যত্র চলে যায়নি সেও দুরন্ত সেই অভিমানেই।

দুরন্ত অভিমানেই নিজেকে সে সমর্পণ করেছিল মহেন্দ্র সাহার লালসার গহ্বরে। কিন্তু তারপরই এসেছিল অনুশোচনা।

এ কি করলো সে। দুরন্ত অভিমানের মোহে এ সে কি করে বসল। দিনের পর দিন তিলে তিলে সে দগ্ধ হয়েছে।

মহেন্দ্র সাহার পাশবিক আলিঙ্গনের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থেকেছে আর অবিমিশ্র একটা ঘৃণার ক্লেদাক্ত অনুভূতি যেন তাকে প্রতি মুহূর্তে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

অথচ উপায়ই বা কি! কোথায়ই বা সে আর যাবে। পৃথিবীর সমস্ত দ্বারই তো তার কাছে আজ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বাকী জীবনটা তার ঐ বিষের জ্বালাতেই জ্বলে খাক হতে হবে। কিন্তু তখনও সে জানতে পারেনি, হরনাথের সন্তান তখন তার গর্ভে। হরনাথ তাকে বিতাড়িত করলেও তার বন্ধন তখনো তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে।

প্রথম যেদিন ক্ষীরোদা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল তার বুকের সমস্ত জ্বালা যেন অশ্রুর আকারে তার দু'চোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় ঝরে পড়েছিল।

কি করবে এখন সে, কি করবে। কিন্তু ভগবানই বুঝি সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন সে রাত্রে। অবিশ্যি স্বপ্নেও ভাবেনি ক্ষীরোদা মীমাংসাটা এমনি এক নিষ্ঠুর পথে এসে দেখা দেবে। কস্তুরীর শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাই তার বুঝি মনে হয়েছিল, এ তো সে চায়নি। এ তো সে চায়নি। তবু সে ভাবতে পারেনি মহেন্দ্র সাহা অতঃপর তাকে এমনি করে তার আশ্রয় থেকে চলে যেতে বলবে। বুঝতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র সাহার কাছে তার প্রয়োজনটা শেষ হয়ে যাবে। মহেন্দ্র সাহার কাছে সে এমনি করে এত তাড়াতাড়ি তুচ্ছ হয়ে যাবে।

কতক্ষণ বসেছিল ক্ষীরোদা অন্ধকারে চৌকীটার উপর খেয়াল হয়নি। সমস্ত চিন্তাটা যেন একটা জায়গায় এসে বরফের মতই জমাট বেঁধে গিয়েছিল। একটা জ্বলন্ত বাতি নিয়ে এসে ভৃত্য বৃন্দাবন ঘরে ঢুকল। এবং বাতিটা হাতে করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বাতির আলোয় ঐ ভাবে স্থাণুর মত ক্ষীরোদাকে শয্যার উপর বসে থাকতে দেখে কয়েকটা মুহূর্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর দু'পা এগিয়ে এসে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে মা। ইদানীং ক্ষীরোদাকে বৃন্দাবন মা বলেই ডাকত।

কি জানি কেন, বৃন্দাবনের ঐ মেয়েটির প্রতি কেমন একটা স্নেহ পড়ে গিয়েছিল।

ইতিপূর্বে মহেন্দ্র সাহার ঐ বাগান বাড়িতে যে সব নারী এসেছে তাদের থেকে ক্ষীরোদা যেন স্বতন্ত্র।

এবং তার ঐ স্বাতন্ত্র্যই বুঝি ক্ষীরোদার প্রতি বৃন্দাবনের মনটাকে আগে যারা এসেছে, তারা হেসেছে, গেয়েছে, কেউ কেউ প্রথম প্রথম দু' চার দিন একটু আধটু মুখভার করে থাকলেও পরে আবার সহজ হয়ে গিয়েছে।

দু' হাতে মহেন্দ্র সাহার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, গহনা নিয়েছে, শাড়ী নিয়েছে। কিন্তু ক্ষীরোদাকে বৃন্দাবনের মনে হয়েছে একেবারে স্বতন্ত্র।

মহেন্দ্র সাহার দেওয়া কোন জিনিষ সে স্পর্শও করতে যেন ঘৃণা বোধ করেছে। নেহাৎ না নিলে নয় তাই যেন নিয়েছে। শাড়ী পরেছে, গহনা পরেছে, কিন্তু সেও সামান্য সময়ের জন্যই। মহেন্দ্র সাহা চলে যাবার পরই সব খুলে ফেলেছে আবার। একদিন বৃন্দাবন না শুধিয়ে পারে নি। শুধিয়েছিল, ওকি সব গা থেকে খুলে ফেললে কেন? ক্ষীরোদা সে কথার কোন জবাব দেয় নি। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে দু' চারটে শাড়ী, গহনা বৃন্দাবনকে দিয়েছে। বৃন্দাবন প্রথমটায় নিতে চায় নি।

বলেছে না, না—কর্ত্তা বাবু জানতে পারলে আমাকে কেটে ফেলবে!

ক্ষীরোদা বলেছে, কিন্তু জানবে কেমন করে বৃন্দাবন? নাও তুমি—

কিন্তু তুমিই বা দিচ্ছ কেন আমাকে এ সব?

দিলামই বা, নাও—

শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারেনি বৃন্দাবন, হাত পেতে নিয়েছে।

মনে মনে এত ভেবেছে, এ কেমন ধারা মেয়েছেলে, নিজের শাড়ী গহনা পরকে বিলিয়ে দেয়।

হাতের বাতিটা এক পাশে নামিয়ে রেখে বৃন্দাবন আবার শুধায়। অমন করে বসে আছো কেন মা? শরীরটা কি আবার খারাপ লাগছে?

ক্ষীরোদার দিক থেকে কোন জবাব আসেনি। যেমনটি সে স্থাণুর মত বসেছিল তেমনিই বসে থাকে।

বৃন্দাবন আবার শুধায়, কি হয়েছে মা? কথা বলচো না কেন?

ক্ষীরোদা ধীরে ধীরে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়াল।

বৃন্দাবন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ক্ষীরোদার মুখের দিকে।

বৃন্দাবন!

কেন মা?

আমি চলে যাচ্ছি—

চলে যাচ্ছো! কোথায়?

কোথায়!

হ্যাঁ, কোথায় যাবে?

তাতো জানি না। আমার ঐ ঘরে যা কিছু রয়েছে তুমি নিও।

শরীর তখনো ক্ষীরোদার রীতিমত দুর্ব্বল।

তবু সেই দুর্ব্বল শরীরেই কাঁপা কাঁপা পা ফেলে খোলা দরজার দিকে কথাগুলো বলে এগিয়ে যায় ক্ষীরোদা।

বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি সামনে এসে দাঁড়ায়।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছো মা? দুর্ব্বল, কাঁপছো হাঁটতে পারছো না—

ক্ষীরোদা কোন জবাব দেয় না, খোলা দরজা পথে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দাঁড়াও মা, দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছো? বৃন্দাবন সামনে ছুটে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

তোমার বাবু বলেছেন, এখান থেকে আমাকে চলে যেতে—

সে কি!

হ্যাঁ—পথ ছাড়ো বৃন্দাবন, আমাকে যেতে দাও।

না, তা হয় না—তুমি ফিরে চল মা। কত্তা বাবুকে যা বলবার আমি বলবো।

বৃন্দাবন।

কেন মা?

কস্তুরীর বাড়িটা কোথায় জানো?

বাঈজী সাহেবার বাড়ি?

হ্যাঁ—

জানি।

আমাকে সেখানে একটু পৌঁছে দেবে?

সেখানে তুমি কোথায় যাবে মা?

আমাকে একটু পৌঁছে দেবে সেখানে তুমি?

কিন্তু মা—

বৃন্দাবন যেন কি বলবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে ক্ষীরোদা বলে, চল আমাকে সেখানে একটু পৌঁছে দেবে?

কিন্তু মা, এই দুর্বল শরীরে সেখানে তুমি যাবে কি করে, সে তো কাছে পিঠে নয়, অনেকটা পথ। একটা বরং গাড়ি—

না, না—তুমি চল, আমি হেঁটেই যেতে পারবো।

এখান থেকে অনেকটা পথ মা—রামবাগান কি এখানে?

ঠিক পারবো আমি—তুমি চলো।

কাল সকালে তোমাকে না হয় সেখানে আমি পৌঁছে দেবো মা। বৃন্দাবন বলে।

না, মা—কাল সকালে নয়, এখুনি, এখুনি—

বৃন্দাবন মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে। তারপর বলে, বেশ—চল।

আবার পথে এসে নামল ক্ষীরোদা। অন্ধকার রাস্তা। দুপাশে কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী। মধ্যে মধ্যে দু-একটা গৃহস্থবাড়ির জানালা পথে সামান্য আলোর আভাস চোখে পড়ে।

আগে আগে বৃন্দাবন ও পশ্চাতে ক্ষীরোদা পথ ধরে হেঁটে চলে।

দুর্বল শরীর ক্ষীরোদার। হাঁটতে আর পারে না। পা দুটো যেন ভেঙ্গে আসে। মাথাটার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে।

এক সময় বৃন্দাবন শুধায়, হাঁটতে কি কষ্ট হচ্ছে মা?

না, না—তুমি চল, কিন্তু আর কত পথ?

এখনো অনেকটা পথ মা।

এতক্ষণে সেই অন্ধকার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষীরোদার দু' চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ক্ষীরোদা হাঁটতে থাকে।

রাত প্রায় পৌনে দশটা নাগাদ ওরা এসে পৌঁছল কস্তুরীর গৃহের সামনে। কিন্তু দ্বারের সামনে পৌঁছেই দুজনে থমকে দাঁড়াল।

দুয়ার বন্ধ।

দরজা বন্ধ মা—তালা দেওয়া। বৃন্দাবন মৃদুকণ্ঠে বলে।

ক্ষীরোদার তখন আর দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। সে সেই বন্ধ দরজার সামনেই ধূলোতে বসে পড়ে। মাথাটা তখন তার ঘুরছে।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে বৃন্দাবন, কি—কি হলো মা!

কিন্তু ক্ষীরোদার জবাব দেবার মত তখন আর ক্ষমতা নেই, ধীরে ধীরে চোখের সামনে তার সব অন্ধকার হয়ে যায়।

পথের 'পরেই লুটিয়ে পড়ে ক্ষীরোদা জ্ঞান হারিয়ে।

[ক্রমশঃ।

## বুদবুদ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এখানে সাগর কেঁদে ফেরে—
আশা হীন, স্বপ্ন হীন সাগরের আদিগন্ত কালো,
নিয়ে গেছে প্রদীপের ঘরে ঘরে জেগে থাকা আলো;
জীবনের বন্ধ্যা ঝড়
পংকিল ঝাপটাতে নিভিয়েছে এরে,
তাই বুঝি তাই—
এখানে সাগর আজো
আজো তাই হয়ত বা কেঁদে কেঁদে ফেরে।

এক বিন্দু বুদ বুদ তবু—
কেড়ে নেয় সাগরের আশাহীন উদ্ধত অঞ্চল;
বুকের বাসায় বাস, নয় তবু ভীরু অচঞ্চল।
মৃত্যুর বিভীষিকা
হারাতে পারেনি এক বিন্দুও কভু,
হোক না সে ছোট—
বুদ বুদই জয়ী হবে
জয়ী হবে বুদ বুদ চিরকাল তবু।

## শিল্প দুঃখ সমন্বয়

অবিনাশ রায়

কে সব পেয়েছে বলো, ইচ্ছামত যা চেয়েছে তা'—
কি প্রেম, কি কৌতুকে, দুঃখে, কণ্টকবনের ধারে বসে
তরঙ্গসমুদ্রে আঁকে কেবা স্মৃতিচিত্রণের খাতা
হিরণ্ময় দিগন্তের প্রান্তে একা একান্ত হরষে।
যেহেতু বঞ্চিত ঋতু, মানে নেই শিল্পজ্ঞ ভূমিকা।
মৃত্যুরে দিয়েছি নিদ্রা (অন্য নামে) লক্ষ কোটি বিস্মিত সময়।
মনশ্চক্ষে ভাসে স্পর্শ অবোধ চিত্তের মুখশ্রীতে
ঈশ্বরের মূর্তি দীন নির্বিকল্প সমাধিতে ভয়।
কস্তুরীগন্ধের মত ঢেউ তুলছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে।
অফুরন্ত দিন-আর্তি, প্রেম পদ্ম-পত্রে যেন লিখা।

বসন্ত জাগ্রত হলে রৌদ্র এসে দরিদ্র কুটীরে,
রত্ন গর্ভা দিন আনে: সুকুমার যৌবনে সম্প্রীতি
উৎকণ্ঠায় তপ্তমুখ, মুগ্ধতার ব্যর্থক শরীরে
অনন্ত কালের দৃশ্য,—অবিস্মরণীয় পরিচিতি।

কিন্তু সে শিল্পিত দুঃখ, বুঝবে কোন আন্তরিকতায়?

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

পরিমল গোস্বামী

১৬

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী রচনা এতই প্রবল এবং শাণিত যে তা অনেকে সহ্য করতে পারেনি। তাঁর লক্ষ্য সব সময়েই প্রায় প্রথা বা সমাজের নামে অসহায় মেয়েদের উপর, অত্যাচারী পুরুষের বিরুদ্ধে। সত্য কথা বলতে তাঁর কোথাও কোনো দ্বিধার লেশ মাত্র নেই। মনে হয় তাঁর নীতি রবীন্দ্রনাথের বাণী থেকেই আহৃত করা—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে।"......

এ আদর্শ থেকে বনবিহারীবাবু ভ্রষ্ট হননি। তাঁর 'নরকের কীট' নামক ব্যঙ্গ রচনাটিকে আমি বনবিহারীবাবুর একটি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ ব'লে মনে করি। এতে তাঁর পাকা হাতের ছাপ। এখানে হিউমার রূপে এসেছে বিষয়বস্তুর জরুরিতে। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করি—

"নরক !—নরকেই ত আছি হে। Been there since 1876. একটা আইডিয়া দিই। উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—হাঁ হাঁ তাই। I mean your সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—অর্থাৎ কি না যে দেশে আখ খেজুরের চাষ হয় এক জাভা থেকে চিনি আমদানি করতে হয়···। নাঃ তোমাদের দোষ কি ? দোষ সব অজেয়া মথার। ১২১১ সাল থেকে দাসত্ব করে আসছে, অথচ জাতকে জাত সমুদ্রে ডুবে ম'ল না। আজও বাঁচতে চায়, অমর হতে চায়। আজও বংশ বৃদ্ধি করছে আর রেখে যাচ্ছে কতকগুলো হ্যাংলা ক্যাংলা ছেলের পাল, যাদের পেট ভরবে শুধু পীলে আর লিভারে। A colony of maggots in a dungheap।

ধানের ক্ষেতে লাঙল পড়ে না। তা হোক, ছেলের ক্ষেত পতিত থাকবার জো নেই, কনসেণ্ট বিলের নামে হাহাকার একেবারে।

মর‍্যালিটি !—হাঁ ও জিনিসটা তোমাদের আছে। সুবোধকে চিনতে ? ওরকম মর‍্যাল লোক প্রায় দেখা যায় না। চুরি করতে পারল না ব'লে চাকরি খোয়াল। হাতে টাকাকড়ি কোন কালেই বিশেষ কিছু ছিল না।··কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তার স্ত্রী একটু লেখাপড়া জানতেন। Higher mental sphere এ মিশবে ব'লে হয়ত শিক্ষিত মেয়ে বে করেছিল। তার প্রত্যক্ষ ফল হয়েছিল চারটে না কটা ছেলে। এই গুলোকে নিয়ে স্ত্রী এক স্কুলে কর্ম নিলেন। সেও আবার বরিশালে না কোথায়।

ছেলে-পুলের সমস্ত ভারটা স্ত্রীকেই বহন করতে হল। তিনি বেতন পেতেন অল্প। তাই স্কুলের কাজের পর সমস্ত দিনটাই প্রায় টিউশন ক'রে কাটাতে হ'ত। প্রবাসে নিরানন্দে গুরুশ্রমে তিনি বেশ রুগ্ন হয়ে পড়লেন।··সুবোধ স্ত্রীর জন্য হা-হুতাশ করত অনেক, কিন্তু কিছু সাহায্য করতে পারত না। তবে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করত, এবং একটি ক'রে সন্তান দিয়ে আসত। ঐ অবস্থাতেই তাঁর গর্ভে আরও চার-পাঁচটা সন্তান উৎপাদন ক'রেছিল।

"Human weakness ? It is inhuman weakness।

"আমি তাকে বলেছিলুম ঐ শ্মশানের মড়াটাকে ছেড়ে দাও। তুমি না হয় একটু কুপথে যাও। But he had not the pluck to be immoral. He had a homicidal morality.

"স্ত্রীকে তুষ্ট করিবার জন্য সে এই কাজ করেছিল ? It is a lie। It is worse than that. It is হিতোপদেশ। ঐ হিতোপদেশে 'অষ্টগুণ কামাগ্নির তুষানলে তোমরা পুড়ে খাক হয়ে গেলে। আজও আগুন নিবল না। আজও পথে ঘাটে তোমাদের তরুণ সাহিত্যের ফ্রয়েডিজম অ্যাণ্ড সাইকোলজির মধ্যে আমি দেখতে পাই ঐ আদ্যিকালের তুষানলের হল্কা। সুবোধকে কামনা করা দূরে থাক, তার স্ত্রী পায়ে ধ'রে তাকে বলেছিল, 'ওগো, আমার উপর দয়া কর। আমার কাছে আর এসো না।' প্রথমটা অনুরোধ উপরোধ। তারপর রাগারাগি। শেষটা she refused to meet him.

"কিন্তু সবল পুরুষ এত সহজে তার প্রপার্টি ছাড়বে কেন ? খুব খানিকটা লাঠালাঠি, পুলিস পেয়াদা, মামলা মকদ্দমার গুজব শুনেছিলাম। তবে ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াল না। স্ত্রীটা managed to die in a hospital during child birth...

"সুবোধও মারা গেছে···

"—ছেলেগুলো ? হা হা হা হাঃ সেগুলো ডিমভাঙা মাকড়সার বাচ্চার মত ছররছর ক'রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমি করেছি ? হ্যাঁ, তা করেছি ত।··· করেছি তাতে কি ? তাতে সুবোধের মর‍্যালিটি কিছু কমল ?

"—ও ! আমার মহানুভবতা ? তা বটে ! But don't you know I used to love that girl ?

"না না না না ! সে রকম কিছু না। ভয় পাবার মত কিছু নেই। তাঁর মধ্যে প্রেমের লেশ মাত্রও ছিল না। স্বামীর প্রতিও না, পরপুরুষের প্রতিও না She was nothing but a mother, এবং মাতৃত্ব ছিল তার দু'চক্ষের বিষ।

"আঃ। বাঁচা গেল, কি বল ? সুবোধের স্ত্রী আমাকে ভালবাসত এমন হ'লে গল্পটা একেবারে মাটি হয়ে যেত। কেমন, না ?"...

এই হ'ল এ কাহিনীর আরম্ভ।

আর এই হ'ল বনবিহারীবাবুর ব্যঙ্গের চেহারা। তাঁর আঁকা ব্যঙ্গচিত্রগুলিও একত্র করলে একখানা উৎকৃষ্ট বই হতে পারত। তার শক্তিও কম ছিল না।

স্মৃতিচিত্রণে এঁর অনেকখানি পরিচয় দেওয়া আছে। আরও একটি কাহিনী আমি তখন শুনেছিলাম বলাইচাঁদের কাছে। বনবিহারীবাবু একবার বিহারের কোনো মহকুমা শহরের হাসপাতালে বদলি হয়ে গেছেন। স্থানীয় দু চার জন বাঙালী এসে আলাপ ক'রে গেছেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর কাছে বাংলা বই দেখে কিছুদিন পরে এক ভদ্রলোক তাঁর কাছ থেকে পড়বার জন্য একখানা ভাল বই চেয়ে পাঠান। বনবিহারীবাবু রবীন্দ্রনাথের কোনো একখানা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে।

কিন্তু সে বই তাঁর পছন্দ না হওয়াতে ফের পাঠিয়ে লিখেছিলেন ভাল বই চান তিনি।

বনবিহারী বাবু তাঁকে মোটা একখানা পঞ্জিকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ ভিন্ন আর কি-ই বা করতে পারতেন তিনি।

এমন মানুষের হৃদয়ে পৌঁছনো বড়ই কঠিন। হৃদয় আছে ব'লেই কারো মনে হবে না। অথচ সেই বনবিহারী বাবুর চোখেও জল ঝরে। জল ঝরেছে ব'লেই তো সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই।

তাঁর চরিত্রের এই দিকটির কথা আরও একটুখানি স্পষ্ট ক'রে বলি। বহুকাল পরে তাঁর সঙ্গে যখন পুরনো আলাপের সূত্র ধ'রে নতুন ক'রে আলাপ হ'ল, তখন তা শুধু আলাপ-এর সীমানাতেই আবদ্ধ থাকেনি, আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল। তিনি আমাদের বাড়িতে প্রায় আসতেন, কিন্তু সুযোগের অভাবে আমি তাঁর লেক রোডের বাড়িতে যেতে পারিনি।

তিনিই লেখা নিয়ে আসতেন আমাদের বাড়িতে। অভিমানী লোক, আত্মসম্মান বোধ অত্যন্ত উগ্র। মাথা নিচু করেননি কোনো অন্যায়ের কাছে। অনুগ্রহ ভিক্ষা করেননি কারো কাছে। আমাকেও একবার লিখেছেন মাথা উঁচু রাখতে। ১৩৫৯ সালের ৩০শে নবেম্বর একখানা দীর্ঘ চিঠির শেষে আমাকে (আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে শুনে) লিখছেন—"কাসতে কাসতে মাথা বার বার নুয়ে পড়বে, তবু মাথা উঁচুই রেখো। নোয়ালে নুয়েই পড়বে। তাতে আনন্দ নেই।"

বলেছি লেখা নিয়ে আসতেন আমাদের বাড়িতে। ৪ঠা ডিসেম্বর (১৩৫৯) তারিখেও এসেছিলেন। কিন্তু এই ভাবে লেখা নিয়ে আসা উচিত হচ্ছে কি না হঠাৎ তাঁর মনে এমন একটি প্রশ্ন জেগে থাকবে। আমাকে পরদিনই চিঠি লিখলেন—

পি ২৪৫ লেক রোড, কলিকাতা ২৯

৫।১২।৫১

পরিমল,

কাল তোমার কাছ থেকে আসবার সময় নিজের কাঙালমূর্তি প্রত্যক্ষ ক'রে আঁৎকে উঠলুম। লেখার তাড়া নিয়ে, বা কোনও দরখাস্ত হাতে করে দ্বারে দ্বারে ঘোরা ত কখনো করিনি। আজ হঠাৎ এ কাজ করবার প্রবৃত্তি হ'ল কেন ? আমার লেখা পাঁচজনকে দেখাবার এ লোলুপতা আমার পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ। মনে হচ্ছে জরাজীর্ণ মনের আবল্যে একটা বেসামাল কাজ ক'রে ফেলেছি—enlarged prostateএর ফলে দেহ যেমন করে।

এবার আত্মস্থ হলুম। লেখা ও ছবির উপর থেকে সমস্ত মমত্ব প্রত্যাহার করে নিলুম। ছাপা হোক আর না হোক তাতে আমার কিছু এসে যায় না। 'নরকের কীট' যেমন করে ছাপিয়েছ—আমার অনুরোধ বা অনুমতির অপেক্ষা না রেখে, তেমনি ক'রে ছাপাতে হয় ছাপিও, না ছাপালে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিও। আমাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে না। কারণ আমি কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখি না। রাখবার আধারও নেই।

অফিশিয়াল খামের পেছনে অর্ডিনারি কালিকলম দিয়ে ছবি এঁকে ছড়িয়ে দিয়েছি। পয়সা চাইনি, appreciationএরও ভরসা করিনি। মনের সেই সতেজ স্বাতন্ত্র্য আমার ফিরে আসুক, এই প্রার্থনা করে right about turn করলুম।

এবার যখন দেখা করতে যাব, কেবল দেখা করার বেশী কিছু মনে নিয়ে যাব না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

আসল মানুষটির পরিচয় এতে অনেকখানি পাওয়া যাবে। ঋজু মেরুদণ্ড। অনমনীয়। উচ্চ শির। বলিষ্ঠ মন। উগ্র স্বাতন্ত্র্য।

এ চিঠি পেয়ে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। আঘাতও পেয়েছিলাম কম নয়। হঠাৎ মনে হয়েছিল আমার কোনো কথায় বা ব্যবহারে কি তাঁর এসব মনে হয়েছে ? অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছু মনে আনা গেল না। তা ভিন্ন তাঁর প্রতি আমার এমনই একটা আকর্ষণ এবং তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভালবাসা এমনই অকৃত্রিম যে তাঁকে কোনো মতেই আমার কোনো ব্যবহারের দ্বারা দুঃখ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। নিশ্চয় তিনি নিজের লেখা নিজে বয়ে আনায় ব্যাপারটাই ভাল মনে করেননি এবং এ রকম আসাটাই অন্যায় মনে করেছেন, তাই এমন একখানা চিঠি।

নিজের লেখা বয়ে আনা নিয়ে আমি চিন্তা করলাম। বনবিহারী বাবুর পক্ষে এটি কিছুমাত্র অন্যায় হয়নি। তাঁর লেখা বিষয়ে আমার প্রকৃত শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে এবং আমার লেখার মধ্যে কিছু সহধর্মিতার পরিচয় পেয়ে, তিনিও আমাকে তাঁর সুহৃদ্ ব'লেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমার কাছে তাঁর কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ ছিল না। তবু হঠাৎ ওরকম একখানা চিঠি তিনি লিখলেন কেন তা নিয়ে চিন্তা করেছি। তিনি আমাকে পরম বন্ধু মনে ক'রেই আসতেন আমার কাছে, তবু কোনো কারণে মনে আত্মজিজ্ঞাসা জেগে থাকবে। নিজের লেখা বয়ে আনার মধ্যে কিছু দীনতা থাকা সম্ভব, এ কথা তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছে, নইলে ও রকম লিখতেন না। কিন্তু এই লেখা ব'য়ে

আনার মধ্যে লেখকের দিক থেকে যে আরও একটি ব্যাখ্যা আছে তা তাঁর মনে আসেনি তখন।

সে ব্যাখ্যাটা এই যে লেখক পাঠক-নিরপেক্ষ ভাবে সম্পূর্ণ নিজের তৃপ্তির জন্য লেখেন এ কথা ঠিক নয়। ভবিষ্যৎ কোনো কালে লোকে তাঁর লেখা পড়বে এমন উদ্দেশ্য থেকেও লেখেন না। তাঁর লেখা তাঁর সমসাময়িক কালের পাঠকদের দিকে লক্ষ রেখেই লেখেন। নইলে তাঁর লেখার প্রেরণাই হ'ত না। যে কোনো চিত্রশিল্পীর সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে। গায়ক বা সঙ্গীতশিল্পীর সম্পর্কেও এ কথা সত্য। খুব ভাল গাইতে পারেন এমন ব্যক্তি লোকালয় ত্যাগ ক'রে প্রতিদিন বিমানে ক'রে মরুভূমিতে গিয়ে গেয়ে আসেন না। কাছাকাছি অন্তত একজন সমজদারও যদি না থাকে তবে শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা জাগত কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চরম কথা ব'লে গেছেন—

একাকী গায়কের নহে তো গান,
মিলিতে হবে দুই জনে ;
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আরেক জন গাবে মনে।

. . . . . . . .

জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে,
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা
সেখানে গান নাহি সাজে।

রবীন্দ্রনাথ এই সহজ সত্যটি বহু বার বহু ভঙ্গিতে বলে গেছেন। এমন কি বিশ্বস্রষ্টাও তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন মানুষকে লক্ষ ক'রেই। সেজন্য তাঁকে মানুষ সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়েছে। 'তোমার আমার মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা,' অথবা 'তোমার—এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে, আমার—প্রাণে নইলে সে কোথাও ধরবে' প্রভৃতি গানের মধ্যেও ঐ একই কথা।

যে স্রষ্টা নয়, সংসারে যার দেবার কিছু নেই, সেই নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। কৃপণই শুধু সবার অগোচরে সিন্দুক বোঝাই করতে পারে। কারণ তা বাইরের জিনিস, সংগ্রহে আনন্দ, অন্যের সঙ্গে ভোগ ক'রে তার আনন্দ নেই। স্রষ্টা ঠিক তার বিপরীত। অতএব স্রষ্টাকে আপন গরজে তাঁর আনন্দের অংশীদার খুঁজে বেড়াতেই হবে। এ কোনো লাভের জন্য নয়, কোনো কিছুর লোভে নয়, এর মধ্যে কাঙালপনা নেই, হীনতা নেই। বনবিহারীবাবুও শিল্পীরূপে স্রষ্টারূপে ঠিক এই কারণেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের সমকালে তাঁদের সহধর্মী একটি দল ছিল। তাঁদের কথা আগেই বলেছি। সে দল, সে উৎসাহ, এখন নেই। যে সব কাগজ তাঁর লেখায় ছবিতে এককালে গর্বিত ছিল, সে সব কাগজে এখন তিনি অবহেলিত। এ কথা তিনি নিজেই আমাকে একবার চিঠিতে লিখেছেন।

তাঁর অনেক কথা শোনাবার আছে, অথচ তাঁর মতো, খরখড়গসম ঝলকিত হয়ে ওঠা সত্যবাক্যের লেখকের দোসর নেই, এ ঘটনা তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি স্বধর্মের তাগিদেই সমধর্মী খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল আমার মধ্যে তিনি মনের কথা খুলে বলবার মতো লোকের সন্ধান পেয়েছেন। এ কথা তিনি আগে আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন।

তাই আমি তাঁর ঐ চিঠি পেয়ে তার মধ্যে তাঁর অভিমান দেখে যে পরিমাণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, সেই পরিমাণ বিব্রত বোধ করেছিলাম। লেখা বয়ে আনার মধ্যে যদি কিছু হীনতাবোধ তাঁর জেগে থাকে তা হ'লে এমন একখানা চিঠি লেখা এক মাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

আমি এ চিঠির উত্তর লিখতে বসলাম। এতক্ষণ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যে কথাগুলো বললাম, সেই কথাগুলিই আরও সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে দিলাম। এ চিঠির মধ্যে আমার আবেদনের আন্তরিকতাটাই বেশি ফুটেছিল হয় তো। কারণ তাঁর চিঠি পড়ে আমার চোখে সত্যিই জল এসেছিল। এবং তা যতখানি দুঃখে, ততখানি আনন্দে। চিঠিকানার নকল নেই, এখন মনে হচ্ছে থাকলে ভাল হ'ত।

আমার চিঠি পেয়ে বনবিহারীবাবু লিখলেন—

P 245, Lake Road
Calcutta 29
9. 12. 57

পরিমল,

"তোমার চিঠি প'ড়ে আমারও চোখে জল এলো। খুব মিষ্টি লাগলো। আমার গুণগান করেছ বলে নয়, আমার চিঠির কদর্থ করনি ব'লে, তোমার কোনও ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছি, মনে করনি ব'লে। ভেবেছিলুম, আমার চিঠির উত্তর দিতে তোমাকে বেশ বেগ পেতে হবে। কিন্তু দেখছি, ঠিক উত্তরটি দিয়েছ—একেবারে masterly

"১১২৫ এ তোমার সঙ্গে অল্পই পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু তোমার কার্টুন দেখে সেই পরিচয় বেশ নিবিড় হয়েছিল। তারপর ইদানীং তোমার লেখা প'ড়ে তোমাকে আমার সগোত্র ব'লে মনে হয়েছে। তোমার মতামতকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করি।

"আমার সমস্ত লেখা ( অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ) তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। এদের সম্বন্ধে তুমি যা করবার কোরো। কোনটা ছাপবে, কোনটা ফেলে দেবে সেটা তোমার বিচারের ওপর ছেড়ে দিলুম।

"আমার লেখা প্রচার হওয়া দরকার মনে করেই লিখেছিলুম। আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। অবশ্য কাঁকতালে কিছু বাহবা পাবার আশাও মনে মনে ছিল। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল লোককে আমার কথা শোনানো। কারণ আমার বিশ্বাস, আমার মত ক'রে আর কেউ বলেনি—নিছক সংসারের মঙ্গল কামনায়।

"সুস্থ থাকো, সুখে থাকো, আশীর্বাদ করি।

"তোমার চিঠি প'ড়ে আমার ভাই তোমাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। এর প্রতিদানে তোমাকে কিছু করতে হবে না।···

শুভাকাঙ্ক্ষী
বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

"প্রচার হওয়া দরকার মনে করেই লিখেছিলুম। আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।"—চিঠির এই কথাগুলি আমার চিঠি পড়বার পর তাঁর আত্মবিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। এই আকাঙ্ক্ষা সকল শিল্পীর। এ কথাটা তিনি আত্মাভিমান বশত হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলেন।

আমাদের বাড়িতে যখন আসতেন, তখন সব সময়েই তাঁর, ভাই বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তিনিও বৃদ্ধ। দু জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব আমি লক্ষ্য করেছি। এ চিঠিতে তাঁর কথাই বলা

হয়েছে। তিনিই বনবিহারীবাবুর একমাত্র সহধর্মী এবং সহচর। একদিন আমাদের বাড়িতে ব'সে কোনো কথা প্রসঙ্গে আমার লেখা একটি ব্যঙ্গ নক্সার কথা মনে পড়াতে সেটি তাঁদের প'ড়ে শুনিয়েছিলাম। রচনাটির নাম "জড়বাদের দেশে দু মাস" (বর্তমানে 'বারোভূতের আসর' নামক আমার গল্পগ্রন্থে সংকলিত)। শোনামাত্র বনবিহারীবাবুই সেটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। বললেন এটি আমি নিয়ে যাব। যে মাসিকে বেরিয়েছিল (সম্ভবতঃ 'সংহতি'তেই মনে হচ্ছে) তার দুখানা কপি আমার ছিল, একটি তাঁকে দিয়ে ধন্য বোধ করলাম। ১৯২৫-এ আমার আঁকা কয়েকটি কার্টুন ছবি দেখে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল, সে কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। এতদিনও মনে রেখেছেন, আশ্চর্য।

তিনি আমাকে তাঁর পুরনো দিনের লেখা ও ছবি পাঠিয়েছিলেন, তখনই আমি সে বিষয়ে কিছু বলিনি, ভেবেছিলাম আমার কেমন লেগেছে তা এক কথায় বলব না, সুযোগ পেলে বিস্তারিত ভাবে বলব। তিনি একখানা চিঠিতে লিখেওছিলেন, কেমন লাগল জানালে না কেন? এ কথারও উত্তর দিতে পারিনি তখন।

একদিন পরে সময় এলো। এর আগে ব্যাঙমা ব্যাঙমী দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যা বলেছি তার মূল কথাটা দ্বিতীয় স্মৃতিতে বিবৃত করেছি। তারপর রেডিওতে একদিন ২৬-৫-৭২ সামান্য কিছু বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর বলছি এই রচনায়। তাঁর সমগ্র রচনা আমার হাতে নেই। সেগুলো সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হত।

অনেক দিন তাঁর সংবাদ জানি না। আন্দামানে বাস করবেন ব'লে কলকাতা ছেড়েছিলেন। ঠিকানা হারিয়েছি। তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় নেই। তিনি তো সর্বত্যাগী। সম্ভবত সকল কামনা ত্যাগ ক'রেই দেশ ছেড়েছেন। (ক্রমশঃ)

# পিপাসা

**শ্রীমতী নন্দী কর**

বৃষ্টি এল,
আকাশ ভরে মেঘ আর
বুক ভরে তৃষ্ণা এল। আমার
সমস্ত দেহমন আকুল
হয়ে উঠেছে। আকণ্ঠ পিপাসায়
ভরে ভরে উঠছে
আমার দেহ
আমার মন।
রোমাঞ্চিত তনু পথের ধারে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা
শুকনো এ জংলা গাছগুলির মতই
সে চেয়ে আছে
উন্মন হয়ে। কখন আসবে
আকাশ ভরে মেঘ আর
নামবে বৃষ্টি। মিটবে
তার এই বুকফাটা পিপাসা,
(দেহের ক্ষুধা সেতো
মিটেছে সহজেই, কিন্তু মন?)
ঘনিয়ে আসা এই অন্ধ
শীতলতা এরই নাম কি মৃত্যু?
তিলে তিলে এই ফুরিয়ে যাওয়া
নিঃশেষ হয়ে এর
নামই কি অস্তিত্বের বিলুপ্তি?
যে বিলুপ্তি ঘটেছে
ঐ চাঁদটার। একদিন
সেও জ্বলেছিল এমনি
অতৃপ্ত তৃষ্ণায়।
সেই তৃষ্ণার উত্তাপে
সে জ্বলেছিল নিজে,
জ্বালিয়েছিল অন্যকেও।

তারপর কত যুগ,
কত বর্ষ পরে হঠাৎ
সবাই আবিষ্কার করলো
হয়েছে মৃত্যু আকাশের
ঐ চাঁদটার। আর সে
কোনোদিনও জ্বলবে না, জ্বালাবে না।

• • •

অতৃপ্ত পিপাসায় আমি
আকাশে উঠতে চেয়েছিলাম।
দু-হাত বাড়িয়ে ধরতে
চেয়েছিলাম এ সুন্দর উজ্জ্বল
তারাদের। আমি চেয়েছিলাম
তাদের চুম্বন করতে,
আলিংগন করতে।
বুকে বেঁধে রাখতে। কিন্তু
পারলাম না। পরিবর্তে
বিন্দু বিন্দু অন্ধকার এসে
ঘিরে ধরলো আমায়
চারপাশ হতে।
আমি জনে জনে বলেছিলাম
ধরো, তুলে ধরো আমায়।
আমি চোখ ভরে দেখি
তারাদের নীল ঐ আলো
বুক ভরে নিই তাদের
উষ্ণ উত্তাপের স্বাদে। কিন্তু
কেউ আমায় একটুকুও
সাহায্য করলো না।
তিলে তিলে মৃত্যুর শীতলতা
তোমায় গ্রাস করলো।

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

৫১

'কাল হোরা পঞ্চমী।' কাশী মিশ্রকে বললে প্রতাপ রুদ্র, 'বিরাট করে উৎসবের আয়োজন করো। যেন মহাপ্রভুর চমৎকার হয়।'

এ উৎসব লক্ষ্মীর বিজয়-উৎসব।

নীলাচলে লক্ষ্মীকে রেখে জগন্নাথ সুন্দরাচলে গেছেন এরই জন্যে লক্ষ্মীর অভিমান। যেখানে জগন্নাথের মন্দির অবস্থিত সেটা নীলাচল, আর যেখানে গুণ্ডিচাবাড়ি অবস্থিত সেটা সুন্দরাচল।

দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা, পঞ্চমীতেই লক্ষ্মী রাগ করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। রাগ করলেও সাজগোজ করতে ছাড়ে না। পালকি চড়ে বেরিয়ে আসে সমারোহে। বেরিয়ে সিংহদ্বারের কাছে এসে বসে। দাসীদের হুকুম দেয় জগন্নাথের চাকরদের বেঁধে আনতে। দাসীরা চাকরদের তুমুল গালাগাল দিতে সুরু করে। গালাগালে যখন কিছু হল না তখন সুরু করল প্রহার। চাকরেরা করজোড়ে ক্ষমা চাইল, বললে, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে জগন্নাথকে ফিরিয়ে আনব, কথা দিচ্ছি। প্রতিশ্রুতি পেয়ে মুক্তি দিল চাকরদের।

এই লক্ষ্মীর বিজয়। প্রতি বৎসরই হয় এই অভিনয়। এবার প্রভু দেখবেন বলে বেশি ঘটা।

প্রভাতে উৎসব দেখতে এসেছেন গৌরহরি। কান্তের সামান্য ঔদাস্যেই প্রেমবতী লক্ষ্মী ক্রুদ্ধ হয়েছে। সুবর্ণের চৌদোলা করে বেরিয়ে আসছে লক্ষ্মী, বাজছে নানা বাদ্য, রথের সামনে দেবদাসীরা নাচছে নানা ছন্দে, কারু হাতে বা ব্যজন-চামর, জলের ঝারি, পানের কৌটো। সিংহদ্বারে ক্রুদ্ধ মুখে বসল লক্ষ্মী। দাসীরা জগন্নাথের ভৃত্যদের বেঁধে নিয়ে এল লক্ষ্মীর কাছে। সুরু করল কটূক্তি, সুরু করল প্রহার। উঠল রঙ্গরসের তরঙ্গ।

দাসীদের প্রাগলভ্য দেখে মহাপ্রভুর খুশি আর ধরে না।

রসতত্ত্ববেত্তা স্বরূপ দামোদরকে মহাপ্রভু জিগগেস করলেন, লক্ষ্মীর প্রেমের তাৎপর্য কী? সুন্দরাচলে যাবার সময় লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিলেন না কেন জগন্নাথ?

রথযাত্রা লীলা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা থেকে বৃন্দাবন গমন লীলা। ব্যাখ্যা করলেন দামোদর। সুন্দরাচলে যে লীলা তা বৃন্দাবন লীলা। আর এই বৃন্দাবনলীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নেই।

কেন নেই?

বৃন্দাবন ঐশ্বর্য লেশশূন্য শুদ্ধ মাধুর্যের ধাম। শুদ্ধ মাধুর্যের অধিকারিণী একমাত্র ব্রজগোপী, লক্ষ্মী নয়। লক্ষ্মীতে ঐশ্বর্যের সমারোহ। বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য মাধুর্যের অনুগত। লক্ষ্মী তো দেবী, সে আনুগত্যে অসম্মত। সে যে বৈকুণ্ঠেশ্বরী।

বৃন্দাবন ক্রীড়ার সহায় ব্রজগোপী। যে শুধু কৃষ্ণ সুখে সুখী। যার প্রেমে আশা নেই, আকাঙ্খা নেই, অভিমান নেই। যার তৃপ্তি কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী। 'নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার।'

'বৃন্দাবন ক্রীড়ায় সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥'

'দেখ দেখ লক্ষ্মীর মান দেখ।'

এ এক নতুন রকমের মান। এ রোষ। মানে তো স্নিগ্ধ রোষ কটু, তপ্ত। মানে তো কান্না ভূষণ

ছাড়ে, মলিন বসনে অধোমুখে বসে মাটিতে নখের আঁচড় কাটে। সে মান দেখেছি সত্যভামায়। স্বর্গ থেকে নারদ পারিজাত নিয়ে এল। দিল কৃষ্ণকে আর কৃষ্ণ তা দিল রুক্মিণীকে। তাই দেখে সত্যভামার মান হল। মুখে বলা হয় আমিই তোমার আদরিণী, আদরের রাণী, কিন্তু পারিজাতের বেলায় আর সত্যভামা নয়। তখন রুক্মিণীতেই বেশি রুচি। সত্যভামা ম্লানমুখে মূক হয়ে রইল। এ রোষ নয়। রোষ না হলেও এ ঈর্ষা। এ ঈর্ষামান। ঈর্ষামানও সহেতুক।

কিন্তু গোপীমান ? গোপীমান অহেতুক।

কৃষ্ণ রাধিকার কুঞ্জে না গিয়ে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়েছে। রাধিকার মান হয়েছে। কিন্তু এ মান চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যে ঈর্ষার মান নয় চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে মনোমত সেবা করতে পারবে না সুখ দিতে পারবে না সেই শঙ্কার মান। এ মানের তুলনা নেই। এ রসের নিধান। এইশুদ্ধতম প্রেমের প্রকাশক।

'বলো বলো আরো বলো।' দামোদরকে উত্তেজিত করলেন মহাপ্রভু।

'গোপীদের ঠাকুরাণী রাধিকা। নির্মল উজ্জ্বল রসের আকর। অধিরূঢ় মহাভাব সদা রাধার প্রেম। বিশুদ্ধ নির্মল যেন দশবাণ হেম।।'

শেষ সীমার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হলেই অনুরাগ 'মহাভাব' নাম ধরে। তার অধিরূঢ় অবস্থা কখন ? চোখের পলক পড়লে সেই ক্ষুদ্র সময়ের জন্যে যে অদর্শন তাও অসহ্য মনে হয়। মিলনে কল্পপরিমিত সময়কে মনে হয় অল্পপরিমিত আর বিরহে ক্ষণকালকে মনে হয় অনন্ত কাল। যখন নায়কের সুখ তখনো তার আর্তি আশঙ্কা করে নায়িকার খেদ আর নিজের সুখ না দুঃখ সে সম্পর্কে বিস্মৃত। সেই অধিরূঢ় মহাভাবই রাধিকার। আর দশবাণ হেম—দশ বার আগুনে পোড়ানো হয়েছে যে সোনা সেই সোনার মত অমলিন।

শ্রীবাস পরিহাস করে বললে, 'জগন্নাথের এ কেমন ব্যবহার ? বৃন্দাবনের সম্পদ তো শুধু ফুল আর কিশলয়, গিরিমাটি আর শিখিপুচ্ছ। সেখানে কে যায় নীলাচল ছেড়ে ? এই ভেবেই লক্ষ্মীর অশান্তি। জগন্নাথের রুচি এমন বিকৃতি হল কী করে ? তাঁকে উপহাস করবার জন্যেই নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করে বসেছে। আমাকে ছেড়ে কোথায় গেল সেই বনবাদাড়ে। তা ছাড়া, তোমার গোপীরা কী করে ? দুধ জ্বাল দেয়, দধি মন্থন করে আর আমার লক্ষ্মী ঠাকরুণকে দেখ, কেমন রাণীর মত বসেছে রত্ন সিংহাসনে।'

দামোদর বললে, 'বৃন্দাবন সম্পদের যে সিন্ধু আছে তার এক বিন্দু বৈকুণ্ঠ, এক বিন্দু দ্বারকা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী, কান্ত পরম পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, সব বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ, সব ধেনুই কামধেনু। ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য। আর বংশীই প্রিয় সখী, বলে দেবে কোথায় সঙ্কেত স্থান, কখন মিলন মুহূর্ত। আর চিদানন্দই চন্দ্র-সূর্য। চিদানন্দই খাদ্য, চিদানন্দই আস্বাদ্য।'

'বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ সিন্ধু।
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ তার এক বিন্দু ।।
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী তাহাঁ বৃন্দাবনধাম ।।
চিন্তামণিময়-ভূমি রত্নের ভুবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ ভূষণ ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাহাঁ সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্যধন ॥
অনন্ত কামধেনু যাহাঁ চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহো না মানে অন্য ধনে ॥
সহজ লোকের কথা যাহাঁ দিব্যগীত।
সহজ গমন করে নৃত্য-পরতীত ॥
সর্বত্র জল যাহাঁ অমৃত-সমান।
চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহাঁ মূর্তিমান ॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহাঁ লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাহাঁ প্রিয় সখীকাজ ॥

রাধার শুদ্ধরস-কথা শুনে প্রভু নৃত্য সুরু করলেন। নিত্যানন্দ বুঝলেন প্রভুর এ রাধাবেশ উপস্থিত। তিনি তো বলদেব, তাই প্রভুর এ ভাব দেখে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে দূরে সরে গেলেন।

জগন্নাথের ফের পাণ্ডুবিজয় হল। অর্থাৎ রথ থেকে নেমে এলেন মন্দিরে। এক গাছি পট্টডুরি ছিঁড়ে গেল। পথে যে তূলোর বালিশ পাতা হয়েছিল তাও অনেক ফেটে গিয়েছে। মহাপ্রভু কুলীনগ্রামের জমিদার সত্যরাজ খান আর রামানন্দ বসুকে আদেশ করলেন। প্রতি বছর তোমরা পট্টডোর তৈরি করে আনবে। জানবে এই তোমাদের জীবনের ব্রত।

সত্যরাজ আর রামানন্দের আনন্দ দেখে কে।

এই ছেঁড়া ডোর নিয়ে যাও। তোমাদের ডোর যেন এর চেয়ে শক্ত হয়। এই পট্টডোরেই অনন্তদেবের অধিষ্ঠান। দশমূর্তি ধরে অনন্তদেব কৃষ্ণের সেবা করে। ছত্র, চামর, পাদুকা, গৃহ, আসন, শয্যা, উপাধান, বসন, যজ্ঞসূত্র আর আরাম—এই দশ মূর্তি।

একদিন মন্দির থেকে বেরিয়ে নিজ গৃহে এসে প্রভু নামকীর্তন করছেন অদ্বৈত এসে প্রভুর পুজো করতে বসলেন। সুগন্ধি জলে পাদ্য ও আচমন দিলেন, চন্দন লেপে দিলেন সর্বাঙ্গে। গলায় মালা দিলেন, মাথায় তুলসী মঞ্জরী। দু'পায়ে প্রণাম করে করজোড়ে প্রভুর স্তুতি করতে লাগলেন।

পূজা-পাত্রে যে সব পুষ্প-তুলসী অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে অদ্বৈতকে আবার পুজো করলেন প্রভু। তুমি যে হও সে হও, তোমাকে প্রণাম। রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো, সীতে রাম, শিবে শিব। যাসি সাসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমস্তুতে। রাধা হও কৃষ্ণ হও রমা হও বিষ্ণু হও সীতা হও রাম হও শিব হও দুর্গা হও, যাই কেননা হও, তোমাকে নিরন্তর প্রণাম। তন্ত্রের এই মন্ত্র পড়ছেন প্রভু আর মুখবাদ্য করছেন আর হাসছেন।

প্রভুকে অদ্বৈত ভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন একদিন। প্রভু যা খেতে ভালোবাসেন তাই নিজ হাতে রান্না করলেন অদ্বৈত। কিন্তু ভাবনা ধরল যদি প্রভুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসীরাও এসে হাজির হয়। অন্য লোক সঙ্গে থাকলে প্রভু ভালো করে খান না। যেন আজ একলা আসেন। যেন তাঁকে পেট ভরে খাওয়াতে পারি একা-একা।

মধ্যাহ্নে প্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে স্নান করতে গেলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সুরু হল। ধূলোয় ছেয়ে গেল দশদিক। কে কোথায় যাবে পথ খুঁজে পায় না, ঝড়ের দাপটে এখানে-ওখানে ছিটকে পড়ল। প্রভু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন।

অদ্বৈতদের অঞ্চলে সামান্য ছিটেফোঁটা। ভোগ সাজিয়ে তার উপর তুলসী মঞ্জরী দিয়ে এক মনে ধ্যান করতে লাগলেন অদ্বৈত, প্রভু যেন একলা আসেন, একেশ্বর হয়ে আসেন। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলতে বলতে প্রভু একাই উপস্থিত হলেন। একলা এসেছ? না এসে উপায় কী। তুমিই তো এ সব ঝড়বৃষ্টি করালে। তোমার প্রার্থনা পূরণ করতে কৃষ্ণ যে সর্বদা উৎসুক, তোমার হুঙ্কারে-ক্রন্দনেই তার অবতরণ।

'এ কি, কত শাক করেছ!' প্রভু বললে সবিস্ময়ে।

'দশ রকম করেছি। জানি, শাকেই তোমার সব চেয়ে বেশি প্রীতি।'

'কেন দধি-দুগ্ধে আমার অরুচি নাকি?'

'না না, তাও আছে বৈ কি।'

যা দেন যত দেন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু অস্বীকার করলেন না। প্রেমরসে আহার করতে লাগলেন।

'প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সে-ই পায় সর্বথায়॥
আচার্য! তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন॥'

রথযাত্রার পর চারমাস থাকলেন পুরীতে।

জন্মাষ্টমীতে গোয়ালার বেশ ধারণ করলেন প্রভু। কাঁধে করে দই দুধের ভাঁড় নিয়ে এলেন উৎসবক্ষেত্রে। প্রতাপ রুদ্র, কাশী মিশ্র, সার্বভৌম, তুলসী পড়িছা পাত্র-ও গোয়ালা সেজেছে। দইয়ে দুধে হলুদের জলে উঠেছে স্নান করে।

'শুধু পোশাক ধরলেই কি গোয়ালা হওয়া যায়?' অদ্বৈত বললেন, 'লাঠি খেলতে হয়। কে না জানে গোয়ালারাই সব চেয়ে বড় লেঠেল।'

এই কথা? মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ লাঠি খেলতে লাগলেন। কখনো মাথার উপরে কখনো পিঠের দিকে, কখনো শরীরের দুই পাশে, কখনো বা দু' পায়ের মধ্যে ঘোরালেন লাঠি, কখনো বা শূন্যে তুলে ঘুরন্ত লাঠি লুফে নিলেন কৌশলে। কখনো বা শূন্যে এত বেগে ঘোরালেন যে মনে হল, লাঠি কোথায়, একটা বুঝি চক্র ঘুরছে।

যে দেখল সেই অবাক মানল। দেখল সন্ন্যাসীরা শুধু আধ্যাত্মিক শক্তিতে নয় শারীরিক শক্তিতেও অগ্রগণ্য।

ক্রমে ক্রমে এল মহাপূজা। এল বিজয়াদশমী। লঙ্কা বিজয়ের দিনে বিজয়াদশমী।

ভক্তরা বানরসৈন্য সাজল আর মহাপ্রভু সাজলেন হনুমান। প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা ভেঙে নিলেন স্বহস্তে, প্রাচীরের উপর গিয়ে বসলেন। ভাঙতে

লাগলেন প্রাচীর? কোথায়, কই রে তুই রাবণ? তুই জগন্মাতাকে হরণ করে এনেছিস, তোকে সবংশে শেষ করব।

নিত্যানন্দের সঙ্গে নিভৃতে বসে পরামর্শ করলেন প্রভু। এবার তোমরা সবাই গৌড় দেশে ফিরে যাও, প্রেমভক্তি প্রচার করো, আর প্রতি বৎসর রথের সময় দেখে যেও আমাকে।

যাত্রার দিন ঠিক হল। সবাই কাঁদতে লাগল নীরবে।

আচার্যকে বললেন প্রভু, 'আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দাও। ভক্তিতে জাতি বর্ণের বিচার নেই। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নেই। আপামর সকলের কৃষ্ণভক্তি।'

'তুমিও যাও গৌড়ে।' নিত্যানন্দকেও আদেশ করলেন প্রভু, 'অনর্গল প্রেমভক্তি দাও। নির্বিচার প্রেমভক্তি। অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন নেই এখানে। কপাট নেই প্রেমের মন্দিরে। সকলের জন্যে দুয়ার খোলা।'

রামদাস আর গদাধরকে বললেন, 'যাও, মাঝে-মাঝে আমি যাব তোমাদের কাছে, গোপনে থেকে তোমাদের নাচ দেখব।'

শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'তোমার বাড়ির কীর্তনে আমি নিত্যি নাচব। আর কেউ পাবে না কিন্তু তুমি দেখতে পাবে। আর এই প্রসাদী বস্ত্রখানা নাও, মাকে দিও।' আর এই সব প্রসাদ।' একটু বুঝি বা কাতর হলেন মহাপ্রভু। 'মায়ের সেবা ছেড়ে আমি সন্ন্যাস করেছি, আমাকে ক্ষমা করতে বোলো। মায়ের সেবাই সন্তানের আসল ধর্ম তা না করে বাতুলের কর্ম করেছি। বাতুল-বালকের মা কি বাতুল-বালককে ক্ষমা করে না?' আমার কথা তাঁকে বোলো, তিনি ঠিক আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার সন্ন্যাসে কী দরকার ছিল—প্রেমধন তো আমার নিজেরই সম্পত্তি। জানো, আমি রোজ তাঁকে দেখতে যাই নবদ্বীপ তিনি আমাকে দেখেও দেখেন না। ভাবেন গাঢ় চিন্তার ফলে আমাকে নয়, আমার ছায়াকে শুধু দেখছেন। কত দিন বালগোপালের ভোগ খেয়ে এসেছি, আমাকে দেখেও তাঁর দ্বিধা গেল না, এত সব কে খেল? পাত্র শূন্য কেন? তবে কি গোপাল খেল? না কি উঠোনের কুকুর? না কি আমিই ভোগ সাজাতে ভুলে গিয়েছি?

রাঘব পণ্ডিতকে বললেন, 'তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি তোমার বশীভূত।'

শুধু নারকোল দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করে রাঘব। নিজের বাড়িতে বিস্তর নারকোল, তবু যদি শোনেন কোথাও ভালো নারকোল পাওয়া যাবে, তা যেমন করেই হোক, যত দামেই হোক, ঠিক সংগ্রহ করে আনবে, দেবে কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ স্নিগ্ধ হোক তৃপ্ত হোক, তার বেশি আর চাই কী।

শিবানন্দ সেনকে বললেন, 'তুমি বাসুদেব দত্তকে চালিয়ে নিয়ো। যে দিন যা হাতে আসে খরচ করে ফেলে, কিছু সঞ্চয় করে না। তুমি এর সরকার হয়ে থাকো। এর আয়ব্যয়ের ভাণ্ডারী হও।'

গুণরাজ খান ভাগবতের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামে। তার একটি মাত্র উক্তিই তার কৃষ্ণ প্রেম প্রমাণ করেছে। কী সে উক্তি? প্রভু বললেন, 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। প্রেমের গাঢ়তা না থাকলে প্রাণনাথ মুখে আসে না। এই এক বাক্যেই তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি। 'তোমার কথা কী, তোমার গ্রামের কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়।'

রামানন্দ আর সত্যরাজ খান বললে, 'প্রভু, আমরা গৃহস্থ বিষয়ী মানুষ। আমাদের সাধন কী?'

প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা আর নামসঙ্কীর্তন।'

'বৈষ্ণব চিনব কী করে?'

'যার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শোনা যায় সেই বৈষ্ণব। সেই সকলের পূজ্য, সকলের শ্রেষ্ঠ। এক কৃষ্ণনামেই সর্বপাপের উচ্ছেদ। নাম থেকেই নববিধ ভক্তি পূর্ণতা পায়। দীক্ষা বা পুরশ্চর্যার কোনো অপেক্ষা করতে হয় না। সম্পূর্ণ উচ্চারণ না করলেও চলবে। জিভে নাম একবার স্পর্শ পেলেই আচণ্ডাল জীবোদ্ধার। নামের মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেম, আনুষঙ্গ ফল সংসারক্ষয়।'

> 'প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
> কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
> এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব পাপক্ষয়।
> নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
> দীক্ষাপুরশ্চর্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
> জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে॥

আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান ॥'

শ্রীখণ্ডের মুকুন্দদাস, পুত্র রঘুনন্দন এল বিদায় নিতে।

'কে পুত্র কে পিতা?' জিগগেস করলেন মহাপ্রভু।

'রঘুনন্দনের প্রাকৃত দেহের জন্মদাতা আমি।' বললে মুকুন্দদাস, 'কিন্তু আমার ভাগবতজন্মের জনক রঘুনন্দন। আমার আগে রঘুনন্দনের জন্মেছিল কৃষ্ণভক্তি, ওর থেকেই আমার কৃষ্ণভক্তি শেখা, তাই ওই আমার গুরু, আমার প্রকৃত পালনকর্তা পিতা।'

'ঠিক বলেছ।' সহর্ষে বললেন প্রভু, 'যার থেকে পাওয়া যায় কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু।' শোনো মুকুন্দের প্রেমের কথা শোনো।'

ভক্তের মহিমা বলতে পঞ্চমুখ গৌরহরি।

'মুকুন্দ রাজবৈদ্য, মুসলমান রাজা গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক।' বলতে লাগলেন প্রভু, 'একদিন মঞ্চের উপর বসে রাজার সঙ্গে চিকিৎসা সম্বন্ধে কথা বলছে, এক ভৃত্য এসে রাজার মাথার উপর ময়ুরপুচ্ছের এড়ানি পাখা দোলাতে লাগল। ময়ুরপুচ্ছ দেখে মুকুন্দের মনে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হল, মঞ্চ থেকে পড়ে গেল মাটিতে।'

রাজা নিজে নেমে এসে সেবা করতে লাগলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে মুকুন্দকে জিগগেস করলেন, 'হঠাৎ পড়ে গেলে কেন?'

মুকুন্দ বললে, 'আমার মৃগীরোগ আছে, তাই ও রকম হয় মাঝে-মাঝে।'

রাজা হাসলেন। সর্বতত্ত্ব তাঁর জানা আছে।'

মুকুন্দের ইচ্ছে নিত্যি কদম ফুল দিয়ে কৃষ্ণ বিগ্রহকে সাজায়। পুকুর পাড়ে যে কদম গাছ আছে সম্বৎসর তাতে ফুল ফুটিয়ে রাখেন শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করতেই তো ভগবানের আনন্দ।

ধর্মে ধন-উপার্জনই মুকুন্দের কাজ। অর্থাৎ ধর্ম পথে থেকে ধর্ম রক্ষা করে ধন-উপার্জন। ধর্মের নামে ব্যবসা করে নয়, ভজনাঙ্গকে পণ্যে পরিণত করে নয়। সাধনভজনের আনুকূল্য না ক্ষুণ্ণ হয়, কৃষ্ণ প্রীতির উদ্দেশে ধনোপার্জন।

আর রঘুনন্দনের কাজ কী?

রঘুনন্দনের কাজ কৃষ্ণ সেবন। 'কৃষ্ণসেবা বিনা ইহার অন্যত্র নাহি মন।'

মুকুন্দদাসের ভাই নরহরিকে বললেন, 'ভক্তসঙ্গে থাকো আর ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথার চর্চা করো।'

সার্বভৌমকে বললেন, 'দারু আর জলরূপে কৃষ্ণ সম্প্রতি প্রকটিত। দারু অর্থ জগন্নাথ আর জল অর্থ ভাগীরথী। দারু ব্রহ্ম দর্শন দিয়ে আর জল ব্রহ্ম স্নান করিয়ে উদ্ধার করছেন জীবকে। সার্বভৌম, তুমি দারু ব্রহ্মের আরাধনা করো।' তাকালেন সার্বভৌমের ভাই বাচস্পতির দিকে: আর বাচস্পতি, তুমি জলব্রহ্মের সেবা করো।

মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'কত বড় ভক্ত মুরারি। কী তার সুদৃঢ় ভজন, কী ভাবনিষ্ঠা আমার কথায়ও সে তার রামচন্দ্রকে ত্যাগ করলনা।'

বাসুদেব দত্ত বললে, 'আমার এক প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করো।'

'কী প্রার্থনা?'

'জীবের দুঃখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।' বললে বাসুদেব, 'তাদের সকলের পাপ আমাকে দাও। আমি চিরন্তন নরকে যাই, আর সকলের ভবরোগ দূর হোক। সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি পাক সকলে।'

প্রভু বললেন, 'তোমার পক্ষে এ প্রার্থনা বিচিত্র নয়, কারণ তুমি সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ। আর ভৃত্যবাঞ্ছা-পূর্তি ভিন্ন কৃষ্ণের অন্যকৃত্য নেই। তবে তুমি পরম বৈষ্ণব, আর পরম বৈষ্ণব যদি কারু মঙ্গল কামনা করে তবে সেও বৈষ্ণব হয়ে যায়। তোমার মঙ্গল কামনায় সর্ব মানুষ বৈষ্ণব হয়ে গেল আর কৃষ্ণ বৈষ্ণবের পাপ ভোগ না করিয়েই দূরীভূত করে দেন। ভক্তদের কর্ম নিঃশেষে দগ্ধ করেন গোবিন্দ। [ ক্রমশঃ।

## ইগর স্ত্রাভিন্‌স্কি

( বর্ষীয়ান রুশ সঙ্গীতশিল্পী )

শিল্পী ইগর স্ত্রাভিন্‌স্কির জীবন ও সৃষ্টি রাশিয়া ও আমেরিকা এই উভয় দেশেরই জনগণের অভিন্ন সম্পদ। বিংশ শতকের সঙ্গীত-কলার ইতিহাসের একটি চিত্তাকর্ষক পৃষ্ঠা এই অসামান্য সুরকারের নামের সঙ্গে বিজড়িত।

গত বছরের গ্রীষ্মকালের কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঐ সময় তিখন খে্‌নিকফ ও বরিস ইয়ারিস্তভাস্কির সঙ্গে আমিও লস্‌ এঞ্জেলেসের প্রথম সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসবে যোগদান করেছিলাম। সেই সঙ্গীত সম্মেলনে ইগর স্ত্রাভিন্‌স্কির সঙ্গীত পরিবেশনা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁর সুরসৃষ্টির সঙ্গে আগেও আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু এতখানি মুগ্ধ আর কখনো হইনি।

স্ত্রাভিন্‌স্কির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হল। উভয় পক্ষে প্রাণখোলা কথাবার্তা চলল। রাশিয়ার সব কিছুতেই স্ত্রাভিন্‌স্কির প্রভূত আগ্রহ দেখে খুশি হলাম।

সোভিয়েত সুরকারদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তিখন খে্‌নিকফ ও আমি স্ত্রাভিন্‌স্কিকে সময় ও সুযোগ মতো সোভিয়েত দেশে যাবার আমন্ত্রণ জানালাম। সুরশিল্পী সানন্দে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বললেন, "যাবার জন্যে তো মন এখনই নেচে উঠেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয়ও রয়েছে। এত কাল বাদে মাতৃভূমিতে যাচ্ছি। এই বয়সে হৃদয়াবেগের ধাক্কা সামলে উঠতে যদি না পারি!"

লস্‌ এঞ্জেলেসের ঐ আন্তর্জাতিক উৎসবে স্ত্রাভিন্‌স্কি সোভিয়েত সুরকারদের সঙ্গীত পরিবেশন মন দিয়ে শুনেছিলেন। আসরের শেষে তিনি আসন থেকে উঠে পড়ে হাত নেড়ে আমাদের অভিনন্দন জানান।

ইগর স্ত্রাভিন্‌স্কি এখন সোভিয়েত দেশে। এখানে তিনি এসেছেন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, বলতে গেলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। অথচ কিছু দিন আগেই তাঁর আশিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

স্ত্রাভিন্‌স্কি পঞ্চাশ বছর রাশিয়ার বাইরে ছিলেন। তাই এখানে সোভিয়েত দেশে তাঁর চোখে সব কিছুই নতুন ঠেকে। কী আমূল পরিবর্তন!

স্ত্রাভিন্‌স্কির শিল্পিজীবন কেটেছে অবিরাম নতুনের সন্ধানে—শিল্পে নতুন ধারা, সঙ্গীতে নতুন শৈলীর উদ্ভাবনে। তাঁর সঙ্গীতসৃষ্টি সব সময়েই মৌলিক। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার নূতনত্বের অশ্রান্ত অন্বেষার সুস্পষ্ট ছাপ।

সোভিয়েত দেশের নিন্দুকরা বলে বেড়ান ইগর স্ত্রাভিন্‌স্কির সঙ্গীত নাকি সোভিয়েত দেশে পরিচিত নয়, সমাদৃত নয়। এই কথা আসল সত্য থেকে বহু দূরে। আমেরিকায় আমাদের আলাপ-আলোচনা কালে স্ত্রাভিন্‌স্কিকেও এই কথা জানিয়েছিলাম। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, লেনিনগ্রাদের মালি অপেরায় অতীত ও বর্তমান পরিবেশনতালিকার মধ্যে ইগর স্ত্রাভিন্‌স্কির "পেত্রুস্কা", "দি ফায়ার বার্ড" ও "ওফিয়াস" সঙ্গীতনাট্যও রয়েছে। এই কিছু কাল আগেই মস্কো সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্ত্রাভিন্‌স্কির "হিস্টোয়রি দু সোলদাত" মঞ্চস্থ করে।

আমাদের দেশের রেডিওতেও স্ত্রাভিন্‌স্কির সঙ্গীত শুনতে পাবেন। সোভিয়েত দেশে তাঁর সঙ্গীতের গ্রামোফোন রেকর্ড অনেক সঙ্গীত রসিকের ঘরে দেখতে পাওয়া যাবে।

শীঘ্রই স্ত্রাভিন্‌স্কির "ক্রনিকোয়ে দ্য মা ভাই" নামক গ্রন্থখানি সোভিয়েত দেশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে। এই বইখানিতে একজন সুরকারের সৃষ্টি সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক ধ্যানধারণা এবং রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

সোভিয়েত দেশে অবস্থান কালে ইগর স্ত্রাভিন্‌স্কি মস্কোয় ও লেনিনগ্রাদে তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। সোভিয়েত জনগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে উল্লসিত হয়েছে, তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর গান শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

—সুরকার : কারা কারায়েফ।

## আধুনিক বাঙলা গান

গানের দেশ এই বাঙলা দেশ। এখানকার আকাশে বাতাসে মাটির ধূলিকণাটিতেও মিশে আছে সুরের মোহিনী মায়া। আমরা জন্মে ইস্তক সুরে ডুবে যেতে অভ্যস্ত; কাজে অকাজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিতান্ত অকারণে গান গেয়ে উঠি। হয়তো মানুষ মাত্রেই গান ভালবাসে—কিন্তু বাঙালী আমরা সবাইকে টেক্কা মেরেছি। এর কারণও আছে। বাঙলার পরিবেশ বড়ই চিত্তস্পর্শী। এখানকার মত আর কোনো প্রদেশেই প্রকৃতি অকৃপণ হাতে এত শোভায় ভরিয়ে দেয়নি জলস্থল গাছপালা নদী-পাহাড়। বছরে ছ'টি ঋতু বাঙলা দেশ ছাড়া আর কোথাও ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসে না। গ্রীষ্মের খর মধ্যাহ্নে প্রকৃতির ধ্যানমগ্না মূর্তি দেখে বুক ভরে যায় পরম গাম্ভীর্যে, বর্ষার রিমিঝিমি নৃত্যছন্দে মনে লাগে দোলা। সবুজ সোনায় মোড়া ধরিত্রী চোখে মোহ-অঞ্জন দেয় এঁকে; শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে তেমনি বিভিন্ন ভাবের সমারোহে চিত্ত আমাদের ভাব-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

এ ত গেল একদিক। অপর দিকে বাঙলার কবিরা ভাব ভাবা আর সুরের জাল বুনে আমাদের দিনের পর দিন হাসিয়ে কাঁদিয়ে মাতিয়ে তুলেছেন। বাঙলার নিজস্ব' সম্পদ কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী—কত না ধারার সুর-প্রবাহ! এর সংগে যুক্ত রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের কথা ও সুরের মন্দাকিনী। এক রবীন্দ্রনাথেই তো মহাসাগরের সম্পদ অনন্ত অফুরন্ত। বহু শতাব্দী এই ঐশ্বর্যের ক্ষয় হবে না।

এর পর এসেছেন আরও কত কবি; বীণাপাণির দেব দেউলে অর্ঘ রচনা করেছেন তাঁরা সাধ্যমত। তার কলঝংকার বাঙলার সংগীতের মহা সাগরে কিছুটা অনুরণন জাগিয়েছে বৈকি। আমাদের প্রত্যাশা ছিল এই ভাবেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনাগত দিনগুলি তার ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে। অতীতে যেমনটি দেখেছি, পেয়েছি সেই ধারাবাহিকতায় বুঝি ছেদ পড়বে না। কিন্তু তা হয়নি। আমাদের আশা সার্থক হ'তে পেল না। আজ আমাদের এই বাঙলা গান—পরম দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই—সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন পথে প্রবাহিত হচ্ছে। একটু কান পাতলেই এই বেদনার অনুভূতি আপনাকে পীড়িত করবে।

কেন এমন হোলো? আর কেন উল্লেখনীয় কথাকার সুরকার আমাদের বাঙলা দেশে দেখা দিচ্ছেন না? বাঙালী যে গানের রাজা—এটা তো দিনের আলোর মতই পরম সত্য। কিন্তু সে রাজার রাজত্বের অবসান হতে চলেছে কী করে।

এই বন্ধ্যাত্বের সূচনা হয়েছে নিশ্চয় বহু আগে, তবে এক দশকেরও বেশি কাল সেটা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। যখনই কোনো গান শুনি, তার কথা, তার সুর তার ভাবধারা ছাপিয়ে উচ্চগ্রামে শুধু আর্তনাদই কানে বাজে—নাই, নাই! যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছুটে চলেছিলো সুরের সুরধুনী, তার প্রবাহ বালুচরে হারিয়ে যেতে বসেছে অচিরে!

এমন দুর্দিন বাঙলা গানে রৌদ্র-করোজ্জ্বল আকাশে নেমে আসার কথা ছিল না তো! কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পূর্বসূরীদের অনবদ্য সৃষ্টির বিদ্যুৎ-বিকাশ ঝলসিয়ে উঠে আমাদের দৈন্য আরও প্রকট করে তোলে। কিন্তু সেই জ্বালার মাঝে শান্তির প্রলেপ বুলায় অতীতের সুর-ঝংকার—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি যার স্রষ্টা। সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত অসামান্য হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তে যে তিমিরে সেই তিমিরে!

আজকের গানের অদ্ভুত বাণী-র কথাই ধরা যাক। অতি আধুনিকতার নামে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার এগুলি জলন্ত নিদর্শন। এর কথাগুলি যেমন অসহ্য ন্যাকামিতে ভরপুর, ভাবও তথৈবচ। কবির কবিত্ব কতই না চমক সৃষ্টি করে থাকে, কখনো দেখি কবি বলছেন, 'প্রাণের গড়েরমাঠে এসে ওগো পলাতকা তুমি বাঁশি বাজাচ্ছো'—আবার কোন্ সময় হয়তো বলছেন 'তুমি সাপের মতো আমায় ছোবল মার, আমি বাজিয়ে যাব প্রেমের তুবড়ি বাঁশি!' অবিকল এই কথা না হলেও ধরণ তার এমনি হাজার রকম।

আমার উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা নয়, সক্ষোভে আজকের অনুসৃত পদ্ধতির প্রতি বেদনাতুর দৃষ্টিপাত। বাঙলা ভাষা—জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষায় অন্যতম যে ভাষা, যার কাব্য-শাখা অতুলনীয়—সেই ভাষার উত্তরসেবকরা আজ এ কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। স্বীকার করি, বাঙলার মাটি, জল-হাওয়ার কল্যাণে এখানকার প্রতিটি মানুষই কবিভাবাপন্ন হতে বাধ্য, তাই বলে সবাইকেই কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে, তার কোনো যুক্তি নেই। যাঁরা কবিতা গান রচনা করছেন তাঁদের যথারীতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, তাঁরা যেন অবহিত হ'ন বাঙলার গীতিকাব্য সমুদ্রের মত বিশাল এবং সেখানে বিভিন্ন রত্নরাজির সীমাহীন সঞ্চয়—সে ভাণ্ডারে তাঁদের সংযোজন যেন অনুরূপ মহার্ঘ হয়, অন্তত কিছুটা যেন তার দাম থাকে।

সুরকারদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, তাঁরা এখনও শিক্ষালাভ করুন। এই চটুল হাল্কা সুরের জাল বুনে, বিদেশী সুরের যথেচ্ছ প্রয়োগ করে আগামী দিনে কিছুতেই বেঁচে থাকা যায় না। সাবানের ফেনায় যতই বর্ণ বৈচিত্র্য থাকুক, তার আয়ু কতটুকু? তার মতই হবে তাঁদের পরমায়ু। এর কালকে দীর্ঘায়ত করতে হলে প্রকৃত সৃষ্টি করতে হবে—অর্কেষ্ট্রার জলতরঙ্গে ভেসে যাওয়াই চলে, সেখানে যশের নীড় বাঁধা বাতুলতা। আর একটা অনুরোধ, কথাকেই সুরে রূপায়িত করুন, সুরকে কথায় গাঁথতে নিযুক্ত করে গীতিকারদের এভাবে হাস্যাস্পদ করবেন না। রবীন্দ্রনাথ সুর অবলম্বনে বহু অনবদ্য গান রচনা করেছেন এবং তাঁর সমগোত্রীয় অনেকেই সেইভাবেই হয়তো অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু আজকের গীতিকারদের এই দুরূহ কাজে নিয়োগ না করাই যুক্তিযুক্ত। এতে করে গানগুলি সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছুতে পারছে না একেবারেই। এটা শুধু আমার কথা নয়—সকলেরই অনুরোধ। সৃষ্টি যদি যুগ থেকে যুগান্তরে মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে না বিরাজ করে তাহলে স্রষ্টার সার্থকতা কোথায়? প্রকৃত সৃষ্টির যে বিনাশ নেই!

আমরা আশাবাদী। বিশ্বাস করি আজকের বাঙলা গানের এই দুর্দিন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আবার কোনো যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় মরা নদীতে বান ডাকবে। মাথা উঁচু করে জাগা বন্ধ্যাত্বের বালুচর চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই। —রমেন চৌধুরী

## আমার কথা (৯১)

### শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতা ও জ্যেষ্ঠের প্রেরণা নিজের প্রচেষ্টা শ্রোতাদের আগ্রহ সুপারিশবিহীন তদ্বিরতদারকহীন—শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিশোর বয়সে সঙ্গীত-জগতের পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। তিনি সঙ্গীতকে সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন—উহাকে অর্থকরী বা ব্যবসায়িক ভিত্তিরূপে দেখিতে এখনও তিনি অনভ্যস্ত।

নিজের কথায় তিনি বলেন :—"আমি হাওড়া শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পিতামহ ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশিষ্ট আইনজীবী ও ত্রিশ বৎসর যাবৎ হাওড়া পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। স্বগ্রাম সিটী-শিবপুর। পিতা ৺শিবচন্দ্রও আইনজ্ঞ ছিলেন। মাতা ৺নলিনী দেবীকে সাত বৎসর বয়সে হারাইয়াছি। তিনি গোয়াবাগানের স্বর্গত ক্যাপ্টেন হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা

ছিলেন। আমার মাতুল বংশ বিরাট শিক্ষিত পরিবার ছিলেন। তজ্জন্য তের বৎসর বয়সে মার বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বরাবরই পড়াশুনা করিতেন। আমি হাওড়া টাউন স্কুলের ছাত্র ছিলাম।

অল্পবয়স হইতে আমার গানের দিকে আগ্রহ ছিল। দিদিও দাদা ( পরলোকগত অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ) খুব ভাল গাহিতেন। বাবা ও দিদি গান শিখিবার জন্য আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। হাওড়ার অন্যতম প্রবীণ সঙ্গীত বিশারদ ৺ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য আমার প্রকৃত ও প্রথম গুরু ছিলেন। দশ বৎসর তাঁহার নিকট খেয়াল ও ঠুংরী শিখিয়াছি। আমার সঙ্গীতের দৃঢ় ভিত্তি তিনিই স্থাপনা করেন। ইহার পর ৺হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, প্রকাশকালী ঘোষাল, দুর্গা সেন ও ৺অনুপম ঘটকের নিকট আধুনিক এবং দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দ্বিজেন চৌধুরীর নিকট রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখিয়াছি। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও আমায় প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। আমার সঙ্গীতজীবনে প্রণব সেন, অধীর সেন, নিমেষ ঘোষ ও পবিত্র মিত্রের সাহায্য উল্লেখযোগ্য।

এচ. এম-ভি-তে আঠার বৎসর বয়সে আমার প্রথম ভজন ( হিন্দী ) রেকর্ড হয়। বেতারে প্রথম সুযোগেই নির্ব্বাচিত হইয়া ও শ্রোতাদের তাগিদে উহাতে ঘন ঘন অনুষ্ঠানলিপি পাইয়াছি।

গত মার্চ্চ মাসে দিল্লী বেতার কেন্দ্রের জাতীয় অনুষ্ঠানে আমাকে আধুনিক সঙ্গীতে ( Light Music ) অংশ গ্রহণ করিতে হয়। গুজরাট রাজ্য-সরকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্য হইতে সঙ্গীতশিল্পীদের আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে আমি পশ্চিমবঙ্গ হইতে উপস্থিত হইয়াছিলাম।"

ফিল্মজগতের সহিত সঙ্গীতশিল্পীদের সম্পর্কের কথায় তিনি জানান যে, সুষ্ঠু গায়কের পক্ষে উহা কোনরূপ সুযোগ দেয় না। অর্থাৎ সঙ্গীত পরিচালনা ও নেপথ্য কণ্ঠদান সম্পূর্ণরূপে সঙ্গীত পরিচালক ও গায়কের উপর ছাড়িয়া দেওয়া ভাল। প্রযোজক বা ফিল্মপরিচালকের নির্দ্দেশে উক্ত দুইটি বিভাগ না চলাই মঙ্গল গুণী সঙ্গীত পরিচালক শ্রীঅনিল বাগচীর পরিচালনায় আমি সম্প্রতি "তরণী সেন বধ" ছায়াছবিতে প্রথম গান গাহিয়াছি—মনোরম ও সুষ্ঠু পরিবেশে।

তরুণবাবু আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, ছায়াছবিতে উপযুক্ত সঙ্গীত পরিচালকদের ক্রমশঃ যেন অভাব দেখা যাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে বিশেষ নজর দেন না বলিয়াই তাঁহার মনে হয়।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মীরা দেবী গীটার বাজাইতে এবং সীবনশিল্পে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষে তিনি বলিয়াছেন যে, যে-ভাবেই হউক আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে গানের প্রসার ও প্রচার হওয়ায় অপ্রয়োজনীয় আলোচনা ও পরচর্চ্চা ইত্যাদি বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে।—

## এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী প্রতিমার একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। হুগলী, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার বিরাট আয়োজন সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত। প্রচ্ছদের এই প্রতিমামূর্ত্তিটির একই ধারায় ও রীতিতে প্রায় একশত বৎসর যাবৎ পূজা চলিয়া আসিতেছে। মূর্ত্তিটি চন্দননগরের ঘটক পরিবারের গৃহে পূজিত হয়।

# কাঁটা

মধুমতী

শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হ'ল সিষ্টার নিবেদিতা ওরফে মাধুরী। তার জবানবন্দীতেই সেটার প্রকাশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত যে কাঁটাটি এসে বিঁধল, স্বীকারোক্তি দ্বারা কি তার অবসান হ'ত?

কাঁটা উপড়ে যেত হয়ত কিন্তু ক্ষত মিলত কি? পরোক্ষে হলেও আমি কি তার মৃত্যুর জন্য দায়ী নই? কে তার পূর্বজন্মের নাম ধরে ডাকল মা-ধু-রী। বা তার মৃত্যুর পরোয়ানা আনল বয়ে? এই আমি—সত্যি যদি সেদিন সেই অঘটনটি না ঘটত তবে হয়ত সে বাঁচত। তার জন্মান্তরের মূলধনটুকু অর্থাৎ কল্যাণীবধূ থেকে কল্যাণময়ী সেবিকার রূপান্তর নিয়ে।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর কোলকাতার একঘেয়েমী জীবন কাটাতে এসেছি মামার বাড়ী বারাসতে। ভেবেছিলাম হেসে-খেলে ক'টা দিন কাটিয়ে যাব, কিন্তু ভগবান তাতে বাদ সাধলেন।

হ্যাঁ বউ, বল দেখি তোমার আক্কেলখানা কি? বাসি কাপড়ে সব সৃষ্টি এক করলে? বলি, তোমার মা কি এটুকুও শিখিয়ে পাঠায় নি?

আর হবেই বা কি ক'রে। যেমন ঘর তেমনি তো হবে তার লক্ষ্মী। তখনই পই পই ক'রে মানা করেছিলুম, ছোটলোকের মেয়েকে এনে ঘরের সিংহাসনে বসিও না। কিন্তু কর্তাটি কি কারুর তোয়াক্কা করতেন। এখন ঠেলা সামলাও—নিজে ত দিব্যি চোখটি বুজলেন আর আমারই যত ভোগান্তি। ভোর না হতেই কাংস্যকণ্ঠের বজ্রনিনাদে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, পাশের বাড়ীর চাটুজ্জ্যে-গিন্নি রণরঙ্গিণী মূর্তিতে অবতীর্ণা হয়ে অনতিদূরে অবগুণ্ঠিতা বধূর স্তবক লক্ষ্য করে একের পর এক বিষাক্ত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে চলেছেন।

পেছন থেকে মামীমা বলে উঠলেন, হাঁ করে কি দেখছিস ক্ষমা? ও তো ওদের বাড়ীর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে, তোর একটু খারাপ লাগবে বৈকি।

আমি বললাম, শুধু খারাপ লাগা—আমি হলে ত ও-বাড়ীর জলও স্পর্শ করতাম না। কি করে বৌটি সহ্য করে দিনের পর দিন এসব।

মামীমা কিছু বললেন না। শুধু নীরব হাসিতে মুখ ভরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তখন বয়স অল্প। কল্পনার রংগীন জগতে ঘোরাফেরা, বাস্তবের রূঢ়তার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। তাই মামীমার নীরব হাসির অর্থ তখন বুঝিনি। কিন্তু দুপুরে খেতে বসে মামীমাই কথাটা পাড়লেন।

আজ সারাদিন বৌটির কথাই ভাবছিস, তাই না ক্ষমা? তবে শোন্ ওর ইতিবৃত্তি। নাম মাধুরী। সত্যিইমাধু যা আছে চেহারায়। আবাল্য বন্ধু নিশিকান্ত চাটুজ্জ্যে আর মণিমোহন মুখুজ্জ্যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্ব স্ব পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়ে পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবেন। তাই এক গণ্ডা ছেলেপুলে রেখে যখন মণিমোহন মুখুজ্জ্যে স্বর্গের পথে পাড়ি দিলেন তখন সহৃদয় নিশিকান্ত আপন আভিজাত্যের মান খাটো হলেও একমাত্র পুত্র নিশীথের সঙ্গে মণিমোহন কন্যা মাধুরীর বিয়ে দিয়ে বন্ধুর আত্মার শান্তি করলেন।

কিন্তু মাধুরীর জন্মলগ্নে হয়ত কোন অপদেবতার অশুভদৃষ্টি পড়েছিল। তাই বছর না ঘুরতেই নিশিকান্তও বন্ধুর পথের পথিক হলেন।

নিশীথের মা গিরিজা দেবী কোনদিনই এ বিয়ে সমর্থন করেননি। কর্তার জীবদ্দশায় যা ছিল তা ছাই চাপা আগুনের মত ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলত, তাই এখন দাবানলের রূপ নিল।

পুত্র নিশীথ নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। তাছাড়া পৈতৃক প্রাণের তাগিদে পৈতৃক সম্পত্তি হারাবার পক্ষপাতী সে নিশ্চয়ই ছিল না। তাই দাবানল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। তারই টুকরো টুকরো স্ফুলিংগ প্রতিদিন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে লাগল।

আমি নিরুপায়, যন্ত্রণায় শুধু ছটফট করতাম। মেয়েটির জন্য দুঃখ হত।

এর পর কেটে গেছে দু' বছর। মা-বাবার স্নেহনীড়ে বসে সগৌরবে ডিগ্রীর ছাপ বহন করেছি।

ধীরে ধীরে মাধুরীর স্মৃতিকথা ক্ষীণতর হয়ে এসেছে টেরও পাইনি। কারণ বেশ কিছুদিন আমার জীবনে নতুন অতিথির আগমন বার্তা ঘোষিত হচ্ছিল। অর্থাৎ আমার বিয়ের তোড়জোড় চলছিল। বিয়ের ক'দিন আগে, আত্মীয়কুটুম্বে বাড়ী ভরে গেল।

নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত। কেনাকাটার আয়োজন পুরোদমেই চলেছে। হঠাৎ সমস্ত কলগুঞ্জন ছাপিয়ে বেজে উঠল একটা করুণ সুর। স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি।

চোখের সামনে একে একে নিভে যেতে লাগল উৎসবের দীপ। সেই বউটি যার নাম মাধুরী সে আত্মঘাতী হয়েছে।

এক ঝড় জলের রাতে অন্তঃসত্ত্বা মাধুরী নিরুদ্দেশের পথে পা দিল। সেই রাতেই বারাসত লাইনে ঘটল একটা দুর্ঘটনা। মেয়েটিকে সনাক্ত করার উপায় নেই। কিন্তু সবাই ধরে নিল কাটা পড়েছে মাধুরী ছাড়া আর কেউ নয়।

কোন পাপে এমন হোল? ফুলের মত নিষ্পাপ একটি মেয়ে, নারী মনের চিরন্তন কামনা স্বামী সন্তান নিয়ে সুখের নীড় গড়তে গড়তে ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল কেন?

এই কেনর উত্তর খুঁজে পেলাম না কিছুতেই।

তারপর বছর পাঁচেক কেটে গেছে স্বামীর সঙ্গে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়িয়ে। কারণ ওর বদলীর চাকরী। একে একে দুই মেয়ে চিনু, মিনু এসেছে কোলে।

অতীত স্মৃতির রোমন্থনে মাধুরীর মুখ ভেসে উঠেছে। কিন্তু পাঁচটা কাজের চাপে তা মিলিয়ে যেতেও দেরী হয় নি।

তারপর কোল জুড়ে এলো খোকনসোনা, তখন থাকি কোলকাতায়। ক'দিন আগে আমায় পাঠানো হ'ল স্থানীয় নার্সিং হোমে।

সুখের বোলকলা পূর্ণ হোল বলা যায়। তাই বোধ হয় কষ্টের চূড়ান্ত মহড়া দিতে হ'ল আমায়।

ছেলে হবার পর দু'দিন নাকি জ্ঞান ছিল না। কিন্তু জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে চরম বিস্ময় আমার সামনে বহুদিনের বিস্মৃতির পর্দা সরিয়ে দেখা দিল। তার ধাক্কায় আবার জ্ঞান হারালুম।

চোখ খুলতেই দেখি বেডের পাশে দাঁড়িয়ে নার্স বেশী সেই হারিয়ে যাওয়া মাধুরী। চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। ও আমার ছেলেকে নিতে এসেছে। বাঁচাও। বাঁচাও···।

জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমার বেডের চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সিষ্টাররা। সবাই উৎসুক জানবার জন্য আমি তাকে চিনি কিনা। অর্থাৎ সিষ্টার নিবেদিতাকে।

সেদিন আমার কেবিন থেকে একটা আর্ত্ত চীৎকার শুনে সবাই ছুটে এসে দেখে সিষ্টার নিবেদিতা বেরিয়ে যাচ্ছেন ঘর থেকে। তাঁর মুখ কাগজের মত সাদা।

পরদিন সকালে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায় শোবার ঘরে, পাশে ঘুমের ওষুধের একটি নিঃশেষিত শিশি।

নার্সদের প্রশ্নোত্তর থেকে যা জানা গেল তা সংক্ষেপে এই :—

বছর সাতেক আগে এক ঝড়জলের রাতে একটি মেয়ে প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় এই নার্সিং হোমের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত নার্সিং হোমের কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হয়ে অসহায়া মেয়েটিকে স্থান দেন।

ক'দিন পর সে একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেয়। মেয়েটি তার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় এবং সকাতরে প্রার্থনা জানায় সুস্থ হওয়ার পর নার্সের কাজে তাকে বহাল করার জন্য। কি ছিল তার মুখে-চোখে, কে জানে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সিষ্টার নিবেদিতা নার্স রূপে এখানেই রয়ে যায়।

অত্যন্ত অমিশুক প্রকৃতির, সদাই বিষণ্ণ এই মহিলাটির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলত অন্য সবাই। তার পূর্ব্ব পরিচয় সবার অজানা, তাই তারা ধরে নিয়েছিল সে ভ্রষ্টা। কিন্তু মৃত্যুর পর স্বাভাবিক নিয়মে পরম শত্রুও হয়ে ওঠে পরম মিত্র।

তাই এরা সিষ্টার নিবেদিতার মৃত্যুর জবাবদিহি চায় আমার কাছে। হয়ত আমি তার মৃত্যু রহস্যের ওপর আলোকপাত করতে পারি এই আশায়। আমি কিন্তু সেদিন কিছুতেই নিজেকে তুলে ধরতে পারিনি তাদের কাছে সত্যের আলোয়। মিথ্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে শুধু বলেছি, স্বপ্নের ঘোরে চেঁচিয়েছিলাম।

ওকে আমি চিনব কি করে? জানি না ওরা আমার কথার সত্যতা যাচাই করেছিল কিনা। তবে নিজেকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারিনি তারপর থেকে। শুধু মন গুমসে গুমরে মরেছি কাঁটার ঘায়ে, থেকে থেকে রক্ত ঝরেছে অন্তরে।

---

## কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতিপর্ব্ব শেষ

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত পার্থ সহরে সপ্তম কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসবে। এর প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়েছে। তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগঠন সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। ২২শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হবে। ৩৪টি কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের বার শত এ্যাথলীট বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন।

এই বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার সকল ব্যবস্থা শেষ হয়েছে। সহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান হবে বলে ঠিক হয়েছে। ইহা পরিচালনার জন্য ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

পেরী লেক ষ্টেডিয়ামের "সিণ্ডার ট্রাকে" এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই ট্রাকের অল্প দূরেই অনুশীলনের জন্য আর একটি ট্রাক তৈরী করা হয়েছে। সহর থেকে দু' মাইল দূরে সাঁতারের ষ্টেডিয়ামটি অবস্থিত। এখানে পাঁচ হাজারের কিছু বেশী দর্শক সাঁতার দেখতে পাবেন।

এ্যাথলীটদের থাকার ব্যবস্থাও বেশ ভাল ভাবে হয়েছে। তাঁদের "স্পোর্টস" গ্রামে রাখা হবে। তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোনটারই অভাব হবে না। এ্যাথলীটদের থাকার জন্য ১৫২টি বাড়ী তৈরী হয়েছে। বিদেশ থেকে আগত দর্শকদের জন্য হোটেল নির্দিষ্ট করে রাখা হবে। তা ছাড়া পার্থ সহরের বাসিন্দারা ছুতাজার দর্শকদের স্থান দেবেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তিনশত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আসবেন। রেডিও ও টেলিভিশনের কর্ম্মীরাও হাজির হবেন।

পার্থ সহর এখন থেকেই সাজ সাজ রবে মেতে উঠেছে। সমস্ত রাস্তা, উদ্যান এমন কি বাড়িগুলিও বিশেষ আলোকমালায় সজ্জিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যান্য দেশ থেকে আগত অতিথিদের বিশেষ ব্যাজ দেওয়া হবে। যাতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা না হয়। প্রায় পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক রেল ষ্টেশন, জাহাজ-ষ্টীমার ও বিমান বন্দরে বিদেশী অতিথিদের স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত থাকবেন বলে ঠিক হয়েছে।

উদ্যোগ আয়োজন থেকেই ভাল ভাবে উপলব্ধি করা যায় যে ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলি কেমন হবে। বিশ্বের সকল দেশের খেলোয়াড়রা এক প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হবেন এইটাই ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য। সকলেই এখন পার্থের দিকে তাকিয়ে আছেন।

## ভারতীয় দলের যোগদান বাতিল

২৬ জন এ্যাথলীট দ্বারা গঠিত ভারতীয় দলের এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু চীনাদের উত্তর সীমান্তে আক্রমণের ফলে দেশে জরুরী অবস্থার জন্য ভারত সরকার ভারতীয় দলের যোগদান অনুমোদন নামঞ্জুর করেছেন। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যাওয়ার বৈদেশিক মুদ্রালাভের প্রশ্ন ছাড়াও বর্ত্তমান অবস্থায় সেনাবাহিনীর এ্যাথলীটদের দলভুক্ত করার বিষয়টি থাকায় সরকারকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে। কারণ ভারতীয় দলের বেশীর ভাগ এ্যাথলীটই সেনাবাহিনীর সদস্য। কমনওয়েলথ গেমস সংগঠন কমিটির বিশেষ অনুরোধে অল্প সংখ্যক এ্যাথলীট নিয়ে গঠিত একটি ছোট জাতীয় দল পাঠাবার একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে।

## মোহনবাগানের চতুর্থবার "ডাবলস" লাভ

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ, শীল্ডের ফাইন্যালের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার মাঠ থেকে ফুটবল বিদায় নিয়েছে। কলকাতা থেকে বিদায় নিলেও দিল্লী ও বোম্বাইয়ের আসর এখন জমে উঠবে। কলকাতার ক্লাবদের মধ্যে এখন ক্রিকেটের সাজসাজ রব পড়ে গেছে।

এবার বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় দল—মোহনবাগান আই, এফ, এ, শীল্ডের ফাইন্যালে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শক্তিশালী দল হায়দ্রাবাদ প্রদেশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে চতুর্থবার "ডাবলস" অর্থাৎ লীগ ও শীল্ড বিজয়ের সম্মানের অধিকারী হয়। এর আগে ১৯৫৪, ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে তারা "ডাবলস" লাভ করেছিল।

মোহনবাগান এবার নিয়ে মোট ১৬ বার ও উপর্যুপরি পাঁচবার শীল্ড ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তার মধ্যে মোহনবাগান আটবার জয়ী হয়েছে অর্থাৎ ১৯১১, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে তারা শীল্ড পায়। অবশ্য এর মধ্যে ১৯৬১ সালে তারা ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী হলেও মোহনবাগান উপর্যুপরি তিনবার শীল্ড বিজয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে।

বহু ঐতিহ্যের অধিকারী মোহনবাগানের এই সাফল্যে একবাক্যে সকলেই দলের খেলোয়াড়দের সাধুবাদ জানিয়েছেন। সত্যই তারা সকলের অভিনন্দন পাওয়ার অধিকারী।

## টেনিস খেলোয়াড় লেভারের পেশাদার হওয়ার সম্ভাবনা

বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন টেনিস খেলোয়াড় রড লেভার সম্প্রতি পেশাদার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। তাঁর বর্ত্তমান বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। বয়সে তরুণ হলেও টেনিসে তিনি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তা খুব কম খেলোয়াড়ের ভাগ্যেই হয়ে থাকে।

রড লেভার নাকি কোন এক টেনিস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৩৬০০০ পাউণ্ডে তিন বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা চিন্তা করছেন।

আরও প্রকাশ যে এক টোবাকো কোম্পানী বার্ষিক ৬,৫০০ পাউণ্ড বেতনে লায়া জীবনের জন্ত এক পাবলিক রিলেশনের চাকুরি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই চাকুরি তিনি গ্রহণ করলে অবসর গ্রহণের সময় তাঁর আয় হবে ১৩০,০০০ পাউণ্ড।

একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে এই সুযোগটা খুবই লোভনীয় সন্দেহ নেই। তাঁর পক্ষে এই সুযোগটা গ্রহণ করাও অন্যায় হবে না। তবে রড লেভারের মত খেলোয়াড় না থাকলে অপেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকখানি কমে যাবে, এটা বলাই বাহুল্য।

## ভারতীয় বিমানবাহিনীর হকি দলের ইংলণ্ড সফর

সম্প্রতি ভারতীয় বিমান বাহিনীর হকি দল সাফল্যের সঙ্গে ইংলণ্ড সফর করে এসেছে। তাঁদের এই সফর পনেরদিন ব্যাপী স্থায়ী হয়। শেষ খেলায় পরাজিত না হলে তাঁরা অপরাজিত ভাবেই এই সফর শেষ করবেন। সাতটি খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ২৮টি গোল দেন। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে পাঁচটি গোল হয়। খ্যাতনামা খেলোয়াড় মহাজন ১১টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার কৃতিত্ব অর্জন করেন। এই সফরে অধিনায়ক বক্সি ও গোলরক্ষক সাণ্টিনাগোর খেলা সকলকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর খেলোয়াড়রা এই সফরে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন ভবিষ্যতে তাহা বিশেষ কার্যকরী হবে বলে মনে হয়। এইরূপ সফরের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

## বিশ্ব ক্রম পর্য্যায়ে কৃষ্ণানের নবম স্থান

লন টেনিস প্রতিযোগিতার বিশ্ব অপেশাদার খেলোয়াড়ের বেসরকারী ক্রম পর্যায়ের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণান নবম স্থান পেয়েছেন। প্রথম দু'টি স্থান পেয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার রড লেভার ও রয় এমার্সন। উহার মধ্যে রড লেভার প্রথম স্থান লাভ করেন। এবারকার রড লেভারের কৃতিত্বই সর্বাধিক। কারণ তিনি বিশ্বের চারটি শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতায় (ফরাসী, উইম্বলডন, আমেরিকান ও অষ্ট্রেলিয়ান) সিঙ্গলসে জয়ী হয়েছেন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন রয় এমার্সন।

অষ্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ মহিলাদের বিশ্ব ক্রম পর্যায়ের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন। নিম্নে বিশ্ব অপেশাদার খেলোয়াড়দের ক্রম পর্য্যায়ের তালিকা প্রদত্ত হ'ল :—

**পুরুষ**

| | |
|---|---|
| ১ম—রড লেভার | (অষ্ট্রেলিয়া) |
| ২য়—রয় এমার্সন | (অষ্ট্রেলিয়া) |
| ৩য়—ম্যানুয়েল সান্তনা | (স্পেন) |
| ৪র্থ—নীল ফ্রেজার | (অষ্ট্রেলিয়া) |
| ৫ম—চাক ম্যাকিনলে | (যুক্তরাষ্ট্র) |
| ৬ষ্ঠ—জান-এরিক লুণ্ডকুইষ্ট | (সুইডেন) |
| ৭ম—মার্টিন মুলিগান | (অষ্ট্রেলিয়া) |
| ৮ম—রাফিল ওসুনা | (মেক্সিকো) |
| ৯ম—রমানাথ কৃষ্ণান | (ভারত) |
| ১০ম—ফ্রেড ষ্টোলে | (অষ্ট্রেলিয়া) |

**মহিলা**

| | |
|---|---|
| ১ম—মার্গারেট স্মিথ | (অষ্ট্রেলিয়া) |
| ২য়—মারিয়া বুয়েনো | (ব্রেজিল) |
| ৩য়—ড্যালিনি হার্ড | (যুক্তরাষ্ট্র) |
| ৪র্থ—কারেন সুসম্যান | (যুক্তরাষ্ট্র) |
| ৫ম—রানি সারম্যান | (দক্ষিণ আফ্রিকা) |
| ৬ষ্ঠ—আন হেডন | (ব্রিটেন) |
| ৭ম—ভেরা সুকোভা | (চেকোশ্লোভাকিয়া) |
| ৮ম—সন্দ্রা প্রিস | (দক্ষিণ আফ্রিকা) |
| ৯ম—কারোল কাণ্ডওয়েল | (যুক্তরাষ্ট্র) |
| ১০ম—বিলিজিয়ান মফিট | (যুক্তরাষ্ট্র) |

ভারতের একমাত্র খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণান নবম স্থান লাভ করলেও তিনি যে বিশ্ব সম্মান লাভ করেছেন—তাতে ভারতবাসী মাত্রেই গর্ব অনুভব করবেন, কিন্তু তাঁর স্থান পূরণের জন্ত ভারতের অন্ত কোন তরুণ খেলোয়াড় এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ভারতীয় টেনিস এসোসিয়েশনের বর্তমানে ভারতের তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

## জাতীয় স্কুল গেমসে বাঙ্গালার সাফল্য

সম্প্রতি ইম্ফলে অষ্টম জাতীয় স্কুল গেমসের শরৎকালীন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এবারকার অনুষ্ঠানে পশ্চিম বাঙ্গালা বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। তারা ফুটবল, সাঁতার ও টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন। তাদের এই সাফল্য সত্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক। কারণ পশ্চিম বাঙ্গালা এই তিনটি বিভাগেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ত প্রতিযোগী পাঠিয়ে ছিল। কোনটাতেই তারা নিরাশ হয়নি।

সাঁতারেই পশ্চিম বাঙ্গালার প্রতিনিধিরা বেশী সাফল্য অর্জন করে। ছাত্র ও ছাত্রী উভয় বিভাগেই তারা চ্যাম্পিয়নশিপ পায়। পশ্চিম বাঙ্গালার ছাত্র ও ছাত্রীদের এই সাফল্য অভিনন্দনযোগ্য।

পশ্চিম বাঙ্গালার ছাত্র ও ছাত্রীদের এবারকার সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শারীরিক শিক্ষা ও যুব কল্যাণ বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীকল্যাণ দত্তের অবদান কম নয়। কারণ এইবার প্রথম তাঁর তত্ত্বাবধানে পশ্চিম বাঙ্গালা দল গঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলা পরিচালনার জন্ত বিভিন্ন অধ্যাপকদের নিয়ে যখন "বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড" আছে তখন কেন পশ্চিম বাঙ্গালার স্কুলের খেলাধুলা পরিচালনার জন্ত বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে "স্কুল স্পোর্টস বোর্ড" গঠিত হবে না? এই বিষয়ে শ্রীকল্যাণ দত্ত একটু নজর দিলে বাঙ্গালা দেশের স্কুলের খেলাধুলার প্রসার আরও বৃদ্ধি পাবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

## বিশ্ব রাইফেল সুটিং-এ রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব

বিশ্ব রাইফেল সুটিং প্রতিযোগিতা সম্প্রতি কায়রোতে হয়ে গেল। রাশিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য অর্জন করেছে। কি পুরুষ, কি মহিলা উভয় বিভাগেই সর্বাধিক স্বর্ণপদক অধিকার করেছে। ৩০০ মিটার সার্ভিস রাইফেল সুটিং-এ রাশিয়া দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

ক্লে পিজিয়ন ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে রাশিয়ার ভ্লাডিমির জিমেনকো ভারতের মহারাজা কারনি সিংকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। মহারাজার সঙ্গে জিমেনকো তিনবার সমান

পয়েণ্ট অর্জন করেন। এই জন্ত চতুর্থবার স্যুটিং-এর ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্য্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর জিমেনকো ২৪-২২ পয়েণ্টে জয়ী হন।

বিশ্ব স্যুটিং-এ ভারতের এই প্রথম রৌপ্যপদক। এর আগে ভারতের কোন রাইফেল চালক পদক লাভের অধিকারী হতে পারেন নি।

এই বছর ৩০০ ক্লেপিজয়ন প্রতিযোগিতায় যেরূপ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তিন দিন ধরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকানীর মহারাজা ২৯৫ পয়েণ্ট পেয়ে অগ্রগামী হন। রাশিয়ার ভ্লাডিমির জিমেনকো শেষ পর্য্যন্ত ২৯৫ পয়েণ্ট করে মহারাজার সমান করেন। পরিচালকরা তখন নির্দ্দেশ দেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান নির্দ্ধারণ কল্পে তাঁদের পুনরায় ২৫টি করে ক্লেপিজন স্যুটিং করতে হবে। এতে পুনরায় মহারাজা ও জিমেনকো ২৪ পয়েণ্ট পান। পুনরায় বলা হয় আরও ২৫টি ক্লেপিজন স্যুটিং করতে দেওয়া হবে। এবারেও উভয়ে ২৪ পয়েণ্ট পান। উপর্য্যুপরি তিনবার সমান পয়েণ্ট হওয়ায় চতুর্থবার স্যুটিং-এর ব্যবস্থা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত জিমেনকো জয়ী হন।

ভারতীয় প্রতিনিধি মহারাজা যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে বিশ্বের দরবারে রাইফেল স্যুটিং-এ ভারতের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## সাঁতারে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য

সাঁতারে অষ্ট্রেলিয়া এবারও যে বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে—তার প্রমাণ এর মধ্যেই পাওয়া গেছে। পার্থে কমনওয়েলথ গেমসে যোগদানের জন্ত অষ্ট্রেলিয়ার দল গঠনকল্পে একটি ট্রায়াল সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই ট্রায়াল অনুষ্ঠানে অষ্ট্রেলিয়ার সাঁতারুরা ৯টি বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইহা ছাড়া অনেকগুলি কমনওয়েলথ গেমসের রেকর্ডের সমান অথবা ভঙ্গ করেন। নিম্নে নূতন বিশ্ব রেকর্ডের তালিকা দেওয়া হ'ল :—

(১) ২২০ গজ বাটার ফ্লাই—কেভিন বেরী। সময়—২ মিঃ ৯.৭ সেকেণ্ড।

(২) ২০০ মিটার বাটার ফ্লাই—কেভিন বেরী। সময়—২ মিঃ ৯.৭ সেকেণ্ড।

(৩) ১১০ গজ বাটার ফ্লাই—কেভিন বেরী। সময়—৫৯.৪ সেকেণ্ড।

(৪) মহিলাদের ১১০ গজ ফ্রি ষ্টাইল—ডন ফ্রেজার। সময়—৫৯.১ সেকেণ্ড।

(৫) মহিলাদের ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল—ডন ফ্রেজার। সময়—৫৯.১ সেকেণ্ড।

(৬) মহিলাদের ৪৪০ গজ ফ্রি ষ্টাইল—রিলে। সময়—৪ মিঃ ১৩.৮ সেকেণ্ড। (এই দলে ছিলেন—মিস রুথ এভারাস, মিস রোবিন থর্ণ, মিস লিন বেল ও মিস ডন ফ্রেজার)।

(৭) পুরুষদের ৪৪০ গজ ফ্রি ষ্টাইল রিলে। সময়—৩ মিঃ ৪৫.১ সেকেণ্ড। (দলে ছিলেন—মারে রোজ, পিটার ডোরাক, ডেভিড ডিক্সসন ও পিটার ফেলপস)।

(৮) ৪×১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলে (পুরুষ)।

(৯) ৪×১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলে (মহিলা)।

## মধ্যবয়স্কের কর্ম-সমস্যা

বয়স হলেই যে মানুষ ফুরিয়ে যায় না, এ কথাটা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন, পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর বয়সে কোন কারণে যাঁরা বেকার হয়ে পড়েন, তাঁদের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকা সত্বেও কেন তাঁদের জন্ত কর্মসংস্থান করা হবে না, এ বিষয়ে অবহিত হওয়ার সময় এসেছে। ও দেশে অর্থাৎ পাশ্চাত্যে লোকে এ নিয়ে শুধু ভাবছেই না, এর প্রতিকার কল্পে সক্রিয়ও হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। যে সব প্রতিষ্ঠান এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত রূপেই সক্রিয় তাদের মধ্যে লণ্ডন শহরের কেনসিংটন অঞ্চলের "মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির কর্মসংস্থান" নামীয় প্রতিষ্ঠানটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটি আকারে বৃহৎ না হলেও এরই মধ্যে প্রশংসনীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাত্র ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত এর কার্যনির্বাহক কমিটি, কিন্তু এই অত্যল্পসংখ্যক মানুষই অগণ্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মধ্যবয়স্ক বেকার মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে বাঁচবার আশ্বাস। যাঁরা কর্মী চান তাঁরা সচরাচর যৌবনকেই সমাদর করে থাকেন, কারণ প্রচলিত বিশ্বাস মতে যৌবনেই নাকি অপরাপর নানা বস্তুর মত মানুষের কর্মক্ষমতাও সর্বাধিক সক্রিয় থাকে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান বহু জায়গায় মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান করেছে এই যুক্তিতে যে মধ্যবয়স্ক মানুষ জীবন সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ হওয়ায়, অনেক বেশী মনোযোগ দেয় নিজের কাজে যা পরিণামে মালিকপক্ষকে অধিকতর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দেয়। তারুণ্যের চপলতা ও আশাবাদ প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে এ বয়সে, আর সেজন্যই যে কাজেই তারা নিযুক্ত হোক না, সেটাকেই একান্ত মনে বাঁচবার অবলম্বন বলে আঁকড়ে ধরতে তারা দ্বিধা করে না। কেনসিংটনের উক্ত কর্মসংস্থানক প্রতিষ্ঠানটির যুক্ত সম্পাদিকা শ্রীমতী এইচ জেমস ভোরের সঙ্গেই বলেন যে তাঁরা যে সব ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মারফত কর্মী পাঠিয়েছেন তার প্রত্যেকটিই পরে মধ্যবয়সী কর্মী লাভের জন্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেছে, ও অধিকতর সংখ্যায় এই ধরণের কর্মপ্রার্থীদেরই কাজে নিযুক্ত করেছে। আমাদের দেশেও মধ্যবয়সী বেকারের সংখ্যা নগণ্য নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখনও এদেশে এই সমস্যা দূরীকরণের জন্ত এ ধরণের কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি; তবে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে সাধারণ মানসে এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত সচেতনতার অভাব হবে না, কারণ প্রকৃত কর্মীর জন্ত কাজের অভাব অন্যত্র-র মত এদেশেও নেই। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলে দেশের ও দশের যুক্ত ভাবেই কল্যাণ হওয়া সম্ভবপর

## স্বাধীন ইয়েমেনী সাধারণতন্ত্র—
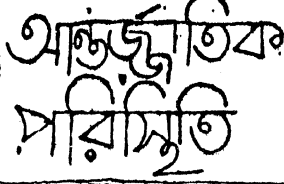
আরব সাগর ও লোহিত সাগরের সংযোগস্থলে—বৃটিশ অধিকৃত এডেনের ঠিক উত্তর পশ্চিমে ক্ষুদ্র ইয়েমেন রাজ্য; আয়তনে পঁচাত্তর হাজার বর্গমাইল, লোক-সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ, যাহার একটি বিশাল অংশ আরব উপজাতীয়। এতকাল সামন্ততান্ত্রিক বীভৎসতায় নিমগ্ন ছিল ইয়েমেন; মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন ইয়েমেনী ইমাম আহম্মদ য়েহায়া যখন তাঁহার বাতব্যাধির চিকিৎসার জন্য রোমে যাইয়া দশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া আসেন, তখন সঙ্গে গিয়াছিল তাঁহার পঁয়ত্রিশটি স্ত্রী, বহু সংখ্যক উপপত্নী ও ক্রীতদাসী। এ হেন ইমাম্ তাঁহার রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু নাসেরের সমাজতান্ত্রিক নীতি তাঁহার মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মেজাজে বরদাস্ত হয় না। গত সেপ্টেম্বর মাসে এই আহম্মদ য়েহায়ার মৃত্যুর পর ইমামের গদীতে অধিষ্ঠিত হন তাঁহার পুত্র মহম্মদ এল বদর। শোনা যায়, বদর পিতৃহন্তা—য়েহায়ার মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটে নাই। যাহা হউক, ইয়েমেনের ইমামী বদরের কাল হইল; গদীতে বসিবার পরই তরুণ সামরিক কর্ম্মচারীদের পরিচালিত বিদ্রোহে তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। এই বিদ্রোহের নেতা কর্ণেল আবদুল্লা খালাল প্রাসাদ-রক্ষীদের অধিনায়ক ছিলেন। (পরবর্ত্তী জনরব—এল বদরের মৃত্যু হয় নাই, তিনি অসুস্থ অবস্থায় কোনও এক হাসপাতালে আছেন।)

ইয়েমেনের শাসকগোষ্ঠী মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিলেও আরব জাতীয়তাবাদের প্রভাব এই রাজ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্রগ এবং সেনাবিভাগ মিশর ও ইরাকের সামরিক বিপ্লবে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। ইমাম য়েহায়া সুয়েজের যুদ্ধের পর তাঁহার বিশ হাজার সৈন্যকে সোভিয়েট ও চেক অস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছিলেন; ইয়েমেনী সৈন্যদের মধ্যে নাসের পন্থীদের নৈতিক প্রভাবও প্রসারলাভ করিতে থাকে। ইহারই পরিণতি সেপ্টেম্বর মাসের সামরিক বিদ্রোহ, যাহার ফলে "স্বাধীন ইয়েমেনি সাধারণতন্ত্রের" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিপ্লবী গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন—জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অনশন, ভীতি ও ব্যাধিকে নির্ব্বাসন দিবার উদ্দেশ্যে এই বিপ্লব সংঘটিত হইল; "মাথা কাটার যুগ" শেষ হইয়াছে, দাসপ্রথা আর থাকিবে না, হিংসাত্মক আচরণ চলিবে না। ইয়েমেনে এই বিপ্লবী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, সিরিয়া, আলজেরিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উহাকে স্বীকৃতি দেয়। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেন—ইয়েমেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাহিরের হস্তক্ষেপ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। নূতন ইয়েমেনী গভর্ণমেণ্ট একদিকে যেমন প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রগুলির এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বীকৃতি ও সমর্থনলাভ করেন, তেমনি অন্যদিকে আরব উপদ্বীপে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবধারার বিজয় অভিযানে জর্ডান ও সৌদী আরবের রাজতন্ত্র আতঙ্কিত হয়।

ইমাম মহম্মদ এল বদরের খুল্লতাত হাসান ছিলেন রাষ্ট্রসংঘে ইয়েমেনের প্রতিনিধি। তিনি বিপ্লবের সংবাদ পাইবামাত্র সৌদী আরবে আসেন; রাজা সৌদের এবং জর্ডানের রাজা হুসেনের সক্রিয় সমর্থনে আরব উপজাতীয়দের সংগ্রহ করিয়া তিনি সাধারণতন্ত্রী ইয়েমেনের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। ইয়েমেনী সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক চক্রান্তের সহায়ক হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। এডেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ গত কিছুকাল যাবৎ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; ইয়েমেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহাদের এই দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়াছে। মুস্কিল আসানের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় সহযোগ আরম্ভ হইয়াছে হাসানের সহিত। বৃটিশের ক্রাউন কলোনী এডেনের অধিকাংশ শ্রমিক এবং ব্যবসায়ী ইয়েমেনী; ইয়েমেনের সহিত এডেনের সংযোগ আছে—ইয়েমেনের ইমামও অনেক দিন হইতে এডেনের প্রতি দাবী জানাইয়া আসিতেছিলেন। এইজন্য এডেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে তাহাদের এগারটি ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া দক্ষিণ আরব ফেডারেশন গঠন করেন। এডেনকে ধীরে ধীরে এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা তাহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এডেনের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং একমাত্র রাজনৈতিক দল 'পিপলস্ সোসালিষ্ট পার্টি' দক্ষিণ আরব ফেডারেশনের সহিত এডেনের সংযুক্তির প্রবল বিরোধী। ইয়েমেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই বিরোধিতা আরও প্রবল হইয়াছে, যাহার প্রকৃত অর্থ খুবই স্পষ্ট।

ইয়েমেনের বিরুদ্ধে হাসান উপজাতীয় বাহিনী লইয়া আক্রমণ চালাইতেছেন বলিয়া সর্ব্বশেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; তাঁহার প্রত্যক্ষ সহায়ক সৌদী আরব ও জর্ডান। তবে, জর্ডানের মারফৎ বৃটিশের জেট বিমান হাসানের সাহায্যার্থে আসিয়াছে এবং সৌদী বিমান মার্কিণ বৈমানিকের দ্বারা চালিত হইতেছে বলিয়া অভিযোগ শোনা গিয়াছে। সাধারণতন্ত্রী ইয়েমেনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। বস্তুতঃ, ইয়েমেনকে উপলক্ষ করিয়া আরব উপদ্বীপে একদিকে প্রগতিশীল আরব জাতীয়তাবাদের এবং অন্য দিকে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিকতার সমাবেশ ঘটিয়াছে; আরব

জাতীয়তাবাদের পক্ষে ঐকান্তিক সমর্থন জানাইয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাঁহার ক্ষুদ্র স্বার্থে সামন্ততান্ত্রিকতার পক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

## ভারত সীমান্তে—

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্বন্ধে গত ১৫ই অক্টোবর হইতে দীর্ঘাকারে আলোচনা হইবার যে কথা ছিল, তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি পূর্ব্ব সীমান্তে চীনারা ভারতভূমি লঙ্ঘন করিয়া আক্রমণাত্মক তৎপরতায় প্রবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারত আলোচনায় যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল। তবে, ইহার পূর্ব্ব সর্ত হিসাবে ভারত সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্যদের অপসারণ চাহে, তাহাতে পিকিং কর্ত্তৃপক্ষ সম্মত হন নাই। পূর্ব্ব সীমান্ত বহু কাল শান্ত ছিল; কিন্তু গত সেপ্টেম্বর মাসে চীনারা সেকা অঞ্চলে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া ভারতীয় চৌকি আক্রমণ করে। ভারতীয় সৈন্য দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণ প্রতিরোধ করায় দুই পক্ষেই প্রচুর হতাহত হইয়াছে। বর্ত্তমানে চীন কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের উদ্দেশে অত্যন্ত অশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন—ভারতকে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, সাম্রাজ্যবাদের দালাল প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিতে তাঁহাদের আটকায় নাই। অবশ্য, সরল-বিশ্বাসী আদর্শনিষ্ঠ শ্রীনেহরুর ইহাই ভাগ্য; তিব্বত সম্বন্ধে যে সব অধিকার স্বাধীন ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, তাহা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া তিনি ঠিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং চূড়ান্ত ভাবে চীন-ভারত সীমান্ত নির্দ্ধারণের প্রশ্নটি চৈনিক নেতাদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া অমীমাংসিত রাখিয়াছিলেন। এই আদর্শনিষ্ঠা, উদারতা ও সরল বিশ্বাসের বিনিময়ে শ্রীনেহরুকে আজ চৈনিক নেতৃবৃন্দের অশিষ্ট গালি-গালাজ শুনিতে হইতেছে।

চীনের আচরণ বিচিত্র ও দুর্ব্বোধ্য। সীমান্ত সম্পর্কে অনমনীয়তা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা সে কি চাহে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শেষ পর্য্যন্ত আপোষ আলোচনার দ্বারাই তাহাকে সীমান্তের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে—উহার হুমকীতে, সামরিক চাপে অথবা অন্যবিধ চক্রান্তে ভারত কখনও নতি স্বীকার করিবে না। ভারতের সহিত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের কল্পনা নিশ্চয়ই চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই! এই যুদ্ধ যে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব যুদ্ধে পরিণত হইবে এবং তাহাতে চীন ও ভারত উভয়ের সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহারা বোঝেন। ভারতের প্রতি চাপ সৃষ্টির জন্য পিকিং কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত জঘন্য কূটনীতির আশ্রয় লইয়াছেন। এমন কি সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের বিভেদটাও তাঁহারা ঢাক পিটাইয়া জাহির করিতেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে যে, সমগ্র কাশ্মীরকে সে ভারতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করে। সেই কাশ্মীরের এক অংশের সীমান্ত সম্বন্ধে পাকিস্তানের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া চীন প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছে, সে পাকিস্তানের এই অন্যায় যুক্তিই সমর্থন করিতেছে যে, কাশ্মীরের সার্ব্বভৌমত্বের প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। জোট নিরপেক্ষ এবং সমগ্র সোস্যালিষ্ট শিবিরের (অবশ্য চীন ছাড়া) সহিত অত্যন্ত সদ্ভাব সম্পন্ন ভারতকে জব্দ করিবার চেষ্টায় কম্যুনিষ্ট বিরোধী সামরিক জোটের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি পাকিস্তানের সহিত কম্যুনিষ্ট চীনের অশোভন হরম-মহরমের কথা ছাড়িয়া দিলাম। এমন কি, ভারত বিরোধিতায় উন্মত্ত হইয়া পিকিং কর্ত্তৃপক্ষ সোভিয়েট ইউনিয়নকে অপদস্থ করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছেন না।

নেপালের গণতন্ত্র বিরোধী স্বৈরাচারী শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভারতের বর্ত্তমানে অসদ্ভাব চলিতেছে, কারণ ভারনীতি বিসর্জ্জন দিয়া নেপালের স্বৈরতন্ত্রকে নিরঙ্কুশ করিবার কাজে ভারত সহায়ক হয় নাই। এই নেপালকে চীনের পররাষ্ট্র সচিব মার্শাল চেন ই সম্প্রতি কতকটা গায়ে পড়িয়াই আশ্বাস দিয়াছেন যে, কোনও বৈদেশিক শক্তি নেপাল আক্রমণ করিলে চীন তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে। খুব সম্ভব ইহা নেপালের সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পরোক্ষ প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাবও ভারতের প্রতি চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধরণের হীন কূটনৈতিক চক্রান্তের দ্বারা ভারতের মত একটি মহান জাতিকে কখনও জব্দ করা যাইবে না। চৈনিক নেতাদের বৈপ্লবিক সাফল্যের গর্ব্ব যতই থাকুক, কূটনৈতিক হিসাবে তাঁহারা যে তৃতীয় শ্রেণীর, তাহা এই সব আচরণে অত্যন্ত কুৎসিতভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

## ফ্রান্সে রাজনৈতিক সঙ্কট—

গত ৫ই অক্টোবর ফ্রান্সের পম্পিদু সরকারের পতন ঘটিয়াছে। পম্পিদু মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি জাতীয় পরিষদের মনস্থির প্রকৃতপক্ষে দ্য' গলের নীতির বিরোধিতা প্রকাশ পাইলেও তিনি উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং আগামী ১৮ই ও ২৫শে অক্টোবর নূতন সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন স্থির করিয়াছেন।

দ্য' গল ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সের এক দুর্দ্দিনে পুনরায় রাজনীতিতে ফিরিয়া আসেন, এবং গণতান্ত্রিক উপায়েই অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছেন। মন্ত্রিমণ্ডলপ্রধান শাসনব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসনব্যবস্থার (পঞ্চম সাধারণতন্ত্র) প্রবর্ত্তন তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি। তাহার পর আলজেরিয়া সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে জনসাধারণের নিকট হইতে বিপুল ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার মনে এই দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে যে, তাঁহার মৃত্যু অথবা অবসর গ্রহণের পর ফ্রান্সে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে। তাঁহার ধারণা—এই বিপদ হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিতে হইলে রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের সংবিধানগত ব্যবস্থা সংশোধন করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু এই সংশোধনের সাংবিধানিক নির্দ্দেশ তিনি পালন করিতেছেন না। বর্ত্তমান সংবিধানে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা এইরূপ—পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির সদস্য এবং সমুদ্র পারের পরিষদসমূহের সদস্যদের লইয়া গঠিত নির্ব্বাচনী কলেজ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করিবেন। দ্য' গল এই ব্যবস্থার সংশোধন চাহেন; তিনি রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্রপতিকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে আগ্রহী।

তাঁহার সংশোধন এরূপ- রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইবেন প্রত্যক্ষ

জন সাধারণের ভোটে, তিনি জাতিকে কর্ত্তব্যপরতায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন; পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার সাধারণ ক্ষমতাও তাঁহার থাকিবে। বর্ত্তমান সংবিধানের নির্দ্দেশ এই যে, সংবিধানের কোনরূপ সংশোধন করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে দুইটি পরিষদের সম্মতি লইতে হইবে। দ্য'গল সে সম্মতি লইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের নূতন পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আগামী ২৮শে অক্টোবর গণভোট লওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ফ্রান্সের দক্ষিণ, বাম ও মধ্যপন্থী রাজনীতিকরা দ্য'গলের এই ডিক্টেটারী মেজাজে বিরক্ত হইয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রস্তাবিত নির্ব্বাচন-পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহাকে সংযত রাখার ও সমতা রক্ষার (চেক এণ্ড ব্যালান্সের) সকল ব্যবস্থা বিনষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। তাহার পর, নূতন ব্যবস্থা সংবিধান-বিরোধী পদ্ধতিতে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইতেছে, যাহা তাঁহারা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন। দ্য'গলের ডিক্টেটারী মেজাজের বিরুদ্ধে এবং স্থায়িভাবে ফ্রান্সের স্কন্ধে ডিক্টেটারী চাপাইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই পম্পিদু মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল এবং সে প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। কিন্তু দ্য'গল অনমনীয়; এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে গণভোট গ্রহণের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অটল রহিয়াছেন।

## স্বাধীন উগাণ্ডা—

গত ৯ই অক্টোবর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে আর একটি আফ্রিকান রাজ্য মুক্ত হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্ব্বাচনের দ্বারা স্বায়ত্তশাসিত উগাণ্ডায় পিপ্‌লস্ কংগ্রেস ও কাবাকা একা পার্টির কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই গভর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ, এম, ওবোটে স্বাধীন উগাণ্ডার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাধীন উগাণ্ডায় সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের ও গণতান্ত্রিক আদর্শের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে; ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই বৈচিত্র্য প্রতিফলিত। উগাণ্ডা পিপ্‌লস্ কংগ্রেস আধুনিক প্রগতিশীল ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এবং কাবাকা একা পার্টি সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের পরিপোষক। এই দুই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সমাবেশের কারণ—উগাণ্ডার জাতিদেহে দুইটি বিপরীত শক্তি সজীব ও সক্রিয়। বুগাণ্ডা, বুনীয়োরো, টোরো ও আঙ্কোল—উগাণ্ডার অভ্যন্তরে চারিটি রাজ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের সহিত উগাণ্ডা রাজ্যের অবশিষ্টাংশের ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর উগাণ্ডা কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকিবে এবং বৃটেনের রাণীকেই উগাণ্ডার রাষ্ট্রপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিবে। সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া-শক্তির সহিত গণতন্ত্রকামী প্রগতি শক্তির গোঁজামিলে যে স্বাধীন উগাণ্ডার প্রতিষ্ঠা হইল, তাহা স্বভাবতঃ কি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কোথাও বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে উগাণ্ডা উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে গুরুতর বৈদেশিক পুঁজি উগাণ্ডায় প্রবেশ করিয়াছে, আমেরিকা হইতে শিক্ষক আমদানী হইতেছে।

—মিহির

# প্রীতিমতী ভার্য্যা

বর্ত্তমান যুগে হৃদ্‌রোগে মৃত্যুসংখ্যার হার আশঙ্কাজনক গতিতে বেড়ে চলেছে, এবং পুরুষেরাই প্রধানতঃ এই রোগের কবলে পড়েন, অতএব ঘরকে বাঁচাতে হলে ঘরণীদেরই এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত হতে হবে। চিকিৎসকগণের মতে অতিশ্রম হৃদ্‌রোগের অন্যতম মূল কারণ, সে জন্যই প্রত্যেক বুদ্ধিমতী স্ত্রীর বিশেষ করে স্বামীর এইদিকটি সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। দৈনন্দিন বাঁধা ধরা কার্য্যতালিকার পর, কিছু বেশী উপার্জ্জনের আশায় অনেকেই নিজেদের অবসর মুহূর্ত্তগুলিকেও কাজে লাগাতে চান, এটা একেবারেই উচিত নয়। কর্মক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরলে যাতে প্রত্যেক মানুষই একটা শান্তি ও আরামের পরিবেশে সমস্ত দিনের শ্রান্তি মোচন করতে পারেন, এটা দেখাই প্রত্যেক ঘরণীর সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালীন শয্যা ত্যাগের মুহূর্ত্ত থেকে রাত্রের বিশ্রামক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামী যাতে সময়াভাবে বিপর্য্যস্ত বোধ না করেন, সেদিকে প্রখরদৃষ্টি রেখে চলা উচিত স্ত্রীর। কর্ম্মক্লান্ত পুরুষ গৃহে ফিরলে তাঁকে সেবায় সান্নিধ্যে ভরে রাখা উচিত এবং নিজের ছোটখাট অভাব অভিযোগগুলিও সে সময়ে অন্ততঃ তাঁর কাছে বিবৃত করতে বসা উচিত নয়, কারণ পরিশ্রান্ত দেহ মনে তার প্রতিক্রিয়া সুফলদায়ক নয়। সন্ধ্যার অবসরে ও ছুটির দিনগুলিতে স্বামীকে তাঁর পছন্দমত কোন 'হবি' যেমন উদ্যানরচনা, মাছধরা বা অন্য কিছুতে উৎসাহিত করে তোলাই সুবিবেচনার কাজ স্ত্রীর পক্ষে। মাঝে মাঝে বনভোজন বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য শহরের বাইরে বেড়িয়ে আসার জন্যও প্রেরণা দেওয়া উচিত যাতে দৈনন্দিন কাজের ভারে অবসাদিত স্নায়ু-শিরা সমূহ একটু সতেজ হয়ে উঠতে পারে। যাঁর যেমন উপার্জ্জন তার সঙ্গে সমতা রেখে সংসার পরিচালনা করাই তাঁদের ঘরণীদের পক্ষে বুদ্ধির পরিচায়ক। অপরের অনুসরণ করতে গিয়ে আয়ের বেশী ব্যয় করার নীতি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। অনেক সময়ই দেখা যায়, স্ত্রীর সখের ঠেলায় স্বামী বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে এবং সাধ্যাতীত বায়নাক্কা মিটাতে গিয়ে সাধ্যাতীত শ্রমের পথই তাঁকে বেছে নিতে হয়, পরিণামে যা ডেকে আনে তার অকালমৃত্যু বা অকাল বার্দ্ধক্য। বছরে অন্ততঃ একবার কোন চিকিৎসকের কাছে স্বামীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যেতে উৎসাহিত করা প্রত্যেক স্ত্রীরই অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তাঁর জোর খাটানো উচিত কারণ এর দ্বারা অনেক সময়ই বড় রকম বিপর্য্যয়কে ঠেকানো সম্ভব। এই সব কর্ত্তব্য পালন সব সময়েই সহজসাধ্য নয়, কিন্তু ঘর দাঁড়িয়ে থাকে যে মানুষটির উপর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই যে পরিণামে শুভ হওয়ার সম্ভাবনা সর্ব্বাধিক, আশা করি, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী মাত্রই একথার সত্যতা অনিবার্য্য বলেই স্বীকার করবেন।

# ইসারা

[ "দি সিগনেল" গল্পের অনুবাদ ]

## গী দ্য মোপাশাঁ

তরুণী মার্কিওনেস্ দ্য রেনেদোঁ তাঁর সুবাসিত অন্ধকার শয্যাকক্ষে তখনো নিদ্রিতা।

তাঁর নরম নীচু বিছানায় মোলায়েম ক্যাম্‌ব্রিকের দুটো চাদরের মধ্যে নিঃসাড় ও স্বস্তির নিদ্রায় তিনি অভিভূত ছিলেন। মোলায়েম চাদরের স্পর্শ যেন একটি উষ্ণ চুম্বনের মতই সোহাগভরা। সদ্য বিবাহ-বিচ্ছেদকারিণীর শান্তিময় গভীর নিদ্রা।

তাঁর ছোট্ট নীল ড্রইংরুমের এক বিশ্রী গোলমাল তাঁকে জাগিয়ে দিল। তিনি চিনতে পারলেন তাঁর প্রিয় বান্ধবীকে। ব্যারোনেস দ্য গ্রেঞ্জারী, ভদ্রমহিলা পরিচারিকার সংগে প্রায় ঝগড়াই করছিলেন, কারণ পরিচারিকা তাঁকে, মার্কিওনেসের ঘরে যেতে দিতে রাজী নয়। তাই মার্কিওনেস নিজেই উঠলেন, দরজা খুললেন, তারপর পর্দাটা সরিয়ে মুখ বাড়ালেন। চুলে আধ-ঢাকা তাঁর সুন্দর মুখখানা : আরে, ব্যাপার কি? এত ভোর-সকালে তুমি? এখনো ত, ন'টাও বাজেনি।

তন্বী ব্যারোনেসকে পাণ্ডুর ও শীর্ণ দেখাচ্ছিল। ক্লান্ত স্বরে তিনি জবাব দিলেন, তোমার সংগে আমার জরুরী কথা আছে। এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেছে!

—এসো, এসো, ভেতরে এসো।

তিনি ভেতরে গেলেন। তাঁরা পরস্পরকে চুম্বন করলেন। তন্দ্রালসা মার্কিওনেস বিছানায় উঠে আধশোয়া হয়ে বসলেন। পরিচারিকা জানলা খুলে দিয়ে গেল। ভোরের আলো ও নির্মল হাওয়ায় ঘর ভরে গেল।

মাদাম রেনেদোঁ কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ভাল, বলো শুনি কি হয়েছে।

মাদাম দ্য গ্রেঞ্জারী কাঁদতে সুরু করলেন। যে অশ্রু রমণীকে করে রমণীয়, ফোঁটায় ফোঁটায় সেই উজ্জ্বল চকচকে অশ্রু গড়াতে লাগল তাঁর সুন্দর চোখের কোল থেকে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে চোখের জল না মুছেই তিনি সুরু করলেন, ওঃ দিদি গো, জঘন্য ব্যাপার ঘটে গেছে, জঘন্য! জঘন্য! সারারাত আমি ঘুমাইনি, এক মিনিটও ঘুম হয়নি, এক মিনিটও নয়। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, এখনো কেমন ধক্ ধক্ করছে।

বান্ধবীর হাত তুলে নিয়ে নিজের সুগঠিত বুকের উপর রাখলেন। তাঁর বুক সত্যি ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল।

তিনি বলে যেতে লাগলেন : ব্যাপারটা ঘটেছিল গতকাল দিনের বেলায়। বিকেল চারটা কি সাড়ে চারটায়, আমি ঠিক বলতে পারব না। তুমি আমাদের বাসাটা চেন। তুমি জান আমার ছোট্ট ড্রয়িং-রুমটা, যেখানে আমি সব সময় বসি, সেটা একেবারে রাস্তার উপর। আর জানই ত' আমার এক বদ অভ্যাস আছে, আমাদের ঐ রু্য সেণ্ট-লাজারে দিয়ে যত লোক আনাগোনা করে আমি জানলায় বসে বসে তাদের দেখি। রেলষ্টেশনের আশপাশটা সব সময়ই যেন খুব সজাগ থাকে। ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি। কি প্রাণবন্ত—ঠিক যেমনটি আমি পছন্দ করি। তাই গতকালও আমি জানলার কাছে রাখা নীচু চেয়ারটিতে বসে ছিলাম। জানলা খোলা ছিল। আমি অলস মনে বসে হাওয়া খাচ্ছিলাম। বলো, কাল দিনটা কি সুন্দর ছিল।

হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম মুখোমুখি বাড়ীর জানলায় বসে একটি মেয়ে,—মেয়েটির পরণে ছিল লাল পোষাক। আমার পরণে ছিল বেগুনী। তুমি ত' দেখেছ আমার সুন্দর উজ্জ্বল বেগুনী কষ্টিউমটা। আমি মেয়েটিকে জানতাম না। সে ছিল নতুন পড়শী, মাসখানেক হল এসেছে এখানে। আর গত একমাস ত' কেবল বৃষ্টিই হল, তাই এর সাথে আমার দেখাই হয় নি। কিন্তু এক পলক দেখেই আমি বুঝলাম মেয়েটা খারাপ। প্রথমটা আমি বেশ আহত ও বিরক্ত হলাম এই ভেবে যে, এই মেয়েটাও আমারই মত জানলায় বসে আছে। পরে কিন্তু আস্তে আস্তে আমার বেশ মজা লাগছিল ওকে দেখে দেখে। জানলার চৌকাঠে কনুইয়ে ভর দিয়ে রাস্তার লোকেদের ও দেখছিল। লোকেরাও তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। প্রায় প্রত্যেকেই। দেখে মনে হচ্ছিল লোকেরা বাসাটার কাছে এলেই যেন কি করে বুঝে যায় যে এখানে ও আছে। তারা যেন গন্ধ পায়। কুকুর যেমন শিকারের গন্ধ পায়, ঠিক তেমনি। কারণ এখানটায় এসে হঠাৎ তারা মুখ তোলে, মুহূর্তের চোখাচোখি হয়। মেয়েটির চোখ বলে, এসো। ওদের চোখ জবাব দেয়, এখন সময় নেই, বা আর একদিন, আজ নয়, অথবা আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। আবার কেউ হয়ত বলে, ওরে হতভাগী, ভেতরে গিয়ে তুই লুকো।

তুমি ভাবতে পারবে না তাকে এরকম কাজে লেগে আছে দেখতে কেমন অদ্ভুত একটা মজা লাগে, যদিও ওটা তার নিত্যির ব্যবসা।

কখনো দেখতাম হঠাৎ সে জানালা বন্ধ করছে, আর একটা লোক তার ঘরে ঢুকছে। বঁড়শীতে পুঁটিমাছ আটকানোর মতই যেন ও তাকে ধরল। আমি তখন আমার হাতঘড়ির দিকে তাকাতাম। আমি দেখতাম তাদের কখনই পনেরো থেকে বিশ মিনিটের বেশী লাগত না। শেষে আমি যেন প্রায় এক নির্বোধ আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। মাকড়সার মত কুৎসিত মেয়েটা আমায় যেন কেমন হতবুদ্ধি করে দিল।

আমি নিজের মনে ভাবতে লাগলাম কি করে মেয়েটা পলকের মধ্যে নিজের সব কথা পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে পারে। সে কি ঘাড় নেড়ে কোনো ইসারা করে, বা কোনো অংগুলি-সংকেত? আমি তাই আমার অপেরা গ্লাস নিয়ে তার প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওঃ এটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার—প্রথমে শুধু একপলক চাউনি, তারপর একটু স্মিত হাসি, তারপর একটু ঘাড় নাড়া যার অর্থ হচ্ছে, তুমি কি আসছ? এটা এত সামান্য, এতই আবছা, কিন্তু আবার এত পরিষ্কার যে যথেষ্ট কুশলী না হলে এতে সফল হওয়া মুস্কিল। আমি ভাবলাম ওরকম আমি কি করতে পারব। ঘাড়টা একটু নাড়ানো, সামান্য একটু ওপরের দিকে তোলা, যেটা এত সুন্দর ও সাহসিক ভাবে ও করতে পারে? যাই বল, তার ভাবভংগী খুবই সুন্দর আমি আয়নার সামনে গিয়ে একটু চেষ্টা করলাম তুমি বিশ্বাস করবে না, ভংগীটা আমি তার চেয়ে ভাল করতে পারলাম, তার চেয়ে অনেক ভাল। আমি খুব উৎফুল্ল হয়ে জানলার ধারের চেয়ারটাতে ফিরে গিয়ে বসলাম।

সে তারপর সেদিন আর কোনো খদ্দের পাকড়াতে পারেনি।

বেচারী একটি লোককেও ধরতে পারেনি। হঠাৎ যেন সে ভাগ্যহীনা হয়ে গেল। সত্যি ও রকম জীবিকা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। তবে মাঝে মাঝে আনন্দদায়কও বোধ হয়, কারণ এই লোকগুলির মধ্যেও কেউ কেউ আছে সত্যি সুপুরুষ।

রোদটা সরে যাওয়ায় লোকেরা তখন আমার জানলা ঘেঁসে যাচ্ছিল। ওর জানলার ধারে কেউই ভিড়ছিল না। একের পর এক তারা চলেছেই—তরুণ-প্রৌঢ়, শ্যামল-ফর্সা, বেঁটে-লম্বা। একজনকে হঠাৎ দেখলাম সত্যি ভারী সুন্দর। অতি সুপুরুষ। আমার স্বামীর চেয়ে সুন্দর। তোমার অর্থাৎ তোমার বিগত স্বামীর চেয়েও সুন্দর।

আমি ভাবলাম আমি যদি ইসারা করি তারা কি বুঝবে, কারণ হাজার-হোক আমি হলাম ভদ্রমেয়ে। হঠাৎ আমায় কি এক পাগল-করা ইচ্ছে পেয়ে বসল। আমি ঠিক করলাম আমি তাদের ইসারা করেই দেখব। এক অদম্য ইচ্ছা! তুমি জান, এক ধরণের ইচ্ছা আমাদের পেয়ে বসে যা কিছুতেই দমন করা যায় না। হঠাৎ আমার ঠিক ও রকমটিই হয়ে বসল। সত্যি সমস্ত ব্যাপারটা কি ভীষণ বোকা-বোকা। তাই নয় কি? আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মেয়েদের আত্মা হচ্ছে বানরের আত্মা। আমি শুনেছি, একজন ডাক্তার আমায় বলেছিলেন যে, বানরের মস্তিষ্ক নাকি অনেকটা মেয়েদের মস্তিষ্কের মত। তাই আমাদের কাউকে না কাউকে অনুকরণ করতেই হবে। আমরা আমাদের স্বামীকে অনুকরণ করি যখন আমরা তাদের ভালবাসি। তারপর আমাদের অন্য যারা প্রেমাস্পদ ও প্রতিবেশী বান্ধবী আমরা তাদেরে নকল করার চেষ্টা করি। আশেপাশের আরো যা কিছু আমাদের মুগ্ধ করে আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা তাদের মত ভাবতে চেষ্টা করি, তাদের কথাবলার রীতি নকল করি, তাদের ভাবভংগী কথাবার্তা সবই অনুকরণ করি। এটা সত্যি খুব নির্বুদ্ধিতার কাজ।

যা' হোক, কথা হল, যখন একটা কিছু করার লোভ আমায় পেয়ে বসে, আমি সেটা না করে থাকতে পারি না। তাই আমি ঠিক করলাম, আমি একবার পরখ করে দেখব। শুধু মাত্র একটি লোকের উপর পরখ করব। কি হয় দেখব। আর কি-ই বা আমার হবে? কিছুই হতে পারে না। একটা স্মিতহাসির বিনিময় হবে মাত্র। পরে ত আমি নিশ্চয়ই সব অস্বীকার করব।

তাই আমি যাচাই করে দেখতে লাগলাম। সুন্দর কাউকে চাই। খুব সুন্দর। হঠাৎ দেখলাম লম্বা ফর্সা ও সুদর্শন একটি যুবক একা আসছে। তুমি জান ফর্সা লোকেদের আমার সব সময়ই ভাল লাগে। আমি তাকে দেখলাম, সে আমায় দেখল। আমি একটু হাসলাম, সেও হাসল। আমি একটু ঘাড় নেড়ে সেই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটি করলাম। কিন্তু সেও জবাব দিল, হ্যাঁ।

ওগো, তুমি [illegible]তে পার, লোকটা আমাদের সদর দরজায় এসে দাঁড়াল।

তখনকার আমার মনের অবস্থা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। আমার যেন মনে হল আমি পাগল হয়ে যাব। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। ভেবে দেখ, সে এক্ষুণি বাসার চাকরদের সাথে কথা বলবে। আমার স্বামীর বিশ্বস্ত চাকর জোসেফের সংগে কথা বলবে। আর জোসেফ নিশ্চয়ই ভাববে ঐ লোকটার সংগে আমার অনেকদিনের সম্পর্ক।

আমি কি আর করতে পারি বলো? এক্ষুণি সে কলিং বেল
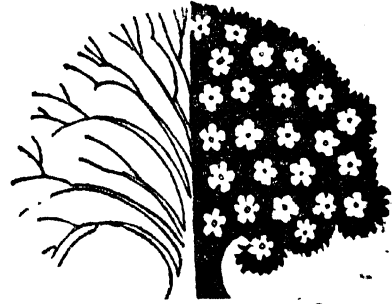
টিপবে। বলো, আমি কি করি? ...তুমি তাকে গিয়ে বলি যে সে মস্ত ভুল করেছে, আর তাকে চলে যেতে অনুরোধ করি। একটি অবলা নারীর উপর নিশ্চয়ই তার দয়া হবে। তাই আমি ছুটে গিয়ে দরজা খুললাম। ঠিক সেই সময়েই সে বেল টিপতে যাচ্ছিল। আমি বোকার মত আমতা আমতা করে বললাম: শুনছেন, আপনি চলে যান। আপনি একটা ভুল করেছেন, খুব ভুল করেছেন। আমি আপনাকে আমার এক বন্ধু বলে ভেবেছিলাম। তাকে অনেকটা আপনার মতই দেখতে। আমায় মাপ করুন।

কিন্তু জানো, উত্তরে সে শুধু হাসতে লাগল, বলল: সুপ্রভাত প্রিয়ে, তোমার ব্যাপার আমার জানতে বাকী নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তুমি বিবাহিতা, আর তাই তুমি কুড়ি ফ্র্যাঙ্কের জায়গায় চল্লিশ চাও। কি আছে, তাই দেব। চল, ভেতরে চল।

সে আমায় ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল। ভীতসন্ত্রস্ত আমি ঠায় দাঁড়িয়ে। তারই সুযোগে সে আমায়...চুম্বন করল।...আমায় ধরে ড্রয়িং রুমে নিয়ে এল। ড্রয়িং-রুমের দরজা খোলাই রইল। নীলামের খদ্দেরের মত ঘরের প্রতিটি জিনিষ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বলল: বাঃ, তোমার ঘরটা ত' বেশ সুন্দর, ভারী সুন্দর। এখন বোধহয় তোমার ব্যবসা ভাল চলছে না, নইলে তোমায় জানলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে কেন।

আমি তখন আবার তাকে অনুরোধ করলাম, দেখুন, আপনি চলে যান, দয়া করে চলে যান। আমার স্বামী শীগগিরই এসে পড়বেন, সময় হয়ে গেছে। আমি সত্যি বলছি আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু সে খুব শান্তভাবেই জবাব দিল: ওগো সুন্দরি, এ-সব ন্যাকামো আমি অনেক দেখেছি। তোমার স্বামী যদি এসেই পড়েন ত' তাকে পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে আমি সামনের ঐ কাফেতে পাঠিয়ে দেব। তারপর ঘরের চুল্লীর উপর রাউলের ফটোটা দেখে জিজ্ঞেস করল: ওটা কি তোমার—তোমার স্বামী?

হ্যাঁ, উনিই।

ও দেখছি একটা বেশ বিশ্রী লোক। আর ওটা কে? তোমার বান্ধবীদের কেউ?

ওগো, ওটা ছিল তোমারই ছবি। তোমার সেই বলড্রেস পরা ছবিটা। আমি যে কি বলছি না বলছি কিছুই আর বুঝতে পারছিলাম না। গলা আটকে—আটকে আমি বললাম, হ্যাঁ ওটা আমার এক বন্ধু।

বাঃ, বেশ সুন্দর ত' মেয়েটা। তুমি আমায় ওর সংগে পরিচয় করিয়ে দেবে।

ঠিক তখন দেয়ালঘড়িতে পাঁচটা বাজল। আর রাউল রোজ সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফেরে। ধর, আজ যদি সে খানিক আগেই এসে পড়ে। ভাব ত, কি হতে পারে। তখন—তখন—আমি আমার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে বসলাম—একেবারে সম্পূর্ণভাবে—আমি ভাবলাম—ভাবলাম—যে—যে সব চেয়ে ভাল হয়, যেমন করে হোক—রেহাই পাওয়া—এই লোকটার হাত থেকে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়—বুঝলে—কতক্ষণ আর লাগবে?

* * * *

তরুণী মার্কিওনেস ত রেনেদোঁ হাসতে লাগলেন। বালিসে মুখ গুঁজে পাগলের মত হাসতে লাগলেন। সারা বিছানা কাঁপতে লাগল। খানিকটা সামলে নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর—আর, সে কি—দেখতে ভাল?

নিশ্চয়ই।

আর তাও তুমি অনুযোগ করছ?

কিন্তু—কিন্তু—তুমি বুঝতে পারছ না, ওগো বন্ধু, লোকটা বলে গেছে—

—কাল আবার আসবে—ঠিক ঐ সময়েই—তাই আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি—তোমার কোনো ধারণাই নেই লোকটা কি ভীষণ গায়ে-পড়া আর নাছোড়বন্দা—আমি কি করতে পারি—বলো, আমি কি করি?

তরুণী মার্কিওনেস বিছানায় উঠে বসে খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর কোনো ভূমিকা না করেই বললেন, তাকে পুলিসে দাও।

বোকা বনে গিয়ে তন্বী ব্যারোনেসের কথা আটকে যেতে লাগল, তুমি বলছ কি? কিসের কথা ভাবছ তুমি? তাকে পুলিসে দেব? কেমন করে?

এ ত অতি সোজা। পুলিস কমিশনারের কাছে যাও। গিয়ে বল, জনৈক ভদ্রলোক গত তিনমাস তোমার পিছু পিছু ঘুরছেন। তাঁর আস্পর্ধা এত বেড়েছে যে গতকাল তিনি তোমার শোবার ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কাল আবার আসবেন বলে ভয় দেখিয়ে গেছেন তিনি। তুমি তাই তোমার পুলিসী প্রতিরক্ষার দাবী কর। আর তখন তাঁরা তোমার সংগে দু'জন পুলিস অফিসার দেবেন যাঁরা তাকে গ্রেপ্তার করবে।

কিন্তু ও যদি সব বলে—

আ রে বোকা, তারা ওকে বিশ্বাস করবে না। তুমি যদি তোমার গল্পটা ভালভাবে বল, ত' তারা তাই বিশ্বাস করবে। কারণ তুমি হলে একটি সদাচারী ভদ্রমেয়ে।

ওঃ, আমার সে সাহস হবে না।

ওগো, তোমায় এ করতেই হবে, নয়ত তুমি সব হারাবে।

কিন্তু ভাব, সে আমায়—সে আমায় অপমান করবে, যদি সে গ্রেপ্তার হয়।

ভাল কথা, তোমার সাক্ষী থাকবে, আর সে সাজা পাবে।

সাজা? কি সাজা?

তোমার শালীনতাহানির জন্ম তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ সব ব্যাপারে কোনো দয়ামায়ার বালাই রাখতে নেই।

হ্যাঁ ক্ষতিপূরণের কথা বলছ। একটা জিনিষ আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। আমার বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন রেখে যাবার আগে ও আমাদের চুল্লীর উপর দুটো বিশ ফ্র্যাঙ্ক রেখে গেছে।

দুটো বিশ ফ্র্যাঙ্ক?

হ্যাঁ।

আর কিছু না?

না।

এ অতি সামান্য। আমি এতে সত্যি অপমানিত হতাম। তাই না?

হ্যাঁ, কিন্তু বল এ নিয়ে আমি কি করি?

তরুণী মার্কিওনেস কিছুক্ষণ এটা ওটা ভাবলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, ওগো, তোমার স্বামীকে—স্বামীকে ও দিয়ে একটা কিছু কিনে দাও। একমাত্র সেটাই হবে সুন্দর।

অনুবাদক: জ্যোতি চৌধুরী

# রহস্যরাজ হিচকক

ভয়, রোমাঞ্চ, শিহরণ, কৌতূহল, উত্তেজনা প্রভৃতি রসসমূহের সুষ্ঠু প্রয়োগে নতুন ধারায় যিনি চলচ্চিত্রের ইতিহাসের নবরূপ দিলেন, গতানুগতিকতা বর্জন করে চলচ্চিত্রকে যিনি বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তুললেন, চলচ্চিত্রশিল্পকে মামুলী পথ অনুসরণ করতে না দিয়ে যাঁর সজীব চিন্তাধারা নতুন পথের সন্ধান দিল—অ্যালফ্রেড হিচকক সেই স্মরণীয় লোকটির অবিস্মরণীয় নাম।

স্থূলদেহ, বিরল কেশ, ষাটোত্তীর্ণ, চলচ্চিত্রশিল্পে রহস্য-রোমাঞ্চের অন্যতম দিক্‌পাল স্রষ্টা হিচককের জীবনের প্রথম অংশ কেটেছে একপাল মুরগীর সান্নিধ্যে। বাবার ছিল পোলট্রির ব্যবসা। ছেলেবেলা কাটল লণ্ডনে। জেস্যুইটদের বিদ্যালয়ে এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিচককের শিক্ষালাভ। শিল্প ছিল যাঁর প্রধান পঠিতব্য বিষয়। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধেও প্রভূত অনুশীলন সুরু করেন। ছেলেবেলায় তিনি অনুভব করতেন যে লণ্ডন যেন তাঁকে আবদ্ধ করে রাখছে, তার বাইরের বিশাল জগৎ সেই তরুণচিত্তে দোলা লাগাত, হাতছানি দিত, কৌতূহল জোগাত। সেই কারণেই জাহাজঘাটি, টাইম-টেবিল প্রভৃতি ছিল হিচককের অতি প্রিয়, তার মধ্যেই যেন বহির্জগতের অনেকখানি স্বাদ তিনি পেতেন। পরবর্তীকালে তাঁর চিত্রসৃষ্টির মধ্যে এর প্রভাব ছায়াপাত করেছে ব্যাপক ভাবে।

১৯২০ সালে বিখ্যাত ল্যাস্কি কোম্পানী লণ্ডনে কার্যালয় খুললেন। আপন শিল্পদক্ষতাকে সম্বল করে হিচকক চেষ্টা করলেন সেখানে যোগ দিতে। চেষ্টা সফল হল, হিচকক যুক্ত হলেন ল্যাস্কি কোম্পানীতে। ক্রমে হিচকক লেখক হলেন, হলেন শিল্পনির্দেশক।

হিচককের জীবনের ইতিহাস তখন রূপ নিচ্ছে, মেধা ও নিষ্ঠা তাঁকে সকল প্রচেষ্টায় সফল করে তুলছে, তাঁর জীবননদী সাফল্যের সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছে। গেনসবরো পিকচার্সে যোগ দিলেন হিচকক। হলেন পরিচালক।

আজকের দিনের বিশ্ববিশ্রুত পরিচালক হিচককের পরিচালক-জীবনের প্রথমাংশ মোটেই সাফল্যমণ্ডিত নয়। তাঁর প্রথম একাধিক ছবি তাঁকে সাফল্য এনে দিতে পারেনি। বিশেষ করে 'মাউন্টেন ঈগল' দারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু তার জন্যেও হিচকক দায়ী নন, এ প্রসঙ্গে তিনি যে বিবৃতি দেন, তা যেমনই যুক্তিপূর্ণ, তেমনই অকাট্য।

ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিল 'দ্য লজার', অপরিসীম ব্যর্থতার পর অসাধারণ সফলতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর তৃতীয় পরিচালিত ছবি 'দ্য লজার' ছবিটিই হিচককের মনে এনে দিল নতুন প্রেরণা, নতুন উদ্দীপনা আর নতুন চেতনা। হিচককের জীবনে যেন এক নতুন দিগ্‌দর্শন ঘটল। এই ছবিতে হিচকক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ছবিতে অজস্র নতুনত্ব আরোপ করেন। ক্যামেরার কাজে যে বৈচিত্র্য তিনি এনেছিলেন তার তুলনা মেলে না। চিত্রগ্রহণ পদ্ধতিতে যে কি পরিমাণ অভিনবত্ব তিনি এনেছিলেন তার তুলনা নেই। ছায়াছবির মূলই হল ক্যামেরা। ক্যামেরাই গল্পটি বলে, হিচককের ক্যামেরা 'সাকসেসান'-এর মধ্যে এমনভাবে গল্পটি জানিয়ে যায় যা বিস্ময়কর, "লজার" এ হিচকক ক্যামেরার সাহায্য অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করলেন। নতুন নতুন ধরণের শট নিলেন তিনি, শট নেওয়ার অনেক নতুন ধারার প্রবর্তন হল নানা ভাবে, নানা কোণ থেকে, নানা ধারার শট নেওয়ার বিচিত্র কৌশল সৃষ্ট হল।

অথচ, মজার ব্যাপার এই যে এর মুক্তির প্রাক্কালে নির্মাতারা একে মুক্তি দিতে চাননি, তাঁরা বলেছিলেন যে এ ছবি প্রদর্শিত হলে দুর্নামের অবধি থাকবে না, তাঁরা যেন দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ জাতীয় তৃতীয় শ্রেণীর ছবি প্রথম দিনেই উঠে যাবে, তার চেয়ে যা গেছে গেছে, একে মুক্তি দিয়ে আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে আর দুর্নামের বোঝাটা বাড়িয়ে কাজ নেই। একজন বললেন—ওতে হস্তক্ষেপ করাটাই আমাদের প্রথম এবং বিশেষ ভুল হয়েছিল। অন্যজন বললেন—যা গেছে, তা তো ফিরে আসবে না জানিই, তবু যা আসে তাই বা ছেড়ে লাভ কি? লজারকে মুক্তি দেওয়া হোক। মুক্তি দেওয়া হল লজারকে; জনসাধারণ এবং সাংবাদিক সম্প্রদায় ঘোষণা করলেন—'The greatest picture made to date.' লজার থেকেই হিচকক নিজের প্রকৃত পথটি খুঁজে পেলেন। তিনি বুঝলেন কোন পথ অনুসরণ করলে তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটবে। ইংল্যাণ্ডে হিচকক যে সব ছবি সৃষ্টি করেছেন অ্যামেরিকায় সেগুলি আশাতীত ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিয়েছে। অ্যামেরিকার চিত্রামোদী মহলে হিচকক একটি বিস্ময়কর নাম তখন। তাঁর সৃষ্টির চেয়ে তিনি নিজে যেন আরও বিস্ময়কর। এই সব ছবিগুলির মধ্যে সিক্রেট এজেন্ট, দ্য গার্ল ওয়স ইয়ং, দ্য থার্টি-নাইন স্টেপস, দ্য লেডি ভ্যানিশেস এবং দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে লিখিতব্য।

হিচকক

১৯৩৮ সালে ডেভিড ও সেলজনিক হিচককে অ্যামেরিকায় নিয়ে এলেন একটি

চুক্তিসহ। এখানেই কি করি ! [illegible] তাকে কা। নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ আর তাকে চলে যেতে অনুরোধ ব—১১১৭)। য়্যামেরিকা সাদরে নিশ্চয়ই তার হয়ে যাবে। তাঁর তিভাধর স্রষ্টা বিপুল সমাদর পেলেন ঠিক সেই সময়েই সে-বেশে টিপলেকার স্বীকৃত নাগরিক। তাঁর জয়যাত্রা আমতা করে বললাম : শুনছে সাফল্যভূষিত অপেরাগুলির মধ্যে ফল্ট ভুল করেছেন, খুব [illegible]সন, ষ্যাডো অফ এ ডাউট, লাইফবোট এবং স্পেলবাউণ্ড প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর প্রথম রঙিন ছবি "রোপ" তাঁর এক নবতম পরীক্ষার অভিনব নিদর্শন। এটি একটানা ছবি হিসেবে তোলা হয়েছিল এতে কোন 'কাট' ছিল না অর্থাৎ খণ্ডচিত্রের সমষ্টি এটি নয়, এটি পূর্ণকলেবর দীর্ঘচিত্র।

[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

# শিল্পের ভবিষ্যত

## অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ সবাই চিত্রশিল্পের প্রতি সহানুভূতিশীল হ'য়েছেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চিত্রশিল্পের কলাকুশলীরা, অভিনেতৃসঙ্ঘ, প্রদর্শক পরিবেশক, চিত্র সাংবাদিক সবাই একজোট হ'য়ে ভাবতে বসেছেন, এই যে দুর্দশা এসেছে তার ভয়াবহরূপ নিয়ে, তার থেকে কি ক'রে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।—এটা খুবই আশাপ্রদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক Enquiry committee গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সব তথ্য এক পথ নির্দ্ধারণের জন্যে। Committee-এর আগেও হয়েছে তাঁদের সুপারিশ মত কার্য হয়নি এক Film enquiry committee-র পর্যবেক্ষণ ও সুরাহার

সুপ্রিয়া চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

বাসবী নন্দী—ছায়াছবির বাইরে

নির্দেশ কাগজের লেখাতেই শেষ হ'য়েছে। আবার সেই Committee নিয়োগের কথা শুনে ভয় পাচ্ছি যে, এর ফলাফল কি হবে—। Committee-র নির্দেশও পর্যবেক্ষণ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত শিল্প কি বেঁচে থাকবে ?

আসল সমস্যা সেইদিনই সৃষ্টি হ'য়েছে যেদিন বঙ্গভঙ্গ ক'রে আমরা স্বাধনীতা পাই—। বাঙ্গলা ভাষাভাষীদের কেটে আধখানা করা হ'লো, তাতে সত্যিই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো বাঙ্গালী ও বাঙ্গলার চিত্রশিল্প। আবার সেই সময় যখন প্রদর্শনের ক্ষেত্রকে উদার ভাবে সম্প্রসারণ করা উচিত ছিল, সেদিন সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে ঘোষণা করলেম যে নতুন প্রদর্শন ক্ষেত্র আপাতত প্রসার করা চলবে না—কেন না—অন্যান্য গঠনমূলক শিল্পকে সম্প্রসারণ করতে হবে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে ও বেকার সমস্যা দূর করবার তাগিদে। পেটের খোরাকের ব্যবস্থা সুরু, তার নিদর্শন আমরা পেয়েছি ও পাচ্ছি, কিন্তু মনের খোরাকের সম্বন্ধে সরকার শুধু নিষ্ক্রিয় হয়েই রইলেন না, উপরন্তু ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আমোদকরকে আরও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলে এই মুমূর্ষু শিল্পের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। সরকারের এই উদাসীনতা দেখে প্রদর্শকরা বুঝে গেল এইবার আমাদের সুদিন এসেছে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁদের চাহিদা গেল বেড়ে একবারও কেউ ভেবে দেখলেন না এর ফল কি হবে। আজ সকলে আহা ! উঁহু ! করছেন বলছেন ভারতের একমাত্র গৌরবের চলচ্চিত্র বাংলা ছবি খাবি খেতে সুরু ক'রেছে—সমাপ্তির পথ দেখা যাচ্ছে। শিল্পপতিরা ভাবছেন কি করে ভরাডুবির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাঁরা এখন বম্বের মত Star System-কে প্রাধান্য দিচ্ছেন তাতে ফল দাঁড়াচ্ছে—গুটিকয়েক হাতে গোণা যায় লোকের কিছুটা সুরাহা—বাকীগুলো ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাক্।

চিত্ত বসু পরিচালিত মুক্তিপ্রাপ্ত "শুভদৃষ্টি"র একটি দৃশ্যে
অরুণ মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়

এই Star System করতে গিয়েও অনেকে এমন ঘা খাচ্ছেন যে, প্রকাশ্যে দেঁতো হাসি দিয়ে অন্তরের গ্লানিকে প্রলেপ দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁদের কর্মজগতে নীরবতা দেখে লাইনের লোকদের কাছে তাঁরা প্রকাশিত হয়ে পড়ছেন। কিছু শিল্পীর দর কল্পনাতীত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার কিছু শিল্পী সংখ্যায় যাঁরা বেশী তাঁরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অতীতের গৌরব নিয়ে মন্থন করছেন। আর Studio-র মালিক বেচারারা কি করে কর্মীদের মাসের বেতন দেবেন তাই নিয়ে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিন গুণে যাচ্ছেন।—

অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি খুব ভাল ভাবেই ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং প্রায় প্রত্যেকদিন কলিকাতার রঙ্গালয়গুলি Engaged হ'য়ে রয়েছেন।—আরও রঙ্গালয় হলে ভাল হয়, কেন না দর্শক সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। জাতীয় জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে তা'কে আংশিক ভাবে মেটাবার ক্ষমতা ছিল বাংলাছবির, কিন্তু যে সুরে বাংলাছবি গাঁথা হয় তা আজকের দর্শকের কাছে হয়তো সম্পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে না, হয়তো চলচ্চিত্রের মানদণ্ড আগের চেয়ে অনেক নেমে গেছে, হয়তো আজকের বাঙালী দর্শকের মনের খোরাক মেটাতে বাংলাছবি অপারক হয়ে পড়েছে, কিন্তু তার উত্তরে

আমি কিন্তু [illegible] রঙ্গালয় কি অতীতের মানদণ্ডকে অতিক্রম করবে [illegible]

বিদগ্ধজন, [illegible] থেকে সংশ্লিষ্ট তাঁরা নিশ্চয় বলবে [illegible] হয়তো হয়েছে, কিন্তু কোথায় তা [illegible] নাট্যসাহিত্য, বাংলার প্রতিভা [illegible] লোর খেলায় ও মঞ্চের আঙ্গিকে যদি [illegible] সাহায্যের Limitation যখন শেষ হয়ে যাবে, [illegible] দর্শকচিত্ত জয় করবে বাংলা রঙ্গালয়। সেদিন আবার নতুন করে ভাবতে বসতে হবে, বাংলা দেশকে তার এতদিনের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। অথচ আশ্চর্য এই প্রতিকার যখন করা উচিত—সাবধান যখন হওয়া বিধেয়, তখন আমরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকি—বসে বসে ভাবি রগড় কতদূর এগোয় দেখা যাক। আজ কত বছর আগে সাধারণ রঙ্গালয় এগিয়ে এসেছিল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যসম্ভারের রূপ দিতে। কিন্তু আজকের প্রগতির দিনে যখন আমরা প্রকাশ্যে চীৎকার করি যে, আমরা অনেক এগিয়ে পড়েছি তখন দেখি রঙ্গালয় পিছিয়ে চলেছে একেবারে যান্ত্রিক যুগে, যখন আঙ্গিকই ছিল একমাত্র সম্পদ। চিত্রশিল্প ঠিক খোলাখুলি ভাবে দর্শকচিত্তকে জয় করবার জন্যে বাংলা দেশে এখনও তাঁর উঁচু যায়গা থেকে নামতে পারছে না—তাই বর্তমান করভারে জর্জরিত House protectionএ ভারাক্রান্ত ঠিক আজকের প্রগতিশীল দর্শকদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না, যদিও পথের পাঁচালী, নীল আকাশের নীচে, অপুর সংসার ও অপরাজিত তৈরী হচ্ছে যদিও কাবুলিওয়ালা, সাগরসঙ্গমে ও ভগিনী নিবেদিতা এখনও রাষ্ট্রপতির সম্মান পাচ্ছে।

প্রতিকার করতে হবে চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তাদের কারুর দয়ার দান নিয়ে নয়। নিজেদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে জোর করে দাবী তুলতে হবে আমাদের এই চাই। এই পাওনা থেকে আমরা বঞ্চিতের দল আজ রিক্ত হয়েছি, তাই এক হয়েছি, তাই আসুন সবাই একসঙ্গে

উত্তমকুমার—আপন গৃহকোণে

প্রতিজ্ঞা করি—সমস্ত বাধা বিপত্তিকে [illegible] যে, নিজেদের চেষ্টায় ভাল ছবি [illegible] ম কি করি ? [illegible] ট্টি চুড়ে তুলতে হবে—পরস্পর প্রে[illegible] আর তাকে চলে [illegible] অনুরোধ [illegible] র্মধারা নিরূপণ করতে হবে, তবেই ভা[illegible] নিশ্চয়ই তার [illegible]। তা[illegible]

শিল্পের সঙ্গে জড়ি[illegible] ঠিক সেই সময়েই সে বেশ টিপে [illegible] বন যে কি করে শিল্পের অগ্রগতি[illegible] তা আমতা করে বললাম : শুনে [illegible] রের ব্যবস্থা নিজেদেরই ঠিক করতে [illegible] ভুল করেছেন, খুব [illegible] জক একসঙ্গে। বাংলা ছবি শুধু ছবি ন[illegible] তার উদ্দেশ্য নয়—তার উদ্দেশ্য আনন্দের মধ্যে মহত্তর জীবনের সন্ধান দেওয়া সেই চেষ্টাই হয়েছে অতীতে হচ্ছে বর্তমানেও, এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে। আমি অত্যন্ত আশাবাদী আমি আজও বিশ্বাস করি বাংলা ছবির সমাদর সম্পূর্ণভাবেই হবে, তবে তার অন্তরায় সব দূর করতে হবে।

## অভিযান

সত্যজিৎ রায়ের ছবি সম্পর্কে আমাদের দর্শক সম্প্রদায়ের এক বিরাট অভিযোগ যে তাদের গল্পাংশ বা নাট্যাংশ অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত নয়। "অভিযান" দেখার পর এ মন্তব্য আমরা অনায়াসে করতে পারি যে, এই ছবিটি সম্পূর্ণরূপে ঐ দোষ থেকে মুক্ত। অভিযান এমন এক জাতের ছবি যা দর্শককে আনন্দ দেয়, তার মনের চিন্তার খোরাক জোগায়, যার বক্তব্য তার হৃদয়ের অন্তস্তলে সাড়া জাগায়। সত্যজিতবাবুর পূর্ববর্তী ছবিগুলির মধ্যে যে অভাব দর্শকবৃন্দ অনুভব করেছেন "অভিযান" সে দিক দিয়ে তাঁদের মন কাণায় কাণায় ভরিয়ে দেবে এ বিশ্বাস রাখি। গল্পে, আঙ্গিকে, স[illegible]তে, নাটকীয়তায় এবং সর্বোপরি পরিণতির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, বর্তমান বাঙলা ছবির জগতে অভিযান একখানি অনন্যসাধারণ অবদান।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাহিনীকার। বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় এর চিত্ররূপদাতা। এক অভিনব বিষয়বস্তু অবলম্বনে এর আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। দু'টি ভাগ্যবিড়ম্বিত নরনারীর দু'টি ভিন্ন জীবন নদী একটি সার্থকতার মহাসাগরে মিলিত হওয়ার হৃদয়ধর্মী উপাখ্যান এখানে শোনানো হয়েছে। ছবির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালকের মুন্সীয়ানার সুস্পষ্ট ছাপ সমৃদ্ধ। সত্যজিতবাবুর প্রয়োগনৈপুণ্য, উপস্থাপন পদ্ধতি এবং বিন্যাসরীতি সর্বতোভাবে প্রশংসাহ´। ঘটনা সংস্থাপন, কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রয়োগ এবং গল্প বলার আঙ্গিক প্রভৃত নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অনুভূতিসম্পন্ন দর্শকদের মনে এর আবেদন গভীরভাবে রেখাপাত করে। জীবনে দুর্যোগ-ঝঞ্ঝা আছেই, কিন্তু আনন্দের সম্ভাবনাও শূন্য নয়, অনেক দুর্যোগের ঝঞ্ঝামুখর কালরাত্রির অবসানে স্বচ্ছ নির্মেঘ আনন্দের উজ্জ্বল প্রভাত, ত্রিযামনিশার অবসানে সুন্দর প্রভাতের আবির্ভাব সুনিশ্চিত। জীবনের ভাগ্যাকাশের নবপ্রভাতের এই মৃত্যুঞ্জয়ী বাণীই "অভিযান" ঘোষণা করছে। অভিনয়কুশলতা এ ছবির এক প্রধান সম্পদ। প্রতিটি চরিত্র যথাযথভাবে বিকশিত। সত্যজিতবাবুর চরিত্র-পরিচর্যা প্রশংসার দাবী রাখে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ওয়াহিদা রেহমান অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের অভিনয় দর্শককে অভিভূত

শর্মিলা ঠাকুর—যাত্রার প্রাক্কালে

করে তোলে। জীবনশিল্পীর রসমধুর কল্পনা থেকে জাত চরিত্র তু'টিকে তাঁরা জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁদের প্রাণবন্ত অভিনয়ে। নরসিং আর গুলাবীর মর্মবাণী এঁরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁদের অভিনয়ে। এঁদের পরেই উল্লেখনীয় চারুপ্রকাশ ঘোষ ও রবি ঘোষের অসামান্য অভিনয়। ছবিটিকে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের অভাবনীয় অভিনয় যে কতখানি সহায়তা করেছে, তার তুলনা মেলা ভার। এঁদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। এঁরা ছাড়া ধীরেশ্বর সেন, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ রায়, রেবা দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

জীবনের অন্তর্দ্ব... ...ন্দ্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাহি... ...কুত্বের বলিষ্ঠতায় ছবিটি সার্থক ও প... ...আনন্দই দেয় না চিন্তার খোরাক... ...রতা যে উদ্যম এবং আন্তরিকতা প্র... ...নন্দনযোগ্য।

অভিনয়াংশে... ...অসাধারণ, সাবলীল ও হৃদয়স্পর্শী। সৌমিত্র চ... ...ভাগা অভিনয় উচ্ছসিত প্রশংসা অনায়াসে দাবী করতে পারে। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অনুপকুমার, মমতাজ আহমেদ প্রভৃতি শিল্পীদের অভিনয়ও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

## বেনারসী

ঘটনাপ্রবাহ বা ভাগ্যচক্র যদি কোন মানুষকে সুস্থ, স্বাভাবিক ও বিধিবদ্ধ জীবনধারা থেকে পঙ্কিলতম এক জীবনে নিয়ে যায় অর্থাৎ ঘটনার প্রবাহে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিবর্তে পঙ্কিল ও পিচ্ছিল জীবন বরণ করতে তাকে যদি সাময়িক ভাবে বাধ্য হতে হয় এবং তারপর সে যদি আবার স্বাভাবিক ও আলোকিত জীবনে ফিরে আসতে চায় তার সেই সদিচ্ছাকে সমাজের বাধা দেওয়ার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ কি থাকতে পারে, বা কেন তার সেই সাধুসঙ্কল্পকে সফল করে তুলতে সহায়তা করা হবে না, এই জিজ্ঞাসাই "বেনারসী" চিত্রটির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিমল মিত্রের লেখনীজাত-এর কাহিনী সমাজের একটি নিখুঁত আলেখ্য উদ্ঘাটিত করেছে।

চাকুরে রতন এবং তার বাল্যসঙ্গিনী সোনার ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ জীবনালেখ্যই এখানে চিত্রিত হয়েছে। দৈব-দুর্বিপাকে সোনা একদিন হারিয়ে যায় রতনের জীবন থেকে, ঘটনাক্রমে সে রূপান্তরিতা হয় বেনারসীবাঈয়ে, রতনের জীবনে একদিন সে আবার ফিরে আসে কালীঘাটে বিবাহের পর তারা নীড় বাঁধে, আবার আসে দুর্যোগ, ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে তার ঝড়ের আঘাত অপ্রতিরোধ্য ভেবেই রতন ও সোনা শুধুমাত্র শান্তির সন্ধানেই অজানার পথে পা বাড়ায়।

মানুষ ঘটনার ক্রীড়নক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে অনেক কিছু মেনে নিতে হয়—বাধ্য হয়েই সোনাকে বেনারসীবাঈ হতে হয়েছিল, কিন্তু তার অন্তরে কোনদিন কোন দুর্বল মুহূর্তেও এতটুকু কালো দাগ পড়ে নি। সেদিক দিয়ে সে খাঁটি সোনাই ছিল। তার

একদিকে অ[illegible] কি করি? [illegible] ল-ফুলে সুশোভিত আর তাকে চলে যেতে অনুরোধ এক জনপদ গড়ে [illegible] প্রিয়তম দয়িতের নিশ্চয়ই তার দয়া হবে। [illegible] মধুসান্নিধ্য সার্থক [illegible] গড়ে তোলার ঠিক সেই সময়েই সে বেল টিপে স্বপ্ন—এই দুইয়ের [illegible] সুখ জীবনে যে [illegible] আমতা করে বললাম : শুনে অপ্রতিরোধ্য দুর্যোগ [illegible] সজ্ঘাতের চরম ভুল করেছেন, খুব [illegible] মুহূর্ত আবার ব্যর্থ জীব[illegible] ভাবে মিলনের মঙ্গলমন্ত্র ধ্বনিত হতে থাকে, তারই রস-রুচিসমৃদ্ধ এক পরম বিচিত্র আলেখ্য পরিবেশিত হয়েছে "কুমারীমন" ছবিটির মাধ্যমে। সুখ্যাত সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু এর কাহিনীকার। জীবনসন্ধানী লেখক যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা অনস্বীকার্য।

নায়ক ও নায়িকা আশা-আকাঙ্খাভরা নবজীবনের মূর্ত প্রতীক হিসেব। অসীম সর্বস্ব দিয়ে গভীর জঙ্গলকে পরিণত করতে চায় লোভন লোকালয়ে। কলকাতার একঘেয়ে জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পেরে খুশীর আমেজে উল্লসিতা হয়ে ওঠে কৃষ্ণা, কিন্তু অরণ্যের বিভীষিকা তার মনে আনে প্রচণ্ড ভয়। তার উপর সঙ্গীহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন জীবন তার অরণ্যপ্রীতিকে নিঃশেষ করে দেয়। অসীমও তার থেকে মনের দিক দিয়ে অনেক দূরে, সে মুক্তির পথ খোঁজে। কয়েই অফিসার প্রণব আসে তাদের জীবনে। অতীতে সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্তেই প্রণবের সঙ্গে কৃষ্ণার চিরবিচ্ছেদ ঘটে যায়, নাহ'লে তার জীবন নিশ্চয়ই অন্য রূপ নিত। প্রণবকে অবলম্বন করেই মুক্তির স্বাদ নিতে চায় কৃষ্ণা, [illegible] বিভীষিকার কবল থেকে মুক্তিলাভ করতে। তারপর ঘটনাচক্রে সেই পরম মুহূর্ত এল যখন কৃষ্ণা আত্মদান করে স্বামীর চরম দুর্যোগ রক্ষা করতে এগিয়ে এল এবং তার পরিণতি মিলনে।

পরিচালক চিত্ররথগোষ্ঠী পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁদের শিল্পনিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় এই ছবিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নয়নলোভন মনোহর দৃশ্যাবলী, অরণ্যের ভীতিসঙ্কুল আবেষ্টনী, নিবিড় গহন পরিবেশ ছবিটিতে সার্থক ভাবে রূপায়িত হয় তার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি স্বামী-স্ত্রীর আদর্শগত সজ্ঘাত অতীব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তিনখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রয়োগ প্রশংসার দাবী রাখে। কাহিনীটিকে সাজানো হয়েছে চমৎকার, মনোরম গতি এবং অভিনব বক্তব্য ছায়াচিত্রটিকে দর্শক-সমাজে উপভোগ্য করে তুলতে বহুলাংশে সহায়তা করেছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক।

অভিনয়াংশে অভাবনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার। মুঠো মুঠো সাধুবাদ তাদের নিঃসন্দেহে প্রাপ্য। দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় যেমনই গাম্ভীর্যপূর্ণ তেমনই ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রেমিক ও ক্রূর দুটি রূপই নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমান দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। সন্ধ্যা রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের এবং ঋত্বিক ঘটকের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। ছবিটির চিত্রায়ণ ও সুরযোজনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন যথাক্রমে দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

বনানী চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

## সংবাদ-বিচিত্রা

ভারতীয় সুরলোকের বন্দিত দিকপাল মনীষী আলাউদ্দীন খান সম্প্রতি তাঁর গৌরবোজ্জ্বল বৈচিত্র্যবিমণ্ডিত জীবনের শততম বর্ষে পদার্পণ করলেন। এ উপলক্ষে বাঙলার মুখোজ্জ্বলকারী এই মহান সন্তানকে আমরা শ্রদ্ধাসহ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দৈহিক স্বাস্থ্য এবং পরম শান্তিসহ আমাদের মধ্যে আরও অনেকদিন বিদ্যমান থাকুন এবং তাঁর সাধনা দেশ ও জাতিকে আরও নানা ভাবে ভরিয়ে তুলুক।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যমৃত্তিকায় সুদূর অতীতে যে সাহিত্য সাধকের দল পদচিহ্ন রেখে গেছেন, অতীতকালের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রূপ পেয়েছে যাঁদের কল্যাণে, দক্ষিণ ভারতীয় কবি ভেমলবর ভীমকবির নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কবি বর্তমান ছিলেন। জানা যায়, তেলেগু ভাষায় ইনি প্রায় তিরিশ খানিরও বেশী মহাকাব্য রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে মাত্র দুটি এখন পাওয়া যায়। মাদ্রাজের জগদম্বা প্রোডাকসান্স এঁর জীবনী অবলম্বনে এক ছায়াচিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কান্ত রাও। বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ এতে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন।

ভারত ভ্রমণরত মালয়ের প্রধান মন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমন তাঁর সহধর্মিণী পুয়ান শারিফা রোজিয়া সমভিব্যাহারে মাদ্রাজের জেমিনী ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন এবং চিত্রগ্রহণ চলাকালে তাঁরা

[illegible]োয়ে উপস্থিত থাকেন। দৃশ্য গ্রহণের শেষে শিল্পীদের সঙ্গে সস্ত্রীক মালয়ী প্রধানমন্ত্রী পরিচিত হন। এই শিল্পীদের মধ্যে বিপিন গুপ্ত ও কিশোর সাহুর নাম উল্লেখযোগ্য। অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকা প্রধান মন্ত্রীজায়াকে মাল্য বিভূষিত করেন। ষ্টুডিওতে তাঁরা একঘণ্টা কাল অতিবাহিত করেন এবং জেমিনীর জনচিত্ত আলোড়নকারী কয়েকটি চিত্রের অংশ বিশেষ দেখে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। কথা প্রসঙ্গে সব চেয়ে উল্লেখনীয় যে বিষয়টি অতিথি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যা জানা গেল তা হচ্ছে যে তিনি নিজেও একদিন লেখক কুলভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর একটি কাহিনী চিত্রায়িতও হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীবি, গোপাল রেড্ডি সম্প্রতি কোয়েম্বাটুরে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন যে বোম্বাইতে তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে টেলিভিসন প্রচলিত হবে। এজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারত সরকার চল্লিশ লক্ষ টাকা ধার্য করেছেন।

উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং চলচ্চিত্র পরিচালক কবিচন্দ্র কালীচরণ পটনায়কের নামানুসারে গত ৩রা অক্টোবর বারাম্বায় একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়েছে। কবিচন্দ্র এই স্থানে তাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত করেছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েৎ এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যাদি পরিচালনা করবেন।

ষ্ট্রাভিন্স্কির "অরফিয়াস", "পেত্রোচকা", "ফায়ারবার্ড" শীর্ষক ব্যালেসমূহ একদা সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল। সম্প্রতি এই একদা নিষিদ্ধ ব্যালেসমূহের এক প্রদর্শনীতে সংখ্যাতীত দর্শকদের মধ্যে স্বয়ং রুশ প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভও উপস্থিত ছিলেন।

## ভারতীয় ছবি ও পাকিস্তান

পাকিস্তানে ভারতীয় ছবির প্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ অথচ ভারতবর্ষে পাকিস্তানী ছায়াছবির আমদানী চলছে। ভারত সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ পেশ করেছেন ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স এসোসিয়েশান। ভারতবর্ষেও পাকিস্তানী ছবির আমদানী বন্ধ করা হোক—এই দাবী তাঁরা বিশেষরূপে উত্থাপন করেছেন।

পাকিস্তান সরকার তো ভারতবর্ষের ছায়াছবি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছেন, কিন্তু তার ফলে তাঁদের নিজেদের অবস্থা কি দাঁড়াল, সেই আভ্যন্তরীণ আলেখ্যটি আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকার সামনে উদ্ঘাটিত করছি। তাঁদের এই নীতির প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশে যা ঘটেছে, তা [illegible]বৃত করেছি কিন্তু তাঁদের দেশের প্রতিক্রিয়া বড়ই মর্মান্তিক। ফিল্ম এক্সিবিটার্স এসোসিয়েশান অফ পাকিস্তান প্রদত্ত এক বিবৃতি অনুসারে জানা যাচ্ছে যে, ভারতীয় ছায়াচিত্রের আমদানী পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হওয়ায় পাক চিত্রজগতে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। উর্দু ছবির অপ্রাচুর্য এবং পাকিস্তানী ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে অক্ষমতা আর ভারতীয় ছবি নিষিদ্ধকরণে ব্যবসায় অচলাবস্থায় দাঁড়িয়েছে এবং এই নীতি বলবৎ হয়ে থাকলে চিত্রগৃহগুলির দ্বার বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অর্থাৎ পাকিস্তানের চিত্রগৃহগুলির ভাগ্যনাট্যের যবনিকা পতন আসন্ন।

অর্থনৈতি[illegible] [illegible]ল দেখা দিয়েছে। টোয়েণ্টিয়েথ [illegible] [illegible]রল জানুক প্রকা[illegible] অর্থনৈতিক সং[illegible] [illegible]ক্রমণের অন্য কোন উপায় আপা[illegible] [illegible]ডিওর সাড়ে তিন শ' কর্মীকে বরখা[illegible]

[illegible]য়্যামেরিকার ৫, [illegible] নির্বাচনানুযায়ী পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর নাম [illegible]ছে। এই দশজনের মধ্যে তাঁরা প্রথম স্থান দিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন (২১) কে। অন্যদের নাম আমরা ক্রমানুযায়ী উল্লেখ করছি—ব্রিজিত বার্দো (২১), গ্রেস কেলি (৩৫), জ্যাকলিন কেনেডি (৩৪), অড্রে হেপবার্ণ (৩৪), জুলিয়া মিড, সার্জে ম্যাকলেন (২১), কিম নোভাক (৩০), প্রিন্সেস মার্গারেট (৩৩) এবং ডোরিস ডে (৩১)। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ নামই চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সংযুক্ত। সোফিয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে "In addition to everything else she has, what must be the most beautiful eyes in the world". মার্গারেটের সম্বন্ধে সেনাটাই বলেছেন, "She has a classically beautiful forehead from which the rest of a most beautiful face flows".

শিল্পীদম্পতি টোনি কার্টিস (৩৮) ও জেনেট লির (৩৬) বিবাহবন্ধন বর্তমানে ছিন্ন হয়েছে। জেনেট বর্তমানে ব্যবসায়ী রবার্ট ব্র্যাণ্টের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ব্র্যাণ্ট হলেন জেনেটের চতুর্থ স্বামী। টোনির সঙ্গে জার্মাণ অভিনেত্রী ক্রীশ্চিন কাফম্যানে (১৮) র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান তবে এঁদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন সংবাদ এখনও অবধি পাওয়া যায়নি। টোনি ও জেনেটের বিবাহ দীর্ঘকাল স্থায়িত্বলাভ করেছিল।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

বাঙলার প্রখ্যাতনামা কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত রচনা "শ্রেয়সী" নামীয়োজকদের মহলে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

লিলি চক্রবর্তী—ছায়াছবির বাইরে

বর্তমানে শক্তিমান কি করি! ... এই কাহিনীটি চলচ্চিত্রে রূপায়ি... তাকে চলে ... অনুরোধ ... নায়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ... নিশ্চয়ই তার ... আত্মপ্রকাশ করেছেন কমল মি... ঠিক সেই সময়েই সে ... টিপে ..., জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, আমতা করে বললাম: শুনে ... দে প্রভৃতি। * * * সুপ্রসিদ্ধ ক... ভুল করেছেন, খুব ... দেখা হল" কাহিনীর চিত্রায়ণপর্ব সুরু হয়েছে। ...ধ্যায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে পরিচালনা ও সুরযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন। চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, সুলতা চৌধুরী প্রভৃতি। * * * স্নিগ্ধ রসোজ্জ্বল চিত্র "বিংশতি জননী"র রূপায়ণকার্য সুসম্পন্ন হয়ে চলেছে খগেন রায়ের পরিচালনায়। কাহিনীকার তিনি নিজেই। রূপায়ণে আছেন অনুপকুমার, জহর রায়, প্রীতি মজুমদার, রাধারমণ, গীতা দে, মাধবী মুখোপাধ্যায়, লিপি চক্রবর্তী ইত্যাদি। * * * "উঁচু পাহাড় নীচু জমি" ছবিটির নির্মাণ কার্য যথারীতি এগিয়ে চলেছে। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছবিটির কাহিনীকার ও পরিচালক। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতবরণ, প্রবীরকুমার, কালী দত্ত, ভাস্কর বড়ুয়া, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী প্রভৃতি। * * * নির্মীয়মান ছবি "মৌনমুখর"এর নায়িকা হিসেবে নির্বাচিতা হয়েছেন ভারতী রায়। শেখর রায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন ত্রয়ীগোষ্ঠী। অন্যান্য সম্ভাব্য শিল্পীদের মধ্যে বিকাশ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অপর্ণা দেবী, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

'রূপসনাতন' ছবির সঙ্গীতগ্রহণের অবসরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও রথীন ঘোষ প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে

# সৌখীন সমাচার

বিশিষ্ট সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় ময়ূখগোষ্ঠীর উদ্যোগে এক অজিতকুমার সেনের পরিচালনায় জরাসন্ধের "ন্যায়দণ্ড" মঞ্চস্থ হল। রূপায়ণে ছিলেন অজিতলাল সেন, দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, গোরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিত ঠাকুর, হৃষীকেশ ঘোষ, সুরেশ সরকার, তপতী মণ্ডল, রুবি মিত্র শাশ্বতী চৌধুরী, রেবেকা চৌধুরী প্রভৃতি। রচনাটির নাট্যরূপ দান করেন অজিতলাল সেন। ** লাইফ ইনস্যুরেন্স এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশান ক্লাবের উদ্যোগে পৃথ্বীশ সরকারের "লবণাক্ত" নাটকটি সম্প্রতি অভিনীত হল। চরিত্রগুলির রূপদান করলেন প্রদ্যোত গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা রায় প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন পিকলু নিয়োগী। * * * চিৎপুর সংগঠনী ক্লাব সম্প্রতি নিবেদন করলেন মঞ্চসফল নাটক "এক পেয়ালা কফি"। গৌরাঙ্গ দেব পরিচালনায় নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন অংশুমান প্রামাণিক, অনিল আচার্য, জিতেন দাস, নারায়ণ চক্রবর্তী, সুশীল দাস, জগবন্ধু সাধুখাঁ, তারাপদ দাস, নারায়ণ কংসবণিক, রেখা সাহা, উষা দে, সন্ধ্যা পাল প্রভৃতি। * * * বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংস্থা অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে "কাঞ্চনরঙ্গ" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটি পরিচালনা করেন করালী সিংহ ও পঞ্চানন কুণ্ডু। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন তিলক সিংহ, দুলাল দে, রামচণ্ডী চক্রবর্তী, দুলাল সাঁট, সুধাংশু সিংহ, স্বপন সাহা, লক্ষণ ভকত, সুভাষ দাস প্রভৃতি। * * * কোলে রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যরা বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "টিপুসুলতান" নাটকটি অভিনয় করলেন। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হলেন বিমল মুখোপাধ্যায়, রবি চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, নিমাই চৌধুরী, নলিনীরঞ্জন সাহা, শ্রীমান গৌতম বল, ডলি মুখোপাধ্যায়, মায়া মৈত্র প্রভৃতি। * * * নদীয়া জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কয়েকজন কর্মী বীরু মুখোপাধ্যায়ের "সংক্রান্তি" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। ক্ষীরোদ চক্রবর্তী নাটকটি পরিচালনা করেন। মাধব পাল, অরুণ চট্টোপাধ্যায় কানাই ঘোষ, কিরণ দাস, গৌতম সান্যাল, নিরাপদ শীল, সুশান্ত ভট্টাচার্য, গৌরী বসু, লতিকা মিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

## ॥ আ লো ক চি ত্র ॥

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত হিচককের ও শুভদৃষ্টির চিত্রটি ব্যতীত অন্যান্য আলোকচিত্রগুলি সর্বশ্রী চিত্ত নন্দী, মোনা চৌধুরী, জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শান্তিময় সান্যাল কর্তৃক মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে গৃহীত।

## আশ্বিন, ১৩৬৯ ( সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '৬২ )

### অন্তর্দেশীয়—

১লা আশ্বিন ( ১৮ই সেপ্টেম্বর ): পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা সমাধানে স্থানীয় শিল্পপতিদের তৎপর হওয়ার আহ্বান—কর্মসংস্থান উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের ভাষণ।

২রা আশ্বিন ( ১৯শে সেপ্টেম্বর ): 'সম্প্রতিকালে তুয়েংসাং জেলায় নাগা বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি—দুই শতাধিক বিদ্রোহীর পূর্ব পাকিস্তানে পলায়ন'।

৩রা আশ্বিন ( ২০শে সেপ্টেম্বর ): নেফা সীমান্তে ভারতীয় ঘাঁটির উপর চীনা ফৌজের গুলীবর্ষণ—তিনজন ভারতীয় সৈন্য আহত।

৪ঠা আশ্বিন ( ২১শে সেপ্টেম্বর ): পূর্বপাকিস্তান হইতে ভূদান আন্দোলনের নেতা আচার্য বিনোবা ভাবের পশ্চিমবঙ্গের রাধিকাপুরে পদার্পণ—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক সম্বর্দ্ধনা।

কলিকাতা ও সহরতলীতে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা—প্রায় ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ঝড় ও বৃষ্টি।

৫ই আশ্বিন ( ২২শে সেপ্টেম্বর ): নেফার সীমান্ত এলাকায় চীনা হানাদারদের সহিত ভারতীয় সৈন্যদলের পুনঃপুনঃ গুলী বিনিময়।

আই. এফ. এ শীল্ড ( ফুটবল ) ফাইন্যাল প্রতিযোগিতায় হায়দ্রাবাদ একাদশ দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগান দলের ৩-১ গোলে জয়লাভ।

৬ই আশ্বিন ( ২৩শে সেপ্টেম্বর ): দামোদরের উপর ( হুগলীর চাঁপাডাঙ্গার নিকট ) নবনির্মিত 'বিদ্যাসাগর সেতু'র ( ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি জড়িত ) উদ্বোধন—উদ্বোধক: মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

৭ই আশ্বিন ( ২৪শে সেপ্টেম্বর ): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর অনশন ধর্মঘট—সান্ধ্য এম্-এ ক্লাশ ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধিক সংখ্যক সিট দাবী।

৮ই আশ্বিন ( ২৫শে সেপ্টেম্বর ): কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্তম থানু পিল্লাই ( পি-এস-পি ) পাঞ্জাবের রাজ্যপাল নিযুক্ত—নূতন মুখ্যমন্ত্রী পদে শ্রী আর শঙ্কর ( কংগ্রেস )।

৯ই আশ্বিন ( ২৬শে সেপ্টেম্বর ): কেরল বিধানসভা হইতে শ্রীথানুপিল্লাই-এর পদত্যাগ—মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীশঙ্করের শপথ গ্রহণ।

১০ই আশ্বিন ( ২৭শে সেপ্টেম্বর ): পাঞ্জাবের স্পিতি উপত্যকায় হিমপ্রবাহের ফলে ৮ জন নিহত ও প্রায় আড়াই হাজার লোক আবদ্ধ।

১১ই আশ্বিন ( ২৮শে সেপ্টেম্বর ): আগরপাড়ায় ( ২৪ পরগণা ) বিক্ষোভকারী পাটকল শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ—৬০ জন আহত ও ১৬ জন গ্রেপ্তার।

১২ই আশ্বিন ( ২৯শে সেপ্টেম্বর ): নেফা সীমান্তে পুনরায় চীনা সৈন্যদের সহিত ভারতীয় ফৌজের গুলী বিনিময়।

১৩ই আশ্বিন ( ৩০শে সেপ্টেম্বর ): নেপালের বীরগঞ্জ হইতে বিহারের রক্সৌলে আসিয়া নেপালীদের গুলীবর্ষণ—হোটেলের মধ্যে পাঁচজন আহত।

১৪ই আশ্বিন ( ১লা অক্টোবর ): বিদেশে সফর শেষে নয়াদিল্লী ফিরিয়া শ্রীনেহরুর ঘোষণা: নেফার ঘটনাবলী সত্ত্বেও চীনারা ভদ্র আচরণ করিলে সামান্ত আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত।

১৫ই আশ্বিন ( ২রা অক্টোবর ): গান্ধীজীর ১৩তম জন্মদিবস সর্বত্র জাতীয় সংহতি দিবসের উদ্বোধন। নয়াদিল্লীর অনুষ্ঠানে শ্রীনেহরুর ঘোষণা: ভারত শান্তিকামী রাষ্ট্র হইলেও নিজ ভূখণ্ডে চীনের হামলা কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না।
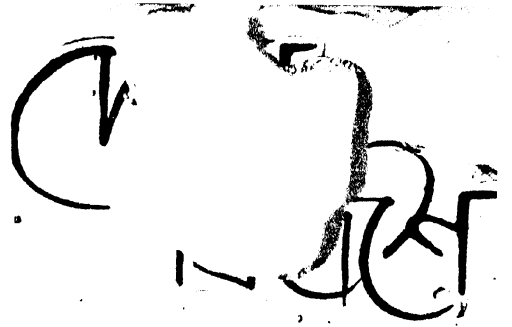
১৬ই আশ্বিন ( ৩রা অক্টোবর ): পৌরসভা ( কলিকাত কর্পোরেশন ) নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তনের ব্যবস্থা—রাজ্য ( পশ্চিমবঙ্গ ) মন্ত্রিসভা কর্তৃক বর্তমান আই সংশোধন করার সিদ্ধান্ত।

১৭ই আশ্বিন ( ৪ঠা অক্টোবর ): 'নেফার অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে'—দিল্লীতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১৮ই আশ্বিন ( ৫ই অক্টোবর ): ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের ( ভারতীয় অধীনে নূতন সৈন্যদল গঠন এবং নেফা সমেত সীমান্তের অংশবিশে রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ।

মূল্যবৃদ্ধি রোধে মহানগরীর ( কলিকাতা ) বাজারের ৩টি ষ্টে ন্যায্যমূল্যের মাছের দোকান চালু।

১৯শে আশ্বিন ( ৬ই অক্টোবর ): মাদ্রাজে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপা ডাঃ পি সুব্বারায়নের ( ৭৩ ) পরলোকগমন।

২০শে আশ্বিন ( ৭ই অক্টোবর ): 'ভারতের এলাকা হইতে আ হটিতে হইবে, তারপর আলোচনা'—চীনা নোটের উত্তরে ভারতের স্প কথা।

দলীয় নির্দেশে কেরলের কোয়ালিশনভুক্ত পি, এস্, পি সদস্যদে পদত্যাগ।

২১শে আশ্বিন ( ৮ই অক্টোবর ): কেরলের রাজ্যপাল শ্রীভিগি গিরি কর্তৃক—কেরল মন্ত্রিসভার পি, এস, পি সদস্যদের পদত্যাগপ গৃহীত।

২২শে আশ্বিন ( ৯ই অক্টোবর ): বিহারের রক্সৌলে নেপা পুলিসের গুলী চালনায় ( ২৯শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা ) প্রতিবাদ—ভার সরকার কর্তৃক বেসরকারী যুক্ত তদন্তের দাবী।

২৩শে আশ্বিন ( ১০ই অক্টোবর ): পারমাণবিক পরী নিষিদ্ধকরণের পন্থা উদ্ভাবন সম্পর্কে দিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত মেক্সিকে প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ম্যাটিওসের বৈঠক—উভয়ের যুক্ত বিবৃতিতে বিশ্বশা জন্য সচেষ্ট হওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ।

২৪শে আশ্বিন ( ১১ই অক্টোবর ): অতি মুনাফা নিরোধ আ বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মাছের প্রধান আড়তদারদের উ নোটিশ জারি—ব্যবসা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পেশ করার নির্দেশ

২৫শে আশ্বিন ( ১২ই অক্টোবর ): নেফা এলাকা হইতে চীনা হটাইয়া দেওয়ার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর কেন্দ্রের নির্দেশ সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২৬শে আশ্বিন ( ১৩ই অক্টোবর ): 'প্রথম ডিগ্রি লাভের প্রত্যেক ছাত্রের ১৫ বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে—উপা সম্মেলনে ( দিল্লী ) শিক্ষাকাল বাড়াইবার প্রস্তাব অনুমোদন।

২৭শে আশ্বিন [illegible] কি করি। [illegible] প্রতিরোধ করার জন্য রাজনৈতিক দ[illegible] তাকে চ[illegible] অনুরোধ [illegible]ব্যবদ্ধ ভাবে সরকারকে সাহায্য [illegible] নিশ্চয়ই অর[illegible] [illegible]। তাই রাধাকৃষ্ণণের আহ্বান। ঠিক সেই সময়েই সে[illegible] টিপে

২৮শে আশ্বিন ( ১[illegible] আমতা করে বললাম : [illegible]তীয় মাধ্যমিক শিক্ষক সম্মেলনের [illegible] ভুল করেছেন, খুব : শ্রী ইউ এন্ ডেবর।

পূর্ব পাকিস্তানের চেক পোষ্টে ভারতীয় মালবাহী ৩০খানি ষ্টীমার ও গাধা বোট আটক রাখার সংবাদ—নেফা ও ত্রিপুরায় মাল সরবরাহ বিপর্যস্ত করার ব্যবস্থা।

২৯শে আশ্বিন ( ১৬ই অক্টোবর ) : ত্রিপুরা সীমান্তে সংঘর্ষ বিরতির আদেশ—চট্টগ্রামে ( পূর্ব পাক অঞ্চল ) ভারত-পাকিস্তান অফিসার-মণ্ডলীর যুক্ত-বৈঠকের প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা।

৩০শে আশ্বিন ( ১৭ই অক্টোবর ) : 'ভারতের সীমানা ম্যাকমেহন লাইন রক্ষার জন্য সরকারের সকল ব্যবস্থাই সঙ্গত হইয়াছে'—ভারত-চীন বিরোধ ( সীমানা সংক্রান্ত ) প্রসঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক মণ্ডলীর অধিবেশনে ( দিল্লী ) গৃহীত প্রস্তাবে ঘোষণা।

**বহির্দেশীয়—**

১লা আশ্বিন ( ১৮ই সেপ্টেম্বর ) : শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যাহারের দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ—সর্বত্র ছাত্রদের অনির্দিষ্ট কালের ধর্মঘট সুরু।

২রা আশ্বিন ( ১৯শে সেপ্টেম্বর ) : রাশিয়া কর্তৃক দ্বিতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক বোমার ( ২৮ মেগাটনী ) পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ।

৩রা আশ্বিন ( ২০শে সেপ্টেম্বর ) : দক্ষিণ ত্রিপুরা সীমান্তে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ও বহু পরিখা খনন—ফেণী নদী অতিক্রম করিয়া পাকিস্তানী ফৌজের ভারতীয় এলাকা 'ছোটখিল' দখল।

৫ই আশ্বিন ( ২২শে সেপ্টেম্বর ) : বুয়েনস এয়ার্সে বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক সরকারী ভবন অধিকার।

প্যারিসে শ্রীনেহরুর ( ভারতের প্রধানমন্ত্রী ) মন্তব্য : 'সোভিয়েট ইউনিয়ন আন্তরিকভাবে শান্তি চায়, কিন্তু চীন বরাবর রাজ্য বিস্তারকামী।'

নেপালের পররাষ্ট্র সচিব শ্রীহৃষীকেশ শা অকস্মাৎ পদচ্যুত—ভারত বিরোধী নেতা ডাঃ তুলসী গিরির উপর দপ্তরের দায়িত্বভার অর্পণ

৭ই আশ্বিন ( ২৪শে সেপ্টেম্বর ) : এডেনের জনতার উপর পুলিশের ব্যাটন চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার—দক্ষিণ আরব ফেডারেশনে এডেনের যোগদান সম্পর্কে হাঙ্গামা।

৯ই আশ্বিন ( ২৬শে সেপ্টেম্বর ) : মুক্ত আলজিরিয়ায় প্রথম প্রধান মন্ত্রী পদে মিঃ আমেদ বেন বেল্লা ( ৪৬ ) নিযুক্ত।

চীনের হামলার উত্তরে লাগোসে শ্রীনেহরুর ঘোষণা : শক্তি দিয়া শক্তি রোধ করা হইবে—ভারত কিছুতেই আপন এলাকা লঙ্ঘিত হইতে দিবে না।

১০ই আশ্বিন ( ২৭শে সেপ্টেম্বর ) : ইয়েমেনে বিদ্রোহী বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল—ইমাম গদীচ্যুত ও নিখোঁজ ( নিহত ? )—মন্ত্রিবর্গ গ্রেপ্তার ও সমগ্র রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

১১ই আশ্বিন ( ২৮শে সেপ্টেম্বর ) : ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত ভারতের শান্তি মিশন ( পরমাণু বিস্ফোরণ বিরোধী ) নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারীর বৈঠক।

১২ই আশ্বিন ( ২৯শে সেপ্টেম্বর ) : আণবিক পরীক্ষা বন্ধের দাবীতে ভারতীয় দ্বিতীয় শান্তি মিশন সদস্য শ্রী ইউ. এন্. ডেবর ও শ্রীরামচন্দ্রনের মস্কো উপস্থিতি।

১৩ই আশ্বিন ( ৩০শে সেপ্টেম্বর ) : কায়রো-এ সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেন্ট নাসেরের সহিত শ্রীনেহরুর বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

১৪ই আশ্বিন ( ১লা অক্টোবর ) : পশ্চিম ইরিয়ানে দীর্ঘস্থায়ী ওলন্দাজ শাসনের অবসান—ইন্দোনেশিয়ার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সাপেক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক শাসনভার গ্রহণ।

১৬ই আশ্বিন ( ৩রা অক্টোবর ) : নূতন মার্কিণ মহাকাশ যানের সফল মহাকাশ যাত্রা—ছয়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণান্তে মার্কিণ মহাকাশচারী ( তৃতীয় ) মিঃ ওয়াল্টার শিরোর ভূতলে অবতরণের সংবাদ।

বৃটেনে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী রেল ধর্মঘট।

১৭ই আশ্বিন ( ৪ঠা অক্টোবর ) : করাচীতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদলের উপর পুলিশের লাঠিচালনা ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার—করাচী হইতে বহিষ্কৃত ১২ জন ছাত্রকে ফিরাইয়া আনার দাবীতে বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের জের।

১৮ই আশ্বিন ( ৫ই অক্টোবর ) : আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ উ থান্টের সহিত শ্রীরাজাগোপালাচারীর ( ভারতীয় শান্তিদূত ) আলোচনা।

২১ আশ্বিন ( ৮ই অক্টোবর ) : ভারতের প্রতি নেপালরাজের ( রাজা মহেন্দ্র ) রক্তচক্ষু ও বজ্রমুষ্টি প্রদর্শন—চীন, পাকিস্তান ও নেপালের নয়া আঁতাতে বিপদাশঙ্কা।

২২শে আশ্বিন ( ৯ই অক্টোবর ) : প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত সাহায্য দানে প্রস্তুত থাকার জন্য রাশিয়ার নিকট ইয়েমেনী বিপ্লব পরিষদের আবেদন—ইয়েমেনে বৃটিশ হস্তক্ষেপের চক্রান্তের জের।

২৫শে আশ্বিন ( ১২ই অক্টোবর ) : 'ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের যত শীঘ্র অবসান ঘটে, ততই মঙ্গল'—সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ গ্রোমিকের মন্তব্য।

২৬শে আশ্বিন ( ১৩ই অক্টোবর ) : কলম্বোয় শ্রীনেহরুর বিপুল সম্বর্দ্ধনা—সিংহলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর তিন দিবসব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফর সুরু।

২৭শে আশ্বিন ( ১৪ই অক্টোবর ) : ভারতের বিরুদ্ধে নয়া-চীনের আর একদফা হুমকী : সীমান্তে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যাঘাত হানার জন্য সৈন্যদল প্রস্তুত।

ইয়েমেন সীমান্তে সংঘর্ষে সৌদী আরব ও জর্ডন সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হওয়ার সংবাদ।

২৮শে আশ্বিন ( ১৫ই অক্টোবর ) 'ভারতীয় এলাকা হইতে চীনারা না হটিয়া গেলে কোন ক্রমেই আলোচনা সম্ভব নয়'—কলম্বোয় শ্রীনেহরুর সাফ উক্তি—চীনের পররাজ্য গ্রাসের দুরভিসন্ধির উল্লেখ।

২৯শে আশ্বিন ( ১৬ই অক্টোবর ) : 'কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণে ভারত আর রাজী নহে'—রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী বি এন চক্রবর্তীর দৃঢ় ঘোষণা।

কাতাঙ্গায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৩০শে আশ্বিন ( ১৭ই অক্টোবর ) : '১৯৬৩ সালের জানুয়ারীর পর আর আণবিক পরীক্ষা হইবে না'—লণ্ডনে ভারতীয় শান্তিদূত শ্রীরাজাগোপালাচারীর আশা প্রকাশ।

## ডনের উল্লাস

"করাচীর ডন পত্রিকাটির চীন প্রীতি হঠাৎ উথলিয়া উঠিয়াছে। চীন-ভারত সীমান্ত সঙ্ঘর্ষ সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'ডন' ভারতের বিরুদ্ধে চিরাচরিত বিষোদ্গার করিয়া লিখিয়াছেন, চীন ভারত আক্রমণ করিয়াছে এ সব ওয়াশিংটনে তৈয়ারী বানানো গল্প। ভারত ইচ্ছা করিয়াই সমগ্র চীন সীমান্তে গণ্ডগোল পাকাইয়াছে এবং নেফাতে যাহা ঘটিতেছে, তাহার মূলে আছে ভারতের ইঙ্গ-মার্কিণ সোভিয়েট পৃষ্ঠপোষকদের উস্কানির ফল। 'ডনের' সাংবাদিকতা ও ভারত বিদ্বেষের নমুনা আমরা যে এই প্রথম দেখিতেছি, এমন নয়; কিন্তু বিদ্বেষ যে কোন নোংরা স্তর পর্যন্ত নামিতে পারে, 'ডনের' এই সম্পাদকীয়টি তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন; কিন্তু 'ডনের' এই বিষোদ্গারকারীরা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, চীন ভারতের ঘাড় মটকাইতে পারিলে পাকিস্তানকেও ছাড়িবে না। পাকিস্তানের এত উল্লাস তখন থাকিবে কি?"

—দৈনিক বসুমতী।

## একটি ঘটনা

"চীনা দস্যুদের ভারত আক্রমণ দেশের মানুষকে কী পরিমাণে উদ্বেলিত করিয়াছে চারিদিক হইতে প্রাপ্ত সংবাদই তাহার প্রমাণ। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বীর জওয়ানদের প্রতি তাহাদের ভালবাসা নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এমন কী যাঁহারা সেনাদলে ভর্তি হইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের প্রতিও দেশবাসীর শুভেচ্ছার অন্ত নাই। গত সোমবার কলিকাতার রাস্তায় একটি ঘটনায় তাহা নূতন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ধমানের চারজন যুবক সেনাদলে ভর্তি হইবার জন্য গোখেল রোডে যাইতেছিলেন। তাঁহারা গোখেল রোড চেনেন না; পকেটে পয়সাও বেশী ছিল না। ফলে ট্রামকনডাক্টর তাঁহাদের পার্ক স্ট্রীটে নামাইয়া দেয়। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও আর্থিক অবস্থার বিবরণ শুনিয়া রাস্তার এক বাঙালী এবং এক গুজরাতী ভদ্রলোক আর্থিক সাহায্য করেন। এক বিহারী শ্রমিকও সাধ্যমত সাহায্য করিবার ব্যাপারে পিছাইয়া থাকেন নাই। গোখেল রোড যাইবেন শুনিয়া রাস্তার লোক যাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করিয়াছেন, মাত্র কয়েকটি ষ্টপের জন্য তাঁহারা ট্রামটি ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কোন যাত্রীকে টিকিট ছাড়া কয়েকটি ষ্টপ যাইতে দেওয়া বে-আইনী মানি। কিন্তু যুবকেরা যখন গোখেল রোডে যাইবার কথা বলিয়াছেন, তখন তাঁহাদের প্রতি একটু সদয় হইলে নিশ্চয়ই আইনভঙ্গের অপরাধ ঘটিত না। কনডাক্টরটি কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## ডাকাতির কেন্দ্রস্থল

"কুখ্যাত আসানসোল অঞ্চল হইতে আবার আর একটি চাঞ্চল্যকর ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। গত শুক্রবার ডামরা কোলিয়ারীর শ্রমিকদের বেতন ও মজুরীর বাইশ হাজার টাকা একদল দুর্বৃত্ত লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার দিকে শ্রমিকদের পাওনা মিটাইবার জন্য এই টাকা লইয়া কর্মচারিগণ যখন কর্মরত ছিলেন, তখন প্রায় বিশজন ডাকাত সেখানে হানা দিয়া কর্মচারীদের মারপিট করিয়া টাকা লইয়া যায়। এবং বাহিরে অপেক্ষমান লোকদের ভয় দেখাইবার জন্য বোমা ফাটাইয়া পলায়ন করে। শ্রমিকদের মজুরীর দিনে তাহাদের প্রাপ্য অর্থলাভে যদি এইরূপ বিঘ্ন ঘটে, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।
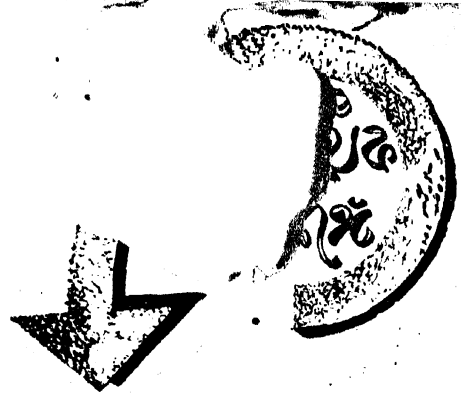
আসানসোল এলেকা সমাজ বিরোধী বহু কাজের জন্য কুখ্যাত হ আছে। দুর্বৃত্ত দমনে সেখানকার পুলিশের ব্যর্থতা বারে ব দেখা যাইতেছে। এই অবস্থা নিঃসন্দেহে শোচনীয়। খনি অ নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি এতই শিথিল যে, এত অধিক সংখ্যক দু একটা খনির ক্যাশের টাকা এইভাবে লইয়া পলায়ন করিতে পারে?"

—যুগান

## বহু প্রয়োজনীয় উদ্যম

"পুরুলিয়া জেলার দুইটি গ্রামে ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের সাহ গরীব চাষীরা একই পতিত ডাঙ্গা জমিতে তিন ধরণের ফসল ফল সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্রকাশ, পুরুলিয়া জেলায় উক্ত ধ কয়েক সহস্র একর জমি আছে। একটি জমিতে যে সাফল্য হইয়াছে, অন্যত্রও কৃষকরা আন্তরিক সরকারী সাহায্য পাইলে ে নিশ্চয় সম্ভব করিতে পারিবেন। কৃষকদের এই কর্ম প্রচে সরকারী আনুকূল্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সর্বতোভাবে সা করা উচিত।"

—স্বাধী

## যুদ্ধের উপকরণ

"কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডী বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই কর্তৃক শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানকে সমরোপকরণ উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হইবে। ইহা অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব, বিগত মহাযুদ্ধে তৎকা ভারত সরকার এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে য সহায়তাও হইয়াছিল। তখনকার সময় অপেক্ষা এখন ভা শ্রমশিল্প অনেক বাড়িয়াছে। উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে ইহ দ্বারা ভারতেই প্রচুর সমরোপকরণ উৎপাদিত হইতে পা ইহাতে কেবল যে যুদ্ধের সহায়তা হইবে তাহা নহে, শ্রমশিল্পক একটা নূতন কর্মের পথ খুলিয়া যাইবে।"

—জনসেব

## বিদেশী সাহায্য বিনা

"আমরা যে এখনও পরাধীন ও পরনির্ভর পদে পদে তা প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সীমান্ত শান্তি আমাদের সাম উপর নির্ভর নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কৃপানির্ভর, ইহা পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে। সীমান্ত যখন আক্রান্ত হইল তখনও ' মুখ চাহিয়া অপোষ প্রত্যাশা করিয়াছি। সীমান্ত ডিঙ্গ যখন চীনা দস্যুরা খাস ভারতে আসিয়া পড়িল, তখন তাহ

তাড়াইবার জন্ত ... টেন-আমেরিকা আমাদের অস্ত্র সাহায্য করি ! ... প্রদিগের তাড়াইতে পারিব। কোনো ... যাহাকে স্বাধীন, বলে তাহা ... তাহাও পরদেশের ঋণে। না ... সেই সময়েই ... যে এমন পরাধীন তাহা ভারত ... না করিলে জানা যাইত না। কবে ... সীমানা রক্ষা করিবার উপাদান উপকরণ তৈয়ারী করিতে পারিব এবং কবে নিজের ঐশ্বর্যে নিজেদের প্ল্যান করিতে পারিব? আজ ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে না।"

—লোকসেবক।

## পাক-কৌশল

"পাকিস্তানের (পবিত্র স্থান) পাক (পবিত্র?) কৌশলের ঠেলায় ত্রিপুরার জনজীবন হামেশা দুর্ভোগের সম্মুখীন হইয়া থাকে। সম্প্রতি ...পাকিস্তান ত্রিপুরা সীমান্তে হামলা চালাইলে—ভারত উহার সমুচিত জবাব দেয়। উহা সীমান্তে ক্রমাগত হামলাবাজীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ ইহা সীমান্তের খণ্ড যুদ্ধ—ইহাকে পুরাপুরি যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যায় না; অন্ততঃ ভারত দেয় না। কিন্তু পাকিস্তান ইহাকে পুরাপুরি যুদ্ধে রূপান্তরিত করিতেই সচেষ্ট দেখিতেছি। কারণ, পাকিস্তান নিজেই হামলা চালাইয়া গোলাগুলী বর্ষণ শুরু করিয়াছে এবং ভারত উহার প্রত্যুত্তর দেওয়া মাত্র পাকিস্তানী লস্করেরা জাহাজে প্রেরিত ত্রিপুরা ও আসামের মাল আটক করিয়া রাখে। উহা যেরূপ সময়ে এবং দ্রুত করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় ইহা পূর্ব-পরিকল্পিত। আরও উল্লেখযোগ্য যে, রেলে প্রেরিত মালও আখাউড়ায় আটক করা হইয়াছে এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে, ঐ সকল মাল ভারতীয় এলাকা হইতে ভারতীয় এলাকায়ই প্রেরিত হইয়াছে। মাত্র পাকিস্তানের উপর দিয়া যাতায়াত করে। আবার এর জন্ত সঙ্গত শুল্ক-অবশ্যই পাক সরকারকে দেওয়া হইয়াছে এবং দেওয়া হইয়া থাকে। যার যে কোম্পানী এই মাল পরিবহন (জাহাজে) করিয়া থাকে তাহার হেড অফিস ভারতেই অবস্থিত। সুতরাং এই মালপত্র আটকের কোন ন্যায় সঙ্গত অধিকারই কাহারও নাই, কারণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন রাষ্ট্রের উপর দিয়া এমত পণ্য আমদানী-রপ্তানী হামেশাই হইয়া থাকে; তাহা না হইলে পৃথিবী চলিতেও পারিত না এবং পাকিস্তানও ভিন্ন রাষ্ট্রের এমন কি ভারতীয় বন্দর ও দিয়া দিয়া পণ্য আমদানী-রপ্তানি করিয়া থাকে। সুতরাং যে পাকিস্তানী অপকৌশল ত্রিপুরার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহা প্রতিরোধের জন্ত যদি কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে সক্রিয় পদক্ষেপ না করেন—তবে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্ভাবনা। আমাদের মনে হয়—পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে সীমান্তের মতই পাকিস্তানী অনৈতিক অপকৌশল কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আশা করি, সরকার এই ব্যাপারটিতে প্রতিবিধানার্থে গুরুত্ব আরোপ করিবেন।"

—গণরাজ (ত্রিপুরা)।

## পুরাতনো চলবে না

"নেহরু সরকার সকল বন্ধু হারাইয়া রাশিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। কিউবা-সঙ্কট সেই রাশিয়াকে চীনের সহিত পুনরায় মিলাইতে বাধ্য করিয়াছে। মস্কোর সংবাদপত্রে ক্রুশ্চেভ-বন্ধু নেহরুর দৈনন্দিন ভাষ্যের একটি লাইনও প্রকাশ করা হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, রাশিয়া পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছে—বিদেশের সাহায্য ভারত লইলে সে চীনকে সাহায্য করিবে, সুতরাং ভারতকে একাই লড়িতে হইবে, ভাগ্যে যাহাই থাকুক; অথবা দলে যোগ দিয়া ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিতে হইবে। পুরাতন নেতৃত্বের নূতন, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী অথবা নূতন নেতৃত্বের অভ্যুদয় ভিন্ন আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় নাই।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী (মেদিনীপুর)

## ব্যবসাদারী চক্রান্ত

"কোথায় কোনো কিছু একটা বাধিলে আর রক্ষা নাই। ব্যবসায়ী মহল যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। হু-হু করিয়া জিনিষপত্রের দাম বাড়াইয়া দিল। সরকারের মুখপাত্রগণ বলেন মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় সরকারের ব্যবসায়ীদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দাম লাফে লাফে বাড়িয়া চলিয়াছে—সরকারের রোষবহ্নিকে ব্যঙ্গ করিয়াই। সরকারের অপদার্থতা ইহারা ভালোভাবে জানে বলিয়াই সরকারকে উপেক্ষা করিতে বাধে না। কোরিয়ার অন্তর্বিপ্লবে ইহারা একবার মুনাফা লুটিয়াছিল। এবার খাস ভারতভূমিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আর যায় কোথা? সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ লইতে আরম্ভ করিয়াছে। ২০শে সেপ্টেম্বর হইতেই ইহারা সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ধাপে ধাপে দাম বাড়াইতে আরম্ভ করিয়া এমন এক স্থানে পৌছিয়াছে যে, জনসাধারণ তাহার চাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না। জাতীয় সংকটকালে যখন সকলের ঐক্যবদ্ধ হইয়া চীন আক্রমণ রোধ করা একমাত্র কর্তব্য সেখানে সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব গঠনের জন্তই যেন ব্যবসায়ীরা মূল্য বৃদ্ধি করিতে কৃত সংকল্প! সংকট মুহূর্তে দেশবাসীর মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টিকে আজ জাতীয় সরকার কি ভাবে দেখিতেছেন, তাহা বুঝি না। তবে এইটুকু বুঝি ব্যবসাদারদের মুনাফালোভী মনোবৃত্তিকে দৃঢ়ভাবে দমন করিতেই হইবে। প্রয়োজন বোধে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া মুনাফালোভীদের সায়েস্তা করিতে হইবে।"

—বর্ধমান বাণী (বর্ধমান)

## বারাসাতের সমস্যা

"বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণার জেলা সহর হইতে চলিয়াছে বলিয়া বারাসাত সহর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের জমির দাম তিন গুণের উপরে উঠিতেছে। জনসমাগম বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বাসাবাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। বারাসাতে বাসা ভাড়া পাওয়া এক বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। বহু পরিবার বাড়ী তৈয়ারীর জমি কিনিয়া বাসা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন। রাজ্য সরকারের গৃহ নির্মাণের ঋণ প্রদানের সুযোগ যদি দ্রুত করা যায়, তবে বহু বাড়ী তৈরী হইতে পারে। আমরা যতদূর দেখিতেছি আলিপুরে ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে গৃহনির্মাণ ঋণের আবশ্যকীয় কাগজ নক্সাসহ আবেদন প্রেরণ করিয়া বার বার রিমাইণ্ডার পাঠাইয়াও আট মাসের মধ্যে সামান্য জবাব পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই সরকারের গৃহ নির্মাণের ঋণ সাহায্যে বাড়া তৈয়ারীর আশা অনেকেই পরিত্যাগ করিতেছেন। ইহার ফলে বারাসাতের বাসাবাড়ীর সমস্যার কিছু সমাধান হইবার সম্ভাবনা দূরে থাকিতেছে।"

—বারাসাত বার্তা (বারাসাত)।

## সদর হাসপাতালে অব্যবস্থা

"সম্প্রতি শিলচর সদর হাসপাতালে ঘুরিয়া দেখার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। সেখানে রোগীরা যে অবস্থায় আছে তাহা দেখিলেও আতঙ্কিত হইতে হয়। বাতাস চলাচলের এবং পরিচর্য্যাকারীদের চলাফেরার জায়গা পর্য্যন্ত না রাখিয়া বিছানার পর বিছানা সাজানো আছে—দশজনের জায়গায় কুড়ি জনকে স্থান দেওয়া হইয়াছে এমন কি বারান্দায় পর্য্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়া রোগী রাখা হইয়াছে। তার উপরও "সিট" প্রার্থীদের ভিড়—ডাক্তাররাও নিরুপায়, সঙ্কটাপন্ন রোগীদের অগ্রাহ্য করিবারও উপায় নাই। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? অবিলম্বে হাসপাতালে শয্যা সম্প্রসারণের ব্যবস্থার দিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় মনোযোগী হইলে দরিদ্র রোগীদের আশীর্ব্বাদ ভাজনই হইবেন।" —জনশক্তি (শিলচর)।

## আখের বদলে গুড় পাওয়া

"শ্রীনেহেরু ভারতকে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মত দেখিয়া থাকেন। তিনি যখন খুশী, যেমন খুশী সম্পত্তির তদারক করিবেন ইহাতে যেন কাহারও কিছু বলিবার নাই। আজ ভারতকে যদি চীনের সহিত একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়, তবে ভারতের জনসাধারণকে কর্ম্মভোগ করিতে হইবে। শ্রীনেহেরুর ইহাতে বড় কিছু আসিয়া যাইবে না, তিনি লম্বা চওড়া বিবৃতি এবং মানবতা ও শান্তি সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সমগ্র বিষয়টি জনসাধারণের নিকট জলবৎ তরল করিয়া ধরিবেন। এদিকে অন্নহীন বস্ত্রহীন সমস্যাজড়িত ভারতবাসী নানারূপ দেশী-বিদেশী ঋণের বোঝা লইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে, এরপর যদি এত বড় যুদ্ধের ব্যয় বহন করিতে হয় তবে ভারতের জনসাধারণের তাহা মৃত্যুতুল্য হইবে। আমরা এ কথা মনে করি না যে ভারতের চীনা হামলা ঠেকাইবার ক্ষমতা নাই। তবে এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, যদি এই চীন ভারত সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তাহা হইবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে তবে ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে, সমগ্র পাঁচসালা পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে এবং ভারতের নৈতিক মেরুদণ্ড যাহা বিদেশীদের নিকট এতকাল খাড়া ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে ২৭খানি ষ্টীমার ৫০টি গাদা বোট ও প্রায় ১৫ কোটি টাকার মাল পাকিস্তানী লস্কররা আটক করিয়াছে। ইহা একটি রাজনৈতিক গগনের ঘনঘটার চিহ্ন মাত্র। হয়ত এই সূত্র ধরিয়া পাকিস্তানের সহিত বিরোধ ঘটিয়া যাইতে পারে। পাকিস্তানী লস্কররা এই কাজ এমনি করে নাই ইহার মধ্যে পাকিস্তানী চক্রান্ত আছে সে কথা বলিয়া দিতে হইবে না। পাকিস্তানের এই স্পর্দ্ধার কারণও হইল শ্রীনেহেরুর দুর্ব্বল পররাষ্ট্রনীতি এবং সেই সঙ্গে অবিরত পাকিস্তানের সঙ্গে নরম ব্যবহার। নেপালের মতিগতিও ভাল নহে, নেপালে এখন হইতে চীনা স্বেচ্ছাসেবক আসিতে শুরু করিয়াছে ভারতের বুকে রক্সৌলে নেপালী সৈন্য বা পুলিশ হোটেলে গুলী চালাইল, তাহার পাল্টা জবাব নেহেরু সরকার দিবেন কোথায় না পরিবর্ত্তে নেপালী লাথি হজম করিতেছেন। আজ যদি নেপালকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় তবে একদিন নেপালের জন্য ভারত সরকারকে আখের বদলে গুড়পাওয়া দিতে হইবে।" —জি, টি রোড (আসানসোল)।

"যুদ্ধক্ষেত্র ... কে নিয়ে যুদ্ধ চলছে, তার অবস্থা ... কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সরকার এব ... ল। এই তুষারাবৃত বন্ধুর পার্ব্ব ... অথবা সেনাবাহিনী অতীত কালে পদার্পণ করেনি ... এই প্রশ্ন জাগে এ হেন এলাকা নিয়ে চীনের ... মাথা কেন? তিব্বত এবং দালাইলামার ব্যাপারটা স্মরণ করলেই চীনের মতলব বোঝা যায়। চীনের উদ্দেশ্য তিব্বত এবং সন্নিহিত অঞ্চল যেখানে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত পীত জাতির বাসস্থান যতটা আছে, সবটাই চীনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ভুটান, সিকিম ইত্যাদিও বাদ যাবে না। তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই ভারত আক্রমণ। চীনাদের যতটা ভারতীয় ভূখণ্ড দরকার তা ইতিমধ্যেই তারা দখল করে নিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। পর্ব্বতচূড়ায় প্রবল তুষারপাত আসন্ন, কাজেই বর্ত্তমান পর্য্যায়ের লড়াই আর সামান্য কয়েকদিন চলবে, তারপর আবার শুরু হতে মার্চ্চ এপ্রিল মাস। ভারত এবং চীনের স্বার্থ ছাড়াও এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দুই পক্ষভুক্ত বৃহৎ শক্তিগুলিও পরোক্ষে জড়িত। রাজনৈতিক মতবাদের সংঘর্ষও এখানে একটি বৃহৎ প্রশ্নরূপে দেখা দিয়েছে।" —বিচার (হাওড়া)।

## ভ্রম-সংশোধন

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান সংখ্যার "চারুকন" বিভাগে প্রকাশিত ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের জীবনীর মধ্যে ভ্রমবশতঃ শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় মহাশয়ের ছবিটি মুদ্রিত হওয়ার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সম্পাদক—মাসিক বসুমতী।

## ভারত আকাশে কৃষ্ণ মেঘ

"ভারতের এই বিপন্ন অবস্থার জন্য যিনি প্রধানতঃ দায়ী, সেই কৃষ্ণমেনন ভারতের আকাশে কৃষ্ণ মেঘ হইয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে এখনো অবস্থান করিতেছেন। বিগত লোকসভা নির্ব্বাচনে এইজন্যই কম্যুনিষ্ট দল তাঁহাকে সমর্থন করিয়া চীনা হামলার তীব্র বাধাদানকারী আদর্শ নেতা আচার্য্য কৃপালনীকে পরাজিত করিয়াছেন। সেই নিমকের হারামী তিনি কেমন করিয়া করিবেন? দৈনিক 'লোক সেবকের' দিল্লীস্থিত প্রতিনিধি জানাইয়াছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল বি, এম, কাউল, যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি, কে, কৃষ্ণমেননের সহিত মতান্তর ঘটায় দুই মাসের জন্য ছুটিতে গিয়াছিলেন, শ্রীনেহরু তাঁহাকে চীনা দস্যু হটাইবার পূর্ণ দায়িত্ব দিয়াছেন। ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই। জাতির এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোন পঞ্চমবাহিনী অবস্থিত থাকিবে, জাতি ইহা কোন মতেই বরদাস্ত করিবে না। সমগ্র জাতির মনোভাব আমরা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দাবী করিতেছি যে অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণমেননকে মন্ত্রিসভা হইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতের নিরাপত্তার জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হউক। ভারতের আকাশ হইতে ঘন কৃষ্ণ মেঘ বিদূরণের ইহাই হউক প্রথম পদক্ষেপ। ইহাতে শ্রীনেহরুর নৈতিক বল সহস্রগুণে বাড়িয়া যাইবে। জাতি জীয়ণ কাঠির পরশ পাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে।" —দামোদর (বর্দ্ধমান)।

কি কবি? ... [illegible]
[illegible] তাকে চলে যেতে অনুরোধ
নিশ্চয়ই তার দয়া [illegible]।
ঠিক সেই সময়েই সে বেল টিপ[illegible]
আমতা করে বললাম: শুনছে[illegible]
ভুল করেছেন, খুব [illegible]

"কথায় বলে [illegible] কিন্তু তথাপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী [illegible] দেশের চোর ডাকাতদের উদ্দেশ্যে [illegible] যে, চীনা আক্রমণের ফলে পুলিশ [illegible] হইতে পারে, অতএব তাহারা যেন [illegible] কার্য্যকলাপ বন্ধ রাখে। জানিনা, শাস্ত্রী ম[illegible] চোর-ডাকাতদের এক কান দিয়া বাহির হইয়া গেল কিনা। তবে শাস্ত্রীজির এ আবেদনের দৃষ্টান্ত ভর করিয়া আমরাও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট সানির্বন্ধ অনুরোধ জানাই যে, সুযোগ পাইয়া তাঁহারাও যেন অধিক মুনাফার অতটুক মোহের পিছনে ধাবিত না হন এবং অকারণে অধিক মূল্য দাবী করিয়া জনগণের মনে অযথা আতঙ্ক ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হইতে বিরত থাকেন। অতীব দুঃখের কথা, কোন একটি কোম্পানী নাকি সুযোগ বুঝিয়া জলপাইগুড়ি হইতে কলিকাতার বিমান ভাড়া ৬০ হইতে ৭০ টাকায় বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ ভাড়া বৃদ্ধি কি এই সময়টিতে না করিলেই চলিত না?"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

## ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধি

"তমলুকে ধান-চালের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী গুদামে চালের অপ্রাচুর্য্য থাকায়, রেশন দোকানগুলি প্রয়োজনমত চাল যোগাইতে পারিতেছে না। ফলে বাজারের চাল-ব্যবসায়ী ও ধানকল-ওয়ালাদের মজা লাগিয়া গিয়াছে। পূজার পূর্ব্বে যে চালের দর কেজি প্রতি ৭০।৭২ ন০ প০ ছিল তাহাই এখন ৭৭।৭৮ ন০ প০ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে গরীব মধ্যবিত্তদের কষ্টের একশেষ হইতেছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের হাতে মজুত যথেষ্ট পরিমাণ চাল রহিয়াছে ইহা প্রচার সত্ত্বেও দেশবাসীদের এইরূপ অভাবনীয় দুর্দশায় ফেলা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থা যা হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক।"

প্রদীপ (তমলুক)।

## জয় অবশ্যম্ভাবী

"দীর্ঘদিন হইতে ভারতের মধ্যে নানা ভেদ-বিভেদ দেখিয়া চীন বিপুল সৈন্য সমাবেশ একযোগে আক্রমণকরত ভারতকে নতি স্বীকারে বাধ্য করিবার যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল, সমগ্র ভারতে যুদ্ধোন্মাদনা দেখিয়া চীনের সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। ভারত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না বলিয়া চীন অতর্কিত আক্রমণে প্রথমটা যে সুবিধা করিয়াছিল, ভারতীয় জোয়ানেরা ক্রমশঃ দুর্ব্বার প্রতিরোধ সুরু করায়, তাহাদিগকে কতকটা বিপন্ন হইতে হইয়াছে। আর তাহার পিছাইবার উপায় নাই। তাই সে মীমাংসার জন্য বহু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শরণাপন্ন। ভারত কিন্তু স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে যে, ৮ই সেপ্টেম্বরে চীন যেখানে ছিল, যদি সেখানে ফিরিয়া না যায়, তবে সে কোন আলাপ-আলোচনা করিবে না। ভারত চীনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যে বলিষ্ঠ মনোবলের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে মার্কিণ প্রভৃতি সমস্ত শক্তিই ভারতের প্রশংসা করিয়াছেন। সকলেই বুঝিয়াছেন—ভারতের জয় অবশ্যম্ভাবী।"

—পল্লীবাসী (কাল্না)।

## ৺তারাপীঠে পানীয় জলের অব্যবস্থা

"তারাপীঠ তীর্থক্ষেত্র হিসাবে এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূজার পর চতুর্দ্দশী তিথিতে এই উপলক্ষে তারাপীঠে বহু জায়গা হইতে যাত্রী সমাবেশ হইয়া থাকে। এ বৎসরের যাত্রীর সংখ্যা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ স্থানে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রচুর। মন্দিরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটি টিউবওয়েল বিদ্যমান। তাহার মধ্যে একটি অচল হইয়া আছে। একটি টিউবওয়েলের উপর আট দশ হাজার লোকের পানীয় জল সরবরাহের চাপ পড়ে। জলের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া অনেককে লাইন দিতে হয়। অবশেষে হতাশ হইয়া অনেককে পুকুর কিংবা নদীর জল বাধ্য হইয়া ব্যবহার করিতে হয়। পানীয় জলের এই অব্যবস্থার জন্য যে কোন মুহূর্ত্তে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা ছিল এবং আজও বিদ্যমান। তারাপীঠে প্রতিনিয়তই দূর দূরান্তরের যাত্রী উপস্থিত হয়। সরকার এবং জেলাবোর্ড এ বিষয়ে পূর্ণ অবহিত আছেন। কিন্তু উভয় কর্ত্তৃপক্ষই এ বিষয়ে চরম উদাসীন। আমরা অকেজো টিউবওয়েলগুলি যাহাতে অবিলম্বে মেরামত হয় এবং আরও দুইটি টিউবওয়েল যথাক্রমে তারাপীঠের উত্তর এবং দক্ষিণ মাথায় যাহাতে প্রোথিত হয় তাহার জন্য রামপুরহাট মহকুমা শাসক মহাশয়ের দৃষ্টি অবিলম্বে আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি আমাদের অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না।"

—বীরভূমের ডাক (বীরভূম)।

## শোক-সংবাদ

### করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের প্রখ্যাতনামা এক সুপ্রবীণ চিকিৎসক লেঃ কঃ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১২ই আশ্বিন ৮৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে উপাধি অর্জনের পর ইনি বিদেশ যাত্রা করেন ও ডাবলিনের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন্সের সদস্য হন। দেশে ফিরে এসে তিনি চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করে নানাভাবে দেশের সেবা করেন ও বিপুল প্রতিষ্ঠা ও যশের অধিকারী হন। মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়ার সার্জেনের আসনে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ইনি ক্যাম্পবেল (বর্ত্তমানে নীলরতন সরকার) হাসপাতালের সার্জেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আসনে সমাসীন ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের কনসালটেণ্ট সার্জেন ছিলেন। "ট্রপিক্যাল সার্জারি য়্যাণ্ড সার্জিক্যাল প্যাথলজি", "অপারেটিভ সার্জারি" এবং "সিফিলিস" নামক তিনখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থের ইনি রচয়িতা। এঁর মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন প্রভূত খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাধর চিকিৎসককে হারাল।

### সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

রাজর্ষি রামমোহন প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য পণ্ডিতপ্রবর সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ গত ৭ই আশ্বিন ৭০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ প্রতিভা এঁকে সুধীসমাজে একটি বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছিল। তাঁর সমগ্র জীবন বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানের সাধনায় উৎসর্গীত। ইনি বিখ্যাত নট-নাট্যকার স্বর্গত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অনুজ ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

## পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, মাসিক বসুমতী'র শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৬৯) শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিশ্বজয়ী মল্ল গামা' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার সামান্য বক্তব্য আছে। এই বিস্তৃত প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ প্রামাণিক কি না তা যেমন জানতে ইচ্ছে করে, তেমনি লেখকের একটি অভিমত যা একান্তই মিথ্যে তার প্রতিবাদ জানানোও দরকার বলে মনে করি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারত পরপর তিনবার বিশ্ববিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছিল।' কোন্ তিনবার? কোন্ ভারতীয়েরা লাভ করেছিলেন বিশ্ববিজয়ীর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি? লেখকের অভিমতের প্রামাণিক সূত্রই বা কি? উক্ত প্রবন্ধের পরবর্তী কয়েকটি লাইন পড়লে মনে হতে পারে যে ১৯০০ সালে গোলাম পালোয়ান ও ১৯১০ সালে বড় গামা পালোয়ান বুঝি সে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যতদূর জানি, গোলাম বা বড় গামা বিশ্ববিজয়ের অনুরূপ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখালেও তাঁদের কপালে বিশ্বজয়ীর আনুষ্ঠানিক তিলকের ছাপ পড়েনি। কারণ এই শতাব্দীর সুরুতে ওয়াকেনহাস মতলে তুর্কী মল্ল কোর দেরেলি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর বলে স্বীকৃত হলেও প্যারিসের দঙ্গলে গোলাম বনাম কোরদেরেলির কুস্তি বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপ হিসেবে অনুমোদিত ছিল না। সে দঙ্গলে জিতেও গোলাম পালোয়ান তাই আনুষ্ঠানিক খেতাব পান নি। একই কথা বলা যায় লণ্ডনে আয়োজিত বড় গামা বনাম জিবিস্কোর লড়াই সম্পর্কে। এটি ছিল ইউরোপীয় প্রাধান্য প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব করেন তদানীন্তন এম পি এবং 'জনবুল' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ হোরেশিও বটমলে। জিবিস্কোকে হারিয়ে বড় গামা সেদিন জন বুল বেল্ট ও ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ান আখ্যা এবং আনুষঙ্গিক পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই সাফল্য উপলক্ষে গামা ইউরোপীয় মল্লসমিতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশ্বজয়ী মল্ল বলে স্বীকৃত হন।' ঠিক ঠিক হিসাবে জিবিস্কো কি তখন বিশ্বের ক্রমপর্যায় তালিকার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? গোবরবাবু 'নাতি-গুরু ওজনের জগজ্জয়ী মল্ল হয়েও বড় গামাকে তাঁর আহ্বান জানাননি'—শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তির আমি প্রতিবাদ জানাই। কারণ এই উক্তিতে ঐতিহাসিকের সততা ক্ষুন্ন হয়েছে ও অসত্য প্রশ্রয় পেয়েছে। এবং আমার আশঙ্কা এই যে এই একটিমাত্র অপভাষণে বড় গামার বড় পরিচয় রাখার চেষ্টায় গোবরবাবুকে ছোট করা হয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের জানা না থাকলেও বাস্তবে গোবরবাবু বড় গামাকে 'আহ্বান' জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বানের সূত্রেই ১৯২ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার মধ্যস্থলে (আজ যেখানে মৌলা আজাদ কলেজ ভবন দাঁড়িয়ে আছে) একটি বিরাট মণ্ডপ তৈ হয়েছিল, গোবরবাবুদের পক্ষধারী সংগঠকদেরই উদ্যোগে। স্থির ছি ৬ই এপ্রিল সেই আসরে বড় গামা বনাম গোবরের কুস্তি হবে দলবল নিয়ে বড় গামা সময় থাকতে কলকাতায় হাজিরও হয়েছিলে সবই ঠিক ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কুস্তির ক'দিন আ গোবর টিপথেরিয়া আক্রান্ত হওয়ায় সে দঙ্গল ভেস্তে যা সুতরাং গোবর বড় গামাকে আহ্বান জানাননি, কথাটি খাঁটি ন আরও বলা যেতে পারে যে ১৯১০ সালে বিদেশ যাবার আগে লাহোরে বড় গামাদের আখড়ায় এবং ইংলণ্ড সফর কালে গামা ও গোবর মাসতিনেক ধরে নিয়মিত 'জোর' করে পালোয়ানী পরিভাষায় 'জোর'-এর সঠিক অর্থ কি, আশা করি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের জানা আছে, যেহেতু তিনি দঙ্গলী কুস্তি সম্ প্রবন্ধ রচনায় হাত দিয়েছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'গে বাবু কিন্তু গামাকে সমীহ করেই চলতেন।' সমীহ করার নিশ্চয়ই ভয় পাওয়া বা এড়িয়ে যাওয়া নয়। যদিও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যা লেখনীমুখে 'আহ্বান জানান নি' এই অসত্যভাষণ থাকায় সম বিকৃত অর্থ করাও বিচিত্র নয়। কোন্ বড় পালোয়ান সমপর্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমীহ করতেন না? এ বিষয়ে স্বয়ং বড় গামাই সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত নন? পরিণত বয়সে হামিদা, ছোটগামা, বক্সের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সর্ত রাখার নজীরে কি বোঝা অথবা তারও আগে বড় গামার ভরা যৌবনে আলি পালোয়ানের বারংবার 'তাল' (চ্যালেঞ্জ) ঠোকার পরও বড় নিরুত্তর ভূমিকা কিসের সাক্ষ্য বহন করে? তবে সে প্রসঙ্গ য আমি বিষয়ান্তরে যেতে চাই না! আমার বক্তব্য, 'সমীহ ক বলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বড় গামার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও গে প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। তাছাড়া গোবর বাবু 'আ জানান নি' এই উক্তিতে অসত্যের প্রশ্রয়ে তিনি ইতি অস্বীকার করতে চেয়েছেন। গামা-গোবরে প্রকাশ্য কুস্তি হলে ফলাফল কি দাঁড়াত তা নিয়ে গবেষণা করার অধিকার উক্ত নেই। কারণ মালমসলার অভাব। যদি মনে মনে ধরেই যায় যে, সে ক্ষেত্রে বড় গামাই বোধ হয় জয়লাভ করতে তাহলে কি ইতিহাসকে উপেক্ষা করবার মূলধন উত্তরকালে থাকে? ইতিহাসের মর্যাদা রাখায় লেখকের যে দায়ি

ঐতিহাসিক। সেই ... হলে আমরা পাঠকেরা বিভ্রত, ... ডাকে চ... পত্রের উৎস পাঠকের সেই বিভ্রম ... কিন্তু ভুল ধরবার স্পর্ধা নিয়ে আমি এই ... ঠিক সেই সময়েই সে ... সন্ধানে ঠিকপথে নিজেকে নি... আমত করে বললাম ... আমার মনোভাব উপলব্ধি করেই ... ভুল করেছেন, খুব ... পত্রিকার লেখক শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় যথা... করবেন। নমস্কারান্তে, ভবদীয়—অজয় বসু- ৬, এ, রামচন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৭।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীশান্তিপ্রিয় রায়, ষ্টেশানমাষ্টার, পূর্ব রেলপথ, ডাক-পাকুড়, (এস পি), বিহার * * * শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম-ক্ষুসতারা, ডাক-হাট-আশুরিয়া, (বেলিয়াতোড় হয়ে), জেলা-বাঁকুড়া * * * শ্রীমতী ইরা মজুমদার, অবধারিক-প্রধানশিক্ষিকা আর, এস, গার্লস এইচ, এস এম, স্কুল ডাক-তমলুক, মেদিনীপুর * * * শ্রীমতী দীপিকা সেন, অবধারক-ডক্টর দেবব্রত সেন, ডি/২ ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্স, কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়, ডাক-কুরুক্ষেত্র, জেলা-কর্ণাল পাঞ্জাব * * * ডা: এস, এম, ধর, চাঁদকীরা, ডাক এবং চা বাগান, কাছাড় * * * শ্রীমতী অর্চনা দত্ত, অবধারক-বি, এস, ... ডাক-জিরো, নেফা * * * শ্রীগোপালচন্দ্র মাহাতো, সচিব জনশিক্ষা পাঠাগার, গ্রাম-কেশরা, ডাক-জয়, বাঁকুড়া * * * শ্রীদুলালচন্দ্র কোলে, ১ শরৎ ঘোষাল ঘাট লেন, গ্রাম ও ডাক-আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা * * * শ্রীসুধাংশুকুমার নস্কর, মালীঘাটি গোচারণ, ২৪-পরগণা * * * প্রধানশিক্ষক, এস, কে, জুনিয়ার হাই স্কুল, ডাক-কোটা- বীরভূম * * * শ্রীমতী শান্তি চৌধুরী, অবধারক-শ্রীআর, চৌধুরী, লাইফ ইনস্যুরেন্স করপোরেশান অফ ইণ্ডিয়া, ১১৬/১ সিভিল লাইনস, ঝান্সী উত্তর প্রদেশ * * * শ্রীমতী বিজলীরাণী দেবী, অবধারক-শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাবুপাড়া, ইমফল, মণিপুর, আসাম * * * অধ্যক্ষ, গুরুদাস কলেজ, নারিকেলডাঙা কলিকাতা-১১ * * * শ্রীএস, এন, হোম, সচিব, বঙ্গভারতী রাইপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি, দেরাদুন * * * শ্রীএম, রামচন্দ্রন, কম্যাণ্ডিং অফিসার, ০৬৩৮/১৪৬, ... ডি, এন, ৩ আসাম, অবধারক ৫৬ এ, পি, ও * * * "থ্রি স্টার্স", ফ্ল্যাট নং ৫, 33rd Road, টি, পি, এস, ৩, বোম্বাই-৫০ * * * শ্রীকে, এম, সাহা, ইন্সপেক্টর, রেলওয়ে কোয়ার্টার নং ৪৩৫এ, বরোদা নিউ ইয়ার্ড, বরোদা-২ * * * প্রধানশিক্ষক, রামেশ্বর ই, টি, স্কুল, ডাক-জানকীয়া, পুরী, উড়িষ্যা * * * শ্রীএস, সেন, লিউ ভিলা, হিল কার্ড রোড, কার্সিয়াং দার্জিলিঙ * * * শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা, অবধারক-ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ম্যাড্রাস, পো: বক্স ১২৬৪, মাদ্রাজ-১ * * * সচিব দলদলি বাণী গ্রন্থাগার, ডাক-চাবলতা, জেলা-পুরুলিয়া * * * শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬/১২৮৮ টাউনশিপ কলোনী, চেম্বুর, বোম্বাই * * * শ্রীমতী ছবি ভট্টাচার্য, "ষোড়শী কুটীর," ১৬৮ ঠাকুরবাড়ী ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী * * * শ্রীমতী শোভা দত্ত, অবধারক ডা: এস, সি, দত্ত, চাসনাল্লা কোলিয়ারী, ডাক-পাথরডিহি, ধানবাদ * * * ক্যাপ্টেন বি, আর, সিংহ, ভগবানবাজার, ছাপরা * * * শ্রীমকবুলার রহমান, মুন্সীগঞ্জ, কুষ্টিয়া।

Sending Rs. 15/- as my annual subscription Dr. A. K. Gupta, M. O. Monigong. P. O. Along

নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১৩৬৯ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত মাসিক বসু... পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ৭.৫০ নয়া পয়সা মণি অর্ডার যোগে পাঠান হইল। শ্রীমতী বীণা নাগ, অবধারক এইচ ডি নাগ, ভূপাল, (এম. পি.)

I am Sending herewith the sum of Rs. 15/- being the renewal subscription for the Monthly Basumati for one year. Please acknowledge. The Rector, St. Paul's School. Jalapahar, Darjeeling.

A sum of Rs 24/- is sent per money order. Please send the copy from the month of Sravan Dr. B. B. Dutt, Jamalpur, (Mongheyr.)

১৫৲ টাকা মণি অর্ডার যোগে পাঠান হইল। বইগুলি তাড়াতাড়ি পাঠাবেন। শ্রীমতী আভা বিশ্বাস, বোকারো, হাজারিবাগ।

I sent herewith Rs 15/- being the renewal subscription of the Monthly Basumati for the year 1962-63. Hony. Secretary, S. E. Rlys. Institute Dongargarh.

Rs. 15/- is sent herewith as the yearly subscription for the year starting from Ashar—Sm. Aparna Das. P. O. Netajinagar, Dt. Cachar. Assam.

From Bhadra 1369 Rs. 15/- is sent herewith for one year. Dr. F. Chrestien Chrestien Lodge, Dighee P. O. Barharwa, S. P.

Sending Rs. 15/- being the yearly subscription for the Masik Basumati. R. N. Sikdar, Carron T. E & P O Jalpaiguri.

শ্রাবণ সংখ্যা হইতে এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠান হইল। আশা করি যথা সময়ে আপনাদের পত্রিকা পাঠাইতে থাকিবেন। শ্রীমতী মালতীরাণী গাঙ্গুলী, পোষ্ট অফিস ডাইনং পার্ক, ইষ্ট বোম্বাই—৫৭।

২১৲ টাকা পাঠান হইল। অনুগ্রহপূর্বক বৈশাখ থেকে এক বৎসরের জন্ম মাসিক বসুমতী রেজিষ্ট্রিডাকে পাঠাইবেন।—Dr. Arun Ch. Dey, A. M. O., Kakajan T. E., P. O. Nakachari Assam.

Rs. 15/- is sent herewith as the annual subscription for the year 1369 B.S. Please send the magazine.—Sushil Kumar Bhattacharyya, Scientific Department, P. O Paritola, Dt. Lakhmipur, Assam.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য টাকা ১৫৲ পাঠাইলাম। ভাদ্রের সংখ্যা হইতে ঠিকমত বসুমতী পাঠাইতে অনুরোধ করি।—শ্রীমতী সুস্মিতা মল্লিক, নর্মদা নিবাস, পোষ্ট: প্যারাক, বোম্বাই-১২।

Please find herewith the annual subscription of Rs. 15/- for the Masik Basumati from Ashar 1369 B.S. Director, West Bengal Forests School Division. Darjeeling.